

শ্রীমতী বত্মকে আক্রমণের নেপথ্যে

ডাঃ গোপাল সেনের হত্যা রহস্য

দর্পণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দর্পণ পুস্তিকা মহল থেকে খবর পেয়েছে যে, নকশালপন্থীরা তাদের গণবাহিনীর মধ্যে সম্মুখ আক্রমণের জন্য আত্মঘাতী (সুই-সাইড) ইউনিট তৈরী করেছে। তাদের কাজ হবে, দরকার হলে, নিজের জীবন দিয়েও শত্রুকে আক্রমণ করা, এবং প্রতি আক্রমণেই অবশ্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতেই হবে।

পুস্তিকা মহলের আরও খবর : রাজ্যে গত মধ্যাহ্নে নির্বাচনে (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

[বাদ্যপদর বিশ্ববিদ্যালয়ে]

উপাচার্য ডাঃ গোপাল সেনের হত্যা সম্পর্কে আমরা একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিটি সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় প্রথম পৃষ্ঠার প্রকাশ করলাম। অবশ্য এই পত্রের লেখক হিসাবে যে কমিটির নাম নীচে দেওয়া হয়েছে এটি সত্যিই তারা লিখেছেন কিনা আমরা জানিনা — সম্পাদক, দর্পণ]

গত আটই জানুয়ারী আপনার প্রকাশিত গোপাল সেন হত্যারহস্য সংক্রান্ত সংবাদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য “মতামতে”র পাতার প্রকাশের জন্য পাঠ্যক্রম। আশা করি সং, নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক

সম্পাদক হিসেবেই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করবেন।

আমেরিকার অর্থসাহায্যে পুস্তক সাক্ষ্যবাদী “ইন্সট্রাক্ট” শিক্ষাব্যবস্থার পুরোহিত, আজীবন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী গোপাল সেনকে অত্যন্ত নৃশংসিত্বকে আমরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি।

কেননা, এই শিক্ষাব্যবস্থা আধাসামন্ততান্ত্রিক এবং আধাওপনিবেশিক ভারতবর্ষের উৎপাদন ব্যবস্থার এবং প্রশাসন যন্ত্রের নাটকীয় অর্থায়ন বৃদ্ধির স্পেশালিষ্ট, “গ্ল্যাডিসনাল ইনস্ট্রাক্টর্যাল” ও “অগনিক ইনস্ট্রাক্টর্যাল” তৈরী করে। তৈরী করে “বাবু” শ্রেণী যাদের অবস্থিতি প্রমিতকৃষকের অঙ্গান প্রাণগণ থেকে অনেক দূরে। এই শিক্ষাব্যবস্থা আমূল ধ্বংস করার জন্য আমরা প্রস্তুত—প্রস্তুত জন হলে আমরা “ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং” ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেব। কেননা, ওইখানেই আমরা নতুন মন্ত্র অঙ্গান বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব প্রমিত কৃষকদের জন্য। আমাদের মর্কিফোর্ডি গঠিত হয়েছে।

এই ঘটনার দেশের দক্ষিণপন্থী প্রতিজ্ঞাশীল দলগুলি এবং সামাজিক সাক্ষ্যবাদের তলপটী-বাহক দলগুলির সকলেই একতান সূত্রে কষ্ট মিলিয়ে অশ্রুপাত করেছে। আমরা যে সঠিক পথে আছি এটা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। ১৯৪৭ সালে পাওয়া তথ্যকথিত স্বাধীনতার পর যত কৃষক-প্রমিত নারী ও বর্ষাক্ষিকের এ প্রশাসন যন্ত্র হত্যা করেছে তাদের মায়ের চোখের জলের স্মৃতি আমরা ভুলিনি। তাই আমরা গ্রামাঞ্চলে “শতম” অভ্যাসের স্বারা ঘাঁটি এলাকা সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইমারতের স্তম্ভগুলির উপর আঘাত হানছি এবং হানব। আমাদের শতমের তালিকা দীর্ঘ। কেননা, ওই তালিকা অনেক মায়ের অশ্রু দিয়ে মহান ভারতবর্ষের সমৃদ্ধভূমির ওপর লেখা এবং অগণিত কৃষক প্রমিতের শ্রেণীস্থলা ও ক্রোধের অগ্নিতে পরিণত।

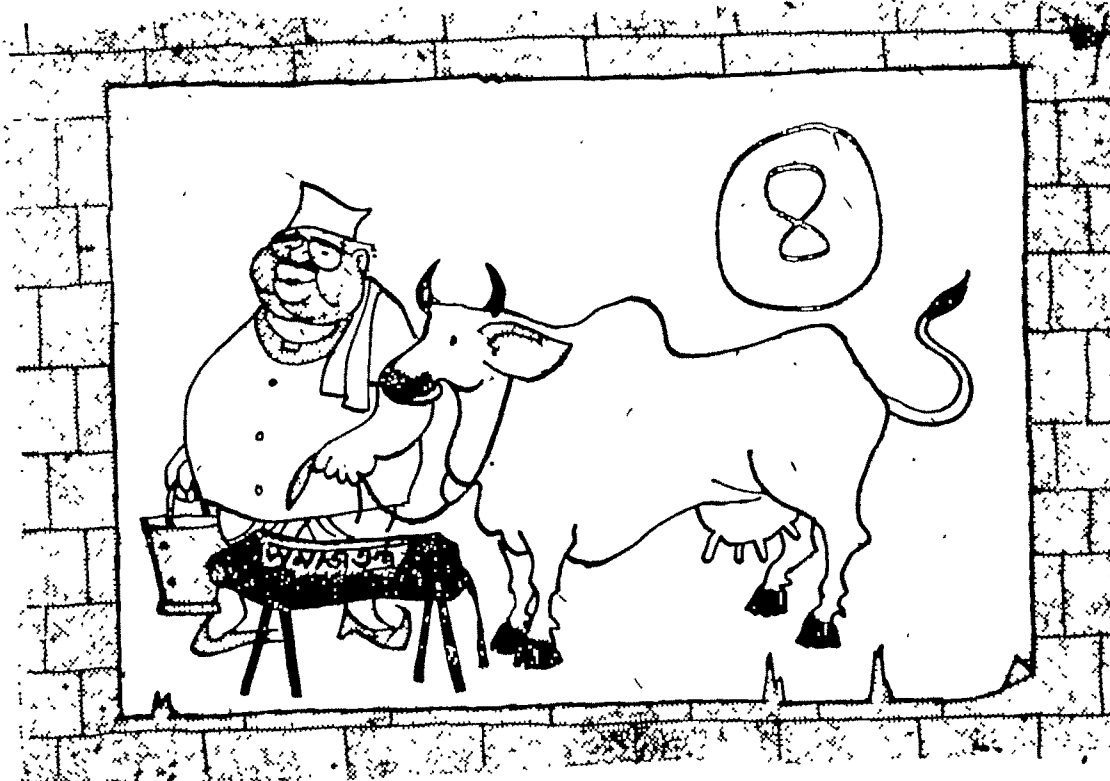
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বাংলা কংগ্রেসে তীব্র অন্তর্বিরোধ

(বিশেষ সংবাদদাতা)

একুশে জানুয়ারী বৃহস্পতি তার বাংলা ও নবকংগ্রেসের জোট করার চেষ্টা দ্বিতীয়বার ভেঙে যার পর বাংলা কংগ্রেসে সাংগঠনিক সংকট দেখা দিয়েছে। এই সংকটের কেন্দ্রে রয়েছেন সুশীল ডাঃ। প্রবব মদ্যাজ্ঞী ও হারিদাস মুখ্য নিরাশ হয়ে বসে পড়েছেন যে তার আগে একবার ছুটে গিয়েছিলেন জনৈক করোয়ার্ড বক নতুন বাড়ীতে, যদি তারা কিছু করতে পারেন, সি পি আই নেতাদের সঙ্গে পরোক্ষে যোগাযোগ করা যাইল, কিন্তু দুই পক্ষই বলেছেন শীলবাবু থাকতে কিছু হবে না। বাংলা কংগ্রেস থেকে আট র উদ্দেশ্যে এই কৃষ্ণ নেতৃ-একটিশে জানুয়ারী পর্যন্ত বসে চলেছেন, কারণ ঐ দিন মদ্যাজ্ঞী কলকাতা ফিরবেন।

(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়)



গুয়াগন-ব্রেকারদের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজস

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কিছুদিন আগে রেলপুলিশের সি পি আই জি শ্রীমতীল চৌধুরীকে কলকাতার পুলিশে বদলি করা হল। তখন পূর্ব রেলওয়ের কয়েকজন উচ্চমহলের কর্মচারীকে নিষ্ঠমহলে আক্রেপ করতে শোনা গিয়েছিল। তারা আক্রেপ করে বলেছিলেন যে, অনেকদিন পরে মিঃ চৌধুরী রেলপুলিশকে কিছুটা সংগঠিত করে এনেছিলেন এবং মালগাড়ী লুট করে যারা প্রতিবছর রেলের কয়েক কোটি টাকা লোকসান করে তারাও বেকারদার পড়েছিল। মিঃ চৌধুরীর পদে যিনি এলেন তিনি কিন্তু সে সুনাম বজায় রাখতে পারেন নি, বরং রেল মহ-এর ধারণা ওরাগন-ব্রেকারদের সর্বকলাপে বাত অবাহত থাকে তদিকেই তিনি নজর দিয়ে আস-ছেন।

এই মহলের ধারণা পুলিশ যদি সত্যিই চান তাহলে এদের প্রতিহত করা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এই ওরাগন ব্রেকারদের গতি-বিধি বরা জানেন তারা বলছেন—তিলজলা, বালাগঞ্জের একাংশ, বেলেঘাটা, মানিকতলা, চিৎপুর, শিবপুর, এবং কালীঘাটে ওরাগন ব্রেকাররা স্বচ্ছন্দেই চলাফেরা করেন। আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলেন যে, পুলিশ মোটেই নির্ভীক নয়—বরং সক্রিয়ভাবে এদের সাহায্য করছে। এবং কোন কোন জায়গায় আর এস পি কর্মীরা বাধা দিতে গিয়ে পুলিশ-ওরাগন ব্রেকার যুক্ত আক্রমণের শিকার হয়েছে। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যে তাঁদের ধারণা সি পি আই জি এদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন।

রেণু চক্রবর্তী সুবিধামত আসন পাচ্ছেন না

আট পার্টি জোটে আসন নিয়ে দর কষাকষি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি পি আই শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর জন্য একটা সুবিধামত আসন খুঁজে পাচ্ছে না, অর্থাৎ এমন একটা বিধান সভা কিংবা লোকসভা আসন যেখানে তিনি দাঁড়ালে স্বচ্ছন্দে নির্বাচিত হতে পারেন। এখন শোনা যাচ্ছে শ্রীমতি চক্রবর্তীর জন্য সি পি আই বাজ-গজ বিধানসভা আসনে প্রার্থী অনুমোদন পশ্চিম বাংলায় হিংসাত্মক কার্য-কলাপে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের কিছু কিছু কেস সরকারের, উপ-দেষ্টা বোর্ড পর্যালোচনা করে-ছেন। এই কাজ এ পর্যন্ত দু-দফার করা হয়েছে। উপদেষ্টা বোর্ড নাকি সবগুলি গ্রেপ্তারই অনুমোদন করেছেন।

দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আগে ঠিক ছিল ব্যারাকপদর অঞ্চল থেকে উনি লোকসভা আসনে দাঁড়াবেন, কিন্তু ঐ আসন ওর পক্ষে নিরাপদ নয় বলে পার্টি মনে করে। এদিকে বর্মিলগজ বিধান সভা আসন নিয়েও কামেলা আছে, অষ্ট-বামের মধ্যে। কারণ, এস ইউ সি ঐ আসনে অধ্যাপক সুরকোমল দাশ-গদ্যকে দিতে চান। ঐ পার্টির ধারণা যে, অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যকে ঐ আসনে পরাজিত করতে একমাত্র অধ্যাপক দাশগদ্যই সক্ষম। কারণ, প্রথমতঃ এস ইউ সির দক্ষিণ কলকাতায় পার্টি সংগঠন অষ্টবামের অন্যান্য শরিকদের থেকে অনেক ভাল, আর দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক হিসাবে শ্রীদাশগদ্য বহুল পরি-চিত। সি পি আই শ্রীদাশগদ্যের প্রার্থী হিসাবে যোগ্যতার কোন (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

দর্পণের বিশেষ সংখ্যা

বর্তমান সংখ্যায় দর্পণ চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে দর্পণের উনিশে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যারূপে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যা থাকবে নিয়মিত সংখ্যা, বিভিন্ন ফিচার, কাটুন ছাড়াও বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধ

বঙ্গদর্শন

চলক, সরকার

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ডামা-ডোলে নির্বাচনী আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে। অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলে সাংগঠনিক ও আরও নানা ধরনের সমস্যা। তাদের সামনে, নির্বাচনের মধ্যে অনেক বিরোধিতা সত্ত্বেও, একটিই সাধারণ শত্রু এবং তা হল মার্কসবাদী পার্টি। আসন ভাগাভাগির ভিত্তিতে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে একটি স্বতন্ত্র নির্বাচনী মোর্চা খাড়া করার চেষ্টা হয়েছে, যাতে এই বিরোধী ভোট ভাগ না হয় আর মার্কসবাদীদের পরাজয় সুনিশ্চিত করা যায়।

কিন্তু জোট বাঁধার প্রাথমিক চেষ্টাতেই ষেরোষেরির ফলে কোন জোটই এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। যে অষ্টবামের জোট গত এক-বছর ধরে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে এবং অজয়বাবুকে সামনে রেখে প্রচণ্ড রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে আসছিল, তা আজ আর অষ্টবাম নেই। দুর্ধা লীগ এই জোটে কোনওদিনই ঠিকমত ছিল না, এখন একদমই নেই। এস এস পি আর বিরোধী পি এস পি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে; আর এই অংশগুলি অপরাপর জোটে আসনের লোভে হাজির হয়েছে। আর সি পি আই এবং বলশেভিকদের ছোট ছোট অংশ তথাকথিত অষ্টবামের শরিক কিন্তু তাদের উপস্থিতি সংখ্যা বাড়ায়, শক্তি নয়।

অষ্টবামের নেতা সি পি আই মহা ফাঁপরে পড়েছে। কারণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে সি পি আই শাসক কংগ্রেস আর বাংলা কংগ্রেসের অতি নিকট। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রয়োজনে সি পি আই শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে পারি বজায় রাখতে পারবে না। বাংলা কংগ্রেসকে সি পি আই জোটে পেলে বটে যেত, আর সে জন্য সি পি আই নেতারা আপ্রাণ চেষ্টাও করেছেন। বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখার্জীও তৈরী ছিলেন। কিন্তু পার্টির নীতি নির্ধারণ করেন সুরশীল খাড়া। এমনকি তথাকথিত বামপন্থী পার্টির ছায়া মাড়তেও তিনি নারাজ। তাই সি পি আই-এর অনেক অন্তর আবেদন সত্ত্বেও সুরশীল খাড়া কোনও ক্রমেই ওদের জোটে যান নি।

এখন স্পষ্ট দাঁড়িয়েছে নির্বাচনের মধ্যে। অবশ্যই আসন ভাগাভাগি নিয়ে। নীতির কথা, কর্মসূচীর কথা এখন শিকের উঠেছে। কোন আসনগুলো নিলে জয়

নিশ্চিত করা যায় সেই চিন্তা। মেদিনীপুরে সি পি আই এগারটি আসনে প্রার্থী দিয়ে, উনিশশ উন-সত্তর সালে দশটি আসনে জিতেছিল। কিন্তু এবারে ত আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র নয়। বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে, সি পি আই-এর সঙ্গে, শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই এবার নির্বাচনের ঘাঁটিতে মূখোমুখি। জয় এবার অত সুনিশ্চিত নয়। অন্যান্য জেলায় বা কলকাতায় আসনের কথা ত ছেড়েই দেওয়া যায়। তথাকথিত অষ্টবামের অন্যান্য শরিকদের লড়াই শুরুর করার আগেই মনোরল বিষদন্ত।

বিভিন্ন সভায় অজয়বাবু বলতে আরম্ভ করেছেন এবারেও রাজ্যে শ্রমিক জোরদার সরকার গঠন সম্ভব হবে না। রাজনীতির সেই একই অনিশ্চিত অকথা থেকে বাবে। এই উক্তি অবশ্যই আশ্বিনবাসের নয়। আর এ কথা বলাবাহুল্য যে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবারের মধ্য-বর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক দৃঢ় সরকার পেতে ইচ্ছুক। গত নির্বাচনেও মানুষের সেই দাবীই

ছিল আর তাই যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য আঠার জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু পারস্পরিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচণ্ড পার্থক্য থাকার ফলে সরকার টিকতে পারে নি। অজয়বাবুর বক্তৃতার মানুষের মনে আশার সঞ্চার হবে না এবং সেই কারণে অজয়বাবুর পার্টিতে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করতে সাধারণভাবে মানুষ চাইবে না।

এই দিক থেকে অষ্টবামের যে করণী দল এখনও এই জোটে পড়ে আছে তাদের পক্ষেও বিকল্প সরকার গঠনের কোন আশ্বাস দেওয়া সম্ভব নয়। এই দলগুলি অবশ্যই জেলা ভিত্তিতে কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস অথবা অন্যান্য সি পি আই বিরোধী জোট বা দলের সঙ্গে আসনভিত্তিক রফার চেষ্টা করবে কিন্তু সেত দুই একটা আসন বাড়াকমার ব্যাপার।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আসল লড়াই হবে নব কংগ্রেস আর সি পি আই-এর মধ্যে। কিন্তু নব কংগ্রেসের সংগঠন সবে গড়ে উঠছে। আগেকার কংগ্রেসের যে শতকরা চল্লিশ বা বিশাংশ ভাগ পাকাপোক্ত ভোট তা এবার ভেঙ্গে বাবে কারণ কংগ্রেস আজ নব কংগ্রেস আর আদি কংগ্রেসে বিভক্ত। এখনও কোন কোন মহল নব কংগ্রেস, আদি কংগ্রেস আর বাংলা কংগ্রেসকে এক সঙ্গে সি পি আই-এর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদের মধ্যে প্রকাশ্যে কাজ চালাচ্ছেন পি এস পি নেতা সমর গুহ। তাঁর ধারণা সি পি আই-বিরোধী ভোটারের সংখ্যা এই পার্টির পক্ষের ভোটার থেকে অনেক বেশী। এই বিরোধী ভোটারদের চাপে শেষ পর্যন্ত জোট সম্ভব হবে বলে সমর গুহের আশা। কিন্তু এই আশা কতটা সফল হবে সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। আর এই জোটের প্রয়োজনীয়তার কথা বত জোরের সঙ্গে বলা হচ্ছে ততই এই কথা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সি পি আই ছাড়া আর কারও এই রাজ্যে এককভাবে কিছু নেই।

আজ অন্যান্য সমস্ত পার্টিই স্বীকার করে নিয়েছে যে, সি পি আই-ই একমাত্র রাজনৈতিক দল যে নির্বাচন তাগদে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধানসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে আর শ্রমিক দৃঢ় সরকার গঠন করতে পারে। এই সম্ভাবনাকে ঠেকাবার জন্য একমাত্র পথ ছিল অন্যান্য সমস্ত পার্টির একাবদ্ধ প্রচেষ্টা। এই চেষ্টার কোন চুটি হয় নি। কিন্তু আজকের রাজনীতি আর নেতাদের সাধের উপর নির্ভরশীল নয়। গণ-আন্দোলন আর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম আজ সমস্ত ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করে দিয়েছে।

এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সি পি আই-এর নির্বাচনী প্রচারণা বথাসাধ্য ব্যাহত করার চেষ্টা চলতে পারে। সি পি আই-এর প্রচার কর্মীদের উপর আক্রমণ এই চেষ্টারই অঙ্গ। সি পি আই-এর

পক্ষে একমাত্র পথ থাকবে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি-আন্দোলন গড়ে তোলার। প্রতিরোধ আন্দোলন আক্রমণে চরিত্র অনুবাদী হিসাবস্বক হতে পারে। এবং সংঘর্ষের সংখ্যা ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচার সূত্র হতে পারে যে, ক্ষমতা আসার পূর্বেই সি পি আই গুন্ডামীর পথ নিয়েছে আর আ-শ্রয়লা ব্যাহত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ যাতে সম্ভব না হয় সেই ধরনের আক্রমণও চলবে।

সি পি আই নেতাদের বিস্তৃত বক্তৃতা থেকে মনে হয়েছে যে, তাঁদের পার্টি প্রতিরোধের জন্য তৈরী। অর্থাৎ কোনও কোন জায়গায় দরকার হলে তারা আক্রমণের উত্তরে প্রতিআক্রমণও করতে প্রস্তুত। গত যুদ্ধক্ষেত্র সরকারে থাকাকালীন সি পি আই-এর অংশই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বহু সর্বাধিবাদী সমাজবিরোধী ব্যক্তি পার্টির আশ্রয় প্রয়োজন মেটাব। জন্য পার্টির কাছাকাছি এসে পড়ে আর শেষ পর্যন্ত তারা পার্টির সংগঠনকেও কোন কোন জায়গায় কাবু করে ফেলে। এই সম্ভাবনা সম্পর্কে এবার সি পি আই-এর সজাগ তা ঘটনাচক্রে বোঝা বাবে

সি পি আই সম্পর্কে অনেক সং, রাজনীতিতে অপাতঃ নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের বিরোধী ধারণা আছে, অথবা বলা চলে সু-নেই। তাঁদের ধারণা, সি পি আই ক্ষমতার এলে পার্টির লো-অপরের জীবন অতিষ্ঠ দেবে। গ্রামে জমির মালিকের এমন কি বাদে জমি আই-সীমার মধ্যে তারাও কিন্তু ভী-সম্ভব।

সভা সমিতিতে প্রচার মার-এবং পার্টির ঘোষিত নীতি আ-বায়ী আজ সি পি আই-কে জো-সঙ্গে একথা বলতে হবে যে, আ-কের সংগ্রামের স্তরে ছোট মা-করা, কি শহরে কি গ্রামে, পার্টি-শত্রু ত নয়ই বরং অতি প্রয়োজন-মিত্র। গ্রাম এবং শহরের মধ্যবিন-দের দিকে পার্টির নজর দেও-দরকার। চাষী এবং প্রোডিউনি-আন্দোলনের আশ্রয় লক্ষ্যের ক-পার্টিকে পরিষ্কার ভাষায় বার-রাখতে হবে। আর সেই স-এ কথাও বলতে হবে পার্টি-কর্মী ও তথাকথিত দরদী-বাদরামী কোন মতে পার্টি-করবে না। এ সম্পর্কে যে যে-অভিযোগের উপর-তদন্তে ব্যবস্থা পার্টির তরফ থেকে করা-এবং অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হ-শাস্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিশ্রু-দিতে হবে।

আসলে রাজ্যের গদী দশ-সংগ্রামের কেবলমাত্র প্রাথমিক-স্তর। সারা রাজ্যের সংগ্রাম-মানুষের একেবারে ভিত্তিতে ব্যা-গণআন্দোলন নতুন থেকে নতুন-স্তরে উন্নীত হতে গেলে মা-বাদ-লেনিনবাদের নীতিতে দীর্ঘ-প্রাথমিক-কৃষকের পার্টির সংগঠ-
(শেবাংশ নবম পৃষ্ঠার)

জ্যোতি বসু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নকশালপন্থীদের "নির্বাচন বরকট" শ্লোগান ছিল। এবারের শ্লোগান হল, "নির্বাচন বানচাল"। বানচাল করতে গেলে কিছু রক্তক্ষয় হয়ত হবে, কিন্তু ওদের রাজনীতির প্রয়োজনে এই রক্তক্ষয় বিপ্লবী অভ্যাসকে সাহায্য করবে।

সি পি আই-এর এক মুখপাত্র বলেন যে, ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে "রাজনীতি ব্যতিরেকে সমস্ত সি পি আই বিরোধী শক্তির একটি এ্যাকশন ফ্রন্ট ভেতরে ভেতরে কাজ করছে—এই ফ্রন্টের সম্মুখ ভাগে আছে নকশালদের এ্যাকশন স্কোয়াড। আক্রমণ ওরা চালাবে

নির্বাচনী অফিসে, নির্বাচন কর্মীদের উপর আর কিছু নেতাদের উপর।"

ওই মুখপাত্র বলেন : "আমাদের এই আক্রমণকে মোকাবিলা করতেই হবে, প্রতিরোধ আন্দোলন দিয়ে। আমরা আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ ইত্যাদি এড়াতে চেষ্টাছি এতদিন। অনেক আক্রমণ আমাদের উপর হয়েছে, কোন কোন জায়গায় পুলিশের অপাতঃ যোগসাজসে। কিন্তু আর নয় প্রতিরোধ আমাদের করতেই হবে।"

পুলিশের খবর যে, সি পি আই এই প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চালাচ্ছে। নানা এলাকায় ওদের এ্যাক্টিভিস্টরা আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য বোমা গুলি ব্যবহার করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। এলাকায় এলাকায় কর্মী সম্মেলনে নেতারা হুঁসিয়ারী দিচ্ছে এই সংঘটিত আক্রমণ সম্পর্কে।

দর্পণের খবর : আক্রমণ শুরুর হয়ে গেছে। জ্যোতি বসুর প্রতি আক্রমণ এই কর্মসূচীরই অংশ-বিশেষ। জ্যোতিবাবু বসিরহাটে বাজিলেন মার্কসবাদী পার্টির গাড়ীতে। সঙ্গে ছিলেন আবদুল্লাহ রসুল আর শান্তিময় ঘোষ। হঠাৎ বসিরহাটের কাছাকাছি একটা জায়গায় তিনজন যুবকের দল রাস্তার পাশ থেকে বোমা ছুঁড়ল তিনটি। গাড়ীতে লাগল দুটি, সম্মুখভাগে লেগেছিল। তাই খালি ব্রেকেরেট, লক্ষম হয়েছিল। গাড়ী জোরে বেরিয়ে গেল।

জ্যোতিবাবু দর্পণকে বলেছেন : ওদের গাড়ীর একটা পেছনেই পুলিশের একটি ভ্যান ছিল। রাস্তার পাশ থেকে বেরিয়ে আসা তিনটে যুবককে বোমা ছুঁড়তে নিশ্চয়ই ওরা দেখেছে। "আমি তাদের দেখতে পেরেছি, ওরা পাবে না হতে পারে না? কিন্তু আশ্চর্য ওরা তখন কিছু করল না। যেমন আমাদের পেছনে আসছিল তেমনি আসতে লাগল।"

জেলা পুলিশের খবর প্রকাশ যে, এই পুলিশ ভ্যানের ওপর আদেশ ছিল জ্যোতিবাবুর গাড়ীর পেছনে যাওয়ার। তখন কোন ব্যবস্থা নিতে গেলে পেছনে যাওয়া বন্ধ রাখতে হত কিছুক্ষণের জন্য। এবং এর অর্থ দাঁড়াত উপরওয়ালাদের আদেশ ঠিকমত প্রতিপালন না করা।

পুলিশ অবশ্য কিছু পরেই এই ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত চালায় এই এলাকাতে। পরে রাতে নকশালপন্থী বলে অভিহিত দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কাছে খবর নিয়ে জানা গেল যে, এই এলাকায় সি পি আই-এর একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী সি পি আই-এ চলে এসেছে, আর তাকেই সি পি আই এই এলাকায় প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র দিচ্ছে। তাই দুই পার্টিতে এখনো যুব মনকষাকষি।

অন্যান্য অনেক এলাকায় সি পি আই-এর উপর আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

গোপাল সেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সবশেষে বলি 'কমরেডগণ ও বন্ধুগণ, সুদীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন। আমাদের মজি ফৌজ নির্দেশের অপেক্ষায়।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং লাং সেলাম। জাতীয় নেতা চারু মজুমদার লাং সেলাম। সি পি আই (এম এল) জিন্দাবাদ। ভারতবর্ষের নবগঠিত মজি ফৌজ জিন্দাবাদ। বিশ্ববিপ্লব জিন্দাবাদ।

দাউদ ক্যালকাটা এ্যাকশন কমিটি

পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের 'নতুন ব্যবস্থা' বানচাল

(বিশেষ প্রতিনিধি)

নির্বাচন হতে না দেওয়া শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের পরমবীর প্রশাসকদের মর্জি বা স্বেচ্ছাচারী উদ্দেশ্যের তাই থাকেনি। তাই পশ্চিমবঙ্গে একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভায় নির্বাচন হতে দিলেও, কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ আর এক চাল শুরুর করে দিয়েছে। প্রথম কেন্দ্রের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের বাছাই করা চর দিয়ে পশ্চিম বাংলায় ক্ষয়মান (নব) কংগ্রেসের তথাকথিত ভলান্টিয়ারদের পাম্ব-বতী সমর্থন দেবার ছলে ব্যাপক হারে সি পি এম দলভুক্ত বাছাই করা দক্ষ ও ষ্টেড ইউনিয়ন তথা কিশোর সংগঠক পোস্ত কর্মীদেরকে খতম করা। এ ব্যাপারে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের পুলিশবিভাগকে ক্রিয়াস্বত্ব করতে পারছে না; কারণ কেন্দ্রের কাছে তাদের গোপন ইন-টেলিজেন্স সূত্রে খবর গতবছরই পশ্চিমবঙ্গে গেল যে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশবিভাগে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে গেছে।

সুতরাং, কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের "বিশেষ ব্যক্তি"র অপ-

প্রয়োগের তাগিদ এলো। তাই তাদের প্রথম চেষ্টা হল বুদ্ধিগত দলগুলির মধ্যে উৎকোচ এবং উল্লেখ্য প্রদানকারী চর ঢুকিয়ে আস্তর বিরোধকে উৎকোচ রক্ত হানাহানিতে পরিণত করা। উদ্দেশ্য যাতে বামপন্থী জনগণের ঐক্যের মূল কাঠামোটাই ভেঙে পড়ে। এসম্বন্ধে কেন্দ্রের রাজনৈতিক গোপন ইনটেলিজেন্স প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তি ছিল। তারা জানতো, বাঙালি দেশের অধিকাংশ বামপন্থী দল-গুলির নেতৃবৃন্দের মাঝে নিম্নমধ্য-বর্গীয় মানসিকতা রয়েছে থাকার দরুণ এবং প্রকৃত মেননতী কৃষক শ্রমিকরা নেতৃত্ব দেবার পর্ষায় পোস্ত না হওয়ায় দলীয় অত্যা-সাহসকে সহজেই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বাতী সংঘর্ষে পরিণত করা চলে। এস্তার টাকা, অস্ত্রশস্ত্রের নিয়মিত আমদানি এবং স্থানীয় বৃহৎ বর্ষসারীদের সংযোগে ভাড়া-টিয়া, দালাল, কুঞ্জি-মারা সর্দার, ওয়াগল-রেকার, স্মাগলার এবং সমাজে উৎপাতকারীদেরকে নতুন রাজনৈতিক ছাপ লাগিয়ে ব্যবহার

শুরু করা এবং বৈরিতিক দেখলেই সেই জীবনটিকে নকশালপন্থী নাম দিয়ে মিথ্যে প্রচার চালানো—এ সমস্তই কেন্দ্রের নীতি বন্দোবস্ত। স্থানীয় নেতারা জেনেও কিছু এলাজ করতে পারেন নি; কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরামর্শদাতারা বুদ্ধি-রহিত সঠিকভাবেই যে, সক্রিয় বিপ্লবের পথ থেকে সরে গেলে পোশাকী রাজনৈতিক আন্দোলনের যে ট্র্যাডিশন গড়ে ওঠে, তার থেকে বামপন্থী দল-নেতারা রেহাই পাবেন না; সুতরাং উল্লেখ্য এবং অস্ত্রপন্থী মারামারিতে উদ্ভ্র-আস্তরবিরোধের ফলে আস্তর-দলীয় ঐক্য ধীরে ধীরে ভেঙে যেতেই ভেঙে চরমার হয়ে যাবে।

এ পর্যন্ত কেন্দ্রের ক্ষয়পন্থ সফল হলেও আজ কিন্তু এ ক্ষমতা রাজনীতির প্রয়োগকর্তারা সন্ধ্যে দেখছে যে, সমাজদ্রোহীদেরকে এক তরফা ভাবে আর ব্যবহার করা চলছেনা; তাদের মাঝে অনেকে পুলিশের এবং তাদের বড়লোক-প্রভুদের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। উপরন্তু নকশালবাদীদেরকেও মসীলিপ্ত

করা যাচ্ছে না; জনগণ ঠিকই ধরে ফেলেছে এই সমস্ত কুক্রম দুষ্ক-মের মূল নিয়ন্তা কারা। বৃহত্তর-এর মতই কেন্দ্রের গোপন গোয়েন্দা বিভাগের অনুসৃত পশ্চিমবঙ্গ-প্রাণ সমস্ত প্রগতিশীল সক্রিয় ও রাজনৈতিক কর্মীদেরকে শেষ করা-বার এই পন্থাটির ফলিত প্রয়োগ জনগণের মাঝে স্থানীয় পুলিশের ভেতর, এমনকি সমাজদ্রোহীদের বিবেকেও কেন্দ্র বিরোধী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

উপরন্তু, আইন শৃঙ্খলা বাস্তবে ভেঙে পড়েছে, এমন পরিণতির অজুহাত নিয়ে সিস্থান্তগতভাবে স্থির করা পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় নির্বাচনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পেছিয়ে দেবার কড়ি কেন্দ্র আর নিতে সাহস করছে না। কারণ কেন্দ্রের বর্তমান আন্তর্জাতিক অভিব্যক্তি, সোভিয়েৎ রুশ এবং তস্যা আশ্রিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, যে দল দলীয় ক্ষমতা রাজ-নীতির হিসেব টনটনে জ্ঞান নিয়েই করে দেখেছে, এই নির্বাচন হওয়া দরকার। গত কয়েকমাস ধরে এবং বিগত কয়েক সপ্তাহ বাৎ বৃহৎ বিস্তারিত সংবাদপত্রগুলি কখনও গৃহবন্দ (ইন্ডিয়ান এক্স-প্রেস), কখনও নকশালী আতঙ্ক (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, হিন্দু-

স্থান টাইমস, এমন কি পরিবার-প্রদোষিত ন্যাশনাল ডে কখনও শৃঙ্খলা, প্রশাসন; বাণিজ্য ইত্যাদির অস্তর (টাইমস) বুদ্ধিজীবীর চাপ খাটি কেন্দ্রকে উত্ত সিস্থান্ত নেওয়া ছে-বিরত করতে পারেনি। অ-বাঙলাদেশের মানবগুলির হাতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়াও কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কাস্মীরের জনগণের সঙ্গে কেন্দ্রের আচ-রণের তুলনা করা চলে।

সুতরাং কেন্দ্রের লৌহ-খাবা সুদৃষ্ট শ্বিতীয় চাল চলেছে পশ্চিম বাংলার পুলিশকে পশ্চিম-বঙ্গের প্রগতিশীল ও বুদ্ধিদান জ্ঞানিকারীদের বিরুদ্ধে ষেপিয়ে তোলা। কিছু কিছু নিম্নস্তরীয় পুলিশ কর্মচারীকে—যাদের মাঝে নির্দোষ (রাজনৈতিক অর্থে) কিছু রয়েছে—সমাজদ্রোহীদের দিয়ে শুন-করিয়ে নকশালীদের বদনাম দেওয়া সুপরিচালিত এক কৌশল। লক্ষ্য, নকশালপন্থী স্ট্র্যাটেজীকে মজাশল রচনা এবং সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা গঠ-করে গেরিলা যুদ্ধের চালনা ছে-শ্রুত করা। এক জিলা দুই পা-মারা চলবে এর পরিণামে। সশ-সংগ্রামের মাধ্যমে বর্তমান রা-বশ্বকে ধ্বংস করে অঙ্গল বি-লোষিত জনতার সমান্তরাল বিপ্ল-সরকার গড়ে তোলার প্রয়াস প্রস্তুতি এভাবে বিপথগামী হ-য়ার ফলে পর্যাপ্ত হয়ে যা-নিজে থেকেই।

দু নম্বর লাভ কেন্দ্র/আগাম ভবিষ্যতে, যখন কেন্দ্রের নিদার-আশঙ্কা সত্যে পরিণত হতে পারে অর্থাৎ আসন্ন নির্বাচনে সি পি এম দলের তার সাথী দলগুলি সম্পূর্ণ এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভান্তে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন। সে সময় সি পি এম এবং তার বৃ-দলগুলি তাদের পার্টি ক্যাডার আত্যন্তিক ক্ষয় হবার ফলে পুলিশ কেন্দ্রের ওপর উত্তরোত্তর নির্ভর করতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা বিভাগ যদি তাদের কুট অভিসন্ধি অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পুলিশকে সামগ্রিক ভাবে সি পি এম তথা বামপন্থী-দের বিরুদ্ধেই বিষিয়ে তুলতে পারে, তাহলে ভবিষ্যৎ বামপন্থী সরকার পশ্চিম বাংলায় সহজে প্রশাসনিক কাঠামোর সক্রিয়তা বলিষ্ঠতা এবং নির্ভরযোগ্যতা জন-চক্ষু প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। অর্থাৎ, পশ্চিম বাংলার মেহনতি জনতার স্বারা আজও অনার-বৈশ্ববিক সংগ্রামের অধ্যায়কে পুনর্বীর স্থানীয় সরকারী প্রশা-সনিক জনদাবীর টানাপোড়নে অবসিত এবং ধ্বংস করে দিয়ে কেন্দ্রের পুনর্বীর হস্তক্ষেপের পথ খুলে রাখা—এই হল মূল অভিস-কেন্দ্রের এবং শাসকশ্রেণীর সেই গোষ্ঠীয়, যা বর্তমানে ইন্ডিকেট কংগ্রেসের পেছনে বিস্তারিত জোগাচ্ছে।

তবে কতদূর ও কতদিন? নয়া দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয়েই নতুন

(১০ম পৃষ্ঠার)

নবগঠিত ছাত্র সংস্থার প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন

গ্রহীত প্রস্তাবে শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিস্তৃত কর্মসূচী

(দশমের সংবাদদাতা)

গত সাতাশে থেকে তিরিশে ডিসেম্বর নবগঠিত ছাত্র সংস্থা ভার-তের ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সম্মেলন কোরালার অনুষ্ঠিত হলো। গ্রিবান্দ্র শহরে টেগোর মেমো-রিয়াল হল অনুষ্ঠিত এই সম্মে-লনে মোট সাতশ সাতষটি জন প্রতিনিধি ও দশক বোগদান করেন। এর মধ্যে ছয়শ চব্বিশ জন প্রতিনিধি ও একশ তেতাল্লিশ জন দশক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের একশটি জেলা থেকে এইসব প্রতি-নিধি সম্মেলনে উপস্থিত হন। তিনশ তিনটি কলেজ, উনচাল্লিশটি স্কুল এবং কুড়িটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। সর্বাধিক প্রতি-নিধি উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বাংলা থেকে। মোট দৃশ্যে সাতসত্তর জন। নবগঠিত "ভারতের ছাত্র ফেডারেশন" (এস এফ আই)-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা এক লক্ষ তেইশ হাজার দৃশ্যে চার জন।

দেশের শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসংগ্রাম পরি-চালনা করার জন্য গত জুন মাসে কলকাতায় আগত বিভিন্ন রাজ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে এক আলোচনা হয়। এর ফলশ্রুতি, ডিসেম্বর মাসে এই সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন। উনিশ ছাত্রিশ সালের মাঝা-মাঝি অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন নামে (এ আই এস এফ) ছাত্র সংগঠনটি দেশে প্রগতি-

শীল ও সমাজবাদ বিরোধী আন্দোলনে জনমানসে উৎসাহ উদ্দী-পনার সঞ্চার করে। বর্তমানে নব-গঠিত ছাত্রসংস্থার নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, উনিশশ বাষটি-তেষটি সালের পর এই সংগঠন তার সমস্ত ভূমিকা ও কর্তব্য পরিত্যাগ করে শোষকগোষ্ঠীর তল্লিপবাহক হিসেবে ছাত্রসমাজকে পরিচালনা করার চেষ্টায় মেতে ওঠে। তাই প্রগতি-শীল ছাত্র সমাজকে এ আই এস এফের কালো হাত থেকে মুক্ত করে আনার জন্যই এই নব সংগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে নেতৃ-বৃন্দ জানান।

তিরিশে ডিসেম্বর প্রথম সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর এক বিশাল সমাবেশে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ বলেন, ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর শত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতি-রোধ আন্দোলনে সামিল হবার জন্যে, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়ে সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দো-লনকে ধাপে ধাপে চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সারা দেশের সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীদের বেনতুন সংগঠনের জন্ম হলো কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইন্দিয়ার হাজার চক্রান্ত এই সংগঠনকে নিমূল করতে পারবে না। প্রতিটি রাজ্যের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ এস এফ আই এর পতাকাতে সমবেত হয়ে সারা দেশব্যাপী শোষকগোষ্ঠী ও তার বামপন্থী নামধারী লেজুড়দের বিরুদ্ধে জঙ্গী ছাত্র-আন্দোলন সংগ-

ঠিত করবে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরায়ীয়া সম্মেলনে বলেন, শ্রমিক কৃষক এবং গণতান্ত্রিক জনগণের আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রসমাজ জড়িত, সেই ছাত্রসমাজের প্রতি-নিধিদের নিয়ে এই সম্মেলন। এটা প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের সবচাইতে বড় এবং অস্বাভাবিক সম্মেলন। তাই আজকের দিনের বড় কাজ হচ্ছে, শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্র ও বৃন্দ আন্দোলনের ঐক্য গড়ে তোলা। এবং একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় নবগঠিত ভারতের ছাত্র ফেডারেশন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে এই ঐক্য গড়ে তোলার কাজ করে যাবে।

সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের সভাপতি শ্রীবিমান বন্দ বলেন, অশিক্ষা, বর্তমান শিক্ষা-পন্থি, দারিদ্র্য, শ্রমিক ও কৃষক নির্যাতন এবং দেশকে বিদেশী শোষণের তাবুতে পরিণত করার বিরুদ্ধে ও অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে এই নব ছাত্র সংগঠন দেশ ও দেশের জন্যে নিরলস ভাবে কাজ করে যাবে। তিনি আরও বলেন, শাসক গোষ্ঠী বছরে পাঁচ লক্ষ নতুন চাকরীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অথচ প্রায় কুড়ি লক্ষ ম্যাট্রিকুলেট স্নাতক, ইঞ্জিনিয়ার, ও ডাক্তার

ইতিমধ্যেই বেকার অবস্থায় রয়ে-ছেন। চাকুরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগে নি। এছাড়া শিক্ষা লাভে বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীর ও অন্যান্য অসুবিধার প্রতি সংগঠন সতর্ক দৃষ্টি রেখে আন্দো-লন কেন্দ্রীভূত করবে।

ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচীতে জানা যায়, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রাম এবং ছাত্রসমাজের সামগ্রিক উন্নতির আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করা হবে। ছাত্রদের সমস্ত গণতান্ত্রিক, অধিকার ক্ষেত্রের চেতনার সঙ্গে শিক্ষায়তনের পরি-চালন পর্ষায় অংশ গ্রহণের অধি-কারকে ছাত্র স্বার্থে অর্জন করার চেষ্টাকে সমর্থন করা হবে। শিক্ষা শেষে চাকুরীর জন্যে আন্দোলন, ও জাতি ধর্ম ভাষা বা শ্রী পদব্রষ নির্বিশেষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্যের জন্যে সংগঠন নির্ভার সঙ্গে কাজ করে যাবে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সঠিক অবৈতনিক শিক্ষার জন্য কর্মোদ্যোগ, শিক্ষার সমস্ত সুযোগ, হোষ্টেল, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে পর্যাপ্ত করার জন্য আওতাভুক্ত হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা, ও সমাজতন্ত্রের প্রতি সৌভ্রাতৃমূলক সংহতি জ্ঞাপন করা এবং প্রায় সমধর্মী ছাত্র সংস্থার সঙ্গে বিশেষ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করাও সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জাতির চিহ্ন

নিরাজীর ক্ষমতা-রাজনীতি কি গোপনিলে ?

রম্যপ্রসাদ মল্লিক

সাতশে ডিসেম্বর সন্ধ্যা, বরেন্দ্র। অকস্মাৎ বদলে গেল পূর্বেরকার তেতা। ইন্ডিকেট কংগ্রেস। এবং তস্য শাসন প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট নির্বাচনের সিদ্ধান্ত পাকা করলো। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সরকারী আদেশ জারী হল—চিনির ওপর থেকে নিরস্ত্র হওয়া তুলে নেবার। কারণ জলের মত ফরসা। উত্তর প্রদেশ কেবল ইন্দ্রাজী স্বপ্রদেশ নয়, সেখানকার রাজনৈতিক ক্ষমতার কর্ণধার সারা ভারতে একমুদ্র, তা কেবল জনরব নয়, গত দুই দশকের ফলিত সত্য। অথচ এই সাতশে ইন্ডিকেট কংগ্রেসের ক্ষমতা-তরঙ্গী জয়ের কিনারার পৌঁছতে তো আরোই নি, বরঞ্চ বি কে ডি দল ও তার নেতা অত্যাশ্রিত উচ্চাভিলাষী চৌধুরী বরণ সিংয়ের সঙ্গে বহু ঐর্ষ্যে রাজনৈতিক সহবাস করা সত্ত্বেও, শ্বেতাধি-কাজী ধানে মই দিয়ে প্রতিশ্রুত্বী হুদি কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করে ফেল। কেবল তাই নয়। বি কে ডি দল চরপিসংজ্ঞা রাজ্যের একদা শক্তিশালী চন্দ্রভান গুপ্তাজীর কৌশল ক্ষমতা-শিখর থেকে নুয়ে, নেমে এসে 'অজলাভ কর', তা প্রয়োগ করে প্রদেশের চাবিকাঠি ইন্দ্রাজীর দাবী থাকা থেকে সরিয়ে ফেললেন। অবশ্য পেছনে রয়েছে; বিরাটকার হুগার লবী, এবং লাখপতি-কোড়পতিদের পোষ্য প্রাক্তন শাসকদলের (পুত্রোহনো কান্দু) কংগ্রেসী রাজনীতি-মাত্রা। চিনি মিলগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব-কার পরামর্শ, অথবা ধুরো তুলে-দেখার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে বে-কারদার ফেলবার চেষ্টা করলে কি হয়? মিল মালিকরা বধ্যপূর্ব মালিকই রয়ে গেলে, উপরন্তু নতুন কংগ্রেসের পেয়া-রীর লোক একদা পি এস পি, পেঁদা-সিংজীকে রাজ্য ক্যাবিনেট থেকে নিষ্কাশিত হতে হল।

লবীর চাপ সোজা চাপ নয়। নভেম্বরের চম্বিশ তারিখে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী, ফকরুদ্দীন আলি, আহমেদ বিরাট প্রচার-বাদ্য সহকারে, চিনিশিল্প সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান কমিশনের (আরজেকের) মোকদ্দা করেছিলেন, তার উচ্চবাচ্য সরকারী মহলে কেউ আর করে না; প্রবাদবাক্যের মতই এই কমিশনও কেন্দ্রীয় সরকারের সাজানো ইচ্ছাকে প্রকাশচ্ছন্দী করে দেবার উদ্দেশ্যেই গঠিত, ফলপ্রত্যাশার নয়। মালিকবর্গ বর্তমানে শাসকদের পেছনের মানদণ্ড-দলিকে চেনে। সুতরাং তারা তাদের তরফে প্রদেয়, অথচ ফেলে রাখা বিশ কোটি বিরাশি লক্ষ টাকার বকেয়া-বা-কৃষক উপাদকদের আশ স্ববরাহ করার দরুণ প্রাপ্য—নিরে পাল্লিমেন্টে ঠে ঠে ও মথারীতি মন্ত্রীর সিন্ধে-মহাশয়ের উদ্বেগ প্রকাশে মোটেই প্রবলিত নয়।

এখন তো পরিস্থিতির ছাঁটাই পালটে গেছে; আগামী নির্বাচনে পুরোনো এবং নবীন কংগ্রেসের

অনেক শর্মাকেই ভোট প্রার্থী হয়ে দাঁড়বার আগেই চিনি লবীর গোপন পুঠিপোষক উক্ত মিল মালিকদের কাছে দুতিয়ালী করতে হবে। দেবীতে হলেও ইন্ডিকেট কংগ্রেস চন্দ্রভান গুপ্তাজীর ধারা ধরেছে; শিল্প তথা বহুং ব্যবসায়ের বিস্তৃতি মালিক পুলাবদের সঙ্গে চিরকালে "বন্দো-বস্তের" মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রাখা। সুতরাং এর পর আমদানী লাইসেন্সও ঢালাও ভাবে দেওয়া শুরু হয়েছে; ব্যাংক রেট বাড়ালে কি হয়, "অগ্রাধিকারের" মর্যাদা যে কোন নতুন শিল্পোদ্যোগকে প্রদান করা ও কনসেশনমূলক সুদের হারে অগ্নের ব্যবস্থা (শতকরা পঁচের স্থানে সাড়ে চার-তে) করে দেওয়া সরকারের নতুন বিবোধিত নীতি। এর দ্বারা নাকি বস্ত্রানি বস্ত্রিক শিল্পগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হয়।

সে বাই হক, শাসকদলের বিবেক ক্ষমতা-রাজনীতির ক্ষমতাপ্রয় বহন তখন ছাঁদ পাল্টায়; এবং সেকারণে প্রাক্তন আদি কংগ্রেসী (হালে ভোল-পালটে নব কংগ্রেসী) মন্ত্রীপ্রবর, শ্রীমানুভাই শাহ সম্প্রতি "অর্থ-নীতিকে বাঁচাও" এমন এক মহৎ লক্ষ্যসম্বিত বিস্তৃতি শ্রীশ্রীরামের স্মৃতিস্বার্থে নিয়োজিত বহুতমসলার অংশ গ্রহণ করবার সময় বাশী দিয়েছেন—“আমি দেওয়ালের লিখন দেখতে পাচ্ছি; উনি বিপুলভাবে ক্ষমতার অভিমুখ হতে বাঞ্ছন”। অর্থাৎ নেহেরু-পুত্রী ইন্দ্রাজী! সম্প্রতি, রাজধানীতে ইন্দ্রাজীকে নবীন ভারতের একমাত্র হাতা হিসেবে এবং কালকোলে গুলিরে রাখা সমাজ-বাদের হোতা রূপে দেখাবার সুপ-রিকল্পিত চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে। এর ফলে ইন্ডিকেট কংগ্রেসের উপর মহলে সম্ভালক গোষ্ঠীর, এবং কেন্দ্রীয় পাল্লিমেন্টারী বোর্ডের ক্ষমতা হিমালয়-সদৃশ হয়ে দাঁড়াল। টিকিট প্রদান নিয়ে বিক্ষোভ শুরুও হয়েছে। কিন্তু “হরিজন” অথবা পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের সেবক কর্মী বলে তারা আজ এগোতে চাইছে তাদের পোল্টার ও ইস্তাহারী লড়াই সন্ন্যাস হয়ে থাকবে কেবল। বোর্ডের ক্ষমতা-রাজনীতির কাণ্ডারী যারা, তারা সহজে সরে দাঁড়বার পাঠ নন। তবে এইখান থেকেই আরম্ভ হতে বাঞ্ছ, নবীন কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ চক্রান্তমুখ্য। নির্বা-চনে ভোট ভাগাভাগি অনুমের।

পশ্চিমবঙ্গ, কাম্বীর, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত নির্বাচন হতে দেওয়া উচিত কি উচিত নয় এনিরে শাসকদলে দোমনাভাব থাকার অনেক কালহরণ ও দৌদ্যমানতার প্রদর্শন কেন্দ্রীয় সরকার তথা শাসকদের ভাবমূর্তি জনচক্ষে নষ্ট করেছে; অন্ততঃ অংশজ্ঞ। বহুং সংবাদপত্র-গুলি বহুং ব্যবসায়ী স্বার্থের রক্ষা-

কল্পে পশ্চিম বঙ্গের বিধানসভায় নির্বাচনকে কয়েকমাস পেছিয়ে দেবার জন্য সুকুমারীসুন্দরী ইশারা দিয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য প্রচুর প্রয়াস করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থানীয় রাজনীতির ওপর অনুপনের প্রতিকূল প্রভাব পড়তে চলেছে, দেখে কেমনে পশ্চিম বঙ্গ-লার জন্য যুক্ত নির্বাচনে রাজী হতে হল। তখন শিবাকুলের মত বিস্ত-শাসিত স্বতন্ত্রের স্বাধীনতার আশ্রয় চাইকার অন্য দিশায় রুতে আরম্ভ করলো। নয়ই জা-রী তারিখে টাইমস অফ ইন্ডিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখলো : “এক বিরাট ব্যক্তি”। হিন্দুস্থান টাইমস সরকারের নীতি সম্প্রতি সাধুতা ও সম্মান বাতে কালিমালিপ্ত না হয় জনতার বিচারে সে হেতু ছন্দ উদারতার ভাষিমা নিয়ে লিখলো : “বাঙলা সম্বন্ধে শূন্যবুদ্ধি”। দক্ষিণমাগ হিমউলিট পার্টির মুখপত্র, পেরির বরণ করে নিচ্ছে এমন মন্তব্য টে লিখলো

“একমাত্র পক্ষ”। জাতীয় পটভূমি-কায় সি পি আই এবং শাসক কংগ্রে-সের বোকাগড়া যে কত গভীর অবধি তা এই মুখপত্রের মুখে নির্বাচন ও দেশে শান্তি করার রাখার ব্যলিতে পরিষ্কার। মোক্ষা কথা, পি এস পির মত এই দলও আপন দলীয় স্বার্থে আলাদাভাবে নির্বাচনী অভি-যান করলেও ইন্দ্রাজী প্রচার-দিশদর্শন গ্রহণ করে ফেলেছে। বস্তুত সি পি আই-এর কতাবস্থানীয় নেতা-দের উক্তি এবং সমর্থিত লেখার নয়-দিল্লীর রাজনৈতিক আবহাওয়াকে খুব বিচক্ষণ কুটচাতুরীর সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের অনুকূলে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাজীকে আর এক নেহেরু সমা-অবিত্যীয়া ভারত নেত্রী রূপে প্রতি-ষ্ঠিত করার প্রয়াসও। অনেক দিন পূর্বে পেরিরট যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উপদেশ শাসক কংগ্রেসকে দিয়েছিল, তা শুনুন, “ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ এবং অপরাপর পদক্ষেপ দ্বারা পার্টির ওপরে জনগণের যে বিশ্বাস জন্মে-ছিল, তা যদি কোনো ধরনের আপোষে প্রতিহতশালীদেরকে পার্টির মাঝে স্থান দেওয়ার ফলে নষ্ট হয়, তাহলে কংগ্রেসের পক্ষে তা হবে ব্যর্থময়।” (তারিখে এপ্রিল উনিশশ সত্তর) একই সূত্রে উক্ত পত্রিকা শাসক কংগ্রে-

সকে হুতপূর্ব মন্ত্রী ভানুপ্রকাশ সিংকে পার্টি থেকে বহিস্কার কর-বার ইচ্ছা প্রকাশ দেয়।

আজও সি পি আই ঐ পক্ষ-তিতেই প্রয়াসী। সমাজতন্ত্রের অকাটা নিরিখ না থাকার এবং সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা (প্রিন্সিপাল সম্পর্কে) বের হবার পর কংগ্রেস (শা) প্রধা-নের পক্ষে রাজনায়গকে দেয় কতি-পূরণের অক্ষ গোপন রাখার স্বর্ণ-সুযোগ চলেছে। রাজারাও পদীর আড়ালে এবং রাজস্বানের মুখ্যমন্ত্রী সুখাভিজাজীর অনুরূপ আনুকূল্যে চার ফ্রন্টী নির্বাচনী সৌধ রচিত হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচীরের পোষাক পরতে আগ্রহী শোষণপূর্ণের রাজমাতা এরই মাঝে আপনাকে “ইন্ডিপেন্ডেন্ট” প্রার্থীরূপে চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

কাম্বীরের “সেলিবিসিট ফ্রন্ট” বা গুপ্তভোক্তার দাবীদার মোর্চাকে আইনের লগুড় দিয়ে ঠেঙাবার এবং কাম্বী-রের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পাবার লড়াইয়ে তারা কাম্বীরী জনতার স্থান পেয়েছেন তাদেরকে রক্ষা থেকে বহিস্কার করার প্রতিক্রিয়াপ্রকল হয়ে দেখা দিয়েছে। কেবল শুধু নয়, নেতা জরপ্রকাশ নারায়ণই নয়, আত্মরিকা-বাসী ভারতীয়দের এককালীন বহু-ধান সংগঠক, ইন্ডিয়া লীগের প্রাক্তন (শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

যুনের মাত শিল্প কামল আমার এই অপরাধ লেখা



দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মোখেই হয়েছে
'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক অঙ্গরোগ



'অতি বামপন্থী'দের সম্পর্কে চেয়ারম্যান মাও সেতুং

(মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)

আমাদের দেশে সম্প্রতিকালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নাম দিয়ে রং বেরয়ের "বামপন্থী", মতবাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৭ সালে বারোই জানুয়ারী তারিখে চীনের 'পপুলস ডেইলী' এবং রেড স্কয়ার পত্রিকার এই সব প্রচ্ছদ বজ্রোজ্ঞা মতাদর্শের বাহকদের সম্পর্কে বৃহৎ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছিল..... এরা (বজ্রোজ্ঞা প্রতিবিশ্ববী শত্রু) লালকান্ডা হাতে নিয়ে লালকান্ডার বিশ্লবী লাইনের বিরোধিতা করে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। জনগণের একাগ্রশ্রুত জনগণের অপর অংশের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। প্রায় সব সময়েই তারা সূচকসূত্রের পাট্টির কেন্দ্রীয় কমিটী এবং চেয়ারম্যান মাওয়ের বিশ্লবী মতাদর্শকে তুলে ধরে নিজেদের প্রতিবিশ্ববী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হয়। এখন তারা "অতি বামপন্থী" রূপ ধারণ করেছে এবং জনসাধারণের চোখে ধুলো দেবার জন্যে তারা বেন "বজ্রোজ্ঞা প্রতিবিশ্ববী লাইনের" বিরোধী এমন ভাব করছে।"

চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিশ্লব চলা কালে, ক্ষমতাসীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মাও সেতুং এর মত মহানায়ক কর্ণধার থাকে কালেই যদি প্রতিবিশ্ববী শক্তি সম্পর্কে এই সত্যবাদিতার বাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, একনো বিশ্লবের জনগণতান্ত্রিক স্তরে পৌঁছাতে পারেন, এমন দেশে প্রতিবিশ্ববীদের কৌশল সম্পর্কে সতর্ক হবার নিশ্চয়ই প্রভূত কারণ রয়েছে। চীনের নয়াগণতান্ত্রিক বিশ্লব সফল হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। তারপর সে বিশ্লব ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক বিশ্লবে রূপান্তরিত হচ্ছে এখন, তখনও যদি "প্রতিবিশ্ববী বজ্রোজ্ঞা লাইনের" অনুসরণকারীরা কলকারখানা বন্ধ করে, কান্টাঘাট, রেলওয়ে, কল্ল, রেডিও, মিউনিসিপ্যাল কমিটী দখল করে সর্বহারা শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্ররোচনা করতে পারে, এবং স্বয়ং চেয়ারম্যান মাও সেতুংকে "সদর দপ্তরে কামান দাগো" এই বিখ্যাত বড় হরফের প্রাচীর পত্র দিতে হয়, কেন্দ্রীয় কমিটীকে বারে বারে প্রতিবিশ্ববীদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিতে হয়, তাহলে আমাদের দেশের প্রকৃত কমিউনিস্টদেরও ক্ষমতাসীন একচেটিয়া পুঞ্জ মালিকদের রাষ্ট্র মালিক শ্রেণী কি ভয়ঙ্কর ভাবে জনগণের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্যে রংবেরয়ের প্রতিবিশ্ববীদের সমাবেশ করে, তা পুরোপুরি বুঝতে হবে।

"জনগণের মধ্যকার স্বল্পবয়স্কদের সঠিক মীমাংসা সম্পর্কে" বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও সেতুং বলেছেন, "আমাদের সংবিধান, সর্বাধিকসংখ্যক

জনগণের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলো সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক লাইন আমরা নানা সময়ে যে ভাবে ঘোষণা করেছি, তার মধ্য দিয়ে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত আচরণবিধিগুলি সঠিক ভাবে বোঝাতে এসেছে :

(এক) আমাদের সমস্ত বক্তব্য ও আচরণ এমন হবে যাতে আমাদের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে ঐক্য বাড়তে পারে না থাকে;

(দুই) সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ও কর্মকাণ্ডে আমাদের বাক্য ও আচরণ কেন সহায়ক হয়, অনিষ্টকর না হয়;

(তিন) জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সুদৃঢ় ও সংহত করার জন্যে বেন আমাদের বাক্য ও আচরণ পরিচালিত হয়, তাকে ক্ষীণশক্তি বা দুর্বল করার জন্যে নয়;

(চার) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে সংহত করার দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলিকে পরিচালনা করতে হবে, একে ধ্বংস বা দুর্বল করার জন্যে নয়;

(পাঁচ) কমিউনিস্ট পার্টিতে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে—তাকে পরিচালনা করতে বা দুর্বল করতে নয়, আমাদের বাক্য ও আচরণকে পরিচালনা করতে হবে;

(ছয়) অস্বাভাবিক সমাজতান্ত্রী ঐক্য এবং দুনিয়ার শান্তিকামী জনগণের ঐক্যকে পরিপূর্ণ করার জন্যে এদের ব্যবহার করতে হবে,—এগুলিকে নষ্ট করার জন্যে নয়।

এর পর চেয়ারম্যান মাও সেতুং বলেছেন, "ওপরে যে অভিমত প্রকাশ করছি তা চীনের বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে এই অবস্থাগুলির তারতম্য হবেই। সুতরাং আমরা কখনই একথা বলি না যে অন্যান্য দেশ ও পার্টিগুলিকে চীনের পন্থী অনুসরণ করতে হবে বা তাদের তা করা উচিত।" [জনগণের মধ্যকার স্বল্পবয়স্কদের সঠিক মীমাংসার পথে চলনা সম্পর্কে, সাতশে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭, নির্বাচিত রচনাবলী পৃঃ ৭১৭]

"স্বল্পবয়স্কদের" (১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে) বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও সেতুং স্বাভাবিক বস্তুবাদী নিয়মগুলিকে প্রাজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কেন বিশ্লবের স্তর সবদেশে একরকম হতে পারে না, বিশ্লবী রপনীতি ও রপকৌশলের প্রয়োগ বিভিন্ন বিকাশমান সমাজে বস্তুগত ও ধারণাগত বিষয়গুলি সাবধানে লক্ষ্য করে করতে হয়। ভুল হলে তাকে কি ভাবে দ্রুত সংশোধন করতে হয়। মাও সেতুং বলেছেন,

"বিভিন্ন ধরনের স্বল্পবয়স্ক বিভিন্ন উপরে মীমাংসা করতে হবে, প্রত্যেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদীকে এটা সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করতে হবে। বুলি আওড়াতে যাঁরা অভ্যস্ত এই নীতিটাই তারা অনুসরণ করে না। তারা বুঝতে চার না যে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লবে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিরাজ করে; তারা একথাও বোঝে না বিভিন্ন ধরনের স্বল্পবয়স্ক মীমাংসা করতে হলে বিভিন্ন রকম পন্থা অবলম্বন করতে হয়। বরং তারা কল্পনা করে যে একটা ফর্মুলা বা বিশেষ নিয়ম আছে বা অদলবদল করা চলবে না এবং সর্বত্র তারী বশেষভাবে এই ফর্মুলা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে। ফলে বা ভালো ভাবেই করা যেত তা লুপ্ত হতে পারে এবং বিশ্লবের অপদ্রবণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে।" (স্বল্পবয়স্ক প্রসঙ্গে নির্বাচিত রচনাবলী পৃঃ ৬৬৬-৬৬৭)

এই "বুলি আওড়ানো" মার্কসবাদী লেনিনবাদীদের মনোগত ধারণা থেকে পর্ববেক্ষণ ও কর্মনীতি সংস্থাপন সম্পর্কে বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও সেতুং বলেন, "আমাদের বুলি-বিশারদ বন্ধুরা, লেনিনের শিক্ষার ("মার্কসবাদের সারাংশের শিক্ষা হল বাস্তব অবস্থাগুলির বস্তুবাদী বিশ্লেষণ"—লেনিন, কলেক্টেড ওয়ার্কস ৩৮তম খণ্ড পৃঃ ৩৬৭) বিরুদ্ধাচরণ করে; তারা কখনও কোনো কিছুই বস্তুগত বিশ্লেষণ করার জন্যে মাথা খাটায় না। তাদের লেখা ও বক্তব্যের তারা অসার বাধা বুলি ব্যবহার করে পার্টির কাজকর্মে খুব ধারণা ধরণ আমদানী করে।

কোনো সমস্যা ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের মনোগত একপন্থে, অসামান্য উপলব্ধিকে এড়িয়ে যেতে হবে। মনোগত ভাবে দেখার অর্থ ঘটনার বস্তুবাদী রূপ না দেখা অর্থাৎ সমস্যাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্ববেক্ষণ করতে অস্বীকার করা। আমি আমার "প্রয়োগ সম্পর্কে" নিবন্ধে তা ব্যাখ্যা করেছি।"

চেয়ারম্যান মাও সেতুং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের বিশ্লবের অসংখ্য শিক্ষামূলক উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে বিশ্লবী সংগ্রামের রপকৌশল স্বল্পবয়স্কের সমগ্রিক অবস্থা ও বিশেষ অবস্থা অনুধাবন করে নির্ধারণ করতে হয়। শ্রুতমাত্র বিশ্লবীদের বাসনা বা সংগঠনকে বৃদ্ধি হতে না, শত্রুর রপকৌশল ও রপনীতিকো ভুলোভাবে বুঝতে হবে। শত্রু শত্রুর রপকৌশলকে বুঝলেই হবে না, শত্রুর রপকৌশলকে পরাজিত করার জন্যে উন্নততর রপকৌশল ও প্রত্নতির প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতে হবে। তা না হলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্লব ও বিশ্লবের শত্রুদের মধ্যে

অর্থাৎ বিশ্লবী শক্তি ও প্রতিবিশ্লবী শক্তির মধ্যকার স্বল্পবয়স্ক পরিবর্তিত হয়। বিশেষ অবস্থার স্বল্পবয়স্ক প্রকৃতি বিশ্লবরূপ ধারণ করে। এখন সমাজবাদ সরাসরি বৃদ্ধি না করে অপেক্ষাকৃত মৃদু উপায় অর্থাৎ রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক চাপের উপায় অবলম্বন করে তখন আধা উপনিবেশ দেশের শাসকশ্রেণী সমাজবাদের সহযোগিতা করে দেশের জনগণের ওপর শোষণ চালান এবং সমাজবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।"

"আবার এখন বিশ্লবী গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি জোরালো হয়ে ওঠে এবং সমাজবাদ ও তার পদলেহী কুকুর দেশীয় প্রতিবিশ্ববীদের বিপন্ন করে তোলে তখন সমাজবাদ প্রায়শঃ তার শোষণব্যবস্থা চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করে। তারা হয় বিশ্লবী শক্তিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে নতুবা দেশীয় প্রতিবিশ্ববীদের সাহায্য করার জন্যে সরাসরি সেনাবাহিনী প্রেরণ করে।"

ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণীর কৌশল বিশ্লবী শক্তিসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং তা ব্যর্থ হলে সমাজবাদী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বিদ্যমান কিনা তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ভিয়েতনামে মার্কিন সমাজবাদ প্রথম উপায় ব্যর্থ হওয়ার ফলে সরাসরি সেনাবাহিনী পার্টিতে হস্তক্ষেপের দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেছে। ইন্দোনেশিয়াতে তারা প্রথম উপায়ে সাফল্য লাভ করেছে বলে দ্বিতীয় বিকল্প পন্থা গ্রহণ করে নি। অতীতে চীনে চিয়াং কাইশেককে বিপুলভাবে সমরসম্ভার ও উপদ্রবী পার্টির তারা চীনা জনগণের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিল। চীনা জনগণ তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলসূত্র তার সার্বজনীন, সর্বকালীন অপ্রান্ত সূত্র স্বল্পবয়স্ক বস্তুবাদ। এই সার্বজনীন, সর্বকালীন সঠিক মতবাদকে বিশেষ বিশেষ দেশের ঐতিহাসিক বাস্তব উপাদানের সঙ্গে মিলিয়ে, বিশ্লেষণমূলক প্রয়োগের পন্থাই প্রকৃত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

"জনগণের সেবা করার" মৌলনীতিকে তারা গণসংগঠনের, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা, শিক্ষক সংগঠন ও মার্কসবাদী কর্মীদের শক্ত করার প্রতিবিশ্ববী কর্মপন্থাতে পর্ববাসিত করেছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে শাসক শ্রেণী এদের শত্রু অভিযানে উল্লাস চেপে রাখতে পারেনা। তারাও প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে এদের নাম নিয়ে কমিউনিস্ট কর্মীদের হত্যাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। শাসকশ্রেণী বা তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে এদের কোন বক্তব্যই নেই। এভাবে শাসকশ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করে প্রচ্ছদ ইন্দোনেশিয়া চালানোর কর্মে এই সব লোকেরা আত্মনিয়োগ করেছেন। কার্ভাং ইচ্ছার বা অনিচ্ছার তারা শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং দ্রুত বেগে ট্রেস্কীবাদের চোরা গহ্বরের দিকে পা বাড়িয়েছেন।

আমাদের দেশে সংশোধনবাদী, শাসকশ্রেণীর নানা রংবেরয়ের দলগুলি এদের উৎসাহ দিচ্ছে, কারণ

এরা তাদের আঘাত করেন না। আঘাত করেন শাসক শ্রেণীর প্রকলতম শত্রুকে। তাতে লাভ হয় কার? শাসক শ্রেণীর।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলসূত্রকে, স্বল্পবয়স্ক বস্তুবাদী নিয়মকে পরিচালনা করে বাধা বুলির আশ্রয় নিলে এমনটী ঘটতে বাধ্য।

তারা বলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পন্থাকে অনুমোদন করেন। তা কি সঠিক? পিকিং রেডিও থেকে উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা কিম ইল সূত্রকেও তো নয়া-সংশোধনবাদী পেটমোটা দালাল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপর গত বছর চীনের পার্টির পলিটবুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটীর সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই উত্তর কোরিয়া গিয়ে কিম ইল সূত্রের বিশ্লবী নেতৃত্বের উচ্চ প্রশংসা করে এসেছেন। কোনটা ঠিক? পিকিং রেডিও না চৌ এন লাই? ১৯৬৭ সাল থেকে দু'বছর ধরে চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিশ্লব চলা কালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সত্য স্তরে, সরকারী দপ্তরে, রেডিও, সর্বদাপত্র ও সমস্ত প্রচারমাধ্যমের মধ্যে "বজ্রোজ্ঞা প্রতিবিশ্ববী লাইন" এবং মাও সেতুংকে নেতৃত্বে পরিচালিত "সর্বহারা শ্রেণীর লাইনের" মধ্যে কঠোর সংগ্রাম চলছিল। তাই কি চৌ এন লাই পিকিং রেডিওর তৎকালীন প্রাপ্ত সংশোধনের জন্যে উত্তর কোরিয়ার ছুটে গিয়েছিলেন। যদি জাপান ও ভারতের সঙ্গে চীনের স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় থাকতো তাহলে চীনা নেতৃত্ব কি তাদের রেডিও প্রচারের সংশোধন করতেন? গত কয়েক বছর পিকিং রেডিওর এদেশের তৎকালীন বিশ্লবীদের সম্পর্কে নীরবতাই অর্থ কি?

সাংস্কৃতিক বিশ্লব চলাকালে চীনের রুচি লিও শাও চি, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে স্বয়ং মাও সেতুংকে "সদর দপ্তরে কামান দাগো" বলে বড় বড় হরফের স্বাক্ষরিত প্রাচীর পত্র দিতে হয়েছিল। তাকে বিশ্লবী অস্ত্রধারণ ছাত্রদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে হঠাৎ প্রাচীরপত্র দিয়ে, জনগণের প্রতিরোধ উদ্দীপ্ত করে—মনে হয় সৈন্য তিনি পার্টি বা সরকারী প্রশাসনিক ব্যবহার করতে সামরিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই এখন চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন পিকিং-রেডিও লিউ শাও চি না মাও (সেখানে ১ম পৃষ্ঠার)

Free I Free II Free III

ধবল বা (শ্বত)

আমাদের বিখ্যাত "দাগ সাফা" ১৯২৬ সাল থেকে রোঙ্গীদের সম্পূর্ণভাবে রোঙ্গা সারিয়ে আসছে। মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়।

বিনামূল্যে এক শিপি দেওয়া হয়।

WESTERN INDIA CO. (V. N.) P.
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

নির্বাচনী সমীক্ষা : গৃহপট ও দৃষ্টিকোণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় পাল্লিমেটে মধ্যবর্তী নির্বাচন এই প্রথম। এই নির্বাচন হওয়ার কথা উনিশশ বারো সালে, আরো এক বছর পর। শাসক কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ের আগেই বখন নির্বাচন করা ঠিক করলেন তখন এটা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে আরো এক বছর দেরী করলে তিনি তাঁর দলের পক্ষে নির্বাচনের ফলাফল, আশানুরূপ হবে না কিংবা এক বছর আগে নির্বাচন হলেই তাঁর দলের সুবিধা হবে বলে মনে করেছেন।

বলা বাহুল্য প্রধানমন্ত্রীর এই রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যায়নের সঙ্গে শাসক কংগ্রেস দলের সভাপতি সহ অনেক নেতৃবৃন্দই একমত ছিলেন না। তবু প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর নিকটতম পরামর্শদাতাদের মতামত ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁদের একমত হতে হয়েছে।

অনেকেই মনে করতেন যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে একটা বড় রকমের

রাজনৈতিক জুয়াখেলায় জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু উনিশশ একাত্তর সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচন আহ্বান করে তিনি এর চেয়েও বড় ধরনের রাজনৈতিক দূরত্ব জীড়ায় লিপ্ত হয়েছেন। এর ফলাফলের প্রভাব ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির পক্ষে সুদূর প্রসারী ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ হবে, একথা নিশ্চিত।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা যে কূটনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় একথা সত্য। কিন্তু রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আধুনিক অবস্থার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুতরাং ভারতবর্ষের দ্রুত ভেঙ্গে পড়া আর্থিক কাঠামো, ভারতীয় পণ্যোৎপাদন, বিনিয়োগ, ভোগ ও সম্পদের সমস্যাগুলি থেকেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির জন্ম হয়।

ভারতের রাষ্ট্রকাঠামো যে প্রণালী কবলে তাঁরা হলেন বিদেশী মূলধনের সঙ্গে অংশীদার, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি আর রাজা, জমিদার, মহাজন, জোতদারেরা। বর্তমানে এই শাসকশ্রেণী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কারণ সারা পৃথিবীতে বখন পুঁজিবাদী সমাজ-

ব্যবস্থা সংকটে নিমজ্জিত, ভেঙ্গে পড়ার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন এই নির্বোধ শাসকশ্রেণী পুঁজিবাদী উৎপাদনের পথে বিকাশ লাভে আগ্রহী।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন শাসক কংগ্রেস এই শাসকশ্রেণীরই অন্য-

তম প্রধান রাজনৈতিক দল। মূর্খ সমাজতান্ত্রিক অথবা প্রগতিশীল বুলি কাজে হীনতম একচেটি পুঁজিপতিদের নীতি অনুসরণ, এটাই হল ইন্দিরাজীর কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য। মোরারজী পাতিল নিজলিঙ্গাপ্পার সংগঠন কংগ্রেস যা চান, ইন্দিরা কংগ্রেস তা রূপায়িত করেন। নিজলিঙ্গাপ্পা বখন সরাসরি কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধমন্ডল সরকারকে বাতিল করে দেবার দাবী জানান। ইন্দিরাজী সুকৌশলে ছদ্ম বামপন্থীদের সহায়তায়

তাই কার্যে পরিণত করেন। নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস দাবী জানান কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পলিশ ও আমলা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানবদলকে পিটিয়ে, শাস্ত্রতা করতে হবে, ইন্দিরাজী তাই করেন। আবার নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস বখন বলেন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে একচেটিয়া মূলধনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না, তখন ইন্দিরা

কুসংস্কারাঙ্ক ও ধর্মাত্ম অংশবে সরাসরি প্রতিক্রিয়ার পতাকার নীচে সংঘবদ্ধ করে ভবিষ্যতে প্রগতিশীল শক্তির ওপর বিরূপ হিংস্র আক্রমণের মহড়া দিচ্ছে। দেশের দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, পি এস পি ফরওয়ার্ড ব্লক, এস এস পি, ডি এম কে প্রভৃতি তথাকথিত একদা প্রগতিশীল দলগুলি কার্যতঃ শাসকশ্রেণীর এই বৈতন্যীতির দালাল ও প্রবক্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

শাসকশ্রেণীর হিসাবে (এক) প্রগতির ধৃজা ওড়ানো মেকী প্রগতিশীল ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের দুই দশকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও ক্রিয়াকর্মে বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশকে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, পি এস পি প্রভৃতি ছদ্মবাম দল এই কুর্কমে ইন্দিরা গান্ধীকে সাহায্য করতে পারবে। বৈতন্যীতির এই মূর্খ, বামপন্থী একতা ধ্বংস ও জনতার বিচ্ছিন্নকরণে বিপথগামী করে কংগ্রেসের পতাকা তলে নিয়ে আসা যাবে। অন্যদিকে (দুই) রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ, সরল কিন্তু কুসংস্কারাঙ্ক মানবকে সরাসরি, নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেসের পতাকার তলে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হবে। আর জনসংঘ, স্বতন্ত্র ও বুলি-বিশারদ এস এস পি দলগুলি একত্রে শাসকশ্রেণীর সহায়তা করবে।

এর ফলে নির্বাচনের পরে দেখা যাবে যে ইন্দিরাজী অথবা নিজলিঙ্গাপ্পা—কোনো কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি কিন্তু উভয়ে মিলে কেন্দ্রীয় পাল্লিমেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। তখন সামান্য অদলবদল করে শাসকশ্রেণী চাপ দিয়ে দুই কংগ্রেসকে মিলিয়ে দিয়ে শত্রু শ্রেণী সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনকে আগে ঐক্যবদ্ধ করলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ সম্ভব হয় না। তাছাড়া জনসংঘ, স্বতন্ত্র, বি কে ডি, দক্ষিণী কমিউনিস্ট প্রভৃতি দল থেকে সদস্য ভাঙ্গিয়ে নিয়ে সংখ্যাগুরু লাভ করা অসম্ভব হবে না। ইতিমধ্যেই বহু স্বতন্ত্র, জনসংঘ, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেতা দুই কংগ্রেসের কোনো না কোনো-টাতে ঢুকে পড়েছেন।

কিন্তু এবারের সংগ্রাম যে শাসকশ্রেণীর পক্ষে সুদূর প্রসারী এটাও শাসকশ্রেণী জানে। তাই তারা কেবল দালাল পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত নয়। টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, গোয়েন্কা প্রভৃতি বাঘা বাঘা পুঁজিপতি এবার নিজেরাই পাল্লিমেটে দাঁড়িয়ে যাতে তারা তাদের সরকারকে মূহুর্তে মূহুর্তে নির্দেশ দিয়ে পরিচালিত করতে পারে। তাই কে কে বিড়লা, রামনাথ গোয়েন্কা, এ কে জৈন, নিজে-রাও পাল্লিমেটে নির্বাচনপ্রার্থী। অন্যদিকে নির্বাচনের পরে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল মহড়া দেবার আব- (লেখকঃ চম পণ্ডার),

ভরত দর্পণ

বৃদ্ধ বয়সেও
স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে



সাধনা

চ্যবনপ্রাশ

বহুমূল্য আয়ুর্বেদীয় রসায়ন

সকল বয়সেই সম্ভাব উপকারী



প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে

সাধনা ওষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ বোমেনচন্দ্র ঘোষ এম.এ.,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম.সি.এস. (লন্ডন)
এম.পি.এস. (আমেরিকা) তাম্রপুত্র
কলেজের সহায়ক শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নবেলচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য



বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত
হয়ে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিশালী একটি
বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ
বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট
থাকে।

এই কলকাতায়

থানা থেকে সজ্জিত আর অমরকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতেই রাত গাড়ির পোনে এক।

“খবরের পেটে মোচড় দিচ্ছে রে।”

“হা বলেছিস। অগস্ত্যের কুখানল। হা, পড়বে বোকা হজম।”

কলকাতার রক্ত রেগে উঠে বললে, “পোন্টার মারার আর জায়গা পেলে না শালা; শেষে সি আর পির চোখের ওপর ‘জ্বালাও অগ্নিশিখা’, ‘লাগাও আগা।’”

ছাড়া উপরে সজ্জিত আর অমরের বোল ফুটেছে। বললে, “প্রশ্নটা নাট্যকারকে করলেই পারতে। বিজ্ঞাপনে অন্য নাম দিলে কপি রাইট এ্যাঙ্কেই চলান করত।”

“তাহলে নাটকই কর আর আমরা কুখার অগ্নিশিখার জ্বলে মরি।” বলল তালুকদার।

রক্ত আগের মতোই গজগজ করতে থাকে। “যত সব ন্যাক-রামো। দেশ কাল বোঝো না বাপু। সি আর পি এক সাংবাদিক চীজ। সেদিন মিলিটারী কামদার এক ব্যহ ফেঁদে বন্দকের নল খুঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক গাড়ি সি আর পি। শব্দকর স্কোপের শেষ দৃশ্যের মতো চোখের সামনে দ্রুততালে উর্ধ্ববাহু নৃত্য করতে করতে নাগরিক বাহাদুরনা কোনো গতিকে সটকে পড়ছেন। আমার পাশেরটার কাঁধে অকস্মাৎ একটি মোক্ষম থাবা, “এই তোমু কাঁহীকা আদমি।” প্রাণভরে লোক বাপের নাম ভুলে যায়। তখন চাচার কথা স্মর্তব্য। লোকটা ষাঁউ মাউ করে চীৎকার করে উঠল, “বরিশাল, বরিশাল!” বোঝো। থাকিস বড়িশাল, ঠাকুরদার জন্মস্থান তুলে দিক্ করা কেন? বরিশাল শুনেই লোকটাকে সম্বন্ধে পাঁচটা সি আর পি সাপটে ধরল। বন্দ দেখে ছুটে এলেন অফিসর, “ক্যা হুয়া?” “ইয়ে এক নরা পাটি হুয়া, সাব, বোল্ রহা কি, ‘বরিশাল’।” অফিসর এমন দৃষ্টিটার সঙ্গে জীবনে বোধকরি প্রথম মোলাকাৎ করছেন, তাই বোকার মতো আমাদের দিকেও তাকালেন। লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর বোকা গেল, সি আর পি সেপাই বেশ কটি পাটির নাম মুখস্ত করে ফেলেছে, থা মাহাজোট কংগ্রেস, মহাজাতি কংগ্রেস, আর আর মুড়ি মিছরি মিশেল পাটি এবং দুর্বিনীত সি পি এম, নকশাল। সুতরাং তাদের ধারণায় “বরিশাল”টাও ঠিক নরা পাটি হো শকতা।

আমরা সমস্তরই হেসে ফেললাম, “এমন কিছুর গালগল্প চালু হয়েছে বটে। কিন্তু রাত দুপুরে তোমার গ্যাসের উনানের চাবি বন্ধ কর বাপু। পা চালিয়ে ডেরায় ফেরা থাক। পশ্চিমঘো সি আর পির নজরে পড়লে ফের থানায় ফিরতে হবে।”

থানায় থাওয়ার নামে নিতাইদা লেপের মধ্যে ঢুকেছিলেন, নিচে

আমাদের গলায় আওয়াজ পেয়ে বারান্দার নিজমুর্তি ধারণ করলেন। গার্জনের গলায় হাঁক পেড়ে বললেন, “তাহলে খালাস হলেন নাটকে বাবুদা।”

ক্ষেপে গেল রক্ত, নিচু গলায় বললে, “শালা ঢামনা বড়ো, স্বার্থপর। থানায় যাবার বেলা লেজ গুটিয়ে সরে পড়ল, এখন হকুম বকুম শোনো।” গলা চড়িয়ে বললে, “আপনারও তো খালাস করার সময় হয়ে এলো।”

“তার মানে?” বারান্দার রেলিং-এ বন্ধদেশ বন্ধিয়ে দিলেন নিতাইদা। (মেসের ভাত খেয়ে গিরীশচন্দ্রের মতো একজোড়া বন্ধ হয় কী করে? উনি যেন উনিশ শতকের নখর পুরুষটি।)

সিঁড়িতে বাক নিয়ে রক্ত বললে, “মানে, পেটপুজো সেরে নিয়েছেন তো, রাতও গাড়িরে এলো। এবার পাশখানায় গোটা চার বিড়ির সাধনা.....”

ডেবেছিলাম নিতাইদা একর মেস মাথায় করে তুমুল কাণ্ড বাধা-বেন, “তুমি কী আমার ইয়ে পেরেছ” নাকি, হ্যা? বাপের বইসী.....” কিন্তু না। কোনো কথা নয়। সোজা ঘরে গিয়ে শুরে পড়লেন নিতাইদা।

রক্ত বললে, “এই ঢামনা বড়ো-গলো যদিমন বাতাসে শ্বাস টানবে, তামিন্দা শালা এদেশের আর কেহনো উমতি নেই।”

ভোর বেলায় বিছানা থেকে ডেকে তুলল হাবু। পাড়ার রেশু মাসিমার ছেলে। বয়স সাত আট। রেশু মাসি ডাকছেন। চা-টা ওখা-নেই খেতে বসেছেন। না, বিমল মিত্রের গম্পান্যাস থেকে অদ্যাবধি বৌদি সোনাদিদাদের নাম এলেই যেমন রোমাসের গম্ব কস্তুরী মুগের মতো ছড়িয়ে পড়ে, রেশু মাসির আহবানে সে সমস্ত কিছু নেই। বিধবা মেয়ে মানুষ, মৃত স্বামীর বাড়িটিতে তিনটি ভাড়াটে বসিয়ে কোনো রকমে হাবকে মানুষ করার কতব্য পালন করে যাচ্ছেন। ঋষিদা স্নেহ করতেন, সেই সুবাদে বিপদে প্রয়োজনে রেশু মাসি ডাক দেন। দাদার বৌ মাসি হরনা, তবে পাড়াভূতো দাদা মাসি বৌদিদের সম্পর্ক ঠিক স্বামী স্ত্রী মসেপে স্থির হয় না। পাড়াতো সম্পর্ক তো আর কোবেলা উইল দানপত্র অপর্ণনামা কিম্বা ম্যারেজ রেজিস্টারের সার্টিফিকেট নয়। তাই ঋষিদার বৌ আমাদের রেশু মাসি।

আহবানের কারণ হরিণ ঘাটার দুধের কাড়। সদাশয় হরিণঘাটা শহরবাসীকে উপযুপরি খোলা দুধ সেবন করিয়েই সুখী হতে পারে নি। আরো কিছু লাভনা বাকি ছিল নাগরিক লগাটে। তাই অনেক মিষ্টিং করে ঠিক হয়েছে, মিলক বুধে কাড় লিখিয়ে বিশেষ অফিসে টাকা জমা দিয়ে আসতে হবে।

শনি রবিবার, মানে লোকের ছুটির দিনে জমা করার সুযোগ নেই। পোষ সংক্রান্ত উরিয়ে পরলা মাখ থেকে শনি-রবি মাইনাস করে ছয়ই মাখ পর্যন্ত, অর্থাৎ পাঁচ দিনে তিন পাঁচ পনের ঘণ্টা টাকা জমার ফরমান জারি হয়েছে। গোটা ভবানীপুরের জন্যে কালী টেম্পল রোডের ওতার সীজ ব্যাংক বিল্ডিং মনোনীত রিসিভিং সেন্টার। এমতা-বশ্যায় রেশু মাসি আমারই স্মরণ-পন্ন।

“তোমার তো ভাই আফটার-নুন ডিউটি। কাড় না করালে হাবুর জন্যে দুখ পাব না। কাছে পিঠে ষাটালও নেই।”

মনে মনে প্রমাদ গললেও মুখে বললাম, “আরে তাতে আর স্কো-চের কি? দিন জমা দিয়ে আসি।” রেশু মাসি কৃতজ্ঞতার কাদা হয়ে গেলেন। না, রেশু মাসিকে ঠিক বদ্বতী বলা যায় না। তবে মুখশ্রী করুণ লাগল। এ বয়সে এমন কারো অনুরোধ ঠেকানো শক্ত।

বিরাট এক মিছিল-অজগর গোটা তিন পাক খেয়ে খুব ধীর, গতিতে বুক মুচড়ে লক্ষ্যস্থলে এগোচ্ছে। অমৃতলোভে অজগরের লেজে পা পেতে দাঁড়ালাম। মাথার ওপর সূর্যদেব তখনও দন্তরাজি কোমুদী বিকশিত করেন নি। শীতের সকাল, সাড়ে আট, তার লেবুকোয়া, ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো রোদ, ছিটকোচ্ছে শব্দ। মন্দ লাগছে না। কিন্তু লাইনে উল্লেখ আর টেনশন চলন্ত শুরো-পোকার মতো মাঝে মধ্যে কেঁপে উঠে ল্যাক্সমুড়ো আন্দোলিত করছে।

“আজ্ঞেই তো দেখেছেন দাদা, শ্যামাপ্রসাদের বাড়ি ছুঁয়ে এরই মধ্যে সদানন্দের (বলা বাহুল্য এ দুটি দু মাথার রাস্তার নাম, উদ্যোর ভাগে হতভাগ্য দংশসেবীদের লাইন) পেটে গুঁতো দিয়ে লাইনটা দুদুবার পাক খেয়েছে। পাঁচশ মানুষ শব্দ রাস্তায়। এরপরও গেট পেরিয়ে বাড়িতে ও তারপর তেতলায়। পেঁহতে কটা বাজবে? অফিস কি স্পেশাল লিভ দেবে এজন্য?”

“অফিস নিয়ে ভাবছে কে? দেশে কি কেউ কাজ চায়? যা চাওয়া হয় তা হল যথেষ্ট অপচয়। মুখে বুলি, কাছে গুলী আর তোর মাকে খাটে তুলি অবস্থা।” (লাইনে হাস্যরোল)

“আমি তো পোস্টাল অর্ডার কিনতে গিয়ে হতাশ। আউট অব পোস্ট অফিস। অগত্যা লাইনে।”

দেখলাম ভুল্লোকের হাতে কাউন্টার ফরেন শব্দ লম্বা কাড়। বললাম, “পাননি ভালই হয়েছে। পেলে গচ্চা বেত।”

“কেন?”

“কাড় করিয়ে ফেললে বুধে আর পোস্টাল অর্ডার নেবে না।”

দেখলাম, একঘর দারুণ কাজ হল। আসলে এমন তরুণ বা যুবক অসম্ভব যে তার তারুণ্য ও বৌবনের স্মৃতিতে সুখী নয়। এদেশে ওদের লোকে কেবল গালিগালাজই করে, ওদের প্রচণ্ড প্রতাপ আর ইমপার্ট্যান্টা কেউ বুঝিয়ে বলেন না, বুকতে চান না। মাঝে মাঝে আহবান করেন। মেকি। আহবান নয়, ওদের মধ্যে বোধের সৃষ্টি চাই।

“বুধ ব্যাংক ড্রাফটও বুঝছে না।” জর্নকের কোভ।

“তা কসড্ চেক নিলে কী হত? সমস্ত পোস্ট অফিসে টাকা জমা নিলে অসুবিধে কী ছিল? পরলা থেকে সাতদিন কসড্ চেক নিয়ে কুড়ি তারিখে কাড় দিলে চেক ডিঞ্জ-অনার্ড হওয়ার ভয় ছিল না। তাছাড়া অমন চেক ইলেকট্রিক সাপ্লাই, গ্যাস কোম্পানী, কর্পোরেশন কে না নেন। এদেরই যত ডিঞ্জনার্ড হওয়ার ভয়।”

কে যেন টিটকিরি কাটলেন, “ওরাই তো সেক্সপায়রের - মোশ্ট অনারেবল মেন কিনা।”

একটা উল্লগত হাসি ধমকে গেল। কেননা লাইনে তখন বিক্ষোভ। ব্যাপারটা চিরাচরিত। জনৈক বছর আঠার উনিশের ছেলে বন্ধু পেয়ে লাইনের আগায় নিজের কাড় গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বর্ষায়ান কয়েকজন তিরস্কার করছেন। প্রত্যন্তরে সেও তেরিয়া। পেছনের ভদ্রমহিলা নিচু গলায় বললেন, “খামিরে দিন না, আজকাল যে রকম অবস্থা। কীর থেকে কী হয়।”

বাস্তবিক, বাক্যবাগিশ বঙ্গভরা সম্প্রতি বে-কামদা। আগে ছিল শতং বদো মা লিখ। এখন হয়েছে, শতং ভাবো, মা বদো কিম্বা লিখ। ভদ্রমহিলার আশঙ্কা অমূলক নয়। ষাড় বাকিরে দেখলাম, তিরস্কারকারী ভদ্রলোকের পরপে অফিসের পোষাক স্কাট নেকটাই। ছেলেটির সার্ট পাজামা। আঘাত পেয়ে প্রত্যাঘাতের আশ্বালন চোখে একে আমাদের দিকেই নেমে আসছে।

পাশাপাশি হতে বললাম, “কি হল ভাই?” (মাঝে মাঝে এমন ন্যাকা সাজতে হয়। জিহ্বায় অস-স্মৃতি, মুখে মিষ্টি পানের পিক।)

“দেখুন না, ভালো করে বল-লেই হয়। অভ্যের মতো.....”

“আহা দেখছি তো উনি বয়ো-জ্যেষ্ঠ, তাছাড়া লাইন দেখে ক্ষিপ্ত। অফিসের সময় গাড়িরে যাচ্ছে। ভেতরে দারুণ টেনশন।”

“তা, ভদ্রভাবে বলতে পারেন না?”

“শিশুর পারেন। চেহারাটো স্নিকিত ভদ্রলোকের মতোই কিন্তু দেশের অবস্থাটা মানুষকে ভদ্র থাকতে দিচ্ছে কৈ। তুমি, তো বোকার কথা। তাছাড়া তোমরাই বলতে গেলে ভরসা। এই এতো লোক, তাতে লাইন ভর্তি মা বোন মাসিরাও দাঁড়িয়ে। তোমাদেরই দেখার কথা, প্রত্যেকে হতাশ না হয়ে বাতে টিটকি, সরি, কাড় পান.....”

দেখলাম, একঘর দারুণ কাজ হল। আসলে এমন তরুণ বা যুবক অসম্ভব যে তার তারুণ্য ও বৌবনের স্মৃতিতে সুখী নয়। এদেশে ওদের লোকে কেবল গালিগালাজই করে, ওদের প্রচণ্ড প্রতাপ আর ইমপার্ট্যান্টা কেউ বুঝিয়ে বলেন না, বুকতে চান না। মাঝে মাঝে আহবান করেন। মেকি। আহবান নয়, ওদের মধ্যে বোধের সৃষ্টি চাই।

এই সময় জনৈক বৃদ্ধকে জন দুই কাড়হোল্ডার সাহায্য দান করে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বছর আশি বয়স। কুঁজো হয়ে গেছেন। তবে এখনো বেঁচে আছেন! বোকা যাচ্ছে, তার ফুস ফুস আর টানতে পারছে না। লাইনটা সরোবে ফেটে পড়ল, “দেখুন অবস্থা!” “বৃদ্ধার কি তিনকুল কেউ নেই?” আমি স্ব-গতোক্তি করলাম।

আমার সামনে জনৈক পরি-চারিকা শ্রেণীর মহিলা বলে উঠলেন, “থাকবেন কেন, ছেলের ভাত খায়, নাইন দিবনি?”

সমস্ত লাইনটা স্তব্ধ। সবার মনেই এক প্রশ্ন, কী সন্তানই পেটে ধরেছিলে মা, এমন দুর্গতি। “আহা, আহা রে।”

বীরেন্দ্র মিত্র

ওরাই কাণ্ডারী, ওরাই বৃদ্ধের বর্ষি, এটা ওদের বাস্তব অবস্থার বোধে উপলব্ধ হওয়া চাই। মানুষের ওপর দায়িত্ব না এলেই সে উচ্-শ্বল হয়। ওদের দায়িত্বশীল হওয়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশ চাই। কিন্তু তা নেই। সব দায়িত্বের বোকা বড়োরা লুপ্তের মতো আঁকড়ে বসে আছেন। আর ওদের বঙ্গা-হীন কুম্বারের মতো সরিয়ে রাখা হয়েছে দেশ গড়ার দায়িত্ব থেকে। দেশের দেশের ওপর টান ওদের আসবে কোথেকে। শব্দ বড়োদের বক্তৃতা শুনে? কিন্তু ঘাটের মড়ার মধ্যে হরি বোল শুনে ইহকালের চিন্তা কার মনে জাগে? ওরা কাঁচা, ওদের পরকালের তোয়াক্কা কী। ওদের দায়িত্ব ওদেরই বুদ্ধে নিতে দেওয়ার মতো বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নিজের প্রতি ওদের সন্তুষ্ট করতে হবে, তবেই না অপরকে শ্রদ্ধা করবে তারা।

কিন্তু তামাশাটা এতক্ষণে তেতে উঠেছে। আউটা থেকে সাড়ে বারোটা। লোকে শব্দ লাইন দিতে দাঁড়িয়ে।

এই না গেট বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বড়বাবু হুকুম দিয়েই “খালাস। জনতার ঠেলা বাদের সামলাতে হয় তারা এগারটা পার করেই কাজ করছেন। ওদিকে জনতা নিয়ে দারুণ শক্তি পরীক্ষা চলেছে। এত-দিন যে খাঁটি দৃষ খাওয়ানো হল, এ তারই শক্তি পরীক্ষা। দেখা যাক, কার কত তাগদ বেড়েছে। কে কত কন্টসহিবু।

একজন মাঝবয়সী চীৎকার করছেন, “আমাদের কিরে যেতে হল, কারকে রেখে যাব না! কি হত কসড্ চেক নিলে? লোকে কি মিস্ক কমিশনারের সঙ্গে জোচ্ছুরি করত? না হয় চেক ভাঙিয়েই কাড় ইস্যু করতেন তিনি। বিনা পয়সায় বিনি দুখ খাওয়াতে পারেন সারা শহরটাকে, তাঁর এমন চেক-শুচিবাই কেন?”

যত বেলা বাড়ছে, লাইন যতই কাউন্টারের কাছাকাছি পেঁহছে, ততই টেনশন অধৈর্য বৃদ্ধি উত্ত অতৃপ্তি। কিছু অঙ্গীল উত্তিও ছিটকে আসছে।

এই সময় জনৈক বৃদ্ধকে জন দুই কাড়হোল্ডার সাহায্য দান করে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বছর আশি বয়স। কুঁজো হয়ে গেছেন। তবে এখনো বেঁচে আছেন! বোকা যাচ্ছে, তার ফুস ফুস আর টানতে পারছে না। লাইনটা সরোবে ফেটে পড়ল, “দেখুন অবস্থা!” “বৃদ্ধার কি তিনকুল কেউ নেই?” আমি স্ব-গতোক্তি করলাম।

আমার সামনে জনৈক পরি-চারিকা শ্রেণীর মহিলা বলে উঠলেন, “থাকবেন কেন, ছেলের ভাত খায়, নাইন দিবনি?”

সমস্ত লাইনটা স্তব্ধ। সবার মনেই এক প্রশ্ন, কী সন্তানই পেটে ধরেছিলে মা, এমন দুর্গতি। “আহা, আহা রে।”

বীরেন্দ্র মিত্র

বীরেন্দ্র মিত্র

বীরেন্দ্র মিত্র

বীরেন্দ্র মিত্র

বীরেন্দ্র মিত্র

বীরেন্দ্র মিত্র

বীরেন্দ্র মিত্র

বীরেন্দ্র মিত্র

বীরেন্দ্র মিত্র

নকশালী পথ সম্মুখে কয়েকটি কথা

গত পঁচিশ ডিসেম্বর সংখ্যা দপণে “জনৈক ছাত্র” সি পি এম সমর্থকদের কিছু চিন্তার ঝোঁক জুগিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করেছেন। সি পি এমের একজন অর্থ সমর্থক না হলেও তার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছি।

এক নম্বর প্রশ্নে পরলেখক জ্ঞানিয়েছেন যে, পুলিশ নকশালীদের বিরুদ্ধে অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। চারু মজুমদারের মধ্যকার অন্য দল হাজার টাকা পর্যন্ত খোঁচা করা হয়েছে, তদুপরি উক্ত নেতার খাট, চেয়ার, টেবিল পুলিশ আটক করেছে। কিন্তু ভেবে পাইনা নেতার খাট, চেয়ার, টেবিল পুলিশ আটক করলেই উক্ত নেতা এবং তার অনুগামীদের সম্বন্ধে ব্যবতীয় সুন্দরের নিরসন হয় কি? আবার সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা যায় (সংবাদপত্র মারফৎ) যে-বঙ্গোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার উপর পুলিশদের এত ক্রোধ, যে বঙ্গোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার হাত থেকে ছাত্র সমাজকে বাঁচার দায়িত্ব নিয়ে নকশালপন্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাঙ্গাচুর চালিয়ে যাচ্ছেন—পরীক্ষা ভাঙল করে দিচ্ছেন সেই বঙ্গোয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারফতই চারু মজুমদারের সন্তান নির্বিকার শিক্ষা লাভ করছে কী ভাবে। অন্যের শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বঙ্গোয়া হয়, তবে চারুবাঘের সন্তানের বেলায় সে কথা খাটবে নাই বা কেন। আর

পুলিশ সি আর পি শব্দে নকশালীদের বিরুদ্ধেই নয় প্রকৃতপক্ষে নকশালদের নাম করে জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সি পি এম সমর্থকদের উপরই সর্বাধিক অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। সি আর পি সহ সমগ্র অত্যাচারী পুলিশ বাহিনীর এই বৈআইনী কার্য-

তা দিয়েই থাকে তাকে নকশালপন্থীদের ভয় পাবার কি আছে—বিস্তারিত যখন সত্যিকারের আসবে তখন কেউ কি তাকে পারবে ঠেকিয়ে রাখতে। আমরা কিন্তু দেখছি ঠিক উল্টো জিনিসটা—যেমন নকশালপন্থীদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের কার্যক্ষেত্র ছিল গ্রাম আর ঐ গ্রামকে

ছয় নম্বর প্রশ্নের জবাবে “জনৈক ছাত্র” জানতে চেয়েছেন বারা ভেটের মাধ্যমে গদির আশা করে তারা কি ভাবে জনগণতান্ত্রিক সর্বহারার বিপ্লব করবে। কিন্তু আমরা প্রশ্ন বারা ব্যক্তিগত সম্ভাব্যদের পথকে আশ্রয় করে এবং ঐ পথে পরিচালিত হয়ে একশ

দেড়শ টাকা মাইনের পুলিশ কন-স্টেবল ট্রাফিক পুলিশ, সাধারণ কেরানী এবং সর্বহারার প্রতীকী পথচারীকে হত্যা করে তারাই বা কি ভাবে সর্বহারার বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে আসছে বুঝে ওঠা দায়।

প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা

যাদবপুরে বীভৎস হত্যাকাণ্ড

আমি দক্ষিণ কলিকাতার যাদবপুর, বিজয়গড় অঞ্চলভুক্ত অরবিন্দ পল্লীর একজন বাসিন্দা। গত সাতেরই জানুয়ারী তারিখে রবিবার দিন এই অঞ্চলে সম্পূর্ণ দিনের আলোয় যে বীভৎস নারকীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হলো কোন সভ্য-দুনিয়ার বোধহয় এর নজীর প্যুওয়া বাবে না।

ঘটনার বিবরণ হলো যে ঐ দিন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটো নাগাদ কয়েকজন সি পি এম সমর্থক যুবক পনেরো-ষোল বছর বয়সের চারটি ছেলেকে বৈষ্ণবঘাটা অঞ্চলের একটি মাঠে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার দিতে থাকে। স্থানীয় জনসাধারণের জিহ্বাসার উত্তরে ঐ যুবকটি জানায় যে ঐ ছেলেগুলি নকশালপন্থী এবং বোমা নিয়ে নাকি ঐ অঞ্চলে এসেছিলো।

এ কথা সত্যি হতে পারে, কারণ এই এলাকার একটি নামজাদা কোম্পানীর (ছয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস) কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কিছু অফিসারের বিরুদ্ধে নকশাল, অ্যাকসনের সম্ভাবনা ছিল এবং ঐ ঘটনার পরের দিন ঐ কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের ওপর অ্যাকশন হয়। বাইহোক ঐ যুবকটি কিন্তু ছেলেগুলির কাছ থেকে পাওয়া কোন বোমা দেখাতে পারে না। তখন জনসাধারণের মধ্য থেকে কয়েকজন ঐ ভাবে অল্প বয়স্ক ছেলেগুলিকে প্রহার করার প্রতিবাদ করেন এবং ওরা যদি সত্যিই অপরাধী হয় তবে তাদের পুলিশের হাতে সমর্পণ করতে বলেন।

এতে ঐ যুবকটি কিন্তু হয়ে ওঠে এবং অশ্রব্য ভাষায় ঐ ভদ্রলোক করজবর্জক গালাগালি করতে থাকে। এরপর বেদম প্রহার দিয়ে ঐ ছেলেগুলির কাছ থেকে কিছু স্বীকারোক্তি আদায় করে ওরা (সি পি এম সমর্থক যুবকদল) ঐ ঐ ছেলেগুলিকে অরবিন্দ পল্লীর পিছনদিকে এক নির্জনস্থানে নিয়ে যায় এবং সেখানে নৃশংসভাবে ছুরি দিয়ে আঘাত করে করে চার-জনের ভেতর তিনজনের মৃত্যু ঘটায়। নাকি ছেলেটিকে পুরোপুরি হত্যা করার আগেই স্থানীয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে পড়ে যাওয়াতে তারা পালিয়ে যায়।

এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বেলা প্রায় দুটো নাগাদ। ঐ ঘটনার প্রতি-ক্রিয়ায় ও নৃশংসতার সমস্ত এলাকার জনসাধারণ ভয়ে বিম্বয়ে নির্বাক হয়ে যায়। সকলের মধ্যে এক প্রশ্ন “নকশাল দমনের” নামে

এক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী তথাকথিত মাকসাদী দলের এক চরম ফ্যাসিবাদী গুডামী।

এর আগেও এ অঞ্চলে প্রেমানন্দ মৃধাজী নামে বাঁশদোপী এলাকার (সংবাদপত্রে প্রকাশিত) ও টেলিগ্রেফের একটি যুবক খুন হয় ঐ একই গুডামীবাহিনীর হাতে। কিন্তু এত ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলের পুলিশ মহল নির্বিকার, এমনকি ঘটনার দিনও তারা ঘটনা জানার বহুক্ষণ পূর্বে হাজির হয়েছে এবং অপরাধীদের ধরার জন্য কিছু-মাত্র চেষ্টাও করে নি।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

প্রতিবাদ

বিশিষ্ট সম্ভাষণী শ্রীনিমল গুহরায়কে পুলিশ অতিক্রান্তে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রবেশ করে প্রোত্তার করে নিয়ে গেছে গত বিশে জানুয়ারী দুপুর বেলায়, এবং তাঁকে বহুবিধ মামলার জড়ার অপপ্রয়াস, চালাচ্ছে। আমরা মনে করি, এই স্পর্ধিত প্রোত্তার বাংলার সংস্কৃতি-জগতের ওপর এক কলঙ্কজনক আঘাত। আমরা পুলিশের এই কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ করি এবং অবিলম্বে শ্রীনিমল গুহরায়ের মুক্তি দাবী করি। শ্রীগুহরায় “অঙ্গার,” “মানুষের অধিকার” প্রভৃতি বিখ্যাত নাটকের মঞ্চস্থপতি; তার ওপর এই অত্যাচার প্রকৃতপক্ষে কলকাতার নাট্যশালা, নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্যমোদী জনগণের অপমান।

উৎপল দত্ত

সম্ভাষণী

বিবেক নাট্য সমাজ

মতামত

কলাপের বিরুদ্ধে একমাত্র সি পি এম-কেই দৌঁধি প্রতিবাদে, বিক্ষোভে সোচ্চার। যে সম্মেলনের ব্যাপারে এত কথা সেই প্রসঙ্গে আবার উল্টো জিনিসটাও সেরদিন চোখে পড়ল। সেরদিন আমেরিকার ভারতস্থ রাষ্ট্রদূত কিটিং সাহেব কোলকাতায় বকে দাড়িয়ে বলে গেলেন নকশালীদের মাঝে আমেরিকানরা নেই। এর ম্বারা কি বুঝব?

দুই নম্বর প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি (পরলেখক) দেখাতে চেয়েছেন সি পি এম নাকি আগে কথায় কথায় ধর্মঘট ডাক্তার আর সংবাদপত্রের অফিস পোড়াতো। ওসব ছেড়ে দিয়ে তারা নাকি এখন মিটিং-এর মাধ্যমে নকশালীদের তথাকথিত বিপ্লবে বাধা দেয় বা দেবার চেষ্টা করছে। আমার কথা মিটিং করে সি পি এম নকশালী বিপ্লবে বাধা দেবে কেন আর যদি বা তারা

দিয়েই শহরে ঘোরার পরিকল্পনা ছিল তাদের, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখছি, সে সব পরিকল্পনা ভুলে গিয়ে কোলকাতা শহরের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলই এখন তাদের আসল কার্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সি পি এমের বিরুদ্ধে কারেমী স্বার্থবাদীরা অপপ্রচার আর কুংসার বন্ধ্যা ছোটাচ্ছে। আর ঠিক এমনি সময়েই আমরা দেখতে পাচ্ছি নকশালপন্থীরাও তাদের ধারতীয় রোষ, একত্রিত করেছেন সি পি এমের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন? সি পি এম কর্মী, কাউনসিলার, মেয়র ইত্যাদির উপর জঘন্যতম আক্রমণ চালিয়ে তারা কাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন একথা একবারও ভেবে দেখেছেন কি?

তিন নম্বর প্রশ্নের সম্বন্ধে বলা চলে—একথা ঠিক যে, শব্দ দেয়ালে লিখে লিখে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের পটভূমি তৈরী করার জন্য বিপ্লবী পন্থা, সর্বশেষভাবে অনুযায়নেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। সর্বসাধারণকে দূরে সরিয়ে রেখে বা অকারণ বোমা ফাটিয়ে নিশ্চয় বিপ্লবী রূপক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া যায় না আর গ্রামের দিক থেকে মূল নজর উঠিয়ে এনে শহরে জীবনে সম্ভ্রান্ত ভাব জাগিয়ে তুলে বর্তমানে কোন মহান বিপ্লবী কার্য সমাধা হচ্ছে?

চার নম্বর প্রশ্নে জনৈক ছাত্র দেখিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন জ্যোতি বোসের একটি উক্তিই নাকি ঐ সি পি এম নকশাল সংঘর্ষের পটভূমি তৈরী করে দিয়েছে। কিন্তু অহিংসপন্থী গান্ধীবাদী নেতা অজয় মুখার্জী যখন বলেন নকশালদের নাক, কান কেটে দিন, ছুরি, দা নিয়ে ওদের প্রতিরোধ করুন তখন নকশালপন্থীরা সেই কথার জের টেনে বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন না।

পঁচ নম্বর প্রশ্নে পরলেখক জানতে চেয়েছেন সি পি এম কী ভাবে ভোটের মাধ্যমে শাসক শ্রেণীকে পরাজিত করবে। এতে ভাববার কি আছে, ভোটের মাধ্যমে শাসক শ্রেণীকে নিশ্চয় হতানো যায়। তাই নির্বাচনের মাধ্যমে সি পি এম কারেমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়ে ঠিকই করেছে।

ভারত দর্শন

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

হাওয়া সৃষ্টির জন্যে কারিগরপা অর্জন সিংদের মত প্রাক্তন সেনানায়কদেরও তারা পাল্লামেন্টে টেনে আনছে।

শাসকশ্রেণীর এই শ্বেতনীতিকে জনসাধারণের শ্বেতনীতি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। ঐ নীতি একই সঙ্গে সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং প্রতিরোধের শ্বেতনীতি। জনগণের শ্বেতনীতি সচেতন ভাবে, সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ হলে শাসকশ্রেণীর দমনে নীতি ভেঙ্গে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। আর তা না হলে শাসকশ্রেণীর শ্বেতনীতি সফল হবে, দেশের বুকে কুৎসিত ফ্যাসিস্ত রিভাযিকা গর্বোন্মত্ত পদক্ষেপ এগিয়ে আসবে। সেরদিন শব্দময় আভ্যন্তরীণ রক্তাণু গৃহস্থ এবং অনুকূল আন্তর্জাতিক অবস্থা এদেশের মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে।

শাসকশ্রেণীর শ্বেতকৌশলের মধ্যে যে স্ব-বিরোধিতা নিহিত আছে, ঘটনা বিন্যাসে তা তীব্র হয়ে উঠতে লাগে। সমস্ত শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সমস্ত নীতি ও তার পেছনকার, ঘটনা শ্রেণীনীতি-গুলিরই প্রতিরূপ। কাজেই শাসকশ্রেণী ও তার দালালদের

মধ্যে স্ব-বিরোধী উপাদানসমূহকে শক্তিশালী করে তুলতে হলে নির্বাচনে ব্যাপক সচেতন ভাবে জনগণকে অংশগ্রহণ করতে হবে, কিন্তু একে ক্ষমতা দখলের পথ বলে না দেখে প্রতিরোধের একটি ঘাঁটী হিসাবে দেখতে হবে।

সেক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর শ্বেতকৌশল অকল্যাণে হয়ে পড়বে অধিকতর সম্ভব। স্বভাবতই তখন তারা আরো হিংস্র, আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

সুতরাং ইন্দিরা গান্ধী অথবা নিজলিগাম্পা কোনো কংগ্রেসই কিংবা তাদের জোটভুক্ত কোনো দলকেই জনসাধারণ সমর্থন করতে পারে না। এই হল সচেতন মানু-ষের কথা। এই সচেতনতার মাপকাঠিতেই বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনী সম্ভাবনার প্রায় কাছাকাছি অনুমান সম্ভবপর। প্রত্যেকটা রাজ্যের ও এলাকার বিশেষ বিশেষ ধরণ-ধারণ, রাজনৈতিক এবং সামাজিক আর্থনৈতিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দপণ আগামী সমগ্র বছর থেকে বিভিন্ন রাজ্য ও এলাকার নির্বাচনী সমীক্ষার প্রারম্ভিক রূপ প্রকাশ করবে।

দপণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ চাঁদর হার

বার্ষিক পনেরো টাকা
সাপ্তাহিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৬১, মট সেন, কলি-১০

আঁত বামপন্থীদের সপ্নকে

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

সেতু-এর বক্তব্য প্রচার করছিল, কি করে বোঝা যাবে? উপরে উল্লেখ পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ও রোলড স্যাসের সম্পাদকীয় তো পরিষ্কার ভাবেই অবস্থা বুঝিয়ে দিয়েছে।

এমন ক্ষেত্রে মাও সেতু-এর চিরা-ন্ত রচনা থেকেই মাও অনুপ্রাণিতা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আলো-চনার সাধারণ লাইন সম্পর্কে চীনের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব নামীয় বে অমূল্য দলিলটী চীনের পার্টি ১৯৬০ সালের ১৪ই জুন পেশ করেছিলেন, তা কি বাস্তব হয়ে গেছে? মাও সেতু-এর অমূল্য রচনা-কলা কি বাস্তব বলে গণ্য করতে হবে? এ চোখই জ্বলন্ত প্রস্তাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চাবিশ্ব নং ধারণ কি বলেছিলেন? তারা বলে-ছিলেন "আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আলোচনার অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দেয় যে কোন দেশে বিপ্লবের বিকাশ ও বিজয়লাভ এই দেশে একটী বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির ওপর নির্ভর-শীল।"

একটী বিপ্লবী পার্টি এ জন্য থাকতেই হবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নির্দিষ্ট বিপ্লবী কারদার এবং বিপ্লবী তত্ত্ব সুশিক্ষিত একটা বিপ্লবী পার্টির অবস্থান থাকা চাই।

দেশের বাস্তব বিপ্লবী অবস্থার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্ব-জনীন তত্ত্বকে একীভূত করে কার্যকরী করার ক্ষমতা থাকবে সেই বিপ্লবী পার্টির। দেশের বৃহত্তম জনগণের অংশের সঙ্গে নেতৃত্বকে একাত্ম করার ক্ষমতা থাকা চাই সেই পার্টির।

এমন এক বিপ্লবী পার্টি হবে শ্রী, যা প্রকৃত ঘটনাকে ধৈর্য সহকারে অনুসরণ করে, ভুল হলে শুধিয়ে নিতে পারে এবং সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার কাজ চালাতে সক্ষম।

কেবল এমন একটা পার্টিই সাম্রাজ্য-বাদ ও তার অনুচরদের পরাজিত করতে জনগণের সর্বাধিক বৃহদাংশকে পরিচালিত করতে পারে, জাতীয় গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবে জয়লাভ করতে পারে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তাকে রূপা-ন্তরিত করতে পারে।"

বে পার্টি এরকম নয়, সেই পার্টিতে বুজুর্গরা সংস্কারবাদী সংশোধনবাদী এবং প্রতিক্রিয়া-বাদের জাতীয় পার্টি আখ্যা দিয়ে চীনের পার্টি সেদিন বলেছিলেন, "যদি পার্টি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করতে না পারে এবং কঠোর অধ্যবসায় অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান চালিয়ে নিজের দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবণতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে না পারে, যদি এ পার্টি মার্কস-বাদ-লেনিনবাদের সার্বজনীন মৌল-সূত্রগুলির সঙ্গে দেশের প্রকৃত বাস্তব অবস্থাকে মিলিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে না পারে, বরং উল্টোভাবে এ পার্টি যদি তাত্ত্বিকভাবে মতো অপ-রের শেখানো বুলি আওড়ে বার, বিচার বিশ্লেষণ না করে বিদেশের

অভিজ্ঞতাকে নকল করে, বিদেশের কোন কোন লোকের নির্দেশে এদিক ছুটোছুটি করে এবং সংশোধনবাদ, লেনিনবাদ ছাড়া আর সব কিছুই এক জগাখিচ্ছুকীতে পরিণত হয় তা হলে তাকে কমিউনিস্ট পার্টি বলা চলে না।

এমন এক পার্টি সর্বহারাশ্রেণীকে এবং জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামে পরি-চালনা করার সম্পূর্ণ অযোগ্য, বিপ্লবে জয়লাভ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং সর্বহারা শ্রেণীর ঐতি-হাসিক কর্তব্য সাধনে সম্পূর্ণ অপা-রণ বলে ধরে নিতে হবে।

এটা এমন একটা প্রশ্ন যা প্রতিটী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীকে, প্রতিটী শ্রেণীসচেতন শ্রমিককে এবং প্রতিটী প্রগতিশীল মানুসকে গভীর ভাবে চিন্তা করে বুঝতে হবে।"

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলসূত্র বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম (unity and struggle of opposites) মার্কসবাদ লেনিনবাদ প্রতিটা ঘটনা, বস্তু ও ধারণাকে এই মৌল দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে পর্যালোচনা করেন। সমস্ত বস্তু, ঘটনা বা ধারণা এক সাধারণ স্বব্দ, প্রত্যেকের বিশেষ স্বব্দ এবং বিশেষ বিশেষ দিকের স্বব্দ, এই সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নির্দেশ দেয়।

স্বব্দগুলির মধ্যে একটী এক বিশেষ অবস্থার প্রধান অন্তর্ভুক্তি অপ্রধান। স্বব্দের বিশেষ বিশেষ দিকের বাস্তবমুখী বিকাশের ফলে কোন এক নতুন অবস্থার প্রধান স্বব্দ অপ্রধান হয়ে পড়ে এবং অ-প্রধান স্বব্দ প্রধান। সামন্তশ্রেণী ও পুঁজি-পতিশ্রেণীর স্বব্দ পুঁজিবাদী বিপ্ল-বের যুগে প্রধান স্বব্দ, ভূমিদাস ও সামন্তশ্রেণীর স্বব্দ কিংবা নব্য-শ্রিত ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বব্দ অপ্রধান ছিল। কিন্তু পুঁজিপতি-শ্রেণীর বিশেষ স্বাবৃত্তিক (উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তি সম্পর্ক) বিকাশের ফলে পুঁজিবাদ সামন্ত-শ্রেণীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করে। বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজে প্রধান স্বব্দ আর সামন্তশ্রেণী ও পুঁজি-বাদের মধ্যে রইল না যদিও তাদের স্বব্দ থেকে গেল। নতুন সমাজে প্রধান স্বব্দ হয়ে উঠল পুঁজির মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে স্বব্দ। মার্কস এই বিভিন্ন সমাজের স্বব্দ-গুলিকে প্রাজ্ঞ সার্থারদীকরণ করে তা যে আসলে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে তা প্রমাণ করেছিলেন।

আমাদের দেশেও বিভিন্ন স্বব্দ-গুলিকে পরীক্ষণ, অধ্যয়ন ও অনু-শীলন করে, প্রধান স্বব্দটীকে নির্দিষ্ট করতে হবে, প্রধান ও অপ্র-ধান স্বব্দগুলির বিশেষ বিশেষ দিকের স্বাবৃত্তিক বিকাশের ধারা লক্ষ্য করতে হবে। তার ভিত্তিতেই সাধারণ কর্মসূচী তৈরী করে বিপ্ল-বের বিজয়লাভের সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে হবে।

এটা করতে গেলে যে কোনো বিশেষ দেশের অনুসৃত প্রথাকে মন্তব্যাকার মত উচ্চারণ করে এগোনো বারনা, তা মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন এবং মাও সেতু-এর অমর রচনাবলী বারে বারে শিখিয়ে দিচ্ছে।

ভারতবর্ষে বিপ্লব রূপ বা চীনা বিপ্লবের হুবহু নকল হতে পারে না। অন্যান্য দেশের বাস্তব অবস্থা ও স্বব্দগুলির বিকাশের ধারা এবং ভারতের স্বব্দগুলির বিকাশের ধারা এক নয়। কারণ সারা পৃথিবীতেই দেশে দেশে অসম বিকাশের নিম্নম-স্তিম ভিন্ন সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মার্কসবাদী দর্শনের মহান শিক্ষকেরা বিপ্লবী শক্তিকে বারে বারে এই স্বাবৃত্তিক বিকাশের ধারাকে অধ্য-য়ন করতে, অনুশীলন ও অনুধাবন করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

ঐতিহাসিকভাবে বা অপ্রান্ত সত্য ঘটনা তা বিশেষ কোন দেশে বিশেষ সময়ে ভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বর্ত-মান যুগে পুঁজিবাদের পরাজয় এবং সর্বহারা শ্রেণীর বিজয় অনিবার্য। কিন্তু সব দেশে তো পুঁজিবাদ হেরে যায় নি, শ্রমিক বিপ্লব জয়লাভ করে নি। কারণ এই পরিণতিও একটা অমোঘ নিয়ম ধরে চলে। হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে না।

বিপ্লবী পার্টিতে এই বাস্তব অবস্থা ও বিজয় সম্ভাবনার মধ্যে বিশেষ দিক অর্থাৎ স্বাবৃত্তিক দিককে লক্ষ্য করে কর্মযারা অনুসরণ করতে হয়। মাথা থেকে গজানো অভিমত বা কল্পনা থেকে কোন সঠিক কর্ম-যারা সৃষ্টি করা যায় না। ধারণা থেকে জনগণের ওপর পছন্দমত কর্ম-যারা চাপাতে গেলে বিপ্লবের পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য। আবার স্বাবৃত্তিক বিকাশের ধারাকে সঠিক না করে বাস্তব অবস্থাকে অন্ধহেল-করাও নিশ্চিত পরাজয় ডেকে আনে। মাও সেতু একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়ে হঠকারী বুলি বিস্ময় এবং সংশোধনবাদী সুবিধাবাদীদের সঙ্গে প্রকৃত বিপ্লবীদের পার্থক্যের সীমা-রেখা টেনে দিয়েছেন। তিনি বলে-ছেন বুলিবিহার হঠকারীরা বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ ও অনুশীলন না করে শুধু ভিন্ন থেকে মুরগীর বাচ্চা হয় এই অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন ভেঙ্গে বাচ্চা বের করার চেষ্টা করে, আবার সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীরা ভিষা-কৃত পাখির (কারণ ওপরটা ভাসা ভাসা ভাবে দেখলে পাখর ও ডিমের তফাত তারা বোঝে না) তা দিয়ে চলে। মুরগীর বাচ্চা কেন হয় না বুঝতে পারে না।

সংসদীয় গণতন্ত্র ও আইনসম্মত কাজ চালানোর সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লব বা বে-আইনী কার্যকলাপ এ দুটোকে একটা বাদ দিয়ে আরেকটী শ্রমভাবে দেখা সঠিক নয়। বিপ্লবী পরি-স্থিতির জোয়ার তটের ওপর কোনটা কখন অবলম্বন করতে হবে তা ঠিক করতে হবে। এক সঙ্গে দুটো পথে-রই প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার মত ক্ষমতা বিপ্লবী পার্টির থাকা চাই। আসল লক্ষ্য রূপান্তর ঘটানোর কাজে কখন কোনটার ওপর জোর দিতে

হবে তা নির্ণয় করার ক্ষমতা থাকা চাই। কারণ লক্ষ লক্ষ মানুসকে এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যে টেনে আনতে হবে। বাস্তব পরিণতি বিচার করেই একমাত্র একান্ত করা যায়।

মাও সেতু স্বয়ং শ্রিতরী আপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের কালে জাতীয় পরিষদ স্থাপনের জন্যে দাবী জানি-য়েছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলে-ছিলেন যে গণতন্ত্র ও জাতীয় পরি-ষদের দাবী সর্বাধিক জনগণের সমা-বেশ ঘটতে সক্ষম। তাই বলে তিনি আপ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধকে বাদ দিতে সম্মত হননি বা কুওমিন্টাং-এর ঐক্যের শর্ত হিসাবে অস্টম রুট আর্মি বা নিউ ফোর্স আর্মি ভেঙ্গে দিয়ে কুওমিন্টাং-এর হাতে সশস্ত্র প্রতি-রোধের দায়িত্ব তুলে দিতে রাজী হন নি।

রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের বিপ্লবীদের শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু বুলি-বিহারদের মত তাত্ত্বিকপাণীর বুলি আওড়ে গেলেই হবে না। ভারতের বাস্তব পরিণতি থেকে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। মোটামুটিভাবে, চীন ও ভারতের বাস্তব অবস্থার (আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ত-তান্ত্রিক) মিল রয়েছে। এ হল স্বব্দের একটা প্রধান দিক। কিন্তু বুদ্ধ জয়ের জন্য শত্রুপক্ষের সঙ্গে এবং আমাদের নিজেদের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে এটা দেখলেই চলেবে না। শত্রুকে জানতে হবে, তার ধরণ ধারণ সামরিক কৌশল, কেন্দ্রীয় অবস্থান বুঝতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সেনাবাহিনী অর্থাৎ জনগণের বাস্তব অবস্থা (সংগঠন, অস্ত্রবল, রসদ সরবরাহ) গুলিও বুঝতে হবে। এই বিশেষ দিকগুলির স্বব্দ নিরসন করেই বিপ্লবকে বিজয়ী করা সম্ভব।

চীনা পরিণতির সঙ্গে ভার-

তের পরিণতি বিশেষ বিশেষ দিক-গুলির সাদৃশ্য যেমন আছে পার্থক্যও তেমনি। রুশ বিপ্লবের বাস্তব অবস্থার সঙ্গেও ভারতীয় বিপ্লবের বাস্তব অবস্থার সাদৃশ্য ও পার্থক্য রয়েছে।

চীনের মহান কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কর্মচার চেয়ারম্যান মাও সেতু লেনিনের পথ ধরে কিন্তু চীনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে চীনের বিপ্লবকে জরী করেছেন। ভারতের বিপ্লবীদেরও চীন ও রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা শিক্ষা করে, কিন্তু ভারতের বিপ্লবী পরিণতির বিশেষ বিশেষ দিকের স্বাবৃত্তিক মূল্যায়ন করে ভারতের বিপ্লবকে জরী করতে হবে।

চীনের বিপ্লবে মাও সেতু স্তালি-নের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, অথচ বারে বারে তিনি স্তালিনের নেতৃ-ত্বকে উচ্চপ্রশংসা ও প্রশংসা করে-কর্না করেছেন। কারণ তিনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী।

রাজধানীর চিঠি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রেসিডেন্ট জে জে সিং খোলাখুলি ভারত সরকারের এই কার্যকলাপকে অসমীচিনতা বলে নিন্দা করেছেন। এস এস পি দলও রাজনৈতিক কারণে বিপক্ষে গিয়েছে। উল্লেখ্য ধনিক গোষ্ঠীর মূখপত্র হিন্দুস্থান টাইমস কিছদিন পূর্বে সরকার বাতে এমনি পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকে সে উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে-ছিল।

বঙ্গদর্শন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নেতৃত্ব প্রয়োজন। এই নেতৃত্বের সামলোয়ার বনিয়াদ হল সংগঠনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, রাজ-নৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচীর সঠিক রূপায়ণ আর রাজনীতি সামনে রেখে বিচ্ছিন্নতার সম্পর্কে গভীর সহনশীলতা।

অপরের সম্পর্কে প্রতিশোধ-পরায়ণ হওয়ার মত ছোট-পার্টি-মনোভাবের সুযোগ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেই। সারা রাজ্যে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব দেওয়ার সময় এসেছে এই পার্টির। এবং এই নেতৃত্ব পার্টি দিতে পারে সঠিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। আজকের যুব সমাজের একাংশের উগ্রপন্থার প্রতি ঠোঁক স্বাভাবিক কারণেই এসেছে। পার্টির সঠিক রাজনীতিই একে পরাস্ত করতে পারে, শুধু প্রতি-ক্রিয়া ও সি আই এর চক্রান্তে উগ্রপন্থার সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা পার্টি দিয়েছে তা রাজনৈতিক দিক থেকে

নিষ্ফল সরলীকরণ। অবশ্য দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়া এর সুযোগ নেবে। কিন্তু উগ্রপন্থার নিবৃত্তি যুবশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার মনোভাব ও আচরণ রাজনৈতিক দিক থেকে ভ্রান্ত। এই দৃষ্টান্ত দিয়ে উগ্রপন্থাকে দমন যাবে না।

ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজই উগ্রপন্থাকে দমন করতে পারে। ইতিমধ্যেই জনসাধা-রণের মধ্যে উগ্রপন্থী কাজকর্ম সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে। মার্কস-বাদী পার্টি জনসাধারণকে পার্টির কর্মপন্থার খোলাখুলি আলো-চনার সুযোগ দিক। এতে পার্টি রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করবে আর জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক নিবিড় হবে। এতেই পার্টি সঠিক পথে চলাতে পারবে। এই পথ জনসাধারণের লেজ ধরে চলার পথ নয়, জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রামে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার পথ।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী জোটের চেহারা যাই হোক সব দলের লড়াই সি পি এয়ের বিরুদ্ধে

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

বঙ্গোপশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে প্রধানতঃ তিন জোট ও সাংগঠনিক কংগ্রেস লড়াই করবে তথাপি দপ্পণ বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছে লড়াইটা হবে প্রধানতঃ সি পি এম জোট ও সি পি এম বিরোধী পার্টিগুলির মধ্যে। অবশ্য আপাত-দৃষ্টিতে বারোশো বা তেরোশো প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়াবেন, কিন্তু তাদের ভিতর সত্যিকারের দল শেষ পর্যন্ত ছয়শত বা সাত শত প্রার্থীদের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

অবশ্যটা অনেকটা ১৯৬৭ সালের মত যখন কংগ্রেস বিরোধী দুই জোট ছিল—পুলক এবং জেলাভিত্তিক যখন এই পার্টিগুলি লড়াইতে নেমেছিল

তখন জনগণকে তারা এই কথাই বুঝিয়েছিল যে “আপনাদের থাকে খুশী তাকে ভোট দিন, কিন্তু কংগ্রেসকে দেবেন না।” এবারও জেলা ভিত্তিক সেই প্রচারই চলছে কিন্তু এবার সি পি এম বিরোধী পার্টিগুলির বক্তব্য হল “থাকে খুশী ভোট দিন, কিন্তু সি পি এম-কে দেবেন না।”

একথা জানতে পেরেই কংগ্রেস (শা) শেষ পর্যন্ত তার লড়াইয়ের কায়দা পালটাল। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত ভেঙে দিল। অবশ্য এর পিছনে অন্য কারণও ছিল। শ্রীবিক্রম সিংহ নাহার কোন দিনই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত হক মনে মনে তা চাননি। কিন্তু বেহেতু সিংধা-বাবু ও তরুণবাবু আগু বাড়িয়ে

কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন সেইজন্য তিনি বাধা দেন নি। শেষ পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে তিনি সিংধাবাবুকে দিয়ে দিল্লিকে এই খবর জানিয়ে দেন, যাতে সিংধাবাবু দিল্লিকে আর আলাদা করে কোন বক্তব্য না দিতে পারেন।

জেলা কংগ্রেসগুলিতে বিক্ষোভ-ছাত্র পরিষদের চোখ রাঙ্গানি এবং তার উপর শ্রীমদশীল ধাড়ার দাপ-দাপি ও হামবড়া ভাব বিজয়বাবুর নিকট সুযোগ এনে দিল। ইতি-মধ্যে শাসক কংগ্রেসের ও সি পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে জেলা ভিত্তিক কোন কোন জায়-গায় নির্বাচনী সমঝোতার কথাও হল। কয়েকদিন আগে ফরোয়ার্ড ব্লকের নান্দু ঘোষ বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখাও করে গেলেন।

কংগ্রেস (শা) দুশো আসনে লড়াই করবে এই বলে জনগণের কাছে এটাই প্রমাণ করতে চায় যে তারা বাংলাদেশে সত্য সত্যই একটা স্বাধীন সরকার গঠন করার জন্য বন্ধপরিচর। পারদুক না পারদুক, সংগঠন বাড়ানোর দিক থেকে এই কৌশল বেশ কাজে লাগবে বলে মনে হয়। তাছাড়া সি পি এম বিরোধী পার্টিগুলির সঙ্গে আস-নের সমঝোতার অনেক বিশেষ সুবিধা এনে দেবে যা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করলে একশো বাইশটি আসন হাতে নিয়ে করা সম্ভবপর হত না।

শুধু কি তাই, কংগ্রেসী নেতারা স্বীকার না করলেও জেলা এবং নীচু তলার কংগ্রেসী সমর্থ-কের কাছ থেকে একটা দাবী দানা বেঁধে উঠছিল যে, দুই কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেসকে এক হয়ে লড়তে হবে।

তাই প্রথম পর্যায়ে সুশীল-

বাবু বিজয়বাবুদের এই কথা বলেছিলেন। তার আগে সাংগঠনিক কংগ্রেসের শ্রীবিক্রমানন্দ চ্যাটার্জি ও শ্রীহংসধর ধাড়া ও বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কিন্তু কথাবার্তা বিশেষ এগোয়নি রাজ-নৈতিক ও অন্যান্য কারণে। তার-পর এও জানা গেছে যে, শ্রীমদশীল ধাড়া সাংগঠনিক কংগ্রেসের কাছে এমন প্রস্তাব রেখেছিলেন যে নিজ-লিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস যথাক্রমে একশো কুড়ি ও একশো ষাটটি আসন নিয়ে জোট বাঁধুক।

কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে আবার কথা-বার্তা শুরু হয়ে গেল। তাই নিজ-লিঙ্গাপ্পা কংগ্রেসের সঙ্গে কথা-বার্তা আর এগোলো না।

এখন একথাও শোনা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস (শা) সি পি এমকে পরাস্ত করতে গিয়ে এমন কি নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেসের সঙ্গেও হাত মেলাবে জেলায় জেলায়।

বাংলা কংগ্রেসে অন্তর্বিরোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অজয়বাবু কলকাতায় ফিরলে নব কংগ্রেস অথবা আট পার্টির সঙ্গে একটা হেমন্তেন্ত তারা করে ফেলতে চান।

নব কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের জোট বাঁধবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর গত শনিবার ও রবিবার বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক মন্ডলী ও কর্মপরিষদের সভার যে নেপথ্য চিত্র পেয়েছি তাতেও এই সংকটের চিত্র প্রকট। শনিবার বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমন্ডলীর সভার পর রবিবার বসলো রাজ্য কর্মপরিষদের বৈঠকে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেসের সঙ্গে একটা অনাক্রম্য চুক্তি করার চেষ্টা করবে। বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের আলোচনা শুধুবার আগে পরি-স্থিতি ছিল নিম্নরূপ। যেমন মোট দুশো আশিটি আসন তিনটে স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম স্তরে একশ তিনটি আসন দুইদল পেল সম্পূর্ণ বিরোধমুখভাবে। এর মধ্যে বাংলা কংগ্রেস পেল চারশতটি আসন। দ্বিতীয় স্তরে ছেচলিশটি আসনে বাংলা ও নব দুই দলই দাবী করলো। আর তৃতীয় স্তরে কেউ চাইল না এমন আসন হল সাতচল্লিশটি। ছোট দলের জন্য চৌদ্দটি আসন রেখে দেওয়া হয়েছিল। বিশদ আলোচ-নায় ঠিক হল কেউ চায় না ছেচ-লিশটি আসন থেকে দুইদল এমন ভাবে আসন নেবে যাতে দুই দলের আসন সংখ্যা সমান হবে। একশ বাইশটি করে আসন দুই দল নিয়ে সমান হল, কিন্তু পরে পাঁচটি নব

কংগ্রেস ও চারটি আসন ছোট দলকে বাংলা কংগ্রেস দিয়েছেন। এই অবস্থায় বাংলা ও নব কংগ্রেসের বৈঠক শেষ হয়েছিল।

কিন্তু রবিবার কর্মপরিষদের সভায় সকালের বৈঠকে সুশীল-বাবু দীর্ঘ বক্তৃতায় সদস্যদের বোকা-লেন কেন বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যেতে পারেনি। দুপু-রের বৈঠকে আসন নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই সুশীলবাবু অন্যান্য আসনের সঙ্গে বাগনান রাজার-হাট ও গদারামপুর তিনটি আসনে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেবে বলে ঘোষণা করলেন। সুশীলবাবুর এই প্রস্তাবে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করলেন অজয়বাবু। অজয়বাবু বলেন এই তিনটে আসনে প্রার্থী দেওয়া ঠিক হবে না, তাতে নব কংগ্রেসের সঙ্গে অনাক্রম্য চুক্তি ভঙ্গ করা হবে। সুশীলবাবু বলেন সম্পাদকমন্ডলীর সভায় এই তিনটে আসনে প্রার্থী দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবার প্রতিবাদ করলেন হরিদাসবাবু। হরিদাসবাবু বলেন সম্পাদকমন্ডলীর সভায় এই জাতীয় কোন সিদ্ধান্ত হয়নি এবং এই জাতীয় কাজ করা ঠিক হবে না। সুশীলবাবু উত্তেজিত ভাবে বলেন সম্পাদকমন্ডলীর সভায় কেন বলেন নি এটা ঠিক হবে না—এখন বলছেন কেন।

দীর্ঘ সময় ধরে ঝগড়ার পর বাগনান রাজারহাট ও গদারাম-পুর বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেবে না এই সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেবার আগেই হরিদাস-

বাবু সভা থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

পরদিন বাংলা কংগ্রেসের প্রথম সারির জনৈক নেতা প্রথমে দেখা করলেন ফরোয়ার্ড ব্লক দলের শ্রীভক্তি মন্ডলের সঙ্গে। ভক্তি-বাবুর কাছে পেশ করা হল বাংলা কংগ্রেসের সর্বশেষ পরিস্থিতি। অন্য একজনের মারফৎ খবর গেল সি পি আই নেতাদের কাছে। কিন্তু সি পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লক দল থেকে বলা হল কোন কিছু করার পক্ষে অনেক দেরী হয়ে গেছে। এর পর দিন বাংলা কংগ্রেস থেকে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হল। দেখা গেল দলের বিগত বিধান-সভার প্রাক্তন দশজন সদস্যের নাম নেই। বাদের নাম নেই তার মধ্যে রয়েছেন শ্রীমতী পারুল সাহা (গাই-ঘাটা), শচীন মন্ডল (মগরাহাট), দেবেন দাস (দাঁতন), অবনী সাহা (ইন্দ্রাস), নিরঞ্জন ভদ্র (কোতল-পুর) সহ কয়েকজন। দলের বিগত বিধানসভার দশজন সদস্য প্রার্থী তালিকায় না থাকলেও সি পি আই দলের কুড়ি জন ও ফরো-য়ার্ড ব্লক দলের এগার জন বিগত বিধানসভার সদস্যের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। যে হেমন্ত বসুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী দেয় নি সেই শ্যামপুতুরে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে।

অজয়বাবু অবশ্য এখনও দম ধরে আছেন। তার ধারণা দোসরা তারিখে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা আসবার আগে হয়ত আর একবার নব কংগ্রেসের উপর চাপ দিয়ে তাঁর দলের সঙ্গে আলোচনার বসতে নব কংগ্রেসকে বাধ্য কর-বেন। অপর দিকে সর্বশেষ সংবাদ হল শ্রীমদশীল ধাড়া দল রক্ষার জন্য প্রাপ্পণে নব কংগ্রেসের সঙ্গে

আপোষের শেষ চেষ্টা শুরু করে-ছেন। আগামী একত্রিশে জানু-য়ারীর মধ্যে বাংলা কংগ্রেস যদি নব কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আপোষ করতে না পারে তবে বাংলা কংগ্রেসে যে সংকট শুরু হয়েছে তা ভাঙ-নের চেহারা নিতে পারে।

দর কষাকষি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্ন তোলে নি, তবে ওদের কাছে শ্রীমতি চক্রবর্তীর পুনর্বাসন প্রকৃ-তই খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই সি পি আই একটি বিকল্প প্রস্তাব নিজেদের জোটের সামনে রেখেছে।

এই প্রস্তাব হল : অধ্যাপক দাশগুপ্ত বালিগঞ্জ বিধানসভা আস-নের পরিবর্তে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন প্রার্থী হোন। আর শ্রীমতি চক্রবর্তী বিধানসভা আসনে দাঁড়ান।

এই প্রস্তাবে এস ইউ সি মোটামুটি সম্মত কিন্তু তারা বালি-গঞ্জ বিধানসভা আসন ছেড়ে দিতে রাজী নয়। তাদের কথা : মার্কস-বাদী প্রার্থী গণেশ ঘোষের বিরুদ্ধে

দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা আসনে লড়তে গেলে বালিগঞ্জ সমেত অন্ততঃ চারটি বিধানসভা আসনে এস ইউ সি প্রার্থীদের দাঁড়াতে দিতে হবে।

এই আসন বন্টন নিয়ে অনেক দরাদরি চলছে, এখনও কোন মীমাংসায় পৌঁছানো যায় নি। এস ইউ সি বলে দিয়েছে যে, সাতষাট এবং উনোশতর সাঙ্গে পার্টিকে অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়েছে, বিশেষ করে কলকাতা আসনের ব্যাপারে। ফলে, এমনকি আর এস পি যার কলকাতায় প্রায় কিছুই নেই তারও এই শহর থেকে দুটি প্রার্থী বেরিয়ে গেল।

কলকাতার আসন বন্টন নিয়ে বেশ কান্নাকাতি আছে অম্বট বামে। তাই একবার আলোচনা করেই চাপা দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক-দিন ধরে এই চলছেই, একটার পর একটা আসন নিয়ে দর কষাকষি। বিবাদ মিটছে কিন্তু অনেক দেরীতে, তার ফলে শরিকদের মন খারাপ—আর মাত্র ছয় সপ্তাহ বাকী। প্রচার আন্দোলনের সময় চলে যাচ্ছে—আর অন্যেরা ইতিমধ্যে আসরে জেঁকে বসছে।

বানচাল

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

চিন্তাধারা ঢুকে পড়েছে এবং তা সর্বাঙ্গিক বিদ্যার্থী ছাত্র ও শিক্ষক-দের মাঝে সেরা লোকদের অন-প্রাপনায়। রাষ্ট্র প্রশাসনের কদম্ব ও জ্বরদস্ত কাঠামোর বিরুদ্ধে সক্রিয় উচ্চারণ কেবল সেই স্ট্রিক্‌স কলেজের গুটিকর ছাত্রের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, তা সারা পড়ুয়া

সমাজে এক ব্যাপক, গভীর এবং পাশ্চাত্যের নকলনবীশীর বিরুদ্ধে কঠিন সংকল্পবদ্ধ সংগ্রামের রূপ নিতে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এতে উঠতি এবং হঠাৎ বড়লোক উপ-শ্রেণী এবং আমলাশাহীর খাজা আমীর সদররা যুগপৎ আতঙ্কিত ও ক্ষিপ্ত। তবে কেন্দ্রের পুলিশ কি শোদ রাজধানীতে উজিয়ে ওঠা চরম চিন্তাকে শেকল পরাতে পারবে?

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক প্রচার ইন্দিরা প্রেস

৭, রাজা সুবোধ মল্লিক কোয়ার্টার কলিকাতা-১০ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১০ দপ্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

কলকাতা পুলিশের কর্তাদের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

ভাড়াটে গুপ্তা দিয়ে পুলিশ এসোসিয়েশনের সাক্ষর সদস্য হত্যা : শুকুর চুরি :

চোর-বাটগাড়দের সঙ্গে শান্তগুণ সহাবস্থান

দপন

১৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৥ শ্রুতবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পঃ

আদ নব ও বাংলা কংগ্রেসের

কোন কোন প্রার্থী ভেগে গড়ছেন

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

দপণে প্রকাশিত সংবাদ বর্ণে বর্ণে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দপণ অনেক আগেই বলেছিল নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে ও পরে বহু নব কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী ভেগে যাচ্ছে, অনেকে দল বদল করবে। সেই সঙ্গে দপণ আরো আগে বলেছিল সিডিকেট কংগ্রেস বেশ কিছু প্রার্থী অন্য দলে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সেই প্রার্থীরা সময় ও সুযোগমত দল ত্যাগ করে নিজ মূর্তি ধারণ করবে। এই দুইটি তথ্য বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। পনেরোই ফেব্রুয়ারী যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় “রাজ্যের দলীয় নেতাদের অনুমতি না নিয়ে বিভিন্ন জেলায় বিরোধী কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের প্রচুর প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস ও বিরোধী কংগ্রেস এখন পর্যন্ত জানে না কার্যত এখন পর্যন্ত তাদের কতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।”

এর পরের খবর হল বাংলা কংগ্রেস ইতিমধ্যে দলের অনুমতি না নিয়ে এততরফা ভাবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেওয়ার অভিযোগে সর্বশ্রী আসিত গাঙ্গুলী, জয়দেব পাঠ, কেদার নাথ ত্রিবেদীকে দল থেকে বহিস্কার করে দিয়েছেন। এই তিন জন প্রার্থী যথাক্রমে উলুবেড়িয়া লোকসভা উদয়নারায়ণপুর ও উলুবেড়িয়া বিধান সভায় বাংলা কংগ্রেস প্রার্থীরূপে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। কিন্তু শ্রদ্ধ এই তিনজনই নয়, আরো বেশ কয়েকজন বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শেষ মর্হুতে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার

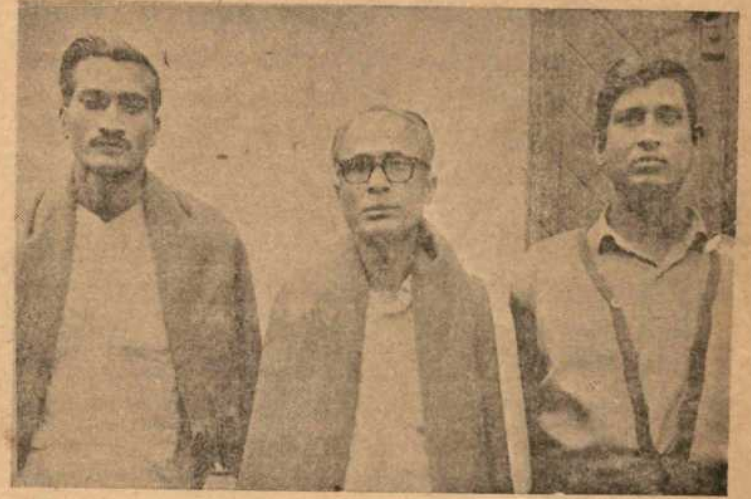
করে নিয়েছেন। শ্রদ্ধ প্রার্থীপদ প্রত্যাহারই নয় দলীয় কর্মীরা বহু জেলাতে এই প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছেন অন্য দলের সঙ্গে সমঝোতা করে। যেমন অনেক চাপ দিয়ে বাংলা কংগ্রেস বসিরহাট লোক সভায় আমজাদ আলি সর্দারকে প্রার্থীরূপে মনোনীত করে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ মর্হুতে আমজাদ আলি সেই নামও প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস রাজ্যের সর্ববৃহৎ এক শিল্প সংস্থার জনসংযোগ অফিসারকে আরামবাগ লোক সভা আসনে প্রার্থী রূপে মনোনীত করেছিলেন। এই পি আর ও ভদ্রলোকের মাধ্যমেই বাংলা কংগ্রেসের শিল্পপতি মহলে আদান প্রদান চলে থাকে। কেউ উক্ত পি আর ও ভদ্রলোক শেষ মর্হুতে আরামবাগ লোকসভা আসনে যার মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন নি। ফলে আরামবাগ লোকসভা আসনে বাংলা কংগ্রেসের কোন প্রার্থী দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেসের উলুবেড়িয়া আর বসিরহাট কেন্দ্রে প্রার্থীরা নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, আবার দুই একজন শেষ সময়ে মনোনয়ন পত্র দাখিলও করেন নি।

সিডিকেট কংগ্রেসেরও প্রায় একই অবস্থা হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। কলকাতায় কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে রাসবিহারী কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীহরেন ঘোষ শ্রদ্ধ প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেন নি, সিডিকেট কংগ্রেসই ত্যাগ করেছেন। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে নব কংগ্রেসের বেশ কয়েক (শেষাংশ দ্বাদশ পৃষ্ঠায়)

(দপণের সংবাদদাতা)

তথাকথিত নকশালী হত্যার কর্মসূচী অনুযায়ী যে সব পুলিশ কনস্টেবল ও অন্যান্য ছোটখাট অফিসাররা রাস্তাঘাটে নিহত হচ্ছেন, সেই সব হত্যা বেশির ভাগই পুলিশের বড় কর্তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং এগুলি সংঘটিত হচ্ছে ভাড়াটে গন্ডা মারফৎ।

এই অভিযোগ করেছেন দপণের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কলকাতা পুলিশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীচিন্তাহরণ দত্ত। শ্রীদত্ত কলকাতা পুলিশে গত (শেষাংশ দ্বাদশ পৃষ্ঠায়)



পুলিশ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীচিন্তাহরণ দত্ত ও তাঁর দুই বডি গার্ড

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের ধোঁকাবাজী

(দপণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গের ইন্দিরা-কংগ্রেসী নেতা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এক নতুন রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি দিয়েছেন। উনি পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার মুসলিম অধিবাসীদের কথা দিয়েছেন, তাঁকে ভোট দিতে ইসলামপুরের সেটেলমেন্ট রেকর্ড উদ্‌দ্য ভাষায় লেখা হবে। এই কথা দেবার পর সিদ্ধার্থ বাবু রাজ্যপাল ধাওয়ানকে ধরে ইসলামপুরে সেটেলমেন্ট রেকর্ড করার কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধার্থ রায় এবার পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচন প্রার্থী।

ইসলামপুরে সেটেলমেন্টের কাজ বন্ধ করার জন্যে রাজ্যপালের আদেশের বিরুদ্ধে রেভিনিউ দপ্তর থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে। প্রতিবাদে বলা হয়েছে, রাজ্যপালের এই আদেশ দেবার কোনো ক্ষমতা নেই। আদালতের ক্ষমতা আছে। কিন্তু প্রতিবাদে কোন ফল হয়নি। ইসলামপুরে সেটেলমেন্টের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

রাজ্যপালের এই অশুভ বে-আইনী আদেশের কারণ সম্পর্কে রেভিনিউ দপ্তরের অফিসাররা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের অনুরোধে এটি হয়েছে। ইসলামপুর আগে বিহারে ছিল। পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হবার পর নতুন করে জমির সেটেলমেন্ট সূর্য হয়। এলাকাটি মুসলমান প্রধান। সিদ্ধার্থ রায় নির্বাচনে নেমে এখানে “হালে পানি” পাচ্ছেন না। পশ্চিম বঙ্গের একটি এলাকার সেটেলমেন্ট রেকর্ড উদ্‌দ্যে করার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট পাবার চেষ্টা করছেন। কেননা, উদ্‌দ্য পশ্চিম বঙ্গের সরকারী ভাষা নয়। সিদ্ধার্থ রায় চেষ্টা করলেও হবে না।



শিশিরকুমার মন্ডল, কলকাতা পতি জিতেন্দ্রনাথ মন্ডল ও হৃদয়রঞ্জন জানা। এঁদের এবং আরও একজনকে সি আর পি হত্যার জন্য নিয়ে গিয়েছিল

প্রশাসনের কর্তারা সি পি এমকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন

(দপণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি প্রশাসনে গভীর ভাঙন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদল, এর মধ্যে আছেন, চীফ সেক্রেটারী, হোম সেক্রেটারী এবং পুলিশের আই জি কেন্দ্রের আদেশে সর্বপ্রকারে সি পি এমকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন।

পুলিশ ও প্রশাসন সম্পর্কে জ্যোতিবাবুর একটি বক্তৃতা একটি-মাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তার আগে আর একটি সংবাদপত্রে সি পি এমের বিরুদ্ধে অভিযোগ

করা হয় যে তারা নাকি সশস্ত্র বাহিনী গঠনের কথা চিন্তা করছেন। এই দুই রিপোর্ট সম্পর্কে মধ্য উপদেষ্টা শ্রীবি বি ঘোষকে রিপোর্টাররা প্রশ্ন করেন। শ্রীঘোষ বলেন, সি পি এম নেতারা কোন কথা বললেই সেটা কার্যকরী হয় না। সরকার দেখবেন যে, ওরা যেন ওদের সব প্রচেষ্টাই কার্যকরী না করতে পারে। এই বলে তিনি থেমে যান। কোন জায়গায় তার অসহনীয়তার ভাব প্রকাশ পায় না। (শেষাংশ এগারো পৃষ্ঠায়)

শয়তানি এখন পাগলামির পর্যায়ে

(বিশেষ পর্ববৈক্যক)

একজন বিখ্যাত দার্শনিক-ইতিহাসবেত্তা বলেছিলেন, “দেব-তারার ষাঁদের ধ্বংস করতে চান, তাদের ক্ষমতালোভে পাগল বানিয়ে ছাড়েন”। পাগলামীর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে আবোল-তাবোল বকা, আর বৈমিল বৃকনির সঙ্গে অসংলগ্ন আচরণ পাগলামির বৈশিষ্ট্য।

এগারোই ফেব্রুয়ারী তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় “কেন্দ্র বরানগর : প্রতি-শ্রমী অজয় মধুসূদন ও জ্যোতি বসু” শিরোনামের বিরাট ভাবে দুই প্রতিশ্রমীর ছবি দিয়ে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে সি পি আই প্রাধী শিবপদ ভট্টাচার্য মনো-নয়ন পত্র দাখিল করলেও, সি পি আই নেতারা অজয়বাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা বরানগরে লড়াই করবেন না। অজয়বাবু ঝাড়ুগ্রামের সভার কথুতা প্রসঙ্গে বলেন যে বৃদ্ধবার সকলেই সি পি আই নেতারা জানিয়ে দিয়েছেন বরানগরে তাঁরা প্রাধী তুলে নেবেন।

সি, পি, আই তাঁর কথা রেখে-

ছেন। “খুনোখুনির রাজনীতির নেতা জ্যোতি বসুকে” হারাবার মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রাধী তুলে নিয়েছেন। আর মহান নেতা অজয় মধুসূদন মশাই-এর বিরুদ্ধে তম-লুকেও তাঁরা প্রাধী দেন নি।

এবার ঐ এগারোই ফেব্রুয়ারী তারিখের আনন্দবাজারে চার পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলামে উদয়নারায়ণ-পুরে (হাওড়া) অজয় মধুসূদন নির্বাচনী সভায় কথুতা দিয়ে কি বলেছেন তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে। শ্রীঅজয় মধুসূদন ঐ সভায় বলেছেন, “সি পি এম ক্ষমতায় এলে দেশের সর্বনাশ হবে। সি পি আই ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি সম্পর্কে তিনি বলেন, খুনখারাপির রাজনীতিতে এরাও, সি পি এম-এর চেয়ে কিছু কম যান না। আট দল জোটে যাওয়ার পর্ত হিসেবে আমি ওদের কাছে প্রতি-শ্রুতি চেয়েছিলাম যে ওরা খুন-খারাপির রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। কিন্তু তাতে সাড়া পাই নি। ফর-ওয়ার্ড ব্লক সোনার পাথরবাটিতে

কাঠালের আমসহ খেতে চায়” ইত্যাদি।

অর্থাৎ আট পার্টি জোট-এর খুনখারাপির রাজনীতির জন্যেই অজয়বাবু ওদের সঙ্গে যান নি।

আবার চোদ্দই ফেব্রুয়ারীর স্টেটসম্যানের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে কেশপুর্বে সি পি আই-এর এক জনসভায় তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত বলেছেন “বাংলা কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী প্রতি-ক্রিয়ার দালাল। এই পার্টির সঙ্গে রাজ্যের অন্য কোথাও আপেক্ষ করা হবে না।”

অজয়বাবুরা “দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার দালাল” এবং ভূপেশ-বাবুরা “সি পি এম-এর মতই খুনোখুনির রাজনীতিতে সক্রিয়” হলেন বরানগরে দক্ষিণপন্থী প্রতি-ক্রিয়ার দালাল বাংলা কংগ্রেস এবং খুনী সি পি আই প্রকাশ্যেই হাত মিলিয়েছেন।

আবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে বাংলা কংগ্রেসের এম, পি, এবং বর্তমান প্রাধী আমজাদ

আলি সি পি আই-এর স্বপক্ষে এবং উল্লেখ্যে বিধানসভা কেন্দ্রের বাংলা কংগ্রেস প্রাধী শ্রীঅসিত গাঙ্গুলী সিদ্ধিকোট কংগ্রেসের প্রাধীর স্বপক্ষে মনো-নয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আবার হিঙ্গলগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি কেন্দ্রটি কেন্দ্রে নব-কংগ্রেস প্রাধীর সিদ্ধিকোট কংগ্রেসের প্রাধী বনে গেছেন, ইন্ডিকোটকে কলা সেক্ষেত্রে।

অন্যদিকে সি পি আই-এর বড় সাধের প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রাধীদের মধ্যে রয়েছেন বেইমান প্রফুল্ল ঘোষ কংগ্রেস, পি ডি এফ মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী অমির কুমার কিসকু (ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্র), প্রম মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক (হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্র) এবং ডি এফ এর অন্যতম এম এল এ জয়নাথ আবেদিন, (মগুরাহাট পশ্চিম বিধান সভা কেন্দ্র)।

কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোক-সভা কেন্দ্রে প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেস প্রাধী শ্রীঅশোক সেনের বিরুদ্ধে আট পার্টি জোটের নির্দিষ্ট আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক শেব পর্ত প্রাধী দেন নি। ফর-ওয়ার্ড ব্লক প্রাধী শ্রীমীরেন ভৌমিক (জোড়াসাঁকো কেন্দ্র) এবং এস এস পি প্রাধী ভূপাল বসু (বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র) বসু-মতীর কর্মহীন কর্মচারীদের প্রতি অশোক সেনের অন্যান্য আচরণের সমর্থক ও অংশীদার। ভূপাল বসু বসু-মতী ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে বসু-মতী ক্রোজারের আদেশ নামায় সই করেন আর ফরওয়ার্ড ব্লকের ধীরেন ভৌমিক অশোক সেনের বিম্বস্ত সেবক হিসেবে ইউনিয়ন ভাঙতে সক্রিয়, বর্তমানে কর্মীদের বিক্ষো-ভের ভয়ে “বসু-মতী” অফিসের ছায়াও মাদ্রতে সাহস পান না। সুতরাং এই সব ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা দালাল থাকতে ফরওয়ার্ড ব্লক অশোক সেনের বিরুদ্ধে প্রাধী দেবেন না এতো জানা কথা।

আবার তমলুক লোকসভা কেন্দ্র সি পি আই প্রাধী দিল্লীর পেট্রিট পত্রিকার কার্যতঃ মালিক অরুণা আসফ আলি কর্মচারী নিষ্পত্তিতে কম যান না। পেট্রিট ইউনিয়ন নেতাদের বদলী; বর-খাস্ত, পুন্ড্রিশের হাতে তুলে দেও-য়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বসু-মতী মালিক অশোক সেনের কীর্তিকে ন্মান করে দেয়। ইনি পেট্রিট পত্রিকা এবং লিংক সাম্ভা-হিকের জন্যে সন্দেহজনক সুত্র থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকেন বলে বিভিন্ন সময়ে লোকসভা বিব-রণীতে প্রকাশ পেয়েছে।

অশোক সেন আর অরুণা আসফ আলিতে এদিক দিয়ে মাসতুতো সম্পর্ক। আবার সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্প-কও মাসতুতো। কাজেই সি পি আই অরুণা আসফ আলিকে দাঁড় করিয়েছেন আর অশোক সেনের বিরুদ্ধে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রাধী দেন নি।

চোলা অমির কিসকু, গঙ্গাধর প্রামাণিক, জয়নাথ আবেদিন এরা সি পি আই-এর চোখে প্রগতিশীল হয়ে পড়েছেন। এরা কিন্তু প্রায়ই দর-দেনেওলা তেমন মনিব পেলে বিক্রী হয়ে যেতে শিখা করেন না।

তা সি পি আই-এর এসব ছদ্মমার্গ নেই। ধরুন না, কেরলে পালাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তাঁরা তো মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা এ কে গোপালনের বিরুদ্ধে জন-সংঘের আঞ্চলিক কমিটীর চেয়ার-ম্যানকে সমর্থন করে বসে আছেন। অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনসংঘকে তারা সমর্থন করছেন। কেরল কংগ্রেস নামক খুনী জ্যোতদার সংগঠনকেও তাঁরা প্রগতি-শীল বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

অবশ্য ১৯৬৭ সালেই সি পি আই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে করতে একে-বারে জনসংঘ, স্বতন্ত্র, আকালীদেব সঙ্গে মন্ত্রিসভায় ঢুকে পড়লেন। মন্ত্রী হওয়ার মোহ কি সোজা চীজ মশাই। মন্ত্রী হওয়া খুবই ভাল কিন্তু ঐ কথা। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া এবং তাদের দালালদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাঁক আরো জোরসে চালাতে হবে।

তাই বরাকরে “দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার দালাল” (১৪ই ফেব্রু-য়ারী, স্টেটসম্যানে শ্রীভূপেশ গুপ্ত) বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি অজয় মধুসূদনের সমর্থনে প্রাধী প্রত্যা-হার করতে হবে আর অজয় মধুসূদন মশাইকে জ্যোতি বসুকে হারাবার জন্যে “খুনোখুনিতে সি পি এম এর চেয়ে যারা কম যান না” (১১ই ফেব্রুয়ারী আনন্দ-বাজারে প্রকাশিত অজয়বাবুর কথুতা) সেই সি পি আইয়ের গালেই চুমো খেতে হবে।

মুর্শকিল হচ্ছে প্রগতিশীল ছাপ পিঠে নিয়ে এখনও দলে দলে ইন্দিরা কংগ্রেসীর সিদ্ধিকোট চলে যাচ্ছে। কুচবিহারের প্রসেন-জিৎ বর্মণ থেকে চব্বিশপরগণার বৃন্দাবন গায়ের অনাদি তাঁতী এদের অসংখ্যবার দলবদল, বেচা-কেনা, সি পি আই ভক্তদেরও বাতি-বস্ত করে তুলেছে। এদিকে সিদ্-কোট থেকে আসছেও বড় কম না। ওদের পিঠে প্রগতিশীল ছাপ মারতে মারতে আবার সি পি আই এর হাত বাধা হয়ে গেল। বসু-মতী আর পেট্রিটের সাধারণ কর্মচা-রীরা উপবাসী, শূকনো মূখে দাঁড়িয়ে এই প্রগতিশীলতার খেলা দেখছেন।

বরানগরে সি পি আই প্রাধী তুলে নেওয়ার মেজ শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক, আর সেজ শরিক এস ইউ সি কথা তুলেছিলেন, অশোক সেনের কেন্দ্রের দিকে আলদা তুলে সি পি আই চোরা চাউনিতে চেপে যেতে ইশারা করতেই ওরা চুপ।

সিউড়ীতে নব কংগ্রেস প্রাধী যদুগোপাল রায় নৃশংসভাবে নিহত হলেন। সি পি এম প্রাধী শরদীশ রায় (লোকসভা) মশাই নব-কংগ্রেস নেতাকে নিয়ে অকুণ্ঠলে

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অস্থিচীয়ে

কম ওপবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। রক্তবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সংযুক্ত আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেরক করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও রক্তা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য করে আশে এক অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভর দেহে মৃদু সজীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিস্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র বোম্বা এম,এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এক,সি,এস, (লন্ডন)
এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাদনপুর
কলকাতার রসায়ন শাস্ত্রের দৃষ্টপূর্ণ অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র বোম্বা, এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

চারের চামচের ৪ চামচ
মহাদ্রাক্ষারিস্টের সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সম পরিমাণ জলসহ
প্রত্যহ দুইবার আহারের
পর সেব্য।

শান্তিনিকেতনে অশান্তির আবহাওয়া

(দশম শতাব্দীর সর্বোচ্চ)

শান্তিনিকেতনে এবার সত্যিই অশান্তির হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। গোটা দেশের ভাবতরঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন শান্তিনিকেতন এতদিন শান্ত তথাকথিত সংস্কৃতি চর্চার এবং জ্ঞান চর্চার নাম করে রায়-ঘোষ পরিবারের সাম্রাজ্য চর্চার দূষিত কেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠছিল। বছর দুয়েক আগে ঐ সাম্রাজ্যিক আমলাতন্ত্র ও তার ধারক উপাচার্যের নানাবিধ অনাচার ও নোংরা-মির বিরুদ্ধে অধ্যাপকগণ সর্বপ্রথমে সংগ্রাম ঘোষণা করেন, কয়েক মাস পরে কমিটি সভাও গঠিত হয়। সভা দুইটিই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতে অধ্যাপক, কমিটি ও ছাত্রদের প্রতিনিধি দাবী করে। কর্তৃপক্ষ ইন্দিরা গান্ধীকে (বিনি আবার আচার্য) দেখিয়ে দেখিয়ে ঐ দাবীপত্রের টালবাহানা করেছিল। কি এক গজেন্দ্র গদকর কমিটির রিপোর্ট করে বেরিয়ে তার জন্য দাবীগুলো ঠেকিয়ে রাখছিল। কমিটি সভা-অধ্যাপকসভার প্রতি-নিধিরা যখন দিল্লীতে ইন্দিরার সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন ঐ সব দাবীদাওয়ার ব্যাপার নিয়ে ইন্দিরা হুঁকার ছাড়লেন—“বেশি বাড়াবাড়ি করেন তো, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবো।”

এদিকে ইন্দিরার বশব্দ ভূত্যা কর্মসমিতির কতিপয় সদস্য (তার মধ্যে একজন আবার আনন্দবাজারী ভূত্যা) তলায় তলায় রায়-ঘোষ পরিবারের অন্তরঙ্গ হিসাবে সভা দুটোর দাবীদাওয়া যাতে গৃহীত না হয় সে জন্য একদিকে দিল্লীর প্রভুকে সামলাচ্ছিল, অন্যদিকে কর্মসমিতিতে সব বানচাল করছিল।

মোটের উপর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নীতি হচ্ছিল—“জোর যার মল্লুক তার।”

ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ কমিটিসভার কয়েকজন নেতাকে উচ্চপদে বসাবার ব্যবস্থা করলেন, অধ্যাপকসভার কয়েকজন প্রোফেসর-সদস্যকে গোলাম করে তুললেন, নানাবিধ ক্ষমতার আসনে বসিয়ে (যেমন একজনকে ছাত্র পরিচালক করলেন, আরেকজনকে পরিকল্পিত বিজ্ঞান ভবনের অধ্যক্ষ হিসাবে লোড দেহাতে লাগলেন, “প্রগতিশীল” অধ্যক্ষ রত্ন সাহেবের মাধ্যমে কিছু গোলামাল আনলেন—ইত্যাদি)। ছাত্রদের মধ্যে মর্ডাটমের এক বামপন্থী বিরোধী অংশকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিতে আরম্ভ করলেন, জনৈক সাম্যবাদ বিরোধী ছাত্রকে দিয়ে ছাত্র-পরিচালকের নীরব সমর্থনের সাহায্যে প্রগতিশীল অধ্যাপক কমিটি ও ছাত্রদের নানাবিধ ভয় প্রদর্শন ও গালিগালাজের ব্যবস্থা করলেন।

সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। কর্তৃপক্ষের বশব্দ, ছাত্র-পরিচালকদের দেহরক্ষী ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের পটভূমি ছাত্ররা পরীক্ষার ফেল

করলো—একবার নয়, তিন তিনবার—বই পড়ে নয়, বই দেখে। গুপ্তা প্রকৃতির যে ছাত্রটিকে ব্যবহার করা হচ্ছিল অধ্যাপক ও কমিটির উপর দৈহিক আক্রমণের জন্য, তাকে কি ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা যায় তার জন্য অধুনা উপাচার্য প্রভু গুপ্তা, ছাত্র-পরিচালক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছাত্রের বিষয়ে প্রধান অধ্যাপক অনিল দে নানাবিধ ফণি ফিকির বের করছিলেন।

সবই সুখে চলছিল। বাদ সাধল নকশালারা। বাদ সাধল সন্তর সালের বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ।

যে ইন্দিরা বারংবার গজেন্দ্র গদকরের গজেন্দ্র গমনকে দেখিয়ে প্রতিনিধিদের দাবী গানের জোরে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন তিনি উপাচার্য প্রভু গুপ্তাকে বললেন—“বাংলাদেশের অবস্থা ভালো নয়, দাবী মেনে নাও।” প্রভু গুপ্তা তার চেলা ছাত্র-পরিচালক, রসায়নের প্রধান অনিল দে আর দার্শনিক সন্তোষকে নিয়ে রায়-ঘোষের অন্তরঙ্গ অমিতাভ সহ শলাপরামর্শ করে ঠিক করলেন “সংসদে ওদের দাবী মেনে নেওয়া যাক, অবস্থা ভালো নয়। দিল্লীই দেবী করিয়ে দেবে।”

নিয়ম হলো বিশ্বভারতী সংসদে ব্যাপারটা পাশ করলেই হলো না, দিল্লী থেকে পরিদর্শক (ভিজিটর) শ্রীভি, ভি, গিরি যতক্ষণ না অনুমোদন করেন, ততক্ষণ প্রতিনিধিদের দাবী ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। এক মাসের অধিক হয়ে গেলো, পরিদর্শকের অনুমতি এখনো আসেনি।

সন্তর সালের ডিসেম্বর থেকে নতুন পর্বায়ে অশান্তি এলো। শ্রীনিকেতনে কুঠি বাড়ীর অফিস ঘর, বিনয় ভবনের লাইব্রেরী, কৃষি কলেজের অফিসঘর পড়ে গেল কোন একদল অদৃশ্য ব্যক্তির উদ্যোগে। পোষ্টার পড়লো নকশালদের নামে—মুন্ডু চাই প্রভু গুপ্তার, সাবধান করে দেওয়া হলো বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল দে এবং এমন কি অশোক রত্নকে। আরো অনেক নাম আছে, যারা নীচের দিকে রয়েছে তবে আমলাতন্ত্রের শৃংখলা।

একান্তর সালের বিশেষ আনন্দবাজারী আমলাতন্ত্রের অধীনস্থ কর্মচারী ধীরেশ দেবনাথ অজ্ঞাত আত-তায়ী কর্তৃক মৃত্যু হলো। পোষ্টার পড়লো “পুলিশের দালাল ধীরেশ মৃত্যু।”

বারোই ফেব্রুয়ারী কৃষি কলেজে সম্মেলন করা আগুন দিল। কর্তৃপক্ষ শ্রীনিকেতন মেলায় যে সি আর পি বাহিনী এনোছিল, সেই সি আর পি বাহিনী ঐ সম্মেলন শ্রীনিকেতনের ছাত্র কমিটি ও অধ্যাপক নির্বিশেষে সকলকে বেদম প্রহার করলো, মেলায় সি আর পি বর্ষরাতা মাতাল হয়ে মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করলো।

তেরোই ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজারী গোলামের উদ্যোগে কর্মসমিতি সিদ্ধান্ত করলেন—ইউক

পুলিশ অত্যাচার, হটক মেয়েদের নিয়ে টানাটানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরবাড়ীর দাম অনেক বেশি, তাদের রক্ষা করার জন্য পুলিশ ডাকতে হবে, আর পুলিশ ডেকেও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ট্রাপাথর না রক্ষা হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবো।

পনেরোই ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজার আর স্টেটসম্যান খবর বের করলো—শান্তিনিকেতন পুলিশ ডাকছে, দরকার হলে শান্তিনিকেতনের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হবে। সি আর পি পাশ-বিক অত্যাচার, নারী নির্বাতনের খবর, কমিটি-অধ্যাপকদের তুমুল বিক্ষোভ কোথাও কোনও কাগজে প্রকাশিত হলো না।

কর্তৃপক্ষ এখন এক টিলে দুই পাখী মারতে চাইছেন। যদি বিশ্ববিদ্যালয় নকশালী আক্রমণের অজু-হাতে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে শত শত কমিটি-অধ্যাপকের দাবী-দাওয়ার আন্দোলন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, প্রতিনিধিদের যে দাবী কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে, তাকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য ঠান্ডা-ঘরে রেখে দেওয়া যাবে। বিজ্ঞ

বাজারী গোলাম, কর্তৃপক্ষ ও তার বশব্দ অধ্যাপক ও কমিটি চেলারা খুব খুশী মদ ও মাসের “ফিফি” তারা এবার করতে পারবে আনন্দ-কুঞ্জে দিনের বেলায়। এতদিন দিনে রবীন্দ্রানুগামী ও রাতে মদ খেতে পারতো, এখন পোস্তাবারো চম্পাশ ঘণ্টার সুযোগ।

সত্যি সত্যি কি শান্তিনিকেতনের আবাসিক কমিটি ও অধ্যাপকরা ভয় পেরেছিল ঐ ঘটনা-গুলোতে? সত্যিই পেরেছিল। ধীরেশের হত্যা নিঃসন্দেহে ভয় জাগিয়েছিল মনে, কিন্তু সে ভয় কেটে গেছে এখন। পুলিশের দালালী সে করেছিল কি না তা অন্যদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে হত্যার পরদিন জেলাশাসককে যখন স্থানীয় লোকজন বলছিলেন যে এটা ব্যক্তিগত কোন প্রতিহিংসার ব্যাপার, তিনি বারংবার ষাড় নেড়ে বললেন “ন, এটা নকশালদের কাজ।” বোলপুর থানাও অসতর্ক মুহুর্তে এ ধারণা ঘনিষ্ঠ লোক-জনদের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিল।

কিন্তু একথাও সত্য, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন বহুদিন যাবত বোলপুরবাসীর ঘৃণা ও পরোক্ষ শত্রুতার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

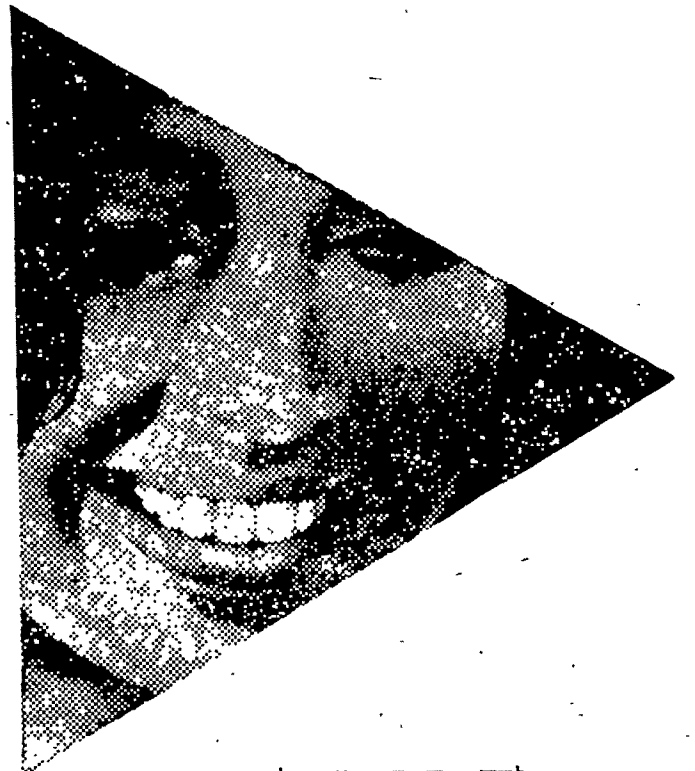
বোলপুরের ছেলেরা পড়তে পারবে না, আগের উপাচার্য সুধীরজ্ঞান এ ব্যবস্থা করেছিলেন, তারপর বোলপুরবাসী শ্রবকদের আন্দোলনে পরবর্তী উপাচার্য এ নিয়ম তুলতে বাধ্য হলেন।

শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞ চাকুরীতে বোলপুরবাসীর অগ্রাধিকার কিছুই নেই, যদি সে আনন্দবাজার চক্রের লোক না হয়। অশোক রত্নের অধীন একটা ফান্স ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনায় বোলপুরের উপস্থিত শ্রবকদের না নিয়ে প্রিয় অধ্যাপক ও কমিটির অন্তর্গত শ্রবীদের নেওয়া হয়েছে—এটাও অভিযোগ।

চারিপাশে দারিদ্র্য, মাঝখানে বিশ্বভারতী সম্পদে আদর্শ “মহীয়ান”। নববর্ষের সকালে যখন কমিটি ও অধ্যাপকরা জলযোগ করেন তখন সাধারণ দ্বন্দ্বের পেছনে অসংখ্য সাঁওতাল ও নিম্ন-শ্রেণীর বাচ্চা বাচ্চা রোগা ন্যাংটো ছেলেমেয়ে পরাক্রমশালী কুকুর-গুলোর সংগে জলযোগের ফেলে বাওয়া উচ্ছ্রিত পাতা সংগ্রহে কাড়া-কাড়ি করে। হায় রবীন্দ্রনাথ।

এ সম্পদ ও স্বচ্ছতার প্রভাবে অধ্যাপক ও কমিটির মধ্যেও এমন (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

তার হাসি কী মধুর



এর পেছনে রয়েছে-তার
বহুদিনের সাধনা—
সাধনা দশন দিয়ে প্রতিদিন
দাঁতের পরিচর্যা।

সাধনা দশন

একটি আদর্শ দাঁতের মাজন

দাঁত মুক্তার মত স্বচ্ছ ও
মুখ, সবল, সুন্দর করে।
মুখ কদ ও চর্চা মুখ হয়



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ বোমেন চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
শ্রীমতী-শ্রীমতী, এক.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ডাঃগুরু বন্দ্যোপাধ্যায়
হসায়ন শাহের কৃতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ মরেন চন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (ক্যালি)
আজকালকার

নির্বাচন পর্ব: অন্ধ্র ও কেরল

(দপর্শের পর্ববৈক্য)

অন্ধ্রের লোকসভার একচল্লিশটি আসনের মধ্যে চৌদ্দটি তেলঙ্গানা অঞ্চলে এবং বাকী সাতাশটি অন্ধ্র অঞ্চলে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে এই একচল্লিশটি আসনের মধ্যে সবকয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অবিভক্ত কংগ্রেস মোট সাড়ে তেইশটি লক্ষ (৪.৮৬%) ভোট এবং পশ্চিমাংশটি আসন দখল করে। তিনজন স্বতন্ত্র, দুজন নির্দল এবং একজন সি পি আই প্রার্থী নির্বাচিত হন। তাঁদের প্রার্থী সংখ্যা ও প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা হল যথাক্রমে উনিশ (৯) ও সাড়ে আঠারো লক্ষ (১০.৭০%), একষটি ও সাড়ে চব্বিশ লক্ষ (১৮.০৭%) এবং কুড়ি ও সাড়ে পনেরো লক্ষ (১১.৪২%)।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এগারোটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, ভোট পান দশ লক্ষের কিছু বেশী, আসন একটাই পান নি। জনসংঘ ছয়টি আসনে প্রার্থী দিয়ে দলক্ষের কিছু কম। ভোট পেয়েছেন, আসন একটাই পাননি। সি এস পি, এস এস পি, রিপাবলিকান পার্টি গুলি একটাই, দুটাই তিনটাই আসনে প্রার্থী দেন, ভোটের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের নীচে অথবা কিছু বেশী, আসন একটাই পান নি।

অন্ধ্রের উপকূলবর্তী সাতটি জেলাতে চৌদ্দটি আসন, এখানে শাসক কংগ্রেসের প্রার্থীরাই শক্তিশালী। আদি কংগ্রেস এই জেলাগুলির মধ্যে পূর্ব গোদাবরী জেলার রাজমহেন্দ্রী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, অন্যগুলিতে প্রধানতঃ স্বতন্ত্র, জনসংঘ এবং এস এস

পি-কে ছেড়ে দিয়েছেন। এই চৌদ্দটি আসনের দশটিতে অবিভক্ত কংগ্রেস প্রার্থীরা ভোট পেয়েছিলেন মোট সতেরো লক্ষ। উপকূলবর্তী অঞ্চলের শ্রীকাকুলাম এবং পার্শ্ববর্তী পূর্বম দুটাই আসনে স্বতন্ত্র দলের পক্ষে জি লচাম্মী (পরে এন জি রঙ্গ) এবং বি নরসিংহ রাও জয়ী হন। আর কুর্নুল আসনটাই পান এই দলের ওয়াই জি গোড়। সি পি আই পান কুন্ডাপা আসনটাই।

কংগ্রেস দল বিভক্ত হওয়ার পর, নব-কংগ্রেস দলে চব্বিশ জন এবং আদি কংগ্রেসে দশ জন সদস্য যোগ দেন। লোকসভায় কংগ্রেস দলের একটাই আসন শূন্য ছিল। পরে শ্রীভেম্বট সুববাইয়া আদি কংগ্রেস থেকে নব কংগ্রেসে এবং শ্রীরামেশ্বর রাও (মহাবনগর) প্রজাসমিতিতে যোগ দেন।

বাঁতল লোকসভার পনের জন নব কংগ্রেস সদস্য, চারজন আদি কংগ্রেস, তিনজন স্বতন্ত্র, একজন কমিউনিস্ট এবং একজন নির্দল স্বতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বাকী সবাই নবগত।

অন্ধ্রের রায়ালসীমা অঞ্চলের দশটি আসনের ছয়টি আসনে আদি কংগ্রেস দল শক্তিশালী। এর কুর্নুল আসনে শ্রীসঞ্জীবারা দশ-হাজার ভোটের ব্যবধানে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে পরাজয় বরণ করেন। কুর্নুল আসনে এবারে নব কংগ্রেসের শক্তিশালী প্রার্থী রয়েছেন।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবার গুন্টুর সহ পাঁচটি আসনে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সি পি আই ছয়টি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। গুন্টুরে নব কংগ্রেস প্রার্থী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমদুরামাইয়া। এখানে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের প্রার্থীর জয়ের উল্লেখ্য সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সি পি আই অর্থাবিত্ত ভাবে একজন প্রার্থী দেওয়ার সেই

সম্ভাবনা ম্লান হয়ে পড়েছে।

তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি তেলঙ্গানা অঞ্চলের মোট চৌদ্দটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছেন। সি পি আই এই আসনগুলিতে নব কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন। তবু বলা যায় তেলঙ্গানা প্রজা সমিতি স্বতন্ত্র তেলঙ্গানা প্রদেশের দাবী নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দরদর অন্ততঃ বারোটি আসনে তাদের জয়ের সম্ভাবনা সমৃদ্ধ।

অন্ধ্রের মোট বারোটি জেলার সতেরোটি আসনে নব কংগ্রেসের জয়লাভের সম্ভাবনা। শুধু মাত্র রাজমহেন্দ্রী আসনটাই আদি কংগ্রেস জয়ী হতে পারেন।

রায়ালসীমা অঞ্চলে আদি কংগ্রেসের প্রভাব এখনো বেশ লক্ষণীয়। জয়পরাজয়ের সম্ভাবনা খানিকটো অনিশ্চিত। তবুও সর্বসাকুল্যে চারটি আসন লাভ করা আদি কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব নয়।

ফলাফল যাই হউক, নব কংগ্রেসের আসন সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হবে একথা জোর করেই বলা যায়, তবু বাঁতল লোকসভার চব্বিশটি আসন তাঁদের পক্ষে রক্ষা করা অসম্ভব। নব কংগ্রেস মোট কুড়িটি আসন লাভ করবেন মনে করছেন, তেলঙ্গানা প্রজা সমিতি দশ থেকে বারো, সি পি আই চারটি এবং সি পি এম দুই থেকে তিনটি আসন লাভ করতে পারেন। আদি কংগ্রেস চার এবং স্বতন্ত্র ও নির্দল সদস্যরা তিন থেকে চারটি আসন লাভ করতে পারেন।

কেরল : কেরলের মোট আসন উনিশটি। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার ফলে এর আঠারোটি আসনই যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করেন। এর মধ্যে সি পি এম নয়, এস এস পি তিন, সি পি আই তিন, মুসলিম লীগ দুই এবং আর এস পি একটাই আসন লাভ করেন।

১৯৬১ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাওয়ার ফলে ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেরল বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কেরলের নব-কংগ্রেস, সি পি আই, মুসলিম লীগ, আর এস পি, সি পি এস পি জোটের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পরিচালিত জোট ও কেরল কংগ্রেস আদি কংগ্রেস জোটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সি পি আই, মুসলিম লীগের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আসন সংখ্যা হ্রাস পায়, কিন্তু নব কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা পাঁচ থেকে বৃদ্ধি এবং পাঁচ থেকে বারোতে ওঠে যায়।

কিন্তু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ও শতকরা হার বেড়ে যায়। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও আদি

কংগ্রেস এগারো জন নির্দল প্রার্থীকে একযোগে সমর্থন করেন। আদি কংগ্রেস একটিও আসন পান নি তবে তাঁদের মনোনীত পাঁচজন নির্দল সদস্য জয়ী হয়েছিলেন।

বিধানসভা নির্বাচনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা প্রায় তেইশ লক্ষ ভোট পান (৩০.৪%) এই ফ্রন্টের অন্যান্য শরিক কে টি পি ও কে এস পি দেড় লক্ষ ভোট ও চারটি আসন পান (১.৮% ভোট) এস এস পি পান সাতটি আসন এবং দুলক্ষ ছত্রিশ হাজার ভোট (৪.৭%), আই এস পি দুলক্ষ ভোট এবং তিনটি আসন লাভ করেন।

অন্যদিকে নব কংগ্রেস প্রার্থীরা বত্রিশটি আসন ও সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ ভোট (১৯.৫%) সি পি আই ষোল্লটি আসন ও সাত লক্ষের কিছু বেশী ভোট (৯.৫%) মুসলিম লীগ বারোটি আসন প্রায় ছল্ল লক্ষ ভোট (৮%) সি এস পি দু লক্ষ ভোট এবং তিনটি আসন (২.৭% ভোট), আর এস পি ছয়টি আসন ও তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার ভোট (৪.৪%) পান।

আদি কংগ্রেস একটি আসনও পাননি তবে দু লক্ষ একষটি হাজার ভোট পেয়েছিলেন, (৩.৪%) তাঁদের সমর্থিত প্রার্থীরা নবুই হাজার ভোট (১.২%) এবং চারটি আসন লাভ করেন। পরে কেরল কংগ্রেসের একজন নির্বাচিত প্রার্থী আদি কংগ্রেসে যোগ দেন।

কেরল কংগ্রেস চৌদ্দটি আসনে জয়লাভ করেন, ভোট পান পাঁচ লক্ষের বেশী। কপাটক একাকল্প সমিতি, জনসংঘ, স্বতন্ত্র, প্রভৃতি দল একটিও আসন পান নি, কিন্তু ভোট পেয়েছিলেন তিন লক্ষ একত্রিশ হাজারের বেশী (৪.৪%)।

সাতষটি সালের হিসাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভোট যুক্তফ্রন্টের আমলে সাড়ে পনেরো লক্ষ থেকে উনিশশো সত্তর সালে একুশ লক্ষে উঠেছে, অবিভক্ত কংগ্রেসের ভোট সাড়ে বাইশ লক্ষের ছয়শো উনিশশো সত্তর সালে সতেরো লক্ষ (নব কংগ্রেস সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ + আদি কংগ্রেস আড়াই লক্ষ) সি পি আই পাঁচ লক্ষের

জয়লাভের সাথে লক্ষের কিছু বেশী মুসলিম লীগ চার লক্ষের কিছু বেশী থেকে প্রায় ছ লক্ষ ভোট পেয়েছে।

কেরলে এককভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলই আসন ও ভোটের দিক দিয়ে প্রধান দল। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সামান্য সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে চতুর্দশটি বিধানসভা আসন হারায়।

লোকসভা নির্বাচনে বিজয় বিধানসভা আসনের ভোট মিলিয়ে সি পি এম কয়েকটি লোকসভা আসনে জয়লাভ করতে পারেন। সি পি এম বাঁতল বিধানসভার সাতাশটি পুরনো আসনে পরাজিত হন, কিন্তু তেরোটি নতুন আসন লাভ করেন। সি পি এম-এর আলোম্পি, কোটায়াম, কুইলন, এণী-কুলাম, কোচিন এবং পালঘাট জেলার প্রতিটি আসনে পাঁচ থেকে দশ হাজার ভোট বেড়েছে। কোন কোন আসনে তাঁদের ভোটসংখ্যা কুড়ি থেকে তেইশ হাজার পর্যন্ত বেড়েছে।

কংগ্রেস-মিনিস্ট্র পার্টি গুলি জোড়াতালি দিয়ে বিধানসভায় উন-সত্তরটি আসন লাভ করেছেন বটে কিন্তু এই মোট তিনজনের সংখ্যা-ধিক্য মোটেই ঘাতসহ নয় বলে সি পি আই কেরল কংগ্রেসকে জোটের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেছেন।

অন্ততঃ লোকসভা নির্বাচনে নব-কংগ্রেস, সি পি আই, মুসলিম লীগ, আর এস পি, সি এস পি, কেরল কংগ্রেস (ও আদি কংগ্রেস কোন কোন আসনে) একাঙ্ক হয়েছেন। এদিকে এস এস পি, কে টি পি ও কে এস পি, সি পি এম-এর সঙ্গ ত্যাগ করে আলাদা-ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। অর্থাৎ সি পি এম-কে প্রায় একক ভাবে বাকী সব দলের একাঙ্ক জোটের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

কিন্তু কেরল সরকারী কর্মচারী, গেজেটেড অফিসার, শিক্ষক সমিতির তিন লক্ষাধিক মানুস মার্কসবাদী নেতৃত্বে হরতাল করায় নির্বাচন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। মুদ্রামন্ত্রী অচ্যুত মেনন হুমকী দিয়েছেন যে সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের ধর্মঘট অবি-লম্বে প্রত্যাহত না হলে তিনি নির্বাচনী কর্মসূচির কাছে নির্বাচন স্থগিত রাখতে সুপারিশ করবেন।

লোকসভা নির্বাচনে নব কংগ্রেস-সি পি আই মহাজোট আঠারোটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং পালঘাটে এ, কে, গোপালনের বিরুদ্ধে জনসংঘের জনৈক নেতাকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে সমর্থন করেছেন।

কাসারগোড, তেলিচেরী, পেম্বানি, পালঘাট, এণীকুলাম, মুন্ডুপুঝা, কোটায়াম, আম্বলা-পুঝা ও চিরাইনিকল আসনগুলি বাঁতল লোকসভায় জয়ী হয়ে-ছিলেন। এবার নিজেদের একক শক্তিতে তাঁরা আরো তিনটি আসন বাদগারা, কোকিখোদ, আড়ুড় মোট (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠার)

শান্তিনিকেতনে অশান্তি

(৩৯ পৃষ্ঠার পর)

একটা মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে যার বৈশিষ্ট্য স্বার্থপরতার, কথাসর্বস্বতার এবং বড়লোকী অর্থ ও ক্ষমতালোভের, যাকে পণ্ডিত করে কল্পপক্ষের অনুচরগণ কম্মী ও অধ্যাপকদের নকশালদের বিরুদ্ধে নিরোক্ত করবার আশ্রয় চেষ্টা করছেন, ছাত্রদের দিয়ে অ্যান্টি-নকশাল স্কোয়াড করবার চেষ্টা করছেন, নকশাল আতঙ্ককে ব্যাপক করবার জন্য সম্মানবোধের সকল অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিচ্ছেন, পদাংশ ও মিলিটারী দিয়ে গোটা ক্যাম্পাস ভরিয়ে তুলছেন।

বিশ্বভারতীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীগণও আজ বিদ্রোহ। নকশালদের অজ-হাতে কল্পপক্ষ যে সকল গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তিকে আজ প্ররোচ দিয়ে চলছেন, তাকে রোধের জন্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যালয়টিকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করবার জন্য কোন কর্মসূচী এ-যাবত অবলম্বন করতে পারে নি।

“জোর যার মূল্যদক তার”-এর যে রাজনীতি কল্পপক্ষ সূচনা করেছিলেন, তার জবাব হলো পাণ্ডা শক্তিকেন্দ্র স্থাপন অধ্যাপক ও কর্মীদের। নকশালরা যে শ্রীনি-কেননকে আক্রমণ করেছে, সে শ্রীনি-কেননকে বহু অনাচার নো-রামি ও বদমাইসীর জায়গা, এবং এ আক্রমণ যে আসলে ঐ অনাচার ও নো-রামির ফলপ্রসূতি, তা কর্মী ও অধ্যাপকদের বোকা দরকার। বস্তুতঃ ঐ আক্রমণগুলো : সত্যি-কারের নকশালদের নয়, হতে পারে না, আসলে নকশাল-মূল্যবোধে উল্লসিত কিছু স্থানীয় বিক্ষুব্ধ বোলপূরবাসী যুবকদের বিশ্ব-ভারতী-স্থান প্রতিফলন-এ চেষ্টা-যতদিন কর্মী ও অধ্যাপকদের মধ্যে না আসবে ততদিন রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, বিশ্ব-ভারতীর ই-ট পাথর কাঠ কিছুই রক্ষা পাবে না, রক্ষা পাওয়ার নৈতিক অধিকার আছে কি না সন্দেহ।

বাংলার বুকে হিন্দীর মধুচক্র

রামজয় চক্রবর্তী

হিন্দীর নামে বরাদ্দ সাতাল কোটি টাকার মধ্যে বাংলার প্রাপ্য অংশ বিপণ্ডিত অর্থ যাতে আত্মসাৎ করা যায় তার জন্য একটি সুসংবদ্ধ চক্রান্ত বহুদিন ধরে চলেছে। এই চক্রের প্রধান নায়ক হচ্ছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যাপক রীডার হেড ও হিন্দী সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রিত এক্সপার্ট মেম্বর, পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিস কমিশন।

হিন্দী অফিসারের নিয়ন্ত্রিত জন্য উনিশশ তেঁষটি সালের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞাপন বের হয়। উক্ত পদের জন্য আবেদন করার নির্ধারিত যোগ্যতা ছিল হিন্দীতে এম এ এডুকেশনের ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা ও পঁচ বছরের শিক্ষকতা অথবা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা। এম এ পি এই ডি, কলেজে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত আবেদনকারী থাকা সত্ত্বেও একজন মাত্র সাধারণ ভাবে পশ্চিম হিন্দী এম এ-কে উক্ত পদের জন্য নির্বাচিত করা হয়। বলাই বাহুল্য যে উক্ত নিয়ন্ত্রিত পিছনে উক্ত মধুচক্রের নায়কের সম্পূর্ণ হাত ছিল।

উনিশশ পঁয়ষটি সালের জুলাই মাসে গভর্নমেন্ট "হিন্দী টিচার্স" ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ পদের জন্য বিজ্ঞাপন বের হয়। বাংলা সরকারের অনুরোধে সেন্ট্রাল হিন্দী ইনিস্টিটিউট, আগ্রা উক্ত পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তির নাম পাঠান। উক্ত চক্রের উপনায়ক হিন্দী এডুকেশন অফিসার উক্ত প্রার্থীর নাম মধুচক্র ভাঙ্গার আশঙ্কায় চেপে দেন।

পুনরায় দ্বিতীয় দফায় উনিশশ সাতষটি সালের ফেব্রুয়ারি জুলাই উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদের জন্য বিজ্ঞাপন বের হয় (বিজ্ঞাপন সংখ্যা একুশ)। তিনজন যোগ্যপ্রার্থী আবেদন করেন। উক্ত মধুচক্রের স্বার্থে সব নাম বাতিল করে দেওয়া হয়।

তৃতীয় দফায় ১৯৭১-৭২ তারিখে বিজ্ঞাপন সংখ্যা ১৬৮ বের হয়। আটজন যোগ্য আবেদনকারীকে ৩-৫-৭৮ সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। উক্ত এক্সপার্ট মেম্বর চক্রের স্বার্থে, সকলকে অযোগ্য ঘোষণা করেন। প্রার্থীগণের মধ্যে এম এ ও এম এড পরীক্ষায় প্রথম-শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারী ব্যক্তিও ছিলেন। উক্ত হিন্দী এডুকেশন অফিসার একজন যোগ্যতার আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট পেশ করেন যে এই আবেদনকারীর কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করার কোনও অভিজ্ঞতা নাই। চতুর্থ দফায় উক্ত অধ্যক্ষ পদের জন্য আটষটি সালের উনিশশ জুন বিজ্ঞাপন সংখ্যা ১০৬৮ তারিখে বের করা হয়। যোগ্য আবেদনকারীগণকে বাতিল করে হিন্দীতে এম

এ নহেন এমন আবেদনকারীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ডিপ্লোমা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়ন্ত্রিতপন দেওয়া হয়। উক্ত আবেদনকারী ডি ডি সির একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি কাজে যোগদান করেন নি। যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া গেল না এই দেখানোর জন্য দফায় দফায় বিজ্ঞাপন বের করে অবশেষে উক্ত হিন্দী এডুকেশন অফিসারকে পোর্ট টাইম অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করা হয়।

উনিশশ সত্তর সালে পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী শিক্ষক সংস্থার আন্দোলনের ফলে একজন অধ্যাপক পূর্ণ সময়ের জন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত অধ্যক্ষ হিন্দীর অক্ষর-জ্ঞানহীন, মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম, রিটার্ড ও বৃদ্ধ। তবে তিনি উক্ত চক্রের পুষ্টিসাধনে তৎপর, প্রায় এগারশ টাকা মাসিক বেতন তিনি অবাধে ভোগ করছেন।

উনিশশ পঁয়ষটি সালের জুলাই মাসে উক্ত কলেজে তিনজন লেকচারার নিয়ন্ত্রিত জন্য বিজ্ঞাপন বেরোয়। সেন্ট্রাল হিন্দী ইনিস্টিটিউট, আগ্রার তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যে নামের তালিকা পাঠান হয়েছিল তা পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পাঠান হয়নি। হিন্দী এডুকেশন অফিসার মধুচক্রের স্বার্থে তা চেপে দেন। এই নির্বাচনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার হেড এক্সপার্ট মেম্বর না থাকায় দুইজন প্রার্থীকে নেওয়া হয়। উনসত্তর সালের পনেরোই জুন লেকচারারের পদের জন্য পুনরায় বিজ্ঞাপন সংখ্যা ১১৬৯ প্রকাশিত হয়। বারজন যোগ্যপ্রার্থী আবেদন করেছিলেন। এম এ এম এড পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারীকেও অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

তখন থেকে অধ্যাপক অনঙ্গত স্কুল মাস্টারদের আর্থিক সমস্যার জন্য নিযুক্ত করা হয়। অনেক-রকম কারচুপি করে তাদের পুরো বছরের বেতন দেওয়া হয়। কলেজে তাঁরা বৎসরে দু'একদিনই পড়াপড় করে থাকেন। তাদের কাজের কোন রেকর্ড রাখা হয় না।

হিন্দী মাধ্যমের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একটি কলেজ আছে, সেটি সম্পূর্ণভাবে সরকারী খরচে চলে। উক্ত মধুচক্র নয়জন করার সুবন্দোবস্তের জন্য সেটিকে বিক্রয় বিদ্যালয় হওয়ার অধীনে রেখেছে। উক্ত পোস্ট মাস্ট্রিক ট্রেনিং কলেজের ছাত্র সংখ্যা চল্লিশ এবং অধ্যাপক সংখ্যা আটজন। অথচ সরকারী পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং কলেজে সমপরিমাণে ছাত্র থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক সংখ্যা মাত্র দুইজন।

পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনার দুই বৎসরের

অভিজ্ঞতার মিথ্যা প্রমাণপত্র দিয়ে মধুচক্রের অন্যতম সদস্যকে পোস্ট মাস্ট্রিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ করার চক্রান্ত বর্তমানে চলেছে।

মধুচক্রের উপনায়ক হিন্দী এডুকেশন অফিসার প্রধান নায়ক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যাপক রীডার হেডের অধীনে ডি লিট-এর জন্য রেজিস্টার্ড গবেষণারত ব্যক্তি অন্য কোনও পরীক্ষা দিতে পারেন না। অথচ তিনি রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশন, ভুবনেশ্বর থেকে বি, এড পাশ করেছেন। উক্ত কলেজ থেকে পরীক্ষা দিতে হলে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনপক্ষে তিন বৎসরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার

প্রয়োজন হয়। উক্ত হিন্দী এডুকেশন অফিসারের এরূপ কোন অভিজ্ঞতা নাই।

অত্যাশ্চর্যের কথা, একই সঙ্গে রাইটস বিল্ডিং-এ হিন্দী অফিসার ও গভর্নমেন্ট হিন্দী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কলিকাতায় অধ্যক্ষের কর্ম তিনি করেছেন এবং বেতন নিয়েছেন। অথচ কোনরকম বিশেষ ছুটি না নিয়েই তিনি রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভারসিটি বোলপুর শান্তিনিকেতনে শতকরা নব্বই দিন উপস্থিত থেকেছেন এবং পরীক্ষা দিয়ে সত্তর সালে পাশ করেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলার ছয় হাজার বিদ্যালয়ে একজন করে হিন্দী শিক্ষক রাখা যেতে পারে। কিন্তু অধিক-সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত হলে উক্ত মধুচক্রের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। তাই নেওয়া হয় না। পশ্চিমবঙ্গ

হিন্দী শিক্ষক সংস্থার বিশেষ প্রয়াসের ফলে ভূতপূর্ব শিক্ষাউপদেষ্টা পাঁচশো শিক্ষক নেওয়া হবে বলে সত্তর সালের অক্টোবর মাসে জানান। অধ্যাপক বিজ্ঞাপন বের করা হয়নি। কার্য নিজেদের দল-ভুক্ত লোকদের নিয়োগ করাটাই তাঁদের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য-পূর্তির চেষ্টায় অনুগতদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে বিজ্ঞাপন বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ব্যাপারে বারবার তদন্তের দাবী করে আমলাতন্ত্রের দরবারে মাধাকটে কোন ফল ফলেনি। আশা করি আগামী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এ বিষয়ে তদন্ত করাবেন ও দোষী সাব্যস্ত হলে অপরাধীদের যথাযোগ্য সাজা দেবেন।

মৌচুমী নকশা

খোজ কার্ফোতে ভবিন জাবাম—নিখুঁত মনোমোহা পড়ুন, আটকধুনীয়া স্টাইল... বাটার এইবোব স্টাইলেবে আপুনি নিজকেই বর-বেছি পবিত্রম আক স্বচ্ছপবোধ কবিব। সূর্যাম কোমল যেনে ওপব-চামবা, তেনে মোলায়েম আক মজবুত ইয়াব চোল—প্রতি খোজতেই জ্ঞানবনীয় জাবাম। ডিজাইনব নানা তবহব বৈচিত্র্য ইয়াব জইন এটি বৈশিষ্ট্য। আজিয়েই আছি চাওকহি বাটার দোকানত চেঙেল আক চম্পলব মনোমোহা মৌচুমী নকশা।

বাপি ৮.৯০
মামনী ৮.৯০
বুলবুল ৮.৯০
পীনা ৮.৯০

Bata

পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি নির্বাচন : একটি সমীক্ষা

দিলীপকুমার সিংহরায়

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে কংস্টিটিউশনাল অ্যাসেম্বলি বা প্রতিনিধি সভা প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। ১৯৪৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী সংবিধানের খসড়া প্রকাশিত হয়। ঠিক এই সময়েই প্রাদেশিক বিধান-সভা ও লোকসভার জন্য বতর্গতী সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা পুনর্ঘোষিত হয়।

নির্বাচনকে দুটিহীন, স্বাধীন ও সরকারী প্রভাব মুক্ত করার জন্য একটি নির্বাচনী কমিশন গঠিত হয়। এই সংস্থাই সারা দেশের বিস্তৃত আইনসভার জন্য এতাবৎকাল নির্বাচন সংক্রান্ত স্বাভাবিক কাজ করে আসছেন।

জনপ্রতিনিধিত্বের আইন ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে গৃহীত হয়। এই আইনের আরও কিছু সংশোধনী হওয়ার দরুন নির্বাচনী সংস্থাকে প্রথম সাধারণ নির্বাচন শুরুর করতে আরও কিছু বিলম্ব করতে হয়। একমাত্র কেরালা (তদানীন্তন কালে ত্রিবাক্স-কোচিন রাজ্য) প্রদেশে ১৯৪৮ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগেও ভারতে নির্বাচন প্রথা চালু ছিল। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ১৯০৫ থেকে দেশের বিভিন্ন আইনসভার জন্য নির্বাচনের ভিত্তিতে সভার সদস্য ঠিক করা হত। কিন্তু অত্যন্ত সীমিতভাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত। শতকরা মাত্র আঠার জনের ভোটাধিকারের ক্ষমতা ছিল। সাধারণতঃ ব্রহ্ম, শিক্কা, আর্থিক অবস্থার দ্বারা ভোটাধিকারের ক্ষমতা নিশ্চিত হত।

আমরা এখানে শুধু পশ্চিম বাংলায় অনুষ্ঠিত গত পাঁচটি সাধারণ নির্বাচনের (বিধানসভা) ফলাফল বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। প্রাথমিক তথ্য অর্থাৎ কেন্দ্র অনুযায়ী ভোটারের ফলাফল সরকারী সূত্র থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম চারটি নির্বাচনী ফলের সূত্র রিপোর্ট অফ দি জেনারেল ইলেকশান-ইলেকশান কমিশন, পঞ্চম বা মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভলুম ১৫, নং ৩০ ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯৬২ সংখ্যা ও এই সময়কার সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রবন্ধটির জন্য স্বাভাবিক সংখ্যাগণনের কাজ ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার সংখ্যা গণন বোর্ড ও কম্পিউটার মেশিনে (আই বি এম ১৪০১) ডাঃ বোগরত রায়ের তত্ত্বাবধানে করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিন্দু প্রীতমসী বোস আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৫২

১৯৫১-র জানুয়ারী মাসে সারা পশ্চিম বাংলায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী কমিশন পশ্চিম বাংলার পনেরোটি জেলার জন্য দশ এক-ত্রিশটি কেন্দ্র নির্দিষ্ট করেন। তপশীল ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ঐ সম্প্রদায় পরিষদ এমন সাতটি কেন্দ্রে মোট দুই জন করে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকে, যার মধ্যে অন্তত একজন তপশীল বা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন। ফলে মোট দশ আটত্রিশ জন বিধানসভার সদস্য হবেন।

১৯৫১-এর আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার লোক সংখ্যা ২,৬০০২০৮৬ তার মধ্যে ১,৭৭,০৭৫৭২ জন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। নির্বাচনের গুরুত্ব তখন সাধারণ লোকের মধ্যে বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করেন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট দেশ বিভক্ত হয় ও স্বাধীনতা অর্জন করে। দেশ বিভক্ত হওয়ার দরুন বহু লোক পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন। রাজ্যের এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিশেষ প্রকোপ দেখা যায়। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট দল কাকদ্বীপ ও তুতলেগানার সশস্ত্র আন্দোলনের দরুন নিষিদ্ধ হয়। ঐ সময়েই গান্ধীজী নিহত হন। স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী সময়ের শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যমণ্ডলী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মন্ত্রিসভার মনোমালিন্যের দরুন মধ্যমণ্ডলী ও শাসক দল ত্যাগ করেন। নির্বাচনের কয়েকমাস পূর্বে ভারতের কমিউনিস্ট দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ঠিক ঐ সময়েই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে জনসংঘ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজ্যে মোট তেরোটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল। একমাত্র শাসক কংগ্রেস দল ছাড়া অন্যান্য দলগুলি একান্ত ভাবেই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট দল নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন সাধারণের মধ্যে এদের সক্রিয় ভাবে কাজ করার অসুবিধা ছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল থাকার দরুন জনসাধারণের মধ্যে তেমন প্রভাব ছিল না।

যাই হোক ফসল কাটার মরশুমে নির্বাচন আরম্ভ হয়। সুতরাং এই সময় রাজ্যের বৃহত্তম শ্রেণী অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে মাঠের কাজ ফেলে নির্বাচনে অংশ

গ্রহণ করার মত রাজনৈতিক সচেতনতা তত ব্যাপক হয় নি।

আর শাসক কংগ্রেস দল ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির পথ ও মত সম্পর্কেও তখন কোন স্পষ্ট ছবি জনসাধারণের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। ফলে নির্বাচন মূলতঃ রাজনৈতিক দলভিত্তিক না হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ-যথা শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ই নির্বাচনে প্রাধান্য পেয়েছিল।

নির্বাচনে তেরোটি রাজনৈতিক দল ও বহু নির্দলীয় প্রার্থী অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচনী কমিশন বারোটি রাজনৈতিক দলকে প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বভারতীয় দল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার দলকে রাজ্যপর্ষদে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১০৭০ জন প্রার্থী এই ভোট যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ প্রতি আসনের জন্য গড় প্রায় ৪.৫ জন। দল নিরক্ষর প্রভাব বিস্তার ছয়শ এগারো জন প্রার্থী নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সারণী-১

নির্বাচনী ফলাফলের সারাংশ-২

দল	প্রার্থী সংখ্যা	আসনলাভ	প্রাপ্ত বৈধ ভোট	শতাংশ	প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট
১। কংগ্রেস	২৩৬	১৫০	২২৭১০০	৩২.৬	১২৬১৬
২। কমুনিষ্ট	৮৭	২৯	৮১৪৫২	১০.৬	২৩৬৪
৩। ফরওয়ার্ড ব্লক (ফইকর)	৩২	২	১০৭০৫	১.৪	৩০৭২
৪। ফরওয়ার্ড ব্লক (মাকিই)	৪৮	১১	৩২২৪২	৫.৫	৮১৭২
৫। আর এস পি	১৩	—	৫০৮২৭	৭	৩২১০
৬। এস ইউ সি	১	১	১৪২৪৪	২	১৪২৪৪
৭। আর সি পি আই	১০	—	৪৫২০৫	৬	৩৪৭৭
৮। জনসংঘ	৮৫	৯	৪১৪৪৭	৫.৫	৪৮৮৮
৯। হিন্দু মহাসভা	৩০	৪	১৬০০২	২.২	৫১২৪
১০। কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি	১২৯	১৫	৬৬১৪৫	৮.৭	৫১৭২
১১। সোসালিস্ট	৬২	—	২১৪৭৫২	২.৭	৩৪০২
১২। বলশেভিক	৯	—	২০২৮০	৩	২২৫৩
১৩। রায়বাজা পরিষদ	১৩	—	৬০০৪	১	৫০০
১৪। নির্দল	৬১১	১৭	১৬০৫২৬৮	২১.৮	২৭৬৮
মোট	১৩৭২	২৩৮	৭৫২৬০৮৮	১০০.০	৫৪৮২

নির্বাচনী ফলাফল

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ৭৫.২৬.১৫ জন বৈধ ভাবে নিজেদের ভোট দানের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। শতাংশের হিসাবে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২.৫। এই সংখ্যা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। রাজনৈতিক দলগুলির জনসাধারণকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা জনসাধারণের ভিতর নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হবেন। একমাত্র কংগ্রেস দলই রাজ্যের দুশো ছত্রিশটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেড়শটি আসনে জয়লাভ করেন। নিম্ন-

স্বেচ্ছা কংগ্রেস দলই রাজ্যের সর্বত্র জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক শক্তিতে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নির্বাচন যতই পক্ষপাত-শূন্য হক না কেন শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকা এই দলের পক্ষে কিছু সুবিধাজনক হয়েছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির পরিচয় তেমন ব্যাপক ছিল না, তা নির্বাচনী ফলের দিকে তাকালেই প্রমাণ হয়। শুধু আসন লাভের পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যাও তেমন প্রচুর ছিল না। কংগ্রেস দল মোট ৩১.৬১ ভোটের বিনিময়ে তেরটি শতাংশ আসন লাভ করেন। রাজ্যের প্রায় ষাট শতাংশ লোক কংগ্রেস বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পর বিরোধিতার পূর্ণ সুযোগ শাসক কংগ্রেস দল লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

প্রায় সব জেলাতেই কংগ্রেস দল তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুরে এই দল শতকরা একশাট আসনই লাভ করেন। মর্শিদাবাদ, মালদহ, কলিকাতা, নদীয়া, বর্ধমান জেলাগুলিতে এই দল নিরক্ষর প্রভাব বিস্তার করেন। বশুত একমাত্র দাঙ্গলিং জেলা ছাড়া এই দল সারা রাজ্যে

নিজেদের প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতীতিষ্ঠিত করেছিলেন। কংগ্রেস দলের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। নির্বাচনী প্রচারণার কার্যে অংশগ্রহণ করতে এই দল অতি অল্প সময় পেয়েছিলেন। সুতরাং অত্যন্ত সূক্ষতার সঙ্গে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যেও এই দলের নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে হয়। কংগ্রেস সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি কমিউনিস্ট বিরোধিতা প্রচারণার একটি প্রধান অঙ্গ করেছিলেন। হয়ত এই ধারাই কমিউনিস্টদের পক্ষে লাভে

বর হয়ে গেল। কেননা জনসাধারণের কাছে তারাই একমাত্র যোগ্য বামপন্থী দল বলে পরিগণিত হলে। এই দল সাতাশটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট উনত্রিশটি আসন লাভ করেন। প্রাপ্ত বৈধ ভোটের ভিত্তিতেও এই দল অন্যান্য কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী ভোট পান। এদের ভাগে মোট ৮,১৪,৬৫১ টি ভোট জমা হয়। যা শতাংশের হিসাবে দাঁড়ায় ১০.১ প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট বেসানে শাসক কংগ্রেস দল ১২,৬১৬ টি পান সেখানে কমিউনিস্ট দল ১০৬৪ টি পেয়েছেন।

তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি। এই দল ১২১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পনেরোটি আসন লাভ করেন এবং ৮.১ শতাংশের জনসমর্থন পান। প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট পান ৫১৭৪টি। এই সংখ্যা সমগ্র রাজ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট ৫৪৮২ অপেক্ষা কিছু কম। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে এই দল নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি অনুপাতে অনেক বেশী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

এই দল অপেক্ষা মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক দল কিছু কম আসনে পেলেও প্রায় ৫.২ শতাংশের জনসমর্থন লাভ করেছিলেন, প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট প্রাপ্তির হিসাবে দেখা যায় এই দল ৮১৭১ টি লাভ করেন।

এস ইউ সি একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি আসনই পান কিন্তু অন্য কয়েকটি বামপন্থী দল-যথা আর এস পি, আর সি পি আই, বলশেভিক, সোসালিস্ট প্রভৃতি দলগুলি একটিও আসন লাভ করেন নি।

রাজ্যের প্রতি দশজন ভোটারের মধ্যে প্রায় চার জন কংগ্রেস, এক জনের কিছু বেশী কমিউনিস্ট দলের সমর্থক, প্রায় এক জন কৃষক মজদুর প্রজা দলের, পোনে এক জনের মত জনসংঘ হিন্দুমহাসভা দলের সমর্থক। আর এস পি, আর সি পি আই উভয় পন্থী ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ সি মিলিয়ে এক জনের কিছু কম লোকের সমর্থন পান। বাকী সব অন্যান্য দলের বা নির্দল সমর্থক।

প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস শাসক।

কংগ্রেস দল একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বেশীর ভাগ কেন্দ্রেই বহুদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। দুশো আটত্রিশটি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র সাতটি কেন্দ্রে দ্বিবিধীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নীচের সারণীতে কেন্দ্রপ্রতি প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস দলের সাফল্য এবং সাফল্যের হার দেখান হয়েছে। লক্ষ্যীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কংগ্রেসের সাফল্য সহজতর হয়।

(শেখাংশ জটন পুস্তক)

মেসের বৈঠক থেকে ছাড়া পেয়ে দেবনাথকে নিয়ে যখন নাম-লাম, অন্যমনস্ক দেবনাথ তখন গুনগুনিতে সুর ভাঁজছিল : পশ্চিম ঢেউ রে... আমার শূন্য হৃদয় পশ্চিম নিয়ে যায়, যায় রে।

শীতের সম্মুখী এমনিতেই বৃকে জমাট ভাঙি বেননা নিয়ে উপস্থিত হয়, তার ওপর পশ্চিম বাতাসের গন্ধ বইছে। কেমন উদাস আর অবসন্ন লাগছিল। অবসন্নতা অবশ্য অসহায় মানুসেরই ভূষণ। জানিনা, একেই পুণ্ডিত জনে হতাশা বলেন কি না। তবে হতাশা সব সময়ই অবসাদকে হাতে ধরে নিয়ে আসে। হতাশা দর্পণ করে এবং দর্পণ মানুসকে মস্ত বড় সর্বনাশা শয়তানের পায়ে আত্মহীন করতে বাধ্য করে। হতাশার পূজারী তো শূন্য শয়তানেরই গোলাম। হতাশা এগিয়ে দেয় না, পিছদ টানে। হতাশা মানুস নিজের মনের ব্যাধি জনে জনে সংক্রমণ করায়। কিন্তু দেবনাথ তো সে জ্বালের জীব নয়। হতাশার আকর্ষণ হিম বনে গিয়ে নিজেকে নিজের মধ্যে মৃত ঘোষণা করার বিলাসিতা তার জন্য নয়। সে আ-তারুণ্য সংগ্রামী। তার হাট-হৃদয় জ্বালি আমি। পশ্চিমের কল-কাতায় তার প্রচণ্ড সাফারিং অথবা নিগ্রহ, তারপর সেই অবস্থা থেকে সন্তরের দশকে তার প্রতিষ্ঠা, এ সবার পেছনে যে পুরুষের কাজ করে এসেছে, আমি সে সমস্তকে সর্বস্বত্ব লক্ষ্য করে এসেছি। সে সব কথা সময় মত বলব। এই মূহুর্তে দেবনাথের গলায় গানের সুর শুনে বাস্তবিক অবাক হয়েছি। তাকে কখনো গান গাইতে শুনিনি। হয়ত সে ফুরসৎ-ও সে যায়নি কোনদিন। তাই অবাক হয়েছি।

প্রশ্ন করলাম : কি রে, গান আসছে? কলকাতা তথা পশ্চিম-বঙ্গের দুর্গতির ওপর এতক্ষণ তো মেসে টেবিল ফাটিয়ে আলোচনা করে এলি। এবার কি আর পিচজন মস্তিকাসমুত্তের (সনস অব দ্য স্ট্রলের) মতো, গগনবিদারক বিলাপ শুরুর করবি? কিন্তু সেটা তো তোকে একেবারেই মানাবে না। আমরা সৃষ্টি করতে ভুলে গেছি, বারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের বরং বাধাই দিলে থাকি, বিলাপেই বিশেষ তুষ্ট আমরা। কিন্তু তুই তো নিত্য সৃষ্টির মধ্যেই বেঁচে আছিস, অন্তত ছিলি। জীবনের প্রত্যেক মূহুর্তকে নিহিত করে নিজেকে উত্তরোত্তর শূন্য গড়েই চলেছিস। তবে হঠাৎ করুণ রাগিনী কেন পুরুষ কণ্ঠে?"

দেবনাথ আমার দিকে তাকালো। আমার অনর্গল বক্তব্য যেন থমকে হজম করার চেষ্টা করল। তারপর তার স্বভাব বিরুদ্ধ ম্লান হেসে বললে, "আমি নদের ছেলে। প্রেমের মাটিতে আমার জন্ম।" যেন নিজেকে বাঙ্গা করার জন্যই মর্চকি হেসে বলল, "কক-নগর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায় রে, আহা প্রেমের বন্যার রে!"

এই কলকাতায়

বললাম, "এই কি আমার প্রশ্নের উত্তর হল?"

আমাকে আমল না দিয়ে দেবনাথ বললে, "আমি পশ্চিম ঢেউ দেখিনি, শুনোছি। পশ্চিমপারে বাই নি, কিন্তু ওপারের মানুষের মাতৃ-ভক্তির নতুন নতুন সংবাদ রোজ সংবাদপত্রে দেখতে পাই। করুণ রাগিনী নয়, ইনসপিরেশন, পশ্চিমপারের ভায়েরা আমার প্রেরণা দেয়।

প্রতিদিন অগাধ বিকৃত্য আমি বখন মনে করি, আমি মৃত, আমার সর্বাঙ্গ থেকে গলিত শবের পচা গন্ধ বের হচ্ছে; আমি বাংলা মায়ের একটা ঘোঁরা সন্তান; আমি আত্ম-বিক্রীত, প্রলুপ্ত, ফসদীবাঙ্গ, বদ-মায়ের, তখন একমাত্র সান্ত্বনা, আমি আমার ভায়ের বীরত্বের কাহিনী শুনতে পাই। সে আমার চির দুঃখিনী মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দেওয়ার জন্য যেন প্রতি-শ্রুতিবদ্ধ। বেরনেট মিলিটারির চোখ রাঙানী তাকে এতোটুকু হত্যাযজ্ঞ করতে পারেনি। সে তার ভাষা নিয়ে লড়েছে। মাতৃভাষাকে মর্ষাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে লড়েছে অন্যায় শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে। দাবি করেছে, মায়ের ওপর খবরদারি সহি না। কিন্তু আমি কী, আমি কী রে। আমার বিষবা মায়ের সম্পত্তি ত্রোক হয়ে যাচ্ছে। একদিন নিঃসম্বল চাষীর জমিতে জমিদার যেমন ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘুঘু চাড়িয়ে দিত, কল-কাতায় তেমনি ঘুঘুর চাষ হচ্ছে। অথচ ঐ কলকাতাই তো ভরসা।

পশ্চিম অন্য পার থেকে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে উৎখাত মানুস এসে বন কেটে গ্রেটার ক্যালকাটা তৈরী করল বিশ বছর ধরে, আর বিশ শাল বাদে শুনছি, ফারাক্কা ফাঁলেই কলকাতার গলায় ফাঁস। পশ্চিমটা সি এম ডি এ বসিয়ে আর কী এমন পাঁচ কড়া উৎসাহ হবে, যদি ফারাক্কার ফাঁকা আওরাজ কাজে না গজায়? যদি সুদূর পরিকল্পনা এবং টাকা না জোটে? এই সব দেশে হতাশা আসে বৈ কি। তবে তুই যে হতাশার বিলাস বললি, ঐ ধূপা কাঁড়টা করতে পারলে কপালে হয়ত কিছু নগদ বিদায় জুটতে পারে। কিন্তু পারলাম না। ওটা জল্লাদের কাজ। দেশী জল্লাদে একদিন বাংলার বহু তরুণ শূন্য গলায় ইংরেজের ফাঁস পরিয়ে আপন সংসারের অম্ব-কণ্ঠ ঘুচিয়েছিল। আমি বরং মোটরে না চেপে পায়ে হাঁটব, মদে না ডুবে জলেই তৃষ্ণা মেটাব। না, হতাশা বিলাস করে আমার সমর্থ ভাইবোনকে অক্ষম বানাতে পারব না। তবে হ্যাঁ, হতাশা হয়ে পড়ি। বড় দরুণেই হতাশা হয়ে পড়ি। এমন কি কদিন আগেই ডায়রিজে লিখেছি :

বেনের হাতে দিয়া আমার সন্তান কইলকাতা,

চল রে মন, কদম বনেই বাই। বৈকুণ্ঠী লো, ঢাইক্যা দিও পোড়া বদনখানি।

মুন্নে আমার কুক্কথা, অন্য কথা নাই। তুমুও রাখা, আমুও রাখা, বল কোথা কুসু শূইজ্যা পাই?

আমি সেই কলেক্স বন্ধু দেবনাথকেই আবার দেখছি যেন। অতীতের দিনগুলো ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দেবনাথকে ভালো লাগছে। ভালো লাগছে, কারণ, শূন্য তো কথাই নয়, অনেকেই যেমন "কলিকাতা বাংলাদেশ মরিল", এই বলে মিনিট কয়েক মড়াকামা কেঁদে নিরোর মতো কাঁচের টিউবে অশ্রু সংগ্রহ করে, দেবনাথের উত্তেজনা তেমন নয়। কথা বলছে যেন তার সমস্ত অন্তঃকরণ। আর তাই তার কথা অতলাস্ত, গভীর, সুস্পষ্ট কিন্তু আবেগবশত কিছুটা খাপছাড়া।

"কিন্তু 'মুন্নে কুক্কথা' মানে," প্রশ্ন করলাম আমি।

দেবনাথ হাসল, "কুল-মান-লাজ এবং নিজের সর্বস্ব কুক্ষে সমর্পণ করে শ্রীমতী রাখা নিঃস্ব। আমরা উভয়জনেই শ্রীরাখা সর্বস্ব সম-র্পিত, স্বাস্থ্য বলতে কানাকড়িটো নেই। পোড়াবদন দেখাতে লজ্জা, কিন্তু মুখ পুড়িয়েই সুখ। এই টুকু সাংকেতিকতা যদি না বুঝিস, কলম পেয়া ছেড়ে দে শালা।"

বহুত দেবনাথের সাংকেতিক বাঙ্গা ধরতে না পারার জন্য মৃদা-বয়স অপরাধীর মতো করুণ করে বললাম, "ওহো! পবিত্র গাভী-শাসিত খেন্দুন্দকে রাখা, সাজালে বুঝতে একটু কষ্ট হয় না কি?"

দেবনাথ এবার সত্যিই রেগে গিয়ে বললে, "তুমি শালা গোম্বায় যাও। তুই কি নিজেকে পুরুষ মনে করিস না কি? প্রকৃত পুরুষে দীর্ঘকাল কবে কোথায় শোষিত হয়েছে প্রেমগদগদ অবস্থায়। কে যেন বলেছেন, বাংলা দেশটা স্বতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের দেশ? ঠিকই বলেছেন। দেখলাম, রাখা-লিং প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকের সম্পাদকীয় গুলোও লুপ্ত নিয়েছে কথাটা। তাহলেই বোঝো, সত্যি কথা সবার পেটেই ঢুকে ঢুক করছে। পাছে কুসু চটে যান, তাই সব চুপ। কথাটা অন্যের কোটেপনে সভয়ে ব্যক্ত করা হচ্ছে, ঘোমটা টানা সতীর পতি নিন্দার মতো। দেবতা নিজেও যে দুর্বাবহারের কথাটা না জানেন এমন নয়। এই গতকালও বাঙা-লাকে পেঞ্চনদন্ডে যারা পিষেছে, আজও যারা শূন্যছে, সুযোগ পেলে রক্তহীন করেই ছেড়ে দেবে, তারাও দেখছি শোষিতের বেদনায় এদেশের মাটিতে এসে নজরাণা কুড়োবার সময় মড়াকামা-কেঁদে যাচ্ছে। প্রেমের গাঁজলা দেশী মদের মতো ভূষণা ছুঁয়ে দিচ্ছে।

হাঁড়িয়া খাও এবং মহাজন

সঙ্গে হরিকীর্তন কর, বহুং আছা। কিন্তু খবরদার, সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন তুমি, নিজস্ব কথটি উচ্চারণ করে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলোনা। তাহলেই 'প'-এ 'র' ফলা আকার দেশীয় বনে বাবে তুমি। ভারি আশ্চর্য লাগে না এই সব ব্যাপার? বিচিত্র দেশস্যা বিচিত্র ব্যাপারম। এই সব আশ্চর্য ব্যাপার আছে বলেই এদেশে এতো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। তুমি নিজে যদি সাবালক না হও, পাড়াপড়শির কী?"

তুমি বলবে, প্রাণনাথ, মল কোরো না। জীবন যৌবন, দেহ-সর্বস্ব সবই তো দিলেছি, এখন আমার এ দেহখানি তুলে ধর। তা ধরবে বৈ কি। বতটুকু চটকালে প্রাণনাথের মনোভূমি হবে ঠিক ততটুকুই তুলে ধরবে। তবে তুমি যে তার কোলেই বসে থাকবে সারা-ক্ষণ, এমনটি সমর্পিত প্রাণার ভাগ্যে ঘটে না। তুমি বলবে, প্রাণনাথ, তোমার সঙ্গে সাধারণ মিলনে আমি বিলীন হয়ে যেতে চাই। রুচ হওনা। সব নিয়ে যাও, প্রতিদানে দিয়ে যাও রক্ষাবক্ষণের প্রতি-শ্রুতি আর আশ্রয়না রুটি। আমি রাখাভাবে মজ্জা প্রাণেশ। প্রেমের ওদায়ে উলঙ্গ হয়েছি। তুমি আমায়, যেমতি শূন্য তেমতি করহ গ্রহণ। কথাটি কব না আর, না না, বলিও না প্রচু মোরে ঈর্ষা-কাতরা নারী। এমন অপবাদে মহা-পাতক হয়। আমি, আনবাড়ি-বাওয়া স্বামীর অক্ষশায়িনী সহ-মরণগামিনী নারীর পবিত্র ইতি-হাসের উত্তরাধিকারিনী। নারীর শরীতে হেন অপবাদ। বাঁচিতে সাহস নাই সুন্দর ভুবনে। বিলাইয়া দিব সব মহামিলনের সাগর তীরে।"

আমি আর সহ্য করতে পার-লাম না, বললাম, "তুই ছোট গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিস দেবনাথ। ছিঃ! জানিস, বসুধৈব কুটুম্বকমু। ভূমৈব সুখম। জানিস আত্মত্যাগের মধ্যেই আত্মসম্মতি। মানুষের দেশ কাল গন্ডী নেই। মানুষের পরি-চয় দুটো, শোষক আর শোষিত।"

দেবনাথ হো হো করে হেসে উঠে বললে, "আমার মাথায় টুপী নেই। থাকলে সেটা মাথা থেকে খুলে বিদেশী কেতার কুঁজো হয়ে তোর হাটতে টুপীর বাতাস করে অভিনন্দন জানাতাম। কিন্তু তোর এই বড় বড় চিন্তাকে জ্বিয়ে রাখতে হলে প্রথম শর্ত হচ্ছে তোকে আগে বেঁচে থাকতে হবে। তুই যদি নিমতলা কেওড়াভাঙ্গা কিছু ছাই আর আগুনের সঙ্গে ঘোম-পথে মিলিয়েই গেছি তো তোর বোল বাজাবে কে? বেঁচে থেকে তোর চিন্তাকে বিকিয়ে দেওয়াও যা, আর চিন্তার খাতিরে আত্মহনন করাও তাই। প্রথম, তোকে বাঁচতে হবে। তোর সংস্কৃতি, চিন্তার মহান ঐতিহ্য ইত্যাদিকে বাঁচাতে হলে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সেই চিন্তার জন্মভূমি এই কলকাতা এই বঙ্গদেশকে। বেদখল, জবর দখল, শোষণ, অপশাসন, ফাটকাবাঙ্গ,

ফকিরকারি, কোরাপসন, কোরিয়া-রিজম সব রুশতে হবে। কিন্তু রাখা ভাবে ভাবিত হলে তো আর এতো এতো মহৎ কাজ করা সম্ভব হবে না বাপদ। তাহলে চল, গুপী গাইন বাঘা বাইন গাইতে গাইতে বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে পড়ি। গাই :

বেনের হাতে দিয়া আমার সন্তান কইলকাতা, চল রে মন কদমবনে বাই ॥ বাজাই :

তেরে কেটে তাক, বাঙলা নিপাত থাক। সকলে ভাগ পাক, (শূন্য) তোরটা তোলা থাক। ভাগ্যে যদি থাকে জ্যান্ত পাবি মাকে; নইলে বড়ি মরুক যাচ্ছেতাই করুক।"

আশ্চর্য! সেই দেবনাথ কি এই দেবনাথ। ও এসব বলছে কি? অথচ ও যা বলছে, সে তো আমা-রই মনের কথা।

দেবনাথ ম্লান হেসে বললে, "বাইরে ঘুরে-এসে বেদনাটা বেড়েছে রে। কুন্সোর ব্যাঙ কি বুঝতে পারে তার গর্তে অন্ধকার কত ঘন। তোদের ঐ জনপ্রিয় লেখক 'শংকর'র বইটার কথা দিচ্ছি না মেসে বসে? তা আমেরিকায় গিয়েও তাঁর মনটা কেবলই কেঁদেছে। বাঙলার জন্যই কেঁদেছে। ঐ লেখকের সব লেখা নয়, তবে ঐ লেখা আমার মূগ্ধ করেছে। এই কামা তোদের মনেও জমে আছে বলেই না তার ঐ বইটা 'এপার বাংলা' ওপার বাংলা' এমন হাকড়ে পড়ছি। তাই যদি হবে, তবে আর নিজের সঙ্গে ন্যাকামো কেন? কান্ডিতে হয় চৌচিরে কান্ডি। বুক হালকা করে নে। কলবধুর মতো ঘোমটার পেছনে ফাঁশি ফাঁশি করা কেন? সব চেয়ে ভালো, চিহ্নকান্ডিনে স্বভা-বটা ত্যাগ করে মরদের মতো মনের কথা প্রকাশ করে বল। পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ হলে নিজের দেহটার কলকজাই শূন্য বিগড়ে বাবে, লাভের মধ্যে ঐটুকু। দুনিয়ার কারও তাতে কিছা এসে যাবে না।"

আমি বললাম, "কিন্তু....." থামিয়ে দিয়ে দেবনাথ বললে, "অধিক 'কিন্তু' বয়স বাড়ায়। অধিক 'কিন্তু' বার্ষিকের লক্ষণ। অধিক 'কিন্তু' সূত্ররং দোষাবহ।"

বীরেন্দ্র মিত্র

Free I Free II Free III

ধবল বা শুভ

আমাদের বিখ্যাত "দাগ সাফা" ১৯২৫ সাল থেকে রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে আসছে। মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়।

বিনামূল্যে এক টিশলি দেওয়া হয়।

WESTERN INDIA CO (V.N.) P. P.O. KATRI SARAI (GAYA)

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

সারণী-২	প্রতিদলের সংখ্যা	অনুযায়ী কংগ্রেস সাফল্য-৫২
প্রতিদলের সংখ্যা	কংগ্রেস দলের	সাফল্যের হার
১	১	১০০০
২	৮	৩৭.৫
৩	৩২	৬৫.৬
৪	৪৭	৫২.৬
৫	৩৭	৫৬.৮
৬	৩৮	৭০.৭
৭	২৫	৬০.০
৮	১৭	৭৬.৫
৯	১৪	৭৮.৬
১০	৫	৮০.০
১১	৬	৩০.৩
১২	২	৬৬.৫
১৩	২	—
১৪	২	—
১৫	—	—
১৬	১	১০০০

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের পরমা মার্চ থেকে প্রায় এক মাস ধরে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৬ সালে লোকসভায় ভাষাভিত্তিক সীমানা পুনর্গঠন বিল পাশ হয়। এর ফলশ্রুতি হিসাবে বিহারের মানকুম সিংহুম জেলার কিসদংশ বাংলা দেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। অন্তর্ভুক্ত এই জেলার নাম হয় পূর্বুলিয়া। এ ছাড়া ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর স্বাধীনতা লাভ করে। এই অংশটি হুগলী জেলার অংশ হওয়ায় হুগলী জেলার কেন্দ্রগুলি পুনর্বিভাজনের প্রয়োজন হয়।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

গত পাঁচ বছর বিভিন্ন দাবী-দাওয়ায় ভিত্তিতে রাজ্যের বামপন্থী দলগুলি মূলত কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে প্রভুত আন্দোলন করেন। ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন তার অন্যতম। তারপর বাংলা বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন। সাধারণ নির্বাচনের কিছু পূর্বেই উত্তর-পূর্ব কলকাতার লোকসভার উপনির্বাচনটি এই উপলক্ষে বিশেষ সরগরম হয়ে ওঠে। নির্বাচনের ফল সরকারের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যায়।

এই সব আন্দোলনের মাধ্যমে বামপন্থী দলগুলির অনেকে পরস্পরের কাছে আসেন। বামপন্থী আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারেও অনেক দলের কাছে একটি মোর্চা গঠনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। অনেক দলই একথা উপলব্ধি করতে পারেন যে, একক দল হিসাবে সংগ্রাম করে কংগ্রেস দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে অসম্ভব। তাই বামপন্থী দলগুলি সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য একত্র হন। যদিও কোন সার্বিক বামপন্থী একা সম্ভব হয় নি, তবুও প্রধান বামপন্থী দল-

গুলি কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতিতে একটি মোর্চায় আবদ্ধ হন। এই মোর্চার নাম হয় সংযুক্ত বামপন্থী নির্বাচনী কমিটি। এই কমিটিতে কমিউনিস্ট দল ছাড়া অন্যান্য হলেন স্বাক্ষরকারী ফরওয়ার্ড ব্লক, ফরওয়ার্ড ব্লক, পি এস পি এবং আর এস পি। সরকারী বিবরণে অবশ্য ফরওয়ার্ড ব্লক দলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে নতুন দল পি এস পি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ প্রয়োজন। গত নির্বাচনে কৃষক মজদুর প্রজা-পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক (রুইকর) ও সোসালিস্ট দলগুলি কোনও এক সম্মেলনে একটি দল হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পশ্চিম বাংলার এই দল পূর্বতন কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির প্রধান শাখা।

এস ইউ সির নেতৃত্বে ও ওয়ার্কার্স পার্টির সহযোগিতায় আর একটি বামপন্থী জোট হয়। এর নাম হয় সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট। বস্তুতঃ এই ফ্রন্টের অংশীদারগণ বাংলা দেশের রাজনীতিতে তেমন প্রভাবশালী না হলেও স্থানীয় ভিত্তিতে এদের কিছু প্রভাব ছিল।

অপর দিকে জনসংঘ হিন্দু-মহাসভা ও আরও কতকগুলি অনুপ্রবেশা দল মিলিত হয়ে আর একটি জোটে আবদ্ধ হন।

নির্বাচনী সংগ্রামে এই তিনটি জোট তাঁদের নিজস্ব কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেস দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার সংকল্পে অবতীর্ণ হন।

নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস দলের বক্তব্য ছিল, রাজ্যের নানা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, শিক্ষার উন্নতি এবং জাতীয় ঐক্য, অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির ভিতরকার অতৈক্য, কমিউনিস্টদের ধ্বংসাত্মক নীতি, ধর্মবিদ্বেষতা ও বিদেশের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট প্রভাবিত মোর্চা যে বক্তব্য জনসাধারণের কাছে রেখেছিলেন তাতে কংগ্রেস দলের রাজত্বকালে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার প্রচণ্ড দুর্নীতি, বেকারী বৃদ্ধি, উৎপাদনের অসম বন্টন, “ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব” ইত্যাদি। এই ফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারলে নানা উন্নয়নমূলক গঠনসূচীর পরিকল্পনা রূপদান করবেন। তাছাড়া কিছু আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গও ছিল—যথা জোট নিরপেক্ষতা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংগে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা, কমনওয়েলথ ত্যাগ ইত্যাদি।

অন্য বামজোটের পক্ষ থেকেও কিছু ইতর বিশেষ করে মোটামুটি এই বক্তব্যই জনসাধারণের কাছে রাখা হয়েছিল।

কেন্দ্র পুনর্বিভাজন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পূর্বুলিয়া জেলা পশ্চিম বাংলার সংগে যুক্ত হয়। ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ায় এই অংশটি হুগলী জেলার সংগে সংযুক্ত হয়। দেশ-বিভাগের পর বহু উল্লেখ্য এই রাজ্যে চলে আসেন। এছাড়া জনসংখ্যার বৃদ্ধি হেতু নতুন নতুন জনপদেরও সৃষ্টি হয়। ফলে আবার নতুন করে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির পুনর্বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। সারা পশ্চিম বাংলার জন্য ২৫২টি কেন্দ্র নির্দিষ্ট হয়। মোট ২,১১,২০,৭১৪ জন ভোটার তালিকাভুক্ত হন (একটি আসনের হিসাব এর মধ্যে নেই)। প্রায় প্রত্যেক জেলার জন্যই কিছু কিছু আসন বৃদ্ধি পায়।

নির্বাচনী ফলাফল

এই নির্বাচনে ২,১১,২০,৭১৪ জন ভোটারের মধ্যে ১,০৪,১০,৭৩৭ জন বৈধ ভাবে তাদের ভোট ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। শতাংশের হিসাবে এই সংখ্যা ৪৭.৭। এই সংখ্যা গত নির্বাচন অপেক্ষা মোটামুটি বেশীই বলা চলে। এর ম্বারা প্রমাণ হয় যে, সাধারণ লোকের পার্লামেন্টারীর গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে দল একাধিটি আসনের জন্য মোট নয়শ একাধিজন জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তারমধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত নয়টি রাজনৈতিক দলের মোট পাঁচশ পঞ্চাশ জন প্রার্থী আর বাকী চারশ ছয় জন নির্দল প্রার্থী।

গত নির্বাচনের তুলনায় এবারকার নির্বাচনী ফলাফল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ গতবার কংগ্রেসের সাফল্য গ্রাম সহরে প্রায় সমভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু এবার শহরগুলো, বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলগুলিতেই বামপন্থীদের তথা কমিউনিস্ট দলের সাফল্য রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়ার একটা দৃশ্যদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

কংগ্রেস দল এবার একটি ছাড়া

সবকিটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। একটি আসনে এই দলের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

কংগ্রেস দলের ভোটপ্রাপ্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই দল গত নির্বাচন অপেক্ষা জনসমর্থন অনেক বেশী লাভ করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলির ভিতর যেমন এক সমাবর্তনের ভাব লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনি ভোটদাতাদের ভিতরও একটি সমাবর্তনের আগ্রহ বিশেষ ভাবে দেখা যায়। সেজন্যই আগের নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী ও বামপন্থী বিরোধী ভোটগুলি যেমন নির্দল প্রার্থীরা পেয়েছিলেন এবার ঠিক তেমনি হয় নি। হয় কংগ্রেস নয় বামপন্থী জোট নচেৎ নয়—এই মনোভাবই ভোটের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছিল।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কংগ্রেস আর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। দার্জিলিং জেলার অবশ্য গতবারের মতই পার্টিটি আসনের মধ্যে মাত্র একটি আসন লাভ করেন।

মালদহ হুগলীদাবাদ নদীয়ার ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয় যে এগুলি কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। বাঁকুড়া হুগলী ও মেদিনীপুরে এই দল গত নির্বাচন অপেক্ষা অনেক ভাল ফলাফল দেখিয়েছেন। পক্ষান্তরে কলকাতা, হাওড়া, চব্বিশ পরগণার শিল্পাঞ্চলগুলিতে এই দল শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়।

সারণী-৩

দল	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত বৈধ ভোট	শতাংশ	প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট
১। কংগ্রেস	২৫০	১৫১	৪৮৫৫২৪৯	৪৬.৩	১৩৪২১
২। কমিউনিস্ট	১০৬	৪৩	১৩৮৭২৭	১৮.২	১৮০০৯
৩। আর এস পি	৪	৩	৬২০৩৫	৬	১৫৫০৭
৪। এস ইউ সি	৩	২	৫০৮৫১	৫	১৩২২০
৫। ওয়ার্কার্স পার্টি	১	১	১৭৩২৬	২	১৭৩২৬
৬। ফরওয়ার্ড ব্লক (মা)	২৬	৮	৪২৫৩১৮	৪.১	১৬০৫৮
৭। পি এস পি	৬৭	২১	১০৬৩৩২	২.২	১৫৪২৬
৮। জনসংঘ	৩১	—	৩৮২২৬	০	৩১৭১
৯। হিন্দু মহাসভা	৩৭	—	২২৫১২৬	২.০	৬০৮৪
১০। নির্দল	৪০৬	১৬	১৮১৪৪৮৭	১৭.৬	৪৪৫২
মোট	২০১	২৫১	১০৪১০৭৩৭	১০০.০	১২২৬৮

তাই রাজ্যের মোট চৌদ্দটি আসন বৃদ্ধি পেলেও কংগ্রেস দল মাত্র একটি আসন বৃদ্ধি করতে পারেন। কিন্তু তবুও স্বীকার করতে হবে যে এই দল অনেক সুখ ও সংগঠিত দল হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট এই দল পান ১১৪২১, যেখানে সমগ্র রাজ্যের হিসাবে এই অঙ্ক হচ্ছে ১১২৬৮।

রাজ্যের দ্বিতীয় স্থানীয়কারী রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টিও রাজ্যের জনসাধারণের উপর তার প্রভাব আরও বৃদ্ধি করেন। বস্তুতঃ বামপন্থী আন্দোলনের ভূমিকার প্রধান নেতৃত্ব দেন এই পার্টি। এছাড়াও অন্যান্য বামপন্থী দলের সংগে মোর্চায় আসাতে বামপন্থী ভোট বিভক্ত হবার সুযোগ

বিশেষ ঘটে। গত নির্বাচন অপেক্ষা এই দল প্রায় আট শতাংশ ভোট বৃদ্ধি করেন। এবার এই দল উনিশটি আসনে বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গত নির্বাচন অপেক্ষা কুড়িটি আসন বেশী লাভ করেন।

কংগ্রেস দলের যেমন উত্তরবঙ্গ শক্ত ঘাঁটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিক তেমনি কমিউনিস্ট দলের কলকাতা হাওড়া ও চব্বিশ পরগণার শিল্পাঞ্চলগুলিতে শক্ত ঘাঁটি তৈরী হয়েছে। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট দলের কলকাতা শহরের সাফল্য অস্বত্বপূর্ণ। প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোটও এবার এই দল গতবারের প্রায় দ্বিগুণ করেন। এ দলের পক্ষে এবার এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮০০৭।

কমিউনিস্ট দলের পরই রাজ্যের দশ শতাংশের সমর্থন লাভকারী দল হচ্ছে পি এস পি। প্রথম নির্বাচনে এই দলের প্রধান কান্ড কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি প্রায় নয় শতাংশের আস্থা অর্জন করেছিলেন। এবার এই দল মোট সাত-ষাটটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একুশটি আসন লাভ করেন। কমিউনিস্ট দলের সংগে এক মোর্চার অবস্থান এই দলের পক্ষে অনেক সুবিধাজনক হয়েছিল। প্রার্থী-প্রতি বৈধ ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা তুলনা করলে দেখা যায় যে এবার এই দল প্রার্থী নির্বাচনেও যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচর দিয়েছিলেন। এবার এই দল প্রার্থী প্রতি বৈধ

নির্বাচনী ফলাফলের সারাংশ-৫৭

প্রার্থী	আসন লাভ	প্রাপ্ত বৈধ ভোট	শতাংশ	প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট
১। কংগ্রেস	১৫১	৪৮৫৫২৪৯	৪৬.৩	১৩৪২১
২। কমিউনিস্ট	৪৩	১৩৮৭২৭	১৮.২	১৮০০৯
৩। আর এস পি	৩	৬২০৩৫	৬	১৫৫০৭
৪। এস ইউ সি	২	৫০৮৫১	৫	১৩২২০
৫। ওয়ার্কার্স পার্টি	১	১৭৩২৬	২	১৭৩২৬
৬। ফরওয়ার্ড ব্লক (মা)	৮	৪২৫৩১৮	৪.১	১৬০৫৮
৭। পি এস পি	২১	১০৬৩৩২	২.২	১৫৪২৬
৮। জনসংঘ	—	৩৮২২৬	০	৩১৭১
৯। হিন্দু মহাসভা	—	২২৫১২৬	২.০	৬০৮৪
১০। নির্দল	১৬	১৮১৪৪৮৭	১৭.৬	৪৪৫২
মোট	২৫১	১০৪১০৭৩৭	১০০.০	১২২৬৮

ভোট পেয়েছেন ১৫৪২৪ বা গত নির্বাচন অপেক্ষা দশ হাজারেরও বেশী।

কমিউনিস্ট দলের মত ফরওয়ার্ড ব্লক (মা) দলেরও শিল্পাঞ্চলগুলিতে বেশ শক্ত ঘাঁটি তৈরী হয়েছে তা তাদের নির্বাচনী ফলাফলে প্রমাণিত হয়।

কমিউনিস্ট প্রভাবিত মোর্চা রাজ্যের দুশ তিনটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট একাধিটি আসন আসন লাভ করেন। এই মোর্চার প্রতি প্রার্থী গড়ে ১৬৮১০ টির মত ভোট লাভ করেন। এই সংখ্যা কংগ্রেস দলের প্রতি প্রার্থী যে ভোট পেয়েছেন তার চেয়ে কিছু কম। এর ম্বারা প্রমাণ হয় যে এবার এই মোর্চা যে বিকল্প সরকারের (শেখাংশ নবম পৃষ্ঠার)

দিল্লীতে খুনে ওয়েস্টমোরল্যান্ডের ফোজী সম্বর্ধনা

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

নয়া দিল্লীতে (মার্কিন প্রান্ত সেনাপতি ও বর্তমানে অধ্যাপক মিঃ টেলারের ভাষণ) প্রধান বক্তাপরাধী জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ডকে গাভি অফ অনার দেওয়া হল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভাষ্যের কোন "বাম-পন্থী" পার্টি প্রতিবাদসূচক জনবিক্ষোভের পথ মাড়ানোর দরকার বোধ করেনি।

ভিয়েতনামের সং মাই ও-মাই লাই গ্রাম দুটির জীবন কুটির-বাসী বেসামরিক চাষীদের ঠান্ডা মাথায় দলে দলে বার করে এনে গুলি করে মারার খবর ফাঁস হয়ে যায় মাসকতক আগে। পেটোগন (সমর দপ্তর) ও ওয়াশিংটনের বড়-কর্তা জম্মাদরা সেন্যনা বেশ একটু বিব্রত বোধ করে ঘটকদের গ্রেপ্তার করতে ও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বাধ্য হন, উচিত শাস্তি দেবার জন্য 'নয়, বিশ্ব-জনমতকে ধাম্পা দেবার জন্য। বিচারটা এক প্রহসন-নাটক মাত্র বার শেষ বর-নিকা এখনো পড়েনি। কিন্তু এরই মধ্যে কিছুর আসামীকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। এই খালাস পাওয়া নরঘাতকদের মধ্যে লেঃ কর্ণেল গাভিন্ ও গুইন্ এবং মেজর ক্যালহাউন ও ওয়াটকে অন্যতম। সামরিক ট্রাইবিউন্যাল নাকি এদের অপরাধের কোন 'নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পায়নি।' লেঃ ক্যালি-যে নিজ হাতে খেলাচ্ছিলে সং মাই-এ পাই-কালীভাবে একশ তুড়ি জনকে খুন করে তার বিচারের পাসা এখনো সাঙ্গা হয়নি। বিচারের এই প্রহসন চলছে ফোর্ট বেনিং-এ, আজ সাত মাস হয়ে গেল। তারিখের পর তারিখ পড়ছে, রায় কিছতেই বার হচ্ছে না।

আর সহ হচ্ছে না

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আর সহ হচ্ছে না—
কিছতেই সইতে পারছি না
এই প্রাত্যহিক, কুৎসিত লাগসা
ওই দেখুন
হাতে হাতে কুপতাকা
একদম এই মূহুর্তে চলে যান
তা নইলে মূড়ো ঝাঁটা
তা নইলে বিক্ষোভ!

আপনাদের দাঁতের কাছে
চোঁগস কিংবা নাদিরশা তো
নিছক ছারপোকা
অতএব বাংলাদেশ রক্তাশ্রুত
চিতাশয্যা নিহত কলকাতা
আর সহ হচ্ছে না—
তবে কোনদিন মানুষের পোষাকে
এলে
যথাযোগ্য স্বাগত পাবেন
মনুষ্যের হৃদয়ে এলে
আমাদের হৃদয় পাবেন।

মার্কিন কাজীদের সৈনিকের কুত্যা-পারা এই আলালের ঘরের দুলালদের কাছে এখনো গোটা ব্যাপারটা নাকি "ঘোলাটে"। কিন্তু বিশ্ববাসীর চোখে সেটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই। ধরুন বেকসুর খালাস সার্জেণ্ট মিচেলের কথা। সে নিহতদের শব থেকে মুণ্ড কেটে নিয়ে নিজের কোলায় ভরে সবে পড়ত একথা কে না জানে। সার্জেণ্ট হুটোর বিচার হয় ফোর্ট ম্যাকফার্সনের এজলাসে শব্দক গতিতে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় এই সাক্ষ্যই দিয়ে যে সে, "প্রথম উদ্ভূত বড় কর্তার হুকুম তামিল করেছিল মাত্র।" কথাটা অবশ্য পুরো মিথ্যা নয়, অর্ধসত্য। নাৎসী দস্যুরাও সোভিয়েতে যে নৃশংস নরঘাতী চরিত্রের পরিচয় দেয় তারাও খুন-খারাবি করেছিল হিম্মলায়ের অধী-নন্দ অফিসারদের হুকুমে। সেই জন্য নরমবেগে হিম্মলায় সমেত যে সব যুদ্ধাপরাধীর বিচার হয় তারা সবাই যুদ্ধাপরাধের প্রধান পাণ্ডা হিসাবে শাস্তি পায়। সাধারণ সৈনিকদের সেখানকার কাঠ-গড়ায় দাঁড় করানো হয়নি তবে তাদের মধ্যেও বাছাই করে অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ড দান করা হয় সোভিয়েতে ও পূর্বে ইউরোপে। তাছাড়া যুদ্ধের মধ্যেও গেরিলারা বহু নাৎসী নরদানবকে আচমকা হানা দিয়ে বন্দী করে হাড়িকাঠে বলি দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের ময়-দানী কাঠগড়ায় বিচারের পর। কিন্তু যুদ্ধাপরাধের প্রধান দায়িত্ব তাদের ছিল না, ছিল হিম্মলারী সেনানীদের। হালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য টেলর—যিনি নরমবেগে বিচারে যুদ্ধ-রাষ্ট্রের প্রধান কৌশলী ছিলেন—ঘোষণা করেছেন :—

"ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রান্তন সর্বাধিনায়ক ও বর্তমান মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ডের সম্মুখেই ভিয়েতনামে এই সব নরমেধের পালা চলে আসছে। সেইজন্য সব-চেয়ে কঠোর শাস্তি তাঁরই প্রাপ্য। অকুণ্ঠে যারা নিরপরাধ মানুষকে গুলি ছুঁড়ে হত্যা করার জন্য দায়ী শব্দ তারাই নয়, যারা গুলি চালানোর হুকুম দেয়, তাদের দায়িত্বও কোন অংশে কম নয়। সেই জন্য প্রধান আসামী হিসাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত সকলের আগে জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ডকেই।"

নিউইয়র্ক পোস্ট পত্রিকার এক ভাষ্যকার লিখছেন, "মার্কিন ও বিশ্বজনমতের চাপে যারা ফোর্ট বেনিং ও ফোর্ট ম্যাকফার্সনে কাজীর বিচারের অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছেন, কোন রকম ছলনা ও প্রতারণা নিষ্ফল হওয়ার তাঁরা যাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন তারা নেহাৎই চূর্ণোপদ্রুতি সৈনিক,

হুকুমের চাকর মাত্র। সার্জেণ্ট হুটো অ্যান্ড কম্প্যানিকে ব্যবহার করা হচ্ছে স্রেফ শিখড়ী হিসাবে। একথা কে না জানে যে সম্মাই-এর নরঘাতীদের অভিনয়ন জানান ভিয়েতনামে মার্কিন পল্টনের প্রান্তন সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড।"

কিন্তু যুদ্ধরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধী পাণ্ডাদের আসল মতলব অনেক গভীর—তারা গভীর জলের মাছ।

মিচেলসহ পাঁচ জন ষাতকের খালাস পাওয়া এবং ক্যালি ও হুটোর বিচারে দীর্ঘসূত্রতার পিছনে আসল মতলব দুটি (এক) দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে নিরীহ আবাল-বৃন্দ-বণিতাদের দলে দলে হত্যা করা হচ্ছে তা গোড়ায় মার্কিন জাঁদরেল যুদ্ধবাজদের শব্দ প্রস্তর কেন নির্দেশও আছে সেটা ধামা-চাপা দেওয়ার অর্থাৎ প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের গায়ে আঁচড় লাগতে না দেওয়া; (দুই) যুদ্ধরাষ্ট্রীয় আগ্রাসী নয়া উপনিবেশবাদ সেখানে যে জাতি উৎসাদনের রাস্তা ধরেছে সেটিকে "দৈবাৎ" অপরাধ বলে দেখানো—গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে মার্কিন কর্মপন্থার বেন কোন সম্পর্কই নেই এবং হত্যাশব্দগুলি নেহাতই "আকস্মিক" ঘটনা। ক্যালি মিচেল, হুটোর যেন এক একটি পথপ্রস্ট আশ্রা, তারা কী অন্যায় করছে তা নিজেরাই বঝতে

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

(অন্তিম পৃষ্ঠার পর)

ডাক দিয়েছিলেন তা প্রায় ফলপ্রসূ হতে চলছিল।
এস ইউ সি প্রভাবিত মোর্চা মাত্র তিনটি আসন লাভ করেন। পক্ষান্তরে হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ শব্দ যে কোন আসন লাভ করতে পারেন নি তাই নয় এদের দলের প্রতি এই রাজ্যের জনগণের আস্থাও বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হয়েছে। এই দলগুলির সম্প্র-দায়িক দৃষ্টিভঙ্গি যে রাজ্যের জন-সাধারণ পরিত্যাগ করেছেন তা নিশ্চয়ই প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাদৃত হবার যোগ্য।
এবার ৪০৬টি আসনে নির্দল সদস্যরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে পদূলিয়া জেলার স্থানীয় দল লোকসেবক সংঘের সদস্যরাও আছেন। এই দলের সাঁতটি আসন লাভের ঘটনা ছেড়ে দিলে নির্দল সদস্যরা এবারও এ রাজ্যের ভোট-দাতাদের স্বারা পরিত্যক্ত হয়েছেন বলা চলে।



পারে নি।
কিন্তু চোখে ধূলা দেওয়া হচ্ছে কাদের? এই পাষাণদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই মনের সাথে ভিয়েতনামীদের মূণ্ড সংগ্রহ করে (পদের্জতির স্বার্থে) আনবার হুকুম দিয়েছিল। কে সেই হুকুম-দার? জেনারেল ওয়েস্টমোর-ল্যান্ডের পেটোগন ছাড়া আর কেউ নয়। পেটোগনের আচরণবিধির রচয়িতা কারা? মার্কিন নয়া-

উপনিবেশবাদী একচেটিয়া মহাজনী মলধনী শ্রেণীর হুকুমের চাকর নিক্সন সরকার। জঙ্গনের আমলে ভিয়েতনামে যে "স্ট্যাটোজিক হাম-লেটে" লেবেল-সাঁটা বন্দীশালাগুলি তৈরী হয়, মার্কিন যুদ্ধাপরাধী-দের এক দিন না একদিন বিচারের পর তাদেরই গড়া এসব বন্দী-শিকরে যাবজ্জীবন আটক রেখে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করাতে পারলে সেটাই হবে প্রাণদণ্ডের চেয়েও মোক্ষম শাস্তি।

প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস সাক্ষ্য
এবার প্রধান প্রধান দলগুলির মধ্যে কয়েকটি মোর্চা হওয়ার বহু-মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যা অল্প হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নির্দল সদস্যদের জন্য বহু-মুখী প্রতি-দ্বন্দ্বিতা অনেক বেশী হয়। যদিও কংগ্রেস দলের প্রাণীর সঙ্গে অন্য
[আগামী সংখ্যায়]

সারণী-৪	প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা	অনুযায়ী কংগ্রেস সাক্ষ্য-৫৭
প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা	বেঙ্গ	বংগের কংগ্রেস সাক্ষ্য হার
১	১	১০০.০
২	৪০	২২ ৬৭.৪
৩	৮৫	৪০ ৫৫.৭
৪	৫২	৫৭ ৬২.৭
৫	৩৪	২৩ ৬৭.৬
৬	১৮	৮ ৪৪.৪
৭	৪	১ ৩০.০
৮	৩	৩ ১০০.০
৯	—	—
১০	—	—
১১	২	—

দুটি শ্লোগান প্রসঙ্গে

“নির্বাচন” উপলক্ষে কলকাতা সহরের দেওয়ালে যে সব শ্লোগান লেখা হয়েছে তার দুটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটিতে বলা হয়েছে যে “একমাত্র বিপ্লবী মনুষ্যই হাজার বছর ধরে নির্বাচন গণ-সংগ্রামের অঙ্গ”। অপরটিতে লেখা আছে : “একমাত্র স্বতন্ত্র অভ্যাস চালিয়েই আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করব।” যে সব সংশোধনবাদী পার্টি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হবার নামে বিপ্লব রূপে চাইছে তাদেরই একটির তরফে লেখা হয়েছে প্রথম শ্লোগানটি। দ্বিতীয়টি লেখা হয়েছে সি পি আই (এম এল)-এর যে সবহারার পার্টির নেতৃত্বে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক বিপ্লব এগিয়ে চলেছে, যে পার্টির নেতৃত্বে ভূমিহীন কৃষক নিজে গঠিত হয়েছে গণমুখী ফৌজ তাদের তরফ থেকে।

এই দুটি শ্লোগান ভারতবর্ষের রাজনীতির দুটি পরস্পর বিরোধী দিককে তুলে ধরেছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সর্বাঙ্গিক অবক্ষয়ের যুগে এবং সমাজতন্ত্রের সুনিশ্চিত জয়ের যুগে ভারতবর্ষের প্রতি-ক্রিয়ালীল শাসকশ্রেণী বেপরোয়া

হয়ে সংশোধনবাদকে আশ্রয় করেছে। সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদের নাম করেই মার্কসবাদকে আক্রমণ করে। প্রথম শ্লোগানটির আপাত লেনিনীয় বক্তব্য তাই প্রমাণ করে। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে সর্বহারার নেতৃত্বে কোন সফল বিপ্লব হয় নি ততদিন পর্যন্ত সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে ধাপে ধাপে সংহত করে “বিপ্লবী মনুষ্যের” জন্য অপেক্ষা

হয়েছে এবং যে যুগে সংশোধনবাদ সংসদীয় গণতন্ত্রকে আশ্রয় করেছে সে যুগে লেনিনের নামে সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করার কথা বলা লেনিনকেই অপমান করা। কিন্তু জেনে শুনেই সংশোধনবাদীরা লেনিনকে অপমান করে, লেনিনকে আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করার কথা বলে জনগণের পেছিয়ে পড়া অংশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। লেনিন নিজে যখন সম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বকে সঠিকভাবে বুঝে এককভাবে রূপ

একজন নকশালপন্থীকে ল্যান্স পোস্টে বেঁধে রেখে তার থেকে “স্বীকারোক্তি” আদায় করার চেষ্টা তাদের এই কায়দার নবতম রূপ। কিন্তু সংশোধনবাদের অস্তিত্বকে ব্যবহার করে এবং গেরিলা কায়দার প্রতিরোধ গড়ে তুলে বিপ্লবীরা অচিরেই নয়া-সংশোধনবাদীদের সমস্ত আশ্বালন স্তব্ধ করে দেবেন।

একজন সমর্থক
সি পি আই (এম-এল)-এর

মতামত

করা সঠিক ছিল। লেনিন-উস্তর যুগে, লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম সর্বহারা বিপ্লব সফল হবার পর, প্রতিক্রিয়ালীলরা “বিপ্লবের মনুষ্যের” জন্য সংগঠিত হবার সময় ও সুযোগ দিতে পারে না জেনেও সংশোধনবাদীরা, সম্রাজ্যবাদীদের ও ভারতীয় প্রতি-ক্রিয়ার স্বার্থে, লেনিনীয় বক্তব্যের অপপ্রয়োগ করেছে। আবার, যে যুগে সংশোধনবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়ে এক স্বতন্ত্র বিশ্ব শক্তি রূপে আবির্ভূত

দেশে বিপ্লব করা সম্ভব বলে ঘোষণা করেছিলেন তখনকার সংশোধনবাদীরা অনুন্নতভাবে মার্কস থেকে উদ্ভূত দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছিলেন।

অপরদিকে, ভারতবর্ষে সম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ উপস্থিতির কথা মনে রেখে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উচ্চতর রূপ মাও-সেতুঙ চিন্তাকে জীবন্তভাবে প্রয়োগ করে সি পি আই (এম এল)-এর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের মাটিতে বিকশিত হয়েছে যে স্বতন্ত্র রাজনীতি, যে নতুন মানদণ্ড তৈরী-রাজনীতি, তারই স্বাক্ষর আছে দ্বিতীয় শ্লোগানটিতে। হাতের কাছে যে অস্ত্র পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে, প্রেক্ষাগুরু স্বতন্ত্র মাধ্যমে, গ্রামাঞ্চলে যে গেরিলা যুদ্ধ বিস্তারলাভ করেছে তার ধাক্কা প্রতিক্রিয়ার অন্যতম ঘাঁটি কলকাতা সহর কেঁপে উঠেছে। বিশ্ববিপ্লবের সুনিশ্চিত জয়ের যুগে কোন আত্মত্যাগই বিফলে যাবে না জেনে কলকাতা সহরের যুবকেরাও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, পুলিশ সি আর পিকে এমনভাবে কাগড়ে বাধে পরিণত করেছেন যে সংশোধনবাদীদের অবশেষে মিলিটারির অভ্যন্তরীণ “নির্বাচনের” শ্লোগান লিখতে হচ্ছে।

আজ যখন বিপ্লব দুবার গতিতে এগিয়ে চলেছে, ভূমিহীন কৃষক কতৃক রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণফৌজ, যখন জাতীয় নেতা চারু মজুমদারের আহবানে গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তখন সংশোধনবাদের মতোস প্রায় সবটাই শুধু পড়েছে। বিপ্লবীদের দুর্জয় প্রতিরোধে বেপরোয়া হয়ে, সক্রিয় ভোট-বক্কটের ধাক্কা বিপর্যস্ত হয়ে, রাজ্য নির্বাচন অধিকর্তা “ক্ষতিপূরণের” লোভ দেখিয়ে ভোট গ্রহণের কাজ করবার লোক সংগ্রহ করতে চাই-ছেন। আর নয়া-সংশোধনবাদীরা প্রকাশ্যে ফ্যাসিবাদী কায়দা গ্রহণ করতেও ইতস্ততঃ করছে না। কিছুদিন আগে কলকাতার হারাতলা রোডে, প্রকাশ্যে দিবালোকে,

নোয়াপাড়া অঞ্চলে শাসক কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লক দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চিত পরাজয় জেনে আজ দিলেহারা হয়ে সমস্ত নকশাল সমাজ বিরোধীরা একজোটে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে। আজকে তারা সমগ্র এলাকার সম্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার মানদণ্ডকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করার অলীক স্বপ্ন দেখছে। প্রতিক্রিয়ালীদের এই জঘন্য আক্রমণ দমন করার পরিবর্তে পুলিশ জঘন্যভাবে এদের আড়াল করছে পরোক্ষে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কমীদের বিরুদ্ধে আক্রমণে সাহায্য করছে। একদিকে নির্বাচনের কাজে (দেওয়াল লেখার, পোস্টার লাগানো, স্টুডেন্টী, নাগরিকসভা সংগঠিত করার কাজে প্রচারে) নিযুক্ত কমীদের নকশাল সমাজ বিরোধীরা আটপাটি ছোট কংগ্রেসের সঙ্গে এক জোটে আক্রমণ করেছে হত্যা করেছে। অপর দিকে পুলিশ পোস্টার লাগানো দেওয়াল লেখার সময় কমীদের বিনা প্ররোচনার হেঁস্তার করেছে। জনসমর্থন না পেয়ে কারেমী স্বার্থবাদীরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দেওয়ালে লেখা মূছে দেওয়ার জঘন্য পথ নিয়েছে। পলতা স্টেশনে আমাদের লেখা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক মূছে দিয়েছে। ইছাপুর স্টেশনে নকশাল ও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা লেখা মূছে দিয়েছে। দেওয়াল লেখার সময় মারের পাড়ার আমাদের কমী পৃথিবী বাগচী ও অমিয় মূখোপাধ্যায়কে হেঁস্তার করেছে। পার্টি সমর্থক স্বপ্ন মৌলিককে আনন্দ মঠে নকশালরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। গারুলিয়ার ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেসী সমাজ বিরোধীরা নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত অন্ততঃ আটদশ জন কমীকে মারমোর করেছে। ছরই ফেরারী তারিখে ফরওয়ার্ড ব্লক গুড্ডারা ফুড গোডাউনের কিছু দুর্বৃত্ত কুশী বাঘ-ঘাট এলাকা প্রায় শ. দুইশেক লাঠি-বর্শা-ভল্লা নিয়ে আক্রমণ করে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি বোমা ফাটিয়ে সম্রাস সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক মানদণ্ড এই গুড্ডারীর বিরুদ্ধে একাধারে প্রতিরোধ এগিয়ে এসে গুড্ডাদের হটে যেতে বাধ্য করে। গুড্ডাদের এক ঘণ্টাব্যাপী হামলা চলা কালে পুলিশ

বারনি। যখন জনগণ প্রতিরোধ করত এগিয়ে আসত তখন নোয়াপাড়া থানার ঠেংরাচারী ও সি, সি আর পি আনিমে পুলিশী সম্রাস সৃষ্টি করে আমাদেরই চার জনকে হেঁস্তার করে। দুর্বৃত্তদের কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি।

মানিকভল্লার নকশাল, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস গুড্ডাবাহিনী কমরেড দুলাল মিয়াকে ছুরি মারে। রক্তিত ভট্টাচার্য সলিল দত্তকে প্রচণ্ড মারমোর করে। লেনিন নগরের প্রব ব্লকে হত্যার উদ্দেশ্যে অগ্নিহরণ করে নিয়ে যায়। মহিলারা প্রচণ্ড বিক্ষোভ জানিয়ে পুলিশকে প্রবকে উদ্ধার করতে বাধ্য করে। সাধারণ মানবের সন্দেহ অমিতাভ ব্লকেও এরাই হত্যা করেছে। মাঝেরপাড়া এলাকার মানদণ্ডের প্রিয় পত্রিকাওয়ারা পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ বেন্দুদাকে ছুরি মারে। কমরেড শিবাজী বিশ্বাস, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও অক্ষয় চৌধুরীকে মারমোর করে। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ রবীন পাল, কল্যাণের সুধীন বন্দুর বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে। আনন্দমঠ অঞ্চলে নকশাল গুড্ডারা বাইরের খুনী নকশালীদের আমদানী করে আনন্দমঠবাসীদের জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। পলতা অঞ্চলে কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লক নকশাল সমাজ বিরোধীরা সম্রাস চালিয়ে বাছে। আনন্দমঠে নকশালরা মারপাল্টা নিয়ে প্রকাশ্যে দিবালোকে ঘুরে বেড়ায়। অথচ এই সকল সমাজবিরোধীদের কাউকেও পুলিশ হেঁস্তার করেনি। বরং পুলিশ নিলম্বভাবে এদের সমাজ বিরোধী কমজের আড়াল করছে। আমাদের পার্টির প্রায় দুশো পঞ্চাশ জন কমীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়ে পঞ্চাশ-বার্টিট মামলা দায়ের করেছে। অন্ততঃ পঞ্চাশ জনকে হেঁস্তার করেছে। এই কারেমী স্বার্থবাদীদের হুশিয়ারী দিয়ে বলতে চাই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ না হলে নোয়াপাড়ার সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক মানদণ্ড যে কোনও মূল্যে এই গুড্ডারী প্রতিরোধ করবে।

বার্মিনী সাহা

টেনিসের আসর বসাতে তিনলক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়

নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর অর্থমন্ত্রী শ্রীশিবশঙ্কর রাও চাবনের কংগ্রেসী সমাজবাদের এক অতি সুন্দর নমুনা পাওয়া গেল। এজন্য এশিয়ান গন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের উদযোজ্যদের ধন্যবাদ।

সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ঘোর অনটনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র, এজ-রে ফিল্ম, শিশু-খাদ্য, পুস্তক, গবেষণার সাহায্য-সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রব্যাদির আমদানী কি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন কংগ্রেসী সরকার। ফলে কোটি কোটি নিপীড়িত জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, পথ্য, শিক্ষা এবং প্রাণধারণের ব্যয় হয়ে পড়েছে নাগালের বাইরে।

অথচ দেশের দেশের এই অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও যখন মুষ্টিমেয় কতিপয় আলালের ঘরের দুলাল হাজার পাঁচেক সমাজের-কলঙ্ক, উটকো-বড়লোকের মনো-রঞ্জনর জন্য কলকাতার সাউথ ক্রবে পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের মস্ত-আসর অর্জাচ্ছেন, তখন বিদেশী খেলোয়াড়দের দক্ষিণা ও যাতায়াত খরচা বাবদ সমাজবাদী কংগ্রেসী সরকারের সদাশয় মন্ত্রি-মণ্ডল এক কথায় তিরিশ হাজার

ডলার (তিন লক্ষ টাকা) বৈদেশিক মুদ্রা মজুর করে দিয়েছেন। অ্যাংলো-আমেরিকান সাহেবদের পদলেহনকারী মোসাহেবদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করতে এবং চোরাকারবারী, অসৎ পথে অর্থোপার্জনকারী, শ্রেণী-শত্রুদের চিন্তাবিনোদনের নিমিত্ত মাধাপাছাট টাকামত দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে কংগ্রেসী সরকার তার শ্রেণী-চরিত্রই ভোটদায়ের কাছে তুলে ধরেছেন। বলার কিছু নেই।

কিন্তু কলকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ বাসিন্দা যখন অনাহারে, অর্থাহারে, বিনা চিকিৎসায়, তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগুচ্ছে, কয়েক সহস্র বেকার যুবক সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে ঋণা, অবজ্ঞা, কৃপা ও লাঞ্ছনার পাত্র হয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটছে, শহরের স্বাভাবিক জীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন যে সব “নীরো” মনের আনন্দে পুঞ্জিপতিদের টেনিসের আসর এই শহরে বসাতে লক্ষ্য পায় না, তাদের সমুচিত শিক্ষা কি সি পি এম-এল-এর সাউথ ক্যালকাটা অ্যাকশান কমিটি দিতে পারে না? বলতে পারেনা—বাংলার বুকে টেনিস, ক্রিকেট, গলফ, ঘোড় দৌড় আর হতে দেব না?

কল্পনা ঘোষ

দর্পণের বিশেষ সংখ্যা

ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ‘চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে দর্পণের বর্তমান সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ আমাদের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়েছে। এই বিশেষ সংখ্যাটি বর্ধিত কলে-বরে প্রকাশ করা হচ্ছে আগামী পাঁচই মার্চ।

বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্র

বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্র

বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্রের ইতিহাস বেশ পুরোনো হলেও আসলে পঞ্চাশের দশকেই বুলগেরিয়ার সিনেমাশিল্প সত্যিকারের সংগঠিত চেহারা নেয়। অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো মত, বুলগেরিয়াও শীগগিরই ছবি তৈরীর কারিগরি বিদ্যা খুব তাড়াতাড়িই রপ্ত করে ফেলে। বুলগেরিয়ার কিছু ভাল ছবি ফিল্ম সোসাইট প্রদর্শনীর কলকাতার দর্শকের পরিচিত। সাম্প্রতিক বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্র উৎসবে এই দেশের আরো কিছু ছবি দেখা গেল। অভিজ্ঞতা যে খুব সুখকর তা বলা যায় না। ছবি তৈরীর যান্ত্রিক কার্যদাকান্দন অবশ্য বুলগেরিয়ার চিত্রনির্মাতারা ভালভাবেই আয়ত্ত করেছেন। প্রতিটি ছবিতেই কারিগরি দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্যামেরার ব্যবহার অসাধারণ গতিময়, বিশেষ করে হাত-ক্যামেরার কাজ তো অপূর্ব। সম্পাদনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো। সঙ্গীতের প্রয়োগও সুস্থি-শীল। কিন্তু বাইরের এত চাক-চিক্য সত্ত্বেও বেশির ভাগ ছবিকি মনে কোন দাগ কাটে না, যান্ত্রিক কুশলতা আর আঙ্গিকসিন্ধি এক নয়। যন্ত্রব্যবহারের বাইরে বিষয়-বস্তুর দাবীতে চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট আঙ্গিত তৈরী হয় এবং সেই আঙ্গিকই যন্ত্রের ব্যবহারও ঠিক করে দেয়। বিভিন্ন উপাদানের সুবহু সমাবেশে বক্তব্য পরিষ্কৃত করবার উপায়ই হল আঙ্গিক। সৈদিক দিয়ে বুলগেরিয়ার ছবির

অনেকগুলোই ব্যর্থ, যদিও চোখ-ভোলানো ব্যাপার-সাপারের কর্মতি নেই। অধিকাংশ ছবিতেই বক্তব্যের প্রকাশে চড়াবস্ত্র জেলেমানুসি, চরিত্রায়ণও অপটু।
উৎসবের তিনটি ছবি, “দি এইটথ” “দি লংগেট নাইট” ও “র্যাক এজেন্স” বুদ্ধিকালীন ঘটনার পটভূমিকায় তৈরী। ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাহিনীর কাজকর্মও অনেক ছবির বিষয়বস্তু। “দি এইটথ” এইরকম একটি বাহিনীর গল্প। দলে অনেক রকমের লোক, নানা ধরনের মানসিকতা। এই মানবিক সম্পর্কের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে উচ্ছ্রাজাতের শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মানবচরিত্রের ভেতরে ঢোকার চেষ্টাই করেন নি পরিচালক। শুধু বাইরের কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনার ঘটা দেখিয়েই কতব্য সেরেছেন। শুধু চমকটা আছে অবশ্যই, কিন্তু নাটকীয়তা ও সুক্ষ্ম মানবিক আবেগ একেবারেই অনুপস্থিত, যদিও গালভরা কথুতা আছে বড়ি বড়ি। “দি লংগেট নাইট” ছবিতে একজন বুদ্ধিবল্লীর পলায়নকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার খোরাক দেবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ক্ষমগতিতে ও দুর্বল চিত্রনাট্যের ফলে চরিত্রের ভেতরকার আলোড়ন তো ধরা পড়েই নি, উপরন্তু বহিরঙ্গণের ঘটনাসংঘাতও দর্শকমনে কোন কৌতুহল সৃষ্টি করে না।
পুরোনো ঐতিহাসিক কাহিনী-ভিত্তিক “আইকনোস্টাসিস” অনা-

বশ্যক মস্তুর ও ক্রান্তিকর। “মেন অন বিজনেস ট্রিপ” প্রেম ও বাস্তবতা সমস্যাকেন্দ্রিক তিনটি ছোট নকস। আধুনিক জীবনের জটিলতা প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায় এ ছবিতে, কতগুলো ছোটখাট ঘটনার রূপায়নে বোঝা যায় যে পরিচালকের দৃষ্টিতে দ্রোণও আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন ফ্যাকাশে, অগভীর, অর্থহীন। স্কুলমাষ্টার আর ছাত্রছাত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তৈরী “ফেরারওয়েল ফ্রেন্ডস” একেবারেই আবেগসর্বস্ব ও ছককাঁধা ছবি। “এ সাইড ট্র্যাক” ছবিতে অবশ্য

গভীর বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে। বুদ্ধ ও বিপ্লবের পরে নতুন সমাজ গড়বার তাড়াহুড়োর অনেকসময়েই মানবিক অনুভূতি-গল্লো চাপা পড়ে যায়—তারপর প্রথম উচ্ছ্বাস অনেকটা খিতানোর পর আবার সেগুলো ভেসে ওঠে। সেই দ্বারিয়ে যাওয়া মূহুর্তগুলো-এই ছবির প্রৌঢ় নায়ক-নায়িকার এই ছবির প্রৌঢ় নায়ক-নায়িকা বিক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে। সে স্মৃতি কখনো মধুর, কখনো ব্যঙ্গা-বিক্ষুব্ধ। অতীত-বর্তমানের মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে ঘুরে বেরিয়েছে ক্যামেরা এবং সবশেষে আবার এক

ভয়ঙ্কর শূন্যতার অন্ধকারে মিশে গিয়েছে সবাই। “দি হোয়াইট রুম” ছবিতে সেই চিত্রাচারিত সমস্যা, এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ, মিনেমার ভাষায় অনবদ্যভাবে বর্ণিত। বুরোক্রাসীর আগ্রাসী রূপ, বিদ্রোহীর অস্থির আক্ষেপ এ ছবিতে নিপুণভাবে চিত্রিত। চলতি পথে নাটক কিছু নেই। নিটোল গল্প বলতেও চাননি পরিচালক, ক্যামেরা মানবমনের অন্তর্লীন স্বন্দ-বিক্ষোভকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

ইলেকট্রিক সান্নাই কর্পোরেশনে মজদুর ইউনিয়নের দুমুখো নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দুমুখো নীতি
সেইজন্য মজদুর সমিতি বাংলা ও হিন্দীতে একটি আবেদন ছাপায়। কিন্তু বাংলায় যেখানে ওভারটাইমের সরাসরি বিরোধিতা করা হয় হিন্দীতে সেখানে লেখা হয়—ইথার কুছ দিনো সে প্রমিক পর কাম কা ভার পহেলে সে অধিক দিয়া গয়া হয়র জব কি ওবরটাইম ভতা ঠর কম কর দিয়া গয়া হয়র। অর্থাৎ বাংলায় বলছে ওভারটাইম তুলে দাও, বুদ্ধ অ্যাকশন কমিটি কোম্পানীর দালাল করছে; আর হিন্দীতে বলছে—ওভারটাইম কোম্পানী আমাদের আর কমিয়ে দিচ্ছে অতএব ভাইও, বহেনো ইত্যাদি।

শীট পায় অনেক প্রমিক। বুদ্ধ সংগ্রাম কমিটি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রমিকদের কাছে আবেদন করেছে। তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে কোম্পানীর সংলগ্নে লড়াই তাকে সামিল হওয়ার জন্য। বুদ্ধ অ্যাকশন কমিটি বিভেদপন্থী মজদুর সমিতির চালে প্রমিকরা যাতে বিভ্রান্ত না হয় তার জন্যও কলকাতা ইলেকট্রিক সান্নাই কোম্পানীর সমস্ত প্রমিকদের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

গত পয়লা অক্টোবর একশো ঘণ্টার ওভারটাইম সীলিং সম্বন্ধে ইউনিয়নগুলির সংলগ্নে কোম্পানী এক সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছে। এদিকে একে বানচাল করার জন্য কোম্পানী তাদের কতিপয় দালাল প্রমিক নেতা এবং মেইন বিভাগের কিছু অফিসার দিয়ে এই সিদ্ধান্ত উপলব্ধ করে প্রমিকদের একো ফাটল ধরিয়ে নিজেদের মুনাকা এবং শোষণের পরিমাণ অব্যাহত রাখতে চাইছে।

দ্রুম সংশোধন

গত সংখ্যায় দর্পণে কলকাতা ইলেকট্রিক সান্নাই কর্পোরেশনের যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেটি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মজদুর ইউনিয়নের বক্তব্য।

দালাল ও বিভেদপন্থী রাজনীতি
এইভাবে যে জটিল ওভারটাইমের প্রশ্নের মীমাংসা সমস্যা-সাপেক্ষ তার সম্বন্ধে হঠকারী ও সুবিধাবাদী দুমুখো ধনী তুলে কিছু প্রমিকদের খেঁপিয়ে তুলে মজদুর সমিতি গত ছয় জানুয়ারি কাশীপুর কারখানার গেটে প্রমিকদের এক সংঘর্ষের মুখে ঠেলে দেয়। পরের ইতিহাস ছকে কাঁধা—পুলিশ আসে, লাঠি চলে একাংশ প্রমিক ধর্মঘট করে এবং কোম্পানী এন ভি এফ তলব করে। তারপর সাময়িক বরখাস্ত, কারপদর্শনী এবং চার্জ-

পাগলামি

(শ্রবণীয় পৃষ্ঠার পর)

গেলেন, এস ডি ওর কাছে তদন্তের জন্যে নব কংগ্রেসের নেতাদের একসঙ্গে গিয়ে দাবী জানান। ধরা পড়ল রক্তমাখা ছোরা জামাকাপড় নিয়ে এস ইউ সি কমি। বাকী পাঁচজন ধৃত ব্যক্তির মধ্যেও চারজন এস ইউ সি কমি বলে পুলিসী সূত্রে জানা গিয়েছে।

কিন্তু কি রকম জলাতনক বা হাইড্রোফোবিয়া হয়েছে নব-কংগ্রেস সভাপতি বিজয় সিং নাহারের ও আদি কংগ্রেস সভাপতি প্রতাপ চন্দ্রের। তাঁরা বলে উঠলেন, সি

পি এম শ্রীবদলোগাল রায়কে খুন করেছে। জেনেহুনে এই মিথ্যা ভাষণ, এও পাগলামির রকমকর।

সি পি একে কোণঠাসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এর কিছুক্ষণ বাদেই কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এক প্রেস নোট বার করা হয়। তাতে জ্যোতি-বাবুর তথাকথিত বক্তৃতা উল্লেখ করে বলা হয় যে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সি পি এমের অগণতান্ত্রিক কার্য-কলাপ সম্পর্কে।

এই ধরনের প্রেস নোটে সরকারের, এমন কি সৈন্য বাহিনীর

উচ্চতম অফিসার মহলও বিস্মিত বোধ করেন। এই প্রেস নোট প্রকাশ হওয়ার আগে চীফ সেক্রেটারী এবং আই জি রাজ্যপালের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ করেন। অবিলম্বে সি পি এমের তরফ থেকে জ্যোতিবাবুর বক্তৃতা এবং সশস্ত্র বাহিনী গঠনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে দুটি রিপোর্টের প্রতিবাদ করা হয়। এতে সরকারী মহল বিব্রত বোধ করছেন। সংবাদপত্রে যে বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হয় একথা তো সরকারী মহল নিজে-রাই অনেকবার বলেছেন, তবে কেন একটিমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে দীর্ঘ প্রেস নোট ছাড়লেন?

নির্বাচন পর্ব

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

বারোটি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। গ্রিবান্দমে সি পি এম প্রাক্তন দেশ-রক্ষামন্ত্রী ভি; কে, কুম্মেননকে সমর্থন করছেন। আরো ছয়টি আসনে তাঁরা নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন জানাচ্ছেন।

কেরলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে, কৃষক এলাকায়। এবার তারা প্রমিক অধ্যুষিত কোচিন ও ত্রিচুর এবং চাকি-রবার বাগিচা প্রমিকের মধ্যে একক শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তালগুড় ও তাড়ি শিল্পের এড়াভা প্রমিকদের মধ্যে তাঁদের প্রভাব বেড়েছে। গ্রিবান্দমে সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের পূর্ণ হরতাল এবং কুটনাদের দেড়-হাজার কৃষিশ্রমিক জাঠার গ্রিবান্দমে সরকারী ভবনের সামনে অনশন ধর্মঘট, কংগ্রেস-মিনিফ্রন্ট দলের সমর্থন সূচনা করে না।

কেরলে যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি মুসলিম জনগণের ক্রমবর্ধমান সমর্থন। তাছাড়া ল্যাটিন ক্যাবলিক খৃষ্টান জেলে সম্প্রদায়, অছাত্র হরিজন সম্প্রদায়

প্রায় সবটাই সি পি এমের পেছনে। সি পি এম দল হিসেবে প্রায় একক। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যেও গত পাঁচ মাসে নতুন পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। কুটনাদ, কোটায়াম অঞ্চলের তিন চার একর জমির ছোট মালিকদেরও বাসগৃহের জন্যে ঠিকা মজদুরকে কিছু জমি ছেড়ে দিতে হবে, এই প্রচার চালিয়ে মিনিফ্রন্ট-কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেস কয়েক লক্ষ ছোট ও মাঝারি কৃষকের ভোট সি পি এম-এর হাত থেকে কেড়ে নিতে পেরেছিলেন।

সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত ছাত্র, শিক্ষক সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন, জনসাধারণের মধ্যে সি পি এম-এর প্রতি আরো কিছু সমর্থন এনে দিয়েছে।

নির্বাচনী ফলাফল এখনই বলা খুব কঠিন হলেও, সি পি এম তাদের আগের নয়টি আসনের মধ্যে চারটি আসন হারাবার সম্ভাবনা এবং তিনটি নতুন আসন তাঁরা পেতে পারেন।

সি পি আই ও মুসলিম লীগ দুটি করে, নব কংগ্রেস চারটি, আদি কংগ্রেস একটি, কেরল কংগ্রেস দুটি ও দুজন নির্দল সদস্য জয়লাভ করতে পারেন। সি পি এম-এর আসন সাত থেকে আট হতে পারে।

চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাঁচিশ বছর যাবৎ কাজ করছেন সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে।

তিনি বলেছেন যে, তাঁর সংগঠনকে ভাঙ্গার বহু চেষ্টা কর্তারা করেছেন বার বার, সংগঠিত শক্তির সামনে পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত এখন হত্যার পথ নিয়েছেন। তাঁর হিসাবে বিশ জনের মত কমস্টেবল কলকাতায় নিহত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই তাঁর সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

তিনি অভিযোগ করেন যে, গত এগারোই ফেব্রুয়ারী প্রায় মধ্যরাতি নাগাদ তাঁর সংগঠনের পাঁচজন সক্রিয় সদস্যকে (সকলেই কমস্টেবল) সি আর পির ঘাতক বাহিনীর দ্বারা হত্যার চেষ্টা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানু-ষের আড়া থেকে সি আর পি পালিয়ে যায় এবং ওরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

যে ঘটনা চিন্তাহরণবাহু দর্প-ণের কাছে বলেছেন তার নজর কোন দেশের পুলিশের ইতিহাসে নেই, এবং পুলিশের কর্তাদের প্রতিশোধ-প্রবলতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে এটি তার সাক্ষ্যবহ।

অজয়বাবু যখন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ দপ্তরের কর্তা তখন মৃত পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনকে চাঙ্গা করেন। উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে পুলিশ ধর্মঘটের পর কর্তারা কোন এসোসিয়েশন করা পছন্দ করেন নি। তাই এই সংগঠন মরে গিয়েছিল। অজয়বাবুর অনুযায়ী আবার এই সংগঠন চালু হল আর সঙ্গে সঙ্গে

এর সদস্য-সংখ্যা দাঁড়াল বারো হাজার।

তারপর স্বিকৃতিয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী জ্যোতিবাবু আগের বারে অজয়বাবুর কাছে পেশ করা এসোসিয়েশনের কাগজপত্র উল্টে দেখতে গিয়ে একেবারে থ বনে গেলেন।

দীর্ঘ আলোচনা জ্যোতিবাবুর হয়েছে এই সংগঠনের কার্য-করী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে এবং অন্যান্য সং কমীদের সঙ্গে। যেসব কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়ে-ছিল তার মধ্যে ছিল পুলিশের কর্তাদের পক্ষের চরিত্র কথা। চোর বাটপাড়দের সঙ্গে যোগসাজসে তাদের লাভের অংশ নেওয়া, বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সহায়তা করে দুনীতিপরায়ণ কালোবাজারী মাদ্রাসারীদের কাছ থেকে টাকা খাওয়া ইত্যাদি বহু অভিযোগ।

পুলিশের কর্তারা এক একটা কুদে সম্মাটে পরিণত হয়েছে। এক একজন এস বি ডেপুটি কমিশনারের বাড়িতে দশ বারো জন করে চাকর-আদালী। এরা সকলেই পুলিশ দপ্তরের কমস্টেবল। প্রত্যেকের পেছনে দপ্তরের খরচ মাসিক পাঁচশো টাকার মত।

লুট করার অনেক কায়দা। দপ্তরের টাকাই লুট হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ পুলিশ কর্মচারীকে খুশি রাখার জন্য কলকাতা শহরে পুলিশ পরিচালিত পাঁচটি ভাঁটিখানা আছে। অভিযোগে প্রকাশ, প্রতি বোতলের অর্ধেক ডেলে নিয়ে জল মিশিয়ে দেওয়া হয়। যেটা ডেলে

নেওয়া হল সেটা বাজারে বিক্রীত ব্যবস্থা আছে। এই ভাঁটিখানাগুলো চালাবার জন্য একটি কমিটি আছে যার অন্যতম পাশা হলেন ডিটেক-টিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার শ্রীদেবী রায়।

তাছাড়া লাখ লাখ টাকা এরা আত্মসাৎ করে রেশন বন্টন ব্যবস্থা থেকে। আরও টাকা আসে পুলিশের পোষাক সরবরাহকারী কন্সট্রাক্টরদের কাছ থেকে। হালে কয়েক বছর ওয়াগন ভাঙ্গার যে হিড়িক তাতে পুলিশ কর্তাদের সক্রিয় যোগাযোগ আছে বলে অভিযোগ।

জ্যোতিবাবু এই সমস্ত অভিযোগের উপযুক্ত তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের কথা সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারে দেখা দিল, তথাকথিত শরিকী সংঘর্ষ ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। সরকারী প্রশাসনে অনিচ্ছা জ্যোতিবাবু ভীম-রূপের চাকে ঢিল মেরেছেন। কামড়ে প্রথম দফায় জ্যোতিবাবু পরাজিত। মন্ত্রিসভা এক বছরের মধ্যে ভেঙ্গে গেল। কিন্তু জ্যোতিবাবু বাঙালার তিন দিন আগে পুলিশ এসোসিয়েশনের বাহান্ন দফা দাবীর বহির্ভূত দফাই মঞ্জুর করে দিয়ে যান।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটান পর শত্রু হয় এসোসিয়েশনের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ। পূর্বতন সরকার যেসব দাবী মেনে নিয়েছিলেন তার কোনটাই কার্যকরী করা হয়নি। সংগঠনের এগারো জনকে কোন কারণ না দেখিয়ে বরখাস্ত করা হয়েছে আর সংগঠনের সম্পাদককেও পাঁচশ বছরের চাকরী সঙ্গেও ছাঁটাই করা হয়। ছাঁটাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের সকলকে পুলিশ ব্যারাক থেকে কুকুরের মত তাড়ানো হয়।

ছাঁটাই করার বিশেষ কারণ হল সংগঠনের সম্পাদক শ্রীচিন্তা-হরণ দত্ত কর্তাদের আদেশ অনু-যায়ী সাধারণ মানুুষের বিরোধী পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণে এক মত হতে পারেন নি।

শ্রীদত্ত অভিযোগ করেছেন যে, পুলিশের এক বড়কর্তা তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে অবিলম্বে নিবর্তন-মূলক আটক আইনের সমর্থনে একটি প্রস্তাব সংগঠনকে গ্রহণ করতে বলেন। বলা হয় যে, অফিসারদের সংগঠন এ সম্পর্কে প্রস্তাব আগেই গ্রহণ করেছে। শ্রীদত্ত সংগঠনে এই প্রস্তাব পেশ করলে তা গৃহীত হয় না। বরং সংগঠন মনে করে যে, এই ধরনের আইন পুলিশের ক্ষমতা বর্ধিত করে, এবং পরে এই ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে জনমানসে পুলিশের বিরুদ্ধে ছবি ফুটে ওঠে এবং তার ফল ভোগ করতে হয় পুলিশের সাধারণ কর্ম-চারীকে। এই ধরনের প্রস্তাবে কর্তারা ক্ষেপে লালা। তার পরেই শত্রু হয় বরখাস্ত, বদলী আর বাদের বরখাস্ত আর বদলী করা যারনি তাদের কুকুরের মত হত্যা!

পুলিশ এসোসিয়েশন মহা-মান্য হাইকোর্টে দরবার করে বর-খাস্ত কর্মচারীদের পুনর্বহাল করিয়েছে। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে।

ভেতরে ভেতরে সংগঠনটাকে যাতে তুলে দেওয়া যায় তারও চেষ্টা হয়। গত বছর পুজোর সময়, যখন আদালত বন্ধ, কর্তারা কেন্দ্র থেকে একটি বিশেষ অর্ডার বহাল করার চেষ্টা করেন। এতে বলা হয় যে, পুলিশ কর্মচারীদের পয়সা নভেম্বর থেকে কোন সংগঠন করার অধিকার থাকবে না। অর্ডারটি এসে পৌঁছয় তেইশে অক্টোবর। প্রশ্নের ব্যবহারজীবী শ্রীএন সি চ্যাটার্জীর প্রচেষ্টায় এই অর্ডার বলবৎ করা যায় নি।

এই পরাজয়ের পর যেটুকু অনুষ্ঠান কর্তারা মেনে চলাছিল তাও বিসর্জিত হল। কনস্টেবল হত্যার সংখ্যা বাড়ল। শ্রীচিন্তাহরণ দত্তকে ঘাতকরা খুঁজে বেড়াতে লাগল। শ্রীদত্ত এখন দুজন সাস-পেন্ডেড কনস্টেবল দেহরক্ষী নিয়ে চলাফেরা করেন। আর একটা সুবিধে যে, পুলিশ সংগঠনে, এমন কি অফিসারদের মধ্যেও, তাঁর বহু শত্রুমানুষ্যারী আছেন। তাঁকে হত্যা করা তাই সহজ নয়।

গত এগারোই ফেব্রুয়ারী শেষ

চেষ্টা হয়েছে একটি গণ-হত্যার। কিছুদিন খাতি সাসপেন্ডেড কন-স্টেবলদের কয়েকজন ব্যারাক থেকে উদ্ধৃত হয়ে এসোসিয়েশনের অফিসে আশ্রয় নেন। এই অফিস হঠাৎ কর্তাদের আদেশে সীল করে দেওয়া হয়।

এগারোই ফেব্রুয়ারী তিনজন অফিসারের নেতৃত্বে একটি সি আর পি বাহিনী হঠাৎ এসে অফিসের সামনে হাজির হয় এবং অফিস-ঘরে ঢুকে খাতাপত্র তল্লাশ করে। চিন্তা-হরণবাবু অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন যে, এসোসিয়েশনের ক্যাশ বাক্সে প্রায় আড়াই হাজার মত টাকা ছিল।

অফিস লুটের পর ওরা বাইরে বিক্ষোভের পাঁচজন কনস্টেবলকে ছোর করে একটি লরীতে উঠিয়ে নেন। এদের নাম হুদয়রঞ্জন জ্ঞানা, কমলাকান্ত পতি, জিতেন্দ্রনাথ মন্ডল শিশিরকুমার মন্ডল এবং ফণিভূষণ মন্ডল। লরীর মধ্যে রাইফেল উঠিয়ে সি আর পি বাহিনী ওদের ঘিরে রাখে।

ওরা তখনই বৃষ্টিতে পারে যে, পরিকল্পনা হত্যার। নির্জন জিজি-রপোলের কাছে ওদের নামানোর সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রচণ্ড চীৎকার শুরু করে দেয়। সি আর পির হত্যাকারীরা ঠিক এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ওরা একটু ঘাবড়ে যায় এবং ধৃতদের চীৎকার তত আকাশ-ভেদী হতে থাকে। কাছেই একটা বাজার ছিল। সেখান থেকে লোক-জন লাঠিসোটা নিয়ে মার মার করতে করতে ছুটে আসে। বেগ-তিক দেখে দু লরী সি আর পি হাওয়া। তাদের শিকার ঐ পাঁচ জনকে তারা ফেলে গেল।

যারা বাঁচল তাদের কয়েক-জনকে নিয়ে ওরা কাছেই গার্ডেন-রীচ থানায় নালিশ জানাতে গেল। সেখানে সফল না পেয়ে একটি লরীর সাহায্যে ওরা জিপি ও-র কাছে এসে নামে, তারপর হেয়ার স্ট্রীট থানায় অভিযোগ দাখিল করতে যায়। সেখানেও অভিযোগ নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ওরা হাই-কোর্টের শরণাপন্ন হুল। আদালত আদেশ দিয়েছেন অবিলম্বে অভি-যোগ সম্পর্কে তদন্ত করার। এই আদেশ সরকারের প্রশাসন ও পুলিশের ওপর বলবৎ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে এরা সকলেই এক গোপন আস্তানায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। দর্পণের সংবাদদাতাকে এই আস্তানায় নিয়ে বাওয়া হয়।

প্রার্থী ভেঙ্গে পড়ছেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জন প্রার্থী শেষ মর্হুতে নব কংগ্রেস থেকে আদি কংগ্রেসে যোগ-দান করে তারা প্রমাণ করে দিয়ে-ছেন যে দর্পণের সংবাদ সত্য, তারা শত্রু নব ফেলে আদিতে আসবার সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। এমন দিনে ও এমন সময়ে তারা দল ত্যাগ করেছেন যখন নব কংগ্রেসের পক্ষে আর নতুন করে কোন প্রার্থী দেবার সুযোগ ছিল না। এই সব দলত্যাগীদের মধ্যে আছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা নব কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীবন্দ্যোবন গায়েন, অনাদি মোহন তাঁতি ও পদ্মান মন্ডল। শ্রীগায়েন ও শ্রীতাঁতি প্রাক্তন বিধান সভা সদস্য। এই তিন জন এখন আদি কংগ্রেস প্রার্থীরূপে তিনটি কেন্দ্রে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করবেন। শ্রীগায়েন প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করবেন। পাথরপ্রতিমা কেন্দ্রে, শ্রীতাঁতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর-বেন মধুরাপুর কেন্দ্রে এবং শ্রীমন্ডল

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন হিম্মলগঞ্জ কেন্দ্রে।

নির্বাচনের শেষ মর্হুতে বাংলা কংগ্রেস থেকে কমীদের দলত্যাগের খবর আসছে। কাঁকড়া জেলার গঙ্গাজলঘাট কেন্দ্রের শ্রীরাধামোহন চট্টোপাধ্যায় দেড় শতাধিক কমী নিয়ে দলত্যাগ করে নবকংগ্রেসে যোগ-দান করেছেন এবং এই কমীরা এখন নব কংগ্রেস প্রার্থীর অনু-কূলে প্রচার করছেন।

এই দলত্যাগ বা দল পরিবর্তন শত্রুমাত্র তিন কংগ্রেসেই সীমাবদ্ধ নয়, এই রোগ বামপন্থী দলেও সংক্রামিত। তমলুক কেন্দ্রে শ্রীঅজয় মুখার্জীর বিরুদ্ধে সি পি আই কোন প্রার্থী দেবে না ঠিক করে-ছিল, কিন্তু হঠাৎ তমলুক সি পি আই দলের প্রভাবশালী নেতা শ্রীশিবাজী দত্ত দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন এবং অনেক চাপ দিয়েও তাঁর প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করানো যায় নি।

এই রোগে তিন কংগ্রেস সি পি আই শত্রু আক্রান্ত নয়, সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টও আক্রান্ত।

মহম্মদবাজার কেন্দ্রে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী শ্রীধীরেন সেনের বিরুদ্ধে মার্কস-বাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর-ছেন। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক উভয়েই সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের সদস্য।

প্রার্থী প্রত্যাহার করে ও না করে বিভিন্ন দলের মধ্যে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে নৈহাটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে নব কংগ্রেসের দুই জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। দুই প্রার্থীর নাম হল শ্রীতারাপদ মুখার্জী ও শ্রীরঞ্জিত ভট্টাচার্য। দুই জনই নব কংগ্রেসের এবং নব-কংগ্রেসের হয়েই মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই জনের কেউই নাম প্রত্যাহার করেন নি। ফলে মহ-কুমা নির্বাচনী কমিশনার দুই জনের কাউকেই নব কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক দেন নি, দুই জনকে নির্দ-লের প্রতীক দিয়েছেন।

WEST BENGAL POLLS

(A hand book of Election Results & Analysis.)
Contains :—Constituency-wise results since 1962 ;
Detailed results of Parliamentary Constituencies
of West Bengal, 20 Tables & a Chart with detailed
information. By—Sudhir Ghose. Rs.—6.00.

DEY BOOKS STORES
Calcutta-12.

Firma K. L. Mukhopadhyay
Phone:—24-1824. Calcutta-12.

শ্রদ্ধেয় জননেতা হেমন্ত বসুকে হত্যার অভিযোগে ধৃত তরুণদের পরিচয় সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলের অপপ্রচার

দপন

১৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ ২ দাম ৩০ পয়সা

বর্ধমান জেলার পুলিশ জুগার ডাছা মিথ্যা কথা বলেছিলেন

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

সম্প্রতি বর্ধমান জেলার উখড়া নির্বাচনী কেন্দ্রে শ্রীদেবদত্ত মন্ডল নিহত হওয়ার ব্যাপারে বর্ধমান পুলিশ সুপার, শ্রীপাচ গোপাল মুখার্জী তদন্তের পূর্বেই টেলিফোন যোগে কলকাতার সংবাদপত্রগুলিকে জানিয়ে দিলেন যে, সি পি এম এই হত্যার জন্য দায়ী।

আরও বলেন যে, তাদের ধরা হয়েছে তারা সি পি এম কর্মী। পরের দিন তদন্তে জানা গেল যে, বখশ শ্রীমুখার্জী এই সংবাদ দেন তখনও পর্বন্ত তদন্তই শুরু হয় নি এবং কোন প্রাপ্তিও হয় নি।

পরে পুলিশ একটি সাত বছরের মেয়ের সম্মান পায়। হত্যার সময় বাড়ীর উঠানে সে পাতকুরো থেকে জল তুলছিল। হত্যাকারীরা রক্তমাখা ছুরি সমেত দৌড়ে গিয়ে তার সামনে দিয়ে পাঁচিল উপক্কে পালায়।

পুলিশ এই মেয়েটির সংবাদের উপর ভিত্তি করে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। তারা কেউই সি পি এম কর্মী নয়। এমনকি নকশাল-পন্থী বলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। পুলিশের তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষ করে একটি এলাকায় নির্বাচন পড় করতে শব্দ নকশালপন্থীরাই নয়, অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলও উঠে পড়ে লেগেছে। এই পন্থ করার ব্যাপারে সব চেয়ে সহজ অথচ নিশ্চিত পথ হল প্রার্থী হওয়া।

শ্রীদেবদত্ত মন্ডল নিহত হওয়ার পর বাংলা কংগ্রেস নেতা সুশীল ধাড়া উখড়া কেন্দ্রে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন সি পি এম-এর বিরুদ্ধে প্রচারের

অনেক কিছু সংগ্রহ করা হবে। কিন্তু ফিরে আসার পর আর তার মুখে কথা নেই।

কিন্তু বর্ধমানের পুলিশ কর্তার আচরণ অস্বস্ত। কারণ প্রথমে তিনি বলেন সি পি এম এই হত্যার জন্য দায়ী। পরে কিন্তু তদন্তে অন্য ঘটনা জানার পর তিনি আর আগের ভুল তথ্য সংশোধন করেন নি।

আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দলই যে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিপক্ষে চাঁৎকার শব্দ করেছে তাই নয় পুলিশের একাংশও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অবশ্য পুলিশ খুব কারদা করে এই কাজ করেছে।

সম্প্রতি কলকাতা, হুগলী জেলার চন্দীতলা ও বীরভূমের সিউড়িতে তিনটি রাজনৈতিক দলের কর্মী খুন হন। কলকাতা ও হুগলীতে মারা যান সি এস পি ও ফরোয়ার্ড ব্লকের দুই কর্মী এবং সিউড়িতে নব কংগ্রেসের নির্বাচন প্রার্থী শ্রীযদুগোপাল রায় নিহত হন। প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই নিহতদের দলীয় নেতারা সি পি আই (এম)-কে দায়ী করে বিবৃতি ছাড়েন।

পরবর্তীকালে পুলিশী তদন্তের ফলে কিন্তু আসল ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। জানা গেল কলকাতার ঘটনার জন্য দায়ী নকশাল-পন্থী বলে বর্ণিত কিছু লোক,

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অবশেষে পশ্চিম বাংলার সি পি এম বিরোধী রাজনৈতিক দল-গুলি প্রচেষ্টা হেমন্ত বসুর হত্যাকে ইলেকশানের মূলধন করেছেন। এরা তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, সি পি এম-ই হেমন্তবাবুকে খুন করেছেন। সংগে দু-একখানা শব্বরের কাগজও মদত দিচ্ছে। কিন্তু দর্পণ পুলিশী সূত্রে জেনেছে, এই খুনের সঙ্গে-

সি পি এম-এর কোন সম্পর্কই নেই। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বলেছেন, “এলাকাটি নকশাল আঘাতও নকশালী কায়দার। আর কিছু বলতে পারবো না।” অফিসারটির নাম দেবার উপায় নেই। কেননা, ও’র ভর তা হলে চাকরী নিয়ে গোলমাল হবে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর প্রচুরা পুলিশকে বারণ করেছেন। সি পি এম বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল-গুলো চাপ সৃষ্টি করছে।

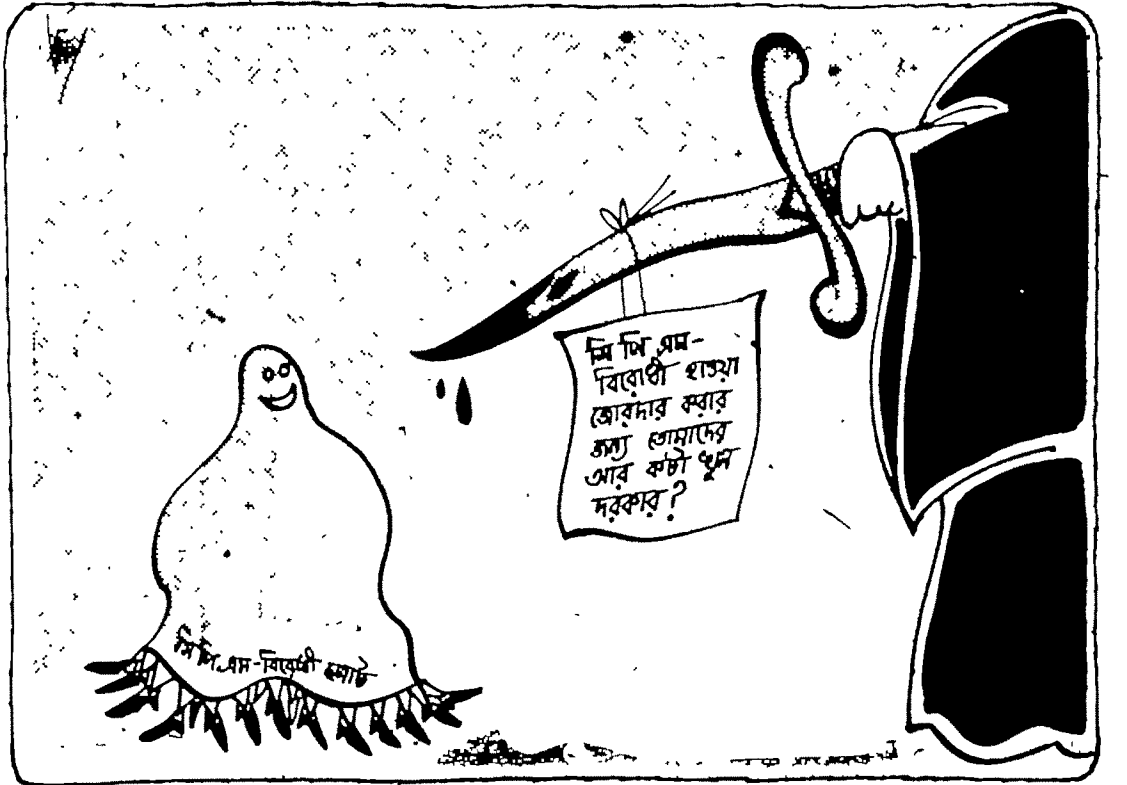
কিন্তু তবু একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। সেটি হচ্ছে, আজ পর্যন্ত কলকাতার ডেপুটি কমিশনার, গোরেন্সা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার কিংবা অন্য কোনো উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার সরকারীভাবে বলেন নি, হেমন্ত বসুর খুনের ব্যাপারে সি পি এম জড়িত। শব্দ বৃগান্তরে এই মর্মে (সেবাংশ ২য় পৃষ্ঠার)

হেমন্ত বসুর হত্যা সম্বন্ধে জ্যোতি বসু

(দর্পণের সংবাদদাতা)

“শ্রীহেমন্ত বসুকে হত্যার ব্যাপারে সি পি এম-এর যোগ্য যোগের কথা অবাস্তব, উদ্দেশ্য প্রণোদিত—কারণ শ্যামপদকুরের যে এলাকায় এই কাণ্ড ঘটেছে সেখানে সি পি এম কর্মীরা গত কয়েকমাস ধরে ঢুকতে পারছে না এবং পুলিশকে এ সম্পর্কে বহুদিন ধরে নাকশ জ্ঞানানো সঙ্গেও অবস্মার কোন উন্নতি হয় নি।”

এই কথা মার্কসবাদী নেত্রী জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গ সংসদকে জানিয়েছেন রাইটার্স (সেবাংশ ২য় পৃষ্ঠার)



পুলিশের অপপ্রচার দুর্গাপুরে সি পি আই প্রার্থীকে আদ কংগ্রেস প্রার্থী সাহায্য করছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দলই যে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিপক্ষে চাঁৎকার শব্দ করেছে তাই নয় পুলিশের একাংশও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অবশ্য পুলিশ খুব কারদা করে এই কাজ করেছে।

সম্প্রতি কলকাতা, হুগলী জেলার চন্দীতলা ও বীরভূমের সিউড়িতে তিনটি রাজনৈতিক দলের কর্মী খুন হন। কলকাতা ও হুগলীতে মারা যান সি এস পি ও ফরোয়ার্ড ব্লকের দুই কর্মী এবং সিউড়িতে নব কংগ্রেসের নির্বাচন প্রার্থী শ্রীযদুগোপাল রায় নিহত হন। প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই নিহতদের দলীয় নেতারা সি পি আই (এম)-কে দায়ী করে বিবৃতি ছাড়েন।

পরবর্তীকালে পুলিশী তদন্তের ফলে কিন্তু আসল ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। জানা গেল কলকাতার ঘটনার জন্য দায়ী নকশাল-পন্থী বলে বর্ণিত কিছু লোক,

হুগলীর ঘটনার ঘটর “পরিচিত কিছু সমাজবিরোধী মারা কোন দলের দলো, বৃদ্ধ নয়” এবং শব্দ-গোপাল রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হয়েছে কিছু স্থানীয় এস ইউ সি দলের প্রার্থী।

এই তথ্য সম্প্রতি সাংবাদিকদের জানান পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বড়কর্তা শ্রীপ্রসাদ বসু। অবশ্য বসু মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরোধও করেন সাংবাদিকদের, যে তাঁরা যেন এস, ইউ, সির নাম না ছুঁতেন কারণ তাতে নাকি “লাইবেল” হতে পারে। ফলে এই তথ্য, যা সরকারীভাবে প্রাপ্ত, তা কোথাও প্রকাশিত হয় না। অবশ্য চন্দীতলার ঘটনার পর এই ভুললোক সাংবাদিকদের কাছে, কোনরকম তদন্তের আগেই বলেন “বোধহয় সি পি (এম) এর কাজ।” তখন কী “লাইবেলের” কথা তাঁর মাথায় আসেনি?

(দর্পণের সংবাদদাতা)
বর্ধমানে নির্বাচনী আবেহাওয়া সি পি এম-এর অনুকূলে। এই জেলায় অনেক কেন্দ্রে সি পি আই ও শাসক কংগ্রেস এক জোট হয়ে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে নেমেছে। যেমন আসানসোল ও বর্ধমান শহর কেন্দ্রস্বর।

আবার দুর্গাপুর কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী শ্রীনিমাই রাউত আপত্তিভাবে আদি কংগ্রেসের শ্রীআনন্দ গোপাল মুখার্জীর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাচ্ছেন।

আনন্দবাবুর ধারণা শ্রীরাউত যত বেশী ভোট পাবেন ততই তাঁর নিজের জয় সুনিশ্চিত হবে, কেননা শ্রীরাউত বামপন্থী ভোট ভাঙবেন। ১৯৬৭ সালে সি পি আই-এর ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীনীহার মুখার্জী এই কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন। আর ছিলেন এখনকার মত দুই প্রার্থী, আনন্দবাবু আর সি পি এম-এর শ্রীদিলীপ মজুমদার। তখন নীহারবাবু প্রায় তিন

হাজারের মত ভোট পাওয়ার আনন্দবাবু পরাজিত হলেন মাত্র সাতশ ভোটে। আর ১৯৬৯ সালে আনন্দবাবু আর দিলীপবাবু লড়াই-এ দিলীপবাবু সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়সূচক ভোটে সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেন।

তাই এবারে আনন্দবাবু আদি কংগ্রেস প্রার্থী হলেও সি পি আই-এর প্রচারে সাহায্য করছেন আর সি পি আইও অকুণ্ঠভাবে এই সাহায্য নিচ্ছেন একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে এবং তা হলঃ সি পি এম প্রার্থী দিলীপ মজুমদারকে পরাজিত করা। বর্ধমান শহরে প্রার্থী ছিল আদি কংগ্রেসের শ্রীদাশরাধি তা, নব কংগ্রেসের শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য আর সি পি এম-এর শ্রীবিনয় চৌধুরী। হঠাৎ দাশরাধীবাবুর আনোদয় হল, তিনি শেষ মূহুর্তে বিধানসভা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন। এই আনোদয় পরম বোধোদয় থেকে সি পি (সেবাংশ আশ্রয় পৃষ্ঠার)

বঙ্গদর্শন

জনক্য সরকার

নির্বাচনে ব্যাপক হত্যা রাজ-
নৈতিক পথ ও কৌশল হিসাবে
শক্তিমূলক চালাই হয়েছে। প্রায়
এক রাজনৈতিক দলই এখন অস্তিত্ব
হারা আর তাদের কর্মীরা কম-
বেশী অস্ত্র ব্যবহারে দীক্ষিত। এমন
কি মনে প্রাণে গান্ধীবাদী শ্রীঅজয়
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও হিংসাত্মক
রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠে-
ছেন। বরানগরে এক নির্বাচনী
ভাষ্য তিনি বলেছেন যে, তিনি
সমতায় প্রতিষ্ঠিত হলে সি পি
এমকে পিটিয়ে সিধে করে দেবেন।
যশাই এই পথ গান্ধীবাদী পথ
নয়। আজ অজয়বাবু বা অন্যান্য
রাজনৈতিক নেতাদের ভাবার সমস্ত
একচেঁহে কি ভাবে এই রাজ্যে হিংসা-
ত্রয়ী রাজনীতি ক্রমশঃ গেড়ে বসল।
এর দায়িত্ব কি অজয়বাবু এড়াতে
পারেন? ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্ত-
ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভাঙ্গার জন্য কে
দায়ী? বাংলা কংগ্রেসের এম এল
এ-রা দলত্যাগ করে চলে গেল,
তারপর অন্যান্য কয়েকটি দলের এম
এল এ-রাও। শেষে ১৯৬৭ সালের
সেসরা অক্টোবর অজয়বাবু গোপনে
কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে
মন্ত্রীসভার পতন ঘটাবার ব্যবস্থা
গ্যাকা করে ফেলেন।

তার অভিযোগ ছিল সি পি
এম-এর সঙ্গে চলা যায় না। অতএব
এই পার্টির সঙ্গে সরকারে থাকা
সর পক্ষে অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত
তার পক্ষে সরকারের পতন হল
না। হল অন্য পথে। কিন্তু প্রকাশ
পেরে গেল কিভাবে অজয়বাবু
তখনকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
শ্রীচাক্রনের সঙ্গে যোগাযোগ করে

মন্ত্রীসভা ভাঙ্গার ব্যবস্থা করে-
ছিলেন।

তারপর ১৯৬৯ এর নির্বা-
চনে যুক্ত ফ্রন্টের বিরাট সাফল্য
বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে
সহযোগিতার পথে কাজ করতে
শেখায় নি—শিখিয়েছে কি ভাবে
অপর পক্ষের প্রসারে এবং প্রভাব
বিস্তারে গায়ের জ্বালায় পরস্পরের
বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করতে হয়।
১৯৬৯ সালে মন্ত্রীসভা গঠনের
প্রচেষ্টার সময় থেকেই যড়যন্ত্র সূর্য
হয়ে যায়। সব দলই লেগে যায় কি
করে সংখ্যাধিক্য থাকা সম্বন্ধে
মাকসবাদীদের কোণঠাসা করা যায়।
শেষ পর্যন্ত অজয়বাবুর নেতৃত্বে
মন্ত্রীসভা গড়ে উঠল, কিন্তু মন্ত্রী-
সভা মনের দিক থেকে দুভাগ হয়ে
রইল সূর্য থেকেই। একদিকে
মাকসবাদীরা আর অন্যদিকে
অজয়বাবু এবং সি পি আই জোট।
প্রায়ই অজয়বাবু ও প্রবীণ নেতা
শ্রীসোমনাথ লাহড়ীর গোপন লগা-
পরামর্শ চলতে লাগল।

পশ্চিম বাংলার কাসেমী স্বার্থ
সংগঠিত। তারা অবশ্যই যুক্তফ্রন্ট
মন্ত্রীসভায় খুশী ছিল না। তারা
নানাভাবে বাংলা দেশে বামপন্থী
হাওয়ার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা
করতে লাগল। প্রথমে এখান থেকে

শিল্প তুলে নিয়ে যাওয়ার আর এই
রাজ্যকে অর্থনৈতিক সংকটে ডুবিয়ে
দেওয়ার হুমকি, আর পরে সরাসরি
রাজনৈতিক আসরে নেমে দলাদলি
আর সংঘর্ষ বাড়াবার চেষ্টা করল।
লাখ লাখ টাকা খরচ হল বোমা
তৈরীর জন্য। বেকার যুবকেরা জুটে
গেল টাকার লোভে। সংঘর্ষের
রাজনীতি সূর্য হল গ্রামে শহরে।

এই কথা অবশ্যই স্বীকার
করতে হবে যে, বহু সংখ্যক সমাজ-
বিরোধীরা সি পি এম-এ ঢুকে
পড়ল আর পার্টির ঘোষিত রাজ-
নীতি সম্বন্ধে নানা পার্টি-বিরোধী
কাজ পার্টির নামে চলতে লাগল।
পার্টির নেতারা বহু রিপোর্ট পেতে
লাগলেন পার্টির নামে সমাজ-
বিরোধীদের কাষকলুষ সম্পর্ক।
নেতারা হঠাৎ পার্টির আয়তন
বৃদ্ধিতে দিশেহারা। কি করবেন
কিছু ঠিক করতে পারছেন না।
বহুদিন সংশোধনবাদের পথে রাজ-
নীতি করে সংগঠন ও রাজনীতির
শুদ্ধতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা
ও গুরুত্ব সম্পর্কে বোধ হারিয়ে
ফেলেছেন। আর তারপর যে ভাবে
আক্রমণ আসতে আরম্ভ করল তাতে
পার্টির অনিচ্ছ নেতারা বিপর্যস্ত
হয়ে পড়লেন। অনভিজ্ঞ বলছি এই
এই জন্য যে, তারা এর আগে এবং

১৯৬৭ সালের সেসরা অক্টোবর
এবং ১৯৬৯ সালের সরকার গঠ-
নের সময় যড়যন্ত্রের তাৎপর্য বুঝে
তার জন্য সাংগঠনিক ও রাজ-
নৈতিক প্রস্তুতি করার কথা আগে
থেকেই চিন্তা করেন নি।

সংঘর্ষ বিবাদের মধ্যে দিয়ে এক
বছরের মধ্যে শ্রিতীয় যুক্তফ্রন্ট সর-
কার পড়ে গেল। এর পর আরম্ভ
হল প্রচণ্ড সি পি এম বিরোধী
প্রচার সি পি আই, অজয়বাবু আর
অন্যান্য সমস্ত পার্টি একত্রিত হয়ে।
এতে সি পি এম এর শক্তি সংহত
করার দিন এল। এই পার্টির সংগ-
ঠন শক্তি এই আক্রমণের মধ্যে আরও
দৃঢ় হয়ে গেল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে
নির্বাচন সংগঠিত হওয়ার আদেশ
এল। সূর্য হল নির্বাচনী আতা-
তের কথাবার্তা। অজয়বাবু নিজেকে
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক গতির
একমাত্র নিয়ামক বলে মনে করে
নিলেন। প্রথমেই তিনি বলে নিলেন
যে, সাম্যবাদের সঙ্গে যাদের সামান্য-
তম যোগাযোগ আছে তাদের সঙ্গে
কোন কথাই তার পক্ষে বলা সম্ভব
নয়। তাঁর ধারণা ছিল তিন কংগ্রে-
সকে এক ফ্রন্টে এনে বামপন্থাকে
অস্তিত্ব কিছদিনের জন্য ঠেকিয়ে
রাখবেন। কিন্তু তা হবার নয়।
বামপন্থীদের মধ্যে সংকট ব্যাপক
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংক-
টেরই প্রতিফলন। আর এই সংকট
খালি বামপন্থীদেরই বিপর্যস্ত
করবে আর দক্ষিপপন্থীরা এক হয়ে
যাবে তা ত আর হবার নয়। সংকট
যখন তীব্র হয় তখন সমাজের প্রতি-
শ্রুতকেই ধসিয়ে দিতে থাকে—
আর সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত হয়
তারা যারা পুরানো পথে নতুন সম-
স্যার সমাধান খোঁজেন।

দক্ষিপপন্থী জোট সম্পূর্ণ
হল না। রাজ্য রাজনীতিতে দুটি
পরিষ্কার ভাব দেখা গেল—সি পি
এম পক্ষ আর সি পি এম বিরোধী।
এই ভাগে আট পার্টি জোটের
অবস্থা কাঁহিল। তারা সি পি এম
বিরোধী ভাগে পড়ে গিয়ে মানুুষের
সামনে দক্ষিপ পন্থার সামিল হয়ে
গেছেন।

নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে
দেখা গেল সি পি এম বিরোধী
শিবির বহুধা বিভক্ত। এর ফলে
ভাবনা দাঁড়াল হয়ত বা কম ভোট
পেয়েও সি পি এম এককভাবে
বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে
যাবে।

এই অবস্থায় সি পি এম
বিরোধী প্রায় সমস্ত দলই নকশাল-
দের স্মরণাপন্ন হলেন সি পি এম-কে
ঠেকাবার জন্য। নকশালরাও
“মাকসবাদী-জেনিনবাদী”। স্ব-
বাদের প্রয়োগে তারা দেখলেন এই
সুযোগ। নির্বাচন বানচাল করার
কাজে দক্ষিপপন্থীদের একাংশের
সহায়তা কাজে লাগানো মত ও
পথের দিক থেকে বিচ্যুতি নয়।

দক্ষিপ পন্থার সহায়ক কাসেমী
স্বার্থ ভাবল উগ্র বামপন্থীকে
কিছুটা লাগাম ছেড়ে যদি সি পি
এম-এর সংগঠিত শক্তিকে ভাঙা

জ্যোতি বসু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশিষ্ট দুটি সাক্ষাৎকারে। বহু-
বার শ্রীবসু মুখ্য নির্বাচনী কমি-
শনার শ্রীরাঘবনের সঙ্গে ও পদলিখ
সচিব, শ্রী বি আর গুপ্তের সঙ্গে
দেখা করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই
কথা বলা যে, শান্তিপূর্ণভাবে
নির্বাচন চালাতে গেলে খালি
ঘোষণা করে বসে থাকলে চলবে
না, উপযুক্ত পদলিখী ও প্রশাস-
নিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
তাঁর মতে পদলিখের একাংশ রাজ-
নৈতিক দলাদলিতে অংশ গ্রহণ
করছে এবং সি পি এম-কে কোণ-
ঠাসা করার যে রাজনীতি অন্যান্য
রাজনৈতিক দলেরা বেশ কিছু দিন
ধরে চালিয়ে আসছে পদলিখ তাতে
মদত যোগাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গেই, শ্রীহেমন্ত বসু
হত্যার কথা ওঠে। শ্রীজ্যোতি বসু
বলেন যে, পদলিখ জানে বরানগর
এবং শ্যামপুকুরের কিছু কিছু
জায়গায় সি পি এম কর্মীদের
প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে—আর
এই সমস্ত জায়গায় পদলিখের
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যে সমাজ-
বিরোধীরা তাদের কাজ কারবার
চালাচ্ছে।

শ্রীবসু বলেন যে, নকশাল-
পন্থীরা তাদের ঘোষণানুযায়ী
নির্বাচন বানচাল করতে চায়। এবং
এই কার্যক্রম অনুযায়ী তারা এবং
তাদের সহযোগীরা নির্বাচন প্রার্থী
হত্যা অন্যতম পথ হিসাবে গ্রহণ
করছে। বেশীর ভাগ রাজনৈতিক
দল সি পি এম-এর কাছে নির্বাচনে
পরাজয় সূচনীয়ভাবে জেনে নকশাল-
পন্থী ও সমাজবিরোধীদের সাহায্য
নিচ্ছে।

শ্রীবসু অভিযোগ করেছেন যে
দিন দিন খুন বেড়ে চলেছে এবং
তার বেশীর ভাগই ঘটছে কয়েকটি
বিশেষ এলাকায়। পদলিখ এই
এলাকাগুলি কেন আয়ত্তে আনতে
পারে না তা তাঁর বোধগম্য নয়।
এখন উপদ্রুত অগুণ বসতে শহর
আর শহরতলীর কয়েকটা জায়গা,
এবং বর্ধমান, হাওড়া ও চন্দ্রশ-
পুর্গগার কয়েকটি অঞ্চল। এই
কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চলকে
বাগে আনা খুব কষ্টসাধ্য বলে
শ্রীবসুর মনে হয় না।

শ্রীবি আর গুপ্ত, অভিযোগের
উত্তরে বলেছেন যে, সরকার জেলা
ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে রিপোর্ট
চেষ্টে পাঠিয়েছেন এবং শীঘ্রই উপ-
যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যায় তবে আশ্বেরে ভাল হবে।
এই রাজনীতির দুই বলি উৎ-
সার বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীদেব-
দত্ত মন্ডল আর কলকাতার শ্রীকান্ত
করেন্দ্র নেতা শ্রীহেমন্ত বসু।

আজ ভাববার সময় এসেছে—
কোন কিছুই ধরে রাখা যাবে না।
কাসেমী স্বার্থ মরিয়া হয়ে আক্রমণ
সূর্য করেছে। প্রতিরোধ প্রয়োজন।

হেমন্ত বসুর হত্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শবর বেরিয়েছে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের
ইনেক মুখপাত্র নাকি বলেছেন, সব
সম্মতি নির্বাচন প্রার্থী খুনের ঘটনা-
তেই সি পি এম জড়িত। বঙ্গা-
স্তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কোন মুখ-
পাত্র বলেছেন তার নাম উল্লেখ
নাই। হেমন্ত বসুর হত্যার
ব্যাপারে সি পি এম জড়িত বলে
সরকারী ভাবে কোনো পদলিখ
অফিসার মন্তব্য করেন নি। তাহলে
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের “মুখপাত্র” এই
তথ্য পেলেন কোথায়?

হেমন্ত বসুর খুন সম্পর্কে
প্রথমে পদলিখ দুজনকে গোপ্যার
করে। এরা হচ্ছে অশোক ঘোষাল
আর প্রবাল দেব ওরফে গুন্ডা।
অশোক ঘোষাল টাউন স্কুলের দশম
শ্রেণীর ছাত্র। খুনের ঘটনার পর
ঘটনাস্থলের কাছে একে ছুটেতে
সহায় গোপ্যার করা হয়। অবশ্য,
তখন অনেকেই জাত থেকে ছোটো-
ছোট করছিলেন। যে দুটি ছেলেকে
ধরা হয়েছে তাঁদের সন্দেহ করেই
ধরা হয়েছে। ব্যাপারটি বিবেচনা-
ধীন। তাই অপরাধ সম্পর্কে এদের
কোনো দায়িত্ব আছে কি না তা
আদালতের বিচার্য বিষয়। আগ-
লব্দ এদের কোন রাজনীতি আছে

কি না তাঁর খবর বলছি। অশোকের
কোন সক্রিয় রাজনীতি আছে বলে
কেউ জানেন না। তবে, ছেলেটি
স্থানীয় জনৈক ফরোয়ার্ড ব্রক
নেতার আশড়ায় বেতো বলে খবর
পাওয়া গিয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্রক
রাজনীতিতে কোন অংশ গ্রহণের
খবর পাওয়া যায়নি। তবে এটি
নিশ্চিত, অশোক একজন ফরোয়ার্ড
ব্রক নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। শ্রিতীয়
জন প্রবাল দেবকে (ওরফে গুন্ডা)
পদলিখ কুকুরের নিশানায় গোপ্যার
করা হয়েছে। প্রবাল শোভারাজারের
দেববাড়ীর ডঃ সুধীর দেবের
ছেলে। পরিবারটি গোড়া কংগ্রেসী।
বঙ্গ-বিহার একীকরণের সময় জন-
মত যখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়ে-
ছিল তখন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়
এঁদের বাড়ীতে সভা করেছিলেন।
কেননা, তখন বাইরে জনসভা করা
সম্ভব ছিল না। শ্রীমান প্রবাল
সুরেন্দ্রনাথ কল্লেকের তৃতীয় বার্ষিক
শ্রেণীর ছাত্র। তবে কলেজে বড়
একটা যায় না। কাজ ছিল, পাড়ায়
তাস খেলা, রেস্টোরাঁর আড্ডা
দেওয়া। এক কথায় মাস্তানী। ওর
কোন রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক
আছে বলে কেউ জানে না। পদলি-
খও কোন হদিশ পায় নি। কিন্তু
তবু বলা হচ্ছে সি পি এম খুন
করছে। এরপর প্রচণ্ড সি পি এম

বিরোধী চাপে পদলিখ কয়েকদিন
পরে শিবু বলে একটি ছেলেকে
গোপ্যার করেছে। একে সি পি এম
সমর্থক বলা যেতে পারে। কিন্তু
মজার ব্যাপার হচ্ছে, শিবুর আবার
হাত কাটা। ওকে লোকে হাত-
কাটা শিবু বলেই ডাকে। হাতকাটা
বাঁহি নিশ্চয়ই ছোরা চালাতে পারে
না। পদলিখও সেকথা বলছে।
কিন্তু উপায় নেই। ওপরের চাপ
আসছে।

আবার বলছি, এরা অপরাধী
কি না তা বিচার্য বিষয়। কিন্তু
রাজনীতির প্রশ্নে এখানে সি পি
এম কোথায় আসছে?

পশ্চিম বাংলার বীরা রাজ-
নীতি বোঝেন তাঁরা কোন রাজ-
নৈতিক বিশ্লেষণেই হেমন্ত বসুর
খুনের সঙ্গে সি পি এম-কে
জড়িতে পারছেন না। কেননা, সি
পি এম খুন করলে কি প্রচণ্ড
প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা কি সি
এম বোঝে না? কিন্তু উপায় নেই।
বিরোধীদের এখন এই একমাত্র
অবলম্বন। তাঁরা তুলে যাচ্ছেন,
খুনোখুনিতে সি পি এমেরই খুন
হয়েছে প্রায় দুশো জন।

পশ্চিম বাংলার এখন সি পি
এম-কেই খুন করা হচ্ছে। ভরসা,
এই করে যদি এদের আটকানো
যায়।

জ্যোতি বন্ধন দমন বন্ধন ও সরকারী প্রেস নোট

(দলপতির পর্ববন্ধন)

রাজ্যপাল খাওয়ান, প্রধান পুরা-
মর্শদাতা বি বি খোষ, মধ্য সচিব
এন সি সেনগুপ্ত, স্বরাষ্ট্র সচিব বি
আর গুপ্ত, এবং পুন্ডলিশের ইনস-
পেক্টর জেনারেল প্রসাদ বন্দু রাজ-
ভবনে জরুরী বৈঠকে মিলিত
হয়েছিলেন। আলোচ্য বিষয় সি
পি এম নেতা এবং প্রাক্তন উপ-
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্দুর একটি
বক্তৃতা। বক্তৃতাটি বেরিয়েছে হিন্দু-
স্থান স্ট্যান্ডার্ডের। (আনন্দবাজার
গোষ্ঠী) যোগেই ফেরারী তারি-
খের প্রথম পৃষ্ঠায়। পত্রিকাটির
উত্তর শহরতলীর সংবাদদাতা
পাঠিয়েছেন।

শ্রীমদ দমনদের নতুন মরদানে
এক জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে গিয়ে
নাকি বলেছেন যে যে সব পুন্ডলিশ
কর্মচারী সি পি এম এর বিরুদ্ধে
যড়যন্ত্রে লিপ্ত তারা তাদের একটা
অলিঙ্কা তৈরী করছেন। সি পি
এম সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে
যুগোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা
হবে। বলা বাহুল্য হিন্দুস্থান
স্ট্যান্ডার্ডের সংবাদদাতা কথাগুলি
কোডেশন দিয়ে পাঠান নি। তবুও
সংবাদটি এমন গুরুত্ব পেয়েছে যে
পুন্ডলিশের রাজ্যপালের সভা-
পতিয়ে রাজভবনে এই উচ্চ পর্যায়ের
বৈঠক বসেছিল।

বৈঠকের পরে একটি সরকারী
প্রেসনোট প্রকাশ করে যা বলা
হয়েছে সেটাও চমৎকারিভাবে অভিন-
ব।

“যদি রিপোর্ট সত্য হয়ে
থাকে” বলে আরম্ভ করে তাহলে
কমতায় আসার আগেই পুন্ডলিশকে
তার পার্টিকে সমর্থন জানাতে হবে
এবং কমতার আসবার জন্যে এই
পার্টিকে সাহায্য করতে হবে বলে
প্রকাশ্য দাবী জানানোর সামিল।
বলে প্রেসনোটে বলা হয়েছে। “এই
দাবী অভিনব ও অস্বাভাবিক” প্রেস
নোটে আরো বলা হয়েছে, “আইনা-
নুসারে, এই পার্টি যদি কমতার
আসে তাহলে তারা সংবিধান ও
আইনের শাসন ভঙ্গ করে রাজ্যের
শাসন পরিচালনা করবেন এই
ভীতি প্রদর্শনের সামিল।”

প্রেসনোটে আরো বা বলা
হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি কথা
গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হিন্দুরা কংগ্রে-
সের শাসনাধীন পুন্ডলিশে আরো
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন
হতে যাচ্ছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত
একটি সংবাদের ওপর ভিত্তি করে
এককম সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
শুধু অভিনব এবং অস্বাভাবিক নয়,
কোন এক বিশেষ পার্টির প্রতি
অন্যায় ব্যবহারে পুন্ডলিশ প্রশাসনকে
প্ররোচনা দেওয়ারও সামিল।

শুধু তাই নয় এই প্রশাসনের
একজন কর্মচারী প্রধান নির্বাচনী
অফিসারও বটেন। তিনিও সাংবা-
দিকদের কাছে এই তথ্যটিতে
বক্তৃতা নিয়ে যত্নবদ্ধ করেছেন,
দিল্লীতে প্রধান নির্বাচনী কমি-

শনারকে রিপোর্ট দিয়ে জানতে
চেষ্টা করেন যে জনপ্রতিনিধি আই-
নানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা
উচিত কিনা।

নির্বাচনে পুন্ডলিশের রাষ্ট্র-
পতি শাসনের বেনামীতে কংগ্রেসী
শাসন কাঠগড়ায়। কয়েক সপ্তাহের
মধ্যে পুন্ডলিশের ভোটারেরা এ
সম্পর্কে তাদের অভিমত জানাবেন।
রাজনৈতিক দলনেতারা জনগণের
সামনে তাদের বক্তব্য বলছেন। যেমন
অজয়বাবু সি পি এমকে ভোট না
দিচ্ছে বরং আত্মহত্যা করেন বলে-
ছেন। তা বলে কি অজয়বাবুকে
প্রচলিত আইনে “আত্মহত্যার
প্ররোচনাদানকারী” বলে গ্রেপ্তার ও
বিচারের সম্মুখীন হতে হবে?

এককম শত শত বক্তব্য—এমন
কি সাধারণভাবে আপত্তিকর মন্তব্য
সবলের নেতারা করছেন। সি
পি এম এখনো পুন্ডলিশকে নিষ্কর
করে রেখেছেন, তাদের সঙ্গে যড়-
যন্ত্র করে অন্যান্য দলকে ক্ষয়
দেখাচ্ছে এমন অভিযোগও ফরওয়ার্ড
রক, এস ইউ সি, সি পি আই করে-
ছেন।

কিন্তু রাজ্যপাল খাওয়ান এবং
তার অসীম গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীরা কি
করে এ সম্বন্ধে এলেন যে
পুন্ডলিশ কতক কোন পার্টির
বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করার অভিযোগ
এবং প্রতিকারের আশ্বাস দানের
অর্থ এই পার্টি কমতার এলে
হেন করবে তেন করবে বলে সর-
কারী প্রেসনোট প্রকাশ করতে
হবে।

এ প্রেসনোটের ভাষা থেকে
সন্দেহ হয় যে সরকারী প্রশাসন-
বস্তুর একাংশ এবং একদল পুন্ডলিশ
কর্মচারী সত্যই সি পি এম
বিরোধী যড়যন্ত্রে লিপ্ত কি না।
প্রেসনোটের ভাষাটী এমন পরি-
ষ্কার যে স্টেটসম্যানের মত পত্রিকাও
পুরো প্রেসনোটটী ছাপাতে লজ্জা
পেয়েছেন।

দিল্লীর কতরা বোধ হয় অতটা
বোকা নন। তারা একটু দুঃখ
প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

তারা সম্ভবতঃ জানেন যে কোন
দল নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন
করে নির্বাচিত হলে তারাই সর-
কার গঠন করবেন। প্রশাসন ও
পুন্ডলিশ কর্মচারীদের তাদেরই
নীতি মেনে চলতে হবে।

জ্যোতিবাবুর বক্তৃতার রিপোর্ট
সঠিক কি না, তার কাছে জেনে
প্রেস বিজ্ঞপ্তিটী প্রকাশ করলেই
শোভন হত। এবং সেই বিজ্ঞপ্তিতে
জ্যোতিবাবুর পার্টি সংবিধান ও
আইন মেনে চলবে কি না এ সন্দেহ
প্রকাশ না করাটাই ভদ্র হুঁচিসম্মত
ও নিরপেক্ষ মনোভাবের নিদর্শন
হত।

তা হয় নি। কারণ পুন্ডলিশ-
বঙ্গের প্রশাসন যে নিরপেক্ষ নয়
তা এই প্রেসনোটের ভাষাতেই ধরা
পড়েছে।

পুন্ডলিশবঙ্গের জনসাধারণের
কাছে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। গত
প্রায় এক বছরের রাষ্ট্রপতির বেনা-
মীতে কংগ্রেসী অপশাসনে আইন-
শৃঙ্খলার এত অবনতি ঘটেছে যে
তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।
পুন্ডলিশ প্রশাসন সক্রিয় হলে, এর-
কম ঘটতে পারে না। আজ পর্যন্ত
কোন হত্যার কিনারা হয়েছে বলে
শোনা যায় নি। একথা মনে
হবার কারণ ঘটতে পারে যে সংবাই
না হলেও অন্ততঃ একদল পুন্ডলিশ
কর্মচারী বর্তমান অবাধ ক্ষমতার
সুযোগ ছাড়তে গরাজী। ধানার
লক আপে পিটিয়ে মারার
ঘটনা, বারাসাত ও সল্ট লেকের
হত্যাকাণ্ড, কিছ, কিছ, নিরীহ
কনসেন্ট্রেল, খুন—এবং খুনী দলের
অবাধ বিচরণ—সব কিছ মিলে
জনমনে এ সন্দেহ বৃদ্ধি পেয়েছে
যে পুন্ডলিশের একাংশ এই ধরনের
কাছে উৎসাহ জোগাচ্ছে। তা না
হলে এ ধরনের অপরাধ নিরমিত
ঘটতে পারত না।

শুধু জ্যোতিবাবুর পার্টি নয়

অন্যান্য অনেক পার্টিও পুন্ডলিশের
পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির কথা
ঘোষণা করেছেন।

প্রেস নোটের দায়িত্ব ধারা
নিরেছেন তারা কি বলতে চান যে
এসব অপরাধমূলক কাজের দোষী
ব্যক্তিদের শাস্তি দেবার দাবী
অন্যায়?

পুন্ডলিশবঙ্গের বর্তমান প্রশা-
সনিক কতৃপক্ষ যে নিরপেক্ষ নন
তার প্রমাণ এই প্রেসনোট। আরো
অনেক প্রমাণ দপ্তরে দপ্তরে খুঁজে
পাওয়া যাবে হয়ত। কিন্তু একটি
মাত্র অভিনব দৃষ্টান্ত এখনো জড়
জড় করছে। সেটা হল দ্বিতীয়
বৃহত্তম সরকারের আমলে বিধান-
সভা আক্রমণের অভিযোগে দায়ী
উৎসানিদাতা ও অপরাধীদের সুবি-
ধানের ৩১১ নং ধারার বরখাস্ত
করা হয়েছিল। এই ধারাটি আদা-
লতের বিচারযোগ্য নয়।

শ্রীমদবোধ দত্ত ঐ ধারার বর-
খাস্ত হয়েছিলেন। তিনি হাই-
কোর্টে মামলা করেন। পুন্ডলিশ-
বঙ্গে শত শত মোটা মাইনের

আমলা পোষা হচ্ছে, ঐ মামলার
সরকার পক্ষে কেউ হাজির হন
নি। ফলে মামলাটিতে এক তরফা
সিদ্ধান্ত হল। সুবোধবাবু পুন-
র্বাহাল হলেন।

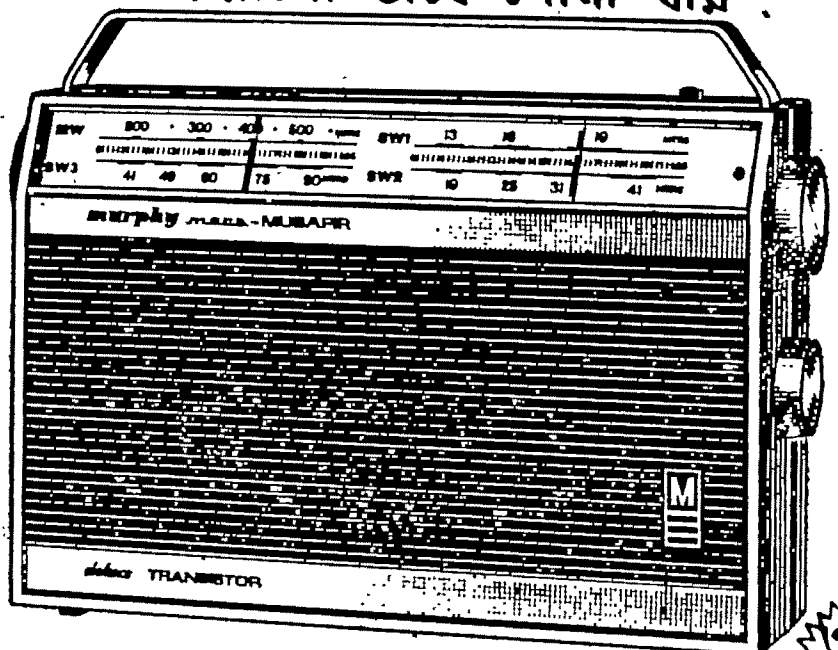
বিধানসভা ভবন ধারা আক্রমণ
করেছিল সেই সাধারণ কনসেন্ট্রেল-
দের চেয়েও উৎসানিদাতাদের অপ-
রাধ অনেক বেশী। পুন্ডলিশবঙ্গ
প্রশাসন কতৃপক্ষ আবার সেই
উৎসানিদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ
হলেন।

কিন্তু এটাই তো স্বাভাবিক।
রাজ্যপাল খাওয়ান প্রায় প্রতি
সপ্তাহে ঘন্টার পর ঘন্টা পদত্যাগ-
কারী মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর সঙ্গে
সলাপরামর্শ করেন। এতো অজয়-
বাবু নিজেই বলেছেন সাংবাদিক-
দের কাছে। অজয়বাবু আটক
আইন চান, মিলিটারী নামাতে
কলেন, রাজ্যপাল খাওয়ানের প্রশা-
সন তা কার্যকরী করেন।

একদিন ধর্মবীরও প্রফুল্ল
ঘোষের সঙ্গে একইভাবে জনবি-
রোধী ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত ছিলেন।
পুন্ডলিশবঙ্গের মানুষ তা সহ্য করে
নি। তাই ধর্মবীর বৈদ্য পুন্ডলিশ-
বঙ্গ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন
সৈদ্যন হাওড়া স্টেশনে প্রশাসনের

(স্বদেশ ও পুন্ডলিশ)

মারফি মেরু-মুসাফির প্রত্যেক স্টেশন স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে শোনা যায়



৪-ব্যাণ্ড ডিলাক্স ট্রানজিস্টর

এমআই ডিউট সবেত।
অত্যন্ত চ্যাপ বস্ত্র।

- সারা হিন্দিয়ার যে কোনও স্টেশন পাওয়ার জন্য অলওয়েভ।
- জোরালো আওয়াজ।
- আপনার পছন্দমত স্বর কম-বেশী করার জন্য হাই-লো টোন কন্ট্রোল।
- অদৃশ্য ফেরাইট রড ও লুপ এরিয়েলের ব্যবস্থা থাকার দরুন অতি সহজে স্টেশন ধরা যায়।
- মৃদু, হিম্মাম, উচ্চস্বরের পলিগ্লিটনের হু-রঙা ক্যাভিনেট।
- ডায়াল স্কেল লম্বা ও সুস্পষ্ট এবং তাড়াতাড়ি সহজে টিউনিং করার জন্য হুটি কাটা আছে।
- বড় সাইজের ব্যাটারীতে চলে। এলিমিনেটর লাগিয়ে নিলে, কিসলীতেও চালানো যায়।

পরিষ্কার, প্রাণবন্ত ও জোরালো এককথার নিশ্চিত ধ্বনি
পরিবেশন করার জন্যই প্রত্যেক মানসিক এখন “ম্যাপশিটিউক”

মারফি সার গ্রুপ প্রাইভেট লিমিটেড



নির্বাচনী পর্ব : উত্তর ও পশ্চিম ভারত

(বিশেষ পর্বসংকলন)

পশ্চিম ভারতের গুজরাট ও মহারাষ্ট্র, উত্তর ভারতের পঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজস্থান, হিমাচল, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ।

গুজরাটে লোকসভার মোট আসন সংখ্যা চব্বিশ। বাতিল বিধানসভার অবিস্তৃত কংগ্রেস পেরে-ছিলেন এগারোটি আসন, ভোট পেয়েছিলেন চৌত্রিশ লক্ষের সামান্য বেশী (৪১.০৮%) স্বতন্ত্র দল দশটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দশটি আসনেই জেতেন, ভোট পান ফুড়ি লক্ষ আটত্রিশ হাজার (৩৩.১১%), নির্দলরা তিনটি আসন ও প্রায় সাড়ে আট লক্ষ ভোট পান (১৩.৬৭%), পি এস পি, এস এস পি ও রিপাবলিকান দল, মিলে দু' লক্ষের কিছু বেশী ভোট পান, আসন একটাও না।

এবার কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত। রাজ্যের মন্ত্রিসভা আদি কংগ্রেসপন্থী। স্বতন্ত্রদের একাংশ নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। রাজ্যের মন্ত্রিসভা মাঝে মাঝে টল-টলায়মান হয়। গুজরাটের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের কুদে নৃপতিদের বৃহদাংশ হিন্দুরা গান্ধীর সুনজরে থেকেই রাজনৈতিক রক্ষা সম্ভব বলে মনে করেন। স্বতন্ত্রের প্রভাব কমেছে, মোরারজীর এই খাস তালুকে নব কংগ্রেস বৃহত্তর করতে পেরেছে। জুনাগড় ও আহমেদাবাদ আসন দুটি এবারও বামবেশী প্রার্থী নির্বাচিত করবে মনে হয়। বৃহৎ শিল্পপতিদের আদি কংগ্রেস প্রার্থী হতে দেখা যাচ্ছে। বুলসার, গান্ধী-নগর, বনস্কন্ঠ, আমরেলি, মোহাদ, দাভর এবং সুরাত আদি কংগ্রেস, কুচ, জামনগর, ভরনগর, মোহাদ এ কয়টি আসন অনিশ্চিত। স্বতন্ত্র পার্টি এবার সবরকন্ঠ, গোদরা

আসন দুটি নিশ্চিত হারাবেন মনে হয়। মোটমোট নব কংগ্রেস নয়টি, আদি কংগ্রেস পাঁচ থেকে ছয়, স্বতন্ত্র চার এবং নির্দলীয় দুই থেকে তিনটি আসন পারার সম্ভাবনা।

মহারাষ্ট্রে নব কংগ্রেসের বেশীর ভাগ আসনই দখল করার সম্ভাবনা। তবে ভাবী লোকসভার বিজয়ী মারাঠা সদস্যেরা প্রায় সবাই শ্রীচাবনের অনুগত বলে শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ হিন্দুরাজী যেভাবে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবসন্তরাও দাদা পাতিলের এবং শ্রীভি, পি, নারেকের বোধ সহ-যোগিতায় অধিকাংশ মারাঠা সদস্যের আনুগত্য লাভের আশা করেছিলেন, তা সম্ভব হয় নি।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ভি, পি নারেক এমন কথাও বলেছেন যে যদি লোকসভার পন্থতাল্লিশটি আসনের মধ্যে চল্লিশটি আসন নব কংগ্রেস দখল না করতে পারেন তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন।

মহারাষ্ট্রের বৃহত্তর বোম্বে শহর বাদ দিলে গ্রামাঞ্চলে স্বতন্ত্র, জনসংঘ বা আদি কংগ্রেসের প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ। এবার মহারাষ্ট্রে গ্রামাঞ্চলীয় কটর কম্যুনিষ্ট বিরোধী নন। তবে শ্রীনারেক যে ভাবে বলছেন তত সহজে নব কংগ্রেসের চল্লিশটি আসন দখল করা সহজ হবে না। অন্ততঃ চোম্বাটি আসনে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বৃহত্তর বোম্বের পাঁচটি আসনের মধ্যে নব কংগ্রেস একটি আসনও লাভের আশা করতে পারেন নি। গ্রামাঞ্চলের বাকী চল্লিশটি আসন একতরফা ভাবে দখল করার সম্ভাবনা নেই বলে মনে হয়। রাজপুত্রে শ্রীনাথ পাই-এর আসনে পি এস

পি প্রার্থী অধ্যাপক মধু দণ্ডওয়া-তের সঙ্গে সক্তবাদী রাজা শিব-রাম রাজে ভেঁসিলে (কংগ্রেস-শা) এবং মিসেস সারদা মুখার্জি (আদি কং), প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর-ছেন। এ আসনটি পি এস পি রক্ষা করতে সমর্থ হবেন মনে হয়। জম্ভারা থেকে শ্রীঅশোক মোটা; আদি কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীজগদীশসদা দুবে সহ নয়জন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মু-খীন। তাঁর পক্ষে আসনটি রক্ষা করা কঠিন।

ভারত দর্শন

ভিওয়ালা, নাগপুর এবং কোলাপুরের আসনে জয়লাভ করা নব কংগ্রেসের পক্ষে খুবই কঠিন। আসল কথা হচ্ছে নব কংগ্রেস সাতটি সালের মোট প্রাপ্ত ভোটের (অবিভক্ত কংগ্রেস শতকরা আট-চল্লিশটি ভোট পেয়েছিলেন) কতটা রক্ষা করতে পারবেন।

সাতটি সালে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা সহিষ্ণুটি। এবার শ্রীভি, পি নারেকের আশানুযায়ী চল্লিশ না হলেও আটত্রিশটি হতে পারে। এস এস পি নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজের আসনটি বিখ্যাত টাটা পরিবারের শ্রীমেনভাল টাটার হাতে বিপন্ন। শ্রীভালো দাঁড়াচ্ছে না, তবে বোম্বে সেন্ট্রাল-সাইথে সি পি আই প্রার্থী সি পি এম-এর সক্রিয় সম-র্থন পাচ্ছেন। প্রমিক অধ্যুষিত এ অঞ্চলে সি পি আই কঠিন হলেও এ আসনটি রক্ষা করতে পারবেন মনে হয়। কোলাবার আসনটিও পেজান্টস এন্ড ওরাকার্স পার্টি রক্ষা করতে সক্ষম হবেন, এটা প্রায় অবশ্যিক। ভিরএ সি পি আই-এর নানা পাতিল আসনটি হারাবার সম্ভাবনা। পুনা শহরে এস এন্ড বোশী দাঁড়াচ্ছে না, তবে পুনা শহর বামবেশী স্বভাব বদলাবে বলে মনে হয় না।

শেষ পর্বন্ত অঘটন না ঘটলে নব কংগ্রেস আটত্রিশ, এস এস পি দুই, আদি কংগ্রেস তিন, সি পি আই এক এবং নির্দল এক, এই হিসাবে মহারাষ্ট্রের নির্বাচন ফল প্রকাশ পেতে পারে।

পঞ্জাব : সাতটি সালের নির্বাচনে মোট তেরটি আসনের মধ্যে অবিভক্ত কংগ্রেস নয়টি আসন ও বোল লক্ষ ভোট, সন্ত আকালী দল তিনটি আসন ও সাড়ে নয় লক্ষের কিছু বেশী ভোট, জনসংঘ একটা আসন এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ভোট পান। সি পি আই, সি পি এম, এস এস পি, স্বতন্ত্র ও তারা সিং আকালী দল কেউ এক-টিও আসন পান নি, কিন্তু ভোট

পেরেছিলেন যথাক্রমে এক লক্ষ তিরিশ হাজার (তিন), একাশি হাজার (দুই), সতেরো হাজার (এক), দু' লক্ষ উনিশ হাজার (ছয়) ও এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার (সাত) ভোট পান। বন্দনীর মধ্যে এই দল-গুলি যে সংখ্যক আসনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তা দেওয়া হল।

সাতটি সালে পঞ্জাব বিধান সভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি। সন্ত আকালী নেতৃত্বে জনসংঘ, সি পি আই, প্রগতি দল কোয়ালিশন, সরকার গঠন করেন। উনোশতর সালের উপ-নির্বাচনে মোট একশো চারটি আসনের মধ্যে সন্ত আকালী দল তিশপাশটি আসন লাভ করে। সি

মধ্যে লাড়াই করছেন। প্রাক্তন নৃপতিবর্গ রাজস্থানে প্রচণ্ড বিরুদ্ধে নব কংগ্রেসের প্রার্থীদের পরাস্ত করতে উদ্যোগী, আবার জয়পুর, বিকানীর, ভরতপুর বাদ দিলে বোধপুর, চিতোর এবং উদয়পুরের রানারা নব কংগ্রেসকে সাহায্য কর-ছেন। তা না হলে শ্রীসুধাদিয়া যতই বলদুন না কেন, নব কংগ্রে-সের পক্ষে দশটি আসনও রক্ষা করা অসম্ভব হত।

রাজস্থানে এবার স্বতন্ত্র ও জনসংঘের সদস্য সংখ্যা অধিকেরও বেশী কর্মে যাবার সম্ভাবনা। সি পি এম এবার অন্ততঃ একটি আসন দখল করবে মনে হয়। নির্দল নৃপতিবর্গ বিকানীর, বোধপুর, ভরতপুর, ঝালওয়ার, কোটা, টংক, আজমীড় ও আলোয়ার আসনগুলি দখল করে নিতে পারেন। তাহলে স্বতন্ত্র একটি, জনসংঘ দুটি আসন কম পাবে। নব কংগ্রেসের আসন দশটি অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

উত্তর প্রদেশের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে সালে মোট পঁচাত্তরটি আসনের মধ্যে সাতচল্লিশটি আসন অবিভক্ত কংগ্রেস দখল করে, তাদের ভোটের সংখ্যা ছিল প্রায় তিরিশতর লক্ষ (৩০.৫০%) এর পরেই জনসংঘ। আসন পান বারো, ভোট ছেচল্লিশ লক্ষ আশী হাজার, (২১.১৮%) এস এস পি-পান আটটি আসন, ভোট পান বাইশ লক্ষ সহিষ্ণু হাজার, (১০.২১%), সি পি আই পাঁচ ও সাত লক্ষ ষাট হাজার, সি পি এম, একটি আসন ও দু' লক্ষ ষাট হাজার ভোট, স্বতন্ত্র একটা আসন ও দশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার ভোট পেয়েছিলেন, পি এস পি দুটো আসন ও আটলক্ষ পনেরো হাজার ভোট, রিপাবলিকান পার্টি একটা আসন ও নয় লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ভোট পান। নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা ছিল একশ একানব্বই, তাঁদের আটজন নির্বাচিত হন, তাঁদের মোট ভোট সংখ্যা ছত্রিশ লক্ষ পন্থাটি হাজার।

উত্তর প্রদেশ : উনিশ সাতটি সাধারণতঃ কৃষক ও শ্রমিক আন্দো-লনের প্রভাব বেশী। এখানে প্রধা-নতঃ বামপন্থী প্রার্থীরা বেশী ভোট পান। পশ্চিমাঞ্চলে মন্ডলিম, জাঠ ও যাদব সম্প্রদায় নিজেদের সম্প্রদায়গত প্রার্থীদের ভোট দেন। এবার নব কংগ্রেস বামপন্থী স্লেগান নিয়ে নির্বাচনে নেমেছেন। আদি কংগ্রেস, জনসংঘ ও এস এস পি বোধভাবে ছাপাশটি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। বাকী আসন-গুলির মধ্যে আটটিতে আদি কংগ্রেস ও এস এস পি, ছয়টিতে জনসংঘ ও এস এস পি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নব কংগ্রেস উনিশ সাতটি সালের বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বিভক্ত ভোটের সুযোগ নিয়ে শত-করা সাড়ে তেত্রিশ ভাগ ভোট পেয়ে জয়ী হতে পারার সুবিধা পাবেন না।

তবে নব কংগ্রেসের ভোট ১৯৬৭ সালের শতকরা হারের দুই

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

সরকারী গ্রেস নোট

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

একটা পোকাও তাকে সমবেদনা জানাতে যায় নি।

জ্যোতিবাবু অপরাধী পুলিশ-দের তালিকা করার কথা যদি নাও বলে থাকেন, আমাদের মনে হয় এবার নির্বাচনী সভায় এ আশ্বাস দেবার জন্যে তার ও তার দলের কাছে দাবী উঠবে।

কারণ জনসাধারণের মনের চাপা ক্ষোভ ও বিক্ষোভ এবারের নির্বাচনে বেপরোয়া পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কে প্রতিকার প্রার্থী। যে দলই জয়ী হতে চান তাদের পুলিশী অত্যাচারের উপবৃত্ত প্রতী-কারের আশ্বাস দিতে হবে ও তা কার্যকরী করতে হবে।

১৯৪৬ সালের পাঁচই অক্টো-বর সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দাঁড়িয়ে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু লখনৌ জন-সভায় এ আশ্বাস দিয়েছিলেন,

কিন্তু তা কার্যকরী করেন নি। তিনি বলেছিলেন, "চারদিকে যদুপারাদীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে। সেদিন আর দূরে নেই বেদিন আমরাও আমাদের দেশের বিজাতীয় অপরাধীদের তালিকা প্রস্তুত করবো। যারা নির্দলভাবে আমাদের দেশপ্রেমিকদের মেরু-দণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল, তাঁদের ওপর গুলি চালিয়েছিল, যারা উৎকোচ ও দুর্নীতি দিয়ে আমাদের গরীব জনগণের অনবরত রক্ত পান করে চলেছিল আমরা কখনো তাদের ক্ষমা করবো না।"

আজ জওহরলালজীর কন্যার রাজ্যে একই অভিব্যক্তির পুনরা-বৃত্তি করে জ্যোতিবাবু যদি প্রতি-কারের আশ্বাস দিতে থাকেন, তা-হলে পিতৃপ্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকারের জন্যে কন্যা হিন্দুরাজীর তীব্রদার দল জ্যোতিবাবুদের ভীতি প্রদর্শন করলেও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত বোধ কর-বেন।

মধ্য শিক্ষা পর্ষতে অচলাবস্থা

কর্মচারীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের অবিচার

আড়াই লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভাগ্য নিয়ে ছেলেখেলা

দেশের আড়াই লক্ষ পরীক্ষার্থীর সামনে যখন স্কুল ফাইনাল হাজার সেকেন্ডারী পরীক্ষার খড়্গা ঝুলছে, পাঠ্য মধ্য শিক্ষা পর্ষতের অফিসে তখন সম্পূর্ণ কর্মবিরতি এবং অচলাবস্থা। পর্ষৎ কর্মীরা আন্দোলনে নামবার আগে বহুভাবে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছেন। ফল হয়নি। প্রতিবারেই কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের দিকে আঙুল দেধিয়ে কর্মী দাবি নস্যাত করে কর্মীদের পরীক্ষার কাজ তুলে দিতে বাধ্য করেন। কর্মীদের দাবী অনাদারী পড়ে থাকে। অথচ সমগ্র দেশে সর্বত্র যখন কর্মচারী মহল নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায় করে নিচ্ছেন, জনসাধারণের মধ্য চরে পর্ষৎ কর্মীরা তখন প্রতিবারই আন্দোলনের পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন এবং শোষণের শিকার হয়েছেন। কিন্তু দুরবস্থা সহ্যাতীত হলে নিরীহ পাখীতেও ঠোকরায়। পর্ষৎ কর্মচারীরা অল্প চুপ করে থাকতে পারেন নি তাই এ বছর তুরা আন্দোলনে নামার সময় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরীক্ষা গ্রহণের এবং ব্যর্থতার জনগণের কাছে জবাবদিহির দায়িত্ব কর্তৃপক্ষেরই। কর্মীরা বেতনভুক্ত কর্মচারী মাত্র।

ভারতবর্ষে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎদের মত এমন আর কোন প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে কর্মচারীরা অন্তত বিবিধ সুযোগ (প্রভিডেন্ট-ফান্ড এবং গ্র্যাচুয়িটি অথবা পেনশন এবং গ্র্যাচুয়িটি) পান না। পর্ষৎদের মত এমন কোন প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই অবসরকালীন বিবিধ সুযোগ (পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি এবং প্রভিডেন্ট-ফান্ড) দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্মচারীদের পক্ষ থেকে গ্র্যাচুয়িটি প্রথা প্রবর্তনের দাবী দীর্ঘদিন আগে তোলা হলেও আজও পর্ষৎ তার কোনো সুদ্রাহা হয়নি। আন্দোলনের চাপে পশ্চিমেটি সালে পর্ষৎদের সভায় কর্মচারীদের গ্র্যাচুয়িটি প্রদানের জন্য একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বর্তমান মধ্যশিক্ষা আইন অনুযায়ী উক্ত প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। কিন্তু অদ্যাবধি সেই অনুমোদন এসে পৌঁছায়নি। ফলে পর্ষৎ কর্মচারীগণ আজও শূন্য হাতেই চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এই গ্র্যাচুয়িটি দিতে যে অর্থের প্রয়োজন তা বহন করার ক্ষমতা পর্ষৎদেরই আছে এবং

একথা বহুদিন পূর্বেই সরকারকে জানানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই দীর্ঘদিন পর্ষৎ কর্মচারীদের এই ন্যূনতম ন্যায় দাবী থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারী খাত থেকে টাকা দেবার প্রয়োজন থাকলে হয়ত সরকার পক্ষ কিছু যুক্তির অবতারণা করতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে তেমন যুক্তিও নেই। তাছাড়া কথায় কথায় সরকার ঘোষণা করেন যে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের কোন সুযোগ সুবিধা দিতে কর্তৃপক্ষ যদি রাজী থাকেন সরকারের সেখানে আপত্তি করার কিছু নেই। কার্যত কিন্তু পর্ষৎদের সভাপতি এবং সচিবের পদে সরকার নিজের পেটোয়া ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করে থাকেন এবং আমলাতন্ত্রের নিয়ম নিয়মানুসারে সরকারী নির্দেশ জারী হয় এই সভাপতি এবং সচিবের কাছে যে, বঞ্চিত কর্মচারীদের কিছুমাত্র সুবিধা দানেও বতখানি পারো দেবী কর।

পর্ষৎ কর্মচারীদের বেতন হার সংশোধনের প্রশ্নটিও দীর্ঘদিন উল্লেখিত। পর্ষৎ গঠিত হবার পর সাময়িক ভাবে সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের কর্মচারীদের অনুরূপ বেতন দেওয়া হতে থাকে পর্ষৎ কর্মচারীদের। পর্ষৎদের কর্মচারীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বেতন হার সর্ব প্রথম প্রস্তাবিত হয় একষাটি সালে। সেই বেতন হার কর্তৃপক্ষ কর্মচারী উত্তর পক্ষের সম্মতি অনুসারে স্থিরীকৃত হয়। সেই বেতন হার চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পর্ষৎদের ছিল। তবুও বাবাটি সাল পর্ষৎ সরকার সে বেতন হার প্রদানের জন্য অনুমোদন না দিয়ে তদানীন্তন পর্ষৎ পরিচালককে অন্যত্র বদলী করে সেই জায়গায় একজন নতুন পরিচালক নিয়োগ করেন। পর্ষৎ অফিসে এসে বার প্রথম কাজ হয়, পূর্বোক্ত বেতনহার প্রস্তাবীক করে বাবাটি সালে কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত বেতনহার (ডাইরেক্ট-রেট) হুবহু পর্ষৎ অফিসে এক তরফা ভাবে চালু করা। বলা বাহুল্য এ ব্যাপারে কর্মচারী সম্মতি আপত্তি জানান সত্ত্বেও কোন কাজ হয়নি। উল্লেখ্য এই যে, এই সময়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন হার বিবেচনার জন্য যে 'পে-কমিটি' গঠিত হয়েছিল, তার কার্যক্রমের মধ্যে কিন্তু পর্ষৎ কর্মচারীদের বেতন হার সংশোধনের প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। গত আগস্ট-মাস থেকে পর্ষৎ কর্মচারীদের যে আন্দোলন চলেছে

তার চাপে বর্তমান পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন যে, পর্ষৎ কর্মচারীদের বেতন হার সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন এবং তদনুসারে কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া বিচার বিবেচনার জন্য পর্ষৎ কর্তৃক একটি সার কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু ষট মাস পার হলে বাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ জানানেন যে বর্তমান হারে সরকারী কর্মচারীদের বেতন হার সংশোধন করা হচ্ছে সেই হারে বেতন হার পুনর্নির্নাস করতে গেলে দুই লক্ষ টাকা পর্ষৎদের অতিরিক্ত ব্যয় ভাব বহন করতে হবে। এখানেও উল্লেখ্য যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত গত 'পে-কমিশনের' বিচার বিষয়ের মধ্যেও পর্ষৎ কর্মচারীদের বেতন-হার সংশোধনের প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের

ব্যাপার পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ এখনও মূখে বলছেন যে সরকারী কর্মচারীদের সমহারে পর্ষৎ কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করার কোন যুক্তি নেই, কেন না পর্ষৎদের কাজের ধরণ সরকারী অফিসের মত নয় এবং পর্ষৎদের আর্থিক অবস্থাও সরকারের অনুরূপ নয়। অথচ গত মোটাই অনুসারী তারিখে এক সভায় পর্ষৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, পর্ষৎ কর্মচারীদের বেতন হার সংশোধনের বিষয়টি আলোচনার জন্য পর্ষৎ থেকে একটি ডেপুটেশন সরকারের কাছে যাবে। কিন্তু কি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য যাওয়া হবে তা ঠিক করা হল না। কোন একটা স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এক ডেপুটেশনে যাচ্ছেন সরকারের কাছে, সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতনহার সংশোধনের বিষয়টি আলোচনার জন্য, অথচ তাদের সেখানে উক্ত বিষয়ে কোন প্রস্তাব নেই। এর অর্থ একটাই, তা হ'ল কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবীটী যখন আর কিছুতেই উপেক্ষা করা যাচ্ছে না তখন একটা অস্থিলায় শূন্য কাল হরণের চেষ্টা। পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ মূখে যে কথা বলেছেন তাই যদি তাদের ইচ্ছা হত তবে নিজেরা নিশ্চয়ই একটা বেতনহার

ঠিক করে নিয়ে সেটা বাতে আঁব-লম্ব কাঁচকরী করা হয় তার জন্য সরকারের কাছে যেতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পর্ষৎদের প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা উত্তর থাকে। গত তিন বছরের হিসাবে ঐ উত্তর টাকার পরিমাণ, উনিশশ সাতষাটি-আটষাটি সালে বাইশ লক্ষ, উনিশশ আটষাটি-উনসত্তর সালে চৌদ্দ লক্ষ এবং উনিশশ উনসত্তর-সত্তর সালে এগারো লক্ষ।

উনিশশ সত্তর সালেই পর্ষৎ এক নিয়ম জারী করেন যে, তিনবারের বেশী কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট হিসাবে পর্ষৎদের পরীক্ষা দিবে পারবে না। ফলে ফী বাবদ আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ প্রচুর কমে যায়। এছাড়া গ্রাউন্ট-ইন-এইড বাবদ পর্ষৎ যে অর্থ ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্কুলে প্রদান করেছেন, সে বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট পর্ষৎদের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ষাট লক্ষ টাকা। যেসব প্রতিষ্ঠানে ষাটটি বাজেট চলছে সেইসব ক্ষেত্রেও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা বোঝায়। কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ষৎদের টাকা উত্তর থাকা সত্ত্বেও সেখান- (শেখাংগ অক্ষয় পুস্তক)

**স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়**

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সঙ্গত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবৎক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় ঔষধসম একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হৃদয় শক্তি ও কুঁচা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অসুস্থদের মধ্যে দ্রুত জরাজীর্ণ ভাব থেকে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যবানী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

**সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিস্ট**
(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ বোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এক.সি.এস., (গেটন)
এস.সি.এস., (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের কৃৎপূর্ব অধ্যাপক।
-কলিকাতা কেন্দ্র: ডাঃ বরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস., (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

চারের চামচের ৪ চামচ
মহাদ্রাক্ষারিস্টের সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সম পরিমাণ জলসহ
প্রত্যাহ দু'বার আহ্বারের
পর সেব্য।

পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি নির্বাচন : একটি সমীক্ষা (২)

দিলীপকুমার সিংহরায়

প্রথম নির্বাচনের তুলনায় দ্বিতীয় নির্বাচন সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জন করে সময় লেগেছিল এবং তৃতীয় নির্বাচন আরও কম সময়ে সমাপ্ত হয়। উনিশশ বার্ষিকীর বোলেই ফেব্রুয়ারী থেকে পশ্চিমে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাড়াতাড়ি নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচনী কমিশন নিশ্চয়ই কৃতিত্বের অধিকারী হবেন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

গত পাঁচ বছরে এই রাজ্যে একটি পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়ে আর একটি পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। দুর্গাপুর শিল্পনগরীর কাজ প্রায় শেষ হয় এবং দুর্গাপুর লৌহ প্রকল্প থেকে উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। বৈদ্যুতিক ট্রেনের প্রচলন হয়। রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ করেকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা উন্নয়নমূলক কাজ হয়। সরকারের এই সব কাজের ফলে কিছু কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। যদিও তা প্রয়োজনের অনুপাতে অত্যন্ত সামান্য।

অপর দিকে করকবর বন্য়ার কসলের নিদারুণ ক্ষতি হয়। কোথাও বা ধরার প্রকোপেও শব্দহীন হয়। প্রবাসীদের উৎসাহিত রোধ করার জন্য সরকারের দুর্বল নীতি জনসাধারণের সহায় সাহায্য এসে দাঁড়ায়। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও হ্র হ্র করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হলেও তা খাতার কলমে থাকে। সাধারণ কৃষক বা ভাগচাষীর ভাণ্ডে কোনই উপকার হয় না। রাজস্বের এ সব অসন্তোষের প্রতিফলন অত্যন্ত তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয় উনিশশ উনষাট সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। বামপন্থী দলগুলি প্রধানতঃ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই সময় এক তীব্র শাসন আন্দোলন করেন। বহুলোক এই আন্দোলনের খবর ছিল।

এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত দেশে এক কংগ্রেস বিরোধী মানসিকতা গড়ে ওঠে।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই লাডক অঞ্চলে চীন-ভারত এক সংঘর্ষের প্রথম কমিউনিস্ট বিদ্রোহ প্রচণ্ড ভাবে দানা বাঁধতে থাকে। উনিশশ ষাট সালে চীনের প্রধানমন্ত্রীর ভারত আগমন ও দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সমঝোতার ভাব সৃষ্টি হলেও এ রাজ্যে কমিউনিস্ট বিদ্রোহের স্রোত একই ভাবে বইতে থাকে। মোটামুটি এরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পশ্চিম বাংলার তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাজনৈতিক দল

পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যেকই এবারও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়াও পূর্বদিল্লী জেলার স্থানীয় দল লোকসেবক সংঘ ও দার্জিলিং জেলার স্থানীয় দল গোষ্ঠী

লাগ এবার স্বনামে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। শেখোজ দলটি স্বাধীন শাসনের দাবীতে স্থানীয়ভাবে আন্দোলন করেন। এই দলগুলি ছাড়া দক্ষিণপন্থী দল নামে অভিহিত এবং ভারতের করেকটি অঞ্চলে বিশেষ প্রভাবশালী স্বতন্ত্র দল এই প্রথম এই রাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

এবারও বামপন্থী দলগুলির কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি মোর্চা হয়। এই মোর্চার কমিউনিস্ট ছাড়া অন্যান্য দলগুলি হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, আর সি পি আই, বঙ্গশৈলিক পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী)। বস্তুতঃ শেখোজ তিনটি দলের অনেক প্রাথমিক কমিউনিস্ট দলের প্রত্যেক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। না হয় নির্বাচন প্রাথমিক হিসাবে দাঁড়ান। কারণ নির্বাচনী কমিশনের পরিসংখ্যানে এই দলগুলির কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

গত নির্বাচনে যে দলটি মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, এবার সে দলটি শ্রম ফরওয়ার্ড ব্লক দল হিসাবেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। একটি ক্ষুদ্র অংশ মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক হিসাবেই থাকেন।

পি এস পি দল এবার এককভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। অবশ্য এতে বামপন্থী মোর্চার পক্ষে ভলিই হয়েছিল বলা চলে। কারণ, এই দলের মত ও আন্দোলনের সময়ে এই দলের নেতাদের আচরণ, এদের বামপন্থী দল অপেক্ষা শাসক দলের অনেক কাছাকাছি বলে জনসাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে এস ইউ সি দল মোর্চার সঙ্গে কোনও মতৈক্যে আসতে পারেন নি। তাই এবারও এরা মোর্চার বাইরে রয়ে গেলেন।

নির্বাচনী কেন্দ্র ও ভোটার সংখ্যা

গতবারের মতই এবারও নির্বাচনী কেন্দ্রগুলি একই থাকে। দুশো বাহ্যিকটি বিধান সভার সভ্য নির্বাচন করার জন্য মোট ১,৭১,১০৪০ জন ভোটার তালিকাভুক্ত হন। এই সংখ্যা গতবারের তুলনায় প্রায় উনিশশ লক্ষের মত কম। যদিও আদম শুমারী অনুযায়ী রাজ্যের লোক সংখ্যা বেড়ে ৩,৪১,২৬,২৭১ জন।

নির্বাচনী ফলাফল

এবার মোট ১৬, ২৮২১ জন বৈধভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এই সংখ্যা গতবারের তুলনায় প্রায় আট লক্ষের মত কম। যদিও শতাংশের হিসাবে এবার বৈধ ভোটদাতাদের সংখ্যা যে কোন নির্বাচন অপেক্ষা অনেক বেশী। ৫০.৫ শতাংশ বাকি এবার বৈধভাবে ভোট ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

দুশো বাহ্যিকটি আসনের জন্য

এবার মোট রাজনৈতিক দলের মোট ছোড়া ছোড়া জন প্রার্থী এবং নির্বাচনী দুশো পচিশজন সহ মোট নব্বিশ বাট জন এবার নির্বাচনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

একটি আসনে এবারও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নি। বলাবাহুল্য এ আসনটি কংগ্রেস দল লাভ করেন।

নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে কংগ্রেস দল তাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। অন্ততঃ আসন সংখ্যার বিচারে। কিন্তু তাদের সমর্থক সংখ্যা এবার প্রায় তিন লক্ষের মত কম গিয়েছে। এবার শতাংশের হিসাবে এই দল আগের নির্বাচন অপেক্ষা এক শতাংশের কিছু বেশী লাভ করেছেন। এবার তালিকাভুক্ত ভোটারের সংখ্যা কম। উত্তর বঙ্গের কংগ্রেস আধিপত্যে এবার ফাটল দেখা যায়। কুচবিহার জেলার এই দলের শোচনীয় হার হয়। মাত্র একটি আসন লাভ করেন। অনুরূপ ভাবে পশ্চিম দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়ও এই দল পরাস্ত হন। নদীয়া ও বীরভূম জেলার ষাটটিতেও ফাটল দেখা যায়। পঞ্চালত্রে কলকাতা, চন্দ্রাশ পরগণার এই দল আশাতীত সাফল্য লাভ করেন। মেদিনীপুর ও পূর্বদিল্লী জেলাতেও এই দলের সাফল্য অস্বাভাবিক। বাকী জেলাগুলিতে কংগ্রেস দল প্রকল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হন। এবার কংগ্রেস দলের প্রতি প্রার্থী গড় ভোট পান ১৮১৮৪। এই সংখ্যা সমগ্র রাজ্যের উপর নিপীত গড় অপেক্ষা প্রায় আট হাজারের মত বেশী। অষ্ট গড়বারের তুলনায় প্রায় এক হাজারের মত কম। এর দ্বারা জনপ্রিয়তা হ্রাসের ইঙ্গিত বোঝা যায়।

কংগ্রেস দলের পর রাজ্যের বৃহত্তম দল কমিউনিস্ট পার্টি। প্রথম নির্বাচন থেকে শুরু করে এই দল জনসমর্থনের সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি করে

আসছেন। যদিও আসন লাভের দিক থেকে বিচার করলে এই দল মাত্র একটি আসন বাড়তে সমর্থ হয়েছেন। কংগ্রেস দলের জনসমর্থন যেমন প্রায় তিন লক্ষের মত কম গেছে, কমিউনিস্ট দলের কিন্তু সেখানে পাঁচ লক্ষের মত জনসমর্থন অর্থাৎ প্রায় আট শতাংশের মত বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই দলের আসন সংখ্যা এত কম হলে কেন? এই সমস্যা নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করে তদানীন্তন পার্টির অভিমত ছিল যে শহর ও শিল্পাঞ্চলে পার্টির সদস্যদের মধ্যে অত্যধিক মাত্রার আত্মতুষ্টির ভাবই এই সব অঞ্চলে এই দলের বেশী আসন না পাওয়ার হেতু।

জেলাগুলির মধ্যে বর্তমান জেলার এই দলের সাফল্য অস্বাভাবিক। এই দলের লজ্জা পঞ্চাশটি আসনের মধ্যে দশটি আসনই এই জেলা থেকে আসে। তারপর বাকী জেলায়ও এই দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন। কলকাতা, হাওড়া ও চন্দ্রাশ পরগণার ফলাফল এই দলের পক্ষে সৌভাগ্য। অন্যান্য জেলার অবস্থা এই দলের সাফল্য বা অসাফল্যের ইতিবাচক হার নি।

এবার বোল হাজার পাঁচ চারটির মত ভোট, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি প্রার্থী গড়ে লাভ করেছেন। এই সংখ্যা যদিও রাজ্যের উপর নিপীত গড় অপেক্ষা প্রায় সাড়ে ছয় হাজারের মত বেশী তবু গতবারের গড় অপেক্ষা অনেক কম। এটা পার্টির পক্ষে দুর্বলতার সূচক।

কমিউনিস্ট দলের পর ফরওয়ার্ড ব্লকের সাফল্য মাত্র তেরোটি আসনে। কুচবিহার জেলার এবার এ দলের সাফল্য অস্বাভাবিক। অপর হাওড়া ও বীরভূম জেলাতেও এ দল অনেক সংগঠিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

আর এস পি দল সতেরোটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নব্বইটি আসন লাভ করেন। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার এই দলের কৃতিত্ব সর্বাধিক। বৃহত্তমের মধ্যে কমিউনিস্ট দলের পরই আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক দলের প্রার্থীরাই প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট রাজ্যের উপর নিপীত গড়

ভোট অপেক্ষা বেশী পেয়েছেন।

এবারকার নির্বাচনে এস ইউ সি ও ওয়ার্কার্স দলের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। বস্তুতঃ বামপন্থী মোর্চার সঙ্গে এদের সংঘর্ষে কংগ্রেস দলেই রই লাভ হয়।

পি এস পি দলের প্রতি জনসমর্থন বিশদ্রু ভাবে হ্রাস পায়। এই দল গত নির্বাচন অপেক্ষা কুড়িটি আসনে বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র পাঁচটি আসন লাভ করেন। গত নির্বাচনের পর যেমন এই দলকে একটা প্রধান রাজনৈতিক শক্তি বলে মনে হয়েছিল সে তুলনায় এবার এ দলের সাফল্য অত্যন্ত নগণ্য।

গত নির্বাচনের মত এ নির্বাচনেও দক্ষিণপন্থী দলগুলি কোন আসন লাভ করতে পারেন নি, উপরন্তু এই সব দলের প্রতি জনসমর্থন পূর্ববর্তী নির্বাচন অপেক্ষা আরও হ্রাস পায়। বস্তুতঃ রাজ্যের রাজনীতিতে এদের প্রভাব শূন্যের কোঠার।

স্থানীয় দলের মধ্যে দার্জিলিং জেলার গুর্খা লীগ দলের প্রথম আত্মপ্রকাশ দুটি আসন লাভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বদিল্লী জেলার লোক সেবা সংঘের ফলাফল কিছু পূর্বে সাফল্য অনুভব করি নি। গত নির্বাচনে এই দলের অধিকাংশ প্রার্থী নির্বাচন হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এগারোটির মধ্যে সাতটি আসন লাভ করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে এবার মাত্র চারটি আসন লাভ নিশ্চয়ই এই দলের কৃতিত্বের নির্দেশক নয়।

যাই হোক গত নির্বাচনে বামপন্থী ও বামপন্থী নয় এই দুই দিকে যে রাজনৈতিক সমাবর্তন শুরু হয়েছিল তা এবার আরও প্রকটভাবে দেখা যায়। বামপন্থী মোর্চা এবারও বিকল্প সরকারের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে সে প্রত্যয় তারা জাগাতে পারেন নি শহর ও শহরান্তরে তাদের আত্মতুষ্টির মনোভাবও বামপন্থী দলগুলির পক্ষে সরকার গঠনের প্রশাসন বহুল পরিমাণে কাহত করেছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস সাফল্য

এবার একটি আসনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নি। বলা বাহুল্য সে আসনটি কংগ্রেস দলের। তা ছাড়া সাতচল্লিশটি কেন্দ্রে দ্বন্দ্বিতা এবং তেরটি কেন্দ্রে ত্রিদ্বন্দ্বিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এবার দ্বন্দ্বিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কংগ্রেস সাফল্যের হার দ্বন্দ্বিতা কেন্দ্রের অনুপাতে কিছু কম হলেও অন্যান্য বহুদ্বন্দ্বিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এদের সাফল্যের হার ক্রমাগত উন্নত। (প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস সাফল্য (৬২) পরের পৃষ্ঠায়)

চতুর্থ লম্বাঘন নির্বাচন ১১৬৭

১১৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের উনিশে তারিখে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। একদিনেই এই রাজ্যের নির্বাচন শেষ করার কৃতিত্বের জন্য নির্বাচনী কমিশন সকল প্রশংসার লোকে কাছের অভিনন্দিত হয়েছেন।

সারণী-৫

দল	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ
১। কংগ্রেস	২৫২	১৫১
২। কমিউনিস্ট	১৪৫	৫০
৩। ফরওয়ার্ড ব্লক	৩৪	১০
৪। আর এস পি	১৭	২
৫। এস ইউ সি	১১	—
৬। ওয়ার্কার্স পার্টি	৮	—
৭। লোকসেবক সংঘ	১১	৪
৮। গোষ্ঠী লীগ	৪	২
৯। জনসংঘ	২৫	—
১০। সি এস পি	৮৭	৫
১১। স্বতন্ত্র	৫২৪	—
১২। হিন্দু মহাসভা	২৫	—
১৩। সোসালিস্ট	৭	—
১৪। সর্বজনীন বিপ্লবী	১৬	১
১৫। নির্দল	২২৫	১১
মোট	১৬০	২৫২

নির্বাচনী ফলাফলের সারাংশ-৬২

প্রার্থী	আসন লাভ	প্রাপ্ত বৈধ ভোট	প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট
১। কংগ্রেস	১৫১	৪৫৮২৪৮৭	৪৭.৬
২। কমিউনিস্ট	৫০	২৩০৩০২৩	২৪.২
৩। ফরওয়ার্ড ব্লক	১০	৪৪১০২৮	৪.৬
৪। আর এস পি	২	২৪৫২৬১	২.৫
৫। এস ইউ সি	—	৬২০৪	০.৭
৬। ওয়ার্কার্স পার্টি	—	২৭০৬০	০.৩
৭। লোকসেবক সংঘ	৪	৬৮৫৮৪	০.৭
৮। গোষ্ঠী লীগ	২	৬৮০৭৬	০.৮
৯। জনসংঘ	—	২৪২৭১	০.৮
১০। সি এস পি	৫	৪৭৭২৫৪	৫.০
১১। স্বতন্ত্র	—	৫৫৪৪৭	০.৬
১২। হিন্দু মহাসভা	—	৭৬১০৮	০.৮
১৩। সোসালিস্ট	—	২৬৬০	০.০
১৪। সর্বজনীন বিপ্লবী	১	৫৮৮০৬	০.৬
১৫। নির্দল	১১	১০৪৮৫১৪	১০.২
মোট	২৫২	৯৬২৮২৩	১০০.০

সারণী-৬ প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস সাংসদ-৬২

প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা	কংগ্রেস দলের সংখ্যা	কংগ্রেস সাংসদের হার
১	১	১০০.০
২	৪৭	৫৫.৩
৩	৬৩	৪২.২
৪	৬৫	১৫.৪
৫	৫০	৬৬.০
৬	১৮	৫৫.৬
৭	৫	১০০.০
৮	৩	৬৬.৭

গতকালিক

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর বহু বিদ্যমান জন এই অতিমত ব্যক্ত করেছেন যে নির্বাচন রাজ্যের রাজনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। সে কারণে গত পাঁচ বছরের সালতাম্যমীর আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৬২-র নির্বাচনের পরেই পরলো জুলাই ৩২ বিধান চম্প রার পরলোক গমন করেন। বস্তুতঃ কংগ্রেস দলের পক্ষে ৩২ রার এক সন্তুষ্ট স্বরূপ ছিলেন। তার প্রজ্ঞা, কর্মকর্তা, ধীশক্তি-কংগ্রেস দলের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী সময়ে অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। একমাত্র তাঁর জন্যই কংগ্রেস দল ছাড়া অন্য কোন বামপন্থী দলের পক্ষে যে সরকার গঠন সম্ভব নয়-এই প্রতীতি জনসাধারণের মনে সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে আগের দৃষ্টো নির্বাচনে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের কাছে এই বোধকে প্রতিহত করাই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

২। ১৯৬২-র সেপ্টেম্বর মাসে চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সংঘর্ষের আকারে নেয়। ফলশ্রুতি হিসাবে সারা রাজ্যে কমিউনিস্ট বিশেষ অত্যন্ত মারাত্মক রূপে তীব্র হয়। কমিউনিস্ট দলের অন্তর্ভুক্ত অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বৃষ্টি পেয়ে এই দলের ভাগ্যের পথ প্রশস্ত করে।

৩। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু উনিশ চৌবাটীর যে মাসে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রীর পদাভিলাষী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ক্রমে ক্রমে শাসক দলের সঙ্কট বৃদ্ধি করে। এই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টি শিখা বিভক্ত হয়।

৪। ১৯৬৫-র মে মাসে পাক-ভারত বৃষ্টি এবং বৃষ্টির দরুন দেশের অর্থনীতিতে তার স্বভাবজ প্রতিক্রিয়া স্রব হয়। নতুন নতুন কর এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রবাল্য অসহনীর হয়ে ওঠে।

৫। কয়েকটি রাজ্যে-পশ্চিম বাংলাতেও খরা এবং তৎকালীন লক্ষ্য-হানি প্রবাল্য বৃষ্টির সহায়ক হয়।

৬। ভারতের আইনের প্রচলন দ্বারা বামপন্থী নেতৃবৃন্দকে নির্বাচনে আটক রাখা প্রচণ্ড গণঅসন্তোষের রূপ নেয়।

৭। প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক সঙ্কট রাজনৈতিক সঙ্কটকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে। বা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হলেও প্রবলভাবে উনিশ চৌবাটীর আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে মারাত্মক শাসন

অবস্থালনের রূপ নেয়। সরকারের চিরাচরিত দমন নীতি এই অবস্থালনকে বাত্যাতিতের ন্যায় সারা দেশময় ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

৮। অন্তর্ভুক্ত পৃষ্ঠ শাসক কংগ্রেস দল এই সময় শিখা বিভক্ত হয়ে যায়। আদিতে যেমন কমিউনিস্ট বিশেষ এই দলের ভাগ্যের পথ প্রশস্ত করেছিল, অন্তে ঠিক তেমনি শাসক দলের প্রতি জনসাধারণের প্রচণ্ড রোষ এই দলকে বিভক্ত করে ফেলল। বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতা কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেস নামে এক নতুন দল গঠন করেন।

এই সময় রাজ্যের জনসাধারণ এক নতুন অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হলেন। এতদিন কংগ্রেস দল কমিউনিস্ট দলের বিরুদ্ধে এবং বিপরীত ভাবে কমিউনিস্ট দল কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে সমালোচনা মূখর হয়ে থাকতেন। এবার কিন্তু অন্যরকম। কমিউনিস্ট দলের এক অংশ অপর অংশের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেস দলও তাদের দলজাগী অংশের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তীব্র ও মারাত্মক ভাবে সমালোচনা চালিয়ে বা সমালোচিত হতে লাগলেন। উদ্দেশ্য অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক-সংগঠন হাতে রাখা ও আরও ভাগ্যের রোধ করা।

এবারকার নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারণা রাজনৈতিক কর্মবলততা এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে রাজ্যের জনসাধারণের মনে এবং চিন্তার এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বোধ হয় স্বাধীনতার পর এই প্রথম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমান গুরুত্ব দিয়ে অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ পূর্ণরূপে সাধারণ্যে আলোচিত হল। কমিউনিস্ট দলের পক্ষে তাদের মতাদর্শের সংগ্রাম জনসাধারণের ভিতর বত ব্যপকতা লাভ করেছিল তা কমিউনিস্ট অবস্থালনের এক স্মরণীয় অধ্যায় হিসাবে স্বীকৃত হবে। রাজনৈতিক এই ঘূর্ণাবর্তে পড়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রথম দিকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবার চেষ্টা করলেও নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই দলগুলির ভিতরও এক সমাবর্তনের ভাব লক্ষ্য করা যায়।

বাই হক মোটামুটি এরূপ পটভূমিকায় উনিশ সাতাটীর উনিশে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্র পুনর্নির্বাচন
১৯৬১-র আদমশুমারী অনুযায়ী রাজ্যের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩,৪১,২০,২৭১ জন। জনসংখ্যার এই

বৃদ্ধি হেতু পুনরায় আসন, বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। এবার রাজ্য বিধান সভার জন্য দুশো আসন নির্দিষ্ট হয়। দার্জিলিং, পুরুলিয়া, কলকাতা ও বাঁকুড়া জেলা ছাড়া প্রত্যেক জেলাতেই আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এবার তালিকাভুক্ত ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭০ ২৫৬ তে দাঁড়ায়।

রাজনৈতিক দল

প্রচলিত ও প্রচলিত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং সে কারণে এই সব দলে ভাগান এবং আরও কিছু নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব এবং নির্বাচন অত্যন্ত জমজমাট হয়।

শাসক দল কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট দল বিভক্ত হয়ে কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) ও কমিউনিস্ট, পি এস পি-র কিয়দংশ ও সোস্যালিস্ট পার্টির মিলনে, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির আর একটি ক্ষুদ্র দল রিভলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টির একটি গোষ্ঠী ঠাকুর গোষ্ঠী নামে অভিহিত হন। এ ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলও আছে।

শাসক দলের অন্তর্ভুক্তের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য প্রায় সব বামপন্থী দলই স্বচেষ্টা হন।

সেজন্য নির্বাচনের বহু পূর্বেই সমস্ত প্রধান বামপন্থী দলগুলি একটি সাধারণ মোর্চা গঠনের প্রয়াস পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে কোন সমঝোতা না হওয়ায় দলগুলি দুটি ভিন্ন ফ্রন্টে সমবেত হন।

একটি ফ্রন্টের নাম হয় সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টে থাকেন মার্কসবাদী, কমিউনিস্ট পার্টি, আর এস পি, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট দল, এস ইউ সি ওয়ার্কার্স পার্টি আর সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী) এবং ফ্রন্ট সমর্থিত কয়েকজন নির্দল প্রার্থী।

অপর ফ্রন্টের অংশীদারগণ হলেন বাংলা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, ও বলশেভিক দল। এই ফ্রন্টের নাম হয় সংযুক্ত গণবাম ফ্রন্ট।

এ ছাড়া গোষ্ঠী লীগ ও লোকসেবক সংঘ এই দল দুটিকে উভয় ফ্রন্টেই সমর্থন করেন।

বস্তুতঃ কংগ্রেস, সংযুক্ত বাম ফ্রন্ট ও গণ বামফ্রন্ট এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যেই নির্বাচনী সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও অন্যান্য দলগুলি ও বহু নির্দল সদস্য নির্বাচনী রূপে উপস্থিত থাকেন।

কংগ্রেস দল দুশো আসনটি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল সহ মোট একশ আটনব্বইটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পি এস পি দল এবার সাতাশটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই দল কোন মোর্চার অংশ গ্রহণ না করলেও অনেক ক্ষেত্রে এরা গণবাম ফ্রন্টের সমর্থন লাভ করেন। গণবাম ফ্রন্ট একশ পঁচাত্তরটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নির্বাচনী কল্যাণ

এই নির্বাচনে শাসক দল রাজ্যের দুশো আসনটি আসনের মধ্যে একশ সাতাশটি আসন লাভ করে সরকার গঠনের গরিষ্ঠতা হারালেন।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট দলগত ভাবে চৌবাটী আসন ও তাদের সমর্থিত নির্দল প্রার্থীদের সাফল্য সহযোগে আটবাটী আসন লাভ করেন। গণবাম ফ্রন্ট চৌবাটী আসন লাভ করেন। লোক সেবক সংঘ ও গোষ্ঠী লীগ বাকরমে পাঁচ ও দুটি আসন লাভ করেন। পি এস পি দলের এই নির্বাচনের পূর্ব নির্বাচন অপেক্ষা অনেক কম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুটি বেসী আসন লাভ নিশ্চয়ই উল্লেখ্য।

এবার জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের একটি করে আসন লাভ কিছুটা আশ্চর্যজনক। আশ্চর্যজনক এই কারণে যে হেতু, এই দু দলের প্রতি জনসমর্থনের ধারা অনুযায়ী বলা চলে এ রাজ্যে এ দু দলের তেমন কোন প্রভাব নেই। সে কারণে এ দল দুটির পক্ষে আসন লাভ গুরুত্বপূর্ণ না বলে আশ্চর্যজনক বলাই ভাল।

কংগ্রেস দল এবার প্রায় ছয় লক্ষের মত জনসমর্থন বাড়তে সমর্থ হন। যদিও শতাংশের বিচারে গত

নির্বাচন অপেক্ষা একশ জনে ছয় পরশেট পাঁচ জন এই দলের প্রতি আসন হারিয়েছেন বলা চলে।

কুচবিহার, দার্জিলিং, মালদা মুর্শিদাবাদ কলকাতা বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি জেলাগুলিতে এই দল তাদের হতশোর পুনরুদ্ধার করলেও বর্ধমান চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর সহ অন্য জেলাগুলিতে এই দল প্রচণ্ড ভাবে পর্বদস্ত হন।

এবার কংগ্রেস দলের প্রতি প্রার্থী ১৮৫৭৮টি বৈধ ভোট পান। এই সংখ্যা রাজ্যের উপর নির্ধারিত মান অপেক্ষা মাত্র ৬-৫ হাজারের মত বেশী। এবার গত নির্বাচন অপেক্ষা প্রায় তিরিশ লক্ষের মত বেশী ভোট বৈধ ভাবে দেওয়া হয়। সে তুলনায় কংগ্রেস দল গত নির্বাচনে বেশানে প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট রাজ্যের উপর নির্ধারিত গড় অপেক্ষা প্রায় আট হাজার ভোট বেশী পেয়েছিলেন, সেখানে এবার মাত্র ৬-৫ হাজার ভোট বেশী পাওয়া এ দলের দুর্বলতার পরিচায়ক।

যদিও একশ সাতাশটি আসন এ দল লাভ করেন 'অ সংঘ ও বলা চলে বামপন্থী ভোট ভাগ না হলে এরা আরও কম আসন লাভ করতেন।

(শেখাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

এমনও হ'তে পারে যে আপনি আজ সকালেই যে ঢাকো চুমুক দিলেন, সেই চা উৎপন্ন হয়েছে এল আই সি.এ. টাকায়!

এল.আই.সি. আপনার প্রিয়তার টাকা সারা দেশে মাঝরকম উদ্দেশ্যে ও আর্থিক ক্লিয়াকলাপে বিক্রয় করে। আবার হল এরবর্তর একটি।

এল.আই.সি. আবাসী বাসারের ক্ষেত্রে ২৮২ কোটি টাকা বিক্রয় করেছে। আপনার দেশে প্রিয়তার টাকা এল.আই.সি. বিক্রয় করে দেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে, যেমন, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, পানি, স্বাস্থ্য, পরিবহন। ৩২শে মার্চ ১৯৭০ অবধি এল.আই.সি.-র মোট বিক্রিয়ার পরিমাণ ১৫২৮.৬৬ কোটি টাকাতেই বেশি। এই টাকার অর্ধ বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে। এল.আই.সি. শুধু যে বিক্রিয়ার ব্যবস্থা করে, তা নয়। আপনার এবং দেশের কল্যাণে এর রয়েছে অপর ভূমিকা। ভারতে এল.আই.সি. হ'ল বৃহত্তম একক বিক্রিয়ার সংস্থা।

এক সময়ে এল আই.সি.-র কয়েকটি বিক্রিয়ার :

	কোটি টাকা
কুচবিহার প্রকল্প	২৮.৬৭
বিদ্যুৎ	২২৫.৭০
জল সরবরাহ ও কলবিদ্যায়	২৮.৪৯
ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০.২৫
সুতীকর ও পাট	৩০.৭৪
মৌহ ও ইস্পাত	১৭.০৫

এল.আই.সি.-প্রগতির পথে আপনার মাথি

মধ্য শিক্ষা পর্ষতে অচলাবস্থা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

কার কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নটী ধামা চাপা দিতে পর্ষৎ কতৃপক্ষ এবং সরকার উভয়েই তৎপর।

পর্ষৎ কর্মচারীদের চাকুরীর বয়স সীমা বৃদ্ধির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত রয়েছে। পর্ষদের মতই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার কর্মচারীদের চাকুরীর বয়সসীমা ষাট বছর এবং তারপরে পাঁচ বছর পর্ষন্ত সেই মেয়াদ কাড়ানো যেতে পারে অথচ পর্ষৎ কর্মচারীদের বয়সসীমা আড়াই পঞ্চাশ বছর। এমন কি সরকারী কর্মচারীদের এই বয়সসীমা আটম বছর পর্ষন্ত বাড়ানো হয়েছে। পর্ষৎ এই বিষয়ে - একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু আজও তা কার্যকরী হয় নি সরকারী অনুমোদনের অভাবে। এর থেকে একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছান যায় যে পর্ষৎ কতৃপক্ষ এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যে একটি বড়-বড় চলছে যাতে পর্ষৎ কর্মচারী-

দের সব রকম ন্যায়সংগত ন্যূনতম দাবী থেকেও বঞ্চিত করে রাখা যায়। এই রকম পর্ষৎ কর্মচারীদের আরও বড় দাবী আজ পর্ষন্ত অমীমাংসিত রয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের অরহেলা আর নিপেষণ সহ্য করার পর বর্তমান পর্ষয়ে পর্ষৎ কর্মচারীগণ আন্দোলন শুরু করেছেন গত আগস্ট মাস থেকে। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ-মাস সময় নানা টালবাহনার পার করে দিয়ে আজ পর্ষৎ কতৃপক্ষ হাজার সেকেন্ডারী ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মধ্যে দাঁড়িয়ে কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে উপদেশামূলক বর্ষণ করছেন যে আসন্ন পরীক্ষার স্বার্থে কর্মচারীরা যেন আন্দোলন বন্ধ রাখেন। পর্ষৎ কতৃপক্ষের এই কৌশল নতুন নয়। আগেও টেনিশল পর্ষটি সালে পরীক্ষার স্বার্থে যখন কর্মচারীরা আন্দোলন স্বাগত রেখেছিলেন ঠিক তখনই পরীক্ষা চলা-কালীন পর্ষৎ কর্মচারীদের আক্রমণ করা হয়। পর্ষদের উনচল্লিশ জন কর্মচারীকে পর্ষদের দীর্ঘদিনের চাকুরী থেকে বিতাড়িত করা হয়। তা ছাড়া যে

কোন ক্ষেত্রেই প্রমজীবী মানব যখন তাদের দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন তখন সব কতৃপক্ষের মত পর্ষৎ কতৃপক্ষেরও "গেল গেল" রব তোলে। দেশের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থ ইত্যাদি বড় বড় গালভরা কথা দিয়ে কিন্তু প্রমজীবী মানব দীর্ঘদিনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আজ একথা বুঝতে পেরেছেন যে কতৃপক্ষ কখনই দেশ বা দেশের স্বার্থে বিচলিত নয়, আসলে শোষিত মানবের সংগ্রামের ফলে যখন তাঁদের বক্তব্য-নীতি ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয় তখনই তারা তারস্বরে নানা কথার জাল বুনে নিজেদের আসল চরিত্রটা লুকিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চান। কিন্তু আজ আর এই বিভ্রান্তি ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তাই দেখা যায় হাজার বেতার ঘোষণা অথবা পুস্তাব্যাপী সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও সংগ্রামী প্রমিক কর্মচারীর পাশে এসে ভাঁড় করে দাঁড়াচ্ছেন দেশের সাধারণ মানব। জনসাধারণ একথা পুচ্ছই বোঝেন যে পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পর্ষৎ কর্মচারীদের নয়, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে কতৃপক্ষের উপর। আর পাঁচটা

প্রতিষ্ঠানের মতই পর্ষৎ কর্মচারীরাও জীবিকার প্রয়োজনে চাকুরী করছেন এবং পরিবর্তে চাইছেন ঐচ্ছিক অধিকার। পর্ষৎ কতৃপক্ষই বরং দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারীদের

ন্যূনতম দাবীরও মীমাংসা করেন নি। এর ফলে আজ যদি পরীক্ষার কাজে কোন বিঘ্ন ঘটে তবে তার দায় দায়িত্ব বর্তমান কতৃপক্ষ এড়িয়ে যেতে পারেন না।

চির বিজোহী বাংলা দেশের প্রতি ইন্দ্রিয়

নকল দরদ

(দশম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনী সময়ে এসে ইন্দ্রিয়-রাজ্য স্বীকার করে গেছেন যে অতীতে বাংলাদেশে, বিশেষ করে কলকাতা ও তার আশেপাশের জেলাগুলির উন্নতির জন্য যা করণীয় ছিল তা করা হয়নি।

ঐ সূরে সূর মিলিয়ে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান তার প্রজ্ঞাপ্ত-দিকের কৃত্য বলবার চেষ্টা করেছেন যে তিনি দিল্লীতে বাংলার হয়ে কতটা ওকালতি করেছেন। বাংলার দাবীকে গণিতিক হিসাবে না দেখে "বিশেষ সমস্যা" হিসাবে দেখার জন্য আবেদন করেছেন তিনি।

বাংলার প্রতি এই দরদ দেখানোর বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল নির্বাচনের মধ্যে। কারণ অনেক দেরীতে হলও দিল্লীর বড়-কর্তারা ক্রমশই উপলব্ধি করছেন তাঁদের কৃতকর্মের ফল।

কিন্তু বাংলাদেশের মানব আর স্তোকবাক্যে ভুলতে চান না। রাতারাতি ভোল পাউন্টের আজ ইন্দ্রিয় প্রশান্তির সানাই-এর পৌ ধরেছেন অনেকই। তাঁদের পক্ষেও গোপন করা সম্ভব হয় নি যে কলকাতাকে বাচানোর সি এম ডি এর প্রকল্প স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ করার দরদটা কতটা লোক দেখানো।

নির্বাচন পর্ব শেষ হলেই নানান অজুহাত দেখিয়ে বর্তমানের এই উৎসাহে যে ভাঁটা পড়বে না তার ভরসা কোঁঠান?

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে কেন্দ্রের অনিচ্ছুক হাত থেকে যেটুকু স্বীকৃতি আদায় হয়েছে তা দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফল।

যদি সারা বাংলা দেশ একাবাক্ষ্য হয়ে থাকতে পারে তাহলে কেন্দ্রের

পক্ষে পিছ হটা সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলার মানব অন্তত এই শিক্ষাই দিয়েছে।

যারা আজকে সম্পূর্ণ স্বার্থের জন্য বাংলাকে নতুন করে কেন্দ্রের উপনিবেশ গড়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে তাদের কেউ মেনে নেবে না। কে অস্বীকার করবে যে, "নব্য-ন্যায়" এর যুগ থেকে আজকের "নকলমলী যুগ"ের সংগ্রামের ইতিহাস এই কথায় প্রমাণ করে যে বাংলার চির বিজোহী।

প্রাক-স্বাধীনতা আন্দোলনে অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, ফজলুল হক, সুভাষচন্দ্রের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপোষ-হীন সংগ্রাম তাঁরই স্বাক্ষর রেখে গেছে। স্বাধীনতার পরেও শরৎ বসু ও শ্যামপ্রসাদ বাংলাকে কেন্দ্রের উপনিবেশ করার বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। বাংলা বিহার এক করার নামে কেন্দ্রের চক্রান্তের জবাব বাংলা দেশের মানব দিয়ে-ছেন। ড. বিধান রায়কে মাথা পেতে সেই রায় মেনে নিতে হয়েছিল।

কংগ্রেসের চার আনার সদস্য না হয়েও এই সংগঠনকে নিজের পক্ষে রেখে ইংরাজের সঙ্গে আপোষ করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সুভাষচন্দ্রকে একদিন রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানিয়ে-ছিলেন।

সুভাষ-ভক্তরা আজ সে কথা ভুলে গেছেন। যারা তাঁকে পেছন থেকে ছুরি মেরেছিল তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছেন তাঁরা।

অনেক দূর্খে রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছিলেন বাংলা দেশের মানব যদি কেবল এখানকার কোনো কাপড় পড়ে, তা হবে না প্রাদেশিকতা হবে আত্মরক্ষা স্বনির্ভরতা।

তার
হাসি
কী মধুর



এর পেছনে রয়েছে-তার
বহুদিনের সাধনা—
সাধনা দশন দিয়ে প্রতিদিন
হাতের পরিচর্যা।

সাধনা
দশন

একটি আদর্শ হাতের সাজ

হাত মুক্তার মত বকককে ও
মুখ, সবল, সুন্দর করে।
মুখ ফল ও মুখের মুখ হয়



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-১৮

অধ্যক্ষ ডাঃ বোমেন চন্দ্র বোস, এম.এ.
আম্বিকেশ-শাস্ত্রী, এক.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকান) ডাক্তারপুত্র কলকাতা
দসারন শাস্ত্রীর কৃতপুত্র অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ বোমেন চন্দ্র বোস, এক.সি.বি.এস. (ক্যালি)
আম্বিকেশ-শাস্ত্রী

WEST BENGAL POLLS

(A hand book of Election Results & Analysis.)
Contains :—Constituency-wise results since 1962; Detailed results of Parliamentary Constituencies of West Bengal, 20 Tables & a Chart with detailed information. This book will help you to find the probable winning candidates among the contesting parties in the ensuing mid-term poll. By Sudhir Ghose. Rs.—6.00

DEY BOOKS STORES
Calcutta-12.

Firma E. L. Mukhopadhyay
Phone:—24-1824. Calcutta-12.

অশোক সেনের নির্বাচনী স্বার্থে আট পার্টি

বসুমতী কর্মীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার

(দপনের সংবাদদাতা)

বসুমতী পত্রিকার কেন্দ্রীয় মালিক প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শ্রী অশোক সেন যে শেষপর্যন্ত প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক (১) ইন্দিরা কংগ্রেসের নমিনেশন পেয়ে উত্তর পশ্চিম কলকাতার লোকসভা আসনে আবারও প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন, আট পার্টির ভূপেশ গুপ্ত হারেন মদুমজো অশোক ঘোষ সুবোধ কানাজীরাও বোধহয় এতদূর অসম্ভব কথা ভেবে উঠতে পারেন নি। কি করেই বা পারবেন। যে অশোক সেনের বিরুদ্ধে সি বি আই-র রিপোর্ট বুলছে; যে অশোক সেন হঠাৎ ধনকুবের হয়ে একটা অর্থতান্ত্রিককালের ঐতিহ্য সম্পন্ন দৈনিক পত্রিকা কিনে তার মালিক হয়ে কসেই সাংবাদিক-অসাংবাদিক কর্মীদের শোষণ করতে শুরু করলেন; যে অশোক সেন ইন্ডিকেট মজরেনের হারার বসে ভূপাল বসুকে সাতাং ও শিখম্ভী করে বসুমতীর গেটে তালা বুলিয়ে সাড়ে পাঁচল কর্মীর পরিবারবর্গকে অনির্দিষ্টকাল অনাহারের মধ্যে ঠেলে দিলেন; অশোক সেনের মালিকানাধীন তারই বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক অজয় মদুমজীকে বৃহস্পতি মৃদুসভার বসাবার কৃতিত্ব দাবি করে নতুনকুর্দান করলেন; সেই বৃহস্পতি অশোক সেনকে সমাজতন্ত্রের ধ্বংসকারী ইন্ডিকেট কংগ্রেস নির্বাচনী লড়াইয়ের টিকেট দেবে কোন লক্ষ্যের সুস্থ মস্তিষ্কে তা কি সহজে ভাবা যায়।

তারা দুই ধাক, স্বল্প ইন্দিরা-জী নাকি অশোকবাবুর ওপর হাড় টা ছিলেন। তবুও উনি বখাসমরে টিকেটটি সংগ্রহ করে নিলেন পশ্চিমবঙ্গ নব কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহার ও তরুণ বাবুদের সাটিফিকেটের জোরে। সংবাদ নব কংগ্রেস নেতারা নাকি ইন্দিরাকে বুলিয়ে দেন যে, বসুমতীর দার খুলে লাভ হকেনা কিছই। বসুমতীর কর্মীরা সি পি এম-এর স্বার্থেই কোমর বাধবেন। এই সংবাদ সত্য হলে অবগাই বৃহতে হবে, বসুমতীর কর্মীরা হরত শেষ পর্যন্ত মদুমজোর আড়ালের মদুমজী চিনে ফেলেন এমন ধারণাই অমন সুপারিশের কারণ। তবে এটা ঠিক যে জোরালো সুপারিশের জোরেই অশোকবাবু শেষ পর্যন্ত টিকেট পেয়ে গেলেন, নয়ত ইন্দিরা নাকি এক সাক্ষাৎকারে বসুমতী সম্পাদক বিবেকানন্দ মদুমজী-পাখ্যাকে বলেন, অশোকবাবুকে তিনি নাকি একটি সংখ্যা বা নাম্বার ছাড়া জনৈক 'পারসন' বলেও গণ্য করেন না।

ইন্দিরাজীর কাছে এই সময় বিবেকানন্দবাবু বসুমতী খেলা সম্পর্কে আশা ও আশ্বাস পেয়ে কলকাতার আসনে ইন্দিরাজীর দৃষ্টীয় করবার জন্য। ইন্দিরাজী নাকি বাংলা কংগ্রেসকে বাগিয়ে আনার জন্য বিবেকানন্দকেই তার ভারপ্রাপ্ত এ্যামবাসাদার করে পাঠান। এককালে

অজয়বাবুর জন্য বিবেকানন্দবাবু তার কলমের সবচেয়ে জোরালো কালি বসুমতীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে চেলে এসেছেন। এমন পারাণির স্বপ্ন অজয়বাবু (তিনি আবার সং মানব বলে ফলাও প্রচারিত।) কি আর না মদুমজী পারবেন? কিন্তু সব ব্যর্থ। বিবেকানন্দের অত পরিগ্রমে গাড়া অজয়দা স্বার্থ ছাড়া পরার্থে অবিশ্বাসী। বিবেকানন্দবাবুর দৃষ্টীয়ালী আজ আর বিশেষ সাড়া জ্বালাল না। কাগজ কৈ ভুললোকের হাতে? বিবেকানন্দের ব্যর্থতা এবং সি পি এম ভীত পশ্চিম বাংলা থেকে 'বসুমতী' সি পি এম খপ্পরে' সংবাদ ইন্দিরা-জীকে তার 'গরীবী হঠাৎ' ও 'সমাজতন্ত্রের' গালভরা শ্লোগান ভুলিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি তিনি অশোক সেনের প্রার্থীপদ মজুর করে বসলেন। বসুমতী খেলার সমস্ত সম্ভাবনা হাওয়ার মিলিয়ে গেল।

বেকারদা বুঝে এইবার বসুমতীর গেটে আর এক আশ্চর্য বেইমানীর খেলা শুরু হয়ে গেল। এতোদিন, মানে, অশোক সেনের নসীব বতক্কপ ইন্দিরার বিবেচনার সুতোয় বুলিছিল, ততদিন আট পার্টির নেতারা বসুমতীর ফটকে এক এক করে জড় হচ্ছিলেন। সেন মহাশয়ের অশকীতির নিজের তুলে ধরে গলাবাঁজি করে নিজেদের প্রমিক দরদ দেখিয়ে বেশ ব্যহবাও লুটে নিরে বাচ্ছিলেন। প্রাক নির্বাচনী প্রচারণাও একটা জুহুসই প্লাটফর্ম মিলে গেছিল ওদের। কিন্তু আট পার্টির বড়দি নব কংগ্রেস এবং বড়দা বাংলা কংগ্রেস হাতে হাত মিলিয়ে অশোক সেনকে মনোনয়ন পাইয়ে দিল বখন, তখন এরা নানা ফিকিরে রঙ্গমণ্ড থেকে সরে পড়তে শুরু করলেন। ভূপেশ গুপ্ত, হারেন মদুমজো, রঞ্জন সেন, সোমনাথবাবু-দের নতুন চেহারা দেখা দিল।

জনৈক সি পি আই নেতা কপালে দৃষ্টান্তের রেখা ফুটিয়ে উপবাসী বসুমতী প্রমিকদের আনালেন, হঠাই তো কি করা যায়। উপবাস আইন না বানালে তো আপনাদের উল্কারের আর পথই দেখা বাচ্ছে না। অমন যে বেরওবাদী সুবোধবাবু, তিনিও জয়নগরের সোওয়ার প্রাতি অধিকতার আসক্তি বোধ করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। জোড়াসাঁকো বিধান সভার অশোক ঘোষের ফরওয়ার্ড রক প্রার্থী ধারেন ভৌমিক, যিনি ডিগবাজি মাল্টার নামে বসুমতী মহলে পরিচিত, তিনি বসুমতী সংগ্রামী কর্মীদের মনে ফাটল ধরাবার ফিকিরে বৃহতে লাগলেন। ভুললোকের এ বিধিরে নাকি দারুণ হাতবশ। বৃহস্পতির হিমালয়ান সাক্ষ্যের সময় বৃহস্পতি প্রার্থী হিসেবেও ইনি নাকি বৃহস্পতির বিরুদ্ধেই নিজের কর্মীদের প্রত্যাহার করে নিরে ডিগবাজির খেলা দেখিয়েছিলেন এবং

অশোক সেনের বশব্দ হিসেবে বসুমতী কর্মী মহলে খুব নাম ডাক অর্জন করেছেন। আট পার্টি এমন এক ব্যক্তিকে প্রার্থী ছাড়া করে বসুমতী কর্মী মহলের সামনে বেইমানীর আর এক নজির সৃষ্টি করেছে।

আট পার্টি অশোক সেনের জয়ের পথ সুগম করার জন্য উত্তর পশ্চিম কলকাতার লোকসভা কেন্দ্রে শেষ পর্যন্ত কোনো প্রার্থীই দিল না। অথচ আগে শোনা গেছিল, ঐ কেন্দ্রে নাকি শ্যামসুন্দর গুপ্ত (এফ বি) মনোনয়ন পেয়ে যাবেন।

বসুমতী কর্মীরা মদুমজোর আড়ালের মদুমজী চিনে নিরে এখন

মার্কসবাদী ট্রেড ইউনিয়ন 'সিস্টেম'র সহায়তা গ্রহণ করছেন। সি আই টি ইউ সাইক্লোস্টাইল আবেদন বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে সংগ্রামী সাংবাদিক অসাংবাদিক কর্মীদের সংগ্রাম তহবিলে প্রত্যেক কর্মচারী সংস্থাকে সাহায্য করার আহবান জানিয়েছেন।

মার্কসবাদী নেতারা সেই বসুমতীরই কর্মীদের স্বার্থে প্রচারে নেমেছেন, যে বসুমতী একদিন বিবেকানন্দবাবুর নেতৃত্বে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। বসুমতী কর্মীদের হরত সি পি এম-এর খপ্পরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু নব ও সিডিকেট কংগ্রেস, সিডিকেট সোস্যালিস্ট এবং আট পার্টি বাংলা কংগ্রেসের ঠেলার তাদের আজ সি পি এম-এর সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।

এপ্রসঙ্গে জনৈক বসুমতী কর্মীর মন্তব্য : মানবদের তো বাঁচতে হবে। যে বাঁচবে মদুমজু মানব তার কাছে না গিয়ে করেই বা কি।

সি পি এম সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সংগ্রামী মানবের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অশোকবাবুর ক্যাম্প যাদের মৃত্যুর মধ্যে ঠেলে দিল তারা কিন্তু অনেকাংশেই সি পি এম বিরোধী, সি পি এম মহলে তা ভালো ভাবেই জানেন। তবু এই পার্টির সাধারণ নীতি সংগ্রামের সাধ্য করা, সেই নীতিই তাদের বসুমতীর সংগ্রামী মানবের আহবানে সাড়া দিতে বাধ্য করেছে।

এ ব্যাপারে বসুমতী কর্মীদের সংগ্রাম সহায়ক সমিতিতেও জোর বিতস্তা বিস্তারিত হয়ে গেছে। সি পি এম সমর্থকরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, যে বসুমতী সুযোগ পেলেই সি পি এম-কে বিবেকানন্দবাবুর নেতৃত্বে কদমাত্ত করার বারম্বার চেষ্টা করে গেছে এবং পুনশ্চ বসুমতী খুললে বসুমতী আগের মতোই কেছা খেউড় শব্দ করলে তা আবারও সি

(লেখাংশ স্বাধীন পৃষ্ঠায়)

মৌমুসী নকশা

পথ চলতে পারের আরাম—
চমৎকার খোলাসোলা গড়ন, হিমছান মনোরম স্টাইল...বাটার এইসব জুতোর নিজেকে আপনি অনেক বেশি পরিচর্য এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন। স্ফটিক, কোমল ওপরি-চামড়া, তেমনি মোলায়েম আর মজবুত সোল—প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য আরাম। নকশার বহুমুখী বৈচিত্র্য এসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে। মৌমুসী নকশার বিরাট সমারোহ।

দাম ১৫.৯৫

দাম ৮.৯৫

দাম ৮.৯৫

দাম ১৬.৯৫

০৯১৫

Bata

যাদবপুরে সি পি এমের বিদ্যা প্রচারের নমুনা

দিন পনেরো আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এফ আই (যাদবপুর শাখা) এবং সি-ই টি ইউনিয়ন-এর দুজন সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত অশোক দাস ও অরুণ দাশগুপ্তের নামে যাদবপুরের ছাত্র কমিটি অধ্যাপকদের নিকট একটি বৈআইনী প্রচারপত্র বিলি করা হয়। তাতে তারিখ ছিল না, প্রকাশক প্রেসেরও নাম ছিল না। প্রচারপত্রের নমুনা দেখে মনে হবে এটা সি পি এম দল হিসেবে না বের করে উপরোক্ত গণসংগঠনের মাধ্যমে বের করেছে ও যাদবপুরের জনসাধারণের মধ্যে বিলি না করে শুধুমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে।

এর একমাত্র কারণ সি পি এম নিজের নামে যদি এ জাতিগতভাবে করে তাহলে যাদবপুরের জনসাধারণের যে অংশ প্রচারপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদের চেনে, তাদের নিকট দলটির মিথ্যার বেসাতি ধরা পড়ে যাবে।

প্রচার পত্রের মর্মার্থ নিম্নরূপ :

(এক) তিরিশে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সি পি এম ছাত্ররা কিছু "সম্মেলনজন ব্যক্তিকে" ধরে ফেলে তাদের দিয়ে কবুল করিয়ে নেয় যে—তারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক রশ-

জয় কারলেকারের নির্দেশে এসেছিল। (কেন এসেছিল তা প্রচার পত্রে জানানো হয় নি।)

(দুই) উক্ত অধ্যাপক নাকি কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তার প্রমাণ তারিখ আশ্বিনেরা উচ্চপদে আসীন ও বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের ও "সি আই এ-র হোতা।"

(তিন) উক্ত অধ্যাপক নাকি স্বীকার করেন, দক্ষিণ কলিকাতার

(পাঁচ) উপাচার্য গোপাল সেনের হত্যার ঘটনার সঙ্গে আশু মজুমদার ও রঞ্জয় কারলেকার যে লিপ্ত—একথা বৃদ্ধিতে প্রচারপত্র রচয়িতাদের কোনও অসুবিধে হয় না। তার পরেই স্লোগান—“কর্তৃপক্ষ নকশাল চক্রের অশুভ আঁতাত ধরুন হোক” (অর্থাৎ উপাচার্য গোপাল সেন ছিলেন সি পি এম দ্বারা বিপ্লবী এবং কর্তৃপক্ষ বিরোধী, তাই নকশালরা তার প্রাণ

মতামত

“কুখ্যাত সমাজবিরোধী” আশু মজুমদার তার বন্দু।

(চার) যাদবপুরের শিক্ষকদের সভার একদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের তেরজন শিক্ষককে নাকি জীবননাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। রঞ্জয় কারলেকারের নেতৃত্বে নকশালপন্থী সমাজবিরোধীরাই নাকি জীবননাশ করবার জন্য এই দিন এসেছিল—কারণ (ক) ঘটনার দিন হঠাৎ কনসুলেট গাড়ির আবির্ভাব, (খ) এদিনই “বিভূষণের উক্তি” “বেকার বন্ধক হলে আমি নকশাল হতাম” (গ) সংবাদপত্রে কেনেথ কিটিং-এর বক্তব্য (এ দিনই হলে হয়তো প্রচারপত্র রচয়িতাদের সুবিধা হতো—লেখক)।

তারিখের বৈশিষ্ট্যের আচরণে বিম্বিত

কদিন আগে “শারদীয়া হোমশিখা”র (কলকাতার আশ্বিন, ১৩৭৭ অক্টোবর ১৯৭০, সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসাদ বসু) প্রকাশিত তারিখের কল্যাণপাঠ্যের “বিদ্যাসাগর শ্রমরত্ন” নামে একটি প্রবন্ধ চোখে পড়ল। প্রবন্ধটি “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাধনাত্মক জন্মদিন উপলক্ষে তথ্যকল্পে অনুষ্ঠিত শ্রমরত্ন সভাপতির ভাষণ। এই প্রবন্ধটির সঙ্গে আজ থেকে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের “বিদ্যাসাগর চরিত্র” নামক প্রবন্ধটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ভাবগত সাদৃশ্য অত্যধিক। উৎসাহী পাঠককে মূল প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। এখানে ভাবগত সাদৃশ্যের কিছু নমুনা দিই।

“তিনি প্রতিদিন দেখিয়েছেন—আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; বাহা, অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; মার্হা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্য-রচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের দৃষ্টি লাইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি;.....” (রবীন্দ্র রচনাবলী,

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮)।

অনুরূপে তারিখেরবাবু লিখছেন “প্রাত্যহিক জীবনে তিনি যে কাজ আরম্ভ করেছেন তা শুধু শেষ করেছেন। যে কর্মটি করা প্রয়োজন মনে করেছেন সেটি সম্পন্ন করেছেন, কিন্তু তারজন্য কোন আড়ম্বর করেন নি। বা বিশ্বাস করেছেন করণীয় বলে, তারই অনুষ্ঠান করেছেন। তিল পরিমাণ বাক্যরচনা না করে ভূরিপরিমাণ আত্মত্যাগ করেছেন। অহংকার দেখিয়ে তিনি পরিতৃপ্ত লাভের প্রয়াস পাননি, প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেছেন। কোন কাজে পরের সাহায্যের প্রত্যাশা করেন নি। তাই পরের দৃষ্টি বিচ্যুতি নিয়ে কোনদিন আকাশ বিদীর্ণ করেন নি।.....” (হোমশিখা, পৃঃ ৪৭১)

তারিখেরবাবুর মত প্রবীণ ও ব্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যসেবীর এই আচরণ আমাকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করেছে। জানিনা আমার বৃদ্ধিতে কোথাও কিছু ভুল হয়েছে কিনা। কিন্তু উল্লিখিত পত্রিকার কোথাও তারিখেরবাবু রবীন্দ্রনাথের কণ স্বীকার করেছেন বলে দেখতে পেলাম না। এই আশ্বিনা ঘটনার ওপর আলোকপাত বাঞ্ছনীয়।

হারা ভট্টাচার্য

নিরেখে বলে উক্ত সম্পাদকবৃন্দ বৃদ্ধিতে পেরেছে)।

দর্পণের পাঠকদের অবগতির জন্য এই প্রচার পত্রের নমুনা রাখা হলো। হিটলার যে চতুর পন্থা-তিতে মিথ্যা ছড়াতো, সি পি এম-এর যাদবপুর কর্তৃপক্ষ ও তার সহযোগী এই দুটি অবচীর্ণ সম্পাদক ভালো করে মিথ্যাটা সাজাতে না পেরে কাকতালীয় ব্যাপার করেছে—এটাই প্রমাণিত হয়।

পরে উল্লিখিত কুখ্যাত সমাজবিরোধী আশু মজুমদার আট্টো সমাজবিরোধী কিনা এবং উনিশশ উনসত্তর সালের আগে কালিকাপুর কৃষক সংগ্রামে সি পি এম-এর কর্মী হিসেবে সে সমাজবিরোধী ছিল কিনা বা উনিশশ সাতষাট-উনসত্তর সালে যাদবপুর সি পি এম নেতা নাস্ট সেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধু হিসেবে এবং সি পি এম-এর কর্মী হিসেবে সে সমাজ বিরোধী ছিল কি না, সর্বশেষে কালিকাপুরের জোতদারদের প্রয়োজনীয় উনিশশ সাতষাট সালে কৃষক কর্মী আশু মজুমদারদের প্ররোচনার করবার জন্য অর্জয় ঘুসাজী চেষ্টা করেছিলেন, তখন সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু কর্তৃক এই কাজে বাধা দান সমাজবিরোধী হিসেবে কিনা—এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ও জনসাধারণকে অবগত করবার জন্য উক্ত সম্পাদকবৃন্দ ও তাদের স্থানীয় প্রভু সি পি এম কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাই।

একথা ঠিকই রঞ্জয় ও আশু মজুমদার এককালে বন্দু ছিল, যে বন্দু অধুনা যাদবপুরের সি পি এম-এর বিপ্লবী নেতাদের সংগেও ছিল। রাজনীতি বদল করলেই যদি কুখ্যাত সমাজবিরোধী হয় তাহলে শ্রীআশু মজুমদারের রাজনীতি তো প্রমোদ দাশগুপ্ত থেকে আরম্ভ করে শ্রীমজুমদারের এককালের নিত্যসহচর (মাত্র বছর দুয়েক আগেকার) সি পি এম নেতা নাস্ট সেনকে কুখ্যাত সমাজবিরোধী বলে আখ্যা দিতে হয়।

এটাও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে সি পি এম দর্পণ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বসবার ঘরের সামনে সকাল দশটার কি করে শ্রীআশু মজুমদার বা তার

সহযোগীরা তেরো জন অধ্যাপকের জীবন নাশের হুমকি রেখে গেল এবং সর্বাত্মে এটা নজরে পড়লে সি পি এম অধ্যাপকদের ও ছাত্রদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসে। এ অভিনয় যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীরা বৃদ্ধিতে পারবে না, তারা এতই গর্ভস্ত-জাতীয় একথা সি পি এম কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধিতে পারেন নি অথচ আগামী দিনের বিপ্লবে নেতৃত্ব করবার কথা অহরই বলেন—এ সত্যিই অবাক হবার ব্যাপার। কংগ্রেস জনসাধারণকে যে ভীতের রাজনীতি দিয়ে থাকে, নকশাল প্রসঙ্গে ও নিজের বিপ্লবীয়ানা জাহিরার্থে সি পি এম একই নীতি অনুসরণ করে সুবিধা করতে পারবে কি?

যাদবপুর সি পি এম কর্মী খোকা, শিবু, কান্তি, অশোক এরা নিশ্চয়ই বিপ্লবী, কারণ তারা আশু মজুমদারকে বন্দু করবার জন্য নিজেরা দুবার চেষ্টা করে-

অভূতপূর্ব নজীর

মধ্যমূলে সুলতানী আমলে (পনেরশ শতাব্দী) হাবসী (আবিসিনিয়ার অধিবাসী) খোজা সৈন্যরা কিছু সময়ের জন্য বাংলা দখল করে রেখেছিল। তাদের স্বল্পায়ু বীভৎস শাসনকালের বিবরণ ইতিহাসে পাঠ করে আমরা রোমাঞ্চিত হই। উনিশশ সত্তর-একাত্তর সালে পশ্চিম বাংলার আমলা-তান্ত্রিক আধিপত্যের দুসহ স্মৃতি ভবিষ্যৎদের ইতিহাসে চিত্রনার জন্য অধিকতর এক রোমাঞ্চিত অধ্যায়ের উত্তরাধিকার দিয়ে গেল।

আগামী সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে পশ্চিম বাংলার সৈন্য অবতরণ করল। এ এক অভূতপূর্ব নজির। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সুস্থ ও শান্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সৈন্য সামন্ত মোতায়েন রাখা হল। বুলেট দিয়ে জনগণকে শাসন করা যায় না, তাই ব্যালট বাকসের প্রয়োজন—পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের স্বপক্ষে এই অকাটা যুক্তি অনেক দিনে থাকেন। কিন্তু ব্যালট বাস্তবের ছিদ্র দিয়ে ভোটপত্র চলাচলের সুগম ব্যবস্থার জন্য মিলিটারী বৃট ও বুলেটের দরকার—পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে এ এক অসম্ভব প্যারডক্স। সৈন্য অবতরণের ষাট দিনে একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ হল—বার সূচনা হয়েছিল সি আর পি অভিযের বাহিনী দিয়ে।

বাস্তবিকই, গত কয়েক মাস পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ দখলদার সৈন্যদের রাজত্ব বাস করছিলেন। এই সি আর পি বাহিনীকে পুষতে লাখ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। যেখানে পশ্চিম বাংলার উন্নয়নের জন্য অর্থের যোগান সম্ভব হয় না, বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে থাকে, সেখানে সি আর পি বিদেশী

ছিল, বাঁশদোষীতে নকশাল পিটিয়ে মারতে বায়া সাহায্য করেছিল, সেই একাংশ স্কোয়াডের তারা অংশীদার, আর কংগ্রেস সি পি এম রাজনীতির একদা ভূত অধুনা সি পি এম নেতা মহাদেব ডেকোর-টার্সের মালিক দাস মশাই ও আরো অনেকে নিশ্চয়ই বিপ্লবী—সুখ্যাত বিপ্লবী, আর সর্বশেষে জাতি-নির্যাস-এর এককালে সি পি এম বিরোধী কংগ্রেসী গুন্ডা সিং মশাই তিনি এখন যাদবপুরে নকশাল হত্যার লালবাজারী পুষ্টিগী গুন্ডার চেয়েও সিস্থহস্ত এবং সি পি এম বাবুদের দেহরক্ষী, তিনি নিশ্চয়ই বড়ো বিপ্লবী।

চমৎকার! সি পি এম নকশাল হত্যার নিজে লিপ্ত হোন, পুষ্টি-শকে ডাকুন আর নিজের রাজনৈতিক দিক থেকে ত্রিশকিত ক্যাডারদের ক্রমশঃ নকশাল হত্যার উত্তেজিত করুন।

“জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব” সফল হয়ে যাবে।

জনৈক তথ্যাভিজ্ঞ

দখলকারী সৈন্যের মত রাজ হালে বাস করে আসছে। আর, পশ্চিম বাংলার অগণিত সাধারণ মানুষকে শ্বিত্যের শ্রেণীর নাগরিকের মত দখলকারী উপনিবেশে এই সি আর পি বাহিনীর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। দুর্গা-পুরের কথা। এই কুসল্যাম গ্রামগুলো সাধারণ চাষীর ওপর সি আর পি অত্যাচারের মর্মসুদ কাহিনী ব্রিটিশ সম্রাজত্বের উত্তর-কর দিনে দরিদ্র রায়তগণের ওপর নীলকরদের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়ে দেয়।

এখন প্রশ্ন রাখছি—আগামী সাধারণ নির্বাচনের সুস্থ ও শান্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাজ্যের পুষ্টি বাহিনীকে সক্রিয় করে তোলা যেত কি না। না, পুষ্টি বাহিনীর নৈতিকতা (মোরেল) এমন অস্বপ্নময় পেঁচেছে যে তার ওপর নির্ভর করা যায় না? বর্তমানে, পশ্চিম বাংলার সমাজবিরোধীরা যে ধরনের লক্ষ্যবিন্দু করে বেড়াচ্ছে তার জন্য পুষ্টি বাহিনীর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এ ধরনের সন্দেহের যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি আছে রাজ্যের পুষ্টি বাহিনীর একাংশ এই সমাজবিরোধীদের গোপনে প্ররোচনা ও উৎসাহ দিয়েছে।

তাই, আমাদের মত সাধারণ ভোটারগণ এই কথা চিন্তা করতে বাধ্য হবে সাধারণ নির্বাচনের জন্য মিলিটারী আহ্বান রাজ্য সরকারের বাধ্যতা সূচিত করে। বর্তমানে না আমলাতন্ত্র দুর্নীতিবৃত্ত ও কংগ্রেসী স্বার্থব্দু হলে ততক্ষণ এর চেয়ে অন্য কোন ফল আশা করা যাবে না। মিলিটারী ডেকে অইন-শৃঙ্খলার নড়বড়ে ভিত্তিকে অটুট রেখে ওপরে চুনকাম করার অসম্ভব সার হবে আর এর বস্তুভার আমরা বইব।

প্রমথ সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস দলের পর কমিউনিস্ট অনেক সুবিবেচনার পরিচর দিয়ে- (মার্কসবাদী) দলের নাম উল্লেখ- যোগ্য। এ রাজ্যে এ দল অবিভক্ত কমিউনিস্ট দলের যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। যদিও জনসমর্থন, সংখ্যা ও শতাংশের হিসাবে কিছু কম গেছে। কমিউনিস্ট দল মাত্র ৬.৬ শতাংশের আসন অর্জন করেন। এই দল দুটি বৃষ্টির পরিপূরক হয় নি।

সারণী-৭ নির্বাচনী ফলাফলের সারাংশ-৬৭

দল	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত বৈধ ভোট	শতাংশ	প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট
১। কংগ্রেস	২৮০	১২৭	৫২০১৮৪	৪০.১	১৮৫৭৮
২। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট	১০৫	৪০	২২২২৮৮	১৮.১	১৬০৮৫
৩। কমিউনিস্ট	৬০	১৬	৮০০২৪৬	৬.৬	১০২২৬
৪। বাংলা কংগ্রেস	৮১	৩৫	১০০৪৪০৪	১০.৫	১৬৪৭৪
৫। কংগ্রেস ব্লক	৪১	১০	৫৫৪৭০৬	৪.৪	১০৫২০
৬। আর এস পি	১০	৭	২৬৭৭২৭	২.১	২০৫২৪
৭। এস এস সি	২৬	৭	২৬২২০১	২.১	১০৩৫৫
৮। এস ইউ সি	৮	৪	১৫১২৮৭	১.২	১৮২১১
৯। ওয়ার্কাস পার্টি	২	২	৪৭২৫০	০.৪	২৩২৭৫
১০। আর সি পি আই	১	X	১৫৬৬০	০.১	১৫৬৬০
১১। কংগ্রেস ব্লক (ম)	২	১	৩৫৭৫৫	০.৩	১৭৮৭৮
১২। লোকসেবক সংঘ	৬	৫	৮৫৩০৫	০.৭	১৪২১৮
১৩। গোর্খা লীগ	৪	২	৫০০৬৫	০.৪	১২৫০১
১৪। নির্মল স: সুবাসক	১১	৪	১৭২৪০০	১.৪	১৫৬৭৬
১৫। সি এস পি	২৭	৭	২৪০৩৭৭	১.৭	৮২০০
১৬। জনসংঘ	৫৭	১	১৭৭২৫১	১.৪	৩১১০
১৭। হিন্দু মহাসভা	২	X	২০৩৪৫	০.২	১০১৭২
১৮। স্বতন্ত্র	২১	১	১০২৫৬৬	০.৮	৪৮৮৪
১৯। আর সি পি আই (ঠাকুর)	১	X	১৪৮৮৮	০.১	১৪৮৮৮
২০। নির্মল	২৭৬	৫	৭২৮০.৭	০.২	২৮২২
মোট	১০৫৭	২৮০	১২৬৬৬৪৫	১০০.০	১১২৮৪

যথাক্রমে তেতাল্লিশটি ও বোলাটি আসন লাভ করেন। প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট লাভের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল গত নির্বাচনে অবিভক্ত কমিউনিস্ট দলের প্রতি প্রার্থী বে ভোট লাভ করেছিলেন তার চেয়ে কম বৈধ ভোট পেয়েছেন। গতবার ও এবার এই সংখ্যা দুটি যথাক্রমে ১৬৫০৪ ও ১৬৯৮৫।

এস ইউ সি দল গত নির্বাচনে কোন বামপন্থী মার্চার অংশ গ্রহণ না করে এগারোটি আসনে প্রতিস্থলিত করে ৬১১০৪টি ভোট লাভ করেছিলেন। এবার সে ক্ষেত্রে আটটি আসনে প্রতিস্থলিত করে প্রায় দেড় লক্ষাধিক ভোটের জনসমর্থন লাভ করেন ও চারটি আসন পান। এই দল প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট পান ১৮১১১টি। যদিও এত কম আসনে প্রতিস্থলিত করে এই সূচক সংখ্যার দ্বারা এদের শক্তির কোন মান প্রকাশ হয় না তবুও কলা চলে প্রার্থী নির্বাচন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে এরা গত নির্বাচন অপেক্ষা

দৃষ্টিতে শাসক কংগ্রেস দলের পরাজয় স্বাভাবিক করতে এ দলের ভূমিকা নিশ্চরই উল্লেখের দাবী রাখে। এই দল একাশিটি আসনে প্রতিস্থলিত করে ১০.৫ শতাংশের সমর্থন লাভ করেন।

বাংলা কংগ্রেসের পর কমিউনিস্ট দল তেতাল্লিশটি আসনে প্রতিস্থলিত করে মাত্র বোলাটি আসন লাভ করেন। কলকাতা ও মেদিনীপুর জেলার এ দলের শক্তি সীমাবদ্ধ। প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট প্রাপ্ত হয় ১৩২২৬ বা রাজ্যের উপর নির্মিত মান অপেক্ষা ১.২ হাজার হাজারের মত বেশী। এর দ্বারা প্রমাণ হয় শক্তি অনুপাতে এ দল বেশী আসনে প্রতিস্থলিত করেছিলেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের অর্ধাংশও অনু-রূপ। এই দলের প্রার্থীরা গড়ে ভোট পান ১৩৫২৯ এ সংখ্যাও রাজ্যের উপর নির্মিত মান অপেক্ষা ১.৫ হাজারের মত বেশী। এ দল একচল্লিশটি কেন্দ্রে প্রতিস্থলিত করে মাত্র দশটি আসন পান। যদিও কুচবিহার জেলার দলের সাফল্য শক্তির আনুপাতিক হয় নি তবুও নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণ করে এ জেলা, এই দলের এক শক্তি ঘাঁটি। হাওড়া ও হুগলী জেলাতেও এই দলের এক বলিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিকাশ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

গন বান্ধব মোট ২৭, ২২ ০৫৬ টি ভোট লাভ করেন। শতাংশের হিসাবে ২১.৫।

যদিও এবার কিছু রাজনৈতিক দলের আকর্ষণ হয়েছে তবুও নির্বাচনী ফলাফল দেখে এ কথা বলা চলে যে জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব এই দুই মেরুতে সমাবর্তিত হবার প্রবণতা বা শ্বিতীয় নির্বাচন থেকে শুরু হয়েছে তা এবার আরও ঘনীভূত হয়েছে।

রাজ্যের প্রতি একশটি ভোটদাতার মধ্যে ৮৯ জনের কিছু বেশী কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিরোধী ফ্রন্ট দুটিকে সমর্থন জানিয়েছেন। হয় জনের কিছু বেশী নির্মল সদস্যদের সমর্থন করেছেন। আর মাত্র চার জন অন্যান্য দলের সমর্থক।

প্রতিস্থলিত সংখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস সাফল্য

এবার কোন আসন কেউ কিনা প্রতিস্থলিত করার ছেড়ে দেন নি। তবুও স্বমুখী প্রতিস্থলিত করার ক্ষেত্রে অনেক কম হয়েছে। এর অবশ্য একটি প্রধান কারণ প্রধান প্রধান বামপন্থী দলগুলির দুটি ভোট হওয়া। প্রথম নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণের শেষে আমরা যে ধারাটি পাবার চেষ্টা করছি সেটি এবার একটি পূরণের রূপ পেয়েছে বলা চলে। অর্থাৎ “প্রতিস্থলিত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে কংগ্রেস সাফল্যের হারও বৃদ্ধি পায়।”

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সারণী-৮ প্রতিস্থলিত সংখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস সাফল্য-৬৭	প্রতিস্থলিত সংখ্যা	কংগ্রেস সাফল্য	কংগ্রেস সাফল্যের হার
১	—	—	—
২	৩৭	৮	২১.০
৩	১০৫	৪৪	৪১.৭
৪	৬৭	৩৫	৫২.২
৫	৪৫	২৪	৫৩.৩
৬	১৭	৮	৪৭.০
৭	৫	৫	১০০.০
৮	—	—	—
৯	৩	২	৬৬.৭
১০	১	১	১০০.০

নির্বাচনী পর্ব

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

থেকে তিন শতাংশ বাড়বে বলে অনেকের ধারণা। যদি তা হয় তাহলে নব কংগ্রেস সাতটি সালের অবিভক্ত কংগ্রেস যে সাতচল্লিশটি আসন পেয়েছিলেন তার চেয়ে আরো সাতটি আসন বেশী পাবেন। ফলে তাঁদের আসন সংখ্যা অন্ততঃ চারগুণে দাঁড়াবে।

অন্যদিকে আদি কংগ্রেস, জনসংঘ ও এস এস পি একত্রে বোধ আসনগুলির আঠারোটি, সি পি আই দুটী, মুসলিম মজলিস ও সি পি এম একটি করে, বি কে ডি দুটী এবং নির্মল সদস্যরা দুটী আসন পেতে পারেন। আমরা এরা এবং মজলিস নগরের দুটী আসনই সি পি আই হারবার সম্ভাবনা। প্রথমটীতে মুসলিম লীগ ও মজলিস উভয়েই প্রার্থী দিয়েছেন। মুসলিম ভোট প্রায় সহিংস শতাংশ। মজলিস নগরে বি কে ডি নেতা চরণ সিং সি পি আই-এর প্রতিদ্বন্দ্বী।

বিহার : মোট তিস্তামটি আসনের মধ্যে ১৯৬৭ সালে অবিভক্ত কংগ্রেস চৌত্রিশটি আসন ও সাড়ে সাতচল্লিশ লক্ষ ভোট (৩৫.১২%), এস এস পি সাতটি আসন ও চব্বিশ লক্ষ ভোট (১৭.১০%), জনসংঘ একটি আসন ও পনেরো লক্ষ ভোট (১১.১৪%) সি এস পি একটি আসন ও প্রায় দশ লক্ষ ভোট (৭.০৮%), সি পি আই পাঁচটি আসন বারো লক্ষ ভোট হাজার ভোট, নির্মল পাঁচটি আসন এবং প্রায় বিশ লক্ষ আশী হাজার ভোট পান, তাঁরা একশো তিনজন প্রার্থী ছিলেন। সি পি এম দুটী আসনে প্রতিস্থলিত করেন ভোট পান প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার, কোন আসন পান নি এবং স্বতন্ত্র পাঁচটি আসনে প্রতিস্থলিত করে একটিও আসন পান নি, ভোট পান সাড়ে চার লক্ষেরও বেশী।

নব কংগ্রেস এই তিস্তামটি আসনের মধ্যে আটচল্লিশটি আসনে প্রতিস্থলিত করেছেন। সি পি আই নব কংগ্রেসকে ছাপরা, মজলিসের এবং নাজদা আসনগুলি ছেড়ে দিয়েছেন, নব কংগ্রেসও সি পি

আইকে পাটনা, রাঁচী এবং মহারাজগঞ্জ আসনগুলিতে প্রতিস্থলিত করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। সি পি আই মোট পনেরোটি আসনে প্রতিস্থলিত করেছেন, এবং সি এস পিকে মতিহারী ও পিউ-পরি আসন দুটী ছেড়ে দিয়েছেন। সি এস পি ও সি পি আইকে পূর্ণিমা ও জেহানাবাদ আসন দুটী ছেড়ে দিয়েছেন। মহাজোটের দলগুলি মোট চল্লিশটি আসনে একজন বোধ প্রার্থী দিতে সম্মত হতে পেরেছেন। বাকী তেরোটি আসনে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিস্থলিত করেছেন। এস এস পি উনিশ, জনসংঘ সাতাশ এবং আদি কংগ্রেস পাঁচটি আসনে প্রতিস্থলিত করেছেন। এছাড়া রয়েছেন স্বাধীন দলের বোল, শোবিত দল দুটী মোট বোল, বি কে ডি তেরো, সি এস পি এগারো, মুসলিম লীগ নয়, সি পি এম তিন এবং অন্যান্য পার্টি ও গ্রুপ মোট সতেরোটি আসনে।

বকসারে আদি কংগ্রেসের সংসদ নেতা শ্রীরামসুন্দর সিং বিহার শাসক কংগ্রেসের সভাপতি এ পি শর্মা এবং সি পি আই সহ আরো বারো জন প্রার্থীর সম্মুখীন।

বিহারের ছোটনাগপুর ডিভিশন এবং উত্তর বিহারে নব ও আদি কংগ্রেস কার্যকরী শব্দ সুবিধা হবে না। তা ছাড়া নব কংগ্রেস ও সি পি আই-এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত রফা না হওয়ায় নব কংগ্রেস ও সি পি আই দু'দলেই অসন্তুষ্টির মনোভাব দেখা দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আদি কংগ্রেস ও নব কংগ্রেস দু'দলেই প্রায় সমান সমান বাবেন অর্থাৎ অবিভক্ত কংগ্রেসের চৌত্রিশটি আসনকে আঠারোটি এবং বোলাটি হিসাবে পেতে পারেন। সি পি আই তাদের পাঁচটি আসন রক্ষা করেও দু'দলে একটি আসন বাড়তে সক্ষম হবে না এস এস পি এখানে কিছু বেশী আসন পাবেন। মনে হয় জনসংঘ কিছু কম আসন এবং বি কে ডি, লোকদল প্রভৃতি কোন আসনই পাবেন না।

মালিকগোষ্ঠীর চক্রান্তে শ্রম টুলস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী বন্ধ

(দর্পণের বিশেষ সংবাদসংগ্রহ)

নারকেলাডাওয়ার শ্রম টুলস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীটি সন্তর সালের আঠাশ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ রয়েছে। সংস্থাটি কলকাতার থেকে লোকসভার নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী গোষ্ঠী পরিচালিত। জানা যায়, এই মালিক গোষ্ঠীরই কলকাতার ট্যাপ ও ডাইয়ের একটি কারখানা রয়েছে। এবং এখানে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় দুশো বাট জন। নারকেলাডাওয়ার এই কারখানাটি বন্ধ হওয়ার ফলে প্রায় চারশো পরিবার এক নিদারুণ সংকটের মধ্যে পড়েছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, রাষ্ট্রপতি শাসনের সুযোগ নিয়ে কারখানাটি বন্ধ করা হল, অথচ ক্রোজার ঘোষণার ন্যায়সংগত কোন কারণ ছিল না। উপরন্তু এখনও বহু টাকার অর্ডার এই বন্ধ অংশটির ওপর সরবরাহ করার দায়িত্ব ছিল। এবং এই অর্ডারের আর্থিক পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। সন্তর সালের জানুয়ারী থেকে আগস্ট মাসের মধ্যেই অর্ডারগুলো পাওয়া যায়। সেইজারল্যান্ড, কানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অর্ডার ছিল বলে এর দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কন্ডেনটি

বসুমতী

(নবম পৃষ্ঠার পর)

পি এমকে আবারের আরোজনই করবে, তবে আচ্ছ সেই বসুমতীর আন্দোলনে সি পি এম কোন ভূমিকা গ্রহণ করবে? কল বাহুল্য, অতীতকে মনে রেখে কিম্বা ভবিষ্যতে শত্রু-শিবিরই পাকা করা হচ্ছে এই প্রশ্নে সি পি এম-এর প্রতিক্রিয়া পিছ হতে পারে। সি পি এম জেনে বন্ধের সাহায্যের বাহু প্রসারিত করে দিচ্ছে দেখে বসুমতীর অনেক কটর সি পি এম বিরোধীও আচ্ছ এই পাটি সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করছেন।

সি পি এম-এর সম্পর্কে বলে অশোকবাবুরা মালিকী কটে চাল চালালেও বসুমতীর ছবিটা অন্য রকম। কটর সি পি এম বিরোধীদেরও কটর সি পি এম বিরোধী মালিকরা নিজের স্বার্থে সি পি এম-এর কোলে ঠেলে দিতেও যে পিছ পাননা, বসুমতীর খেলার তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত দেখাছেন অশোক সেন এন্ড কোম্পানী। এদের মতোশ কর্মীমহলে এই ভাবেই খুলে পড়ে।

ডাইস (রেডিয়াল চেজার), ট্যাপ, ডাই, রিমার প্রভৃতি ইঞ্জিনারিং প্রযন্ত্র সরবরাহ করার ক্ষেত্রে কারখানাটি আন্তর্জাতিক সুনামের অধিকারী। বন্ধ হওয়ার আগে সংস্থাটির কাঁচা, মালেরও কোন অভাব ছিল না বলে শ্রমিকবৃন্দ জানান। আরো জানা যায়, ছেইটি সাল থেকে আর্থিক গড়গড়ালের শুরু। এ সময় থেকে মালিক-গোষ্ঠী শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের অপচেষ্টার কলা-কৌশল সৃষ্টি করেন বলে শ্রমিক মহল জানান। পঁয়ষিটি ছেইটি সালে পুজা বোনাসের দাবীর ভিত্তিতে যে কারচুপি করা হয়, অনেকের ধারণা, ক্রোজার ঘোষণার আগে পর্যন্ত এই নিয়ম চালু রাখার ফলেই সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়। হিসাবপত্র অসমাপ্ত থাকার কারণ দেখিয়ে মালিকগোষ্ঠী এই সময় থেকে পুজোর বোনাস দেওয়া বন্ধ করেন, পরিবর্তে মালিক পক্ষ অগ্রিম টাকা শ্রমিকবৃন্দের মধ্যে বিলি করার প্রথা চালু করেন।

সংস্থার কর্মচারী মহল জানান, এর ভিত্তিতে ছেইটি সালে অগ্রিম টাকার ভিত্তিতে বোনাসের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় কুড়ি পার্সেন্ট এবং আটবাটি উনসন্তর এই পরিমাণ হয় প্রায় দশ পার্সেন্ট। এবং উনসন্তর-সন্তর সালে মালিকগোষ্ঠী মাত্র চার পার্সেন্ট বোনাস দিতে চায়। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকবৃন্দের সংগে মালিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন দাবীর সঙ্গে বোনাসের দাবী নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে মালিক গোষ্ঠীর কোন যুক্তিসংগত কারণই ছিল না, তবুও কারখানার ক্রোজার ঘোষণা করে শ্রমিকবৃন্দের আর্থনৈতিক সংকটের সুযোগ নিতে চাইছেন মালিক-গোষ্ঠী।

সংস্থার কর্মচারীগণের আরো অভিযোগ, আটবাটি উনসন্তর সালে সাতাশ লক্ষ টাকার ব্যবসা করে যে পরিমাণ অর্থ বোনাস বাবদ

মালিক পক্ষ শ্রমিকদের দিয়েছিলেন, এবারে বিরাজিশ লক্ষ টাকার ব্যবসা করা সত্ত্বেও মালিক পক্ষ গতবারের তুলনায় অর্ধেক অর্থ বোনাস দেবার সিদ্ধান্ত একতরফা ভাবে ঘোষণা করেন।

কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করার মর্নি-ভাবে মালিকপক্ষের একেত্রে অনেকখানি প্রকাশ পেয়েছে বলে জানা যায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা, আঠাশ সেপ্টেম্বর সংস্থাটি বন্ধ হয়েছে, অথচ ঐ মাসের বেতন এখনও পর্যন্ত কর্মীদের দেওয়া হয়নি। এমনকি, শ্রমিকবৃন্দ কারখানা বন্ধ থাকাকালীন বিভিন্ন সুত্র থেকে যে সব অর্থ সাহায্য পান, সেটিও মালিকগোষ্ঠী বন্ধ করে দেওয়ার ঘৃণা বড়বড় আড়াল থেকে চালিয়ে যাচ্ছেন। ই এস আই এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কর্মচারীগণ যে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন, সেটি বন্ধ করে দেওয়ার এক দফা চেষ্টা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

শ্রমিক কর্মচারী মহলের জিজ্ঞাসা, সন্তর সালের বোলাই আগস্ট ইলাকো হাউসে মালিক-গোষ্ঠী ও ইউনিয়নের সংগে, মামুলী প্রোডাকসন, ইনসেন্টিভ বোনাস, ক্যান্টিনের সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি দাবি নিয়ে যে আলোচনা শুরু করা হয় তার মধ্যে আঠাশ সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের অগোচরে সংস্থাতে ক্রোজার ঘোষণা করা ন্যায় সংগত কাজ হয়েছে কি? এছাড়া কোম্পানীর কাগজপত্রের হিসাবে বাই-দেখানো হোক না কেন, একথা কি সত্য নয়, কয়েক বছরের মধ্যে কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছে? উনিশশ আটচল্লিশ সালে ভিত্তিপত্রের পর মাত্র বারো জন কর্মী নিয়ে পঞ্চাশ সালে উৎপাদন শুরু করার পর সংস্থার বর্তমান কর্মীসংখ্যা প্রায় চারশোতে দাঁড়িয়েছে, এবং বিদেশে অর্ডার সান্ধ্যাইয়ের ক্ষেত্রে এই শ্রমিকগণের দান কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। তবুও কারখানা

হাট-বাজারের রূপকথা

ভারা এক পরসার কন্যা নাচার মেঘবরষ কেস,
ভারা এক পরসার বেচে-কেনে সোনার মত দেশ।
ভারা এক পরসার কন্যা নাচার...

ভারা কেউ রাজা কেউ মন্ত্রী হয়ে দেশকে বেচে যায়,
নাচেতে নাচেতে কন্যা আমার পাখর হয়ে যায়।
ভারা এক পরসার কন্যা নাচার...

সোনার অঙ্গ পুড়ে শ্মশান জন্মভূমি মা,
হাসতে জানে না পাখানী, কাদতে জানে না।
ভারা এক পরসার কন্যা নাচার...

ভারা কেউ রাজা কেউ মন্ত্রী হয়ে চোখ করে-আপন,
চোখের জলে ঢাকে কন্যা বৃকের রাঙা খুন।
ভারা এক পরসার কন্যা নাচার...

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঘগুলোর

বাঘগুলোর নখ খসে গেছে
দাঁত বরে গেছে
দু-পায়ে খাড়া হয়ে উঠেছে
সিঁদ্ধ করে খাচ্ছে মাংস-অমাংস
জঙ্গলে ঘুম আসেনা, ঘরের নিচের থাকে।

বদলে হাতে এসেছে বন্দুক
চমকায় তা চালায়

ধাবায় ছুড়ে মারে বোমা, আঙলের খাঁজে খাঁজে ভোজালি
আরো প্রাণর, উষত, ধারালো।

দয়াজলাল বসুপাধ্যায়

ক্রোজার হয়েছে। মালিক গোষ্ঠীর সভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেস নেতা অনাতম কলকাতার লোকসভার নব অতুল্য ঘোষের অবস্থা শোচনীয়। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী ইলা পাল তিনি তাঁর জামানত বাঁচাতে পারলে চৌধুরী এবং তাঁর পুত্রস্বয় সেন-র্যালো ও বেঙ্গল ল্যাম্পের ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য শ্রীঅমিতাভ পাল চৌধুরী ও শ্রীঅনিক পালচৌধুরী কি অস্বীকার করতে পারবেন, শ্রম-দপ্তর পৃষ্ঠ বার আলোচনার আরো-জন করলেও তাঁরা একবারের জন্যেও হাজির হননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সংস্থার কর্মচারীবৃন্দের দাবী আদায়ের আন্দোলন ক্রোজার ঘোষণার মাধ্যমে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা হলেও দাবী আদায়ে দৃঢ় সংকল্প শ্রমিকবৃন্দ জানান, কুড়ি পার্সেন্ট বোনাস, কাজের ভিত্তিতে গ্রেডেশন, ক্যান্টিনের সুবন্দোবস্ত, প্রোডাক-সন বোনাসের সম্মানজনক ফরসাল না হওয়া পর্যন্ত আপোষহীন আন্দোলন চলবে। শ্রমিক মহলের দাবি ও কারখানা ক্রোজারের সঠিক কারণ বাচাই করতে স্বল্প দিনের ভিত্তিতে একটি তদন্তের আদেশ এখনও কেন দেওয়া হচ্ছে না, এ বিষয়েও ইতিমধ্যে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে।

বর্ধমানে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এম-এর বিরুদ্ধে দলদালি আর রাজনীতি ভুলে এক না হতে পারলে ঐ দলকে আটকান যাবে না।

নির্বাচনী ফলাফলে বর্ধমানে কি হবে সেই সম্পর্কে ব্যাপক ভবিষ্যদ্বাণী না করেও এই কথা

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

। চাঁদর হার ।

বার্ষিক পনেরো টাকা
বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, মট জেন, কলি-১০

দর্পণের বিশেষ সংখ্যা

চতুর্দশ বর্ষে পদাৰ্পদ বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক উপলক্ষে দর্পণের আগামী সংখ্যা বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদ ফিচার কাটুন ছাড়াও থাকবে।

সম্পাদক-হীরেন বসু

সম্পাদক কতক মতাদর্শ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোরার কলিকাতা-১০ থেকে মুদ্রিত এবং ৩১ম মট জেন, কলিকাতা-১০ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত



কোন দলে কত আসন বিভিন্ন পার্টির অনুমান

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে
অন্যদিকের মত এবারেও নানা
জল্পনা শোনা যাচ্ছে। তবে এবারের
গণনা বৈশী ভাগ মহলেই সি পি
এম কত আসনে জয়ী হবে সেই
নির্দেশ মূল্য ভাবনা। বিগত সমস্ত
নির্বাচনেই কংগ্রেসের আসন
সম্পর্কে আলোচনা শোনা যেত।
এবারের আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের

রাজনীতিতে সি পি এমকেই মূল
প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে স্বীকার করে
নেওয়া হচ্ছে।

(শেখাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)



একটি নারকীয় পারিকল্পনা

অতি নির্ভরযোগ্য সূত্রে
জানা গেল যে, বহরমপুর
জেলায় মধ্যে সম্প্রতি কয়েক-
জন বন্দীকে যেভাবে মেরে
ফেলা হয়েছে সেই ভাবে
প্রেসিডেন্সী জেলে পাঁচ ছয়
জন নকশালপন্থী বন্দীকে
হত্যা করার এক নারকীয়
পারিকল্পনা করা হয়েছে। এই
পারিকল্পনা রূপায়িত হবে
আগামী দশ তারিখের মধ্যে।
বেলেঘাটার যেমন দুবার কয়েক-
জন নকশালপন্থীকে সোজা-
সুজি গুলি চালিয়ে হত্যা
করে পুলিশের সঙ্গে সংঘ-
র্ষের কাপনিক কাহিনী সংবাদ-
পত্রে প্রচার করা হল এক্ষেত্রেও
সেইরূপ কাহিনী রীতিয়ে
দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে হত্যাকাণ্ডের আসল ঘটনা

(বিশেষ সংবাদদাতা)

গত চব্বিশে ফেব্রুয়ারী বহ-
রমপুর সেন্ট্রাল জেলে যে নার-
কীয় ঘটনা ঘটেছে অতি
বিস্মিত সূত্রে আমরা তার বিবরণ
জানতে পেরেছি।

জানা গেছে যে, হেড ওয়ার্ডার
নিরঞ্জন করাল ছুরিকাঘাত হওয়ার

পর পঙ্গলা ষষ্টি বাজতে থাকে
এবং দরশো থেকে আড়াইশো ছেল-
রক্ষী, পুলিশ ও অন্যান্যরা নক-
শালপন্থী বন্দিদের ওপর ঝাঁপিয়ে
পড়ে বেরনেট ও লাঠি দিয়ে বোপ-
রোয়াভাবে পেটতে থাকে। চার
(শেখাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

দপন

১৪শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২ শ্রুতবার ৫ই মার্চ ১৯৭১ খ্রিঃ ৫০ পৃ

চরদের সাহায্যে পুলিশ নকশালদের ধরে হত্যা করছে বেলেঘাটার ঘটনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

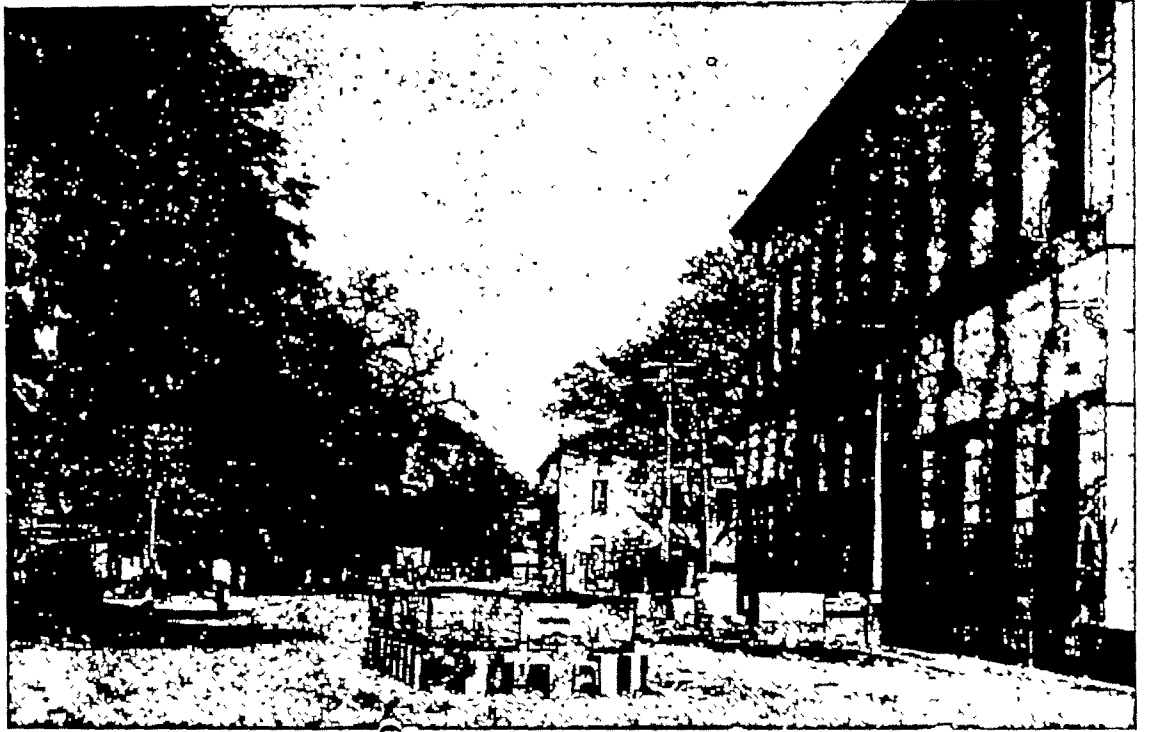
সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ
দাবী করছে যে নকশালীদের মধ্যে
তারা বহুলভাবে অনুপ্রবেশ করতে
পেরেছে। এর একটি প্রমাণ হলে
পাওয়া গেছে।

বেলেঘাটার হাঙ্গে যে কয়েকজন
তরুণকে রাস্তায় খোলাখুলি
পুলিশ গুলি করল তারা সকলেই
নকশালপন্থী ছিল বলে পুলিশের
বিশ্বাস। এদেরকে চিহ্নিত করার
জন্য নিহতদের বন্দুবান্ধবদের
মধ্যে একজনকে পুলিশ সঙ্গে করে
নিরে এসেছিল, কারা কারা নক-
শাল দেখিয়ে দেওয়ার জন্য।

পুলিশের একটি জীপ গাড়ীতে

বোরখা পরিধে এই ছোকরাকে
বেলেঘাটার নিরে আসা হয়। তার-
পর শব্দ হর ব্যাপক হোজার। এদের
যখন হাটিয়ে নিরে যাওয়া হচ্ছিল
সেই সময় বোরখা পরা গদস্তচর
ধৃত বন্দকদের মধ্যে কে কে সক্রিয়
নকশাল তা চিহ্নিত করে দেয়। এই

(শেখাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)



জেলায় মধ্যে বন্দী হত্যার প্রতিবাদে গত শুক্রবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুর বন্দ।
জেলা কালেক্টরেটের সামনের দৃশ্য।

—এল এল ফটো

সরকারী অর্থ কংগ্রেসের বেনামা নির্বাচনী প্রচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে
কেন্দ্রীয় সরকার কত সজাগ তার
বিপুল প্রচার সরকারী পয়সায়
শুরু হয়েছে। এই প্রচারের দায়িত্ব
নিরেছে ক্যাবিনেট ম্যাকান নামে
একটি মার্কিন-ভারতীয় বিজ্ঞাপন
প্রচার সংস্থা। এই প্রচার সংস্থার
জন্য এই সংস্থার দশ লাখ টাকার
কন্ট্রাক্ট।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ঠিক
আগের দিন, অর্থাৎ নয়ই মার্চ
কলকাতার দুটি বৃহৎ দৈনিকের
(স্টেটসম্যান ও আনন্দবাজার) বিশেষ

সংখ্যা প্রকাশিত হবে কলকাতা
উন্নয়নের প্রকল্প বিষয়ে। এই
ব্যাপারে এই দুই সংবাদপত্রকে বেশ
কয়েক হাজার টাকা দিতে হবে।

হঠাৎ এই শহর সম্পর্কে সর-
কারের এই বিশেষ আশ্রয় অবশ্যই
প্রচারমুখী। নব কংগ্রেসীরা মনে
করছে যে, এই প্রচারের দ্বারা
পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের ওপর
প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।
কিন্তু এই ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন
উঠতে পারে।

(শেখাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

রথীন দেব গুরুতর আহত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রজন্মের হেমন্ত বসুকে হত্যার
পরেও আরও হত্যা প্রচেষ্টা চলেছে।
বৃহস্পতিবার (চৌঠা মার্চ) আবার
হেমন্তবাসুর এলাকা শ্যামপুরে
আর একজন প্রজন্মের প্রবীণ নেতা
আততায়ীর আক্রমণে গুরুতর
আহত। তার নাম রথীন দেব।
তিনি স্থানীয় জবিলী স্কুলের
প্রধান শিক্ষক, অকৃতদার এবং অল
বেঙ্গল টিচার্স এ্যাসোসিয়েশনের
(শেখাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্বজনশ্রদ্ধেয়

হেমন্ত বসুর

হত্যা নিয়ে রাজনীতি

(দর্পণের পর্ববৈক্য)

হেমন্ত বসুর হত্যার সঙ্গে
সি পি এম-কে জড়ানোর দৃশ্য
প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কলকাতার
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বাতিল
করে দিলেন। অতিরিক্ত পুলিশ
কমিশনার গত শনিবার সাংবাদিক-
দের বলেছেন, এই “হত্যার ব্যাপারে
দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—পাঁচ-
জন নয়। * * তারা কোনো রাজ-
নৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিনা
জানা যায়নি” (আনন্দবাজার,
(শেখাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

আগামী সপ্তাহে দর্পণ বেকুচে মজলবার

আগামী সপ্তাহে দর্পণ
প্রকাশিত হচ্ছে মজলবার,
অর্থাৎ নির্বাচনের আগের
দিন। এই সংখ্যায় বিভিন্ন
সংবাদ ছাড়াও থাকবে এরা-
দের নির্বাচনে রাজ্য বিধান-
সভা আসনের পূর্ণ প্রার্থী
তালিকা।

হেমন্ত বসুকে হত্যা প্রসঙ্গে

হেমন্ত বসু নিহত হয়েছেন। কজন লোক কোন কায়দায় তাঁকে আক্রমণ করে কটা কোপ মেরে হত্যা করেছিল তার বিশদ বর্ণনা দিয়ে কোন লাভ নেই। কোন কোন সংবাদপত্রে দেখেছি আক্রান্ত হয়ে তিনি কি বলেছিলেন সেসব কথা তুলে দেয়া হয়েছে। আমার জিজ্ঞাস্য যারা সেসব কথা শুনেছেন তাঁরা তখন কি - করছিলেন? টাউন স্কুলের কাছে বেলা এগারোটার সময় এত লোকের ভীড়ে হেমন্ত বসু কয়েক জন লোকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ওসব কথা বললেন ও নিহত হলেন, আর সবাই দাঁড়িয়ে তা দেখলো? তাই যদি হয় তবে হেমন্ত বসুর জন্য দৃশ্য করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করে হেমন্ত বসু সে কথাই আমাদের বলে গেছেন।

কিছুকাল আগে উষ্মা কেন্দ্রের বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেবদত্ত মন্ডল নিহত হয়েছেন। তারও আগে দু-জন সম্ভাব্য নির্বাচন প্রার্থী নিহত হয়েছেন অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে। কে বা কারা এসব খুন করছে পদলিখ তার কোন হাদিস আজো করতে পারে নি। কিন্তু একথা কি স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না যে এই সমস্ত খুনের পেছনে একই অদৃশ্য হাত কাজ করছে? অর্থাৎ বাংলাদেশে বিশেষ যত্ন নিয়ে কোন এক অদৃশ্য শক্তি একটি পেশাদার খুনে বাহিনী তৈরী করে চলেছে। খুব ঠান্ডা মাথায় অনেক ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা কার্যকরী করা হচ্ছে। হেমন্তবাবুর মৃত্যুতে যারা নির্বাচন বন্ধ করার জন্য তারস্বরে চীৎকার করছেন তাঁরা জানেননা যে নির্বাচন বন্ধ হলেও খুন চলবে। কারণ যারা একদা ব্যক্তিগত সম্ভাসের মধ্য দিয়েই বিশ্ববাস আসে বলে খুন শুরুর করেছিলেন তাঁরা সেদিনই প্রতিবিলম্বীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। সে অস্ত্র কেড়ে নেবার শক্তি কিন্তু তাঁদের ছিলনা। আজ তো কোন কথাই ওঠে না।

দর্পণ ও নকশালপঙ্খীরা

আমি আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকার একজন পাঠক। আপনি নিরপেক্ষতার ভাণ করে যে বড়াই করেন আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র পত্রটুকু ছাপিয়ে তাঁর পরিচয় দিবেন।

প্রত্যেক সংখ্যায় লক্ষ্য করছি আপনি আপনার পত্রিকার প্রথম পাতায় খুব চটকদার এবং আকর্ষণীয় সংবাদ পরিবেশন আর ভিতরের পৃষ্ঠায় নকশাল অর্থাৎ যারা সি আই এর প্রত্যক্ষ এক্সেস্ট এবং যাদের নেতাকে (চার্লস মজুমদার মহাশয়কে) আমেরিকান কনসাল অফিসে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় বলে শোনা যায় এঁদের সমর্থনও করেন। কি জানি কি বিচিত্র আপনার সংবাদ পরিবেশন।

হেমন্ত বসুর মৃত্যুকে মূলধন করে কোন কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বিশেষ ফেব্রুয়ারীই অবিবেচকের মত কথা বলেছেন। তাঁরা শোকে মূহ্যমান বা উত্তেজনার বেসামাল হয়ে ওসব কথা বলেছেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই। যেমন ধরুন ফরওয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী শ্রীঅশোক ঘোষ বলেছেন, “পদলিখ এদিন এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যে দুজনকে ধরেছেন তারা ওই অঞ্চলের সি পি এম কর্মী বলেই পরিচিত। আমাদের পার্টির আঞ্চলিক কর্মীরা আমাদের তাই

জানিয়েছেন। এর পর সি পি এম হরতাল ডাকে কোন মর্মে?” (আনন্দবাজার) নব কংগ্রেসের নবীন নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের শোকস্বাক্ষর বিবৃতির উল্লেখ করে অভিযোগ করেছেন, “কোন পদ পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে সমারোহের সঙ্গে তাঁর শ্রাদ্ধ করলে বা দাঁড়িয়ে ওই শোকস্বাক্ষর - বিবৃতিটিও সেরুপ?” (আনন্দবাজার),

কলকাতার পদলিখ কমিশনার সাংবাদিক সম্মেলনে কিছু গোলমালে কথা বলেছেন। বিষয়টি যখন অনুসন্ধানসাপেক্ষ এবং মনুষ্যত্বের প্রাথমিক সাহায্য নিয়ে যখন অনুসন্ধান চলছে, তখন পদলিখ কমিশনার এসব কথা না বললেই পারতেন। নীচে তাঁর কথাবার্তার একটু নমুনা দেয়া গেল :

প্রঃ নকশালপঙ্খীরা আক্রমণ চালালে তো আপনি সব সময় তাদের নাম করে বলেন।

উঃ তাতে বিভিন্ন পার্টির মধ্যে সংঘর্ষের আশংকা থাকেনা বলে।

প্রঃ যাদের প্রোত্তার করা হয়েছে তাদের পার্টির কেন নাম করছেন না তা আমরা কি বুঝতে পারছি না।

যে নকশালরা আজ সমাজবিরোধীদের দলে পরিচিত হয়েছে আপনি প্রাণের ভয়ে তাদেরও সমর্থন করছেন। চমৎকার। আশা করি নকশালদের “চরিত্র” আপনি অবগত আছেন, বিশেষ করে আপনার মত একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু বিএম বিড়লা, ভূপেশ গুপ্ত, প্রফুল্ল সেনের মত নিজেদের প্রাণনাশের ভয়ে ঐ সমাজবিরোধী নকশালদের সমর্থন করে যাচ্ছেন, এবং মেহনতী মান্দ্য, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত ইত্যাদিকে বিভ্রান্ত করছেন।

পত্রকের এই চিঠিটুকু ছাপিয়ে আপনার নিরপেক্ষতার পরিচয় দিলে বাঞ্ছিত থাকিব।

দর্পণের জনৈক পাঠক

উঃ নকশালপঙ্খীদের নাম করলে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

কমিশনার সাহেব কিন্তু স্পষ্ট করে বলেন নি খুঁত ব্যক্তির কোন দলের, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়েছেন যথেষ্ট। অথচ অশোক ঘোষ ও সিদ্ধার্থ রায় মশাইরা বলে ফেললেন খুনীরা হচ্ছে সি পি এম-এর লোক। আইন কানুন জানা লোক দেশবন্দুর নাতি সিদ্ধার্থ রায় কি করে মনে করলেন যে খুঁত দুই ব্যক্তিই হেমন্ত বসুকে খুন করেছে? যদি তাও ধরে নেয়া হয়, তাহলেও একথা প্রমাণসাপেক্ষ যে ঐ দুজন সি পি এম-এর লোক।

বাইশে ফেব্রুয়ারীর “আনন্দ-

মতামত

বাজার” ও “বঙ্গান্তর” খুলে, ছবিটা আরও ঘোরালো ঠেকবে। আনন্দবাজার প্রথম পৃষ্ঠায় খবর দিচ্ছেন বিডন স্ট্রীট ও বিধান সরণীর সংযোগস্থলে যখন মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল আসে তখন দশবারো বছরের দুটি তরুণ দুটি রজনীগন্ধার মালা নিয়ে ছুটে আসে লরীর দিকে। মালা দুটির গায়ে লাল অক্ষরে লেখা—“শোক নয় বুলেট চাই” আর “শোক নয় বদলা চাই।” নীচে লেখা—সি পি আই এম এল। বঙ্গান্তর জানাচ্ছেন একুশে ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে শ্যামপুকুর অঞ্চলের কোন এক অজ্ঞাতনামা নকশাল নেতা টেঞ্জি ফোনে জানিয়েছেন যে প্রমথের হেমন্ত বসুর হত্যার সঙ্গে কোন নকশালপঙ্খী জড়িত নেই। পদলিখ যদি খুনীকে খুঁজে বার করতে না পারে তবে তাঁরই ওদের খুঁজে বার করবেন। খুঁতে অরাক লাগে হেমন্ত বসু নকশালদের কাছে কবে থেকে প্রমথের হলেন এবং তাঁর শবদ্বারে মাগ দেবার জন্য তাদের এতো আকুলি বিকুলিইবা কেন।

দুজন সম্ভাব্য নির্বাচন প্রার্থীর আততায়ীর হাতে মৃত্যু হবার দু-একদিনের মধ্যেই কলকাতার নানা দেয়ালে একটা লেখা আমার চোখে পড়েছে। লেখাটা এই—“ভোট প্রার্থীর মৃত্যু কাটা চলছে-চলবে (সি পি আই এম এল)।” এটা সত্যিই নকশালপঙ্খীরা লিখেছেন কিনা জানিনে, কারণ বাংলাদেশে তারা ছাড়াও আরো অনেকে নির্বাচন চান না। এই স্বাভাবিক প্রণয়ীর লোকেরা নির্বাচন চাননা, কারণ তারা জেনে গেছেন শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হলে কারা ক্ষমতার আসবে এবং তখন তাদের অসুবিধা কোথায়। সুতরাং উঠে পড়ে লেগেছেন নির্বাচন বন্ধ করতে। দু'একটা খুঁচরো খুঁনে যখন কিছু হলো না তখন হেমন্ত বসুকে হত্যা করা হলো নৃশংসভাবে। এই হত্যাকে উপলক্ষ্য করে দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ, তৈরী করার সমস্ত ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

জয়দেব পাণ্ডা

প্রবীণ ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্তকুমার বসুকে হত্যা করার পেছনে যে গভীর চক্রান্ত বিরাজ করছে, তা যে কোনও সুস্থ ও সচেতন মানুষের বুদ্ধিতে এতটুকুও অসুবিধা হয় না। আমার অভিজ্ঞতা ইতিহাসের পাতা থেকে “১৯০৪ সালে জার্মানিতে কমিউনিস্টদের খতম করার উদ্দেশ্যে হিটলার পার্লামেন্ট ভবনে আগুন লাগিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল যে কমিউনিস্টরাই আগুন লাগিয়েছে এবং তারপরই নাসী বাহিনী কমিউনিস্টদের উপর কাঁপিয়ে পড়েছিল।” এই ঘটনা শিক্ষা দেয় যে, শাসকগোষ্ঠী যখন নানা সংকটে জর্জরিত হয় এবং যখন দেখতে পায় যে সমস্যা থেকে উদ্ধারের সমস্ত পথ রুদ্ধ, তখন জনসাধারণের মধ্যে বিভেদের বীজ ছড়াবার চেষ্টা করে, নানারূপ এক্সেস্টের মাধ্যমে গুপ্তহত্যা করে ও ফ্যাসিস্ট কায়দায় পদলিখী নির্বাচন শুরুর করে। এটা কি তারই ইঙ্গিত?

যুক্তফ্রন্টের আমলে কোথায়ও ব্যক্তিগত সম্ভাস এত বিস্তীর্ণ ব্যাপক ছিল না, কিন্তু আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রগুলি সাংবাদিক রকমের চীৎকার শুরুর করে দিয়েছিল “আইন শৃঙ্খলা সব গেল—পদলিখ নিষ্কল” ইত্যাদি ইত্যাদি। তথাকথিত ভণ্ড তপস্বী অজয় মুখার্জী সুরেন্দ্রনাথ পাকের সাক্ষাস পার্টির মত ক্যাম্প খুলেছিলেন।

জয়া ইউনিয়ন সন্মার্ক

গত বারোই ফেব্রুয়ারীর দর্পণে মতামত পৃষ্ঠায় জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী কৃষ্ণক “সি পি আই এম কি মনো-সমারী প্রতিবিলম্বী”? এই মর্মে প্রশ্ন তুলে যা লেখা হয়েছে, তা গোয়েবলিসও প্রচারকেও ছাড়িয়ে যায়।

বাংলাদেশী অঞ্চলে সি পি আই এম-এর মজবুত সংগঠনকে যখন আঘাত করা সম্ভব হচ্ছে না, সি আই টি ইউ তথা মার্কসবাদী পরিচালিত জয়া ইউনিয়নে (যা শ্রমিক কর্মচারীদের একমাত্র সংগঠন) ভাঙন ধরানোর সমস্ত অপচেষ্টাই যখন ব্যর্থতার পর্ববাসিত; শ্রমিক কর্মচারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পচ্ছে, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক মধ্যবিত্ত মানুষেরা গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সূদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলছেন, কায়দা স্বার্থের ধারক এবং বাহকদের পায়ে তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, ঠিক তখনই দিশাহারা প্রতি-ক্রিয়ালীল গোষ্ঠী বিপ্লববাদের সঙ্গে মিশিতভাবে চক্রান্ত শুরুর করল—যাতে এলাকার সাধারণ মানুষ পদলিখ এবং সমাজ বিরোধীদের ভয়ে ভীত সন্ত্রাস্ত হয়ে পড়েন, ইউনিয়ন (জয়া) অফিসে স্বেচ্ছাসেবক-গণ উপস্থিত থাকতে না পারেন এবং সর্বোপরি অসুবিধা হয় যদি কৃষ্ণক নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে কারখানা (উষা) বন্ধ করে দেন (পূর্ব থেকে এদের সঙ্গে মালিক

১৯৭০ সালের ষোলই মার্চের পর থেকে আজ পর্যন্ত খুনের রেকর্ড একবারটি দেখুন তো? এখন তো পদলিখ, সি আই পি সবাই অত্যন্ত সক্রিয়, তবে কেন আজ অতীতের সমস্ত খুনের রেকর্ড স্থান হয়ে গেল? আজ মানুষ কেন এত সন্ত্রাস্ত? এই সম্ভাস-সৃষ্টির ক্রমাগত ব্যাপকতার বিরুদ্ধে কোন সংবাদপত্রই তো গর্জে উঠছে না? জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে বিশ্বাসঘাতকতা করে “জনগণের সেবক” ভুললোক সাধু-টিকে তো কোনও পার্কে তাড়িয়ে ফেলেতে দেখা যাচ্ছে না?

একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখের কালান্তরের সম্পাদকীয়তে দেখলাম “সি পি এম খুনোখুনির রাজনীতি আমদানী করেছে।” সত্যিই কি তাই? তাহলে সি পি এমের প্রায় দুশো জন কর্মী ইতি-মধ্যে খুন হয়ে গেল কেন? সেই তুলনায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের খুনের হিসাবটী-একবার কালান্তরের সম্পাদক মহাশয় জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবেন কি?

সবশেষে, মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ যে অনতিবিলম্বে হেমন্ত বসুর প্রকৃত খুনীকে খুঁজে বের করে জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে, তা সে যে কোনও রাজনৈতিক দলের লোক হোক না কেন। আমরা প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি চাই-ই।

গীতা ঘোষ

বা কৃষ্ণপক্ষের কারও কারও গোপন যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। এই সব কারণেই কারখানার সামনে পরিকল্পিতভাবেই মিঃ কপিলাকে আক্রমণ করা হলো (পাঠকরা দয়া করে বারই ফেব্রুয়ারী গণশক্তি পড়ুন ঘটনা বুঝতে সুবিধা হবে)।

ইউনিয়ন (জয়া) এইদিন সঠিক সময়েই শ্রমিক কর্মচারীদের সামনে প্রতিক্রিয়ালীল এবং প্রতি বিপ্লবীদের মনোবাস উন্মোচন করেন; নেতৃত্বের ডাকে শ্রমিক-কর্মচারীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে (প্রাণের ভয়ে নয়) এলাকায় মিছিল করে সাধারণ মানুষের পাশে প্রয়োজন মাত্রই থাকার প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রতিক্রিয়ালীলদের বিরুদ্ধে দুঃস্বপ্নারী জানান। ইউনিয়নের (জয়া) নেতৃত্বে শ্রমিক কর্মচারীগণ ঐ দিন যা করেছেন, সোচ্চারেই বলতে পারি “মালিকের দালালি নয়”, বরং শ্রমিকদের রক্ষার স্বার্থে সর্বত্র এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর দ্বারা পদলিখ এবং মালিকের তথা রাষ্ট্রপক্ষের উপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করা যায় (বারই ফেব্রুয়ারীর গণশক্তি দেখুন) শ্রমিকদের মনোবল বাড়ে এবং নেতৃত্বের চরিত্রও প্রকাশ পায়। সুতরাং মিঃ কপিলার উপর আক্রমণ শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী কাজই হয়েছে। নিম্নাই কেবলমাত্র তাদের প্রাপ্য নয়, প্রতিবাদ এবং যুক্ত করাও উচিত।

(শেখাংশ ১৭ পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পর্ব

(দশম পর্বের পর্বসংক্ষেপ)

পশ্চিমবঙ্গের আগামী দশই মার্চের অকাল নির্বাচন এ রাজ্যের রাজনীতির মোড় কোন দিকে নিয়ে যাবে, এ প্রশ্ন আজ প্রত্যেকটী নাগরিকের মনে।

নির্বাচনের দুটী দিক। মান্দ্র-বের সমস্ত অভিজ্ঞতা, টানা পোড়ো-নের নির্বাচন রাজনৈতিক উপলব্ধি এটাই হল প্রাথমিক। সংগঠিতভাবে অধিকাংশ মান্দ্রবের এই মনোভাবকে প্রতিফলিত করা হচ্ছে তার আকৃতিগত বিষয়বস্তু। অর্থাৎ মান্দ্রব যদি সাধারণভাবে ভেবে থাকেন, যে বিশেষ কোন রাজনৈ-তিক দল তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন, অপরে পারেন না, তা হলে তাঁরা ঐ দলকে ভোট দেবেন। ভোট গণনায় তাঁরা তাঁদের পছন্দ-সই রাজনৈতিক দলকে জয়ী করেন।

কথাতা বত সহজে বলা গেল, তত সহজ সরল এটা নয়। প্রচার, সত্যমিথ্যার টানা পোড়ো মিলিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য; সংবাদপত্র, জাতি-কর্ষ, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ সব মিলিয়ে মান্দ্রবের মনকে প্রভাবিত করে।

সুতরাং ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের নির্বাচনী ফলাফলের আংশিক হিসাব ধরে এবছর দশই মার্চের ভোটের ফলাফল কি হবে কেউ বলতে পারেন না। বলা সম্ভব নয়। তাহলেও রাজনৈতিক পর্বসংক্ষেপের এই প্রারম্ভে অসাধ্য সাধন করার চেষ্টা করতে দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তি পার্শ্বিক ও পিণ্ডিন পোল-এর মনগড়া হিসাব দাখিল করে সাময়িক আশ্বাসপ্রসাদ লাভ করেন। আমরা তাদের দলে নই, এবং নির্ভুল ভবি-ষ্যদ্বাণীর অসার দাবীও আমরা করি না।

তবু পাঠকদের দাবী মেনে নিয়ে আমরা নির্বাচনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাগুণি এবং তার প্রতি-ফলন কি ভাবে হতে পারে তার একটা পর্বলোচনা উপস্থাপন করছি।

প্রথমেই মান্দ্রবের মনে একটা উঠেছে যে পশ্চিমবঙ্গের যে বৃহৎ-সংসদ সরকার ১৯৬৯ সালে দশ আঠারোটি আসন পেয়ে শাসন ক্ষমতা লাভ করেছিল, তা তেরো মাস পরে ভেঙ্গে গেল এবং রাষ্ট্র-পতির শাসন কেন কয়েক মাস। বৃহৎসংসদের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেও-রার দায়িত্ব যে প্রাথমিক ভাবে একক বাংলা কংগ্রেসের তা সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ সি অন্তর্ভুক্ত প্রথমদিকে স্বীকার করে-ছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাংলা কংগ্রেস বেরিয়ে বাওয়ার পরও বৃহৎসংসদের যে একশ পঁচাত্তর জন সদস্য ছিলেন তাঁরা বৃহৎ সরকারকে বাঁচিয়ে রাখ-লেন না কেন? দেখতে পাওয়া গেল যে একমাত্র মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সরকারকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভবিষ্যতে বাংলা কংগ্রেসও যাতে আবার বিচার বিবেচনা করতে

পারেন তার সুযোগ দিতে সব-করতী বামপন্থী দলকে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ততদিনে কেরলে কংগ্রেস সমর্থনে সরকার গঠনের দৃষ্টান্ত তাঁদের চোখের সামনে। তাঁদের মনে অনেক আশা।

পরবর্তীকালে জনগণের অভি-জ্ঞতা হয়েছে যে বাংলা কংগ্রেস যে একক ভাবে পদত্যাগ করে বৃহৎসংসদ সরকার ভেঙ্গে দিয়েছিল, তার পেছনে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দল, কংগ্রেস প্রভৃতির গোপন আঁতাত কাজ করেছে। কেরলের অদ্যুত মেনন সরকার শাসকশ্রেণীর সঙ্গে কতগুলি হুমবাহ মঙ্গল বড়-বস্ত্রের ফল, এটাও অধিকাংশ জন-গণের বিশ্বাস হয়েছে।

গ্রামাঞ্চল ও শহরের বস্তী ও কারখানা অঞ্চলে, অফিস ও দপ্তরে অধিকাংশ সংগঠিত শ্রমিক-কর্ম-চারী সংগঠন, কৃষক সংগঠন মার্কস-বাদী কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য প্রথমে সংশয়াকুল চিত্তে, পরে সাগ্রহে শুনছেন এবং মোটামুটি মার্কসবাদীদের সংগ্রাম ও বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস, আদি-নব কংগ্রেস ও আট পার্টি জোট রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে প্রধানতঃ রাজ্যপাল ও সর-করী দপ্তরে ঘোরাঘুরি করে, নিজে-দের ঘরোয়া আলোচনা ও আঁতা-তের মারফতে এবং সংবাদপত্র মার-ফত বিবৃতি দিয়ে গত কয়-মাস রাজনৈতিক অস্থিরতা বজায় রেখেছে।

তাই দেখা যায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী অফিসে অবিরাম মান্দ্রবের চলাচল, দেয়ালে পোষ্টার লিখন, প্রচারা-ভিযান চলছে, অন্যদিকে আদি-নব-বাংলা কংগ্রেসের দপ্তরে; আট পার্টি জোটের অফিসে গোপন বৈঠক, রাজ্যপালের কাছে আনা-গোনা, সন্দেহ অকিঞ্চিৎকর সংশয়ের সোজামান অনিশ্চয়তা।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে মার্কসবাদী পার্টি যে অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে আছেন তার কারণ তারা রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই জন-সাধারণকে নতুন সরকার গঠনের সুযোগ দেবার জন্য নির্বাচনের দাবী করে এসেছেন। অন্যদিকে নব কংগ্রেস নেতা সিদ্ধার্থ বসু, বিজয়বাবু, আদি কংগ্রেস নেতা প্রতাপচন্দ্র এবং বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় দৃঢ়ভাবে নির্বা-চনের বিরোধিতা করে এসেছেন। আট পার্টি জোট, সোজাসুজি নির্বাচনের বিরোধিতা না করে বলেছেন যে আগে সি পি আই (এম)-কে শাসনস্তা করা হোক, তারপর নির্বাচন। অজয়বাবু কুখ্যাত আটক আইন জারী, এন্ডারসন কালেকশন প্রবর্তনের এবং তাতে না হলে মিলিটারী নামিয়ে সি পি আই (এম)-কে দমন

করার দাবী জানিয়ে এসেছেন। সংগত হটক বা অসংগত হটক রাষ্ট্রপতি শাসনের খুন, পুলিশী নিপীড়ন ও অত্যাচারের অধিকাংশ বাংলা কংগ্রেসের এবং আট পার্টি জোটের ঘাড়ের এসে পড়েছে, যদিও তাঁরা তা সি পি এম-এর ঘাড়ের চাপাতে চেয়েছিলেন। অজয়বাবু, সিদ্ধার্থ বসু, রঞ্জন সেন এদের বিভিন্ন বক্তৃতা থেকেই এই উলটো ফল দেখা দিয়েছে।

যে আইন শৃঙ্খলা ও পুলিশী-শক্তি নিশ্চয় করে রাখার অভি-যোগ করে অজয়বাবু এবং আট পার্টি জোট বৃহৎসংসদ সরকার ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতির নামে বে-নামী কংগ্রেসী শাসন ফিরিয়ে আনলেন, জনসাধারণ দেখতে পেলেন যে জ্যোতি বসুর আমলের চেয়েও এই আমলে খুন খারাপ, পুলিশী নির্বাতন শতগুণে বেড়ে গেছে। আর এই শাসনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে বাংলা কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কমিউ-নিস্ট দল ও তাঁদের নেতৃত্বে আট পার্টি জোট। এর অবসান ঘটানোর দাবী নিয়ে এগিয়ে এসে-ছেন সি পি এমের নেতৃত্বে সংব্রত বামপন্থী বৃহৎসংসদ। আর পুলিশ ও নকশালী আক্রমণের আঘাত পড়ছে সি পি এম কর্মীদের ওপর। ফলে অস্পষ্টভাবে হলেও মধ্যবিস্তরের মনে এবং সংশয়হীন ভাবে সংগ-ঠিত কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সি পি এম-এর প্রতি সহানুভূতি দৃঢ় সমর্থনের আকৃতি গ্রহণ করেছে।

এবারের নির্বাচনে এই পট-ভূমিকার চিত্রটি মনে রাখলে যোঝা যায় কেন সি পি এম ও সংব্রত

বামপন্থী বৃহৎসংসদের নির্বাচনী অভি-যান এত সূক্ষ্মশীল, বিশাল জমা-জমতে মূর্খবিরত, আর অন্যদিকে কলহ-সংশয় এবং পরস্পর বিরোধী ধারার তিন কংগ্রেস ও আট পার্টি জোট জর্জরিত।

সাতটি সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব তীব্র হলেও, কংগ্রেস বিরোধী দুটি বামপন্থী বৃহৎসংসদ (৬৪+৬৩=১২৭) কংগ্রেসের সমান সংখ্যক একশ সাতটি আসন লাভ করেছিলেন। বৃহৎসংসদ সরকার গঠিত হয়েছিল সাতজন পি, এস, পি, চারজন লোকসেবক চব্বিশ, পাঁচজন নির্মল এবং দুজন গোষ্ঠী-লীগ সদস্যকে (এরা নির্বাচনে কোন বামপন্থী বৃহৎসংসদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না) নিয়ে।

এরপর বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় ইন্দিরা গান্ধী, চাবন ও গুলজারীলাল নন্দীর সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে প্রথম বৃহৎসংসদ সরকার ভেঙ্গে দেবার সব কন্ডোবস্ত পাকাপাকি করেন সাত-টি সালের দোসরা অক্টোবর। শোনা যায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল সেনেরা সেদিন ইন্দিরা গান্ধী ও অজয়বাবুর পরা-মর্শ মত দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দলকে নতুন-মন্ত্রিসভার নিতে রাজী হননি বলে শেষ পর্বন্ত অজয়বাবু পদত্যাগ করেন নি। অগত্যা কংগ্রেসকে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের শরণাপন্ন হতে হয়। কিভাবে বাংলা কংগ্রেসের এগারো জন সদস্যকে কিনে নিয়ে প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর পি ডি এফ-কংগ্রেস কোরা-লিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন পশ্চিমবঙ্গের মান্দ্রব তা ভুলে যায় নি। এবারকার নির্বাচনেও ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের ঐ মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত তিনজন সদস্য (কংগ্রেস

নিয়ে চার) শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন যেমন গঙ্গাধর প্রামাণিক, চন্দ্রীপদ মিত্র, অমির কিস্কু এবং দাশরথি তা। এ ঘট-নাও পশ্চিমবঙ্গের মান্দ্রবের নজরে পড়েছে। সি পি আই এখন এদের "প্রগতিশীল কংগ্রেসী" বলে যে সমর্থন করছে রাজ্যের কংগ্রেস-বিরোধী ভোটারদের তা নজর এড়ায় নি।

উল্লেখ্য সাত সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বৃহৎসংসদকে দুশো আঠা-রোটি আসনে বিজয়ী করে পশ্চিম-বঙ্গের মান্দ্রব কংগ্রেসী ষড়যন্ত্র-কারীদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিশেষ লক্ষণীয় হল জনগণের এই ষড়-যন্ত্র সম্পর্কে আরো বেশী সজাগ সচেতনতা। তাঁরা বাংলা কংগ্রেসকে তার নেতাদের বিশ্বাস করেন নি। অজয়বাবু আরামবাগে জেতা আসন সাড়ে বোল হাজার ভোটে হারা-লেন। দুশীল ধাড়ার ভোট কমল ছয় হাজার, তমলুকে অজয়বাবুর ভোটও ছয় হাজার কম গেল। মেধাগঞ্জের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অমর রায় প্রধানের এবং দিনহাটার কমলকান্তি গুহের ভোট ছ হাজার ও পাঁচ হাজার কম গেল। শেখোজ জন আসনটিও হারালেন। কাশীকান্ত মৈত্রের ভোট কমল পাঁচ হাজার, অপূর্বলাল মজুমদা-রের ভোট কমল আট হাজার, নিশীথ কুন্ডুর ভোট কমল এগারো হাজার, স্বরূপনগরে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট সদস্য বামিনী সেনের ভোট কমল ছয় হাজার, বসিরহাটে অমির ব্যানার্জীর ভোট কমল পাঁচ হাজার—এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে ভোট বাড়ল প্রধানতঃ কংগ্রেস এবং সি পি এম-এর। প্রায় প্রতিটি আসনেই জনসাধারণের এই (শেখোজ ১৭ পৃষ্ঠায়)

নতুন

- স্বাদ
- রূপ
- আকার

গুণতিতে ও বেশী





কোলে

স্বর্ণাশ্বরে ... শ্রেষ্ঠত্বে

ক্রীম ক্র্যাকার বিস্কুট

পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি নির্বাচন : একটি সমীক্ষা (৩)

দিলীপকুমার সিংহরায়

পশ্চিম সাধারণ নির্বাচন, ৬৯

গত নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন নি। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হবার পর স্বধাবিভক্ত বামপন্থী জোট এক কর্মসূচীর ভিত্তিতে মিলিত হন এবং রাজ্যে সরকার গঠনের প্রয়াস পাবার চেষ্টা করেন। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কংগ্রেস দল বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সরকার গঠনের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য যে সব দল এগিয়ে আসেন তারা হলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, এস এস পি, পি এস পি এস ইউ সি, লোকসেবক সংঘ, গোষ্ঠী লীগ, ওয়ার্কাস পার্টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, আর সি পি আই, বলাশেভিক দল ও কিছু কিছু ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল সদস্য।

৬৭৯ মার্চের পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। জনসাধারণের প্রচণ্ড আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে প্রচুর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে এই সরকার কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু “ভালবাসা আহ্বাদের অঙ্গ সমস্ত আমাদের বেশী নয়”। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ শুরু হয়। খাদ্য সঙ্কট, মূল্য বৃদ্ধি, বেকারী ও শিল্পে শাসিত প্রদেশে সুনির্দিষ্ট পথের জন্য ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে মতবৈধ প্রচণ্ড রূপে বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতি হিসাবে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কিছু সদস্য ৬৭৯ নভেম্বরে কংগ্রেস দলের পরোক্ষ সহায়তায় আর একটি সরকার গঠনের প্রয়াস পাবার চেষ্টা করেন। নতুন সরকারের নাম হয়— জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও কংগ্রেস মিলিত সরকার। কিন্তু এই সরকার গঠনে সাংবিধানিক দুটি থাকায় রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বামপন্থী দলগুলি পুনর্নির্বাচনের আহ্বান জানান। শত্রু করলে উনসত্তর-এর নয়ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যে আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাজনৈতিক দল

এই প্রথম রাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে একটি সার্বিক বামপন্থী ঐক্য গঠিত হয়। নবগঠিত এই বামপন্থী জোটের নাম হয় যুক্তফ্রন্ট। যদিও নির্বাচনে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের চৌদ্দটি দল ছাড়া আরও বহু দলের আবির্ভাব হয়। এই নির্বাচনে যুক্ত রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বস্তুতঃ এমনটি এর পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। যদিও জনসাধারণের ভিতর ঐ সমস্ত দলের প্রভাব অতি নগণ্য। তবুও এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বলা চলে।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস দল তাদের হত মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য অত্যন্ত স্বেচ্ছা হন। যুক্তফ্রন্টের শাসন কালে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনমন, মূল্যবৃদ্ধি জনিত রাজ্যের অর্থনৈতিক সঙ্কট, শিল্পে অশান্তি ইত্যাদির জন্য ফ্রন্টের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাই কংগ্রেস দলের প্রচারণার প্রধান বিষয় ছিল।

অপরদিকে যুক্তফ্রন্ট তাদের রাজত্বকালে যে স্বল্প পরিমাণ উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন সেই সব প্রসঙ্গ, সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দান এবং রাজ্যের নিদারুণ অর্থনৈতিক ও খাদ্য সঙ্কটের জন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে নির্বাচনী প্রচার চালান।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল না। কংগ্রেস দল প্রতিবারের মত এবারও দুশো আশিটি কেন্দ্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এবং যুক্তফ্রন্ট ঐ দুশো আশিটি কেন্দ্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবতীর্ণ হন। মেদিনীপুর জেলার পি এস পি শাখা ফ্রন্টের কর্মসূচী মেনে চলার সুবাদে ফ্রন্টের সমর্থন লাভ করেন।

এই রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি দল প্রগেসিভ মুসলিম লীগ এই নামে নির্বাচনে চারশটি আসনে প্রার্থী দেন। প্রথম নির্বাচনে বহু নির্দল সদস্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক নির্বাচনে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রবণতার ভাট্টার ভাব দেখা যায়—সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এবার সর্বনিম্ন মোট সাতাশ জন নির্বাচনে নির্দল হিসাবে অবতীর্ণ হন।

এবার তালিকাভুক্ত ভোটারের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের মত বৃদ্ধি পেলে মোট ২০৭৪২০০৫ জন হয়। তার মধ্যে ১০৪১০৯১১ জন বৈধ ভাবে ভোট দেন। এই সংখ্যা শতাংশের হিসাবে হয় ৬৪.৭। যে কোন নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা অপেক্ষা এই সংখ্যা সর্বাধিক।

নির্বাচনী ফলাফল

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে কংগ্রেস দলের প্রতি জনসমর্থন কিছু কমেই বরং প্রায় তিন লক্ষের মত বৃদ্ধি পেয়েছে। শতাংশ অঙ্ক আগের নির্বাচনের শতাংশ অঙ্কের মাত্রার প্রায় সমান। যদিও আসনলাভের সংখ্যা এবার এ দলের ভাগ্যে অনেক কম হয়। মাত্র পঞ্চাশটি। প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট পড়েও আগের নির্বাচনের তুলনায় এক হাজারের কিছু বেশী। এর থেকে এই মন্তব্য করা যায় যে রাজনৈতিক সমাবর্তনে কংগ্রেস দল সংহত হয়ে আসছে। জনসাধা-

রণের উপর তাদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা স্থিতি অক্ষয় পেয়ে গেছে। বামপন্থী দলগুলির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যে ভোট ভাগাভাগি হত এবার তার সুযোগ বিশেষ ঘটে নি বলে কংগ্রেস দলের বিশেষ অসুবিধা হয়। কংগ্রেস দলের সাফল্য প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গের জেলাগুলিতেই বেশী। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি পশ্চিম দিনাজপুর, ও মালদা জেলাতেই তাদের লাভ আসনগুলির মধ্যে একশটি আসন লাভ করেন। চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার যথাক্রমে পঞ্চাশ ও পঁয়তাল্লিশটি আসনের মধ্যে এই দলের মাত্র দশটি আসন লাভ সাফল্যকে আরও সঙ্কুচিত করে। এবারই কংগ্রেস দল কাঁকড়া ও বীরভূম জেলায় কোন আসন লাভ করতে পারেন নি। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে এমন কখনও হয় নি যে বাংলা দেশের কোন জেলায় কংগ্রেস আসন পান নি। অন্যান্য জেলাগুলিতেও কংগ্রেসের সাফল্য অত্যন্ত সীমিত হয়।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের এই নির্বাচনে আসন লাভ সর্বাধিক। এই দল সাতান্নবুইটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আশিটি আসন লাভ করেন। আসন লাভের দিক থেকে বিচার করলে এই দলই প্রথম রাজ্যের সর্ববৃহৎ দলের মর্যাদা লাভ করেন। এই দলও এবার গত নির্বাচন অপেক্ষা প্রায় তিন লক্ষের মত জনসমর্থন বাড়তে সমর্থন হয়েছেন। ভোটদাতাদের প্রতি পাঁচ জনে একজন এই দলের সমর্থক। এই দলের লাভ আশিটি আসনের মধ্যে পঞ্চাশটি আসন পেয়েছেন কলকাতা চব্বিশ পরগণা ও বর্ধমান জেলা তিনটি থেকে। এবার হাওড়া ও হুগলী জেলাতেও এই দলের সাফল্য অসুতপূর্ব। তবে উত্তর বঙ্গের পাঁচটি জেলাতে এই দল মাত্র দুটি আসন লাভ করেছেন। এটা ঐ অঞ্চলে এই দলের দুর্বলতার পরিচায়ক। প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট প্রাপ্ত সংখ্যাও এই দলের পক্ষে সর্বাধিক হয়েছে। মোট ২৭৬১১ জন গড়ে এই দলের প্রতি প্রার্থীকে ভোট দেন। এই সংখ্যা যে কোন দলের পক্ষে নিশ্চয়ই সংখ্যা অপেক্ষা সর্বাধিক। এই দলের ফলাফল বিশ্লেষণে এটুকু বলা চলে রাজ্যের প্রায় সকল জেলাতেই এই দল তাদের সাংগঠনিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছেন।

কমিউনিস্ট দলের প্রতি জনসমর্থন সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি না পেলেও আসনলাভের দিক থেকে এই দল আশ্চর্যজনক সাফল্য লাভ করেছেন। মোট ছত্রিশটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিরিশটি আসন লাভ করেন। এই দলের প্রতি প্রার্থী দলের জন্য গড়ে ২৬০৬০টি ভোট এনেছেন। যা গত নির্বাচনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

সারণী-১		নির্বাচনী ফলাফলের সারাংশ-৬৯			
রাজনৈতিক দল	প্রার্থী সংখ্যা	আসনলাভ	প্রাপ্ত বৈধ ভোট	শতাংশ	প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট
১। কংগ্রেস	২৮০	৫৫	৫৫৪২২৮৬	৪১.০	১২৭২৪
২। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট	২৭	৮০	২৬৭২০৫৪	২০.০	২৭৬১১
৩। কমিউনিস্ট পার্টি	৩৬	৩০	২০৮২২১	৭.০	২৬০৬০
৪। বাংলা কংগ্রেস	৪২	৩০	১০২৪৬২৮	৮.২	২২৩৩৭
৫। ফরওয়ার্ড ব্লক	২৮	২১	৬৭১৬৮২	৫.০	২৩৮৮২
৬। আর এস পি	১৮	১০	৪০২৫৫৫	৩.০	২২৩৬৪
৭। এস এস সি	১০	৮	২১২৬১৫	১.৬	১৬৮২৩
৮। এস ইউ সি	৭	৭	২০২৭২১	১.৫	২৮৮০
৯। ওয়ার্কাস পার্টি	২	২	৪৭৩২১	০.৪	২৩৬২৬
১০। আর সি পি আই	২	২	৫০৩৭০	০.৪	২৫১৮৫
১১। ফরওয়ার্ড ব্লক (মা)	১	১	২৭১৪০	০.২	২৭১৪০
১২। লোকসেবক সংঘ	৬	৪	২২৮৪৪	০.৭	১৬৬৪১
১৩। গোষ্ঠী লীগ	৪	৪	৭১৬৬৫	০.৫	১৭৩১৬
১৪। ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল	১০	২	২৮০৫২৬	২.১	২১৫৮৪
১৫। ফ্রন্ট সমর্থিত					
পি এস পি	৪	৪	১২২৭৪৬	০.৭	৩০৬৮৭
মোট যুক্ত ফ্রন্ট	২৮০	২১৮	৬২০৮০৮	৫১.৫	
১৬। লোকদল	৫০	—	১০৫১৫৭	১.০	২৫৫০
১৭। প্রাউটিউ	৫৮	—	৩৫৩৫২	০.৩	৬১০
১৮। জনগণ	৪২	—	২২৫২২৪	০.৭	২৫৫৬
১৯। হিন্দু মহাসভা	৮	—	২০০৫৮	০.১	২৫০৭
২০। স্বতন্ত্র	৪	—	৮২২৬	০.১	২২০২
২১। জাতীয় দল	২০	—	২৮০১৮	০.২	১৪১৬
২২। প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ	৪০	৩	২০০১৬	০.১	৫২২৫
২৩। রিপাবলিকান	২	—	১০৭২৬	০.১	১১২২
২৪। পি এস পি	২০	১	৫০১৬৫	০.৪	২৬৫৭
২৫। আই এন ডি এক	২৬	১	১১৮৭৭৮	০.৭	১২৩৭
২৬। আর সি পি আই (ঠাকুর)	৪	—	৮৩২৩	০.১	২০৮০
২৭। মাইনরিটি লীগ	২	—	৩৭২	—	১৮৬
২৮। পশ্চিম বঙ্গ কৃষক	২	—	৬২৩০	—	৩১৪৬
২৯। এম বি এক	১	—	১২৩৭	—	১২৩৭
৩০। স্বাধীনতা	৬	—	১৭১৬৭	০.১	২৮৬১
৩১। নির্দল	৮৩	২	১৮৫২২১	১.৪	২২৩২
মোট	২০৭১	২৮০	১০৪১০৯১১	১০০.০	৬৪৭৭

সারণী ১০		প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা		অনুযায়ী কংগ্রেস সাফল্য - ৬৯	
প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা	কেন্দ্র	কংগ্রেস সাফল্য	কংগ্রেস সাফল্যের হার		
১	—	—	—		
২	৬৬	১০	১৫.২		
৩	৭২	১৬	২০.৩		
৪	৭৭	১৩	২২.৮		
৫	৫৬	১০	১৭.৭		
৬	১৬	৪	২৫.০		
৭	৬	২	৩৩.৩		

বাংলা কংগ্রেস দলের প্রভাব জেলায় সাফল্য মোটেই তাদের কিছু জনসাধারণের মধ্যে সীমিত হয়ে গেছে। এই দল গত নির্বাচনে ২০-৫ শতাংশের জনসমর্থন লাভ করেছিলেন এবার সেখানে মাত্র ৮-২ শতাংশের সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু গতবার প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট পেয়েছিলেন ১৬৪৭৪টি এবার পেয়েছেন ২২৩০৯টি। বলা চলে গতবার তারা শক্তি অনুপাতে বেশী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এবার প্রার্থী নির্বাচন চব্বিশ পরগণার সীমান্ত ক্ষেত্র থেকে এই দল এবার বীরভূম ও ফরওয়ার্ড ব্লক দলের কুচবিহার (শেখাংশ ১৭ শতাংশ)

সংশোধনবাদ ও অতি বাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে

সংগ্রামে সি পি আই (এম)

মার্কসবাদী লেনিনবাদী।

আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে সি পি আই, সি পি আই (এম) এবং সি পি আই (এম-এল)-এর অনুসরণকারী তিনটি প্রধান ভাবধারা বিদ্যমান। অবশ্য এ ছাড়াও আরো কয়েকটি বামপন্থী দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে এবং প্রমিত সর্বস্বত্বাধারের মতাদর্শকে অবলম্বন ও অনুকরণ করে সংগঠিত বলে দাবী করে থাকেন। আমরা মতাদর্শের দিক থেকে এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই বলে যদি ধরেও নিই, তাহলেও প্রয়োগ এবং কর্মপন্থার ক্ষেত্রে এদের মধ্যকার স্বল্প-বৈষম্য তিক্ত এই সময়ে বৈরমূলক স্বল্প পরিণত হল কেন তার সহজ ব্যাখ্যা শুধু পাওয়া যায় না।

অতি-সরলীকরণ করে কেউ কেউ একে নেতৃত্ব পর্যায়ে সুবিধামূলক আপোষ অথবা বৈরিতা এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে আপোষ ও নিষ্কর্ষ ভাবধারার প্রকাশ বলে ধরে থাকেন।

বলা বাহুল্য সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে সার্বিক মার্কসবাদী বিশ্লেষণ ও তার নির্দেশিত পথে এগিয়ে হতে হবে। মার্কসবাদ শিক্ষিয়েছে যে প্রতিটি বস্তু, ঘটনা, চিন্তা বিপরীত উপাদানের সংমিশ্রণ। কোন কিছুই স্বাচ্ছন্দ্য বা একধরনের উপাদান নয়। এই উপাদানগুলি বস্তুজগতে পরস্পরবিরোধী উপাদান মাত্র। এটম অণু ভেঙেও মানব দেহেছে তার উপাদান পরস্পর বিরোধী পীড়ন ও নিউটন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, কোন কিছুই এর ব্যতিক্রম নয়। “বিপরীতের একা ও সংগ্রাম” এই পথ বেয়ে বস্তু ও চিন্তাজগতের অগ্রগতি।

সুতরাং কোন বিশেষ বস্তু বা ঘটনাকে পর্ববৈক্ষণ করতে হলে তার মনোভাব স্বল্পগুলিকে অনুধাবন করতে হবে। এই অনুধাবনও ইতিমধ্যেই জ্ঞানকে অনুশীলন দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে। তারপর এই পরিমার্জিত জ্ঞানকে বাস্তব কর্ম অর্থাৎ বস্তুর অবস্থা বদলে দেওয়ার প্রয়োগমূলক কর্মপন্থায় দিয়ে নতুন উন্নততর বস্তুতে রূপান্তরিত করতে হবে। কমলালব্ধের রং অথবা বাহ্য আকৃতি দেখে কমলালব্ধের সম্পর্কে ভাসান্ডাসা জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। কিন্তু খোসা ছাড়িয়ে কোরগুটি মধু না দিয়ে তার স্বাদগ্রহণ অসম্ভব। কাজে কাজেই স্বল্পের প্রকৃতি নির্ণয়, অনুশীলন এবং তাকে বদলে দেবার জন্যে হাতে কলমে কাজ করা, একমাত্র এই মার্কসবাদী পন্থায় অনুসরণ

করেই সমাজ বিপ্লবকে সফল করে তোলা যায়। অন্য কোন সহজ, চুস্ত পথ নেই।

এই মার্কসবাদী বিশ্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি; সঠিক পন্থা নির্ণয় সম্ভব এবং খড় থেকে ধান, তুণ থেকে চাল বেছে নেওয়া সম্ভব। প্রথমতঃ এই বিশ্বজনীন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ সমস্ত ঘটনা ও বস্তুকে, সমাজ, পরিবার, রাজনৈতিক দল ও তাদের কর্মসূচী এবং বাস্তব কর্মধারাকে বিশেষ প্রেমী-দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখে। প্রেমীবস্ত্ত সমাজে সব কিছুই প্রেমীর ছাপ বহন করে। কর্ম ও চিন্তা এর ব্যতিক্রম নয়।

দেশের আভ্যন্তরীণ স্বল্পের সমাবেশকেও দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। এক ভাববাদী, অপরটি বস্তুবাদী। ভাববাদী দৃষ্টিকোণ বস্তু সম্পর্কহীন কাল্পনিক চিন্তাকে বস্তুর পরিবর্তে স্থাপন করে। সনাতনকে প্রকৃষ্টতম মনে করে, অতীতকে বর্তমানের চেয়ে উন্নততর মনে করে এবং জগতটাকে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ, অতীতের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়, বর্তমানকে অতীতের আবর্তন ও পরিণতি হিসাবে লক্ষ্য করে এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের উন্নততর বস্তুগত অবস্থায় নিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় কর্মরত থাকে।

সুতরাং কোন বাস্তব ঘটনার প্রকৃতি রীতিনীতি বোঝা, সঠিকভাবে সেই জ্ঞানকে উন্নততর অবস্থায় পরিবর্তিত করা প্রেমী-দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হয়।

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে কোন কোন স্বল্প প্রকট এবং এর মধ্যে কোন স্বল্পটি প্রধান? মনে রাখা দরকার যে বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদ বহন করমুখীন এবং সমাজতন্ত্রী বিশ্ববাসনা গড়ে উঠছে তখন আমাদের দেশের প্রেমী গুলি ও স্বল্পগুলির ওপর তার মৌলিক ছাপ পড়বেই। আমাদের দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। স্থালিন বলেছেন, “আগেকার দিনে প্রমিত বিপ্লবের অবস্থা বিশ্লেষণ করার সময় প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার স্তরের দিক থেকেই বিচার করা হত। এখন কিন্তু প্রশ্নটা এভাবে বিচার করা যথেষ্ট নয়। এখন প্রশ্নটাকে সমস্ত দেশের কিংবা প্রধান দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে; সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে বিচার করতে হবে।” (স্থালিন, লেনিনবাদের ভিত্তি পৃ ৩৫৬)

কারণ মার্কস শিক্ষিয়েছেন

যে “বাস্তববাদী মতাদর্শ” শুধু দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করে তাই নয়, এর কাজ হল দুনিয়াকে বদলে দেওয়া। দেশের প্রধান স্বল্পগুলিকে বস্তু তাকে নিরসন করে সমাজ বদলে দেওয়ার কাজে লাগালে মার্কসবাদী বস্তু অসার শাস্ত্রবাক্যে পরিণত হয়ে পড়ে। তাই সঠিক বস্তুগত অবস্থা বিশ্লেষণ করে স্বল্পের সঠিক প্রাধান্য নির্ণয় এবং বিপ্লবী সংগ্রামে জরাজীর্ণ করতে হবে, প্রথম কাজই হল বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের প্রয়োগ শিক্ষা করা।

রণনীতি হল বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে প্রমিতপ্রেমী কোথায় প্রধান আঘাত হানবে, তাই স্থির করা, বিপ্লবের মধ্য ও সহায়ক মন্ত্রণ বাহিনীর সমাবেশ এবং বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে আগাগোড়া ঐ পরি-কল্পনাকে কাজে পরিণত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

রণকৌশল হচ্ছে আন্দোলনের জোয়ার ভাঁটা, বিপ্লবের উত্থান-পতনের দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে কোন পন্থায় প্রমিত প্রেমী নিজেই পরিচালিত করবে তা স্থির করা, পূর্বনো ধরনের সংগ্রাম ও সংগঠনের বদলে দ্রুত নতুন ধরনের সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তোলা, পূর্বনো শোলাগানের বদলে নতুন শোলাগানের অবলম্বন। বিভিন্ন ধরনের কর্মমাধ্যমে রণনীতির লক্ষ্য ও পন্থা পন্থায় মধ্য সমন্বয় সাধন। রণনীতি বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত একই থাকে, কিন্তু রণকৌশল বিপ্লবের জোয়ার ভাঁটার সময় দ্রুত পরিবর্তন করতে পারা চাই। দুনিয়ার বিপ্লবের প্রথম স্তরে ১৯০১-১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব পর্যন্ত রণনীতি একই ছিল কিন্তু রণকৌশল বারবার পরিবর্তিত হয়েছিল স্বল্প লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে। চীনের বিপ্লবের প্রথম স্তরে ১৯২৫-১৯২৭ সালে গ্রামিকালের উত্তরমুখী অভিযান পর্যন্ত চীনের পার্টি কুওমিন্টাং কমিউনিস্ট একা সাধনের রণকৌশল গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯২৭ সালে ডাং সান-ইয়াং সেনের স্বলাভিষিক্ত কুওমিন্টাং নেতা চিয়াং কাইশেক বহন পার্টি বিশ্বদ্রষ্টকরণের নামে কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ চালায় তখন রণনীতি অপরিবর্তিত রেখে চীনা কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ রণকৌশল দ্রুত পরিবর্তিত করেন। ১৯৩১-৩৩ সালে জাপ আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও চীনা কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ রণনীতি অপরিবর্তিত রেখে যুগপৎ একা ও সংগ্রামের অপূর্ব রণকৌশল উদ্ভাবন করেন এবং জয়ী হন।

রণনীতির উদ্দেশ্য বিশেষ স্তরে

চরম লক্ষ্য সাধন করা। রণকৌশল বিশেষ বিশেষ স্বল্পস্বল্পে জরাজীর্ণের উদ্দেশ্যে রচিত। রণকৌশল হচ্ছে রণনীতিরই অঙ্গ এবং রণনীতির আওতায় থেকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই হচ্ছে রণকৌশলের সার্থকতা।

উপরোক্ত মৌলিক মার্কসবাদী ধারণাগুলি মাথায় রেখে আমাদের দেশের প্রধান স্বল্প নির্ণয়, বিপ্লবের স্তর নির্দেশ, রণনীতি নির্ধারণ ও রণকৌশলের সূচনা প্রয়োগ এই কয়টি বাস্তব নির্ণয় থেকে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল আন্দোলনের মূল্যায়ন সম্ভব।

আমাদের দেশ আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন; অন্যকথায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। এ স্বাধীনতা অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে বটীশ সাম্রাজ্যবাদ এবং এদেশের সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল বুদ্ধোন্নত প্রেমীর মধ্যে বোকাপড়ার ভিত্তিতে। সাম্রাজ্যবাদ এবং এদেশের পুঁজিবাদ সামন্তবাদের যে স্বল্প তার চেয়ে এদের একা যে প্রধান এর ফলে তা সুপরিষ্কৃত। কিন্তু এটা হল সাম্রাজ্যবাদ ও এদেশীয় পুঁজিবাদের সম্পর্কের একটা দিক মাত্র। প্রধান স্বল্প ছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং এদেশীয় জনগণের বিভিন্ন প্রেমীর মধ্যে। তাই জনগণকে বিজ্ঞাত করার জন্যে হলও এদেশীয় বুদ্ধোন্নত যারা একদিকে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, সামন্তপ্রেমীর সঙ্গে একত্রে সামন্ত-ক্ষমতার আসীন হয়েছিল, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণকে অবাধ নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকার দিয়েছে কিন্তু সেই সার্বজনীন ভোটাধিকার পুঁজিবাদ সামন্তবাদের প্রেমীস্বার্থে রচিত সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ, সীমায়িত। অন্যদিকে স্বল্পের প্রয়োগ এবং প্রমিত কৃষকের বাহিনীর মধ্যে অনগ্রসরতা, পশুচাদপদ-গামী মনোভাব এবং পেতিবুদ্ধোন্নত সুবিধাবাদের স্বল্পগুলি দিয়ে অবাধ নির্বাচনের অধিকার সংকুচিত এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

এদেশীয় শাসকপ্রেমী (বুদ্ধোন্নত সামন্তপ্রেমী) আর্থিক শোষণ ও প্রীতিস্বর লক্ষ্য সাধনের জন্যে পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করেছে। পুঁজি সংগ্রহের জন্যে তারা যে নীতি অবলম্বন করেছে তার দুটো মাত্র পথ। (এক) এদেশের জনগণের প্রমূল্য শোষণ ও ক্ষমবর্ধিত হাবে করভার; (দুই) বিদেশী সাম্রাজ্য-

বাদীদের কাছ থেকে সাহায্য (কণ) গ্রহণ। অর্থাৎ উন্নয়নের এই নীতি থেকেই এদেশের শাসকপ্রেমী বৃহৎ বুদ্ধোন্নত সামন্ত রাজা জমিদারদের প্রেমীচরিত্র, অর্থাৎ তারা যে জনগণের অধিকাংশ প্রমিত কৃষক মেহনতী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী জনগণের বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদের মূল্যপেক্ষী, আপোষকামী তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

সামন্তবাদী শোষণ বাস্তবায়ন অবসান ঘটিয়ে বুদ্ধোন্নত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাপ্ত করা এদেশের বিপ্লবের প্রাথমিক স্তর। বুদ্ধোন্নত গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থ কৃষিতে সামন্তবাদী শোষণ উঠিয়ে দিয়ে দ্রুত শিল্পায়নের পথ খুলে দেওয়া, জাতির প্রতিটি অংশের ছোট বড় মাকারী শিল্পের দ্রুত বিকাশ, কৃষি উৎপাদনের উৎসাহ খুলে দিয়ে শিল্পপ্রসারের ভিত্তি রচনা, সর্বস্তরের জন্যে শিক্ষা, স্বল্পের ব্যবস্থা কাজের বন্দোবস্ত, গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশের শাসকপ্রেমীর যে চরিত্র অর্থাৎ তারা সামন্তবাস্তবায়ন সামন্তপ্রেমীর অংশীদার সূত্রায় সামন্তশোষণ খুলে দেওয়াতে তাদের প্রবল অনিচ্ছা, উৎসাহ পণ্যের বাজার ও মূলধনের জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ হওয়ার নীতি গ্রহণের ফলে এদেশের শাসকপ্রেমী এদেশের জনসাধারণের আর ও জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ সংকুচিত করতে বাধ্য। শাসকপ্রেমীর এই প্রেমীচরিত্রের দরুনই তারা আজ আর বুদ্ধোন্নত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে অপারগ। ১৯২১ সালেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সভায় মানবেন্দ্র নাথ রায়ের প্রস্তাবের সংশোধনী হিসাবে লেনিন একমাত্র প্রমিত প্রেমীর নেতৃত্বেই বর্তমান যুগে বুদ্ধোন্নত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হতে পারে এই কথাটী জড়িয়ে দিয়ে বুদ্ধোন্নত দিচ্ছেলেন যে বর্তমান যুগে বুদ্ধোন্নত প্রেমী আর গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপনে আগ্রহী নয় বরং তারা এর বিরোধী।

সুতরাং সি পি আই আজ যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছেন অর্থাৎ তাদের “বুদ্ধোন্নত এবং প্রমিতপ্রেমীর মৌখ নেতৃত্বে” গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত করার মতাদর্শ আসলে মার্কসবাদ লেনিনবাদ বিরোধী, স্বল্প লেনিনের নির্দেশের বিরোধী এবং শাসকপ্রেমীর স্বপক্ষে, জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য মতাদর্শ। সি পি (সেবাংশ ১৫ পৃষ্ঠায়)

WEST BENGAL POLLS

(A hand book of Election Results & Analysis.)
Contains :—Constituency-wise results since 1962; Detailed results of Parliamentary Constituencies of West Bengal, 20 Tables & a Chart with detailed information. This book will help you to find the probable winning candidates among the contesting parties in the ensuing mid-term poll. By Sudhir Ghose. Rs.—6.00

DEY BOOKS STORES
Calcutta-12.

Firma K. L. Mukhopadhyay
Phone:—24-1824. Calcutta-12.

নকশালবাড়ীর বিপ্লবী তাৎপর্য

সুদীপ মৈত্র

নকশালবাড়ী আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করতে হলে এদেশের, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার আভ্যন্তরীণ সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি এবং পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ ও জনগণের স্বাধীনতার বিকাশ—এই দুটি অবস্থার পারস্পরিক হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (সাতার ও ষাট সালের বিবৃতি ও ঘোষণা) পৃথিবীতে বর্তমানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্প বর্তমান। (এক) সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মিশ্র, (দুই) সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে মিশ্র, (তিন) পুঁজিবাদী দেশের মালিক শ্রেণীর সঙ্গে এই দেশের শ্রমিক-সর্বস্বীকার শ্রেণীর নেতৃত্বে নিপীড়িত জনগণের মিশ্র এবং (চার) সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের নিজেদের মধ্যেকার মিশ্র।

উপরোক্ত মিশ্রগুলির বিচার করেই আজ বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, পরাজয়, বিজয় প্রভৃতির ধরন বোঝা যায়। তাই নকশালবাড়ী আন্দোলনের সম্যক সারবস্তা বুঝতে হলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্বাম্বিক নিয়মগুলিকে না বুঝে পারা যায় না।

আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীর বিশ্লেষণ করলে কি দেখি? সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের বৃট্টীয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে এদেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন প্রধানতঃ আপোষকারী বৃজ্জেরা শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অতীতবস্ত্য গ্রামীণ জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের আগাগোড়া এদেশের জনগণকে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের ভিত্তিতে স্বাধীনতা অর্জনের পথ থেকে সতর্কভাবে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। পাছে, আপোষের লেনদেনে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে স্বাধীনতা আন্দোলন কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল তার প্রধান লক্ষ্য ছিল বৃট্টীয় সাম্রাজ্যবাদকে বৃজ্জেরা সূচিয়ে, তার “হৃদয়ের কাছে আবেদন” করে ভারতের জনগণের জন্যে “ধাপে ধাপে” বৃট্টীয় আইন-কানুন, সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুকরণে রচিত এক প্রকার “স্বাধীনতা”। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানবের সংগ্রাম ও চূড়ান্ত বিজয়ের ফলে অর্জিত স্বাধীনতা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসীন শ্রেণীগুলির মোটেই কাম্য ছিল না।

স্বয়ং গান্ধীজি উনিশশ তেইশ সালে জমিদারদের ও সরকারের খাজনা মিটিয়ে দেবার জন্যে দুর্ভিক্ষক্লান্ত কৃষকদের ওপর চাপ দিতে কসর করেন নি এবং কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিও কৃষকদের খাজনা বন্ধ আন্দোলন কিংবা আমোদবাদ শ্রমিকদের সংগঠন ও একতরফ বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, একবার নয়, বারে বারে।

অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রথম থেকেই এ দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের সাধারণ স্বার্থের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ পুঁজিবাদের স্বপক্ষে সক্রিয় হয়েছেন। এরও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় এই জাতীয় বৃজ্জেরা সামন্তবাদী শ্রেণীগুলির বিশ্লেষণের মধ্যে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে বৃট্টীয় সাম্রাজ্যবাদের এদেশে শাসন প্রতিষ্ঠার অভিযানে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছিল যে শ্রেণীর তারা হল মূহুরদ্বী বেনিয়ান শ্রেণী। মূহুরদ্বীর বীরজী ভোরা, নরানসুখ দাস থেকে বাংলা দেশের জগত-শেষ, নবকৃষ্ণ দেব, স্মারকানাথ ঠাকুরেরা সবারই সম্মুখের পেছনে ছিল বৃট্টীয় বণিকদের মূহুরদ্বী-বৃত্তি। এরা নিজেদের পুঁজিসংগ্রহ করেছেন এদেশের তাতী, নীলচাষী ও গ্রামীণ উৎপাদকদের পণ্য করে বৃট্টীয় ব্যবসায়ীদের কমিশন এক্সেস্ট রূপে। বৃট্টীয় শোষণের অংশ পেয়েই এরা পুঁজির মালিক হয়েছিলেন। সুতরাং বৃট্টীয় শাসনের এঁরাই ছিলেন উগ্রতম সমর্থক। এঁরাই আবার বৃট্টীয় সাম্রাজ্যবাদের এদেশীয় দালাল হিসাবে জমিদারীতে সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠী করেন। ফলে এই দালালশ্রেণীকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমিকবন্ধক আইন ইত্যাদির মারফতে বৃট্টীয় শাসকেরা গ্রামাঞ্চলে কারেমী স্বার্থের রক্ষক ও প্রতিরূপে সৃষ্টি করে। এদেশীয় ধনিক বণিক জমিদার শ্রেণী কার্যতঃ একই সাম্রাজ্যবাদী শিকড় থেকে গজানো দুটী কান্ড মাত্র।

এদেশে বন্ধন বৃট্টীয় বণিকেরা আসে তখন তারা এদেশের পণ্য কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রী করার লক্ষ্য নিয়েই আসে। অ্যাডাম স্মিথের ভাষায় “To buy cheap and sell dear”। এদেশীয় পণ্য কমদামে কিনে ইউরোপে বেশীদামে বেচার নীতি নিয়ে তারা এসেছিল। এদেশে ইউরোপের পণ্য বিক্রয় করার সম্ভাবনা তখন ছিলই না কারণ প্রোগ্রিবিদ্যায় এবং আর্থিক ক্ষমতার ভারতীয়দের চেয়ে বৃট্টীয় বা ইউরোপীয় বণিকেরা দূর্বল ছিল। সুতরাং বৃট্টীয় কুঠিওয়ালারা এদেশের পণ্য কেনার জন্যে বীরজী ভোরা, নরানসুখ দাস প্রভৃতি ভারতীয় পুঁজিমালিকের কাছ থেকে উচ্চ হারে টাকা ধার

করত এবং তাদের মাল কেনার জন্যে উচ্চ হারে কমিশন দিত। বাংলা দেশেও বৃট্টীয় কেনাবেচার মূহুরদ্বী হয়ে বাংলা দেশের ধনিকশ্রেণী শোষণের ভাগীদার হয়েছিল।

বাংলাদেশ জুড়নের ফলে, মার্কসের ভাষায় plundering of Bengal Gold এর ফলে বৃট্টীয় বণিকশ্রেণী শিল্প বৃজ্জেরাতে রূপান্তরিত হয়। তখন তারা বৃট্টেনের পণ্য এদেশের বাজারে বিক্রয় করার এদেশের কাঁচামাল সম্ভারের কেনার নীতি গ্রহণ করে। এই স্তরেও ভারতীয় পুঁজির মালিকেরা গ্রামীণ অভিজাত জমিদার ও আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের হিসাদার হিসাবে বৃট্টীয় শাসক শ্রেণীর দালালের ভূমিকা গ্রহণ করে।

পরবর্তীকালে বৃট্টীয় পুঁজি যখন একচেটিয়া মহাজনী পুঁজির রূপ গ্রহণ করল, তখন জার্মান, আমেরিকান ও জাপানী পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্যে এদেশে কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠা করে সম্ভা মজুর, কাঁচামাল ও পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করল। তখন তারা এদেশীয় এক্সেস্টদের কিছু কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিল। আর্বিসিনিয়া বৃজ্জেরা বৃট্টীয় কল্যাণ নগেশ্বরানজী টাটার পুত্র জামদজী টাটা ইম্পাত কোম্পানী ও জলবিদ্যুত কোম্পানী খোলার সুযোগ পেল। বোম্বে ও আহমেদাবাদে বৃট্টীয়ের ভারতীয় আমলা কর্মচারীদের উদ্যোগে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হল। এই ভারতীয়দের শিল্পোদ্যোগ প্রধানতঃ হারদরবাদের নিজাম বরোদার পাই-কোরাড়, বর্মানের মহারাজা এদের গ্রামীণ শোষণের ফলে অর্জিত অর্থের ওপর নির্ভরশীল ছিল। টাটা, ওয়ালচাঁদ, করমচাঁদ খাপার বিড়লা প্রভৃতি এদেশীয় বৃজ্জেরা পুঁজিপতি গোষ্ঠীও নিজাম, বরোদা, বিকানীর, জয়পুর, ইন্দোর প্রভৃতি সামন্ত রাজা জমিদারদের নির্ভরশীল ছিল। ফলে একবৃত্ত পুঁজির ওপর শিল্পায়নের জন্যে নির্ভরশীল ছিল। ফলে একবৃত্তে দুটী ফুলের মতোই এদেশীয় পুঁজিপতি বৃজ্জেরা এবং সামন্তশ্রেণী বৃট্টীয় সাম্রাজ্যবাদের সহায়তার বেড়ে ওঠে।

এই কথাগুলি মনে রাখলেই বোঝা যায় এদেশের পুঁজিমালিক ও সামন্তশ্রেণী আসলে সাম্রাজ্যবাদের মূখ্যপেক্ষী নির্ভরশীল মূহুরদ্বী পুঁজি ও গ্রামীণ বৃজ্জেরা সামন্তবাদের আধার। তাই বন্ধন তথাকথিত স্বাধীনতা আমরা পেলাম তাও এসেছে নয়া-উপনিবেশিক কায়দার পরিপূরক এদেশীয় পুঁজিপতি সামন্ত শ্রেণীর বোকাপড়ার ভিত্তিতে। এর ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে একসঙ্গে বৃট্টীয় মার্কিন পুঁজি (সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যকার মিশ্র) এবং একচেটিয়া ভারতীয় পুঁজি ও সামন্তশ্রেণীর বোধ মালিকানার রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিতে ভারতীয় জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া

“দুটি পাহাড়” এদেশের শ্রমিক কৃষক মেহনতী জনতার কাঁধে চেপে বসেছে।

সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সহযোগী সামন্তশ্রেণীর এই দুটী জগদ্বন্দ্বী পাহাড়কে অপসারণ এবং জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া ভারতীয় জনগণের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে নকশালবাড়ীর আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়কে বোঝা সহজ হবে।

ভারতের শতকরা সত্তর জন কৃষিনির্ভরশীল কৃষক ও কৃষিমজুর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দেশের জাতীয় আয়ের অধিকাংশ কৃষিজাত পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এদেশের কৃষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে একমাত্র এমন ব্যবস্থাই জাতীয় শোষণের অবসান ঘটাতে পারে। শ্রেণী হিসাবে কৃষকশ্রেণী রক্ষণশীল এবং ক্ষুদ্রে উৎপাদকের পর্যায়ে পড়েন। এদের মধ্যে অনেকগুলি স্তর। বিভিন্ন স্তরের বিপ্লবী চেতনা বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে। এদের প্রধান শত্রু জোতদার জমিদার মহাজন শ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর মিশ্রই আমাদের দেশে প্রধান মিশ্র। এই সামন্ত শ্রেণী বিরোধী কৃষক শ্রেণীকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্বে সমাবেশ করে শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় ও প্রশস্ত করে তোলা যায়।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এই সামন্তশ্রেণীর প্রধান মরুদ্বী। এদেশের পুঁজিপতিরাও সামন্ত রাজা মহারাজাদের অংশীদার। আর রাষ্ট্রের চরিত্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত মূহুরদ্বী বৃজ্জেরা জমিদার শ্রেণীর রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের নীতি ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন নয়। এই শাসক শ্রেণী ক্ষুদ্রে উৎপাদকদের ওপর নির্ভরশীল কৃষি-উৎপাদকে পুঁজি মালিকানাধীন উৎপাদনে এবং ক্ষুদ্রে মালিকদেরও ভূমিহীন কৃষকমজুরের পরিণত করার আগ্রহী।

অন্যদিকে শিল্পায়নের জন্যে এদেশের মালিকশ্রেণী প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভর করে। বিদেশী পুঁজির সঙ্গে অংশীদারিত্বে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ এদের শিল্পায়নের নীতির বিনিময় সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য এবং আভ্যন্তরীণ শোষণ। আভ্যন্তরীণ শোষণ থেকে লব্ধ পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রদত্ত পুঁজি থেকে এরা শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখে।

সুতরাং বিশ্বের প্রধান প্রধান মিশ্রগুলির সঙ্গেও এদেশের সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী মিশ্রের প্রকৃতিগত পারস্পরিক রয়েছে। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী জনগণের সংগ্রামের প্রকৃতির সঙ্গে এদেশের সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণীর অভ্যুত্থানের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য রয়েছে। অতীত মূহুরী সাম্রাজ্যবাদ তার ক্ষয়নশীলতার কবলে অন্যদিকে তার দালাল এদেশে (শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠার)

৫ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন ৫

প্রকৃতপক্ষে আপনাবাই শাসক

আসন্ন নির্বাচনে—

- ১। আপনার ভোট দিতে ভুলবেন না।
- ২। কোন ভয় বা পক্ষপাতিত্ব না করে, আপনার মনোমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিন।
- ৩। কোন বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন অথবা হুমকীতে ভয় পাবেন না।
- ৪। যদি কেউ আপনাকে ঘুষ বা কোন বেআইনী পুরস্কার দিতে চা, তবে সে আপনাকে মানুষ হিসাবে, ভারতবর্ষের আত্মমর্যদা সম্পন্ন নাগরিক হিসাবে, অপমান করছে।
- ৫। কোন ব্যক্তির দেওয়া কোন গাড়িতে চড়ে ভোটদান কেন্দ্রে যাবেন না, কারণ ভোটদানকেন্দ্রে আপনার বাসস্থান থেকে সওয়া এক মাইলের (ছই কিলোমিটারের) মধ্যে। আমাদের প্রত্যেকে এইটুকু পথ অনায়াসেই হেঁটে যেতে পারি।

আপনারা যদি ভোট দিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করেন তবে দেশের ঘোগ্য সম্ভাবনাই হবেন আমাদের জাতীয় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার সদস্য এবং আমাদের সরকারও হবে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সেবা ও মঙ্গলের কাজে উৎসর্গীকৃত সত্যিকারের একটি ভাল সরকার।

(মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন থেকে উদ্ধৃত)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

কামটান্ড বিপ্লবীদের কর্মনাতির পর্যালোচনা

প্রবর্তন

শোষণ ব্যক্তির দৈহিক মৃত্যুতে শোষণ ব্যবস্থার ধ্বংস হয় না। প্রেসীসংগ্রাম আর সমাজবিপ্লবের সূচী ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এই সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। আরও একবার নতুন করে এ কথা আমরা বুঝছি আমাদের নিজেদের গত দেড় বছরের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে। প্রমাণিত হয়েছে—যদি কোনো বিপ্লবী পার্টি শোষণ ব্যক্তিদের হত্যা করে বিপ্লবের বিকাশ ঘটতে চায়, তারা শোষণ-ব্যবস্থার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না; উটে, জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। চোখের উপর জ্বলজ্বালন্ত এইটাই আমরা হতে দেখছি।

এমন হয় কেন? ব্যক্তিহত্যার কর্মনীতি ব্যর্থ হয় কেন?—এই কারণে যে, শোষণব্যবস্থা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের উপর ভর করে টিকে থাকে না। শোষণ-ব্যবস্থার মূল আশ্রয় বা ভিত্তি হল তার আর্থনীতিক বিন্যাস। সেই শোষণমূলক আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই শোষণের রাজনীতিক ক্ষমতা—রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করে। আবার, রাজনীতিক ক্ষমতার মূল বিনিয়োগ হল শোষণের সশস্ত্র বাহিনী। শোষণ-প্রেশীদের এই সশস্ত্র বাহিনীকে ধ্বংস পর্বত না ধ্বংস করা বার ততক্ষণ পর্বত শোষণব্যবস্থার গারে হাত পড়ে না।

কিন্তু, সশস্ত্র বাহিনীকে ধ্বংস করার অর্থ কি এই যে, শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি সৈন্যকে হত্যা করতে হবে? না, তা নয়। শত্রুর সশস্ত্র বাহিনীকে ধ্বংস করার সত্যকার অর্থ হল সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্যের মনোবল ভেঙে দেওয়া, তাদের যুদ্ধ-ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া, তাদের নিরস্ত্র করে ফেলা, ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। মাও সেতুও বলেছেন, “শত্রুকে ধ্বংস করার অর্থ তাকে নিরস্ত্র করা, অথবা “তার প্রতি-রোধক্ষমতা হ্রাস করা”, তার বাহিনীর প্রত্যেক মানুষকে দৈহিকভাবে ধ্বংস করা এর অর্থ নয়।” (উদ্-ভূতি, ইংরেজি সংস্করণ, পিকিঙ, ১৯৩৭, পৃ ১১)

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও সেতুও চিন্তাধারা সমস্যাটিকে এইভাবেই বিচার করে এসেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে বোঝা যায়, “প্রেশীশত্রুকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই মৃত্যু”—সি পি আই (এম এল) নেতা চারু-বাবুর এই সিদ্ধান্তটি বৈশ্ববিক নয়, মার্কসবাদ লেনিনবাদের অন্তর্গত নয়। প্রেশীশত্রুকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেই অক্টোবর বিপ্লব হয়েছে; চীন বিপ্লবও হয়েছে। প্রেশীশত্রুকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেই প্রমিকপ্রেশী বিপ্লব করেন, করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। কেননা, প্রত্যেক সমাজবিপ্লবেরই ঐকান্তিক লক্ষ্য—শত্রুপ্রেশীর ধ্বংস (উৎপাদ-

নের উপকরণে তাদের যে মালিকানা, সেই মালিকানার ধ্বংস; সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনীতিকতার উচ্ছেদ, তাদের সৈন্যদের যুদ্ধ-ক্ষমতার বিলোপ)। ব্যক্তি নয়—প্রেশীর ধ্বংসই বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

মার্কসবাদ লেনিনবাদ তাই বলে, ব্যক্তিহত্যা বিপ্লবী কর্মনীতি হতে পারে না। লেনিন বলেছেন, একশো ছার হত্যারও বিপ্লব এসে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি সংঘবদ্ধ আর সমবেত হয়ে নিজেদের দৈনন্দিন লালনার সঙ্গে রাজনীতিকতা দখলের জন্য বৈশ্ববিক গণসংগ্রামের তাৎপর্য বোঝে, তখন বিপ্লব এসে। এই কারণেই, রুশদেশের ব্যক্তিহত্যাবাদী নারদ-নিক আর সোস্যালিস্ট রেভলিউশ-নারদের বিরুদ্ধে লেনিন সূত্রীয় মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। সোভিয়েত পার্টির ইতিহাসে বলা হয়েছে, এই সংগ্রাম না করলে সোভিয়েত পার্টির ভিত্তিই তৈরি হত না। তাই, ব্যক্তিহত্যা কমিউ-নিষ্ট বিপ্লবীর কর্মনীতি নয়, ধৈর্যহীন পেটিবুজেরা যুদ্ধ-জীবী বিপ্লবীর হঠকারী কর্ম-নীতি।

গত দেড় বছর এই ব্যক্তিহত্যার কর্মনীতি অনুসরণ করে আমরা মারাত্মক ভুল করেছি। শত্রু ভুল করেছি বললেই চলে না—বিপ্লবের প্রতি, প্রমিকপ্রেশীর কাছে, কৃষকসমাজের কাছে, নিবর্তিত মধ্য-প্রেশীর কাছে আমরা গুরুতর অপ-রাধ করেছি।

আমাদের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা যে নিছক ক্যাশন নয়—আন্তরিক এবং গভীর, একদা প্রমাণ করতে হলে আজ আমাদের খোলামনে ভুল স্বীকার করতে হবে। কেন এ ভুল করলাম, তার কারণ বিশ্লেষণ করা উচিত, আর কী করে এ ভুলের সংশোধন হবে, তারও উপায় সন্ধান করা উচিত। লেনিন বলেছেন, “কোন রাজনীতিক পার্টি কত-খানি একনিষ্ঠ এবং নিজের প্রেশী আর মেহনতি জনসাধারণের প্রতি তার নিজের দায়িত্ব সে কার্যত কত-খানি পালন করে, তা বিচার করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর নিশ্চিত উপায়ের একটি হল—নিজের ভুল সম্বন্ধে পার্টির মনোভাব। অকপটে ভুল স্বীকার করা, তার কারণ নির্ণয় করা, কোন অবস্থায় এই ভুল হল তার বিশ্লেষণ করা, এবং ভুল সংশোধন করার উপায় প্ৰস্তা-নুপ্ৰস্তা রূপে আলোচনা করা—এই-ই হল দায়িত্বশীল পার্টির লক্ষণ; এইভাবেই তার কর্তব্য পালন করা উচিত, এইভাবেই তার উচিত প্রথমে প্রেশীকে, তারপর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। এই কর্তব্য পালন করতে, নিজেদের সুস্পষ্ট ভুলপ্রান্তির প্রতি-গভীর-তম মনোযোগ, স্বয়ং আর বিচার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়ে, জার্মানির

(আর হল্যান্ডের) “বামপন্থীরা” প্রমাণ করেছেন যে তারা প্রেশীর পার্টি নয়, একটি চক্রমাত্র, জনসাধা-রণের পার্টি নয়, যুদ্ধজীবীদের, এবং যে অলপকিছু প্রমিক যুদ্ধ-জীবীপন্থার সবচেয়ে মন্দ আচরণ-গুলির অনুকরণ করেন তাদের গোষ্ঠীমাত্র।” (“বামপন্থী” কমিউ-নিজম, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চম অনু-চ্ছেদের শেষাংশ)

প্রকৃত কমিউনিষ্টদের বিপ্লবী কর্মনীতি তাহলে কী? গণসংগ্রাম।

মাও সে তুও বলেছেন, “জন-সাধারণ, কেবল জনসাধারণই হচ্ছেন বিশ্ব-ইতিহাস সৃষ্টির চালিকা শক্তি।” জনসাধারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিপ্লব সৃষ্টির বিপ্লব, অসীম ক্ষমতা।

জনসাধারণের মধ্যে সেই নিহিত ক্ষমতা প্রকাশিত আর কার্য-কর হয় কী করে?—তাদের চেত-নার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, তাদের সংগ্রামী চেতনা প্রেশীচেতনার রূপা-ন্তরিত হলে। লেনিন বলেছেন, “প্রমিকপ্রেশীর অধিকাংশের দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন না হলে বিপ্লব অসম্ভব।” (“বামপন্থী” কমিউনি-

জম নবম অধ্যায়, একাদশ অনু-চ্ছেদ)

প্রমিকপ্রেশীর তথা জনসাধা-রণের অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন কেমন করে আসে? লেনিনের উত্তর : “এই পরিবর্তন ঘটে জনসাধারণের নিজস্ব রাজ-নীতিক অভিজ্ঞতার দ্বারা—কেবল প্রচারের মাধ্যমে কখনোই নয়।” (এ)

জনসাধারণের নিজস্ব রাজ-নীতিক অভিজ্ঞতার উপর জোর লেনিন সারা জীবনই দিয়ে গেছেন। আমরা কি দিচ্ছি?

জনসাধারণ এই রাজনীতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন কিভাবে? তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। প্রয়ো-গের মধ্য দিয়েই শোষিত মানুষ জ্ঞানে অর্থাৎ প্রেশীচেতনার পৌছয়। শোষিত জনসাধারণের প্রয়োগ হল তাদের প্রেশীসংগ্রাম। প্রেশীসংগ্রামে দাবি বা উপলক্ষটা সবচেয়ে বড়ো কথা নয়, অর-পর-জয়ও নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, মূল কথা হল—তাদের রাজনীতিক অভিজ্ঞতার বিস্তার, তাদের বৈশ্ব-বিক প্রেশীচেতনার উন্মেষ আর গভীরতা।

আমরা অনেকে বলি, গণসংগ্রা-মের শক্তিতে দশ-বিশ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে কি আজ সংকটের স্থায়ী সমা-ধান হতে পারে? নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু যেটা হয়, হতে পারে—সেটা হল জনসাধারণের গণ-সক্রিয়তা; গণসমাবেশ; রাজনীতিক শিক্ষা; রাজনীতিক অভিজ্ঞতা; রাজ-নীতিক, বৈশ্ববিক প্রেশীচেতনার উন্মেষ, বিস্তার, গভীরতা।

কিন্তু এটা নিজে নিজেই হয় না—সেজন্য একটি পূর্বশর্ত পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। সেটি হল—অর্থ-নীতিবাদী, সংস্কারবাদী, সংশোধন-বাদী অপ-নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করে এইসব গণসংগ্রামে প্রকৃত কমিউ-নিষ্টদের নেতৃত্ব স্থাপন করতে হবে। আজ আমাদের বোঝা দরকার যে, এতকাল পর্বত কমিউনিষ্ট আন্দো-লন এবং মেহনতি মানুষের গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব অ-কমিউনিষ্টরা কবজা করে রাখার জন্যই বা হওয়া প্রয়োজন ছিল, সম্ভবও ছিল, তা হয়নি। এইটাই এতদিনকার ঘাটতি, এখন এই ঘাটতিটাই পূরিয়ে নিতে হবে।

সুতরাং, প্রকৃত কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের একটি মৌলিক কর্তব্য হল, জনসাধারণের এইসব প্রেশী-সংগ্রামের নেতৃত্ব থেকে তাদের রাজ-নীতিক অভিজ্ঞতার বিস্তারের সহা-য়তা করা, তাদের বৈশ্ববিক প্রেশী-চেতনার উন্মেষের বিকাশ ঘটানো।

গণসংগ্রাম সম্বন্ধে এই হল সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টি- (শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়)

LANTEE
FOR
POWER
TRANSMISSION

LANTEE BELTS LAST LONGER

MANUFACTURERS & DISTRIBUTORS
LEWIS & TYLOR
(PRIVATE) LTD.,

বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত রাজনীতির ভবিষ্যৎ

চন্দ্রনাথ বসু শাস্ত্রিক

সাম্প্রতিককালে দর্শনের পাতার নকশায় সি পি এম সমর্থকদের রাজনৈতিক বাগবিড়ান্ডা বেশ বেড়ে চলেছে। দৃষ্টির বিষয় উত্তর পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে নিজ পক্ষের সমর্থনে অর্থাৎ নিজদের লাইনের সমর্থনে ব্যক্তি কম থাকে, বেশি থাকে প্রতিপক্ষের কার্যাবলীর সমালোচনা।

কলাবাহাদুর, মধ্যবিত্ত রাজনীতির প্রবণতাই এই। ১৯৬৭ সালে যখন কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতি প্রসারিত হয়েছিল, তার মৌল সূত্র ছিল নেতিবাচক। অর্থাৎ কংগ্রেস দলের অধীন ব্যক্তিবর্গই হলেন অবাস্তব এবং তাদের স্বারা কৃত কাজগুলোই হলো ব্যর্থ কাজ। অন্যভাবে বুলিয়ে কলা হতো—দেশের সকল দুর্গতি ও সংকটের দায়িত্ব কংগ্রেস পার্টির।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগকে অসত্য বলে বিশ্বাস করানো যে সম্ভব নয়, তা আধুনিক কালের নব বা আদি কংগ্রেসের নেতারাও নানাভাবে স্বীকার করেন। কিন্তু অভিযোগ সত্য হলেই যে বামপন্থী দলগুলোর শাসনভার হাতে দেওয়ার বৌদ্ধিকতা স্বতঃপ্রসঙ্গিত হয়—এমন কথাও বলা শক্ত।

বিশেষ করে ১৯৭১ সালের বাংলা দেশের তথাকথিত বামপন্থী রাজনীতির যে বিভিন্ন ধারা চলেছে, তা মূলতঃ মধ্যবিত্ত বাবু রাজনীতির একই খাতে চলেছে। সি পি এম গুন্ডামি করে, খুন করে, দলবাজি করে, সুতরাং এদের হৃদয়ে হবে—এ হলো ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি এবং সি পি আই রাজনীতির মূল স্লেটান দূতোর অন্যতম—অর্থাৎ সি পি এম-এর সদস্যবৃন্দ যদি উপরোক্ত দলগুলোর হয়ে একই কাজ করে, তাহলে তাদের সাতখুন মাপ হবে, তারা “জনস্বার্থে” করেছেন বলে অভিহিত হতে পারবে। ভাবনা এমনি যে—এ পার্টিগুলো দলীয় স্বার্থ বাড়াবার জন্য যদি কোন সংঘর্ষ বা হত্যার পথ নের, তা হবে তুলসীপাতা দিয়ে ধোয়া। সে বাহক, দলীয় কার্য-

কলাপের আঞ্চলিক হিসেব নিকেশ যদি নেওয়া হয়, তাহলে এটা প্রমাণ করা অসম্ভব হবে না যে (ক) সি পি এম দল হিসেবে অন্যান্যদের চেয়ে সমর্থক জনসাধারণ ও কর্মীর দিক থেকে অসন্তোষ দশগুণ বড়ো, (খ) খুনের রাজনীতিতে সি পি এম তাই অন্যদের তুলনায় দশগুণ।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে কংগ্রেস পার্টি তার অভিলক্ষ্য অবস্থায় সি পি এম-এর চেয়ে তো বড়ো ছিল, তবে কেন কংগ্রেস পার্টির আমলে এত খুন খারাপীর কথা শোনা যায়নি?

শোনা যায়নি বলে কংগ্রেস আমলে খুন খারাপী হয় নি—এ কথা মিথ্যা। তখনও খুনখারাপী হতো, তবে সে কাজটা করতে পুলিশ ও ধর্মীর টাঁকার পোষা গুন্ডা আর শিকার হতো গরীব চাষী, শ্রমিক, ততটা মধ্যবিত্ত নয়। এই কোলকাতা শহরে একদিনেই স্পষ্ট দিবালালকে আশি জন কুবককে হত্যা করলো পুলিশ। শ্রুত ১৯৬৯ সালেই নয়, তার আগে ১৯৪৮-৪৯ সালে কাকেশীপে পুলিশ বহু কুবককে হত্যা করেছে জ্যোতদারদের পক্ষ নিয়ে, তারপর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রচুর কমিউনিস্ট কর্মীকে গোপনে হত্যা করেছে কংগ্রেসী গুন্ডা, এবং পুলিশ। খুনের রাজনীতি আরম্ভ করেছে শাসক শ্রেণী বহু বহুদিন আগে থেকে। তফাতটা শ্রুত এই যে, তখন সংবাদপত্র এ ব্যাপারে নীরব ছিল। অনেক বামপন্থী পার্টি হয় নীরব দর্শক বা বিবর্তনকারী বাবু রাজনীতির দায়িত্ব সেজেছে অথবা মিথ্যাদের নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে হত্যার ঘটনাকে ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং কংগ্রেসী আমলে খুন-খারাপী হয় নি, এ শ্রুত মিথ্যা নয়, এ হলো বাবু রাজনীতির আয়নার দোষা বাস্তবতা। তবে একটা তফাত নিশ্চয়ই দেখা যায়। এখন খুন শ্রুত কুবকই হচ্ছে না। শ্রমিক-ইচ্ছে না, হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসিন্দারা, হচ্ছে জ্যোতদার শ্রেণীর লোকেরা, হচ্ছে

নামী গুন্ডা বড়োলাক, অফিসার, অধ্যাপক ইত্যাদি। অর্থাৎ বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক সংকট খুনের রাজনীতিকে শ্রেণীসংকীর্ণতার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে, গরীবদের মধ্যে আবশ্য না থেকে বড়োলাকদের মধ্যেও প্রসারিত হচ্ছে, তাই আজ এত আতঙ্ক, এত শাস্তির চীৎকার, এত সর্বোদর পদযাত্রা এবং কালজলুদের এত আতর্নাদ.....!

খুন এই শ্রেণীচারের বদল করেছে সি পি এম-এর জন্য—এ কথা বলে আবার সি পি এম-কে কঠিনগড়ার আসনে বসানো তো হয়ই না, বরং তাকে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অঙ্গ দূত হিসেবে পূরস্কৃত করা হয়।

বহুতম সমাজের নীচতলা থেকে উপর তলা অধি রাজনৈতিক খুনের এই ব্যাপ্তির জন্য বতটা সি পি এম-এর সশস্ত্র বিপ্লবের আওরাজ দায়ী, তার চেয়ে আসল দায়িত্ব এ গলে-পড়া সমাজ ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কর্তার শ্রেণীগুলো। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শিকার নামে প্রহসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার জালজুতুরীর বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত মানসিকতা সামাজিক অর্থনৈতিক সংকট-বৃষ্টির সংগে সংগে অনেক গভীরভাবে বিকস্ম হয়ে উঠেছে—এ ক্ষেত্রের আবহাওয়ারকে সি পি এম মধ্যবিত্তশ্রেণীসুলভ সামরিক দাঁও মারবার আশার ব্যবহার করেছে বিপ্লবের নাম করে। চাষী ও শ্রমিক সাধারণের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের অধী-রতা ও গভীরগতিক পার্লামেন্টারী রাজনীতির প্রতি অকিঞ্চাস ও হুগা ১৯৬৪ সালের ক্ষুদ্র পার্টি সি পি এম-কে ১৯৬৭ সালে দ্বিতীয় বৃহত্তম নির্বাচনী পার্টিতে পরিণত করেছে। সি পি এম-এর সশস্ত্র বিপ্লবের তৎকালীন আশঙ্করা বাণী গরীব চাষী ক্ষেত্রে, শহরাঞ্চলের শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত বৃদ্ধকদের মধ্যে আশার আলো এনেছিল কারণ সি পি এমই আধুনিক কালের বাংলাদেশে প্রথম বলেছেন নির্বাচনের স্বারা

প্রমিত কুবক কমতা হাতে পাবে না, সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব প্রয়োজন; নির্বাচন শ্রেণীসংগ্রামের শ্রুত হাতিয়ার।

রাজনীতি ও রক্তপাতের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দিক হয়তো সি পি এম-এর মধ্যবিত্ত রাজনীতি প্রথম তুলে ধরেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলা দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতবর্ষের তুলনায় অধিকতর দ্রুত গতিতে যে ভেঙে পড়েছিল এবং শাসকশ্রেণীর কেনা দল কংগ্রেসও যে মধ্যবিত্ত রাজনীতির অন্য একটি ধারার প্রমিত-কুবকের দূরবস্তার জন্য নতুন নতুন সমাজ-তন্ত্রের কথা বিজ্ঞাপিত করছিল—এও জানা প্রয়োজন।

সংকট কালে মধ্যবিত্ত রাজনীতি তার শ্রেণীগত অবস্থানের বশেই দালালীর ভূমিকার আসে, চাষীকে বলে সজাগ থেকে, জমিদারকে বলে চুরি করো। শ্রমিক চাষীর মুক্তি মধ্যবিত্তকে শ্রেণীগতভাবে বিপর্যস্ত করে বলেই সে বিপ্লব আন্তরিকভাবে চাইতে পারে না, আবার জমিদার জ্যোতদার বা শিল্প-মালিককে সে মনে প্রাণে মেনেও নিতে পারে না, কারণ মধ্যবিত্ত তাদের স্বারা স্লেহিত হয় নানাভাবে। সুতরাং মধ্যবিত্তকে হতে হয় বাগেনার—মধ্যবিত্ত রাজনীতি ভাল বাটোরার রাজনীতি। তাই মধ্যবিত্ত শ্রমিক-চাষীর শ্রেণীস্বার্থকে ব্যবহার করে জ্যোতদারশ্রেণী ও মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কিছু লাভের আশার, কমতা, অর্থ ও প্রতিপত্তির আশার—এ দিক থেকে মধ্যবিত্ত রাজনীতি বর্তমান সমাজব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রেখে শাসক শ্রেণীর কাছে থেকে নিজের বারগেনিং-এর জন্য কমতা ও অর্থ চায়, জনগণকেও কিছু কিছু আর্থিক রিলিফ দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই খাপ খাইয়ে নিতে চায়। মধ্যবিত্ত রাজনীতির চূড়ান্ত রূপ তাই নির্বাচনী গণতন্ত্র, সর্বহারার বিপ্লবী একনায়ক তার ভয়ের বস্তু সুস্পষ্ট কারণ; আবার পুঁজিবাদের সৃষ্ট একনায়ক তার ইর্বার বস্তু কারণ পুঁজিবাদীর ভৃত্য একজন হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠনগঠন প্রমিত-চাষী শোষণের ফল উপভোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

শৈল্পিক নেতারা এবং জার্মান বিপ্লবী আন্দোলনের নেত্রী রোজা লুড্জেন-বুর্গও মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকেই এসেছিলেন।

— সুতরাং মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা বিপ্লবী রাজনীতি আরম্ভ করবে—এতে অবাক হবার কিছু নেই। প্রশ্নটা হচ্ছে, রাজনীতিটা কাদের জন্য? জ্যোতদার সামন্ত প্রতিভুদের ও বড়োজারদের জন্য, না চাষী শ্রমিক সাধারণের জন্য, না, নেহাতই মধ্যবিত্তশ্রেণীর সুবিধাবাদী ভাগ-বাটো-রার জন্য?

ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাগ বাটোরার রাজনীতি প্রকাশিত হয় সোশ্যাল ডেমো-ক্রেসীর ভূমিকার, অধুনাকালে এ সংশোধনবাদী রাজনীতি নতুন চেহারা নিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের ওভার-রেই সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্ব দানা-বেঁধে এবং প্রতিবিপ্লবের শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনের ভেতরকার প্রতিবিপ্লব বাইরের শাসকশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবের তুলনায় অধিক বিপজ্জনক, কারণ তাকে বিপ্লবী জনসাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করা বেশ কঠিন।

এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটা হলো মধ্যবিত্ত রাজনীতির কোনটা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে আর কোনটা ধনিকশ্রেণী বা মধ্যবিত্তের প্রতিবিপ্লবী শ্রেণী স্বার্থে সেটা কি করে—কেন কঠিন পাথরে বোকা বাবে? প্রশ্নটাকে স্পষ্ট করে বলা বার—কেন কেন মৌল পৃথকিত-গত কারণে বড়োজারশ্রেণীর প্রত্যাক বা পরোক্ষ দালাল মধ্যবিত্ত রাজনীতি থেকে শ্রমিক কুবকশ্রেণীর বিপ্লব সেবক মধ্যবিত্ত রাজনীতির চরিত্র পৃথক বা ভিন্ন জাতের?

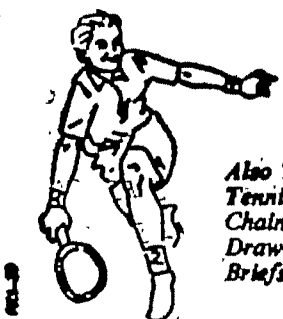
পৃথকিত তফাত হয় উদ্দেশ্যের তফাতের ফলে।

বড়োজা বা সামন্ত প্রতিভুদের উদ্দেশ্যই হলো তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানকে টিকিয়ে রাখা। ফলে অর্থনৈতিক সংকট-যখন ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষকে আরও ব্যাপক করে আনে, তখন শাসকশ্রেণীর সেবাদাস মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদদের চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে এই সংকটকে নানা-বিধ অর্থনৈতিক কার্যসূচী প্রনয়নের মাধ্যমে এড়িয়ে বাওয়া এবং তাদের সামাজিক রাজনীতিক সর্বহারার শ্রেণীকে “আর্থিক রিলিফ” দেবার রাজনীতিতে নিয়ে যাওয়া। যেমন উনিশশ ছেচলিশ সালে ফিলিপের লেবার পার্টি করলা শিল্পের বাজার সংকট ও শ্রমিক অসন্তোষ দূর করার জন্য এই শিল্পকে জাতীয়করণ করণ করে এবং জাতীয়করণ ছিল লেবার পার্টির মতে সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ। উক্ত জাতীয়করণ অবশ্য করলা শিল্পকে অধিকতর একচেটিয়া পুঁজির করতলে আনলো, কারণ রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌল শক্তি ছিল একচেটিয়া পুঁজিবাদ। ভারতবর্ষেও যেমন ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণকে কেন কোন বামপন্থী সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করেছেন, কেন ভারতবর্ষের কর্তার শ্রেণীগুলো শ্রমিক ও কুবকশ্রেণী ছাড়া আর

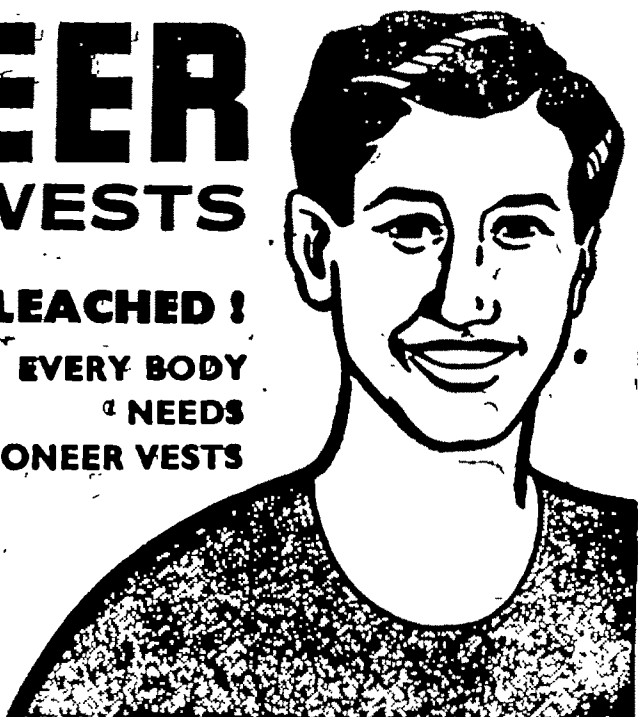
PIONEER VESTS

ARE HYGIENICALLY BLEACHED!

EVERY BODY
NEEDS
PIONEER VESTS



Also Tee shirts,
Tennis shirts,
Chain Shirts,
Drawers &
Briefs



PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS, CALCUTTA-2 Phone : 54-2982

দুই

আবার একথাও ঠিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিরাই সমাজ বিপ্লবের প্রথম দিশারী হয়ে এসেছেন। ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফসল বড়োজা শ্রেণীর ঘরেই উঠেছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু আন্দোলনের ক্যাডারগণ মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকেই এসেছিলেন।

এমন কি সোভিয়েতের অক্টোবর বিপ্লব বা চীনের মূর্তিবৃষ্টির প্রথম সারির নেতারা কেউ সর্বহারার শ্রেণীতে জন্ম নেন নি, তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই বেঁকিয়ে এসেছেন সর্বহারার শ্রেণীস্বার্থে সংগ্রামের জন্য। সুতরাং এ ব্যক্তির অবকাশ আজ অর নেই যে মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে উদ্ভূত ব্যক্তির সর্বহারার রাজনীতি কিস্ত-তার সংগে করতে পারবেন না। এ ব্যক্তির উদ্ভাতা সোভিয়েত মেন-

(শেখাং ১০ পৃষ্ঠার)

বিপ্লবী ঘাঁটি সৃষ্টি প্রসঙ্গে

মণি কুহ

ভারতের বিপ্লব কোন পথে, কেমন করে হবে তা নিয়ে গভীর অনুশীলন ও অধ্যয়ন চলছে। গ্রামাঞ্চলে লাল ঘাঁটি সৃষ্টি করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চীনের পথে ভারতের বিপ্লব সম্পন্ন হবে এরূপ একটা চিন্তা ভারতীয় বিপ্লবীদের একাংশের মধ্যে আছে। এই প্রসঙ্গেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গ্রামাঞ্চলে লাল ঘাঁটি সৃষ্টি প্রসঙ্গে মাও সে তুং বলেছিলেন : “...চীনের গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ হবার অনতিকাল পরেই উনিশশো সাতাশ সালের শেষের দিকে এবং আঠাশ সালের প্রথম দিকে হুনান কিয়ানসি সীমান্ত অঞ্চলের চিৎ কাং পাহাড়ের কিছুর কিছুর কমরেড প্রাশ্ন তুলেছিলেন যে “কতদিন পর্যন্ত আমরা লাল পতাকা উর্ধ্বে তুলে রাখতে পারব?” কারুণ, এটি ছিল একটি বিশেষ মৌলিক প্রশ্ন। চীনের বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল এবং চীনা লাল ফৌজ টিকে থাকতে এবং বিকাশ লাভ করতে পারবে কি না এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমরা এক কদমও এগোতে পারি না।” (একটি ক্ষুদ্রলিঙ্গ)

শ্বেত শাসন পরিবর্তিত অবস্থার কেন চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকতে পারবে তার সন্তোষজনক উত্তর মাও সে তুং দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে এ প্রশ্ন আরো তোলা হয়নি; স্বতঃসিদ্ধ বলেই একে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্বেত শাসন পরিবর্তিত স্থানও কেন চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকতে পারবে তার উত্তর মাও সে তুং প্রধানতঃ তাঁর তিনটি প্রবন্ধ দিয়েছেন। প্রথম-গদলি হলো : (এক) “একটি ক্ষুদ্রলিঙ্গ দাবানলে পরিণত হতে পারে,” (দুই) “চিৎ কাং পাহাড়ের সংগ্রাম” এবং (তিন) “চীনের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকতে পারে।” এই প্রবন্ধ তিনটিতে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকবার স্বপক্ষে মাও সে তুং যে বিবরণগুলির ওপর জোর দিয়েছেন তাকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে হচ্ছে : (এক) অনৈক্য জীইরে রেখে শোষণ করবার জন্য বিজয় সাধ্যাবাদী শক্তিসমূহের প্রভাবাধীন রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন এলাকা; (দুই) প্রভাবাধীন এলাকার শাসক শক্তিশালীর মধ্যে পারস্পরিক অবিরাম সশস্ত্র যুদ্ধ এবং সশস্ত্র ও সামরিক উপায়েই অনৈক্যের প্রকাশ ও মোকাবেলা; (তিন) স্বয়ং সম্পূর্ণ স্থানীয় ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতি; (চার) একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের শক্তিসম্পন্ন লাল ফৌজ; এবং (পাঁচ) সামরিক কার্যকলাপ পরিচালনার পক্ষে

অনুদত্ত ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। আর দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে : (এক) একটি জ্বরদন্ত ব্যাপক গণভিত্তি; (দুই) একটি জ্বরদন্ত পার্টি সংগঠন।

মাও সে তুং অবশ্য আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। তার প্রতিও আমাদের নজর এড়িয়ে যাওয়া সঠিক হবে না। মাও সে তুং বলেছেন : “পরিবেশনকারী শাসক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে স্বাধীন রাজের রণনীতি অবশ্যই রক্ষণের করতে হবে। শাসক শ্রেণীর রাজ স্বত্ব সামরিক ভাবে স্থায়ী লাভ করেছে তখন এক ধরনের রণনীতি, আবার স্বত্ব তারা বিস্তৃত করে পড়েছে তখন আর এক ধরনের রণনীতি গ্রহণ করতে হবে।” (মাও সে তুং, চিৎ কাং পাহাড়ের সংগ্রাম)। এই “সামরিক ভাবে স্থায়ী” আর “বিস্তৃত” বলতে কিন্তু মাও সে তুং শাসক শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সশস্ত্র যুদ্ধ বিগ্রহ বিহীন অবস্থার কথা বলেছেন। এ কথা আমাদের বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীগুলির মধ্যে-কার অনৈক্য এবং স্বত্ব এখনও সশস্ত্র যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে না, তারা “সামরিক ভাবে স্থায়ী” মতোই থাক বা “বিস্তৃত” অবস্থারই থাক, সব অবস্থার মোকাবেলা তারা রাজনৈতিক উপায়েই করে, সশস্ত্র সামরিক উপায়ে করে না।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাও সে তুং উল্লেখ করেছেন। তা হলো : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল রাজনৈতিক ক্ষমতাগুলি হবে জনসাধারণের কাছে উদাহরণ স্বরূপ, যে উদাহরণের সাফল্য দেখেই দেশবাসী জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে। তাই তিনি বলেছেন : “কেবলমাত্র এই ভাবেই দেশব্যাপী জনগণের বিশ্বাস গড়ে তোলা সম্ভব, যেমন দুর্দিনস্বাপী গড়ে তুলেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন।” (একটি ক্ষুদ্রলিঙ্গ)। অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি সামরিক ভাবে ক্ষমতা দখল ও রক্ষার প্রশ্ন নয়; ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে একাঙ্গীভূত করে কৃষক সাধারণের মনে আস্থা, বিশ্বাস ও উদাহরণ স্থাপনের প্রশ্নটিই আসল কথা। তাই তিনি বলেছেন : “যারা বহু সহস্র বছর ধরে প্রতিষ্ঠাশীল শাসক শ্রেণী কর্তৃক প্রবর্তিত এবং ভ্রুচকিত সেই প্রমজীবি জনগণকে তাদের স্বহস্তে বন্দুক গ্রহণ করবার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হবেই কঠিন কাজ।” (যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা) অর্থাৎ তাদের মনে এই বিশ্বাস, আস্থা উপাদান একমাত্র সম্ভব স্থানীয় ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সুদীর্ঘ দিন টিকিয়ে রেখে উদাহরণ সৃষ্টি করেই। বৃন্দদের মতো ক্ষমতা

দখল আর তা মিলিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কেবল মাত্র বিপরীত অবস্থারই সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে তাই মাও সে তুং আরও বলেছেন : “কেবলমাত্র প্রামাণ্য গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে যাবার যে নীতি তা দিয়ে দেশজোড়া বিপ্লবী জোরারকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়।” (একটি ক্ষুদ্রলিঙ্গ)।

লালফৌজ ও গেরিলা বাহিনী প্রসঙ্গ

মাও সে তুং বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন : “চতুর্থতঃ, আর একটি অস্বাভাবিক ঘটনা বা চীনের বাইরে কোথায়ও দেখা যায় না, সেটিও বন্ধা যাচ্ছে। এ ঘটনাটি প্রথমটিরই (অর্থাৎ কেবলমাত্র চীনেই শাসকশ্রেণীগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে) অনুসিদ্ধান্ত এবং তা হলো লালফৌজ ও গেরিলা বাহিনীর অস্তিত্ব ও শক্তিবৃদ্ধি...” অর্থাৎ “লালফৌজ ও গেরিলা বাহিনীর অস্তিত্ব ও শক্তিবৃদ্ধি” সম্ভব হয়েছে শাসক শ্রেণীগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র ও জটিল যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যই। তাই মাও সে তুং এটিকে প্রথমটির অনুসিদ্ধান্ত বলেছেন। “চীনের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকতে পারে?” প্রবন্ধটিতেও মাও সে তুং একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন : “এই ধরনের অশুভ ব্যাপার (লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার অস্তিত্ব ও টিকে থাকা) অবশ্যই আর একটি অশুভ ব্যাপারের অনুসঙ্গী, এবং তা হলো শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতা-গুলির মধ্যে যুদ্ধ।”

অর্থাৎ, ইচ্ছে করলেই লালফৌজ সৃষ্টি করা যায় না; লালফৌজ সৃষ্টি হওয়ার জন্য এমন কতকগুলি পূর্ব শর্তের অস্তিত্ব বা আবির্ভাব চাই, যা না হলে লালফৌজ সৃষ্টি করা যায় না। এই প্রসঙ্গে মাও সে তুং-এর আর একটি বক্তব্য অবশ্যই বৃদ্ধবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করবে। “বিপ্লবী যুদ্ধের নীতিগত সমস্যা” পুস্তিকায় তিনি বলেছেন : “বিদেশের যুদ্ধোত্তর পার্টিগুলির প্রত্যেক কবজার মধ্যে কোন সশস্ত্র বাহিনী রাখবার প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু চীনের অবস্থা স্বতন্ত্র। এ দেশটি সামন্ততান্ত্রিক শাসনাধীনে বহু ভাগে বিভক্ত; তাই যে জমিদার ও যুদ্ধোত্তর বৃদ্ধ বা পার্টিগুলির বন্দুক আছে তারাই ক্ষমতার অধিকারী, এবং যাদের বেশি বন্দুক আছে তারা বেশি ক্ষমতার অধিকারী। এই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর পার্টিরও মূল বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন।” এই প্রসঙ্গেই মাও সে তুং “বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা উদ্ভব হয়” উক্তিটি ব্যবহার করেছেন।

লালফৌজ, সশস্ত্র বাহিনী বা গেরিলা বাহিনী উদ্ভবের এরূপ

একটি আভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থাও কিন্তু ভারতে নেই।

“চীনের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকতে পারে?” প্রবন্ধটিতে মাও সে তুং আরও বলেছেন : “চতুর্থতঃ, লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার টিকে থাকার আর একটি অপরিহার্য শর্ত হলো নির্দিষ্ট পরিমাপের শক্তি সম্পন্ন একটি নিরমিত লাল ফৌজের অস্তিত্ব। কেবলমাত্র যদি স্থানীয় লাল রক্ষীবাহিনী থাকে তা হলে কেবল জমিদারদের দ্বারা লালিত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গেই মোকাবেলা সম্ভব, কিন্তু কোন নিরমিত শ্বেত বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা সম্ভব নয়। অতএব, প্রাথমিক, কৃষক, সাধারণের সক্রিয় সমর্থন সংগে নির্দিষ্ট পরিমাপের শক্তি সম্পন্ন নিরমিত সৈন্য বাহিনী না থাকলে ঘাঁটি এলাকা সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব, আর তার দীর্ঘকাল টিকে থাকা ও রক্ষণাবেক্ষণ ভাবে বিকাশ লাভ করাও আরও অসম্ভব।” তাই “প্রাথমিক-কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার মতাদর্শ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা কমিউনিষ্ট পার্টির ও স্থানীয় ঘাঁটি এলাকার প্রাথমিক-কৃষক সাধারণকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে হবে।”

এখানে কিন্তু দুটি দিক বিচার্য। প্রথমতঃ, চীনে একটি একাবাক্ষ কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না এবং শাসকশ্রেণীগুলির বিভিন্ন এলাকার জিন্ন জিন্ন বহু গভর্নমেন্ট ছিল এবং প্রত্যেকটি গভর্নমেন্ট ছিল পরস্পর থেকে “স্বাধীন” এবং সামরিক একনায়কের গভর্নমেন্ট, এবং পরস্পর নিরবিক্রম যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত। তাই শাসক শ্রেণী ও শাসিত শ্রেণী উভয়েরই রাজনীতির অতি প্রাথমিক ভিত্তিই ছিল—সামরিক উপায়ে রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মোকাবেলা। যার জন্য চীন একটি নিরবিক্রম যুদ্ধের মধ্যেই বাস করছিল এবং একটি সশস্ত্র বিপ্লব একটি সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের মতো-মুখি দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ উপরের উল্লেখিত “স্থানীয় লাল রক্ষীবাহিনী” বলতে মাও সে তুং বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার জনসাধারণের সশস্ত্র সংগঠনের কথা বলেছেন। এই সংগঠন গড়ে উঠেছিল কমিউনিষ্ট পার্টি ও কুয়োমিনতাংয়ের যুক্তফ্রন্টের ক্যান্টন গভর্নমেন্টের উত্তরাভিমুখী অভ্যন্তরীণ সমর এবং বা শক্তিশালী হয়েছিল উহান গভর্নমেন্টের আমলে। এই সংগঠনের সদস্যরা ছিল উপাদানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। “স্থানীয় লাল রক্ষী বাহিনী” কিন্তু উপাদানের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত জনা কয়েক বিপ্লবে উদ্ভূত শক্তিত মধ্যবিস্তৃত বিক্ষোভকারী (ডিস্টোনেটর) নয়। এ কথা উপলব্ধির প্রয়োজন, কেবল মাত্র ব্যাপক ও গভীর কৃষক আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনীর সৃষ্টি হতে পারে। মাও

সে তুং বলেছেন : “হুনানের জু-স্বামী শ্রেণীর সশস্ত্র বাহিনী প্রদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগের তুলনার মধ্যভাগে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। প্রতিটি অঞ্চলে গড়ে হুশো রাইফেল ধরে হিসেব করলে পঁচাত্তরটি অঞ্চলে রয়েছে মোট পঁচাত্তরটি হাজার রাইফেল এবং প্রকৃতপক্ষে তার বেশীও হতে পারে। দক্ষিণ ও মধ্যভাগে বেথানে কৃষক আন্দোলন সর্বাধিক শক্তিশালী যেমন নিংসিয়াং, পিকিয়াং, লিওয়াং, চ্যাং শা, লিলাং, সিয়াটাং, সিয়াং-সিয়াং, আনহুয়া, হেংশান ও হেংহাং-এর কৃষকরা প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠার সে সব স্থানের জু-স্বামীরা তাদের নিজস্ব বাহিনীকে ধরে রাখতে পারেনি এবং তাদের সশস্ত্র বাহিনী কৃষক সমিতির কাছে ব্যাপক ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। জু-স্বামীদের সশস্ত্র বাহিনী, যেমন পাওচিং প্রভৃতি অঞ্চলে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছে বটে, কিন্তু তারা আত্মসমর্পণের মধ্যে... প্রতিষ্ঠাশীল জু-স্বামীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীকে “বাড়ী বাড়ী ভিত্তিক নিরমিত বাহিনীতে” পুনর্গঠন করে...এই সব পুরানো সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে দখলে আনার এরূপ একটা পথ যার দ্বারা কৃষকের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠেছে।” (হুনান রিপোর্ট)

সুনির্দিষ্ট পরিমাপ নিরমিত বাহিনীর প্রশ্ন তো আছেই, স্থানীয় সশস্ত্র লাল রক্ষী বাহিনী যে ভাবে চীনে গড়ে উঠেছিল—ভারতে কি সে ভাবে গড়ে উঠতে পারবে? আমাদের দেশে কি জু-স্বামীদের সশস্ত্র বাহিনী আছে? জু-স্বামীদের কি হাজারে হাজারে রাইফেল আছে বা চীনে ছিল। এ বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

স্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি ও বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা

স্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি থাকা সংগে মাও সে তুং তাঁর “চিৎ কাং পাহাড়ের সংগ্রাম” রিপোর্ট-টিতে বলেছেন : “যুদ্ধরত দুটি দেশের মতো শ্বেত এলাকা ও বিপ্লবী এলাকা আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। পেটবুজোঁরাাদের প্রতি আমাদের তুল আচরণ এবং শত্রু সদৃশ আবেষ্টনী এই দুয়ের ফলে শ্বেত ও বিপ্লবীদের এলা-

(শেখারাম দশম পৃষ্ঠার)

Free I Free II Free III

এবং বা স্মৃতি

আমাদের বিখ্যাত “দাস সাক্ষাৎ” ১৯২৫ সাল থেকে রোয়ালিদের সম্পূর্ণভাবে রোল সারিয়ে আসছে। মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়।

বিনামূল্যে এক শিশি দেওয়া হয়।

WESTERN INDIA CO. (V. N.) P.
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

লাল ঘাটি সৃষ্টি প্রসঙ্গে

(নবম পৃষ্ঠার পর)

কার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য পুরো-
পূরি বন্ধ হয়ে গেছে। লবণ, কাপড়,
ওষুধাদি ইত্যাদি প্রয়োজনীয়
জিনিসগুলি দুষ্প্রাপ্য এবং এগু-
লির দামও অত্যধিক। শুধুকে
কৃষিজাত দ্রব্যাদি, কাঠ, চা, তেল
ইত্যাদি বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না।
ফলে কৃষকদের নগদ টাকা আয়ের
পথই বন্ধ এবং সমস্ত জনগণই তার
ফল ভুগছে। এই ধরনের কষ্ট-
স্বীকারে দরিদ্র কৃষকেরা বেশী
সক্ষম কিন্তু কষ্ট বহন আর সহিতে
পারবে না তখন মধ্যবর্তী শ্রেণী
জমিদার শ্রেণীর দিকে চলে যাবে।
জমিদার শ্রেণীর মধ্যে এবং চীনের
বুদ্ধবাজ সামন্ত প্রভুদের নিজেদের
মধ্যে বিভেদ ও যুদ্ধ না চলতে
থাকলে এবং দেশব্যাপী একটি
বিশ্ববী পরিস্থিতি বিকশিত হয়ে
না উঠলে ছোট ছোট লাল রাজ-
নৈতিক ক্ষমতাগুলির উপর বিরাত
অর্থনৈতিক চাপ পড়বে এবং শেষ
পর্যন্ত সেগুলি টিকে থাকতে
পারবে কি না সেটাই সন্দেহের
কারণ। কারণ, এ ধরনের অর্থনৈ-
তিক চাপ বে শূন্য মধ্যবর্তী শ্রেণীর

পক্ষেই অসহনীয় তা নয়, একদিন
এই চাপ প্রমিত, দরিদ্র কৃষক ও
লালফৌজের সৈন্যদের কাছেও অস-
হনীয় উঠবে।

উপরের উল্লেখ থেকে যে
বিষয় বিবেচ্য তা হচ্ছে ভারতে
স্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতির
এলাকা খুবই কম। স্বয়ং সম্পূর্ণ
কৃষি অর্থনীতির এলাকা থাকা
সঙ্গেও ঘাটি এলাকার সমস্যা দেখা
দিচ্ছেছিল। দেশব্যাপী বিশাল
পরিস্থিতি বিকশিত হওয়াটাই এর
একমাত্র প্রতিবেদক নয়, শাসক
শ্রেণীর মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহও
একটি প্রতিবেদক বলে মাও সে তুং
উল্লেখ করেছেন।

এই অবস্থাটিও ভারতে নেই।

বিশ্ববী লাল ঘাটির প্রশ্নে চীন
ও ভারত

কমুদ কমুদ লাল রাজনৈতিক
ক্ষমতা সৃষ্টির অনুকূলে চীনের
কতকগুলি অবস্থা ছিল : (এক)
শাসক শ্রেণীগণের মধ্যে অবিরাম
যুদ্ধ; (দুই) শাসক শ্রেণীর
প্রতিটি ব্লকের স্বশাসিত এলাকা

ও গভর্ণমেন্ট; (তিন) সামরিক
উপরে সমস্যাবলীর মোকাবেলা
ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ের অব-
তমানতা; (চার) কমিউনিস্ট পার্টির
নেতৃত্বে একটি লালফৌজ; (পাঁচ)
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহ্যমণ্ডিত
এলাকাগুলিতে উত্তরাভিমুখী
অভিযানের সময় থেকে এবং উহান
গভর্ণমেন্ট কালীন (ক) একটি গণ-
ভিত্তিক; (খ) একটি জোরদার পার্টি
সংগঠন (গ) প্রতিটি এলাকার একটি
সম্পন্ন লালরক্ষী কৃষক বাহিনী;
(ঘ) সামরিক কার্যকলাপের উপ-
যোগী ক্ষুদ্রকৃতি; এবং (সাত)
স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি। এত
সব অনুকূল অবস্থা সঙ্গেও চীনা
কমিউনিস্টদের একটি বিরাত প্রতি-
কূল অবস্থা ছিল, তা হলো :
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে
একটি বিশাল পরিস্থিতির অনু-
পস্থিতি এবং বিশাল পরিস্থিতি
ও জোয়ারের পরিবর্তে প্রতি-
বিশ্লবের জয় ও বিশাল পরি-
স্থিতি প্রবল ভারতীয় টান। সম্ভা-
বনা যেটি ছিল তা হলো, বিশাল
জোয়ারের সম্ভাব্য আসন্নতা।
তাই উনিশশো সাতাশ সাল থেকে
জাপানী আক্রমণ এবং সিয়ান ঘট-
নার আগে পর্যন্ত ঘাটি অঞ্চলের
সংগ্রাম দেশব্যাপী সংগ্রামে একটি
পার্ব শ্রোত হিসেবেই রয়ে গিয়ে-

ছিল, দেশব্যাপী জাতীয় শ্রোত
পরিণত হতে পারেনি।

সংক্ষেপে, গ্রামাঞ্চলে কমুদ কমুদ
লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার এই ছিল
অবস্থা।

চীনের অবস্থার সঙ্গে ভার-
তের অবস্থার তুলনা করলে এবং
কমুদ কমুদ লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা
টিকিয়ে রাখবার প্রশ্নে মাও সে তুং
এর বক্তব্য বিচার করলে দেখা যায়
কমুদ কমুদ লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার
প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখবার পক্ষে
আমাদের সমস্ত অবস্থাই, মাও সে
তুং-এর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতি-
কূল। চীনের অবস্থার সঙ্গে
তুলনায় কেবলমাত্র একটি অবস্থা
আমাদের অনুকূলে আর তা হচ্ছে :
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে
তখন ছিল বিশাল পরিস্থিতির
অনুপস্থিতি আর আজ জাতীয় ও
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশাল পরি-
স্থিতির বিদ্যমানতা।

আমাদের দেশে যদি এ প্রশ্ন
তোলা হয় “শত্রু শাসন পরিবেষ্টিত
অবস্থায় কমুদ কমুদ রাজনৈতিক
ক্ষমতাগুলি এখানে টিকে থাকতে
পারবে কি না এবং টিকে থাকবার
সপক্ষে কি কি যুক্তি আছে?” তবে
কিন্তু প্রথমেই প্রশ্নকারীকে এক
নিঃস্বাসে “বিশ্ববী বিরোধী”
“শোষনবাদী” ইত্যাদি অভিযোগ-
বাণে বিশ্ব হতে হবে। এ সব অভি-
যোগ স্বত্ত্বেও কিন্তু চীনে লাল
রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকবার
সপক্ষে মাও সে তুং যে সব
যুক্তি তৎকালে উপস্থিত করে-
ছিলেন, আমরা তার একটিও আমা-
দের সপক্ষে হাজির করতে পার-
বোনা। কারণ (এক) সাম্রাজ্যবাদ
সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবাধীন এলাকা
ও শাসন আমাদের দেশে নেই;
(দুই) শাসক শ্রেণীগণের মধ্যে
বিরোধ ও অনৈক্য আমাদের দেশে
সম্পন্ন ভাবে, সামরিক উপায়ের
মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ এখনও
করে না এবং অবিরাম বা বিরাম
যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে সম-
স্যাবলীর মোকাবিলা করা হয় না।
বরঞ্চ শাসক শ্রেণীগণের বিরোধ
ও অনৈক্য পার্লামেন্টের মধ্য
দিয়েই রাজনৈতিক উপায়েই
মোকাবেলা করা হয়। এমন কি
পাকিস্তান, বামী ও মধ্য প্রাচ্যের
মতো সাম্রাজ্যবাদী বড়বড় প্রভা-
বান্বিত সামরিক ক্যুপ বা প্রাসাদ
বিশ্লবের উদাহরণও এখন পর্যন্ত
আমাদের দেশে নেই, (তিন)
বুদ্ধেরা বা সামন্ততান্ত্রিক শক্তি-
গুলির পার্টির প্রত্যক্ষ কবজার
মধ্যে সম্পন্ন বাহিনী নেই। রাষ্ট্র
নেই, শাসনাধীন অঞ্চল নেই, (চার)
কি প্রতিবিশ্ববী দল, কি বিশাল
দল কারুই কোনো সম্পন্ন বাহিনী
নেই তাই ভারত একটি বুদ্ধের
মধ্যেও নেই বা একটি সম্পন্ন
বিশ্ববী এখনও একটি সম্পন্ন প্রতি-
বিশ্লবের যুগোমুখি দাঁড়ানি;
(পাঁচ) স্থানীয় ভিত্তিক স্বয়ং
সম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি আমাদের
দেশে যেটুকু আছে তা একেবারেই
অনুপ্রবেশযোগ্য; (ছয়) ১৯২৪-২৭
সাল পর্যন্ত চীন একটি বিরাত

সম্পন্ন বিশ্লব ও বুদ্ধের মধ্য দিয়ে
পার হয়েছিল বা ছিল পরবর্তী
কালের গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাবার
একটি গুরুত্বপূর্ণ মহলা, যার
ফলে চীন কমিউনিস্ট পার্টির
নেতৃত্বে একটি লাল ফৌজ ও
স্বাধীনভাবে সম্পন্ন লাল রক্ষী বাহি-
নীর সৃষ্টি হতে পেরেছিল। এই
২৪-২৭ সালের বিশ্লব একটি
পার্বশ্রোত ছিল না। ছিল সমস্ত
দেশব্যাপী বিরাত ও মহান বিশ্লব
যার ব্যর্থতার মধ্যেও এমন কতক-
গুলি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল
যার ফলে পার্বশ্রোত হিসেবে
ঘাটি অঞ্চল গঠন ও গেরিলা যুদ্ধ
চালিয়ে বাওয়া সম্ভব হয়েছিল।
আমাদের একটি নির্দিষ্ট পরি-
মাণের শক্তিসম্পন্ন নিরস্ত্র লাল
ফৌজ তো দুরন্ত, যে অর্ধে মাও
সে তুং স্থানীয় লালরক্ষী বাহি-
নীর কথা বলেছেন সে অর্ধে
স্থানীয় লাল রক্ষী বাহিনীও নেই
আর লাল রক্ষী বাহিনী সূনিশ্চিত
অবস্থেই লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা
প্রতিষ্ঠা করলেও টিকিয়ে রাখতে
পারে না। লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা
প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নে আমাদের
দেশে জমিদারদের সম্পন্ন বাহিনী
মোকাবেলার প্রশ্ন নেই, স্থানীয়
বুদ্ধবাজ গভর্ণমেন্টের নড়বড়ে
“বুদ্ধ-রুট” সামরিক বাহিনীর
মোকাবেলার প্রশ্ন নেই, অতি প্রা-
থমিকস্তরেই সূনিশ্চিত, সূনিশ্চিত,
সূনিশ্চিত কেন্দ্রীয় সরকারের আধা
সামরিক ও সামরিক বাহিনীকে
মোকাবেলা করতে হবে।

একটি শক্তিশালী গণভিত্তিক
ও বিশাল পার্টি সংগঠনের কথা
না বলাই ভালো।

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি
ও চীনের তৎকালীন পরিস্থিতি

যে সময়ে মাও সে তুং কমুদ
লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা
প্রতিষ্ঠা করবার ও টিকিয়ে রাখ-
বার কথা বলেছিলেন সে সময়টা
ছিল সমস্ত চীনে একটা বিশাল
পরাজয়ের যুগ, প্রতিবিশ্লব ও
প্রতিক্রিয়ার প্রাধান্যের যুগ, দেশ-
ব্যাপী বিশাল জোয়ারের অব-
সানের যুগ। আন্তর্জাতিক
ক্ষেত্রেও তখন ছিল বিশ্ব পুঁজি-
বাদের সামরিক স্থানান্তরের যুগ
ও আশু বিশাল সম্ভাবনার সাম-
রিক পশ্চাদপসরণের যুগ। এই
ছিল তৎকালীন পরিস্থিতির একটি
দিক। অপর দিকটি ছিল, দেশ-
ব্যাপী আর একটি বিশাল জোরা-
রের আসন্নতা এবং আন্তর্জাতিক
ক্ষেত্রেও বিশ্ব পুঁজিবাদের সামরিক
স্থানান্তরের অবসানের আসন্নতা।
বিশ্লবে পরাজয় সঙ্গে, চীন
প্রতিক্রিয়াশীল ও চীন কমিউনিস্ট
পার্টির একটি লাল ফৌজ ছিল,
একটি পার্টি সংগঠন ছিল, কোনো
কোনো অঞ্চলে ব্যাপক গণভিত্তিক,
বিরাত কৃষক সংগঠন এবং স্থানীয়
সম্পন্ন লালরক্ষী বাহিনীও ছিল।
পরাজয়ের মধ্যেও এই সম্পন্ন-
গুলিকে নিছক বাঁচিয়ে রাখবার
প্রশ্নটি অত্যন্ত স্বাভাবিক তাকেই
(শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠার)



সাধনা
চ্যবনপ্রাশ
বহুমূল্য আয়ুর্বেদীয় রসায়ন
সকল বয়সেই সমার উপকারী

প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
ফিলিস্তান-৯৮

অথাক ডাঃ বোসেনচন্দ্র বোর এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) তালগপুর
কলেজের হাসান শাহের চূড়ান্ত অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র বোর, এম.বি.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য



বৃদ্ধ বয়সে স্বাস্থ্যরক্ষণ: মানুষ জরাগ্রস্ত
হয়ে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি
বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ
বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি আট
থাকে।

পুঁজিবাদী সমাজের পুলিশ

পল লাকার্গ

বিস্তারিত প্রেক্ষাপটের মধ্যে পুঁজিবাদী প্রণালী হল প্রথম বার নিজেদের প্রমে বিস্তৃত অর্জন করতে যেমন অক্ষম, তা রক্ষা করতেও তেমন। সেই জন্যই পুলিশকে তারা তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ রূপে গড়ে তুলেছে। এদের পিছনে তারা অস্বাভাবিক এবং অগণিত ভাবে অর্থ-ব্যয় করে। পুলিশের বৃত্তিধীন এবং বৈজ্ঞানিকী সমস্ত পাশবিকতারকে খুঁড়ি “কমিউনিস্ট” নামাধারী-দিগের আশ্রিত করে রাখে এই পুঁজিবাদী প্রণালী। এদের স্বপ্রণালীর কেউ বন্ধন এই পুলিশের হাতে উত্তমমধ্যম খেয়ে আসে তখন সেই অভিজ্ঞতা এরা পরম পরিচালিত সঙ্গল গ্রহণ করে কারণ তাদের প্রণালীতে সোশ্যালিস্ট শরতালগ্নী বন্ধন এই পুলিশের ডাঙাওলা নোংরা হাতে পড়বে তখন তারা কেমন জামাই-আদর পাবে তার পূর্বসূরী তারা আগে থেকেই পেয়ে যায়।

পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি

কর-বাওরা ছোকার মত প্রচুর পেতে পেতে পুলিশের ধারণা বন্ধ-মূল হয়ে যায় যে, তারা বা কিছু করবে তাই সমর্থিত হবে। এবং এই ভাবে ফ্রান্সের সং নাগরিকদের ইচ্ছার ভর দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা বন্ধন হাস্যকর হয়ে উঠল তখন সোশ্যালিস্টদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবার জন্য সেখানকার পুলিশ সম্ভ্রাসবাদের প্রবর্তন করল। মর্শিয়ে আর্টিও নামে পুলিশের জনৈক প্রাক্তন প্রিন্সিপাল (কমিশনার) তাঁর স্মৃতি-কথার লিখেছেন যে, ফ্রান্সের প্রথম সম্ভ্রাসবাদী মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার টাকা জুটিয়েছিল সেখানকার পুলিশ—বেকাগেজ সব সাধারণের জাতার্থে নানা ধরনের বিস্ফোরক এবং ঠোঁট বাসনোদ্যম ফর্মুলা ছাপা হত। মর্শিয়ে আর্টিও আরো লিখেছেন যে, ফরাসী সম্ভ্রাসবাদীদের প্রথম হত্যা চেষ্টার লক্ষ্য ছিল তিরেসের মূর্তি—বা পরিকল্পিত এবং কবরীকৃত হয়েছিল পুলিশের অবগতি এবং সাহায্য নিয়ে। কিন্তু পুঁজিবাদীদের চোখে পুলিশ এমন এক স্বর্গীয় এবং অপরিবর্তনীয় প্রতিষ্ঠান যে, এর কোন কাজই ধারণা হতে পারে না। যদিও নিজের স্বীকৃতি অনুসারে প্রমাণিত হয়েছে যে, মর্শিয়ে আর্টিও সম্ভ্রাসবাদী বৃদ্ধান্ত সংগঠিত করেছিলেন তবু কেউ যে তার গারে হাত দিল না তাহি নয়, এমন কি সরকার বা তাদের বশবৎ সংবাদপত্রগুলি এই কর্ম করার জন্য তাকে মৃত্যু ভবননা পূর্বসূরী করল না। এই সব ঘটনা নিষ্ঠুর ভাবে ফাঁস করে দেওয়ার জন্য দৃষ্ট প্রদর্শন করাই হল তাদের কর্তব্যের চরম প্রকাশ। বৃজেরা সংবাদপত্রগুলি সম্ভ্রাসবাদীদের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা, এমন কি ভালবাসা প্রকাশ করে এবং সব সময় তাদের সমাজবাদীদের আক্রমণ করতে উৎসাহিত করে। গত বছর “লা কিগারো” পত্রিকা সো-

সাহে কেবল, লাইব্রেরি এবং সমস্ত জার্মান সোশ্যাল ডেমক্রেটদের বিরুদ্ধে সম্ভ্রাসবাদী নেতা কোহেনের একটি বিতর্কমূলক জিগার প্রকাশ করেছে। জনান্তিকে বলে রাখা যায় যে, সমাজবাদীদের বিরুদ্ধে এই সব কুৎসা রচনার জন্য কিগারো পত্রিকা মর্শিয়ে কোহেনকে বদন্য পরিতোষিক দান করেছে।

সম্ভ্রাসবাদের বৃত্তি

পুলিশ এই ভেবে ভ্রমগ্রস্ত ছিল যে, পোবা কুস্তুরের মত শিকলে বেঁধে রেখে সম্ভ্রাসবাদীদের দিয়ে তারা ইচ্ছা মত কাজ করিয়ে নিতে পারবে। উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র সমাজবাদীদের বিরুদ্ধে এদের ব্যবহার করা সমাজবাদী প্রচার ব্যাহত করা, তাদের সভা ভেঙ্গে দেওয়া, সমস্ত হয়ে সমাজবাদী পত্রিকাগুলির দস্তুর আক্রমণ করা এবং তাদের সম্পাদকদের ছুরি ও রিভলভার দিয়ে আত্মপায়ন করা। সম্ভ্রাসবাদীরা বত দিন এই ভূমিকার লেগে থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠার সেবা করল তত দিন তারা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। পুলিশের উপরে আদেশ ছিল—সম্ভ্রাসবাদীরা বন্ধন সমাজবাদী নেতাদের (এমন কি তারা যদি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলারও হয়) আক্রমণ করবে তখন পুলিশ যেন তাদের কোন রকম বাধা না দেয়। প্যারিসের একজন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার থাকাকালে বর্তমান ডেপুটি (এম পি) রুরনেং পোবা গুন্ডা মার্শিয়েনের দ্বারা পরিচালিত সম্ভ্রাসবাদী বৃত্তিদের দ্বারা আক্রান্ত ও প্রহৃত হন। দুই দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ পুন্ডা বেরা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তবু আউড়ে চলে গেলেন—ভুললোকেদের বিবাদ নিজের দ্বারা মীমাংসা হওয়া উচিত।

সম্ভ্রাসবাদী বন্ধন সমাজবাদী

পুলিশের এ রকম খুঁড়ি সহি-কৃত্য, কলাই বাহুল্য, সম্ভ্রাসবাদীদের আরো সাহসী করে তুলল। অতঃপর তারা সম্পত্তি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব তত্ত্বকে কার্যে পরিণত করতে আরম্ভ করল, শো-উইন্ডো এবং স্টোর ভেঙ্গে লুট করল, ধনী নাগরিকদের বাড়ীতে জোর করে ঢুকে তাদের ভারমুক্ত করল এবং যেখানেই প্রতিরোধ পেল সেখানেই ছুরি এবং পিস্তলের আশ্রয় নিল। কিন্তু এ ধরনের “চৌধ” পুঁজিবাদীরা বরদাস্ত করতে পারল না। এটা তাদের কাছে বড় বেশী বর্বর মনে হল। কাজেই পুলিশের সামনে প্রয়োজন দেখা দিল তাদের নিজের আদরে লালিত সম্ভ্রাসবাদী বাহাদুরের পাকড়াও করে আদালতে কোবালা করে দেওয়ার। জেজদের এই “বাহাদুর” সাধারণ চোর এবং খুনীর মত শাসিত দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। কিন্তু “কমরেড-দের” মধ্যে এই ঘটনার গভীর নৈতিক ক্রোধের সঞ্চার হল এবং তারা সোশ্যাল ডেমক্রেটদের মতো জেজদের পশ্চা-

শ্রাবণ করল। নৈরাজ্যবাদী কৃত্য এই ভাবে, চাগিয়ে উঠে আরো বড়ো হাঁ করল। ডেল’গ্রেসের অফ ডেপুটিজে (পার্লিমেণ্ট) বোমা ছুঁড়ল এবং কাসারো কামুনোথকে হত্যা করল।

সমাজবাদীদের খতম করার কাজে পুলিশ এতকাল মগ্নী এবং রাজনীতিকদের উৎসাহিত হয়ে বে-খুশ মেজাজে ছিল, ছোরা এবং বোমা বন্ধন সাধারণ নাগরিকদের বিস্ত অশ-হরণ এবং জজ ও ফরিসাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাধনোচিত ধামে প্রেরণ করল তখনও তাদের মোজ নষ্ট হল না। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা বন্ধন রাজনীতিকদের জীবনকে পূর্বসূরী সম্ভ্রাস্ত করে তুলল তখন পুলিশ বৃত্তিতে পারল যে, মস্করাটা একটু বেশী হয়ে গেছে। ভরকম্পিত ডেপুটিগন সম্ভ্রাসবাদীরোধী আইন এবং পুলিশ বাজেটের বৃদ্ধি দাবী করলেন। এই ভ্রমহোদয়ের বেশ ভালই জানতেন যে, যে চেষ্টিত হাজার ভরে তারা কম্পান্বিত তবু সংগে পুলিশের প্রত্যাক বা পরোক্ষ বোল-সাজস সব সময়ই ছিল এবং আছে।

কিন্তু তবু এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি তাদের ভক্তি এতই গভীর এবং অচলা যে, তার বিরুদ্ধে একটি মাত্র নিন্দা-বাক্য উচ্চারণ করার বা তাদের অতীত কর্মের তদন্ত দাবি করার সাহস তাদের হল না। তাদের অপ্রীতি-ভাজন হওয়ার সাহস তো তাদের হলই না বরং সোৎসাহে আরো নতুন নতুন অধিকার এবং সুযোগ তারা পুলিশের উপরে অর্পণ করলেন। এই বিষয়কে তারা কয়েকটি মিনিতি করলেন সম্ভ্রাসবাদী ছুরিকা এবং ডিনামাইট থেকে তাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করার জন্য।

সমাজবাদীদের কার্যকলাপ ব্যাহত করার জন্য পুলিশ বন্ধন তাদের সম্ভ্রাসবাদী বাহিনীর শিকল ঢিলে করে দিয়েছিল তখন পুঁজিবাদী রাজনীতিক এবং সাংবাদিকেরা হাতে হাত দিয়ে তাদের বাহবা দিয়েছিল। সমাজবাদীদের সত্য সম্ভ্রাসবাদী “কমরেডদের” হামলার ফলে যে হটগোল হয়েছিল তার পুন্ডান্দ-পুন্ড বর্ণনার বৃজেরা কাগজ-গুলো ভরা থাকত। সনন্দে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তারা বলত : এ দেখ সোশ্যালিস্টরা একে অপরের সংগে কী রকম আচরণ করে। কারণ জন-সাধারণের মধ্যে তারা এই মিথ্যা ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছিল যেন নৈরাজ্য-

বাদী এবং সমাজবাদীদের মধ্যে কোনই তফাৎ নেই। তাদের মত নৈরাজ্য-বাদ বা আন্যার্কিজম হল সমাজবাদের নৈরাজ্যিক পরিণতি। নৈরাজ্যবাদী বা সম্ভ্রাসবাদীদের সাহস এবং শিথলতা আছে এবং নিজেদের ধারণা তারা কার্যে পরিণত করতে পারে। আর সোশ্যালিস্টরা হল ভ্রম এবং বিরাদী সম্ভ্রাসবাদী—ভীরুতা অথবা উচ্চাকা-ঙ্কর জন্য তারা নিজেদের তবু পরিণতিতে যেতে সাহস পার না। এই প্রচার সাময়িক সাক্ষ্য লাভ করেছিল। - কিন্তু কাল লোকেরা সম্ভ্রাসবাদীদের উদ্ভট কথার এবং হট-কারী কাজের জন্য সমাজবাদীদের দারী করেছিল।

সম্ভ্রাসবাদ পুঁজিবাদের কুটুম

পুঁজিবাদী সাংবাদিকদের গোপনে ও কোশলে লালিত এই প্রচারকে প্রীতি-রোধ করার চেষ্টা সমাজবাদীরা করে-ছিল। তারা প্রমাণ করেছিল যে, সম্ভ্রাসবাদীদের তবু ল্যা-সে-ফরার তবু স্বাভাবিক পরিণতি বৃদ্ধি কলা বার বৃজেরা ব্যক্তিগতভাবে যৈয সম্ভ্রাস্ত। তারা দেখাল যে, সম্ভ্রাসবাদীদের কার্যপন্থািত হল ব্যক্তিগত প্রয়াস আর সমাজবাদীদের পন্থািত হল সংগঠিত প্রমিক প্রণালী (শেখাংশ দ্বাধন পুন্ডার)

Nescafé—the coffee with life in it!

Have a wonderful evening!
Serve stimulating Nescafé
(made in just 5 seconds!)

Appreciate the aroma of full, rich coffee. Taste Nescafé. You'll find it positively stimulating. Nescafé puts the accent on coffee!



পুঁজিবাদী সমাজে পুলিশ

(১১ পৃষ্ঠার পর)

বৌদ্ধ আন্দোলন। সমাজবাদীরা নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিবোপসার করে আর সমাজবাদীরা এর সুযোগ নিয়ে প্রশাসন এবং আইনপ্রণয়ন সংস্থা-পুলিশে অনুপ্রবেশ করে বুর্জোয়া রাজনীতিকদের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। সমাজবাদীরা প্রচার করে কাজের এবং বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হত্যার উপরে জোর দেয়। কিন্তু সমাজ-বাদীরা কেবল ভাবধারার প্রচারে সন্তুষ্ট দেয় এবং জিহ্বাসু বক্তৃতা এবং বোমা ডিনামাইটের রাস্তাকে নিরুৎসাহ করে কারণ এর দ্বারা সামাজিক সমস্যার সমাধান তো হয়ই না বরং তা জঙ্গী প্রমিকদের বিরুদ্ধে উৎসাহন করে আন্দোলনকে ব্যাহত করে। এই বিরক্তিকে উসকিয়ে দিয়ে সমাজবাদীদের জনচক্ষে হয় করার চেহারা বুর্জোয়া রাজনীতিকেরা করে আসছে যেতে সমাজবাদীরা সাধারণ চোর ডাকাতির মত আদালতে শাসিত পায়। ১৮৮২ সনে মূল্যসের সেশন আদালতে গেস্‌দে, ডরমর এবং লাকার বন্দন অভিযুক্ত হয়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড লাভ করেন তখন প্রজাতন্ত্রের 'অ্যাটর্নি' সমাজবাদীদের

কাজ থেকে অংশ বিশেষ আদালতের সামনে পড়ে শোনান, যে কাজ পুলিশের অধেই স্থাপিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। নৈরাজ্যবাদ (সমাজবাদ) এবং সমাজবাদ সম্পর্কে লোকের ধারণা-এত গোলমালে ছিল যে তখন সমাজ-বাদী আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছিল, এবং এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে তো ছিলই, এমন কি চিরস্থায়ী হয় তো হয়ে পড়ত যদি না পরবর্তী করেকটা মারাত্মক সংঘর্ষ বাস্তব সম্পর্কে জনমতের চোখ খুলে দিতে সাহায্য করত। সাধারণভাবে হয়তো লোকের নজর এড়িয়ে যেত এমন সব ঘটনা বিশেষ-তাপর্বে আলোকিত হয়ে লক্ষণীয় হয়ে উঠত। যে সব ডিনামাইট বীর-পুলাবেরা "হাতেকলমে কাজের চর্চা" বা তৎ অনুমোদন করত তারা সকল শ্রেষ্ঠ সমাজবাদী নেতাদের সম্বন্ধে তাঁর ঘৃণা পোষণ ও প্রকাশ করত। তারা তাদের গালাগাল দিত এবং "কোমল কুসুম", "বৈকুণ্ঠকুর" ইত্যাদি আখ্যায় ব্যঙ্গ করত ঠিক যেমন পুঁজিবাদীরা সমাজবাদীদের

"উস্কানিদাতা" নাম দিয়ে তাদের প্রখ্যাত নেতাদের খুন করবে বলে ভয় দেখাত। যে সব কিতাব পাঠ করে সমাজবাদীরা পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে তাদের ঘৃণা সত্তর করেছে সে সব বই পুঁজিবাদী সমাজের প্রিয় সমাজসেবী এবং দার্শনিকদের দ্বারা রচিত যেমন ডারউইন, হিকেল এবং হবার্ট স্পেনসর। ভুলেও কোন সমাজবাদী মার্কস, এঙ্গেলস বা অন্য কোন সমাজবাদী লেখক থেকে উদ্ধৃত করে না। পুঁজিবাদী অর্থ-নীতিকেরা যেমন কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের প্রতি অপরিণয়ম অবজ্ঞার ভরপুর, সমাজবাদের দ্বারা তথ্যদাতা যেমন এলিসি রুড্রু বা রুপোর্টকিন-মার্কসবাদের প্রতি তাদের তাচ্ছল্যও সমান। এদের ভাবল-বাগাড়স্বরপূর্ণ এবং গা-জোরারী বিতর্কের মধ্যে কার্ল মার্কসের নাম পর্বন্ত উচ্চারিত হয় না। বুর্জোয়া সমাজের পদনত এবং ভিত্ত জনতার মনে সমাজবাদ যদি কোন নীতি-আদর্শের সত্তার এবং লালন করে থাকে তাহলে তা হল জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে "অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম" তব্বা হল অর্থনীতিকদের "স্বাধা প্রতিযোগিতা" তত্ত্বের পরি-পূরক অপর পিঠ। মার্কস এঙ্গেল-সের ইতিহাসের কল্‌তাত্ত্বিক ধারণার

সঙ্গে সমাজবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই তত্ত্ব আমাদের দেখিয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশ কী করে মানব এবং তার সমাজকে প্রভাবিত করে এগিয়ে চলে এবং শেষ পর্যন্ত সমস্যাকে পৌঁছায়।

সমাজবাদ সমাজবাদের, বিপরীতমুখী

পুলিশ এতকাল ধরে প্রচুর পরি-প্রমের বিনিময়ে যে তথ্যগত ভুল ধারণা মানবের মনে সৃষ্টি করে জীবিয়ে রেখেছিল, তারা নিজেরাই তাকে দূর করতে সাহায্য করল। এই বছরের (১৮৯৬) পরলা জানুয়ারী ভেল'এ-এর বোমা হোড়ার কয়েক সত্তাহ বাদে আভাস্তরীণ মন্ত্রী ম'ৱেনাল দৃ-হাকার স্বেচ্ছায় এবং তত্‌তাত্ত্বিক-খানা-তন্ত্রাশি করালেন। সমস্ত নামজানা সমাজবাদীদের বাড়ী অরাল করে পাওরা সমস্ত দলিলপত্র সত্ত্বয়ে স্তুপী-কৃত করা হল। মল্লিমহালার আশা করেছিলেন যে, এই দলিল-সত্ত্বাবেজ দিয়ে তিনি অনারসে প্রমাণ করে ফেলবেন যে, সমাজবাদীরা এমন একটা বিরটি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র পরি-কল্পনা করেছিল বার সঙ্গে সমাজ-বাদীদের সম্পর্ক খুব নিকট। তিনি অনুমান করেছিলেন যে, সমাজবাদী নেতাদের কাছে লিখিত সমাজবাদী-দের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দেবেন যে, এই ব্যাপারে এই দুই দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগ এবং গোপন আঁতাত বিদ্যমান।

কিন্তু ম'ৱেনালের অদৃষ্টে লেখা ছিল নিষ্কল হতাতা। সমাজবাদী-দের কল্ল সমাজবাদীদের একটা সাং-রশ চিঠি পর্বন্ত পাওরা গেল না। অপর পক্ষে সমাজবাদীদের পরস্পরের চিঠিপত্র সমাজবাদীদের সম্পর্কে গালাগালি এবং ভীতিপ্রদর্শনে পরি-পূর্ণ। এই পুঁজিবাদী তন্ত্রাশি সন্দেহা-তীত ভাবে প্রমাণ করল যে, কি ব্যক্তিগত কি প্রকাশ্য জীবনে সমাজ-বাদীদের সঙ্গে সমাজবাদীদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অপর পক্ষে এই ঘটনার সব বিষয়ে তাদের পারস্প-রিক শত্রুতাই প্রমাণিত হল।

যদিও সমাজবাদীদের সঙ্গে সমাজবাদীদের গোপন সম্পর্ক প্রমা-ণের পুঁজিবাদী পরিকল্পনাটির ভরস্তুবি হয়ে গেল তব্বা এই তন্ত্রাশিতে এমন কল্ল উদ্‌ঘাটিত হল যা সকলের কাছেই অস্বাভাবিক ছিল এবং বার দ্বারা পূর্বোক্ত কৃতির কিতং পূরণ হল। নামজানা সমাজবাদীদের দখলে চিঠি পাওরা গেল ধর্ম-বাজক; শেরার মাকেটের দ্বারাবা ঘোরাল এবং জমি-দারদের। এরা যেমন বড় মানব তেমন বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। এই চিঠিপত্রিতে ধন্যবাদ এবং অর্থ-সাহায্যের নির্দেশ ছিল। এ থেকে জানা গেল যে, কয়েক বছর আগে প্যারিস শ্রীক একচেজে গ্যালাস যে পিস্তল ছুঁড়েছিল সে ধরনের সমাজ-বাদী ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য সমাজবাদীদের সাহায্যার্থে পারিসের শেরার দালাল সমিতি একটি বিশেষ ভাষ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমাজ-বাদ একটা লাভজনক ব্যবসারে পরিণত হয়েছিল এবং উগ্রপন্থীদের হঠকারী কর্মের দ্বারা সৃষ্ট ভয়ের সুযোগ

নির্মে আশের গুচ্ছোতে বৃষ্টিমান লোকের অতাব হল না। শ্রীক এক-চেজের করণিক সেবাস্তিতন ফোরে সমাজবাদী এবং শেরার দালালদের মধ্যে দুতের কাজ করে তাদের দেনা পাওনার মামলার ফরসালা করে দিতেন। এই ঘটনাই ব্যাখ্যা করে কী করে ম'ৱেনালের হুমেনা পাচ শ শ্রীর নোট ভাঙ্গাতে বা আসত শ্রীডনা-মাইট দৃষ্টিনা নিবারণী ভাষ্যার থেকে। কারণ এর আগে দীর্ঘ কাল লোকের জানত না কী করে ফোরে সংসার চলে। এই ভাবে সমাজবাদী-দের ব্যাঙ্গারদের সম্মান পুঁজিব পেরে গেল। কাজেই এই ঘটনাকে প্রচার করতে পুলিশ দেরি করল না কারণ ভেল'এ-এর বোমা বানানর জন্য যে এক শ শ্রীর দরকার হয়েছিল তা পুলিশ দিয়েছিল বলে যে অভিব্যাস উঠেছিল তাকে কাটান দেওয়া পুলি-শের পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু বিচারের সময় বিচারক এই একশ শ্রী সম্বন্ধে এত সতর্ক তাচ্ছল্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন যেতে সাধারণ মানব ধরেই নিল যে, উক্ত অভিব্যাস সম্পূর্ণ সত্য।

হিংসার সম্বন্ধে ধর্ম-বাজক

বুর্জোয়া সংবাদপত্র এবং রাজনীতি-কেরা বলে থাকে যে সমাজবাদ হল সমাজবাদের অন্তবর্তী ফল। প্রথমে লোকে গণ-আন্দোলনকারী হিসেবেই সাহসী এবং অকৃত্রিম বলে পরিণমে কাজ আরম্ভ করে কিন্তু ন্যায়বাদী, ডিনামাইট নীতির উপাসক হওয়া তার পক্ষে অবধারিত। উত্তীর্ণ খুব সত্ত্বের নয়। কেন না, ঘটনাচক্রে প্রমাণ পাওরা গেল যে, যে-সমাজবাদীরা কর্ম-বাদের আশ্বাস দ্বারা নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলেছিল তারা প্রত্যেকে কিনাবাতিক্রমে ছিল ধর্ম-বাজকদের শিক্ষিত।

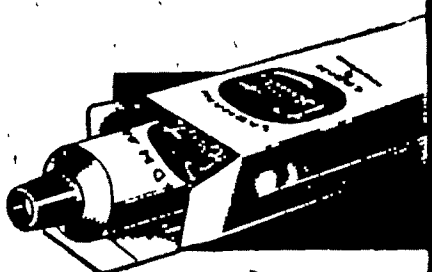
সমাজবাদী বক্তাদের মধ্যে সর্ব-ধিক বাগবিড়িত সম্পন্ন সেবাস্তিতরা ফোরে বিনি সারা ক্রলস জুড়ে তার সত্যসমিতিতে কথা নয়, কাজের মারাত্মক প্রচার করে এসেছেন তিনি তার প্রথম বৌবন কাটিয়েছিলেন সেম্ট এটিয়েনের এক স্কুলে। পিতার মৃত্যুর পরে পিচিশ বছরে তিনি যখন বাজকের পোষাক পরতে উদ্যত এমন সময়ে পালিয়ে গিয়ে তিনি স্ববসার করেন এবং ফনাডো শ্রীর প্রাচুর্বে উড়ে বেড়ান। সমাজবাদী বাচলতা সত্ত্বও ধর্ম-মন্দিরের সঙ্গে তিনি চিরঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছেন এবং যেখানেই বক্তৃতা করতে গেছেন সেখানেই স্থানীয় বাজকদের সঙ্গে গোপন সলাপারামশ করে নিজেছেন।

অনুনা প্রমোদপ্রমত্তত কাইভোই লির'সের কাথলিক মুনিয়েনের সদস্য। প্রথম যখন তিনি সমাজবাদী বক্তা রূপে আবির্ভূত হন তখনো তিনি সে'৭ তিসে'৭ দ্য পৌলের সদস্য। রাবাচোল এবং ভেল'এ-এরও ধর্মীয় শিক্ষা লাভের ইতিহাস আছে। ধর্মীয় আবেগের জন্য কাসারিও বিশ্বাস্য। যে স্কুলে তার শৈশব কেটেছে সেখানে তিনি ইন্ সে'৭ অর্থ'৭ সন্ত নামে পরিচিত ছিলেন। সেখানে পনেরো (দেখাৎ ১০ পৃষ্ঠার)

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য



দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে



সাধনা ওষধালয়

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক গুণগ্রাস

লাল ঘাটি সৃষ্টি প্রসঙ্গে

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

চীন কমিউনিস্ট পার্টির কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল। পার্টি ও পার্টি সংগঠন কোনো প্রকারে গোপনে বাঁচিয়ে রাখা এক কণ্ঠা আর লাল ঘাট ও লাল রক্ত-বাহিনীকে বাঁচিয়ে রাখা আর এক বাহিনীকে নিষেক বাঁচিয়ে রাখতে হলেও প্রতিবিলম্বী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণ করতেই হবে। গণভিত্তিক ও লাল রক্ত-বাহিনীকে কেন্দ্র করেই বাঁচিয়ে রাখতে হলেও এমন অবস্থা সৃষ্টি করা দরকার যে অবস্থায় একে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। ঘাটি অঞ্চল ও লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার চিন্তাটি উদ্ভব হয়েছে এই অবস্থার মধ্য থেকেই। সুতরাং বিপ্লবী পরিস্থিতি আছে কি নেই এই প্রশ্নটি চীনের তৎকালীন অবস্থায় একটি অবাস্তব প্রশ্ন ছিল। যে সম্পদ আছে তাকে যেমন করেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এই প্রশ্নটিই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

খুব শীগগিরই আবার একটা জোয়ার দেখা দেবে এ আশা, এ প্রত্যয় না থাকলে যা আছে তাকে টিকিয়ে রাখবার প্রস্নে

নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, আত্মত্যাগ অহতুক মনে হতে বাধ্য। মনের জোরে তাতে পাওয়া যায় না, দৃঢ় প্রত্যয়ের শক্তি আসে না। চীন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শীগগির যে একটা উত্তাল বিপ্লবী জোয়ার দেখা দেবে এ বিষয়ে চীনের পার্টির মধ্যে কোনো সন্দেহ ছিল না। এই 'শীগগির'টি কত দূরে বা কত কাছে নেতৃবৃন্দের মধ্যে সন্দেহ ছিল তা নিয়ে, এই 'কত দূরে' এবং 'কত কাছে' বিষয়টির সঠিক বিশ্লেষণের উপরেই কিন্তু কার্যক্রম নির্ধারণের সঠিকতা নির্ভর করছিলো। মাও সে তুং বলেছেন : "একটি বিরাট বিপ্লবী জোয়ার যে আসন্ন একথা তারা বিশ্বাস করলেও সেই জোয়ার যে কত আসন্ন তা তারা জানেন না।" (একটি স্ক্রলিং)।

চীনে তখন প্রতিবিলম্বীর প্রাধান্য ছিল বলেই জনগণের ও কমিউনিস্ট পার্টির বা কিছু সম্পদ ছিল তা পশ্চাদপসরণের মধ্য দিয়েই তাকে রক্ষা করার প্রশ্নটি প্রধান ছিল। এই পশ্চাদপসরণের প্রশ্ন থেকেই গ্রামাঞ্চলে মাটির প্রশ্নটি

আসে। সাতাশ-আঠাশ সালে বিপ্লবী পরিস্থিতিতে ভাটা ছিল বলেই এবং প্রতিবিলম্বীর প্রাধান্য ছিল বলেই চীনের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত এলাকাগুলিতেই শৃঙ্খমায় বিপ্লবের পতাকা অগ্রগামী অংশ উর্ধ্বে তুলে ধরতে পেরেছিল। শহুরে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবিলম্বী অসম্ভব শক্তিশালী থাকায় এবং বিপ্লবী পরিস্থিতিতে ভাটা থাকায় পশ্চাদপসরণ জনগণ এই ভাটার টানে আরও পিছিয়ে যাওয়ার বিপ্লবী ঘাটি-সমূহ দেশব্যাপী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং এই ঘাটির সংগ্রাম একটি পার্শ্বপ্রান্তে হিসেবেই বেঁচে ছিল এবং তারই ফলে অন্যান্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিও (একটি লাল ঘাট, স্থানীয় লালরক্তী বাহিনী, সংগ্রামী প্রতিহিংসামণ্ডিত স্থানে গণভিত্তিক ও পার্টি সংগঠন, শাসক শ্রেণীর মধ্যে অবি-রাম ব্রহ্ম ইত্যাদি, ইত্যাদি) দেশব্যাপী বিপ্লবের জোয়ারের অনুপস্থিতিতে ঘাটি অঞ্চলগুলি টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মাও সে তুং বলেছেন : "গত বছর বহু জাগ্রার আমরা যত্ন করেছি। গোটা দেশেই যে বিপ্লবের জোয়ারে ভাটা পড়েছে সে কথা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব

করিছি। একদিকে করেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপিত হয়েছে, অঞ্চল অন্যান্যদিকে গোটা দেশের জনগণের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু নেই; প্রমিক, কৃষক এমন কি গণতান্ত্রিক বুদ্ধোন্নতিরও বাক-স্বাধীনতা বা সমবেত/হওয়ার স্বাধীনতাটুকু নেই, আর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করাটাতো সব চাইতে ঘৃণ্য অপরাধ বলে পরিগণিত হচ্ছে। (আন্তর্ঘ) মাও সে তুং একটা আশা উপনিবেশিক দেশে "জনগণের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার" "গণতান্ত্রিক বুদ্ধোন্নতির অধিকার" ইত্যাদির আশা পোষণ করছেন। এ সবইতো আমাদের দেশে মাও সে তুং চিন্তাধারার বিরোধী। লালঘাটের যেখানেই যার দেখতে পায় জনগণ উৎসাহহীন, দূরে দূরে সরে থাকছে, আমাদের প্রচারকার্য চালানো হলে পরে তবেই তারা ধীরে ধীরে গিয়ে সংগ্রামে সামিল হয়, শত্রু সৈন্যের যে কোন ইউনিটেরই আমরা সম্মুখীন হই, সে সব সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ হয়েছে, অথবা তারা আমাদের দিকে চলে এসেছে এমন ঘটনা প্রায় ঘটেই না ফলে লড়াইটা আমাদের পুরো পুরাই করতে হয়... আমাদের বিচ্ছিন্নতা আমরা তীব্রভাবে অনুভব করছি, আশা করেই চলছি এর শেষ হবে..."

বিপ্লবীদের অনুকূল সমস্ত অবস্থা, থাকা সত্ত্বেও একটিমাত্র প্রতিকূল অবস্থার জন্যই অর্থাৎ বিপ্লবী পরিস্থিতির অভাবের জন্যই কেন্দ্রীয় সৌভাগ্যেও করেও শেষ পর্যন্ত ঘাটি অঞ্চল ও লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু চীনের তৎকালীন পরিস্থিতি ও তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যা ছিল আজকের ভারতের পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তা তো নয়ই, বরং একেবারে বিপরীত। আজকের দিনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি বিদ্যমান। সমস্ত দুনিয়াটাই একটা যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটেতে পারে এরূপ একটা আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে। "একটি স্ক্রলিং দাবানলে পরিণত হতে পারে" এরূপ একটি আসন্ন সম্ভাবনার পৃথিবী আজ আর নেই; আজকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকাই নয়, সমগ্র দুনিয়াটাই একটা প্রচণ্ড দাবানলের মধ্যেই বাস করছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখবার প্রশ্নটিতে সাতাশ-আঠাশ সালের চীনের সৃষ্টি এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য। এই পাঠ্যের গুরুত্ব বুঝতে না পারলে আমাদের প্রত্যয়ের বদলে অল্প বিশ্বাস ও আবেগ সর্বস্বতাই প্রধান হয়ে উঠবে এবং হুবহু নকল ও অনুকরণ সর্বস্বতাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে।

এ সব পাঠ্য হাড়াও আজকের ভারত ও পুরানো চীনের মধ্যে আরও অনেক পাঠ্য আছে। তা বারান্তরে আলোচনা করা যাবে। চীনের সৃষ্টি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলির বিশদ আলোচনা না করে "চীনের পথ আমাদের পথ" বললে অনুকরণ সর্বস্বতাই আমাদের পেরে বসবে।

পুজিবাদী সমাজের পুলিশ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বছর পর্যন্ত তিনি কোরাস-বালক ছিলেন।

খুবই আশ্চর্যের কথা যে, কার্ণেল হত্যার দায়ে হত ব্যক্তিদের একজন সমাজবাদী নয় বরং কেউ কেউ রাজক। একজন কাসারিওর ভূমিকা প্রশংসা করে দৃষ্ট প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি তাকে কোন আর্থিক সাহায্য করতে পারেন নি। রাজকের কার্ণেলকে স্বাধীনচিন্তাবাদী বলে মনে করতেন এবং সেজন্য তাকে ঘৃণা করতেন। মৃত্যুর দিন ক্যাথলিক লাজো দ্য নোভ (উত্তরের তারা) পত্রিকার প্রজাতন্ত্রের রাস্তা পিছু বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে বলা হয় যে, তার ইহকাল ফুরিয়ে এসেছে।

ধর্মসংস্কারগুলি চিরকাল ধারাল করে এসেছে যে, রাজপুত্রদের বিচার করার অধিকার তাদের। মধ্যযুগে এরা আশ্রিত সামন্তদের গদী চ্যুত করত। তৃতীয় ও চতুর্থ হেনরীর হত্যাকণ্ডের হাতে ছুরি তুলে দিয়েছিল জেসুইটরা। প্যাসকল তাঁর "লেভিস প্রোভেন্সাল"-এ প্রমাণ করেছেন যে, নাম-করা ধর্মনেতারাই এই নীতি পোষণ করতেন যে, তাদের বারা অত্যাচার করতে উদ্যত যার তাদের ধনমান হানি করে তাদের মৃত্যু, যে সব মিথ্যা সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় এবং যে সমস্ত বিচারক তাদের অন্যান্য, তবে জেগে দেয় তাদের মৃত্যুকামনার অধিকার তাদের আছে।

এই সব শিক্ষা আজো পর্যন্ত এদের মধ্যে কতখানি কার্যকরী আছে কে জানে? বাই হোক, প্যাসকল বর্ণিত কার্যকরী কোনো দিন পোপের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়নি। তাছাড়া, সে জুডিশ অ্যাসিবিয়ান সেনাপতিদের দেহদান করে তাকে মদ খাইয়ে হত্যা করেছিল, পুরাণ কিতাবে তাকে কি মহতী প্রতিপন্ন করা হয় নি। তে জানে, শেষবে শেষে এই বিরোদ্ধাত্মক কাহিনীই কাসারিওকে সাহসী করে তুলেছিল কিনা কারণভুক্ত হত্যা করতে?

অনুবাদ : হারিশ চক্রবর্তী

মধ্যবিত্ত রাজনীতির ভবিষ্যৎ

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তুই নয়। ভাগচাকীকে জমি দেওয়া, কণ দেওয়া, বিভিন্ন শিল্পের জাতীয়করণ, বেকার ভাতা, সমাজবাদী প্রবর্তন, প্রমিকদের মজুরীবাধি ও বোনাস প্রদান এবং কর্মসংস্থান বাধি-এগুলোই হল উক্ত মধ্যবিত্ত রাজনীতির চরম লক্ষ্য। এ ধরনের লক্ষ্য থাকবার আসল কারণ হলো বনারমান সংকট ও অর্থনৈতিক অসন্তোষকে সমগ্র শ্রেণীসংগ্রামের দিকে থেকে ছড়িয়ে রাখা। শৃঙ্খল এটুকু বললে সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। অর্থনৈতিক বা প্রশাসনিক রিলিফ আন্দোলন, নির্বাচিত শ্রেণীর সামনে আরেকটা মিথ্যা বলে, সে হলো এই— "তোমাদের নির্বাচনকে এ ব্যবস্থায় মূর্ত করা সম্ভব, অসন্তোষ আর্থিক মূর্ত করা সম্ভব।" ছড়িয়ে বলতে গেলে এর মানে দাঁড়ায় এই যে "তোমাদের নির্বাচন এখন থাকবেই, তোমাদের শোষণ থাকবেই, যা আশা করতে পারো তা হলো নির্বাচন বা শোষণের পরিমাপগত হাস।" বাংলা দেশের বর্তমান নির্বাচনী আবহাওয়ার এই মধ্যবিত্ত রাজনীতির প্রতিটি পার্টির প্রোগ্রাম কলকাতার রাস্তার রাস্তার বিজ্ঞাপিত হয়েছে—

সি পি এম-এর বিজ্ঞাপন :
(এক) আই-এ-এস কর্মীদের মনোমন ও নিবৃত্তি কেন্দ্রের হাতে না থেকে রাজ্যের হাতে থাকবে।
(দুই) কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার করতে হবে।
(তিন) রাজ্য থেকে কয় আদায়ের

ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকারের হাতে দিতে হবে, এবং রাজ্যের অধিকাংশ রাজ্য সরকারের হাতে সমর্পণ করতে হবে।

(চার) বন্ধ ফ্যাকটরী চালু করতে হবে।

(পাঁচ) পরিকল্পনার অর্থবোজনায় রাজ্য সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রের তুলনায় অধিক থাকবে।

(ছয়) সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

সি পি আই-এর বিজ্ঞাপন :

(এক) বিদেশী ঠেল শিল্প ও কারখানাগুলোকে জাতীয়করণ করতে হবে।

(দুই) একচেটিয়া মনোকা খর্ব করতে হবে ও সংবিধানের পরিবর্তন করতে হবে।

(তিন) রস্তানী-আমদানী বাণিজ্য জাতীয়করণ করতে হবে।

(চার) কৃষকের স্বার্থে আমূল ভূমিসংস্কার করতে হবে।

(পাঁচ) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান করতে হবে।

(ছয়) দুবামূল্য কমাতে হবে।

নব কম্প্রেন্সের বিজ্ঞাপন :

(এক) বিদেশী ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করতে হবে।

(দুই) একচেটিয়া মনোকা খর্ব করতে হবে।

(তিন) বৈশ্বিক ভূমিসংস্কারের দ্বারা চাষীদের হাতে জমি ও কণ দিতে হবে। সেচ কর্মসংস্থান প্রসার করতে হবে।

(চার) রাজ্য সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

(পাঁচ) কণ ফ্যাকটরী চালু করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বাড়াতে হবে, বেকার ভাতা দিতে হবে।

(ছয়) সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে।

বিজ্ঞাপনের করেকটি নমুনা দেখানো গেল মাত্র। হতে পারে প্রতিটি পার্টির তালিকা আরো দীর্ঘতর, বা স্থান বিশেষে নতুন নতুন স্লোগানের সংযোজনে বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে। কিন্তু প্রোগ্রামগুলো একই চরিত্রের অর্থাৎ আর্থিক রিলিফের দাবীতে মূখ্য এবং নির্বাচনী প্রোগ্রামের দিক থেকে বিচার করলে সব পার্টিগুলোর মধ্যে একতার না আসতে পারাটা অস্বাভাবিক, অন্যথায় ভোটদাতাকে লটারী করে ভোট দিতে হবে।

আর্থিক দাবীগুলো মেটানো যদি এ সমাজব্যবস্থার সম্ভব হয়, তাহলে তা নির্বাচনের মাধ্যমেই করতে হবে, কারণ তা গণতন্ত্র সম্মত। কোন উপকারী আর্মি জেনারেল যদি উক্ত দাবী মেটানোর প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনীতি তা মানবে না, কারণ তা গণতন্ত্র সম্মত নয়, কারণ তা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা হবে না। সুতরাং মধ্যবিত্ত রাজনীতির গণতন্ত্র আর্থিক দাবী মেটানোর আন্দোলন কার্যতঃ নির্বাচনী আন্দোলন এবং পার্টিগুলোর সাংগঠনিক প্রস্তুতি তাই নির্বাচনকেই কেন্দ্র করে, বিপ্লবকে নয়। কারণ পূর্বেই বলেছি কোন পার্টির উদ্দেশ্য ও পন্থা একসঙ্গে পাঠ্য।

[আগামী সংখ্যায় লক্ষ্য]

কামিউনিষ্ট বিপ্লবীদের কর্মনাতি

(সমস্ত পৃষ্ঠার পর)

জীন্স। কিন্তু সি পি আই (এম-এল) এবং "দক্ষিণ দেশ" (এম, সি, সি) নেতৃবৃন্দের বিচারধারা অন্যরকম—আর সেটা মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্ন। আমরা দেখেন—গণসংগ্রামের দাবি বা উপলক্ষটা কী? কাজের সময় কমানো? বোনাসের পরিমাণ বাড়ানো? বেনামা জমি দখলে রেখে চাষ? উচ্ছেদের বিরোধিতা? প্রত্যক্ষ আত্মরক্ষার প্রতিরোধ? তাহলে এইসব গণসংগ্রাম থেকে শতহস্ত দূরে থাকো। কেননা, ওসবে অর্থ-নীতিবাদ প্রদ্রব পাঠ।

আমরা কি বলতে পারি, এইসব দাবি নিয়ে বেসব গণসংগ্রাম হয় সেসব কারণ চাপানো বা সাজানো সংগ্রাম? না, পারি না। আমরা কি বলতে পারি, এসব গণসংগ্রাম জন-জীবনের গভীরতম অন্তঃস্থল থেকে, মেহনতি জনসাধারণের প্রকৃত, বাস্তব প্রয়োজন থেকে ওঠে না? তা বলতে পারি না। তাহলে কেন আমরা ছদ্মগামী হব? কেন আমরা জাবব বে, এইসব সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলে আমরা আদর্শচ্যুত হয়ে যাব? আমাদের বৈশ্বিক আদর্শ সত্যিই তো এত ঠুনকো নয় যে, ছোটখাট সংগ্রামের ছোঁয়া লাগলেই তা শূন্যে কাটি হয়ে যাবে।

বিপদ আছে, ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপকের আশঙ্কাও আছে। কিন্তু সে বিপদ কি ক্ষমতা দখলের পরেও নেই? ক্ষমতা দখলের পরেও বিপদ থাকবে—অনেক বেশি পরিমাণে, অনেক জটিল আর তীব্র আকারে থাকবে। সেই বিপদ অতিক্রম করার জন্যই তো সাংস্কৃতিক বিপ্লব। আমরা যেভাবে গণ-সংগ্রাম থেকে দূরে সরে গিয়ে বিপদ এড়াতে চাইছি সেভাবে বিপদ এড়ানো যায় কি?—যায় না।

দুই

বিপ্লবের কাজ কোথা থেকে শুরু করতে হবে? এটা একটা জরুরী প্রশ্ন।

সি পি আই (এম-এল) আর "দক্ষিণ দেশ" (এম সি সি) নেতৃবৃন্দের মত অনুসারে, গ্রামাঞ্চলে সাম-রিক ঘাঁটি আর গোরলা দল গড়ার কাজ থেকেই শুরু করতে হবে। কয়েক মাস আগে "দক্ষিণ দেশ" পত্রিকার এই বলে আক্ষেপ করা হয়েছিল যে, আমরা নকশাবাদীদের মতো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রাম শুরু করে দিতে পারি নি কেন? প্রবন্ধকার নিজেই উত্তর দিয়েছি-লেন, গ্রামে সামরিক ঘাঁটি আর গোরলা দল তৈরি করাকে "প্রাথমিক, প্রধান আর কেন্দ্রীয়" কর্তব্য বলে গ্রহণ করা হয় নি, এই কারণে।

এই কমরেডদের যুক্তি হচ্ছে, গ্রামে শহুপক্ষ দুর্বল।

লেখকের বক্তব্য, এই যুক্তিটি যোগে টেকে না। এই যুক্তি প্রাক-বিপ্লব চীনে সত্য ছিল, ভিয়েতনাম

ইত্যাদি আরও কিছু কিছু, ঔপনিবেশিক দেশেও হয়তো সত্য—কিন্তু ভারতবর্ষে নয়। চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে গ্রাম ছিল শহর থেকে বিচ্ছিন্ন, গ্রাম ওখানে শহরকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক বাজারের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কোন কেন্দ্রীভূত শাসনের অধীনে আসে নি।

লেখকের বক্তব্য, ভারতবর্ষে শহুপক্ষ গ্রামেও সবল, অ-গ্রামেও সবল—যদি প্রকৃত কামিউনিষ্ট নেতৃত্ব না থাকে; আবার, শহুপক্ষ গ্রামেও দুর্বল, অ-গ্রামেও দুর্বল—যদি প্রকৃত কামিউনিষ্ট নেতৃত্ব সক্রিয় থাকে। ভারতবর্ষকে গ্রাম অ-গ্রাম হিসাবে ভাগ করা বাস্তব থেকে বিচ্যুতি। কারণ, ধনতন্ত্রের বিকাশ আর তার ফল হিসাবে যোগাযোগ-ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তার গ্রাম অ-গ্রাম মিলিয়ে দেশের বৃহত্তম জন-বসতিতে একটি কেন্দ্রীভূত বাজারে পরিণত করেছে, একই আর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে। সেই কারণে, এদেশে গ্রাম আর অ-গ্রামের মধ্যে রাজনৈতিক আর সামরিক ভেদ কল্পনা করা হবে চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতার হুকে-ফেলা যান্ত্রিক প্রয়োগ।

রশকোশল নির্ধারণে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যেটি অপরিহার্য, প্রাথমিক, মৌলিক শর্ত—নির্দিষ্ট অবাস্তব বাস্তব বিশ্লেষণ—সেই শর্তটিই এই কমরেডরা উপেক্ষা করছেন। শূন্য তত্ত্ব নয়, গত দুই আড়াই বছরের অভিজ্ঞতাও (তরাই শ্রীকাকুলাম, মশাহারি ইত্যাদি) চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই কমরেডরা শহুপক্ষকে গ্রামাঞ্চলে যুঁহুটা দুর্বল ভেবে এসে-ছেন তারা কিন্তু সেখানে সত্যি-সত্যি ততটা দুর্বল মোটেই নয়। সামরিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে বিচ্ছিন্ন কৃষকবিদ্রোহকে পিষে মারার ক্ষমতা তো তাদের আছেই, উপ-রন্তু "ম্যান্ডার" করার ক্ষমতাও এখনও তাদের বাকি আছে।

"দক্ষিণ দেশ" নেতৃত্ব বলেন, আজকের পৃথিবীতে সমাজবিপ্লবের মাত্র দুটি পথ আছে—অষ্ট্রের বিপ্লবের পথ, চীন বিপ্লবের পথ। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। (বেমন প্রথম গৃহযুদ্ধের পর্বের প্রথম দিকে চীনের পার্টিতেও অতিবাসম্পন্নী কমরেডরা বলতেন—বিপ্লবের একটিই মাত্র পথ আছে, অষ্ট্রের বিপ্লবের পথ।

এই সিদ্ধান্তটিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী, মাও-সেতুও চিন্তাধারার বিরোধী, ১২৭ বছরের কামিউনিষ্ট আন্দোলনের সাম-গ্রিক অভিজ্ঞতারও বিরোধী।

লেনিন বলেছেন, "প্রমিক-প্রণয়ী, আন্তর্জাতিক বৈশ্বিক সংগ্রাম বিভিন্ন দেশে সমভাবে এবং একই রূপে বিকশিত হয় না, হতে পারে না। প্রত্যেক দেশই

[সংগ্রামের] অস্তিত্ব ধারায় তার নিজস্ব মূল্যবান এবং বিশিষ্ট চরিত্র উপহার দেয়।" (১৫ খণ্ড পৃ ১৮৭) "বাসম্পন্নী" কামিউনিজম বইতে লেনিন বলেছেন, "প্রত্যেক দেশের প্রমিক আন্দোলন তার নিজস্ব ধারায় বিকশিত হয়।" "সকল দেশের প্রমিক আন্দোলন এই দাবি করে না যে, বৈচিত্র্যের অবসান ঘটুক অথবা জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে চোপে দেওয়া হোক।"

"দক্ষিণ দেশ" নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, লেনিনের "বাসম্পন্নী" কামিউনিজম বইটির "কয়েকটি সিদ্ধান্ত" শীর্ষক অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদটি বার-বার পড়ুন; উপলব্ধি করুন লেনিনের এই বাক্যটির তাৎপর্ষ্য: "যেটি বিশেষভাবে জাতীয় সেইটিকে পরীক্ষা করুন, অধ্যয়ন করুন, অনুসন্ধান করুন, আবিষ্কার করুন, আয়ত্ত করুন।" চীনের পার্টিতে অতিবাসম্পন্নী কমরেডদের সঙ্গে মাও যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে-ছিলেন, তার ফলশ্রুতি কী ছিল? চীন বিপ্লবের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংযোজন। জাপানের কামিউনিষ্ট নেতৃত্বকে মাও কী পরামর্শ দিয়ে-ছিলেন? তিনি বলেছিলেন, জাপানী কমরেডরা যদি জাপানী বিপ্লবের বাস্তব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংযোজন ঘটাতে পারেন, তাহলে জাপানে বিপ্লব অরণ্যেই সফল হবে। চীনের পার্টির চৌদ্দই জনের চিঠির ২৪শ অংশ পড়ে দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে, যে পার্টি নিজের দেশের বিপ্লবের বাস্তব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মার্কসবাদ লেনিন-বাদকে যুক্ত করতে পারে তাকেই কামিউনিষ্ট পার্টি বলা যায়।

এইসব সিদ্ধান্তের তাৎপর্ষ্য বহাধাধর্যে উপলব্ধি করলে "দক্ষিণ দেশ" নেতৃত্ব অবশ্যই বুঝতে পার-বেন, তাঁদের বিচারধারা আত্মগত চিন্তাপন্থতির দ্বারা প্রভাবিত; আধুনিক পৃথিবীতে সমাজবিপ্লবের মাত্র দুটি পথ নেই, ইতি-হাসের গতিপথে বহু পথ বেরোবে; বিভিন্ন দেশ তার "জাতীয়" এবং জাতীয় রাষ্ট্রিক পার্থক্যের দরুন" (এই শব্দবাহার লেনিনের— "বাসম্পন্নী" কামিউনিজম-এই বিভিন্ন পথ ধরে এগোবে। এইটাই যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত। পৃথিবীর তাৎপর্ষ্য ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবের কর্মকৌশল ছাড়ে ঢালা একরকম হতে পারে না। হতে পারে—এ কথা মার্কস থেকে মাও কেউই আভাসে ইঙ্গিতও বলেন নি।

প্রাকবিপ্লব চীন আর আজকের ভারতের মানচিত্র শুধু রেলপথ আর মোটরপথের বিকাশের তুলনা করলে আমাদের অনেক ভুল ধার-নার নিরসন হবে। প্রাকবিপ্লব চীনে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ষোল হাজার মাইল; পূর্ব উপ-কূলের শিল্প-শহরগুলিকে এই রেলপথ সংযুক্ত করে রেখেছিল।

ভারতে, সাতচল্লিশের আগে, রেল-পথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল আড়াই লক্ষ মাইল, এখন তা সাড়ে তিন লক্ষ মাইল। সপো সপো এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে ভারতের রেলপথ সারা দেশ জুড়ে ছড়ানো; গোটা ভারতকে জালের মতো ছেকে রেখেছে।

আধা-ঔপনিবেশিক ভারত অন্য সমস্ত আধা-ঔপনিবেশ থেকে বিশিষ্ট। ভারতের সমাজ-জীবনে বতগুদাল "বিশেষভাবে জাতীয়" উপাদান আছে, তাদের মধ্যে সব-চেয়ে গুরুত্ববহ হল এদেশে সাম্রাজ্য-বাদী আর ভারতীয় শিল্প-মূল-ধনের বিকাশ (যে পরিমাণে বিকাশ চীনে ছিল না, অন্য কোনো ঔপনিবেশেই ছিল না।) সেই কারণে স্তালিন ঔপনিবেশিক বিপ্লবের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে ভারতকে পৃথক এক কোঠায় ফেলিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্তালিনের দুটি বক্তৃতা থেকে কমরেডরা বিশেষভাবে লাভবান হবেন। দুটি বক্তৃতাই স্তালিনের রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে পাওয়া যাবে। (এক) ঔপনিবেশিক আর পরাদীন দেশ-সমূহের কামিউনিষ্ট উপাদানগুলির আশু কর্তব্য (পৃ ১০৭-১১০)। (দুই) প্রাচ্যদেশের প্রমজীবী বিপ্লব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা (পৃ ১৪৬-১৫৬)।

সাম্রাজ্যবাদী আর ভারতীয় শিল্প-মূলধনের বিকাশ—এই ঘট-নার তাৎপর্ষ্য কী? তাৎপর্ষ্য এই যে, ভারতে পশ্চাৎপাদন শিল্পে এবং পরিবহন শিল্পে নিযুক্ত একটি সংখ্যাবহুল শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হয়েছে। এই ঘটনাই আবার, বিকশিত পরিবহনব্যবস্থার দরুন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শ্রেণীকে (শ্রমিকশ্রেণীকে) গ্রামজীবনের সঙ্গে তথা কৃষকসমাজের দরিদ্রতম অংশের সঙ্গে নিত্যনিয়মিত সম্পর্কে বিজড়িত করেছে।

ধনতন্ত্রের বিস্তার—অত্যন্ত সীমা-বদ্ধ হলেও এইটিই আধুনিক ভার-তীয় সমাজের নতুন, প্রগতিশীল, সবচেয়ে গুরুত্ববহ উপাদান। ভার-তীয় বিপ্লবের নির্ধারক গণশক্তি এই উপাদানটি থেকে জন্মগ্রহণ করেছে (ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন বৈশ্বিক সক্রিয়তাই ভার-তীয় বিপ্লবের নির্ধারক গণশক্তি, কারণ শ্রমিকশ্রেণীই দরিদ্র কৃষক-সমাজকে বৈশ্বিক সংগ্রামে সংগ-ঠিত করতে পারেন—অন্য কোনো শক্তি তা পারে না।) মার্কস-এঙ্গে-লস "কামিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোতে" বলেছেন—"শিল্প নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীই সবচেয়ে বিপ্লবী...। ধন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা ক্ষুদ্র সেই সমস্ত শক্তিকে নিজের পাশে সম-বেত করে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্র-মণে নেতৃত্ব একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই দিতে পারে।"

আসুন, আমরা সকলে মিলে এই উপাদানটির বাস্তব, ঐতি-হাসিক ফলাফলকে গভীরভাবে, নিবিড়ভাবে, সর্বতোভাবে—আর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক—এই তিন দিক দিয়েই—পরীক্ষা করি, অধ্যয়ন করি, অনুসন্ধান করি,

আবিষ্কার করি, আয়ত্ত করি—লেনিন বা বার-বার করতে উপদেশ দিয়েছেন। এই গভীর, নিবিড় আর সর্বতোমুখী পরীক্ষা অধ্যয়ন অনু-সন্ধান আবিষ্কার আয়ত্ত করার মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারব—চীনের মতো, ভিয়েতনামের মতো ছোট ছোট গ্রাম-এলাকা নিয়ে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার আবির্ভাব এদেশে অসম্ভব হতে পারে কিনা।

তিন

আমরা নিজেদের প্রকৃত কামিউ-নিষ্ট বলে দাবী করি। কিন্তু এ কথা তো মানতেই হবে যে, এ-দেশের রাজনৈতিক জীবনে আমরা নির্ধারক নেতৃত্ব হিসাবে আজও সংগঠিত হতে পারি নি। কেন এই ব্যর্থতা?

ব্যর্থতার কারণ, অধিকাংশ কমরেডই নিজেদের (অগ্রাণীদের) মানসিক প্রস্তুতিকেই এবং নিজে-দের বৈশ্বিক ক্রিয়াকর্মকেই সর্বস্ব করে দেখছেন—জনসাধারণের অধি-কায়ের (এমনকি তাঁদের অগ্রাণী-দেরও) মানসিক প্রস্তুতির প্রয়ো-জনকে কার্ভ অস্বীকার করছেন। সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিবিশ্ববী শিবি-রের দুর্বলতাকেও তাঁরা আত্মগত-ভাবে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখছেন। এ কথা সত্য যে, নিজেদের তৈরি সংকটের চোপে (সংকটের সমাধান করতে না পেরে) প্রতিবিশ্ববী পক্ষ ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে, তাদের একটা ফাটল দেখা দিচ্ছে দিনের পর দিন। কিন্তু, আর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর সামরিক—এই তিন দিক থেকেই তারা এখনও এত দুর্বল হয়ে পড়ে নি (লেনিনের কথায়, তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন দা-কুমড়ো সম্পর্কে দেখা দেয় নি) যে, পাঁচ-সাতটা নকশাবাদী ধরনের তথাকথিত "ক্ষমতা দখলের সংগ্রামকে" তারা ঘেরাও করে পিঁবে মারতে পারে না। অবশ্যই পারে। "ম্যান্ডার" করার ক্ষমতা তাদের এখনও ফুরোর নি।

তা ফুরোতে পারে, তাদের সংকট আর অন্তঃকরোধকে আরও তীব্র করে তোলা যায়, যদি আমরা জনসাধারণের উপর নির্ভর করে, জনসাধারণের বৈশ্বিক সক্রিয়তা জাগিয়ে তুলে সঠিক পথে চলাতে পারি।

সেই সঠিক পথটি কী?

প্রথমত, ব্যক্তিগত কর্মকৌশ-লকে শ্বিষাহানভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকশ্রেণীর দিকে চোখ ফেরাতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রাণীদের সংগঠিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, গণসংগ্রামগুলির মধ্যে মিলে যেতে হবে। কন্ট্রোলপতন্ত্রকে "ক্ষমতা-দখলের সংগ্রাম তোলাবার" চেষ্টা না করে বাস্তব জীবন থেকে যে সংগ্রাম-গুলি উঠছে সেগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করে সেগুলিকে বৈশ্বিক চেতনার উদ্দীপিত করে তুলতে হবে।

বারান্তরে এই তিনটি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা আছে।

সি পি আই (এম)

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

আই এম এই মৌলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে এই দল বর্তমানে বৃহৎ একচেটিয়া পুঞ্জীয় মালিক ও সামন্তবাদী শাসকশ্রেণীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। তারা নিজেরাই পাটনা কংগ্রেসে শাসকশ্রেণীর চরিত্রের যে মূল্যায়ন করেছিলেন তাকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করে কংগ্রেস দলের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক ও পশ্চিমবঙ্গে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বুদ্ধজয় সরকারগুলি ভেঙ্গে দেবার যুদ্ধক্ষেত্রে তারা প্রধান অংশীদার, কৃষক ও শ্রমিক মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠা সংগ্রামে তারা ধর্মঘট ভাঙ্গা, পেছনে ছুরি মারার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সংসদীয় নির্বাচন ও সংসদ-বাহিত প্রতিক্রিয়া কৃষক আন্দোলনেও তারা একই বুদ্ধিজীৱী শ্রেণীর প্রসাদভোজী পদলেহী দলের ভূমিকা পালন করেছেন। শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্র পর্যায়ে তাদের সোশালিস্ট বিপ্লবী ব্যক্তির রাজনীতির মূলোৎপাটন পড়েছে। খোলাখুলি সি পি আই-এর শাসকশ্রেণীর সেবাদাসের পরিণত হয়েছে তারা।

আর এস পি, এস ইউ সি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি পেতি-বুদ্ধিজীৱী দলগুলি নীতিগত ভাবে সি পি আই-এর শাসকশ্রেণীর সেবাদাসের ভূমিকাকেই তাদের পথ নির্দেশক বলে গ্রহণ করেছে। সোশালিস্ট বিপ্লববাদ কাকে বলে তার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, “সুবিধাবাদ হচ্ছে ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের মৌলিক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর অতি নগণ্য অংশের সাময়িক স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করা, অন্য কথায় ব্যাপক সর্বস্বার্থ শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীৱী শ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রমিক অভিজাত অংশের মৈত্রীস্থাপন।” সি পি আই পরিচালিত এই ছোট ছোট পেতিবুদ্ধিজীৱী আধামেনশেভিক দলগুলি মার্কসবাদকে মনগড়াভাবে ব্যাখ্যা করে পেতি-বুদ্ধিজীৱী বাগাড়ম্বর করে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত শাসকশ্রেণীর সেবাদাস হয়ে পড়ে। এবং বুদ্ধিজীৱীরা জানে যে “শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সক্রিয় সুবিধাবাদীরা বুদ্ধিজীৱীদের নিজেদের চাইতেও দক্ষতার সঙ্গে বুদ্ধিজীৱী শ্রেণীকে রক্ষা করতে সক্ষম” (লেনিন : আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মৌলিক কর্তব্য)।

আজ ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের চেয়েও সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি, আর এস পি প্রভৃতি দল অধিকতর “দক্ষতার সঙ্গে” এগিয়ে এসেছে।

আবার রূপকোশলকে রূপনীরত ওপরে একপেশে ভাবে স্থান দিয়ে, তাকে বিপরীত ভাবে মূখ্য করে ফলে হঠকারী অতিবাস্তব বোঁক

মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং-এর বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃত দিয়ে, অপ্রধানকে, প্রধান, গৌণকে মূখ্য বলে মনে করে বিপ্লব বিরোধী পথ গ্রহণ করে। দলত্যাগী কাউন্সিল থেকে ট্রাস্টিক পর্যন্ত সমস্ত প্রতিবিপ্লবীদের ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে।

চীনের বিশেষ অবস্থায় মার্কস-বাদ লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্য বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রামের মূলনীতিকে সার্বকভাবে প্রয়োগ করে মহান মাও সে তুং চীন বিপ্লবের সার্থক পরিণতি, তার সাফল্য অর্জন করেছিলেন। মাও সেতুং বলেছিলেন, “আমাদের উপরোক্ত মতগুলি চীনের বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক অবস্থার তারতম্য আছে। সুতরাং আমরা কখনও একথা বলি না, যে অন্যান্য দেশ ও পার্টিতে চীনের পন্থা অনুসরণ করতে হবে বা তা তাদের করা সংগত। (মাও সে তুং : জনগণের মধ্যকার দৃষ্টি প্রসঙ্গে, নির্বাচিত রচনাবলী ৭১৭ পৃঃ)

চীনের ঐতিহাসিক অবস্থায় গুলি কি ছিল? এক, চীনে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। জাপান তার সমগ্র ভূভাগের এক তৃতীয়াংশ দখল করে নিয়েছিল। উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাংশে কুওমিন্টাং দলভুক্ত প্রায় স্বাধীন সেনাপতিদের স্বৈরাচারী এলাকা; কুওমিন্টাং শাসিত এলাকা, জাপান অধিকৃত এলাকা এবং মন্তাঞ্চল এই কয়টি এলাকায় চীন বিভক্ত ছিল। মন্তাঞ্চল বহিষ্কৃত এলাকাগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিজ্ঞাশীল কুওমিন্টাং-এর অত্যাচারী শাসন। এই কঠিন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাও সে তুং-কে চেন তু সিউ-এর সংশোধনবাদী আত্মসমর্পণ এবং ওয়াং মিং-এর অতিবাস্তব ব্যক্তি “জাপান ও কুওমিন্টাং-এর সঙ্গে একসঙ্গে লড়াই করার দাবীর বিরুদ্ধে “বুদ্ধপন্থ ঐক্য ও সংগ্রামের” আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রস্নে, মজুতবাহিনীর প্রস্নে, কৃষিবিপ্লবের প্রস্নে মাও সে তুং একচুল আত্মসমর্পণ করতেও রাজী হন নি। সঙ্গে সঙ্গে, তিনি জাপান-বিরোধী যুদ্ধে কুওমিন্টাং-এর সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাতেও ইতস্ততঃ করেন নি। উনিশশ সোঁত্রিশ সালে “সিরান” ঘটনার চিরাকাইশেক কমিউনিস্টদের হাতে বন্দী হওয়ার পরও মাও সে তুং চিরাকাইশেককে “খতম” করার ফতোয়া দেন নি, তাঁর সঙ্গে আপোষ আলোচনা করে জাপান-বিরোধী ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। জাপানের আত্মসমর্পণের পর মাও সে

তুং উনিশশ পঁয়তাল্লিশ সালের তেরোই সেপ্টেম্বর চুংকিং-এ চিরাকাইশেক-এর সঙ্গে জাতীয় পার্লামেন্টে (পরিষদ) এক বছরের মধ্যে নির্বাচন ধার্য করার প্রস্তাব করেন। চিরাকাইশেক রাজী হয়েছিলেন এবং সমাগত মার্কিন, ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকদের কাছে মাও সে তুং স্বয়ং এই নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু চিরাকাইশেক শেষ পর্যন্ত মার্কিন ইচ্ছাতে নির্বাচন করতে অস্বীকার করেন এবং কমিউনিস্টদের ওপর বিরূত জাপ, মার্কিন ও কুওমিন্টাং বাহিনী—পূরো একশো সাতশ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালান। স্বভাবতই এ অবস্থার চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র গৃহযুদ্ধের মারফত চীন-বিপ্লবের প্রথমস্তর সফলভাবে অতিক্রম করেন।

কিন্তু এর আগে মাও সে তুং বলেছিলেন, “আমরা কমিউনিস্টরা কুওমিন্টাং-এর একদলীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে দৃষ্টি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করি। প্রথম, বর্তমান স্তরে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও নির্দলীয় ব্যক্তিদের সাধারণ সম্মতি নিয়ে একটি অস্থায়ী কোরালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়, পরবর্তীকালে অস্থায়ী, স্বাধীন নির্বাচনের ভিত্তিতে একটি জাতীয় পরিষদ আহ্বান এবং একটি নিরমিত (রেগুলার) কোরালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা। দৃষ্টি ক্ষেত্রেই কোরালিশন সরকার গঠন করতে হবে। যে সব রাজনৈতিক দল বা শ্রেণীর প্রতিনিধি আককের দিনে জাপান-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে নিম্নতম কর্মসূচীতে আত্মসমর্পণ ও ঐক্যবন্ধ এবং আগামী দিনে যে সব রাজনৈতিক দল ও শ্রেণীর প্রতিনিধি জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে ঐক্যবন্ধ ভাবে আত্মনিয়োগ করতে আগ্রহী তাদের সবাইকে নিয়েই এই কোরালিশন সরকার গঠিত হবে।” (উনিশশ পঁয়তাল্লিশ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে মাও সে তুং-এর রাজনৈতিক রিপোর্ট—“কোরালিশন সরকার সম্পর্কে”—নির্বাচিত রচনাবলী পৃঃ ২৭২)

তিনি আরো বলেছিলেন, “নয়া-পনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রমিক ও পুঞ্জীমালিকের স্বার্থের মধ্যে একটি বোঝাপড়ার নীতি গ্রহণ করা হবে। একদিকে এর ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে, সামাজিক বীমা চালু করা হবে এবং ফ্রেড ইউনিয়নের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হবে; অন্যদিকে সুপরিচালিত রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও সমবার প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যায় মুনাকা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া হবে, যাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং সরকারী উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মধ্যেই শ্রমশিল্পের উৎপাদন বিকাশের জন্যে সহযোগিতা সম্ভবপর হয়।” (এ পৃঃ ২৮০)

মাও সে তুং এই রিপোর্টে

বলেছিলেন, “যে মূহুর্তে চীনে এরকম একটা নয়া-পনতান্ত্রিক কোরালিশন সরকার গঠিত হবে, চীনের মূহুর্ত অঞ্চল তাদের সেনাবাহিনীকে এই সরকারের হাতে সমর্পণ করবে।” (এ পৃঃ ২৭৬)

“সংসদীয় নির্বাচন না সশস্ত্র বিপ্লব” এ ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা রূপনীরত ওপরে নির্ভরশীল নয়। বিপ্লবের জোরের ভাটার ওপর, বিপ্লবী পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। বিপ্লবী পরিস্থিতি কি? লেনিন বিপ্লবী পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছেন, “সমস্ত বিপ্লব, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর তিনটে রক্ত-বিপ্লব বিপ্লবের যে মৌলিক নিয়মকে সমর্থন করেছে তা হল এই : বিপ্লবের পক্ষে এটাই শত্রু বধেছে নয় যে শোষিত, নির্বাচিত জনসাধারণ পূরনো অবস্থার জীবন-যাপন করা অসম্ভব বুদ্ধিতে পেরে পরিবর্তন দাবী করেছে; বিপ্লব সফল হতে হলে এটা অবশ্য প্রয়োজন যে শোষকশ্রেণী আর আগেকার মত বাঁচতে পায় না, পূরনো কায়দায় শোষণ চালাতে পারবে না। নিম্নশ্রেণীগুলি যখন পূরনো আমলকে আর চায় না এবং উচ্চ শ্রেণীগুলি যখন পূরনো কায়দায় আর চলতে পারে না একমাত্র তখনই বিপ্লব জরাজীর্ণ করে। সত্যটা অন্যভাবেও প্রকাশ করা চলে : শোষক আর শোষিত উভয়কেই আঘাত করে সারা দেশব্যাপী এমন সংকট ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় অবস্থার গুলি হচ্ছে : প্রথমতঃ শ্রমিককে (অন্ততঃ পক্ষে অধিকাংশ শ্রেণীসচেতন, চিন্তাশীল, রাজনীতিতে সক্রিয় শ্রমিককে) সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিতে হবে যে বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে এবং এজন্য তাদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকতে হবে; দ্বিতীয়তঃ শাসকশ্রেণী সরকার সংক্রান্ত সংকটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ফলে জনসাধারণের অতি পশ্চাদপদ অংশও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে—গভর্মেন্টে দূর্বল হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে শত্রু তাড়াতাড়ি এই গভর্মেন্টকে উচ্ছেদ করা বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছে।” (“লেনিনবাদের ভিত্তি” নিবন্ধে স্তালিন কর্তৃক উদ্ধৃত লেনিনের উক্তি বামপন্থী কমিউনিজম—খোকামি রোগ, নির্বাচিত রচনাবলী ১০ম বন্ধ ১২৭ পৃঃ)

আমাদের দেশের দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কতিপয় ছন্দ বাম পার্টি খোলাখুলিভাবে শাসকশ্রেণীর এই সংকটে সাহায্য করতে অগ্রসর এবং চিরকালই যেমন হয়ে থাকে তেমনি অতিবাস্তব বিপ্লবীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নাম ধরে বিপরীত মেরু থেকে একই কর্মসাধনে তৎপর হয়েছেন। বামপন্থী অথবা দক্ষিণপন্থী উভয়বিধ বিচ্ছিন্নতাই জনসাধারণের বিপ্লবী মতাদর্শের শত্রু। মাও সে তুং-এর চিন্তাধারার

নামে চেগুয়েভারার, ওপার থেকে চাপানো কৃষিবিপ্লব, অথবা রেনেস ডেকের বিপ্লবের ভিত্তরে বিপ্লব—এ দেশের জনগণকে বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট তো করেছে না বরং ঘোর বিরোধী করে তুলে। আর বিপ্লবী পরিস্থিতি যখন আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে তখন মাও সেতুং এর কথায়, “বিপ্লবের একটা ব্যাধি অতিবাস্তব বিপ্লবীরা” বিপ্লবকে অন্ধুরে বিনষ্ট করে প্রতিবিপ্লবের পথ সূচন করে। আমাদের দেশের অতিবাস্তব সশস্ত্র বিপ্লবের প্রবর্তার জনগণের মধ্যকার দৃষ্টিকে বৈরিতামূলক স্বল্পে পর্ব-বিস্তার করেছেন, শত্রুকে বন্ধু বলে মনে করেছেন এবং ফ্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা, ছাত্র, নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারী বন্ধুদের শত্রু বলে আঘাত করে চলেছেন। অন্যদিকে তাঁর যে শ্রেণী-শাসনকে আঘাত করেন বলে বড়াই করেন তাদের অফিস আদালত হাইকোর্ট, তাদের ছেলেমেয়েদের ইংরাজী মিডিয়াম বিদ্যালয়গুলি সব ঠিকই চলছে, উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারেরা, আই এ এস আমলা, বড় বড় পুঞ্জীপতিরা বহালতাবিরতে রয়েছেন। একটু খেমে দাঁড়ালেই, মৃদুতম আত্মসমালোচনা করলেই তারা দেশতে পাবেন তাদের কঠোর আর শাসকশ্রেণীর ও তার দালাল পার্টিগুলির কঠোর একই, কোন তফাত নেই। মাও সে তুং বলেছেন “কারা আমাদের শত্রু, কারা আমাদের বন্ধু এটাই হলো বিপ্লবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন” (উদ্ধৃতি চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ)। চেয়ারম্যান মাও সেতুং এর নির্দেশিত এই প্রথম প্রয়োজনটিকে অবহেলা করে এই অতিবিপ্লবীরা বিপ্লব বিরোধী কোরাসে গলা মিলিয়েই শত্রু ক্রান্ত হন নি, কমিউনিস্ট রক্তপাতে প্রথম স্থান অধিকার করে শাসকশ্রেণীর হাতিয়ার এবং জনগণের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন।

এই দুই বিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ বা সংশোধনবাদ এবং অতিবাস্তব ট্রাস্টবাদ দুটোই একবৃত্তে দৃষ্টি ফুল। একই শোষণ শ্রেণী বিপ্লবের বন্ধু নয়।

সি পি আই এম ১৯৬৪ সাল থেকে সংশোধনবাদ সুবিধাবাদের সঙ্গে সংগ্রাম ত্যাগ করে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে আবির্ভাব দূর করেছে, তার জন্যেই ব্যাপক জনসাধারণ তাদের পেছনে এসে দাঁড়ান। কিন্তু সংশোধনবাদ বিরোধী মতাদর্শগত সংগ্রামে একপেশে বোঁকের ফলে সি পি আই এম-এর মধ্যেই অতিবাস্তব বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়। এর প্রধান কারণ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিবিজ্ঞিত অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং পার্টির মধ্যে মধ্যশ্রেণীগুলির প্রাবল্য। যতদিন পার্টির নেতৃত্বে এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে অর্থনৈতিকবাদ ও আমলতান্ত্রিক ঝোঁক থাকবে, ততদিনই সি পি আই এম-এর দৃষ্টিগণের বিচ্ছিন্নতা বারে বারে ঘটতে বাধ্য।

কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা (শোষণ বোঁক পৃষ্ঠার)

নকশালবাড়ীর বিপ্লবী তাৎপৰ্য

(কণ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীম পুঞ্জিবাদ সামন্তবাদও সংকটের অধীনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

এমন অবস্থায় কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার বা কৃষককে উৎপাদনের ন্যায় অংশ দেওয়ার আন্দোলনের স্তর অতিক্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় শাসকশ্রেণীই এগিয়ে এসে কৃষকের ফসলের ভাগ পঁচাত্তর শতাংশ করে দিতে চায় (তেভাগা আন্দোলনের দাবীর চেয়েও বেশী) বেনামী জমি বিলি করতে এগিয়ে আসে এবং জমির মালিকানার পরিমাণ কমিয়ে পঁচাত্তর বিঘের স্থলে পঁচাত্তরশ বিঘে করে দিতে আগ্রহী হয়। অর্থাৎ তারা এদেশে সাম্রাজ্যবাদী পরোক্ষ শাসন বজায় রাখার জন্যে কিছু কিছু গ্রামীণ শোষণের হেরফের করতে গররাজী নয়। তাদের এই সংস্কার প্রচেষ্টা আসলে তাদের গোটা সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা মাত্র।

সুতরাং একদিকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন বিপ্লবী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল আঘাত চলেছে, তখন ঐ বিপ্লব-বিপ্লবী আন্দোলনের অংশ হিসাবে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকেও সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানতে হবে। কৃষিবিপ্লব ভূমিসংস্কার নয়। কৃষি বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক শ্রেণীর সাম্যক্ষমতা দখলের লড়াই। একমাত্র এই লড়াইয়ে জরী হয়েই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের শতকরা সমস্তজন কৃষক ও বহুতর শোষিত মান্দুৰ নয়া-গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের কারণে করতে পারে, শোষণের অবসান ঘটতে পারে। কাজে কাজেই সাম্যক্ষমতা দখলের জন্যেই এই কৃষক সংগ্রামকে সংগঠিত করতে হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলেই নকশালবাড়ী আন্দোলনের উদ্যোগেরা স্থানীয় ভাবে সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদের বা চ্যালেঞ্জ জানালেন তা অবিলম্বে ভারতের আনাচে কানাচে বিপ্লবী জনগণকে অনুপ্রাণিত করল। একথা মনে করা

ঠিক নয় যে বাস্তব অবস্থার উপলব্ধিই যথেষ্ট। এই উপলব্ধিকে কৃষকদের, ভূমিদাসদের সংগঠিত লড়াই-এর রূপ দিতে হবে। একদিনেই সাম্যক্ষমতা দখল ও বিপ্লব সম্পূর্ণ হবে না। এই সংগ্রাম চলবে দীর্ঘদিন ধরে, অনেক সময়ের ব্যাপ্তি পেরিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষকেরা প্রথমে স্থানীয় সরকারী বন্দ ও স্থানীয় শোষক, জোতদার, মহাজনদের নিশ্চিহ্ন করবে। দখলীকৃত ভূমি গ্রামীণ কৃষক কমিটির নির্দেশে পুনর্বণ্টন হবে। কৃষকদের গণবাহিনী এই সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রধান অস্ত্র। শত্রু অধিকৃত এলাকায় এবং যে এলাকায় শত্রুকে উৎসাদিত করে শ্রমিক কৃষকের কার্যতঃ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে কৃষক বাহিনীর সংগঠন অবস্থানদ্বারা নানা ধরনের হতে পারে।

চেন্নায়রম্যান মাও সে তুং লিখিয়েছেন সেই অপ্রান্ত পথ অবলম্বন করে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়। “শত্রু যখন প্রবল আক্রমণ করে আমরা তখন পশ্চাদপসরণ করি। শত্রু যখন বিশ্রাম করে আমরা তখন তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলি, শত্রু যখন পিছু হঠতে থাকে আমরা তখন তার পশ্চাদাবান করি।” কৃষক-বাহিনীর সামরিক নীতির মোদ্দা কথা হল এই। শত্রুকে সমগ্রভাবে দেখলে প্রবল মনে হয়। তার আর্থিক শক্তি, প্রশাসনের শক্তি ও সামরিক শক্তিকে অপরাধের মনে হয়। কিন্তু অতিবলশালী মান্দু-বেরও দুর্বল স্থান আছে। প্রথমে একটা আঙ্গুল কেটে নেওয়া, তারপরে আরেকটা, তারপর তার পা, হাত, চোখ, কান, নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঙ্গুল আঙ্গুল করে আঘাত করলে অমিতবলশালী লোকও কাবু হয়ে পড়ে। তাই মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ-পুঞ্জিবাদ তাদের অমিত-বিক্রম সাম্রাজ্যবাদের সবই “কাগজের বাঘ”। দেখতে ভীষণ, কিন্তু একটা দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি তার অবসান ঘটতে সক্ষম।

এর অর্থ এই নয় যে শত্রুর শক্তি সম্পর্কে, ওয়াকিবখাল না হলেও চলবে। চেন্নায়রম্যান মাওয়ের উক্তি এতদূরলক্ষে বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার, “রপনীতির হিসাবে (অর্থাৎ চূড়ান্ত জয়-পরাজয়ের নিরিখে) শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে, রণকৌশলের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ প্রতিটি পৃথক পৃথক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে) তার শক্তির পূর্ণ উপলব্ধি নিলে এগোবে”।

শত্রুর আক্রমণের উত্তরে অভাবিত স্থানে শত্রু ঘাঁটিকে আক্রমণ, বিশাল সেনাবাহিনীর আক্রমণের মধ্যে জনগণের মধ্যে মিশে থাকা গেরিলা সংগঠন এবং প্রতি-আক্রমণে অনুকূল অবস্থার গেরিলাদের গণমুক্তি কৌশল রূপান্তর, এই হল এই কৃষিবিপ্লবের মূল কথা।

নকশালবাড়ীর আন্দোলন শত্রুমুখ কৃষি সংস্কারের আন্দোলন নয় বলেই এরকম সার্বজনীন বিপ্লবী উৎসাহ সৃষ্টি করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এই আন্দোলন যদি হঠকারী হয় তাহলে তো যে কোন বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টাকে, বিপ্লবী বাজ় রোপণের প্রাথমিক প্রচেষ্টাকেই হঠকারী বলা যায়। কারণ এই বাজ়কে অংকুরে রূপান্তরিত করার আগে নানা পোকা-মাকড় শস্যভুক পল্লপাল ও আবহাওয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। বাজ় এদের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে যারা বাজ়-বপনেরই বিরোধিতা করেন, তাদের কি বিপ্লবী বলা যায়?

বিপ্লব কালই হয়ে বাবে, একথা নকশালবাড়ীর বিপ্লবীরা বিশ্বাস করেন না। কারণ ঐ

বিশ্বাস অর্থাৎ হাতে হাতে বিপ্লবের সাফল্য লাভের কল্পনাই হঠকারী পথ। আবার সংশোধনবাদীদের শাস্তিপূর্ণ উপায়ে! সমাজ-বিপ্লবের কথাও তারা প্রতারণিত হন না কারণ বুর্জোয়া সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কৃষিবিপ্লবের বাজ় বর্ষিত হয় না, মৃত্তির বাজ় অংকুর মেলে না। সংশোধনবাদ বিপ্লবের অংকুরকে পিষে মারার চেষ্টা করে।

এ কাজে সংশোধনবাদের প্রধান হাতিয়ার সংস্কারবাদী, অর্থনীতি-বাদের অস্ত্র। সাম্যক্ষমতা দখলের লড়াই-এর বিকল্প হিসাবে জমি দখলের, শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি ও বোনাসের লড়াইকে তুলে ধরা। এর ফলে শাসকশ্রেণীর বাঁচার মেরাদ বাড়িয়ে তারা শাসকশ্রেণীকে রক্ষা করে। আমলাতান্ত্রিক সাম্যীয়করণে তারা সমাজতান্ত্রিক সাম্যীয়করণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, শাসক শ্রেণীর ভিৎ পাকা করে দেয়। অথচ তারা দেখাতে চায় না যে সমাজ ও রাষ্ট্রের মালিকানা কাদের হাতে।

আমাদের দেশেও সংশোধনবাদ, নয়া সংশোধনবাদ এই বুর্জোয়া-জমিদার শাসনের কাঠামো বজায় রেখেই সংস্কারবাদের অস্ত্র গণ-বিপ্লবের জোয়ারকে রুদ্ধ করে চায়। তাই তারাও শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রামের শত্রু, বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর পশ্চমবাহিনী। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদের জোয়ারে বেঁধে রেখে তারা শাসকশ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। বৃটেন ও ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলনকে সংসদীয় গণতন্ত্রের খোঁরাড়ে

আটকে রেখে এটিলা, বৈজিন, লাক্সম্বর বা করতে পেরেছে, আমাদের দেশের সংশোধনবাদী নয়া সংশোধনবাদীরাও সেই ভূমিকা পালনে অগ্রবর্তী হয়েছে।

নকশালবাড়ী আন্দোলনের ভূমিকা তাই আজ তলিয়ে বুঝতে হবে। অটল বিপ্লবী ধৈর্য এবং তিতিক্ষা নিয়ে, জনগণের সংগ্রামী ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে জনগণের প্রতিটী সংগ্রামে বিনরী সেবকের ভূমিকা নিয়ে বিপ্লবীদের এগোতে হবে। তাহলেই একটী দৃষ্ট প্রচণ্ড আঘাতও সমাজ শোষণের ভিত্তিমূলে ভাঙ্গন ধরিয়ে দেবে।

“এখনো সময় হয় নি” বলে বিপ্লবীদের পথপ্রদর্শন করা যায় না। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নব নব অভিজ্ঞতা, শত্রু মিথ্রের অবস্থান উপলব্ধি সম্ভব হয়। সংগ্রাম আরম্ভ মানেই বিজয়ের সূচনা। সংগ্রাম বিমূর্ত্যই শাসকশ্রেণীর অবস্থানকে দুঢ় করে। বিভিন্ন বাস্তব অবস্থার অনুধাবন করে, কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমেই গণমুক্তির বিজয়সৌধ নির্মাণ সম্ভব। নকশালবাড়ী আন্দোলন সেই বিজয়ের অংকুর।

এই সংগ্রামে শেষ কথা বলবেন, বিপ্লবী জনগণ, শাসকশ্রেণী বা তার দালাল সংশোধনবাদ নয়া-শোধনবাদ নয়। বিপ্লবের আকা-বাকা পথে সমতল উপত্যকা ও বন্দুর পাহাড়, পথপ্রান্তর পেরিয়ে এই মৃত্তি অভিবান আগামী দিনে সারা ভারতে বিপ্লবী সমাবেশের জোয়ার গড়ে তুলবে। দীর্ঘস্থায়ী এই বন্ধ, এই সংগ্রাম।

সি পি আই (এম)

(পনেরো পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গেও সি পি আই এম বিপ্লবী পরিস্থিতির অনুকূলে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তুলেছে একথা না বলা বা গোপন করা অসমততার সামিল হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনা কালে ছোটখাটো দ্রুত-বিচ্যুতি সঙ্গেও সি পি আই এম মৌলিক কাজে অবহেলা করেন নি। এর প্রমাণ শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন ও সংগ্রাম, কৃষক শ্রেণীর হাতিয়ার হাতে ভূমির ও ফসলের জন্যে সংগ্রাম। সি পি আই এম প্রাথমিক ভাবে দলভিত্তিক যুক্তফ্রন্টকে সম্প্রসারিত শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের পথেই উন্নীত করতে গিয়েছেন বলেই শাসকশ্রেণী যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়েছে এবং পোতিবুর্জোয়া সুবিধাবাদী দলগুলি মাকসবাদ সেনিনবাদের মতোস পরিচয় করে খোলাখুলি শাসকশ্রেণীর পক্ষে বোগ দিয়েছে।

তারা শাসকশ্রেণীর পক্ষে গেলেও শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ধর্মঘটের পথে পা বাড়িয়েছে, কৃষক হাতিয়ার ধরে এলাকাগুলিতে জোতদার জমিদারের প্রভাব ভেঙ্গে দিয়েছে। সি পি আই এম আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জয়লাভ

করলে নতুন শ্রেণীভিত্তিক সরকার মজুর কৃষকশ্রেণীর সংগ্রামের দুর্ধর্ষ হাতিয়ারে পরিণতি লাভ করবে। তখন সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে কৃষক-শ্রেণীর স্বল্প এই প্রধান স্বল্পটী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নতুন উন্নততর স্তরে আত্মপ্রকাশ করবে। কৃষক শ্রেণীর এই অগ্রগতি নির্ধারিত বিজয়ের পথ ধরে সারা ভারতের কৃষক সংগ্রামের উৎসমুখ বুলে দেবে। শ্রমিকশ্রেণী প্রচণ্ড আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে। ভারতব্যাপী বিপ্লবী পরিস্থিতি আশ্রয় হয়ে উঠবে।

আর নির্বাচনে সংখ্যাধিক্য না হলেও কৃষকশ্রেণী লড়াইয়ে পেছ পা হবে না, শ্রমিকশ্রেণী সারা পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূর্বের মত সংগ্রামী প্রতিরোধ বে গড়ে তুলবে তাও আজ প্রশ্নাতীত কারণ গত দশ মাসের রাষ্ট্রপতি শাসনের কালে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামগুলি খণ্ড খণ্ড রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করেছে। এ অভিজ্ঞতাও প্রথম।

বাই ঘটুক না কেন, আসন্ন বিশ্বপরিস্থিতি, প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল থেকে প্রবাহিত রাজনৈতিক ঝড় সারা ভারতের শাসকশ্রেণীকে বিপন্ন করে তুলবে, এসময় অব-ধারিত, আর কয়েকমাসের মধ্যেই

“সরকারসংক্রান্ত সংকট” এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের তত্ত্বমি দৃষ্টি-গোচর হয়ে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজের হাওয়া এদেশে প্রবেশ করবে। সফল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী স্তর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিবিসৌধে ভারতের প্রবে-শাধিকার ঘটবে। সি পি আই এম ইতিহাসের ইঙ্গিতে সেই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের নারক। তাই দক্ষিণ-বাম সম্মুখ পন্থা চতুর্দিক থেকে সি পি আই এম আক্রান্ত।

“শত্রু যদি আক্রমণ করে, তা ভাল, এটা প্রমাণ করে শত্রু ও আমা-দের মধ্যে আমরা একটী স্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনেছি”—মাও সেতুং। সি পি আই এম-এর ওপর দক্ষিণ ও অতিবামপন্থী আক্রমণ, শোষণ-শ্রেণীর আক্রমণ একটী মাত্র ভাবী-কালের চিত্র ফুটিয়ে চলেছে। সেটা হচ্ছে লক্ষ কোটী মানুুষের বিপ্লবী উদ্যোগ আগামী দিনের গোপন-প্রকাশ্য সবরকম আঁতাত ভেঙ্গে গুলিয়ে শোষণহীন সমাজের পথে পা বাড়াবে। সি পি আই এম এই শ্রেণী সংগ্রামের সর্বহারা মতা-দর্শকে উচ্চ করে ধরেছে বলেই তার ওপর শোষণ শ্রেণী ও তার অতিবাম-দক্ষিণ সেবাদাসদের হিংস্র আক্রমণ চলেছে।

Introduction :

With a view to serve ever expanding Indian Industries, we offer to our industrial and domestic consumers "BIDYUT" brand, trouble free, quality "Heat Sealing Machine" for Alkathene, cellophane, aluminium foil, waxed and paraffin laminated papers and all other materials which are capable of being thermally sealed.

UP TO DATE HEAT SEALER

The "BIDYUT" hand set heat sealer is elegant in appearance and handy to use. Suitable for A.C./D.C. current. It is portable to enable it to be carried to where it is to be used. It is engineered for effective and efficient sealing of packets or bags which are unwieldy because of their weight or dimensions and for sealing long joints and seams.

Manufactured by BIDYUT ELECTRONICS.

Marketed by ANBI TRADING COMPANY
61, MOTT LANE, 1st Floor, CALCUTTA-13

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মেজাজ লক্ষ্যণীয় হয়ে ফটে উঠেছে।

অর্থাৎ যদি আমরা ধরে নিই যে কংগ্রেস বিরোধী ভোটের অধিকাংশ কংগ্রেসে সি পি এম-এর দিকে প্রধান বামপন্থী দল হিসেবে এবং অনিশ্চিত ভাসাভাসা ভোট-গুণি প্রধানতঃ কংগ্রেসে ফিটের এসে তার ভোট সংখ্যা বাড়িয়েছে, তা সম্ভবতঃ সঠিক বলেই গণ্য হবে।

তবু উনোসত্তর সালে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করেছিল কারণ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ সর্বদাই কংগ্রেস বিরোধী। এবং তাঁরা একসঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেবার স্বেচ্ছা পোষণে ছিলেন। উনোসত্তর সালে সংগঠিত ভোট যুক্তফ্রন্টের পক্ষে, অপরদিকে অসংগঠিত দোদুল্যমান ভোট কংগ্রেসের পক্ষে গিয়েছিল। কংগ্রেসের কাছাকাছি দলগুলি এ-জন্যই ভোট কম পেয়েছে।

একাত্তর সালের অকাল নির্বাচনে এই মেরুকরণের প্রক্রিয়া অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে বলে দেখা যাবে। উনোসত্তর সালে কংগ্রেস ভেঙে যেমন দুভাগ হয়েছে কংগ্রেস বিরোধী টুকটাক ভেঙে প্রধানতঃ দুভাগ হয়েছে। সুতরাং এবারের নির্বাচনের ফলাফল আন্দাজ করতে গেলে খুব সতর্ক ভাবে এগোতে হবে।

বাহ্যে সাল থেকে উনোসত্তর সাল পর্যন্ত পাঁচটি নির্বাচনে কংগ্রেস কোনদিন পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ভোটারের সমর্থন পায়

নি। একবারও না। উনোসত্তর সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট মোট বৈধ ভোটের ৪০.৬ শতাংশ, বাতিল ভোটের পরিমাণ চার শকেরও বেশী বা তিন শতাংশ। তা হলেও কংগ্রেস বিরোধী ভোটের সংখ্যা প্রায় সাতাশ শতাংশ।

একথা স্বীকার করা যায় যে কংগ্রেসের ভোট অধিকাংশ নব-কংগ্রেস পাবে। আদি কংগ্রেস তার চেয়ে কম পাবে। এই ভাগের ব্যবধান কতটা হবে তা নির্ভর করছে দুই কংগ্রেসের নির্বাচনী সংগঠনের ওপর। আমাদের ধারণা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এই প্রবণতাই বজায় থাকবে।

কিন্তু কংগ্রেসের ভোট এখনো ৪০.৬ শতাংশ রয়েছে এটা ভেবে নেওয়া ভাল হবে। হাতে কলমে চারটি উপনির্বাচনের নজর থেকে এবং আই এন টি ইউ সি, প্রদেশ কংগ্রেস প্রভৃতি সংগঠনের চেহারা দেখে কমবেশী এরকম সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে কংগ্রেসের ভোট এবার শতাংশ হিসাবে অনেক কম যাবে। যদি নব কংগ্রেস ১৯৬৯ সালের শতকরা হিসাব রক্ষা করতে পারতেন তাহলে তাদের সংখ্যা-যিক্য অর্জনের সম্ভাবনা নিশ্চিত হত। কিন্তু তা কি সম্ভব?

প্রধান কারণ, গ্রামাঞ্চলে চিরা-চরিত নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে গেছে। গ্রামের জ্যোতদার, ধনী কৃষক, প্রাক্তন জমিদার, রেশন দোকানের মালিক, সার বিক্রেতা, কো-অপারেটিভের চাইল্লেরা প্রধানতঃ গ্রামীণ কৃষকদের

পরিচালিত করতেন। গত দুব্বারের, বিশেষ করে ১৯৬৯ সালের পর থেকে গ্রামাঞ্চলে ঐ নেতৃত্ব ঐ শ্রেণীগুণির হাত থেকে চলে এসেছে প্রধানতঃ সংগঠিত কৃষক আন্দোলন, নিম্ন-স্তরের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও অধ্যাপক এবং গ্রামের ক্ষয়মুখী বিস্তুহীন ভ্রমশ্রমিকের হাতে। আশে-পাশের শ্রমিক এলাকাও এঁদের এখন বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব হারানোর অর্থ কৃষকের বিপুল সংখ্যক ভোট হারানো। সুতরাং আমাদের মনে হয় কংগ্রেসের নিজস্ব মোট ভোটের সংখ্যা শতকরা হিসাবে ১৯৬৯ সালের চেয়ে অনেক কম যাবে। সম্ভবতঃ মোট বৈধ ভোটের কুড়ি থেকে পঁচিশ শতাংশের বেশী ভোট পাওয়া নব-কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হবে না। রায়না, মেদিনী-পুর, টালিগঞ্জ ও বসিরহাট লোক-সভা উপনির্বাচনের প্যাটার্ন এটাই প্রমাণ করে। কংগ্রেসের সঙ্গে স্বনামে-বেনামে যুক্ত দলগুলিকেও কংগ্রেস সমর্থনের খেসারত গুণতে হবে।

এবারকার নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের আসন সংখ্যাও একই কারণে দারুণ ভাবে কমে যেতে বাধ্য। বাংলা কংগ্রেস সম্ভবতঃ দশটীর বেশী আসন রক্ষা করতে পারবেন না।

আট পার্টি জোট খোলাখুলি ভাবে সি পি এম-কেই প্রধান শত্রু বলে প্রচার অভিযান চালিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস ও সি পি আই পরস্পরকে সাহায্য করছেন এটা সুবিদিত। নব কংগ্রেসের সঙ্গে আট পার্টি জোটের শরিক-দের এই দহরম মহরম পশ্চিম-বঙ্গের চিরাচরিত কংগ্রেসবিরোধী ভোটাররা কি ভাবে নেবেন? তাঁরা কংগ্রেস বিরোধিতায় জলাঞ্জলি দিয়ে আটপার্টী জোটের ইচ্ছানুসারে কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন? অথবা চিরাচরিত কংগ্রেস সমর্থকেরা কংগ্রেস সমর্থন বাদ দিয়ে আট-পার্টী জোটকে সমর্থন করবেন। বিশেষ বিশেষ দুর্য্যটকী ক্ষেত্রে তা ঘটলেও সাধারণতঃ এর উল্টোটাই ঘটবে।

এদিক দিয়ে বরানগর একটা বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব আদি বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি আই নেতৃত্বে আট পার্টী জোট একত্রে সি পি এম নেতা জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে অজয় মুখার্জীকে সমর্থন করছেন। আমাদের মতে এখানেও বামপন্থী কংগ্রেস বিরোধী ভোট প্রায় সবটা অজয় মুখার্জীর বিপক্ষে জ্যোতি বসুর পক্ষে যাবে। অপর দিকে কংগ্রেসী ভোটের প্রায় সবটা পাবেন অজয়বাবু। বারই জয়পরাজয় হোক বরানগরের গুরুত্ব সারা পশ্চিম-বাংলার নির্বাচনী ফলের ওপরই নির্ভরশীল। অজয়বাবু হেরে গেলেও তমলুকুর আসন রয়েছে, অবশ্য যদি সেখানে হেরে না যান। জ্যোতিবাবুর পার্টি সংখ্যাধিক্য লাভ করলে তিনি হেরে গেলেও

অন্য একটি আসন থেকে নির্বাচিত হতে পারবেন।

সব মিলিয়ে এই যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী ভোটের অধিকাংশ, প্রায় সবটাই, পাবে সি পি এম, আট পার্টি জোটকে এর অতি ক্ষুদ্র ভূনাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

কিন্তু আট পার্টির পক্ষে সামান্য ভূনাংশ বামপন্থী ভোট কি নির্বাচনের ফলাফল উলটে দিতে পারে? হ্যাঁ পারে, যদি কংগ্রেসের ১৯৬৯ সালের সাড়ে চত্বিশ শতাংশ ভোট বজায় থাকে। কংগ্রেস ও আট পার্টি জোটের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় সে অবস্থা এবার অক্ষর থাকে নি। গরীব মানুষগুলির মধ্যে নতুন মর্বাদাবোধ, নতুন জীবনের আশ্বাস যা তারা তের মাসের যুক্তফ্রন্ট শাসনে পেয়েছিল বা পারার সম্ভাবনা দেখাছিল তার ফলে আদি নব বাংলা কংগ্রেসকে তারা ভোট দেবে বলে মনে হয় না। এটা বুকেই সম্ভবতঃ আদি ও নব কংগ্রেসের প্রত্যক্ষবদ্ধ সিদ্ধান্ত-বাবুরা বিধানসভা ছেড়ে দিয়ে লোকসভায় দাঁড়িয়েছেন। যদি কপাল ফেরে।

গোপন পরামর্শ সভার গৃহ্য মন্ত্রণা সল্যাপারামর্শ দিয়ে একদিন যে মানুষগুলিকে ভেড়ার মত পরিচালনা করা যেত, আজ সেদিন চলে গেছে।

প্রশাসন কঠোর, পুলিশ আম-লারা আজ প্রকাশ্যে আদি নব বাংলা কংগ্রেস ও আট পার্টি জোটকে সাহায্য করার পরিকল্পনা করছে। সর্বজনপ্রিয় হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এই সব জোট ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অশো-ভন ও কুরূচিপূর্ণ অসত্য ভাষণ, পুলিশ কমিশনার কঠোর তার পরোক্ষ অস্পষ্ট সমর্থন দুই শতের অধিক সি পি এম কর্মীকে হত্যা এবং আরো হত্যাকাণ্ড চালাবার অবিরত কৌশল, সচেতন সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছে।

কেউ কেউ বলছেন যে এবার নির্বাচনে কোন দলই সংখ্যাধিক্য পাবে না, অনিশ্চিত অবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির শাসনই (বা বেনামী কংগ্রেসী) শাসন চলবে।

কিন্তু লক্ষণ দেখে তা মনে হয় না। সাধারণ লোক অভিজ্ঞতার ফলে মনে করেন যে নকশালী হাঙ্গামা, পুলিশী নির্যাতন ও আক্রমণ একমাত্র শত্রু সি পি এম সরকারই বন্ধ করতে পারে। অন্য কোন দল বা জোটের সেই ইচ্ছাও নেই, সাধ্যও নেই।

এই সব লক্ষণ আলাদা আলাদা ভাবে এবং একসঙ্গে বিচার করে একটি অনিবার্য সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হয়। তা হল, সি পি এম নেতৃত্বে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনসংখ্যা অবস্থা-ভেদে একশ পঁচাত্তর থেকে একশ আশীটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সমস্ত ফলাফলই সংগঠনের ওপর নির্ভর করছে। আমাদের

অনুমান বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ, আলাপ আলোচনা এবং বাস্তব অবস্থার পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটাকে ভবিষ্য-বাণী বলে না ধরে প্রাপ্ত তথ্যসম-হের ভিত্তিতে উপনীত পরিণত সিদ্ধান্ত বলে ধরতে হবে।

মতামত

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কেবল সিং প্রসঙ্গে যা বল হয়েছে, ইউনিয়নের (জয়া) এক জন সাধারণ সভা হিসাবে অত্যন্ত দুত্বের সঙ্গেই বলতে পারি যে ঐ ব্যক্তিকে ইউনিয়ন অফিসে বা তার আশপাশে ঐ সমস্ত জিনিষ সমেত আজ পর্যন্ত দেখিনি; এবং বিশ্বাস রাখি যে বিশুবী জয়া ইউনিয়ন-এ ঐ ব্যক্তিকে কখনই প্রদান দিতে পা-বে না। জয়ার শ্রমিক কর্মচারীগণ এবং ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকগণই ইউনিয়ন অফিস (জয়া) বা নেতৃত্ব-রক্ষা করতে সক্ষম।

জনৈক শ্রমিক (পেন্ট সপ)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পর্কে

প্রথমেই আমরা আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি এই চিঠি প্রকাশ করার জন্য। যদি চিঠি প্রকাশ করা হয় তাহলে এ বিষয়ে আমার স্থির নিশ্চিত হব যে দর্পণ নব শালপন্থী এবং সি পি এম বিরোধী পত্রিকা, নিরপেক্ষ পত্রিকা নয়।

গত সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরীক্ষা অনু-ষ্ঠিত হয়, সেই পরীক্ষা সম্বন্ধে এই পত্রিকায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যা-লয়ের নামে যথেষ্ট কুসং-রটন করা হয়েছে। যদিও ঐ সময়ে অনু-ষ্ঠিত বি ই কলেজ ও -দুর্গাপুর আর ই কলেজের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষাতেও অতি ব্যাপক হা-নকশা করা চলেছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে এই পত্রিকা আশ্চর্যজনক নীরবতা পালন করে কোনও এক অজানা কারণে।

গত সত্তরোই ফেব্রুয়ারি থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ফাস্ট সেমিস্টার পরীক্ষা শুরুর হয়। ঐ পরীক্ষা এত সুন্দর ও সম্ভা-নে অনুষ্ঠিত হয় যে বাংলা দেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার স্বর্গরাজ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। নকল করা ত দুব্বার কথা, পরীক্ষা হলে একটি কথাও বলতে দেও-র হয়নি।

এই পত্রিকাই যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুর্নাম রটনা করেছে কাজেই আমরা সম্পাদক মহাশয়কে এই পরীক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এই চিঠি প্রকাশ করতে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, যাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলঙ্কমুক্ত হয়ে লো-ক ঐতিহ্য ফিরে পায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রবৃন্দ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

একটি সমীক্ষা

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

পূর্বদিল্লী জেলাতে তাদের সাংগ-ঠনিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছেন।

এবারকার যুক্তফ্রন্টের সকল শরিক দলের স্বর্ণবর্গ বলা চলে। রাজ্যের দুশ আশিটি আসনের মধ্যে দুশ আঠারটি আসন এই ফ্রন্টের কোন না কোন শরিক দল-করেন। আর মাত্র সাতটি আসন অন্য দলের ভাগে যায়। তার মধ্যে নবগত প্রগতিশীল মুসলিম লীগ তিনটি আসন পান। এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দলগুলি কোন দিনই বিশেষ সন্নিবিষ্ট করতে পারেন নি সে দিক থেকে এ দলের সাফল্য নিশ্চয়ই রাজনীতিকদের চিন্তার বিষয় হবে।

এবার কংগ্রেস দল দুশ আশিটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫১.০ শতাংশের সমর্থন লাভ করেন সেখানে যুক্তফ্রন্ট সমসংখ্যক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫১.৫ শতাংশের সমর্থন লাভ করেন। কংগ্রেসের প্রতি প্রার্থী বৈধ ভোট লাভ করেন ১১৭১৪টি সেখানে যুক্তফ্রন্টের প্রতি প্রার্থী ভোট পান ২৪৬৭০। রাজ্যের প্রতি একশ জনের

মধ্যে ৫১.৫ জন ফ্রন্ট ও ৪৯.০ জন কংগ্রেস আর বাকী ৭.২ জন অন্যান্য দলকে সমর্থন জানিয়ে-ছেন। ১৯৫৭ থেকে যে রাজ-নৈতিক সমাবর্তন শুরুর হয়েছিল তা ক্রমাগত উল্লম্বমুখী হয়ে চলে-ছিল এবার প্রায় স্থিরাক্ষের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অনুযায়ী
কংগ্রেস সাফল্য

এবার মধ্যত কংগ্রেস ও ফ্রন্ট প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকে। তবুও অন্যান্য দলের জন্য প্রকৃত স্টিমুল প্র-তিদ্বন্দ্বিতা ৬৬টি কেন্দ্রে ও ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৭১টি কেন্দ্রে হয়।

লক্ষণীয় এবার কংগ্রেস সাফল্যের উৎপত্তি বিন্দুটি শতাংশ রেখার অনেক নীচ থেকে আরম্ভ হলেও প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যের রেখাটিও অত্যন্ত কন্টের সঙ্গেও উল্লম্বমুখী রা-খ-বার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ পূর্বের নির্বাচন গুলির আলোচনার শেষে আমরা যে নিয়মটি পাবার চেষ্টা করেছিলাম তা এবারও সত্য বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ কংগ্রেস সাফ-ল্যের হার প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যার সমানুপাতিক।

বেলেঘাটার ঘটনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চিহ্নিত তরুণরাই এই দিন পুন্নি-
শের গুলিতে নিহত হয়।

গোয়েন্দা বিভাগ দাবী করছে
যে, নকশালী দলকে সম্পূর্ণ
ধ্বংস করে দেওয়া পুন্নিশের পক্ষে
এখন খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়।
কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই
কর্তব্য সম্পাদনার পুন্নিশের বাধা
আছে।

এই দলের মধ্যে পুন্নিশের
অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে দলীয়
সাংগঠনিক সংকটে। সংকট সৃষ্টি
হয়েছে দুটি বিপরীতমুখী শক্তির
সংঘর্ষের ফলে। নকশালী “এ্যাক-
শনে”র প্রয়োজনে দুর্ধর্ষ সমাজ-
বিরোধীরা একটি বিশেষ অবস্থায়
হলেন, মধ্যে টুকে পড়ে। দল
ত্যাগ রাজনীতি একমাত্র সম্ভব
দূর্যে এখন এগিয়ে বাওয়ার পরি-
ক্ষণনা করে তখন এই সমাজ-
বিরোধীরা অনেক জায়গার বিশেষ
প্রভাবশালী হয়ে পড়ে।

অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে

মাওবাদী নীতির দিক থেকে জীবন
পন করে যে সমস্ত তরুণরা এই
দলে এসেছে অনেক জায়গার এই
অংশের সঙ্গে সমাজবিরোধীদের
প্রচ্ছন্ন সংঘর্ষ চলতে থাকে।

পুন্নিশের গোয়েন্দা বিভাগের
রিপোর্টে প্রকাশ যে পার্টির সর্বোচ্চ
নেতা প্রীতারা মজুমদারের নামে
একটি সাকুলার দলের বিজ্ঞ
শাখায় প্রচারিত হয়। এর মূল
কথা ছিল এই যে, নির্বাচন পর্যন্ত
দলের একমাত্র কাজ হবে এমন
ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে নির্বাচনে
সি পি এম ক্ষমতায় না আসে। এই
সাকুলার প্রচারের পরেই হত্যার
নীতি আরও জোরদার হয় এবং সি
পি এম বিরোধী অন্যান্য দলের
সঙ্গেও “এ্যাকশন ভিত্তিক” সম-
ঝোতা হয়। এই রাজনীতিতে
নীতিবাদীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে।
আর বারো বেরোয়া তারাই প্রধান
লাভ করে। এই বেরোয়াদের মধ্যে
অনেকেই সমাজ বিরোধী।

দলের মধ্যে সমাজ বিরোধীদের
অনুপ্রবেশ ও প্রধান লাভ পুন্নি-
শের পক্ষে লাভজনক হয়েছে, কারণ
এর পরেই দলের মধ্যে পুন্নিশের
অনুপ্রবেশও সম্ভব হয়েছে। এই
পরিপ্রেক্ষিতেই বারাসাত হত্যা এবং
আরো অনেক হত্যা। আজ অজ্ঞাত
নয় যে, দলীয় বিশ্বাসঘাতকতার
ফলেই বারাসাতে আট জন তরুণ
নিহত হয়েছিল এবং সম্প্রতি বেলে-
ঘাটারও সেই একই কাণ্ড ঘটল।

হেমন্ত বসু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রবিবার, আঠাশে ফেব্রুয়ারী)।

অতিরিক্ত পুন্নিশ কমিশনার
আরও বলেছেন, পরে যে তিনজনকে
গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের অন্য
কেসে জড়িত সন্দেহে ধরা হলেও
হেমন্তবাসুর খুনের ব্যাপারে
জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়।

[এই তিনজনের মধ্যে ঝপ্পে
গত সংখ্যায় উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড
শিবুও ছিল। এদের ছেড়ে দেওয়া
হয়েছে।]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সি পি
এম-কে জড়ানো গেলনা। এই
প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা
হচ্ছে, চারবারের দলত্যাগী সিন্ধা-
শংকর রায়ের অচরণ। উনি
হেমন্তবাসুর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে
পুন্নিশ কুকুরের আগেই বলেছি-
লেন, এই হত্যার ব্যাপারে সি পি
এম জড়িত। সিন্ধাশংকর রায়-
শক্তি বোধহয় পুন্নিশ কুকুরের
চেয়েও বেশী। কিন্তু অতিরিক্ত
পুন্নিশ কমিশনার সেই প্রাণজটিক
আমল দিলেন না।

আর একটি ঘটনা পাঠকদের
জানানো প্রয়োজন। হেমন্তবাসুর
হত্যা নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি যে জন-
সাধারণ অনুমোদন করেননি তার
প্রমাণ পাওয়া গেল তার শোক-
সভার। ফরোয়ার্ড ব্লকের আহবানে
শহীদ মিনার ময়দানে এই শোক-

বহরমপুর জেলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন নকশালপন্থীকে ঘটনামুখেই
পিটিয়ে মারা হয় এবং পৃষ্ঠ জন
পরে হাসপাতালে মারা যায়।
ছািবিশে তারিখে আরও দুজন
মারা যায়। গুরুতরভাবে আহত
আরও ষোল জনকে হাসপাতালে
নিয়ে যাওয়া হয়। জানা যায় গুরু-
তর আঘাতপ্রাপ্ত আরও একশিশ
জন নকশালপন্থী হাসপাতালে
আছে।

ঘটনার পর জেলের দুজন সিভিল
ইন্সপেক্টরস প্রীমতী ইন্সপেক্টা গুপ্তা
ও প্রীমতী গৌরী চট্টোপাধ্যায় জেল
পরিদর্শন করেন। নকশালপন্থীরা
যে ওয়ার্ডে থাকত সেখানে তাঁরা
রক্ত ছিড়িয়ে আছে দেখতে পান এবং
হাসপাতালে আহত নকশালীদের
পরীক্ষা করে দেখেন যে, তাদের
আঘাত মাথার মুখে কাঁধে এবং
হাতে।

নকশালপন্থীদের প্রহারের
ধরন দেখে মনে হয় ঘটনা পূর্ব-
পরিকল্পিত। পশ্চিমে ও ছািবিশে
ফেব্রুয়ারী স্টেটসমানে প্রকাশিত
একটি সংবাদ এই ধারণাকে বশ-
মূল করে। স্টেটসমানে বেরিয়ে-
ছিল যে, চৌদ্দজন জেল রক্ষী
গুরুতররূপে আহত। কিন্তু
সিভিল ইন্সপেক্টরস দুজন ও
অন্যান্যরা যখন জেল পরিদর্শন
করেন তখন মাত্র দুজন আহত
জেল রক্ষীকে দেখতে পান, বাকী
বারো জন আহত জেল রক্ষীকে
খুঁজে পান না।

সভায় সি পি এম বাদে আদি, নব
কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল
যোগ দিয়েছিল। কিন্তু সভায়
তখন লোক হয়নি। কলকাতা
পুন্নিশের হিসেব অনুযায়ী উপ-
স্থিতির সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন
থেকে পাঁচ হাজার। দর্পণের প্রতি-
নিধি সভায় ছিলেন। তার হিসেবে
সর্বোচ্চ চার হাজার।

অন্যদিকে ছািবিশে ফেব্রুয়ারী
সি পি এম এই একই জায়গার জন-
সভা করে হেমন্ত বসুর প্রতি প্রম্মা
জানিয়েছে এবং তার হত্যার
ব্যাপারে ঘৃণ্য রাজনীতির প্রতিবাদ
জানিয়েছে। এই জনসভায় কল-
কাতা পুন্নিশের হিসেব অনুযায়ী
উপস্থিতির সংখ্যা ছিল অন্ততঃ
কুড়ি হাজার। সি পি এম বলে
পুন্নিশকে কিছু কম করে লিখতেই
হয়। দর্পণের প্রতিনিধি এখানেও
ছিলেন। তার হিসেবে অন্ততঃ
তিরিশ হাজার মানদ্ব এই সভার
বোলা দিয়েছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একজন
সর্বজনপ্রিয় নেতার হত্যাকে সি
পি এম বিরোধী রাজনীতিতে
রূপান্তরিত করা গেল না।

কোন দল কত আসন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সি পি এম মহল মনে করে
যে, এককভাবে বিধান সভায় তারা
সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে। তাদের
ধারণা বিধান সভায় দুশো আশিটি
আসনের মধ্যে তারা অন্ততঃ
একশো ষাটটি আসনে জয়ী হবে।

সি পি এম অন্য পাঁচটি দল
নিয়ে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠন
করেছে এবং দুশো বাহান্তরটি
আসনে এই ফ্রন্টের প্রার্থীরা প্রতি-
শ্রব্ধতা করছেন। এর মধ্যে
এগারো জন নির্দলীয় প্রার্থী সমেত
সি পি এম-এর মোট প্রার্থী
সংখ্যা দুশো আটচল্লিশ।

নব কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ
শাখার সভাপতি বিজয় সিং নাহার
মনে করেন যে, সি পি এম সমস্ত
এর বেশী আসনে জয়ী হতে পারবে
না। গতবারের বিধান সভায় সি
পি এম-এর সদস্য সংখ্যা ছিল
তিরিশ।

প্রীনাহারের ধারণা যে, নব-
কংগ্রেসের আসন সংখ্যা দাঁড়াবে
একশ ছািবিশ। গতবারের বিধান
সভায় কংগ্রেসের মোট আসন
সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। আদি ও নব
দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর নব
কংগ্রেসের দিকে আটচল্লিশ জন
সদস্য চলে আসে এবং অবশিষ্ট
সাত জন আদি কংগ্রেসের দিকে
থেকে যায়। সমস্ত রাজনৈতিক মহ-
লাই মনে করে যে, আদি কংগ্রেসের
শক্তি বিশেষ বাড়ার সম্ভাবনা নেই।
এই পাঁচটি কোনক্রমে দশটির বেশী
আসনে জয়ী হতে পারে না বলে
সকলের ধারণা।

অনুপ্রভাবে বাংলা কংগ্রে-
সের ভাগেও কোন মহলাই জয়ী
প্রার্থীর সংখ্যা দশটির বেশী হবে
বলে মনে করছেন না। বিগত
বিধানসভায় বাংলা কংগ্রেসের সদস্য
ছিল তেরিশ। এবারে বাংলা কংগ্রে-
সের মোট প্রার্থী সংখ্যা একশো
পঁচাত্তিশ।

সি পি আই আট পাঁচটি
জোটের সংযুক্ত বামপন্থী গণতা-
ন্থিক ফ্রন্টের নেতা। বিজয় গণ-
নার এই ফ্রন্টকে ষাটটি আসনের
বেশী দিতে কেউই রাজি নয়।
কারণ গণনাকারীদের মতে নির্বা-
চনী প্রতিশ্রব্ধতা মূলত নব
কংগ্রেস ও সিপি এম-এর মধ্যে
সীমাবদ্ধ। বাংলা কংগ্রেস কিংবা
অন্যান্যদের ভূমিকা হল ভোট
ভাগের। যেমন অনেকের ধারণা যে,
মৌদীনীপুরে বাংলা কংগ্রেস ও সি
পি আই নিজেদের মধ্যে কাটাকাটির
ফলে বেশীর ভাগ আসনে নব
কংগ্রেসই জয়ী হয়ে যাবে।

সি পি এম বিরোধীরা মনে
করছেন যে, মুসলমান ভোট এবার
মুসলিম লীগ পাবে। আর রেফি-
উজ্জি ভোট নকশালদের প্রভাবে হয়
সি পি এম-এর বিরুদ্ধে যাবে, না
হয় ভোট বান্ধে পড়বে না। এদের
এই ধারণার ভিত্তি হল যে, নক-
শালীরা স্বধারণতঃ যে সমস্ত

রেফিউজি এলাকার সি পি এম
ভোট বেশী পেতে সেই সমস্ত এলা-
কাতেই প্রভাবশালী। অর্থাৎ
মুসলমান ও রেফিউজি ভোট বাধ
দিলে সি পি এম-এর আর কিছুই
থাকে না।

সি পি এম নেতারা মনে
করেন যে, এই সমস্ত গণনা বাংলা
দেশে যে তুমুল আন্দোলন চলেছে
সেই সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রতি-
ফলন। তাদের দাবী : প্রমিক-কৃষ-
কের সংগ্রামে তারা পুরোদোষ।
হাজার হাজার জঙ্গী কর্মী পুন্নিশ
নকশাল কংগ্রেস অষ্টবাক্য আক্রমণ
তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছে পার্টির
কাছে। নতুন নতুন কৃষক এলাকার
পার্টির জঙ্গী সংগঠন গড়ে উঠেছে।
নির্বাচনে এর প্রতিফলন হলেই
বলে সি পি এম মনে করে।

পুন্নিশের মধ্যে নির্বাচনী গণ-
নার জিহ্ন মত আছে। পশ্চিমবঙ্গ
পুন্নিশের উচ্চ মহলের ধারণা সি
পি এম-এর আসন কোনক্রমেই
ষাট-এর বেশী হতে পারে না।
আবার কেউ কেউ এই সংখ্যা
বাড়িয়ে একশো পর্যন্ত নিয়ে বেতে
রাজি। কেন্দ্রীয় পুন্নিশের মতে সি
পি এম-এর আসন সংখ্যা হয়ত
একশো দশ-এ পৌঁছতে পারে।

রথধীন দেব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সহকারী সম্পাদক। রথধীনবাসুর
কমল বাহান বহর।

তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট
পার্টির সদস্য। পার্টির তরফ থেকে
বলা হয়েছে যে, কংগ্রেসী ও সমাজ
বিরোধীদের যুক্ত আক্রমণের শিকার
হয়েছেন রথধীনবাসু। উম্মাদের
মত হয়ে গেছে ওরা। মার্কসবাদী-
দের অভিযোগ যে, হেমন্তবাসুকে
ভাড়াটে গুন্ডাদের দিগে হত্যা-করি-
য়েও কংগ্রেসীরা মার্কসবাদীদের
বিরোধী হাওয়া তুলতে পারে নি।
তাই আরও হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে।
নির্বাচনী প্রচারে নিষিদ্ধে হত্যা
এবারের নতুন কৌশল।

নির্বাচন প্রচার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

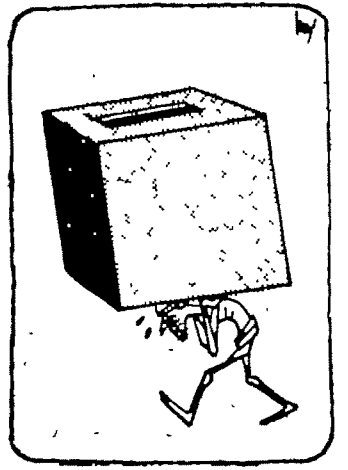
সরকারী প্রথা অনুযায়ী সর-
কারের কোন কাজ আংশিক বা
পূর্ণ বিদেশী কোন সংস্থাকে
দেওয়া যায় না। বিশেষ করে এই
কাজে যদি যোগ্য কোন ভারতীয়
সংস্থা পাওয়া যায়। প্রচার সংস্থা
হিসেবে অনেক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান
পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের যোগ্যতা
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সংবাদপত্রে
প্রচার ছাড়াও কলকাতা বেতার
কেন্দ্রে প্রত্যহ এই ব্যাপারে নানা
কাল্পনিক প্রচার চলেছে। রোজ
দুপুরে কলকাতার উন্নয়ন বিজ্ঞ
সংকল্প নাটিকা প্রচারিত হয়।
যদিও এইগুলি প্রচারমূলক এর
জন্য সরকারের কোন বিজ্ঞাপন খরচ
লাগে না।

সম্পাদক-হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক সভার ইতিহাস প্রেস ৭, রাজা নৃসিংহ মল্লিক স্কয়ার কলিকতা-১০ থেকে প্রকাশিত এবং ৩১শে মার্চ ১৯৬৬, কলিকতা-১০ দর্পণ কর্মসূচি থেকে প্রকাশিত

ভারত-পাক সরকারের যুক্তিবর-বিরোধী চক্রান্ত

ঢাকায় পাক সৈন্য পাঠানোর দিল্লী সহযোগিতা করতে প্রস্তুত



দপন

১৪শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ৪ শ্রুতবার ১২ই মার্চ ১৯৭১ ৪ দ্বিতীয় ০০ পৃ.

পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা

সেনাবাহিনীর মতে রাজ্য পুলিশের একাংশই দায়ী

(দপনের বিশেষ সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পূর্বই বিশ্বে পড়েছেন। ভাবা গিয়েছিল যে সেনাবাহিনী নামলেই আইন-শৃঙ্খলার অস্থায়ী উন্নতি ঘটবে। তাতে হয়ই নি, বরং সেনাবাহিনীর তরফেই যে রিপোর্টগুলি সম্প্রতি দিল্লী পাঠান হয়েছে তাকে বলা হয়েছে যে রাজ্য পুলিশের একাংশই আইন শৃঙ্খলার এই ক্রমবর্ধমান অবনতির জন্য দায়ী।

সেনাবাহিনীর মতে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশের একটি বড় অংশ সি পি এম নিখন যত্নে একটি প্রধান অংশ নিয়েছে এবং এদের সহায়তায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীর লোকেরা অনবরত মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের ওপর অক্রম চালাচ্ছে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তর্কগেই সি পি এম সমর্থকদেরও হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হচ্ছে, যার ফলে হাঙ্গামা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

সেনাবাহিনীর কর্তারাও কেউ সি পি এম সমর্থন নন। তাঁদের মতে সেনাবাহিনীর মর্যাদা রক্ষা পাবে যদি বাঙালদেশে অবিলম্বে এই শুনো-খুনি থামে। এবং তা সম্ভব নয় বতর্কণ না স্থানীয় পুলিশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপ বন্ধ করে।

এইসব রিপোর্ট দিল্লীতে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যার ফলে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এবং সেনাবাহিনীর কর্তা জেনারেল ম্যাকেনসন গত সপ্তাহে কলকাতার ছুটে আসেন। দপনের

নিজস্ব

বৃহস্পতি ও শ্রুতবার প্রেস বন্ধ করে এই সপ্তাহের দপন আজ মঙ্গলবার প্রকাশ করা হল। পুনরায় দপন প্রকাশিত হবে আগামী উনিশে মার্চ। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা ভিতরের পৃষ্ঠার।

সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন যে দপনেই সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেছেন যে রিপোর্টগুলি পুরোপুরি সত্য।

এর ফলে প্রধানমন্ত্রী নিজের দিল্লী ফিরে গেলেন, কিন্তু রেষে গেলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী শ্রীমতী নন্দিনী (শেখাংশ শেখ পৃষ্ঠার)

কংগ্রেসী গ্রেপ্তারের

অধিকার নেই

(দপনের সংবাদদাতা)

গত রবিবার বিকালের দিকে টালীগঞ্জ গলফ ক্লাবে হঠাৎ কিছু যুবক ঢোকে। তাদের হাতে একটি কোলা। ক্লাবের বেশ কিছু সদস্য তখন উপস্থিত।

যুবকেরা ক্লাবে ঢুকতেই সদস্যদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। এরা কারা? প্রশ্ন করতে এদের মধ্যে করেকজন নিজের কংগ্রেস কর্মী বলে পরিচয় দেয়। এর মধ্যে ওই দলের অন্যান্যরা পাঁচিলের দিকে চলে যায় এবং পাশের বস্তিসড়ির উপর বোমা ফেলতে থাকে—এই বস্তির অধিবাসীরা সাধারণত সি পি আই এম সমর্থক বলে পরিচিত।

ক্লাবে হৈ চৈ পড়ে যায় এবং স্থানীয় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ও কিছু সি আর পির লোক বখন আসে তখনও ওই যুবকেরা উপস্থিত। বখন কিছু সদস্য প্রশ্ন করেন এদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন তখন নাকি পুলিশ জবাব দেয়, “গ্রেপ্তার করার কোন অধিকার আমাদের নেই।” এর মধ্যে ওই যুবকেরা পালিয়ে যায়।

সেই সময় গলফ ক্লাবে বাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই হোমরা-চোমরা লোক। নিজেদের প্রিয় পুলিশের এই নিরপেক্ষতার নাকি তাঁরা হতবাক হয়ে পড়েন।

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

পূর্ব বঙ্গে স্বাধিকার দাবীর উত্তাল আন্দোলনে দিল্লী প্রচণ্ড ভীত। ওরা ভবে পূর্ব বাংলার আন্দোলনের রেশ পশ্চিম বাংলার অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তুলবে।

তাই দিল্লী মনে করে যদি পূর্ব বাংলার অন্দোলন মিলিটারী দ্বারা দমন করা যায় তা হলে পশ্চিম বাংলার এ ধরনের আন্দোলন হতে পারবে না। এখানে হত্যার সংবাদ প্রচার হলে মানব ভয় পেয়ে যাবে।

এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে দিল্লী ইস-লামাবাদ গোপন আলোচনা সূত্রে হয়েছে বলে প্রকাশ।

দিল্লী মেটামুটি রাজী হয়েছে ভারতীয় আকাশ দিয়ে সৈন্যবাহী

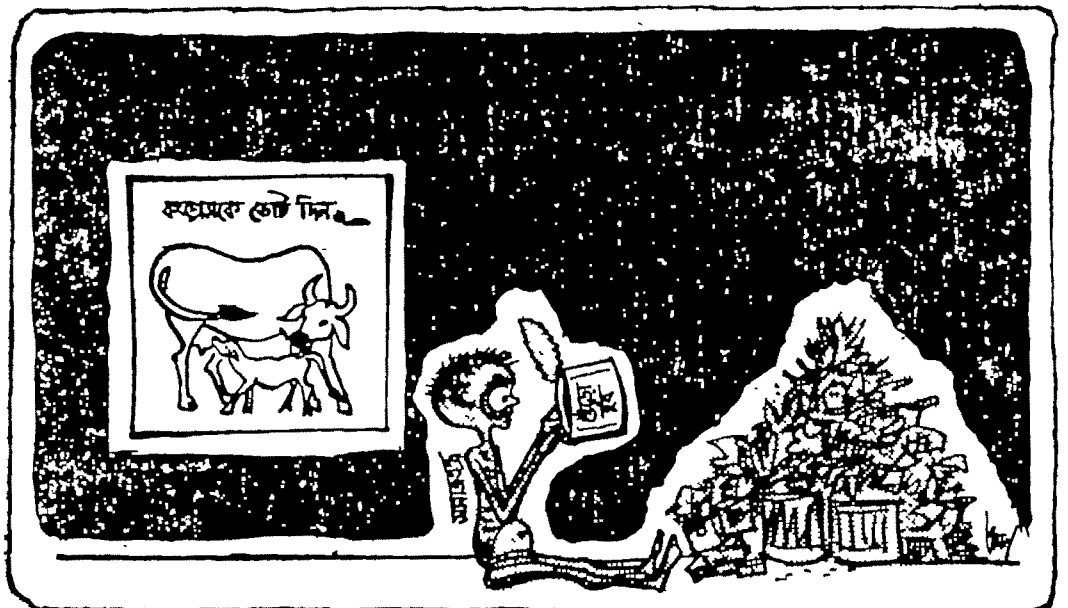
পাক বিমান চলাচলের সুযোগ দিতে। বিমান চলাচল বন্ধ ছিল ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় বিমান চড়ার পর। ভারত দাবী করেছিল কোন আলোচনা (শেখাংশ শেখ পৃষ্ঠার)

প্রিয়জনেন্দ্র বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতে বিফল

(দপনের সংবাদদাতা)

গত বারোই ফেব্রুয়ারীর দপনে প্রেসিডেন্সী জেলে নকশালপন্থী বন্দিদের ওপর জেলরক্ষী বাহিনীর নারকীয় অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হবার পর বন্দিদের মা এবং বোনরা উদ্ভিষ্ট হয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে

যান। কিন্তু বন্দিদের সঙ্গে তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি। জানা গেল, তাঁদের নানা অজুহাতে ধোঁরা হাচ্ছে এবং আজ পর্যন্ত তাঁরা দেখা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বলা হয়ে (শেখাংশ শেখ পৃষ্ঠার)



নির্বাচনের মুখে

সি পি এম কর্মীদের বেপরোয়া গ্রেপ্তারের আদেশ

(দপনের সংবাদদাতা)

নির্বাচনে সি পি এম-এর জয়ী হবার সম্ভাবনার পশ্চিম বঙ্গের শাসকগোষ্ঠী এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে পুলিশ অফিসারদের মৌখিক আদেশ দেওয়া হয়েছে : বত প্যারো সি পি এম কর্মী গ্রেপ্তার করো। আর তারই প্রতিফলন দলে দলে সি পি এম কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে বোগ দিয়েছে শাসক কংগ্রেস আর তাদের সঙ্গে মদদ দিচ্ছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা (সি পি আই) এখন সমস্ত ঘোষিত নীতি ত্যাগ করে বেশনে পালিয়ে সেখানেই শাসক কংগ্রেসকে মদদ দিচ্ছে। এই কমিউনিস্টদের নেতা হুশেন গুপ্ত মেদিনীপুরের জনসভায় তারপরে ঘোষণা করেছেন, বাংলা কংগ্রেস প্রতিফলনশীলদের দল। কিন্তু বরানগরে তাঁরা বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি অজয় মুখার্জীর

সমর্থনে নির্বাচন পরিচালনা করছেন। (সাবাস সি পি আই-এর রাজনীতি।) অবশ্য এর প্রতিফলনও দেখা দিয়েছে। বরানগরে বহু সি পি আই কর্মী নেতৃত্বকে অস্বীকার করে অজয় মুখার্জীর হয়ে কাজ করছেন না। দপন বরনগরের রাজনীতি পর্বা-লোচনা করে ঘোষণা করছে এখানে জোড়ি বসুর জয় অবশ্যম্ভাবী। বরন তমলুকে অজয় মুখার্জীর অবস্থা সুনিশ্চিত নয়। মেদিনীপুর জয় প্রফুল্ল ঘোষের রাজনৈতিক কবর খুঁড়েছে। এবারে দেখতে হবে অজয় মুখার্জীর রাজনৈতিক কবরও এখানে খোঁড়া হয় কিনা। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেতারা এখন আর নিজেদের এলাকা ছেড়ে বেরতে চাইছেন না। করণ তাঁদের প্রত্যেকেরই নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁদের নেতৃত্বে অষ্ট বাসের শরিকরা এখন ছড়ান। কংগ্রেস

রাজ রক তাঁদের সর্বজন প্রেমের নেতা হেমন্ত বসুর হত্যাকে নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে জনসাধারণের কাছে অপ্রাণ্য কুড়িয়েছে। হেমন্ত বসুর হত্যার কিনারা করার দাবী ওঁরা করেন নি। ওঁরা অনর্থক সি পি এম বিরোধী রাজনীতি করতে গিয়েছিলেন। দপনের কাছে খবর এসেছে কুচবিহারে কংগ্রেসের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গের শাসক কংগ্রেস এখন পুরোপুরি বিশ্বাভিত্ত। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিজয় সিং নাহার আর অন্যতম সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার শূক্রে একদিকে। অন্যদিকে সিদ্ধার্থ রায়। পরস্পরিক ষেয়েষেরি এমন পর্বারে পৌঁছেছে যে প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হইছিল। শাসক কংগ্রেস দলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হচ্ছে পুরোনো নেতৃত্বের সঙ্গে ছাত্র পরিষদের নেতাদের মনোমুখ। ছাত্র পরিষদের নেতারা বারবার পুরোনো নেতৃত্বকে উপহাস করে বাচ্ছেন। কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা মানছেন না। এর প্রতিবাদে বিজয় সিং নাহার করেকবার পদত্যাগ পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন। এদিকে বউবাজার কেন্দ্রে বিজয় সিং নাহারের অবস্থা এবার সঙ্গীন। সি পি এম প্রার্থী হাসিম আবদুল হালিম গরীব মনুদের প্রতিনিধিরূপে এবার (শেখাংশ শেখ পৃষ্ঠার)

নকশালগত ও আমাদের তরুণ সম্ভাবনা

নকশাল রাজনীতি অনেকটা যুদ্ধক্ষেত্রের আকর্ষকতা নিয়ে দেশের ভেতরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিতর্ক কিছুটা হয়েছে; কিন্তু এখনও পর্যন্ত হতাশার ভাবটাই আমাদের বিচার ক্ষমতার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয়, দেশের দ্বিপাক্ষিক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা যারা কারণে অকারণে লম্বা চণ্ডা বিবর্তিত দিতে অভ্যস্ত তারা প্রায় নিঃশব্দ।

কেনা জানে নকশালদের মতবাদ একটা রাজনৈতিক মতবাদ এবং রাজনীতি ভারত সেবাপ্রম সংঘের মানবপ্রেম বিতরণ করে না। রাজনীতিটা ভুল কি নির্ভুল স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ওদের একটা মতাদর্শ আছে, দৃষ্টিভঙ্গি আছে; একটা কর্মকৌশল আছে এবং বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ এই ভারতবর্ষে আমার আপনার ক্ষিত্রের মত পোষণের অধিকারও আছে। কিন্তু এটা কেমন কথা যে, সহিংসতার দর্শনে বিশ্বাসী ভারতবর্ষের পুলিশ তাজা তাজা ছেলেগুলোকে ধানার লক-আপে ঢুকিয়ে অথবা রাজপথে দাঁড় করিয়ে শব্দ জম্বুতর বিশ্বাসের জন্য গুলি বা অকথ্য অত্যাচার চালাবে আর আমাদের দেশের ভগবান তথাগতের শিষ্যরা প্রতিবাদে টু শব্দটি করবেনা।

কলকাতায় বিগত বাইশে এপ্রিলের মিছিল যারা দেখেছেন তাদের কাছে এটা অজানা নয় যে, বাংলা দেশের কিশোর-যুবকদের একটা ভিরাট অংশ নকশালগণ্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামিল হয়েছে। এদের বেশীর ভাগের বয়স ষোল থেকে পঁচিশ। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টাকে এরা একটি আদর্শে উৎসর্গ করেছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এরা অংশ নেননি। সেই আন্দোলনের রূপ প্রকৃতি এরা প্রত্যক্ষ করেনি। জাতীয় আন্দোলনের স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, মানসিকতার দিক থেকে নতুন যুগের ভাবধারার লালিত এই কিশোর যুবকেরা আজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে। আমি আপনি বিশ্বাস করে পড়েছি কিনা। তাই, স্বপ্ন দেখিনা। মাঝে মাঝে দৃষ্টিশ্রম দেখি। তাই ব্যঙ্গ করি, তুচ্ছ করি। কিন্তু, ভেবে দেখুন, একদিন আপনিও স্বপ্ন দেখতেন কিনা—সুভাষ বন্দুর আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুর ইচ্ছা থেকে এগিরে আসছে শুনে আপনাদের রক্তও নেচে উঠেছিল কিনা। আজ পৃথিবীর সীমানাটা ছোট হয়ে গেছে। এখানে ভিক্টোরিয়া, ওখানে কম্বোডিয়া। এপারে থাইল্যান্ড, ওপারে লাওস আসে-

মতামত

রিকা। পলধারি শোনা যায়। খবর এসে পৌছয়। ছেলেরা দামাল হয়ে ওঠে—রক্তে ঢেটে খেলে যায়। গান্ধী প্যাটেল নেহেরু ওদের মনে ধরে না। হো চি মিন ওদের রক্তে ফুল ফোটার। রেড বুক-রাইফেল ওদের চোখে বিস্ফোরিত করে। মাও সেতু-এর তর্জনি চলে আসে সীমান্তের বাধাকে ভিঙ্গিয়ে।

দেশ জুড়ে রক্ত ঝরছে। বেদনার কারণ বৈকি! কবে থেকে রক্ত ঝরা শুরু হল? ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সালে খাদ্য আন্দোলনে যে অত্যাচার মানুষের রক্ত ঝরেছিল কলকাতার রাস্তার সে কি শব্দিকরে গেল? সেদিন যারা কলম ছেড়ে বন্দুক ধরতে চেয়েছিলেন সেই সব বুদ্ধিজীবীরা কী বলেন?

কালিদাস কুন্ডু

না, আমরা মনে করি এইটাই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চরম বিকাশ। সুতরাং এই দুই ক্ষেত্রে তাদের কি রকম প্রতি-বিস্তারী নমনরূপটি আমাদের কাছে ধরা পড়ল।

এই দালাল গোষ্ঠী হামেশাই বলে যে নকশাল নামধারী সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের বোম-সাজস রয়েছে। এখানে কিন্তু আমরা দেখছি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। কিছুদিন পূর্বে কয়েকটা ছোটখাট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই হামলাবাজ ক্ষমতাবিস্তার দালালদের প্ররোচনার পুলিশ সাধারণ ছাত্রদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, কিন্তু আজ ওরা কলেজের দুটি হোস্টেল ম্যাকফারসন এবং ফ্রেসারকে বোমের আড়তে পরিণত করেছে। এই সেদিনও বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণের ফলে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে এবং দু-চার জন আহতও হয়, কিন্তু পুলিশকে একবারের জন্য ভুল করতে ওপথে যেতে দেখা যায় না। সুতরাং বোমসাজসটা কাদের সঙ্গে কার আজ আর কি তা আমাদের বলে দিতে হবে?

নরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সি পি এম কি প্রতিবিলম্বী?

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা সি পি এম কি মূখ্যসাধারী প্রতি-বিস্তারী মতামতটি সম্প্রতি আমিও সম্পূর্ণ একমত, আমরা কলকাতার যুগে বসে এই রকম প্রচুর উদাহরণ পাচ্ছি। এখানে তারই একটা নমুনা দিচ্ছি।

আমার বাসার পাশেই বেঙ্গল স্টেটেরিনারী কলেজ। ওটা নাকি সাক্ষাৎ বিপ্লবী সি পি এমদের শত্রু ঘাঁটি। কিছুদিন পূর্বে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দুঃস্থ প্রকল্পের সহকারী মিস্ট্র কমিশনারকে কে বা কারা ছুরিকাঘাত করে। ঘটনাটি স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রবল উদ্বেগের সৃষ্টি করে, কারণ সে একজন নিষ্কর্মা বৈতনিক ইতার প্রাণী বিশেষ, তার কাজই হচ্ছে কতৃপক্ষের দলালি করা এবং নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা। সুতরাং এইরকম পরিস্থিতিতে তাকে শ্রেণী শত্রু রূপে গণ্য করতে আমাদের কোনই অসুবিধা নেই। কিন্তু এত সব জানা সত্ত্বেও সি পি এম গোষ্ঠী বুদ্ধিজীবী মানবিকতা বোধে উদ্বেগ হলে লিফলেটের মাধ্যমে মিস্ট্রের মত প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিক্রিয়ালব্ধি গোষ্ঠীকে জানিয়ে দিল যে সি পি এম তোমার সঙ্গে আছে। এর কিছুদিন বাদেই দেখতে পাই কুন্ডু লেনে এখন একজন নরপিশাচ লাঞ্চারি তেলকল মালিক খুন হয় তখনও ঐ বিপ্লবীরা জমায়েতের মাধ্যমে শোক প্রস্তাব নিল এবং ঐ স্বাধীনতা-কামী জনগণকে প্রোত্তার করবার জন্য পুলিশের দরবারে তাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। আমরা এইরূপ এক একটি খতমকে শব্দ একটি মৃত্যু হিসাবে দেখি

বুদ্ধিজীবীদের উপর আক্রমণ

এইবার বাংলার বোধহয় বুদ্ধিজীবীদের উপর পুলিশী আক্রমণ শুরু হইল। এতদিন আমরা দেখতেছিলাম যে শুধুমাত্র ছাত্র, প্রমিক, কৃষক ও সংগ্রামী জনসাধারণের উপর এই আক্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল।

হাওড়ায় শিক্ষকদের উপর পুলিশী অত্যাচারের কথা কাগজের মাধ্যমে পড়িয়াছি। তথাকথিত গান্ধীবাদী নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়ের সুবোধ্য গুরু প্রীতিক্ষত্র ঘোষের নির্দেশে পুলিশের উত্তর-পাড়া কলেজের অভ্যন্তরে তাম্বু নৃত্যে অংশ গ্রহণ ও সম্প্রতি নয়া প্রগতিবাদী ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি ফোঁজ সি আর পি বাদবন্দুর বিপ্লববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে সভা জগতের নিদর্শন স্থাপন করিয়া ছিল তাহা সকলের জানা আছে। এইবার আমরা দেখতেছি যে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের প্রোত্তার করিয়া ধানার লক আপে বেদম প্রহার করা হইতেছে। সম্প্রতি আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক প্রীদেববর পাণ্ডাকে বরানগরের বাড়ী হইতে প্রোত্তার করিয়া বেদম প্রহার করা হইয়াছে। সেইজন্য আনন্দমোহন কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক ধানার গিয়া প্রতিবাদ করাতে পুলিশ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়াছে। প্রমথের দেবেশ্বর পাণ্ডা সি পি এম সম-র্থক, বাংলা কংগ্রেসের দালালীতে

অংশগ্রহণ করেন নাই, সেইজন্য তাহাকে পেটন দেবার অধিকার আমাদের আছে এই বলিয়া ধানার ও সি হমকী দিয়াছেন। শ্যাম-বাজার এ ডি স্কুলের একজন প্রমথের শিক্ষক সি পি এম-এর সম-র্থক হওয়ার জন্য তাহাকে ধানার ডাকিয়া লইয়া বাইরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হইয়াছিল। চমৎকার আমাদের এই বাংলাদেশের পুলিশবাহিনী। যতদিন জ্যোতিবাবুর হাতে এই পুলিশ দপ্তর ছিল ততদিন এই পুলিশ বাহিনী জ্যোতিবাবুর পিণ্ডী না দিয়া জলস্পর্শ করিত না। কারণ জ্যোতিবাবু ইহাদের যাকে তাকে পেটন দেবার ও ঘৃণা নেওয়া কথ

করিয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য তখন বাংলা দেশের সরকার ছিল অসভ্য এবং বর্বর।

ইংরাজ আমলে পুলিশ বাহিনীর/বে চরিত্র আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পড়িয়াছি এখনও ঠিক সেই চরিত্রই আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের বাংলা দেশের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে রহিয়াছে। ইংরাজ জাতি পেটন দিয়া ভারতের স্বাধীনতা-কামী বাঙালী ছেলেদের মাথা নোয়াইতে পারে নাই। এখন ইহারা কি পেটন দিয়া বাংলার সংগ্রামী জনসাধারণের মাথা নোয়াইতে পারিবে, সেটাই প্রশ্ন।

হানসী স্ত্রীচার্য

বঙ্গদর্শন

চমৎকার সরকার

শত্রু সমর্থ স্থায়ী সরকার গঠনই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য। ভোটের ফলাফল ঠিক করে দেবে অনিশ্চয়তার পরিবর্তে স্থায়ী সরকার গঠিত হবে কিনা, হত্যার রাজনীতির বদলে মানুষের মঙ্গলের কথাই রাজনীতির একমাত্র অবলম্বন হবে কিনা। অনেক প্রচেষ্টা হয়েছে মানুষকে দ্রাস্ত পথে পরিচালিত করার। এই প্রচেষ্টা তাদের সফল হয়েছে কিনা নির্বাচনে তার প্রমাণ মিলবে। হত্যার রাজনীতি, নিছক হিংসাত্মক মতবাদ, গণতান্ত্রিক পথে মূর্তি নেই আছে সংঘর্ষের পথে এই সব অতিবিস্তারী বক্তব্য এক-দিকে আর অন্যদিকে গণতন্ত্রের সমাজবাদের নামে অতিবিস্তারীদের সঙ্গে গোপন যুদ্ধযন্ত্র ইত্যাদি নানা খেলা পশ্চিমবঙ্গে চলেছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের জন্য এই রাজ্যে সৈন্যবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছে। যদি নির্বাচনে দ্রাস্ত পরিবেশ সৃষ্টির ফলে স্থায়ী সরকার গঠিত না হয় তা হলে এখানে পুনরায় রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হবে আর এই শাসন তখন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অধিকতর বোম-ধোলে চালান হবে। পূর্ববঙ্গেও এই পন্থায় অনেক অগ্রগতি নেওয়া হয়েছিল। সেখানে বহু রাজনৈতিক দল মানুষকে দ্রাস্ত পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার ব্যর্থ হওয়ার পর মিলিটারী শাসন প্রবর্তন করা হয়। পূর্ববঙ্গের মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করে এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও দাবীর যৌক্তিকতা প্রকাশ করে।

পূর্ববঙ্গের নির্বাচন বা অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার দেখা গেছে যে, বিপ্লবীদের ইচ্ছায় মানুষ গণতন্ত্র বজ্রন করে না। সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে কারোমী স্বার্থ ও

শাসক শ্রেণী নিজেরাই গণতন্ত্র বজ্রন করে একনারক্যের পথে যায়। কারোমী স্বার্থের নিজের প্রয়োজনে যতদিন গণতন্ত্র বজ্রন রাখার দরকার ঠিক ততদিনই এই পন্থায় কার্যকরী রাখে। পূর্ববঙ্গের নির্বাচনে মজিবুর রহমানের পক্ষ সঠিক ছিল কারণ তিনি তাঁর পথে সারা পূর্ববঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন। সেখানে তথাকথিত ঐক্যের খাতিরে অন্যান্য দল উপদল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধযন্ত্র করার চেষ্টা করেন নি। তবে তাঁর একটা সুবিধা ছিল। তা হল এই যে পশ্চিমবঙ্গের মত ওখানে দেশী বিদেশী কারোমীস্বার্থ এত সংগঠিত ছিল না। বার ফলে এই স্বার্থের অনুকূল অর্থপদ শক্তিশালী জন-বিরোধী দলসমূহ প্রচারে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। পশ্চিমবঙ্গের বোমা, পিস্তলের রাজনীতির পেছনে আর তথাকথিত পার্টি-বাজির পেছনে কারোমীস্বার্থের অজল্ল অর্থ আছে। এটা খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু এখনও মানুষ বিভ্রান্ত থাকে সম্ভব। আর এই বিভ্রান্তিই আজকের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মূল কারণ।

তবে এর মধ্যেও আশার আভাস আছে। এ রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসকে নিজের শত্রু ভেবে কোন নির্বাচনেই বেশী ভোট দেয় নি। ওরা সরকারী গদী কম ভোট পেয়েই বরাবর অধিকার করে এসেছে। ১৯৬৭ সাল থেকে হাওয়া অনাদিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু কংগ্রেস পার্টি পরাজিত হলেও তার বশব্দবরা রয়ে গেছে। আজ তাদের চেষ্টা আবার কি করে এই দলের প্রতিপত্তি বাড়ি। মনে হয়, হাওয়া যে মোড় ১৯৬৭ সালে নিয়েছে তা আর ক্ষিত্রের কৌশলে ঘোরানো যাবে না। যে সমস্ত দল বিভিন্ন কায়দায় কংগ্রেসের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করছে তারাও জনমানসে কোন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয় না।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের ক্রুর উল্লাস

রাজ্যসভা মন্ত্রিক

২০ তারিখ শনিবার। সারা নতুন মিলি সরকার। বাসে সংবাদপত্র অকস্মে, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে, রাজনৈতিক শব্দীমহলে। শুভব-ওয়ালারা পোড়ায় হেমন্ত বস্তুর আয়গায় জ্যোতি বস্তুর নাম চালাবার চেষ্টা করে, ছিল, ইচ্ছাকৃত অজ্ঞানতার ভাণ করে। বিজ্ঞ শব্দ পর্বত সত্য শব্দ সত্যই উদ্ভাসিত হল; এখন বাংলার জন্তে মায়ী কায়ী, তবে বড় সড় অক্ষসার মহলে একটা গোপন উল্লাস। বেন ঘটনা ঘটে থাকার পরে বিজ্ঞের সানন্দ আশ্বস্তপ্রসঙ্গ।

কেন্দ্রের বরাট বিভাগের মুখ্য সচিব গোবিন্দ মহারাজী এই সেমিনেই রাজ্য-সরকারের সচিবদের মিটিং তেকে যেভাবে “হিংসা”র ঘটনা সম্পর্কে এবং “আইন ও শান্তি” বজায় রাখার উপদেশ দিলেন, তাতে মনে হবার কারণ ঘটে যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটবে পূর্বাভাসেই তা আঁচ করে নিয়েছেন— বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলায়।

আজ একথা আর অজানা নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রাজনৈতিক সংগঠন পশ্চিম বাঙালয় “বামপন্থী” হলগুলির খিসিস-সর্ব্ব স্বর্গপদ্ধতি এবং তার দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য রাখে। তথ্য এবং হৈনন্দিন রিপোর্ট (অল্পপ্রতিষ্ঠ গুপ্ত-চক্রদের তরফে প্রাপ্ত) ভাল করে যাচাই করে এই বিভাগ যে মোক্ষম প্রাণ-প্রাণীটার চেষ্টা করছে ১৯৬৭-এর মার্চ মাস থেকেই, অর্থাৎ দ্বিতীয় বার যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার প্রায় প্রথম সপ্তাহ থেকে, তার “সুফল” তারা পেয়েছে—পশ্চিম বাংলার “বামপন্থীদের” আত্মঘাতী “কলহের তীব্র প্রায় ও অনমনীয় মনো-ভাব অনিত কটিন সঙ্কেটে। এ সম্পর্কে রূপে একাধিক একাধিক লেখায় ঘেঁষেছি যে কেন্দ্রের উক্ত বিভাগ অতি সহজেই পশ্চিম বঙ্গ বামপন্থী হলগুলির ক্যাডার এবং নেতৃবর্গের মাঝে পারস্পরিক তিক্ততা, ঈর্ষান্বিত অসহিষ্ণুতা, এবং জুড় প্রতিক্ষাসমূলক পার্টী আক্রমণ ও পুনঃ আক্রমণের কলুষিত চক্রের ব্যবস্থা করতে পেরে-ছিলেন। সেজন্য যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত করা সরকার, তার অতিরিক্ত তারা পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কলঙ্কতার, এবং বেশি বিদেশী বৃহৎ ব্যবসায়ীপুট কার্যমী স্বার্থের কাছে। বর্তমান শত্রুর অচেন আমদানি সমাজ-কোষী ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের হাতে সর-

বরাহ হয়েছে, তার এক সামান্য তদ্রূপেও পুলিশ যে ধরতেও পারেনি তা সারা বড়বড়টির বৈশিষ্ট্য। স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই অল্পবয়স্ক বিদেশী গুণ্ডাদের কৃত্ত্ব।

এই সপ্তাহে বহিঃবিভাগী শাসক-বর্গের মুখপত্র সংবাদপত্রগুলির পশ্চিম বঙ্গে নির্যাতন স্থগিত রাখার পক্ষে ওকালতী, অস্বাচিত পরামর্শ (সরকারকে) এবং ঘোমটাচাকা ভীতি-প্রদর্শন লক্ষ্য করা যায়, তাহলে অভি-বিশ্বাস্য, উদ্ভাসিতপ্রায়ী ক্ষমতা-রাজনীতির প্রয়োগ ঘটা পড়ে। নির্বাচন ঘোষণা হবার আগের দিনই এমনি এক মুখপত্র প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলাগত স্বাভাবিকতা না আসা পর্যন্ত নির্বাচন যে অস্ব-স্তিত হবে না, সে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে স্বরণ করিয়ে দিয়েছিল, এবং পঃ বঙ্গ রাজ্য বিধান সভার নির্বাচন হতে দেবার সুঁকি সম্পর্কে লিখেছিল “পুলিশ হয়তো আবার নিজের হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে যে, সি, পি, এম এবং তার সহযোগী হলগুলি ক্ষমতার প্রত্যাবর্তন করবে।” (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৬ ডিসেম্বর ’৭০)

নির্বাচন হবার সঙ্গে সঙ্গে কার্যমী স্বার্থের স্বার্থান্বিতদের কল্যাণ এবং তাদের পোষা গুণ্ডাবাহিনীর তৎপরতা বেড়ে চলছে। তাদের উদ্দেশ্য মোটামুটি এই—বিরোধী হলগুলির সক্রিয় এবং প্রভাবশালী কর্মীদের, এবং নেতৃবর্গের সেই ব্যক্তিদের বেছে বেছে আক্রমণ—সম্ভব হলে শেষ করা, বামের জনমানসে আকর্ষক ভাবমূর্তি রয়েছে। ফলে বিরোধী হলগুলি পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঘেঁষ এবং তিক্ততা এক অসম্পন্ন শত্রুসমূলক আক্রমণ, পার্টী আক্রমণ, হিংসা ও প্রতিহিংসার ঘটনাচক্রে আটকা পড়ে যাবে, জনজীবন হয়ে উঠবে অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খল, পরে এই অস্বাভাবিক ও অব্যবস্থিত আবহাওয়ার অচ্ছন্নত নিয়ে, স্বেচ্ছাবে বাব বার কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-নির্ধারণ ক্যাবিনেট সাবকমিটির ওপর, প্রস্তাবের ছলে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্থগিত রাখার জন্ত চাপ আনবে।

তবে শাসকশ্রেণীর অন্তরটিপুনি সঙ্গেও শাসকবল আজ শিঙি মাই গেলার অবস্থার পড়ে গেছে। তাদেরই প্রত্যাশিত গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগের চক্রাঙ্ককারী কার্যপদ্ধতিতে আত্মকল্যাণ অর্থ সমর্থন দিয়ে চলায় কলে আজ পশ্চিম বাঙালয় প্রয়োজনীয় হামলা-

বাজীর (বামপন্থীহলগুলির ওপর) খেলা যুগে এসেছে কেন্দ্রেই মাথায় বুকেরোত্তের মত। কারণ সমাজ-কোষীরা প্রকৃতই কারও কেনা হয়ে চিরদিনে থাকেন। তাছাড়া টাকা দিয়ে বিবেকহীন জীবনের চিরকাল একটিকে লেলান যায় না—পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রগতিশীল চেতনার স্তর এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালীন দুই দশকের সংগ্রামী পরম্পরা, তাদের স্পষ্ট বিবেককে নাড়া দিয়ে কখনও কখনও দৃষ্টদর্শন-শক্তির বিরুদ্ধেই লড়াইয়ে মাতিয়ে দেয়। কেন্দ্রের সর্বোচ্চ ইন্টেলিজেন্স বিভাগ এটা লক্ষ্য করেছে, কিন্তু বহুদিন ধরে অচ্ছন্নত গোয়েন্দা বিভাগের পুরোনো কার্যপদ্ধতি বহলাতেও পারছে না। সাম্প্রতিক কাল কেন্দ্রের ইন্টেলিজেন্সে বিভিন্ন বিভাগীয় অসংহতি এবং আরি ইন্টেলিজেন্স তথা রাজ্য ইন্টেলিজেন্স ও পুলিশ বিভাগের মাঝে সঙ্কটের এবং কার্য-সমর্থনের অভাব দৃষ্টকটভাবে ঘটা পড়ে গেছে কামীর থেকে ভারতীয় এয়ারলাইনের বিমান অপহরণের ঘটনা উপলক্ষে। পশ্চিমবাঙালয় চালু রাখা উক্ত গোয়েন্দার মাঠের প্রানের অনিবার্য পরিনতি—গণ-তান্ত্রিক নির্বাচনীপদ্ধতির আপন-আপনিই কলঙ্কিত হয়ে যাওয়া।

অথচ এর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মান, এবং গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্র হিসেবে তার চেহারা ও প্রভাবকরী শক্তিকে বিনষ্ট করে দেবে। সুতরাং নির্বাচন হতে দিতেই হয়; কেবল তাই নয়, সম্ভব হলে আরি টহলদারীদের পাহারায় এক হস্তকর ঠাঁট রাখা উচিতও। তাই অতি সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রীকে বলতে হয়েছে নির্বাচনী কার্যক্রম অপরিবর্তিত রাখার স্বপক্ষে—যদিও মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ইনিই পশ্চিম বাঙালয় জনগণের এই আত্ম-নিরস্ত্রাধিকার বাতে প্রয়োগ না হতে পারে সেই দিশায় সর্ববিধ ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করছিলেন।

উল্লেখ্য, শাসক বংশের বর্তমান ভ্রাতাং সি, পি, আই, তার রাজনৈতিক পার্টী-মুখি অরান রাখবার ভালে বিরূতি দিয়েছে, যুগাইটেড লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের বকলমে যে অন্তর্ভুক্তকালীন নির্বাচনকে স্থগিত রাখার তারা বিপক্ষে। সঙ্গে এস, এস, পিও ভাল দিয়েছে।

বস্তুতঃ আজ পশ্চিম বাঙালয় সংযুক্ত মোর্চা সম্পূর্ণ ক্ষয় এবং প্রকৃত বামপন্থী

শক্তিরেত্র ঐক্য নষ্টনাবুহ করে দেবার হস্তোদ্ধাস দিল্লীর শাসক শ্রেণীর উচ্চ মহলে শোনা গেলেও, শাসক হলের দায়িত্বশীল মহলে ঠিক ঐ সুরে আওয়াজ শোনা যায় না। নতুন মিলি জানে, তাদের পছন্দসই বে-সমস্ত “বামপন্থী” হল এবং তাদের মোর্চা, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার পরোক্ষ আত্ম-কল্যাণ ছাড়া “বাঙলা বন্ধ” বা এমন কি শহীদ-দিবসও পালন করতে অক্ষম, সেই হলগুলি পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে রাজ্য বিশেষে ক্ষমতাবাহী হতে চায়; এই চাওয়ার বাগড়া দিতে গেলে নিত্যন্ত আহা-মুখিই হবে। তাই সি, পি, আই-এর প্রতিজ্ঞা “শেট্টিংস” আজ ইমার্জেন্সী-কালীন অবস্থাকেও স্বাগত করতে প্রস্তুত কিন্তু সি, পি, এম-এর বিরুদ্ধে কটকটিত হুঙ্কার অভিযোগে জেহাদ চালানয় কান্ড দিতে নারাজ। [“হিংস্রতা বা (সি, পি, এম) বিশ্বাসভাজনরূপে গৃহীত হতে চায় তো তাদের হলকে অতীতের বহু দুর্ভিক্ষের জন্ত দোষ স্বীকার করতে হবে, ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রধান সম্পাদকীয়]।

বলা বাহুল্য, সি পি আই ও অন্ত গোষ্ঠীর কোনো হলই এভাবে উদ্ভাসিত প্রমাণহীন অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে কৃতজ্ঞালিপুঞ্জ বশবদ হতে চাইবেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার সাম্প্রতিক নির্বাচনী সফরে বলেছেন,

“দেশের ভবিষ্যৎ গোঁয়ার হবে যদি কেহে কোট বাধা দলীয় সরকার গঠন করতে হয়।” অর্থাৎ নির্বাচনের পরে একদলীয় সরকারের কার্যমী ক্ষমতা এবং আপন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক এক-নায়েকতাই চান। হায়, সি পি আই, সি এস পি, প্রমুখ গণতান্ত্রিকতা ও সমাজবাদের, “আন্তে আন্তে” সমাজ-সংস্কারকামী সহজিয়া পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হলগুলি। কেন্দ্রে ক্ষমতা-শরিকানার স্বপ্নধ্বংস যে যেতে বসলো।

প্রসঙ্গতঃ আদি বংশের পার্টি-সচিব শ্রীভ্রামর মিশ্র হেমন্ত বস্তুর মৃগংস হত্যা উপলক্ষে সরকারের ওপর, বিপক্ষীয় হলগুলির প্রার্থীদেরকে একে একে শেষ করার অভিযোগ এনে-ছেন। তিনি শাসক বংশেরকে যে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগে অভিযুক্ত করে-ছেন, তা থেকে রেহাই ইতিহাস তাদেরকে দেবে নাঃ কার্যপঞ্জী ১১ মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের শাসনাবধীম! যে কোনো দলের প্রার্থী, কর্মী এবং নেতাদেরকে রক্ষা করা—জীবন যদি সর্বোচ্চ সম্পত্তি বলে গণ্য না হয় ভারতের সংবিধানে, তাহলে বস্তুতঃ কথা—কেন্দ্রীয় সরকারের মৌলিক কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন থেকে সরে গিয়ে, অছিলি খোঁজার জন্ত কোনো হল-বিশেষের ওপর অবরোধ অথবা প্রচার চালানো শুধু নীতিহীন রাজনীতির ব্যক্তিচর্চাই নয়, তা পশ্চিম বাঙালয় মানুষগুলিকে অতৈক্যে অর্জব, আত্মভীতি দিশাহারা, এবং স্বাভাবিক লড়ায়ে অক্ষত হবে দিয়ে; কেন্দ্রের ভাবেবার বানানর কবর্ষ অপকোশল।

অশোক সেন লেখক ও

শিক্ষীদেরও উকিয়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

“বসুদেবতা” পত্রিকার ফটক বন্ধ করে দিয়ে পত্রিকার বেনামদার মালিক উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅশোক কুমার সেন শব্দে এই পত্রিকার কর্মীদেরই পেটে মারেন নি বহু শ্যাত অশ্যাত লেখক শিল্পী সাংবাদিকদের পাওনা টাকাও আত্মসাৎ করে বসে আছেন। “বসুদেবতা” সংবাদ প্রতিষ্ঠানের তিনটি পত্রিকা, দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিকের নিয়মিত এবং অনিয়মিত লেখক সাংবাদিকরা তাঁদের সাম্প্রতিক আদায়ের কোনো পঞ্চমী ঋণে পাচ্ছেন না। মামলা করে এদেশে ন্যায় প্রাপ্য আদায় করা সুদূর পরাহত ব্যাপার। তাছাড়া লেখক সাংবাদিকরা সহসা এ পথে তাঁদের প্রাপ্য আদায়ে সংকোচ বোধ করেন। অশোক সেন ভ্রমজনের মতো এঁদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি অপরের প্রাপ্য আত্মসাতের অশুভ পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন যদিও নির্বাচনী আসরে জনগণের জন্য তাঁর দরদ ইনিই বিনিময়ে উপহাস পড়তে শোনা যাচ্ছে।

কাগজের নিয়মিত ও বিশেষ

সংখ্যায় বারী লিখে ছবি এঁকে দীর্ঘদিনের বকেয়া সাম্প্রতিক আদায় করে উঠতে পারেন নি তাঁদের নামের দীর্ঘ তালিকা এখানে প্রকাশের পক্ষে স্থানান্তর জনিত অসুবিধা আছে। আমরা কয়েকটি সর্বজন পরিচিত নামের উল্লেখ করছিঃ

সর্বপ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, পরিমল গোস্বামী, অক্ষয়শঙ্কর রায়, জ্যোতি রিম্র নন্দী, হরিপারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়, বাপী রায়, দীনেশ দাস, মণীশ ঘটক, সুভাষ মৃধো-পাধ্যায়, আশুতোষ মৃধোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র মিত্র (মিট্রেন) রঞ্জিতকুমার সেন, ভবানী মৃধো-পাধ্যায়, রাম বসু, অসীম মৃধো-পাধ্যায় এবং আরও অনেকে। শিল্পী সঞ্জয় ও মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত অনেক টাকা পাবেন।

শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসুকে কর্তৃ-পক্ষ একটি ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ওপর চেক দিয়েছিলেন যা অগ্রাহ্য হয়ে ফেরৎ আসে। অগ্রাহ্য হওয়ার ‘অগ্রাহ্য ও অন্তর্ভুক্ত’

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রার্থীতালিকা

মুর্শিদাবাদ

করাচী—কাজলেশ্বরী আদি কং, জবীর কুমার সাহা নব কং, জিরাতি আলি সি পি এম, সিদ্দিক হোসেন এস ইউ সি, জোহা আহমদ মুঃ লীগ, মহম্মদ হামসিন বাঃ কং।

সুতী—আবুল কালাম নিঃ, এক-কড়ি গোপাল সরকার নিঃ, বিজয়কৃষ্ণ সরকার নিঃ, শিশু মহম্মদ আর এস পি, ইয়াহ আলি নিঃ, মহঃ সোরাব নব কং, হবিবুর রহমান এস ইউ সি, সাহমহম্মদ বিশ্বাস মুঃ লীগ।

জলপাইগুড়—সুভদ্রাভোম ভোম নিঃ, আসরফ হোসেন নব কং, রাজারাম মুন্ডা নিঃ, অচিন্তা সিংহ এস ইউ সি, বাদফিন আহমদ মুঃ লীগ, অরুণ দাস নিঃ, আবদুল হক আর এস পি প্রমোদ চ্যাটার্জী আদি কং।

সাগরীয়া—বতীন্দ্রনাথ রবিদাস মুঃ লীগ, বিজয় সরকার আদি কং, কুবের চাঁদ হালদার নিঃ, স্বর্নধর সাহা ইউ এল এক-নিঃ, বীরেন্দ্রনাথ দাস বাঃ কং, অর্চনা দাস আর এস পি, অতুল চন্দ্র সরকার নব কং।

লালগোলা—আবদুল সত্তার কং, মঈনুদ্দীন দাস আদি কং, মহম্মদ হুজিবুর রহমান মুসলীম লীগ, শচীন নাথ দাস নির্দল।

ভগ্নমহলগোলা—কজল সরকার বাঃ কং, মহম্মদ হোসেন নব কং, মঈনুদ্দীন মণ্ডল জনসংঘ, মহম্মদ সমাদ্দ বিশ্বাস মুসলীম লীগ, হজিবুর রহমান নির্দল, রাসিম হুগার এস এস পি, শেখ কাজিমুদ্দিন মহম্মদ নির্দল।

মহাশীল—আবদুল বারি বিশ্বাস নব কং, কমলচন্দ্র পাণ্ডে আর এস পি, চুর্গাপা সিং আদি কং, বীরেন্দ্রনাথ দাস নির্দল, মহম্মদ আলি শেখ মুঃ লীগ।

জলজী—আবদুল হোসেন সরকার সি পি এম, তরুণ কান্ত সরকার নির্দল, বীরেন্দ্রনাথ তালুকদার জনসংঘ, মহম্মদ আজিম আলী নব কং, মহম্মদ আজিমুল্লাহ সাহেব মুঃ লীগ, সোলেমান মণ্ডল নব কং।

মুর্শিদাবাদ—আজিজুর রহমান নব কং, আতার রহমান সি পি এম, আহমদ জলিমুদ্দিন মুঃ লীগ, প্রমুদ-কুমার সরকার জনসংঘ।

ভোমকল—দেবীপ্রসাদ মজুমদার নির্দল, বিশ্বাস অজমল হক নব কং, মহীতুল ইসলাম বোম্বাকর মুঃ লীগ, মহম্মদ বারি সি পি এম, মহম্মদ আকতার আলি নির্দল, সুনীল ব্রহ্মচারী জনসংঘ।

মণ্ডলা—দান নাসিরুদ্দিন মুঃ লীগ, অরুণকুমার বিশ্বাস আর এস পি, জবীর কুমার দাস দাস নব কং, অনাথবল্লু পাণ্ডে নির্দল, রমেশচন্দ্র বিশ্বাস জনসংঘ, শেখ কইয়ুদ্দিন আহমদ সি এম।

রায়গঞ্জ—উদিত শিকদার আদি কং, মানস রায় সি পি এম, ডাঃ রমেশ নাথ দত্ত নব কং, নিখিল কুণ্ডু সি এস পি।

কালিয়াপাড়া—ডাক্তার প্রসাদ বর্মণ আদি কং, অরুণালাল সরকার গোঃ লীগ, হেবেন রায় নব কং, হেমন্ত রায় বাঃ কং, নমী রায় সি পি এম।

ইটাছার—দেবকুমার রায় আদি কং, ডাঃ অরুণালাল আমেরীন নব কং, শচীন চক্রবর্তী সি পি আই, সঞ্জীব বসু সি এস পি।

মালদা—ইংলিশ বাজার—করিমুদ্দিন আমের মুঃ লীগ, নিখিলবিহারী গুপ্ত নব কং, বিমলকান্ত দাস সি পি আই, শৈলেন সরকার সি পি এম, হরিপ্রসাদ মিত্র জনসংঘ।

গাজোল তপ উপঃ—বুধাই বেনরা, সি পি আই, বেনজামিন হেমরম বাঃ কং, লক্ষণ সরেন আদি কং, অরুণ মুন্ডু সি পি এম।

হারিবল্লু তপ উপঃ—জন হেমরম নব কং, বসন্তা মুন্ডু আদি কং, রবীন্দ্রনাথ হেমরম বাঃ কং, সরকার মুন্ডু নিঃ শিবনাথ প্রমোদ সি পি আই।

হরিশ্চন্দ্রপুর—বিক্রম তট্টাচার্য নব কং, বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র আদি কং, মহঃ ইলিয়াস রাজী নির্দল, মহম্মদ নির্দল, সীতারাম বারি বাঃ কং।

মানিকচক—চুর্গাপ্রসাদ সেন সি পি আই, হরিশ্চন্দ্র মণ্ডল নব কং, সুধেন্দু তা সি পি এম, শেখ বিবির বসু আদি কং।

কালিয়াপাড়া—মুন্ডুল ইসলাম সি পি এম, প্রমোদরঞ্জন বসু আর এস পি, বোগেন্দ্রনাথ সরকার কং বঃ, সামসুদ্দিন আহমেদ নব কং, সুনীলচন্দ্র মণ্ডল নির্দল।

ধববা—গোলাম ইয়াজমানী সি পি এম, সৈয়দ আলি মুঃ লীগ, মহম্মদ হক নব কং, ববলাকান্ত সরকার বাঃ কং, জবীরকুমার দাস আদি কং।

রত্না—আলি আবেদ নিঃ, মহঃ আসকাক সি পি আই, নীরেনচন্দ্র সিংহ নব কং, নিঃ, মহম্মদ আলি সি পি এম, বিশ্বাস মহম্মদ নৈমুদ্দিন আদি কং, বিজয়কুমার চৌধুরী বাঃ কং।

জলপাইগুড়—গুয়াহাট নিঃ, আনন্দ-মোহন দে আদি কং, আবদুল বরকৎ গণি খাঁ চৌধুরী নব কং, হবিবুর রহমান মুঃ লীগ, হুমায়ুন চৌধুরী নিঃ।

আলদহ—গোবিন্দ বিহারী আগর-ওয়ারা আদি কং, জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নির্দল, বীরেন্দ্রনাথ দাস বাঃ কং, মহম্মদ রত্নকান্ত মিত্র সি পি আই, মহম্মদ গোবিন্দ রহমান নব কং, মহম্মদ ইলিয়াস সি পি এম।

গোঁড়া লীগ, পদ্মবাহাদুর ভট্ট নব কং, আনন্দপ্রসাদ পাঠক সি পি এম, ইন্ড্র-বাহাদুর বাজারি আদি কং।

শিলিগুড়ি—অরুণকুমার মৈত্র নব কং, বীরেন বসু সি পি এম, অনন্ত রায় চৌধুরী বাঃ কং, রণজিৎ চ্যাটার্জী সি পি আই, সি। দাওয়া লামা নির্দল, পকানন তালুকদার নির্দল।

কাসিগুয়া—ঈশ্বর ত্রিপুরি নব কং, পান্ডাস মিনজ সি পি এম, তেজা গুপ্তা আদি কং, গোপাল হাসদা কং, বরিয়স টিগা বাঃ কং, অনজুল্লু বরমু নি, জোসেফ মুন্ডা আর এস পি।

পশ্চিম দ্বিজপাড়া র বালুগুয়াট : বীরেন্দ্র রায় নবকং, বতীন চক্রবর্তী আর এস পি, দ্বিগীপ-কুমার চৌধুরী কং সঃ, জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী সি পি আই, অরুণ ব্যানার্জী আর সি পি আই, চুনীলাল নিরোঙ্গী নির্দল।

তপন তপঃ : পটরাণ হেমরাম নব-কং, বসন্ত গুপ্তা আর এস পি, রবীন বরমু সি পি আই, হিলু বরমু সি পি এম, হাকাই মারি আদি কং।

পদারামপুর : অরুণ সরকার সি পি এম, মসলেকুদ্দিন আহমেদ নব-কং, ভূপেন চৌধুরী সি পি আই লক্ষণ লাল পারিক বাঃ-কং, শ্রীপদ সরকার আর এস পি, বীরেন্দ্রনাথ প্রমোদী আব সি পি আই।

কুমারগঞ্জ : হিগেন্ড সরকার বাঃ কং, প্রবোধকুমার সিংহবার নব কং, বামিনী মজুমদার সি পি এম, বহিমুদ্দিন সরকার সি পি আই, আবদুল জব্বার মিত্র আর এস পি।

চোপরা : বাচ্চামুন্ডী সি পি এম, প্রেম বিহারী ঠাকুর কং বঃ এনাঙ্গুল হক আদি কং, আজিজ আহমেদ মুঃ লীগ, হিরিকুমার চৌধুরী বাঃ কং, কবির চৌধুরী নব কং, আহমেদ আকস সি এস পি।

গোয়ালপুতুর : ঈশাক এস এস পি, মহঃ সালিমুদ্দিন সি এস পি, বসিরুদ্দিন সরকার আদি কং, শরাকৎ হোসেন নব কং, নিজামুদ্দিন মুঃ লীগ, রাজেন্দ্র মসকরা বাঃ কং, নাসিরুদ্দিন আমীঃ সি পি এম, মহঃ ইসমাইল নির্দল।

করণদীঘি—আবদুল হাকিম সি পি এম, সুরেশচন্দ্র সিং কং বঃ, গোপীনাথ সিং আদি কং, অনিল দে সরকার নির্দল, হাজি সাহজাদ হোসেন নব কং, হাসদা জোহান নির্দল, শেখ হাসিব সি এস পি।

কুমারগুড়ি : রমণীমোহন সম-কার আদি কং, বোগেন রায় আর এস পি, বতীন রায় নব কং, তুপাল সরকার সি পি আই, আশানন্দ সরকার সি পি এম।

পি, ভবানী পাল নব কং, বিমল ভট্টা-চার্য বাঃ কং, মনসা মুন্ডা আহিবাসী গোরখা লীগ, গুরজুদীন (নি), হুরেশ দে সি পি এম, লক্ষণ দাস সাও-তাল আর এস পি।

কালাকাটা তফঃ—অরুণালাল রায় নব কং, বীরলাল সিংহ আদি কং, অরুণ বর্মণ সি পি এম, নৃপেন্দ্রনাথ রায় এস এস পি, পকানন মর্দন (নি) দেবেন্দ্র বর্মণ আর এস পি, হিতেন রায় (দি)।

মাল তফঃ উপঃ—অ্যান্টনিটোপোনে নব কং, হুসু ভগৎ আদি কং, গুরুচরণ গুপ্তা সি এস পি, অর্জুন গুপ্তা সি পি আই, জগদীশ গুপ্তা সি পি এম, এল-সিরা মিনচ আর এস পি, আপলু গুপ্তা ইউ কে।

নাগরাকাটা তফঃ উপঃ—অজুন মাহাত আদি কং, এল এল এল লাকরা নব কং, পুনাই উতাও সি পি এম, মজর ভগত আদিবাসী গোরখা লীগ, সোমা গুপ্তা সি এস পি।

আলিপুরজুর—ননী ভট্টাচার্য আর এস পি, রামচন্দ্র রায় সরকার উত্তর।

নির্দল, কানাইচন্দ্র গোস্বামী বাঃ কং, নারায়ণ ভট্টাচার্য নব কং, জ্যোতিপ্রকাশ মোক্তার নির্দল, রজিত দাসগুপ্ত নির্দল, শচীন্দ্রলাল পাণ্ডা এস এস পি।

কুমারগ্রাম—দীপু মুখার্জী নব কং, হুরেশ তালুকদার আর এস পি, নিতাই দাসচৌধুরী সি পি এম, শ্রীমতী অনিমা হোড় আদি-কং, ললিত ব্যানার্জী আহিবাসী গোরখা লীগ, বেনজামিন সরেন নি, বীরেন সরকার কং বঃ।

কালচিনি তফঃ—ডেনিস লাকরা নব-কং, ববীন ব্রহ্ম আদি-কং, আরখার গুপ্তা আব এস পি, ইমামুল কুদ্দুস কং বঃ, ফিলিপ মিনজ আহিবাসী গোরখা লীগ, রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রমনি নির্দল।

মাছারিগাট তফঃ-উপঃ—বীরেন্দ্রনাথ নারজিনারাই আদি-কং, এ এইচ বেস-টারউইচ আর এস পি, পবনকুমার রায় নব-কং, বুধরা মাহালি এস এস পি বিলাস ভগৎ সি পি এম, কুজিবাম পাহান আহিবাসী গোরখা লীগ, সোমরা গুপ্তা নির্দল।

হারজিলিং কালিগলং—মহনকুমার প্রধান গোঁড়া লীগ, সোনাং গুয়াংহি নবকং, পদ্মশ্রী ব্রহ্মা বিহারী গোঁড়া লীগ, বসন্তকুমার মহল নির্দল, রামশংকর প্রসাদ সি পি এম।

হারজিলিং—দেওপ্রকাশ রাই গোঁড়া লীগ, রাজেন্দ্র সিংহ সি পি এম, মহনকুমার ধাপা নব কং।

জোড়বাংলো—নন্দলাল ভট্ট

কোচবিহার কোচবিহার (উত্তর) : সুনীল কর (নব কংগ্রেস), বিজেন্দ্রনাথ দত্ত (আদি কং), শিবেন চৌধুরী (সি পি এম), মোহিতলাল চক্রবর্তী (কং বঃ), পর্জন্য দাসগুপ্ত (বাঃ কং)।

কোচবিহার (দক্ষিণ) : সন্তোষ রায় (নব কং), জুবীরচন্দ্র নিরোঙ্গী (আদি কং), বিমল বসু (কং বঃ), প্রোপাল সাহা (সি পি এম), রাই-মোহন রায় (বাঃ কং)।

কোচবিহার পশ্চিম (তফঃ) : সুরারী পাটোয়ারী (আদি কং), অরুণেন্দ্রনাথ বর্মণ (কং বঃ), জুবীর প্রামাণিক (সি পি এম), রজনীকান্ত দাস (নব কং)।

সিতাই : ডাঃ কজলার হক (নব কং), বহুনাথ রায় মণ্ডল (আদি কং), শহীদার রহমান (সি পি এম), হিতেন দাস (কং বঃ)।

দীনহাটা : কমল ভট্ট (কং বঃ) বোগেন সরকার (নব কং), আহি-কুদ্দিন দ্বিজা (আদি কং), ননীগোপাল রায় (সি পি এম)।

মাধাতালা (তফঃ) : অশোককুমার রায় বসুনিয়া (নির্দল) অবিলাস সিংহ (বাঃ কং), কুমার নিধিনারায়ণ (আদি কং), বীরেন্দ্র রায় (নব কং), বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য (সি পি এম), মুকুন্দ বর্মণ (কং বঃ)।

বেধলিগুড় (তফঃ) : হিরিকুমার রায় (কং বঃ), তারাপ্রসাদ রায় বসু-নিয়া (আদি কং), মণিকুন্দ রায় (নব কং), কীর্ত্তিপ্রসাদ বর্মণ (সি পি এম) জখাং রায় সরকার (নির্দল)।

তুফানগঞ্জ (তফঃ) : নরেন্দ্রনাথ বর্মণ (আদি কং) শিরিকুমার ইসর (নব কং), বোগেননাথ পাখাধরা (কং বঃ), মঈনুদ্দীন বর্মণ (সি পি এম)।

জলপাইগুড় জলপাইগুড় সদর—ডাঃ অমৃপম সেন (নব কং), পরেশ মিত্র (সি পি এম), শ্রীমতী রাণু চক্রবর্তী (সি পি আই), অরুণাচল চৌধুরী (আদি কং), বিজুতি সরকার (বাঃ কং), শিরিশচন্দ্র দেবসিং (নি)।

রায়গঞ্জ (তফঃ) : জীবন রায় আদি, কং, ভগদান সিংহ নব কং, জানেশ্বর রায় বাঃ কং, বীরেন রায় সি পি এম, তবেন রায় হাকিম এস এস পি, জ্যোতিপ্রসাদ বর্মণ (নি)।

ময়নাগুড়ি তফঃ—দীননাথ রায় আদি কং, বতীন বাহুনিয়া আর এস পি, বসন্ত রায় সি পি আই, নীলচরণ রায় সি পি এম, অখিলচন্দ্র রায় সি এস পি, হরিপ্রসাদ রায় (নি) আনকী নাথ রায় বাঃ কং, বিজয়কুমার মহান্ত নি।

দুপগুড়ি—নরেশ সরকার আদি কং, অনিল গুহ নিরোঙ্গী এস এস

(শেবাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

Free! Free!! Free!!!

ধবল বা শ্বেত

আমাদের বিখ্যাত "দাগ সাফা"
১৯২৫ সাল থেকে রোগীদের
সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে
আসছে। মাত্র তিন দিন ব্যবহা-
রেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে
ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়।
বিনামূল্যে এক শিশি
দেওয়া হয়।

WESTERN INDIA CO. (V. N.) P.
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

প্রার্থী তালিকা

কাকেশ্বীপ—হুম্বীকেশ মাইতি (সি পি এম), খগেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী (সি পি আই), অশোক সামন্ত (বার কং), হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (আদি কং), বাসুদেব সাউতিয়া (নব কং)।

সাগর—প্রভজন মন্ডল (সি পি এম), গোবর্ধন ডিম্ভাল (বার কং), মাল্ল্য বানাজী (আদি কং), ঠিকো-কেশ মিত্র (নব কং), আবদুল সাত্তার সাহ (মু লীগ)।

শ্রীমদ্রূপনগর—মোকসেদ আলি (আদি কং), বামিনী সেন (সি পি আই), গোপাল গোস্বামী (সি পি এম), চন্দ্রনাথ মিত্র (নব কং), আজিজুর রহমান (বার কং) আলাউদ্দীন মন্ডল (মু লীগ)।

বাদুড়িয়া—হরেন রায় (আদি কং), শেখ আলি আহমদ (সি পি এম), কাজি আবদুস গফ্ফর (নব কং), হরেন্দ্রনাথ মুখার্জী (বার কং), আখতার হক খান (সি পি আই) মোস্তাফা নাসিরুদ্দীন (মু লীগ)।

বসিরহাট—অরুণ বসু (সি পি আই), নারায়ণ মুখার্জী (সি পি এম), ললিত ঘোষ (নব কং), মহেশ মোনাঙ্গল আলি মন্ডল (আদি কং) সিদ্দিক আমেদ (মু লীগ)।

হাড়েয়া—সনৎকুমার মন্ডল (আদি কং), জগদ্বাণ সরদার (সি পি এম) গঙ্গাধর প্রামাণিক (নব কং), ব্রজেন সরকার (বার কং), প্রশান্তকুমার মন্ডল (নির্দল), শান্তিপদ মন্ডল (সি পি আই)।

হাসনাবাদ—আবদুর রেজ্জাক খান (সি পি আই), বিমল সেন (সি পি এম), চৌধুরী ইয়াজ্জল আলি (মু লীগ), মোস্তাফা তখনাভুয়া (আদি কং), রামধনু মিত্র (বার কং)।

হিঙ্গলগঞ্জ—বিনোদ গায়ের (সি পি আই), গোপাল গায়ের (সি পি এম), অবনীভূষণ মন্ডল (নির্দল), আদিত্য মন্ডল (নির্দল), তারাপদ মন্ডল (নির্দল), পদ্মানন মন্ডল (আদি কং)।

গোসবা—রামনাথ পাঠ (এস ইউ সি), কল্পতরু বর্মণ (সি পি এম), পুরেশ বৈদ্য (নব কং), গণেশ মন্ডল (আর এস পি), কৃষ্ণপদ মালি (বার কং), কমলপদ মন্ডল (নির্দল), চন্দ্রকান্ত সরকার (নির্দল)।

সন্দেহখালি—শরণ সরদার (সি পি এম), দেবেন্দ্রনাথ সিং (নব কং), ধীরেন সরদার (আর এস পি), গোপাল মন্ডল (সি পি আই), সুধীর মোহান্ত (নির্দল)।

কলিকাতা

ঢাকুরিয়া—হরিন্দাস মালাকার (সি পি এম), বাসুদেব চ্যাটার্জী (আদি কং), সোমনাথ লাহিড়ী (সি পি আই)।

বালিগঞ্জ—জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য (ওয়ার্ডার্স পার্টি), নীলরতন সিংহ (আর এস পি), শ্রীমতী মেনকা রায় (এস ইউ সি), সুব্রত মুখার্জী (নব কং), উমাশঙ্কর রায় (আদি কং)।

এনটালি—এ এম গণি (সি পি আই), মহা নিজামুদ্দিন (সি পি

এম), আবদুল করিম (মুসলিম লীগ), অশোককুমার বাগচী (আদি কং)।

ভালতলা—আবুল হাসান (সি পি এম), হাকিম এ এন বাদাউনি (মুসলিম লীগ), রঞ্জিতকুমার মিত্র (সি এস পি), আবদুর রোফ আনসার (নব কং)।

কাশীপুর—(কলকাতা)—সুশীল-কুমার পাল (আদি কং), কে জি বসু (সি পি এম), প্রফুল্লকান্ত ঘোষ (নব কং), মণিপ্রসাদ সিং (জনসংঘ)।

শ্যামপুর—কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হেমন্ত বসু নিহত হওয়ার জন্য নির্বাচন স্থগিত।

জোড়াবাগান—নেপাল রায় (নব কং), হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী (সি পি এম), ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বার কং)।

জোড়াসাঁকো—দেওকানন্দন পোন্দার (নব কং), শ্যামসুন্দর গোস্বামী (জনসংঘ), রাজেন্দ্র সিং (আর এস পি—এম এল), ধীরেন্দ্র-চন্দ্র ভৌমিক (ফঃ বঃ) মহঃ ওমর (নির্দল), সুকুমার বানাজী (নির্দল), জগমোহন প্রসাদ (নির্দল), সত্যনারায়ণ জাল (সি পি এম)।

বড়বাজার—রামকৃষ্ণ সারোগী (নব কং), অমোঘ্য সিং (সি পি এম), ললিতকুমার শর্মা (নির্দল), বসন্ত সিং (আর এস পি এম এল), দর্গা-প্রসাদ নাথানি (জনসংঘ), জগদীশ সিং (এস এস পি)।

বড়বাজার—বিজয়সিং নাহার (নব কং), রবীন্দ্রনাথ গুহাচকুরতা (ফঃ বঃ), হাসিম আবদুল হালিম (সি পি এম), জ্ঞানেন্দ্র বানাজী (জনসংঘ)।

চৌরঙ্গী—মহম্মদ ইরাকুব (ফঃ বঃ), অশোককৃষ্ণ দত্ত (আদি কং), শঙ্কর ঘোষ (নব কং), পার্বতী-প্রসন্ন বসু (সি পি এম)।

রাসবিহারী—শচীন সেন (সি পি এম), ভবেন্দ্র গাঙ্গুলী (এস ইউ সি), লক্ষ্মীকান্ত বসু (নব কং)।

কাজীঘাট—সলিলবরণ চ্যাটার্জী (আদি কং), সত্যীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (এস এস পি), সাধন গুপ্ত (সি পি এম), রথীন তালুকদার (নব কং), সুশীল মজুমদার (নির্দল)।

টালিগঞ্জ—যতীন্দ্রমোহন মজুমদার (বার কং), সত্যপ্রিয় রায় (সি পি এম), অমিয় দাশগুপ্ত (সি পি আই)।

আলিপুর—নারায়ণপ্রসাদ ঘোষ (আদি কং), মণি সান্যাল (সি পি আই)। শ্যামনারায়ণ মিত্র (নির্দল), নেপাল ভট্টাচার্য (বলশেভিক পার্টি), কানাইলাল সরকার (নব কং)।

বেলেঘাটা দক্ষিণ (তফঃশিলি)—অর্ধেন্দ্রশেখর নন্দকর (নব কং), শান্তিরঞ্জন মন্ডল (সি পি আই), মনোরঞ্জন বড়াল (সি পি এম)।

বেলেঘাটা উত্তর—সুবোধ দে (ফঃ বঃ), কৃষ্ণপদ ঘোষ (সি পি এম)।

বিদ্যাসাগর—শ্যামসুন্দরমোহন (নব কং), চিত্ত দাশগুপ্ত (বার কং), সুশোভন বানাজী (আদি কং), চন্ডী মুখার্জী (সি পি আই), সমরকুমার বসু (সি পি এম)।

মানিকতলা—শান্তিরঞ্জন সিংহ-রায় (আদি কং), ইলা মিত্র (সি পি

আই), অনিলা দেবী (সি পি এম), অনন্তকুমার ভারতী (নব কং)।

বড়তলা—লক্ষ্মী দে (সি পি এম) অপরেণ ভট্টাচার্য (আদি কং), অশোক দাশগুপ্ত (বিদ্রোহী পি এস পি), অজিত পাঁজা (নব কং), নিখিল দাস (আর এস পি), বিজয়-কুমার সেনশর্মা (নির্দল)।

বেলগাছিয়া—লক্ষ্মীচরণ সেন (সি পি এম), গণপতি শ্রু (নব কং)।

কবিতীর্থ—সুধীর চৌধুরী (আদি কং), সুকুমার দত্ত (নি), রামীন্দ্রনাথ রায় (নব কং), কলি-মন্ডল সামস (ফঃ বঃ), মীর আবদুস সৈয়দ (সি পি এম)।

শিলালদহ—সুধাংশু পালিত (সি পি এম), বিনয় বানাজী (নব কং), নন্দ ভট্টাচার্য (সি পি আই), বরেন দাঁ (আর এস পি), চিত্তরঞ্জন বাগ (আদি কং)।

হাওড়া

হাওড়া উত্তর—শঙ্করলাল মুখার্জী (নব কং), চিত্তরত্ন মজুমদার (সি পি এম), অরবিন্দ ঘোষাল (ফঃ বঃ), জগদ্বালাল খান্না (নি), শিবজেন্দ্রলাল ঘোষ (নি)।

হাওড়া মধ্য—অনাদি দাস (আর সি পি), সুধীন কুমার (আর সি পি), শরদিন্দুশেখর শেঠ (আদি কং), সত্যেন্দ্র কুন্ডু (বার কং)।

হাওড়া দক্ষিণ—প্রমথ তালুকদার (সি পি এম), শান্তিকুমার দাশ-গুপ্ত (নব কং), সুপ্রভাত মুখার্জী (সি পি আই), সুশীল ঘোষ (আদি কং)।

বাগি—পতিভূষণ পাঠক (সি পি এম), ভবানীশঙ্কর মুখার্জী (নব কং), তারকনাথ বানাজী (আদি কং), গোপাল মুখার্জী (বার কং), রামেশ্বর তেওয়ারি (এস এস পি), শ্রীকান্ত পাঠক (সি এস পি)।

শিবপুর—কানাইলাল ভট্টাচার্য (ফঃ বঃ), অসীম রায় (আদি কং), অশোককুমার মল্লিক (নব কং), হরিসাধন মিত্র (সি পি এম) মিনাতি অধিকারী (বার কং)।

সাঁকরাইল (সং)—হারাগচন্দ্র হাজরা (সি পি এম), অরবিন্দ নন্দকর (নব কং), শিবজেন্দ্র বাচার (আদি কং), দলুলালচন্দ্র মন্ডল (সি পি আই)।

পাঁচলা—বিভূতিভূষণ ঘোষ (ফঃ বঃ), অশোককুমার ঘোষ (সি পি এম), রামচন্দ্র মজা (আদি কং), আকবর আলি মিশ্র (মুসলিম লীগ)।

ডোমজুড়—জয়কেশ মুখার্জী (সি পি এম), রেবতী মুখার্জী (নব কং), শঙ্করপ্রসাদ বানাজী (আদি কং), নিধন সরদার (নির্দল), অমিয়দাসী সরদার (বার কং)।

জগৎবল্লভপুর—তারাপদ দে (সি পি এম), পাম্মালাল শীল (নব কং), গৌর বাগ (বার কং), চিত্তরঞ্জন ষাড়া (আদি কং), অরুণকুমার বাগ (এস এস পি), মোস্তাফা আজিজুল করিম (মুসলিম লীগ)।

উলবেড়িয়া উত্তর—কালীপদ মন্ডল (ফঃ বঃ), রাজকুমার মন্ডল (সি পি এম), গোবিন্দচন্দ্র সিং (নব কং), জয়দেব শিকারী (আদি কং)।

উলবেড়িয়া দক্ষিণ—বিশ্বনাথ দাশগোষ (ফঃ বঃ) অলোকরঞ্জন সান্যাল (আদি কং), বটকৃষ্ণ দাশ (সি পি এম), দর্গাশঙ্কর রায় (নব কং), মোস্তাফা ফজলুল হক (মুসলিম লীগ)।

বাগান—নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় (সি পি এম), অমলেন্দুবিকাশ মাইতি (নব কং), সুকুমার মিত্র—বার কং।

শ্যামপুর : শশিবিন্দু বেরা (ফঃ বঃ), শিশিরকুমার সেন (নব কং), সুশীল দিম্ভা (সি পি এম), মুকুন্দ-রাম দাশ—আদি কং।

আমতা : বারীন্দ্র কোলে—সি পি এম, গুণাকর সিং—নব কং, সেশ সেরব আলি—আদি কং, গোবিন্দ মাজি—সি এস পি।

উদারনারায়ণপুর : পাম্মালাল মাজি—সি পি এম, ভূদেব মল্লিক—আদি কং, আবদুল করিম মল্লিক—নব কং।

কল্যাণপুর : সুদীনকুমার মিত্র—বার কং, নিতাইচন্দ্র আদক—সি পি এম, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ—নব কং, প্রসাদ চক্রবর্তী—জনসংঘ, শান্তিপ্রসাদ মন্ডল—ফঃ বঃ, আদিত্য কুমার মাজি—আদি কং, আতিয়ার রহমান—মুসলিম লীগ।

হুগলি

জালপাইড়া—মণীন্দ্রনাথ জানা—সি পি এম, গণেশচন্দ্র হাফুই—নব কং, সনাতন ভট্ট—বার কং, সুশীল চ্যাটার্জী—সি পি আই।

চন্ডীতলা—আবদুল লতিফ—নিঃ, কাজী সফিউল্লাহ—সি পি এম, সুধাংশু দাস—ফঃ বঃ, সাহাদত আলি—নব কং, জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জী—আদি কং, স্বরূপপ্রসাদ ধিরানী—নিঃ।

উত্তরপাড়া—গোবিন্দ চ্যাটার্জী—সি পি আই, শান্তপ্রী চ্যাটার্জী—সি পি এম, কালীনাথ বানাজী—আদি কং।

শ্রীরামপুর—পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি—সি পি আই, কমলকৃষ্ণ ভট্টা-চার্য—সি পি এম, গোপালদাস নাগ—নব কং, দর্গাশঙ্কর সান্যাল—আদি কং।

চন্দ্রনগর—দীনেশরঞ্জন মুখার্জী—নিঃ—ইউ এল ডি এফ সমর্থিত, ভবানী মুখার্জী—সি পি এম, সুপ্র-ভাত বসু—আদি কং, বিপিন-বিহারী সাউ—নব কং, কিরণকুমার ঘোষ—নিঃ।

সিলপুর—অজিত বসু—সি পি আই, বামিনীকুমার বাগ—বার কং, অজিতকুমার ভট্টাচার্য—আদি কং, গোপাল বানাজী—সি পি এম।

হরিশাল—অমলেশচন্দ্র মজুমদার—নির্দল, চিত্তরঞ্জন বসু—ওয়ার্ডার্স পার্টি, শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী—আদি কং, অধীরচন্দ্র ঘোষ—নব কং।

চুচুড়া—শম্ভুচরণ ঘোষ—ফঃ বঃ, অমিয় নন্দী—সি পি এম, ভূপতি মজুমদার—নব কং, বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত—নিঃ।

পোলবা—ব্রজগোপাল নিয়োগী—সি পি এম, কৃষ্ণন গাঙ্গুলী—বার কং, শ্রুভেন্দ্র সিংহ রায়—ফঃ বঃ, আবদুস শোভন—আদি কং, ভবানীপ্রসাদ সিংহ রায়—নব কং,

রজনী টুডু—ঝাড়খন্ড।

পানভুয়া—দেবনারায়ণ চক্রবর্তী—সি পি এম, শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী—বার কং, আনোয়ার হোসেন মোস্তা—নব কং, মল্লিক হেমরম—ঝাড়খন্ড।

বলাগড় (তফঃ)—অবিনাশ প্রামা-ণিক—সি পি এম, হরেকৃষ্ণ দাস—আদি কং, ধীরেন সরকার—নব কং, নারায়ণ সরদার—ঝাড়খন্ড, সন্তোষকুমার ভারতী—সি পি আই।

চাঁপনানী—হরিশদ মুখার্জী—সি পি এম, গিরিজাভূষণ মুখার্জী—সি পি আই, নিখীলকমল সান্যাল—নব কং, বোমকেশ মজুমদার—আদি কং।

তারকেশ্বর—অজিত বসু মল্লিক—সোস্যালিস্ট পার্টি, রামসিং পাল—নব কং, নিত্যানন্দ অধিকারী—আদি কং, মনসারাম সামন্ত—ফঃ বঃ, রামু চ্যাটার্জী—ফঃ বঃ।

ধনিয়াখালি (তফঃ)—কৃপাসিন্দু সাহা—ফঃ বঃ, কালীনাথ রায়—সি পি এম, কালীনাথ পাঠ—নব কং, গোবুলচন্দ্র মাজি—বার কং।

পূর্বশুড়া—মহাদেব মুখার্জী—নব কং, গৌরমোহন গাঙ্গুলী—সি পি আই, ভোলানাথ মজুমদার—আদি কং, মৃদালকান্তি মজুমদার—সি পি এম।

খানাকুল—(তপ)—বসুদেব হাজরা—নব কং, কৃষ্ণপদ পাণ্ডিত—আদি কং, মদনমোহন সাহা—সি পি এম, তিনকাড়ি বর—বার কং, বিষ্ণুপদ রায়—ফঃ বঃ।

আরামবাগ—প্রফুল্লচন্দ্র সেন—আদি কং, রবীন্দ্রনাথ রায়—ফঃ বঃ, বসন্তীবাম চ্যাটার্জী—সি পি এম, শৈলেন্দ্রনাথ পাল—নিঃ।

গোঘাট (তপ)—অজিতকুমার বিশ্বাস—ফঃ বঃ, মদনমোহন মোস্তা—নব কং, নান্দরাম রায়—আদি কং, রাধানাথ দাস—সি পি এম। কার্তিক চন্দ্র মন্ডল—ঝাড়খন্ড।

(শেবাংশ সন্তম পৃষ্ঠার)

অশোক সেন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কারল স্বরূপ নাকি উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনাদারী আয়করের দরুন “বসুমতীর” এই এ্যাকাউন্ট এ্যাটচ করা হয়েছে।

মজার ব্যাপার এই যে, বখন লেখক সাংবাদিক এবং শিল্পীদের সাম্মানিক দেওয়ার কোনোও উদ্যোগ আরোজনই নেই, তখন কতৃপক্ষ কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে এই মর্মে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছেন যে, নিয়মিত বিজ্ঞাপনগুলি যেন সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ বাতিলের ঘরে না যান, কেননা বসুমতী সংস্থাকে সামগ্রিকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

আমরা আরও শুনলাম যে, অশোকবাবুর ব্যবসায় সংস্থা যদি লেখক সাংবাদিক শিল্পীদের বকেয়া অর্থ অবিলম্বে মিটিয়ে না দেন তবে তাঁদের তরফে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কেও বিশেষ মহল আলোচনা করছেন। লেখক সাংবাদিক মহল একবাক্যে এমন আচরণকে বিচার দিচ্ছেন।

প্রার্থী তালিকা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

মেদিনীপুর

মহিষাদল—সদুলকুমার ধাড়া—
বাং কং, নিগমানন্দ ভৌমিক—
আদি কং, জগদীশচন্দ্র দাশ—সি পি
এম, দীপক মিত্র—সি পি এম, আনন্দ
বাগ—মুসলিম লিগ, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী—নব কং।

পাশকুড়া পূর্ব—বীরভদ্র গৌরী—
বা কং, জগদীশপ্রসাদ গৌরী—
আদি কং, গীতা মুখার্জী—সি পি
আই, গজেন্দ্রনাথ শী—সি পি এম, স্বদেশরঞ্জন মাজি—আর এস পি।

পাশকুড়া পশ্চিম—বলাই মন্ডল—
বা কং, চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী—নব কং,
সৈয়দ আবদুল মাসুদ—আদি
কং, শেখ ওমর আলি—সি পি
আই, মনোরঞ্জন রায়—সি পি এম,
শেখ লিয়াকত আলি—মুসলিম
লিগ।

নরঘাট—বিক্রমবিহারী মাইতি—
বা কং, শরদিন্দু সামন্ত—নব
কং, ভারতবিজয় মাইতি—আদি কং,
স্বদেশকুমার মাস্তা—সি পি আই,
অদিতি ধাওয়া—বিস্তারী বা কং।

মেদিনীপুর—বিশ্বনাথ মুখার্জী—
সি পি আই, বিনয়জীবন ঘোষ—
সি পি এম সমর্থিত নি, সুধাংশু
কুমার মিত্র—বা কং, সুধীর দাসশর্মা
নব কং, অজুর্ন হাঁসদা—নির্দল,
মদনমোহন খাউস—আদি কং।

চন্দ্রকোণা—সরসী চৌধুরী—
সি পি এম, সত্যগোপাল মুখো—
পাধ্যায়—আদি কং, সত্য ঘোষাল—
সি পি আই, সুভাষ দত্ত রায়—নব
কং।

ঘাটাল (তফ)—কার্তিক দলুই—
বাং কং, নন্দরায়ী দল—সি পি
এম, ভোলানাথ বাগ—আদি কং।

দাশপুর—সুধীরচন্দ্র বেরা—নব
কং, মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য—সি পি এম,
হরেকৃষ্ণ বেরা—হিঃ মঃ, শশধর
চক্রবর্তী—আদি কং।

মরনা—কানাই ভৌমিক—সি
পি আই, গৌরচন্দ্র অধিকারী—
আদি কং, পদুমক বেরা—সি পি
এম, প্রণব বহুবলিন্দ্র—নব কং।

তমলুক—অজয় মুখোপাধ্যায়—
বাং কং, দেবীপ্রসাদ ভৌমিক—সি
পি এম, বীরেন্দ্রনাথ ঘড়ুই—নির্দল,
রাধাকান্ত বেরা—আদি কং,
শিবাজী দোবে—নির্দল।

সুতাহাটা (তফ)—নিরঞ্জন গায়েন—
নব কং, বাণেশ্বর পাঠ—বাং কং,
রবীন্দ্রনাথ করণ—সি পি আই,
সুবলচন্দ্র দাশ—সি পি এম, হরি-
হর দেব—নব কং।

নন্দীগ্রাম—অহীন্দ্র মিত্র—বাং কং,
প্রবীরকুমার জ্ঞানা—আদি কং,
তৃপালচন্দ্র পাণ্ডা—সি পি আই,
রবীন্দ্রনাথ মাইতি—নির্দল, শেখ
ফরিদ মহম্মদ—মুসলিম লীগ,
সৈয়দ ওসমান আলি—নব কং।

ভগবানপুর—রাধারমণ অধিকারী—
নির্দল, অমলেশ জ্ঞানা—বাং কং,
প্রশান্তকুমার প্রধান—সি পি এম,
জগদীশচন্দ্র পাল—নব কং, বিপিন-
বিহারী বর্মণ—নির্দল, শেখ কবি-
মুন্সী—মুসলিম লীগ, হরিপদ

জ্ঞানা—আদি কং।
খাজুরী—অবলিতকুমার দাশ—
নির্দল, জগদীশচন্দ্র দাশ—সি পি
এম, পরেশকান্ত দাশ—বাং কং,
সুনির্মল পাইক—এস এস পি।

কাঁধি উত্তর—অনিলকুমার মাস্তা—
পি এস পি, অনিলকুমার মন্ডল—
নির্দল, অনুদ্রুপ পাণ্ডা—সি পি
এম, রাসবিহারী পাল—আদি কং,
শৈলজা দাশ—নব কং।

কাঁধি দক্ষিণ—তবরেজুদ্দীন মহ-
ম্মদ—নির্দল, প্রাণরঞ্জন মাইতি—
নির্দল, রামশঙ্কর কর—সি পি এম
শিশিরকুমার অধিকারী—নব কং
সত্যরত্ন মাইতি—আদি কং,
সুধীরচন্দ্র দাশ—পি এস পি।

রামনগর—অবলিতকুমার মিত্র—
বাং কং, বলাই দাশ মহাপাত্র—নির্দল
রাধাগোবিন্দ বিশল—আদি কং,
রোহিণী করণ—নির্দল, হেমন্ত
দত্ত—নব কং।

এগরা—হৃষিকেশ চক্রবর্তী—আদি
কং, নিমাইসুন্দর জ্ঞানা—বাং কং,
ননীগোপাল পাল—সি পি এম,
বিভূতি পাহাড়ী—নির্দল, প্রবোধচন্দ্র
সিংহ—পি এস পি, খান সামসুল
আলম—নব কং।

মুগুর্বেড়িয়া—অটলকুমার গিরি—
বাং কং, কিরণময় নন্দ—এস এস
পি, অমরেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী—সি পি
এম, জন্মেজয় ওয়া—পি এস পি,
প্রসন্নকুমার ত্রিপাঠী—নব কং।

পটালপুর—অনিল মহাপাত্র—
সি পি আই, জীবনকৃষ্ণ বেরা—
আদি কং, প্রফুল্ল মাইতি—নব কং,
রেনুকা সামন্ত—নির্দল।

পিঙ্গলা—কামাখ্যানন্দন দাশ
মহাপাত্র—সি পি আই, গৌরাঙ্গ
সামন্ত—নির্দল, পূর্ণ টাডু—নির্দল
বিজয় দাস—নব কং।

ডেবরা—গোপাল ভট্টাচার্য—সি
পি আই, ডঃ বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত—
আদি কং, বাবুলাল হাঁসদা—নির্দল
বিজয় দাস—নির্দল।

কেশপুর—গঙ্গাপদ কানার—বাং
কং, সুবলচন্দ্র গলুই—আদি কং,
রঞ্জনীকান্ত দলুই—নব কং, শঙ্কর-
প্রসাদ দলুই—সি পি আই, হিমালয়
কোণার—সি পি এম।

গরবেতা (তফ)—কালীকঙ্কর
চলক—আদি কং, কৃষ্ণপ্রসাদ সর্বে-
সি পি আই, অংশুমালা বিবল—
সি পি এম, মদনমোহন গঙ্গা—নব
কং, সাধনচন্দ্র মুইদাস—বাং কং।

গড়বেতা পশ্চিম—স্বরকানাথ দে
—বাং কং, পণ্ডান সিংহ রায়—
আদি কং, প্রাণকৃষ্ণ টাডু—নির্দল,
মনোহর মাহাতো—সি পি এম।

শালবনী—অমল্যরতন মাহাতো—
বাং কং, চন্দ্রানন্দ মুন্সী—নির্দল,
ঠাকুরদাস মাহাতো—সি পি আই,
নিতাইচন্দ্র ঘোষ—নির্দল, নিরঞ্জন
খামরুই—নব কং, বীরেন্দ্রনাথ হেম-
রাম—নির্দল, বৈদ্যনাথ ওয়া—আদি
কং, সুন্দর হাজরা—সি পি এম।

খড়গপুর—করুণাময় ভট্টাচার্য—
সি পি আই, জ্ঞানসিং সোহন পল-
—নব কং, হতীন্দ্রনাথ মিত্র—সি পি
এম, উগর সিং—নব কং, শেখ মেহদী
হোসেন—বাং কং।

খড়গপুর স্থানীয়—অজিতকুমার
কসু—আদি কং, দেবেন দাস—সি

দি.আই, কালিচরণ পাল—বাং কং,
বিজয়কুমার মন্ডল—নব কং, শেখ
সিরাজ আলি—সি পি এম, হরিপদ
নায়েক—নির্দল।

নারায়ণগড়—দশরাথ হাঁসদা—
নির্দল, বিভূতি ভূষণ মাইতি—সি
পি আই, রত্নকিশোর মাইতি—নব
কং, মিহিরকুমার লাহা—বাং কং,
সর্বানন্দ মিত্র—আদি কং।

দাঁতন—কেশব পাণিহারি—নির্দল,
পুলিনবিহারী ত্রিপাঠী—নব কং,
নির্মলেন্দ্র দাশ—নির্দল, নবকুমার
হাঁসদা—নির্দল, নয়ানচাঁদ সাতরা—
বাং কং, প্রদ্যোতকুমার মহাশি-
আদি কং।

কেশিয়ারি—গণেশচন্দ্র সিংহ—বাং
কং, চিত্তরঞ্জন নন্দী—নির্দল, ভূধন
চন্দ্র টাডু—নব কং, মন্থনাথ সিং-
আদি কং, মাস্তাবর সিং—সি পি
এম, সুরেন সিং—সি পি আই।

নয়ানন্দ (তফ)—গদ্যরাম হেমরাম
—আদি কং, জগতপতি হাঁসদা—
—বাং কং, দাশরাথ সোহেন—নির্দল
বীরেন্দ্রনাথ মুন্সী—এস এস পি,
মনোরঞ্জন সোহেন—নির্দল, বৃন্দেব
সিং—সি পি এম।

গোপিন্দ্রভদ্র—উমেশচন্দ্র দে—
—নির্দল, শঙ্কর ঘোষ—নির্দল, ধন-
জয় কর—নির্দল, মনোরঞ্জন মহা-
পাত্র—সি পি এম, রাজ্যরাম সিং
—এস এস পি, শিবেন্দ্রনাথ মহ তো
আদি কং, হরিশচন্দ্র মহাপাত্র—নব
কং।

কাড়গ্রাম—সুক্রম ঘোষ—সি পি
আই, পাঁচকাড়ি দে—বাং কং,
নরেন্দ্রনাথ - মাহাতো—আদি কং,
ভোলা রায়—আর এস পি, বীরেন্দ্র
বিজয় মল্লদেব—নব কং, মনোরঞ্জন
মাহাতো—নির্দল, দহরেশ্বর সেন—
সি পি এম।

বীনপুর (তফ)—জয়রাম সোহেন
সি পি আই, মানসরাম সোহেন—
বাং কং, শ্যামাচরণ মুন্সী—নির্দল,
মঙ্গলচন্দ্র সোহেন—আদি কং,
ভারত হেমরাম—সি পি এম, ফকির
হাঁসদা—নব কং।

পূর্বদিল্লী

পূর্বদিল্লী—বিভূতিভূষণ দাশ-
গুপ্ত—এল এস পি, প্রবীর মল্লিক
—সি পি আই, সনৎ মুখার্জী—নব
কং, নারায়ণ চ্যাটজী—জঃ সঃ,
রত্ননাথ সিং—ফঃ সঃ।

জয়পুর—রামকৃষ্ণ মাহাত—নব
কং, অশোক চৌধুরী—এল এস
এস, ফণী মাহাত—আদি কং, চক্রধর
মাহাত—পি এস পি, হরিপদ রাজো-
য়ার—কিট্রাহী পি এস পি, ভারত
ভান্ডারী—বা কং।

পারা (তফ)—তিনকাড়ি বারুই—
—বা কং, শরৎচন্দ্র দাস—নব কং,
গদ্যরূপ বারুই—এল এস এস,
প্রদ্যোত বারুই—সি পি এম, শৈলেন্দ্র
নাথ বারুই—এস ইউ সি, মনসারাম
বারুই—আদি কং।

হুড়া—কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী—এল
এস এস, শতদল মাহাত—নব কং,
সাধুচরণ বানার্জী—এস ইউ সি,
অম্বরীশ মুখার্জী—সি পি এম,
নবীন ওয়া—বাং কং, রাধারমণ
বন্দ্যোপাধ্যায়—আদি কং।

রত্ননাথপুর (তফ)—হরিপদ

বারুই—এস ইউ সি, নেপাল
বারু—আদি কং, মধুসূদন শর্মা—
—এল এস এস, মদনগোপাল বারুই—
—সি পি এম, দুর্গাদাস বারুই—
নব কং, কালোবরণ বারুই—বাং
কং।

ঝালদা—চিত্তরঞ্জন মাহাত—ফঃ কঃ,
সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য—নিঃ, কিংকর
মাহাত—নব কং, গৌরাচাঁদ মাহাত—
আদি কং, জনার্দন কুমার—সি পি
এম।

আরশা—ওমন কন্নরী—ফঃ কঃ,
অনিলকুমার খাস্তা—এল এস এস,
মতিলাল মাঝি—আদি কং,
দুর্গা মাঝি—সি পি এম, নিতাই
দেশমুখ—নব কং, শরৎকুমার
চক্রবর্তী—হিঃ মঃ, ভৃগুরাম ভগত—
বা কং।

বলরামপুর (তফ)—গোবর্ধন
মাঝি—এল এস এস, বিক্রম টাডু—
সি পি এম, বেধুরাই মাঝি—জঃ সঃ,
সুফল সরদার—এস এস পি।

এই কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী
আছেন। তাঁর নাম এখনও পর্যন্ত
আমাদের দফতরে পৌঁছায় নি।

কাশীপুর—লেদু মাঝি—এল
এস, এস, বৃন্দ মাঝি—আদি কং,
শিশির কুমার বানার্জী—বাং কং
মদন মোহন মাহাত—নব কং,
বাসুদেব আচার্য—সি পি এম,
প্রমথনাথ মন্ডল—সি পি আই।

মানবাজার—গিরীশ মাহাত—
এল এস এস, সীতারাম মাহাত—
নব কং, হরলাল মাহাত—জঃ সঃ,
অনিরুদ্ধ মাহাত—এস ইউ সি,
রজেন্দ্রনাথ সি—বাং কং, সত্যকংকর
সেন—আদি কং।

বান্দেয়ান—কান্দু মাঝি—এল,
এস এস, শীতসচন্দ্র হেমরাম—নব
কং, বৃন্দেশ্বর মাঝি—আদি কং,
মতিলাল মুন্ডা—সি পি আই,
প্রফুল্ল সিং সরদার—জঃ সঃ,
গোপীনাথ হাঁসদা—ঝাড়খণ্ড।

বাকুড়া

ভালভাঙ্গা—অজিত সিং—সি
পি আই, দেবীদাস সিংহ মহাপাত্র
—আদি কং, মোহিনীমোহন পাণ্ডা
—সি পি এম, মৃত্যুঞ্জয় মাহাত—
নির্দল, প্রদ্যোত সিংহ চৌধুরী—
নব কং।

বিক্রপুর—করুণাময় গোস্বামী
—সি পি এম, ষষ্ঠীদাস সরকার—
বাং কং, নারায়ণ মুখার্জী—আদি
কং, ভবতারণ চক্রবর্তী—নব কং,
বিমলকুমার সরকার—সি পি আই,
ভূধরকান্ত ভট্টাচার্য—জঃ সঃ।

কোতুলপুর—বন্দাবন ভট্টাচার্য
—আদি কং, জটধারী মুখোপাধ্যায়
—সি পি এম, গোবিন্দ বন্দ্যো-
পাধ্যায়—বাং কং, চন্ডীদাস মুখার্জী
সি পি আই, শশাঙ্ক মিত্র—নব
কং।

ইন্দ্রাস (তফ)—মদন বড়া—সি
পি আই, সনাতন সাহা—নব কং,
বিশ্বনাথ ভোম—সি পি আই, নন্দ-
দুলাল বারেন—বাং কং।

সোনমুখী—সুখেন্দ্র খাঁ—
সি পি এম, কানাই সাহা—নব কং,
কিরিটী বাগদী—সি পি আই,
জৈদর মাঝি—বাং কং।

রায়পুর (তফ)—বাবুলাল হেম-

রাম—নব কং, ভবতোষ সোহেন—
বাং কং, মানিকলাল বেসরা—সি
পি আই, স্বদনাথ মুন্সী—আদি
কং, শ্যামাচরণ মাঝি—নির্দল, বাব-
লাল সোহেন—নির্দল।

রানীবাঁধ (তফ)—নন্দিনী মুন্সী
সি পি আই, বৈদ্যনাথ হাঁসদা—বা
কং, রাইচরণ সোহেন—নব কঃ
সুচাঁদ সোহেন—সি পি এম, সুক-
কাশ মুন্সী—নির্দল, নবীনচন্দ্র
হেমরাম—নব কং।

ইন্দ্রপুর (তফ)—অজিত সাহা—
সি পি আই, গৌর জোহার—বা
কং, প্রয়াগ মন্ডল—নির্দল, বগল-
কান্ত মন্ডল—আদি কং, বিশ্বনাথ
মন্ডল—আর এস পি।

ছাতনা—কমলাকান্ত হেমরাম—ন-
কং, সনাতন কিসকু—নির্দল, নিঃ
লেদু দে—আদি কং, রবি দত্ত-
নির্দল, সুদর্শন সিংহ—নির্দল
সুনীল এস এস পি।

গঙ্গাজলবাটি—কামাখ্যা বাউা
—আদি কং, নবদুর্গা মন্ডল—বা
কং, কালিপদ বাউড়ি—সি পি এ
শক্তিপদ মাঝি—নব কং।

বারজোড়া—অরুণপ্রকাশ চট্টে
পাধ্যায়—আদি কং, অম্বিনীকুমার
রায়—সি পি এম, শক্তিপ্রসাদ সাম-
নির্দল, সুধাংশুশেখর তেওয়ারী-
বাং কং, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়—ন-
কং।

বাকুড়া—অরুণ মুখোপাধ্যায়-
আদি কং, কাশীনাথ মিত্র—ন-
কং, গিরীপ্রসাদ দত্ত—বাং কঃ
গণেশ চট্টোপাধ্যায়—জনসংঘ, দেব
রত চট্টোপাধ্যায়—সি পি আই
অমিয়কান্ত রায়—আদি কঃ
সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়—সি পি এম

ওন্দা—অনিল মুখোপাধ্যায়—ফঃ
সঃ, তরুণচন্দ্র পাঠ—নব কং, গোব-
চাঁদ চক্রবর্তী—আদি কং, গুইরাম
পাঠ—নির্দল, মাণিক দত্ত—সি পি
এম, শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্দল
সুনীতি চট্টোপাধ্যায়—জন সং
সুবল চন্দ্র দে—বাং কং।

বর্ধমান

হীরাপুর—সত্যনারায়ণ আশ-
ওয়াল—বাং কং, মিহির উপাধ্যায়-
নব কং, রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, আ
কং, নীতিশ শেঠ—সি পি আই
বামাপদ মুখোপাধ্যায়—সি পি এম
কুলটি—অপর্ণা সিংহ—নির্দল
কালিপদ মুখোপাধ্যায়—আদি কঃ
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—সি পি এম
ডাঃ তারকনাথ চক্রবর্তী—এস এ
পি, রমদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ন-
কং, মোহনপ্রসাদ ভাট্টা—বাং কং।

বড়দানি—কৃষ্ণপ্রসাদ টিবেদী—
আদি কং, সুনীল বসু রায়—সি পি
এম, ভবানীতোষ মুখোপাধ্যায়-
নির্দল, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ন-
কং, দক্ষিণেশ্বর মাজি—নির্দল,
হরিদাস চক্রবর্তী—সি পি আই।

রাণীগঞ্জ—রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
নব কং, সুনীল সেন—সি পি আই
হারাধন রায়—সি পি এম।

আউলগ্রাম (তফ)—নবকুমার দত্ত
আদি কং, বংশীধর সাহা—বাং কঃ
রামদাস বামাপদ—সি পি আই
শ্রীধর মালিক—সি পি এম।

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠার)

ধর্ম নিরপেক্ষতার নমুনা

(বিশেষ সংবাদদাতা)

প্রার্থী তালিকা

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসন ব্যবস্থার রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবীর প্রতি প্রতিষ্ঠার জন্যে ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোতি বসু যে তিনজন মুসলিম অফিসারকে উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন তাঁদের সবাইকে পদচ্যুতির শাসন ব্যবস্থা অপসারণ করেছেন। পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী শ্রমসভাই পরিচালনা করেন। এই তিনজন মুসলিম অফিসার হচ্ছেন, বরাষ্ট্র দপ্তরের ভূতপূর্ব জয়েন্ট সেক্রেটারী মুস্তাক মুর্শেদ আই এ এস, ভূতপূর্ব এ্যাডিসন্যাল আই জি, পুলিশ মাসদ আই পি এবং কলকাতা পুলিশের ভূতপূর্ব জুডীচি কমিশনার এ আর খান গাইপি এস।

ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে কংগ্রেসীদের বাগাড়ম্বর ছেও পশ্চিম বঙ্গে স্বাধীনতার ব কোনো মুসলিম অফিসারকে বরখাস্ত পদ দেওয়া হয়নি। গুটা দিচ্ছেন ১৯৪৭ সালের ইশ বছর পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোতি বসু। ১৯৪৭ সালে প্রথম স্ট্রট ফ্রান্সিসভার পতনের পর

কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী কতৃপক্ষের নির্দেশে রাজ্যপাল ধর্মবীর পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ বাহিনীতে একমাত্র মুসলিম ডি আই জি মাসদ সাহেবকে পুলিশ বাহিনী থেকে সরিয়ে প্রায় কোম্পানীর এ্যাডমিনিস্ট্রেটর করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোতি বসু তাকে আবার পুলিশ বাহিনীতে এনে প্রমোশন দিয়ে এ্যাডিসন্যাল আই জি পুলিশ নিয়োগ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনে মাসদকে অপমানিত হয়ে রিটার্ন করলে হয়েছে। রিটার্ন করার আগে চার মাসের সবেতন ছুটিও তাঁকে দেওয়া হয়নি। তাই মাসদ সাহেব স্বাভাবিক প্রথা অনুযায়ী রিটার্ন করার আগে চার মাসের ছুটিও নেননি। চাকরী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জ্ঞানিয়ে গিয়েছেন।

মুস্তাক মুর্শেদের প্রতি কংগ্রেসীদের প্রতিশোধাত্মক কাহিনীর কথা দর্পণের পাঠকরা জানেন। এর বিরুদ্ধে কোনো দলীয় কোনো স্বজন পোষণের অভিযোগ ছিল না। শ্রীতীয় স্ট্রট ফ্রান্সিসভার পতনের পরে মুর্শেদকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারীর পদ থেকে দিল্লীতে বদলী করা হয়েছে। কলকাতার বিরাট সংখ্যক মুসলিম নাগরিকদের কথা বিবেচনা করে জ্যোতি বসু কলকাতা পুলিশে স্বাধীনতার বাইশ বছর পরে একজন তরুণ মুসলিম অফিসারকে অন্যতম ডেপুটি পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করেছিলেন। নাম তাঁর এ আর খান আই পি এস। কর্ম দক্ষতার অফিসারিটি সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রথম দিকেই তাঁকে কলকাতা পুলিশ থেকে সরিয়ে এক গুরুত্বহীন পদে বদলী করা হয়।

পুলিশ দায়ী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভূতপূর্বকে। শ্রীমতীর ওপর আদেশ বেছে যে নির্বাচনের দিন অবধি তিনি যেন প্রতি সন্ধ্যায় দিল্লীতে কাটি করে রিপোর্ট পাঠান সরকারী শাসন সম্পর্কে।

ইন্দিরাজীর উদ্বেগের কারণ গাছে। তিনি বুঝেছেন যে শ্রীবি বি বাব এন্ড কোং যেভাবে সি পি এমকে রে আনতে বললে বেঁধে আনছে হুত তাঁর নিজের দলের অসুবিধা বই দ্বিধা হবে না। সেনাবাহিনী এবং জা প্রশাসনের একটি অংশের তরুণ তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে পুলিশ যে ভাবে লড়ে তাতে সামান্য মানুষের সি পি এমের প্রতি সহানুভূতি আরও ক্ষুণ্ণত পারে।

কলকাতা এবং আশেপাশে তাঁর জনসভাদলিতে যে সামান্য জমায়েত হোছিল তাতে তাঁর উদ্বেগ আরও বেড়েছে বলে জানা গেছে।

পুলিশের পক্ষপাতের নিদর্শন প্রতি পাওয়া গেল একটি বৃহৎ প্রবাদপত্রের জনৈক সংবাদদাতার গল্প। তিনি দর্পণের সংবাদদাতাকে গানিয়েছেন যে বরহনগর, নোয়াপাড়া ঠাণ্ডা ইত্যাদি বিভিন্ন থানার অফিসের অফিসারদের মার্কসবাদী গান্ডিনিস্ট সম্পর্কে 'সি পি এম বদমাশ' ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেন। অন্যান্য লগুদল সম্পর্কে অবশ্য এরা খুবই লম্বাশীল।

সি পি এম গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিজয় সিংহ নাহারকে দারুণভাবে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

শাসক কংগ্রেস নিজেদের অবস্থা বুঝতে পেরে শেষ মুহূর্তে ইন্দিরাজী আর জগজীবনকে আনিরে- ছিলেন। কিন্তু ইন্দিরাজী গান্ধীর এবাবের মিটিংগুলোতে তেমন জনসমা- বেশই হয়নি। আর ট্যাক্স-ফাঁকিদার জগজীবন রমের সভায় বে লোক হবে না তা কংগ্রেসীরাও জানতেন।

এই অসহায় অবস্থার শাসক কংগ্রেস আর দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট-দের চাপে পুলিশ দলে দলে সি পি এম কর্মীদের গ্রেপ্তার করে চলেছে। কিন্তু এসব সফল দর্পণ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে সি পি এম-কে হারানো যাবেনা।

ভাতার-অশ্বিনী রায়-সি পি আই, ডাঃ আবদুস সত্তার-আর এস পি, অনাথবন্দু ঘোষ-সি পি এম, সুনীলকুমার দাস-আদি কং, সুনীলকুমার ঘোষ-বাং কং।

গলসি-অনিলা রায়-সি পি এম, দেবরঞ্জন সেন-ফঃ বঃ, বস্তিয়ার মন্ডল-আদি কং, মনোরঞ্জন বসু-বাং কং।

বর্ধমান উত্তর-কেন্দ্রনাথ অধিকারী-নির্দল, দাশরাধি তা-আদি কং, প্রদীপ ভট্টাচার্য-নব কং, বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী-সি পি এম।

খন্দোঘোষ (তফ)-প্রমথনাথ ধীর-আদি কং, গোবর্ধন পাকড়ে-এস এস পি, পূর্ণচন্দ্র মালিক-সি পি এম, বিমলাকান্ত মল্লিক-বাং কং, মনোরঞ্জন প্রামাণিক-নব কং, প্রবীর মল্লিক-আর এস পি।

জামালপুর (তফ)-অনিলা সাঁতরা-আদি কং, কালিপদ দাস-ফঃ বঃ (মা), পূর্ণরঞ্জন প্রামাণিক-নব কং, বাসুদেব মল্লিক-বাং কং।

মেমারী-বিনয়কৃষ্ণ কোন্ডার-সি পি এম, জিতু মুন্ড-নির্দল, তুহিনকুমার সমস্ত-নব কং, রাধা-রমন সেন-আদি কং।

কলনা-কংক মুন্ড-নির্দল, হরেকৃষ্ণ কোন্ডার-সি পি এম, নুরুল ইসলাম মোল্লা-আদি কং।

নন্দঘাট-গোপালচন্দ্র মন্ডল-নির্দল, পরেশচন্দ্র গোস্বামী-আদি কং, সৈয়দ আবদুল মনসুর হাবি-বুদ্দা-সি পি এম।

মুন্ডেশ্বর-কাশীনাথ হাজরা চৌধুরী-সি পি এম, চন্দ্রশেখর সামস্ত-বাং কং, রাজকৃষ্ণ দাঁ-আদি কং, মানবেন্দ্র ব্রহ্মচারী-ফঃ বঃ, শৈলেন্দ্রনাথ হাতি-নব কং।

কাটোয়া-তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-আদি কং, সুব্রত মুখার্জী-নব কং, হরমোহন সিংহ-সি পি এম।

মল্লিকোট-কেনরাম পাঁজা-বাং কং, নিখিলানন্দ সুর-সি পি এম, মনমোহন চৌধুরী-আদি কং।

কেতুগ্রাম-নিমাইচন্দ্র মন্ডল-সি পি এম, প্রভাকর মন্ডল-নব কং, শক্তিপদ হালদার-সি পি আই, সহ-দেব মালিক-আদি কং।

দুর্গাপুর - আনন্দ গোপাল মুখার্জী-আদি কং, নিমাই রাউত-সি পি আই, দিলীপ মজুমদার-সি পি এম।

ফরিদপুর-জাৰ্যগোপাল ঘটক-আদি কং, জাবর্ণানন্দ চ্যাটার্জী-বাং কং, দীননাথ রায়-সি পি আই, নীরদবর মুখার্জী-নিঃ, শিবদাস ঘটক-নব কং, সনৎকুমার ব্যানার্জী-বি বাং কং, প্রফুল্ল-কুমার মুখার্জী-নিঃ।

অসানসোল-জ্যোৎস্না ঘোষ-সি পি এম, নিরঞ্জন ডিহিদার-সি পি আই, গোপিকারঞ্জন মিত্র-আদি কং।

জমুদিয়া (তফ)-দুর্গাদাস

মন্ডল-সি পি এম, চন্দ্রনাথ বাউড়ি-আদি কং, অমরেন্দ্র মন্ডল-নব কং, দিবাকর বাউড়ি-এস এস পি।

উত্তরা কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত

পূর্বপন্থী-মোজা হুমায়ুন কবির-সি পি এম, রাধাগোবিন্দ-প্রসাদ মল্লিক-নব কং, মানবেন্দ্র রায়-আদি কং, বিনোদবিহারী দেবনাথ-এস এস পি।

রায়না-সুকুমার চট্টোপাধ্যায়-নব কং, রমসানী তা-আদি কং, গোপালানন্দ রায়-সি পি এম।

বীরভূম

নানুর-ইলা দাস-বাং কং, বন-মালী দাস-সি পি এম, শক্তিপদ বাগদী-সি পি আই, সৃষ্টিধর বাশ-আদি কং।

লাভপুর-অনিলা মুখার্জী-এস ইউ সি, শশাংকশেখর মুখ-বাং কং, শিশিরকুমার দত্ত-নব কং, সুরেন্দ্রকুমার রায়-আদি কং, সুনীল কুমার মজুমদার-সি পি এম।

দুবরাজপুর-এনায়েৎ করিম-চৌধুরী-আদি কং, ধীরাজকুমার চক্রবর্তী-নির্দল, ভক্তিব্রজ মন্ডল-মন্ডল-ফঃ বঃ, মহম্মদ ইদ্রিস-নব কং, মোজা গোলাম সিরজা-আর এস পি, শেখ মজরুল ইসলাম-সি পি এম।

রাজনগর (তফ)-নন্দ বাউরী-সি পি এম, নবনী ধর মন্ডল-নব কং, গান্ধী বাউরী-আদি কং, গোপাল বাউরী-ফঃ বঃ।

সিউড়ি-অরুণকুমার চৌধুরী-সি পি এম, সুনীত চ্যাটার্জী-নব কং, শ্যামল চ্যাটার্জী-বাং কং, প্রতিভা মুখার্জী-এস ইউ সি, অম্বিকা শেখ-মুসলিম জীগ।

ময়ূরেশ্বর (তফ)-অধর সাহা-নব কং, পঞ্চানন গোট-সি পি এম, লালচাঁদ ফুলমালি-সি পি আই, ধরজাদারী গোট-আদি কং।

রামপুরহাট - আনন্দগোপাল রায়-নব কং, কুমারেশ গুই-ফঃ বঃ, দুর্গাপদ দাস-আদি কং, ব্রজমোহন মুখার্জী-সি পি এম।

হাসান (তফ)-প্রিলোচন মাল-আর সি পি আই, সঞ্জয়কুমার সাহা-আদি কং, সত্যবান মন্ডল-নব কং, বিজয়কৃষ্ণ মন্ডল-নির্দল, বিজুভূষণ মন্ডল-ফঃ বঃ।

মুরারাই-নুরুল হুদা আখতার আলিম-বাং কং, বজল আমেদ-এস ইউ সি, ইউসুফ আলি-আদি কং, দুর্গাদাস ঘোষ-নিঃ, মনসুরুল হক-নব কং।

নলহাটি-সৈয়দ মৈনুল হক-আদি কং, আবদুল আজিজ-নব কং, জিয়া আলি বকসী-এস ইউ সি, মোজা জহরুল ইসলাম-মুঃ লীগ, গোলাম মহীউদ্দিন-নিঃ।

কোলপুর-জয়গিস মোল্লা-সি পি এম, অজয়কুমার নন্দন-মুঃ লীগ, চিত্তরঞ্জন রায়-সি পি আই, রঞ্জিত চৌধুরী-বাং কং, প্রশান্ত মুখার্জী-সি পি এম।

মহম্মদাবাদ-শ্রীপদ মুখো-পাধ্যায়-নির্দল, বিজয় ঘোষ-বাং কং, এনামুল হক মল্লিক-

আদি কং, নীলরতন ঘোষ-নব কং, ধীরেন্দ্রনাথ সেন-সি পি এম, মহম্মদ কুদ্দুস আলি-এস ইউ সি।

পাক-ভারত চক্রান্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হবে না যদি পাকিস্তান বিমানের জন্যে কতিপয় না দেয়। এই দাবী এখন আর উত্থাপিত হচ্ছে না।

হালেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর কত্যা জেনারেল মনেকশ কলকাতার এসে আরও সেনাবাহিনী আনার পরিকল্পনা করেছেন।

ইন্দিরা গান্ধী আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রামও হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। সরেজমিনে তদন্ত হল পূর্ববঙ্গের আম্পোলনের ব্যাপারে কি প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে হতে পারে। আর এই আম্পোলনের জোয়ার এখানে এসে পৌঁছলে কি করা দরকার।

এখন পরিস্থিতি যে, পশ্চিমবঙ্গে সেনা বাহিনীর অবতরণ শুধুমাত্র এ রাজ্যে এখন শান্তি শৃঙ্খলা সমস্যার সঙ্গে জড়িত নয়।

সেনা বাহিনী স্পষ্টই ঘোষণা করেছে যে, নির্বাচনের পরেই যে ওয়া চলে যাবে এমন কোন আশ্বাস দেওয়া যায় না।

দিল্লী পশ্চিম বঙ্গের সরকারী প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি শুধিরা সহচরী নন্দিনী সংপর্ষকে কলকাতার বসিয়ে রাখা হয়েছে।

তবে ওয়ের আশা যে, পশ্চিম-বঙ্গে পূর্ব বঙ্গের অবস্থা হয়ত হবে না। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মুজিববরের আওয়ামী লীগের মত অত শক্তিশালী হতে পারবে না।

যে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি এখনে সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে এখানকার মানব পূর্ব বঙ্গের মত একতরফ- হতে পারবে না। উগ্রপন্থী, বং-কংগ্রেস, আট পার্টি আর নব কংগ্রেসের নতুন ভাবমূর্তি সব মিলিয়ে হয়ত মার্কসবাদীদের ঠেকাতে পারবে।

সাক্ষাতে বিফল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছিল যে, ডি সি এস বির অনুমতি দরকার। কিন্তু সেখান থেকে জানানো হল একথা সত্য নয়।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্সী জেলে ঐ ঘটনা ঘটান আগে পর্যন্ত নকশালপন্থী বন্দিদের সঙ্গে দেখা করার বিশেষ অসুবিধা ছিল না। জেল গেটে একটি পিটিশন দিলেই দেখা করা যেত।

বন্দিদের সঙ্গে দীর্ঘদিন দেখা করতে না পেরে তাঁদের না-বোনেয়া দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। রঞ্জিত পুস্তক কছে গেলে তিনি ভাগিয়ে দেন। দেবী রায় দুর্বিসহার করেন।

এমন অভিযোগও আছে যে, নক-শাল পন্থীদের না পেরে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ তাদের মা-বোনের হরণা-করছে।

সি পি আইয়ের এরঙ্গর বিরোধী নীতি । জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা

দমন

১৪শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১১ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিঃ ৩০ পৃঃ

সি পি একে প্রচণ্ড মার দেবার সরকারী সিদ্ধান্ত সাইটসে গোপন বৈঠক

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

সি পি আই-এর মধ্যে কংগ্রেস-সীসের মন্ত্রিসভা গঠন প্রসঙ্গে যে সামান্য অন্তর্বিবোধ ছিল তাও মিটে গেছে। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা ভবানী সেন দিল্লী থেকে নির্দেশ আনার সঙ্গে সঙ্গে।

দিল্লী আদেশ দিয়েছে বি, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-ই হল একমাত্র রাজনৈতিক শত্রু, অতএব এই দলকে কোন মতে সরকার গঠনে সহায়তা করা চলবে না।

স্বতন্ত্রতা, ইন্দিরার নেতৃত্বে নব কংগ্রেস প্রগতিবাদী, সেই (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি পি এম দলকে প্রচণ্ড মার দেবার জন্যে পশ্চিম বঙ্গের সরকারী কর্তারা এক গোপন পরিকল্পনা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। গত পনেরোই মার্চ রাইটাস বিল্ডিংয়ে এক অত্যন্ত গোপনীয় বৈঠকে রাজ্যের চারজন ডিভিসন্যাল কমিশনারকে এই পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। বৈঠকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উপদেষ্টা বি বি ঘোষ এবং চীফ সেক্রেটারী এন সি সেনগুপ্ত এই মর্মে আভাস দেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম মন্ত্রিসভা গড়তে দেওয়া হবে না

এবং কেন্দ্রেরও সেই রকম ইচ্ছা। যদি অমার্কসবাদী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তাহলে কিংবা রাষ্ট্রপতির শাসন কালেম থাকলে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের কঠোরভাবে দমন করতে হবে এবং সেজন্যে দরকার হলে প্রচণ্ড মার দিতে হবে। বৈঠকে ওরা দাজন, চারজন ডিভিসন্যাল কমিশনার ভিন্ন আই জি পুলিশ এবং পুলিশ কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনোত্তর আইন ও শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে বৈঠকটি ডাকা হয়।

জানা গিয়েছে, বৈঠকের প্রারম্ভেই একজন কমিশনার প্রশ্ন করেন, নির্বাচনের পরে আইন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নতুন মন্ত্রিসভার। তাহলে এই বৈঠক ডাকা হয়েছে কেন। জবাবে বি বি ঘোষ বলেন, পশ্চিম বঙ্গে সি পি এম সরকার গড়তে দেওয়া হবে না। কেন্দ্র থেকেও সেই মর্মে আভাস এসেছে। যতদূর মনে হচ্ছে, কোনো মন্ত্রিসভাই হবে না। যদি হয় তাও সি পি এম বিরোধী মন্ত্রিসভা হবে। সেই অবস্থায় আইন ও শৃংখলার কি অবস্থা দাঁড়াবে তা বলার জন্যে তিনি আই জি পি, কে বন্দুকে অনুরোধ জানান। পি কে বন্দু শ্রবণশীলভাবে বলেন, এই অবস্থায় সি পি এমরা দারুণ গোলমাল করবে বলে আই বি রিপোর্ট দিয়েছে। তখন আর একজন ডিভিসন্যাল কমিশনার প্রশ্ন করেন, এই

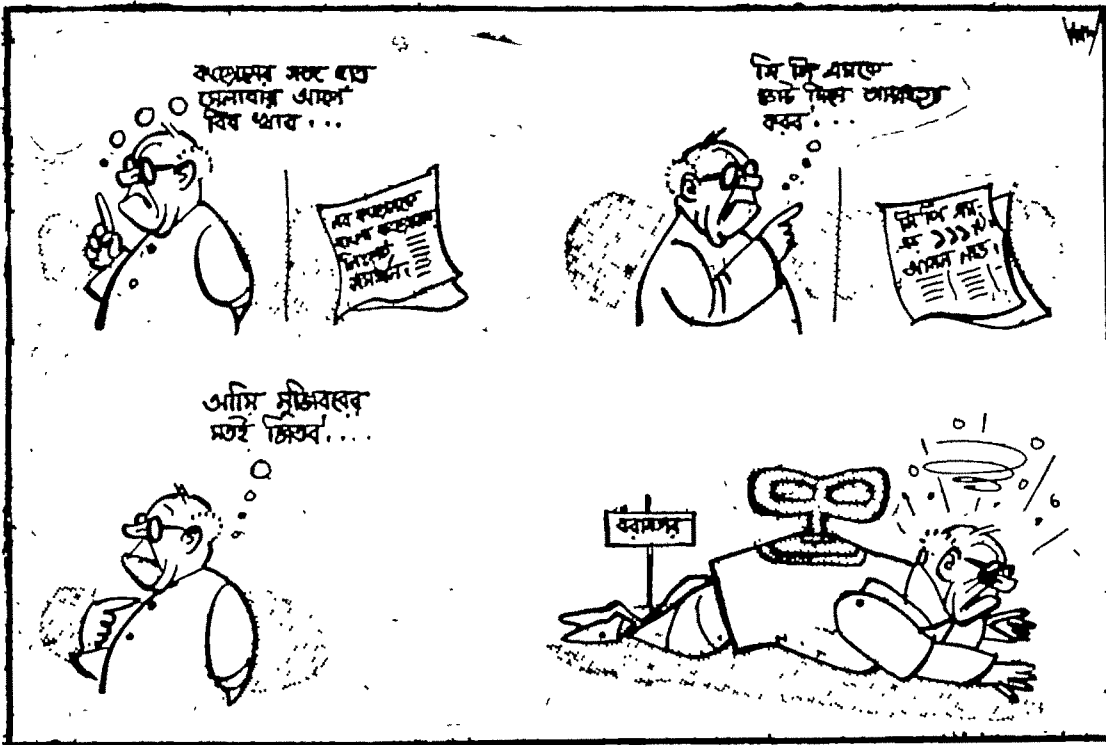
(শেখাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

বাংলা কংগ্রেস উঠে যাচ্ছে একমাত্র বাধা আড়াই লক্ষ টাকা দান

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

শ্রীঅজয় মধুপাধ্যায় বাংলা কংগ্রেস দল তুলে দিতে চান, কিন্তু শত্রু একটি মাত্র কারণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণটা হল শ্রীসুশীল ধাড়া বলেছেন দল তুলে দিতে হলে আড়াই লক্ষ টাকার দরকার হবে, কারণ নির্বাচনের পর দলের দেনার পরিমাণ হল আড়াই লক্ষ টাকা। দেনা অর্থে এই টাকাটা বাংলা কংগ্রেস সরকার গড়বে এই হিসাবে বিভিন্ন মহল থেকে আগাম নেওয়া হয়েছিল। বাংলা কংগ্রেস নির্বাচনে যে টাকা ব্যয় করেছে তার মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছিল শ্রীঅজয় মধুপাধ্যায়ের বক্তৃতা রেকর্ড করিয়ে। মহান নেতার বক্তৃতা বিভিন্ন গ্রামে বাজিয়ে শোনানো হবে এই উদ্দেশ্যে এই রেকর্ড করা হয়েছিল।

এদিকে শ্রীঅজয় মধুপাধ্যায় শ্রীসুশীল ধাড়াকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন। তা হল : তুমি কোন দল বা কারো সঙ্গে কোন কথা বলবে না। কর্মপরিষদ ও সম্পাদক মণ্ডলী বলে কিছু নেই। কাজেই তার কোন সভার দরকার নেই। তবে একটা সভা হবে আর সে সভায় শত্রু কতকগুলি পদত্যাগ পর আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা হবে বার মধ্যে তোমার (শ্রীসুশীল ধাড়া) পদত্যাগ পর অবশ্যই থাকা চাই। বহুসংখ্যক বাংলা



নকশাল নেতা সুশীতল রায়চৌধুরী সম্পর্কে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নকশালপন্থী নেতা শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরী দক্ষিণ কলকাতায় এক নার্সিং হোমে সম্প্রতি মারা গেছেন। মৃত্যুর পেছনে কোন সন্দেহজনক ব্যাপার জড়িত থাকতে পারে বলে পুলিশ মনে করছে।

তাই শবদেহ ময়না তদন্তে পাঠান হয়। পুলিশের এই সন্দেহের কারণ হল, সুশীতলরায়ের সঙ্গে নকশালী নেতা চান্দ্র মজুমদারের (শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

শ্রদ্ধেয় নেতা হেমন্ত বসুর হত্যা সম্পর্কে আরও তথ্য

কংগ্রেসের সভায় শ্রীহরিদাস মিত্র, শ্রীপ্রবল মধুপাধ্যায় শ্রীআমজাদ আলি দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের অভিল্যাব জানিয়েছেন আর শ্রীসুশীল ধাড়াকে লক্ষ্য নিবারণের জন্য একশত বন্দু দিয়ে রাজী হন নি। সেই বিবরণ পরে প্রকাশ করা হবে।

শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসুর হত্যা সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য এখন পাওয়া যাচ্ছে। এটা পরিষ্কার যে, হত্যা সংঘটিত হয়েছিল সি পি এম বিরোধী নির্বাচনী আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য।

দর্পণের সংবাদদাতা সম্প্রতি শ্যামপুঙ্কর স্ট্রীটে বৈশাখ হেমন্ত- (শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

যাদবপুর থানায় নারকায় অত্যাচারে নকশাল নেতা আশু মজুমদার নিহত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আত্মসমর্পণ করার পরও সামরিক বাহিনীর রক্ষীল উপরূপরি ভুলী করে যাদবপুর ও কসবা অঞ্চলের সুপরিচিত নকশাল নেতা আশু মজুমদারকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ধরনের হত্যার পড়ার পর এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কোথায়, কিভাবে আশু মজুমদারকে হত্যা করা হলো, এ সমস্ত কিছুর সুস্পষ্ট উত্তর দাবী করে ইতিমধ্যেই স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ একটি স্বায়কলিপি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও যাদবপুর থানার সঙ্গে যুক্ত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একজন কনস্টেবলের মুখ থেকে আমরা আশু মজুমদারের হত্যা সম্পর্কে

যে বিবরণ সংগ্রহ করেছি, তা অবিকৃত ভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরা হলো।

গত ১০ই মার্চ নির্বাচনের দিন সকাল ১০টা নাগাদ সামরিক বাহিনীর সহায়তায় যাদবপুর ও কসবা থানার সমগ্র পুলিশল কসবা থানার কালিকা-পুর অঞ্চলটি অকস্মাৎ ঘিরে বেলে ও বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালাতে থাকে। খুব সম্ভব আশু মজুমদার ও তার অস্ত্র চারজন সঙ্গী এই সময় কালিকতার একটি বাড়ীতে আশ্রয়প্রাপ্ত হয়ে ছিলেন। পুলিশ আশু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করার অস্ত্র দীর্ঘনিম্ন ধরে চেঁচা চািলিয়ে বাজিয়ে। ঘাই হোক, ব্যাপক তল্লাশীর খবর শোনা মাত্র (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে দুর্গারকল্পিত নকশাল হত্যা

সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে পুলিশের তাম্ভবলীলা কতটা দানবীয় রূপ নিয়োগিত তা বোঝা যাবে নিহত ও আহত নকশালপন্থীদের সংখ্যা দেখে। চব্বিশশে ফেব্রুয়ারী আকাশবাণীর সন্ধ্যা সংবাদে পুলিশের গুলিচালনা ও বর্বরোচিত বেরনট চার্জের ঘটনাটি শ্রদ্ধাভাজ্য লাঠিচালনারূপে পরিবেশন করা হয়েছে। সেদিন দুপুরের দিকে এই জঘন্য পুলিশী হত্যাকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত হয়, এখন পর্যন্ত বার মৃত্যুসংখ্যা নয় এবং এখনো যারা গুরুতর অবস্থায় জীবিত, তাদের সংখ্যা ষাট-এর বেশীই হবে (এদের অধিকাংশের অবস্থা সংকটজনক, বাঁচার আশা অত্যন্ত কম)। কয়েকজন নকশালপন্থী বন্দীর মৃতদেহ গুল্ম করে ফেলা হয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে। চব্বিশশে ফেব্রুয়ারীর বিকেল হতে না হতেই হাসপাতালের সম্মুখে শোকাবুল জনতার ভিড় বাড়তে থাকে। আশ্রিত ফেব্রুয়ারী হাসপাতালে গিয়ে নিহত ও আহতদের গায়ে পার্শ্বিক আঘাতের চিহ্ন দেখি, কিছু সংখ্যক বন্দীর দেহ একোড়-একোড় করা,

কয়েকজনের মূখ্য বেরনট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এত বিকৃত করা হয়েছে, কোন সভ্য দেশের পুলিশের দ্বারা এ কাজ হয়েছে একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। নজরুল ইসলাম নামে জনৈক নিহত বন্দীর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না এমন নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে, একদিকের চোখ মাংস-সমেত বের হয়ে এসেছে।

এই বীভৎস পুলিশী উল্লম্বতার গায়ে “নকশাল-পুলিশ” সংঘর্ষের লেবেল এঁটে পুলিশ রিপোর্ট মিথ্যা প্রচার চালালেও সকলকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না নিশ্চয়ই। কতকগুলি কাল্পনিক ঘটনার সাহায্যে মর্শিদাবাদের জেলা শাসক তাঁর জঘন্যতম অপকর্মকে ঢাকতে চেষ্টা করছেন। রেডিও থেকে অধিকাংশ খবরের কাগজ মিথ্যাভাষণে অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের বক্তব্য হলো নকশালপন্থী বন্দীরা প্রথমে জেল-পুলিশবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় এবং একজন ওয়ার্ডারকে ভোজালি দ্বারা গুরুতরভাবে আহত করে লুকিয়ে রাখে। এক-

থাও বলা হয়েছে বন্দীরা পুলিশের উপর ইটপাটকেল বর্ষণ করে। অসংখ্য সি আর পি ও সশস্ত্র জেল-পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত বন্দীরা একটি ভোজালির দ্বারা তাদেরকে যুদ্ধে আহ্বান জানাবে, এ কি পাগলো বিশ্বাস করবে? বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে অত ইটপাটকেল এলো কোথা থেকে অত রাইফেলধারী সতর্ক পুলিশ, সি আর পি এবং জেল অফিসারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে? চিল ছুঁড়ে রাইফেলের সংগে এমনভাবে বন্দীরা রণক্ষেত্র তৈরী করতে পারে, এও কি কেউ বিশ্বাস করবে? এতজন বন্দীর স্বাধীন সমাবেশ জেলের মধ্যে ঘটতে পারে কিনা এ প্রশ্ন সকলের কাছেই রহস্য হয়ে আছে। উপরন্তু যুদ্ধে যুদ্ধে একটা কাহিনী বহরমপুরে চালু করা হয়েছে, নিহত বন্দী নজরুল ইসলাম নাকি সর্বাত্মে লাঠি নিয়ে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীকে আক্রমণ করে। হাসপাতালে গিয়ে নজরুল ইসলামকে দেখে প্রচারটি কতটা হৃদয়হীন এবং সেই সংগে হাস্যকর, তা বুঝতে পারলাম। নজরুলের জন্ম

থেকেই একটি পা নেই, সে ক্রমের সাহায্যে চলত। এ অবস্থায় আত্মরক্ষা করাও তার পক্ষে কঠিন ছিল আক্রমণের কথা তো ভাবতেই পারা যায় না। বহরমপুরে এই জেলে নকশাল বন্দীদের ওপর পুলিশের নারকীয় অত্যাচারের কথা আমাদের কানে এসেছে, তবু এর পরি-সমাপ্তি এভাবে ঘটবে তা ভাবা যায়নি। চব্বিশশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনায় নিহত ও আহতদের অনেকেই পি ডি আইনে ধৃত এবং এদের বিরুদ্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ও অভিযোগ ছিল না।

একদা বারাসতে নিরীহ জনতার উপর গুলিবর্ষণের হুকুম দিয়ে যে এস ডি ও রাতারাতি ডি এম পদে উন্নীত হন তাঁর মৃত উম্মতির রাস্তা কখনের জানা আছে। বর্তমানে মর্শিদাবাদের জেলা শাসক-রূপে দক্ষতার পরিচয় দিন আর না-ই দিন, পদোন্নতির স্বপ্নধনি যে হাতের কাছে একটা পেয়েছেন এতে আমাদের সন্দেহ নেই। পরে হয়তো এই সুযোগ না-ও আসতে পারে, সেই সংগে প্রশাসন বিভাগের শীর্ষস্থানে দ্রুত আরোহণ করার স্বপ্ন-টিও দীর্ঘদিন পিছিয়ে যেতে পারে।

সুতরাং অগণিত নিরস্ত্র বন্দীর জীবননাশের মধ্য দিয়ে তাঁর সুপরি-কল্পিত দ্রুত উন্নতির পথ পুনরায় রচিত হলো। বতপূর জানা গেছে, শোলাগান দেওয়া নিয়ে নকশালপন্থীদের সংগে জেলরক্ষী ও জেলকর্তৃপক্ষের সামান্য বিরোধ ঘটলে ডি এম সাহেব রাইফেলধারী পুলিশ বাহিনীকে তাদের উপরে জেলে দিয়ে দেন। অত্যন্ত বিশ্ববস্তসমূহে এ-ও জানা গেছে যে এই গৌরীর অফিসারটি বেরনটচার্জের হুকুম দিলে জেলের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার তার পা চেপে ধরে উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করার জন্যে অনেক সাধ্যসাধনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদেশ বহাল থাকে এবং তিনি (ডি এম) কাছে দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশবাহিনীর দ্বারা এই হত্যাকাণ্ডটি সুসম্পন্ন করেন। অবশেষে নিরস্ত্র বন্দীদের উপর এই নিষ্ঠুর নৃশংসতার দ্বারা তিনি যে পদের লালসাই চরিতার্থ করেন না কেন, তিনি জেলাশাসকের পদে যে অব্যোধ্য একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট ও প্রকাশিত। অবিলম্বে বধোপবৃত্ত তদন্তের ব্যবস্থা হোক।

সি পি আই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কারণে এই পার্টিকে সমর্থন করা সি পি আই-এর রাজনৈতিক কর্তব্য।

কয়েকজন পুরনো সি পি আই নেতা, দৃষ্টান্ত হিসাবে সোমনাথ লাহিড়ী, কংগ্রেস সমর্থনের রাজনীতির তাঁর বিরোধিতা করেন। কিন্তু পার্টির মধ্যে কেউ ভুল বুঝতে পারে মনে করে সপ্তে সপ্তে বলে রাখেন যে, সি পি আই-এর কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

সমস্ত আলোচনা স্তব্ধ হয়ে যায় একটি প্রশ্নের অবতারণার, এবং তা হল সোভিয়েট ইউনিয়নের ইন্দিরা গান্ধী ও নব কংগ্রেসের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন। সোভিয়েটের এই লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে সি পি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে অন্য কোন রাজনীতির কথা ভাবা সম্ভব নয়।

ভবানীবাসু সোভিয়েট-ইন্দিরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্টের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন পরিচিত তাত্ত্বিক ভণ্ড। সি পি আই রাজ্যকর্মিটির সভায় তখন অনেকেই হাই তুলতে দেখা যাচ্ছিল। সকলেই জানে সোভিয়েট অর্থসাহায্য ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই-এর অবস্থা কি দাঁড়াবে। কি করে চলবে পার্টির খরচ, কি করেই বা চলবে কালান্তর দৈনিক, কালান্তর সাম্প্রতিক আর সম্ভাব্য।

অর্থাৎ রাজনীতির চেয়ে পার্টির সোভিয়েট নির্ভরশীলতার বাস্তব অবস্থা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই সি পি আই বিরোধিতা অথবা নিঃশর্ত কংগ্রেস সমর্থনের ব্যাপারে সি পি আই-এর কোন সংকোচ নেই।

এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কি

যুক্তি দিলে সি পি আই বিরোধিতা আর কংগ্রেস সমর্থন কিছুটা লোকসমক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য হয়। সি পি আই-এর নির্বাচন সম্পর্কে যা বিচার বিশ্লেষণ ছিল সমস্তই ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

সি পি আই প্রমিক কৃষক আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নির্বাচনী ফলাফলই তার প্রমাণ। প্রমিক এলাকায় সি পি আই-এর একচ্ছত্র প্রভাব। আর কৃষক এলাকায় সি পি আই তার সংগঠিত শক্তির পরিচয় দিয়েছে। অন্যদিকে নব কংগ্রেসে ছোটদার আর অন্যান্য জমির ছোট ছোট মালিকের সমাবেশ লক্ষণীয়।

আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন সি পি আই নেতারা তাই এখন নব কংগ্রেসের সঙ্গে কেন নির্বাচনের পুর্বেই যুক্তফ্রন্ট করা হয়নি সেই কথা তুলেছেন। তাঁরা বলছেন এই ধরনের যুক্তফ্রন্ট তামিলনাডে বিহারে সি পি আই-এর আসন সংখ্যা বাড়তে সাহায্য করেছে। আর সেই সপ্তে তামিলনাডে সি পি আই-এরও বিধ্বস্ত করা গেছে।

পার্টির কেউ কেউ আলোচনা সভায় বিড় বিড় করেন যে, এই অবস্থায় ত পার্টি তুলে দিয়ে নব কংগ্রেসে মিলে গেলেই হয়। গোলামালো তাদের কথা ভুলে যায়। অনেকে বলেন ভিড়তে চাইলেই নব কংগ্রেস নেতারা ভিড়তে দেবেন কেন। তাছাড়া সি পি আই-এর আলাদা সভা সি পি আই বিরোধী রাজনীতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

এখন সি পি আই-এর মধ্যে একমাত্র চিন্তা কি যুক্তি দিয়ে নব কংগ্রেসকে নিঃশর্ত সমর্থন আর সি পি আই-এর জিম্মা রাজনৈতিক সভা এই দুই পরস্পর বিরোধী নীতিকে সুসমঞ্জস করা যায়।

আশু মজুমদার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আশু মজুমদার ও তার সঙ্গীরা গোপন বাঁটি থেকে বেরিয়ে অস্ত্র পালিয়ে বাবার চেঁচা করেন। কিন্তু ঐ সময় তারা পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি পড়ে যান। আশু মজুমদার ছাড়া অস্ত্র সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পুলিশ ও সামরিক রক্ষী বাহিনীর ব্যূহের মধ্যে আটকা পড়ে বাবার পর আশু মজুমদার হাত তুলে আত্মসমর্পণ করতে চান। কিন্তু জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করার হযোগ থাকা সত্ত্বেও রক্ষী বাহিনীর একজন “অগুরু” স্টেন-গান থেকে গুলি চালায়। গুলীর আঘাত কাঁধে লাগে, নিরস্ত্র আশু মজুমদার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঐ অবস্থায় পুলিশ তাকে বাহরপুর থানায় নিয়ে যায়। নির্বাচন তখন পুরোদমে চলছে। আহত আশু মজুমদারকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখন স্থানীয় লোকেরা মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। কোথাও কোথাও নির্বাচন বন্ধও হয়ে যায়।

প্রকাশ, আশু মজুমদারকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় সকাল ১০-১০টা নাগাদ। অচল বাহুর হাসপাতালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় দুপুর ১টা। আর আড়াই ঘণ্টা ধরে আহত

আশু মজুমদারকে থানার আটকে রেখে দেওয়া হয়।

থানার একজন কনস্টেবলের মুখ থেকে শোনা যায় এই আড়াই ঘণ্টা ধরে আহত আশু মজুমদারকে থানার মধ্যে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। অত্যাচারের মুখ্য মার খেয়েও আশু মজুমদার স্বীকার করেন-নি যে তিনি “খুনী আসামী”। সন্ধ্যার একজনে নামও পুলিশ তার মুখ থেকে আদায় করতে পারেনি। কী-কর্মে বার বার তার মুখ থেকে শোনা গেছে—“সি পি আই (এম-এল) জিম্মাবাদ; কমরেড চাক মজুমদার জিম্মাবাদ”।

থানায় নিয়ে আসার আগে আশু মজুমদার মাঝ একবার গুলীবিদ্ধ হন, ডান হাতে, কাঁধের কাছে, অচল হাসপাতালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে তার বেহে অস্ত্র চারবার গুলী করা হয়েছে। দেহের নানা স্থানে চাকুরি ফালা কালা করে কেটে দেওয়া হয়েছে। মাথার চুল হাত দিয়ে টেনে উপড়ে ফেলা হয়েছে, নখের আঘাতে মুখ বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। থানার মধ্যে এ ধরনের অত্যাচার ও খুনের খবর আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। কলকাতার পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্ত বাধ্য হয়ে নিজেই স্বীকার করেছিলেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে ভামপুতুর থানায় মর্শেই সঙ্গীরা ভট্টাচার্যকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এই, পুলিশ কমিশনারের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও

আজ পর্যন্ত ভামপুতুর থানার কেনা কোন্ পুলিশের কর্মীরা সঙ্গীরা ভট্টাচার্যকে লাঠিপেটা করে হত্যা করেছে তা পুলিশ জানতে পারে নি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বার বার কলকাতা পুলিশের উপর মহলের ব্যক্তিবৈর কাছ থেকে একটি মাত্র জবাব পাওয়া গেছে—“হ্যাঁ থানার মধ্যে হত্যা করা হয়েছে, তবে কে করেছে এখনও জানা যায়নি, তদন্ত চলছে।”

ভর্তির একটু পরেই বাহুর হাসপাতালে আশু মজুমদার মারা যান। দুদিন ধরে পুলিশ তার মৃতদেহে পোষ্ট-মর্টেমের অজুহাতে আটকে রাখে। দুদিন পর তার দেহ পুলিশের গাড়ী করে কেঁকড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। অহরোধ সত্ত্বেও মৃতদেহ আত্মীয় বন্ধুদের কাছে সমর্পণ করা হয়নি।

হোলের দিন সন্ধ্যায় আশু মজুমদারের মৃতদেহ সংস্কার করা হয়। সমস্ত শ্রমণ ঘাটটি পুলিশ ঘিরে রাখে। পুলিশের ভয়ে বন্ধুরা শ্রমণ ঘাটে উপস্থিত থাকতে পারেনি। অচল পুলিশের চোখে গুলো দিয়ে তারই মধ্যে কে একজন মৃতদেহের উপর ফুলের তোড়া মালা বিধে যায় থেকে গৌরানের শব্দ ভেসে আসে—“কমরেড আশু জিম্মাবাদ”। অনেকে দেখেছে বাহরপুর অঞ্চলের কিছু বয়সী মহিলা মৃতদেহের চারপাশে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছেন। কেউ কেউ স্বপ্নতোক্তি করেন—আশু খুব ভালো ছেলে ছিলো, ও সবসময় গরীবদের সঙ্গে মিশত, গরীবদের ও ও খুব ভালবাসতো।

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচন

(দপনের পূর্ববর্তক)

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলে দপনের প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষা সাধারণভাবে সঠিক প্রমাণিত হল।

প্রাপ্ত ভোট এবং আসন সংখ্যার ভিত্তিতে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম একক রাজনৈতিক দল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। উত্তরবঙ্গের (মালদহ জেলা ছাড়া) অন্যত্র এই দল সুবিধা করতে পারেন নি বটে কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পার্টির প্রতি সমর্থন যথেষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

এই নির্বাচনের ফলে যে কমিটি লক্ষণীয় বৌদ্ধ পরিষ্কৃতি হয়েছে তা হল (এক) পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অধিকাংশ চিরাচরিত ভাবে কংগ্রেসবিরোধী। সারা ভারতে যখন ইন্দিরা কংগ্রেসের বিজয়তরঙ্গ ছুটে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গে এসে তার গতি রুদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেই ইন্দিরাজীর অপ্ৰতিহত গতি অভিযান প্রধান বাধার সম্মুখীন হয়েছে। লোকসভার আসন সংখ্যা এবং বিধানসভার আসন সংখ্যার দিকে তাকালেই এটা ধরা পড়ে। (দুই) ১৯৬৭ সালে স্বাধীনতা বার্ষিকী স্মৃতি এবং ঐক্যবন্ধ কংগ্রেসের ভোট ও আসনের তুলনায় ১৯৭১ সালে তিন কংগ্রেসের সম্মিলিত আসন সংখ্যা অনেক কমে গেছে (একশ সাতাশ ও বাংলা কংগ্রেসের চৌত্রিশ মোট একশ এক-ষটি থেকে একশ বারো)। সি পি এম-এর আসন সংখ্যা তেতাল্লিশ থেকে একশ এগারোতে উঠেছে, সি পি এম বিরোধী সি পি আই, কংগ্রেস, ব্রজ, কল্যাণিক ও বাংলা কংগ্রেসের জোটের তেবটিটি আসন কমে গিয়ে তিরিশে দাঁড়িয়েছে। একটি দলকল এ রাজ্যে মুসলিম লীগ বেশ কিছু আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। (তিন) একথা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয়েছে যে ১৯৬৯ সালের বৃহত্তর ভোটের অধুত-পূর্বে বিজয়ের প্রধান দায়িত্ব ছিল সি পি এম-এর; অন্যান্য পার্টিগুলি প্রধানতঃ সি পি এম-এর সমর্থনের ফলেই এই সময় এত বেশী আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, সি পি এম পরিচালিত সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট প্রধান একক গোষ্ঠী রূপে আবির্ভূত হলেও, তারা তাদের লক্ষ্য সাধনে অর্থাৎ নিরংকুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হন নি। সি পি এম পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ কি?

কলকাতা শহরে, এবং জেলা-ভিত্তিতে প্রথম বৈধ ভোটের সংখ্যার দিকে তাকালে দেখা যায় ১৯৬৯ সালে, এমন কি ১৯৬৭ সালের তুলনায় তুলনামূলকভাবে ১৯৭১ সালে অনেক কম ভোট পড়েছে। অথচ মোটামুটি কংগ্রেসের পক্ষে ভোটের সংখ্যা কমে নি কিংবা বাড়ে নি। দৃষ্টান্ত

বঙ্গ কলকাতার কাশীপুরে ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছিলেন ২৫১০০টি ভোট, এবার পেয়েছেন ২৬০০০, অত্রিকের সি পি এম প্রার্থী পেয়েছিলেন ২৫৩০৮, এবার পেয়েছেন ১৫৮৫৫টি ভোট। ১৯৬৯ সালে ভোট পড়েছিল একাত্তর হাজার এবার পড়েছে সাত্বে তেতাল্লিশ হাজার বৈধ ভোট এবং বাতিল ভোট ছেড় হাজার নিয়ে একুশে পরিতাল্লিশ হাজার। বিভাগাগর কেন্দ্রে ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস পার ১৮০৬৮টি ভোট, ১৯৬৯ সালে ১৭০১৭ এবং ১৯৭১ সালে ১৭৫৩৭টি ভোট, অত্রিকের সি পি এম প্রার্থী বশাক্রমে পান ২৪৮১২ (১৯৬৭), ২৬২৫২ (১৯৬৯) এবং ১২৪১৮ (১৯৭১), অথচ ১৯৭১ সালে এখানে একজন সি পি আই প্রার্থীও ছিলেন, তিনি পান ৩০৬৬টি ভোট এবং তাঁর ভ্রাতানত

বাকেরাও হয়। ১৯৬৯ সালে এই কেন্দ্রে মোট ভোট পড়ে ৪৬৭৫৫টি এবার পড়েছে ৩৪২৬৪টি ভোট। মোট প্রথম ভোটের সংখ্যা কমেছে অথচ কংগ্রেসের মোট ভোট প্রায় একই আছে, সি পি এম-এর ভোটাররা কমসংখ্যার ভোট দিয়েছেন। এই হচ্ছে কলকাতা শহরের সাধারণ চিত্র। কাশীপুর, বিভাগাগর, শিলালহ, তালতলা, প্রভৃতি কেন্দ্রেও চিত্র একই।

অত্রিকের বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলের নমুনা চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ধরন বারাসাত কেন্দ্রে। ১৯৬৯ সালে এখানে মোট প্রথম ভোট প্রায় সাতার হাজার, এবার বৈধ ভোট ৫৫০০০ এবং বাতিল ভোট ৩৫০৭ নিয়ে একুশে উনবাট হাজার, নদীয়া হাওড়া, হুগলী, বাকুড়া, বীরভূম, চব্বিশ পরগণা সর্বত্র এবারে প্রথম ভোটের হার বেড়ে গেছে। কমেছে পুর্নুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলায়। বিভিন্ন জেলার শহরাকলেও প্রথম ভোটের সংখ্যা ১৯৬৯ সালের তুলনায় কম, কলকাতার বেশ কম, এবং শহর ও গ্রাম মিশ্রিত অঞ্চলে মোটামুটি একই রকম। যেখানেই ভোট কম, সেখানেই কংগ্রেস সুবিধা করতে পেয়েছে। প্রাক নির্বাচনী বহু ভাষাকারের বক্তব্যকে যেন উপহাস করেই এই চিত্রটি পরিকার হয়ে ফুটে উঠেছে।

এর থেকে এটা বেরিয়ে আসে: এক, শহরাকলে কংগ্রেসের ভোট একই রকমের আছে, সি পি এম এবং সংযুক্ত

বামপন্থী মোটর ভোটারদের বেশ বড় একটা অংশ ভোট দিতে আসেন নি। দুই, গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে প্রথম ভোটের পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং প্রধানতঃ সি পি এম ও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট বর্ধিত হারে ভোট পড়ার দরুন লাভবান হয়েছেন।

প্রশ্ন ওঠে সি পি এম ও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের ভোটারেরা শহরাকলে এত বেশী সংখ্যার ভোট দিতে এলেন না কেন? আমাদের মনে হয় (এক) রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে পুলিশ মিলিটারী মোতায়েন, নকশালী উৎপাতের আশংকা এবং ভোটের করহিন আপে থেকেই রাজ্য প্রশাসন পুলিশ এমন কি খোদ রাজ্যপালের পক্ষপাত-মূলক বেতারভাষণ, কলকাতার সংবাদ-পত্রগুলির ভীতিকরক সংবাদ প্রচার এবং এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে প্রতিরোধ

করার যত সংগঠনের অভাব ও বেশ কিছু পরিমাণ আতঙ্কভূত ও সাংগঠনিক শৈথিল্য ভোটারদের এই অনীহার জন্মে হারী। (দুই) রাজনৈতিকভাবে সম্পর্ক বর্জিত মধ্যবিত্ত সমাজ, বিশেষ করে নারীসমাজ গত এক বছরের নকশালী ও পুলিশী হামলা, অপাধি ও অনিশ্চয়তা ঘুর করতে কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী হলই সক্ষম এরকম একটা ধারণার অস্তিত্বে তাতে প্রভাবিত হয়েছেন। কলে-সাধারণভাবে রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন বেশ কিছু সংখ্যক লোক এবার ভোট দিতে আসেন নি অথবা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন।

এক কথায় শহরাকলে সি পি এম ও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের সাংগঠনিক শৈথিল্য এবং আতঙ্কভূত কংগ্রেসকে তাঁদের কলকাতার আটটি নিয়ে পশ্চিম বঙ্গে মোট মাইজিগিটি আসন হথল করতে সাহায্য করেছে।

নকশালপন্থী বলে ব্যাধা পরিচিত তারা প্রধানতঃ শহরাকলে কংগ্রেসের বপক্ষে শুধু ভোটই দিয়েছে তা নয় কংগ্রেস যাতে জয়লাভ করতে পারে তার জন্মে সি পি এম কর্মীদের খুন, ভীতিকরকর্ন, ভোটারদের ভয় দেখান ইত্যাদি ভূমিকা সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করেছে। কেউলপুর, বরানগর, মণিক-তলা, বেলেঘাটা, চণ্ডীতলা, শিলালহ, বিভাগাগর, প্রভৃতি অসংখ্য কেন্দ্রে মাত্র নকশালপন্থী ও কংগ্রেসের মধ্যে এই সক্রিয় সহযোগিতার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। অপরিকল্পিতভাবে সি পি এম ভোটারদের ভোট দিতে না

বাওয়ার জন্য তারা জোর করেছে, পুলিশ প্রশাসন এভাবে সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, কংগ্রেস যাতে ভিততে পারে তার জন্মে শহরাকলে ও আধা শহরাকলে পুলিশ, নকশাল প্রভৃতি কংগ্রেস ও অষ্টধামের বপক্ষে সক্রিয় থেকেছে, বহু ভোটার ভোট দিতে না আসাব এটাও অন্ততম কারণ বলে অনেকেরই মনে হয়েছে।

এক কথায়, নকশাল উপদ্রব বমানোর অজুহাতে ইন্দিরা গান্ধীর প্রশাসন প্রচুর পরিমাণে সি, আর, পি, পুলিশ, বর্ডার ফোর্স, ও মিলিটারী মোতায়েন করে প্রথমে ভোটারদের প্রভাবিত করতে চেয়েছে, খোদ রাজ্যপাল বেতার ভাষণ দিয়ে পক্ষপাতমূলক ভাবে এই ভীতিকরক সহায়তা করে-ছেন, প্রধান নির্বাচনী অফিসারও জ্যোতি বহুর তথাকথিত বক্তৃতা নিয়ে

নির্বাচন বাতিলের ভয় দেখিয়েছেন এবং প্রশাসন বপ্তর তাদের ঐতিহাসিক প্রেসনোট দিয়ে কংগ্রেসকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।

এর মোট ফল হিসেবে লোভল্যমান মধ্যবিত্ত ভোটারদের সংখর জেগেছে যে সি পি এম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট জিতলেও তাদের 'মাইনরিটি ভোটে জয়ী' এবং নির্বাচন বাতিলের অলীক ধুয়া তুলে ইন্দিরা গান্ধী তাদের মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেবেন না। অথচ রাজ্যপাল এই ধারণা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে-ছেন। সুতরাং শান্তিখেলাকামী কিছু মধ্যবিত্ত ভোটার, কেন্দ্রীয় সরকারের হল কংগ্রেসই শান্তিাপনে সক্ষম, অথচ কেউ নয় একথা মনে করে ভোট দিয়েছেন।

তাহাড়া সি পি আই, কংগ্রেস, ব্রজ, এস, ইউ, সি প্রভৃতি বামপন্থী নামে এতদিন ধরে পরিচিত দলগুলি সি পি এম বাংলাদেশে খুনোখুনির বাজানীতি আমদানী করেছে বলে প্রায় এক বছর ধরে দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মারকতে যে ম্যাডিসন এতিনিউ ধরণে উচ্চ চাপের প্রচার-ভিধান চালিয়েছেন, তার ফলেও বেশ কিছু সংখ্যক নির্মল মনোভাবসম্পন্ন লোক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন, অথবা চিরাচরিত কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব কাটিয়ে উঠতে না পেয়ে এক-ধম ভোট দিতেই চান নি।

এসব সত্ত্বেও, সি পি এম যে প্রথম ভোট ও প্রাপ্ত আসন সংখ্যার দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ হলের সম্মান লাভ করতে পেয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর।

অত্রিকের কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে প্রধানতঃ তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির অপরীক্ষিত ক্রতির মধ্য দিয়ে। কংগ্রেস যে পক্ষপাতি নতুন আসন (৫৫ থেকে ১০৫) লাভ করেছে তার মধ্যে সি পি এম-এর কাছ থেকে কলকাতার চারটি ও গ্রামাঞ্চলের আটটি থেকে নিয়েছেন, আর সি পি এম কংগ্রেসের আসন কেড়ে নিয়েছেন গ্রামাঞ্চলে আটটি এবং কলকাতার একটিও নয়। অর্থাৎ কংগ্রেস সি পি এমের মোট বারোটা আসন হথল করেছেন এবং সি পি এম কংগ্রেসের মোট আটটি আসন হথল করার কংগ্রেসের সি পি এম থেকে নীট লাভ করেছে চারটি আসন। অত্র দিকে কংগ্রেস যে অতিরিক্ত পরিতাল্লিশটি আসন পেয়েছেন (সি পি এম-এর নীট পাঁচটি আসন বাধে) তার সবটাই পেয়েছেন সি পি আই, কংগ্রেস, ব্রজ, বাংলা কংগ্রেস, আর এস পি, এল এস এস প্রভৃতি দলের কাছ থেকে আব সি পি এম যে একত্রিগিটি অতিরিক্ত আসন পেয়েছেন তাও এসেছে সি পি আই, আর এস পি, বাংলা কংগ্রেস কংগ্রেস, আর এস পি, গোষ্ঠী লীগ প্রভৃতি দলের কাছ থেকে। আবার বাকুড়া ও মুর্শিদ লীগ হল প্রধানতঃ সি পি আই বাংলা কংগ্রেসের হাত থেকে মোট ছয়টি আসন কেড়ে নিয়েছেন।

এসব সত্ত্বেও মোট ভোটের সংখ্যা থেকে কংগ্রেসের আটত্রিগিটি এবং সি পি এম-এর সত্ত্বেয়াটি আসন নিরাপদ নয়।

যদি অত্র ভবিষ্যতে কংগ্রেস ও অষ্টধামের মধ্য ধরণে মৈত্রী করেও নির্বাচনে দাঁড়ান এবং সি পি এম ও তাদের মিত্রদলগুলি বর্তমান আসন রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না অথচ: বাবটিটি কেন্দ্রে। অত্র দিকে যদি আর, এস, পি, এক এস, ইউ, সি, সি পি আই ও কংগ্রেস ব্রজকে বাধ দিয়ে সি পি এম-এর পরিচালিত ফ্রন্টে বোণ যেন তাহলে এখনই নির্বাচন হলে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট নিশ্চিতভাবে আরো পরিতাল্লিশটি আসন হথল করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গড়তে সক্ষম হবে।

ইউ এল, ডি এক-এর সবকয়টি দল যদি সি পি এম পরিচালিত ইউ এল এক-এর সঙ্গে বামপন্থী সমঝোতার উপনীত হতে পারে তাহলে তারা যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে একটা অবিমিশ্র শক্ত বামপন্থী সরকার গড়তে পারে, তা নয়, এখনই নির্বাচন হলে এই নতুন সংযুক্ত ফ্রন্টের কাছে কংগ্রেস (তিন কংগ্রেস ধরে) মোট সাতানব্বইটা আসনই হারাবে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

অর্থাৎ এই মুহূর্তে বাংলাদেশে (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

আবার ভীত সন্ত্রস্ত নাগরিক মূগ্ধ খুঁজছে। মূগ্ধ খুঁজছে, তবে খুব সতর্ক। চোরের মতো চার-দিকে একবার পরীক্ষা করে নিলে সমস্ত অবলম্বীদের মধ্যে এতোদিনের বোবা মানুষ যেন কথা কয়ে পুনর্জীবিত হতে চাইছে।

কলকাতা রাজনীতি চর্চা না করে বাঁচতে পারে না। অবশ্য তার মানেই এই নয় যে, কলকাতার বাহ্যিক রাজনীতি অভিজ্ঞ। কলকাতার খেলার মাঠের চেয়ে নির্বাচনের ময়দানে অনেক বেশি সৌখীন কৌতূহল ও উদ্দীপনা। কিন্তু এই কলকাতারই অস্তিত্বে গলিতে আবার গুপ্ত ঘাতকের নারকীয় হারা। মানুষ তাই মূগ্ধ খুঁজতে ভয় পায়। ইতিপূর্বেও অনেক-গুলো নির্বাচনী খেলার অনেক কিসমতের ভাড়া গড়া হয়েছিল, কিন্তু মৃত্যু বিভীষিকার মতো আপামর জনসাধারণকে কখনো ভাড়া করে বেড়ায়নি। পশ্চিম বাঙলার নির্বাচনী লড়ারের ময়দানে এ জিনিস নতুন। এ কারণে অভিনব। অবশ্য লড়াইটাও ঐতিহাসিক। ইতিপূর্বে ব্রিটিশ পঞ্চাশ বছরের দেশ মানুষের ভাড়া নিয়ে খেলেছে বিধান সভার। এবার চিহ্নটি আলাদা। খেলা হল মাঠে ময়দানে, ক্ষেতে, খামারে, কলে কারখানায়, শহরে শহরতলীতে, গ্রামে জেলায়। ব্রিটিশ দলের দেশ কী এক আশ্চর্য চৈতন্য মূগ্ধ দুই দলের দেশে পরিণত হয়ে গেল। মোটামুটি দেশের মানুষ এতে খুঁশি। বিদ্রোহিত অমানিশা অস্তিত্ব হতে চলেছে বোধ হয়। স্পষ্ট স্বচ্ছ হয়ে আসছে পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। সচেতন গণতন্ত্রের দিকে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে শহর শহরতলী, গ্রামের পরে গ্রাম, জেলার পরে জেলা, অঞ্চলের পর অঞ্চল।

অবশ্য কলকাতার দিকে তাকিয়ে বুদ্ধিজীবী-প্রধান এই প্রকাশ্য শহরের চেহারাটা তবুও অস্পষ্ট। রোডওয়ার কান পেতে যেন হিসেব-নিকাশ নাগরিকরা কলকাতার এক একটি প্রাণীর অপ্রত্যাশিত পতনের খবরে চমকে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে। এমন বিস্ময়ের চমক ছিল প্রথম যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রাককালীন নির্বাচনী সংবাদে। কলকাতার এবার সেই চমক। অপ্রত্যাশিতের চমক।

সুদূত, লক্ষ্মী, প্রিয়রঞ্জন, রথীন তালুকদার। আবার ওদিকে নেজামুদ্দিন, অনিলা দেবী।

সব হিসেব ওলোট পালোট।

আর ওদিকে বরানগর। দুপক্ষের সমস্ত শক্তির চরম মোকাবিলা। উৎকণ্ঠ মানুষের প্রহর গণনা। সি পি এম আর দক্ষিণপন্থী শক্তি জোটের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

কলকাতার দারুণ উত্তেজনা।

কিন্তু কী অশ্রুত করুণ আর শীতল এই উত্তেজনা। মানুষ কথা বলতে না পেরে, রাস্তার বার হয়ে আসতে না পেরে কী নিদারুণ মর্মবাতনায় কাতর। শহরে ঘাতকের ভয় ১৪৪ ধারা, শহরতলীতে সান্থা আইন।

কাতর হয়েছে আট, বছরের শিশু হাবুও। অপরাধী ঘাতক মানুষের পরোক্ষ করে না সেই নিষ্পাপ শৈশব। সে জানে, পৃথিবী নিশ্চয়। আকাশ নীল। সেখানে নিশ্চিন্ত প্রাণী সাতার কাঠে। গাছের পাতা ক্রোরোয়াল টেস্টটুসে সবুজ। সেখানে হরেক রঙের ফুল ফোটে। প্রজাপতির ডানায় থাকে হলুদবরণ পরাগ। তাই তার ভাষা মৃদু হরনা, মন সত্য গোপন করে না। সে তার মা রেশম মাসিকে বললে, “মামি, সেরকম ভোট আর হবে না।”

হাবুকে কাছে টেনে জিজ্ঞাসা করলাম, “কিরকম ভোট রে?”

হাবু বললে, “সেই বে সেবার, ভোট হল; কত প্রসেসান, বেন রাজা আসছে। সবাই রাস্তায় গিয়ে কথা বলছিলো। সবাই কথা বলছিল। ... ময়দানে মশাল জ্বলে উঠেছিল।”

রেশম মাসিকে উঠলেন, “এই চুপ কর। সব ব্যাপারে ডেপোমি।

আমি বললাম, “আহা, ও তো বাচ্চা। হাবু, এবার কিন্তু আরও ভালো হয়েছে। একদম কুরকুর।” আমি হাসলাম।

রেশম মাসি আতঙ্কিত মুখে বললেন, “শিশু আর বুড়ো? ভোটের জন্য কেউই তো রেহাই পেল না দেখলাম। না বাপু, ছোটদের আর কথা শিখিও না। শিশুও মরল, বুড়োও মরল। অথচ এই তো, ভোট চাইতেই আমরা পাড়া খাঙ্কি করে সবাই ভোট দিয়ে এলাম। তবে এমন করে মেরে মেরে মানুষকে শিশু বানানো হল কেন? ভোটের দেশে অস্ত্রত দড়টো দল তো থাকবেই। নাহলে ভোট হবে কেন? কেন? কেন? কেন? অনেক মনে একই প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের উত্তর জানে ইতিহাস। আর সে ইতিহাস খুব অল্প সময়ের লেখা হবে। লেখা হোক চাই না হোক, মানুষ এর অর্থ বুঝবে। অথচ এই মুহূর্তে রেশম মাসির প্রশ্নের জবাব আমিও দিতে পারব না। মলিন মুখে একটাই উত্তর, আমি জানি না। মিছে প্রশ্ন কর কেন?

আর বস্তুত কেউই আমার মতোই জানে না এর উত্তর। জানলে তাই নিয়ে গবেষণা হত। কিন্তু এখন সে সময় নেই। এখন ভোট বাস্তব হারাজতের গবেষণা। মৃত্যুশীকার কথা ভুলে বাবে মানুষ। একটা নির্বাচনের জন্য কত যে অজ্ঞাত ব্যক্তি নিজের নিজের দলের হয়ে দলীয় শহীদ হলো, সে হিসেব

কেউ কখনো না।

কিন্তু মনের দাগ তো মোছে না।

সেই সে সেদিন, কলকাতার বড়কেই “দি গ্রেট কিং”, হিন্দু মোহলমানের সেই রক্তক্ষয়ী ডাইরেট্র্যাকসান, সে তো আমার স্কুল জীবনের ঘটনা। অথচ কৈ, ভুলতে তো পারিনি আজও মৃত্যুশব্দের আকারে ইন্দুরের মতো অসহায় নির্বিশ্বাস মানুষকে একাধিক মানুষের নির্মমভাবে পিটিয়ে মারার, উৎখাত করার ছবি সমস্ত মন জুড়ে আছে। রাস্তায় পড়ে আছে পচা শব, আদি গঙ্গার ভেসে বাচ্ছে শবুনাবাহী মনুষ্যদেহ, রাস্তার নিচে কালি দিয়ে যোয়ানো আছে সভ্য শহরে মানুষের সারিবদ্ধ মৃতদেহ, আশ্রয় মানুষকে পোড়ানো হচ্ছে চারপাই-এ বোম্ব। সে আজ ইতিহাস। সে ইতিহাসের ফলশ্রুতিতে হয়েছে কিছু মানুষের বাসনা পূরণ। তারই পরিণামে সুতোর মতো পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মানচিত্রে আজ অবহেলিত রুমবিলীয়মান একটি জাতির জন্মভূমি মাত্র। আর তারই ফলশ্রুতি মুজিববরের বাংলা দেশ। চমককার। এরই জন্য আদি গঙ্গার পচা শবের ভেলা ভেসে ছিল, হুগলি গঙ্গার জল হয়েছিল রক্তিম। অথচ কী আশ্চর্য, সেই বঙ্গ বিভাগ রক্তধার জনাই না আবার তের আগে হিন্দু ভাই তার মুসলিম ভাইয়ের হাতে পিয়রে দিচ্ছেলি রাশীর বন্দনী। ইংরেজ শাসক নতি স্বীকার করে বলতে বাধ্য হয়েছিল, বঙ্গবিভাগ রদ করিলাম। বঙ্গবিভাগ নিয়ে সেইসব ইতিহাসের পঞ্চাভের খেলা আজ সবাই বুঝে গেছে। এ-ও বুঝবে।

ইতিহাস এমনি বিচিত্র গতি ভাগ্যময়ই নেচে চলে। কে জানে, নাচতে নাচতে কোথায় টপ্পিছাব সকলে?

কলকাতার বুদ্ধিজীবী মানুষ কিন্তু এতো কথা ভাবছিল না। আমিও ভাবতে সময় পাই নি। রোডওয়ার “বল পড়ে ব্যাট নড়ে” সংবাদ। দুই তিন দিনের সংবাদ-পত্রে এমনকি ওপার বাংলার খবরেরও জায়গা নেই।

রেশম মাসি তাঁর শিশুর মুখের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ ভবিষ্যতের কথা ভেবে ফেলেছেন। এমনই হয়। একমাত্র ভবিষ্যৎ ভাবনাই আপন-জনের মুখের দিকে তাকালেই বোধ হয় জায়গা হয়।

আমার মুখে “জানিনা” শুনে রেশম মাসি হাসলেন। বললেন, “চা খাবে?”

আমি সোৎসাহে বললাম, “নিশ্চয়, গলাটা শুকিয়ে আছে।”

রেশম মাসি হেসে বললেন, “ঠিক বুঝছি।” বলে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে আবার প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা, ভোট তো দিলাম, এবার শান্তি হবে তো?”

“জানি না।” আমি হাবুকে কাছে টেনে নিলাম।

“এবার কী হবে?” রেশম মাসির অযোধ্য প্রশ্ন।

বুসে বললাম, “মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে কাড়াকাড়ি।”

“তার জন্যে, আবার মারামারি?”

“জানিনা।”

রেশম মাসি বললেন, “কী জানি ভাই, এই ভোটের ব্যাপারটা বুঝি না। রোজ কাগজে পড়লাম, সি পি এমনই দাঙ্গাবাজ পাঁচি পাঁচি আবার শুদ্ধি এ দলই সব চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে, দিল্লীতেও দু নম্বর দল। ওরা নিশ্চয় ভোট চুরি করেছে, তাই না?”

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, “শুদ্ধ ভোট চুরি। একজন খুব বুদ্ধিমান লেখক কী বলেছিলেন জানেন, ঐ দলের নেতাকে ‘জঙ্গলের রাজা অরুণ দেবের চেহারার খাড়া করেছিলেন।’

রেশম মাসি ঝিল ঝিল করে হেসে বললেন, “পড়ছি। ঐ ‘কম-রেড জ্যোতি বোসদার লেখকের লেখার কথা বলছি তো? আমরা তো হেসে আর বাঁচি না। খুব ভালো লেখেন, না? নির্বাচন কমিশনার কি ওর মামাবাবু? মামাবাবুর কান টানা নিয়ে খুব মজার কথা ছিল, পড়েছে?”

আমি লম্বা করে বললাম, “হু-উ-উ। রীতিমত হাস্যকর লেখা। চুটিয়ে পড়ছি। উনি যে

দু দলকে নিয়ে মজা করেছেন; তারাই ছিটে গেল। কিন্তু।”

রেশম মাসি বললেন, “এবার কিন্তু ছেলেরা কেমন পটাপট বেরিয়ে গেল দেখলে তো?”

“চম্পন বছর ধরে যারা মার খাচ্ছে। তারা তাদের সমকয়সী পেয়ে এবার উৎসাহে ফেটে পড়েছে। খুব লক্ষ্যণীয় খবর। তারতম্য বঙ্গ পরম্পরায় নবাবীতে বিশ্বাসী। সৈদিক দিয়ে এ-ও এক ধরনের তরুণ উদ্দীপনা। দেশের পূর্ব দিক থেকে তারুণ্যের জয়ের এ হল আর এক ধরনের প্রকাশ। এটাকে দলের, আবার সেই সঙ্গে কংগ্রেস তরুণ-দলের জয়ও বলব।” দেবনাথ কথা বলল।

তাকিয়ে দেখি, লেখনাথ এসে দাঁড়িয়েছে।

রেশম মাসি বললেন, “ওমা! তুমি কখন এলে?”

দেবনাথ বলল, ঢুকতে ঢুকতেই তোমাদের কথা শুনেলাম।”

রেশম মাসি বললেন, “কী কান্ডই হল বলত।”

দেবনাথ বললে, “চমককার। দু পড়েই মাউলান্স রেজাল্ট। এমন নির্বাচন আগে হয়নি। এ এক নতুন ইতিহাস। বাংলা দেশ থেকেই গণতন্ত্রের বাতাস শূন্য হবে। গণতন্ত্র (দেবনাথ নবম পৃষ্ঠার)

আনন্দময় প্রতীক্ষা



প্রতীক্ষা সূর্যের সময়। লাজুক লাজুক চোখের চাউনি আর বিধা-জড়ানো বীর পদক্ষেপ—গরবিনী এগিয়ে আসে প্রিয়তমের কাছে। সেই আনন্দময় মুহূর্তে চোখে চোখে চলে এক গোপন ইসারা, যে ইসারার সূত্রে ইতিহাস, ব্যক্তিত্বের বিকাশের ব্যঙ্গনা।

আপনি সন্তানের পিতা হতে চানো হব।

এ শুধু অনাবিল উল্লাসে অবগাহনের সময়... আনন্দময় প্রতীক্ষার সময়। কিন্তু এ সময় বাস্তব জগৎ থেকে দূরে থাকলে তো চলবে না। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, অথচ দায়িত্ব দিনের পর দিন বেড়েই চলে। অতাবিত কত কী প্রয়োজনের তাগিদ এসে যায়। ভবিষ্যতের জ্ঞান পরিকল্পনা করবার এই তো সময়... পরিবারের জন্ম-বর্ধমান চাহিদা মেটাতে হবে, করতে হবে তাদের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা। জীবন বীমার মাধ্যমে এ ছুটি কর্তব্য সাধন করা সহজ হয়ে ওঠে। কেননা একমাত্র জীবন বীমাই পরিবারের ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাই আপনার জীবন বীমা করে নিরাপদ হ'ন।



জীবন বীমার কোম বিকল্প নেই

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

অশোকনগরে মিলিটারীর গুলিতে তরুণ হত্যার প্রকৃত ঘটনা

হীরলাল পাল

ভেল্লা মার্চের শুক্রবার, অশোকনগর ও অন্যান্য সংবাদপত্রের রিপোর্টে চব্বিশ পরগণার অশোকনগরে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহতের সংবাদ পরিবেশনে কৌশলে বিশ্রান্তির সন্দিগ্ধ প্রচেষ্টার স্তম্ভিত হইয়াছে। আমি নিজে নিহতের হত্যাকাণ্ড পিতা।

সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত অসিত পাল আমার পুত্র। তাহার জন্ম তারিখ বিশে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১। দেশবাসী ও সরকারের অবগতির জন্য আমি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিতেছি। অসিত পালের ফেরার হইতে অ্যাপো-ডকুলার ল্যাম্পে তুলিতেছিল। প্রথমতঃ স্থানীয় ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকার পর উনিশে ফেব্রুয়ারী শ্রুতবার বিপদাপন্ন অবস্থায় তাহাকে নীলয়ন সরকার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ডাক্তারদের চিকিৎসার তাহার অসহ্য ব্যর্থতায় উপশমের পর দুই সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ ও ঔষধপত্রের প্রেসক্রিপশন সহ প্রতি শ্রুতবার হাসপাতালে দেখাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। অস্বাভাবিক শারীরিক দুর্বলতার জন্য পলিটিক্স বাদ্যের ব্যবস্থা করিতে বলেন এবং চোঁটা এপ্রিল তারিখে হাসপাতালে আসিয়া সেকেন্ড ডোজ অফ ট্রাইড ইনজেকশন নিতে বলেন। পরবর্তী চিকিৎসার ব্যবস্থা তারপরে হইবে বলিয়া ডাক্তার জানান।

এই অবস্থায় আমি প্রীমানকে নিয়ে তেইশে ফেব্রুয়ারী অশোকনগর রওরানা হইয়া বাই এবং গাড়ীর গোলমালের দরুন রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটে অশোকনগর পৌঁছি। অবস্থা বদলিয়া করেকদিন পর ভাতপথ্য একবেলা দেবার নির্দেশ ছিল। তদনুসারে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী শ্রুতবার হইতে একবেলা ভাতপথ্য দেই। প্রীমান কেন-রকমে হাতমুখ ধোওয়া, পায়খানা বাওরা, এঘর ওঘর বাইতে পড়িত; আর দুর্বলতার জন্য দিবারাত্রি বিছানার পড়িয়া থাকিত। বাড়ীর বাহিরে এক মৃদুতের জন্যও বাওয়ার ক্ষমতাই ছিল না।

শ্রুতবার দিন রাত্রিতে (পরলা মাচ) আমি ছেলে মেয়েদের পড়াইতেছিলাম। অসিত বারান্দার বিছানার ঘরের পাশে শুইয়া রেডিওর সাল্য সংবাদ শুনিতেন। এমন সময় হঠাৎ তরুনক বোমার শব্দ শোনা যায়। দীর্ঘকাল অশোকনগরে বোমা, গুলির শব্দ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার ব্যাপার হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর হইতে বমারীতি দরজা জানলা বন্ধ ছিল। আমরা সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আটটা নাগাদ আমার ঘরের সমস্ত দরজা আঘাতের শব্দ শুনিত। দরজা খুলিতে ছুটিয়া বাই। দরজা খুলিতেই সাত আট জন মিলিটারি আমার ঘরে ঢুকিয়া সকলকে টানটানি কর সচ ইত্যাদি করিবার সঙ্গে সঙ্গে

আমরাই মিলিটারির উপর বোমা ফেলিয়াছি বলিয়া চেঁচাইতে থাকে। আমার স্ত্রী, শিশু সন্তান, ও আমার দুটি মেয়েও তাদের অত্যাচার হইতে রেহাই পায় নাই। একজন বাঙ্গালী অফিসার সঙ্গে ছিলেন। পরে লোক-মুখে শুনিয়াছি তিনি বারাসতের এস ডি পি ও। মিলিটারি আমার মৃত সন্তানকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিয়া বুক রাইফেল দিয়া খোঁচা মারে। স্ত্রী ও আমি চীৎকার করিয়া ছোড় হাত করিয়া বলি, “মৃত, বহুদিন বাবু অসুস্থ, আঘাত করিলে মরিয়া বাইবে”, সঙ্গে সঙ্গে দোড়াইয়া ডাক্তারের সার্টিফিকেট হাজির করি। বাঙ্গালী অফিসারটি ও মিলিটারিরা তাহার সার্টিফিকেট নয় বলিয়া চীৎকার করেন। তখনই ছুটিয়া গিয়া হায়ার সেকেন্ডারীর (কম্পার্টমেন্টাল) ফটোবুথ অ্যাডমিট কার্ড দেখাই। তাহারা কোন কথাই না শুনিয়া রাইফেল উচাইয়া আমাদের সকলকে আক্রমণ করে এবং হিন্দীতে চেঁচাইতে থাকে—“শ্যুলা লোগ, ইলেকসন করেগা এম এল এ হোগা, মন্ত্রী হোগা, মিলিটারি মালুম নোহি হ্যায়”, এবং টানিতে টানিতে শিশুদের সহ আমাদের সাতজনকে পশ্চিমদিকের বাসার ভিতর দিয়া সদর রাস্তার লইয়া যায়। নানা রকম অশ্লীল কটাক্ষ, নানা প্রশ্নবনের পর শত অনুন্নয়ন কিনয় উপেক্ষা করিয়া অসিতকে লইয়া যায়। আমাদের ছয়জনকে মিলিটারি পাহারার বাড়ী লইয়া গিয়া দরজা জানলা বন্ধ করা-ইয়া রাখাইয়া বাড়ীর চারিদিকে মিলিটারি চহল দিতে থাকে। স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে মিলিটারি ও পুলিশ অফিসারদের বলিয়াছিলাম—তার বিগত উনিশ বছরের জীবনে যদি সামান্যতম অপরাধের চিহ্ন খুঁজিয়া পান, তাহলে বে কোন শাস্তি দিবেন। কিন্তু অনুসন্ধান না করিয়া বাছাকে কোন শাস্তি দিবেন না।

ঘরে ফিরিয়া সবাই মাটিতে পড়িয়া ভয়ে নিঃশব্দে কর্মিতে থাকি। আমার স্ত্রীর বয়স পঞ্চাশ বছর রান্না প্রেসারের রেগী সংগ্রহহীন হইয়া পড়েন। কতকাল বাসে পাশের বাসার মেয়েরা দোড়াইয়া আসিয়া ও সিন্দ সঙ্গে দেখা করাইবার জন আমাকে তাহাদের বাসায় নিয়া যায়। ও সি কেও সমস্ত কাগজপত্র দেখাই। পাশের বাড়ীর ভদ্রমহিলা সুরমা দাশগুপ্তা, তাহার মেয়েরা এবং আমরা সকলে মিলিয়া অসিতের মৃত্যুবাস্তব কথা জানাইয়া তাহাকে মৃত্যু দিবার জন্য কাতর মিনতি জনাই। ও সি বলেন আমার বাড়ীতে বোমা পাওরা গিয়াছে। কিন্তু আমাকে কোন বোমা দেখাইতে পারেন নাই, মিথ্যা দোষারোপ করেন। আমরা সকলেই মিলিভাবে প্রতিবাদ করি। ঘরে ফিরিয়া আসি। কতকাল পর পাশের বাড়ীর জানলা হইতে আমাদের ডাক আসে। জানলা খুলিলে

তাহারা জানাইলেন তাহাদের বাড়ীর ছেলে মাণিককে ছাড়িয়া দিয়ছে; অসিতকে ছাড়ো নাই। শুনিয়া ভদ্রমহিলা ‘হার ভগবান’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। আমরা সকলে চীৎকার করিয়া ডাকিগা পড়ি। বাহির হইতে মিলিটারিরা চুপ করিবার জন্য শাসাইতে থাকে। পাশের বাড়ীর সুরমা দাশগুপ্তার মুখে শুনিয়াছিলাম অ্যারেস্টেড সকলকে একসঙ্গে সদর রাস্তার বসাইয়া মিলিটারি পাহারার ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে। অসিতের পরশে শুল্লি, গারে শব্দমাত্র শার্ট ছিল, শীতে কষ্ট পাইতেছে ভাবিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। কিছুকালবাসে (সময়ের ধারণা নাই) ‘বাবা-মা’ বলিয়া দুটি চীৎকার শুনলাম। আমাদের বুক ডাকিগা গেল, স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলাম “অসিতকে মারিতেছে,” গুলির শব্দও পাইলাম। সারারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বসিয়া ভগবানকে ডাকিয়া কাটাইলাম।

প্রতিবেশী লালমোহন ব্যানার্জী রাতি দুইটার আমার বাসার আসিলেন। তৎপূর্বে তাহার স্ত্রীও আসি-রাহিলেন। লালমোহনবাবু অমাকে নিয়া সংবাদ লইবার জন্য দুটি বাসায় গেলেন। কেহই কিছু বলিতে পারিল না, ফিরিয়া আসিলাম।

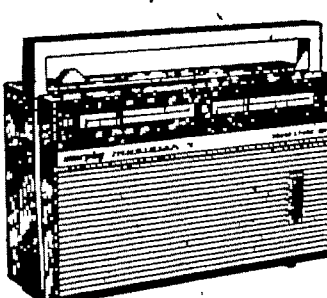
ভোর হইতেই লালমোহন বাবুকে লইয়া থানার বাইবার জন্য ছুটেছুটি করিতে লাগিলাম। সফ্রী নরেশ-নাথ দত্ত, কেশব ভট্টাচার্য, সুধীর ভট্টাচার্য, শ্বিবেশ চ্যাট্টাচার্য, ননী কর, শোভেন রায় প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিলাম। থানার ছুটিয়া গেলাম। থানা লক-আপে অসিতকে দেখিলাম না। পাড়ার ছেলে মনোজ ব্যানার্জীকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম রাত্রিতে ধরিয়া আনিবার পর অসিত তাহাদের সঙ্গেই বসা ছিল। পরে মারিতে মারিতে তাহাকে একটী জীপে করিয়া লইয়া যায়। থানা অফিসাররা অসিতের কোন সন্ধান দিতে অক্ষমতা জানাইল, মিলিটারির কথা বলিল। সকাল দশটা নাগাদ (দোসরা মাচ) ননী কর হাবড়া থানার কোন খোঁজ না পাইয়া করেক জন লোকসহ মোটর গাড়ী নিয়া বারাসত রওরানা হইলেন এবং অমাকে বাসার ফিরিয়া ছেলে মেয়েকে দেখিতে বলিলেন। ননীবাবু প্রতিশ্রুতি

দিলেন, অসিতের সন্ধান আমার বাসার না পৌঁছাইয়া দিয়া অন্যকোন কাম করিবেন না। আমি বেলা এগারটা নাগাদ বাসার ফিরিয়া গেলাম। সব আশা ছাড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। দুইটার পর অশোকনগর বাজারের একটি বৃক্ষ দোকানদার বুলেট বিশ্ব অবস্থায় বারসত হাসপাতালে অসিতের মৃত্যু সংবাদ আমাকে জানাইল। স্থানীয় শিক্ষক পবিত্রকুমার ঘোষ মহাশয় অমাকে ধরিয়া বাসে করিয়া হাবড়ায় নিয়া গেলেন। সেখান হইতে আমার প্রতিবেশী সত্য রায় আমাকে বারাসত হাসপাতালে নিয়া গেলেন। স্বচক্ষে মৃত সন্তানকে দেখিলাম। বারাসত থানার দোড়াদোড়ি করিলাম। সেদিন তাহার মৃতদেহ পাইলাম না।

পরদিন তেসরা মাচ-পনেরায় আত্মীয়স্বজন ও সত্য রায় সহ বারাসত গিয়া বহু চেষ্টা করিয়া “মৃতদেহ হাবড়া নিবনা” এই প্রতিশ্রুতিতে প্রায় বিকাল চার ঘটিকার মৃতদেহ হস্তান্তরিত হইল। শোকহত হৃদয়ে সন্তানের মৃতদেহ আনিতে গিয়া যে প্রকার হরয়ান ও অবহেলিত হইয়াছি তাহা কোনদিন ভুলিবনা। বাহার কিনা বিচারে হত্যা করিয়া জীপে করিয়া মৃতদেহ লইয়া বাইতে পারেন (স্বাক্ষর ওঠ পুস্তক)

মারফি ট্রানজিস্টর

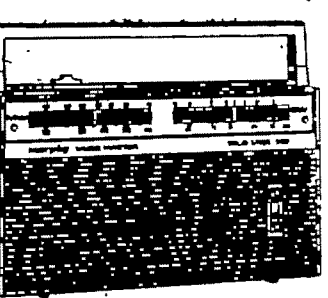
সৌন্দর্য ও জোরালো ধ্বনির সমন্বয়।



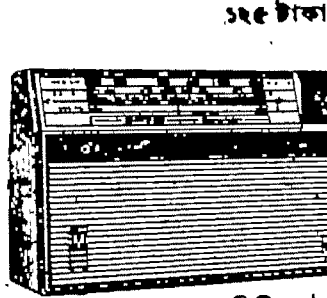
২৫ মিটার ব্যান্ডবেড সবেত মিডিয়াম ওয়েভ ১২৫ টাকা



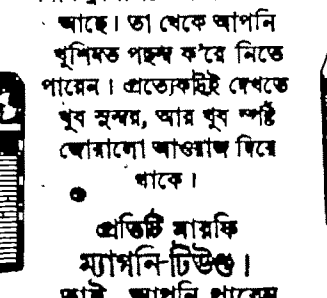
মারফি ট্রানজিস্টর অনেক রকমের আছে। তা থেকে আপনি খুশিমন পছন্দ করে নিতে পারেন। প্রত্যেকটিই দেখতে খুব সুন্দর, আর খুব স্পষ্ট জোরালো আওয়াজ দিয়ে থাকে।



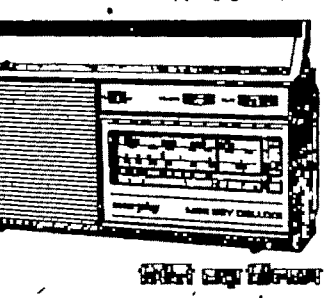
মিডিয়াম বাইটার ২-ব্যাণ্ড ১৬০ টাকা



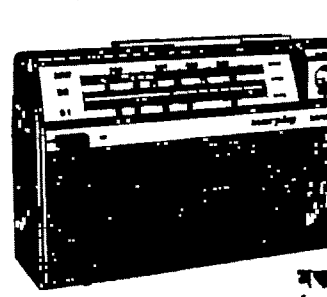
মিডিয়াম বাইটার ২-ব্যাণ্ড ২১০ টাকা



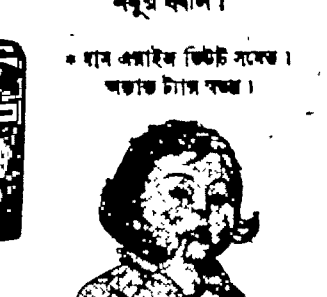
প্রতিটি মারফি ম্যাপিনি-টিউড। তাই, আপনি পাবেম স্পষ্ট, জোরালো ও সুধুর ধ্বনি।



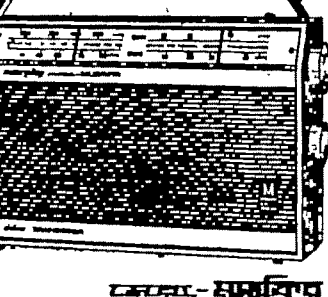
জরুরি ক্ষেত্রে মিলিয়ে ২-ব্যাণ্ড ১৭৫ টাকা



মডেল ২-ব্যাণ্ড ২৪৫ টাকা



২-ব্যাণ্ড ২৪৫ টাকা



জরুরি ক্ষেত্রে মিলিয়ে ২-ব্যাণ্ড ২৪৫ টাকা



মারফি সার্বজনীন

‘অতি বামপন্থী’দের সম্পর্কে মাও সে তুং

সম্প্রতি দর্পণে “অতি বামপন্থী”-দের সম্পর্কে চেয়ারম্যান মাও সে তুং নামক প্রবন্ধটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হল। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে লেখা হয়েছে “কেন্দ্রীয় কমিটিকে বারো বারো প্রতিবিল্বীদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিতে হয়.....” এবং অষ্টাদশ প্যারাগ্রাফে লেখা হয়েছে “...তাকে (মাও সে তুং) বিল্ববী ছাত্রদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে হয়েছিল প্রাচীরপত্র দিয়ে, জনগণের প্রতিরোধ উদ্দীপ্ত করে—মনে হয় সৈনিক তিনি পাট্টী বা সরকারী প্রশাসন বস্ত্র ব্যবহার করতে সামরিক ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।—বস্ত্র্য দৃষ্টি পরম্পরবিরোধী। অতঃপর সরকারী প্রশাসন বস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে বলতে চাই, এই প্রশাসন-বস্ত্র ব্যবহার করার চেয়ে জনগণের প্রতিরোধ উদ্দীপ্ত করা কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অনেক বেশী কার্যকরী এবং বাঞ্ছনীয়। সেই কারণেই কমরেড চেয়ারম্যান মাও সে তুং এই পন্থাটি গ্রহণ করেছিলেন। কথার কথার প্রশাসন বস্ত্র ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রেরা এবং সংশোধনবাদীরা এবং তারা এগুলা ব্যবহার করে বিল্ববী আন্দোলনগুলিকে দমন করতেই—বেরকম করা হয়েছিল তেলেক্সানার, কাকশীপে, বারাসতে, নকশালবাড়ী, শ্রীকাকুলাম গোপীবল্লভপুর ডেকরার এবং ভারতের অসংখ্য গ্রামে।

চতুর্দশ প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে “জনগণের সেবা করার” মৌলনীতিকে তারা গণসংগঠনের ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, শিক্ষক সংগঠন ও মার্কসবাদী কমিটিদের খসম করার প্রতিবিল্ববী কমপন্থীতে পূর্ববিস্তৃত করেছেন.....শাসকশ্রেণী বা তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে এদের কোন বক্তব্যই নেই.....প্রাক্তন ইন্দোনেশিয়া চালাবার কর্মে আত্মনিরোপ করেছেন।”

যারা বাল্যবয়সে সম্পর্কে এই রকম ভুল বিবরণ দেয় এবং

উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মিথ্যা প্রচার চালায় তাদের সম্পর্কে বলা যায় যে তারা শত চেষ্টা করেও জনগণের চোখে ধুলো দিতে পারবে না। দর্পণের এই সংখ্যাতেই মতামতের পৃষ্ঠায় একটি শব্দের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—দেখুন কি জঘন্য উল্লাসে বাদবপুত্রের পাঁচজন বিল্ববীকে হত্যা করা হয়েছে। আসল কথা হল বিল্ববী প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্র শাসকশ্রেণী সংশোধনবাদী ও নয়া-সংশোধনবাদীরা দুটি ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছে। সংশোধনবাদীরা কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষাশীল সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তা করে পুলিশ মিলিটারীর সাহায্যেই তাদের উদ্দেশ্য সাধন করেছে। নয়া-সংশোধনবাদী নেতৃবৃন্দ একটিলে দুই পাখী মারবার কন্ডী আঁটলেন। তারা বখন দেখলেন হাজার হাজার বিল্ববী কমিটি দল ছেড়ে বিল্ববী আন্দোলনে বাগিয়ে পড়েছেন, অপর দিকে তাদের মৌরসীপাট্টা টলমলানমান তখন তারা এই দৃষ্টি বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য জাতীয়তাবাদের আড়াল থেকে তাদের সংকল্পীদের প্ররোচিত করলেন বিল্ববী আন্দোলনগুলিকে প্রতিরোধ করতে। গত যুক্তফ্রন্টের আমলেও নয়া-সংশোধনবাদী নেতৃবৃন্দ এই ভূমিকাই ছিল প্রধান। তাই অবশ্যই আন্তর্জাতিক বিল্ববীর স্বার্থে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার অধিকার আছে।

লেখকের পূর্ববর্তী বক্তব্য হল “...শাসকশ্রেণী বা তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে এদের কোন বক্তব্যই নেই” এটি লেখক কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন! “এদের” বা বক্তব্য তা সবই তো এই যুক্তরাষ্ট্র সমাজব্যবস্থা, শাসকশ্রেণী ও তার পদলেহী অনুগামীদেরই বিরুদ্ধেই। নয়া-সংশোধনবাদীরাও অন্যান্য সংশোধনবাদীদের মতই শাসকশ্রেণীর পদলেহী অনুগামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরপরে লেখক বলছেন “...প্রাক্তন ইন্দোনেশিয়া চালাবার কর্মে আত্ম-

নিরোপ করেছেন”। লেখক সম্ভবতঃ ইন্দোনেশিয়ার ঘটনা জানেন না, বা জেনেও না জানার ভাণ করছেন। লেখক কি প্রমাণ করতে চাইছেন যে ইন্দোনেশিয়ার এই রকম সব ঘটনাই ঘটেছিল এবং তারপর ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষাশীল সরকার তিন লক্ষ কমিউনিস্ট কমিটিকে হত্যা করে। লেখককে অনুরোধ করছি ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির আত্মসম-

মতামত

লোচনামূলক প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে। এতে বলা হয়েছে যেহেতু ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন নেতৃবৃন্দ সশস্ত্র পথ ত্যাগ করে পার্লামেন্টের পথ গ্রহণ করেছিলেন এবং সুবিধাবাদী নয়া-সংশোধনবাদী লাইন অনুসরণ করেছিলেন তাই শাসকশ্রেণী এই রকম একটি ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

পঞ্চদশ প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে “আমাদের দেশে সংশোধনবাদী, শাসকশ্রেণীর নানা রং-বেরংয়ের দল-গুলি এদের উৎসাহ দিচ্ছে, কারণ এরা তাদের আঘাত করে না। আঘাত করেন শাসকশ্রেণীর প্রবলতম শত্রুকে”।

আগেই বলেছি যে সংশোধনবাদীদের চক্রান্তটি নয়া-সংশোধনবাদীদের থেকে একটু ভিন্ন। সংশোধনবাদীরা প্রতিরক্ষার সঙ্গে সরাসরি হাত মিলিয়ে বিল্ববীকে সামনে থেকে ছুঁড়ি মারছে এবং নয়া-সংশোধনবাদীরাও প্রতিরক্ষার প্রাক্তন দালাল এবং তারা বিল্ববীকে পেছন থেকে ছুঁড়ি মারছে।

এই কিছুদিন আগেও একজন নয়া-সংশোধনবাদী নেতা তো বলেই ফেললেন, “পুলিশের গুলিতে কি নিরোধ লাগানো থাকে যে গুলিতে নকশালারা মরে না”। পুলিশের স্বপক্ষে এই ধরনের নিরোধ দালালী সাম্প্রতিক কালে আমাদের চোখে পড়েনি। আসলে এই নয়া-সংশোধনবাদীরা বিল্ববীদের হত্যা করার জন্য রাজনৈতিক মনত বোলাচ্ছে বিল্ববীদের গায়ের সমাজবিরোধী গুন্ডা ইত্যাদি লেবেল এঁটে দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বারাই দৈহিক ভাবে সশস্ত্র বিল্ববী আন্দোলনকে দমন করতে চাইবে—সে পুলিশ হোক, মিলিটারী হোক বা বেই হোক না কেন, তাকে “এরা” চূড়ান্ত আঘাত করবেই, এতো খুবই স্বাভাবিক।

অবশেষে প্রশ্ন করি “শাসকশ্রেণীর প্রবলতম শত্রু” বলে তিনি কাদের মনে করেন? বাদের সমস্ত কাজকর্ম হচ্ছে অবরোধ, দলীয় মধ্যপন্থাগুলি বেয়েছে অবরোধ, বারা গান্ধী জন্মজন্মন্তী থেকে শত্রু করে, যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন অনুষ্ঠানে ভি আই পি হিসাবে আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং ভাষণ দিচ্ছেন, প্রয়োজন মত পুলিশী সাহায্য পাচ্ছেন তাই কি শাসকশ্রেণীর প্রবলতম শত্রু? নাকি বাদের জেলের ভেতর পিটিয়ে, গুলি করে, অকথ্য নিৰ্যাতন করে হত্যা করা

হচ্ছে, বাদের দলীয় মধ্যপন্থা জোর করে কষ করে দেওয়া হয়েছে, বাদের নেতাদের বক্তৃতা দেওয়া দূরে থাক প্রকাশ্যে বেয়েবার উপায় নেই, বাদের হাত পা বেঁধে গুলি করে হত্যা করে রাস্তার ছাড়িয়ে রাখা হচ্ছে তারা? বাই হোক, বিশ্বাস করি মার্কসবাদী কমিটিদের মধ্যে রয়েছে হাজার বিল্ববী বারা সত্যিই শাসক শ্রেণীর শত্রু এবং তারা অচিরেই এই সংশোধনবাদী নয়া সংশোধনবাদী মোহজাল ছিন্ন করে দিয়ে বিল্ববীর কাছে বাগিয়ে পড়বেই সংশোধনবাদী, নয়া সংশোধন-

প্রথমোক্ত উদ্ভূতগুণি এই বিল্ববীদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। বাই হোক বারা এই প্রবন্ধটি পড়বেন তারা এর অন্তর্নিহিত ধোঁকাবাজ সূত্রটি ধরতে পারবেন।

লেখক আরো বলছেন “ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বর্তমান যুগের পুঞ্জিবাদের পরাজয় এবং সংহারা শ্রেণীর বিজয় অনিবার্য। কিন্তু সব দেশে তো পুঞ্জিবাদ ঘেরে যার নি, শ্রমিক বিল্ববী জয়লাভ করেনি। কারণ এই পরিণতিও একটা অমোঘ নিয়ম ধরে চলে। হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে না।” কিন্তু লেখক কি জানেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বখন সাম্রাজ্যবাদ পরিপূর্ণ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, ধ্বংসের সময় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বেশ টিকে রয়েছে এই সাম্রাজ্যবাদ (বা পুঞ্জিবাদের ফল-প্রসূতি)? তার কারণ সংশোধনবাদী একে টিকিয়ে রেখেছে। তাই “সংশোধনবাদীদের নির্দিষ্ট প্রকাশগুলির বিরুদ্ধে” সর্বাত্মক আমাদের লড়াই করতে হবে। আরো বলি ভারতের বিল্ববী কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম, শ্রমিক বিদ্রোহ, সৈন্যবিদ্রোহ শ্রেণী সংগ্রামের মহান ইতিহাসগুলি স্মরণ করুন তাহলেই বুঝতে পারবেন ভারতের এই বিল্ববী আন্দোলন, এই সশস্ত্র সংগ্রাম আকাশ থেকে পড়েনি।

সবশেষে বলি লেখককে যে, তিনি বিল্ববীদের যে সকল পরামর্শ দিয়েছেন, তা তারা শ্রদ্ধা করে, প্রয়োগের মাধ্যমে শিখে নিচ্ছেন এবং নেবেন। মনে রাখতে হবে সশস্ত্র বিল্ববী একটা ছেলেখেলা নয়। পথ অত্যন্ত বিপদ-সংকুল অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবেই এবং সেই পথে দুটি অবশ্য এসেছে এবং আসবে। যেহেতু বিল্ববীরা যে কোন আত্মত্যাগ প্রস্তুত তাই তারা সেই দুটিগুলা শত্রুর নিরে ভারতে জনগণতান্ত্রিক বিল্ববী সফল করবেই। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে রুদ্ধ করে পারবে না।

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

সংখ্যায়। —সম্পাদক, দর্পণ।
[মূল প্রবন্ধ-লেখকের উত্তর আগামী

অশোকনগরের হত্যা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

তাহারা কি তাহাদের সর্বপ্রকার প্রয়োজন চরিতার্থ করিয়া হতভাগ্য সন্তানের মা-বাবার কাছে সেই মৃত দেহটি সম্মুখ করে দিতে পারে না?

আমি বলিতেছি, অসিত ছাত্র-জীবনে কোন প্রকার রাজনীতি বা বলের সংগ্রহে যার নাই। একথা দল-মত নির্বিশেষে অশোকনগরবাসী সকলেই স্বীকার করিবেন।

দর্পণের ভারতের রাষ্ট্রপতি, ভারত সরকার, জেনারেল মানেকশ, প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও নাগরিকবৃন্দের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ ও আবেদন, সর্বস্তরে নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়া সত্য উন্মোচন করতঃ মিথ্যা রিপোর্টের মূখোপ খুলিয়া অপরাধীর শাস্ত-

বিধান করুন। আমার প্রাণপ্রীত সন্তানকে আর পাইব না। কিন্তু দেশের শত শত ছেলে এইভাবে বলি হইতেছে। বাংলা দেশের মানুষকে আপনারা বাঁচান, নৃশংসতার হাত হইতে রক্ষা করুন।

আমি সৈনিকের অন্যান্য আটক বন্দীদের মধ্যে শুনিয়াছি আমার হতভাগ্য নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ পুত্র অসিতকে অন্যতমদ্বয়ে তাহাদের সম্মুখেই হত্যা করা হইয়াছে।

এইভাবে দোষ প্রমাণ না করিয়া বাংলা দেশের নির্দোষ সন্তানদের গুলি করিয়া, পিটাইয়া নির্মমভাবে হত্যা করিবার সরকারী অধিকারই কি দেশের স্বাধীনতা?

আমিও বৌদ্ধকালে দেশের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশের জেলাখানার ও বন্দী শিবিরে কাল কাটাইয়াছি। স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসকবৃন্দের কাছে বাট বৎসর বরসে এই কি আমার শেষ পুরস্কার?

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডিয়া

প্রেস

১, সুবোধ মল্লিক কোয়ার্টার

কলিকাতা-১৩

নকশালপন্থীদের বিদ্রোহ

জানিনা আমার এই চিঠি প্রকাশিত হবে কিনা, কারণ দপ্পে দিনের পর দিন নকশালপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে লেখা হচ্ছে অথচ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছি যে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের নামে যার শত্রু তা আজ প্রতিবিপ্লবীদের হাতের হাতিয়ার হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে দপ্পে নীরব। এই নীরবতা সন্দেহের উদ্রেক করে। প্রতি-শীল সাংবাদিকতার যে দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রয়োগ তার প্রতিফলন নেই এক্ষেত্রে। কেন তা আপনাই জানেন। তবে কোন কিছুই অকা-রণ ঘটে না। বিশেষতঃ রাজ-নীতিতে নিরপেক্ষতা বলে যখন কোন কিছুই নেই। একথা সত্য যে বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবীদের হাতে অনেক শ্রেণী শত্রুর জীবন শেষ হবেই। তার চেয়ে বড় সত্য যে শাসক শ্রেণী এখনই চিংকার শুরু করে সেবে ওরা খুনী, ওরা সমাজ বিরোধী বলে। রুশ ও চীন বিপ্লবের ইতিহাস একবার সত্যতা প্রমাণ করে। হ্যাঁ, এক অর্থে, সেকথা সত্য। এই পচাগুলো ধন-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী বলেই আমরা এই পচাগুলো সমাজের কবরের উপর এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। তাই আজ সংগ্রামী শক্তিকে সমাজ বিরোধীরা লেবেল এঁটে দিয়ে নির্বিচারে পুলিশের হত্যালাীলা শুরু করেছে। একথা সত্য যে, বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে, কিছু যুবক নকশালপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। "জ্যোতদার খতম" দিয়ে যে কৃষি বিপ্লবের(?) শুরু তার ব্যর্থতা অচিরেই প্রমাণিত হয়ে যায়। কারণ জ্যোতদার খতমের মধ্যে শোষণমূলক সম্পদ নষ্ট। তাই পথ বদলাতে হয়; শুরু হয় শহরে অ্যাকশন। বিবরণ নিম্নপ্রয়োজন। কি ঘটছে সবাইই জানা আছে।

সমাজ বিরোধীদের বৈপ্লবিক কর্মে ব্যবহার এই প্রথম। এই প্রসঙ্গে চারু মজুমদারের বক্তব্য বলে সংবাদপত্রে বা বেরিয়েছে তা দেখছি। সমাজবিরোধীদের যদি সঠিকভাবে বিপ্লবী তত্ত্ব দেওয়া যায় তবে তারাও বৈপ্লবিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে। তবে "যদি" সাপেক্ষে। সেই "যদি" নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। এখানে তার অবকাশ নেই। আমি সে বিতর্কের মধ্যে ঘাচ্ছি না। কিন্তু বিপ্লবীদের কি প্রয়োজন নেই বিপ্লবী তত্ত্ব জানার? প্রয়োজন নেই বিপ্লবী মানসিক-তার? দু'একটা অ্যাকশন থাকাই কি বিপ্লবী চরিত্রের পরিচয়? এর পরিণতিতে যা ঘটা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে। বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া যে অ্যাকশন তা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতিয়ার হয়ে গেছে। তাই বিপ্লবী আর সমাজবিরোধীতে একাকার হয়ে গেছে। আর সেই অবস্থার সুযোগ নিয়েছে শাসক-শ্রেণী। আজ এদের হাত থেকে অহিলাও রেহাই পাচ্ছে না। এদের কিছু নতুন শ্লোগান শোনা

বাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি বুর্জো-য়াদের এক্সেস্ট। কাজেই ট্রেড ইউ-নিয়নগুলি ভেঙে দিতে হবে। আর সরকারী কর্মচারীরাও নাকি এদের খতম আন্দোলনের লক্ষ্য (এরাও বুর্জোয়া নাকি?)। স্বামী-স্ত্রী নাকি একসঙ্গে চাকরী করতে পারবে না (মাফ করবেন, নকশালদের কারো পরিবার এমন নেই তো?) চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার কিছু নেই। এটা ক্রমশই দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে শোষ-ণের বিরুদ্ধে এদের সংগ্রাম নয়, শোষকের পক্ষেই এদের যত কার্য-ক্রম। এরা নয়। ফ্যাসিস্ট। কিন্তু পরিকল্পনা শুরুর উচ্চদরের। এদের বিপ্লবী ভেদ আছে। সেকথা শাসকশ্রেণী ভাল ভাবেই বুঝেছে। তাই দেখা গেছে বাজারী পত্রিকার শয়তান সাংবাদিক থেকে শুরু করে রাজ্যপাল ধাওয়া, পর্যন্ত

এদের মেধাবী ছাত্র (সি আই এর লোকেরা নির্বোধ একথা কে বলে?) লেবেল এঁটে দেবার চেষ্টা করছে। আর এরা যত এদের কাজের ক্ষেত্র বাড়িয়ে ততই জন-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। ক্রমশঃ অসামাজিক ও সমাজবিরোধীদের সংগে এক হয়ে যাচ্ছে। আমরা দিনের পর দিন দেখতে পাচ্ছি পুলিশের প্রচুরে এরা কিভাবে বিপ্লবী বুলির আড়ালে সর্বস্তরের খেঁটে খাওয়া মানুষের সমূহ ক্ষতি করে চলেছে। এর মারাত্মক ফল এই হচ্ছে যে, এই সবার মাধ্যমে শুরুর সুকৌশলে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী মানুষের মধ্যে একটা বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমার অভিজ্ঞতা এইখানেই। নকশালপন্থীদের ওপর পুলিশী অত্যাচার যদি দপ্পে স্থান পায় তবে এই ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে দপ্পে নীরব কেন?

পর্যবেক্ষক

শুধু বেকার যুবকরাই নকশাল নয়

অনেকের ধারণা যে, কেবলমাত্র বেকার যুবকরাই নকশালপন্থী, চাকরী না পেয়ে বাধ্য হয়ে তারা এই পথে নেমেছেন, যদি সেই সমস্ত বেকার যুবকদের চাকরীর ব্যবস্থা করা হয় তবে নকশালী বিপ্লব সহ-জ্বলি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে এটা যে কত বড় অসত্য তার নিদর্শন সমস্ত অফিস কল-কারখানার খোঁজ করলেই জানা বাবে।

অফিসে কলে কারখানার যারা কাজ করছেন তারা আজ নকশাল মনোভাবাপন্ন হলেন কি করে? বেকারদের ভয়াবহ জ্বালা তো তাদের মধ্যে স্থান পায় নি, অথচ অফিসে কলে কারখানার খোঁজ করলে দেখা যাবে সেখানকার বহু লোক আজ নকশালদের পূর্ণ সম-র্থন করেন।

কাজেই শুরুর বেকার সম-স্যার সমাধান বা কিছু আর্থিক সুবিধাদান করলেই যে নকশাল আন্দোলন বন্ধ হবে তা নয়। কেননা নকশালরা লোভী বা সুবিধাবাদী নয় যে মর্দুত্বের কতকগুলি লোকের সুযোগ সুবিধা দান কর-লেই আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে। দীর্ঘ দিনের শোষিত, অবহেলিত এবং নির্বাতীত মানব জাতির লাসন কারেম করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এক সুস্থ এবং সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপনই এই বিপ্লবী পার্টির উদ্দেশ্য। যে সমাজ ব্যব-স্থায় উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। সমাজের কেউ কাউকে ঘৃণা করবে না।

জনৈক অফিস কর্মচারী

এম সি সি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

দপ্পের একজন সতর্ক পাঠক হিসাবে আমি চাই দপ্পে বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশে তথ্যনিষ্ঠ হোক। বিশেষভাবে এ দাবী তুলতে হচ্ছে চৌদ্দ বর্ষ স্থিতীয় সংস্থা (পাঁচই ফেব্রুয়ারী) দপ্পে রাজনৈতিক সংবাদদাতার "নির্বাকনী লড়াইয়ের চেহারা বা দাঁড়াচ্ছে" লেখাটি পড়ার পর। লেখাটির এক জায়গায় আছে "... অন্যান্য বামপন্থী অর্থাৎ মাও কো-অর্ডিনেশন কমিটি (অর্থাৎ এম সি সি)" ইত্যাদি। আমার মতে এই অংশটি বিপ্লবী জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে সাহায্য করবে। কারণ এতে অনেকে ভ্রান্ত হতে পারেন সি পি আই (এম-এল)-র বাইরের "দক্ষিণ দেশ" "লাল বাম্ভা" "মুক্তিযুদ্ধ (অসিত সেন)" ইত্যাদি সংগঠনের একাবন্ধ রূপ বোঝার এম সি সি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো তা নয়। "দক্ষিণ দেশ"

Free I Free II Free III

ধবল বা শ্বেত

আমাদের বিখ্যাত "লাল সাক" ১৯২৫ সাল থেকে রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে আসছে। মাত্র তিন দিন ব্যবহা-রেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শরীরই মিলিয়ে যায়।

বিনামূল্যে এক শিশি দেওয়া হয়।

WESTERN INDIA CO. (V. N.) P.
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

নকশালদের কর্মমূর্তী প্রসঙ্গে

ভাসা ভাসা দৃষ্টিভঙ্গী এবং আমলা-তৈরীর শ্রেষ্ঠ কারখানা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করার মত বুর্জোয়া শিক্ষালাভ হয়নি বলেই বোধহয় গত পনেরোই, আন্দোলনের দপ্পে প্রকা-শিত প্রেসিডেন্সী-কলেজের জনৈক ছাত্রের জবাবের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উদ্ভৃতি এবং প্রচুর উদ্ভাস ছাড়া আর কিছুই পেলাম না।

বর্তমান সমাজব্যবস্থার সবকিছুই আমাদের চিন্তাধারাকে বিকৃত করেছে। তবে শুরুর বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষাব্যব-স্থাকে আঘাত হনলেই কি আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন হবে? এ শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দর-কার এটা সবাই বোঝে কিন্তু এই মর্দুত্বের অন্য ব্যবস্থা না করে শিক্ষাকে বন্ধ করতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে মার্কস, লেনিন এবং মাও সে তুং-এর চিন্তা-ধারা বিকরে শিক্ষাও কি বন্ধ হয়ে যার না? নাকি নকশালবন্দুরা মনে করেন প্রেসিডেন্সী বা অন্যান্য কলে-জের কিছু তথাকথিত "ভাল ছেলের" বচনামৃত পান করেই বিপ্লবের পথে এগোন যাবে। তাহাড়া এ শিক্ষা-ব্যবস্থা কি আমাদের কিছুমাত্রও প্রভাবান্বিত করে? তা যদি সত্যই করতো তাহলে প্রেসিডেন্সী কলেজ, মেডিকেল কলেজ অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি যেখানে এ শিক্ষা ভাল-ভাবে প্রাপ্ত "ভাল" ছেলেরা প্রবেশাধি-কার পায় সেখানে নকশাল কার্য-কলাপের এত আধিক্য কেন? নক-শাল বন্দুরা কি ক্ষমতা দখলের পূর্বেই সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছেন? পুঞ্জীভূত ক্রোধ, হতাশা, বেদনা, ক্ষোভ ইত্যাদির বিস্ফোরণ কেবল পরীক্ষা ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অন্য ব্যবস্থাগুলোর বিষয়ে এত-টুকুও দেখা যাচ্ছে না। বরং সেগুলো সমর্থন করতে এইসব ছেলেরদের অনে-কেরই শুরুর উৎসাহ দেখা যায়।

সুদখোর মহাজন, বড় বড় ব্যব-সারী, চোরাকারবারী, জ্যোতদার, কালজের মালিক কারখানা মালিক এবং সর্বোপরি শাসকশ্রেণির ওপরতলার ব্যক্তিগণ বারা একদিকে সাধারণ লোককে শোষণ করছে অন্যদিকে নানারকম প্রচারে বিভ্রান্ত করে সাধা-রণ লোকের চিন্তাধারাকে বিকৃত করছে তাদেরই জনসাধারণ তাদের ভাসা ভাসা দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শত্রু বলে মনে করে। শিক্ষক, কেরাদী কিম্বা ছোট ছোট ব্যবসারী বারা এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকে উপরোক্ত শ্রেণীর কাজ করতে এবং হয়তো কখনও দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে জনসাধারণ কখনই তাদের প্রকৃত শত্রু বলে মনে করে না। নিম্নস্তরের সাধারণ লোককে আঘাত করার সুবিধা অনেক। এরা কোন সময়ই অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করে না। পুলি-শও এদের শত্রু বলে মনে করে, সুতরাং পুলিশের সাহায্যও এরা পায় না বা চায় না। খতম করে এদের দালাল অথবা প্রতিবিপ্লবী বলে চালানো সেজ্ঞা। এই দালাল কথটির অর্থ অতি ব্যাপক। আজ প্রতিটি দলই দালাল অপবাদে ভূষিত করে অপরপক্ষকে আঘাত করছে।

কিন্তু এইভাবে বিচার করলে প্রেসি-ডেন্সী কলেজের জনৈক ছাত্রও কি দালালের পর্যায়ে পড়েন না? বতই না তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের কন্ট-কাকীর্ণ পথে (বিপ্লবের পথ কুসু-মালীর্ণ নয়) থেকে এবং জ্যাবরে-টরী বদলে করে নিজেকে বিপ্লবী বলে জাহির করার চেষ্টা করেন। প্রকৃত লক্ষে বতক্ষণ না সকলেই সব ছেড়ে দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে নেমে পড়ছি ততক্ষণ সকলেই তো কোন না কোন ভাবে দালাল। তাহাড়া নক-শাল বন্দুরা যে রকম শ্রেণী শত্রু খতম করা হচ্ছে বলে দাবী করছেন সেয়কম শ্রেণী শত্রু তো সি পি এম-ও খতম করেছে এবং করছে বলে দাবী করছে। তবে কি তাদের কার্যকলাপকেও বিপ্লবী কার্যকলাপ বলা যাবে?

মুঠি ভেঙে বিদ্যাসাগর ইত্যাদির প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র কতখানি উদ্-ঘাটিত হয়েছে জানিনা তবে যেসব তথাকথিত মহাপুরুষদের স্মৃতি বর্ত-মান শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণই আমাদের কাছে ক্রমশঃ বাপসা হয়ে আসছিল আজ অন্ততঃ কিছু ছেলের কাছে তাদের স্মৃতি জাগিয়ে তোলা হয়েছে।

বিপ্লব মানেই বাড়াবাড়ি এটাই একমাত্র সত্য বলে নকশালপন্থীরা মনে করেন কিনা জানিনা কিন্তু এক পক্ষ বাড়াবাড়ি করলে অপর পক্ষের বাড়াবাড়িকেও কি স্বীকার করে নিতে হয় না?

নকশালী কার্যকলাপে সাধারণ লোক আন্তর্জাতিক একথা বলা বোধহয় আমার ভুল হয়েছে কারণ ধাওয়ান সাহেবের প্রজাতন্ত্র দিবসের বক্তৃতার মধ্যেও প্রেসিডেন্সী কলেজের জনৈক ছাত্রের এ সম্পর্কে উত্তির সমর্থন পেলাম।

আজকের দিনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বক্তব্য এবং কার্যকলাপের মধ্যে বিরাত পার্থক্যের যে ভাঙামা দেখা যায় নকশালপন্থীদের মধ্যেও যে সেটা দেখা যাচ্ছে এটা সত্যই দুঃখজনক। তারা বস্তব্যে জনচেতনা জাগানো বিপ্লবী, কিন্তু কার্যে উদ্ভাসপ্রবণ সম্মানবাদী।

মুকুন্দ সেন

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

১ চাঁদার দ্বার ১

বার্ষিক পনেরো টাকা
ষাণ্মাসিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৫১, মট সেন, কলি-১০

অগ্নিগর্ভ 'বাঙলা দেশ'

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ঠিক মনে নেই, ১৯৬০ কি ১৯৬১। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের এক প্রতি-নিষিদ্ধ জনাব আম্রবের সঙ্গে মোসাদ্দাক করেন ঢাকার কিছু অন্ডার অভিমোগের সুরাহার জন্য। আম্রব বেশ গরম মেজাজে বলেন :— তোমাদের অন্ডার অভিমোগ নিয়ে স্মিমা মাথা বামাব, এটা প্রত্যাশা কর কোন লজ্জার? আমি নিশ্চিত জানি যে অন্ডার ভবিষ্যতে পাকিস্তান থেকে খসে পড়ার মত-লব আছে তোমাদের।"

জনাব আম্রবের ধারণা যে একে-বারে ভিত্তিহীন ছিল না তার প্রমাণ পূর্ব বাংলার বর্তমান অগ্নি-গর্ভ ঘটনাবলী। আগেকার আর একটি প্রমাণও আছে। আশি-জন শহীদ ছাত্রের আত্মার অক্লেশ ব্যারি-কেড আম্রবের পশ্চিম পাকি-স্তানের মতভাষা উর্দুকে রাজভাষা হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে হানা দিতে দেয়নি (আমরা ভরতীয়রা কিন্তু হিন্দী চাপতে দিচ্ছি)। পাকি-স্তানের বাঙালীদের (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) এই জাতী-

য়তা জাত্যাভিমান (শাভিনজম্) নয় সেই সূক্ষ্ম জাতীয়তা বা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতার ও বহু-জাতিক সংহতির আবশ্যিক উপাদান। এ জাতীয়তা বাঙালীর জাতীয় সত্তা, মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে অবলু-প্তির থেকে বাঁচাবার জন্য জাতীয়তা।

পশ্চিম ও পূর্ব

এটা আজ অনস্বীকার্য যে পূর্ব বাংলার মুসলমান 'মোহনতী জনগণ ও সাধারণ ব্যাপারীরা নিজে-দের দুই দশকাধিক ব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে শুরুর করেছেন যে "ইসলাম রাষ্ট্র" তাদের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে নি ও পারবে না এবং ধর্মের সঙ্গে সামাজিক জীবনযাত্রার কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং বলা যায় যে সেখানে বাস্তব অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে আজ প্রায় পরিপক্ব। বলতে পারেন তাহলে বুর্জোয়া নির্বাচনের প্রহ-সনের কী দরকার ছিল? হাঁ ছিল কারণ ভারতে যে ক্ষেত্রে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে এবং লোকে ক্রমশঃ

বুঝছেন যে ভোটের স্বারা কিছু হবে না সেক্ষেত্রে পাকিস্তানে রয়েছে নন্দ বুর্জোয়া শৈবতন্ত্রের (সংশয় বাহিনী এই তন্ত্রেরই আত্মবহ) ঐতিহ্য। তাই সেখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মানে বিপ্লবের দিকে এক কদম প্রগতি— শৈবতন্ত্র থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র।

আর একটি বিচার্য প্রশ্ন, পাকিস্তান কি একটি জাতি, একটি সংহত রাষ্ট্র? এই প্রশ্নটির বিশদ আলোচনার প্রয়োজন বলে এটি নিয়ে অন্য একটি প্রবন্ধ লেখা বাবে। আপাতত এটা বলা দরকার যে দুনিয়ার এমন কোন রাষ্ট্র বা জাতি নেই পাকিস্তান ছাড়া, যার ভৌগোলিক অবস্থান অন্য রাষ্ট্রের অঙ্গুলের স্বারা শিশিভিত। দুটি খন্ডের মধ্যে হাজার মাইল ব্যবধান। কোথাও কোন সংযোগ বিস্ম নেই যা শাসক পশ্চিম খন্ড থেকে শাসিত পূর্বখন্ডে সৈন্যসামন্ত পাঠাবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসক জাতির বাসভূমি থেকে শাসিত জাতির বাসভূমির এই ধর-ণের দূরত্ব থাকে শব্দ সন্ত্রাস্য-ভোগী দেশ ও তার সাম্রাজ্য বা উপনিবেশের মধ্যে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চল খন্ড ও বাংলা খন্ডের সম্পর্ক কি ঐ ধরনের? কাগজে

কলমে ও নামে না হলেও কার্যত ঐ ধরনেরই বটে। পাকিস্তানের কৃষিজাত পণ্য—যেমন খাদ্যশস্য, পাট প্রভৃতি—মাছ, দুধ ও অন্যান্য খাদ্যের বেশির ভাগ উৎপন্ন হয় পূর্ব বাংলার। পাকিস্তানের রপ্তানী বাণিজ্যের (অর্থাৎ বৈদে-শিক মুদ্রা লাভের) মেরুদণ্ডা হচ্ছে পূর্ববাংলার পাট।

পাকিস্তানের রাজস্বেরও বেশির ভাগ আসে পূর্ববাংলা থেকে। যে পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান (কাশ্মীরের অধিকৃত অঞ্চল বাদে) সেগুন্দির মধ্যে চারটি—পশ্চিম পঞ্জাব, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেগুচিস্তান—রয়েছে পশ্চিম খন্ডে। পশ্চিম পঞ্জাব বাদে বাকি তিনটি জনবহুল নয় ও উষ্ণ। পশ্চিম পাকিস্তানের মোট আয়তন তিন লক্ষ দশ হাজার চারশ তিন বর্গ মাইল, মোট লোকসংখ্যা সাড়ে চার কোটির মত। পূর্ববাংলার আয়তন মোটে পঞ্চাশ হাজার একশ ছাব্বিশ বর্গ মাইল, কিন্তু লোকবল সাত কোটি। সর্বসাকুল্যে পাকি-স্তানের বাসিন্দা সাড়ে এগারো কোটি। পূর্ব বাংলার অরুণসম্পদ সামান্য নয়, বছরে সত্তর হাজার টন মাছ ধরা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশের সংলগ্ন পশ্চিম পঞ্জাবের সামান্য এলাকায় কিছু বনজঙ্গল আছে, মাছ ধরা হয় বছরে বাবাটি হাজার টন। পশ্চিম পাকিস্তানে গম হয় প্রচুর, চা, পাট ও ধান হয় না, হয় জোয়ার জ্বালা, আখ ও সামান্য তামাক। পূর্ব বাংলার উৎপন্ন হয় প্রধানত ধান ও পাট, সামান্য চা, তুলা ও তামাক। খনিজ সম্পদ বলতে পশ্চিম পাকিস্তানে আছে সামান্য টপগোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, লিগনাইট ও বক-সাইট। পূর্ব পাকিস্তানে খনিজ সম্পদ বিশেষ কিছু এখনো পাওয়া যায়নি। কারখানা শিল্প পশ্চিম পাকিস্তানে আছে কাপড়ের, পশ-মের, চিনির, সিমেন্টের চীনা মাটির এবং জাহাজ নির্মাণের। পূর্ব বাংলার আছে পাট ও বস্ত্র শিল্প।

হাজার মাইল দূরে অবস্থিত অন্য রাষ্ট্র-পরিবেষ্টিত পকেট পূর্ব পাকিস্তানের বাবতীয় জাতীয় ও প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকাংশ রাজস্ব এবং বড় বড় ব্যবসা ও চাকরী ইস-লামাবাদের কৃষ্ণগত থাকার সঙ্গে পরাধীন আমলের ভারতের বাবতীয় সম্পদ ট্রোটারটেনের কৃষ্ণগত থাকার মধ্যে কার্যত বিশেষ কোন ভাষা আছে কি, আছে কি তফাৎ পশ্চিম বাংলা ও কেরলের চা, পাটশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, কৃষি ও কাছ-বাদাম রপ্তানীর স্বারা নগরাদিল্লীর অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিশেষ কোন পার্থক্য? অথচ পাকিস্তানের ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দৌলতখানা থেকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ভাগে বা পড়ে তা কেন্দ্রীয় সরকার দুটির এই রাজ্য বা প্রদেশগুলি থেকে শোষণ করা সম্পদের অনুপাতে অনেক কম। পূর্ব বাংলার লোকসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের

জন্য অনেক বেশি অর্থ ব্যয়ান করা হয়। এই হচ্ছে অবস্থা।

পশ্চিম ও পূর্ব বাংলা

আজ পূর্ব বাংলার বাঙালীরা যে বিদ্রোহী দেশপ্রেমিক সংগ্রামে নেমেছেন সারা বাংলার বিপ্লবী ঐতিহ্য তাতে পুনঃসজীবিত হয়ে উঠেছে। পশ্চিম বাংলা সেই ঐতিহ্য বজ্রন করেছে বহুকাল। ভোট-বোম্বা আমাদের লক্ষ্য রাখবার জায়গা নেই।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আসদ্-রিক সশস্ত্র পুলিশ-মিলিটারী রাজ কয়েম করা হয়েছে মুহসুদুদী-এক-চেটিয়া-বৃহৎ পুঞ্জি-ভুসামী শাসক শ্রেণীগুলির কয়েমী স্বার্থ ও চরম মনোফা অক্ষত রাখার মতলবে, যে স্বার্থ ও মনোফার ফাঁড়ির প্রহার দশদশমান ইন্ডিকেট শাসক কংগ্রে-সের কেন্দ্রীয় সরকার স্বয়ং তাদের সমস্ত সশস্ত্র শক্তি নিয়ে, সিন্ডিকেট কংগ্রেস, স্বতন্ত্র পার্টি বা জনসংঘ নয়। আজকের এই ঐতিহাসিক ক্ষণে ইতিহাসেরই অমোঘ সমাজের গতির নিয়মাবলী শাসক কংগ্রে-সের মালিক শ্রেণীগুলি ও পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষার ক্ষমতার কুরে কুরে ঘুপ ধরিয়ে দিয়েছে বলে অকালে এই নির্বাচনীবোমন।

তিন তিনটি "কমিউনিষ্ট" পার্টি আমাদের দেশে কিছু একটি-রও একজনও নেতা বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক ও নাগরিকাদিকারের উপর "রাষ্ট্রপতির শাসনের" মাকীমারা নন্দ বুর্জোয়া শৈবতন্ত্রের আত্ম-বহু পুলিশ-মিলিটারীর বন্দুক ও বট জুতার হামলার বিরুদ্ধে, কিনা-বিচারে, বিনা পরোয়ানার বাকে মর্জি আটক রাখার, আটকদের অমানুষিক দৈহিক নির্যাতনের এবং পিটিয়ে ও গুলি করে মরু করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জন-তার বৃহৎচরার কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করেন নি। এ'রা ন্যাকা মোটেই নন এবং খুব ভাল করেই জানেন যে আজকের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে বাংলার মানুষের গণ-তান্ত্রিক নাগরিকাদিকার পুনরুদ্ধার করা এবং সেটাই এখন জনবিপ্লবের একমাত্র উপক্রমণিকা।

মুজিববরের পার্টি জেনিন-বাদের স্বারা পরিচালিত নয় জাতীয় চেতনায় উদ্ভূত। মুজি-বর নেতৃত্ব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক তথা জাতীয় গণতান্ত্রিক অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত যাবেন কিন্তু তারপর জনগণতন্ত্রের অধ্যায়ে পা দেবেন কিনা সেটা জেনিনবাদী আদর্শের ভূমিকার মানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভারতের কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব (এম এল বাদে) আজও ইন্ড-কেটের বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রগতির চিহ্ন দেখতে পান। কিন্তু ওটা প্রগ-তির চিহ্ন নয়, মৃত প্রগতির ভূতের চিহ্ন।

শেষ মুজিববর রুহমানের চার দফা দাবী জাতীয় স্বাধীনতার দাবী বার অনুপ্রেরণা শ্রেণী চেতনা ততটো নয়, যতটা সমস্ত মানুষের জাতীয়-তাবোধ (সুস্থ)। এইটাই ক্ষেত্র (খেবাহে ১০ম পৃষ্ঠায়)।



সাধনা
চ্যবনপ্রাশ
বহুমূল্য আয়ুর্বেদীয় রসায়ন
সকল বয়সেই সমাধ উপকারী



প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে
সাধনা ওষধালয়-ঢাকা
ফলিতা-৮৮

অধ্যাপক ডাঃ বোসেনচন্দ্র বোস এম.এ.,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস., (লন্ডন)
এম.সি.এস., (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাখার ভূতপূর্ব অধ্যাপক।



ফলিতা-৮৮
কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ বোসেনচন্দ্র বোস, এম.বি.বি.এস., (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

বৃদ্ধ বয়সে বাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত হয়ে হ্রস্ব ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা চ্যবনপ্রাশ নিরমিত ব্যবহারে জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে।

মেডিক্যাল কলেজে ইউনিয়ন নিয়ে রাজনীতি

(দপ্তরের সংবাদবাহক)

সম্প্রতি মেডিকেল কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যে ধর্মঘট হয়ে গেল তার কারণটি বড় অস্পষ্ট। জানা গেছে, জনৈক নার্সের এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে ডিউটি বদলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাঁচ দিন কর্মবিরতি চলে। কর্মচারীরা হাজিরা খাতায় সই করে কোন কাজ না করেই বেরিয়ে আসেন। নার্সস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়নি। কারণ এর মূল্য ছিল একটি মাত্র নার্সের স্বার্থ রক্ষা। পূর্বতন ওয়ার্ডে তার দশটা পাঁচটা ডিউটি ছিল। কিন্তু নতুন ওয়ার্ডে তার ডিউটি বদল হওয়ার কথা। এই অবস্থায় অন্যান্য নার্সরা কতৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন, যদি পূর্বোক্ত নার্সকে আগের ওয়ার্ডে রাখা হয় তাহলে আমাদেরও একই জায়গায় আমাদের সুবিধা মত ডিউটি দিতে হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষিত হলে যেদিন ঠিক তার আগের দিন রাজ্যপালের একটি অর্ডার এল এই মর্মে যে সন্তর সালের বিশেষ জেনে মেডিকেল কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা যে কর্মবিরতি পালন করেছিল সেই দিনের জন্য বেতন তাদের দেওয়া

হবে। অথচ কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা যখন পাঁচদিন কর্মবিরতি ও ধর্মঘট করলেন তখন তাদের বেতন কাটা হল। এদের পক্ষ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ স্বাস্থ্য সচিবের কাছে এই পক্ষপাতিকের কারণ জানতে চাইলে সচিব মহাশয় পূর্বোক্ত অর্ডার সম্পর্কে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। একথাও তিনি বললেন যে, ওসব স্বাস্থ্য উপদেষ্টা কিদোয়াই সাহেবের ব্যাপার।

সর্বশেষে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, একটি নার্সকে অন্য ওয়ার্ডে বদলীর সামান্য ঘটনা সম্পর্কে একজন সদস্য বিশিষ্ট এক কমিশন বসান হয়েছে। এরকম নজর বোধ হয় ভুভারতে নেই। এরপর আরও অর্ধেক হওয়ার পালা। সরকারি বিবৃতিতে জানিয়ে দিলেন,

“মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘট মিটে গেছে।” অথচ ধর্মঘট করেছিলেন শ্রুত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের এক বিরাট অংশ নার্সিং স্টাফ সহ গণ-অভিযান করলেন সরকারী ভবনে এবং অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতি-নিধি দল স্বাস্থ্য সচিবের কাছে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কি? উত্তর : ভুল হয়ে গেছে।

আসলে ভুলটা ইচ্ছাকৃত। কারণ যে ব্যক্তিটির নেতৃত্বে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘট সংঘটিত হল তিনি রং বদলে ওস্তাদ। অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্য তিনি মেডিকেল কলেজে রাজনীতি করছেন। আর সরকার তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করছেন।

হেমন্ত বরুণ হত্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাবু নৃসিংসভাষে নিহত হয়েছিলেন সেখানে আশেপাশের বাড়ীতে ও ওই এলাকায় তদন্ত করে। ওখানকার লোকেরা স্বচক্ষে এই হত্যা সংঘটিত হতে দেখেছেন। স্থানীয় লোকেরা জোরের

সঙ্গে বলছেন এই হত্যার জন্য সি পি এম দায়ী নয়। দায়ী যারা তাদের সম্পর্কে ওরা এখনই কিছু বলতে রাজী নন, কারণ এলাকায় সন্ত্রাসের আবহাওয়া এখনও মূছে যায় নি।

স্থানীয় লোকেরা দাবী করছেন যে, এখনই একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক—তখন তারা বলবেন কারা এই হত্যা করেছে। তারা এদের অনেককে চেনেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে পুলিশের আচরণ অস্বস্ত মনে হয়েছে। তবে একটা আশার কথা। নির্বাচনের পরে শ্যামপুত্রের এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে সাহস বেড়েছে। এই এলাকায় সি পি এম অফিস প্রায় ছয় মাস আগে তথাকথিত নকশালপন্থীরা তখনই করে আর সমস্ত সি পি এম সদস্য ও সমর্থকদের পাড়া থেকে বার করে দেন।

এখন আবার অনেকেই ফিরে এসেছে। আর পাড়ার লোকেরা তথাকথিত নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে “নকশালীরা” বাড়ী বাড়ী আগের মত চাঁদা চাইতে আসে, বলে, বোমা তৈরীর জন্য আরও পয়সা চাই। যাট বছরের এক বৃদ্ধ চাঁৎকার করে বলেন, “এক পয়সাও আমি দেব না আর হত্যার ভয় আমাকে দেখিও না। বোমা আমারও আছে।” এলাকায় সমস্ত লোক বৃদ্ধের এই সাহসে চমকিত আর তারা সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিরোধে বশ্যপরিবর্তন।

এদের একজন বললেন যে, তথাকথিত নকশালীরা পাড়ার বকাটে ছোঁড়া। কিছুদিন ধরে পুলিশের তাড়া খেয়ে অন্যান্য এলাকা থেকেও এদের দলোরা পাড়ায় হাজির হয়েছিল। এর কিছু পরেই হেমন্তবাবু নিহত হন। আবার তারপরেই নিহত হলেন সি পি এম কার্ডিনালার রথীন দেব।

শ্রুতীজল মায়চোখুরী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হত্যার রাজনীতি নিয়ে তাত্ত্বিক মতভেদ। পুলিশের কাছে খবর আছে (পুলিশের খবর অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করার কোন বিশেষ কারণ নেই) যে, চারুবাবুর সমর্থকরা শ্রুতীজলবাবুকে অনেকদিন থেকে হত্যার চেষ্টা করছিল।

শ্রুতীজলবাবুর বয়স যাট আর তিনি বহুদিনের কম্যুনিষ্ট। সেদিন ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা কমরেড মজুমদার আহমদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল শ্রুতীজলবাবু সম্পর্কে।

শ্রুতীজলবাবুর মৃত্যুর খবর শুনে আর তার অতীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে মজুমদার সাহেবের চোখ ভিজে আসছিল। তিনি আবেগপূর্ণ ধরা গলার বললেন, “গিলের দশকে তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন—সমস্ত বিচারে শ্রুতীজল একজন যোগ্য আদর্শনিষ্ঠ কম্যুনিষ্ট ছিলেন।” তারপর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না থেকেই বলে চললেন দীর্ঘ এক ইতিহাস।

সংক্ষেপে বা দাঁড়ায় তা হল এই। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার এক সম্পন্ন পরিবারের সন্তান শ্রুতীজল। বাবা সরকারী ইঞ্জিনিয়ার, তখনকার দিনের হিসাবে বেশ মোটা মাইনের চাকুরে। ভাল ছাত্র হিসাবে শ্রুতীজল স্কুল কলেজে পরিচিত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই ইতিহাস আর রাজনীতি সংক্রান্ত বই পড়ার ঝোঁক।

এই ধরনের ছেলেদের তখনকার অবস্থায় বা স্বাভাবিক পরিণতি তাই হল শ্রুতীজলের। তরুণ অবস্থায় যোগ দিলেন “বঙ্গান্তর” সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে। বাদবপদর জাতীয় বিদ্যালয় তখন বিপ্লবীদের আশ্রয়। সেখানে এসে অন্যান্যদের সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। উনিশশ পঞ্চাশ-ষাশি সালের ঘটনা।

কিছুদিন পরে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। দীর্ঘ চার বছর জেলে—নিরবচ্ছিন্ন পড়াশুনার দিন কেটে গেল। তখনকার দিনে মার্কসবাদ সম্পর্কে বা বই পাওয়া যেত, সবই পড়ে ফেললেন। জেল থেকে বেরিয়ে সোজা মজুমদার সাহেবের কাছে হাজির। কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছে তিনি কাজ চাইলেন, বললেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভারতের মুক্তির পথ নয়, শ্রেণী সংগ্রামের পথেই জাতীয় মুক্তি সম্ভব। ক্রমে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হলেন।

পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী, কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক ফ্রন্টের কাজ তার ম্বারা হওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ তখনকার প্রচারের যুগে তাঁর জিহ্বা-জড়তা বাধা স্বরূপ ছিল। তাই পার্টি লেখাপড়ার কাজে তাঁকে নিয়োগ করল। চম্পুশের দশকে যখন পার্টির দৈনিক “স্বাধীনতা” প্রকাশিত হল তখন শ্রুতীজলবাবু সরাসরি সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হলেন। পরে তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্যকমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

উনিশশ আটচল্লিশ-পঞ্চাশ সালে পার্টির উগ্রপন্থার যুগে শ্রুতীজলবাবু জেলে কাটালেন দীর্ঘ তিন বছর। জেলে সদু হজ্ঞ অনশন আন্দোলন, অসুস্থ শরীরেও তিনি যোগ দিলেন, একবার পাঁচশ দিনের আর শ্বিতীয়বার চরম দিন।

পঞ্চাশের দশকে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে সদু হজ্ঞ অস্তির্বোধ আর তাত্ত্বিক আলোচনার নামে ব্যক্তিগত আক্রমণ। এর মধ্যে আজকের দুই কম্যুনিষ্ট পার্টিতে বারী প্রখ্যাত তাঁদের অনেকেই পরস্পরের কুৎসা রটনায় ব্যস্ত। শ্রুতীজলবাবু এই ধরনের রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন নি।

চৌষটি সালে যে অধিবেশনে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হল সেখানে শ্রুতীজলবাবু হাজির হলেন বিকল্প থিসিস নিয়ে। অন্যান্য নেতারা যে খসড়া কর্মসূচী সমর্থন করলেন শ্রুতীজলবাবু সরাসরি তার বিরোধিতা করতে গিয়ে বললেন যে, সংশোধনবাদের বীজ লুকিয়ে আছে কর্মসূচীর মধ্যে, এই বীজ পরে নয়া-সংশোধনবাদের মহারুহে পরিণত হবে। শ্রুতীজলবাবু কোন সমর্থন পেলেন না অধিবেশনে—খসড়া প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। আর শ্রুতীজলবাবুর বিকল্প থিসিস পার্টির দলিলে পরিণত হল।

সাতষটি সালে নির্বাচনের পর আবার গোলমাল শ্রুতীজল সি পি এম-এর সরকারে যোগদান প্রসঙ্গ নিয়ে। শ্রুতীজলবাবু এর বিরোধী ছিলেন। পরে নকশালবাড়ী আন্দোলন নিয়ে সি পি এমে যে ভাঙ্গান দেখা দিল তার অন্যতম প্রমুখ শ্রুতীজলবাবু। ক্রমাগত ভাঙ্গা অংশ একত্রিত হল সি পি এম-এল পার্টিতে। শ্রুতীজলবাবু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটবুরোর সদস্য হলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তার মনে হল সি পি এম-এল পরিচালিত আন্দোলন বিপথগামী। দেশ-লেন আলোচনার কোন বিশেষ সুযোগ নেই।

এখন যেটা গোলমালে মনে হচ্ছে তা হল পুলিশী আচরণ। ময়না তদন্ত হয়ে গেল, কিন্তু তিনি নিহত হয়েছেন না স্বাভাবিক ভাবে মারা গেছেন সেই সম্পর্কে কোন কথা বলতে পুলিশ নারাজ। কোন নার্সিং হোমে তাঁকে নিয়ে বাওয়া হয়েছিল তাও পুলিশ বলতে চায় না। এরা অস্বস্ত। অপদার্থতার একটা সীমা থাকা উচিত।

এই কলকাতায়

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

জোরদার হয় দুটো জোরালো পার্টির অস্তিত্ব। দু পক্ষেরই প্রজন্ম দারুণ খুশি হওয়া উচিত। যদি গলতলই করতে হয়, তবে দুটো দল চাইই, পশ্চিম বাংলার তার নিশান উড়েছে। এবার দুদলে খেটে খাও। লোক ঠকানোর রাত ভোর হচ্ছে। এখন সমঝে চলা।

নির্বাচন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

একটি স্থায়ী শক্তিশালী বামপন্থী জনপ্রিয় সরকার গঠন করে ইউ এল, এফ এবং ইউ এল ডি এক একজে আগামী দিনের ভারতবর্ষে অগ্রগতির প্রধান ষাঁটি রচনা করতে পারেন অথবা কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব করে ইউ এল, ডি, এফ সামান্য সময়ের জন্যে সেই অগ্রগতি রোধ করতে পারেন।

একথা আজ পরিষ্কার যে বাংলা দেশের অধিকাংশ মানুষ কংগ্রেস বিরোধী ভোট দিয়েছেন। ইউ এল এফ ও ইউ এল, ডি এক একজে ১৪৮টি আসনের অধিকারী। ভোটের ঝিক দিয়ে এবং সংসদীয় আসনের সংখ্যা থেকেও এটা সপ্রমাণিত।

যদি এই জনমতের বিক্ষিপ্ত ইউ এল, ডি একের অস্বস্তি সি পি আই ফরওয়ার্ড ব্লক এবং গোষ্ঠী লীগ আঠারোটি সমস্ত নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে যানও তাহলেও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট, আর, এস, পি এবং এস ইউ সি মোট ১৩৩টা আসন নিয়ে বিরোধী দলে বসবেন। আর যে মাসে তিনটা স্থগিত আসনে নির্বাচন হলে এ সংখ্যা দাঁড়াবে নিশ্চিতভাবে একশ ছত্রিশ।

কংগ্রেসের সঙ্গে আর সবদল জোটবদ্ধ হলেও কংগ্রেসী ভোটের

আসন সংখ্যা দাঁড়াবে একশ চুয়ান্নশ; এর মধ্যে থাকবেন কটর জনসংঘ বিরোধী মুসলিম লীগ সাত, জনসংঘ এক, কটর সি পি আই বিরোধী আদি কংগ্রেস দুই এবং আদি কংগ্রেস জনসংঘ এস এস পি আঁতাতের কটর বিরোধী সি পি আই এর তেরো জন। এ ছাড়া আদি-বাংলা তিন কংগ্রেসের প্রাণীণ মাতঙ্গরত্নের মুকুটীয়ানার বৌক, এসব নানা উপসর্গে আক্রান্ত এই জোট কখন টিকবে? মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের সুবিধা না দিলে মুসলিম লীগ গৌসা করতে পারেন। আবার ইমির পাখীর দল মুসলিমলীগ-জনসংঘের সঙ্গে আঁতাত করে যে ইমেজের আমদানী করবেন তা চূর্ণ ও কালি মাখার ইমেজ হবে। প্রতিক্রিয়ামূলকতার বোর বিরোধী সি পি আই মুসলিম লীগ-আদি-কংগ্রেস-জনসংঘের সঙ্গে এস এস পির যে মজাদার ঘরোয়ানা দেখাবেন, তাতেও কি তেরোর ইমেজ তিন-এ নেমে আসবে না?

আগামী দু চারমাসের মধ্যে এই পরমহুবিধাবাদী জোট প্রতিপক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে, সমস্ত সুবিধাবাদী মৈত্রী ভেঙ্গে কংগ্রেস সহ তার সহযোগী দলগুলির যে অবস্থা দাঁড়াবে তা অতীতের খবরের কাগজের বাঁধ অজয় মুখুজ্যের কল্প চেষ্টার চেয়েও কল্পপূর্ণ হবে, একথা রাজনীতিক-আর্থ ব্যবস্থার পর্ববেক্ষকমাজেই বুঝতে পারবেন।

পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন সশ্রব্কে ঢাকার ডেপুটি হাই কমিশনার

ঢাকার ভারতের ডেপুটি হাই-কমিশনার শ্রীকে, সি সেনগুপ্ত আও-
স্লামী লীগের দুর্বীর আন্দোলনকে
বিচ্ছিন্নতাবাদী চরিত্রের অথবা পূর্ব
পাকিস্তানকে স্বাধীন সার্বভৌম
বাংলাদেশে পরিণত করার কোন
পরিকল্পনা এই আন্দোলনের
পিছনে আছে বলে মনে করেন না।
পাকিস্তানী কমিউনিস্ট এবং
মৌলানী ভাসানী, সার্বভৌমত্বের
স্বাধীন দিলেও মুজিববুর একে
“উগ্রপন্থী ও প্রত্যাশিতাবে কৃতিকর”
বলে মনে করেন। মুজিববুরের লক্ষ্য
পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙা-
লীর স্বাভাবিক স্বীকৃতি লাভ।
পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি
লোক তাঁর ডাকে সমবেত হয়েছে।
জানা গেছে, এটাই হল শ্রীসেন-
গুপ্তের অভিমত। গত সোমবার
রাতে তিনি কলকাতা হয়ে দিল্লী
গেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা
পর্যালোচনার জন্য শ্রীসেনগুপ্তকে
দিল্লীতে ডাকা হয়েছে। দিল্লী
রওনা হবার আগে তিনি পশ্চিম-
বঙ্গের চীফ সেক্রেটারীকে প্রায় দু-
ঘণ্টা ধরে আওস্লামী লীগের আন্দো-
লন ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অব-
হিত করেন।

সারা পূর্ব পাকিস্তানে হাজার
হাজার আওস্লামী স্বেচ্ছাসেবকের
অশ্রুত শৃঙ্খলাবোধের নজর ইতি-
হাসে নেই। এদের কর্মতৎপরতা
আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক বা ভাষা
ভিত্তিক দাঙ্গার আত্মবিধ্বসী পথে
নিরে যেতে দেয়নি। তার কারণ
জনগণ ইতিমধ্যে জেনে গেছে শাসক
শ্রেণীর সেই সব কৌশল, যা কোন
আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করতে তারা
ব্যবহার করে এবং তারপর আন্দো-
লনকে একেবারে খতম করার
জন্য দমন নীতি চালায়।
শ্রীসেনগুপ্ত পূর্ব পাকিস্তানে
রাজনৈতিক চেতনার গভীরতা লক্ষ্য
করেছেন। তাঁর অভিমত এই যে,
সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের
সাহায্যে যে পাক্সাবী চক্র পাকিস্তান
শাসন করছে তাদের নীতি স্বীকার
করতে হবে—যেমন ইতিপূর্বে তারা
পূর্ব পাকিস্তানীদের চাপের কাছে
হার মেনেছে।
পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক
চক্র পাক্সাবী কারেমী স্বার্থের
দাসান্দ্যাস এটা আজ পরিষ্কার।
ভূট্টোর পূর্ব পাকিস্তানে আসার
মরোদ নেই।
মুজিববুরের আন্দোলন পাকি-

স্তানের রাজনীতিতে দূরপ্রসারী
প্রভাব বিস্তার করবে। তাঁর হয়
দফা দাবী, যাতে শব্দ প্রতিরক্ষা ও
কৈদেদিক নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের
হাতে থাকবে—পশ্চিম পাকিস্তানের
অন্য চারটি প্রদেশকে উৎসাহিত
করছে।

এই ঘটনা ভূট্টো ও তাঁর পি-
লস পার্টিকে পশ্চিম পাকিস্তানের
অন্যান্য প্রতিনিধিদের থেকে
বিচ্ছিন্ন করেছে। তিনশো তেরো
জন সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে
পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদে-
শের একশো চরমালিঙ্গ জন প্রাতি-
নিধি। ভূট্টো তিরিশ জনের এবং
মুজিব একশো সাতঘণ্টা জনের
আনুগত্য লাভ করেছেন। ভূট্টোর
প্রতি সমর্থন সিন্ধু ও পাক্সাবীর
মধ্যে সীমাবদ্ধ যেখানে কারেমী
স্বার্থ তাঁর ও তাঁর দলের পৃষ্ঠ-

পোষক।
পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য
অধিকাংশ দল হয় দফা দাবীর
ভিত্তিতে মুজিবের সমর্থক। তার
মানে তাঁর একশো সাতঘণ্টা জন
সদস্যের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের
একশটি জনের সমর্থন তিনি
পাবেন। এতে মুজিব পূর্ব ও
পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় নেতা
হয়ে উঠবেন।

মুজিব কেন্দ্রীয় সরকারে
অধিষ্ঠিত হলে পাক-ভারত সম্প-
র্কের উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা
যায়। আওস্লামী লীগ দীর্ঘদিন ধরে
একথা মনে করে যে, পাকিস্তান
ভারতের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক
জাইয়ে রাখছে প্রতিরক্ষার ব্যয়
বৃদ্ধি করার জন্য যাতে পাক্সাবী
আমলা ও আর্মির সুবিধা হয়।

অজয়বাবুকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নকল মুজিবর অজয় মুখার্জি
এখনও পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
হবার ধাম্মাঘ ঘুরছেন। কিন্তু এবার
আর মেজাজে নয়, আবেদনপত্র
নিরে ঘুরছেন। কিন্তু কেনো
পাত্তা পাচ্ছেন না।

নির্বাচনের ফলাফল বেরুবার
পর গত চোদ্দই মার্চ রবিবার
রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি
বিজয় সিং নাহার, সিন্ধুবাংলার
রায়, রাজ্যের মুসলিম লীগের
সভাপতির সঙ্গে রাত প্রায় এগারো-
টার মিলিত হয়েছিলেন মন্ত্রিসভা
গঠনের ব্যাপারে। বৈঠকে দক্ষিণ-
পন্থী কমিউনিস্ট দলের একজন
প্রতিনিধিও ছিলেন। নামটি সঠিক
আমরা জানতে পারিনি। তবে শব্দ
সম্ভবতঃ বিম্বনাথ মুখার্জি।
বৈঠকে অজয় মুখার্জিও ছিলেন।

এখানে সি পি এম বিরোধী
মন্ত্রিসভা গঠনের নানা বিকল্প
সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনার এক
পর্যায়ে প্রস্তাব ওঠে, পশ্চিমবঙ্গে
কেন্দ্রীয় মতো সংখ্যালঘু দল ইউ-
এল ডি এক মন্ত্রিসভা গঠন করবে

এবং কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যোগ
দিয়ে সমর্থন জানাবে। এই মন্ত্রি-
সভার মুখ্যমন্ত্রিত্ব সেনমনাথ লাহি-
ড়ীকে নিতে হবে। কিন্তু শ্রীলাহি-
ড়ীর মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রস্তাবে সি পি
আই প্রতিনিধি আপত্তি জানিয়ে
বলেন, সোমনাথবাবু অসুস্থ। ওঁকে
মুখ্যমন্ত্রী করা যায় না। প্রয়োজন
হলে ভূপেশ গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রী
হবার জন্য অনুরোধ করা হবে।
আর যার কোথায়। অজয়
মুখার্জি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন,
তাঁর কথা কলা হচ্ছে না কেন।
আমাকে তো আর একবার “চান্স”
দেওয়া উচিত। আমিই তো সি পি
এমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী
বলেছি।

কিন্তু পাঠক বিশ্বাস করুন,
বৈঠকে উপস্থিত কেউই অজয়
মুখার্জির কথায় কোন গুরুত্ব
দিলেন না। তাঁরা অন্য আলোচনা
চালাতে লাগলেন।

ব্যাপার সুবিধের নয় টক্কে
“নকল মুজিবর” ম্লান মুখে
বৈঠক থেকে চলে গেলেন।

গোপন বৈঠক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সব আই বি রিপোর্টের মূল্য কি?
এই কলকাতা শহরের একটি নাসিং
হোমে নকশাল নেতা সুশীতল
রায়চৌধুরী আত্মগোপন অবস্থায়
ছিলেন। প্রতিদিন তাঁর স্ত্রী
স্বামীকে দেখতে গিয়েছেন। স্ত্রী
সরকারী হাউসিং এজেন্টের ক্লাটে
থাকেন। তা সত্ত্বেও আই বি কোন
খবর দিতে পারেনি। এই আই-বির
কোনো গুরুত্ব আছে কি?

তখন আই জি বলতে সুরু
করেন, আই বির কাজ করার কত
অসুবিধে ইত্যাদি। অকস্মাৎ
পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্ত
বলেন, নির্বাচনের ঠিক আগে তিনি
অনেকগুলো আই বি রিপোর্ট
নির্বাচন সম্পর্কে পেরেছিলেন।

কিন্তু তখন ব্যস্ত থাকার পড়তে
পারেন নি। এখন সেগুলো পড়ে
দেখছেন, রিপোর্টগুলো কত বাজে
রিপোর্ট। “সত্যি স্যার আই বির
অবনতি ঘটেছে।” এই কথা বলার
পর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বনাম কল-
কাতা পুলিশের দলীয় কগড়া
লেগে যায় এবং ডিভিসন্যাল কমি-
শনাররা হাসতে থাকেন।

হাই হোক, কি বি ঘোষ দলীয়
কোন্ডল থামিয়ে ডিভিসন্যাল কমি-
শনারদের বলেন, তারা যেন সি পি
এমের প্রতি এতটুকু নরম না হন।
ওদের মন্ত্রিসভা করতে দেওয়া হবে
না। নতুন অমাকসবাদী মন্ত্রিসভা
হলে কিংবা কোনো মন্ত্রিসভা না হলে
সি পি এমদের উচিত শিক্ষা দিতে
হবে এবং সে সম্পর্কে কমিশনাররা
যেন এখন থেকেই প্রস্তুত হতে
থাকেন।

ফরোয়ার্ড ব্লকের

বেচারি অশোক ঘোষ -

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ফরোয়ার্ড ব্লকের বেচারি অশোক
ঘোষ। ওঁর কথা এখন আর ফরো-
য়ার্ড ব্লকের এম এল এরাই শুন-
ছেননা। যুক্তফ্রন্টের আমলে ফরো-
য়ার্ড ব্লকের একজন জন এম এল এ
থেকে উনি মাত্র তিনজনকে এবার
এম-এল-এ করতে পেরেছেন। আর
এর মধ্যে কতবার বড় বড় লোকের
সঙ্গে লাল-ডিনার খেয়ে সি পি
এম বিরোধী নানা গালগল্প করে
আসার জমিয়েছেন। মিডল্টন স্ট্রীটে
একটি ফ্যাসানি রেস্তোরাঁর ওঁকে
মাঝে মাঝে খবরের কাগজের এক
মালিকের সঙ্গে দেখা যেত। ফরো-
য়ার্ড ব্লকের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির
সম্পাদকরূপে অশোক ঘোষ আবার
“জেনামও” করেছিলেন।

কিন্তু হাওয়া একেবারে বদ-
লেছে। ওঁর দলের মন্ত্রী শব্দ
ঘোষ, ডঃ কানাই ভট্টাচার্য, ভক্তি
মন্ডল পরাজিত। পরাজিত নান্দ
ঘোষ। পরাজিত নির্মল বোস।
শব্দ নির্বাচিত হয়েছেন তিনজন
অপূর্ব মজুমদার, সরল দেব আর
মিহির রায়।

এই তিনজনকে নিয়ে তিনি
আবার বৈঠক করে নির্বাচনোত্তর
নীতি স্থির করতে চেয়েছিলেন।
কিন্তু কেউই সাড়া দেন নি।
অপূর্ব মজুমদার নাকি বলেছেন,
কারুর উপদেশ দেবার দরকার নেই।
সরল দেব বলেছেন, তিনি নাবালক
নন। আর তৃতীয় জনকে দখল করে
রেখেছেন ভূপেশ গুপ্ত।

এর মধ্যে অশোক ঘোষকে
কেউই পাত্তা দিচ্ছেন না।

অগ্নিগর্ভ বাংলা

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে জনগণের একমাত্র মিলনক্ষেত্র।
শেখ মুজিবুর হচ্ছেন শোষিত
বাংলায় জাতীয় বুদ্ধোত্তর শ্রেণীর
প্রতিনিধি। প্রগতি ও আত্মবিকাশের
সুযোগ প্রদান বলেই ঐ শ্রেণী
আজকের বৈপ্লবিক আন্দোলনের
সমর্থক। কিন্তু জনতা যখন পুষ্টি-
বাদের চোঁহান্দি ডিঙ্গিয়ে যাবার
জন্য তৈরি হবে তখন শ্রেণীটির
ধনিক অংশ আন্দোলনের বাধা হয়ে
দাঁড়াবে, এটাই অভিজ্ঞতার শিক্ষা।
তাদেরই প্রতিনিধি শেখ মুজিবুর
তখন ব্যারিকেডের কোন পাশে
থাকবেন সেটা ভাববার বিষয়।
বহুতায় মুজিবুর অনেক বৈপ্লবিক
সত্য বলেছেন বাংলায় জাতীয়তার
ভিত্তির পর দাঁড়িয়ে। কিন্তু
আসল পাপীদের তিনি “সামরিক
চক্র” ও “সংখ্যালঘু” বলেছেন,
বলিক ও মুৎসুদ্দী বুদ্ধোত্তর শ্রেণী
ও তালুকদার গোষ্ঠীর নামই করেন
নি অথচ “চক্রটি” তাদেরই সিপাই
সাম্রাট।

পূর্ববঙ্গ নয়, ‘বাংলা দেশ’

পূর্ব বাংলার ওয়া নিজেদের
দেশকে গত তেরো বছর ধরে “বাংলা
দেশ” বলে আখ্যা দিয়েছে—পূর্ব
পাকিস্তান বলতে ওয়া ঘৃণা বোধ
করে।

শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনের
মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, বুদ্ধোত্তর
গণতন্ত্র হত্যার ব্যবস্থা শাসক শ্রেণীই
নিজের স্বার্থে করে, মেহনতী মানদু-
চিরকলাই শান্তিপূর্ণ উপায়ে তার
দাবী আদায় করতে চায়।

ওদের সমস্যা কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত
পাক্সাবী শাসক-শোষক শ্রেণীর উপ-
নির্বোধিক শোষণ। সেই ১৯৫২
সাল থেকে ওরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম
করে আসছে। শোষণের কারদা চির
পূরাজন।

নরম-গরম অনেক রাজনৈতিক দল
মানদুকে বিভক্ত রেখেছিল। শেষ
পর্যন্ত মিলিটারী শাসন দিয়ে ১৯৫৮
সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত
শোষণ চালিয়ে গেছে পাক্সাবী ও
সিলি কারেমী স্বার্থের দল।

পূর্ব বাংলার মেহনতী মানদু
শেষ পর্যন্ত গণ সংগ্রামের জোয়ারে
সব কিছু ধুয়ে দিয়ে আবার গণতন্ত্র
প্রতিষ্ঠার দাবী আদায় করে। ১৯৭০
সালে সাতই ডিসেম্বর নির্বাচন হয়।

ওখানকার মানদু অনেক অভিজ্ঞ।
তাদের বোকা বানানো গেল না। বহু
পার্টি সৃষ্টি করে শাসক শোষক শ্রেণী
বেমনটি চেয়েছিল তা পেল না।

সাতই ডিসেম্বরের নির্বাচনে মুজি-
বুর রহমানের দল, আওস্লামী লীগ,
নির্বাচনে অপর সকলকে ঝেঁটিয়ে

বিদায় করে দিল।

ইমামিয়া খান ও ভূট্টো অনেক
শলা পরামর্শ করতে লাগলেন আর
মাঝে মাঝে মুজিববুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ
চলতে লাগল। মুজিববুরের একটি
কথা হয় দফা দাবীর ভিত্তিতে আও-
স্লামী লীগ জিতেছে—এই দাবীর
ব্যাপারে কোন দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন
উঠতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে ইমামিয়া-ভূট্টো চক্র তার-
স্বরে চীৎকার করল যে পূর্ব বাংলার
পাকিস্তান সংহতি বিরোধী কার-
কলাপে লিপ্ত। অতএব মার্চ মাসের
তিন তারিখে নির্ধারিত এসেসবলীর
ঢাকা অধিবেশন হতে পারবে না।

ভূট্টো বললেন যে তার দলের
সদস্যদের পক্ষে ঢাকার যাওয়া নিরাপদ
নয়। ওয়া ঢাকা অধিবেশন বরকট
করলেন।

এর আগে আরও অনেক চক্রান্ত
হয়েছে, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে অব-
নতি ঘটিয়ে একটা শব্দ পরিমার্জিত
সৃষ্টি করার।

কিন্তু কোন কিছুই পূর্ব বাংলার
মানদুকে বিভলিত করতে পারে নি।
ওয়া মিলিটারীর কামান বন্দুকের
সামনে হাজারে হাজারে এগিয়ে এল।
সারা পূর্ব বাংলা শহীদের রক্ত লাগ
হয়ে গেল।

মুজিবুর বলেন আমরা লাখে
লাখে মরছি বন্ডার আর দুর্ভিক্ষে,
এবার মরার জন্য প্রস্তুত আছি
গুলির মুখে। “আমাদের আন্দোলন
শান্তিপূর্ণ, আমাদের দাবী পশ্চিমী
শোষণ বন্ধ করা।”

পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে শাসক কংগ্রেসে ল্যাং যারামারি

দপন

১৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ২৬শে মার্চ ১৯৭১ ৥ দপন ৩০ পৃ.

পূর্ববঙ্গের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনী সক্রিয়

(দপনের সংবাদদাতা)

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ যে ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনী পূর্ববঙ্গের বিশাল অসহযোগ আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরানোর নানা চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রচেষ্টায় অন্যান্য দু'একটি বিদেশী রাষ্ট্রও সহযোগিতা করছে বলে আওয়ামী লীগের সম্মেলন।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, পিকিং রেডিও পূর্ববঙ্গের বিশাল মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে বিম্বলকর ভাবে নিবৃত্ত। ঐ রেডিওতে সংবাদ পরিচয় নানা দেশের আন্দোলনের খবর শোনা যায় কিন্তু পূর্ববঙ্গের আন্দোলন ঘোষণা হয় ওদের মনঃপুত নয়।

মস্কোর প্রতিরক্ষাও ঘোষণা হয় খুব অনুকূল নয়। ওরা ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী জয়ে আহ্বানে আটখানা। কিন্তু পূর্ববঙ্গের আন্দোলন সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেছে বলে এখনও শোনা যায় নি।

ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু প্রথমেই ধরে নিয়েছে যে, এই আন্দোলন চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গে এর প্রভাব পড়বেই এবং ফলে পূর্ব ভারতে আলোড়ন হয়ে যেতে পারে। এমন কি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারে।

তাই ব্রিটিশ সরকার সর্বতোভাবে ইয়াহিয়া খানের সৈন্য চলাচলের জন্য বঙ্গোপসাগরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ঘাঁটি মালদ্বীপে পাকিস্তানী যুদ্ধ বিমান অবতরণের সুযোগ করে দিয়েছে। এই সুযোগের ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র পূর্ব বঙ্গে নিয়ে আসার সুবিধা হবে।

অবশ্যই এই সৈন্য এবং অস্ত্র আমদানী পূর্ব বঙ্গের আন্দোলনকে দমন নীতির সাহায্যে ধ্বংস করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইয়াহিয়া খান ব্রিটিশ এবং মার্কিন উপদেষ্টাদের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ব বঙ্গের আন্দোলনকে বিপজ্জীর্ণ করার নানা কৌশল অবলম্বন করছে।

শান্তিপূর্ণ অসহযোগ সারা পূর্ব বঙ্গে এক বিরাট সাফা জাগিয়েছে। এই আন্দোলন এখন খালি অসহযোগেই সীমাবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতাও আওয়ামী লীগ দখল করেছে সরকারী পুলিশ মিলিটারী এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে পঙ্গু করে দিয়ে।

পশ্চিম দফা নির্দেশনামা জারী করে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের রেল চলাচল, বন্দর পরিচালনা, ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, পুলিশ এবং সরকারী প্রশাসনের সব কিছু বন্ধই অধিকার করেছে। জনসাধারণকে টাকার কন্ডেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মহল্লায় মহল্লায় আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শান্তি (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠার)

অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে চাপিয়ে দেওয়ায়

পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসে বিক্ষোভ

(দপনের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে বিজয় দলের যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে নব কংগ্রেসে দলাদলি সূর্য হয়ে গেছে।

গত মঙ্গলবারের কংগ্রেসী পরিষদীয় দলের সভায় ভীষণ গোলামাল হল অজয় মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে।

তরুণ অনেক কংগ্রেসী এবং বিশেষ করে মেদিনীপুর আর উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিরা অজয়বাবুর নেতৃত্ব মেনে নিতে সরাসরি

(দপনের সংবাদদাতা)

অজয় মুখার্জীর মন্ত্রিসভা গঠনের খেপে এখন জমেছে। খবরের কাগজে যত ফলাও করে এই প্রচেষ্টাকে প্রকাশ করা হচ্ছে আসল ঘটনা তা নয়। জানা গিয়েছে, সাত সদস্যের মুসলিম লীগ ইতিমধ্যে কেরালার মতো মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা ও আইন দপ্তর চেয়েছেন। মুসলিম লীগের স্বরাষ্ট্র দপ্তর দাবীর বিরোধিতা করেছেন শাসক কংগ্রেসের উপ-দলপতি সান্তার সাহেব। তিনি বলেছেন, মুসলিম লীগকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেবার চেয়ে মন্ত্রিসভা গঠন না করাই ভালো হবে। মঙ্গলবার শাসক কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় সান্তার সাহেব একথা বলেছেন।

অন্যদিকে মুসলিম লীগকে মন্ত্রিসভায় তিনটি আসন দেওয়া হবে শুনে শাসক কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারাও তিনটির বেশী আসন দাবী করেছেন। এখন পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, শাসক কংগ্রেসের তিনজন মুসলমান সদস্য সান্তার সাহেব, জয়নাল আবেদিন এবং বরকতিকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে। কিন্তু এতে কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যরা খুশী নন। বাই-হোক এই ব্যবস্থা হলে দেখা যাবে, কংগ্রেসের আনুকূল্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগ আবার পশ্চিম বঙ্গের শাসন ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করবেন। কেননা, ওদের নির্বাচনী ঘোষণাতেই মুসলিমদের জন্যে চাকরী সংরক্ষণ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক দাবী আছে। তাহলে নকল মুজিবরের মন্ত্রিসভায় অন্ততঃ ছয়জন মুসলমান স্থান পাবেন।

মন্ত্রিসভা গঠনের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, শাসক কংগ্রেসের (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠার)

বাংলা কংগ্রেসের সভায় তুশীল ষাড়া কোণঠাসা

(দপনের সংবাদদাতা)

নব কংগ্রেস থেকে প্রীসদৃশীল ষাড়াকে কোনক্রমে আমল ও পাস্তা দেওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থায় প্রীসদৃশীল ষাড়া এখন চাপ সৃষ্টির চেষ্টায় আছেন যে, বাংলা কংগ্রেসকে সঙ্গে পেতে গেলে বা প্রীঅজয় মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হলে প্রীসদৃশীল ষাড়াকেও মন্ত্রী করতে হবে। তবে এই কথাটা বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক মন্ডলীতে বলা সম্ভব হয়নি, কর্মপরিষদের সভা থেকে বলবার জন্য মূলতুর্বা রাখা হয়েছে।

এই ব্যাপারে প্রীসদৃশীল ষাড়া প্রীকাশীকান্ত মৈত্র ও প্রীসদৃশীল

দাসকে মন্তব্য দিয়েছেন। নব কংগ্রেসের একটা অংশ প্রীসদৃশীল ষাড়ার নাম শুনেতেও রাজী নয়। নব কংগ্রেসের একটা মহলের শব্দে সৃশীল ষাড়া নয়, প্রীঅজয় মুখার্জী সম্পর্কেও নানা রকম বক্তব্য আছে। নব কংগ্রেসের একটা মহল মনে করছে দিল্লী থেকে অজয়বাবুকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এটা করার পিছনে অজয়বাবুরই হাত সব চেয়ে বেশী। নইলে পাঁচজন সদস্য নিয়ে বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করলেই হত, (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠার)

তুশীতল রায়চৌধুরীর মৃত্যু সম্পর্কে

(দপনের সংবাদদাতা)

বিশ্ববী নেতা তুশীতল রায়চৌধুরীর মৃত্যু নিয়ে কলকাতার অনেক ফিসফিসানি চলছে, এবং পুঞ্জিগণের রহস্যজনক নীরবতা মৃত্যু সংবাদের আকস্মিকতার সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। কাণাঘুঘু : ওকে হত্যা করা হয় নি ত?

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ রিপোর্টারদের কৌশলে এই সন্দেহ

আরও দৃঢ় ভিত্তিক করার জন্য সাহায্য করেছে। তারা বলেছে যে নকশালী নেতা তুশীতলবাবুর সঙ্গে বহুদিন ধরেই সি পি (এম-এল) এর বিরোধ চলছিল। আর কোথায় যেন বিরোধীরা ওকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

দপনের সংবাদদাতা দক্ষিণ কলকাতার যে নার্সিং হোমে তুশী- (শেখাংশ ১০ম পৃষ্ঠার)।

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগদান নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকে তীব্র অন্তর্বিরোধ

(দপনের সংবাদদাতা)

ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করা নিয়ে তুমুল মতভেদ দেখা দিয়েছে। সমর্থন করার পক্ষে আছেন পার্টি সম্পাদক অশোক ঘোষ এবং তার

কলকাতা ও হাওড়ার দলবল। অন্যদিকে আছেন অমর চক্রবর্তী, ভক্তিভূষণ মন্ডল, অজিত বিশ্বাসের দল। উল্লেখযোগ্য, এই প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করার প্রস্তাব গত সপ্তাহে পার্টির সেক্রেটারিয়েট বৈঠকে ১৫০-১০০ ভোটে পাশ করানো হয়েছে। অশোক ঘোষই তোড়জোড় করে প্রস্তাবটি পাশ করান।

কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হলেও সমস্যা মেটেনি। কারণ তিনজন এম এল এর উপর অশোক ঘোষের কড়াকড়ি খাটছে না। দুজন অপূর্ব মজুমদার এবং সরল দেব বলেছেন, অশোক ঘোষের মাতবুদার ধার ধারেন না। অপূর্ব মজুমদার স্পীকার পদের জন্যে চেষ্টা করছেন। তৃতীয় সদস্য মিহির রায় বলেছেন, কংগ্রেস বিরোধিতাই ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনৈতিক লাইন ছিল। এখন সেই কংগ্রেসকে সমর্থন করে উত্তর বঙ্গে গিয়ে কি কৈফিয়ত দেবেন তিনি।

এই অবস্থায় অমর চক্রবর্তী এবং ভক্তি মন্ডল লোক মারফৎ সি পি (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠার)

তারা হিসেব দিয়েছে যে, বাংলা কংগ্রেসের একশ ছত্রিশ জন প্রাধীর মধ্যে একশ এগারো জনের জামানত জম্ব হয়েছে, আর মাত্র পাঁচজন নির্বাচিত হয়েছে। জ্যোতি বসুদর কাছে পরাজিত হয়ে কোন মুখেই বা অজয়বাবু আবার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য হ্যাংলামী করছেন।

এত গেল অজয় সংবাদ। তারপর আরও কেলেকারী মুসলীম লীগ নিয়ে। অজয়বাবুকে মন্ত্রী সভা গড়তেই হবে, এই সুযোগে (শেখাংশ ১০ম পৃষ্ঠার)

অস্বীকার করেছে। প্রচণ্ড হটগোল সভায়, শেষপর্যন্ত প্রস্তাবে কল হল যে, দিল্লীর নির্দেশে অজয় মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকার করে নেওয়া হল।

অজয় মুখার্জী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওই বৃন্দ্র নেক্ষে মন্ত্রিসভা কখনই পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় হবে না। আর তা ছাড়া বীর দল নির্বাচনে প্রায় নিধন হয়ে গেছে তার মুখ্যমন্ত্রীর করা সাজে না।

কংগ্রেসীদের মধ্যে মুখর বারা

মুশলি ধাড়া কোণঠাসা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মুশলি আসবার এমন কি দরকার ছিল। তাছাড়া এই মুশলি সভা যখন নিতান্তই একটা অস্থায়ী ব্যাপার।

আঠারোই মার্চ বাংলা কংগ্রেসের সভা শুরুর হতেই শ্রীমদশীল ধাড়া বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচনী বিপর্যয় সম্পর্কে এক রিপোর্ট রাখলেন। এই রিপোর্টে শ্রীধাড়া বললেন বাংলা কংগ্রেসের রাজনীতি বাংলা দেশের মানুষ গ্রহণ করে নি এবং এত বেশী আসনে প্রার্থী দেওয়া ভুল হয়েছিল। নব ও বাংলা কংগ্রেস আঁতাত না হবার জন্য মানুষ বাংলা কংগ্রেসকেই দায়ী মনে করেছিল এবং সাধারণ মানুষ বাংলা কংগ্রেসকে নব কংগ্রেস থেকে আলাদা ভাবে দেখে নি, তাই তারা ভোট দিয়েছে নব কংগ্রেসকে। রাজ্যের প্রমিষ্ট ও নিম্নবিস্তরা বেছে নিয়েছিল সি পি এমকে আর মধ্যবিস্তরা বেছে নেয় কংগ্রেসকে। ফলে বাংলা কংগ্রেসের জন্য কেউ এগিয়ে আসে নি। বাংলা কংগ্রেস শুরুর আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি বলে চীৎকার করেছে কিন্তু সংগঠন করে নি। এই সব কারণেই বাংলা কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটেছিল।

শ্রীমদশীল ধাড়ার এই বক্তব্যের প্রথম জবাব দিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় শ্রীধাড়ার

বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন শ্রীধাড়ার ব্যক্তিগত খারাপ ব্যবহার ও ডিকটেক্টর সুদান্ত মনোভাব পার্টি'কে ডুবিয়েছে। শ্রীমদশীল ধাড়াকে সবতোভাবে বিশ্বাস করা হয়েছিল, সমস্ত দায়িত্ব তার উপর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার কোন মর্যাদা রক্ষা হয় নি। কিন্তু এই সব বললেও আমার হৃদি বা অপরাধ শেষ হয় না। তাই আমাকে আপনারা বিদায় দিন।

এর পর একে একে বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা শুরুর করেন। শ্রীআমজাদ আলি সর্দার বলেন বাংলা কংগ্রেসই সি পি এমকে একশ এগারোটি আসন উপহার দিয়েছে। আজ নেতারা একে অপরের উপর দোষ চাপিয়ে সরে পড়বার তাল করছেন। আসল কথা হল কেন আট পার্টিতে যাওয়া হল না, কেন নব কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত হলো না তার বিচার দরকার। শ্রীপ্রব মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা ভুল করেছি, আজ আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সন্তর সালের একটিশে মার্চ বাংলা কংগ্রেস রাজ্যের সব দলের কাছে পর দিয়ে একটা সার্বিক ফ্রন্ট গড়ার আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু কয়েক

মাস পরে নির্বাচন করতে গিয়ে দেখা গেল বাংলা কংগ্রেস একা, সেটা একা নকল কুন্ডের মত বৃদ্ধিগত দখলে আঁপিয়ে পড়েছে। রাজ্যের কোন জেলার বাংলা কংগ্রেসের সংগঠন বলে কিছু নেই। মালদা জেলার বেখানে কোন জেলা কমিটি পর্যন্ত নেই সেখানে বাংলা কংগ্রেস ছয়টা আসনে লড়াই করলো। উত্তর বাংলায় বেখানে একটা পা রাখবার জায়গা নেই সেখানে উনিশটি আসনে প্রার্থী দেওয়া হল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম লোকে আমাদের ভোট দিতে কষ্ট আর আমরাই হলাম গাভী। এই হল যে দলের মনোভাব ও দূর দৃষ্টি সেই দলের নেতৃবৃন্দের বিদায় নেওয়াই ভাল। তার পরও যদি কেউ বলেন এই নেতারা না থাকলে দল থাকবে না তবে দলেরও না থাকা ভাল।

শ্রীহরিন্দাস মিত্র ক্ষোভে দৃষ্টি হতাসায় ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে যা বললেন সে এক ইতিহাস। যে ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি চিট-এর চরিত্র আর রয়েছে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ীর একটা অংশ খোঁরা দেওয়ার কথা। শ্রীমিত্র বললেন পদূলিয়া জেলার তেইশ লত গ্রামের মধ্যে যেখানে তেইশটা গ্রামেও বাংলা কংগ্রেসের নাম জানে না সেখানে সাতটা আসনে প্রার্থী দিয়ে আমরা লোকসভায় প্রার্থী করা হল। সারা বছর শ্রীমদশীল ধাড়া কিছু জেঁকে খিচুড়ি খাওয়ান আর তাই দেখে শ্রীধাড়া তার দলের পরিমাপ করেন।

শ্রীঅহীন মিত্র বললেন, কত নির্লজ্জ ও বেহায়া হলে তবে এখনো দলের কথা নিয়ে আলোচনা সম্ভব তার প্রশ্ন হল এই নেতৃবৃন্দ। আজকের সভায় একমাত্র আলোচ্যসূচী থাকা উচিত ছিল নেতারা পদত্যাগ করেছেন, সেই পদত্যাগ পত্র বিবেচনা, তা নয় এখনো চলছে আলোচনা। শ্রীমিত্র শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কেও জানিয়েছিলেন তার এখনো দৃষ্টির অনেক বাকী।

শ্রীএস, পি, বাগ বললেন, দল বা করেছে ঠিকই করেছে, তবে জেঁকে বড়তে পারে নি এই যা মুশকিল হয়েছে। এর জবাব দিয়ে শ্রীবিভূতি রায় বললেন, হ্যাঁ সবই

ঠিক হয়েছে এইবারে পাঁচটা মালা এনে নেতাদের পাঁচজনকে পরিয়ে দেওয়া হোক, তবে ঠিক হবে।

এই সব কথার জবাব দিতে উঠলেন শ্রীমদশীল ধাড়া। শ্রীধাড়া শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগের জবাব দিলেন সবার আগে। শ্রীধাড়া বললেন, নব কংগ্রেসের খারাপ ব্যবহারের কারণেই নব-বাংলা আঁতাত সম্ভব হয়নি। আর তিনি যা করেছেন সবই করেছেন দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুগত সৈনিক হিসাবে। পোলারাইজেশন বলে একটা কথা চালু হয়েছে যেটা হল কলেজে পড়া কিছু জেঁকের কথা। বাস্তবে ঐ কথার কোন দাম নেই। আমরা সং ও আদর্শের রাজনীতি করেছি, সুবিধাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ

করি নি, তাই এই বিপর্যয় হয়েছে।

শ্রীঅমরেশ সরকার বললেন, আগে ঠিক হওয়া দরকার আমাদের দলের রাজনৈতিক চরিত্র কি, কাদের জন্য আমাদের দল কাজ করবে। সবার শেষে আবার উঠলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন, তার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীমদশীল ধাড়ার জন্যই নব কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত ভেঙ্গে গেছে। যা হোক আপাতত দলের স্থিতিবাস্থ্য বজায় রাখতে হবে। তার পর গঠিত হল একটা নির্বাচনী বিপর্যয় তদন্ত কমিটি, যার আহ্বানক হলেন শ্রীমদশীল ধাড়ার স্বয়ং।

ব্রিটিশ গুপ্তচর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে। নির্দেশে আরও বলা হয়েছে যে, কোন প্রকারে এই আন্দোলনকে অহেতুক হিংসাত্মক হতে দেওয়া চলবে না।

আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনসাধারণকে উগ্রপন্থীদের কার্যক্রম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সপেক্ষ যে, বিদেশী গুপ্তচরেরা লীগের মধ্যে দালাল সৃষ্টি করে তাদের সাহায্যে এই বিশাল আন্দোলনে ভাঙ্গান ধরাবার চেষ্টা করছে।

এই সম্পর্কে কিছু বিলাতী রক্ষণশীল সংবাদপত্রের ঢাকার সংবাদ পরিবেশন আওয়ামী লীগের নজরে এসেছে। প্রথম থেকেই লন্ডনের টাইমস ও ডেলী টেলিগ্রাফ নামক দুটো দৈনিক ওদের সংবাদে বিশ্ববাসীকে বোকাবার চেষ্টা, করছে যে, পূর্ব বাংলার আন্দোলন পাকিস্তান ঐক্যের বিরোধী এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত পূর্ব পশ্চিম বঙ্গ এক হয়ে গিয়ে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হবে।

টাইমস পত্রিকার একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক হঠাৎ সেদিন কলকাতায় এসে হাজির। শহরের গলগলান

লোকেদের সঙ্গে দেখা করে ওঁর বোকার চেষ্টা করছিল পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা পূর্ব বাংলার সঙ্গে ভিড়তে চার কিনা।

আর ডেলী টেলিগ্রাফের একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক ঢাকা থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগে ভাঙ্গান শুরুর হয়ে গেছে। উগ্রপন্থীরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরুর জন্য কলকাতা। আর মুজিবুর নাকি তার দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারছেন না।

উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেই সাম্রাজ্যবাদীরা অনেক ব্যাপক গণআন্দোলনের সর্বনাশ করেছে বিভিন্ন দেশে। ওদের আন্দোলন ভাঙ্গার অভিজ্ঞতা বেশী, রসদ অর্ধ সব কিছুই ওদের আছে। তাই উগ্রপন্থার নামে দালাল সৃষ্টি করা ওদের পক্ষে সম্ভব।

আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর কলকাতায় প্রথম আন্দোলনের দীক্ষা নেন নেতাজী সুভাষ বসুর কাছে, সেই গ্রিসের যুগে। কি ভাবে সাম্রাজ্যবাদ আর তাদের দেশী পদলেহীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে বিপর্যয়ময় করে মুজিব সাহেব সেই সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই উগ্রপন্থা বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ছেন আন্দোলনের শুরুর হতেই।

ল্যাং মান্নামান্নি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি বিজয় সিং নাহারকে "ল্যাং" মারা। এটি নন্দাদিত্যের মারফৎ ঘটানো হয়েছে। ব্যাপারটি হচ্ছে, নির্বাচনের পরে শাসক কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা তরুণকান্তি ঘোষ হবেন বলে একরকম স্থির ছিল। ইন্দিরাও নাকি তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু পার্লামেন্টারী দলের সভায় তরুণকান্তির সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে বিজয় নাহার দলপতি এবং সাধারণ সাহেব উপ-দলপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই সিদ্ধান্তে সিদ্ধার্থশংকর রায় খুসি হননি। তাই বিজয় নাহার মন্ত্রিসভা গড়বার ব্যাপারে তরুণকান্তি ঘোষের সঙ্গে দিল্লী গিয়ে দেখেন, হাওয়া তাঁর বিরোধী। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেবার জন্য অজয় মুখোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠানো হলো। দিল্লী থেকে বোঝানো হলো অজয় মুখোপাধ্যায় কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। অথচ লোকটার কিছু নাম ডাক আছে। দ্বিতীয়ত এই লোকটি প্রচণ্ড সি পি এম বিরোধী। সুতরাং আগামী দিনে সি পি এম ঠেঙানোর কাজ অজয় মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে করতে হবে। তারপর বেশী সমালোচনা হলে সব দোষ ওর ঘাড়ের ফেলতে হবে। অর্থাৎ এক টিলে দুই পক্ষী মারা। বিজয় নাহারের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষ এবং অজয় মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে

নোংরা কাজ করানো। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরাও এতে সমর্থন জানিয়েছে। অর্থাৎ অজয় মুখোপাধ্যায়কে দ্বিতীয় ডব প্রকল্প ঘোষ করা হবে। নন্দাদিত্যের এই কলকাতা নাড়ানোর পিছনে ছিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায়। সিদ্ধার্থ রায় বিজয় নাহারকে সহ্য করতে পারেন না।

প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভা গড়ার আরও নেপথ্য কাহিনী আছে। অজয় মুখোপাধ্যায় চাইছেন বাংলা কংগ্রেসের শ্রীমদশীল ধাড়াকে মন্ত্রিসভায় আনতে। কিন্তু দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা এতে ঘোরতর আপত্তি করেছেন। জবাবে অজয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, সি পি আই-এর আপত্তি করার কোনো এজিয়ার নেই। "ওদের সঙ্গে তো কোনো চুক্তি নেই", অজয় মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তবু সি পি আই আপত্তি জানিয়ে যাচ্ছেন।

এর পরে আছে ঝাড়খণ্ড, গুজরাট লীগ, এস এস পি, পি এস পি'কে মন্ত্রিসভায় কোন পোর্টফোলিও দেওয়া হবে তার প্রশ্ন। সবাই বড় বড় পোর্টফোলিও চাইছেন। ফলে শাসক কংগ্রেসে দারুণ বিক্ষোভ জন্মেছে। তাই কলকাতায় প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভা এত সহজে হচ্ছেনা। আর যদিও হয় তখন হতাশ প্রার্থীরা কি মনোভাব দেখান সেটিও লক্ষ্য করতে হবে।

ফরওয়ার্ড ব্লক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এমের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। এঁদের পক্ষ থেকে অজিত বিশ্বাস ইতিমধ্যেই ইউ এল এফের কনভেনশন সুধীনকুমারের সঙ্গে এক দফা আলোচনা করেছেন। সুকুমার রায়ের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। ওরা বলেছেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের রিকুইজিশন মিটিং ডাকানোর জন্যে চেষ্টা করা হবে। অন্যথায় পার্টি অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। তাঁরা কোনোমতেই কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্যে নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত পার্টি'কে কংগ্রেস সমর্থনে যেতে দেবেন না।

Just Arrived

Strategic ideas for revolutionary struggle in the U.S., a collection of basic PLP articles in recent years.

[355 pages]

Revolution Today : U.S.A.

Rs. 15.00

Also available:

Stalin: On Chinese Revolution (4.00); Chen Po-ta: Mao Tse-tung on Chinese Revolution (1.60); China in the News, No. 10 (3.15); Broadsheet (10.00 for 1 yr.); N. Brunner: China's Economy (1.80); Edgar Snow: Red Star Over China (63.00) and Otherside of the River (56.70).

NEW BOOK CENTRE

14, Ramanath Majumdar Street
CALCUTTA-9

কলকাতায় মাত্র ৪০ শতাংশ ভোট গড়ল কেন

(দশম পৃষ্ঠার রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিরতা লাভ করে নি, একথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একটু তালিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে কলকাতা শহরজুড়ে ভোট দাতারা নিঃশঙ্কচিত্তে ভোট দিতে সক্ষম হলে, ভোটের হার এত কম হত না। কলকাতায় ভোটের হার মাত্র একচল্লিশ শতাংশ, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের তুলনায় প্রায় পঁচিশ থেকে বিশ শতাংশ কম।

অথচ এই কম ভোটের হার থাকা সত্ত্বেও কলকাতার তেইশটি নির্বাচন কেন্দ্রেই কংগ্রেসের পক্ষে প্রদত্ত ভোট ১৯৬৭, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সালে মোটামুটি এক, বাড়েও নি, কমেও নি। অর্থাৎ কংগ্রেসের পক্ষে ভোটদাতাদের সংখ্যা একই রয়েছে। অথচ মোট প্রদত্ত ভোট পূর্ববর্তী দুটো নির্বাচনের তুলনায় অনেক কম।

এ থেকে একটা তথ্যই প্রমাণিত হয় যে সি পি এম বিরোধী প্রচার অনবরত চালানো সত্ত্বেও কলকাতার লোক কংগ্রেসের বা অন্য দলগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েন নি। তা যদি হত তাহলে কংগ্রেসের ভোটের পরিমাণ বেড়ে যেত। এবং মোট প্রদত্ত ভোটের হার অন্ততঃ ১৯৬৭, ১৯৬৯ সালের তুলনায় কম হত না, বেশী হত বা সমান সমান থাকত।

এবার নির্বাচনে কংগ্রেস দল তাদের সমর্থন বাড়তে না পেরে, কংগ্রেস বিরোধী ভোটদাতাদের অনুপ্রাণিত করার সুযোগে, বেশ কয়েকটি আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ সি পি এম-এর পক্ষে বাদ্যের ভোট দেবার সম্ভাবনা ছিল, তারা বিপুল সংখ্যায় ভোট কেন্দ্রে আসেন নি বা আসতে পেরেন নি। তারা যদি শংকাহীন মনে ভোট দিতে আসার দৃঢ়তা দেখাতে পারতেন তাহলে কলকাতার আসনগুলিতেও কংগ্রেস পরাজিত হত এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন অর্ধাৎ আকাশ কুসুম বলে প্রমাণিত হত।

কলকাতার কংগ্রেস বিরোধী বিপুল সংখ্যক ভোটার কেন ভোট দিতে এলেন না?

গত এক বছর ধরে একটানা যে পদলিখী তান্ডব চলছিল, তা গত দুমাস ধরে সুপারিকলিপিত ভাবে এমন তীব্র করা হয়েছিল যে বহু কংগ্রেস বিরোধী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

পদলিখী তান্ডবের সঙ্গে নকশালী খুন খারাপি মিলে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে সাধারণ নাগরিকের মনে সংশয়, সন্দেহ ও আতঙ্কের আবহাওয়া ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল।

এই আশঙ্কা ও আতঙ্ক ঘনী-

ভূত করার কাজে প্রধান অংশ গ্রহণ করে কলকাতার কয়েকটি বৃহৎ সংবাদপত্র। আমরা বারান্তরে বর্তমান নির্বাচনে এই সংবাদপত্রগুলি যে কী ন্যাকারজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা বিস্তারিত ভাবেই পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেব।

দেশা গেল যে সি পি এমকে পরাজিত করার মহান লক্ষ্য নিয়ে শাসকশ্রেণী ধাপে ধাপে এগিয়েছে কিন্তু সি পি এম নেতৃত্ব তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেন নি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সি পি এমকে পরাজিত করার জন্যে কংগ্রেস ও তার সাক্ষর দলগুলি বেছে নিয়েছিল কলকাতা, চব্বিশ পরগণা এবং বর্ধমান জেলাকে। এখানেই তারা সবচেয়ে বেশী একা-বৃন্দ হয়ে প্রধানতঃ একজন প্রার্থীকে সমর্থন করেছে।

এই তিনটি জেলাতেই সি পি এম বিরোধী দলগুলি প্রধানতঃ হিন্দীরা কংগ্রেসের পেছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং অলিখিত সমঝোতা করেছিল সবচেয়ে বেশী।

প্রথম ধাপে, প্রচণ্ড নিপীড়ন চালানো হয় চব্বিশ পরগণা ও বর্ধমানে। বর্ধমানে সি পি এমের প্রাক্তন বিধানসভা সদস্যদের পর্যন্ত নানা মামলায় জড়িত করে জামীন না দিয়ে জেলে আটকে রাখা হয়। চব্বিশ পরগণায় এলাকায় এককায় ব্যাপক পদলিখী সম্ভ্রাস চলতে থাকে। একমাত্র চব্বিশ পরগণা জেলায় হিন্দী হাজার কর্মীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়। কলকাতায় সি পি এম সমর্থকদের ওপর পদলিখী হামলা চলে, জেলের মধ্যে পিটিয়ে মারা, রাস্তায় এমন কি বাড়ী থেকে টেনে এনে গুলী করে মারার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এ সম্পর্কে পদলিখের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও ফৌজদারী খুনের মামলা আদালতে দায়ের হয়েছে। হাজার হাজার সি পি এম কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করা হয়, নকশালী দমনের অজুহাতে হাজার হাজার কর্মীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আসরে নামে নয়া-কংগ্রেসী প্রাক্তন বামপন্থী দলগুলি। বাংলা কংগ্রেস নেতা সদম্ভে ঘোষণা করেন যে তারা জয়ী হলে গুলী চালিয়ে সি পি এমকে ঠান্ডা করে দেবেন। মিথ্যা কুৎসা, পদলিখী প্রতিটি অত্যাচারকে অকুণ্ঠ সমর্থন করে, সি পি এম সমর্থকদের বিরুদ্ধে হিংসামূলক কাজ চালাবার প্রকাশ্য উসকানি দিয়ে তারা জনসাধারণকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলে দেন যাতে তারা সি পি এমকে বর্জন করে চলেন।

এতেও যখন হল না তখন নকশালী পন্থী, খুনে গুডাডল সি পি এম নির্বাচন কর্মীদের খুন করতে আরম্ভ করল। পোপার্স লাগাতে

ব্যস্ত দশ বছরের কুচি বালককে গুলী করা হল, শব্দটিনী করতে ব্যস্ত কিশোর তরুণদের কুপিয়ে হত্যা করা হল। এমন অবস্থায় সৃষ্টি করা হল যে নির্বাচনী প্রচার চালাতেও সি পি এম যেন না পারে। অন্যদিকে অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে প্রমোদ প্রবীণ জননেতা হেমন্ত বসুকে (এবং আগে পিছে আরো বেশ কয়েকজনকে) হত্যা করা হল। দোষ চাপানোর চেষ্টা হল সি পি এম এর ঘাড়ের পদলিখ সংবাদপত্র, কংগ্রেসী নেতা, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক সবাই মিলে খোঁজখন্ডি সি পি এম-এর ওপর খুনের দায়িত্ব চাপাতে উদ্যোগ নিলেন। প্রবীণ নেতার ষড়যন্ত্রমূলক হত্যার পরিকল্পনা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা আড়াল করে দেবার জঘন্য প্রয়াসে লিপ্ত হল সি পি এম বিরোধী মহাজোট। পদলিখ, নকশাল, কংগ্রেস, অশ্বত্থাম সর্বত্র মিলে নরকের আগুন জ্বালালে কলকাতার পথে পথে। হাওড়া, নদীয়া, চব্বিশ পরগণার জনপদে জনপদে।

ইতিমধ্যে রাস্তায় রাস্তায় সংগীন, রাইফেল উর্গিয়ে নামলো মিলিটারী। অজুহাত নকশাল দমন।

সংবাদপত্র দিনের পর দিন ইঙ্গিত দিয়ে চললো, শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হবে না। সরকারী অফিসারদের একাংশ ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হল।

আমরা জানতে পেরেছি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বশীল অফিসারবৃন্দ নির্বাচনী কাজের দায়িত্ব না নেবার জন্যে কর্মচারীদের মধ্যে প্রচার চালিয়েছেন। রেলের চীফ পার্সন্যাল অফিসার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কর্মচারী ইউনিয়নের আলোচনা করতে দেবার সুযোগ দিতেও স্পর্ধার সঙ্গে অস্বীকার করেছেন। বহু স্থলে কর্মচারীরা জানতেই পারেন নি যে তাঁরা নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত হয়েছেন, কারণ ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন অফিসার তাদের চিঠিই বিলি করেন নি।

এর কি উদ্দেশ্য ছিল? সরকারী কর্মচারী বহির্ভূত এমপ্লয়-মেন্ট এক্টেজে নাম লেখানো হাজার হাজার হাজার বেকার যুবককে একাজে নিযুক্ত করা হয়। তাদের

নানা ভবিষ্যতের প্রলোভন দেখানো হয়। বহু কংগ্রেসের লোক, এই সুযোগে পোলিং অফিসার, প্রসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব হাতে তুলে নেন। বিশেষ করে এ রকম ঘটনা ঘটেছে চব্বিশ পরগণা, হাওড়া কলকাতা ও বর্ধমানে। চীফ ইলেকটোরেল অফিসার রাঘবন নিজেও এটা ভালো করেই জানেন।

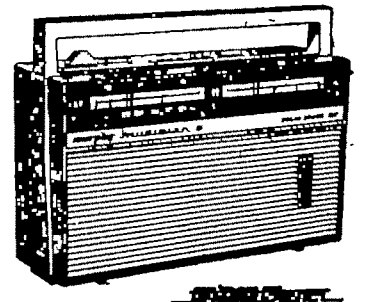
চুচুড়া কেন্দ্রে আটশ ব্যালট পেপার বাতিল হল, প্রসাইডিং অফিসারের সহি ছিল না বলে। হাওড়ার কেন্দ্রে ভুলক্রমে সি পি এম প্রার্থীর ভোটের সংখ্যা চেক লিস্টে কংগ্রেসের নামে লেখা হল, কংগ্রেসের স্বরূপ সংখ্যক লেখা হল সি পি এম প্রার্থীর নামে। তা ধরা পড়ল কোন কোন অফিসারের সতর্ক দৃষ্টির ফলে।

আমরা জোর করে বলতে পারি যে অন্ততঃ কয়েকটি কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গণনা হলে এরকম আশ্চর্যজনক ভুল বেশ কিছু ধরা পড়বে।

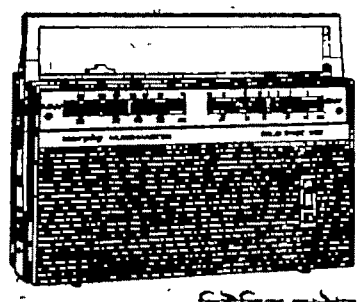
এই আতঙ্ককর রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করার পর খোদ রাজ্যপাল আসরে অবতীর্ণ হলেন। তিনি যে ভাবে বেতার বক্তৃতা দিলেন তাকে বলা যায় কংগ্রেস-ও (স্বাধীন ১ম পৃষ্ঠায়)

মারফি ট্রানজিস্টর

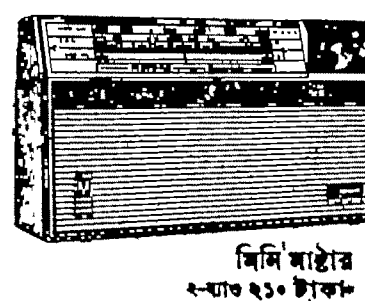
সৌন্দর্য ও জোরালো ধ্বনির সমন্বয়।



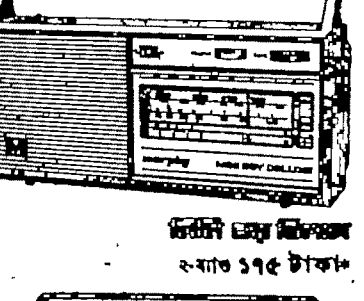
১৫ সিটার ব্যাটের সহজে পরিচালিত ওয়েব
১২৫ টাকা



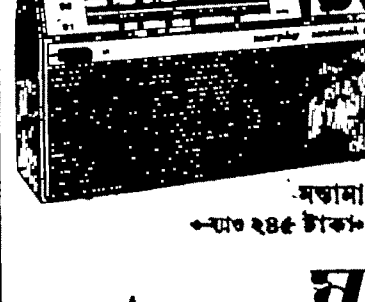
মিউজিক মাস্টার
২-ব্যাট ১৩০ টাকা



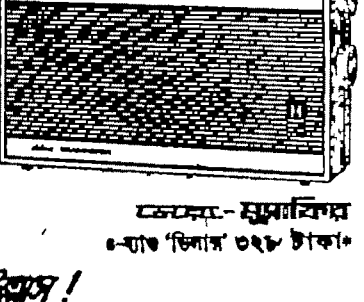
মিমি মাস্টার
২-ব্যাট ২১০ টাকা



ক্রিস্টাল কন্ট্রোল
২-ব্যাট ১৭৫ টাকা



মহামা
২-ব্যাট ২৪৫ টাকা



জেনারেল-ম্যুজিকিয়াল
২-ব্যাট 'ডিলার' ৩২৮ টাকা

মারফি সার্ব গুণের উন্নয়ন!

কমিটারি বো আমাদের পাড়ার
রেশমাসি হলেও দেবনাথ তাকে
কৌড়ি বলেই ডাকে। দেবনাথ এ-
পাড়ার নয়, আমার কলেজী বন্ধু।
মাসিমা সুবাসে সম্বন্ধস্বাক্ষর করে
সমীহ করতে হয় না তার। দেব-
নাথের অধিকারে ভোগ্য সমস্ত হাসি-
ঠাট্টার তদারকি অব্যাহত।
নির্বাচন নিয়েই কিছুক্ষণ টিপুনি
হল ওদের মধ্যে। আমি স্মিত
নির্বিক মুখে উপভোগ করছিলাম।
দেবনাথ হঠাৎ খেয়াল হল, রেশ-
মাসির ছেলে হাবুও একজন আসর
স্রোতা। সে পকেট থেকে চকচকে
বার করে দিয়ে বলল, “কি, স্কুলের
কেমিষ্টি বন্ধু, তাই খুব মজা না?
লেখা-পড়ার পাট চুকে গেছে তো।
যাও, অনেক কচি ছেলের গলার
আওরাজ পাচ্ছি, খেলো।”
রেশমাসি বললেন, “ছেলে-
মেয়েদের স্কুল বন্ধ হয়ে আমাদের
হয়েছে এক জালা। সারাদিন সারা
দুপুর হুজুলা করছে। পড়াশুনা
যতটুকু শিখিয়েছি ছুঁলে যাচ্ছে।
স্কুল কি খুলবে না?”
দেবনাথ বলল, “এ দেশে
যেমন কোন সুস্থ শাসন প্রশাসন
নেই, তেমন সুস্থ শিক্ষাব্যবস্থাও
নেই। স্কুল থাকলেও প্রকৃত শিক্ষাটা
হচ্ছে কি? গ্রেস নম্বরের সংখ্যা
ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। একবারের জার-
গার তিনবার কম্পাউন্টালের

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

সুযোগ। হামলা করলেই সেন্ট
আপ। তার ওপর অব্যাহত টুকলি
বিজনেস। অর্থাৎ স্কুল-কলেজী
শিক্ষার্থী আর শিক্ষা নেই, হয়েছে
ব্যবসা।”
রেশমাসির মনে ধরল কথা-
গুলো। মাথা নেড়ে বললেন,
“চৈতালীদিকে চেনো তো বীরেন?
চৈতালীদির দুই ছেলে এক মেয়ে।
সবাই বড় বড় স্কুলে পড়ছে।
বড় ছেলে সরকারী স্কুলে। বাকি
দুজন ইংলিশ মিডিয়াম। সে দুটির
স্কুলের মাইনেই এতো ষাতে আমার
সংসার চলে যায়। বড়টির স্কুলে
মাইনে কম; কিন্তু ওদের তিন-
জনের জন্যেই স্কুলের টিচার রাখতে
হয়েছে বাড়িতে। এক একটি ছেলে-
মেয়ের পেছনে পড়ার জন্যেই একশ
দেড়শ খরচ। স্কুলের টিচার না-
রাখলে নাকি ছেলে-মেয়ের পরী-
ক্ষার ফল খারাপ হয়। চৈতালী-
দিও বলছিলেন, স্কুলগুলো ব্যবসা
হয়েছে।”
দেবনাথ বলল, “তিন দেড়ে
সড়ে চার। বীরেন কত মাইনে

পায় রে? বরং একটা স্কুল করে
ফেল।”
আমি হাসলাম।
রেশমাসি ঠোঁট টিপে হেসে
বললেন, “বেচারী, ওই দুই ছেলে
তো আখ ডজন মেয়ের বরণ-মালা
ফেরৎ দিয়ে মেয়ের সোদা-গন্ধ
ঘরে পড়ে রয়েছে।”
আমার আর্থিক অকৌলীন্যের
ওপর এহেন সহানুভূতি খুব উপা-
দেয় বোধ হল না। বললাম, “ইচ্ছে
করলে, দড়াম করে আমিও একটা
বিয়ে করে ফেলতে পারি। কিন্তু
এই পরাধীন দেশে আর নকল
নাগরিকের সংখ্যা বাড়াতে চাই
না।”
“পরাধীন? সর্বনাশ। প্রসি-
কিউটেড হয়ে যাবি বীরেন।”
দেবনাথ সশব্দে সাবধান করে
আমাকে।
রেশমাসি মুখ টিপে হেসে
বললেন, “হেরে গেছ বলে বুকি
আবার ‘এ আত্মদী বড় হ্যাং’
শ্লোগান দেবে?”
মাথা নেড়ে আপত্তি করলাম,
“না। হারানো কালকে বলে, বুকি
না। জিতল তো একশ পাঁচ আর
একশ তেইশ আসনের দাবিদার
কংগ্রেস ও সি পি এম। কিন্তু
পশ্চিম বাংলার ভাগ্য নিরন্তর
বন্দুত কে? পাঁচ আসনের বাংলা
কংগ্রেস, সাত আসনের মুসলিম
লীগ এবং তের আসনের বিম্বনাথ-
বাবুদার।” সদুত্তর গলতল্যে হার হয়
একমাত্র সংখ্যাগুরু জনগণেরই।
হারের জন্যে দুঃখ করি না।”
“তো পরাধীন বলতে আবার
কেন নতুন থিসিস আনছ?”
দেবনাথ জিজ্ঞেস করল।
“পরাধীন ছাড়া কোন ব্যাপারে
স্বাধীনতা আছে? খাওয়া-পরা,
মজদুদার আড়ম্বারদের কুপা।
বাজার থেকে মাল উবে গেলেই
হল। শিক্ষাদীক্ষা, ইচ্ছে থাকলে,
উপায় থাকলেও, সুবিধেমত মনের
মতো জারগা পাবে না। কাজ কর্ম,
ক্ষমতা থাকলেও সুযোগ নেই।
কথা বলা কিম্বা কিছু লেখা,
গলতল্যের কল্যাণে ও দুটোই বন্ধ।
এমন কি চলাফেরার স্বাধীনতা, কস-
বাস করার স্বাধীনতা, কোনটাই
নেই। আমরা শ্রমিক শ্রমিক
কেন, কোন শ্রমিক নাগরিকই
নয়। মৌলিক অধিকার না থাকলে
নাগরিক কিসের?”
দেবনাথ গম্ভীর হয়ে সিগা-
রেট জ্বালাল।
রেশমাসি বললেন, “তোমাদের
তবু একটা স্বাধীনতা আছে।”
“কি?”
“ইচ্ছে হলে চুপ ছাটতে পার,
না হলে মেয়েদের মতো ঘাড়ের
ওপর বব করতে পার। যেমন খুশি
জ্বালানী রাখা যায়। কিন্তু মেয়ে-
দের, ইচ্ছেমত মাপের জামা পরার

স্বাধীনতাটাও ব্রেড দিয়ে শরীর
কেটে তোমরাই বন্ধ করে দিচ্ছ।”
দেবনাথ হেসে বলল, “বা,
রেশম বৌদি, তোমার উম্মতি হচ্ছে।
বীরেন্দ্রা রোজ এসে তোমাকে বেশ
বাকপটু করে তুলছে।”
রেশমাসি কেমন স্তানমুখে
বললেন, “তোমরা কখন আসো
তাই বেঁচে আছি। না হলে, উঃ
ভাবতেও পারি না।”
আমার মুখ দিয়ে নিজের
অজান্তে ফস করে বেরিয়ে এলো,
“এ পড়ায় রেশমাসির মেয়ে বন্ধ
খুব কম।” দেবনাথের চোখের দিকে
তাকিয়ে খেমে গেলাম, ভবসনা।
কথাগুলো শোভন হলনি।
আমাতটা রেশমাসিকে কাছ
করতে পারে নি কিন্তু। উনি
উদ্ভীষ্ট হয়েই জবাব দিলেন, “ঠিক
বলেছে। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে
হলে অনেক খরচ। ব্যাপারটা ব্যা-
সাধ্য।”
আমরা চমকিত হয়ে তাকা-
লাম। ভারি অশ্রুত আর নোতুন
কথা তো।
রেশমাসি বলছিলেন, “কিন্তু
অন্ত পয়সা তো আমার নেই ভাই।
তাই মেয়েদের থেকে দূরে থাকি।”
দেবনাথ বলল, “ব্যাপারটা ঠিক
বুঝলাম না।”
“বয়স্কারা শাড়ি গয়না সংসারের
সম্পদ আর কতটা আয় নিয়ে
জীক করেন। সেখানে আমি বল-
বার কথা পাই না। মেয়েরা শাড়ির
লেটেন্ট ডিজাইন, সিনেমা ফিল্ম স্টার
আর সিনেমা পরিচালক নিয়ে তুলে
তর্ক করে, আমি সেখানেও বোবা।
চাকুরে মেয়েরা ওরই মধ্যে অফিস
ইস্কুল, শহরের অবস্থা, পদুম

কলিগদের প্রসঙ্গ পাড়ে, কলেজের
মেয়েরা ছেলে বন্ধু। ছোকরা মাস্টার
মশায়দের বর্ণনা দেয়, আমি এ-
কারেই অপাঙ্কতের।” রেশমাসি
হাসলেন বটে, কিন্তু আমি ও দেব-
নাথ ক্রিস্ট চোখে পরস্পরের সঙ্গে
দৃষ্টি বিনিময় করলাম।
তাই তো। রেশমাসির সমস্যাটা
আমরা স্তবে দেখিনি। মৃত স্বামীর
স্মৃতিটুকু নিয়ে, সামান্য বাড়িভাড়া
আর দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাঙ্ক মূলধনের
সুদে কোনো ক্রমে হাবুকে মানদু
করে তুলেছেন। তিরিশ না পেরতেই
তেষটি রকমের আহাদ থেকে
বঞ্চিত। জীবিত মানদুয়ের মেলায়
অবহেলিত অতীতের মতো
প্রস্তরীভূত অবয়ব তিনি। আমি
তাইক কাপড়ের মতো আহত
করাই ঠাটা করার নির্বোধ উৎসাহে।
আমাদের চপ করে থাকতে দেখে
রেশমাসি পুনশ্চ একইভাবে হেসে
বললেন, “তোমরা আসো বলে কত
লোকে কত কথা বলে। অনেকে
বলে, আমার সংসারের অর্থিক
খরচও তোমরাই নাকি পঁচিয়ে
চালালে দাও। শহর তাই বাঁচো।
গ্রাম হলে হয়ত সবাই মিলে গাঁ-
ছাড় করে দিত।”
রেশমাসি একটাও মিথ্যে কথা
বলেনি। রাস্তায় নেমে আমি আর
দেবনাথ অনেকক্ষণ চপচাপ হয়ত
সেকথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ দেব-
নাথ বলল, “সত্যি বীরেন। আমরা
এখনো স্বাধীন হতে পারিনি। না
অবস্থা বিশেষ, না মানসিকভাবে।
রেশম বৌদিও একই পরাধীনতার
প্প। স্বাধীন মন থাকলে রেশ-
ম বৌদি আবার বিয়ে করতে
পারতেন।”

এল.আই.সি. আমার বাড়ি বার্নিয়ে দিয়েছে

বালক অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রিধারী।

আমি কলকাতা জাতিতে যে আসার ফিল্ড
একটি বাড়ি দেই।
একজন বুদ্ধিমানের এল.আই.সি.-র একটা
আমাকে বুদ্ধি দিয়েছে, কি ভাবে
এল.আই.সি.-র ভাষা থেকে আর্থিক স্বাধীনতা
পেয়ে আসার মত হার্ডওয়ার কাজের সোজা
‘মিক কুইক হ্যান্ড’ একইভাবে ফিল্ড
মাড়ি বানাতে শেখতেন।
এল.আই.সি. থেকে এই বাড়ি বনামের এক আর্থিক সুখে ফিল্ড টাকা কল পেয়েছি।
এই গ্রন্থে ভাষা বীমা-প্রতিরোধ বালিকার বনামের ফিল্ড মকুল বাড়ি বাগাবার জন্ম বা কেমবার জন্ম
১৭ কোটি টাকার ওপর কল অলিমেন্ট অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মবীণ একমাত্র এল.আই.সি.-র স্ট্রাটজি বিনিয়োগের
পরিচালক ২৬৬ কোটি টাকার ওপর।
কেবলমাত্র এল.আই.সি.-র মাথা অফিস বা মাথা-অফিস আছে, কল ফিল্ডের বোর্ড ৩৩৩ থেকে
এই গ্রন্থে কলকাতা চমু করা হয়েছে।
বিভাগীয় বিবরণের ওপর আপত্তি মিকুল
এল.আই.সি.-র অফিসে বোম্বাষণ ফল।



লাইক ইন্সিগুরেন্স
কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া



পুলিশ-মিলিটারী অপারেশনের নমুনা

(দর্পণের সংবাদভাষ্য)

রাইটার্স বিল্ডিং আবার বাঘা
কথা অফিসারেরা মধ্য উপদেষ্টা
বি বি ঘোষের সভাপতিত্বে বৈঠক
করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে হিংসা-
স্বক কার্যকলাপ রোধের জন্যে
এলাকা এলাকা ঘিরে পুলিশ ও
মিলিটারীর সাহায্যে খানাতল্লাসী
চালানো এখনো চলবে। উদ্দেশ্য
বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার এবং
হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালাবার
জন্যে যারা দারী তাদের শ্রেণ্ডার।
মিলিটারী অফিসারেরা পশ্চিম-
বঙ্গে এ ধরনের খানাতল্লাসী চালা-
বার কাজে যে অংশ গ্রহণ করছেন
তা প্রধানতঃ ঘেরাও এবং প্রহারের
মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
কোন এলাকায় সন্দেহভাজন
ব্যক্তিরা রয়েছে বা বে-আইনী অস্ত্র-
শস্ত্রের মজুত রাখা হয়েছে তা ঠিক
করার দায়িত্ব পুলিশ বিভাগের।
পুলিশ বিভাগের দায়িত্বশীল অফি-
সার তা মিলিটারী সগোত্রকে
জানান। সেইমত মিলিটারী সেনা-
দলকে এলাকা ঘিরে ফেলার কাজে

জাগায় এবং তখন পুলিশ বাহিনী
জালের মধ্যে ধরা পড়া মাছের মত
সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও বে-আইনী
অস্ত্রশস্ত্র ছেঁকে তোলেন।
কিন্তু আসলে বে-আইনী
অস্ত্রশস্ত্র উল্লেখযোগ্য কিছুই ধরা
পড়েনি এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা
অবাধে চলাফেরা করছে অথচ
শান্তিপ্রিয় সাধারণ নাগরিকদের
অথবা ইয়রাশির সীমা থাকছে না।
কোন কোন জায়গায় সাধারণ
নাগরিকদের দৈনন্দিন কার্যকর্ম
চালাতেও দেওয়া হয় না, এমন কি
পানখানা বা প্রস্তাব করতেও
যেতে দেওয়া হয় না।
খানাতল্লাসীর এলাকা ঠিক
করেন স্থানীয় পুলিশ প্রধান। এস
ডি ও দের কিংবা খানাতল্লাসীর
সরকারী দায়িত্ব প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট-
দেরও তা জানানো হয় না। অথচ
সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা তাদের অস্ত্র-
শস্ত্র মজুত সহ যে কি করে
মিলিটারীর শত জল এড়িয়ে চলে
যায় তা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য।
(সংবাদ ১৯ পৃষ্ঠায়)

'অতি বামপন্থী'দের সম্পর্কে মাও সে তুং

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী

অতি বামপন্থীদের সম্পর্কে চেরাম্যান মাও সে তুং নামীয় প্রবন্ধটি সম্পর্কে প্রিয়োত্তম সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য পড়লাম।

সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যগুলির মধ্যে (এক) প্রবন্ধটিতে "কেন্দ্রীয় কমিটিকে বারে বারে প্রতিবিলম্বীদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিতে হয়" (শ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ) এবং "তাকে (মাও সে তুং) বিপ্লবী অস্ত্র-রীপ ছাত্রদের স্বপক্ষে দাঁড়াতে হয়েছিল প্রাচীরপত্র দিয়ে, জনগণের প্রতিরোধকে উদ্দীপ্ত করে—মনে হয় সেদিন তিনি পার্টি বা সরকারী প্রশাসন বন্দ্য ব্যবহার করতে সামরিক ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন" এ দুটি বক্তব্য পরস্পরবিরোধী।

সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর উদ্ভূত আমার লেখা থেকে "অন্তরীণ" কথাটা তুলে দিয়েছেন। এটা সত্যতা নয়। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের লিউ শাও চির হৃদয়ে অন্তরীণ করা হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবিলম্বী দৃষ্টিভঙ্গি নীতি অবলম্বনের অভিযোগ আনা হয়েছিল কারণ তাঁরা পিকিং এবং তিরেনসিং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রমিত-কৃষক সন্তানদের পড়বার সুযোগ না দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির বড় বড় নেতাদের (প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক) পুত্রকন্যাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে বলে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় হরক্ষের পোষ্টার দিয়েছিলেন। ছাত্ররা পোষ্টার দেন ছেঁটুটি সালের মে মাসে। তারপরেই লিউ শাও চির প্রেরিত পার্টি ওয়ার্কটিম ছাত্রদের মধ্যে "আত্মসমালোচনার" ধারা তুলে তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভ্রম সৃষ্টি করে। ছাত্রদের অন্তরীণ করা হয়।

চেরাম্যান মাও সে তুং এর প্রতিবাদে নিজে বাহুতে জলী রেড-গার্ড কমিউনিস্ট ব্যান্ড পরে অন্তরীণ ছাত্রদের পেছনে দাঁড়ান। ছেঁটুটি সালের পাঁচই আগস্ট নিম্নলিখিত পোষ্টারটি দেন। আমরা পাঠকদের বিচরণের জন্য সমস্ত পোষ্টারটি ও তার বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নীচে দিলাম।

সদর দপ্তরে কামান দাখো
আমার বিরাট হরক্ষের পোষ্টার
এই আগস্ট ১৯৬৬ মাও সে তুং
চীনের প্রথম মার্কসবাদী-লেনিন-বাদী বিরাট হরক্ষের পোষ্টারটি (পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ছেঁটুটি সালের মে মাসে টাঙ্গানো পোষ্টার-লেখক) এবং তার ওপর "রেনমিন-জিপিও-তে" ভাব্যকারের প্রবন্ধটি চমকদের ভাবে লেখা হয়েছে? কমরেডগণ, আপনারা আবার তা পড়ুন। কিন্তু কমবৌ গত-পঞ্চাশ দিন ধরে স্থানীয় এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির স্তর পর্যন্ত কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মরত ঠিক বিপরীত আচরণ করে চলেছেন। বৃজোরাসের প্রতিবিলম্বী দৃষ্টিভঙ্গী

গ্রহণ করে তাঁরা প্রমিতপ্রণীর মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব, আন্দোলনের তরঙ্গগুলিকে আঘাত করে বৃজোরী একনায়ক চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা সমস্ত ঘটনাকে উলটে দিতে চাইছেন, সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা বলে ধাঁধার সৃষ্টি করছেন; বিপ্লবী কর্মীদের বৈরিতা করে দমন করছেন, তাঁদের মতামতের বিরোধীকে কোন মতামতকে কঠোর করে নীরব করে দিচ্ছেন, তাঁরা শ্বেতসন্ধ্যাস চালাচ্ছেন এবং এসব খুব বাহাদুরির কাজ মনে করে আত্মপ্রশংসা লাভ করছেন। তাঁরা বৃজোরাসের ঐশ্বর্যকে ফুলিয়ে দিচ্ছেন এবং প্রমিত প্রণীর সাহসিকতাকে চুপসে দিতে চাইছেন। কী ভয়ঙ্কর বিষয়! বাবাটি সালের 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির' সঙ্গে এবং চৌবাটি সালের বে তুল-প্রবণতা, 'আকৃতিতে অভিব্যক্তি, কিন্তু সারবস্তুর হিসাবে চরম দক্ষিণপন্থী' ছিল, তার সঙ্গে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে—আমাদের সবাইকে ব্যাপারটিকে অতি শীঘ্র গভীরভাবে অনুমান করে বুঝে নিতে হবে; এটাই কি সঠিক নয়?

মাও সে তুং
চেরাম্যানের পাঁচই আগস্ট ছেঁটুটি তারিখের উপরোক্ত বড় হরক্ষের পোষ্টারের উল্লিখিত বিষয় 'স্থানীয় এলাকা কেন্দ্রীয় কমিটির স্তর পর্যন্ত নেতৃস্থানীয়' ব্যক্তিদের সম্পর্কে সতর্কবাণী নয় কি? আমার প্রবন্ধে পার্টি ও সরকারী প্রশাসনবন্দ্য ব্যবহার করতে সামরিক ভাবে অক্ষমতার কথা সংগতভাবেই উঠেছে কারণ ছেঁটুটি সালের মে মাসে ছাত্রদের অন্তরীণ করা ও নিপীড়ন আরম্ভ করা হয়, মাও সে তুং পোষ্টার দেন ছেঁটুটি সালের পাঁচই আগস্ট। "গত পঞ্চাশ দিন ধরে" যা চলেছিল তা চেরাম্যান মাও সে তুং নিজেই প্রাচীর পত্রে উল্লেখ করেছেন। সাতখটি সালের বারোই জানুয়ারী পিপলস ডেইলী এবং রেডক্ল্যাগ পত্রিকার বৌ-সম্পাদকীয়তে বা লেখা হয়েছিল, তা থেকেই আমার প্রবন্ধটির প্রথম প্যারার উদ্ধৃতি। মিলিয়ে পড়লে কোন পাঠকেরই মনে হবে না আমার অস্বাভাবিক প্যারার বক্তব্য ও শ্বিতীয় প্যারার বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। অবশ্য মতামত কোন ব্যক্তির জ্ঞানচক্র উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা কারোরই নেই।

এটা ঠিক যে জনগণের প্রতিরোধ উদ্দীপ্ত করেই সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারী প্রশাসন সামাজিক সাংস্কৃতিক লক্ষ্যগুলি পূরণ করে থাকেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রী দেশে প্রশাসন বন্দ্যও কমিউনিস্ট পার্টির প্রমিত প্রণীর একনায়ক ও প্রণী সংগ্রামের হাতিয়ার।

সুতরাং অবশ্যই ভাবে "তেলে-পানার কাকশ্বাপ" ইত্যাদি বলে ব্যক্তির অবতারণা হয় না, মতামত-মতাই পরিচিতি দেওয়া হয়। তেলে-

পানার কাকশ্বাপ নকশাবাদী ইত্যাদি কৃষক অভ্যুত্থানের অমর স্বাক্ষর। তার মূল্যায়ন স্বতন্ত্র ভাবে করা প্রয়োজন। এখানে তার নিকশেষ আলোচনার পরিধি কম।

সেনগুপ্ত মহাশয়ের আরেকটি অভিযোগ যে উত্তর কোরিয়ার মহান নেতা কিম ইল সুন-কে "নয়া সংশোধনবাদী দালাল" বলে পিকিং রেডিও থেকে উল্লেখ করা হয়েছিল, বলে আমি বা কলোই তা "উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভিত্তিহীন" এবং পরে তিনি এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখার সাধ্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

উত্তর কোরিয়া এবং চীনের অতীত সম্পর্ক সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলাই যথেষ্ট হবে যে সাতখটি সালে সিন-হুয়া নিউজ এজেন্সীর প্রচারিত উত্তর কোরিয়ার 'অভ্যুত্থান' সম্পর্কে সংবাদটিকে সরকারী উত্তর কোরিয়া সেন্ট্রাল এজেন্সী 'অসহনীয় মিথ্যা কুৎসা' বলে অগ্রাহ্য করেছিলেন। সাতখটি সালের জানুয়ারী মাসে পিকিং-এ 'কেন্দ্রীয় বৃক্ষের প্রবীণ বোম্বার্ডের' স্বাক্ষরিত রেডগার্ড প্রাচীরপত্রে কিম ইল সুন-কে "পেট্টেমোটা সংশোধনবাদী দালাল", "ক্লেশের শিকার" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয় এবং "ভিত্তিহীনতার মূর্তি" 'সংগ্রামের বিরোধী' বলে তাঁকে আখ্যা দেওয়া হয়। সাতখটি সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্কয়ার চৌ এন লাই চীনা নিরাপত্তা সম্পর্কে ভাব্য দিতে গিয়ে "কেন্দ্রীয় সংশোধনবাদীদের উল্লেখ করেন। চীন উত্তর কোরিয়ার অন্তর্ভুক্ত চ্যাং-পাই পর্বতমালা ও উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ মাউন্ট পাই-তো চীনের কিরিন প্রদেশের এলাকা বলে দাবী করেন। আটখটি সালের ডিসেম্বর ও উনো-সত্তর সাতের মার্চ মাসে চীন ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে গুলি বিনিময় হয় এবং সীমানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পিকিং রেডিও থেকে উপরোক্ত ঘটনা ও উদ্ভূতগুলি ঐ সময়ে প্রচারিত হয়েছিল। এর উত্তরে, জাকার্তা, নিউইল্লী, অলিম্পিয়াস ও হাভানা থেকে উত্তর কোরিয়া দূতবাস সমূহের প্রচারিত বিবৃতি লক্ষ্য করলেই ঘটনার বথার্থতা সন্দেহে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সাতখটি সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত কমরেড-হিউয়ান জন কিউককে পিরাহগিয়াং ফিরিয়ে আনা হয়, ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আবার পিকিং যান এবং চীনের রাষ্ট্রদূত ঐ বছর 'মার্চ' মাসে পিরাহগিয়াং-এ আবার কার্ভার গ্রহণ করেন। উনো-সত্তর সালের এপ্রিল মাসে চীনের অনুরোধেই উত্তর কোরিয়া ও চীনের সম্পর্ক পুনরায় স্বাভাবিক করার জন্যে স্কয়ার চৌ এন লাই পিরাহগিয়াং যান।

উত্তর কোরিয়া-চীন সম্পর্কের অবনীত প্রত্যেকটি মার্কসবাদী-লেনিন-

বাদীর কাছে উদ্বেগজনক ও বর্তমান ক্রমশঃ প্রকৃত পক্ষে অত্যন্ত উনো-জনক।

জ্যোতির্ময়বাদের স্বরূপ করিয়ে দিতে চাই চীনই যে উদ্যোগী হয়ে এই সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে এগিয়ে এসেছিলেন এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এবং আপনাদের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কেও তারা গ্রহণ করতে পারেন, এমন আশা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং বর্তমান ঘটনাবলী অদূর ভবিষ্যতেই তা সম্ভব হতে পারে বলে ইংগিত দিচ্ছে। সুতরাং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নকশাবাদী বিপ্লবীদের স্বীকৃতি দেবেন, এটা তাঁদের বর্তমান নীরবতা এবং ভারতের নির্বাচন সম্পর্কে প্রচারের দ্বারা থেকে মনে হয় না।

এর সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে মার্কসবাদী-কমিউনিস্ট পার্টিবে আমন্ত্রণ আসবে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে না কি? এদেশের দ্রাস্ত সং বিপ্লবীরা মোহবশে প্রতিবিলম্বীদের সঙ্গে আজ বোল দিলেও, আগামীকাল তাদের আত্মসমালোচনা করে সঠিক পথ ঠেঙে নিতেই হবে। অন্যরা বাবে ইতিহাসের আঁতড়ুড়।

"প্রাক্তন ইন্দোনেশিয়া চালাবার প্রতিবিলম্বী কর্মে" আত্মনিয়োগ করা" সম্পর্কে জ্যোতির্ময়বাদের মন্তব্য করেছেন, এবং শেষের দিকে প্রকৃতপক্ষে বারোই দৈহিকভাবে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে চাইবে—সে পুলিশ হোক, মিলিটারী হোক, বা যেই হোক না কেন, তাকে 'এরা' চড়াপ্পত আঘাত করবেই এতো স্বাভাবিক বলে যে ফতোয়া দিয়েছেন তার উত্তরে তাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রীমতী পাদুল বন্দু, দীপ্তি তড়াচার কি ভাবে তথাকথিত বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনকে দৈহিক ভাবে দমন করতে চাইছিলেন তিনি বলবেন কি?

পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে তথাকথিত বিপ্লবীদের সম্পর্ক আজ আর গোপন আছে কি? যে কোন এলাকার তথাকথিত বিপ্লবীদের মধ্যে একদা কংগ্রেসী, পরে ফরওয়ার্ড ব্লক অথবা নামজাদা ওয়ানগন ব্রেকার, তার কাটার দলকে দেখা বাবে। পুলিশের দালাল, অফিসারদের বশবৎ লোকেরা বারা আজ নকশাবাদী পরিচিত অন্ততঃ পাড়ার সাধারণ মানুসেরা তাদের চেনেন। এখনও তাদের নির্বাচনে কংগ্রেস ও সংশোধনবাদীদের ক্যাম্প "নকশাবাদী ভাই" বলে তারা অকিম্বরশীর এবং তাদের পাহারাবার। এটাও প্রায়ঃ লক্ষণীয়। এরা আজ প্রকাশ্যে প্রতিবিলম্বী অনুচরবৃত্তিতে রত। তাই তারা সি পি এম কর্মীদের হত্যা করে প্রকৃত মনঃতৃপ্তি সাধন করছে। লুপ্তদের নেতৃত্বে শতম অভিব্যক্তির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার কমি-ক্যাপি স্কুল ছাত্র ও লুপ্তদের কমিউনিস্ট নিখনবজের সামাজ্য লক্ষ্য করে এবং তাদের যে ভাবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এবং নাসদুন সুহার্তো চক্র কাজে লাগিয়েছিল, এখানেও কমিউনিস্টদের হত্যা করার প্রতিবিলম্বী চক্র—ঠিক সেভাবেই দক্ষিণপন্থী প্রতিবিলম্বীর শক্তি

কংগ্রেস, জনসম্মত, স্বতন্ত্র, সংশোধনবাদী নেতৃত্ব এবং প্রতিবিলম্বী 'শতম' অভিব্যক্তির চক্র, এখানেও একই কাজ 'প্রাক্তন ভাবে' চালিয়ে যাচ্ছে নাকি? আর প্রাক্তন বলেই লাভ কি? আজ তো খোলাখুলিই তারা প্রতিবিলম্বী শক্তির জন্মদায়ক হিসাবালা।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির আত্ম সমালোচনার বলা হয়েছে সুদূর-পর নেতৃত্বে সরকারে অংশ গ্রহণ, নাসা কমেস নামে গ্রামাঞ্চলে প্রণী সংগ্রাম তুলে বাওয়া ভূমি সংস্কারের কাজে হাত না দেওয়া, পার্টির নেতৃত্ব অর্থাৎ প্রমিতপ্রণীর নেতৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে শ্বেতসন্ধ্যা জাতীয় বৃজোরী প্রণীর নেতা সুদূর আত্মসমালোচনার ওপর আত্মা স্থাপন করে চলা, এই সংশোধনবাদী তুলগুলির ফলেই পার্টি ক্যাডারদের গণহত্যা চালানো-প্রতিবিলম্বী সামরিক চক্রের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গোড়া থেকেই প্রমিতপ্রণীর নেতৃত্ব ও প্রণীসংগ্রাম সম্পর্কে দৃঢ় নীতি অবলম্বন করেছিল বলেই দু-দুবার বৃজুস্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে শাসকপ্রণী প্রমিত-কৃষক জনসাধারণের সংগ্রামের একটা হাতিয়ারকে কেড়ে নিতে পেরেছিল আর এই কাজে শাসক প্রণীকে সাহায্য করেছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দল এবং তথাকথিত নকশাবাদী প্রতিবিলম্বীরা। শাসকপ্রণী দুচারটে খুঁজে ভয় পায় না। তারা ভয় পায় লক্ষ লক্ষ কৃষকের অভ্যুত্থান, বিপ্লবী প্রমিতপ্রণীর নেতৃত্বে বিশাল-তম জনসমাবেশকে। গুপ্ত হত্যাকারী গোষ্ঠীগুলিকে শাসকপ্রণী লালন করে প্রতিবিলম্বীদের কাজে লাগায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দোষারমণ সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু সং মানুসকে হত্যা করে নিপীড়ন করে পুলিশ প্রতিবিলম্বীদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং জনসাধারণের এই বিভ্রান্তির আড়ালে নিজেদের প্রতিবিলম্বী সংগঠনকে কাজে লাগায়। সবদেলেই শাসকপ্রণী এ পথ নিয়ে থাকে। পুলিশ প্রায়ঃ কিছু কিছু সমাজবিরোধীদের প্রোত্ভার করে, নির্বাচন করে, আবার বিশেষ বিশেষ এলাকার তাদের অব্যবহাসামাজিক ক্রিয়াকলাপ চালাতে দিয়ে ওদের লুপ্তের বখরা নের। এর ফলে পুলিশের খুব দুর্নীতি উৎকোচের কাজ এবং শাসক প্রণীর স্বার্থে প্রতিবিলম্বী কাজ চালাবার সময় জনগণের চোখে হলো দিতে .(লেখক অজ্ঞান পুতুর)

Free I Free II Free III

ধবন বা শ্বেত

আমাদের বিখ্যাত "দ্যাস সাকা" ১৯২৫ সাল থেকে রোঙ্গীদের সম্পর্কে ভাবে রোঙ্গ সাহিত্যে আসছে। মায় তিন দিন ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়।

বিনামূল্যে এক শীঘ্র দেওয়া হয়।

WESTERN INDIA CO. (V. N.) P.
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

যাদবপুরে আশু মজুমদার হত্যার গটভূমি

নকশাল নেতা আশু মজুমদারকে চব্বিশ পরগণার ডি এস পি (সিউপি) সুবিমল দাশগুপ্ত যে নারকীয় পন্থায় সাহায্যে হত্যা করেছেন, তা আজ যাদবপুরবাসী জনসাধারণের প্রত্যেকেই জানতে পেরেছেন।

উক্ত পুলিশ অফিসার্সিট আশু মজুমদারেরই পাড়ার ছেলে। পুলিশে চাকুরীতে ঢুকেই সে একবার তার কংগ্রেসী আত্মীয় পাড়ারই কংগ্রেসী গুন্ডা তরুণ দাশগুপ্ত ও অশোক সেন প্রমুখের প্ররোচনায় ১৯৬৪ সালে আশু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করবার জন্য চেষ্টা করেছিল, স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত (এ নোংরা পুলিশ অফিসারের সম্পর্কে শব্দ) তখন গড়ফা সেন রোডে মসলমান বাড়ী-গুলোর ওপর কংগ্রেসী গুন্ডাদের আক্রমণে একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তখন আশু মজুমদার ও কান্টি গাঙ্গুলী (উভয়েই তখন সাম্যবাদী রাজনীতির সমর্থক) এই কংগ্রেসী গুন্ডা ও সমাজ বিরোধীদের আক্রমণকে প্রতিহত করে অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের বাড়ীতে মসলমান পরিবারগুলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটাই ছিল আশু মজুমদারের অপরাধ এবং এই অপরাধেই আশু মজুমদারকে এই সময়ে “দাঙ্গাপরাধী” নাম দিয়ে এই সুবিমল দাশগুপ্ত পি ডি এ্যাট-এ গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৬১ সাল এল। আশু মজুমদারের রাজনীতি পরি-

বর্তিত হয়েছে। সি পি আই থেকে সি পি এম এবং পরবর্তী কালে তিনি সি পি এম এল রাজনীতি করছিলেন। এককালীন কংগ্রেসী গুন্ডা তরুণ দাশগুপ্ত (সুবিমল দাশগুপ্তের শ্যালক) ও অশোক সেন সি পি এম রাজনীতি করতে আরম্ভ করলো এবং সদস্যপদ লাভ করলো। সুবিমল দাশ-

গুপ্তের আরেক আত্মীয় প্রব সেন এখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির হালতু লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং ইনি এককালীন কংগ্রেসী গুন্ডা অধিনা মার্কসবাদী রাজনীতির সমর্থক ও পার্টি সদস্য অশোক সেনের সহোদর দাদা। কান্টি গাঙ্গুলী সি পি এম নেতা হিসেবে এদেরও নেতা।

১৯৭০ সালের দশই মে তারিখে কান্টি গাঙ্গুলীর পরিচালনায় কামারপাড়ার (যাদবপুর রেল স্টেশনের লাগোয়া গ্রাম) বসিত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত অরাজনৈতিক ভাড়াটিয়া গুন্ডা শিবু এবং অধুনা সি পি এম প্রাক্তন কংগ্রেসী গুন্ডাদের সহযোগিতায় সন্তোষপুর অঞ্চলে আশু মজুমদারকে খুন করবার চেষ্টা হয়। সি পি এম নামধারী এই গুন্ডাপ্রকৃতির লোকগুলির আশু মজুমদারকে খুন করবার এটা ছিল মিতীয়া প্রচেষ্টা।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সব ছাত্র নকশাল নয়

প্রেসিডেন্সী কলেজের সব ছাত্র নকশাল নয়

প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন ছাত্র হিসাবে কয়েকটি কথা আমি বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে রাখতে চাই। প্রথমতঃ, গ্রামে, বাসে, টেনে এবং বিভিন্ন আলোচনার প্রায়ই শুনতে পাই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা সব নকশাল হয়ে গেছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই শুধু যে নকশালদের বিরোধী তাই নয়, অনেকের নাম শুনলেই ঘৃণার মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমাদের কলেজে ওদের সংখ্যা শতকরা পনেরো থেকে বিশ। কংগ্রেস-প্রভাবিত এবং কমিউনিস্ট বিরোধী ছাত্র সংখ্যা অল্পতঃ শতকরা বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ, শতকরা পনেরো থেকে বিশ জন সি পি এম প্রভাবিত বি পি এস এফের সমর্থক, সামান্য কিছু বি পি এস এক (ডান)-এর সমর্থক আর বাকী সবাইই দল নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এক বহু অংশই কোন রাজনীতির ধার ধারেন না। আমি এটা চম্ভিশ ঘণ্টার নোটেশ প্রমাণ করে দিতে পারি, শুধুমাত্র নকশালপন্থীরা যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে ওরা

চেষ্টা সফল হয় না, আশু মজুমদার গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে যাদবপুর শাখার মার্কসবাদী পার্টির কমরীরাও আশু মজুমদার হত্যার লিপ্ত হতে আরম্ভ করে।

কি কারণে? মার্কসবাদী পার্টির সাধারণ সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে এমন প্রচার চলতে থাকে

মতামত

যে আদর্শ নগর, শহীদ নগর, বিবেকনগর, গড়ফা সেন রোড, সন্তোষপুর (নিউ) কালিকাপুর-এ পুরো অঞ্চলে আশু মজুমদারের পরিচালনায় সি পি এম সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে নকশালীরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। এ অভিযোগ যে সর্বৈষ শিখ্যা, এবং সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা আসলে যে এই প্রাক্তন কংগ্রেসী গুন্ডা এবং সি পি এম নামাবলী পরিহিত কিছু দুর্চারিত লোক—এটা এই অঞ্চলের জনসাধারণ জানেন। জানেন বলেই এই অঞ্চলগুলোতে প্রচুর সি পি এম সদস্য নিরাপদে বসবাস করতেন অথচ সি পি এম মার্কী গুন্ডা গুন্ডাপ্রকৃতির ছেলেরা পালিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। গত দশই মার্চের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি উপলক্ষে সি পি এম কমরীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে নির্বাচনী প্রচার চালান। নকশাল সমর্থকদের তরফ থেকে একটিও প্রতিবাদ হয় নি। এমন কি আশু মজুমদারের বাড়ীতে গিয়েও তারা ভোটের কাগজপত্র দিয়ে আসে।

আসল ঘটনা হলো এই অঞ্চলে সি পি এম গুন্ডাবাজী করে এমন ধারণা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সি পি এম-এর যে অংশটি এই পার্টিরই গুন্ডাবাজীর বিরুদ্ধে এমনকি তাঁরাও একঘরে হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক দিক থেকে একঘরে হয়ে পার্টির নেতৃত্ব এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গিয়ে সন্তোষপুরের এক অংশে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। অপরদিকে নকশালপন্থী যুবকরা প্রধানতঃ তাদের পার্টির নির্দেশানুযায়ী গুন্ডাচর পদলিখে এলাকার দেখতে পেলেই প্রতিরোধমূলক হত্যার কার্যসূচী গ্রহণ করে এবং জনসাধারণের সাহায্যেই এ কাজগুলো করে।

গত এক বছর যাবত নকশালপন্থী নেতা আশু মজুমদার সি পি এম নকশাল সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে থাকেন, এবং তার দলের যে দু'একজন মুখ্যবিস্তারিত প্রবণতা-বশতঃ অন্য এলাকার সি পি এম কতৃক নকশাল হত্যার (যেমন গত ফেব্রুয়ারী মাসে নাকতলার) বদলা নিতে ইচ্ছুক ছিল, তাদের নিবৃত্ত করেন। ফলে এলাকার সি পি এম

কমরীদের প্রবেশের পথে বাধা ছিল না। কিন্তু আই বি কনস্টেবল ঢুকতে পারতো না, জনসাধারণই পুলিশ গুন্ডাচরকে ধরিয়ে দিতো।

এখানে জনসমক্ষে একটি ঘটনা রাখার প্রয়োজন আছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে সি পি এম নেতা কান্টি গাঙ্গুলী নকশাল নেতা আশু মজুমদারের নিকট লোক মারফত জানতে চান যে সি পি এম নির্বাচনী প্রচারে এলাকার যেতে পারে কিনা। শ্রীমজুমদার জবাব পাঠালেন—দুটো শর্তে সি পি এম নির্বাচনীপ্রচার করতে পারে—(ক) এলাকার নকশাল-বিরোধী কোন গোষ্ঠীর বা স্বেচ্ছায় লেখা চলে না; (খ) সন্ত্রাস-সৃষ্টিমূলক কোন কাজ অর্থাৎ বোমাবাজী, ভীতি প্রদর্শন বা নকশালপন্থী কোন সমর্থকদের গায়ে হাত দেওয়া ইত্যাদি চলবে না। কান্টি গাঙ্গুলী শর্ত দুটো মেনে নিয়ে তার দলের লোকদের প্রচারে প্ররোচিত।

বস্তুতঃ সি পি এম রাজনৈতিক ভাবে এলাকার নকশালদের মোকা-বেলা করতে অক্ষম হয়ে নির্বাচনী প্রচারের নাম করে নকশালদের বিরুদ্ধে গুন্ডাচরবৃত্তি করতে আরম্ভ করে—এ গুন্ডাচরবৃত্তির পুরস্কার হয়েছে পুলিশ কতৃক বিস্তীর্ণ এলাকার শত শত বাড়ীর মধ্যে নির্দিষ্ট একটি বাড়ীতে আশু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে ও হত্যা করে।

আশু মজুমদারকে হত্যা করার সংবাদে সমগ্র এলাকার নির্বাচনী যুগ্মগুলো ফাঁকা হয়ে যায়, পঁচিশতাবিক মহিলা যাদবপুর থানায় গিয়ে গুলিবিদ্ধ আশু মজুমদারকে অনতিবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে

যাবার দাবী জানাতে থাকে, মিলিটারী কতৃক বেষ্টিত অবস্থায় পদলিখ কনস্টেবলরা মহিলাদের সম্পর্কে কুৎসিত গালিগালাজ করে রাইফেল উঠিয়ে ভয় দেখায়।

আশু মজুমদারের দাদা ও বৌদি থানায় গিয়ে আশুর অবস্থা জানতে চাইলে থানার ও সি রিভলবার উঠিয়ে তাদের থানা থেকে বেরিয়ে যেতে বলে এবং না বেরিয়ে গেলে রিভলবার দিয়ে মাথা উড়িয়ে দেবে বলে ভয় দেখায়। তখন থানার অন্য একটি ঘরে সুবিমল দাশগুপ্তের পরিচালনায় গুলিবিদ্ধ আশু মজুমদারের কাছ থেকে এলাকার নকশালপন্থীদের নাম বের করবার জন্য নারকীয় অত্যাচার চালানো হয়। আশু মজুমদার আত্মসমর্পণ না করায় তাকে মৃগে ও পিঠে বেলনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। তার মর্দিত হয়ে যাবার পূর্বে মৃত্যু পর্যন্ত সে তার শেষ শক্তি দিয়ে পুলিশ কুকুরদের জানায় সে অপরাধের, সে আদর্শের জন্য প্রাণ দিচ্ছে, মৃত্যুকে ভয় করে না, সে চীৎকার করে ওঠে “নকশাল-বাড়ী লাল সেলাম”।

তখন ঠিক এই সময়েই কামারপাড়ায় সি পি এম নামাবলী দেওয়া কুৎসিত কয়েকটি লোকের উগ্রাস এবং সন্তোষপুরে নকশালপন্থী একটি ক্লাবে বোমা বর্ষণ করার ঘটনা ঘটতে থাকে। জনৈক রাজনৈতিক নেতা সুবিমল দাশগুপ্তকে ফোন করেন “বে এলাকার বোমাবাজী হচ্ছে, আপনারা আসুন।” দাশগুপ্ত জানান—আমরা আর পেরে উঠিনি, আপনারাই বাহক কিছু করুন।”

জনৈক তথ্যাক্ত

আত্মসমালোচনাকরুন

ব্যক্তিহত্যানীতির মূল প্রবন্ধ চারু মজুমদার অবলম্বে তার ভুল বুঝতে পেরেছেন। এজন্য বাংলা দেশের বিপ্লবী মাঝেই তাঁকে সাধুবাদ জানাবেন। এই জ্ঞানোদয় যদি তাঁর অন্তত ছয় মাস আগেও হত, সারা ভারতে কয়েকশত বীর বিপ্লবী মল্যবান জীবন অকারণে নষ্ট হত না।

অনেকে কমরেড চারুবাবুর উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছেন। এই মনোভাব কিন্তু ঠিক নয়। সমস্যাটা চারুবাবুর ব্যক্তিগত দৃষ্টি বিচ্যুতির ব্যাপার নয়। মতাদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই যে অপূর্ণতা, দুর্বলতা আর একদেশদর্শিতা রয়েছে চারু মজুমদারের ভুল চিন্তাধারার মধ্যে তারই প্রতিফলন হয়েছে। সুতরাং আমাদের সকলেরই আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন—আত্মসমালোচনার দায় কেবল চারুবাবুর উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। সি পি আই (এম এল) নেতৃত্ব এবং কমরীরা আত্মসমালোচনা করুন, এম সি সি নেতৃত্ব আত্মসমালোচনা করুন, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের অন্যান্য ছোটো ছোটো অংশের নেতৃত্বও আত্মসমালোচনা করুন।

এ বিষয়ে এম সি সি নেতৃত্বের দায়িত্ব সমাধিক। সি পি আই (এম এল) গঠিত হওয়ার পর যখন তাঁদের সংগঠন থেকে দল-ত্যাগের হিড়িক শুরু হল, তখন যদি তারা ভীতি-সন্ত্রাস বিহীন না হয়ে দৃঢ়চিত্তে মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু করতেন, পিকিং বেতারের দিকে কান পেতে না থেকে নিজেদের মাথাগুলিকে পরিপ্রসন্ন করতেন, তাহলে আজ এই শোচনীয় অবস্থা হত না।

কতকগুলি বিষয়ে আজ ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। যেমন, প্রমিক প্রেশীর নেতৃত্ব মানে কী? প্রমিক-প্রেশীর নেতৃত্ব কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? যে পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদে মৌখিকভাবে বিশ্বাস করে কিন্তু প্রমিকপ্রেশীর দৈনন্দিন সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকে, সেই পার্টি কি কমিউনিস্ট পার্টি বলে দাবি করতে পারে?

মিতীয়াতঃ, ভারতের গ্রামাঞ্চল কি সত্যসত্যই শাসকশ্রেণীর দুর্বল স্থান? নকশালবাদি, শ্রীকাকুলাম, গোপীবিষ্ণুপুত্র, মশাহারি ইত্যাদি স্থানের অভিজ্ঞতা কী? এই অভিজ্ঞতা কি গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও

করার রণকৌশলকে সঠিক বলে প্রমাণ করছে?

দুর্ভাগ্যের বিশেষ সংখ্যার মণি গৃহের প্রবলতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখক বলেছেন, ভারত-বর্ষে চীনের প্ল্যাটফর্মে ছোট ছোট গ্রামসমষ্টি নিয়ে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা সম্ভবও নয়, ভারতীয় বিশ্লেষণের বিকাশের জন্য তার প্রয়োজনও নেই। পূর্ববঙ্গে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে প্রার সাধা পূর্ববাংলা জুড়ে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে বাঙালী জাতির যে বিপুল গণ অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে তার থেকে মনে হয়, লেখকের সিদ্ধান্ত বুদ্ধিগাছ। এই গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে যদি বুর্জোয়া আওয়ামী লীগ নাথাকে একটি সাদা কমিউনিস্ট পার্টি থাকত, তাহলে এই অভ্যুত্থানই জনগণতান্ত্রিক বিশ্লেষণ

রূপান্তরিত হতে পারত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারত উপমহাদেশেই কোনো সাদা কমিউনিস্ট পার্টি নেই—কি ভারতে, কি পাকিস্তানে। পূর্ববঙ্গের গণ-অভ্যুত্থান আরও একটি কথা প্রমাণ করেছে। সেটি এই যে, পাল্লামেন্টারি সংগ্রাম এ ধরনে অচল হয়ে যায় নি। লেনিন-স্তালিনের যুগেও তার কার্যকারিতা ছিল, আজও আছে। পাল্লামেন্টারি সংগ্রামের মধ্য দিয়েও মেহনতী মানুষের বৈশ্বিক সমাবেশ ঘটানো যায়।

এইরকম আট-দশটি বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে, কেবল ব্যক্তিগত্যানীতি পরিচালনা করে এক পাও এগোনো যাবে না।

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

মুসলিম লীগ প্রসঙ্গে

সাম্প্রতিক নির্বাচনে শাসক শ্রেণী ও তার লেজুড়দের দলন-পাড়ন সত্ত্বেও একদিকে যেমন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংবদ্ধ বামপন্থী ফ্রন্ট (ইউ এল এফ) মোর্চার সংগঠিত মেহনতী মানুষের উল্লেখযোগ্য রায় (তা সে সংখ্যার দিক দিয়ে গরিষ্ঠ না হলেও) ঘোষিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আরেক অশুদ্ধ শক্তি মুসলিম লীগ জনসংঘের মত দল-গল্লোও কিছু কিছু আসন দখলে সক্ষম হয়েছে।

১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন গোটা প্রদেশের মানুষ কলে কারখানার খেতে খামারে দাঁধ বাইল বছর-কার কংগ্রেসী খুনী রাজের অবসান ঘটাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন ঠিক সেই সময়ে হিন্দু মহাসভা স্বতন্ত্র জনসংঘ ধরনের এক সাম্প্রদায়িক দলের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটল বাংলা দেশে। তৎকালীন নির্বাচনে কিছু প্রার্থী দাঁড় করানোর মাধ্যমেই জনসমক্ষে এলো এই দলটি। যুগ যুগ বিস্তৃত নির্বাচনী নিপীড়িত শহর আর গাঁয়ের মেহনতী জনগণ যে মুহূর্তে সচেতন এবং সংবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছেন তখনই তাদের সে সংহত শক্তিকে চূর্ণ করার মহান ষড়যন্ত্র (যা শাসক গোষ্ঠী তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন) কার্যকরী করতে এই উপদল সমূহের নান্দকরা আরেক অবৈধ সন্তানের জন্ম দিলেন।

কেবলমাত্র মুসলিম ভোটই নয় কিছু পরিমাণে হিন্দু ভোটও নিজদের দিকে আনার জন্য প্রথমটায় পি এম এল (প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ) নাম গ্রহণ করে এরা মাঠে নেমেছিলেন।

এবারকার নির্বাচনের পূর্বের দশটি মাস পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপতির বেনামে কংগ্রেসী শাসনের কালে সাধারণ মানুষের ওপর সর্বমুখী আক্রমণ এবং জনতার ঐতিহাসিক প্রতিরোধ শতধা বিভক্ত কংগ্রেস ছাড়াও এই সব উপদলগুলিরও

চোখের ধূম কেড়ে নেন। সে জন্য মরিয়া হয়ে শেষ অস্তিত্বটুকু বজায় রাখতে তারা “মুসলিম লীগ” নাম নিয়ে নির্বাচনে প্রার্থী দেন। শহর ও গ্রামাঞ্চল উভয় স্থানেই তাদের বেশ কিছু প্রার্থী ছিল। শহরাঞ্চলে নাগরিকরা তাদের খতম করবে জেনে সরাসরি তারা কংগ্রেসকে সমর্থন করেন। এবং এ সমর্থন কখনও পরোক্ষ কখনও প্রত্যক্ষ চালান হয়। আর গ্রামে যেখানে মুসলিম জনবসতি এবং এখনও যে সব এলাকার মানুষ মূলতঃ নিরক্ষরতার জন্যই প্রতিক্রিয়ার কূট কৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারেননি, হতে পারেন নি মূল দলমন্ডলের বিরুদ্ধে সংবদ্ধ সে সব এলাকাতেই তারা জয়ী হতে পেরেছেন।

কোন রাজনৈতিক প্রচার ব্যতিরেকেই এবং কেবলমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং আরো অধিক পরিমাণে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা ইত্যাদি করিয়ে দেবার ভাঙ-তার তারা অসচেতন গ্রাম্য জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার ঔষধ প্রকাশ করেছেন। এবং একারণেই একথা বলা বাহুল্য হবে যে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কিছু ব্যালটই তাদের কিছু আসন পাইয়ে দিয়েছে।

গা-গজের খেটে খাওয়া মানুষকে আজ স্মরণ রাখতে হবে—এইসব কার্যক্রম স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক অপজাত চক্রকে বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টার অর্থই হবে সার্বিক জনগণ বিশেষতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের ওপর আরো শোষণ খুন জখম ইত্যাকার অমানুষিক অত্যাচারের হাতিয়ারটি শ্রবণে শাসক নামীয় শোষণ শ্রেণী-গুলির হাতে তুলে দেবারই নামান্তর।

প্রতিটি সংগ্রাম সচেতন মানুষকে মূল গণশত্রু কংগ্রেসের সোদর-প্রতিম এই অশুদ্ধ শক্তিগুলিকেও চেনার সময় এসেছে। প্রতিটি এলাকায় আজ এই গোষ্ঠীগুলির কালো মৃত্যুশব্দ শুনে ধরার দায়িত্বও তাদেরকেই নিতে হবে।

জাত ধর্ম বর্ণের উর্ধ্বে সর্বশ্রমে মেহনতকারীকে আজ আরো জোরদার লড়াইয়ের জন্য এককাটা হতে হবে। কেবলমাত্র নিছক কিছু সাম্প্রদায়িক দাবী দাওয়া নয়, গরীবের রাজপ্রতিষ্ঠা করার জন্য গ্রামে নগরে মাঠে বন্দরে সূতীর লড়াইকে সংগঠিত করতে হবে। ছিনিয়ে আনতে হবে খেটে খাওয়া মানুষের আগামী ভবিষ্যৎকে।

সবশেষের সে লড়াই শোষিত বিপ্লবী মুসলিমদের এককাটা লড়াই—এতে তাদের ঐতিহাসিক জয় অবধারিত, আর এইসব জনবিরোধী সাম্প্রদায়িক উপদল সমূহের ধ্বংস অনিবার্য।

শেখ হাসিনার আলী
দেগঙ্গা
চবিশ পরগনা

সি পি আইয়ের ভাবধারা

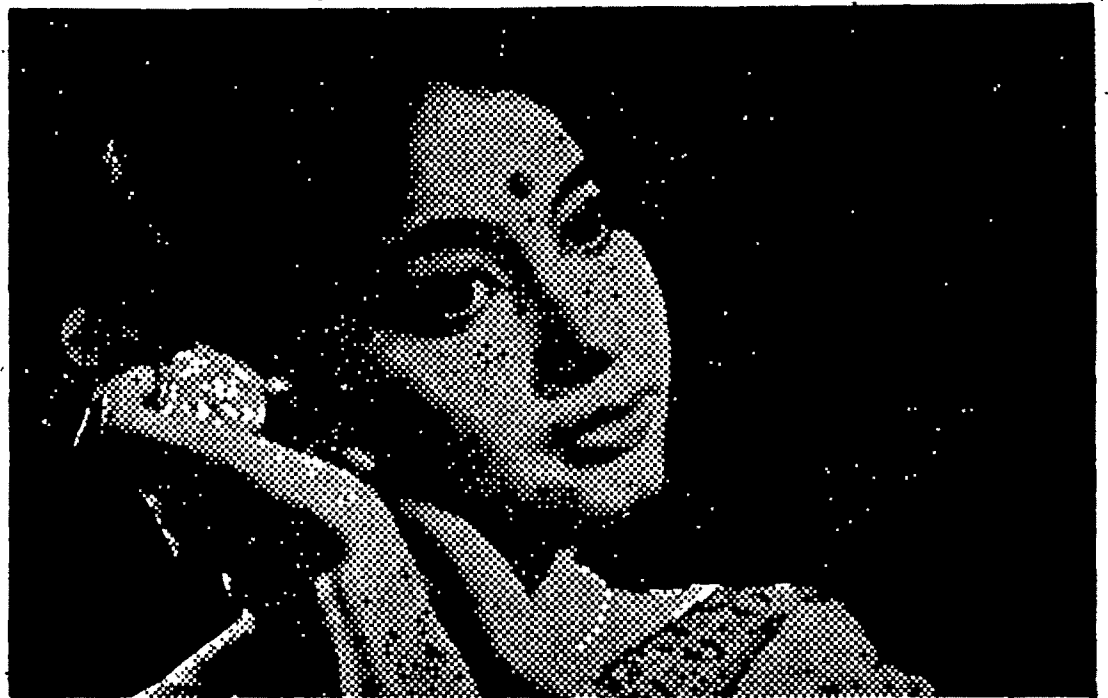
সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের ফলাফল তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য : (এক) জনগণ দরদী বামপন্থী দল হিসেবে সি পি এমের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ, (দুই) মৃতপ্রায় কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবিত কলেবর লাভ এবং (তিন) অন্যান্য উপদলীয় জোটের বিপন্ন অস্তিত্ব। এই তিন দিকটিই বিশেষতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির কারণে মনে হতে হবে প্রাক-নির্বাচনী রাজনীতিতে সি পি আই পরিচালিত আট পার্টি জোটের এবং বাংলা দেশের স্বনির্বাচিত সেবক (১) অজয়বাবু ও তাঁর লেজুড় গণতান্ত্রিক সংহতির ভূমিকার।

প্রাক নির্বাচনী সমঝোতা ও প্রচারণায় সি পি আই কেবলমাত্র প্ল্যাটফর্মে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে খোলাখুলি হাত মেলাতে গিয়ে বিফল হয়েছিল শুধুমাত্র এস ইউ সি ও কংগ্রেসার্ড ব্লকের অনমনীয় মনোভাবের ফলে। মূলতঃ এই দুটি দলের বিরোধিতায় সি পি আই নেতৃত্ব শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচনে নামতে পারেনি। কিন্তু যেহেতু আট পার্টি জোট এবং গণতান্ত্রিক সংহতি উভ-

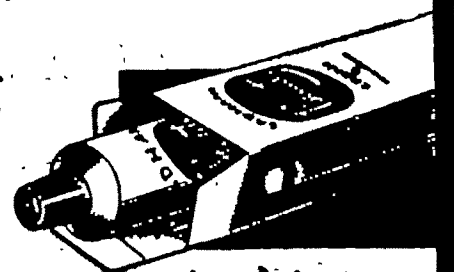
য়েরই ঘোষিত নীতি ছিল সি পি এম জোটকে বেন তেন প্রকারেই পরাস্ত করা সেহেতু তারা সি পি এমের বিরুদ্ধে সর্বতোমুখী অভিযান চালিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম বাংলার কেরালামার্কী সবিধাবাদের রাজনীতি কয়েম করা। কিন্তু পশ্চিম বাংলার জ্ঞাত জনসাধারণ এই সবিধাবাদের শিকার হন নি, বরং তার সমুচিত জবাব দিয়েছেন এই দুই জোটকে প্রামাণ্যলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়ে।

কেরলে সি পি এমকে উৎসাহিত করার যে প্ল্যাটফর্ম সি পি আই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাতে তারা মোটামুটি সফল হলেও শাসক কংগ্রেসের সমর্থন পুষ্ট মন্ত্রিসভার সাহায্যে বামপন্থী আন্দোলনকে কতটা এগিয়ে নিতে পেরেছেন তারা সে সম্বন্ধে ভেবেছেন কি? এটা অত্যন্ত সাধারণ কথা যে, যে বামপন্থী মন্ত্রিসভা অবামপন্থী সভ্যদের সমর্থনপুষ্ট সে মন্ত্রিসভা আসলে চোরাবালির ওপর প্রাসাদ গড়বার মূর্খমিতে মগ্ন। তাছাড়া সদ্য সমাপ্ত সাধারণ নির্বাচনেও (শেষাংশ চম পৃষ্ঠায়)

ফুনের মত স্নিগ্ধ কোমল আমার এই অপকৃপ লাবণ্য



দিনের পর দিন
সাধনা
বিটাট
ক্রীম
মোখেই হয়েছে



‘সাধনা বিটাট ক্রীম’ একটি অতি আধুনিক গুণগুণ

সাধনা ঔষধালয়
কলিকাতা-৩

অতি বামপন্থীদের সম্মুখ

(নবম পৃষ্ঠার পর)

সম্মুখ হয়। এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

মাও সেতু এর বক্তব্য বলে আমার প্রবন্ধে বা উল্লেখ করেছি তা সর্বদেলে সর্বকালেই প্রযোজ্য। কারণ বিপ্লবের সঙ্গ সঙ্গ প্রতিবিপ্লবের বীজ একসঙ্গে মিশেই থাকে। এটাই স্বাভাবিক কস্তুবাদী নিয়ম। কমিউনিস্টদের কাছে প্রাণ হলে, বিপ্লবের শক্তিকে প্রমিত্রের নেতৃত্বে কৃষক-শ্রমী ও অন্যান্য কর্মবাহী শোষিত শ্রমীর মোর্চার শক্তিকে প্রবল করা ব্যতীত গুপ্ত হত্যা, রাজনৈতিক খুন, জোর করে জনগণকে বিপ্লবের নামে প্রতি-বিপ্লবের শিকারে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্তকে কণ্ট্র করা যায়। আমাদের দেশেও এই অসোচ্চ নিয়ম ক্রিয়ালীল। জ্যোতির্ময় বাবুদের বিচার করতে হবে তাঁরা কেন পকে? যে প্রমিত্র-শ্রমী বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে, যে কৃষক-শ্রমী কৃষিবিপ্লব তথা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি, যে মেহনতী মানব শ্রেণি পর্বন্ত বুজোঁরা সংবিধান ও সংসদীয় গণতন্ত্রের মোহ চূর্ণ বিচূর্ণ করে বিপ্লবকে সফলতার পথে নিয়ে যাবে বলে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায়, ক্ষেত্রে খামারে কলে কারখানায় বাস্তব প্রতিরোধ গড়ে তুলছে

তাদের বাহা ব্রাহ্ম জঙ্গী কর্মীদের গুপ্ত হত্যা করা করে? বিপ্লবীরা না প্রতিবিপ্লবীরা? সুতরাং মাও সেতু তাঁর দেশে ওরাং মিং দের সম্পর্কে আগে বা বলেছিলেন এবং সাম্প্রতিককালে তাঁর বড় হরফের প্রাচীরপত্রে “১৯৬২ সালের দক্ষিণ-পশ্চিমী বিচ্যুতি এবং ১৯৬৪ সালের যে ভুল প্রবণতা আকৃতিতে অতিবাস, কিন্তু সারকস্তু হিসাবে চরম দক্ষিণ-পশ্চিমীদের” সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, অভিজ্ঞতার ফলে এদেশের মানব ও তথাকথিত নকশালী বিপ্লবী অর্থাৎ আকৃতিতে অতিবাস কিন্তু সারকস্তু হিসাবে চরম দক্ষিণ-পশ্চিমীদের চিনে নিতে সক্ষম হয়েছেন। জ্যোতির্ময়বাবু নাকি বিশ্বাস করেন সি পি এমের মধ্যে হাজার হাজার সং বিপ্লবী কর্মী রয়েছেন। অথচ সেই কর্মীদের হত্যা করেই নাকি তাদের বিপ্লব এসেছে। পাড়ার প্রতিটা সাধারণ মানব তাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতার মারফতেই এই নকশালী বিপ্লবীদের স্বরূপ বুঝতে পারছেন। তাদের প্রতিবোধও দানা বেধে উঠেছে। সং বিপ্লবীরা এখনও আত্মসমালোচনা করে কমিউনিস্ট নিষ-নের প্রজ্ঞা বড়বড় থেকে সরে আসছেন

এটাই বাহানীরা।

জ্যোতির্ময়বাবু বলেছেন যে বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বুজোঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রের ভেটে অংশগ্রহণ সংশোধনবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতি ষাঁটি সত্য কথা। বিপ্লবী পরিস্থিতি বিচারের নিরিখ সম্পর্কে স্তালিনের লেখা লেনিনবাদের ভিত্তি বইটীর দিকে জ্যোতির্ময়বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। লেনিন বলেছিলেন এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে বিপ্লবের সাক্ষ্যের জন্যে অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় অবস্থাদুটি এই : প্রথমতঃ অধিকাংশ প্রমিত্রকে (অন্ততঃ পক্ষে অধিকাংশ শ্রমী সচেতন, চিন্তাশীল, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় প্রমিত্রকে) সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে এবং এজন্য তাদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকতে হবে; দ্বিতীয়তঃ শাসকশ্রেণীর সরকার সংক্রান্ত সংকটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ফলে জনসাধারণের সবচেয়ে পশ্চাদপদ অংশও রাজনীতি সম্পর্ক সচেতন হয়ে উঠেছে...গবর্ণমেন্ট দুর্বল হয়ে বাচ্ছে এবং তার ফলে এই গবর্ণমেন্টকে উচ্ছেদ করা বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছে” (নির্বাচিত রচনাবলী দশম খণ্ড পৃঃ ১২৭, স্তালিন লেনিন বাদের ভিত্তি পুস্তকের ছোট্টাংশ পৃষ্ঠায় এই উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন)। একাজ এদেশে করা করছেন, কারাই

বা তার বিরুদ্ধে?

শ্রমী সচেতন প্রমিত্রশ্রেণীকে বিপ্লবী সংগঠনে জন্মায়ত করে, কৃষক শ্রমীকে সমাবেশ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে সফল বিপ্লব সংগঠনের কাজে প্রুত এসেছেন দেশে শাসকশ্রেণীর পার্টির সর্বোচ্চ নেত্রী থেকে তাঁর প্রতিবিপ্লবী অনুচরেরা, পুলিশ মিলিটারী প্রতিবিপ্লবকে সংগঠিত করেছে। জ্যোতির্ময়বাবুদের বিপ্লবীরা কোন প্রমিত্র সংগঠন, কোন কৃষক সংগঠনকে এভাবে জঙ্গী শিক্ষা দিয়ে সংগঠিত করছেন? আমরা তো দেখি তারা প্রমিত্র-কৃষক সংগঠন পরি-ত্যাগ করে চে গুরুভারার “ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া” বিপ্লবের নীতি গ্রহণ করেছেন। মাও সেতুকে তারা চে গুরুভারার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইছেন। মুখে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব; কাজে খতম অভিবাস, তাও কৃষক প্রমিত্র ছাত্র শিক্ষক-ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের বিরুদ্ধে—এই তো তাদের বিপ্লব। মাও সে তুংএর বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করতে হয়; “কী ভরকের বিবাত”। প্রতিবিপ্লবীরা বিপ্লবের নামে শাসকশ্রেণীর হাতিয়ার হয়ে প্রকৃত বিপ্লবী কর্মীদের হত্যা করছে।

জ্যোতির্ময়বাবু শাসকশ্রেণীর প্রবলতম শত্রুকে চিনতে পারেন নি। বাংলার শত শত কৃষক শহীদ, দুর্গা-পুত্রের বীর প্রমিত্রশ্রেণীর বিরুদ্ধে করা দাঁড়িয়েছিল? অর্থনীতিবাদ ছেড়ে দিয়ে দুর্গাপুত্রের প্রমিত্র যখন রাজনৈতিক দাবী নিয়ে ধর্মঘট করল তখন তাদের ওপর কারা আক্রমণ চালিয়েছিল, কারা শাসকশ্রেণীর পক্ষে দাঁড়িয়ে বীর প্রমিত্রশ্রেণীর প্রতিরোধকে ভেঙ্গে চুরমার করার জন্যে সংশোধনবাদী ও অতিবাস প্রতিবিপ্লবীদের কাজে লাগিয়েছিল? শাসকশ্রেণী পশ্চিমবঙ্গে যে সত্তর হাজার জঙ্গী কৃষক কর্মীর নামে প্রোপাগান্ডা পরিচালনা জারী করেছে তাঁরা জনগণের মধ্যে মিশে রয়েছেন, জলের মধ্যে মাছের মত। আর তথাকথিত বিপ্লবীরা তাদের হত্যা করে তাদের সেবা করছে।

১৯৬০ সালের চৌদ্দই জুন “আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আলোচ-লনের সাধারণ লাইন” সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, চীনের মহান নেতা মাও সে তুংএর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রদত্ত এই দ্বিসি নিশ্চয়ই সর্বদেশের প্রকৃত কমিউনিস্টদের মতাদর্শগত শ্রেষ্ঠ দলিল। আমি ঐ দলিল থেকে চর্চা নং ধারা উদ্ধৃত করে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে কোন বহু পার্টির ব্যাটন উত্থানে দেশে এদিক সৈদিক বারা ছোট্টাছুটি করে তারা কমিউনিস্ট এই পবিত্র নামেরই যোগ্য নয়। আর মাও সে তুংএর অমর রচনাবলী থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে আমি মরগীর ডিম ভেঙ্গে বাচ্চা বের করার শোকা-মিকে পরিহার করার জন্যে বিপ্লবী-দের অনুপ্রাণিত করেছি। জ্যোতির্ময়-বাবু এতে চটলে আমার কিছুই করার নেই। যত্ন করেই যেমন যত্ন শিখতে হয়, তেমনি মার্কসবাদ-লেনিন-বাদহীন শিক্ষা বুজোঁরা ভাববাদ ছাড়স আর কিছুই যে নয়, একথাও মনে রাখতে হবে। সৌধীন বাবু মজুর

আর লুপ্পেন, ভিক্টর, ছমছাড়া খুনে গুপ্তা বুজোঁরা শ্রমী শাসনেই জন্মগ্রহণ করে। এপোলস থেকে মাও সেতু পর্বন্ত, এদের বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করা সম্পর্কে বারবার সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছেন। বারা মনে করেন সৌধীন বাবু মজুরেরা বুজোঁরা সংসদীয় কঠোরতার মধ্যে অথবা লুপ্পেন হতাশা বুজোঁরাবাদের মিলিত সমিগ্রণে “খতম অভিবাস” চালিয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করবে; তারা “দক্ষিণপশ্চিমী স্বেচ্ছাবাদ সংশোধন-বাদ এবং “আকৃতিতে অতিবাস, কিন্তু সারকস্তু হিসেবে চরম দক্ষিণপশ্চিমী” প্রতিবিপ্লবী। মূলতঃ এক্স মার্কস-বাদ-লেনিনবাদের ঘোর শত্রু, এরা উদ্ভ-রেই লাল বাচ্চা হাত নিয়ে চালাকি করে লালবাস্তার বিরোধিতা করে। এরা সাদাকে কালো আর কালোকে সাদা বলে দেখাবার বাহাদুরি দেখায়। এদেশেও সংশোধনবাদী ও অতিবাস-পশ্চিমীদের একই উদ্দেশ্যে গলাগালি করে চলেতে দেখা যাচ্ছে এবং ঐতি-হাসিক নিয়মেই জনসাধারণ তাদের চিনে ফেলেছেন। এই দুই প্রান্তের প্রতিবিপ্লবীদের সম্পর্কে চেরম্যান মাও সেতু-এর সতর্কবাণী নিশ্চয়ই প্রযোজ্য, “কি তরফের বিবাত”।

মতামত

(নবম পৃষ্ঠার পর)

পরিস্থিতিতে কেমনে তথা সারা ভারতে সি পি আই শাসক কংগ্রেস আঁতাতের মূল্যমান মাত্রাতিরিক্ত হ্রাস পেয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে সি পি আইয়ের সমর্থন শাসক কংগ্রেসের একান্ত প্রয়োজন ছিল, অনেকটা কুরোর পড়া শেরাণের যেমন প্রয়োজন ছিল একটি ছাগমস্তক। নির্বাচনের পরে এই মূহুর্তে পশ্চিমবাংলা ছাড়া শাসক কংগ্রেসের আর কোথাও সি পি আইয়ের সহ-যোগিতার প্রয়োজন নেই, এমনকি কেরালাতেও নয়। অদূর ভবি-ষ্যতে যদি শাসক কংগ্রেস অচ্যুত মেনন মন্টিসভা থেকে তাদের সম-র্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে দেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করে কিংবা নোতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কেননা, ওই নির্বাচনের ফলাফল বর্তমানের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরি-প্রেক্ষিতে শাসক কংগ্রেসের অনু-কূলে যাবার সম্ভাবনাই প্রবল।

সুতরাং সি পি আই নেতৃবৃ-কি বাংলা দেশেও শাসক কংগ্রেসের পায়ের তলে মাথা বাড়িয়ে দেবেন এবং বাংলা দেশের অগণিত শোষিত আগ্রত জনতার আশা আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করে দক্ষিণ-পশ্চিমী শোষণ কায়ম করবেন এবং নিজেদের বামপশ্চিমী চরিত্রকে আর একবার কলঙ্কিত করবেন? অবশ্য যদি সি পি এম বিরোধিতাই তাঁদের একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য হয় তবে তাঁরা তাইই করবেন। সেক্ষেত্রে বাংলা তথা সারা ভারতে তাঁরা নিজেদের অকাল অবলুপ্তি ভেঙে আনবেন।

প্রদীপেন্দ্র মৈত্র
বহরমপুর

তার
হাসি
কী মধুর



এর পেছনে রয়েছে-তার
বহুদিনের সাধনা—
সাধনা দর্শন দিয়ে প্রতিদিন
জীবনের পরিচর্যা।

সাধনা
দর্শন

একটি আদর্শ জীবনের মাত্র

জীবন সূতার মত ককককে ও
হৃদয়, সবল, স্পন্দন করে।
দুঃখ কষ্ট ও দুর্ভাগ্য মুক্ত হয়



সাধনা ঔষধালয়-চাকা
কলিকাতা-৪৮

কৃষক চাঃ বোমেন চন্দ্র বোম, এম.এ.
বাহুবল-সাহী, এক.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাস্করপুর কলেজের
ইলাশ শাস্ত্রীর কৃতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডঃ নরেন চন্দ্র বোম, এম.এ.বি.এস. (কোল)
স্বাক্ষরকার

ন্যাশনাল রবার কোম্পানী বন্ধ কেন কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বেলেঘাটার ন্যাশনাল রবার কোম্পানীটি গত পঁচাত্তর বছর ধরে দেশের বড়দিন যাবৎ প্রমিক-দের দাবী উপেক্ষা করার পরিণামেই কারখানাটি আজ অচল। মালিক-গোষ্ঠী পুঞ্জিপতিদের পরিচালিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রমিকদের দাবীকে যদিও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তবুও নিষ্প্রভ একথা বলা যায় এই কোম্পানীর প্রায়-তিন হাজার কর্মীর মধ্যে মালিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ তমশই সোচ্চার হয়ে উঠছে। ন্যাশনাল রবারের এই কারখানাটি খিদির-পুরের বাফুলিয়া হাউসের মুখা-জীর প্রায় সাত লক্ষ টাকার খরচ করে। বর্তমানে এই কারখানার মোটরগাড়ী ও লরীর দামই প্রায় নয় লক্ষ টাকার উপর। সাত লক্ষ টাকার কেনা প্ল্যান্ট ও মেশিনারীর মূল্য আজ প্রায় দেড় কোটি টাকার

মত। এবং এই কারখানা থেকেই ১৯৬৮ সালে রিজার্ভ ফান্ড থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা শেয়ার হোল্ডারদের বোনাস শেয়ার হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রমিক কর্ম-চারীদের বাৎসরিক বোনাস দেওয়ার সময় মালিকপক্ষ অর্ধাভাবের অজ-হাত দেখাচ্ছেন।

জানা যায়, এই কারখানাটির আর্থিক সংগতির উপর ভিত্তি করেই কলিকাতায় ইনচেক টায়ার ফ্যাক্টরী ও কল্যাণীতে অন্য একটি কারখানার সৃষ্টি। প্রথমদিকে, সংস্থাটির বাৎসরিক উৎপাদনজাত দ্রব্যাদির মূল্য ছিল প্রায় দশ লাখ টাকা, এখন এর পরিমাণ সব মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা। প্রমিকগণের মতে, সংস্থাটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হলেও মালিকগোষ্ঠী আর্থিক সমস্যাটির দোহাই দিয়ে প্রমিকগণের মজুরী বৃদ্ধির দাবী এবং ১৯৯১ সনের

ন্যায্য বোনাসের বিষয়টি মানতে চাইছেন না।

জানা যায়, উনসত্তর ও সত্তর সালে সংস্থাটিতে কম লাভ হওয়া সত্ত্বেও এর পরিমাণ দাঁড়ায়, বথাক্রমে সাড়ে সাত লাখ ও দু'লাখ টাকা। মালিকগোষ্ঠী যদিও প্রমিকগোষ্ঠীর আর্থিক দাবী মেনে নেননি বা মোটোবার আগ্রহ দেখাচ্ছেন না কিন্তু সত্তর সালের মে মাস থেকে কার-খানার অফিস কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তারা তাদের মজুরীবৃদ্ধির দাবীটি মেনে নিয়েছেন।

এছাড়া, মালিকগোষ্ঠী বহু বিমানসুলভ আচরণের কন্ট্রল বোর্ড সাধারণ প্রমিকমহলের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। কোম্পানীর অন্য একটি সংস্থা ইনচেক টায়ার, উন-সত্তর সালে উনিশ লাখ টাকা লোকসান হওয়া সত্ত্বেও আঠারো লাখ টাকা অতিরিক্ত খরচ করে দেশজাত গ্রেড রিভিশন করা হয় অথচ ন্যাশনাল রবার কারখানাটি লাভজনক সংস্থা রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও আজও পর্যন্ত এখানে ঋণ-পের কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এছাড়া, ইনচেক টায়ারে প্রমিকগণ যে নাইট এ্যালাউন্স, ও এ্যাটেন-ডেন্স বোনাস পাচ্ছেন এই ফ্যাক্ট-রীর কর্মীদেরকে সে সুবিধা দেওয়া হচ্ছেনা। একই মালিকের একই ধরনের দুটি কারখানাতে দরকমের নীতি অনুসৃত হওয়ার অভিযোগ, সংস্থার জনৈক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) দায়িত্বশীল মালিক-

পক্ষীয় কর্মচারী যদিও এড়িয়ে কেতে চান তবুও তার কথাবার্তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সুযোগ সন্ধানী মালিকগোষ্ঠী কর্মীদের দাবীদায়কে দাবিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে প্রমিক অনৈক্যকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছেন। এবং কারখানার প্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য রেখে সে ব্যবস্থা আগে থেকেই পাকা করে রেখেছেন। যতই দিন যাবে মালিকগোষ্ঠীর এই সুযোগ সন্ধানী মনোভাব আরও তীব্র হয়ে উঠবে।

এর পরিণাম সরকারী দপ্তরে গিয়েও পৌঁছাবে। সংস্থাটি বন্ধ হবার একচল্লিশ দিনের মাথায় প্রম দপ্তর দয়া করে আলসেমি ভেগেছে। প্রমিক অনৈক্য জোরদার হলে প্রমদপ্তরের অপদার্থতা জঘন্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই দিকে

লক্ষ্য রেখে, কারখানার ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, সংগ্রাম কমিটি, এমসল-মিক্স ইউনিয়ন যুক্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে, গ্রেড রিভিশন, বিশ পারসেন্ট পুজা বোনাস, গ্র্যাচুয়িটি নাইট এ্যালাউন্স, এ্যাটেন্ডেন্স বোনাস, বর্ধিত মূল্যে ন্যায্য ভাতা ও অন্যান্য দাবীকে জোরদার করে তুলবেন, সাধারণ প্রমিক মহল এই আশাই তাদের নেতৃবৃন্দের কাছে করছেন। এর সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন সাধারণ প্রমিক মহলের মধ্যে দানা বেধে উঠছে যে, আইনগত নানা অজুহাতে প্রমদপ্তর আর কতদিন, তিন হাজার মানুষের সংগে জড়িত প্রায় পনেরো হাজার মানুষের ভাগা নিজে ছিনমিনি খেলবেন এবং দরিদ্র প্রমিকগোষ্ঠীর আর্থিক সমস-টের সুযোগ নিয়ে মালিকগোষ্ঠীকে সাহায্য করবেন।

কমিশ্যনাল ট্যাক্স ইন্সপেক্টরদের প্রতি অবিচার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-দপ্তর এবার কমিশ্যনাল ট্যাক্স ইন্সপেক্টরদের পে-স্কেল নির্ধারণে ভানুমতীর খেল দেখিয়েছে। প্রস্তাভে ছিলেন অর্থ কমিশনার জে, এল, কুন্ডু ও ডেপুটি সেক্রেটারী এস, কে দাশগুপ্ত। পে-কমিশ-শন যখন এই দপ্তরের কাছে বিভিন্ন ক্যাডারের বেতনের ক্ষেত্রে সরকারী সুপারিশ চান, তখন এরা কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই ইন্সপেক-টরদের আইনগত ক্ষমতা, দায়িত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে সত্য গোপন করে অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সংকীর্ণ সুপারিশের ব্যবস্থা করেন। কেবলমাত্র কমিশ্যনাল ট্যাক্স অফি-সারদের সাহায্যকারী এবং ত্রুটিব-য়ের তথ্য অনুসন্ধানকারী হিসাবে ইন্সপেক্টরদের চিত্রিত করা হয় তার প্রমাণ পে-কমিশনের রিপো-টেই আছে।

কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ হবার পর বেতন নির্ধারণে ইন্স-পেক্টরদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে সেই অভিযোগ করে এবং অন্যান্য সমতুল্য ক্যাডারের ক্ষেত্রে যে পক্ষপাতদৃষ্ট, মনোভাব দেখানো হয়েছে, তা দেখিয়ে কমিশ্যনাল ট্যাক্স ইন্সপেক্টরস এ্যাসোসিয়েশন একটি দল পুস্তার স্মারকলিপি মধ্য উপদেষ্টা বি, কি, ঘোষের নিকট সত্তর সালের তেরোই মে তারিখে পেশ করেন। সত্তর সালের চন্দ্রশেখর নভেম্বর তারিখে অর্থ-দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারী এ্যাসো-সিয়েশনের একটি ডেপুটি সেক্রেটারীকে সুবিচারের আশ্বাস দেন। যেখানে এ্যাসোসিয়েশন ন্যায্যতা দাবী করেন বেতন ৪৫০-৬২৫, সেক্রেট্রে কমিশন সুপারিশ করেন ৩৫০-৬০০। এবং অর্থদপ্তর সুবিচার করে বেতন নির্ধারণ করেন ৩৩০-৬০০। এই হল সুবিচারের নমুনা।

গত উনিশশে জানুয়ারি একা-স্তর তারিখে অর্থ কমিশনার সাক্ষাৎ-কারী ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল, ভবিষ্যতে এই ইন্সপেক্টরদের বেত-নের প্রশ্নে পুনর্বিবেচনা করা হবে। যদিও আগে দপ্তর ইন্সপেক্টরদের বেতনের প্রশ্নে সংকীর্ণ সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁদের বেতন বৃদ্ধির দাবীর বৌদ্ধিকতা অন্যান্য সমতুল্য ক্যাডার বাদে স্বীকার করে নিয়ে ফলস্বরূপ অধিক বেতন সুপারিশ হয়েছিল, তাঁদের বেতন নামিয়ে এনে এ একই স্কেলে রাখার ব্যক্তি প্রতি-ষ্ঠিত হয়েছে। অথচ এই ইন্সপেক-টরদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, এক্সাইজ ইন্সপেক্টর ও কমিশ্যনাল ট্যাক্স অফিসারদের (সকলেই গেজে-টেড) সমান হওয়া সত্ত্বেও এদের বেতন বৃদ্ধি করা হয় না। একের নাক কেটে অন্যের ঘাঘাঙা করা হল আর কি।

কলকাতায় ৪০ শতাংশ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অষ্টবামের পক্ষে সি পি এমের বিপক্ষে ভোট দেবার জন্যে জন-গণের কাছে প্রচেষ্টা আবেদন। এ আবেদনে তিনি কংগ্রেসের ভোটার-দের আশ্বস্ত করলেন। পুর্লিশ, মিলিটারী তাদের রক্ষা করবে। টুটুটসমান পরিচালক চিঠিপত্রের স্তম্ভে পাঠকদের ওপর রাজ্যপালের বেতার বক্তৃতা কি দারুণভাবে কংগ্রে-সের পক্ষে কার্যকরী হয়েছিল, তার অনেকগুলি উল্লেখ দৃষ্টান্ত লিপি-বন্ধ রয়ে গেছে।

কোনো সভ্য দেশে সাধারণ নির্বাচনের সময় এরকম পক্ষপাত-মূলক আচরণ সম্ভব কিনা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু বাংলা দেশে তা সম্ভব হয়েছে। চীফ ইলেক-টোরেল অফিসার নিজেও এই বৌক সামলাতে চান নি বা পারেন নি।

সঙ্গীণ, রাইফেল উচানো মিলিটারী, এলাকা এলাকা ঘিরে আতঙ্ক সৃষ্টি কংগ্রেসী, ফরওয়ার্ড ব্লক, নকশাল, সি পি আই সব এক জোট হয়ে সি পি এম-এর নির্বাচনী কর্মী হত্যা, অবাধ সন্ত্রাস চালানো অথচ পুর্লিশ চোখ বন্ধ করে এদের সাহায্য করে চলেছে এবং সি পি এম কর্মীদের নির্বাচনে প্রেরণার ও আটক করেছে।

নির্বাচনের দুদিন আগে থেকে নকশালী খুনেদের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছিল ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করতে। কিন্তু রহস্যজনক ভাবে দেখা গেল কংগ্রেসের সুপরি-চিত নেতা ও প্রাণীদের সপক্ষে তারা স্কুটিনী করছে, প্রচার করছে

এবং নির্বাচনের দিন তাদের প্রহরা দিয়েছে। নরই মার্চ রাতে এলাকার এলাকার সারারাত ধরে বোমাবাজী করে ভোটারদের সম্ভ্রান্ত করা হয়েছে।

এই ভাবে সরকারী প্রশাসন, পুর্লিশ, নয়া কংগ্রেসী অন্তঃবাহ, সমাজবিরোধী খুনে গুন্ডা এবং নকশালপন্থী সবাই একজোট হয়ে সি পি এমের ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করেছে, আতঙ্ক ছাড়িয়ে, ভয় দেখিয়ে তাদের ভোট দেবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথা বলতেও বাধ্য যে এরকম মহাজোটের হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হবার মত জঙ্গী সংগঠন সি পি এম নেতারা আগে থেকেই কেন গড়ে তোলেন নি তা বোধগম্য হয় না।

কিদি তাঁরা সারা কলকাতায় প্রতিরোধের জঙ্গী সংগঠন গড়ে তুলতেন, আক্রমণের বিরুদ্ধে, কর্মী হত্যার বিরুদ্ধে, জনমত সংগঠিত করে প্রতিরোধের সংগঠন গড়ে তুলতেন তা হলে তাঁদের পক্ষের ভোটাররা অসহায় অনুভব করতেন না। তারা আরো অধিকসংখ্যায় ভোট দিতে যেতেন। যেমন গিরে-ছেন বেলেঘাটা, বরানগর, মালিক-তলা, বেহালা, বাদকপুর অঞ্চলে।

আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, শান্তি নিশ্চিত করে। ভীরাভাবে নিয়ে আসে পরাজয়ের স্মৃতি। আসন্ন আক্রমণের মধ্যে অন্ততঃ একখাটি তাঁদের মনে রাখতে হবে।

অপারেশন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

জনৈক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দপ-গকে বলেছেন যে তিনি নিজেও এ ব্যাপারে খোঁজ করে দেখেছেন এবং জেনে সন্তোষিত হয়েছেন যে খানা-তলাসীর এলাকা, তারিখ ও সময় ডি এম এস ডি ও এবং ম্যাজিস্ট্রেট-দের কাছে গোপন থাকলেও প্রকৃত অপরাধীদের কাছে গোপন থাকে না। কারণ পুর্লিশ সাইক্লোইল করা তালিকা টপসিক্রেট চিহ্নিত করে মিলিটারী কতৃপক্ষের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ফলে কয়েক কপি সাইক্লোইল করা তালিকা আগেই পুর্লিশের মারফ-তেই পাচার হয়ে যায়।

আর পুর্লিশের সঙ্গে দাগী আসামী এবং বে-আইনী হিংসাত্মক কর্মকলাপের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের সম্পর্ক আজ আর কারো অজানা নয়। আগে থেকেই এভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয় বলেই আরও অপ-রাধীরা নিশ্চিন্তে বে-আইনী মাল-পাঠ নিয়ে মিলিটারীর জাল এড়িয়ে পালিয়ে যেতে পারে, একথা এখন পরিষ্কার।

দুর্গা

স্বাধীন সাপ্তাহিক

১১ চাঁদর হার

বার্ষিক পনেরো টাকা
বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

গীতাকর্ষ ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, মট লেন, কলি-১০

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন

ফলাফলের সমীক্ষা

এবারকার লোকসভার নির্বাচনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ভোটের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সাতটি সালের তুলনায় সি পি এম শূন্য তাদের আসন সংখ্যা চারগুণ (পাঁচ থেকে কুড়ি) বাড়িয়েছে। তাই নয়, এই দল প্রায় ভোটের শতকরা হার শিশুদেরও বেশী করেছে। সে তুলনায় এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল নব-কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা সে হারে বাড়ি নি।

পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে বড় লোকদের পরিচায় সবজাতা ভাষাকারদের প্রাক-নির্বাচন জল্পনা-কল্পনা প্রমাণোক্তি ছাড়া কিছু নয়। সাতটি সালে সি পি আই-এম লোকসভায় এই রাজ্য থেকে শতকরা ১৫.৫৬ ভাগ ভোট পেয়েছিলেন। এবারে সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৫.৮৮ ভাগ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে নব-শালদের প্রচার সত্ত্বেও শতকরা ষাট জনের উপর এবারে ভোটে অংশ গ্রহণ করেন।

এরই পাশাপাশি দেখা যায় অবিভক্ত কংগ্রেস সাতটি সালে

ভোট পেয়েছিলেন শতকরা ৩৯.৬৯ ভাগ। তার জায়গায় নব কংগ্রেস ও আদি কংগ্রেস উভয় মিলিয়ে পেয়েছে শতকরা ৩৩.৯২ (২৯.৫৯+৪.৩৩)।

আর একটি সর্বভারতীয় দল সি পি আই পূর্বের পাঁচটির জায়গায় তিনটি আসন রক্ষা করতে পেরেছেন। গতবারের তুলনায় ভোটের হার বেড়েছে ৯.১৪ থেকে ১১.০৪-এ।

যে তিনজন সি পি আই প্রার্থী অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি, ডাঃ রণেন সেন এবং ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত জিতেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে নব কংগ্রেস কোন প্রার্থী দাঁড় করানি।

নব কংগ্রেস বহিঃ জন প্রার্থী দিয়েছিলেন। তার মধ্যে তেরো জন নির্বাচিত হয়েছেন। সি পি আই-এম আটগুণ জন দিয়েছিলেন তার মধ্যে বিশ জন নির্বাচিত হয়েছেন। সি পি আই এবারে পনেরো জন প্রার্থী দিয়েছিল।

সি পি আই-এম-এর প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রীমতী বোম্বা এবং প্রবীণ নেতা শ্রীআবদুল্লাহ রসুল পরাজিত হয়েছেন নব কংগ্রেসের কাছে, কিন্তু এই দলের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র, ডাঃ

কদম্বরেন্দ্র গুহ, ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু, শ্রীদেবেন সেনকে পরাজিত করা। সর্বোপরি বঙ্গোপসার শ্রীঅতুল্য ঘোষের জামানত জম্ম হওয়ার অনেকেদিন স্মরণে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে দর্পণের সংবাদ-দাতার ভবিষ্যৎবাণীও পাঠকের মনে আছে নিশ্চয়। শ্রীঅতুল্য ঘোষকে হারিয়ে গতবারে বিনি সারা দেশে নাম কিনেছিলেন সি পি আই-এর সেই শ্রীজ্ঞে এম কিশোর এবারে বাঁকুড়ায় নব কংগ্রেসের প্রার্থীর কাছে হেরেছেন।

সংসদের প্রবীণতম সদস্যদের অন্যতম শ্রীহীরেন মুখার্জি এবারে প্রায় বাইশগো ভোটে জিতেছেন। এই কেন্দ্রে বাতিল ভোটের সংখ্যাও অনেক বেশী। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন সদস্য এবারে নব কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে কুচবিহার থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

এ বছর মুসলিম লীগের একজন প্রার্থীর সাফল্যের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক, লোকসেবক সম্ব, এস ইউ সি প্রার্থীদের পরাজয় অনেকের নজরে পড়েছে। ছোট দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে।

উত্তরবঙ্গে সি পি আই-এম পরাজিত হলেও নব কংগ্রেসের সঙ্গে এই দলই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। আর এস সি বা ফরওয়ার্ড ব্লকের পুরানো ঘাঁটি আজ পূর্বের মত শক্তিশালী নয়।

দুশীতল রায়চৌধুরী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তলবাবুর মৃত্যু হয় সেখানে গিয়ে ঠিক ডাক্তারদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছে। দর্পণের তদন্তে দেখা গেছে দুশীতলবাবুর মৃত্যু কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ফলেই ঘটেছে এবং ওঁকে আক্রমণ অথবা হত্যার চেষ্টা হয়েছে বলে যে সন্দেহ তা সম্পূর্ণ অমূলক।

গত চোঁঠা মার্চ দুশীতলবাবু তাঁর এক পুরানো পরিচিত ডাক্তারের ঐ নার্সিং হোমে এসে হাজির হন চিকিৎসার জন্য।

ডাক্তারবাবু ত ওঁকে দেখেই বিব্রত হয়ে পড়েন। কেননা দুশীতলবাবু সরকারী হোষ্টেলারী পরোয়ানা এঁড়িয়ে এসে হাজির হয়েছেন। ওঁর মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা।

দুশীতলবাবুর ডাক্তারের কাছে একটি মাত্র আবেদন : কেউ যেন, এমনকি তাঁর স্ত্রীও, তাঁর নার্সিং হোমে চিকিৎসার ব্যাপারে জানতে না পারে।

যে ডাক্তার ওঁর নার্সিং হোমে থাকার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন তিনি দুশীতলবাবুর সঙ্গে একই জেলে সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে ছিলেন—সে প্রায় তেইশ বছর আগেকার কথা। দমদম জেলে।

ডাক্তারবাবু দুশীতলবাবুর একজন গুণগ্রাহী। বহু বছরের ব্যবধান হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারবাবু দুশীতলবাবুকে ভোলে ন। ঐ দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ তাঁকে দেখে ডাক্তারবাবু অভিভূত। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন সর্বপ্রকারে চিকিৎসার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।

দুশীতলবাবুকে টি সি মুখার্জী নামে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হল মার্চ মাসের চার তারিখে। পায়ে হেঁটেই তিনি এসেছিলেন—রোগী ছিমছাম চেহারা, মুখে একটু ক্লান্তির ছাপ, বোধ হয় একটু হতাশারও। ডাক্তারবাবু ঘর ঠিক করে, খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা করে রাতির মত বিদায় নিলেন।

তারপর দিন প্রশ্ন করে ডাক্তারবাবু জানতে পারেন যে গত কয়েক মাস ধরেই দুশীতলবাবু থেকে থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। আগে একটী হৃদরোগ আক্রমণের ঘটনাও ছিল।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এসে যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেন রুগীর অবস্থা খারাপ। কি করে এতদিন চলাফেরা করছিলেন সেই চিন্তা করে বিশেষজ্ঞ বিস্মিত হলেন। তিনি বিজ্ঞানায় সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে চলে গেলেন। পরে আরও অনেক বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা হল।

দিন সাতেক পরে শয্যাশায়ী রুগীর তড়াকার ভাব দেখা গেল। মার্চ মাসের তের তারিখে সকালে তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ল।

ডাক্তারবাবু মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিলেন। এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু

ঘনিয়ে আসবে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। মৃত্যুর পর দুশীতলবাবুর স্ত্রীকে খবর দেওয়া হল। দুশীতলবাবুর একটি ছেলে জেলে। পুলিশকে জানান হল মৃত্যুর কথা আর আবেদন করা হল ছেলেকে কিছুদিনের জন্য বাইরে আসার অনুমতির জন্য, যাতে করে ছেলে বাপের শেষ কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

মৃত দুশীতল রায়চৌধুরীর খবর পেয়ে পুলিশের বীরপুংগবেরা সদল বলে এসে হাজির হলেন নার্সিং হোমে। তারপর সন্ধ্যা হোল তাদের তদন্ত আর নার্সিং হোমে দাপাদাপি। প্রথমেই সমস্ত নার্সদের ডেকে অন্যান্য রোগীদের সম্পর্কে কোন কথা চিন্তা না করেই ওরা চিন্তা করতে লাগল। এই সব নার্সিং হোম ত বেআইনী গর্ভপাত করেই চলে। এখন আবার নকশালীদের চিকিৎসার কাজে লেগেছে। ওরা বলল কিভাবে শাস্ত্রতা করতে হয় ওদের নাকি জানা আছে। এই রকম অনেক চেষ্টামেচি করে ওরা ঐ ডাক্তারবাবুকে গোয়েন্দা বিভাগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে নিয়ে গেল। যে সমস্ত দুর্ব্যবহার গোয়েন্দা পুলিশের অফিসাররা নার্সিং হোমে করেছে তার জন্য গোয়েন্দা পুলিশ কতটা শ্রীঅবদ মুখার্জী, দুঃখ প্রকাশ করলেন।

প্রশ্নোত্তরে ডাক্তারবাবু কিভাবে ওঁর সঙ্গে দুশীতলের আশ্রয় আর চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা বর্ণনা করলেন অরূপ মুখার্জীর কাছে। তিনি বললেন হৃদরোগের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে হাজির হয়েছিলেন। মৃত্যুকে ঠেকান গেল না।

পুলিশের প্রশ্ন : আপনি কেন আগে দুশীতলবাবুর উপস্থিতি সম্পর্কে পুলিশকে খবর দেন নি।

ডাক্তারবাবু : আমার বোধ হয় পুলিশকে খবর দেওয়া কাজ নয়। তাছাড়া ওঁর কাছে আমি কার্ডকে খবর না জানানোর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। আর পুলিশকে জানালে ওঁর মৃত্যু ঘরান্বিত হবে বলে আমার ধারণা হয়েছিল। রোগীকে যথাসাধ্য চেষ্টায় নিরাময় করা আমার ব্রত। এমন কোন কাজ যাতে রোগীর ক্ষতি হয় তা করা আমার নীতি বিরুদ্ধ।

ডাক্তারবাবু পুলিশকে বলেছেন যে মিথ্যানামে দুশীতলবাবুকে নার্সিং হোমে ভর্তি করার জন্য তিনি দায়ী। যাতে কারুর মনে কোনও সন্দেহ না হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই কাজ করা হয়েছিল। ডাক্তারবাবু বলেছেন তিনি দুশীতলবাবুর রাজনীতির কোন খবর রাখতেন না, বা অন্য কোন রাজনীতিরও।

পুলিশ অবশ্য মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠান। অরূপ মুখার্জী বললেন এসবের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজন আছে—ভবিষ্যতে যাতে কামেলা না হয়।

কংগ্রেস বিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লীগ নিজের আয়তনের তুলনায় অনেক বেশী আশ্বাস করে বসেছে। লীগের মাত্র সাতজন এম, এল, এ, আর এই সাতজনকে না পেলে অজমুবাবুর বিধান সভায় সরকার গঠন করার উপযোগী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয় না। তাই লীগ সাত জনকেই মন্ত্রী করার দাবী তুলেছিল।

কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমান সদস্যেরা লীগের সহযোগিতায় মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। তারা বলে যে, লীগকে

পূর্ববঙ্গ বর্জন করেছে। আর এখানে লীগকে মাথায় তুললে এর ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানো হচ্ছে।

মুসলিম লীগকে দুটি পুরো মন্ত্রি, দেওয়ার ব্যাপারে উত্তর বঙ্গ, মুর্শিদাবাদ নদীয়া চাঁদপুর পরগণা প্রভৃতি জেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ। তারা মনে করেন যে লীগের হাতে বেশী ক্ষমতা থাকলে আমামী নির্বাচনে দলের প্রার্থীদের মুসলমান ভোট পাওয়া শক্ত হবে। বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ আবদুস সাব্বারের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ গ্রুপ যাদের এবার লীগের প্রার্থীদের সঙ্গে লড়তে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। দিল্লী অবশ্য এ সব কথার বেশী কান দেবে বলে মনে হয় না কারণ তারা জানে পশ্চিম বাংলার লীগকে চটালে কেরলের মন্ত্রিসভায় তার প্রতিফলন ঘটতে পারে।

অনেক চেষ্টা আগে হয়েছে এখানে হিন্দুদের মুসলমান-বিরোধী সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ার জনসংঘ বহুদিন চেষ্টা করেও পশ্চিমবঙ্গে কোন খুঁটি গাড়তে পারে নি। মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী লীগের তোষামোদ পশ্চিমবঙ্গে জনসংঘ সম্প্রসারণে সাহায্য করবে বলে কংগ্রেসী মুসলমান সদস্যেরা মনে করেন।

ওদের কোন প্রতিবাদই আমল দেওয়া হয় নি। লীগের তিনজনকে মন্ত্রী করার স্বীকৃতি দিয়ে ওদের

সাতজনের সমর্থন কেনা হয়েছে।

অজমুবাবুর নেতৃত্বে পশ্চিম-বাংলার মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্তে শ্রীবিজয় সিং নাহার সন্তুষ্ট নন। দলের বৈঠকগুলিতে তিনি ক্রমাগতই তাঁর নিজের গোষ্ঠীর লোকদের দিয়ে বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের বিরুদ্ধে বলছেন—শোনা যাচ্ছে যে পুরো ব্যাপারটিই নাকি আবার নব কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির বৈঠকে আলোচিত হবে। এবং যদি দিল্লীর সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয় তাহলে হয়ত বিজয়বাবু মন্ত্রিসভায় যাবেন না। অপরিদকে এই ধরনের একটা অবস্থার কথা চিন্তা করে তরুণবাবুও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কি করে তিনি উপ মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন।

দাঁড়কাক



হরবোলা পাখিটার শুনলাম কত গান কত রাগ-রাগিনীর বড়ো কালাপালা কান। কখনো পেখম তুলে দেখলাম নাচতে কাজনে বহুজন রামধনু গাইতে।

প্রখর রোদের বানে পুচ্ছ যে খসলো এমা! এটা দাঁড়কাক লোকে চিনে ফেললো।

দীপক চৌধুরী

Just out

Liberation War (2)

Edited by Asit Sen

Contents :

Let the people speak, Victory and defeat of Revolution, Learn from the glorious history of the Great Indian people, and other articles concerning questions on Indian Revolution.

Contact :—

Nihar Roy

9 Basanta Bose Road Calcutta-26

দপন

১৪শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ৥ শ্রুতবার ২রা এপ্রিল ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা.

বাংলা দেশের সশস্ত্র বিপ্লবে জাতীয়তাবাদ ও শ্রেণী-সংগ্রাম একাকার

চণক্য সরকার

পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নাম-
করণ অনুযায়ী বাংলাদেশের সশস্ত্র
বিপ্লবে বাঙালী জাতীয়তাবাদী
আন্দোলন আর শ্রেণী সংগ্রাম একা-
কার হয়ে গেছে। সেখানকার মানুষের
আজকের সশস্ত্র বিক্ষোভ দীর্ঘ শ্রেণী
সংঘর্ষ ও সংঘাতের এক অনিবার্য
পরিণতি। এই সংগ্রামে শোষিত মানু-
ষের জয় অবশ্যম্ভাবী—কারণ শ্রেণী
সংগ্রাম তখনই জয়যুক্ত হয় যখন এই
সংগ্রাম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের
অংশ হিসাবে বিকাশ লাভ করে।
পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেণী সংগ্রাম
যেখানেই জয়যুক্ত হয়েছে, সেখানেই
এই সংগ্রাম উগ্র জাতীয়তাবাদী
আন্দোলনের আকারে ব্যাপকতা লাভ
করেছে। শ্রেণী সংগ্রাম যদি জাতীয়
আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে
তবে সে সংগ্রাম পরাজিত হতে বাধ্য।
চীন, কিউবা, আলজেরিয়া এবং
ভিয়েতনামের সংগ্রামী ইতিহাস এই
তত্ত্বের সাক্ষ্যবহ।

মনে রাখা দরকার যে, বাঙালী
মুসলমান, বিশেষ করে পূর্ব বঙ্গের
অধিবাসীরাই মুসলিম লীগের পাকি-
স্তান আন্দোলনকে সাফল্যের পথে
নিয়ে গেছে। স্বাধীনতার আগে
এখানকার মুসলমান নিজের সত্তাকে
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে হিন্দু প্রভু-
ত্বের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনে
ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছে মুসলমান

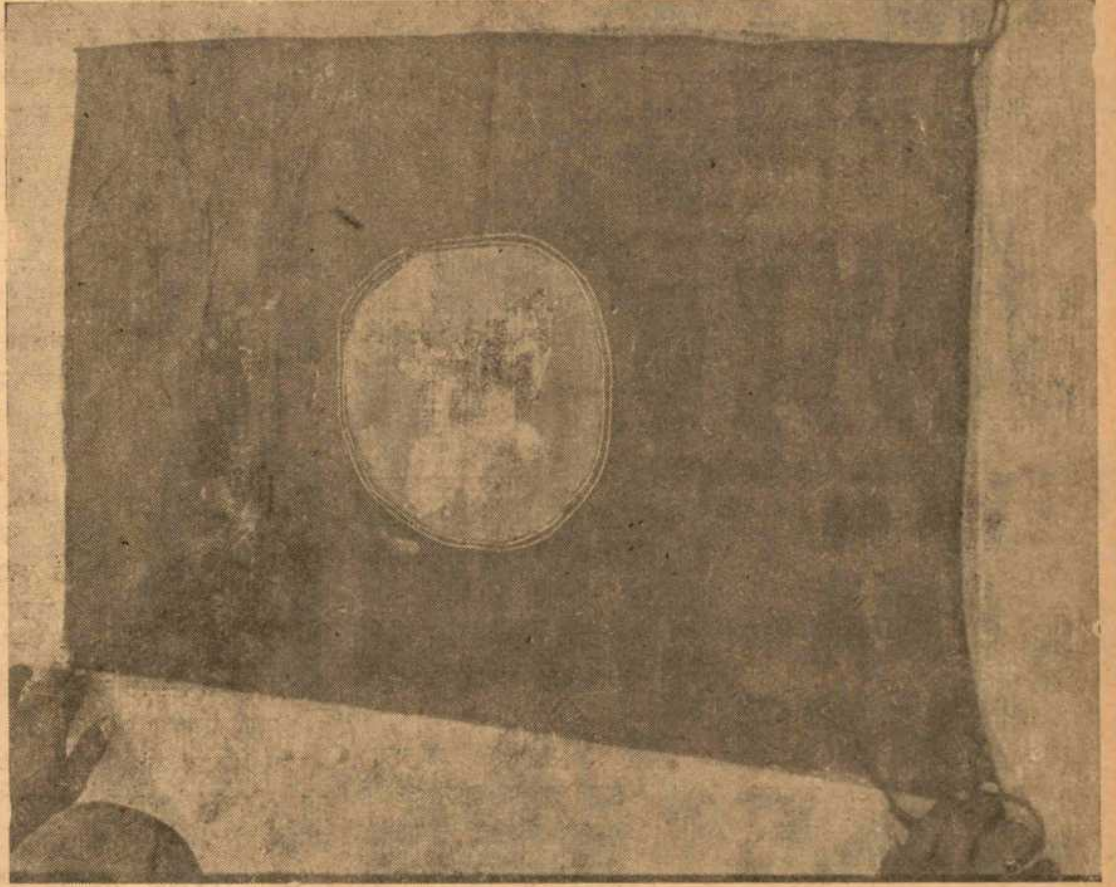
চাষী। এই সাড়া শুধুমাত্র ধর্মীয়
আবেগের প্রতিফলন বলে রায়
দেওয়া নিছক সরলীকরণ। তখন-
কার অর্থশ্রিত বাঙালী জমিদার,
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার,
আর সমাজের প্রতিপত্তিশালী সবাই
প্রায় হিন্দু। জাতি বিভক্ত হিন্দু
সমাজে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান ভূমি-
হীন কৃষকের ভাগ্যে জড়টেছে শোষণ,
অবমাননা আর সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা
লোপ। তাই যখন পাকিস্তান, অথবা
পৃথক মুসলিম রাজ্যের, শ্লেগান
১৯৪০ সালে ফজলুল হক মুসলিম
লীগ কনফারেন্সে তুললেন পূর্ব
বঙ্গে এই আবেদন এক অভূতপূর্ব
সাড়া জাগাল। অর্থশ্রিত ভারতবর্ষের
অন্য কোথাও মুসলিম জনসাধারণের
সমর্থনের ব্যাপকতা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে
কোন ক্রমেই তুলনীয় নয়। ১৯৪৬
সালের মুসলিম লীগের “প্রত্যক্ষ
সংগ্রাম” আহ্বান বাঙালী মুসল-
মানদের মধ্যে যে সাড়া জাগিয়েছিল
তা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের
মধ্যে লক্ষ করা যায় নি।
স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের পর,
বারে বারে বাঙালী মুসলমান
তাদের প্রতিনিধি মরফৎ একথা
জানাতে চেয়েছে যে, পাকিস্তান
সৃষ্টির পেছনে তাদের অবদানই সব-
চেয়ে বেশী। আর আজ যারা এর
সুফল ভোগ করছে তারা হয় উত্তর
প্রদেশের ধনী উম্বাস্তু অথবা সিন্ধী
পাজাবী জমিদার শ্রেণী যারা স্বাধী-
নতাপূর্ব যুগের আন্দোলনে বাক্যব্যয়
ছাড়া আর কোন আত্মবিসর্জনের
নজীর রাখেন নি।

দেশ বিভাগের পরেই বাঙালী
মুসলমান নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝতে
শুরু করল যে, হিন্দু জমিদার বা
শোষকদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)
ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয়
পরিষদের তেসরা মার্চ অধিবেশন
বাতিল হওয়ার পর আওয়ামী লীগ
নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহ-
মান গণ-আন্দোলন আহ্বানের সঙ্গে
সঙ্গে নিজ দল ও অন্যান্য দলের
মধ্যে একেবারে ভিত্তিতে বাঙালীর
সর্বব্যাপী একটি বিরাট সুসংবদ্ধ
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য
সাংগঠনিক প্রস্তুতি সুরু করেন।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ছাত্র-
বন্দ্য শেখ মুজিবুর রাজনীতিতে
হাতেখড়ি কলকাতায় নেতাজী

সুভাষের কাছে, তাঁর বয়স তখন
মাত্র সতের। তখন থেকেই মুজিব
কলকাতার বিপ্লবী আন্দোলনে
যোগ দেন এবং নেতাজী ও শ্রম্বেয়
শরণ বসু মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয়
হয়ে ওঠেন। তখন দ্বিশ দশকের
মাঝামাঝি এবং নেতাজী তখন
স্বদেশে এবং বিদেশে বহু ছাত্র
সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে-
ছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়
মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য।
মুজিব নেতাজীর এই সাংগ-
ঠনিক প্রস্তুতির অবস্থায় তাঁর
সান্নিধ্যে আসেন। উনিশশ তেত্রিশ

সালে নেতাজী তাঁর মৌলিক রাজ-
নৈতিক দর্শন উপস্থাপিত করেন
লন্ডনে এক ছাত্র সভায়। বক্তৃতার
বিষয় ছিল “সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী
সংগ্রাম এবং সাম্যবাদ”। এই
বক্তৃতায় ভারতের সাম্রাজ্যবাদ
বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক হওয়া
সঙ্গেও আপসমুখী নেতৃত্বের জন্য
কি ভাবে পণ্ডা হয়ে গেছে তার
এক বিরাট ইতিবৃত্ত নেতাজী তুলে
ধরেন।
মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত
অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বাংলাদেশের পতাকা

সুশীল ধাড়ার মন্ত্রী হবার সাধ এবার মিটল না

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

অজয়বাবু তার প্রধান সহচর
শ্রীসুশীল ধাড়াকে ত্যাগ করেছেন।
অজয়বাবুর সুশীল ধাড়ার প্রতি
বিরাগ দেখে অনোরাও শ্রীধাড়াকে
ত্যাগ করেছে। ছাত্রবিশে মার্চ অজয়-
বাবুর বাড়ীতে নব কংগ্রেস, বাংলা
কংগ্রেস, সি পি অই, ফরোয়ার্ড ব্লক,
পি এস পি, এস এস পি দলের যুক্ত
সভায় যখন সুশীলবাবু দাবী জানা-
লেন যে বাংলা কংগ্রেসকে আর একটা
মন্ত্রিস্ব দিতে হবে তখন শ্রীবিজয়
সিংহ নাহার অতি ককর্ষ কণ্ঠে সেই
প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তখন অজয়-
বাবু শব্দ নয়, এমন কি সভায় উপ-
স্থিত শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীসুধীর
দাস, শ্রীঅরুণ মিত্র, যারা সুশীলবাবুর
অতি পেয়ারের লোক তারাও মুখ
ফিরিয়ে ছিলেন। কেউ সুশীলবাবুর
পক্ষ হয়ে টু শব্দ পর্যন্ত করেন নি।
ক্ষোভে রাগে অপমানে সুশীল-
বাবু সভা ছেড়ে চলে যান। মুসলিম
লীগকে তিনটে মন্ত্রিস্ব দেওয়া হচ্ছে,

আবার যে দলের একজন সদস্য তাদের
একজনকেও মন্ত্রী করা হচ্ছে অথচ
বাংলা কংগ্রেস পাঁচজন সদস্য একজন
মন্ত্রীর বেশী পেল না। এই অপমান
সুশীলবাবুর দলের জন্য নয়, অপমান
নিজের জন্য। তাই সুশীলবাবু সভা
ত্যাগ করে যান। কিন্তু সেখানেও
কেউ একবার সুশীলবাবুকে বসতে
বলল না।
এর আগের দিন অবশ্য অজয়-
বাবুকেও বাংলা কংগ্রেসের সভা মন্ত্র-
পথে ছেড়ে আসতে হয়েছিল অন্য
কাজের অজুহাত দেখিয়ে। অন্য কাজ
অজয়বাবুর অবশ্য ছিল, কিন্তু পরে
আবার তিনি সভায় যান, তাকে
বাড়ীতেই পাওয়া গেছিল। প্রকৃত
কথা, পাঁচশে মার্চ বাংলা কংগ্রেসের
কর্মপরিষদের সভায় শ্রীসত্যেন কুন্ডু
অজয়বাবুকে যা বলেছিলেন তাঁর পর
আর তার সভায় থাকা সম্ভব ছিল
না।
পাঁচশে বাংলা কংগ্রেস কর্মপরিষ-

দের সভায় সুশীল বেশ একটা
বাগড়া দিলেন অজয়বাবুর মধ্যমন্ত্রী
হবার পথে। বাংলা কংগ্রেসের সম্পা-
দক মন্ডলীর নামে এক প্রস্তাব কর্ম-
পরিষদের সভায় রাখা হল। সেই
প্রস্তাবে বলা হল : কংগ্রেস জানে
বাংলা কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যাবে না
বলে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অত-
এব এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে
কংগ্রেস তাদের কছে আবেদন করে
সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অনুরোধ
করুক। তখন তারা ভেবে দেখবে
অজয়বাবুকে মধ্যমন্ত্রী হতে দেওয়া
যায় কি না। পরে আরো বলা হল :
অজয়বাবুকে মধ্যমন্ত্রী হতে ফরমাল
কোন অনুরোধ না করা পর্যন্ত কোন
কথা হবে না। অজয়বাবু এক সময়
পকেট থেকে শ্রীকৃষ্ণকুমার শূরার পত্র
বের করে দিয়ে বললেন—কংগ্রেস
বিধিসম্মত প্রস্তাবই করেছে। তখন
প্রশ্ন তোলা হল দলকে চিঠি দেওয়া
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

আগামী সংখ্যায়

দর্পণের আগামী সংখ্যায়
বাংলা দেশ ও তার সংগ্রাম
সম্পর্কে নানা তথ্য ও
কয়েকটি আলোচনা প্রকাশ
করা হবে।

(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

আওয়ামী লীগের নির্দেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অবশ্যই বিরোধী তিনি ছিলেন না। কিন্তু নেতাজী আন্দোলনের স্তর উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা সমগ্র উপস্থাপিত করেন। তিনি আন্দোলনের সাক্ষর জন চারটি প্রাথমিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন :

(এক) সরকারের কর এবং অন্যান্য রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বানচাল করার ব্যবস্থা।

(দুই) সরকারী প্রশাসন, পুলিশ এবং সম্ভব হলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা—যাতে আন্দোলন দমনকারী সরকারী নির্দেশ কার্যকরী না হয়।

(তিন) আন্দোলন চলাকালীন সরকারের সংকটময় মত্বর্তে সমস্ত সরকারী সরবরাহ—খাদ্য, অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সর্বকিছ—বিচ্ছিন্ন করার জন্য সুসংগঠিত

ব্যবস্থা, এবং (চার) শেষ পর্বন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সমস্ত প্রচেষ্টা।

নেতাজী তাঁর বক্তৃতার বলেছিলেন যে, প্রথম তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে সরকারী প্রশাসন বস্ত্র ছিন্নহাড়া হয়ে বাবে আর সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল হওয়ার ফলে আন্দোলন জয়ের পথে এগিয়ে যাবে। এই বক্তৃতায় নেতাজী ঠিক কেন্দ্রস্থলে বিপ্লব সমস্ত আকার নেবে তার কোন উল্লেখ করেন নি। তিনি শুধু বলেছিলেন গান্ধীর নেতৃত্বে বিপ্লব ঠিক পূর্বোক্ত পথে এগোয় নি তা ব্যর্থ হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে নেতাজীর এই বক্তৃতা প্রথম রাজনৈতিক জ্ঞানোদয়ে সাহায্য করেছে এবং এবারের পূর্ববাংলার মুক্তি আন্দোলন সংগঠনে প্রথম রাজনৈতিক দীক্ষার ছাপ স্পষ্ট। প্রথমেই মুজিব আন্দোলনের লক্ষে স্থির, হয় সরকার তার ছয় দফা

দাবী মেনে নিক, অন্যথায় তাঁর সংগ্রাম আপসহীন। আন্দোলনের কৌশল অবশ্যই অহিংস—অসহযোগ, কিন্তু হিংস আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তাঁর বক্তৃতার অনেক দিন থেকেই বলে আসছেন। আক্রমণ হিংস এবং বীভৎস পর্ষায় যেতে পারে এই ধারণা তাঁর এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ছিল। এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন পর্ষায় শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক প্রস্তুতিও করেছেন লীগ নেতারা।

দোসরা মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্বায় চলে চৌদ্দই মার্চ পর্বন্ত। তারপর সূর্য হয় দ্বিতীয় পর্বায় এবং শেখ মুজিবুর ঘোষণা করেন তাঁর পঁয়ত্রিশ দফা নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন : “বীরত্বপূর্ণ গণসংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় বাঁরা স্বাধীনতার জন্য জীবনপন সংগ্রাম করছেন তাঁরা যেন আমাদের সংগ্রামকে বিশ্ব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসাবে মনে করেন। বাংলা দেশের জনসাধারণ প্রমাণ করেছে কি ভাবে তাঁদের সংগ্রামী ঐক্য ও দৃঢ়তা পার্শ্ববর্তী শত্রুর দ্বারা স্বাধীনতাকে বাঁরা নিশ্চিত করতে চায় সেই যুগ্মস্বাক্ষরীদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিশালী দৃষ্টি পরিণত করতে পারে।

আজ বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষ—পুরুষ, মহিলা এবং এমনকি শিশুরা পর্বন্ত উন্নতিশীল নন্দহিংসা দিয়ে বাঁরা মানুষকে অবদমিত করতে চেষ্টা করে তারা আজ পূর্বদন্ত। সরকারী ও অফিস কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক কৃষক ও ছাত্র, বাংলা দেশের সমস্ত মানুষ নিশ্চিত ভাবে ঘোষণা করেছে যে, তাঁরা আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মদানে প্রস্তুত।

“সামরিক আইন অনুসারে নির্দেশ জারি করে সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন থেকে নিরস্ত করার জঘন্য প্রচেষ্টা চলছে। বাংলা দেশের সমস্ত মানুষ সামরিক আইনের সামনে অবনিমিত না হওয়ার দৃঢ়তার ঐক্যবন্ধ। বাঁদের বিরুদ্ধে এই নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে তাঁদের নির্দেশ অমান্য করতে অনুরোধ জানাই। বাংলা দেশে সাড়ে সাত কোটি লোক তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারবর্গের সমর্থনে ব-ধপরিহার। দমননীতির দ্বারা বাংলা দেশের মানুষকে যেমন দমনো যায় নি, সেই ভাবে এই সমস্ত কর্মচারীদের উপর সামরিক নির্দেশও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

“বাংলা দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করা যাবে না। আমরা অজ্ঞেয় কারণ প্রয়োজন হলে আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত—যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা স্বাধীনতা ও সম্মানের সঙ্গে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচতে পারে। তাই আমাদের সংগ্রাম নতুন উদ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া

এক নজরে অজয়বাবুর জনপ্রিয়তা

(দশমের পর্ববৈকক)

এক নজরে ভাবী মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর জনপ্রিয়তা—সংখ্যা কথা কয় :

মেদিনীপুরের তমলুক কেন্দ্রে অজয়বাবু আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিদের গত তিনটি নির্বাচনের ফলাফল দেওয়া হল। দেখা যাবে অজয়বাবুর ভোট সংখ্যা দিন দিন কমছে আর তাঁর বিরুদ্ধে ভোটের ব্যবধানও। আরও লক্ষণীয় যে, এবারে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট প্রার্থী এই প্রথম তমলুকে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস প্রার্থীর ভোটের সংখ্যা প্রায় নগণ্য করে এনেছে। নির্বাচন :

১৯৬৭	অজয় মুখার্জী	৪৭,০৯১
	কংগ্রেস প্রার্থী	১০,৫৮০
	ব্যবধান	৩৬,৫১১
১৯৬৯	অজয় মুখার্জী	৪১,০৯৪
	কংগ্রেস প্রার্থী	১২,১০৬
		২৮,৯৮৮
১৯৭১	অজয় মুখার্জী	৩২,৪৯৮
	মার্কসবাদী প্রার্থী	১২,৪২৬
	কংগ্রেস প্রার্থী	২,৮৬২
	নিকটতম প্রার্থীর	
	তুলনায় ব্যবধান	২০,০৭০

পর্বন্ত এগিয়ে যাবে। যে কোন আত্মত্যাগের জন্য আমি মানুষকে প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই এবং আন্দোলনকে হিংসার দ্বারা দমন করার সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।

পনেরোই মার্চ থেকে আন্দোলন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নতুন নির্দেশ নিম্নে দেওয়া হল।

সরকারী সংস্থা সম্পর্কে এক নং নির্দেশ : সারা বাংলাদেশের সেক্রেটারিয়েট কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অফিস স্বয়ংশাসিত সংস্থাসমূহ, প্রধান বিচারালয় ও অন্যান্য বিচারালয় নিম্নে বর্ণিত নির্দিষ্ট নির্দেশ এবং বিজ্ঞপ্তি সমূহে প্রচারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষে হরতাল পালন করবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ
দুই নং নির্দেশ : বাংলা দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা
তিন নং নির্দেশ : (ক) ডেপুটি কমিশনার ও সাব ডিভিশনাল অফিসাররা কোন অফিস না খুলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার এবং এইসব নির্দেশ পালন করার জন্য বৈধ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের প্রয়োজন সেসব সমেত অন্যান্য কর্তব্য সম্পন্ন করবেন।

কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে সফলকর্তৃপক্ষ আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতার কাজ করবেন।

(খ) পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কর্তব্য সম্পাদন করবেন, যদি প্রয়োজন হয় আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে।

(গ) জেলরক্ষী ও জেলের অফিসাররা সক্রিয় থাকবেন।

(ঘ) আদালতের তাদের কর্তব্য করে যাবেন।

চার নং নির্দেশ : পোর্ট কর্তৃপক্ষ সর্বক্ষেত্রে সক্রিয় থাকবেন, জাহাজ চলাচল করবে। কিন্তু পোর্ট কর্তৃপক্ষের সেই শ্রেণীর অফিসাররা কাজ করবেন সূচন্যভাবে জাহাজ চলাচলের জন্য বাঁদের প্রয়োজন। শুধু জনগণকে দমনের জন্য ব্যবহার সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র

সমবেত করার জন্য কোন সহযোগিতা করা হবে না। সমস্ত জাহাজ, বিশেষ করে বাংলা দেশের জন্য খাদ্যশস্য বহনকারী জাহাজ থেকে মাল খালাস বাতে তাড়াতাড়ি হয় সেই চেষ্টা পূরোদমে করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের প্রাচ্য এবং জাহাজের বন্দর প্রবেশের জন্য দেয় অর্থ আদায় করবেন।

আদালত
পাঁচ নং নির্দেশ : বন্দরে প্রবেশকারী সমস্ত জাহাজ থেকে দ্রুত মাল খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের প্রয়োজনীয় শাখা এই ব্যাপারে কাজ করবে মাল খালাসের অনুমতি দেবে। তার আগে যে পরিমাণ শুল্ক ধার্য হবে সেটা ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রোলেশন অথবা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেডে একটি বিশেষ অ্যাকাউন্ট খুলে জমা দিতে হবে। এই অ্যাকাউন্ট আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুযায়ী শুল্ক বিভাগের কালেক্টর অপারেট করবেন। এই আদায়ীকৃত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা করা হবে না।

রেলপথ
ছয় নং নির্দেশ : রেলওয়ে সক্রিয় থাকবে, কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের শৃঙ্খলায় সেই অফিস বা রেল চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় জনগণকে দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী বা অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যাপারে কোন সহযোগিতা করা হবে না। বন্দর থেকে দেশের মধ্যে খাদ্যশস্য চলাচলের জন্য রেলওয়ে ওয়াগন সরবরাহকে সঘণ্টায় জরুরী বলে গণ্য করতে হবে।

পরিবহন
সাত নং নির্দেশ : অন্তর্দেশীয় নদীকেন্দ্রিক বন্দর সূচন্যরূপে চালু রাখার জন্য ই পি এস সি এবং অন্তর্দেশীয় নদী পরিবহন এবং টি ডবলু টি এর প্রয়োজনীয় স্বল্পসংখ্যক কর্মচারী কাজ করবেন, কিন্তু জনগণকে দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে কোন সহযোগিতা করা হবে না।

ডাক ও তেল
আট নং নির্দেশ : শুধু বাংলা দেশের মধ্যে চিঠিপত্র টেলিগ্রাম ও (শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠার)

সুশীল খাড়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হরিন, চিঠি দেওয়া হয়েছে অজয়বাবুকে।

তারপর সূর্য হল বক্তৃতার তোড়, যাকে ঘোলাই বলাই ভাল। যে তিন জন বক্তা এই কাজে দক্ষতা দেখালেন তারা হলেন শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য, শ্রীমতী দাস, শ্রীমতেন কুম্ভু। সেই বক্তৃতার মূলকথা হল অজয়বাবু মন্ত্রকের লোভী। তার গুরুদেব ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মতই তার অবস্থা করবে কংগ্রেস, গণতন্ত্রও আমরদের কন্ডার তিনি প্রথমে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চান নি, ক্ষমতা ও মন্ত্রিত্বের লালসার তিনি দলকে দেখছেন না। এই বক্তৃতার মধ্যেই আসল কথাটা বলা হল, অজয়বাবু মন্ত্রী হলে দলের প্রতিনিধিত্ব হবে না, তার জন্য চাই সুশীলবাবুকে, তাই মন্ত্রিত্ব যদি নিতে হয় তবে সুশীলবাবুকেও নিতে হবে।

অজয়বাবু সব শুনে ভয়ানক রেগে গেলেন। বলেন, এই সব হল অ্যালপারসন, কুৎসা, আপনারা অনেক কিছু জেনেন না। এই যদি আপনাদের মনোভাব হয় তবে আমি এখানে কুসেই পদত্যাগ করছি। দল না বলে আমি মন্ত্রিসভার বাব না, কিন্তু মনে রাখবেন তখন সি পি এম মন্ত্রিসভা গড়বে। রেগে গেলেন প্রবল মুখোপাধ্যায়। তিনি সতেন কুম্ভুকে বলেন—আপনি বাড়াবাড়ি করছেন, কাজে কি বলতে হয় জানেন না। এইসব কথা আপনাকে প্রত্যাহার করতে হবে। আইন মন্ত্রি বলেন দলের মধ্যে যদি এইভাবে টিউটর হয়ে দলের নেতার বিরুদ্ধে কুৎসা করা হয় তবে সেই দলে থাকার দরকার নেই। অজয়বাবু বলেন, আপনারা যা ঠিক করার করেন, করে আমাকে জানবেন। এই বলে অজয়বাবু চলে যান। তখন অবিলাসবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অজয়বাবু চলে যাবার পর সুশীলবাবু বলেন অজয়বাবুকে দিয়েই বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদককে অপদস্থ করার চেষ্টা চলছে। ওরা আমায় কাছে পত্র না দিয়ে দিয়েছে সভাপতির কাছে।

সূর্য হল মধ্যপন্থা বের করা। নদীরায় হলেন ভট্টাচার্য তখন প্রস্তাব করেন (এক) অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রিত্ব নেন, (দুই) বাংলা কংগ্রেস থেকে অর একজন মন্ত্রী নিতে হবে (তিন) অর সমস্ত আলাপ আলোচনার সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সঙ্গে থাকবেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে অজয়বাবুকে ফোন করা হল, দাদা একবার আসুন আমরা একটা প্রস্তাব ঠিক করেছি।

অজয়বাবু এলে তাকে প্রস্তাব শোনান হয়। তিনি প্রথম দুটি প্রস্তাবে সরাসরি কিছু না বলে শুধু বলেন তৃতীয় প্রস্তাবটা প্রেসে দেওয়া চলবে না। এর পরই অজয়বাবুর বাড়ীতে সব দলের সভা। সেখানে সুশীলবাবু দলের প্রস্তাব রেখে অর একজন মন্ত্রী করার কথা বলেন, কিন্তু কেউ পাস্তা দিল না।

কিন্তু তাতেও হাল ছাড়েন না সুশীলবাবু। পরদিন হরিদাস মিত্র, অবিলাস বসু, ললিত সিংহ, শান্তি মুখার্জী, বিজুতি সরকার, বিমল ভট্টাচার্য, নীহার দাস, প্রবল মুখার্জী শ্রীমতী সুমিত্রা ক্ষেত্রী প্রমুখ এক দলকে অজয়বাবুর বাড়ীতে পাঠানো হয়। সকলের হয়ে দুই একজন বলেন, দাদা আমাদের অর একজন মন্ত্রী চাই। আপনি বলেনই হবে। আপনি একটু চাপ দিলেই হবে। অজয়বাবু জানিয়ে দেন : এ নিয়ে আর কোন কথা হবার অবকাশ নেই, সুযোগ নেই। তিনিও কিছু বলতে পারবেন না। অবশেষে সুশীলবাবুর আর মন্ত্রী হওয়া হল না।

সামরিক শাসন বনাম বাংলা দেশের গণ-প্রতিরোধ

ওয়াকিবহাল

পূর্ববঙ্গের বীর জনগণের ওপর সামরিক ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খানের আঘাত নেমে এসেছে। সেই আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠন বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সামরিক আক্রমণের মোকাবিলা করতে দৃঢ়সংকল্পে দণ্ডায়মান।

আফ্রিকার নাইজেরিয়া বিদ্রোহী সংঘর্ষের পর এটা আফ্রোএশীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম রাজনৈতিক ঘটনা। নাইজেরিয়ার জেনারেল গাবোনের সেনাবাহিনীর আক্রমণে বিদ্রোহের বে-সামরিক জনগণ যে অপদূর্ব প্রতিরোধ সংগঠিত করেছিল, অতুতপূর্ব দৃষ্টবরণ ও ত্যাগ স্বীকারের রক্ত করা কাহিনী রচনা করেছিল, তা সারা বিশ্বের জনসাধারণকে চমকুত করেছে।

তা সত্ত্বেও বাংলা দেশ বিদ্রোহী নয়। আন্তর্জাতিক চক্রান্তে বিদ্রোহী পুরাক্রিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক চক্রান্তকে প্রতিহত করে বাংলাদেশ বিজয়ী হবে।

পাকিস্তানের জনসংখ্যার অধিকাংশ বাঙ্গালী। পাকিস্তানের আর্থিক সংগঠিত মূল উৎস বাংলা দেশে। তবু পাকিস্তানের দরিদ্রতম জাতি বাঙ্গালী। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার অপরাজ্য বাংলা দেশের ওপর বিতর্কীয় বিমুখ।

পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান বলে বাংলা দেশ পরিচিত হল। বাংলা ভাষার স্থান দখল করল উদ্ভূত ভাষা। সেদিনও বাঙ্গালী পশ্চিমের এই কতোয়াল মেনে নেয় নি। কালদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নাহকেও সেদিন ঢাকা ছাত্রসভায় অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। সে ১৯৬২ সালের কথা।

ঢাকা শহরে কার্কাট। একশ চর্যাগ্নিশ ধারা চুরমার করে ছাত্র-সমাজ বেরিয়ে এল। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের রক্তে ঢাকা রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রামের রাজপথ লাল করে দিল। তবু তারা মাথা নোয়ান নি।

বাংলা ভাষা “কাফেরের ভাষা” বাংলা সাহিত্য ভারতীয় আদর্শ প্রচার করে, এই ফতোয়া দিয়ে মুসলিম লীগ সরকার উদ্ভূত ভাষার প্রসারের ব্যর্থ চেষ্টা করল। বাংলা দেশের মানুষ বলল, যে অমৃতময় ভাষার প্রথম মা বলে ডেকেছি, যে ভাষা বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভাষা, তা আমার জাতীয় ভাষা। তার বদলে উদ্ভূত নয়, অন্য কিছু নয়।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগ সরকারের লাঠি, গুলি, টিম্বার গ্যাস, কারকর সব অস্ত্রাস্ত্র করে ঢাকা মহাকরণের সামনে মাথা তুলল শহীদ মিনার। শহীদ মিনারের

ভিত্তি স্থাপন করল বারোটা ছাত্রের পবিত্র রক্তধারা।

সেদিনও অনেকের মোহ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায় বিচার করবে। সে মোহ কাটতে দেবী হয় নি।

১৯৬৪ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বাংলা দেশের মানুষ জবাব দিল। তিনশো নয়টী আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পেলে সাতটী। যুক্তফ্রন্ট অধিকার করল তিনশো দুইটী আসন।

যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান এনে দিল, যে মুসলিম লীগ কালদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নাহের দর্পণ নেতৃত্বে প্রাক-বিভাগ ভারত উপমহাদেশের অঙ্গ-চ্ছেদ করে মুসলিম জাতিগুলির স্বাধীন আবাসভূমি রচনা করল, সেই মুসলিম লীগ বাংলা দেশের জনগণের হাতে ধরাশায়ী।

স্বভাবতই পাকিস্তানের দ্রুত বর্ধমান একচেটিয়া পুঞ্জিপতি গোষ্ঠী, ইম্পাহানী দাউদের দল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার মারফত বাংলা দেশে হস্তক্ষেপ করল। জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা (ইনি মীরজাকরের নবম পদমুখে বংশধর) এলেন পূর্ববঙ্গের গভর্নর হয়ে। ভেলো দিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার।

তারপর কিছুদিন দলবদলের পালা, উজান পতনের টালমাটাল। আব্দুহোসেন সরকার আতউর রহমান, বাংলা দেশে বগুড়ার মহম্মদ আলী শহীদ সুরাবাদী, চুঙ্গিগড়, ডাঃ খান সাহেব, ফিরোজ খান নুন, কেন্দ্রে দ্রুত বেগে ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন, আর ক্ষমতাচ্যুত হলেন।

কিন্তু যেদেশে পুঞ্জিবাদী বিকাশের ধারা এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধারা ওতপ্রোত মিশে শাসকশ্রেণীকে নিরন্তর ক্ষয়মুখী করে চলেছে, সেদেশে একচেটিয়া পুঞ্জিপতিগোষ্ঠীর নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট শাখা নবাবদের শাসকশ্রেণী ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে চায়। সবদেশেই এরকম ঘটে থাকে। কারণ জনগণের স্বাধীনতাকে সম্বলিত না করে, একচেটিয়া পুঞ্জির শোষণ চালানো যায় না।

তাই জিপীর উঠল পাকিস্তানের সংহতির, কেন্দ্রের জন্যে আরো বেশী ক্ষমতা। সিংহ, পাজীব, বেঙ্গল ও পাঠান জাতিগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া হল, মিলিয়ে দেওয়া হল একমাত্র অপরাজ্যে; পশ্চিম পাকিস্তান হল তার নাম। সিংহ, বঙ্গল কেউ থাকল না, পাজীবী, বেঙ্গল, পাঠান রইল না। সবাই হল পশ্চিম পাকিস্তানী।

পূর্ব পাকিস্তান অনেক দূরে

তাই সম্ভবতঃ বাঙ্গালী জাতি-সত্তাকে ভৌগোলিক ভাবে নিশ্চিহ্ন করা গেল না। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে বাঙ্গালী জাতিকে দাস জাতিতে পরিণত করার সবরকম চেষ্টা সূর্য হল।

প্রথমেই বাঙ্গালীদের সংখ্যা-ধিকা হরণ করা হল। উচ্চ পাকিস্তানের মধ্যে সমতার ভিত্তি অনুসারে আসনবন্টন করে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে সংখ্যাগুরু বাঙ্গালী জাতিকে চিরতরে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হল।

তারপর সূর্য হল অবাধ শোষণ। একচেটিয়া পুঞ্জিমালিকদের অধিকাংশই উদ্ভূত পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। এর আগে তারা ছিল ভারতের জাঁদরেল জাঁদরেল শব্দসায়ী গোষ্ঠী। বাংলা দেশের মানুষ দুর্ভিক্ষ মৃত্যুর কারবারী ইম্পাহানী, হোসেনকাসেম দাদা, আমজাদ হাজী দাউদ এদের চিনতো। এই সব মৃত্যু ব্যবসায়ী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের আসল মালিক। বাংলা দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে এরা দিন দিন রক্তক্ষীত হয়ে উঠতে লাগল।

এই শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্যেই চিরকাল বর্ধিত পুঞ্জিপতি শ্রেণী জাতিসত্তা ক্ষয় করে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনের উগ্র সমর্থক হয়ে ওঠে। সবদেশে সবকালে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দুর্বল জাতিগুলিকে শব্দসায়ী করে অশুভ জাতীয়তার নামে এই প্রথাটি পুঞ্জিবাদী শোষকেরা চালিয়ে থাকে।

পূর্ববঙ্গে যে সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিল, তার পেছনে ছিল হিন্দু সামন্ত জমিদার শ্রেণীর দেশত্যাগ এবং পাকিস্তানী এক-জাতীয়তার আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানী একচেটিয়া পুঞ্জি মালিক শ্রেণীর পূর্ব পাকিস্তানের অর্ধে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উগ্র অনুপ্রবেশ।

বাংলা দেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের শতকরা নব্বই জন সাধারণ কৃষক। ক্ষুদ্র শিল্প বা হস্তশিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং কলকারখানা সংগঠন করে যে ধনিক শ্রেণীর গোড়পত্তন হয়, তা সেখানে অনুপস্থিত। সঞ্চিত মূলধনের স্বল্পপরিমাণ হেতু পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিদের পুঞ্জি এবং বিদেশী পুঞ্জির ওপরেই বাংলা দেশের আর্থনৈতিক বিকাশ নির্ভরশীল। অর্থাৎ বাংলাদেশে পুঞ্জি সঞ্চারের হার এতো কম যে বাঙ্গালী পুঞ্জিপতি শ্রেণী সরকারী পুঞ্জি ছাড়া বর্ধিত হতে অক্ষম।

অন্যদিকে মধ্যশ্রেণীগুলির

মধ্যে ছোট ছোট উৎপাদক ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবী শ্রেণী যথা শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, সৈনিক, নাবিক এরা প্রধানতঃ কৃষকের ঘরের সন্তান। এখনো কৃষক-শ্রেণীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক কাঁপ হয়ে একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এখনো কৃষকের সঙ্গে মধ্যশ্রেণী-গুলির সম্পর্কে নিবিড়।

শিক্ষা প্রসার ও দ্রুত সামাজিক বিকাশের মধ্যে এই নবোদ্ভূত মধ্যশ্রেণীগুলি দেখেছে তাদের বিকাশ-লাভের প্রধান অন্তরায় পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঞ্জি।

অন্যদিকে দ্রুত মূলধনগঠনের জন্যে তাদের একমাত্র সাহায্য দিতে পারে প্রসারিত সরকারী বিনিয়োগ ক্ষেত্র।

কলে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থনৈতিক রাজনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রধান বাধা রূপে দেখা দিল পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। এবং ততদিনে এই কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক শাসনের রূপ গ্রহণ করেছে। এই সামরিক ডিক্টেটরী শাসন জনসাধারণের সঙ্গে মৃদুতম সম্পর্কও রাখে না বা রাখতে পারে না। জনগণের আশা আকাংক্ষার প্রতি সংবেদনহীন অনুভূতি শাসক ও শাসিতের খোলাখুলি সম্পর্ক রেখা চাবুকের নির্মম আঘাতে একে দিলে এই সামরিক শাসকেরা দুর্বল রাজনৈতিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বাইরের অশ্রুসজ্জা, দাম্ভিক উগ্র জনবিরোধিতা সত্ত্বেও এরা দুর্বল, কারণ জনগণ এদের বিপক্ষে।

শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার এই নব উদীয়মান মধ্যশ্রেণীগুলির নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তাই বাংলা দেশের আশা আকাংক্ষার প্রতীক। বাংলা দেশের প্রমিত-কৃষক মেহনতী সকলশ্রেণী তার পশ্চাতে দণ্ডায়মান।

শেখ সাহেব সংবিধান পরিবর্তন নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারেন নি। কারণ পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী আগে থেকেই সংবিধানে তাদের শোষণের অধিকারকে কয়েক করার নিশ্চিত গ্যারান্টি চাইছিল। সামরিক ডিক্টে-

টর ইয়াহিয়া খান কৌশলে, আপোষ আলোচনার মারফতে তার লক্ষ্য সিদ্ধ না হলে যে বলপ্রয়োগে পশ্চাদপদ হবেন না, একথা বাংলা দেশের মানুষ ও তাদের নেতা শেখ মুজিবুর বুঝতে পারেন নি এমন নয়।

আজ পাকিস্তানের অপরাজ্য হিসাবে পূর্ববঙ্গ বা বাংলা দেশ নিজের অবস্থান রক্ষা করা সম্ভব নয় হৃদয়গম্য করে স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছেন।

শেখ মুজিবুর উদীয়মান, মধ্যশ্রেণীগুলির নেতা হিসাবে বাংলা দেশের জাতিসত্তার পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছেন। কিন্তু তার নেতৃত্বের সীমারেখাও আছে। দখলদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর আক্রমণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ তার মূল্যায়ন যুক্তিবদ্ধ ও নয়, সম্ভবও নয়।

ইতিমধ্যেই সংগঠিত কৃষক সমিতির অশীতিপর নেতা মৌলানা ডাসানী স্বাধীন বাংলা দেশের সার্বভৌম অধিকার ঘোষণাকে সমর্থন করে পঞ্চাশ হাজার সংগঠিত কৃষক ভলান্টিয়ারদের শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ হল প্রতিরোধকে সামগ্রিক জনবৃন্দে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপ।

অন্যদিকে বালুচ, সিন্ধী ও পাখতুন জাতিসত্তাগুলি বাংলা দেশের সার্বভৌম অধিকারের সমর্থনে এগিয়ে আসবেই। তার লক্ষণও পরিষ্কট।

সামরিক কতৃপক্ষ যতই বলুন না কেন, তাদের পক্ষে স্বাধীন সার্বভৌম অধিকারের জন্য বাঙ্গালী জাতির এই দৃঢ় প্রতিরোধকে দমন করতে পারা সম্ভব নয়। কারণ যে কোন ঐক্যবদ্ধ জাতি যখন স্বাধিকারের জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করে, তখন শক্তি সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। তখন বিশ্বের সঙ্গে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ মানুষের, সংগ্রাম চলে। অর্থাৎ এই পরিবর্তিত সম্পর্ক বিরোধকে জনবৃন্দের উন্নত স্তরে উপনীত করে।

জনবৃন্দের বিজয় সম্পর্কে কোন (শেখাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

Introduction :

With a view to serve ever expanding Indian Industries, we offer to our industrial and domestic consumers 'BIDYUT' brand, trouble free, quality "Heat Sealing Machine" for Alkathene, cellophane, aluminium foil, waxed and paraffin laminated papers and all other materials which are capable of being thermally sealed.

UP TO DATE HEAT SEALER

The 'BIDYUT' hand set heat sealer is elegant in appearance and handy to use. Suitable for A.C./D.C. current. It is portable to enable it to be carried to where it is to be used. It is engineered for effective and efficient sealing of packets or bags which are unwieldy because of their weight or dimensions and for sealing long joints and seams.

Manufactured by BIDYUT ELECTRONICS.
Marketed by ANBI TRADING COMPANY
61, MOTT LANE, 1st FLOOR, CALCUTTA-13

পশ্চিমবঙ্গের নকল মুজিবুরের তালি-মারা মন্ত্রিসভা হচ্ছে

(দশম শ্রেণীর পূর্ববঙ্গের)

বাংলা দেশে যখন সামরিক স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষ রক্তে দাঁড়িয়েছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের নকল মুজিবুর কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পরে ধরে দেড়হাতি গামছা দিয়ে লম্বা নিবারদের ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছেন। মবলগ পাঁচ জনের দল-নেতা যদি মধ্যমশ্রী হবার বাসনা করে, তাহলে সেই দেড়হাতি গামছা দিয়ে সামনে ঢাকতে গেলে পেছন উদ্যম, পেছন ঢাকতে গেলে সামনে খোলা এই করুণ দৃশ্য দেখে কার মন না বিগলিত হবে?

তবু আমাদের নকল মুজিবুর আকাশে গদা ঘোরাচ্ছেন। আধ ন্যাংটোর বাউপাড়ের ডগ কি? দু'কান কাটা গেলে লোক সমাগমে কে আর লম্বা পায়?

“আমি মুজিবুরের মতই জিতব” বলে খবরের কাগজের তৈরী এই বীরপুঙ্গবটী হাঁকি ছেড়ে বাজার মাত করছিলেন। এবার মধ্যমশ্রীর গদী পাবার লোভে তাঁর গুরু মশাইকেও ছাড়িয়ে গেছেন। বরানগরে হাটু ভাঙ্গা দ' করেই লোকে তাকে ছেড়ে দেয় নি, সারা পশ্চিমবঙ্গের লোক অজ্ঞান মিথ্যা কথার হাড়ি, গান্ধীবাদী ভেকধারী ভুললোককে মাথার ঘোল ঢেলে মোটে পাঁচজনের দল বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু মধ্যমশ্রী তার চাই-ই। ইন্দিরা গান্ধীর দরবারে ধর্না দিয়ে অনেক ধূসকাঠি পোড়ানোর পর দেবীর আদেশ হয়েছে।

নাহার আমাদের নকল মুজিবুরের কাছে গো-হারা হয়েছেন। তিনি নাকি অবাঙালী, বাংলা দেশে নাকি তাকে মধ্যমশ্রী করা যায় না। তবে হ্যাঁ ডেপুটী হতে পারেন।

নকল মুজিবুর কিন্তু তার প্রধান সহকারীকে মন্ত্রিসভায় নিতে পারবেন না বলে কসম খেয়েছেন। সি পি আই বলে দিয়েছে তারা খাড়ার খাটামো আর সইবে না। এতোদিনের দুস্কর্ম সুস্কর্মের সঙ্গী! আহা! তাকেও ছেড়ে দিতে হল গদীর লোভে।

বাংলা দেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাকে সরকার গড়তে দেয়নি, তাকে ও তাঁর দলকে বে-আইনী করে দিয়েছে।

কিন্তু আমাদের নকল মুজিবুরকে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার দূর্শ আশী জনের মধ্যে পাঁচজনের ছেঁড়া দলের নেতা হওয়া সত্ত্বেও ডেকে মধ্যমশ্রী হবার সুযোগ দিয়েছে। যা তারা সর্ব-বহুং দদেল নেতা জ্যোতি বোসকে দেয় নি। দেখুন না গলতন্তের কি মহান দুস্কর্ম।

বাংলা দেশের শেখ মুজিবুর

রহমান ক্যাডাঙ্গলপন্থী কনভেনশন-পন্থী কোয়ার্টেমপন্থী তিন মুসলিম লীগকেই ধরাশায়ী করে বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নিশিচিৎ করেছেন। আর আমাদের নকল মুজিবুর বাইশ বছর পর সেই মুসলিম লীগকে অস্তিত্বহীন থেকে তুলে এনে নতুন ভাবে দেশে সাম্প্রদায়িকতাকে পুনরুজ্জীবন করার মহান ব্রত গ্রহণ করেছেন।

বাংলা দেশের নেতা শেখ মুজিবুর কেন্দ্রীয় সরকারের দখলদার ফৌজের সঙ্গে জড়াই করার জন্যে বাঙালী জাতিসত্তাকে সামরিক বুটের তলায় গুঁড়িয়ে দেবার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে অকুতোভয় সংগ্রাম চালাচ্ছেন। আর আমাদের নকল মুজিবুর কেন্দ্রীয় সরকারের দখলদার বাহিনী সি আর পি ও মিলিটারীকে এপার বাংলার জনগণকে গুঁড়িয়ে দেবার কাজে সেজ্ঞাসে আহ্বান জানাচ্ছেন।

ভাঙ্গামী গান্ধীবাদীদের বৈশিষ্ট্য বলে ধারা মনে করেন, তারা এতে আশ্চর্য হবেন না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ অত ধৈর্যশীল নাও হতে পারেন। তবু দেড়হাতি গামছা মার্কা মন্ত্রিসভায় অসংখ্য তালি মারতে হয়েছে। মেদিনীপুরের ছটি থানা ভবিষ্যতে বাড়শুভ প্রদেশ গঠিত হলে ছেড়ে দেওয়ার অঙ্গীকার, মুসলিম লীগকে কৃষি, শিল্পব্যবসায়, এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল দপ্তর ছাড়াও আরো দু'চারটি দপ্তর ছেড়ে দেবার অঙ্গীকার, সবেখন নীলমপি এস এস পি সদস্য কাশীকান্ত মৈত্রকে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর দিয়ে চলার দর বাড়াবার বন্দোবস্ত করার অঙ্গীকার, সুশীল খাড়াকে মন্ত্রী না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সি পি আইকে শূন্য করার অঙ্গীকার, গাইবান্ধুর আর চরকাধারীকে একই মেলাবার অঙ্গীকার, সি এস পি উন্নাংকেও তৈলপ্রদানের আশ্বাস—এতগুলি তালিমারার পরও আমাদের নকল মুজিবুর ফরওয়ার্ড ব্লককে ওপর তাম্পি দিয়েছেন ছয় মাসের মধ্যে আবার নির্বাচন করা হবে।

নব কংগ্রেসের রথীমহারথীরা যার হাতে হুকো রেখে তামাক খাবেন, সেই নকল মুজিবুরের এতে কোন লম্বা নেই। সি পি এমকে পেটাবার জন্যে তার হাত নিসর্পিস করছে।

কিন্তু তাতেও ঝামেলা। বিধানসভার অধিবেশন ডাকলে কি যে হবে কে জানে? গুরু প্রফুল্ল ঘোষ না-হয় করুণাময় ঈশ্বরের অপার করুণায় বেঁচে গিয়েছিলেন। নকল মুজিবুর কি করে তা সামলাবেন? তবে হ্যাঁ, ইয়াহিয়া খানের আওরামী লীগকে বে-আইনী করার মত সি পি এমকে বে-আইনী করে দিয়ে, তার সব এম

এল একে গ্রেপ্তার করে শূন্য বিধান সভা চালালে কেমন হয়?

ভালোই হয়। আমাদের অপূর্ব সংবিধানের গাই বাছুর-গোয়ালিনী মার্কা গলতন্ত যে কেমন চাঁজ খোলা চোখে লোকে তা দেখবার সুযোগ পায়।

আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দামুর নেতৃত্বে গাই বাছুর মার্কা কমুনিষ্ট পার্টি'কে আদি কংগ্রেসের পায়ের তলায় ঠেসে দেওয়া যায়। যেমন তিনি বরানগরে দিয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল প্রফুল্ল সেনের পদ-তলে শ্রীবিম্বনাথ মধুজ্যে'কে বে-

মানান লাগবে না। তাঁর দলের ও-রকম অভ্যাস হয়ে গেছে সাতঘটি সালে জনসংঘ, স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে ঘর করে। এখানেও একটি জনসংঘ আছে, একটি এস এস পি ও দুটি আদি কংগ্রেস রয়েছে নৈবেদ্য মাহি হিসেবে।

আর ফরওয়ার্ড ব্লক? এ দলে তো কমী নেই, শূন্য নেতা। সৈন্য নেই খালি জেনারেল। এতগুলি জেনারেল পাঁচ বছর ধরে বেকার বসে থাকবেন, তাতো হতে পারে না। সুতরাং তাদেরও আশ্বাস চাই, ছয় মাসের মধ্যে বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন করতে হবে।

নব কংগ্রেসের তরুণ নেতারাও অধীর। বেলা যে যায়। এবার যদি মন্ত্রী না হতে পারি, আর তো সময় পাওয়া যাবে না। একটা নব বাংলা কংগ্রেস করলে কেমন হয়?

কিকিমিকি চিন্তা মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে।

পিটার জামুরেলি একদা স্পেক্টর পত্রিকার লিখেছিলেন, যতরকম ভাঙ্গামী আছে তার মধ্যে ভাঙ্গের শাস্ত্রবাক্য আওরামোটা একদম, অসহ্য।

আমাদের নকল মুজিবুরও বাংলা দেশের মানুষের কাছে অসহ-ণীয় হয়ে উঠছেন।

অপমানের আন্তাকুঁড় থেকে তুলে এনে তাকে মধ্যমশ্রীর শিরোপা দিয়েছিলেন সাতঘটি, উনোস্তর সালে যে বাংলাদেশের মানুষ আজ তাদের কামড়ে দেবার সারমের বৃষ্টি তিনি অবলম্বন করেছেন।

আবার তাকে আন্তাকুঁড়ে ফিরে যেতে দেখলে কে আর অবাধ হবে?

গরমে চলুন
হালকা পায়ের

বাটার সানশাইন
চম্পলগুটির নকশাই এমন, যাতে হাঁওয়া
শেলেতে পায়, যাতে সারাদিন পায়ের লেগে
থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ।
সুস্ত্রী ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের
স্বাস্থ্যের কথা মনে রেখেই
তৈরি... আসুন না,
একবার প'রে দেখুন।

সানশাইন ১২
১০.৫০

সানশাইন ৭২
১১.১৫

সানশাইন ১০
১০.১৫

সানশাইন ২৫
১০.৫০

Bata

সানশাইন

বাতা

বৃদ্ধ বয়সেও
স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে

সাধনা চ্যবনপ্রাশ

বহুমূল্য আয়ুর্বেদীয় রসায়ন
সকল বয়সেই সম্মান উপকারী

প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

অথাক ডাঃ বোপেনডর বোব এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কর্মেজের রসায়ন শাস্ত্রের মুক্তপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র বোব, এম.বি.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত
হয়ে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি
বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ
বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট
থাকে।

১৯৮০-৮/১০

কংগ্রেস ও সি পি আইয়ের মিতালীর নেপথ্য কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নির্বাচনের কিছুদিন আগেই নব কংগ্রেস ও সি পি আই-এর মধ্যে আসন রক্ষা নিয়ে যে একটা মিতালী হয়েছিল সে সম্পর্কে নেপথ্য কাহিনী নিম্নরূপে সূত্র জ্ঞানা গেছে।

নব কংগ্রেসের নেতৃত্বে পশ্চিম-বঙ্গে সরকার গঠন করা হলে সি পি আই তাতে সমর্থন করবে কি না এ সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে বিভিন্ন পত্রিকার ভাষ্যকাররা প্রচার করার চেষ্টা করছেন যে সি পি আই নেতৃত্ব যেন স্বাধীনতা, নিজেদের বামপন্থী চেহারা বজায় রেখে একটি অ-মার্কসবাদী সরকারকে সমর্থন জানাতে তাদের নাকি সঙ্কোচ দেখা দিয়েছে। যাদের পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন সি পি আই নেতাদের গতিবিধির সঙ্গে পরিচয় আছে তারা এ ধরনের মন্তব্যে কৌতুক বোধ করছেন।

দর্পণের সংবাদদাতার অন্তত একজন উদ্বলোকের সম্পর্কে

আসবার সুযোগ হয়েছিল যিনি মিতালী গড়ার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সম্প্রতি তার এক বন্ধুর কাছে এই উদ্বলোক বলেছেন যে দেওয়ালে লেখা—“সত্যিই বিচিত্র এ দেশ সেলুকস। সি পি আই-এর সঙ্গে কংগ্রেস।” যারা লিখেছিলেন তারাও সব তথ্য জানেন না, মনে হয়।

কংগ্রেস প্রার্থী রূপে ইনি রাজ্যসভার সদস্য। কংগ্রেসী মহলে ইনি সি পি আই এবং সি পি আই মহলে কংগ্রেসী বলে পরিচিত। অনেক কিছু জেনে ইনি এখন “জানি কিন্তু বলব না” ভাব নিয়েছেন। তার আশঙ্কা সব কথা প্রকাশ হলে নেতাদের অনেকেরই প্রতিষ্ঠা নষ্ট হবে সাধারণ কর্মীদের কাছে।

ওর কাছ থেকে যেটুকু জানা গেছে তাতে ডাঃ রঞ্জন সেন সি পি আই-কে প্রতিনিধিত্ব করেন। নব

কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাভাজন নেতা ছিলেন প্রথম বৈঠকে।

খানাপিনা ও হত্যাপূর্ণ কর্ম-মর্দনের মধ্য দিয়ে বৈঠকটি শেষ হয়। তাতে মোটামুটি স্থির হয় যে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচনে নব কংগ্রেস অন্তত চারটি আসনে সি পি আই যাতে সহজেই নির্বাচিত হতে পারে সেজন্য কোন প্রার্থী দেবে না। এবং সি পি আই যাতে ভোট পার তার জন্য নব কংগ্রেস কর্মীরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে। ডাঃ সেন নিজেই অন্য এবং শ্রীমতী অরুণা আসক আলী, শ্রীহরেন মুখার্জি ও শ্রীহরেন গুপ্তার সাফল্যের জন্য নব কংগ্রেসের সমর্থন চান।

এর বিনিময়ে চম্পলটি আসনে নব কংগ্রেস যাতে সহজেই বিধান সভায় নির্বাচিত হতে পারে তার জন্য সি পি আই-এর তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। নব কংগ্রেস চাকুরিয়া কেন্দ্রে শ্রীসোমনাথ লম্বী-ডীকে বিনা সত্রে সমর্থন জানাতে চান। বিধান সভায় অন্য কোন কোন আসনে সমর্থন জানানো সম্ভব হবে সেটা স্থির করার জন্য দ্বিতীয়বার বৈঠকে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

লোকসভার আসনে নব কংগ্রে-

সের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিজে ডাঃ সেন কিন্তু হঠাৎ গা-ঢাকা দেন। অনেকে চেষ্টা করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

এর পরের আলোচনা প্রধানত টেলিফোনে এবং উপরের উদ্বলোকের মাধ্যমে হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দশটি বিধানসভা আসন সম্পর্কে সি পি আই-এর সক্রিয় সমর্থন আদায় করেই নব কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কারণ আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। যে দশটি আসনে সি পি আই কংগ্রেসকে সমর্থন করতে রাজী হন সেগুলি হল : শ্যামপুকুর, বেলগাছিয়া, রাসবিহারী, বালাগঞ্জ, কালীঘাট, গার্ডেনরীচ, জলপাইগুড়ি, বিদ্যা-সাগর, কবিতীর্থ ও দক্ষিণ বেলে-ঘাটা কেন্দ্র।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এর মধ্যে দুই-একটিতে সি পি আই-এর নিজেরও প্রার্থী ছিল। তাছাড়া তারি ফ্রন্টের শরিকদেরও প্রার্থী ছিল। পরে জানা গেছে, ডাঃ সেন এই প্রস্তাবে তার প্যারি কমীদের রাজী না করাতে পেরেই গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সংবাদ সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে একটা হতাশা এসে যায়। এর প্রভাবে দেখা যায় কয়েকটি কেন্দ্রে সি পি আই কর্মীদের প্রচার অভিযানে জিহ্মা বা অনেক-কেই বিশ্রান্ত করেছে। বিশেষকরে অশোকনগর, আলীপুর শটালী, জলপাইগুড়ি ও গার্ডেনরীচ এলা-কায় নির্বাচনী প্রচারণার সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট এমন অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে সি (সংবাদ ১ম পৃষ্ঠার)

ব্যক্তিহত্যা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

তখনও তারা বিরুদ্ধ শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সশস্ত্র সংঘর্ষে নেমে আসেন নি, সেই সময়ে কি এই মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করা উচিত? না, তা কখনোই উচিত নয়।

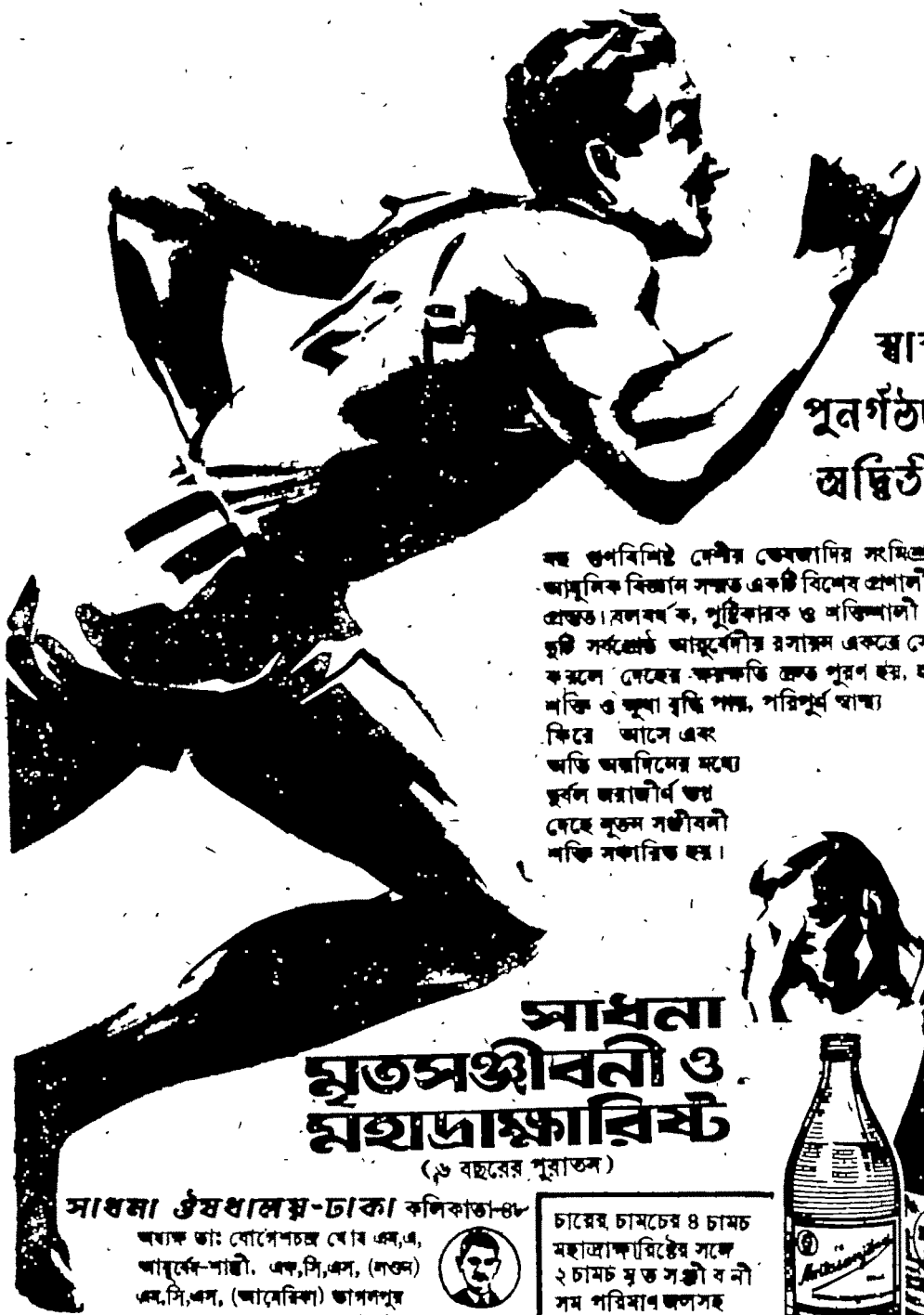
এই বিষয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সিদ্ধান্ত খুবই স্পষ্ট। সমাজবিশ্ববের গণসংগ্রামে বৈশ্ব-বিক হিংসার প্রয়োজন আছে। সেই হিংসা সংগঠিত জনসাধারণই সূচি-স্তিতভাবে, গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করে প্রয়োগ করবেন— জনসাধারণের নাম করে কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠী তা প্রয়োগ করবেন না। জনসাধারণ যদি বিচারে ভুল করেন, নেতৃত্ব তাদের ভুল বুঝিয়ে নিরস্ত করবেন। প্রাণহরণই বৈশ্ববিক হিংসা প্রয়োগের একমাত্র রূপ নয়—অনিবার্য, অত্যাশঙ্ক মনে হলেই প্রাণহরণ করা উচিত। জনসাধারণ যখন অসংগঠিত, কিংবা সশস্ত্র সংগ্রামের জোয়ারের মধ্যে নেই, বিপ-রীতে শত্রুপক্ষ যখন তুলনায় বেশি সংগঠিত, তৎক্ষণাৎ প্রত্যাঘাত করার জন্য প্রস্তুত অথচ জনসাধারণ প্রতি-রোধ করার জন্য প্রস্তুত নয়, সেই অবস্থায় প্রাণহরণ করতে যাওয়া প্রচণ্ড ভুল। শত্রু ভুল নয়—মার-ম্রক অপরাধ। সি পি আই (এম এল)—এবং অংশত এম সি সি—নেতৃত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই সিদ্ধান্তটিকে অমান্য করে, ব্যক্তি-হত্যাকে সকল সময়ের সাধারণ রপ-নীতি বা শত্রুচৌকির পর্ষায়ে তুলে দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছেন।

আজ এর পরিণাম কী দাঁড়িয়েছে? এই হর্মণীতি প্রয়োগের উদ্যোগ আজ বিপ্লবীদের হাত থেকে শাসকগোষ্ঠীর হাতে চলে গেছে। কখন কাকে দিয়ে কাকে খতম করা হবে—সেই সিদ্ধান্ত আজ পুলিশ নিচ্ছে, পুলিশের ইচ্ছামতো কাজ হচ্ছে। বিপ্লবীরা নির্বাক, অসহায় দশকের মতো দেখছেন—ছাপোষা পরিবারের

মানুষ সাধারণ পুলিশ খুন হচ্ছে, রাজনীতিক জগতে যাদের নীতি-নির্ধারণে কোনো ভূমিকাই নেই সেই অতিসাধারণ নেতা আর কর্মীরা খুন হচ্ছেন। এসবের ফলে বিপ্লবী শ্রেণীগুলির মধ্যে হতাশা বিস্তারিত সৃষ্টি হচ্ছে, ভীরা দিশেহারা হয়ে পড়ছেন, তাদের মন ফোঁজী বা আধা-ফোঁজী শাস-নকে বরণ করে নেওয়ার তৈরি হয়ে উঠছে। দেড় বছর ধরে “শ্রেণী-শত্রু খতম” করে যাওয়ার পর এই দাঁড়িয়েছে মোট। ফল-জমার ঘরে বিরাট একটা শূন্য।

চারু মজুমদার সম্প্রতি বলে-ছেন, ব্যক্তিহত্যার বৌকি কমাতে হবে। কমানো বাড়ানোর কথা নয় এই কর্মনীতি নিয়মকোডে সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ, বিপ্লবীরা বৌকি কমাতেও পুলিশ তা বাড়াবে—বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে পুলিশের পাঠানো লোক যারা আছে, তারা বাজারে বাজারে, বর্বর দমননীতির স্টীমরোলার অপ্রতিহত বেগে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য। তাই মানুষ-খুনের কর্মনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে আসতে হবে। এটা নৈতিবাচক দিক। ইতিবাচক দিক হল—প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক ব্যক্তি, গোষ্ঠী আর দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দমননীতির বিরুদ্ধে, বন্দী মুক্তির জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার আর রক্ষা করার জন্য ব্যাপক গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এই সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সি পি এম কর্মীদের সঙ্গেও লড়াইয়ের মরদায়ে একতাবদ্ধ হতে হবে—অতীতের সমস্ত বিশেষ রেয়ারেই ভুলে গিয়ে (যেমনভাবে মাও সে তুং জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য অতীতের কথা ভুলে গিয়ে কুওমিনটানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।)

ইন্দ্রিরা কংগ্রেস সরকার আর তার দালাল পার্টিদের বর্বর দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলাই হচ্ছে আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রলেতারীর রাজনীতির আশ-কর্তব্য।



স্বাস্থ্য
পুত্রগঠনে
অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ডেবজাদির সংমিশ্রণে আধুনিক বিজ্ঞান সম্রত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবৎক, পুষ্টিকারক ও সক্রিয়শীল এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেকম করলে দেহের ক্ষমকতি দ্রুত পূরণ হয়, হৃদয় শক্তি ও জুয়া বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য করে আসে এক অতি অল্পদিনের মধ্যে।

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাড্রাক্সারিস্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ বোপেনচন্দ্র বোস এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাণ্ডারপুত্র
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের দৃষ্টপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ বরেন্দ্রচন্দ্র বোস, এম.বি.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

চারের চামচের ৪ চামচ
মহাড্রাক্সারিস্টের সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সম পরিমাণ জলসহ
প্রত্যহ্ন দু'বার আহ্বারের
পর সেব্য।



SMM-2/65

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

দেবকে নিয়ে বারিকবাবুর চায়ের দোকানে উপস্থিত হলাম যখন, রেন্দ্রমাসির কথা দুজনেই ভুলে গেছি।

বাঙালী হওয়ার সুবিধে এই যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বেশিক্ষণ ভাববার দায়িত্ব বহন করতে হয় না। গাধার মতো বোকা আমরা ঢের বইতে পারি, পারি না শুধু নিজের ভালোর জন্য বিশেষ কোনো দায়িত্বের বোকা কাঁধে তুলে নিতে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের “কালিদাস”রা ছাড়াও পূর্ববঙ্গে বাঙালী আছেন। তারা শোষণের বিরুদ্ধে সমস্ত কুসংস্কার ঝোঁটের ফেলে আত্মোন্নতির জন্য রুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন। বাঙালী বলে গর্ব বোধ করেন। বাঙালার উত্তরা মাটিকে অবশ্বকশোষণের শয়তানি চক্রান্ত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য যা কিছু বঙ্গীয় তা ভালোবেসে নিজের সম্পদ হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী শাড়ির বদলে শূঙ্গি পরে স্বদেশী বর্জন ও বিদেশী আঙ্গিনের চ্যামনারির মধ্যে হীনজন্ম। তার বিকার ব্যতীত আর যে কোনোই কৃতিত্ব নেই, এসত্য তারা উপলব্ধি করতেও পারে না। ওপার বাঙালী সগর্বে বলে, এই আমার “বাঙলা দেশ” এই আমার “জয় বাঙলা” পোষাক। এই আমার বাঙলার কবি। এই আমার স্বদেশী গান।

ওরা যতকাল আছে, মনে তাই ভরসা আছে, বাঙালী নামক ঘর-জ্বালালে পর-ভালালে জাতটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। পশ্চিম এ পারে বাঙালীর আত্মবিশ্বাসিত যত নিলম্ব হব, পশ্চিম ওপারে তার ব্যক্তি তার চেয়ে ঢের বেশি দৃষ্টিমান হয়ে উঠবে। বাঙলা বেঁচে থাকলে ওখানেই বাঁচবে। বাঙলার জীবনানন্দ ঐ ধানসিঁড়ি নদীটির তীরেই আবার ফিরে আসার সুযোগ পাবেন। এপার বাঙলা দেউলে হয়ে গেছে। এপার বাঙলার কলকাতা তাই আমলা আর পুঞ্জপতির গদীতে কেরানী পয়দা করে যাচ্ছে। বড় বড় বুকনি শিখেছে। শেখেনি শুধু নিজেকে রক্ষা করার কায়দা। এ পারের নেতারা মিনিস্টারীর টোপে জীবনের যতবড় প্রাপ্তির গম্ব পান, ওপা-

রের শেষ মুজিবর নকলি প্রধান মন্ত্রকের খাচার ঢুকতে সেই পরি-মাণেই ঘৃণা বোধ করেন। আমি পশ্চিমবঙ্গীয়, নিজের ওপর তাই কোনো শ্রদ্ধা রাখিনা। আমি দেউলে হয়ে গেছি। আমি সচেতন মনেই সেকথা জানি।

আমি তাই খুঁজে খুঁজে সেই-সব প্রবন্ধ পড়ি যেখানে অনেক নিচু দরের পড়ুয়া বিলেতী বই বেঁচে কোটেশন কালেক্ট করে রবি ঠাকুরকে ছোট করতে জাহির চায় আর সেই সুবাদে নিজেকে পশ্চিমত বলে জাহির করার আনন্দ লাভ করে। আমি নিজের সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানার জন্য সর্বাপেক্ষা গর্ব বোধ করি। আমি দাদা এবং মনিব পাকড়তে না পারলে তাদের কাছ থেকে আদেশ নির্দেশ না আনতে পারলে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় আর নিঃসম্বল বোধ করি। আবার আমিই মুজিব-বর রহমানের “বাঙলা দেশে” যা ঘটছে তাই নিজে টেবল-তাতানো উদ্ভাস প্রকাশ করি। বহু চ্যামনারি মিলে আমাকে সৃষ্টি করেছে। আমি দ্বিবিদ নিশ্চিত যে আমার আর উপায় নেই। আমি তাই আমাকে নিয়ে কখনো তর্ক করি না। লজ্জা পাই। যেন আমি কলবন্দু। আমার কিছু পেতে নেই। চাইতে নেই। আমি বংশধর পয়দা করতে নীত হয়েছি, একামবতী সংসারের ঘানিতে যে সন্তান আরও একটি কল্লুর বলদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে মাত্র। আমি তাই হতাশার জয়-গানে সুখী।

কিন্তু আমি এসব কেন ভাবছি জানিনা। গ্রীষ্মের অনেক টেবলেই আমার বয়সী ছোকরার দল। চোঙা পাতলদুন। গালপাট্টা জ্বলপাট্টা। দ্বিবিদ পরিভূষিত সপ্তে চা ও ধূম পান করছে তারা। আমার মতো তাদেরও কোনো মানসিক অসু-স্থতা বা ব্যারাম আছে কি? এঁদের অনেকেই আমারই মতো সুপ্রতি-ষ্ঠিত নয়। একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত-রাই প্রতিষ্ঠা টিকিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না। ভাববার অব-সর ও বোকামি তাদের বিচলিত করে না। তথাপি এঁদের অনেকেই হয়ত জীবনের অন্যতর কেনা অর্থ খুঁজে পেয়েছে, না হলে মানুষের অবয়বে অমন পরিভূষিত আসতে পারে না। বিশেষ যৌবনকালে। তাহলে কি আমিই কোনোও অকৃত-কার্যতার দরুণ খামোকা জাতীয় চেতনার উদ্ভব হয়ে উঠেছি? একমাত্র সর্বহারাই সব সময় অকৃ-প্তির আগুন জ্বলে মরে; সুখী সমাজকে উত্থাপন করে।

দেবনাথ এতোক্ষণ আমার বিমর্ষ অনমনস্কতা লক্ষ্য করছিল ধীরভাবে, এখন সে হঠাৎ কেবিনের পর্দা সরিয়ে ডাক দিল, “এই সুদীপ্তা, এখানে এসো!” আমার

দিকে ফিরে বললে, “সুদীপ্তা, এখানে হঠাৎ?” যেন এসমুদায় ছেলে বলেই, তার ধারণা, সুদী-প্তার খোঁজ খবর আমি রাখি, এবং সুদীপ্তা এদিকে প্রায়ই আসে।

সুদীপ্তা আমাদের কেবিনে এল খপ করে বসে পড়ল। আমাদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টেপে বললে “তাহলে তোমরা দুটি মালিকজোড় এখনো চালিয়ে যাচ্ছে?” দেবনাথকে প্রশ্ন করল, “আমেরিকা থেকে ফিরলে কবে? তোমার স্ত্রী মিলি ছেলে মেয়েরা কেমন আছে? বীরেন, এখনো রাস্তার রাস্তায় মেয়েদেখা অভিজানে সবচেয়ে লাজুক ছেলে-টির ভূমিকায় সেই পুরোনো পার্ট-টাই করে যাচ্ছে না কি?”

আমি সাধারণতই একটু সরল এবং বোকার মতো কথা বলে ফেলি। দেবনাথ বলে, ওটা নাকি আমার আইবড়ো থাকার বদগুণ। মানুষ সময়ে বিবাহ না করলে “অপজিট সেকসেস”র সামনে একটু বিমূঢ় হয়ে যায়, মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকে বলা যেতে পারে, ষ্ট্রীডাবনতা।

তা সেইভাবে আমি বলে ফেললাম, “দেখে তো মনে হচ্ছে বিয়ের জলে তুমিও এখনো গা হলদে করনি, অথচ বিবাহিতা মেয়েদের মতই মৃদু হয়ে উঠেছ, ব্যাপার কি?” অথচ আমার ঠিক এই প্রশ্নটাই এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ সুদীপ্তার বিয়ে না করার কারণ আমার আর দেবুর চাইতে অন্য বেশি জানে না। সুদীপ্তার জীবনে একটা মহৎ ট্রাজেডি আছে। এবং তার কারণ আমাদেরই এক বিশিষ্ট বন্দু, অলোক বাগচী। অলোক সুদী-প্তাকে খেলিয়ে অথচ বিয়ে না করে সেই যে হল্যাণ্ড পালিয়ে গেল আর ফেরেনি। সে ধাক্কা সামলাতে না পেরে সুদীপ্তা বেছা বৈধব্য নিয়ে একটা বিদেশী ফার্মে রিশেপ-সিন্টের কাজ করছে। হয়ত কোনোদিন কোম্পানীর বোলসুয়ে সেও রুরোপে যেতে চায়। অন্য কিছু নয়, তার অলোক স্বদেশের লোক ভুলে বিদেশে কেমন পবিত্র ধর্মশোকটি সেজে বিদেশিনী ঘরণী-নিয়ে সুখে ঘর করছে তাই সে দেখে আসতে চায়। ঈর্ষা পঙ্গলিনী। তাই বোধহয় সুদীপ্তার এমন উন্মাদ ইচ্ছা। কিন্তু সে বাই হোক, আমার কথামতো নিম্পাপ হলেও ঘটনাচক্রে তার একটা ইঙ্গিতময় অভ্র বাক্যনা ফুটে উঠেছে। দেবু স্পষ্ট বিরক্তি বোধ করছে। আমিও নিজেকে কমা করতে পারছিলাম।

সুদীপ্তা মৃদুহৃৎর জন্য চুপ থেকে হেসে হেসেই উত্তর দিল, “আমি না হয় দাগা পেয়েছি। তুমি কারো মনে একটা স্লেট পেনসিলের দাগও টানতে পারলে কি?” দেবনাথ খাবড়া মেয়ে প্রশঙ্গ

চাপতে চাইল, “স্টপ ইট! নন-সেন্স!”

চোখের ওপর থেকে চুলের কুমকো সরিয়ে সুদীপ্তা বললে, “বেশ, তবে প্রশঙ্গ দাও। পলিটিকস সোসিওলজি ইকনমিকস, হিস্টরি...”

দেবনাথ বললে, “না হিস্ট-রিয়াল!”

“ওমা! আমরা যে এখানে কেউই ডাক্তার বদ্য নই।” সুদীপ্তা অকারণে একটু বেশি হাসল। সম্ভ-বত পূর্ব প্রশঙ্গ এখনো তার মনকে অধিকার করে আছে।

দেবনাথ বললে, “আমরা রেন্দ্র-বৌদির ওখান থেকে আসছি। দেশ থেকে তরুণী বৈধব্য বিতাড়ন সম্পর্কে আমরা খুব চিন্তিত। আমরা মনে করছি, কলকাতার বৃকে অনেক আন্দোলন হচ্ছে। অনেক মহিলা নারী সমিতি। অথচ নারী মুক্তির এই জ্বলন্ত প্রাণটি বিদ্যা-সাগর মশায়ের কাল থেকে আজ পর্যন্ত আর এক ধাপও এগোয় নি। আইনে বাধা নেই। কিন্তু ব্যাপারটা চালু হচ্ছে না। এ বিষয়ে মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। মিলি তোমাদের মতো শিক্ষিতা হলে তাকে সম্পাদিকা এবং রেন্দ্র বৌদিকে প্রেসিডেন্ট করে একটা তাজা মডেমেন্ট শুরুর করা যেত। কিন্তু বিধবা বিবাহ রীতিমত চালু করার উপায় সূত্র চাই।

সুদীপ্তা মন দিয়ে শুনল। বললে। “ধন্যবাদ। বিধবাকে কেন্দ্র করে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার আমা-দের আঁকড়ে আছে। এটাকেও উপড়ে ফেলা দরকার। মানুষের ওপর মানুষের মালিকানা বোধ এক্ষেত্রে লোকভয় ও লোকলজ্জার ভাবুতে নিঃশব্দে জীবন্ত রয়েছে।” আমি বললাম, “অথচ মজার ব্যাপার এই, ডিভোর্স পুরোদমে চালু হয়েছে। স্বামী বর্তমানে দ্বিতীয় পুরুষ বিবাহিতা হরণে তৎপর। কিন্তু মৃত স্বামীর জীবিত সম্পত্তির ওপর কেউ দখল-দার হওয়ার জন্য ব্যস্ত নয়।”

দেবনাথ হতাশভাবে বললে, “অত কাশের আইনও কোনো কাজে এলো না। এ বিষয়ে তোমার কোনো সাজেশন আছে?”

সুদীপ্তা একটু ভাবল। তার-পর তর্জনী তুলে বললে, “আর একটা আইন চাই।”

আমরা সপ্রশ্ন। সুদীপ্তা বলল, “বিপন্নীকরা পুনরায় বিবাহ করলে তাদের এক-মাত্র বিধবাই বিবাহ করতে হবে। না হলে দণ্ড।”

হেসে বললাম, “এবং বিপন্নী-করা বৈধব্য পালন করবেন, মানে পুরুষসমাজের চাপে করতে বাধ্য হবেন।”

ঠোঁটের ওপর তর্জনী ঠুকতে ঠুকতে সুদীপ্তা রাম দুই ভল্লিতে ভেবে ভেবে থেমে থেমে বলতে লাগল, “এক, ধূমপান ও পানীয় নিবন্ধ। দুই, মাছ মাংস চলাবে না। তিন, সাদা পোষাক পরতে হবে। মোটা খন্দর হলে সব চাইতে ভালো হয়। চার, বিবাহাদি উৎসবে তাদের সহায়তা অগ্রাহ্য হবে। ইত্যাদি।”

দেবনাথ বললে, “রুরেকা। এবার আন্দোলন!”

সুদীপ্তা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, “বাঁচা গেল। শুধু মন্ত্রকের আন্দোলনের মধ্যে কল-কাতা হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই যে শেকসপীয়র মনে করতেন, মানুষের যে কোনো একটি বৃত্তি বৃদ্ধ হয়ে উঠলে এবং সর্বাত্ম সুন্দর সমতা না থাকলে বিপন্ন ও ট্রাজেডী অনিবার্য হয়ে ওঠে, কলকাতার সেই অবস্থা। খুন খারাপি, অশান্তি এবং কথায় কথায় ‘বন্দ-এ’ মানুষ অতিষ্ঠ। আর্থিক দাবীর সঙ্গে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব-গুলিকেও একতালে এগিয়ে না নিলে, মানুষের মগজ ফাঁকা হয়ে যাবে। তখন হয় নেশার বৃদ হয় ধাকা, ক্ষেপে ধাকা, নয় কম্মিটি অবসাদ। আমাদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিকে ঝোঁক বাড়তে হবে। দেহ ও মনকে সমতালে এগিয়ে নিতে হবে। না হলে সুখী এবং শিক্ষিত আধাশিক্ষিত মগজ খোরাকের অভাবে নীতরে পড়বে। হতাশা পেয়ে বসবে। বিচার ক্ষমতা লোপ পাবে। তাকে পথ ভোলানোও সহজ হবে।

সুদীপ্তা হয়ত আরও কিছু বলত কিন্তু ঠিক এই সময় জনৈক হাতে একটি সামান্য টেলিগ্রাম নিয়ে প্রবেশ করলেন। সমস্ত গ্রীলকে স্তব্ধ করে একটি মাত্র নাম উচ্চা-রিত হল, “বাঙলা দেশ।”

বঙ্গবন্দু মুজিবর নিখোঁজ। পশ্চিমী শোবকরা পশুর মতো খাঁপরে পড়েছে কিস্কের রেকর্ড সৃষ্টি করা গণতান্ত্রিক জয়কে পর্বদস্ত করার জন্য।

টেবলে চায়ের কাপ পড়ে রইল। এপারের বাঙালী ওপারের অত্যা-চারিত বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রা-মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছে মুক বেদনার অনুভূতি নিয়ে।

আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালাম।

কেউ কি কিছু বলতে চান? অস্বস্ত। সকলেই সপ্রশ্ন। আবার প্রত্যেকেরই কী যেন বলবার কথা আছে।

দর্পণ

দেবনাথ সাপ্তাহিক

চাঁদার হার

বার্ষিক পনেরো টাকা
মাসিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাফাঁড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, নট লেন, কলি-১০

Free I, Free II, Free III

ধবল বা শ্বেত

আমাদের বিখ্যাত “দাদা সাক্ষাৎ” ১৯২৬ সাল থেকে রোঙ্গীদের সম্পর্কিত রোঙ্গ সাহিত্যে আসছে। মাত্র তিন দিন ব্যবহা-রেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়।

বিনামূল্যে এক শিশি

দেওয়া হয়।

WESTERN INDIA CO. (V.N.) P.
P.O. KATRI SARAI (GAYA)

সি পি আই (এম-এল)-এর প্রতি

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী কর্মনীতি অনুসরণ করার ফলে সি পি আই (এম এল) আজ গভীর সম্মুখে নিমজ্জিত। গণাভিত্তি বলিতে প্রকৃত কমিউনিস্টরা যাঁহা বুঝিয়া থাকেন তাহার ষড়টুকু ছিল প্রায় সবটুকুই নষ্ট হইতে চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলিতে কার্যত কিছুই নাই; আঞ্চলিক পরিসরেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনুপস্থিত; পার্টির মধ্যে যাহারা রাজনৈতিকভাবে কতকটা সচেতন তাঁহারা কোণঠাসা, অজস্র প্রশ্নে আন্দোলিত হইতে হইতে তাঁহাদের অনেকেই দিশেহারা; যাহারা রাজনৈতিক তত্ত্বের তোয়াড়া করেন না কিন্তু তথাকথিত অ্যাকশনে পটু, দলে এখন তাঁহাদেরই প্রধান্য, তাঁহাদেরই কর্তৃত্ব।

এই সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়ার পথ এখনও খোলা আছে। সেই পথ হইতেছে—

(এক) ব্যাপক জনসাধারণের কাছে প্রকাশ্যভাবে এবং অকপটভাবে ঘোষণা করিতে হইবে, পার্টি ব্যক্তি হত্যার পথ, ইংস্কুল-কলেজ আক্রমণের পথ ত্যাগ করিল।

(দুই) যাহারা পার্টিকে এই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের অতি অবশ্য অবিলম্বে নেতৃত্বের আসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। একটি পদনগঠন কমিটি নিয়োগ করিয়া সাময়িকভাবে সেই কমিটির হাতে দলের পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হইবে।

(তিন) স্তালিন-রচিত সোভি-

য়েত কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাসকে মূলভিত্তি করিয়া পার্টির মতাদর্শগত নব-শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে।

(চার) “জনযুদ্ধের সাহায্যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকুন”— এই রণধ্বনি লইয়া পার্টিকে কলে-কারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে, ইংস্কুলে-কলেজে, দপ্তরে, ছড়াইয়া পড়িতে

কাজকর্ম এবং প্রচারের সুযোগ যখন ষড়টুকু থাকিবে তাহা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকাশ্য রাজনৈতিক কাজকর্মকে একেবারেই বাতিল করিয়া দিয়া সবকিছুই গোপনে করবার পৌড়িবুদ্ধি প্রবলতাকে দমন করিতে হইবে।

(ছয়) শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুবক শিক্ষক অধ্যাপক, অফিস কর্মচারী, দোকানী পসারী—এই সকল অংশের প্রত্যেকটি সংগ্রামের সঙ্গে

মতামত

হইবে। মেহনতী মানুষের কোনো অংশকেই বাদ দেওয়া হইবে না—কিন্তু সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হইবে শ্রমিকশ্রেণীর উপর। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিনিয়োগ পাকাপোক্ত হইলেই কৃষকসমাজের মধ্যে অনেক ব্যাপক বিস্তৃত পরিসরে ছড়াইয়া পড়া সম্ভব হইবে। কৃষকসমাজের মধ্যে বৈপ্লবিক রাজনীতি প্রচারের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হইতেছেন শ্রেণীসচেতন শ্রমিক। মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যুবকের চেয়ে গ্রামবাসী শ্রমিক গ্রামের গরিব কৃষকদের অনেক ভালোভাবে জনযুদ্ধের রাজনীতি বুঝাইতে পারিবেন ও জনযুদ্ধের জন্য সংগঠিত করিতে পারিবেন।

(পাঁচ) প্রকাশ্য রাজনৈতিক

সামিল হইতে হইবে। সংগ্রাম-গুলিকে উচ্চস্তরে তোলার জন্য—মন্ত্রিসভাদীদের প্রভাব হইতে সংগ্রাম-গুলিকে উদ্ধার করার জন্য—নির-লস রাজনৈতিক অ্যাজিটেশন চালাইতে হইবে, নির্দিষ্ট ঘটনার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভাদীদের আসল রূপ খুলিয়া ধরিতে হইবে, এবং এইভাবে সংগ্রামী জনগণের মধ্যে ঐক্যের সংগ্রামগুলিকে কমিউনিস্ট চেতনায় ভরিয়া দিতে হইবে।

(সাত) সমগ্র পার্টিকে আত্ম-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে—সকল মোহ সংস্কার ত্যাগ করিয়া গত দুই বৎসরের কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ রিভিউ করিতে হইবে। মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মার্স চিন্তার কঠিনপাথরে উচ্চতম নেতৃত্বের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক

সুশীতল রায়চৌধুরী সম্পর্কে

গত উনিশে মার্চ তারিখের দর্পণে “সুশীতল রায়চৌধুরী” সম্পর্কে লিখিতে গিয়ে আপনারা আমার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে কিন্তু আপনাদের কোন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করেন নি। কলকাতার একখানি বিখ্যাত পত্রিকার একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি টেলিফোনে সুশীতল রায়চৌধুরী সম্বন্ধে অনেক কথা আমার জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সব কথার উত্তরও আমি দিয়েছিলাম। ভালো করে বোঝাবার জন্যে কিছু বেশীও আমি বলেছি। আমার এই টেলিফোনে দেওয়া বিবরণ হতেই বোধ হয় আপনারা আপনাদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। সাংবাদিক জগতে এই রকম রেও-ম্যাক যে চালু হয়েছে তা আমি তেরটি সালে প্রথম বুঝতে পারি। সেই সময়ে “আনন্দবাজার পত্রিকা”র জন্যে দেওয়া আমার একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেখেছিলাম পরের দিনের স্টেটসম্যান পত্রিকায়ও ছাপা হয়ে গেছে।

কিন্তু “মুজফফর সাহেবের চোখ ভিজে আসছিল” লেখার আগে আপনাদের ভাবা উচিত ছিল যে চোখ ভিজে ওঠাটা টেলিফোনে

দেখা যায় না। আমি প্রতিবাদ করছি এই জন্যে যে বন্ধু ও আত্মীয়-বিশ্রোগে আমার ভিতরটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, তবুও আমি চোখের জল ফেলতে পারি নে। চোখের জল ফেলতে পারলে তো আমি বেঁচে যেতাম।

একথা সত্য যে সুশীতল রায়চৌধুরী অনেক পড়তেন, তবে কথায় ও লেখায় তিনি তা প্রকাশ করতে পারতেন না। তাঁর জিহ্বার কেমন একটা সহজাত জড়তা ছিল। একথা আমি কখনও বলিনি যে মজুর-কৃষকের ভিতরে তিনি কোন দিন কাজ করতে পারেন নি। সাহিত্যিক সালের শেষ ভাগে কিংবা আর্টগিল সালের শুরুর দিকে বন্দীদশা হতে মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তখন তাঁকে সাংগঠনিক কাজ করার জন্যে হুগলী জিলায় পাঠানো হয়েছিল। তাঁর সম্ভ্রাসবাদী বিপ্লবী জীবনে হুগলী জিলা ছিল তার কর্মক্ষেত্র। তিনি বহুদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হুগলী জিলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। সেই সময়ে নিশ্চয় তিনি মজুর ও কৃষকদের মধ্যেও সাংগঠনিক কাজ করেছেন। সুশীতল রায়চৌধুরী সম্বন্ধে

বলতে পারেন এমন অনেক লোক এখনও হুগলীতে আছেন। কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা তো আছেনই। তাঁর আগেকার পার্টির অনেকেও জীবিত রয়েছেন। পার্টির প্রাদেশিক কমিটির কাজে তাঁকে আনা হয়েছিল উনিশ শ পঞ্চাশের দশকের প্রায় মাঝামাঝিতে। তখন তিনি নানা কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। শেষ উল্লেখযোগ্য কাজ তিনি করেছেন “স্বাধীনতা”র সম্পাদকীয় বিভাগে।

ষাট-এর দশকে সুশীতল রায়চৌধুরীর মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে থাকে। তিনি পার্টির ভিতরে থেকে পার্টিকে আঘাত হানতে লাগলেন। এর পরে তাঁকে পার্টি হতে বহিস্কার করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তিনি কোন পথ বেছে নিয়েছিলেন, আর কিসের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তা এখন সকলে জানেন। সে ভাবে তিনি পার্টি হতে বার হয়ে গেলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক জীবন যে ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল তা ভেবে আমার চিন্তা ব্যথিত।

মুজফফর আহমদ

সিমান্তগুলিকে ঝাড়াই করিতে হইবে।

(আট) গোষ্ঠীকেন্দ্রিক অহমিকা ত্যাগ করিয়া নির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে সকল বৈপ্লবিক ব্যক্তি ও সংগঠনের সহিত হাত মিলাইয়া কাজ করিতে হইবে।

নীরদ দত্তগুপ্ত

সি পি এমের রাজনীতি

সম্প্রতি দর্পণে প্রকাশিত “সি পি এম-এর রাজনীতি প্রসঙ্গে” অনিল মজুমদার লিখিত সমালোচনাপূর্ণ বক্তব্য আমার দৃষ্টিগোচরে আসিল। তিনি সি পি এম-কে “চোরের মা” বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন আত্মরক্ষার অধিকার সি পি এম-এর আছে কি না? যদি বলেন আছে, তবে সি পি এম কেন যে কোন দলই তা করবে এবং আত্মরক্ষার তাগিদে সি পি এম যদি অন্য কোন দলের উপর আঘাত হানে তবে কি সি পি এম খুশী? শ্রাইক ভাঙ্গা, নারী লাঞ্ছনা এইসব তো অজয়বাবুর বক্তব্য, আপনার মূখ থেকে বের হচ্ছে। অজয়বাবু যেমন এইগুলি প্রমাণ করতে পারে নি আপনিও তা পারবেন না। আর পাণ্ডা ইউনিয়নের যে কথা আপনি বলেছেন সেটা আপনার অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। শোষণবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে যে ইউনিয়নের নেতৃত্ব করছে, সেই নেতৃত্ব শ্রেণী সমর্থকতা এবং শ্রমিককে মালিকের পা চার্জ কুকুরে পরিণত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী সংগ্রামের তবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ইউনিয়ন গড়ে তোলা যদি অন্যায় হয়, তাহলে এইরকম অন্যায় আমরা করেছি এবং আরো করবো।

আপনি আরো লিখেছেন যে সি পি এম নকশালদের উপর পুলিশী অত্যাচার ঢেকে রাখে। আপনার বক্তব্য যে কতখানি অসত্য তার প্রমাণ রয়েছে অশ্বের শ্রীকাকুলামে। শ্রীকাকুলামে যখন নকশালীদের উপর পুলিশী নিপীড়ন চলছিল তখন সি পি এম এই পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে গজে উঠেছিল এবং এর বিরুদ্ধে পি, সুন্দরায়ীয়া ইন্দিয়ার কাছে পর্যন্ত পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া বেলে-ঘাটা, শ্যামপুকুর অঞ্চলে যখন পুলিশী নকশালপন্থীদের নির্মম ভাবে হত্যা করে তখন কি সি পি এম চুপ করে বসেছিল?

কিন্তু দুর্গাপুরে যখন আমরা দেব মা, বোনেদের ও শ্রমিকদের উপর নেমে এসেছিল পুলিশী অত্যাচার তখন চারুবাবু, বিশ্বনাথ-বাবু চুপ করে থাকলেন কেন? উপরন্তু জাপো চক্রর লোকেরা এবং এস ইউ সি, ফরোয়ার্ড ব্লক, প্রভৃতি দলের কর্মীরা পুলিশের গাড়ী চড়ে আমাদের কর্মীদের বাড়ী চিনিয়ে দিয়েছে, সি আর

পির সাহায্যে মা বোনেদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে।

অবশেষে আমি এইটাই বুঝতে পারলাম কোন দলের হয়ে বক্তব্য করার সংসাহস আপনাকে নেই। আপনি সর্বশেষে বলেছেন যে আপনি নকশাল তরুণদের ভালোবাসেন এবং তারাই দেশের ভবিষ্যত। আমার মনে হয় দেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রধান সাথী শ্রমিক, কৃষকের উপর আপনার কোন আস্থা নেই, দেশের শ্রমিক, কৃষক, দেশের ভবিষ্যত না হয়ে কতিপয় নকশাল তরুণ আপনার কাছে ক্লি করে দেশের ভবিষ্যৎ হলো সেটা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়।

স্বদেশ গদহ

মুক্তমেলা প্রসঙ্গে

আপনার দর্পণ পত্রিকায় “মুক্তমেলা” সম্পর্কে দু-একটা লেখা দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে। কিন্তু আজকাল “মুক্তমেলা” সম্পর্কে আপনারা একেবারে নীরব। এই মেলা যে তার বিষাক্ত হাওয়ার প্রভাব ক্রমশঃ কলকাতায় ছড়িয়ে দিতে চাইছে সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন।

“মুক্তমেলা” একদল অলস মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের সূচত্বর শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা শিল্পসংস্কৃতির নামে বাংলা দেশের যুবশক্তিকে এক বিদ্রী নেশায় আচ্ছন্ন করে দেবার চেষ্টা করছে। এই মেলার পরিচালকবৃন্দ (এই কথাটিতে আবার এদের ঘোরতর আপত্তি), যারা “আনন্দবাজার” গোষ্ঠীর সাহায্যপুষ্ট এবং সামান্য খ্যাতির প্রতি প্রবল আসক্ত, বলেন যে, “রাজনীতি নয় মুক্তমেলায় কামা”। অথচ তারা যে ভোটার পাশ্চাদের নিয়ে কিংবা নকশালপন্থী বিপ্লবীদের নিয়ে বিদ্রোহ-স্বক কবিতাগুলো লেখেন, তা কি রাজনীতি বহির্ভূত কিছু? সকলেই জানেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কোনদিনই চায়না যে, দেশের যুবকরা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করুক। কারণ, যুবকরা চিরদিনই প্রগতির পক্ষে প্রতিক্রিয়ার দুর্গকে চুরমার করে দেয়। এই ভয়েই প্রতিক্রিয়াশীলরা যুবকদের রাজনীতি থেকে সরিয়ে শ্রমিক-কৃষকের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিল্পের ব্যাপারে মস্ত করে রাখবার চেষ্টা করে। “মুক্তমেলা” যুব বিশ্বস্ততার সঙ্গেই এ কাজ করার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুক্তমেলায় গিয়ে একদিন দেখেছি যে, সেখানকার কবি ও শিল্পীরা লটারী ও নীলামের জঘন্য ব্যবসায় লিপ্ত। লটারী, নীলাম কোন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর পক্ষেই করা সম্ভব।

বাংলাদেশের যুবসমাজের ওপর আমার আস্থা ক্রমবর্ধমান। প্রতি-ক্রিয়াশীলরা তাদের প্রয়োজনে যেমন মুক্তমেলায় সৃষ্টি করেছে, প্রগতি-শীল যুবসমাজ যদি তেমনি ভার-

(দেখায়ে ১ম পৃষ্ঠায়)

বাংলা দেশের বিপ্লব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জন্য পৃথক মুসলিম রাজ্য শোষণ বন্ধ করে না—শোষণ নিহিত আছে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আর রাষ্ট্র কঠামো এই শোষণের রক্ষক আর তলিপ-বাহক। পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় মুসলমান দেখল পশ্চিমের শোষণ জেঁকে বসছে আর তাদের শোষণের তীব্রতা হিন্দু শোষণের থেকে গুণগত ভাবে পৃথক নয়। এদিকে দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে প্রায় অর্ধেক সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল, যেটা পশ্চিম পাকিস্তানে, বিশেষ করে পাজাবে অথবা সিন্ধু প্রদেশে ঘটে নি। হিন্দু জমিদার আর জোতদাররা দেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এল। সমস্ত শ্রেণী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল, কৃষকরা জমির মালিক হয়ে বসল। অর্থাৎ শিল্পায়নের তাগিদে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব তা প্রায় আপনা থেকেই হয়ে গেল। এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপর অংশ হল দ্রুত শিল্প সমাজের সৃষ্টি। তাহলেই এই বিপ্লব সার্থক হয়। আর তা না হলে সমাজে নানা সংঘর্ষ দেখা দেয়, বিরোধ বাড়ে।

পূর্ব পাকিস্তানের চাষী জমির মালিক হওয়ার ফলে গ্রামে গ্রামে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠল। ভূমিহীন চাষীর মধ্যে এক এক নতুন সম্ভার বোধ। চাষীর ছেলে মেয়ে স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রী হয়ে বিরাট এক নয়া মধ্যবিত্ত সমাজের অংশ হয়ে দাঁড়াল। সুদূর থেকেই তাই টানাপোড়েনের লক্ষণ; নতুন জোরার ধর্মের আবেগ আর মুসলিম লীগকে টিকিয়ে রাখতে পারল না। উনোপশাশ সালেই আওয়ামী লীগের জন্ম হল আর নয়া বিপ্লব বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এলেন

আওয়ামী লীগের নির্দেশ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মনি আর্ডার বিলি করার জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করবে। বিদেশী মেল সার্ভিস এবং সর্বশ্রেণীর বিদেশী টেলিগ্রাম সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে সরাসরি পাঠানো যেতে পারে। ইন্টার-উইং টেলিপ্রিন্টার চ্যানেল তিনটি থেকে চারটে পর্যন্ত অর্থাৎ এক ঘণ্টার জন্য খোলা থাকবে সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার শুধুমাত্র পশ্চিম নং নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন বাতী যাতে ব্যক্তিগত টেলিপ্রিন্টারে পাঠাতে ও গ্রহণ করতে পারে [আগামী সংখ্যার সমাপ্য]

সি পি আই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পি আই-এর বহুদিনের পুরাতন সদস্যদের নিজের ভোট দিতে যান নি, অন্যকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টাও ওঠে না। এর পরিণাম কি হয়েছে পাঠকদের নিশ্চয় অজানা নয়। নব কংগ্রেস এজন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু অবিস্বাসের বাজ় রয়েছে গেছে।

তখন উনিশ বছরের যুবক শেখ মুজিবুর রহমান। মুসলমান মেয়েরা ঘরের আরু ছেড়ে বেরিয়ে এল শিক্ষিতা হতে, নয়া জমানার উপবৃত্ত অংশীদার হতে।

ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু ঠিক এ জিনিষ ঘটল না। সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আরও জোরদার হল। বিখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ ও সমাজতত্ত্ববিদ গুদার মিরডাল তাঁর “এশিয়ান ড্রামা” নামক বই-এ লিখেছেন : “দেশ বিভাগের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু সম্প্রদায় মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানে আশ্রয় নিলেন। তারা কিন্তু তাদের বিপুল ঐশ্বর্যের বেশীর ভাগ অংশই সঙ্গে নিয়ে এলেন—আর নয়া মুসলমান রাষ্ট্রে এই ধন লক্ষী করে মনোহা করার বিরাট সুযোগ পেয়ে গেলেন। সিন্ধু, পশ্চিম পাজাব আর পাশা-পালি এলাকার বড় বড় জমিদারদের ঘাটি ছিল (এবং তাঁরাই কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নেতা হিসাবে প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন এবং সেই প্রতিপত্তি আজও অটুট)। পাজাবে জমিদারেরা শতকরা বাটভাগ জমির মালিক। আর সিন্ধুতে নতুন শোষণের প্রতিমূর্তি করত শত জমিদার ঐ প্রদেশের প্রায় সমস্ত আবাদী জমির মালিক। বিপরীতভাবে, পূর্ব পাকিস্তানে বেশীর ভাগ জমিদার ছিল হিন্দু। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এরা ভারতে পালান আর চাষী জমিদার দখল করে বসল। দেখা যাবে যে, জমির মালিকানার পাকিস্তানের দুই অংশে এই প্রভেদ শেষ পর্যন্ত দুই অংশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাট সংকট সৃষ্টি করল। পশ্চিম পাকিস্তান জমিদার বাড়ীর ছেলেরাই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেল, তারা প্রশাসনে আর সৈন্যবাহিনীতে বড় বড় অফিসার হয়ে বসল, তাদের লক্ষ হল নেতৃত্বের অর কঠোরময় শ্বিতাবস্থা বজায় রাখা। তাদের সামনে বিরাট তত্ত্বের সমস্যা—শ্রেণীগত রক্ষণশীলতা আর পশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষার সম্মুখীন।”

এই সমস্যার পশ্চিম পাকিস্তান করতে পারে নি বা করার জন্য মানসিক প্রস্তুতিও তার ছিল না। বার ফলে পূর্ব-পশ্চিম ফারাক ক্রমশঃ বেড়ে গেছে। একে আর সংকীর্ণ করা যাবে না কেবলমাত্র শ্রেণীগত কারণে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রমজীবী মান্দ্রব বাংলা ভাষাভাষী সমাজের নিরপেক্ষ। উনোপশাশ সাল থেকেই তারা দেখল অবাংলায় মুসলমানের ক্রমবর্ধমান দৌরাহা—অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বময় কৃষ্ণ। এদের লক্ষী আর শোষণের রক্ষার রাজনৈতিক কঠোরময় ভূমিকা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলায় লক্ষ করল, আর তখন থেকেই তার রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের সূত্র।

পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসাবে সূত্র থেকেই বিকাশ লাভ করে, কারণ সারা পূর্ব বাংলা পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমী লক্ষীকারীদের

নয়া শোষণ ভূমিতে পরিণত হয়। রাষ্ট্রকঠামো পাজাবী আর সিন্ধী মুসলমানের কবজার চলে যায়। আদি আমলের সেই সাম্রাজ্যবাদী কারদার পশ্চিমী শোষণ ও শাসন জেঁকে বসতে চায়। শিল্পের মালিকানা ছাড়াও বড় বড় চাকরী, কি প্রশাসনে কি সৈন্যবাহিনীতে, সব পাজাবীরা দখল করেছে। কারণেই আজম জিন্নাও এই শোষণের দাসে পরিণত হলেন। তাঁর চিন্তা ধর্মের জিগির তুলে নতুন মুসলিম রাষ্ট্র তৈরী করার। রাষ্ট্র গঠনের পর কি কর্মসূচী হবে তার কোন হাদিস তিনি দেন নি বা মুসলিম লীগেরও তা ছিল না। তাই নয়া শোষণের হাতে তিনি কবজা হয়ে গেলেন। প্রথমেই রাষ্ট্রের ভাষা কি হবে তাই নিয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হল। পশ্চিমী শোষণেরা সাম্রাজ্যবাদী কারদার বাংলায় “ইনকিয়ারার রেস” তত্ত্ব হাজির করে উদ্ভূত ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, বাংলা ভাষার সামনে দেখা গেল সমূহ বিপদ। প্রথমে প্রতিবাদের গুঞ্জন থেকে, বিরাট প্রতিরোধের ব্যাপ্তিকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠল বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, পশ্চাশ দশকের সূত্রভূমি। ইতিমধ্যে কারণেই আজম জিন্নার মৃত্যু হয়েছে, আর পাজাবী সিন্ধী শোষণেরা চক্রান্ত করে লিরাফ আলীকে হত্যা করেছে। পাকিস্তানের দুই অংশকে ধরে রাখতে পারার মত ব্যক্তিগতপন কোন নেতাই আর রইল না। ভাষা আন্দোলনে শোষণের প্রথম পরাজয় ঘটল—বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেল।

তখন থেকেই পশ্চিমীরা যুকে ছিল বাংলালীকে বাদ দিয়ে শাসন শোষণ চালান যাবে না। ভাষা আন্দোলনের সামনে পশ্চাশদশকের পর, পশ্চিমীরা নতুন কৌশলে বাংলায় নেতাদের একের পর এক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী-একটা অন্যান্য মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত করল। এইসব মন্ত্রীরা বুঝলেন মন্ত্রিত্বে গেলেও ক্ষমতার চাবিকাঠি আসলে পশ্চিমী শোষণের হাতে। এরাই নতুন সংবিধান হতে দিচ্ছে না—গণতন্ত্রের পূর্ব বিপ্লব লাভে এরা বাধা দ্বন্দ্বপ।

পূর্ব বাংলার অধিবাসী সমস্ত মুসলমান বুঝতে সূত্র করল যে, শোষণ-বিরোধী আন্দোলনকে বিপথগামী করার চক্রান্ত হিসাবেই সাম্প্রদায়িকতার বিবশোষণের কৌশলে লড়িয়ে দেয়। ইসলামের জিগির তোলায় পশ্চিমী চেষ্টা কোন সময়েই পূর্বে দানা বাঁধে নি। কাল্মীর নিয়ে পাক-ভারত বিরোধ পূর্ব পাকিস্তানকে পাজাবী শাসক-শোষণ গোষ্ঠীর সমস্যা আকারে দেখা দিয়েছে।

ছাপান সালের উনিশ ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন গণপরিষদে জনাব সোহরাওয়ার্দী শাসনতত্ত্ব বিলের ওপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানে সংবিধান, রাষ্ট্র চর্চা, জাতির সংজ্ঞা, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত করেন। সেই বক্তৃতার পূর্ব বাংলার বাংলায় মনসিকতা, আলা, আকাশ্যার কিছু পরিচর মেলে।

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে সোহরা-

ওয়ার্দি বলেন : “ভারত বিভাগের উদ্দেশ্যে যে শ্বিতাবাদের অবতারনা করা হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে তার তাৎপর্ষ বা নিগলিতার্থকে নজির হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। মুসলমানরা তখন বলেছিল : আমরা এক জাতি। কেননা বহু বিষয়ে হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য রয়েছে। ধর্মের দিক থেকে আমরা হিন্দুদের সঙ্গে আলাদা। আমাদের সাহিত্য আলাদা, আমাদের সংস্কৃতিও আলাদা। আদতে ভারত বিভাগের প্রয়োজনে আমাদের যুক্তিকে জোরদার করার জন্যই আমরা দাবী করেছিলাম : আমরা এক জাতি, আর বঙ্গবাকী সবাই আর এক জাতি। এটা ছিল পুরোপুরি অস্বীকার, কেননা ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে। কিন্তু এর নিগলিতার্থ হল এই যে, আমরা এমন একটি দেশ চাই যাতে মুসলিম প্রাধান্য থাকবে।

“আমরা যদি সেই ষিওরীটি আজ একেবারে বেলার প্রয়োগ করি, তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? তাহলে সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা হবে এক জাতি, হিন্দুরা হবে আর এক জাতি, পারসিকরা হবে আরেক জাতি, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রকৃতি বিভিন্ন ধর্মীর গোষ্ঠীরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক জাতি।” সোহরাওয়ার্দী সাহেব শ্বিতাবিত তত্ত্বের তীব্র বিরোধিতা করেও বলেন যে, পাকিস্তান একটি সুস্থ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে তখনই যখন এখনে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মান্দ্রব গণতান্ত্রিক অধিকার পায় আর তাদের অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত হয় একটি শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বারা। (এখন বলা প্রয়োজন যে, চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি মুসলিম লীগ যখন শ্বিতাবিত তত্ত্বের ভিত্তিতে তাদের দেশবিভাগের আন্দোলন চালিয়েছে তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই তত্ত্বের উগ্র সমর্থক। স্তালিনের জাতির সংজ্ঞা অপব্যাখ্যা করে কমিউনিস্টরা তাদের সমর্থনের যুক্তি শোষণের অপপ্রয়োগ চালায়। কলা বাহুল্য, সেই “জনবৃত্তের যুগে” কমিউনিস্টরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল, আর সোভিয়েত-বৃটিশ মিতালির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে বৃটিশ নীতি রূপান্তরে সাহায্যকারী। দেশের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এই সব পেটি-বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী দালালরা তখন মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা করেছে। মার্কসবাদকে ভারতীয় বাস্তবতার উপযোগী সূজনশীল দর্শন হিসাবে কোনও দিনই প্রয়োগ করতে পারে নি এই কমিউনিস্টরা। তাই বরাবরই এদের প্রাপ্তি, আর বরাবরই এরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে এই আন্দোলনকে বুর্জোয়া নেতৃত্বের কবলে যেতে সাহায্য করেছে। অপর পক্ষে ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বুর্জোয়া সার্মস্ত-নেতৃত্ব, কংগ্রেস পার্টি, নীতিগতভাবে শ্বিতাবিত তত্ত্বের বিরোধী হয়েও শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগের যড়যন্ত্রের সাক্ষী হয়েছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তদানীন্তন নীতির সহায়ক হয়ে। শেষ চেষ্টা হয়েছিল প্রথের শরণ বঙ্গুর নেতৃত্বে বাংলা বিভাগ বন্ধ করে সমাজ-

তান্ত্রিক বাংলা দেশ সৃষ্টি করার। এই ব্যাপারে এখনকার মুসলিম লীগ নেতারা, বিশেষ করে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও কৃষক প্রজা পার্টির জনাব ফজলুল হক এক মত হন শরণবাবুর সঙ্গে। মহাত্মা গান্ধীও এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী হিন্দু ও মুসলমান নেতারা (এদিকে ছওহরগাল নেহেরু, ডায় রাজেন্দ্র প্রসাদ ও কলভাই প্যাটেল আর ওদিকে জনাব জিন্না এবং জনাব লিরাফ আলি খান) সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজসে দেশ বিভাগে রাজী হয়ে গেলেন। আজকের বে সব সংবাদপত্র বাংলা দেশ আন্দোলনে প্রায় কাছা খোলা হয়ে উন্মত্ত হয়েছেন তাদের অনেকেই সেদিন বিভাগের দাবীতে সোচ্চার।)

(আগামী সংখ্যার সমাপ্য)

মতামত

(৬য় পৃষ্ঠার পর)

তের বিপ্লবকে স্বাধীনতা করার জন্য কিছু গাড়ীওয়াল, স্যুট-বুট পরা, লম্বা জুড়ীপধারী ধনীমন্দন এবং কিছু তরুণীসাজা বৃন্দা মহিলায় পরিচালিত এই মুক্ত-মেলায় ওপর আঘাত হানেন, তবে বাংলার বিপ্লবকামী মান্দ্রব হিসেবে আমি খুবই খুশি হবো।

অরুণ চক্রবর্তী

পুলিশ ও নকশাল

কলকাতা পুলিশের কঠোরদের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ (উনিশে ফেব্রুয়ারী) আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে। সত্যিই এর নজীর কোন দেশের ইতিহাসে নেই। আর এই হত্যার খোসারত দিতে হচ্ছে নিরপরাধ ভ্রম্যকরের তরুণ নকশালদের। এর চেয়ে মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর আর কি হতে পারে? এই মিথ্যা কারণে নকশাল হত্যার রাজনৈতিক ইশ্বন জুগিয়েছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসু এই বলে যে সাধারণ পুলিশ-দের নকশালরা হত্যা করেছে, পুলিশের দালাল নকশাল। অথচ সেই পুলিশের হাতে মরছে শুধু নকশালরা।

এপ্রসঙ্গে আগমার পত্রিকা মারফত চিন্তাহরনবাবকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। গ্রামে গ্রামে “সাধারণ পুলিশ” যে অথবা অত্যাচার চালাচ্ছে (গণশক্তি প্রকট) কৃষক ও কৃষকরমণীদের উপর তার প্রতিবাদ পুলিশ এসোসিয়েশন করছেন কেন? শহরে ধানার মধ্যে যে নিদারুণ অর্থনীতি যেআইনী অত্যাচার তরুণ নকশালদের উপর পুলিশ চালাচ্ছে তার প্রতিবাদ করছেন না কেন? দরিদ্র রিক্সাওয়াল, তরকারী বিক্রেতা, ফেরীওয়ালর উপর সাধারণ পুলিশ যে জ্বর-দস্ত অত্যাচার চালায় ও যুব নের তার প্রতিবাদ করা হচ্ছে না কেন? আর একটি প্রশ্ন সি আর পি কি অসাধারণ পুলিশ। তারা কি বিহার, ইউ পির কৃষক ঘরের ছেলে নয়? তাদের সম্বন্ধেই শুধু বলা হয় কেন? অজিত চক্রবর্তী

কল্পলোক স্বপ্নবিলাস

স্বপ্নাঙ্কশেখর রায়

“প্রতিবাদ”-এর নামক বিম্বজিৎ বাংলা ছবির সেই চিত্রাচারিত আদর্শবাদী যুবক, সমাজসংস্কারের তাড়ায় বাদের - নাওয়া-খাওয়ার সময় অবধি হয় না। সংসার প্রতিপালনের তুচ্ছ দায়িত্বও তার ওপর নেই। কোন আলাদিনের অদৃশ্য প্রদীপ এবং পাড়ার মৃদুর কাছে অফুরন্ত ধারের কল্যাণে সংসার বেশ জমিয়েই চলে। যদিও গল্পের প্রয়োজনে নামককে চাকরী করতেই হয়। কারণ না হলে তার সমাজ-কল্যাণে বাধা পড়ে। নামকের নমটিও খাসা, “মানব”-প্রতীক বঙ্গনা যেন উপছে পড়ছে। নামক মিউনিসিপালিটির ধাণ্ডাদের তদারকির চাকরী করে কিন্তু শহরের ময়লা পরিষ্কার করবার চাইতে বহুতাবাজি ও সম্মেলক সঙ্গীতেই তার আগ্রহ বেশি বলে মনে হয়। পবিত্রতার পূজারী সে, তাই মদ্যপান তার কাছে বিষয় পবিত্র। বেচারী হরিজন কলো-নারী লোকেরা কোথায় সারাদিন খেটেখুটে এসে আরামে বোতল নিয়ে বসবে, নামকের বুলিবুকে-নিব চোটে সে গুড়ে বাজি। পরি-যত্নে সন্ধ্যাবেলায় হ্যারিকেনের আলোতে কণপরিচয় শিক্ষা ও নামতা পাঠ। আদর্শবাদী নামক কিন্তু প্রেমের বিম্বজ্ঞ নয়। এত কাজের মধ্যেও সময় করে রোমান্টিক পরিবেশে একটি ডুরেট গান শোনাতে ভোলেনা দর্শকদের। অঙ্কের নিয়-মেই এরপর ভিলেনের প্রবেশ। ভিলেন বড়লোক, হোমরা-চোমরা, ব্যবসা জগতের মাতব্বর একজন; অতএব লম্পট এবং মাতাল। ভিলেনের প্রলোভনে নামকার সাময়িক চিত্তবিকল্য ঘটে। কিন্তু অচিরেই অনুতাপ ও পুনর্মিলন। তারপর নামকা-অপহরণ, ধস্তাধস্তি, খুন-ধারাপির পালা। পরিশেষে নারী-গাতা মধুসূদনরূপে “স্বপ্নং দেহি” ববে নামকের আবির্ভাব। অহিংস-পন্থায় কিস্বাসী বলেই বোধহয় নামক রক্তপাত আর ঘটানি, গলা

টিপেই ভিলেনের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। বাংলা ছবির আদিকাল থেকেই চলে আসা এই উপাখ্যান একটু রকমফের করিয়ে পরিবে-শিত “প্রতিবাদ” ছবিতে। সেই নাকিকামার সিচুয়েশন, কাঁচা, রগ-রগ, বস্তাপচা উপাদানে ভর্তি। সিনেমার কারিগরি দিকের কথা না তোলাই ভাল, কারণ কোন অর্থেই এই ছবি সিনেমা নয়।

প্রমোদ-বিতরণের আর এক জগাখিচড়ি নিদর্শন হচ্ছে “জয়-জয়ন্তী”। মোটামুটিভাবে “সাইন্ড অফ মিউজিক” এর ছাঁচে ঢালা, কিন্তু নকলনিবিশির দোষণগুলো আছে, মূলের গুণ ছিটেফোঁটাও নেই। বিলেত ফেরৎ কড় মেরা-জের লোক উত্তমকুমার। তার পাঁচটি দূরন্ত ভান্ডানভান্ডার গভর্নিস অপর্ণা সেন। প্রথমে নাকাল কর-বার চেষ্টা, পরে কিন্তু ছেলে-মেয়েরা তাদের আশ্রিত ভালবেসে ফেলল। হৃদয় হারালেন শত্রু মান্দুস মামাটিও। অতনুর পণ্ডশর গভ-নেসকেও রেহাই দিল না। ছবিতে মজার দিকটা একেবারেই উপেক্ষিত, বাচ্চাদের দম্ভুদমির দৃশ্যগুলোও কিরকম রচনা। ফ্যাকাশে। ছবিতে গান আছে অটেল, কিন্তু কথা ও সুর দুইই এমন উদ্ভট যে সেগুলো গান না ভূত-তাড়ানোর মন্তর বোঝা কঠিন। আর বোঝার ওপর শকের আঁটি আছে উত্তমকুমারের অসহ্য ইংরিজী সংলাপের ছররা।

“চৈতালী” ছবিটিও আর একটি এই জাতের কল্পলোকের স্বপ্ন-বিলাস-কাহিনী। বিম্বজিৎ নামক বন্ধ প্রেমিক ও আদর্শবাদের ধ্বজা-ধারী। পাহাড়ী মেয়ে তনুজার

প্রথম দর্শনেই প্রেমের সম্ভার। বিম্বজিৎ এখানেও স্কুল খুলে বসেছে, “হাসিখুশী”র পড়া আর প্রেমের পাট চলেছে একসঙ্গে। এই উদ্ভাদপদুরীর আর একটি উদ্ভট চরিত্র বৃদ্ধ নবাবসাহেব, কথার কথার বৈষ্ণব পসাবলী আর রবীন্দ্র-নাথ আওড়ান। অবশ্যই একটি ভিলেনও আছে, তবে ভাগ্য ভাল বোম্বাই চং-এ নামকের সঙ্গে তার কোন মিলবন্ধ নেই। ছবির আর সব কিছুই কিন্তু বোম্বাই মার্কা। সেই নাচ-গান হল্লা, ন্যাকা-ন্যাকা আধো-আধো প্রেমের ফিসফিস, পরিশেষে ধর্মের জয়, অধর্মের পরাস্ত এবং নামক-নামিকার সুখে স্বরকমা। পুরোনো, পুরোনো, একেবারেই পুরোনো।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেশি ছবি সম্পর্কে লিখতে গেলে ক্রোধ, ঘৃণা, দুঃখ, হিংসা কয়েকটা অন-ভূতিকে বাদ দিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন মাথায় খুন চাপে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন সিনেমাতে বস্ত্র ও আঙ্গিক নিয়ে উখাল পাখাল হচ্ছে, আমাদের দেশের যখন বিভিন্ন জীবন্ত সমস্যা পর্দার শিল্পরূপ পাবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে, বুদ্ধিবিকারের কোন আদিম স্তরে বসে এরা “প্রতিবাদ” “জয়-জয়ন্তী” “চৈতালী”র মত ছেলে ভুলোনো ছবি করেন। এসব ছবিও দেখতে হয়, লিখতে হয়, আলো-চনা করতে হয়। কতদিন! হা ইশ্বর! আর কতদিন?

গণ-প্রতিরোধ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সন্দেহ নেই। তবু একথা আমরা জানি পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতি-সত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পথ সহজ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অনেক প্রাণ, অটেল রক্ত দানের বিনিময়েই দীর্ঘ-কালধারী জনবৃন্দে জনগণের চূড়ান্ত বিজয় লাভ সম্ভব হবে। ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাস-নকে যে জনবৃন্দের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার শিক্ষা এই যে জনগণই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের অধিকারী, অস্ত্র নয়।

চূড়ান্ত বিজয়ের উপর আস্থা রেখেই বাংলা দেশের অগণিত সাধা-রণ মান্দুস সংগ্রাম চালাচ্ছেন। তাঁদের সাফল্য সহজ নয়। কিন্তু সুনিশ্চিত।

নান্দীকারের তিনটি একাক্ষ

অবেশ দাস

একসময় নাট্য প্রযোজনায় নান্দীকার আভিনয়িক সাফল্য অর্জন করে থাকলেও সর্বাপেক্ষা কুশল সার্থকতার যেন অভাব ঘটেছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত “পূর্বরাগ” নাটকটি কোন এক যুবকের ভালবাসার পরিণত প্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে আকাশার চেয়ে গৌরবজনক ভাবে দীর্ঘ হয়ে ওঠার কাহিনী। অর্থাৎ যুবকটি কিভাবে হিংস্রতা নিষ্ঠুরতাকে ছাড়িয়ে ঐশ্বরিক প্রসারতায় উদার হয়ে উঠেছে, তাই এই নাটকের প্রাণ-বস্তু। নাটকের ভাব পরিমন্ডলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কলাকুশলীরা অভিনয়ে সফল হয়েছেন। অভিনয় করেছেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেসা চক্রবর্তী, স্বপ্নজিত বোষ।

পরবর্তী একাক্ষ তুলসী লাহিড়ী রচিত “আলোর বাইরে” অভিনয়ীদের সামাজিক মূল্যবো-ধের নাটক। কলাকুশলীরা যতক্ষণ মগ্ন ততক্ষণই তাদের কদর। মগ্নের বাইরে অর্থাৎ আলোর বাইরে এলেই তারা এক একটি স্বাধীনতাবাদী সজীব শরীর মাত্র। যারা একদিন দর্শকের অন্তঃসারশূন্য হাততালিতে মগ্নের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, বোবোনোস্তীর্ণ বয়সের নিম্নমতায় আজ তারা অপমানিত ও অবহে-লিত—এই নাটকে সবকিছুই স্থায়ী চরিত্র। এরা প্রত্যেকেই নির্দেশমত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেসা চক্রবর্তী, দীপালি চক্রবর্তী ও লতিকা বসুর অভিনয় চিত্রিত।

সবশেষে ইউজিন আয়োনেস্কোর “দ্য গেসন” অবলম্বনে উদয়ন বোষের “নীলিমা” এই একাক্ষের মঞ্চে সর্বাধিক সার্থক নাটক। অধ্যাপক ছাত্রীর এক আপাত কিস্তৃত ঘটনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও অন্তঃসারশূন্যতার মৈত্রী বন্ধনকে উপস্থিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের “তোতাকাহিনী”র সঙ্গে এই নাট-কের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। অভিনয়ে অধ্যাপক চরিত্রে পরিমল মন্ডোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য হরতে হয়।

উল্লিখিত নাটকগুলির মধ্যে একটিরও বস্ত্র আধুনিকতম জিজ্ঞাসায় উদ্ভীর্ণ হতে পারে নি। অর্থাৎ নাটকগুলি সমকালীন সম-স্যাকে স্পর্শ করে থাকলেও, তার পরিবর্তিত সাম্প্রতিক চেহারা কে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন আলোর বাইরে নাটকটি তুলসী লাহিড়ী বহুকাল আগে লিখে-ছেন। তৎকালীন বস্ত্র পরিণত বয়স্ক কলাকুশলীদের সমস্যার সঙ্গে একালের শিল্পী সমস্যার অন্তর্গত গভীরতার দূরত্ব ব্যব-ধান। সুতরাং শুধুমাত্র পর-

বর্তী জীবনে শিল্পীর দায়িত্ব এবং নতুন শিল্পীদের দম্ভ আর নাসিকাকুণ্ডন দিয়ে সে কথাতাকে মূর্ত করে তোলা সম্ভব নয়। বরং এক্ষেত্রে সমস্যার আংশিক ছবি তুলে ধরার অর্থ শিল্পী সমস্যাকে ব্যঙ্গ করা। এ জন্যে দারী নাট্যকার নন। নাটক নির্বাচন যারা করেন তারা। সমস্যার সমকালীন পরি-প্রেক্ষিতে যে কোন নাটকের আধ-নিকায় প্রয়োজন।

এমন কি “নীলিমা” নাটকটির ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে। তোতা-পাখীকে বুলি শেখানোর কোশল দিয়ে কোন আধুনিক অধ্যাপকের প্রতিকী চরিত্র চিত্রিত করতে গেলে শিক্ষার্থীর পীড়িত মানসের প্রতি অবহেলা করা হয়। শুধুমাত্র অন্তঃ-সারশূন্য শিক্ষাকে গলাধঃকরণ করার চাপ দিয়ে শিক্ষার্থীর পীড়িত মানসকে ক্ষুদ্রিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তাছাড়া শিক্ষক শিক্ষার্থীর জটিল সম্পর্ক, বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতি গুণাগুণগুলি অধ্যাপকের সৃষ্টিতে একান্ত প্রয়োজন।

আভিনয়িক প্রকণতা যখন নাট্যক্ষেত্রের শিরা উপশিরাকে ছাড়িয়ে যায় তখন সে অভিনয়ে দর্শক মজানো সম্ভব হলেও, নাট-কের প্রাণকেন্দ্র আড়াল হয়ে পড়ে। বস্ত্রত নান্দীকার এই মনমাতানো অভিনয়ের প্রতি অতিমাত্রায় প্রলুপ্ত হয়ে পড়েছেন, নান্দীকারের সাম্প্র-তিক অভিনয়রীতি মনমাতানো হলেও, সে অভিনয়রীতির অবশ্যই বদল হওয়া প্রয়োজন, অন্ততঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কতীত নান্দীকারের কথা ভেবে। সেজন্য, আমার মনে হয়, অজিতেশবাবুর উচিত গোষ্ঠী-উত্থ নিজে-জকে ভেঙ্গে দেওয়া। সেজন্য গোষ্ঠীর অভিনয়ে তার অন্ত-ভুক্তি যদি বাতিল করতে হয়, তাও করতে হবে। নতুবা এই রক্ষণশীল বন্ধনের যদি অন্য কোন ভাবে মূর্তি হয় তাতেও কোন আপত্তি নেই।

‘দেশ তো এখন হুমসার পুখারী।
কুস্পিত করে নেছে। সত্যকার
দেশের ছবির তো শুধু বেঁচে আছে
আমাদের বুক।’

চতুরঙ্গের/স্বপ্নাঙ্কশেখরী নাটক

চাঁদ
বণিকের
পালা

নির্দেশনা : বরুণ দাশগুপ্ত
পরবর্তী সংখ্যার বিজ্ঞাপন দেখুন

মিনার্ভার সংগ্রামী কর্মীদের প্রযোজনায়

নতুন নাটক **প্রবাহ**

নাটক : অমিতাভ গুপ্ত

পরিচালনা : ইন্ড্রজিৎ সেন (চারপদল)

মুক্তি : ৩৩ (পাদপ্রদীপ)

শুভমুক্তি—১লা বৈশাখ

মিনার্ভা থিয়েটার

৫৫-৪৪৮২

সম্পাদক—হীরেন বসু

কল্পলোক কবিতা-মতলী ইন্ড্রজিৎ সেন ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোরার কলিকাতা-১০ থেকে দুইটি এবং ৩১ম নং সেন, কলিকাতা-১০ দর্শন কর্মীদের থেকে প্রকাশিত

দপন

বাংলা দেশে সশস্ত্র
প্রতিরোধের শ্রেণীতত্ত্ব

চাপকা সরকার

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের করে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে
বিবর্তন সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলল হিন্দু জমিদার ও শিল্প-
আগের সপ্তাহে দর্পণে প্রকাশিত পতিদের শোষণ থেকে মুক্তি পাবার
হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, জন্য। কিন্তু নতুন মুসলিম রাষ্ট্রে
বাংলায় মুসলমান জান কবুল (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

যশোর খুলনা জেলার মাওবাদীরা মুক্তিযুদ্ধ এবং পার্টির

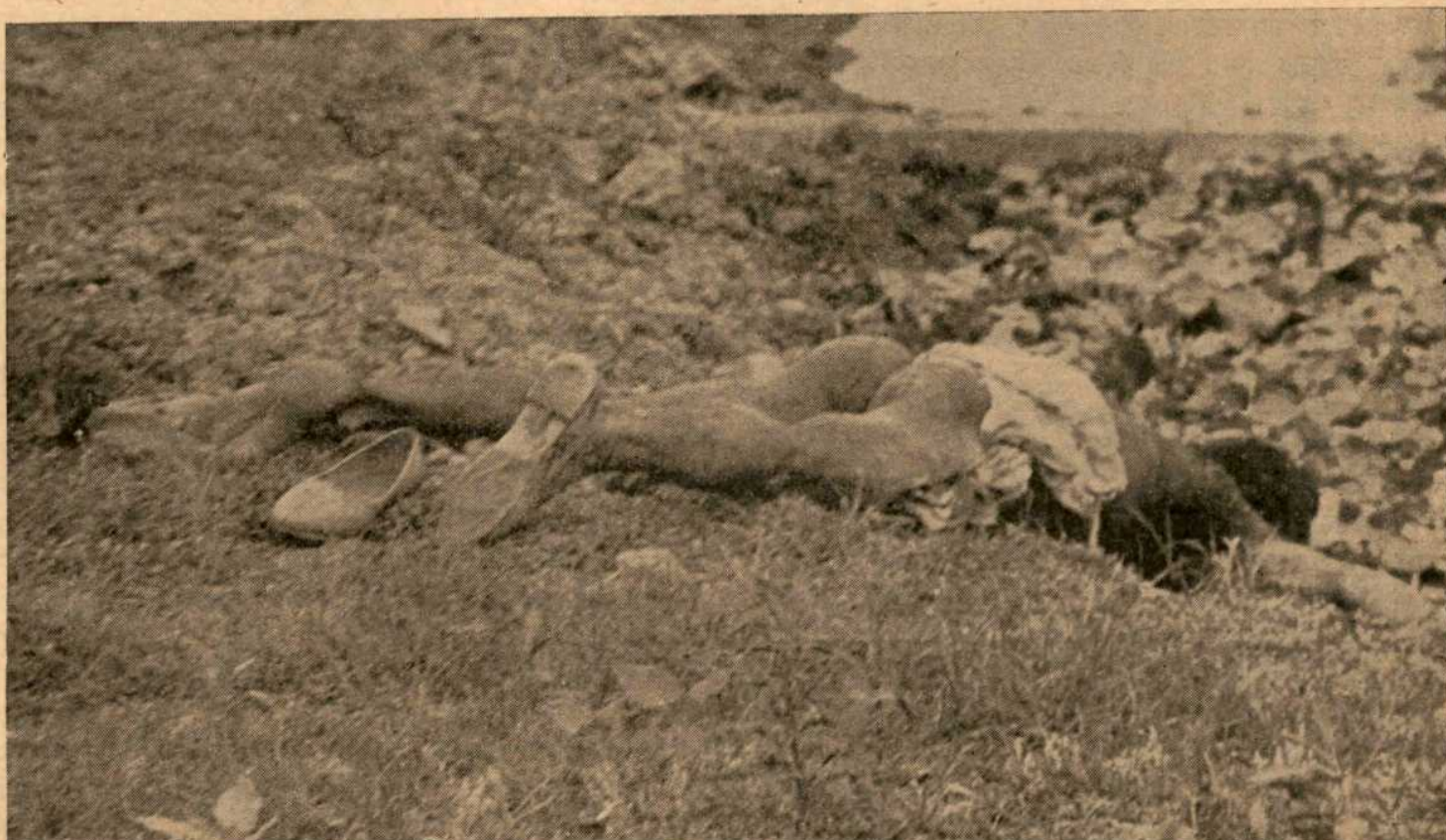
সংগঠন

তৈরী করছেন

(দর্পণের বিশেষ সংবাদদাতা)

(সম্প্রতি যশোর ও খুলনা জেলার
যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে এসেছেন)

যশোর ও খুলনা জেলার মুক্তি-
যোদ্ধাদের মধ্যে মাওবাদের প্রভাব
বিশেষ লক্ষণীয়। যশোর সহর
পাকিস্তান সৈন্যের একটি শক্তি-
শালী ঘাঁটি। কিছুদিন কয়েক-
হাজার মুক্তিযোদ্ধা সহর দখল
করে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর
পনরো হাজার সৈন্যকে ক্যান্টনমেন্টে
অবরোধ করে রেখেছিলেন। কিন্তু
পাকিস্তানী সৈন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে
পাল্টা আক্রমণ করলে মুক্তিযোদ্ধা-
দের সহর ছেড়ে আসতে হয় এবং
তারা এখন সহর থেকে চারমাইল
দূরে গ্রামগুলিতে ছোট ছোট ঘাঁটি
(শেখাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)



মাঝে মাঝে পাক সৈন্যরা গ্রামের আশেপাশে এসে এলোপাথাড়ি গুলি করছে। এইরকম মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে
চারদিকে। আর শহরে মৃতদেহ স্তুপাকার ৥ ছবিঃ নিখিল ভট্টাচার্য



মস্কোয় পার্টি কংগ্রেসে

‘বাংলা দেশে’র কমিউনিষ্টদের বক্তব্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ থেকে একদল কমিউ-
নিষ্ট এখন মস্কোয়। ওরা
সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির
চব্বিশতম কংগ্রেসে যোগদান কর-
ছেন ভ্রাতৃত্বমূলক সদস্য গোষ্ঠী
হিসাবে।

এদের মধ্যে অনেকেই হালে
জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন দীর্ঘ
কুড়ি বছর পর। নতুন বাংলাদেশের
অস্থায়ী সরকার প্রথমেই এদের
ছেড়ে দিয়েছে। কেউ কেউ সরা-
সরি জেলের দরজা থেকে অস্ত্র
নিয়ে রগাংগনে, আর নেতৃস্থানীয়
কয়েক জন মস্কোয়।

পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টি
দীর্ঘ কুড়ি বছর বেআইনী আছে।
অনেকে জেলে, কেউ নিহত হয়ে-
ছেন, আবার কেউ দীর্ঘ অত্যাচারের
পর পঙ্গু হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের
কমিউনিষ্ট পার্টির নেত্রী ইলা
মিত্রের উপর পাক পুলিশ মিল-

টারীর অমানুষিক এবং পাশবিক
অত্যাচারের কথা এখনও হয়ত অনে-
কের মনে আছে।

বাংলা দেশের যারা মস্কোয়
গেছেন তাঁদের দাবী অবিলম্বে
তাঁদের দেশের অস্থায়ী সরকারকে
সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বীকৃতি দিক,
এবং তারপর অস্ত্র সাহায্য।

তারা ওখানে একটি রিপোর্ট
পেশ করেছেন। তাতে ওদের
বক্তব্য যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও
ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো
বাংলা দেশের এবং পাকিস্তানের
গণ আন্দোলনের প্রতি কোন সম-
র্থন জানায় নি। বরং শাসক-
শোষকদের নানা সাহায্য করে
এসেছে। এই ভাবে সাহায্যপুষ্ট
হয়ে শোষকরা তাদের অত্যাচারের
পরিধি ও গভীরতা নিঃসঙ্কোচে
বাড়িয়ে গেছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে
(শেখাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

বাংলা দেশের সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে বিদেশী সংবাদিকদের আভিমত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বেশ কয়েক ডজন বিদেশী
রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার আর টেলি-
ভিশনের লোক কলকাতায় আগ্রয়
নিয়েছেন বাংলা দেশের সশস্ত্র গণ-

অভ্যুত্থানের কথা সারা বিশ্ববাসীকে
জানাবার জন্য। এদের মধ্যে অনেকে
আছেন যারা পৃথিবীর বিভিন্ন
দেশে এই ধরনের বিপ্লব দেখে-
ছেন, সেই সম্পর্কে লিখেছেন আর

বিপ্লব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন
করেছেন।

এদের সকলেরই প্রায় একই
আভিমত যে, বিপ্লবের নজীর
(শেখাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

সশস্ত্র প্রতিরোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নতুন মুসলমান শোষক শ্রেণী গড়ে উঠল। পশ্চিম পাকিস্তানের বড় জমিদার আর মূলধন খাটিয়ে মুনাকালোভীদের সমন্বয় এই শ্রেণীতে। এরা পূর্ব বঙ্গে সমস্ত কিছু কব্জা করতে চাইল, ইসলামী ঐক্যের জিগার তুলে। পূর্ব বাংলার মানুষ আস্তে আস্তে বুঝল যে, এই ধর্মের জিগার শোষণ কার্যে রাখার বড়বস্ত্রের এক অংশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সোহরাবর্দির ছাপায় সালে গণপরি-পরিষদে বক্তৃতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একে-বারে মূলে চলে গেছেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, স্বিজাতিত্ব ধোপে ঠেকে না, ধর্ম-নিরপেক্ষ শোষণমূলক রাষ্ট্র কাঠামোর দরকার আর এর জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্র কার্যে করার।

অর্থাৎ সোহরাবর্দি বাংলায় নয়া কিন্তু দুর্বল পুঁজিবাদীদের মুখপাত্র হিসাবে গণপরিষদে সামন্ত শোষণ থেকে মুক্তির কথা বলেছেন, ধর্মীয় রাষ্ট্রের বদলে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলে-ছেন। তখন থেকেই এই

নয়া পুঁজিবাদীরা বাংলায় জাতীয়তাবাদী-আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায়। লক্ষ্যের প্রয়ো-জনীয় পুঁজির অভাবে এই নয়া পুঁজিবাদীরা তখনও শিল্প-পতি হওয়ার চিন্তায় ব্যাকুল নয়। তারা চায় বাণিজ্য যাতে এর মার-ফৎ তাদের প্রয়োজনীয় পুঁজি সৃষ্টি হতে পারে। তাই বার বার দাবী উঠেছে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান প্রদানের বিধি-নিষেধ রদ হওয়া দরকার। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা এই ব্যবস্থায় রাজী হতে পারে নি, কারণ পূর্ব পাকিস্তানে বাণিজ্যে তাদের মোটা মুনাফা আসে। আর তা ছাড়া পূর্ব-পশ্চিম বাংলার বাণিজ্যিক আদান প্রদানে পশ্চিম-বঙ্গের পাট শিল্পের সুবিধা হবে এবং সেই অনুপাতে পশ্চিমীদের কব্জায় পাট শিল্পের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি হবে।

এই ভাবে নানা টানপোড়ে-নের মধ্যে পূর্ব বাংলার নতুন রাজ-নৈতিক চেতনার উন্মেষ হতে থাকে। এতে চাষীরাও জড়িয়ে পড়ে, কারণ তারা তাদের ফসলের মাছের আর

অন্যান্য যা কিছু কৃষিতে উৎপাদন হয় তার বেশী দাম পেতে ইচ্ছুক। পশ্চিম বাংলার সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগে বড় মধ্য চাষীদের স্বার্থ আছে। এরা তাই বাংলায় নয়া পুঁজিবাদের স্বাভাবিক দাবীতে সামিল। অনুরূপভাবে বাংলা দেশের নতুন মধ্যবিত্ত সমাজও। তারাও বাংলায় বাজার বিস্তারের ফলে বর্ধিত সুযোগ সুবিধার সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ।

তাই বাংলায় স্বাভাবিক দাবীতে সকলে এগিয়ে আসে, গ্রামের ছোট বড় চাষী ও জমির মালিক, নয়া পুঁজিবাদ, মধ্যবিত্ত ও মেহনতী জনসাধারণ। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব আসে প্রধানতঃ এই জমির মালিক, নতুন পুঁজিবাদ ও মধ্য-বিত্তের মধ্যে থেকে। ধনতন্ত্র বিকা-লের প্রথম যুগে এরা অবশ্যই প্রগ-তিশীল। তাই আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী ভূমিকা ঠিক মেহ-নতী মানুষের শ্রেণী সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি। কিন্তু তবুও এই ভূমিকা জাতীয়-তাবাদী আন্দোলনে পশ্চিমী সাম্রা-জ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে বাধা স্বরূপ নয়। এমনকি প্রতিরোধ সশস্ত্র আকার নিলেও। যদি পুঁজি-বাদী নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী হত, যেমন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের যুগে ছিল,

তাহলে এই নেতৃত্ব সশস্ত্র প্রতি-রোধের পক্ষে কোন মতেই জন-সাধারণকে নামতে দিত না। পশ্চিমীরাও নতুন রাষ্ট্রে উন্মুক্ত-শোষণের সুযোগে আশ্বহারা। তারা এখনও বুঝতে শেখে নি যে শোষ-ণকে মানুষের প্রতিরোধ থেকে বাচতে গেলে কিছু রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। ভার-তের পুঁজিবাদীরা এদিক থেকে অনেক পোক্ত, তাদের এ ব্যাপারে কোন গোলমাল হয় নি। তাই পাকিস্তানে মুসলিম লীগের মত, ভারতে কংগ্রেস পার্টি মানুষের আন্দোলনের মুখে লেজে গোবরে হয়ে যায় নি।

এই সুত্রে আবার বিবিসিখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ ও সমাজতত্ত্ববিদ গুণার মিরডালের কথা বলতে হয়। তিনি বলেছেন যে, ভারত ও পাকিস্তা-নের রাজনৈতিক অবস্থার কৈফিয়া-নিহিত আছে এই দুই দেশে নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্রের বিভিন্ন-তায়। তাঁর বিখ্যাত বই “এশি-য়ান ড্রামা”র প্রথম খণ্ডে ৩০৮—৩০৯ পাতায় গুণার মিরডাল লিখেছেন :

“স্বাধীনতাপূর্ব যুগে দেশ বিভা-গের আন্দোলনে মন থেকে মুসলিম লীগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কথা ভাবতে পারে নি। দেশ বিভাগের পর নতুন মুসলিম রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য, হিন্দু শোষণ মুক্তি ছাড়া, আর কি করতে চায় সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার কথা আগে থেকে ভাবা হয় নি। মুসলিম লীগের বেশীর ভাগ নেতা-দের ভাবভঙ্গী কয়েক বৃগ আগের বৃটিশ রক্ষণশীলদের সঙ্গে তুল-নীয়। এই মুসলিম নেতারা নিজে-দের প্রতিপত্তি বজায় রেখে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ, কিয়দংশে আধুনিক, এবং এমন কি প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টি করার স্বপ্নের আশাও দিয়েছিল। এই সব নেতারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষার কিছুটা অনুপ্রাণিত। কিন্তু এই নেতৃত্বের প্রবল বিরোধিতা করেছে আরও বেশী রক্ষণশীল ও সাম্প্র-দায়িকতাবাদী মোল্লারা। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের এই দুই অংশই কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে প্রগতিশীল সংস্কারমূলক কর্ম-সূচীর তীর বিরোধী।

“মুসলিমলীগ নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্র থেকেই তার রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার কৈফিয়ৎ মেলে। নেতারা বেশীর ভাগই পেশাদার রাজনীতিবিদ, উত্তর ভারতের বড় সামন্ত পরিবারের সন্তান অথবা এই পরিবারসমূহের সঙ্গে কোন না কোন যোগসূত্রে আবদ্ধ। এদের মধ্যে ব্যবসায়, বাণিজ্যে শিল্পে নিষ্পত্ত পরিবারের কেউই তেমন ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম-র্থনের একটি বিরাট অংশ এসেছে এই শেষোক্ত গোষ্ঠী থেকে।”

অর্থাৎ পাকিস্তানে নেতৃত্ব সাধারণভাবে সামন্ত শ্রেণী কব্জা করেছে—তাই ওদের এই অনমনীয় রক্ষণশীলতা। ভারতের নেতৃত্ব

পুঁজিবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—তাই পুঁজিবাদের প্রাথমিক যুগের প্রগতিশীলতা কংগ্রেসের কর্মসূচীতে এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতীয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রকল্পে প্রতিফলিত।

পাকিস্তানে সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীলতা শিল্পে নতুন লক্ষ্যের সুযোগে দিশেহারা হয়ে যায়—এই লক্ষ্য এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার যোগ-সুত্র ওদেশের নেতৃত্বের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই ভার-তীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত ওরা গণতান্ত্রিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে প্রয়োজনমত অভিজ্ঞ ছিল না। সেই জন্যই আপাতঃ প্রগতিশীল কোন সংবিধানই সেখানে রচিত হতে পারে নি; ওদেশের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী সামন্ত শ্রেণী (পশ্চিম পাকিস্তানে) কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রগতিশীল কথার আড়ালে ঝুলায় গোপন করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে নি; ওরা শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধিতে মানুষের অসন্তোষের প্রাথমিক রাজনীতিগত মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে সরাসরি মিলিটারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে; এবং এই শাসনের আমলে দুই পাকিস্তানেই মানুষের অবশ্যম্ভাবী প্রতিরোধের কথা চিন্তা করে নয়া-পুঁজিবাদের সঙ্গে সামন্তশ্রেণীর যুক্তফ্রন্টের প্রয়ো-জনীয়তার কথা ওরা ভাবতে শেখে নি। তাই ওদের রক্ষণশীলতা, অসহনীয়তা এবং মানুষের অস-ন্তোষ প্রকাশের ভঙ্গী থেকে শিক্ষা গ্রহণের অক্ষমতা। এবং সেইজন্যই শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে মানুষের অসন্তোষ আর শাসক-শোষকের অসহনীয়তা অনিবার্য ভাবে আন্দো-লনের স্তরে রূপোন্নয়ন আনে—জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সশস্ত্র প্রতিরোধের পর্বাণে পৌঁছে বার।

সেনাবাহিনীর তাণ্ডব

(১২ পৃষ্ঠার পর)

থেকে গুলি চালিয়ে অসামরিক লোকদের মনোবল ভাঙ্গার চেষ্টাও চলেছে।

নারীর সম্মান ও শিশুর নিরা-পত্তা রক্ষা করার জন্য মুক্তি ফৌজের নির্দেশে তাদের গ্রামাঞ্চলে অথবা ভারত সীমান্ত সারিয়ে আনা হয়েছে।

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে অন্য সবাই নানাভাবে এগিয়ে এসেছেন। বাড়ী বাড়ী খাবার রান্না হচ্ছে এবং রিকসা ও সাইকেল করে পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে যোদ্ধাদের হাতে। জিনিষপত্রের দাম যাতে না বাড়ে সেদিকেও নজর আছে।

চিকিৎসা ও অস্ত্রের সমস্যা আছে, কিন্তু সবাই একমনে এক-প্রাণে লড়াই করে চলেছেন এই ভরসায় যে, এ বাধা কাটিয়ে উঠবেন তাঁরা সহজেই। ইতিমধ্যে জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা এঁদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সম্পর্কে এঁরা খুবই নিশ্চিন্ত।

স্বাধীনতা
পুনর্গঠনে
অস্থিতীয়

কত ভগ্নবিশিষ্ট দেশীয় ভেতরকারি সম্মিলিত, আধুনিক বিজ্ঞান সঙ্গত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবৎক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এক অতি অল্পদিনের মধ্যে। দুর্বল অরাজকীয় ভয় দেখে লুপ্ত সজীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিষট্

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ বোমেনচন্দ্র বোম এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এক.সি.এস., (লন্ডন)
এম.সি.এস., (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের তৃত্বপূর্ণ অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ বরেন্দ্রচন্দ্র বোম, এম.বি.বি.এস., (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

চারের চামচের ৪ চামচ
মহাদ্রাক্ষারিষট্‌র সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সহ পরিমাণ জলসহ
প্রত্যহ্ন দু'বার আহারের
পর সেব্য।

যশোর শহরে

অসীম রাস

মুজিবফোজের রিলিফ বাস বখন আমাদের যশোরের সদর হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে গেল গত তেসরা এপ্রিল তখন বেলা এগারোটো।

প্রথমেই যে অনুভূতি পরিব্যাপ্ত করে তা এক বিশাল নিজনতার অনুভূতি। নিশ্চুতি রাত, সর্বাত্মক হরতাল কিংবা দাঙ্গা পরবর্তী প্রথমদিকে জীবনযাত্রার চেয়েও স্বাপক এ অনুভূতি। কারণ সারি সারি নিশ্চুত বাড়ের ভেতরেও সামান্য আওয়াজ নেই, একটিও খোলা জানলা দরজা নেই। কোর্ট কাছারি স্কুল বাড়ি ঘর দোর চায়ের দোকান লম্বা সব কুন্দপ আটা। রাস্তার একটা নেড়িকুত্তাও নেই।

এই বিশাল রৌদ্রবলকিত মরুভূমির মাকখানে একমাত্র মরু-দ্যান হাসপাতালটি। গুলি ও মর্টার শেলবিদ্ধ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের আহত সৈনিক ও সাধারণ নাগরিক। ডাক্তার রোগী দেখছে। দুটি নার্স রিলিফের উপকরণ গুনতে গুনতে হাসছে, কথা বলছে।

করিডোরে বেরোতেই কামানের আওয়াজ এবং নিশ্চুততা সচকিত

করে ক্রমাগত মেশিনগানের গুলি। নিজনি রোদে কলমল রাস্তা দিয়ে শহরের সবচেয়ে বড় চৌরাস্তা, “দড়া-টানার মোড়ে” আসতেই ক্যান্টনমেন্টে মাইল দূরেক দূরে ধোরার কুন্ডলী দেখা যায়। মুজিবফোজ ও পাকিস্তানী ফোজের গোলাগুলির উত্তর প্রত্যুত্তরে চার-দিক প্রতিধ্বনিত।

আমরা পেছন দিকের রাস্তা নিলাম। হেলমেট পরা একটি ই পি অর-এর সৈনিক ছুটতে শেল সম্পর্কে আমাদের সাবধান করে দেয়। রাস্তা ছেড়ে দু ধার দিয়ে এগিয়ে এক নারকেল কুঞ্জে এসে পৌঁছাই। এই ই পি অর হেড কোয়ার্টারে আশ্চর্য মনোবল ও সাহসের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। ফেরার সময় গাড়ি নেই কারণ রিলিফ বাস ফিরে গেছে। অরে পেট্রলের দূরন্ত টান। এ অবস্থায় আমরা বখন কিঞ্চিৎ বিহ্বল তখন ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টির এক অংশের এক পৌঁছে দেন হরিদাসপুর বর্ডার। নেতা সোজা রিলিফের একখানা গাড়ি চালিয়ে আমাদের একেবারে

আসবার সময় শহরের বাহিরে চাট-ডের মোড়ে বিধবাস্ত বাস ও দশ কুন্ডের ছবি ভোলা হয়। আমরা ফেরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুজিবফোজ যশোর শহর থেকে হটে আসে।

রিপোর্টার হিসেবে স্বাধীন বাংলা দেশের অভ্যন্তরে যশোরে ঘুরে আসা এমন এক জীবন্ত অনুভূতি যার স্লে সচরাচর রাজনৈতিক মিটিং মিছিলের কিঞ্চিৎ তফাৎ আছে। আমরা যারা স্বাধীনতার পরবর্তী কাল থেকেই স্টাটফর্ম দাঁড়িয়ে আছি কখন অস্বকার মাঠ ঘাট কাঁপিয়ে বিপ্লবের ট্রেন আসবে তাদের কাছে এ অভিজ্ঞতা এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য। কারণ বারে বারেই ট্রেন আসে নি। কল-কাতার রক্তরঞ্জিত রাজপথে দাঁড়িয়ে কিংবা উনিশশো সাতষাটি সালে এক নতুন আরম্ভের রাতে ঠান দাঁড়িয়ে থেকে থেকেও এ ট্রেনের হৃদিস পাই নি। সেদিন যে ছবি স্ক্রপ-ফর্মের জন্যে হলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা হল আমাদের যৌবনের স্বপ্ন এখন বাংলা দেশে। কিছু-কালের জন্যে হলো আমাদের সেই ঈশ্বিত ট্রেনের ফ্লাড লাইট আমাদের গায়ে এসে পড়ল। বর্ডার পেরিয়ে এসেও আমরা হুইসিলের আওয়াজ শুনেছি।

আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী (২)

টেলিফোন

দশ নং নির্দেশ : কেবলমাত্র স্থানীয় ও বাংলা দেশের আন্তঃ-জেলা ট্রান্সমিটার টেলিফোন চালু থাকবে। মেরামতি ও টেলিফোন কার্যক্রমী রাখার প্রয়োজনীয় বিভাগ কাজ করবে।

এগারো নং নির্দেশ : রেডিও টেলিভিশন ও সংবাদপত্র চালু থাকবে এবং জনগণের আন্দোলন সম্পর্কে ব্যবহারী বিবৃতি ও সংবাদে সম্পূর্ণ বিবরণ দেবে, অন্য-ধাম যারা এইসব জায়গায় কাজ করেন তারা সহযোগিতা করবেন না।

স্বাস্থ্য ও আবজনা পরিষ্কার : বারো নং নির্দেশ : সমস্ত হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও আবজনা পরিষ্কার সফলত কাজ জেলা হাসপাতাল, টি বি ক্লিনিক এবং কলোরা রিসার্চ ইনস্টিটিউট চালু থাকবে। মেডিকেল স্টোর চালু থাকবে এবং সমস্ত হাসপাতালে, মফস্বল শহরের হাসপাতালে, গ্রামের হাসপাতালে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঔষধ ও প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ বজায় রাখতে হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ

তেরো নং নির্দেশ : ই পি ডবল পি ডি এ-র সেইসব বিভাগ চালু থাকবে যা মেরামতি ও প্রয়োজনীয় রক্ষাবেক্ষণের কাজ সমেত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দরকার।

জল ও গ্যাস সরবরাহ

চৌদ্দ নং নির্দেশ : গ্যাস ও জল সরবরাহের কাজ চালু থাকবে এবং এই সম্পর্কিত মেরামতি ও রক্ষাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

কয়লা সরবরাহ

পনেরো নং নির্দেশ : ইটি-খোলার জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে কয়লা সরবরাহ করা হবে।

খাদ্য সরবরাহ

ষোল নং নির্দেশ : সর্বাপেক্ষা জরুরী ভিত্তিতে খাদ্যশস্য আমদানী, সরবরাহ, গুদামজাত করা ও চলাচল অব্যাহত থাকবে। এই কাজের জন্যে ওয়ান, বজরা, ট্রাক প্রভৃতি সমেত পরিবহনের সমস্ত সুযোগ সর্বাপেক্ষা জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রম

সতেরো নং নির্দেশ : (ক) ধান, পাটের বীজ, সার প্রভৃতি সংগ্রহ, চলাচল ও বিতরণের কাজ চালু থাকবে এবং কৃষি খামার ও রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও তার সব প্রকল্প সক্রিয় থাকবে।

(খ) বিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও অন্যান্য কারিগরী যন্ত্র ও জিনিসের চলাচল, বিতরণ, মাঠে বসানো ও চালানো, তৎসহ তৈল জরাজীর্ণ ট্রলস ও স্প্যান্টসের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও রক্ষাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা চালু থাকবে।

(গ) টিউবওয়েল খনন ও জল

তোলার কাজ ও সেচের অন্যান্য ব্যবস্থা তৎসহ খালের জল সেচ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অনু-মোদিত কেন্দ্র, থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশন এবং অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান চালু থাকবে।

(ঙ) এখানে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ই পি এ ডি সির প্রয়োজনীয় বিভাগ চালু থাকতে পারে।

(চ) গ্রিকালচারাল ডেভেলপ-মেন্ট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক বন্যা কবলিত এলাকায় সুদ ছাড়া টাকা এবং কৃষকদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঋণ দেবে।

(ছ) আলু কিনে গুদামজাত করার জন্য এ ডি বি পি দ্রুত টাকার ব্যবস্থা করবে।

বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নগর রক্ষা

আঠারো নং নির্দেশ : ই পি ডবল পি ডি এ এবং অন্যান্য সংস্থার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নগর রক্ষার কাজকে বিস্তৃত করা, তৎসহ কারিগরী যন্ত্র এবং ড্রেজার চালানো ও মেরামত, মালপত্র খালাস ও চলাচল সম্পর্কিত জরুরী কাজ অতি দ্রুত-তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারী সংস্থা অথবা সংশ্লিষ্ট স্বয়ংশাসিত সংস্থাই পূর্বের মত কনট্রাক্টরদের টাকা দেবে।

উন্নয়ন ও-নির্মাণ কার্য

উনিশ নং নির্দেশ : সরকারী স্বয়ংশাসিত সংস্থা ও আধা-সরকারী সংস্থাসমূহের অধীনস্থ সমস্ত উন্নয়ন ও নির্মাণকার্য এবং তৎসহ বিদেশী সাহায্যে রাস্তা ও সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ অতি দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা অথবা স্বয়ংশাসিত সংস্থাই পূর্বের মত কনট্রাক্টরদের টাকা দেবে। এরাই চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বাড়ি তৈরী ও অন্যান্য মালপত্র সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

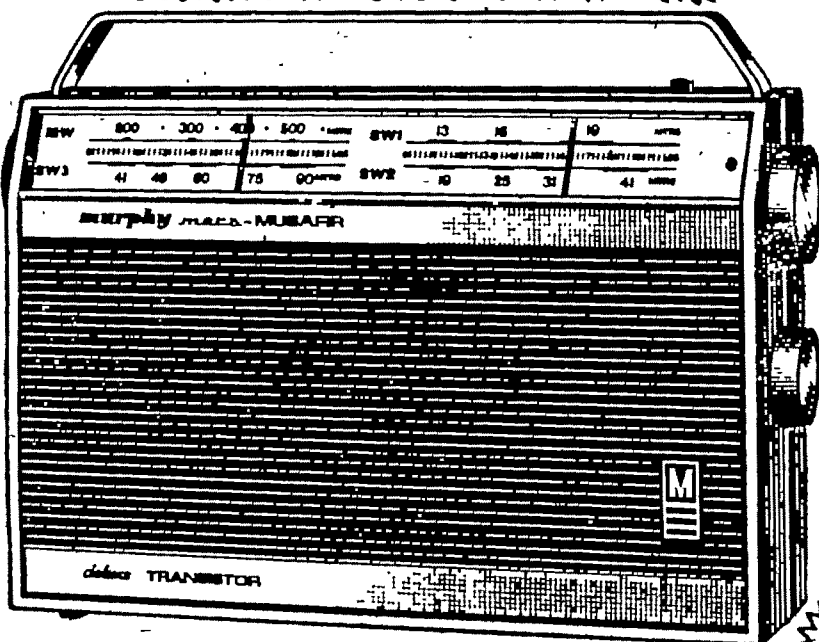
ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস

৭, হুগোব মল্লিক কোয়ার্টার কলিকাতা-১৩

মারফি

হেড-মাসফির প্রত্যেক স্টেশন স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে শোনা যায়



৪-ব্যাণ্ড ডিলাক্স ট্রানজিস্টর

- সারা দুনিয়ার যে কোমও স্টেশন পাওয়ার জন্য অলওয়েইস।
- জোরালো আওয়াজ।
- আপনায় পছন্দমত স্বর কম-কমী করার জন্য হাই-লো টোন কন্ট্রোল।
- অদৃশ্য কেরাইট রড ও লুপ এরিয়েলের ব্যবস্থা থাকার দরুন অতি সহজে স্টেশন ধরা যায়।

একটাই ডিউটি সমেত। অত্যন্ত চ্যার বজায়।

- ফুল্লুর, হিমছান, উচ্চতরের পলিস্টিরিয়ে হ-রড। ক্যাভিনেট।
- ডায়াল স্কেল লম্বা ও ফুল্পট এবং তাড়াতাড়ি সহজে টিউনিং করার জন্য হুটী কাটা আছে।
- বড় সাইজের ব্যাটারীতে চলে। এলিমিনেটর লাগিয়ে নিলে, বিজলীতেও চালানো যায়।

পরিষ্কার, প্রাপক ও জোরালো, এককথায় নিখুঁত ধ্বনি পরিবেশন করার জন্যই প্রত্যেক মানসিক এখন মাসপনিটিউ

মারফি সারা গৃহের প্রভু!



আগ্নয়তলা মামলার বিশেষ ট্রাইবুনালে মুজিবর রহমানের লিখিত জবানবন্দী

স্বাধীনতা পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস ভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্বন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ—পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়ম-তান্ত্রিকতার প্রধানসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৬৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং জাতীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়ম-তান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যেই কয়েক বৎসর কারা নির্বাসন ভোগ করিতে হয়। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্বাসন চালাইতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং ষোড় বৎসর কাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি এ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৬৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারীতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তিলাভ কালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারী করা হয়—যেমন : ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থলের সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল রাষ্ট্রকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরও একই ভাবে সেই বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মত আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারীর প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আও-

রামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধীদের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধীদল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহাতারের মা ফাতেমা জিন্নাকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরুর করি। সরকারী কর্তৃপক্ষও আমার কথুতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লালিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলের সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা-জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবন্ধ ভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করিবার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশ সহ সকল বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসত্ত্ব বোম্বাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে আত্মবান—আমরা বিশ্বাস করি যে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে

লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান—হয় দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হইয়াছে।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত ঘাটাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্ট সহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসক যন্ত্র আমাকে “অস্ত্রের ভাষায়, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি প্রদান করে ও একযোগে আঘাতেরও অধিক” মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানী করিতে শুরুর করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি খুলনার একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকায় ফিরি—তেজগেম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর কথুতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে এক গোপ্তারী পরোয়ানা বলে এই বারের মত প্রথম গোপ্তার করে।

আমাকে যশোহর মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমার অস্তবর্তীকালীন জামীন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহাকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামীনে অসম্মত হন কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামীন বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সম্মা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সম্মা-রই, আটটায় পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক কথুতার উপর সিনেট হইতে প্রেরিত এক গোপ্তারী পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গোপ্তার করে; পুলিশ সেই রাতেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামীনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করে। পর দিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামীন প্রদান করেন কিন্তু আমি মৃত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক কথুতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গোপ্তার করে। এবারের গোপ্তারী পরোয়ানা মরহুম শাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই রাতে আমাকে পুলিশ পাহারাদানে মরহুম শাহী লইয়া

যাওয়া হয় এবং একই ভাবে মরহুম শাহী মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামীন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামীনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গোপ্তারী প্রহসন ও হয়রানী ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবতঃ আটাই মে নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাতে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ “ডিক্লেস অফ পাকিস্তান রুল”—এর ৩২ ধারায় আমাকে গোপ্তার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহু সংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গোপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দাকার মুলতাক আহম্মদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রথম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরী সহ বহু অন্যান্য। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিছান্দুর রহমান চৌধুরী এম এল এ প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও বারদর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুসা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোস্তা জালালুদ্দীন আহাম্মদ এডভোকেট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহসভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রি ক্যাপটেন য়নসুর আলি প্রাক্তন এম এল এ জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আয়িনুদ্দীন আহাম্মদ পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তাফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দীন আহাম্মদ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সদপাদক জনাব মোহাম্মদ রাহ এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোহাম্মদ হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজুদ্দীন আহাম্মদ রাজার বাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি শাহবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সহ সভাপতি জনাব রশীদ মোশাররফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ

কর্মী জনাব নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইল, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধির ৩২ ধারায় (নিম্নের অত্যাচার) বলে কারান্তরকালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই প্রাপ্তপুরুষ—পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইন্সেফাককেও বর্তমান শাসক গোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইন্সেফাক যাকে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতি-সমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মাণিক মিল্লাকে দীর্ঘকালের জন্যে কারারুদ্ধ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধিবলে অস্থাকারাক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গোপ্তারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের সাতই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা নারায়ণগঞ্জে এগারো জন ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় আটশ লোক গোপ্তার করে ও অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব মোমেন খান প্রায়শই তাহার লোকজন এবং সরকারী কর্মচারী সমক্ষে উদ্ভৃষ্টভাবে বলিয়া থাকেন যে ষতদিন তিনি গদীতে আসীন থাকিবেন ততদিন শেষ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখিত হইতে হইয়াছে। প্রায় এগারো মাস আটক রাখার পর ১৯৬৮

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

Free I Free II Free III

এবল বা শুভ

আমাদের বিখ্যাত “দান সাক্ষা” ১৯২৫ সাল থেকে রোজীদের সম্পূর্ণভাবে রোজ সাক্ষরে আসছে। মাত্র তিন দিন ব্যবহৃত হইে শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়।

বিনামূল্যে এক শিপি দেওয়া হয়।

WESTERN INDIA CO. (V. N.) P.
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

পূর্ব বঙ্গের লড়াই কেন সারা বাংলা দেশের লড়াই

(দুর্গার পূর্ববঙ্গের)

“বাংলা দেশের” প্রতিরোধের প্রাচীরে মাথা কুটে মরছে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের দখলদার ফৌজ।

এই প্রতিরোধের রাজনৈতিক ভিত্তি বাঙালী জাতীয়তা কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে এমন দুর্বীর সক্রিয় রূপ কেমন করে ধারণ করল?

এই প্রশ্নের ব্যুত্থানে হলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আধুনিক গণতন্ত্রের রূপ, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতীয় সত্তার আত্মবিকাশের পথে সর্বাধুনিক বাধাগুলিকে বুঝতে হবে।

আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি জনগণের স্বাধিকার। এই স্বাধিকার সংজ্ঞা পেয়েছে প্রথমে ১২৫০ খৃস্টাব্দের ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ খৃস্টাব্দের পিটিশন অব রাইটস এবং ১৬৮৯ খৃস্টাব্দের বিল অব রাইটস—এই তিনটি সনদে।

আজ আধুনিক গণতন্ত্রের বুকে সম্ভবতঃ আমরা মনে করতে পারি না যে ঐ ইতিহাস বিখ্যাত গণতান্ত্রিক সনদগুলিতে শান্তির সময়ে স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখা জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধিকারের বিরোধী বলে ঘোষিত হয়েছিল। স্থায়ী সেনাবাহিনীকে জনগণের স্বাধিকার রক্ষার বিরোধী বলে ঘোষিত হয়েছিল কারণ গণতান্ত্রিক অধিকারের ঘোষণার অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে বেতনভূক স্থায়ী সেনাবাহিনীকে জুলুমবাজ শাসকশ্রেণী জনগণের স্বাধিকার খর্ব করতে ব্যবহার করে।

পূর্ববঙ্গের প্রথম নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একদা এই লেখককে বলেছিলেন যে তিনি নিজেও পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালে সামরিক বাজেট বৃদ্ধি করার স্বপক্ষে উদ্যোগ নিয়ে যে কত বড় ভুল করেছিলেন তা আরব্বশাহীর আমলে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন।

ইতিহাসের ধারার পরম্পরায় এই মানদণ্ডটিকে ইয়াহিয়া খানের দখলদার ফৌজের হাতে নৃশংসভাবে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে বলে প্রকাশ।

বলা বাহুল্য যে ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণিত যে সামাজিক কর্তৃত্ব পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে আসার প্রথম বৃগে সামন্ততান্ত্রিক শাসনকে পর্যায়ান্তর করার জন্যে ঐ শ্রেণী জনগণের স্বাধিকারের উপর-উল্লিখিত সনদগুলিকে রাষ্ট্রীয় স্বাধিকারের মর্বাদা দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ যখন একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হয়ে গোড়ার দিকের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে বিলোপ করতে এগিয়ে এল, তখনই

আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের আসল ক্ষমতা স্থায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা দপ্তর, জেলখানা ও বিচার বিভাগের হাতে অর্পণ করা হল।

ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যিক পুঁজির স্বার্থেই যে অখণ্ড জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল তাই শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য স্বার্থের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয় এবং পরিশেষে বৃটেনকে এদেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে হয়।

কিন্তু এই কর্তৃত্ব ত্যাগের প্রাক্কালে বৃটেন ভারত ও পাকিস্থান দুটি রাষ্ট্র স্থাপন করে যায়।

বলা বাহুল্য দুটি রাষ্ট্রেই উদীয়মান ধনিক শ্রেণী সাম্রাজ্য স্বার্থের পাহারাদার ও অর্থনৈতিক শোষণের অধিকারভোগী শ্রেণী হিসাবে রাষ্ট্র কর্তৃত্বের অংশীদার হয়।

এই দুইটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীই কেন্দ্রিকতার বোঁকে আচ্ছন্ন, কারণ এরা নিজেদের দেশে একচেটিয়া পুঁজি মালিক ও সামন্ত শ্রেণীর ঘোঁষ মালিকানা রাষ্ট্র কর্তৃত্ব লাভ করেছে।

এদেশের টাটা, বিড়লা, গোয়েন্দাদের মতই পাকিস্থানে ইস্পাহানী, দাউদ, ভালিকাদের রাজত্ব। এদেশের রাজামহারাজা, জোতদার, জমিদারদের মতই ওদেশে নবাব-খাজা-মেহতররা একচেটিয়া পুঁজি-মালিকদের সঙ্গে অংশীদারিত্বে জোটবদ্ধ। সমস্যা, শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী, মোটামুটি একই ধরনের।

এদেশে যেমন “হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের” বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে আঞ্চলিক ও ভাষা বিরোধের তীব্রতা দেখা যায়, পাকিস্থানেও বাঙালী, সিন্ধী, বেলুচ, পাখতুন, পাঞ্জাবী জাতিসমূহের স্বাধিকার বোধের তীব্রতা লক্ষ্যণীয়।

পাকিস্থানে রাষ্ট্রের মালিক শ্রেণী প্রথমে ধর্মীয় উত্তেজনার আড়ালে থেকে, ভারত বিরোধী জেহাদের ধূয়া তুলে দেশের জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়মেই জাতি-সত্তাগুলি একচেটিয়া পুঁজি-মালিক ও নবাব-খাজা-মেহতরদের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ফলে অখণ্ড পাকিস্থানী জাতি সৃষ্টি করার নামে এরা সিন্ধী, বেলুচ, পাঞ্জাবী ও পাঠানদের একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্থান অঙ্গারাজ্যের গোড়পসন করে। পূর্ববঙ্গের নাম হয় পূর্ব পাকিস্থান; ভৌগোলিক কারণে তাকে অলাদা থাকতে দিতেই হল।

পূর্ববঙ্গের সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসে একচেটিয়া পুঁজিমালিক অথবা বড় ভূস্বামীদের স্থান নেই। কোনো বাঙালী বৃহৎ শিল্পপতি

গোষ্ঠীর অভ্যুদয় এখানে হয় নি এবং হিন্দু বড় বড় ভূস্বামী স্বার্থ অপসৃত হবার ফলে সামাজিক বিন্যাসে স্থানীয় বৃহৎ ভূস্বামী স্বার্থেরও প্রভাব নেই বললেও চলে। আরব্ব খাঁর আমলে বেসিক ডেমোক্রেসীর আড়ালে গ্রামীণ এক জোতদার, ধনী কৃষক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটেছিল। কিন্তু পাকিস্থানের শাসনব্যবস্থায় এদের স্থান খুবই নগণ্য।

অন্যদিকে, ছোট ছোট শিল্প বিকাশের সুযোগ একবারে সীমিত। পূর্ববঙ্গের বিড়লিশিল্প নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিকেরা পাক-ভারত বাণিজ্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার ফলে অলস হয়ে পড়ে। পাকিস্থান শিল্প ও বণিক সমিতির পক্ষ থেকে উনোস্তর সালে বৃটিশ একচেটিয়া পুঁজির মালিক ইম্পিরিয়েল টোব্যাকো (পাকিস্থান) লিমিটেডের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশানো হয় যে ভারত থেকে টেবু পাতা (বিড়ির পত্যা) আমদানী নিষিদ্ধ করার আগে বছরে সাতশ কোটি সিগারেটের চাহিদা ছিল। টেবু পাতা আমদানী নিষিদ্ধ হবার পর পূর্ববঙ্গে বছরে বোলাশ কোটি সিগারেটের চাহিদা হবে অনুমিত হয় এবং এই বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্যে পনেরটি স্থানীয় ছোট ছোট সিগারেট প্রস্তুতকারীকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। কিন্তু বৃটিশ কোম্পানী তার উৎপাদন ক্ষমতা আগে কার বাট শতাংশ থেকে আশী শতাংশ বাড়াবার অনুমতি পেয়ে যায় এবং ছোট ছোট সিগারেট প্রস্তুতকারীরা এর সঙ্গে অসম-প্রতিযোগিতার পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

শুধু বৃটিশ নয়, মার্কিন পুঁজি মালিকেরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকে নি। পশ্চিম পাকিস্থানের সঙ্গীতবান শিল্পপতিদের সহযোগিতায় মার্কিন কোম্পানী-গুলিও পূর্ববঙ্গে শোষণ ও লুণ্ঠনের অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে। মার্কিন বৃহত্তম কোম্পানী জেনারেল মোটরস (পাকিস্থান) লিঃ প্রেসিডেন্ট আম্রব খানের পুত্র ক্যাপ্টেন গওহর আম্রবের সঙ্গে ভাগাভাগি কারবারে লিপ্ত হয়। সরকারী বিদ্যুৎ ও জলসরবরাহ প্রকল্পগুলিতে (ওয়ারপা ও ওয়াপসা) মার্কিন কোম্পানীগুলি নানাভাবে প্রচুর মুনফা কামায়। রত্নপুত্র বাঁধ নির্মাণের কাজে (মোট খরচ একশ ছত্রিশ কোটি টাকা) পশ্চিম পাক শিল্পপতি ও মার্কিন কোম্পানীগুলি একযোগে বখরার কাজ চালিয়ে প্রচুর মুনফা অর্জন করে।

ভারী শিল্প বস্ত্রপাতি নির্মা-

ণের জন্যে চীন ও সোভিয়েতের ঘোঁষ সাহায্যে যে কারখানাটি স্থাপিত হয়, প্রথমে তা চট্টগ্রামে স্থাপন করার কথা থাকলেও, তা পালাটে পশ্চিম পাকিস্থানে কালাবগের নবাবের এলাকায় স্থাপন করা হয়।

পাকিস্থান সরকার বিদেশী পুঁজির অবাধ অধিকার ঘোষণা করে পশ্চিম পাক শিল্পপতি এবং বিদেশী পুঁজির ঘোঁষ শোষণের বনিয়াদ রচনা করেন। একশ সাতটি পণ্যোৎপাদনকে ‘ক’ তালিকাভুক্ত করে বিদেশী লক্ষ্যের ওপর সমস্ত কড়াকড়ি তুলে দেওয়া হয়।

বিত্তীয় পরিকল্পনা কালে পাকিস্থানে মোট শিল্প বিনিয়োগের পরিমাণ পাঁচশ বারো কোটি টাকার মধ্যে পূর্ববঙ্গের বরাদ্দ হয় একশ একচল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে প্রথম পরিকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্পগুলিকেও ধরা হয়। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে নীট শিল্পবিনিয়োগের বরাদ্দ কার্যতঃ একশ কোটি টাকারও কম হয়ে দাঁড়ায়।

একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্থানে শিল্পক্ষেত্রে চারশ নব্বুই কোটি ষাট লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়, কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্য হয় পাঁচশ আশী কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারী লক্ষ্য দেড়শ কোটি টাকা। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্থানে পরিকল্পনার বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশী লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানে এর পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়।

যদি আমরা মনে রাখি যে পূর্ববঙ্গে যে সামান্য শিল্পলক্ষ্যই ঘটেছে তার মালিকানা মূলতঃ পশ্চিম পাকিস্থানের শিল্পপতি এবং বিদেশী পুঁজির কবলিত এবং যদি একথা লক্ষ্য করা যায় যে ভারী শিল্পে (প্রধানতঃ পশ্চিমপাক এলাকায়) লক্ষ্য বৃদ্ধির পরিমাণ শত-করা আঠারো ভাগ, কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পে বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ছয় শতাংশ, তাহলে আশ্চর্য হতে হয় যে পূর্ব পাকিস্থানকে উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করার কোঁক কি তীব্রই না ছিল। আরেকটি সংখ্যা-তত্ত্ব এই নন্দন শোষণকে উন্মুক্ত করে দেয়।

বিত্তীয় পরিকল্পনা কালে মোট শিল্পলক্ষ্যের পরিমাণ ছয়-চল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র আঠারো কোটি টাকা ক্ষুদ্র শিল্পের বরাদ্দ।

পূর্ববঙ্গের পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, কফি, কাগজ, সার, কেমিক্যালস, সিগারেট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে প্রধানতঃ বিদেশী পুঁজি এবং পশ্চিম পাকিস্থানী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঘোঁষ মালিকানা, পূর্ববঙ্গের শিল্পবিকাশের প্রধান অন্তরায়। পাকিস্থানে বিদেশী পুঁজির সুযোগ সুবিধা, ডিভিডেন্ড ও মূলধন দেশে পাঠানোর অবাধ সুযোগ ইত্যাদি পাকিস্থানের শাসকশ্রেণীর চরিত্র নন্দন করে দেখিয়ে দিয়েছে যে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নয়ন এদের হাতে সম্পূর্ণ রুদ্ধ।

সরকারী বস্ত্র বরাদ্দের এই পক্ষপাতমূলক ব্যবহার যে শুধু শিল্পায়ন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। সরকারী চাকুরী, সেনা বিভাগের স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীতে নিয়োগের বেলায়ও একই পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করা হয়। সামরিক চাকুরীতে বাঙালীর সংখ্যা সাড়ে নয় শতাংশের কিছু বেশী, পশ্চিম পাকিস্থানের অংশ নব্বুই শতাংশেরও বেশী। একত্রিশ জন মেজর জেনারেলের মধ্যে একজন মাত্র বাঙালী (তিনি খাজা সাহাবুদ্দিনের পুত্র) বাকী সবাই পশ্চিম পাকিস্থানী, প্রধানতঃ পাঞ্জাবী। নীচের দিকে শতাংশ হিসাবে লেঃ কর্নেল রিপোর্ডমায়র মেজর ও ক্যাপ্টেনদের সংখ্যা দুই থেকে তিন শতাংশ। সিভিল সার্ভিসেও বাঙালী অফিসারের সংখ্যা কম।

পূর্ববঙ্গে সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য ছ হাজার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানের পাঁচ কোটি আশী লক্ষ মানুষের জন্য ছাব্বিশ হাজার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

পূর্ববঙ্গে পাকিস্থানের মোট রপ্তানী পাঁচশ আশী কোটি টাকার মধ্যে চারশ তেইশ কোটি টাকার পণ্য সরবরাহ করে। এর মধ্যে চা পাট, বস্ত্র ও পেট্রোকেমিকেলস বারদ রপ্তানী তিনশ কোটি টাকার কিছু কম।

পশ্চিম পাকিস্থানের গম, চাউল, সোনা পূর্ববঙ্গে পাঠিয়ে যে দাম আদায় করা হয় তা পশ্চিম পাকিস্থানের প্রচলিত দামের দেড় থেকে ষোল্লগুণ বেশী। এটা অসম বাণিজ্য নীতির ঔপনিবেশিক কারণ। শুধু এভাবেই নয়, পূর্ববঙ্গের জন্যে বরাদ্দ হয় কোটি টাকা মূল্যের পক-ইতালী সাহায্য চুক্তির মেশিনারি ও বস্ত্রাংশ, অবৈধ ভাবে পশ্চিম পাকিস্থানে ছাড়া থেকে খালাস করার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেয় যে পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাক শাসকশ্রেণী কি নজরে দেখে।

স্বভাবতই এই একচেটিয়া পুঁজি বিদেশী পুঁজি ও সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতি-সত্তা বিদ্রোহ করেছে। আবাজবৃদ্ধ (শেখহাফেজ ওম পুত্র)

দুর্গা

নবাব সাহায্যিক

১ চাঁদার দ্বার ১

বার্ষিক পনেরো টাকা

বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা

প্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠানো

ঠিকানা :

৩১, ৪১ লেন, কলি-১০

সাত কোটি সন্তানের
হে মৃদু জননী,
রেখেছো বাঁচিয়ে যেন
দালাল করনি।

বাঙলা দেশে বঙ্গবন্ধু মুজিব-
বর নিখোঁজ, এই সংবাদ সামান্য
দৈনিকের পাতায় ভর করে যখন
গ্রীষ্মের গরম চায়ের আসরে এসে
উপস্থিত হল, সমস্ত গ্রীষ্মটা তখন
স্তব্ধ হয়ে গেছে। পশুর মতো
পশ্চিম-পাক দস্যুরা ওপার বাঙলা
জ্বালাচ্ছে পোড়ো ঘর ও
ঘরপাশ করছে। এপার বাঙলার
বুকের রক্ত অবরুদ্ধ প্রান্তের মতো
চলছে উঠল। আমাদের হৃৎপিণ্ডে
কামনের গর্জন। কিন্তু অসহায়।
সীমান্তের এপারে বন্দী এবং ও-
পারের আশ্রয় দোসর আমরা অস-
হায় আক্রোশে মুক হয়ে গেছি।
সুদীপ্তার চোখে জল। আমাদের
চোখের ওপর উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প।

“টিঙ্কা খাঁ নিহত!” কাগজ
থেকে এক নরপশুর ভাবলীলা
সাপ হওয়ার কথা সোজাসে
চীৎকার করে কে বেন জানাচ্ছে?
“সামসুদীনীর গুলীতে
জঙ্গী জঙ্গাদ টিকা নিহত? জয়,
জয় বাংলা!” বিমর্ষ চায়ের দোকানে
বিজয়োৎসবের জয়ধ্বনি বেজে
উঠল আবার।

আর তখনই দেবনাথের মস্তক

এই কলকাতায়

গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেলাম।
স্বভাবকবি দেবনাথ তার পদ
মিলিয়ে সরের রেশ টেনে আবৃত্তি
করছে : সাত কোটি সন্তানের হে
মৃদু জননী! রেখেছো বাঁচিয়ে যেন
দালাল করনি।

আমরা মৃদু ফেরালাম দেব-
নাথের দিকে। সে আশ্রয়। তখনও
আবৃত্তি করছে। প্রাণে যেন
কণ্ঠগিরিগদহা থেকে কাঁপতে
কাঁপতে বেরিয়ে আসছে। বলছে :

ওপারে মৃত্যির আলো
মায়ের পা দুটি
হল লাল!

এপারে হত্যার লীলা
অসহায় কবন্ধ সকাল।

দু একটি টেবল থেকে অপরি-
চিত দু-একজন মৃদুও উঠে
আসছেন আমাদের কেবিনে।

“চমৎকার, আর কিছু
শোনান!”

প্রশংসায় লজ্জা কিংবা অহং-
কার, দেবনাথের কোনটাই নেই।
অপরিচিত বলেও কেউ তার কাছে
সহজে এগোতে ইতস্তত করে না।

অনুরোধ করছে সুদীপ্তাও,

“রচনাই তোমার স্বভাব। এমন কত
রচনা হারিয়ে যায়। তুমি বল,
থামলে কেন দেব, মুখে মুখে
বীরেন টুকে নিক!”

আমি তৈরী হয়ে বললাম,
“শব্দ কর দেবনাথ!”

দেবনাথ শব্দ করল :
বে ছেলে লড়তে জানে
সাদা মরদ

স্বাধীন মনে ও প্রাণে,
সেই রেখেছে বন্দী মায়ের মান।

সেই খেয়েছে বাঙলা দেশের ধান।

বলবুলি যার ধান খেয়ে যার

খাজনা দেওয়ার দূর্ভাবনা তার;

বাঙলা দেশে জাগছে ছেলে

নাড়িয়ে দেবে দস্যু পদভার।

সময় হয়েছে, সময় এবার,

ঝটি দিয়ে দাও চক্রান্তের মল,

সুজলা সুফলা অঙ্গ শ্যামলা

স্নেহময়ী মার রক্ত অশ্রুজল

রুধিরের রঙে রাঙা হয়ে আছে

কতদিন কতকাল।

খুলে দাও তরী,

হুঁসিয়ার,

ধর হাল।

দেবনাথের কণ্ঠস্বর কাঁপছিল

আর সর সর করে নোয়ানো রোম
বেন খাড়া হয়ে উঠছিল আমাদের
শরীরে।

এই সময় কে বেন আর এক
কোণ থেকে গেয়ে উঠেছে :
“পশ্চিম চোট রে। আমার শূন্য
হৃদয় পশ্চিম নিয়ে যায় যায় রে—”

কে বেন বলছে, “সীমান্তের
শেকল ভেঙে পড়ছে। এবার আমি
ফিরে যাব আমাদের গ্রামে। ভিটে
ছেড়ে মা বাবা কাকা খুড়িমা আসেন
নি। আমরা ভাই বোনেরা স্কুলের
নিচ ক্লাসের ছাত্রছাত্রী। আমা-
দেরই পাঠিয়ে দেওয়া হল। মা
দু চোখ মুছতে মুছতে, আদর
করতে করতে বলেছিলেন :
আমরা ভাবনা ভাবিস না রে
মাণিক। তুগো বাপ মায়ের ঠিকই
ধাককা। তুই মাইরা-দুডারে লগ্না
কইলকাতার দিদিবাড়ি যা। ভগমান
বদি দয়া করেন, মাণিক রে, আবার
ফিরা আসিস বুড়ি মায়ের
কোলে। তখন মা বুড়ি ছিলেন না,
এখন হয়ত বুড়ি হয়ে গেছেন।”

একটি দীর্ঘশ্বাস মোচনের
শব্দ। আধার স্বগতোক্তি, “জানিনা।
ফিরে গিয়ে দেখতে পাব তো মাকে?
জানিনা। চিনতে পারব তো আমা-
দের গ্রাম? পশুর মতো আক্রোশে
ওরা সব কিছু জ্বালিয়ে দিচ্ছে,
ধ্বংস করছে। একান্তরের ইতি-
হাসে নরমুখ বর্ষার হিটলার, ইয়া-
হিয়া-ভুটো। আশ্চর্য সমস্ত গণ-
তান্ত্রিক দুনিয়া আজও চুপ করে
এই মৃত্যুর লীলা, এই হত্যার হিংস
উন্মাদ দেখছে। আন্তর্জাতিক
আইন। রোমানরা বেন সিংহের
খাচার অসহায় মানুষ ছেড়ে লড়া-
য়ের মজা দেখতো, এও সেই
রকম। ওদের মধ্যে এখন কথা
হচ্ছে, নিরস্ত্র মানুষ যদি সর্বাধি-
নিক অস্ত্রসম্পন্ন আইন লঙ্ঘনকারী
নরপশুকে হারিয়ে জিততে পারে
তখন বীর গণতন্ত্রীরা একটা ব্যঙ্গা
করবে। গণতন্ত্র তো সিংহলেও,
অথচ ওদের হাত ফ্যান্সি হাতকেই
মদত দিচ্ছে!”

একটি হতাশ প্রশ্ন, “আজ্ঞা।
বাঙলা দেশের জয় অনিবার্য তো?”
উত্তরও করল একজন,
“হারাবে কে? বর্ষা নামতে দাও,
তারপর মার কাকে বলে দেখিয়ে
দেবে বাঙলা দেশ। অবশ্য তার
আগেই হয়ত ডালকুস্তার দল লেজ
গুটিয়ে পালাবে।”

আর একজন বললে, “সাত
কোটি সংস্রবস্থ মানুষের কাছে
সর্বাধুনিক মারপাশও উন্মাদ সম-
দ্রের বুকে অহংকারী রূপপোতের
মতো নস্যাৎ হয়ে যাবে।”

সুদীপ্তা শুনছিল। বললে,
“ভুটো ইয়াহিয়াকে সময় দিয়েই
প্রাণ দিতে হল অনেক বেশি বাঙা-
লীকে। ভুটো ইয়াহিয়ার এটা
কাপড়ের যুদ্ধ। সরল বাঙা-
লীকে বাঙলার মাটিতে ঠকিয়ে এই
ভাবেই ওরা পালিয়ে গিয়ে নিজের
কাজ হাসিল করে।”

দেবনাথ মাথা নাড়ল, “না।
মুজিব তো ঠকেননি। সময় দিয়ে
রিস্ক নিয়ে তিনি কুটনীতির যুদ্ধে
জয়লাভ করেছেন। আজ সমস্ত

বিশ্বের জনমত বাঙলা দেশের
পক্ষে। এটা কম বড় জয় নয়।
প্রথম জয়, বিপুল গণতান্ত্রিক সম-
র্থন। শ্বিত্যের জয়, বৈঠকে বসে
প্রমাণ করে দেওয়া যে, পাকিস্তা-
নকে হেরে যাওয়া মুষ্টিমেয় দস্যু-
তেই টুকরো করল। দেশদ্রোহী
তারাই, বিচ্ছিন্নতাকামী তারাই।
আবার পাকিস্তানীদের কুটনীতিক
হারও ঐতিহাসিক। আসলে বাঙা-
লাকে যদি উপনিবেশ করে শোকাই
না করা যায়, তবে ওরা বাঙলাকে
বরং ধ্বংস করাই শ্রেয় মনে করে।
এই বিচির জাতীয়তা আর একের
দাবি তুলেই ওরা বলছে বাঙলা
দেশের লড়াইটা ওদের আন্তর্জা-
তীয় ব্যাপার। ধন্য আন্তর্জাতিক
আইন, শোষণ করার, অত্যাচার
করার, ধ্বংস করার পরওয়ানা। সেই
পরওয়ানা মানুষ মানুষকে দিচ্ছেনা,
দিচ্ছে মারপাশকে। পাকিস্তানে
ইয়াহিয়া কারও প্রতিনিধি নয়।
ইয়াহিয়া চীন রাশিয়া আমেরিকার
দেওয়া তার পূর্বসূরী আন্তর্জাতিক
অস্ত্র সম্বন্ধিত একটা ধ্বংসের বম-
দুত। কিন্তু দুনিয়ার গণতান্ত্রিক
শক্তি আজও যদি তাকে গণতন্ত্র
হত্যার বাধা না দেয়, তাহলে
পৃথিবীর ইতিহাসে গণতন্ত্র আরও
একবার বিপন্ন হবে। আর সেই
আঘাত সেই বিস্ফোরণ ঘটবে অন্যান্য
গণতান্ত্রিক দেশেও। গণতন্ত্রের
স্বাধেই গণতন্ত্রী শক্তিকে সংহত
হতে হবে বাঙলা দেশের গণতন্ত্র
রক্ষার সংগ্রামের পাশে। নাহলে
আবার হিটলার। আবার শূন্য,
ধ্বংস, অত্যাচার। পশু, মনুষ্যের
ওপর বলাৎকার।”

সমস্ত গ্রীষ্মটা উৎকর্ষ হয়ে
শুনছে। প্রত্যেকের মনেই এক
প্রশ্ন, কয়েকটা নরখাদকের হাতে
কয়েক কোটি অসহায় মানুষকে
কাতারে কাতারে মরতে দেখেও যে
দুনিয়া আইন দেখিয়ে চুপ করে
বসে থাকে সে দুনিয়ার সেই
আইন কোন নীতিশাস্ত্রের ওপর
প্রতিষ্ঠিত। মানুষের গড়া সে
আইনের হাতে মনুষ্যই অসহায়।

সুদীপ্তা হঠাৎ জানতে চাইল,
“বীরেন, তুমি তো এই বাঙলার
না?”

মাথা দু'লিয়ে বললাম, “আমি
বাঙালী। মনে মনে দুই বাঙলাকে
কোনোদিনই ভাগ করতে পারিনি।
ভাগ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান।
করেকজন কুচক্রী ভাগ করেছিল
দেশটা। ইতিহাস তাদের কখনো
ক্ষমা করবে না। ভাগ হয়েছিল
একটা ভৌগোলিক রাজনৈতিক
ভুখণ্ড। কিন্তু ভাগ হয়নি আমার
ভাষা সংস্কৃতি আত্মা।”

দেবনাথ তার তৎক্ষণাৎ রচিত
কবিতা পকেট বুকে টুকে নিচ্ছিল।
আমার কথার মূখ তুলে তাকাল।
বললে :

নকল দুর্গ মানচিত্রেই আছে
আমার দুর্গ আত্মা দিয়ে গড়া।
তুমি আছ, আছি আমি
তোমার আমার কাছে :
দুই বাঙলার জাগছে তারই
সাড়া।

(শেখাশেখ সন্তান পুস্তক)

বৃদ্ধ বয়সেও
স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে



সাধনা
চ্যবনপ্রাশ
বহুমূল্য আয়ুর্বেদীয় রসায়ন
সকল বয়সেই সম্মান উপকারী



প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫৮

অধ্যক্ষ ডাঃ বোসেনচন্দ্র বোস এম.বি.এস.
আয়ুর্বেদ-ব্রাহ্মী, এম.সি.এস. (গুণন)
এম.পি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলকাতার রসায়ন শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অধ্যাপক।



কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ বোসেনচন্দ্র বোস : এম.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদচার্য

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত
হয়ে দুর্বল ও অকর্ম হয়ে পড়ে। সাধনা
চ্যবনপ্রাশ নিরমিত ব্যবহারে জরায়
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি
বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ
বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট
থাকে।

সি পি এম হটাও শ্লোগান নিয়ে বঙ্গমতীর দোর খুলছে। বেশ কিছু কর্মী ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা।

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অর্ধ শতকের ঐতিহ্যপূর্ণ "বঙ্গমতী" সাহিত্য মন্দিরের ফটক নাকি এপ্রিল মাসের মধ্যেই আবার খোলা হচ্ছে। তবে বঙ্গমতীর বেনামদার হটাও মালিক শ্রীযুক্ত বাবু অশোক সেন মহাশয় (গরিবী হটাও ইন্দিরা কংগ্রেসের মাননীয় সদস্য এবং লোকসভা আসনে নির্বাচন ক্ষেত্র নেতা) কর্মচারীদের একাংশকে শাস্তি দেওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর সাম্প্রতিক সি পি এম হটাও জেহাদ তিনি এবার তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ সাক্ষ্য প্রয়োগের মাধ্যমেই শুরুর করবেন বলে সংকল্পবদ্ধ। অবশ্য তথ্যভিত্তিক মহলের বুকে অসুবিধা হবে না যে সি পি এম হটাও-এর নামে আসলে গরিবী হটাও পার্টির ধনকুবের অশোক সেন (সর্বোচ্চ আদালতের উকীল) নিজের প্রতিপক্ষকে (অন্তত তিনি যাদের সেন-বিরোধী বলে গণনা করেন) ঘায়েল করার জন্যই স্বপক্ষের ব্রিফ সাবজেক্ট। সংবাদ, ঐ ব্রিফ তিনি নাকি পুলিশ মহলের কর্তাব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে পি ভি এ্যাঙ্কে এমন কিছু কর্মীকে গ্রেপ্তার করানোর ফন্দিও এঁতেছেন।

পারলে বঙ্গমতীকে হরত ঢেলেই সাজানো হত কারণ বঙ্গমতী

পত্রিকাকে এবার পশ্চিমবঙ্গের কোয়ালিশন সরকারের প্রচার মাধ্যম হিসেবেই বাজারে ছাড়া হবে। তাই শ্রী অশোকবাবুই নন, আট পার্টির আরও কয়েকজন নেতা বিশেষ করে কংগ্রেস সাংবাদিকের ওপর তাঁদের চাপা রাগ এবার সোজাসেঁকে নিতে চান। এঁদের মধ্যে কাশীকান্ত মৈত্রের নামটা শোনা গেল। এই ভদ্রলোক বঙ্গমতীতে একটি ধারাবাহিক রচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সম্পাদকীয় স্তরের কয়েকজনের মতে রচনাটি সারবস্তুহীন বোধ হওয়ায় তাঁর পাঁচালীটি অর্ধপথে অসমাপ্তই থেকে যায়। ফলত তিনি বিক্ষুব্ধ। এখন যেহেতু বিজয় সিং নাহারদের থেকেও এক আসনের বিজয়ী বীর-পদ্মাবতীর দর কদর বেশি, তাই অশোকবাবুর আমদরবারে এঁদের আড়কাঠি নাড়ানোর সুযোগও অটল। এঁরাও এগিয়ে আসছেন "গরিবী হটাও" নেতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গরিবমারা খেলার নামতে। অন্যপক্ষে নব কংগ্রেস সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীকালী মদ্যাজীও এঁদের কাছে দুর্বল। কেননা বঙ্গমতী প্রেস এমসলিঙ্ক ইউনিয়নের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও কালীবাবুর এখন কোনোও বিশেষ কর্মীকে কর্তাদের রোষবাহি থেকে

উদ্ধার করার ক্ষমতা নেই। তাঁরই ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীউমাপদ মিত্রেরই নাম ছাঁটাই তালিকায় বসেছে। আরও খবর, ছাঁটাই তালিকা বেশ দীর্ঘ এবং তা নির্বিচার। কাল্প নামের তালিকা ধরে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, মালিক অশোকবাবু যাদের সি পি এম বলেই শাস্তি দিতে চান, তাঁদের অনেকেই কিন্তু কমিনকালেও ঐ পার্টির নামে একটা সমর্থনসূচক শব্দও উচ্চারণ করতেন না। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেই ছাঁটাই অবশ্য কংগ্রেস ও আট পার্টির কাছে কোনও সমর্থন না পেয়ে শ্রমিক দরদী একমাত্র পার্টি রূপে সি পি এম পরিচালিত "সিউ"র কার্যকারিতায় হরত মদ্য হরেছেন। অশোকবাবুদের কাছে সেটাও কম অপরাধ নয়। ভাত দেওয়ার মালিক নাহলে কি হয়, কিয় মারার গোসাই হতে বাধ্য কি? অশোকবাবু আর আট পার্টির নেতারা যে কর্মচারীদের অনশনের বিষয়িকার মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রকৃত শ্রমিক দরদী সংস্থার সঙ্গে কেন যোগাযোগ রেখেছেন এই অপরাধ নিশ্চয় দৃঢ়মতো পেটের ভাত দেওয়ার মালিক গরিবী হটাও পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত বাবু অশোক সেন মহাশয় এবং তাঁর মোসায়ের চক্র এখন খতিয়ে দেখবেনই।

এই মূল্যবান বিচারের পর নিম্নলিখিত সাংবাদিকদের মধ্যে কেউই হরত আর বঙ্গমতীতে জায়গা পাবেন না। নব কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কালীবাবু অবশ্য দিল্লী গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সেনপতির সঙ্গে আলোচনা করে সকলকেই ধর্মঘটপূর্ব অবস্থার স্থিতিবস্থা বজায় রেখে বঙ্গমতীতে গ্রহণ করার আবেদন করে এসেছেন। কিন্তু সর্বশ্রী বিজয় সিং নাহার, সিদ্ধার্থ রায়, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী প্রমুখ নেতারা বঙ্গমতীতে নব কংগ্রেস কোয়ালিশনের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে। সুতরাং কালীবাবুর আবেদন কতখানি কাজে আসবে তা তো বোঝাই যায়। ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা করছেন বিশেষ করে সম্পাদকীয় দায়িত্ব বাদের ওপর ছিল তাঁরাই। তাঁদের জনৈক মুখপাত্র দর্পণের সংবাদদাতাকে বলেন, তালিকাবদ্ধ এই কর্মীদের অন্তত চারজনকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ এখন থেকেই তাঁদের ঠিকানা সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

যাদের সামনে ছাঁটাই-এর খড়গ বুলছে তাঁদের মধ্যে আছেন : দৈনিক বঙ্গমতীর সর্বশ্রী সত্যানন্দ ভট্টাচার্য (সাব এডিটর), গণেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ-সম্পাদক),

জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ-সম্পাদক), মণি বসু (চীফ সাব এডিটর) নির্মল ঘোষ (চীফ সার), কল্পতরু সেনগুপ্ত (দৈনিক ও সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর চলচ্চিত্র সম্পাদক), উমাপদ মিত্র (প্রেস এমসলিঙ্ক ইউনিয়নের সম্পাদক), নীলমণি মন্ডল (চৌমুহী নভেম্বর মালিক) অশোকবাবুর দ্বারা নিম্নমভাবে প্রস্তত কর্মী) এবং নব পর্বীর সাপ্তাহিক বঙ্গমতী গড়ে তোলার পেছনে যার অবদান সব চেয়ে বেশি এবং এককালের জনৈক কংগ্রেসী মন্ত্রীর সহকারী ও স্নেহভাজন সহ সম্পাদক গোষ্ঠীয় শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী।

শোনা যাচ্ছে বর্তমানে যুগান্তর পত্রিকার পোশ্ট এডিটোরিয়াল লেখক এবং ঐ কাগজেরই প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মল্লোপাধ্যায়কে (বঙ্গমতী সম্পাদক) নাকি সি পি এম এজেন্ট রূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা হচ্ছে। 'এতোবড় আজগুবি' বিস্ময়কর সংবাদে দেশবাসী পুলকিত না মর্মাহত হবেন, সংবাদলেখক তা সঠিক বলতে পারেন না। তবে সি পি আই মূখপত্র "কালান্তর" সম্প্রতি এই নিয়ে গবেষণা করছেন বলে দেখা যাচ্ছে।

বর্ষমানের জেলাশাসক ও এস পির কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের প্রশাসনিক দপ্তর অপদাধিত্য কতদূর নীচে নামতে পারে সে সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। বর্ষমানের জেলা শাসক ও এস পি রাজ্যপাল ধারণান সাহেবের বে অনুগ্রহীত ব্যক্তি আজ একথা সবাই জানেন। অভিযোগ, শ্রীধাওয়ানের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে উপরোক্ত দুজন প্রশাসনিক কর্তব্যবাহির ঔষধতা আজ চরম পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্গাপুর এ ভি বি কোম্পানীর মালিক পক্ষের পয়সায় এরা দুজন সুসজ্জিত বিলাসবহুল হোটেল রীজ গেষ্ট হাউসে দিনের পর দিন কাটান, ক্ষুধা করেন। সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী সংস্থার কাছ থেকে এধরনের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন জেনেও রাজ্যপাল নীরব। অথচ কোন এক দায়িত্বশীল মহল থেকে

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে এ বিষয়টি রাজ্যপালের গোচরে আনা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অজস্রবাদ কি ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজ করেন?

শোনা যাচ্ছে, উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও, বর্ষমানের জেলা শাসক কোন এক ব্রিটিশ মহিলার সঙ্গে ক্রমশই অন্তরঙ্গতায় জড়িয়ে পড়ছেন। মহিলাটিকে গৃহস্থচর বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কর্তব্যবাহির প্রায় সবাই জানেন ব্যাপারটি। স্বরাষ্ট্র সচিব বি আর গুপ্ত ও ওয়াকিবহাল। বিভাগীয় তদন্তও কিছু হয়েছে। তাতে মহিলাটিকে গৃহস্থচর বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এখন বি আর গুপ্ত ঘটনাটিকে নিজের স্বার্থ সিঁথির কাছে লাগানোর কথা ভাবছেন।

এই কলকাতায়

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

হ্যাঁ, সাড়া জাগছে। কলকাতায় দেউলে বাঙালীমনে আত্মসচেতনতা চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে। কিন্তু এই আবেগ আর উদ্দীপনা কতদূর আত্মবিশ্মৃত একটা জাতিকে প্রজ্বলিত রাখবে জানিনা। আমার আবেগ আছে, কিন্তু সেই আত্মীয়তা নেই যে আত্মীয়তা বাঙালী দেশকে ঘরে ঘরে জাগ্রত করেছে আজ। তাই কোনো অসুবেগে বিশ্বাস নেই। এতো ক্ষণস্থায়ী, বদবুদ্ধির মতো, এতো ইঠাৎ ক্ষীণ আর তাই তা অমন অস্ত্যসারশূন্য ফাঁপা।

অস্ত্যসারশূন্যতার জন্যই "অরম্বন"। অস্ত্যসার শূন্যতার জন্যই "বন্ধ"। এসবই তো ভেতরকে চাপা দেওয়ার জন্য ওপরের আলোড়ন। অসহায়তার স্বীকৃতি। মৃজিবে দেশ যা কবেনি।

আমার এখন একা থাকতে হচ্ছে করছে। কম কথা বলতে হচ্ছে করছে। হাতে জীবনানন্দের "রূপসী বাঙলা" নিয়ে আপসা চোখে মাছু-বন্দনা গান বারবার আবৃত্তি করতে হচ্ছে করছে। (আমরা কজন জীবনানন্দকে পড়িছি?) তাঁর মতো ভালবাসতে পেরেছি বাঙলার শান্ত শ্যামলিমাকে? আমরা উত্তেজনা তাও অত্যন্ত সাময়িক উত্তেজনা কেই ভালবাসি।

আমার কেমন একটা অসহ্য বেদনার অনুভূতি হচ্ছিল। উঠে দাঁড়ান। কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লাম উত্তপ্ত গ্রীষ্ম ছেড়ে। নিজেকে আমার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। একটা দুর্বোধ্য আকৃতি আমার ভেতরে ছটফট করছে। মনে হচ্ছে, কী যেস আমার করা হয়নি। কী যেন আমি ভুলে গেছিলাম। কী যেন আমি করতে পারিনি।

বাংলা দেশের লড়াই

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

বাগিতা বাঙালী এই শোষণ অবসানের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরাও কিস্তি এই অতুলনীয় সশস্ত্র প্রতিরোধের দিকে তাকিয়ে আছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের এই প্রতিরোধ, কেন্দ্রীয় শাসনের নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বলেই গণ্য হবে। পূর্ব বঙ্গের সমস্যা, এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সমস্যা অনেকটা এক ধরনের। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অবিচার, বৈষম্য উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রতি পক্ষপাতমূলক নজরের অভিযোগ ইতিপূর্বে বহুবার উঠেছে। গত দুই দশকের কেন্দ্রীয় আর্থিক নীতিগুলি ও দপ্তরে দপ্তরে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলে শিল্প-প্রসারের উন্নতি বিরোধী মনোভাবের বিচার করলে দেখা যায় যে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের উন্নয়ন ও বিকাশের সমস্যার সামঞ্জস্য রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সর-

কারের অবিচারমূলক উন্নয়ননীতি বিক্ষোভের সঞ্চার করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই এই বিক্ষোভকে দমাবার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীরা রাজনৈতিক দল, ও সাম্প্রদায়িক দল-গুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই সাময়িক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে বিক্ষোভকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। অথচ গণতান্ত্রিক, উদার, ন্যায়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চললে, এই অকারণ রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের আবহাওয়া তৈরী হত না। কোনো জাতিসত্তাকে পীড়ন কবে, বড়শত্রুমূলক রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ কবে দিয়ে দেশের অশান্ততা, ভৌগোলিক ঐক্যকে রক্ষা করা যায় না। একমাত্র পূর্ণ স্বাধিকারের ভিত্তিতেই সুদৃঢ় ঐক্য স্থাপিত হতে পারে। সোভিয়েত রাষ্ট্র তার অগ্নিরাজ্যগুলিকে পর-বাস্তব বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছে, তাতে সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙে যায় নি, আবেগ শক্তিশালী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদেরও পূর্ববঙ্গের এই বিদ্রোহকে স্বাভাবিক বিশ্ববিশেষের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। কারণ সকল নিপীড়িত জাতিসত্তার সমস্যাই এক।

ন্যাশনাল রবার কারখানার ধর্মঘট

বিগত ছবিদশে মার্চের দপশে বিশেষ প্রতিনিধির ন্যাশনাল রবার কারখানার প্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবরণের জন্য ধন্যবাদ। এই সংবাদে ধর্মঘটের একটা মোটামুটি চিত্র থাকলেও ওয়ার্কারস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটা বক্তব্য রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

ওয়ার্কারস ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিগত বারোই জানুয়ারীর প্রমিক কর্মচারীদের সাধারণ সভার আড়াই হাজার প্রমিক কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে চোটা ফেব্রুয়ারীর ভিতর দাবীপত্রের মীমাংসা না হলে পাঁচই ফেব্রুয়ারী থেকে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত হয়। ওয়ার্কারস ইউনিয়নের ধর্মঘটের নোটাশের ভিত্তিতে এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে। একাধিক ধর্মঘটের নোটাশ এই ধর্মঘটে নাই।

নিজস্ব মূল্য ও তফের ভিত্তিতেই ন্যাশনাল রবারের প্রমিক কর্মচারীরা মজুরীর কাঠামোর ও গ্রেডের, উচ্চমুখী পরিবর্তন দাবী করেছে। প্রকল্পনির্ভরিত মূল্যতম মজুরী বিভিন্ন ক্যাটিগোরীর প্রমিক কর্মচারীদের দিতে হবে, ওয়ার্কারস ইউনিয়ন এই দাবীই রেখেছে। এই সপ্তে উনোত্তর সনের বার্ষিক বোনাস, গ্রাচুইটী স্কীমের সংশোধন, নাইট এলাউন্স হাজারা বোনাস প্রভৃতির দাবীও রয়েছে।

একথা ঠিক নয় যে ইনচেক টারার প্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি হয়েছে বলেই ন্যাশনাল রবারের প্রমিকেরা মজুরী বৃদ্ধির দাবী করেছে। ইনচেক টারার প্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য ন্যাশনাল রবারের প্রমিকেরা ও তাদের ওয়ার্কারস ইউনিয়ন আনন্দিত। কারণ এটা প্রমিক আন্দোলনেরই একটা সাফল্য। ইহা সকলেরই জানা আছে যে সাধারণ রবার ফ্যাকটরীর মজুরী ও অটোমোবাইল টারার ফ্যাকটরীর মজুরীর হারে পার্থক্য আছে। ইনচেক টারার প্রমিকদের সাধারণ রবার ফ্যাকটরীর মজুরী দিয়েই বৎসরের পর বৎসর এই কোম্পানী কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে ইনচেকের সংগ্রামী প্রমিকেরা করেছে এমনিতে। কোম্পানী এখানে মজুরী বৃদ্ধিতে রাজী হয় নাই। দপশের বিশেষ প্রতিনিধি যে বলেছেন সেখানে গ্রেডের মীমাংসা হয়েছে এই তথ্য সঠিক নয়। গ্রেডের কোনও নতুন মীমাংসা সেখানে এখনও হয় নাই।

ন্যাশনাল রবারে একজন অদক্ষ প্রমিকের নিম্নতম মোট মজুরীর পরিমাণ ছিলো মেনন ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলির একজন অদক্ষ প্রমিকের প্রায় সমতুল্য। বিগত বৃহস্পতি সরকারের আমলে উনোত্তর সনে মেনন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রমিকদের মজুরীর কাঠামোর যে উচ্চমুখী পরিবর্তনের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তার ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রমিকদের সপ্তে ন্যাশনাল রবারের প্রমিক কর্মচারীরা মজুরী বৃদ্ধির দাবী করে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মত কোনও সংকটই

যে রবার শিল্পে নাই একথা সর্বজনবিদিত তথ্য।

প্রমিক কর্মচারীদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী পূরণ করার আর্থিক সম্ভাব্যতা যে কোম্পানীর আছে তথ্য দিয়ে ওয়ার্কারস ইউনিয়ন তা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কোম্পানীর ডাইরেক্টর, ও টেকনিকাল এ্যাডভাইসার ডঃ ডি, ব্যানার্জী

মতামত

মজুরী বৃদ্ধির দাবী নিয়ে ওয়ার্কারস ইউনিয়নের সপ্তে বিপাকিক আলোচনা বৈঠকে এই বক্তব্য রেখেছিলেন যে মাসিক টার-ওভার আটাত্তর লাখ টাকার দাঁড়ালে মজুরী বৃদ্ধির আর্থিক দায়িত্ব কোম্পানীর পক্ষে নেওয়া সম্ভব। সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ওয়ার্কারস ইউনিয়ন ম্যানিং প্যাটার্ন, উপপাদন ও উপপাদন বোনাসের কতকগুলি বর্ধিত উপপাদন চুক্তি কোম্পানীর সপ্তে করে। সন্তর সনের শেষ দিকে এই চুক্তিগুলির ফলাফল দেখা যায়। কোম্পানীর প্রদত্ত হিসাবেই জানা যায় সন্তর সনের শেষ তিন মাসের মাসিক গড় উপপাদন আটাত্তর লাখ টাকার দাঁড়িয়েছে।

শুধু তাই নয়। চলতি বাক্সার দরে ইহা ছিরাশি লাখ টাকার দাঁড়িয়েছে। কমরপ কারখানাভাত পণ্যের মূল্য কোম্পানী প্রায় শতকরা দশ ভাগ বাড়িয়েছে। শিল্পজাত কাঁচামালের দাম বেড়েছে শতকরা ছয় ভাগ। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির ভিতর দিয়েও কোম্পানী প্রায় শতকরা চার ভাগ অতিরিক্ত মূল্যকার গ্যারান্টি করেছে। মূল্যবৃদ্ধিজনিত বাড়তি আয়ের শতকরা ষাট ভাগ ন্যায্য ভাবেই প্রমিকেরা এই ক্ষেত্রে দাবী করতে পারে।

ছিরাশি লাখ টাকার মাসিক টার-ওভারের যে কথা এখানে বলা হলো, তাও পুরা চিত্র নয়। যে উপপাদন বৃদ্ধির চুক্তিগুলি বিপাকিক আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো, কিন্তু প্রমিকেরা বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সম্পাদিত হতে পারে নাই, সেগুলি সম্পাদিত হলে মাসিক উপপাদন দাঁড়াবে এক কোটি টাকার। অর্থাৎ বৎসরে বারো কোটি টাকার মত।

ছাপ্পার সনেই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীর শেষ বৎসর এবং সাততম সনে এই কোম্পানী পাবলিক লিমিটেড হিসাবে রূপান্তরিত হয়। ছাপ্পার সনে এই কোম্পানীর বার্ষিক টার-ওভার ছিলো ১০১,১০,২৪৭ টাকা। ১৯৬১ সনের টার-ওভার দাঁড়াবে ৮,১৯,৮৭, ৫৭৬ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৭৫০% বৃদ্ধি। ১৯৬৬ সনে কোম্পানীর রিজার্ভ তহবিলে ছিলো ৪,০০,০০০ টাকা, ১৯৬৮ সনে ইহার পরিমাণ বাড়ার ৬১,৪৪,০১০ টাকা। এই টাকা থেকে কুড়ি লাখ টাকা নিয়ে কোম্পানী শেরার হোল্ডারদের বোনাস শেষার দেয়। কিন্তু

প্রমিকদের ১৯৬৯ সনের বোনাস দেয় না। ১৯৬৬ সনে কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিলো ১৪,৮৬, ৫৭৪ টাকা। ১৯৬৯ সনে এই সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৮৮,২১, ৫৭১ টাকার। এই কোম্পানীকে ভিত্তি করেই ইনচেক টারারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং কল্যাণীতে পরিণত একর জমির উপর রিক্রেস রবার

ফ্যাক্টরীর শেড তৈরী হয়েছে। উত্তর প্রদেশেও একটা বৃহৎ কারখানার জন্য জমি নেওয়া হয়েছে।

হেড অফিস ও সেলস অফিসের মাহিনা ও মজুরীর কাঠামো ও ন্যাশনাল রবার ফ্যাক্টরীর মজুরীর কাঠামো একই ছিল। ১৯৭০ সনের ফেব্রুয়ারীতে হেড অফিসের ও সেলস অফিসের মজুরীর কাঠামোর

পুলিশ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

“কলকাতা পুলিশের কর্তাদের বিরুদ্ধে চঞ্চল্যকর অভিযোগ” এই শিরোনামের গত উল্লিখে ফেব্রুয়ারীর দপশে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা বিশেষ জরুরী বলে মনে করি। দপশ ওই রিপোর্টটি ছাপিয়ে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ মিলিটারী ও অন্যান্য প্রেশীশব্দর স্বতন্ত্র যে বিপ্লবী আন্দোলন চলছে তার গিছনে পুলিশের বড় কর্তাদের অদৃশ্য হাত রয়েছে।

দপশের পৃষ্ঠপোষকতার পুলিশ এসোসিয়েশনের সম্পাদক চিন্তাহরণ দত্তের যে বক্তব্য ছাপা হয়েছে তার থেকে তিনটি জিনিস পরিস্কারভাবে উঠে আসে। এক অধিকাংশ পুলিশ, বিশেষ ভাবে এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্যরা শোষিত জনগণের বৃদ্ধ এবং সে কারণেই পুলিশের বড় কর্তারা তাদের গুন্ডা লাগিয়ে হত্যা করছে; দুই, পুলিশকে জনগণের এই মহান বৃদ্ধের ভূমিকার রূপান্তরিত করেছেন বৃহস্পতি প্রাক্তন দুই মন্ত্রী অজয় মুখার্জী এবং জ্যোতি বোস; তিন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে বর্বর পুলিশী সম্রাস চলছে তার পেছনে আছে শুধুই সি আর পি, পুলিশ এসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং সক্রিয় সদস্যরা এর ঘোরতর বিরোধী।

আসলে ব্যাপারটা কী? আজ যখন ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবের আগুন সশস্ত্র প্রতিবিলম্বী সমস্ত শক্তিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, আজ যখন দিকে দিকে পুলিশ মিলিটারী স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে বিপ্লবী গেরিলা লড়াই নতুন স্তরে উঠে আসছে, ঠিক তখনই দেখা যাচ্ছে স্ব-বেরঙের সমস্ত সংশোধনবাদী ও তার দালালরা পুলিশী শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণকে

ও গ্রেডের উচ্চমুখী মীমাংসা হয়েছে। একই চুক্তিনামার অন্তর্ভুক্তদের একটা অংশের মীমাংসা করে অপর অংশটির বিষয় অমীমাংসিত রাখা যে সামাজিক ন্যায়নীতির বিরোধী একথা জনসাধারণের বুদ্ধিতে কোনই অসুবিধা হবে না।

প্রমিক কর্মচারীদের দাবীর ন্যায্যতা ওয়ার্কারস ইউনিয়ন শুধু যে প্রমিক কর্মচারীদের নিকটই স্বাধা করেছে তাই নয়, যে সমস্ত উচ্চপদস্থ অফিসার ট্রেড ইউনিয়নের আওতার পড়েন না তাদের নিকটও ব্যাখ্যা করেছে। এর ফলে প্ল্যান্ট ম্যানেজার প্রোডাকশন ম্যানেজার, টেকনিকাল ম্যানেজার সমস্ত সেকশনাস ম্যানেজার ও ফের-ম্যানরা প্রমিক কর্মচারীদের দাবীর ন্যায্যতা কোম্পানীর নিকট তথ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে ওয়ার্কারস ইউনিয়নের সপ্তে মীমাংসার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কোম্পানী এদের বক্তব্যকে কোনও মর্শাদা না দিয়ে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদিও এই কোম্পানী একটা পাবলিক লিমিটেড প্রতিষ্ঠান, কিন্তু খিদিরপুরের বাকুলিরা হাউসের মধ্যাজী পবিত্রই

পরিপূর্ণভাবে একে নিয়ন্ত্রণ করে। কোটি কোটি টাকার মাল কেনার সর্বমর কতৃৎ এই পরিবারভূক্ত একজন ডাইরেক্টরের হাতে। কোটি কোটি টাকার উপপাদিত মাল বিক্রিরও সর্বমর কতৃৎ এই পরিবারভূক্তই অপর একজন ডাইরেক্টরের হাতে। সমস্ত ফাইনাল নিয়ন্ত্রণ করেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিনি এই পরিবারেরই লোক।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনালস কর্পোরেশনের কোটি কোটি টাকা ধপ হিসাবে এখানে লক্ষী করা হয়েছে। এল আই সিরও প্রায় পঁচিশ পারসেন্ট শেরার এই কোম্পানীতে আছে। সুতরাং এই কোম্পানীর প্রমিক বিরোধী কারবলীর এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী পরিচালনার অব্যবস্থার দায়িত্ব থেকে ভারত সরকারও মুক্ত হতে পারেন না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনালস কর্পোরেশনের ও কোম্পানী বোর্ডের দৃষ্টিও ওয়ার্কারস ইউনিয়ন আকর্ষণ করেছে বারবার।

জগত বোস
সভাপতি, ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়ার্কারস ইউনিয়ন

নানাভাবে বিভ্রান্ত করার আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ সম্পর্কে জ্যোতি বোসের পাটির বক্তব্য ও চিন্তাহরণের বক্তব্য মিলিয়ে দেখলে প্রতিক্রিয়াশীল-জোতদার জমিদার ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল এই দুই পান্ডা ও তাদের দলবলের গোপন আঁতাত দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, এক জ্যোতি বোসেরা অভিযোগ এনেছেন পুলিশের একপ্রেশীর বড় অফিসারই শুধু খারাপ, চিন্তাহরণের অভিযোগও তাই। দুই, বাংলা দেশে বর্বর পুলিশী সম্রাসের জন্য চিন্তাহরণ শুধু সি আর পিকেই দায়ী করেছেন (তারা নিজেরা যেন নিরামিকভোজী বাঘ), জ্যোতি বোসের পাটিরও শ্লোগান—“বাংলার পুলিশ, সি আর পি মা-বোনদের উপর অত্যাচার চাচ্ছে।” অর্থাৎ জ্যোতি-বোসেরা পুলিশ কুস্তাদের জনগণের সপ্তে একই আসনে বসিয়ে দিয়ে ওদের শত অত্যাচার ও খুনের ইতিহাসকে আড়াল করে দিতে চাইছে। তাই আজ বিপ্লবীরা যখন “আমরা পুলিশ মিলিটারী স্বতন্ত্র করছি, করব” এই শ্লোগানকে প্রতিদিন কার্যকরী করে গেরিলা-বৃদ্ধের আগুন চেউরের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তখন সাধারণ পুলিশ, নিরীহ পুলিশ হত্যার জন্য পুলিশের বৃদ্ধ রক্ত-বেরঙের সংশোধনবাদীদের কলমের অস্ত্র নেই। সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী এইসব সংশোধনবাদী কুস্তারা পুলিশ মিলিটারীর প্রহরর নিজেদের প্রাপ বাঁচায় কল ওদের হয়ে সাফাই না গাইলে চলবেই বা কি করে।

তবে বাংলার মনুষ আছো ভোলেনি অজয়-জ্যোতিই একদিন পশ্চিমবঙ্গে সি আর পি এনেছিলেন, বাংলার মনুষ কখনো ভুলবেনা নক-

শালবাড়ী ডেকরা গোপীকান্তপুরে ভূমিহীন গরীব কৃষক হত্যার জন্য পুলিশ প্রেরণের ঘটনা, কিংবা কলকাতার জে স্টোন কোকাকোলার ধর্মঘটী প্রমিক হত্যার ঘটনাকে। এছাড়া দিনের পর দিন ফেলঘাটা, দমদম, বরাহনগর, শ্যামপুর, জোড়াবালান, বেহালা ইত্যাদি অঞ্চলের হাজার হাজার সাধারণ মনুষ যেভাবে পুলিশী হিংস্রতার শিকার হচ্ছে সে কথা কি কখনো তারা ভুলতে পারেন। তাই তো দেখি আজ দিকে দিকে পুলিশ মিলিটারীর প্রতি জনগণের তীব্র ঘৃণা ক্রমে ক্রমে জোড়ের আগুনে পরিণত হচ্ছে, জনগণ আরো বেশি করে বুদ্ধিতে পারছেন হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই মৃত্যু।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান বাগের আছে তারাই জ্ঞানেন এই রাষ্ট্র কাঠামোর সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ হচ্ছে পুলিশ-মিলিটারী। এই কারণে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রম্নে সশস্ত্র শক্তির মারা পুলিশ মিলিটারী স্বতন্ত্র বিপ্লবী কর্মের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সর্বহারার প্রেশী দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামো ও প্রশাসনের অঙ্গ পুলিশ-মিলিটারীকে অতি অংশই শোষিত জনগণের প্রেশীশব্দ হিসাবে দেখতে হবে। এটাই মার্কসবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এর থেকে সামান্য বিচ্যুতি অর্থাৎ পুলিশ সম্পর্কে কোনরকমের দুর্বলতা পোষণ কিংবা তাদের উপর বিশ্বাস রাখা বিপ্লবের পক্ষে যে কি মারাত্মক হতে পারে তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত ইন্দোনেশিয়া রেখে গেছে। সুতরাং ওই ঘটনার পরও সংশোধনবাদী শরতানদের স্বপ্নের পড়ে জনগণ নিশ্চর আর ভারতবর্ষকে ইন্দোনেশিয়া (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানের দলীয় মনোভাব

(দশমের পর্ববৈক্যক)

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। যে দলগুলি অজয়বাবুর নেতৃত্বে মেনে মন্ত্রিসভায় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের মোট বিধানসভা সদস্য সংখ্যা শাসক কংগ্রেস দল একশ পাঁচ, বাংলা কংগ্রেস পাঁচ, মুসলিম লীগ সাত, পি এস পি (বি) এক, এস এস পি (বি) এক, গোষ্ঠী লীগ দুই, মোট একশ একশ জন এম এল এ। এই মন্ত্রিসভাকে শর্তসাপেক্ষ সমর্থন জানাবে সি পি আই, তেরো, ফরওয়ার্ড ব্লক তিন, সরকারী পি এস পি দুই ও আদি কংগ্রেস দুই মোট কুড়ি জন। সর্বসাকুল্যে একশ একশ জন বিধানসভা সদস্যের সমর্থনের দাবী নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে।

অর্থাৎ যে ছটা দলের মন্ত্রী এই মন্ত্রিসভার সদস্য এই দলগুলির মোট সদস্য সংখ্যা একশ একশ, রাজ্যপাল এই সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা গঠনে অনুমতি দিয়ে এবং এই সংখ্যালঘু সদস্যদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভাকে বাইরের কয়টি দলের সমর্থনের চিঠির ওপরে ভরসা রেখে চলতে হবে এটা বুঝেও যে ভাবে এই মন্ত্রিসভা তাজহুড়া করে অভিব্যক্তি করলেন, তা সাংবিধানিক ইতিহাসে অমর নজর হয়ে থাকবে।

ধরা যাক আজ জনাপীঠকে বিক্ষুব্ধ সদস্য এই কোয়ালিশন থেকে বেরিয়ে এসে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চাইলেন এবং সংসদ বামপন্থী ফ্রন্টের একশ তেইশ, এস ইউ সি ও আর এস পির দশ মোট একশ তেইশ জন সদস্য চিঠি দিয়ে রাজ্যপালকে জানানেন যে ঐ পাঁচ জনের দলকে তাঁরা সমর্থন করছেন, সুতরাং এদের মন্ত্রিসভা গড়বার অধিকার দিতে হবে।

বর্তমানে যে নজর রাজ্যপাল দেখালেন তাতে তাঁর পক্ষে না বলবার উপায় নেই। অর্থাৎ মাত্র পাঁচজন সদস্য আজ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পেয়েছে।

রাজ্যপালের সাংবিধানিক জ্ঞান ও গণতন্ত্রের ধারণা যে পরিষ্কার নয় তা তাঁর পয়লা এপ্রিলের বেতার ভাষণ থেকে বুঝতে দেবী হয় না। তিনি ভুলতে পারেন নি যে তিনি কোন দলের অনুগ্রহে চাকুরী করছেন, কাদের হুকুমে তার এরকম শাসনো চাকরীটি বাতিল হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ অত বোকা নয়। যে দল একবছর ধরে শান্তিলাল ভট্টাচার্য অজয়বাবুর হাতে পশ্চিমবঙ্গের মাটি চষে বেড়িয়েছে সেই বাংলা কংগ্রেস জনগণের রাগে পাঁচজনের ক্ষুদ্র দলে পরিণত। তাদের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিশীল দল

জোটের সমর্থন পেয়েও বরানগরে সাড়ে এগারো হাজার ভোটার ব্যবধানে সি পি এমের কাছে পরাজিত।

এই ভুললোককে মুখ্যমন্ত্রী হবার সুযোগ যারা দিয়েছেন, তাদের গণতান্ত্রিক রায়ের প্রতি কোন প্রশ্ন নেই এটাই বোঝা যায়।

শ্রদ্ধে তাই নয়, বিধানসভার সদস্যরা ব্যক্তিগত ভাবে কেউ রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে জানান নি যে তিনি অজয় মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন। অথচ যেখানে মাত্র চার পাঁচজন সদস্য দলহুটে হলে এই মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যাবে, সেখানে রাজ্যপাল কেন প্রতিটি সমর্থনকারী দলের সদস্যদের লিখিত সম্মতি চাইলেন না এটা বোঝা যায়। এমন তো হতে পারে যে বিজয় দলের সদস্য যারা কংগ্রেস বিরোধী অথবা বাংলা কংগ্রেস বিরোধী, কিংবা উভয়ের বিরোধী ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, তারা সকলে নিজেদের নির্বাচনী কেন্দ্রের ভোটদাতাদের মনোভাব লক্ষ্য করে তাদের দলীয় নেতাদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করতে পারেন।

অথবা যে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভা সমর্থনকারী অন্য সবগুলি দল নির্বাচনে জড়িয়ে করেছেন, তাঁদের অনেকেই (অন্ততঃ চার পাঁচজন তো নিশ্চয়ই) নতুন করে বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদ বৃদ্ধি সৃষ্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেস-বাংলা কংগ্রেস চক্রান্তের অংশীদার হয়ে নিজেদের ভবিষ্যত কলঙ্কাকীর্ণ করতে চাইবেন না, এটাও কি সম্ভব নয়? সুতরাং কেন রাজ্যপাল সমস্ত সমর্থনকারী সদস্যের স্বাক্ষরিত সম্মতি আগেই চাইলেন না?

যদিও সাংবিধানিক নিয়ম-কানুন অনুসারে রাজ্যপালের এ ধরনের কোন সম্মতি চাওয়ারই অধিকার নেই, তবু তিনি যখন দলনেতাদের চিঠির ওপর এতটা গুরুত্ব দিয়ে একজন পরাজিত, প্রত্যাখ্যাত লোককে মন্ত্রিসভা গঠন করতে দিলেন, তখন তিনি সবার্হা কেন নিশ্চিত হলেন না যে তাই তাঁর বিরুদ্ধে অশোভন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে না পারে।

সাংবিধানিক নিয়মে রাজ্যপালকে সর্ববৃহৎ দলের নেতাকে আহ্বান করে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুরোধ জানাতে হবে। তিনি অসমর্থ হলে পরবর্তী দলনেতাকে অথবা তাঁর পরামর্শদাতার উপর কাউকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানানোর নিয়মই প্রচলিত। কোয়ালিশন হবে কি হবে না সেটা রাজ্যপাল ঠিক করবেন না। দলগুলি ঠিক করবে। রাজ্যপাল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নন; তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত কর্মচারী। সুতরাং নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বিশীদের মধ্যে কে স্থায়ী মন্ত্রিসভা

গঠন করতে সক্ষম তার নির্বাচ, নির্বাকুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা কারো না থাকলে, বিধানসভার অধিবেশনে পরীক্ষিত হওয়াই বিধি। বিধানসভাই ঠিক করবেন কে সংখ্যাগরিষ্ঠ কে নন, কারণ বিধানসভার হাতেই মন্ত্রিসভা বজায় রাখা বা না রাখার চূড়ান্ত ক্ষমতা।

রাজ্যপাল অশোভন ব্যস্ততার সঙ্গে সন্দেহজনক পরিস্থিতির মধ্যে অজয়বাবুর মন্ত্রিসভাকে গদীয়ান করেছেন। তাঁকে মনে রাখতে বলি যে তাঁর পূর্ববর্তী রাজ্যপাল ধর্মবীর্য ও একদিন প্রাসাদ বড়বস্ত্রের মাধ্যমে অজয় মুখোপাধ্যায়ের গুরু প্রফুল্ল ঘোষকে গদীয়ান করেছিলেন। বাংলা দেশের মানুষ তা মেনে নেয় নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী রাজ্যপাল নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি, সেটা সবটা যে তাঁর হুটী তা নয়। কারণ তাঁকে মন জুগিয়ে চলতে হয়। যেখানে যুক্তি নেই সেখানে যুক্তি আবিষ্কার করতে হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রসংগে ওপর তাঁর ভাগ্য যে নির্ভর করে।

তবু তিনি তাঁর বেতার ভাষণে যে ভাবে শালীনতা বজ্জিত ভাবে ভোটের অংকের হিসাব দেখিয়েছেন তা যেমন অশ্রুত তেমনই হাস্যকর।

তিনি কি জানেন যে গত নির্বাচনে আদি কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেস পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে? বাংলা কংগ্রেস উভয়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে? সি পি আই পরিচালিত ইউ এল ডি এক তিন কংগ্রেসকেই ভোট না দিতে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছে? একথা কি তিনি ভুলে গেছিলেন যে বাংলা দেশের অধিকাংশ মানুষ কখনো কংগ্রেসকে ভোট দেয় নি? ১৯৫২ সালে ৩৮ শতাংশ ১৯৫৭ সালে ৪২.৪ শতাংশ ১৯৬২ সালে ৪৫.৬ শতাংশ

১৯৬৭ সালে ৪১.২ শতাংশ এবং ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস মাত্র ৪০.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল?

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কোনদিন প্রতিদ্বন্দ্বিশীল কংগ্রেস, সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ কিংবা জনসংঘকে অধিসংখ্যক ভোট দেয় নি। সর্বদাই তারা বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক।

এবারেও সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, প্রভৃতি যে সব ছদ্মবাম দলকে সন্দেহ করেছে তাদের ভোট দিতে শিখা করেছে। তবু এই সব দলের ভোট যা কিছু ভোট পেয়েছে তাও কংগ্রেস বিরোধিতার নাম করেই পেয়েছে। তাই এদের বামপন্থী ভোটকেও কংগ্রেস মুসলিম লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিশীল সাম্প্রদায়িক জোটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বীকার করতে পারেন না।

রাজ্যপাল জেনে রাখেন পশ্চিমবঙ্গের বৈধ ভোটের পঁয়ষাট লক্ষেরও বেশী ভোট পেয়েছে দুটী বামপন্থী জোট। নির্বাচনের আগে সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি কংগ্রেসের মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন বলবার সাহস করেন নি। আজ এই ছদ্মবেশী বামদলগুলি বামপন্থী মুখোপাধ্যায় ফেলে সরাসরি কংগ্রেসকে সমর্থন জানাবার সাহস দেখালো, ভোটদাতারা যে তাদের সমর্থন করবেন না তা সুবিদিত।

রাজ্যপাল যে ভাবে নতুন মন্ত্রিসভাকে অশোভন ব্যস্ততার সঙ্গে গদীয়ান করেছেন, তার ফল গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পক্ষে মারাত্মক। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিসর্জন দেবার এই পদক্ষেপকে প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষ ঘিঙ্কার জানাবেন।

নতুন মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত হবে বিধানসভায় কারণ সাংবিধানিক অর্থে বিধানসভা রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং অবিলম্বে বিধানসভা আহ্বান করে এই মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করা হোক। এবং যদি তা প্রমাণিত না হয় তাহলে মন্ত্রিসভার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপালকেও বিদায় গ্রহণ করার সংসাহস দেখাতে হবে।

সারা ভারতে যখন ইন্দিরা গান্ধীর "গরীবী হঠাৎ" এর ভাঙ-তাবাজি ঝড়ের মত সাফল্য লাভ করে চলছিল, গণতন্ত্রের দুর্গ পশ্চিমবাংলা তাকে বুধে দাঁড়িয়ে স্তম্ভ করে দিয়েছে। তাই সারা ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ আজ

(দেখাও ১০ম পৃষ্ঠায়)

দুর্গাপুরে পুলিশী সন্ত্রাস

(দশমের সংবাদদাতা)

কলকাতার শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক শ্রমিক নির্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পনগরী দুর্গাপুরেও শ্রমিক নিপীড়ন শুরু হয়েছে। সত্তর সালের বারোই আগস্ট থেকে এই নির্বাসনের শুরু। রাজ্যে অ-মার্কসবাদী সরকার গঠনের জল্পনা কল্পনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অত্যাচারের মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়।

গত কয়েকদিন বাবু সাগর ভাট্টা, এ ডি বি কোম্পানী, দুর্গাপুর প্রোজেক্টের ও অন্যান্য শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে মিলিটারীর সাহায্যে জোর তল্লাসী চালানো হয়। মাত্র রাতে কর্মচারীদের নিয়ে হয়রান করা হয়। কয়েকজনকে বোমা তৈরী, আশ্রয়স্থল ব্যবহার ইত্যাদির অভিযোগে গ্রেপ্তার ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। নিগ্রহের হাত থেকে মোরোও বাদ যায় না। এছাড়া, শ্রমিক সংগঠনের একটি অফিসের তাল্লা ভেঙে মিলিটারী ও পুলিশ বিভাগ দখল করে নেয়। অনেকেই বলছেন, বড় ধরনের এক গণ্ডগোল বাধানোর উদ্দেশ্যেই সরকারী মহল থেকে এধরনের প্ররোচনা চালানো হচ্ছে।

PIONEER VESTS

ARE HYGIENICALLY BLEACHED ! EVERY BODY NEEDS PIONEER VESTS

Also Tee shirts, Tennis shirts, Chain Shirts, Drawers & Briefs

PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS CALCUTTA-2 Phone : 34-2983

-(8ର୍ष भङ्गान्न भङ्ग)

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোরাম্জম হোসেন এককর্ণেরাল আমিঁর হোসেন, এল এস সুলতান উম্মিন আহামেদ কামালউম্মিন আহমেদ, শ্ৰীমাদ মুজিবুর রহমান, ক্লাইট সার্জেন্ট মহাফিজ উল্লাহ ও এই মামলার জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান—এই তিনজন সি এস পি অফিসারদের আমি জানি। আমি মস্তি হিসাবে সরকারী কার্য সম্পাদন কালে তাহা-দিগকে জানিবার সুযোগ পাইরা-ছিলাম—এবং তাহারাও তখন পূর্বে পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাহা-দের সঙ্গে কখনো রাজধানী কিসক আলোচনা করিনাই কিংবা কোন বড়-যশ্বেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনোদিন লেঃ কঃ মোরাম্জম হোসেনের বাসগৃহ অথবা করাচীতে

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা নিয়ম-তান্ত্রিক রাজনৈতিক দল দেশের অর্থ-নৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে বাহ্যর একটি সুদৃশ্য, সুসংগঠিত নীতি ও কর্ম-সূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়ম-তান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থা-শীল নই। আমি দেশের উত্তর অংশের জন ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম— ছয় দফা কর্মসূচীতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি বাহাই মঙ্গলকর তাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডীর ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকশোচী এবং শাস্যবাদীদের হাতে নিগূহ হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠা-নকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জন-গণের, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানী-দের উপর শোষণ ও নিপেষণ অব্য-

আমি নির্দেশ এবং এ ব্যাপারে
স্বদেশীয় সম্পর্কে আমি কিছুই জানি
না।

(નવમ અષ્ટાવ્ર અવ્ર)

আগামী দিনগুলি ভারতের
রাজনীতিক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের এই
দৃঢ় প্রতিরোধ অমর স্বাক্ষরে
উজ্জ্বল হবে উঠবে, এটা যেমন
জানা, তেমনি এই ধ্রুব সত্যও
প্রতিষ্ঠিত হবে যে একচেটিয়া
পুঞ্জি জমিদারদের শাসকশ্রেণী
কংগ্রেস দলের আসন্ন বার্ষিকার
মুখে দর্শ্য পশ্চিমবঙ্গের মানদণ্ড
কেন্দ্রীয় উপনিবেশবাসের অকোপাল
বাহু পেছন থেকে সারা ভারতের
গণতন্ত্রকে রক্ষা করবেন, বলিষ্ঠ
করবেন ও প্রতিষ্ঠা করবেন।

(୪୫ ଅକ୍ଟୋବର ୩୩)

প্রসঙ্গত, পদলিঙ্গের প্রতি বিশ্লবী-
দের বক্তব্য কি—সে-বিষয়ে কমরেড
চার্লস মজুমদারের প্রচারপত্রই একমাত্র
মানদণ্ড। এ বিষয়ে সংশোধনবাদী এবং
অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরাণী ও তার দালাল-
দের জবন্য অপপ্রচার বিশ্লবীদের
সঠিক আহ্বানকে কোনমতেই বিকৃত
করতে পারে না। সত্যিই যদি চিন্তা-
হরণবাবুরা গরীবের দরদী হন তবে

নকশালা নাম নিয়ে সমাজবিদ্বেষীদের ছদ্ম

অনেক বাধা বিপত্তি পার হয়ে ভোট দিয়েছিলাম শব্দুমার জ্যোতি বসু তথা সি পি এম গদীতে আসীন হবেন এবং নকশাল দমনে তৎপর হবেন বলে। নকশাল নাম নিয়ে যে সমাজ বিরোধীরা আজ দিনের পর দিন আমাদের ওপর অত্যাচার করে চলেছে তার কি হবে? সি পি এম তাম্রতে এই সব সমাজ বিরোধীদের পাড়ার পাড়ার ঢোকানো হয়েছিল বিরোধী পক্ষের দ্বারা। আজ সি পি এম বিরোধী সরকার গঠন করে তাদের যে তড়ানো হবে এমন আশা আমরা করি না। এই সমস্ত সমাজ বিরোধীরা এখন প্রতিমাসে পাড়ার নিরীহ বাসিন্দাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে চাঁদা নিয়ে। শব্দু চাঁদা নয় খাবার দিতে হচ্ছে, ঝাঁকতে দিতে হচ্ছে, ভোট দেওয়া নিয়ে শাসনো হচ্ছে। যার ফলে প্রাপের দাঁয়ে লোকে পাড়া ছাড়ছে। লোক সংখ্যা যত কমছে অন্য যারা একান্ত অন্যতর বেতে অপারগ তাদের ওপর তত চাপ পড়ছে। কিছুদিন আগে যাদের পুন্ডলিশ ঘরেছিল দু দিন যেতে না যেতে তাদের সব ছেড়ে দিয়েছে। পুন্ডলিশ কি জানেন না কে কোথায় আছে। অথচ শিক্ষিত শান্ত পরিবারগুলোর ওপর কি দারুণ অত্যাচার করছে। প্রসঙ্গতঃ দর্পণেই প্রকাশিত অধ্যাপক দেব-কুমার পাণ্ডার কথা বলা যায়। যখন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল তখন পুন্ডলিশ অত্যাচার এমনই হয়েছিল যে তাকে অন্ত্রভেদন দিতে

সম্মান চৌধুরী
(সি পি এম-এলের একজন সমর্থক)

શ્રીમતી ચન્દ્રપ્રભાવત્ત

সংবাদের প্রতিবাদ

বাংলা কংগ্রেস থেকে আমাব্
সম্পর্কে ত্যাগের অভিজ্ঞায সম্পর্কে
যে তথ্য আপনার রাজনৈতিক
সংবাদদাতা জানিয়েছেন, এরূপ
কোন উদ্দেশ্যই আমি প্রকাশ করিনি
বা কখনও মনে মনে পোষণও
করিনি। বিবর্তনীয়তা শ্রীযাড্
সম্পর্কে আমাকে নিয়ে যে মন্তব্য
করা হয়েছে তারও আমি তীব্র
প্রতিবাদ করছি।

मर्मज्ञ आरक्षण आनी

বিদেশী সাংবাদিকদের অভিমত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাল আমলে কোথাও দেখা যায় নি। দেশের প্রায় সমস্ত লোক এক সঙ্গে প্রতিরোধে নেমেছে, সৈন্য-বাহিনীর অত্যাচার প্রায় চেষ্টা-খার বর্বরতাকেও হার মানায়, আর তার ওপর আছে অত্যাচারীর আধুনিক অস্ত্রসম্ভার যা এসেছে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন আর বৃটেন থেকে আবার বিপ্লববাদী রুশ আর চীন থেকে।

প্রতিরোধে বন্ধপরিষদ মানব অত্যাচারী শাসকের এই নির্মম আক্রমণের জন্য হত প্রতুত ছিল না। কিন্তু অপ্রতুতির জন্য প্রাথমিক প্রচণ্ড ক্ষয় ক্ষতিতে মানব দমে যায় নি—বরং তার প্রতিরোধ আরও দুর্বীর হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এর নজরী হাল আমলের কোন বিপ্লবেই মেলে না।

বিদেশী সাংবাদিকরা ত একে-বারে হতবাক, এও কি সম্ভব। তাঁদের উৎসাহের অন্ত নেই। তারা কেউ কেউ সব বাধা অতিক্রম করে

এখন একেবারে ঢাকা যাবার ফন্দী আঁটছেন।

এরা সকলেই মনে করছেন যে, এ “যুদ্ধ” দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য তাই অবিলম্বে ওরা বিভিন্ন জায়গায় সংবাদ ঘটি করতে চায়। ওদের ধারণা যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক একটি গাড়ী কিনে নতুন রং লাগিয়ে টানা ঢাকা যাবার মতলব করেছেন। এই কয়েকদিনে তারা বাংলা দেশের নতুন পতাকা জোগাড় করেছেন আর সঙ্গে থাকবে পাকিস্তানের চাঁদ তারা পতাকাও। বাংলাদেশে যখন যে এলাকায় যে পতাকা দরকার তখন সেই পতাকা ওড়ানো হবে। বাধা বিপত্তি অনেক, বিপদও আছে। তবু ওরা অদম্য।

এদের মধ্যে প্রায় সবাই পশ্চিম বঙ্গের কাছাকাছি মৃত্ত এলাকায় ঘুরে এসেছেন, ইংরাজী জানা বাংলায়ী ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে

প্রতিরোধ সংগঠনের বিভিন্ন কর্মীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। প্রচণ্ড উৎসাহিত হয়েছেন ওরা। এদের অনেকেই হয়ত কোন বিপ্লব সমর্থন করেন না, আবার কেউ কেউ হয়ত নিজেদের দেশের সরকারের কাছে বিপ্লবের গতি, সংগঠন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা গোপন সংবাদ পাঠান।

অবশ্য এ রকম ধরনের সংবাদ আরও অনেকেই পাঠাতে পারেন, এখানকার সাংবাদিকরাও। কিন্তু তাতে গণঅভ্যুত্থানের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। বিপ্লবের বিশেষ স্তরে সংগঠনের প্রয়োজনে বিপ্লবীরা বদ্বতে পারে নিরাপত্তার কি বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার।

সবাইকেই সি আই এর দালাল বলে হিটলে দিলে বিপ্লব খুব বেশী এগুবে না। আর যেহেতু বিপ্লবীদের নৈতিক বৃদ্ধি ও পম্পতি সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই অবিলম্বে সন্দেহ বাতিল থেকে সবাইকে দালাল বলারও প্রয়োজন নেই। তবে শেষ পর্যন্ত যখন গেরিলা যুদ্ধ আরও উচ্চস্তরে পৌঁছাবে তখন বিপ্লবীরা নিজেদের নিরাপত্তা নিজে-রাই ঠিক করবেন।

সাংগঠনিক ব্যাপারে এদের ভেতর মতানৈক্য আছে। কিন্তু আজ বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্যায়ে এই তিনটি পার্টি হাত মিলিয়ে মজিবরের আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে এই আন্দোলনে মদত দিচ্ছেন। কিন্তু মাওপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে তারা শক্তিশালী হতে পারবেন।

যদিও বাংলাদেশে এখনও এই তিনটি কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী তবুও এরা গোপনে এদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এদের পার্টির কর্মীরাও প্রধানতঃ ছাত্র বা যুবক। এরা দিনের বেলা আঞ্চলিক আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশে মস্তি যুদ্ধের সহায়ক কাজে ব্যস্ত থাকেন কিন্তু রাতি-বেলা এরা নিজেদের পার্টির সংগঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। সাতাফরা সহরে মাওপন্থী শ্লোগান ও মাও-এর প্রতিচ্ছবি বিশেষ লক্ষণীয়। মার্শাল ল-এর আমলে এদের বহু নেতাকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল কিন্তু মস্তিষ্মা অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে সব জেলখানা খুলে দেওয়া হয়েছে। মাওপন্থী নেতারা বেরিয়ে এসে গোপনে তাদের পার্টির সাংগঠনিক কাজ করে যাচ্ছেন। যুদ্ধরত ছোট ছোট মস্তিসৈন্যের দলের পেছনেও এই নেতারা আছেন যাতে যুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাওবাদের লক্ষ্য বোঝানো যায়।

এই দলের যে সমস্ত যুবকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে নেই তারাও সব সময় লুকিয়ে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ান। এদের প্রধান কাজ হল সহরবাসীদের বা মস্তিষ্মাদের মাওবাদের শিক্ষা দেওয়া এবং গেরিলাযুদ্ধে

কলকাতা করপোরেশনে রাজনীতির পালা বদল

(দপ্পনের সংবাদমাতা)

সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালীর ব্যাপারে গোপনীয়তা বজায় রেখে নিজেদের বামপন্থী চেহারা অটুট রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতা পৌরসভার মেয়র নির্বাচনে সে গোপনীয়তা রক্ষা করা আর সম্ভব হচ্ছে না। শাসক কংগ্রেসের সরকারকে সমর্থন জানানোর পর আগেকার পিধা কেটে গেছে।

সবচাইতে মস্তিকল হয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লকের। নিজেদের মধ্যে দলদলি ছাড়াও সি পি এম-এর প্রকাশ্য ঘোষণা ফরওয়ার্ড ব্লক আর কংগ্রেস বিরোধী পার্টি নয় এবং সেজন্য আগেকার চুক্তি অনুযায়ী মেয়র পদের জন্য সমর্থন পাওয়ার অযোগ্য—এই পার্টিতে বিরত করেছে।

এস ইউ সি, আর এস পি, আর সি পি আই এবং ওয়ার্কাস

পার্টির মনোভাব এই যে কংগ্রেসের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সাহায্য নিয়ে কোন প্রাথমিক তীরা সমর্থন করবেন না। করপোরেশনের একশো ছয় জনের মধ্যে এঁদের মোট সংখ্যা উনোপঞ্চাশ, তার মধ্যে সি পি এম-এর সহিংগ জন আছে।

এদিকে কংগ্রেসের একশ জন সভ্য নিয়ে পঞ্চাশ জন আছেন। জনসংঘের দুজন, নির্দলীয় তিনজন ছাড়া দলত্যাগী একজন সি পি এম ও সি আই টির চেয়ারম্যান আছেন। ঐ পঞ্চাশ জনের মধ্যে সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লকের এগারো জন করে সভ্য আছেন।

কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লকের মেয়র পদের জন্য সাহায্য করার পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ চায়। সি পি আইও এই সুযোগে কয়েকটি কমিটির সদস্য পদ পেতে পারে। এর ফলে কংগ্রেস আবার পৌরসভায় ফিরে আসতে পারবে।

বাংলা দেশের কমিউনিস্ট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

যে, এশিয়া আফ্রিকার কিছু দেশ নতুন স্বাধীন হবার পর নিজেদের স্বার্থে বিশ্ব রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের নিরপেক্ষ বলে জাহির করে সাম্রাজ্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় রাষ্ট্র গোষ্ঠীর কাছ থেকেই আর্থিক ও অস্ত্র সাহায্য পেয়ে আসছে। এই সব তথ্যকথিত “নিরপেক্ষ” রাষ্ট্র বিদেশী সাহায্য পুষ্ট হয়ে নিজেদের দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের টুটি টিপে ধরেছে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার নীতি কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কোন ক্ষোভ সঞ্চার করে নি। এই দুনিয়ার সমস্ত সাহায্য এই সমস্ত নয়া স্বাধীন রাষ্ট্র বরাবরই পেয়ে আসছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সাহায্যের পরিমাণ বেড়েছে।

বাংলা দেশের কমিউনিস্টরা সোভিয়েত নেতাদের বলার চেষ্টা করবেন যে, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রু তারা যেন “নিরপেক্ষতার” ভাণ করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কোন সাহায্য না পায়। এই সাহায্য আন্দোলনের ক্ষতি করে এবং সেই দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ জ্বিয়ে রাখে।

শর্মিষ্ঠা বর্মণ

সুপরিচিতা গীটার শিল্পী।

গীটার শেখাচ্ছেন।

২৪১-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,

(জিবার্টি সিনেমার কাছে),

কলিকাতা-৬

“ভাইরে, আমরা কি নিডোরিয়া বাপ পিতামহদের বংশের সন্তান? নাকি আমরা সবাই সব বেজন্মা. ক্ষেত্র? প্রাণ দিয়া তারা নিজ নিজ প্রাণটারে সওদা কর্যাছে। আর আমরা কি করি চম্পকনগরীর যত নিডোরিয়া সওদাগর ভাইসব, সেই সব আত্মার তপর্ণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য—আমাদের জয় কেউ ঠেকাতে পারে না।”

প্রাচীন লোকগাথা অবলম্বনে
অভ্যাসনিক আশ্চর্য নাটক

টান্ড বনিকের পালা

প্রযোজনা / চতুরঙ্গ

নির্দেশনা / বরণ দাশগুপ্ত

যোগাযোগ :

৪২, বাবুরাম ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০

যশোর ও খুলনার মাওবাদী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করে যশোর শহরকে ঘিরে রেখেছে। এই গ্রামগুলি থেকে মস্তিষ্মা প্রায়ই অতর্কিতে পাকিস্তান সৈন্য-বাহিনীকে আক্রমণ করে ক্ষতিসাধন করে।

মস্তিবাহিনীর নেতারা বলেন তাদের গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া শক্তিশালী পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীকে কাবু করার বা পরাজিত করার কোনও উপায় নেই। এই অঞ্চলে মস্তিবাহিনীর হাতে বিশেষ আধুনিক বা যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রসম্ভার নেই। তাই মস্তি ফৌজ নেতারা গেরিলা উপায়ে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরা জানেন এই যুদ্ধ বহুদিন চলবে, এরা

তারজন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কিন্তু এদের অস্ত্র গোলাবারুদের বিশেষ প্রয়োজন এবং কিছুদিন পরে খাদ্যাভাবও দেখা দিতে পারে।

মস্তিসৈন্যরা বলেন তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কিন্তু পাকিস্তানী সৈন্যকে ধ্বংস না করে তারা মরবেন না। এই তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মস্তিবাহিনীর অনেকে সাধারণ লুটী ও জামা গায়ে দিয়ে বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। তারা লজ্জরখানার সামান্য ডালভাত খেয়ে দিনরাত্রি শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সর্বদাই জাগ্রত।

বাংলা দেশে মাওপন্থী তিনটি পার্টি আছে। যদিও তত্ত্বগতভাবে এদের চিন্তাধারা এক, পার্টির

“...তুমি যে সত্ত্বা দশকের ম, গর্ভধন্যগাভীর পৃথিবীর প্রতিমূর্তি...”

৭০ দশকের বলিষ্ঠ নাটক

প্রবাহ

নাটক : অমিতাভ গুপ্ত

পরিচালনা : ইন্দ্রজিৎ সেন (চারণদল)

সুজিত গুপ্ত (পাদপ্রদীপ)

১লা বৈশাখ থেকে নিয়মিত অভিনয়

অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

মিনার্ভা থিয়েটার

৫৫-৪৪৮২



বাংলা দেশের পতাকা হাতে বাংলা দেশের ছেলেরা



খুলনা শহরে স্কুটার রিকসা মদ্রিস্তি ফৌজের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ॥ দর্পণের জন্য ছবি তুলেছেন নিখিল ভট্টাচার্য

রাজশাহী শহরে পাক সেনাবাহিনীর তাণ্ডব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জঙ্গী পাক সরকারের পৈশা-
চিকতায় বহু ঐতিহ্যময় রাজশাহী
শহরটি আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে।

যাঁরা ওপারের বাংলার সংবাদ
রাখেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে
ঢাকার পরেই উত্তরবঙ্গের এই
শহরটি বঙ্গসংস্কৃতি বিকাশের
একটি অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র
রূপে গড়ে উঠেছিল বিগত
ক-বছরে।

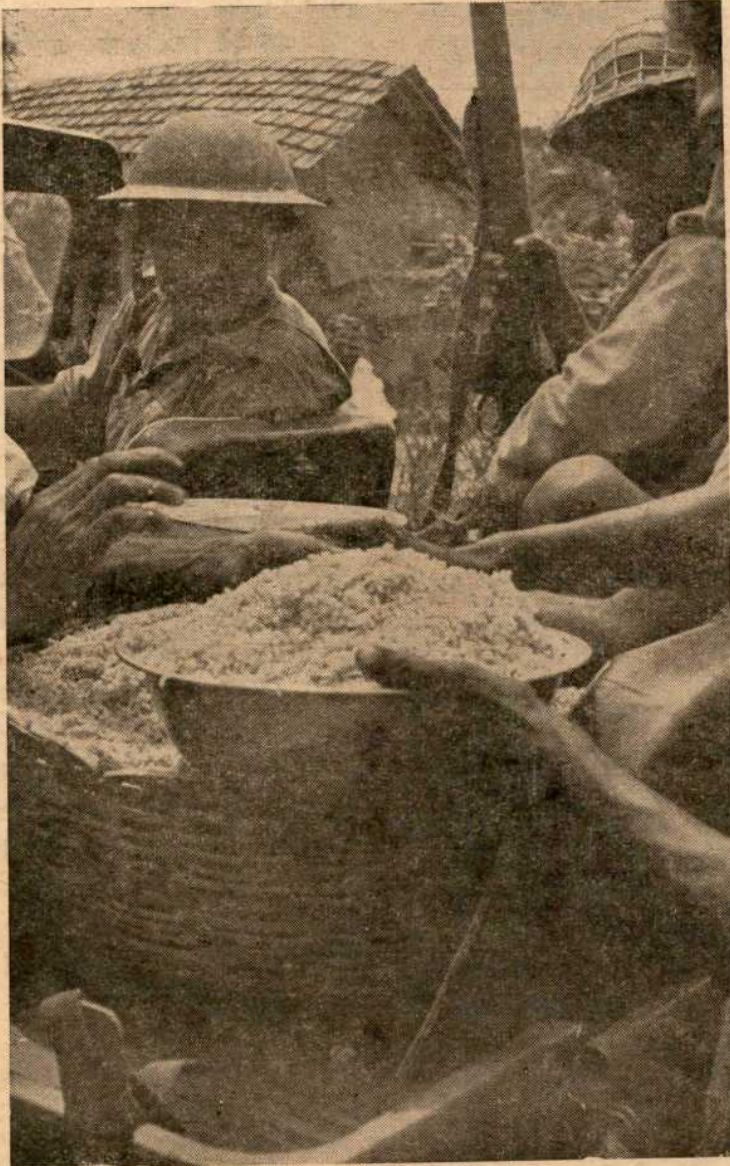
সীমান্তের ওপার থেকে
সম্প্রতি যে দু-চার জন মদ্রিস্তি যোদ্ধা
এপারে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে
আলাপ করে জানা যায় যে অত্যন্ত
সুপারিকল্পিত ভাবে পাকিস্থানী
শাসকগোষ্ঠী বাঙালী বুদ্ধিজীবী-
দের বেছে বেছে নিয়ে খুন করে
চলেছে। বিশেষ করে যে সব
হিন্দু নেতা জনপ্রিয় এবং জঙ্গী
শাসনের বিরোধী তাঁরাই আক্রমণের
লক্ষ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ,
বড় বড় পাঠাগার, যে কোন সাংস্কৃ-
তিক প্রতিষ্ঠান এমনকি ঐতি-
হাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র স্মৃতি
বিজড়িত বিখ্যাত বরেন্দ্র অন-
সন্ধান সমিতি এই আক্রমণের হাত
থেকে অব্যাহতি পায় নি।

মদ্রিস্তিময় পাজাবী “বুদ্ধি-
জীবী” ও কিছুর ব্যবসাদার শাসক-
গোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য
করে চলেছে। ইন্টার্ন রাইফেলসের
পশ্চিম পাকিস্থানী লোকেরাও
এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

অধ্যাপক, ব্যবহারজীবী, ডাক্তার,
শিক্ষক এবং ছাত্ররা পাকবাহিনীর
শিকার হয়েছে। কতজন মারা গেছেন
তার সংখ্যা সঠিক ভাবে জানা
এখন সম্ভব নয়।

জঙ্গী শাসকের আক্রমণ
অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে এলেও
ওখানকার সাধারণ মানুষ কিন্তু
নীরবে তা মেনে নেয় নি। প্রথম



গ্রামের মেয়েরা ঝড়ি ঝড়ি ভাত আর তরকারী পাঠিয়ে দিচ্ছে শহরে
যুদ্ধরত মদ্রিস্তি ফৌজের জন্য। মদ্রিস্তি ফৌজের লোকেরা ভাত ও ডাল
নিতে এসেছেন যশোর শহর আর গ্রামের মাঝামাঝি কোন এক জায়-
গায়। দর্পণের জন্য ছবি তুলেছেন নিখিল ভট্টাচার্য।

আক্রমণে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত
হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে
নিজেদের সংগঠিত করে প্রতি-
রোধের জন্য এগিয়ে এসেছে।

যুবক ছাত্র, পুলিশ বাহিনী
বিশেষ করে সারদা পুলিশ ট্রেনিং

কলেজের সর্বশ্রেণীর শিক্ষার্থী
ও কর্মচারী এবং ইন্টার্ন রাইফেল-
সের লোকেরা বর্তমানে মদ্রিস্তি-
ফৌজের প্রধান অংশ সহরাগলে।
গ্রামে গ্রামে কৃষকরা বিশেষ করে
সাঁওতাল অধিবাসীরা মদ্রিস্তি যুদ্ধে



মদ্রিস্তিফৌজ কর্তৃক যশোর শহর দখলের পর মেজর নূরুল হুদা এবং তাঁর একজন সহকর্মী

অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন।

পাক বেতার যতই প্রচার
করুক না কেন একথা আজ পরি-
ষ্কার যে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট সজে
বাইরের জগতের যোগাযোগের জন্য
পাক বাহিনীকে একমাত্র আকাশ
পথের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

পাকা সড়ক, রেলপথ সম্পূর্ণ
বিচ্ছিন্ন। নদীপথে যোগাযোগ
করাও পাকবাহিনীর পক্ষে প্রায়
অসম্ভব। শহরের টেলিফোন ব্যব-
স্থাও অচল।

বেতার কেন্দ্রে কোন কর্মচারী
উপস্থিত না হওয়ায় মাঝে মাঝে
করাচীর সংবাদ প্রচারেই এর কর্ম-
সূচী সীমাবদ্ধ।

সন্ধ্যা ছটা থেকে সকাল সাতটা
পর্যন্ত কারফিউ জারী থাকে। সে
সময় বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালায়
পাকবাহিনী এবং নেতৃস্থানীয়
কাউকে পেলেই গুলি করে।

নিজেদের জন্য খাদ্যাদাদাম
লুণ্ঠ করা, গরু ভেড়া ছাগল যেখানে
যা পায় তাই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা
করাই পাকবাহিনীর নিয়মিত
কাজ।

নতুন গড়ে ওঠা সপদরা শহর-
তলীতে পাকবাহিনী এখন আশ্রয়
নিয়েছে। কিছু ধনী পশ্চিমা
ব্যবসাদারও তাদের সঙ্গে আছে।
মাঝে মাঝে নির্বিচারে বিমন
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

বাংলা দেশের সংগ্রাম সম্পর্কে সি পি আই (এম-এল)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এখানকার সি পি আই (এম-এল) অর্থাৎ নকশালীরা বাংলা দেশের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশীদার হবে কি না এ প্রশ্ন অনেকের মনে জেগেছে। এই প্রসঙ্গে এ পার্টির মুখপত্র "দেশরত্নী"র একটি সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

"দেশরত্নী"র পনেরোই ফেব্রু-

য়ারীর সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : "মুজিবর যে মার্কিন দালাল, সে কথা সে নিজেও গোপন করে না। সে দুই বাংলা জোড়া দেবার কথা বলছে। ভারত সরকার মুজিবরকে মদদ দিচ্ছে, আকাশ-বাণীতে মুজিবরের প্রচার চলছে অবিশ্রান্ত ভাবে। মুজিবরকে দেখানো হচ্ছে দুই বাংলার ভবিষ্যৎ দায়িত্বের। এই মার্কিন দালাল মুজিবরকে সি পি এম. পর্যন্ত নিজস্বভাবে সমর্থন জানাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবরকে ক্ষমতার বসানো এবং একই সঙ্গে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন উত্তরানোর নামে কারোমতো মিলিটারী বসানোর পেছনে গুট সাদ্ধাবাদী রহস্য আছে তা ক্রমেই স্পষ্ট হতে উঠছে।"

সম্পাদকীয়তে অন্যত্র বলা হয়েছে : "পূর্ব পাকিস্তানে সাদ্ধা কমিউনিস্ট পার্টি তৈরী হয়েছে নকশালবাদের প্রেরণায়, চেয়ারম্যান মাও সে তুঙের চিন্তাধারায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনার সেখানে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীশত্রু শতমের মধ্য দিয়ে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম শব্দ শব্দ হয়নি, মৃত বেড়ে চলেছে।"

দর্পণ

ঢাকার ঘটনা সম্পর্কে অপ্রকাশিত তথ্য

তথ্য

"পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের কবলে ঢাকা শহরের পথঘাট বেলা দশটার পরই জনশূন্য হয়ে পড়ে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় যে কজন লোক এখনও শহরে আছেন তাঁরাও বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েন। রাস্তায় শব্দ শুনে বেড়ায় মিলিটারীর সাজোয়া গাড়ী।"

মৃতপ্রায় ঢাকা শহরের এই বর্ণনা দেন ওখান থেকে আগত জনৈক ছাত্র দর্পণের সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে। তিনি বলেন সদরঘাট, শাখারী বাজার, শান্তিনগর বাজার ইত্যাদি জায়গাগুলি ধ্বংসরূপে পরিণত হয়েছে। (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বিচারপতি কে এল রায়ে হত্যা সম্পর্কে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিচারপতি কে এল রায়ে হত্যা সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য পুর্নালিশের হস্তগত হয়েছে। গত এক বছর ধরে এই বিচারপতির কাছ থেকে শোভাবাজার এলাকার কয়েকজন হত্যার ভর দেখিয়ে বহু টাকা আদায় করেছে। দিন দিন দাবীর মাত্রা বাড়তে থাকে।

এ বছর জানুয়ারী মাসে বিচারপতি রায় বেশ কিছুদিন নিজ বাসস্থান ছেড়ে শহরের অন্য নিরাপদ এলাকায় গিয়ে ওঠেন।

নির্বাচনের পর তিনি ভেবেছিলেন অবস্থার পরিবর্তন হবে। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে কড়াকড়ি আশ্বস্ত হয়ে তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসেন। পাড়ার পরিচিত ছেলেরা সংগে সংগে বিচারপতি রায়ের কাছে টাকা দাবী করে। সাহসের সঙ্গে তিনি এই দাবী অগ্রাহ্য করেন। এর পরের ঘটনা পাঠকের জানা।

কিন্তু তারপরেও ঘটনা আছে। অপঘাতে মৃত্যু বলে প্রাশ্য তিনদিন পরে সম্পন্ন হয়। আত্মীয়দের অনুরোধে প্রাশ্য বাড়ির সামনে

থেকে মোতামেন করা পুর্নালিশ সরিয়ে নেওয়া হয়। সংগে সংগে দাবীদাররা হাঙ্গির হয়ে অত্যাচারের হুমকী দিয়ে টাকা চায়। বাধ্য হয়ে আবার পুর্নালিশকে প্রাশ্য বাড়ি পাহারা দিতে আসতে হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের অর্থ কমিশনার জে এল কুন্ডু এই দাবীদারদের অত্যাচারের কিছু পরোক ফল ভোগ করছেন। শোভাবাজারে কুন্ডু মহাশয়ের শব্দরবাড়ি এবং এ পরিবারের সমস্ত লোকজন এখন নিজের বাসস্থান ছেড়ে কুন্ডু মহাশয়ের লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

নকশালী সন্ত্রাস রুখতে হবে

সি পি আইয়ের সিক্রান্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে বরাহনগরে সি পি আইয়ের সক্রিয় কর্মীরা নকশালীদের হাতে প্রচণ্ড

মার খাচ্ছে বলে পার্টির রাজ্য কমিটিতে নাজিশ এসেছে। রাজ্য পরিষদের তিনদিনের সভায় নকশালীদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়েছে।

পার্টির সিদ্ধান্ত : নকশালী সন্ত্রাসবাদ রুখতে হবে। এই ব্যাপারে সি পি আই অন্যান্য বাম-পন্থী পার্টির সহায়তায় গণ-আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছে।

রাজ্য পরিষদের এই আলোচনার সময় ষ্টেড ইউনিয়ন এলাকার কিছু নেতৃস্থানীয় সি পি আই কর্মী পার্টির জাতীয় পরিষদের নকশালীদের সম্পর্কে "কোমল" দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই সমস্ত জঙ্গী নকশালীদের সাহায্যে অনেক কত্র-খানার ইউনিয়নে সি পি এমকে ঠেকানো গেছে। তারা বিশেষ করে খিদিরপুর ও মেটিয়াবুর্জের কয়েকটি ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করেন।

কিন্তু রাজ্য পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা সি পি আই কর্মীদের (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বাংলা দেশের সংগ্রাম ও এপারের মুসলীম

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গোয়েন্দা দপ্তরের খবরে প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গের কিছু সংখ্যক মুসলমান বাংলা দেশের সামরিক প্রশাসনকে নানা রকম তথ্য দিয়ে সাহায্য করছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা দেশের মুসলীম লীগের যে অল্প কয়েকজন সদস্য ও সমর্থক আছে তারা ওখানকার সামরিক কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন শহরে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিপ্লবী পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্যদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলীম লীগ, রাজ্যের

কোয়ালিশন সরকারের শরিক হওয়া সত্ত্বেও অজয়বাবুর নেতৃত্বে গঠিত বাংলা দেশ সংগ্রাম সহায়ক কমিটির সদস্য হতে সম্মত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার যে বিশেষ অধিবেশনে বাংলা দেশের সংগ্রামের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সেখানে মুসলীম লীগের তিন জন মন্ত্রী ইচ্ছাকৃত ভাবে অনুপস্থিত থাকেন।

মুসলীম লীগের বেশ কিছু অ্যাডভোকেট ও ব্যারিষ্টারকে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী ও এসোসিয়েশনে বাংলা দেশের সংগ্রাম

সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে শোনা গেছে। তাদের বক্তব্য : বাংলা দেশের সংগ্রাম পাকিস্তানের একা বিরোধী। এই আন্দোলনে ভারতের সমর্থন অসদৃশ্য প্রদোষিত। কংগ্রেসী কিছু মুসলমান এই ঘটনা পার্টির নেতৃত্বের কাছে পেশ করে বলেছেন যে, মুসলীম লীগকে নিয়ে কংগ্রেসের কোয়ালিশন গঠন রাজনীতির দিক থেকে ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য যে কোন সুবিধাবাদী পথ অবলম্বন আশ্বরে পার্টির পক্ষে কঠিকর।

সেলস ট্যাক্স বিভাগে প্রমোশনের নামে প্রহসন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সেলস ট্যাক্স দপ্তরের মধ্যে রপ্তায়া ধরতে শুরু করেছে অনেক কাল আগে থেকেই। এই ধরনের রাজস্ব আদায়কারী প্রশাসনিক কঠামোটি এখন ভেঙে পড়ার অপেক্ষায়। কিন্তু কাঁধ লাগিয়ে কোন রকমে আগলে রেখেছেন এই দপ্তরের কয়েকজন কর্মী। এই চক্রের এতকালের নায়ক কমিশনার এস কে বোসের চাকুরী মেয়াদ শেষ হতে চলল। তার যোগ্য উত্তরাধিকারী কয়েকজন এ্যাডিশনাল কমিশনার ও পদলেহী কিছু এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং চার অফিসাররা বহাল। তবিরতে কর্মচারীদের উপর লাঠি ধরিয়ে চলছেন। অর্থকমিশনার স্বনামধন্য জে এল কুন্ডু সাহেব তাঁদের বড় খুঁটি। সব মিলিয়ে সেলস ট্যাক্স দপ্তর অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতির একটি বরাবরের মজবুত ঘাঁটি। ১৯৬৭ সালে একমাত্র তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কড়া শাসনের এ ঘাঁটি নড়বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তী অর্থমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর আমলে আবার যে কে সেই।

এই চক্রটির অন্যতম প্রধান

কাজ বশব্দে কর্মচারী ও অফিসারদের সন্তুষ্টি বিধান এবং উপেক্ষিত চোখের বালি সকলকে ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করার ব্যবস্থা। তাঁদের হাতের একটি সফল হাতিয়ার হল বার্ষিক গোপন রিপোর্ট। এই রিপোর্টের মাধ্যমে অধিকাংশ কর্মচারীর প্রমোশনের বরাতকে গরম ও ঠান্ডা করে রাখা হয়। সেই বীরপুংগবের ব্যক্তিগত রোম মেটাতে অনেককে প্রমোশনে বঞ্চিত করে চাকুরীর মেয়াদ শেষ করতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এদের মধ্যমণি এ্যাডিশনাল কমিশনার কৃষ্ণচন্দ্র সাহা সাহেব এ বিষয়ে সিম্ধহস্ত ও স্বনামধন্য।

ইন্সপেক্টরদের ক্ষেত্রে এই সুপারসেন হ্যাটিক করে করে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। বছরের পর বছর প্রমোশনের নামে প্রহসন হয়ে চলেছে, এবং যারা একজনও অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত নন। কিন্তু ধামাধরার দলে নেই, এমন অনেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিতের তালিকা বৃদ্ধি করে ভাগ্যের মাথার কুড়ুল মেরে বসে আছেন। আর এইসঙ্গে অর্থদপ্তরের সেক্রেটারীর দল বশব্দদের জন্য তাম্বুর তদারিকর মাধ্যমে প্রমোশন

পাইয়ে দিতে সদা প্রস্তুত। অন্যদিকে সেলস ট্যাক্স কমিশনার মদোদয় উপরিত্ত বঞ্চিতদের আবেদন ক্রমে তাঁদের সি এ আরগুটি পরীক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ্যাসোসিয়েশনের কাছে। কিন্তু এখন ঐ ইন্সপেক্টর ও সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সামনে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখার নৈতিক দায়িত্বটি তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন নিছক নিজের সৃষ্টি হওয়ার অজুহাত তুলে।

ইন্সপেক্টরদের ঘাড় সুপারসেনের যে গিলোটিন চাপানো হয়েছে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ঠিক আগেই ছাব্বিশ জন ইন্সপেক্টরকে প্রমোশন দিতে তিন গুণ সংখ্যক ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হল। এই অবিচারের বিরুদ্ধে ইন্সপেক্টররা তাঁর আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী মহাশয় কোন প্রতিবিধান করে যাননি। ফলে ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে আবার ছাব্বিশ জনকে প্রমোশন দিতে প্রায় সমসংখ্যককে বঞ্চিত করা হল। এবারও লোকায়ত্ত সরকার আসার আগেই গত দোসরা



শিল্পী : ভূপেন সেন

মার্চ চার জনকে প্রমোশন দিতে আবার ছাব্বিশজন সুপারসেন করা হয়েছে।

কমিশনার ট্যাক্স ইন্সপেক্টরস এ্যাসোসিয়েশন বারবার দাবী করেছে, যেক্ষেত্রে অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়নি, সেক্ষেত্রে বঞ্চিত ইন্সপেক্টরদের আগে প্রমোশন দিতে হবে। কিন্তু এই ন্যায় দাবীর প্রতি অর্থদপ্তরের উচ্চপদস্থ আমলারা কণপাত করছেন না। প্রমোশন যত না হচ্ছে, তার থেকে বেশী হচ্ছে সুপারসেন। বলা বাহুল্য, যা হচ্ছে তা হল “প্রমোশনের প্রহসন”—যার ফলে ইন্সপেক্টরদের মনোবল ও কর্মপ্রেরণা ভেঙে গিয়ে তাঁর হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ক্যাডারের মধ্যে।

সি পি আই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি কথী সভায় পেশ করেন। এই ব্যাপারে উদ্ভেজনা উচ্চ মার্গে উঠলে ডঃ রপেন সেন ব্যাপারটি সম্পর্কে একটি তথ্য সম্বলিত বিবৃতি উপস্থাপিত করার আশ্বাস দিয়ে তখনকার মত আলোচনা স্বাগত রাখেন।

পরে নকশালীদের এবং সি পি এমের নাম না করে সম্মানবাদ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, বহুদিন পরে পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই সম্মানবাদ বিরোধী প্রস্তাবে সি পি এমের সম্পর্কে কটুক্তি করেন। বস্তুত এই প্রস্তাবে সি পি এমের নামোচ্চারণ কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে আছে। সি পি আইয়ের কর্মীরা এই প্রস্তাব দেখে বিস্মিত। কেননা এতদিন সি পি আই এমকে গালাগালি না দিয়ে ওপর নকশালী অত্যাচার এবং তার ফলে নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত

সি পি আই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ওপর নকশালী অত্যাচার এবং তার ফলে নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত

সি পি আইয়ের বিরুদ্ধে

কাউন্সিলার কানাই রায়ের অভিযোগ

(দর্পণের পর্ববন্ধক)

কলকাতা কর্পোরেশনের যুগ্ম ফ্রন্টের আহ্বায়ক এবং সি পি আই কাউন্সিলার কানাই রায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কাউন্সিলের সেক্রেটারির কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেছেন যে, সি পি আই শাসক কংগ্রেসের সাঙাতে পরিণত হয়েছে। বামপন্থী গণসংগ্রামকে নেতৃত্ব দেওয়ার পরিবর্তে সি পি আই ভারতের বজ্রোন্মী প্রণালীর মূখপাত্র শাসক কংগ্রেসের দালিত্যের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার এক কল্পিত আতঙ্ক প্রচার করেছে যা গত নির্বাচনে সর্বোচ্চ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। এর স্বারা পার্টি শাসক কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। এর

ফলে গত নির্বাচনে সি পি আই এবং তার নেতৃবাহিনী ইউ এল ডি এক এই রাজ্যের জনসাধারণের স্বারা হাসকর ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। পার্টির সুবিধাবাদী রাজনীতির সর্বশেষ নিদর্শন হল পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের রায় অগ্রাহ্য করে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুবিধাবাদী অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক বিশ্বাসঘাতক সরকার প্রতিষ্ঠা করে এই রাজ্যে কংগ্রেসকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা সি পি আইয়ের আর এক বিপজ্জনক পদক্ষেপ।

সি পি আইয়ের সমর্থকদের মধ্যে এ নিয়ে যে ব্যাপক বিক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে তাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আরো ঘটেবে বলে আশা করা যায়।

ঢাকার ঘটনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে সেখানে আর কেউই জীবিত নেই।

গত চতুর্দশে মার্চ রাতি এগারটা নাগাদ পাক সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সংখ্যক সাজোয়া গাড়ী এসে দাঁড়ায় রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকের সামনে। তাদের তরফে পুলিশবাহিনীকে “ফল ইন” করতে বলা হয়। উদ্দেশ্য এদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া। পুলিশ বাহিনী গুলি চালিয়ে এই নির্দেশের উত্তর দেয়। অপরপক্ষ থেকে গুলি ছুটে আসে এবং তিন-চার ঘণ্টা ব্যাপী খন্ড-বৃদ্ধি চলে। এর পর পুলিশবাহিনী বৃদ্ধিতে পারে যে আর বেশীক্ষণ ব্যারাক ধরে রাখা বাবে না। তারা তখন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

রাজারবাগের লড়াইয়ে পাক সেনাবাহিনীর বেশ কিছু মারা যায় এবং জানা গেছে যে তাদের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ অফিসারও ছিল। এ-খবর পাওয়া যায় কমসাপদর স্টেশনের জনৈক রেল পুলিশ কর্মচারীর কাছে। তিনি সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেনকে বলতে শোনেন যে একজন ব্রিগেডিয়ার রাজারবাগে মারা গেছে। সৈন্যরা কমসাপদর স্টেশনও আক্রমণ করে

ও বাঙ্গালী স্টেশন মাস্টারকে মেরে ফেলে।

রাজারবাগ থেকে সৈন্যদল যায় পিলখানায় পূর্ব-পাকিস্থান রাই-ফেলস (ই, পি, আর) ক্যাম্পে। এখানে লড়াই চলে একটানা তিনদিন বার পর গোলাবারুদ ফুড়িয়ে গেলে মৃত্যু ফৌজ পিছু হটে যায়। মর্টারের প্রচণ্ড আঘাতে ক্যাম্পটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই মৃত্যু ফৌজের যারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁরা এখন শহরের বাইরে থেকে নতুন আঘাত হানতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

এর পর আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলগুলির পাল্লা। ছাত্ররা অবশ্য অধিকাংশই আগে পালিয়ে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। বারা তখনও ছিল তাদের নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। জগন্নাথ হলের একশত ছাত্রকে সারি বেঁধে দাঁড় করানো হয় ও তারপর একজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর চলে গুলি এবং নিরানব্বইটি দেহ লুটিয়ে পড়ে। যাকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল তাকে বাধ্য করা হয় মাটি খুঁড়ে এদের কবর দিতে। সেই কাজ হয়ে যাবার পর একেও গুলি করে মারা হয়।

শেখ মুজিবুর কোথায় আছেন এর উত্তর এই ছাত্রটি দিতে পারে না। তবে জানা যায় যে ধানমন্ডীতে শেখ সাহেবের বাড়ী অক্ষত আছে এবং সেটি এখন দখল করেছে সেনাবাহিনী। ওপরে উড়ছে পাকিস্থানী পতাকা। শেখ সাহেবের পরিবারের অন্যান্যদেরও কোন খবর নেই। রোকেয়া হলের (মেয়েদের) আবাসিকদেরও কোন সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছে না। শেখ মুজিবুরের ছেলে শেখ কামালকে শেষ দেখা যায় চতুর্দশে রাতে রাজারবাগে পুলিশদের তৈরী থাকার জন্য নির্দেশ দিতে।

সৈন্যদল এখন ঢাকা শহরে যে কিছু সংখ্যক লোক আছে তাদের বাধ্য করেছে জিম্মার ছবি টাঙ্গাতে এবং গাড়ীর নম্বর প্লেট বাঙ্গালা থেকে উদ্ভূত পাল্টে ফেলতে। পথচারীদের বাধ্য করেছে তাদের জুঁপে উঠতে এবং তারা যে বাঙ্গালা দেশ আন্দোলন বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে তা বাঙ্গালায় ঘোষণা করতে। ব্যাঙ্ক, অফিস ইত্যাদি সেনাবাহিনী খুলিয়েছে বটে কিন্তু লোকের অভাবে এগুলিতে কোন কাজই হতে পারছে না। পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যেও মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া কাজে আসেন না। বাকীরা শহরের বাইরে চলে গেছেন এবং অনেকেই মৃত্যু ফৌজের সঙ্গে সহায়তা করছেন।

ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি এখন কুটিল রাস্তা ধরেছে

(দর্পণের পূর্ববন্ধক)

ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি আজ শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ একথা যে ঠিক নয় তা স্বাভাবিক। গত তিন চার বছরের সংবাদ রাখেন, তারাই বুঝতে পারবেন। অন্ধ্র, মহাশূরে, কেরলে, রাজস্থানে উত্তর প্রদেশে তা পরিব্যাপ্ত। অন্যত্রও তার আবির্ভাবের সূচনা চিহ্ন স্পষ্ট।

বিরোধী মতবাদকে হিংসামূলক দমননীতির স্বারা দমিয়ে দেবার ক্রিয়াকলাপ গত তেইশ বছর ধরেই কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি ভারতে প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদও দুঃখ করে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে স্বাধীনতার প্রথম কুড়ি বছরে স্বাধীন দেশের নাগরিকদের ওপর লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস চালানোর সংখ্যা দশ বছরের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার নিপীড়নের সংখ্যাকেও বহুগুণে অতিক্রম করেছে।

পশ্চিমত জওহরলালের আমলেই এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল। অত্যাচারের শব্দ হয় বিক্ষুব্ধ গণ-তান্ত্রিক মানবের প্রতিবাদকে স্তম্ভ করে দেবার জন্যে। বারে বারে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে যখন কংগ্রেসী সরকার সংবিধান, আইনকানুন পদদলিত করে গণ-তান্ত্রিক স্বাধিকারকে ধ্বংস করে দিতে চেষ্টা করে তখন থেকেই হিংসার রাজনীতির সূত্রপাত। এক-কথায় রাষ্ট্রীয় হিংসামূলক দমন-ব্যবস্থার প্রতিবাদেই বিক্ষোভের শব্দ হয়।

সবগুলি ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করার পরিসর এখানে নেই। কিন্তু সংবিধান নির্দিষ্ট উপায়ে নির্বাচিত কেরল সরকারকে বরখাস্ত করে দলীয় শ্রেণীস্বার্থে অন্যায় পদক্ষেপ যখন ঘটে তখন পরলোকগত জওহরলাল নেহরু ছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন কংগ্রেস দলের উপস্থিত সভানেত্রী। পিতা ও পুত্রী স্বেচ্ছাধীন বিধানসভায় আস্থা-ভাজন সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিউনিস্ট সরকারকে হিংসামূলক ভাবে গণ-তান্ত্রিক রীতিপন্থিত জলাঞ্জলি দিয়ে বরখাস্ত করার নশন ফ্যাসিস্ট নীতি গ্রহণ করতে শিখা করেন নি।

এরও আগে ১৯৫২ সালে যখন অবিভক্ত মাদ্রাজ বিধানসভায় কংগ্রেস দল সংখ্যালঘুতে পরিণত হল, তখন সংখ্যাগুরু পি ডি এফ কোয়ালিশন সরকার যাতে ক্ষমতাসীন হতে না পারে, চক্রবর্তী রাজাগোপালচারীকে বিধান পরিষদে সদস্য মনোনীত করে বে-আইনীভাবে, সমস্ত গণ-তান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে সমস্ত সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে

অকংগ্রেসী দলগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তৈরী করা হল।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম কংগ্রেসী সরকার ডঃ প্রফুল্ল চৌধুরীর আমলে পুলিশ প্রথম গুলি চালিয়ে ডাঃ শিশির মন্ডলকে নিহত করে। তার পরে বোম্বায়ে মহিলা মিছিলে গুলি চালিয়ে লতিকা, প্রতিভা, গীতা, অমিয়া চারজন মহিলাকে খুন করা হয়। কোচবিহারে কবি-তার বন্দনার রক্তে অনশনক্রান্ত জন-তার খাদ্যের দাবী স্তম্ভ করে দেওয়া হয়। ১৯৫১ সালে শত শহীদদের রক্তে বড়ুক্ষ মিছিল রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।

কংগ্রেসের পক্ষে সেদিন ব্যক্তি-গত হত্যার রাজনীতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না কারণ রাজ্যের পুলিশকে দিয়েই সেই কাজ সম্পাদন করানো যেত। কংগ্রেসী দমন-নীতি সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে যে কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত বিরাট শতাব্দীর “ভারত ছাড়” আন্দোলন দমন করার জন্যে সারা ভারতে সাম্রাজ্যবাদ যত গুলি চালিয়েছিল যত লোককে হত্যা করেছিল এবং যত লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, এক-মাত্র পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে তার চেয়ে অনেক বেশী লোক নিহত আহত ও বন্দী হয়েছিলেন (১৯৪০ সালের মার্চ মাসে ভারত সচিব মিঃ আমেরীর দেওয়া হিসাবের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিবরণী তুলনা)।

বলা বাহুল্য যে রাষ্ট্রীয় হিংসার নীতি কংগ্রেস দলের শ্রেণী-নীতি। বর্ণপুত্রের ধর্মঘটের শ্রমিক নেতার ওপর ট্রাক চালিয়ে পিষে মারা, চব্বিশ পরগণা, হুগলীতে গ্রাম্য কৃষক রমণীর ওপর গুলি চালনা, প্রকাশ্য জনসভায় কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্বের কমিউনিস্টদের হাত পা ভেঙে দেবার হিংস্র হুমকী, এতো সেদিনের কথা।

একদিকে কৃষক শ্রমিক ছাত্র মেহনতী জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারকে রাষ্ট্রীয় হিংসা দিয়ে দমিয়ে দেওয়া, অন্যদিকে টোকা ফাঁকি, চোরাকারবারী, ভেজাল ব্যবসায়ীদের প্রত্ন দানের নীতি,—একই কংগ্রেসী নীতির দুটো দিক।

এদেশের তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্রগুলি জনগণের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির ওপর আক্রমণকে নানাভাবে সমর্থন করে এসেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শাসকশ্রেণীর পদতলে কাপ্তানমূল্যে বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

বটীশ মণীষী অধ্যাপক হিউ টিংকোর তার “ভারত ও পাকিস্তান” গ্রন্থে সখেদে উল্লেখ করেছেন, দুদে-

শেই “নাগরিক স্বাধিকার রক্ষার সতর্ক প্রহরী হিসাবে সংবাদপত্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। দুদেকটী ঘটনা বাদ দিলে সংবাদপত্রগুলি সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করা ছাড়া আর কিছুই করে নি। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয়ই বলতে বাধ্য হবেন যে সংবাদপত্রের কতব্যবোধ স্বাধীনতার আগেই বা কিছু ছিল, স্বাধীনতার পরে তা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে নি।”

মানুষের জীবনকে জলের দামে বিক্রী হতে দেখে যদি প্রতি-রোধ জাগে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং একটা জাতি যে এখনো প্রাণবন্ত সজীব তাদের প্রতিরোধের মাধ্যমেই তা ফুটে ওঠে। কিন্তু একমাত্র জনগণের ঐক্যবন্ধ প্রতি-রোধ গড়ে তুলেই এর প্রতিকার সম্ভব, ব্যক্তিকে হত্যা করে নয়।

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় হিংসার

বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধ, অন্য-য়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। কোথাও কোথাও তেইশ বছরের ছমা, পুঞ্জীভূত ক্রোধ বিপথে যায়, তার পন্থাতি অনেক ক্ষেত্রে সমর্থনীয় বলে মনে না হলেও, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কাহিনীতে তা সমৃদ্ধ।

এই প্রতিরোধ দেশের রাজ-নীতিতে সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বহুক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে শাসকশ্রেণী তার কায়দা পালটায়। কায়দা পাল-টারার পন্থাতি নিয়ে কংগ্রেস দু-টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু সচচর শাসকশ্রেণী একদা বামপন্থী ছিলেন এমন কয়েকটী দলকে কিনে নেয়। ফলে ১৯৬৯ সালের শেষভাগ থেকে কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী কেরল সরকারের পতন ঘটে। ১৯৬৮ সালে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সভানেত্রী রূপে গায়ের জোরে যে ভাবে কংগ্রেস বিরোধী নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে দিয়েছিলেন, ১৯৬৯ সালে নয়া কৌশলে ছন্দ বামপন্থী দলগুলির সহায়তার একই কাজ তিনি সম্পন্ন করলেন।

পশ্চিমবঙ্গেও এর কৃচ্ছ্রা এল। জনগণের মূল শত্রু কংগ্রেস পর্বদন্ত হলেও, বেইমান ছন্দ-বাম

দলগুলির সাহায্যে তারা আবার ক্ষমতাসীন হবার সম্ভাবনা দেখতে পেল। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে বামপন্থী দলগুলিকে বিভক্ত করতে পারলেও শাসক কংগ্রেস বামপন্থী জনতাকে এখানে প্রতারণিত করতে পারে নি। প্রধান বামপন্থী দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি।

তখন তারা ব্যক্তিগত খুন ও হত্যার রাজনীতি গ্রহণ করেছে। নকশাল নামধারী শাসকশ্রেণীর দালালদের ওপর এ দায়িত্ব তারা অর্পণ করে। কোথাও কোথাও বিক্ষুব্ধ বেশ কিছু সংলোক এই আন্দোলনে প্রথম দিকে যোগ দিলেও শেষ পর্যন্ত এই প্রতিবিলম্বী গোষ্ঠী পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের হত্যার হাতিয়ারে পরিণত হয়। একদা সেনিনের সহকর্মী লিও ট্রটস্কিও ব্যক্তি অহমিকাবাদ ও তাত্ত্বিক বস্তুবাদের বিবে আচ্ছন্ন হয়ে শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট অনুরাগে পরিণত হয়েছিলেন।

কোন কোন প্রাক্তন বামপন্থী দল পশ্চিমবঙ্গে হত্যা ও খুনো-খুনির রাজনীতি সুরু করার দায়-ভাগ সি পি এমের ঘাড় চাপিয়ে ছেন। এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে (শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল আমার এই অপরূপ লাবণ্য



দিলে পর দিলে

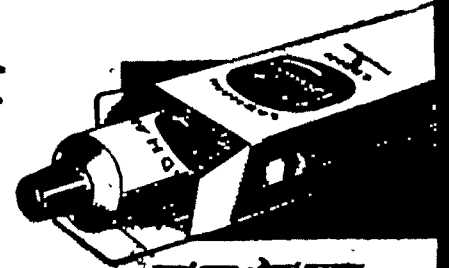
সাধনা

বিউটি

ক্রীম

মেখেই হযোছে

‘সাধনা বিউটি ক্রীম’ একটি অতি আধুনিক সংযোগ



সাধনা ওষধালয়

কলিকতা-৩

সুশীল ধাড়া এখন অজয়বাবুর বিরুদ্ধে লেগেছেন

(রাজনৈতিক সরোদনাত্মক)

শ্রীসুশীল ধাড়র শ্রীঅজয় মদ্যমন্ত্রীর কাছে বেপাক্তা হয়ে এখন অজয়বাবুকে দল থেকে হটা-বার চেষ্টা করছেন। কয়েকদিন পরে বাংলা কংগ্রেসের দু'রাজ্য সম্মেলন হবে। সেখানে অজয়-বাবুকে আর একবার নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা হবে এবং চাপ সৃষ্টি করে তাকে মদ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে আনবার একটা চেষ্টা হবে। অজয়-বাবু যদি মদ্যমন্ত্রীর পদ অকিড়ে থাকেন তবে বাংলা কংগ্রেস সংগঠ-নকে সুশীলবাবু হাতের মুঠোর পরে দরকার হলে সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবার চেষ্টা করবেন। তাতে যদি সরকারের পতনও ঘটে তাহলেও সুশীলবাবু পরোয়া করবেন না। এই হল সুশীলবাবুর সর্বশেষ ষ্ট্র্যাটেজি।

রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার বাংলা কংগ্রেসের যোগদান এবং অজয়বাবুর মদ্য-মন্ত্রীর পদ গ্রহণে সুশীলবাবুর গুরুতর আপত্তি ছিল। এই আপ-ত্তির মূল কারণ ছিল এই যে তখনও সুশীলবাবু ভেবেছিলেন

অজয়বাবু হয়ত তার মান ভাঙ্গাতে তাকে মন্ত্রী করতে চাইবেন, কংগ্রে-সও হয়ত তাকে সঙ্গে পাবার জন্য বেশ সাধ্যসাধনা করবে এবং একজন দৃঢ়চেতা কমিউনিস্ট বিরোধী হিসাবে মন্ত্রী করবে।

কিন্তু সময় কালে দেখা গেল কেউ আর সুশীলবাবুর নামটা পুষ্পিত করছেন, দল হিসাবেও তার সঙ্গে কেউ একটু ভাল মন্দ পরা-মর্শ করছেন। তবু শেষ পর্যন্ত সুশীলবাবুর তার কর্ম পরিষদের বেশ কয়েকজন ইয়েসম্যানকে দাদার কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু দাদা তাদের স্রেফ ছাঁকিয়ে দিয়েছেন। মন্ত্রিসভা যেদিন গঠিত হয় সেই দিন রাজসভানে সুশীলবাবু উপ-স্থিত থেকে বিরল বদনে মালা পরিয়েছিলেন “অজয়দা” আর “বিজয়দা”কে। কিন্তু সেই দিন দেখা গেল কেউ যেন তাকে চিনতে পারছে না।

এর পরের অবস্থা আরো বিয়োগান্ত হল। মন্ত্রিসভা গঠিত হল, দলের নেতা মদ্যমন্ত্রী হয়ে-ছেন, কিন্তু তিনি কোন ব্যাপারেই দলের সঙ্গে কোন পরামর্শ আলো-

চনা করলেন না। এমনকি অজয়-বাবু লাগো কংগ্রেস দপ্তরে পর্যন্ত যাওয়া বন্ধ করলেন। “বাংলা দেশ” নিয়ে সাহায্য কমিটি গঠিত হল তার জন্য সভা হল, কিন্তু কোথাও সুশীলবাবুর নাম নেই, পাস্তা নেই। সেই কমিটিতে শ্রীহরিদাস মিত্রকে সম্পাদক করা হল। অর্থাৎ এই কমিটির মধ্য দিয়ে সুশীলবাবু যে আবার সকলের সঙ্গে একটু দহ-রম মরম করবেন সেই পথও বন্ধ হল।

এইবার সুশীলবাবু এক কাজ করে বসলেন। তা হল অজয়বাবু কর্তৃক পরিত্যক্ত আর এক ব্যক্তি ডাঃ ভূপাল বসুকে নিয়ে নিজেই একটি কমিটি গঠন করে ফেললেন। ভূপাল বসু সভাপতি, সুশীল ধাড়া সম্পাদক। মঙ্গলবার বাংলা কংগ্রেস দপ্তরে এই কমিটির একটা সভা আহ্বান করা হল। দুপুরে সুশীল বাবু অনেক দিন পরে দাদাকে একটা ফোন করলেন, “দাদা বাংলা দেশ নিয়ে আলোচনার জন্য দলের সভা হবে আজ সন্ধ্যায়। আপনাকে আসতে হবে।” অজয়বাবু প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, বলেন, বাংলা

দেশ নিয়ে সর্বদলীয় কমিটি হয়েছে। “যা করবার সেই কমিটি করবে। কিছু সাহায্য করতে হলে সেই কমিটিকে করবে। দলের হয়ে আলাদা কিছু করার নেই। আর আমি কোন সভায় যেতে পারবো না।

এর মধ্যে সুশীলবাবু আবার হুজুদিয়াতে দলের সম্মেলনের জন্য জোর প্রস্তুতি শুরু করেছেন। সম্মে-লনের মন্ডপ তৈরী ও বিদ্যুতের কাজ করার জন্য কলকাতা থেকে কনট্রাকটর হুজুদিয়া গেছে। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ তিন দিন থাকবে, খাওয়া দাওয়া করবে, হৈ হৈ রূপার। কিন্তু এই হৈ হৈয়ের মধ্যে শ্রীধাড়া বেশ কিছু অস্ত্র প্রস্তুত করছেন অজয়বাবুর বিরুদ্ধে-প্রয়োগের জন্য। মন্ত্রিসভা গঠিত হবার আগেই কর্ম পরিষদের সভায় অজয়বাবুকে বলা হয়েছিল, তিনি লোভী, তিনি মন্ত্রিত্ব পাগল। এইবার বলা হবে আরো কড়া কথা। কারণ রাজ্যের মন্ত্রিসভা তাদের

কার্যধারাকে কিছুটা “লেক্ট ওরি-য়েন্টেড” করার জন্য কর্মসূচী নিয়েছেন। যেমন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ পাহারা প্রয়োগ করা হবে না, কৃষকদের দখলী জমিতে সস্তা প্রদান করা হবে একশ দিনের মধ্যে। যেখানে সুশীলবাবুর দর্শন হল সব মেরে ঠাড়া করার সেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সরকারের ভূমিকা সুশীলবাবুর কাছে অসহ্য। তারপর কৃষকদের দখলী জমি কৃষকদের দেওয়া? এত হল প্রচণ্ডতম নীতি বিরোধী কাজ সুশীলবাবুর বিচারে। সুশীলবাবুর বক্তব্য হল দখল করা জমি সব কৃষকদের ফেরত দিতে হবে; তারপর সরকার দেখবেন যে-সব জমি ভেঙেট বা বাড়তি সেই সব জমি সরকার দখল করে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বন্টন করবেন।

শব্দ তাই নয়, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টো-পাধ্যায় যে কর্মসূচী রচনা করছেন সেই কর্মসূচীও করা হচ্ছে বাম ঘোষা করে। অর্থাৎ সি পি এম অপেক্ষা আমরা কম নই এই মনো-

(শেখাংশ চম পৃষ্ঠার)

ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পুনরায় ক্ষমতাসীন করার স্বপক্ষে এটাকেই যুক্তি হিসাবে খাড়া করতে চাইছেন।

যদি কেউ জানতে চায় যে কোন দলের কত সমর্থক অন্য দল অথবা অভিমুখ সি পি এম দলের হাতে নিহত বা আহত হয়েছে, তা হলে এঁরা সদৃশর দিতে পারেন না। কারণ আসলে তাঁদের অভিযোগ বিশেষ একটী রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে রচিত। তা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পুনর্বা-সন। যেনকশালীরা ব্যক্তি হত্যাকে রাজনীতি বলে গ্রহণ করেছে, তাদের সঙ্গে এদের গলায় গলায় ভাব।

কেরলে সি পি এমের বিরুদ্ধে কোন খুনোখুনির অভিযোগ এঁরা তোলেন নি, কিন্তু তবু তাঁরা যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছেন এবং কংগ্রেসের সমর্থনে “পুতুল সর-কার” গঠন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও এদের ভূমিকা এক। জনগণের রায় অনুযায়ী বামপন্থী সরকার গঠনে সাহায্য না করে তারা অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল সরকার স্থাপন করেছেন।

এবার নতুন করে উচ্চপর্যায়ের হত্যা ও ব্যক্তিগত-সম্ভাস সৃষ্টির প্লানমারফিক পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।

যে পুলিশবিভাগ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে দায়ী, জন-গণের স্বাধিকার ব্যক্তিগত স্বাধী-নতা রক্ষার জন্যে ভারপ্রাপ্ত, তাদের যোগ্যতার মান ক্রমশঃ নিম্ন-মুখী। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এটাই ঘটে থাকে। অপরাধীকে ধর-

বার ক্ষমতা পুলিশের যত কমছে, ততবেশী তাদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণের জন্যে কোলাহল উঠেছে। এবং যতবেশী বিশেষ ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হচ্ছে, ততবেশী হারে পুলিশের অপরাধ দমনের যোগ্যতা কমে যাচ্ছে। কার্যতঃ পুলিশ বাহিনীকে জন-গণের ওপর হত্যা ও সম্ভাসের নীতি প্রয়োগের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠতে হচ্ছে।

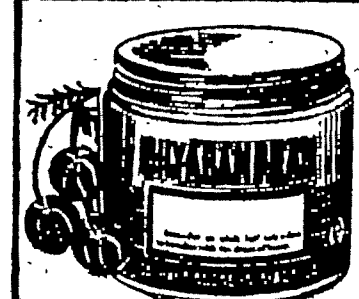
এই ষড়যন্ত্রমূলক রাষ্ট্রীয় হিংসা ও জনগণের রক্তধারার ঘাদের হাত কলংকিত, তারাই স্বাক্ষর কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তমূলক সহায়তায় এ রাজ্যের ক্ষমতা অধি-কার করেছেন। তাই ব্যক্তিগত হত্যা ও সম্ভাসের রাজনীতি আজ সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্পকলায় পরি-ণত হতে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় এই সত্যকবাপী উচ্চারিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, ব্যক্তিহত্যার রূর চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্যে জনগণ রক্ত না দাঁড়ালে, কেউই এর হাত থেকে নিস্তার পাবেন না। অজস্র রক্তসিঞ্চে গণ-তান্ত্রিক স্বাধিকারকে হারাতে হবে।

এ ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যেই আঘাত হানতে শুরু করেছে। সম্ভাসের রাজস্ব প্রতিক্রিয়া-সাম্প্রদায়িকতার হাত ধরে এগিয়ে এসেছে। সভা-সমিতির প্রাথমিক অধিকারও আজ লুপ্ত; সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার বিপর্যস্ত করার আগেই এই অশুদ্ধ শক্তিকে পর্যায়ান্তর করতে হবে। গণতন্ত্রের বিপদ সংকেত ঘটাধূনি বাজতে শুরু করেছে। জনতাকে হুঁশিয়ার হতে হবে।

**বৃদ্ধ বয়সেও
স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে**





**সাধনা
চ্যবনপ্রাশ**
বহুমূল্য আয়ুর্বেদীয় রসায়ন
সকল বয়সেই সমাধ উপকারী

প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪
অধ্যাপক ডাঃ বোসেশ্বর বোস এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) আগরতলা
কলেজের হাসান শাহের কৃত্তবর্ষ অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ মরেশচন্দ্র বোস, এম.বি.বি.এল. (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ মানুষ জরাজীর্ণ
হয়ে হ্রস্ব ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি
বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ
বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট
থাকে।

স্বাধীনতা চিহ্ন

বাংলা দেশ বহু শক্তিবর্গ ও ভারত

রাজনীতি মল্লিক

বাংলা দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা চায়, স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের মারফৎ। কিন্তু আণবিক শক্তির বহু রাষ্ট্রস্বয়ং, সোভিয়েত রাশিয়া এবং আমেরিকা ক্ষমতা রাজনীতির কূটনীতির কূটকৌড়ায় এখনই ক্ষান্ত হবে না; কারণ বিশ্ব-ব্যাপী সামরিক তথা রাজনৈতিক স্বার্থপূর্তির উদ্দেশ্যে তারা ভারত-পাকিস্তান উপ মহাদেশের এই সংকট কূটিল পূর্বদৃষ্টিতে এমন এক শক্তি ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়, যাতে ইসলামাবাদ, নতুন দিল্লী এবং ঢাকার কেন্দ্রবিন্দুগুলির ওপর খাড়া করা অচলায়তন শক্তিস্থলের ত্রিকোণ পাকিস্তান ভারত এবং বাংলা-দেশের জনগণকে সর্বদা বিবাদের টানাপোড়েনে বাতিব্যস্ত রাখে এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ তথা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো প্রগতিশীল পদক্ষেপ ফেলতে না দেয়। ভারত সরকারের বর্তমান নীতি এই দুই বিশ্বশক্তির ক্ষমতা রাজনীতির ধারা অনুগামী। ভারতের শাসকদল ইন্দিরাজীর ইন্ডিকেট কংগ্রেস ঐ ধারার বিশ্বস্ত অনুসরণে চলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছেনা, যা আন্তর্জাতিক স্তরে ঐ দেশের জনগণকে রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে কার্যকরী সাহায্য দিত।

অথচ ভারতের জাগ্রত জনমতকে শাস্ত রাখা দরকার। সেজন্য চাই সূক্ষ্ম ও অভিশঙ্খমূলক প্রচারের ধুমুজাল বিস্তার। ভারতের পরজাতিশাসকদের রচিত প্রস্তাব-যাতে বর্তমান দলীয় শক্তির পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলির সার নীতি উপায় ছিলনা—এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দলের সর্ব-ভারতীয় অধিবেশনে এমনি বিভ্রান্তিকর প্রচারের কাড়ানাকাড়া বাজানো হয়েছে। ফলে জনগণের মধ্যে মোহ জন্মেছে, যদিও সাময়িক ভাবে যে, ভারত সরকার বৃষ্টি প্রকৃতিই বাংলাদেশের বর্তমান অস্থায়ী এবং ক্রান্তিকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে চায়, বৃষ্টি আন্তর্জাতিক পরিবেশ অনুকূল না হওয়ার দরুণ দিতে পারছে না। আসল সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত দেখা ভারতের অধুনা শাসকশ্রেণীর অভিপ্রায় নয়। এর কারণ—

(এক) যে মৌল নীতির ভিত্তিতে বাংলা দেশের জনতা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চায় এক স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বে তার প্রতিষ্ঠা পশ্চিমবঙ্গে যেমন, তেমনি কাম্বোজেরও অনিবার্য। বিশেষতঃ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যক্ষ

ফল রূপে এই অধিকার বাংলা-দেশে অর্জিত হলে ভারতের শাসকশ্রেণী আর একবার আন্তর্জাতিক তথা নৈতিক সংকটে পড়বে, যার সুবিধা পাকিস্তানের সরকারই কেবল নেবেনা, শ্রীনগরস্থ কাম্বোজী জনগণের নেতারা উক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রয়োগ দাবী করবে বাংলা দেশের দৃষ্টান্তে উদ্ভূত হয়ে। বঙ্গ বাহাদুর, ভারতের শাসকশ্রেণী কাম্বোজের জনগণকে উক্ত অধিকারের প্রয়োগ—যার অনুমতি ১৯৪৮ সালে তদানীন্তন ভারত সরকার দিতে একরকম স্বীকৃত হয়েছিল—থেকে বিরত রাখতে চায়। সম্প্রতি কাম্বোজের নির্বাচনে তথাকার প্লেবিসিট ফ্রন্টকে আইনের বলে আটকে রেখে ভারত সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার হননের যে নমুনা রেখেছে, তাতে ভারতের বর্তমান শাসকদলের পক্ষে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিয়ে ফের বিশ্ব-জনমতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানার সম্ভাবনা খুব প্রতীকর নয়।

(দুই) স্বাধীন বাংলাদেশে আরম্ভ মন্ত্রিসভা গঠন সংগ্রামের কোশল ও পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে এবং ক্রমশঃই তা তীব্র থেকে তীব্রতর পর্যায়ে উন্নীত হবে। আগামী ক মাসে এই সংগ্রামের ব্যাপকতা ও বিস্তার ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে অর্থাৎ আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং উত্তর-বঙ্গ সমেত সমগ্র পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হবে, যার তাল সামলাতে হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক উল্লেখযোগ্য অংশকে এই অঞ্চলে মোতায়েন রাখতে হয়। গেরিলা বৃন্দে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য পরিণতি ক্ষয়ান্তক চরম লড়াই (War of attrition)। এমনি লড়াইয়ে পাকিস্তানী বাহিনী যতদিন লিপ্ত থাকে, এবং যতদিন বাংলা-দেশের উদীয়মান বৈপ্লবিক শক্তিদেব ধরে রাখতে পারে, ততদিনই ভারতের উচ্চ-ধনিকবর্গ চালিত সরকারের নিশ্বাস নেবার অবসর। বাংলা দেশে গেরিলা সংগ্রাম মারফৎ নিন্মতম সমাজস্তর থেকে উন্নীত সর্বহারা কৃষক, শ্রমিক এবং সচেতন বৃন্দে বিপ্লবী নেতৃত্ব একবার প্রতিষ্ঠিত হলে, উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীদের মেকী গণতন্ত্রের নাভিস্বাস উঠবে। সুতরাং এই শক্তিকে ভারতের পূর্ব সীমান্তে জাঁকিয়ে বসতে না দেওয়াই অধুনা ভারত সরকারের সম্ভাব্য শাসক শ্রেণীর নীতি।

এই নীতির আর এক মূখ্য, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ যাতে অনির্দিষ্টকাল অবধি বাংলা দেশে রাষ্ট্র সংহতি রক্ষার লড়াইয়ে আবদ্ধ থেকে যায়, তার ব্যবস্থা করা। পূর্বদিক পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহত হতে বাধ্য হলে যে ক্ষোভ এবং হতাশাজনিত বেপরোয়া ভারতবিশেষ পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী তৈরী করবে, তাতে ভারতের সেনাবাহিনীর পক্ষে পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষার দায় ও ঝুঁকি বহুলাংশে বর্ধিত হবে। একারণে বর্তমান ভারতসরকারের প্রতিরক্ষা নীতি নিশ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশে যতদিন সম্ভব এক রাজনৈতিক তথা সামরিক অচলায়তনী অবস্থা বজায় রাখার তাগিদে, রক্তক্ষয়ী ভারসাম্য জুইয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষমতা রাজনীতির সঞ্চল প্রয়োগে। এই ধরনের শক্তি ভারসাম্য জুইয়ে রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভাবমূর্তি ও প্রভাব বাড়িয়ে তোলা, যুক্তরাষ্ট্রের যেমন, সোভিয়েত রাশিয়ারও বর্তমান পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম নির্ণায়ক সূত্র। ভারতের শাসকশ্রেণী এই বহু বিশ্বরাষ্ট্রদ্বিটির স্বারা অনুসৃত বিবাদ বাধানো ও তার নিষ্পত্তির ছলে বিবর্তমান ক্ষয় রাষ্ট্রগুলির মরুশিয়ানা করার রাজনীতিকে মূলতঃ মেনে নিয়েছে—মুখে ভারত মহাসাগর অঞ্চলকে ক্ষমতারাজনীতির প্রভাবমুখ রাখার জন্য বতই মেকী দরদ দেখাক। বিশ্বের কথা নয়, যে, বাংলাদেশে বর্তমান মন্ত্রিসভার পটভূমিকায় ভারতের কূটনীতিজ্ঞ দূতরা ওয়াশিংটন এবং মস্কোতে বহুক্ষেপে নীরব কর্ম-পদ্ধতি এবং সরব দুর্ভাগ্যবান স্বারা উক্ত ভারসাম্যের ক্ষেত্র রটনার উদ্যোগী হয়েছে। লক্ষ্য, আর এক তাল-খন্দ-চুক্তির খসড়া তৈরী করা, যার অনুবন্ধ শর্তাদির ফাঁদে স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশকে পাকিস্তানী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বোঁধে রাখা চলবে, যদিও স্বায়ত্তশাসনের নামে কতকগুলি স্ত্রেপক দেওয়াও হবে।

জনমত বনাম সামরিক শিল্পতন্ত্র। স্বতন্ত্র বিশ্ববৃন্দে পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার শিল্প মালিক এবং সমাজের সর্বোচ্চ কোটিতে অবস্থিত ধনিকবর্গের সঙ্গে সংঘর্ষ সমরনায়করা দারা দেশে যেমন তেমনি রাষ্ট্রবিশ্বের ওপর খবরদারি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এবং তাদের সম্মিলিত অর্থ-নৈতিক তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা-জোড়ের কারেমী স্বার্থে স্বদেশে এবং বিদেশে রাষ্ট্রচালিকা নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করে। শিল্পবিকশিত আমেরিকার অনুসরণে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কতকগুলি আমেরিকার বশবদ সরকারের মাথা হয়ে দাঁড়ায়, এমনি শিল্পমালিক তথা সমরনায়কদের আমলাতন্ত্র। উদাহরণতঃ দক্ষিণ

ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া এবং তাইওয়ান সরকার। পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী বহুদিন থেকেই এমনি আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক জোড়ের কবলিত। সম্প্রতি কয়েক বছর হল ভারতেও এ ধরনের শক্তি সমাহার ঘটেছে। তবে ভারতে জনমত অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী জাগ্রত বলে ভারতের শাসকবর্গ এই বহু আমলা তথা সেনাবাহিনীর হাই-কমান্ড তথা বহু ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিকশ্রেণীর জোড় সূচ্য-কৌশলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ধোঁকা চালায়। সেজন্য এদের প্রচারপদ্ধতি আরও সূক্ষ্ম, আরও ধূর্তমিতে ঠাসা, আরও সুদূর-প্রসারী। কিন্তু জোড়ের কারেমী স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে এদের রাষ্ট্র-প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর বৈরাচারী। একের পর এক রাজ্য সরকার উল্টিয়ে ইন্ডিকেট কংগ্রেসের মাধ্যমে শাসকশ্রেণী যে কঠোর গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র চালিয়ে চলেছে, কাম্বোজ থেকে পশ্চিম-বাংলা পর্যন্ত জনমতের কঠোরোষেই তার প্রমাণ। এ-হেন সরকার যখন বাংলা দেশের বহুদূর শোষিত সর্বহারা কৃষক-শ্রমিক বৃন্দজীবীদের মন্ত্রিসভা হঠাৎ নিষ্ঠুর দরদী হয়ে দাঁড়ায়, তখন যুক্ত হতে হবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপন মরু-শিয়ানা বাড়াবার তাগিদে এই প্রচার-মূলক পটভূমিকার রচনা।

প্রসঙ্গতঃ, নেপো দুই মারার মত ভারত সরকার চাইছে যত সম্ভব কম-সে-কম ঝুঁকি নিয়ে বাংলা-দেশে আপন প্রভাবপরিধি বিস্তৃত করতে। সুতরাং, প্রাজ্ঞ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী এম সি চাগলা সাহেব বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেবার আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যতই সদুপদেশ দিন না কেন, তা বখিরকণ্ঠে ফেলার মতই পণ্ডিত্য হবে। ইসলামাবাদ সরকারও জানে, ভারত সরকাররূপী মোস্তার দৌড় মস্কোর কোন মসজিদ তক্। তাই তারা একনাগাড়ে চুটিয়ে ভারত-বিরোধী মিথ্যা প্রচার করে চলেছে এটা ভাল-ভাবে জেনে যে, ভারত থেকে কোনো শপথসভারের সর্ববরাহ বা সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকের অনুপ্রবেশ পাকিস্তানে ঘটেনি। অপরপক্ষে তারা ক্রমজিনের শক্তি মানবগুলির ডান্ডার শক্তিকে সমীহ করে তাদের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি একটু আঘাত করে যাবে মেজে ভদ্র ও দেখনবাহারি করে তুলছে। উদ্দেশ্য সাধু প্রবণতা, সন্দেহ নেই।

এম সি চাগলার উক্তি উদ্ভূতির অবকাশ রাখে। ভারত সরকারকে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রোথ করে তিনি বলেছেন যে, বাংলা-দেশকে সরকারী স্তরে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টা কোনো আইনগত সূক্ষ্মবিশ্লেষণের ব্যাপার নয়। কারণ রূপে তিনি অকাটা বৃষ্টি দর্শিয়েছেন যে, স্বীকৃতি না দিলে নৈতিক সমর্থন ও সমবেদনা প্রকাশ ও পররাষ্ট্র হস্তক্ষেপের রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে, স্বীকৃতি

দিলে এ ধরনের কাজ আইনসম্মত পদ্ধতির আশ্রয় পায়। “স্বীকৃতি যদি অবিলম্বে না দেওয়া হয়, তাহলে ইতিহাস এবং গণতন্ত্রের বিচার এজলাসে আমাদের বিচার হবে; বলা হবে যে, আমরা এক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে সময়ের দাবী অনুযায়ী উপযুক্ত সাড়া দিতে পারিনি।”

এক নিকটতম প্রতিবেশী জাতি হিসেবে ভারতীয়রা আজ বাংলাদেশে “সামরিক বৈরতন্ত্রের বর্বরতা” সম্বন্ধে নিন্দাবাদসূচক প্রস্তাবের এবং বক্তৃতা করার স্তর পেরিয়ে গেছে। এখন এসেছে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আহবান!

এই কঠোর আশু পালনীয়তা সম্পর্কে কোনো ভ্রান্তি, ভারত সরকারের প্রচার দুন্দুভি সম্পর্কে কোন মোহ থাকে এখন বাস্তবতা-বিরোধী কাজ হবে। সুতরাং, বিদেশের জননেতাদের মধ্যপেক্ষী হয়ে নিশ্চেষ্ট থাকা এই সঞ্জীন-মুহূর্তে ভারতের নির্ণীত শোষিত জনগণের পক্ষে আত্মহত্যার সমতুল্য কুকাঙ্ক হবে।

পাকিস্তানের বর্তমান সামরিকতন্ত্রী শাসকগোষ্ঠী মন্ত্রিস্বর মহম্মদের মত উদারপন্থী, মধ্য-বিত্তশ্রেণীপ্রতিনিধি নেতার সঙ্গে আপোষ না করে উপরন্তু তাঁকে নিগাহীত এবং সম্ভবতঃ বন্দী করে বাংলা দেশে জনগণের বিপ্লবী অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে।

তাদের নির্বুদ্ধিতাকে ধন্যবাদ, সকলপ্রকার সমাজবাদ এবং উপ-নিবেশিকতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও শোষণমুক্তির বিপ্লবী সংগ্রাম আজ সাফল্যের স্বে উপর্যুপ।

Free I Free II Free III

ধবল বা শ্বেত

আমাদের বিশ্বাস “দান সাক্ষা” ১৯২৬ সাল থেকে রোস্টারের সম্পূর্ণভাবে রোস্টার সাক্ষরে আসছে। যার তিন দিন ব্যবহা-য়েই শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়।

বিনামূল্যে এক শীশি দেওয়া হয়।

WESTERN INDIA CO. (V.N.) P
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

স্বাগতকারী / চক্রবর্তী প্রবোজন

টান্ড বনিকের পাল্লা

নির্দেশনা / বরুণ দামস্ত

৪২, বাবুদাম ঘোষ রোড,

কলিকাতা-৪০

বাংলা দেশ ও ভারত সরকার

আজ যখন সারা ভারতবর্ষ মুক্তি-বর মহামানের স্বাধীন। পূর্ববাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দেবার দাবীতে সোচ্চার, তখন ভারতীয় সংসদে সুব দলের সম্মতিতে পূর্ব বাংলার মুক্তি-কামী বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে সংহতি জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করানো হল। এই প্রস্তাব আমদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। কেননা, এই প্রস্তাবে আসলে একটি মূর্ত কূটনৈতিক খোঁকা অতি সুকৌশলে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাংলার মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটাই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর ধরে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক কারদার বিবেকহীন শোষণ চালিয়েছে পূর্ব বাংলার মানবের ওপর। ন্যায়কন্ঠ মুজিবর এই নির্বিচার শোষণের বিরুদ্ধে সংহত করেছেন ওপর বাংলার তাইদের। তার দৃষ্ট প্রতি-বদল সংকল্পের অনমনীয়তার আপো-ষহীন সংগ্রাম এবং তার নীতির প্রতি অমূল্য জনসমর্থনে আত-ক্ষিত পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী তাদের শোষণকে নিরন্তর করার উৎকট আশার পূর্ব বাংলার সাত কোটি স্বাধীনতাকামী প্রায় নিরস্ত বাঙ্গালীর ওপর যে পৈশাচিক বর্বরতার তান্ডব শূর করেছে তা মানবসভ্যতার ইতি-হাসে অপ্রতিষ্পন্নী পাপাচারের কল-বত্ম সংবোজন। তাই মানব হিসেবে বাংলা দেশের এই মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। সংসদে প্রস্তাব পাশ করে ভারত স-র-

কার সে কর্তব্য পালন করে বিশ্বের ন্যায়বাদী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাহবা লাভ সুনিশ্চিত করেছেন ঠিকই; কিন্তু রাজনীতিতে ন্যায়বাদের স্থান কতটুকু?

পূর্ববাংলার মুক্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। পাকিস্তান সৃষ্টিকাল থেকে বর্তমান মুক্তি আন্দোলন পর্যন্ত পাক-ভারত সম্পর্কের পর্যালোচনা করলেই এই গুরুত্বের সঠিক আন্দাজ করা যাবে। জিমা সহবেবের হিংস্র ধর্মাত্ম জিগির নেহেরু প্রভৃতি ভারতীয় নেতাদের অপরিণামদর্শী ক্রমতালিম্বা, পলায়-মান পাপবৃষ্টি ইত্যেজ সাম্রাজ্যবাদের বিভেদ সৃষ্টিকারী হীন চক্রান্ত—এই সবের পটভূমিতে ভারতীয় উপমহা-দেশকে ঋণিত করে সৃষ্টি করা হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান রেষ্টের। পাকিস্তানের জন্মলেনের এই হিংসা আর পাপ আর বিভেদ পরবর্তীকালে দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর ধরে ভারতের শান্তি আর নিরাপত্তার পথে দুর্ভিত্ত্য বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে গৃহে অভিসন্ধি নিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারত বিভাগের পরিকল্পনা করে-ছিল তা পূর্ণ হতে দেবী হয়নি। পাকিস্তানের ভারত বিবেককে উসকে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও বৃটেন কমিউনিস্ট চীন এমনকি সমাজতন্ত্রী রাশিয়াও ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশ থেকেই রাজনৈতিক মনোহা-শিকার করেছে। পূর্ব এবং পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা অক্ষুর রাখতে গিয়ে ভারতের অর্থনীতির ওপর

প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে, উন্নতী হয়েছে ব্যাহত।

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে যে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার ফলে দ্রান্ত ভারতীয় নেতৃত্ব পাকিস্তান সৃষ্টি মেনে নিয়েছিলেন, সেই ভুল সংশোধনের সুবর্ণ সুযোগ আজ এসেছে। এই মুহূর্তে মুজিব সর-কারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে ভারত সরকারের উচিত স্বাধীন পূর্ব-বাংলার হাত শক্ত করা। তাহলে পূর্ব সীমান্ত রক্ষা করার বিপুল করভার থেকে রেহাই পাবে ভারতীয়

তারা নিজেদের স্বার্থেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে ভারতের হাত শক্ত করতে চাইবেন। পাক ভারতের মধ্যে ষতদিন ঠান্ডা অথবা গরম লড়াই জ্বিইয়ে রাখা চলে ততদিনই তাদের লাভ। স্বাধীন পূর্ববাংলা থেকে তাদের লাভের আশা কম, অথচ ভারতের লাভ সাড়ে বোল আনা। সুতরাং আমেরিকা অথবা তথাকথিত ভারত-মিত রাশিয়া কোন দিনই স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতির সবুজ সংকেত দেবে না। যা কইবার ভার-তকে তা নিজের দায়িত্বেই করতে হবে এবং অবিলম্বে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের

দাবীতে সংগ্রাম শূরু করেন তাহলে?

সুতরাং ভারতীয় সংসদে এমন একটি সবিধাবাদী প্রস্তাব পাশ করানো হলো বা মোচড়ালে নানান ধরনের অর্থ করা যেতে পারে, যেমন, বৃহৎ শক্তিগুলি চাপ দিলে বলা যেতে পারে ওতো নির্ধারিত মানবা-ম্মার সংগ্রামে নৈতিক সমর্থন মাত্র, মুজিবকে বোঝান যেতে পারে তার ন্যায়সংগত আন্দোলনের পাশে আমরা বরাবরই আছি, আবার স্বাধীন পূর্ববাংলার স্বীকৃতিকামী ভারতীয় জনসাধারণকে বোঝান যেতে পারে, প্রস্তাবটি তো এককরম স্বীকৃতিই ন.মাস্তর।

প্রদীপেন্দ্র মৈত্র

মতামত

পশ্চিমবঙ্গে

অজয় সরকারের তালুব

অর্থনীতি, পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার কাজ হবে সহজ এবং সুদৃঢ়।

অথচ সংসদে ভারত সরকার একটি নিতান্ত জলো নৈতিক প্রস্তাব পাশ করালেন কেন? কালহরুণের জ্বলন্ত? বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির প্রতিরূপা লক্ষ্য করার জন্য অবকাশের জন্য? ধরে নেয়া গেল তাই। ভারত সরকার হয়তো ভাবছেন, কিছুদিন কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে রাশিয়া কিংবা আমেরিকাকে পূর্ববাংলার মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে রাজী করানো যেতে পারে। কিন্তু এই সমর্থনের আশা করাও এক দ্রান্ত রাজনীতির পরিচায়ক। যদিও আমে-রিকা অথবা রাশিয়া কেউই পাকি-স্তানের জংগী শাসক গোষ্ঠীর চীনা মিতালী সুদূরজরে দেখেনা, তবুও

বিবেচনা করতে হবে। সেটি হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধের। ভারত সরকার পূর্ব বাংলার স্বাধীন সত্তা মেনে নিয়ে মুজিব সরকারকে সব রকমে সাহায্য করলে পাকিস্তানের সমরনায়কেরা পশ্চিম সীমান্তে ভারত আক্রমণ করবে কিনা। করলে, তাদের সম্ভাব্য সহায়ক কোন কোন রাষ্ট্র হতে পারে। আমেরিকা? না। আরেকটি ভিয়েতনাম সৃষ্টি নিকসন সরকারের বদহজমের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চীন? সেও না। লড়াই শূরুমাগ পশ্চিম সীমান্তে সীমান্ত-ধাকলে ভারতকে কাবু করা অত্যন্ত সুসাধ্য স্থাপার। চীনা কমিউনিস্ট-দের সেকথা বোঝাবার মত মগজ আছে। তাছাড়া চীনের সহায়তার পাকিস্তান দীর্ঘস্বামী ভারত বিরোধী যুদ্ধ শূরু করলে আমেরিকার ভারত শিবিরে বোম্বাদনের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং ভারতের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের পক্ষে চীনের অস্ত্র ধারণ করা এবং উত্তর সীমান্তে হামলা করার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। বাকী থাকল, রাশিয়া। রাশিয়া তার সমাজ-তান্ত্রিক মৈত্রীর ভন্ডামী বজার রাখতে বাধ্য হবে এবং পূর্ব বাংলাহীন পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের সৌহার্দ্যই বেশী কামনা করবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের জংগীশাহী যদি আক্রোশ বশত ভারতকে আক্রমণ করেই বসে, তবে ভারত তাদের যুদ্ধ বাসনার সমুচিত জবাব দিতে পারবে।

তাহলে এই শ্বিধা কেন? কেন এই নৈতিক সমর্থনের আড়ালে গা বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা। পূর্ব-বাংলার মুক্তি যুদ্ধের চেউরের দোলা পশ্চিম বাংলাভেঙে আসতে পারে এই আশংকার? স্বাধীনতার পরে পশ্চিম বাংলাভেঙে পূর্ব বাংলার ধাক্কে কেন্দ্রীয় সরকারের শোষণ নীতি চলেই অবাধে। সি পি এম রাজ্যের বৃহত্তম দল হিসেবে সম্প্রতি এই অবাধ শোষণের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের কাজে লেগেছেন। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা লাভে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি পশ্চিমের বাঙ্গালীরাও কেন্দ্রের শোষণ নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের সার্বভৌম অধিকারের

অজয় সরকারের তালুব শূরু হয়েছে। বিভিন্নস্থানে সি পি এম কর্মী, সদস্য এবং সমর্থকরা পুলিশের নবপর্বায়ের আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছেন। চোঁটা এপ্রিল রবিবার দুপুর বারটা নাগাদ অতর্কিতে কিনা-প্ররোচনার দমদম সি পি এম পাটি অফিসে পুলিশ সদলবলে ঢোকে তল্লাসীর পরোরানা নিয়ে, কিছুই পায় নি, কিছু রং তুলি ছিল তাইই নিয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে বি পি এস এফ সম্পাদক এবং দমদম মিউনিসিপালি-টির অন্যতম কমিশনার সুভাষ চক্র-বর্তী সহ করেকজন পাটি কর্মীকে অ্যারেস্ট করে। সেইদিনই পুলিশের প্রত্যেক সহায়তার দুপরে কিছু নক-শালপশ্চী ছাতাকল অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। বাইহোক, ছাতাকলের মানব এককটা হয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করেছেন।

এপ্রসঙ্গে একটি জিনিষ লক্ষ্যীয় যে অজয় সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনী স্ফিগুদ উৎ-সাহে সি পি এম উচ্ছেদে নেবে পড়েছে। অজয় মুখোপাধ্যায় তার নির্বাচনী বক্তৃতায় বহুবার নিজেকে “ফুকুর” বলে প্রচার করেছেন। সত্যি কথাত কি এমন স্পষ্টবাদী কলিযুগে বিরল। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি আমার দেখা একটি নাটকের একটি বিশেষ দৃশ্য স্মরণে আসছে। নাট-কটিতে পুঞ্জিবাদী শোষকের বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন শোষণ পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। শেষদৃশ্যে সেই পুঞ্জিবাদী শোষক তার লুসিকে (ফুকুরে নাম) খুঁজে বেড়াচ্ছে। এবং সে সবার্বে ঘোষণা করছে যে প্রতি-দিন তার লুসিকে স্মরণে হিসেবে হিউম্যান ব্রাড দিতে হয়। তবে এই লুসি বারা শোষকের বাধ্য তাদের কিছুটি বলে না, কিন্তু তাদের মধ্যে আছে ঘৃণা, ক্রোধ এবং প্রতিরোধ তাদেরই রক্ত সে সমস্ত শূবে নেয়। অজয় মুখোপাধ্যায়কে শূরু একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তিনি যদি ঠেঁবে থাকেন যে এপার বাংলা শূরু পারস্পরিক হানাহানিতেই উন্নত থাকবে তবে ভুল করবেন। কারণ এপার বাংলারও প্রাপ্যচরু ভরপূর, সংকল্পে দৃঢ় সাহসে দমর এক প্রাণদানে অকুণ্ঠ মানবই সাক্ষ্য অধিক। সন্তু সেন

এরা কোন্ লজ্জায় গলাবাজি করছে?

“বাংলাদেশ” সম্পর্কে কংগ্রেস দক্ষিণী কমিউনিস্ট, অজয়বাবু ও সংবাদপত্রের কামা দেখে আমি করেকটি প্রশ্ন রাখছি। (এক) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসেবে যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৯৪৭ সালে দেশটাকে দু-টুকরো করেছে আজ পূর্ব বাংলার জন্য সেই কংগ্রেস নেতৃত্ব কোন্ লজ্জায় গলাবাজি করছে? নিশ্চয়ই পূরনো পাপ ঢাকার জন্য নয়? এই নিলজ্জা খুঁদে কংগ্রেসের কালো হাত দেশ-বিভাগ-জনিত পাপ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপরাধে রক্তাক্ত। এরা কোন্ মুখে “স্বাধীন বাংলা”র জন্য সভা শোভাযাত্রা ও মিছিল বের করে? এই ভন্ডামীর মুখোশ কেউ কি খুলে ধরবেন না? চোরের মার এই চোঁচেরে কামা আমাদের যে আর সহ্য হয় না। (দুই) ওই খুঁদে কংগ্রেসের বশব্দে ভূত্যা বেই-মান দক্ষিণপশ্চী কমিউনিস্টরা “স্বাধীন বাংলার” জন্য চেঁচাচ্ছে কেন? ওরা ইন্দিরার দালাল। ইন্দিরার হুকুমে পশ্চিম বাংলার পুলিশ মিলিটারীর অবাধ অত্যা-চারকে সমর্থন করে, মদত দেয়। পূর্ব বাংলার মিলিটারীর অত্যাচার

চলছে বলে ওদের প্রতিবাদ করা কেন? কংগ্রেসের ভন্ডামী যদি বা সহ্য হয় তাদের দালাল কমিউনি-জমের নামাবলী পুরা এই ভন্ডামী যে আর সহ্য হয় না! এর বিরুদ্ধে আপনারা কি একটা কথাও বলবেন না? (তিন) অজয় মুখাজ্জী হালে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সেদিন আকাশবাণীতে তার যেউ যেউ শুনলাম। এই লোকটি বলছে— শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষকে পেটানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ ও মিলিটারী থাকবে, ১৪৪ ধারাও তোলা হবে না। কিন্তু মজা দেখুন ইনি স্বাধীন বাংলার মিলিটারীর অত্যাচার দেখে হাউমাউ করে কাঁদ-ছেন। ওদের সাহায্য করার জন্য কি একটা তহবিলও খুলে ফেলে-ছেন। (চার) আনন্দবাজার, যুগা-ন্তর, অমৃতবাজারের মতো কমিউ-নিস্ট বিদ্রোহী বুর্জোয়া কাগজ-গুলো “স্বাধীন বাংলা”র নামে কেমন গদগদ, তা লক্ষ করেছেন? বাংলাদেশ করায়ত্ত হলে ওদের বিক্রী বাড়াবে—এই আশায়? না, অন্য কোনো বিদেশী হাতের ইঙ্গিত আছে? এমন নির্ভেজাল জাতীয়-রতাবাদ এমন গলে-পড়া বাঙ্গালী প্রেম আগে তো কখনো দেখি নি।

একদিন এই কাগজগুলিই তো উদ্বেক উদ্বেক হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর দুাল্লা লাগাত। সুবোগ পেলে এখনো তা লাগিয়ে দিয়ে দিল্লীর স্বার্থ সিদ্ধি করবে। এদের এই চিরই তো বরাবর দেখছি। ভিয়েতনামের বুকে আমেরিকার বর্বর অত্যাচারের কথা এরা কি কোনোদিন ছেপেছে? ইন্দোনেশিয়ার বুকে লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্ট হত্যার খবর? এখনো ইন্দিরা সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেয় নি। এখনো এই সরকার কিছু বিদেশী মদ্রার লোভে ভিয়েত-নামে মুক্তি সৈন্যকে খতম করার জন্য আমেরিকার হাতে নিরমিত গ্রীক, অস্ত্রজেন গ্যাস প্রভৃতি পৌঁছে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এই পৌঁ-ধরা বজলোকী কাগজগুলো কোনোদিন কি একটাও প্রতিবাদ করেছে? আজ পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ ও মিলিটারি দখলদার বাহিনীর মতো অত্যাচার চালাচ্ছে। গ্রাম বাংলা থেকে হত্যা ও লুণ্ঠনের পাশাপাশি নারী ধর্ষণের সংবাদও আসছে। কই, যুগান্তরের মহা-প্রভুরা তো এর প্রতিবাদ করছেন না! স্বদেশব্রজ সিংহ

বিজ্ঞান ব্যাঙ্কে অন্যায়

আপনার বহুল প্রচারিত এবং সত্যাত্মক পত্রিকা পশ্চিম বাংলার মেহনতী মানবের কাছে পরম ভালোবাসার বস্তু। মেহনতী মানবের সংগ্রামের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণী ও তার দালালরা যবনিকার অস্ত্র-রালে যে যত্নবশত করছে আপনারা তা জনসমক্ষে অত্যন্ত দক্ষতার সংগে উন্মোচন করে ইতিহাসের পাতায় আপনাদের আসন সুপ্রতি-
ষ্ঠিত করছেন। শাসক শ্রেণীর যত্নবশত বিরুদ্ধে দর্পণ মেহনতী মানবের হাতীয়ার। আপনারা মেহনতী মানবের পরম বন্ধু এবং তাদের কাছে পরম বিশ্বস্ত। সেই হেতু আপনাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, এই কলকাতার ডালহৌসীর বৃকে 'বিজ্ঞান ব্যাঙ্ক' একদল মানবকে ধারা "ঠিকা মজদুর" নামে পরিচিত, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং তাদের দালাল 'গিরিজা ব্যাঙ্ক ওয়ার্কস' 'ইউনিয়নের' নেতারা কিভাবে মধ্যস্থগীর পন্থায় শোষণ ও শাসন করছে, কিভাবে তাদের উপর জুলুম করছে, কিভাবে তাদের মানবতাকে প্রতি মুহূর্তে পদদলিত করছে সেই পাশবিক এবং নারকীয় অত্যাচারকে প্রত্যক্ষ করে বান এবং আপনাদের পত্রিকা মারফৎ জনসমক্ষে তুলে ধরে এই মানবরূপী জানোয়ারগুলোর মুখোশ খুলে দিন। যে কোন দিন এই ব্যাঙ্ক আসুন, দেখবেন একদল মানব, মুখে তাদের বেদনা আর হতাশার চিহ্ন, পাবলিক কাউন্টারে বসে আছে কাজের প্রত্যাশায়। রাস্তায় কুকুর যেমন গৃহস্থের দর-
গার সামনে এঁটো কাটার জন্য বসে থাকে ঠিক তেমনভাবে তাদের দুর-
বস্থার সুবোল নিয়ে তাদের বসিয়ে রেখে দিয়েছে এই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। আর মাঝে মাঝে আশমাড়াই কলে তাদের নিষ্পেষিত করছে। এই নরপিণ্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যবহার করে ব্যাঙ্কের সমস্ত কাজে। কিন্তু সবদাই বঞ্চিত করে সকল রকম সুযোগ সুবিধা থেকে। কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম মানবিক অধিকারও ঠিকা মজদুরদের দিতে সারাজ।
জনৈক ঠিকামজদুর

বিভ্রান্তি

প্রতি সপ্তাহে তিরিশ পরস্য খরচ করে আমি আপনার দর্পণ পড়ি। পত্রিকার নিরপেক্ষতার ব্যাপারে মতামতগুলি থেকে আমি একটু লিখতে ভরসা পাচ্ছি।
গত উনিশে মার্চের পত্রিকার পড়লাম জ্যোতিষ্মের সেনগুপ্তের "অতি বামপন্থীদের সম্পর্কে মাও সে তুং" রচনার সমালোচনা। সমালোচনার শেষে লেখা ছিল মূল প্রবন্ধ লেখকের উত্তর আগামী সংখ্যায়— সম্পাদক (উল্টোপাল্টা লাইনে)। এখা-

নেই ধাক্কা খেললাম। লেখকেরা বস্ত্য রাখেন পাঠকের কাছে। পাঠকেরা পঠ করার পরই মাত্র আশা করেন তার কোন সমালোচনা সমর্থন বা খণ্ডন, বা প্রশংসা। আপনি কিন্তু সেই আশা করার অবকাশ আমাদের দিলেন না এবং তার পরের সপ্তাহের অর্ধাং গত ছাব্বিশে মার্চের দর্পণে "মার্কসবাদী-লেনিনবাদী" বস্ত্য বা জবাবটি ছাপলেন। অতএব, বক্তৃতে অসুবিধা হয় না যে আপনি প্রথমে সমালোচনাটি পাঠকের কাছে প্রকাশ করার আগেই তা আপনাদের "মার্কসবাদী-লেনিনবাদীকে" পড়িয়ে নিয়ে উত্তরটি লেখার ব্যবস্থা করেছেন।

যাক, এবার দেখি প্রথমে সমালোচনাটি ও তৎপরে প্রকাশিত তার উত্তরটি পরপর পাঠ করে আমরা কি প্রতিজ্ঞার সম্মুখীন হই। দুটি রচনা পরপর পড়লে, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, 'বিস্ময়' লিখার ছাত্রদের মধ্যে একটা মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হবেই; কারণ রচনা দুটি 'বিস্ময়' তত্ত্বের অতি সরলীকরণের বিরুদ্ধে অতি জটিলতা ও তারসলো বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

ওই দুই লেখকের রচনা দুটি পরপর পড়লে মনে হবেই যে তারা 'বিস্ময়' বিবর্তনের শব্দবল্লভ করে গিয়ে (এবং তা অবশ্যই মহান মাও সে তুং-এর নাম নিয়ে) শব্দেই নির্মিত সংকীর্ণতাবাদ ও সংশোধন-বাদের কদম্ব ক্রন্দ পরস্পরকে মাথা-
জেই বাস্তব, শব্দ কবল্লভ স্বারা জন অজ্ঞানের কানও চেঁচাই তাঁদের নেই।

শ্রদ্ধা মিহ

[প্রচলিত রীতি হল, কোন প্রবন্ধের কেউ সমালোচনা পাঠালে সেটি মূল প্রবন্ধের লেখককে পড়িয়ে তার উত্তর সমেত প্রকাশ করা। এখানে এই রীতিই অনুসরণ করা হয়েছে তবে স্থানান্তরে দুটি লেখা একই সংখ্যায় ছাপা বারনি।—সম্পাদক, দর্পণ]

দর্পণ সন্মর্কে

আমি গত মাস দুই এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। সারা সপ্তাহ উদগ্রীব হয়ে থাকি এই প্রিয় পত্রিকাটির জন্য, যা সি আই এর গোপন অর্থপুষ্টি অন্যান্য বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র ও পত্রিকার গোষ্ঠী থেকে আলাদা এক আশ্চর্য ব্যাতিরিক্ত। বহু গোপন অর্থব্যয় বিকৃতভাবে প্রচারিত তথ্যের আশ্চর্য সত্যানুসন্ধান করে, বহু রাজনৈতিক দলের মুখোশ খুলে দর্পণ আজ আমাদের মত সাধারণ মানব-
বের কাছে আধারে দীপবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে, একথা বলতে আজ আর বিধা নেই। আমার কৌতূহল, অনন্যসাধারণ এই পত্রিকা পাঠক এদেশে কত? অন্য প্রকৃত অঙ্কটি কত? এই প্রশ্নের কথার এর সাপ্তাহিক প্রচার সংখ্যার উত্তর আগামী সংখ্যায় দর্পণ-
টিতে দেখার উদগ্র কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষার রইলাম।
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যায় গ্রেপ্তার

শোষণ ও শাসকশ্রেণীর স্বার্থে পশ্চিমবাংলাবাপী যে ব্যাপক ও সুপরিচালিত ফ্যাসীবাদী পুলিশী ডাউব ও হত্যালীলা চলিতেছে তাহারই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বাদবন্দুর ধানার পুলিশ ও গ্রেপ্তার, অমানবিক শরীরিক নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালাইতেছে এবং জনগণকে আতঙ্কিত ও ভীতসন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে।

আমাদের পান্ধবতী বিজয়গড় কলোনী কমিটির সম্পাদক শ্রীকুলেন্দ্র সোম মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং 'বহারীতি' মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া তাহাকে আটক করা হয়। আরও প্রকাশ যে এই সময় তাহাকে বধেছ মারধোরও করা হয়। এই অশ্রুপূর্ণ গণ আন্দোলনের সহিত যুক্ত আরও বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার অত্যাচার ও পি ভি এ আইনে আটক করা হয় এবং ভবিষ্যতে আরও কিছু কর্মীকে এই আইনে আটকাইবার পরিকল্পনা ফাঁদা হইতেছে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছি।

অশ্বিনীনগর বাস্তুহারা সমিতি, কলিকাতা ৪০।

মুজিবের অতীত

"মুজিবের অতীত" নাম দিয়ে আপনার দোসরা এপ্রিলের দর্পণে একটি লেখা পড়লাম। মুজিবের ছাত্রাবস্থা এবং রাজনীতির দীক্ষা প্রসঙ্গে বা বলা দচ্ছে, সেটা অসংগতি-
পূর্ণ। মুজিব সাহেবের বাড়ীর কাছে আমার বাড়ী; সে জন্য এর প্রতিবাদ না করে পারছি না।

আমার বাড়ী মুজিব সাহেবের বাড়ী থেকে ছয় মাইল দূরে। আমার গ্রামের নাম আরপাড়া, আর মুজিব সাহেবের গ্রামের নাম টাঙ্গিপাড়া। মুজিব সাহেব গোপালগঞ্জ এস এম মডেল হাইস্কুলে পড়াশুনা করেছেন। আমিও সেই স্কুলের ছাত্র। যদিও মুজিব সাহেব আমাব থেকে বয়সে অনেক বড়, তবে আমার দাদা ও অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট থেকে সহপাঠী হিসাবে মুজিবের জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানার সুযোগ পেরেছি।

বাল্যাবস্থার মুজিব সাহেবের রাজনীতির প্রতি ঝোঁক ছিল। একদা শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব গোপালগঞ্জ শহরে একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন। মুজিব তখন স্কুলের ছাত্র। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বক্তৃতার পর মুজিব সেই সভায় কিছু বলার অনুমতি চেয়ে বার্ষ হল জোর করে মধ্যে উঠে বলতে শুরু করেন। স্কুলের ছাত্রাবস্থার পরীক্ষার বিশেষ ভাল রেজাল্ট তিনি কোনদিন করেন নি। ছাত্র হিসাবে সাধারণ স্তরের ছিলেন।

মুজিব সাহেব ১৯২০ সালে জন্মলেন শরীরিক কারণে স্কুল জীবনে প্রায় তিন বছর পড়াশুনার ছেদ পড়ে। ১৯৪২ সালে কলকাতার

এসে কলেজে ভর্তি হন। কলেজে এথেকেই দেখা যায় মুজিব সাহেব বাইশ বছর বয়সে কলকাতায় আসেন। আপনার কাগজে লিখেছেন সতেরো বছর বয়সে রাজনীতির হাতে-
খড়ি হয় নেতাজীর কাছে। এটা কি করে সম্ভব? যে ব্যক্তি কলকাতায় এলেন বাইশ বছর বয়সে তার রাজনীতির হাতেখড়ি হল সতেরো বছর বয়সে। এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে মুজিবকে রাজনীতিতে দীক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯০৭ সালে নেতাজী কখনো গোপালগঞ্জের টাঙ্গিপাড়া গ্রামে বান নি।

উপরন্তু ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজী ভারত-
বর্ষের বাইরে ছিলেন। তাই তখন

কি করে মুজিব সাহেবকে রাজনীতির দীক্ষা দেওয়া সম্ভব? মূলত রাজনীতির হাতেখড়ি যদি কারুর কাছে হয়ে থাকে, তবে সেটা শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের, কাছেই হয়েছিল। তিনি ১৯৪২ সালে কলকাতায় এসে মুসলিম ছাত্র সংগঠনের সম্পর্কে আসেন এবং উক্ত সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কৃত্য এবং রাজনৈতিক ধ্যানধারণার প্রতি স্কুল জীবন থেকেই আকৃষ্ট হলেও কলেজ জীবনের আগে তার সান্নিধ্যে আসার সুবোল হয় নি মুজিবের। সুসন্ত হীরা (শেখাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্র নৃত্যের পিতা কে?

ঐসামাজিক

প্রশ্নটা আপাতঃদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর। রবীন্দ্রনৃত্যের প্রমুখ রবীন্দ্রনাথই হবেন, আবার কে? কিন্তু খবরের কাগজের মহিমায় অনেক সত্যই পৃথিবীতে মিথ্যা হয়ে যায়, অনেক মিথ্যা হয় সত্য যে কারণে বার্ষাৎ শ বলেছিলেন :
রোজ সকালে যদি মিথ্যা কথা শুনতে না চাও তাহলে খবরের কাগজ পড়ো না। অনেক সত্য সংবাদকে জবাই করে করে এবং অনেক অনেক মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দিতে পেরে পেরে আমাদের মালিকী প্রেসের সাংবাদিক বন্ধুদের ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, হয়-কে নয় এবং নয়-কে হয় করা তাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। এই রকম একটি উৎসাহী প্রচার দেখা গিয়েছিল কিছু দিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায়—
রবীন্দ্রনৃত্যের প্রমুখ কে?

রীতিমত গবেষণামূলক প্রশ্ন। অমনি আনন্দবাজার কোম্পানীর শান্তিনিকেতন গ্রুপের ভ্রা-
টিয়ারদের লেখনী চম্ভল হয়ে উঠল, গবেষণার তুফান ছুটল এবং কয়েক কিলোগ্রাম কালি এবং কয়েক টন কাগজ উন্টন মুখে প্রেরণ করে সাবাস্ত হল যে, রবীন্দ্রনৃত্যের সৃষ্টা রবীন্দ্রকুর হতে পারেন না—রবীন্দ্রনৃত্যের প্রমুখ হলেন শান্তিদেব ঘোষ। বিশ্বাস না হয় তো উনিশশ সত্তর সনের এপ্রিল-মে মাসের আনন্দবাজার দেখুন। দীর্ঘকাল ধরে এই তর্ক-
রার চলছিল।

আপনার মনে হয়তো খটকা লাগতে পারে : রবীন্দ্রনৃত্যের প্রমুখ আবার কে হবেন? কিন্তু আপনাদের সংশয় বৃথা। কেন না, শান্তিদেববাবু যদি রবীন্দ্রনৃত্যের প্রমুখ না হন তাহলে তিনি কিসের প্রমুখ হবেন? তা যদি তিনি না হন তাহলে তাঁর আত্মীয় আনন্দবাজার পত্রিকার মালিকবর্গ খুঁশি হবেন কী করে? এবং তারা যদি খুঁশি না হন তাহলে তথাকার শান্তিনিকেতনী গবেষকদের পদোন্নতি হবে কী করে? অতএব প্রমাণিত

হইল যে, রবীন্দ্রনৃত্যের প্রমুখ শান্তিদেব ঘোষ। কিউ-ই-ডি।

একটি বিশেষ চক্র আনন্দবাজারে নিয়মিত পত্র লেখে (বললে ভাল হয়—তাদের দিয়ে প্রয়োজন মত লিখিয়ে নেয়া হয়) এবং এর বাইরের লোকের চিঠি সেন্সার করা হয়। প্রথম অভিজ্ঞতার পরে কোন ভুললোকই পারতপক্ষে ও পথ মাড়ায় না। তাদের নামে চিঠি বেরোয়, একটু-দৃষ্টি করলেই তাদের নামগুলো আপনার চেনা হয়ে যাবে। উল্লিখিত গবেষণার উত্তরে দর্পণের সংখ্যিত সভায় উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, রবীন্দ্রনৃত্যের প্রমুখ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—প্রতিমা দেবী, শ্রীমতী দেবী মৃদুলা সারস্বতী। ফেলু নায়ার অথবা শান্তিদেব ঘোষ কেউই নন। এদের দিয়ে ফুল সংগ্রহ করে বৃক্ষ রবীন্দ্রনাথ তোড়া বাধ-
তেন। রাজবাড়ীর মালী এবং মালিনীরা ফুল সংগ্রহ করে কিন্তু তোড়া যে বানায় সে শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকে যা বেরিয়েছে তার একটা অংশও যদি শান্তিদেব মাথা থেকে বেরোত তাহলে তিনি একজন জিনিয়স বলে মান্য হতেন।

কথাটা শুনে শান্তিনিকেতনী দাদারা একটু রুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ রবীন্দ্রজীবনী নামক পুস্তকটিতে প্রভাত মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ভ্রমলোক বাবতীর গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে গেছেন। মুখিমন্ত সিং নবকুমার সিং, শ্রীমতী ভিকল, মৃদালিনী সারস্বতী সকলের নামই তিনি লিখেছেন। রবীন্দ্রনৃত্যের ইতিকথা সবই সেখানে আছে। অতএব বলবার কিছু নেই। রইটির কথা দর্পণে উল্লেখ করা হয়েছিল।

দেখে শুধী হওয়া গেল যে, আমাদের আনন্দবাজারের হব্দ নোবেল-লারিয়েট শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় প্রভাতবাবুর উক্ত বইটি খেঁটে সম্প্রতি একটি নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ ফেঁদে ফেলেছেন দেশ (শেখাংশ ১৯ পৃষ্ঠায়)

গ্রীল ছেড়ে আমি ঠিক কেন যে একা একা বেরিয়ে এসেছিলাম, জানিনা। বোধহয় উত্তেজনার উত্তাপে গরম লাগছিল। কলকাতার গরমীর যেমন আভাস দিচ্ছে তাতেই গলদঘর্ম অবস্থা, তদুপরি সবদাই কোনো না কোনো উত্তেজনার গরম আতিশয্যের অতিরেক। এই আতিশয্যটাই আসলে অসহ্য লাগে আমার। অথচ কলকাতার এই রোগটাই প্রধান। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে এবং নাগরিক চরিত্রে সর্বত্রই আতিশয্য। কলকাতাকে অনেকে অনেক নামেই ডেকেছেন, আমি বলব, এ শহরের সবচেয়ে জুড়সই নাম হতে পারে একটাই তা হল : আতিশয্য নগরী। যখন যেটা নিয়ে মাতবে, মাতাল করে উন্মাদ করে ছাড়বে। কারণ যত তুচ্ছ কিম্বা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক। লম্বা জুলপীর মতো এক একটা ব্যাপার সাময়িক উৎসাহের অতিরেকে মহানগরীর চন্দ্রাননে গজগজিয়ে ওঠে।

বাংলা দেশের ডেউ পশ্চিম তটে ভেঙ্গে পড়ারই কথা; না পড়লেই বরং অবাক হতে হত। কিন্তু সে ডেউ এপারকে কতটা নাড়িয়েছে, কতটা ভাসিয়েছে, আতিশয্যের আড়ালে তার চারিত্র্য নির্ণয় করা সহজ নয়। মাটি মায়ের প্রতি অন্তরের টান তো আজ হঠাৎ জাগ্রত বাংলা দেশে। সেখানে পশ্চিমা প্রভুদের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহ ভাষাকে নিয়েই শুরু হয়েছিল। সেদিন কিন্তু নিদ্রালস কলকাতার কুম্ভকর্ণ নিদ্রার এতোটুকু টোল পড়েনি। বাংলা ভাষা নিয়ে এপার বাংলার কারও যে সামান্যতম লালসাবাধা ছিল মনেও হয়নি। রাজ্যে বাংলা ভাষা ব্যবহার সরকারী অনুমোদন পর্যন্ত পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার কিন্তু মাতৃভাষা চালু করার জন্য কোথাও এতোটুকু উৎসাহের গুরুত্বও প্রকাশ পায়নি। দু একজন মাতৃভাষা-প্রেমিক অফিসী কাজে বাংলাকে চালু করতে গিয়ে বাঙ্গালী আমলার নাক

সুশীল বাড়ী এখন অজয়বাবুর বিরুদ্ধে লেগেছেন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

ভাব প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হবে কমসুচারি মাধ্যমে। সেখানেও সুশীলবাবুর প্রচণ্ড আপত্তি দেখা দেবে। সুশীলবাবুর বক্তব্য হল, আমরা সরকারে থাকবো, অথচ সরকারী নীতি রূপায়ণে আমাদের কোন বক্তব্য থাকবে না—এ চলেবে না। কিন্তু বর্তমান সরকার ও অন্য দল কোন ক্রমেই সুশীলবাবুকে পাক্সা দিতে রাজী নয়। তাই সুশীলবাবুর সব রাগ ঘেঁষে পড়ছে অজয়বাবুর উপর। সুশীলবাবু দলের লোকদের বোকাচ্ছেন অজয়দা দলকে কংগ্রেসের কাছে বন্দক দিয়ে ডেকে তুলে দিচ্ছেন। বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিসরের প্রস্তাব মত আর একজন মন্ত্রী যে নেওয়া হয় না সে শব্দ অজয়দার কারণেই। অজয়দা যদি চাপ দিতেন তবে নিশ্চয়ই আর একজন মন্ত্রী নেওয়া হত। সুশীল-

উচ্চ অসহযোগিতা লক্ষ্য করে বৃথা চেষ্টার বিরত হলেন। ইংরেজি মিডিয়মে ছেলেপুলে পড়ানোর জন্য কেপে উঠলেন তাবৎ কলকাতাবাসী। পশ্চিমবঙ্গ যে বহুকাল তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে নির্মম ভাবে বঞ্চিত, ওপার বাংলার মতো এই উপলক্ষ্যেও কারো মনে জাগ্রত হওয়ার কোনো কালে কোনো কারণ ঘটল না। আজকের উৎসাহী দৈনিকগুলি সর্বভারতীয় রাজনীতির কচকচিত্তেই কাল কাটিয়েছে। আজ আতিশয্যের বিড়বনয় সবার আধপাগল অবস্থা। কেন? না, ওপারে বিজয় দুন্দুভির জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ইয়াহিয়ায় ট্যাক যদি গাড়িয়ে দিত জাতীয় চেতনার উদ্বেগ ওপার বাংলাকে, তখন এখানে হয়ত মুখ মচকে হেসে অনেকেই আমরা বলতাম, “ওরা প্রাদেশিক হয়ে যাচ্ছিল। আরে বাবা, সবটাই কি অত সহজ ব্যাপার! মজারিক!”

ভাগ্যগুণে বাংলা দেশের জয় আজ অপ্রতিরোধ্য। দুর্বল দেউলিয়া মানুষ সব সময়ই সবলের পরাক্রমে চকিত উচকিত। বাংলা দেশের একাবন্ধ পরাক্রমে এপার বাংলার অসহায় প্রবঞ্চিত মানুষও তাই হঠাৎ উৎফুল্ল। কিন্তু দেউলিয়া উচ্ছ্বাসের আরু বড় স্বল্পমেয়াদী। দেউলিয়া চরিত্রের প্রধান লক্ষণই আতিশয্য বিলাসী। কথায় কথায় তাই তার আসমান জমিন ফারাক। মুজিববরের মতো নেতা এখানে জন্মাবে না; কারণ বাংলা দেশের মতো জনতা এখানে নেই। নেতাজীব মতো নেতাকে ঘরের দুয়ারে এসেও ফিরে যেতে হয়েছিল; কারণ জীবন্ত কণ্ঠস্বরকেও আমরা সেদিন বিশ্বাস করিনি। যেমন বোঝানো হয়েছিল তেমন

বাবু দলের এম এল এদের আলাদা আলাদা করে বলছেন “আমি তো আপনাকে মন্ত্রী করার জন্যই আর একজন মন্ত্রীর কথা বলেছিলাম, কিন্তু সে হল না। অজয়দার জনাই আপনাকে মন্ত্রী হওয়া হল না। তাই আমাদের নতুন কিছু ভাবা দরকার”।

এই নতুন কিছু ভাবা অন্য কিছু নয় অজয়বাবুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সেই সপ্তে দলের আগামী সম্মেলনে অজয়বাবুর উপর এমন কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা যা অমান্য করলে ভবিষ্যতে অজয়বাবুকে বাদ দিয়েই দল চালানো যায়। তাতে যদি রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রিসভার পতন ঘটে তবে ঘটক। যে মন্ত্রিসভার দলের কোন ফয়দা নেই সেই মন্ত্রিসভা থাকলো অথবা গেল তাতে কি আসে যায়।

বীরেন্দ্র মিত্র

বুঝেছি। মহাবিশ্বে বিশ্বপাখিক সুভাষচন্দ্রকে হারিয়ে যেতে দিয়েছি। আবাহন নয়, নির্মম প্রত্যাখ্যাতের অসহ্য বেদনা নিয়ে বিপুল দেশ-প্রেমের ভার একা বহন করে তিনি বিদেশ বিদূর কোথায় হারিয়ে গেছেন, কেউ জানিনা। জানবার চেষ্টাও করিনি। তখন অনেক কাজ। দেশ কেটে ভাগ করা। মানুষকে পিঠার মতো রল দেওয়া। তাকে ভিটে ছাড়া করা এবং নিজের নিজের কাজ গুছানোর ব্যস্ততায় বৃন্দ হয়েছিলাম। ফলে এই বাংলার সমস্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবন দারুণ হতাশা আর প্রতিকূলতার স্রোতে ভেসে গেছে। কারণ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিনি। আজও তা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। এহেন আমি। এ হেন তুমি। আজ উচ্ছ্বাসে দেশপ্রেম উথলে উঠল ব্যাপারটায় সত্যতা কতখানি?

কী জানি কেন, আমার বোধ হয় এসব কথা মনে পড়েই লজ্জা করছিল। আমি উৎসাহের অতিরিক্ত প্রকাশ করতে গিয়ে অদৃশ্য আয়নার নিজের মুখ দেখে দারুণ লজ্জা ও ক্ষোভে ছটফট করে বের হয়ে এসেছি একা একা। এই মুহূর্তটি, এ যেন আমারই আত্ম সমীক্ষার মুহূর্ত। এখন উচ্ছ্বাস নয়, সৈবর্ষ চাই। আমি ঠিক এখনো কী করছি, সেই কথাটাই ভাবা চাই। ওদের জয়ই আমার জয়, একথা বলতে বাধ্য আমি। ওদের জয় আমার হিমালয়ান পরাজয়টাকেই চোখে আলুদল দিয়ে দেখাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি, এই পশ্চিম বাংলাকে আমি শব্দ ভাঙছি জ্বালাচ্ছি নিঃশ্বাস আর নিঃশ্বাস করছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, চিন্তার দিগন্তে, মননের মহাকাশে আমি আজ সর্বস্বান্ত। মুজিববরের বাংলা দেশ আমাকে সেই চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমার তাই উৎসাহের অতিরেকে নিজের অপকীর্তিকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টাটা সর্বনেশে বলেই বোধ হয়। মুজিববরের বাংলা দেশে আজ প্রাকৃতিক বন্যা হচ্ছে না যে কেবল হাণকাষের আত্মমুখী উদ্দীপণায় মহান কিছু করার তৃপ্তি পাব। ওখানে উঠেছে আত্মপ্রত্যয়ের তরঙ্গ তুফান। তার পাশে গিয়ে দাঁড়তে হলে আমাকেও সেই মহান যোগ্যতা নিয়েই যেতে হবে। হাণকাষের মতো তরুণ কতব্যানন্দ আজ আমার প্রাপ্য নয়। বাংলা দেশের প্রোজ্জ্বল আলোয় নিজেকে আলিয়ে নেওয়া, জ্বালায়ে নেওয়ার সময় এটা। কিন্তু গঠনমূলক কর্মসূচির সময় এটা। আমার চরিত্রের সমস্ত ক্রীষ্ম পরিহারের এইটাই ব্রাহ্ম মুহূর্ত। পূর্বাণ্ণের অরুণ আভার প্রদীপ্ত ভাস্কর

সেই ইঙ্গিত। আমাকে ফিরে ভাবতে হবে, আমি কোন অর্থ গলিপথে পা বাড়িয়েছি? যে আমি নিজে অর্থকারে নির্মম, সেই আমার আলোকভিত্তিরের জয় গান গাইতে হবে শব্দ দায়িত্বের সঙ্গে। আত্মহননের পথ ছেড়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মায়মানের পথে পা ফেলতে হবে। কিন্তু ঠিক এই সব কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে আতিশয্য নগরীর এলোমেলো উত্তেজনার। আমার কেমন বিশ্বাস, আমাদের এই উত্তেজনার মধ্যেও হালকা ভাব-প্রবণতাই বর্তমান। বাংলা দেশ বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এখনো নাড়াতে পরেনি। সেই একই অন্তঃসার শূন্যতা আর কিছু না হোক, এপারকে তাই বাচাল করেছে। আমরা এলোমেলো বকছি। নরম গরম ফীচার সম্পাদকীয় কাড়ছি। বক্তৃতার কপিটেশন করছি। “অর্থ-ম্মন” “বন্দে”র বাহাদুরবরের মধ্যেই তৃপ্তি খুঁজছি। পরমুহূর্তেই বাস জ্বালাচ্ছি, গ্রাম পোড়ানো খোলা ছুরি আর উদ্যত রিভলভার নিয়ে চতুর্দিকে “বুদ্ধিতে” বার ব্যাখ্যা অসম্ভব” সেই আনপ্রোডাষ্টভ গ্রাসের সঞ্চার করছি। আমাদের অভাব অভিযোগ বস্তুর কী, তাই ভুলে বসেছি আজ। সাধারণ আমরা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং আর আর সমস্ত নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন একদল গ্রাসিত মানুষ, অসহায়ের মতো অনেক মলোবান মুহূর্তকে নষ্ট হয়ে যেতে দেখছি। কলকাতার মাথায় শুন চেপেছে। সে তার নিজের মুখ দেখতেই ভুলেছে। আতিশয্য নগরী তাই অনামুখে মুক্তির উদ্ভাস লক্ষ্য করে উত্তেজিত। কিন্তু এই উত্তেজনার মূলেই গলদ। এই উত্তেজনা মেকী বন্যপ্রাণের বক্তৃতার মতোই এ-ও হল আত্মবিশ্মৃত অথচ আত্মতৃপ্ত কলকাতার আর এক আতিশয্য ব্যামোর “হিস্টোরিক” তড়কা। কলকাতা নিজেকে গোছাতে চাননি, আজও চায় না।

কিন্তু এইসব চিন্তা আমার পক্ষে সঠিক কি না জানিনা। বস্তুর একমাত্র দুপাতা ডায়রী লেখা ছাড়া আমি নিজের তো আর কিছুই করছি না।

পাড়ার ছেলেরা দোরে দোরে চাঁদা তুলতে বেরিয়ে পড়েছে। ওরা সীমান্তের অপর পারে শব্দকেনা খাবার, নুন, কেরোসিন তেল ওষুধ-পত্র পেয়েছে দেবে বলে জানিয়েছে। আমি শব্দ ভাবছি। কটা টাকা চাঁদা দিচ্ছি এবং ডায়রী লিখছি। আমার এই ডায়রী কোথাও ছাপা হবে না। স্রবণ দুঃখ নেই তাতে। ঢের লেখক তৈরী আছেন। তাঁরা কত কথাই বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের মনেও অনেক অভিযোগ। হয়ত লিখছেন ওপারে যখন লড়াই, এপারে তখন আমরা সিনেমা থিয়েটার দেখছি। রেকর্ডেটে খিঁচি। কী উপলক্ষ্য! আর কী সাম্প্রতিক দাম্যদামী বক্তব্য।

আমি মাথা নেড়ে তাই প্রশা-

স্তকে বলেছিলাম, “দেখ, কী চমৎকার লিখেছেন উনি। বাস্তবিক, আমরা কি সত্যিই বতটা একান্ততা দেখছি, মনে মনে ততদূর ঐকান্তিক? আমরা রেকর্ডেটেও খিঁচি, সিনেমাও দেখছি।”

প্রশান্ত বলেছে, “দারুণ ফিল-জফি তো! তাহলে ও দুটো বন্দ্য করলেই মৃত্তি? আর কিছু ভেবে পাওয়া গেল না বুঝি? আসলে, বাঙ্গালী, তুমি নিজেকে নিয়ে চিন্তাই করনি; হঠাৎ সাক্ষাৎ কর্ম দেখলেই তোমার ঐকান্তিকতা এসে যাবে, এ-ও আবার হয় নাকি? আমরা ভিয়েতনাম টিয়েতনাম নিয়ে যেমন উচ্ছ্বসিত, পাশের বাড়ি নিয়েও ঠিক সেই রকমই। কিছু বলার নেই, বাজে বকছি। ব্যবসা চাই, তাই সীমান্তের বুদ্ধিকালীন গোপন সংবাদও ছেপে চারিদিক গরম করে তুলছি।”

আমি শব্দ হতে পারিনি, বলেছিলাম, “কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যিক লিপ্সুরা বস্তুরই চিন্তিত। এই সব লেখা তার প্রমাণ। তাছাড়া রোজ স্টেটসম্যান বের হচ্ছে ওদের।”

প্রশান্ত হেসে বলেছে, “তবে শোন, কাল স্পেনসেস “বড়ে কাবাব” “বার” থেকে রাত দশটার যখন টেবল ছেড়ে উঠলাম, তখন বাংলা দেশে বাই-বাই-ম্মন অন্তত একজন উদীয়মান লেখককে তখনও বসে থাকতে দেখে এলাম। উনি বোধহয় বন্দক কাঁধে স্বপ্নের রথে চেপে ওপারে যাচ্ছিলেন হালকা অব-য়বে। বলা যায় না, পরবর্তী কোনো ইনস্টলমেন্টে “বার” ব্যায়-রামের ওপর তরঙ্গ কলমের কড়া ধমক দিয়ে কিছু লিখে ছেপে পাঠা-বেন হয়ত আমাদের কাছে।”

সাধারণ বাঙ্গালীর মতো রও “নোজ ফর নিউজ” (অর্থ সংবাদসংগ্রাহী মন) জেগে উঠল এ কথার। প্রশান্তের পাশে বসে পড়ে দুর্ভাগ্য সংবাদ সংগ্রহের আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, “তাই নাকি, কে রে? নিজের চোখে তুমি এমন একজন লেখককে দেখে এলি?” প্রশান্ত হেসে বলেছে “দেখলাম। তাই বলছি, বেশি চিন্তা করিস না। চিন্তা চালাক সোকে করবে।”

দুর্গা

সংবাদ সাপ্তাহিক

৮ চাঁদার হার :

বার্ষিক পনেরো টাকা
বাস্তবিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, দশ মেন, কলি-১৩

মতামত

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

[দর্পণের প্রচার সংখ্যা বর্তমানে বাইশ হাজার পাঁচশো।—সম্পাদক, দর্পণ]

আশু মজুমদারের মৃত্যু সম্পর্কে

আপনার পত্রিকায় নকশাল নেতা আশু মজুমদারের মৃত্যু সম্পর্কে জনৈক তথ্যভিত্তিক চিঠি পড়লাম। সাধারণ নির্বাচনের দিন মিলিটারীর গুলিতে শ্রীমজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীআশু মজুমদারের মৃত্যু হয়। এ খবর পেরে দিন আপনাদের কাগজে বেরিয়েছিল। এ ঘটনা সম্পর্কে দু-একটি কাগজে এবং স্থানীয় এলাকায় পরস্পর-বিরোধী প্রচার হওয়ার আমি এ ব্যাপারে খবরাখবর নেবার চেষ্টা করি। নানা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমি ঘটনা সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তার মোটাদুটি বিবরণ নীচে দিচ্ছি।

নির্বাচনের দিন কিছু কিছু এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন সকালে

সেনাবাহিনীর একজন সুবেদারের অধীনে একটা ছোট দল কসবা এলাকার কালিকাপুরের দিকে টহল দিতে যায়। বড় গাড়ীর রাস্তা না থাকায় তারা পায়ে হেঁটে গিয়েছিল। টহল দেবার সময় তারা দশ-বারো জন ছেলের একটা দলকে রাস্তার কিছূ দূরে সম্মেলনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাদের দিকে এগিয়ে যায়। মিলিটারী আসতে দেখে ছেলেরা পালাতে আরম্ভ করে। শ্রীআশু মজুমদারের হাতে রিভলবার ছিল। সেনাবাহিনীর সুবেদারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে আশু পালাবার সময় তার রিভলবার থেকে একবার গুলি ছোঁড়ে। সেনাবাহিনীর লোকেরা তখন প্রায় দশ-বারো রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে যার মধ্যে তিনটি গুলি আশুর গায়ে লাগে। একটি গুলি পেটে লাগে এবং এরই ফলে শ্রীমজুমদারের মৃত্যু ঘটে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডি এস পি, সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচনের দিন সকালে একসঙ্গে বিভিন্ন পোলিং বুথ দেখে বেড়াচ্ছিলেন। শহিদনগর ও রামলাল-বাজার এলাকায় অনেক লোকের সঙ্গে তারা কথাবার্তাও বলে-

ছিলেন। ওই এলাকার ঘোরার সময় তারা আর টিতে খবর পান যে মিলিটারীর গুলিতে একজন লোক নিহত হয়েছে। খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে যান। জিজ্ঞেস করায় আশু তার পরিচয় জানান। তখন মিলিটারীর গাড়ীতে তাকে ধানায় নিয়ে আসা হয়। ধানায় মিলিটারীর লোক প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর তাকে পুর্লিশের গাড়ীতে হাসপাতালে পাঠান হয়। হাসপাতালে প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনা সম্বন্ধে অনেক গুরুত্ব ছাড়িয়েছে। কেউ বলছেন, ধানায় দুটো গুলি করা হয়েছে, কেউ বলছেন ধানায় ছুরি মারা হয়েছে। অথচ ময়না তদন্তের রিপোর্ট স্বীকারে দেখলে জানা যাবে যে মিলিটারীর গুলির চিহ্ন ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন মৃতের শরীরে পাওয়া যায়নি। এ তথ্য আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছি।

আমার প্রশ্ন ঘটনার সত্য বিবরণ যদি এই হয় তবে একে বিবৃত করা পুর্লিশের পক্ষে আদৌ সম্ভব কি? কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন মিলিটারী আশুকে চিনবে কি করে? মিলিটারীর বক্তব্য আশুর হাতে রিভলবার দেখে তারা আশুর প্রতি তাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ করে-ছিলেন।

আমি স্থানীয় সম্মুখবর্তী সম্পদ এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কাছে অনুরোধ করবো তারা স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বলুন সরকারের উচ্চতম মহল থেকে ঘটনার সত্য বিবরণ জেনে নিতে এবং স্থানীয় জনসাধারণের কাছে সে ঘটনা তুলে ধরতে। তা না করে ঘটনাকে বিকৃতভাবে পরিবেশন করলে হয়ত এ অঞ্চলের শান্তি আরও বিঘ্নিত হবে, আরও কিছূ নিরীহ লোকের মৃত্যু হবে। কিছূ যুবক, কিছূ তরুণ আরও বেশী হিংসার পথে পা বাড়াবে। এর ফলেই হয়ত ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে একজন দরিদ্র, প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাণ হারিয়েছেন। এ অবস্থা নিশ্চয়ই চলতে দেওয়া উচিত নয়। এ অবস্থা নিশ্চয়ই কাম্য নয়, পরিশেষে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অনুরোধ করবো তারা যেন এই মৃত্যুকে রাজনৈতিক মূলধন হিসেবে ব্যবহার না করেন।

সমরেশ রায়
গরুকাহাট

নকশালী হত্যার প্রশ্ন

প্রাকৃতিকতার বিরুদ্ধে আপনাদের প্রচারকে ধন্যবাদ। রোজ সকালে আট দশটা তাজা তরুণের শব্দে খবর পড়তে অভ্যস্ত হওয়াটা মানসিক বিকৃতি ও অবনয়নের পরিচয়। অনুরোধ করছি সঠিক বিশ্লেষণ করে এটা বন্ধের পথ বার করতে অগ্রসর হোন।

একটি পর্বারে নকশালী আন্দোলনে জোতদার হত্যা অভিযান সূর্য হয়। এর স্বপক্ষে চারুবাড় বহু ব্যক্তি দেখালেও পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলে জমি দখল ও ফসল লুণ্ঠাইয়ের ব্যাপ্তিতে সেই অভিযান বন্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর শহরাঞ্চলে মর্তি-ভাঙ্গা, স্কুল কলেজে হামলা করে সেগুদি বন্ধ রাখার সঙ্গে সঙ্গে কনস্টেবল-হত্যা, মধ্য ব্যবসারী হত্যা ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র নেতাদের হত্যা সূর্য হয়। কনস্টেবল হত্যা রাজ্য পুর্লিশের নীচতলাকে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করতে কিস্তাবে সাহায্য করেছে তার, আশা করি, উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তেমনিই মধ্য ব্যবসারী হত্যা পুর্লিশের হাতে ছাড়পত্র যুগিয়েছে সর্বত্র প্রবেশ ও অব্যবহাল গুলি চালাবার। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তিমূলক জায়গায় এই হত্যাকাণ্ডগুলি সংগঠিত হওয়ার সেই পার্টির ওপর আক্রমণ হয়েছে বারবার। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আক্রমণ ও হত্যার তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন আশা করি নেই। সমস্ত কটি হত্যা অভিযান একতরফাভাবে শাসক শ্রেণীকে সাহায্য করেছে। পুর্লিশী নির্বাচনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়ার প্রচেষ্টাকে ও জনসাধারণের মনোবল ও সাহসকে আঘাত করেছে। গ্রামের কৃষক আন্দোলনের সমপরিমাণ শক্তিশালী শহরাঞ্চলের শ্রেণীসংগ্রাম ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণ-আন্দোলনই এই অভিযানকে শহর থেকেও মুছে দিতে পারে।

এই তথ্যটাও উল্লেখযোগ্য যে নকশালদের পার্টি-কর্মসূচীতে ও তাদের প্রথম কংগ্রেসের প্রস্তাবে লুপ্তপ্রায় প্রগতিশীলদের সংগঠিত করে মধ্যপন্থাবাদীদের হত্যা করার কথা এবং এই উদ্দেশ্যেই কিশোরদের ব্যবহার করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ সমাজ বিরোধীদের সংগঠিত করা এবং সি পি আই এম, কমিউনিস্ট শব্দে করা এবং এই কাজে কিশোরদের শিক্ষণবীণ হিসাবে লাগানো। একমাত্র-গোড়া সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট দল ছাড়া এই ধরনের কার্যক্রম অন্য কারও হতে পারে বলে জানা নেই।

সামাজিকভাবেই সমাজ বিরোধী অল্প কমিউনিস্ট বিরোধীদের নিয়ে গঠিত নকশাল সংগঠনের বিরূত অংশকে বাদ দিয়ে হত্যার ব্যর্থকাম মধ্যবিত্ত যুবক ও তরুণ-বারা এই প্রতিবন্ধবী চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়েছেন তাদের এটা বোঝা উচিত।

অভিযুক্ত তারা নন—অভিযুক্ত কংগ্রেস পুন্ট মালিকশ্রেণী আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লাগিত কেউটে সাপ সি আই এ। এই আসামীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও জনগণের ঐক্যসাধন বিপ্লব বিরোধী এ চক্রান্তকে নির্মূল করতে পারে; হত্যা অভিযানের অবসান ঘটাতে পারে।

দিলীপ ভট্টাচার্য

সি পি এমের রাজনীতি

সম্প্রতি মতামতের কলমে “নকশালীদের বিরুদ্ধে অপ্রচার” শীর্ষক আলোচনার উত্তরে জনৈক অধ্যাপকের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি-তেছি।

(এক) নকশালপন্থীরা যদি সমাজবিরোধী হয়, পুর্লিশের সাহায্যেই যদি তাহারা কাজ চালিয়ে যান তবে তারা পুর্লিশ স্বতন্ত্রকে তাদের কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করিবেন কেন? আর পুর্লিশই বা কাজল, সমীর, অশোকের মত বহু সমাজবিরোধীদের সহিত আপোষ না করিয়া গুলী করিয়া তাহাদের হত্যা করিবেন কেন?

(দুই) সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি বিপ্লবের শাসনব্যবস্থা করার পক্ষে যথেষ্ট হয় তাহলে কংগ্রেস অনেক আগেই ভারতবর্ষ থেকে দেড় মিনিটের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টিকে চিট করে দিতে পারত। এ ব্যাপারে অধ্যাপক মহাশয়কে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ভালো করে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। সংখ্যাগরিষ্ঠ নহ, গুরুত্ব সংগঠন না থাকলে পার্টির যে কতবড় ঐশ্বর্য হয় ইন্দোনেশিয়ার দিকে তাকালে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

(তিন) পেটি বুজোয়া শ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব থাকলে প্রথম শ্রেণী তাদের শ্রেণীশত্রুকে স্বতন্ত্র করার কথা উপলব্ধি করতে পারে না, শ্রেণী সম-কোতাই তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। পেটি বুজোয়া নেতৃত্ব সচেতন প্রমিতকে নানা প্রলোভনে ফুলিয়ে রাখে নিজেদের স্বার্থের তাগিদে।

(চার) জ্যোতি বসু বি পি এস একের হাতে রাইফেল তুলে দেবার কথা বলেননি একথা ঠিক কিন্তু একথাও ঠিক যে তিনিই নকশাল-বাড়ীতে ই এক আর প্রকৃতিকে পাঠিয়েছিলেন আন্দোলন দমনের জন্য।

(পাঁচ) ভোটের লীলাখেলা বিপ্লবের তাগিদে কিছুদূর পর্বন্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি হাতিয়ার, একথা অস্বীকার পড়াশোনা করা প্রতিটি ব্যক্তিই জানেন। কিন্তু আসল প্রশ্ন কিছুদূরটা কতদূর? মাঝে মাঝে শোষকশ্রেণীকে বিপ্লবের ভয় দেখিয়ে ও সেই সঙ্গে প্রলোভন (রুটি, গুড়, অর্থ) দেখিয়ে অসংখ্য সরলমন চাষী ও শ্রমিককে রিগেড গ্লাউন্ডে জড় করে বিপ্লবের মোড়কে “ভোটলীলাকেই” একমাত্র ওষুধ হিসাবে গেলানো ও বছরের অধিকাংশ দিনই বন্ধ পয়লান করা (এমন কি ছুটির দিনে) ছাড়া কোনো ন্দুনির্দিষ্ট কর্মসূচী এসের আছে বলে, আমার জানা নেই। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সহিত মার্কস-বাদী পার্টির তফাৎ শুধু এই যে, (শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠার)

সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র

মৃগাক্ষ শেখর রায়

ইদানীং বাংলা ছবির বাজারে কবিসাদারীর কিছুটা ভোল পাচ্ছে। আগে যেমন শরৎচন্দ্রের ছকে বাঁধা ঘরোয়া নাটক দিয়েই বাজার মাং করবার চেষ্টা হতো, এখন তার সঙ্গে খানিকটা সমাজ-তত্ত্বের বদহজম ভেজাল হিসেবে এসে মিলেছে। এর ফলেই অনেক ছবি-কিরিয়েদের নজর পড়েছে রক-বাজ মাস্তান, খুঁনে, গুন্ডা, সমাজ-বিরোধী ওয়াগলপেরকার এই জাতের কিছু ভিন্নধরনের চরিত্রের ওপর। কিন্তু বেশির ভাগ এরকম ছবি একটু বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে যে আসলে সমাজজিজ্ঞাসার মোড়কে মোড়া জ্বোলো সেন্সিটিভ সর্বস্ব রোমান্টিক রূপকথা ছাড়া এগুলো আর কিছুই না। সম্প্রতি "সোনা বোদি" ছবির আরম্ভও এইরকম একটি মাস্তানদলের কার্যকলাপ কেন্দ্র করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা বেপান্তা, তারপর এক পারি-বারিক নাটকের টানাপোড়েনে সমাজ-সমস্যার বদ্বন্দ্ব সব উবে যায়। তারপর আরম্ভ হয় "প্রফুল্ল" ধাঁচের মেলাড্রাম। একাধিকবার পরি-বারের সব ফরমুলা বাঁধা কারবার। স্নেহশীল পিতা, মমতাময়ী বোদি, ফন্দিবাজ, কুচক্রী বড়ভাই। একে-বারে "টেকুন্ডের উইল" ঢং-এ গল্প এগোয়। বড়ভাই ও তার বোঁএর চক্রান্তে সংসার ছারখার, তারপর নানান অসম্ভব, উদ্ভট, অলীক ঘট-নাবিন্যাস, ফিকে রহস্য রোমাঞ্চের ছোঁয়াচ একটু, তারপর দুন্ডের দমন ও সর্বপ্রিয় মিলনান্ত ঘব-নিকা। নড়বড়ে গল্পের বাঁধনি দুর্বল চরিত্রগুলি আর কুঁসিত রুচি-বিকারের সাড়ে বত্রিশ ভাজা এই ছবিতে চলচ্চিত্রগুণের আভাস খোঁজাও পশুভ্রম।

ইলিয়া কাজানের "দি এয়ারেজ-

মেন্ট" ছবির নামক এডি এ্যান্ডার-সন আধুনিক সমাজের এক লেফা-পাদরপ্ত ভল্লোক। বিজ্ঞাপন সংস্থার পদস্থ কর্মচারী তার বিশ বছরের সূক্ষী দাম্পত্য জীবনও অনেকেরই ঈর্ষার বিষয়। কিন্তু এত সুখ ও সাফল্য সঙ্গেও এডি এক ভয়াবহ মানসিক নিঃসঙ্গতার শিকার, রক্তের ভেতর অনবরত সেই "বিপন্ন বিস্ময়"-এর দোলা। ছবির গোড়া থেকেই রুটিনবাঁধা

জীবনের প্রতি কাজানের তীব্র ব্যঙ্গ ধরা পড়ে এবং সংগঠিত সমাজের আবর্তে ঘূর্ণমান চরিত্রগুলোর হাসি-কান্না, দোষগুণগুলোও পরিচালকের ক্যামেরায় এড়িয়ে যায় না। কিন্তু মানসিকতার গভী-রতর স্তরে ঢোকবার সময়ই কাজান তাঁর মাধ্যমের ওপর দখল হারিয়ে ফেলেন এবং ছবির স্টাইলেও এক-ধরনের শিথিলতা এসে যায়। কাজা-নের আর সব ছবির মত এ ছবি-তেও অভিনয় একটু বিশেষ সম্পদ, বিশেষ করে এ্যান্ডারসন-দম্পতির ভূমিকায় কার্ক ডব্ল্যাস ও ডেবোরা কার্ তো অনবদ্য।

কলাকুশলীদের সংলাপভাষা, বিচিত্র স্বরক্ষেপ নাট্যরসকে অসামান্য দক্ষ-তার সঙ্গে ঘনপানীন্দ্র করেছে। চারজন শিল্পী যথাক্রমে বিভাস চক্রবর্তী (ইনি নির্দেশক), সত্যেন মিত্র, অশোক মন্ডোপাধ্যায়, মায়ী ঘোষ প্রত্যেকেই অসম্ভব ভালো অভিনয় করেছেন।

অন্যদিকে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা নাটকে যেমন একটি নিজস্ব আসন তৈরী হতে চলেছে তার নাট্যকর্ম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তুলে ধরার বোধহয় এটাই উপযুক্ত সময়। অসম্ভব উচ্ছ্বাস এবং ব্যক্তিগত মতামতের উল্লেখ উঠেই বলছি, নাটক রচনার শুরুর থেকেই নাট্যকার যে ভাবে প্রতিটি চরিত্র কিংবা অলৌকিক সংবাদ অথবা প্রাচীন কোন আখ্যান উপা-খ্যানের আশ্রয় নিয়ে মগ্নে জীবনের আধুনিকতম বাস্তব জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরতে চাইছেন, তা কতখানি বাস্তবতার সঙ্গে দর্শকমনে দীর্ঘ-স্থায়ী হতে পারে? যেমন আলোচ্য নাটকে সোরাব এ্যান্ড রুস্তম কোম্পানীর আয়রণ দিয়ে রাজা সাহেবের যে চরিত্র ফোটানো হয়েছে, তার ফলে চরিত্রের উপর symptom of symbolism এর

ছায়া বেশী পড়ার ফলে তার বাস্তব ইঙ্গিত ধোঁয়াটে হয়ে যায় না কি? যদিও একথা মানতেই হবে মোহিতবাবু, সংলাপ রচনায় কবি-তার যে মনমত্ততা ফুটে ওঠে সেখানে চরিত্রে প্রতীক অবলম্বন ছাড়া উপায় না থাকলেও তিনি প্রতিটি নাটকের অন্তরায়্যায় যে বাস্তবতা তুলে ধরতে চান, তা দর্শকের হৃদয়-পৃষ্ঠে পৌঁছে দিতে গেলে, নাট্য-কারের কবি-আবেগকে বোধহয় আরো সংযত করতে হবে। আমি এ প্রশ্ন নাট্যকারের সব নাটকের কথা ভেবেই তুলে ধরেছি।

সি পি এমের রাজনীতি

(নবম পৃষ্ঠার পর)

কমিউনিস্ট পার্টি শান্তিপূর্ণ উত্ত-রণে বিশ্বাসী এবং মার্কসবাদীরা যুদ্ধে বিশ্লবের বুলি চড়িয়ে এখনও জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। আন্তর্জাতিক পার্টিতে মার্কস-বাদীদের স্থান কোথায় সবশেষে পশ্চিম অধ্যাপককে সে কথাও ভেবে দেখতে বলি।

এন চ্যাটজ

থিয়েটার ওয়াকশপের রাজবক্ত

ভবেশ দাশ

বিগত শারদীয়া সংখ্যার "বহুদূপী"তে প্রকাশিত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের "গিনিপিপ" নামের নাটকটির নতুন নামকরণ হয়েছে "রাজবক্ত"। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের যে কটি নাটক ইতিপূর্বে বিভিন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে থিয়েটার ওয়াকশপ-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে আমার মনে হয়েছে। শ্রেষ্ঠ শব্দমাত্র নাটকের কথা ভেবেই নয়, প্রযোজনার অসামান্য সার্থকতার কথা ভেবেও।

নাটকটির মূল ঘটনাগত তাৎপর্য প্রযোজনার নিপুণত্ব এবং সুচিন্তিত অভিনয় কর্মে যে আলো-ডন তুলেছে, তা দেখে মুগ্ধ হবার কথা। নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজাসাহেব কিভাবে তার প্রভুত্বের দাপট নিয়ে সমাজের স্তরে স্তরে একাধিক চরিত্রে আত্মগোপন করে থাকে এবং মানুষের ক্রমমাত্রের সংগ্রামে এই রাজাসাহেবকে নিশ্চি-করে ফেলার দুর্জয় যাত্রাপথেই এই নাটকের পরোয়ানা। কারখানার

মালিক, সংবাদপত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অধ্যাপক থেকে শুরুর করে বন্দীশালার ভৃত্য পর্যন্ত সক-লের শিরা-উপশিরাতেই রাজাসাহে-বের যে দৃষিত রক্ত সচল হয়ে উঠেছে তার হৃৎকৃত কলরবে চিরকালের মত স্তম্ভ করে দেওয়ার শৃঙ্খল চেতনায় নাট্যকার কণ্ঠ দিয়ে-ছেন।

আলোচ্য নাটকে মাত্র চারজন কলাকুশলী কাজ করেছেন। কিন্তু নাটকের খাতিরে প্রত্যেকেই যেভাবে একাধিক চরিত্র রচনায় সার্থক হয়ে-ছেন, এবং চরিত্রকে সার্থক করার জন্য যে পদ্ধতিতে অভিনয়-রীতির বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছেন তার প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। অর্থাৎ একজন শিল্পী মগ্নে অবস্থিত থেকেই তাঁর চরিত্র বদল করার সঙ্গে সঙ্গে একই মগ্নের অর্থ কিভাবে বদলে যেতে পারে তা দেখে থিয়ে-টার ওয়াকশপের কলাকুশলীদের চিন্তাকর্মে প্রশংসার সঙ্গে বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি। আলোর কাজ, আবহসঙ্গীত, মণ্ডপারিকল্পনা,

আকাদমী অব্ আর্টস্ অ্যাণ্ড কালচার' এর যা বলে তাই বলে

প্রথমে ভেবেছিলুম এ নাটক নিয়ে আলোচনার কোন অর্থ নেই। তারপর মনে হয়েছে, না দর্শকদের টনক নড়া উচিত। কখনো কখনো কিছু দর্শকের অভিনয়ের আপাত চাকচিক্য চমকে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে যায়। হজম হোক চাই না হোক, তাই তারা ঘাড় কাত করে দেখে যান।

কোন কোন নাটক চূড়ান্ত ভাবে উন্মীল না হলেও নাটক সম্পর্কে অভিমত প্রকাশের জায়গা থাকে। অন্ততঃ কিছু কথা যায়, দুটি-বিচ্ছিন্নতাবলি প্রশংসার সঙ্গে আলো-চনা করা যায়। কিন্তু "যা বলে তাই বলে" এমনি এক অশ্রুত নাটক যার সম্পর্কে মতামত প্রকাশের কোন ফাঁক নেই।

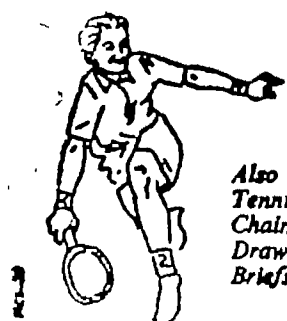
নাটকের শুরুরতেই দেখা যাচ্ছে, নাট্যকার নাটক লিখবেন, তাই বসে ভাবছেন। কিন্তু কি লিখবেন ভেবে পাচ্ছেন না। হঠাৎ এক আগন্তুক এলেন। তিনি অনেক কিছু বলে গেলেন। অনেক বড় বড় কথা বল-লেন। অনেক কবিতা আবৃত্তি কর-লেন। শারীরিক কলাকৌশল দেখা-লেন, কিন্তু তার আগমনের উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা গেল না। অথচ নাটকে মস্তান ডাক্তার পুর্লিশ ইন্স-

পেকটর সবই আছে। সিনেমাহলের টিকিট ব্যাক থেকে জীবনানন্দের কবিতা পর্যন্ত এ নাটকে সবই পাওয়া যাবে, শব্দমাত্র আসল কথাটা বাদ দিয়ে। এই নাটকের নির্দেশক অভিনেতার শৈলীনা-পাগল না হলে সাধারণ দর্শকের সামনে এই বস্তাপচা বাকচাতুরী নিয়ে হাজির হতেন না। এ নাট-কের নির্দেশক নির্মাল্য সেনগুপ্ত, যতদূর জানি, পশ্চিমবঙ্গ লোক-রঞ্জন শাখা এবং বেতারে বেশ কিছুহাল নাটক অভিনয় করে আসছেন। কিন্তু এত নাটক অভিনয়ের পরেও তাঁর কি এতদিনেও নাটক সম্পর্কে এই সামান্য পরি-মিত্তিবোধ জন্মায় নি?

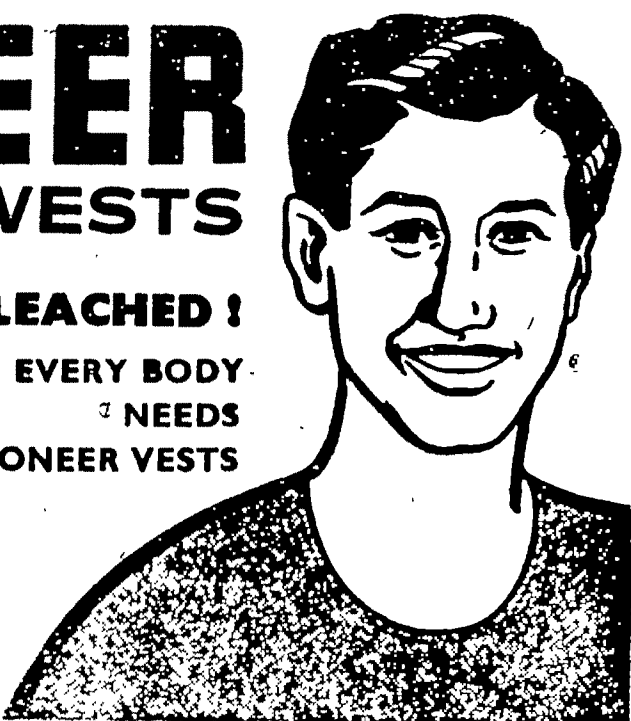
সংবাদে জানা গেল, নাট্যকার চরিত্রে অভিনেতা আশীষ বন্দ্যো-পাধ্যায় নাকি এবার "অভিনয়" পত্রিকার পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু যেখানে নাটকের নাটক বলতে কিছু নেই, সেই নাটকের অভিনয়ে মন্থ হয়ে অভিনেতাকে পুরস্কার দেওয়ার অর্থ অভিনয়কর্মতাকে ব্যঙ্গ করা নয় কি? আমার মনে হয়, সমালোচকের কোন মতামতেই এই নাট্যশিকারের কিছু আসবে যাবে না, বোধ করি সেই কারণেই নাটকের নাম "যা বলে তাই বলে"।

PIONEER VESTS

ARE HYGIENICALLY BLEACHED ! EVERY BODY NEEDS PIONEER VESTS



Also Tee shirts, Tennis shirts, Chain Shirts, Drawers & Briefs



PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS, CALCUTTA-2 Phone : 34-7993

সম্পাদক-হীরেন বসু

সম্পাদক কতক মদার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সর্বোদয় মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্শন কাবাঁলয় থেকে প্রকাশিত

পশ্চিম বাংলার ভাবী মুখ্যমন্ত্রীরূপে ত্রিগুণা সেনকে তালিম দেওয়া হচ্ছে

দপন

১৪শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা ৥ শুক্রেবার ২৩শে এপ্রিল ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

বাংলা দেশে জাতীয় লিবারেশন ফ্রন্ট গঠিত মহম্মদ তোহার দল যোগ দেয়নি গণহত্যা সম্পর্কে পিকিং রেডিও নীরব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলা দেশে মুক্তিফৌজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং গেরিলা যুদ্ধ কৌশল প্রবর্তনের জন্য হালাই জাতীয় লিবারেশন ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে।

এই ফ্রন্ট বাংলা দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠিকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। এই ফ্রন্ট গঠনে ওদেশের যুব শক্তি বেশ কিছু দিন ধরে চেষ্টা করছিল।

নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর সৈন্য বাহিনীর নির্যম- আক্রমণের মুখে বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতাদের পলায়ন এবং ঐ পার্টির শোচনীয় সাংগঠনিক অবস্থা দেশের

নিহত পুলিশদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে অজয়বাবু অস্বীকৃত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী নিহত পুলিশ কর্মচারীদের পরিবার পিছদ দশ হাজার টাকা সরকারী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিরোধী।

অজয়বাবু বলেছেন, এই ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাতে সরকারী তহবিলে ঘাটতি পড়বে। অজয়বাবুর বিরোধিতা পুলিশ মহলে বিক্ষোভ এনেছে।

যুবশক্তিকে নতুন ভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

লিবারেশন ফ্রন্টে যে সমস্ত দল ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে আছে আওয়ামী লীগের যুব সংগঠন, জাতীয় আওয়ামী পার্টির দুটি অংশ এবং দুটি কমিউনিস্ট পার্টি।

মহম্মদ তোহার নেতৃত্বে উগ্র-পন্থীরা এই ফ্রন্টে সামিল হতে রাজি হয় নি। এই উগ্রপন্থীরা চীনের লাইন অনুসরণ করে বলে জানা গেছে। চীন কমিউনিস্ট পার্টি বাংলা দেশে মুক্তি যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরোধী।

পিকিং রেডিও রোজ রাতে বাংলা এবং ইংরাজিতে বাংলা দেশের আন্দোলন সম্পর্কে চীনা দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করে। পিকিং রেডিও মুক্তি যুদ্ধ অথবা পাক সৈন্যবাহিনীর গণহত্যা, নির্বাচনে বোমা ও গুলিবর্ষণ বিস্তীর্ণ এলাকায় অগ্নি সংযোগ ও ধ্বংসলীলা সম্পর্কে কোন কথাই বলে না।

পিকিং রেডিওর প্রচার অনুযায়ী, পূর্ববঙ্গে বর্তমানে যা কিছু ঘটছে তা নিছক পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। চীনের অভিযোগ যে, "ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা নিজেদের প্রভু প্রসারের প্রয়াসে পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন অংশে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে সীমান্ত অতিক্রম করার আদেশ দিয়েছে। ভারতীয় সেনারা যে সীমান্ত অতিক্রম করেছিল (শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)"

আগামী জুন মাসে রাজ্যে চারটি উপনির্বাচন হবে। এই উপনির্বাচনে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন প্রার্থী হবেন এবং নির্বাচিত হবার পর ডঃ সেনই হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই সংবাদ দর্পণ (শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

অজয় মন্ত্রিসভা আঁতুর্ঘরেই অপমৃত্যুর সম্মুখীন

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে সদ্যোজাত প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক জোটের সরকারের আঁতুর্ঘরেই অপমৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

দর্পণ বিশ্ববিস্তৃত জানতে পেরেছে যে নব-কংগ্রেসী সদস্যদের একাংশ মুসলিম লীগের সঙ্গে

কোয়ালিশন করার বিরোধী আগেই ছিলেন। গত শনিবার, এঁদের সদস্য ও ফরওয়ার্ড ব্লকের একজন সদস্য নিহৃত আলোচনার জন্যে মিলিত হন। আলোচনায় স্থির হয় যে, (এক) সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের অহে-তুক হস্তক্ষেপের ফলে তড়িঘড়ি (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)।



চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছেন এই তরুণটি। এঁর পরিবারের সকলেই নিহত। এখানে তিনি পাক সৈন্যের হত্যালীলা সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন। ছবি : সেনগুপ্ত স্টুডিও (শ্যামল) শ্রীরামপুর।

কংগ্রেস সম্পর্কে সি পি আইয়ের মোহভঙ্গ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১২ই এপ্রিল থেকে দিল্লীতে দশ দিন ধরে সি পি আইয়ের জাতীয় পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভা পার্টির শাসক কংগ্রেস সম্পর্কে রাজনীতি ও কার্যক্রম বিবেচনা করবে। আনুষ্ঠানিকভাবে জানান হয়েছে নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ পরিষদের আলোচ্য বিষয়।

প্রাক-নির্বাচনী যুগে সি পি আইয়ের ইন্দিরা সমর্থন এখন আর রাজনীতির দিক থেকে সঠিক পথ নয় বলে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ মনে করছেন। এই মনে করার পেছনে ঘটনা হল নির্বা-

চনের আগে কংগ্রেস যেটুকু অন্যান্য ছোট দলের ওপর নির্ভরশীল ছিল এখন বিরাট নির্বাচনী জয়ের পর আর সেই নির্ভরশীলতার প্রয়োজন নেই। তাই শ্রীমতী গান্ধী আর কোন ব্যাপারেই সি পি আইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না।

এদিকে কিন্তু সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি জোরের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর প্রগতিশীলতার সমর্থক। এবং এই সমর্থন সদ্য-সমাপ্ত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির চব্বিশতম কংগ্রেসে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে।

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

হেমন্ত বসুর হত্যা সম্পর্কে ধৃত আসামীদের নাম ঠিকানা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এতদিন পরে হেমন্ত বসুর হত্যা সম্পর্কে পুলিশ সাত জন পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আদালতে হাজির করেছে। প্রবাল দেব ও অশোক ঘোষাল নামে যে দুটি তরুণকে সন্দেহবশে ধরা হয়েছিল তারা ছাড়া পেয়েছে।

বর্তমানে যারা অভিযুক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে আছে "২০ তেলিপাড়া লেনের পাণ্ডবেশ্বর মদ্যাজী, সঞ্জিবনী কেবিনের অশোক সামন্ত, রাধামাধব গোসাঁই লেনের চন্দন গাঙ্গুলী, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের

স্বপন পাল চৌধুরী, শান্তি ঘোষ স্ট্রীটের বিদ্যুৎ ঘোষ, মহেন্দ্র বোস লেনের কান্তি লোধ এবং রামধন মিত্র লেনের গলু ভদ্র।

অভিযোগে প্রকাশ যে উপরোক্ত আসামীরা ষড়যন্ত্র করে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে টাউন স্কুলের সামনে হেমন্ত বসুকে হত্যা করে। পুলিশের সংবাদে প্রকাশ এদের মধ্যে কয়েকজন গত তিনটি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার ও অন্যান্য কাজ করেছে। আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ সক্রিয় নকশাল পন্থী বলেও অভিযোগ আছে।

দুশীল ধাড়াও আসেননি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত দোসরা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন ছিল। এবার কিন্তু তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে লোকেরা ভীড় করেনি। দু'একজন মাত্র এসেছিলেন। এমন কি তাঁর পেয়ারার সুশীলও (ধাড়া) অজয়বাবুর বাড়িতে পদাঙ্গণ করেন নি। শুধু একটি মালা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস কোয়ালিশনকে সমর্থনের ব্যাপারে এই রাজ্যের ফরওয়ার্ড ব্লকে চরম অন্তর্দৃষ্টি দেখা দিয়েছে। বর্তমানে এই রাজ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক একটি ছোট পার্টিতে পরিণত হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই দলকে কংগ্রেস বিরোধী সোস্যালিস্ট দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে এই দলের হাল সঞ্জীন হয়েছে। এখন মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য ছাড়া এ দলের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

একদা পাজাবের জেনারেল মোহন সিং ও বিহারের শীলভদ্র রাজী স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লকের এক বিরাট অংশকে কংগ্রেসের সঙ্গে সামিল করেন। এরা দলের প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। তার কিছুদিন পূর্বে স্বর্গীয়া লীলা রায়, আর এস রইকর ও হরিবিন্দু কামাথের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লকের অপর বিরাট অংশ প্রজা সোস্যা-

লিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এরা আদর্শগত কারণেই দলত্যাগ করেছিলেন।

নেতৃত্বের ব্যর্থতা

ফরওয়ার্ড ব্লক এখন যে অবস্থায় এসে ঠেকেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গ কমিটিরই দায়িত্ব অন্যান্য রাজ্যে দলকে সম্প্রসারিত করা। কিন্তু নেতৃত্বের মধ্যে এ ধরনের লোক নেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিরও একই অবস্থা। অল্প কয়েকজন লোক গ্রিন্স ইউনিট কমিটি থেকে শুরু করে জেলা কমিটি প্রাদেশিক কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দীর্ঘদিন ধাবং নির্বাচন হয়নি। প্রায় বিশ বৎসর ধাবং একই লোক কমিটির নেতৃত্ব দখল করে আছেন। একটি জোট গঠন করে তারা নেতৃত্ব বজায় রেখেছেন। এর বিরুদ্ধে বারাসত প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কমিটির তরফ থেকে সরকারী ভাবে একটি প্যানেল পেশ

করা হয়। অপর পক্ষে আর একটি বিরোধী প্যানেলও পেশ করা হয়, কিন্তু বিরোধী প্যানেলটি পড়াই হয় নি। বিরোধী প্যানেলটি উপস্থাপিত না করে সরকারী প্যানেলটি পাশ হয়েছে বলে চেয়ারম্যান পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। এ ধরনের গণতন্ত্র বিরোধী কথকলাপে কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। বিরোধী প্যানেলে অমর চক্রবর্তী, শশবিন্দু বেরা, ধীরেন ভৌমিক, অজিত বিশ্বাস, সুরল দেব, মতি মৈত্র, দুর্গেশ নিয়োগী, হরিদাস ব্যানার্জী, শান্তি গাঙ্গুলী, এদের নাম ছিল। দলের সর্ব ভাবতীয় কলকাতা সম্মেলনেও একই চিত্র প্রতিফলিত হয়। ফলে দলের মধ্যে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটেছে।

গত সাধারণ নির্বাচনে চরম পরাজয়ে দলের কর্মীদের মধ্যে নিদারুণ হতাশা দেখা দিয়েছে। যে দলের জন্ম হয়েছিল কংগ্রেস বিরোধিতায় তাকে এখন কংগ্রেসের অস্তিত্ব গঠনের সহায়ক হতে দেখে কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। এস ইউ সির মত নিরপেক্ষ ভূমিকাই কর্মীরা আশা করেছিল। কর্মীদের মতে দলকে মেরুভিত্তিক মানবদলের স্বার্থে নিয়োজিত করতে (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

সংগ্রামীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিন্তু সংগঠনের অভাব

অমিয় তরফদার

আবার যে পার্টিস্থান যেতে পারবো কম্পনাতেও আনতে পারি নি। কথাটা অবশ্য ঠিক হলো না। সত্যিই যেতে পারিনি পার্টিস্থান কোনদিনই—গিয়েছিলাম বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলা দেশে।

বাংলাদেশে দেখা হয়েছে বহু পুরনো সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে, দেখা হয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে। অনেক খোঁজ খবরও নিলেছি, অনেক সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয়ও হয়েছে। তবে এই পরিচয়ের আদান প্রদান যেমন সুখের আবার খুব দুঃখেরও, কেননা শুনলাম প্রত্যেকেরই কেউ না কেউ স্বাধীন বাংলার জন্য প্রাণ দিয়েছে আর না হয় পাক সৈন্যেরা অত্যাচার করেছে তাদের উপরে।

দিনাজপুরের দিকেই অবশ্য আমি বেশী ঘুরেছি। এই জেলাতেই ঘোরাঘাট বেখাদ্দের বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল। সেটা এখন দখলে আছে মুক্তি ফৌজের। এদের অফিসার সবাই ছিল “খান সাহেব”। তাদের এই বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালীরা খতম করে। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয় যে এসব বাঙালী সৈন্যেরা তাদের পরবর্তী কর্মধারা সম্পর্কে জানে না। সত্যি কথা বলতে তাদের পরিচালনা করার মত নেতার অভাব। সেইজন্য বহু বিদ্রোহী সৈন্য অকেজো হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করেছে। আবার সাধারণ লোক অনেকেই এই স্বাধীনতার যুদ্ধে কাঁপিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু কোন সংগঠন না থাকার জন্য সবাই দিশেহারা হয়ে পড়েছে দেখলাম। হাজার হাজার যুবকের চোখে দেখছি আগুন, কিন্তু সেই আগুন পাক-হানাদারদের ওপর ছড়িয়ে দেবার কেউ নেই। দিনাজপুর শহরে দেখছি যারা এই স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম দিকে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরাই শহর থেকে থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত। তাই মনে হয়েছে যে অপরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায় তাহলে আর কেন প্রাণ দিই—এই ভেবেই অনেক বর্ধমান লোকেরা শহর ছেড়ে চলে যায়।

ওদিকে যখন সৈয়দপুরের রাস্তা দিয়ে দিনাজপুরের দিকে এগিয়ে আসছি পাক হানাদারদের আক্রমণে সমস্ত শহর কেঁপে কেঁপে উঠেছে। আর সবচেয়ে দুঃস্বপ্ন হচ্ছে পাক ফৌজ কতদূর এলো আর মুক্তিফৌজেরই বা অবস্থা কি কেউই বলতে পারে না। নামেমাত্র কন্ট্রোল রুম। কেউ নেই। সব পালিয়ে ভারতের সীমান্তের দিকে। নেই কোন যোগাযোগ, না আছে বেতার, না আছে অন্য ব্যবস্থা যার জন্যে হাজার হাজার যুবক মুক্তিযোদ্ধা

বদলেতে পারছে না কোন মুহূর্তে তাদের ষেতে হবে রণাঙ্গনে। দেখছি রসদ গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রাকে কঁর, ফিরে এসেছে ঠিক সেই অবস্থায়, কেননা সেই মুহূর্তে মুক্তিফৌজ আগের পজিশন ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে বা যুদ্ধের সুবিধার জন্য অন্য জায়গায় সরে গেছে। আর যোগাযোগ না থাকায় সমস্তটাই যেন এলোমেলো। শক্তি প্রচুর, কিন্তু পরিচালনার অভাবে সবটাই প্রায় নষ্ট হচ্ছে। বাংলা দেশে এখন লক্ষ লক্ষ মুজিব কিন্তু ডাক দেবার কেউই নেই—এগিয়ে যাবার রাস্তা কেউ দেখিয়ে দেবার নেই।

মানবিকতার দিক দিয়ে দেখছি মুক্তিযোদ্ধারা অবাঙালী ছেলেমেয়েদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের উপর কোন রকম অত্যাচার যেন না হয় একজন মুক্তিযোদ্ধা আর কয়েকজন যোদ্ধাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর সবচেয়ে বিস্মিত হলো যখন জানলাম ঐ মুক্তিযোদ্ধার ছোট ছোট দুই ভাই-বোনকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে মেরেছে পাক হানাদাররা। বাঙালী জাতির সংখ্যা যাতে বাড়তে না পারে সেইজন্য কংসের মত তাদের বিনাশ করতে চায় ইয়াহিয়াব সৈন্যেরা।

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক মননশীল শ্রমিক

সংকেত

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে নির্বেদিত চতুর্থ সংকলন প্রকাশিত হল.....

যোগাযোগ করুন :

সংকেত সাহিত্য সংস্থা- ১৭৬, মানিকতলা মেন রোড কোলকাতা-৫৪

মালিক গোষ্ঠীর চক্রান্তে বিড়লা ইলেকট্রিক কনস্ট্রাকশন এণ্ড ইকুইপমেন্ট কোম্পানী বন্ধ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

কম্পিউরে বিড়লা (বাদাস) পরিচালিত এই কারখানাটি গত পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে বন্ধ। মালিক গোষ্ঠী ক্রোজার ঘোষণা করেছেন। অভিযোগ, মালিক-গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভগ্নের অনিবার্য পরিণামেই কারখানার শ্রমিক অসন্তোষের শুরু। সন্তর সালের তেইশে ফেব্রুয়ারী এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে শ্রমিকগণের বহুদিনের ক্যাটাগোরাইজেশনের দাবীটি মালিক-

পক্ষ মেনে নেন। এবং তিন মাসের মধ্যে ক্যাটাগোরাইজেশন প্রথা চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পরে মালিকপক্ষ কার্যত প্রতিশ্রুতি মানতে গররাজী হন। পরিণামে কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভের শুরু।

ইতিমধ্যে আগষ্ট মাসে একটি সাধারণ বিরোধকে কেন্দ্র করে মালিক ও শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে তিক্ততা আরেক ধাপ এগিয়ে যায়।

মালিকের তরফ থেকে একজন শ্রমিকের উপর চার্জশীট আনা হয়। ফলে কারখানার চারশো আঠারো জন কর্মী “টুল ডাউন” আন্দোলন শুরু করে। সতেরো দিন পরে কর্তৃপক্ষ কর্মীটিকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আগষ্ট মাসের সতেরো দিনের বেতন মালিকপক্ষ এখনও শ্রমিকগণকে মিটিয়ে দেন নি। ইতিমধ্যে পুজো আসে এবং উপরোক্ত দাবীর সংগে স্বাভাবিক কারণেই আরও কিছু দাবী যুক্ত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে পুজা বোনাস এবং ইউনিয়নের স্বীকৃতির প্রশ্ন-টিও মূল দাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এরপর নভেম্বর মাসে উপরোক্ত দাবীসম্বলিত দাবীপত্র মালিক গোষ্ঠীর কাছে পেশ করা হয়। এবং মালিকপক্ষকে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কাজ হয় না। মালিকগোষ্ঠী দিনের পর দিন দাবীপত্র নিয়ে টালবাহানা শুরু করে। এবং তারপর পয়লা ফেব্রুয়ারী কারখানার ক্রোজার ঘোষণা করেন। শ্রমিক অশান্তির একঘেয়ে নীতির পুনরাবৃত্তি এখানেও হয়েছে। তাই, ট্রান্স-ফরমার, ইলেকট্রিক মোটর, পাম্প ইত্যাদির প্রস্তুতকারক এই ফ্যাক্টরীটি আজ অচল। এবং প্রমদপত্রের নিলম্ব উদাসীনতায় কারখানার সাতশো কর্মীর ভাগ্য আজও বিভ্রান্ত।

সি পি আই বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন

থেকে সরে থাকছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জনগণ থেকে সি পি আই কতখানি বিচ্ছিন্ন গত নির্বাচনে লোকসভা ও বিধান সভার শোচনীয় পরাজয়ের ফলাফল থেকে তা বোঝা যায়। শ্রমিক ও কৃষকের উপর অত্যাচারের ঘটনা অনর্ন্ত হওয়া সত্ত্বেও দলটি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার পরিচালনা করেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনে দলটির এক অশুভ নীতি। বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন থেকে দলটি ক্রমশই সরে দাঁড়াচ্ছে।

গত তেইশে থেকে সাতাশে মার্চ বুধবারেই জেনারেল ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্স অফ রুম-নিয়ার ষষ্ঠ বিশ্ব সম্মেলন অনু-

ষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে ওয়ার্ল্ড ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, আই, এল, ওর প্রতিনিধি ছাড়াও আট-বাড়িটি দেশের উনআশি জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভারত থেকে সর্বপ্রথম সিনটুর শ্রমিক সংগঠন থেকে কমল সরকার প্রতিনিধিত্ব করেন। মজার ব্যাপার এই যে, সম্মেলনে সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশ-গুলির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সি পি আইয়ের শ্রমিক সংগঠন থেকে কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন থেকে এভাবে পিছিয়ে আসার জন্যে দলের অনেক কর্মী আজ বিক্ষুব্ধ।

Free I Free II Free III

ধবল বা শুভ

আমাদের বিখ্যাত “দাগ সাফা” ১৯২৫ সাল থেকে রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে আসছে। মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়। বিনামূল্যে এক শিশু দেওয়া হয়।

WESTERN INDIA CO. (V N.) P. P. O. KATRI SARAI (GAYA)

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেননের চার ও দুর্নীতির কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কেরলে সি পি আই দল কংগ্রেসী প্রভুদের দৃষ্টান্ত ভালোভাবেই অনুসরণ করছেন। অচ্যুত মেনন সারের দীর্ঘদিন আগেই কমিউনিজমে বিশ্বাস হারিয়ে বসেছেন। চেম্বারলেন-কিয়ার কল্পিত সোভিয়েত আক্রমণের প্রতিবাদে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ১৯৬৮ সালে পদত্যাগ করেছিলেন।

তবুও “কমলি” অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে ছাড় নি। ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে সচা কমিউনিস্টরা তাদের দল ছেড়ে দেবার পর বে অবশিষ্ট কয়েকজন নেতা সাইনবোর্ডটি নিয়ে বলে রইলেন, তারা অচ্যুত মেননের ও নিজেদের কমিউনিস্ট বিরোধিতার মধ্যে কোন তফাৎ খুঁজে পান নি।

ফলে মিথ্যা, শঠতা ও দুর্নীতির

কৌশলে সি পি আই নেতৃবৃন্দ একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অচ্যুত মেননের কাছে হেরে গেছেন। অচ্যুত মেনন নিজের জন্যে মধ্যমশ্রীর পদটী বাগিয়ে রেখেই সম্পূর্ণ প্রাকেন নি, ভ্রমণে ভাইপোদের হিফ্র করে দেবার এবং খানিকটা “নগদ” নারায়ণের চেম্বার তিনি অসু-সই ভাবে করে বাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি বড় বিশ্রীভাবে বমাল সমেত ধরা পড়ে গেছেন।

কেরলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে হিচকুরের একজন স্বাধীন বাগিচার মালিকের জমি দু'কেটী টাকার কিনে নেবার সিদ্ধান্ত করেন শ্রীঅচ্যুত মেনন। এই জমির বর্তমান বাজারদর বিশ লাখ টাকার বেশী নয় বলে সরকারের জনৈক সেক্রেটারী গভর্নমেন্টকে জানান। কিন্তু এই জমির

মালিক সি পি আই নেতাকে নগদ পাঁচিশ লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে শ্রীঅচ্যুত মেনন এককোটি সত্তর লাখ টাকা রাহাজানি উদ্দেশ্যে সরকারী অনুমোদন দিয়ে দেন। শ্রীঅচ্যুত টাকটা হাতে পাবার অপেক্ষা, হঠাৎ বাদ সাধলেন রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য প্রবীণ আই এ এস অফিসার শ্রীরমণ কুটি। তিনি লিখিত রিপোর্টে সরকারকে জানানলেন যে প্রস্তাবিত জমি এ মায়ে কেনা যায় না, জমির ন্যায্য মূল্য বিশ লাখ টাকার বেশী হতে পারে না। শ্রীকুটি সি পি আই দলভূত কৃষিমন্ত্রী শ্রীএন কে বলকৃষ্ণনের নিকট আশ্রয়। শ্রীকুটি কিন্তু এই মিলজ্ঞ চুরিকে সমর্থন করতে পারেন নি। বরং তিনি লিখিত রিপোর্টে অভিযোগ করেছেন যে মধ্যমশ্রীর ইচ্ছাতে

চীফ সেক্রেটারী তাকেও উৎকোচ দেবার প্রস্তাব দেন। শ্রীকুটি বলেন যে চীফসেক্রেটারী তাঁকে বলেন যে যদি তিনি এই রবার বাগিচা কেনার মজুরী সম্পর্কে আপত্তি না করেন তহলে তাঁকে প্রস্তাবিত কেরল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগ করা হবে। শ্রীরমণ কুটি স্বাভা-ভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

এই ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়বার পর সারা কেরল জুড়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে। সবাই বলেছে অচ্যুত মেনন আর্থি মাথি মেনন। “আর্থি মাথি” মল্লারাম ভাবার চোর, ঘুংঘোর, দুর্নীতিপরররর বোকার।

শ্রীঅচ্যুত মেনন অর্থপ্রাপ্তির চেম্বা করে অচ্যুত মেনন ক্ষান্ত হন নি। কেরলেব হোম সেক্রেটারী শ্রীনারায়ণ স্বামী এক তদন্ত রিপোর্টে জানিয়েছেন যে কেরল সরকারের গ্রিবাঙ্কুর কোচিন কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠানটীর সমস্ত নিয়োগ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মারফতে করতে হবে, স্বরাষ্ট্র বিভাগের এই সাকুলার অমান্য করে চুরাশি জন ভাগ্যবান কৃত্তিকে চুরুরী দেন। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সি পি আই ও মুসলিম লীগ মন্ত্রী ও নেতাদের নিকটাত্মীয়। এদের মধ্যে একজন মধ্যমশ্রী অচ্যুত মেননের ভাগনে, দুজন আরেকজন সি পি আই নেতা এবং দুজন জনৈক মুসলিম লীগ মন্ত্রীর আশ্রয় বলে তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তোয়াক্কা না রেখে এই কেলেকারী করার সময় গ্রিবাঙ্কুর কোচিন কেমিক্যালস একটী লিখিত পরীক্ষা দেন এবং প্রার্থীদের এই পরীক্ষার ভিত্তিতে ইন্টারভিউ নেন। ব্যাপারটাকে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা না করার জন্যে এই কৌশল নেওয়া হয়েছিল বলে তদন্ত কমিশন রিপোর্ট দেন। কারণ পরীক্ষার বারী এই মন্ত্রীদের ও দলীয় নেতার আশ্রয়, তাঁদের চেয়ে বে সব প্রার্থী অনেক ভাল ফল করেন, অনেক বেশী বোলরতাসম্পন্ন, তাঁদের বাদ দেওয়া হয়।

এই দুটী রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভার আলোচনার দাবী ওঠে। কিন্তু সবক'র রিপোর্ট দুটী বিধানসভার আলোচিত হতে দিতে অস্বীকার করেন। ফলে বিরোধী পক্ষ একটী অনাস্থা প্রস্তাব এনে আলোচনার সুত্রপাত করতে বাধ্য হন।

এই দুর্নীতি ও আশ্রয় পোষকের রিপোর্টটী এত নাকারজনক হয়ে ওঠে যে মন্ত্রিসভার সমর্থক কেরল কংগ্রেস পর্যন্ত মন্ত্রিসভার পক্ষে ভোট দিতে সাহস করেন নি। তারা নিরপেক্ষ থেকে মন্ত্রিসভাকে কোনমতে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। পক্ষে ভোট দেন, নব-কংগ্রেস, সি পি আই, মুসলিম লীগ এবং পি.এস.পি দল। সেই একই প্রতিদ্বন্দ্বী সাংসদারিক জোট, যারা পশ্চিমবঙ্গেও সি পি আই সমর্থন পেয়েছে।

কংগ্রেসী নীতির সহায়ক জন্ম-বাম সি পি আই যে কংগ্রেসী চুরি, দুর্নীতির কারাগারটি এত সত্তর রপ্ত করে ফেলতে পারবেন, তা অনেক সি পি আই সমর্থকও কল্পনা করতে পারেন নি। কেরল

মুসলিম লীগ নেতা যাকারি খংগ-সের পদ ও আশ্রয়রা বে-আইনী চোরাচালানে ধরা পড়ার পর থেকেই মুসলিম লীগ তদানীন্তন নাম্বারদারিপাদ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে চলে যায়। সি পি আইও যে একই অসং পদ্ধতির পক্ষ, তা এখন অনেকের কাছেই পরিষ্কার হবে। কেরলে প্রমাণিত হচ্ছে সি পি আই একটী দুর্নীতিপররর, অগণ-তান্ত্রিক দল। পশ্চিমবঙ্গেও এরা খুনেদের সাগরের হিসাবে ধরা পড়তে বেশী দেরী হয় নি।

এখনও “যারা সি পি আই-এর সমর্থক, এই ঘটনা তাদের মনেও আলোড়ন তুলেছে। তারা বিমর্ষ-চিন্তে ভাবছেন যে সরকারী কংগ্রেসী দলের সঙ্গে আতাতের এই অশুদ্ধ পরিণামের জন্যে বে নেতৃত্ব দায়ী তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া গতানুগত নেই। কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক কংগ্রেস ভালোভাবেই সি পি আই নেতাদের ট্রেনিং দিয়ে চুরি এবং মিথ্যাচারের প্রতিবিশ্ববী কৌশলে রপ্ত করে দিয়েছে। সং কমিউনিস্টরা এদের সম্পর্কে আসতেও স্বা বোধ কর-ছেন।

জনসাধারণ কোতুকুর সঙ্গে লক্ষ্য করবেন যে এহেন দুর্নীতি-পররর, জনস্বার্থবিরোধী, অশুদ্ধ জোটকে বারী গণতান্ত্রিক শক্তি বলে প্রচার করছিলেন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটী সরে যাচ্ছে।

সি পি একে উৎখাত করার পরিকল্পনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বাংলার নকল মুজিবর মন্ত্রিসভার এক সাম্প্রতিক বৈঠকে সহকর্মীদের ভরসা দিয়ে বলেছেন : “কমিউনিস্টদের আমি ভয়তেও মারব, পানিতেও মারব।”

ওর অভিধানে “কমিউনিস্ট” বলতে অবশ্য সি পি এম-কেই বোঝার সেকথা কারও বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

মন্ত্রিসভার সেদিন আলোচনা হচ্ছিল : আইন ও শৃঙ্খলার “উন্নতি”র জন্য কি করণীয়।

ওর প্রভুপ্রণীর একজন মুখ-পাত্র আরও পরিষ্কার করে শাসক গোষ্ঠীর নীতি জানিয়ে দেন : সি পি এম যাতে আর পশ্চিম বাংলার ক্ষমতার না আসতে পারে তার “পরিকল্পনা” প্রস্তুত।

তিনি আরও বলেন : এসেম্বলীতে ভোটভাঙাটতে হেরে গেলেও আমরা দেখব যাতে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়। এটাও আপনারা জেনে রাখুন যে এবারকার রাষ্ট্রপতির শাসন হবে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। অতীতের প্রভু আমরা আর করছি না। কেরল থেকে আমরা অনেক কিছু শিখছি।

কলকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস

আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে

ফরোয়ার্ড ব্লক ও সি পি আই সাহায্য করছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বহু নাটকের নামক নব কংগ্রেসের শ্রীশিবকুমার খান্না পৌরসভায় ত দু বছরের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে আবার রপ্তমণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অল্প কিছুদিন আগেও তাঁদের কাছে তিনি একেবারে অজ্ঞাত ছিলেন আজ ইনি তাঁদের পরম সুহৃদ শ্রী নন, একমাত্র পথ-নির্দেশক।

কেরলের অচ্যুত মেননকে ধন্যবাদ তিনিই এই “প্রগতিশীল” কংগ্রেসীদের চিনিয়ে দিয়েছেন।

খান্না সাহেবের আশ্রয় প্রায়ই বর্পচোরাদের আনাগোনা দেখা যায়। ইনিও মদ্যপী চালে প্রভুর সুরের ডিস্ক বাজিয়ে বলেছেন : “কলকাতা করপোরেশন থেকে সি পি এম-কে হটিয়ে তবে ছাড়ব।”

নতুন পাওয়া সাক্ষরদের উনি সাফ বলে দিয়েছেন : “আপনারা বিশৃঙ্খল করুন। ভোটে হেরে গেলেই আমরা আমাদের মিনিষ্টার রউফ আনসারীকে দিয়ে করপোরেশনকে সুপারসিড করিয়ে দেব। সেখেকে ত, টেস্ক্যান পরিচর এই কথাই বলেছে।” দরকার হলে সি পি এম কাউন্সিলরদের গ্রেপ্তার করতেও পারেন—সে কথাও বলেন।

বর্তমান পৌরসভার একশো ছয়জন সদস্যের মধ্যে নব কংগ্রেসের

সদস্য একশ জন। আর সি পি এম সব চাইতে বৃহত্তম দল সাইব্রিশ জন সদস্য নিয়ে। গত দু বছর চোন্দ দলের যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসকে কোণঠাসা করে রেখেছিল।

কিন্তু আজ খান্না সাহেবের ভরসা যুগিয়ে চলেছেন সি পি এম-এরই এককালের দোসর সি পি আই আর ফরওয়ার্ড ব্লক।

“দুখও খাব, তামাকও খাব”—এই নীতিতে সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক নব কংগ্রেসের “ডেমক্রেটিক কোয়ালিশন”কে সমর্থন করেও পৌরসভায় যুক্তফ্রন্টে থাকার সুযোগ সুবিধা পেতে চান। বাম-পন্থী ছাপ মেরে রাজনৈতিক জীবন জুড়িয়ে রাখার স্বপ্ন দেখতে চান।

পি এস পি, এস এস পি, বাংলা কংগ্রেস ও বলশেভিক পার্টির একজন করে প্রতিনিধি আছেন। এরা যুক্তফ্রন্টের দৌলতেই নির্বাচিত। কিন্তু নিরপেক্ষতার ভাণ নিয়ে কংগ্রেসীদের মতলব হাসিল করতে চলেছেন।

কংগ্রেস ও সি পি এম থেকে সমদ্রবর্তিতা বজায় রাখার নীতির ফলে আর এস পির আটজন সদস্যও মুস্কিলে পড়েছেন। তবে পার্টিতে রক্ষা করতে হলে এদের কংগ্রেসের সমর্থন পুষ্ট ফরওয়ার্ড

ব্লকের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া মুস্কিল।

সি আই টির চেয়ারম্যান সাধারণত নিরপেক্ষ থাকেন। তাঁর ওপরেও সরকার থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে ভোট দেওয়ার জন্য খান্না সাহেবের নির্দেশমত।

জনসংঘের দুজন সদস্য আর অনাদৃত নন ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি পি আই নেতাদের কাছে। “অসামাজিক কাজের অপরাধে” সি পি এম থেকে বিতাড়িত ডাঃ হেমী বসুকে এরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে চলেছেন।

তিনজন নির্দল সদস্য অবশ্য দুই শিবিরেই ঘোরাফেরা করছেন। যে দিকে পাঞ্জা ভারি সেদিকে ঝুঁকবেন।

এস ইউ সিও একই স্বল্পে পড়েছেন। নব কংগ্রেসীরা খুসী যে এরা নিরপেক্ষ থাকছেন।

অবশ্য সব কিছু নির্ভর করছে ফরওয়ার্ড ব্লক কাকে মেরর স্থির করবেন তার উপর। অনেকেরই পদ-প্রার্থী। এ নিয়ে মনকষাকষি চলছে। সি পি আই-এর মধ্যেও অন্তর্স্বন্দ্ব চলছে।

সি পি এম বলেছে সুবিধাবাদীদের স্থান হবে না—আগে প্রকাশ্য ঘোষণা করে, তবে তাঁদের শিবিরে আসতে হবে।

অবশেষে ডাঙে সাহেবদের চৈতন্যোদয়

(দর্পণের পর্ববৈক্য)

সি পি আই নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে অশুভ আঁতাতের মর্মস্মিতক পরিণাম সম্পর্কে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

নির্বাচনের আগে দর্পণে লেখা হয়েছিল যে এই নির্বাচনে প্রগতিশীল রাষ্ট্রীয় মোড়া ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস জয়লাভ করতে সক্ষম হলেও বাস্তব অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতর স্তরে আগামী দিনে নির্বাচনের কয়েক মাসের মধ্যেই নব-কংগ্রেসের মিত্র দলগুলি ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

নির্বাচন শেষ হবার একমাসও যায় নি, ইতিমধ্যেই যারা সবচেয়ে গলা বাড়িয়ে ইন্দিরা প্রগতিশীল বলে জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার কাজে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর ছিলেন তারা পশ্চিমবঙ্গে একমাসের অভিজ্ঞতার ফলেই দ্রুত মোহমুক্ত হতে সুরু করেছেন।

ইন্দিরাকে বামপন্থী ভেদে ধারণ করাবার কাজে সবচেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা সি পি আই-এর। ইন্দিরার ইঙ্গিতে কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারগুলি ভেঙ্গে দিয়ে নব-কংগ্রেসকে গদীতে ফিরিয়ে আনার প্রধান দায়িত্ব সি পি আই-এর। পশ্চিমবঙ্গে ও কেরলে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রিসভা গঠন করার দায়ভাগও তাদের। দুটী রাজ্যেই জনগণের অধিকাংশ কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী রায় দিলেও এবং বামপন্থী মন্ত্রিসভা গঠনের সমস্ত সুযোগ থাকলেও, সি পি আই বামপন্থী সরকারের পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক জোটকে

ক্ষমতায় বসাতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম। তার রথচক্রে তল্লাচির কালই প্রাসাদ ঝড়বৃষ্টি, কুটীল জনস্বার্থ-বিরোধী চক্রান্তের কৌশলী নায়কেরা গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছেন অমিত শক্তির সংঘবদ্ধ সাধারণ মানুষ।

এই নির্মম ইতিহাসের চাকার তল্লাচি, গুঁড়িয়ে যাবার আগেই সি পি আই নেতৃত্বের একাংশ পার্টিকে রক্ষা করার উদ্যোগ নিতে অগ্রসর হয়েছেন। বামপন্থী অনৈক্যের হোত্ববৃন্দে গতিক দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। একমাস আগেও তারা যে নব-কংগ্রেসকে প্রগতিশীল বলে প্রচার করেছেন লোকসভার চবিদশটী আসনের মধ্যে তেইশটিই সে নব-কংগ্রেসের দাবিদার তারা লাভ করতে পেরেছিলেন, সেই সি পি আই-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব আজ বাস্তব অবস্থা ও জনগণের বিরূপতা দেখে আতঙ্কিত।

সম্প্রতি সি পি আই-এর চেয়ারম্যান এবং এ আই টি ইউ সির সাধারণ সম্পাদক শ্রীডাঙ্গা সাহেব এপ্রিল তারিখে বিজয় শ্রমিক সংস্থা ও ইউনিয়নের কাছে একটা চিঠি দিয়ে যা বলছেন তা বিশেষ অর্থবহ। শ্রীডাঙ্গা এ চিঠিতে লিখছেন :

“হয়ত যা এটা বতটা আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে ততটা আশ্চর্যজনক নাও হতে পারে, নতুন ভারত সরকারও ‘মজুরীবান্ধি স্বর্গিত রাষ্ট্র’ এবং উৎপাদনের সঙ্গে মজুরী

বোঁধে দেবার এই ধনীগুলি আবার আওড়াতে শুরু করেছেন।

“ভারত সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী নতুন কিছু নয়। আঠারো বছর আগে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূসাবিদা করার সময় থেকেই ভারত সরকার মজুরীবান্ধি স্বর্গিত রাষ্ট্র-বার এবং মূল্যবান্ধি জনিত মজুরী হ্রাসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত ভাটা না দেবার চেষ্টা করে এসেছে।

“ফলে ভারতের জাতীয় অর্থনীতি সবচেয়ে বড় বড় এককট্রিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং বড় বড় জমিদারগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে। এই গোষ্ঠীগুলি একযোগে রিজার্ভ ব্যাংক সহ সমস্ত ব্যাংকগুলিকে করায়ত্ত করেছে এবং তার মারফতে পণ্যমূল্য এবং মূল্যবান্ধি বণ্ণেছ বাড়াবার মত যে কোন পরিমাণ অর্থ ঋণ পেয়েছে। এই সীমাহীন কুর্জ পাবার সুযোগ দেবার ফলে ফাটকা-বাজী ও মূল্যবান্ধি অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়েছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে জাতীয় অর্থনীতি এবং জনগণের প্রয়োজন মেটোবার কোন ব্যবস্থাই করতে পারা সম্ভব হয় নি।

সুতরাং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের ছকে বাঁধা মজুরী-মূল্য-আয় সম্পর্কিত নীতি এবং পুরনো ধাঁচের শ্রমনীতি বারবার আওড়ে, নব-গতিতে ভারতসরকার নির্বাচনের সময় যে পবিত্র প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়েছিল, তা ভঙ্গ করেছে।

এই নতুন পুঁজিবাদী আক্রমণ একটা নতুন মুখোশ ধারণ করারও প্রয়োজন দেখে নি। এই পুঁজিবাদ বিপ্লবপুঁজিবাদের মতই নশন। সুতরাং আমাদের দেশের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এবং শ্রমজীবী জনসাধারণকে মিলিতভাবে বসে এই অবস্থাটী সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে এবং একাব্যবস্থাবে এই নয়া পুঁজিবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করতে হবে।”

বিলম্বে হলেও ডাঙে সাহেবদের এই উপলব্ধি অবহেলা করা উচিত নয়। ইতিহাসের নির্মম শিক্ষা যে তাঁরা গ্রহণ করেছেন, তা জনগণের সামনে প্রমাণ করার সুযোগ তাঁরা পাবেন।

শুরু পরমবেদনা ও দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হয় যে ইন্দিরা সরকারের নয়া-পুঁজিবাদী চরিত্র সম্পর্কে তাঁরা যদি দুমাস আগেও প্রকাশ্যে বলতে সাহস করতেন, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য পৃষ্ঠে চলতে পারত।

তবু এখনও সময় আছে। নির্বাচনে হারজিতই শেষ কথা নয়। নির্বাচনে অতুলনীর জয়লাভ করার পরও বাংলাদেশের জনগণ ইয়াহিয়া খানের কাছে অপরিমেয় রক্তক্ষণ শোধ করতে বাধ্য হচ্ছে। নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বামপন্থী অনৈক্যের সুযোগে কংগ্রেস

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে।

আজ যদি সি পি আই নেতৃত্ব সত্যিই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকারের নয়া পুঁজিবাদী চেহারা যে আর প্রগতিশীলতার মুখোশ ধারণ করারও দরকার মনে করছে না বলে উপলব্ধি করতে পেরে থাকেন, অবিলম্বে তারা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার অবসান ঘটাতে উদ্যোগ গ্রহণ করুন; আমরা আশা করি কেরলেও তাঁদের মন্ত্রিসভা রক্ষার দায়িত্ব সি পি এম গ্রহণ করবেন।

এভাবেই বামপন্থী দলগুলির

অনেকা দরে হতে পারে। আমরা ও নব কমীয়ারার সঞ্জীবিত পশ্চিমবঙ্গে ও কেরল ডাঙে বর্ণিত নয়া-পুঁজিবাদ প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত দর্পণেই দৃষ্টমান হতে পারে।

সি পি আই মনে মনে রাখেন যে দীর্ঘ সময় তাঁদের হাতে নেই। জনগণের আস্থাভাজন হবার এটা তাঁদের শেষ সুযোগ।

মিথ্যাচারের পুঁজিবাদী কৌশলে আর জনগণকে কিংবা সচেতন শ্রমিক শ্রেণীকে ডাঙে মারেররা বোকা বানাতে পারবেন না।

ওপার বাংলার সংগ্রামের স্রোত নিচ্ছে এপার বাংলার স্বার্থবাজরা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলা দেশের মুক্তি বোম্বারদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সারা ভারতে যে কীভাবে সাড়া পড়েছে তার খবর প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বভাবতই সীমান্তের এপারে পশ্চিমবঙ্গে এ ব্যাপারে উৎসাহ অনেকটা বেশী। পাক-সামরিক বাহিনীর অত্যন্ত আকস্মিক এবং নৃশংস আক্রমণে বিচলিত হয়ে অনেক মুক্তিবোম্বা এপারে ছুটে আসছেন।

কতকটা অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন এবং বাকীটা কেন্দ্রীভূত সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এই সব মুক্তি বোম্বা এপার থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য চান।

যতদিন বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকার ঝুটনৈতিক মর্ষিদা না দিচ্ছে ততদিন এপার থেকে সাহায্য করার অবকাশ খুবই কম।

স্বাধীনতার আন্দোলন যে প্রধানতই নিজেদের ত্যাগেই অর্জন করতে হয় একথা আমরা সবাই ভুলে গেছি। এর কারণ ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে আপোষের ফলেই আমাদের দেশ দুর্ভিক্ষের হলেছিল এবং আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম “অনেকটা” বিনা রক্তপাতে।

রক্ত অনেক বয়েছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ততটা নয় বতটা নিজেদের মধ্যে কলহে।

এ থেকে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে বাংলাদেশের এই লড়াইয়ে আমরা কোনরকম সাহায্য করব না। আসলে মনে রাখতে হবে যে ওখানকার মুক্তি-যুদ্ধের সাফল্যের উপর আমাদের এখানকার ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে। সেজন্য মামদুলী নৈতিক সমর্থন ছাড়া আমাদের আরও কিছু করা দরকার।

কিন্তু বেশ দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি এবং বিজয় সূত্রে সংবাদ পাছি যে ওপারের সংগ্রামীদের সাহায্য করার ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য যে সব কার্যকলাপ চলছে তা ওখানকার আন্দোলন ত বটেই এখানকার

আন্দোলনকেও বানচাল করে দেবে।

এই প্রসঙ্গে গোড়াতেই বড় বড় সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করার কথা বলতে হয়।

বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা এ একটা টোটাল ওয়ার এই অনুভূতি সকলের নেই। চমক লাগানো সংবাদ প্রচার করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। দেশের আপামর জনসাধারণ এই সংগ্রামে অংশীদার। তাদের কাছে সব কথা জানাতে হবে। তার মানে এই নয় যে আমাদের প্রবর্তী অভিযানের “পরি-কল্পনা” আগেই প্রকাশ করে দেব।

পাকিস্তানী আক্রমণের তীব্রতা বাড়ার পর এখন গুরুত্ব করতে, ইলিস মাছ, কাঁচাগোলা ও ডাব খেতে যাওয়ার যাত্রীর সংখ্যা কমেছে, কিন্তু সুযোগ সম্মানীর অভাব যে নেই বারী সীমান্ত এলাকার সংবাদ রাখেন তাঁরা জানেন।

বিরক্ত মানুষের দৃষ্টান্তের সুযোগ নিয়ে মূল্যবান করার জন্য ব্যবসায়ীদের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। এ বিষয় রাজ্যসরকারের কমীরা সজাগ হলে এটা হতে পারত না।

পুলিসী সূত্রে আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে সীমান্তবর্তী কয়েকটা জেলার বিদ্রোহ করে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা ও মন্দিরাবাদে কয়েকজন নামকরা অসামাজিক ব্যক্তি সরকারী কতৃপক্ষকে উপেক্ষা করে নব কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওপারের মুক্তিবাহিনীর উদ্ভার করা-অশ্রুপূর্ণ নিজেরাই আত্মসাৎ করেছেন। তাঁরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন অন্তরঙ্গ মহল্লে যে বামপন্থীদের মারার জন্য এগুলি এদেশে কাজে লাগবে। এ বামপন্থী কার্য-সেটা বলে দেওয়া কি প্রয়োজন?

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বরখাস্ত পুলিশের লোকেরা চাকরী ফিরে পেলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বাংলা সরকার হালে ছয়জন পুলিশ কর্মচারীকে চাকরীতে পুনর্নিয়োগ করেছেন। শুরু তাই নয়, সরকার এই সিদ্ধান্তও নিয়েছেন যে তাদের বকেয়া গত কয়েক মাসের মাইনেও দেওয়া হবে এই ভেবে যে তারা চাকরীতে বহাল ছিলেন।

এই ছয়জন কর্মচারীকে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার দুর্গাপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজে যে পুলিশী তাড়ব হয়েছিল এক বছর আগে তার সঙ্গে জড়িত বলে বরখাস্ত করে ছিলেন।

বিধান সভায় তাড়ব করবার জন্য যে সতেরো জন পুলিশের লোককে বরখাস্ত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে এগারো জন ইতিমধ্যেই চাকরীতে বহাল হয়েছেন রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে। বাকী ছয় জন কয়েকদিন আগে শ্রীবিজয় সিং নাহারের কাছে তাদের আবার

চাকরী দেওয়া হক এই তাড়ব করতে গিয়েছিলেন। বিজয়বাবু বলেছেন যে তাদেরও আবার চাকরী দেওয়া হবে। তিনি শীগগিরই তাদের কথা স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুকে বলবেন। এই আশ্বাস নাকি দিয়েছেন।

নিজেদের মনোমত কোন কোন পুলিশ অফিসারদের কোথায় কোথায় বসান যায় এই নিয়ে বিজয়বাবুর সঙ্গে অজয়বাবুর এক দফা আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে। কোন কোন উন্নতন ও মিডল ক্যাডার অফিসারকে বদলি করতে হবে তাও ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সমস্ত জায়গায় কাকে বসান হবে সেই লিষ্ট এখনও তৈরী হয় নি। পুলিশ কমিশনার শ্রীবিজয় গুপ্তর উপর বিজয়বাবুরা মোটেই সন্তুষ্ট নন এ সংবাদ একাধিক কংগ্রেসী সূত্রে থেকে জানা গিয়েছে।

বাংলা দেশ ও আমরা

জুম্মত বন্ধ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের স্বাধীনতার লড়াই পশ্চিম বাংলার মানুষকে নানাভাবে উদ্বেগ করছে, বিজ্ঞপ্তির স্তরে বিজ্ঞপ্তি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এর ফলে আমাদের নিজেদের প্রবণতাগুলিকে নিঃসংকোচে ঘাচাই করার একটা সুযোগ এসেছে।

ওপারে বা, ঘটছে তার সংবাদ এদেশের মানুষকে পেঁপে দেবার ব্যাপারে বাংলা খবরের কাগজগুলির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। দূর্ভাগ্যবশত, চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী এই সংবাদপত্রগুলি এই সুযোগে একজাতীয় সস্তা রোম-হর্ষকতা ও নাট্যকেনার অবতারণা করেছে। হাসিও পায়, দৃষ্টিও হয় যখন দেখি যে সংবাদপত্রটি চৌধুরী সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বিশেষ চর-এর খবর পেশ করে সাম্প্রদায়িকতা উল্লেখ দিয়েছিল, আজ তারই সাংবাদিকেরা পূর্ব বাংলার মুসলমান ভাই-বোনদের দৃষ্টিতে অশ্রুপাত করছেন। আমার মনে আছে চৌধুরী সালে দাঙ্গার নিগদলিতে প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা শিয়ালদহ স্টেশনে বেতে হত, বনগাঁ থেকে ট্রেনে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উৎপীড়িত হিন্দু উদ্ভাস্তদের কাছ থেকে দাঙ্গা সংক্রান্ত সংবাদ জোগাড় করতে। কাটা মুন্ড তো মূরের কথা, কোনদিন কোন রক্তাক্ত, আহত উদ্ভাস্তকে আমি অস্তিত্ব দেখি নি। অথচ পরের দিন সকালে বাংলা সংবাদপত্রগুলি খুলে দেখতাম, রোমহর্ষক সব সাক্ষাৎকার বার হয়েছে। বীরা লিখেছেন, তাঁরা ভ্রম্যরই সঙ্গে শিয়ালদহ স্ল্যাটফর্ম দাঁড়িয়ে উদ্ভাস্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতেন।

এইসব কাগজের সাংবাদিকেরা খন পূর্ব বাংলায় কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে এসে রোমাঞ্চকর বিবরণী পেশ করেন, তখন তাই আমি অবাক হই না। যুঝতে পারি, যে রোমহর্ষকতার তর্জিনে এক সময় তারা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের গুন্ডা বানিয়েছিলেন, তারই প্রয়োজনে আজ আবার সেই মুসলমানদেরই মুক্তিযোদ্ধা বলে জয়গান গাইতে হচ্ছে। স্বভাবতই আতিশয্য তখনও বেগন হয়েছিল, এখনও হচ্ছে।

এক এক সময় এই আতিশয্য নিলম্ব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন একটি সাংবাদিক যশোর থেকে ফিরে এসে লিখলেন কি করে কলি ডুইয়ে মুরগীর কোল উপভোগ করে এসেছেন তিনি। ওপারে যখন মানুষ যুঝ করে মরছে, বোমার ক্ষেত-খামার বিধ্বস্ত হচ্ছে, আসন্ন দূর্ভিক্ষের ঘনামান ছায়া, তখন বিনি সেই মানুষগুলির আতিথেয়তার সুযোগ নিয়ে তাদের ভ্রম-ধ্বংস করে মুরগীর কোলের স্বাদ আহরণে ব্যস্ত, বাংলাদেশের মুক্তির লড়াই সম্বন্ধে তিনি কতটুকু আন্তরিক তা সহজেই অনুমেয়।

এই ধরনের সংবাদ রচনা না হয় অর্বাচানের ইতরানি বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু দিনের পর দিন, এই যুঝটাকে অত্যন্ত সহজ বিজ্ঞপ্তি-অভিধান বলে প্রতিপন্ন করে নৈতিক মনোবল রক্ষার নামে পূর্ববাংলার এইসব কাগজের পাঠকদের মনে এক ধরনের আত্ম-সম্বৃদ্ধি উৎপাদন করা হয়। যশোরের বিকোরগাছ গ্রামে গিয়ে দেখেছিলাম স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের সংবাদপত্র পড়ে নিশ্চিত হয়ে বসেছিলেন যে পাক-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাভূত। তাই কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিকোরগাছ উপর পাক আক্রমণ এদের কাছে যেমন অপ্রত্যাশিত ছিল, তেমনই বেদনাদায়ক। তাঁরা আশা করতে পারেন নি এপারের বাঙালী বন্ধুরা, বিশেষ করে সাংবাদিকেরা তাঁদের এইভাবে বিভ্রান্ত করবেন। সংবাদ-পরিবেশ-নাম আমাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এই নিজস্বগুণে এদেশে বসে মনে হয় নিরীহ অতিশয়োক্তি, কিন্তু বীরা সংগ্রামরত ওদেশে তাঁদের কাছে বিপজ্জনক।

অবশ্য এই জাতীয় নাট্যকেনা কেবলমাত্র সাংবাদিকদেরই একচেটিয়া নয়। যুঝের শুরুর দিকে, যখন ভারতীয় সীমান্তের নিকটবর্তী পূর্ববাংলার অঞ্চলগুলি নিরাপদ ছিল, তখন দলে দলে যুঝক, ওপারে গিয়ে দিন কাটিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে কিছু আন্তরিক ভাবে সাহায্য করার জন্যই, খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধপত্র নিয়ে গেছেন। কিন্তু অধিকাংশই প্রায় একটা চড়ুইভাতি করার মেজাজ নিয়ে যুঝে এসেছে। হিন্দী গান গাওয়ার চর-এ “জয় বাংলা” স্লোগান দিতে দিতে যাকের উপর নাচতে নাচতে ছেলেদের বনগাঁ থেকে যাত্রা করতে দেখেছি। খুলনার সাতক্ষীরায়—যেটা আমাদের ইটিং-ডায়াট থেকে কয়েক মাইল দূরে—দেখেছি এ পারের লোক সস্তায় মুরগী কিনে ফিরে আসছে। এপারের শ্রমবৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বীরা, তাঁরা অনুরোধ করেছেন—“ওপারের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসবেন না দয়া করে; কারণ ওঁরা যুঝ করছেন; ওঁদের আরও বেশী দরকার।” কিন্তু কা কস্য পরিবেশনা! সাতক্ষীরাতে এমন দৃশ্যও দেখেছি, এপারের ছেলেরা চারমিষ্ট খেয়ে দাম দেবার বেলায় দরাদরি করছে।

পূর্ববাংলার ঘটনাবলীর প্রতি-ক্রিয়া এদেশের এক শ্রেণীর মানুষের কাছে আর এক জাতীয় সুযোগ এনে দিয়েছে। নিপীড়িত উদ্ভাস্তদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গুন্ডা-বদমায়েস, মেয়েমানুষের দালালদের উৎসাহ বেড়ে গেছে। পশ্চিম দিনাজপুরে রাধিকাপুর স্টেশনে দেখলাম প্রায় হাজার দশেক উদ্ভাস্ত এসে হাজির হয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান, উচ্চমধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্য-

বিত্ত দরিদ্র মানুষের ভীড়। কেউ একেবারে নিঃশব্দ, কেউ কিছু সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। অল্প বয়সী মেয়েদের সংখ্যা বেশী। ওখানকার পুলিশের অফিসারদের কাছে শুনলাম ছেনতাই রাহাজানি শুরুর হয়ে গেছে। বদমায়েস লোকদের আনাগোনাও বেড়ে গেছে।

আবার উদ্ভাস্ত সমস্যা এবং তার সঙ্গে জড়িত যতরকমের ন্যায়-জনক পূর্বপরিচিত লক্ষণগুলির পুনরাবির্ভাব ঘটছে। এই নবাগত উদ্ভাস্তদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির খেলা শুরুর হতেও আর বেশী দেরি নেই। রিলিফের নামে অর্থ সংগ্রহ এবং তার শেষ কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও শুরুর হয়ে গেছে।

তবে সবচেয়ে দৃষ্টান্তমূলক, এদেশের কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিক্রিয়া। বামপন্থী আন্দোলনে লালিত হয়েও সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে তাঁদের চিন্তাধারা আজও মুক্ত নয়। বহু জায়গায় শুনছি এদের বলতে—“১৯৪৭ সালে ওঁরা আমাদের এমনি করে তাড়িয়ে-

ছিল; আজ ঠেলা বুরুক?” ওঁরা ভুলে যান পূর্ববঙ্গের আজকের মুসলমান যুব সম্প্রদায় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতায় পুষ্ট। যে আনসার বাহিনী আজ রণাঙ্গানে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে আর ১৯৪৭ সালে সীমান্তে যে আনসাররা হিন্দু উদ্ভাস্তদের নিঃশব্দ করে বার করে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক ঘটে গেছে গত চব্বিশ বছরে। পূর্ব বাংলায় পদা-র্পন করলে, সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বললে, যে কেউ বুঝতে পারবেন যে সাম্প্রদায়িকতা সেখানে আজ বিলম্ব। কে হিন্দু কে মুসলমান—এনিয় কেউ মাথা ঘামায় না। চব্বিশ বছর পূর্বে কিছু স্বার্থান্বেষী নেতার কথায় বিহবল একদল মানুষ দেশভাগে সায় দিয়েছিল—এবং সেই দেশভাগে আমাদের এদেশের হিন্দু নেতাদেরও যথেষ্ট অবদান ছিল। অতীতের সেই ভুলের জন্য, তাদের পুত্র-কন্যাদের বর্তমান সংকটের জন্য সমস্ত মুসলমান সমাজকে দায়ী করে এদেশের যে হিন্দুরা প্রতিশোধ বাসনা চরিতার্থ করছেন, তাঁরা একধরনের বিকৃত আনন্দে মগ্ন।

আবার আর এক ধরনের মানসিকতা লক্ষ করি উত্তর ভার-

তের উদ্ভাস্তরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। দিল্লীর পাজাবী ও অবাঙ্গালীরা শুরুরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বেশ মাতামাতি করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই হাওয়াটা অন্যদিকে ঘুরতে লাগল। এমন কথাও শুনলাম যে পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা বাড়াবাড়ি করছে; তাদের প্রতি কোন অর্থনৈতিক বৈষম্য করা হয় নি। যে পাজাবী হিন্দুরা পাজাবী মুসলমানদের দৃষ্টে দেখতে পারতেন না (পশ্চিমের ও পূর্বের বাঙালীদের মধ্যে যে সম্প্রীতি গঠন করে বহুরের মধ্যে গড়ে উঠেছে, তা পাজাবে কখনই হয় নি) রাতারাতি তাঁরা হঠাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। পাজাবের একজন মন্ত্রী বলে বসলেন যে পূর্ব বাংলার ঘটনা নিয়ে ভারত সরকারের বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, কারণ তা হলে দুই পাজাবের মধ্যে যে সম্প্রীতি তাতে চিড় খাবে। এদের অতীত-শ্রমী বাঙালী বিশ্বেষী মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

আর উদ্ভাস্তরা মুসলমানরা একটু আতঙ্কগ্রস্ত। তাঁরা বুঝতে পারছেন পাকিস্তান দেশ হিসেবে আর বেশীকাল টিকে থাকবে না।

‘সংবাদ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা’

তার হাসি কী মধুর



এর পেছনে রয়েছে-তার
বহুদিনের সাধনা—
সাধনা দশন দিয়ে প্রতিদিন
জীবনের পরিচর্যা।

সাধনা দশন

একটি আদর্শ জীবনের মাজে

দীপ্ত মুক্তার মত কবিতা ও
স্বপ্ন, সবল, সুন্দর করে।
যুব কবি ও কবিমুগ্ধ



সাধনা ওষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-১০

অবাক চা: বোমেন রস বোন, এম.এ.
অমূল্য-শাস্ত্রী, এম.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভারতীয় কলেজের
কম্পিউটার বিভাগে অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডঃ নরেন চন্দ্র বোস, এম.এ.পি.এস. (কোল)
অধ্যাপক

আশু মজুমদারের মৃত্যু সম্পর্কে

বাদবন্দুর নকশাল নেতা আশু-তোষ মজুমদার আমার ছোটভাই। তার মৃত্যু নিয়ে, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহু কাগজেই লেখা হয়েছে। তবে কিস্তিবে তাঁর মৃত্যু ঘটল তা নিয়ে একমাত্র দৃষ্টান্তই ষ্টাফ রিপোর্টার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বলে আমার ধারণা; এই বিবরণের শেষাংশ অর্থাৎ কেওড়াতলা শ্মশানের বিবরণ আরেকটু বাস্তবানুগ হলে হয়তো ভালো হতো।

কিন্তু সমরেশ রায় নাম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে তদুলোক গত ঘোলাই এপ্রিল দপ্তরে লিখেছেন, তা হলো মূলতঃ বাদবন্দুর থানার কতৃপক্ষের বিবরণ। এই বিবরণে দপ্তরের প্রতিনিধির বিবরণের সত্যতা অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছে।

কলতে বাধা হাছ সমরেশবাবুর বিবরণ একতরফা। আশু মজুমদারের মৃত্যুর পরেও যেভাবে থানা কতৃপক্ষ স্থানীয় তরুণদের নিয়ে নিয়ে হয়রানি, মারধোর এবং আশু মজুমদারের মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা পরিহাস করেছেন, আমাদের অনুপস্থিতিতে কল বাড়াতে চুকে জিনিসপত্র তছনছ ও আমার বর্ণিত দা নিয়ে গেছেন (আমার ধারণা) তাতে এলাকার হিসার ভাব সৃষ্টি করা—পুলিশ ও স্থানীয় তরুণদের মধ্যে পারস্পরিক চ্যালেঞ্জের ভাব আনমনের জন্য প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব থানা কতৃপক্ষের।

সমরেশবাবুর প্রথম মিথ্যা—আশু মজুমদারের মৃত্যু নিয়ে নরক পরস্পর বিরোধী সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। হয় নি। একমাত্র মিথ্যা প্রচারের অপমানে অপরাধী হলো থানা কতৃপক্ষ।

চম্পা পরগণার ডি এস পি সুবিমল দাশগুপ্ত শব্দে আশু মজুমদারকে কেন, পরিবারের সকলকেই চিনতেন। থানার অনেক অফিসার করেবার এসে আমার স্মৃতিকে শাসিয়ে গেছেন—“যদি পেওরকে ঠিক পথে না আনতে পারেন, তাহলে কিন্তু একদিন গুলি করে মেরে ফেলবো।”

বাংলা দেশ ও আমরা (পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)
এদেশে প্রায়ই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এই উৎপীড়িত মুসলমানরা একমাত্র পাকিস্তানেই আশ্রয় পেতেন এতকাল। ভারতবর্ষে ভবিষ্যতও দাঙ্গা বাধবে; কিন্তু পাকিস্তান না থাকলে এরা কোথায় যাবেন—এই ভয়টা স্বভাবতঃই এদের পেয়ে বসেছে।

এই সব নানা স্তরের নানা স্বার্থ প্রসূত উদ্দেশ্যের ফলে দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব বাংলার মুক্তি-যোদ্ধাদের পাশে দাঁড়াবার লোক খুব অল্প। চিরায়িত ধারায় আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা রেডিও সংবাদপত্রের নাটকপূর্ণা, ব্যবসাদারদের সুযোগ সম্বন্ধী ও রাজনৈতিক দলগুলির কুটিল হিসেবের দর কষাকষিতে পরবিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে।

কেন গণতন্ত্র তাঁকে এসব কথা বলার উৎসাহ দিয়েছে জানি না।

এত চেনা সঙ্গ ও রহস্যজনক কারণে থানা কতৃপক্ষ (ডি এস পি ন ও সি?) লাগবজারকে ভুল তথ্য সরবরাহ করেছেন, বলেছেন—(ক) মিলিটারীর ওপর বোমা মারতে যাওয়ার অশোক মজুমদার (?) নামে এক যুবক গুলিবিস্ত্র হয়েছে (আনন্দবাজার এগারোই মার্চ প্রত্যয়) আবার যুগান্তরে এই একই তারিখে বেরিয়েছে যে একটি নির্বাচনী বৃদ্ধ আক্রমণ কালে সন্তোষ মজুমদার (?) নামে এক যুবক গুলিবিস্ত্র হয়েছে। মিথ্যার বেসাতিতে আশুতোষ মজুমদার থানা কতৃপক্ষের কারিগরিতে এক জারগার অশোক, অন্য জারগার সন্তোষ—কিন্তু কেন?

আশুর মরদেহ নিয়ে বখন পাড়ায় আসতে চেরেছিলাম, পুলিশ অন্বেষিত দের নি, শুনলাম তাদের ইন্টেলিজেন্স বলেছে—“হি ইজ হাইলি পপুলার ইন দি এরিয়া, ইফ বডি ইজ টেকেন দেয়ার, দেয়ার মে বি মব ফিউরি এগেইনস্ট দি পুলিশ।” কোনটা যে ঠিক কারণ তা জানি না।

আশুকে কিভাবে মারা হয়েছে তার সাক্ষ্য সমরেশবাবু দিয়েছেন যে মিলিটারীরা মেরেছে তাদের সুবেদারের কাছ থেকে। সমরেশবাবু নিশ্চয়ই নিভেজাল তথ্য পেয়েছেন। সমরেশবাবু ময়না তদন্তের রিপোর্টও দেখেছেন—শুনছি আমরা—আজ্ঞার স্বজনেরাই এই রিপোর্ট পেতে মাস দেড়েক লেগে যাবে। “নিরপেক্ষ” সমরেশবাবু থানার অফিসারদের কেউ কি না জানি না, তবে আবার বলছি তার তথ্য-সংগ্রহ একতরফা।

তিনি কি শুনলে চমকে উঠবেন যে থানার সাধারণ কর্মচারীরাই আশু মজুমদারকে থানার অভ্যন্তরে অভ্যচারের বিশদ কাহিনী জনসাধারণকে জানিয়েছেন? একথা সমরেশবাবু জানেন কি যে আশু মজুমদারের ব্যক্তি তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য এলাকার রাজনৈতিক অরাজনৈতিক নির্বিশেষে সকলের মধ্যে তাঁকে প্রেম্য আসনে বসিয়েছিল? সমরেশবাবু জানেন কি যে থানার একজন অফিসার আহত মর্মুর্ষ আশুকে দিয়ে নানাপ্রকার স্বীকারোক্তির চেষ্টার ছিল, তার মধ্যে ছিল—“লিখে দাও, তুমি অমুক অমুক আই বি লোকদের খুন করেছ?” আশু জবাব দিয়েছে—“সাধারণ পুলিশ মারা আমার পার্টির নীতিবিরুদ্ধ, যে সকল আই বি আমাদের প্রেরণা ও নির্বাহনে সহায়তা করেছে, তাদের মেরে ফেলা আমার পার্টির নির্দেশ। এই নির্দেশ পালনে আমি নিশ্চয়ই সহায়তা করেছি, অবশ্য এ্যাকশনে আমার থাকার প্রয়োজন হতো না।” সমরেশবাবু কি আরো তথ্য প্রয়োজন? তথ্য তিনি পাবেন থানা কতৃপক্ষের কাছে না, সাধারণ পুলিশ কর্মচারীর কাছে।

আশুকে থানা ও হাসপাতালে কিভাবে রাখা হয়েছিল তা নিয়ে “নিরপেক্ষ” সমরেশবাবু যা লিখেছেন, তা

দক্ষিণ চম্পা পরগণার ডি এস পি সুবিমল দাশগুপ্তের বক্তব্যের আফ্রিক প্রতীকধারী। সুবিমল দাশগুপ্ত অধ্যাপক শান্তিময় রায় এবং আরো চারজন শুদ্ধলোকের সামনে আমাকে সমরেশবাবুর বর্ণিত কাহিনীই নিয়ে খেঁচে শুনিয়েছেন।

সুবিমল আমার পূর্বপরিচিত, ছাত্রাবস্থায় সে বিবেকনগরে থাকতো। আশু কিভাবে মারা গেল এ নিয়ে বা আশুর রাজনীতি নিয়ে সুবিমলকে আমি কোন প্রশ্নই করিনি। এগারোই মার্চ সকাল সাড়ে নয়টার প্রমোডজন অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের অনুরোধে তাঁর সংগে সুবিমলের থানা কোর্টারীতে আমি যাই আশুর দেহ ফিরে আনার ব্যবস্থা করতে। সেখানে সুবিমল বতর্টা সম্ভব থানাকে বাঁচিয়ে নিয়ে থেকে যা বলেছে তা হলো : (ক) সে রাস্তায় শুনতে পার কেউ একজন গুলিতে আহত হয়েছে। (খ) সে কন্সটেন্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট সহ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে আশু গুলিবিস্ত্র। (গ) সে থানায় আশুকে নিয়ে আসে, (ঘ) হাসপাতালে পাঠাতে একটু দেরী (প্রায় দেড় ঘণ্টা সুবিমলের হিসাবমতো) হয়েছে থানার কোন গাড়ী বা আর টি তাল না থাকতে।

এ অবস্থায় আমি সুবিমলকে জিজ্ঞেস করি : “আশুকে যে সময়টা থানার রাখা হয়েছিল, তখন তুমি থানায় ছিলে?”

সে জবাব দেয় : “আমি থানিকক্ষণের জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলাম।”

আমি প্রশ্ন করলাম : থানার ওকে অভ্যচার করেন এমন বিশ্বাস তোমার এলো কোথেকে?

জবাব : মিলিটারীর হাতে ছিল। তারা কি এসব এলাউ করবে?

প্রশ্ন : আমার ছোটভাই ও স্ত্রী বখন আশুকে দেখতে গিয়েছিল, তখন থানার ও সি রিসলবার উঁচিয়ে ওঁদের বেরিয়ে যেতে বলল কেন?

জবাব : এ সত্যি অন্যান্য। আমি তো শুনই অবাক। আমি ছিলাম না।

প্রশ্ন : পাড়ার মহিলারা বখন আশুকে হাসপাতালে পাঠানোর দাবীতে থানার এসেছিল, তখন থানার ভেতর থেকে কোন অফিসার নাকি দেখা করেন নি। রাইফেলধারী ভারতীয় জওয়ানরা রাইফেল উঁচিয়ে মেবেদের দিকে তেড়ে এলো, চলে না গেলে গুলি করার ভয় দেখাল। তুমি শুনলে?

উত্তর : আমি তখন থানায় ছিলাম না, কি হয়েছে জানি না।

অর্থাৎ আশুকে থানার নিয়ে যাবার পর বতর্গুলো কুণ্ডিত ঘটনা ঘটে তার একটিও সুবিমলের সামনে ঘটনি বলে সে দাবী করেছিল, সেক্ষেত্রে সুবিমলের তথ্য বাস্তব হবে কি করে?

সমরেশবাবু বা সুবিমল ময়না-তদন্তের রিপোর্ট দেখতে পেতে পারেন, কিন্তু আমরা পারিনি। কিন্তু যে বাংলায় হাসপাতালে আশুকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানকার সূত্রে জানি—

কোন এক হীরাদাল দস্ত ও একজন জওয়ান আশুর দেহ নিয়ে হাসপাতালে যার এবং ডাক্তাররা এমন কোডও প্রকাশ করেছেন—একে শেষ করে কেন হাসপাতালে আনা হলো? দায়িত্বশীল একজন বলেছেন বলে শুনছি “এমন একটি তথ্য ছেলেকে এমন কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছে যে দেখলে মাথা ঠিক থাকে না।” বাংলায় ডাক্তাররা ব্যক্তিগতভাবে আশুকে জানতেন বলেই আমার ধারণা এবং ঐজন্য তাঁদের কোডও ছিল অনেকখানি।

গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক শ্রীশান্তিময় রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আশুকে থানার এতক্ষণ আটকে রাখার কারণ তদন্ত করে জনসাধারণকে জানাবার দাবী জানিয়েছেন—সুবিমলের সামনেই এই দাবীপত্র লেখা হয়েছিল।

থানায় কি করা হয়েছে না হয়েছে, সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত কে করবে—এটাও একটা প্রশ্ন। দাবী আমাদের গণতন্ত্রে নিজের চাকুরী বাঁচানোর জন্য স্তম্ভ। সমরেশবাবুকেও তাই গাড়ীফাটা থেকে থানা কতৃপক্ষের হয়ে ওকালতিতে নাতে হয়।

চোদ্দই মার্চ সকালে মিলিটারী দিয়ে ঘেরাও করে বাদবন্দুর থানা আমাদের পাড়া সাঁচ করে, অনেক সাধারণ অরাজনৈতিক ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়। তখন আমি বাড়ীতেই উপস্থিত ছিলাম।

পুলিশ চলে যাবার পর সাধারণ লোকজন আমার কাছে এসে অভিযোগ করেন : একটি বাঙালী পুলিশ অফিসার এসে বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞেস

করেন—“কি ক্যাপার, ডাক্তারের জন্য শোক করছেন?”

ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় জিজ্ঞেস করে “কলতো, আশু মজুমদার কোথায়?” কে তাকে মেরেছে?”

বক্তৃতে পারছি না থানার এই উক্ত অফিসারটি তো মনুষ্য সম্মত—একখানা রাইফেল বা থানার একখানা চেয়ার তো জীবিকাজনের জন্য মাত্র, নিজের মনুষ্যত্বকে নিজেরাই এমন অবমাননা করেন কিসের জন্য? মনুষ্যের মধ্যে পশুর স্বভাব রয়েছে জানি, কিন্তু এই পশুপ্রকাশই কি হিসার পথে, তথাকথিত ‘বাদলার’ পথে প্ররোচক নয়?

সমরেশ রায়কে আশ্বাসদান করতে বলছি। আশু মজুমদার জীবনে কোন চাকুরীর প্রমোশন চাননি তার রাজনীতি, ভুল কি সঠিক এ প্রশ্ন এখানে অবাস্তব, হাজার খানেক আশ্রয়বিক্ষেপিতা কেওড়াতলায় যেভাবে আশুর শবের পাশে কবরাকাটি করেছিল, আশু কি তাদের ঘৃণা দিয়ে রেখেছিল? অশুকে হত্যা করে যদি কেউ নিজের চাকুরীর, পাউরুটিতে মাখন মাখানোর ব্যবস্থা করতে চায়, করুক, ইতিহাস তার জবাব দেবে, কিন্তু একই নিশ্বাসে স্থানীয় সাধারণের শাস্তি বিধায়িত হবে বলে অভিনয় না করলেই নয়? আশুর মৃত্যুকে কেউ রাজনৈতিক মূলধন করছে, বলে আমার জানা নেই, কিন্তু যে মূলধন স্বার্থপর মহল নিজের ব্যক্তি ব্যালান্সের জন্য করেছে, তা বর্তমান সমাজব্যবস্থার ভয়াবহ দিকটাকেই তুলে ধরে।

অরূপ মজুমদার
শান্তিনিকেতন

নকশালদের স্বরূপ

আপনার পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। ফলে পত্রিকার “মতামত” পত্রায় নকশালদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে আমি সেগুলো খুব মনোযোগ দিয়েই পড়ে থাকি এবং সেই সঙ্গে আমাদের চারপাশে রোজ যেসব ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে—সেগুলোও বিশ্লেষণ করে থাকি। তাই মতামতের পাতায় আমার নিজের কিছু মতামত জানাতে চাই।

কুসনগর শহরে নকশালদের বিপ্লব শব্দ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত বতলোক এদের “শ্রেণীশত্রু বতমের” শিকার হয়েছেন, তারা সবাই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ এবং যারা পেশায় ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক, কেরানী, স্কপবেতনভূক পুলিশ কর্মচারী, ছোট দোকানদার ও বেকার যুবক। সম্প্রতি একজন ব্রিগাওয়ালাকে নকশাল বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার করে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেছে। আপনারা হয়ত জেনে অবাক হবেন, এই কুসনগর শহরেই আমার জানা এমন প্রায় দশজন ধনী ব্যবসায়ী আছেন, যারা আমাদের বছরের পর বছর

শোষণ করে লক্ষ লক্ষ টাকা মনোফা লুণ্ঠেছেন এবং নকশাল... তাদের কাছ থেকে প্রতিমাসে মোটা টাকা চাঁদা হিসাবে নিয়ে থাকে শব্দমাত্র আনেন্দ্রাস্থ এবং বোমা ও অন্যান্য খরচের জন্য। সুতরাং আমার প্রশ্ন, পৃথিবীর কোনদেশে কোন বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যাবে কি, ধনী ব্যবসায়ীর দেওয়া চাঁদায় টকনা ছুরি ঢুকছে মধ্যবিত্ত ও গরীব মানুষের পেটে “শ্রেণীশত্রু” লেবেল নিয়ে? আমার মনে হয় আজ সারা বাংলা-দেশ জুড়ে এই ঐতিহাসিক ঘটনাই রোজ ঘটে চলেছে।

আমি এই শহরের একজন জ্ঞানবানী তাত্ত্বিক নকশাল নেতাকে জানি, যিনি একজন ধনী ব্যবসায়ীর টাকায় ব্যবসা করে থাকেন। যেদিন রেডিও এবং সমস্ত সংবাদপত্রে প্রচার করা হলো গান্ধীবাদী নেতা অজয়বাবু বরাহ-নগর কেন্দ্রে মার্কসবাদী নেতা জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়াবেন, সেইদিন সকালে এই কুসনগর শহরের কোন একটি দোকানে কয়েকজন ধর্ম্মদার, একজন নকশাল নেতা (যার বিরুদ্ধে পুলিশ

মতামত

পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে এবং তারপরেও এই নেতাটি পদাধীনের চোখে ধুলো (!) দিয়ে এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়ান) এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। নকশাল নেতাটি খবরটি শুনলেই সকলের সামনে নিজের আনন্দ প্রকাশ করে মস্তবাই করে ফেললেন—“এইরার জ্যোতি বোস জন্ম হবে।” আমি অবাক ছিলাম। বরাহনগর কেন্দ্রে যদি মার্কসবাদী নেতা জ্যোতি বসু পরাজিত হন তবে জিতবে কে? গান্ধীবাদী নেতা অজয়বাবু? কিন্তু তাতে একজন সাক্ষী মাওবাদীর আনন্দ প্রকাশ করার হেতু কি? আমাকে এই প্রশ্ন চিন্তিত করেছে।

অনেকে আমাকে বলেছেন, এইসব নকশালদের সঙ্গে পদাধীনের কড়কর্তাদের এবং প্রশাসনের উচ্চ-মুন্ডলের সঙ্গে একটা ব্যাপক যোগাযোগ আছে। আমি একথা বিশ্বাস করি, কারণ বিশ্বাস করার মত কারণগুলো আমার চোখের সামনেই রয়েছে। একটা কারণ এখানে উল্লেখ করছি, সেটা হলো—এই শহরের প্রতিটি দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় হরফে নকশালারা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি এবং হত্যার রাজনীতির স্বপক্ষে প্রচুর শ্লোগান লিখেছে এবং আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি এই শহরের প্রতিটি রাস্তার প্রতিটি মিনিট পলিশ ও মিলিটারীর গাড়ী সারাদিন ধরে পাক খাচ্ছে। তখনই প্রশ্ন জাগে সারা শহর জুড়ে এতো সুন্দর করে নকশালারা এইসব শ্লোগান কখন লেখে? দিনের বেলা নয়, সেতো আমরা দেখতেই পাই। তবে কি গভীর রাতে? তবে কি গভীর রাতে এসে শ্লোগান লেখার সুযোগ করে দেবার জন্য শহর থেকে পদাধী ও মিলিটারী তুলে নেওয়া হয়? অনেকে হয়ত প্রশ্ন তুলবেন, পদাধীনের সঙ্গে যদি নকশালদের যোগাযোগই থাকে তবে পদাধী নকশালদের হত্যা করে কেন? আমার জবাবঃ আমরা যেমন মুরগী পুষে তার ডিম খাই আবার প্রয়োজন হলে সেই মুরগীকেই জবাই করে তার মাংস রান্না করে থাকি এও অনেকটা সেই রকমের ব্যাপার। মাওবাদের নামে এইসব নকশালদের দিয়েই খনিক প্রেমীর আত্মবাদী প্রশাসন সংগ্রামী মান্দুস-গুলোকে পাইকারী হারে হত্যা করাচ্ছে। আবার সেই প্রশাসনের যখন রক্ত পানের নেশা জাগে তখন সেই পদাধী ঘরে পোখা মুরগীর মতই নকশালদেরও জেলের মধ্যে অথবা রাস্তার গুলি করে হত্যা করে।

নকশালারা নির্বাচনের আগে দেয়ালে দেয়ালে শ্লোগান লিখেছিল—“প্রাধীদের গলাকাটা চলছে চলবে।” কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখতে পেলাম? শ্রীহেমন্ত বসু এবং আদি কর্ণসের প্রাধী

শ্রীপাণ্ডব ঘোষ যখন নিহত হলেন তখন এসব মাওবাদী, নকশালারা এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে এসব নিহত নারকদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে এলো এবং এসব নেতা যে নকশালদের কাছে “প্রম্ভের” এবং কমরেড এই কথা মালার সঙ্গেই লিখিত চিরকুটে জানিয়ে দিতে ভুল করলো না। এইতো এদের মাওবাদী চরিত্র। আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে যে কোন হত্যাকাণ্ডকেই স্পষ্টর থেকে ঘৃণা করি এবং সেই সঙ্গে শ্রীহেমন্ত বসু থেকে শত্রু করে বিভিন্নদের যত রাজনৈতিক কর্মী ও সংগ্রামী মান্দুস নিহত হয়েছেন, তাদের হত্যাকারীদের চরম শাস্তি দাবী করি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, জৈষ্ঠি বসু ও তার দলের লোকেরা যদি শত্রু ভোটে দাঁড়ানোর জন্যই নকশালদের কাছে প্রেমীশত্রু হয়ে থাকেন তবে হেমন্ত বসু, নিজলিঙ্গাপাণ্ডব, কর্ণসের প্রাধী ও অন্যান্য দলের প্রাধীরা নকশালদের কাছে কিভাবে “প্রম্ভের” এবং “কমরেড” হতে পারেন? এর জবাব কোনদিনই পাওয়া যাবে না। এই সঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখছি, সেটা হলো নকশালদের প্রতিটি মৃত্যুগুণে (যেমন নকশালবাড়ী, ডেবরা, গোপীকন্দপুর, শ্রীকাকুলাম ইত্যাদি) কিভাবে কর্ণস প্রাধীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করলো? তবে কি “ভোট বরকট করুন” শ্লোগানটির মানে কর্ণসকে আরো বেশী ভোট দিন?

নকশালদের দীর্ঘ দিন বছরের সমস্ত কার্যকলাপ ভালভাবে বিচার করেই বলতে পারি, এদের পেছনে আছে সারা ভারতের খনিকপ্রেমী, কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমেরিকার সি আই এ। এরা দেয়ালে দেয়ালে মাও সে তুং-এর ঘেসব বাণী লেখে বিপ্লবের স্বপক্ষে ঘেসব বাণী লেখে তা এই দেশের সাধারণ মান্দুসকে ভীত দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আমেরিকা ভিয়েতনামে সরাসরি বুদ্ধ করতে গিয়ে চরম শিক্ষা পাচ্ছে এবং সেই কারণেই এদেশে আমেরিকা শত্রু করেছে নতুন ধরণের কৌশল। সেটা হলো মাওবাদ দিয়েই মাওবাদকে ধ্বংস করার কৌশল এবং এই পরিকল্পনায় নকশালারা হলো সব চেয়ে বড় হাতিয়ার। এইদেশে সুকৌশলে ও সুপরিকল্পনায় সঙ্গে মাও সে তুং-এর নামে এমন একটা পরিণতির সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে এদেশের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সবাই মাও সে তুং-কে হিটলারের চেয়েও বেশী ঘৃণা করে এবং সেই সঙ্গে চীনের মহান বিপ্লবের ইতিহাসকে ঘৃণাভরে হুড়ে ফেলে দেয়।

অরুণ রায়বিশ্বাস
কলকাতা

বর্মানের পুলিশ সুপারের বড়বন্দ

গোপনসূত্রে জানতে পারিরাছি বর্মান জেলার পুলিশ সাহেব শ্রীপাণ্ডি গোপাল মুখার্জীর একটি বিশেষ রাজনৈতিক কর্মীদের নির্দেশে বর্মান জেলার বিশেষতঃ মুসলমান গোষ্ঠীদের উপর এক ভ্রাবহ অত্যাচার চালাইয়া চলিয়াছেন। এ সমস্ত অত্যাচারের মধ্যস্থতিকার আছেন বর্মান সদর থানার ও সি শ্রীকেশব-ব্যানার্জী এবং দু একজন কুক্ষিগত দায়েগো ও জমাদার।

এ জেলাতে বহু নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী আছেন বাহার সংখ্যা শতকরা আশী। কিন্তু বড়বন্দ করিয়া গত পঁচিশ মার্চ সৈয়দ মহম্মদ রসুল এবং তেরোই এপ্রিল আব্দুল জলিলকে সাসপেন্ড করা হইয়াছে। ১৯৬৭ সালে direct পুলিশ অফিসারদের পঁচিশ জনের মধ্যে এ দুজনই ছিলেন মুসলমান অফিসার।

মুসলিম লীগ মন্ত্রীগণ দাবী করিয়াছেন মুসলিমদের চাকুরী পদ রিজার্ভ রাখা হইবে। কিন্তু বর্তমানে দেখিতেছি চাকুরী পদ রিজার্ভ রাখা তো দূরের কথা যে কর্মজনের চাকুরী আছে তাঁদেরই চাকুরী হইতে

কি ভাবে বরখাস্ত করা যার তারজন্য গভীর বড়বন্দ চলিতেছে। আমরা আশা করব এ কাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদর উপযুক্ত তদন্ত করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। তবে তদন্ত যেন বর্মান পুলিশ সাহেবের তাবোদার অফিসারদের দিয়া যেন না হয়।

মুসলমান পুলিশ কর্মীবৃন্দ
বর্মান

চূড়ান্ত ভণ্ডামী

অজর মুখার্জী বিজয় সিং নাহার বিশ্বনাথ মুখার্জীর দল পশ্চিম বাংলায় পুলিশ মিলিটারীর রাজস্ব কার্যে করতে চেয়েছেন। এই বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের গণ আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য এক গভীর বড়বন্দের সামিল হয়েছেন। তারা এপার বাংলার বৃদ্ধ পুলিশ মিলিটারী দিয়ে দুমননীতির রথচক্র চালাতে চায় তারা কোন লক্ষ্য ওপার বাংলার দরদী সাজে? নাক-কান কাটা মুখামুখী অজর মুখার্জী গলা-বাজী করে বলেছেন “ওপারের বীরদের জন্য রক্ত দোব।” এই বাংলার রক্ত শব্দে নিয়ে বৃদ্ধি এ বাংলার পাঠাবেন তিনি? কিন্তু বাংলাদেশের মান্দুস এই বেইমানীর রক্ত নেওয়ার জন্য তো রক্ত দিয়ে লড়ছেন না।

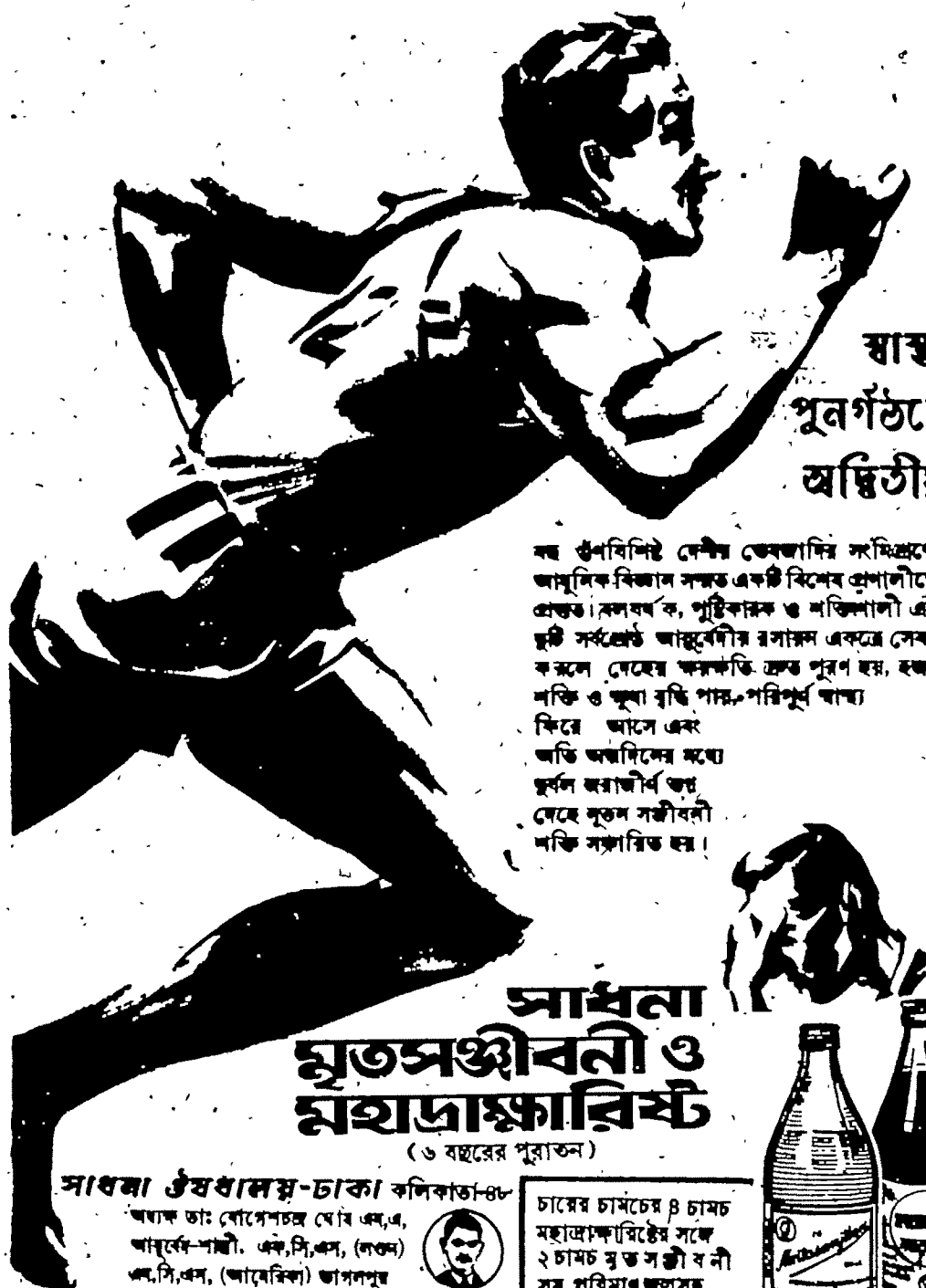
এদের ভণ্ডামী আজ এতদূর

গেছে যে, এরা মুজিববরের ছবি গভীর বড়বন্দ চলিতেছে। আমরা সপ্তে ইন্দ্রার ছবি টাঙ্গিয়ে মিটিং করছে। চমৎকার। একজন মুজিববরের স্বাধীনতার পক্ষে একজন অত্যাচারীর ছবি। এই না হলে দালালী। এই রাজনৈতিক চলাচলে, পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধ থেকে ইন্দ্রার প্রেরিত পুলিশ মিলিটারীর বর্মান অত্যাচারের কাহিনীকে কি চাপা দেওয়া যায়? পশ্চিমবঙ্গের মান্দুস ইন্দ্রাকে কেন্দ্রীয় মুজিববর মনে করবেন। বর্মান ইন্দ্রার সঙ্গে ইয়াহিয়া খান মিল খুঁজে দেখবে।

জৈনক পাঠক
হাওড়া

চীন নীরব কেন?

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই এ চিঠিটা লিখতে হল। “বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে লালচীনের অবিস্বাস্য নোংরা ভূমিকায় আমি স্তম্ভিত। এতদিন আমি শত শত নকশালপন্থীর সঙ্গে সগর্বে কষ্ট মিলিয়েছি। চীনের চেয়ারম্যান আমদের চেয়ারম্যান। কিন্তু আজ? লক্ষ্যের ঘৃণার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে—চেয়ারম্যানের দেওয়া অস্ত্রে আজ আমাদেরই মা ভাই বোনের রক্ত বরছে আর চেয়ারম্যান মদত দিচ্ছে ইয়াহিয়াকে যার (শেখাংশ জম্মত পুস্তক)



স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু ঔষধিযুক্ত দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্বলিত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। রক্তবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের কর্মক্ষমতা দ্রুত পূর্ণ হয়, হৃদয় শক্তি ও ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কিংবা আসে এক অতি অল্পদিনের মধ্যে।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষট
(৩ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধাময়-চাকা কলিকাতা-৪৮

অথবা ডাঃ বোমেন্দ্র চৌধুরী এম.এ., এম.বি.এস., (কলকাতা) এম.সি.এস., (আমেরিকা) ভাগলপুর কলকাতার রসায়ন শাস্ত্রের তৃত্বপূর্ণ অধ্যাপক।

চাকের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষটের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সহ পরিমাণ জলসহ প্রত্যাহার বা আহারের পর সেব্য।

কলিকাতা-৪৮ : ডাঃ বোমেন্দ্র চৌধুরী, এম.বি.এস., (কলকাতা) আয়ুর্বেদচর্চা



“দুই বালার এক নাম, সংগ্রাম
সংগ্রাম”

মিছিল দৌড়াচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে।
যুবক যুবতী, তরুণ তরুণী এমন
কি কিশোর কিশোরীরাও চলে-
ছেন সমস্ত লেনিন সরণী জুড়ে।
মিছিল আসছে দূর দূরান্ত থেকে।
হুগলী বধমান মেদিনীপুর,
বিভিন্ন জেলা। লেনিন সরণী ধরে
নেমে আসছে হুগলী চুচুড়া জগ-
ন্দল নৈহাটী অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা।
দাঁড়িয়ে গেছি। রাস্তা পার হবার
সুযোগই হয়ত আসবে আশ ঘন্টা
তিন কোয়ার্টার পরে। ভেসে চলেছে
তাজা প্রাণের ঢেউ। তীরে দাঁড়িয়ে
তাই দেখছিলাম দুচোখ ভরে। গণ-
তান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ব্যানার
কাঁধে সোচ্চার যৌবন বাংলা দেশের
ভাই বোনদের জানাচ্ছে সংগ্রামী
অভিনন্দন। জাল পতাকায় লেনিন
সরণী রাঙ্গা হয়ে আছে।

না, মিছিলে পথ রুখে দিলে
প্রান্ত ঘরমুখী অফিসফেরৎ মানু-
ষের চোখে যেমন একাধারে হতাশা
ও বিরক্তি ফুটে ওঠে, এই মিছিল
দেখে কিন্তু তেমন অস্বকার হয়ে
ওঠেনি কারও মূখ। এ যেন কোনো
বিজয় মিছিল, পথের দুই প্রান্তে
পথচারীরা স্মিত মুখে অভিনন্দিত
করছেন এই কলোজিত জনস্রোতকে।
আমিও ভুলে গেছি নিজেকে। ভুলে
গেছি কোথেকে আসছিলাম, কোথায়
যাচ্ছি। দু চোখ বিস্ফারিত। দেখ-
ছিলাম, দূরন্ত এই মিছিল। সে
যেন জানে, কোথেকে আসছে এবং
তার গন্তব্য কোথায়। এ মিছিল
জানে, দিন আগত ঐ, দেরি নেই,
শ্রিধা নেই। জানে, নতুন জীবন
জাগছে স্বকীয়বন্ধা পশ্চা নদীর
নতুন পলিমাটির বুকে, এখন জীবনে
জীবন বোল করাই কর্তব্য।

মনে পড়ে গেল, “গ্রীলস” কসে
সেদিন ভেবেছিলাম, কী যেন আমার
করা হয়নি, কী যেন আমার কুল
হয়ে গেছে, কী যেন করতে হবে।
এই মিছিলের দিকে তাকিয়ে মনে
হল, এই হাজার হাজার যুবক
যুবতী কী যেন একটা কর্তব্য শৃঙ্খলে
পেরেছে, একটা লক্ষ্যের পথে
এগিয়েছে। আমি লক্ষ্যচ্যুত কক্ষ-
চ্যুত একটা ঠান্ডা গোলক, ব্যর্থতার
নীরেট, বিস্ময়ভার ভারাক্রান্ত।
আমার গন্তব্য নেই, যন্ত্রণা আছে।
হস্তপদাদি নেই। গুবরের মাটির
গোলকের মতো অন্যের ইচ্ছায়
গড়িয়ে চলছি।

আজও শনিবার। দশই এপ্রিল।
অফিসের ঝাঁপ দরজা বন্ধ। আমি
আমার ফেরীওয়াল ব্যাগ হাতে
নীড়ে ফেরা পাখীর মতো ব্যস্ত
হয়ে উঠেছিলাম। ওদের কাজ আছে।
নীড় ছেড়ে ময়দানের দিকে হাটছে।
কখন ফিরবে, ফেরার পথে ঠিক
ঠিক লোক্যাল ট্রেন পাবে কিনা,
কিছু ঠিক নেই।

আমি সওদাগরী অফিসে সেলস-
ম্যানের কাজ পেয়েছি সম্প্রতি।
মাইনের ওপর উপরি, কমিশন আর
পার্টি পরিতোষণা বাবদ কাঁচা
পয়সা। জীবনকে, পয়সার মূল্যে
মাপবার সুযোগ এসেছে। খাটতে
পারলে অচিরে তপ্পনদার মতো

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

রিলে না র্যালি, কি যেন নাম (?)
গাড়ি চেপে পাক শ্রীটের বড় বড়
পানশালার গিয়ে মদুস্বাীর মতো
পানাহার করব। তুচ্ছ ব্যাপারে আর
মাথা ঘামাব না। চিন্তা করব কোন
সরকার, কার সরকার হচ্ছে ইন-
ডাস্ট্রিতে কামেলা হবে না। আমার
চাকরি উন্নতির পথে পা পাতবে
আর কোম্পানীর বাণিজ্য লক্ষ্য
সোনার পশ্মাসন-ছেড়ে স্টিটিনামের
সিংহাসনে গিয়ে চাপবেন।

নাঃ নিজেকে তবুও এতো
ছোট করে বস্তুতই বেশিক্ষণ চিন্তা
করতে মন সরে না। মিছিল
এগিয়ে গেছে। দক্ষিণ কলকাতায়
ট্রাম বাসে ফিরতে ইলে এখন অনেক
সময় অপেক্ষার থাকতে হবে।
সুতরাং কোথাও গিয়ে কিছু খেতে
খেতে সময় কাটানোই ভালো। এই
রাস্তায় ভাঙা অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতদার
রেস্তোরাঁ নেই। বেছে বেছে নামটা
ঠিকই দিয়েছে বটে, লেনিন করণী।
দরিদ্র বন্দুর নামাঙ্কিত এ পথের
চেহারাও শ্রীহীন। গোটা দুই ‘বার’
আর একটা সোডা ফাউন্টেন ছাড়া
‘ভন্দরলোকের’ উপবেশনের জায়গা
পর্যন্ত নেই। “কমলালয়ের” হরেক
রকম খায় ঢুকলে অবশ্য ইচ্ছাটো
থাকে। কিন্তু উজিয়ে পুবে যেতে
হয় তাহলে। সেখানে মিটিং মিছি-
লের আড়ং সুবোধ মল্লিক কোয়ার্টারে
আবার কোন পার্টির মাইক বাজছে
কে জানে। ফেরার পথে মদুস্বাীটো
বেশিই হবে শুদিকে গেলে। উত্তরে
দুপা হাটিলেও একটু দূরের
রেস্তোরাঁ কিম্বা পানশালা মিলতে
পারে। দক্ষিণে নামলে মেসের পথে
এগোনোও হবে, ইচ্ছেমত পানাহারও
চলতে পারে। দক্ষিণে পা বাড়ি-
নোই ভালো।

লেনিন সরণী, যদিও কারও
ক্ষমতা নেই ধর্মতলা শ্রীটকে
লেনিন সরণী বলে চিনে নেওয়ার।
কারণ সব-কিছু দোকানের সাইন
বোর্ডে এখনো পুরাতন ঠিকানা :
ধর্মতলা। ষাঁরা রাস্তায় নাম পাল-
টান তাঁরা তো পর্যাবপির সাইন
বোর্ড পালটাবার নির্দেশ দেন না।
তাই একই বাড়ির নিচে দুটি
দোকানের নম্বর দূরকম পড়তে
হয়। “ধর্ম মানুষের ওপর অর্ধ-
ফেনের প্রভাব বিস্তার করে”, এই
কথা যিনি বিশ্বাস করেছেন এবং
কলেছেন, সেই লেনিনের নাম
আঁকিয়ে ষাঁরা ধর্মতলাকে ভুলতে
এবং ভোলাতে নারাজ, তাঁরা সাইন-
বোর্ডে ধর্মতলাই লিখে রেখেছেন।
অতবড় লেনিন সরণীতে গোটা
তিনচারটি ছাড়া কোনো বোর্ডই
লেনিন সরণী, এই নব নামাঙ্কন
কেউ করেন নি। অথচ কপো-
রেশনের হাড়েই নাকি দোকানদারের
ট্রেড লাইসেন্সের ছাড়পত্র। রাস্তার
নাম পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে
দোকানের সাইন বোর্ড পাল্টানোর
নির্দেশ তাঁরাই তো দিতে পারেন,

কিন্তু অতদূর কেউ হয়ত চিন্তাও
করেন না। তাই গান্ধীজীর নাম
এখনো হারিসনে একচেটে হয়নি,
দুই আচার্ণের নামে এর্ল সি, আপার
সাকুলার রোডও পুরোপুরি নামা-
ঙ্কিত নয়। বউবাজার শ্রীটে সস্তা
পুরোনো রূপোপবিনার সঙ্গে
এখনো পুরাতন সাইনবোর্ডগুলি
মুখের প্রলেপ ছবজবে করে পথ-
চারীদের দিকে কানা চোখে তাকিয়ে
থাকে। মরুক সে। আমার কী!
আমার এখন পেটে পাক দিচ্ছে।
মিছিলটা পাক খাচ্ছে এসপ্ল্যান্ডের
মুখে। আশ্রি হাটা দিলাম।

শহরের পথে হাটের সুবিধে এই,
পথপ্রম সর্বদা খোলা থাকে না।
অনেক কিছু দেখবার আছে। দেখতে
দেখতেই পথ এক সময় ফুরিয়ে
আসে। ইদানীং মানে, নির্বাচনের
প্রাককাল থেকে সব চেয়ে বড় দর্শ-
নীয় জিনিস হয়েছে রাস্তার ওপর
ছোট বড় বাড়ির দেওয়াল। স্লেগান
কবিতা ছড়া প্যারোডি ছবি। বলতে
গেলে রীতিমত প্রাচীর প্রদর্শনী।
অল ক্যালকাটা ইজ এ্যান এগজিবি-
শন হল। পাকা আর্টিস্টের তুলিতে
ছবি আর লেটারিং। ফ্রেসকো
পেইন্টিং-এর যুগ গতায়। কল-
কাতায় এসেছে এখন স্লেগান ও
পিণ্ডিং-এর হুজুগ। দেওয়ালের
ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা খারিজের
মাধ্যমেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির কবর
খোঁড়া হচ্ছে কিনা কে জানে, তবে
আমি বাড়ির মালিক হলে, ব্যাপার-
টাকে স্বাগতই জানাতাম। ইতি-
পূর্বে দেওয়ালগুলো ছিল নোংরা
বিজ্ঞাপনী পোস্টার মারবার জায়গা।
এখন হরেক দলের স্লেগান প্রতি-
যোগিতার স্লেট হয়েছে এগুলো।
ভালোই তো। এর ফলে জ্ঞানোদয়ের
বোধোদয়ের সম্ভাবনা। এটা কম
বড় লাভ নয়। কিন্তু এই কথাটা
নিতাইদার কিছুতেই বুঝিয়ে
উঠতে পারি না।

নিতাইদার স্থির বিশ্বাস, কল-
কাতায় সি পি এম যে গো-হারান
হেরেছে তার মূল্যই আছে দেও-
য়ালদারি বিরাজ। অর্থাৎ দেওয়াল-
ওয়ালারাই সম্ববম্বভাবে হারিয়ে
দিয়েছে সি পি এম-কে।

নিতাইদা নির্বাচনের ফলাফল
দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন, “হু,
হু বাবা, গরীবের কথা বাসি হলে
দাম। বলেছিলাম কিনা যে, যে
রেটে ওরা দেওয়াল ঘাঁটছে তাতে
ভোট বাজে দিশেহারা হয়ে যাবে।
হল তে?” উনি বলেন, “নব
কংগ্রেস স্যায়না। নির্বাচনী প্রচা-
রের ক্ষেত্রে ওরা খুব সমঝেই দেও-
য়ালে হাত দিয়েছিল। লিখেছে
একবারে তলদেশে। ফলও মিলিয়ে
নাও।”

বাস্তবিক, সমস্ত পর্যবেক্ষকের
“ফরচুন টেলিং” টোটাটি ফেলিওর।
কারণ হয়ত এই যে, তাঁরা নিতাই-
দার মতো এই দিকটা একবারও

গণনা করেন নি।

বলেছিলাম, “নোংরা সিনেমা
পোস্টারের বদলে সুন্দর লিপি ও
ছবি অঙ্কনটা কি বেশ ভালো
নয়?”

নিতাইদা মাথা নেড়ে বলেছিলেন,
“উহু, ব্যাপার আছে। বিজ্ঞাপক-
দের শাস্তি দেওয়ার উপায় শহর-
বাসীর নেই। নিখরচায় বিজ্ঞাপন
করার জন্য কোনো ব্যবসাদারকে
দেওয়াল মালিকের নালিশে জরি-
মানা দিতে হয় না। কিন্তু ভোট-
ভিক্ষাকে বণ্ডিত করার বার্থ-বাইট
আছে প্রাপ্ত বয়স্কের, এ দিকটা
ভেবে দেখেছো?”

না তো, ওদিকটো ভেবে
দেখিনি। নিতাইদা জীবন সাম্রাজ্যে
এসেও রাজনীতি নিয়ে খুব ভাব-
ছেন। আজকাল অনেকেই ভাবে,
হিসেব করে। ঠিক ক্রিকেট ফিকে-
টের হিসেবের মতো।

কিন্তু সে বাই হোক, কলকাতার
দেওয়ালগুলো আপাদমস্তক চিত্র-
বিচিত্রিত হয়ে আছে। চোখ পীড়িত
হয় শব্দ দেওয়াল-লিখনে বাক্য-
বিন্যাসের দুটি চোখে পড়লে।

“এ ভোট ফর সি পি এম মিনস
এ বুলেট ফর ইওর ডায়ার ওয়ানস”
—দেওয়াল বিজ্ঞাপ্তি নিয়ে একদিন
তো রুদ্র আর প্রশান্তর মধ্যে হাতা-
হাতি হওয়ার উপক্রম। নির্বাচনী
লড়ায়ের স্লেগানে এহেন বক্তব্যে
অনেকেই চমকিত হয়েছিলেন।

রুদ্র বলেছিল, “এর মানে কি?
সি পি এমকে একটি ভোট দিয়েছে
কি তোমার প্রিয়জনকে এক বুলেটে
সাবড়ে দেওয়া হবে? কেন, গণ-
তন্ত্রে আমি থাকে খুশি ভোট
দেব।”

প্রশান্ত রুদ্র হয়ে উঠেছিল,
“আগে ইংরেজিটা শেখ, তবে কথা
বলিস। ওটার মানে, সি পি এমকে
ভোট দেওয়ার অর্থই হবে বুক
পেতে বুলেট গ্রহণ করা।”

“তাই নাকি?” রুদ্র মুখ বাকি-
য়েছিল, “তাহলে দেওয়ালের পাশে
তো মতো একজন অধ্যাপক দোড়া-
বীকে দাঁড় করিয়ে রাখাই উচিত
ছিল। ওরকম “রাশোইন্ড” ইংলিশ
আমরা আর কি করে বুঝব বল।”

“রাশোইন্ড মানে?” সকৌ-
তুক প্রশ্ন করেছি।

উত্তর দিয়েছে রুদ্র, “রাশিয়ান-
ইন্ডিয়ান সংকর ইংলিশ। ও জিনিস
প্রশান্ত ছাড়া কেউ বুঝবে না,
প্রশান্ত আবার অধ্যাপক।”

প্রশান্ত রাগ করলেও আমাদের
সঙ্গে হেসেই ফেলেছিল। প্রশান্ত
রুদ্রের চেয়ে ঠান্ডা।

সম্প্রতি দেওয়ালে বাংলা দেশের
সংগ্রাম সম্পর্কেও লেখা পড়ছে :
“এ জয় পূর্ব বাংলার নয়, জয়
সারা বাংলার।” উত্তেজনার আতি-
শয্যে এই বাক্য পূর্ব বাংলার
বিজ্ঞাবাহার্যই অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।
বলা যেত, “শব্দ পূর্ব বাংলার নয়,
এ জয় সারা বাংলার।” অবশ্য কথা-
টার স্বার্থার্থ্য সম্পর্কে তাহলেও
যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যায়। তবু
মন্দের ভালো।

“পশ্চিমবঙ্গকে দিল্লীর উপ-
নিবেশ করা চলবে না”—লেখা

পড়েছে বিভিন্ন দেওয়ালে।

হয়, দিল্লী যেন হঠাৎ
শেষের আওতার আনছে।
ঘটনা তো তা নয়। বলা যেত,
“পশ্চিমবঙ্গকে দিল্লীর উপনিবেশ
করে রাখা চলবে না।” তাহলে
প্রজেন্ট কর্তীনউয়াস টেসস আর
ফিউচার টেসসের বিরোধটা অর্থ-
বিম্রাট ঘটতো না। “চীনের চেয়ার-
ম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান” কথা
খুবই মজরে পড়েছে। নির্বাচনের
আগে বেশিরভাগ দেওয়ালে ঐ
কথাই লেখা থাকত। এ বাক্যের
রাজনৈতিক গুঢ়ার্থ এবং বাস্তবতা
আমার মতো অনেকেই বুঝতে
পারেন নি।

শব্দ একটা জিনিস বেশ
বুঝি। মানুষের মুখের ভাষা
মুক হয়ে গেছে ভয়ে ভাবনায়।
শহরের দেওয়ালে কথা বলছে বোবা
মানুষ। এ এক নতুন জিনিস।
এমন বোবা শহর বিদেশী প্রভুত্বের
আমলেও ছিল না। মৃত কলকাতা
মুক আর তাই বধির। এখন শব্দ
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার
সময়।

আমি দেওয়াল পড়তে পড়তেই
এগিয়ে যাচ্ছি। একা থাকলে আমাকে
নানা ভাবনার পেয়ে যসে। রাস্তায়
যেতে যেতে পরাজিত বৃক্ষের মতো
কখনো সখনো বোধহয় ঠোঁট নেড়ে
মনে মনে কথাও বলে ফেজি-নিজের
অজ্ঞাতে। অজ্ঞেও তেমন দুঃখিনী
ঘটেছিল কিনা জানি না, তবে ঠিক
সামনেই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে কে যেন
বললে, “আপন মনে কাকে শাসা-
জিস বীরেন?” তাকিয়ে দেখি,
আমার সামনে পুরুষপদ। একে-
বারে পুরোনো আসবাব পাশল-
করা নতুন চেহারা। মাস কয়েক
আগে এই পুরুষপদই কমস্বল
কারখানার ক্রোজার চলছিল। আমি
জোর করে ওর পকেটে একটা দশ
টাকার নোট গুজে দিয়েছিলাম।
চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ও আমাকে
তার দশগুণ ফিরিয়ে দিতে পারে
আজ।

“খুব খুশি হলাম পুরুষপদ।
নিশ্চয় তোদের ক্রোজার উইলফ্রন
হয়েছে?” মুখে খুশির ভাব
ফোটেতে হয়।

পুরুষপদ আমাকে টেনে নিয়ে
চলল, বললে, “বেতাম তোর ওখা-
নেই। চল কোথাও বসে দুটো কথা
বলি।”

চীন নীরব কেন?

(দ্বিতীয় পর্বের পর)

জঙ্গীবাহিনী ইতিমধ্যেই করেকলক
নিরীহ বাঙ্গালীকে ঠান্ডামস্তকে
কুহুর বিভ্রালের মত হত্যা করেছে, মা
বোনেদের পাইকারী হারে বেইজিং
করেছে। আশ্চর্য। কমরেড মাও সে
তুং এই লিঙ্কাই কি তুমি আমাদের
দিরেছিলে? অথবা এইটাই কি
তোমার আসল রূপ? বিশ্ববিশ্ববের
কেন্দ্রস্থল চীন আজ সাড়ে সাত
কোটি বাঙ্গালীর আত্মনাদ শুনতে
পার না, এ যে কিছুতেই বিশ্বাস
করতে ইচ্ছে করছে না। চেয়ারম্যান,
তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেছ?

জটিল হতভাগ্য বিশ্ববী

গানের নামে গলার কসরৎ

সামাজিক

যে কোন জলসায় যেমন তেমনি এখানেও—যে কথাটা প্রথমেই মনে আসা উচিত তা আসে সবার শেষে। গান বাজনা শুনতে এসে সত্যি সত্যি শ্রোতা কী শুনতে চান? আরো নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে ক্লাসিক্যাল সংগীতের শ্রোতা হিসেবে আমাদের অস্থিষ্ট কী হওয়া উচিত? শুধু কি স্বর, তাল, পকড় বাদ্যসংবাদী? না কি বস্তুগত ভাব বা গানের বা চীৎস-এর মাধ্যমে প্রকটিত হয়, তারও কিছু ভূমিকা আছে সংগীতের রসসংবাদে? পশ্চিমাদের কিতাবে যদিও তার অস্তিত্ব স্বীকৃত, বাস্তবে কিন্তু তার কার্যকরিতা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে না। যেমন ধরুন, দরবারী কানাড়া করুণ রসের রাগ বলে স্বীকৃত হলেও যে-সব গান অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে তার রূপায়ন হয় বিজ্ঞান ধরনের তাদের মধ্যে কিন্তু শৃঙ্গার রসেরই আধিপত্য। ছোট খালের যে কোন একটি আত্মপ্রকাশ নিলেই তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া বাবে।

আবার, বিলম্বিত খালেও এর ব্যতিক্রম বিশেষ লক্ষণীয় নয়। যেমন ধরুন সেদিনের গাওয়া আমীর খাঁ সাহেবের “এরী বীর রী” বোলটির লক্ষ্য রাম এবং কৃষ্ণের যে-কেউ হতে পারে। প্রসিদ্ধ গান “বীর বামনবা” বোলের সামান্য হেরফের বলেও একে মনে হতে পারে—জানি না বোলটা খাঁ সাহেবের স্বরচিত কিনা। বাই হোক, এই ভাবে তো করুণ রসের দ্যোতক নয়। বরং বীর রসের দ্যোতক হিসেবে এর যোগ্যতার আধার হত মালকোশ, শংকরা বা নট।

ফরোয়ার্ড ব্লক

(২য় পৃষ্ঠার পর)

হবে। চিন্তা বস্তুকে রাজ্যসভায় পাঠানোর জন্য বা কাউকে মেরুর পদে সমাসীন করার জন্য আদর্শ বিচ্যুত দলকে কংগ্রেসের বা অন্য কোন দলের বি টিম রূপে চিহ্নিত কর্তিক হবে না।

দুঃস্থবৃত্তের কপকপকনের বিড়লাদের সঙ্গোপ খুব খাতির। তাদের বিপুল অঙ্কের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে বলে গুজব রটেছে। জনৈক নেতা বিড়লাদের বিদ্যালয়ে মোটা মাহিনার চাকুরী করেন। অজিত বিশ্বাসকে জোড়াবাগানের আসনটি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের সাহায্যে বিজয়ী করার চেষ্টাও আছে। তাতে দলীয় কৌশল কমানর চেষ্টা হবে, শ্রীবিবাসের সুরও তাতে নরম হবে। তবে তরুণ কমরীরা তাতে খুসী হবে না। শ্রীঅমর চক্রবর্তী, শ্রীশান্ত গাঙ্গুলী প্রভৃতি নেতারা জেলা সফর শুরু করেছেন। এরা কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রকম আশবরফার বিরোধী।

গানের সম্বন্ধে কিন্তু এহ বাহ্য। ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদ গানে গানের দেখা পেতে হলে আজকাল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। আলোচ্যমান অনুষ্ঠানে উদ্ভূত কাব্যার্থের অতিরিক্ত কিছু আমার বোধগম্য হয়নি, অন্যরাও বলতে পারেননি। ধ্রুপদ গানের বোলায় কিন্তু এরকম হয় না। নির্ভেজাল ধ্রুপদ গানে প্রতি তুকে চার পর্যন্ত করে কথা থাকে। খালের বোলায়ও প্রতি তুকের জন্য তালের চার ফেরতা অর্থাৎ আট পর্যন্ত কথা থাকার বিধান আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি মোগল রাজশক্তি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংগীত-শিল্পে কলাবিদের আসন বেসমল করে নিরেয়েছিল তথাকথিত অর্ধ-শিক্ষিত ওস্তাদ, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মাঝারি শ্রেণীর লোক। অর্থাৎ এরা আর্টিস্ট নয়—ক্যাফে-স-মান মাত্র। সেই জন্যই বোধ হয় সদারলোভের খাল গানে এক আবর্তের বেশী বাণী পাওয়া যায় না। অধুনাতন কারও কারও গানে (যেমন আলোচ্যমান গায়ক) বাণীর পরিধি মোহড়া পর্যন্ত। কিন্তু তাতে নাকি খাল গান আটকান না। তাহলে, তেলেনার মত বোল দিয়ে গানের মধু বানাতেই হয়—‘খাল গান’ বলার আর প্রয়োজন থাকে না যেমন সেতার বা শরদে গান বাজনার দাবি কেউ তোলে না। কিন্তু তাতে যদি গৎ না থাকে তাহলে আমার মত অবদর শ্রোতা হয়তো সপশ্চন্দ্র হতে পারে।

শব্দকেন্দ্র

গলার আওরাজ, তানের কায়দা, লরকারি ইত্যাদি আধুনিক সমালোচকদের একমাত্র উপজীব্য হয়েছে বিদেশী সমালোচনার অনুকরণে। যেমন কণ্ঠস্বরের পরিধি। এটাই যদি শিল্পীর গুণাবলীর অন্যতম হত তাহলে আশ্চর্য ক্রমকে ব্যতিত করে লতা মল্লেশকর বা মহম্মদ রফিকে দেখবার মত মার্কী দিতে হত। আবার স্পষ্টতার চেয়ে তথাকথিত কণ্ঠলালিত্য যদি শিল্পিত্বের নিরিখ হত তাহলে কৈসর বাঈ-এর উপরে বসাতে হত আরতি মুখার্জীকে।

পার্কসাকাস জলসা

আমীর খাঁ সাহেবের কণ্ঠ-পরিধির সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমি বাব না কেননা, এ দোষ অনেকের মধ্যেই বর্তায়। কিন্তু তার রাগ-রূপায়ণ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আলোচনা চলতে পারে। অনেকে তার সম্বন্ধে একধেরেমির অভিযোগ করেন। বস্তুত বিলম্বিত এবং দ্রুত গানে রসের এবং মেজাজের যে পার্থক্য তা তিনি ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। দ্রুত অংশে উদ্দীপনা বা হর্ষের যে-ভাব থাকা উচিত তা তিনি আনতে পারেন

না। আবার বিলম্বিত অংশে পশ্চিমভোগ্য বিমূর্ততা (abstraction) পদ্যোপদ্যির আশ্বাদনে অপারগ যে-সব অভাজন তাদের সুবিধার্থে দ্রুত খাল গানে আগেকার দিনে যে সব ভোগ্যবস্তু থাকত খাঁ সাহেবের গান থেকে তারা কাটা পড়েছে। ফলত, তার দৃষ্টি গান-বিলম্বিতেরই পুনরুজ্জী মাত্র—সেই স্বর, সার্গম এবং তানের পৌনঃপুনিকতা। তান আর সার্গম কখন কোনটা শেষ হয়ে অন্যটা আরম্ভ হবে তারও কোন ঠিকঠিকানা নেই। এর চেয়ে তো তারানা গায়নই ভাল।

তেলেনা, কিন্তু তারানা নয়

খাঁ সাহেব তেলেনা গাইলেন যোগ রাগে। এ কিন্তু সত্যিকারের তারানা নয়। কারণ অর্ধহীন শব্দ, বাঁণ এবং পাখোয়াজের যে-বোল শানদানী তারানায় আছে তা খাঁ সাহেবের তেলেনায় নেই। কিন্তু একটা জিনিস তিনি নতুন আমদানি করেছেন—আমীর খুস্রোর স্মৃতিবাচক একটি বস্তু। কেননা খাঁ সাহেবের খিওরি হল, আমীর খুস্রো পারস্য থেকে তারানা আমদানী করেছিলেন, তার আগে নাকি এ পোড়া দেশে তারানা ছিল না। এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে আমি কেবল ভারতীয় নৃত্য বিভাগের গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যারা এদেশের আদিম সংগীতে দশ হাজার বছরের পুরনো তারানা-জাতীয় গানের সম্বন্ধ পেয়েছেন বলে দাবি করেন।

দেখা মেলে না

সবার দেখা পেলাম—স্বর, শ্রুতি, মীড়, আল, কপ, বিস্তার, সার্গম, তান, তেহাই। কিন্তু দৃষ্ণের বিষয় যে মানবিক ভাব ও বাজনা নিয়ে সমস্ত শিল্পের কারবার তার দেখা খাঁ সাহেবের গানে পেলাম না। পাওয়া বোধ হয় সম্ভবও নয়। কেন না, যে সব মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা নিয়ে আমাদের ধ্রুপদী গানের কারবার তা আজকের দিনের মনের তারে ঘা দিতে পারে বলে মনে হয় না। লোকেরা যে বরং শব্দ পপ গানে আকৃষ্ট তার রহস্য বোধ হয় এইখানে। কেবল ‘ভোর ভরী’ কথা দুটি দিয়ে যে গান সম্পূর্ণ তার ভাব পরিমন্ডলের সীমা কতখানি যে, তা শুনলে আজকের মানুষ উদ্দীপিত, উজ্জিসিত বা মূগ্ধ হবে? প্রগাঢ় কোন মানবিক অনুভবকে ব্যক্ত করা যখন সম্ভব হয় না তখন মানব কৃষ্টিম অভিনব দিলে লোককে ভোলাতে চায়। খাঁ সাহেবের স্বকীয় রাগ কলাত্মী এমন একটি জিনিস বা বস্তুত বিস্তী হলেও নাম হয়েছে কলাত্মী। কলাবতীর সঙ্গে রাগত্মী মিলিয়ে যে-রাগ তার মধ্যে শ্রী আছে কি যে, তার নাম হবে কলাত্মী? সংস্কৃত ভাষা যদি

খাঁ সাহেব এক আধটু জানতেন তাহলে বুঝতেন যে, এ রকম রাগ পারশ্যে হতে পারে যেখানে কোন খ্যাতাঙ্গ গান নেই, ভারতে হয় না। খাঁ সাহেবের গানে আমরা সবই পেলাম—তানের কেরামতি, শ্রুতি আর তেহাইয়ের কেরদানি; কিন্তু ভাব এবং রস, যা সকল শিল্পের আদি ও অন্ত, তার দেখা মিলল না দৃষ্ণটার গানে।

কার সম্পর্কে গান?

একই কথা বলা চলে সুন্দলা পট্টনায়কের গান সম্বন্ধে। ‘রাম গয়ে বনবাস’ বলে তারস্বরে তিনি যতই আতনাদ করুন না কেন এবং তার ফলে আমার মতো ক্ষীণজীবী শ্রোতার কর্ণপটই যতই বিদীর্ণ হোক না কেন, ত্রেতাযুগের কোন রামচন্দ্র বোকার মত প্রাসাদ-যড়-যন্ত্রের শিকার হয়ে রনে গিরে-ছিল্লেন বলে তার দৃষ্ণে কাউকে অভিভূত তো দেখলামই না, বরং শ্রীমতী পট্টনায়কের সুতীক্ষ্ণ বিলাপে তারা শ্বানত্যাগের প্রয়োজনীয়তা বিচার করছিল। ইনি (এবং অংশতঃ মনোবদর আলীও) জানেন না যে, গলার পরিধি চড়া হলেই তার অপব্যবহার করতে হয় না কারণ আজকাল মাইকের দৌলতে না চেঁচিয়েই গান শোনান যায়। কণ্ঠস্বরকে দৃষ্ণাসনের মত

জাহির না করে তাকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করাই হচ্ছে সংগীতের মর্ম। শ্রীমতীর গান শেষ হওয়ার অনেক আগেই হাততালি দিয়ে তার অকালসমাপ্তি ঘটিয়ে শ্রোতারা আপাতঃ অভ্রতা দেখালেও পরিণামে তার উপকারই করেছিল। তুলনায় তার ভ্রম দৃষ্ণ শ্রোতারা উপভোগ করেছে। এই সময়ে গায়িকা এবং শ্রোতাদের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক (র্যাপোর্ট) স্থাপিত হয়েছিল। মনে হয় মধ্যযুগীয় শৃঙ্গাররসের চেয়ে মানবিক আধ্যাত্মচেতনা কিছুটা সত্য। যদিও আজ আর কেউই মনে করবে না যে, যেহেতু ‘জগন্নাথ স্বামী’ গায়িকার ‘নয়নপথগামী’ সেই হেতু আপাততঃ আমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমাদের এই জীবন যে ‘এক মধুর জাল’ শ্রীমতী পট্টনায়কের এ ধারণার সংগে খুব কম শ্রোতাই হয়ত একমত হবেন। আমার খাঁ, মনোবদর আলী এবং সুন্দলা পট্টনায়ক তাদের গানে যে-জতংকে উদ্দীপিত করেন তা আমাদের জীবনে কোন সত্যতা বহন করে না—তা মেকী, শ্রীমতী পট্টনায়কের মারাজালের মতই মিথ্যা।

চেতনা : নতুন বোতলে পুরনো মদ

সুগন্ধশেখর রায়

“চেতনা” ছবির গল্প পতিতার আত্মত্যাগের সেই পুরনো উপাখ্যান, নতুন রং চং-এর মোড়কে মোড়া পুরো আদিকালের ব্যাপার। নায়িকা সীমা ভারতের মোহিনী, দাম্পত্য বৈশ্য। অনবরত দেহবিবর্তীর লীলাখেলায় স্বভাবতই মেরেটির চিরন্তন পুরুষ বিবেচ্য। নায়ক অনিল, নিষ্পাপ অবোধ শিশুর মতো, নারী শরীরের অলিগলির রহস্য তার অজানা এখনো। প্রথম দর্শনেই সীমার প্রেমে সে হাবুডুদ। সীমা কিন্তু একেবারেই আমল দেয় না তাকে। অবশেষে এক চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্তে তাদের প্রেমের সার্থক পরিণতি। অনিল বিয়ের প্রস্তাব দেয় সীমাকে। সীমা ভীষণ বিস্মিত, কিছুটা পুরুষীকৃত। কিন্তু বিয়ের পরেও শরীরী মিলনে সীমার অনীহা। চিন্তাশূন্য ব্রত নিয়েছে সে। অনিলও আদর্শ স্বামীর মত স্থায়ী সব আবদারে জোগান দিলে যায়। বিধাতার কটাক্ষে অবশ্য সবই ভস্মল হয়ে যায়। হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় সীমা অন্তঃসত্তা, নিষ্ঠুর অতীত চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেয়। অতএব নায়িকার আত্মহত্যা এবং করুণ সঙ্গীতে নায়কের আত্মপ্রকাশ। সস্তা সেস্টিমেটের বন্যায় সমস্ত যুক্তি ও বিচার বৃষ্ণি ভেসে গেছে। বাজার চলতি আর পাঁচটা ছবির মতই “চেতনা”তে অবাস্তব, অতি নাটকীয় ঘটনার ছড়াছড়ি। সত্যিকথা যে এখানে

নামী তারকার সমাবেশ নেই, ভিলেনের ছলচাতুরি নেই এবং নাচগানের ভীড় নেই। কিন্তু চিত্রনাট্য ও চরিত্রায়ণে দৃবল গাছনি, সংখ্যার কম হলেও গানের অপপ্রয়োগ এবং কুশিলত ভাড়াটিয়ে এ ছবিও কিছু কম যায় না। গুণগুণো সবই নঞর্থক। তার ফলে এ ছবিকে কিছুতেই দেশি ছবির জগতে একটা ব্যতিক্রম বলে গণ্য করা যায় না। “চেতনা” বোম্বাইয়ের কিছু দোষ এড়াতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু তার বদলে বাংলা ছবির ভাবালু আবেগ-সর্বস্বতার শিকার হয়ে পড়েছে। শেষ বিচারে সেটাই বড় দোষ।

এ জীবন দ্রোপদীর শাড়ীর মতন বত তার ভাঁজ খোলে রঙ তার বহুতর—তারে জানা চাই, দেখা চাই, পাওয়া চাই।

চতুরঙ্গ প্রযোজনা

চাঁদ বনিকের পাল্লা

নির্দেশনা / বরুণ দাশগুপ্ত
রঙমহল
২রা মে ববিবার সকাল ১০টা
২৬ এপ্রিল থেকে অগ্রিম বুকিং
বিকাল ৪—৭টা

নকল মুজিববরের নকল দরদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ওপার বাংলায় যুদ্ধ। পাক-মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষের বাহিনীর নৃশংসতা আজ চরমে। এপারেও তার চেউ এসে পড়েছে। দলে দলে উম্মাস্ত আসছে দিনের পর দিন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-গুলোতে গ্রাণ ভাঙারও খোলা হয়েছে। দেশাধীশ রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রী অজয় মুখার্জিও সরব। যদিও সি আর পি, ও মিলিটারী শাসন রাজ্যময় মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, তথাপি ইদানীং

মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষের জন্য মাঠে ময়দান ও বাজারী পটিকায় দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে চলেছেন।

কিন্তু একটা কথা ফাঁস হয়ে গেছে। অভিযোগ, খুলনা, বশোর, রাজশাহী থেকে আগত আওয়ামী লীগ দলের একদল দায়িত্বশীল কর্মী আটাই এপ্রিস মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় দেখা করতে

চান। মুখ্যমন্ত্রী কোনরকম সাহায্য দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেন না। এবং পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে অপরের মারফৎ উপ-দেষ্টা দেন। সাহায্যের ব্যাপারে অজয়বাবুর নিজের ভূমিকা হলো এই। অন্যদিকে বাংলার সাহায্যে রাস্তায় চাঁদা তোলাও সরকারের পক্ষ থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ফতোয়া জারী করা হয়েছে। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে গঠিত “বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটির” দুজন কর্মীকেও ইতিমধ্যে উত্তর কলকাতায় অপমান ও হুম-রাপি করা হয়।

ত্রিগুণা সেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে। দিল্লী কলকাতা দুই স্থান থেকে শ্রীমদ্রামার্শ করেই ডঃ সেনকে এই তালিম দেওয়া হচ্ছে। ডঃ সেন দমদম বা জোড়াবাগান এই দুইয়ের যে কোন একটি কেন্দ্রে দাঁড়াবেন। যদিও কংগ্রেসের প্রচণ্ড জোড় হল শ্যামপদকুর কেন্দ্রটির জন্য কারণ জোড়াবাগান আসন খুব নিরাপদ নয় আর দমদম বিদ্রোহ বসুকে আগেই দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস থেকে ফরোয়ার্ড ব্লক দলের কাছে শ্যামপদকুর কেন্দ্রটি তাদের দিয়ে দেবার জন্য আবেদন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে পরিবর্তে তাদের একটা ভাল আসন দেওয়া হবে। ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে উঠে কংগ্রেসকে বলা হয়েছে শ্যামপদকুর আসন তাদের ছাড়বার প্রশ্নই ওঠে না, বরং তাদের জোড়াবাগান আসনটি ছেড়ে দেওয়া হোক। শ্রীঅজিত বিশ্বাস যিনি অতীতে জোড়াবাগান কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছেন তাঁকেই ওখানে প্রার্থী করা হবে।

ফরোয়ার্ড ব্লকের বক্তব্য হল তারা তো সরকার সমর্থন করছেই। কাজেই ফরোয়ার্ড ব্লক যদি আরো বেশী দূটো আসন পায় তাহলে কংগ্রেসের লাভই হবে আর কংগ্রেস যদি তাদের প্রার্থীকে সমর্থন করে তবে জোড়াবাগান আসনে ফরোয়ার্ড ব্লকের জয়লাভ অসুবিধাজনক হবে না।

প্রকৃতপক্ষে ফরোয়ার্ড ব্লকের কাছে শ্যামপদকুর আসন চাইতে এসে কংগ্রেস বিপাকে পড়েছে। কারণ ফরোয়ার্ড ব্লককে চটানো এখন কোনক্রমে সম্ভব নয়, বিধান সভার অধিবেশন সামনে, এমনি তলে তলে কি হচ্ছে কেউ জানে না। মুসলিম লীগের জনাব নসরুজ্জা প্রকাশ্যে দলত্যাগ করেছেন। কিন্তু দলত্যাগ না করেও বিধান সভার অধিবেশনে কে কি করবেন বোঝা যাচ্ছে না। মুসলিম লীগের আর একজন হিন্দু সদস্যও নাকি ইতিমধ্যে অন্যত্র বাতায়িত করছেন। সি পি আই দলেরও কিছু সদস্য নাকি এখনও প্রাণ খুলে সরকারকে সমর্থন করতে স্বীকৃত হন নি। তারা দলের সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত মাথা পেতে মেনে চলছেন বটে, তবে হাউসে কতদিন হাজির থাকবেন সেটা বোঝা যাচ্ছে না। অথচ হাউসের যা অবস্থা তাতে যে কোন দিন সরকার পক্ষের দশজন সদস্য অনুপস্থিত থাকলেই স্ন্যাপ ভোটে সরকারের পতন হতে পারে এবং দশ বিশ জন সদস্য অনুপস্থিত থাকে কোন দিনই অসম্ভব নয়।

স্পীকার নির্বাচন নিয়েই শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাবে। সংযুক্ত বাম-পন্থী ফ্রন্ট স্পীকার হিসাবে বা ডেপুটি স্পীকার হিসাবে ফ্রন্টের বাইরের কাউকে পাওয়া যায় কি না

তল্লাস করছে। সেই রকম কাউকে পাওয়া না গেলে শ্রীসুধাংশু কুমারকে স্পীকার দাঁড় করানো হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনা যাচ্ছে তবে এস ইউ সি নাকি রাজী নয়। আর এস পি দলের একজন সদস্যকেও ডেপুটি স্পীকার পদে পাওয়া যায় কি না দেখা হচ্ছে। সরকারী তরফে যদিও শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদারকে স্পীকার হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু শ্রীমজুমদার নিজে মোটেই রাজী নয়। দলের পক্ষ থেকেও কিছু আপত্তি আছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের এক অংশের দৃঢ় অভিমত হল আমরা যতটা সমর্থন করছি, তার বেশী এই সরকারের সঙ্গে নিজেদের ইনভলভ করতে চাই না। কারণ এই সরকারকে সমর্থন করে আদৌ কোন ফায়দা হচ্ছে না। গত কয়েক দিনেই বোঝা গেছে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই হোক অথবা অন্য কোন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণেই হোক সরকার অক্ষম। কাজেই যে সরকার কোনরকম মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারবে না সেই সরকারকে সমর্থন করে কি হবে? তার চেয়ে যা আছে ততটুকু থাকাই ভাল।

এইসব দেখে শুনে বুঝে বিধান সভার অধিবেশন মে মাস থেকে পিছিয়ে জুন মাসে নেওয়া হয়েছে এবং সেটাও হবে হয়ত উপনির্বাচনগুলি হয়ে যাবার পর। যে উপনির্বাচনে সরকার পক্ষ আশা করছেন তারা চারটির মধ্যে কম করে তিনটি আসন পাবেনই। অবশ্য সি পি এম মহলের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের ধারণা উপনির্বাচনের চারটে আসনই তাদের দখলে আসবে। সি পি এম-এর হিসাবে চারটি আসনের মধ্যে কোন আসনই অন্য দলের পাবার সম্ভাবনা নেই।

যা হোক ডঃ ত্রিগুণা সেন বর্তমানে পশ্চিম বাংলার রয়েছেন। পূর্ব বাংলার গ্রাণ কাজে আশ্ব-নিয়োগ করেছেন। এই গ্রাণ কাজের জের টেনেই তিনি নির্বাচনপ্রার্থী হবেন। কিন্তু সেইখানেও কিছু বাধা আছে। উত্তর কলকাতার জেলা কংগ্রেস তথা শত ঘোষ প্রমুখ ডঃ সেন সম্পর্কে যতটা উৎসাহী মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস তথা শ্রীবিজয় সিং নাহার ততটা উৎসাহী নয়। বিজয়বাবু প্রমুখের ইচ্ছা উত্তর কলকাতার দুটো আসনের একটিতে উপনির্বাচনে শ্রীগোবিন্দ দেকে আনতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু গোবিন্দ দে নিজে আবার রাজনীতিতে একেবারে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি দিনান্তে কালীঘাটে মায়ের চরণে পূজা দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কর্মতৎপরতায় নিজেকে যুক্ত রাখতে চান না।

সি পি এমকে আরো শায়েস্তা করার জন্য পুলিশে রদবদল হচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি পি এমকে শায়েস্তা করার জন্য পুলিশ যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গে অজয় বিজয় মন্ত্রিসভা সন্তুষ্ট নয়। এই ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য পুলিশের উচ্চ মহলে রদবদলের সম্ভাবনা আছে।

পুলিশের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে

সি পি এমের অন্তর্প্রবেশে বহু অভিযোগ মন্ত্রিসভার কাছে এসেছে। এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভা যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ করছে।

রদবদলের কথা পুলিশ মহলে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে, কিছুটা অসন্তোষও। এতদিন ধরে যারা সি পি এম নিধনে সমস্ত আদেশ ও নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে

পালন করে এসেছে তারাও এই রদবদল থেকে হতবাক হয়ে পাবে না।

মন্ত্রিসভার অভিযোগ যে, পুলিশ অফিসারদের একাংশ বড় বেশী আইন ও অনুষ্ঠানের কথা তুলে সি পি এম বিরোধী অভি-যানে বাধা সৃষ্টি করে। মন্ত্রিসভা এ অবস্থা চলতে দেবে না।

মোহভঙ্গ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই পরিপ্রেক্ষিতে সি পি আই-য়ের পক্ষে হিন্দুরা বিরোধিতা কোন কর্মনীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

জাতীয় পরিষদের সভার পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ আলোচনার বিষয়বস্তু হবে।

পার্টির রাজ্য পরিষদের আলো-চনায় বেশির ভাগ সদস্যই সি পি এম বিরোধিতা এবং কংগ্রেস সম-র্থনের রাজনীতির তীব্র সমালো-

চনা করেন। তাঁদের মতে এই রাজ-নীতিতে সি পি আই-য়ের পশ্চিম-বঙ্গ শাখার প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এবং বামপন্থী দল হিসাবে কোন ইমেজ রাখা দলের পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই আপাততঃ সিদ্ধান্ত হয়েছে সি পি এম বিরো-ধিতার তীব্রতা কমাতে হবে এবং কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারকে ঢালাও সমর্থনের পরিবর্তে কার্-কমাত্তিক সমর্থন জানান হবে।

রাজ্য পরিষদের সভায় অনেক সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন যে, পার্টি কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল

অংশকে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের আওতাভুক্ত করে ব্যাপক প্রগতি-শীল আন্দোলনে অংশীদার করতে পারেনি, বরং কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া-শীল নেতৃত্ব এখন উঠেপড়ে লেগেছে সি পি আই-য়ের নিজস্ব ট্রেড ইউ-নিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের এলা-কাকে বিধ্বস্ত করার কাজে। বহু কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সি পি আই ট্রেড ইউনিয়নের আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসীরা তলে তলে নিজে-দের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ছে। প্রম-মন্ত্রী কংগ্রেসী হওয়ার ফলে এইসব কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন অচিরেই সরকারী স্বীকৃতি পাবে এবং তার-পর মালিকের সহায়তায় সি পি আই ইউনিয়নগুলি ভেঙ্গে দেবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও জোত-দার-কংগ্রেসী জোট পার্টির আন্দো-লনের ক্ষতি করবে।

পিকিং রেডিও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব পাকিস্তানের দুটি ভারতীয় সৈন্য গ্রেপ্তারে তা প্রমাণিত হয়েছে।”

পিকিং রেডিওর মতে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের এই সম্প্রসারণ উদ্যোগের পেছনে মার্কিন ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনা ও সক্রিয় সহায়তা আছে।

অজয় মন্ত্রিসভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করে কংগ্রেস দলের ভবিষ্যত বিপন্ন হয়েছে (দুই) প্রদেশ কংগ্রেস সভা-পতি শ্রীবিজয় সিং নাহার অবা-লালী সূতরাং তিনি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন না, বলে যে সব দায়িত্বশীল কংগ্রেস নেতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেসকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবল-ম্বন করতে হবে (তিন) সাম্প্র-দায়িক মুসলিম লীগ দলকে বাদ দিয়েই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা চলতে পারে কারণ, এস ইউ সি ও আর এস পি-কে কোয়ালিশন সরকারের বিরুদ্ধে ভোট না দিতে রাজী করানো সম্ভব (চার) অবিলম্বে মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগের সদস্য-দের বাদ দিয়ে বাংলা কংগ্রেসের একজন এবং নব-কংগ্রেসের দুজন

নতুন মন্ত্রী নিতে হবে। নব-কংগ্রেস এম এল এদের মধ্যে উচ্চাশাসন্য কয়েকজন এ শর্তগুলি মেনে না নিলে বিদ্রোহ করার পর্যন্ত ভয় দেখিয়েছেন।

ঐ বৈঠকে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের দুজন, জনৈক সি পি আই নেতার সঙ্গে বৈঠকে আসার আগে তারা যে আলোচনা করেছেন তার সার মর্ম বৈঠককে জানান। উক্ত সি পি আই নেতা এস ইউ সি এবং আর এস পি যাতে অনাস্থা প্রস্তাবের ভোট-ভুটিতে নিরপেক্ষ থাকেন তার প্রায় নিশ্চিত আশ্বাস নাকি তাঁদের দিয়েছেন। ফলে মুসলিম লীগের সাতজন এম এল এ-কে বাদ দিলেও কোয়ালিশনের পক্ষে একশ পয়-ত্রিশ জন সদস্য ভোট দেবেন, আর সি এম এর জোড়ের পক্ষে একশ তেইশ জনের বেশী ভোট পড়বে না। মন্ত্রিসভার সংখ্যাধিক্য বজায় থাকবে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কতর্ক মজার ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলকাতা-১০ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলকাতা-১০ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

নব কংগ্রেসে উপদলীয় কোঁদলের জন্ম রঞ্জিত গুপ্তকে বিদায় নিতে হল

রাইটার্স বিন্ডিংয়ের ঘটনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

রাইটার্স বিন্ডিংয়ে জঙ্গী কংগ্রেসী ছাত্র-যুবকদের যে মিছিল সংগঠিত হয়েছিল তা তেঁসরা মে বিধানসভার সামনে সভার উদ্বেগন উপলক্ষে মিছিলের মহড়া বলে জানা গেছে।

সমস্ত ঘটনাই পরিকল্পনা

অনুযায়ী সংগঠিত হয়েছে বলে কংগ্রেসের একাংশ খুশি। সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় মিছিলের পূর্ণ বিবরণী, মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং কংগ্রেসী (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস দলের অস্তিত্বের পরিণতিতে কলকাতার পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তকে সরতে হলো। (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

১৪শ-বর্ষ ১৪শ সংখ্যা ১১ শ্রবণ ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

পূর্ব বাংলার
কমিউনিষ্ট পার্টি
গেরিলা যুদ্ধ
চালাচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

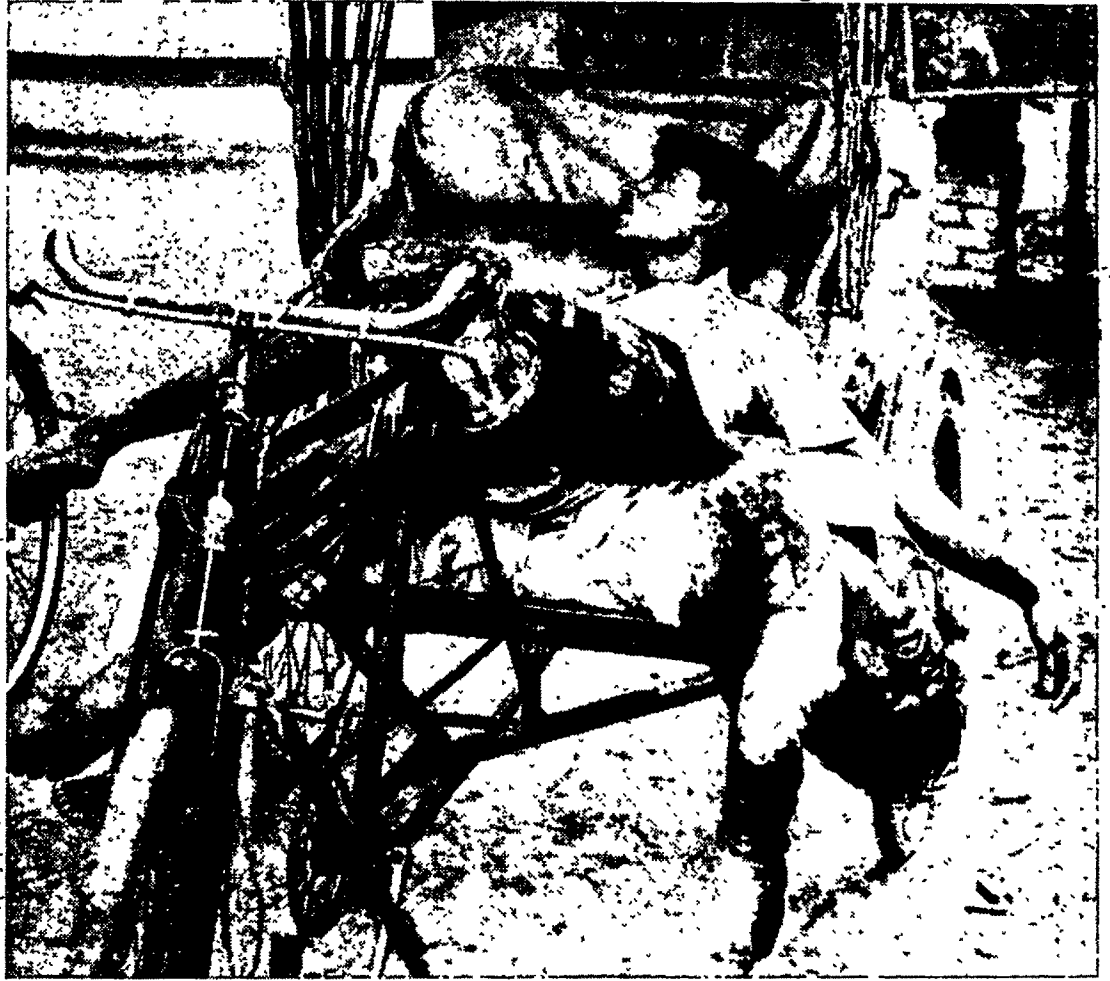
বাংলা দেশের মর্যাদা সংগ্রাম সংগঠিত আকার নিচ্ছে। মর্যাদা-কামীরা আবেগের পরিবর্তে সংগঠিত প্রমিক ও কৃষকের নেতৃত্ব এগিয়ে এসেছে এই সংগ্রামকে সঠিক রাজনীতির ভিত্তিতে গেরিলা যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখানে রণা প্রয়োজন যে, সংগঠিত প্রমিক শ্রেণী চট্টগ্রাম (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

চাকরা নিয়ে
কংগ্রেসের
দলীয় রাজনীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস দল বেকার সমস্যা সমাধানের নামে দলীয় রাজনীতির খেলার নেমে-ছেন। গত সপ্তাহে রাজ্যের উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রথীন তালুকদার এক গোপন সাক্ষাৎকারে উন্নয়ন দপ্তর, সি এম ডি এ এবং কলকাতা মেট্রোপলিটন স্যানিটেশন অথরি-টিকে সমস্ত প্রকার নতুন নিয়োগ বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইন্দিরা কংগ্রেস যখন বেকার সমস্যা সমাধান করবে বলে তার-স্বরে চেঁচাচ্ছে তখন নতুন কর্ম-সংস্থান বন্ধ করার এই সাক্ষাৎকারে (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



পাক সৈন্যের গুলিতে নিহত রিক্সাচালক ও আরোহী

আসল মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু নয়, বিজয়বাবু
সুশীল ধাড়া এই অবস্থার সুযোগ নিতে চাইছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্রীঅজয় মুখার্জির জন্মদিনে সুশীল ধাড়া শুভেচ্ছা জানাতে যান নি বলে আপনারা হয়ত ভাবছেন যে অজয়বাবুর সঙ্গে সুশীলবাবুর সরকার গঠনের ব্যাপারে মতান্তর মনান্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

করোয়ার্ড রকে ভাঙন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

করোয়ার্ড রকের শ্যামসুন্দর গুপ্ত মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর এই দলে ভাঙন শুরু হয়েছে। মহম্মদ ইয়াকুব নামে এই দলের একজন কার্ডিনালের দল থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে। আর একজন সদস্য কলিমুদ্দীন সামস এক জোরালো ইন্দিরা বিরোধী বক্তৃতা করার পর পার্টির কাছ থেকে ধাক্কা খান। শোনা যায়, পার্টির নেতা নির্মল বসু তাকে পার্টির রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে সমঝে দিতে গিয়েছিলেন।

উত্তরে কলিমুদ্দীন বলেছেন যে আমার এলাকায় আমিই পার্টি এবং এই এলাকায় আমি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেস বিরোধিতার যে প্রতিশ্রুতিতে নির্বাচিত হয়েছে সেই রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করে যাব। নির্মল বসু মহাশয় আর বেশি কথা বাড়াই নি।

সরকারী
প্রশাসনে আরো
অদল বদল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত সপ্তাহে দর্পণ লিখেছিল যে পুলিশ কমিশনার শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত মহাশয়কে যেতে হবে। হয়েছেও তাই। এবার যাবেন ডেপুটি কমিশনার (হেড কোয়ার্টার্স) মজুমদার। (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বশোরের চাঁচড়ার মোড়ের একটি দৃশ্য। পাক ফৌজের ধবংসলীলা।

ছবি : সেনগুপ্ত স্টুডিও (শ্যামল) শ্রীরামপুর

নব কংগ্রেসে উপদলীয় কোঁদলের জন্ম রঞ্জিত গুপ্তকে বিদায় নিতে হল

রাইটার্স বিন্ডিংয়ের ঘটনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস দলের অন্তর্ভুক্তির পরিণতিতে কলকাতার পুন্নিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তকে সরতে হোলো।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

রাইটার্স বিন্ডিংয়ে জগী কংগ্রেসী ছাত্র-যুবকদের যে মিছিল সংগঠিত হয়েছিল তা তেসরা মে বিধানসভার সামনে সভার উদ্বেগন উপলক্ষে মিছিলের মহড়া বলে জানা গেছে।

সমস্ত ঘটনাই পরিকল্পনা

অনুযায়ী সংগঠিত হয়েছে বলে কংগ্রেসের একাংশ খুশি। সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় মিছিলের পূর্ণ বিবরণী, মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং কংগ্রেসী (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

১৪শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা ১১ শ্রুতবার ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

পূর্ব বাংলার
কমিউনিস্ট পার্টি
গেরিলা যুদ্ধ
চালাচ্ছে

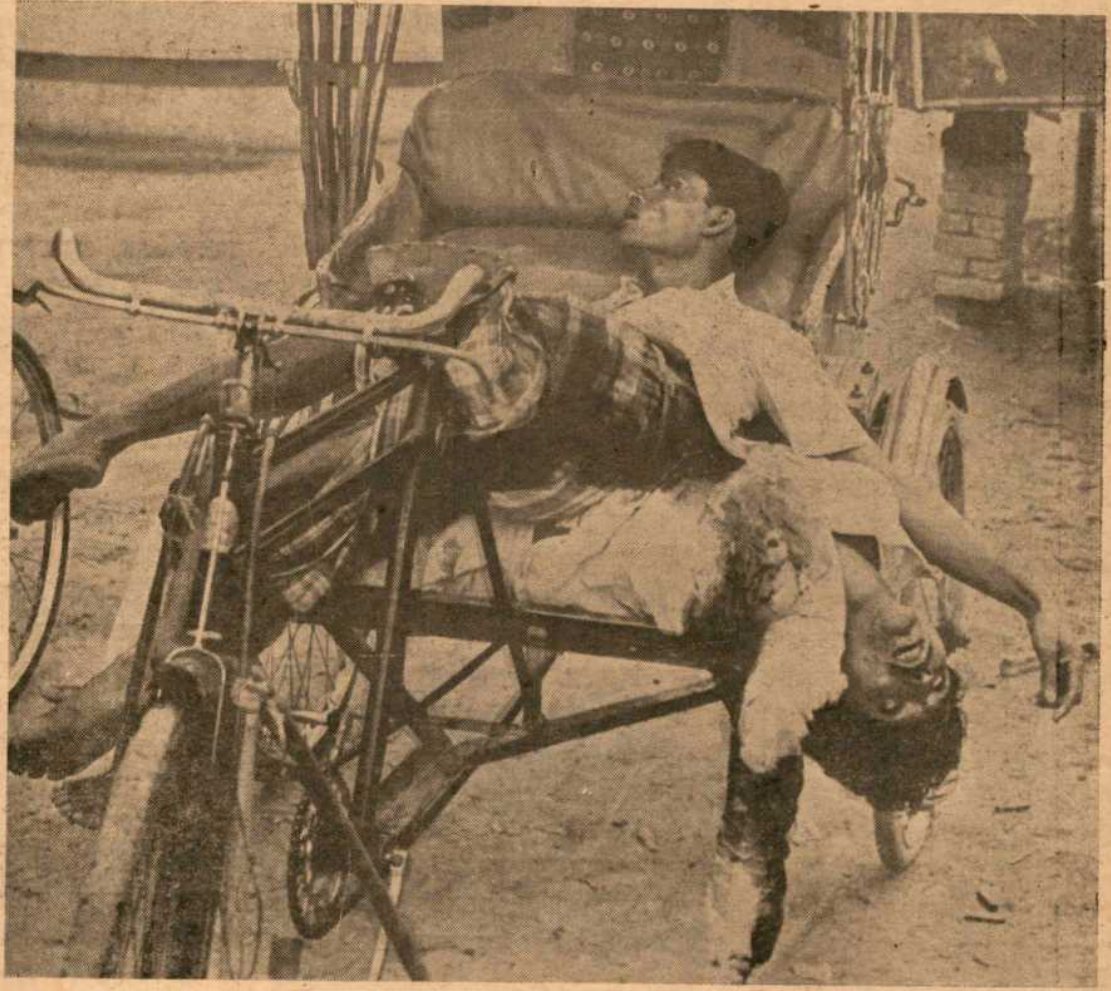
(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত আকার নিচ্ছে। মুক্তি-কামীরা আবেগের পরিবর্তে সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকের নেতৃত্ব এগিয়ে এসেছে এই সংগ্রামকে সঠিক রাজনীতির ভিত্তিতে গেরিলা যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখানে বলা প্রয়োজন যে, সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী চট্টগ্রাম (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

চাকরী নিয়ে
কংগ্রেসের
দলীয় রাজনীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস দল বেকার সমস্যা সমাধানের নামে দলীয় রাজনীতির খেলায় নেমে-ছেন। গত সপ্তাহে রাজ্যের উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রথীন তালুকদার এক গোপন সাক্ষাৎকারে উন্নয়ন দপ্তর, সি এম ডি এ এবং কলকাতা মেট্রোপলিটন স্যানিটেশন অথরি-টিকে সমস্ত প্রকার নতুন নিয়োগ বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। ইন্দিরা কংগ্রেস যখন বেকার সমস্যা সমাধান করবে বলে তার-পরে চেঁচাচ্ছে তখন নতুন কর্ম-সংস্থান বন্ধ করার এই সাক্ষাৎকারে (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



পাক সৈন্যের গুলিতে নিহত রিক্সাচালক ও আরোহী

আসল মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু নয়, বিজয়বাবু
সুশীল ধাড়া এই অবস্থার সুযোগ নিতে চাইছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্রীঅজয় মুখার্জির জন্মদিনে সুশীল ধাড়া শুভেচ্ছা জানাতে যান নি বলে আপনারা হয়ত ভাবছেন যে অজয়বাবুর সঙ্গে সুশীলবাবুর সরকার গঠনের ব্যাপারে মতান্তর মনান্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

সরকারী

প্রশাসনে আরো

অদল বদল

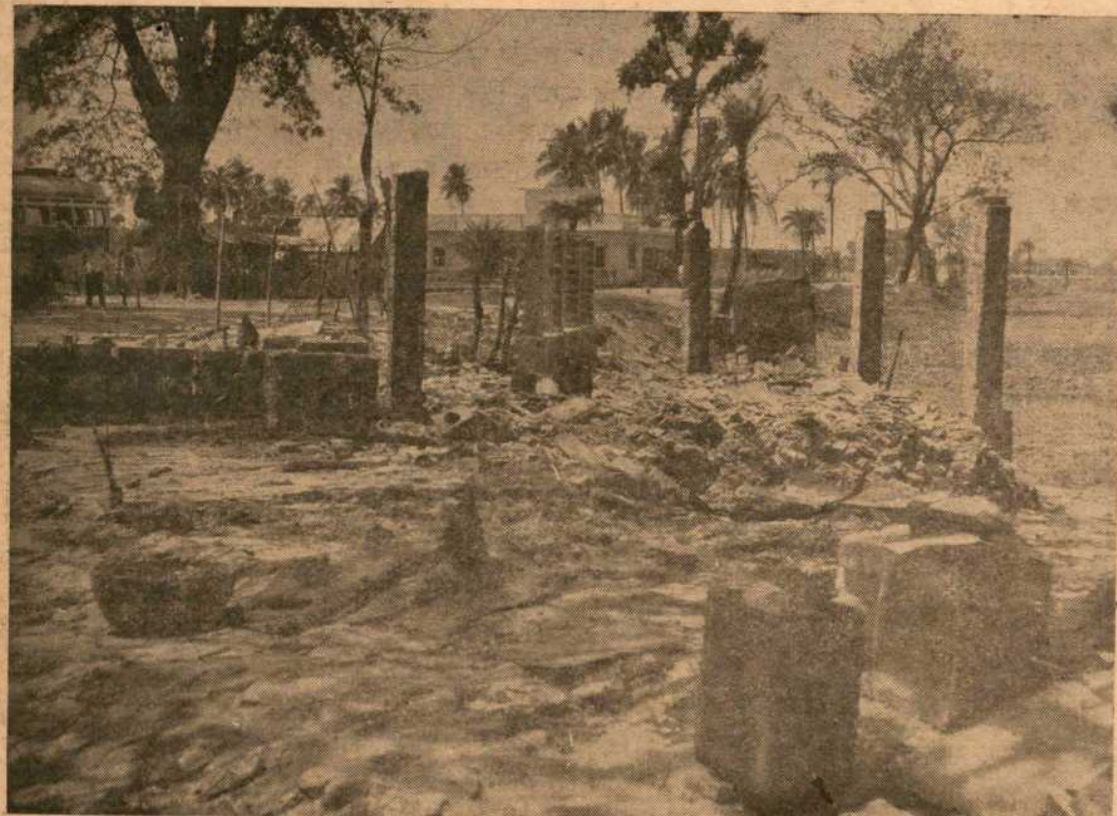
(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত সপ্তাহে দর্পণ লিখেছিল যে পুন্নিশ কমিশনার শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত মহাশয়কে যেতে হবে। হয়েছেও তাই। এবার যাবেন ডেপুটি কমিশনার (হেড কোয়ার্টার্স) মজুমদার (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

ফরোয়ার্ড ব্লকে ভাঙন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্যামসুন্দর গুপ্ত মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর এই দলে ভাঙন শুরু হয়েছে। মহম্মদ ইয়াকুব নামে এই দলের একজন কার্ডিনালার দল থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে। আর একজন সদস্য কলিমুদ্দীন সামস এক জোরালো ইন্দিরা বিরোধী বক্তৃতা করার পর পার্টির কাছ থেকে ধাতানি খান। শোনা যায়, পার্টির নেতা নিমল বসু তাঁকে পার্টির রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে সমঝে দিতে গিয়েছিলেন। উত্তরে কলিমুদ্দীন বলেছেন যে আমার এলাকায় আমিই পার্টি এবং এই এলাকায় আমি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেস বিরোধিতার যে প্রতিশ্রুতিতে নির্বাচিত হয়েছে সেই রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করে যাব। নিমল বসু মহাশয় আর বেশি কথা বাড়ান নি।



বশোরের চাঁচড়ার মোড়ের একটি দৃশ্য। পাক ফৌজের ধ্বংসলীলা।

ছবি : সেনগুপ্ত ষ্টুডিও (শ্যামল) শ্রীরামপুর

রঞ্জিত গুপ্তর বিদায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তার বিরুদ্ধে কোনো দুনীতি স্বজনপোষণের অভিযোগ ছিল না। রাষ্ট্রপতির শাসনে তিনি মোটামুটিভাবে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের খুশি রেখেই কলকাতা পদাধি চালিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু রঞ্জিত গুপ্ত এই দলের একটি উপদলের সঙ্গে বেশী মাথামাথি করতেন সেজন্যে বিরোধী উপদলের নেতা উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার পদাধি কমিশনারকে অত্যন্ত অসম্মানজনক অবস্থায় সরিয়ে দিলেন, তাঁকে বিকল্প কোন পদে নিয়োগ করা হবে তাও বলা হয়নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে, অফিসার নিয়ে কংগ্রেসীদের এই ক্ষমতার লড়াইয়ে নকল মুজিবর মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি ঠুঠো জগন্নাথের ভূমিকা পালন করছেন। বিজয় নাহার ঠুঠো হুকুম দিচ্ছেন আর উনি সই করছেন। অথচ উনিই হচ্ছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী। পদাধি কমিশনার বদলের বিপক্ষে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়, রাজ্যের অর্থ-মন্ত্রী তরুণকান্ত ঘোষ, উত্তর কলকাতার এম এল এ প্রফুল্লকান্ত ঘোষ, পূর্ব মন্ত্রী সন্তোষ রায়। এরা বিজয় নাহারের বিরোধী উপদল। আর রঞ্জিত গুপ্ত এই উপদলের বিশ্বস্তজন।

মন্ত্রিসভা গঠনের আগে থেকেই ইন্দিরা কংগ্রেসীদের দলদলির খবর দর্পণের পাঠকরা রাখেন। ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেসীদের একটি অংশ চেয়েছিলেন তরুণকান্ত ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করতে। কিন্তু বিজয় নাহার তা হতে দিতে চাননি, নিজেই মুখ্যমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। তখন

সিদ্ধার্থশংকর রায়রা পাঁচ মেরে অজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করেন এবং সেসময় থেকেই বিজয় নাহার চটে আছেন। এখন অবস্থাটা হচ্ছে, সিদ্ধার্থশংকর রায়, তরুণকান্ত ঘোষরা রাজ্য মন্ত্রিসভায় প্রধান্য পেতে চান। অন্যদিকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় নাহার দেখতে চান, তাঁর দলেরই প্রধান্য। সমস্ত রকম অফিসার বদলের ব্যাপারে বিজয় নাহারই ক্ষমতার ছাপ রাখছেন। বিজয় নাহার জানতেন, কলকাতার পদাধি কমিশনারের পদটি রঞ্জিত গুপ্ত রাষ্ট্রপতির আমলে সিদ্ধার্থ রায় এবং দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট (সি পি আই) নেতা ভূপেশ গুপ্তের সহায়তায় পেয়েছিলেন।

রঞ্জিত গুপ্তও অকৃতজ্ঞ নন। হেমন্ত বসুর খুনের ঘটনায় তিনি এমন বিবৃতি দিয়েছিলেন যাতে সন্দেহ হতে পারে, ঘটনার সঙ্গে সি পি আই জড়িত! এই বিবৃতিতে সি পি আই বিরোধীদের যথেষ্ট রাজনৈতিক সুবিধে হয়েছিল। এখন অবশ্য হেমন্ত বসুর খুনের মামলায় অভিযুক্ত করে যে সাত জনের বিরুদ্ধে চার্জসীট দেওয়া হয়েছে তারা সবাই উত্তর কলকাতার তথাকথিত নকশালপন্থী বলে পরিচিত।

এই ধরনের নানা ব্যাপারে পদাধি কমিশনার রঞ্জিত গুপ্ত ইন্দিরা কংগ্রেসীদের সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গুপ্ত সাহেবের বোধ হয় একটু ভুল হয়েছিল। তিনি শ্রদ্ধা সিদ্ধার্থ রায়, প্রফুল্লকান্ত ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখার্জির (সি পি আই) সঙ্গেই মাথামাথি করছিলেন। বিজয় নাহারকে তেমন পাস্তা দেন নি। বিজয় নাহারও

সুযোগ খুঁজছিলেন।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবার পরে বলতে থাকেন রঞ্জিত গুপ্ত যথেষ্ট পরিমাণে কম্যুনিষ্ট বিরোধী নন। কম্যুনিষ্ট, বিশেষ করে সি পি আইকে ঠ্যাঙাতে হলে রঞ্জিত গুপ্তকে বদলাতে হবে। বিজয় নাহারের কথায় তাঁর বিরোধী উপদল বেশী গুরুত্ব দিলেন না। তিনি মন্ত্রিসভায় বদলের প্রসংগটি তুললেন। কেউই সেদিন এটিকে গুরুত্ব দেননি। কিন্তু বিজয় নাহার ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বদলের ব্যাপারটিতে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন।

তাঁর বিরোধী উপদল এবার সক্রিয় হলেন আদেশটি বানচাল করার জন্যে। আদেশটি কয়েকদিন চাপা থাকলো। রঞ্জিত গুপ্ত ফাইলের খবর পেয়েই দিল্লী ছুটলেন সিদ্ধার্থ রায়কে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে ধরে অর্ডার বানচাল করার জন্যে। বিজয় নাহারও বান্দ্র লোক। যেদিন রঞ্জিত গুপ্ত দিল্লী গেলেন সেদিনই তিনি আনন্দবাজার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের রিপোর্টারকে ডেকে এই বদল করার গোপন খবরটি দিয়ে দিলেন।

পরদিন রঞ্জিত গুপ্ত যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করছেন তখন কলকাতার দুখানা কাগজে পদাধি কমিশনার বদলের খবর বেরিয়ে গিয়েছে। আর এই ধরনের খবর একবার বেরিয়ে গেলে তার কোনো প্রতিকার করা যায় না। কেননা, অফিসার বদলের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের। প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে কিছু করতে গেলে রাজ্যের মন্ত্রিসভাকে হেনস্থা করা হবে। এত ছোটো ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তাই নাক গলালেন না। বিজয় নাহার দেখিয়ে দিলেন মন্ত্রিসভায় তাঁর এবং তাঁর উপদলেরই ক্ষমতা বেশী। মাথামাথি রঞ্জিত গুপ্ত উপলক্ষ্য মাত্র।

রাইটার্সের ঘটনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মিছিলে আক্রমণ হতে পারে—এই সবই সুদৃষ্টভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কংগ্রেসীদের ধারণা তেসরা মের মিছিল এই প্রচারে আরও জোরদার হবে।

মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেক অণ্ডলের সি পি আই ও নকশাল কমীদের দেখা গেছে বলে পদাধিগণের অভিযোগ। মিছিল যখন আসছে তখন এই সম্পর্কে লালবাজার থেকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কংগ্রেসীদের খবর জানানো হয় এবং নির্দেশ চাওয়া হয় শহরে একশো চম্পাঞ্জি ধারা বলবৎ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে মিছিল আটকানোর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না।

মন্ত্রীরাজ্য জানান যে, আইনকে একটু শিথিলভাবে প্রয়োগ করলেই চলবে। নির্দেশ অনুযায়ী পদাধিগণও খুব বেশি মাথা ঘামান নি এবং রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে পদাধিগণ প্রহরা জোরদার করার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি।

মিছিল এসেই জঙ্গী রুপ নেয়। এর একাংশ রাইটার্স বিল্ডিং

অধিকার করতে চায় সোজা চার-তলায় উঠে গিয়ে ছাত্র পরিষদের পতাকা উড়িয়ে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সরকারী কর্মচারীদের সবাইকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট ভেবে নানা কটুক্তি করে।

উপরের ছাদে এক বৃদ্ধ কর্মচারী মিছিলকারীদের একজনকে শোভন আচরণের উপদেশ দিলে ওরা বৃদ্ধকে যৎপরোনাস্তি নিগৃহীত করে। এই ঘটনায় ওই বৃদ্ধের অল্পবয়সী সহকর্মীরা মোকাবিলায় এগিয়ে আসে। এই ঘটনা থেকেই সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ঘটনার শুরুর।

ঘটনার একটি বিশেষ দিক হল যে, এই মিছিল সাধারণভাবে কমিউনিষ্ট বিরোধী এবং এটি সংগঠিত হয়েছিল মার্কসবাদীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এ ছাড়াও যে সমস্ত বয়স্ক কংগ্রেসীরা মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন তাদেরও ওরা হুমকী দিতে এসেছিল। মন্ত্রীদের মধ্যে বিজয় সিং নাহারকে ওরা মোটেই পছন্দ করে না বলে জানা গেছে।

এই ঘটনার পর অজয় মুখার্জী ও বিজয় সিং নাহার বিচলিত বোধ করছেন। তাঁরা নিভুতে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দুজনেই একমত যে, এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে মার্কসবাদীরা সুযোগ নেবে আর সরকার বিরোধী জনমত গড়ে উঠবে।

দলীয় রাজনীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উপরোক্ত তিন কতৃপক্ষই বিস্মিত বোধ করেন। তাঁরা উন্নয়ন মন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

প্রকাশ, বিজয় নাহার এদের বলেছেন, সাকুলারটি তাঁরই আশীর্বাদপুষ্ট। তবে নতুন নিয়োগ বন্ধ করা হবে না। শ্রদ্ধা ইন্দিরা কংগ্রেস সমর্থকদের চাকরী দেওয়া হবে এবং সেজন্যে প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত নতুন নিয়োগ বন্ধ করা হয়েছে।

আরও প্রকাশ, বিজয় নাহার একথাও বলেছেন, শ্রদ্ধা যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারী চাকরী দেবার দিন আর নেই। রাজনীতি দেখতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি এই রকম ইংগিতও দেন যে, চাকরী দেবার সময় অফিসাররা যেন তাঁর বহু-বাজার কেন্দ্রের প্রার্থীদের দিকে একটু বেশী নজর দেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রথীন তালুকদার কিন্তু বে-আইনীভাবে সাকুলারটি সি এম ডি এ এবং স্যানিটেশন অথরিটির ওপর প্রয়োগ করেছেন। কেননা, এই দুটি সংস্থাই স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান। এদের প্রতিষ্ঠানে চাকরী দেবার জন্যে সিলেকশন কমিটি আছে এবং রাজ্য সরকারের সেখানে কোন প্রত্যক্ষ কতৃপক্ষ নেই। প্রকাশ, দুটি প্রতিষ্ঠানই বিষয়টি সম্পর্কে বিজয় নাহারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কিন্তু তাতে কি আসে যায়? রাজনীতিই এখানে বড় কথা।

সরকারের

ধমকেও

মেট্রো নারাজ

রাতের শো চালু করলে

খরচে পোষায় না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতায় আইন শৃঙ্খলার অবস্থার অবনতি ঘটায় অনেক সিনেমা হলে রাতের প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেছে। এই সিনেমা হল-গুলির মধ্যে মেট্রোর নাম উল্লেখযোগ্য।

পাছে এই নিয়ে আবার সংবাদপত্রে হৈ চৈ হয় সেই আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী ঐ সিনেমার ম্যানেজার জনাব হাফেজের কাছে লোক পাঠান সিনেমা হলে রাতের শো চালু করার জন্য।

হাফেজ সাহেব জানান যে, রাতের শো চালানো তার ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিকর, কারণ দর্শকের সংখ্যা প্রায় নগণ্য থাকে বলেই চলে। এর আগে কখনও এই পরিস্থিতি আসেনি।

সরকারের তরফ থেকে মেট্রো সিনেমার কতৃপক্ষের ওপর নির্দেশ আসে রাতের প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রীর হিসেব চাই। হাফেজ সাহেব যে হিসেব দিয়েছেন তাতে প্রকাশ যে রাতের শোতে টিকিট বিক্রীর হার হল গড়ে ষাট থেকে আশি টাকা। আর খরচ হল শ্রদ্ধা ইলেকট্রিক্সের একশ পঞ্চাশ টাকা। অন্যান্য খরচ ধরলে আরো অনেক দাঁড়াবে। এই হিসেব পাওয়ার পর সরকার নীরব।

প্রশাসনে অদল বদল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহাশয়। শ্রীমজুমদারকে লালবাজারে এনেছিলেন পূর্বতন পদাধি কমিশনার শ্রীপ্রণব সেন। মজুমদার মহাশয় অবশ্য কোন দিনই সি পি আই ডক্ট ছিলেন না। কংগ্রেসী আমলে তাঁকে কংগ্রেসী সেবক বলে অনেকেই জানতেন। কিন্তু তিনি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীমনোরঞ্জন রায়ের আত্মীয়। তাই বোধহয় প্রণব সেন মজুমদার মহাশয়কে লালবাজারে এনে সি পি আইয়ের প্রিয়ভাজন হতে চেয়েছিলেন এবং হলেও ছিলেন বলে অনেকে মনে করতেন। মজুমদার মহাশয়ের জায়গায় আসছেন বর্ধমানের এস পি শ্রীপাচাঁদগোপাল মুখার্জী। সি পি আই বা অন্য উগ্রপন্থী কমিউনিষ্ট ঠেঙানোর ব্যাপারে তিনি বেশ সন্মত অর্জন করেছেন।

উপরের বা নীচ তলার পদাধি অফিসারদের ভিতরে আরও কিছু অদল বদল হবে। অপেক্ষা শ্রদ্ধা কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন অফিসারদের

খুঁজে বার করা। যত তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা করে ফেলা যায় সেই দিকে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ খুবই সজাগ, কেননা তাদের মতে আইন ও শৃঙ্খলা ঠিক মত বজায় রাখা সব কিছুর আগে প্রয়োজন, তারপর অন্য সব ব্যাপারে হাত দেওয়া হবে।

পদাধি মহলে যেমন অদল বদলের পালা শুরু হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আই এ এস অফিসারদেরও পরিবর্তন করা হবে। বিজয়বাবু এই ব্যাপারে অবশ্য ইতিমধ্যেই আগ্রহের হয়েছেন। কিন্তু বার্দ সেধেছেন সি এম পি ওর শ্রীএস দত্ত মজুমদার। সি এম পি ওর ডিপার্টমেন্ট শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের হাতে। নানা কারণে বিজয়বাবু শ্রীদত্ত মজুমদারের প্রতি সুপ্রসন্ন নন। তাই তিনি শ্রীদত্ত মজুমদারকে বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের পদে নিযুক্ত করতে চাইলেন। দত্ত মজুমদার মহাশয়

বেঁকে বসেছেন।

তিনি স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে এই পদে যোগ দিয়েছিলেন শ্রীবি বি ঘোষের আমলে। শ্রীদত্ত মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করে ঐ বদলীর বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। অজয়বাবু নাকি ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ সরলতা নাকি বলেছেন যে আই এ এস অফিসারদের বদলীর কথাবার্তা যখন হয় তখন তাঁর নাম ছিল না। পরে বিজয়বাবু তাঁর নাম প্রস্তাব করেছেন।

দত্ত মজুমদার মহাশয়ের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্য রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ওপরের তলার অদল বদল স্থগিত আছে কিন্তু বেশী দিন থাকবে বলে মনে হয় না। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

মেয়র ও স্পাকার নির্বাচন প্রসঙ্গে

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

কর্পোরেশনের নির্বাচনের পশ্চাদপট পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনের রাজনৈতিক টালমাটালের সংকেত চিহ্ন বলে ধরে নিলে যে চিরটী ফুটে ওঠে, তা যেমন করুণ তেমনি হাস্যোদ্দীপক।

করুণ এই জন্যে যে এতদিনের চিরাচরিত বামপন্থী দলগুলির মধ্যে সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক অবশেষে কংগ্রেসী ক্ষুরে গলা কেটে আত্মহত্যা করল, আর হাস্যোদ্দীপক এই কারণে যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে অনেক তাবড় তাবড় বামপন্থী নেতার অঙ্গবাস খুলে পড়ছে একথাও তারা বন্ধুতে পারছেন না।

কর্পোরেশনে সি পি আই এবং 'ওয়ার্ড ব্লক' প্রকাশ্যে এবং এস-এ সি কায়দা করে যে ভাবে জনগণ পরিত্যক্ত কংগ্রেসীদের এ রাজ্যে জিতে তুললেন, তার সঙ্গে বিগত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের সময়কার ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য আছে।

লোকে ভেবেছিলো যে মাজা ভাঙা মার খাবার পর সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক খানিকটা শিক্ষা গ্রহণ করবে। তাতো হয়ই নি, বরং এরা আরো পিছল পথে, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার পথে পা বাড়িয়েছেন।

কিন্তু এপথে যাবার আগের মূহুর্তেও কোন কোন একদা বামপন্থী আজ কংগ্রেস সমর্থক নেতার দোটানা একই সঙ্গে করুণ ও হাস্যরসের সঞ্চার করছে।

কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্ডিনালার শ্রীকুমার দত্ত মেয়র পদে পার্টি কর্তৃক মনোনীত হবার ভরসা পান। বস্তুতঃ ১৯৫২ সাল থেকে নম্ব-নং ওয়ার্ডের কার্ডিনালার হিসেবে তিনি নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যকরী সমিতির সভায় নম্ব-দশ ভোটে শ্রীকুমার দত্তই পার্টির প্রার্থী হবেন সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তখন সভায় অনুপস্থিত আরো দুজন ব্যক্তি সভাগৃহে ঢুকে তারা কার্যকরী সমিতির সভা বলে দাবী করেন এবং ঘোষণা করেন যে দশ-এগারো ভোটে শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্তকেই প্রার্থীপদে মনোনীত করা হল। খানিকটা গোলমাল হয় এবং দু'জন ব্যক্তিকে পদাধি গোলমালের অজুহাতে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু এগারো-দশ ভোটে শ্যামসুন্দর গুপ্তই ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী থেকে গেলেন।

অতঃপর সর্বশ্রী কুমার দত্ত, অজয় দে, কলিমুদ্দীন শামস ও মহম্মদ ইয়াকুব সি পি এম-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সি পি এম

তাদের বলেন যে তাঁরা যদি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বামপন্থী জোটে ফিরে আসেন তাহলে সি পি এম মেয়র পদে শ্রীকুমার দত্তকে এবং ডেপুটী মেয়র পদে মহম্মদ ইয়াকুবকে সমর্থন করতে রাজী আছেন।

ফরওয়ার্ড ব্লক এই অবস্থা টের পেয়ে শ্যামসুন্দর কেন্দ্রে শ্রীকুমার দত্ত অথবা অজয় দেকে মনোনীত করার চিন্তা তাঁরা করছেন এরকম ভাব দেখান।

ফলে ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে আশু ভাঙনের সম্ভাবনা কিছুটা কমে আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়র পদে ভোট দেবার সময় নানা অজুহাত তুলে শ্রীকুমার দত্ত প্রায় আশ্বস্তা সময় কাটান এবং ডেপুটী মেয়র নির্বাচনের সময় কলিমুদ্দীন শামস-চীৎকার করেই বলে ফেলেন যে তিনি পান্নালাল দাসকে ভোট দেবেন না।

সি পি আই নেতা কমলাপতি রায় সবসময় তাঁর "শিবদূতা" অর্থাৎ শিবকুমার খান্নার নির্দেশে চালিত হচ্ছেন এটাও পরিষ্কার হয়ে যায়।

অন্যদিকে বিখ্যাত বিপ্লবী পার্টি এস ইউ সি সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে এমন ধারা একটী প্রস্তাব রাখলেন সি পি এম-এর কাছে। তাঁরা বলেন যে তিনটী শর্ত মেনে নিলেই তাঁরা সি পি এম জোটের প্রার্থীদের ভোট দেবেন, অন্যথা নিরপেক্ষ থাকবেন। শর্ত-গুলি হল ছয় মাসের মধ্যে মশককুল ধ্বংস ও সর্বস্বত জজাল অপসারণ করতে হবে এবং যে সব কর্মচারী ইউনিয়ন কাজে শৈথিল্য বা গাফিলতি দেখাবেন তাদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে হবে। সি পি এম প্রস্তাবগুলিকে অবাস্তব বলে মনে করেন কিন্তু এস ইউ সি-কে বলেন যে তাঁরা যদি এই কর্মসূচী পালন সম্ভব বলে মনে করেন তাহলে তারাই মেয়র ও ডেপুটী মেয়র পদে প্রার্থী দিন, সি পি এম তাঁদের সমর্থন করবে। কিন্তু তখন এস ইউ সি পিছিয়ে যান।

এদিকে কর্পোরেশন নির্বাচনের ছায়া আগামী দিনের বিধানসভার রাজনীতিতে ছায়া ফেলেছে।

এই ধরনের স্বিধা, সংশয়, হতাশা ও টানাটানির কারণে এই রাজ্য-রাজনীতি অলংকৃত করার কাজ চলেছে। ওরা মে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনের আগে এই অলংকরণের কাজ দ্রুততর হবে।

সি পি আই আজ যে ভদ্দাদশায় পড়েছেন, তাতে জোর করে একথা বলা যায় না যে তাঁদের সব কজন এম এল এ তেসরা মে বিধান- (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

যাদবপুর অঞ্চলে গুণ্ডা ও পুলিশের সন্ত্রাস

প্রতিরোধের জন্য জঙ্গী স্কোয়াড গঠিত হচ্ছে?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশপাশ অঞ্চলে কতিপয় সমাজ-বিরাোধী ব্যক্তি ও সি আর পি ও মিলিটারীর যুগ্ম নির্বাতন এতদ-াঞ্চলে এক ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। অভিযোগে প্রকাশ, প্রকৃত সমাজবিরাোধীদের গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, একটি বিশেষ রাজনৈ-তিক দলের কর্মীদের চিনিয়ে দেও-য়ার উদ্দেশ্যে এদের পদাধি ভ্যানে নিয়ে ঘোরা হচ্ছে।

কিছুদিন আগে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হোটেলে ও থানার পাশে যেন হোটেলে এক বিরাট পদাধি ও মিলিটারী বাহিনী ছাত্রদের উপর জঘন্য অত্যাচার করে। থানার অভ্যন্তরে ধৃত ছাত্র-দের উপর অত্যাচার চরমে পৌঁছয়। নয়জন ছাত্রকে পদাধি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক যথাক্রমে অরূপ দাশগুপ্ত ও অঞ্জন মুখার্জী ছিলেন। এখান থেকে গ্রেপ্তার করা

হয় একজনকে। ছাত্রদের উপর নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা করেন চব্বিশ পরগণার পদাধি সদপার সদাধি দাশগুপ্ত।

জানা যায়, এখনও বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে। জামিন পূর্বত দেওয়া হয়নি। ধৃত কয়েক-জনকে মর্জি দিয়ে জেল গেট থেকে পদারায় গ্রেপ্তার করা হয়। গত উনিশে মার্চ পি ভি এ্যাঙ্কে ধৃত কয়েকজনকে পদারায় আটক করা হয়। এদের মধ্যে আছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীঅমলকুমার বসু, বিশ্বনাথ মিত্র, তপন মাইতি, আব্দুল আজিজ প্রভৃতি।

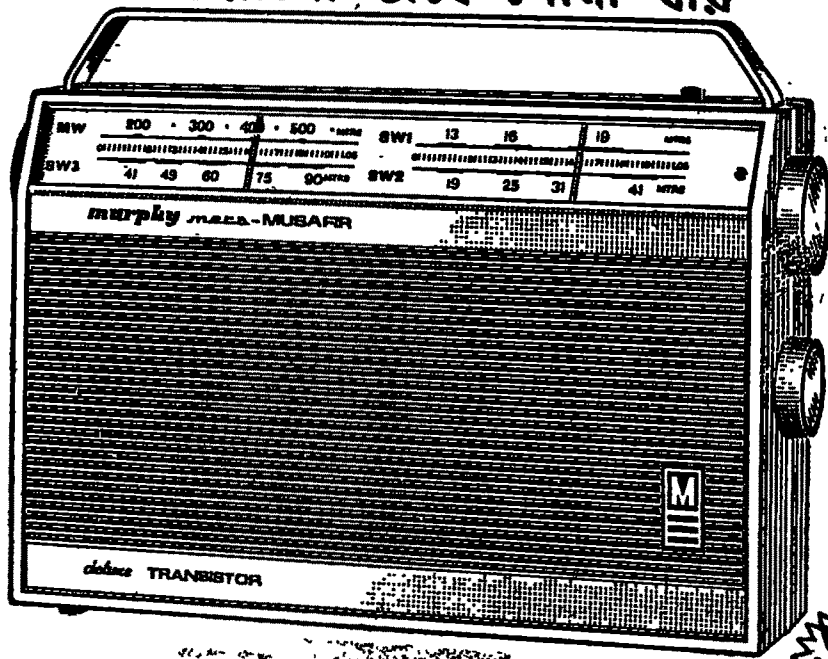
সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো চব্বিশ পরগণার জেলা শাসক রথীন সেনগুপ্ত এসব নির্বাতনের সবই জানেন, তবু যাদবপুর থানায় একদল উগ্র ছাত্রবিরাোধী কর্মচারী থাকার ফলে এ ধরনের ঘটনা যাদব-পুরে এক অশান্তির সৃষ্টি করে চলেছে।

বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, এর

পরিপ্রেক্ষিতে পদাধি ও মিলিটা-রীর অত্যাচার প্রতিরোধে কোন এক মহল থেকে এক জঙ্গী স্কোয়াড তৈরী করার কয়েকদফা গোপন আলোচনা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। পদাধি প্রশাসন ব্যবহারে সংযত না হলে এই স্কোয়াড শীঘ্রই সক্রিয় হয়ে উঠবে। এছাড়া, মিলিটারী কর্তৃক নারী লাঞ্ছনা ও শাড়ী ধরে টানাটানি করার ঘটনাটি নিয়ে উক্ত গোপন সভায় উদ্বেগের সংগে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া আরেকটি অভিযোগ এখানে ক্রমশই সোচ্চার হয়ে উঠছে যে, পূর্ব বাংলার উপর পাক ফৌজের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী প্রচণ্ড ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে, অথচ পশ্চিমবঙ্গের, দিল্লীর সি আর পি ও মিলিটারীর অত্যা-চারে লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষ ছাত্র-ছাত্রী ও যুবশ্রেণীর বিষয়ে সত্য ঘটনা প্রকাশে বাজারী পরিকা-গুলো এত নীরব কেন?

মারফি মেরে-মুসাফির প্রত্যেক স্টেশন স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে শোনা যায়



৪-ব্যাণ্ড ডিলাক্স ট্রানজিস্টর

- সারা হনিয়ার যে কোনও স্টেশন পাওয়ার জন্য অলওয়েভ।
- জোরালো আওয়াজ।
- আপনার পছন্দমত স্বর কম-বেশী করার জন্য হাই-লো টোন কন্ট্রোল।
- অদৃশ্য ফেরাইট রড ও লুপ এরিয়েলের ব্যবস্থা থাকার দরুন অভি সহজে স্টেশন ধরা যায়।

একটি ডিউটি স্মেট।
অত্যন্ত চ্যার বক্স।

- স্ক্রল, ছিমছাম, উচ্চস্বরের পলিষ্ট্রিমের হ-রঙা ক্যাবিনেট।
- ডায়াল স্কেল লম্বা ও স্পষ্ট এবং তাড়াতাড়ি সহজে টিউনিং করার জন্য হুটি কাঁটা আছে।
- বড় সাইজের ব্যাটারীতে চলে। এলিমিনেটর লাগিয়ে নিলে, বিজলীতেও চালানো যায়।

পরিষ্কার, প্রাণবন্ত ও জোরালো, এককথায় নিখুঁত ধ্বনি পরিবেশন করার জন্যই প্রত্যেক মারফি এখন "ম্যাগনিটিউড"

মারফি সারা গ্রহের ঊর্ধ্ব!



বাংলা দেশে সংগ্রামের পটভূমি ও গতিপথ

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

বাংলা দেশের রণাঙ্গনের যে সব সংবাদ আমাদের দেশের বড় বড় পত্রিকাগুলিতে সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় যে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় শেষ হয়েছে। আপাততঃ বিভিন্ন জেলা শহর ও সামরিক কেন্দ্রে পাকিস্তানী সৈন্যদলের সামরিক প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত বন্ধ করে দেবার সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ইতিমধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি স্বাধীন বাংলা দেশ সরকার গঠিত হয়েছে এবং শেখ সাহেবের অনুপস্থিতিতে জনাব নজরুল ইসলাম সরকারের প্রধান বলে ঘোষিত হয়েছেন এবং জনাব তাজুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী রূপে তার ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ করেছেন।

অপরদিকে পরবর্তী কালে এ সংবাদ পাওয়া গেছে যে বাংলা-দেশের যে সব মুক্ত এলাকায় পাকিস্তানী ফৌজ এখনও পদার্পণ করে নি, সে সব জায়গায় স্থানীয়ভাবে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠিত করে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চলেছে। এই জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টে আওয়ামী লীগ, জাতীয় আওয়ামী পার্টির উভয় অংশ, কৃষক সমিতি প্রভৃতি সংস্থার অগ্রগামী অংশ একাবদ্ধ হতে পেরেছেন।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও সম্ভাব্য পরিণতির চিত্রকে বুঝতে হলে সর্বাগ্রে এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। একথা বোঝা দরকার বাংলা দেশের বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষ কি ভাবে এই সংগ্রামকে দেখছেন এবং কি ভাবে তারা এই সংগ্রামে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করতে পারছেন।

এটা আজ পরিষ্কার যে বাংলা দেশের সংগ্রাম প্রধানতঃ উনিবিংশ

শতাব্দীর ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণের বিরুদ্ধে এবং এর নেতৃত্ব উদীয়মান জাতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর হাতে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ধর্মসম্পর্কীয় বন্ধন ছাড়া আর কোন মিল নেই। ভাষা, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধের প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একথা মনে রেখেই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম লীগ “এক বা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের” কথা বলেছিল।

ইতিহাসের অভিনব পরিহাস যে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ গোড়া থেকেই একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবকে আদৌ আমল দিতে চান নি, যদিও লাহোর প্রস্তাবে তাঁরা তার যৌক্তিকতার কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়ে নবগঠিত রাষ্ট্রের শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যেই এই স্ববিরোধিতার কারণ নিহিত।

পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হবার সময় নেতৃত্বভার যে মুসলিম লীগের হাতে ছিল, তার কার্ডিনাল সদস্যের সংখ্যা ছিল পাঁচশ তিন জন। এর মধ্যে বৃহৎ ভূস্বামী নবাব, জমিদারদের সংখ্যা ছিল একশো তেরটিজন। এদের মধ্যে পাজারের বৃহৎ ভূস্বামীদের সংখ্যা সর্বাধিক একশ জন। এরপরেই পূর্ববঙ্গ, উত্তর প্রদেশের ভূস্বামী প্রতিনিধিদের সংখ্যা। কার্ডিনালে সিদ্ধদেশের পশ্চিমাঞ্চল সদস্যের মধ্যে পনের জনই ছিলেন বৃহৎ ভূস্বামী। সমস্ত ভূস্বামীদের সংখ্যা দেশের জনসাধারণের শতকরা এক-জন, কিন্তু তাঁরাই দেশের মোট জমির পঁচাত্তর লক্ষ একরের মালিক এবং তাদের সর্বনিম্ন জোতের পরিমাণ পাঁচশো একরেরও বেশী। অন্যদিকে দেশের জমির

উপর নির্ভরশীল বাকী পয়ষাট শতাংশ লোক পাঁচ একরের চেয়েও কম ছোট ছোট জোতে মোট চারাত্তর লক্ষ একর জমির মালিক ছিলেন।

বলা বাহুল্য মুসলিম লীগ কার্ডিনালের এই সামন্তশ্রেণীর প্রাধান্য থেকে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটীশ আমলের নিয়ম অনুযায়ী এই শ্রেণী থেকেই উচ্চ সামরিক পদে লোক নিয়োগ করা হত এবং এই সামরিক নেতৃবৃন্দ ভূস্বামী স্বার্থের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

পশ্চিম পাকিস্তানে যে সব বড় বড় জমিদার ভারত থেকে রিফিউজী হিসাবে আসেন তাদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি খান, জনাব খালিকুজ্জমান, জনাব মহম্মদ ইসমাইল এরা ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম সারির নেতা।

অন্যদিকে যে সব বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ব্যাংকার মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও কার্যকরী প্রভাব ভূস্বামী স্বার্থের তুলনায় অনেক কম ছিল। তবে ইম্পাহানী, দাউদ, আবদুল রহমান হাসেম কাসেম দাদা প্রভৃতি বিশাল ধনিকশ্রেণী ভারত থেকে বিস্তারিত নিয়ে পাকিস্তানে চলে যান। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে এই জমিদার শিল্পপতি জোট রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইতিহাসের ছত্র মাথেরে জানেন যে উনিবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শাসকেরা অধীনস্থ দেশগুলির মধ্যে তাদের নির্ভরযোগ্য এবং চির অনুগত যে শ্রেণীর জন্ম দেয় তাই হলে রাজা মহারাজা নবাবদের ভূস্বামী শ্রেণী। জন্মসূত্রেই এই শ্রেণী বিদেশী সাম্রাজ্য-স্বার্থের সমর্থক।

সুতরাং নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় শোষণের ব্যবস্থা অটুট থাকে, অপরদিকে জমিদার পুঁজিপতি জোটের শাসকশ্রেণী পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ওপর সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ কালেক্ট করে। এই ভাবে পূর্ববঙ্গের সম্পূর্ণ শোষণ করার জন্যে তারা চারটি প্রধান উপায় অবলম্বন করে।

প্রথমতঃ এটা জানা আছে পূর্ববঙ্গের কৃষিজাত পণ্যের উৎস্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উৎস্ব পাওনা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশেষ করে স্বাধীনতার কোরীয় যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন প্রকল্পগুলির দরুন পূর্ববঙ্গের এই উৎস্ব বিশাল আকার ধারণ করে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তান এই সমস্ত বাণিজ্য ঘাটতি

এলাকায় পরিণত হয়। সুতরাং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুটো সম্পূর্ণ আলাদা অর্থনীতিকে এক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে আটকে রেখে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের সমগ্র উৎস্ব (বিদেশী মুদ্রায় প্রায় পাঁচশ কোটি টাকা) আত্মসাৎ করে। এবং আন্তর্জাতিক বিনিময় হারের ভারতম্যের সুযোগে আমদানী লাইসেন্স বাবদ আরো প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তান কেড়ে নেয়।

দ্বিতীয়তঃ রাজস্ব ও মূলধনী বাজেট বরাদ্দে অসম বন্টন করে এবং আমলাতান্ত্রিক চাতুরী, অহেতুক বিলম্ব ও প্রকল্প মঞ্জুর করতে গড়িমসি করে কেন্দ্রীয় পাকিস্তানী সরকার পূর্ববঙ্গকে বঞ্চিত করে। একমাত্র রাজস্ব বাজেটে কারচুপি করে প্রতিবছর পূর্ববঙ্গ থেকে একশ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে টেনে নেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ সরকারী প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বিনিয়োগ হাতবদল করার নীতি কার্যকরী করে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ শিল্প কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফলে সরকারী ব্যয় বাবদ যে আয় ও চাকুরী সংস্থান ঘটে তার নব্বই শতাংশই পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাগে চলে যায়। সরকারী সামরিক বেসামরিক কাজে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকানাধীন শিল্প ব্যবসায়েও বাঙালীদের আয় ও চাকুরী সংস্থানের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

চতুর্থতঃ ঔপনিবেশিক কায়দায় পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানী পণ্যের দাম কমিয়ে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ববঙ্গে রপ্তানী পণ্যের দাম চড়িয়ে অসম বাণিজ্যের মারফতে পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ থেকে ক্রেতাদের পকেট শূন্য করে কোটি কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা ঘরে নিয়ে যায়। ফলে উদীয়মান বাঙালী মধ্যশ্রেণীগুলি এবং নবীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাঁদের সামনে বিকাশের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হয়ে গেছে দেখতে পায়।

স্বভাবতঃই এই নবীন, উদীয়মান শ্রেণীগুলি এর থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে। প্রথম তার প্রকাশ ছাত্র আন্দোলনে, কৃষক বিক্ষোভে এবং পরে ১৯৫৪ সালে যুদ্ধফ্রন্টের বিপুল জয়লাভের মধ্যে তা পরিষ্কৃত হয়ে উঠে।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী জমিদার পুঁজিপতি শ্রেণী জানে যে পূর্ব বঙ্গের বাণিজ্য উৎস্ব ও অন্যান্য ধরনের শোষণজাত মুনাফা বন্ধ হলে পশ্চিম পাকিস্তানে যে শিল্পভিত্তি গড়ে উঠেছে তা ধ্বংস পড়বে। এবং নতুন নতুন শিল্প বিকাশের রাস্তা বন্ধ তো হবেই, এ যাবত প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানী করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

তাই তারা খোলাখুলি ভাবে

সংসদীয় গণতন্ত্র তুলে দিয়ে স্বাধীন শ্রেণীর সামরিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল।

একথা বোঝা দরকার বর্তমানে পাকিস্তানের যে আর্থিক বিনিয়োগ গড়ে উঠেছে তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য এমনভাবে বিন্যস্ত যে কোনরকম সুবিচার করার ইচ্ছে থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের হাতে আর সে সুযোগ নেই। হয়ত বা আর্থিক আয়ের খানিকটা বেশী পূর্ববঙ্গকে তারা দিতে পারেন, কিন্তু শিল্পভিত্তি সংগঠনের দরুন সবটাই পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে গিয়ে জমা হবে। কারণ কাঁচামালের বা যন্ত্রপাতির দরুন আমদানীর সিংহভাগ পাবে ইতিপূর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, তাইই আবার রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্য ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পণ্য যোগান দেবার ক্ষমতা রাখে। তাই পূর্ব অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের সমস্ত ব্যয়বরাদ্দ পশ্চিম পাকিস্তানের হাতেই জমা হবে। পাকিস্তানী অর্থনীতির বিনিয়োগ এভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে।

সুতরাং পূর্ববঙ্গের বাঙালীদের যদি আত্মবিকাশের পথ খুলে দিতে হয়, যদি তাঁর চিরস্থায়ীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের “জলতোলা কাঠ কুড়ানোর” দঙ্গসহ জীবন যাপন করতে অনিচ্ছুক হন তাহলে তাঁদের স্বতন্ত্র, সার্বভৌমত্বের দাবীর ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে। আজ না পারলেও, একদিন না একদিন ইতিহাস এভাবে তাঁদের কাছ থেকে কঠোর মূল্য আদায় করে নেবে।

আজ বাংলাদেশের সংগ্রাম তাই একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। এবং এই সংগ্রামের নেতৃত্ব উদীয়মান শ্রেণী ও জাতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হাতে ন্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ ও বিশ্ব সাম্রাজ্য স্বার্থের শোষণের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের জনগণ জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত। এ মুক্তিসংগ্রাম সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের সমর্থন পাবার যোগ্য।

অন্যদিকে আজকের দিনে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নেতৃত্ব যে চূড়ান্ত জয়ে আত্মবিশ্বাস নয়, তারা যে আপোষকারী একথা পরিষ্কার না থাকলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামীরা সংকট মুহূর্তে বিহবল, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারেন।

বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগে, যে কোন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিক ও গ্রামীণ সর্বহারা শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্ব ছাড়া চূড়ান্ত বিজয় অসম্ভব। এবং একমাত্র শ্রমিক ও গ্রামীণ কৃষকশ্রেণীর যৌথ নেতৃত্ব পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিক, কৃষক শ্রেণীকে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি জমিদার জোটের বিরুদ্ধে মিত্র হিসাবে পাশে পেতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সমর্থন বাংলা দেশের জাতীয়

(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

Introduction :

With a view to serve ever expanding Indian Industries, we offer to our industrial and domestic consumers "BIDYUT" brand, trouble free, quality "Heat Sealing Machine" for Alkathene, cellophane, aluminium foil, waxed and paraffin laminated papers and all other materials which are capable of being thermally sealed.

UP TO DATE HEAT SEALER

The "BIDYUT" hand set heat sealer is elegant in appearance and handy to use. Suitable for A.C./D.C. current. It is portable to enable it to be carried to where it is to be used. It is engineered for effective and efficient sealing of packets or bags which are unwieldy because of their weight or dimensions and for sealing long joints and seams.

Manufactured by BIDYUT ELECTRONICS.
Marketed by ANBI TRADING COMPANY
61, MOTT LANE, 1ST FLOOR, CALCUTTA-13

ইয়াহিয়া-ইন্দিরা ও বাংলা দেশ

শ্রবীর বসু

বাংলা দেশের পূর্ব দিগন্তে ঝড় উঠেছে। এই ঝড়কে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল একদিকে যেমন ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর বর্বরতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে অপরদিকে মুক্তি ফৌজ নামধারী বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর বীরত্বকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এই নিন্দা ও অভিনন্দন এত বিচিত্র জায়গা থেকে আসছে যে সাধারণ রাজনৈতিক মানুষের কাছেও তা খানিকটা বিদ্রান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য, যেমন বিদ্রান্তি হয় যখন কোন চোর প্রতিশ্রুত্ববী চোরের বিরুদ্ধে চৌকসবস্তির অভিযোগ আনে।

ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে যে ভারতীয় দলগুলো আজ সবচেয়ে বেশি রণ-হুংকার দিচ্ছে, সেই স্বতন্ত্র, জনসংঘ থেকে কংগ্রেসের আদি ও নব দুই সংস্করণই ইয়াহিয়াকে গণতন্ত্রের শত্রু বলে অভিহিত করেছে। ভাবখানা এমন যেন স্বতন্ত্র, জনসংঘ বা কংগ্রেস হলো গণতন্ত্রের মূর্তপ্রতীক। একটা ব্যক্তি অবশ্য ঐ ভারতীয় দলগুলো হাজির করবে যে ইয়াহিয়া গণতন্ত্রের শত্রু হতো না যদি না পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব কোন সাম্যবাদী দলের হাতে থাকতো, কারণ সাম্যবাদীরা তো কংগ্রেস মার্কা অর্থাৎ বুর্জোয়ামার্কা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, সুতরাং তাদের নিধনে কোন পাপ নেই। যদি পূর্ব বঙ্গের আন্দোলনের নেতৃত্ব সাম্যবাদ বিরোধী মুজিবের বা কিছু প্রান্তিক বাঙালী সেনার হাতে না থাকতো, থাকতো শুধুই কমিউনিস্ট ডোহা বা ভাসানী সাহেবের নেতৃত্বে, তাহলে হয়তো ইন্দিরাকে মদত দিতে হতো ইয়াহিয়াকে, স্বতন্ত্র জনসংঘ আদি নব কংগ্রেস সকলেই তখন বাংলাদেশের মুক্তিফৌজকে “সম্ভ্রাসবাদী ফৌজ” নামে আখ্যা দিতো এবং পশ্চিমবঙ্গকে সাম্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষার অজুহাতে রাতের অন্ধকারে দুই বাংলার সীমানা দিয়ে ইন্দিরার মর্টার আর এ্যাণ্টি এয়ার ক্রাফ্ট ইয়াহিয়ার “ল এন্ড অর্ডার” বাহিনীর হাতে পৌঁছে যেত।

এ কি কষ্ট কল্পনা? না, আমাদের সামনেই দৃষ্টান্ত। তাকিয়ে দেখুন সিংহলের দিকে। এখানে প্রধানমন্ত্রী মিসেস বন্দরনায়ক ক্ষমতাসীন এবং “গণতন্ত্রের মিত্র”। কেন? যেহেতু ঐ দেশে সাম্যবাদীদের বড়ো একটা অংশ সাম্রাজ্যবাদী দালাল সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ নিয়েছে, সেখানে সরকারী মদ্যপত্র স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বিপ্লবী সম্ভ্রাসবাদীদের আক্রমণ করতে গিয়ে বন্দরনায়কের সেনাবাহিনী যখন ভারত ও ইংরেজ সরকারের সদ্য দেওয়া হেলিকপ্টার থেকে নীচে বোমাবর্ষণ করছে, তখন সাধারণ নিরপরাধ মানুষও মারা যাচ্ছে। সিংহলের চারপাশের জলপথে ভারতীয় নৌবাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাতে কোন অহিংশ্রম্, সিংহলী বিপ্লবীদের সাহায্যে না ঢুকতে পারে।

পূর্ববঙ্গ ও সিংহল দুজায়গায়ই নিরস্ত্র জনসাধারণ মারা যাচ্ছে সরকারী ল এন্ড অর্ডারের বোমা, কামান ও মেরিনগানে কিন্তু একক্ষেত্রে ভারত সরকার মানবতার ধুরা তুলছে গণতন্ত্রের নামে, অন্যক্ষেত্রে মানুষ নিধন-যজ্ঞে সহায়তা করছে গণতন্ত্রের নামে। একজায়গায় পাকসরকার তার বর্বরতাকে ঢাকছে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-জনিত তথাকথিত “ল এন্ড অর্ডারের ধুরা তুলে অন্য জায়গায় বন্দরনায়ক সরকার ল এন্ড অর্ডারের ধুরা তুলে সেনাবাহিনীর বর্বর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুর তফাত আছে? নেই, এক বিন্দুও নেই, বিশেষ করে শোষণশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে। ইন্দিরা সরকারও ল এন্ড অর্ডার-এর মিলিটারী দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে রক্ষা করছে, কোলকাতায় ও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলের অনুগামী বিশেষ করে নকশালদের হত্যা করছে শত শত, অজস্র গ্রেপ্তার করছে বিনা বিচারে আটকে রাখার গণতন্ত্র প্রয়োগ করে, পদূলিকে প্রয়োশনের ঘৃষ দিয়ে লেলিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী জনসাধারণকে চোরাগোস্তা খুন করবার জন্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে ল এন্ড অর্ডারের নাম করে মিলিটারী পদূলি দিয়ে বিক্ষুব্ধ বা বিপ্লবী জনসাধারণকে হত্যার ইন্দিরা ও ইয়াহিয়ার তফাৎ রয়েছে। তফাৎ যেটুকু রয়েছে সেটা হলো মাত্রার ও ব্যাপকতার। আবার ইন্দিরা ও সিরিমোভা বন্দরনায়কের মধ্যে তফাৎ তো নেইই, বরং সক্রিয় বর্বর সহযোগিতা রয়েছে।

দুই প্রশ্ন জাগে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবীদায়কে দমন করাতে ইন্দিরা ও ইয়াহিয়ার যদি কোন অমিল না থাকে, তবে কেন পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক সংহিস আন্দোলনকে ইন্দিরা তথা ভারতীয় সামন্ত ও পুঁজিপতি শ্রেণী সমর্থন করেছে? কোন স্বার্থের প্ররোচনার না প্রেফ মানবতার দিক থেকে?

এ প্রশ্নের জবাবের আগে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক আন্দোলনের প্রকৃতি বোঝা দরকার। ১৯৪৭ সালের দাঙ্গা ও বাংলা বিভাগের পর পূর্ববঙ্গে অর্থনৈতিক শ্রেণীগত কোন পরিবর্তন হয় নি; শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক রদবদল হয়েছে মাত্র। ১৯৪৭ সালের আগে অর্থাৎ অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে যে একচেটিয়া পুঁজিবাদ অ্যাংলো মার্কিন পরাক্রম পুঁজিবাদের ছহায়ায় গড়ে উঠেছিল, তাতে হিন্দু মালিকানার পরিমাণ ও পরাক্রম মুসলিম মালিকানার তুলনায় অনেক অধিক ছিল, ফলে একচেটিয়া পুঁজিবাদের হিন্দু-মালিকদের নিকট প্রতিশ্রুতিবতায় মুসলমান মালিকগণ অনেকটা দুর্বল ছিলেন। একই ইংগমার্কিন প্রভুর ঘরে মুসলিম পুঁজিবাদী দুর্বলতা মুসলিম মধ্যবিত্ত নেতাদের পাকিস্তান দাবীর দিকে নিয়ে যায় উপমহাদেশের বাজারে একাধিপত্যের নির্দিষ্ট অংশ

পাওয়ার আকাশকায় অর্থাৎ ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র হলে মুসলিম একচেটিয়া পুঁজিবাদের নিজস্ব বাজার হবে, নিজস্ব শোষণক্ষেত্র হবে যেখানে বিড়লা টাটা ডালিমিয়া সাহুজেন প্রমুখ হিন্দু পুঁজিবাদের প্রভু বা অর্থনৈতিক পরাক্রম থাকবে না। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়া এদিক থেকে হিন্দু একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণক্ষেত্রে সীমিত হওয়ার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হিন্দু একচেটিয়া পুঁজি বেকারগণের তার শ্রেণীস্বার্থে ভারতবিভক্তি পছন্দ করেনি। কিন্তু ইংরেজ একচেটিয়া পুঁজির লক্ষ্যই ছিল হিন্দু একচেটিয়া ও মুসলিম একচেটিয়ার মধ্যে ঝগড়া জ্বাইয়ে রাখা এবং সে লক্ষ্যে মুসলিম একচেটিয়া বরাবর ইংগ-মার্কিন একচেটিয়াকে প্রলুপ্ত করেছে। পাকিস্তান জন্ম নিয়েছে ইংরেজ একচেটিয়া ও দুর্বল মুসলিম একচেটিয়ার যৌথ ষড়যন্ত্রে এবং ভারতীয় সামন্ত শ্রেণীর সক্রিয় সহযোগিতায়; ভারতীয় হিন্দু একচেটিয়া ইংগ-মার্কিন প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারে নি শোষণব্যবস্থার ক্ষমতা হস্তান্তরের তাত্ক্ষণিকতায় এবং হিন্দু সামন্ত প্রভুরের চাপে।

যে সকল ঐতিহাসিক কারণে অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সংগে গাটছড়া বাঁধা ভারতীয় একচেটিয়ার অভ্যন্তরে মুসলিম একচেটিয়া হিন্দুদের তুলনায় দুর্বল ছিল, অনুদূপ ঐতিহাসিক কারণে অবিভক্ত ভারতে বাঙালী একচেটিয়ার উপস্থিতি ও পরাক্রম নগণ্য। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যদিও বা কেউ কেউ এগিয়ে ছিল, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তাও ছিল না।

আবার ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশে হিন্দুদের অর্থনৈতিক অবস্থান মুসলমানদের তুলনায় ভালো। পূর্ববঙ্গে সামন্তশ্রেণীতে হিন্দু একাধিপত্যের খবর আমরা অনেকেই জানি, গরীব চাষী হিসেবেই বাঙালী মুসলমানরা পরিগণিত হতেন। এমনকি অবিভক্ত বাংলার উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে মুসলিমদের প্রায় অনুপস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়, নিম্ন-মধ্যবিত্তদের মধ্যে মুসলিম উপস্থিতিও মাত্র গত স্বাভাবিক মহাধুমধের সময় থেকে। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে অনুপস্থিতির অন্যতম সাক্ষ্য হলো বাংলা উপন্যাসের বাঙালীর চরিত্র-চরণে মুসলমান নায়ক বোধ হয় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অবিভক্ত বাংলার কোন গ্রন্থিতযশা হিন্দু সাহিত্যিক ও শিল্পী নিয়ে আসতে পারেন নি, একে -হিন্দু মধ্যবিত্তের চাপা-মুসলিম-অবজ্ঞা বলেও অনেকে ব্যাখ্যা করতে পারেন, তবে আমাদের মনে হয় এর মূল কারণ মুসলিমদের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস। হিন্দু গরীব চাষী নিয়েই বা উপন্যাস বা ছোটগল্প তেমন কোথায়?

বাংলাদেশকে কেটে দৃভাগ করায় হিন্দু একচেটিয়াবাদের যে ক্ষতিটুকু হয়েছে, তা ভারত বিভাগের ক্ষতির

সমতুল্য, রাজনৈতিক লাভ হয়েছে অনেকটা, কারণ অবিভক্ত বাংলার প্রাথমিক কৃষক আন্দোলনের জ্ঞানী চরিত্র বরাবরই সাম্রাজ্যবাদী ও তার তাবৈদ্য শোষণশ্রেণীর দৃষ্টিচ্যুততার কারণ ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি ও সাংপ্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো উক্ত প্রাথমিক কৃষক আন্দোলনকে ছুরিকাঘাতের সামিল।

অপর পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোলাম জিন্নাসাহেব যে ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠন করে গেছে, তাতে মুসলিম একচেটিয়াবাদ ও মুসলিম সামন্তশাহীর যৌথ শোষণের ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করা হয়েছে। অবিভক্ত ভারতের মুসলমান একচেটিয়াবাদের বোম্বাই তৈরী হয়েছে করাচী ও অম্বুদা ইসলামবাদে। আর ইংগ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল উক্ত পশ্চিমপাকিস্তানী একচেটিয়াবাদ পূর্ববঙ্গে একটি উর্বর শোষণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছে।

অবাধ শোষণের এই সুযোগে সমৃদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-চক্রকে পূর্ববঙ্গের নবগঠিত মুসলিম সামন্তশাহী ও নপুংসক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী অভিনন্দন জানিয়েছিল। এ কথা শেখ মুজিবর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নিজস্ব জবানবন্দীতে স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন ছাত্র জীবন থেকেই মুসলিম লীগের পতাকাভালে তিনি জিন্নাসাহেবের পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য “সংগ্রাম” করে এসেছেন। যে বাঙালী মুসলিম ধনী কৃষক, স্বাভাবিক মহাধুমধকালীন হঠাৎ ফেপে ওঠা ব্যবসায়ী, কনট্রাক্টর, কালোবাজারী বৃদ্ধি-জীবী সম্প্রদায় এবং সরকারী উচ্চ কর্মচারীরা সৈদীন পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তাঁদের আশু লক্ষ্য ছিল-তিনিটি (ক) হিন্দু জোতদারদের বিতাড়িত করে সেখানে ধর্মের জিগীরে নিজেদের সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণকে কার্যকর করা, (খ) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নতুন তৈরী হওয়া মুসলিম মধ্যবিত্তদের স্থাপিত করা, (গ) পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়াবাদের সংগে হাত মিলিয়ে ইংগ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক শোষণে অংশীদার হওয়া। সুরাবদী ও মুজিবর সাহেবের পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল এই।

কিন্তু স্বাভাবিক ও ভূতীয় লক্ষ্যই বিবাদ বেঁধে গেল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক চক্রের সংগে উঠতি বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। চাকুরী বাকুরী, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অর্থাৎ বর্তমান ক্ষয়িক্ষয় সমাজ ব্যবস্থায় গরীব মুসলিম কৃষক ও শ্রমিককে শোষণ করবার অধিকার বাঙালী মধ্যবিত্ত কতটা পাবে আর অবাঙালী মধ্যবিত্ত কতটা পাবে—এই নিয়েই লেগে গেল ঝগড়া। এ ঝগড়ার প্রথম বিস্ফোরণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে-ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান ছয় বৎসরের মধ্যেই ভাষার ভিত্তিতে বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। মনে রাখা দরকার ভাষা-আন্দোলন মূলতঃ পেটিবুর্জোয়া আন্দোলন, প্রাথমিক-কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রামের আন্দোলন নয়। ভাষা আন্দোলনের পর পরই ধর্মের জিগীর

তোলা পার্টি মুসলিম লীগ পূর্ববঙ্গ থেকে মুছে গেল।

বিক্ষুব্ধ বাঙালী মধ্যবিত্ত পেটিবুর্জোয়া তখন থেকেই পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবীতে সোচ্চার হতে আরম্ভ করলো, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার স্থান নিল নতুন ধরণের সাম্প্রদায়িকতা বাঙালী প্রাদেশিকতাকে কেন্দ্র করে। সুরাবদী সাহেবের সংগে লেগে গেল পশ্চিম পাকিস্তানী ধনকুবেরদের। পশ্চিম পাকিস্তানী ধনকুবেররা তখন মিলিটারী শক্তি প্রয়োগ করে আম্রুব খাঁকে দিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্তদের শাসনস্তা করতে চাইলেন।

এই পটভূমিকায় বিক্ষুব্ধ বাঙালী মধ্যবিত্তদের নেতা মুজিবর ও সুরাবদী সৃষ্ট আওয়ামী লীগ জন্ম নিল। পরবর্তী ইতিহাস আমাদের জানা—আম্রুবের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের কৃষকগণ হিংসাত্মক আন্দোলনে নামলেন ভাসানীর নেতৃত্বে। মুজিবর তখন উচ্চকণ্ঠে ভাসানীকে “দেশদ্রোহী” “পাকিস্তানের শত্রু” বলে আখ্যা দিয়ে হিংসাত্মক আন্দোলনকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করতে আরম্ভ করলেন, অপর দিকে প্রেসিডেন্ট আম্রুবের নিকট “গণতান্ত্রিক অধিকার” পাবার জন্য কাকুতি মিনতি চাইবার চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন। নাটকীয়ভাবে আম্রুবের পদচ্যুতি ঘটিলে ইয়াহিয়া খাঁ গণতান্ত্রিকতার অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কৃষক বিদ্রোহ দমনার্থে পাক ফৌজ পাঠালেন। ইয়াহিয়া খাঁকে তখন পূর্ববঙ্গ থেকে প্রথম অভিনন্দন জানালেন “বংগবন্দু মুজিবর”। ভাসানীও ভক্ত পেয়ে আন্দোলন ধামিয়ে দিলেন। তার পার্টির সম্পাদক তোহার সংগে ভাসানীর রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটল।

তিন এর পরের দৃশ্য খুবই সাম্প্রতিক। মুজিবরের আওয়ামী লীগ পূর্ববঙ্গের উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মদ্যপাত্র হিসেবে প্রাথমিক কৃষক শোষণ ব্যবস্থায় অবাঙালীর সংগে বাঙালীকে এক পৃথিভিতে বসাতে চাইলো। ছয় দফা দাবী তার সাক্ষ্য। প্রাদেশিক স্বাভাবিক দাবী তোলা হলো ঐ যুক্তিতে, যে যুক্তিতে এককালে মুসলিম একচেটিয়াবাদ হিন্দু একচেটিয়াবাদের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করবার (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

৯ চাঁদার হার

বার্ষিক পনেরো টাকা
ষাশ্মাষিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাফাঁড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার ঠিকানা :
৩১, মঠ লেন, কলি-১৩

পূর্ববঙ্গের জন্য খুনীদের এত দরদ কেন?

পশ্চিম বাংলার সচেতন জনসাধারণ যদি অল্প কিংবা বধির না হন তবে মাত্র কয়েক বছর আগের ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো-নাসাদিত্যন সামরিক জুস্টার ভয়াবহ নরমেঘ যজ্ঞের কথা এই মূহুর্তে বিস্মৃত হবেন না। বিস্মৃত হবেন না জাকার্তার রাজপথগুলিতে স্তম্ভীকৃত গলিত শবদেহের কথা—ডোম আর ধাংগরের অভাবে যে গলিত শবদেহগুলি জাকার্তার আকাশ-বাতাস ভারী করে রেখেছিল এক বছরেরও বেশী, শকুনে শকুনে ছেয়ে ফেলেছিল সমস্ত জাকার্তার আকাশ আর রাজপথ। ঐ মৃতদেহগুলির মধ্যে ছিল কর্ণেল উনতুং থেকে সরল ও অশ্ববিস্বাসী সাম্যবাদের পথিকরা, ছিল বহু সরল বিশ্বাসী প্রগতিশীল সোস্যালি ডেমোক্রেট, ছিল সাধারণ বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষক, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার এবং আইনজীবীর দল। দক্ষিণ জাভার জীবন্ত নরপিষাচ নাসাদিত্যনের নেতৃত্বে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সারা ইন্দোনেশিয়ার দশ লক্ষ মানুষকে খুন করা হয় সি আই এ পরিচালিত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তারপরই ইন্দোনেশিয়ার আকাশে দলে দলে শকুনের ভীড়। সেই শকুনের দলে সেদিন কারা বোণ দিচ্ছে?

এ-হেন ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান সরকারের দম্ভমুণ্ডের কর্তা কিন্তু তদানীন্তন সুহার্তো-নাসাদিত্যন জোট। সেই নরহত্যারকর দল আজ পূর্ব-বাংলায় ইয়াহিয়ার নরমেঘ যজ্ঞের নিন্দা করেছে। নিন্দা করেছে সোভিয়েত রাশিয়া—সারা ওয়রশ চুক্তির অজুহাতে চেকো-স্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ড এই সেদিন দখলদারী ফৌজ পাঠিয়েছে। ইয়াহিয়ার নরমেঘ যজ্ঞে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া-লাওস-এ শতাব্দীর ঘৃণিত পৈশাচিক নরহত্যার নিজে মতে রয়েছে। আর ইয়াহিয়ার নরমেঘ যজ্ঞের বিরুদ্ধে মূহুর্তে মূহুর্তে হুংকার, আশ্ফালন এবং জলসার হাট বসিয়েছে ভারত সরকার—যে ভারত সরকার গণতন্ত্রের ঘোমটা পরে পুলিশ-গন্ডা মিলাটারি এবং এজেন্ট প্রভোকেটরদের সাহায্যে পশ্চিম বাংলার জনজীবনকে জংলী হাসে ভরে দিয়েছে। পূর্ববাংলার রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে এই সমস্ত যোগাযোগ কি নিতান্তই আকস্মিক?

সাম্রাজ্যবাদ এবং সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আর তার আন্তর্জাতিক গোলামের দল, খুনি সুহার্তো-নাসাদিত্যন জোট সহসা পূর্ববাংলার ব্যাপারে এতটা দরদী হয়ে উঠল কী কারণে? নরহত্যা আর লুণ্ঠনের শব সাধকরাই বা কেন সহসা আজ নরহত্যা আর লুণ্ঠনে বিচলিত হয়ে পড়ল? ঐ সব খুনি আর খুনের সাক্ষরদেয় কি রাতারাতি সব সাধ হয়ে গেল?

যে-কোনো সামরিক ব্যাপারে তার রণনীতি ও রণকৌশল সম্পূর্ণভাবেই তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্ব রণনীতি এখন সুদৃষ্ট দুইটি ভাগে বিভক্ত। একটি অভ্যুত্থানমূলক, সামরিক বা অসামরিক ক্যুপ-ধর্মী; অপরটি দীর্ঘস্থায়ী জনবুদ্ধিমূলক, যা মূলতঃ পিপলস ওয়র। বিশ্ব রণনীতির এই দুই সুদৃষ্ট বিভাগ কোনো আকস্মিক কারণে ঘটে নি, ঘটেছে বিশ্বরাজনীতির ঐতিহাসিক প্রবাহকে অনুসরণ করেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মহান লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ছুঁমির অভ্যুদয়ে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ পদানত জাতিবর্গের বকে জ্বলে উঠেছিল স্বাধীনতার মশাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মহান চীন ভূখণ্ডের মুক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ-রণনীতি রণকৌশল। সত্তর কোটি চীনা জনগণ কুওমিন্টাংয়ের বিশ্বাসঘাতকতা আর ইং-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে চরমার করে, জাপানী আক্রমণকে বিধ্বস্ত করে মুক্তি অর্জন করল—যে মুক্তির পেছনে ছিল কমিউনিস্ট

বোলই এপ্রিল সংখ্যার দশম পৃষ্ঠায় গ্রীষ্মদেশ রজন সিংহের “এরা কোন লক্ষ্যায় গলাবাজি করছে” শীর্ষক চিঠিখানি একটি বাংলা প্রবাদকে মনে পড়িয়ে দিল।

গ্রীসিংহ কংগ্রেস, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস নেতা এবং অমৃত-বাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকাগুলোর উপর খুব একচোট ঝাল বেড়েছেন বাংলা দেশের সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষ্যে তাদের “গদগদ” ভাব আর “কাহ্না” দেখে। তাঁর একতরফা সমালোচনা প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য, বাংলাদেশে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছে তা ইতিহাসের এক অতুল-নীর অধ্যায়। তার মধ্যে কোন নোংরা রাজনীতি নেই। অন্তত এখন পর্যন্ত নেই। তাকে যারা সমর্থন করছে, বিশেষ করে ভারত, তের এবং পশ্চিমবঙ্গের তরফ থেকে, করছে প্রধানতঃ দুই কারণে।

(এক) এমন ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান, দেশের জন্য সমগ্র জাতির ঐক্যবন্ধ মরণপণ সংগ্রাম বাঙালীর জাতীয় জীবনে আগে কখনো দেখা যায় নি। যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং কল্-যতাহীন স্বজাতি ও দেশপ্রেমিকতার অভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী আজ ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত, ওপার বাংলায় তার সার্থক রূপায়ণের প্রতিচ্ছবি বাঙালী মাত্রেই চিস্তাকে উদ্বেলিত না করে

পার্টির নেতৃত্ব, নয়া গণতান্ত্রিক মোর্চা এবং জনবুদ্ধির জ্ঞান।

ঔপনিবেশিক কিংবা নয়া-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের, যে কোনো রূপই হোক না সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-কাঠামোর বিরুদ্ধে সামরিক কিংবা অসামরিক অভ্যুত্থানমূলক অভ্যুত্থান চালিয়ে চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না, কারণ সাম্রাজ্যবাদী সংগঠন এদিক থেকে অনেক বুল-শালী। সদৃশ নেতৃত্বে ইন্দো-

মতামত

নেগার জনগণ ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদকে একদা খোঁটিলে বিদায় করেছিল; কিন্তু স্বাধীনতা চলে গেল সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের হাতে—সুহার্তো-নাসাদিত্যনের হাতে, ইন্দোনেশিয়া মূলতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবলিত হলো নয়া-ঔপনিবেশবাদী চক্রান্তে। কুখ্যাত কংগ্রেস যুদ্ধে নরপিষাচ শোষে প্যাঁচ লুণ্ঠনকে যে পরাজিত করতে পেরেছিল তার কারণ পেছনে

ছিল বোজাজানদের মদত। সাম্রাজ্যবাদ নিজেরই স্বার্থে ঐ অভ্যুত্থানকে পেছনের দরজা দিয়ে সাহায্য করেছিল। যদি সামরিক অভ্যুত্থানগুলিরই পরিণতি এরকম হয় তবে অসামরিক অভ্যুত্থানগুলির পরিণতি যে আরও ভয়াবহ হবে এবং এই সামরিক বা অসামরিক অভ্যুত্থানগুলি যে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের প্রলম্ব করবে পূর্ব-বাংলার ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়া-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া সহ ভারতের গা টেপাটোপ তারিহী অস্ত্রান্ত প্রমাণ।

এ-যুগে স্বাধীনতার যুদ্ধে জনবুদ্ধি পরিণত হতে বাধ্য। ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া-লাওস-এ এর জ্বলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে। পূর্ব-বাংলার ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা যুদ্ধ যাতে জনবুদ্ধি পরিণত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের নিরাশ করতে না পারে তার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী জোট ইয়াহিয়া বিরোধী নিন্দা ও আশ্ফালনের জোয়ার বইছে।

অমৃতবাজার সেন

এদের ‘গলাবাজী’র দরকার ছিল

পারেনি। ওপার বাংলার সংগ্রামী মানুষেরা আমাদের সহানুভূতি এবং শ্রম্মা জয় করে, নিয়েছেন আপন গৌরবে।

(দুই) বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের ব্যাপক গণহত্যার নীতি একদিন এবং অচিরেই ভারতকেও নানা সমস্যায় জর্জরিত করে তুলবে যদি সর্বকম প্রচেষ্টার স্বারা এ রক্তস্রোত বন্ধ করা না যায়।

বাংলা দেশের সংগ্রামী মানুষদের আজ পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের সহানুভূতি, স্বীকৃতি এবং সাহায্য পাওয়া সবচেয়ে জরুরী দরকার। আর তা যে তাঁরা কিছু পরিমাণে পাচ্ছেনও তা প্রধানতঃ এইসব বুদ্ধোন্নত পত্রিকাগুলোর আশ্রয় প্রচারের ফলেই, তাই নয় কি? এরা যদি “গলাবাজি” করে বিশ্বকে, ভারতকে, পশ্চিমবঙ্গকে ও-বাংলার পুণ্ডান্দপুণ্ড সংগ্রামের ইতিহাস না শোনাতে, ছবিতে লেখার সে দেশের প্রতিদিনকার ঘটনার বিবরণ না তুলে ধরতেন, তবে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত এমন উত্তাল হয়ে উঠত কি? রেডিওতে সফিক্ত সময়ের মধ্যে আর কতটুকু খবর বলা যায়? তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী ঘটনা ঘটে চলেছে এবং সেগুলো প্রচার করে, সম্পাদকীয়তে তীব্র, তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে যুগান্তর, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, দেশ, অমৃত লক্ষ লক্ষ

মানুষকে বিচলিত, উদ্বেগিত করে তুলেছে। এরা স্বদেশীয় রাজনীতি কিংবা কূটনৈতিক ব্যাপারে একেবারে খোলা তুলসীপাতা তা কেউ বলবে না। কিংবা কংগ্রেস অথবা সি পি আই কিংবা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও আমার বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব নেই। কিন্তু পশ্চিমবাংলার ভুল রাজনীতির একটার পর একটা ভুল তারা করে ফাঁদে আটকেপুটে জড়িয়ে গিয়ে চলেছেন বলে, কখনো ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে একটা ভাল কাজ করলে কিংবা একটা ভালো কথা বললেও, তাকেও অবিশ্বাস আর সন্দেহের চাঁখে দেখে, সমালোচনায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে—মানুষের শ্রুতিবিশ্বের উপর এতখানি আস্থা হারিয়ে ফেলবার কোন বুদ্ধি আমি দেখতে পাইনে।

কটু সমালোচনা একটু কম হলে হয়ত দেখা যাবে ওপার বাংলার নিষ্কলঙ্ক জাতীয়তাবোধ ইতিহাসের নিয়মে এপার বাংলার মানুষের মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছে এবং আশ্রয়লহে, পারস্পরিক নিন্দায় ও কুৎসায় জর্জরিত, বিদ্রোহ এপার বাংলার বাঙালী-রাও ঐক্যবন্ধ হতে, ভালোবাসতে শিখছে। আর এটা যে আমাদের এখন কত দরকার তা কি আপনারা বোঝেন না?

কণা সেন

প্রতিবিলম্বীরাও গলাবাজী করছে কেন

পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশে আজ যে সংগ্রাম চলেছে তা নিঃসন্দেহে ন্যায়সঙ্গত। শোষণের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে এ লড়াই। এইজন্য স্বাভাবিক কারণেই ভারত-বর্ষের মেহনতী জনগণ এই লড়াইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন ও সাহায্য করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন। এবং এইভাবেই তাঁরা তাঁদের আন্তর্জাতিকতাবাদী দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষের ঘৃণ্যতম প্রতিবিলম্বীরাও পর্যন্ত এ ব্যাপারে গলাবাজি করছে এবং এমনভাবে দেখাচ্ছে যেন বাংলা-দেশের জনগণের জয় হলে তারা খুব খুশি হয়।

কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে ভারতের শোষণকা কেল-মাত্র ভারতীয় জনগণের লড়াইকেই নয় পৃথিবীর যে কোন দেশের জনগণের লড়াইকেই প্রচণ্ড ভয় পায়—প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জনগণের লড়াইকে তো বটেই। কারণ অন্য দেশের জনগণের জয় এদেশের জনগণকে অল্প ধরতে প্রেরণা জোগাবে। তবে বাংলাদেশের লড়াই-এর প্রতি ভারতীয় শোষণকদের এরকম আচরণের অর্থ কি? ভারত সরকার ও ভারতীয় শোষণকা মোটেই বাংলাদেশের জনগণের জয় চায় না। তবে তারা মুখে এ লড়াইকে সমর্থন জানাচ্ছে প্রধানতঃ তিনটি কারণে। কারণগুলি হলঃ

(এক) ভারতীয় জনগণের কাছ থেকে নিজেদের আসল চেহারাটাকে আড়াল করা।

(দুই) পাকিস্তান রাষ্ট্রকে দুর্বল করা। পাকিস্তান রাষ্ট্র দুর্বল হলে ভারতীয় শোষণকা নিরঙ্গুটে কাম্বোডিয়ায় ভোগ করতে পারবে এবং নিজেদের সম্প্রসারণ-বাদী নীতির একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোণঠাসা করে রাখতে পারবে।

(তিন) সাহায্য করার নাম করে বন্ধুবেশে এ লড়াই-এর ওপর খবরদারী করা, বাংলাদেশে প্রকৃত জনগণের শাসন যাতে কালেম না হতে পারে তারজন্য ওখানকার জনবিরোধী, আপাত প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে মদত দেওয়া এবং বাংলাদেশকে নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করা। ভারত সরকার এই সমস্ত অভিসন্ধিগুলো ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরুর করেছে। “পূর্ব বাংলার ব্যাপারে ভারত নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে, না”—ইন্দিরা গান্ধীর এই ঔষধ্যপূর্ণ উক্তি এবং “বাংলাদেশে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের” স্বপক্ষে যুগান্তর, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্র-

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

অন্যরকম দেখাচ্ছে পদ্মেন্দ্রকে। একেবারেই অন্যমানুষ। টেরিগলিন প্যান্ট, ইম্পোর্টেড শার্ট, সাজাটো-টপীর মতো কপালঢাকা চুলের ঝুল বারান্দা, কুড়ালকাট রঘুঢাকাত জুলাপী, সব মিলিয়ে কিম্বদন্তি উৎকট একটি মনুষ্যমূর্তি। এখন ভাবাই যায় না যে, কিছুদিন আগে ওদের কারখানায় বড় তাল্লা ঝুলিয়ে লক আউট ঘোষণা করেছিলেন কোন এক ধনগবী মালিক। অজুস্ত (দেখে তো তাই মনে হতো) পদ্মেন্দ্রের পকেটে জোর করে গুঁজে দিয়েছিলেন আমার সাধ্যাতীত সাহায্য—দশটা টাকা। সৌদীন ও ছিল স্নিগ্ধমান, নিরাশ। সাকুলার আর জওহরলাল নেহরু রোডের মুখে একটি পোষাকের দোকান অনেকদিন বন্ধ চলাছিল। দুপুরে তাপেও সেই দোকানের সিঁড়িতে কিছু স্নানমুখ মহিলা শ্রমিককে রোজ বসে থাকতে দেখতাম। হতাশ, স্নিগ্ধমান। ওদের দেখে পদ্মেন্দ্রের কথা কতদিন মনে পড়ে গেছে। ভেবেছি ওর খোঁজ নেব। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে নদীর জলের মতো দিন গড়িয়ে গেছে। দেশের পরিস্থিতি পাশ্চাত্যে, বাংলা দেশের সমস্যা আর

সবাকছকে চাপা দিয়ে দৈনিকের পাতা জুড়ে বসেছে। উদ্বেজনার প্রতি মূহুর্ত বনবন করছে। তবু পদ্মেন্দ্রের কথাও মনে পড়েছে প্রায়ই। যাওয়া হয়নি। আজ হঠাৎ দেখা। সম্পর্ক নতুন মানুষ।

বাবাদলের কারভালো সাহেবের ভাণ্ডারে পদ্মেন্দ্র আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি লক্ষ্য না করার ভাগ করছি। যদিও সম্প্রতি এসব ভাণ্ডার আমাকেও খানকটা রপ্ত করে নিতে হয়েছে। পুরোনো চাকরি ছেড়ে এখন একটা নামজাদা বিদেশী ফার্মের সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ করছি, অনেক দৃষ্টিকটু আদবকায়দা তাই জীবিকার খাতিরে আমাকেও শিখতে হচ্ছে। খারাপ লাগে। উপায় নেই। দেশটা স্বাধীন হওয়ার পর এদেশের মানুষগুলো কালা সাহেব বনবার জন্য কেমন আঁকুপাঁকু কম্পিটিশন শুরু করেছে নিজস্বের মধ্যে। কায়দাদরপ্ত

হওয়ার জন্য সর্বশেষ কুপ্রতিভা আমদানির হিড়িক লেগে গেছে যেন সারা ভারত জুড়ে। সর্বভারতীয় হিন্দী ছায়াচিত্রে গিভলি মুরারী নামক আর টোকিও নু ইয়র্ক-প্যারী-মার্কী নায়িকার মধ্যে সেই নব্য ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করে বদ্বতে পারছি, দেউলে কলকাতা এসমস্তরই দারুণ কপি করছে। মাছিমাঝি কেরানীর কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু অবশ্য আশা করাই অনায়াস। “কপি” করাই যার কাজ, সে কপি করাই যাবে। তাতেই উন্নতি তাতেই মোক্ষ। পদ্মেন্দ্র করছে, আমাকেও করতে হবে। বেঁচে থাকতে হলে সবার মাঝে নিজেকে পাণ্ডিত্য করে নিতে হয়। নাহলেই অসংগত। গোটা জাতিই এখন “কপি ইস্ট” হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি একটা রিটিং পেপার না হলে যুগাবর্ত থেকে হড়কে হারিয়ে যাব। অন্তত চাকুরির মুখ চেয়ে আমাদেরও যুগচেতনায় উদ্ভূত হতেই হচ্ছে। কিন্তু এই মূহুর্তে যেহেতু আমি চাকুরির চৌহান্দীর বহির্ভূত, সেজন্য বন্ধুদের মতো নিষ্পাপ মুখ করে পদ্মেন্দ্রের পরিবর্তনটা যেন লক্ষ্যই করিনি এমন একটা ভাব দেখালাম।

পদ্মেন্দ্র হাতটা গুটিয়ে নিল।

বললে, “তোমার ওখানেই যেতাম। ভালই হল দেখা হয়ে।”

“তোদের কারখানা তাহলে খুলল?” প্যান্টের পেটে কামড় দিয়ে প্রশ্ন করি পদ্মেন্দ্রকে।

“না খুলে উপায় আছে! গর্ভমন্ট পলিসিও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হস্তক্ষেপ না করা। এ তো আর তোমার সেই আমলাদের রাজত্ব নয়।” পদ্মেন্দ্র বেশ হুটু-চিন্তে কান্নার কাপে চামচ নাড়ছে, বললে, “এবার অনেক বন্ধ কারখানাই খুলবে।”

খুলবে নাকি? তা হতেও পারে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি একাত্তর সালের কোয়ালিশন সরকারও দিয়েছেন। অবশ্য ভেবে দেখলে, এই প্রতিশ্রুতিটা জনগণই আদায় করে নিয়েছে। সাত-ষাট সালে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় অভাবনীয় পরিবর্তন না এলে, যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রথাবদ্ধ রাজ্য প্রজা সম্পর্কে ত্যাগ করে সরকারী গদী থেকেই গণ-আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার না হলে, ধর্মবীরা সাহেবের শক্ত হাতের খেলায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সর্বনাশ না ঘটে গেলে সরকারী চিন্তায় এইসব উদারনীতির স্থান হত কি না কে বলবে। নবজীবন ও নবচেতনা লাভের সময় ঢের দেরি করেই উপস্থিত হত হয়ত। আসলে একাদিক্রমে একছত্র আধিপত্য

শাসকদলকে বেপরোয়া করে। উন্নততর গণতন্ত্রে তাই ঘন ঘন সরকার পাল্টে জনগণ বেপরোয়া পথ থেকে রাজনৈতিক দলগুলিকে সচেতন করে রাখে। কোনো একটি মাত্র দলকে সুবেদারি দিয়ে বসেন না। নবাবী করার পরওয়ানা অপমৃত্যু মুষ্টিমেয় কতকগুলি সুযোগসন্ধানীর হাতে গচ্ছিত করে দেন না। জনগণ সব সময় এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেন যে, যাচ্ছ যাও, কিন্তু সেবক হয়ে, চাকর হয়ে থেকে; বাড়াবাড় করলে পরের নির্বাচনে বোঁটের সাফ করে দেব। এই ভয়টা মনের মধ্যে গাঁথা না থাকলে কোনো দল বা ব্যক্তি জনকল্যাণের কথা ভুলেও ভাবেন না। আর এটা সর্বত্র এবং সব দেশেই সত্য। প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের, এ সত্য ক্ষমতালোভীদের জানান দিতে হয়। না হলে প্রাণী প্রদাতারই প্রাণ সংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আসলে ক্ষমতা সব সময় সব দেশেই গণদমনের পথে ক্রমশ ঝোঁক নেয়। মানুষের ইতিহাস তাই বার বার হতাশ, প্রবলিত। কোনো দল, ব্যক্তি বা সরকার “জনদরদী” হয় না, জনগণ সচেতন হলে তবেই সরকারী কর্মসূচী জনকল্যাণমূলক হতে বাধ্য হয়। দুর্বল জনগণ শৃঙ্খল নিষ্ঠুর সরকারই সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু আজ আর পদ্মেন্দ্রকে বোধহয় এইসব জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। এক কালে সেও এইভাবেই চিন্তা করত। কলেজে রাজনীতি করত। ফ্যাক্টরীতে ঢুকে ষ্ট্রেড ইউনিয়ন করেছে। এখনও করে কি? ওর সর্বশেষ সংবাদ আমি জানি না।

“তুই স্ননিয়ন একজিকিউটিভ ছিলি না?”

পদ্মেন্দ্র মাথাটাকে বেশ করে আন্দোলিত করে নেয়, বলে, “ছিলাম। অতীত কাল। এখন নেই।”

আমি জিজ্ঞাসা চোখে তাকাই। ও বলে, “ষ্ট্রেড স্ননিয়নে যেম্মা ধরে গেছে। ষ্ট্রেড স্ননিয়ন মানে, আমার অভিজ্ঞতা বলে, তাড়া দাও, শ্রমিক কর্মীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাও, তারপর তুঁতিয়ে বদিয়ে কিছু আদায় কর। না হলে আন্দোলনকে মাঝপথে “কিল” করে তোমার নিজের রাজনৈতিক সিঁধি লাভ কর। পুরো ব্যাপারটাই প্রহসন, নাটক একটা।”

বুর্জোয়া ব্যাখ্যাকারের মতো শোনাচ্ছে নাকি পদ্মেন্দ্রের বক্তৃতা? আমার গলায় ধোঁয়া আটকেছে, বিবম কাশির একটা দমক সামলালাম।

পদ্মেন্দ্র নিজেই বলে চলেছে, “দুই পাল্টে স্ননিয়নে এবার ক্ষমতা দখলের খেলা হয়ে গেল আমাদের কারখানায় তাল্লা ঝুলিয়ে।”

“সে কী করে!”

“হ্যাঁ! নাম্বার ওয়ান স্ননিয়ন আন্দোলনের ডাক দিল। মাহিনা-বান্ধি, ওভার টাইম, বোনাস ইত্যাদির দাবি। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। লক আউট। আমাদের আন্দোলন শক্ত হচ্ছে,

কর্তৃপক্ষও নতুন আঘাতের অস্ত্র শানাচ্ছে। বিরোধী গ্রুপ চাইল এই সময় আন্দোলনকে তাদের নেতৃত্বের আওতায় টেনে নিতে।” পদ্মেন্দ্র হাসল, “জীবনে যেখানেই তুমি থাকো, রাজনীতির আওতার বাইরে তোমার জন্য এক চিলতে জমি নেই। খুব মাথা ঘামিয়ে বাঁচতে হয় রে, খুব কসরৎ করতে হয়।”

প্রশ্ন করলাম, “তুই কোন পক্ষে?”

মাথা নাড়ল পদ্মেন্দ্র, “কোন পক্ষেই নয়, খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের সঙ্গেই আছি, থাকব।”

পদ্মেন্দ্রের চেহারা কিন্তু তার বক্তব্যের ঠিক উল্টো কথাই বলছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে মহান ভেবে তৃপ্তি পাই। পদ্মেন্দ্রও তাই ভাবতে চায়। আমিও তেমনিই ভাবি নিজের সম্পর্কে। ওকে আশ্বাস করব কি না বুঝে উঠতে পারছি না। বিবেক নামক অপদার্থ চেতনাটা ফিস ফিস করে বলছে, সাবধান। কেঁচো খুঁজতে সাপ। কারকে আঘাত করার আগে একবার নিজের মূখটা আয়নায় দেখে নিও। আমার মতো সহস্র মানবদরদী পেছনের দোর দিয়ে ভেজাল কারবারির নোকারি করে। এইসব বৃহত্তর স্বার্থ সম্পর্কে আমাদের তাই কথা না বলাই উচিত। কিন্তু পদ্মেন্দ্রের পরিবর্তনের পেছনে যে রহস্য সেটা জানতে ইচ্ছে করছে। প্রায়ই এক একটা লোকের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে চোখে তাকলেগে যায়। আজ হাতের কাছে একটা মানুষ, যার পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু তথ্য পেলেও পেতে পারি। সুযোগমত হয়ত ও লাইনে নিজেরও আঁখের গুঁছানো যাবে।

শেষে নিজের সঙ্গে একটা রফা করে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করি, “শেষ পর্যন্ত জয় তাহলে হল কার?”

“কিছু পাওয়া গেল। হঠাৎ কর্তৃপক্ষ কেমন নয়ম হয়ে গেলেন। লক আউট উঠে গেল। মাঝ থেকে পাশ্চাত্য আরও বেশি ঘায়েল হল।” পদ্মেন্দ্র হাসল, “এর নামই রাজনীতি।”

“বুঝলাম না।” আমি বোকার মতো তাহালাম।

পদ্মেন্দ্র ফের সেই অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে, “শ্রমিক স্বার্থ এখন শৃঙ্খল শ্রমিক স্ননিয়নই দেখে না, প্রয়োজনমত কর্তৃপক্ষও দেখেন। প্যান্ট গ্রুপকে তাদের অধৈর্য প্রকাশের সুযোগে একেবারে খতম করাও হল। আর আমরা শ্রমিকদের জন্য কিছু আদায়ও করে নিলাম। কিছু ছেড়ে দিলাম। কর্তৃপক্ষও ঝামেলা এড়ালেন।”

তবুও দুর্বোধ্য ব্যাপার। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, পদ্মেন্দ্র নিজেকে একজন প্যান্ডা গোছেরই লোক। সুতরাং এর চেয়ে স্পষ্ট কিছু সে ভাঙবেও না। বদ্বতে পারছি, এরা যে খেলা খেলেছে, তাতে সাপও মরেনি, লাঠিও ভাঙে নি। বিরোধীপক্ষকে মাথা চাড়া দেওয়ার সম্ভাবনাটা ওরা খতম (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)।

ইয়াহিয়া-ইন্দিরা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি করতে চাইল ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলিম একচেটিয়াবাদের তখনকার লক্ষ্য ছিল নিজের জন্য একটা “সংরক্ষিত বাজার” (প্রোটেক্টেড মার্কেট) সৃষ্টি করা, ধর্মভেদে তখন ব্যবহার করতে হয়েছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছানুযায়ী। তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল টাটা-বিড়লা প্রমুখ একচেটিয়াবাদ, কারণ তাদের শোষণের ক্ষেত্র ভাগ হয়ে কমে গেল। আজ সেই হিন্দু একচেটিয়াবাদ মদ্রিজবরের বন্ধু সজেছে, কারণ এখানে তাদের স্বার্থ অভিন্ন। মদ্রিজবর এখন ভারতের দোহাই দিয়ে, বাঙালীরাণার দোহাই দিয়ে “সোনার বাংলা ভালোবাসি” গেয়ে যা আসলে চাইছেন সেটা হলো, পূর্ববঙ্গের শ্রমিক কৃষক শোষণ ব্যবস্থায় প্রতিবন্দ্বী পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদের অবলম্বি এবং নিজের শ্রেণীস্বার্থকে কয়েম করে - উক্ত শোষণ ব্যবস্থার ঘোল আনা ফলভোগ। যে মুসলিম, একচেটিয়াবাদ (যা আসলে পশ্চিম পাকিস্তানেরই জিনিষ) এককালে টাটা-বিড়লাকে টেক্কা মেরে পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়ে প্রতিযোগীহীন শোষণের ব্যবস্থা করেছিল, আজ সেটা বুঝে যাচ্ছে ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিকতাবাদের মধ্য দিয়ে মদ্রিজবর বা বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক তার ওপর আঘাত হয়ে ফিরে এসেছে। লক্ষ লক্ষ বাঙালী মুসলিম মাঝা মাঝার ঘটনা যতই বিষাদপূর্ণ হউক, আজ মনে মনে হাসছে ভারতীয় হিন্দু একচেটিয়াবাদ, ভাবখানা এই—“কেমন পাকিস্তান করেছিল?”

মদ্রিজবরও ভেবেছিলেন বিনা রক্তপাতের পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকরা শোষকের আসন বাঙালী শোষকদের ছেড়ে দেবে, তাই শেষ মূহুর্ত অবধি অহিংসার বাণী ছেড়েছিলেন, কিন্তু যে অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছেন, সেখান থেকে ফিরে গেলে তাকে নেতৃত্ব হারাতে হয়। শৃঙ্খল তাই নয়, তিরিশে মার্চ শেটসম্যান-এ প্রকাশিত রিয়ান মে নামে ইংরেজ সাংবাদিকের কাছে মদ্রিজবর মন খুলেছিলেন ঠিকই—“আমি পূর্ব বঙ্গকে কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এরা (ইয়াহিয়া খাঁ ও পাক সামরিক চক্র) তা বদ্বতে পারছে না।”

মদ্রিজবর চেয়েছিলেন - “বাংলা” “বাংলা” করে যদি বাংলা দেশেরই আভ্যন্তরীণ শ্রেণী সংগ্রামকে চাপা দেওয়া যায়, যেমন জিম্মা ইসলাম ইসলাম করে পাক শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণী মতলবকে মুসলিম চাষী-মজুরের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রেখে শ্রেণী শোষণের ব্যবস্থা কয়েম করতে চেষ্টাছিলেন।

কিন্তু মদ্রিজবরকে ইন্দিরা বা ভারতীয় শোষকগোষ্ঠী আঁতেরে লাভের কথা বিবেচনা করে যতই মদত দিক না কেন, পূর্ববঙ্গের বর্তমান বস্তৃক্ষীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের দামামা বাজবে, মদ্রিজবর ইন্দিরা এবং বিচিত্র বাঙালী প্রেমের নিলজ্জ ভাড়াটীর উপরে এটাই আশার কথা—পূর্ব বঙ্গের পথ ঠিকেরতনামের পথে যাবেই, কারণ এই সৌদীন-অবধি পাক-সরকারের ভাড়া করা লুন্ডা আনসার, ইস্ট পাক রাইফেলস আর বাঙালী রেজিমেন্ট দিয়ে আব যাই হোক, মদ্রিজবর হতে পারে না, নতুন মদ্রিজবর লাল-প্রতাকা নিয়ে আসছে।

সেন র্যালের কোম্পানী বন্ধ কেন

কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের অভিযোগ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সি পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে কোন সাহায্য দেবে না বলে যে প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়েছিলেন, নির্বাচনের পর সেই সিদ্ধান্ত পাল্টে যায়। ফলে পুরোনো পাপীসহ কংগ্রেসের অনেকেই আবার মসনদে বসেছেন। মন্ত্রিসভা হবার কালে রাজ্যের সেন র্যালের কোম্পানীর এক বিরাট শ্রমিক অংশের উপর ক্রোজারের নোটিশ এসে পড়ে। এই নোটিশে তাঁরা বিস্মিত, হতবাক। তাদের অভিযোগও অনেক। ক্রোজার ঘোষণার ঘটনাটি ঘটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক আঠারো দিন পরে। কংগ্রেস সমর্থিত মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে।

উনিশশে মার্চ সেন র্যালের কোম্পানীর মালিকগোষ্ঠী কারখানাতে ক্রোজার ঘোষণা করেন। ফলে সাড়ে চার হাজার কর্মচারী আজ সম্পূর্ণ বেকার। আসানসোলার কন্যাপুরে সাইকেল তৈরীর কারখানাটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীর সেন পণ্ডিত ও এ্যাসেলারী বিভাগটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কল্যাণীর এই দুটি কারখানাতে সাইকেলের বিভিন্ন পার্টস ও কম্পোনেন্ট তৈরী করা হতো।

বাই সাইকেল তৈরী করার অন্যতম এই শিল্পসংস্থাটি সারা ভারতে সাইকেল উৎপাদনের কুড়ি পার্সেন্ট উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে। মালিকপক্ষের তরফ থেকে কল্যাণীর কারখানায় ক্রোজার নোটিশে মালিক

কের সংগে শ্রমিকদের অসহযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

জানা যায়, মালিকগোষ্ঠী প্রস্তাব করে, সেন র্যালের কন্যাপুর (আসানসোল) কারখানা থেকে ছশো পঞ্চাশ জন এবং কল্যাণীর সেন পণ্ডিত কারখানা থেকে দুশো আশিজন শ্রমিক ছাঁটাই করার ব্যবস্থাকে কর্মচারীদের মেনে নিতে হবে। এবং সেন র্যালের দুশো পঞ্চাশ জন ছাঁটাই শ্রমিকের কাজ বাকী শ্রমিকদের অতিরিক্ত পরিশ্রম দিয়ে শেষ করতে হবে। এ্যাসেলারীর ক্ষেত্রে প্রতি শ্রমিককে মাসিক চল্লিশ টাকা কম মজুরী নিতে হবে। প্রয়োজনবোধে লে-অফ মানতে হবে। কাঁচা মাল নিকুট হলেও তা দিয়েই উন্নত ধরনের দ্রব্যাদি তৈরী করতে হবে। এ ধরনের আরও কয়েক দফা প্রস্তাব মালিক গোষ্ঠীর তরফ থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

একথা সত্য, শ্রমিক কর্মচারীগণ এসব প্রস্তাব কোনমতেই মেনে নিতে সম্মত হন না। পরিণামে, উনিশশে মার্চ শ্রমিকগণের তথাকথিত অসহযোগিতার নামে কারখানায় ক্রোজার নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া, মালিক গোষ্ঠী উনিশশো উনসত্তর সালে এক চুক্তিতে দৈনিক এক হাজার ছশো পঞ্চাশটি সাইকেল তৈরী করার একটি স্কীম রচনা করে। একাত্তর সালের উনিশশে জানুয়ারী মালিক গোষ্ঠী ইউনিয়নকে এক চিঠিতে “১৬৫০” স্কীম সার্থক করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বিনিয়াদ মজবুতের কথা পুনরায় ঘোষণা করে। এর সঙ্গে এ্যাসেলারী বিভাগেও নতুন এক স্কীম রচনা হয়। অথচ কার্যত স্কীম অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রেই উৎপাদন সূরু করা হয় না।

হিসাবপত্রে একথা পরিষ্কার উনিশশ একাত্তর সালে কারখানায় উৎপাদন সূরু হওয়ার পর থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উৎপাদনের পরিমাণ চরম উন্নতির দিকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে। বার্ষিক সাইকেল উৎপাদন পঞ্চাশ হাজার থেকে চার লক্ষ আটাত্তর হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। কারখানার নীট লাভের পরিমাণও আজ পর্যন্ত ক্ষতির পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়নি। আসানসোলার মূল ফ্যাকটরীর হিসাবপত্রে প্রকাশ, সাতষাট সালে লাভের পরিমাণ ছিল প্রায় একচল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা। আটষাট সালে ছিল আঠাশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার। এবং এই লাভের পরিমাণ উনসত্তর সালে চার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়ায়। যদিও লভ্যাংশের পরিমাণ ক্রমশই কমে যাওয়ার কারণটি কারখানার দায়িত্বশীল শ্রমিক ও কর্মচারীবৃন্দ

হিসাবপত্রের কারচুপি বলে মনে করছেন।

অথচ এসব হিসাবের ভিত্তিতেই মালিক গোষ্ঠী সরকার পক্ষের কাছে সাইকেলের দাম বাড়ানোর অনুরোধ চান। সরকার পক্ষও শিল্পপতিদের এই আবদার মঞ্জুর করেন এবং প্রতি সাইকেলে নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা দাম বাড়ানোর ব্যবস্থা করে দেন। অথচ লভ্যাংশের পরিমাণ কম দেখিয়ে অন্যত্র টাকা সরানোর অভিযোগ কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এ বিষয়ে কারখানার মালিকগোষ্ঠীর অন্যতম দুজন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রি-কনস্ট্রাকশন করপোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীঅর্জুণ সেন এবং রিভাইবেল সীক ইন্ডাস্ট্রিজ কমিটির ইন্টার জেনের চেয়ারম্যান শ্রীসঞ্জয় সেনের বিরুদ্ধে কর্মীদের অভিযোগ প্রবল। অভিযোগ, এরা দুজন স্বনামে ও বেনামে বিভিন্ন ব্যবসাতে কারখানার লভ্যাংশের টাকা

লুণ্ঠী করেন। বৈপর্যয়্যভাবে এসব ব্যবসা চালু করার ফলে এতে প্রচুর টাকা ক্ষতি হয়। এবং বর্তমানে এই ক্ষতির বোঝা মূল ফ্যাকটরীর লাভের পরিমাণকে কমিয়ে আনতে সাহায্য করেছে।

আসানসোল ও কল্যাণীর দুটি কারখানা ছাড়াও সংস্থার সঙ্গে নোয়াখালিতে মেশিনটুল, ন্যাশনাল টানারী নামে আরও কতকগুলি বিভাগ জড়িত রয়েছে। এর মধ্যে উনিশশে এপ্রিল থেকে টানারীর সু-ডিভিশনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরিণামে আরও প্রায় দুই শত কর্মী সম্পূর্ণ বেকার। জানাযায়, সামগ্রিক ভাবে ইংরেজ মালিক নটিংহামর্যাল ও বাঙালী মালিক সঞ্জয় সেন ও অর্জিত সেন কারখানার অসংখ্য কর্মীদের নিয়ে এক নিষ্ঠুর খেলা শুরু করে দিয়েছেন এবং নিজেদের দুষ্কর্ম প্রকাশ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজে মেতে উঠেছেন।

ইতিমধ্যে মালিকগোষ্ঠীর লেজুড় বৃত্তিতে অসাধারণ কৃতিত্ব রয়েছে এমন একটি দলের নামে পাল্টা অস্বীকৃত একটি ইউনিয়ন গড়ে তোলা হয়েছে। একদিকে সাধারণ কর্মীদের উপর পদূলিশ

মিলিটারীর অত্যাচার, অন্যদিকে এই ধরনের ইউনিয়নের যোগসাজসে শ্রমিক হত্যার অপচেষ্টা পরি-স্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে। ইতিমধ্যে দোসরা এপ্রিল জনৈক কর্মীকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা হয়। আততায়ীর নাম ধাম বলা সত্ত্বেও কোন গ্রেপ্তারের খবর নেই। এত সব পরোচনা সত্ত্বেও শ্রমিক কর্মচারীদের মনোবল এত টুকু ভাঙেনি। কলকাতার হেড অফিসের কর্মচারীরাও বিপর্যস্ত শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পিকিটিং, ডেপুটেশন প্রভৃতি নানা ভাবে মালিক গোষ্ঠীর অনুসৃত নীতিব তীর প্রতিবাদ করে চলেছেন। জানা গেলো, তাঁরা শীঘ্রই লাগাতার ধর্মঘটের জন্যেও প্রস্তুত হচ্ছেন।

এর সঙ্গে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর কাছে ফ্যাকটরীর সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীর জিজ্ঞাসা, তাঁর দলের ইউনিয়ন এবং তাঁদের নেতৃত্বে শ্রমিক কর্মচারী সংগঠিত নয় বলেই কি তিনি কারখানাটিতে ক্রোজার ঘোষণার ঘটনা সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়?

বাংলা দেশের সংগ্রাম

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

মুক্তি সংগ্রামকে দ্রুত বেগবান করতে পারে। তা না হলে শেষ পর্যন্ত বড়জোর একটা জগাখিচ্ছুড়ী ধরনের আপোষ হতে পারে কিন্তু বাঙালী মধ্যশ্রেণী, জাতীয় বুদ্ধিজীবি এবং শ্রমিক কৃষকের সর্ব-গণীন মুক্তি আকাক্ষুস্ম হয়েই থাকবে।

সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রামকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে হলে রণনীতি ও রণকৌশলের যথাযথ বিন্যাস করেই এগোতে হবে।

এর জন্যে প্রথম রাজনৈতিক পদক্ষেপ একদলীয় সরকারের পরিবর্তে সর্বদলীয় সরকার গঠন, অবিলম্বে ভূমিসংস্কার কার্যকরী করা ও মেহনতী মানুষকে অনুপ্রাণিত করার দীর্ঘস্থায়ী কর্মনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

তাহলেই বাংলা দেশের মানুষ জয়লাভ করবেন সুনিশ্চিত ভাবে। কারণ হিটলার থেকে ইয়াহিয়া খান সব ডিক্টেটরই ইতিহাসের আবর্জনা মাত্র আর একমাত্র জনগণই অমর।

বৃদ্ধ বয়সেও
স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে



সাধনা
চ্যবনপ্রাশ

বহুমূল্য আয়ুর্বেদীয় রসায়ন
সকল বয়সেই সম্মান উপকারী

প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে
সাধনা ওষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ বোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ.,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।



কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত হয়ে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে।

১৯৮০/৭০

বাংলা বইয়ের বাজার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তবুও দাম বাড়ানো ছাড়া একে-বারেই উপায় নেই।

বড় বড় কয়েকটি প্রকাশক ছাড়া, সাধারণ প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতার অবস্থা বর্তমানে খুবই আশঙ্কাজনক। বড় বড় প্রকাশকেরা নিজেরদের হাতে একটি বড় সাময়িক পত্র রেখেছেন। ফলে তাদের পরি-কায় প্রকাশিত জনপ্রিয় রচনাটি লেখকের কাছ থেকে আগেই কিনে রাখেন। সেই কারণে চলতি বইয়ের বাজারটি অন্য প্রকাশকেরা কিছু-তেই উপভোগ করতে পারেন না। যেমন আনন্দ পাবলিশার্স। এঁরা যে বই প্রকাশ করেন, তাঁর অধিকাংশই “দেশ” কিংবা “আনন্দ-

বাজার পত্রিকা”র বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে যায় এবং তাঁরাই প্রথমে লেখকের কাছ থেকে প্রকাশনার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া “দেশ” কিংবা “আনন্দবাজার পত্রিকা”র প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপনেও তাঁরা ভুলনামূলক ভাবে বেশী সুযোগ পান। সুতরাং অন্যান্য প্রকাশকেরা যখন এই সমস্ত লেখকের গ্রন্থই প্রকাশ করতে চান, তখন লেখকেরা তাঁদের অপরিণত লেখাগুলি ছুড়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পান।

এছাড়া সাধারণ প্রকাশকেরা আমার কাছে আরেকটি অভিযোগের কথা জানালেন। তারা বললেন : এটা আমাদের সংক্রামক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা জানি না, আজকাল বাংলাদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই ইংরেজী বইয়ের ভক্ত। পেলিক্যান আর থেগুইন সিরিজের বই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। তাছাড়া অন্তর্দেশীয় লেনদেনের মাত্রাও কমে এসেছে। পশ্চিমবাংলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত বাংলা পাঠক রয়েছেন সেজন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারই কিছু কিছু বাংলা বই কিনতেন। ইদানীং আর কেউই তা কেনেন না। তবে আশার কথা, এ বছর ত্রিপুরা সরকার এবং আসাম সরকার তাঁদের নিজস্ব কোটা অনুযায়ী কিছু বাংলা বই কিনেছেন। কিন্তু এটা এমন কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ নয়। প্রসঙ্গত তাঁরা আরো বললেন : শ্রদ্ধামাত্র অপরাপর প্রদেশগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই চলবে না। আমাদের বাংলাদেশেই বা প্রাদেশিক ভাষার বই কটা কিনা হয়? অন্য

প্রদেশকে বাংলা বই কেনার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে গেলে, অন্তত ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং অনুবাদ কর্মের জন্য কিছু বই নিয়মিত ভাবেই কেনা উচিত এবং অনুদিত হয়ে বাংলায় পাঠক মহলে প্রচারিত হওয়া উচিত।

এরপর জানতে চাইলাম, পাবলিশার্স এসোসিয়েশন সম্পর্কে। তাঁরা খুব আক্ষেপের সঙ্গে আমার জানালেন : নামে মাত্র একটি এসোসিয়েশন আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন কাজ নেই। কেননা প্রত্যেক প্রকাশক-ব্যবসায়ী-রাই নিজেরদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে এত বেশী সচেতন হয়ে পড়ে-ছেন, যার ফলে সম্মিলিত ভাবে যে কোন কাজের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য না থাকার ফলে প্রত্যেকের স্বার্থের দিকে যথোপযুক্ত নজর রেখে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে না।

সব শেষে প্রায় প্রত্যেক প্রকাশকই একটি আশাবাদ মূল্যবান কথা বললেন। পঁয়ষাট সালে পাক-ভারত যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ওপার বাংলার সঙ্গে বই-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। তার পরেও ইন্নতো অনিয়মিত ভাবে বিপথে কিছু বই গেছে। কিন্তু তা খুবই সামান্য। এখন সম্প্রতি ওপার বাংলায় যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, তা এই বাংলার বইয়ের বাজারের বন্ধ দুর্দশাকেও অনেকখানি মুক্তি দেবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। এই সঙ্গে তাঁরা আরেকটি কথাও স্মরণ রেখেছেন, যে যেভাবে ওপার বাংলায় বর্বরো-চিত অত্যাচার চলছে; বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব কিছু জঙ্গী-শাহীরা হিংস্র আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, তাতে আগামী দশ বছরে

আমাদের বইয়ের বাজারের পুনরু-জ্জীবনের আশা আপাতত ত্যাগ করে ওপার বাংলার পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তবেই একদিন আমরা আমাদের ইঁসিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে ফিরে পাব।

ওপার বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মথুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎ চ্যাটার্জি ছাড়াও পরবর্তী কালের, তারাশঙ্কর, মানিক, প্রেমেন্দ্র, জীবনানন্দ, সুখীন্দ্রনাথ এবং তৎ-পরবর্তী আরো অনেকেই শ্রম্ভার সঙ্গে সমাদৃত হয়েছেন। অদ্ব নিশ্চিত ভবিষ্যতে ওপারের সঙ্গে এপারের সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে সুদৃঢ় করতে গেলে এপারের সাহি-ত্যিকদের লেখার দুই বাংলা মাটির কথা, মানুষের কথা সোচ্চারে লিখতে হবে। এ জন্য আগামী দশ বছর কম সময় নয়। আমার মনে হয়, সেকাজে ওরা অনেকেই উৎসে-যোগ্য ভাবে এগিয়ে আসছেন।

সমাচার দর্পণ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

জৈনক ভদ্রলোককে দিয়ে বঙ্গিয়ে নিচ্ছেন। যেমন আগরতলা থেকে খবর এল যে চীনা অফিসাররা পাক সরকারকে যুদ্ধ চালাতে সাহায্য করছে। কুমিল্লা কোন গ্রামের অধিবাসী এই কথা বলেছেন। পাক সরকারের কী এতই দুরবস্থা যে ইসলামাবাদের সর্বোচ্চ মহলের গোপন ঋণগুলিও বিজ্ঞান গণ্ড-গ্রামে ছাড়িয়ে পড়ে? মিথ্যার বেসাতি করতে গিয়ে সংবাদদাতারা নিজেদের যে কতখানি হীনস্বপ্ন করে তোলে এ তার একটা প্রমাণ।

তথাকথিত “ওয়ার ক্রেস-পন্ডেন্ট”দের জ্ঞানের পরিচয়ও আমরা পেয়েছি। যেমন কাগজে বেরিয়েছে যে পাক সেনাদের একটি খাদ্যবাহী হেলিকপ্টারকে দুটি স্যাবার জেট প্রহরা দিয়ে নিয়ে চলেছে—স্যাবার জেটের স্পীড বোম্বহার সংবাদদাতা জানেন না। আরও দেখলাম যে মর্টারের গোলায় স্যাবার জেট ভূপাতিত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায় নি। এ যেন পিস্তল দিয়ে টাঙ্ক ঘায়েল করা।

আর বাংলা দেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর অত্যাচারে কী দুঃখ। কিন্তু মহাশয়গণ, যখন কলকাতার রাস্তায় পুলিশের গুলিতে একের পর এক তরুণের দেহ ভাঙিয়ে পড়ে, কারাগারে

মেয়র নির্বাচন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সভায় উপস্থিত হয়ে কংগ্রেস পক্ষে ভোট দেবেন। এস ইউ সি নির-পেক্ষ থাকার অজুহাত হয়ত খুঁজ-ছেন, কিন্তু তাঁদের সম্পাদক শ্রীনীহার মুখার্জী বলেছেন যে স্পীকার নির্বাচনে তাঁর দল কংগ্রেস সমর্থিত কোন প্রার্থীকে ভোট দেবেন না।

আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরী একুশে এপ্রিল প্রাপ্ত কংগ্রেসী মন্ত্রী ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে বাংলা দেশ সহায়ক কর্মীটির কাজের জন্যে অপ্রতর্নিতভাবে দেখা করলেও রাজ্য রাজনীতির কথাও কিছু আলোচনা করেছেন। ঐদিনই ইউ এল এফ নেতা শ্রীসুধীনকুমারও ত্রিগুণাবাবু ও ত্রিদিববাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন জানা গিয়েছে। আলোচনাটা নেহাত আবহাওয়া-সংক্রান্ত যে ছিল না এটা জোর করেই বলা যায়।

কর্পোরেশনে যা ঘটেছে, বিধান সভার স্পীকার নির্বাচনে ঠিক সেই রকম ঘটনা যে ঘটবে তা বলা যায় না। এবার ভোটটা উলটো হয়ে বিরোধী দল থেকে স্পীকার নির্বা-চিত হবার সম্ভাবনাও একবারে কম নয়।

ইতিমধ্যেই সি পি এম-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছাও প্রচেষ্টা বেড়ে চলেছে। বেশ কিছু বিধানসভা সদস্য এবার রাজনীতিক পালা বদলের হাওয়া জোরদার করে তুলেছেন। এর মধ্যে রয়েছেন, নব কংগ্রেস, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্ততঃ একজন সদস্য।

তাঁদের পিটিয়ে মারা হয় তখন আপনাদের চোখের জল কোথায় থাকে? আর আপনারা সকলেই শেখ মুজিবের স্বাধিকারের এবং এখন স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করছেন। কিন্তু যখন এপার বাংলার কোন দল রাজ্যের হাতে আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়ার ন্যায় দাবী জানায় তখন আপনারা যিকিভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠেন কেন? এই হিপোক্রেসী আর কত-দিন চালাবেন?

শ্রীমতী বর্মণ

সুপরিচিতা গীটার শিল্পী।
গীটার শেখাচ্ছেন।
২৪১-এ, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ,
(লিবার্টি সিনেমার কাছে),
কলিকাতা-৬

সুশীল বাড়ি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দর্পণ বিশ্বস্ত সুদূর জানতে পেরেছে যে হালে অবস্থার আবার পরিবর্তন হতে চলেছে। তার প্রধান কারণ অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছেন সত্যিকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার, যেমন যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের আমলে ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু।

লোকজনের আনাগোনা, সরকারী অফিসারদের ছুটোছুটি দাপাদাপি সবই বিজয়বাবুর কাছেই। অজয়-বাবু তাই খুবই দৃষ্টিগত ও মর্মী-হত। সুশীলবাবু অজয়বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে আবার নতুন করে পাঁচ কষতে শুরু করেছেন। অজয়বাবু যে সুশীল-বাবুর প্রতি খুবই বীতশ্রম্ব হয়ে-ছিলেন তার প্রমাণ বাংলা দেশ সর-কারকে সাহায্য করার ব্যাপারে যে কমিটি, গঠন করা হয় তাতে সুশীলবাবুর কোন স্থান হয়নি। বাংলা কংগ্রেসের শ্রীহরদাস মিত্র সেই কমিটিতে জাঁকিয়ে বসেছেন। সুশীলবাবু রেগে গিয়ে শ্রীভূপাল বোসকে নিয়ে অন্য এক কমিটি দাঁড় করিয়েছেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে সরকারে অজয়-বাবু নিজের ঠাঁটো জগন্নাথের অবস্থা বতই উপলব্ধি করতে পারছেন, ততই তিনি আবার নতুন করে সুশীলবাবুর প্রতি আস্থা-ভাজন হয়ে উঠছেন আর সুশীল-বাবুও তার সুযোগ নিতে চাইছেন।

অজয়বাবুর দলে সুশীলবাবুকে ছাড়া আর যে তিনজন বিধানসভার সদস্য আছেন তার ভিতর একজন ছাড়া আর দুজনই সুশীলবাবুর নিজস্ব লোক। এবং এই “রিকোর্ট” সরকারের কাছে সুশীলবাবুকে নিয়ে তিনজন সভ্যের দাম খুবই বেশী। সুতরাং অজয়বাবু সুশীল-বাবুর উপর আবার নির্ভর করতে শুরু করেছেন, পাছে তার মুখ্য-মন্ত্রিত্ব হাতছাড়া না হয়ে যায়। অবশ্য সুশীলবাবু তার পরিবর্তে দুটো দাবী রেখেছেন। এক, তাঁকে মন্ত্রী করতে হবে আর দুই বাংলা কংগ্রেস থেকে যে দুই নেতা বিরুদ্ধপন্থী তাঁদের হঠাতে হবে। তার ভিতর একজনকে এক্ষণি যেতে হবে। ঠিক শ্রীসুধীনকুমার রায়কে যেভাবে যেতে হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে অজয়বাবু এই ব্যাপারে প্রায় নিমরাঞ্জি হয়ে গেছেন। আর প্রথম দাবীর ব্যাপারে মে মাসের বিধান-সভার অধিবেশন হয়ে বাবার পর হয়ত একটা সুদ্রাহা হতে পারে।

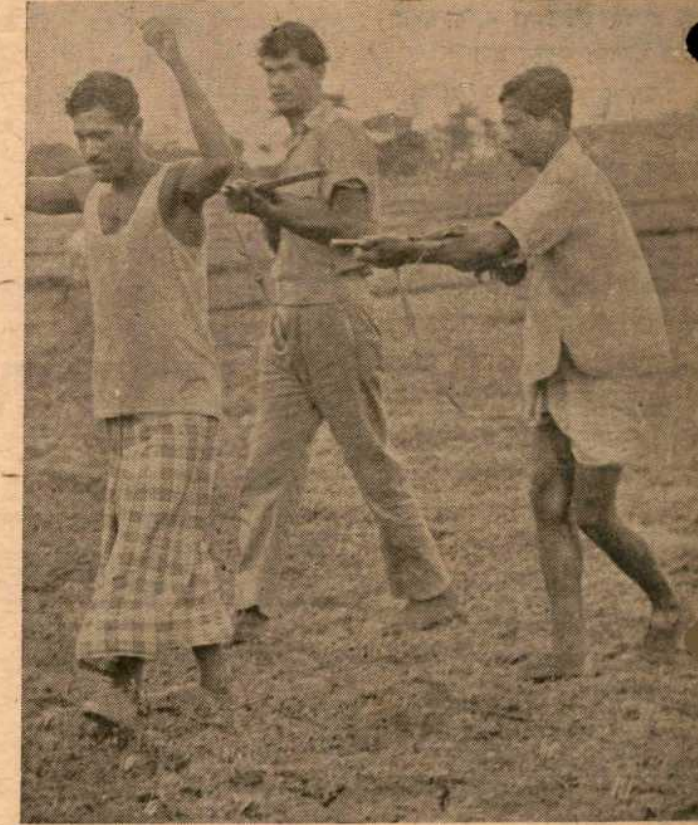
মানুষের এটা তো কোন পরিচয় থাকা চাই, নাকি, আমরা কেবল মনুষ্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নানাবিধ ভূমিকায় অভিনয় করো করো যাবো? কখনো বা এটা কখনো বা সেটা? যখন বা ইচ্ছা হয়? শ্রদ্ধাই মনুষ্য? মানুষের মনুষ্য নাই কোন? শ্রদ্ধা মনুষ্যস সীতান মনুষ্য?

টান্ড বনিকের পালা

নির্দেশনা/-বরণ দাশগুপ্ত
রঙমহল ১২২ মে/রবিবার সকাল দশটা
চতুরঙ্গ প্রযোজিত [একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য] যুগান্তকারী নাটক

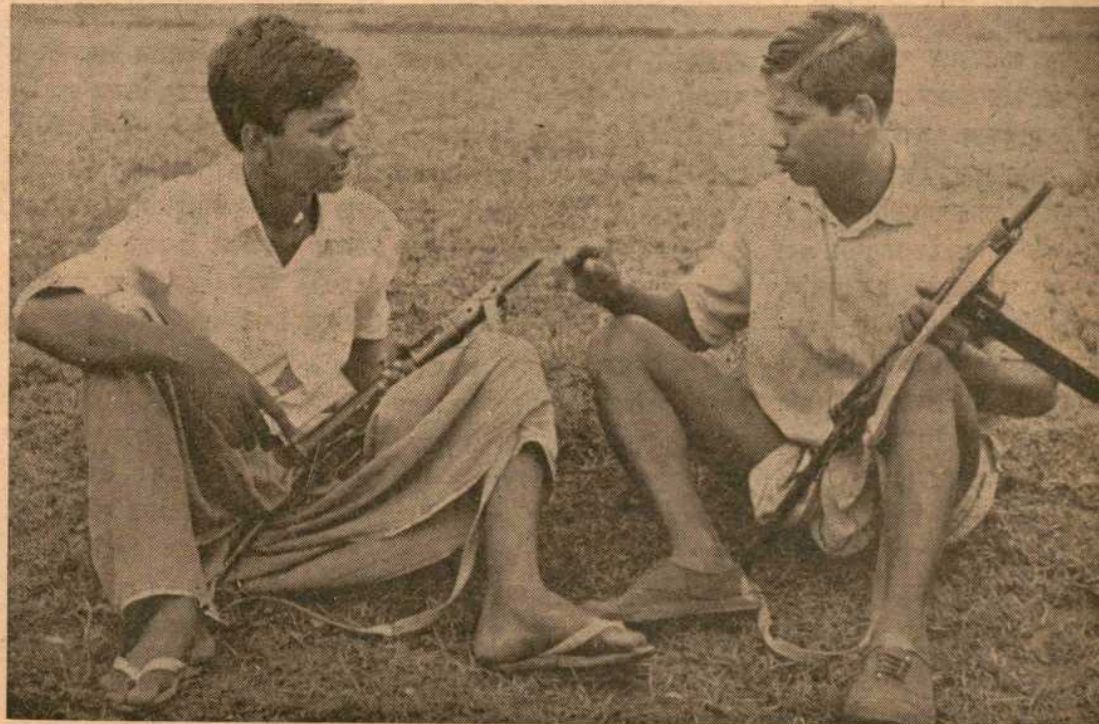


দুজন গুপ্তচরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি : প্রণব মুখার্জী



বাংলা দেশের পশ্চিম রণাঙ্গণে কোনও এক গ্রামে কৃষকরা তালিম নিচ্ছেন আধুনিক ছোটখাটো অস্ত্র ব্যবহারের। প্রথমে এঁরা শিখছেন সাধারণ ধরণের অস্ত্রের ব্যবহার এবং এর সাহায্যেই আঞ্চলিকভাবে ঠেকাতে পারবেন ইয়াহিয়ার বাহিনীকে। 'মুক্তিযুদ্ধ' সূর্য হওয়ার সময় এই কৃষকরা ঘরের দা-কুড়ুল নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরে এদের ফিরিয়ে আনা হয় আধুনিক অস্ত্র তালিম দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য ধরণের গ্রামীণ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য। পরবর্তী পর্যায়ে এঁরাও যাবেন মূল ফ্রন্টে এবং এঁদের জায়গায় আসবেন আবার আর একদল তরুণ কৃষক।

ডানদিকে উপরের ছবিতে বাংলা দেশের দুই তরুণ কৃষক রাইফেল চালনা শিখছেন। মাঝের ছবিতে গুপ্তচর বা বিশ্বাসঘাতককে কি ভাবে নিয়ে যাবে। নীচে তালিমের অবসরে দুই তরুণ কৃষক। প্রথম ছবি তুলেছেন প্রণব মুখার্জী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরুণ চক্রবর্তী (ল্যান্ড এন্ড লাইফ)



সম্পাদক দর্পন

সংবাদপত্রের সেই পুরণো খেল

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

খেলাটা আবার শুরুর হয়ে গিয়েছে। সেই চীন বিরোধী খেলা যা প্রথম শুরুর হয় ১৯৬২ সালে। তখনকার মত এখনও প্রধান খেলদুড়ি হিসাবে পশ্চিমবাংলার সংবাদপত্র জগত আবার আসরে অবতীর্ণ হয়েছে, শুরুর হয়েছে নানাধরণের গুজব ও আজগুবি কাহিনীকে বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত সত্য ঘটনা বলে চালানোর প্রচেষ্টা।

গোড়া থেকেই, মানে বাংলা দেশের নির্বাচনের সময় থেকেই সংবাদপত্রগুলি একটি অদ্ভুত যুক্তির ভিত্তিতে নিজেকে চীন তথা কমিউনিস্ট বিরোধী আক্রমণ চালিয়েছে। যুক্তিটা হোল যেহেতু চীনের সঙ্গে পাক সরকারের সম্পর্ক কূটনৈতিক স্তরে হৃদয়তাপূর্ণ সেই হেতু চীন নিশ্চয়ই পূর্ব বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণের পরিপন্থী। এবং সেই যুক্তির জেরে আজও চলছে।

লড়াই শুরুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজগুলি ক্রমাগত বলে যেতে লাগল যে পাক হানাদাররা চীনা রাইফেল, চীনা মর্টার, চীনা মেশিনগান ব্যবহার করছে। উদ্দেশ্য লোককে বোঝানো যে চীনই ইয়াহিয়াকে তার বাঙালী নিধনযজ্ঞে সাহায্য করেছে। কিন্তু পাকিস্তান ত চিরকালই বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে অস্ত্র কিনেছে এবং সে সবই ব্যবহৃত হচ্ছে। কই খবরের কাগজে ত কখনও দেখিনা একথা লেখা হয়েছে যে, মার্কিন উড়ো জাহাজ থেকে বোমা নিক্ষেপ করেছে পাক বিমান বাহিনী। তা অবশ্য লিখতেও পারে না, কারণ তাহলে সুতারকিন স্ট্রীট বাগ-বাজার চৌরঙ্গী স্কোয়ারে অনেক বড়সাহেবের "উপরি" মারা যাবে।

এবং কী অপূর্ব সাংবাদিকতা! যে যা বলছে তাই লেখা হচ্ছে, সত্য মিথ্যা বিচারের অবকাশ নেই এবং অনেক সময় সংবাদদাতা চাকরী বজায় রাখতে গিয়ে সম্পূর্ণ মনগড়া কথাও "বাংলা দেশ থেকে আগত" (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

দর্পণ প্রকাশনীর প্রথম বই
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
সাংবাদিক
প্রশান্ত সরকারের
বাংলাদেশে
গণতন্ত্রের
সংগ্রাম

নানা বিচিত্র রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কি ভাবে পূর্ব বাংলার অধিবাসী শোষণমুক্তির দীর্ঘ সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে উপনীত হল সেই ইতিহাসের তত্ত্ব ও নানা তথ্য সম্বলিত এই বই বাংলাদেশের বিপ্লবী পটভূমি বদ্বতে সাহায্য করবে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কতর্ক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১০ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১০ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

দপন

১৪শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা ॥ শতাব্দীর ৭ই মে ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা.

কারারুদ্ধ সদস্যদের বিধানসভায় উপস্থিত করার প্রক্ষেপ সরকারের দিশেহারা অবস্থা

(দপনের সংবাদদাতা)

সি পি এম-এর বিধানসভা সদস্য বিনয় কৈটার আর এস ইউ সির রবীন মন্ডলের জেল থেকে এসে স্পীকারের কাছে শপথ গ্রহণ আর তারপর বিধানসভায় নতুন স্পীকার নির্বাচনের সময় ওদের একই সুবিধাদান প্রসঙ্গে জল ঘোলা হয়েছে।

সরকার পক্ষ দিশেহারা, প্রায় বিধবস্ত বললেও বেশী বলা হয় না। বিরোধীদের তরফে জ্যোতি বসু এবং সুবোধ ব্যানার্জী বিধান সভা অধিবেশনের প্রথম দিনে দুই বিচার্যধীন বন্দী সদস্য কোণ্ডার ও মন্ডলের বিধান সভায় উপস্থিত- (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)



বাংলা দেশ থেকে আগত উদ্বাস্ত শিশু। ছবি নিখিল ভট্টাচার্য।

বাংলা দেশের সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনার প্রক্ষেপ মতান্তর

(দপনের সংবাদদাতা)

বাংলাদেশে সশস্ত্র আন্দোলন নিয়ে নানা গোলমাল দেখা দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। বামপন্থীরা বলছেন যে, আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে এর নেতৃত্বকে ব্যাপক করে, সংগঠনকে সংগ্রামী কায়দায় মজবুত করে। আর আওয়ামী লীগের ঘাঁরা কলকাতায় বা

অন্যান্য ভারতীয় এলাকায় ঘোরাফেরা করছেন তাঁরা নেতৃত্বের প্রশ্নে বা সংগ্রামের প্রয়োজনে কোন যুক্তি মার্চার ব্যাপারে কথা বলতে রাজী নন। ভারতে এবং অন্যান্য দেশেও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে সশস্ত্র (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

বন্দুক ছিনতাই করে কি এম-এল দলের যুক্ত ফৌজ গঠিত হচ্ছে?

(দপনের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী সূত্র সপ্তাহে পঁচিশ ত্রিশটি বন্দুক থেকেই খবর পাওয়া যাচ্ছে যে পাইকারী হারেই বেশ কয়েকটি জেলায় বিশেষ করে বীরভূম, বাঁকুড়া ও হাওড়া জেলায় বন্দুক ছিনতাই শুরু হয়েছে। একমাত্র বীরভূম জেলাতেই নাকি গত দু

সপ্তাহে পঁচিশ ত্রিশটি বন্দুক খোয়া গেছে। সরকার এই ব্যাপারে চিন্তিত। মুখ্যমন্ত্রীর মতে সরকার আবার এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। প্রতি (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

হেমন্ত বসুর হত্যা নিয়ে আবার রাজনীতি

(দপনের সংবাদদাতা)

হেমন্ত বসুর হত্যার ব্যাপারে নব কংগ্রেস আর ফরোয়ার্ড ব্লক আবার নতুন করে রাজনীতি শুরু করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারী এই প্রম্ভেয় নেতা শ্যামপদকুরে খুন হন। খুন হবার সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেস এবং ফরোয়ার্ড ব্লক প্রচার করতে থাকে সি-পি-এম এই খুন করেছে। কলকাতার বিদ্যায়ী পুর্লিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তের একটি বিবৃতিতে কংগ্রেসী রাজনীতির সুবিধে হয়। কিন্তু সেই পুর্লিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তই বিদ্যায় নৈবার আগে হেমন্ত বসুর খুনের ঘটনায় যে সাতজনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেবার আদেশ দিয়ে গেছেন তাঁরা সবাই উত্তর কলকাতার তথাকথিত নকশালপন্থী। সি পি এমের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

চার্জশীট দেবার ব্যাপার কাগজে বেরুনের পর থেকেই নব কংগ্রেস আর ফরোয়ার্ড ব্লক এই

প্রম্ভেয় নেতার হত্যা নিয়ে আবার রাজনীতি শুরু করেছে। ওরা বলছেন যে দুজনকে আগে ধরা হয়েছিল তার মধ্যে প্রবাল দেবকে ছাড়া হেল কেন? প্রবাল দেব তো সি পি এম নেতা রথীন দেবের ভাইপো। ওকে রাখলে তো সি পি

এমের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো যেতো। প্রকাশ এর জবাবে, রঞ্জিত গুপ্ত বলেছেন, প্রবাল দেব আবার নব কংগ্রেসের চীফ হুইপ প্রফুল্ল কান্তি ঘোষেরও মামাতো ভাই। তাছাড়া প্রবাল এবং অপরজন, (শেষাংশ এগারো পৃষ্ঠায়)

মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতৃত্বের কর্তব্য সম্পর্কে পিকিং ডেলী

(দপনের সংবাদদাতা)

গত দোসরা ও তেসরা মে মধ্যাহ্ন নগাদ পিকিং রেডিও মিডিয়ম ওয়েভে সংবাদ প্রচারের সময় মে দিবস উপলক্ষে পিকিং ডেলী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় থেকে অংশ বিশেষের ইংরাজী তর্জমা শোনায়। মিডিয়ম ওয়েভে

প্রচারের উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের শ্রোতার মাতে নির্বিঘ্নে ভালভাবে সাধারণ বেতার যন্ত্র মারফৎ শুনতে পায়। যে অংশ পড়ে শোনান হয় তার কতব্য বিষয় হল যে কোন গণ- (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

জাতীয় নেতাদের মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গে

সি পি আই (এম-এল)-এর বক্তব্য

সি পি আই (এম এল)-এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি ইস্তাহার সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হয়েছে। এতে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলা হয়েছে “গোলাম তৈরীর জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল”।

এই প্রসঙ্গে জাতীয় নেতাদের মূর্তি ভাঙার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

“বিশ্ববী শব্দ-ছাত্রেরা আজ যাদের মূর্তি ধ্বংস করছেন, সত্যিই কি তারা কৃষক-শ্রমিক তথা দেশ-প্রেমিকদের সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন? ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিরুদ্ধে কি তারা বিশ্ববী প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন? ইতিহাসের বিচারে কিন্তু এই সমস্ত নবজাগরণের নেতারা ইংরেজ অপশাসনের এবং কৃষক বিদ্রোহের প্রভুত্ব ক্ষেত্রে নীরব থেকেছেন, ঔপনিবেশিক শোষণের যন্ত্রকে সংস্কৃতি ধর্ম ও বিভেদপন্থী সংস্কারপন্থী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের কাছ থেকে আড়াল করেছেন। এইভাবে তারা দেশের নবদুই ভাগ মানুষের বিরুদ্ধে গেছেন। অতএব তাঁরা জাতীয় নেতা কি সে?”

রামমোহন “ন্যাকারজনক নীল চামকে তিনি সমর্থন করেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থাকে

সমস্ত বাংলা দেশে পত্তনের চেষ্টা করেছিলেন, গ্রামে কৃষক বিপ্লবের থেকে দৃষ্টিকে অন্যত্র সরাবার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ না করে তিনি সত্যিই প্রথা রোধ নিয়ে সোরগোল তুলেছিলেন, মূল কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন।”

বিদ্যালয়গর

“যে মৌদীনীপুরে আজ কৃষক মজি মদ্রুদ্বার, সেখানেই তার জন্মস্থান, আর যে কলিকাতা বিশ্ববী তেজে প্রতিক্রিয়াশীল, সংশোধনবাদীদের পড়াড়ির মেরে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সেইখানেই তার কর্মস্থল। দেশ জুড়ে নারেক তিপ্রা-সাতাল-সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে যখন ইংরেজ নিধন যজ্ঞ চলেছে—তখন তিনি সংস্কৃত কলেজকে সেনা নিবাসে পরিণত করেন, সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ-প্রণয়ী শিক্ষা গ্রহণের একচ্ছত্র স্বাধিকার অবসানের তিনি কোন চেষ্টা করেন নি। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে উৎসাহ না দিয়ে তিনি ব্রিটিশদের সাহায্যে বিধবা বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়েই তাঁর কর্মসূচী সীমিত করে রেখেছিলেন।

বিবেকানন্দ

“যে ধর্ম মানুষের কাছে আফিম

স্বরূপ তিনি তাই ভারতীয় জনগণের কাছে প্রচার করেন। কাম্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পদ-ব্রজে ঘুরে ভারতীয় জনগণের কাছে পচা গলা সামন্তবাদী হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়ে তেলার কাজে তিনি ব্যাপৃত থেকে ছিলেন। ‘অজ্ঞ, মর্চি, মেখর, চন্দালের’ রক্তে তৈরী এই সমাজকে যে ইংরেজ দখল করেছিল, জমিদার, ধনীরা যে এই সমাজকে অন্যান্যভাবে শোষণ করছিল তার বিরুদ্ধে ‘চন্দাল, মূর্খ,’ শোষিত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করার কথা না বলে, গীতার ‘কর্মবাদ’ আর বৈদান্তিক ‘মায়াদেব’ ধোঁয়াশা ছড়িয়ে বিবেকানন্দ ঔপনিবেশিক শাসনের দালালী করেন নি?

রবীন্দ্রনাথ

মুক্তি বোজাদের ব্যঙ্গ করে ‘ঘরে-বাইরে’ চার অধ্যায়, লিখেও তিনি দেশপ্রেমিক, কৃষকদের গানের রক্তে মানসী-সোনারতরী চিত্রার তুলি ভিজিয়েও তিনি মানব-মুক্তি-পিয়ালী, ইতালীর ম্যুসোলিনী, সাম্রাজ্যবাদী শোষণজাত নোবেল প্রাইজ, এবং ইংরেজ শাসনের ভুসসী করেও তিনি ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদের দালালদের সহযোগিতায় দালাল তৈরীর আখড়া ‘শান্তিনিকেতন’ তৈরী করেও তিনি আদর্শ শিক্ষাগুরু, ব্রিটিশের কুকুর গান্ধীকে ‘মহাত্মা’ উপাধি দিয়েও তিনি ন্যায়নিষ্ঠ,

কাব্য-প্রবন্ধ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পচা গলা সামন্তবাদী ‘ঔপনিবেশিক ভক্ত’ প্রচার করেও তিনি প্রগতিশীল, বৈজ্ঞানিক বিচারে রবীন্দ্রনাথ কি প্রতিক্রিয়াশীল নয়?

“দেশের মধ্যে যখন ঔপনিবেশিক শোষণ চরম হয়ে উঠেছে, তখন শ্রমিক-কৃষককে নিয়ে গণমুক্তি ফোঁজ তৈরী না করে মজি-মদ্রুদ্বার-শব্দ না করে প্রথমে ক্ষমতার লেভে কংগ্রেসের মধ্যে নীরবে অবস্থান করেছেন এবং পরে জার্মানি ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ও ফ্যাসিবাদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ

মুক্তি ফোঁজ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জেলার সেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক-ধারীদের সংখ্যা মোটেই নগণ্য নয়। ছোট ছোট জেলাতে হয়ত পাঁচশো সাতশো বন্দুকের মালিক রয়েছে এবং বড় জেলাতে হয়ত তাদের সংখ্যা এক হাজার থেকে দুই হাজারের ভিতর হবে।

সরকার হয়ত এই সব বন্দুকের মালিকদের স্থানীয় সরকারী অস্ত্রাগারে বন্দুক জমা দিতে বলতে পারেন যাতে আর বন্দুক ছিনতাইয়ের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু আবার ভাবছেন যদি সকলেই বন্দুক জমা দিতে শুরু করে তাহলে, হয়ত দক্ষিণকারীরা সেই সুযোগে ডাকাতি রাজাজানি করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যাবে। রাইটস বিল্ডিং থেকে বীরভূম জেলাতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যে সমস্ত জায়গায়, বিশেষ করে রামপুরহাট, বোলপুর অঞ্চলে অনেক বন্দুক চুরি হয়েছে সেই সব জায়গায় বন্দুকের মালিকদের সরকারী অস্ত্রাগারে যত শীঘ্র সম্ভব তাদের বন্দুক জমা দেওয়ার।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এই সমস্ত অঞ্চলে কে বা কারা এই বন্দুক চুরি করছে। সরকারী মতে কোন কোন জায়গায় নকশালরা এই কাজ করছে, আবার কোন কোন জায়গায় নাকি সমাজ-বিরোধীরা এই কাজে লিপ্ত আছে। আবার কোন কোন জায়গায় নকশালরা আর সমাজবিরোধীরা সব একাকার হয়ে গেছে।

তবে একটা ব্যাপার খুবই পরিষ্কার যে বন্দুকের মালিকেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রায় কোনও রকম প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না করেই বন্দুক চাওয়া মাত্রই দক্ষিণকারীদের দিয়ে দিয়েছেন। মদ্রুখোস পরে পাঁচ সাত জন লোক ছোরা, ভোজালি বা বোমা নিয়ে বন্দুকের মালিকদের বাড়ী চড়াও হয় এবং নির্বিবাদে নাকি বন্দুক নিয়ে পাালিয়ে যায়। তাই দেখে অনেকের ধারণা হয়েছে যে বন্দুকের মালিকেরা যে কোন কারণেই হক আজ-কাল ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং কোন কামেলার সম্মুখীন হতে রাজী নন। এমন কি সন্দেহ করেও কারুর নাম পালিশের কাছে দিতে চান না, পাছে আবার তাদের বাড়ীতে হামলা হয়।

সাহায্য নিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালিয়েছেন।”

“যে সমস্ত জাতীয় নেতাদের মূর্তি বিপ্লবী শব্দ ছাত্ররা ধ্বংস করছেন, হয়তো ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা মহৎ, ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে বিদেশের স্বার্থে হলেও সামান্য ভূমিকা তাঁদের আছে। কিন্তু প্রত্যেকটী ব্যক্তির কর্মকালাপকে তাঁর প্রণয়ী থেকে পৃথক করে দেখবার দিন-সময় এখনও আসেনি অতএব তাঁদের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন এখন চলতে পারে না।”

শব্দ যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুকের মালিকদের কাছ থেকে বন্দুক চুরি হচ্ছে তাই নয়, পালিশের হাত থেকেও বন্দুক ছিনতাই কিছুদিন হল চলছে। এই চুরি করা বন্দুক নিয়েই কি তাহলে সি পি এম (এম-এল) তার পার্টির “মুক্তি ফোঁজ” গঠন করতে চাইছে। কিছুদিন আগে এই পার্টির নেতা শ্রীচারু মজুমদার বলেছেন যে, যেই মদ্রুখোসে দেখা যাবে যে কৃষক বন্দুক ছিনতাই করতে শুরু করেছে তখনই মনে করতে হবে যে মুক্তি ফোঁজ গঠন করার সময় হয়ে গেছে।

তিনি বলেছিলেন যে, চীনের “রেড আরমি” মাত্র তিন শত রাইফেল নিয়ে বিপ্লবাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এবং ভারতবর্ষে বাটীট রাইফেল আর দুই শত পাইপগান নিয়েই মুক্তি ফোঁজ গঠন করা যেতে পারে। তবে কি সি পি আই (এম-এল)-এর মুক্তিফোঁজ গঠনের পথে?

পিকিং ডেলী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সংগ্রামে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃবৃন্দের কতবা সম্পর্কে।

কঠিন অধ্যবসায় নিয়ে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করতে হবে, প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাকে আয়ত্ত করতে হবে। গণ আন্দোলন ছাড়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অয়ত্ত করার অথবা প্রয়োগ করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পিকিং ডেলীর এই সম্পাদকীয় বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আরও গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়ম ওয়েভে প্রচার।

এখানকার মার্কসবাদী-লেনিনবাদের বাদী নেতা শ্রীচারু মজুমদার অনেকদিন আগে মার্কসবাদ লেনিন অধ্যয়ন বিষয়ে একটি সোজা ফরমুলা দিয়েছেন। তাতে চেয়ারম্যান মাও-এর তিনটি নীতিদীর্ঘ রচনা পড়লেই বর্তমানের প্রয়োজনে যথেষ্ট বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

আর গণ-আন্দোলন সম্পর্কে চারবাবুর দলের মত পরিষ্কার। ওদের পথ গণআন্দোলনের নয়, ষড়যন্ত্রের। ওদের মতে সমস্ত গণ-আন্দোলনই মৌলিকভাবে অর্থ-নীতিবাদের গাড়ডায় আবদ্ধ হয়ে যায়, এবং তার ফলে মূল রাজ-নৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম চিরকালই দুর্বল থাকে।

বাংলা কংগ্রেসের ভাঙ্গন অবশ্যতাবী

তলবী সভা ডাকা হচ্ছে ॥ সুশীল খাড়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

সুশীল খাড়াকে বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকীয় ও সম্ভব হলে দল থেকে বহিস্কার, অন্যথায় অজয়বাবু নিজেই আলাদাভাবে দল করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ফলে বাংলা কংগ্রেসে একটা বড় ভাঙ্গন অবশ্যতাবী। সুশীলবাবু একটা আপোষের চেষ্টায় আছেন, এবং খ্রীসতীশ সাম্রাজ্যকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু খ্রীসাম্রাজ্য সেই প্রস্তাবে রাজী হন নি এবং অজয়বাবুও সুশীলবাবুর কোন কথা শুনতে রাজী নন।

লোকচক্ষুর অন্তরালে রাজ্যের মধ্যমশ্রেণী খ্রীঅজয় মধ্যশ্রেণীর দলে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। কর্ম-পরিষদের একজন প্রবীণ সদস্য খ্রীশিউমঙ্গল সিংহ দলত্যাগ করে নব কংগ্রেসে চলে গেছেন। অপর প্রবীণ সদস্য খ্রীঅবিনাশ বসুও পদত্যাগ করেছেন। এদিকে গত পাঁচশে মার্চ টেশবাবুর মত কর্ম পরিষদ ও বাইশে মার্চ সম্পাদকমণ্ডলীর শেষ সভা হয়ে গেছে

তারপর আর কোন সভা ডাকা হচ্ছে না বা ডাকার কোন লক্ষণও নেই।

সভায় ঠিক হয় যে, খ্রীসুশীল খাড়াকে দরকারমত দল থেকে বহিস্কার না হোক, সম্পাদক পদ থেকে অপসারণ অবিলম্বে করতে হবে। খ্রীখাড়া যদি তাদের উদ্যোগ আগে ভাগে জেনে খ্রীপ্রণব মধ্যশ্রেণীকে বা অন্য কাউকে দল থেকে সরাবার চেষ্টা করেন তবে সেটা সমবেতভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। আশু কর্মসূচী হিসাবে ঠিক হয় যে, অবিলম্বে খ্রীইন্দ্র সেনগুপ্তের বাড়ী থেকে বাংলা কংগ্রেস অফিস সরিয়ে আনতে হবে। সেই কাজে যদি বাধা দেখা দেয়, তবে আলাদা ভাবে বাংলা কংগ্রেসের অফিস করা হবে। সুশীলবাবু সম্পর্কে অজয়বাবুর মনোভাব কি তাও সভায় বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়।

সুশীলবাবু একটি নতুন পথ নিয়েছেন। সেই পথ হল বিভিন্ন কর্মী সম্মেলনে তিনি অজয়বাবুকে তীব্রভাবে সমালোচনা করছেন-আর শিল্পপতিদের কাছে দাদার খুব

প্রশংসা করছেন। সুশীলবাবু বলেছেন, দাদার খুবই ইচ্ছে ছিল তাকে মন্ত্রী করবার, কিন্তু নানা পরি-স্থিতিতে তা সম্ভব হয় নি। পরি-স্থিতি পরিবর্তন হলেই তাকে মন্ত্রী করা হবে। একজন শিল্প-পতি কথা প্রসঙ্গে অজয়বাবুকে বলে ফেললেন, সুশীলবাবুকে কবে মন্ত্রী করবেন। অজয়বাবু শুনেই বজ্রেন সুশীল কোনদিন মন্ত্রী হবে না। ও সব কথা ভুলে যাও। এ ছাড়া অজয়বাবু খ্রীপ্রণব মধ্যশ্রেণী ও খ্রীহরিদাস মিত্রকে বলে দিয়েছেন তেঁয়রা সংগঠন করো আর তিনি নিজেও খুব শীঘ্র সংগঠনের কাজে কিছুটা মনোযোগ দেবেন, কারণ সুশীল খাড়াকে বাদ দিতে তার নিজেরও সংগঠনে কিছু সময় দেওয়া দরকার। সুশীল খাড়া কর্মপরিষদের সভা না ডাকলে একটা তলবী সভা ডাকার ব্যাপারেও তিনি অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানা গেছে। খ্রীপ্রণব মধ্যপাধ্যায় তলবী সভা ডাকা ও অন্যান্য সংগঠনমূলক কাজে বিভিন্ন জেলা সফর সুরু করে দিয়েছেন।

এবার পশ্চিমবঙ্গে সত্যই অসভ্য ও বর্বর সরকার কায়েম হয়েছে

(দর্পণের পূর্ববন্ধক)

পশ্চিমবঙ্গে এবার সত্য সত্যই একটা “অসভ্য বর্বর” সরকার কায়েম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

না হলে দিন দপ্তরে মহাকরণে দলীয় পতাকা তোলার দৃশ্যসাহস আসে কোথা থেকে? সরকারী কর্মচারীদের ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আক্রমণ চালাবার সাহস কংগ্রেসীরা কোথা থেকে পেল? প্রকাশ্য দিবালোকে রাজ্য-সরকারের প্রধান দপ্তরে আক্রমণ যারা চালাতে সাহস পেল, বর্তমান সরকারের মধ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর এবং উপমধ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহারের প্রত্যক্ষ প্রায় ও গোপন উৎসাহ না পেলে এরকম দৃশ্যসাহস দেখাবার স্পর্শ কি করে তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে? অর্থমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষই বা কি ধরনের ক্ষুভা দিলেছিলেন, যার ফলে তারা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ওপর পতাকা তোলার প্রেরণা পেল?

জনসাধারণ লক্ষ্য করে থাকবেন যে বর্তমান অগণতান্ত্রিক অত্যাচারী কংগ্রেসী সরকার কায়েম হবার পর রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য খুন, রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা, রাহাজানি বিপুল হারে বেড়ে গেছে। সি আর পি মিলিটারী ও স্থানীয় পুলিশের অত্যাচারী দনীতীপরাগণ অংশ জনসাধারণের উপর বলগাহীন অত্যাচারের স্রোত বইছে দিচ্ছে।

থানায় অভিযোগ করতে গেলে সরকারী গুন্ডাদল পুলিশের ও স, মহিলাদের চুলের ঝুটি ধরে প্রহার করতেও বিধা করছে না। থানায় লক আপে অমানুষিক নির্যাতনে ফ্যাসিস্ট হিটলারী রাজ্যের অন্ধকার দিনগুলির কথাই মনে হয়।

ব্যপক ভাবে নির্দোষ সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের অজুহাত হিসেবে নকশালী আক্রমণের দোহাই দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেখা গেছে কংগ্রেসী গুন্ডার দলই কখনো নকশাল কখনো ফরওয়ার্ড ব্লক, কখনো সি পি আই লেবেল এটে জনসাধারণের উপর যখন আক্রমণ চালায়। তখন পুলিশ সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে অন্যদিকে মৃদু ফিরিয়ে থাকে। কিন্তু যদি কোন এলাকার মানুষ মরিয়া হয়ে এসব হামলার প্রতিরোধ করতে যান তাহলে পুলিশ, মিলিটারী, সি আর পি সঙ্গে সঙ্গে এসব বদ-মাইশ হামলাবাজকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে।

বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে আজ যে কোন সংবিধান বিদ্রোহিত গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি চালু আছে তা মনেই হয় না।

অজয় নারায়ণ হত্যার রক্ত-ধারায় সিক্ত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ক্ষমতা-সীন হয়ে আরো উদ্দাম, নৃশংস হয়ে উঠেছে। মন্ত্রিসভার প্রথম তিরিশ দিনেই রাজনৈতিক হত্যার তালিকা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছে— ইতিমধ্যেই তা দেড়শর কোটা ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মন্ত্রিসভার আমলে জ্যোতি বসু, স্বরাষ্ট্র সচিব থাকা কালে তেরো মাসে এর এক তৃতীয়াংশ নিহত হইল, তবু বর্জ্যেরা শ্রেণীর পোষা সারমেয়র দল চীৎকার তুলেছিল আইনশৃঙ্খলা নেই।

সারমেয় সাংবাদিক আঘাতে গল্প রচনা করেছিল বাংলা দেশে নারীর ইচ্ছা নেই, বাংলাদেশে সাধারণ নিরাপত্তা নেই। তাদের প্রচুর হুকুম দিয়েছিল সাদাকে কালো বলে দেখাও আর কালোকে সাদা বলে বর্ণনা কর। সঙ্গে সঙ্গে সারমেয়রা চীৎকার উঠেছিল আনন্দবাজার, ষড়যন্ত্র, স্টেটস-ম্যানের পাতায় পাতায়। শাশুড়ী বউয়ের ঝগড়াকে, সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধকে এবং জল নিয়ে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটে কলহকে পর্বন্ত এরা সেদিন সি পি এম ও অন্যান্য দলের (কংগ্রেস বাদে!) শত্রুকে সংঘর্ষ বলে প্রচার করেছিল।

নারী নির্যাতনের কল্পিত কাহিনী বানিয়ে সেদিন অজয় মুখার্জী কুম্ভীরপ্রদ বর্ণন করেছিলেন। বলেছিলেন তার সরকার অসভ্য বর্বর সরকার।

সেই মানদণ্ডে বিচার করে আজ অজয় মুখার্জীর কংগ্রেসী সরকারকে কি বলা যায়? যেখানে ভদ্রঘরের রমণী থানায় গিয়ে ও সির হাতে প্রহৃত হয়ে সংবাদপত্রে সুবিচার প্রার্থনা করে পর লেখেন এবং বার্ষিকমোক্ষ হয়ে লাঞ্ছিতা পাণ্ডুলীর মত অভিযাপ দেন, যে রাজ্যে কৃষক রমণী, বালিকাবধূ কন্যা সি আর পি পুলিশ গুন্ডাদের হাতে নিগৃহীতা অপমানিতা লাঞ্ছিতা হয়ে চোখের জলকে আগুনে পরিণত করছেন, যে রাজ্যে দিনের পর দিন ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি রক্তলেখায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করছে, সেই রাজ্যের মন্ত্রিসভাকে কি বলা যায়? শয়তান, অসভ্য, বর্বর?

দুঃখের বিষয় অভিযানে এ সরকারের বিশেষণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

কানা ছেলের পশ্মলোচন নামকরণ করার মত এই সরকারকে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের সরকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

অথচ গত একমাসে এই মন্ত্রিসভার কার্যকলাপ রূঢ়ভাবে দেখিয়ে

দিয়েছে এই সরকার শ্রমিক-কৃষক কর্মচারী বিরোধী একটা ফ্যাসিস্ট সরকার মাত্র।

সংবিধানে সাধারণ মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে সভা সমিতি শোভাযাত্রা বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোন নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে সেই মৌলিক অধিকারকে ধ্বংস করে দিতে চায়?

কোন গণতান্ত্রিক সরকার সাধারণ মানুষের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার পর্বন্ত তুলে দিয়ে বিনবিচারে আটকের আইন আশ্রয় করে বেঁচে থাকে? বুটীশ আমলের এন্ডারসন কালেকান্দন বলে কোন গণতান্ত্রিক সরকার শাসন চালাতে চায়?

সাধারণ মানুষকে পুলিশ সি আর পি, মিলিটারী দিয়ে ঘিরে ধরে, তার সমস্ত মৌলিক অধিকার-গুলিকে নস্যং করে বিভীষিকার কালো অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করে?

কোন গণতান্ত্রিক সরকার দলীয় ব্যক্তিদের মহাকরণে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে সরকারী কর্মচারীদের দৈহিক নির্যাতন চালাতে উৎসাহ দেয়?

কোন গণতান্ত্রিক সরকার শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের লাঞ্ছিত করে, নিগৃহীত করে তাদের মনো-বল ভেঙ্গে দেবার জন্যে এলাকা এলাকা মিলিটারী দিয়ে ঘেরাও করে রাখে? একশ চুয়াল্লিশ ধারা পি ভি এ আইন, এন্ডারসন কালেকান্দন বলে নিপীড়নের তুষ্ণা যার মেটে না, পাড়ায় পাড়ায় গুপ্তচর বাহিনী সৃষ্টি করে (মাসে একশ পাঁচ টাকা দিলেই যে সব সমাজ-বিরোধী দৃষ্টান্তদের পাওয়া যায় তাদের নিয়ে), স্বাধীন দেশের নাগরিকের পবিত্র অধিকার তার দেহ, গৃহ এবং সম্মানকে নিগৃহীত করে যারা বিবেকের বিপদমাত্র দংশন অনড়ব করে না, তারা গণতান্ত্রিক?

অজয় মুখার্জী যেদিন বলেছিলেন যে তাঁর সরকার “অসভ্য বর্বর” সেদিন কিন্তু এসব ছিল না। আজ তিনি সত্যিই এক অসভ্য, বর্বর সরকারের মধ্যমন্ত্রী!

শুধু তাই নয়, এ সরকার পশ্চিমবঙ্গে আজ সাম্প্রদায়িকতা প্রচারেরও অগ্রদূত। যে পশ্চিমবঙ্গে সুস্থ গণতান্ত্রিক চেতনার বলে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিক্রিয়াশীল সমস্ত মনোভাবকে পবিত্র বঙ্গভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছিল, বর্তমান মন্ত্রিসভা আজ কবর থেকে সেই সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ লীল, ও জন-সংঘকে তুলে এনেছে।

এ সরকার সাম্প্রদায়িকভাবে পুনরুজ্জীবিত করেই ক্ষান্ত হব নি।

ফ্যাসিস্ট সন্তাসের রাজনীতি আশ-দানী করে, তাকে উৎসাহ দিয়ে সংগঠিত করে এলাকায় এলাকায় তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বেলিয়াঘাটায় ডাকঘরের কর্মচারীদের উপর আক্রমণ, মহাকরণে সরকারী কর্মচারীদের উপরে আক্রমণ, ব্যাপক ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মহড়া মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দ্রুতবেগে এই সত্যটী তাঁদের সামনে উদ্ঘাটিত হতে দেখেছেন।

অজয় জোড়াতালি দিয়েও এই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল অগণতান্ত্রিক সরকার জনগণের রোষবাহি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। হিংস্র ফ্যাসিস্ট দমনপীড়ন চালিয়েও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের উন্নতমস্তক নুইয়ে ফেলা সম্ভব হবে না।

বিরোধী এম এল এদের জেলে আটক রেখে, তাঁদের অনেককে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিধানসভায় উপস্থিত হতে বাধা দিয়েই এই অগণতান্ত্রিক সরকার নিশ্চিন্ত নয়, নিজের অস্তিত্বেরোধে জর্জরিত সংখ্যালঘু জোটকে জোড়াতালি দিয়ে রাখার জন্যে মন্ত্রিসভার টোপু ফেলে, আশ্রয় গম্ভীরামদের পায়ে তৈলসিঞ্জন করে, কখনো বা দলীয় সদস্যদের পর্বন্ত গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে এরা টিকতে চাইছে।

সরকারী আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে দলীয় নির্বাচন কর্মীদের নিয়োগ করার গোপন অভিসন্ধি

নিয়ে যারা বেকার সমস্যা সমাধানের ভাঙ দেখায়, গুন্ডা পোষার কল হিসাবে দপ্তর খোলার অভিসন্ধি নিয়ে যাদের চলতে হয়, পুলিশ, সি আর পি-র লাঠি ও বুলেটের আড়ালে না থাকলে যারা নিরাপদ বোধ করতে পারে না, তেমন একটী অগণতান্ত্রিক সরকার বাংলাদেশের তেজগাঁয়ান, সংগ্রামী মানুষ কতদিন সহ্য করবেন?

যারা আজ এই ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারকে জনগণের কাঁখে চাপিয়ে দেবার অশুভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাদের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ী জনগণ ক্ষমা করবেন না। ইতিহাসের আঁতাকুড়ে তাদের নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

ইতিহাসের ইংগিত মূঢ় মাত্রই দেখতে পায় না। বিগত নির্বাচনে তেঁরিশ থেকে পাঁচে, তিরিশ থেকে তেরোয় এবং একশ থেকে তিন-এ পর্য্যবসিত হয়েও যে সব দলের কংগ্রেসী মহামারী রোগ ধরেছে, তাদের যশে বাতি দেবার অবশিষ্টও যে থাকবে না, একথা স্বরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে।

গিল্টিকে গিনি সোনা বলে যেমন চালানো যায় না, তেমনি এই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল অসভ্য বর্বর সরকারকেও গণতান্ত্রিক সরকার বলে চালানো যাবে না।

বাংলা দেশের মানুষের দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠাধার, জলাটের হুকুটীতে, মর্দিত বন্ধ হস্তের ইসারায় সেই অমোঘ আদেশ ঘোষিত হয়েছে।

দুর্গাপুরে বেগরোয়া ছাঁটাই ও শ্রমিক নির্যাতন চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী বাজারী পরিচালনা গুন্ডার মাধ্যমে যখন বন্ধ কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত ফলাও করে প্রচার করছেন ঠিক তখন একের পর এক কারখানা, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে বিভিন্ন মালিকগোষ্ঠী বেগরোয়াভাবে, নানা সংস্থাতে ছাঁটাই করে চলেছেন।

সরকার পক্ষ নিজেরাও শ্রমিক নির্যাতনে কোন অংশে কম যাচ্ছেন না। দুর্গাপুর ও বিভিন্ন শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে সি আর পি, মিলিটারীর তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। ইদানীং ওপার বাংলায় মেয়েদের উপর পাক ফোজের হামলাতে মন্ত্রিসভার ও বিভিন্ন সংবাদপত্র-গুলোর “আমি” সর্বস্ব সাংবাদিকগণ অনেকে কামাকাটি শুরু করেছেন, কিন্তু এপার বাংলাতেও মিলিটারী ও সি আর পি হাতে শ্রমিক কর্মচারীদের মেয়েরা যে যথেষ্টভাবে লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হচ্ছেন সে সম্পর্কে এরা নীরব।

শিল্পনগরী দুর্গাপুরে মালিক গোষ্ঠীর বেপরোয়া ছাঁটাই নীতি ও সরকার পক্ষের তরফে সি আর পি ও মিলিটারীর শ্রমিক নির্যাতন অব্যাহত গতিতে চলেছে। এ সি

সি ভিকার্স বেব কপ কোম্পানীতে গত বিশে এপ্রিল সাতাশজনকে ছাঁটাই করা হয়েছে। সস্তর সালে দুর্গাপুর শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ গ্রহণকারী কর্মী ছাড়াও, এ ভি বি এমসলিঞ্জ ইউনিয়নের এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিও এই ছাঁটাই তালিকায় রয়েছেন। গত আটই ফেব্রুয়ারীও একদফা ছাঁটাই করা হয়েছে। সেই তালিকায় সতেরো জন কর্মী ছিলেন।

এতো গেল ছাঁটাই প্রসঙ্গ। অন্যদিকে, দুর্গাপুরের মাইনিং এন্ড এ্যালাইড মেশিনারী কর্পোরেশনের সস্তর জন কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আজও বহুদূর। নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা আজ বিপদগ্রস্ত। অভিযোগ, ইতিমধ্যে বিব-কর্মীগণের দু জনকে গ্রেপ্তার হব যথেষ্ট হুমকি ও নির্যাতন করা হয়। এবং অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারীদের বাড়ী সার্চ করার সময়ে তাঁদের অপমান করা হয়। এখন অনেকেই প্রশ্ন, মালিক গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ ও সি আর পি মিলিটারী দিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের উপর অত্যাচার চালিয়েই কি শিল্পে শান্তি আনা হবে?

বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কিভাবে সফল হতে পারে

(দর্পণের পূর্ববন্ধক)

বাংলা দেশের অমর জনগণ ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন, তার প্রকৃতি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃতি। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বস্তুতঃ বিদেশী ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিসত্তার প্রতিরোধ সংগ্রাম।

এই সংগ্রাম শ্রেণী ভাষাপর্ব-বিহীন হতে পারে না, কারণ শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যা কিছু ঘটে তার পেছনে শ্রেণী মনোভাব থাকতে বাধ্য। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামও শ্রেণীনিরপেক্ষ হতে পারে না। জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণী নিজ নিজ চূড়ান্ত লক্ষ্য অনুসারে পরিচালিত হয়, কিন্তু সাময়িক ভাবে সাধারণ লক্ষ্য সাধনের জন্যে এই শ্রেণী সংঘর্ষ অস্থায়ী ধরনের ঐক্যেরও সৃষ্টি করতে পারে এবং করেও। বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার ঐক্য ও সংগ্রামের চলমান ধারাই সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যায়।

কিন্তু শ্রেণী মনোভাব থেকে উদ্ভূত ঘটনা পরস্পর বিশ্লেষণ কালে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন প্রত্যেকটী মানুষকেই একথা ভুলে গেলে চলবে না যে শ্রেণী সংগ্রামে ঐক্যের উপাদান নিত্যন্তই স্বল্প-

স্থায়ী, বিরোধের উপস্থানই মধ্য ও প্রধান। সাময়িক রণকৌশলগত ঐক্যকে মৌলিক রণনীতিগত বিরোধীয় উপাদানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে দ্রুত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভুল ব্যাখ্যা দেখা দেয়। আবার, কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে সামাজিক শক্তির বিন্যাসে সাধারণ লক্ষ্যের ঐক্যকে ছোট করে দেখা মতামত মতুতারই পরিচায়ক।

১৯২২ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সম্মেলনে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নতুন অবস্থা ব্যাখ্যা করে লেনিন দেখিয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ যখন বর্তমান যুগে প্রতিযোগিতামূলক বিকাশের ধারা পরিহার করে একচেটিয়া পুঁজিবাদী রূপ গ্রহণ করেছে তখন কোন দেশেই আর জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৃজ্জোন্মাদ শ্রেণীর কার্যকরী নেতৃত্ব থাকলে তা সফল হতে পারে না। আপোষমুখিতা, সুবিধাবাদী আঁতাত ইত্যাদি ঝোঁকের দরুন মূল্য লক্ষ্য অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে জাতিসত্তার মুক্তি সংগ্রাম সম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে সুবিধাবাদী আপোষে পরিণত হয়।

ভারত-পাক উপমহাদেশের দুটি দেশেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব ও দায়িত্ব প্রধানতঃ সামন্ত বৃজ্জোন্মাদ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত থাকার দরুনই স্বাধীনতার পরবর্তী কালে জনগণের অসীম দুঃখ ও ক্লেশভোগের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেখা দিয়েছে।

সুতরাং বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ, পরিষ্কার ধারণা নিয়েই তাকে স্বাগত সমর্থন জানাতে হবে।

একথা ভাবা ঠিক নয়, যেহেতু বর্তমান স্তরে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম উদীয়মান মধ্য শ্রেণী-গুলি ও নবীন বৃজ্জোন্মাদ শ্রেণীর হাতে অতএব প্রগতিশীল শক্তিশালী ঐ সংগ্রাম থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে হবে। তাহলে কম্বোডিয়ান রাজা সিহানুক অথবা জাওসের রাজপ্রত্যাগত নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকেও সমর্থন করা যায় না। দুঃখের বিষয় কিছু কিছু তথাকথিত প্রগতিবাদী শেখ মুজিববরের নেতৃত্বে এবং প্রধানতঃ বাঙালী সিভিলিয়ান ও পুঁজিবাদের সহায়তার আরম্ভ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে নেহাৎ ইয়াহিয়া-মুজিব লড়াই বলে দেখাতে চাইছেন। অর্থাৎ এঁরা আরম্ভ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বকে বড় করে দেখছেন এবং শ্রেণীসংগ্রামের উপাদানকে ছোট করে দেখাচ্ছেন। এঁরা গরম গরম বুলি বেড়ে বিপ্লবীদের প্রকৃত দায়িত্ব-জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে প্রমিক শ্রেণীর ও গ্রামীণ সর্বহারা, গরীব কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্বে নিয়ে আসার বিপ্লবী দায়িত্ব এড়াবার কৌশল গ্রহণ করেছেন।

অন্যদিকে আরো একদল প্রগতির ধুরাবাহী “শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা”, বলে উচ্চ নিনাদ করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জনগণের ভূমিকাকে ছোট করে দেখাবার হীন প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। এঁরাও একই পথের পথিক। শেখ মুজিবের ব্যক্তিসত্তাকে সংগ্রামের উদ্দেশ্য স্থাপন করে এভাবেও বাংলা দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শ্রেণীনিরপেক্ষতার ভাণ দেখিয়ে বিপথে, পরাজয়ের মুখে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। একাজ বৃজ্জোন্মাদ শ্রেণীর পদলেহীদেরই কাজ।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে বাংলাদেশের সমস্ত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলে বুঝে নেওয়া যায়। অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম প্রধানতঃ বৃজ্জোন্মাদ শ্রেণীর নেতৃত্বের আওতার রাখা সম্ভব হয়েছিল এবং সংগ্রাম পরিচালনার গতিপথে প্রমিক-কৃষক

শ্রেণীর ভূমিকাকে ছোট করে রেখে, বৃজ্জোন্মাদ আপোষ-প্রবণতার খাতে সংগ্রামকে পরিচালিত করা হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি পাক-ভারত উভয় দেশেই সামন্ত একচেটিয়া পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়েছে এবং তার পেছনে বিশ্ব-পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় সমর্থন রয়েছে। সুতরাং মুখে সমাজ-তন্ত্রী ধাঁচ থেকে “গরীব হঠাৎ”-এর সমাজতন্ত্র বা “গরীব হঠাৎ” মার্ক্স উদ্ভূত পুঁজিবাদের ক্রেশকর পর্বেরে এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি।

বাংলাদেশের মানুষকে পাক-ভারত উপমহাদেশের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্থানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে গণ অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে তার রণনীতি ও রণকৌশলের গতিশীল প্রয়োগের উপরেই ভবিষ্যত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

প্রত্যেকটি সংগ্রামই বিভিন্ন পর্বেরে বিভিন্ন রূপ নেয়। প্রত্যেক সংগ্রামের পেছনে থাকে রাজনীতি। রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য কখনও শান্তি কখনও সশস্ত্র সংগ্রাম, কখনও শান্তি আলোচনা কখনও দ্রুততার সঙ্গে অস্ত্রবলে সমস্যার সমাধান—এই উদ্ভাবিত কৌশলই নমনীয়ভাবে অবলম্বন করার ক্ষমতা যে কোন নেতৃত্বের অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য গুণ। মূল লক্ষ্য অর্থাৎ রণনীতি স্থির রেখে স্থানীয় অবস্থাকে দ্রুত অদল-বদল করে মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে পারাটাই সাফল্যজনক রণকৌশলের পরিচয়।

সুতরাং রণনীতিকে রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে সুসমঞ্জস করে তোলাটা প্রাথমিক দায়িত্ব। বাংলা দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এই দুর্বল দিকের জন্যেই ইয়াহিয়া খানের সামরিক শক্তি প্রথম পর্বেরে জাতীয় মুক্তি বাহিনীকে অনেকটা বে-কায়দার ফেলতে পেরেছে। বাংলাদেশের নেতৃত্ব অঁচিরেই এই দুর্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন, এ ভরসা না পাবার কারণ নেই।

এই দুর্বল দিক পরিহার করতে গেলে প্রথমেই বাংলাদেশের অস্থায়ী জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট সরকারের গণভিত্তি সবল করে তুলতে হবে। অর্থাৎ বাঁরা বাঁরা আজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা পন্থাভিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পন্থায় বিশ্বাসী তাঁদের সবাইকেই জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সরকারে অংশ গ্রহণ করতে দিতে হবে।

এই গণভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করাতে হলে অবিলম্বে ছাত্রদের এগারো দফা দাবীগুলির ভিত্তিতে (শেখ মুজিব, মৌলানা ভাসানী, পি ডি পি প্রভৃতি সমস্ত দলনেতাই একে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং এই এগারো দফা দাবী মূলত মুজিব ও ভাসানীর ছয়দফা ও চৌদ্দদফার সুমজস সাধারণীকরণ মাত্র) প্রয়োজনীয় শাসন-

তান্ত্রিক সংস্কারগুলি ঘোষণা করতে হবে।

এগুলি করতে হলে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে ছুটি বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রথমেই দরকার। তা হলেই বিন্মৃত গ্রামাঞ্চলে কৃষক সাধারণ বিপুল উৎসাহে ঘোষিত অধিকার রক্ষা করবার জন্যে ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবেন।

সঙ্গে সঙ্গে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের ন্যূনতম দাবীদাওয়া মেনে নিয়ে সনদ জারী করতে হবে। শ্রমিকদের এই ঘোষিত অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্যে তাদের মধ্যে গেরিলাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। ছাত্র ও বৃদ্ধকে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে গুপ্ত গেরিলা সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

যদি এই কাজগুলি অবিলম্বে করা হয়, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ আবেগের সৃষ্টি হবে, তাঁরা যত স্বচ্ছ ভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত যোগসূত্র লক্ষ্য করতে পারবেন, ততটা দৃঢ়ভাবেই তাঁরা এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবেন।

অর্থাৎ রাজনীতিকে দৃঢ়ভাবে রণনীতির সমর্থনে এগিয়ে নেবার গণভিত্তি রচিত হবে। তখনই প্রকৃত জনস্বত্বের পর্বায় শুরুর হবে।

তখন রসদ অথবা সমরোপকরণ পাবার জন্যে কোন বন্ধু দেশের ধোঁজে বেরতে হবে না। পেলে ভালো, না পেলেও সংগ্রামের উপকরণ পাকসেনাদের কাছ থেকেই আহরণ করা সম্ভব হবে। জনগণ জনস্বত্ব শুরুর করলে সারা দেশের ভূ-প্রকৃতি গেরিলা সেনাদের সমর্থনে সক্রিয় হবে। অজস্র খাল, বিল, নদী-নালা, মেঠো পথ জঙ্গলের আড়ালে তাদের আশ্রয় ও ভ্রাতারক্ষার দৃঢ় বৃহৎ রচিত হবে।

মনে রাখা ভালো যে বিশ বছর ধরে যুদ্ধ চালাবার পর ইন্দো-চীনে নতুন করে পশ্চিমজিপস সালে ফরাসী আক্রমণ শুরুর হয়েছিল। চম্পাস সালের জেনেভা চুক্তির মাত্র একবছর পর পশ্চিম সাল থেকে নো দিল্লম চক্রের পেছনে দাঁড়িয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জেনেভা চুক্তিকে কুর্বতঃ বাতিল করে দেয়। তারপর দিয়েমের ফ্যাসিস্ট চক্র গ্রামে গ্রামে কাঁটাভারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ধরে, মাইন বাসিয়ে, পেট চিরে নাড়ী-ছুড়ি বের করে নানা বীভৎস অত্যাচার করেও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে দমন করতে পারে নি। ১৯৬৫ সাল থেকে ছয় লক্ষ সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত মার্কিন সেনা ও কুড়ি লক্ষ সুসজ্জিত দক্ষিণ-পূর্বের নামা আর্মির সেনা দল আক্রমণ চালিয়েও গেরিলাদের আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু খুব সহজে এ অবস্থা আসেনি। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রতিরোধের (শেখাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

কৃষক শ্রমিক ক্যান্ট্রীর

শ্রমিকদের আভ্যোগ

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

কৃষক শ্রমিকদের বাদবপূর ও বারুইপুড় শাখাটি যথাক্রমে গত বাইশে অক্টোবর ও সাতোয়েই অক্টোবর থেকে আজও বন্ধ হয়ে আছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে সংস্থার কর্মচারীদের দুর্দশা আজ চরমে। অভিযোগ, প্রমিক-বৃন্দের চরম দুর্দশাতেও শ্রমদপ্তরের দৃম ভাঙানো সম্ভব হচ্ছে না। সেড় সহস্রাধিক কর্মচারীকে অনশনের মুখে রেখে মালিক গোষ্ঠী নিশ্চিন্তে নিরাপদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথচ শ্রমদপ্তরের তরফ থেকে কারখানা খোলার বিষয়ে এদের বিরুদ্ধে সক্রিয় কোন ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত গৃহীত হলো না। মালিকগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে মালিকানা নিয়ে হানাহানির বোঝা সাধারণ কর্মচারীবৃন্দের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া দীর্ঘকাল চাকুরী করার ফলে কর্মীদের প্রতিডেট ফান্ডে যে পরিমাণ অর্থ জমা হও-যর কথা ছিল তাও সম্পূর্ণরূপে জমা পড়েনি। জানা যায়, কর্ম-চাবী রাজ্য বীম কর্পোরেশনেও যথাসময়ে নতুন রোট কার্ড না থাকার

দরুন বিপদগ্রস্ত শ্রমিকবৃন্দকে প্রচুর অর্থকতি ও অযথা হস্তানি সহ্য করতে হচ্ছে। এসব ব্যাপারে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম-বিভাগ, প্রিভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার ও রাজ্যপালের কাছে বারবার আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও বন্ধ কারখানার দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক-বৃন্দের কোন সুদ্রাহা হয়নি।

সংস্থার কর্মীদের অনুমান, কারখানা বন্ধকালীন সময়ে রেশনের মাধ্যমে মালিক গোষ্ঠী কোন ‘র’ মেট্রিরিয়াল তুলছেন কিনা, প্রিভিডেন্ট ফান্ডের ও ই এস আইয়ের বকেয়া টকা ঠিক মত ঠিক সময়ে জমা হয়েছে কিনা, এসব বিষয়ে যথাশীঘ্র তদন্ত হলে অনুদ্ব্যটিত অনেক রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। সংস্থার দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ জানান, ভারতীয় কাঁচ শিল্পের অন্যতম এই লাভজনক কারখানাটি গ্রেসাম, রেথওয়েট কারখানার মত এখনই সরকারী মালিকধীনে আনা হোক। এ বিষয়ে, সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীবৃন্দ ও ইউনিয়ন সরকারের সঙ্গে সর্বরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম বিষয়ে

কমলকুমার মজুমদার

আজ প্রায় তিন হস্তা হইতে যায়, পূর্ববঙ্গে নিরীহদের ক্রন্দন রোল উঠিত রহিয়াছে কত বেচারী নিষ্কলঙ্ক শিশু কণ্ঠে বাজান বাজান। ধর্নি, মাতার, বাজানরে! বুক ফাটা আত্মনা দাওয়াতে মিলিয়েছে; অনেক জনম দুখী তবু বিশ্বাসী আল্লাহ! বলিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে; অসংখ্য মানুষ ইতঃমধ্যে আর নাই; আজান আর প্রভু হইবে না, সৌন্দর্য পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; যে তবু ইহা অবধারিত শাস্ত বাহারা, ক্ষোভে অবমাননার মারাত্মক হইবেই, কাজেই এবং উহাদের রাজনৈতিক অভিলষ, জনমগত অধিকার, ভগবান পূর্ণ করিবেন। জয় ইহাদের—আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

শুধু গার, খালি পায়, একদম বে-তালিম লড়াই কেহ কখনও লিখে নাই; স্থলে জলে আকাশে ধাঁড়স অস্ত্রধারী সৈন্যচাচারী; আমরা বাহারা যুগ যুগ ধরিয়া মনুষ্যকৃত রক্তক্ষয় শরতানীর মধ্যে জীবন ধারণ করিতে আছি, তাহারা এই বিকট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, আমাদের চিত্ত বিস্মৃত হইল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা যে কোন ছুতায়, “সেমিটিক এ্যাটরাসিটি” পদটি, বিশেষত ফিরিঙ্গীরা, উল্লেখ সাপাতে তৎপর দেখা যাইবে (এই শালারা ভুলক্রমে প্যাগওপনেজিয়ান যুদ্ধে বিবিধদের মধ্যে থেরাসিয়ানদের স্বভাব সূচনা নগরীর কথা, একাধিক ইনকুইজিশন, বন্দুকহীন রেড ইন্ডিয়ান বধ, টাস-মানিয়াতে প্রাতঃরাশের পর জঙ্গলী-শীকার রূপ অবসর বিনোদন, ইদানীং ভিয়েনাম সেদিন বেলজেন ক্যাম্প, হিরোসিমা—অহো নরান্ডক (!) মহিমা, —মনে রাখে না, নিশ্চয়ই মনে রাখে না বলিয়াই পুনরায় হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধ টেন করে। একমাত্র ভেলেভের লিখেন যে, প্রতীচোর রাজারা অপছন্দ যে কোন লোকের মূণ্ড কাটিয়া থাকে, একই কমি পাস্চাত্যে রাজারা ভগবদ আঁখিকারে করিয়া থাকে) —এ “সেমিটিক এ্যাটরাসিটি” ইয়াহিয়া খাঁ আমাদের দেখাইল।

ইয়াহিয়া খাঁ ও তৎগোষ্ঠী কড়ক অন্তর্নিহিত ইত্যাকার কুর্নিসিত পৈশাচিকতার ভুলনা কোথাও নাই, কেন না অস্ত্র এত ভয়ঙ্কর কখনও হয় নাই, এমনও যে যুদ্ধখোর মার্কিন, চীন ও ফিরিঙ্গি দেশবাসী সাধারণ মানুষ (!) তাহারাও এই ঘটনাতে শিহরিবে, চমৎকার অমায়িক নৃশংসতা। বাবার (সম্ভবত) মাজুন ভঙ্কণরত থাকিয়া জগর আহ্বাদে মনুষ্য কোতল পর্ব দর্শনে চক্কু মাধক করেন, খাঁড়িত খড় নিগত রক্তে জমি পিচ্ছিল ও তদীয় সামিয়ানা স্থান নোহরা হইল, এই কারণ তাহার সামিয়ানা তিনবার হটাইতে হয়, অবশ্য এই ক্ষেত্রে ভাগ্য-হতরা সকলেই সক্ষম পুরুষ মানুষ। ইয়াহিয়ার চাঁদমারী শিশু রমনী বৃন্দ আত। এবং হার। আমাদের একমাত্র বিশ্বাস একটি সুখ, রক্ত দাগ শত ধৌতিতে উঠে না, দুষমনে দরজার করাঘাত শূন্যবে।

দৈনিক কাগজ, ঐ বিকারকে নিভুল আখ্যা দিতে হাঁতড়াইতে আছে, বলিয়াছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, আমরা যদি খতাইয়া দেখি তবে বৃদ্ধি ঐ আখ্যা কি পর্বন্ত যুক্তিজোরা; তদানীন্তন অত্যাচাররত দুষমনের গায় আহতর রক্ত ফিনিক কোন মমতার সঞ্চার করিত না; তবু ইহার মধ্যেও ছাড় ছিল, হেরট ব্রেড বা তরবারীও সামান্য হেঁতেলে, পাখী ছিল অল্প, মারাত্মক-কে শৃঙ্খ হাতে ঘায়েল করার বহু উল্লেখ দেখা যায়, যেহেতু সংসাহস ও শারীরিক বল তখন নস্য্য হইয়া নাই আর রায়ে বৃন্দ প্রায়ই হইত না! কিন্তু ইদানীংকার অস্ত্র যদি কোন সহজ মানুষ দেখে তাহা হইলে কীটিত তাহার স্মারুঘাত হইবে, এখানে কোন নিস্তার নাই; শব্দ শ্রুত হওনের পূর্বেই দেহ ঝিকরা হইবে, (হায় একদা দমদম বুলেট লইয়া কত মৃত্যু আপত্তি উঠে!) ইয়াহিয়া খান এই রূপ অস্ত্র সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে। পূর্ববঙ্গ বিকৃত হইতেছে, আমরা বাহারা কয়েক বছর বাবৎ কলিকাতার তথা পশ্চিমবঙ্গের খুন-লীলাতে আঁকাইতেছিলাম (ইদানীং কোন দৈনিক পূর্ববঙ্গের আলোচনের সহিত তুলনামূলক ভাবে এই জঘন্যতাকে “গদ্য বিস্তার” বলিয়া মানিয়াছেন) তাহারা ঐ সংবাদে ধাত-ছাড়া হইয়াছে। আমাকে বহুদিন পূর্বে ভৈরবগঞ্জ এক নিকারী বলিয়াছিল, “করতা বাবু মাহের চেয়ে মানুষের চেয়ে এমন হালাল জীব আর নাই”।

ইয়াহিয়া সহাসবিদনে ইতিহাস পেটোই যোগাইতেছে, যেহেতু ফিরিঙ্গী মার্কিন চীন ও রুশ ও ভারত সরকার তাহার বন্দু; ন্যায় অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বালখিল্য শব্দ-লুডো খেলার ভাষা; এখানে এক মহতী নীতি বা কুটনৈতিক পাটোয়ারী ক্রিয়া করে, তাহা এই যে “টিপেছ কি টিপেছ”। উপরিস্থ শরতানেরা যে কি রূপ তাহা নিশ্চয়ই ইতিহাস জানিতে চাহিবে না, কিন্তু যে, ছাপোষা মানুষের রগ বিদীর্ণ হইবে ঐ শালাদের রক্তসকল দেখিলে, এমনও যে খচ্চড়-প্রধান লরেন্স, সেও ফিরিঙ্গী-ফরাসী খলতার ধাঁধিয়া গিয়াছিল। এখন এখানে যে দেশ গরদনা দিতেছে তখন একমাত্র সেই বেচারী দেশই আতঙ্কিত প্রতি কম্পিত কণ্ঠে বলিতে পারে “আমার মারছে কেন?”

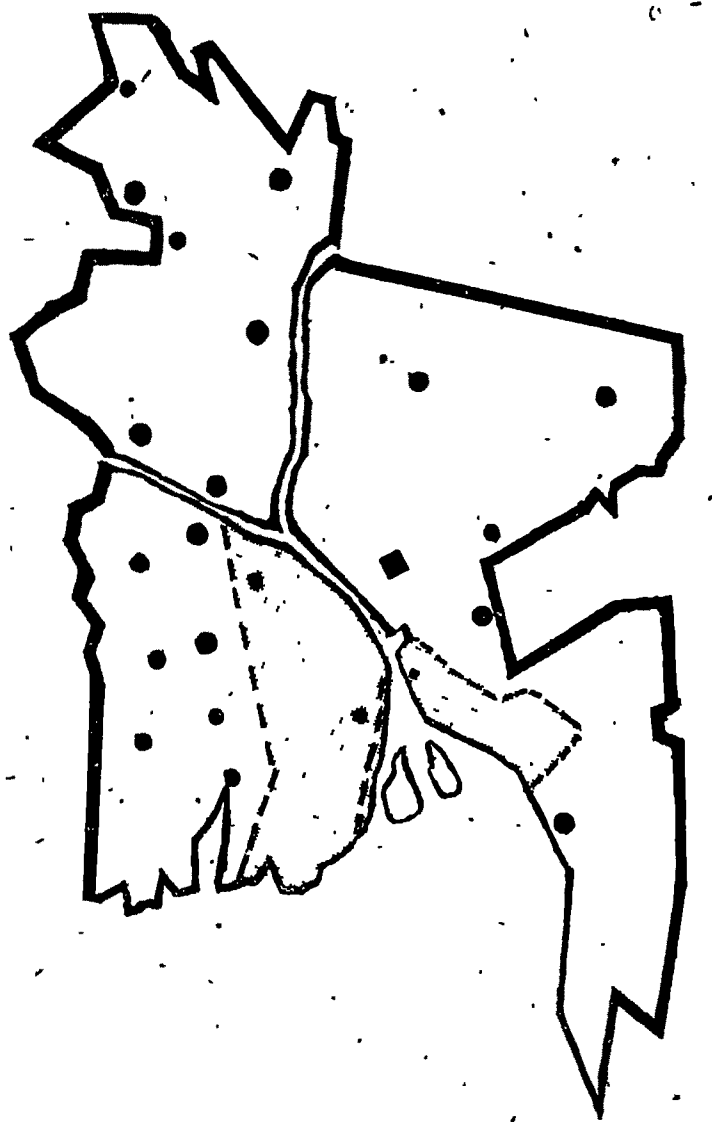
ভারত বিরাট শক্তি কখনও ছিল না; এখনও, কখনই হইতে পারিবে না; সে তাহার পরীক্ষিত সৈন্যদের (বাহারা ভি সি হইতে বহু পদক প্রাপ্ত হইয়াছে, এইসব পদক পাওয়া যে কি দূঃসাহসের পরিচয় তাহা কংগ্রেস বদ-মাইসরা কখনও ভাবিতে পারিবে না) ভজন শিখাইয়াছে, সে তাহার প্রজাবর্গকে ধনী নির্ধনী, মস্ত্রী হইতে চৌকিদারকে, এমন কি বালক কালিকাকে ছাচড়া জুয়াচোরে পরিণত করিয়াছে, ফলে সং এবং অসং রূপ জ্বরদস্ত কোন কাষই তাহার ভারতের নিকট আশা করা বাতুলতা, যে এবং তাই মানবতা নামে খুঁচু চাষাড়ে

শব্দ লইয়া আঁখিয়ারা ব্যতীত তাহার, ইয়াহিয়ার নিদারুণ অমানুষিকতার ভারতের, উপায় নাই। আজকার এই বিরুদ্ধে তাহার, কিছু বলিবার নাই। বিবিধ কার্যক্রমে চরিত্র তথা মনুষ্য আসিবার নহে।

পূর্ববঙ্গস্থিত নির্বাচনে মজিবর রহমান অবিশ্বাস্য সংখ্যায় জয়ী হইলেন, ইহাতে দলের মান বাড়িল, কাজেই যে তিনি পূর্ববঙ্গ নিয়ন্ত্রতা হইবেন এমন কথা উঠে না; সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিটি যে কত জেলো তাহা যে নেহাৎ এলেবেলে ইহা পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাত আমরা বুঝিতেছি; কতিপয় ডাক্তার, নার্স মেথর হাজার হাজার মর্মদ বৃজ্জা-অবৃজ্জা আত্মদের ফেলিয়া ধর্মঘট পাকাইল, লক্ষাধিক শিশুকে, বৃজ্জা নির্বিশেষে, ভুলিয়া দৃষ্ট দৃষ্টের মেহনতী (!) - কুলিকামারী কেরাণী পোস্টার সাঁটিতে লাগিল, অগণন ছাত্রকে প্রায় দ মজাইয়া, সেকেন্ডারী বোর্ড কেরাণী পিওনরা জনগন চিন্তাজয়ী ইউনিয়ন করিতে থাকিল; অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠ-ডাকের ঘর থাকিলেও, অর্থাৎ আপেক্ষিক হইলেও—শক্তিটি কিছু নহে।

মজিবর সাহেব অসহযোগ আন্দোলন বিবেচনা করিলেন, ইহা খন্দরই আন্দোলন নহে, বাহা সর্বাত্মে ফিরিঙ্গী পছন্দ, ইহা ভাড়ি ব্যাপার। আমরা দেখিলাম, লাটের বাবুচি নাই, জঙ্গসাহেব শপথ বাক্য পাঠ করাইতে অস্বীকার করিলেন, যেহেতু ইয়াহিয়া পূর্ববঙ্গকে উপনিবেশ রূপে গড়িতে চাহিয়াছিল, আশ্চর্য যে তাহাদের পবিত্র পাকিস্তানের এক বিরাট অংশ যে পূর্ববঙ্গ তাহা সে অমান্য করিল, তথাপি মজিবর রহমান অবিচলিত চিন্তে পাকিস্তানকে ধরিয়াছিলেন। ইয়াহিয়া গোষ্ঠীরশততা তিনি বুঝিলেও দেশবাসীকে সম্বন্ধ-উপলব্ধি বাহাতে তাহা করিতে পারে, অল্পবয়সী ছাত্রী পর্যন্ত বাহাতে এক স্বাধিকার বোধে, অধীরতার পৌছার রমণীগণ বাহাতে তাহাদের সন্তান-সন্ততি ভবিষ্যৎ চিন্তা করত ঐ মজিবর প্রদর্শিত ধর্ম জেহেদে বাঁধা প্রদান না করেন তাই বেশ করেকদিন মীমাসার জন্য ঐ মহান নেতাকে পশ্চিমাদের স্বারম্ব হইতে হইয়াছিল। তাজব যে, শাসক ইয়াহিয়া পূর্ববঙ্গীয় ব্যাপার যে জীরো আউরারে পৌছিয়াছে তাহা বুঝিয়াছিলেন, যে এবং দাগো কামান আজ্ঞা দিয়া গেলেন, তাহার গুনতি ছিল, আটচল্লিশ ঘন্টাতে এই ছেদো বোটের নিষ্পত্তি হইবে। ঢাকাকে কেন্দ্র করত রেল টিমার, যদি মদত প্রয়োজন হয়, ধরিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্যতে যাওয়া-আসা ঐ আটচল্লিশ ঘন্টার কুলাইবে। বিমান এর প্রযোজন ঘটিবে না।

পূর্ববঙ্গীয় মানুষে ঐ মহড়া লইল; এই দিক চরিত্র তাহাদের খন্দর বা ছাচড়া মার্কসিজম গঠিত নহে, ইহা নিরেট জম্মস্থানের প্রতি মাতৃভূমির প্রতি গভীর মায়। এই



চরিত্র তাহার একদিনে নির্মিত এক-শোবার যে হয় নাই, ইহা মর্মভেদী অপমান হইতে উদ্ভূত; ইতঃপূর্বে গুলির সম্মুখে সে নির্বিকার চিন্তে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ যে ডাকী আন্দোলন তীব্রভাবে মুখাইয়া উঠিল, অবশেষে ঐ জেহাদ সফলকাম যে হয় তাহা আমরা জানি, যে এবং তখনকার উচ্চশ্রেণী অপামর জনসাধারণের মধ্যে অধিকার বোধ বপন করিতে লাগিলেন; সকলের বক্ষে দেশাত্মবোধ উদ্ভূত হইল; ইতিমধ্যে বাহারা গোড়া নেমাজী, হজী তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, ফলে আধুনিক মত ও জীবন এক হইতে কল্প হইল। এবং ঘণাই অহাদের ক্ষমতার পরিচয় হইল। প্রত্যেকেই বুদ্ধিমান হইল যে স্বাধীনতা ব্যতীত কোন পথ নাই, এবং যে ঐ জারগান্ধ বালক বালিকা মারই ঐ সত্যের কারণে এক ভীমকর্মা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; হার তাহার হেঁতেল হীন হইয়াও প্রতিজ্ঞা করে।

এখন অজস্র মানুষে পাণ দিতেছে। আমাদের সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করিলাম, আমরা কেবলমাত্র খবর পাইতে হন্যে হইলাম, বিজন খুনে আমাদের গা-সওয়া হইয়াছে, ভাগিদস ঠিক তখনই ঐ প্রচার-সংখ্যা স্ফীতকারী কি-দুঃসংবাদ আসিল। কাগজে পদ্য, রেডিওতে বকরোতান, জাল ফোটোগ্রাফ, ফিল্ম এখনও বাণ্ডিত। অবশ্য একাদিক দিয়া বিবোচিত হয় যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয়বাসীর বোধশক্তি ঐ তরিখা ব্যতীত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তাৎপর্য সঠিক কক্ষা করিতে অক্ষম; মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া উহাতে ঐ আবেগে হয় নিশ্চয়ই (!); কিন্তু যে, নামজাদা দৈনিক সকলের অপরিণত ভ্রূইং-এর যুদ্ধবিষয়ক কার্টুন দেখিলে, একের বোধগম্য হইবে যে, পূর্ববঙ্গে যে কি ঘটিতেছে তাহা সংবাদপত্র আজও ঠাণ্ড করিতে

পারিতেছে না। তবুও পুনরায় বলিতে হইবে, যে পশ্চিমবঙ্গীয়া ইহা অনুমত দেশ, অনগ্রসর দেশ ইহাতে যদি কতক্যপারায়ণ হয় তাহা হইলে, উহাই দামী।

প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ করিলে বোধ হয় গহিত হইবে না, যে স্থলে ও সূক্ষ্ম নজরে পূর্ববঙ্গে ঐ গম্ভীর হাল আমাদের তিন চারি বা ততোধিক ভাবে কাজে লাগিয়াছে : আমাদের কাব্যোদ্যম বিস্তৃত করিবার, কাপুরুষতা ভুলিবার, পূর্ববঙ্গ নির্মিত প্রাণ কত পড়িয়াছিল তাহার পরিচয় দিবার এবং যে সর্বোপরি রুধির কামাইবার সুযোগ বহন করিয়া আনিল।

সেদিন পর্যন্ত জানিতাম, মধুসূদন নবীন সেন ইহারা বঙ্গের কবি এখন জানিলাম তাহারা কেহ চট্টগ্রাম কেহ যশোহর-এর, সম্ভবত ইহা এই যুদ্ধ-কারণে প্রমাণ করিতে চাওয়া হইয়াছে যে ঐ স্থান সকল শব্দ যে ভুলগোল উদ্ভব করিয়া আছে এমত নহে, অধিকন্তু উহাদের সংস্কৃতিমূলক ঐতিহ্য অমর এবং আমাদের সহিত ঐ সাংস্কৃতিক যোগ অবিচ্ছেদ্য এই কাব্যোদ্যমে আশ্চর্য যে ঢাকার গোবিন্দ দাস বাদ পড়িয়াছেন এবং আরও স্মৃতিচর্যের ইহা, অগণন পূর্ববঙ্গীয় কবি, বাহারা এই সংগ্রামে যোগ রাখিয়া আসিতেছে, তাহারা রাদ পড়িল, হয়ত কাগজের মানের দিক দিয়া তাহারা বাজে লেখে। অথবা রেডিও ইহাদের এত পচাইয়াছে যে ব্যবহার, যোগ্য নহে। তবু স্বীকার করিতে হইবে, মধুসূদন নবীন সেনকে কবিরূপে গণ্য করা হইল—ইহা সূক্ষ্মতার লক্ষ্য। এবং এই যুদ্ধতে বহু ন্যাকা কবিত্ব পুনরায় জাগরুক হইল। সাংস্কৃতিক যোগের পর বাহা সবিশেষ লক্ষণযুক্ত তাহা প্রাণ-পড়িয়া থাকা। পূর্ব পটিকা (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

বরানগরে অশান্তির পটভূমি

অজয়বাবুর শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি এবং শ্রীসুচারুকান্তির খুল্লাতাত শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের সেই অবগেভরা উত্তির (সুচারুকান্তির শব্দেহ দাহ করার পর সদ্য শ্মশান থেকে ফেরা তরুণকান্তি বলেছিলেন “আর যেন কোন নারীকে এমন ভাবে সিঁথির সিঁদুর মুছতে না হয়”) পরেও বরানগরের অবস্থার কিছু মাত্র উন্নতি হয় নি, বরং এ অঞ্চলে হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরও বহু-গুণে বেড়েই গিয়েছে। বরানগর টেনামেন্ট স্কিম জমিটির সঙ্গে রাজ্য রাজনীতির ওয়াকিবহাল মহল মোটামুটি সুপরিচিতই আছেন কারণ বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই বরানগরের প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে এই টেনামেন্ট অঞ্চলে।

এ এলাকায় বনহুগলী গ্রুপ অব হসপিটাল অবস্থিত। সরকার এ জায়গায় কতগুলি বাড়ী তৈরী করেছিলেন যেগুলিতে উদ্ভাস্ত থাকবে বলে তাদের মনোবাসনা ছিল। সেখানে- জনৈক মাণিক ভৌমিক নামে পরলোকগত শ্রীনেপাল রায়ের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুটি মৌরসী পাটায় সেই জমিদারী ভোগ করতেন। এই মাণিক ভৌমিক শোভাবাজার অঞ্চলের একটি বিস্তার ইজারাদার, আলু-পোস্তায় একটি আলুর কারবারের মালিক বলে পরিচিত ছিলেন। অকল্যাণ্ড বোর্ডের সঙ্গে ব্যবস্থা করে শ্রীভৌমিক ধুবলিয়ান একটি উদ্ভাস্ত কলোনীরও পুতন করেন বলে জানা যায়। সে সব পূর্বতন কংগ্রেসী আমলের কথা। তখন তিনি টেনামেন্টে একটি বড় বাড়ীর মালিক হয়ে বসে এ অঞ্চলের সমস্ত সমাজ বিরোধী ও ওয়াকিবহাল রেকার-দের নিয়ে বেশ জাঁকজমকই ছিলেন। এ অঞ্চলের ওয়াকিবহাল রেকার-দের কুখ্যাত সদাগর, কালা, কার্তিক বসু প্রভৃতি এর আগ্রহেই ছিল।

পুলিশের হাতে মাঝে মধ্যে ধরা পড়লেও এই ভৌমিক মহা-শয়ই তাম্বির করে খালাস করে আনতেন। এই সঙ্কোপাঙ্গোদের নিয়ে ভৌমিক মশাই একটি ক্লাবও করেছিলেন যেখানে ভাল নেশাটেশা করার উত্তম বন্দোবস্তের হাভাব ছিল না, কংগ্রেসীকাণ্ডা ছিল তাদের রক্ষাকর্তা।

বিভিন্ন কলকারখানায় ধর্ম-ঘট ভাঙা, বিশেষত রাজ্য পরিবহন কর্পোরেশনের ধর্ম-ঘট ভাঙা, ধর্ম-ঘট প্রমিক কর্ম-চারীদের মারধোর করার এবং উল্টোভাঙার কংগ্রেসী শ্রীনরেন সেনের পাণ্ডা ইউনিয়ন গড়াব কাজের সঙ্গে এরা যুক্ত ছিল। বিভিন্ন কল কারখানার মালিকের কাছ থেকে খোক টাকা নিয়ে এরা এসব কাজ করত। এটা গড়ে ওঠে

উত্তর শহরতলীর গুন্ডাদের ও সমাজবিরোধীদের কেন্দ্র হিসাবে।

৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পরেই হঠাৎ একদিন ভৌমিক মশাই নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চেলা চামুন্ডারাও বেপান্ত হলে পড়ে।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের নয় মাসের জীবন যাত্রা এমনই জটিল হয়ে পড়ল। অভ্যন্তরীণ গোলামলে (পি, ডি, এফ সরকার গঠনের ব্যাপার ও তার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন তৈরী ইত্যাদি তখনই

আস্তানা সেই ক্লাবঘরটির দরজাও তিনি খুলে দিলেন। শ্রীমাণিক ভৌমিকের সঙ্গে নিরুদ্দেশ সেই সমাজদ্রোহীদের শ্রীমুখগুণি আবাব সৈখানে এসে ভীড় করতে শুরু করল। স্থানীয় লোকেরা প্রমাদ গুললেন। কারণ কলকারখানার শ্রমিকদের কাছে এই মানুসগুণির পরিচিতি অজানা নয়। মালিকের পোষা দালাল দুর্ধর্ষ গুন্ডা হিসাবে তারা সকলেই বেশ আতঙ্কেই ম্রষ্ট।

স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা

মতামত

ঘটে ছিল) যে এসব ব্যাপারে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বা তাদের স্থানীয় দলগুলি- মাথা গলাবার ফরসতই পেলেন না।

১৯৬৯ সালে আবার বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলে টেনামেন্ট অঞ্চলের কমিশনার শ্রীআশু নন্দী এবং স্থানীয় সি পি এম নেতা শ্রীক্ষিতীন ঘোষের প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলে দীর্ঘদিনের খালি কোয়ার্টারগুলি সরকার ও বরানগর পৌরসভার জ্ঞাতসারে স্থানীয় বিভিন্ন কলকারখানার নিম্ন আয়ের দঃস্থ বাস্তুহারা শ্রমিক-পরিবার-গুলির মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। এ অঞ্চলে এক সি পি এম ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দলও ছিল না সেদিন। এর অব্যাহত পরেই নেতাজী কলোনীর দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দলের নেতা শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য সেখানে আবির্ভূত হলেন।

শিবাবু কোথা থেকে সেই নিরুদ্দেশ মাণিক ভৌমিকের কাছ থেকে তার বিরাট কোয়ার্টারের চাবী সংগ্রহ করলেন এবং একদিন সেই কোয়ার্টার খুলে সেখানে বসবাস করতে শুরু করলেন। স্থানীয় কমিশনার শ্রীঅজিত নন্দী শিবপদ-বাবুকে সেদিন অনুরোধ করেছি-লেন, তিনি যেন কুখ্যাত কংগ্রেসী মাণিক ভৌমিককে তার চাবি ফিরিয়ে দেন। প্রয়োজন হলে শিবপদবাবুকে একটি ভাল কোয়ার্টার দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতিও শ্রীনন্দী দিয়েছিলেন বলে শোনা যায় (যদিও নেতাজী কলোনীতে শিবপদবাবুদের নিজস্ব বাড়ী-রয়েছে এবং যদিও প্ল্যান অনুসারে উক্ত নেতাজী কলোনীতে পরিবার পিছ দই কাঠা করে জমি বন্টন করা হয়েছে, তবু শিবাবুরা এমনই ভাগ্যবান যে, তার পরিবার কলোনীর হাইল্যান্ড পাঁচ কাঠা জমির অধিকার ভোগ করছেন)। শিবপদবাবু কমিশনার, শ্রীনন্দীর কথায় কর্ণপাত করলেনই না-বরং একদিন দেখা গেল ওয়াকিবহাল রেকার ও সমাজবিরোধীদের পূর্বতন

একদিন সত্যি সত্যি ভয়ঙ্করভাবে সূতা হয়ে উঠল।

সেদিন দমদমে ছিল সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন। সে সম্মেলনে স্থানীয় কমিশনার শ্রীআশু নন্দী, ক্ষিতীন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তির ডেলিগেট হিসাবে উপস্থিত। এই শূভক্ষণে শিবাবুর নয়া আমদানি করা জীবরা আরও অনেক পরিচিত ও অপরিচিত সমাজ দ্রোহীর দল বেশ জমজমাট হয়ে আসর জমিয়েছিল টেনামেন্ট তাদের পুরানো ক্লাব ঘরে। নয়ামধ্যমি দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য তাদের সঙ্গে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কেউ কেউ সেখানে গিয়ে শিবাবুকে অনুরোধ করেন তিনি যেন এ সব সমাজবিরোধীদের এ এলাকা ছেড়ে

সি পি এমের সুবিধাবাদী রাজনীতি

নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সি পি এমের কতকগুলি দেওয়াল লিপি-আমার চোখে পড়লো। যেমন, “পিতন কংগ্রেস নকশাল অন্তবাম একই কাজ ভিন্ন নাম”, “সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও সি আই এর অনুচর নকশালদের ধ্বংস করুন”, “ডোন্ট দিন বাঁচতে, তারা হাতুড়ি কাস্তে” ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ সি পি এম ভিন্ন বাংলা তথা ভারতের যাবতীয় রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ও প্রতি-বিস্তারী। একমাত্র সি পি এমই যথা-যথ সর্বহারার বিপ্লবী পার্টি! এরাই শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী জনতার একমাত্র রক্ষক। তাই দেখি এরা ১৯৬৯ সালে আসানসোলে কল্যাণী অঞ্চলে এস এস পি ইউনিয়নের অধীনস্থ কিছু শ্রমিকদের কবর দিয়ে-ছিলেন নিজেদের ইউনিয়ন গড়ার প্রচেষ্টায়। এটাই প্রমোদবাবুদের মতে শ্রেণী সংগ্রাম। এই তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামের ধাক্কা বাংলাদেশের অসংখ্য শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী জনতাকে সি পি এম এর হাতে শিকার হতে হয়েছে। কল্যাণী জোতদার সুদখোর মহাজন মিল মালিক বড়

যেতে বলেন, কারণ তাদের উপ-স্থিতি এলাকার অধিবাসীদের পক্ষে ভীতি ও আতঙ্কজনক। মুখ থেকে তাদের কথা বেরুবার আগেই বাঁপিয়ে পড়ল গুন্ডারা উপস্থিত লোকদের উপর। এ অঞ্চলের অধিবাসীরাও তখন তাদের তাড়া করতে শুরু করে। সমাজ বিরোধীদের অধিকাংশই ছিল অন্য অঞ্চলের মস্তান। কাজেই ওখানকার পথ-ঘাট ছিল তাদের অজানা, সে সন্ধ্যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের তাড়া খেয়ে যে যৌদিকে পারল দৌড়াল। অন্ধকারের মধ্যে কার্তিক বসুর সঙ্গে শিবপদবাবুও কেমন করে এক রাস্তা দিয়েই দৌড়োচ্ছিলেন। অন্ধকারের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের আঘাত কার্তিক বসুর সঙ্গে ভীড়ের মধ্যে শিবপদবাবুর গায়েও লাগে। ঘটনার সময় টেনামেন্ট ছিল গাড়ি অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে ছিল অল্প বৃষ্টি। তিনি আহত হলেন সেদিন মারাত্মকভাবে।

সেদিনকার ঐ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তারা ছিল পড়ে পড়ে মার খাওয়া সাধারণ শ্রমিক। তবে তাদের অনেকেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের প্রভাবাধীন। শিবাবু এলাকার পরিচিত রাজনৈতিক কর্মী এবং তার গায়ে আঘাত লাগাটা ছিল নিশ্চয়ই দুঃখজনক। কিন্তু একথাটাও তেমনি সত্য যে এই অবস্থিত ঘটনার জন্য শিবাবুর দায়িত্বই ছিল সর্বাধিক। কারণ যে এলাকায় তার পার্টির কোন কর্মী দূরে থাক একজন সমর্থকও ছিলেন না সে এলাকায় তিনি কতকগুলি সমাজ-বিরোধীদের নিয়ে রাতারাতি পার্টির প্রভাব বাড়াতে সচেষ্ট হলেন।

আশ্চর্য এই যে শিবাবু আহত অবস্থায় হাসপাতালে যে

জবানবন্দী দিলেন (যা. কাগজে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী বলে ঘোষিত হয়েছে) তেতে তিনি নাম ধরে বললেন যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতা শ্রীলক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, কমিশনার শ্রীআশু নন্দী ও শ্রীক্ষিতীন ঘোষ তাকে মারধোর করেছেন। সেদিন শ্রীনন্দী ও শ্রীঘোষ যে রাত এগারোটা পর্যন্ত দমদমে উদ্ভাস্ত সম্মেলনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তা শিবাবুদের পার্টির স্থানীয় ডেলিগেটরাই সাক্ষ্য দেবেন। ঘটনার সময় লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য প্রথমে আলমবাজারে পরে পার্টির আঞ্চলিক অফিসে পার্টি কর্মীদের সভায় ছিলেন বলে বিবৃতি দিয়েছেন বলে শুনা যায়। ইতিমধ্যে পাণ্ডা আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। ন-পাড়ায় সাগরদত্ত হাইস্কুলের হেড মাস্টার বিনয় সেনগুপ্ত, মর্কেন্টাইল ফেডারেশনের নেতা লক্ষ্মী ঘোষ, গণনাট্য সংঘের কর্মী গণেশ চক্রবর্তী বাড়ীতে আক্রমণ হয় এবং লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য বাড়ীতেও দমদম বোমা পড়তে শুরু করে। বোমার আঘাতে শ্রীভট্টাচার্য স্ত্রী সেদিন আহত হলেন। পরের দিন ঘটনার বিবরণ দিতে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র কালান্তরে পূর্বোক্ত কার্তিক বসুকে তাদের পার্টি কর্মী বলে পরিচয় দেওয়া হয়।

বরানগরে সি পি আই, সি পি এম সংঘর্ষের এই হল গোড়াকার কথা। শিবপদবাবু হাসপাতালে ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করলেন এবং তার পরবর্তীকালে কেমন করে বরানগরে বি টি রোডের সমগ্র পূর্বপার্শ্বে সি পি আই-সি পি এম সংঘর্ষের এলাকা প্রসারিত হল তা আলোচনা করা যাবে বারান্তরে। জনৈক পাঠক

ব্যবসায়ীকে শ্রেণীশত্রু হিসাবে তাঁরা খতম করেছেন?

আজ যদিও এরা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বলছেন, কার্লই এঁদের প্রগতিশীল বলতে সি পি এম-এর বাঁধে না। তা না হলে ইন্দিরা গান্ধী যখন ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রদ্রোহ করলেন তখন এই সি পি এমই না তাকে, প্রগতিশীল বলে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৬৭ সালের দোসরা অক্টোবরের বিশ্বাসঘাতক নরক শ্রীঅজয় মধো-পাধ্যাককেই না তাঁরা ১৯৬৯ সালে তাঁদের সরকারের শিরোমণি করে-ছিলেন। এই বাংলা কংগ্রেসের মধ্যেই না তাঁরা বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের গন্থ পেয়ে সুকুমার রায়কেই কোল দিয়েছেন! আবার ভয়-হয় দু-দিন পরেই না সি পি এম এঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বলে বলেন? সি পি এম-এর রাজনীতি এত ঘন ঘন, পাণ্ডায় যা মার্কসীয় দর্শনে অভূত-পূর্ব অভাবনীয় ও অতুলনীয়।

তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়ার তেইশ বছরের মধ্যে তথাকথিত গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে মেহনতী জনতার কি উপকার হয়েছে, বলতে পারেন-

আপনারা? মৌল পরিবর্তনের কথা ছেড়েই দিলাম সংস্কারই বা কতটুকু হয়েছে যাতে জনসাধারণের কিছু উপকার হতে পারে? ভরভরবেই ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে তথাকথিত গণ আন্দোলনের কার্য-কারিতা আর নেই। আর কেবলমাত্র গণ-আন্দোলনের মারফতেই কখনও কোন দেশে সর্বহারার বিপ্লব সফল হয় নি হবেও না। এটা মার্কসবাদের অমোঘ নিয়ম। “শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন যখন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন উদারনীতিবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার করতে সাহসী হয় না; কিন্তু এরা চেষ্টা করে শ্রেণী সংগ্রামের ধারণাটিকে সংকীর্ণ করে দিতে, ধারণার কিছুটা কেটে বাদ দিতে এবং ধারণাটিকে হীনবীর্য করে দিতে।” (শ্রেণী সংগ্রাম : উদারনীতিক ও মার্কসবাদী ধারণা—দেবীহৈতৈষী, সাতই এপ্রিল ১৯৬৭, পৃষ্ঠা : সাত, চতুর্থ কলামের প্রথম অংশ)। তবে সি পি এম এর ক্ষেত্রে সর্বহারার মহান নেতা মার্কসের মত-বাদ খাটে না। যুগের সঙ্গে তাল

য়েখে কি হবে গোঁজামিল দিয়ে
চলতে হয় সি পি এম-এর দুর্ভিক্ষ
বাঘা বাঘা স্বেচ্ছাসেবক নেতারা তা
ধরে ফেলছেন। তা না হলে “রাজ্যের
হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে”,
“শিল্পের ওপর কর আরোহণ অধি-
কার রাজ্যকে দিতে হবে” ইত্যাদি
সংস্কারী শ্লোগান আসবে কেন?
জার্মানী ও রাশিয়ার সোশাল ডেমো-
ক্রেটদের ভূমিকা সম্পর্কে কুমারের
লেনিনের অমর গ্রন্থ “কি করিতে
হইবে” (What is to be done)
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অনেকেই নকশালদের সম্পর্কে
বিদ্বেষ করে বলে থাকেন—“দেওয়ালে
লিখে বিপ্লব হয় না। এটা যদি
সত্যই হয়, তবে “আপনারা দেও-
য়ালে লিখে ভোট চান কেন” দেও-
য়ালে লিখে বিপ্লব হবে না কেন?

চারবাবুর ছেলেমেয়েরা বুর্জোয়া
পরীক্ষা দিচ্ছে কেন? যখন চার-
বাবু বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে
ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন তখন
কিনা তাঁর ছেলে মেয়েরা বুর্জোয়া
পরীক্ষা দিচ্ছে—এটা চারবাবুর মহা
দোষ। এটা তাঁর বিপ্লব বিচ্যুতি।
বুর্জোয়া কাগজগুলি তাঁর এই বিপ্লব-
বিচ্যুতি আমাদের চোখে ভুলে ধরছে।

বিপ্লবী স্বার্থে বুর্জোয়াদের এত দরদ
কেন? কারণ একবার যদি চারবাবুর
চরিত্রের ওপর কলঙ্ক লেপন করা যায়
তবে ভারতের বিপ্লব একটা প্রচণ্ড
মার খাবে। তার অর্থ এই নয় যে,
চারবাবুর ছেলে মেয়েরা বুর্জোয়া
পরীক্ষা দিচ্ছে না। আলবাত্ তারা
বুর্জোয়া পরীক্ষা দিচ্ছে। আমি
পাঠকদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখছি—
চারবাবু কি সাধারণ সুস্থ লোকের
মত বর্তমানে সপরিবারে শিলি-
গুড়িতে বসবাস করছেন? তার উত্তরে

যাপনের বালবেন, নিশ্চয় না। যদি
নাই হয়ে থাকে এবং থাকে ওয়া-
রেস্ট মাধ্যম নিয়ে মাসের পর মাস
কিপ্লবের স্বার্থে আত্মগোপন করে
থাকতে হয় তাঁর কাছে পারিবারিক
জীবনের দায়িত্ব বড়, না বিপ্লবী

জীবনের দায়িত্ব বড়? তাঁর ছেলে-
মেয়েরা বুর্জোয়া পরীক্ষায় বসুক বা
জাহান্নামে যাক, তাতে চারবাবুর
যায় আসে না, কারণ তিনি এখন
পরিবার বহির্ভূত লোক। নিজের
সংসারের ভাল মন্দের উর্ধ্বে তিনি।

পিতা বিপ্লবী হলে ছেলেমেয়েকেও
বিপ্লবী হতেই হবে এমন কোন অর্থ
নেই। ছেলে মেয়ের কোন দোষের
জন্য বিপ্লবী পিতা দায়ী থাকবেন
না। তখন যখন তিনি ঘরে থেকে বিপ্লব
করছেন। কিন্তু তিনি যখন ঘরে
থেকে বিপ্লব করেন না, ছেলেমেয়ের

জন্য তখন তাঁকে যারা দোষ দেয়
তারা প্রতিক্রিয়াশীল ভিন্ন আর
কিছুই নয়।

অজিত সাহিড়ী
শিবপুর
হাওড়া

বাংলা দেশের সংগ্রাম চলছে চলবে

মুক্তি ফৌজের প্রারম্ভ ও
সহায়তায় আমার প্রিয় জন্মভূমি
ছেড়ে এ পার বাংলায় আমি এসেছি।
হিলিতে ওপার থেকে তাদ্রা খাওয়া
মানুষের সঙ্গে দুদিন শরণার্থী
শিবিরেও কাটিয়েছি। দীর্ঘ বোল
বছর পর আমি এদেশে এলাম।

এখানে আমার পূর্বসূরী
পূর্বত আমি মুক্তিবাহিনীর একটি
শিক্ষা শিবিরের মেডিকেল অফিসার
ও পরামর্শদাতা ছিলাম। স্থানীয়
রাজনৈতিক নেতা ও কৃষকীরা ও
আমার ব্যক্তিগত মুসলিম বন্ধুরা
যখন নিশ্চিত ভাবে স্বাক্ষরেন যে
বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল সংস্কৃতি-
সেবী ও হিন্দু হিসেবে পাক জঙ্গী
বাহিনীর হাতে সপরিবারে আমার
নিশ্চয় হয়ে যাবার পুরোপুরি
আশঙ্কা রয়েছে, তখনই তাঁরা
আমাকে পাঠিয়ে দিলেন মুক্তি-
যোদ্ধাদের সাহায্যে বিদেশে কাজ
করার জন্য।

পূর্ব দিগন্তে আজ এক নতুন
সূর্য প্রদীপ্ত। আমি সেই সূর্য,
হরিণ ও লালের দেশ বাংলা দেশের
নাগরিক। আমরা এক অসম মরণ
যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছি—এ একটা
যুদ্ধ। যুদ্ধই বা বলি কেন এ
হচ্ছে বাঙালী নিধন যজ্ঞ-বাঙালী
জাতির শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি
মুছে ফেলবার মরণপণ লড়াই।
নির্মম জঙ্গীশাহীর প্রয়োজন শুধু
বাংলার মাটিটুকুর, আর সব কিছুই
তারা ধূয়ে মুছে পুড়িয়ে ছারখার
করে দিতে চায়। নইলে তারা এই
সেদিন (একুশে এপ্রিল) আমার
নিজের জেল বগুড়ার পাঁচবিবিতে
বাংলা দেশের পতাকা উড়িয়ে এসে
হাটের দিনে মেশিন গান-বসিয়ে
হাজার হাজার নিরস্ত্র ও বেসামরিক
জনগণকে বিনা প্ররোচনায় হত্যা
করবে কেন?

আমরা জানি এটা আমাদের
মুক্তি সংগ্রাম। বিশ্ব যদি আমাদের
পাশে এসে নাও দাঁড়ায় তবুও এ
যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।
জানি এ যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী ও
রক্তক্ষয়ী। সংকল্পে অটল বীর
মুক্তিযোদ্ধারা এই সংগ্রামকে সাফ-
ল্যের মজিলে পৌঁছে দেবেই। বাংলা
দেশ এক নতুন যুগের সূচনা
করল। আমরা সেই নতুন যুগের
অগ্র পথিক। বাংলা দেশে যা ঘটছে
জাতি সংঘের সংজ্ঞায় তা রীতিমত
গণহত্যা। এতে সভ্যজগতের
বিরুদ্ধে শিহরিত হওয়া উচিত ছিল।
তবুও সেই পাম্রাণ দেবতাকে আমরা
টলাতে পারি নি। ১৯৬৫ সালের
পাক ভারত যুদ্ধে উভয়পক্ষ মিলে
ছয়-সাত হাজারের বেশী নিহত হয়
নি। তাতেই জাতিসংঘ চণ্ডাল হয়ে উঠে
ছিল, নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন
ডেকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব গ্রহণ
করা হয়েছিল। তারপর তাসখন্দ
চুক্তি। বর্তমান যুদ্ধে ছয়-সাত
লক্ষ লোক নিহত হয়েছে, সম্পত্তির
ক্ষয়ক্ষতি গত চার সপ্তাহে আন-
মানিক দুই হাজার কোটি টাকা
মূল্যের। তবুও জাতিসংঘ নিশ্চুপ।

রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকখানা শুধু বৃহৎ
শক্তিবর্গের রাজনীতির দাবখেলা ও
কূটনীতির কুটিল লড়াইয়ে মগ্ন।
সেখানে মানবতার প্রশ্ন নেই মানবা-
ধিকার সেখানে তুচ্ছ। অবস্থাদৃষ্টে
মনে হয় যতদিন এটা পাক-ভারত
যুদ্ধে রূপান্তরিত না হয়, ততদিন
জাতিসংঘ আসুরে নামবে না। উ
থাক কি একটা যুদ্ধই চান? তাই
আজ আর জাতিসংঘের নিষ্ঠুর
বিরুদ্ধে কাছে আবেদন নিবেদন
নয়, আজ তার বিরুদ্ধে ঝিকার ও
বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন। জাতি-
সংঘ হয়তো গণ-হত্যা বন্ধ করতে
পারে। কিন্তু তাতে স্বাধীন বাংলা
দেশ বাস্তবায়িত হবে না। আপোষ
আলোচনা এ অবস্থায় অর্থহীন।
আমরা স্বাভাবিক তাসখন্দ চাই না।
আমাদের লড়াইতে হবে। স্বাধীনতা
রক্ষার জন্য আমরা চাই অস্ত্রশস্ত্র।
চালাবার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং
এবং রণকৌশল শিক্ষা। শুধু শর-
ণার্থীদের সেবা-মেডিকেল রিলিফ
ক্যাম্প ও বেস হসপিটাল স্থাপন
করাটাই যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন বাংলা
দেশ সহায়ক সমিতি কোটি কোটি
টাকা তুলছেন। তারা কি সেই
অর্থ দিয়ে আমাদের অস্ত্রসজ্জায়

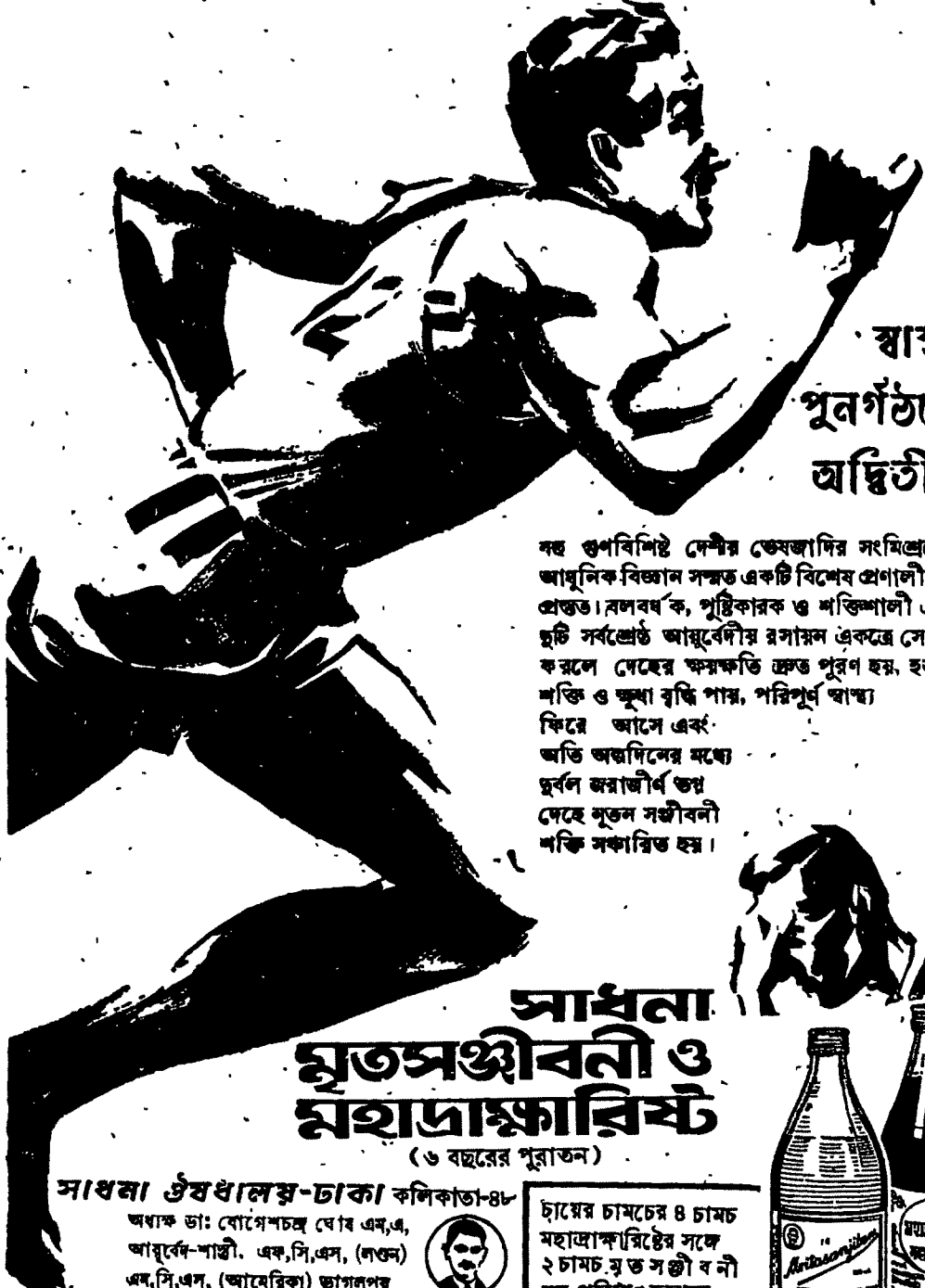
সম্মিলিত করতে পারেন না? এমন
কি কয়েকটা ট্রান্সমিটার-ও কিনে
দিতে পারেন না? কবি শিল্পীরা
কি দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা
করে এপার ওপার বাংলার একাত্মতা
ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকবেন?
রাজনৈতিক দলগুলি কি আমাদের
হাতিয়ার যোগান দিতে পারেন না?

‘যেখানেই অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ’ কোথায়?

আপনাদের তেইশে এপ্রিল
প্রকাশিত দপ্তরের “মতামত” পাতায়
কৃষ্ণনগরের শ্রীঅরুণ রায়বিশ্বাস
নকশালদের স্বরূপ নিয়ে যে
আলোচনা করেছেন আমি তা পূর্ণ
সমর্থন করি এবং বর্তমান পরি-
স্থিতিতে এই ধরনের বাস্তব
আলোচনা আরো ব্যাপকভাবেই
হওয়া উচিত বলে মনে করি।
আমিও কৃষ্ণনগরের একজন বাসিন্দা।
ছোটবেলা থেকেই এই শহরে বাস
করাছি সুতরাং দীর্ঘদিন আমি এই
শহরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের
অথবা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের
বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন দেখেছি।
নকশালরা মাওবাদী, বিপ্লবের নামে
এই শহরের প্রায় প্রতিটি এলাকায়

সংকল্পে অটল মুক্তিযোদ্ধারা
কখনই আত্মসমর্পণ করবে না।
আমরা বিশ্বাস করি সামরিক এক-
নায়কত্ব চিরস্থায়ী হতে পারে না।
আমরা জানি উপনিবেশবাদের দিন
শেষ হয়ে গেছে। গৃহযুদ্ধের
খতম করে আমাদের এগোতে হবে।
ইস্রাইলি খানের এডভেনচারিজম-
এর সমুচিত জবাব আমরা দেবই।

ননীগোপাল দেবদাস



স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

নয় গুণবিশিষ্ট দেশীয় ঔষধাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। রক্তবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও জুখা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ শর দেহে নতুন সজীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিস্ট
(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ.,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এক.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের দৃষ্টপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদোচাৰ্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ
মহাদ্রাক্ষারিস্টের সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সম পরিমাণ জলসহ
প্রত্যহ্ন দু'বার আহারের
পর সেব্য।



পদ্মেন্দ্রের নতুন ঠিকানা খোঁজ করতে শরীরের অধিক রক্ত জল হয়ে পাজাবীর পিঠ ভিজিয়ে দিল। আমার মনে পড়ছিল নির্বাচন কমিশনার সেনবর্মী সাহেবের ঠিকানা খোঁজ করার সেই ক্রান্ত অভিজ্ঞতা। শ্বিতীয় বক্তৃষ্ট হওয়ার আগে সেনবর্মী নির্বাচনী তদারকীতে কলকাতায় এসেছেন। একটি সাম্প্রতিক পত্রিকার চুক্তিবদ্ধ সাংবাদিক হিসেবে সাংস্কার রচনার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে বোধপূর্ণ পার্ক। সম্প্রসারিত কলকাতার দক্ষিণ ডানায় এ এক নয়া খন্য পট্ট। বড় বড় পুস্তকালয়, ছোটবড় সদস্য নতুন বাড়ি। মন্ডল হল ঠিকানা বললে হাদিশ মেলে না। রক্ত নব্বয় না জানলে তো স্রেফ নো-হোয়ার। অমন যে সেনবর্মী মশায়, প্রখ্যাত ব্যক্তি, তা তাঁরও অস্থান সংবাদ রাখেন না আশপাশের মানবজ্ঞান দোকান বাজার। শহর তার নিজের খেললে নিজেই নিজে মত্ত, নাম-ডাকের পরোয়া করে না নাগরিকরা। অবশ্য সেনবর্মী স্থায়ী বাসিন্দা হলে নামমায়ে লোকে নিশ্চয়ই বলে দিতে পারতেন। উনি উঠেছিলেন মেয়ের বাড়ি। তা সে মাই হোক, বোধপূর্ণ পার্কে তবু একটা চৌহান্দ নির্দেশক প্ল্যান ছেকে দেওয়া ছিল মেন রাস্তার ওপর।

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

তাতেও রক্ত খুঁজে ঠিকানা পেতে কল্প পরিগ্রহ হয়নি। কিন্তু পদ্মেন্দ্র তো স্বনামধন্য নয়। তাছাড়া নিউ আলিপুর্নেও সেই একই রক্ত সমস্যা। রাস্তার আলাদা নাম নেই। একদিক থেকে শব্দ করলে ভুলভুলাইয়া ঘুরে আবার সেইখানেই ফিরে আসতে হয়। গলদঘর্ম না হলে সঠিক গলিতে বিনি প্রথম স্কেপেই ঢুকে পড়তে পারেন, হয় তিনি ঠিকানা রিসে, নয় সেটা এ্যাকসিডেন্ট, নাহলে রক্ত নিশানার বিবরণী তাঁর পূর্বা-হেই জানা ছিল বলে বুঝতে হবে। আমি যেহেতু গলির নামেই ঠিকানা সন্ধানে অভ্যস্ত, আমাকে বেগ পেতে হল। নিউ ও গ্রেটার ক্যালকাটার এই রক্ত-ওয়ারী ফ্যাশন আগন্তুককে বিরত করার ক্ষেত্রে এক নয়া কৌতুক।

পদ্মেন্দ্রের নতুন ঠিকানা আসলে তার কোম্পানীর ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়ি। কয়েকঘর শাসাল স্টাফের বাস। নাম করতেই চিনলেন একতলার, মধ্যবরূপ ক্ষুদ্র লোক। চশমার কোণ দিয়ে আমার

আপাদমস্তক ভালো করে পরীক্ষা করে নিয়ে বিনা ছিমিকান প্রশ্ন করলেন, “কী করা হয়?”

প্রশ্নের উত্তরে অমন অশ্রুত প্রশ্ন কখনো শুনিনি বলেই প্রথম ধাক্কা কেমন খিঁতিলে গেলাম। কোনো উদ্ভাদের, পাল্লায় পড়লাম না তো? কারও সম্মান জিজ্ঞাসা করলে নিজের পরিচয় পেশ করতে হয় বলে কখনো তো শুনিনি। বললাম, “মানে আমাকে বলছেন?”

“পদ্মেন্দ্র সরকারের কোন রিলেশন-টিলেশন কিনা জানতে চাইছিলাম।” ভদ্রলোক নির্বিকার ভাবে পরচর্চা করছেন, যা অনুচিত।

মেজাজটা রুদ্ধ হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। কন্ঠস্বর গম্ভীর করে বললাম, “পদ্মেন্দ্রের ফ্ল্যাটটা জানতে পারলেই খুশি হতাম, আমি তার বন্ধু।”

“বন্ধু?” ভদ্রলোক ফের সেই সন্ধিষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, নেপথ্যে সশব্দ কোনও নারীকন্ঠ ফিসফিস করে ধমক দিলো, “আঃ তুমি

ভেতরে চলে এসো না, তোমার সব ব্যাপারে”

মনে হল, একটি শাখা চুড়ি-পরা হাত ভদ্রলোকের শাটের আঙ্গিন ধরে আকর্ষণ করছে। ভদ্রলোক আমার দিকে আরও একবার তাকিয়ে হঠাৎ দোরটা বন্ধ করে দিলেন।

আশ্চর্য এমন অশ্রুত মনুষ্যের পরিচয় ইতিপূর্বে কখনো পাইনি। ভদ্রলোক যে ছিটগস্ত, এতে এর পরও কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তথাপি সমস্ত ব্যাপারটাই বিসদৃশ এবং অশালীন। কিন্তু এমন ঘটনার পর পদ্মেন্দ্রের সন্ধানে ভেতরে ঢুকে অথবা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আরও বিচিত্র কোন অভ্যর্থনার সম্মুখীন হতে হবে কি না সেটাই ভেবে ঠিক করতে পারছি না। মাথা ঘুরিয়ে আসপাশে লক্ষ্য করতে দেখলাম, বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের নেটের পর্দার পেছনে কোন এক কৌতু-হলী বদ্বতী দাঁড়িয়ে আমাকেই দেখাছিলেন, চোখে চোখ। পাড়তে ছায়া সরার মতো দেয়ালের পাশে আশ্রয়গোপন করলেন। রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। নিজেরও কেমন একটা দৃষ্টিচলিত সমস্ত মনকে জিজ্ঞাসা করে তুলছে। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। এ কী, পথের ওপর জনকয় ছোকরা প্রায় একটা ব্যারিকেডের মতো বৃক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ কে জানে। এ সবার মানেই বা কী?

পা বাড়লাম। কলকাতা শহর ইদানীং আশ্চর্য অচেনা। প্রত্যেকটি মানুষের মুখ আততায়ীর মতো সন্ধিষ্ম সতর্ক। প্রত্যেক জিজ্ঞাসা, প্রত্যেকেই সশব্দ।

চারটি ছেলে। টাইপ চেহারা। তারও পা পা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এমন অবস্থায় ওদের উপেক্ষা করে এগোনো উচিত নয়। বরং পদ্মেন্দ্রের কথায় জিজ্ঞাসা করি। কিছুর বলবার জন্য মুখ তুলতেই দলপতি গোছের ছেলেটি হাসল, “খুব ঘাবড়ে গেছেন বোধহয়। আসলে সকলেই আশঙ্কা করছেন যখন তখন পদ্মেন্দ্রদার একটা কিছুর হুঁসে ঝুঁত পারে। আপনাকে অবশ্য আমি চিনি। আপনার একটা নাটক মুক্তাঙ্গনে অভিনয় হয়েছিল না?”

পায়ের তলার অনেকটা মাটি পাচ্ছি যেন। রেদ-তাতে তৃষ্ণা ছিলাম, এখন মনে হচ্ছে এক শ্বাস ঠান্ডা জলের অভাবে কণ্ঠতাল শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। তাড়া-তাড়ি মাথা নেড়ে বললাম, “হ্যাঁ, কিন্তু পদ্মেন্দ্রের ফ্ল্যাটটার পৌছাতে পারলে প্রথমেই এক শ্বাস জল খেতাম, এতো তেঁটা পেয়েছে।”

“রম্ভ, এই, এক শ্বাস জল দে তো, শিগগির।” পাশ থেকে একজন বললে। বুললাম গবাক্ষ পথে যে কৌতুহলী বদ্বতী আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁকেই উদ্দেশ্য করে ছেলেটি অনুরোধ করছে।

দলপতি ছোকরা বললে, “মিঃ তালুকদার বোধহয় আপনাকে

দেখেই ভুল পথে গেছিলেন (হাসি) মিসেস তালুকদার যা করলেন (সমবেত হাসি)।”

ফিজের ঠান্ডা জলের স্প্রে করণাময়ী রম্ভ দেবী হয়ত কমলারস মিশিয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধের মধ্যে একটা ঠান্ডা স্রোত নামছে। শুনো গাছের গোড়ায় জল পড়লে যেমন তা সতেজ হয়ে ওঠে, আমারও তেমনি ধড়ে প্রাণ ফিরে আসছিল। রম্ভা বলে মধু বলে বললাম, “দেখুন, আমি ঠিক কিছুর বুদ্ধিতে পারছি না।”

“কলকাতায় নতুন এসে পড়লে এতক্ষণে হয়ত কেঁদেই ফেলতেন।”

শুনতে পেলাম, একজন সর্কলের স্প্রে গবাক্ষচারিণী রম্ভ দেবীও উদ্ভাত হাসি দমন করতে পারেন নি। শব্দ আমিই, হাসব কিনা, বুঝে উঠতে না পেরে কেমন বোকা বোকা হয়ে গেছি।

দলপতি বলল, “আমার নাম রম্ভ। থিয়েটার টিয়েটার করি আমরা। পদ্মেন্দ্রদারা তো নেই। আসুন, সব বলছি আপনাকে। এই রম্ভ, দোরটা খুলে দে তো।”

সকলের সমবেত হাসির মধ্যে সৌদীন বৈঠক শেষ হলেও প্রপথে নেমে সমস্ত মনটা ফাঁকা প্রান্তরের মতো শূন্যতায় অসহনীয় হয়ে উঠল। ছি ছি ছি, পদ্মেন্দ্র শেষকালে পড়িয়ে গেল। অবশ্য সৌদীন তার কথাবার্তায় খানিকটা আঁচ পেয়েছিলেন। তাদের কারখানার ধর্মঘট লক আউটের পেছনে বুঝতে পেরেছি, একটা অদৃশ্য হাতের খেলা হয়ে গেছে। অবশ্য সেই খেলায় পদ্মেন্দ্র যে “ফাউল” করে বসেছে এবং তার পরের ধাক্কাও যে তারই ওপরে চড়াও হয়েছে, এতোটা ভাবতে পারিনি।

কিন্তু ঘটনা যা শুনলাম তাতে মনে হয়, প্রমিক কর্মীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পদ্মেন্দ্রের যুনিয়ন। স্কেপে আছে এখন সকলেই। কোম্পানী তাই পদ্মেন্দ্রকে কলকাতায় রাখা নিরাপদ মনে করেননি। খোদ দিল্লীতে রাতারাতি বদলী করেছেন, হয়ত সেখান থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনিংএর নামে বিদেশেও পাঠানো হবে তাকে। প্রমিকদের জন্য যত না হোক, পাণ্ডি সংগঠনের কোপ পদ্মেন্দ্রের রক্তকদের চিন্তিত করেছে। শহরের অবস্থা অরাজক। হত্যা জিজ্ঞাসা আক্রমণ এখন বে-পরোয়া। পদ্মেন্দ্র তার ভয় ও আশঙ্কার কথা জানিয়ে একেবারে দেশান্তরী হওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

পদ্মেন্দ্র দুভাবে খেলছিলেন। মালিকের পক্ষে প্রমিকের দাবি কমিয়ে আনা এবং পার্টি সংগঠনকে আন্দোলন ভাঙার অপবাদে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। সফলও হয়েছে। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। কিন্তু সে এক ইতিহাস। অথচ নতুন কিছুর নয়। আজকের কলকাতায় এমনটা আকছার ঘটছে। খারাপ লাগছে শব্দ এই ভেবে যে, পদ্মেন্দ্র দারুণভাবে পাল্টেছে। ওকে আর বন্ধ বলে ভাবতেই পারছি না।

তার
হাসি
কী মধুর



এর পেছনে রয়েছে-তার
বহুদিনের সাধনা—
সাধনা দশন দিয়ে প্রতিদিন
হাঁতের পরিচর্যা।

সাধনা
দশন

একটি আদর্শ হাঁতের মাজন

হাঁত মুক্তার মত বকবকে ও
সুন্দর, সবল, সুন্দর করে।
বুখ ফুট ও দুর্গম মুক্ত হয়



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-১৮

অধ্যক্ষ ডাঃ বোসেন চন্দ্র বোস, এম.এ.
বাসুদেব-শাস্ত্রী, এক.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাণ্ডারী কলকাতা
কলকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ বোসেন চন্দ্র বোস, এম.বি.বি.এস. (কলকাতা)
অধ্যক্ষগণ

সম্পাদক

সাংবাদিকদের মিথ্যা প্রচার

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রোমহর্ষণকারী রাজনৈতিক খবরের খবর প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে। দিনে দশ থেকে বারোটা খবর এখন গা-সওয়া ব্যাপার বলেই বোধ হয় নিভীক জাতীয়তাবাদী বাজারী কাগজগুলির নরশোণিতে অরুচি ধরেছে। অথচ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত এরা কী সুকৌশলেই না সারা ভারত এবং দুনিয়ার কাছে এমন প্রচার চালিয়েছিল যে পশ্চিম বাংলায় আইনশৃঙ্খলা নেই, প্রায় প্রতিটী তরুণ হয় খুনে, না হয় নারী ধর্ষণে ব্যাপ্ত, এবং কোন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চলছে না, পরীক্ষা হচ্ছে না, রাস্তায় বের-নোর পর বাড়ী ফিরে আসার আশ্বাস কারুরই নেই।

বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয়বাবু এই সংবাদ পরিবেশনের হাতল এদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ যখন সত্যি আইন-শৃঙ্খলার, নিরাপত্তার ঐকম নিদারুণ অবস্থা, প্রত্যহ হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ডজন ছাড়িয়ে গেছে এবং আরো কত ঘটনা অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ এই সব সংবাদ-পত্র এই শোচনীয় ঘটনাগুলিকে প্রায় অলক্ষ্য পাতায় ঠেলে দিচ্ছেন অথবা মোটেই প্রকাশ না করার বন্দোবস্ত করেছেন কেন?

আমরা কালান্তর, পেট্রিট জাতীয় ছন্দ প্রগতিশীল দলীয় কাগজগুলির কথা তুলছি না, কারণ এদের অর্ধসত্য ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের ট্রেনিং অভ্যস্ত। এদের মিথ্যাপ্রচারের পরীক্ষা দিয়ে মনিবের অর্থসাহায্যের স্বর্ণ শোধ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের কোন মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে এগুলা পড়েন বলে মনে হয় না। ওরকম হিংস্র, আত্মমর্ষণকামী সাংবাদিকতা নিয়ে রুচিসম্পন্ন কোন মানুষ মাথা ঘামাতে যাবেন না।

কিন্তু যে কাগজগুলি পশ্চিম-বঙ্গের মানুষ খবরের তৃষ্ণা মেটা-বার জন্যে পয়সা দিয়ে কেনে এবং বদলে ভেজাল মেশানো মন্তব্য-ওয়ালা সংবাদভাষ্য পায়, তার বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভ জাগা খুবই স্বাভাবিক এবং ন্যায্যসংগত।

গোটাকয়েক খবরের কাগজের মুনাকালস জর্জীরত মালিক আর তাদের পদলেহী কয়েকজন বিক্রীত-বিবেক অসাধু সাংবাদিক পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনকে ভেজালের বিষে আচ্ছন্ন করে দেবার হীন প্রচেষ্টা বিনা প্রতিবাদে চালিয়ে যাবে, এ হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ খবরের কাগজ পাঠকে বদ্বতে হবে যে মিথ্যে

খবর, অর্ধসত্য খবর ভেজাল খাদ্য বা ঔষধের চেয়েও মারাত্মক। ভেজাল কারবারীরা মানুষ মারার জন্যে খাদ্য, ঔষধে, অত্যাব্যাক সমস্ত পণ্যে ভেজাল দিয়ে যে অসামাজিক জঘন্য অপরাধ করে, এই সব খবরের কাগজের মালিক ও সারমের সাংবাদিক তার চেয়েও জঘন্য কাজে লিপ্ত। কারণ অসামাজিক, জন-বিরোধী কার্যকলাপের স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়ে, অথবা সত্য গোপন করে তারা জনগণকে ভুল দ্রান্ত-পথে পরিচালনা করে।

অজয় মুখার্জীর কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গদ্যিতে আরোহণ করার পর থেকে কতগুলি খবর হয়েছে? পাঠকেরা জেনে স্তম্ভিত হবেন এই একমাসে একশ তিম্পান্ন জন সাধারণ মানুষ, পুলিশ কনস্টেবল, ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক নেতা খুন হয়েছেন। এই একমাসে পুলিশ মিলিটারী, সি আর পি উনিশটি এলাকা ঘিরে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, গড়ে দৈনিক চার রাউন্ড গুলী বর্ষিত হয়েছে। সাধারণ অপরাধের মাত্রা স্বাভাবিক অপরাধের পরিমাণ ছাড়িয়ে গোটা সমাজ-দেহকেই বিবাক্ত করে তুলেছে।

খবরের কাগজের সাংবাদিকরা কি পাঠকের খুলে বলেছেন যে কংগ্রেসী ছাত্রপরিষদের গুন্ডামীর ফলে, মন্ত্রীদের প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দেওয়ার ফলে কতজন সরকারী কর্মচারী, শ্রমজীবী মানুষ আহত বা নিহত হয়েছেন? লজ্জার কথা কংগ্রেসী গুন্ডাদের হাতে দুজন সাংবাদিক লাঞ্চিত হবার পরও ঐ সব সাংবাদিকের উদ্যোগে প্ররোচনা দানক-রী মন্ত্রীকে প্রেস ক্লাবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের যে সাকুলার পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জির কাছে পাঠানো হয়েছে (সাকুলার নং সি/৪/সি ৭১ তাং ৩রা এপ্রিল) তা নিয়ে কোন সংবাদপত্রে একটু বিরূপ মন্তব্য বা বিরোধিতার আভাস মাত্র দেখেছেন? অথচ কি ভাবে সরকারী প্রশাসন যন্ত্র বিরোধী দলনেতাদের ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে মিথ্যা বা কল্পিত অভিযোগে আটক রাখতে পারে, তা দেখে প্রতিটী সুস্থবিরবেক, গণতান্ত্রিক মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যাবেন।

কোন সংবাদপত্র কি জবরদস্তি-মূলক আটক আইন, বৃটীশ অস্ট্রাগর থেকে তুলে আনা এন্ডারসন আইনকে স্বাধীনদেশে প্রয়োগের চেষ্টাকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ধ্বংসকামী প্রচেষ্টা বলে নিন্দা করেছে? এই সব কাগজের কোন



বাংলা দেশের উদ্বাস্তুদের ত্রাণকার্য

সাংবাদিক কি ভুলেও বলেছেন যে নির্বাচিত সরকারের পক্ষে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ পি ভি এ আইনের প্রয়োগ নির্বাচনকে প্রহ-সম্মো পরিণত করেছে?

বরং মিথ্যা খবর মনগড়া মালিকের পছন্দসই খবর তৈরী করে ছাপিয়ে তার নিজেদের শাঠা ও অসত্যতার কালো দৃষ্টান্তে সাংবাদিকতাকে রূপোপজীবী নারীর সঙ্গে তুলনীয় করে তুলেছে।

ধরুন একদা টেলিফোন অপারেটর এখন জ্ঞানী সাংবাদিক এক ভদ্রলোক কপনই এটে বুকনি ঝড়-লেন, সি পি এম উথরা কেন্দ্রে লোক সেবক সংঘের শ্রীবর্ভূত দাশগুপ্তকে মনোনয়ন দিয়ে দল বাড়াতে চাইছে। ভদ্রলোক লেজ তুলে দেখ-লেন না মন্দা না মাদী। উথরা কেন্দ্রটী তপশীলভুক্ত সংরক্ষিত আসন, বিভূতিবাবু কি করে এখানে প্রার্থী হবেন?

আনন্দবাজার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের এক একজন বিশেষ প্রতিনিধি তো রাজনৈতিক ব্যাখ্যার শিরো-মণি মশাই। কি যে লেখেন আর কি যে বলতে চান, বোঝাই দায়। তাদের রচিত সংবাদ পড়ে মনে হয় না যে এটা খবর, মনে হয় এটা তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য।

বাজারী পত্রিকাগুলি বা স্টেটস-ম্যান পড়ে লোকে জানতে পারেন না সত্যি সত্যি এদেশে কি হচ্ছে, বিদেশে কি ঘটছে। যা জানতে পারেন তা হচ্ছে ঐ সব মালিক সারমের সাংবাদিকদের সম্বরণচিত মিথ্যা।

জৈনক ছাত্রনেতা সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে-ছেন। তিনি বলছিলেন যে বাংলা-দেশের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে কলকাতার সংবাদপত্রগুলি (বিশেষ করে তিনি যুগান্তর ও আনন্দবাজারের উল্লেখ করেন) এমন ভুল তথ্য ও মিথ্যা সংবাদ দেয় যার ফলে বাংলা দেশের সাধা-রণ মানুষ পাক সেনাদলের আক্রম-ণের মুখে দিশাহারা হয়ে যান। কারণ তাঁরা খবরের জন্যে কল-



দর্পণের জন্য ছবি তুলেছেন নিখিল ভট্টাচার্য।

কাতার খবরের কাগজগুলিই পড়-তেন এবং ঢাকা থেকে সংবাদপত্র পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি বলেছেন যে ঝিকরগাছায় মদ্রি ফোজ অপ্রস্তুত অবস্থায় মার খেয়েছে, কারণ কলকাতার খবরের কাগজে তারা দেখে-ছিল যে যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখ-লের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। এই অসুস্থ অসং সাংবাদিকতা সংগ্রামী মদ্রিফোজের অনেকের মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণকামী প্রতিটী গণতান্ত্রিক মানুষকেই সংবাদপত্র ও অসাধু সাংবাদিকতার

বিরুদ্ধে সচেতন হতে হবে। এরা মিথ্যে, ভেজাল পণ্য সরবরাহ করে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে অসাড় করে রাখবেন, তার গণতান্ত্রিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেবেন, ঐ অবস্থা চলতে পারে না।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে এরা যদি এ ব্যভিচার চালিয়ে যেতে পারেন, তা হলে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যেকোন ব্যক্তি অন্যের স্বাধী-নতা ক্ষুণ্ণ করার দাবী করতে পারে, স্বাধীন ব্যবসার নামে যে কোন ভেজাল-চোরাকারবারী অবাঞ্ছিত ভেজাল দেবার অধিকার দাবী করতে পারে।

এভারেট্ট হ্যাণ্ড ফেব্রিকস বন্ধ

কত পক্ষের হৃদয়হীনতা

আন্তর্জাতিক - খ্যাতিসম্পন্ন বিখ্যাত হ্যাণ্ডলুম পর্দা, সোফা ও চেয়ার-কভারের কমপুড, বেড-কভার ও তোয়ালে প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক দি. ওয়েবিং এন্ড বেল্টিং ফ্যাক্টরী প্রাইভেট - লিমিটেডের (নিকলসন রোড, দিল্লী-৬) অতি নিজস্ব সেল ডিপো ও শো-রুম কলিকাতাস্থিত (১নং লিমডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬) এভারেট্ট হ্যাণ্ড ফেব্রিকস ২৯শে মার্চ থেকে লক আউট ও ক্লোজারের আওতায় আর এর কর্মচারীরা বেকার হয়ে পথে নেমে আজ চরম সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে এই একতরফা ও অতীব বে-আইনী লক আউট ও ক্লোজার রুখে লড়ায়ে ব্যস্ত।

কলিকাতাস্থিত এই শো-রুম এভারেট্ট হ্যাণ্ড ফেব্রিকসের প্রতিষ্ঠা ১৯৫০ সালে আজ থেকে আঠারো বছর আগে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এই পনেরো বছর ধরে প্রতি বছর কেবল কলিকাতাতেই এই শো-রুম ও সেল ডিপোতে সাড়ে চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার সেল হোতো আর আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা এই সব

নিয়মিত এই সেলের অঙ্ক দাঁড়াতো আট থেকে নয় লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের অঙ্ক দাঁড়াতো এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা।

১৯৬৯ সাল থেকে হঠাৎ দিল্লী কত পক্ষের ব্যবসায় নীতিতে ষষ্ঠে পরিবর্তন দেখা গেলো। যা কিছু নতুন মাল তৈরী হতে শুরু করলো তা সবই রপ্তানীর জন্য। কলিকাতার ডিপোতে এই কারণে ফ্যাক্টরী থেকে নতুন মাল আনা বন্ধ হয়ে গেলো। যা কিছু আসতে লাগলো তা শুধু পুরোনো মাল যা গাদা হয়ে ফ্যাক্টরীতে পড়ে ছিলো। স্বভাবতই ঋণেরদের ভিড় কমতে শুরু করলো এবং সুপে সপে সেলের পরিমাণও। কর্মচারীরা অনুরোধ করলেন নতুন মাল পাঠান, কলিকাতার এই ডিপো স্বর্ণখনি। এখন সেল ফল করতে পারে না। কিন্তু তাদের কথায় কথায় করা তো দূরের কথা উনিতিরশে মার্চ তারিখে তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হোলো

ছাটোর নোটিশ। হেড অফিস কলিকাতার ডিপো নাকি আর রাখতে চায় না।

কর্মচারীরা স্থানীয় ম্যানেজারকে জনালেন আজ আঠারো বছর ধরে আমরা এখানে কাজ করছি, কোন দিনের জন্য আমরা ধর্মঘট, কর্মবিরতি প্রভৃতি কিছু করিনি, আঠারো বছরের ইতিহাসে কোনদিন কোন দাবী দাওয়া পেশ করিনি, তবুও কেন এই ব্যবস্থা? এর উত্তর দেওয়া তো দূরে থাক তাদের কমপেনসেশনের টাকার পরিমাণ কি হবে তাও পর্যন্ত সেটেল করা হল না। তারা টেলিগ্রাম ও পাঠালেন কত পক্ষকে অন্ততঃ একবারও যেন তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে আলোচনা করেন। কিন্তু তার উত্তরে স্থানীয় ম্যানেজারের কাছে গোপন চিঠি এলো আইনের আশ্রয় নিয়ে কর্মচারীদের যেন শো-রুম থেকে বার করে দেওয়া হয়। কর্মচারীরা নিরুপায় হয়ে শো-রুমে একরকম না থেয়ে না দেয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বসে বসে কাটাচ্ছেন মনে আশা বন্ধিবা অনুগ্রহ করে কত পক্ষ তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

পুরনো ভারতীয় ছবি

সুগন্ধেশ্বর রায়

পুরোনো ভারতীয় ছবির একা-দিক্সে প্রদর্শনী আজকাল সতিই অসহ্য লাগে। চলচ্চিত্রের ইতিহাস জিখিয়েদের কাছে নিশ্চয়ই এসব ছবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাঁতল, কিছু প্রাচীন ব্যক্তি অবশ্য এখনও এই ছবি দেখে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অতীতমাহাত্ম্যে গদগদ হয়ে ওঠেন; কিন্তু আঙ্গিক ও বস্তুর নিত্য-নতুন বিস্ফোরণে উদ্ভাল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের প্রভাবে পুষ্ট আধুনিক দর্শকের কাছে পুরোনো ভারতীয় ছবি এক আজব রগড়ের ব্যাপার ছাড়া কিছুই না। বস্তব্য ও আঙ্গিক দুতরফেই সাহিত্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত না হবার জন্য কোনদিকেই এসব ছবিতে কোন গভীরতা আর্সেই। ফলে না হয়েছে সাহিত্য, না সিনেমা। এমন কি, দ্বিগ দর্শকে তৈরী কল-কাতা ও বোসের নামী ছবিগুলো-রও এই দশা। তার মানে অবশ্য এই নয় যে আজকেও ভারতীয় ছবির খুব উন্নতি হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে দেশি সিনেমা এখনও যে ভিত্তিরে যে ভিত্তিরেই। শুধু বাইরের রং বদলেছে। খানিকটা বহিঃপ্রাঙ্গণ চটক এসেছে, ব্যবসায়িক উপাদানের রকমফের ঘটেছে। কিন্তু ভেতরে সেই একই ভূমিমালা, সেই পুরোনো দ্বিগ চর্চাশ বছর আগেকার বিষয়বস্তু, আঙ্গিকেরও অন্তর্লীন কোন উন্নতি হয়নি। যদিও যুগের সঙ্গে তাল রেখে কিছুটা যান্ত্রিক পারিপাট্য এসেছে ছবিগুলো-র মধ্যে। অরশ্য অসহনীয় হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এধরনের পুরোনো ছবির প্রদর্শনী দর্শক-দের উপকারই করে। পুরোনো দিনের চলচ্চিত্রকারদের সম্পর্কে নির্বিচার ভাঙলুত ভাব কেটে যায়, নতুন করে বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়। শিল্পের জগতে মাঝে মাঝে এধরনের মূর্তিভাঙা কারবার খুবই দরকারী। সম্প্রতি ক্যাল-কাটা ফিল্ম সোসাইটী আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে মেহবুব-এর "আওরং" ও "রোটি" এবং বোসের টকীজ-এর "অজ্ঞানকন্যা" দেখে আমাদের দেশের প্রবীণ চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের সম্পর্কে নতুন মূল্যায়নের সুযোগ পাওয়া গেল।

করে এই কাহিনীর মানবিক সম্ভা-বনা ছিল প্রচুর, কিন্তু লেবু যেমন বেশি কচলালে তেতো হয়ে যায়, এখানেও সেরকম আবেগঘন মৃদু-ত'গুলাকে অতিনাটকীয়তার ভরে তোলা হয়েছে। তাছাড়া বস্তব্য ও আঙ্গিকের সুসম মিশ্রণ না হবার ফলে ছবির গঠনে ঋজুতা আসে। "রোটি" ছবির বিষয়বস্তু অবশ্য আরও জটিল-শিল্পকৌশলিক নগর-জীবনের সঙ্গে আদিবাসীদের সরল জীবনযাত্রার সমঝোতার সমস্যা। তাছাড়া ধনী-দরিদ্রের স্বল্পসংস্পর্ক সম্পর্কেও কিছু কথা আছে ছবিতে। কিন্তু বাস্তবানুগ ভঙ্গীতে সমস্যার উপস্থাপন একে-বরেই অনুপস্থিত, বরং সমস্ত ছবির মেজাজেই তৃতীয় শ্রেণীর অপেরার ছাপ প্রকট। "অজ্ঞান-কন্যা" অবশ্য তৎকালীন এক বড় সমস্যা অপস্থাতা নিয়ে তৈরী। কিন্তু হিমাংশু রায়-অস্টেনকৃত এই ছবিতে নির্মাতাদের মাধ্যমের ব্যবহার একেবারেই নিপুণ নয়। অবাক লাগে এজন্য যে এদের তৈরী নির্বাক ছবি "এ প্রো অফ ডাইস" কিংবা "লাইট অফ এশিয়া" অপূর্ব কারিগরি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সমস্যার গভীরে যাবার কোন চেষ্টাই নেই। ওপর ওপর ছুঁয়ে যাওয়া মাত্র। আসলে সেই চিরচিরিত প্রেমকাহিনী, নাচে-গানে বোকাই।

সফল হতে পারে

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

অগ্রবাহিনী ছিলেন শুধু ভিয়েত-নামী কমিউনিস্টরা।

ষাট সালে প্রথম-জাতীয় কন-ভেনশন ডেকে তেইশটি দল ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠিত হয়। তারপর থেকে সুসংবদ্ধ গেরিলা বাহিনী আক্রমণ চর্চায় মার্কিন ও তাবৈদ্য বাহিনীকে বারে বারে পরাস্ত করে আজ বিজয়ের সম্মু-খীন হতে পেরেছে।

ইয়াহিয়া খানের "সশস্ত্র সাম-রিক বলের সামনে নিরস্ত জনসাধা-রণ প্রাথমিকভাবে দুর্বল। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে জনগণের সংঘবদ্ধ প্রস্তুতির সামনে এ সামরিক অস্ত্রবল জন-গণের পক্ষে চলে যেতে বাধ্য। রাজ-নীতি ও সমরনীতির সূচক সম-ব্বয়ের ফলেই এটা ঘটবে। এটা ঘটলে, ইয়াহিয়া খান তুচ্ছ, তার মৃদুবাঈ ইগমার্কিন সম্রাজ্যবাদী জোটও পর্যাস্ত হয়ে পড়বে। একটা ভিয়েতনাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে কাগজে বাঘ তা প্রতিপন্ন করেছে, আরেকটা বাংলাদেশ প্রমাণ করবে স্ববরকম উপনিবেশিকতাবাদ সম্রাজ্যবাদই কাগজে বাঘ, বাংলা-দেশের অজ্ঞান মানব প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন যে অস্ত্র নয়, জনগণই বিজয়ের মূল্য উপাদান ও গ্যারান্টি।

বাংলা দেশের সংগ্রাম

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

কতিপয়ের নস্টালজী ছাড়াও ঐ সকল পড়িলে ইন্দুনারায়ণবাবুর উল্লেখ মনে পড়েছে যে, আফগানে যুদ্ধ সংঘটিত কোন ফিরিঙ্গীর এপিক লেখার উদ্দেশ্যে হয়-আমরা যদি স্বাধ্যার করি তাহা হইলে, মানিতে বাধ্য হইব যে সামাজিকভাবে বাঙালীর পূর্ব-বংশের সম্বন্ধে অজ্ঞর রহিয়াছে, চতু-

বর্শে জগত বটেই এবং ঘর, পরিচর, রীতিনীতি আচার পূর্ববংশের বিভিন্ন স্থানের নাম বহন করে, এখন বিবা-হদির ও শোক সংবাদ বিজ্ঞাপনে তাহার সাক্ষ্য পাইয়া থাকি। এই প্রাণ-পড়িয়া থাকার জন্যই বাঙালীর চিত্ত অস্থির হইয়াছে, আমরা সকলেই অক্সাভিচারী মানসে গাঢ় খেদ রাব-নিক স্বেষ বিস্মৃত হইলাম। নিজে-বাঙালী বলিতে পারিয়া আমাদের দেহ মন শূন্য নিশ্চরই হইল। যে-

এবং নিজেকে বাঙালী স্মরিয়া আমরা পূর্ববংশের মাতৃভূমির জন্য ঈদৃশ লড়াইয়ের বীরত্বের অংশীদার হইলাম! ও তাহাতে ক্রিয়া আমাদের এখাবং কাপুরুষতা ভুলিবার বিষয় পাইলাম।

বাঙালীর চরিত্র সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিকের পর্ববেক্ষণ নিম্নপ্রয়োজন, কালী সিংহী বাহা বলিয়াছেন তাহা সাদাভাবে ইহা যে, যে কোন ভকর পাইলেই বাঙালী বা বঙ্গোত্তরা খাম-চইয়া পোষাইয়া লইবে (যথা পূর্ব-বংশের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা পড়ুন, ইহা দেখুন "জয়-বাংলা" ইতি-মধ্যেই দৈগত তহবিল খোলা হই-য়াছে, ছেদা বাঙ্গা রাষ্ট্রতে অনবরত ঝাঁক মারিডেছে, অনেক সংস্থা সম্প্রতি হৃদয়-বান হইয়াছে, এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিলক ফান্ড, বন্যা ফান্ডগুলি, চীন প্রতিরোধ ফান্ড উবিয়া গিয়াছে; চীন যুদ্ধে রক্তসংগ্রহ নদমায় গিয়াছে। অতএব পূর্ববংশ কতখানি উপকৃত হইবে, তাহা কম্পনা করা যায়। ইহা সত্যই দুঃখের।

সংগ্রামী জনতার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মহকুমা শাসক এবং জেলা শাসককে আত্মগোপন করতে হইছিল, ছুটে আসতে হইছিল সৈন্যবাহিনীকে দাউ দাউ করে আগুনে পড়ে যাওয়া সরকারি অফিসগুলো রক্ষা করতে। কিন্তু হায়! সেই সংগ্রামী জনতা আজ এই শহরে কোথায় হারিয়ে গেল?

নকশালরা দিনের পর দিন বোমার ধোঁয়ায় কুসনগরের, কলেজ স্ট্রীটের এবং আরো বহু পাড়ার অসংখ্য ছোট ছোট দোকানদারের ব্যবসা নষ্ট করে দিয়েছে বা দিচ্ছে কিন্তু যেখানে কোটি কোটি টাকার মদ্যফা হয়ে থাকে সেই শোয়ার মর্কেট অনন্তকাল এদের মজা-গুলের বাইরে থেকে যায়, বিড়-লার বাড়ীর সামনের ফুটপাথে একটা সামান্য পটকা ফাটতেও এদের বিবাকে বাঁধে।

করে সর্বত্র তজ্রাশী চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোন মানুষ এই বিষয়ে সামান্য একটু বিবর্ত, প্রকাশ করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে-প্রতিরোধ তা দূরের কথা। কিন্তু কেন এমন হলো? আজ কুসনগ-রের এই পটভূমিকায় ১৯৬৬ সালের সেই ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের দিনগুলোকে শ্রদ্ধাভাজ্য স্বপ্ন বলেই মনে হয়। সচেতন মন চার-দিকে নকশালদের এই বিপ্লব দেখে কিছুদূরই বিশ্বাস করতে চায় না যে এই শহরের সাধারণ মানুষ-গুলোই মাত্র পাঁচ বছর আগে চালের দাম বেড়ে যাওয়া এবং কেরাসিন তেল বাজার থেকে উধাও হওয়ার জন্যে তৎকালীন মণ্ডলবর ভূতুল্য প্রফুল্ল চক্রের পদলিখ বাহিনীকে পিটিয়ে তাদের গোষ্ঠিক খুলতে বাধ্য করেছিল,

নন্দরানী সেনগুপ্তা
কুসনগর

দুই নং বসন্ত বোস রোডের শেষ সংবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দুই নং বসন্ত বোস রোডে অবস্থিত সেই সেনগুপ্ত ভবন। একাংশে সাইন বোর্ড বোলান বাংলা কংগ্রেস অফিস। চাল-চলন চেহারা প্রায় সবই ঠিক আছে। কিন্তু দলের সভাপতি অজয়বাবু পশ্চিমে মাঠের পর থেকে আর সুশীল ধাড়া এন্ড কোয়েলের দরজায় ভুলেও পা দিচ্ছেন না। আসেন না হরিদাস মিত্র, অহীন মিশ্র, প্রণব মদ্যাজী, আমজাদ আলি ও দলেব বিশিষ্ট নেতৃবর্গের আরও অনেকে। অফিস খাঁ খাঁ মরুভূমি। মহিষা-দলের ভাগনে মেদবহুল তৈলাক্ত শরীরটি নিয়ে কুতূহলে দুটি চোখ মেলে টেবিল আলো করে বসে আছেন আর যথারীতি কাশ সামলাচ্ছেন। ভেতরের ঘর থেকে

(ধাড়া মশাইর খাস চেম্বার) হুকুম এলই তিনি নড়বেন, নইলে নয়। মহিষাদলের ডঃ বাগ (দাদার অনুগ্রহপুষ্ট ছোট ভাই ও সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দাদার গোপন টাকা কড়ির জিম্মাদার) মাঝে মাঝে চ্যাটা স্ট্রাকশন হতে ঢুকছেন, দরজা বন্ধ করে কী যেন গভীর সলাপারামর্শ করছেন আবার বেরুচ্ছেন আবার ঢুকছেন। কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে চম্বিশ পরগণার সিংহ এন্ড সন এন্ড ডটার কোম্পানীকেও। চম্বিশ পরগণার সদস্যরা বলেন, সিংহ মশাই এবার ছেলেকে ডায়মন্ডহারবার লেকসভা আসনে প্রার্থী কবে মাত্র যে ক'হাজার ভোট টানতে পেরেছেন, তার সাতগুণ বেশী মদ্রা

নির্বাচন তহবিল থেকে ঝেড়ে নিয়েছেন।
ওদিকে ঝড় উঠেছে বিদ্রোহের। লেয়ার সাকুলার রোডে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট হস্টেলের চারতলার তের নং রুমে গত পয়লা মে বিদ্রোহীদের আলাপ আলোচনা রীতিমত উন্মেষজনক। বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, হাওড়া, চম্বিশ পরগণা, কলকাতা, বীরভূম, বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলাগুলির সভাপতি, সম্পাদক অথবা বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ ছাড়াও প্রদেশ কর্মপরিষদের কমপক্ষে দশজন বিশিষ্ট সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রবীণ হরিদাস মিত্রের পাশাপাশি তরুণ প্রণব, অহীন, আমজাদ মিঃ ধাড়ার অগণ-তান্ত্রিক ব্যক্তিচারের সমালোচনায় কঠোর। হাওড়ার সহ-সভাপতি অধ্যাপক শ্যামল বিশ্বাস, প্রাক্তন এম, এল, এ পারুল সাহা, বর্ধমানের নেতা সুশীল ঘোষ ও অমরেশ সরকার, আরামবাগের বিভূতি রায়, বীরভূমের উমাপতি মিত্র প্রভৃতি আরও অনেকে তীক্ষ্ণ সমালোচনায় ধাড়া মশাইর রাজ-

নৈতিক ও আর্থিক উচ্চাকাংখা চরিতার্থ করার লালসাকে উন্মাদের তুল্য বলে অভিহিত করলেন। তাঁর যচ্ছেচারিতার নিন্দা করলেন কঠোর ভাষায়।
অসাধু চোরাকারবারী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মদ্যপান ধাড়া মশাইর প্রবলতম প্রতিবন্দনী অহীন মিশ্র এতদিন তাঁর দুর্নীতি ও নোংরামির বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম চালিয়ে আসছিলেন, এবার দেখা গেল সব জেলার প্রতিনিধিরাই সোচ্চার। উনসত্তর সালের ডিসেম্বরে অনশন আন্দোলনের সময় থেকে এ যাবৎ সংগৃহীত বিপুল অর্থের আয়ব্যয় বা কিছু সবই ধাড়া মশাইর পকেটে। প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন, তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনীতির সুবিধার জন্য বেশ কয়েক লাখ সরানো আছে। কোষাধ্যক্ষ-সভাপতি অজয়বাবু সব কিছু জানেন এবং জানেন না।

ধাড়া মশাই যথেষ্ট বুদ্ধিমান তাই আগে থেকে অভূত্যা ঘোষীয় কায়দায় সম্পাদকমণ্ডলীতে দল ভারী করে রাখতে ভুল করেন নি। সাতষাট উনসত্তর সালে তাঁর দুবার মন্ত্রিস্বের আমলে যারা অনুগ্রহীত তাদের সংগে জরুরী পরামর্শ সেরে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর বশব্দদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি পত্রে অজয় মদ্যাজীর কৈফিয়ৎ তলব করেছেন, কেন তাঁকে মন্ত্রী করা হোল না। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে যারা চিঠি নিয়ে অজয়বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন অজয়বাবু তাদের গেট আউট বলতে কসদুর করেন নি।

ওদিকে বিদ্রোহের আভাস পেয়ে ধাড়া মশাই জেলায় জেলায় ছুটো-ছুটি শরদ্ব করে দিয়েছেন। মেদিনীপুর, দক্ষিণ চম্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান এবং আরও কোথাও কোথও মন্ত্রী না হতে পারার দ্ব্যখে তিনি বুক চাপড়ে কাতর আতর্নাদ করেছেন, উন্মাদের মত প্রলাপ বকেছেন। সদস্যরা হেসেছেন মদ্য টিপে টিপে।

রাজনীতিতে পরিত্যক্ত ভূপাল বসুকে সভাপতি ও নিজেকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে তিনি যে বাংলাদেশ সহায় কর্মিটি করে টাকা তুলে বেড়াচ্ছেন (অজয়বাবুর নিষেধ সত্ত্বেও), তাকে বিদ্রোহীরা বাংলা কংগ্রেসের সংগে সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা করেছেন। অজয়বাবুকে বাদ দিয়ে ধাড়া এন্ড কোং তথা বাংলা কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি যে ভূপাল বসু এখন থেকে তারই মহড়া চলেছে। আর মহড়া চলেছে আগামী রাজনীতির। আদি কংগ্রেসের অশোক দত্ত, বদ্র, আভা, বীজেশ ও মেদিনীপুরের স্বনামধন্য প্রবীর ইত্যাদির সংগে ধাড়া মশাইর প্রাক-নির্বাচনী গোপন প্রণয় এখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে।

হেমন্ত বসুর হত্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অশোক ঘোষালের বিরুদ্ধে যখন কিছু নেই তখন তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে এবং পদলিখ যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করেছে, তাদের বিরুদ্ধেই চার্জশীট দেবার আদেশ দেন। জানা গিয়েছে, রঞ্জিত গুপ্ত উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে বলেছিলেন, এতবড় একজন নেতার খুনের ঘটনায় রাজনীতি করা দীর্ঘদিন চলে না এবং রাজনীতির চাপে ভুল লোকের বিরুদ্ধে চার্জশীট দিলে আদালত থেকে প্রচণ্ড তিরস্কারের সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়তঃ ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের তদন্তকারী অফিসাররাও ভুল লোকের বিরুদ্ধে মামলা আনতে চাননি। কেননা, আদালতের তিরস্কার তো তাদের ভাগ্যেই পড়বে। এতে চাকরীর ক্ষতি হতে পারে। যাইহোক, এই অবস্থায় চার্জশীট দেবার আদেশ দেওয়া হয়।

এখন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রস্তাব নিয়েছে, নতুন করে তদন্ত করতে হবে, অর্থাৎ সি.পি.এমকে জড়াতে হবে। কিন্তু কলকাতার গোয়েন্দা পদলিখ যে কোন তদন্তের জন্যে প্রস্তুত। তাঁরা চ্যালেঞ্জ করেছেন, অন্য কেউ তদন্ত করে যদি নতুন কিছু বের করতে পারেন তো করুন। ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট স্ব-ইচ্ছে আর আসামী বদল করবে না।

নকল মুজিবর

(১২ পৃষ্ঠার পর)

যাই করুন না কেন। ওরাই যে সরচাইতে বেশী বিপ্লবী এবং বড় বড় বড় পুঞ্জিপতিদের বিরোধী একথা জাহির করার কোন দ্রুতি করেন নি।

চেম্বার অব কমার্সের ঘনিষ্ঠ মহলের সংবাদ যে দিল্লীতে দরবার করার আগে তাঁর আরাজির মদ্যাবিদা অজয়বাবু মালিকদের দেখিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি যে এ বিষয়ে সত্যিই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নি তাও জানিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর এই নিষ্ঠায় সি.পি.আই নেতারা আরও বিচলিত।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রের তরফ থেকে নতুন করে আর্টিক আইন চালু করার প্রস্তাব এঁদের আরও বিরত করেছে।

অষ্টবাদের ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ সি ইতিমধ্যেই এর বিরোধিতা করেছে। আবার বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করার আইন করার প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে।

ইতিপূর্বে বাংলা কংগ্রেসের সংগে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করে গত বছর জমি দখলের লড়াইকে চাপা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল সি.পি.আইয়ের পক্ষে।

এভাবে নানা দিক থেকে চাপ এলে নবকংগ্রেসের সংগে মধ্যমিনী কতদিন চলবে, একথা অনেকেই আলেচনা করছেন।

বিপর্যস্ত অবস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তির সুযোগ দাবী করেন।

তাঁরা বলেন শপথ গ্রহণে যদি তাঁদের অনুমতি দেওয়া যায় তাহলে স্পীকার নির্বাচনেও তাদের একই সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার পক্ষের যুক্তি ছিল যে কোর্টের অনুমতি ছাড়া এ সুবিধা দেওয়া যায় না; পরে এ্যাডভোকেট জেনারেলকে সভায় তলব করে বন্দী সদস্যদের উপস্থিতি একমাত্র কোর্টের অনুমতিক্রমেই হতে পারে বলে যুক্তি দেওয়া হয়।

বোধহয় এ্যাডভোকেট জেনারেলের আরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু তাঁর পূর্ণ বক্তব্য শেষ করার

পূর্বেই তাঁকে প্রায় সভাকক্ষ থেকে ঠেলে বার করে দেওয়া হয়।

তাতে অব্যাহতি বিরোধীদের কোন ক্ষতি হয় নি, কারণ তাদের উদ্দেশ্য প্রথম আক্রমণেই সফল হয়ে গেছে। সরকার পক্ষ বিরোধীদের কোন যুক্তি খণ্ডন করতে পারে নি। এমন কি বেগতিক দেখে সরকার পক্ষের সি.পি.আই সদস্য বিশ্বনাথ মদ্যাজী আর ফরোয়ার্ড ব্লকের সরল দেব বন্দী সদস্যদের পদলিখ প্রহারায় সভায় আসতে দেওয়ার দাবী সমর্থন করেন।

মন্ত্রীদের ঘন ঘন এধার ওধার ছুটাছুটি করতে দেখা যায়, কিন্তু পরামর্শের পথে কোন সুদ্রাঘা কবুতে পারে নি। মূল প্রশ্নের কেন জবাব মেলে নি।

মূল প্রশ্ন : যদি শপথ গ্রহণের

সময় আদালতের অনুমতির প্রয়োজন না হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম দিন বিধানসভায় উপস্থিতির জন্য অনুমতির প্রয়োজন হবে কেন?

পরের ঘটনায় সরকারের বিরত অবস্থার পূর্ণ ছবি পাওয়া গেল। গত বুধবার (পাঁচই মে) ক্যাবিনেটের বিশেষ বৈঠক হল এই ঘটনা আলোচনার জন্য।

প্রথমবারের অনুমতি দান বেহিসেবী ও বে-আইনী বলে সাব্যস্ত হল। আর হোম সেক্রেটারী বি আর গুপ্ত ফেসে গেলেন। সমস্ত সরকারী আনুষ্ঠানিক পন্থাতি বিসর্জন দিয়ে তাঁকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। চীফ সেক্রেটারী পুরনো আই সি এস অফিসার নির্মল সেনগুপ্ত একটু আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু গুপ্ত মহাশয়কে সরানোর আদেশ বলবৎ থাকল।

পরে জানা গেছে যে, বন্দী সদস্যদের শপথ গ্রহণের জন্য স্পীকারের সামনে হাজির হওয়ার অনুমতি হোম সেক্রেটারী মদ্যাজী অজয় মদ্যাজীর পরামর্শ ক্রমেই দিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ ঘটনা অজয়বাবু নিজের গা বাঁচাতে সম্পূর্ণ চেপে গেলেন। উনি অনেক ব্যাপারেই এই ধরনের আচরণে অভ্যস্ত। আগেও এই ধরনের ঘটনার নজীর আছে।

হাইকোর্টের আইনজ্ঞ মহলের মতে কোন বন্দীকে বিশেষ কারণে প্যারোল দেওয়ার ব্যাপারে কোর্টের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। হোম ডিপার্টমেন্ট টুজল দপ্তরের পরামর্শ এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বরাবরই এই ভাবে চলে আসছে।

হোম সেক্রেটারী বি আর গুপ্ত এই কথাই বলেছিলেন। ফলে বেচারীর দুর্ভোগ।

তাদের ত ফ্রন্টে যেতে বাধা নেই।

মোট কথা, শত্রু যখন নির্দিষ্ট, সংগ্রামের বর্তমান স্তরের লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে যখন কোন স্খিমত নেই তখন চলচেরা তাত্ত্বিক আলোচনায় নেমে নানা ফাঁকিঝা তোলা পলায়নবাদের সামিল।

মধ্যপন্থীরা ক্রমশঃ নিজদের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন। এবং এই মধ্যপন্থীরা বাংলাদেশের ছোটবড় সবদলেই আছেন। তাঁরা এখন ভাবছেন যে, সরকার যেমন আছে থাক আর ফ্রন্টে লড়াই চালাবার জন্য আর দৈনন্দিন নেতৃত্বের প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন এলাকার নেতৃত্বের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিপ্লবী কাউন্সিল গঠিত হওয়া দরকার। কাউন্সিল অবশ্য সরকারেরই অংশ হবে। বিভিন্ন কাউন্সিল ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা, অস্ত্র আমদানী ইত্যাদি সরকার ও বিপ্লবী কাউন্সিল যুক্তভাবে করতে পারে।

মতান্তর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলে নরমপন্থী গণতন্ত্রপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতারা নেতৃত্ব থেকে হটে যাবেন এবং উগ্রপন্থী ছোকারার দল সংগ্রামের পুরোভাগে চলে আসবে।

নরমপন্থী এবং উগ্রপন্থীদের মাঝে জোরালো একদল মধ্যপন্থী আছেন। তাদের বক্তব্য যে নেতৃত্বের প্রশ্নে প্রশ্নী চরিত্র বা অতীত কাহিনী ইত্যাদি কথা তুলে এখন আর আন্দোলনে ভাগগন ধরানোর দরকার নেই। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য : সশস্ত্র সংগ্রাম চুলবে। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। যে সমস্ত নেতা ভারতীয় নিরাপত্তার আড়ালে গা বাঁচাতে চান তাদের সংগ্রামী ফ্রন্টে জোর করে ঠেলে না দিয়ে এখানে যা কিছু করা দরকার তাই করুন। যারা লজ্জতে চান

নকল মুজিবর সি পি আই ভাষীদের বিপদে ফেলেছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বাংলার নকল মুজিবর তাঁর স্থানীয় মালিকদের নির্দেশে দিল্লীর দরবারে একটি আরজি পেশ করে তাঁর প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু মুন্সিকলে ফেলেছেন তাঁর সি পি আই ভাষাদের।

“পশ্চিম বাংলাকে বাঁচাও”—এই আওয়াজ তুলে তিনি কেন্দ্রের কাছে একটা করুণ আবেদন করেছেন যে এই রাজ্যের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার যেন তাঁদের রচিত একচেটিয়া মূলধন সম্প্রসারণের উপর বিধিনিষেধটি আপাতত স্থগিত রাখেন।

মন্ত্রীদের বাড়ী মিলছে না

তুতরাং মেজাজ খারাপ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কী ভীষণ বিপদ! মন্ত্রীদের জন্য এখনও বাড়ী পাওয়া যায় নি। রাজভবনে মন্ত্রীদের জন্য যে বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে তার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করা যাচ্ছে না। মাত্র আটটি ফ্ল্যাট ওখানে আছে। অথচ যুক্তফ্রন্ট আমলে বেশীর ভাগ ফ্ল্যাটই খালি ছিল। কেননা কোন মন্ত্রীই রাজভবনে যেতে রাজী হন নি। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রীদের নাকি কারুরই রাজভবনের ফ্ল্যাটে যাওয়ার আপত্তি নেই। তাই কাকে রেখে কাকে দেওয়া হবে এই হল সমস্যা।

বর্তমানে মন্ত্রী সংখ্যা পঁচিশ। মন্ত্রিসভার কলেবর অরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথায় মন্ত্রীদের জন্য বাড়ী পাওয়া যায় সেই নিয়ে সরকারী মহল খুবই উদ্বেগ্ন। এদিকে নাকি মন্ত্রীরা বাড়ী পাচ্ছেন না বলে মেজাজ খারাপ করতে শুরু করেছেন।

তিনি নাকি জানিয়েছেন, বড় বড় মালিকদের অন্তত তিরিশটি নতুন শিল্পোদ্যোগের সম্প্রসারণ সম্ভব হতে পারছেন। এই বিধিনিষেধের জন্য।

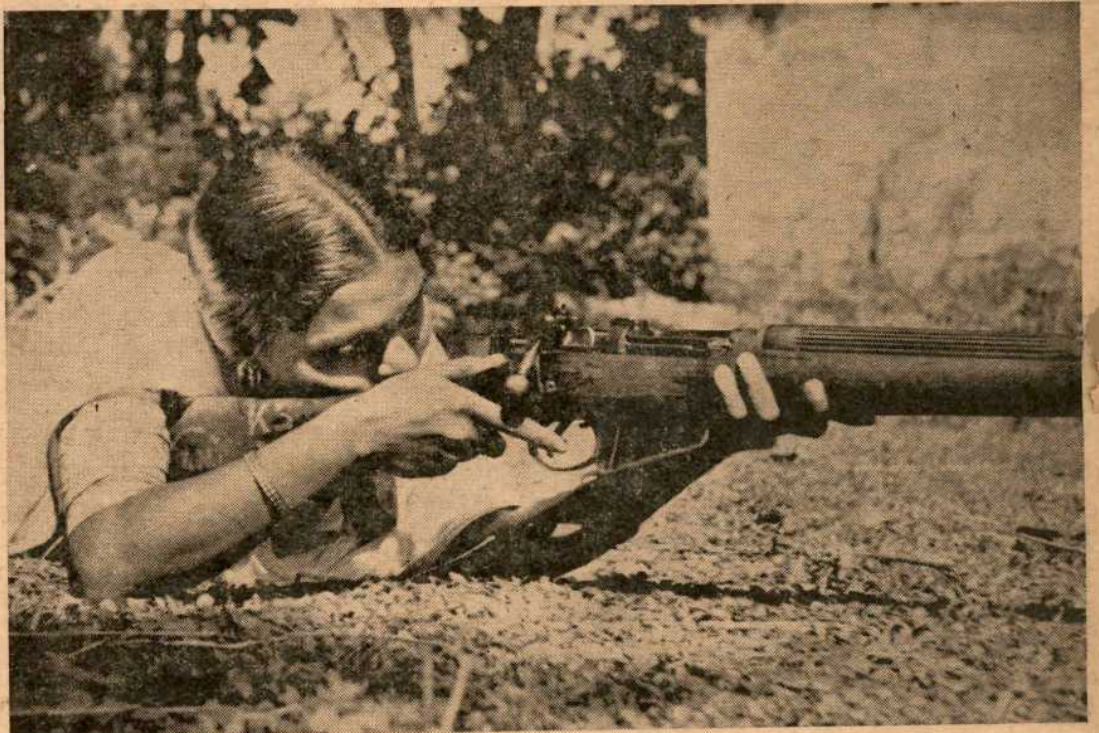
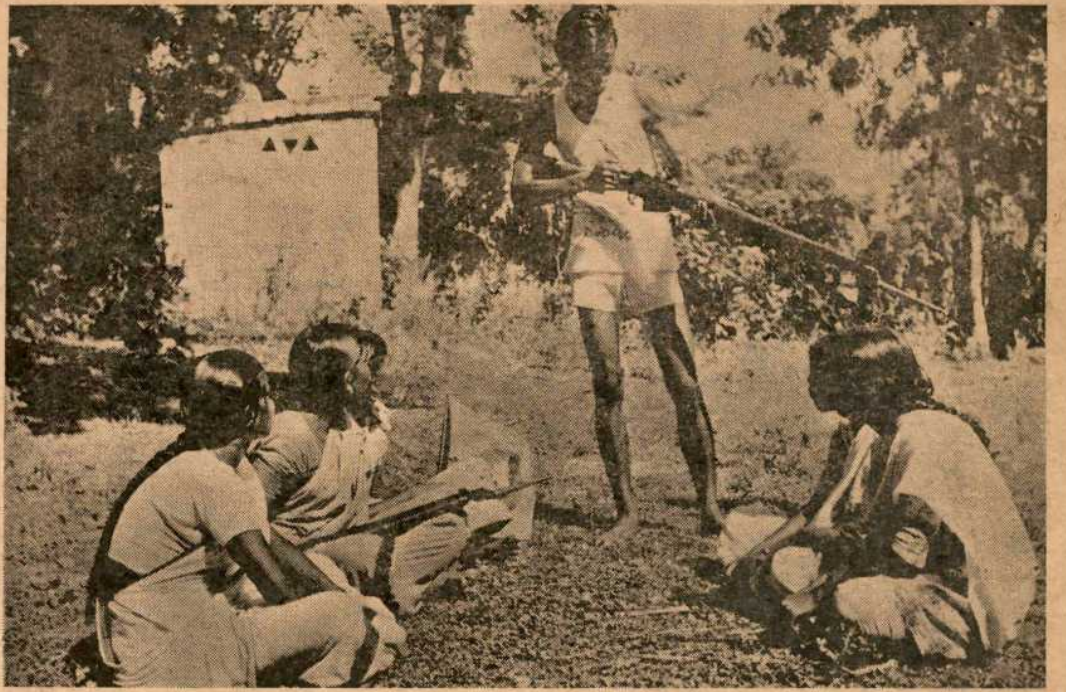
নির্বাচনের ঠিক আগেই দিল্লীর এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীবি এম বিড়লা নকশালপন্থী হয়ে যাওয়ার সিদ্ধি প্রকাশ করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন যে কেন্দ্রের “অসহযোগিতার” জন্য পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্পের বিকাশ হতে পারছে না। বাঙালী যুবকদের বেকারীর অবসানের জন্য তিনি সোঁদীন দরদ দেখিয়েছিলেন অনেক।

কেন্দ্রীয় সরকার এই বিধিনিষেধের বিষয়ে “উদারতা” দেখালে ক’রা যে বেশী লাভবান হবে সেটা অনুমান করা মুশ্কিল নয় নিশ্চয়।

কিন্তু নব কংগ্রেসের “প্রগতি-শীল”দের সঙ্গে ঘরকন্না করার নীতি গ্রহণ করার পর সি পি আইয়ের পশ্চিমবঙ্গ শাখা এই ব্যাপারে একটু বে-কায়দায় পড়েছে।

সবই কেন্দ্রীয় সরকার করছে, আমরা কি করব—এই কথা বলে এড়িয়ে যাওয়া সহজ হবেনা। কারণ তাঁরা বিড়লার দালাল বলে তাঁদের প্রতিপক্ষকে অনেক কিছুই বলেছেন প্রকাশ্যে, গোপনে তাঁদের নেতারা

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)



লোকায়ণ প্রযোজিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

মালিনী

দশই মে মজাঙ্গনে
ষোলই মে মহাজাতি সদনে
[রবীন্দ্র মেলা]
উনিশে মে রবীন্দ্র সদনে

লোকায়ণ ঠিকানা :

১৪ই মহিম হালদার স্ট্রিট
কলকাতা-২৬

সবচেয়ে উপরে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র কুণ্ঠিয়াতে কয়েকজন ছাত্রীকে রাইফেল ছোঁড়া দেখাচ্ছেন। মাঝে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রী রাইফেল ছোঁড়া অভ্যাস করছেন। এই ছবি দুটি তুলেছেন প্রণব মুখার্জী। নীচে ডানদিকে বাংলা দেশ থেকে আগত জনৈক বৃদ্ধা উদ্ভাস্তু। এই ছবিটি তুলেছেন নিখিল ভট্টাচার্য। গত সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প'ক সৈন্যের গুলিতে নিহত রিক্সাচালক ও আরোহীর ছবিটি তুলেছেন অমিয় তরফদার।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

দপ্পন

হেমন্ত বসুর হত্যা নিয়ে গোয়েন্দা
পুলিশের তদন্তে উদঘাটিত তথ্য

(দপ্পনের সংবাদদাতা)

সর্বজনপ্রিয় হেমন্তবসুর হত্যা নিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক ও নব কংগ্রেসীরা কি ঘণ্য রাজনীতি করার চেষ্টা করেছিল তার প্রমাণ্য বিবরণ দপ্পন সংগ্রহ করেছে। ফরোয়ার্ড ব্লক ও নব কংগ্রেসীরা চেয়েছিল ঘটনা সম্পর্কে ধৃত প্রবাল দেবকে খুনের মামলায় জড়িয়ে দেবে। কেননা প্রবাল দেব সি পি এম নেতা রথীন দেবের আত্মীয়। এটা হলে হেমন্ত বসুর খুনের ঘটনায় সি পি এমকে জড়ানো যাবে। কলকাতা পুলিশও

ওদের খুঁশি করার জন্যে প্রবাল দেবকে জড়ানোর জন্যে প্রচুর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা দপ্পরের তদন্তকারী অফিসাররা এতবড় মিথ্যে মামলা সাজানোর দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। কেননা, এই হত্যার মামলা হাইকোর্ট সেসনে যাবে এবং সেখানে দারুণ কশাঘাতের সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু কেন গোয়েন্দা দপ্পর প্রবাল দেবকে জড়তে পারলেন না তার প্রমাণ্য কাহিনী বলছি।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

উপনির্বাচনে সি পি এম-বিরোধীদের স্বার্থে পাড়ার মাস্তানদের ছাড়া হচ্ছে

(দপ্পনের সংবাদদাতা)

নতুন পুলিশ কমিশনার আর এন চ্যাটার্জী এবং অই জি পি কে বসু সরকারী আদেশে পাড়ার মাস্তানদের ছাড়তে শুরুর করেছেন।

উত্তর কলকাতা এবং দমদম এলাকার মাস্তানরা যারা কিছুদিন ধরে হিংসাবিরোধী আইন অনুসারে আটক ছিল তারা মুক্ত হয়ে পাড়ার ফিরে এসেছে। এখন তাদের তাগদ বেশি। তারা জানে পুলিশ এবং সরকার তাদের পেছনে।

এ সমস্তই ঘটছে চারটে উপনির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে। প্রায় সব রাজনৈতিক দল একবাক্যে এই উপনির্বাচনে সি পি এমকে হারাবার সংকল্পে। এই সংকল্প কেবলমাত্র সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপার নয়। সি পি এমের পরাজয় সি পি এম

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বাংলা দেশে গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। ছবি : অমিয় তরফদার

ক্ষুশীল ধাড়ার বিতাড়ন আসন্ন

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

খ্রীস্টদেবী ধাড়া বাংলা কংগ্রেস দলের সভাপতি পদ থেকে অজয়-বাবুকে সরিয়ে ডাঃ ভূপাল বসুকে বসাবার চক্রান্ত শুরুর করেছেন। সেই সঙ্গে দল থেকে বিতাড়ন নিশ্চিত জেনে খ্রীস্টদেবী ধাড়া বাংলা কংগ্রেস দপ্পর থেকে কাগজপত্র টাকা পয়সা সরিয়ে ফেলতে শুরুর করেছেন। বাংলা কংগ্রেস দপ্পরে সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত এক-

জন কর্মী কয়েক দিন পূর্বে তমলুক চলে গেছেন। সঙ্গে নিয়ে গেছেন ষাট হাজার টাকা। সেই টাকা দিয়ে সেই কর্মী পানের ব্যবসা শুরুর করেছেন সুতাহাটা মহিষাদলে। অপর একজন কর্মী যার সঙ্গে খ্রীধাড়ার আত্মীয়তা আছে তিনি ইতিমধ্যে দুইবার দুই ট্রাক কাগজপত্র ফাইল বসন্ত বোস রোডের অফিস শেখ অন্তর

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বিজয় নাহারের পুত্র অন্যান্যদের টপকে দ্রুত স্কুটার পেয়ে যাচ্ছে

(দপ্পনের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসী উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেই ছেলের স্কুটার সমস্যার সমাধানে রতী হয়েছেন। স্কুটার পেতে হলে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। হাজার হাজার আবেদনকারী অপেক্ষা করছেন। এই ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে পারে রাজ্য সরকারের ট্রান্সপোর্ট দপ্পর। তাই বিজয় সিং নাহার স্বহস্তে ছেলের স্কুটার পাবার আবেদনকে অগ্রাধিকার দেবার জন্যে সুপারিশ করেছেন।

বিজয় নাহার কর্তৃক লোক বলেই পরিচিত। তাই কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে ছেলের দর-খাস্তের ওপর লিখেছেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্যে (ডু দি নীড ফর)। ছেলেও ঝগড়া। যাতে ট্রান্সপোর্ট দপ্পরের কোনো অসুবিধে না হয় সেজন্যে 'নাহার হাউসের' প্যাডে স্কুটার পাবার দর-

(শেষাংশ ১ পৃষ্ঠায়)

উপনির্বাচনে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করা হচ্ছে না

(দপ্পনের সংবাদদাতা)

আগামী ছয়ই জুন পশ্চিম বাংলায় যে চারটি উপনির্বাচন হবে, তা পরিচালনা করবার জন্য নীচু তলার সরকারী কর্মচারীদের (অর্থঃ নন-

গেজেটেড) নির্বাচনী কাজে নিয়োগ করা হবে না বলে নির্বাচনী অফিসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রায় চার শত পোলিং বৃথের

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সি পি আইয়ের বিপদ

(দপ্পনের সংবাদদাতা)

সি পি আই কী বিপদেই না পড়েছে! আগামী সতেরই মে এই পার্টি বিধান সভায় কী করবে তা হয়ত সকলেই দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবে।

সতেরই মে বে-সরকারী প্রস্তাব নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে। সি পি এম এই প্রস্তাবের মাধ্যমে সি অর পি মিলিটারি আর একশত চারাল্লিশ ধারা তুলে নেওয়ার জন্য দাবী জানাবে।

সি পি আই নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে সি পি এমের সঙ্গে একমত, কিন্তু ভোটভূমির সময় যদি সি পি আই এই প্রস্তাবের অনু-

কুলে ভোট দেয় তা হলে কিন্তু বে-সরকারী প্রস্তাব ভোটে জিতবে তার মানে সরকারী পক্ষের পরাজয়। কিন্তু তার মানে এই নয় তার ফলে সরকার যাবে। কেননা বে-সরকারী প্রস্তাবে সরকার হেরে গেলেও পদত্যাগ করতে বাধ্য নয়। তা হলেও সরকারের নীতিগতভাবে পরাজয়ে কোন সরকারই খুশী হতে পারে না।

সি পি এম এ ব্যাপার সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। কিন্তু সি পি আইকে আরও একটু লোকচক্ষে হেনস্থা করবার জন্য উৎসুক। দেখা যাক এখন সি পি আই কী করে।

হাওড়ার জেলা জজের যথেষ্টাচার

(দপ্পনের সংবাদদাতা)

হাওড়ার জেলা জজ শ্রীজি বি ঘোষের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উঠেছে। প্রথমতঃ কর্মচারীদের বদলীর ব্যাপারে তিনি যথেষ্টাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন নিয়মকানুনের পরোয়ানা না করে জজ সাহেব কউকে তিন চারবার বদলী করছেন আর যাদের তিনি পছন্দ করেন, অর্থঃ পেটোয়া ব্যক্তিদের তাদের খুশিমত জায়গায় রেখে দিচ্ছেন। এই ব্যাপারে একটি

জবলন্ত উদাহরণ হলেন শ্রীকালী-প্রসাদ বসু, যিনি কপিং ডিপার্ট-মেন্টের হেড কমপোজিট ক্রাক। তাঁকে এক বছর মাত্র অন্তর বদলী করা হয়েছিল। তিনি আবার প্রাক্তন জায়গায় ফিরে এসেছেন, যেখানে তাঁর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে।

নতুন নিয়োগের ব্যাপারে জজ সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও গুরুতর। তিনি সমস্ত নিয়মকানুন

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

হেমন্ত বসুর হত্যা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

(এক) তদন্তে দেখা গিয়েছে প্রবাল দেব কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। ও হচ্ছে “খায় দায় তাস খেলে” শ্রেণীর ছেলে। সি পি এম বা কংগ্রেস কোনো রাজনীতির সঙ্গেই ও যুক্ত নয়।

(দুই) প্রবাল দেব সি পি এম নেতা রথীন দেবের যেমন আত্মীয় তেমনি নব কংগ্রেসী চীফ হুইপ প্রফুল্লকান্তি ঘোষেরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ওখান থেকেও ওকে মুক্ত করার চাপ আসছিল।

(তিন) গোয়েন্দা পুলিশ এই খবরের ঘটনায় যে সাক্ষীদের পেয়েছেন তাদের দিয়ে একটা সনাক্তকরণ প্যারেড (অইডেনটিটি প্যারেড) করান। কিন্তু একজন সাক্ষীও প্রবাল দেবকে সনাক্ত করেন নি।

(চার) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সাক্ষ্য এসেছে কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্বর্গীয় রূপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ীর মহিলাদের কাছ থেকে। এই মহিলারা পুলিশকে বলেছেন, খবরের ঘটনার সময় প্রবাল দেব ওদের বাড়ীতে বসে তাস খেলছিলেন। এতবড় অভিজাত পরিবারের মহিলাদের বিবৃতি স্বভাবতই পুলিশ অবিশ্বাস করতে পারেনি।

(পাঁচ) প্রবাল দেবের বিরুদ্ধে একমাত্র বক্তব্য পুর্নালিশ কুরুর তাকে সনাক্ত করেছিল। কিন্তু ব্যাংক

গোয়েন্দারা জানেন, এই সনাক্তকরণ আদালতে গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া শহরের নবদুর্গে পুর্নালিশ কুরুর তার নিশানা হারিয়ে ফেলতে পারে। এই অবস্থায় কায়দা করে ট্রেনার কুরুরকে খুশিমত জায়গায় ভিড়িয়ে দিতে পারে।

(ছয়) খবরের ঘটনার পরেই উত্তর কলকাতা পুলিশ এবং পরে গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পেরেছিলেন, তথাকথিত নকশালপন্থীরা এতে জড়িত। ওরা প্রাথমিক তদন্তেই বলেছিলেন, এলাকাটি নকশাল এবং গলায় ছুরিকাঘাত করা হচ্ছে নকশালী আক্রমণের কায়দা। তাছাড়া নির্বাচন প্রার্থীদের গলাকাটা হবে বলে প্রকাশ্যেই পোষ্টার লাগানো হচ্ছিল। কিন্তু হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় এবং অশোক ঘোষের বিবৃতিতে বলা হয়, সি পি এম খবর করেছে। তারপর পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তের একটা ধোঁয়াটে বিবৃতিতে রাজনীতি আরও দানা বাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লক এবং নব কংগ্রেসীরা প্রচণ্ডভাবে সি পি এমের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকে। এর প্রতিফলন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত খবরের তদন্ত একরকম স্থগিত হয়।

(সাত) নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর গোয়েন্দা পুলিশ আবার হেমন্ত বসুর খবরের তদন্তে হাত দেয়।

এতবড় একটা মানবের খবরের কিনারা হবে না, এই নিশ্চয়বাদ গোয়েন্দা দপ্তর মানতে রাজী নয়। তাই ধীরে ধীরে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ চলতে থাকে।

(আট) নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষী এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করার পর গোয়েন্দা পুলিশ উত্তর কলকাতার সাতজন তথাকথিত নকশালপন্থীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দিতে চায়।

(নয়) ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্ত নিজেকে বাঁচানোর জন্যে এই সাক্ষ্য প্রমাণ পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে পাঠান। তিনি পর্যালোচনা করে ঐ সাতজনের বিরুদ্ধে চার্জশীট অনুমোদন করেন এবং তখন গোয়েন্দা পুলিশ কলকাতার এডিশন্যাল চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে উপরোক্ত সাতজনের বিরুদ্ধে চার্জশীট পেশ করেন এবং জানান, ওদের এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

(দশ) উল্লেখযোগ্য, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজনে চার্জশীটে সাক্ষীদের নাম দেওয়া হয়নি। কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশ নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষী পেয়েছেন এবং পাবলিক প্রসিকিউটর তাঁদের অনুমোদনও করেছেন।

এই হচ্ছে হেমন্ত বসুর খবরের তদন্তের প্রামাণ্য বিবরণ। এখন পাঠককে অনুধাবন করতে হবে অজাতশত্রু সেই হেমন্তদার খবরের তদন্ত দাবী না করে খবর নিয়ে রাজনীতি করা অশোক ঘোষের উচিত হয়েছে কিনা?

সুশীল ধাড়ার বিতাড়ন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রেখে এসেছেন। দলের কর্মপরিষদ বা সম্পাদকমণ্ডলীর কোন রকম অনুমোদন না নিয়েই দলের মতপত্র দেশের ডাকের টাকা পরিসা আগেই তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন পরিচালক সমস্ত কর্তৃক শ্রীললিত সিংহের ছেলে শ্রীআশিস সিংহকে দেওয়া হয়েছে আর মহিলা সংগঠনের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তৃক দেওয়া হয়েছে শ্রীমতী কুমুদিনী ডাকুরাকে।

শ্রীসুশীল ধাড়া অবশ্য নিজে জেনে ফেলেছেন দল থেকে তাঁর বিদায় আসন্ন, তাই তার তৎপরতা সূর্য হুইপে দল ভাগ করে নেবার। বর্তমানে তিনি দলের সকলকে বলেছেন তিনি তো অজয়দার সঙ্গে বিরোধ মীমাংসা করতে চান, কিন্তু অজয়দা তার সঙ্গে কথাই বলেছেন না। কাজেই উনি ওর মত থাকুন আসুন আমরা দল চালাই। এই কথা বলে দলের সদস্যদের প্রণব মদ্যাজী হরিদাস মিত্রের আওতা থেকে বের করে আনবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু শ্রীধাড়ার সেই চেষ্টায় কেন ফলে হচ্ছে না, কারণ বেশীর ভাগ সদস্যই ইতিমধ্যে হাত মিলিয়ে শ্রীধাড়ার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনবার ব্যবস্থা করে

ফেলেছেন। কয়েকজন সদস্য সম্পর্কে শ্রীধাড়া শেষ মর্মেতেও আশা রাখছিলেন, কিন্তু তারাও নাকি জেনে বকে সরে পড়েছেন। যেমন শ্রীচারুমিহর সরকার। দলের প্রবীণ দুইজন সদস্য শ্রীশ্যামপদ ভট্টাচার্য ও শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ সরকার সম্পর্কে শ্রীধাড়ার বেশ আশা ছিল, কিন্তু তাঁরও বলে দিয়েছেন যে কোঠারী আর বদুবাবুর জন্য কংগ্রেস ছেড়েছি সুশীলবাবু হল বদুবাবুর বাবা।

অজয়বাবুও তাঁর মন স্থির করে ফেলেছেন। তাই গত সোমবার শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়কে জানিয়ে দিয়েছেন তোমরা যা করে যাচ্ছে, করে যাও, আমি আছি। অজয়বাবু নিজেও দলের কয়েকজন সদস্যকে ডেকে বলেছেন সুশীলকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরাতে হবে নইলে দল রাখা যাবে না।

সুশীলবাবু আর দলে থাকতে পারবেন না। পারলেও সম্পাদক থাকবেন না—এই কথা বকে বিভিন্ন জেলার কর্মীদের কলকাতা ডেকেছিলেন নানা ছতায় নিজেও গিয়েছিলেন কয়েকটি জেলায়। সবটাই বলে এসেছেন অজয়দা এখন প্রণব হরিদাসের কথায় দলকে ভেঙে

ফেলতে উঠে পড়ে লেগেছেন, আপনারা আমার পাশে দাঁড়ান।

সুশীলবাবু ঘুরে আসবার পর শ্রীপ্রণব মদ্যাজী সোমবার রাতেই চল গেছেন বিভিন্ন জেলায়। সুশীলবাবু যাদের কাছে গিয়েছিলেন প্রণববাবু তাদের কাছে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা জানাবেন। প্রণব মদ্যাজী ফিরে এলেই অজয়বাবুর কাছে তলবী সভার নোটিশ দাখিল করা হবে। তলবী সভার নোটিশে অভিযোগ অনেক থাকবে তার মধ্যে দলের কর্মকর্তাদের মতামত না নিয়ে সদস্য করার ব্যবস্থা করা, দেশের ডাক ও মহিলা সমিতির দায়িত্ব হস্তান্তর, ও টাকা পরিসা সংক্রান্ত অভিযোগ থাকবে।

সুশীলবাবু অবশ্য নতুন করে বাংলা কংগ্রেস করার কথাই চিন্তা করছেন, কারণ তলবী সভার পর দল ভাগ হয়ে যাবেই। সুশীলবাবু দল ভাগ করে অজয়বাবু হরিদাসবাবু আর প্রণববাবুকে তাড়তে চান। সুশীলবাবু তার বাংলা কংগ্রেসে সভাপতি করতে চান ডাঃ ভূপাল বসুকে। আর ডাঃ ভূপাল বসু এর প্রতিদানে সুশীল ধাড়াকে অনেক কিছুই দেবেন যার মধ্যে অন্যতম হবে বসুমতী পরি-

সন্তান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিরোধীদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করবে।

চারটি উপনির্বাচন কেন্দ্র হলঃ বর্ধমান জেলার উখরা, চম্বিশ পরগণার দমদম এবং কলকাতার শ্যামপুকের আর জোড়াবাগান।

প্রথম তিনটিতে প্রার্থীদের খবর করা হয়েছিল তখনকার মত নির্বাচন স্থগিত করার জন্য। এই পরিপন্থা অনুযায়ী বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে ক্ষেত্রু অধিকারীকেও খবর করার কথা ছিল, কিন্তু ঐ জেলার প্রশাসক সুজিত ব্যানার্জী এবং পুলিশ সুপার পাঁচগোপাল মদ্যাজী রিপোর্ট পেশ করেন যে, নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্য সি পি এম প্রার্থী বিনয় চৌধুরীকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ভাগ্যবান ক্ষেত্রু অধিকারী জীবিত রইলেন।

কিন্তু উখরা সম্পর্কে সি পি এম বিরোধীরা পরাজয় সুনিশ্চিত ধরে নিয়েছিলেন। এর ফলে নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেওদত্ত মণ্ডল খবর হলেন। বলা হল ওটা নকশালী হত্যা।

ঐ একই ঘটনা দমদমে সি পি এম বিরোধীরাও স্বীকার করে কেন মতেই নির্বাচনে তখন সি পি এম প্রার্থী তরুণ সেনগুপ্তকে হারানো যেত না। তাই নির্বাচন স্থগিত রাখা প্রয়োজন। এবং স্থগিত রাখা যায় প্রার্থী খবর করে। এই প্রয়োজনে সংগঠন কংগ্রেসের পীযুষ ঘোষও নিহত হলেন।

শ্যামপুকের প্রাথমিক হেমন্ত বসু অবশ্য নিহত হয়ে দুটি উদ্দেশ্য সফল করলেন। প্রথম নির্বাচন স্থগিত আর দ্বিতীয় হত্যার দায় সি পি এমের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রচারের সুবিধা করে দিলেন।

আর জোড়াবাগানের নির্বাচিত প্রার্থী নেপাল রায় নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লেন। লেনদেনের ব্যাপারে গুডগেলে নেপালবাবুর নিজের লোকেরাই ওকে খতম করেছে বলে পুলিশের অভিযোগ।

হিংসার বিরোধী আইনে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মুক্তির প্রশ্নই কলকাতার পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তকে যেতে হয়েছে বলে এখন শোনা যাচ্ছে।

সি পি এম এ ব্যাপারে অবশ্যই চূপ করে বসে নেই। এবারের নির্বাচনী সংগ্রামে চারটি কেন্দ্রেই আদর পড়নো প্রার্থী। সি পি এম মরীয়া। আক্রমণে প্রত্যাক্রমণ হবে।

কার পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম করা। দুইপক্ষের প্রতীতি চলছে। এই মাসের শেষ সপ্তাহে এই শক্তি পরীক্ষার শেষ হবে।

নিয়োগ করা হচ্ছে না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জন্য দুই হাজার গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। পশ্চিম বাংলা সরকারের একটা বস্ত্রমূল ধারণা হয়ে গেছে যে সাধারণ কর্মচারীরা সকলেই সি পি এমপন্থী, সুতরাং ভোট গ্রহণ করার সময় নানা রকম কারচুপি হয়ে থাকে বলে তাদের দৃঢ় ধারণা। এদিকে চারটি উপনির্বাচনের মধ্যে তিনটিতে সি পি এমের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন ফ্রন্ট সরকারি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এই তিনটি উপনির্বাচন হচ্ছে উখরা, (বর্ধমান জেলায়), জোড়াবাগান ও শ্যামপুকের এলাকায়। প্রথম দুটিতে থাকছে কংগ্রেস (শাসক) প্রার্থী। আর শ্যামপুকের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীঅজিত বিশ্বাসকে।

কিন্তু গুডগেলে লেগেছে দমদম নির্বাচনী কেন্দ্রে। নিজলিঙ্গাপা কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ইতিমধ্যে শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শাসক কংগ্রেসকে কোন প্রার্থী দেওয়া থেকে বিরত করেছেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ সি পি এম গোষ্ঠী তাকে সন্তুষ্ট নন। তাদের দলের নেতা শ্রীবিদ্যুৎ বোস দাবী তুলেছেন যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন ফ্রন্টের তাঁর প্রার্থী পদ সমর্থন করা উচিত। ইতিমধ্যে কোয়ালিশন ফ্রন্টের দুটি সভা হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুই স্থিতিশীল হয় নি। নিজলিঙ্গাপা কংগ্রেসের দাবী হল যে তাদের সংস্থাও বর্তমানে কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার। তাছাড়া, গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাদের প্রার্থী এই কেন্দ্রে খবর হওয়ার জন্য নির্বাচন হয় নি। সুতরাং যদি শ্যামপুকের কেন্দ্রে ফরোয়ার্ড ব্লক পায় তাহলে দমদম কেন্দ্রেও তাদের প্রাপ্য।

শাসক কংগ্রেস এই দমদমের উপনির্বাচনে খুব আগ্রহী নয়। কেননা এই এলাকা সি পি এমের শক্ত ঘাঁটি। সুতরাং তাদের পক্ষে এই কেন্দ্রে জয়ী হওয়া মেটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত স্থিতিশীল যাই হউক না কেন, শাসক কংগ্রেস যে এই কেন্দ্রে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবে না তা একেবারে সুনিশ্চিত হয়ে গেছে।

জজের যথেষ্টাচার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের এবং পেটোয়া লোকদের আত্মীয়স্বজনদের চাকরী দিচ্ছেন। এমন কি প্রয়োজনীয় যোগ্যতারও ধার ধরেন না। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছি। আগামী সংখ্যায় তা প্রকাশ করা হবে।

জজ সাহেবের যথেষ্টাচারের বিরুদ্ধে ওখানকার কর্মচারী ইউনিয়ন সংগ্রামে নেমেছেন। প্রতিদিন তাঁরা টিফনের সময় বিক্ষোভ জানাচ্ছেন।

(विशेष प्रतिनिधि)

(विशेष प्रतिनिधि)

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

রাজসরকার গত পয়লা এপ্রিল
এক সুপারিশ পত্রে ন্যাশনাল ইন-
স্ট্রুমেন্ট-এর কর্তৃপক্ষকে ক্যান্টিনের
নিযুক্ত কর্মীদের কেন্দ্রীয় পে-কমি-
শনের ভিত্তিতে বেতন কাঠামো
পুনর্নির্ধারণ করার অনুরোধ
জানান। কিন্তু সংস্থার কর্তৃপক্ষের
অনমনীয় স্বেচ্ছের ফলে কর্মীদের
দাবীদাওয়াট এখনও অমীমাংসিত
রয়েছে। ক্যান্টিন কর্মীদের দাবীকে
প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ইউনিয়-
নের কার্যকলাপকে অনেকেই সন্দে-
হের চোখে দেখছেন। যদিও ইউ-
নিয়ন এ অভিযোগ অস্বীকার
করেন। অত্যন্ত কর্মচারীদের অনে-
কেই বলেন, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও
ব্যক্তিগত আক্রোশ স্থগিত রেখে
ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও ন্যাশনাল
ইনস্ট্রুমেন্টের বিরাট সংখ্যক কর্ম-
চারী রাজ্য সরকারের সুপারিশ
মেনে নিতে কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তরকে
বাধ্য করুন।

বাংলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম প্রসঙ্গে

(রাজনৈতিক পর্ষবেষক)

একথা আজ স্পষ্ট যে বাংলা দেশের অগণিত মৃত্যুকামী মানু-
ষের সামনে যে প্রশ্ন ইতিহাস তুলে
ধরেছে, তার উপযুক্ত জবাব দেবার
ওপরেই বাংলা দেশের ভাগ্য নির্ভর
করছে।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ হয়তো
খেঁচছিলেন নির্বাচনে বিপুল
জয়লাভের পর তাঁরা জয়দফা দাবীর
ভিত্তিতে পাকিস্থানে শাসনক্ষমতা
লাভ করতে সক্ষম হবেন। পূর্ব-
বঙ্গের সাধারণ মানুুষের বিপুল
সমর্থন তাঁদের ভরসা জুগিয়েছিল
যে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি-
শ্রুতি পালন করে ক্ষমতা হস্তান্তর
করবে।

তাঁরা সামাজিক আর্থ ব্যবস্থার
মালিক শাসকশ্রেণীকে ছুল-বুকে-
ছিলেন। কোনো শাসকশ্রেণীই
স্বৈচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে না।
নির্বাচনের ফলে তাদের শাসন-
ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকলেই তারা গণ-
তন্ত্রের জয়ধ্বনি দেয়, অন্যরকম
হলে সংসদীয় নির্বাচনকেই বাতিল
করে, গণতন্ত্র ধ্বংস করেও নিজেদের
শাসন ক্ষমতা বজায় রাখে। এটাই
সর্বদেয়ে সর্বকালের ইতিহাসলব্ধ
অভিজ্ঞতা।

এই অভিজ্ঞতা মনে না
থাকলে, কোনো জাতীয় মুক্তি
সংগ্রাম অথবা বিপ্লবী সংগ্রাম
সাফল্য লাভ করতে পারে না।

পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুুষ
পশ্চিম পাকিস্থানের সাধারণ মানুুষ
সামরিক শাসক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে
একাব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াতে পারেন নি।
অথচ পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম পাকি-
স্থানের সাধারণ মানুুষের সাধারণ
শত্রুই একচোঁটরা পুঁজি-সামন্ত-
শ্রেণীর সামরিক শাসন। এটা হল
বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রথম
দুর্বলতা।

আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রধান
দুর্বলতা হল বাঙালী জনসাধা-
রণের পশ্চিম পাকিস্থানী শোষক-
দের প্রতি ঘৃণাকে সংগঠিত প্রতি-
রোধের পথে চালাবার অক্ষমতা।
বরং এই প্রতিরোধকে স্বতঃস্ফূর্ত
ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হতে

দিয়ে, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ
নিশ্চিত পরাজয়ের মধ্যে তাকে
ঠেলে দিয়েছেন।

আজ এই দুর্বলতাকে কাটাতে
হলে, প্রতিরোধ সংগঠিত করতে
হলে কাগজে সরকার গঠনের
চাইতেও বাংলা দেশের অভ্যন্তরে
সমস্ত দল, শ্রেণী সংগঠনকে নিয়ে
একাব্যবস্থা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন
করা অনেক বেশী প্রয়োজন।

ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহি-
নীর আঘাতে প্রথম পরাজয়ের মধ্যে
বাংলা দেশের অসংখ্য প্রতিরোধ
সংগ্রামী সম্ভবতঃ বিহীন, বিচ্যুত
হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে
পারেন। বিশেষ করে স্থানীয় নেতৃ-
বৃন্দের অন্তর্ধান এই বিহীনতাকে
পজারনমুখী করে তুলতে পারে।

এই হতাশা বিহীনতাকে কাটা-
বার জন্য যদি এখন সাংগঠনিক
ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তা হলে
দীর্ঘকালের জন্যে বাংলাদেশ
আন্দোলনকে পিছিয়ে পড়তে হবে।

সংকট যত তীব্র হয়, সুবো-
গের অজ্ঞান স্ফারণ তখন খুলে
যায়। নিরস্ত জনসাধারণ প্রতিরো-
ধের সংগঠনে উদ্বুদ্ধ হলে শত্রু-
সৈন্যের অস্থিরতা তাদের করতলগত
হতে বাধ্য।

যে কোন ধরনের যুদ্ধে শত্রু-
সৈন্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ
করা প্রাথমিক প্রয়োজন। শত্রু
শত্রু সৈন্যদল সম্পর্কে জান টাই
খঁচেও নষ্ট। শত্রু সৈন্যের সংখ্যা,
অবস্থান, অস্ত্রশস্ত্রের ধরণ, সরব-
রাহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, মনোবল
সম্পর্কেও প্রতিরোধবাহিনীর পরি-
ষ্কার ধারণ থাকা প্রয়োজন।
সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সমগ্র অব-
স্থাও খতিয়ে দেখতে হবে, কারণ
শত্রুসৈন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার
না করতে পারলে জয়লাভ করা
অসম্ভব। শত্রুকে ভালো করে জানা
এটা হচ্ছে জয়লাভের প্রথম শর্ত।
শত্রুর শক্তির চেয়েও অতিরিক্ত শক্তি
সমাবেশ না করতে পারলে জয়লাভ
করা যায় না।

এই কাজ করতে হলে শত্রু পক্ষকে
এড়িয়ে গিয়ে দূর থেকে করা সম্ভব
নয়। শত্রু যখন অস্ত্রবলে, সংগ-
ঠন বলে শ্রেষ্ঠ, তখন তার সঙ্গে
মুখোমুখি লড়াই করতে গেলে
বীর্য দেখানো সম্ভব হলেও
বিজয়ী হওয়া যায় না। কাজেই
অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিরোধ
সংগ্রামী কি করবেন? তারা
গেরিলা যুদ্ধের, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের
কৌশল গ্রহণ করবেন। সংখ্যা ও
অস্ত্রবলে বলীয়ান শত্রুদের সঙ্গে
অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুক্তি যোদ্ধাদের
একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের
সফল্যজনক পরিণতিতেই শেষ
পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব।

একজন ব্যক্তি যত বলশালীই
হউক, তার আঙ্গুল, চোখ, নাক,
কান, পায়ে প্যাঁতা এগুলি সমগ্র
দেহের তুলনায় দুর্বল। প্রথমে যদি

তার হাতের আঙ্গুল, পায়ে প্যাঁতা
এবং চোখকে আক্রমণ করা যায়,
তাহলে তার বাহুবল, পেশীশক্তি
কোন কাজেই লাগে না। সতরাং
শত্রুকে ভালো করে জানার অর্থ
শত্রুর সমস্ত দুর্বলতাকে খুঁটিয়ে
পর্যবেক্ষণ করা। কোথায় আঘাত
করতে বেশী জোর লাগে না, অথচ
শত্রু দুর্বল হয়, তা খুঁজে বের
করা।

স্বভাবতঃই একাজ বিরাট
দল বেঁধে করা যায় না। তাই
প্রাথমিকভাবে বাংলা দেশের মুক্তি-
যোদ্ধাদের তিন অথবা পাঁচজনের
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত
করতে হবে। এদের মধ্যে একজন
রাজনৈতিক শিক্ষক এবং অন্ততঃ
দুজন যোগাযোগ ও আক্রমণের
দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। এভাবে
এই ক্ষুদ্র দলটী অবাধে গ্রামে
গ্রামে প্রায় অলক্ষিত ভাবে ঘুরে
বেড়াতে পারবেন এবং গ্রামের কৃষক-
দের মধ্যে প্রচার ও সংগঠন গড়ে
তুলবেন। অস্ত্রচালনা, সরঞ্জাম
ব্যবহার, প্রাথমিক চিকিৎসা, ও
রাজনৈতিক শিক্ষার এই দলের
প্রতিটী মুক্তিযোদ্ধাকে শিক্ষিত
করে তুলতে হবে।

প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা
গ্রাম থেকে সহরে, সহর থেকে
গ্রামান্তরে সংবাদ আদান প্রদান ও
যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন।
এটাই দীর্ঘকালব্যাপী ধৈর্য ও
সহনশীলতার পরীক্ষা।

এরকম অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল
মানবদেহের অসংখ্য কোষের মত
সারা দেশে ছড়িয়ে থাকবেন। শত্রু-
পক্ষের সৈন্যদলকে ভুলিয়ে বিপক্ষে
পরিচালনা, বিচ্ছিন্ন শত্রু সৈন্যকে
ঘিরে ধ্বংস করা, যোগাযোগ ব্যবস্থা
সেঁচু, ডাকঘর পুঁড়িয়ে দেওয়া, খাদ্য
ও ঔষধ সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল
করে দেওয়া এসবই এই গেরিলা-
বাহিনীগুলির প্রাথমিক দায়িত্ব।

গেরিলা বাহিনীকে সাধারণ
মানুষের কাছে প্রিয় হতে হবে,
নতুন সদস্য ব্যবহার করে তাঁদের
বিপদে আগদে পাশে দাঁড়িয়ে
তাঁদের চিন্তাজন করতে হবে। সব
রকম ঐশ্বর্যতা, সবজ্ঞাতা, হুকুম-
জারী করার মনোভাব এড়িয়ে চলতে
হবে। কারণ গেরিলা দলের এক-
মাত্র আগ্রহ ও প্রেরণার উৎস সাধা-
রণ জনগণ। সাহসী অথচ নম্র,
দৃঢ় অথচ বিনয়ী, ক্ষিপ্ত অথচ
নিশ্চল মূর্তির মত পড়ে থাকার
অভ্যাস জন্মের প্রত্যেককে শিখে
নিতে হবে।

এই গেরিলাদল কোন গ্রামে
জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে
সক্ষম হলেই সেখানে ছাঁটি তৈরী
করতে হবে। অত্যাচারী, জমিদার
গ্রামীণ শোষকদের নিশ্চিহ্ন করে
গ্রামীণ জনতার হাতে গ্রামের ফস-
লের জমি, গেমচরণের মাঠ, পুকুর
প্রভৃতি তুলে দিতে হবে এবং সাহসী
জগী ভূমিহীন কৃষকদের জোরান

সন্তানদের মুক্তি ফ্রন্টে এবং শেষ
পর্যন্ত সক্রিয় গেরিলাদলের অস্ত্র-
ভূক্ত করতে হবে।

গেরিলা যুদ্ধের মূলনীতি
শত্রুর দুর্বলস্থানে আঘাত করা,
শত্রুর আক্রমণের মোকাবেলা না করে
তার চেতন ধুলো দিয়ে এড়িয়ে
যাওয়া। বিশ্রামরত শত্রুকে ব্যতি-
ব্যস্ত করে তোলা। এই কাজে
সাধারণ মানুুষের প্রকৃতিদত্ত
সৃজনী প্রতিভাকে বিকশিত করা।
মূলনীতি হল, শত্রু যখন আক্রমণ
করে গেরিলাযোদ্ধারা তখন অস্ব-
গোপন করেন, শত্রু যখন বিশ্রাম
করে, গেরিলা যোদ্ধা তখন তাকে
ব্যতিব্যস্ত করে তুলেন, শত্রু যখন
পালিয়ে যায়, তাঁরা তখন তার
পশ্চাৎদিক করেন।

বাংলা দেশের বিরাট সংখ্যক
জনসাধারণ ভোট দিয়ে সমর্থন
জানালেও, সাধারণ দাবীকে রাজ-
নৈতিক সংগঠনের মধ্যে রূপায়িত
করা হয় নি বলে, প্রাথমিক পর্যায়ে
শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রবল জরী হয়েছে।
সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বভাবতঃই এই
প্রাথমিক জয়কে রাজনৈতিক ভিত্তির
ওপর দাঁড় করাতে চাইবে। আর
তাঁদের রাজনীতি হলো বাংলা
দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণের
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির, ধর্মীয় জিগির
এবং পশ্চাদপদ মনোভাবকে উস-
কিয়ে তোলার রাজনীতি। এই
ধরনের রাজনৈতিক আক্রমণের
মোকাবেলা করতে হলে ব্যাপক
অর্থনৈতিক সংস্কার এবং তার
ওপর রাজনৈতিক সমর্থনকে দৃঢ়
করে তুলতে হবে।

যে ভাবেই হউক শত্রুকে মুখো-
মুখি লড়াই-এ টেনে আনার চেষ্টা
পরিহার করে, প্রথমতঃ শত্রুর
যোগাযোগ সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর
বিচ্ছিন্ন ভাবে আক্রমণ চালিয়ে
যেতে হবে।

শত্রু সৈন্য এলাকায় প্রবেশ
করার চেষ্টা করলে, তাকে এড়িয়ে
যাবার কৌশল অবলম্বন করতে
প্রস্তুত থাকতে হবে। গেরিলা
দলকে জনগণের মধ্যে ওতোপ্রোতাঃ-
ভাবে মিশে যেতে হবে। আবার
শত্রুসৈন্য বিশ্রাম করতে বসলেই
তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে হবে।
এর জন্যে দেশের ভূ-প্রকৃতি, খাল-
বিলা, নদীনালা, পাহাড় জঙ্গল
এমন কি বিষধর সাপ, জ্যেঁক
এদেরও কাজে লাগাবার উপায় অব-
লম্বন করতে হবে। এইভাবে ভূ-
প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে হলে
সাধারণ মানুুষের সীমাহীন
সৃজনী প্রতিভা ও কৌশল উদ্ভা-
বনের শক্তির ওপরই নির্ভর করতে
হবে। ভিয়েতনামের বীর গেরিলা-
দল যেভাবে শ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্র সুস-
জ্জিত মার্কিন সেনাবাহিনীকে
শেষ পর্যন্ত গুটীকর শহরে আটকে
রাখতে পেরেছে, বাংলা দেশের
গেরিলাদলেরও তা অন্দসরণ করতে
না পারার কারণ নেই।

এইভাবে বেশ কিছুদিন চলতে
পারলে সশস্ত্র শত্রু সেনাদল সহ-
রের ঘাঁটী ছেড়ে ছোট ছোট দলে
আর গ্রামে প্রবেশ করতে চাইবে না।
ইতিমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা দল

অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ হবেন, অস্ত্র
চালনার পারদর্শী হবেন, এবং
শত্রুর মারণাস্ত্র কেড়ে নিয়ে কি ভাবে
নিজেদের অস্ত্র ভান্ডার বাড়িয়ে
তোলা যায় তা শিখে নেবেন।

তখন তাঁদের ক্ষুদ্র সংগঠন
বজায় রেখেই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর
সেনাদল তৈরী করার সুযোগ
আসবে। যেমন পাঁচজনের একশ বা
পঞ্চাশটী গ্রুপকে অবস্থা বুঝে
পাঁচশ বা আড়াইশো সুসজ্জিত
শিক্ষিত সেনাদলের মধ্যে সংগঠিত
করতে হবে। বিভিন্ন এলাকায়
রাজনৈতিক ক্ষমতা দৃঢ় হবার সঙ্গে
সঙ্গে ছোট ছোট সহরের ওপর
আক্রমণ চালাতে শত্রু করতে হবে।
কিন্তু বৃহত্তর সেনাদল সংগঠনের
সময় সেনাদলের দ্রুত চলাচলের
শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে।

এই ভাবে কয়েক বছর চললে
দুটী প্রধান সুযোগ মুক্তি সংগ্রামী-
দের করায়ত্ত হবে। প্রথমতঃ দীর্ঘ-
স্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রামের ফলে
শহরভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
অচল হয়ে পড়বে। সামরিক সর-
কারের আর্থিক ভিত্তি নড়ে উঠবে।
আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর অস্ত্র-
শস্ত্র রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা বিপ-
বস্ত হবে এবং এই দুর্বল অব-
স্থায় সুযোগ নিয়ে আরো অপেক্ষা-
কৃত বড়ো ধরনের লড়াই, বিভিন্ন
বিচ্ছিন্ন এলাকাকে মুক্তি ফ্রন্টের
কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার
সম্ভাবনা দেখা দেবে। দ্বিতীয়তঃ
পশ্চিম পাকিস্থানের সাধারণ মানু-
ষও এই রূপা আক্রমণ চালিয়ে যাবার
বিরুদ্ধে দৃঢ়ায়মান হবেন। তাঁদে-
রও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী প্রবল হয়ে
উঠবে। তাঁরাও শাসকশ্রেণীর
স্বৈরাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে
দাঁড়াবার প্রেরণা পাবেন। যেমন
ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণের
বিরুদ্ধে আজ খোদ আমেরিকার
বিপুল সংখ্যক জনগণ সক্রিয় হয়ে
উঠেছেন, একদিন পশ্চিম পাকি-
স্থানের সাধারণ মানুুষও এই
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে
উঠবেন।

বাংলাদেশে প্রমিত কৃষক মধ্য-
বিত্তের একাব্যবস্থা প্রতিরোধ, তবু
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার
পশ্চিম পাকিস্থানের সিম্বী, বালুচ
পাখতুন, পাঞ্জাবী কৃষক-প্রমিত
মধ্যবিত্তকে প্রভাবিত না করে পারে
না। পাকিস্থানের জাতিগুলির
সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার
চাই, এই জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে
পাকিস্থান রাষ্ট্রের সংহতি ও একা
বজায় রাখা যে সম্ভব ছিল একথা
যেদিন পশ্চিম পাকিস্থানের সাধা-
রণ মানুুষ হৃদয়ঙ্গম করবেন, সেদিন
তাঁরাও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের
সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইয়াহিয়া খানের
সামরিক সরকারের টুটি চেপে
ধরবেন।

পাকিস্থানের বাঙালী, সিম্বী,
পাঞ্জাবী, বালুচ ও পাখতুন জন-
গণের সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের
অধিকারের দাবী পাকিস্থানের
সমগ্র জনগণকে সামরিক ফ্যাসিস্ট
শাসনের বিরুদ্ধে একাব্যবস্থা সংগ্রামে
(শেখাংশ ও পৃষ্ঠাংশ)

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

২ চাঁদার হার ২

বার্ষিক পনেরো টাকা

ষাণ্মাসিক সাড়ে সাত টাকা

ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, মট লেন, কলি-১০

পূর্ববাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা

শফিকুল হাসান

বামপন্থীদের দূরবন্দ্য

স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার প্রথম থেকেই প্রত্যাশ, সংহতি, শান্তিশালী কেন্দ্র এবং সর্বোপরি ইসলামকে রক্ষার নাম করে জনগণের উপর শোষণ ও নিপীড়ন চালাতে থাকে। পূর্ব বাংলার জনগণের উপর এই শোষণ ও নিপীড়ন ছিল সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক চরিত্রের। বামপন্থী দল হিসেবে কমিউনিস্টরা যাতে এই শোষণ নিপীড়ন সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করে, তাদের শোষণ কার্যে বিষয় সৃষ্টি করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে সমস্ত কমিউনিস্ট কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বৈধতাহীন ঘোষণা করা হয় এবং মুসলীম লীগের গৃহদারের ধর্ম রক্ষার অজুহাতে কমিউনিস্ট নিধন কার্যে নিয়োগ করা হয়। এই অকথ্য অত্যাচারের ফলে কার্যতঃ স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলায় কোন সুশৃঙ্খল বামপন্থী পার্টি গড়ে উঠতে পারেনি।

শোষণের রূপ

পূর্ব বাংলা একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এর প্রায় শতকরা আশি জনই কৃষক। মুসলীম লীগের কর্মীরা রক্ষণীয় সহায়তা নিয়ে নিরীহ কৃষক সমাজকে চরম ভাবে শোষণ করতে থাকে। ফলে গড়ে ওঠে জোতদার, মহাজন, ইজারাদার, ভহশীলদার ও গ্রাম্য টাউট-বাটপাড় দালাল ও বদ মাতব্বরদের রাজত্ব। মিথ্যা মামলা, সুদ ও ঘবের দৌরাণ্ডে কৃষকরা ধীরে ধীরে তাদের চাষের জমি হারাতে থাকে এবং ভূমিহীন ও গরীব কৃষকে পরিণত হয়। এই শোষণ নিপীড়নের ফলে কৃষক তার জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুর, বেকার বা সর্বহারা শ্রমিকে পরিণত হয়। অন্যদিকে জোতদার, মহাজন, ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য এবং মুসলীম লীগ কর্মীরা তাদের গণবিরোধী কার্যকলাপ স্বরা কৃষকদের জমি ছিনিয়ে নিয়ে আরো জমির মালিক হয়। এভাবে পূর্ব বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জমির মালিকানা অকৃষকদের হাতে চলে আসে এবং তাতে তাদের যে পুঞ্জি গড়ে ওঠে সে পুঞ্জি বিনিয়োগ করে এই জোতদার মহাজন শ্রেণীই ক্রমে ক্রমে পূর্ব বাংলার উঠতি পুঞ্জিপতি-রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। এদিকে পাকিস্তানী সরকার বারোশ মাইল দূর থেকে প্রত্যাশ সংহতি-ইসলাম শক্তিশালী কেন্দ্র এবং সর্বোপরি “শিশুরাষ্ট্রের” নামে পূর্ব বাংলার এই নির্বাসিত ককালসার মেহনতী জনতার উপর পূর্ণ মাত্রায় ঔপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ চালিয়ে যেতে থাকে। এক

পর্বাণে এই শোষণের মাত্রা এত বেশী হয় যে বাহান্ন-তিংপান্ন সালে পূর্ব বাংলার জনগণকে ষোল টাকা সের দরে লবণ ও বাহান্ন টাকা মণ দরে চাউল ক্রয় করতে হয়েছে। এমতাবস্থায় পূর্ব বাংলার জনগণের উপর জোতদার মহাজন দালাল বাটপাড়দের সামন্তবাদী শোষণ, পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, পূর্ব বাংলায় ও পাকিস্তানে একচেটিয়া ও বড় পুঞ্জির শোষণ এবং সরকারী আমলা অফিসারদের শোষণগুলিই পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট স্বল্প হিসাবে বিরাজ করতে থাকে।

ভাষা আন্দোলন

শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তিকামী পূর্ব বাংলার জনগণের মনে ক্রমশ বিক্ষোভের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। জনতা তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক রাজনৈতিক ও বৈষয়িক অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হতে শুরু করেন। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এই গণবিক্ষোভ ও গণ আন্দোলনকে প্রতিহত করতে এক কলঙ্কময় ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের বন্ধ থেকে জাতি হিসাবে বাঙালীর অস্তিত্বকে মুছে দেবার এক ঘণ্য চক্রান্তের প্রথম কার্য হিসেবে দেশের ছাপান্ন ভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। সমগ্র পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতা এই গণবিরোধী অক্রমণের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তুলেন। পূর্ব বাংলার ইতিহাসে সেই আন্দোলন “৫২ সালের ভাষা আন্দোলন” নামে খ্যাত। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার আপামর জনতা, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিব ও পাবনার আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও তার দালালরা এই উত্তাল জনতার দাবীকে নস্যং করার জন্য ‘৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী এক গণমিছিলের উপর গুলি চালিয়ে অমানুষিক বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করে ভাষা আন্দোলনের বীর সেনানী শহীদ সালাম জব্বার রফিক আরো অনেককে। পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনতা সেদিন পিশাচদের হিংস্র খাবর আঘাতে দাবী ত্যাগ করেনি, বরং রক্তে রাজপথে রাঙিয়ে তারা তাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, জয় করেছিল। শোষক

ও শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়েছে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে স্বীকার করে নিতে। পূর্ব বাংলার বীর জনগণের এই বিজয় ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়—যা এসেছিল রক্তরাগা পিচ্ছিল পথ ধরে। পরবর্তীকালে দেখা গেল বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও কার্যত এর কোন মর্যাদা দেয়া হচ্ছেনা, বরং বড়লোকের আর এক ধাপ হিসেবে বাংলা অক্ষরকে আরবী বা রোমান অক্ষরে পরিবর্তিত করার অপর এক নতুন চক্রান্তে তারা লিপ্ত। জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ভাষার উপর এ ধরনের জঘন্য আক্রমণকে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করেন।

বিমাতালুভ ব্যবহার

পাকিস্তানের শাসক ও শোষক গোষ্ঠী অতঃপর পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে নানাপ্রকার বিমাতালুভ ব্যবহার শুরু করেন। সেনাবাহিনীতে, সরকারী, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরীর ক্ষেত্রে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, আমলা অফিসার বিনিয়োগ ক্ষেত্রে, শিক্ষার খাতে, স্বাস্থ্য-রক্ষার খাতে উন্নয়ন খাতে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণকে বঞ্চিত করা হয়। বিশেষ করে শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে চরম বাধার সৃষ্টি করা হয়। দ্রব্যমূল্যে দুই দেশের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রচিত হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের উপর কর ও শুল্কের বেঝা বাড়িয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রতিপালনের দায়িত্ব জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়। একচেটিয়া পুঞ্জিপতিদের আরো বড় ধনিক পুঞ্জিপতিতে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে সুপারকম্পিত ভাবে পূর্ব বাংলার সকল কুটির-শিল্পগুলিকে ধ্বংস করা হয়। ফলে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগের প্রতি গণমনে আস্থা-হীনতা জন্মে এবং মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫১ সালে “নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ” প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরে এই নাম

বদলে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ রাখা হয়।

দাঙ্গা ষড়যন্ত্র

অপর দিকে শেরে বাংলা ফজলুল হক “কৃষক শ্রমিক পার্টি” নামে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম দেন। এ সময় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টরা হাজী দীনেশ, ফজলুল করিম মণি সিং ও দেবেন শিকদারের নেতৃত্বে “গণতন্ত্রী দল” নামক একটি বামপন্থী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই তিনটি রাজনৈতিক পার্টি যুক্তফ্রন্ট নামে প্রাদেশিক পরিষদে মুসলীম লীগকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল কাসেমী স্বাধীনবাদীরা অদম্য শিল্প এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধায় এবং ৯২ (ক) ধারা জারী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। পূর্ব বাংলার গণ-রায়কে বাতিল করার জন্য তৎকালীন কুখ্যাত ইক্ষান্দার মিজা সরকার ঢাকার জনগণকে ট্যাঙ্ক ও কামান অক্রমণের আশ্রয় নিয়েছিল। পরে আপোষের মাধ্যমে শহীদ সারও-রাদীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে কেন্দ্রের দালাল সরকার হিসাবে ক্ষমতা দান করা হয়। প্রগতিশীলরা এই সব ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করে। এই ন্যাপকে কেন্দ্র করেই কমিউনিস্টরা ১৯৫৬ সালে জাতীয় আওয়ামী শহর ও গ্রামের জনগণের নিকট তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী তুলে ধরেন।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতা পাবার দীর্ঘ নয় বছর পর ১৯৫৬ সালে শোষকগোষ্ঠী একটি তথাকথিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। ইসলামের নাম করে সে শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার জনগণকে শোষণ করার বিভিন্ন কৌশলকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল মাত্র। জনগণ এই শাসনতন্ত্র তাঁর ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সারা দেশে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, চুরি ডাকাতি, সুদ ঘৃণ ও চোরা কারবারে ছেয়ে যায়। ১৯৫৯ সালে নির্বাচনের আশায় জনগণ

“শেখাংশ ওষ্ঠ পুস্তার”

বাংলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম

(চতুর্থ পুস্তার পর)

টেনে নিয়ে আসতে পারে, এ সম্ভাবনা শূন্য বস্তুত তাই নয়, একে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতেই হবে। এ সম্ভাবন র ভিত্তি ইতিপূর্বেই রচিত হয়েছে, এখন তাকে সক্রিয় প্রতিরোধ এবং ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সংগঠিত করে তুলতে হবে।

সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক প্রতিরোধ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জাতিসমূহের সঙ্গে দৃঢ় ঐক্য স্থাপন এই শ্রেণী নীতিকে রূপায়িত করেই বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামীরা পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন

করতে সক্ষম হবেন।

দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রাজনীতি ও রণনীতিকে অনুধাবন করে নমনীয় রণকৌশলের সূচক প্রয়োগ করতে সক্ষম হলে বাংলাদেশের বীর জনগণের জয় অনিবার্য, একথা শাসকশ্রেণীও বোঝে। বাংলাদেশের সংধারণ মানুষ অজ্ঞ ইতিহাসের ইজিতে যে দৃষ্টি ভার তুলে নিয়ে অজস্র শোণিত সিংগনে, অশ্রু অনশন সুযোগ সুবিধার প্রলোভন অগ্রাহ্য করে যে সফলভাবে তা পালন করবেন, এ বিশ্বাস না রাখার কোন হেতু নেই।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসিত পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রধানতঃ দুটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে জন্মেছিল। এদের মধ্যে প্রথমটি ছিল বামপন্থীদের নেতৃত্বে সর্বহারা, অর্ধ-সর্বহারা ও জাতীয় ধনিকদের সমন্বয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজিত করে স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতবর্ষ কাসেম করা। দ্বিতীয়টি হলো ভারতবর্ষের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের মৎসুদীর্ঘ ধনিক, জোতদার মহাজন ও আমলাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। স্বচ্ছ ও সঠিক রাজনৈতিক বক্তব্যের অভাবে, উপযুক্ত সংগঠন না থাকায় এবং নেতৃত্বহীনতার জন্য বামপন্থীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতবর্ষের সর্বহারা জনগণের আস্থা লাভে ব্যর্থ হয়। ফলে মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত বামপন্থীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জনগণের মাঝে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। অপরপক্ষে ভারতবর্ষের বড় ধনিক, জোতদার মহাজন, আমলা ও তার দালালশ্রেণী নিজদের মাঝে ক্ষমতা বন্টন করে নৈবার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জনগণকে ধর্মের খোলসে এই উভয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিপথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয় (অবশ্য এর জন্য উভয় দলকেই কয়েক দফা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে হয়)। স্বাধীনতা সংগ্রাম সশস্ত্র যুদ্ধের রূপ নিলে বামপন্থীদের হাতে ক্ষমতা চলে যেতে পারে এই ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শোষকরা আপোষের পথে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভারতবর্ষকে পাকিস্থান এবং ভারত এ দুটি বিবাদমান রাষ্ট্রে পরিণত করে এবং উজ্জ্বলিত দুই প্রতি-ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এ ভাবেই ভারত ও পাকিস্থান সার্বভৌমত্বহীন তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ করে। ধর্মের আবরণে এ দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল এই দুটি রাষ্ট্রের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে শোষণকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা, ধর্মের নামে জনগণের বিপ্লবী শক্তিকে দাবিয়ে রাখা এবং ধর্মের নাম করে অবাধে জনগণের উপর শাসন, শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়া। দুটি দেশের তথাকথিত এই স্বাধীনতা দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থকে পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখার এক ঘণ্য চক্রান্তের ফলমাত্র।

বাংলাদেশকে সমর্থন প্রসঙ্গে

গত এগারোই এপ্রিল তারিখের যুগান্তরে একটি লেখা পড়লাম। বিষয়বস্তু “বাংলা দেশের স্বাধীনতার ভারতবর্ষ ও রাশিয়া-চীনের বিরূপতা ও মার্কিন সহানুভূতির তাৎপর্য” শ্রীবিবেকানন্দ মদুখোপাধ্যায়। পূর্বেই বলে নিই আমার বক্তব্য থেকে যেন কেউ না মনে করেন যে আমি বাংলা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের লড়াইকে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করছি। বরং ঠিক তার উল্টোটাই আমার চিন্তার অঙ্গে।

বিবেকানন্দবাবু লিখেছেন “ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে প্রায় ধর্মকের সুরে বলিতেছেন—কেন পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাইতেছেন? চীনের এই ক্রম্ভ নোট পড়িয়া মনে হয় চীন যেন ভারতবর্ষের অভিভাবক। কিন্তু এই অভিভাবকগিরির অধিকার চীনের কে দিয়েছে? আমাদের পররাষ্ট্র নীতি ও রণনৈতিক নীতি কি হইবে সেই বিষয়ে গায়ে পড়িয়া এই মাতবুদ কিংবা এই উদ্ধত ভঙ্গী কেন?”

সত্যিই তো চীনের কে বলেছে গায়ের জোরে গার্জমান হতে? কিন্তু একটা খটকা লাগছে—বিশ্বের যে কোনো রাষ্ট্র তার নিজস্ব রণনীতি ও রণকৌশল অবলম্বন করতে পারে এবং বক্তব্যও রাখতে পারে। তা না হলে ভারত কী করে বিশ্বের “বিবেক” জাগ-

রণের জাগরীদারী পেয়েছে? বিবেকানন্দবাবু বলেন “প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের রক্ত-স্নানের প্রতি সন্ন পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন শক্তিবর্গের (রাষ্ট্রসংঘসহ) বিবেকের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।” সাড়া দিয়েছে কোন কোন শক্তিবর্গ দেখা যাক। বিশ্বের ‘মুক্তিকামী’ শান্তিকামীদের মধ্যে আছেন বিবেকানন্দবাবুর ভাষায় “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (মদুখোপাধ্যায়) রাশিয়া আর ভারত তো আছেই। এছাড়া ব্রিটিশ, ইউরোপীয়, কানাডীয়, অস্ট্রেলিয়ান ইত্যাদি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় বড় সংবাদপত্রে এই নৃশংসতার খবর প্রকাশিত হইয়াছে।

এবার ঘরের কথায় আসি। নিজদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য মিজেন্ ও নংগা জাতি দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করছে। হোক না ক্ষুদ্র অংশ। ভাষা ও সংস্কৃতির কোন চোখে দেখব? বিবেকানন্দবাবু কী বলেন জানতে ইচ্ছে করে। আজ যদি পশ্চিমবঙ্গ পারিস্থিতির গুণে ভারতের অঙ্গীভূত থাকতে না চায় তখন “গাই-বাহুর গোয়ালিনীর গণতন্ত্র” সরকার কি হাসি মুখে সেই দাবীটি মেনে নেবে, নাকি পাক-সরকারের নেতা খাঁ সালেহের মতেই-হিংস্র দন্ত বের করে রক্ত রঞ্জিত হাতে নৃত্য করবে জাতীয় সংহতি রক্ষার নামে?

বিবেকানন্দবাবু বলেন “আমরা পূর্ব দিকে এখন একটি গণতান্ত্রিক মিত্র রাষ্ট্রকে পাইতেছি যার ফলে বাংলা দেশের স্বাধীনতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে নতুন নির্বিঘ্নতা বা সিকিউরিটির প্রতিশ্রুতি আনিয়া দিতেছে।”

ভালো কথা। আজ যদি দিল্লীর মহান একা থেকে কোনো অংশ চলে যেতে চায় সংবিধানের কত বছর শান্তির ব্যবস্থা আছে? উপরন্তু তখন যদি বিশ্বের কোন রাষ্ট্র সম-

মতামত

র্থন জ্ঞান বা “বিবেক” জাগরণের চেষ্টা করে, তখন বিবেকানন্দবাবু ও ভারত সরকার কী বলবেন জানতে ইচ্ছে করে।

বলা হচ্ছে পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলাকে শোষণ ও শাসন স্বারা গত তেইশ বছরে পঙ্গু করে দিয়েছে, তাই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করা উচিত। এই যদি ঠিক হয় তবে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে কী পরিমাণ শুল্ক আদায় করেন এবং তার কত অংশ এই হতভাগ্য দেশের কপালে জোটে সেই হিসেবটা বিবেকানন্দবাবুর কাছে চাইছি। এই প্রসঙ্গে ভাষার

ব্যাপারটাও যেন নজর এড়িয়ে না যায়, কোন কোন ভাষার ঔৎকর্ষের জন্য কতটাকা দিল্লীর দরবার বস করেছে তারও একটা ছবি আঁকা প্রয়োজন। কেননা পাকিস্তানে তো উর্দু বাংলাকে পেষণ করছে। তাই এখানে হিন্দি বাংলাকে কতটা তোষণ করছে তার হৃদিশ পাওয়া যাবে।

ভারত তো অনেক আবেদন নিবেদন করলো অনেক প্রস্তাব পাঠও হলো। কই এখনও তো স্বীকৃতি দেবার হিম্মত দেখাতে পারেনি। কাজেই অমুক দেশ হেন করেছে, তমুক দেশ তেন করেছে

না করে নিজের চরকায় ভালো করে তেল দেওয়া প্রয়োজন। ভালো কথা; ভারত ও আকাশবাণী-যে হারে চে-চমিচি শব্দ করেছে তাতে না আবার বিদেশী ফোজ মোতায়েনের রসতাকেই সঙ্গম করে দেওয়া হয়। এই মদুহুতে ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়ার কথা মনে রাখুন। ত হলেই এদেশের সুবিধাবাদী সাংবাদিক, লেখক ও শিক্ষীদের সতীত্ব রাখতে গিয়ে কিরকম দেশপ্রেমের, চৌর্য চেকুর উঠছে বোঝা যাবে।

পূর্ব বাংলার যে গণ অভ্যুত্থান হয়েছে তা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দলের নয়। হয়েছে বিরাট বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন জনগণের দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রামের প্রকাশ। অবশ্য শেখ মুজিববরই বেড়ালের গলায় ঘন্টা বেঁধেছেন।

লড়াই চলছে এবং চলবে। মাঝে যতই টালবাহানা চলুক না কেন, যতই ডাইনে বাঁয়ে সমঝোতা-এগরতে হোক না কেন এই সংগ্রাম সেদিনই থামবে যদিন বাংলাদেশে সর্বহারার রাষ্ট্র কায়েম হবে।

জৈনক পাঠক

নকশালদের হেয় করবেন না

গত তেইশে এপ্রিল “নকশালদের স্বরূপ” এই শিরোনামের অরুণ রায় বিশ্বাস মহাশয়ের লেখাটি পড়লাম। তাঁর কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ কোনো দল অথবা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে ইতিহাস বিকৃত করে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। স্মরণ করুন ১৯৬৭ সালের কথা। সেদিন অসংখ্য মানুষের শৃঙ্খলায় নিয়ে যুক্তফ্রন্ট শাসনকার্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব নিয়েছিল। স্মরণ করুন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভারতের ইতিহাস। সূভাষ, ক্ষুদীরাম, প্রফুল্ল, ভগৎ সিং, বীণা দাসের মতো শত সহস্র বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ, দেশ

প্রেমের কথা। সেই সংগে সেদিনের আইনী গণ-আন্দোলনের সেই একচ্ছত্র নেতা গান্ধীজীর কথা। গান্ধীজী ভগৎ সিংয়ের মত দেশপ্রেমিককে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তদানীন্তন বড়লাটকে লিখলেন “ঈশ্বরের অসীম করুণা যে আপনাদের অমূল্য জীবন রক্ষা পেয়েছে”। সূভাষকে বললেন “বখাটে” ছেলে। সংগঠনহীন, বাস্তব, পরিকল্পনা-বিহীন এই সব দেশপ্রেমিকদের সেদিন অনেক কুৎসা, বিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গণ-আন্দোলনের জোয়ারকে সেদিন যে সব নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট অইনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা পশ্চিমীচালে দূর থেকে শব্দ মন্তব্য করেছিলেন যে এই সব ব্যক্তিরা (সূভাষ, ক্ষুদীরাম ভগৎ প্রভৃতি) শব্দ সন্ধান সৃষ্টি করে দেশের মূল আন্দোলনকে ধ্বংস করেছে। অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামের উদাত্ত আহবানকে নাকচ করেছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (যদিও মার্কসীয় দর্শনে সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখলই হচ্ছে শেষ কথা), তাঁরা বললেন দেশের সর্ববৃহৎ দল জাতীয় কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তাঁরা এ আন্দোলনে সামিল হবেন না। দিকে দিকে সেদিন প্রমিক কৃষক, সাধারণ মধ্যবিত্ত, শ্রম-জল সেনারা প্রকাশ্য বিদ্রোহ সুরু করেছেন অত্যাচারী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে।

এইরকম যখন অবস্থা তখন বিভিন্ন দলের নেতারা বাস্তব অবস্থাকে এড়িয়ে সুকৌশলে মুক্তি-যুদ্ধের বিরোধিতা করলেন। ইতস্ততঃ এই সকল বিদ্রোহ উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে চোরা গলিতে মাথা কুটে মরল। নেতারা করলেন জনগণের প্রতি চরম কিস্বাসঘাতকতা। তারপর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এল ভিক্ষা লম্ব দান হিসাবে। গোটা ভারতবর্ষকে দুটুকরো করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সুরু করল নতুন কায়দার শোষণ। অরুণাবাবু দয়া করে জবাব দেবেন কি, যে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই জঘন্য ইতিহাস সৃষ্টির জন্য দায়ী কে? ভারতীয় জনগণ অথবা ক্ষুদীরাম, প্রফুল্ল, ভগৎ সিং না সেই সব নেতা বীর অগণিত জনগণের মনসিকতাকে উপেক্ষা করে সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তথাকথিত আইনী আন্দোলনের মধ্যে। বিভ্রান্ত করেছিলেন জনগণকে।

আজকের গান্ধীবাদী অজ্ঞানবাবু এবং মার্ক্সবাদী (আসলে সংস্কারবাদী) জ্যোতিবাবু জনগণের মেজাজ দেখে তাই গদীনসিন হওয়ার প্রাক্কালে এককালের সন্ধানবাদী, হঠকারী বিপ্লবীদের গলায় মালা দিতে বাধ্য হলেন (যেমন জনগণের চাপে গোড়া কংগ্রেসীরা গদগদ ভক্তিতে লেনিনের প্রতিভূতিকে মালা দিলেন)। জ্যোতিবাবুকে সূভাষ সম্বন্ধে নতুন কথা শেনাতে হল।

অরুণাবাবু যে এ ইতিহাস (শেবাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

পূর্ববাংলার সংগ্রাম

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

যখন উদ্মুখ ঠিক তেমন সময়ে পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীলদের অন্যতম প্রতিনিধি শর্ট চুডামণি আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালের সাতাশে অক্টোবর সামরিক আইন জারী করে ক্ষমতা দখল করে নেয়। এ ভাবে পদে পদে শাসক ও শোষকরা জনগণের বাঁচার প্রতিটি দাবীকে বিভিন্ন কলা কৌশলে উপেক্ষা করে সমগ্র জাতির উপর দীর্ঘদিন ধরে চালিয়েছে অকথ্য লাঞ্ছনা, নির্যাস নিপেষণ এবং পদে পদে তাদের ন্যায় অধিকার থেকে করেছে বঞ্চিত। দীর্ঘ এক যুগ ধরে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর আইয়ুববাহারী নির্যাতন সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্ক জনক অধ্যায়। পশ্চিমা প্রভুদের নিকট প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত দাবীর বিনিময়ে জনগণ কেবলই পেয়েছে বুলেট বেয়নেট আর অকথ্য নির্যাতন।

গণ অভ্যুত্থান

এই লালিত নিপীড়িত জাতি মার খেতে খেতে সংগ্রামমুখী বিপ্লবমুখী হয় এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য উদ্মুখ হয়ে উঠে। পূর্ব বাংলার ধনিক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ এ সময়

কেন্দ্রের নিকট ছয় দফা নামে একটি আপোষ চুক্তি তুলে ধরেন। পাক-পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এই আপোষ-রফাকেও বাড়াবাড়ি মনে করতে থাকে এবং ছয় দফার প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে “আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা” নামক এক মিথ্যে ভিত্তিহীন মামলায় যুক্ত করে বিচারের জন্য সামরিক আদালতে প্রেরণ করে। ইত্যাদি ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জনগণ বিশেষ করে ছাত্র সমাজে এক প্রচণ্ড গণআন্দোলন গড়ে তুলেন। আইয়ুবের জাঙ্গা বাহিনীও ঢাকার পথে সাম্য আইন জারি করে বিশেষ জান্দুয়ারী উনিশশ সত্তর চালিয়েছে রাইফেল, স্টেনগান মেশিন গান, হত্যা করেছে কমরেড আসাদুজ্জামান রুমতম, মতিউর ও আরো অনেক ন্যূনা জানা শহীদদের। প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে শেখ মুজিব এক আপোষ চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি পান এবং “গোল টৌরল” নামক এক আপোষ আলোচনায় লিপ্ত হন। গোলটৌরল জনগণকে কিছুই দেন নি, বরং নেতাদের এই আলোচনামূলক বিশ্বাসঘাতকতায় গণ অভ্যুত্থানকে স্তম্ভ করে দেয়া হয়। জনগণের মনে চাপা আক্রোশ ভিসডিয়সের ন্যায় প্রতিনিয়ত জ্বলতে থাকে।

এই রুদ্ধ রোষে আইয়ুব সরকারের সিংহাসন পড়ে ছাই হয়ে যায় এবং রণমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে

নব জন্মদ ইয়াহিয়াব শ্বিতীয়বার সামরিক আইন ঘোষণার মাধ্যমে। ক্ষমতা হাতে পেয়েই এই নরপিশাচ একজন অদর্শ গণতন্ত্রী ও ভালো মানুষের ছদ্মবেশে ঘোষণা করেন তিনি দেশে সদ্ধ শান্তি ফিরিয়ে দেবেন, গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন এবং তার কথানুযায়ী তিনি নির্বাচনের দিন তারিখও ঘোষণা করেন। তার এই ঘোষণাকে পূর্ব বাংলার ধনিকগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ, দক্ষিণ পশ্চিমী কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মস্কোপশ্চিমী ন্যাপ, প্রতিক্রিয়াশীল তিনটী মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম নেজামে ইসলাম, পি ডি পি ও কৃষক প্রমিক পার্টি স্বগত জানায়। এসব পার্টির কর্মকর্তারা ইয়াহিয়া খানের গণতন্ত্রী কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অপরাধকে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টরা “স্বাধীনতা নির্বাচনে আসতে পারে না, বিশেষতঃ সামরিক শাসন চলাকালীন নির্বাচন, যেখানে ব্যপক জনগণের অংশ গ্রহণের কোন স্থান নেই সে বুজোয়া নির্বাচন কোন ক্রমেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন হতে পারে না” বলে অভিমত প্রকাশ করে এবং গণতন্ত্রের নামে এই প্রহসনকে প্রতিহত করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।

(চলবে)

পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম বিষয়ে (২)

কমলকুমার মজুমদার

আমরা যদি ছবিবিশেষে মার্চ হইতে অদ্যাবধি বড় পালোয়ান দৈনিক ভাষা নির্বিশেষে, পর্বলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে অনুধাবন করিব যে, এক টেবিল হইতে সম্মুখের টেবিলের সহিত কোন সমন্বয়বিধান শৃঙ্খলা নাই, এক কলম বলিতেছে, পাক সৈন্য চম্পা হাজার খতম, অন্য কলমে পঞ্চাশ হাজার, কামানের গোলা ভিজিয়া যাওয়াতে (পলাশীর যুদ্ধ) আর শব্দ শ্রুত হয় নাই, মৈসিন গান-হইতে গোলা নিক্ষেপ হইতেছে; কখন ভয়-ঙ্কর কখন মজাদার ফোট ছাপাইতেছে; কোথাও সগর্বে লিখিত হইয়াছে বাট কাটারী লইয়া সকলে ছুটিতেছে, তখনই বোমা পেটো দিয়া কি হইবে। এই একজন মরিল এই বাঁচিল, ট্যাক্সি পিষিয়া মারিয়াছে (না মারিয়া পিষিয়াছে) এইখানে ঐতিহাসিক কথা 'ওরিয়েন্টাল একসজারেসন' উল্লেখ-যোগ্য।

খবর মূর্খিত হইতেছে তাহাতে তারিখ নাই, দৈনিকে বিজ্ঞাপন যখন বেশী, তখন পূর্ববঙ্গীয় কথা ছাটকাট হইতেছে। নিজস্ব সংবাদদাতার খবর অশ্রুত, যে মনোবল তাহারা এক হাতে তৈয়ারী করিতেছেন অন্য হাতে তখনই করিতেছেন, একদিন এক-স্থানের খবর পরদিন চুপ, তাই খুলনার (!) চালনার কোন সংবাদ নাই। আজ পর্যন্ত বরিশাল বা ফরিদপুর কি ঘটিতেছে তাহা নাই। মনোবলের নামে খালি পদ্মই দেখি। এলেনবি কয়েক কথায় বিয়ারস্যা বা যুদ্ধ গার্জা জয় সম্পর্কে যাহা লন্ডন-নগর যুদ্ধ দপ্তরকে পাঠাইলেন, তাহা খবর-ভুল মিটার নাই; যুদ্ধ দপ্তর বিশদ বিবরণ চাহিলে, ইনালজেনসের একজন পদস্থ ব্যক্তি সূদীর্ঘ বিবরণ in the style of an imaginative war correspondent. লিখিলেন) ইহাতে অনুমেয় যে টেবিলে টেবিলে কোনই যোগাযোগ নাই আমরা মনে রাখি নাই যে যখন মজিবর মরী-ষাদের কোন জানপাচানি নাই, আমা-দের খবরই তাহা যোগাইতেছে, অব-খ্যাত হত প্রতি যুদ্ধালিপ্ত দেশের বলিবর্ধন অধিকার আছে—এবং ঐ দেশের বন্ধুদেরও আছে। আরও যুক্তিসঙ্গত ভাবে যে অবখ্যাত-হত এক শক্তিশালী অস্ত্র। তবে সেখানেও এক পোস্ত সংগঠন দরকার।

এই কয়েকদিনের যুদ্ধ বিষয়, একটির কাহারও গহিত কিছু মন্তব্যর অধিকার নাই—বলিতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের উল্লাসই তাহাদের পাড়িয়া মার খাওয়াইয়াছে; কোন বুদ্ধিমান দূরবান বাঙালীর ইহা কবা উচিত নহে! এই কয়েকদিনের ঘটনার ভুল বা মড়তার প্রশ্নই উঠে না! অবশ্য ইহাও ঠিক যে মাছুম-প্রেমে বেকার মবপণ করিতে উদ্বেগ্ন কল্পাও নির্ব-ধিতা। এমনিতেই তাহারা গুলির হাদিশে এঁকাকাকা (জিগজাগ) ছুটিয়া পালাইতে, বোমার মাটিতে শূইয়া পাড়িতে, দাঁতে পরসা রাখিতে, লন্ঠনের চিমনী কাগজ মারিতে পর্যন্ত

জানেনা আগুন নিভাইতে যেখানে বালতির অভাব প্রচুর তাহারা এই এক কুটিল মহামারিতে প্রাণ দিতেছে। একমাত্র তাহাদের জন্য আমরা কাঁদিতে পারি!

মজিবর রহমান যে কি পাকা কি অটুট ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা অল্প প্রমাণিত হয়, তাহার রাজ-নৈতিক লক্ষ্যই তাহার সংগঠন, ভার-তীয় কাগজ ব্যতীত কোন পূর্ববঙ্গীয় বলিবে না যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কত পর্যন্ত প্রস্তুত যে সকলেই, যে তাহারা পাকিস্তানের মত সর্ব অস্ত্র সরঞ্জামিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস করিল। এক চোটে বৃহৎ আদর্শ তথা পাকি-স্তান হইতে অন্য হইল, আরও যে, মানচিত্র দেখিলে—প্রস্তুত বলিতে যে অর্থ হয়, যাহা এই, যেমন দুই পক্ষের এক মধ্যবর্তী এলাকা ছিল, যাহার দুই পাশে লোকে ট্রেন খনন করিবে—তাহার কোনই উপায় নাই; আমরা সর্বত্র ছড়াইয়া আছি, সেই প্রস্তুতি মানে ভালমন্দ পরিণতি বিবেচনা করত এখানে বৃথা; একমাত্র নৈতিক বল স্বাধীনতা তাহা সূকুমার মতি বালিকারও আছে, এই সূত্রে মার্চ মাসের গোড়া হইতে তিনি প্রত্যহ, তাহার দেশবাসী বাঙালী মাত্রকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন; এবং ঐ দেশ এমনও হলপ করিয়া বলা যায় যে, স্বাধীনতার প্রথম দিন হইতেই তৈয়ারী ছিল, যে আমরা সর্বস্ব পণ করিব।

এই বিচার জেজে নিশ্চয় মানিবে যে, ইয়াহিয়া কোন ভারতীয় মন্ত্রী নহে যে মজিবরকে একটি লাটড্যাগা ছাড়িয়া দিবে, যাহাতে তিনি এক-নিষ্ঠভাবে কুচকাওয়াজ করিতে পারেন, খুব ফুটিতে—ট্রুপ স্কোয়াড্রন রেজি-মেন্ট বৃগেড ডিভিশন গাড়িয়া এক তাগড় ইনফ্যান্ট্রী যুদ্ধ নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে পারেন; কিন্তু আর এক প্রস্তুতি তাহার ছিল যাহার প্রবল-তায়, ঐতিহাসিকের স্মর্তব্য যে, পুর্লিশ, ই পি আর, ই বি আর সশস্ত্র নির্ভীকভাবে তাহার দেওয়া স্বাধীনতা রাখিতে মৃত্যুপণ করিল। ইয়াহিয়া তাহাকে অটল প্রস্তুত না জানিলে—এই হত্যাকাণ্ডে ক্ষেপিয়া উঠিত না। ইয়াহিয়া বুদ্ধিরাহিল পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হয়েছে।

এখানে প্রস্তুত কথাটা যে কত বৃথা তাহা যদি দশাসই শক্তিগুলির ঘটনা উল্লেখ করি তাহা হইলে আন্দাজ করিতে পারিব, যথা অতিক্রান্তে পার্জ হারবাব; যথা ১৯০৬-০৮ বিমানবহর সম্পর্কে বৃটিশ সময় নায়কবা দৃকপাত করে না (ফিলিপ গুয়াডেল)। অন্যপক্ষে মজিবর বাহি-নীর দৈনিক-নিশ্চিত সংগঠন রাহি-তাই—বিচ্ছিন্নভাবে প্রতি ছটাক জমি হইতে নৈতিক প্রতিরোধ—বিপক্ষকে জ্বালাতন করিবার জন্য পর্যাপ্ত, ইহাই আর এক তুখড় সংগঠন মানি-তেই হইবে। ইহাতে পাক-পক্ষ নিজ গতিবিধি, দাগা-আক্রমণ (একসন)

সম্পর্কে অব্যর্থ হইতে অদ্যও পারে না। পূর্ববঙ্গ ক্ষেত্রে মহা মহা রক্ষীর প্রয়োজন এখানে তাহা নাই! তাই এতাবৎ দেখা যায় যুদ্ধচালনা কমান্ডো রূপই আছে—অনেকটা 'শক-ট্রুপস' কোথাও কামান—যেখানে এল এম জি বথেষ্ট, কোথাও স্যাভাঃ জেইট, কোথাও বিমান হইতে গুলি বর্ষণ। কখনও ইহা যেন জলযুদ্ধ, কখনও নাম মাত্র ইনফ্যান্ট্রী!—অথচ বাঙালী যেখানে নিরস্ত, রক্ত, ধতমত! ইতা-কার আক্রমণ অশ্রুত, ক্ষেত্র-রণসম্মত নহে ইতালীলার জনহি উদ্ভাবিত।

সংগঠন শক্তিটি সর্বসময়ই রণ-কৌশল লক্ষ্য; সংগঠন ছত্রভঙ্গ করাই যে কোন সেনা বাহিনীর পণ দেখা বাইবে; তাই বড় খেদে চার্চিলকে বলিতে হইয়াছিল, আমরা রণের পর রণে ভগ্ন দিতেছি, বিতর্কের পর বিতর্ক জিতিতেছি! ইতিহাসে কদাচিৎ পোস্ত জঙ্গীর সমক্ষে কমজোরীর দাঁড়াইবার কথা উল্লেখ আছে—যাহা মিরাকল! পুরাকালে প্রবল সাহস সংখ্যা এবং প্রায় তখন হইতে মরণাস্ত্র উদ্ভাবনা-বিপক্ষকে তখনই করিয়া আসিতেছে—স্ক্যাক্স-এর মূর্খ বহুতে পদাণত-হইল—এক এক মারাত্মক অস্ত্ররজ্জা ইতিহাসে ফিহাত সংগঠন ভাঙ্গার কাহিনীতে অব্যর্থ হইয়াছে।

কনকারিয়েদেব অতুলনীয় তড়াকা-হোঁ মারাতে সকলে ঘাই ঘাই করিয়াছে। কোথাও পাড়িয়া থাকি চেঙ্গিস-এর বহরের অবস্থার উল্লিখিত খুলায় আকাশ কয়েক প্রহর কালো হইয়া রহে—গড ইজ ফর দা 'বিগ বাটলিয়ানস' সৈন্যও প্রমাণিত হইয়াছে, চরুট-খেগো চার্চিল ডানকারক-এর পতনের পব বলিয়াছিল, 'অউ! ওভারগেলামিং অ-ড' এবং এই সূত্রে মনে করা যাক মাজিনও লাইন কি কারণে বেকার হইল। সংগঠন ভাঙ্গাই রণকৌশল, তিনজন 'বিশ্ববিখ্যাত মিলিটারী জিনিয়াস আলকজান্দার, চেঙ্গিস ও নেপোলিয়ান যাহাতে দারুণ সিস্থ তাই তাহারা পুণ্যক্ষেত্রে!—কিন্তু যেখানে, ধরা যাক, দৈনিক নিশ্চিত সৈন্য সংগঠন নাই সেখানে ভাঙ্গিবে কি ইহা যে মনোবল।

মজিবর যে মনোবলের সঞ্চার করিয়াছেন তাহা অভাবনীয়, ইহা ধর্মের ডাক নহে, ধর্মহীন মড় মার্কসবাদী ডাক নহে—ইহা দেশাত্মবোধ। অবশ্য মানিতে হইবে যে, এখানেও সেই ফ্যানটিসিজম-মিহরোইক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ দেশাত্মবোধেই স্ক-লেই আত্মত্যাগে প্রস্তুত! তথা পশ্চিমে মার্চ মজিবর যে স্বাধীনতা তাহাদের দিয়াছে তাহা রক্ষার জন্যই এই যুদ্ধ।

যুদ্ধের অনেক সময় গিয়াছে, অদ্যাবধি আমরা কোথা অর্থৎ দৈনিক পূর্ববঙ্গে পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র-প্রকা-শিত হইতে দেখি নাই অথচ উহাদের জন্য আমাদের কি ভুকরানি! অথচ পূর্ববঙ্গে কাহার কি করা উচিত আমাদের কাগজে রুকমারি ফন্দি ও ফাঁকির বাতলাইতে আছেন এমন কি

গত দুই মহাযুদ্ধে ইংরাজ বাহিনীকে জি এইচ কিউ * হইতে পরিচালনার যে কি গহিত ফল হয় তাহা লিখিত আছে। আমরা সকলেই পাক সৈন্যকে আহামকের দল বলিয়া ভাবিতোছি, তাহারা যে পোস্ত পোড়-খাওয়া সৈন্য ইহা ভুলিয়া যাই যে এবং অভিজ্ঞতা বলেন, শত্রুকে কখনওই কম-জোরী বুলিও না। অন্যপক্ষে মজিবর মরীয়া যাহারা ইহাও ভুলিয়াছি যে, সেখানে-তেও চৌকস পদস্থ সৈন্য সামন্ত আছে, যাহারা 'লাগে-তাক' পশ্চাতি যুদ্ধ চালনা শিখে নাই, (অবশ্য জাঁদরেল কালুর ন্যায় অনেকেই আছে) যাহারা রক্ষণ, পরিচালনা, দাগা-তে তুখড়। 'আবহাওয়া তাহাদের নখ-দপ্পে। যে টুকু এখনও মজিবর মরীয়াদের ঘাটতি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় পাক-রণকৌশল তাহা শিখা-ইয়া দিবে। ঠাকুরের অমনি ইচ্ছা, পাকা জঙ্গীবাজরা সর্বসময়ই প্রতিপক্ষ অনভিজ্ঞদের তারড় করে। আজও সঠিক পদাতিক সৈন্যবাহিনীর সহিত ছোট খাট, সময়ের দিক দিয়া, সংঘর্ষ ব্যতীত কিছু ঘটনা সম্ভব হয় নাই একদিকে নিরস্ত লোক সংখ্যা যেমন প্রচুর অন্যদিকে এক সৈনিকের হাতে হাজার লোক বলওয়াল অস্ত্র। এই-রূপ অস্থায়ীকে বা অস্থায়ীদের ঘিরিয়া মজিবর মরীয়ারা পর্যন্ত করিয়াছে, ইহাতে তাহাদের অস্ত্র প্রাপ্তি ঘটিয়াছে; প্রতিটি অস্ত্র ছিনা-ইতে জানা-নাই কত কত মানুষ মরিয়াছে, কিন্তু ক্রমে তাহারা বলীয়ান হয়।

এই সকল সংঘর্ষ, যতদূর সম্ভব খবর হয়, প্রতিক্ষেত্রেই রাস্তা-ঘাটে ঘটি-তেছে—মাঠ প্রান্তর প্রতিপক্ষ লাভ করে নাই জ্বালা সম্ভব নহে—মজি-বর মরীয়ারা ক্রমে এক পাকা গঠনে আসিতেছে এক চরিত্রের 'দিকে তাহা অগ্রসর হইতেছে, যে surprise ও mobility লইয়া, প্রথম মূহুর্ত হইতে মজিবর মরীয়ারা বৃক ঠুকি-য়াছে; গণনা বলে, ঐ দুই সংঘর্ষ তাহাদের decisive victory দিকে

অগ্রসর, করিবে কেননা ঐ দুই বৃক্ষ কখনই জঙ্গীকে বেদম প্রত্যয় দেয় না। কখনই, ভাগ্য, সহ-কর্মীদের কাবধারা বাহিনীর জঙ্গী পটু-শত্রুপক্ষের দুর্বলতা, অস্ত্র বা একের চৌকসতার উপর কোন আঁখি-ঠারে না। সকল সময় জঙ্গী তৈয়ার। সারপ্রাইজ কথাটা জুয়া খেলার চাল লওয়ার মত ব্যবহার করে না—এবং safety-first লইয়া বেশী মেয়েলীপানা উহার করিবে না। এখানে পুরাকালের সাহস-ও বাহুবল আর একরূপ লইবে; ইহা ছলে কৌশলে।

আমরা দেখিতেছি পাক-সৈন্য এখন সবিশেষ নজর দিয়াছে সেই সকল জেলায়, যাহা সি-নেভেল হইতে কোথাও কোথাও কিছুটা উপরে, পূর্ব উত্তরে; গড়পড়তা ৫-১৫০ ফুট পূর্ববঙ্গের উচ্চতা, এই স্থানগুলি প্রায়ই নিম্নবঙ্গ বা সমতটের মত এক-টানা নহে, পূর্ব অঞ্চল পার্বত্য পাদভূমি হইলেও, জমি বড় নাবল, (মৈমনসিংহ জিলা, গ্রীহটর কিয়দংশ) পূর্ব দক্ষিণ কিছুটা পাহাড়ী। ইহা পাক সৈন্য নায়করা জানে, ঐ প্রদে-শের কোন ঘোঁষা ঘোগ, জঙ্গ-দপ্তরের অবিদিত নাই! কোথায় কত জল দাঁড়ায় নিশ্চয়ই তাহাদের ছিট ম্যাপে দেখান আছে, অতএব বুদ্ধিতে হইবে তাহাদের বৃষ্টিতে কোন মৃদুস্কল ঘটিবার নহে; তাহারা সর্ব সময় চাহিতেছে, বেশ কিছু উদ্ভাস্ত সৃষ্টি করা এবং ভারত হইতে যে একরকম যোগান আসিতেছে তাহা বন্ধ করা; ফলে ঠাকুর গাঁ, দরশন, রংপুর পূর্বে কুমিল্লা অঞ্চল গ্রীহট তাহারা বেড় করিতেছে। এবং সর্ব-সময়েই তাহারা ছোট দল হইয়াই আসে, কিন্তু কখন আসে, কোথা হইতে আসে, কিসে করিয়া আসে, যদি মোটর তাহা হইলে তার স্পিড কত, একই রেজিমেন্টের কিনা, পদস্থ কেহ থাকে কিনা, কিভাবে চলিয়া আবার কোথায় যায়, তাহাদের আড়াল করিতে, কোন বিমান বহর (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

মতামত

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

জানেন না এমন কথা বলছি না: আমার মনে হয় অরুণাবদ্র কোনো দল বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে সজ্ঞানে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন। এতগুলি ভাল ছেলে (তঁর মতে সমাজ বিরোধী), যারা শূদ্র জন-সাধারণের স্বার্থে পুর্লিশের (তঁর মতে সাধারণ পুর্লিশ) অমানুষিক অত্যাচারে প্রাণ হারালো, তাদের আত্মত্যাগ অরুণাবদ্র মনকে নাড়া দিল না, এ কথা ভাবতেও আশ্চর্য লগে। অরুণাবদ্র হেমন্ত বসু পীযুষ ঘোষের হত্যাকারীর শাস্তি দাবী করেছেন, করেননি পুর্লিশের শাস্তি দাবী। সাধারণ মানুষ (মহাবিশ্ব, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শিক্ষক এমনকি রিক্সা চালকও পুর্লিশের চর হয়ে কাজ করলে তখন সে শ্রেণী শত্রু হিসাবেই গণ্য হবে) খুনেব নিন্দা করেছেন। অজয়

বিজয় সরকারকে কল্লদা করে মিলিটারী পাহারা আরো জোর-দার করতে বলেছেন। পুর্লিশ প্রহ-রায় থাকা জ্যোতিবাবুকে সাদ্কা মার্কসবাদী বলে জেনেছেন।

অরুণাবদ্র কাছে অনুরোধ, যে ছেলেগুলি (যাঁরা একটি আদর্শে অনুপ্রাণিত; হয়ত তাদের পথ ভুল কিন্তু আগেই সে কথা কি কবে বলা যায়), অত্যাচারী সি আর আর পি বাংলা ছাড়ে (ভেক) স্লেগান না দিয়ে পুর্লিশের আঘা-তকে প্রত্যাঘাত হানছে নিজের জীবন তুচ্ছ করে, তাদের ভাল না করতে পারেন করবেন না কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট তাদের হয়ে প্রতিপন্ন করে অগণিত মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না।

এস দে
বেলগাছিয়া
হাওড়া

পদ্মপেন্দু শব্দ যে নিছক ভুল পেয়েই পালাতে চেয়েছে তাই নয়, ভুলের কারণ সৃষ্টি করে কোম্পানীর চোখে নিজের গুরুত্ব বাড়িয়ে নিয়েছে। ফলে মোটা একটা এলাওয়েন্স সহ বদলী।

অমলেন্দু, অর্থাৎ সেই দলপতি গোছের স্ববকটির অন্তত এটাই স্থির বিশ্বাস। অমলেন্দুও পদ্মপেন্দুর কারখানার সম্প্রতি ঢুকেছে। পদ্মপেন্দুকে চিনতে তাই অসুবিধে হয়নি অমলের। অসুবিধে হয়েছে একজিকিউটিভ পদের তালুকদার শ্রেণীর কিছু লোকের। এরাই সব সময় আঁতকে আছেন। নিজেরা তো বটেই, অপরের মনেও সন্দেহ সৃষ্টি করছেন। অবশ্য তালুকদারের মতো মোটা মগজের লোক যে কোনও সুক্ষ্ম রাজনীতির চাল চালছেন না, অমল সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ। তালুকদার ভীত মানুষ। ভয় এবং আশঙ্কার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। গৃহীনি আবার তদপেক্ষা দুঃস্বপ্নবিলাসিনী। তিনি ভেতরেই নিচ্ছেন, যে কোন মুহূর্তে এই স্টাফ কোয়ার্টারের নিচে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এবং তাতে এ বাড়ির কোন তলার কেনমোজাইক টাইলই অক্ষত থাকবে না। যদি তেমন দুর্ঘটনা দরবতীও হয়, তবে দু-একটা খুন-জখম যে কোন মুহূর্তেই ঘটে যেতে পারে। যা দিন কাল। গভর্ণরের রাজত্ব গিয়ে নির্বাচিত সরকার এলো, গলা কাটার সংখ্যা তবু কমল না। এখনও সুযোগ পেলেই যে কেউ যে কারকে জানে খতম করে সরে পড়ছে। বিচার নেই, বিচারক নেই; রক্ষা নেই, রক্ষকও নেই।

তালুকদার গৃহ সাম্প্রতিক কলহের প্রথম কারণ তাই হয়েছে কর্তার ট্রান্সফার কেন্দ্রিক। তালুকদারের মতো স্বমীর হাতে পড়েই তালুকদারগির আজ নাকি প্রকট নিয়ে টানাটনি। সৌদিনের ছোকরা পদ্মপেন্দু কেমন চরমিক গুঁহিয়ে নিয়ে কেটে পড়ল। তালুকদার চিরকাল একটি খোঁটতেই বাঁধা রইলেন। এই এক নিত্য অভিযোগ নিয়ে গজ গজ করেন তালুকদারগির, আর ছেলেমেয়ে সন্তোষ কর্তৃক সামলান, সাবধান করেন সর্বদা। এই প্রসঙ্গে রুম উল্লেখ হারিস চেপে বসেছিল, “মিঃ তালুকদার এই অভিযোগে একেবারে ককটেল বোমার মতো বাস্ট করেন। বলেন, চিরকাল তো শব্দ গয়ন গাড়িয়ে পান চিবিয়ে বাস্কেপ দেখে কাটালে। তখন যে ম্যাডরাসে ট্রান্সফারের একটা অর্ডার হয়েছিল, যেতে দিলে আমরা? সৌদি, কলকাতা ছাড়া চলবে না। আমার অমন একটা লিফট ফস্কে গেল। এখন চাও, কলকাতা ছেড়ে যে কোন চুলোয় পালাতে; ‘মানে, জীবনের শেষ লিফটটও হারুতে বলছ। স্ট্রী বৃষ্টিতে দুবার ঠকা মানে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া। এই বলে দিলাম, যাব না, যাব না, যাব না!”

রুম ভারি চমৎকার কন্ঠস্বর নকল করতে পারে। আমরা সবই

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

উপভোগ করেছিলাম তার বর্ণনা।

শৈবাল পরিচয় দিয়ে বলেছিল, “জানেন, রুম ফাস্ট ক্লাস আর্টিস্ট। একবার আমার সঙ্গে হিরোইন হয়ে আমাকে একেবারে ম্লান করে ছেড়ে দিয়েছিল।”

রুম কপট রাগের সঙ্গে অনুরাগ মিশ্রিত মিষ্টি গলায় ধমক দিয়েছে, “এই শৈবালদা!”

আমি মর্চকি হেসে বলেছি, “প্রতিভা কখনো নিজেকে লুকোতে পারে না, উনি না বললেও আমি ঠিকই বুঝলাম আপনি সুঅভিনেত্রী!”

“ঈস, ভারি একটা কমপ্লিমেন্ট বেন। জানেন, কথাটা কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে মোটেও ভালো শোনায় না।”

বাস্তবিক লজ্জায় পড়তে হয়েছে আমাকে। তাড়াতাড়ি বলতে চেয়েছি, “না, মানে, আমি তো—”

অমল হাত নেড়ে খামিয়ে দিয়েছে, “যেতে দিন, যেতে দিন। ওদের যে কোনটা কমপ্লিমেন্ট আর কোনটা মেনটাল শক, চৌকস মনো-বিজ্ঞানীতেও তার হিঁদিশ পাবে না মশায়, আপনি আমি তো পিকচারেই নেই।”

রুম শব্দ বড় করে টেনে টেনে বলেছে, “ঈ—ই—স!” তার কাঁধকাটা রুমকো চুল তাতে পনি টেলের মতো ডাইনে কাঁয়ে ঝাপট খেয়েছে। আমি সৌন্দর্যের দ্যুতি সহ্য করতে না পেরে চশমা মোছার ছলে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিয়েছি।

অমল আসলে পদ্মপেন্দুর কথায় ছেদ টানতে নারাজ। পূর্ব-সূত্র ধরে তখনই বলেছে, “পদ্মপেন্দুদের ট্রেড রুনিয়ন একটা সোনের পাম্পর বাঁটি। ওরা সকলকে বোকাতে চেয়েছে, ট্রেড রুনিয়ন হল একটা কমী সংস্থা, যার একমাত্র উদ্দেশ্য মালিকের কাছে প্রমিক কমীদের জন্য কিছু আদায় করে নেওয়া। আদায় করতে হলে বার-গেইন করতে হয়, অর্থাৎ সদর-প্রসারী লাভালাভ বিচার করতে হয়। আর এই লাভালাভ কেবল-মাত্র কর্মচারী ও প্রমিকদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করতে হবে। সুতরাং প্রমিক কমীর এই আন্দোলনের সঙ্গে রাজনীতির কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। রাজনীতি দলগত স্বার্থ সিঁধির উপায় মাত্র। বাঁচতে হলে, কিছু পেতে হলে, তাই চাই একটা অ-রাজনৈতিক রুনিয়ন। আমরা আমাদের শক্তিতেই আদায় করব আমাদের প্রাপ্য। কোন দলকে প্রাপ্য অদায়ের ভার দিলে, সেই দলের হাতে চাবিকাঠি তুলে দিয়ে আমাদের ভাগ্য নিয়ে খেলতে দেব না ওদের। রাজনৈতিক দলগুলো সবাই সমান। কেউ আমাদের স্বার্থ দেখবে না। আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে সিঁধ করে নেবে তাদের

বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ভাই সব, আপনারাই বলুন, আমরা কি দলীয় রাজনীতির দয়্য আর চ্যারিটির নিচে নিজের শিরদাঁড়া পেতে দেব, না, আমার স্বার্থ, আমার পাওনা-গন্ডা আমরাই বুঝে বুঝিয়ে যেখানে যতটা সুবিধে, আদায় করে নেব?” পদ্মপেন্দুর বক্তৃতার ঢঙে হাত নেড়ে প্রায় একটিং করছিল অমল, বাধা দিয়ে রুম বললে, “পদ্মপেন্দুবাবু ঠিকই বলেন, তাই কি না, বলুন?” প্রশ্ন করে সে নিজেই জবাব দেয়, “রাজনীতি-মালারা কি রাজা করে দেবে? ওরা মন্ত্রী হবে, ক্ষমতা দখল করবে। আমাদের সমস্যা ভালো করে খেয়ে পরে বাঁচা।”

অমল দাবড়ে উঠল, “তুই চুপ কর তো, ফচকে মেয়ে! তাকে আর তোদের এই সাজনো ঘর দেখলে কে বলবে রে, খাওয়া পরার সমস্যায় বিব্রত হয়ে পড়েছিস? তোরা যারা সুখে আছিস, তাদের মুখেই এসব মানায় ভালো। আর লাখে লোক, যারা খেটে খায়,

পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম

(সপ্তম পর্বতর পর)

ব্যবহৃত হয় কিনা, তাহা আমরা কেহই জানি না; কখন কিছু জিজ্ঞাসা খবর স্থান নাই—অথচ সাংবাদিক সর্বত্র সংবাদ-দপ্তর আমাদের কিছু বলে না, অর্থাৎ নিরস্ত্রদের বা কম-জোরীদের সাবধান করে না, শব্দ আমরা পাড়োঁছি যেখানেই কিছু মুজিবর-মরীয়া সম্বন্ধ হইল, সেখানেই হামলা; অতএব আমাদের তরফে কোন গুপ্তচর নাই, অন্যদিকে যে কোন ভীত নিরীহ দুখীই ও অবাঙ্গালী পাক বাহিনীর চর; ফলে আমরা তাহাদের কখনও হরণাণ করিলাম, কিন্তু তাহারা অচিরেই কোন স্থান পুনর্দখল করিল, গ্রামান্তর হইতে নতুন-জোয়ান বাহারা ঘৃণায় মরীয়া হইয়া আমাদের দল-বৃষ্টি করিল, তাহারা খোরা যাওয়ার বন্দুক লইল। তাহারা প্রাণ দিল।

গেরিলা যুদ্ধের অর্থই যত তাগড়া সরঞ্জামত সৈন্য হউক না কেন, তাহাতে উন্নতভাষা হইবার সম্ভাবনা অব্যর্থ। দেখা যায় এই গেরিলা আরও বেপয়েয়া হয় যখন সুপরিচালিত আক্রমণের কাজে লাগিবে—সকল সময় দখলকামী সৈন্য মুহূর্ত লয়, এখানে একমাত্র শব্দ সহায়ক ব্যাপার এই যে পাক সরঞ্জামত বাহিনী তাহার নিজস্ব কায়দা মত আসিতে পারিবে না; এবং যখনই সে তাহার কায়দামত আক্রমণ করিবে না অর্থাৎ একজন সৈনিক বেন বর্মআটা এই নির্ভাবনায়—তখনই মারাত্মক অন্ত হাতে কখনই সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না; তখনই তাহার মরাল-এ টোল খাইবে। মরাল উহাদের ক্ষেত্রে ভদ্রভাবে বলা হইল

তার চান্না ভালো করে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই চলাতে। রাজনীতি মানে মন্ত্রী হওয়া, এইসব চুলবাজ কথা বলে খটিয়ে মানুষদের হতাশ করাবি তোরাই। হতাশ করবে ঐ পদ্মপেন্দুরা যে শালা নিজের গুঁহিয়ে নিয়ে কেটে পড়ার তাল খুঁজছে। মোটা এলাওয়েন্স মেয়ে একেবারে ক্যাপিটালে গিয়ে কর্তাদের লাইম লাইটে আসবার জন্যে পদ্মপেন্দু সরকার একটা আতঙ্কের লাইন তৈরী করেছিল। নয়ত পদ্মপেন্দুর মতো একটা মরা ইন্দুর মেয়ে রাজনীতি করার, ট্রেড রুনিয়ন করার মাথা ব্যথা ওদের নেই।”

“ঈস, নেই বললেই নেই? মারপিট হচ্ছে না বুঝি? পদ্মপেন্দুবাবু বোঁছেলে নিয়ে ঘর করেন। ভয় হওয়া তো স্বাভাবিকই। আজ-কালকার রাজনীতিই তো এই যে, যখন নীতি ফিট বুঝিয়েও দলে টানতে-পারলে ন, তখন খতম কর।”

অমল প্রায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়া-ছিল। আমি ভয়ানক অবস্থিত অনুভব করছি। একেবারে অপরিচিতের মধ্যে এমন অবস্থিতকর ঘটনায় বিমূঢ় এবং নির্বাক হয়ে গেছি। এদের জল কোন পথে কোন দিকে গড়ায়, জানা নেই।

দেখলাম, শৈবাল ছেলেরিটি মধ্যস্থ হয়ে অমলকে হাত ধরে বসালে, “উত্তেজিত হোসনা! উত্তেজনা উদ্দেশ্যকেই নষ্ট করে। তুই রাগিলি তো রুমদর ভারি বয়েই গেল। দেখ, ও মিটমিট করে হাসছে। রাগিয়ে দিয়ে থামিয়ে দেওয়াটাও ওদের কুট কৌশল।”

অমল ঠান্ডা হয়ে বসে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, “সরি। জানেন, মেয়ে জাতটাই শালা জাত বুজোয়া। ওদের রাজনীতি শিখতে হয় না। কুট-কৌশলী করে স্বয়ং প্রকৃতিই ওদের তৈরী করে ছেড়ে দেয়, এক একটা সাক্ষাৎ শয়তানি!”

আমি হেসে বললাম, “আপনার মধ্যে অশ্চর্য ভালো লাগছে। আমার ধারণা ছিল, মানে...”

“খামলেন কেন? বলুন না?” শৈবাল একটা সিগারেট বাড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করেছে।

বেফাস বলে ফেলেছি, নিরুপায়। বলেছিলাম, “মানে, ঠিক আপনাদের মতো তরুণতরুণীরা যে রাজনীতিটিতে ভাবছেন...”

“আমাদের সাজ পেযাক চলন বলন চেহারায় তা ঠিক ধরা পড়ে না, তাই না?” রুম হাসছে।

বোকাগিরি ধরা পড়ে গেছে। বোকা বোকা হাসা ছাড়া উপায় নেই। (শেষাংশ ১৪ পর্বতর)

হইতে অন্য লইতে হইবে। পিতল বোতাম পরিবার ফুরসৎ পাইবে না। ইতিমধ্যেই খবর হইয়াছে, অসামরিকদের তাহারা লুণ্ঠের তৈরী করিতেছে, ইহাতে অন্তরঙ্গ লোকও আছে। (ইহাদের উপর কি তাহারা নির্ভর করিবে?) ভালো, কিন্তু ইহা তাহারা জানিয়াছে ঐ কপ্তর, মরাত্মক অস্ত্র বাঁট ব্যবহার করিতে হইবে—কেননা আমরা সর্বত্র বাহা আপাতত আমাদের বাধা—যতদিন বাধা ততদিন এই লড়াই স্টাটিক থাকিবে। (ফলত দীর্ঘস্থায়ী) এখন গেরিলা হইবে পরে আক্রমণ নিশ্চয়ই অর্থাৎ ক্রমে এই বাধাই বেপ-রোয়া আক্রমণ করিবে। তখনই জয় অবধারিত কেন না মনোবল এতটুকু টোল খাইবে না। অবশ্য পশ্চিম-বঙ্গের মনোবল অর্ধে, দৈনিক বল কর্তাদিন তাহারা পাইবে তাহাই চিন্তার কথা।

* এই সূত্রে বাহার কথা মনে পড়ে, তাহাকে প্রভাস গুপ্ত হিন্দুস্থান স্টানডার্ড বিশেষ জানেন, ঐ ব্যক্তি ইতালীর পতনে বাড়ীতে হরিদ্র-দেয়; সে এক ফিরিঙ্গী পদলেহী। ৪১-৪২শে শত বসুর কাছে কাজ করত; ফলে আমার কাকা শান্তি রায়চৌধুরী ক্যারিষ্টারদের সহিত তাহার আলাপ হয়, সে তখন ফিলেল স্টাটিজিস্ট, (কনান ডয়েল-এর গুরু) বলিল পতন সিংগাপুর হইবে না, পাকা ব্যবস্থা আছে। আশ্চর্য তখন যুগপৎ শোনা গেল—হো গিয়া! লোকটি মজার পারে ডারবী জুতা মালকোচামারা, গায়ে পাঞ্জাবী! বেশ্টে খাট। আদতে সে সাহেদ সুরাবন্দীর শিষ্য।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে দুর্নীতি স্বজন পোষণ ও অর্থের অপব্যবহার

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ও সরকারী অর্থ তছনছের মছব পড়ে গেছে ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মার্কেটিং ডিভিশনে।

একদিকে কর্পোরেশনের প্রশাসন কতৃপক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী সম্পর্কে উন্নাসিক মনোভাব দেখিয়ে চলেছে, অপর দিকে অকারণে অফিসারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তাদের বিলাস বৈভবের চলাও ব্যবস্থায় লাখ লাখ টাকা খরচ করা হচ্ছে। অফিসারদের সংখ্যা বৃদ্ধি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম হারে বাড়ছে সাধারণ কর্মীর সংখ্যা। উনিশ শ চৌষটি সালের মার্চে প্রাতি একজন অফিসারের পিছনে ছিলেন দশজন কর্মী। উনিশ শ সত্তর সালের একপ্রিশে মার্চ পর্যন্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে অফিসার

স্কুটার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

খাস্ত করে বাককে দিয়ে সুপারিশ করিয়ে নিয়েছেন। তারপর দর-খাস্তখানা ফায় ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের কাছে। তিনি কিন্তু কোনো মন্তব্য না করে দর-খাস্ত অফিসে পাঠিয়ে দেন। দপ্তরে তখন সাজ সাজ রব। বিজয় নাহারের ছেলের দরখাস্ত। ওতো দিতেই হবে। তবে আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে একখান ফরম ভর্তি করতে হবে। সেখানা পাঠানো হয়েছে। দুই একদিনের মধ্যেই হাজার হাজার আবেদনকারীর দাবী উপেক্ষা করে বিজয় নাহারের ছেলেকে স্কুটার দেওয়া হবে।

ছাত্র পরিষদের ছেলেরা কি সাথে বলে বিজয় মারোয়াড়ী?

এই কলকাতায়

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

আমরা। এক্ষেত্রে অপ্রিয় সত্য মৌনমুখে জনান দেওয়াই শ্রেয়। অমল বলেছে, “যাই হোক, পুষ্পেন্দ্রদের ভাওতায় যারা ভুলে ছিল, আমোদজন পিকে উঠতেই তারা টের পেয়ে গেল যে, বড় রকমের একটা গলদ হয়ে গেছে।”

বাধা দিয়ে রমু বললে, “অমনি হুড়ু মুড়ু করে সবাই তোমাদের দলে যদি ঢুক পড়ে তোমাদের নেতৃত্ব মেনে নিত, তাহলে আমিও বলতাম, ইনকিলাব নিন্দা—আঃ, এই ধোঁ!”

শৈবাল ছাড়িয়ে দিল, নাহলে অমল হাত বাড়িয়ে রমুর রেশমের মতো চুল যেভাবে খামচে ধরেছিল তাতে কয়েক গাছি উপড়ে আসতেও পারত।

রমু অমর কাছেই নালিশ করে বললে, “দেখুন, ওরা যে দুঃশাসন তার প্রমাণ হাতে নাতে। মিসেস তালুকদার তাইত কর্তাকে

ও কর্মীদের আনুষ্ঠানিক হার এক জন পিছদ চারজন। উল্লেখযোগ্য, কমলজিৎ সিং নামে জনৈক ব্যক্তিকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করার পর তাঁর তত্ত্বাবধানে গত ছ' বছরে অফিসার হিসেবে অস্বাভাবিক সংখ্যায় লোককে ঢোকানো হয়েছে। এই কমলজিৎ সিং ছিলেন রামাশেলের চীফ পার্সোনাল ম্যানেজার।

গৌরী সেনের টাকা?

আমাদের মতো অনুন্নত দেশে এই সংস্থার অফিসারদের বিলাস বাসনের জন্য কী রকম ব্যয় হয় তা শুনলে চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম। এক কলমের খোঁচায় তাদের এই ধরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি আড়াই শত টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটাইল অ্যালাউন্স বাবদ অফিসারদের এক হাজার টাকা দেওয়া হয়, যা কর্মীরা পান না। এই টাকা ফেরৎ যোগ্য নয়। দু বছর অন্তর ভারতের যে কোন জায়গায় প্রমোদ ভ্রমণের জন্য অফিসারদের পরিবার সুবিধা দেওয়া হয়।

আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন, উনিশ শ আষটি উনসত্তর সালে ভ্রমণ ব্যয় বাবদই খরচা হয়েছে পঞ্চাশ লাখ টাকা।

স্বজন প্রেমের পরাকাস্তা

চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে চাকরী-গুলোর জন্য ঠিকই। কিন্তু তা লোকের চোখে ধুলে দিতে। লীগাল অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়েছে জনৈক চিকারকে। ইনি সদ্য গ্রাজুয়েট হয়েছেন। এর চেয়ে

সব সময় সাবধান করেন। পুষ্পেন্দ্রবাবুও কেটে পড়ে বেঁচে গেছেন।”

এ কথায় অমলও নির্বিকারে হাসতে বধ্য হল। বললে, “আচ্ছা, তোর কী আক্কেল বলত রমু, ভদ্রলোক আমাদের অতিথি, এখনো পর্যন্ত এক কাপ কাফি পর্যন্ত এলো না। ফাস্ট ক্লাস বুজোয়া আর কী ভাবে হতে পারে মানুষ, বিশেষ মেয়েমানুষ।”

আমি ব্যস্ত হয়ে বাধা দেওয়ার আগেই রমু লম্বাজ রাঙা হয়ে বললে, “সত্যি কি অন্যান্য! অমলদা, এই পরস্টে আমি সম্পূর্ণ সারোডার করছি, পরাজিত দোষী ক্ষমাপ্রার্থী। শিল্প, একটু বসুন, দেখবেন, একদম দেরি হবে না।”

আমি বললাম, “না, না, ব্যস্ত হবেন না, শুনুন।” কিন্তু একটা ব্যাপারে মেয়েরা কাবও কথাই শোনেনা। রমুও শোনেনি। রমুকে হটিয়ে অমল অতঃপর শান্তিতে তার বাকি বস্তব্য ফের শুরুর করল।

যোগ্যতাসম্পন্ন অনেকেই আবেদন করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য, এই চিকারাই আই ও সির চেয়ারম্যান এন এন কাম্যপের আস্থায়। ডি এন সিনহা হচ্ছেন একজন সাধারণ গ্রাজুয়েট। অ্যাকাউন্টেন্টে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাঁকে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কলকাতা অফিসে নিয়োগ করা হয়েছিল। দু বছরের মধ্যে তিনি অফিসার পদে উন্নীত হয়ে গেলেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর, ডি এন সিনহা অলাদাভাবে ইন্টারভিউ নেওর হয়েছিল। অথচ সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল—কমার্সে সেকেন্ড ক্লাস গ্রাজুয়েট ও অ্যাকাউন্টেন্টে অন্ততঃ পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় এই চাকরী-টির জন্য। নেপথ্য সংবাদ, এই ডি এন সিনহা হলেন কলকাতা শাখার ফিন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার এন এন সিনহার ছোট ভাই। চৌদ্দ পনের মাস আগে পঞ্চাশ জন সেলস অফ-

সুরকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে সংবাদপত্রে কোন বিজ্ঞাপন না দিয়ে। অফিসার পদে (গ্রেড-এক) সাধারণ গ্রাজুয়েট জনৈক সিনহাকে সেকশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ-পত্র দেওয়া হয়েছে। এই পদটির জন্যও সংবাদপত্রে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। এই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস এন সিনহার একজন নিকট আস্থায়। এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ ছাড়িয়ে আছে।

জনসাধারণের টাকা নিয়ে
অমার্জনীয় অপব্যয়

এখানেই বিস্ময়ের শেষ নয়। জনসাধারণের টাকা খোলামুচির মতো খরচা করা হয়েছে। উনিশ শ আটষটি সালে জনৈক রামপদ্রীয়ায় আটশ লাখ টাকা বাড়ি ভাড়ার জন্য অগ্রিম দেওয়া হয়। অথচ সে বাড়ি দু বছর হয়ে গেলেও আজও পুরো হয় নি। টাকাদা দেওয়া হয়েছিল দুতলা, তিনতলা ও চারতলার ভাড়া হিসেবে। বাড়ির ঠিকানা এক নং থিয়েটার রোড। এই টাকা দিয়ে আই ও সি কতৃপক্ষ নিজেরাই একটা বাড়ি তৈরী করতে পারতেন।

আই ও সি কতৃপক্ষ তাদের

নব কংগ্রেসে অসুস্থ নন্দ চাঁপ হুইপের পদত্যাগ ও প্রত্যাহার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দর্পণ বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার চীফ হুইপ প্রফুল্লকান্তি ঘোষ এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই পদত্যাগ করেছিলেন। চৌঠা এপ্রিল তিনি পদত্যাগ করেন। তারপর বেঝানোর পর বর্তমান বিধান সভার অধিবেশন অর্থাৎ সতেরই মে পর্যন্ত চীফ হুইপ থাকতে রাজী হয়েছেন এবং নেপথ্যে কোনো ঘটনা না ঘটলে আঠারই মে আবার পদত্যাগ করবেন।

এই ব্যাপারের তেমন রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। নব কংগ্রেস দলে উপদলীয় কৌদলের পরিণতিতেই প্রফুল্লকান্তির পদত্যাগ। জানা গিয়েছে, বিজয় নাহারের উপদল

যেভাবে মন্ত্রিসভার ক্ষমতা দখল করে কাজকর্ম চালাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে প্রফুল্লকান্তিও দল করে যাচ্ছেন। নব কংগ্রেসেরই একটা মোটা অংশ প্রফুল্লকান্তিকে মন্ত্রিসভার আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাগড়া দেন বিজয় সিং নাহার। তিনি বলেন, এক বাড়ী থেকে দুজনকে (তরুণকান্তি ঘোষ ও প্রফুল্লকান্তি) মন্ত্রী করা শেভন হবে না। প্রফুল্লকান্তির দল এতে ক্ষুব্ধ হন। তখন ঠেকে চীফ হুইপ করা হয়। এতে প্রফুল্লকান্তি আরো রুদ্ধ হয়ে পদত্যাগ করেছিলেন।

প্রফুল্লকান্তিরা এখন ডঃ ত্রিগুণা সেনকে তালিম দিচ্ছেন বিজয় নাহারের বিরুদ্ধে।

নব কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকে ঝড়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ নব কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের বৈঠকে সেদিন ঝড় উঠেছিল। বিধানসভা ভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ছাত্র পরিষদের নেতা এম-এল-এ সুরত মথার্জি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের তুলোধোনা করেছেন। বলেছেন, গুরু কথা শুনেন মন্ত্রীদের চলতে হবে, নইলে দেখিয়ে দেবেন। প্রবীণ সদস্যরা সুরতর লক্ষ্যবস্তু দেখে মূর্ছকি মূর্ছকি হাসছিলেন। শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয়নাল আবেদিন তারস্বরে বলেন, তাহলে সুরতরই মন্ত্রিত্ব করুক, আমরা বাইরে থাকি। সুরত

তাতেও দমেননি। যাই হোক অনেক করে অবস্থা আয়ত্তে আনতে হয়। সভা শেষে সুরত বিজয় মারোয়াড়ীকে দিয়ে চলবে না বলতে বোরিয়ে আসেন।

অফিসারদের প্রমোদ খরচা দিয়ে থকেন। পার্টি, বার, রেস্টোরাঁ ও ‘ড্রিংকসের’ মহান খাতে এ সব ব্যয়। গত বছর বারোই ডিসেম্বরের এক সাকুলারে হেড অফিস কতৃপক্ষ জানালেন এ জন্য কোন ভাউচার পেশের প্রয়োজন নেই। অনেকেই এই সুযোগটির পূর্ণ সম্ভাব্যতার করছেন। সে সব নির্দিষ্ট খবরও আছে।

যদিও পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেড আতাচে আছেন, তবুও আই ও সির মন্ত্রিসভা নানা ছলে প্রায়শঃ জাপান, থাইল্যান্ড ইউ এস এস আর ঘুরে এসেছেন।

আই ও সির ঘোষিত নীতি বেকর গ্রাজুয়েট, ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডিপ্লোমাদারীদেরই ডিলার ও ডিসট্রিবিউটর করা হবে। এরই জন্য বিশ্বের মার্কেটিং অ্যাডভার্টাইসিং এজেন্সিসহসেটের মাধ্যমে দশ লাখ টাকা বিজ্ঞাপন খাতে খরচ করা হয়েছে। অথচ এ কাজ আই ও সির জনসংযোগ দপ্তর সহজেই করতে পারতো।

জেসপ কোম্পানীতে অপদার্থের বেতন পাঁচ হাজার টাকা

জেসপ কোম্পানীর বারোটা বাজতে চলেছে। ১৯৬৯ সালে যেখানে এই কোম্পানীর লোকসান হয়েছে ৪৮.৯২ লক্ষ টাকা সেখানে ১৯৭০ সালে লোকসানের পরিমাণ ২,২৪,৮২,১৬৭ টাকা। যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডি কে প্যাঙ্কহাণ্টের অপদার্থতার জন্য কোম্পানীর এই দর-বস্থা তাঁকে আগামী একপ্রিশে মে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রোডাকশান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে। বেতন পাঁচ হাজার টাকা। তাছাড়া অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও আছে।

রওশন মুখতিয়ার
ব্রাহ্মদেশের বার্ষিক প্রোগ্রাম ৫'০০

দীপায়ন ১৮এ, ট্যামার লেন, কলকাতা ১

বর্ধমানের পুলিশ জুপারের বিরুদ্ধে
গুরুতর অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ধমান জেলার পদ্মলিখ সদুপার পাঁচগোপাল মুখার্জী কতকগুলি কৃষিগত গেজেটেড অফিসারদের সহযোগিতায় নীচের তলার পদ্মলিখ কর্মচারীদের উপর নির্ধারিত চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে। পদ্মলিখ সদুপারের সমস্ত অত্যাচারের মূল বাঁটি বর্ধমান সদর থানা ও দুর্গাপুর থানা এবং আসানসোল থানা। অভিযোগ এই থানার বড়বাবুগণ এবং কিছু অফিসার পদ্মলিখ সাহেবের আমোদ প্রমোদের খোরাক জোগাচ্ছেন।

পদাংশ সদপার পাঁচুগোপাল মুখার্জী বৰ্ধমান সদর থানার সে সব অফিসার কংগ্রেসের সমর্থক তাদের সকলকেই সদর থানাতে রেখেছেন এবং যারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করে তাদের সদর থানা থেকে অন্যান্য বদলি করেছেন। এমনকি এমন কয়েকজন দারোগা ও জমাদার আছে যাদের বদলির আদেশ অনেক দিন হয়ে গেছে। কিন্তু তারা কতকগুলি সি পি এম কর্মী গ্রেপ্তার করার ফলে এই সব অফিসারদের পুনরায় সদর থানাতেই রাখা হয়েছে। যেমন দারোগা শঙ্করীপ্রসাদ, দারোগা রাখাল দে, দারোগা মনোজেন ঘোষ, দারোগা সুধীর পাল, জমাদার পাইদুষ মুখার্জী, জমাদার বিনয় পাল, জমাদার অশোক ঘোষ, কনষ্টেবল বসন্ত। এই সব অফিসাররা প্রায় দিনে একবার করে কংগ্রেস অফিস পরিদর্শন করে এবং কংগ্রেস কর্মীদের নির্দেশ অনুযায়ী সি পি এম কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে এমন অফিসার আছেন যিনি এই সদর থানায় জমাদার থেকে দারোগা পদে প্রমোশন পেয়ে এই সদর থানাতে পাঁচ বছরের অধিক আছেন বা বিধিবিহীনত।

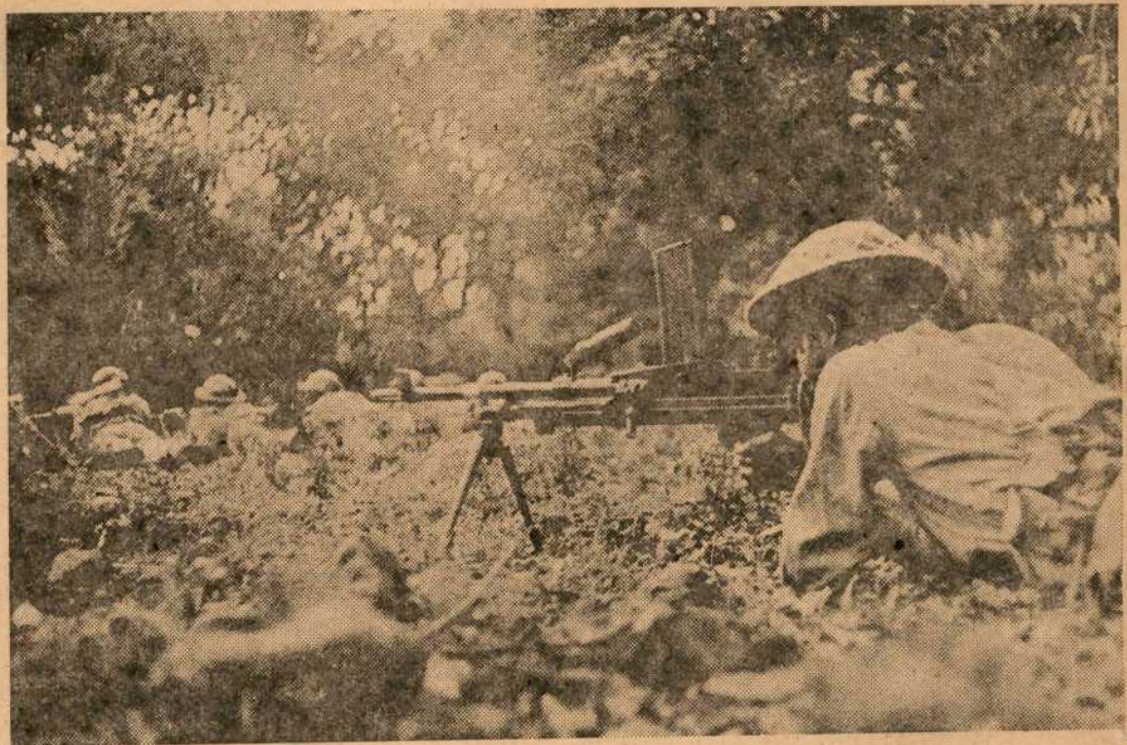
পদ্মলিখা সদুপার বর্ধমান
পদ্মলিখা লাইনে এম টি সেকশনে
নিজের মনোমত একজন দারোগা
সত্য চৌধুরীকে আসানসোল থেকে
আনিয়েছেন। এই সত্যাবাদ বর্ধ-
মান পদ্মলিখার অন্তর্গত যত কর্ডনিং
জিপ আছে (অন্ততঃ কুড়ি-পঁচি-
শটি) প্রতি কর্ডনিং জীপ থেকে
মাসিক একশ টাকা করে জীপের
মালিকদের কাছ হইতে আদায় করেন
বলে অভিযোগ। মালিকরা এই
টাকা দিতে অস্বীকার করলে জীপ
এবং লরীকে আনফিট বলে ঘোষণা
করা হয়। এর ওপর আছে পেট্রোল
চুরির ঘটনা।

পালিশ সদুপারের বিরুদ্ধে
মহিলা ঘাটত অভিযোগও আছে।
এ ব্যাপারে তাঁর দোস্ত জেলা
শাসক সৃজিত ব্যানার্জী। তাঁদের
ফর্তির কাহিনীও আমরা জানি।

এ সমস্ত আমোদ প্রমোদের
খরচার ব্যবস্থা করেন দুর্গাপুত্র
থানার ও সি বি জি বোস। একে
পদলিখ সদপার নিজ দায়িত্বে রাই-
টার্স বিন্ডিং থেকে সরাসরি দুর্গা-
পুত্র থানাতে নিযুক্ত করেছেন।
দুর্গাপুত্র থানার বড় থানার
আন্ডারে যত ফাঁড়ি ও আই সি
ক্যাম্প আছে তার অফিসারদের
কাছ থেকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা
করে আদায় করা হয়। ফরিদপুত্র
ফাঁড়ির একজন তরুণ মদুলমান
অফিসার সৈয়দ মহম্মদ রসুল এই
টাকার ভাগ দিতে অস্বীকার করলে
পাঁচশে মার্চ তারিখে তাঁকে সাম-
য়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।



সিলেটের রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা



কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
স্নাতকোত্তর পরিসংখ্যান
বিভাগে দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
দশতম বর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগে
দর্শনীতি সম্পর্কে অনেক অভিযোগ
দর্পণের কাছে এসেছে। এই
দর্শনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ-
পক্ষের ও বিভাগীয় শিক্ষকদের
একাংশ জড়িত বলে অভিযোগ
করা হয়েছে। দর্শনীতির ফলে অধিক
সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অকৃত-
কার্য হয় বলে প্রকাশ। গত দশকে
প্রতি বছর পাশের হার শতকরা

দশ থেকে পঁচিশের মধ্যে।

সম্প্রতি এই বিভাগে স্নাত-
কোত্তর পরীক্ষায় পাঁচটি থিওরিটিক্যাল বিষয়ের মধ্যে চারটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা বর্জন করে। তাদের বক্তব্য : পঞ্চম বিষয়ে অধিক নম্বরের সাহায্যেও তাদের পক্ষে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব ছিল না। এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা এঁদের সমর্থন করেছেন।

একজন মনুষ্যবোদ্ধা গ্রেনেড ছাড়ছেন। ছবি : প্রণব মন্থোপাধ্যায়

সম্পাদক—হীরেন বসু

কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬৯নং মট লেন, কলিকাতা-১০ দর্শন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

শ্যামপুকুর কেন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অজিত বিশ্বাসের হত্যারহস্য

দপ্পন

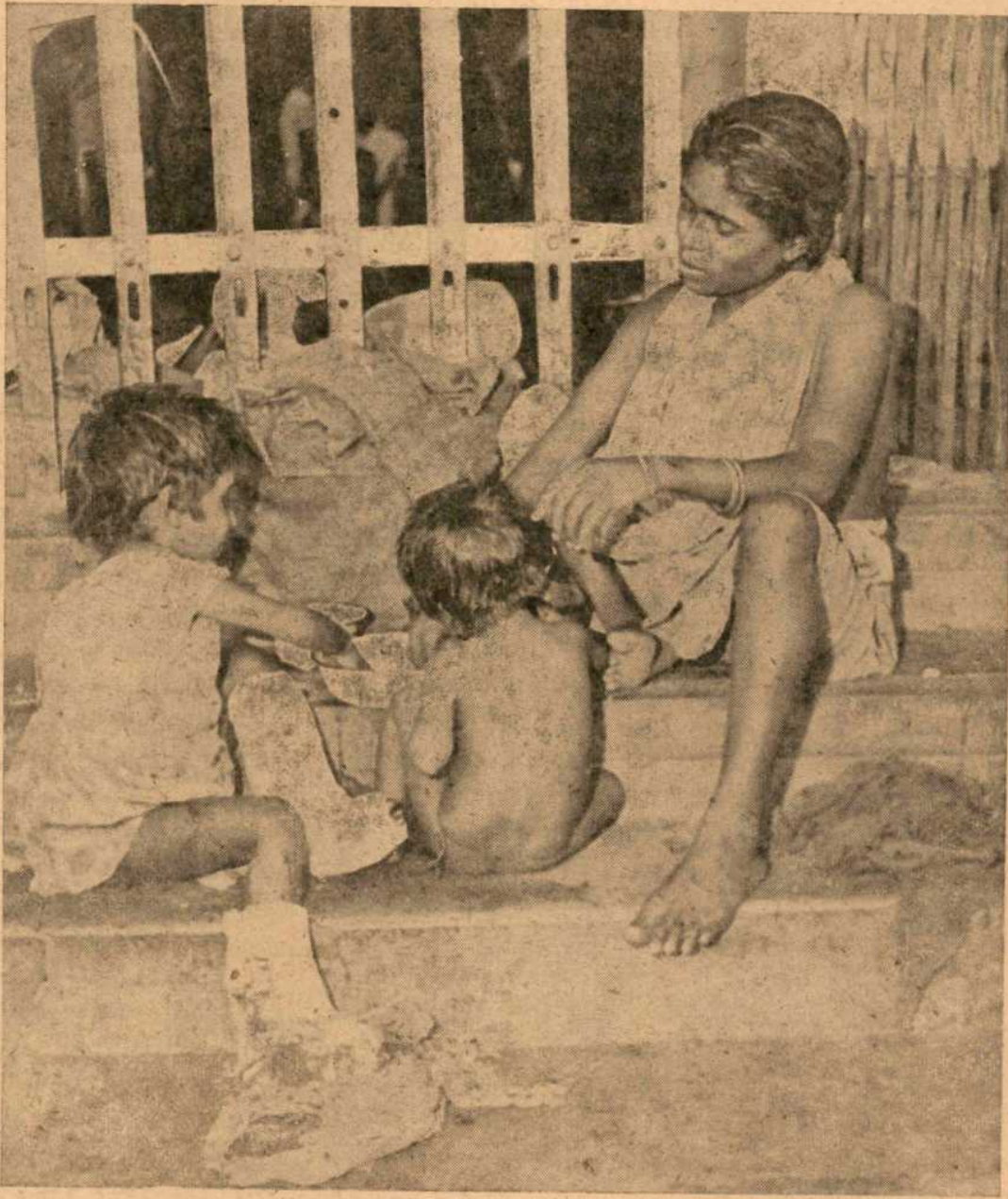
১৪শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা ৥ শ্রুতবার ২১শে মে ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা.

টাকার ব্যাপারে জুশীল ধাড়া অভিযুক্ত অজয়বাবু ও সতীশ সামন্তকে ডুবিয়েছেন

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

বাংলা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধ অবশেষে প্রকাশ্য রূপ নিয়ে চরমে উঠেছে। এইবার সত্য-কার শক্তি পরীক্ষা হবে অজয়বাবু আর সুশীলবাবুর মধ্যে। দলের তলবী সভা ডেকে সুশীলবাবুকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরাবার ব্যবস্থা পাকা হয়েছে কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে সুশীল ধাড়া সরে গেলে দলের যে টাকা দেনা থাকবে তার কি হবে। শ্রীসুশীল ধাড়া কিছুদিন আগে দলের কর্মপরিষদের সভায় বলেছিলেন গত নির্বাচনে মোট সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এবং এর মধ্যে দলের দেনা রয়েছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। যখন তাকে নেতৃত্ব থেকে সরাবার কথা উঠেছে অমনি ধাড়া বলতে সুরু করেছেন নির্বাচনে খরচ হয়েছে প্রায় দশ

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্ভাস্ত। ছবি : প্রণব মদুখোপাধ্যায়

ভাসানীকে নিয়ে জল ঘোলা হচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলাদেশের প্রবীণ নেতা মোলানা ভাসানীকে নিয়ে জল ঘোলা হচ্ছে। সি পি এম নেতারা প্রকাশ্যেই বলছেন যে, ভাসানী সাহেবকে প্রায় নজরবন্দী অবস্থায় ভারতীয়-সীমান্ত পুলিশ রেখে দিয়েছে। এই অভিযোগ আসার সঙ্গে

সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার আর হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড মোলানা ভাসানীর এক সাক্ষাৎকারের বিবরণী প্রকাশিত হয়। ভাসানী সাহেবের সঙ্গে যে কোন সংবাদপত্রে এখন একক সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে যে ধরণের খবর লোকে আশা করে তার

কিছুই এতে ছিল না। অনেকের সন্দেহ যে, হয়ত বা এই সাক্ষাৎকার আদৌ হয় নি, কেবলমাত্র সি পি এম-এর অভিযোগ খণ্ডন করার তাগিদেই পুলিশের অনু-রোধে এই ধরণের একটি সংবাদ প্রচার করা হয়েছে।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ত বিবরণীতে খোলাখুলি বলেছে সাক্ষাৎকার প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। এই সংবাদপত্রে বলা হয়েছে যে, সাক্ষাৎকার প্রমাণ করে যে ভাসানী সাহেব বাংলাদেশে

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

প্রধানমন্ত্রীর অধানত্ব একটি দপ্পর বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডে জড়িত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে গত এক-বছর ধরে যে খুন চলেছে তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। জানা গেছে যে খোদ প্রধান মন্ত্রীর অধীনে আছে এমন একটি দপ্পর এই সব খুনের সঙ্গে জড়িত।

দপ্পরটির নাম রিসার্চ এন্ড অ্যানালিটিক্যালি উইং। এদের কাজ দেশের মধ্যে বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর জোগাড় করা এবং বিদেশী

কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সেই খবর আদান-প্রদান করা।

পশ্চিমবঙ্গে এদের প্রধান লক্ষ্য মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। যেমন একদিকে এরা সি পি আই (এম)-এর কর্মীদের খুন করার ব্যাপারে উৎসাহ যোগাচ্ছে ততমত আবার সময় সময় অন্যান্য দলের কিছু নেতা ও কর্মী খুন করিয়ে তাদের পরোচনা যোগায় সি পি আই (এম)-এর ঘাড়ে দোষ চাপাতে। এই ব্যাপার খুব বেড়ে গিয়েছিল গত নির্বাচনের ঠিক আগে।

এই দপ্পরটির কর্তা হচ্ছেন যুক্ত প্রদেশ কাডারের একজন সিনিয়র আই পি এস অফিসার। কলকাতায় সম্প্রতি এরা নিজেদের অফিস খুলেছে এবং “স্বাধীন” ভাবে নিজেদের কাজ চালায়ে যাচ্ছে। এই দপ্পরের হাতে প্রচুর টাকা আছে যা এরা খুশীমত কোন হিসাব না দেখিয়ে খরচা করতে পারে। এই টাকা থেকে এরা বিভিন্ন সময় নিজেদের পোষা খুনিদের বখশিসও দিয়ে থাকে।

এদের এই স্বাধীন কার্যকলাপ রাজ্যের পুলিশ মহলে যথেষ্ট বিরক্তির সৃষ্টি করেছে। কারণ রাজ্য পুলিশ বিশেষ করে গোয়েন্দা দপ্পর, অনেক সময় জানতেই পারে না এরা কী করছে যার ফলে কোন খুন হলে তার তদন্ত করতে গিয়ে দেখে যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ছে। তখন তদন্ত ধামাচাপা দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। বিশ্বস্ত-সূত্রে জানা গেছে যে প্রমথের শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যার পেছনেও এই দপ্পরের হাত ছিল। এবং একথা আজ সকলেরই জানা যে হেমন্তবাবুর হত্যার কিনারা করতে গিয়ে কলকাতা পুলিশ কী ভাবে বেগ পাচ্ছে—একজন কমিশনারকে ত বিদায়ই নিতে হল।

এই দপ্পরটির সঙ্গে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলিরও যোগাযোগ আছে। উদ্দেশ্য কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর বিনিময়। জানা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) সম্পর্কে যে খবর এরা বিদেশীদের দেয় তার বিনিময়ে মোটা অর্থ এদের হাতে আসে। এবং অনেক সময় এই বিদেশী সংস্থাগুলিই এদের বুদ্ধি দেয় কী ভাবে কমিউনিস্টদের “জব্দ” করা যাবে সে সম্পর্কে।

শহরের অনেক অঞ্চল এখন মাস্তানদের কবলে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এতদিনে পশ্চিমবঙ্গে কোয়া-লিশন সরকার বিব্রত বোধ করছেন এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির দ্রুত অবনতিতে।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

অজিত বিশ্বাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জুড়ে ঘাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ লোক অনেকে অন্য এলাকায় উদ্ভাসিত, নয়ত নিজ গৃহে এবং এলাকায় নড়িরা।

সমাজ বিরোধীরা বাড়ী বাড়ী এসে টাকা জুলুম করে নিয়ে যায়। প্রশ্ন করলে বলে এলাকায় থাকতে গেলে মামুল দিতে হবে। মাঝে মাঝে কথা বলার সময় নিজেদের রিভলবারটী প্রশ্নকারীকে দোঁখিয়ে দেয়।

শ্যামপদকুর এলাকায় হাই-কোর্টের বিচারপতি কে এল রায় এই জুলুমের প্রতিবাদ করেছিলেন। ফলে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন। এলাকার সাধারণ মানুষ খুঁটিনাটি জানে কারা এই হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের রাজনৈতিক কি-এবং টাকা পরস্যা নিয়ে তারা কি করে।

এলাকার বহু লোক দুর্গকে বলেছে যে, পুলিশকে এদের সম্পর্কে কোন নালিশ জানানোর উপায় নেই, কেননা সপ্তে সপ্তে নালিশের খবর ওদের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে অভিযোগ-

কারীর বরাতে মৃত্যু অবধারিত। পুলিশের বিনোদন প্রণীত কর্মচারীরা বলে যে, তারা এলাকার সমাজবিরোধীদের গতিবিধি সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানে। কিন্তু তাদের কর্মক্ষমতা ওপরের আদেশের দ্বারা সীমিত। প্রকাশ্যেই তারা স্বীকার করে যে, ধরার আদেশ দিলে সমাজ বিরোধীদের টিট করা তাদের পক্ষে খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। অনেককে ধরাও হয়েছিল। হালেই ওপর মহলের অঙ্গদেশে তারা ছাড়া পড়েছে। বোরিয়ে এসে তারা আরও হিংস্র, বেপরোয়া।

গত মঙ্গলবার রাতে অজিত বিশ্বাস নিহত হওয়ার আগেকার দু-একটা প্রসঙ্গিক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এবারে শ্যামপদকুর উপনির্বাচনে ফঃ রকের কংগ্রেসীদের সঙ্গে যুক্ত নির্বাচনী মোর্চা করার কোন প্রকাশ্য বাধা নেই। তাই বিভিন্ন এলাকায় অজিত বিশ্বাসের পক্ষের নির্বাচনী কর্মীদের সভায় কংগ্রেসী নেতারা ও অজিত বিশ্বাস নিজে প্রচারণার সম্পর্কে আলোচনা সুরু করেছিলেন।

গত সপ্তাহের শেষের দিকে নতুন বাজার এলাকার কর্মীদের একটি গোপন সভায় কংগ্রেস নেতা-

বিজয় সিং নাহার উপস্থিত ছিলেন। কর্মীরা এলাকায় নকশাল বলে পরিচিত। এদের মধ্যে অনেকেই আবার ছেনতাই ইত্যাদি নানা সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত।

শ্যামপদকুর ও জোড়াবাগান এলাকায় নির্বাচনে সি পি এম ছাড়া অন্য যে কোন দলের এই সমাজ বিরোধী মাস্তানদের সাহায্য নিতেই হবে। সি পি এম-এর সংগঠন আছে, ক্যাডার আছে। অন্য কোন দলের এই ধরনের সংগঠন ওই দুই এলাকায় নেই। তাই সি পি এম বিরোধিতায় সমাজ-বিরোধীদের সাহায্য দরকার।

শ্রীনাহার নতুন বাজারের কর্মী সভায় গেলে তাঁর কাছে কর্মীরা কয়েকটি নামের একটি তালিকা পেশ করে। তালিকা ভুলত সবাই এলাকার মাস্তান, এখন বিভিন্ন অভিযোগে জেলে বা হাজতে। কর্মীদের দাবী ছিল আটকান এই মাস্তানদের ছেড়ে না দিলে ওরা এই এলাকায় নির্বাচনে হতে দেবে না। পরোক্ষে ওরা ইঙ্গিত দেয় যে, নির্বাচন বন্ধ করার জন্য ঠিক যা করার দরকার ওরা তাই করবে। সুবিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রীনাহার সভা থেকে বেরিয়ে আসেন।

শ্রীঅজিত বিশ্বাস যে কর্মী সম্মেলনে মঙ্গলবার সম্মান্য হাজির হয়েছিলেন সেখানে উপস্থিত সবাই গরানহাটা অঞ্চলের তথাকথিত নকশালী। বিডন স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে গোপন সভা বসে। কর্মীরা আগে থেকে বলে দেয় অন্য কাউকে যেন শ্রীবিশ্বাস সঙ্গে না আনেন।

শ্রীবিশ্বাসের মনে সন্দেহ হয়েছিল যে মঙ্গলবার রাতে সভায় তিনি আক্রান্ত হতে পারেন। তাই সকালে কয়েকবার তিনি পুলিশের উদ্ধতন মহলে আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন অবিলম্বে সশস্ত্র বডিগার্ডের জন্য। এই বডিগার্ড দেওয়া হয়েছিল কি না এই নিয়ে পুলিশ এবং ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

একথা সুনিশ্চিত যে, ঐ বাড়ীর সভায় শ্রীঅজিত বিশ্বাস কোন বডিগার্ড না নিয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন। সভা চলাকালীন তিনি হঠাৎ উঠে পড়েন। আপাততঃ সভায় মতান্তর হয়। শ্রীবিশ্বাস তাড়াতাড়ি বোরিয়ে এসে দাঁড়ান, জাঁপে উঠতে যান। তার সঙ্গে ছয় সাত জন যুবক বোরিয়ে আসে।

জাঁপে একটা পা তিনি তুলে-

ছেন সেই সময় তাকে লক্ষ্য করে খুব কাছে থেকে পর পর ছবার গুলি করা হয়। গুলি বাইরের কোন দল ছুঁড়ে পারে অথবা সভার মধ্যে থেকে যাত্রা ঘোরিয়ে এসেছিল তারাও ছুঁড়ে থাকতে পারে। বাইরের কোন অপরিচিত লোক বা দল ওই এলাকায় সম্মান্য ঘোরাঘুরি করতে পারে না পাড়ার মাস্তানদের দাপটে। এই মাস্তানদের একাংশ শ্রীবিশ্বাসের সভায় উপস্থিত ছিল।

যারা গুলি ছুঁড়েছে তারা অবশ্যই সভায় উপস্থিত মাস্তানদের একাংশ, নতুবা তাদের খুব পরিচিত। এরা বহুদিন আগেই ওই এলাকা থেকে সি পি এম এবং তাদের সমর্থকদের উৎখাত করে একচ্ছত্র হয়ে বসে আছে। ওই এলাকায় একটি মিষ্টির দোকানে আর একটি রেন্ট্রেরেন্ট ওদের দিনভোর আড্ডা। মাঝে মাঝে উক্ত কলকাতার ডি সি শ্রীবিভূতি চক্রবর্তীকে ওই মাস্তানদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মিষ্টির দোকানে দই খেতে দেখা যায়।

রাজনৈতিক মহলে শ্রীবিশ্বাসের হত্যায় কিছুটা বাস্তব জ্ঞান ফিরে এসেছে। অনেকে বুঝতে পারছে যে, নিজেদের প্রয়োজনে মাস্তানদের সাময়িক ভাবে ব্যবহার করলে নিজেরাই কোন দিন ওদের হাতে বেধোরে মরবেন। সি পি আই নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী আর ফরোয়ার্ড ব্লকের কেউ কেউ এখন সমস্ত দলের যুক্ত মাস্তান বিরোধী কর্মপন্থার কথা বলতে সুরু করেছেন। অবশ্যই আশার কথা, কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মাস্তানদের যে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেই অবস্থায় ওদের হাত থেকে বোরিয়ে আসা শক্ত।

মাস্তান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাবিনেট এই বিষয়ে একটি বিশেষ সভা করার পরিকল্পনা করেছে।

পি ভি এ্যাঙ্কি ছাড়াও নতুন আর একটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স চালু করা হয়েছে, যার বলে যাকে খুসী গোপ্যার করা যাবে। এত সঙ্কেত পরিষ্কারিতর উন্নতি হয় নি।

ক্যাবিনেট মনে করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ঠিক কাজ করতে পারছে না। সরকার নাকি সমাজ-বিরোধীদের গতিবিধির সঠিক খবর পাচ্ছেন না। এই গতিবিধি এত প্রকাশ্যে যে, এর জন্য এখন আর গোয়েন্দা বিভাগের গোপন লাবাদে প্রয়োজন হয় না।

কলকাতা আর শহরতলীর কোন কোন অঞ্চল সমাজ বিরোধী অধ্যুষিত তা এখন প্রায় জানা। সেখানে দিনের পর দিন বোমাবাজী হয়ে চলেছে, লাস পড়ে থাকছে, আর বাড়ী বাড়ী জুলুম করে টাকা আদায় করা হচ্ছে।

সুশীল খাড়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লক্ষ টাকা এবং দেনার পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকা। শ্রীপারুল সাহা সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন শ্রীখাড়া চব্বিশ পরগণা জেলার এক কর্মী সভায় নির্বাচনে দশ লক্ষ টাকা খরচের কথা বলেছেন।

আর একদিকে যখন তলবী সভা ডেকে শ্রীখাড়াকে তাড়বার ব্যবস্থা প্রায় পাকা তখন শ্রীখাড়া বলে দিচ্ছেন তাকে যারা তাড়াবে এই দেনার ভার তাদের নিতে হবে। অবশ্য শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়ও কাঁচা ছেলে নন। তিনি অনেক অভিযোগের সঙ্গে টাকার কথাও তুলেছেন এবং বলেছেন বাংলা কংগ্রেস সচিবের পর থেকে শ্রীখাড়া কখনও দলের সামনে কোন হিসাবপত্র রাখেন নি। কাজেই ঐ সব টাকা পরসার

ভাসানী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মুহুর্ত, এবং সি পি এমের অভিযোগ মিথ্যা। কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে পাঠকের প্রত্যয়ের জন্য বলা হয় বাংলাদেশের কোন এক জায়গায় এই সাক্ষাৎকার ঘটে।

এই কাহিনী প্রচারের পরের দিনই ভাসানী সাহেবের ছেলে কলকাতায় এসে হাজির হন। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় যে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করেও পুত্র পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ব্যর্থ হয়েছেন।

কথা আমরা কিছু জানিনা। ঠিক হিসাব পত্র করলে দেখা যাবে কিছু দেনা আছে না পাওনা আছে। বাংলা কংগ্রেসের দেনা প্রসঙ্গে ফাঁসাদে পড়বেন শ্রীঅজয় মুখার্জী কারণ কোষাধ্যক্ষ হিসাবে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নাম আছে।

শুধু অজয়বাবু নন দেনার দায়ের আরো একজন। দুবেছেন, তিনি হলেন বাংলা কংগ্রেসের নির্বাহী নেতা শ্রীসতীশ সামন্ত। শ্রীসামন্ত মহিষাদলে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের নামে একটি হল লাইব্রেরী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য বেশ কিছু টাকা দিয়েছিল। সেই সঙ্গে সতীশ বাবুও টাকা তুলেছিলেন অনেক। সতীশবাবু দিল্লীতে থাকেন তাই কাজের দেখা শোনা ও পরিচালনার ভার ছিল শ্রীসুশীল খাড়ার উপর। কাজ শেষ হলে অনেক দিন পরে হিসাব নিয়ে দেখা গেল শ্রীসামন্তের সমস্ত হাজার টাকা দেনা হয়ে গেছে। শ্রীসামন্ত, মাথায় হাত দিলেন। বৃন্দ সামন্তের নিজের বলতে কিছু নেই। তিনি এখন সমস্ত হাজার টাকা কোথায় পাবেন। তবু তিনি পাওনা দারদের বন্ধন-যাহোক যে দেনা হয়েছে তিনি ধীরে ধীরে শোধ করবেন। এর মধ্যে শ্রীসামন্তের সমস্ত জন্ম দিবস এসে গেল। শ্রীখাড়া উদ্যোগ নিলেন যে, সতীশদার জন্মদিনে তাকে সমস্ত হাজার টাকার একটা তোড়া দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য হল জন্ম দিবসের নামে টাকা তুলে সেই টাকায় সতীশবাবুর দেনা শোধ করা। জন্ম দিবসের জন্য বিরাট উদ্যোগ আয়োজন পরিকল্পনা করা হল কলকাতা, তমলুক দিল্লীতে।

জন্ম দিবস হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় টাকা? জন্ম দিবসের সমস্ত হাজার টাকা দুরে থাক শ্রীসামন্তকে একটী হিসাব দাখিল করা হল। যে হিসাবে দেখা গেল এই জন্ম দিবস করতে গিয়ে আরো পঁচিশ হাজার টাকা দেনা হয়ে গেছে। কাজেই সেই টাকাও শ্রীসামন্তকেই দিতে হবে। শ্রীসামন্ত এখন নিজের জন্ম দিবস অনুষ্ঠানের দেনার টাকা মিটাতে মাথায় হাত দিয়েছেন। কয়েকদিন আগে বাংলা কংগ্রেসের শ্রীআমজাদ আলি সতীশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন শ্রীসামন্ত তার এই সব দুঃখের কথা কিছু আমজাদকে জানিয়ে বলেন বাংলা কংগ্রেস থাকলেই বা কি গেলেই বা কি, আমি শুধু ভাবছি যে কদিন বেচে থাকবো—তাঁতে এই দেনা শোধ করতে পারবো কিনা? সতীশবাবু ফেসেছেন এক দেনার আর অজয়বাবুর ভাবনা শ্রীখাড়াকে সরতে গেলে কত টাকা দেনার ভার তার উপর চপানো হবে। এই সব পাওনাদাররাও সুশীলবাবুকে দলে রাখবার জন্য অজয়বাবুর উপর চাপ সৃষ্টি করবে নিশ্চয়ই কিন্তু তার চেয়ে ভয়ের কথা—সুশীল টাকা পরস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক কিছু বলতে পারে যাতে তার বিপদ বাড়বে। তাছাড়া শ্রীখাড়া শুধুমাত্র তলবী সভার নোটিশে আত্মসমর্পণ করবেন বা সম্পাদক মন্ডলী পুনর্গঠন করবেন এমন সম্ভাবনা নেই বরংই চলে। সেখানে শ্রীখাড়া নিশ্চয়ই শক্তি পরীক্ষায় নামবেন এবং তার প্রত্যাশিত তিনি অনেকদিন আগে থাকতে সুরু করেছেন। জেলায় জেলায় গিয়ে কর্মী সম্মেলন করে

অজয়বাবুর বিরুদ্ধে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন।

কিন্তু সব চেয়ে মজার ঘটনা ঘটবে বাংলা কংগ্রেস কর্মী-পরিষদের সদস্যদের তালিকা নিয়ে। কারণ যে সদস্য তালিকা নিয়ে অজয়বাবু প্রণববাবু সুশীল খাড়াকে হটাতে চাচ্ছেন পরে দেখা যাবে সেই তালিকাই। ঠিক নয়। শ্রীখাড়া নিজের সংখ্যাধিক্য দেখাবার মত কর্মপরিষদ অনেক আগেই নতুন করে গড়েছেন—যাদের কাছে সুশীল খাড়া হলেন নেতা, অজয়বাবু কেউ নন। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে সম্প্রতি বাংলা দেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক কমিটি গঠন প্রসঙ্গে। অজয়বাবুর নেতৃত্বে বাংলা দেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক কমিটি গঠিত হলে সুশীলবাবু রাতারাতি ডাঃ ভূপাল বসুকে নিয়ে পাক্কা কমিটি গঠন করেন। এর পর মুক্তি সংগ্রাম কমিটি যখন জেলায় জেলায় শাখা গঠনের নির্দেশ দেয় তখন সুশীলবাবু দলকে পাক্কা নির্দেশ সাকুলার দিয়ে জানিয়ে দেন যে অজয়বাবুর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সঙ্গে তার দলের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে জেলায় জেলায় সব দলের সদস্য নিয়ে যখন বাংলা দেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক কমিটি গঠিত হয় সেখানে বাংলা কংগ্রেস যোগদান করে না। এই ঘটনায় দলের মধ্যে প্রভাবের একটা শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। যাহোক চরম শক্তি পরীক্ষা তলবী সভাতেই হবে তবে সুশীলবাবু তলবী সভার ব্যবস্থাকেও বানচাল করার জন্য পুরো উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

সাম্প্রতিক ডলার সংকট পৃথিবীব্যাপী

আর্থিক সংকটের বিপদ সংকেত



(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন ডলারের সংকটের দরুণ আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থায় যে অভূতপূর্ব বিপদ দেখা দিয়েছিল, তার ফলে পশ্চিম জার্মানীর মার্ক মুদ্রার মূল্য ৯.২৯ শতাংশ বাড়তে হয়। ফলে পশ্চিম জার্মানীর রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে তুলনামূলক ভাবে বৃটেন ও আমেরিকা স্টার্লিং ও ডলার রিজার্ভ মুদ্রার মালিক দুটো দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাময়িকভাবে খানিকটা সুবিধা হয়। কিন্তু স্টার্লিং ও ডলার মুদ্রার সংকট এর ফলে কেটে যায় নি। কারণ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংকটের মৌলিক কারণগুলি এই দুটো রিজার্ভ মুদ্রাকে আরো গভীর সংকটের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

একথা সকলেরই জানা আছে যে আন্তর্জাতিক লেনদেনে বৃটেনের পাউন্ড স্টার্লিং এবং আমেরিকার ডলার মুদ্রা রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ বৃটেন ও আমেরিকা নিজের নিজের দেশের মুদ্রা ভাঙ্গিয়ে নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক হারে সোনা দিতে আইনত অঙ্গীকারবদ্ধ। এই আন্তর্জাতিক হার ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট প্রায় জবরদস্তি করে সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকেই মেনে নিতে বাধ্য করেন।

১৯৩৪ সালের পর ১৯৭১ সাল মাঝে সাঁইগ্রিশটী বছর কেটে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ হয়েছে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ক্রমকমতা কমেছে বা পণ্যমূল্য বেড়ে গেছে, কিন্তু আমেরিকা কিছতেই সোনার দাম ১৯৩৪ সালের বাঁধা দর আউন্স প্রতি পঁয়ত্রিশ ডলারের চেয়ে বাড়তে রাজী হয় নি। কারণ তাহলে মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতা আরো অনেক কমে যাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন অর্থনীতি পরিচালিত হয়। ডলার মুদ্রা অন্যতম আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হওয়ার ফলে এবং বৃটেনের স্টার্লিং মুদ্রা মার্কিন ডলারের মূল্য নিভর করে থাকার ফলে আমেরিকার এই সম্প্রসারণ নীতি গোড়ার দিকে বেশ কিছু সাফল্য লাভ করে।

কিন্তু এই আর্থিক সম্প্রসারণ নীতির স্ব-বিরোধিতাও সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী ধন-তান্ত্রিক বাজার সংকুচিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং চীন মিলিয়ে প্রায় একশ দশ কোটি মানুষ অধ্যুষিত বিশাল এলাকা—পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ বাজার এই সব বৃহৎ

পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির হস্তচ্যুত হয়। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যেমন বাজার ও কাঁচামালের উৎস দখলের জন্যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বিরোধ শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হল,— যুদ্ধ শেষ হবার পর দেখা গেল সেই মৌলিক বিরোধ আরো তীব্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কারণ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে পুঁজিবাদের বাজার আরো অনেক সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

সুতরাং এই সংকুচিত বাজার নিয়ে রেয়ারেই শেষ পর্যন্ত দেখা দেবেই একথা বুদ্ধিতে না পারার কারণ নেই।

বাজার দখলের এই লড়াই-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে অগ্রণী এবং ডলার রিজার্ভ মুদ্রা এই সম্প্রসারণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার সমস্ত সুযোগ আমেরিকা গ্রহণ করেছে।

যুদ্ধ বিধবস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনের কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী হয়ে মার্শাল পরিকল্পনা প্রবর্তন করে। যুদ্ধকালে আমেরিকা যুদ্ধরত ইউরোপীয় মিত্র-দেশগুলিকে সাঙ্গসরঞ্জাম ও পণ্য সরবরাহ করার কেন্দ্র ছিল। ফলে আমেরিকায় অভ্যন্তরীণ দ্রুত হারে শিল্পকারখানা বেড়ে ওঠে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই কলকারখানা, বা উন্নত কৃষি উৎপাদনকে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় কমিয়ে দেওয়া যায় না। অর্থাৎ উৎপন্ন পণ্যের প্রয়োজন থাকলেও বিধবস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির ক্রয় সামর্থ্য নেই। তাই উৎপাদন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে আমেরিকাকে প্রায় সবটা উৎকৃষ্ট পণ্য ধারে বা মজুরী হিসাবে ইউরোপকে দিতে হতো।

কিন্তু পণ্য উৎপাদনের অভ্যন্তরীণ খরচ মেটাবার দায় দায়িত্ব তো এড়ানো যায় না। প্রাথমিকের মজুরী কাঁচামালের দাম যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণ এগুলো তো দেশের ভেতরেই মেটাতে হবে। পণ্য বিক্রয় করে বিদেশ থেকে সোনা বা রিজার্ভ মুদ্রা পেলে তা দিয়ে ঐ দায় মেটানো যেত, কিন্তু বিধবস্ত দেশগুলির পক্ষে নগদ দাম দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমেরিকা ডলার মুদ্রা ছাপিয়ে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যোৎপাদনের খরচ মিটিয়ে দিতে থাকে। ফলে আমেরিকায় জিনিষপত্রের দাম বাড়তে থাকে, এবং আমেরিকায় তৈরী জিনিষপত্র আন্তর্জাতিক বাজারে দুর্মূল্য হয়ে পড়ায় কম বিক্রী হতে থাকে, আমেরিকার হাতে রপ্তানীযোগ্য মাল জমা হতে থাকে। এ হল সংকটের প্রথম ধাপ।

আমেরিকা তখন বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানীর চেয়ে পুঁজি রপ্তানীর দিকে বেশী মনোযোগ দেয়। ডলার

আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত থাকার ফলে বিভিন্ন দেশের সংরক্ষিত তহবিল (কারেন্সী রিজার্ভ) সোনা ও ডলার মিলিয়ে (এবং স্টার্লিং) রাখা হত। ইউরোপের শিল্পে পুঁজি কক্ষ দিয়ে এবং লন্সী করে আমেরিকা এর সুযোগ নিল।

প্রথমে বৃটেন, তারপর ছোট্ট ইউরোপীয় দেশের কমন মার্কেটে আমেরিকা পুঁজি লন্সীর উদ্দেশ্যে নগদ ডলার রপ্তানী করতে লাগল। এই লন্সীর প্রাথমিক রূপ মার্শাল পরিকল্পনা, তারপর বৈদেশিক আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের নানা রূপের আবেগ দিয়ে এই লন্সী চলতে লাগল। কমিউনিজমকে রুখে দেবার নাম করে পশ্চিম ইউরোপে মার্কিন সামরিক সাহায্য, সেনাদল সংরক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম ইত্যাদি বাবদ প্রচুর ডলার ইউরোপে (এবং এশিয়াতেও) পাঠানো শুরু হল। এই ডলার ভর্তুকি পশ্চিম জার্মানীর মার্ক, ফ্রান্সের ফ্রাঁ, ইতালীর লিরা ও বৃটেনের স্টার্লিং মুদ্রা এই সব দেশের মার্কিন ব্যাংকগুলিতে জমা পড়ল। এই ইউরোপীয় দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ সংরক্ষিত তহবিলে ডলার রিজার্ভ মুদ্রা জমা রেখে স্ব স্ব মুদ্রা বিনিময় করল। এর ফল হল সাংঘাতিক। সমস্ত ইউরোপীয় কমনমার্কেট ভুক্ত দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতি ডলারের শক্ত জালে আটকে পড়ল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বমোট বৈদেশিক লন্সী দ্বিতীয় যুদ্ধের ঠিক আগে ১৯৩৯ সালে ছিল বারোশ ত্রিশ কোটি ডলার, ১৯৬৫ সালে হয় ন হাজার চারশ কোটি ডলার ১৯৬৯ সালে এর পরিমাণ দশ হাজার চারশ কোটি ডলার। এই মোট বৈদেশিক লন্সীর অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচ হাজার দশ কোটি ডলার লন্সী হয়েছে পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে। এর মধ্যে সরাসরি মার্কিন সরকারী লন্সীর পরিমাণ দু হাজার দুশো কোটি ডলার।

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কুড়ি বছরে এই সব লন্সী থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুনাফার লভ্যাংশ পেয়েছে চার হাজার কোটি ডলার।

১৯৭০ সালে কমনমার্কেট ভুক্ত ছোট্ট দেশে মার্কিন লন্সীর পরিমাণ ছিল তিন হাজার কোটি ডলার। ইউরোপে ব্যবসারত ১৮-৭৪৪ বৃহৎ মার্কিন কোম্পানীর ১২৯৮৪ শৃঙ্খলিত কমনমার্কেট ভুক্ত দেশগুলিতে ব্যবসা করত। এরা খনি ও প্রেসিং শিল্পের চল্লিশ শতাংশ, আগেই দখল করে নিয়েছিল। মোটর শিল্পে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপীয় উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ এবং কানাডার মোট উৎ-

পাদনের ষোল্লানবুই শতাংশ এই বৃহৎ মার্কিন কোম্পানীগুলির কৃষ্ণগত হয়। তাছাড়া ট্রান্সফর্মার ইলেকট্রনিকস, জেনারেটর, মোটর গাড়ী, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কেমিকেলস, ও সিগেটিকস শিল্পে মার্কিন লন্সী দ্রুতহারে (১৬০ শতাংশ) বেড়ে যায়।

মার্কিন বৃহত্তম প্রথম দুশোটি কোম্পানীর প্রত্যেকটি কমন মার্কেটে এবং ইউরোপে শাখা খুলছে, নতুন স্থানীয় সার্ভিসিডারারী স্থাপন করেছে। ১৯৬৩-৬৫ সালে কমন মার্কেটের সবকটি দেশ মিলে শিল্পে যে মূলধন খাটাতো, একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার তিনগুণ লন্সীর মালিক। ১৯৬৭ সালে কমন মার্কেটভুক্ত দেশগুলি সতেরোটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে হস্তান্তর করে আর একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিনে নেয় আটচল্লিশটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই বছর সমস্ত কমনমার্কেটভুক্ত দেশ মিলে তেতাচল্লিশটি সার্ভিসিডারারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রী করে, একা আমেরিকা রেজিস্ট্রী করে তিরানবুইটি এবং এছাড়া নতুন আরো একশো চারটি বাণিজ্য সম্পর্কিত সার্ভিসিডারারী আমেরিকা এই বছর স্থাপন করে। ১৯৭০ সালের তিরিশে জুন পর্যন্ত কমনমার্কেটের ছোট্ট দেশে মোট মার্কিন লন্সীর পরিমাণ তিন হাজার কোটি ডলারের অঙ্ক ছাড়িয়ে যায় বলে

কমন মার্কেট কমিশনের রিপোর্টেই বলা হয়েছে। কমিশন বলেছেন,—“গত কুড়ি বছরে জেনারেল মোটরসের মত বৃহত্তম মার্কিন কোম্পানীও কমন মার্কেটে লন্সী-বাবদ এক ডলারও আমেরিকা থেকে পাঠায় নি। সবটাই এসেছে ডলার সাহায্য বাবদ জমা সরকারী লন্সী ভাঙ্গিয়ে।”

এছাড়া মার্কিন ব্যাংক ও অন্যান্য লন্সী প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন দেশের রপ্তানীকারকদের কক্ষ-দেবার জন্যে ব্যাংকরস এ্যাকসেসেটস অর্থাৎ মূল্য দেবার দায়িত্ববাবদ ব্যাংক লন্সীর পরিমাণ ক্রমগত বাড়িয়ে চলায় স্বল্পকালীন লন্সীর জন্যে ইউরো-ডলার বা ইউরোপে ভাঙ্গানোর জন্যে নির্দিষ্ট ডলারের পরিমাণ দ্রুত হারে বাড়িয়ে চলেছে।

ফলে স্বল্পকালীন দল বাবদ মার্কিন ডলারের প্রাচুর্য হেতু ইউরোপ এবং জাপান প্রভৃতি দূর প্রাচ্যের দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির হাতে অসম্ভব বেশী হারে ডলার জমা পড়ছে। এই ডলার বন্য়ার ফলে এই সব দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্য বৃদ্ধির জোয়ার দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ জমা ডলার ভাঙ্গিয়ে সোনা দেবার ক্ষমতা আমেরিকার নেই কারণ আমেরিকার মজুত সোনার পরিমাণ ক্রমগত লেনদেন ঘাটতির দরুন ১৯৪৮ সালে চব্বিশ হাজার মিলিয়ন ডলার (শেবাংশ ১৯ পৃষ্ঠার)

বিজয়গড় অঞ্চলে পুলিশী সন্ত্রাস ও গুণ্ডাদের রাজত্ব

(দপণের সংবাদদাতা)

ইদানীং যাদবপুরে আজাদগড়, গলফ ক্লাব, বাঁশদোণী, রাণীকুঠী গ্রী ও পল্লীগ্রী কলোনী, গান্ধী কলোনী ও বিজয়গড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অরাজকতার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এতদগুলির অধিবাসীবৃন্দের অভিযোগে জানা যায়, সি, আর, পির সহযোগিতায় গুন্ডাপ্রেশীর একদল সমাজ-বিরোধীর বোমাবাজী, মেয়েদের ইজ্জতহানি, নারী যুবক নির্বি-শেষে হত্যাণি নিত্যনৈমিত্তিকের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, সার্চের নামে বিভিন্ন বাড়ীর দামী দামী আসবাবপত্র তছনছ করার ঘটনাও রয়েছে।

সবুজ সাঁলের উনিশশে অক্টোবর কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র প্রশান্ত শুরকে আক্রমণের ঘটনার পর থেকেই এদের দৌরাত্ম্যের মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিবাসীদের ধারণা, পল্লিশ ও সি আর পির সহ-যোগিতা না পেলে এসব সমাজ-বিরোধীদের জলুমবাজী অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যেত।

জানা যায়, দশই মে নির্বাচনের পর সমাজবিরোধী ও সি আর পির যুগ্ম আক্রমণ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি

পেয়েছে। নির্বাচনের পর মাত্র এই কদিনে প্রায় আট শত জনকে ধরা হয়েছে। এবং প্রায় দুশো জনকে তিরিশটি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই সঙ্গে মৃত ব্যক্তিদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতনের সংবাদ তো আছেই। নির্বাচনের পর এই অঞ্চলে সমাজবিরোধী ও পুলিশ আক্রমণে সাতজন মারা গেছেন। এর মধ্যে একজন মহিলাও আছেন। বিজয়গড়ে আট নম্বর ওয়ার্ডটি সমাজ-বিরোধীদের এক প্রধান কর্মস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এই অঞ্চলে একটি ক্লাবের প্রাণণ বেসরকারী আদালতে পরিণত হয়েছে। পুলিশের বিভিন্ন দপ্তরে কুখ্যাত গুন্ডা হিসাবে যাদের নাম পাঠান হয়েছে তারই বর্তমানে বিচারকের ডায়েরী অবতীর্ণ। পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়া যে কোন যুবককে আগে এখানে আনা হয় তারপর এসব ব্যক্তিদের অনুমতিক্রমে কাউকে ছাড়া হয়, নতুন বেদম প্রহারের সঙ্গে ধানায় পাঠান হয়। এছাড়া সমাজবিরোধীদের দ্বারা জোর-পূর্বক পণ্ডাশ, একশো, পাঁচশো টাকা চাঁদা তোলার ঘটনাও এখানে সাধারণ মানুষকে বিবর্ত করে তুলছে।

ইছাপুর এখন ইত্যাকারীদের ঘাঁটি

বহু আশা ভরসা নিয়ে ভোট দিয়েছিলাম রাজ্যে একটা স্থায়ী প্রগতিশীল সরকার হবে এবং খুনো-খুনিটা বন্ধ হবে। মহামান্য লাটবাহাদুর জনাব শান্তি-স্বরূপ ধাওয়ানের কৃপায় গঠিত হলো “জাতীয় গণতান্ত্রিক কোয়ালিশিয়ান” সরকার, এলেন পশ্চিম বাংলার মন্ডিবর কিন্তু এর ফলে খুন বন্ধ হয়নি, বরং ইত্যা রাতের অন্ধকার ও চোরা-গোস্তা পথ ছেড়ে স্থান নিয়েছে দিবালোকে ও প্রকাশ্যে। এই প্রসঙ্গে আমার একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলছি।

গত ছয়ই মে সকাল নয়টা দশ মিনিট নাগাদ শিয়ালদহগামী শান্তিপূর লোকাল ইছাপুর স্টেশনের দুই নং প্ল্যাটফর্মে সিগনাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ইত্যা দেখলাম একটা ছেলেকে (কুড়ি-বাইশ) দশ-বারো জন তাড়া করে আসছে এবং দুই নং প্ল্যাটফর্মে তাকে ধরে ছোরা মারতে উদ্যত। ঠিক সেই মর্হুতেই আমাদের গাড়ীর লোকজন হৈ চৈ করে উঠতেই গুন্ডারা একটু থমকে দাঁড়ালো এবং সেই সন্ধ্যোগেই ছেলেকে দৌড় মারলো আমাদের কামরার দিকে, কিন্তু পরমর্হুতেই দেখলাম গুন্ডাদের একজন ছুটে এসে ছেলেকে জাপটে ধরলো। এমনি সময় আমাদের গাড়ী থেকে এক ভদ্রলোক সেই গুন্ডাটির মূখে লাথি বাসিয়ে দিতেই ছেলেকে পড়লো এবং সেবারের মতো প্রাণে বাঁচলো। পরে আলোচনা করে জানলাম ছেলেকের নাম মকুল; থাকে ইছাপুরের বিধানপল্লীতে,

ওরা দুই ভাই নাকি সি পি এম সমর্থক। ও বললো আজ বাঁচলাম আপনাদের দয়ায়, কিন্তু ওরা আমাদের কাউকেই বাঁচতে দেবে না। জানি না ছেলেকে এখনও বেঁচে আছে কিনা। সেদিন সারাটা পথ চিন্তা করছি “গণতান্ত্রিক” কোয়ালিশিয়ানের কী মহিমা। শুনলাম থানায় বলে কোনো লাভ হয়না,

মতামত

বরং পারলে পুলিশ নিজেই গুলি করে মারে।

তবে ইছাপুর এখন সমাজ-বিরোধীদের ও তথাকথিত নৃশাল বিপ্লবীদের একটা ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নোয়াপাড়া থানার ও সি স্ক্রিগিশ নাগেরই কৃপায়। প্রায় রোজই আগ ডাউন শান্তিপূর (এটা ইছাপুরের স্টপ নেই) সকালে ও বিকালে জোর করে সিগনাল দিয়ে থামানো হয় এবং গাড়ী তল্লাশি হয় শ্যামনগরের কোনো ছেলে পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্য। শ্যামনগরের ওপর ওদের খুব রাগ, ওখানকার ছেলে মেয়ে বড়ো সবাইই নাকি সি পি এম এটা কতদূর সত্য জানিনা।

আরও শোনা যাচ্ছে আগামী তেরোই মে তারিখের পর থেকে ওরা নাকি শ্যামনগরের কোন যুবককেই ইছাপুর অতিক্রম করে কলকাতায় যেতে দেবে না, রোজ

গাড়ী থামবে এবং বিপ্লবী রক্ত-মণ চালিয়ে যাবে। কিন্তু তেরোই তারিখে কেন বন্ধলাম না। তবে কী তেরোই তারিখের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ওদের বিশেষ ক্ষমতা দেবেন? এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, সেটা হচ্ছে এই নোয়াপাড়া থানার ও সি স্ক্রিগিশ নাগ এপ্রিলে খড়দহ থানায় বদলী হয়ে যায় এবং তার জায়গায় আসেন দমদম থানার ও সি ফলে

নতুন ও সির আগমনে দিনে-রাত্রে বোমার আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা গেলো সেই ও সি রিপোর্টিং নিয়ে হাজির হলো এই নোয়াপাড়া। শোনা যায় এই বদলীর জন্য মন্ডিবরবাবুর কাছে এখানকার হেরে যাওয়া নব কংগ্রেস ফর রক এবং গার্লিস্কার গণ্যমান্য গুন্ডারা দরবার করেছিলেন এবং সুপারিশও করেছিলেন যে এই ও সিকে নোয়াপাড়ায় না পাঠালে নোয়াপাড়ার সি পি এমকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না।

বাগীদের দাবী ইছাপুরে অবিলম্বে মেন ট্রেন থামানো বন্ধ করা হোক এবং পুলিশ পিকিটের ব্যবস্থা করা হোক।

জনৈক যুবক
নোয়াপাড়া
চব্বিশ পরগণা

বর্ধমান ইত্যাকার

গভীর দুঃখ ও আতঙ্কের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমার খুঁড়া-ভুতো ভাই স্নেহতোষ দত্ত গত পরশ দিন বর্ধমান তৈলমারুই অঞ্চলে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে। আমার কাকা মৃত। আমার বিধবা কাকীমার এই একমাত্র সম্বলটিকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার শিকার হতে হল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা আমার ভাইয়ের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের বা মতের কোন সম্পর্ক ছিল না। পুলিশ উদ্দেশ্যে এসেছিল কিন্তু একটা বিশেষ কারণে ও বিশেষ দলের প্রভাবে চোখে ধুলো দেওয়ার তদন্ত করেছে। এ পাড়ার অনেকে দেখেছে যে কারা এই ইত্যাকার সংঘটিত করেছে। মধ্যমশ্রীর নিশ্চয় মনে আছে বর্ধমানের দুজন কুখ্যাত গুন্ডা মল্লয় সাই ও প্রণব সাইয়ের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতির চরম খেলা গত দু বছর ধরে হয়ে গেল ও এখনও হচ্ছে। সাইবাড়ীর নবকুমারবাবু এখন ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার জীবিত দুই ভাই বিজয় ও উদয় সাই সহ কুখ্যাত গুন্ডাদের দ্বারা আশ্রয় অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্ধমানে ইতিপূর্বে যে সকল ইত্যাকার সংঘটিত পুলিশ কর্তাদের জন্য তার কিনারা হচ্ছেনা এবং ইত্যাকারীরা হাসিমুখে সহরের বুকে ঘাস সৃষ্টি করে চলেছে। বর্ধমান বীরহাটা ও প্রতাপেশ্বর শিবতলা অঞ্চল, যে অঞ্চলে সাইবাড়ী অবস্থিত সেই অঞ্চলের মানুষের আতঙ্ক এত বেশী যে রাতে আটটার পর ওই অঞ্চল জনশূন্য হয় এবং মানুষের বাক স্বাধীনতা থাকে না। মধ্যমশ্রী নিজে এসে একবার যদি তদন্ত করেন তাহলে এর সত্যতা বুঝতে পারবেন। আপনরা বহু ঘোষিত শান্তি শৃঙ্খলা

রক্ষার প্রতিশ্রুতি যদি সত্যিই অমৃত রিকতার সঙ্গে পালিত হয় তবে আমার কাকীমার মত আর কোন নারী নিশ্চয় বর্ধমানে সন্তানহারা হবে না। মানুষ এত ভীত ও সন্ত্রাস্ত হয়ে পড়েছে যে ভয়ে তারা সাক্ষ্য পর্যন্ত দিতে চাইছে না। আমি বর্ধমানের বাইরে থাকি। আমার প্রাণের ভয় নেই। আমি অনেক খোঁজ খবর নিয়ে আপনাকে সব জানালাম।

আমি শুনছি বর্ধমান কালী-বাজার অঞ্চলে একটা ক্লাব ঘরে এদের ঘাঁটি। এরা রাতের অন্ধকারে ভুল করে স্নেহতোষকে হত্যা করেছে।

সোমেন দত্ত

এপার বাংলার সংগ্রাম ও এপার বাংলার মুসলীম

বঙ্গবন্ধু মন্ডিবরের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আজ জনসংগ্রামে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ নওজোয়ান মরণ পণ করে তাদের স্বল্প সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমের বাহি দিয়ে ইয়াহিয়া খাঁর জাতিম শাহীর জিজির ভেঙ্গে এক মজ, স্বাধীন, শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার রাষ্ট্র কায়েমের মহৎ প্রচেষ্টায় রতী।

ঠিক সেই সময়েই এপার বাংলার কিছু সংবাদপত্র বেসামাল অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নীরব দর্শক ও ইয়াহিয়া খাঁর চর বলে চেঁচামেচি সুরু করেছেন। এর উদ্দেশ্য যে কি তা শ্রেণী সচেতন সংগ্রামী মানুষের অগম্য নয়।

এপার বাংলার মুসলীম কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, বাঁরা রাজি ও রুটির লড়াইয়ে বিভিন্ন সংগ্রামী সংগঠনের সাথী, তাঁরা সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধির উর্ধ্বে থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে আছেন ও থাকবেন। এপার বাংলার মুসলীমদের সংগ্রামী চেতনা বিচ্ছিন্নতাকামী প্রতিরক্ষাশীল চক্রের প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে এপার ও ওপার দুই বাংলাতেই সংগ্রামের ঐক্যে দৃঢ় ও মজবুত করতে বন্ধপারিকর। ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতাকে তাঁরা ঘৃণা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারের অন্যতম অংশীদার সাম্প্রদায়িক মুসলীম লীগ ও তাঁদের চেলাচামুড়াদের বাংলা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সম্পর্কে - দৃষ্টিভঙ্গীকে কি তা ভ্রাজ্ঞ ও পরিষ্কার নয়। এমনকি বিধান সভায় বাংলা দেশের সমর্থনে জ্যোতি বসুর তথা সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের বলিষ্ঠ বক্তব্যের অবতারণার মর্হু-তেও মুসলীম লীগের ভূমিকা সম্পর্কে মুক্তি যোদ্ধাদের তথাকথিত দরদী সংবাদপত্রগুলি সোচ্চার নন কেন?

হাবিবুর রহমান

নকশালী কার্যকলাপ এসঙ্গে কয়েকটি কথা

দপ্তরে অরুণ রায়বিশ্বাস মহাশয়ের লিখিত নকশালদের স্বরূপ শীর্ষক চিঠিতে এমন কতকগুলি অংশ আছে বাহা আপত্তিকর।

প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে কুসনগর শহরে নকশাল বিপ্লবের পর হইতে যে সকল শ্রেণীশত্রু খতম হইয়াছেন তাহারা হইতেছেন হয় শিক্ষক আর নয়তো বেকার যুবক, পুলিশ কর্মচারী ইত্যাদি ব্যক্তিগণ। কিন্তু আমার প্রশ্ন শ্রেণীশত্রু কি বেকার যুবক, পুলিশ কর্মচারী, ছাত্র প্রভৃতি (তাঁহার নির্দিষ্ট) ব্যক্তিরা হইতে পারে না? শ্রেণীশত্রু বলিয়া কোন জাত কি এই পৃথিবীতে আছে? আমার মনে হয় যে তিনি-শ্রেণীশত্রু কথাটির আসল অর্থ জানেন না। সেইজন্য তাহার জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে শ্রেণীশত্রু আমাদের সমাজে সর্বত্র আছে। একজন ধনীলোক যদি লম্বাঘাড় সাধারণ মানুষের বিপক্ষে কাজ করে তবে সে যেমন শ্রেণীশত্রু তেমনি এক-

জন গরীব বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকও যদি কোন ধনী লোকের সহায়তায় সর্জনস্বত্ব সাধারণ মানুষের বিপক্ষে কাজ করে তবে সেও শ্রেণীশত্রু বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতএব অরুণবাবু, আপনার নির্দিষ্ট লোকেরা কি কাহারও ইঙ্গিতে সাধারণ মানুষের বিপক্ষে কাজ করিতেছে কি করিতেছে না তাহা আপনি দেখিয়াছেন?

দ্বিতীয়তঃ তিনি লিখিয়াছেন যে নকশালরা শহরের ধনী শ্রেণী লোকদের নিকট হইতে অর্থ লইয়া তাহার দ্বারা অস্ত্র কিনিয়া গরীবদের “শ্রেণীশত্রু” নাম দিয়া হত্যা করিতেছে। আমার মনে হয় নকশালরা এই নীতি অনুসরণ করিয়া সঠিক কাজ করিয়াছে। দেশের ধনী শ্রেণীশত্রুদের (আমার মতে) বাচাইয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন, কারণ ইহাদের অর্থের দ্বারা সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রই দেশের অন্যান্য শ্রেণী শত্রুকে খতমের যথেষ্ট সহায়তা করিবে এবং অব-

শেষে দেখা যাবে যে সেই সকল ধনী ব্যক্তিও (যাহারা শ্রেণীশত্রুর পরায়ভূত) শেষ হইয়া গিয়াছেন। তৃতীয়তঃ তিনি এমন একজন নকশাল নেতার পাশাপাশি একদিন অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে ব্যক্তির পিছনে পুলিশ অর্থ ঘোষণা করিয়াছেন। তাই আমার মতে “অরুণবাবুর কি উচিত ছিল না যে সেই সময় পুলিশকে খবর দিয়া এই দৃষ্টান্তকারীকে(?) গ্রেপ্তার করানো। তিনি যখন তাহা করাননি তখন ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে তিনি বিরাট ধনবান ব্যক্তি এবং তাহার ফলে পুরুষত্ব সেই অর্থ লাভ তাহার নিকট নগণ্য, আর নয়ত সেই নেতার পিছনে এমন জনসমর্থন আছে যাহার ফলে সেই দ্রুত দিবালোকে অনার্যাসে চক্রফেরা করিতে পারেন এবং যাহার ফলে অরুণবাবু এবং তাঁহার মত লোকেরা তাহাকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিতে ভয় পান।। আমার

মনে হয় যে দ্বিতীয় অংশটাই বোধ হয় সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

চতুর্থতঃ, অরুণবাবু লিখিয়াছেন, যখন সেই নকশাল নেতা শুনিলেন যে জ্যোতি বসুর বিপক্ষে অজয়বাবু লাড়িতেছেন তখন তিনি বলিয়াছেন “এইবার জ্যোতি বসু জঙ্গ হবে।” তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন যে জিতবেন কে-গান্ধীবাদী অজয়বাবু? কিন্তু আমরা মনে করি সি পি এম, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, কংগ্রেস প্রভৃতি সব দলই এক ধাতুতে গড়া, শত্রু বুলির একটু তফাৎ।

শেষে এইটুকুই বলিতে চাই যে, জ্যোতি বোস ও তাহার চেলাদের মনে রাখা উচিত যে এটা সত্তর দশক, আজ লোক ধর্ম্মিয়ে নেই, অতএব তাহাদের ভাঁওতা-বাজীতে লোকে আর নাচছে না, নাচবে না।

জনৈক পাঠক

রাজধানী থেকে

বাংলা দেশকে নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের বেদরদী খেলা

রমাপ্রসাদ মল্লিক

বাংলাদেশকে নিয়ে তুমুল প্রচারণা সার, বাংলাদেশের জনগণকে প্রকৃত সাহায্য করার বেলায় ভারত সরকার কিন্তু কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অথচ ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাড়িয়ে তোলায় জন্য কয়েক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য রিক্রুট করা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেগুনালিক শস্ত-সম্পত্তি করা এবং উপযুক্ত পরিমাণ সময়-সম্ভার উপাদানের। এজন্য (এক) ডিফেন্স সম্পত্তি উপাদানিক সংস্থা-গুলির কাজকর্ম স্বাধীন ও-সুসংহত করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হয়েছে, এবং (দুই) সেনা-বাহিনীর বর্তমান শক্তি আট লক্ষ পঁচিশ হাজার থেকে আট লক্ষ আঠাশ হাজার পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, আর্মি থেকে স্বাভাবিক নিয়মে যে সৈনিক-দের (জওয়ান, বিশেষতঃ অফিসার) অবসর গ্রহণের কথা তাদের-এবং আর্মি রিজার্ভ থেকে পুনর্বার-আর্মিতে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ তালিকাভুক্ত বাছাই ব্যক্তিদের ডেকে নেওয়া হচ্ছে। এক কথায়, শত্রু হয়েছে সাজ-সাজ ভাব।

অথচ প্রতিরক্ষা খাতে খরচ এ বছরেই শতকরা ৫.৫ বেড়ে ১২৪১.৬৮ কোটিতে ঠেকেছে। আর্মির শক্তিবৃদ্ধি এই খরচ আরও বাড়িয়ে তুলবে, যদিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে, নতুন সৈন্যদলগুলিকে মজুত শস্তাভান্ডার থেকেই সুসজ্জিত করা সম্ভব এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে এজন্য কোনো যুদ্ধ সরঞ্জাম কিনতে হবে না। কথটা আংশিক সত্য। যুদ্ধোদ্যম ছাড়াও অপর একটা দিক আছে। বাংলাদেশ থেকে আগত তথাকার নাগরিকদের সংখ্যা সরকারীভাবে বলা হয়েছে বার লক্ষ।

আসল চাপ আসার এখনও বাকি। অসামের মন্ত্রী শ্রীকে পি টি পাঠী অনুমান করেছেন যে এ সমস্ত উদ্ভাসভূদের জন্য ভারতের বাৎসরিক ব্যয় অনুদান একশ কোটি টাকা অবধি যেতে পারে, যার অনিবার্য ফলরূপে ভারতের অর্থনৈতিক এবং সামরিক দুর্বলতা বেড়ে চলবে। সুতরাং ভারতের শাসক শ্রেণীর বিশেষ শক্তিশালী মহল থেকে ভারত সরকারের ওপর গোপন

প্রভাব বিস্তৃত হবে, যাতে অর্থ-নৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হবার পূর্বেই সামরিক অভ্যবানের বীর-বাজক প্রদর্শনী করান হয়, সম্ভবতঃ পূর্ব ও পশ্চিম দুই সীমান্তেই। এমনি একটা ভারত-পাকিস্তান সম্বন্ধ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যে চলে না, সে-সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রী দেশ-গুলি যত্নে ওয়াকিবহাল।

“সর্বোত্তম” ঋণপ্রদায়ী বন্ধু তথা পৃষ্ঠপোষক আমেরিকায় বাংলাদেশ-সংকট-উদ্ভূত পরিণতি সম্পর্কে সাব-ধনবাণী বিতরণ করা হয়েছেঃ “ভারত এবং পাকিস্তান দুয়েরই উচিত পারস্পরিক বাগবান্দকে শান্ত করা, যাতে বর্তমান উত্তাল অবস্থান হাতের বাইরে চলে না যায়। পাকিস্তানের পক্ষে বিশেষতঃ জানা দরকার যখন পূর্ববঙ্গকে দাবানোর ব্যাপারে তার রণসম্পদে অতিরিক্ত টান পড়েছে, তখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আত্মহত্যার সমতুল্য। [“বাল্টিমোর সান”, দোসরা এপ্রিল, উনিশ শ একাত্তর],

কেন যে আমেরিকাই এগিয়ে এসেছে ভারত এবং পাকিস্তানের মাঝে একটা মিটমাটের মরুদ্বন্দ্বমানার ভূমিকা নিয়ে, তার কারণ স্বতঃপ্রতিভাত। ভারতকে আমেরিকা আজ পর্যন্ত সাত হাজার চারশো বাইশ কোটি টাকা সাহায্য দিয়েছে। ভারতের “অর্থনৈতিক বিকাশে সর্ববৃহৎ পাটনার” হিসাবে। বলা বাহুল্য, নব উপনিবেশী কায়দায় এই বিরাট অঙ্কের মূলধন ভারতে লগ্নী করার পর আমেরিকা নিশ্চয়ই চেষ্টা করে যাবে যাতে, ভারতের শাসকবর্গ মোরসী পট্টা গেড়ে বসতে পারে এবং যাতে এই উপমহা-দেশে ভারত এবং পাকিস্তানের বর্তমান শাসকবন্দ আমেরিকার পোষ-মানা ভূমিকা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে—সামরিক এক আধটু বন্ধ-বন্ধ-খেলা সঞ্চে—মিলে মিশে থাকে।

প্রসঙ্গতঃ, পাকিস্তান সরকারকেও সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমেরিকার অনুপ্রেরণায় গঠিত রাষ্ট্র সমাবেশ (বিশ্ব ব্যাংক সহ) অদ্যাবধি যে বিপুল ‘সাহায্য’ দিয়ে এসেছে তার মোট পরিমাণ হল, পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণে তিন হাজার আটশো কোটি ডলার! এ বছরও ৪০.৮ কোটি ডলার দেবার কথা ছিল। পাকিস্তানকে, দেওয়া হতও যদি বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর স্ফারা নর-সংহারের বাঁহংসতা সারা বিশ্বে চাউর না হত। ঋণগ্রস্ত পাকিস্তান সরকারের “কজ্জমকুব” আবেদনের ওপর আপাততঃ সুযোগ নেবার তালে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি সামান্য একটু চাপ দেবার চেষ্টা করেছিল।

তাতেই পাকিস্তানের পুঞ্জিপতি-সামরিকতন্ত্রের গোষ্ঠীস্বার্থে আঘাত পড়ার দরুণ প্রচণ্ড চীৎকার উঠেছে। তিরিশে জুন উনিশ শো একাত্তর অবধি পাকিস্তানের দেয় (কজ্জশোধ ব্যবদ) পঞ্চাশ লক্ষ ডলার কিস্তি পেমেটের তারিখ। এই তারিখ এগিয়ে দিতে বিশ্ব ব্যাংকের অধ্যক্ষ রবার্ট ম্যাকনামারা অস্বীকার করেছেন। অথচ এদিকে বাৎসরিক ঋণ

শোধের মোট পরিমাণ বাইশ কোটি ডলার। সামান্য চাপেই পাকিস্তানের উপরোক্ত কয়েমীস্বার্থ গোঁসসার উদ্-গার করেছেঃ—“এই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি বৃদ্ধিতে চায়না যে, পাকিস্তানের অর্থ-নৈতিক উন্নতি এখন স্বাভাবিকই স্তব্ধ হয়ে আছে, কেননা তার ভৌগোলিক অশুভতার লড়াই পেয়েছে অগ্রাধিকার। মাল জমে যাবার দরুণ শিল্পে গন্ডগোল চম্বা দিয়েছে। অতীতের সুচক তথ্য থেকে জানা যায় যে, গত দুমাসেই, সমুদ্রপথে চালিত বাণিজ্য ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭.৪ কোটি টাকায়। রপ্তানি বস্তুর দরুণ ক্ষতির পরিমাণ তিরিশ থেকে চল্লিশ কোটি পর্যন্ত অনুমান করা যায়।”

[পাকিস্তান টাইমস]

কেন এই ক্রোধ বৃদ্ধিতে অসুবিধে হবার কথা নয়, কারণ ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানকে ঔপনিবেশিক কারদার মাল বেচে এবং ওখানকার কৃষি-জাত অর্থকরী পণ্য রপ্তানি করে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী, বিশেষতঃ মোমিন ভোরা ইত্যাদি আটটি এক-চেটে বিপুলপুঞ্জির মালিকগোষ্ঠী এত-দিন লাল হয়ে আয়েস-আরামের গদীতে নশীন হয়েছিল। আজ পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রী দেশগুলি, বিশেষতঃ আমেরিকা চায়, ভারত এবং চীনের মধ্যে একটা বাড়তি “বাধক-রাষ্ট্র” বা বাফার স্টেট খাড়া করা, এর জন্য বর্মার মত একটা ভারসাম্য-হীন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করা যায় না। সুতরাং অর্থ সাহায্যের খিলি মূখ সঙ্কুচিত করে পাকিস্তানের অধুনা শাসকচক্রকে একটু সামান্য শিক্ষা দিয়ে সম্ভব ফেরানর চেষ্টা শুরু হতে না হতেই এই চক্র থেকে হুস্কার উঠেছে, টাকা না দাও চীনের কাছে যাব। আসলে এটা একটা ভাঁওতা ধমকি মাত্র।

চীনের প্রস্তাবিত অর্থ সাহায্য আসলে কোনো ঋণ মারফৎ পুঞ্জি-লগ্নী নয়, সিংকিয়াং থেকে পাক-কবলিত কুম্মীরের গিলগিট হুনজা অঞ্চল অবধি যে রাস্তা, চীন এবং পাকিস্তানী ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তৈরী হয়ে এক ঐতি-হাসিক ব্যবসা বাণিজ্যিক পথকে পুন-রুজ্জীবিত করেছে, সেই পথে চীন চায় তার রপ্তানিযোগ্য উদ্ভূত শিল্প পণ্য পাকিস্তানে পৌঁছিয়ে দিতে। এমনি চৈনিক রপ্তানির অনুমানিক মূল্য নাকি বছরে পনেরো কোটি পাউন্ড। কর্যাচিন্স বন্দর কর্তৃপক্ষ তাই মনে করেন। চীনের প্রস্তাব পাকিস্তান গ্রহণ করলে কেবল যে সমুদ্রপথে বাণিজ্যবাহী জাহাজের সংখ্যা কম করে দিশাটি বাড়তে হবে তাই নয়, এর ফলে পাকিস্তানী জনগণের ক্রোতাসম্প্রদায় উপকৃত হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী প্রাইভেট সেক্টরের ধনপতি মালিকবর্গ তাদের এতদিনের চালু মুনাকা শোষণ বজায় রাখতে পারবে না।

সুতরাং, জাপান ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা তিনটি রাষ্ট্র আজও অর্থ সাহায্যের গ্যাডাকলে পুঞ্জি রপ্তানি করে এবং নতুন কলেবর উপনিবেশ অধিকারও করে থাকে এখন পাকিস্তান সরকারকে বাগে আনবার জন্য পদান্তরালে শাসানি দিচ্ছে পূর্ব বাংলায় একটা “গণতন্ত্রী” সরকার খাড়া হতে দেবার জন্য, যা বকলমে আমেরিকার বশব্দ হয়ে থাকবে। পাকিস্তানের মুনামূল্য বস্তুতঃ এখন নিদারুণভাবে পড়ে গিয়েছে। আন্ত-জাতিক বাণিজ্যবাজারে এক ডলারের তুলনায় পাকিস্তানী মুনদার বিনিময় মূল্য ৪.৭১ টাকা নেই; ফি ডলার পিছু এগারো টাকা।

এখন বিচার জাপান যদি তার প্রতিশ্রুত তিন কোটি ডলার, ব্রিটেন সাড়ে চার কোটি ডলার এবং আমেরিকা আট কোটি ডলার পরিমাণ অর্থ সাহায্য আপাততঃ বন্ধ রাখেও, তাহ-লেই কি পাকিস্তানের বর্তমান জেদী এবং সুচতুর শাসক গোষ্ঠীকে কাবু করতে পারবে। বর্তমান লেখকের ধারণায়, আমেরিকা এবং তার সঙ্গী অপরাপর ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি পাকিস্তানের উক্ত গোষ্ঠীকে বশব্দ বানা-বার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কারণ, তাদের অতি-চলকিপনা এবং স্খিঁধা। বাংলাদেশের জনগণকে সাহায্য করতে এরা চায়না মুখে মায়াকান্না কাঁদলেও। এদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভিতটাকে একটু ঢিলে করে দিয়ে দুর্ভরফের পাকিস্তানকেই (পশ্চিম এবং পূর্ব) ধীরে ধীরে নয়া সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির খপ্পরে আনা।

কিন্তু এদের হিসেবে গরমিল একটু থেকে গেছে; তার কারণ এ নয় যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অপ্রত্যা-শিত দ্রুততার সঙ্গে পূর্ব বাংলায় জনগণের প্রতিরোধ ভাঙবার উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কারণ আসলে এই—এরা, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, বিশেষতঃ সরলপ্রাণ এবং ঈষৎ বোকা মুজিবর রহমানের সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে। যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী খ্যাপার মত নিরস্ত এবং প্রায় অপ্রতুত জনতার ওপর চরম নিপেষণ আরম্ভ করলো, তখন এই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ মুনদার সাজের বাহবা চাইলেও, দায়িত্ব নিলনা। অর্থ-নৈতিক সুদোটন, ক্ষমতা-রাজনীতির পরোক্ষ প্রয়োগ কুটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে আশ্রয়দান—এমনি অনেক কৌশল এদের জানা ছিল কিন্তু গ্রহণ করে বৃদ্ধি নেবার সাহস হয়নি।

ক্রমশঃ পাকিস্তানের সামরিকতন্ত্র বনাম বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের সংঘর্ষ প্রথম অধ্যায় অভিক্রম করে মুক্তি যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থিত। ভৌগোলিক অর্থে কতৃষ্ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হতে এসে যাওয়ায় এই শক্তিবর্গ এখন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অজুহাত ভুলে পিছিয়ে এসেছে। এদের আশঙ্কা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র ও নেতৃ-রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তখন নবোদীত বাংলাদেশে, গেরিলাযুদ্ধের দৈনন্দিন লড়াই, জনসুযোগ, সমান্ত-রাজ সরকার চালিয়ে জন-প্রতিরোধকে আরও পোক্ত আরও দৃঢ় আরও সুসং-

হত করার কার্যক্রমে সফলকাম যে নতুন নেতৃত্ব সম্ভালকরূপে আবির্ভূত হবে তারা এই পশ্চিমী রাষ্ট্রদের ক্ষমতাপ্রয়তার বাদ সাধবে—পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও সম্ভবতঃ তত-দিনে যুদ্ধ প্রতিরোধী আন্দোলনে মেতে উঠতে বাধ্য হবে, বাস্তব ঘট-নাচক্রের কঠিন শিক্ষায়। বাহুল্যই বলা, যত দেরী হবে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিপূর্ণতায়, ততই সাধা-রণ কৃষক ও শ্রমিকবর্গের সঙ্গে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাংলাদেশবাসীর চেতনা হবে অগ্নিপ্রধর এবং সকল-প্রকার স্বৈরাচারের সঙ্গে পাক্ষা করার উপযুক্ত। ভারতীয় জনগণের সামনেও আসবে পরীক্ষাকাল।

বলতে কোনো বাধা নেই, ভারতের বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি, জাতির যে উচ্চকোটি, বিভবান শ্রেণীর মনোভাব প্রতিফলিত করে চলেছে, তারা বাংলা দেশের সাধারণ মানুসগুলির সম্পর্কে সংবেদনশীল তো নয়ই, এমন কি তাদের সম্পর্কে কোনো খবরও রাখে না। মূলতঃ পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষ, এবং (সরকারী মহলে) পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ভীতি ও অনিশ্চয়তার ভাব থেকে আজকের এই মেকী, বাংলা-দেশ দরদের আতর্শ্বা। নতুন দিল্লী লখনৌ, জয়পুর তিনটি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় রাজধানীর নাম করা হল কেবল—প্রভৃতি সহরে যে সমস্ত সরকারী কংগ্রেসদল অধুনিষিত জন-সভা করা হয়েছে, কোথাও জনগণের স্বতোৎসারিত অভিব্যক্তি দেখা দেয়নি, দেখা মিলেছে শিক্ষিত এবং স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের সাজানো মণ্ডবিলাস। ব্যতিক্রম, কানপুর এবং শিল্পাঙ্গলীর শহর এলাকার শ্রমিকবৃন্দ। তাদের হৃদয়-জাত অভিব্যক্তি প্রকৃতিই বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুসদের জন্য কারণ তারা নিজেদের রুজিরোজগারসম্পত্ত দাসত্বের বেদনা থেকে শিখেছে, গরীব-দের মুক্তি সংগ্রাম কত সুদূরপ্রসারী, কত সর্বদেশব্যাপী।

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইন্ডিয়া

প্রেস

৭, হুবোথ মল্লিক কোয়ার্টার
কলিকাতা-১৩

পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা (২)

শফিকুল হালান

গত ১৯৭০ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারী পল্টনের এক বিরাট জনসভায় কমরেড মাহাবুব-উল্লাহ নেতৃত্বে পূর্ব বাংলাকে একটি “স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র” হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং এই নতুন রাষ্ট্রের কাঠামো এবং রূপ-রেখা সম্বন্ধে এগারো দফা সম্মিলিত একটি বাস্তব কর্মসূচী জনগণের নিকট তুলে ধরা হয়। এই কর্মসূচী বাস্তবে প্রয়োগ বিধির প্রশ্নে এক্ষণে কমিউনিষ্টদের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দেয় এবং তাঁরা কত-গুলো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

(এক) হক তোলাহা গ্রুপ—পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম এল) নাম দিয়ে এরা পাকিস্তান ভিত্তিক কৃষি বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। আখা উপনিবেশিক আখা সামন্তবাদী দেশ পূর্ব বাংলার কৃষি বিপ্লব অপরিহার্য; কিন্তু বর্তমানে পূর্ব বাংলার পশ্চিম পাকিস্তানী অত্যাচারী সেনা-বাহিনীর (যাদের জনগণ বিদেশী অনুপ্রবেশকারী, সেনাবাহিনী বলে মনে করেন) উপনিবেশিক চরিত্রের শোষণকে বজায় রেখে কৃষি বিপ্লব, বিশেষতঃ পাকিস্তান ভিত্তিক কৃষি বিপ্লব (সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) সমাধা করা সম্ভব কি? পূর্ব বাংলার জনগণ যখন শোষণ, শাসন ও নিপীড়ন থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত তেমন সময়ে “জনগণ ভুল করছে” এই অমার্কসী দৃষ্টি-ভঙ্গির ফলে তাঁরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। পক্ষান্তরে তারা পূর্ব বাংলার জনগণ যে শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায় এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেছেন এবং পাকিস্তানের সংহতি কামনা করছেন। বন্দুকের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আখা সামন্তবাদী

আখা উপনিবেশিক দেশ বিপ্লব-পূর্ব চীনের জনগণ ও বিপ্লবীরা সামন্তবাদ প্রধান স্বন্দর থাকা সত্ত্বেও জাপানী সেনাদের (যারা অনুপ্রবেশকারী ছিল) প্রথম বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে এমন কি চিয়াং কাইশেকের সঙ্গেও ঐক্যবন্ধ হতে পেরেছিলেন এবং প্রমাণ করে-ছিলেন ঐক্যবন্ধ সশস্ত্র যুদ্ধই কোন দেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে সফল করতে পারে। মহান চীনের পথ আমাদের পথ—তাঁদের কার্য-কলাপে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না। কৃষি বিপ্লবের কথা বললেও বাস্তবে তাঁরা তা করছেন না (যা করলে পূর্ব বাংলার সামন্তবাদী শোষণের অবসান হতো) কেননা বিপ্লবের প্রথম ধাপ হিসাবে গ্রামে গ্রামে কৃষক বিশেষতঃ ভূমিহীন গরীব কৃষকদের রাজনীতিগতভাবে সচেতন করে তোলা ও আলোচনার মাঝে তাদের সংগঠিত করা প্রয়োজন, যা করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে খুলনা ও যশোরের কিছু অংশে তাঁরা কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও কোন লাল এলাকা বা ভিত্তি অঞ্চল গড়ে তুলতে সক্ষম হননি।

(দুই) সিরাজ শিকদার গ্রুপ। “পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন” নাম দিয়ে তাঁরা বলছেন, “পূর্ব বাংলা হচ্ছে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ এবং এ উপনিবেশকে মুক্ত করতে হবে”। এ তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁরা সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন। তারা জনগণকে এড়িয়ে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ফলে জনগণের সঙ্গে তারা সম্পর্কিত নন। তাই গ্রাম বা শহরে তাদের কোন ভিত্তি এলাকা গড়ে উঠেনি। কৃষক শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন বেশ কিছু যুবক ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনাতে

তাদের সঙ্গে পার্টিগতভাবে যুক্ত। (তিন) জাফর-মেনন গ্রুপ। পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট সমন্বয় কমিটি জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ ও জনগণতন্ত্রের শ্রেণী সংগ্রামকে পৃথক পৃথকভাবে কার্যকরী করার পক্ষপাতী। এরা কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কিত হবার চেষ্টা করেন এবং সিলেটে একটি ভিত্তি এলাকা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। টাঙ্গা এলাকার শ্রমিকরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

(চার) মতিন-আলাউদ্দিন-দেবেন বাসার গ্রুপ। “পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি” নামে এরা পরিচিত। পূর্ব বাংলার জনগণের বৈশিষ্ট্য ভাগ কৃষক এবং তারা যেহেতু সামন্তবাদী শোষণে জর্জরিত সেহেতু পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে সামন্তবাদী শোষণের স্বন্দরই প্রধান। কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানী উপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ এমন উলঙ্গ রূপ নিয়েছে যে পূর্ব বাংলার জনগণ এখন পাকিস্তানী তথা পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ-দের বিদেশী শক্তি বলে মনে করছে এবং তাদের শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি কামনা করছে। ফলে পূর্ব বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা একই সঙ্গে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত বলে মনে করেন এবং এ দুই সংগ্রামকে সশস্ত্র গণযুদ্ধের রূপ দেবার চেষ্টা চালাতে থাকেন। কৃষক ফ্রন্টে মতিন-আলাউদ্দিন এবং শ্রমিক ফ্রন্টে দেবেন শিকদার ও বাসার রাজনীতি প্রচারের দায়িত্ব নেন। তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় খুব কম সময়ের মধ্যেই পাবনা, বগুড়া, যশোর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল ও নোয়া-

খালীতে ভিত্তি অঞ্চল (লাল এলাকা) সমূহ গড়ে উঠে। ঢাকার শ্যামপুর-নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ, পাবনার ঈশ্বরদী, পাকশী ও সৈয়দপুর, কুমিল্লা আখাউড়া, লকসাম রাক্ষসবাড়িয়া, সিলেটের ফেঞ্চগঞ্জ, নোয়াখালীর ফেণী ও চট্টগ্রামের বন্দর, রেল ও ডক শ্রমিকরা এই পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত। খুলনা ছাড়া পূর্ব বাংলার প্রতিটি জেলাতে এই পার্টির রাজনৈতিক কার্যকলাপ জালের মত ছড়িয়ে আছে। এই পার্টি তাঁদের লাল এলাকাসমূহে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে ও দেশীয় শোষণদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাবার ব্যাপক চেষ্টা চালাতে থাকে। তাঁরা গেরিলা সেনা গড়ে তুলেন এবং সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন জনগণ-তান্ত্রিক পূর্ব বাংলা গড়ে তোলার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণকে আহ্বান জানান। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকায় উপরোক্ত পার্টিই পার্টিই পোপনে তাদের কার্যকলাপ চালাতে থাকে এবং প্রকাশ্যভাবে মাওলানা ভাসানীর ন্যাপের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। এদের বদ দিলে মাওলানা ভাসানীর ন্যাপে আর যারা আছেন তারা হচ্ছেন শ্রেণীগতভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয় ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের প্রগতিশীল ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে “আইন ও শৃঙ্খলা” রক্ষার নাম করে ইয়াহিয়া লিগাল ফ্রেম অর্ডার নামে কতগুলি সত-মূলক আইন জারি করে, যে সত-গুলো মেনে নিলে গণতন্ত্র বলতে অবশিষ্ট কিছুই থাকেনা। স্বত-গুলোর অন্যতম পার্টি হলো (এক) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দেয়া পর্যন্ত সামরিক শাসন চালু থাকবে এবং ইয়াহিয়ার হাতে সর্বময় রাষ্ট্রীয় ও নির্বাচনী ক্ষমতা থাকবে; (দুই) নির্বাচিত পরিষদ তিনি (ইয়াহিয়া) ইচ্ছা করলে যে কোন ক্ষুদ্র-ভেগে দেবার ক্ষমতা রাখেন এবং তার জন্য কোন কৈফিয়ত দিতে তিনি বাধ্য নন; (তিন) নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সবাই একপক্ষে রায় দিলেও সেটা তার (ইয়াহিয়ার) মনোমত না হলে তাতে তিনি স্বাক্ষর দেবেন না এবং তাঁর স্বাক্ষর ব্যতীত কোন আইন শাসনতন্ত্র গৃহীত হবে না; (চার) পাকিস্তানের সংহতির বিপক্ষে যে কোন প্রস্তাব আনা হলে পরিষদকে বাতিল করে দেয়া হবে; (পাঁচ) এই শাসনতন্ত্র একশো দুই দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে না পারলে নির্বাচিত পরিষদকে বাতিল ঘোষণা করা হবে। বামপন্থী কমিউনিষ্ট দলগুলো গণতন্ত্রের নামে এ প্রহসনকে প্রতিহত করার আহ্বান জানান এবং ইয়াহিয়া সরকারকে সামরিক শাসন তুলে নেবার জন্য হুঁশিয়ার করে দেন। কিন্তু ডানপন্থী ক্ষমতালোভী তথা-কাথিত নেতৃবর্গ ক্ষমতা লাভের

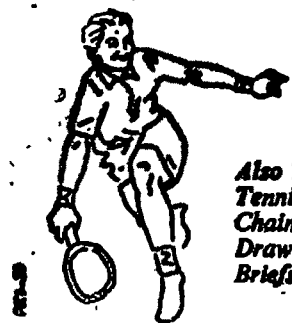
আশায় ইয়াহিয়ার লিগাল ফ্রেম অর্ডার এর গণতন্ত্রের পরিপন্থী সত-সমূহ মেনে নেয়, ইয়াহিয়া সরকারকে শান্তিকামী ও গণতন্ত্রী বলে ভ্রূসী প্রশংসা করে। তারা ইয়াহিয়া সরকারের সমালোচক বামপন্থী দলগুলোকে সমাজ-বিরোধী, গণদুশমন রূপে রীতিহিত করে এবং নিজেদের গুড্ডা বাহিনীকে তাদের উপর লেগিয়ে দেয়। কিন্তু পূর্ব বাংলার ইতিহাস নিজেই আজ প্রকাশ করছে কারা সত্যিকার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন আর কারাই বা সত্যিকার গণদুশমন ছিল।

১৯৭০ সালের পাঁচই অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। হঠাৎ ইয়াহিয়া সে নির্বাচন সাতাই ডিসেম্বরে পরিবর্তিত করে তার যথেষ্টাচারিতার আর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। গণমনে তাঁর বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও আপোষ-কামী ক্ষমতালোভী ডানপন্থী নেতারা জনগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে এবং ইয়াহিয়ার এ সিংহাসনকেও আপোষের পথে মেনে নেয় এবং নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে থাকে। পূর্ব বাংলার দৃষ্ট ময় রাহি বারোই নবেম্বর প্ররল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণি-ঝড়ের ফলে প্রায় তিরিশ লক্ষ লোক হতাহত ও সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। এমন দুঃসময়েও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা কেউ এই অস-হায় নিরাশ্রয় জনগণকে সাহায্য করা দূরে থাক, একবার দেখবারও প্রয়োজন রোধ করেন নি। মানবতার বিরোধী এই সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের ভেক ধরজাদারীদের মুখোশ খুলে পড়ে এবং বামপন্থী বিভিন্ন নেতা ও মাওলানা ভাসানী এদের তাঁর সমালোচনা করেন। এক কালের পাকিস্তান সংহতির অন্যতম অগ্র-নায়ক ভাসানী চব্বিশে নবেম্বর পল্টন ময়দানে ঘোষণা করেন—“তোমাদের এই ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি সব বোগাস”। তিনি চোঁটা ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের অপর এক জনসভায় ঘোষণা করেন—“আজ থেকে পূর্ব বাংলা স্বাধীন, আমরা এ দেশকে আমরাই স্বেচ্ছা ও সম্মুখাঙ্গী করে গড়বো”। তিনি তার দলকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে দৃষ্ট মনবান্ধার সেবা করার নির্দেশ দেন।

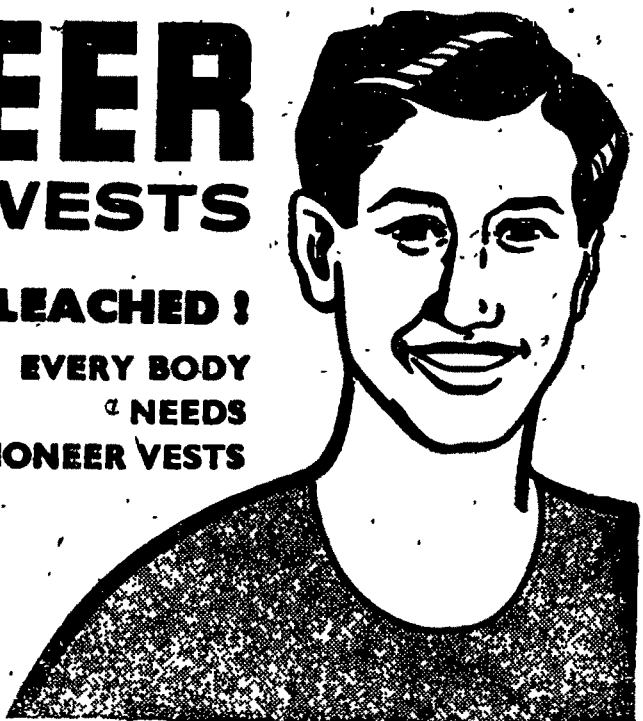
এরই মধ্যে ক্ষমতালিপ্সু পূর্ব বাংলার ডানপন্থী নেতারা শব-দেহের উপর দাঁড়িয়ে মানবতাকে অস্বীকার করে ভোট ডিফান্স লিপ্ত হন। সাতাই ডিসেম্বর এই তথা-কাথিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম এল) পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন, মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ ও ন্যাপে অবস্থান রত পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট সমন্বয় কমিটি এবং আতাউর রহমানের জাতীয় প্রগতি লীগ অংশ গ্রহণে বিরত থাকে। নির্বাচনে সকল (শেয়ারিং অস্ট্রম পৃষ্ঠায়)

PIONEER VESTS

ARE HYGIENICALLY BLEACHED !
EVERY BODY
NEEDS
PIONEER VESTS



Also Tee shirts,
Tennis shirts,
Chain Shirts,
Drawers &
Briefs



PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS, CALCUTTA-2 Phone : 54-2901

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্রমিত্র

পদ্মেন্দ্রের খোঁজে গিয়ে পরিচয় হয়ে গেল এক গুচ্ছ তরুণ ছেলে-মেয়ের সঙ্গে। পদ্মেন্দ্রকে কেন্দ্র করেই আলাপ। বিদায় নেওয়ার সময় দেখলাম, পদ্মেন্দ্র সত্যিই অনেক দূরে চলে গেছে বটে, তবে নতুন বন্ধু তৈরী হয়ে গেল তারই পরিত্যক্ত-আবাসে। ওদের প্রত্যেকে একই রকম নয়। অথচ সকলে মিলে ওরা নতুন আর বৈচিত্র্যের সমাহার। মন্টু ওরফে অমলেন্দুই সবচেয়ে তাকীক। সবচেয়ে রাগী ছিলে। ব্যক্তিত্বও স্বতন্ত্র। তাই প্রথম দর্শনেই তাকে একটা দলপতি গোছের হোমরা চোমরা ভেবে-ছিলাম। মন্টুর সেই পা-ফাঁক করে অপেক্ষার ভিজি ভয় পাইয়ে দিয়ে-ছিল। পরে পরিচয়ে জানলাম, এরা সাধারণ নির্বাচিত ছেলেমেয়ে। আজকের হাওয়ায় চিন্তা করতে চাইছে। উলটা পালটা প্রশ্নে নিজের চারদিক গমগমে করে রেখেছে। তবে কোনো প্রশ্নের ওপরই এখনো পর্যন্ত খিঁচিয়ে বসতে পারে নি। সবটাই জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসার ধরনেই অবশ্য এক একজনের চিন্তা আকৃতি নেয়। অর্থাৎ এক জাতের জিজ্ঞাসা আছে যাকে বলা যায় সংশয়ীর জিজ্ঞাসা। সংশয়টার জিজ্ঞাসা আগে টুকরো টুকরো প্রমাণ ও বিশ্বাস খোঁজে, পরে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটা সমাধানের সত্যে পরিণত হয়। মন্টুর প্রশ্নের ধরণও সেই জাতের। এখনও বয়স কাঁচা বলেই সেটা প্রশ্ন আর প্ৰতিধার স্তরে রয়েছে। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমশ সেই প্রশ্ন ওর বক্তব্য হয়ে উঠবে। তখন মন্টু আর প্রশ্ন তুলবে না, প্রশ্নের উত্তরে তার বিশ্বাসমত সমাধান বাতলাবে।

ছাত্র জীবনে মন্টু রাজনীতি করে নি। অভাবের সংসারে জন্ম নয়; রাজনীতির পরোয়া কি। অবশ্য অভাবী হলেই যে সে রাজনীতি করবে এমন নয়। তবে অভাব মানুষকে জীবন সম্পর্কে সচেতন করে। দারিদ্র্য থেকে মৃত্তির জন্য ক্রিষ্ট মন পথ খোঁজে। মন্টু কারখানায় ঢুকেও স্বপ্নিতর নিঃশ্বাস ফেলেছিল, যাক, সর্বত্র যা, এখানে তা নয়; রাজনীতির উষ্ণ শ্বাসে কারখানার অফিসবাড়ি উত্তপ্ত নয়। রিক্রিয়েশন ক্লাবে নাটক, সোস্যাল, ক্যারাম, তাস, টেবল টেনিস। ঝাণ্ডা নেই। ঝাণ্ডা নিয়ে ঝগড়া নেই। যন্ত্র-রঙ করা দেওয়ালে, দাবি ও দোষারোপের শ্লেগান নেই। জীবন যেন সেখানে পাটভাঙা সুড়টের মতো ঝকমকে।

শুনতে পেল, শ্রমিক কর্মী সংস্থা একটা আছে বটে, তবে তাই নিয়ে সংকটের আবর্ত নেই। কর্মী সংস্থাও ছিমছাম। বছরে একবার নির্বাচন। নির্বাচনের আগে টেবিলে টেবিলে ব্যক্তি বিশেষ নিয়ে আলোচনা। নির্বাচনী প্যানেল একটাই। নির্বাচন প্রার্থীও প্রায় ঘুরে ফিরে একই মুখ।

পদ্মেন্দ্র সরকারের সঙ্গেও ঐ নির্বাচন উপলক্ষে পরিচয়। সুন্দর চেহারার একটা আলাদা আকর্ষণ

আছে। মার্জিত ধীর কথাবার্তার প্রভাব অন্যরকম। পদ্মেন্দ্রকে ভালই লেগেছিল মন্টুর। ভোটও দিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন মন্টুর মনে হচ্ছে, সমষ্টির স্বার্থ ব্যক্তি-নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়াটা একটা হতাশ ফ্যাসিস্ত মনোভাবেরই লক্ষণ। ফ্যাসিস্তরাই দলনিরপেক্ষ বলে জাহির করে নিজেকে, ফ্যাসিস্তরাই ব্যক্তি নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা চায়। পদ্মেন্দ্র নেতা হয়েছে। মন্টুদের নির্ভর করতে হচ্ছে ঐ মানুষটির বিচার, বিবেচনা সততা ও শাঠ্যের ওপর। সে যদি ভুল করে তবে ভুল, সে ঠিক করলে ঠিক। সে পালালে তুমি পথে বসলে, সে থাকলে তুমি জনৈক মূর্খবুদ পেলো। ভাবতে বসলে ব্যাপারটা কী সাংঘাতিক। পরিণাম কী হতাশাব্যঞ্জক।

আর আমার স্বার্থ আমিই বুঝে নেব, কথাটা বিশ শতকের শেষে দাঁড়িয়ে ভাবাই যায় না। এই বিরাট পৃথিবী বহু শক্তির শিবিরে শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। যে লোকটা নাগরিকও নয়, পথের ভিখরী, সেও বিশ্ব রাজনীতির দাবার ছকে মার খাচ্ছে। মন্টুদের ছোট কারখানা। কিন্তু এর একটা নাট বলটু। শ্রুতমাত্র এই সংস্থায় ইচ্ছায় সংযুক্ত বিষয় হতে পারে না। আমি রাজনীতিতে নেই বললেই যদি আমার মস্তিষ্ক হত, তবে ঐ পাপের ক্রেদে সাধ করে আর কোন সুস্থ মানুষ জড়িয়ে পড়ে। আমার ইচ্ছার ওপর আমার জীবন রচনা তো নির্ভর করে না। প্রতি মূহুর্তে আমি কট রাজনীতির উর্ণনাভে জড়িয়ে পড়ছি। একটা কুৎসিত মাকড়সা দূরে বসে লোভের লালায় তৈরী সুতো নাচিয়ে আমাকে জালে বাঁধছে। জন্মেই বন্ধ জীব আমি। আমি রাজনীতিরই ক্রীড়নক। আমি রাজনীতি করি বা না করি, রাজনীতি তার প্যাটার্ন মতো আমাকে তৈরী করছে। রাজনীতি না করার শ্রুত একটাই অর্থ হয়, তা হল, যে প্যাটার্নে আমি আছি, সেই প্যাটার্নকে নিঃশর্তে মেনে নেওয়া।

কিন্তু একম একটা সমাধানে পৌঁছেও পূর্বাপর সমস্ত প্রশ্ন ঘুলিয়ে গেছে মন্টুর। গণতান্ত্রিক দেশে বাস করে কোনো একটা বিশেষ প্যাটার্ন নিঃশর্তে মেনে নেওয়ার অধিকারও তো নেই। নিঃশর্তে মানার প্রশ্ন একমাত্র সেখানেই, যেখানে মালিক হলেন রাজা, আর মানুষের অবয়ব বিশিষ্ট কতগুলি মূক বধির যন্ত্রবৎ প্রাণী হলেন তাঁর খাসতালুকের ক্রীতদাস। একমাত্র ক্রীতদাসই “সাবমিট” করে বসে আছে। নিঃশর্ত মানার মূঢ়লেকা সেই লিখে দিয়েছে। একমাত্র তার কাছেই রাজনীতি হল রাজার নীতি। হোক তা নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী

কিন্তু “যা ইচ্ছে”, সেটা রাজার নীতি, ক্রীতদাস তাকে নিঃশর্তে মেনে নিতে বাধ্য। মানুষের সে দুর্দিনও গেছে। সেই অন্ধকার থেকে আলোয় আসার সংগ্রামই তো ইতিহাসের পাতা ভরিয়ে আসছে। কিন্তু আজ, নিঃশর্ত প্রশ্নহীন যন্ত্র-দাসের জীবনে এসেছে গণতন্ত্রের মূর্তি, যার প্রথম শতই হল, তুমি যেখানেই থাকো আর যত ক্ষুদ্রই হও, তোমাকে সজাগ থাকতে হবে, তোমাকে রাজনীতি করতে হবে।

কেন? আমি সাথে পাঁচে নেই।

কিন্তু তাই কি হয়, তোমাকে ভোট দিতে হবে। কোনো ব্যক্তিকে নয়, হরেক দলের মধ্যে তোমাকে বাছাই করতে হবে। নিজের স্বার্থটা ভালো করে খতিয়ে দেখে দল বেছে নাও। বুঝে নাও, কোন দল তোমার স্বার্থের সংরক্ষক। কোন দলই বা তোমাকে গ্রাস করতে চায়। তারপর তুমি তোমার ভোট দাও। গণ-তান্ত্রিকের এটাই কতব্য, এটাই ধর্ম।

মন্টু যেবার প্রথম ভোট দিতে গেল, পলিটিক্যাল সায়েন্সের দুটো পরিচ্ছেদের কথা মনে পড়ে-ছিল তার : নাগরিকের দায়িত্ব। নাগরিকের কতব্য।

নির্বাচনের আগে সংবাদভাষ্য পড়ার জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে বিভিন্ন মতবাদের কাগজ কিনে ফেলেছে। বুঝতে চেয়েছে। চিনতে চেয়েছে নিজের দলকে। চেনা ভারি মূর্খকল। এতো খেলার মাঠ নয় যে, ক্লাবের নামে সমর্থক হয়ে ছাতা জুতো ছুঁড়ে কিছুক্ষণ উত্তেজনা অনুভব করার পর নিরুদ্বেগ ঘুমের কোলে চলে পড়া; স্নেহ উত্তেজনার জন্যই সমর্থন। এ হল রাজনীতি। জীবনের সম্পূর্ণ প্যাটার্ন নিয়ে এই খেলা। এখানে ভুল আর গলতি হলে জীবনভোর তার খেসারত তোমাকেই গুণে যেতে হবে। দল বাছাই-এর দায়িত্ব তোমারই। রাজনীতিটা পুরোই স্বার্থের বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দলের স্বার্থ, বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ, গোষ্ঠীর স্বার্থ। কেননা বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে বিশেষ শ্রেণীর খাদ্যখাদক সম্পর্ক। সঠিক দল বাছতে না পারলে তুমি হয়ত তোমারই অজ্ঞাতে এক বিজ্ঞ অজ-গরের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে

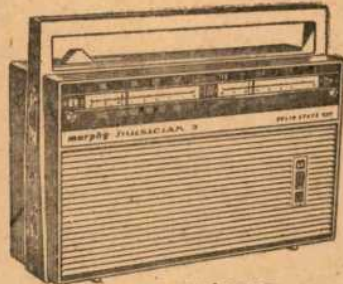
বসবে। সর্বনাশ। কিন্তু তখন আর উপায় নেই।

রাজনীতিটা এমনিই মারাত্মক আর সাংঘাতিক। ভোটের ব্যাপারটা এমনিই গুরুত্বপূর্ণ। বেকায়দা হলেই পূর্ণগ্রাস। তাই ভোট মানলে রাজনীতি তোমার করতেই হবে, বুঝতেই হবে। দল বাছতেই হবে। তোমার শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী প্রতি-ভোট না আসলে শক্তিমান হয়ে পক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। তা সে যাই কর না কেন, রাজনীতিই করছ। রাজনীতির বাইরে আছি, একথা হয় মূর্খের বয়ান, নয় বুদ্ধবুদ্ধের ভাষা। তোমার যুগটা তোমাকে রাজনীতির বাইরে থাকতে দিতে নারাজ। এমন কি নিরপেক্ষ থাকার কথা বলাটাও অবাস্তব।

এই সব সঠিক বুঝতে পারলেও মনটা কিন্তু নিজে কোন দলে যোগ দিতে চায় নি। দলও মূহুর্তে চেহারা পালটাচ্ছে। আবার নিরপেক্ষ থাকারও ভারি ঝামেলা। কেউ বিশ্বাস করে না। কেউ বন্ধ হতে চায় না। নিরপেক্ষ মানে, তুমি নির্বান্ধব, নিরপেক্ষ মানে, তুমি শূন্যের ওপর পা পেতেছ। তোমার কোনো তরফেই কোনো ইপ্রাটেক-শন নেই। অথচ সব তরফের ডিক-শেন (শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

মারফি ট্রানজিস্টর

সৌন্দর্য ও জোরালো ধ্বনির সম্মিলন।



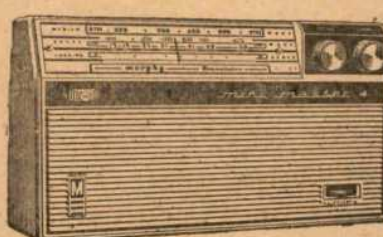
২০ মিটার ব্যাণ্ডসহ সমস্ত মিডিয়াম ওয়েভ ১২৫ টাকা।



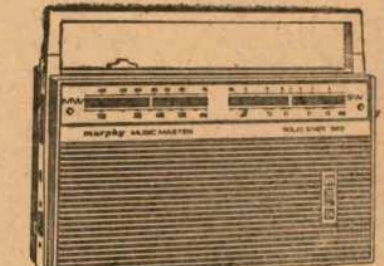
মারফি ট্রানজিস্টর অনেক রকমের আছে। তা থেকে আপনি খুশিমত পছন্দ করে নিতে পারেন। প্রত্যেকটিই দেখতে খুব সুন্দর, আর খুব স্পষ্ট জোরালো আওয়াজ দিয়ে থাকে।

প্রতিটি মারফি ম্যাগনি-টিউপ। তাই, আপনি পাবেন স্পষ্ট, জোরদার ও মধুর ধ্বনি।

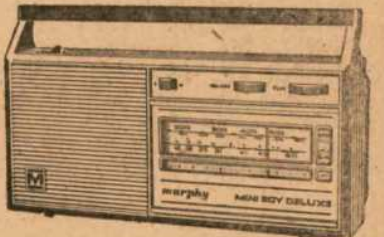
০ গাব এয়াইজ ডিউট সমস্ত। অত্যন্ত চার বছর।



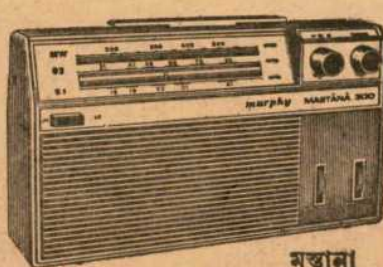
মিনি মাস্টার ২-ব্যাণ্ড ২১০ টাকা।



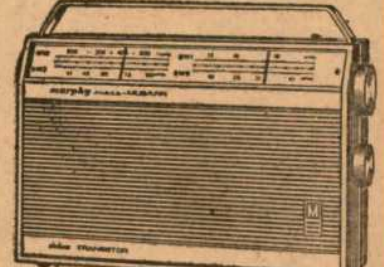
মিউজিক মাস্টার ২-ব্যাণ্ড ১৬০ টাকা।



ফ্রান্সি ডক্স ডিসপাল ২-ব্যাণ্ড ১৭৫ টাকা।



মহানন্দা ৩-ব্যাণ্ড ২৪৫ টাকা।



ফ্রেন্স-মুমারিন ৩-ব্যাণ্ড ডিলাক ৩২৮ টাকা।

মারফি সারা গৃহের উজ্জ্বল!

পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

দক্ষিণপন্থীরা, যথা আওয়ামী লীগ তিনটি মসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল (পি ডি পি), অন্যান্য স্বতন্ত্র দল ও দক্ষিণপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মস্কো ন্যাপ অংশ গ্রহণ করে। পাকিস্তান নির্বাচনী কমিশনার পূর্ব বাংলার নিম্নরূপ নির্বাচনী রায় ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগ পেয়েছে মোট ভোটের শতকরা তেরিশ ভাগ; অন্যান্য দল সতেরো ভাগ জাল ভোট ও বাতিল ভোট ছয় ভাগ মোট গৃহিত ভোট হলে শতকরা ছিয়ান্ন ভাগ।

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে মোট তিনশটি আসনের মধ্যে একশো একষাটটি আসনে (অর্থাৎ পূর্ব বাংলার একশ তেরটি আসনের মধ্যে একশো একষাটটি আসনে) জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদেও অনুরূপ বিজয় লাভে আওয়ামী লীগ সমর্থ হয়। নির্বাচনের এই ফলাফল পাকিস্তানী শাসক ও শোষক গোষ্ঠীকে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত করে তোলে। পশ্চিমা শোষক গোষ্ঠী ভেবেছিল আওয়ামী লীগ খুব বেশি হলে একশ কুড়িটি আসনে জয়ী হবে এবং বাকী ১৮০টি আসনের একটি এককবন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী শীল চক্রের দ্বারা আওয়ামী লীগকে সংখ্যালঘু পার্টি হিসাবে দমিয়ে রেখে পূর্ব বাংলার ধনিক গোষ্ঠী সহ সকল জনগণকে চিরায়ত প্রথার শোষণ করা হবে। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনাকে পূর্ব বাংলার জনগণ কার্যতঃ ব্যর্থ করে দিয়েছে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়াহিয়া ও ভুট্টো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্রের পথ খুঁজতে থাকে।

এদিকে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ও পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধীনতার দাবীতে প্রবল জনমত সৃষ্টি করে। কেননা নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের কমরীরা “জয় বাংলা মনেই স্বাধীন বাংলা” বলে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিল। বাস্তবে স্বাধীনতা আনয়নের প্রতিশ্রুতিই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সাফল্য ঘটিয়েছিল। এক্ষণে আওয়ামী লীগের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ স্বাধীনতার দাবীতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবুর রহমানের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। অপরদিকে পূর্ব বাংলার সেনা বাহিনী ইন্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অধা সামরিক বাহিনী ইন্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই পি আর) এর সেনারাও (যারা এতদিন পাকিস্তানী সেনা কর্তৃক পদে পদে জ্বালাত নিষ্পত্তি এবং অপদস্থ হয়েছে) স্বাধীনতা

ঘোষণার দাবীতে শেখ মুজিবকে চাপ দিতে থাকেন। এমন কি পূর্ব বাংলার সকল বাঙালী আমলা অফিসাররাও এই স্বাধীনতার জন্য এককবন্ধ ভাবে এগিয়ে আসেন। অন্যদিকে হক্ তোয়াহাদের পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম ছল) ছাড়া অন্য সব কটি বামপন্থী দল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের ব্যাপক প্রচার ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরুর করেন।

ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন সামরিক শাসকরা ঢাকা, ঈশ্বরদী, সান্তাহার, পাকশী, সিরাজগঞ্জ, সৈয়দপুর চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শহরে বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, যা কমিউনিস্টরা কঠোর মনোভাব দ্বারা ব্যর্থ করে দেয়। উপর্যুক্তর না পেয়ে ভুট্টোর পরামর্শ অনুযায়ী পরলা মার্চ ইয়াহিয়া সরকার তেহরা মার্চে ‘অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের টেকনাফ থেকে দিনাজপুরের তিতুলিয়া সীমান্ত পর্যন্ত প্রতিবাদের ঢেউ বয়ে যায়। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পিপাসু মারমুখি জনতার মিছিলে ছেয়ে যায় প্রতিটি শহর। শেখ মুজিবের নির্দেশে সমগ্র প্রদেশে প্রতিপালিত হয় হরতাল, বন্ধ হয়ে যায় অফিস আদালত, যানবাহন, ব্যাঙ্ক বীমা, স্কুল কলেজ ও কলকারখানাগুলো। পশ্চিমা শোষক গোষ্ঠী পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সজাগ জনতা সে ষড়যন্ত্রকেও ব্যর্থ করে দেয়। সমগ্র পূর্ব বাংলার মুক্তি-কামী জনতা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য বিক্ষোভ মিছিল করে এগিয়ে যায় ধানমন্ডিতে অবস্থিত শেখ মুজিবের বাড়ীর পানে। দোশরা মার্চ বর্ষর সেনারা তেজগাঁও ও মালিবাগ এলাকায় গুলি করে নাগরিক হত্যা করা সত্ত্বেও তেহরা মার্চ শেখ মুজিব “আহিংস ও অসহযোগ” আন্দোলনের ডাক দেন হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করে কালো পতাকা উত্তোলন করার নির্দেশ দেন।

এদিকে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি জনগণকে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে সামিল হয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে পাকিস্তানী সেনাদের খতম অভ্যাস চালাতে নির্দেশ দেন। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির একটি গেরিলা দল পাঁচই মার্চ রাত এগারটায় মহাখালী রেলগেটে পাকিস্তানী সেনাদের একটি ঘাঁটি আক্রমণ করে একটি সশস্ত্র সেনাকে নিহত এবং অপর একজনকে আহত করে। ছয়ই মার্চ পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র আদায় করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী সকল রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠান, পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিকদের সমন্বয়ে একটি একফ্রন্টের আহ্বান জানান এবং “পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফোর্স” গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা তাদের এই বক্তব্যের ব্যাপক প্রচার করেন এবং অন্যান্য বামপন্থী-নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রলীগের নেতৃবর্গ ও কমরীরা সশস্ত্র যুদ্ধের পথে স্বাধীনতা আদায়ের জন্য এক ফ্রন্টের প্রস্নে একমত হন।

ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া সরকার এক আপোষ আলোচনার জন্য শেখ মুজিব ও ভুট্টোকে এক গোল টেবিল বৈঠকে আহ্বান করেন। শেখ মুজিব সতই মার্চ নিম্নোক্ত চারটি দাবী না মানা পর্যন্ত গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। দাবী চারটি হলো— (এক) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নিতে হবে; (দুই) সেনাবাহিনী ব্যারকে ফিরিয়ে

নিতে হবে; (তিন) অবিলম্বে গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং (চার) দোশরা মার্চ তেজগাঁয়ে হত্যাকারী সেনাকে তদন্ত করে বের করে উপযুক্ত শাস্তি বিধান ও নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সেদিনই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী ছাত্রবৃন্দ রেসকোর্স ময়দানে “স্বাধীন বাংলা দেশের” পতাকা উত্তোলন করেন এবং জনগণকেও স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দেন। নয়ই মার্চ মাওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানের এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের আহিংস নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং একফ্রন্ট গড়ে তুলে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন। তিনি “স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার” স্বীকৃতিও দাবী করেন। সেদিন রাতে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির অপর এক গেরিলা-দল ঢাকা কেন্দ্রনগরে অবস্থিত

এক পাকিস্তানী কণ্ঠের বাড়ী আক্রমণ করেন এবং ঐ কণ্ঠকে হত্যা করে তার স্টেনগান নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এর পর থেকে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট সমন্বয় কমিটি পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন এবং ভাসানী ন্যাপ যুদ্ধফ্রন্ট ও গণমুক্তি ফোর্সের মাধ্যমে সশস্ত্র যুদ্ধের ব্যাপক প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপোষকামী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ আহিংস ও অসহযোগ নীতির ভিত্তিতে সশস্ত্র যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন। ফলে আওয়ামী লীগের ছাত্রপ্রতিষ্ঠান ছাত্র লীগের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে উঠে। স্বাধীনতাকামী ছাত্রলীগের “রব গ্রুপ” এককবন্ধ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের পথে দেশকে স্বাধীন ও জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করে একটি ভালো প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেন। (চলবে)

এই কলকাতায়

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

টেশনেই-তুমি আন্দোলিত। বেঁচে থাকারাই একটা স্বপ্নময়। বেঁচে থাকা মানেই কুট কৌশল, না হলে কুটকৌশলীর ছায়ায় থাকা। আর এই স্বপ্ন মনের অবস্থা, তখন পুষ্কেন্দ্রকে বুঝতে পারা তো সম্ভব নয়। সে লড়াই করবে বলে, অথচ রাজনীতির বাইরে থাকতে বলে। এ আবার কেমন রাজনীতি? মন্টু বলে, “বুঝতে পারছি, আমারটা আমিই বুঝে নেব, পরিষ্কার আমাদের এতোটা দাম্পত্যিক হওয়ার সুযোগ দেয়নি। মদুখে নিরপেক্ষ থাকলেও বাস্তবে যে তা সম্ভব নয়। তাই ওটা বুজরুকি।” মন্টুর বিশ্বাস নেই ওসবে।

মনোযোগ দিয়ে সবটাই শুনছিল শৈবাল। সে বললে, “অর্থাৎ তুমি বলতে চাস, কোনো দলকে সমর্থন না করলে অন্তত তার বিরোধিতাও করতে হয়, আর সেটাও রাজনীতিই?”

“পরিষ্কার বুঝেছিস তুমি।” মন্টু বাকি চাটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে নেয়।

আমি বলি, “কিন্তু রাজনীতি চুকলেই আজকাল বড় গোলমাল, এমন কি খুন জখমও হচ্ছে। স্বতন্ত্র ওগুলো এড়িয়ে গেলে...”

মন্টু আহত হয়। স্মান হেসে বলে, “এইসব ইন্টেলেকচুয়াল ধোঁয়াশাই আমাদের ক্ষতি করছে বীরেনদা। স্মার বন্ধ করে দিয়ে ধোঁকাটাকে আড়ালে রাখার চেষ্টা, সেও তো এক ধরনের ষড়যন্ত্র। সত্যকে আড়াল করলেও ছিন্ন

পথে তার অনুপ্রবেশ কতকাল রাখা হবে। আমি অরাজনৈতিক, একথা যখন একটা রাজনীতিকের প্রতিহত করার জন্যই বলছেন, তখন আপনিও সেই রাজনীতিই করছেন না কি? সপ্রশ্ন মানুষের কাছে এই প্রশ্ন কদিন আর চেপে রাখা সম্ভব?”

আমি উত্তর করি না। বস্তুত আমি বা বললাম, সত্যি সত্যিই সেকথা তো আমি বিশ্বাস করি না। বলছি ঝামেলা এড়াবার জন্যই। অথচ বুঝছি, রাজনীতি আচ্চে-পুচ্চে বেঁধেছে আমাদের। নিরপেক্ষ থাকার অর্থ ক্ষমতাসীনকে কুণিষ্ঠ করা। যে যখন ক্ষমতায় তাকে তখন সেলাম বাজিয়ে গেলেই সেটা হল নিরপেক্ষ থাকা। কিন্তু এই অসত্যের মধ্যে আর যে-ই বাঁচুক, গণতন্ত্র বাঁচতে পারে না। এই মনোভাব গণতন্ত্র বিরোধী। কণ্টার্জিত গণতন্ত্রকে দূর করে হারানো আরও ধীর চিন্তার অপেক্ষা রাখে। নিরপেক্ষ সেজে গণতন্ত্রকে বানচাল করার শঠতা মানুষের ইতিহাসকে পিছনে ঠেলে দেওয়ার অপরাধ। এসব বড় সাবধানী চিন্তার ব্যাপার। সাধারণ মানুষ অত ভাবতে গেলে দিশাহারা হয়ে পড়ে।

মন্টুর উত্তেজনা পুষ্কেন্দ্রের বয়সে গিয়ে অনেক নিবিড় হয়ে যায়। কিন্তু তাতেও কোনো সরাসরি ভরসা নেই; মন্টুর বয়স

নিয়ে আর এক রাগী ছোকরা প্রশ্ন তুলবে তখন।

যৌবন রাগী, কারণ যৌবন সত্যানুসন্ধিৎসু। যৌবন উত্তেজিত কারণ যৌবনই সপ্রশ্ন। যৌবন কারিগর কারণ যৌবনই সংগ্রামী।

মন্টুর দিকে তাকিয়ে, তার সেই উত্তেজিত রক্তিম চোখালের ওপর দৃষ্টি রেখে হঠাৎ আমার মনে হল, পুষ্কেন্দ্রের বয়সী আমি। আমার বয়স হচ্ছে। বয়স হলে মানুষ স্বল্পভাবী হয়। আমি শব্দ প্রোতা হয়ে যাচ্ছি। বয়স বোবা হতে শেখায়, কারণ একমাত্র নাকি দোবারই শব্দ নেই। অথচ কথাটা কি বাস্তবিকই খাঁটি? তরুলতা বোবা, অথচ সপ্রাণ। কিন্তু তার কি শব্দ নেই? কন্টুরের কুড়ালের আঘাতকে প্রত্যাহাত না হেনে রক্তাক্ত দেহে নুয়ে পড়লেই একমাত্র নিঃশব্দ হওয়া যায়। বয়স আঘাতের সঙ্গে সমঝোতা করে।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ চাঁদার হার

বার্ষিক পনেরো টাকা
ষাণ্মাসিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা :
৬১, মট লেন, কলি-১৩

সাম্প্রতিক ডলার সঙ্কট

(৩য় পৃষ্ঠার পত্র)

মূল্য থেকে ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে এগারো হাজার মিলিয়নে এসে পৌঁছেছে।

অন্যদিকে স্বল্পকালীন ডলার দায়ের পরিমাণ ১৯৪৮ সালে ছয় হাজার মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৮ সালেই ব্রিটিশ হাজার মিলিয়ন ডলারে উঠেছে। অর্থাৎ বৃটেন ও আমেরিকার লেনদেন ঘাটতি সর্বদাই চলতে থাকায় ঐ দুটো দেশ ডলার বা স্টার্লিং নেট ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক দায় শোধ করেছে। এর ফলে অন্যান্য দেশে মদ্রাস্থিতি ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটানোর পরে তদের রপ্তানী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অর্থাৎ বৃটেন ও আমেরিকার লেনদেন ঘাটতি হলে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মদ্রার পরিমাণ বাড়বে কিন্তু মদ্রার রক্ষণমত সব দেশেই কমে যায় এবং ফাটক বাজী দেখা দেয়। অন্যদিকে বৃটেন বা আমেরিকার লেনদেন উন্নত হলে আন্তর্জাতিক মদ্রাব্যবস্থায় যোগান কমে যায় ফলে সবদেশেরই আর্থিক প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এই হল মৌলিক স্ব-বিরোধ।

যতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৃটেন ও মার্কিন মদ্রা রিজার্ভ মদ্রা হিসাবে বজায় থাকবে, ততদিন এই উভয় সংকট বিভিন্ন পুঞ্জিবাদী দেশে দেখা দেবে। এই মৌলিক পুঞ্জিবাদী সংকটের হাত থেকে কোন পুঞ্জিবাদী দেশেরই মুক্তি পাবার উপায় নেই। বিশেষ করে ভিয়েতনামে যুদ্ধ খরচ বাবদ আমেরিকা বছরে তিন হাজার চারশ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। এই খরচ মার্কিন মোট লেনদেন ঘাটতি বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে দ্রুতবেগে ডলারের রক্ষণমত কমে যাওয়ার বিভিন্ন দেশের মজুত তহবিলের সংকট দেখা দিয়েছে। এ খরচ বন্ধ হলে অর্থাৎ ভিয়েতনামে মার্কিন অক্রমণ বন্ধ ও সৈন্য প্রত্যাহার করা হলে আপাততঃ এই সংকট থেকে আমেরিকা রক্ষা পেল।

এই অপ্রতিরোধ্য সংকটের হাত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের আত্মরক্ষা করতে পারছে না। আমেরিকা থেকে পুঞ্জি লক্ষ্যবাদের বিদেশে চলে যাওয়ার ফলে আমেরিকার শিল্পপ্রসার মন্দ হতে পড়ছে এবং বেকারী (১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ৪৮ লক্ষ) বেড়েছে; আমেরিকায় উৎপন্ন পণ্য যে পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে, বিদেশস্থিত মার্কিন কোম্পানীগুলির উৎপন্ন রপ্তানী তার স্বিগুনেরও বেশী; বিদেশে লক্ষ্যবাদের জন্য আমেরিকার আভ্যন্তরীণ বিকাশের জন্য লক্ষ্যবোগ্য মূলধনের কুড়ি শতাংশ বাইরে চলে যাচ্ছে; প্রায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশী মার্কিন বৃহৎ কোম্পানী বিদেশে পণ্য উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকার ফলে দেশের সংগতিতে টন পড়েছে; ইউরোপে পণ্যোৎপাদনের খরচ মার্কিন দেশে

উৎপাদন খরচের তুলনায় পনেরো শতাংশ কম হওয়ার ফলে মার্কিন লেনদেন ঘাটতি প্রায় স্থায়ী অকার ধারণ করেছে। তাই ইউরোপের পণ্যোৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে তা আমেরিকার পক্ষে সুবিধাজনক। পশ্চিম ইউরোপে লক্ষ্যবোগ্য দাদনের উদ্দেশ্যে রিজার্ভ মদ্রা হিসেবে ডলারের অবধারিত স্রোতের ফলে ইউরোপের প্রতিটো দেশের স্থানীয় মদ্রা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ পণ্যমূল্য উর্ধ্বমুখী হয়েছে।

ডলারের রক্ষণমত কমে গেলে এই দেশগুলির মজুত তহবিলে টান পড়ে। তারা তখন ডলার বদলে সোনা জমাতে চায়। ফলে সোনার দাম উর্ধ্বমুখী হয়ে আন্তর্জাতিক মদ্রা বিনিময়ের হারকেই বিপন্ন করে তোলে। সোনার দাম আর বেড়ে দেওয়া আন্তর্জাতিক দর আউন্স প্রতি পয়ত্রিশ ডলারে ধরে রাখা যায় না।

দশটি উন্নত পুঞ্জিবাদী দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি এই বিপদ রোধের জন্যে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে ডলারের ও নিজেদের দেশের মদ্রার বিনিময় হার অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে বাজারে ডলারের দাম পড়ে গেলে সরকারী দরে ডলার কেনার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নেয়, এর নাম সোয়াপ, এবং সোনার দাম উর্ধ্বসীমার ওপরে উঠলে পয়ত্রিশ ডলার দরে সোনা বিক্রয় করতেও চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১৯৭১ সালের পাঁচই মে পশ্চিম জার্মানীর মদ্রাবাজারে ডলারের যোগান বেড়ে যাবার ফলে সেয়াপ চুক্তি অনুসারে প্রথম এক-ঘণ্টায় পয়ত্রিশ জার্মানী একশ ঘাট কোটি ডলার সরকারী দরে কিনে নেয়। কিন্তু ততৈ চাপ কমে নি বরং দর আরো পড়ে গিয়ে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন পশ্চিম জার্মানী সরকারী আদেশ-বলে ডলার ও মার্ক বিনিময় বন্ধ করে দেয়। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ইউরোপ, জাপান ও সিঙ্গাপুরের বাজারে দেখা দেয়। সমস্ত দেশেই বৈদেশিক মদ্রার লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনা ১৯৬০-৬২ সালের অর্থিক বিপর্যয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

হঠাৎ এভাবে সংকট উপস্থিত হল কেন? এর প্রথম কারণ গত বছরে আমেরিকার লেনদেন ঘাটতির পরিমাণ এক হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে এবং এবছর এপর্যন্ত ঘাটতি পাঁচশো কোটি ডলার। ফলে ডলারের রক্ষণমতের ওপর আন্তর্জাতিক আস্থা কমে গেছে। দ্বিতীয় কারণ এই ঘটতি সত্ত্বেও মার্কিন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট নিকসন এ বছরের ষে বাজেট বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন, তা আর্থিক সম্প্রসারণ-মূলক। ফলে ডলার মদ্রার পরি-

মাণ বাড়ানো হয়েছে এবং সুদের হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সুদের হারের সুযোগ নেবার জন্যে ১৯৬৮-৭০ সালে মার্কিন ব্যাংকগুলি বৈদেশিক শাখাগুলি থেকে যে ডলার কজ্জ নিয়েছিল (কারণ ঐ সময়ে আমেরিকাতে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের চেয়ে সুদের হার বেশী ছিল) তা সঙ্গে সঙ্গে শোধ করে দিয়েছে, সুতরাং ইউরোপীয় দেশগুলিতে ডলারের যোগান হঠাৎ বেড়ে গেছে।

ইতিমধ্যেই নিউইয়র্ক বিদেশী মদ্রা বিনিময় বাজারে পশ্চিম জার্মানীর মার্ক ও সুইস ফ্রাঁ সরকারী দরের চেয়ে যথাক্রমে তিন ও চার শতাংশ বেশী দরে বিক্রী হতে শুরু হয়েছে।

ডলারের মূল্য হ্রাস (ডি-ভ্যালুয়েসন) ছড়া আপাততঃ এই সংকট নিরসনের অন্য কোনো পথ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মার্কিন অর্থনীতিবিদরা পশ্চিম জার্মানীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে তারা যেন মার্কের মূল্য খোলা বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে নির্ধারণিত হবার সুযোগ দেন।

পুঞ্জিবাদী দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মদ্রা ডলার। আজ অর্থনৈতিক অমোঘ নিয়মে তার মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হলে, নিজেদের রপ্তানী বাণিজ্যকে ঝঁচাবার জন্যে আরো শতাব্দিক পুঞ্জিবাদী দেশকে স্ব স্ব মদ্রার মূল্য হ্রাস করতে হবে। আমাদের দেশের পুঞ্জিবাদী সরকারও এর থেকে রক্ষা পাবেন না। ফলে বিশ্বের গোটা আর্থিক কাঠামোই ভেঙে পড়ার মধ্যে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে এই আর্থিক সংকট যেভাবে চিরস্থায়ী আকার ধারণ করেছে, তার ফলে পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক সংকট, যুদ্ধ ও আর্থিক দেউলিয়াপণা দেখা দিতে বাধ্য। এই অর্থনৈতিক সংকট দেশে দেশে রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তরিত হতে বাধ্য।

এই পুঞ্জিবাদী আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই এই সংকটের মূল নিহিত। হয় বর্তমান পুঞ্জিবাদী উৎপাদন কৌশল পরিচালনা করে সামাজিক মালিকানায় সামাজিক উৎপাদনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ গোটা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নতুবা প্রতি এক-বছর দুবছর পরে এরকম আর্থিক সংকটের অনিশ্চয়তা ও বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে।

অবশ্য বৃহৎ পুঞ্জিবাদী রাষ্ট্রগুলির সামনে আরেকটো আপাতঃ সংকট নিরসনের ব্যবস্থা খোলা আছে। আর্থিক সম্প্রসারণের শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হবার পর এই একটো রাস্তাই খোলা থাকে। তাহলো স্ব স্ব দেশের বিপুল কর্মহীন শ্রমশক্তি এবং পুঞ্জিকে সামলিক ভাবে ধ্বংস করে ফেলা যাতে পুনরুৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

একমাত্র বিরাট আকারে যুদ্ধ বাঁধলেই পুঞ্জিবাদ সাম্রাজ্যবাদ এই উদ্ভূতকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সুস্থ সবল মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে সমরোপকরণ নির্মাণে উৎপাদন-শক্তিকে ব্যাপৃত রেখে ভোগ্য পণ্যের ঘাটতি সৃষ্টি করে কয়েক বছরের জন্যে সমস্ত উদ্ভূত ধ্বংস করে ফেলা যায়। এবং একাজ করতে হলে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ধ্বংসলীলা সৃষ্টি না করে করা যায় না।

কিন্তু বর্তমান যুগে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করা সহজ হলেও যুদ্ধ বাঁধলে দেওয়া অত সহজ নয়। কারণ আধুনিক যুদ্ধে কোন দেশের সাধারণ অসামরিক মানুষও নিরাপদ থাকতে পারে না। সুতরাং পৃথিবী বসপী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তিশালী জনমত যুদ্ধবাজদের হাত চেপে ধরতে পারে।

সুতরাং এই পুঞ্জিবাদী অনিশ্চয়তা, আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা পাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর জনসাধারণ পচা, জীর্ণ গোটা পুঞ্জিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে নতুন যুগোপযোগী সমাজ-তান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

করতে এগিয়ে আসবেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার জন্যেই সাম্রাজ্যবাদ পুঞ্জিবাদ বিশ্বযুদ্ধ ডেকে অনতে পারে। কিন্তু ফল একই হবে।

এক কথায় আজকের যুগে যখন বিশ্ব পুঞ্জিবাদী সমাজব্যবস্থা বারে বারে অপ্রতিরোধ্য সংকটের আবর্তে পড়ে বিলুপ্তি ও ধ্বংসের পথে অগ্রসর তখন যেকোন বিশ্ব-যুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিস্তৃত করবে যেমন ইতিপূর্বে দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে। আবার পৃথিবীব্যাপী শান্তিপ্রিয় মানুষ পুঞ্জিবাদকে ধ্বংস করে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন করে চিরতরে যুদ্ধের বিধ্বংসী লীলাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। অর্থাৎ হয় বিশ্বযুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রতিষ্ঠিত করবে, না হয় বিশ্ব বিপ্লব বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে চিরতরে বিলুপ্ত করবে, এমন একটা সম্ভাবনাপূর্ণ সমীক্ষণে বিশ্ব অর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান ডলার-মার্ক, ডলার ইয়েন, ডলার স্টার্লিং সংকট এই সম্ভাবনারই সংকেত চিহ্ন।

সেলুয়েড জগতের রজনীতা

মুগাকশেখর রায়

সিনেমা জগতের পাণ্ডপাঠীদের কান্ডকারখানা নিয়ে ছবি তৈরী অবশ্য নতুন নয়। 'জেমস আই-ভির' নতুন ছবি বোম্বে টকী নির্মাণকালে আশা করা গিয়েছিল যে এবার বৃদ্ধি তাঁদের আগের দুটো ছবি "সেপ্টেম্বর ওয়ালা" ও "গুরু"র ফাঁকা দার্শনিকতা থেকে রেহাই পাওয়া হবে এবং পদার আড়ালের রঙ্গব্যঙ্গের বেশ একটা মজার চেহারা থাকবে।

ছবি আরম্ভ হয় অবশ্য একটী ফিল্ম স্টুডিওর মধ্যেই। ভারত-ভ্রমণে ব্যস্ত এক বিদেশী লেখিকা লুইসিয়া লেন ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞানভণ্ডের জন্য স্টুডিও পরিদর্শন আসেন এবং নামী চলচ্চিত্র অভিনেতা বিক্রম কাপুরের সঙ্গে তাঁর আলাপ।

দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম এবং আনুষ্ঠানিক নানারকম ঝামেলা বিদেশী মহিলার ভালোবাসার শরিক আরো একজন, বিক্রমের বন্ধু হরি। বিক্রম বিবাহিত, কিন্তু তার স্ত্রী মাল্লা বন্ধ্যা। আরো নানা জাতের চরিত্রের ভীড় ছবিতে। চিত্র-প্রযোজক বোস, মালার শরীরের ওপর তার লোভ কম নয়। বাকপট্ট এক স্বামীজী, পুরোনো দিনের নামকরা এক অভিনেত্রী ও তার কিছু তরুণ মোসাহেব, এই রকম বিভিন্ন উদ্ভট লোকজন। পাঁচ-মিশেলী মশলার উপাদানে তৈরী চিত্রনাট্য সারাক্ষণ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে এবং ছবিতে কখনোই কোন গভীর মূহুর্ত সৃষ্টি হয়নি। যদিও গালভরা কথা আছে অটলে।

আসলে নির্মাতাদের উদ্দেশ্য-

টাই পরিষ্কার নয়। তাঁরা কি বোম্বেই ছবির আজব ব্যাপার নিয়ে একটা ব্যঙ্গাত্মক কৌতুকনাট্য তৈরী করতে চেয়েছেন, নাকি চরিত্র-গল্পের মনোজগতের সূক্ষ্ম অন্তর্লীন আলোড়নকে ক্যামেরার ভাষায় ধরতে চেয়েছেন? কিন্তু উদ্দেশ্য ষাই থাক, তার রূপায়ণে আইভির একেবারেই অসার্থক। মনুষ্যত্বের নিপুণ কারিকুরিও নেই, আবার দক্ষ ব্যঙ্গের আভাসও অনুপস্থিত। সুদূরত মিথের আলোকচিত্র গ্রহণের শিল্পকুশলতায় ছবির কিছু কিছু জায়গায় উপযুক্ত কাব্যিক মেজাজ পরিস্ফুট। কিন্তু ছবির মৌল অন্তঃসারশূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যামেরাশিল্পীর সাফল্য বিশেষ কাজে আসে না। আসলে সমস্ত ছবিটাই একটা রং-এ কান্দাবাজি, একেবারে সস্তা আর হাল্কা।

ফিলিপস কর্মীদের

একদিনের বেতন দান

ফিলিপস ওয়ার্কস ইন্ডিয়ান কর্তৃক আয়োজিত চোন্দই মে তারিখে কনভেন্ট পার্কে একটি জনসভায় ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশংকর কর্মকার ফিলিপসের কলকাতাস্থিত কারখানা-সমূহের তরফ থেকে কর্মীবৃন্দের একদিনের বেতন ১৪৭৪ টাকার একটি চেক পিপলস রিলিফ কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ মণি বিশ্বাসের হাতে বাংলা দেশের মুক্তিকামী নাগরিকদের সাহায্যার্থে দান করেন।

সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা রাজনীতি করছেন

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

সরকারী কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে নব কংগ্রেস মন্ত্রীদেব একটি অলিখিত নির্দেশ বিভিন্ন জেলায় কতৃপক্ষ এবং দপ্তর প্রধানদের যে বিচলিত করেছে এ সংবাদ বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে।

বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের সি-এম-ডি-এর কাজে নিয়োগ করা সম্পর্কে আগেকার প্রস্তুত প্যানেলকে বাতিল করে দেওয়ায় বেশ কিছু সংখ্যক কর্মপ্রার্থী বিব্রত।

শ্রীবিজয় সিংহ নাহার তাঁর দপ্তরে জানিয়ে দিয়েছেন—সব “বেকার” বেকার নয়। আমি থাকে বলে দেব তাকেই গ্রহণযোগ্য মনে করতে হবে।

অনেক আশা নিয়ে যে সব নাগালী যুবক কোন মর্দুনিব জোগাড় করতে পারেন নি, অথচ একবারে প্যানেলে নাম অন্তর্ভুক্ত করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তাঁরাই আজ সব চাইতে বিপন্ন।

কয়েক দিন আগে চব্বিশ পরগণা জেলায় ভূমি রাজস্ব বিভাগে গ্রাম তিরিশটি পদ খালি হয়।

কোন পক্ষপাত যাতে না হয় সেজন্য স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির পরামর্শ অনুসারে জেলা শাসক বিভিন্ন প্রার্থীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেন।

তিনি যাঁদের উপযুক্ত মনে করেন তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়াও স্থগিত করে ফেলেন; কিন্তু ভূমি রাজস্বমন্ত্রীর এক টেলিফোন তাঁকে বন্ধুত্ব করে।

মন্ত্রী মহাশয় নাকি হুমকি দিয়েছেন যে তাঁর অনুমোদিত প্রার্থী ছাড়া অন্য কাউকে নিয়োগ করা চলবে না।

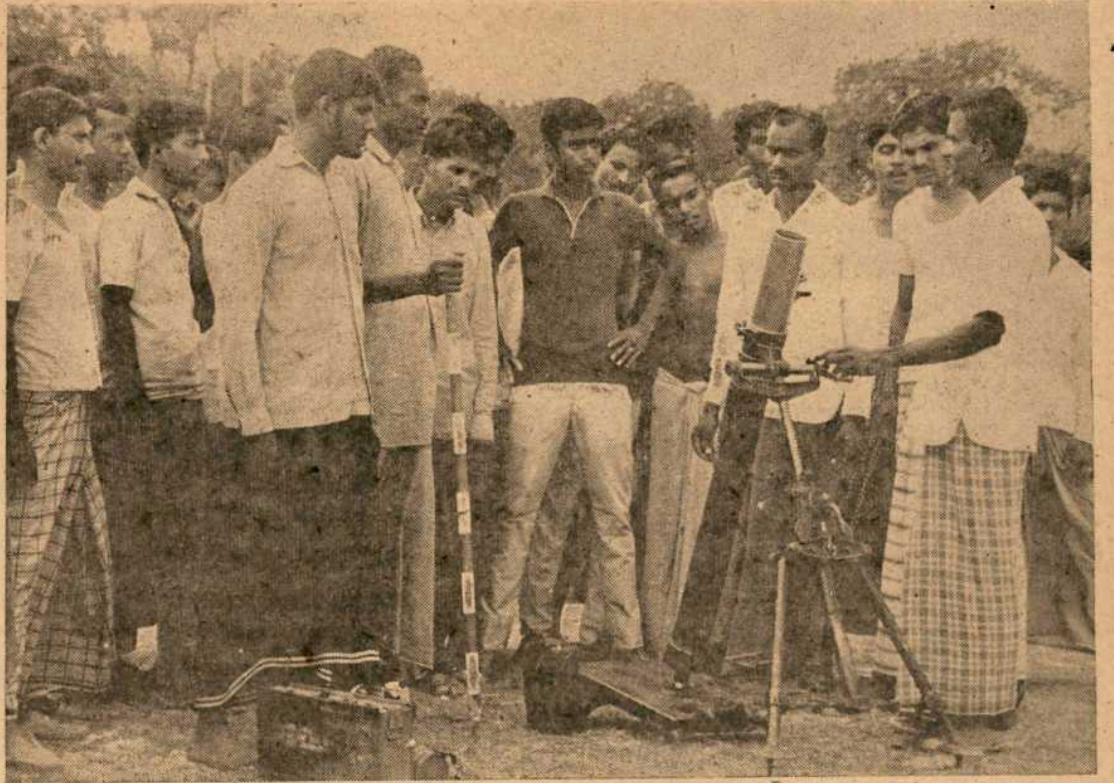
জেলাশাসক বলে দিয়েছেন যে যাদের যোগ্য মনে করবেন তাদের নিয়োগ করার স্বাধীনতা না দিলে তিনি জেলার শাসনভার চালিয়ে যেতে অনিচ্ছুক। প্রতিটি ছোটখাট ব্যাপারে এই ধরনের হস্তক্ষেপ করলে শাসন ব্যবস্থাকে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি পালন করা অসম্ভব বলে তিনি জানিয়েছেন।

এর পর মন্ত্রী মহাশয় আপাতত চূপচাপ হয়ে গেছেন। শোনা গেছে নিয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

এই ধরনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ প্রতিটি জেলার দপ্তর থেকেই আসছে। বর্ধমান, পশ্চিম দিনাজপুর, হুগলী ও হাওড়ায় এ ব্যাপার নিয়ে ছোটখাট বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন সরকারী কর্মচারীরা।

রাইটাস বিল্ডিংসের একজন প্রবীণ অফিসার বলেন সৈদিন: “এখন যে কদিন আছেন এঁরা গৃহীয়ে নিতে দিন। মন্ত্রী হওয়ার পরে যদি দলের লোকদের চাকুরীর সুদ্রাহা না করতে পারি তাহলে গদীতে বসে কি লাভ।”

অল্প দিনের মধ্যে পি-এস-পি সদস্য দাস গতবারে এই পথে এগিয়ে কতটা বন্ধবৎসল তা প্রমাণ করেছেন।



বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মর্টার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। ছবি : অমিয় তরফদার



বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ। ছবি : প্রণব মৃথোপাধ্যায়

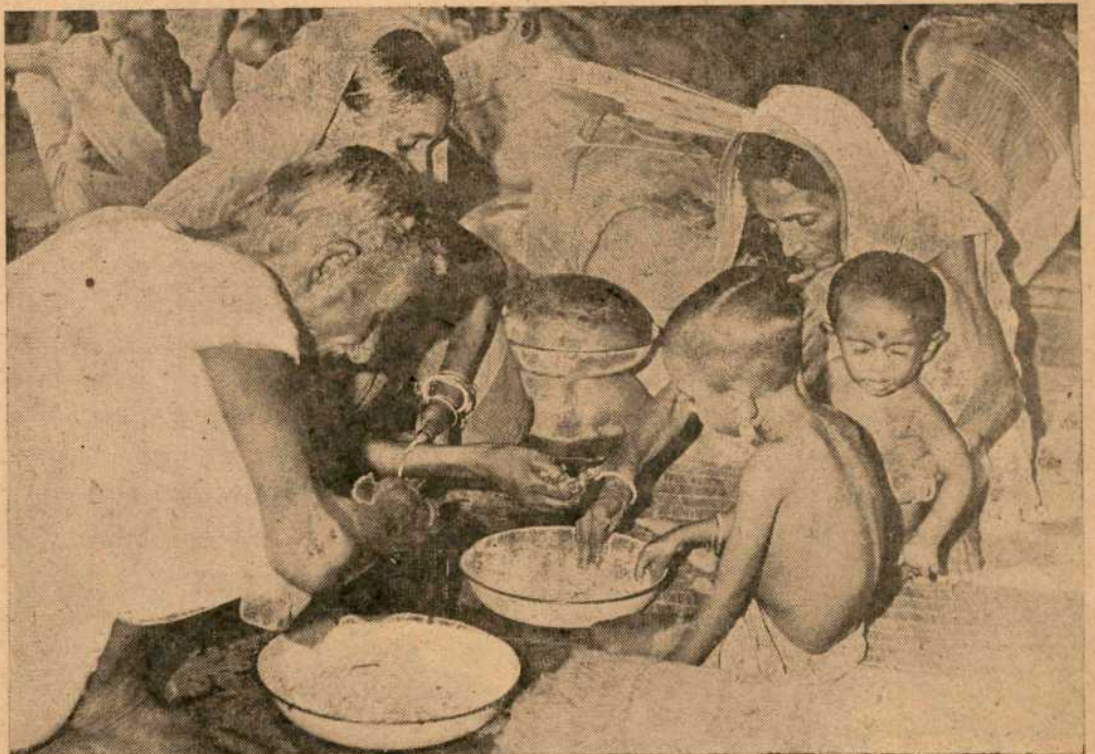
এথোরায় প্রধান শিক্ষক হত্যা মামলার অভিযুক্তদের সম্মানে মুক্তিলেভ

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

আসানসোল দশই মে : আসানসোল আদালতের অতিরিক্ত দায়রা জজ এথোড়ায় প্রধান শিক্ষক হত্যা মামলার অভিযুক্ত মণিতোষ তরফদার সহ সাত জনকে সকল অভিযোগ থেকে সম্মানে মুক্তি দিয়েছেন। মাননীয় বিচারপতির রায় শুনবার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে প্রচুর জনসমাগম হয়। এথোড়ায় এই ঘটনাকে অবলম্বন করে প্রতি-ক্টিয়াশীলরা সারা দেশব্যাপী সি পি এমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে, এমন কি ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন থেকেও এই কুৎসা

প্রচার করা হয়। গত নির্বাচনের সময় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসীরা মানুষকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে, এমন কি আসানসোলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার নির্বাচনী সমাবেশেও সি পি এমের বিরুদ্ধে এই ঘটনাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন।

অভিযুক্তদের পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেন শ্রমিক নেতা ও আইনজীবী শ্রীচন্দ্রশেখর মদ্বাজী এবং তার সহকারী শ্রীবিবাজ মন্ডল।



বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্ভাস্ত। ছবি : প্রণব মৃথোপাধ্যায়

সম্পাদক—হীরেন বসু

১০৪৬ কতৃক এডার্স ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দপ্তর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

বর্ধমানের পুলিশ লাইনে কায়েমী স্বার্থের চক্র

নায়ক পুলিশ সুপার : উপনায়ক সদর থানার ও সি

(দপণের সংবাদদাতা)

বর্ধমানের পুলিশ সুপার পাঁচগোপাল মুখার্জীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। তিনি নীচের তলার পুলিশ কর্মচারীদের, বিশেষ করে নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির সক্রিয় সদস্যদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত মূলক আচরণ করছেন এবং তাদের হয়রাণি করার জন্য নানা স্থানে বদলী, কারোকে সাসপেন্ড, এমন কি কারোকে গ্রেপ্তার করছেন। ফলে এইসব কর্মচারীর পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত। এই কাজে পুলিশ সাহেবের সহযোগী সদর থানার বড়বাবু কেশব ব্যানার্জী, তৎসহ দু'একজন দারোগা ও জমাদার। পুলিশ কর্মচারীরা সমাজ বিরোধীদের মতো আক্রান্ত ও ছুরিকা-হত হচ্ছেন। কর্মচারীদের দাবী : উপযুক্ত তদন্ত হলে প্রমাণিত হবে যে এর পেছনে বর্ধমান থানার ও সি ও কয়েকজন অফিসারের হাত আছে।

গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি চাপলাকর ঘটনা ঘটে। জানা যায়, ঐ দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সাদা পোষাক পরা তিনজন মিলিটারী বর্ধমান শহরে কানাই নাকশাল পাড়ার বাস এবং বর্ধমান

পুলিশের একজন জমাদারের (এর ভাই একজন কন্সটেবল) বাড়িতে প্রবেশ করে। ওদের দেখেই মেয়েরা চীৎকার করে ওঠে। ফলে বীরপুংগব মিলিটারী পলায়ন করে। পাড়ার দু'জন তরুণ একজন মিলিটারীকে পাকড়াও করে। কন্সটেবলটি সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান কন্ট্রোল রুমে খবর দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলিটারী ভ্রাতা করে সকলকেই মিলিটারী ক্যাম্পে বন্দি আসা হল। অভিযোগ যে, কন্সটেবলটির মাথায় রইফেলের কেসনেট দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করা হয়। তাকে যখন বর্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল তখন তিনি মৃত।

বর্ধমান সদর থানার ও সি কেশব ব্যানার্জীর একটি চক্র আছে। এই চক্রের অফিসার ও কন্সটেবলরা বদলী হওয়া সত্ত্বেও তাদের সদর থানায় রাখা হয়েছে। দারোগা মনোরঞ্জন ঘোষ, সুধীরবাবু, রাখাল দেবকে যথাক্রমে বীরভূম জেলা, ডি আই বি ও আসানসোলে বদলী করা হয়েছিল। দারোগা শঙ্করী-প্রসাদ সদর থানায় তিন বৎসরের বেশী আছেন। জমাদার অশোক ঘোষও সদর থানায় তিন বৎসরের

বেশী আছেন। একে আসানসোল ও মেমারীতে বদলী করা হয়েছিল। জমাদার বিনয় পাল অনেক দিন ধরে সদর থানায় আছেন। কন্সটেবল পীমুখ মুখার্জী আসানসোলে বদলী হয়েছিলেন। ড্রাইভার দেবু ও সির গাড়ি চালান। ইনি হুগলীতে বদলী হয়েছিলেন। কেশব ব্যানার্জী এর বদলীর আদেশ চেপে রেখেছেন। এই দেবু ড্রাইভার পাঁচ বছরের বেশী সদর থানায় আছেন। এর বিরুদ্ধে বেআইনী কার্যকলাপের অভিযোগও আছে।

বর্ধমান পুলিশ লাইনে কয়েকজন অফিসার পুলিশ সুপার পাঁচগোপাল মুখার্জীর পেটোয়া। এরা বদলী সংক্রান্ত ব্যাপারে আশী টাকা বেতনের গরীব কন্সটেবলদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে পুলিশ সুপারকে ফর্তির জোগান দেন বলে অভিযোগ। বর্ধমানের একটি স্থানীয় পত্রিকায় এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

বর্ধমান রিজার্ভ অফিসেও দুর্নীতির বাসা। এই অফিসের দু'জন কুখ্যাত দারোগা বহু গরীব সিপাইকে চোখের জলে ভাসিয়েছেন। এই অফিসটি প্রকৃতপক্ষে ঘুঘুর বাসা। এখানে একজন কুখ্যাত দারোগা আছেন যিনি মহিলা হোমগার্ডদের দেখাশোনা করেন। ইনি সাত বছর এই পুলিশ লাইনে একই পদে আছেন। ইনিও পুলিশ সুপারের একজন জোগানদার।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পালিয়ে এসেছেন কেন ?

(দপণের সংবাদদাতা)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখার্জী যদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শান্তির আশায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করে চলে গিয়েছিলেন। যদবপুরের নকশাল ছাত্ররাও যা করেনি, এবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদের ছেলেরা তার চেয়েও বেশী এগিয়ে গেছে। ছাত্র পরিষদের কিছু কিছু সদস্য আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই ছোরা ভোজালি প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে চলাফেরা করে। ইতিমধ্যেই ছাত্র পরিষদের বিরোধী ছাত্র সংস্থাভুক্ত ছাত্রেরা এই সব গন্ডাদের হাতে নিগৃহীত, জখম, এমন কি খুন পর্যন্ত হয়েছেন।

জানা গেছে যে ছাত্র পরিষদের এই গন্ডাদল উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেও খাতির করে নি। তার বড়ীতে ঢুকে তাকে ছোরা দেখিয়ে তারা শাসিয়েছে যে তিনি যদি তাদের

কথায় সাঙ্গ না দিয়ে চলেত তা হলে নতুন মন্ত্রিসভার আমলে তাকে চাকরী তো ছাড়তে হবেই, প্রাণ নিজেও টানটানি হতে পারে। - ফলে ডঃ মুখোপাধ্যায় অবিলম্বে দীর্ঘ ছুটী নিয়ে বর্ধমান ছেড়ে চলে এসেছেন।

দপণ জানতে পেরেছে যে ডঃ মুখোপাধ্যায় নতুন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তি রঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাত করে সমগ্র ব্যাপারটা তাকে জানিয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রিমন্ত্রণ এতে রুষ্ট হয়ে নাকি তাকে আবার যদবপুরেই ফিরে আসতে হবে বলে দিয়েছেন। তাহলেই নাকি ডঃ মুখোপাধ্যায় বৃদ্ধিতে পারবেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ভেজালীধারী ছাত্র পরিষদের ছাত্ররা না যদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বোমা রিভলবারধারী নকশালী ছাত্ররা বেশী বিপজ্জনক।

মন্ত্রিমন্ত্রণের এই ইঙ্গিতের পর বর্ধমানের উপাচার্য মহাশয় কি করবেন এখন ভাবছেন।

শিক্ষা সচিবের কাছে দাক্ষণী কামউনিটদের হেনস্থা

(দপণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ সেনগুপ্ত যুক্তফ্রন্ট আমল থেকে সাধারণ ছাত্র শিক্ষকদের দাবী দাওয়াগুলির প্রতি সহানুভূতিহীন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হাল করার জন্যে তিনি তার দপ্তরের সচিব পদের সুযোগ গ্রহণ করতেন এবং শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের নানা দাবীদাওয়া অথবা শিক্ষা সংস্কারের নানা কার্যকরী ব্যবস্থা সম্পর্কে যে নির্দেশগুলি দিতেন তা নানা কৌশলে অকেজো করে দিতেন।

যুক্ত ফ্রন্টের আমলে সেনগুপ্ত মহাশয় দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টদের সঙ্গে খুব দহরম মহরম করতেন। কারণ শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট ভুক্ত দলগুলির মধ্যে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টদের কাছে লাগানো তার অন্যতম কৌশল ছিল। ফলে দক্ষিণী কমিউনিষ্টরা সেনগুপ্ত মহাশয়ের গদগদমুখ ছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি কংগ্রেসী শিক্ষামন্ত্রীর তালিম পেয়ে তিনি বৃদ্ধিতে পেরেছেন যে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টদেরও দিন ফুরিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে টিকে থাকতে হলে তাদের কংগ্রেসীদের দয়ার ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে।

সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর সামনেই সেনগুপ্ত মহাশয় এই নয়া তালিমের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সম্প্রতি পলিটেকনিক কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক প্রতিনিধিদল নতুন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এক ডেপুটেশন নিয়ে যান। আলোচনাকালে প্রতিনিধিদল উল্লেখ করেন যে অতীতে ডঃ ভূপাল দে যে রিভিউ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সেই কমিটি পলিটেকনিক শিক্ষকদের দাবীদাওয়া সংগত বলেই রায় দিয়েছেন। বিশিষ্ট প্রযুক্তি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ কপিষ্ট ভট্টাচার্য মহাশয়ও ঐ রিভিউ কমিটির সভ্য ছিলেন। বলা বাহুল্য এই দু'জনেই দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক।

শিক্ষামন্ত্রী কিছু বলার আগেই সেক্রেটারী সেনগুপ্ত মহাশয় বলে উঠেন, "আরে ওতো কমিউনিষ্টদের কমিটি, ওদের রায় তো চোখা কাগজ এখন।"

ডঃ ভূপাল দে এবং কপিষ্ট ভট্টাচার্য মহাশয়ের দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট সমর্থক বলেই শ্রীসেনগুপ্তের কাছে আগে খাতির ছিল। এখন তাঁদের অভিমত তার কাছে "চোখা কাগজ" বলেই গণ্য হচ্ছে। কে জানি বলছিল, বারাগনা ও আমীর ওমরাহদের মধ্যে প্রভেদ সামান্যই থাকে। আধুনিক ওমরাহরাও কম যান না দেখা যাচ্ছে।

পশ্চিম বঙ্গে কোয়ালিশন সরকারের আসল স্বরূপ

(দপণের সংবাদদাতা)

সি পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থিত বংলা কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর মাত্র একদিনে আড়াইসের বেশী মানুষকে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রকৃত আসামী ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক, সাধারণ মানুষকে তার জন্যে অনেক হয়রানি, অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। এমনকি গান্ধীভক্ত অজয়বাবুর অমলেই কয়েকদিন আগে নিরস্ত্র জেল বন্দীদের পিটিয়ে মারা হলো। আরও অনেক অসহায় বন্দীদের আখরায় অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কোন বিচার নেই, চতুর্দিকে যেন জঙ্গলের রাজত্ব শুরু হয়েছে। অবশ্য যেসব মানুষ সর্বজনপ্রিয় হেমন্ত বসুর মৃত্যুকে রাজনীতি ও নির্বাচনী কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন তারাই তো এখন মন্ত্রিসভার নামী দামী অংশীদার, তাই তাদের কাছে সাধারণ মানুষের হত্যার বিচার চাওয়াটাও বোকামী। আর

যদিও বা তদন্ত বিচারের ব্যবস্থা হয় সেখানেও প্রকৃত আসামী ধরা পড়বে, এমন গ্যারান্টিই বা কে দেবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসব বলা বৃথা, নারী লাঞ্ছনা, নারী হত্যা, অগণিত খুন, জখম, চুরি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার এখন অনশন তো দূরের কথা, মাথা ঘামাবারই বা সময় কোথায়? এর উপরে রয়েছে নিজ দল বাংলা কংগ্রেসের ভাঙ্গন প্রতিরোধে জোড়াতালি দেওয়ার ব্যাপার। তবুও একটা কথা রাজ্যের জনগণের কাছে অশির্ভজনক বলে মনে হচ্ছে। কয়েকদিন আগে রাজ্য বিধানসভায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সি পি আই, মিলিটারী দ্বারা কোনওরূপ বিরোধিতা করা হবে না বলে যে নির্দেশ বিধান সভার তরফ থেকে রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে, বর্তমানে সেই প্রস্তাবকেও কার্যত কাঁচকলা দেখানো হচ্ছে। রাজ্যময় একশো চুরাঙ্গিশ ধারা জারী করে সাধারণ মানুষের

স্বাভাবিক আন্দোলন তো অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, উপরন্তু ১৪৪ (২) ধারানুসারে ব্যক্তিগতভাবেও এই আইনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সংগ্রামী মানুষের উপর। ডুরাস ও হিরিয়ানা ট্রান্সপোর্ট, প্রিমিয়ার রোড ক্যারিয়ার অধিকাংশ কর্মীর উপর এই আইন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি এসব সংস্থার কর্মীদের কর্মস্থলের একশ গজের মধ্যেও আসতে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে, উপরোক্ত সংস্থাগুলোর সঙ্গে জড়িত হুয়িরসন রোড, নস্কর পাড়া লেন (হাওড়া) বালমুকুন্দ রোড ও অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত কর্মস্থলে বাওয়া কর্মীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ রাজ্যের সি পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লকের মেকী শ্রমিক দরদী নেতাদের কাছে কিছু আশা করছে না, কারণ এদের পরিচয় আজ সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রশাসনিক কর্তা হিসেবে অজয়বাবুর কাছে তাদের প্রশ্ন, সতর্ক করে দেবার আশায় কুকুরের মত চীৎকার করে জনগণের দোরে ভোট ফিরি করার কি তবে আসল কারণ "মনিব"কে সতর্ক করা নয়, মুখ্যমন্ত্রীর পদে বাগিয়ে রাজ্যের মেহনতী-মানুষকে কামড়ানো।

আসন্ন তিনটি উপনির্বাচন প্রসঙ্গে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

আগামী জুন মাসের ছয় তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার উত্তরা (বর্ধমান), দমদম, এবং জে.ডাবাগানের তিনটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

রাজ্য বিধানসভার বর্তমান দলীয় অবস্থা এই তিনটি আসনের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রধানতঃ এই আসনের ফলাফলের ওপরই বর্তমান মন্ত্রিসভার ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করছে।

১৯৬৭ সালে উত্তরা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হারাধন মন্ডল ১৬২৪৭৮টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষণ বাগদী পান ১৩৯৫৫ এবং অপর প্রার্থী বাংলা কংগ্রেসের দেবদত্ত মন্ডল (ইনি ৭১ সালের নির্বাচনের পূর্বে নিহত হওয়ার উত্তরা কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত থাকে) পান ৪৪২২৮টি ভোট। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস বিরোধী বঙ্গব্রহ্ম প্রার্থী হিসাবে এই কেন্দ্রে থেকে সি পি এম দলভুক্ত লক্ষণ বাগদী ১৮১৪৪৮টি ভোট পান এবং তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী গভবাবের বিজয়ী, কংগ্রেস প্রার্থী হারাধন মন্ডল ১৫৮৪৯৮টি ভোট পেয়ে পরাজিত হন। বর্তমান উপনির্বাচনে সি পি এম প্রার্থীর সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থীর জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে আশা করা যায়। বাংলা কংগ্রেস এবারকার উপনির্বাচনে শাসক কংগ্রেস, সি পি আই, মুসলিম লীগ প্রভৃতি সরকারী দলের জোটবদ্ধ সমর্থন পাবেন। অন্যদিকে সি পি এম প্রার্থীকে প্রধানতঃ নিজস্ব সংগঠনশক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে। বর্তমান জেলা গভ্যবতী নির্বাচনে যেভাবে একবাক্যে সি পি এম প্রার্থীদের বিজয়ী করেছে, তাতে ঐ মেজাজ ও সংগঠন বজায় থাকলে এ আসনে সি পি এম প্রার্থীর বিজয় সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে অতিরিক্ত আত্মসম্মতির জন্যে তাঁদের কঠোর মূল্য দেবার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

দমদম কেন্দ্রে ১৯৬৭ সালে সি পি এম প্রার্থী তরুণ সেনগুপ্ত পান ৩৭০৬৬৮টি এবং একাবাক্যে কংগ্রেস প্রার্থী বীরেন গুহ পান ৩০৬৮২৮টি ভোট। অপর একজন নির্দলীয় প্রার্থী ১৩৫৮৮টি ভোট পান। ১৯৬৯ সালে তরুণাবাবু ভোট পান ৪৫,১৫২ এবং কংগ্রেস প্রার্থী বীরেন গুহ পান ৩০৮৬৭, অর্থাৎ সি পি এম-এর ভোট আট হাজার বেড়ে যায় এবং কংগ্রেস প্রার্থীর ভোট মোটামুটি একই থেকে যায়। এবারকার উপনির্বাচনে দমদম আসনটী-সি পি এম-এর পাবার সম্ভাবনাই অধিক, তবে এখানেও সংগঠন ও ভোটার উপস্থিতির ওপর জয়পরাজয় নির্ভর করে।

কলকাতার নির্বাচন কেন্দ্রে গুলির এবারকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কংগ্রেস ভোট ১১৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে যা ছিল তাই আছে, বিশেষ বাড়ি নি বা কমে নি। অন্যদিকে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের প্রার্থীদের প্রায় সব কয়টি কেন্দ্রেই ভোট কমে গেছে। অর্থাৎ কংগ্রেসের সমর্থকরা দল বেঁধে ভোট দিতে গিয়েছেন যদিও নতুন শক্তি তারা সংগ্রহ করতে পারেন নি। অন্যদিকে বামপন্থায় বিশ্বাসী ভোটাররা সংখ্যায় অধিক হলেও নির্বাচন কেন্দ্রে যেতে উৎসাহ পান নি; সেটা পলিশ মিলিটারী, সি আর পি, নকশালবাজির ভয়েই হউক, অতিরিক্ত আত্মসম্মতির ফলেই হউক অথবা বামপন্থী দলগুলির মধ্যে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে বিচ্ছিন্ন হবার ফলেই হউক—বেশ কিছু বামপন্থী সমর্থক ভোটার নির্বাচনে ভোট দিতে যান নি।

কিন্তু মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর এই ভোটারদের জড়তা ও বিচ্ছিন্ন বেশ কিছু পরিমাণে অন্ত-হিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

প্রথমতঃ আটপাটি জোটের কংগ্রেস ও সি পি এম উভয়েরই বিরোধী মনোভাব কেটে গিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক এবং দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি খোলাখুলি কংগ্রেস পক্ষে চলে গিয়েছেন। এর ফলে বামপন্থায় বিশ্বাসী ভোটারদের বেছে নিতে সুবিধা হবে। যারা চিরাচরিত ভাবে শাসকশ্রেণী বা এন্টারপ্রাইজমেন্টের বিরোধী তারা নির্বিঘ্ন ভোট দেবার সুযোগ পাবেন। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান সরকারী দলগুলি মধ্যবর্তী-নির্বাচন-কালে খুনোখুনির রাজনীতির জন্যে সি পি এম এর বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন, উত্তরা, দমদম ও শ্যামপুকুর কেন্দ্রের প্রার্থীদের, বিশেষ করে প্রখ্যাত প্রবীণ নেতা হেমন্তকুমার বসুর ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডকে নির্বাচনী মূলধন করার যে অশোভন প্রকৃতি দেখিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে সাধারণ ভোটারদের ধারণা অনেক পরিপরিষ্কার হয়েছে। বর্তমানে সাহিবাবাদীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে এরকম উচ্চ চাপের প্রচার চালানো সত্ত্বেও বর্তমানের সাধারণ মানুষ সি পি এমকে চাঁবুদটার মধ্যে তেইশটি আসনে নির্বাচিত করে এরপরের মিথ্যা রাজনৈতিক প্রচারের সম্মুখিত জবাব দিয়েছেন। শ্যামপুকুর অথবা জে.ডাবাগান কেন্দ্রের ভোটারেরা ইতিমধ্যে প্রখ্যাত হেমন্ত বসুর নিন্দনীয় হত্যাকাণ্ডের পেছনে কাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচেষ্টা নিহিত ছিল হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। অন্যদিকে নির্বাচিত সদস্য নেপাল-রায়ের হত্যা সম্পর্কেও অনুরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। নেপাল-বাবুর হত্যা মন্ত্রীপদভারের রেবারিষ অথবা বেলগাছিয়ায় ভূতপূর্ব

রাষ্ট্রমন্ত্রী পরিমলবাবুর স্ত্রী ও পুত্রের ওপর আক্রমণের মত নকশালী ঘটনা কি না, তা হস্ত উপনির্বাচন চলাকালে জানা যাবে না, যদি না নতুন পুলিশ কমিশনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্রীড়নক না হয়ে অপরাধী ধরার অঙ্গল-কাজে তৎপর হন।

সুতরাং জে.ডাবাগান কেন্দ্রের অবস্থা গত দশই মার্চের কলকাতার অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র হওয়াই সম্ভব। আরো এইজন্য যে, উপনির্বাচনে শ্যামপুকুর কেন্দ্রের প্রার্থী অজিত বিশ্বাস নিহত হয়েছেন। এবার কিন্তু এ ব্যাপারে সি পি এমের বিরুদ্ধে প্রচার করা সম্ভব হয়নি।

জে.ডাবাগানে ভোটার সংখ্যা ৮৮০২৪ জন। ১৯৬৭ সালে একজন শক্তিশালী জনসংঘ প্রার্থী তুলসী পাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ফলে কংগ্রেস প্রার্থী নেপাল রায় পরাজিত হন। সি পি এম প্রার্থী হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী পান, ২০০৮৩, নেপাল রায় ২০৯২৫ তুলসী পাল ১৫-৬৫৮টি ভোট পান। ১৯৬৯ সালে বঙ্গব্রহ্ম প্রার্থী সি পি এম দলের হরপ্রসাদবাবু এবং কংগ্রেস প্রার্থী নেপালবাবুর মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নেপালবাবু ২৯০৮১ ভোট পেয়ে জয়ী হন, হরপ্রসাদবাবু পান ২৮০১৫; আর দুজন নির্দল প্রার্থী যথাক্রমে ৩০৬ এবং ১৮১৮টি ভোট পান। লক্ষ্য করার বিষয় যে কংগ্রেস প্রার্থী নেপালবাবুর ১৯৬৯ সালের ভোট (২৯০৮১) তাঁর এবং তুলসীবাবুর ১৯৬৭ সালের সম্মিলিত ভোটের (২০৯২৫+১৫৬৫= ৩০৪৯০) চেয়েও এক হাজার কম অন্যদিকে হরপ্রসাদবাবুর ভোট এককভাবেই ১৯৬৭ সালের তুলনায় ১৯৬৯ সালে প্রায় পাঁচ হাজার বেড়ে গেছে। ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যে ভোট পড়েছে তার হার ৬২ শতাংশ, কিন্তু কলকাতা শহরে ভোট পড়ে মাত্র ৪০ শতাংশ। জে.ডাবাগান কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গের নিন্দনীয় ভোটের হার লক্ষিত হয়। এখানে মাত্র ২০.৮ শতাংশ ভোটার ভোট দেন। কেন এত কম ভোট পড়ল তার মধ্যে না গিয়েও একথা বলা যায় যে যদি এই কেন্দ্রে ভোটারেরা অনীহা ও সংশয় ত্যাগ করে ভোট দিতে এগিয়ে আসেন তাহলে ফলাফল অন্যরূপ হতে পারে। ১৯৭১ সালে কংগ্রেস (শ) প্রার্থী নেপাল রায় ২০৮০৬ সি পি এম প্রার্থী হরপ্রসাদবাবু ১০,৩৩৭ এবং বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী ৭৮৫৮টি ভোট পান। অর্থাৎ নেপালবাবু ১৯৬৭ সালে যে ভোট পেয়ে হেরেছিলেন, ১৯৭১ সালে সমান্য কিছু কম পেয়েও জিতে গেলেন। আর হরপ্রসাদবাবু যে ভোট পেয়েছিলেন (১৯৬৭ সালে

২০০৮৩ এবং ১৯৬৯ সালে ২৮০১৫) তার চেয়ে এবার তুলনামূলকভাবে যথাক্রমে ১০০০০ (১৯৬৭) এবং ১৮০০০ (১৯৬৯) ভোট কম পেয়েছেন। মনে হয় পূর্বোক্তিত কারণে বামপন্থী ভোটারেরা ভোট দিতে এগিয়ে এলে এবার অন্যরূপ ফল হবার সম্ভাবনাই অধিক।

বিধান সভায় বর্তমানে যে শক্তি সমীকরণের চেহারা তাতে এই তিনটি আসন গুরুত্বপূর্ণ পরি-স্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। স্পীকার নির্বাচনে কংগ্রেস ১৪০-টির বেশী ভোট সংগ্রহ করতে পারেন নি। এর মধ্যে মনোনীত এয়ালো ইন্ডিয়ান সদস্য এক, জনসংঘ এক বাদ দিলে বর্তমান সরকারের সদস্য সমর্থক সংখ্যা ১৩৮ জন। স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর আরো একজন কমেছে এবং মুসলিম লীগের জনৈক সদস্যের প্রকাশিত মনোভাবের দরুন আরো একজনকে অনিশ্চিত ধরলে মন্ত্রিসভার বর্তমান সমর্থক সংখ্যা মাত্র একশো ছত্রিশ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা কার্যতঃ সংখ্যালঘু। অন্যদিকে জেলে আটক দুজন এবং হাইকোর্টের নির্দেশে একজন বিরোধী সদস্যকে ধরলে বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা

১০২+৩ = ১০৫ জন। অর্থাৎ মন্ত্রিসভার ভাগ্য একটি ক্ষীণসূত্রের ওপর ঝুলে আছে।

বর্তমান উপনির্বাচনে বিরোধী দল জয়লাভ করলে বর্তমান মন্ত্রিসভাকে গদী ছাড়তে হবে। মন্ত্রিসভার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি, বিশেষ করে হত্যা, নিপীড়ন, ভীতি আশংকা দূর করার প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তিগত সন্তোষের সংখ্যা বেড়ে এখন খাস মহাকরণেও গুন্ডামি ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের দুঃসাহস দেখা দিয়েছে। চাল, ডাল, কয়লা সমস্ত দৈনন্দিন জিনিষের মূল্য বেচন এ সরকারকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই উদ্ভব। আর মন্ত্রিসভার আসল প্রেরণাদায়ী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিশ্রুতির মোড়কের রংটা খুলে গিয়ে অসার বস্তুটি লোকচক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। সারাবারত জুড়েই মার্চের ইন্দিরা পক্ষপাতী হাওয়া ইন্দিরা বিরোধী হাওয়াতে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সদ্য বিজিত মহারাষ্ট্রের নাগপুর লোকসভা আসনে চারটি উপনির্বাচনেও তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

ছাত্রনিগ্রহের প্রতিবাদে আন্দোলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত কয়েক মাসে রাজ্যে বিশ-হাজারেরও বেশী মানুষকে জেলে যেতে হয়েছে। এরা কবে মুক্ত হবে বলা শক্ত। এর মধ্যে, পাঁচ-শেরও বেশী ছাত্র নিগ্রহের হয়েছে। হাজার দুই ছাত্রের উপর এখনও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বুলছে। এর উপর রয়েছে এক শ্রেণীর পলিশের ছাত্রহত্যা অভিযান ও গ্রেপ্তারের পর থানায় প্রচণ্ড নির্যাতন।

অভিযোগ, গত দুই ফ্রন্টের পর এবারও বেশ কিছু ছাত্রকে প্রাণ দিতে হয়েছে। বেপরোয়া হত্যা, থানায় প্রচণ্ড নির্যাতন ছাড়াও রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সি আর পি, মিলিটারী দিয়ে অকথ্য অত্যাচার চালানো হচ্ছে। অহিংস অস্ত্রবাবুর আমলে ছাত্র নির্বাচন চরমে উঠেছে। ছাত্রের দ্বন্দ্ব পলিশের হাত রক্তাক্ত হয়ে উঠলেও তাঁর সুধনিন্দ্রায় কোন বিঘ্ন ঘটছে না। তাই দিনের পর দিন, বাদবপুত্র বিশ্ববিদ্যালয় আর জি কব বিদ্যাসাগর ও কামারপুকুর কলেজে ও ছাত্রাবাসে সার্চের নামে ছাত্রনিগ্রহ পরিচালনা মাফিক এগিয়ে চলেছে।

তাই রাজ্যের সামগ্রিক নির্বাচন-মূলক ঘটনার বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবে ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছে। জানা গেলো, বিভিন্ন দাবী আদায়ের জন্যে এই আন্দো-

লন-শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। রাজ্যের প্রতি আরও অর্থনৈতিক সাহায্য, বিনা বেতনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ানোর সুবিধা, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, হোটেল ও শিক্ষার অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, চাকুরী ন্যস্ত ভাতা, বাসে ছাত্র কনশেশন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পলিশী হামলা বন্ধ করার দাবীর সঙ্গে স্বাধীন বাংলা দেশকে স্বীকৃতির দাবীটিও এদের রয়েছে। এসব দাবী দাঁড়ায় ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র থেকে বিশেষ জেলাই সামাজ্যবাদ বিরোধী পক্ষ পালন করার সিদ্ধান্তও এই ছাত্র-সংগঠন নিয়েছে।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

২৮শে মে ১৯৭১

বার্ষিক পনেরো টাকা
ত্রৈমাসিক সাত টাকা
মাসিক চার টাকা

টাকাভিত্তি ও চিঠিপত্র পাঠানোর

ঠিকানা :

৩১, লট লেন, কলি-১৩

দপন

১৪শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা ৥ শ্রুতবার ২৮শে মে ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা.



পেট্রোপোলে উদ্ভাস্তু শিবির। ছবি : প্রণব মধুখোপাধ্যায়

চৌ এন লাই ও যাওকে লেখা খ্যাতনামা চীন- সমর্থকদের খোলা

চিঠির বক্তব্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সারা পৃথিবীব্যাপী পরিচিত চীন বিপ্লব সমর্থকেরা চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের পাকিস্তানে ইয়াহিয়াখানার সাম্প্রতিক সমর্থনে প্রচণ্ড মর্মান্বিত। তাঁদের মধ্যে অনেকেই, যাঁদের জগজগোড়া খ্যাতি, চেয়ারম্যান মাও সে তুং আর প্রধানমন্ত্রী চৌকে একটি “খোলা চিঠি” দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

এই “খোলা চিঠি”তে যাঁদের স্বাক্ষর আছে তাঁদের মধ্যে আছেন ফরাসী দেশের জাঁ পল সাত্তার এবং তাঁর বান্ধবী সাইমন দ্য বুভোয়া,

বুটেনের জোয়ান রবিনসন, আরব গেরিলা নেতা ইয়াসের আরাফত, মার্কিন দেশের ব্ল্যাক প্যান্থার বিপ্লবী নেতা হুয়ে নিউটন প্রভৃতি।

এই চিঠির একটি খসড়া নিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

বাংলা কংগ্রেসে এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার পালা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলা কংগ্রেস সদর দপ্তর থেকে অজয়বাবুর বিশ্বস্ত অনুচর শ্রীআশুতোষ পাঁজাকে তড়ানো হয়েছে। শ্রীপ্রণব মধুখোপাধ্যায়ের নামে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্যামপদকুর কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক দলভুক্ত ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন প্রার্থী অজিত বিশ্বাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সরকার সমর্থক বিভিন্ন দলের মধ্যেও যে বিসদৃশ সন্দেহ ও সংশয়ের উদ্বেক হয়েছে তার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশেষ

করে কর্পোরেশনে জনৈক ফরওয়ার্ড ব্লক কার্ডিন্সলার যে ভাবে হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব সরকারভুক্ত একটী বৃহৎ দলের ওপর আরোপ করে বিবৃতি দিলেন এবং অজিত বিশ্বাসের মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় মিছিলকারী ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থকেরা আওয়াজ তুললেন (অজিত বিশ্বাসের হত্যার জন্যে দায়ী কে, অজয় বিজয় আবার কে?) তা থেকে লোকের মনে এ ধরনের নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে।

(ক) ১৬।১ বিডন স্ট্রীটের যে বাড়ীতে অজিত বিশ্বাস তথাকথিত নকশাল সমাজবিরোধীদের সঙ্গে সভা করতে গিয়ে নিহত হলেন, সেই বাড়ীর মালিক কি গত কর্পোরেশন নির্বাচনে আঠারো নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন? পরে তিনি তথাকথিত নকশালদের মদ্রুবনী হয়ে যান?

(খ) অজিত বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ডের সময় কলকাতা কর্পোরেশনের জনৈক কর্মী কি তাঁর সঙ্গে ছিলেন? ঐ ব্যক্তিটি কি জয়রাম মিত্র স্ট্রীটের বাসিন্দা? অজিতবাবুর সঙ্গে যারা যাঁরা ছিলেন, তাদের পরিচয় কি?

(গ) একথা কি সত্য যে অজিত বিশ্বাস, ফরওয়ার্ড ব্লক যে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করেছে তার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং ফলে তাঁর নির্বাচন ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন ভুক্ত একটী বৃহৎ দলের কাম্য ছিল না? জানা গেছে অজিত বিশ্বাস যেমন সি পি এম বিরোধী ছিলেন, তেমনি চূড়ান্ত কংগ্রেস বিরোধীও। শেষোক্ত ব্যাপারে তিনি অশোক ঘোষের বিরুদ্ধবাদী। বালিগঞ্জে একজন কংগ্রেসী এম এল এর বাড়ীতে একটি সভায় ঠিক হয়েছিল কোয়ালিশন সরকারের যেসব দল কংগ্রেস বিরোধী তাদের শিক্ষা দিতে হবে।

(ঘ) পরলোকগত অজিত বিশ্বাস কি তাঁর জোড়াবাগান এলাকার বাড়ী নকশালী-কংগ্রেসীদের তড়ায় ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন?

দেখা যাচ্ছে, সি পি এম কর্মীদের খুন করার জন্যে নকশালদের কাজে লাগাবার নীতি যে কটী দল পশ্চিমবঙ্গে চালু করেছিলেন, তা এখন বুঝে যাওয়া হয়েছে। তাই তাঁদের ঘাড়ের আঘাত হানতে (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

উথরায় বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হত্যা সম্পর্কে নতুন তথ্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ধমান জেলার উথরা বিধানসভা কেন্দ্রের নিহত বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেবদত্ত মন্ডলের হত্যার ব্যাপারে এক নতুন তথ্য দর্পণের হস্তগত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে গত ছাব্বিশশে ফেব্রুয়ারী জনৈক বিশিষ্ট গ্রামবাসী দুর্গাপুরের মহকুমা বিচারপতির সামনে এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি ছয়জন ব্যক্তির নাম করে বিচারপতির সামনে বলেছেন এই ছয় জনকে তিনি দেবদত্ত মন্ডলকে খুন করতে স্বচক্ষে দেখেছেন।

ব্যক্তিগত নিরপত্তার কারণে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীটির নাম প্রকাশ করছি না। আদালতে প্রদত্ত এই বিবৃতির পূর্ণ বয়ান দর্পণের কাছে আছে। উল্লেখযোগ্য

বিবৃতিতে যে ছয় জনের নাম করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে এরা কংগ্রেস ঘোষা সমাজ বিরোধী।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন উথরায় এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে সি পি এমকে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল এবং প্রথম দিকে ধৃত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন কিশোর সভার কর্মী ও সি পি এম সমর্থক। অবশ্য গত ছয়ই মার্চ আদালত এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে জামিন দিয়েছেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বিচারপতির সামনে প্রদত্ত বিবৃতিতে যে ছয় জনের নাম করা হয়েছে তাদের একজনকেও এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি।

যে নেম প্লেট ছিল সেটি তুলে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। শ্রীআশু পাঁজা গত শ্রুতবার মহাকরণে গিয়ে শ্রীঅজয় মধুখোপাধ্যায়কে জানান যে দাদা আমি আর থাকতে পারলাম না। আমি তমলুক যাচ্ছি। বাংলা কংগ্রেসের আর এক খবর হল গত নির্বাচনের সময় দলের টাকায় বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু মাইক লাউড স্পীকার, টেপ রেকর্ডার কেনা হয়েছিল সেইগুলি সবই জেলের দামে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এর ব্যতিক্রম করেছেন মদ্রুশিদিবাদ জেলার জনৈক নেতা। এই রকম কিছু মূল্যবান বস্তু তার কাছে ছিল কিন্তু সেইগুলি সুশীলবাবু চেষ্টা করেও ফেরত আনতে পারেন নাই। উক্ত ব্যক্তি বলেছেন তার সুশীলবাবুর কাছে বেশ কিছু টাকা পাওনা আছে, তা না পেলে তিনি তা ফেরত দেবেন না।

এই দিকে তলবী সভা বা কর্মপরিষদের সভা ডাকা নিয়ে অজয়বাবু একটা ফরমুলা দিয়েছেন, সেই ফরমুলা মত পাঁচই জন বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভা ডাকা হবে। এখন সংকট দেখা দিয়েছে সভায় কারা যোগদান করবেন ও সভার আলোচ্য সূচী কি হবে তা নিয়ে। সুশীলবাবু কর্ম- (শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

উদ্ভাস্তু আগমনের ফলে ঠিকাদারদের মজ্জ্ব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলা দেশের দুর্গত উদ্ভাস্তু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঠিকাদারদের মজ্জ্ব লেগে গেছে আর শুরুর হয়েছে কংগ্রেসীদের অনুগ্রহ বিতরণের পালা। অনেক ঘটনা আছে, এবারে শুধু ত্রিপুরা কেনার কাহিনী বলছি। রিলিফ দপ্তর চেয়েছিল বরো আউন্সের পঞ্চাশ হাজার তাঁবু। প্রতিটি একশ বারো টাকা দামের ক্রোটেশন গৃহীত হয়। শর্ত

ছিল টেস্ট রিপোর্টে খারাপ দেখা গেলে প্রতি তাঁবুতে শতকরা তিরিশ ভাগ টাকা কেটে নেওয়া হবে। মাল সরবরাহের পর দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ তাঁবু ছয় আউন্সের। এগুলোর দাম বাজারে প্রতিটি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা। শর্ত অনুযায়ী খারাপ মালের জন্য শতকরা তিরিশ ভাগ কেটে নেওয়া হবে। কিন্তু তাতেও বিরাট লাভ। একশ বারো টাকা থেকে শতকরা তিরিশ ভাগ কাটলেও তেতিরিশ টাকার মত বাদ যাচ্ছে, অর্থাৎ দাম দাঁড়াচ্ছে উনআশি টাকা। আর বাজারে এর দাম চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ।

পশুচিকিৎসা বিভাগে মন্ত্রীর তুফলকাঁ কারবার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশু চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী শপথগ্রহণের পরই যেসব কাজ আরম্ভ করেছেন তাতে মন্ত্রিসভার প্রকৃত চরিত্র ফুটে উঠছে। এই বিভাগে পশু চিকিৎসকদের পদোন্নতির সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে, কারণ এই বিভাগের সম্প্রসারণের জন্য বিভাগীয় পূর্ব-তন মন্ত্রী বা পূর্বতন ডিরেক্টর কেউই কোনও চেষ্টা করেন নি। সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে যে ব্লকগুলো (উন্নয়ন সংস্থা) আছে তা সর্বত্র একরকম নয় অর্থাৎ কোনও কোনও জায়গায় পশু চিকিৎসালয়-গুলি বেশ কর্মব্যস্ত থাকে, কোনও কোনও জায়গায় শহরের সুযোগ সুবিধা, হাসপাতাল, স্কুল কলেজ, বাসার সুবিধা আছে আর বেশীর ভাগ জায়গায়ই এই সুবিধা নেই। এই বিভাগে কোনও জায়গায় তিন বছরের বেশী সাধারণতঃ রাখা হয় না। যেখানে প্রয়োগের সুযোগ নেই সেখানে এই বদলীর মারফৎ ভালো জায়গায় পোশ্টিংই একমাত্র মোক্ষপথ।

কিন্তু এই বদলী ও পোশ্টিং-এর ব্যাপারে কোনও একটা সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ করা হতো না, যার জন্য ডিরেক্টরের স্বজনপোষণ নীতির দৌলতে অনেক জুনিয়র পশু-চিকিৎসক খুব ভালো ভালো জায়গায় পোশ্টিং পেয়ে আসছিলেন এবং বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজে এমন বহু লোক পোস্টেড আছেন যারা দুই-তিন বারের বেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। এই স্বজনপোষণ নীতির বিরুদ্ধে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মান নিম্নমুখী করার বিরুদ্ধে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারী এসোসিয়েশন জোরদার আন্দোলন করে এবং তারা এক সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ করার দাবী করে যে নীতিতে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে ভালো জায়গায় পোশ্টিং, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগত যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি। একই জেলাতে একাদিক্রমে রাখা বন্ধ করা, চাকরী জীবনে একবার অন্ততঃ উত্তর বাংলায় পোশ্টিং বাধ্যতামূলক করতে হবে ইত্যাদি ছিল।

শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন-কালে বিভাগীয় ডিরেক্টর এই দাবী মেনে নেন এবং তেসরা নভেম্বর উনিশশ সত্তরে দশ হাজার সাতশো কুড়ি নম্বর অর্ডার অনুযায়ী এই ব্যাপারের জন্য এক পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটিতে এসোসিয়েশনের পাঁচজন প্রতিনিধি ছাড়াও ডিরেক্টর, দুজন জয়েন্ট ডিরেক্টর, বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজের প্রিন্সিপাল ও রিসার্চ অফিসারকে গ্রহণ করা হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী

গত ডিসেম্বর (সত্তর)-এ এস ডি এস দুইর এক বদলীর অর্ডার হয়। মার্চ মাসে নির্বাচনের জন্য দু-চর জন ছাড়া কেউই নতুন জায়গায় যোগ দিতে পারেন নি চীফ সেক্রেটারীর আদেশের জন্য। কিন্তু তবু বহু পশুচিকিৎসক তাঁদের ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোনকে নতুন জায়গায় স্কুল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে রাখেন। মার্চ মাসে নির্বাচনের পরেই মার্চ মাসের মাহিনা নিয়ে সকলে নতুন জায়গায় যাওয়ার জন্য সকল রকম প্রস্তুতি-পর্ব করেন অর্থাৎ নতুন জায়গায় বাড়ী ভাড়া নেওয়া, জিনিষপত্র নেওয়ার জন্য ট্রাক ভাড়া এডভান্স দেওয়া ইত্যাদি শেষ করেন। মার্চ মাসের মাহিনার 'পে-স্লিপ' পেতে পেতে পনেরই-বোলই এপ্রিল হয়ে যায়।

কিন্তু ইতিমধ্যে এসেরা এপ্রিল নতুন মন্ত্রী শপথ নিয়েই আটই এপ্রিল আদেশ দেন যে ঐ পরামর্শদাতা কমিটির কাজ বন্ধ থাকবে, এবং ঐ সব বদলীর আদেশ তাঁর কাছ থেকে আর কোনও আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। নতুন জায়গায় বাড়ীভাড়া নিয়ে, স্কুল কলেজে ছেলে-মেয়ে ভাইবোনের ভর্তি করে দিয়ে ঐ সমস্ত পশুচিকিৎসকেরা এক অশ্রুত পরি-স্থিতির মধ্যে থাকলেন।

এই অন্যান্য ও স্বজনপোষণ ভিত্তিক খেলালী আদেশের বিরুদ্ধে এসোসিয়েশন বিভাগীয় ডিরেক্টরের কাছে প্রতিবাদ জানান এবং দাবী করেন যে মন্ত্রীকে যেন অবিলম্বে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়ে ঐ আদেশ প্রত্যাহার করানো হয়। মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর গত মাসের উনিশ তারিখে ডিরেক্টর আবার আদেশ দেন যে স্থগিতের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। এই আদেশ বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে বাইশ-তেইশে এপ্রিল হয়ে যায়। ঐ আদেশের সংগে বলা হয় যে, রামনগর এক নং ব্লকের, হাওড়ার সাকরাইল ব্লকের এবং চব্বিশ পরগণার মগরাহাট এক নং ব্লকের পশুচিকিৎসকদের বদলীর আদেশ বাতিল করা হলো। প্রথম জন মন্ত্রীর আতি পরিচিত ও মন্ত্রীর এলকার লোক এবং একই জেলাতে এই বিভাগে কাজ করার প্রথম থেকেই আছেন, স্থিতীয়জন মন্ত্রীর অন্তরঙ্গ বন্ধুর সুপারিশের লোক, তৃতীয়জন চাকরীর প্রথম থেকেই ঐ একই জায়গায় প্রায় পাঁচ বছর আছেন এবং একজন কংগ্রেসী নেতার ছেলে। এর সংগেই মন্ত্রীর এক আতি পরিচিত আত্মীয়ের মত ব্যক্তিকে কলকাতার বদলীর জন্য সুপারিশ করা হয় অন্যান্যভাবে। পাঁচ দিনাজপুরের গংগারমপুর ও

তপন থেকে দুজন বদলী হয়ে কুচ-বিহারে দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গাতে চার্জ নিতে পারেন না কারণ দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গার দুজন মন্ত্রীকে ধরেছেন। মন্ত্রীর স্বজন পোষণের রূপ ভুলে ধরাতে তিনি ক্ষেপে গিয়ে বদলীর আদেশ আবার স্থগিত রাখেন। এর ফলে বহু কর্মচারী গ্রিস্তকুর মত বদলেছেন।

পশুচিকিৎসা বিভাগের পূর্বতন ডিরেক্টর মারোয়ার সম্বন্ধে সকলেই জানেন এবং তিনি উনিশশো সত্তর এর ফেব্রুয়ারীতে এই রাজ্য থেকে চলে যাওয়ার পরে পশুচিকিৎসকেরা ও ভেটেরিনারী কলেজের ছাত্ররা বিশেষ শান্তিতে কাজ করছিলেন। যদিও তারপরে বর্তমান মন্ত্রী উনিশশো সত্তর সালে থাকা-কালীনই তদানীন্তন জয়েন্ট ডিরেক্টর ডাঃ মুখার্জীকে ডিরেক্টরের পদে এবং মন্ত্রীর আতি পরিচিত ও দেশের লোক ডাঃ ডি এন দাশকে জয়েন্ট ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করেন। পশুচিকিৎসকদের আন্দোলন জোরদার হওয়াতে ডাঃ মুখার্জী উনিশশো একাত্তর-এর জানুয়ারীতে দীর্ঘকালীন ছুটিতে যান। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার মুখোমুখি ডিরেক্টর পদে কউকে না দেওয়াতে এই বিভাগে এক

অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সারা পাঁচ বাংলার সমস্ত পশুচিকিৎসা-লয়ের ওষুধপত্র কেনার জন্য বরাদ্দ প্রায় তিন লক্ষ টাকা ফেরৎ যেতে চলেছিল এবং যার ফলে পুরো এক বছর সমস্ত পশুচিকিৎসালয়কে বিনা ওষুধপত্রে বসে থাকতে হতো।

এই অবস্থার অবসান ঘটানোর দাবীতে এসোসিয়েশন তদানীন্তন রাজ্যপালের বিভাগীয় উপদেষ্টা ও সেক্রেটারীর সংগে দেখা করে বিভাগের অভিজ্ঞ, প্রবীণ ব্যক্তিকে ঐ ডিরেক্টর পদে নিয়োগের দাবী জানান। সেই অনুযায়ী গত উনিশশে ফেব্রুয়ারী অপর জয়েন্ট ডিরেক্টর ডাঃ এম এস দাসকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়। এই সময়েই বহু দিনের তাঁদের দাবী যার বার উপেক্ষিত হওয়াতে পশুচিকিৎসকেরা আন্দোলনে নামেন এবং তাঁদের কতগুলি ন্যায্য দাবীর সমর্থনে ও তৎসংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত ছাব্বিশশে ও সাতাশে ফেব্রুয়ারী গণছাউনেন। সরকারী কাজে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত "ভেটেরিনারিয়ানরা" এই গণছাউনেন, সেই সঙ্গে ডাঃ এম এস দাশও নেন। স্বাস্থ্য দপ্তরেও এর নজর আছে। ডাঃ এম এস দাশ কার্ভার গ্রহণের পরেই আতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই প্রায় ফেরৎ যাওয়া টাকার ওষুধপত্র কেনার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু গণছাউনেনেও দরুণ নতুন মন্ত্রী শপথ গ্রহণের পরই তাঁকে ভালো চোখে দেখতে পারলেন না আর তার সঙ্গে যোগ দিলেন

তাঁর দেশের লোক ডাঃ ডি এন দাশ। ন্যায়সংগত দাবীর সমর্থনে আন্দোলন মানেই শাস্তিযোগ্য অন্যায় এই হচ্ছে, তাঁর অভিমত। সেইজন্য পূর্বতন সরকারী আদেশ বাতিল করে ডাঃ এম এস দাশের পদাবনতি ঘটানো হলো। আর ডাঃ ডি এন দাশকে ডি-ফ্যাক্টো ডিরেক্টর বানানো হলো। এই ডি এন দাশের যে পদোন্নতি গত বছর সুধীর দাশ করেন তাই অন্যায় হয়েছে। কারণ ডিরেক্টর ডি এম এস ক্যাডার থেকে জয়েন্ট ডিরেক্টর পদে (ডিরেক্টর ডি এইচ ডি এস ক্যাডার) কখনই নিয়োগ করা হয়নি। উপরন্তু এই ব্যাপারে উনিশশো পঁয়ষাট সালে ডাঃ বি চৌধুরীর হাইকোর্টে কেসের সময় সরকার এফিডেভিট করেন যে জয়েন্ট ডিরেক্টর পদে বিভাগের অন্য ডিরেক্টর ডি এইচ ডি এস ক্যাডার থেকে বদলীই হচ্ছে সরকারী নীতি। এই ব্যাপারে সরকার পক্ষ জয়লাভ করেন। এই অজু-হাতেই। সুতরাং ডি এন দাশের সময় হাইকোর্টে কেসের বক্তব্য কেন উল্টানো হলো? তিনি মন্ত্রীর লোক বলেই কি? এইখানে কিন্তু মন্ত্রী থাকেন নি। বিভাগীয় ডেপুটি সেক্রেটারী অবসর গ্রহণ করলেন, তারপর আবার তাঁকে পশুচিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর পদ দেওয়া হচ্ছে! চিন্তা করুন, একটি টেকনি-ক্যাল বিভাগের ডিরেক্টর পদে অব-সরপ্রাপ্ত আই এ এস। এই সর-কারের আমলে সব কিছই সম্ভব।

সমাজ-বিরোধীদের কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসীরা এখন বণদে পড়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅজিত বিশ্বাসকে হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ইতিপূর্বে দর্পণে প্রকাশিত সংবা-দের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন সূত্রে।

বিভিন্ন স্ট্রীটের একজন সেল-নের মালিক শ্রীপরেণচন্দ্র দাসকে এই ঘটনার সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারীভাবে জানান হয়েছে যে শ্রীদাসই সৈদনের গোপন বৈঠকের অন্যতম উদ্যোক্তা। ঐ বৈঠক থেকে বার হওয়ার পরই শ্রীবিশ্বাস আত-তায়ীর হাতে নিহত হন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলো-চনার সময় গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার শ্রীদেবী রায়, যিনি এই হত্যার ব্যাপারে তদন্তের প্রধান দায়িত্ব নিয়ে আছেন—জানি-য়েছেন যে বৈঠকে কি "আলোচ্য" বিষয় ছিল তা এখন অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

একজন জানা গেছে যে ঐ বৈঠকে প্রায় বিশ জন উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে দু-চার জন

ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীও হয়ত ছিলেন। বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ শ্রীবিশ্বাস বেরিয়ে আসেন।

সি পি এম-এর কোন কর্মী যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না—একথাও পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে-ছেন।

সি পি এমকে জড়াতে না পারায় "বাজারী" পত্রিকার অনু-চরেরা একটু বিব্রত হলেও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা এবারে সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন।

সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে পাঞ্জা দিয়ে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার হেমন্ত বসুর হত্যার জন্য সি পি এমই দায়ী মন্তব্য করে যে মুন্সিলে পড়েছিলেন এঁরা আর সে ভুল করতে রাজী নন।

সামনের নির্বাচনের আগেই এ ধরনের সংবাদ "প্রচার" করার জন্য তাঁদের আগ্রহের অভাব নেই; কিন্তু এখনও আদালতের হা কিম-দের ভরসা করা চলে না। সমজানো মামলা ধোপে টেকানোর দায়িত্ব পুলিশ কর্মচারীদের। তখন কোন

মুদ্রবদী বাঁচাতে আসে না দেখা গেছে, বলেছেন একজন প্রবীণ কর্মচারী।

কিন্তু তদন্তকারী অফিসাররা সবচাইতে মুন্সিলে পড়েছেন নতুন একটা সমস্যা নিয়ে। শ্রীনেপাল রায়, শ্রীপীষ্মকান্ত ঘোষ এবং শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষের হত্যা ও শ্রীপরিমল ঘোষের মৃত্যু ও পুত্রকে খুন করার চেষ্টা সম্পর্কে যে তথ্য তাদের কাছে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই প্রত্যেকটি ঘট-নার পেছনে নব কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন দায়িত্বপূর্ণ লোক রয়ে-ছেন।

সম্পর্কিত দলীয় স্বার্থ চরি-তার্থ করবার জন্য এরা সমাজ-বিরোধী অথচ নকশালী-বলে দাবী করে এমন গোষ্ঠীর সাহায্য নিয়েছেন। পরস্পরের স্বার্থে এবং শ্রেণীশত্রুকে খতর করার "পরিব্র" আদর্শে এই দুই শক্তির মিলন হয়।

কিন্তু যেভাবে পরস্পরের চাহিদা বেড়ে চলেছে তাতে নব-কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা যে সব গোষ্ঠীকে প্রশস্ত দিয়ে এসেছেন তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

নিজেদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্য অনুশোচনা না করে পুলিশ-শের উপর নানান ধরনের চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা

শফিকুল হাসান

দেশের জনগণ যখন স্বদেশকে রাহুদুস্ত করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করে চলছেন ঠিক তেমনি সময় পাক সেনারা রাজার বাগ পুলিশ স্টেশনের অস্ত্রাগার, ই পি আর সদর দপ্তর ও তার অস্ত্রাগার দখল করার এবং পুলিশ ও ই পি আরকে নিরস্ত করার এক প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। জয়দেবপুরে অবস্থিত পূর্ব বাংলার একমাত্র অস্ত্র কারখানাটি পাজাবী সেনারা দখল করতে গেলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ক্যান্টন-মেন্ট থেকে সশস্ত্র ভাবে বেরিয়ে এসে পাজাবী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং প্রচণ্ড গোলা-গুলির পর পাজাবী সেনাদের হাটিয়ে দিয়ে অস্ত্র কারখানাটি নিজেরা দখল করে নেয়।

এদিকে শেখ মুজিবের উল্লেখিত চার দফা দাবী নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য দু'রাখা জল্পাদ ইয়াহিয়া ভালো মানুষের ছদ্ম-বেশে ঢাকা আগমন করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আপোষকামী ক্ষমতালিপ্সু নেতারা এই নর-পিশাচের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপোষ আলোচনায় লিপ্ত হন। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জনগণ ও পূর্ব বাংলার ছাত্র সম্প্রদায় (এমনকি ছাত্র লীগের রব গ্রুপ বা ছাত্রদের মাঝে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছিল) এই আপোষ আলোচনার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রা “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম;” “এবারের রক্ত স্বাধীনতার রক্ত;” “রক্ত দিয়েছি আরো দেবো বাংলা দেশ স্বাধীন করো”; “খুনির সাথে আপোষ আলোচনা চলবে না চলবে না” ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে এবং শেখ মুজিবের বাড়ীতে নিজেদের আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দু'রাখা ইয়াহিয়া আলোচনার নামে সময় নিয়ে লর-খাদক রক্তপিপাসু টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসক হিসাবে ও পাজাব রেজিমেন্টের ষাট হাজার সেনাকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠায়। এই সেনাবাহিনীর পূর্ব বাংলা অভিমুখে অগ্রসরের সংবাদ বি বি সি থেকে প্রচার করা হয়। নরপিশাচ ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীকে অবতরণের সময় ও সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে থাকে এবং অবশেষে পশ্চিমা জল্পাদ ভূট্টোকে ডেকে পাঠায়। ইসলামবাদে অনু-ষ্ঠিতবা গোলটেবিল বৈঠক অবশেষে অঘোষিত ভাবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত

হতে থাকে। ইয়াহিয়া ও ভূট্টোর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ “ইয়াহিয়া হুঁসিয়ার” “ভূট্টোর মৃত্যু জুতা মার, বাংলা-দেশ স্বাধীন কর” ইত্যাদি শ্লোগান সহকারে বিক্ষোভ শোভাযাত্রা চালাতে থাকেন। ইয়াহিয়া ও ভূট্টো আলোচনার নাম করে সময় নিতে থাকে, কিন্তু ঘণাক্ষরেও তাদের ধংসলীলার পরিকল্পনার কথা জানতে দেয়নি। সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছলে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিকরা সেনাবাহিনীর অস্ত্রসমূহ জাহাজ থেকে নামাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পশ্চিমা সেনারা শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়ে তাদের কাজে যোগ দেবার নির্দেশ দেয়, কিন্তু শ্রমিকরা সে নির্দেশ উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

তেইশে মার্চ ঢাকায় সংগ্রামী ছাত্ররা আওয়ামী লীগের অনু-মোদন ছাড়াই পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ভস্মীভূত করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং জনগণকেও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার আহ্বান জানান। সারা পূর্ব বাংলার জনগণ ঐদিন পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা উড়িয়ে তাদের স্বাধীনতার আগ্রহের বহিঃ-প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ভূট্টো চক্র পূর্ব বাংলার প্রতিটি জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা ও মৃত্যুকামী প্রতিটি বাঙালীকে হত্যা করার এক নৃশংস ও পৈশাচিক নির্দেশ দিয়ে রাতের আধারে পূর্ব বাংলা থেকে পালিয়ে যায়। পূর্ব বাংলার ইতিহাসে দঃ-স্বপ্নের মত নেমে আসে দঃখময় রাত্রি পঁচিশে মার্চ। পৃথিবীর ইতিহাসের হিটলার, মুসলিনীর ও ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতাকে স্মান করে দিয়ে টিক্কা খাঁর সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলার শহর থেকে গ্রামগুলি পর্যন্ত ধূলিসাৎ করে দিতে থাকে। পূর্ব বাংলার বুকে অনুপ্রবেশকারী পাজাবী সেনারা নিরস্ত্র জনগণের উপর অমানুষিক বর্বরতার সঙ্গে চালিয়ে যায় ট্যাংক, কামান, মেশিনগান, গুটেনগান, রেণ-গান ও বোমা। এক অঘোষিত যুদ্ধের মাধ্যমে তারা নির্বিচারে গণহত্যা চালাতে থাকে এবং দেখা-মাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়ে তারা একটানা চল্লিশ ঘণ্টা সান্ধ্য আইন জারী করে এবং এ সময়ে শব্দ ঢাকাতেই তারা কমপক্ষে চল্লিশ হাজার নিরস্ত্র নাগরিককে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করে। সঙ্গে

সঙ্গে তারা চালায় লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং ধ্বংসলীলা ও নারী ধর্ষণের মত ঘৃণ্য পার্শ্বিক কার্যসমূহ।

পূর্ব বাংলার এই নির্বাতীত মার খাওয়া জনগণ বিনা প্রতিবাদে এ মার খেতে রাজী হলো না। গুলি খাওয়া বাঘের ন্যায় পূর্ব বাংলার বীর জনতা বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করে জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রে হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্ব বাংলার প্রতিটি গ্রামে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেন। পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা সশস্ত্র শত্রুকে সশস্ত্র ভাবেই মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমবেত হতে থাকেন। তাঁরা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে সশস্ত্র ভাবেই আক্রমণ করেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল পাক সেনাবাহিনীকে খতম করতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে একাবদ্ধ হতে সক্ষম হন। চট্টগ্রামে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক ফ্রন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুল বাসারের নেতৃত্বে বর্তমানে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। পাবনাতে টিপু বিশ্বাসের পরিচালনায় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কম-রেড আবদুল মতিন ও কমরেড আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গেরিলারা সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। টাঙ্গাইল টাঙ্গ ও ময়মনসিংহে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট সমন্বয় কমিটি, ভাসানী ন্যাপ ও কৃষক সমিতি একাবদ্ধ ভাবে মোহনের গেরিলা নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। বগুড়াতে তপনের নেতৃত্বে ও রংপুরে ছিমির মন্ডলের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ করছেন। এই পার্টি সিলেট ও কুমিল্লায় সমন্বয় কমিটির সঙ্গে এবং বরিশাল ফরিদপুরে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে একাবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ করে চলেছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন যথাক্রমে কাজী জাফর মতিউর রহমান ও বাদশা। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে শ্রমের কমরেড দেবেন শিকদার (পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান) সম্প্রতি বেরিয়ে আসেন এবং আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আগরতলার যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এই বামপন্থী দল-

(স্বাক্ষর ১১ পৃষ্ঠায়)



বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্ধাস্ত

পুলিশী অত্যাচারে যত্ন একটি ঘটনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে নকশালীদের দমন করার জন্যে প্রীমতী গান্ধী ও তাঁর গণতান্ত্রিক দলবল যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তা ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ খুদে ইন্দো-নেশিয়াল পরিণত হয়ে গেছে। সব জায়গায় একই ঘটনা ঘটছে। পুলিশের লালবাজার হেড কোয়ার্টার্স থেকে সাধারণতঃ যে গল্প শোনানো হয়ে থাকে তা একই রকমের। জনসাধারণ, সাধারণতঃ যুব-কেরা আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে তছনছ করার জন্যে বন্দপরিচর। সে-জন্যে তারা কখনো পুলিশকে আক্রমণ করছে; কখনো জেল থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। যারা এখানে আইন ও শৃঙ্খলাকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের শাস্তি দেবার জন্যে কখনো কখনো পেটাতে পেটাতে মেরে ফেলছে। কখনো ঝণাট এড়াতে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলছে। তারপরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও নিজেরাই সম্পন্ন করছে; হাতে সময় কম থাকলে পরিজনদের হাতে লাশ তুলে দিচ্ছে। অনেক ঘটনার মধ্যে একটির সংবাদ এখানে দেওয়া হল। একত্রিশ বছর বয়স্ক শিবশংকর দাস উলুবেড়িয়াতে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের খাদ্যবিভাগে চাকরী করতেন। তিনি সি পি আই (এম এল) এর সদস্য ছিলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্টির জন্মের বহু আগে থেকেই তিনি পার্টির সংগে যুক্ত ছিলেন। গত ছয়ই এপ্রিল রাত এগারোটার সময়ে তাঁকে শিয়ালদহ রেল স্টেশনের নিকটবর্তী প্যারামাউন্ট সিনেমার কাছ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি তখন পার্টির প্রচারকার্যে রত ছিলেন। লালবাজার লক আপে পুলিশ তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে। অত্যাচার এতো বেশী হয়েছিল যে সতেরোই এপ্রিল রাত এগারোটার সময়ে তিনি মারা যান। অথচ সেই দিনই তিনি আলিপদর জেল কার্গিডিতে থাকবার সুযোগ পান। সতেরো তারিখে ভাগ্যক্রমে যখন তাঁর পরিবারের কিছু লোক আলিপদর জেলে তাঁকে দেখবার সুযোগ পান তখন তিনি নড়াচড়া করতে পারছিলেন না, এমনকি নিশ্বাস নিতেও পারছিলেন না। শিবপুর থানা পরের দিন দুপুর তিনটের সময়ে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দেয়। উনিশ তারিখে মোমিনপুর মর্গ থেকে তাঁর লাশ খালাশ করে আনা হয়।

সমাজ-অচেতন সাহিত্যিকের বাণী

সাহিত্য সংগ্রহ দেশে অল্পদা-
শংকর রায়ের “স্বাধীন মানস”
পড়লাম। প্রবন্ধের অনেকটা জুড়ে
তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ
ও ফলাফল বিবৃত করেছেন কোন
প্রসঙ্গের অরতারণা না করেই।
ফরাসী বিপ্লবের তাত্ত্বিক চেউয়ে
ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ শূত্রের সামাজিক
ব্যবধান নাকি সংকীর্ণ হয়েছে, আর
এদেশে ঐ বিপ্লব হলে তো কোন
বৈষম্যই থাকতো না।

“ফরাসী বিপ্লবের রক্তপাত
প্রচুর ঘটেছিল বলে হঠাৎ মনে
হতে পারে রক্তপাতটাই বিপ্লব”,
এটা বারো বিপ্লবে বিপ্লবসী তারা
ভাল করেই মানে। তবে যখন
বিপ্লব আসবে তখন কিন্তু সেই
রক্তাক্ত শ্রেণী সংগ্রামকে বিকৃত
করা এই লেখকদের পক্ষে কিছু
আশ্চর্যের নয়। তা নাহলে গান্ধী
কি করে লেনিনকেও ছাড়িয়ে যান
যুদ্ধের মাঝখানে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে?
“জব্বরের চেয়েও গান্ধীকেই
ইংরেজ কতরা ভয় করতেন। কারণ
যুদ্ধ কালে গান্ধীর পলিসি ছিল
লেনিনের মতো।” একথা শুনলে
মরা মানুষ হেসে উঠবে। গান্ধীর
মত সাম্রাজ্যবাদীদের এক অনুগত
ভৃত্যকে লেনিনের সঙ্গে তুলনা
করার মতো বস্তুজ্ঞান একমাত্র
ভাড়া করা কলমজীবীদের পক্ষেই
সম্ভব। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে
আসুক না আসুক পার্লামেন্টে
কংগ্রেসকে ঢুকতেই হবে—“কংগ্রে-
সের প্রতিষ্ঠামূল্যেও ছিল সেই
ভাবধারা সিংগন।” কিন্তু জাতীয়
কংগ্রেস গঠনের সেই কলংকময়
ইতিহাস কেনা জানে? বিদ্রোহে
উত্তাল জনমানস পাছে বৃটিশ

সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেয় তাই
তা দাবিয়ে রাখার জন্য বৃটিশের
হিতাকাঙ্ক্ষী অক্টোভিয়ান হিউম
এগিয়ে এলো কংগ্রেস গঠনের
জন্য। যে প্রতিষ্ঠান সমস্ত আন্দো-
লনকে একটা আপোষ মীমাংসার
ঘূর্ণিপাকে ফেলে ভারতে বৃটিশ
সরকারের রক্ষাকবচ হয়ে থাকবে।
কংগ্রেস সম্পর্কে হিউমের নিজের
উক্তি : A safety value for the
British imperialists. স্মরণ করা
যেতে পারে ইনিই অবসর গ্রহণের

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। ঐতি-
হাসিক রবার্টস বললেন :

They were drawn at first
almost entirely from the small
section of Indians who spoke
English and had acquired a
western education. They had
very little claim to speak for
the great mass of their fellow
countrymen, the dumb mil-
lion of agriculturists.

১৯১৯ ও '২০ সালে গান্ধীর

মতামত

প্রাক্তালে এক স্মারকলিপিতে
ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান অস-
ন্তোষ যে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে
সে বিষয়ে বৃটিশকে সতর্ক করে
দিয়েছিলেন। এবং পরে ইনিই
স্বতঃপ্রসূত হয়ে বৃটিশের অনু-
মতিক্রমে কংগ্রেস গঠনে এগিয়ে
এসেছিলেন। ১৮৮৫ সালে
জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধি-
বেশনে সভাপতি বললেন, “আমা-
দের প্রিয় লর্ড রিপনের স্মরণীয়
শাসনকালে জাতীয় ঐক্যের যে
মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার
পূর্ণ বিকাশ ও সংহতি সাধনই
কংগ্রেসের আদর্শ। লক্ষ্য করুন,
কেন দাবী নয়, শোষণের বিরুদ্ধে
সংগ্রাম নয়, শৃঙ্খল পার্লামেন্টে
চেষ্টার দখলের আবেদন। সোজা
কথায় ইংরেজ রাজের প্রতি অবিচল
আনুগত্য। কি লক্ষ্য! সাম্রাজ্য-
বাদীর দালাল হিসেবে জন্ম হল

আইনঅমান্য ও অসহযোগ আন্দো-
লনের বন্যা নীতি সম্পূর্ণভাবে
মার খেল। মানুষকে ধোঁকা
দেবার মতো এতবড় কাপড়বোচি
ক্রীড় আন্দোলন আর হয়নি।
বস্তুতঃ ভারতের বিপ্লবী জন-
মানসকে দাবিয়ে রাখার জন্য এই
বংশবদ দালালটিকে খুঁজে নিতে
ইংরেজ ভুল করেনি। ১৯২০
সালে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের
সময় বাংলার কয়েকজন বিপ্লবী
গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন।
উদ্দেশ্য, কয়েকজন বিপ্লবীকে
(যাঁরা তখনো ফেরার) স্বাধীনিক
জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি
যাতে প্রভাব বিস্তার করেন। উত্তর
হল : লুকিয়ে থাকার কারণ কি?
এরা বৃটিশ সরকারের কাছে আত্ম-
সমর্পণ করলেই পারে। গান্ধী
আরউইন চুক্তি আর ভগৎ সিং-এর

ফাঁসী কি এত সহজে ভুলে যাবার?
'Half naked Fakir' শোনার
পরও কি মানতে হবে ইংরেজ
কর্তারা গান্ধীর ভয়ে আশ্রয় হলে
থাকত? বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ লেনিন যে
যোগ্যতার সঙ্গে জীবনের সর্ব-
স্তরে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তা
বিশ্বের যে কোন মূর্খ আন্দোলনের
প্রেরণার উৎস। আর পাশাপাশি
গান্ধীর আন্দোলনের দিকে তাকালে
দেখতে পাই দেশ বিভাগ,—যার ফল-
শ্রুতি আজকে পূর্ব বাংলায় গণ-
হত্যা আর স্বাধীনতা,—যা ধনী-
দের আরো ধনী হওয়া আর গরী-
বের না খেয়ে মরার স্বাধীনতা।
একজনের চরিত্র আপোষহীন
সংগ্রামে ভাস্বর, অপর জনের ইতি-
হাস শৃঙ্খল দালালির, অননুন্ন-বিনয়ে
শাসক শোষণের।

কিন্তু আজকের বাংলা সাহিত্যে
এই গলিত সমাজের কোন প্রতি-
ফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি?
পশ্চিম বাংলার আইন শৃঙ্খলা ও
গণতন্ত্রক্ষার নামে অত্যাচার, নিপী-
ড়নের বন্যা বইয়ে দেওয়া হচ্ছে।
মেদিনীপুর, বহরমপুর জেলে
আলো নিভিয়ে এলোপাখড়ি গুলি
চালানোর পরও কি গণতন্ত্রের
নন্দনরূপ বোরিয়ে আসে নি?
সম্প্রতি দমদম জেলে লাঠি গিটি-
য়েই (সরকারী সূত্র) পনেরো
জনকে (?) নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া
হল। অথচ অল্পদাশংকরের বক্তব্য
শুনুন : “পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসী
মানুষকে স্বর্গ এনে দিতে পারে
না, কিন্তু হত্যাবিভীষিকার হাত
থেকে বাঁচায়। একটি প্রাণকে এত
মূল্যবান মনে করে যে তাকে
ফাঁসীতে ঝোলাবার আগে বাঁচবার
জন্য একশো রকম সূচনোগ দেয়।”

আহা, কি সাহিত্য! সমাজ
জীবনের একেবারে অবিকল প্রতি-
চ্ছবি! আরো শুনুন : “স্বাধীন
ভারত আর কিছু না পান্ডুক
পায়ের শিকল খুলে দিয়েছে”।
কথাটা কিন্তু সত্য। নিজের দিকে
তাকান, দেখবেন শেকলটা কোমরে
উঠে এসেছে।

গান্ধীর সঙ্গে লেনিনের তুলনা
করে আর রুশ, চীন বিপ্লবে
রক্তপাতের বিবর্তিত চিত্র ভুলে ধরে
এই সব লেখক কি নিজের প্রগতি-
শীলতা প্রমাণ করতে চাইছেন?
শাসক গোষ্ঠীর দুষ্কৃতি আর
বিপ্লবান্ত অর্থনীতি ঢাকার জন্য
গণতন্ত্রের গুণগানকে উপজীব্য
করেছেন কাদের স্বার্থে? কই
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রগতি
ও স্বনির্ভরতার প্রশংসাতো এদের
মুখে শুনিনা? শৃঙ্খল বিপ্লবকে
বিভীষিকা বলে গলাবাজি করতেই
দেখ।

সাবিত্রী আইচ

মণীন্দ্র ঘোষ, দেবশীষ সিংহ

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম প্রসঙ্গে

পূর্ববাংলা গণসংগ্রামের রক্তাক্ত
পটভূমিকা, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের
বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। পূর্ব-
বাংলার জনগণ দর্শাচির মত প্রাণ
দিয়ে জেদে দিয়েছেন বিপ্লবের
আগুন, যাতে জ্বলে পুড়ে থাক
হতে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী কুস্তারা।
তাই এই সংগ্রামকে রোখার জন্য
সাম্রাজ্যবাদীরা উঠে পড়ে লেগেছে।
কিন্তু তারা জানেন না এই সংগ্রা-
মকে রোখা যাবে না। তারা আরও
চক্রান্ত করছেন সংগ্রামের ধারক ও
বাহক কমিউনিষ্ট ও কমিউনিজম
ধ্বংস করার। এই ঘৃণ্য চক্রান্তের
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী
ফ্রন্টের তথাকথিত জনদরদী ও
হিতৈষী ইন্দিরা সরকার। বিপ্লবী
ও কমিউনিষ্টদের নিধন চক্রান্তের
বিচিহ্নানুষ্ঠানে সরে ভাঁজছেন
ইন্দিরা সরকার ও সংগতে আছেন
কমিউনিষ্ট নামধারী ভুণ্ড দালাল-
গুলি। পূর্ববাংলার ব্যাপারটা তো
তারা প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের
শৃঙ্খল বিপ্লব ওপর খোলাখুলি
ভাবে ন্যস্ত করেছেন। তারাও
সাম্রাজ্যবাদীদের গলায় গলা মিলিয়ে
চেঁচাচ্ছেন মূর্খবরকে অবিলম্বে
স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু
পূর্ব বাংলার এই গণ সংগ্রামকে
সমর্থন করছে বিপ্লবের সমাজ-
তান্ত্রিক দেশ, অথচ মূর্খবরকে
সমর্থন করছে না কেন। যে
সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বের সমস্ত
নিপীড়িত জনতাকে নিষ্পেষিত
করে দিতে চাইছে, তারা হঠাৎ
মূর্খবরকে নিয়ে লাফালাফি
করছে কেন।

মূর্খবর রহমান, সাম্রাজ্যবাদী
ফ্রন্টের মতে নিপীড়িত জনতার
যোগ্য প্রতিনিধি, বিনি সগর্বে
প্রকাশ করেছিলেন “একমাত্র আমিই
পারতাম পূর্ববাংলার মাটিতে
কমিউনিজম রোধ করতে।” (রায়ান
মে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০শে
মার্চ) তিনি ইয়াহিয়াকে আলো-
চনার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন
একটু ভুল করলেই পূর্ব বাংলার
মাটিতে বিপ্লবী স্বাধীনতা দাবা-
নলে পরিণত হবে। এই স্বাধীন-
তাকে রোধ করার এবং ধাম্পা
দেওয়ার একমাত্র পথ নির্বাচনের
মাধ্যমে বুদ্ধোন্মাদ গণতান্ত্রিক
স্বাধীনতা দেওয়া। এই স্বাধীনতার
নাম করে পূর্ব বাংলার আসবে
মার্কিন ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যের
বহর এবং তাঁদের রাষ্ট্রে পরিণত
হবে পূর্ববাংলা। যার মাধ্যমে শৃঙ্খল
সহজেই আক্রমণ করা যাবে সমাজ-
তান্ত্রিক ও সর্বহারার সুরক্ষিত
দুর্গ জালচীনকেও সমূলে ধ্বংস
করা যাবে ভারতীয় বিপ্লবকে।
কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল চীনের
কূটনৈতিক চাল ও পাকিস্তানী
বিপ্লবী জনগণের দুর্দর্শিতার।
তারা চান না এক শোষণের
শৃঙ্খলকে চূর্ণ করে সাম্রাজ্যবাদী-

গুলিশের মিথ্যা অভিযোগ ও একটি পরিবার

অনেক আবেদন নিবেদন করে ও
ধূর্ণা দিয়েও আজ পর্যন্ত কোন
সাদা মেলেনি, তাই আপনার বহুল
প্রচারিত কাগজের মাধ্যমে আমার
অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে
চাই।

আমার ছেলে শ্রীমান শক্তিপ্রসাদ
আইচ ওরফে পিল্টু, একটি ছোট
কনট্রাক্টার প্রতিষ্ঠানে চাকুরী
করে এবং বি এর প্রথম বার্ষিকের
প্রাইভেট ছাত্র। প্রতিদিন ছয়টা-
সাতটা ছয়টায় সাঁকরাইল কর্ম-
স্থলে যেত ও রাত সাড়ে সাত-আট-
টার সময় বাড়ি ফিরত। শ্রীমানের
এই স্বল্প আয়ের ওপরই আমা-
দের পরিবারের পাঁচ-ছয়টি প্রাণীর
আহার নির্ভর করে। অতীতে
থানায় লা কোর্টে শ্রীমানের নামে
কোন অভিযোগ ছিল না এবং
শ্রীমানের খোঁজেও পলিশ বাড়ীতে
বা তার কর্মস্থলে আসেনি। শ্রীমান
বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক,
কিন্তু কোন দলের সভ্য নয় ও
কোন সংঘর্ষে জড়িত হয়নি।

গত বিশে মার্চ সকালবেলা
বিজয়গড় অঞ্চল মিলিটারি ঘেরাও

করে। যথারীতি শ্রীমান অফিসের
জন্য বেরোলে বাড়ির অদূরে কার্ফু
ভঙ্গের অভিযোগে পলিশ শ্রীমান-
নকে গ্রেপ্তার করে বাদবন্দুর থানায়
নিয়ে যায়। উনিশ তারিখের একটি
খবরের মামলায় (৮৪।৩) জড়িয়ে
শ্রীমানকে পরের দিন আলিপুর
কোর্টে হাজির করা হয় এবং পাঁচই
এপ্রিল পর্যন্ত জেল হাজতে
শ্রীমানকে রাখা হয়।

চব্বিশ পরগণা জেলা শাসকের
জাবিদে মর্চ তারিখের ১৭৮।-
৭৯ আদেশ বলে আচমকা শ্রীমানকে
দোসরা এপ্রিল আলিপুর জেল
থেকে পি.ভি.এ আটক আইনে
দমদম জেলে নিয়ে যাওয়া হয়,
এবং এই দুটি অভিযোগ জানান
হয় : (এক) ষোলই ফেব্রুয়ারী
তারিখে বিজয়গড়ে সকাল সাড়ে
দশটায় বোমা নিয়ে পলিশ দলকে
আক্রমণ (বাদবন্দুর থানায় ৭৪।-
২৭৭ কেসে); (দুই) উনিশে
মর্চ তারিখে রাতি সোয়া নয়টা-
সাতটা লায়লকা মাঠে তপন
বল্লি নামক জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা।
(বাদবন্দুর থানায় ৮৪।৩ নং কেসে)

ষোলই ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘট-
নার উল্লিখিত সময় শ্রীমান কর্ম-
স্থলে উপস্থিত ছিল। এ সম্পর্কে
পলিশ বা কোর্ট তদন্ত করলে
বক্তব্যের সত্যতা জানতে পারত, উক্ত
ঘটনার (৭৪।২) সঙ্গে শ্রীমানকে
কোর্টেও কিন্তু জড়ানো হয়নি,
এবং এফ.আই.আর-এ শ্রীমানের
নাম উল্লেখ নেই। উনিশে মার্চ
তারিখের ঘটনা সম্পর্কে শ্রীমান যে
তার চাকুরী স্থলে উপস্থিত ছিল
তার সার্টিফিকেট কোর্টে পেশ
করা হয়। ব্যাপক ও বিস্তৃত তদন্ত
করলে পলিশের অভিযোগ মিথ্যা
প্রমাণিত হত। এবং মিথ্যা অভি-
যোগের ভিত্তিতে একটি চাকুরী-
জীবী ছেলেকে পি.ভি.এ আটক
আইনে একদিকে আটক রাখা হচ্ছে
অপরদিকে একটি পরিবারকে বর্ত-
মান দুর্দিনে আরও দুর্ভাবস্থার
মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আশংকার
স্বরাস্ত্র বিভাগ শ্রীমানকে অবি-
লম্বে মৃত্যু দান করে বাধিত কর-
বেন।

সাবিত্রী আইচ

দের সাহায্যের মালা নামক শৃঙ্খল গলায় এঁটে বসাতে।

আর মন্দির যদি সত্যিই সর্বহারার জনতার প্রতিনিধি হতেন তবে তিনি প্রথমেই সাহায্য চাইতেন বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের কাছে, বিশেষ করে সর্বহারার হেড কোয়ার্টার পিকিং-এর কাছে। কিন্তু তার বদলে তিনি পূর্ব বাংলার সমস্ত সর্বহারার ভাগ্য ন্যস্ত করলেন বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের শৃঙ্খল উপর। যাতে সাম্রাজ্যবাদীরা এই সংগ্রামকে সামনে রেখে এশিয়ার বৃক্ষ থেকে কমিউনিজম ও সর্বহারার একনায়কত্বকে মূছে ফেলতে পারে। সুতরাং মন্দিরকার স্বার্থ দেখছেন তা দিনের আলোর মতই ভাস্বর।

আজ মন্দিরকে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে, সুপারিকম্পিত উপায়ে সর্বহারার চীন সম্পর্কে ও ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে। তারা জনগণের মনে জাতীয়তাবাদের জিগার তুলে ধরতে চাইছে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের। কিন্তু বস্তু দেবী হয়ে গিয়েছে। এটা বাষটি সাল নয় এটা একাত্তর সাল। ভারতবর্ষের মাটিতে ইন্দোনেশিয়া গড়ার চক্রান্তকে ব্যর্থ করে জনতা গড়বে ভিন্নতর। ভারতবর্ষের মাটিতে রচিত হবে মূর্খ সাহায্যবাদের গোরস্থান। কমিউনিস্ট হিসাবে বিপ্লবীদের কতব্য পূর্ব-বঙ্গের মন্ডিকামী জনগণের সংগ্রামকে মন্ডিক সংগ্রামে পূর্ববাসিত করা। ভীড়বড়ি করে সংগ্রামে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টার বিরোধিতা কর।

প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য

নকশালীদের প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন

এই চিঠি যখন লিখছি, তার কিছুক্ষণ আগেই আমাদের পাড়ায় বেমা পড়েছে একটি বেসরকারী কাপড়ের দোকান। আর তারই ফলস্বরূপ সারা পাড়া এখন অন্ধকার। সি আর পি আর মিলাটারী ভ্যান ছুটাছুটি করছে। শুনছি আজ রাতেই নাকি বাড়ি বাড়ি সি আর পি হামলা হবে। এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। সারা বাংলা দেশেই এই ঘটনা চলছে। বৎসরখিককাল থেকে বাংলা দেশে চলছে ১৪৪ ধারা। মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ জানানো বেআইনী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি প্রশ্ন আমার মনে দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ নকশালপন্থীরা কী ধরে নিয়েছে আমাদের দেশের মানুষেরা এ দেশের একচেটিয়া শিল্পপতি ও জমিদারদের রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে পুরোপুরি মোহমত্ত হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ নকশালপন্থীদের এইরকম তথাকথিত এ্যাকশন থেকেই কী জনসাধারণের মোহমত্তি ঘটবে? তৃতীয়তঃ নকশালপন্থীদের এই এ্যাকশনের পর যে অত্যাচার নেমে আসবে, জনসাধারণ কী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার মোকাবিলায় এগিয়ে আসবে? যদি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর ইতিবাচক হয়, তাহলে নকশালপন্থীদের এই এ্যাকশন পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য ও সমর্থন করা উচিত।

কিন্তু প্রশ্নগুলোর উত্তর কী ইতিবাচক হওয়া সম্ভব? ক্ষমতব ঘটনা কী বলে? হয়ত কেউ কেউ কতকগুলি ব্যতিক্রমকে সাধারণ উদাহরণ বলে তুলে ধরবেন। কিন্তু সেইগুলি কী বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করবে? এ দেশের জনসাধারণ যদি উক্ত জনবিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনটির বা সংগঠনগুলির সম্পর্কে পুরো মোহমত্ত হয়, তাহলে অত্যাচারের মোকা-

বিলায় জনসাধারণের এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু কোথায় প্রতিরোধ? এই তো দমদম জেলে বীভৎস হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল, তারও আগে মৌদীনীপুরে ও বহরমপুরে। লোকে বিক্ষোভ ফেটে পড়ল কী? ব্যাপক জনসাধারণ বারাসাতের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে কী? কিন্তু লোকের মন থেকে বিক্ষোভ, ঘৃণা, ক্রোধ দূর হয় নি। একটা চাপা বিক্ষোভে উদ্ভেজনার লোক ছটফট করছে। প্রকাশের ভাষা নেই, অধিকার নেই। একটা নিদারুণ আতঙ্ক লোককে বেঁধে করে দিয়েছে। অথচ ছেয়টি সালে একজন নরুনের হত্যার বদলার লোকের মেজাজ দেখেছি। সে মেজাজ গেল কোথায়? সে মেজাজ নেই, কারণ

যাদবপুরে সি আর পির অত্যাচার

আমি একজন অধ্যাপক। রবিবার (পাঁচশে এপ্রিল একাত্তর) বিকেলবেলা আমি যখন আমার পরিবারের কোন একজনের অসুখের জন্য ডাক্তারখানায় যাচ্ছিলাম তখন যাদবপুরের সন্তোষপুর সদর রাস্তা দিয়ে সি আর পির একটি দল আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি স্বভাবতই একটু সরে এসে রাস্তার পাশ দিয়ে চলতে থাকি। এই সময় হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সি আর পি দলের অফিসার পানোন্মত্ত অবস্থায় রিভলবার উঠিয়ে আমার সাটের কলার ধরে সামনে নিয়ে আসে এবং আমি একটি কথাও বলার আগেই অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও মারধোর শুরু করে। খোলা রিভলবার হাতে একজন মাতাল অফিসার আর সঙ্গে রাইফেলধারী একজন সি আর পি, স্বাভাবিক কারণেই আমি হতচকিত হই।

তবুও আমি আমার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি; কিন্তু ঐ অফিসারটি আমার কোন কথাই বলতে দেন না। আমি অবাক হয়ে দেখি বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত ঐ অফিসার-দুগ্ধব যে ভাষায় কথা বলছে তার জন্যই যে কোন সভ্যদেশে তার দণ্ড হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত উদ্ভেজিত সেই মাতাল বীরের কাছে কোন ক্রমে আমার পরিচয় দেওয়ার পর তিনি বলেন যে অধ্যাপকদের শিক্ষিত করার যে বিশেষ পদ্ধতি তার জানা আছে তা তিনি নিকটবর্তী সি আর পি ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে আমায় দেখাবেন। প্রকাশ্য রাস্তায় উন্মত্ত দিবালোকে আমায় অফিসারটি টানতে টানতে প্রায় আধ মাইল রাস্তা নিয়ে চলে এবং অবশেষে আমার গন্তব্য ডাক্তার-

মেজাজ দেখাতে গেলে যে অবস্থা দরকার নকশালপন্থীরা তা নষ্ট করে দিয়েছে। ১৪৪ ধারা মিলাটারী, কাফরী বজায় রাখার অজুহাত শাসকশ্রেণীর হাতে সৃষ্টি করে দিয়েছে। অথচ এর প্রতিবাদ কোথায়? বিধানসভায় কংগ্রেসী মন্ত্রী অজিত পাঁজা বলেছেন, “সি পি এম নকশাল ফ্রাংকস্টাইন তৈরী করে তার ফলভোগ করছে। অর্থাৎ অজিত পাঁজার খুব মজা। অথচ আমরা জানি, সকলে জানে তিরিশ দশকের ভুলের পুনরাবৃত্তি কখনোই সাফল্য লাভ করবে না। ইতিহাসের নিয়মে করতে পারে না। দিন আসবে, যেদিন বিচার হবে প্রত্যেকটি ব্যক্তিহত্যার। বিচার হবে এর পিছনে কারা ছিল।

সি এ মস্তাক
সিউড়ী, বীরভূম

খানার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে রাস্তার ধারে থাকা দিয়ে ফেলে সগর্বে চলে যায়।

আমাকে ধরে খানিকটা এগোবার পর রাস্তার পাশে দোকানের সামনে দাঁড়ানো একজন যুবককে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে চলে যাবার জন্য ধমক দেয়। আর একটু যেতেই আরও দুজনকে ডাকে এবং কিছু বলার পূর্বেই ঐ দুজনকে লাথি মেরে রাস্তার পাশে ফেলে দেয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রাস্তায় চলমান নাগরিককে প্রহার ও হররানি করেই কি পুলিশ ও সি আর পি বাহিনী আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে?

এই সময়ে আগামী দিনের ফসল তোলার কাজে যারা লাগবে, আমি বিনীতভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি এবং আজ সরকারী অফিসারের বক্তৃনির্বোধে ঘোষণা করলো তা শুনে আমি চমকে উঠছি। বাংলা দেশের অগণিত শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী জনতার উপর যে অত্যাচার চলছে তা আমি ঐদিন প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছি। স্বভাবতই মনে হয় বাংলা দেশে সি আর পি বাহিনী শান্তিরক্ষার্থে নয়, বরং শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবনকে বিধ্বস্ত দেবার জন্যে। সমগ্র যাদবপুরবাসী প্রায় প্রত্যহই গণতন্ত্র রক্ষকদের এই রকম আচরণ দেখছে। বাংলা দেশে এই দখলদার বাহিনীর তাম্বড়ের মেন্দ আর কতদিন চলতে দেওয়া হবে?

শৈলেন ভৌমিক
বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী

জাতীয় নেতাদের যুতি ভাষা প্রসঙ্গে

দুর্গে জাতীয় নেতাদের যুতি ভাষার প্রশ্নে সি পি আই (এম এল)-এর বক্তব্য পাঠ করলাম। চেয়ারম্যান মাও সে তুং ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী এক নিষ্ঠাবান তরুণ হিসেবে চারু মজুমদারের দলকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

প্রথমতঃ, বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের সময়ে কোন ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদকে তাঁদের চাইতে বেশী ঘা দিতে পেরেছিলেন? সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের অবাধ শোষণের সেটা ছিল সমস্র, সে সময়ে পচা গলা সামন্ততন্ত্র ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের বৌদ্ধ কমে কত নিরীহ নারী, শিশু, যুবক, শ্রমিক কৃষক যে লাঞ্চিত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। তার বিরুদ্ধে তাঁরা গর্জে উঠেছিলেন সর্বপ্রথম। সেই হিসেবে তাঁরা নিশ্চয় বিপ্লবী। তাঁদের সময়ের পটভূমিতে তাঁদের বিচার করতে হবে। তখনও সর্বহারার একনায়কত্ব এবং কার্ল মার্কসের যুগের প্রারম্ভ ঘটে নি। সুতরাং সে চেতনা যদি তাঁদের না এসে থাকে তবে কি আজ এত দিন পরে তাঁদের মূর্তি ভেঙ্গে তাঁদের অবমাননা করাটাকে নিছক পাগলামী ছাড়া কিছু বলা যায়?

তারপর বিবেকানন্দকেও কত গালি দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই বলি, তাঁর প্রবন্ধ “ভারতের সভ্যতা” যেন চারুবাবুর ভক্তরা পড়েন। তিনিই প্রথম চন্দ্রাল ভাইদের মূখে ভাত, ধর্ম নয়, দেবার কথা তুলেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পোষা দালাল বিশদ খুন্টের ভক্তগুলো যখন ধর্ম নামক আফিগের বীজ ছড়াচ্ছিল, তখন তিনিই আমেরিকার বৃক্ষে তাদের নিন্দা করেছিলেন। আর বিবেকানন্দ কিনা সামন্ততান্ত্রিক। হায় চেয়ারম্যান মাও সে তুং।

তারপর শুনুন যে বৈজ্ঞানিক বিচারে রবীন্দ্রনাথও প্রতিক্রিয়াশীল। “চার অধ্যায়” বা “ঘরে বাইরে” বোঝার বুদ্ধি চারু সরোজ খোকনের ভক্তদের নেই বলেই মনে হয়। তখনকার সমাজে এই সব ভ্রুত ও স্বার্থপর বিপ্লবীদের জন্যই মনে করাই সূর্য সেন ভগত সিন্ধু ফাঁসির কাঠে ঝুলতে হয়েছিল। তার কারণ ওই সব মেরুদণ্ডহীন বিপ্লবীরাই পুলিশের গুলির হিমেবে শেষ পর্যন্ত কাজ করেছিল। সেটা দেখানো কি বিপ্লবীদের প্রতি ঠাট্টা করা? হায় সূর্য সেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে এই বুদ্ধিজীবী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ করেন নি? তিনিই (শেখাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে

আকাশবাণীতে একটা মেয়ে পাকিস্তানী ফৌজের অত্যাচারে ক্রিয়াকর আতঙ্কিত হয়েছে সেটা প্রায়ই প্রচার করা হয়। কিন্তু এপার বাংলার কি আমরা পুলিশের জুপুমে আতঙ্কিত হইনা। আমরা অর্থাৎ ছেলেরা কোনরকমে হাটেবাজারে রাস্তায় বেরুতে পারি না, যদিও আমরা কোনোদুপ দোষী নই। কিন্তু কেন আমরা যেতে পারি না? সেটা কি পুলিশের অদরের জন্য না নিষীতনের জন্য? আকাশবাণী, আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা মিথ্যে কেসে কেসে এই গ্রীষ্মকালেই বর্ষাকালকে ডেকে এনেছে কেবল মাত্র ইয়াহিয়া ফৌজের অত্যাচারের জন্য।

আমার মতে মন্দিরর কোনো মতেই নেতা নয়। তার মধ্যে নেতৃত্বের কোনো ছাপ নেই। যদি

তিনি প্রকৃতই একজন দেশনেতা এবং দেশপ্রেমিক হতেন তাহলে এত লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র জনগণকে অজ ইয়াহিয়া ফৌজের কাছে বলি হতে হতোনা। যদি মন্দিরর সভাই দেশকে শোষণ মত্ত করতে চেয়েছিলেন তাহলে কেন জনগণকে সশস্ত্র করেননি? পাকিস্তানের জনগণ কিন্তু মোটেই এই যুদ্ধ পছন্দ করেনি। এখন ওখানকার জনগণ বাধ্য হয়েছেন পাকিস্তানী ফৌজের বিরুদ্ধে লড়তে। আর আওয়ামী লীগের সমস্ত কর্মসূচি এবং কর্মকর্তারা ভারতে এসে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন নির্ভীকভাবে। তারা সব এখানে বসে স্বপ্ন দেখছেন যে দেশ স্বাধীন হলে কোন মন্দিরের পদ নেবেন।

মীর গোলাম নবী (সিরাজ)
বিশ্বভারতী

বয়স আঘাতের সঙ্গে সম-
ঝোতা করে।

রুমের ড্রেসিং টেবলে চোখ
পড়তে নিজের মুখ দেখতে পাই
আমি। এই শহরে অনেক পথ
হেঁটে হেঁটে ক্রান্তির রেখা পড়ে
গেছে কপালে কপালে চোখের দুই
কোণ ঘিরে। এমন করে নিজেকে
ইতিপূর্বে দেখিনি। সম-বয়সীদের
মেলন দিনগুলির কথা মনে পড়ে
না। আজ অপেক্ষাকৃত তরুণদের
সামনে নিজের চোখে নিজেই যেন
নতুন করে ধরা পড়ে যাঁই।

হ্যাঁ, বয়স আমাকে দলিত
মণ্ডিত করে যাচ্ছে। নারীর ওপর
বলাৎকারের মতো আমার ওপর
বয়স চড়াও হয়েছে। আমি নিস্তেজ
আর নিজস্ব হয়ে গেছি। অভি-
জ্ঞতার দ্বিভিত রক্তে সর্বঙ্গ চটচটে।
বস্তু ওরফে অমলেন্দুকে তাই বলে
ফেলোছি, “কর্মস্থলে রাজনীতি
টুকলেই গোলমাল।” মন্টু তরুণ।
মানবে কেন? শাণিত উত্তরে
আমাকে নির্বাক করে দিয়েছে।
বস্তুত তার কথার জবাব জানা
নেই। হ্যাঁ, চমৎকার বলেছে মন্টু,
“এইসব ইনটেলেকচুয়াল থোয়াশাই
আমাদের ক্ষতি করছে বীরেনদা।”

একথা বলার অধিকার মন্টুর
যুগই মন্টুকে দিয়েছে। পদ্মশের
দশকের তরুণ আমি, সেদিনও
এমন ভীতভাবে এসব কথা বলতে
পারতাম না আমরা। আজ ভাবছি,
সময় এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুততালে।
আমি একটা বয়সীমায় বন্দী।
জীবন সংগ্রামে পোড় খেতে খেতে
অভিজ্ঞতার ভারে ক্রান্ত আমার
বয়স। এ বয়স হিসেবী সংসারীর
মতোই কথা বলবে! এ বয়স পরি-
স্থিতির সঙ্গে সমঝোতা দূর্বল
হয়ে পড়বেই। সেই দূর্বলতাই
ধরা পড়ে গেল। যুগে আমার কথা
সরছে না।

রুম অশ্বস্তি অনুভব কর-
ছিল। মন্টু ঠোঁটকাটা। আপোষ-
হীন। সে আমাকে আঘাত করেছে,
রুম যেন সে জনাই সঙ্কুচিত।
সে তার কাঁধকাট শ্যাম্পুস্ফীত
চুল নিয়ে বাস্তব হয়ে পড়ে হঠাৎ।

শৈবাল বলে, “সাধারণ কথা-
গুলোকে তেজর কেবল অপারেশন
করে করে দেখিস মন্টু। এ কি
কোর্টকাছারি যে পয়েন্টে পয়েন্টে
কথা কইতে হবে। সত্যিই তো,
রাজনীতি আজ কোথায় পৌঁছেছে?
আমরা বস্তুত কোথায় যাচ্ছি?
আক্রোশের রাজনীতি নিশ্চয় হেলদি
নয়, স্বাস্থ্যকর নয়।”

মন্টু হাসে, “আপত্তি নেই, এ
কথায় যদি কথাটা সবার প্রতিই
সমান প্রযোজ্য হয়। কিন্তু ডিফে-
ন্সের রাজনীতিকেও “মারদাঙ্গা”
বলে প্রচার করতেই আগন্তিক।”

সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি
নিজের কথা বলে রাখি আমিও,
“আমি কিন্তু সঠিক ভাবেই কথাটা
বলেছি। বর্তমান রাজনীতির
চরিত্রের কথাই বলতে চাইছিলাম।
কোনো দল বা গোষ্ঠী আমার লক্ষ্য
নয়। ঠিকই তো, শান্তি শৃঙ্খলা,
শাসন প্রশাসন যখন নগরিক
জীবনের নিরাপত্তা দেখতে অপারগ

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

হয়, তখন আর মারের বদলে মাম-
লার সুযোগও থাকে না। তখন যে
যেমন শক্তিমান, নিজেকে রক্ষা
করে। কিন্তু এ কী! একটা সভ্য
শহর যেন নো ম্যানস ল্যান্ডস। বঙ্গ
দেশের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের
মার খাওয়ার, শাসন শৈথিল্যের
আরও নজির আছে। কিন্তু তার
পরিণাম তো ভালো হয় নি। গোটা
দেশটাই হাত-ফিরতি হয়েছে।
হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ, ইংরেজ
বাগিকের যুগ, ইংরেজ শাসনের
যুগ। কি জানি, আমাদের মধ্যে
ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতাও কি
কমে যাচ্ছে? রক্ষক না থাকলে
সদ্বিধে মতো ভক্ষকের লোভ সহ-
জই তার শিকার গ্রাস করে।
দিনের পর দিন বা ঘটছে নীরব
দশকের মতো তাই দেখা ও তর
ওপর বঙ্গাহীন দায়িত্বহীন তর্ক-
জাল ফাঁদার পরিণাম যে কী সাংস-
তিক মরাস্তক হতে পারে, আশ্চর্য,
কেউ কি তা ভাবছেন না?”

রুম বললে, “অথচ অত বড়
বড় মাথায় যাই-ই থাক, আমরা
সাধারণগণও তো বুঝতে পারছি,
একটা ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে
কোনো একটা আদ্য হাত আমা-
দের ঠেলে দিচ্ছে! এমনটা কেন
হচ্ছে বলুন তো?”

“দেশপ্রেমের অভাব।” শৈবাল
বলে ওঠে।

মন্টু বললে, “দারুণ কথা।
টপ। এক কথায় সব সমস্যার সমা-
ধান। তাই বাবতীয় দেশপ্রেমিকের
টনক নড়ছে। এবার নাকি বঁধে
গরুতে এক সঙ্গে এক ঘাটের জল
খাওয়ার আয়োজনও হচ্ছে। দেশ-
প্রেমের ভানুমতীকী খেল। তবু
মন্ডের ভালো। সবাই মিলে, সব
দলে সত্যিই যদি খুন জখম থামাতে
পারে, আমরা বাঁচি।”

রুম গা মোড়া দিয়ে বসে,
“মন্টুদা সবতাতেই হট। কেবল
টগবগ করে ফুটছে। সিরিস
কথাকে কী করে যে শেষ কথা
বলার মতো ধাপ্পড় মেরে চুপ
করিয়ে দাও তোমরা?”

আমি শৈবাল ও মন্টু চেঁখে
চোখে হেসে ফেললাম। আজকের
কিছু শিক্ষিতা মেয়েও বুঝতে
চাইছে। সেই আগ্রহের উচ্ছ্বাসে
বাধা পেয়েই রুম রেগে গেছে
সত্যি সত্যি।

এই বয়সটাই বড় সুন্দর।
রাগ অভিমান আগ্রহ উচ্ছ্বাস উদ্দী-
পনা। জীবন যেন ভরা নদী।
বর্ষায় ফাঁপছে ফুলছে গর্জন
করছে। ওর রং, সে রাগ
নিষ্পাপ। ওরা হাসে, সে হাসি
অনাবিল। ওরা মদ্য হয়, সেই
বিমুগ্ধতা স্বাধর্গম্যহীন। দেশ
গড়ার কাজে বস্তুত যদি ওদের
দায়িত্বপূর্ণ অংশ থাকত, জাতি
জীবনীশক্তিতে নববোবনে যুবতী

নারীর মতো সম্ভাবনার প্রাচুর্যে
উবছে পড়ত। যে সব দেশ আজ
উন্নত, পৃথিবীর বৃহৎ শক্তির অন্য-
তম, সে দেশে এই বোবনের দর
কদর কত! ও সব দেশের পদ্ম-
পত্রিকা খুললেই স্বাস্থ্য আর
বোবনের উজ্জ্বল চেহারাটা সব
আগে চোখে পড়ে। এদেশের ছেলে-
মেয়েরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তর্ক করতে
করতে এক সময় হতাশ হয়ে সাম-
নের টেবলে প্রচণ্ড ঘৃসি মেরে,
চয়ের কাপ উল্টে সভা ভেঙ্গে
বেরিয়ে যাচ্ছে। যাবে না? ওদের
তর্কের যে শেষ নেই, সমাধান নেই।
উপসংহার নেই।

কি করছি বা থাকে। অনাধি-
কার চর্চা কি কখনো কোনো
গঠনমূলক সমাধানে পৌঁছাতে
পারে? যে দেশ, যে দেশের-সমস্যা
নিয়ে তর্কে মাতে ওরা, সেই দেশ,
সেই দেশের ভালেমন্ডে ওদের
অংশভাগ নেই। ওরা দেশের রূপ
একভাবে কল্পনা করে, দেশকে পায়
আর এক ভাবে। সহজ প্রেমের
সহজ সমাধান মেলে না। আকা-
ঙ্কার পরিভূতি হয় না। অথচ
দেখতে পায় : সেই অনভিপ্রেত
চেহারা নিয়ে যে-দেশ তাদের মুখ
ব্যাদান করছে, মনের মতো সেই
দেশ গঠনের জন্য আহ্বান মাঠেই
ওরাই ওদের বুকের রক্ত ঢেলে
দিয়েছিল। দেহের স্বাস্থ্য তো
বটেই, ওদের মনের স্বাস্থ্যও মরে
হেজে যাচ্ছে। ওদের তর্কের উপ-
সংহার একটাই : অসীম ক্রান্তি।

আমি বললাম, “রুম, আমি
তোমাকে ‘তুমি’ বলেই ডাকছি,
কিছু মনে করো না। দাদা ডেকে
এই সুযোগটা তোমারাই করে দিলে
আমায়।”

“বঁরে, আমরা আবার ‘আপনি’
‘মাদাম’ ‘মাদামোয়েল’ না-কি-সব
বলে বিব্রত করতে চান বুঝি।”

“না। তুমি খুব ভালো মেয়ে
আর খুব সুন্দর কথা বল। আমি
তোমাকে তুমিই বলব।”

মন্টু উচ্ছ্বসে, হেসে উঠে
বলে, “একটা ফাঁকা মগজকে
‘আপনি’ বললে শব্দের অপচয়
আর অপপ্রয়োগ হয়।”

“দেখছেন, পায়ে পদ দিয়ে
ঝগড়া করাই মন্টুদার স্বভাব।”

আমি রুমের এই অসহায়তার
সহানুভূতি বোধ করি। মন্টুর
কছে রুমের দুর্বলতা ধরা পড়ে
যায়। অহরহ বিবাদ তাই নিয়ে।
রুম মন্টুর ব্যাপারটা এতক্ষণে
যেন টের পাচ্ছি। রুমও চিন্তা
করতে চায়। তার চর পাশের
ঘনিষ্ঠ চেনা পরিচিত জনের মুখ
আহ্বাদ চায়। তাই তার কথা, সব
গোলমাল করে দিও না। যেহেতু
যেহেতু দুধের সর ছিঁড়ে ফেলছ,
তর্কের টক অম্বল দিয়ে ছানা
কাটিয়ে দিচ্ছ। ডগ ইন দি ম্যান-

জার। নিজেও হাবড়ে খেতে চাও
না, আবার অপূরণে শান্তির খাদ্য
খেকিয়ে আসছ। কেন বাপু, হয়
নিজেরটা করে খাও, নয় এসো,
এক পাতে বসে পড়।

অবুঝ মেয়ে। বাস্তবিক রুমের
এই গিহ্মী সুলভ ক্রোডটাও চমৎ-
কার।

মন্টুর চোখ তো চার দেওয়ান-
লের মুখ শান্তির মধ্যেই সর্বক্ষণ
আটক নেই। সে বহির্জগতে
বেরিয়ে পড়েছে। বুঝেছে, পুরুষ
মানুষকে কত সংগ্রাম করে এই দুঃখ
ভাষাটি ঝেঁগাড় করে আনতে হয়।
কেউ কেড়ে আনে, কেউ অর্জন
করে আনে। তাই যোগাড়ের যোগা-
নের প্রশ্নে সে অস্থির। সে অর্জ-
নের একটা সুস্থ পথ চায়।

রুমকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি,
“এটাকে তুমি ঝগড়া বলছ কেন
রুম? দেশপ্রেমকে তুমি একভাবে
ভাবতে শিখেছ, মন্টু আর এক-
ভাবে। মন্টুকে বুঝতে চেষ্টা
করলে দেখবে, ওর দেশপ্রেমটার
উচ্ছ্বাস কম বটে, তবে তা খাঁটি ও
গভীর। মন্টু বলতে চাইছে দেশ-
দোর জনলার খিল এঁ বসে
প্রেমটা একটা “খেল” কথা নয়।
থাকলেই কি তোমার সংসারটা
নিরাপদ? সেজন্য কত রকম
ব্যবস্থা চাই। মন্টু অট ঘাট বেঁধে
দেশকে উন্নত বলিষ্ঠ নির্ভর দেখতে
চায়। তুমি ওর মতো করে ভাবলে
বোধ হয় বুঝ বঁসে, তোমার প্রতি-
বোধ নিরাপদ না হলে তোমার
নিরাপত্তা ক্ষণস্থায়ী। তাই মন্টুর
দেশপ্রেমের ব্যাখ্যা অন্যরকম। সে
বলছে, ছোট করে নয়, বড় করে
ভাবো। সবার শান্তিই তোমার
শান্তি। সাক্ষ কথা।”

“এই যা, সব ছুলিয়ে গেল।
আপনার কথার এক বর্ণও বুঝ-
লাম না।”

মন্টু হাসছিল।

বললাম, “দেশপ্রেমের কথাটা
শৈবাল খুব শিথিল ভাবেই ব্যবহার
করেছে। মন্টুর আপত্তি বোধ হয়
সেখানেই। আমাদের শহরের এই
বিস্তারিত অবস্থার কারণটা
মূল সমস্যাটা যে শৃঙ্খল মাস্তানী
আর গুন্ডামী নয়, এর পেছনে
অনেক ইতিহাস, সেইটার মূলে
যেতে হবে। যোঁয়া দেখে তুমি
যদি শূকনো পাতার ওপর খড়ের
আঁটি চাপা দাও, তাতে কি আগুন
নেভে? দেশপ্রেমটা তো কোনো
অনির্বাক তরল পদার্থ নয়,
বালির বস্তা নয়। দেশপ্রেম হল
দেশ গঠনের আন্তরিক আকৃতি।
সেই আকৃতি কিন্তু খুব নিষ্ঠুর।
প্রয়োজনে তা সব লণ্ডভণ্ড করে
ভেঙ্গে চুরমার করে গড়তে চায়।
কিন্তু “দেশপ্রেমের অভাব” বলতে
আমরা একটা ঠান্ডা শীতল
সহনীয় এবং সমাপিত মনোভাবের
অনুপস্থিতির কথা বুঝি ও
বোঝাতে চাই। মন্টুর “দেশপ্রেমটা”
নিষ্ঠুর। সে বোঝে, দেশপ্রেম সম-
াপিত মনোভাব নয়, দেশপ্রেম
হাতুড়ে কাটখোটা। পাকা মিস্ত্রীর
মতো তা নির্দয়। নড়বড়ে ভিতের
ওপর যে বাড়ি, তার গায়ে নতুন

পলস্তারা চাঁপিয়ে তাকে শোভন
বানাতে আপত্তি ওর মন্টু বলছে
ভিতটাই শক্ত করতে হবে। তাসের
ঘরে বসে সেই ঘর নিয়ে নিয়ে
আহ্বাদ করা এক রকম, আর বাঁশ
খোঁটা পুতে মাচা বানিয়েও
অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া আর এক
রকম। বলত, তুমি কোনটা চাও?”

রুম অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে
বলল, “আপনাদের এইসব উল্ভট
কথাবার্তা নিয়েই থাকুন। কিছু
বুঝিনা। বুঝতে চাই-ও না।”

মন্টু বলল, “থাক, আর বুঝে
কাজ নেই। তোর নিশ্চয় ক্ষিমে
পেয়েছে, বেলা হয়েছে তো।”

আমিও উঠে পড়লাম, “সত্যি
বেলা হয়ে যাচ্ছে।”

রুম সলজ্জ। বললে, “স্বায়ে,
ক্ষিমে বুঝি শৃঙ্খল আমাদেরই পায়।”

“না। আমারও প্রচণ্ড ক্ষিমে।
তোমার সব গুচ্ছেনো আছে, খেতে
বসে যা। আমরা আমাদের যোগাড়
দেখি।”

রুম বললে, “অসভ্য।”

আমরা হাসতে হাসতে রাস্তায়
নামলাম। শৈবাল হাত তুলে নম-
স্কার করলে, “আমাদের আগামী
শোতে নিশ্চয় আসবেন। এই
মন্টু, কার্ড দিয়েছিস?”

“হ্যাঁ পেয়েছি। নিশ্চয় আসব।
পদ্মপন্ডুর খোঁজে এসে আপনাদের
(তোমাদের) পেলাম। এ কম বড়
লাভ নয়।” ওদের প্রতি হাত
নেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। মন্টু
আমাকে মোড় পর্বত এগিয়ে দিতে
এলো।

মতামত

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

সর্বপ্রথম আমলা তৈরীর কার-
খানার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা
করেন নি? আর শান্তিনিকেতন
কিনা দালাল তৈরী করত? যদি
দু একটা দালাল তৈরী হয়ে থাকে
সেটা কি বিশ্বকবির দোষ? জা
ছাড়া মুসোলিনীর ইতালীর প্রতি
তার মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিলেন কিম-
উনিষ্ট দ্বিনিয়য় স্বীকৃত রোঁয়া
রোঁয়া। তার রাশিয়ার চিঠি কি
চারবাবুর পড়েন নি? চার-
বাবুরা কি জানেন না যে তিনিই
কার্ল মার্কসের আদেশ অনুসারে
মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয়
ঘটতে চেয়েছিলেন? তিনিই না
বস্তুবাদী জগৎকে সর্বপ্রথম
স্বীকৃতি দিয়েছিলেন? তিনিই না
“স্যার” উপাধি ছুড়ে ফেলে-
ছিলেন।

যে সুভাষচন্দ্র গান্ধীবাদ ও
সমাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনলস
সংগ্রাম করেছিলেন, তিনিও আজ
ক্ষমতালোভী? কমরেড চারু
মজুমদার, আপনারা সাধারণ
মানুষের মন থেকে দ্রুত সরে
যাচ্ছেন।

অসিতপন্থী ছাত্র নেতা

মুক্তি সংগ্রামের গটভূমিকায় ওগার বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প

● ● রঞ্জন মজুমদার

গত তেইশটি বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে পূর্ব বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) চলচ্চিত্রের ছোট হলেও এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পায়তন। পূর্ব বাংলার আগে কোন স্টুডিও ছিল না। ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে—লাহোরে। ওখানে কিছু কিছু উর্দু-ভাষী ছবি তৈরী হতো। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর স্বভাবতই লাহোর চলচ্চিত্র শিল্পের গুরুত্ব অনেকাংশে বেড়ে যায়, উপেক্ষিত হতে থাকে শূন্য পূর্ব বাংলা। পূর্ব বাংলাকে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হতো কলকাতায় তোলা ছবি—বাংলা ছাড়া ছবিরই ওপর। তাই সে ভাল মন্দ যাই হোক না কেন। এটা আবার পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকবৃন্দ মোটেও পছন্দ করেনি। ওরা চেয়েছিল, বাংলায় তো হয়েছিল, ওরা মুসলমান তো বটে। আর মুসলমান যখন তখন উর্দু ছবি দেখা খাটী দেশপ্রেমের লক্ষণ। কিন্তু বাংলায়ীরা স্বৈর-আদপ তেমনি কাঠ গৌরার। বাংলা ছবি ওরা দেখবে বলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তখন পাকিস্তান সরকার কিছু পেটোয়া লোকদের দিয়ে লাহোরে একটি দুটি বাংলা চিত্র তৈরী প্রয়াস পেল। কিন্তু তাতে কী কিছু হয়? তখন পাকিস্তান সরকার ডিঙি গতিতে বৈদেশিক সাহায্যের ভিত্তিতে ঢাকায় একটা সরকারী ফিল্ম স্টুডিও নির্মাণ করে সবাইকে বললে, 'নাও, এই করে দিলাম, এবার তোল ছবি। কিন্তু সাবধান। কেউ ঐশলামিক ঐতিহ্যের বাইরে যাবার চেষ্টা করো না। করলে তাকে কিন্তু কচু কাটা করা হবে।'

আসলে ভারতীয় ছবির আওতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানীদের বার করে নিয়ে আসার জন্যই সেদিন অত ডিঙি আয়োজন হয়েছিল সব। তারপর ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহ। মজার কথা সেদিন এই মধ্যবিত্ত বাঙালী সম্প্রদায়ের মোহাজ্জম এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জাতীয় স্তরে জীবনের সব কিছুকেই পাক-করণ (পাকিস্তানীজেশন) করতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিল। এমন কী সাংস্কৃতিক উন্নয়নের নাম দিয়ে দেশের কালচারাল প্যাটার্নকে পুরোদস্তুর ঐশলামিক রীতিতে পুনর্নির্মাণ করতে বন্ধপরিকর হয়েছিল। এতে পশ্চিমা শাসকবর্গের মূর্খি, যা আজ হত্যা-কাণ্ডে রক্তাক্ত, অনিবার্যভাবেই শক্ত হয়েছিল। এরা যাত্রা, থিয়েটার জল-সাকে বিষবৎ জ্ঞান করতো। এতে নাকি হিন্দুমানীর গন্ধ আছে, বলা হত। আসলে বাংলাদেশে পশ্চিমের অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক মগজ ধোলাই যাতে অব্যাহত থাকে, পাকিস্তানী শাসকদের সর্বাগ্রে নজর সেদিকেই ছিল। ফলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতিকে বিভিন্ন সময়ে নানা ছলচাতুরীতে বাধা দেওয়া হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষ পণ্ড করে

ফেলারও জোর চেষ্টা হয়েছে। অনিচ্ছুক বাঙালী দর্শকদের কাঁধে জোর জবরদস্তি উর্দু ছবি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলা ছবি, বিশেষ করে যোগদল তুলনায় সমান্য প্রগতিশীল, যাতে কোনরকম সরকারী ইনসেন্টিভ না পায় সেটা ভালভাবে দেখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা ছবি যাতে কোনরকমে প্রতিযোগী না হতে পারে, গোড়ার দিকে তেমন চেষ্টা বিলম্বণ হয়েছে।

আমার স্মরণ আছে পাকিস্তানের খ্যাতনামা প্রযোজক পরিচালক কারদার একবার কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর 'জাগ হুয়া সবেরা' ছবির জন্য ইন্টার-ন্যাশনাল ফ্রু সংগ্রহ করতে। ওই ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের তদানীন্তন প্রধান সহকারী পরিচালক শান্তি চ্যাটার্জি কাজ করতে ঢাকায় গিয়েছিলেন মামদুলী কুশলী হিসাবে নয় তাঁকে সহযোগী পরিচালকের সম্মান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন বুটেনের বিশ্বখ্যাত ক্যামেরাম্যান ওয়াল্টার লেসাল্লি। এ'র সঙ্গে সহকারী হিসাবেই কাজ করবার জন্য কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন সাধন রায়। ছবি শেষ হলে শান্তি চ্যাটার্জি ফিরে আসেন, কিন্তু সাধন রায় ফেরেন নি। তিনি ঢাকাতে ক্যামেরাম্যান হবার অফার পেয়ে পাকাপাকিভাবে রয়ে যান। আর হ্যাঁ, ওই একই ছবিতে সম্পাদনার কাজ করতে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদক দুলাল দত্ত। ছবির নায়িকা সেজেছিলেন আসামের জনপ্রিয় নায়িকা ইভা আচাও। সমগ্র ছবিতে প্রধানতঃ বাঙালীদেরই আধিপত্য ছিল। কলকাতায় কারদার আমায় বোলছিলেন, আমি পাজাবের লোক, লাহোরে ছবি করলে হয়তো অনেক সুযোগ সুবিধা পেতাম, কিন্তু আমি তো জানি বাঙালীরা যত ছবি বোঝে পাজাবীরা তার এক শতাংশও বোঝে না। বুঝবেও না। পরে মস্কো ফেস্টিভ্যালে ছবিটি স্মিতীয় বা তৃতীয় কী যেন একটা পুরস্কারও পেয়েছিল। ভাষা উর্দু হলেও ওই ছবির গল্প ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'পদ্মা নদীর মাঝি'। ছবিতে একটা প্রগতিশীলতার ব্যাপার ছিল, কারদার প্রথমে ছবিটা বাংলা ভাষাতেই করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সরকারী অনুমতি মেলেনি।

বলা বাহুল্য দেশজ সাংস্কৃতিক বিকাশের মূলে চলচ্চিত্রের অবদান এবং উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এছাড়া লোকরঞ্জন এবং সমাজ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এর গুরুত্ব যে অপরিসীম, এটা পশ্চিমা শাসকবর্গ ভাল জানতো। তাই আগাগোড়া এই শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রেখে ছড়ি ঘোরাবার ব্যবস্থা ওরা প্রথম থেকেই করেছিল। পোস্ত ব্যবস্থা হিসাবে বাংলা ছবিতে একের পর এক



বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কবরী চৌধুরী

কড়া নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু করা হয়েছিল। সুত্বের কথা, সেই সব হীন প্রচেষ্টার অনেকগুলিকেই বাঙালী চিত্র নির্মাতারা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন, এই সেদিন পর্যন্তও করেছেন। নিজস্ব মাতৃভাষা এবং সংস্কৃতিকে এই চিত্রনির্মাতারা অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন। সঙ্গে এও চেয়েছেন যে তাদের তোলা ছবি দেশে বিদেশে দেখানো হোক। পাকিস্তান সরকার বাংলা ছবিকে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারটা গোড়ায় নাকচ করলেও পরে দুর্বীর প্রতিরোধের সামনে নীতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে শেষ শর্ত ছিল ঠিক আছে, সব জায়গায় পাঠাতে পারো, কেবল ভারত ছাড়া।

সারা দেশ জুড়ে যখন আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী প্রবল হচ্ছিল তখন চলচ্চিত্র শিল্পের রাজনৈতিক দায়িত্ব বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। সরকারী বাধা নিষেধের বেড়া উপেক্ষা হয়তো তখনই সর্বাঙ্গিক কিছু করা সম্ভব হয়নি, তবু আইন বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এমন সব ছবি তৈরী হয়েছে যাতে স্বাধিকারের দাবী, অর্থনৈতিক দাবী-গুলির কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কায়দা করে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যা বুঝতে বাঙালী দর্শকের ভুল হয়নি।

শাসক শ্রেণীর অন্ধ ভারত বিম্বে-ধ-ই কিন্তু পরোক্ষে সেই সুযোগ এনে দিয়েছিল। আমি শুনছি, অ্যান্টি ইন্ডিয়ান থীম-এর গল্প ছবিতে এমন চমৎকার কায়দায় সাজানো হয়েছে

যাতে পরিষ্কার বোঝা গেছে—মূলে এটা পশ্চিমা শাসক বিরোধী ছবি। ভাষা এবং সাংস্কৃতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পূর্ব বাংলায় যত আন্দোলন হয়েছে, তার প্রত্যেকটির স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে বাংলা ছায়া-ছবিতে। কোনও ক্ষেত্রে সরাসরি বলা হয়নি, সব ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। যে মধ্যবিত্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় একদা বাংলা শিক্ষা সংস্কৃতিকে ঐশলামিক টং-এ ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে নিতে প্রয়াসী হয়েছিল, ইতিমধ্যে তাদের যে মোহমুগ্ধি ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। পরবর্তী ধাপে সেই একই সম্প্রদায় স্বাধীনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়েছে—এরাও চলচ্চিত্রের সঙ্গে নানা ভাবে সংযোগ রক্ষা করটা কতখানি হিসাবে নিয়েছে। ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায়ের তো কথাই ওঠেনা, এঁদের তো 'মেঘ না চাইতে পাণি'র ব্যাপার। সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে এরা সেদিনও কমব্যাটিং ফোর্স হিসাবে কাজ করেছে, অজও করছে। পূর্ব বাংলার দুই জনপ্রিয় তরুণ অভিনেতা রেশ্মাক (ওখানকার উত্তমকুমার) ও আনোয়ার তাদের ছাত্র জীবনে প্রগতিশীল আন্দোলনের ট্রেনিং পেয়েছেন। পরবর্তীকালে ছায়াছবিতে এলেও, গোড়ার ব্যাপারটা বিস্মরণ হয় নি।

মজিবুর সাহেবের অসহযোগ আন্দোলন অফিসিয়ালী শূন্য হবার বেশ কিছুদিন আগে অর্থাৎ পয়লা মার্চ থেকেই চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভা-

গের কর্মীরা কাজ বন্ধ করে দেন। সরকারী স্টুডিও-র দোরে তোলা পড়ে। বেসরকারী আর যে তিনটি ছোট স্টুডিও আছে, তারাও হাত গুটিয়ে নেন। গোটাবার পর কেউ চুপচাপ বসে ছিলেন না। সক্ষম শিল্পী এবং টেকনিশিয়ানরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কাজে নেমে পড়েন।

সম্প্রতি বাংলা দেশ থেকে বেশ কিছু চলচ্চিত্র শিল্পী এবং কলা-কুশলী চলে এসেছেন এপারে। সবাই প্রায় কলকাতাতেই আশ্রয় নিয়েছেন। ওঁদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি, তবে কিছুদিন আগে বাংলা ছবির জনপ্রিয় নায়িকা কবরী চৌধুরী এবং তাঁর প্রযোজক স্বামী চিত্ত চৌধুরীর সঙ্গে আকস্মিক যোগাযোগ হয়েছিল। ওঁদের মধ্যে ফিল্মের ব্যাপারটা সব শুনলাম।

চিত্ত চৌধুরী ঢাকার বিশিষ্ট প্রযোজক। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকখানি ছবি করেছেন। সব কয়টি মোটামুটি সফল ছবি। প্রথম ছবি 'সুতরাং' বিদেশে এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় একটা পুরস্কারও পেয়েছিল। বর্তমানে ওর দুটি ছবি ফ্লোর রয়েছে। তার একটির কাজ প্রায় শেষ।

উনি বলছিলেন, পাজাবীরা বেশ কিছুদিন যাবৎ বাংলা ছবি তোলার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। ওরা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, বাংলা ছবি সুদূরপ্রসারী স্কট সৃষ্টি করছে পশ্চিমাদের নানাভাবে বিপদগ্রস্ত করবার ষড়যন্ত্র এঁটেছে। দেখুন, লাহোরের স্টুডিওয় আট ঘণ্টার এক শিফট শূটিং করলে আপনাকে ফ্লোর ভাড়া দিতে হবে পাঁচশো টাকা, কিন্তু ঢাকায় আমরা এযাবৎ দিয়ে আসছি সাড়ে সাতশো টাকা। রংগীন ফিল্ম ঢাকায় দুপ্রাপ্য, অথচ যান লাহোরে, ওরা কালার ফিল্ম দিয়ে ফ্লাড করে দেবে। ফটোগ্রাফীতে ভাল কোয়ালিটি আনবার জন্য আপনি যেই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কোডাক ফিল্ম চাইবেন ওরা কসিজ উল্টে বলবে, কোডাক পশ্চিম পাকিস্তানের প্রোডিউসারদের জন্যে এক্সক্লুসিভ, কোডাকের বদলে গেভার্ট নিতে হবে। রীতিমত জোর-জবরদস্তি। আমার স্ত্রী কবরী 'সাত ভাই চম্পা' (এমন হিট বাংলা ছবি আর বিবর্তীয়াটি নেই) ছবিতে নায়িকা সেজেছিল। ক্রেডিট টাইটেলে ওর নামের আগে 'শ্রীমতী' শব্দটা ব্যবহার করেছিল ছবির কর্তৃপক্ষ। অমনি কায় করে ধরলো সেন্সার বোর্ড। শ্রীমতী হটাৎ, ওটায় ইন্ডিয়ান কালচারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কাসার থালা, বাটি ইত্যাদি কথাগুলো আমাদের ছবিতে বলা প্রহিভিটেড। ওতেও নাকি ইন্ডিয়ান কালচার রয়েছে। 'মাছের কোল' বলা যাবে না, বলা—মাছের সুদুয়া। এই রকম হাস্যকর আরও কত কী! তারপর ধরণ, বিদেশে আমাদের তৈরী বাংলা ছবিই প্রাইজ আনছে, কিন্তু যখন ডেলি-গেসান পাঠবার কথা হলো, অমনি বাঙালীদের হাটিয়ে পাজাবীদের প্লেস করা হলো। পূর্ব বাংলার দর্শকদের উপর চড়া হারে প্রমোদকর বসিয়ে পাজাবে হাস্য করে দেওয়া

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

বহুরূপী 'পাগলা ঘোড়া'

ভবেশ দাশ

বাদল সরকারের “বাকী হাঁড়-হাস” থেকে শুরুর করে সাম্প্রতিক-কালের “পাগলা ঘোড়া” পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, বহুরূপী আভিনয়িক কলা কৌশলের রীতিনীতি সহসাই বদল হতে চলেছে। এটা কি আভিনয়িক জটিলতার ক্রমোন্নতি, না কি ছুৎ-মার্গিক বন্ধন? আমার মনে হয় “বহুরূপী” এই শেখোস্ত বিশেষণ থেকে মধ্যস্থ যোগ্যতার কারণেই মূল্য। অভিনয় রীতিতে বহুরূপী একটি নিজস্ব আদল যে আবহ-মানকাল ধরে গড়ে উঠছিল, তার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণত প্রবেশের সংযোগ রেখেই ইদানীংকালের নাটকগুলির আভিনয়িক চেহারা বদল হয়েছে। বস্তুতঃ এই “পাগলা ঘোড়া” নাটকটিতে তার প্রমাণ স্পষ্ট।

মূল নাটকের অন্তর্লীন রস সিঞ্চিত করে, তাতে অভিনয় রসের সূনিপুণ একাত্মতা বহুরূপীর অপরাপর নাটককে যেমন অসামান্য মর্যাদা দেয়, “পাগলা ঘোড়া”ও তেমনি মর্যাদা পেয়েছে।

চারজন ভদ্রলোক একটি মেনের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে এসেছেন। মণ্ডের বাইরে মেরেটির চিতা জ্বলছে। মণ্ডের ভেতরে বিপ্রমাগারে চারজন তাদের আশ্রয় জমেছেন। তারপর এরা প্রত্যেকই অল্পবিস্তর মদ্যপান করবেন এবং তাঁর আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে তাঁদের আপন আপন বিপন্ন ভাল-বাসার স্বীকারোক্তি করবেন। অপরদিকে যে মেরেটি চিতায় জ্বলছে, তাঁর দুর্দমনীয় প্রেতছায়া এদের আত্মকে কুরে খাচ্ছে। তাই প্রত্যেকই অসহায় বন্ধুর মত আত্মকে ওদের বিপন্ন ভালবাসার কাহিনী আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছেন।

এই নাটকে একটা প্রশ্নকে বড় করে দেখানো হয়েছে। মানুষ তার ভালবাসার বিপন্ন কাহিনীকে কখনোই স্বল্প ব্যক্তিত্বের সংগে প্রকাশ করে নিজের আত্মকে কিছুতেই মূল্য দিতে চায়না। এটা আমাদের বিরাট ব্যাধি। এমন ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবণতাই আমাদের অসহায়

শব্দমাত্র কতকগুলি প্রেমের করে, তুলেছে। আলোচ্য নাটকে এই তীব্র জিজ্ঞাসাকে অনুভব করা গেছে মাত্র। কিন্তু ঘটনাগত ব্যঞ্জনা তা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। ছেঁদো গল্প জোড়া দিয়ে বক্তব্যকে বলিষ্ঠ করা সম্ভব নয় (যে কথা একজন অভিনেতার মুখ দিয়েও স্বীকার করানো হয়েছে)। আমাদের এই ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবণতার পরিণতি কি শব্দমাত্র অসহায়? অসহায়ত্বের পরিণতি কি শব্দমাত্র নিঃসঙ্গতা? গোটা সমাজের দেহে কি তার কোন প্রতিফলন নেই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তার বীভৎসরূপের ইঙ্গিত কোথায়? আমরা যারা দিনরাত ভালবাসার জন্য হাহাকার করি, তারা শব্দমাত্র ঐ বিপন্ন ভালবাসার ছেঁদো কাহিনী নিয়েই পঙ্গু নই। দেশজোড়া মানুষের আরো বৃহত্তর আত্মিক দুর্বলতা : শোষণ-শাসন-বিলাস-বাসন এসবের ছায়া ভালবাসার অনুভূতিতে কি একেবারেই পড়েনা? আমার মনে হয়, আমাদেব সার্বিক সমস্যাকে ভেঙে টুকরো করে দেখাবার দিন বোধ হয় আর নেই। শব্দমাত্র আংশিক শব্দমাত্র দিয়ে আমাদের পুনরুজ্জীবিত

বনের কাজ একেবারেই এগোবেনা। আমাদের জীবনের বৃহত্তম, মহত্তম জিজ্ঞাসাকে নাটকে জায়গা করে দিতে হবে। অস্তিত বহুরূপীর কাছে এ দাবী আমরা নিশ্চয়ই করব।

নাট্যকার বাদল সরকার তার নাটকে একের পর এক যেভাবে প্রকাশমুখী হয়েছেন, তাতে পরবর্তী কালের অধিকাংশ নাটকই ধানিকটা “ধরি মাছ না ছুঁই পানি” গোছের হয়ে যাচ্ছে। ও দেশের খিয়েটারের কথা ভাবতে ভাবতে নাটকের আঙ্গিক এতবেশী রকম জায়গা পেয়েছে, যে কারণে দেশের বৃহত্তর সমস্যাগুলি একেবারেই তাঁর চোখে পড়ে না। তাঁকে প্রথমে স্থির করতে হবে, তিনি বিষয়-বস্তুর জন্য আঙ্গিক আনবেন, নাকি আঙ্গিকের জন্য বিষয়বস্তু?

নির্দেশনার নিপুণতায় শম্ভু মিত্র অন্যান্য নাটকের মতো এখানেও সার্থক। খালেদ চৌধুরীর মণ্ড পরিকল্পনা খুবই উন্নতমানের। মণ্ডমধ্যে দাঁড় করানো স্ট্যাচুগুলি যথেষ্ট অর্থবহ, সন্দেহ নেই। অথচ একই সঙ্গে শ্মশানের ছবিও ফুটে উঠেছে। অভিনয়ে শাওলি মিত্র অসম্ভব ভালো অভিনয় করেছেন।

আমরা নিঃসন্দেহে আরো একজন স্থিতি মিত্রকে পেতে চলেছি। চরিত্র অভিব্যক্তি এবং ঘটনা প্রকাশের মনোভাবগত নৈপুণ্যের সাংগীতিক ব্যঞ্জনার সাহায্য নিয়ে প্রেতছায়া রূপী শাওলিকে মণ্ডের আড়ালে রাখলে, নাটকের আভিজাত্য আরো বাড়ত বলে মনে হয়। বরং মণ্ডের আড়ালেই তাঁর দুরূহ এবং নিকটবর্তিতা বজায় রেখে কণ্ঠস্বরের পর্দা ওঠানামার মধ্য দিয়ে শিল্পীর উন্মাদনা আরো তীব্র হোত বলে মনে হয়। নীরবতার যেমন একটা ভাষা আছে, মণ্ডে কখনো কখনো কোন শিল্পীর অনুপস্থিতিরও একটা হৃদয়স্পর্শী রহস্য থাকে। সেটা এ নাটকে খুব কার্যকরী হোত মনে হয়। এই শিল্পীর মুখে “সেদিনের চাঁদটা কি সাইজের ছিল?” কথাটা হঠাৎ যেন হৃদয় পতন ঘটিয়েছে। অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে কুমার রায়, দেবতোষ ঘোষ, শান্তি দাস এদের দূরন্ত অভিনয় সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। নতুন অভিনেত্রী তাপ্তী গুপ্তকেও ভীষণ ভাল লেগেছে।

ওগার বাংলার চলচ্চিত্র

(নবম পৃষ্ঠার পর)

হলো। উদ্ভাসী ছবিতে পাকিস্তান সরকার দেবার খণ দিচ্ছে, নানান উন্নয়ন খাতে দু হাতে টাকা ঢালছে ওখানে, কিন্তু বাংলা ছবির ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া আরও পরোক্ষ শোষণ চালু রয়েছে বাংলা ছবির নির্মাণ এবং ব্যবসায়ের ওপর।

পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে নানা সূত্রে যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলি হচ্ছে : ঢাকার উপস্থিত পাঁচটি স্টুডিও আছে। একটি সরকারী, অপর চারটি বেসরকারী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। সরকারী স্টুডিওটিই আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বিষ্ট। অপর তিনটির খুবই দৈন্যদশ। ভাঙ্গাচোরা যন্ত্রপাতি দিয়ে কোনগতিকে কাজ কর্ম চালু রাখা হয়েছে। শিল্পে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিল্পী এবং কলাকুশলী কর্মরত আছেন। ভাগ্যবান কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। কাজের অভাবে বছরের সব সময় কিছু না কিছু শিল্পী এবং কলাকুশলী বেকার বসে থাকেন। পনের থেকে আঠারোটি প্রযোজনা সংস্থা নিয়মিত ছবি তৈরী করে থাকেন, বাদবাকি সবাই অনিয়মিত। অধিকাংশ কুশলী ফ্রী-ল্যান্সিং চরিত্রভিত্তিক কাজ করে থাকেন। এক একটা বাংলা ছবি (আটটি রিলিজ প্রিন্ট ও পাবলিসিটি সহ) নির্মাণ করতে আড়াই থেকে সর্বোচ্চ চার লাখ টাকা খরচ করতে হয়। একটা ছবি নির্মাণ করতে লাগে এক থেকে দেড় বছর। নতুন শিল্পীদের নিয়ে কাজ করলে আরও কম সময়ের মধ্যে ছবি

কম্প্লিট করা যায়। ওখানকার পপুলার শিল্প জুটি (এখানকার উত্তমকুমার সূচিয়া সেনের মত) হচ্ছেন নায়ক রেজ্জাক এবং ক্যাবেরী চৌধুরী। এক একটা ছবির জন্য পারিশ্রমিক বাবদ রেজ্জাক পেয়ে থাকেন কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা, কবরী পান দ্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। একটা অবিবেচ্য ছবির জন্য নতুনপক্ষে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ শিফট (আট ঘণ্টার এক শিফট) শটটিং করতে হয়। গান আবহ সঙ্গীতের জন্য এক শিফট, শব্দ-পুনর্ব্যোজনায় লাগে এক শিফট। পূর্ব বাংলায় সিনেমা হাউসের মোট সংখ্যা একশো পনেরটি। এই সব প্রেক্ষাগৃহে বছরের বেশীর ভাগ সময় বাংলা ছবি দেখানো হয়। উদ্ভাসী ছবি শহরেই বেশী চলে, গ্রামাঞ্চলে চলে খুব কম। ঢাকার প্রযোজকদের একটি সংগঠন আছে। তবে সেই সংগঠনটি খুব শক্তিশালী নয়। প্রযোজকদের নিজের নিজের ছবি নিজের উদ্যোগেই রিলিজ করতে হয়। ঢাকার স্টুডিওর উদ্ভাসী ছবি যে একেবারেই হয় না এমন নয়। তবে খুব কম হয় বলে জেনেছি। এমনই একটা ছবির কথা উল্লেখ করলেন কবরী চৌধুরী “শোয়ে নদীয়া জাগে পানী”, এতে কবরী নায়িকা চরিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি মস্কো ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিল গত বছর, সেখানে কবরী দেবীর অভিনয় উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। ছবি বাঙ্গালী শিল্পী এবং টেকনিশিয়ানরা মিলেই করেছিলেন।

অনেক বাঙ্গালী প্রযোজক এছাড়া অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি পাবার আশায় শিল্পীদের নিয়ে লাহোরে গিয়ে কখনো-সখনো ছবি করেছেন। পরসার দিক দিকে হয়তো তাঁদের সামান্য সাফল্য হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা

নিদারূণ ভিত্তি হয়েছে। প্রযোজক চিন্তা চৌধুরী নিজে একবার ছবি করতে ওখানে গিয়েছিলেন। তার ধারণা জন্মেছে, কোন আত্মমর্যদাবোধসম্পন্ন বাঙ্গালীর পক্ষে ওখানে গিয়ে ছবি করা সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলার দর্শককে ছবি দেখতে গিয়ে সরকারকে যে প্রমোদকর দিতে বাধ্য হতে হয়, পশ্চিমে তার পরিমাণ অনেক কম। পূর্ব বাংলা নদীমাতৃক দেশ, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম বলে সব বাংলা ছবিতে বেশ কিছুটা বহির্দৃশ্য থেকে থাকে, তবে পাহাড় বা বরফ ঢাকা পর্বতের দৃশ্যের প্রযোজনে পশ্চিম পাকিস্তানে (গিলগিট প্রভৃতি জায়গার নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য) যাওয়া ছাড়া গন্তব্যত্ব থাকে না। অথচ পশ্চিম থেকে পূর্ব বাংলার এসে কোন উদ্ভাসী ছবির আউটডোর শটটিং হয় না। আমি কয়েক বছর আগে কলকাতার পূর্ব বাংলার অন্যতম স্বাধীনসম্পন্ন নায়িকা শবনমকে (এর আসল নাম ঝর্ণা বসাক) ইন্টারভিউ করেছিলাম। ইনি স্বামী রবীন ঘোষ (ইনি একজন সুপরিচিত সঙ্গীত পরিচালক) এবং শিশুপুত্র সহ কলকাতা হয়ে লাহোরে যাচ্ছিলেন এক রঙ্গীন উদ্ভাসী ছবির শটটিং করতে। ইনি বলেছিলেন, উদ্ভাসী ছবিতে বেশী পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, গল্পে নাটকীয় জটিলতা থাকে না বললেই চলে। ফলে রিল্যান্সড মডে কাজ করা যায়। আর ঠিক এর উল্টো হচ্ছে বাংলা ছবি। কম পারিশ্রমিক, প্রচুর মেহমত, অভিনয় তো নয়, যেন অশ্লীলপরিচা।

ঢাকার এখনও পর্যন্ত কোন রঙ্গীন বাংলা ছবি তৈরী হয়নি। কারণ, খরচ না ওঠার সম্ভাবনাই বিলম্ব। তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে রঙ্গীন ছবিই বেশী। কারণ স্বদেশ ছাড়া

বিদেশেও ওদের কিছু কিছু বাজার আছে। যেটা বাংলা ছবির একেবারেই নেই। ঢাকার প্রেত স্টে-ব্যাক গায়িকা ফেরদৌসী। বলা হয়, ইনি পাকিস্তানের লতা মঙ্গেশকর।

প্রদেশের নামজাদা পরিচালক-বৃন্দ হচ্ছেন সুভাষ দত্ত (খবর, এঁকে নাকি ইয়াহিয়ার ফৌজ গুলি করে হত্যা করেছে, মেরেছে এর ক্যামেরাম্যান আলি আহমেদকেও), নারায়ণ ঘোষ (ইনি মিতা নামে সমধিক পরিচিত), খান আতাউর রহমান (ইনি বহু সুপরিচিত ছবির নির্মাতা), জাহির রাইহান এবং কাজী জাহিদ। উপরোক্তরা একই সঙ্গে প্রযোজকও বটেন। এর মধ্যে সুভাষ দত্ত আবার সঙ্গীত পরিচালকও। পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে এর অসীম প্রভাব। এর ছবিই পূর্ব বাংলাকে সম্ভবতঃ প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। সে ছবির নাম “সুতরাং”—প্রযোজনা করেছিলেন চিন্তা চৌধুরী। খান আতাউর রহমান নির্মিত “সাত ভাই চম্পা” ছবিটি পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করেছে। সম্প্রতি উনি “জয় বাংলা” ছবিটি প্রযোজনা পরিচালনা করছিলেন। সুজাতা নামে একজন নায়িকার (হিন্দু মেয়ে পরে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছেন) কথায় জানা গেল, ইনিও বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন ওখানে। বর্তমানে ওঁর নাম সালমা আজম। পি কে দাস নামে একজন প্রযোজক সম্প্রতি “আবির্ভাব” নামে একটি ছবি করেছেন। ছবিটি উদ্ভাসের বক্স অফিস হিট ফিল্ম, কম্বোডিয়ান অনুরূপিত এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। বাংলা ভাষাকে ভালবাসার যে নমুনা দেখিয়েছেন ‘পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্রের কারিগররা, তার বাস্ত-

বিক কোন তুলনা হয় না। ওখানে বাংলা প্রাথমিক বর্ণের নামে একটি দেশাত্মবোধক ছবি করেছেন ওরা। তার নাম “ক খ গ ঘ ঙ”।

বর্তমানে কলকাতার উপস্থিত প্রযোজক চিন্তা চৌধুরী এবং ওঁর অভিনেত্রী স্ত্রী কবরী চৌধুরী ওখানকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করেছেন। ওঁরা সর্বস্ব ফেলে একবন্দে শব্দ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। চিন্তা চৌধুরী বললেন, পালিয়ে এসেছি বলবেন না, বন্দন পালাতে বাধ্য হয়েছি।

উনি বললেন, ইয়াহিয়া চক্রে প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল এই ফিল্ম লাইনের ওপর। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় শরিক হচ্ছে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প। আমরা গোড়া থেকে সক্রিয়ভাবে মদত জুটিয়েছি ভাষা আন্দোলনে, অর্থনৈতিক আন্দোলনে এবং সর্বশেষে স্বাধীনতা ঘোষণায়। তাই ফৌজী আকস্মিক শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে জহাদের খাঁড়া সর্বপ্রথম আমাদের ওপরই নেমে আসে। ফিল্মের মাথা মাথা ছিলেন যারা, পাক মিলিটারী সর্বাত্মে তাঁদের খতম করে দেয় তারপর সেই রক্তাক্ত হাত অন্যান্যদের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

চিন্তা চৌধুরী বললেন, ফিল্ম লাইনের অনেকেই এখন মৃতিফোজে আছেন। তবে, এই সপ্তকের দিনে, এমন একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যে সব ক্ষম-ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি তা ভবিষ্যতে পূরণ করা শক্ত হবে। তবে এই আশায় আছি, টোটাল লিবারেশন হলে আমাদের উত্তরাধিকারীরা অস্তিত্ব সূত্রে স্বচ্ছন্দে এবং নিরাপদে থাকতে পারবে।

পাকিস্তানের ব্যাপারে খোলা চিঠি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইউরোপের বিখ্যাত যুবনেতা তরিক আলি। তারকের উদ্দেশ্য ছিল চিঠিতে বাংলাদেশের জনপ্রিয় চীনপন্থী নেতা মোলানা ভাসানীর স্বাক্ষর জোগাড় করা।

তারকের খবর ছিল ভাসানী সহ্যে হয়ত কলকাতায় অথবা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও আছেন। অনেক খোঁজ খবর করে কোন হাদিস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি ইউরোপে ফিরে গেলেন।

তারিক কলকাতায় এসেছিলেন ছদ্মবেশে—মাথার বড় চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে আর গৌফ কামিয়ে। পরগে ছিল পালঙ্কমা আর পাঞ্জাবী। তাঁর পরিচিত বন্ধু বাম্বেবেরাই তাঁকে চিনতে পারেন নি।

ছদ্মবেশের কারণ ছিল। সম্প্রতি সিংহলে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়ে গেল এবং যে বিদ্রোহ দমন করতে সিংহল সরকারকে ভারত সৌভিক্ষেত এবং মার্কিনীরা যুক্তভাবে সবরকম সাহায্য দিল সেই বিদ্রোহের আন্তর্জাতিক নেতাদের মধ্যে ছিলেন তারিক আলি। তাই তারকের সন্দেহ হয়েছিল হয়ত বা ভারত সরকার এদেশে তাঁর উপস্থিতি পছন্দ করবে না। তারকের সন্দেহ বোধ হয় অমূলক ছিল না।

“খোলা চিঠি”র শুরুরতেই চীনের প্রধানমন্ত্রী ইয়াহিয়াকে বারোই এপ্রিলের বাতী থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হয়। উদ্ধৃতিতে আছে : “আমরা বিশ্বাস করি আপনার এবং পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের উদ্যোগে পাকিস্তানে সুনিশ্চিত ভাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। আমরা মনে পাকিস্তানের একা এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের একত্রিত হতেই পাকিস্তান শান্তি ও ঐক্যের পথই অগ্রসর হতে পারে।”

এই উদ্ধৃতির উৎস খোঁজ চিঠির স্বাক্ষরকারীরা বলেছেন : “আমরা আন্তর্জাতিকতা-

বাদী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীন বিপ্লবের নিঃসন্দেহ সমর্থক। পাকিস্তানে যে মিলিটারী রাজ পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চূর্ণ করার বর্বর উদ্যোগে নিযুক্ত সেই মিলিটারী রাজকে এই তাৎপর্যপূর্ণ সমর্থনে আমরা বিশেষ ভাবে মর্মাহত।

“দুইটি কারণে, ইয়াহিয়া খানের মিলিটারীশাহীর গণহত্যার প্রকাশ্য সমর্থন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। প্রথমতঃ এই সমর্থন সমস্ত জাতির জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের লেনিনবাদী মৌলিক নীতির বিরোধী। অন্যান্য শোষিত জাতির মত পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনসাধারণের পক্ষে এই নীতি প্রযোজ্য। পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে। বিভিন্ন কায়দার আন্দোলনে এবং এখন সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে উদ্ভূত সংগ্রামে তারা একই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল রাজশক্তি এই আন্দোলন ধ্বংস করার কাজে ব্যাপৃত। এই রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিদ্যায়ী ঔপনিবেশিকতাবাদীদের সমর্থনে। কেবলমাত্র ধর্মীয় বন্ধনের ভিত্তিতেই এই রাষ্ট্রের একা নির্ভরশীল। ধনবাদ ও সামন্তবাদের প্রতিভূ এই রাষ্ট্র শাসিত হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর এক চক্রের স্বরা যার সহযোগী বর্তমানের ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। পূর্ব বাংলার বর্তমান সংগ্রামে মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের দাবীই কেবলমাত্র সমর্থন করতে পারে।

“পশ্চাতীয়তঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, চীনের জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিপ্লবের স্তর উন্নয়নে সাহায্য করবে। পাকিস্তানে বর্তমানে যে ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে পাকিস্তানের বিপ্লবী শক্তির বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং পূর্ব বাংলার বিপ্লবীদের পক্ষে এই পরিস্থিতি অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে।

“চীন বিপ্লবের প্রথম সারির বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার প্রচুর খ্যাতি ও সম্মান আছে। এই খ্যাতি ও সম্মান পূর্ববঙ্গে বিচ্ছিন্ন এবং ঘৃণিত দখলদার শক্তির সহায়তায় নিযুক্ত হলে সেখানকার বিপ্লবীদের মধ্যে কেবল প্রচণ্ড বিভ্রান্তি ও বিভেদের সৃষ্টি করতেই সাহায্য করবে। পূর্ববঙ্গে জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির গণসংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়াই চীনা নেতাদের কর্তব্য। এই সংগ্রাম চীনের গণসংগ্রামের মত জাতীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে পূর্বেপূরি সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ

বিরোধী শিবিরে পরিণত হতে পারে।

“অওয়ামী লীগ যে এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারে না এবং আন্দোলনের বর্তমান কর্মসূচীতে যে সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলন শুরুর হয়েছে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম তার পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

“১৯৬৯ সালে পাকিস্তানে প্রমিত কৃষক ও ছাত্রদের যে উত্তাল আন্দোলনের ফলে আরববাহীর পতন হল সেই আন্দোলন তারই উত্তরসূরী অর্থাৎ কঠোর দমন করেছিল। পাকিস্তানের উত্তর অংশে জনগণের বিপ্লবী চেতনা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সেই সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণতান্ত্রিক নিষ্পত্তি ছিল। এখন চীন পূর্ব বঙ্গের সাড়ে সাত কোটি জনসাধারণকে দমনের অভিযানের সমর্থনে আন্তর্জাতিক ভাবে এগিয়ে এসেছে। চীনের এই সমর্থন সেখানকার বিপ্লবের স্তর উন্নয়নের বিরোধী।

“চীনের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সাম্রাজ্যবাদপন্থী ভারতীয় সরকার ও শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপকেই সহায়তা করবে। ভয়ঙ্কর এবং চক্রান্তকারী ভারতের শাসক গোষ্ঠী এবং তাদের সরকার মরণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে পূর্ববঙ্গের বিপ্লবকে বিপথে চালিত করার জন্য। কারণ এই বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গে এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। বস্তৃত ভারত পাকিস্তান ও সিংহল সরকার সিংহলের বিপ্লবী সংগ্রাম দমনে লক্ষণীয় শ্রেণী সংহতির পরিচয় দিয়েছে। এই তিন সরকার যুক্তভাবে তাদের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিরোপ করেছে এবং আমেরিকা বটেন ও সৌভিক্ষেত ইউনিয়নের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছে।

“এই উপমহাদেশে বিপ্লব বিরোধী প্রতিক্রিয়ার এই সংহতির সামনে বিপ্লববাদীদের প্রয়োজন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বচ্ছতা এবং বিপ্লবী একা। চীনের আচরণ এই একা ও স্বচ্ছতার পক্ষে সহায়ক নয়।

“আমরা বিশ্বাস করি যে, সারা এশিয়ায় বিপ্লবী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামই চীন বিপ্লবের প্রেরণিত। ইন্দোচীনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে আজকের গণমুক্তি আন্দোলনের প্রেরণিত নিদর্শন। ভারতীয় উপমহাদেশে চীনের প্রকৃত বন্ধু হল সেই সমস্ত গণ আন্দোলন যা এখন সেখানে ফেটে পড়ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কেবল এই আন্দোলনগুলিই চীন বিপ্লবের দৃঢ় এবং প্রকৃত मित्र। হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

“তাই ইয়াহিয়া খানের মিলিটারীশাহীর সমর্থনে আপনার বিপর্যয়কর ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য আমরা আপনাকে আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি।”

চলচ্চিত্র

আধুনিকতার অপচেষ্টা

সুপারিশকৃত কাহিনী

বিজ্ঞাপনের চকানিনাদেই কোন শিল্পকর্ম আধুনিক হয়ে ওঠে না। তখন সিংহের সাম্প্রতিক ছবি “এখনই” আধুনিক কালের যন্ত্রণাক্লান্ত যুবজীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বহুলাবিজ্ঞাপিত। ছবির কাহিনীও কয়েকটি যুবককে নিয়েই, সারা ছবিতে যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে সহপাঠীদের পেছনে ঘোরা। কলেজজীবনের একটা চেহারাও ছবিতে উপস্থিত, কিন্তু ছাত্রদের যেভাবে চিড়িয়াখানার আজব জীব হিসেবে দেখানো হয়েছে, যে পরিমাণ ভাঁড়ামো পাগলামোর আতিশয্য আছে এ ছবিতে, তাতে আজকের ছাত্র সমাজ সম্পর্কে পরিচালকের জ্ঞান কতখানি, সে ব্যাপারে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ আছে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত বাংলা ছবিতে মেস-হোটেল-বোর্ডিং বেরকম পাগলের আড়ং হিসেবে দেখা যেতো, তখন সিংহের ছবির কলেজীয় পটভূমিকাও তার কিছুটা সংস্কৃত রূপান্তর মাত্র। যুগযন্ত্রণা, শূন্যতা-বোধ নিঃসঙ্গা বিচ্ছিন্নতা, এধরণের চালু কথাবার্তা চরিত্রদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে ছবির যতটুকু, কিন্তু কখনোই এই ভক্তগুণো কাহিনীর ভেতরে সঙ্গীত নয়, যার ফলে চরিত্রগুলো সব তোতাপাখীর মত পাট মৃৎস্থত বলে গেছে মাত্র, কথার ওজন বদলে কেউ কথা বলেনি।

আসলে প্রচুর চ্যাটামেচি সঙ্গেও আজকের ছেলেদের প্রকৃত সমস্যাটী কোথায়, তাদের ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধের উৎসই বা কি এ প্রসঙ্গে ছবি একেবারেই চপচাপ। ছবির পাঠপাত্রীদের দেখে তো মনে

হয় যে তাদের কোন ভাবনাচিন্তাই নেই। দিকি বাপের হোটেল খাচ্ছেদাচ্ছে, রাস্তায় বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়চ্ছে আর ফাঁক পেলেই প্রেম-প্রেম খেলার মেতেছে। এধরণের কৈশোরক উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোন গভীর জীবনদর্শন খোঁজার চেষ্টাই বৃথা।

সমসাময়িক কলকাতার প্রতিচ্ছবি হিসেবেও এ ছবি একেবারেই মল্যাহীন। যদিও কলকাতার রাস্তাঘাটে ছবি তোলা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু শহরের প্রাণস্পন্দন ছবিতে একেবারেই ধরা পড়েনি আর পটভূমিকা এবং চরিত্রগুলিও পারস্পরিক সম্পৃক্ত হয়ে ওঠেনি।

সবচেয়ে হাস্যকর হল তখন সিংহের বালসুন্দর রাজনীতিব চেতনা। ছবির শেষের দিকে একটি যুবক চরিত্র চাকরী খোঁজার চেষ্টায় বীতশ্রম হয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে জড়িয়ে পড়ে এক গ্রামে চলে যায়। কিন্তু যেভাবে সমস্ত ব্যাপারটা চিত্রিত, তাতে বোঝা মৃদাশিল যে ছেলোটী গ্রামে গেল কি করতে। মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিতে, নাকি উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রাম্যসংস্কারে যোগ দিতে, নাকি তার এই গ্রামপ্রব্রাজ্য শূন্য প্রকৃতির রসিকের রসিক প্রকৃতিরই প্রকাশ। আসলে তখন সিংহের বিশ্লেষণী-শক্তিও নেই, সামাজিক দায়দায়িত্বও ধার ধারেন না তিনি। এই ধরণের শিশুতোষ সমাজচেতন সম্বল করে কোন স্পর্শায় তিনি আজকের জটিল জীবন নিয়ে ছবি করতে যান, সেটাই বোঝা দায়।

পূর্ববাংলার সংগ্রাম

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

গুলো এককবন্ধভাবে এই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য স্থানেও ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছেন ও সংগঠিত হচ্ছেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এই যুদ্ধরত বীর যোদ্ধাদের নাম ও কার্যাবলী কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করছেন না, এবং এর পেছনে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাই দায়ী।

আওয়ামী লীগ, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত মস্কোপন্থী নগণ্য (সংশোধনবাদের জন্য ঝার্স ইতিহাসের আঁতড়কুড়ে নিষ্কিন্ত হয়েছেন) কোন দিনই পূর্ব

বাংলার জাতীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা চালান নি এবং সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনৈতিক সঠিক বলে স্বীকার করে নি। “বন্দকের নল থেকেই সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে”—এই মহান তত্ত্বকে তার তাদের শ্রেণীগত চরিত্রের জন্যই গ্রহণ করতে পারে নি। ফলে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠা সঙ্গেও আওয়ামী লীগ নেতারা নিজ দেশের রণক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক যুঁটিবোদ্ধাদের অসংগঠিত অবস্থায় রেখেই প্রাণভয়ে ইন্দিরা সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে স্বভাবতই যুঁটিবোদ্ধারা যোগাযোগ খাদ্য সরবরাহ, সুসংগঠন, প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ ও সর্বোপরি দেশের অভাব উপলব্ধি করেন ও তাদের মনোবল হারাতে থাকেন।

অজিত বিশ্বাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উদাত। এখন এই দলগুলি “হত্যার রাজনীতি” বন্ধ করার জন্যে সি পি এম-সহ সবদলের সহযোগিতা চাইছেন।

প্রশ্নের হেমন্ত বসুর হত্যার পর নির্বাচনী অফিসার মিঃ রাঘবনের আমন্ত্রিত সর্বদলীয় সভায় সি পি এম দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্রে সভায় বসতে এরাই আবার সদম্ভে অস্বীকার করেছিলেন। সি পি এম কর্মীদের হত্যাকাণ্ডে উৎসাহ জোগাতে গিয়ে এবার পশ্চিমবঙ্গকে কোন অবস্থায় তারা টেনে নিয়েছেন একবার ভেবে দেখুন। দেবী হলেও শূন্যবাসির উদ্বেগ হওয়া ভালো।

কর্মচারী বদলী ও নিয়োগের ব্যাপারে হাওড়ার জেলা জজের পেটোয়া ও স্বজন পোষণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়ার জেলা জজ শ্রীজি বি. ঘাষ সরকারী নিয়ম কানুনকে মৃদুগুণ্ঠ দৈখিয়ে নিজের পেটোয়া কর্মচারীদের তাদের সুবিধামত জায়গায় রাখছেন আর ইউনিয়ন কর্মীদের মফঃস্বলে বদলী করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তিনি নতুন লোক নিয়োগের সরকারী বিধি ভংগ করে নিজের ও তাঁর পেটোয়া লোকদের আত্মীয় স্বজনদের চাকরী দিচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় যোগ্যতারও ধার ধারছেন না।

বদলীর ব্যাপারে নিয়ম আছে যে, প্রত্যেককেই মফঃস্বলে যেতে হবে এবং দুবছর থাকতে হবে আর একই পদে কেউ পাঁচ বছরের বেশী থাকতে পারবেন না। বর্তমান জেলা জজ এই নিয়ম ভেঙে ইউনিয়নের কর্মীদের কাউকে নিজের খুশিমত মফঃস্বলে, কাউকে ক্রিমিনাল বিভাগে বদলী করছেন। কারণ এঁরা তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার

বিরুদ্ধে। সম্প্রতি একজন মহিলা কর্মীকে মফঃস্বলে বদলী করে খুব অসুবিধায় ফেলা হয়েছে। সেখানে একজন মহিলার পক্ষে একা থাকার খুবই অসুবিধা। তার স্বামী কলকাতায়। তাই নিতান্তই শিশু সন্তান নিয়ে মহিলা খুব বিরত অবস্থায় পড়েছেন।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে প্রার্থী আহ্বান না করে, দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না দিয়ে এমনকি হাওড়ার সিভিল কোর্টে লোক নিয়োগ সম্পর্কে কোন নোটিশ না টাঙিয়ে জেলা জজ নিজের খুশিমত চাকরী দিচ্ছেন। ইনি রেজিস্ট্রারের বোনকে স্টেনোগ্রাফারের চাকরী দিয়েছেন। মহিলা স্টেনোগ্রাফার কিছুই জানেন না বলে অভিযোগ। জেলা জজের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে কেরাণীর পদে নিয়োগের ব্যাপরটা বেশ মজার। একে প্রথমে পিয়নের পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পরের দিনই তাকে কপিইস্ট করে দেওয়া হয়। সাতদিন পরেই তাকে কেরাণীর পদ দেওয়া হল। অথচ অনেক সিনিয়র টাইপিষ্ট ও কপিইস্টকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আরও একজন কেরাণীর কাহিনীও বেশ মজার। ইনি জেলা জজের স্টেনোর ভাই। ইনি প্রথম ঢোকেন টাইপিষ্ট হিসাবে উল্লবড়িয়াতে। সেখানে সাতদিন কাজ করার পর হাওড়া সদরে বদলী হন। পনেরো দিন কাজ করার পর বিনা ইন্টারভিউয়ে ইনি জেলা জজের আদেশে পনেরো দিনের জন্য কেরাণীর কাজ পান। পরে দেখা গেল তার প্রমোশন হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় তাকে এমন একটি ফাইলে কাজ দেওয়া হয়েছে যে ফাইলে বরো তেরো বছরের অভিজ্ঞ কর্মচারী ছাড়া অন্য কাউকে পূর্ববর্তী জেলা জজের কাজ করতে দেননি। আর একজনকে চাকরী দেওয়া হয়েছে যার বয়স চার্জশের বেশী। ইনি তৃতীয় ম্যুন্সেফ অফিসের সেরস্তাদারের জামাতা। এর সঙ্গে জেলা জজের খুবই খাতির।

বাংলা কংগ্রেস

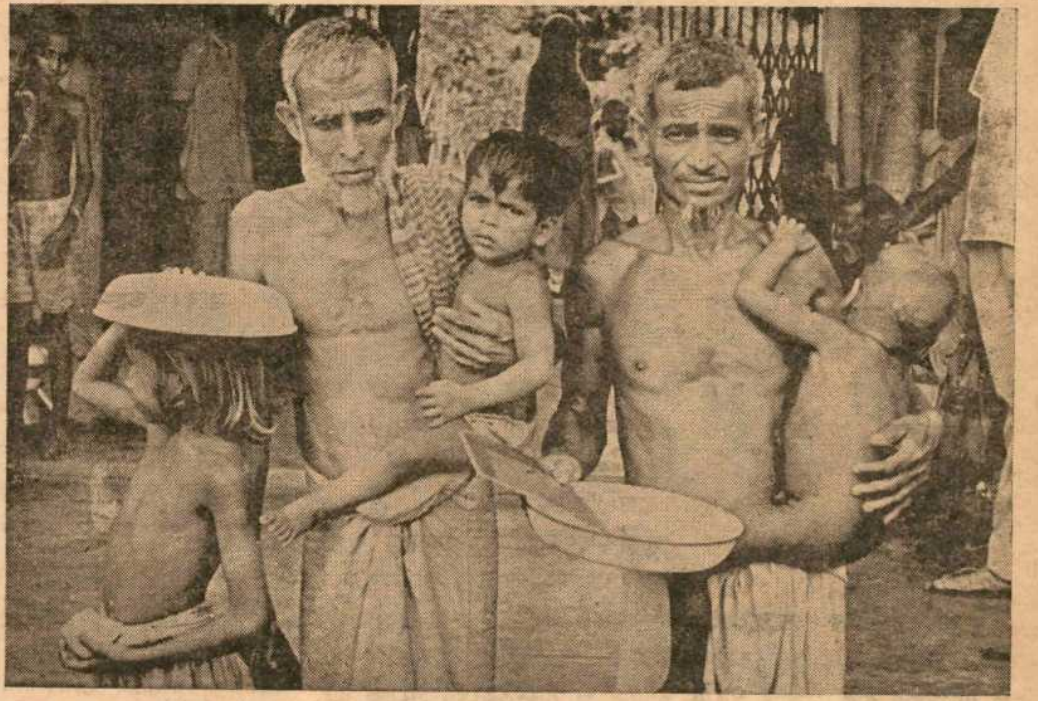
(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরিষদের সদস্য বলে একটা গালিকা ঠিক করেছেন যে তালিয়ার অনেক নামের সঙ্গেই প্রণব দুখাজী একমত নন। প্রণব দুখাজী বলছেন যাদের দুই একজন কোন দিন কর্মপরিষদের সদস্য নয় খাতা বদল করে তাদের নাম ঢাকান হচ্ছে। আর সুশীলবাবু বলছেন এরই হল আসল লোক। কাজেই পাঁচই তারিখের সভায় তারা আসল আর কারা নকল এই নিয়েই প্রথম বিরোধ দেখা দেবে।

গোপনে আরো অনেক খেলা চলছে। তা হল অজয়বাবু ঠিক করেছেন ভাই বলে আর তিনি সুশীল ধাড়াকে ছেড়ে দেবেন না—দরকার মত সদস্য ও কর্মীদের কাছে তার কুকর্মের সব ফিরাশিত হলে ধরবেন। সুশীলবাবুও প্রস্তুত। সুশীলবাবু নিজে ও তার অনুগামীরাও চুপ করে বসে নেই। তারা বলছেন একবার মধু খুলে দেখুন না তার পর দেখতে পাবেন কত ধানে কত চল। হাটে হাড়ি ভেঙে দেব। তাই দুই পক্ষই প্রস্তুত হচ্ছেন হাটে হাড়ি ভাঙতে।



বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা অ্যাকশনে যাচ্ছেন। ছবি : প্রণব মদুখোপাধ্যায়



উদ্বাস্তুরা রেশন আনতে যাচ্ছেন। ছবি : প্রণব মদুখোপাধ্যায়

একটি সুন্দর প্রদর্শনী

কলকাতা “মুকবর্ধির বিদ্যালয়ে”র প্লাটিনাম জুবলী উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের ছবি ও মাটির কাজের একটি সুন্দর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

আত্মপ্রকাশের মধ্যম ভাষা। কিন্তু যখন প্রকৃতির বিদানে এই প্রকাশের পথ অবরুদ্ধ হয় মানুষ কী দুর্দান্ত অধ্যবসায়ে সেই বাধা ভাঙতে চয় তার খবর আমরা কজনাই বা রাখি। ভাষার জগতে সম্পূর্ণ ভাবে বর্ধিত হয়েও যে সৃষ্টি রহস্যের গাম্ভীর্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব তার স্বাক্ষর বহন করছে এই সব শিশু ও কিশোর মুক বর্ধির শিল্পীদের বলিষ্ঠ রচনাগুলি।

বিশেষ করে এদের স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণোচ্ছল আত্মপ্রকাশের মধ্যে এমন একটি সহজাত অথচ বলিষ্ঠ ভাব আছে যা দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। আশ্চর্য হতে হয় এদের রচনার রং নির্বাচন রংএর সাবলীল ব্যবহার—কম্পোজিসনের বাঁধুনি দেখলে।

এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে

উল্লেখযোগ্য আর, বালসুদ্রাক্ষানিয়াম, আশীষ মৈত্র, সুনীমল বানার্জী, রাধেশ্যাম ঘোষ, অভিজাত বসু প্রভৃতি।

এই ছেলেগুলি ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে চিত্রকলায় বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি কোরিয়ার অনুষ্ঠিত তৃতীয় বার্ষিক আফ্রো-এশীয় চিত্রকলা প্রতিযোগিতার তিনিটি প্রথম পুরস্কারের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি লাভ করেছে। এবং একটি প্রথম পুরস্কার বালসুদ্রাক্ষানিয়াম অধিকার করে বিশেষ কৃতিত্ব ও সম্মানের অধিকারী হয়েছে। এই বর্ধির শিল্পীর বিভিন্ন রচনার মধ্যে ‘নিষ্ঠুরতা’ ছবিটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওপার বাংলার অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী এই বালক শিল্পীর অন্তরলোকে আলোড়ন জাগিয়েছে—পেনসিলের কালো কালো শেডের সাহায্যে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তা ফুটিয়ে তুলেছে। অন্যান্য রচনার মধ্যে এই শিল্পীর ‘কুয়াসা’, ‘পবিত্র স্থান’ ও ‘উত্তেজনা’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আশীষ মৈত্রের ‘লাল আকাশের নীচে’ ও ‘এক পশলা বৃষ্টির পর’ ছবি দুখানায় সৃজন-

শীল ক্ষমতার পরিণত ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ধূসর বর্ণলেপনে ছবি দুখানায় গ্রাম বাংলার মেজাজ খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

সুনীমল বানার্জির ‘কানাগলি’র রোমান্টিক আলো মনকে কেড়ে নেয়। সারা গলিটায় অন্ধকার ছড়িয়ে একফালি আলোর মিল্টতাকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে আলোর অস্তিত্বটা যেন একটু প্রতীকধর্মী। এর ‘বর্ধির’ ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পোট্রেটের মূখের ও চোখের করুণ ব্যঞ্জনা অন্তরকে অভিভূত করে। সুনীমলের অন্যান্য রচনার মধ্যে ‘গৃহের পথে’ ‘কার্যরত’ ‘প্রাকৃতিক দৃশ্য’ প্রভৃতি খুব আনন্দ দেয়। রাধেশ্যাম ঘোষের ‘জয় বাংলা’ ছবিটি উপভোগ্য। নেতৃত্বের বলিষ্ঠতায় মানুষ ভেঙে পড়েছে ময়দানের জমায়েতে। অভিজিত বসুর ‘শিটল লাইফ’ একটি বলিষ্ঠ রচনা। রং নির্বাচন ও রংএর সাবলীল ব্যবহার ভালো লাগে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ পাল, রাজীব-কুমার কুমার, সুব্রেশ অগ্রবাল, রবীন্দ্র টেকরীওয়াল প্রভৃতির রচনাগুলিও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

দপন

১৪শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা ৥ শ্রুতবার ৪১ জুন ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

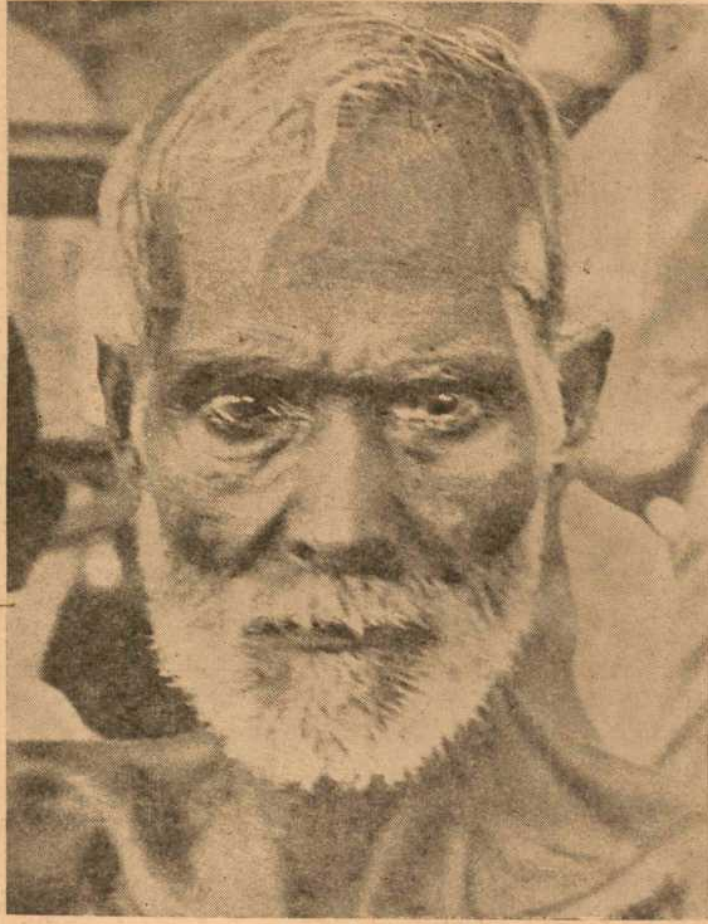
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে কৌদল

বিজয় সিং নাহার
বনাম সিদ্ধার্থ রায়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ইন্দিরা-
পন্থী কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ কলহ
দানা বেঁধে উঠছে। প্রদেশ কংগ্রেস
সভাপতি বিজয় সিং নাহারকে
সভাপতির পদ থেকে বিতাড়িত
করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের
একটি শক্তিশালী উপদল সক্রিয়

হয়ে উঠেছেন। এঁরা চান যে
শ্রীমতী পুরবী মুখার্জী প্রদেশ
কংগ্রেসের সভানেত্রীপদে নির্বাচিত
হন। কারণ অদূর ভবিষ্যতে
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারের
পতন প্রায় অবশ্যম্ভাবী। এই সর-
করের পতন ঘটলে ১৯৭২ সালে
(শেবাংশ ৯ পৃষ্ঠায়)



বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্ভাস্ত ক্যাম্প এদের আর জায়গা হচ্ছেনা।
কর্তৃপক্ষ এদের ট্রেনে তুলে কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরা শহরের ফুট-
পাথে অথবা শিয়ালদহ স্টেশনে আগ্রয় নিচ্ছে। ছবি : প্রণব মুখার্জী

অজয় মুখার্জী ও দুশীল ধাড়ার শক্তিপরীক্ষা

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

পাঁচই জুন বাংলা কংগ্রেস কর্ম-
পরিষদের সভায় প্রকৃতপক্ষে অজয়
মুখার্জী আর দুশীল ধাড়ার
মধ্যেই শক্তি পরীক্ষা হবে। ইতি-
মধ্যে শ্রীমুখার্জী ধাড়া অজয়বাবুর
উপর শেষ চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে
বিধান সভায় কয়েকজনকে নিয়ে
একটি ফ্রন্ট গঠনের ব্যবস্থা করে
ফেলেছেন। পাঁচই বাংলা কংগ্রেসের
সভার পরই শ্রীধাড়া তার নতুন
ফ্রন্টের কথা ঘোষণা করবেন।

একথা তিনি কংগ্রেস পরি-

ষদ দলের জনৈক বিশিষ্ট নেতাকে
জানিয়ে দিয়েছেন এবং পরোক্ষে
বলে দিয়েছেন এই ফ্রন্টের কম করে
দুই জনকে মন্ত্রী করা না হলে
তারা কি করবেন বলা যায় না।

এদিকে বাংলা কংগ্রেস কর্ম-
পরিষদের সভায় দুই পক্ষই একে
অপরকে ধরাশায়ী করার ব্যাপারে
খুবই আশাবাদী। দুই পক্ষ থেকেই
জেলার সদস্যদের কলকাতা টেনে
(শেবাংশ ৯ পৃষ্ঠায়)

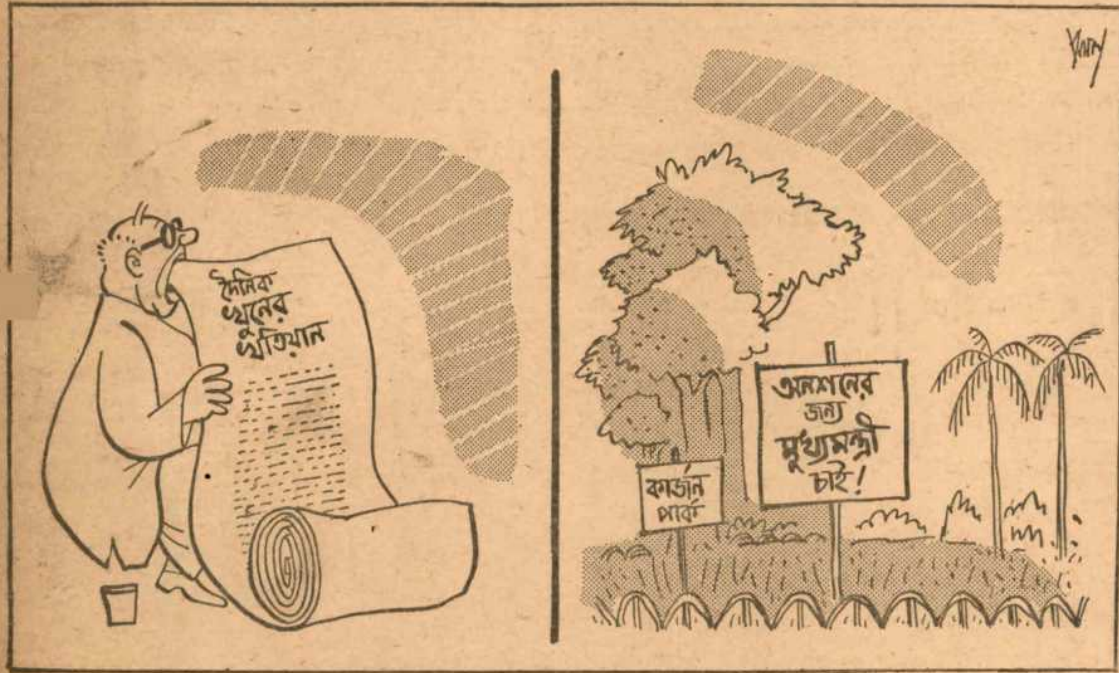
পরিকল্পনা করে ইয়াজদানী ও
বদরুদ্দোজাকে ধরা হয়েছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পাক গৃহপ্রচার কিনা তা এক-
মাত্র আদালতই ঠিক করতে পারে।
তবে দর্পণ নিভরযোগ্য সূত্রে
সংবাদ পেয়েছে কংগ্রেসীরা পরি-
কল্পনা করে গোলাম ইয়াজদানী ও
সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে পি ডি অ্যাঙ্কে
গ্রেপ্তার করিয়েছে।

দর্পণের কাছে খবর : ইচ্ছা করে
একজন পেটোয়া সাংবাদিককে দিয়ে
এই খবর প্রথম প্রচার করানো হয়।
বলা হয়েছিল, এদের সঙ্গে একজন
ভূতপূর্ব কংগ্রেসী উপ-মন্ত্রী এবং
আরও কয়েকজন আছেন। তারপরে
ঘন্টা করে প্রকাশ করা হয়েছে
এদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।
সৈয়দ ও বিজয় সিং নাহার সেই
কথা ঘোষণা করেছেন। আমরা
গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য কর-

ছিলাম ভারতের আই বি দপ্তর
এবার অন্ততঃ একটা মামলা খাড়া
করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু কার্য-
কালে দেখা গেল সেই কুখ্যাত পি
ডি অ্যাঙ্কে রাজনৈতিক প্রতিবন্দ্বী-
দের আটক করা হচ্ছে। আর
কারোকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। শুধু
দুজন মুসলমান নেতা গোলাম
ইয়াজদানী ও বদরুদ্দোজা সাহেবকে
গ্রেপ্তার করা হল। উদ্দেশ্য পরি-
ষ্কারঃ গোলাম ইয়াজদানীকে
গ্রেপ্তার করে বিধানসভায় আর
একটি সি পি এম ভোটকে জেলে
পরে রাখা হল। আর মুর্শিদাবাদ
লোকসভা আসনে মুসলিম লীগ
সদস্য মারা গিয়েছেন। সেখানে
যাতে বদরুদ্দোজা সাহেব প্রতি-
বন্দিতা না করতে পারেন, সেজন্য
তাকেও জেলে যেতে হল।



কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান
বিচারপতির অশোভন আচরণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা হাইকোর্টের সেই
কুখ্যাত প্রধান বিচারপতি প্রশান্ত-
বিহারী মুখোপাধ্যায় কয়েক দিন
আগে দার্জিলিং সফরে গিয়ে
অশোভনতার এক নজীর স্থাপন
করে এসেছেন। দার্জিলিং থেকে
নেমে শিলিগুড়িতে এক কুখ্যাত
বাবসায়ী ওংকারলাল মিশ্রের চা-
বাগান গয়গাংগা টী এস্টেটে তিনি
আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ-

যোগ্য, এই ওংকারলালকে একদা
পি ডি অ্যাঙ্কে আটক রাখা হয়ে-
ছিল। প্রধান বিচারপতি এ হেন
ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করে ঢালাও
পান ভোজনের ফলে বোধ হয় ভুলে
গিয়েছিলেন যে, তাঁর বাগডোংরা
থেকে কলকাতার বিমানে সীট
রিজার্ভ করা আছে। এয়ারলাইনস
কর্তৃপক্ষ বার বার ঘোষণা করার
পরেও যখন প্রধান বিচারপতি ও
তাঁর সংগীকে পেল না তখন ওদের

দুখানা সীট অপেক্ষমান দুজন
যাত্রীকে দিয়ে দিলেন। তারপর শেষ
মহুর্তে প্রধান বিচারপতি এয়ার-
পোর্টে এসে হাজির। সেকি হিম্ব-
তম্বি। এয়ারপোর্টে শিলিগুড়ির
এস ডি ও সাহেব ছিলেন। তিনি
প্রশান্তবিহারীর এই অবস্থা দেখে
আই একে ধরে দুজন যাত্রীকে
নামিয়ে ওদের দুখানা সীট করে
দিলেন। এরপরে আমরা শুনছি
কলকাতায় ফিরে উনি অসুস্থ হয়ে
পড়েছেন। গুরু আরোগ্য কামনা করে
আমরা আপাততঃ এই আশ্বাস
দিচ্ছি ওঁকে বরখাস্ত করার সুপা-
রিশ সম্বলিত এস আর দাশের
রিপোর্ট নিয়ে আবার কথা
তুলছি না।

বেলা সত্যিই হয়েছে। গত দুদিন যাবৎ কলকাতায় দারুণ গুমোট। পিচ রাস্তা গাড়ীটানা মোষের কাঁধের মতো। ভায়ে চাপে রুলি রুলি হয়ে ফেটেছে। দগদগে কালচে মাংসের থোকা যেন। মাথার ওপর সূর্য, দালান বাড়ির ছায়া তই কুপশ।

মন্টু আকাশের দিকে মুখ তুলে হাসে, “খরার খাঁড়া ঝুলেছে মাথায়, বর্ষা ঝেঁপে আসে। কখনো দারুণ খরায় মাঠ গ্রাম পড়ে থাক হয়ে যায়। স্লাবনে বন্যার আবার চারদিক ভাসতে থাকে। মাঠের ফসল ঘরে ওঠে না, সপ্তের ভান্ডার লগ্নরখানায় খালি হয়ে যায়। জীবনটা আমাদের এমনি নাকি? এ প্রশ্ন তো পুরোনো। প্রাগৈতিহাসিক। প্রকৃতির খুশি খেলালের ওপর আজও আমাদের অর্থনীতি নিরক্ষর। বিধবার মতো নির্ভরশীল। আচ্ছা বলুন তো, এতদিন ধরে আমরা কী করলাম, বীরেনদা?”

মন্টুর মাথায় সব চিন্তা সব সময়ই সবার চিন্তা হয়ে পাক খায় নাকি? এ প্রশ্ন তো পুরোনো। স্লান হাসিই এর উত্তর। হেসেই বলে, “কেন? তুমি আমায় প্রশ্ন করলে; আমি তোমায় প্রশ্ন করলাম। বস, ফর্সিয়ে গেল।”

“স্বা বলেছেন।” মন্টু রুমালে ঘাড় মোছে। তার পেশল শরীর ঘন ঘন ঘর্মাক্ত হয়। আমরা বাস স্টপে এসে দাঁড়ই।

বাস আর ট্রাম স্টপের মধ্যে উপকারী ভারপ্রাপ্ত অফিসরদের কল্যাণে ইদানীং একশ ফুটের ব্যবধান। এই দারুণ যানবাহন সমস্যার শহরে এটা একটা ফালতু বিজ্ঞবনা। ভিড় দেখে একটার

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

বদল আর একটান উঠবে এমন নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতাও তোমার নেই। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে খালি ট্রামের দিকে তাকিয়ে থাকো; ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে খালি বাস দেখো। কিন্তু একটার বদলে আর একটা ধরতে পারবে না। ট্রাম হালকা দেখে দৌড়ে ট্রাম স্টপে যাও, দেখবে হয়ত ঠিক তখনই নাকের ডগা দিয়ে হালকা বাস ছুটে যাচ্ছে হু হু শব্দে। ফের বাসের জন্য ফিরে এসো, তখন ইম্পাতের লাইনে নিম্নের দেতো হাসি হেসে ফাঁকা ট্রাম, মুখ ভেঙে যাবে। একই জায়গায় হাত কয়েকের ব্যবধানে ট্রাম বাসের স্টপ ছিল আগে। হঠাৎ কার উর্বর মস্তিষ্ক প্রথমে হেরফের করে অতিষ্ঠ নাগরিক জীবনকে বললে, ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর, তিষ্ঠ ঘন্টাকাল। অতএব ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে এখন হা-পিত্যোশে দাঁড়িয়ে থাক।

বাবুদের ইচ্ছে হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বৃন্দ-প্রশাসনের কৌতুক আর রাগী সূর্যের আকোশ উপভোগ করছি। মন্টুকে বললাম, “তুমি এবার হাঁটা দাও অমলেন্দু। অনেক বেলা হল।”

মন্টু সে কথার জবাব না দিয়ে আঙুল তুলে ডায়মন্ড হারবার রোডের দক্ষিণ প্রান্ত নির্দেশ করল।

“ওদের আজ ময়দান সমাবেশ।

মিছিল আসছে। রাস্তা জুড়েই আসছে। চলুন, গাছের নিচে দাঁড়াই। ট্রাম বাস পেতে এখন ঢের দেরি।”

গাছ? শহরের রাস্তায় আগে দুপাশে দেওদের গাছের শোভা ছিল। এখন ছোটখাটো পত্র পল্লব-বহীন গাছ দ্রুত জায়গায় আছে বটে, তবে কোনটাই যথার্থ পশ্চ-পাদপের কাজ করে না। এতো এতো পথিককে সূর্যাতপ থেকে রক্ষা করা কি চাঁটখানি ব্যাপার।

গাছটার নাম জানি না। থোকা থোকা বেগুনে ফুল আর সবুজ পাতা। গাছের শৃংখা প্রশংসা পরীক্ষা করে দাঁড়ালুম। শহুরে কাক বড় পরশ্রীকাতর। সুযোগ পেলেই ওপর থেকে বিস্তা বর্ষণ করে বোকা বানিয়ে উড়ে যাবে।

মিছিলটা আগে এসেছে। সারিবদ্ধ দক্ষিণী কৃষিজীবীর মিছিল। এতোবড় মিছিল। এমন শব্দে শব্দে মেয়ে পুরুষ, কারও পায়ে জুতো বা চটির বালাই নেই। কালো কালো উদ্যম গা। জামা লাল গামছা। এই গনগনে রোদে গলন্ত পিচে পা পেতে চলেছে ময়দান। একই সঙ্গে এতো অর্ধ বিবস্ত্র মানুষের মিছিল। চলেছে আশার বাণী শুনতে। চলেছে কত যুগ যুগান্ত ধরে। শুনছে বংশ পরম্পরায় সেই একই বাণী। আর দেখছে, পাকা বাড়ি ভেঙে

প্যালেস হচ্ছে। -তিন তলা নিচ্ছে তের তলার বিরাটাকার। ওরা বরং আগের চেয়ে আরও ছোট আরও ক্ষুদ্রাকৃতি হচ্ছে। মাথ: তুলে ইমারত দেখতে দেখতে আজ প্রায় মাথা ঘুরে যাওয়ার অবস্থা। তবু আশা মারাবণী। ওরা দূর দুরান্ত গ্রাম জনপদ মাড়িয়ে এই ভাবেই ছুটে আসছে।

মায়ের কোলে স্তন্যপায়ী শিশু। ছেলের বোয়ের আঁচল ধরে বড়ি শাশুড়ি। ওদের এই শহর অভিযান, এ কি রঞ্জনীতি, নাকি ক্ষুধার তাড়না? ওদের সংসার সুস্থ এমন অটুট বিশ্বাসে ব্যাড়া আর মিছিলে নির্ভাবনায় সর্বস্ব সমর্পণ করে দেয় কেমন করে। প্রতিদানে কী পায় ওরা? গড় আর রুটি? কী পেয়েছে এতোকাল, কী আর পণ্ডার আশা রাখে?

মন্টুর দিকে তাকিয়ে মনের প্রশ্নগুলিই যেন আবৃত্তি করি, “একই মিছিলে এমন অটুট দারিদ্র্যের চেহারা। ফুটন্ত পিচে পায়ের পাতা স্বেদ হয়ে যাচ্ছে। প্রথর রোদে শরীরের সমস্ত তৈলাক্ত আস্তরণ শুঁবে নিচ্ছে। এক একজন তার গোটা পরিবার নিয়েই মিছিলে সামিল হয়েছে, আচ্ছা, ওরা সত্যি বিশ্বাস করে ওরা কিছু পাবে? ব্যাপারটা আমার কাছে খুব জটিল মনে হয়।”

মন্টু বললে, “আমিও অবাধ হয়ে এসব ভাবি বীরেনদা। তবে একবার এমন এক মিছিল নিয়ে আসার সুযোগ ঘটেছিল নূপেনদার সঙ্গে। নূপেনদা কৃষি ফ্রন্ট কাজ করেন। বড় লীডার।” অপস্ম-মান মিছিল মানুষের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে মন্টু হাসে, “ওদের কাছে

আমরাই বরং জটিল মানুষ। আমরা মিছিলে সামিল হওয়ার আগে কত প্রশ্ন কত হিসেব নিকেশ করি। দেশ বিদেশ আন্তর্জাতিক, নেতা উপনেতা দল উপদলের কার্য-কারিতা ইত্যাদির বিচারে বসি। ওরা অত শত বোঝেও না জানেও না। কমরেডই ওদের সর্বস্ব। যে কমরেড ওদের সুখ দুঃখের সাথী তার ডাকে উত্তর ওদের প্রস্তুত: “কমরেড তুমি আগে চল! আমরা করেগে ইয়া মরেগে।”

মন্টুর হাসির মধ্যে কেমন এক বিমিশ্র বেদনা ছিল। মন্টুর চেখে ঐ অর্ধউল্লগ বিশ্বাসী মানুষ-গুলির জন্য কেমন এক নরম সহানুভূতির সজল একান্তিকতা। এই মনুতে আমরাও ভুলে গেলাম, বেলা গাড়িয়ে মধ্যাহ্ন অপরাহ্নের কোলে ঢল নিচ্ছে ভুলে গেলাম, আমরা এখনো অভুত।

আমি প্রায়-উল্লগ শিশুগুলিকে দেখছি। যে হাঁটিতে পারে সে হাঁটছে। যে পারেনা, মায়ের বুকের কাছে বানর ছানার মতো ঝুলে আছে, আর জুলজুলে চোখে দেখছে এই যানবাহন সমাকীর্ণ সমারোহের শহরটা।

কমরেড দুই সারি মানুষে মধ্যে হাঁটিতে হাঁটিতে হাঁক পাড়ছেন, “ইন কিলাব।”

ওরা দৌড়ে লাইনবন্ধ হতে হতে সমস্তর বলছে, “জিন্দাবাদ।”

আমি বললাম, “মন্টু বাড়ি যাও। এখনও ঢের সময় নেবে। বেলা হচ্ছে।”

মন্টু বললে, এতোগুলো মানুষ ময়দানে পৌঁছে হয়ত জল চিড়ে থাকবে। হোকনা একটু দেরি।”

চাকরীর ক্ষেত্রে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে জেলায় জেলায় অনেক নতুন মূখের আমদানী হয়েছে। এরা অধিকাংশই যুবক—বিজয় বাহিনীর লোক—উপ মূখ্য-মন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের সুপারিশনয়।

কলকাতা করপোরেশনেও বিজয়বাবুর বিশ্বস্ত সাকরেদ শ্রীশিবকুমার খান্না নিজের দলের লোক ভর্তি করার উদ্যোগ-আয়োজন শুরুর করেছেন।

গত নির্বাচনের সময় নব কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার অভিযানে যে সব যুবকের রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় তাঁদের পরবর্তী দু-একটা ঘটনায় কমিউনিষ্ট অর্থাৎ সি পি এম কর্মীদের উপর হামলায় অংশ গ্রহণ করার পরই সরকারী চাকুরীতে বহাল হওয়ার “যোগ্য” বিবেচনা করা হয়।

চাকুরী প্রার্থী যুবকদের কাছে এখন প্রধান সমস্যা কলেজ ইন্সকুলে পাওয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা নয়। এসবের

নেই। বিজয়বাবুর আস্থাভাজন কংগ্রেস কর্মীদের আগে খুঁজে বার করতে হবে। কারণ সব কংগ্রেস সভাই বিজয়বাবুর লোক নন।

এর পরে সেই কংগ্রেস কর্মীর কাছ থেকে সুপারিশ সংগ্রহ করতে হবে। নেহাৎ ভাগ্যবান না হলে সে সুপারিশ যোগাড় করা মুশকিল। সেখানেও সময় সময় “পরীক্ষিত” যুবকদের বাদ দিয়ে অন্যদের সুপারিশ করা নিয়ে ব্যস্ততা হয়েছে।

সব চাইতে বেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ এসেছে পুনর্বাসন দপ্তরে। বাংলা দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের “সেবা”র নামে এখানে অনেকেরই সুরাহা হচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে, পুনর্বাসন সম্পর্কে ক্যাবিনেট সাব-কমিটির সদস্য পূর্তমন্ত্রী শ্রীসন্তোষ রায় ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিনের সুপারিশের জোর নাকি বেশ কার্যকরী।

ডাঃ আবোদিন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ঘনিষ্ঠ বলে তাঁকে উপেক্ষা করার ইচ্ছা বিজয়বাবুর নেই। যাঁকে পূর্ত বিভাগের ঠিকাদার

হিসাবেই মানায় তিনিই এখন মন্ত্রী হয়েছেন। সুতরাং এই দপ্তরের অনেক কিছুই তাঁর জানা আছে। মদ্রুস্বীর জোর থাকলে এর মারফৎ বেকার ছেলেরা সুবিধা করে নিতে পারছেন। বিজয়বাবুও একে বিশ্বাস করেন।

সি পি আইকে ধন্যবাদ। আজ এঁদের শব্দ প্রচেষ্টায় নব কংগ্রেস কলকাতা করপোরেশনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কমিটি দখল করতে পেরেছে যার

সরকারী স্তরে বিজয় সিং নাহারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার সরকারী স্তরে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে নিযুক্ত প্রচার বিভাগের দুজন অফিসারকে গত আটাশে মে সরাসরি বরখাস্ত করেছেন। উল্লেখযোগ্য, এই দুজন অফিসারই সি পি এম সমর্থক বলেই দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট নেতা

মারফৎ এরা ইতিমধ্যে নিজ দলীয় প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ নিচ্ছে।

ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীশিবকুমার খান্না করপোরেশনের কোথায় কোথায় নিজের দলের লোককে ভর্তি করা যায় তার তালিকা প্রস্তুত করতে লেগেছেন।

অর্থনৈতিক সংকটের জন্য নতুন কোন নিয়োগ করার আগে ভাল করে বিচার করা দরকার যে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছ থেকে পুরো কাজ পাওয়া যাচ্ছে কি না—এটাই ছিল যুক্তফ্রন্টের নীতি। কারণ ইতিপূর্বে প্রাক্তন মেয়র

শ্রীগোবিন্দ দের নির্বাচনে য সাহায্য করেছিলেন তাঁদের অনেককেই চাকুরী দিয়ে করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ মুশকিলে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই কোন কাজ না করেই নিয়মিত চাকুরী করে যাচ্ছেন। এদের কাজ করার জন্য অন্য লোককে নিয়োগ করতে হয়।

খান্নাসাহেব শ্রীদের অনুসৃত নীতিই যে মেনে চলছেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। করপোরেশনের নতুন কমিশনারকে তিনি ইতিমধ্যে নিজের অনুচর হিসাবে কাজে লাগাতে শুরুর করেছেন।

সোমনাথ লাহিড়ী যখন প্রচার দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তখন এদের মনোনীত করেছিলেন। এদের মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক আরও দুজন সাংবাদিককেও প্রচার দপ্তরে নিয়োগের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি সি পি এম সমর্থক অফিসার দুজনকে সরাসরি বরখাস্ত করা হয়েছে এবং সেজন্য বর্তমান মন্ত্রিসভার সমর্থক দক্ষিণ-

পন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে কোন সরকারীভাবে প্রতিবাদ জানানো হয় নি। বলা বাহুল্য এই পার্টির সমর্থক সাংবাদিকটি কিন্তু তাঁর পদে যথার্থীতি বহাল আছেন। দ্বিতীয় মনোনীত সাংবাদিকের অকাল মৃত্যু ঘটে।

প্রচার দপ্তরের ইনফরমেশন অফিসার অম্বীর চক্রবর্তী আর নদীয়া জেলার ইনফরমেশন অফিস- (শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়)

নেতাজীনগরে সি আর পি অত্যাচার বেপরোয়া গুলি করে তরুণ হত্যা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উনিশশে মে, কলকাতার ইতি-
হাসে কলো বিভীষিকাময় আরে-
কটা ভয়াবহ দিন। কেন্দ্রীয়
রিজার্ভ পদলিখ বাহিনী নেতাজী-
নগর কলোনির ওপর যে হিংস্র
আক্রমণ চালালো, তার সঙ্গে এক-
মাত্র সম্প্রতি খবরের কাগজে পড়া
ইস্রাইলি খানের সেনাদলের বাংলা-
দেশের স্বাধীনতাকামী মান্দুসদের
ওপর আক্রমণের সঙ্গেই তুলনা করা
যায়।

খবরের কাগজে খান সেনা
বাংলা দেশের গ্রামে, গঞ্জে শহরে
বাড়ী বাড়ী ঢুকে যে ভাবে নির্বি-
চারে গণহত্যা চালিয়ে, শিশুনারী
বৃন্দ নির্বিষেবে খতম করে, নারী-
দের ওপর পশুদুলভ আচরণ করে
সারা জগতের ঘৃণা ও ক্রোধের
উদ্রেক করেছে, নেতাজী নগরে
আক্রান্ত বাড়ীগুলি ঘুরে তার
কথাই মনে হল। খান সেনাদের
সঙ্গে ছিল মুসলিম লীগ এবং
জমাতে ইসলামী দলের গুন্ডারা,
আর এখানে সি আর পি-র
সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছে,
বাড়ী বাড়ী আক্রমণ চালিয়েছে
কংগ্রেসী নয়া কংগ্রেসী সমাজ-
বিরোধী গুন্ডার দল।

আক্রমণের অজুহাত হিসেবে
বলা হয়েছে, আজাদগড়ে সি আর
পি ভ্যানের ওপর কারা নাকি
বোমা ছুঁড়েছিল। তা হলে নেতাজী
নগরের কলোনিতে আক্রমণ কেন?
আজাদগড় তো ওখান থেকে পাঁচ
ছয় ফার্ম-এরও বেশী দূরে।
যদিও আজকাল পদলিখ অবাধে
নাগরিকদের হত্যা করার অজুহাত
হিসেবে বোমা ছোঁড়ার কাহিনী
অথবা পদলিখে বাবার চেষ্টাকে তুলে
ধরে, অন্ততঃ এই একটী ক্ষেত্রে
দেখলাম সে অজুহাত অচল।

কারণ বোমা ছোঁড়ার পর অজু-
হাত হিসেবে পদলিখের গুলি
ছুঁড়ে মান্দুস খুনের বৃদ্ধি এখানে
নেই। বোমা যদি পড়ে থাকে তা
হলে তা আজাদগড়ে রাস্তার
ওপর। কিন্তু সেখানে পদলিখ
গুলি করে নি। করেছে আশু-
লের ওপর দৌড়ে এসে, সামরিক
কামদায় পট্টচটী দিক থেকে
নেতাজী নগর কলোনির বাড়ী-
গুলিকে বেষ্টন করে।

নেতাজী নগর কলোনিতে
কয়েক বছরের মধ্যে কোন রাজ-
নৈতিক খুন বা অপরাধ অন্তর্ভুক্ত
দৃষ্টান্ত নেই। কোনদিন সরকারী
কর্মচারী, বা পদলিখের ওপর
এখানে আক্রমণ হয় নি। তাঁদের
একমাত্র অপরাধ তাঁরা পদলিখের
আশ্রিত কংগ্রেসী সমাজবিরোধীদের
হত্যা, ছিনতাই প্রভৃতির বিরুদ্ধে
প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শূনে
স্তম্ভিত হলাম যে গত দুমাস ধরে
এই এলাকায় চলাচলের ছয় নম্বর
স্টেটবাস এবং লায়লকার মাঠের
কম দূরে চলাচলরত একচক্রিশ

নম্বর বাসগুলি ধানার কাছে
খামিগে পদলিখ সি আর পির
সামনেই রিভলবার হাতে নিয়ে
কংগ্রেসী নকশাল গুন্ডারা যাত্রীদের
মধ্যে সি পি এম সমর্থক
খুঁজে বেড়ায়। এর মধ্যে তারা
চৌদ্দ পনেরো জন লোককে বাস
থেকে নামিয়ে নিয়ে খুন করেছে।
ফলে এই এলাকার লোক অফিসে
কারখানায় কর্মস্থলে যেতে পারেন
না নিভয়ে। কারণ বাস থেকে
নামিয়ে খুন হবার ভয় আছে,
বেইজত হবার আশংকা আছে আর
এ সবই ঘটছে পদলিখ, সি আর
পির প্ররোচনায়, সারা কলোনির মান্দু-
সই একথা বললেন।

আঠাশে মে তারিখে মেটাল
বকসের কর্মচারী এই এলাকার
বাসিন্দা এবং সি পি এম সমর্থক
বলে পরিচিত প্রদীপ মুখার্জীকে
গুন্ডারা ধরে নিয়ে যায়। পরদিন
উনিতিশে মে পাশের শ্রীকলোনির
লাললকার মাঠে তার মৃতদেহ
পড়ে থাকতে দেখা যায়। সমস্ত
কলোনিগুলির বাসিন্দারা জমায়েত
হয়ে এই হত্যার বিরুদ্ধে শান্তি-
পূর্ণ বিক্ষোভ জানান এবং অপ-
রাধী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী
করেন।

তারপরেই ঐদিন পদলিখ, সি
আর পির সঙ্গে সুপরিচিত
কংগ্রেসী গুন্ডা কাজল, সজল,
উজ্জ্বল, নিখিল এবং আরো কয়েক
জন আজাদগড় কলোনিতে হানা
দেয়। বাড়ী বাড়ী ঢুকে তারা
সি পি এম সমর্থকদের খুঁজে
বেড়ায়। এই সব পশুর দল মারে-
দের গায়েও হাত দেয়, শিশু
বৃন্দদেরও সবুট লাথি মারে, আর
অশ্লীল গালাগালির কথা তো
ছাপার অক্ষরে লেখাই যায় না।

উনিতিশে মে, এলাকার
সাতটী সেন্টারে হাজার সেকেন্ডারী
পরীক্ষা শুরুর হয়। এলাকার
সতেরোটি কলোনির চৌত্রিশটী
স্কুল কলেজের গভর্নিং বডি
প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটী
কমিটি শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা
গ্রহণের জন্যে উদ্যোগ নেন। প্রাক্তন
মেক্সর প্রীপ্রশান্ত শুর ঐ কমিটির
আহ্বায়ক। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা
বোর্ডের কাছে জানান যে কমি-
টির উদ্যোগে এলাকার সাতটা
সেন্টারেই তাঁরা স্বেচ্ছাসেবকদের
সাহায্যে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা গ্রহণের
ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু
পরীক্ষা কেন্দ্রে পদলিখ বা সি আর
পি মোতায়েন করা হলে অবস্থা
গোলমাল বাধতে পারে। উত্তরে
মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সম্পাদক
চীফ সেক্রেটারীর এক সার্কুলার
উল্লেখ করে তাঁকে জানান যে
পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে এধরনের
বে-সরকারী উদ্যোগকে সরকার
সমর্থন করেন এবং এই আশ্বাসও
দেন যে পদলিখ অথবা সি আর
পি বড় রাস্তায় টহল দেবে, কোন

পরীক্ষা কেন্দ্রে এই এলাকায়
মোতায়েন করা হবে না।

কাজেই নির্বিঘ্নে পরীক্ষা
গ্রহণের জন্যে উনিশশে মে ঐ
কমিটি প্রতিটী কেন্দ্রে প্রায় একশ
জন করে স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন
করেন। সেদিন নির্বিঘ্নে পরীক্ষা
সমাপ্ত হয়।

ইঠাং বিকেল পাঁচটা নাগাদ
গান্ধী কলোনির দিক থেকে সি
আর পি গুলিবর্ষণ করতে শুরুর
করে এবং গুলি চালাতে চালাতে
নেতাজী নগর কলোনির দিকে
এগুতে থাকে। সঙ্গে সেই কুখ্যাত
কংগ্রেসী গুন্ডার দল। পরীক্ষা-
কেন্দ্রে প্রহরারত স্বেচ্ছাসেবকদের
ওপর হঠাৎ তারা গুলিবর্ষণ করতে
আরম্ভ করে। তখন হতভম্ব হয়ে
স্বেচ্ছাসেবকরা এদিক ওদিক ছুটো-
ছুটি করে আশ্রয় খুঁজতে
দৌড়ায়।

তিনজন স্বেচ্ছাসেবক দীপক
নিয়োগী (আঠারো), ডীপক বসু
(ষোল) এবং আশিষ চক্রবর্তী
(পঁচিশ) দৌড়ে পরলোকগত
হেডমাস্টার রাখাল মজুমদারের
বাড়ীতে (৭/২৪নং বাড়ী) ঢুকে
পড়ে। সি আর পি সেখানে তাদের
ধাওয়া করে উঠানের ওপর পর
পর তিনজনকে গুলী করে মারে,
তাদের মাথার খুলি টুকরো টুকরো
হয়ে এখার ওখার ছিড়িয়ে থাকতে
আমরা দেখতে পেরেছি। উঠানে
চাপ চাপ রক্ত। রাখালবাবুর স্ত্রী
বললেন যে চারদিকে গুলির শব্দ,
টিনের ছাদ, ঘরের দেওয়ালে
অজস্র গুলি পড়ছে দেখে তিনি
দরজা জানালা বন্ধ করে দেন। তাঁর
ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে
এসে খেতে বসেছিল। সি আর পি
তাকে টেনে বের করে মারধর
করে। উঠানে পড়া রক্তাক্ত দেহ-
গুলিকে তারা পায়ে ধরে
মরা কুকুরকে মদুসফরাস যেমন
টেনে নিয়ে যায় সেভাবে টেনে নিয়ে
চলে যায়। পথে চাপা চাপ রক্তের
ছোপ লেগে থাকে।

আরেকটী বাড়ীতে ঢুকেই
পদুহারা মারের আতঁ চাঁৎকার
শুনে থমকে দাঁড়ায়। মনে হল
অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের বাড়ী।
তিনি ভাঙা ভাঙা কন্ঠে অভি-
সম্পাত দিচ্ছেন বর্তমান সরকারকে।
বলেন দেশে কি এরকম অরাজক
অবস্থাই চলবে? তাঁর ছেলে বি
এস সি ফাইন্যাল ছাত্র চন্দ্রশেখর
সাড়ে চারটা পাঁচটার সময় বলে,
মা একটু চা দাও, খেয়ে দেখে
আসি পরিচিত হাজার সেকেন্ডারী
পরীক্ষার্থীরা কিরকর পরীক্ষা
দিল। মা চা করে দিলেন। খেয়ে
পাশের নারকেল বাগানে ফাঁকা
জায়গারটার কাছে যেতেই গুলি-
বিস্ফ হলে পড়ে গেলেন। কয়েক-
জন লোক ধরাধরি করে পাশের
৬/১৪ নং বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।
বাড়ীর মালিক চরাসুর পঁচাত্তর

বছরের বৃন্দ আঠারোই এপ্রিল
তাঁর একমাত্র পুত্র দল্লাকে গুন্ডা-
দের হাতে হারিয়েছেন। তিনি
চন্দ্রশেখরের মাথা কোলে নিয়ে বস-
লেন, জল খেতে চাইলে তার মুখে
একটু জল দিলেন। হয়ত তাঁর
নিহত পুত্র দল্লালের কথা মনে
পড়েছিল। ততক্ষণে সি আর পি
গুন্ডারা বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে।
চারদিকে আতঁনাদ গুলির শব্দ।
বৃন্দের মুখে বৃদ্ধি মেরে তাঁকে
ফেলে দিয়ে কোল থেকে ছিনিয়ে
নিয়ে গেল চন্দ্রশেখরকে ঠিক মরা
কুকুরকে যে ভাবে মদুসফরাস
নিয়ে যায় পা ধরে টানতে টানতে।
ফলে গুরুতর আহত ছাত্রটী আর
বাঁচতে পারলেন না। তাই আজ
তার ঘরে মায়ের বুকফাটা কান্নার
রোল।

এই আক্রমণ চালাবার নেতৃত্ব
যাঁরা নিয়েছিলেন তার মধ্যে থানার ও সি
রামকৃষ্ণ মহান্তিকে কলোনির
লোকেরা চিনতে পেরেছেন। আর
তাঁরা চিনেছিলেন কংগ্রেসী গুন্ডা-

দের যাদের নাম তাঁরা আমাদের
কাছেও উল্লেখ করেছেন।

সাধারণ মান্দুসের ওপর এ ধরনের
জঘন্য আক্রমণ পাক সেনাদল
করেছে বলে বাংলাদেশের মান্দুসের
প্রতি অসীম মমতায় যাঁরা বিচলিত,
'নারীর মর্মস্থল লাঞ্ছনায় যাঁরা
ঘৃণায় ক্রোধে জর্জরিত, এপার
বাংলার সেই সব সং মান্দুসদের
বলবো নেতাজী নগরের ওপর
ভারতীয় খান সেনাদের আক্রমণ
আপনারা দেখে আসুন। ঘৃণায়,
লজ্জায় আপনারা অধোবদন হবেন,
ক্রোধে রক্তম হয়ে উঠবেন। আপনি
শান্ত নির্বিষেবে মান্দুস হলেও
শিশু-নরমাতী এই বিভীষিকার
বিরুদ্ধে অগ্নিময় হয়ে জ্বলে
উঠবেন।

আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে
যদি একটা গোটা এলাকা জুড়ে
শান্তিরক্ষকরা নিজেরাই স্বাধীন
দেশের নাগরিকদের নির্বিঘ্নে হত্যা
করতে পারে, যদি গৃহধর্মচারিণীর
সতীদেহে পশুবাহিনী নির্বিধায়
(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

একটি হত্যা এবং গুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পদলিখের লোক জড়িত আছে
বলেই মলির বাবার ডাইরী নেওয়া
হয়নি। মলি মুখার্জীর মৃতদেহ
বাবার আসা পশ্চান্ত রাখা হয়নি।
যে রিভালভারের গুলিতে মলি
মুখার্জীকে খুন করা হয়েছে তার
নম্বর চাইলে মলির বাবাকে থানা
থেকে চলে যেতে বলা হয়।
পদলিখের পরিবারের লোক খুনের
সঙ্গে জড়িত জেনে নিরাপদে হত্যা
করবার সুযোগ দিয়ে দেড় মিনিটের
পথ অতিক্রম করতে পদলিখের প্রায়
দুই ঘণ্টা লেগে গেল। যদিও
ঘটনার শুরুরতেই খবর দেওয়া
হয়েছিল।

গত সাতাশে মে সকালে আম-
তার ডি আই বি কর্মচারী সুব্রত
কুন্ডুর পুত্র নিখিল কুন্ডু স্থানীয়
বি ডি ও অফিসের মুখ্য সৈবিকা
প্রীমতী ইন্দিরা মুখার্জীর মেয়ে
মলিকে (বারো) জোর করে ঘরে
নিয়ে গিয়ে সকলের সামনে দরজার
খিল ও তারপরে বাবার রিভাল-
ভারের সাহায্যে গুলি করে হত্যা
করে। এবং পরে পালাবার পথ না
পেয়ে নিজে আত্মহত্যা করে।
খুনের কারণ সম্বন্ধে যে কোন
মতামতই প্রকাশ করা হোক না
কেন এর সঙ্গে অনেক গুরুতর
প্রশ্ন জড়িত।

ডি আই বি কর্মচারীকে আত্ম-
রক্ষার জন্য সরকার প্রদত্ত রিভাল-
ভার ব্যবহার করবার শিক্ষা তিনি
তার পরিবারবর্গকে দিতে পারেন
কিনা? তিনি যখন ডিউটিতে
ছিলেন তখন তার আশ্রয় অশ্রুটি
ছেলেকে ব্যবহার করবার জন্য

বাড়িতে রেখেছিলেন কোন আইনের
দেওয়া অধিকারে? আমতা থানায়
যখন মলির মা ছুটে গিয়ে আকুলি
বিকুলি করে বলেছিলেন শিশুর
আসুন আমার মেয়েকে ডি আই
বির ছেলে ঘরে ঢুকিয়ে রিভাল-
ভার বার করেছে মেয়ে ফেলবে বলে
তখনো পদলিখ আসতে চাননি
কেন? এবং যখন ইন্দিরা দেবী
মরিয়া হয়ে পদলিখের রাইফেল
ধরে টানাটানি করেন তারা আসতে
রাজী হন। কিন্তু গাড়ীসি করে
অনেক পরে আসেন এবং পোশাক
পরতে দেবী হয়ে গেল কৈফিয়ত
দেন। দুটো লাস ঘরে পড়ে আছে,
পদলিখ এসে প্রথমে তদন্ত না করে
ডি আই বির কর্মীকে ও তার
পরিবারবর্গকে মাথায় জল হাওয়া
দিতে শুরুর করে। যেন সেইজনেই
তাকে ডাকা হয়েছে। পদলিখের এই
আচরণের কৈফিয়ত কি? নিখিলের
ডাইরী ছিল সেটা কোথায় গেল?
ঘর সার্চ হলো না, যে ঘরে খুন
হলো সে ঘর সরকারীভাবে সীল
করা হল না। প্রীকুন্ডুর সমস্ত
জিনিষপত্র পদলিখ নিজে ঘাড়ে করে
নিয়ে গেল। সমস্ত প্রমাণ লোপ
করার জন্য কি? 'ডি আই বির
রিভালভারে খুন হয়ে গেল অথচ
ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা হলো না,
বরং নিরাপদ স্থানে পদলিখ প্রহ-
রায় আশ্রয় দেওয়া হল। এ কোন
দেশী গণতন্ত্র যেখানে পদলিখের
গাফিলতিতে সরকার প্রদত্ত অস্ত্রের
অব্যবহারে একটি নিষ্পাপ
কিশোরী খুন হয়ে গেল?

ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম আক্রমণ : এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেট

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

নির্বাচনের ঠিক পরেই প্রবণতার নতুন রূপটা ধরা পড়ুক এটা সম্ভবতঃ নব কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী চান নি। তাই তিনি দুটি মাস অপেক্ষা করে ভারতের সাধারণ মানুষের ওপর প্রচণ্ড হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছেন। কারণ তাঁর পক্ষে আর বেশীদিন রাজকন্য়ার মনোহর রূপ ধারণ করে চলা সম্ভব ছিল না, রূপকথার রাক্ষসীর রূপ তাঁকে ধরতে হবেই।

ইন্দিরাজীর অর্থমন্ত্রী চ্যবন সাহেব; ভারতের যেসব খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলি মাত্র কদিন আগে তাদের “গরীবী হঠাও” বুলিতে ভুলে গিয়ে সরল মনে ডোন্ট দিচ্ছিলেন, এবার তাদের ওপরেই তাঁর আক্রমণের পাশব হিংস্রতা নৈমে এসেছে। একান্তর-বাহ্যুর সালের কেন্দ্রীয় বাজেট নব কংগ্রেসী মালিক শ্রেণীকেই খুশী করবে।

চ্যবন সাহেব যে নব কংগ্রেসী বাজেট লোকসভায় পেশ করেছেন, তাকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে সমস্ত নয়া ট্যাকসের বোঝা সাধারণ গরীব মানুষগুলিকেই বহন করতে হবে। চ্যবন সাহেবের বাজেটে ঘাটতি চারশ চিল্লিশ কোটির মধ্যে ট্যাক্স তুলে মেটানো হবে দুশো কুড়ি টাকা। এই নতুন ট্যাক্সের মধ্যে তেতাঁলিশ কোটি টাকা সতেরোটি রাজ্য সরকার পাবেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাখবেন একশ সাতাত্তর কোটি টাকা কিন্তু তবু আরো দুশ কুড়ি কোটি টাকা ঘাটতির ফাঁক থেকে যাবে। ঐ ঘাটতি খরচ মেটাবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার দরাজ হাতে কাগজী নোট বাজারে ছাড়বেন, ফলে সমস্ত জিনিষপত্র দুমুদলা হবে। এখানেই ফাঁকের ফাঁকি!

বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে নব কংগ্রেসী ইন্দিরা সরকারের পুরনো বহু-

নির্দিষ্ট কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়ার চির-পরিচিত ছাপ।

মোট অতিরিক্ত ট্যাক্স বসেছে দুশ কুড়ি কোটি টাকা। এর মধ্যে মাত্র সাতাত্তর কোটি টাকা প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর, সম্পদ কর, কোম্পানীগুলির দেয় কর ইত্যাদি কিন্তু এ বছর আদায় হবে মাত্র সাতাত্তর কোটি টাকা। বাকী সবটাই পরোক্ষ কর অর্থাৎ যে কর ক্রেতা সাধারণের কাছ থেকে তুলে নেওয়া যায়।

বলা বাহুল্য এই করের বোঝার দরুণ প্রায় সবরকম জিনিষের দাম বাড়বে। তা ছাড়া, ঘাটতি মুদ্রা ব্যয়ের যে বিপুল ফাঁক রয়েছে তার দরুণ মূল্য বৃদ্ধি (অন্য কথায় টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া) অবশ্যম্ভাবী। এই মূল্য বৃদ্ধির গোটা বোঝাটাই সরলমনা গরীব মানুষগুলিকেই বহতে হবে এবং দীর্ঘকাল ধরে ইন্দিরা কংগ্রেসকে নির্বাচিত করার গুণাগার গুনতে হবে।

যে সব নিত্যব্যবহার্য জিনিষের ওপর উৎপাদন শুল্ক বসিয়ে সাধারণ গরীব মধ্যবিত্তের গলাকাটা হল তার মধ্যে রুটী, সস্তা দামের সিগারেট, কাঁচের গ্লাস ও পেয়লা, তৈরী সাট প্যান্ট জামা, সাবান, মাথার তেল, শ্যাম্পু, ময়দা প্রভৃতি। তাছাড়া মেয়েদের ব্যবহার্য প্রসাধনী সামগ্রী, পাটের তৈরী কাপেট, পা-পোষ, ক্যামেরা, লবঙ্গ, মশলা-পাতি, ফাইন সূতী কাপড়, প্রেসার কুকার, খেলার তাস, প্রভৃতি মধ্যবিত্তদের ব্যবহার্য সামগ্রীগুলিও নব-কংগ্রেসী “গরীবী হঠাও” মার্কা সমাজতন্ত্রী গ্রাস থেকে রক্ষা পায় নি। এইসব উৎপাদন শুল্ক ববদ এ বছরের বাকী কয়-মাসে সরকারের আয় হবে একশ একুশ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর বাড়বে সাতাত্তর কোটি আর পরোক্ষ কর চাপানো হবে একশ একুশ কোটি। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ কর জিনিষের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না, কিন্তু পরোক্ষ কর জিনিষের উৎপাদন খরচের সঙ্গে যোগ করে দাম ঠিক করা হয় বলে এই করের আওতাভুক্ত সব জিনিষেরই দাম বাড়বে।

এর ওপর শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামালের ওপর অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক বসিয়ে এদেশে উৎপন্ন শিল্পজাত জিনিষের মোট উৎপাদন খরচও বাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মধ্য-পায়ীদের বন্ধু কংগ্রেসী সরকার মদের ওপর কোন ট্যাক্স বসান নি।

স্বভাবতঃই সমস্ত ষ্টক এক্সচেঞ্জের ফাটকাবাজ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং একচেটিয়া কারবারীরা এই সমাজতান্ত্রিক-গরীবী

হঠাও মার্কা বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে। বিভিন্ন শৈয়ার বাজারে হরেক রকম শৈয়ারের দাম এক টাকা থেকে সাত টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে। কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, আহমেদাবাদ প্রভৃতি বাজারের ব্যাপারীরা খুশীতে ডগমগ হয়ে এটা যে খাটী সমাজতন্ত্রী ধাপ, তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। কারণ তাঁদের অতিরিক্ত মুনাফার তুলনায় প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ অতি সামান্য।

অন্যদিকে এটা নিশ্চিত যে এক হাজার টাকা পর্যন্ত মাইনে পান, এমন মধ্যবিত্তের মাসখরচা শতকরা অন্ততঃ তিরিশ টাকা বাড়বেই। নীচের দিকে যারা দুশ টাকা মাইনে পান, তাঁরা অতিরিক্ত এই ষাট-সত্তর টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন?

সরাসরি পরোক্ষ কর বৃদ্ধি, আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি, দুশ কুড়ি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ঘাটতি এবং দুশ ষাট কোটি টাকা রাজ্য সরকারগুলির মোট ঘাটতি মিলিয়ে সর্বমোট চারশ আশী কোটি টাকা ঘাটতি মুদ্রা ব্যয় নীতি—জিনিসপত্রের দামকে কোন আকাশ ছোঁয়া স্তরে নিয়ে যেতে পারে তা কি গরীবী হঠাও-এর মায়াকান্নায় নব-কংগ্রেসীরা ভেবে দেখেছেন? না কি ভোটের কাজ সারা হয়ে গেছে বলে তারা আবার স্বমূর্তি ধারণ করলেন?

কোন দেশের ট্যাক্স বসানোর ও সরকারী ব্যয় বরাদ্দের চেহারা থেকেই সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। ট্যাক্স বসালেই দোষের হবে তা নয়। এই ট্যাক্স কদের ওপর পড়ল, সরকারী খরচের ফলে দেশের জনসাধারণের কোন অংশ লাভবান হবেন, জিনিষপত্র কেনাবাচা দরদাম এর ফলে কি

ভবে প্রভাবিত হবে, এগুলিই হচ্ছে যে কোন বাজেট সম্পর্কে বিচার্য বিষয়। তার থেকে সরকার কি ধরণের সরকার বোঝা যায়।

এবারের বাজেটে ট্যাক্সের দুশ কুড়ি কোটি টাকার মধ্যে এ বছরের বাকী ন মাসে আদায় হবে একশ আটত্রিশ কোটি টাকা, তার মধ্যে সাধারণ গরীব মানুষকে বহতে হবে একশ একুশ কোটি টাকা, বড়লোকেরা বইবেন সাতাত্তর কোটি টাকা। গরীবদের ট্যাক্সের বোঝা আরেকটু বাড়তে পারে, কারণ অন্তর্নিহিত আদায়ের চেয়ে উৎপাদন শুল্ক প্রভৃতি ট্যাক্স ববদ সর্বদাই বেশী আদায় হয়, ব্যবসায়ীরাও এ সুযোগে ট্যাক্সের চেয়ে দর আরো কিছু বাড়িয়ে দেন। আর আয়কর, সম্পদকর, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেবার ব্যবস্থাও ঢালাও রকমের; সুতরাং বড়লোকদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় সাতাত্তর কোটির চেয়েও কম হবে, এটা বলাই বাহুল্য। এর থেকে বোঝা যায় চ্যবন সাহেবেরা কাদের লোক।

নতুন ট্যাক্সের মধ্যে মাত্র সাত কোটি চিল্লিশ লক্ষ টাকা শিশুকল্যাণের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ রয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় শিশুদের মাথা পিছর বছরে এক টাকা তিন পয়সা বরাদ্দ হল অথচ শিশুদের ট্যাক্সের জন্যে শিশু বৃদ্ধ নারী নির্বিশেষে প্রতিটী ভারতীয়কে মাথাপিছর আড়াই টাকা করে দিতে হবে।

এই বাজেটে যে মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে তা হচ্ছে গরীবের ন্যায্য প্রাপ্য ফাঁকি দিয়ে বড় বড় ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীদের ধনভাণ্ডার স্ফীত করা।

সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রবণতা এই বাজেটে প্রতিফলিত হচ্ছে। এ আশংকা যে অমূলক নয় তা প্রমাণিত হতে দুচারমাসের বেশী

দেরী হবে না। যেমন ইন্দিরা গান্ধী যে শ্রেণীর প্রতিনিধি, সেই শ্রেণী যে গরীবী হঠাও-এর বুলিকে নির্বাচন জেতার উপায় বলেই মনে করেন, সত্যি সত্যি গরীবী হঠাও নীতিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন না, একথা নির্বাচনের মাত্র দুমাসের মধ্যে প্রমাণিত হল।

আগামী মাসগুলিতে নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের দাম যে দ্রুত উধারগামী হতে যে বাধ্য তা এখন অনেক নব-কংগ্রেসী, তরুণ তুর্কী, এমন কি তাঁদের অন্তর্গত সি পি আইও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

এর ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমবে, টাকার দাম কমবে, আমাদের দেশের যেসব পণ্য রপ্তানী হয় তার দাম বাড়বে—ফলে আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারে যেমন কেনাবেচা কমবে, তেমনি আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যেও লোকসান হবে। দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনজীবিকার ওপর এই তীব্র আক্রমণকে প্রতিহত করতে চাইবেন।

ফলে দেশব্যাপী রাজনৈতিক বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাবে। তখন আবার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বরাদ্দ চুয়া-চিল্লিশ কোটি থেকে বাড়িয়ে দিতে হবে, সি আর পির জন্যে বরাদ্দ পঁচিশ কোটি চিল্লিশ লাখ টাকায় কুলোবে না এবং সেনাবাহিনীর মোট বরাদ্দও বারোশ একাশ কোটি টাকার চেয়ে আরো অনেক বেশী করতে হবে।

কারণ আজকাল ক্রমশঃ সেনাবাহিনী, সীমান্তবাহিনী ও সি আর পি জাতীয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর খরচ একধরণের পটুনি ট্যাক্সের মত জনসাধারণের ঘাড়ের চেপে বসে আছে। এটাও শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় বহন করে।

সি আর পির অত্যাচার

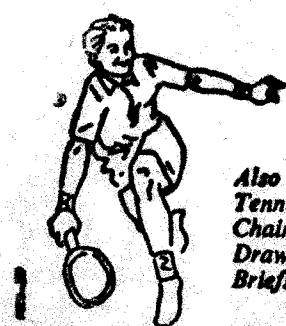
(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অশুচি হস্তস্পর্শ বারণ রক্ষা পেয়ে যায়, কোলের শিশুকে প্রহার করতেও যে দস্যবদের হাত কাঁপে না, সেই দেশের মানুষ তো আর স্বাধীন থাকে না।

ওপার বাংলাদেশের অগণিত বাঙালী খান সেনাদের হাতে নিহত, লাঞ্ছিত, ধর্ষিত, এপারে যদি তাই ঘটতে থাকে তাহলে বাঙালী জাতির স্বাধীনতার প্রদীপ কি নিভে যাবে? বাঙালীকে আবার একযোগে সামরিক পশুবলের বিরুদ্ধে নতুন করে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাতে হবে?

PIONEER VESTS

ARE
HYGIENICALLY BLEACHED!
EVERY BODY
NEEDS
PIONEER VESTS



Also Tee shirts,
Tennis shirts,
Chain Shirts,
Drawers &
Briefs

PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS, CALCUTTA-2 Phone : 54-2983

রাজধানী থেকে

ভারত মহাসাগরে ক্ষমতা-রাজনীতির প্রসার

বাংলাদেশের প্রতি 'দরদে' সাম্রাজ্যবাদী অভিযান

রমাপ্রসাদ মল্লিক

ভারতের ও পাকিস্তানের শাসক-শ্রেণী সম্প্রতি তাদের সরকারী স্বপ্নকে পারস্পরিক সংঘর্ষ সম্প্রদায়-বন্যপূর্ণ টানাপোড়নে, উত্তেজনা এবং তিক্ততার পরস্পরা থেকে সরিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আপোষের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। অবশ্য বাংলা দেশকে উপলক্ষ্য করে কূটনৈতিক লড়াই চলছে, যার কারণ এবং উদ্দেশ্য দু'তরফেই সূত্রপ্ৰসারী।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সূক্ষ্ম চাতুৰ্যপূর্ণ উক্তি—(এক) ভারত কাউকে ভয় পায়না, না পাকিস্তান না চীন; (দুই) বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে ভারত সরকার স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; (৩) স্বীকৃতি-প্রদানের প্রশ্ন বিবেচনামূলক এবং উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায়—খতিয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়, যে বাংলাদেশ সম্বন্ধে “সহানুভূতি”র প্রবল বন্যা সঞ্চে ও ভারত সরকার বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক তথা বিস্তারিত বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীকে এবং তস্যা মুরব্বি ডলার সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার শাসকচক্রকে ঝটকায় চায় না। তাদের পেছনে যে বিস্তারিত-শিল্পপতি তথা আমলাতন্ত্রীরা রয়েছে, তারা পাকিস্তানে ক্ষমতাধারী অনুদ্রুপ শ্রেণী অপেক্ষা আরও দৈত্যাকার, আরও শক্তিশালী এবং অর্থনৈতিক “সাহায্য” দেবার মানদণ্ড আরও নিম্নরোগ্য।

সুতরাং, চতুর্থ যোজনা পরিপূরণের অভিযানে পূর্জ-উপযাচী ভারত সরকার আমেরিকান সহায়কের ব্যাকুল প্রত্যাশী থাকবে, তাতে ‘অশ্চর্যের কি? তাই, বর্তমান ডলার সংকটে উক্ত মুরব্বি স্থিতিশীলতাই যখন বিপন্ন তখনও ভারতের সরকারী প্রবৃত্তিকে বলতে হয়, ডলার-মূল্য সম্প্রসারিত মুরোপীয় মুরো-বাজারের ডামা-ডোল অবস্থা সঞ্চে ভারতীয় মুরো নাকি অবিচল। অর্থাৎ, ভারতের রূপী এবং আমেরিকার ডলারের বিনিময় হার কেবল নয়, পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। ভারতের ধনতন্ত্রী অর্থনীতি—সম্প্রসারণ যাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে—পাকিস্তানের সমচারিত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে একই ডলারের জাহাজে বিচরণশীল। ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় স্তরে সম্বন্ধকে ‘সেকারণে বিপন্ন হতে দেওয়া যায় না বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেবার মত এক অহেতুক পদক্ষেপ নিয়ে। প্রধান-মন্ত্রী মহাশয় তাই ঝড়কি, নিতে

চান না পাকিস্তানকে চটান। তিনি ঝড়কি নিতে চান না, আমেরিকার শাসক মহলে বিরক্তি উৎপাদনের। জেনারেল কারিয়াপ্পা (ইয়ামিনা খাঁর আর্মি-আমলাতন্ত্রী স্যাপ্পাং) সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের এই স্বীকৃতি না দেওয়া-রূপী “সুবিবেচনার” ভূমসী প্রশংসা করেছেন। দুই রশ্মের শাসকবর্গের যোগসূত্র কোথায় তা এই প্রান্তন কম্যান্ডার ইন চীফ চোখে আগলে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ভারতের সমরকৌশল, নীতি এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমে কয়েকটি কেন্দ্রবিন্দুর ওপরে সিম্বল। ভূটান, আসাম, নেফা, নাগাল্যান্ড কাছাড় হিমালয় মিজোরাম এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গমপূর্ণ কলকাতা শিল্পাঞ্চল তথা উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি কোচবিহার সিকিমের সংযোজক গ্রিকোগাঙ্গল—এই ক্ষেত্রগুলির নিরাপত্তা ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ ভারতের রণনীতির এক মূখ্য অঙ্গ। অপরূপ কাম্মীরকে কেন্দ্র করে রূপায়িত। অর্থাৎ হিমালয়ী উত্তর সীমান্ত ১৯৬২ সালের সংঘর্ষের তিন বছর আগে থেকেই সরগরম; কিন্তু এ-সীমান্তে ভারতের কল্পিত প্রতিপক্ষ যে রাষ্ট্র তার সঙ্গে মুরোমুখি রয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে পৃথিবীর দুই বৃহৎ বিশ্বশক্তি আমেরিকা এবং সোভিয়েত রুশিয়া। এই রাষ্ট্রদ্বয় ভারতের আন্তর্জাতিক রাজনীতি তথা সমরকৌশল ও পশ্চিমের প্রয়োগ সমস্যা অনেক সরল ও সর্বাঙ্গীণ করেছে এই হিসেবে ষ, এদের বিপুল নৌবাহিনী ও আকাশবাহিনীর সহচর যে কোনো সংকটমূহুর্তে ভারত সরকারের প্রয়োজনে হাজির হতে পারে। ১৯৬২-র শেষভাগে আমেরিকান নৌ-শক্তির মুরো এমন সাহায্যের সম্ভাব্যতা বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতা জবাহরলাল নেহরু স্বয়ং। অবশ্য তা মুরোর ঘনঘটায় প্রধুমিত হয়নি।

সমস্ত দশকের গোড়া থেকেই কিন্তু আন্তর্জাতিক সামরিক ভারসাম্য বিষমভাবে নাড়া খেয়েছে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। ব্রিটেন স্থিতিশীল বিশ্বযুদ্ধের অন্তেই আর বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। এডেনের পূর্বে তাই ব্রিটেনের নৌবাহিনীর বিচরণ ও সক্রিয় প্রভাব ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে থাকে। মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর থেকে অবক্ষীণ ব্রিটেন তার সামরিক উপস্থিতি-ও ভূমিকাকে শেষ করে দেবার সিদ্ধান্ত

নেয় মূলতঃ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে। এই সংকট আজ প্রায় চরমে যখন বিরোধী লেবরপ্রবর্তদের ভাষায় মুরোক্ষীতক্কে নিয়ন্ত্রণে রাখবার প্রয়াসে ব্রিটেনের কনসারভেটিভ দলীয় সরকারকে কৃষ্ণম-ভাবে বেকার বৃষ্ণ করতে হয়; অর্থাৎ এক উপসর্গ দিয়ে মূল রেগের আর এক উপসর্গকে ঠেকানো। এ হেন ব্রিটেন মুরো পরিভ্রম ভারত মহাসাগরের বিশাল এলাকার শূন্যতা পরিপূরণের কথা উঠবে বৈ কি! শূন্যতা শূন্য যে অনুপ্রবেশকারীকে আমন্ত্রণ করে আনে তাই নয়, অনিবার্য করে তোলে শক্তি-সংঘর্ষের ঝড়।

ভারত সরকার অবশ্য বার বার প্রতিবাদ করেছে, জিনাতে চেয়েছে যে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শূন্যতা পরিপূরণের নাকি প্রশ্ন ওঠে না। তথাপি, বাস্তব ঘটনাবলী এবং বিকাশম-ন রাজনৈতিক তথা সামরিক পরিস্থিতি প্রমাণ করে ঠিক উল্টো সত্য। ভারত মহাসাগর এক বহুবিস্তৃত অঞ্চল। পশ্চিমে আরব উপসাগরের মুরে গুরুপূর্ণ এডেন এবং সেকোত্রা স্বীপ, দক্ষিণে মিরশাস, মধ্য সিচিলিস-মাল্যাদি-ল্যাকোডিস স্বীপপুঞ্জ-গুলি সিংহল এবং আন্দামান-নিকোবার, দক্ষিণ পূর্বে সিঙ্গাপুর। এছাড়া রয়েছে ভারতের সুদীর্ঘ সমুদ্র উপকূল, এবং পূর্ব পাকিস্তানেরও।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে কয়েক বছর যাবৎ মুরো রাষ্ট্রের নৌবাহিনী তরুণতর বড়িয়ে চলেছে। সিচিলিস স্বীপপুঞ্জকে নৌঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নতুন নয়। এখানে ব্রিটেন একটি তথাকথিত স্বাধীন অখচ বংশব্দ সরকার স্থাপন করেছে। এর রাজধানীকে তেল রসদ ইত্যাদি নেবার একটি সুবিধাজনক নৌবাহিনী কেন্দ্র রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। সিঙ্গাপুর এবং জাভা থেকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত একাধিক আশ্রয়স্থল এবং বন্দর ব্রিটেন এবং আমেরিকার প্রভাবাধীন সরকারের নিয়ন্ত্রণে। তাছাড়া ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকান সেনাবাহিনীকে একদিন না একদিন ফেরৎ নিতেই হবে; তখন থাইল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল এবং মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরের পেটাপ্রয়গুণিতে ডকিং, মেরামতী এবং নৌবাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন মোটানর ব্যবস্থা চলবে, চাই কি আণবিক শক্তি-চালিত দুর্গপাঞ্জায় সর্বমেরিনের যাত্রাবিরতিস্থল হিসাবে কাজে লাগানো। ভারত মহাসাগরের গুরুপূর্ণ মধ্যাঞ্চলে ভারত তার দীর্ঘ তটরেখা সমেত বিদ্যমান।

পশ্চিম উপকূলে বম্বে গোয়া এবং কোচিন; পূর্বে মাদ্রাজ পারা-দ্বীপ বিশাখাপত্তনম এবং কলকাতা ব্যারাকপুর (আকাশ তথা নৌবাহিনীর আশ্রা) কেন্দ্রগুলি ভারতমহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক শক্তি ভারসাম্যের টানাপোড়নে যথেষ্ট অবস্থান গুরু রাখছে।

ভারতের পার্লামেন্টে প্রতি-রক্ষামন্ত্রী অস্বীকার করা সঞ্চেও বার বার খবর রটছে যে, সোভিয়েত নৌবাহিনীর কতিপয় মুরো জাহাজ এই অঞ্চলে ঘুরাফেরা করেছে, মুরো মহড়া দিচ্ছে, বুরো পেতে চলমান অবস্থায় রণপোত-গুলির তেল রসদ ইত্যাদি নেবার অভ্যাস চালিয়েছে। এছাড়া, আর এক টাইপের নির্দেশক বুরো ব্যবহার করে রুশিয়া তার সার্বমেরিন-গুলির যাত্রায় তার সুবিধা করে দিচ্ছে। বুরো বাহুল্য, নিকট প্রান্ত অবধি সর্বত্র আমেরিকা এবং রুশী নৌবাহিনীর রেবারেবি এবং সামরিক প্রস্থিতির প্রতিবন্ধিতা তীব্র। ভারত মহাসাগর এলাকার প্রথমোক্তের প্রাথমিক সুবিধা দু'দিকে (এক) ব্রিটেনের প্রভাবাধীন এবং প্রতিষ্ঠিত নৌকেন্দ্রগুলিতে মুরো সংক্রান্ত যাবতীয় সাজ সরঞ্জামের সুযোগ সুবিধা; (দুই) নরো-উপনিবেশী কাম্মদায় বিভিন্ন দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলিকে তথাকথিত সাহায্যের রশিতে বেঁধে পরোক্ষ-ভাবে সেখানকার বন্দর এবং ঘাঁটি-গুলিতে অবস্থিত সামরিক রুশিট এবং প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লাভ।

বর্তমান রাজনৈতিক পরি-স্থিতিতে ভারত সরকার উপরোক্ত বৃহৎ শক্তির মাঝে একজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারে না। তবে ঘটনাক্রমে প্রতীয়মান হয় যে, ভারত বরুণ রুশিয়াকে সামরিক সহযোগিতা দেবে। এর কারণ—(এক) ভারতকে রুশিয়া চারটি সার্বমেরিন সরবরাহ করেছে এবং সেই সঙ্গে সার্বমেরিন নাবিকদের প্রশিক্ষণ, বিশাখাপত্তনমে সার্বমেরিন ঘাঁটি গড়ে তোলার ব্যাপারে সহযোগিতাও দিচ্ছে। এ ছাড়া মির বিমান, বিমান ইঞ্জিন, জটিল ও ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা উৎপাদনক্ষম করে তোলার ব্যাপারে রুশী সাহায্য ভারতকে ক্রমশঃই রুশিয়ার মুরো-পেক্ষী করে তুলছে—বাণিজ্য-গত ব্যাপারে দুই দেশের অর্থ-নীতি বিনষ্ট হয়ে উঠছে।

কেবল, বিশাখাপত্তনমে নয়, শোনা যায় যে, আন্দামান ও নিকো-বার স্বীপপুঞ্জেও রুশীয় নৌবাহিনীর বহুদূরপূর্ণ উপস্থিতি ক্রম-বর্ধমান। মুরোজাহাজের শূন্য-সফর এমন এক মাধ্যম যার দৌলতে বিদেশী রাষ্ট্রের নৌবহর এদেশের নৌ-অফিসার, এমন কি আর্মির উচ্চ পদাধিকারী মহলেও দহরম-মহরম বাড়িয়ে তুলতে পারে। ইদানীং আমেরিকান রণতরীর উপস্থিতি যেমন, তেমনি রুশীদেরও ঘটছে রণমঞ্চে প্রবেশ। উক্ত মহা-সাগর অঞ্চলে রুশী মুরোজাহাজের সংখ্যা, শক্তিসম্পত্তি, একবার মুরো

তেলা নিয়ে পরিভ্রমণ পরিধি এ-সকল বিষয়ে তথ্যাদি নানা মহল থেকে পাওয়া যাচ্ছে। হালে পাওয়া খবরে জানা যায় যে, সাতটি মুরো-জাহাজ, চারটি সার্বমেরিন এবং নয়টি ট্রলার জাতীয় জাহাজ রুশী নৌবাহিনীর এই অঞ্চলে নিয়োজিত শক্তি। এডেন ঘাঁড়ির মুরে রিম-নের হুডাইডা, এডেন বন্দর এবং নিকটবর্তী সেকোত্রা স্বীপে রুশীরা তাদের নৌশক্তি, কেন্দ্র গড়ে তুলতে ব্যস্ত। আমেরিকানরা এই অঞ্চলে ঠিক কি জাহাজের মুরো-জাহাজ মোতায়েন রেখেছে তা বুরো না। আমেরিকার রণনীতি অত্যন্ত কঠিন গোপনীয়তার নিয়-পিত হলেও পাকিস্তানী নৌবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ (তুরস্কের মাধ্যমে সাহায্যদান যার অঙ্গ) প্রকাশ হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে নিপীড়নকারী সামরিক অভিযান পাকিস্তানের সফল হবার মুরো আছে এমনি বকলমে আমেরিকার সাহায্যলাভ।

ভূমধ্যসাগরে যেমন, ভারত মহা-সাগরেও তেমনি, আমেরিকী ও রুশী নৌবাহিনীর প্রতিবন্ধিতা ভারত এবং পাকিস্তানকে আশ্রয় করে শক্তিসম্পদ এবং অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলছে। তবে এই মুরো ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বাধাবেনা। কেননা তাহলে ভারতের শাসকবর্গের পক্ষে অপরিসীম হয়ে পড়বে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর সঙ্গে অর্থক্ষমী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। যদিও সুম্ভাব্য ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষের প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় নৌবহর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নৌকেন্দ্র-গুলিকে (যথা চালনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ভোলা এবং সম্বীপ) অকেজো এবং বর্তমান পাকিস্তানী সেনা সমাবেশকে পর্যুদস্ত করে দেবার ক্ষমতা রাখে, সে ক্ষমতা আদৌ কাজে লাগান হবে কিনা সন্দেহ। কারণ, আমেরিকা তা হতে দেবে না। পাকিস্তানকে প্রভাবাধীন ক্ষেত্রে ধরে রাখার জন্য এবং পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে ভবিষ্যতে স্বপক্ষে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকা পাকিস্তানের বর্তমান শাসকচক্রকে সমর্থন করে যাবে; অবশ্য, একনারকতন্ত্রের ব্যক্তি-সম্বন্ধে ওষ্ঠ পুষ্ঠ্য।

দপণ

পঞ্চদশ সাপ্তাহিক

১ চাঁদার হার ১

বার্ষিক পনেরো টাকা
সাপ্তাহিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাফি ও চিঠিপত্র পাঠান

টিকানা :

৩১, মট জেন, কাস-১৩

ধুবুলিয়ায় ধরে ধরে অত্যাচার চলছে

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কিছুর ঘটলে আনন্দবাজার যুগান্তের প্রমুখ পত্রিকাগুলি বড় বড় হেডলাইন দিয়ে খবর বের করতো। যুক্তফ্রন্ট আমলে আইন শৃঙ্খলা নেই এবং সি পি এম আমলে দেশে এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে তা তার-স্বরে প্রকাশ করতে তারা এতটুকু কাপুরুষ করে নি। কিন্তু এখন কংগ্রেস দক্ষিণ কমিউনিস্ট মুসলিম-লীগ সরকারের আমলে যে ভয়াবহ ও ভীষণ অবস্থা বিরাজ করছে, ধুবুলিয়ায় থেকে তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এবং আশ্চর্যের বিষয় উপরোক্ত কাগজগুলো, যারা “নিরপেক্ষ নির্ভর দৈনিক” লগাটে একে বৈধবী ভালমানুষের ভাণ করেন, এসমস্ত ঘটনা বিস্ময়প্রকাশ করছেন না!

ধুবুলিয়ায় অশান্তির সূত্রপাত গত মধ্যবর্তী নির্বাচনের দশ-পনের দিন আগে থেকে। এখানকার ফাঁড়ির দারোগা আনন্দ ব্যানার্জী সি পি এমের দশ-বারো জন প্রথম শ্রেণীর কর্মীর বিরুদ্ধে পি ভি এ ওয়ারেন্ট বের করে। এরমধ্যে রাম-প্রসাদ দাস নামক কংগ্রেসের জনৈক লোকও ছিলেন এবং তাকে ঐ একই ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে জানা যায়, থানার জনৈক হোম-গার্ডের সঙ্গে রামপ্রসাদ দাসের ব্যক্তিগত ঝগড়ার পরিণতিতে এই গ্রেপ্তার। সম্প্রতি রামপ্রসাদ দাস মৃত্যু পেয়েছেন, কিন্তু ঐ একই

অলীক ও অসত্য সাজানো কেসে যে তিনজন সি পি এম কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁরা মৃত্যু পাননি। এবং আরও যে পনেরো-ষোল জনের নামে পি ভি এ ওয়ারেন্ট আছে, দারোগা তাদের ধরবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নির্বাচনের দশ-পনেরো দিন আগে প্রথম শ্রেণীর কর্মীদের আটকানোর উদ্দেশ্যে সি পি এম প্রার্থীকে পরাজিত করা। কিন্তু ভোটের ফলাফলে দেখা যায় সি পি এম প্রার্থী প্রায় দশ হাজার ভোট বেশী পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

এবার নদীয়ায় চোদ্দটি আসনের মধ্যে সি পি এম পেয়েছে এগারোটি, আর সি পি আই পেয়েছে একটি। কংগ্রেস মুসলিম লীগ একটি করে পেয়েছে। কংগ্রেসের শক্ত ফাঁটি নদীয়ায় তাদের এই বিপর্যয় দেখে কংগ্রেসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবং কি ভাবে সি পি এম-কে নদীয়া জেলা থেকে উৎখাত করা যায়, কি ভাবে তাদের মাজা ভেঙে দেওয়া যায় তারই প্রচেষ্টার একটি নিম্নম ভয়াবহ ও নৃশংস চিত্র ধুবুলিয়ায়।

নির্বাচনের প্রাক্কালে সি পি এমের যে সব কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল, তারা আত্মগোপন করে নির্বাচনী কাজ-কর্ম চালিয়ে যায়। দারোগা আনন্দ ব্যানার্জী কংগ্রেসী গৃহচরদের সাহায্যে এদের ধরবার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে নির্বাচনের ফল প্রকাশ

হতে থাকে। নদীয়ায় সি পি এমের ফল ভাল হওয়ায় স্থানীয় সি পি এম কর্মী ও সমর্থকরা পটকা ফাঁটিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। চূড়ান্ত ফলাফলের আগেই যখন দেখা যায় সি পি এম আর সরকার গঠন করতে পারবে না, তখন এখানকার

মতামত

তাত্লা নামকস্থানে জনৈক কংগ্রেসী বাড়ীতে মিথ্যা ডাকাতের ঘটনা সাজিয়ে ব্যাপক ভাবে সি পি এম কর্মীদের ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে যায়।

তাত্লার প্রতিটি উম্বাস্তুর ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজে পুলিশ ও কংগ্রেসীরা। কয়েকজনকে ধরে ভীষণভাবে মারধর করে। উম্বাস্তুর শিবিরের বারো-তেরো বছরের ছেলে থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছরের লোকেরা সব পালিয়ে যায়। এর কয়েকদিন পরে নতুন ক্যাম্প মিলিটারী দিয়ে ঘেরাও করে শতাধিক লোককে ধরে নেওয়া হয়। এই ভাবে চলতে থাকে ধুবুলিয়ায় পুলিশ মিলিটারী ও কংগ্রেসীদের যৌথ আক্রমণ।

ইতিমধ্যে এখানকার সুপরিচিত নকশালীরা ফিরে আসতে আরম্ভ করে। গত বছর গ্রীষ্মের বন্ধের পর বোদিন স্থানীয় দেশবন্ধু উচ্চ-তর মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলে, সেই

দিনই এই নকশালপন্থীরা স্কুলটি পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই নিয়ে স্কুলের ছাত্র ও স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ হয় ফলে নকশালরা এখান থেকে পালিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, গত বছর নদীয়া জেলার অধিকাংশ স্কুলেই কোন পরীক্ষা হতে পারেনি। নকশালরা ব্যাপক ভাবে স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগায়, শিক্ষক ও ছাত্র হত্যা করে, শিক্ষা ক্ষেত্রে হ্রাসের রাজস্ব কায়েম করে। কিন্তু একমাত্র ধুবুলিয়ায় উম্বাস্তুর শিবিরের চারটি হাই স্কুল ও দশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সি পি এমের ছেলে মেয়েরা ও জনসাধারণ মিলিত ভাবে পাহারা দিয়ে পরীক্ষাগুলি সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করায়।

কিন্তু এখন নির্বাচনের পরেই সেই সুপরিচিত নকশালীরা নব-কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছেন এবং দারোগা পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধুবুলিয়ায় ঘরে ঘরে অত্যাচারের রোলার চালিয়েছে।

গত দোসরা মে রায়ে এখানকার অমল বিশ্বাস নামে এক সুপরিচিত সমাজ বিরোধীকে কে বা কারা হত্যা করে। অমলের এক কালের সাঙ্গাৎ গুন্ডাদের সঙ্গে তাঁর একবার চোরাই মালের ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি হয়। অনেকের ধারণা এই হত্যাকাণ্ড তারই ফলশ্রুতি। অমলের হত্যাকাণ্ডের পরদিন থেকেই ধুবুলিয়ায় এক নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পরদিন তেসরা মে উক্ত নকশালপন্থীরা (অধুনা নব কংগ্রেসীরা) দলবদ্ধ ভাবে দেশবন্ধু স্কুলে প্রবেশ করে ছোরা, লাঠি ও বোমা দিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যাপক আক্রমণ করে। সি পি এম সমর্থক জুড়ুন বিশ্বাস নামক জনৈক শিক্ষককে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করে। ছাত্র ও শিক্ষকরা প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে, অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার মাত্র তিনশ গজ দূরে থানা, দারোগাকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও তিনি আসেন না। ইতিপূর্বে স্কুলের সামনে ট্রাক দুর্ঘটনায় একজন ছাত্র মারা যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা ট্রাকটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। দারোগা ক্ষিপ্ত হয়ে স্কুলে ঢুকে বন্দুক উঠিয়ে শিক্ষকদের বধেছে গালিগালাজ করে এবং এই ঘটনায় শিক্ষকদের হাত আছে বলে অভিযোগ করে।

এখন নকশাল কংগ্রেসী ও পুলিশ মিলিটারী একযোগে ধুবুলিয়ায় ব্যাপক অত্যাচার আরম্ভ করেছে। যখন তখন গৃহস্থের বাড়ী ঢুকে সার্চ করার নামে হাঁড়িকড়ি ভাঙছে। সি পি এম সন্দেহে আগে গুন্ডার দল এখানকার কোন ছেলেকে ধরে

টাঙ্গি বা ছোরা মেরে মারাত্মকভাবে জখম করে রাস্তায় ফেলে রাখছে, পুলিশ তখন তাকে গ্রেপ্তার করে চালান দিচ্ছে। কংগ্রেস ও নকশাল নামধারী গুন্ডারা প্রকাশ্যে দিবালোকে উম্বাস্তুর ছোরা, লোহার রড ও বোমা হাতে ঘোরাফেরা করছে, ইচ্ছামতো যেকোন পাড়ায় ঢুকে হামলা চালাচ্ছে। গ্রেপ্তার হলেই ডোল বন্ড। সুতরাং স্থানীয় যুবকরা যে যেমন পারে পলায়ন করেছে। দু একদিন পরেই পরিবার শূন্য সরকারী ডোল বন্ড ও পুনর্বাসনের সমস্ত সুযোগ বন্ড করে উম্বাস্তুরদের ভাতে মারার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য, এ-কোনদেশী সভ্য সরকার এদেশে বহাল রয়েছে? বাদের ছহুসায় এহেন অরাজকতা চলতে পারে? এই যদি অবস্থা হয়, তবে সি পি এম পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দিলেই তো হয়? একটি বৈধ পার্টি যার পেছনে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে, নেহাৎ রাজনৈতিক কারণে ঘৃণ্য প্রতিহিংসা ও জিঘ্রংসা চরিতার্থ করা রাষ্ট্রশক্তি ও গুন্ডা বাহিনীর সহযোগে, একমাত্র ইয়াহিয়ার রাজস্ব ছাড়া আর কোথায় চলছে? এর কি কোন বিচার ও প্রতিকার নেই?

জনৈক ধুবুলিয়া নতুন ক্যাম্প অধিবাসী

চীনের বিরুদ্ধে অণুপ্রচার

গত ছই এপ্রিল ভারত সরকারের কাছে প্রেরিত প্রতিবাদ পত্রে চীন স্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে

“It is a slander against us that we are supporting Pakistan Govt. against the freedom loving people of East Bengal”.

ইহা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে চীনের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার করে চলেছে আমাদের দেশের বুর্জোয়া সংবাদপত্রসমূহ। বাংলা-দেশের প্রশ্নে চীনের ভূমিকা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না তা বুঝতে হলে কোন দেশের জাতীয় আন্দোলনকে কমিউনিস্টরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তা জানা দরকার। কমরেড স্ট্যালিনের মতে

“The national problem is a part of the general problem of the proletarian revolution, a part of the problem of the dictatorship of the proletariat”. (J. Stalin, Problems of Leninism, p. 61).

ঐ একই বইয়ে কোন জাতীয় আন্দোলনকে কমিউনিস্টরা সমর্থন জানাবে সে প্রশ্নের উত্তরে স্ট্যালিন বলেছেন,

“Such national movement as tend to weaken, to overthrow imperialism and not to strengthen or preserve it.”

কমঃ স্ট্যালিন আরও বলেন,

রাজধানীর চিঠি

(পঞ্চম গুন্ডার পর)

বিশেষকে সরিয়ে ভিন্ন ধাঁচের সরকারী বস্ত্র গড়ে উঠতে সাহায্য করাও আমেরিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে চীনকে ঠেকানোও হবে সম্ভব। চীনকে দু-মুখো নীতির শিকার বানিয়ে পাকিস্তান ধোঁকা দিয়ে যেতে চায়, তবে এ ধোঁকা কতদিন টিকবে বলা যায় না।

আমেরিকার শাসকশ্রেণীর একাংশ আজ ধীরে ধীরে রাজনৈতিক হিসাব অনুসারে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতীক্ষায়। পাকিস্তানের শিল্প, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং বিকাশ স্তম্ভিত, রুদ্ধ অবস্থায়; তার বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল আজ এতই ক্লান্ত এবং বিপজ্জনক রেখার নিচে যে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দেয় কিস্তী ও সুদ চুকতেই তা ফাঁক হয়ে যেতে পারে। দেনার দায়ে যুদ্ধের খরচ মাথায় ওঠবার উপক্রম হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে প্রশাসনিক ছাঁদকে পুনর্বাসন সাজিয়ে তোলা দূরে থাক। এমনি পর্যায়ে পাকিস্তানী শাসকমহলের সামনে রয়েছে দুটি রাস্তা—(এক) পূর্বপাঞ্জেল শিল্প

ও বাণিজ্যিক উদ্যোগের দায় ও দায়িত্ব, মায় সম্পত্তি এবং প্রতিষ্ঠান ঐ অঞ্চলের বাইরে থেকে আসা উদ্যোগপতিদের হাতে সম্পর্ক; (দুই) নতুন, ক্রমশঃ চীনের সাহায্য নির্ভর হয়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশের সকল দিকগুলি চৈনিক অর্থনীতির (এবং স্বতই রাজনীতির) সঙ্গে গ্রন্থন করা। প্রথম পথ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর মনঃপূত হলেও বিস্তৃতিদের মাঝে যারা শীর্ষস্থানীয় তারা তাদের দূরপ্রসারী স্বার্থের মূখ চেয়ে এমনি অবিস্ম্যকারী নীতি গ্রহণ করবে না, কারণ তাহলে স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে ধনতন্ত্রী ঠাটে সহযোগ স্কেভের আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। দ্বিতীয় পথও উক্ত বিস্তৃতিদের তাঁর বিরোধিতার সম্মুখীন হবে; পেছনে সমর্থন যোগাবে আমেরিকার বিবর্তকার্য ধনিক মুরদুবিররা। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের সরকারের ওপর আমেরিকার উক্ত জোটের—দৈত্যাকার শিল্প-বিস্তৃতিসংস্থার মালিকবর্গ তথা সামরিক আমলা-তন্ত্রের যারা মাথায় তাঁদের চাপ আমেরিকী সরকারের সক্ষম অথচ প্রচণ্ড প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলা দেশের সমস্যার এক রাজনৈতিক সমাধানের দিশায় কাজ

অবশ্য আমেরিকার বিশ্ব রাজনীতি করতে শুরুর করেছে। এই সমাধান তথা রণকৌশলগত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের অনুকূল ষাতে হয় সে চেষ্টাও চলছে, অর্থাৎ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলা দেশের উপকূলরেখা বরাবর একসারি নৌ-ঘাঁটি আমেরিকী নৌবহরের ভবিষ্যৎ বিচরণ এবং মহড়ার জন্য আশ্রয় ও শক্তির ভিত্তি দুই ষাতে যোগায় তারই প্রয়াস।

এমনি আন্তর্জাতিক ক্ষমতারাজনীতির গোপন ক্রিয়ার কথা খেয়ালে রেখে সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন সেখান থেকে পালিয়ে আসা উম্বাস্তুরা ফিরে যেতে পারবে এবং তাদের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

কিন্তু এ ধরনের রাজনৈতিক রফায়—যাতে পাকিস্তানের বর্তমান স্বৈরাচার ভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠমো বজায় রেখে বাংলাদেশে লাগাম পরা গণতন্ত্র কায়েম করা চলবে—আমেরিকী নব-সাম্রাজ্যবাদের নীতি মোটা লাভ হলেও রাষ্ট্রায় স্বার্থ এ অঞ্চলে হবে বিপন্ন এবং চীনেরও ঘটবে কটনৈতিক পরাজয়!

"The question of the right of the nation is not an isolated self-sufficient question; it is a part of the general problem if the proletarian revolution subordinate to the whole and must be considered from the point of view of the whole".

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেই গত শতাব্দীর চম্পিশ-এর দশকে কার্ল মার্কস পোল এবং হাঙ্গেরীয়দের জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করলেও চেক ও স্লাভদের জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করেন নি।

এই সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি বলেছেন,

"The national movement of the oppressed countries should be appraised not from the point of view of formal democracy but from the point of view of actual results obtained as shown by the general balance sheet of struggle against imperialism". (Collected Works, Vol. XIV, p. 257).

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের আন্দোলনকে বিচার করলে দেখব যে আওয়ামী লীগের ছয়-ফা অথবা বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাপত্রের কোথাও পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের প্রধান শত্রু বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও নেই। অপর পক্ষে এই আন্দোলনের তথাকথিত নেতারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথের স্বীকৃতি এবং সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। যে প্রতিক্রিয়াশীল ইন্দিরা সরকার সিংহলের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য দিচ্ছে একযোগে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোবিয়ৎ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, যুগোস্লাভিয়া ও পাকিস্তানের সঙ্গে, সেও আজ ঐওয়ামী লীগের নেতাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের এই তথাকথিত নেতারা আজ জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত প্রার্থনা করছেন কিন্তু আজ কে না জানে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ মানেই সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ।

একথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে লাওস ও ভিয়েতনামে প্রচণ্ডভাবে মার খাওয়ার পর-দক্ষিণ এশিয়ার চীন বিরোধী যুদ্ধের নতুন ঘাঁটি হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে চায় এবং আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতৃত্বকে তারা একাজে সহযোগী হিসাবে পেয়েছে। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ প্রতিক্রিয়াশীল ইন্দিরা সরকারের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের নেতাদের সমর্থনে প্রকৃত বিপ্লবী শক্তিসমূহকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিবিপ্লব রপ্তানী করতে চায়। বাংলাদেশের এই প্রকৃত বিপ্লবীরা একদিকে যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার ইয়াহিয়া খানের বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দা লড়াই চালাচ্ছে অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক

নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম চালাচ্ছেন। এই সংগ্রাম যে মনুষ্যত্ব শক্তি সঞ্চার করে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার আক্রমণের বর্ষা পরিচালনা করবে সেই মনুষ্যত্বই সে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন পাবে।

চীন একথা ভালভাবেই জানে যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে নিদারুণ আত্মত্যাগ করতে হবে। একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের জাতীয়

পূর্ববাংলার মুক্তযোদ্ধাদের প্রতি

পূর্ব বাংলার যুদ্ধরত বন্ধুরা, আপনাদের জানাই অসংখ্য প্রম্মা, জানাই লাল সালাম! আপনারা যুদ্ধ করছেন, দেশের ভিতরের ও বাইরের শোষণ শ্রেণী, তাদের দালাল শ্রেণী এবং তাদের রক্ষী বাহিনীকে খতম করে দেশকে শোষণ ও নিপীড়ন মুক্ত করার জন্য। কমরেড লিন পিয়াও বলেছেন, "পৃথিবীর যেখানেই যারা সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁরা আমাদের সঙ্গে আছেন, তাঁদের এ সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামেরই এক ধাপ।" অতএব আপনারা এ যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে পরিণত করুন, কারণ আপনারা নিশ্চয়ই নিপীড়িত লালিত্ব ও শোষণিত বাংলার জনগণকে শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত করতে যাচ্ছেন। এ জনগণের প্রতি আস্থা রাখুন, তাদের উপর নির্ভর করে দৃঢ় পদে এগিয়ে যান, জয় আমাদের হবেই। এ প্রসঙ্গে যোম্মা হিসাবে আমরা সবদা মনে রাখবো কমরেড মাও-এর বাণী, "জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম কোন মতেই প্রতিক্রিয়াশীল বা তাদের পদলেহী দালাল শ্রেণীর উপর ন্যস্ত করা উচিত হবে না, কেবলমাত্র জনগণকে সুসংগঠিত করেই এ সমস্যার সমাধান করা যায়।"

বন্ধুরা প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী শাসকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। পূর্ব বাংলার এ মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে পাকিং রেডিও পাকিস্তানী প্রচারের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, "পূর্ব বাংলার মুক্তি যোদ্ধাদের দমনের জন্য চীন পাকিস্তানকে বর্তমানে সাহায্য দিচ্ছে ইহা কুৎসা মাত্র।" গণ-চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির একজন কমরেড পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। আওয়ামী লীগ প্রসঙ্গে সে ভদ্রমহোদয় বলেন, "বস্তুতঃ আওয়ামী লীগ হলো পূর্ব বাংলার বড় ধনিক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা সম্পূর্ণরূপে কমিউনিস্ট বিরোধী এবং

মুজিব আন্দোলনকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

এই অবস্থায় চীন বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ঘটনা বলার মধ্য দিয়ে বাস্তবে বাংলাদেশের ঘটনাস্থানকে হস্তক্ষেপকেই প্রতিহত করেছে। এই অবস্থায় চীন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ থেকে বাংলাদেশের বিপ্লবকে রক্ষা করেছে যাতে আপন শক্তির উপর নির্ভর করে দেশের অভ্যন্তরের বিপ্লবী শক্তিসমূহ এগিয়ে যেতে পারে।

স্ট্রেন বন্দ্যোপাধ্যায়

চীন বিরোধী ভূমিকা পালন করে আসছে এবং যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তার অনুগামী সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত, ফলে শত্রু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত চীন বিরোধী কোন সরকারকে নীতিগত ভাবেই চীন সমর্থন করতে পারে না।" পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"It has been a national oppression and suppression throughout the long 23 years. Now it has taken a naked shape. If you can form a united front against aggression—then and only then we can support this movement."

সুতরাং চীন একাবন্ধ সশস্ত্র গণযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা ভেঙে দেবে না, বরং তাকে সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি একটি কথা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবী শোষণ গোষ্ঠীর কোন দুর্ভাগ্যবশত প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে আসুন আমরা একাবন্ধ ভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গড়ে তুলি ও সশস্ত্র গণযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে শোষণ ও অত্যাচারীদের সমূলে উৎখাত করি। আজ আমাদের ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত, দলীয় স্বার্থকে ভুলে গিয়ে জাতীয় মুক্তির স্বার্থকে উদ্দেশ্য করে ধরি এবং পূর্ব বাংলাকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করি।

সর্বশেষে আমি পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের একজন হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর প্রতিটি বিপ্লবী কর্মীর প্রতি আকুল আবেদন জানাই, দয়া করে আপনারা পাকিস্তানি ভিত্তিক বিপ্লবের পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। যদিও মার্ক্সবাদীরা সমগ্র বিশ্বের জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে, তথাপি বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে জনগণের চেতনার স্তর ও পরিচালনা করার মত গড়ে ওঠে একটি বিপ্লবী পার্টি। ইত্যাদি বিপ্লবী পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানের

বিপ্লবী ক্রিয়াক্ষেত্র বিভিন্ন হতে বাধ্য। আসুন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র লড়াই করে নিজেদের বিপ্লবী বলে কর্মতঃ প্রমাণ করি, কারণ শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে না সে বিপ্লবী হতে পারে না। এ সংগ্রামকে আমরা শ্রেণী সংগ্রামের রূপে দেই। "পূর্ব বাংলার ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান দমন করা হচ্ছে"—এ বক্তব্য দিয়ে আপনারা নিষ্ক্রিয়তা অতিগোপনীয়তা এবং অপর যুদ্ধরত বিপ্লবীদের সঙ্গে অসহযোগিতার নীতিতে সঙ্কীর্ণতাবাদকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন।

আমি জানতে চাই পূর্ব বাংলার প্রায় সাত লক্ষ জনতা কী ফ্যাসিস্ট ছিলেন? পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার, নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস, পূর্ব বাংলার মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার কি ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপ নয়? তবে আপনারা এ ফ্যাসিস্ট অত্যাচারীদের সম্পর্কে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থেকে পরোক্ষ ভাবে সমর্থন দিচ্ছেন কোন বিপ্লব সফল করার উদ্দেশ্যে? আপনারা যে ফ্যাসিস্টদের কথা বলছেন বাস্তবে সে ফ্যাসিস্টরা সীমান্তের ওপারে নিরপদ আশ্রয়ে অবস্থান করছে। নির্বিচারে গণহত্যার প্রতিবাদে জনগণ আজ অস্ত্র ধারণ করেছেন, যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংগ্রামী জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাদের সঙ্গে, তাদের পথে নেমে আসুন! আপনাদের নিশ্চয়ই স্বরণ আছে মহান নেতার সতর্কবাণী "নিষ্ক্রিয়তাবাদ সন্দেহবাদ ও সঙ্কীর্ণতাবাদ হচ্ছে সংশোধনবাদ।" আপনারা এই সংশোধনবাদী ভূমিকা ত্যাগ করে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে সশস্ত্র

শ্রেণীশত্রু কারা?

শ্রীরজন চৌধুরীর নয়ই এপ্রিলের চিঠিতে স্পষ্টভাবে পুন্ড্রিশ ও মিলিটারীর ভূমিকাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে রাষ্ট্রশক্তির স্তম্ভ ভাবলেও শ্রেণীশত্রু মনে করা কি ঠিক? সামন্ততন্ত্র ও দেশী বিদেশী পুন্ড্রিকে আশ্রয় করে শিক্ষক কৈরাণী অধ্যাপক পিওন ও অন্যান্য বৃত্তিধারী মানুষ, নানা ধরনের রাজনৈতিক দাদারা এই ব্যস্ততাকেই প্রকারণতঃ রক্ষা করে চলেছে বা চলতে হচ্ছে। যে পুন্ড্রিশরা বর্বরের মত মহান বিপ্লবী আশ্রয় মুজুমদারকে হত্যা করেছে তাদের পাশাপাশি কয়েকজন যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাচ্ছে এনজীর আমরা পেরেছি। মিলিটারীকেও শ্রেণীগতভাবে এখনই সমাজতন্ত্রের শত্রু বলতে চাই না, কারণ গণসংগঠন এখনো তৈরী হয়নি, এখনো তা প্রায় পার্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ আশা রাখি স্বাধীনতা সি পি আই (এম-এল) বিপ্লব কৃষক শ্রমিক থেকে শুরুর করে প্রতিটি শোষণিত ও এখনো যারা বিভ্রান্ত এই সকল মানুষের বুদ্ধে

গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে (যারা বর্তমানে পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণের শ্রেণীশত্রু) খতম করে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন। মহান লেনিনের অমর বাণী "যে শোষণিত ও নিপীড়িত শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করে না এবং অস্ত্রের পরিচালনা শিক্ষা করে না শোষণ ও নিপীড়নই সে জাতির একমাত্র প্রাপ্য" কে নিজেদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করুন। প্রমাণ করুন মহামনীষী মার্কসের কথা "শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তির যে কোন আপোষহীন সংগ্রামই শ্রেণী সংগ্রাম।"

একথা সত্যি যে প্রতিক্রিয়াশীলরা কোন দিন মুক্তির সংগ্রাম চালাতে পারে না। কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক শ্রেণীর এ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব অবশ্যই বিপ্লবীদের দিতে হবে। সত্যিকারের বিপ্লবী হিসাবে এ সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করুন, কৃষক শ্রমিক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত এ একাবন্ধ পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের বিপ্লবী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন। পূর্ব বাংলার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আগামী দিনের ইতিহাস আপনাদের এ বাস্তব বর্জনতাকে কোন ক্ষমাই ক্ষমা করবে না। পরিশেষে আমি পুন্ড্রিশ একাজে গড়ে তোলার জন্য সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আহ্বান জানাই, আসুন আমরা একাবন্ধভাবে পূর্ব বাংলার এ গণযুদ্ধ জনগণের বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করি, মুক্তির লাল সূর্যোদয় ঘটাই পূর্ব বাংলার পূর্ব আকাশে।

জনৈক মুক্তিযোদ্ধা

আগুন ধরাবে। তখন পুন্ড্রিশ ও মিলিটারীর এক ভয়ংকর কি ধন-তন্ত্র ও ছোটবড় সমস্ত শোষণ ও সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না? তাদের সকলেই কি শেষ পর্যন্ত একইভাবে এই বিপ্লবের ওপর চৌম-রোলার চালিয়ে যাবে? সেদিনের জন্যে অত্যন্ত সতর্ক ও সহিষ্ণু হয়ে আমাদের সংগঠন দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তখন বিপ্লবের এমন একটা স্তর আসবে যখন নতুন কেউ আর পুন্ড্রিশ বা মিলিটারীর স্বাভাবিক নাম লেখাবে না, বুদ্ধিজীবীদেরও একটা অংশ নানাভাবে আমাদের বিপ্লবকে সাহায্য করবে ব গণফৌজে সামিল হবে। এখন শত্রু বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ হত্যাকারীরাই শাস্তি পাক।

ভূপতি দাস
সি পি আই (এম-এল)-এর একজন সমর্থক

পূর্ব বাংলার বামপন্থী রাজনীতি

ভাসানী-তোহা সম্পর্কের ইতিকথা

শফিকুল হাসান

সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান ঘৃণা বিবেচ্য সন্দেহ ও অবি-
শ্বাস ১৯৬৫ সালের ছয়ই সেপ্টেম্বর এক আত্মঘাতী অস্ত্র প্রতি-
যোগিতার রূপ নেয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী পাকিস্তান সরকার "সিনাটো" "সেন্টো" সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্বীয় স্বার্থের কারণে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে তারা অসম্মতি জানায়। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান চীনের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে এবং অস্ত্রস্বাক্ষর প্রয়োজনে গণচীনের সঙ্গে রাষ্ট্রগত সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। আইয়ুব সরকারের এই চীন ঘোষা নীতিকে ভাসানী ন্যাপে অবস্থান রত চীন-পন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মোহাম্মদ তোহা, আব্দুল হক, বদরুদ্দিন উমর, আসহাবউদ্দিন, নজরুল ইসলাম ও ইন্দু সাহা প্রমুখ নেতৃ-
বর্গ প্রতিষ্ঠাশীল আখ্যা দেন এবং প্রতিকর্মে এ সরকারকে তাঁরা সমর্থন জানাতে থাকেন। যে সরকার দীর্ঘ নয় বছর যাবৎ (তখনকার সম্মানদায়ী) সামরিক শাসনের নামে জনগণের ওপর চালিয়েছে শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার আর নিপেষণ; কেড়ে নিয়েছে জনগণের মৌলিক অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা বাক্যের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতাদর্শের স্বাধীনতা; জনগণের প্রতিটি দাবীকে যে সরকার বুগেট, বেয়নেট ও লাঠি দিয়ে দমিয়ে রেখেছে, শতশত রাজ-
বন্দীদের জেলে পুড়ে অকণ্ঠা নির্বাতন চালাচ্ছে সে সরকারকে আর বাই হোক প্রতিষ্ঠাশীল বলা যায় কি? প্রতিটি শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে; অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে; সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানী ছিলেন আপেক্ষহীন সংগ্রামের অগ্রদূত। ক্ষমতার লোভে নয়, পদের মোহে নয় অত্যাচারী শোষণের বিরুদ্ধে মেহনতি জনগণের পার্শ্বে সর্বদাই মাওলানা ভাসানীর এক বিরাট সংগ্রামী নেতৃত্ব ছিল। অত্যাচারী স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার যতই

চীন ঘোষা নীতি অবলম্বন করুক না কেন মাওলানা ভাসানী তাকে প্রগতিবাদী বলে স্বীকার করা দূরে থাক, বরং আইয়ুবশাহীর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে সংগ্রামের পথে আন্দোলনের পথে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। ফলে ন্যাপে অবস্থানরত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মাওলানা ভাসানীর নীতিগত বিরোধের সূত্রপাত হয়। আইয়ুব সরকারের মত প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে সমর্থন করার ফলে খোদ কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। পার্টির অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতা পাবনার মতিন, আলাউদ্দিন এবং চট্টগ্রামের দেবেন শিকদার, আবুল বাসার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আইয়ুব সমর্থন ও নিষ্কল্প ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন এবং মাওলানা ভাসানীর সংগ্রামকে সমর্থন জানান এবং তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ তোহা সাহেবরা মাওলানা ভাসানী ও অন্যান্য সংগ্রামী কমিউনিস্টদের এ ভূমিকাকে মহান চীন বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ বলে অভিহিত করেন এবং এ সকল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পার্টি থেকে বহিস্কার করে দেন। তাঁরা ন্যাপে থেকেও ন্যাপপ্রধান মাওলানা ভাসানীর এ সংগ্রামী কার্যকলাপকে নিন্দা করেন এবং এসকল সংগ্রামে অংশ গ্রহণে বিরত থাকেন।

মাওলানা ভাসানী এবং পার্টি থেকে বহিস্কৃত সংগ্রামী কমিউনিস্ট কর্মীরা (যারা পর-
বর্তীকালে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন) ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে পাবনার শাহ-
পুর্বে দুদিন ব্যাপী এক বিরাট কৃষক সম্মেলনের আহ্বান করেন। কৃষক সমিতির সম্পাদক আব্দুল হক এ সম্মেলনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করেন এবং নানা অজুহাতে সম্মেলনের সাংগঠনিক কার্য থেকে দূরে সরে থাকেন। সম্মেলনের প্রথম দিনেই মাও-
লানা ভাসানীর সমর্থক এবং মোহা-
তোহা সাহেবের সমর্থকদের পর-
স্পর বিরোধী শ্লোগান ও পাল্টা

শ্লোগানের পরিণতি হিসাবে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় এবং দুদিন ব্যাপী অনর্ন্তভাবে সম্মেলনের প্রথম দিনেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনার পর মাওলানা ভাসানী এবং মোহাম্মদ তোহার সম্পর্ক আরে তিক্ততা লাভ করে। উভয় পক্ষ প্রকাশ্য-
ভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা-
ছোঁড়াছাড়ি করতে থাকেন।
এ সময়ে প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি প্রবল আকার ধারণ করে। ঘৃণাচার অফিসার, সুদখোর মহাজন, মনোফাকারী মজদুরদারী ও চোর-
কারবারীদের অত্যাচার জনজীবনে ঘাসের সৃষ্টি করে। মাওলানা ভাসানী এ সকল দুর্নীতিবাজদের সতর্ক করে দেন এবং জুন মাসে তাদের বিরুদ্ধে ঘেরাও অভিযান শুরু করেন। পূর্ব বাংলার ইতি-
হাসে ইহা জুন আন্দোলন নামে খ্যাত। এ ঘেরাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে মোহাম্মদ তোহা সমা-
লোচনা করেন এবং তাতে অংশ গ্রহণে বিরত থাকেন। অন্যদিকে মাওলানা ভাসানীও তাঁদেরকে দুর্নীতিবাজদের সমর্থক হিসাবে অভিযুক্ত করেন, ফলে তাঁদের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে।
এদিকে আইয়ুব সরকারের স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের বেড়া-
জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্য মুক্তি-
কামী সংগ্রামী জনতা সভা ও শোভাযাত্রা চালাতে থাকেন। এসকল সভা ও শোভাযাত্রায় পুলিশ ও মিলিটারীর গুলি চালানার প্রতি-
বাদে সারা পূর্ব বাংলা ব্যাপী জন-
গণের যে সংগ্রামী চেতনা বৃদ্ধি পায় তার প্রকাশ ঘটে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে। ছয় দফার প্রণেতা শেখ মুজিবকে আইয়ুব সরকার বহু পুর্বেই "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" আসামী করে সামরিক কারাগারে বিচার চলতে থাকে। প্রতিক্রিয়া-
শীল শাসক ও কায়মী স্বার্থবাদী-
দের এ সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানী সংগ্রামের পথে নেমে আসার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। তাঁর এ আহ্বানে পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসেন। সকল ছাত্র প্রতি-
ষ্ঠান ঐতিহাসিক এগারো দফা দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি গঠন করে এবং স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারকে, উৎখাত করার এক বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৬৮ ধারা ভঙ্গ করে জনতা হরতাল, শোভাযাত্রা এবং জনসভা করতে থাকেন। এই জনসভায় পুলিশ ও মিলিটারী গুলি চালালে জনতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রাম ও শহরে

স্বতন্ত্রভাবে পদলিখ মিলিটারী, সুদখোর, মহাজন, ঘৃণাচার অফিসার, দালাল গরুচোর, বদ-
মাইশদের খতম করতে থাকে।
ঠিক এমনি সময় কোন সুসং-
গঠিত জনগণের রাজনৈতিক পার্টি (কমিউনিস্ট পার্টি) এগিয়ে এসে যদি এ অসংগঠিত বিপ্লবী জনগণকে সংগঠিত করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পরিচালনা করার মহান দায়িত্ব স্বৈচ্ছ্য কণ্ঠে তুলে নিতেন তাহলে পূর্ব বাংলার ইতিহাস নিঃসন্দেহে অন্য ভাবে লিখতে হতো। মোহাম্মদ তোহার বিপ্লবী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালনা করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ঠিক এমনি সময়ে জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালনা করার মহান দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভাসানী ন্যাপের অন্যান্য বিপ্লবী কমিউনিস্টরা মতিন আলাউদ্দিন দেবেন শিকদার ও আবুল বাসারের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সম্মুখে গড়ে তোলেন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। নবগঠিত এ পার্টি জনগণকে পরিচালনা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষ জায়েদারী পদলিখের গুলিতে শহীদ হলেন কমরেড আসাদুজ্জ-
মান, শহীদ হলেন রুমতম, মতিউর আরো নাম না জানা অনেকে। মাও-
লানা ভাসানী ক্ষিপ্ত জনতাকে যে কোন মূল্যে এ সরকারকে প্রতিহত করার আদেশ দেন। বিপ্লবী বীর জনগণ সৈদীন সশস্ত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তাঁরা স্বাক্ষর করে-
ছিলেন ক্যান্টনমেন্ট। সরকারী দালালদের প্রচার কেন্দ্র, দালাল মন্ত্রীদের বাড়ী, সরকারী অফিস আদালত, পুলিশ মিলিটারীর গাড়ী, শহর গ্রামের থানার থানার এ বিপ্লবী জনতা সৈদীন করে-
ছিলেন অগ্নি সংযোগ, শোষণ নিপীড়ন থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য স্বতন্ত্র জনতা সৈদীন সর্বাত্মক বিপ্লবী প্রচেষ্টা চালিয়ে-
ছিলেন। অবশেষে আতঙ্কগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীল আইয়ুব সরকার জনগণের শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নবগঠিত পূর্ব-
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি তখনো জনগণকে নেতৃত্ব দেবার মত সুসং-
গঠিত হয়ে উঠতে পারে নি, তাদের এ দুর্বলতার কারণে জনগণের বিপ্লবী নেতৃত্ব শেখ মুজিবের হাতে চলে যায়। কিন্তু শেখ মুজিব তার শ্রেণীগত চরিত্রের জন্যই জন-
গণের বিপ্লবী চেতনায় আতঙ্ক-
গ্রস্ত হন এবং তাদেরকে ভুলপথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে আপোষ আলোচনায় লিপ্ত হন। ফলে জন-
গণের বিপ্লবী ভূমিকা ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় এবং অবি-
প্লবী ভূমিকা গ্রহণের ফলে সংগ্রামী জনগণকে বিপ্লবী গণস্বপ্নের পথে নিয়ে যাবার একটা মূর্খ সুযোগ

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ তোহা সাহেবরা নস্যাক-
করেছেন।
মাওলানা ভাসানী অতঃপর সম্মুখে অনর্ন্তভাবে দ্বিতীয় কৃষক সম্মেলনে সি আই এর একটি দলিল সম্পর্কে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন। সে দলিলে ভারত পাকিস্তান সরকারের মাঝে কনফেডারেশনের চুক্তিতে দুই বাংলা ও আসামকে নিয়ে নতুন "বেংগাম" রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে মহান চীনের বিরুদ্ধে একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের কথা লিপিবদ্ধ ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। দলিলটি তিনি মোহাম্মদ তোহাকে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেন। মোহাম্মদ তোহা দলিলকে তথাকথিত দলিল বলে উল্লেখ করেন এবং তা প্রকাশে বিরত থাকেন। পরে তিনি তার নিকট এ দলিলের উপস্থিতি অস্বীকার করেন। এতে উভয়ের মাঝে পরস্পর বিরোধী অভি-
যোগের বিনিময় হতে থাকে এবং জনগণের মনে মোহাম্মদ তোহার কার্যবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। মাওলানা ভাসানী এবং মোহাম্মদ তোহার মাঝে এভাবে যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তার থেকে অকাঙ্ক্ষিত পাবার জন্যই মোহাম্মদ তোহা তার দীর্ঘদিনের পরিচয়ে গড়া ন্যাপ, কৃষক সমিতি এবং শ্রমিক ফেডারেশনকে বিপ্লবের পরিপন্থী পার্টি বুর্জোয়া সংগঠন হিসাবে এবং মাওলানা ভাসানীকে বিপ্লব বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে অভিযুক্ত করে এ সকল প্রতি-
বিপ্লবী গণসংগঠন থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।
কিন্তু মোহাম্মদ তোহা সম্পর্কে গণমনে এক তীব্র জিজ্ঞাসা বিরাজ করতে থাকে। কৃষি বিপ্লবের এতবড় একজন বিপ্লবী নেতা (নোয়াখালীতে যাদের পরিবারের তিরিশ হাজার বিঘা জমি আছে) সুদীর্ঘ অট বহুর যাবৎ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি, ন্যাপের সম্পাদক এবং কৃষক সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেও সেখানে কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন না কেন? এমন সব প্রতিবিপ্লবী কৃষক শ্রমিক সংগঠনগুলিতে দীর্ঘ দিন তিনি কেন ছিলেন এবং সেখানে তাঁর মত বিরাট বিপ্লবীর কি ভূমিকা ছিল? সকল শ্রমিক কৃষক সংগঠন যে প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব বিরোধী সংগঠন তা উপলব্ধি করতে মোহা তোহার মত বিপ্লবীর এত দীর্ঘ সময় লাগলো কেন? তিনি কি কোন উদ্দেশ্য-
প্রণোদিত হয়ে এসব বলছেন? নাকি তোহা সাহেব নিজেই প্রতি-
বিপ্লবী ইত্যাদি জিজ্ঞাসার ধ্বং-
জালে জনগণকে ফেলে রেখে মহান বিপ্লবী নেতা তাঁর বিপ্লবী দল-
বল নিয়ে সকল বিপ্লব বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সংস্পর্শকে চরম ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেন।

৪৩শ্রু মুখ্যতঃ
শ্রীমাদেশের রাজনৈতিক প্রোগ্রাম ৫'০০

দীপায়ন ১৮৮, ট্যাক্স লেন, কলকাতা ১

বিজয় বনাম সিদ্ধার্থ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সারা ভারত জুড়ে রাজ্য বিধান-সভাগুলির নির্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন হতে পারে। তখন নাহার-বিরোধী উপদলের হাতে প্রদেশ কংগ্রেসের কর্তৃত্ব রাখা প্রয়োজন যাতে নির্বাচনে মনোনয়ন দেবার চূড়ান্ত ক্ষমতা তাঁদের হাতেই থাকে।

এই উপদলটী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীকে বদ্বিয়েছেন যে বিজয় সিং নাহারের সঙ্গে অভ্যুত্থান-প্রফুল্ল চক্রের গোপন আঁতাত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসে সংগঠনপন্থী কংগ্রেসের সদস্যদের অনেক ইন্দিরা বিরোধী নেতাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার জন্যে বিজয় সিং নাহার আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছেন। বীজেশ সেন, অবনী বসু, আনন্দ-গোপাল মুখোপাধ্যায়, বীরেন মৈত্র প্রমুখ সংগঠনপন্থী কংগ্রেসের জেলা নেতাদের সঙ্গে বিজয়বাবুর কথাবার্তা হবার পরই সংগঠন কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির সভায় সংগঠন কংগ্রেস তুলে দিয়ে সবাইয়ের ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদানের সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বিজয় সিং নাহারের বিরোধী উপদলের নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেন যে একদিন ফাঁরা অভ্যুত্থান প্রফুল্ল চক্রের বশব্দ হয়ে ইন্দিরা বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের আর কোনদিন শাসক কংগ্রেসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইন্দিরা-পন্থী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী থেকে সমস্ত প্রদেশ কংগ্রেসকে জানিয়ে দেন যে সংগঠনপন্থী কংগ্রেসের কেন নেতা বা কর্মী তাদের সংগঠন ছেড়ে দিয়ে ইন্দিরা-পন্থী কংগ্রেসে যোগ দিতে চাইলে

তাদের সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান করে নিঃসন্দেহ হলে তবেই এ-সম্পর্কে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শ্রীবিজয় সিং নাহার সম্পর্কেও এই উপদলটী সন্দেহান। কারণ তিনি শ্রীঅতুল্য ঘোষের জনসেবক ট্রাস্টের এখন পর্যন্ত একজন বিশ্বস্ত ট্রাস্টি। অপর ট্রাস্টিরা হলেন অভ্যুত্থানব্দ স্বয়ং, বদ্বাব্দ প্রফুল্ল সেন এবং ইতিপূর্বে হাওড়ায় নিহত পরলোকগত বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সিদ্ধার্থবাবু সঙ্গত কারণেই সম্ভবতঃ বিশ্বাস করেন যে বিজয়-বাবু আসলে অভ্যুত্থান ঘোষণার ট্রোজান হর্স। ইতিমধ্যেই দেখা গেছে যে সংগঠন কংগ্রেসের জেলা কমিটী-গুলির অধিকাংশ সদস্য ও কর্মকর্তারা জেলাস্তরে ইন্দিরা কংগ্রেসে ভিড়ে পড়েছেন। সিদ্ধার্থবাবু মনে করেন যে প্রদেশ কংগ্রেসে বিজয় সিং নাহারের কর্তৃত্ব থাকলে সুকৌশলে তিনি প্রাক্তন অভ্যুত্থানপন্থীদের দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসে স্থানীয় সংখ্যাধিক্য বাগিয়ে নেবেন। ফলে ভবিষ্যতে যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে বিজয়বাবুরা অনুগত গোষ্ঠীভুক্ত লোকদেরই পছন্দ করবেন। সেক্ষেত্রে সিদ্ধার্থ-তরুণ-পূরবী চক্রকে হটে আসতে হবে।

সিদ্ধার্থবাবু ইন্দিরা কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। তাঁরই উদ্যোগে সম্প্রতি কংগ্রেস হাই-কমান্ড সিদ্ধান্ত নেন যে কোন কংগ্রেস নেতা একই সঙ্গে সরকারী পদে ও সাংগঠনিক পদে থাকতে পারবেন না। অর্থাৎ বিজয় সিং নাহার উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদে চাইলে তাকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদটী ত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় তাঁকে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ

ছাড়তে হবে। বিজয়বাবু প্রথমে কংগ্রেস সভাপতির পদ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুগামীরা তাঁকে বদ্বিয়েছেন যে তাহলে তাঁর উপমুখ্যমন্ত্রীর পদও বেশীদিন থাকবে না।

বিজয়বাবু গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে হাই কমান্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বটে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবস্থার দরুন এই নিয়ম এ রাজ্যে এখন চালু হবে না। অর্থাৎ তিনি উপমুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস প্রদেশ সভাপতি দুটী পদেই থাকতে চান।

সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থবাবুরা সক্রিয় হয়েছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (ইন্দিরাপন্থী) সাধারণ সম্পাদক খোদ বিজয়বাবুর কাছে সরাসরি পরামর্শ করে জানতে চেয়েছেন যে তিনি যেন অবিলম্বে মনঃস্থির করেন কোন পদটী তাঁর কাম্য, উপমুখ্যমন্ত্রী না প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। কারণ তিনি একসঙ্গে দুই পদে থাকতে পারবেন না।

সিদ্ধার্থবাবু সম্প্রতি কলকাতায় চারদিন কাটিয়ে গেলেন, বিজয়বাবুর সঙ্গে তাঁর কোন কথাবার্তা হয় নি। বিজয়বাবুও গোপনে সংগঠন কংগ্রেস ও স্বীয় উপদলের সদস্যদের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক করছেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রিপদলোভী কংগ্রেসজন কংগ্রেস সদস্য দুই উপদলের কলহে ইশ্বন ঝুগিয়েই চলেছেন। সিদ্ধার্থবাবু শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লী থেকে এসেই সরাসরি রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল ধাওয়ানের সঙ্গে দুঘণ্টা ধরে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

বাংলা কংগ্রেস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আনবার ও নিরাপদ আগ্রয়ে রাখবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। অজয়বাবুর পক্ষ থেকে আলাদা একটা জায়গাও সভার জন্য ঠিক করে রাখা হয়েছে, কারণ বসন্ত বোস রোডের সভা ভেঙে গেলেই অন্য জায়গায় সভা বসবে।

প্রকাশ, শ্রীমুখোপাধ্যায় নাকি আগামী শনিবার একটা এসপার ওসপার করতে চান। শনিবার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কলকাতা আসছেন ও সমস্ত দিন থাকাবন। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায়ের খুবই ব্যস্ত থাকার সম্ভাবনা। তাই কেউ কেউ শনিবার বাংলা কংগ্রেসের সভার দিন একটু পিছিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছেন কোন দরকার নেই, শনিবারই সভা হবে।

তাই আগামী পাঁচই জুন বাংলা কংগ্রেস কর্মপরিষদের সভায় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে সকলকে বদ্বিয়ে দেবেন তার পক্ষে আর সুশীলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। সদস্যরা হয় তাকে না হয় সুশীলকে বেছে নিন। বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে হয় তিনি থাকবেন, না হয় সুশীল থাকবে, দুইজনের এক সঙ্গে থাকা বা কাজ করা সম্ভব নয়।

কোমলগরের ঘটনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হল একটি বাড়ীতে যেখানে ওদের বস্ত্রব্য অনুরায়ী ওদের বন্দু দেবু ব্যানাজীর থাকার কথা। সেখানে দেবু ছিল না, ওর বাবা পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ ওদের চিনতে পারলেন না। তাই ওদের নিয়ে যাওয়া হল অন্য একটি বাড়ীতে যেখানে ওরা দুপদরের খাওয়া এবং আতিথ্য পেল।

তারপরের ঘটনা হল ওদের আত্মীয় স্বজনেরা পুর্লিশের কাছে ওদের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ জানাল। আর অস্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গে পুর্লিশ গিয়ে ঐ অঞ্চলের একটি আম বাগানে হাজির হল যেখানে ওদের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তিনিটি কবরে।

দেখা গেল, ওদের হত্যার জন্য বন্দুক ছোরা ছুরি এবং গ্র্যাসিড ব্যবহার করা হয়েছে। হত্যার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল। আর ঐ অঞ্চলের ব্রিটিশ জনকে পুর্লিশ ধরে নিয়ে এল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। ধৃতরা সকলেই সি পি এম সমর্থক।

নিহতদের একজন বাদে সবাই নকশাঙ্ক অধ্যুষিত বাঁটার অধিবাসী। সকলেই শিক্ষিত, কেউ কেউ ইঞ্জিনিয়ার। এদের মধ্যে দুজন হিন্দ মোটর কারখানার কর্মচারী।

আই জি প্রসাদ বসু বলেছেন যে, যাদের ধরা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণাদিসহ কোন চার্জ-শীট এখনও তৈরী করা যায় নি। আদালতে যুক্তিগ্রাহ্য কোন মামলা খাড়া করা যাবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তিনি বলেছেন, স্থানীয় অধিবাসীরা কেউই পুর্লিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই হত্যাকাণ্ড যদি ঐ অঞ্চলেই হয়ে থাকে তাহলে ঘনবসতিপূর্ণ ঐ এলাকার লোকেরা অবশ্যই এই ব্যাপার সম্পর্কে অবগত। দেবু ব্যানাজীর বাবা ঐ অঞ্চলের অধিবাসী এবং পাড়ার ছেলেরা যদি নল্লিটি তরুণকে প্রথম তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তিনি ঐ ছেলের দলের অনেককেই চিনবেন। আর বন্দুক ছোরাছুরি দিয়ে পাড়ার মধ্যে দিনের বেলায় নয়জন জোয়ান তরুণকে হত্যা করা হলে পাড়ায় হট্টগোল পড়ে যাওয়ার কথা। এবং যেখানে হত্যা করা হয়েছে সেখানে বত সতর্কতাই হত্যাকারী নিকনা কেন হত্যার কোন না কোন সূত্র সেখানে পাওয়া যাবেই।

এই সমস্ত তথ্যই প্রসাদ বসু স্বীকার করেন কিন্তু ক্রোন্ডের সঙ্গে বলেন ঐ অঞ্চল সি পি এম-এর শক্ত ঘাঁটি এবং ওখানকার কোন লোককেই পুর্লিশ সাক্ষী হিসাবে পায় নি। এমন কি দেবু ব্যানাজীর বাবাও কোন কথা বলতে রাজি নয়। এই ভদ্রলোকের এক ছেলে পুর্লিশ অফিসার।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন :

এটা কি সম্ভব যে সি পি এম-এর সন্ত্রাসের ফলে দেবু ব্যানাজীর বাবা সমেত ঐ অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীরা ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না?

প্রসাদ বসু : সমস্ত অধিবাসীদের চুপ করিয়ে রাখার ক্ষমতা অবশ্যই সি পি এম-এর নেই। দেবু ব্যানাজীর বাবার বয়স পঁচাত্তর বছর। তাঁর ত আর বেশীদিন বাঁচার সম্ভাবনা নেই। তাঁর কিসের ভয়?

প্রশ্ন : তবে কেন পুর্লিশ বাড়ী বাড়ী গিয়ে যারা দল বেঁধে এত-গুলো ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল আর পরে হত্যা করল তাদের সম্পর্কে খবরাখবর জোগাড় করতে পারছে না?

প্রসাদ বসু : এইটাই রহস্য। তবে আমার স্থির বিশ্বাস যে সি পি এমই এই হত্যার জন্য দায়ী। কি তথ্য থেকে এই বিশ্বাস হল তা অবশ্য প্রসাদ বসু মহাশয় বলেন নি। খালি বলেছেন ঐ অঞ্চল সি পি এম-এর শক্ত ঘাঁটি।

মৃতদেহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সি পি এম-এর তরফ থেকে একটি বিবৃতি দিয়েছেন স্থানীয় দুজন পার্টির নেতা দীনেন ভট্টাচার্য, এম পি, এবং শান্তপ্রী চাটাজী। তাঁরা এই ব্যাপারে সি পি এম-কে জড়ানোর চেষ্টাকে এক জঘন্য ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন।

তাঁরা বলেছেন যে, যে অঞ্চলে মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেই অঞ্চল পুর্লিশ পৃষ্ঠ সমাজ বিরোধীদের আড্ডা। কাছাকাছি দিল্লী রোড, রঘুনাথপুর এলাকা সমাজবিরোধীদের লীলাক্ষেত্র। সেখানে লরী লুট, হত্যা, বন্দুক ছিনতাই প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। পুর্লিশকে এ ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীরা বহুদিন থেকে লিখিত এবং মৌখিক বহু অভিযোগ করে আসছে। এই সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই পুর্লিশ এতদিন গ্রহণ করেনি।

সি পি এম নেতারা দাবী করেছেন, অবিলম্বে এ ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় অথবা অন্য কোন উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত হোক। আর এস পি-র তরফ থেকেও অনুরূপ তদন্তের দাবী করা হয়েছে এবং সেই সূত্রে বলা হয়েছে যে বারাসতের ঘটনার ব্যাপারটা পুর্লিশ বোমালুম চেপে গেল।

স্মরণ থাকতে পারে যে, বারাসত ঘটনার তদন্তের জন্য বিচারপতি টি পি মুখাজী নিযুক্ত হয়েছিলেন আর তার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ছুরিকাঘাতে আক্রান্ত হন। পুর্লিশ সে ব্যাপারেও কোন তদন্ত করেনি। সরকারও এ ব্যাপারে অন্য কোন বিচারপতিকে তদন্তের জন্য নিয়োগ করেনি।

দুর্ভাগ্যবশত ঘটনার ব্যাপারে সরকার তদন্ত বিষয়ে নীরব। কেন?

অর্কেষ্ট্রা ব্যালেরিনা

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিজস্ব অর্কেষ্ট্রা ব্যালেরিনা, কলিকাতা-৬

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সার শ্যামল সেন বরখাস্ত হয়েছেন। অধীর চক্রবর্তী অধুনালুপ্ত স্বাধীনতা পত্রিকার চীফ রিপোর্টার ছিলেন। তারপর তিনি বসুমতী পত্রিকায় বিশেষ প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। উনিশশো সাতষটি সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় প্রচারমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে সোমনাথ লাহিড়ী লক্ষ্য করেন দপ্তরটি কংগ্রেসী “মালে” ভর্তি। তখন মন্ত্রিসভায় স্থির হয় নতুন পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচজন ইনফরমেশন অফিসার নেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী সোমনাথ লাহিড়ীকে চেয়ারম্যান করে একটি সিলেকশন কমিটি গঠিত হয়। এরপর সোমনাথ লাহিড়ী ও জ্যোতি বসু যুক্তভাবে অধীর চক্রবর্তীকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে ঐ পদে আবেদন করতে অনুরোধ জানান। শ্রীচক্রবর্তী স্থায়ী চাকরীতে থাকা সত্ত্বেও ওদের অনু-

রোধে আবেদন করেন। সিলেকশন কমিটি অধীর চক্রবর্তী সহ সি পি আইয়ের মুখপত্র কালান্তরের সাংবাদিক মাণিক সরকার এবং আর একজন (ইনি মারা গেছেন) এবং আরও দুজন সাংবাদিক এই মোট পাঁচজনকে ইনফরমেশন অফিসার পদে মনোনীত করেন।

কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ-পত্র দেওয়ার আগেই প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ফাইলটি কিন্তু সরকারী দপ্তরে থেকে যায়। উনিশ শো উনসত্তর সালে শ্বিতীয় ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে প্রচার মন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য পূর্বসূরী সোমনাথ লাহিড়ীর সুপারিশ কার্যকরী করেন। অধীর চক্রবর্তী ও মাণিক সরকার সরকারী পদে যোগদান করেন।

নদীয়া জেলার ইনফরমেশন অফিসার পাবলিক সারভিস কমিশনের মারফৎ নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সি পি এম সমর্থক সৈজন্য তাঁকেও বিজয় সিং নাহার বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্বর্তীকালীন অডিট রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটিত

হীরেন বসু

কলকাতা কর্পোরেশনের টাকার অভাব একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সেই কর্পোরেশনের প্রাপ্য টাকা কি ভাবে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে তার কাহিনী ১৯৬৭-৬৮ সালের অন্তর্বর্তীকালীন অডিট রিপোর্টে জানা গেছে। যেসব উপায়ে কর্পোরেশনের প্রাপ্য লক্ষ লক্ষ টাকা মারা যাচ্ছে তার মধ্যে আছে কর্পোরেশনের কয়েকজন অফিসারদের কাছে পাওনা, ট্যাক্সের সার্ভিসমেন্টারী বিল বাদ বকেয়া, বে-আইনী এ্যাসেস-মেন্টের জন্য লোকসান, রেসের ঘোড়ার মালিকদের কাছে প্রাপ্য ট্যাক্সের বেআইনী ছাড়, বিজ্ঞাপনের ট্যাক্স কম করে ধরা, স্টলওয়ালাদের দৈনিক ভাড়া বেআইনী হ্রাস, প্রভৃতি।

অফিসাররা অগ্রিম নিয়ে
হিসেব দিচ্ছেন না
কয়েকজন অফিসার কর্পো-

রেশনের কোন কাজ করা বা জিনিষ কেনার জন্য টাকা অগ্রিম নিয়েছেন যার হিসেব বা বিল ১৪।৮।৫০ তারিখের ৪১৩ নং রেজোলিউশান অনুযায়ী কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার একমাস অথবা জিনিষ কেনার পনেরো দিনের মধ্যে দিতে হবে। কিন্তু কয়েকজন অফিসার হিসেব দেননি। যেসব অফিসারের নামে এই টাকা পড়ে আছে তারা হলেন ওয়ার্টার ওয়ার্কসের এঞ্জিনিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার টালিগঞ্জের এ্যাসেসর ও কালেক্টর, হেলথ অফিসার। এরা যথাক্রমে ৬৭-৬৮ সালের কয়েকমাসের মধ্যে ৭০,১৫১-৩৭ টাকা, ৮১,০৩৪,০৭ ২৬,৩৭৪-০০ টাকা এবং ৯,৮৫০-০০ টাকা নিয়েছেন।

সার্ভিসমেন্টারী বিল দেওয়া হয়নি
অডিটের টেস্ট চেকে দেখা

গেছে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে (টালিগঞ্জ বাদে) মোট এক কোটি টাকার মত সার্ভিসমেন্টারী বিল করদাতাদের নিকট উপস্থিত করা হয়নি। এদের নাম ও ঠিকানা ক্যালকাটা ক্রেডিট কর্পোরেশন লিমিটেড, ২৪ পার্ক স্ট্রীট; বিনয় কুমার গোস্বামী ২৭বি ক্যামাক স্ট্রীট; জেওয়ানলাল (১৯২৯) লিঃ, ২৩ রেবোর্ণ রোড; মেটা সুরিয়া (প্রা) লিঃ, ১৪।১বি এজরা স্ট্রীট; বাগানিয়া কোঃ লিঃ, ২৩এ নেতাজী সুভাষ রোড; স্টেট গভর্নমেন্ট অফ আসাম, ৮ রাসেল স্ট্রীট। এদের সার্ভিসমেন্টারী বিলের পরিমাণ যথাক্রমে ৮১৭১৬ টাকা, ৭১৩৯০ টাকা, ১৫৮২২৭ টাকা, ১৩৯৭৪১ টাকা, ৮৬২৭৭ টাকা ও ১৯১০৮০ টাকা।

কয়েকটি নাম দেওয়া হল।
এছাড়া আরও অনেকে আছেন।

১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের ভ্যালুয়েশনের তিরিশ হাজারটি অবজেকশান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলেও এ্যাসেস-মেন্টের খাতা সংশোধন করা হয়নি। এদের কয়েকজনের নাম ও ঠিকানা কৃষ্ণন দে, ৪২ বালিগঞ্জ স্টেশন; এন পি সিং ও অন্যান্য, ২৩এ। ২১৯ ডায়মন্ডহারবার রোড; শ্রীমতী অরুণমতী মৃথোপাধ্যায়, ২৩এ। ৩৯৫ ডায়মন্ডহারবার রোড; ইউনিয়ন জুট মিল কোং বারো, কনভেন্ট রোড। এদের সার্ভিস-মেন্টারী বিলের পরিমাণ যথাক্রমে ২৮১৮৮-১১ টাকা, ১৭৫৮৬ টাকা, ১০৯০৮ - টাকা এবং ২১৯৮৬ টাকা।

সংশ্লিষ্ট অবজেকশান রেজিস্টার পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৪৮-৪৯ থেকে ৬৮-৬৯ সালের বিভিন্ন সময়ের ২৩০৬৮টি অবজেকশান সম্পর্কে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ফলে পঞ্চাশ হাজারের বেশী টাকার সার্ভিসমেন্টারী বিল করা হয়নি।

বেআইনী ছাড়
ট্রেস্ট অডিটে দেখা গেছে যে, কয়েক ক্ষেত্রে বে-আইনীভাবে জমির মূল্যের ওপর শতকরা দশ ভাগ বাদ দেওয়া হয়েছে ফলে কর্পোরেশনের ৯৫,৫৫২-৬৮ টাকার মত লোকসান গেছে। এই বে-আইনী ছাড় যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের ঠিকানা ও টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ২৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, ৪, শশীশেখর বসু রোড, ৪ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, ১৭, ৬, ১৫ নেতাজী সুভাষ রোড এবং ৯, ৫৩৩ টাকা, ১৮১৪ টাকা, ৮৭০৮ টাকা ও ৫০৮৪ টাকা, ১৮৮৪০ টাকা, ১৫১১৫ টাকা ও ৫,৭৩০ টাকা ১৫০৬০ টাকা ও ১১,৯৪৭ টাকা।

অডিটে দেখা গেছে কয়েকটি রেসের ঘোড়ার মালিকদের ১৯৬৭-৬৮ সালের প্রথমার্ধের প্রদত্ত ট্যাক্স আংশিকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে যদিও রেসিং ক্যালেন্ডার থেকে দেখা যায় যে এরা ঐ সময় দৌড়েছে। এইসব ঘোড়ার মালিক ও ঘোড়ার নাম যথাক্রমে এস এম ওমর, ডি এন ব্যানার্জী, এস ডবলু শর্মা, অশোককুমার সিং এবং মিন্ট মানি, ওয়াইল্ড ম্যানার ও সাহি বুলবুল।

যারা ট্যাক্স দেয়নি তাদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এদের নাম ও ঘোড়ার নাম আর এইচ রাইট ও আর ডবলু এম ক্লার্ক (সার ফ্রান্সিস) ডি এন ব্যানার্জী ও এস ডবলু শর্মা (ওয়াইল্ড ম্যানার) অশোককুমার সিং (সাহি বুলবুল) আর এল আগরওয়াল (আটা-লিয়া)। যোগিন্দর সিং (লং ফেলো, মহারাজাস গার্ল) মিসেস ডি পি চ্যাটার্জী (প্রিন্সেনেরো) কে নাগার্জুন (আওয়ারা, সীতা) জে ডবলু ক্লার্কস ই এল অ্যাবাস্টন (সিম্পল লিমন, গালিকো)

১৯৬৬-৬৭ সালের বিজ্ঞাপন ট্যাক্সের রেজিস্টার পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পঁয়ষট্টিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারের অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ হারে বিজ্ঞাপন ট্যাক্স ধরা হয়েছে, ফলে ৭,৯৩১-০০ টাকা ক্ষতি।

চীফ ভ্যালুয়ার ও সার্ভিসার বিভাগের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, ট্রামের সেলটার ও রাস্তার কিছু হোড়িং কর্পোরেশন ক্যালকাটা স্ট্রীট আডভার্টাইজিং কোং ও সেলভেল সিন্ডিকেটকে লীজ দিয়েছে। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কেরামতীতে কর্পোরেশনের ৩,৬৯৬,০০ টাকা লোকসান।

স্টলের ভাড়া হ্রাস
১৯৬৮ সালের ২৫শে নভেম্বর হগ মার্কেটের ষোলটি স্টল পয়লা ডিসেম্বর থেকে একমাস ক্রিসমাস ডেকোরেশন বিক্রির জন্য আট-জনের দৈওয়া হয়। তারা প্রত্যেকে ঐ দিন এক হাজার টাকা করে অগ্রিম দেয়। শর্ত অনুযায়ী তাদের স্টলে বসার আগে তাদের ভাড়া বাবদ আরও ২৮,৭০৬ টাকা দেবার কথা। সে টাকা না দিয়ে তারা যুক্তভাবে আবেদন করল অগ্রিমের টাকা ফেরত দেওয়ার। এক নং ডি সির সুপারিশে স্ট্যান্ডিং ওয়ার্কস ও টাউন প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান অগ্রিম বাজেয়াপ্ত করার এবং ১।১২।৬৮ তারিখে নতুন অকশানের আদেশ দিলেন। ঐদিনই আবার, অকশান করে আগের লোকদেরই কম ভাড়া ঐ স্টল দেওয়া হল। অডিট নোটে বলা হয়েছে “গোপন বোঝাপড়া” মারফৎ ঐ স্টল দেওয়া হয়েছে। ফলে কর্পোরেশন ১৪,৮৯৯-০৪ টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্যান্ডিং স্ট্যান্ডিং কমিটি অথবা কর্পোরেশনের অনুমতি নেওয়া হয় নি।
লেক রোড মার্কেটের একটি রকের আঠারো ও দশ নং স্টল (আয়তন ১৫৬ বর্গফুট) বিজয় কুমার নাথ নামে এক ভদ্রলোক ভাড়া নেন। স্টল দুটি এক করার পর বিষয়টি স্ট্যান্ডিং ওয়ার্কস ও টাউন প্ল্যানিং কমিটিতে পেশ করা করা হয় এক নং ডি সি মারফৎ এবং প্রতি বর্গফুট পাঁচটাকা দৈনিক ভাড়ার সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরে পার্টির আবেদন ক্রমে কমিটি দৈনিক ভাড়া বর্গফুট প্রতি পাঁচ টাকার স্থলে দৈনিক ১-৫০ টাকা ধার্য করে। ফলে দৈনিক ভাড়া ৭-৮০ টাকা থেকে ১-৫০ টাকা কম গেল। এতে কর্পোরেশনের লোকসান হল ১১,৪৫৫-৪০ টাকা এবং এই লোকসান চলতে লাগল।

এডুকেশন কর্পোরেশন ব্র্যালে

কেন এই ব্যর্থ অনুকরণ?

(দর্পণের সমালোচক)

এডুকেশন কর্পোরেশন নামক একটি সংস্থা কিছু কাল যাবৎ শহরে পাশ্চাত্য নৃত্যনাট্যগুলির আংশিক উপস্থাপনা করে আসছেন। তিরিশে মে রবীন্দ্রসদনে এরা দেখালেন নাটক্যাকার, সোয়ান লেক (চাইকোভস্কি), ডাইং সোয়ান (সেন্ট সাইন), ফায়ার বার্ড (স্ট্র্যাভিনস্কি), গীজেল (অ্যাডাম) এবং যোহান সেবাস্তিয়ান বাখের ব্র্যান্ডেনবার্গ কণ্ঠতোঁরা অবলম্বনে নৃত্যনাট্যের অংশ বিশেষ।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য নৃত্যের পার্থক্য মৌলিক। প্রথমটি তাল-প্রধান আর দ্বিতীয়টি ছন্দ ও রূপ-প্রধান। ছন্দ এবং দেহভঙ্গিমা দিয়ে নানান নয়নাভিরাম অঙ্গসৌন্দর্য রচনার দ্বারা নৃত্যবিষয়ের ভাবাভিব্যক্তি ঘটানোর দিকেই পাশ্চাত্য নৃত্যের ঝোঁক। ভারতীয় নৃত্যের নায়ক নায়িকা দেবতা বলে সেখানে মানবিক ভাবানুভূতির বালাই নেই কিন্তু পাশ্চাত্য নৃত্যনাট্যের উদ্ভব ফরাসী বিপ্লবোত্তর বলে মানবিক কামনাবেদনা তাতে নিবিড় আশ্রয় লাভ করেছে।

আমাদের নর্তক নর্তকীরা নাচে পায়ের পাতার উপরে কিন্তু পাশ্চাত্য নর্তকীরা নাচে পায়ের আঙ্গুলের উপরে ভর দিয়ে। এর সর্বাধিকার তাই তাদের বিশেষ, ধরনের ব্যালে পাদুকা পরান হয়। এখানেও

সে ব্যবস্থা হয়েছিল মনে হলোও নর্তকীরা সে কায়দাটি পুরোপুরি আয়ত্ত্ব এখনো করতে পারে নি। নানা প্রকার জিমন্যাস্টিক ফর্ম পাশ্চাত্য নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলি আয়ত্ত্ব করা বিশেষ সাধনা-সাপেক্ষ। আমাদের নাচের অঙ্গ-সৌন্দর্য অর্জিত হয় হাতের বিবিধ মূদ্রার দ্বারা কিন্তু পাশ্চাত্য নৃত্যে হাত বা বাহুর প্রয়োগ তুলনায় কম।

এডুকেশন কর্পোরেশন ছাত্রীরা পাশ্চাত্য নৃত্যের সাধারণ ভাবে অনুকরণ করতে পেরেছেন বটে কিন্তু এই সব নাচে লাফানোতে বা চলাফেরায় যে সহজ সাবলীলতা থাকে তা তাদের নাচে এখনো আসে নি। এই ধরনের নাচের জন্য শরীর যত লম্বা হওয়া দরকার, অনেকের শরীরই তা নয়।

এদের নিজস্ব কোন অর্কেস্ট্রা নেই। টেপ-করা বাজনার সংগে (যা অনেক সময় কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবার উপক্রম করেছে) নাচবার ফলে অর্কেস্ট্রার শেষ মাত্রায় কম্পোজিশন করে থেমে নাটকীয়তা সৃষ্টির যে শর্ত আছে তা এরা পূরণ করতে পারে নি। তবু এই মধ্যে সব চেয়ে ভাল লেগেছে সেবাস্তিয়ান বাখের ব্র্যান্ডেনবার্গ কণ্ঠতোঁরা-সঙ্গে নৃত্য পরিকল্পনাটি।

যে কোন শিল্পরূপের ঐতিহ্য-ব্যতিক্রমে কোন দেশেই তার সার্থক সফলতা হতে পারে না। আমরা পায়ের পাতা এবং গোড়ালির উপরে ভর দিয়ে চলি বলে আমাদের নাচ অঙ্গুলিনির্ভর নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যে পায়ের আঙ্গুলের উপরে ভর দিয়ে হাঁটে বলে ওদের নাচ ঐ রকম। মানবের শিল্পরূপ কখনো তার সামাজিক রীতিনীতির বিরোধী হতে পারে না। পাশ্চাত্য পদচারি একটি অস্বাভাবিক কারণ কোন মানুষই অতটা উটকো হয়ে হাঁটে না। সেইজন্য ইসাডোরা ডানকান পুরো পা পেতে নাচার স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রচলন করেন। আধুনিক পাশ্চাত্য নৃত্যে তাই চলে।

কিছু মাত্র আশ্চর্য নয় যে, কেবল অনুকরণের দ্বারা কোন বিদেশী নৃত্যরীতিকে আয়ত্ত্ব করা যায় না। এডুকেশন কর্পোরেশন তা পারে নি। এ জিনিসের ঐতিহ্য গড়ে না ওঠা পর্যন্ত একে পুরোপুরি আয়ত্ত্ব করা যাবে না। অনুকরণের আড়ম্বরতা লেগেই থাকবে এর গানে।

তা ছাড়া, খামোকা নকল করে লাভই বা কী? লাভ হতে যদি এরা একে আঙ্গুসাং করে আমাদের দেশের রূপকথা, পদরাগ বা ইতিহাস নিয়ে নতুন কিছু রচনা করতে পারতেন। পাশ্চাত্য ব্যালের প্রভাব সেখানে সার্থক হত। যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে। রবীন্দ্রনাথের যুগের মানসিকতা ও তার চাহিদাকে নতুন নতুন রূপ-বন্ধে সংযোজিত করতে পারলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পরিচয় সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

সম্পাদক-হীরেন বসু

কলকাতার দূতাবাসগুলিতে বদলী ও নতুন নিয়োগের হিড়িক

দর্পন

কারণ রাজনৈতিক ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হঠাৎ কি যেন একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে! মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছাড়ে কলকাতা এলেন। দূতাবাসে দূতাবাসে গুপ্তন, ফিসফিসানী। বাংলাদেশ? ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ? পঞ্চাশ লক্ষ নবাবগত শরণার্থীর চাপ? পশ্চিমবঙ্গে ধর্মায়িত অসন্তোষ?

এলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। আনন্দবাজার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখল, “যুদ্ধ না শান্তি—প্রধান প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীকে”? খবর নয়, খবর তৈরী করার চেষ্টাও আনন্দবাজারের কল্যাণে খবর হয়ে

উঠলো। খবরের কাগজ পুরোপুরি “দাবীদিবসের” হ্যাণ্ডবিল হয়ে উঠেছে।

তাই বোধ হয় দূতাবাসের অফিসগুলোতে বদলীর পালা চলেছে। সোবিয়ত, মার্কিন, পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী উত্তর কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স এবং মধ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশ নিয়ে প্রায় সবকটি দেশের কলকাতা দূতাবাসে নতুন নতুন লোকের আমদানী হচ্ছে।

সবাই জানেন (সেলার ও শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

কোন্নগরের

হত্যাকাণ্ড

নারীঘটিত ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কোন্নগরে নয়জন যুবক হত্যার সঙ্গে কি কোনো নারীঘটিত ব্যাপারের যোগাযোগ আছে? মিতীতঃ এই যুবকদের সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা এবং বর্তমানে বিধান সভার স্পীকার অপূর্বলাল মজুমদারের কি সম্পর্ক?

দর্পণ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছে, কোন্নগরের ঘটনার সঙ্গে নারীদেহ বিক্রয় এবং এই সংক্রান্ত পাপ ব্যবসায়ের সম্পর্ক আছে। এই ঘৃণ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হাওড়ায়। ঘটনার সঙ্গে সি পি এমকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে জড়ানো হচ্ছে। আই জি পুর্লিশের চাকরীর মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। তাই তিনি প্রকাশ্যে সি পি এম বিরোধী হয়ে এক্সটেনশনের চেষ্টা করছেন।

আর অপূর্ব মজুমদারকে এই ব্যাপারের দারুণ ছোটোছোটো করতে দেখা যাচ্ছে কেন? উনি বলেছেন, নিহতরা অরাজনৈতিক ছেলে ছিল। তাহলে একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে এতগুলো অরাজনৈতিক ছেলের পরিচয়ের কারণ কি? পুর্লিশকে যদি সত্যিকারের তদন্ত করতে দেওয়া হয় তবে অনেক গোপন ঘটনায় আলোকপাত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মাহিষ্য পাটি করে

জুশীল ধাড়া

অজয়বাবু ও

বিশ্বনাথকে

দেখে নেবেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্রীসুশীল ধাড়ার সব চেষ্টাই একের পর এক ব্যর্থ হয়ে ভেসে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও বাংলা কংগ্রেসে তিনি কর্মপরিষদের এগারো জন সদস্যের বেশী পান নি। এম এল এদের মধ্যেও একটি ভাঁড়কে সঙ্গে পেয়েছেন মাত্র কিন্তু সেই ভাঁড়ও যে কোন সময় কেটে পড়তে পারে। অবশ্য তাতে হাল ছাড়েন নি ধাড়া মশায়। তিনি ঠিক করেছেন মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীতে মাহিষ্য পাটি করবেন। মাহিষ্যদের এককাটা করে তিনি অজয়বাবু, বিশ্বনাথবাবু দুই বান্দন ভাইকে জোখাবেন।

তাই শ্রীধাড়া অনেক ভেবে



কলকাতার ফুটপাথে বাংলা দেশের শরণার্থী। ছবি : প্রণব মদখাজী

হাওড়ার মাহিষ্য সমাজের নেতা ডাঃ পুর্ণেন্দু খাঁকে সভাপতি করেছেন এবং সম্পাদকমণ্ডলীতে ডাঃ এস পি বাগ সহ অন্য মাহিষ্যদের রেখেছেন। শ্রীধাড়ার স্ট্রাটোজ হল মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীতে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। এই মাহিষ্যরা যদি একতাবদ্ধ হয় তবে নির্বাচনে কম করে বিশটি আসন দখল

করা যায়। সেই সঙ্গে মাহিষ্যরা এককাটা হলে অজয় মদখাজী ও বিশ্বনাথ মদখাজী দুই জনের দলেরই মেদিনীপুরে অবস্থা খারাপ করা যায়। এই ব্যাপারে শ্রীধাড়া বেশ কয়েকজন মাহিষ্য শিল্পপতির সহায়তা পাচ্ছেন। তার মধ্যে একজন প্রধান হচ্ছেন হাওড়ার।

আর এক দিকে শ্রীধাড়ার অনেকগুলি চেষ্টাই বানচাল হয়ে গেছে। বাংলা কংগ্রেসের সভায় সংখ্যাধিক্য লাভের আশায় তিনি বিমান খরচা দিয়ে দুজনকে এবং অন্যান্য সকলকে ট্রেন ভাড়া দিয়ে কলকাতা আনিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটের সময় বিমান খরচা দিয়ে আনা একজন সদস্য অজয়বাবুকে ভোট দিয়েছে। শুধু তাই নয়, শ্রীধাড়া সকলকে এতদিন বলে আসছিলেন দলে তার পক্ষেই সকলে, ভোট হলে বৃন্দ অজয় মদখাজী আর ছোকরা প্রণব মদখাজী গেহারা হেরে যাবে। বেশ কয়েকজনকে শেষ সময়েও এই বলে আতিয়ে রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীধাড়ার পক্ষে যে এগারোজন হাত তুলেছিল তার মধ্যে বেশ কয়েকজন অমরাই জিতোঁছ বলে হাত তুলেছিল।

কিন্তু পরে দেখলো বেশীর ভাগই চলে গেছে প্রণব মদখাজীর দিকে। ভোটে হেরে গিয়ে শ্রীধাড় আর সভায় বসে থাকেন নি। কারণ নিজের মদপাত নিজে বসে দেখতে চান নি। সেই দিন যে

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

সব সময় বিশ্বাসঘাতক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অজয় মদখাজী সব সময়েই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বাংলা কংগ্রেস ভাঙবার পর পশ্চিম বঙ্গের একজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মন্তব্য করেছেন : তেরো বছর কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মন্ত্রিত্ব করার পর উনি পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস ভেঙে বাংলা কংগ্রেস গড়েন। তারপর প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট ভাঙবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৬৭ সালে দোসরা অক্টোবর ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ধরমবীরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। মিতীতঃ যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মদখামন্ত্রী হবার

পর এই মন্ত্রিসভাও ভেঙে দেন। এবার ভাঙলেন বাংলা কংগ্রেস। ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে নিয়ে কি করেন তা দেখতে হবে।

এই নেতা আর একটি প্রশ্ন করেছেন জ্যোতি বসুর কাছে। সেটি হচ্ছে, মিতীতঃ ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় অজয় মদখাজীকে কেন মদখামন্ত্রিত্ব দিয়েছিলেন তার জবাব জ্যোতি বসুকে দিতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারূপে মদখামন্ত্রিত্ব তো জ্যোতি বসুর পাওনা ছিল।

কংগ্রেসী গুপ্তচরদের ধরা হচ্ছে না কেন?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

তথাকথিত পাকিস্তানী গুপ্তচরবৃন্দের অভিযোগে কংগ্রেসীদের আটক করা হচ্ছে না কেন? দর্পণ জানতে পেরেছে, পুর্লিশের লিষ্টে অন্ততঃ দুজন কংগ্রেসী মুসলমান নেতার নাম আছে। এদের একজন ভূতপূর্ব উপমন্ত্রী এবং একজন বর্তমান মন্ত্রিসভার মন্ত্রী। কিন্তু তাঁদের ধরা হচ্ছে না।

মিতীতঃ নব কংগ্রেস দলের আরো একজন নেতার নামও আছে। কিন্তু পুর্লিশকে এদের সম্পর্কে নীরব থাকতে হচ্ছে। বিজয় নাহার

ঘোষণা করেছিলেন, গুপ্তচরবৃন্দের সম্পর্কে মামলা করা হবে। কিন্তু এখন মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগ ও অন্ততঃ একজন মুসলমান মন্ত্রী মামলা করার প্রস্তাবে বাধা দিচ্ছেন। ওরা নিশ্চয়ই জানেন, মামলা হলে অনেক কাহিনী বেরিয়ে পড়বে। পুর্লিশও মামলা চাইছে না। কেননা তাহলে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের সত্যাসত্য জানা যাবে। এখন পর্যন্ত আই বি রিপোর্টের তথ্যে কোনো মামলা আদালতে দাঁড়ানি যে।

নেতাজীনগরে জ্যোতিবাবু

রবিবার তিরিশে মে, সি আর পি কর্তৃক নেতাজীনগরে তিনজন সি পি এম কর্মী নিহত হবার পরের দিন সকালবেলা “জনগণের” নেতা শ্রীজ্যোতি বসু, আজাদগড়, নেতাজীনগর অঞ্চলে পুন্ডলিশী অত্যাচারের- সরেজমিন তদন্ত এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন একটি কালো ফিরাট গাড়ী করে। তাঁর গাড়ীর সমনে ছিল জনা দুই পুন্ডলিশ অফিসার সহ একটি সশস্ত্র পুন্ডলিশের জীপ। তাঁর গাড়ীর পিছনে ছিল একটি বিরাট জ্বলন্ত ভাতি রাইফেলধারী সি আর পি। এই নিলম্ব দৃশ্য দেখে আমি এবং আমার মত অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। যে ঘণ্টা সি আর পির গুলীতে আগের দিনই তার দলের সক্রিয় কর্মীরা নিহত হয়েছেন সেই সি আর পির নিরাপদ প্রহরায় সি আর পিরই অত্যাচারের তথাকথিত “তদন্ত” করতে এসেছেন জ্যোতিবাবু। এই চরম বিবেকহীনতা ও ভন্ডামির কোন তুলনা নেই।

আজকের দিনে একজন নেতার নিরাপত্তার প্রশ্ন অবশ্যই আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে সি পি আই এম নিজেকে- সংগ্রামী- জনতার পাঁচি বসে দাবী করে তার কি নিজেদের নেতাদের রক্ষা

করার শক্তি নেই? যাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম তাদের কাছে গিয়েই কি হাত পাতে হয় জনগণের নেতাকে? তিনি যদি জনগণের একান্ত প্রিয় হন, তবে সেই নেতাকে রক্ষা করবে জনতার সম্মিলিত শক্তি, না প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের অত্যাচারী পুন্ডলিশ?

মতামত

প্রশ্নের শেষ এখানেই নয়। বাংলাদেশের বিপ্লবী মানুষকে আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ করি কেন জ্যোতিবাবু, মিলমালিকের প্রতিভু কংগ্রেস সরকার আর তার পোষা কুকুর পুন্ডলিশ ও সি আর পি যখন সাধারণ মানুষের উপর চালাচ্ছে চরম দমননীতি তখনই অত্যন্ত সহানুভূতি, রিণয় ও সৌজন্যে তারা ব্যগ্র- তথাকথিত বিপ্লবী নেতাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য। এর উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার। সুবিধাবাদী, ক্ষমতালোভী, বিপ্লবী মূখোপনয় এইসব নেতাদের সামনে খাড়া করছে শোষণশ্রেণী প্রাণপণে চেষ্টা করছে বিপ্লবী জনতাকে বিপথগামী করতে। যখন বিপ্লবী

পরিস্থিতি চমৎকার, চিরকালের পড়ে পড়ে মার খাওয়া নিপীড়িত মানুষ মার দেবার একচেটিয়া অধিকার শোষণ শ্রেণীর কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে শেবত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সক্রিয় লাল সন্ত্রাস গড়ে তুলছে তখন এই “নেতারা” চেষ্টা করছে কি করে জনতার রোষকে বন্ধ্যা “বন্ধ্য” ডেপুটেশনের মরা কামা আর নিছক কাগজে প্রতিবাদে পর্ববাসিত করা যায়।

পুন্ডলিশী অত্যাচারের ষোণ্য জবাব দেওয়ার জন্য যখন যদি বসু, টালীগঞ্জ অঞ্চলের সংগ্রামী মানুষ প্রস্তুত হচ্ছে তখন সি আর পির সশস্ত্র প্রহরায় লালিত জ্যোতিবাবুদের কলকাতায় আর একটি “বন্ধ্য”-এর মাধ্যমে পল্লী জুন একটি সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করা কি এই ঘণ্টা অপচেষ্টারই আর একটি প্রমাণ নয়? আমার স্থির বিশ্বাস নেতাজীনগরে তিনজন তরুণের আত্মবলিদান বৃথা যাবে না। বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ ক্ষমতালোভী এই সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে তাঁদের বিশ্বসম্মতিকতার চরম শাস্তি দেবেনই এতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। অনিন্দ্য চৌধুরী

অওয়ামী লীগ সম্মুখে মোহভঙ্গ হোক

পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ ছিন্ন-মূল যখন নিরাপত্তার অবস্থায় থোলা আকাশের নীচে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন ক্রমে প্রাণে বেঁচে আছে, তখন আমরা অওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে আরামে আয়্যাসে বহাল-তবিলতে কলকাতার বিভিন্ন অট্টালিকাতে ফুটির আসর জমাতে দেখতে পাচ্ছি। তাদের সংকীর্ণমনা, স্বার্থপর দুর্বল নেতৃত্ব পূর্ব বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনা করতে ব্যর্থ এটা অজ্ঞ সবাই উপলব্ধি করতে সক্ষম। তাদের স্বারা আর যাই হোক না কেন, জাতীয় স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। অতি সতর্কতায় এর পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টদের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সংবাদ চেপে রেখেছে। কিন্তু ক্রমে সত্য প্রকাশিত হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে অওয়ামী লীগের আসল রূপ। নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে আজ তারা প্রতিক্রিয়াশীল ইন্দিরা সরকারের পুন্ডলিশ বাহিনীর নিকট পূর্ব বাংলার বঙ্গপন্থীদের ধরিয়ে দিচ্ছে। শত্রু তাই নয়, ইন্দিরার গুপ্তচর বৃত্তি করে তারা বিভিন্ন সি পি এম নেতাদের বিরুদ্ধেও গুপ্তচর বৃত্তির মিথ্যা অভিযোগ আনছে। তাদের কার্যকলাপে স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, অওয়ামী লীগ নেতৃত্ব হচ্ছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল, কট্টর কমিউ-

নিস্ট বিরোধী এবং ইন্দিরা সরকারের দলীল ও স্নেহভাজন। এদের এ ধরনের কার্যকলাপ বিনাপ্রতিবাদে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এরা প্রতিক্রিয়াশীল ইন্দিরা সরকারের পেটোয়া একটি গুপ্তচর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, যা শত্রু পূর্ব বাংলারই নয় পশ্চিম বাংলারও কমিউনিস্টদের সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পূর্ব বাংলার নির্বাচিত দুঃখী উদ্ভাস্তদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ বা তাদের বিরুদ্ধে আমা-

দের কোন বস্তব্য নেই। বরং তাদের এ দুর্দিনে আমরা যথাসম্ভব সাহায্য-সহয়তা করছি এবং আরো করবো। কিন্তু সি পি এম-এর একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে আমি আমার পার্টির নেতৃত্বকে কোন মোহাবন্ধ না থেকে বরং অওয়ামী লীগের নেতৃত্বের কাষাবলী পার্টির ভবিষ্যত চিন্তাকরে সম্মত থাকতেই মোকাবেলা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

খুনী কংগ্রেসকর্মী হয়ে গেল!

আনন্দবাজারে প্রকাশিত দোসরা জুন বরাহনগরে অশ্বিনী ভৌমিক নামে একজন কংগ্রেস কর্মী নিহত নকশালপন্থীদের সহিত সংঘর্ষে। ভাবতে আশ্চর্য লগে অহিংস অজয়বাবুর দল কি ভাবে একজন খুনী লঙ্ঘনপন্থকে কংগ্রেস কর্মী বলে সনাক্ত করলেন। তবে হ্যাঁ, এক হিসাবে সে কংগ্রেস কর্মী, কারণ কত সি পি এম এবং সি পি এম এল কর্মীকে সন্দেহ করে শীলের ঘাটে (গঙ্গার ঘাট) নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তার হিসাব রাখা আশেপাশের বাসিন্দাদের পক্ষে অসম্ভব। কত তরুণ ছেলে বারবার ক্ষমা চেয়েছে পায়ে লুটিয়ে পড়েছে এ গান্ধিবাদী

অহিংস কংগ্রেস কর্মীর কাছে, কিন্তু বিফল হয়েছে তাদের শেষ প্রাণভিক্ষা। কত মায়ের কোল খালি হয়েছে। কত বোয়ের সিঁদুর ধরে গেছে গঙ্গার স্রোতে তার কি হিসাব রেখেছেন কংগ্রেস নেতা অজয়বাবু? ইনি এখন নেবেছেন কমিউনিজমকে দেশ থেকে উৎখাত করতে। কিন্তু পারবেন কি? এখন অশ্বিনীর চেলাচামুণ্ডদের ঠেলার প্যাড়ায় টেকা দায়। জানিনা তাদের এই দৌরাঙ্ক কবে কমবে। কবে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে জীবন-যাপন করবে।

বাবলি বসু

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে

দপন শ্রীপ্রবীর বসুর প্রবন্ধটি পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে এই প্রবন্ধে করতে বাধ্য হচ্ছি। শ্রীবসু তার ইয়াহিয়া-ইন্দিরা ও বাংলা দেশ প্রবন্ধের একেবারে শেষ অনুচ্ছেদের এক বায়গায় লিখেছেন, “মুজিবের ইন্দিরা এবং বিচিত্র বাঙালী প্রেমের নিলম্ব ভন্ডামীর উপরে এটিই আশার কথা পূর্ববঙ্গের পথ ভিন্নতানামের পথে যাবেই। কাবণ এই সৈনিক অবাধি পাক সরকারের ভাড়া করা গুন্ডা আনসার, ইস্ট পাক রাই-ফেলস আর বাঙালী রেজিমেন্ট দিয়ে আর যাই হোক, মুক্তিযুদ্ধ হতে পাবে না, নতুন মুক্তিযোদ্ধা লাল পতাকা নিয়ে আসছে।

দেখা যাচ্ছে, শ্রীবসুর দৃষ্টিভঙ্গীতে বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের সবটাই ভন্ডামী! কিন্তু তখন মুক্তি যোদ্ধা লাল পতাকা নিয়ে কোথা থেকে আসছে, সে কথা তিনি বলেন নি। উগ্র জাতীয়তাবাদ না হয় খারাপ কিন্তু আন্তর্জাতিকতার এত অর্থ মোহই কি ভাল! তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা এই, বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলে বাম-পন্থীদের হাতে চলে যাবে এ যুদ্ধের নেতৃত্ব। খুবই সম্ভব সেটা। কিন্তু সে কথাটা এমন বিকৃত করে ঘুরিয়ে বলা কেন? দুই মাসের উপর সে দেশে যা চলেছে সেটা যদি তার মতে মুক্তিযুদ্ধ না হয়, তবে সেটা কী? প্রবল প্রতিরোধ, লম্বা লম্বা মানুষের অবলীলায় আত্মদান আর পাক ফৌজের গোলায় শ্মশান হয়ে যাওয়া দেশটার ছবি কি শ্রীবসুর চোখে প্রহসনের মত ঠেকেছে? দেশের সমস্ত মানুষ একাবদ্ধ হয়ে যখন শত্রুর অস্ত্রের মুখে দলে দলে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে তখন অতীতে তারা পাক সরকারের ভাড়াটে গুন্ডা ছিল, কি ই পি আর ছিল, কি বেঙ্গলী রেজিমেন্ট ছিল-শ্রীবসুর সেই হিসাব দাখিলের বহর দেখে আমার গল্পের সেই পিণ্ডিত মশাইকে মনে পড়ছে, যিনি ডুবন্ত ছোট্ট ছেলটিকে জল থেকে তুলবার চেষ্টা মাত্র না করে তার দুশ্চরমীর ফিরিস্তি দিয়ে চলেছেন!

শেখ মুজিবের চরিত্র বিশ্লেষণেও শ্রীবসু সেই একই ভুল করেছেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবের রাজনৈতিক ভূমিকাকে কট কল্পনার সাহায্যে অবিশ্বাস্যভাবে উপস্থিত করেছেন তিনি। দপনের পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন। তথাকথিত নানা যুক্তির সাহায্যে মুজিবকেও তিনি প্রতিক্রিয়াশীল শোষণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। শত্রু তাই নয়, সবচেয়ে যা বেদনাদায়ক, মুজিবকে ছোট করতে গিয়ে পূর্ববাংলার অবিভিন্নগণীয় ভাষা আন্দোলন থেকে সরু করে স্বাধীন বাংলা দেশের জাতীয় সঙ্গীত “আমার সোনার বাংলা”-পর্বন্ত সমস্তই তিনি ব্যঙ্গ ভরে নস্যাক করে দিতে চেয়েছেন। আমরা সত্যি দুঃখী! এসব ইতিহাস তো আমাদের দেশে তৈরী হয় নি। আন্তর্জাতিকতার মোহ-

মুহ হয়ে বুদ্ধের রক্ত ঢেলে নিজের ভাষাকে, নিজের দেশকে নিজের বলে ভাবতে, ভালোবাসতে আমরা শিখিনি। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা তা আমাদের শেখান না। তাই তার মূল্যও আমরা বুঝিনে।

কিন্তু গণতন্ত্র আর ভোটাভুটির মূল্যটা তো কিছুটা বুঝি। যে দেশের একটি রাজনৈতিক দল সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ৯৮.৭টি আসন দখল করে নেয় তার নেতাকে জঙ্গী শাসক আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খান নিজের গদী হারাবার ভয়ে দেশদ্রোহী আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু শ্রীবসুর মত একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী মানুষ কি করে এ কথা বলেন, “মুজিববিরোধী আওয়ামী লীগ পূর্ববঙ্গের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে প্রমিত-কৃষক শোষণ ব্যবস্থার অব্যবহারী সঙ্গে বাঙালীকে এক পর্যায়ে বসাতে চাইল। ছয় দফা দাবী তার সাক্ষ্য”।

মুজিববিরোধী ছয় দফা দাবী ইতিহাসের ম্যাগনাকার্টা। তার মধ্যে বাঙালীর স্বাধিকার রক্ষার ঘোষণা স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে। প্রমিত কৃষকদের কথা আলাদা অক্ষরে কিছু বলা হয়নি-শ্রীবসুর আক্ষেপ কি সেই জন্যই? কিবো দেশের কল্যাণকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকভাবে মুজিব কিছু ভাবেন নি অর্থাৎ প্রমিত-কৃষকদের সাক্ষা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা হয়ে উঠতে পারেন নি বলেই কি শ্রীবসু তাকে প্রতিক্রিয়াশীল শোষণ গোষ্ঠীর সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন? তা তিনি যাই ভাবুন, আর একটা বিশেষ মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের একচ্ছত্র অধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানকে যতই রাজনৈতিক মতলব বাজ বলে বোঝাতে চেষ্টা করুন, ইতিহাস তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফলাফল যাই হোক, মুজিববিরোধী মুজিববিরোধী থাকবেন। তাঁর বাঙালী-মানা স্বজাতি প্রীতি, সারল্য এবং অফুরন্ত নেতৃত্বের ক্ষমতা নিয়ে তিনি চিরকাল দেশপ্রেমিক মুক্তি সংগ্রামীদের প্রেরণাশ্বর হয়ে থেকে অভিনন্দিত হবেন। এতবড় প্রাপ্তি শ্রীমুজিবেরও কল্পনার অগোচরে ছিল। তাঁর “ছোট সূত্র, ছোট সাধ, ছোট আশা” আজ বাংলা দেশের সোনালী সবুজ পতাকায় আগুন হয়ে জ্বলছে! পাক জঙ্গীশাসকচক্র-হয়ত শেষ পর্বন্ত তাকে বাঁচতে দেবে না। কিন্তু তিনি এপার বাংলার বাঙালীদের জন্য যা রেখে যাবেন তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করতে পারলে আমরাই উপকৃত হব। ভিন্নতানাম, ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের চেয়েও আমাদের দরকার প্রতিবেশী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করা এবং সর্বপ্রকার কেতাবী মতবাদের প্রভাবমুক্ত হয়ে আপামর জনসাধারণের মুক্তি যুদ্ধের এই ইতিহাসের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করা।

কশা সেন

কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুর্নীতির রামরাজত্ব

(দর্পণের সংবাদদাতা)
ইদানীং বেশ কিছুকাল যাবৎ কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চরম দুর্নীতি চলছে। সরকারী পক্ষের খামখেয়ালীপনা এবং তাদের সমর্থন পুষ্ট গৃহদাদের সহায়তায় হাসপাতালের আবহাওয়াকে কলুষিত এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতির এক চরম অচলাবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রোগীদের সেবা-সুশ্রুসা এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা তো দূরের কথা, কোন রোগীর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকলেও তার মৃত্যু অচিরেই অনিবার্য উঠছে।

আমি কিছুদিন আগে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালটিতে ভিতর মহলের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড, আউটডোর বিভাগ তথা বিভিন্ন চিকিৎসা বিভাগ পৰ্যবেক্ষণ করে কতকগুলি অভাবনীয় আশ্চর্য রকম অভিজ্ঞতাসম্মুখীন হলাম। সেখানকার ছাত্র-ছাত্রী এবং নার্সদের সংগে আলোচনা কালে তারা আমাকে একটা ঘটনা জানালেন: প্রতিটি হাসপাতালেরই নিয়ম যে, জরুরী অবস্থায় ছাড়া কোন রোগীকে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করা হয় না। কিন্তু কিছুদিন আগে ছাত্র-ছাত্রী এবং নার্সদের অজ্ঞাতসারেই শান্তি দাস নামে একটি ক্লিনিক এ্যাপেন্ডিকুলার ল্যাম্পের রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে। রোগের নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, রোগীর অবস্থা মোটেই জরুরী নয়। পরে যখন ছাত্র-ছাত্রীরা

উপর মহলে কতটা ব্যক্তিদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন, তার প্রত্যুত্তরে তারা অর্ধাং আর এস এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট জানিয়েছেন যে তাদের কিছু করার নেই, এ নির্দেশ আরো উপর থেকে এসেছে। এ বিষয়ে খোদ মালিক হলেন ডিরেক্টরেট অব হেলথ সার্ভিসেস। বিগত আঠাশে মে তারিখে যখন ছাত্র-ছাত্রীরা এই নিয়মবাহিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট ডি রায় মহাশয়ের কাছে এক ডেপুটেশনে যান তখন তিনি উক্ত রোগী শ্রীদাসকে লিখিতভাবে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য হন। প্রসঙ্গক্রমে ছাত্র-ছাত্রীরা আরো জানালেন, হাসপাতালের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, কিন্তু তারা জানতে পারছেন না এবং এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আরো ঘটবে না সে বিষয়ে আর এস কিংবা সুপারিনটেন্ডেন্ট কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। যখনই তাদের কাছে কোন অভিযোগ নিয়ে যাওয়া হয়, তখনই তারা বলেন “আপনারা মন্ত্রী মহলে যোগাযোগ করুন; আমরা কিছু করতে পারব না, আমাদের হাত নেই।”

এর পর গেলাম আউটডোর বিভাগে। সেখানে দূর দূরান্তের রোগীদের দীর্ঘ লাইন পড়েছে। কিন্তু সে লাইনের ক্রমানুসারে কিছুতেই রোগী পরীক্ষা করা হয় না। লাইনের রোগী যদি একজন

দেখা হয়, তবে বাইরের রোগী দেখা হয় পচিশজন। তারা অন্য জায়গা থেকে কাগজে লিখিয়ে আনেন এবং আউটডোরের ডাক্তার তক্ষুণি তাকে দেখতে বাধ্য হন। এছাড়া কয়েকজন ছোকরা বয়সের ছেলেকে লক্ষ্য করেছি, পঞ্চাশ পঞ্চাশ কিংবা ষাট পরসার বিনিময়ে জাইন বিক্রী করা হচ্ছে। গ্রামগঞ্জ থেকে আগত রোগীরা নিরুপায় হয়ে এ পরসার দিয়েই লাইন কিনতে বাধ্য হন। অন্যদিকে আবার কিছু কিছু দক্ষতকারী নিয়মিতভাবে ডাক্তারের কাছ থেকে কলিপত রোগের অঙ্ক-হাতে ঔষধ লিখিয়ে নিয়ে বাইরে র্যাকে বিক্রী করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা এ সব ঘটনাকে উপর মহলের গোচরে আনা সত্ত্বেও আজো কোন ফল হয় নি।

তারপর গেলাম ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তিনটি কি চারটি মাত্র বেড রয়েছে। ছাত্র-চিকিৎসকরা রোগী পরিচর্যা ব্যস্ত ছিলেন। তারা জানালেন; প্রাথমিক চিকিৎসা কিংবা অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মর্যাদাত্মক অভাব। ইঞ্জেকশনের জন্য একটি মাত্র সিরিঞ্জ এবং তাও আবার বাঁকা। অনেক সময়েই ব্যান্ডেজ থাকে না, কাঁচি, ছুরি, একটর বেশী দ্রুতি নেই। ওয়ার্ডের ভিতরে যেখানে আগে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ নেওয়া হতো, সেখানে এখন রোগীদের আরো নতুন বেড দেওয়া হচ্ছে। চলাচলের পথে প্যাসেজের মধ্যে রোগীদের জায়গা দেওয়ার ফলে নার্স-চিকিৎসকদের চলাফেরার যেমন অসুবিধে হচ্ছে, তেমনি যখন তখন কুকুর-বিড়াল ঢুকে ধ্বংস রোগীদের পাশে চলাফেরা করছে, আডাকা খাবার খেয়ে নিচ্ছে। এই সব দুঃসহ দৃশ্য দেখে নিকটবর্তী কয়েকজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম—“আপনারা এই দুরবস্থার বিকল্প পথ কি মনে করেন?” তারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে জানালেন: এই মেডিকেল কলেজের মধ্যেই প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতাল নামে একটি হাসপাতাল আছে। সেখানকার চিকিৎসক হলেন অধ্যাপক ডাঃ এ কে রায় এবং ডাঃ এস বানার্জী। এদের অনুমতি প্রাপ্ত রোগী এই হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে এই হাসপাতালটি অনেক বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং জায়গাও প্রচুর। সাধারণতঃ কতটা ব্যক্তিদের রোগীরাই এখানে স্থান লাভ করেন। কিন্তু ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের মাটিতে যে সমস্ত রোগী রয়েছেন, তাদের একটা বড় অংশ সেখানে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। কিন্তু সে কাজ কতপক্ষে কিছুতেই করবেন না। কেননা তাহলে আত্মীয় স্বজনদের কিংবা বন্ধুবান্ধবের

চিকিৎসার ব্যাঘাত ঘটবে। এছাড়া হাসপাতালের রোগী, নার্স ও ছাত্র-ছাত্রীদের আরো অভিযোগ যে রাষ্ট্রপতি শাসনের সূত্র থেকেই হাসপাতালের আবহাওয়াকে দূষিত করা হয়েছে। হাসপাতালের ভেতরে কলেজ-ক্যান্টিন থাকা সত্ত্বেও জলের ট্যাকের উপর গেটের দ্বাধারে দুটি বেআইনী দোকান খোলা হয়েছে। এ দোকানে খাদ্যদ্রব্য থেকে সূত্র করে চোলাই মদ পর্যন্ত সব কিছুই বিক্রী হয়। হাসপাতালে ঢোকায় সময় লক্ষ্য করছিলাম ইদানীং আবার পোলিট্রি খোলা হয়েছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াই রোগীকে অনেকাংশে সুস্থ করে তোলে; সেখানে দিনের পর দিন সরকারের সমর্থনপুষ্ট গৃহদাদের সন্ত্রাস হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ যদি অপরিচ্ছন্ন হতে থাকে, তবে এ প্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতেই বিকল হতে বাধ্য।

সরকারী পক্ষের এই দালালেরা হাসপাতালের দারোয়ানদের দিয়ে যেমন সুদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে রাস্তার ভিখারী কিংবা দুস্থ ব্যক্তিদের ধরে এনে সম্মান্য পরসার বিনিময়ে তাদের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে হাসপাতালের মধ্যেই সেই রক্তের ব্যবসা করছে। আরো খবর নিয়ে জানা গেল, রোগীদের জন্য রান্না করা খাদ্য

এবং দুধ নিকটবর্তী হোটেল-গুলোতে গোপনে সরবরাহ করা হয়। ফলে রোগীরা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের ভাগ্যে জোটে জল মেশানো দুধ। সম্প্রতি কিছুদিন আগে মাত্র সাতদিনের মধ্যে তের হাজার টাকার শিশু খাদ্য উধাও হয়ে গেছে; তার কোন হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের দুষ্কৃতির শৃঙ্খলা এখনেই শেষ নয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের সাহায্যের জন্য পাঁচ হাজার টাকার ঔষধপত্র যে মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে অজয়বাবুর হাতে দেওয়া হয়েছে তার সম্পর্কটাই এই হাসপাতালের রোগীদের তহবিল থেকে চুরি করা।

জানা গেছে সুশীল বসু নামে একজন লোক (যিনি এই হাসপাতালের কোন কর্মীই নয়) কলকাতা সেন (যার ঘটনা ইতিপূর্বেই দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল) ও বাঁথিকা দত্ত এবং কয়েকজন সাধারণ কর্মচারীকে নিয়ে মেডিকেল কলেজের কল্যাণ-কামী সংগঠনের মধ্যে ভাঙনের সূচীত করছে। সে জন্য দরকার মত বোমাবাজি, সন্ত্রাস, বলপ্রয়োগ, নার্সদের অপমান প্রভৃতি জঘন্যতম ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে হাসপাতালের আবহাওয়াকে চরম-অর-স্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নারীহত্যা ‘সভ্য’ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে অস্থির করে না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অনেকেরই মনে আছে গত যুক্তফ্রন্ট আমলে অবিবাহিত মধ্যম-মন্দ্রী অজয়বাবু হঠাৎ নারীহত্যা হয়ে উঠেছিলেন। মেয়েদের দুর্গতি তাঁকে শতগুণ ব্যাধির কাতর করে তুলেছিল। তখন তদন্ত করার জন্য তিনি প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর হাতে ছয়-সাতটি নারী লাঞ্চার ঘটনা তুলে দিয়েছিলেন।

অথচ বর্তমান সরকারের আমলে মাত্র এক দিনেই শৃঙ্খলা নষ্ট, সাত জন মহিলাকে একেবারেই পৃথিবী থেকে সরে যেতে হয়েছে। দশ বছরের কুলি-কুণ্ডলী এই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাননি। সিঁথির বীথি দে দমদমের অঞ্জলি বোঁধ, কোচবিহারের শিক্ষিকা লিতিকা নিয়ে গী, দুর্গাপুরের শিক্ষিকা ঝর্ণা দাশগুপ্ত, হাওড়া শিবপুরের শিক্ষিকা গায়েদী ভট্টাচার্যের হত্যাকাণ্ডেও সংস্রব অহিংস মানব

অজয়বাবুর কাজে কর্মে কোন বিষয় ঘটছে না। যুক্তফ্রন্টের আমলে তথাকথিত নারী লাঞ্চার বিচলিত অজয়বাবু আজ নির্বিকার। কয়েকদিন আগেও এধরনের ঘটনা ঘটে গেলো। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বর্ষীয়সী সভানেত্রী শ্রীমতী জ্যোতি চক্রবর্তীকে টলীগঞ্জের বাড়ীতে বৃদ্ধ স্বামীর উপস্থিতিতেই প্রকাশ্যে দিবালোকে সমাজবিরোধীরা মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এখন তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে। তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হতে পারে এমন আশঙ্কার কথা পুলিশকে আগেই জানানো হয়েছিল। তবু সভ্য (?) সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর অমলে জ্যোতি চক্রবর্তী কোন নিরাপত্তা পাননি। এমনকি, আসামীদের কাউকে এপর্যন্ত ধরাও হয়নি।

দমদম জেলে একজন জলজাত বন্দী পনেরো মিনিটের মধ্যে মৃত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কয়েকদিন আগে দমদম জেলে কারারক্ষীদের হাতে নিহত নকশালপন্থী বন্দীদের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে আমরা যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করেছি, তাতে বোঝা যায় যে ঠান্ডা মাথায়, সুপরিকল্পিতভাবে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করার পর তাদের পলায়ন ও কারারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী প্রচার করা হয়েছে। সেই ষটনার কিছুক্ষণ আগে এক নিহত বন্দীর দিদি এবং জামাইবাবু তার সঙ্গে দেখা করতে যান। বন্দীর সঙ্গে দেখা করার পর তারা জেল গেটের বাইরে আসেন এবং কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পান, তার মৃতদেহ বাইরে থেকে টেনে হিঁচড়ে জেলের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বন্দীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ এবং এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র দশ-পনের মিনিট।

তাঁদের ধারণা, বন্দীকে হত্যা করার পর তার মৃতদেহ জেলের পাঁচিলের বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাকে পলায়নের চেষ্টার রূপ দেওয়া হয়। এই দৃশ্য পনের মিনিটের মধ্যে বন্দীরা সূর-ক্ষিত জেলের গেট ভেঙে তাকে মই হিসেবে ব্যবহার করে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল একথা কে বিশ্বাস করবে! আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিভিন্ন জেলে একের পর এক এই ধরনের নারকীয়, বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটছে, কিন্তু বৃহৎপন্থী দল-গুলো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাড়া তুলছেন না। দলীয় স্বার্থের গািঙে আবদ্ধ হয়ে তারা বৃহতে চাইছেন না যে পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা কাহেম হতে চলেছে, জহাদের রক্তপিপাসা হত্যার অস্ত্র শেষ পর্যন্ত কাউকে রেহাই দেবে না।

‘বাজারী’ পত্রিকার বদমায়েসী

(দপর্ণের সংবাদদাতা)

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের বক্তৃতিতে যে কতদূর যেতে পারে, তা এই দেশের মানুষ হাড়ে হাড়েই জানেন। পথে ঘাটে, গ্রামে বাসে আলোচনা মন্তব্যে কান পাতলেই শোনা যাবে সাধারণ মানুষ এ ধরনের সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সম্পর্কে কি ভাবেন। দুর্ভাগ্যের কথা, খবরের তুচ্ছ মোটাবার জন্যে নগদ পরিসা খবচ করে তবু লোককে সব ভেজাল মালের নেশা কিনতে কারণ সুস্থ মানসিকতা নির্ভীক স্বাধীন সংবাদপত্র পাওয়া যায় না। সংবাদপত্র এখন শিশুস্বাক্ষর গণিকা-বৃত্তিতে রত বাড়ীউলি বিগত-যৌবনা বারাগনার জগতে পরিণত। আর সাংবাদিক? যেমন জঘন্য ব্যবসা তেমনি উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত গালমুখ এনমেল করা রুজ লিপিস্টিক ঘষা নাচনেওয়ালীর দল। আমরা বিশেষ করে কলকাতার “বাজারী” সাংবাদিকদের কথাই বলছি যারা সাংবাদিকতাকে গণিকবৃত্তির সঙ্গে তুলামূল্য বলে ধরে নিয়েছে।

যে পশ্চিমী দুনিয়ার হাস্যাস্পদ অনুকরণ করে এরা আত্মপ্রসাদ লভ করে, সেই পশ্চিম দেশগুলিতেও সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা এত ন্যাকারজনক, বীভৎস হয়ে উঠেনি।

মার্কিন শাসককুল ভিয়েতনামে নারীশিশু নির্বিশেষে হত্যা করে গোটা দেশটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে মৃত দুনিয়ার স্বাধীনতার বীভৎস নমুনা দেখিয়ে সারা পৃথিবীর দিক্বর কুড়াচ্ছে। তবু সেই মার্কিন দেশেরই সুস্থ স্বাধীনমনা সাংবাদিক নিজেদের দেশের সরকারের ঘৃণ্য কর্মকলাপের কাহিনী দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরছেন, জনমত সৃষ্টি করছেন। দুনিয়ার সাধারণ মানুষ যে “মাইলাই” গ্রামে মার্কিন সেনাদলের নৃশংসতার কাহিনী শুনে ঘণায় জ্বলে উঠেছেন, সে কাহিনী মার্কিন সরকারী বাধানিষেধ অমান্য করে দুনিয়ার মানুষের সামনে যারা হাজির করেছেন তাঁরও মার্কিন দেশেরই নাগরিক, মার্কিনী সাংবাদিকেরই স্বাধীন-মনা প্রতিনিধি। দেশের সরকারের কাছে দাসখত লিখে, বিবেক বিস্ময় করে তারা সাংবাদিকতাকে গণিকবৃত্তিতে পরিণত করেন নি। তাই তারা মানুষের মতোই মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে স্বদেশের সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার কথা ঘোষণা করে তত্ত্বজনী নির্দেশ করে বিশ্ব-মানবতার আদালতে তাকে কাঠ-গড়ায় দাঁড় করতে শিখা করেন নি। মিথ্যা ছলনাভরা নকল দেশ-প্রেমের মায়াকান্নাকে, সরকারের ব্যাভিচারকে প্রশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছেন!

তার সত্ত্বে কলকাতার ডাক-সাইটে “বাজারী” তরজাওয়ালীদের

তুলনা করে স্বাধীন বিবেক সং-সাংবাদিকতার মর্যাদাকে খাটো করতে চাই না।

কিন্তু পরিসা দিয়ে যারা এসব ঝুটামাল কেনেন তারা যদি কৈফিয়ৎ চান তবে এরা কি জবাব-দিহি করবে? ভেজাল ওষুধ,

সম্পাদক দপর্ণ

ভেজাল খাদ্য ব্যবসায়ীদের পুঁলিশে দেবার আগে দুচার ঘা দিয়ে দেবার যে বাঙালী জনোচিত বে-আইনী রীতি আছে, এদের বেলায় সেটা প্রয়োগ করলে তো তাঁরা “আমরা আক্রান্ত” বলে রাসভসুলভ চাঁৎকার শুরু করবেন।

সদ্য সদ্য আদি কংগ্রেসের দল থেকে নম কাটিয়ে (?) নব কংগ্রেসের সরকারী সানাই হাতে নেবার পর থেকেই সংবাদপত্র গোষ্ঠীগুলি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বিরোধী সমস্ত ব্যক্তি এবং দলকে কৌতল করর কাজে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উস্কানি দিতে আগুয়ান হয়েছেন।

দেশপ্রেমের ঠিকাদারী নিয়ে এই সারমেয় সাংবাদিকবৃন্দ (পুঁলিশের কুকুর নয় তো?) বেশ কদিন ধরেই জানাচ্ছিলেন যে, পাকিস্তানের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে নাকি একটা গুপ্তচর চক্র সক্রিয় রয়েছে। তাঁরা দুয়েকদিন ধানাই-পানাই করে বলেও ফেললেন যে জনৈক পরাজিত পাল্লামেন্ট সদস্য একজন যুক্তফ্রন্টের আমলের মন্ত্রী এবং একজন প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী নাকি এই চক্রে জড়িত! এমন সব প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে নাকি আছে যে প্রকাশ্যে তার বিচার হতে পারবে। মনে পড়ে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের সময় অতুল্য ঘেষের নামেও এরকম একটা বদনাম বাজারে চালু করা হয়েছে।

বোঝা গেল, সূত্রটো নাজুছেন রাজ্যের জনৈক কংগ্রেসী মন্ত্রী, যিনি শিখণ্ডী মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখে আসল মুখ্যমন্ত্রীর কাজ চালাচ্ছেন। শেষে শুভ্রলোক এতবড় বাহাদুরীটা এই বাজারী কাগজের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন নি।

পাল্লামেন্ট এনিয়ে ঝড় উঠল। অবিলম্বে এই জঘন্য কাজের জন্যে অভিযুক্তদের বিচার চাই! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলে বসলেন যে তাঁরা এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কোন পত্র পান নি। বোঝা গেল কেন্দ্রীয় সরকার এই কাগজে ষড়যন্ত্র মনে মনে খুশি হলেও নাওয়া কাজে নিজেদের বেশী জড়িয়ে ফেলতে চান না।

যে দুজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাদের বিনাবিচারে অটক করা হয়েছে। একজন সৈয়দ বদ-রুদ্দোজা, অপরজন প্রাক্তন যুক্ত-

ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ডঃ গোলাম ইয়াজদানী। এ দুজনেই কংগ্রেস বিরোধী, মুসলমানও বটেন। সৈয়দ সাহেবকে ১৯৬৫ সালেও বিনাবিচারে প্রফুল্ল সেন আটক করেছিলেন।

পাল্লামেন্টে এবারের ঝড় আরো

প্রচণ্ড! সদস্যেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা হয়তো এ ষড়যন্ত্রের খানিকটা আভাস পেয়ে থাকবেন। তাঁরা দাবী করেছেন হয় অভিযুক্তদের প্রকৃত্তে বিচার করো নয়তো তাদের সম্মানে মুক্তি দাও।

আমরা এখনই অভিযোগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাই না কারণ

(সরকারের জনৈক মন্ত্রীর বক্তব্য ছাড়া) অভিযোগ বা তার সরবস্তা সম্পর্কে পাল্লামেন্টের বহু মাননীয় সদস্যেরও সন্দেহ রয়েছে দেখছি।

এবার বাজারী সংবাদপত্রটী সতী সাজতে চাইল। “আটকের চেয়ে মামলা ভাল” বলে সম্পাদকীয় লিখে এরা দেখতে চাইল যে সরকার এবার বেশ ভালো একটা কাজ করলেন। ছুটে ছুটে বজাতির বিষে ভরা এই সম্পাদকীয়তে “বাজারী” তরজাওয়ালী এমন ভাব দেখাল যেন সরকার ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থাই করেছেন, বিনা বিচারে আটক নয়। যদি বিচারের মত যথেষ্ট প্রমাণই হতে থাকবে তাহলে আবার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করে এদের বিনাবিচারে অটক কেন করা হল? এই সংগত প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে উঠতে পারে। তাই ধোঁকা-

বাজির উদ্দেশ্যে এই সম্পাদকীয় বদমায়েসী।

কেউ যদি বলে আমেরিকান বার্তা বিভাগের টাকায় আমেরিকান রিপোর্টার ছাপানোর দরুন আমাদের সন্দেহ হয় যে ঐ বাজারী গোষ্ঠী মার্কিন গুপ্তচর চক্রে জড়িত? সুতরাং আটক না মামলা? বাজারী সম্পাদক কি বলেন? যদি কেউ বলে এই সংবাদ রচনা, রটনা ও ঘটনার পারস্পর্য দেখে সন্দেহ হয় বাজারী কাগজে বেশ কয়েকটি দেশের (এবং সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় গুপ্তচর চক্র) বেশ কিছু অনুচর রেখেছে, তবে তাকে কি বলব? আটক ভাল না মামলা ভাল?

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী প্রশাসনকে বিশেষ একটা দলের স্বার্থে ব্যবহার করার চক্রান্ত আবার মামলা দিকে সুদূর হয়েছে। বলা বাহুল্য গত বাইশ বছরেরও বেশী এই দলটী রাজ্য প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে পরিচালনা করে এসেছিল।

(শেখাশেখ শেখ পুন্ডার)

গরীব হঠানোর পয়লা ধাক্কা

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে, (চার) এবারের বাজেটেও রাজন্য-ভাতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং বড় বড় কারবারীদের মুনামফার ওপর ধার্য কর অতি সামান্যই বাড়ানো হয়েছে।

এতো গেল গরীব হঠাও-এর উল্টো দিক অর্থাৎ ধনীকে আরো ধনী করার পদক্ষেপগুলি। এবার গরীবদের জন্যে ইন্দিরা সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা দেখুন; (এক) রেলের যাত্রী ভাড়া ও মালের মালদল গড়পড়তা প্রায় শতকরা দশ ভাগ বেড়েছে। মালের মালদল বাড়ার অজুহাতে স্বভাব-সিদ্ধ নিয়মে ব্যবসায়ীরা এর ওপর আরো দশ-বারো পারসেন্ট না বাড়িয়ে থাকেন কি করত? অতএব গরীব ক্রেতাদের সব পণ্যের জন্যেই এখন প্রায় কুড়ি ভাগ বেশী দাম দিতে হবে, শুধু চুঙ্গী কর এবং রেলওয়ে মালদলবৃদ্ধির দরুন! (দুই) কেরোসিন, রুটি, সিগারেট, আরসী, চুলের তেল, সাবান, মোটা সূতী কাপড়, তোয়ালে, গামছা, প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিষের ওপর গরীব মানুষদের অতিরিক্ত টাক্স গুণতে হবে শতকরা দশ থেকে পঁচিশ টাকার মত, (তিন) দেদার নোট ছাপিয়ে বাজেটের ঘাটতি মোটাবার চেষ্টা হয়েছে, (চার) পেট্রলের মালদল বৃদ্ধির ফলে সাধারণ যানবাহন মোটর বাস, ট্যাক্সি প্রভৃতির ভাড়া বাড়বে। ফলে লরী টেম্পোতে মাল চলাচলের দরুন অতিরিক্ত খরচ গরীব ক্রেতাদের ঘাড়েই চাপবে। এ বছরের শেষদিকে রেলের মালদল বৃদ্ধি, অতিরিক্ত টাক্স এবং অতিরিক্ত কাগজী নোট ছাড়ার ফলে সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য

দ্রব্যসামগ্রীর দাম শতকরা অন্ততঃ ত্রিশ টাকা যে বেড়ে যাবে ভাধারণা করা যায়।

অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর দল ক্ষমতা হাতে পেয়ে ক্ষমতার সিঁড়ি জনসাধারণকে লাথি মেরে সরিয়ে দেবার মনোভাব দেখিয়েছেন। আর গজদন্তমিনারে অপেক্ষমান একচেটিয়া কোটীপতি দেশবাসীরা শোষণ দল এবং জমিদার রাজা-মহারাজারাই যে ইন্দিরা কংগ্রেসের নিজের লোক তা বোকা গরীব মানুষগুলিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুধু গরীব মানুষ কেন, সাধারণ ভাবে ভালো-থাকা মধ্যবিত্ত চাকুরী-জীব, স্বল্পবিক্রম ও মাঝারী ব্যবসায়ী সবাইকেই ইন্দিরা কংগ্রেস কদলী প্রদর্শন করে সরে পড়েছেন।

এক কথায় গুটিকয়েক কোটিপতি রাজামহারাজাদের জন্যে ঢালাও ব্যবস্থা করা হচ্ছে আর কোটি কোটি গরীব মানুষ যারা গরীব হঠানোর মিথ্যে ভাঁওতায় ভুলে গিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিল, তাদের জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ইন্দিরাজী ভারতের কোটি কোটি বুদ্ধিমান নগ্ন শোষিত সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝেছেন। যে সরল বিশ্বাসে তারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, সেই বিশ্বাস শতসহস্র ক্রোধের শিখায় তাঁকে এবার বেঁটন করে ধরবে। সরল মানুষগুলোর প্রবঞ্চিত হবার ক্ষোভ ও ক্রোধের আগুন শত শত অত্যাচারী ভাঁওতাবাজ শাসকশ্রেণী উৎখাত হয়ে গেছে, ইতিহাসে তা লেখা আছে।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা

শক্তি কুল হাসান

পাকিস্তানী শোষণ শাসন অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনতা বর্তমানে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত। অত্যাচারী অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার শোষিত লাঞ্ছিত জনগণ আজ হাতে তুলে নিয়েছে রাইফেল, চালিয়ে যাচ্ছে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিতৃভূমিকে শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তির দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ঐক্যবদ্ধ, অদম্য মনোবলে বলীমান। এতদসঙ্গেও প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অসাফল্য ও বিপর্যয়ের মূলে সুনির্দিষ্ট কতগুলো কারণ সম্পর্কে আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন।

মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই হলো পূর্ব বাংলার যুব ছাত্র সম্প্রদায়। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, বিদ্রোহী বাঙালী পদলিখ, মিলিটারী, ই পি আর এবং আনসার বাহিনী। রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পূর্ব বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা প্রধানতঃ দুটি শিবিরে বিভক্ত। রণনীতি ও রণকৌশলগতভাবেও এরা সম্পূর্ণ পৃথক ও পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করে থাকে। এদের প্রথমটি হচ্ছে শেখ মুজিবুর অনুগামী আওয়ামী লীগের সমর্থক যারা নীতিগত ভাবে শত্রুমাত্র পাকিস্তানী শাসন থেকে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম করছে। এরা “মুক্তি ফৌজ” নামে প্রকাশ্য সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে এবং প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। এদের পরিচালনা করছে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, যারা ইতিমধ্যেই “স্বাধীন বাংলা সরকার” গঠন করেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা শ্রেণীগত চরিত্রের কারণেই অতি সতর্কতার সঙ্গে জনগণকে সশস্ত্র হতে না দিয়ে সর্বদা অহিংস ও অসহযোগের মাধ্যমে দাবী আদায়ের আপোষের রাজনীতি করে আসছে। সস্তা উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধূয়া তুলে জনগণ থেকে তারা ভোট আদায় করেছে, কিন্তু জনগণকে রাজনীতিগতভাবে সচেতন বা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ও সশস্ত্র করে তোলার কোন প্রচেষ্টা করেনি, বরং অহিংস নীতিতে সর্বদাই সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। কারণ শ্রেণীগতভাবে আওয়ামী লীগ হচ্ছে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। শ্রেণীগত চরিত্রের জন্যই জনগণকে সশস্ত্র করতে তারা ভয় পেতো এবং অহিংস আন্দোলন ও আপোষ আলোচনার পথে দাবী আদায়কে কৌশলগত ভাবে অবলম্বন করেছিলো। পূর্ব বাংলার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কৃষক ও বারো ভাগ

প্রাথমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা বা তাদেরকে রাজনীতিগতভাবে সচেতন করে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা ইত্যাদি মূল কর্তব্যকে উপেক্ষা করে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় ধনিক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সমবেত করে, পাকিস্তান সহ বিশ্বের ধনিক শ্রেণীর স্বার্থকে বজায় রেখে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচীই ছিল আওয়ামী লীগের মূল রণনীতি। তাদের এ আপোষের রাজনীতিক বার্ষিক ক্ষতি দিয়ে নর-পিণ্ডাচ ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী যখন পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনগণকে রাইফেল, স্টেনগান, মেশিনগান কামান ট্যাঙ্ক ও বোমাবারার আক্রমণ করে গণহত্যা অভিযান চালালো তখন দেখাগেল নেতৃত্ব দেবার মত একজন আওয়ামী লীগ নেতাও জনগণের পাশে নেই, কিন্তু তাদের পরিচালনা করার

কারণ অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ শ্রেণীগতভাবেই সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করতে অক্ষম। পাকিস্তানী হানাদার-বাহিনী সশস্ত্র বাঙালী পদলিখ-মিলিটারী ও ই পি আর বাহিনীকে নিরস্ত্র করতে গিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো। এ বিদ্রোহী সশস্ত্র বাঙালী বাহিনী অহিংস নীতিকে পরিত্যাগ করে দেশপ্রেম ও আত্মরক্ষার তাগিদে সশস্ত্র শত্রুকে সশস্ত্র ভাবে মোকা-বেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শ্রেণীগত ভাবেই এরা সবাই ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক। সেই সঙ্গে যোগ দিল হাজার হাজার দেশপ্রেমিক আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালী আমলা অফিসার সহ অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী। বৃকে তাদের পিতৃভূমিকে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার অদম্য মনোবল, হাতে তাদের শত্রু নিধনের অস্ত্র।

কিন্তু তাদের পরিচালনা করার

মত কোন নেতৃত্ব নেই, নেই কৃষক শ্রমিক জনগণের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক কোন সম্পর্ক। ফলে ব্যাপক কৃষক শ্রমিক মেহনতী জনগণের আস্থা লাভে অসমর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়লো। মরিয়া হয়ে এ মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের উপর দৈহিক চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য হলো। যেমন পাবনা জেলার নগরবাড়ী ঘাটে শ্রেণী কটার জন্য স্থানীয় কৃষকরা একটি কোদাল দিয়েও সাহায্য করতে রাজী হয়নি, রাজী হয়নি শ্রেণী কাটতে বা পাক সেনাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। অনেকস্থানে মুক্তি ফৌজকে জনগণ আশ্রয় দিতে সাহস করেনি, খাদ্য সরবরাহ করে নি, বা যানবাহন ব্যবহার করতে অনুমতি দেয় নি। মুক্তি ফৌজ ধৈর্যসহকারে এ পরিস্থিতির রাজনৈতিক মোকা-বেলা না করে বল প্রয়োগের চেষ্টা করেছে, যা তাদেরকে জনগণ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করেছে।

জনগণের উপর অস্থিরাধা ও জনগণের উপর নির্ভরশীল হওয়া তাদের রাজনীতিগতভাবে সচেতন করে তোলা এবং তাদের

সঙ্গে একাত্ম হবার পরিবর্তে উক্ত মুক্তি ফৌজ মুক্তিযুদ্ধকে স্বীয় গান্ডিতে কুক্ষিগত করার এক আত্মঘাতী অহমিকার মেতে উঠেছিল। এর মূলে ছিল মুক্তিফৌজের সেনাদের মাঝে সঠিক রাজনৈতিক অর্শের অভাব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপলব্ধির অভাব জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের অভাব এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব, বার ফলে ওরা হয়ে উঠেছিল স্বেচ্ছাচারী উগ্রত্ব এবং বিভ্রান্ত। তাছাড়া অস্ত্র পরিচালনায় অদক্ষতা, পরিকল্পনাহীন ভাবে শত্রুসেনাকে সামান্যমান মোকাবেলা করার মত ভ্রান্ত কৌশল, শত্রু সেনার শক্তিকে ক্ষুদ্র ভেবে কম্পনার আশ্রয় ও পরিচালকহীন অসংগঠিত অবস্থার ফলে সুসজ্জিত শত্রু সেনাদের বর্বর আক্রমণের সঙ্গে সংগেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। যোগাযোগের অভাব, ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের অভাব, প্রয়োজনীয় রসদ ও খাদ্য সরবরাহের অভাব এবং সর্বোপরি নেতৃত্বের অভাবে তারা ক্রমে ক্রমে তাদের মনোবল হারাতে থাকে।

আওয়ামী লীগের বৃটেন, আমেরিকা ও ভারতের উপর নির্ভর (শেষাংশ অস্পষ্ট পৃষ্ঠায়)

দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দীদের পিঁড়িরে মারার ঘটনা প্রসঙ্গে

(দপনের পর্ববৈক্ষক)

বহরমপুর, মোদিনীপুরের পর, নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই সরকারের আমলেই গত কয়েকদিন আগে এক নৃশংস ঘটনা দমদম জেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অজ্ঞববুদ্ধকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে অতীতের জহাদ কংগ্রেস সরকারের আমলে নিরস্ত্র অবস্থায় অসহায় বন্দীদের সরকারী আইনকানুনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জেলের ঘেরা জায়গায় পিটিয়ে মেরে ফেলা হলো।

বিশ্বস্ত মহলের অভিযোগ অনেক। কিন্তু পদলিখের বেপরোয়া এই হত্যাকাণ্ডে নিহত একজন বন্দী প্রীপার্থ ঘোষের কথাই এখানে উল্লেখ করছি। ছেলোটি এবার হায়ার সেকেন্ডারীর পরিক্ষার্থী ছিল। বোম্বপুর্বে সেন্ট এন্ড্রুজের পনেরো বৎসরের পার্থ স্কুলের একজন সেরা ছাত্র। প্রতিটি ছাত্র ও শিক্ষকের প্রিয় এই ছাত্রটি ডিসেম্বর মাসের শেষাংশে পদলিখের হাতে ধরা পড়ে। স্কুল পোড়ান, ওয়ালিং, সেটেলমেন্ট অফিস পোড়ানোর অভিযোগের সঙ্গে ছেলোটিকে জড়ানো হয়। মজার ব্যাপার, পদলিখের বীরপুংগবরা অভিযোগ প্রমাণ করার জন্যে অদালতের শরণাপন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত কেসগুদলি আঠাশে ডিসেম্বর প্রত্যাহার করে নেয়। এবং তারপরেই পদলিখ আলিপুর এস, ডি, ওর কোর্টে পি ডি অ্যাক্টে পৃথকে পদনারায়, গ্রেপ্তার করে।

জানা যায়, পার্থর বিরুদ্ধে স্কুল পোড়ানোর অভিযোগ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সরাসরি অস্বীকার করেন। সংশ্লিষ্ট স্কুলের অনেকের কাছ থেকে জানা যায়, পার্থর গ্রেপ্তার হওয়ার আসল কারণটিই ছিল সম্পূর্ণ চক্রান্তমূলক। অনেকেই বলেন, সেন এন্ড্রুজ তুলে দিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সিনেমা হল তৈরী করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ কর্মিটি গঠিত হয়। কর্মিটির কাজ ছিল, স্কুলের কাজকর্ম অব্যাহত রাখা এবং স্কুলের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা। এ ব্যাপারে আগে থেকেই এই কর্মিটি সতর্কতার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করে আসাছিলেন। তাদের আশঙ্কা ছিল, এই স্কুল কর্তৃপক্ষের স্বারা পরিচালিত কল্যাণী এন্ড্রুজ, সল্টাব-পুর্ এন্ড্রুজ যেভাবে অচল করে দিয়ে কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের বিপন্ন করা হয়েছে এক্ষেত্রেও সেরকমই হবে। তাই এই কর্মিটি প্রস্তুত হয়েছিল এবং পার্থ ঘোষ এর সক্রিয় সদস্য ছিল। পদলিখের তরফ থেকে বতই একে “উগ্রপন্থী” হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হোক না কেন, একথা সত্য, পার্থ স্কুল পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিষ নজরে পড়েছিল।

এর পরেই গ্রেপ্তার, তারপর পি ডি অ্যাক্টে আটক করার ঘটনা ঘটে। দমদম জেলে পার্থ নর নম্বর সেলে আটক ছিল। বন্দীদের আত্মীয় স্বজন অনেকের কাছ থেকে জানা

যায়, সাত ও নয় নম্বর সেলে আটক বন্দীরা অনেক দিন আগে থেকেই হামলার আশঙ্কা করে আত্মীয় স্বজনের কাছে অন্য জেলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। এমনকি, জেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া খাবারদাবারও বন্দীরা সহজে খেতে চাইছিলেন না। অনেকেই জেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। এছাড়া, চোন্দই মে, ঘটনার দিন অনেক বন্দীই সেল থেকে বেরুতে চাইছিলেন না। আত্মীয় স্বজনের কান্নাকাটিতে যখন বেরিয়ে আসেন তারা, সেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে পদলিখের হামলা ও পরিকল্পনা মাফিক খুন করার আশঙ্কার কথা আত্মীয় স্বজনকে জানান। এবং সেজন্যে সেল থেকে বেরুতে তারা ন্যারাজ ছিলেন বলে প্রকাশ করে।

জানা যায়, ঘটনার দিন, বিকেল পাঁচটা তিরিশ পর্যন্ত কোন গান্ডি গেল হয়নি। অবশ্য জেলের বাইরে ও ভিতরে প্রচণ্ড পদলিখ মোতায়ন ছিল। সাড়ে পাঁচটার কিছু সময় পরে বন্দীদের আত্মীয় স্বজন বেরিয়ে আসার পরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরিণামে, পনেরো জন নিহত ও পঁচাত্তর জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। পরাধীন ভারত বা সম্ভব হত না, তাই সম্ভব হলো, শিখণ্ডী অজ্ঞববাবুর মৃত্যুমিহনের সামলে। শত্রু পার্থ ঘোষ নয়, ঘটনার

সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক নিহত ও আহত বন্দী। এধরনের ঘটনা আগেও ঘটে গেছে। সোদিনও ঘটলো। তাই এই ধরনের হত্যা বন্ধের জন্যে অনেকেই চাইছেন দমদমের ঘটনার অসিল তথ্য প্রকাশ ও এর সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নেরও সুরাহা হোক। প্রশ্ন হলো, জেলের অভ্যন্তরে সাত ও নয় নম্বর সেলের বন্দীদের পক্ষে সশস্ত্র থাকা কি সম্ভব ছিল? পদলিখের কাছে বন্দীদের পল্লানো অথবা ষড়যন্ত্রের কোন তথ্য আগেই যদি এসে থাকে, তবে পনেরো জন বন্দী নিহত হওয়ার মত ঘটনা ঘটে কী করে। বাইরে ও ভিতরে সশস্ত্র পদলিখ মোতায়ন থাকা সত্ত্বেও অল্পবয়স্ক বন্দীরা কি এতই বোকা ছিল যে, তারা সাড়ে পাঁচটার পর পাল্লানোর মত ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবে। বন্দীদের গুলি করে কিম্বা পিটিয়ে মারা সম্পর্কে পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট কি বলে? জেলের মধ্যে অসহায় বন্দীদের পর পর তেরো জনকে মেরে ফেলার সময়ে জেলার ডেপুটি জেলার ও অন্যান্য ষাণ্ডেশীল অফিসারদের ভূমিকা কি ছিল। বন্দীদের বাঁচানোর কার্য কি তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে ছিল না? এছাড়া, চোন্দই মের ঘটনার নিহত বন্দীদের মৃতদেহ জেল তারিখ বেলা তিনটের সময়ে ঘাটে নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু রাত নয়টার সময়ে ব্যারাকপুর্কের মণি-রামপুর্কের অল্প আলোকিত ঘাটে মিলিটারী গাড়ীতে নিয়ে আসা হলো কেন?

“অতুল্য ঘোষ রাজাগোপাল চারী যে এমন করে কলকাতার বৃকে ফিরে আসবেন কে ভেবেছিল!” ত্রিদিব সেই তার কালো চশমাটা মুছতে মুছতে বলছিলেন।

আমাদের অফিস কার এখন কুইনস ওয়ে ছেড়ে শেকসপীর সরণীতে ঢুকছে। আখ ডজন সেলস একজিকিউটিভ ফিটফাট পোষাকে আমাদের নোতুন এরিয়া সেলস ম্যানেজার মিঃ সিং-এর ফ্লাটে চলছে “ককটেল” পার্টি এ্যাটেন্ড করতে। রাস্তার বাতিগুলো র্যাক আউটের আপদকালীন মলিন চেহারায় সমস্ত সুর অন্ধকার করে দিয়েছে। অর্থাৎ আমাদের চোখের কালো চশমা শহরটাও টিম টিম করছে। মটর গাড়ির হেড লাইট চশমার কাঁচে সার্চ লাইটের মতো তাঁর আর তীক্ষ্ণতার সঙ্গে আক্রমণ করছে বেন। ছ-জনার চারজনই কালো চশমার আড়ালে রক্তজবা চোখ ঢেকে আছি। মাঝে মাঝেই জলের পর্দা পড়ে চোখের দৃষ্টি আরও ব্যাপসা হচ্ছে। ত্রিদিবের কন্ঠস্বরে তাই বিরক্তির উদ্ভাপ।

তালুকদার ড্রাইভারের পাশ থেকে চোঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, “অতুল্য-রাজাগোপাল মানে?”

“মানে তুমিও বুঝবে চাঁদ। কেউ বাদ পড়বে না। চোখের পঙ্গপাল শহর জুড়ে উড়ছে। এচেখে অতুল্য ঘোষ ওচাখে রাজাগোপাল চশমা এটে প্রায়শ্চ অবস্থাটা দেখতে পাছ না? সিগারেটের মতো কালো চশমা, চোখের ওষুধ, সবই উধাও, ব্লাক! চশমা পিছ, কমসে কম দুটো করে টাকা নাকি হোল-সেলসদের গদীতেই বেড়েছে, দোকানী তার ওপর কত চড়াচ্ছে বোকা!” একটু থেমে প্রশ্ন করে, “হারে, চাবন সাহেবের চোখেও কি রাজা-অতুল্য বাবুদের মতো কালো চশমা আছে?”

“কৈ না তো!”

আমরা হাসি। আমি বলি, “কিন্তু চাবন সাহেবের চোখ নিয়ে আবার গবেষণা কেন, ত্রিদিব?”

“না, ভাবছিলাম নিশ্চয় চশমা আছে। না হলে আর একটু দূর-দৃষ্টি থাকত তাঁর। ওনার আর একটু ফারসাইট থাকলে উনি নিশ্চয় কালো চশমার ওপরেও ট্যাক্স বসিয়ে দিতেন। লাখ কয় টাকা শ্রুত কলকাতা থেকেই উঠে আসত চশমার ওপর ট্যাক্স বসিয়ে।”

প্রণব অধিকারী বললে, “স্মার-সইটেরই চড়াতে হয়েছে এবারের কোম্পানি বাজেটে। জিনিষের দাম ঐ হেভী রেটে চড়ানোর পেছনে কতবড় দূরদৃষ্টি কাজ করছে বলত, ইন্দিরাজী “গরিবী হটাও” এক বাজেটেই সাকসেসফুল।”

“তার মানে?” রুখে ওঠে ত্রিদিব।

“খুব সোজা। যে দেশে জিনিষ-পত্রের মূল্যমান যত বেশি, বৃকতে হবে, সে দেশ তত সমৃদ্ধ-শালিনী। নহলে মানুষ কিনবে কী করে!”

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

“বাহ, বাহ বা! খুব বললে ব'হোক, প্রেফ নিউজ পেপারের রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতো কথা। যারা কিনতে পারবে ন', তারাই তো একশ। তাদের দিকে এক চোখ বন্ধ করে হিসেব?”

তালুকদার বললে, “তারা নেই। তারা উবে যাবে। এ হল গরীব তাড়ুয়া বাজেট। নো গরীব। বজেটই বলছে, দেশে আর গরীব নেই। থাকবে না।”

আমি ওদের চপ করাবার জন্য প্রসঙ্গ ফেরাতে চাইলাম। বললাম, “কালো চশমা থেকে ভালো বাজেটে চলে গেলে তোমরা। কিন্তু এই চোখ গেলো রোগট নাকি মল্লা থেকে আমদানী?”

“না, ন', লোকে ওটার নাম দিয়েছে, “জয় বাংলা” রোগ। কেন এই নামকরণ অবশ্য বুঝছি না। হয়তো ওদের বক্তব্য, ইয়াহিয়্যর বিবাহ বোমার বিষ সীমান্ত পেরিয়ে এব'র পশ্চিমবঙ্গের চোখ খুবলে নিতে এসেছে। আই-এপিডেমিক! ওদিকে আবার শুনছি, বাংলা দেশের শরণার্থী শিবিরে কলেরার প্রাদুর্ভাব। রাজ্য সরকার বলছেন, ছেড়ে দে, মা কেঁদে বাঁচি। কেন্দ্র তুমি রাজ্য নাও, আমাদের র'ইটার্স ছাড়তে দাও!”

আমাদের কন্ঠস্বরের বোঝা নিয়ে এই সময় গাড়িটা বড় এক ফটক পেরিয়ে সিধে বড় বাঁকান্দার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে সারি সারি মটর কারের শোভা। এই অট্টালিকার অনেক ফ্লাট বাড়ি নয়, যেন একটা কলেনী, সোজা আকাশ ফুড়ে কেবলই শূন্য হাত বাড়ছে।

আমাদের নোতুন এরিয়া সেলস ম্যানেজার কর্তৃক কলি। চার্জ নিয়েই স্বগৃহে পার্টি বসিয়ে দিলেন। কথার কথ'র কাজের হিসেব আর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ। খোদ দিল্লী থেকে তালিম নিয়ে এসেছেন। তৎপূর্বে চন্দীগড়েই পাঁচ বছর। লম্বা দোহারা চেহারা। জর্জ দি ফিফথের মতো মদুখশী। দাড়ি সব সময় কালো নেটে টান টান বাঁধা। দামী কটনের ওপর সুদৃশ্য নেকটাই। ইংরেজি বেন মাতৃভাষা। তবে ঐ, উচ্চারণে জাত্যভিমান অটুট। পর্দার আড়াল থেকে কথা বললেও পাজাব যে মাতৃভূমি এটা বুঝতে ভারতবাসীর পক্ষে বেগ পেতে হবে না।

মিসেস সিং নিজেই পানীয়ের গ্লাস তুলে “চোরও” জানালেন আমাদের উদ্দেশ্যে। পাজাবী নারী অপেক্ষা পুরুষমুখ অনেক বেশি সুন্দর হলেও মিসেস সিং বাস্তবিক রূপের হাট। ত্রিদিব আমার কোমরে একটা ইঞ্জিতপূর্ণ খোঁচা দিয়ে সেই রূপসী “বস” জায়ার বুপের তারিফ করল। আমি চোখ

পাকিয়ে তাকালাম তার দিকে। সে নির্বিকার। হাত বাড়িয়ে বোয়ারার ট্রে থেকে কাঠি গোঁজা ফিস ফাই-র টুকরো তুলে নিচ্ছে। একই সঙ্গে প্রায় গোটা চারেক। ফিস ফিস করে আমাকে বললে, “আ-স্টম্ফক ঠেসে নে শালা! কয়েতের ছেলে, খেতে জানিস না ভোরা।” পর-মুহূর্তেই চোখ টিপে শিবুকে ডাকলে। শিবু, আমাদের অফিসের বোয়রা। বর্তমানে জিনি ওয়াকর ওল্ড স্কচ ট্রে ভার্ট গ্লাসে করে পরিবেশন করছে। ত্রিদিব বলল, “বড় পেগ ঢেলে আনিস” হাপের মধ্যে তিন পো সোডা। ভেতরে শ্রুত গাঁজল উঠবে।”

শিবু হাসে। আমি বলি, “এই হচ্ছে কী? ককটেলের ছোট পেগই নিয়ম।”

“আরে ধাম, এখানে ককও নেই টেলও নেই। মিকসচার বানায় কেউ? নিয়ম শেখাস ন' ত্রিদিব সোমকে। হাপ, চালিয়ে বাকি বোতালগুলো সিং সাহেব পার-সোনাল 'বারে' রেখে দেবে, তারপর ঢুকু ঢুকু। এ তো যে সে চাঁজ নয়, বাড়িয়া মাল। কোম্পানী একটু বেসামাল বলেই দিচ্ছে, কখনো খেয়েছো এ জিনিস?”

না, খাইনি। এতো দামী জিনিস সপ্তায় একমাত্র হিন্দী ছবির পর্দায় দ্রষ্টব্য। জিনি ওয়াকর। কিন্তু তা সেবনযোগ্য নয়।

কোম্পানী খাওয়াচ্ছে কথাত ত্রিদিবের কাছেই শুনলাম, আমার ধারণা ছিল এরিয়া ম্যানেজার নিজেই এই আয়োজনের আয়োজন করেছেন। মিঃ লাহিড়ীকে অনেক জল ধোলা করে কলকাতা থেকে সরাতে হয়েছে। তার পপুলা-রিটি কোম্পানীর নাকি বিষ নজরে পড়েছিল। লাহিড়ী যখন বিদায় নিতে ব'ধ্য হলেন, তাঁর বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল অভূতপূর্ব। সেলসের সকলেই মোটা চাঁদা তুলে তাঁকে রেকর্ড স্পেলারের সঙ্গে এক গুচ্ছ দামী লং স্লেইং রেকর্ডও উপহার দিয়ে-ছিল। কোম্পানীর কানে সব খব-রই গেছে। হেড অফিসের হেড-এক হয়ে উঠেছিলেন মিঃ লাহিড়ী। এসবই জেনে এসেছেন মিঃ সিং। আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা তাই মধুর করার জন্যই হয়ত এই আয়োজন। কিন্তু ত্রিদিব জানিয়ে দিল, এটাও কোম্পানীর ইনস্ট্রাক-শন। খরচ খরচাও কোম্পানীর। সুতরাং লজ্জা করে না। পার তো বোতাল-টাক মেরে দাও! এবং ত্রিদিব সত্যিই ঢক ঢক করে গ্লাস শেষ করে যাচ্ছে। আমার মনে হল, মিসেস সিং ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ব্রু কুঁচকে দু-একবার তাকি-য়েওছেন। ত্রিদিব বে-পরোয়া।

মিঃ সিং জ্বাল বাঁধা দাঁড়

চুমড়ে শ্রুত করছিলেন, “জেন্সটল-মেন, কোম্পানীর তরফে আপনাদের অভিনন্দন জানাই। আপন রাই কোম্পানীর ভরসা এবং গর্ব! একাধারে কোম্পানীকে পপুলার করা আর তার আয় বাড়ানোর দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কর-ছেন আপনরাই। আপনাদের নামও কোম্পানীর গুড বৃকে। আমি জেনে এসেছি, কোম্পানী আপনা-দের সুযোগ সুবিধার প্রতি বিশেষ জোর দিয়ে বিবেচনা করছেন।” মিঃ সিং মাথা দু'লিয়ে হাসলেন, যেন খবরটা পেয়ে আমরা দারুণ উৎফুল্ল। এটা তিনি ধরেই নিয়ে-ছেন এবং কোম্পানীর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেই পরিতৃপ্ত হাসি। তাই মাথা দু'লিয়ে এই হাসিকে আপ্যা-য়িত করছেন। মিসেস সিং দু-হাতে তালি ব'জিয়ে আমাদের কর্তব্যাকমুঢ় অবস্থা থেকে যেন নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলাম আমরাও। ক্ল্যাপ, ক্ল্যাপ, ক্ল্যাপ!

হাততালি থামলে মি সিং অসল প্রসঙ্গে এলেন। কন্ঠস্বরে আরও একটু মধ'দার ছোঁয়া দিয়ে বললেন, “মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস! আপ-নারা নিশ্চয় জেনেন, আমার পূর্ব-সূরী মিঃ লাহিড়ীকে কেন কল-কাতা থেকে বদলী করা হল। ওয়েল, লাহিড়ী আপনাদের মধ্যেই থাকতে পারতেন, যদি না।—” মিঃ সিং তাঁর গুরুকনো গলায় গ্লাসটা উবুড় করে ধরলেন, গলা ভিজিয়ে শ্রুত করলেন আবার, “আপনারা জানেন, মিঃ লাহিড়ী কলকাতার বিভিন্ন এরিয়া অফিসের কিছু তরলমতি ইয়ং সেলস এক-জিকিউটিভকে বিপথে চালাতেন। তাদের নিয়ে একটা চক্রান্তের ঘাঁটি বানাতে চেয়েছিলেন—এ্যাম আই কারেন্ট, ঠিক বলছি কি ন'?” মিঃ সিং সমর্থন চাইছেন। আমরা পর-স্পরের দিকে তাকাছি।

মিঃ সিং আর প্রতি ইঞ্জিত করছেন। কি বলব? আমি একে-বারেই নতুন। মিঃ লাহিড়ীর বিদায় দিবসে আমার বেগদান। আমি এ অফিসের বিজনেস অথবা অফিস কোন পলিটিক্সই এখনো বুঝবার সুযোগ পাইনি। এবং এসবই মিঃ সিং-এর জ্ঞানর কথা। আমি ত্রিদিবের দিকে তাকালাম। সে মাথাটা ওপর নিচে একটু নাড়িয়ে দিল। আমিও তৎক্ষণৎ একই মস্তক মূদ্রা প্রদর্শন করলাম। মিঃ সিং খুশি হয়ে সহধর্মিনীর দিকে তাকিয়ে মোলায়েম হাসলেন। মিসেস সিং স্বামীর হাতে অর একটা গ্লাস তুলে দিয়ে নিজে একটিতে ছোট করে লিপ করলেন।

আমরা প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে আছি। জন চারেক বোয়ারা ঘুরে ঘুরে আমাদের সামনে এসে ট্রে ধরছে। গোপেন্জন চিক ফিস। বোন-লৈস রেস্ট চিকেন। কাজ, নাটস এন্ড পটাটো চিপস। জিনি ওয়াকার ওল্ড স্কচ। ত্রিদিবের এই নিয়ে সান্ত গ্লাস হল।

মিঃ সিং বলছেন, “সেই চক্রান্তের ঘাঁটির নাম দিয়েছিল

ওর, সেলস ওয়াকার। মুনিনয়ন। হাউ ফানি! একজিকিউটিভরা হয়ে গেল প্রমিক আর কমী! অফিসর-দের আবার মুনিনয়ন? না, জেন্সটল-মেন, অফিসারদের কেন ব্রাডি মুনিনয়নের প্রয়োজন হয় না। আপ-নারা অফিসরস। কিন্তু আপনরা সবেমাত্র জীবন শ্রুত করছেন। কাঁচা বয়স। জীবন সংগ্রামের কত-টুকু জানেন। মিঃ লাহিড়ী আসলে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের প্রভাব বাড়িয়ে ডিরেকটরস বোর্ডে প্রমো-শন করিয়ে নিতে। আপনদের শ্রুত দাবার ছকে বড়ে ঘাঁটির মতো কবহার করতে চেয়েছিলেন উনি। এ ভোরি গুড পলিটিসিয়ান নো ডাউট। ব্রুড এন্ড ক'নিং। কিন্তু আমি তাঁকে মোটেই ভাল বলতে পারি না। তিনি আপনাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করতে চেয়েছেন।— আপনাদের, কোরিয়ার, চাকরির উন্নতির ধারাকে বন্ধক রেখে নিজের প্রভাব বাড়াতে চেয়ে-ছেন। মূর্খের স্বর্গ রচনার স্বপ্ন!” মিঃ সিং অম্লত ঘড়ঘড়ে গলায় হাসলেন।

আমাদের কী করা উচিত? হাসা উচিত? পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত? লাহিড়ী? শুনছি, মিঃ লাহিড়ীর অপরাধ, তিনি সেলস একজিকিউটিভদের কিছু নতুন সুযোগ সুবিধার আবেদন সমর্থন করে-হেড কোয়ার্টারে সুপারিশ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, মালিক-গোষ্ঠী ব্যাপারটা সুনজরে দেখে নি। তারা ভেবেছিল, সেলসে যখন কোন মুনিনয়নের বালাই নেই, মিঃ লাহিড়ী তখন তেমন একটি সম্ভা-বনার পিঠ চাপড়াচ্ছেন। দিল্লী থেকে একটা প্রোব কমিটি কল-কাতায় উড়ে এলো। জেনে গেল কলকাতায় মিঃ লাহিড়ীর প্রভাব প্রতিপত্তি এমনই বেড়েছে যাব-স্বারা তিনি ইচ্ছেমত তাঁর জোনে সংকট সৃষ্টি করতে পারেন আবার সংকট গ্রাণও তাঁর ইচ্ছেতেই সম্ভব। প্রকাশ্যে প্রোব-কমিটি মিঃ লাহিড়ীর ভূয়সী প্রশংসা করে ফেরৎ স্পেনে দিল্লী গেলেন। তারপরই ডিসকাশনের জন্য আলো-চনা বৈঠকে ডাক পড়ল মিঃ লাহি-ড়ীর। বেশ কিছুদিন পরে জানা গেল, মিঃ লাহিড়ীর কর্মোদ্যোগে সন্তুষ্ট হয়ে কোম্পানী তাঁকে মধ্য-প্রদেশের কোন একটি ছোট শহরে একটা নতুন অফিস চালু করার কাজে পাঠিয়েছেন। তিনি আর ফিরবেন না। এলেন মিঃ সিং। সহৃদয় ব্যবহার সন্দেহ নেই। তবে আজকের পার্টিতে স্পষ্টতই জানা-শ্রুত, তিনি আমাদের সতর্ক করতে চান। মিঃ লাহিড়ীর উত্থান পতনের ইঞ্জিত দিয়ে জানাতে চান, সাবধান-ছেলেরা, সাবধান।

আমি হয়ত অন্যান্যনস্ক ছিলাম। হঠাৎ কানে এলো ত্রিদিবের কন্ঠ-স্বর। মনে হল সেও হাসছে আর গ্লাসসমুখ হাতটা তুলে ধরে বলছে, “ওয়েল সেইড মিঃ সিং, ওয়েল সেসড! খুব ভালো বলেছেন স্যার! মূর্খের স্বর্গ! ফ'লস প্যারাডা- (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

সি পি এম এল দলের রাজনীতির ব্যাখ্যা

পিনাকী চক্রবর্তী

সি পি আই (এম এল)-র নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে শ্রেণীশত্রু খতমের যে অভিযান আরম্ভ হয়েছে তাকে মার্কসবাদ-মার্কসবাদের অনেক দল ও ব্যক্তিই "ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ" বলে অভিহিত করে। সি পি এম ও সি পি আই উভয়েই খতম অভিযানকে শ্রেণীসংগ্রাম বহিঃস্থিত "বাম হঠকারী পথ" বলে এর বিরুদ্ধে কুৎসা করে। শত্রু তাই নয় এদের ধারণা উক্ত খতম অভিযান আসলে-গণ আন্দোলনকে দুর্বল করে শাসকশ্রেণীকে সহায়তা করে এবং শাসক শ্রেণীর বর্বর আক্রমণকে আমন্ত্রণ জানায়।

সি পি এম রাজনীতি এক ধাপ বেশি এগিয়ে খতমের অভিযানকে সি আই এ নিয়ন্ত্রিত, কংগ্রেস-পুষ্ট "প্রতিবিলম্বী অভিযান" বলে আখ্যা দেয় এবং "সাজা বিলম্বী" সি পি এম-এর বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণীর চক্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করে।

সি পি এম এল রাজনীতিকে যে মুখ বা শরতান সাম্রাজ্যবাদী দালাল শাসকশ্রেণীর রাজনীতির অংশ বিশেষ বলে ব্যাখ্যা দেয় তাই তাদের সঙ্গে বিতর্কে প্রবেশ করার মতো উদ্দেশ্য নিয়ে এ লেখার সূত্রপাত হয়। বুদ্ধোন্মত্ত ও প্রতিবিলম্বীদের একটানা কুৎসা রটনার মধ্যে সি পি এম এল-এর রাজনৈতিক বক্তব্যকে বিলম্বী জনসাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করাই এর উদ্দেশ্য।

১. "ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ" ও "বাম হঠকারী পথ" কাকে বলে?

ভারতবর্ষের পেটি বুদ্ধোন্মত্ত নেতৃত্বাধীন তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলনে "ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ" একটা প্রবণতা হিসেবে উঠেছিল। উক্ত "ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের" প্রবণতা আসবার অন্যতম কারণ ছিল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির সফল প্রয়োগের অনুপস্থিতি। উক্ত "সন্ত্রাসবাদ" তাই কিছু ইংরেজ নাগরিক বা অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত হলেও কৃষক শ্রমিক জনসাধারণের শ্রেণীচেতনতা ও শ্রেণীঘৃণা দ্বারা পরিচালিত হয়নি। বিলম্বীশত্রু পেটিবুদ্ধোন্মত্ত তরুণদের মধ্যে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব থাকার ফলে উক্ত সন্ত্রাসবাদ পরিচালিত হয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা। অধুনাকালে "গেরিলা এ্যাকশনের" নামে পূর্ববঙ্গে এ ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী হত্যা সংঘটিত হচ্ছে, এবং হত্যায় ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনীই শত্রু খতম হচ্ছে—এ কথা বলা যায় না। বস্তুত অব্যঙ্গ্যলী খেটে খাওয়া মদসলমান শ্রমিক এধরনের সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের অর্থ এই

নয় যে একটি জোতদার বা শোষক শ্রেণীর কাউকে হত্যা করা, এর অর্থ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গীহীন পেটি বুদ্ধোন্মত্ত প্রবণতার সাহায্যে ও শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতির পথ এড়িয়ে শাসক শ্রেণীর জাতি বা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যে কাউকে হত্যা করা। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ফ্যাসিবাদীর ভঙ্গীর প্রথম ধাপ।

"বাম হঠকারী পথ" তাকেই বলে যখন শোষিত মানুষকে অস্বাভাবিক করবার কোন প্রচেষ্টা না চালিয়ে গণফৌজের ব্যাপক সংগঠন তৈরী না করে প্রায় নিরস্ত্র জনতাকে শোষক শ্রেণীর পুলিশ ও মিলিটারীর বিরুদ্ধে সোজা-সুজি মোকাবিলার জন্য এগিয়ে দেওয়া হয়। প্রাক বিপ্লব চীনে লি লি সান লাইন, আটচালিশ সালের রণদীপে লাইন, অধুনাকালের সি পি এম-এর তথাকথিত জঙ্গী লাইন এ বাম হঠকারী পথের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গণফৌজ ও দীর্ঘমেয়াদী জনযুদ্ধের তত্ত্বকে পরিহার করে জনসাধারণের বিপ্লবাকাঙ্খার সুযোগ গ্রহণ করে বাম হঠকারী পথের রাজনীতি। তবে বামহঠকারী পথ গ্রহণ সংশোধনবাদী নেতৃত্বের পক্ষে তখনই অপরিহার্য হয় যখন অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয় এবং দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি জনসাধারণের মানসিকতার দিক থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যায়। দীর্ঘমেয়াদী জনযুদ্ধের পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও পরিকল্পনা সংশোধনবাদী নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কিন্তু একদিকে বিপ্লবী জনতার চাপে, অন্যদিকে নিজেদের নেতৃত্বের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্য ও শোষকশ্রেণীর সঙ্গে ভাগ-বাটোয়ারার রাজনীতিতে নিজের "বারগে-গেইনিং ক্ষমতা" বাড়ানোর জন্য সংশোধনবাদী নেতৃত্ব বরাবরই নিরস্ত্র বিপ্লবী জনতা ও বিপ্লবী ক্যাডারদের শোষকশ্রেণীর পুলিশ ও মিলিটারীর নিকট আহুতি দেয়। যেমন সম্প্রতি পূর্ববঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও তার বংশবদ ইন্দ্রিয় সরকারের অঙ্গুলি-হেলনে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুমতি নিয়ে দেড়লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র জনতাকে ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনীর থোরাক হিসেবে জুগিয়েছিল এ আশঙ্কা যে তাতে ইয়াহিয়া তার সঙ্গে বোঝাপড়ায় বসে শোষণের অধিকার খানিকটা তাকে ছেড়ে দেবে। দেড় লক্ষ লোকের মৃত্যু বতাই শোকাবহ হোক না কেন, পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের সৌভাগ্য যে মুজিববরের পরিকল্পনা সফল হয় নি। কয়েকমাস আগে বাংলা দেশের দুর্গাপুরে সি পি এম নেতৃত্ব নিজেদের পার্টির জঙ্গী ক্যাডারদের ইন্দ্রিয় বর্বর পুলিশ ও মিলিটারীর মুখে একইভাবে ঠেলে

দিয়েছিল—যখন সেনাবাহিনীর একটিকেও খতম করতে পারেনি সি পি এম-এর দুর্গ দুর্গাপুরের স্বেচ্ছাসেবকরা, নিজেরাই দলে দলে খতম হয়েছে সেনাবাহিনীর দ্বারা। কেন? যাতে-সিটুর নেতৃত্ব তথা সি পি এম নেতৃত্ব ইন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া করতে পারে। আজ দুর্গাপুরে হিন্দুস্থান 'সিটু' হলো মালিকশ্রেণীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সংগঠন। বাম হঠকারী পথের মশলা হিসেবে যে বিপ্লবী তরুণরা ব্যবহৃত হয় তাদের নিকট দীর্ঘমেয়াদী জনযুদ্ধের কোন পরিকল্পনা সি পি এম রাখে নি, রাখতে চায় না, সি পি এম নেতৃত্ব এ সত্য গোপন করে যে—শত্রু বিপ্লবী মানসিকতা দিয়ে বিপ্লব হয় না, এর জন্য আরো প্রয়োজন সশস্ত্র পরিকল্পনা মার্কিন রাজনীতির বস্তব বিকাশ।

বাম হঠকারী পথ চটকদারী পথ—সংশোধনবাদের দ্বারা অনুসৃত জঘন্য পথ, যে পথে পার্টির ক্যাডার, সমর্থক ও বিপ্লবী জনতা নেতৃত্বের ক্ষমতালোভ, অর্থলোভ শোষকশ্রেণীর পাতের উচ্ছৃঙ্খলিত কুড়ের নোবর জন্য ব্যবহৃত হয়, প্রতারণিত হয়।

সি পি এম এল দ্বারা অনুসৃত শ্রেণীশত্রু খতম অভিযান ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ নয়, বাম হঠকারী পথও নয় এ অভিযান একদিকে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিকাশের অন্যদিকে শ্রেণীসংগ্রামকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবার পথ—যে পথের আশ্রয় উদ্দেশ্য গণফৌজ গঠন করে দীর্ঘমেয়াদী জনযুদ্ধের প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কি ভাবে? বলছি।

শ্রেণীশত্রু খতমের দ্বারা

শ্রেণীসংগ্রামের পরিচালনা

যে কোন বিপ্লবীই জানেন যে স্থান ও কাল নির্বিশেষে শ্রেণী সংগ্রাম কোন বিমূর্ত রূপ নিয়ে বসে থাকে না। সামাজিক অবস্থার স্তর এবং জনসাধারণের বৈপ্লবিক চেতনার মান দ্বারা শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃতি নির্ধারণ, বিপ্লবের স্তর বিচার বৈপ্লবিক জনযুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামকে নিয়ে যাবার কৌশলগত দিক—এ সবই যে কোন জাতীয় কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সমস্যা যদিও এ সমস্যার কিনারা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শ্রেণীসংগ্রামকে বৈপ্লবিক জনযুদ্ধে নিয়ে যেতে গেলে কোন দেশ ও কালের বিশেষ পরিস্থিতিতে সামাজিক রণনীতি ও সাময়িক রণনীতি কি হবে তা বৈপ্লবিক প্রয়োগের বিকাশের পথেই নির্ধারিত হয়। কোন ছক বাঁধা

পথের বা ঐতিহাসের পাতা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া কোন কৌশলগত নজীরের অন্ধ অনুকরণ বিজ্ঞানসম্মত নয়।

সংশোধনবাদীরা মুখে অস্বীকার করলেও কার্যতঃ শ্রেণীসংগ্রামকে একটা সামগ্রিক খাঁচে, ছক বাঁধা পথে বরাবরের জন্য আবদ্ধ রাখতে চায়। সংশোধনবাদীদের শ্রেণীসংগ্রামের উক্ত কায়দা হলো মিছিল ও ধর্মঘট করা, বাম হঠকারী পথের অনুসরণ করে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে নিরস্ত্র বা আধা সশস্ত্র জনসাধারণকে সোজাসুজি পুলিশ মিলিটারীর কুকুরদের সামনে ঠেলে দিয়ে হত্যা করানো, দাবার চালে হেরে গেলে বাম সর্বিধাবাদ থেকে নাকে খত দিয়ে দক্ষিণ সর্বিধাবাদে এসে আত্মরক্ষা করা এবং চূড়ান্ত অবস্থায় ভোটবৃদ্ধ করে পাঁচগলা রাষ্ট্রকাঠামোর মন্ত্রিসভার গদি নিয়ে কামড়াকামড়ি করা।

সি পি আই থেকে সি পি এম পর্যন্ত সকল বুলির নেতারা কার্যতঃ ১৯৪৬ সাল থেকে যে ধরনের "শ্রেণীসংগ্রাম" মদত দিয়েছিল, আজও অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর পর ১৯৭১ সালে এ একই কায়দায় "শ্রেণীসংগ্রাম" চালাচ্ছে। যেন গত পঁচিশ বছরেও ভারতবর্ষে বিপ্লবী পরিস্থিতি, এমন এগোয়নি যে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর কোন পর্যায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

সংশোধনবাদী নেতারা মনে করে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর পর্যায় হলো অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের প্রসারিতা—বোনাস বা ঘেরাও আন্দোলনের এবং জমি দখল আন্দোলনের ব্যাপকতা অথবা বিপ্লবী জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রেণীঘৃণাকে ব্যবহার করে, প্রতারণিত করে মন্ত্রিসভার গদি পাওয়া। বৈপ্লবিক জনযুদ্ধ বা গণফৌজ গঠনের প্রশ্নে এরা নীরব বা বুলি-সর্বস্ব। এরা বলে—শোষক শ্রেণী সোজাসুজি হিংসার পথ বতর্দিন না নিচ্ছে শোষিত শ্রেণীর আগু বাঁড়িয়ে শ্রেণীহিংসার পথ নেওয়া ভুল। গণফৌজ গঠন বা বিপ্লবী রণনীতি গ্রহণের প্রশ্নকে ধামাচাপা দেবার জন্য আমাদের দেশের সংশোধনবাদী নেতারা আরো একটা বুদ্ধি হাজির করে; সেটা হলো—ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অসম-বিকাশ তথা শ্রেণী চেতনার অসম-বিকাশের দরুণ বিপ্লব সূদূর-পর্যন্ত। এটা শত্রুই বিপ্লবী জনগণের প্রতি অনাস্থা এমন নয়, এটা আসলে প্রতারণার কথা।

নকশালবাড়ীর কৃষকরা রাজস্থানের কৃষকদের চেয়ে অধিক শোষিত হয় এটা সত্য নয়। পাঞ্জাবের কৃষকরা সব কুলাক, পশ্চিমবঙ্গের নয়—এমন কথাও একটা বিকৃত বাস্তবতা। ভারতবর্ষের সবচেয়ে শোষিত মানুষের মধ্যে বিপ্লবী মানসিকতা গড়ে উঠেছে সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংকটের জন্য, এখন প্রয়োজন এ মানসিকতার প্রতিবন্ধক সকল পেটিবুদ্ধোন্মত্ত

দ্যানধারণার সংস্কারের মূলে আঘাত হানা। এ আঘাত কোথায় হানতে হবে, শ্রেণীঘৃণার শিকার করা হবে এটাই নকশালবাড়ী ভারতবর্ষের কৃষক শ্রেণীকে দেখিয়েছে।

নকশালবাড়ীর আন্দোলন আরো দেখিয়েছে যে শ্রেণীঘৃণার স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ বিপ্লবী সংগঠনের দ্বারা পরিকল্পনামাফিক পরিচালিত না হলে শোষকশ্রেণী ও তার দালাল সংশোধনবাদী নয়—সংশোধনবাদীরা শোষিত শ্রেণীর উপর যে প্রকাণ্ড অত্যাচার চালাবে তা থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করা যাবে না। নকশালবাড়ী আন্দোলনের শিক্ষা থেকেই গেরিলা কায়দায় খতম অভিযান পরিচালনার সূচনামূলক পথ নির্দেশ আসে।

শ্রেণীশত্রু খতম কৃষককে তার সামন্ততান্ত্রিক ও বিজয় পেটিবুদ্ধোন্মত্ত মূল্যবোধ থেকে মুক্তি দিয়ে গণফৌজ গঠনের বিপ্লবী মানসিকতার সামিল করে। শ্রেণীঘৃণার শত্রু পেটিবুদ্ধোন্মত্ত পিছ-টান; জড়তাকে খতম করে, বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের মানসিকতাকে তৈরী করার কোন চেষ্টাই এ যাবত কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী সাম্রাজ্যবাদীর চতুর দালালরা চেষ্টা করেনি। এদিক থেকে সি পি (এম এল)-ই অগ্রণী।

সি পি (এম এল) মনে করে নকশালবাড়ী সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণীঘৃণার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশে। শত্রু তাই নয়, ভারতীয় বিপ্লবের স্তর, তার অগ্নিগর্ভ অবস্থাকেই সূচিত করেছে নকশালবাড়ী। তাই ভারতবর্ষে শ্রেণীসংগ্রামের নবতম পর্যায় হবে উক্ত শ্রেণীঘৃণাকে স্বরাস্বিত করা। তার ব্যাপকতম আত্মপ্রকাশের পথে যে মানসিক জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তার বাধা রয়েছে, তাকে উপড়ে ফেলা, সশস্ত্র বিপ্লবী জনযুদ্ধের মানসিক বাতাবরণ সৃষ্টি করা।

সি পি (এম এল) বিনাবিচারে ব্যক্তির খতমে বিশ্বাস করে না। আবার শ্রেণীহীন ব্যক্তি বলে কিছু আছে বলে স্বীকারই করে না। তাই সি পি (এম এল)-এর মতে কোন ব্যক্তির বিপ্লবী এ্যাকশন স্কোলাডের হাতে খতম হওয়াকে (শেখাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

নবাব দাখানিক

১ চাঁদার হার

বার্ষিক পনেরো টাকা
বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, মঠ মেন, কলি-১০

ছবি তৈরীর শিক্ষানবিশী

স্বপ্নাঙ্কনশিল্পী কাক

পুণ্য চলচ্চিত্র শিক্ষানবিশীর মত বয়স হল নব্বয়। একটা প্রতিষ্ঠানের জীবনে এটা খুবই কম সময় এবং এখানে প্রচুর সাংগঠনিক গুটিবিচ্ছাদিত বর্তমান। কিন্তু এই অল্পসময়েই পুণ্য প্রাক্তন শিক্ষা-ধীদের মধ্যে অনেকেই দেশের সিনেমাজগতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁদের সমবেত প্রয়াসে ভারতীয় চলচ্চিত্রে কিছুটা নতুন রক্তের আমদানী সম্ভব হয়েছে। একটা বিদ্যালয়ের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। আসলে ছবি তৈরীর হাতেকলমে শিক্ষানবিশী পুণ্য ছেলেদের পরবর্তী জীবনে খুবই কাজে লাগে। তাঁদের পাঠক্রমের মধ্যে প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে একটা ছোট ছবি করতে হয় এবং এর ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণের গুটিবিচ্ছাদিত অনেকটাই তাদের আয়ত্ত

হয়ে ওঠে। অন্যান্য বছরের মত এবারেও কলকাতায় পুণ্য ছাত্রদের তৈরী ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল সত্তর সালের স্নাতকদের তোলা ছবি নিয়ে। বিভিন্ন রকমের ছবি, বিভিন্ন মেজাজে তৈরী। রূপকল্পিত প্রতীকী ব্যঙ্গনা থেকে আরম্ভ করে সমসাময়িক বাস্তবের দলিলচিত্র অবধি সবই আছে এখানে। নতুন শিক্ষার্থীদের তৈরী ছবিতে কাঁচা হাতের ছাপও অজস্র, তবুও স্বাধীন আত্মপ্রকাশের চেষ্টাও কম মূল্যবান নয়। “সুমন” এবং “চেতনা” কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের সন্ধিক্ষণের যন্ত্রণা ও বিক্ষোভের ছবি। এধরণের দুর্দহ প্রয়াস অভিনন্দন-যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্যামেরার ভাষায় মৌন চেতনার বিকাশ এবং এ বিশেষ সময়ের আলো-

আধারি জগৎ একেবারেই পরিষ্কট হয়নি। দুটি ছবিতেই জয়া ভাদুরীর অভিনয়ে সেই সুক্ষ্ম আবেগের প্রকাশ অনুপ্রাণিত। “মহাদীপ” “সত্যনাথ” ও “দি র্যাভিট” দাম্পত্য জীবনের নানারকমের সমস্যা নিয়ে তৈরী। মহাদীপ স্বামী-স্ত্রীর ফুল বোঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে নির্মিত একেবারেই সাধারণ বাজারী ছবির ধাঁচে। “সত্যনাথ” ছবিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে নায়ক তার স্ত্রীকে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে তুলতে গিয়ে পারিবারিক শান্তি নষ্ট করল। খুবই ছেলেমানুষি ব্যাপার, বোম্বাই-ঢং-এর পাটি ও নাচগানও রয়েছে ছবিতে। “দি র্যাভিট”-এ অবশ্য একটু মানবিক আবেগের পরিচয় দেবার চেষ্টা রয়েছে। একটি সুখী দম্পতির জীবনে হঠাৎ কোথেকে এসে বিপ্রাট বাধাল স্ত্রীর পোষা একটা খরগোস। বেশ নতুন ধরনের বিষয়, কিন্তু প্রয়োগনৈপুণ্যের অভাবে কিছুই দানা

বাঁধেনি। “ইন পাঁচগনি” ও “এ বয় গ্র্যান্ড এ গার্ল” যুবক-যুবতীর রোমান্টিক সম্পর্কের মিষ্টি সুরের ছবি, কিন্তু এখানেও মাধ্যমের ওপর নির্মাতাদের যথেষ্ট দখল না থাকায় চরিত্রগুলোর অন্তরঙ্গ মানসের বিশ্লেষণ সম্ভব হয় নি। “মা নিষাদ” এবং “আরিং ইয়ং-ম্যান” বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে মৃদুধর কিন্তু খুবই নাটকপণ্যের বাহুল্যে বিপর্যস্ত, যদিও “আরিং ইয়ং-ম্যান”-এ কমল নায়কের দক্ষ ক্যামেরা-কৃতি বিশেষ করে হাত ক্যামেরার ব্যবহার চমকে দেবার মত। “লটারী” খুব পুরোনো কমেডী পরিস্থিতি (হারানো লটারী টিকিটের খোঁজে দৌড়াদৌড়ি) নিয়ে তৈরী হাস্য-ধরনের ছবি, যদিও মাঝে মাঝে কাতুত্ব দিয়ে হাসানোর চেষ্টা খুবই বিরক্তিকর। ব্যাক অ্যান্ড হোয়াইট-এর বিষয় হচ্ছে আজকের মানবের অনিকেত অস্তিত্ব। রূপ-কথার মেজাজে তৈরী ছবি। কিন্তু

এখানেও ভঙ্গীর শৈথিল্যে বিষয়ের গুরুত্ব অনেকটাই কমে গেছে। “হুম টু রেম” এবারকার ছবির মধ্যে সবচাইতে বেশি নাড়া দিয়েছে। রেলপথের নানা সমস্যা ও দূর্নীতিকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই দলিল চিত্রে শ্লথ সম্পাদনার যদিও ছবির গতি কিছুটা ব্যাহত কিন্তু তবুও দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবসম্মত রূপ এ ছবির একটা বড় সম্পদ। সব মিলিয়ে দেখতে গেলে অবশ্য এবারের ছাত্রদের কাজ বেশ নৈরাশ্যজনক। সবচাইতে ভয়ের কথা এই যে, পরীক্ষা নিরীক্ষার ইচ্ছেটা কেমন যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং রক্ষণশীলতার মনোভাবটা যেন গেড়ে বসেছে। আগের দু-তিন বছরের ছবির মধ্যে যে একটা দূরন্ত সজীবতা ছিল, সেটা যেন ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষামানের এ-ধরণের অবনতির কারণ অনুসন্ধান খুবই জরুরী।

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

শীলতার আশ্বাস প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তি ফৌজের মাঝে মোহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও বাস্তবের কষাঘাতে সে মোহ আজ আর নেই। একমাত্র ভারত সরকারই হাজার হাজার উদ্ভাস্তকে আগ্রহ দিয়েছে, অনুমতি দিয়েছে নিজস্ব ভূমি মুক্তি ফৌজকে কবজার করতে। কিন্তু আর কোন দেশ পূর্ব বাংলার জনগণের আত্মনাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেনি, বরং তাদের স্বার্থে এখনো তারা পাকিস্তান সরকারকে নীরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাচ্ছে মুক্তিফৌজের- দিব্যদৃষ্টি, কল্পনা থেকে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন এ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অর্জন করেছে তা জীবন ক্ষেত্রে তারা গ্রহণ করতে শুরু করছে।

আজ তারা বুঝতে শুরু করেছে এ যুদ্ধ হচ্ছে শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে শোষণ ও শোষিত শ্রেণীর এক আপোষহীন যুদ্ধ, পরস্পর হিংসাত্মক রক্তপাত। এ যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ, যা মরার পূর্ব বাংলার লালিত্ত নিপীড়িত জনগণকে উগ্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অত্যাচারী শোষণ শ্রেণীকে সম্মুখে উৎখাত করে জাতীয় স্বাধীনতা ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কামের করতে হবে। এটাই হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম আর বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতর রূপ। বাস্তব অভিজ্ঞতা আজ তাদের শিখিয়েছে পরনির্ভরশীল হয়ে, বিশেষ করে প্রতিরক্ষাশীল শক্তি বা তাদের অনুচরদের উপর নির্ভর করে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। নিজের জাতি ও দেশের জনগণের মুক্তির যুদ্ধে নিজ দেশের জনগণকেই ব্যাপক হারে সংগঠিত

করে, নিজস্ব গণবাহিনী গড়ে তুলে সশস্ত্র গেরিলা পদ্ধতিতেই এ দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব। ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত এবং সশস্ত্র করতে না পারলে, অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধে জনগণকে সমবেত করতে না পারলে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির সম্ভাবনা সুদূর-পুরোহত।

তাই আজ তারা জনগণের সহায়তায় বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে পাকিস্তানী হানাদার সেনাদের উপর সাফল্যজনক ভাবে আক্রমণ করে চলেছে। জনগণের সঙ্গে একাত্মতা, কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ এবং রাজনীতিগতভাবে সচেতন হয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ তারা নিঃসন্দেহ। আওয়ামী লীগ শত প্রচার চালিয়েও তাদের এ সঠিক উপলব্ধি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না এবং পারছে না। ফলে সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন মুক্তিফৌজ ইউনিটগুলির উপর কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, মতান্তর ঘটলেই তাকে “পাকিস্তানী অনুচর” হিসাবে চিহ্নিত করে পুলিশের নিকট সোপান করা হচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের স্মরণ রাখা উচিত দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের বাস্তব উপলব্ধিকে এ ভাবে দমিয়ে রাখা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, কারণ এটা হচ্ছে বাস্তব ইতিহাসের অমোঘ রায়।

পূর্ব বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের অপর দলটি হচ্ছে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অন্যান্য বামপন্থীদের সহযোগিতায় পরিচালিত ঐক্যবদ্ধ একটি বিপ্লবী ফ্রন্ট, যারা পাকিস্তানী শাসন ও শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, সামন্তবাদী শোষণ ও পুঁজিবাদী শোষণ থেকে পূর্ব বাংলার জাতীয়

মুক্তি ও জনগণের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত। গ্রামে গ্রামে ব্যাপক জনগণকে রাজনীতিগত ভাবে সজাগ, ঐক্যবদ্ধ এবং সশস্ত্র করে সম্পূর্ণ গোপন গেরিলা পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমান যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে পরিণত করে সমগ্র হানাদার সেনা ও তাদের তাঁবেদার শ্রেণীকে সম্মুখে খতম করাই হচ্ছে এদের রণকৌশল। পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে সাধারণ মেহনতী মানবের মাঝে মিশে গিয়ে এরা গড়ে তুলেছে তাদের গণবাহিনী। সুযোগ মত যৌথ ভাবে তাঁর অথচ ক্ষিপ্ততার সঙ্গে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে এরা হানাদার পাকিস্তানী সেনাদের খতম করে চলেছে, আবার পরক্ষণেই মিশে যাচ্ছে কৃষক শ্রমিক মেহনতী জনতার মাঝে।

এরা অন্যান্য নেতাদের মত জনগণকে বিপদে ফেলে রেখে নিজেদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায় নি, বরং পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণের পাঁচ হিসাবে এরা পূর্ব বাংলার লালিত্ত নিপীড়িত জনগণের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, জনগণের অগ্রবাহিনী হিসাবে তাদের পার্শ্ব গিয়ে দাড়িয়েছে, তাঁদের দুঃখকষ্টকে নিজের দুঃখকষ্ট হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং হানাদার শত্রুসেনাদের অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, উদ্দীপ্ত করে তুলেছে এবং শক্তি সাহস যোগাচ্ছে। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারার বাস্তব প্রয়োগে পূর্ব বাংলার বুকে এরা গড়ে তুলেছে পূর্ব বাংলার জনগণের নিজস্ব গণবাহিনী। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, সিলেট, বরিশাল, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং পাবনার বিভিন্ন অঞ্চলে এ গণবাহিনী

গড়ে তুলেছে মৃত্ত এলাকা, গড়ে তুলেছে তাদের গোপন সামরিক বাঁচ। যেখান থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুসেনাদের উপর চালাচ্ছে প্রচণ্ড আক্রমণ, খতম করেছে পূর্ব বাংলার জনগণের দুঃশমন পাকিস্তানী সেনা ও তাঁবেদার বাহিনীকে। এ সকল অঞ্চলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মুক্তিফৌজ ও অন্যান্য দলের কর্মীরাও রাজনীতিক ভাবে সচেতন হয়ে দলে দলে প্রমিক কৃষক শ্রেণীর সঠিক নেতৃত্বে সমবেত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বহু করছে মুক্তিফৌজ যোদ্ধাদের সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভবিষ্যৎ ইংগিত। এ সকল এলাকার সমগ্র জনগণই আজ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী যুদ্ধের সশস্ত্র যোদ্ধা। তারা দুঃ মনোবলে বলী-ধান এবং প্রচণ্ড শক্তিরূপে ঐক্যবদ্ধ। তাদের অসীম সাহস, দুঃ মনোবল এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তি আজ

প্রমাণ করে চলেছে “জনগণ-কেবল-মাত্র জনগণই হচ্ছে বিপ্লবী” ব্যক্তি হাসের পরিচালক শক্তি। ব্যক্তি স্বার্থ দলীয় স্বার্থ এবং শ্রেণী-স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জাতীয় মুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে অর্জ পূর্ব বাংলার প্রতিটি যুব সেনার অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত এ যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবী গণযুদ্ধ, যা নিঃসন্দেহে দীর্ঘস্থায়ী হতে বধ্য। সুতরাং এ যুদ্ধে ব্যাপক কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক শ্রেণীর জনগণকে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে “দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আত্মবলিদানে - নির্ভয় হয়ে, বধ্যবিকপ্তিকে অতিক্রম করেই বিজয় অর্জন করতে হবে।”

পূর্ব বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামী জনগণের জয় হবেই এ গণযুদ্ধের বিজয় সুনিশ্চিত।

মনোরঞ্জন রায়ের চিত্রপ্রদর্শনী

সম্প্রতি তরুণ চিত্রশিল্পী শ্রীমেনরঞ্জন রায়ের একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল গ্রিফেই ব্যান্ডেল থারমাল পাওয়ার রিক্রেশন হলে। বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে মের্ট ৮৯ খানা ছবি প্রদর্শন করা হয়। শ্রীরায় ছবিকে ফাইন আর্টস-এর নামাবলী চাড়িয়ে সাধারণ মানুষের রসগ্রহণ থেকে ছবিকে সরিয়ে রাখার বিরোধী। তাঁর মতে ছবিকে বাস্তবধর্মী করে তুলতে পারলেই ছবিগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয় এবং বিভিন্ন ভাবে পুষ্টপোষণও বৃদ্ধি পায়। তার প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে অয়েল কলারে আঁকা “সইলেন্ট পাক”, প্যাস্টেল পোর্ট্রেট বাতে একটি নারীর দুঃখ-বেদনার রিবেশ মুহূর্ত ধরে রাখা হয়েছে, “মাই বিলাভেড ব্যাক” এবং বাংলা দেশের উপর “ল্যাস্ট ফেজ অফ একজিসটেন্স” নামক ছবিগুলির

বিষয়বস্তুতে ও রং ও তুলির টানে শিল্পীর মননশীলতার ও নৈপুণ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যান্ডেল থারমাল পাওয়ার-এর টেকনিক্যাল বিভাগের কর্মী শ্রীরায় তাঁর জীবিকার কর্মকালান্ত অবসরেও চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে যে নজর সৃষ্টি করেছেন তা অনেক শিল্পীর কাছেই মৃদুান্তবরূপ। চারু ও কারু শিল্পের প্রাণ-কেন্দ্র কলকাতা থেকে বেশ দূরে গ্রিবেণীতে এই চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করে ফ্রেন্ডস সার্কেল গ্রাম বাংলার চিত্রশিল্পের প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা করছে। উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ ও সাংবাদিক শ্রীঅহিভূষণ মল্লিক। শ্রীঅশ্রুমান-ঘটক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত

হীরেন্দ্র চক্রবর্তী

ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সংগীতের পার্থক্য মৌলিক। পার্থক্য কেবল স্বরের আনু-রূপিক সংখ্যায় নয়—সংগীতে স্বরের উপযোগিতা সম্পর্কেও এই পার্থক্য বিদ্যমান। ফরাসি ষ্ট্রাৎসওয়েজ তাঁর মিউজিক অফ হিন্দোস্তান গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, ভারতীয় শব্দ যৈবত টেম্পো ড্যান্স-টোনিক স্কেলের মেজর সিক্সথ থেকে বৈশ চড়া। কিন্তু কেবল তাই নয়—ভারতীয় স্বরগ্রামের শব্দ স্বাভাবিক পাশ্চাত্য ড্যান্সটোনিক মেজর সেকেন্ড থেকে চড়া ছিল যদিও বিগত শত বছরে হার-মোনিয়মের প্রভাবে দুটো প্রায় সমান হয়ে গেছে। বিকৃত বা কোমল স্বরের ব্যবহারে ভারতীয় সংগীতে যে প্রভাবের প্রয়োগ হয়, যেমন ভৈরবের অতি কোমল স্বাভাবিক দরবারী কানাড়ার অতি ক্রমল গান্ধার, দেশী টোড়ির অনুকোমল গান্ধার ইত্যাদি তেমন প্রয়োগ পাশ্চাত্য হার্মনি সংগীতে সম্ভব নয়। কারণ স্বরের ব্যবধান স্থির এবং সমান না হলে কর্ড রচনা সম্ভব হয় না এবং কর্ড, কাউন্টার পয়েন্ট এবং তন্ত্রনিত হার্মনি হল পাশ্চাত্য সংগীতের মূল ভিত্তি। কিন্তু ভারতীয় স্বরগ্রামের প্রতিটি স্বরের উচ্চাচতা রাগভেদে বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতাই রাগের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। তার সংগে আছে স্বরগ্রামের চলন যার স্কার রাগের অঙ্গ গঠিত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়েই তো জৈব বস্তুর অবয়ব। যেমন টোড়ি ও মূলতান বা জৌন-পূরী ও দরবারী কানাড়ার স্বরগ্রাম এক কিন্তু চেহারা এক নয়। সেই

জন্য পাশ্চাত্য সংগীতে ঠাট বা স্কেল যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সংগীতে তত নয়—ভারতীয় সংগীতে ঠাটের চেয়ে গুরুত্ব হল স্বরের চলনের। ভাতখাশেজীর সংগীত পদ্ধতির প্রথম চার খণ্ডে ঠাটের দেখা পাওয়া যায় বটে কিন্তু পরবর্তী খণ্ড দুটিতে তিনি চলন অর্থাৎ রাগের অঙ্গগত অবয়বের দিকেই জোর দিয়েছেন। একটা কথা প্রায় শোনা যায় যে, ভারতীয় সংগীত হার্মনি-ভিত্তিক নয়—তা হল মেলডি অর্থাৎ সুরভিত্তিক। কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীত হার্মনি ভিত্তিক অর্থাৎ সেখানে মেলডিটা প্রধান নয়—স্কেলের মধ্যে সম্ভাব্য কর্ডগুলির পারস্পরিক হার্মনিক সম্পর্কই পাশ্চাত্য সংগীতের অবিচ্ছেদ্য। কথাটা আপাতঃ সত্য। সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় সংগীতে হার্মনির কি কোন উপযোগিতা নেই? যজ্ঞ মধ্যম এবং যজ্ঞ পঞ্চমের গুরুত্বকে অস্বীকার করে রাগ-সংগীতে এক পদও অগ্রসর হওয়া কঠিন। বাদী এবং সংবাদীর মধ্যে নয় এবং তেরো প্রভৃতির যে ব্যবধান থাকে তাকে যথাক্রমে যজ্ঞ-মধ্যম এবং যজ্ঞ-পঞ্চম সম্পর্ক বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। “রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁর “গান্ধার ভাব” প্রবন্ধে আর একটি স্বরসংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাকে বলা যায় যজ্ঞ-গান্ধার বা অনুবাদী সম্পর্ক। যেমন মালকোশ, হিন্দোল বা হিন্দোলীর আরোহ-বরোহ। এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, কেদারের স ম প

বলতে আমরা বলে থাকি স ম (গ) প বা প্রচ্ছন্ন গান্ধার ভাবের প্রভাব-জাত। হর্মীরের ন প গ ম বা ছান্ন-নটের প গ ধ প, র গ ম প গ ম র স একই স্বাভাবিক নিয়মের ফল। ঝিকোটি, বন্দাবনী, পীলু, কাফি, পূবী, বিল বল প্রভৃতি রাগেও এই গান্ধার ভাব প্রবল। একে অধুনা-লব্ধ গান্ধার গ্রামের অবশেষ বলা যায় কি না তা গবেষণার বিষয় হলেও বাদী, অনুবাদী এবং সংবাদী তন্ত্রের উপর অধ্যাপক রায় যে নতুন আলোকসম্পাত করেছেন তাঁর স্কার ভারতীয় সংগীতের উপরিস্তি সমৃদ্ধ হবে সন্দেহ নেই। তবে সব সংগীতেরই দুটি দিক থাকে—শাস্ত্রীয় এবং কলা-বস্ত। এই দুটিতে যে সব সময়ে মিল থাকে তা নয়। যেমন অহোবল তাঁর সংগীত পারিজাত-য়ে যে বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে তৎ-কালীন সংগীতের কোন নির্ভর-যোগ্য প্রায়োগিক চিত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু বীণার তারের দৈর্ঘ্য-বিভাগ অনুসারে স্বরস্থাপনার যে পদ্ধতি তিনি প্রচার করেছেন, ভারতীয় স্বরগ্রামের ব্যবধান নির্ণয়ে তাঁর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কাজেই কিছু মাত্র আশ্চর্য নয় যে, সংগীতের শাস্ত্রীয় এবং কলাবস্ত রূপ চিরকালই একই স্বতন্ত্র। তবু একটির বাদ দিয়ে অপরের সমৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে না। “রাগ নির্ণয়ের” প্রখ্যাত গ্রন্থ-কার আর্টচিল্লিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকার প্রবন্ধ দ্বারা তাঁর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতীয় সংগীতের কয়েকটি আবৃত অংশ আলোকিত করতে চেষ্টা করেছেন যা এ বিষয়ে অনুসন্ধানসু-মনের ঋণগ্রাক যোগাবে। তাঁর ইংরেজী যে প্রবন্ধগুলির উল্লেখ এই পুস্তিকায় আছে তার একটি সংকলন প্রকাশিত হলে সংগীত-লোচনাত্মক সমাজ প্রকাশকদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবেন। পিথোগোরাস থেকে গ্রীক সংগীত শাস্ত্রের সূচনা। গ্রীক চতুষ্প্রকার স্বরগ্রামে আরো তিনি স্বর যোজনা করে তিনি নাকি তাকে সম্পূর্ণতা দান করেন। তিনি মিশরে এবং কিছু কাল পারস্যে অবস্থান করে সেই সব দেশের সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে-ছিলেন শোনা যায়। গ্রীক সংগী-তের উপরে ভারতীয় বৈদিক সংগীতের যে প্রভাবের কথা শোনা যায় তা সেকেন্দারোসের কি না বলা কঠিন। তবে ভারতের নাট্য-শাস্ত্রের উপরে যে গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান তার কথা অধ্যাপক রবীন্দ্র-লাল রায় স্বীকার করেছেন। ভারতের প্রমাণ প্রতীতি এবং পিথোগো-রিয়ান কোমর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ-ণীয়।

রোম কর্তৃক গ্রীস বিজয়ের মাধ্যমে গ্রীক সংগীতের “সর্ব-রূপে” যাত্রা। রূপে কর্তৃক গ্রীক সংগীত আত্মীকরণে যে দুটি নাম সর্বগ্রন্থ্য সে দুটি হল সেন্ট এমরেস এবং পৈপ্স গ্রিগরী। প্রথমোক্তকে ভারতের সমকালীন বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। রূপে খৃষ্ট ধর্মের প্লাবন এই সংগীতের প্রচারে বেগসঞ্চার করে-ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে অর্গান আবিষ্কার। রূপে-পায় সংগীতভি-হাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একাদশ শতক পর্যন্ত গীর্জা সংগীতের অধীনে পোপালিফোনির বৃদ্ধি। এই সময়ে গুইদো আর্তে-নিস কর্তৃক স্বরলিপি আবি-ষ্কার। পঞ্চম বা মধ্যম-যুগে দল ভাগ করে কোরাস গাইবার প্রথা থেকে সৃষ্টি হয় কাউন্টার পয়েন্ট। দ্বাদশ শতক থেকে লোকসংগীতে প্রেমসংগীতের প্রবর্তন এবং পঞ্চ-দশ শতকে রেগেন্সার সময়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ সংগীতের জন্মলাভ। ষোড়শ শতকে ভেনিসের স্কুল অফ মিউজিক লক্ষ্য করল যে, কাউন্টার পয়েন্টের বিভিন্ন গীত অংশগুলির সমন্বয়ে ধর্মনির কর্ডগুলি একটি নতুন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করছে যাকে বলা হল হার্মনি। মোটা-মুটি এই হল পাশ্চাত্য সংগীতের রেখারূপ। এর পরে লেখক সেবাস্তিয়ান বাখ থেকে সুরু করে মোৎসার্ট, বেথোফেন, হরাগনার ইত্যাদি বারো জন সংগীতজ্ঞ এবং কতিপয় অপে-রারচায়তার জীবনীর মাধ্যমে রূপে-পায় সংগীতের একটি ধরা-বাহিক ইতিবৃত্ত অনুসরণ করে-ছেন। বিশুদ্ধ তত্ত্বকথার বদলে সরস জীবনী নির্ভর হওয়াতে এই কাহিনী সাধারণ পাঠকের হৃদয়-গ্রাহী হবে। কিন্তু সামাজিক ও রাজ-নৈতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত কোন সত্যিকারের শিল্প-তিহাস গড়ে উঠে না। এলিজাবেথীয় অথবা জর্জীয় সংগীত সমাজ বিক্ষোভের পশ্চাৎপট ব্যতীত শেকসপীয়র বা মিল্টনের সাহিত্যে-তিহাস কখনো সম্পূর্ণ জাভ করতে পারে না। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইউরোপীয় জাতিগুলির বিস্তারনের পরিণাম হল তৎ-কালীন শিল্প সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলন। লেখককে পাশ্চাত্য সমাজ-বিপ্লবের পটভূমিতেই সেখানকার সংগীতভিত্তিক পর্বলোচনা করতে হবে এবং পাশ্চাত্য ঐতি-হাসিকেরা তাই করে থাকেন। এ-দিক দিয়ে আমাদের দেশের সংগীতভিত্তিক অত্যন্ত খণ্ডিত। কী কারণে ভারতীয় সংগীতে কোরাস গান এবং অর্কেস্ট্রা সমৃদ্ধ হল না তার সামাজিক ও বস্তুগত হেতু সম্বন্ধে আমাদের সংগীতভি-হাসিকরা কোতূহলী নন। ইউ-রোপীয় সমাজে ব্যক্তিগততন্ত্রের উদ্ভব এবং ভারতীয় সমাজে তার অভাব শিল্পবিপ্লবোত্তর সাংগী-তিক বিকাশকে কতখানি প্রভাবিত করেছে, আমাদের ঐতিহাসিকরা

সে বিষয়ে আসৌ সচেতন নন। অথচ সাংগীতিক সংগঠনে সামা-জিক সংগঠনের প্রভাবকে আদর্শেই অস্বীকার করা যায় না। সংগঠনের দিক থেকে শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউ-রোপীয় সংগীতের সংগে পার্থক্য যে ভারতীয় সংগীতেরই ঘটেছে তা নয়, মিশর, আরব, পারস্য, চীন এবং জাপানের দেশজ সংগীতের সংগে তার এই পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ সমাজ, শ্রেণী ও ব্যক্তিবিন্যাসের পার্থক্য। গুইদো আর্তেনিস একাদশ শতকে যখন তোনিক সোলফা এবং স্বরলিপিপদ্ধতি আবিষ্কার করেন, আমাদের দেশে তখন জয়-দেবের গীতগোবিন্দ রচিত হচ্ছে; আর্যীয় খ্রিস্টো যখন ভারতীয় রাগ এবং পারাশিক মোকাম ও গুৎসা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন রূপে তখন রেনেসাঁ আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে; ভেনিসে হার্মনি আবিষ্কারের সমকালে আকবরের দরবারে সেনী ঘরানার সুরপাঠ হচ্ছে; তানসেনের ধ্রুপদ এবং ইতা-লীয় প্যালাস্ত্রিনার মাস ভজন গান সমকালীন। এইরূপ পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনা ভারতীয় সংগীতের পক্ষে কোতূহলজনক হত। বইটিতে ছাপার ভুল যথেষ্ট কিন্তু দামটি খুবই সুলভ।

সংগীতে শাস্ত্রী ও কলাবিৎ—অধ্যাপক রবীন্দ্রলাল রায়, প্রকাশক রজনকুমার রায়, পৃঃ ৪৮, তিন টাকা।

রূপে-পায় সংগীতের কাহিনী—দীপঙ্কর সেন, প্রকাশক মণিকা সেন পৃঃ ১৮৪, চার টাকা।

এম এল রাজনীতি

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

“ব্যক্তিগত সন্তোষবাদ” বলার অর্থ শ্রেণীভেদে বিনষ্ট আত্মপ্রকাশকে পেটিবুজোয়া দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ঢেকে রাখার অপচেষ্টা। প্রতিটি মার্কসবাদী লেনিনবাদী জানে—কোন একটি জোতদার বা কুশীদ-জীবী বা পুষ্টিশিল্পের দারুণ খতমের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের বৈশ্ববিক দায়িত্ব শেষ হয় না, আসলে সুরু হয়। অত্যাচারিত জনসাধারণের মধ্যকার পেটিবুজোয়া অসহায়তা, ভীরাভা বা তাকে শ্রেণীহীনতা তথা সশস্ত্র সংগঠিত ব্যাপক শ্রেণী-হিংসার পথ থেকে সরিয়ে রাখে তা থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করা, শোষিত জনসাধারণের শ্রেণীপ্রত্যয়কে মদত দিয়ে শোষক-শ্রেণীর একতরফা “স্বৈর সন্তো-সের” বিরুদ্ধে লাল সন্তো-সের মানসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা—খতম অভিযানের আশ্রয় উদ্দেশ্য এটাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

এই কলকাতায়

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

ইজ। ফুলস প্যারাডাইজ ইন ওল্ড স্কচ।—

শ্রদ্ধা মিঃ সিং-ই নন, আম-রাও এই অভাবনীয় ঘটনায় হক-চকিয়ে গেছি। মিঃ সিং-এর এ্যাড-মস এ্যাপল চিবুকের নীচ থেকে বুকুর আগা পর্যন্ত মাকুর মতো খট খট করে ওঠা-নামা করছে। খতমত খেয়ে বাকি প্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে ফেললেন তিনি, আবার একটা তুলে নিলেন।

প্রণব অধিকারী এই সময় একটা কাজের কাজ করল। শিবুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, “কী করেছিস কি, ত্রিদিববাবুতো আউট। ছি ছি চাইলেই অতবার দিতে হয়।”

অমনি আরও দু’তিনজন ত্রিদিবকে ঘিরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শুনতে পেলাম চাপা গলগল প্রণব বলছে “সর্বনাশ করেছিস ত্রিদিব। তোর কথাগুলো চাবুকের মতো

হিট করছে। উপায় নেই। এখন কম্প্লিট মাতাল সেজে যা।”

মিঃ সিং এগোবেন, না পেছ-বেন স্থির করতে পারছিলেন না, তালুকদার তাঁকে আশ্বস্ত করে বললে, “ডান্ট ওয়ারি স্যার। আমরা ঠিক করে নিচ্ছি।”

মিসেস সিং স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন। মৃত্যুর গোলাপী রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। খুব ভয় পেয়ে গেছেন তিনি। কলকাতা সম্পর্কে চের কথা শোনা আছে ওদের। হয়ত অসহায় বোধ কর-ছেন। নিরাপত্তাহীন মনে করছেন অবস্থাটা। ভাবছেন, হতেও পারে অবস্থাটা হয়ত সাজানো। এখনই যা হোক একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। আমি তাঁর পাশে গিয়ে হেসে বললাম, আসলে কি জানেন, জিনি ওয়াকারের মতো দামি জিনিস এরা কখনো খায়নি। মিসেস সিং আমার হাত চেপে ধরে বললেন, “আহ, তাই বল, আমি ভাবছিলাম, না জানি কি হয়।”

থিয়েটার গিল্ডের 'যদুবংশ'

ভবেশ দাশ

সমকালীন নাট্য ক্ষিপ্রাক্ষেপে "থিয়েটার গিল্ড" একটি নতুন নাম। বিমল করের "যদুবংশ" এদের প্রথম নাটক। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মহলে এই নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিগত এগারেই মে রংগনায় নাটকটির অভিনয় দেখে মনে হল সত্যিই এ নাটক জনপ্রিয় হওয়া উচিত। মানুষের চিরায়ত মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবে সোনার পঞ্চপ্রদীপকে গণদের মতো মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর কাছে বেচে দিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের বিপর্যস্ত রূপটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

অবয়বহীন শূন্য মঞ্চে শিল্পীদের অভিনয় অস্বাভাবিক ভাল হয়েছে। সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে সমীর লাহিড়ীর নাট্যরূপ। এই নাটকে চমক সৃষ্টির যেমন কোন ব্যর্থ প্রচেষ্টা নেই, তেমন নেই কোন প্রচার-ধর্মিতার বাহুল্য; যা এই ধরনের অধিকাংশ নাটকেই দেখা যায়। ঘটনাকে শৃঙ্খলিত করে নাট্যসংঘতের মূল্যবোধগলিতে অশ্লুত ছন্দময়তায় জড়ানো রয়েছে।

চারবন্ধ এবং অন্যান্য সব শিল্পীদের অভিনয়ই দারুণ ভাল হয়েছে। তবে আশিস রয় (ছকন্দ) এবং স্ট্রী চরিত্র দুটিতে চিত্রা সেন, সুলেখা ভট্টাচার্যের অভিনয় অত সাবলীল নয়। এই নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে শিল্পীদের একটি কথা মনে রাখা দরকার, "যদুবংশ"র অভিনয়ধারা অনেকটা সহজ বলে তাঁদের ভবিষ্যত অভিনয়কর্ম নিয়ে এখনই কোন মন্তব্য করা যায় না।

সমাচার দর্পণ

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

এই কলংকিত বাইশ বছর এই সব বাজারী কাগজ নীরব ছিল। আজ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল দল ও ব্যক্তি একজোট হয়ে যখন সাধারণ মানুষের জঘন্যতম শত্রু দুর্নীতিপরায়ণ একটী সরকার কৌশলে ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে তখন ক্ষমতায় অসীন থাকার জন্যে তারা খুন, জালিয়াতি, গ্রেপ্তার, বিনাবিচারে আটক কোন কিছু নোংরা কাজই অসংগত মনে করবে না এতো স্বাভাবিক। আর "বাজারী" খোঁয়াড় থেকে নোংরা দুর্গন্ধ আগে থাকতে ছড়িয়ে এসব দুষ্কর্মের সফাই তৈরী করা হবে, এতো আরা স্বাভাবিক।

ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী একজন নির্বীচিত বিরোধী দলভুক্ত এম এল এ, সৈয়দ বদরুদ্দোজা মুর্শিদাবাদ সংসদীয় উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনজন বিরোধী দলভুক্ত সদস্য বিধানসভায় ভোট দিতে পারছেন না। এটা হল আসল ঘটনা।

এক্ষেত্রে অবশ্য শ্যামল সেন (সূর্য/নির্দেশক) ও জিতেন ভট্টাচার্যের (পিনকি) অভিনয় অনেকটা ভিন্ন জাতের। যাকে বলে ষ্টাইলাইজড এ্যাক্টিং।

আলোচ্য নাটকে জন্মক্ষণের পঞ্চমুখী প্রদীপের প্রতীক আশ্রয়ে যতই নাটকের মহত্ব প্রমাণের চেষ্টা হোক না কেন, এ নাটক তবুও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। দিন এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে এর আবেদন ফুরিয়ে যেতে চলেছে। সমকালীন জীবন জটিলতার সঙ্গে আগামীদিনের অনাগত ইতিহাসের একটা যোগ থাকলেই তবেই নাটকে শৃঙ্খলাবাদের ইতিগতটা স্পষ্ট হতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে নাট্যবস্তুর দায় মণ্ডনবাদকের চাইতে ঔপন্যাসিক বিমল করের অনেক বেশী।

শুশীল খাড়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এগারো জন সুশীলবাবুর পক্ষে ছিল তারা অনেকে রাত পোয়াতেই প্রণব মদুখাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং পরদিন থেকেই অজয়বাবুর নতুন বাংলা কংগ্রেস দপ্তর সনাতন ভেঁড়ার বাড়ী যাতায়াত শুরু করে। সুশীলবাবু তখন সকলকে বোঝান সব বামুনরা এক দল হয়েছে, এরা সবাই মদুখাজ্যে, অজয়, বিশ্বনাথ আর প্রণব সবাই মদুখাজ্যে, সবাই এক।

শ্রীধাড়া আরো একটা চেষ্টা বানচাল হয়েছে। সেটা হল তিনি আদি কংগ্রেস, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড পার্টি'কে নিয়ে বিধান সভায় একটা নতুন ফ্রন্ট করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিছুটা ভরসাও কোন কোন মহল থেকে পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ সময়ে তারাও সকলে পিঁছিয়ে গেছে। কারণ সুশীলবাবু তাদের বলেছিলেন দলের এম এল এরা সকলে তার সঙ্গে। তাই বাণেশ্বর পাঠ ও বাকিম মাইতিকে সব সময় দলের দপ্তরে হাজির রেখে দিতেন। কিন্তু পাঁচই জুনের সভা হয়ে যাবার পর বাণেশ্বর পাঠ আর বসন্ত বসু রোডের বাড়ীমুখে হাজির না। অবস্থা বদলে অন্য দল বলছে তোমার সঙ্গে যখন কেউ নেই তখন শৃঙ্খলিত জাত নষ্ট করে কি হবে।

শ্রীধাড়া কোয়ালিশন সরকার পক্ষকেও বেশ ভয় দেখিয়ে রেখে ছিলেন। প্রফুল্লকান্ত ঘোষকে পরোক্ষে বলে দিয়েছিলেন তাকে মন্ত্রী করা না হলে সরকারের বিপদ হবে। কিন্তু সেই মন্ত্রী হবার কথাও আর বলার পথ নেই। একার দলের একা গিয়ে মন্ত্রী হবার কথা বলা যায় না। তবে হ্যাঁ, শ্রীধাড়া ঠিক করেছেন এখন তিনি শৃঙ্খলিত গজরন করে যাবেন। সরকার কিছু



শিয়ালদহ স্টেশনে বাংলা দেশের শরণার্থী। ছবি : প্রণব মদুখাজী

করছে না, সরকার কিছু করতে পারছে না, সরকার ব্যর্থ হয়েছে— এই সব বলে রাতারাতি বামপন্থী হবার চেষ্টা করবেন। তার পর যদি বিধান সভায় তার একার চেষ্টাতেও সরকারের কোন ক্ষতি করা যায় সেই চেষ্টা করবেন।

এই সঙ্গে তিনি আরো একটি কাজ করবেন। সেটা হল, শীগগির তিনি বলবেন অজয়বাবু সম্পর্কে অনেক অকথিত তথ্য তার কাছে আছে, তিনি দরকার মত সব ফাঁস করে দেবেন। এই হুমকির উদ্দেশ্য হল এই যে অজয়বাবু যাতে আগে বেড়ে তার সম্পর্কে কোন কিছু না করে বসেন, কারণ খাড়ার বিরুদ্ধে মামলা খাড়া করবার মত অনেক তথ্যই অজয়বাবুর কাছে আছে।

দুতাবাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কানের সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তের ইতিহাসে, রবিন্স, সিডনী রিলিদের পরিচয় আজ অনেকেরই অজানা নেই) যে বৈদেশিক দুতাবাসে সংস্কৃতি, বার্তা বিভাগ, সাহায্য বিনিময় বিভাগ ও রেডক্রস জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অনেকেই স্ব স্ব দেশের রাজনৈতিক গুরুত্বের কাজ নিয়ে আসেন।

সুতরাং হঠাৎ কলকাতার দুতাবাসগুলির এই সব বিভাগের প্রধানদের পাইকারী বদলী এবং নতুন লোকের আগমন ওয়াকিবহাল মহলে বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে হত্যা খুনো-খুনির রাজনীতি আমদানী এবং তা অবলীলাক্রমে বিনাবাধায় চালিয়ে যাওয়ার পেছনে বৈদেশিক যে গুরুত্ব চক্র সক্রিয় তার মধ্যে পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম শক্তি নাকি অবতীর্ণ! অটর্নট্রি সালে মার্কিন গুরুত্বের বিভাগের বড় কর্তারা লাল-বাজারে পর্যন্ত ঘুরে গিয়েছেন। তার পর থেকেই কংগ্রেস, পি এস

পি, এস এস পির কিছু কিছু নেতার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ঘটানো হবে বলে আমরা শাসানী শব্দতে পেয়েছিলাম।

ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে বটে তবে খোলাখুলি নয়। প্রতাহ অসংখ্য রাজনৈতিক গুরুত্ব হত্যা ঘটছে যাকে প্রচ্ছন্ন ইন্দোনেশিয়া বলে মনে করা যায় অনেকটা।

কিছু কিছু পুলিশ প্রশাসন কর্মচারী ও পার্টির নামে রিক্রুট করা সমাজ বিরোধী খুনে গুলি সঙ্গঠিত করে যে হত্যাকাণ্ড চলছিল, আজ জনসমক্ষে তার প্রকৃত রূপ প্রায় ধরা পড়ে গেছে।

তাই এবার ছোট ছোট রাজনৈতিক দল এবং বিচ্ছিন্ন, হতাশাগ্রস্ত রাজনৈতিক সম্পর্কযুক্ত লোক দিয়ে ঘটনাগুলোর নতুন আবরণ সৃষ্টি করা দরকার। আমরা দেখেছি উনিশশো আঠার-তেইশ সালের সোভিয়েত দেশেও বিভিন্ন বিপ্লব বিরোধী ও প্রতিবিপ্লবী ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলিকে বৃটিশ, ফ্রান্স, মার্কিন গোয়েন্দা চক্র শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্র ও প্রায় অনাভিজ্ঞ বলশেভিক পার্টি'কে ধ্বংস করার চক্রান্তে নিযুক্ত করতে পেরেছিল।

ভারতবর্ষের ওপর সোভিয়েত এবং মার্কিন খবরদারী প্রায় সমান। বর্তমান সোভিয়েত রাষ্ট্রও পুরোপুরি লেনিনের স্তালিনের আদর্শ মেনে চলে না। বরং দুনিয়ার ভাগবাটোয়ারায় তারা মার্কিনীদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বোঝাপড়ায় আগ্রহী মিত্রও বটে।

ইন্দিরা সরকারের প্রতি সোভিয়েত মার্কিন যতখানি অনুরূপ, পাকিস্থানের ইয়াহিয়া খানের প্রতিও তাঁরা অন্ততঃ ততখানিই সদয়। বৃটেন, ফ্রান্স পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, কোরিয়া প্রভৃতি কমবেশী এই দুটি বৃহত্তম শক্তিরই অনুসরণকারী মাত্র, যদিও তাঁদের নিজ নিজ দেশের বিশেষ স্বার্থও তারা দেখেন।

আন্তর্জাতিক শক্তি সমূহের মধ্যে যেমন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা

রয়েছে, আবার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত সাধারণ কর্মসূচীও রয়েছে। সম্প্রতি সিংহলে সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে যারা যারা এক হয়ে বন্দরনায়ক সরকারের সাহায্য এগিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে পরস্পর শত্রু ভারত ও পাকিস্থান, আমেরিকা ও রাশিয়া বৃটেন এমন কি খাস চীনও রয়েছে। ভারত আর পাকিস্থান তো বিনামূল্যেই কোটি কোটি টাকা মূল্যের হাতিয়ার দান করে দিল।

পশ্চিমবঙ্গে সে রকম কোন আভাস না দেখা গেলেও, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক তৎপরতা বড় বেশি রকম দৃষ্টিকটুভাবে শূন্য হয়েছে। এই কলকাতা শহরে আনাগোনা, বাস্তুতা, সংবাদ চয়নের নানা অলিগলিতে ভীড় জমে উঠেছে। ছোট ছোট রাজনৈতিক দল, দলছাড়া রাজনৈতিক ব্যক্তি খবরের কাগজের লোকদের দিকে নজর রাখলেই ডালহৌসী আর লালবাজার থেকে উড়ন্ত ট্রীট হ্যারিং-টন ট্রীটের আনাগোনা বাস্তুতা চোখে পড়বে। চোখকান খোলা রাখলে সুতারাকিনী-মার্কিনী এবং বাগবাজারের দু চারটে বৈষ্ণব বাবাজীর দেখাও এখানে মিলে যাবে।

তাতেই আপনার মনে হবে কি যেন ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে।

"তোমাদের নেতা তো নির্বাচন বয়স্কদের ডাক দিয়েছিলেন। ...ইজি ছাট নট এ পোলেটিক্যাল ব্রাণ্ডার!"—

গোলাপ কাঁটার মৃত্যু

বাংলাদেশের রক্তঝরা কাঁহিনী নিয়ে সব্যসাচীর শ্লিষমনে এক ঐতিহাসিক প্রযোজনা।

মুক্ত অঙ্গণে।

টিকট পাওয়া হচ্ছে

১৩ই জুন, বুধবার, সন্ধ্যা ৭টা।

পুলিশকে পূর্বাঙ্কে জানানো সত্বেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ধমানের আহুদীপদে গ্রামে শাসক কংগ্রেসের লরী লরী গুন্ডা গিয়ে গ্রামবাসীদের আক্রমণ করল, তাদের শাখানেক বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দিল আর বেপরোয়া গুলি

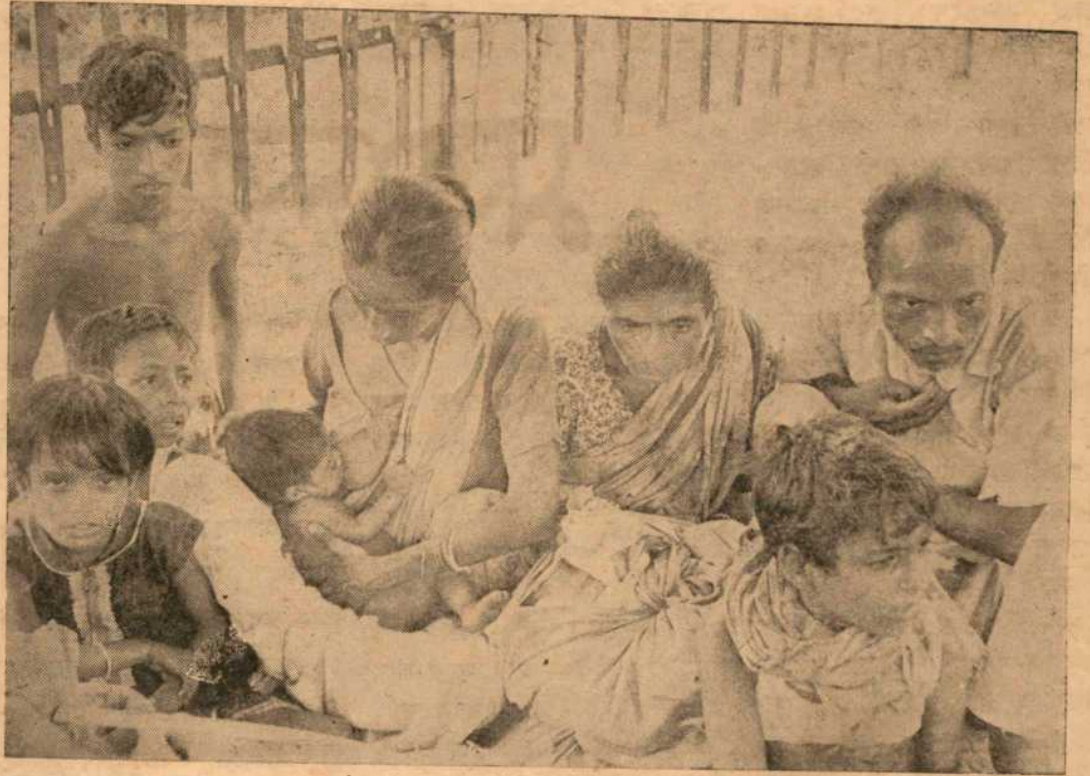
চালিয়ে অন্ততঃ জন চারেককে হত্যা করল। এ ধরনের ঘটনা ঘটবে আশা করে গ্রামের অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল। তাই হত্যার সংখ্যা কম।

গ্রামবাসীরা ঠিক শহরের লোকের

মত পেছপা নয়। তাদের একটি দল গুলির সামনে লাঠি, বর্শা, টাংগি নিয়ে রুখে দাঁড়াল। প্রচণ্ড সংঘর্ষ। কংগ্রেসী দলের দুজন নায়ক নবকুমার সাই আর ইউসুফ নিহত হল।

ঘটনা ঘটেছে বারই জুন শনিবার। বর্ধমান থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্য সোমনাথ চ্যাটার্জী দর্পণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, এই ধরনের আক্রমণের যে একটা প্রস্তুতি চলছে তার খবর তিনি আগেই পেয়েছিলেন। তাঁর খবর ছিল যে, বর্ধমান সার্কিট

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়)



শিয়ালদহ স্টেশনে বাংলাদেশের শরণার্থী : ছবি প্রণব মন্ডাজী

অজয়বাবু ও সুশীলবাবুর অভিযোগ পাণ্টা অভিযোগে অনেক তথ্য জানা গেল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চাপ সৃষ্টির রাজনীতির এক ধারায় সুশীল ধাড়া বাংলা কংগ্রেসকে ভাঙার পথে নিয়ে গেছেন, আর সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, মুশলীম লীগ কোয়ালিশন সরকারের স্থায়ী সম্পর্কে অনিশ্চিততার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন।

অজয় মন্ডাজী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, সুশীল মন্ত্রী হতে পারে নি বলে ক্ষোভে বাংলা কংগ্রেসকে দুভাগ করল। অজয়বাবুর কথা : “ওকে কোয়ালিশনের কেউ মন্ত্রী করতে চায় নি। আমি কি করতে পারি?”

এবার হয়ত সুশীলবাবুকে মন্ত্রী না করে আর উপায় থাকবে না। কারণ সুশীলবাবুর সঙ্গে ভাঙা বাংলা কংগ্রেসের আরও দুজন এম এল এ। অজয়বাবু বলেছেন যে, এই দুজনের একজন সুশীলের ছায়ার মত। তাকে অজয়বাবু দলে পাওয়ার আশা রাখেন না। আরেকজনকে ভাঙাবার চেষ্টা অজয়বাবু নিজেই করছেন। তবে মনে হয় ওঁর আশা কম।

এদিকে কংগ্রেসীদের প্রভাবশালী একাংশ সুশীলবাবুকে মন্ত্রিত্বে নেওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই বলে জানিয়েছে। কংগ্রেসীদের এই অংশের নেতা শ্রীবিজয় সিংহ নাহার। নাহার মহাশয় ইলেকশন ঘূষু। তিনি জানেন যে, বাহান্তর-এ আবার এ রাজ্যে

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

হাওড়ার কয়েকটি অঞ্চলে খুনেদের রামরাজত্ব। নব কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়ার কয়েকটি অঞ্চলে গুন্ডামী, চোরাগোপ্তা খুন, ছেনতাই, লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে গ্রাস সৃষ্টির অপচেষ্টা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানতঃ শিবপুর, জগাছা এবং বালী থানার কয়েকটি অঞ্চলে এই ধরনের গুন্ডামীর ফলে নাগরিকরা নাস্তানাবুদ। প্রশাসন এবং পুলিশের একাংশ মনে করে যে,

গুন্ডামীর সঙ্গে শাসক গোষ্ঠীর কোন কোন দল সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

এই কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার জেলার পুলিশ সদপার নিরুপম সোম আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দীপক রুদ্রের ওপর মহাখাপ্পা। একজনকে সি পি এম সমর্থক বলে জেলা থেকে গত সপ্তাহে বদলী করা হয়েছে। আর দীপক রুদ্র বেগতিক দেখে ছুটি নিয়ে বসে আছেন।

রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, শালিমার ও সাঁতরাগাছি অঞ্চলে ওয়াগন রেকারের দলগুলি পুলিশের এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় বেপরোয়া রেলের সম্পত্তি ও মালবাহী ওয়াগন লুট করে চলেছে। রাজনীতির নামে যারা মহল্লায় মহল্লায় খুন আর ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে তাদের কেউ কেউ এই ওয়াগন রেকারদের অর্থপুষ্টি।

সি পি এম-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, নতুন সরকার পস্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর আক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে। জেলা

(শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায়)

পুলিশ রিপোর্ট বলছে

কোমগরে নিহত তরুণরা

নারী ব্যবসায়ী জনৈক অকংগ্রেসী

এম এল এর অনুচর ছিল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কোমগরে নয়জনের হত্যা সম্পর্কে অনেক তথ্য পুলিশ রাজ্য সরকারকে জানিয়েছে। সরকার সন্তোষিত, আর এব্যাপারে কোন তদন্ত করতে রাজী নয়।

পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী, এ ব্যাপারে যে নয়জন নিহত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাজ্যের একজন গণ্যমান্য অকংগ্রেসী এম এল এ-র বিশ্বস্ত অনুচরবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

এই অকংগ্রেসী এম এল এ নিজের ব্যবসার প্রয়োজনে একটি গুন্ডাবাহিনীও পোষণ। তার ব্যবসায়ের পণ্য নারীদেহ। হাওড়া এবং শিয়ালদহ অঞ্চলে দুটী হোটেল মেয়ে ধরে এনে দেহ ব্যবসারে নামান হয়। অর্জিত টাকার অল্প অংশ মেয়েরা পায় আর বাকী যায় হোটেল মালিক আর এ গণ্যমান্য এম এল এর পকেটে।

এ ধরনের ব্যবসায় চালাতে

গেলে গুন্ডার দরকার হয়। লোকের বাড়ী থেকে জোর করে মেয়ে তুলে নিয়ে আসা, তারপর খরিদ্দারদের ঠিকমত বশে রাখা ইত্যাদি অনেক কাজেই করার দরকার।

আর তা ছাড়া এখন এ এম এল এ সরকারপক্ষীয় দলে থাকায় এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকায় ব্যবসায় সরগরম।

নির্বাচনের পূর্বে এই গুন্ডাবাহিনী অনেক রাজনৈতিক হামলা-বাজীতে জড়িত ছিল বিশেষ করে মধ্য হাওড়া এবং বালী অঞ্চলে। এই গুন্ডাদের অনেকেই এম এল এ মশায় চাকরী করে দিয়েছেন। তাতে গুন্ডাদের মনোবল বেড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে দৌরাত্ম্যও।

যে নয়জন নিহত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ এই দেহ ব্যবসারে নিযুক্ত গুন্ডাবাহিনীর সদস্য

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

চাকরী দেওয়া হচ্ছে কংগ্রেস দলের স্বার্থে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান অংশীদার শাসক কংগ্রেস দল বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে দলীয় স্বার্থের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। এ কাজে তাদের প্রধান সহায়ক পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস।

শ্রীবিশ্বাসের অফিস ঘর এখন

লোকে ভর্তি থাকে। সবই ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের সদস্য। কারণ শাসক কংগ্রেসের অলিখিত নির্দেশ যে পুনর্বাসন ক্যাম্পে যে সব সহকারী নেওয়া হবে তাঁরা সকলেই এই দুটি সংগঠনের সদস্য হবেন।

এর ফলে মন্ত্রীমহাশয় প্রতিটি জেলা সংগঠকদের কাছে এই চাকুরী

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

পূর্ব বাংলা ও চীন

আপনাদের দর্পণের তিরিশে এপ্রিলের সংখ্যায় “মতামত” পাতাটিতে প্রকাশিত অমল্যরতন সেন, শ্যামল ঘোষ এবং মৈত্রেয় ভাস্কর মহাশয় লিখিত মতামতগুলো মন দিয়ে পড়লাম। প্রথমেই বলে রাখি, আমেরিকা রাশিয়া বা ভারত সরকারের চরিত্র নিয়ে উপরোক্ত তিন ভদ্রলোক যে বক্তব্য রেখেছেন, আমি সেই বক্তব্য পুরোপুরি সঠিক বলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকি। কিন্তু দৃষ্টান্তের বিষয় তিন জনের লেখাতেই দেখতে পেলাম একটা প্রশ্ন তারা সন্দেহভাবের এড়িয়ে গিয়েছেন। সেটা হলো—বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের আলোকে মহান চীন সরকারের ভূমিকা কি?

রাষ্ট্রের অস্থকরে অসীম সমুদ্রে জাহাজকে যেমন বন্দরের নিশানা দেখায় বাতিঘর তেমনি সারা দুনিয়া জুড়ে শ্রমিক কৃষক ও সংগ্রামী জনতার ওপর আজ যে অত্যাচারের কালো রাতি নেমে এসেছে, সেই কালো রাতির মধ্যে শ্রমিক কৃষক ও সংগ্রামী জনতার কাছে অজেকের দিনে একমাত্র “বন্দরের বাতিঘর” হলো মহান চীন। সুতরাং আমরা যদি আমাদের দেশের শ্রমিক কৃষক এবং সংগ্রামী জনগণকে আরো বেশী রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে চাই, আরো বেশী শ্রেণীসচেতন করতে চাই তবে আজ আমাদের ঘরের পাশে যে মুক্তিযুদ্ধ শত্রু হয়েছে সেই যুদ্ধের আলোকে মহান চীনের সঠিক ভূমিকা কি তা নিয়ে অতি অবশ্যই খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে হবে।

সুতরাং আজকের দিনে আমাদের অতি অবশ্যই আলোচনা করতে হবে কেন রাজপুত্র সিহান্দুক মাও সে তুং-এর সঙ্গে একই পাত্রে বসে ভাত খাবার অধিকার পেয়েছে, কেন পাক সামরিক শাসক সেন্সেটো-সিন্সেটোর সভ্য ইয়াহিয়া খানের (যেখানে মার্কসবাদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে হিটলার থেকে ইয়াহিয়া খান সব ডিক্টেটরই ইতিহাসের অবজ্ঞা) হাতে চীন লক্ষ লক্ষ আধুনিক অস্ত্র তুলে দিয়েছে, কেন বাংলা দেশের কয়েক কোটি শ্রমিক কৃষক মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ দিলেও মহান চীনের এতটুকু নৈতিক সমর্থন পাবারও যোগ্য হতে পারে না। আলোচনা করতে হবে আমেরিকার দালাল (!) মুজিববরকে কোন রকম সমর্থন করার চেয়ে খোঁদ আমেরিকার সঙ্গে ঠীনের পিংপং খেলা অথবা আমেরিকাতে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় চীনের সুন্দরী যুবতী পাঠানো কেন অনেক অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। মুজিববরের সংগ্রাম যদি শত্রুমার, ঈর্ষান্বিতদের অশান্ত্যন্তরীণ সংকট হয়ে থাকে তবে হাঙ্গেরী বা চেকোশ্লোভাকিয়ার সংকটও তো ছিলো সেইসব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সেইসব দেশের

বেলায় মহান চীন কোন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো? দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর যুদ্ধ করে চলেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামেরই মুক্তির জন্য, তবু সেটা কেন জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ নয়? আর বাংলা দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ যখন সর্বশক্তি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শত্রু করেছে তখন সেই যুদ্ধকে ঘৃণ্য জাতীয়তাবাদের উস্কানী বলে আমাদের মতন আন্তর্জাতিকতাবাদীদের

“মনোবল” সম্পন্ন করে কোন জাতি বছরের পর বছর মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেনি বা পারবে না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ কবে শেষ হয়ে যেত যদি না চীন, রাশিয়া বা উত্তর ভিয়েতনামের লক্ষ লক্ষ আধুনিক অস্ত্র সময়মত এবং প্রয়োজনমত দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষগুলোর হাতে না আসতো। সুতরাং বাইরের সমর্থন না পেলে, অস্ত্র না পেলে কমরেড তোহার নেতৃত্বে শত্রু হওয়া গেরিলা যুদ্ধও অচিরেই স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। এইসব প্রশ্নের অবশ্যই জবাব

দিতে হবে এবং সেই জবাব নিয়েই আমাদের যেতে হবে শ্রমিকের বসতিতে, কৃষকের ক্ষেতে খামারে। আর তা যদি না করে তাদের কাছে শত্রুমার হিন্দুদের শ্লোগানের মতো “বিশ্বাসে মিলান হারি তর্কে বহুদর” মার্কস চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান—এই শ্লোগান নিয়ে এবং আমেরিকা, রাশিয়া বা ভারত সরকারের শ্রেণীচরিত্রের বিশ্লেষণ নিয়ে হাজির হই তবে তা হবে একটা মারাত্মক ভুল এবং এর ফলে শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ মানুষ কোনদিনই পুরোপুরি শ্রেণীসচেতন হবে না এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে এইসব সংগ্রামী মানুষগুলোই বুদ্ধোন্মাদের সামান্য প্রচারেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে।

অরুণ রায় বিশ্বাস

মতামত

সেই যুদ্ধ থেকে সাত হাত দূরে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে কেন? কোন কোন মহল থেকে বলার চেষ্টা হচ্ছে, কমরেড মাও সে তুং-এর নীতিতে পুরোপুরি আস্থাশীল বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধা কমরেড তোহার নেতৃত্বে বাংলা দেশে গেরিলা যুদ্ধ শত্রু হয়ে গিয়েছে। যদি প্রকৃতপক্ষে ক্যাপারটা এইরকম হয়ে থাকে তবে একজন কমিউনিস্ট হিসাবে আমি নিশ্চয়ই খুসী হতে পারি। সেই সঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে, সেটা হলো কমরেড তোহার নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধ শত্রু হবার পরও কেন মহান চীন ইয়াহিয়া খানের মাথায় ছাতা ধরে আছে? তা হলে মহান চীনের কি উচিত নয় এখনই কমরেড তোহার পাশে এসে দাঁড়ানো অথবা ইয়াহিয়ার টপছন থেকে মহান চীনের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া? শত্রুমার

দিতে হবে এবং সেই জবাব নিয়েই আমাদের যেতে হবে শ্রমিকের বসতিতে, কৃষকের ক্ষেতে খামারে। আর তা যদি না করে তাদের কাছে শত্রুমার হিন্দুদের শ্লোগানের মতো “বিশ্বাসে মিলান হারি তর্কে বহুদর” মার্কস চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান—এই শ্লোগান নিয়ে এবং আমেরিকা, রাশিয়া বা ভারত সরকারের শ্রেণীচরিত্রের বিশ্লেষণ নিয়ে হাজির হই তবে তা হবে একটা মারাত্মক ভুল এবং এর ফলে শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ মানুষ কোনদিনই পুরোপুরি শ্রেণীসচেতন হবে না এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে এইসব সংগ্রামী মানুষগুলোই বুদ্ধোন্মাদের সামান্য প্রচারেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে।

শ্যামনগরের তরুণদের বিপদ

শ্রবণ, একুশে মে তারিখে প্রকাশিত দর্পণের “মতামত” বিভাগে জনৈক যুবক লিখিত “ইছাপুর এখন হত্যাকারীদের ঘাঁটি” প্রসঙ্গটি পড়লাম। এতে যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে আমি সেই ঘটনাটির একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটনাটির এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে “একটি ছেলেকে (কুড়ি বাইশ) দশ বারোজন ছেলে তাড়া করে আসছে।” কিন্তু আমার মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তিন-চারটি ছেলে ঐ ছেলোটিকে তাড়া করেছিল এবং তার মধ্যে দুটি ছেলে তাকে ছোঁরা মারতে উদ্যত হয়েছিল।

আমরা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করেছি যে ইছাপুর স্টেশনের এক নং প্ল্যাটফর্মে চার-পাঁচ জন সশস্ত্র পুলিশ থাকেন এবং ইছাপুর স্টেশনের নিকটেই একটি লেভেল ক্রসিং-এর পাশে একটি পুলিশ পিকেটও আছে। কিন্তু

তা সত্ত্বেও তাদেরই চোখের সামনে প্রায়ই ইছাপুর স্টেশনের উপর বা আশপাশ এলাকায় প্রকাশ্য দিনের বেলায় ঐ ধরনের ঘটনা কি করে ঘটে। এছাড়া ধারা বাসে করে ইছাপুরের উপর দিয়ে যান তাদের মধ্যে থেকেও তল্লাশী করে শ্যামনগরের লোকদের নামানো হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলতে চাই যে শ্যামনগরের যে সব ছেলে কোন পার্টি করে না তাদেরও এই অহেতুক হয়রান করার মানে কি? কেনই বা তারা ট্রেনের মধ্যে লুকিয়ে চলা ফেরা করবেন? আর তাদের অভিভাবকরা যদি নিজের ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে না পারেন তাহলে এ সরকার অরাজকতা দমনে কতটুকু সক্ষম হচ্ছেন?

জনৈক তরুণ শ্যামনগর

কর্পোরেশন প্রসঙ্গে

চোঁটা জুন সংখ্যায় প্রকাশিত অডিট রিপোর্টের তথ্যগুলো সত্যিই কি চাঞ্চল্যকর? কেননা কর্পোরেশনের পক্ষে ঐ সব অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঐ সম্বন্ধে আমার দুটো বক্তব্য আছে।

প্রথম : এর আগেও ত অডিট রিপোর্টে ঐ ধরনের চুরি ও উদ্দেশ্যমূলক গাফিলতি অনেক ছিল, বছর বছরই বেরুতো। কিন্তু আপনাদের নজর আজই হঠাৎ এদিকে পড়লো কেন? প্রশান্তদা সেই বলেই? নয়তো গত ছয় বছর যাবৎই কর্পোরেশন একটি জনদরদী ও বিপ্লবী দলের সম্পূর্ণ দখলে আছে—তবুও ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে জনস্বার্থের সামান্যতম খাতিরেও অণুমাত্র নৈতিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তন দেখা গেছে কি?

দ্বিতীয় : দশ-বিশ টাকার চাঁদার দিন শেষ হয়ে এখন অলিতে-গলিতে সর্বত্র বাঙালী চাকুরীজীবী ও বাঙালী ছোটখাট ব্যবসারীদের মূন্ডের উপর দাম ঠিক করে দেয়া

হয়েছে—পাঁচ থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত। তাও আবার অনেক ক্ষেত্রে বিবদমান দুই বিপ্লবী দল থেকেই। (সর্বোচ্চ প্রয়াস শিবপুর বৈষ্ণবপাড়া অঞ্চলে অতি-বিপ্লবী মাওবাদীরা রেশনের লাইন থেকে পরিবার পিছ দৃশ পঞ্চাশ থেকে পাঁচশ গ্রাম পর্যন্ত চাল তোলা হিসাবে আদায় করছেন দলের লোকের জন্য।) ঐ সব বিপ্লবী ও অতি বিপ্লবীদের নজর কি পড়বে আপনাদের দেয়া কর্পোরেশনের পাওনা গারিব-কারীদের ও তাদের সাহায্যকারীদের প্রতি? ঐ টাকা আদায় হলো কর্পোরেশনের লাভ (কলকাতা-বাসীর না হলেও বা) আর সেই সঙ্গে বিপ্লবী / অতি বিপ্লবীদেরও কিছু আয় হবে এবং তা কিছুটা ভদ্রভাবে, কেননা কর্পোরেশন বকেয়া আদায়কারীদের কিছু কমিশন দিয়ে থাকেন। তবে কিনা এই সব “আদর্শের যুগপক্ষে” বলিদত্ত তাজা প্রাণগুলো কি পাড়া ছেড়ে বেরুবেন?

ইন্সিডা চৌধুরী

বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে ভুল তথ্য

দর্পণ পত্রিকার গত এগারোই জুন এর সংখ্যায় পত্রিকার সংবাদদাতা কর্তৃক লিখিত “মহিষা পাটী করে সুশীল খাড়া অজয়-বাবু ও বিশ্বনাথকে দেখে নেবেন” শীর্ষক সংবাদে বলা হয়েছে “শ্রীখাড়ার আরো একটি চেষ্টা বান-চাল হয়েছে। সেটী হোল আদি কংগ্রেস, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড পাটীকে নিয়ে বিধান সভায় একটী নতুন ফ্রন্ট করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিছুটা ভরসাও কোন কোন মহল থেকে পেরোছিলেন। কিন্তু শেষ সময়ে তারাও পিছিয়ে গেছে।” প্রতিবাদে জানাই যে “খাড়া গোষ্ঠী” বা

“অজয় গোষ্ঠী”র সহিত ফ্রন্ট গঠন করা তো দুইয়ের কথা, আমাদের দলের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে শ্রীঅজয় মুখার্জী বা শ্রীসুশীল খাড়ার সহিত কোথাও কোনদিন কোন বিষয়েই আজ পর্যন্ত আলোচনাই হয় নি। আমরা শত্রু সংযুক্ত বাম-পন্থী ফ্রন্টের অন্যতম শরিক দলই নই, তৎপূর্বে ছয় পাটী কমিটি সৃষ্টি থেকেই তার অন্যতম সদস্য। তাছাড়া আমাদের দলের নিজস্ব একটী আদর্শ ও কর্মপন্থা আছে যা আদি ও বাংলা কংগ্রেসের সম্পূর্ণ বিরোধী।

অসিত চৌধুরী সম্পাদক রাজ্য কমিটি, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস

কংগ্রেসীদের জুপারিশে চাকরী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলাদেশের শরণার্থীদের শিবিরে তদারকী ও অন্যান্য কাজের জন্যে লোক নেওয়া হচ্ছে। মাইনে দেড়শো টাকার কিছু বেশী। রাইটাস বিল্ডিংএ মন্ত্রীর কামরা থেকে সাদা ফরমে মন্ত্রীর সুপারিশ লিখিয়ে কিছু কংগ্রেসী ও ছাত্র পরিষদ নেতা চাকুরী প্রার্থীদের বিলি করছেন। এতে বেশ কিছু পরস্যাও কামাই হচ্ছে।

জনৈক কংগ্রেসী মহিলা এম পির স্বামী এবং অপর এক জন ভদ্রলোক শরণার্থী শিবিরে চাকুরী-গুলি যাতে বিশেষ বিশেষ বাছাই

করা লোকেরা পায়, তার জন্যে বন্দোবস্ত করতে জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতার ডেরা গেড়ে বসেছেন। উদ্দেশ্য, বিজয় সিং নাহারের লোকগুলিকে পাশা না দেওয়া এবং কোন সি পি এম সমর্থক যাতে চাকুরী না পেয়ে যায় তা দেখা।

বর্তমানে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দলের দুচারজন অধ্যাপক নেতাকেও দরখাস্তের ফরম নিয়ে ঐ ভদ্রলোকদের কাছে দোঁড়াদোঁড় করতে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমন্বয় কমিটির ঘোষণা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের বিভিন্ন দল ও সংগঠনের একটি সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের ভাসানী নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আওয়ামী পার্টি, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন শিকদারের নেতৃত্বে পরিচালিত), শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার), পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন (পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন) এবং পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এই সমন্বয় কমিটি গঠন করেছেন। কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে যে ঘোষণা প্রণয়ন করেছেন তা "দর্পণের" হস্তগত হয়েছে। তার থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা প্রকাশ করছি।

সমন্বয় কমিটি মনে করেন যে অপ্রস্তুত হলেও বাংলাদেশের জনগণ প্রতিরোধ শুরুর করেছেন এবং যেভাবেই পেরেছেন শোষকগোষ্ঠীর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করেছেন। বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই পি আর ও পদাংশ বাহিনী সশস্ত্র প্রতিরোধের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শিক্ষালাভ করেছেন

যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, আপোষের পথে মুক্তি আসবে না। বাংলার জনগণকে বেঁচে থাকার তাগিদেই হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গড়ার আহ্বান : কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে বর্তমান সময়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ, গণসংগঠন ও শ্রেণীসংগঠন এবং প্রতিটি নাগরিকের মহান কর্তব্য—পরস্পরের সমঝোতা রক্ষা করে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, কেননা এই যুদ্ধ সমগ্র জাতির যুদ্ধ, সমগ্র জনগণের যুদ্ধ। গত পয়লা জুন উপরিউল্লিখিত রাজনৈতিক দল, গ্রুপ ও গণসংগঠন ও শ্রেণীসংগঠনগুলি মিলিত হয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকার ও মুক্তি সংগ্রামের সকল শক্তির সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই সমন্বয় কমিটির তরফ থেকে আওয়ামী লীগ-সহ স্বাধীনতাকামী সকল দলমত ব্যক্তির সমবায়ে একটা সুসংহত জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই সমন্বয় কমিটির চূড়ান্ত লক্ষ্য বাংলাদেশকে হানাদার দস্যু-

দের হাত থেকে মুক্ত করে বাংলার বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী একটি স্বাধীন, সুখী সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই বাংলা হবে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষ, মধ্যবিত্ত দেশপ্রেমিক ধনিক শ্রেণীর বাংলাদেশ—জনতার বাংলা।

সমন্বয় কমিটি মনে করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত ও সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার কর্মসূচী রূপায়িত করাই কমিটির আশু কর্তব্য। যেহেতু হানাদার বাহিনী সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী এবং অন্যদিকে জনগণ প্রায় অস্ত্রহীন, এবং যেহেতু বিদেশী বর্বর হানাদার বাহিনী সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য, সেই হেতু কমিটি মনে করে যে একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী জনগণের গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েই শত্রুর শক্তিকে ক্রমাগত দুর্বল করে চূড়ান্ত জয়লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। জনগণের শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করেই—কোনো বিদেশী শক্তির ওপর নির্ভর করে নয়—এই জনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। প্রস্তাবিত গেরিলা যুদ্ধে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষকরাই গণফৌজের মূল শক্তি। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের ঘাঁটি হবে এবং বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সংগে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন করে এই যুদ্ধ পরিচালিত হবে।

এই উদ্দেশ্যে সমন্বয় কমিটি জনগণের সম্মুখে আশু করণীয় কর্তব্য উপস্থিত করেছেন। তার মধ্যে প্রতিটি গ্রামে জনতার বিভিন্ন (শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

পরীক্ষা পাহারা দেবার নামে বোর্ডের কাছে টাকা আদায়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা উপলক্ষে জনসাধারণের সহযোগিতা চেয়ে আবেদন করার নীতি গ্রহণ করেছেন। বোর্ড হেডমাস্টারস এসোসিয়েশনের শ্রীমতী সুপ্রীতি সান্যালকেও নির্বিশেষে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য স্বেচ্ছাসেবক তালিকা দাখিল করতে বলেন। তিনি ও মধ্য কলিকাতার একটি বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার পরিমল রায় বলে এক ভদ্রলোক তদনুসারে এক তালিকা দেন এবং তালিকায় উল্লিখিত স্বেচ্ছাসেবকরা এসে বোর্ডের অফিসে হাজির হন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বোর্ডের অফিসে যাঁরা আসাযাওয়া করেন তাঁরা দেখতে পেলেন যে এরি মধ্যেই নরক গুলজার হয়ে পড়েছে। কুকুরের ডাক, বেড়ালের ডাক, সিটী দেওয়া চলল। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মাঝে মাঝে মহিলা কর্মচারীদের দিকে অশোভন ইংগিত করে তারা বেশ জমিয়ে বসল।

বোর্ড এহেন স্বেচ্ছাসেবকদের তখন তাড়াতাড়ি তাড়াতে পারেনি বাঁচেন। তারা ওদের রামরিখ ইনস্টিটিউশনে পাঠিয়ে দিলেন। এহেন স্বেচ্ছাসেবকদের দর্শন মাত্রই ঐ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বোধ হয় বেশ নাভাস হয়ে পড়লেন। তাঁরা বলে দিলেন বিনা ভলান্টিয়ারেই তাঁদের বিদ্যালয়ে নির্বিশেষে পরীক্ষা হচ্ছে,

ভলান্টিয়ার তাঁদের চাই না।

অতঃপর ভলান্টিয়ারেরা আবার বোর্ডের অফিসে ফিরে এলেন। আবার একই অবস্থা। সেই কুকুর বেড়াল পাখীর চীৎকার, সেই ধোঁয়ার ফানুস আর অশ্লীল কথাবার্তা। মাঝে মাঝে কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বেলেলাপনা।

দিন কয়েক কাটল কিন্তু বোর্ডের সবাই অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। কাঁহাতক আর সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা এমন মহৎ সংগে কাটানো যায়। অগত্যা বোর্ডের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হল যে আর ভলান্টিয়ারের দরকার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তখন ভলান্টিয়াররা স্বমর্মে ধারণ করল। তাদের সাতদিন বসিয়ে রাখার জন্যে দৈনিক দশ টাকা করে মজুরী দিতে হবে। তা নাহলে তারা দেখে নেবে! বোর্ডের সভাপতি ভালমানুস বটে কিন্তু টাকা দেবেন কি করে, সাাংশন ছাড়া?

কিন্তু নব কংগ্রেসী ভলান্টিয়ারেরা ছাড়বে কেন। শেষ পর্যন্ত মাথাপিছু দৈনিক সাড়ে সাত টাকা করে নগদ বিদায় দিয়ে বোর্ডের কর্মকর্তাদের মাথা বাঁচাতে হয়েছে। অর্থাৎ এতগুলি স্বেচ্ছাসেবীর সেবালাভের জন্যে বোর্ডকে করকরে বেশ কয়েকশ টাকা গুনে দিতে হল। সহযোগিতার কী অপূর্ব নিদর্শন!

৫৫৫ -র এভারেস্ট পাখা এত ভাল চলে কেন?

জি. ই. সি-র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি বলে। আর শুধু যে ভাল চলে তা' নয়, দেখাতও অপূর্ব।

৫৫৫

এভারেস্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:

- * নিঃশব্দে চলে
- * বছরের পর বছর ব্যবহারেও পাখার চেহারা নতুন মত থাকে
- * বহু বছর নিঃশব্দে চলে



শিগ্ধ আমেজ আর নিবিড় নরম সুখ উপভোগ করার জন্য চাই জি. ই. সি-র এভারেস্ট। আপনার ঘরে আজই লাগান।

ডি. জি. এস
এন্ড
ডি. রেট কন্ট্রোল
পাওয়া যায়।

KALPANA G.E.C. 582 BEN

৫৫৫

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কলিকাতা ও গোহাটি
ভুবনেশ্বর ও পাটনা ও কানপুর ও নিউ দিল্লী ও চণ্ডীগড় ও জয়পুর ও বোম্বাই ও আমদাবাদ
নাগপুর ও জব্বলপুর ও মাদ্রাজ ও কোয়েম্বাটোর ও বাজালোর ও সেকেন্দ্রাবাদ ও এর্নাকুলাম

TRADE MARK ৫৫৫ PERMITTED USER—THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA LIMITED

বাজারী পত্রিকায় অর্থসত্য ও বিকৃত সংবাদ

(দপনের পর্ববৈক্য)

মার্কিন পাঠকেরা নাকি তাঁদের দেশের খবরের কাগজে বা লেখা হয়, তা আর বিশ্বাস করতে চাইছেন না। সরকারী খবর দেবার রীতি এবং সংবাদপত্রে বা লেখা হয়, দুটোকেই তাঁরা আজকাল প্রায়-অসত্য বলে মনে করছেন। বিশেষ করে সম্প্রতি লাওস-কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণের ফলাফল সম্পর্কে সংবাদপত্র পাঠকেরা তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। প্রেসিডেন্ট নিকসন ও পেন্টাগন জানিয়েছিলেন যে ইন্দোচীনের দেশগুলিতে মার্কিন অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। মার্কিন খবরের কাগজগুলিও ফলাও করে তা ছাপিয়েছিল। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হল ভিয়েতকন্দের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে মার্কিন সেনাদল ও তাবোদার দক্ষিণ ভিয়েতনামী সেনাবাহিনী কোটি কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়েছে। সবাই পালাতেও পারে নি, কচুকাটা হয়েছে না হয় বন্দী হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা কয়েকজন সাংবাদিক 'এ ঘটনার কথা কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সংবাদ বিচিয়ার দেশবাসীকে জানিয়েছেন। অথচ সরকারী কতৃপক্ষ ও সংবাদপত্র এর ঠিক উল্টো খবরই আগে জানিয়েছিল। সুতরাং সরকারী খবর প্রচার ও সংবাদপত্রের প্রচারে মার্কিন জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা কেনোডি ও জন্সনের আমলেও কি ভাবে সংবাদপত্রের মারফতে মিথ্যা ও অর্থসত্য প্রচার করা হত, তার সম্পর্কে নতুন করে আলোচনা ও বিরাগ প্রদর্শন শুরু করেছেন।

আমেরিকান সোসাইটি অব নিউজপেপারস এডিটরসের বিদ্যায়ী সভাপতি মিঃ নিউকোল্ড নয়েস এপ্রিল মাসে সোসাইটির সভায় এ জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন যে এ জন্যে মার্কিন সাংবা-

দিকদের অলস অকর্মণ্যতা, গতা-ন্যুগতিকতা এবং বাহ্য আড়ম্বরের ধাম্পাবাজিকে দায়ী করেছেন। বিশেষ করে তিনি "সংবাদ তৈরী করার" প্রবণতাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। আমেরিকান সংবাদপত্রের একপেশে সংবাদ

সম্পাদকীয় লেখকের

প্রকাশ ও মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে শব্দ সাধারণ মানুষই নন, চীফ জাস্টিস ওয়াশিংটন, এবং সাংবাদিক জগতের অনেক বাম বাম সাংবাদিকও সংবাদপত্রের এই নিম্নমানের জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

আমাদের দেশের সংবাদপত্র সম্পর্কেও একথা ঠাটে। সম্ভবতঃ সব দেশের সংবাদপত্রই আজকাল মিথ্যা প্রচার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। তেরোই জুনের স্টেটস-ম্যানে লন্ডনের চিঠিতে জেমস কাউলেও প্রকারান্তরে বলে ফেলেছেন যে ইউরোপের (তিনি সাই-প্রাসের কথা উল্লেখ করেছেন) সাংবাদিকরাও মিথ্যা সংবাদ রচনায় সিম্বহস্ত।

কিন্তু সিম্বহস্ত বাজারী সাংবাদিকদের সঙ্গে ওরকম মার্কিন ইউরোপীয় সত্যগোপন ও মিথ্যা প্রচারের তুলনা চলে কি না, অনেকেরই সন্দেহ আছে। ধরুন না গত পয়লা জুনের সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের ডাকা সি আর পি অত্যাচারের বিরুদ্ধে হরতালের সংবাদ! শব্দ সংবাদ গোপন করেই বা সরকারী বিকৃত বিবৃতি ছাপিয়েই কলকাতার খবরের কাগজগুলি ক্ষান্ত হয় নি, হরতালের আগে অচেনা অভ্যাস স্বয়ং নিযুক্ত বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নামে বর্ডি বর্ডি বিবৃতি ছাপিয়ে তারা সাধারণ মানুষ যে সি আর পি অত্যাচারের পক্ষে এবং ধর্মঘটের বিরোধী তা প্রচারের চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন দল বা অঙ্গ মনুষ্যজ্ঞের বিবৃতি, সরকারী চ্যালেঞ্জ এসবের কথা বাদই দিলে। তারপর হরতাল যখন সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হল, তখন তাঁদের মৃগীরোগ ও খিঁচুনি দেখবার মতো। বাজারী কাগজের সূত্রাকিনী ইংরেজী তরজমা পত্রটা লিখল সো হোয়াট? তাতে কি হয়েছে? আমরা জানি কিছু হয় নি। শব্দ নিজের কাগজের দুদিন আগের সংবাদ পৃষ্ঠার সঙ্গে ঘটনার তুলনা করলেই সম্পাদকীয় লেখকটি বুঝতে পারতেন কি ঘটবার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন, আর কি হয়েছে। তবে গ্রামা জ্ঞানী-মানী অনেক ব্যক্তি না কি মনে করেন যে বাজারে কানমলা দিলে লোকে হাসে বটে কিন্তু অপমান হয় না।

সম্পাদকীয় লেখকের ষোণ্য সাংগাত অমিতাভ দাশগুপ্ত নামে একজন বিশেষ-অঙ্গ সাংবাদিক এবার স্ব-নামে অতীর্ণ হলেন। তিনি লিখলেন "ভোট ষোণ্যগাড়ের চেষ্টার বন্ধ" (এ বন্ধ টু কালেক্ট ভোটস); পাঠকদের মনে থাকবে

ছয়ই জুন জোড়াবাগান, দমদম এবং উথরা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের তারিখ ছিল। সুতরাং এই মতলববাজ সাংবাদিক পয়লা জুনের পর পাঁচদিন বসে থেকে পাঁচই জুন হিন্দু-মুসলিম স্ট্যান্ডার্ড হরতাল যে সি আর পি অত্যাচার ও খুনের বিরুদ্ধে নয়, আসলে উপনির্বাচনে সি পি এম যাতে ভোট বেশী পায় তার জন্যেই হরতাল ডাকা হয়েছে এই ধরনের অমূল্য জ্ঞান বিতরণ করতে চেষ্টা করলেন। সি পি এম যদি জেতে তাহলে পয়লা জুনের হরতাল ডাকার জন্যেই জিতবে? না হরতাল বিরোধী সব লোক যাতে ভোটে সি পি এমকে হারাতে অগ্রসর হন, কি উদ্দেশ্য? ভোট হয়ে গেল, সি পি এম উথরা ও দমদম দুটি নতুন আসন পেয়ে শক্তিবৃদ্ধি করল, কংগ্রেস জোড়াবাগানের আসনটি রক্ষা করে সংখ্যা রক্ষা করতে পারল, বাড়তে পারল না।

ইতিমধ্যে অঙ্গ-খাড়া কলহ বেড়ে বাংলা কংগ্রেস ভেঙ্গে গেছে। তিনজন এম এল এ সদৃশীল ধাড়ার সঙ্গে, অঙ্গবাবুর সঙ্গে দুজন। যদি সদৃশীল ধাড়া মনুষ্যসভার বিরুদ্ধে চলে যান। বাজারী সাংবাদিকদের চোখের ঘুম রইল না। তাঁরা লিখলেন, "সদৃশীল ধাড়া মনুষ্যসভা সমর্থন করবেন" অথচ এই শিরোনামের নীচেই লিখলেন সদৃশীল ধাড়া বলেছেন যে তাঁরা মনুষ্যসভাকে সমর্থন করবেন কি না পরে সিদ্ধান্ত নেবেন। কোনটা ঠিক? শিরোনাম, না সংবাদ, না, বাজারী সাংবাদিকের দুর্ভাবনা? তারপর ঐ পত্রিকায়ই সম্পাদকীয় বের হল নো চেঞ্জ, মনুষ্যসভায় পরিবর্তন হবে না। বাজারীদের দুর্ভাবনা তাহলে কাটলো? না মশাই না, অত সহজ নয়। অত সহজে দৃষ্টিচলিতা যায় না। সদৃশীল ধাড়ার সাংবাদিক বৈঠকের খবর দেখুন। সি পি এম কন্ট্রোলড প্রেসের সাংবাদিকদের উপরুপার প্রশ্ন সম্বন্ধে নাকি শ্রীধাড়া বলেছেন যে মনুষ্যসভার সমর্থন করা না করা সম্পর্কে রবিবার দলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে। অমিতাভ বাবুরা না হয় হাঁফ ছেড়ে বাচলেন। কিন্তু রিপোর্টে সি পি এম কন্ট্রোলড প্রেস-এর রিপোর্টারের উল্লেখ

করে সংবাদ পরিবেশনের যে নতুন অসাংবাদিকজনোচিত কায়দা সহ-কর্মীদের সম্পর্কে চালু করলেন তা অনুসরণ করে এখন যদি কেউ কোন বাজারী কাগজের সাংবাদিককে সি আই এ কন্ট্রোলড প্রেস রিপোর্টার অথবা সি আর পি ব্যাকড প্রেস রিপোর্টার বলে উল্লেখ করি তাহলে কি অমিতাভ বাবুরা ক্ষুব্ধ হবেন?

সবচেয়ে মজা ঘটেছে এগারোই জুন সি এম ডি এর সাতজন এম এল এ সদস্য নির্বাচনের সংবাদ পরিবেশন নিয়ে। সি পি এমের

চারজন সদস্যই নির্বাচিত হয়েছেন প্রথম প্রফারেন্স ভোটে যথাক্রমে পন্ডিত, চৌধুরী, চৌধুরী ও তেওঁরা ভোট একুনে একশো ছত্রিশটি ভোট পেয়ে আর কংগ্রেসের দুজন পন্ডিত করে, মুসলিম লীগের একজন বাইশটি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। বাজারী কাগজগুলি এই গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতবহু খবরটি বেমানান চেষ্টা গিয়েছেন, যুগান্তর লিখেছেন সরকারী দল-নায়েব আল আর স্টেটস-ম্যান অস্ট্রিয় পৃষ্ঠায় এক কোণে ছেপে দিয়ে দায় সেরেছেন।

মন্ত্রীর পকেট থেকে টাকা ছিনতাই

(দপনের সংবাদদাতা)

রাইটার্স বিল্ডিংএ ঢুকে জনৈক মন্ত্রীকে শাসিয়ে জনৈক ছাত্রপরিষদের নেতা নগদ তিনশো টাকা আদায় করে নিয়েছে। মন্ত্রীর ঘরে তখন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রীমশায়ের, ঘরে ঢুকে আঙ্গুলে টাকা দিয়ে ঐ ছাত্রপরিষদ নেতাটী বলেন, দেখি তিনশো টাকা। মাইনে তো পেয়ে গেছ। মন্ত্রী বলেন, সে কি? তিনশো

টাকা দিলে হবে কি করে?

ছাত্রপরিষদ নেতা-রংবাজি-ছাড়া, এক্ষণি টাকা দাও।

মন্ত্রী-টাকা কি সঙ্গে থাকে? এখন কাছে নেই।

ছাত্রপরিষদ নেতা অস্পষ্টবদনে মন্ত্রীর পকেটে হাত চালিয়ে তিনখানা একশো টাকার নোট তুলে নিয়ে বাকী টাকা ফিরিয়ে দিলে তারপর বড়ের বেগে প্রস্থান করলেন।

সমস্বয় কর্মচারী ঘোষণা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গণ-মুক্তি পরিষদ গঠন এবং গ্রামাণ্ডা মুক্তি পরিষদ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সববিধ কতৃপক্ষ গ্রহণ করবে। গণ-আদালত গঠন করে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করবে; পাক জঙ্গী-শাহী সরকারকে দেয় খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ ও সুদ পরিশোধ বন্ধ; মুনাকা-লোভীদের মজুত বাজেয়াপ্ত করে গরীব মানুষের কাছে ন্যায্য দরে বিক্রয় ব্যবস্থা; শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা সাহায্য অথবা শত্রুর চর হিসাবে কাজ করলে গণমুক্তি পরিষদ মৃত্যুদণ্ড সহ কঠোরতম শাস্তি দেবেন; যেসব জোতদার জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে থাকবে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কৃষক শোষণের ব্যবস্থা লাঘব করা; অন্যদিকে শরণার্থী বাস্তুত্যাগীদের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির তদারক ও সংরক্ষণ; পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রামাণ্ডা যথাসম্ভব স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা; শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বনো কলঙ্কিত ভাবধারা বর্জন করে সম্পূর্ণ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন; গ্রামে গ্রামে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা দল সংগঠন; তাদের সুশিক্ষিত করে শত্রুর ওপর পরি-কল্পনানুসারে অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা ও অস্ত্র সংগ্রহ; হানাদার বাহিনী যাতে বাংলাদেশের মাটিতে চলাচল, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা; গেরিলা দলকে জনগণের শ্রম ও ভালোবাসা অর্জন

করতে হবে বলে দৃঢ়ভাবে জনগণকে রক্ষা, জনগণকে সাহায্য ও জনগণকে শ্রম্য করার তিন নীতি গ্রহণ; জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক প্রচার কার্য; দেশের যে কোন ব্যক্তি পাকিস্তানী সামরিক কতৃপক্ষের সঙ্গে যেকোন সহযোগিতা করলে তাদের জাতীয় শত্রু বলে ঘোষণা এবং তৎকরার পর সশস্ত্র সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাদের ধ্বংস করা; জনগণের মনোবল নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে প্রচার; সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রভৃতি কাজকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা; ডাকাতি, রাহাজানি ও অন্যান্য অসামাজিক ক্রিয়াকলাপরত ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড সহ কঠোরতম শাস্তিদান; জঙ্গীশাহীর সমস্ত সামরিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহিত সম্পূর্ণ অসহযোগ; "আঘাত কর ও সরে পড়ো" এই নীতির ব্যাপক প্রয়োগ এবং সর্বোপরি জঙ্গীশাহীর আর্থনৈতিক বিপর্যয় স্বরাষ্ট্রবত করার জন্যে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে সক্রিয় তৎপরতা দেখানোর আহ্বান-এই আন্দোলনমূলক গ্রহণ করার জন্যে সমস্বয় কর্মীটি বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীর জনগণ, পশ্চিম পাকিস্থানের সিন্ধী, বেঙ্গাল, পাঠান ও পঞ্জাবী কৃষক ও শ্রমিক জনগণের নিকট আবেদন করেছেন।

বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতা-প্রিয় জনগণ, গণতান্ত্রিক ও সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কাছে বাংলা-দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অস্ত্র, অর্থ, ঔষধপত্র, রসদ ও নৈতিক সমর্থন দানের জন্যে কর্মীটি আবেদন জানিয়েছেন।

প্রকাশিত হোলো

অনৌক

পূর্ব বাংলা সংখ্যা

দাম : এক টাকা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১১ পঁচ টাকা

লাল লখন

পিকিং অপেরার বিপ্লবী গীতিনাট্য

দাম : দেড় টাকা

পিপলস বুক এজেন্সি

এক, কিশোর ঘোষ লেন,

পোঃ ষাণ্ডা মুর্শিদাবাদ

কোলকাতায় প্রাপ্তিস্থান :

র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব (কলি-১২)

নিউ বুক সেন্টার (কলি-৯)

অল্পপূর্ণী ফিল (শিয়ালদা)

ছাত্র পরিষদ নেতা ও কংগ্রেসী এম এল এর অশোভন আচরণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত আঠাশে মে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসে বাণিজ্যিক কংগ্রেস এম এল এ এবং ছাত্র পরিষদের নেতা সুব্রত মৃধাজী পর্বদের সেক্রেটারী এবং কর্মচারীদের সঙ্গে যে অশোভন আচরণ করেছেন তার তুলনা হয় না।

এই অপরিপক্ক বিধানসভা সদস্যটি আঠাশে মে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের অফিসে বান। গেটে প্রহরারত কর্মী তাঁকে ইন্টারভিউ-এর শিল্প লিখে দিতে বলেন। শুনেনি তিনি নাকি লাফিয়ে ওঠেন, কি আমাকেও শিল্প দিতে হবে? জান আমি কে? কর্মীটি সর্নিবনে জানান যে তিনি তাঁকে চেনেন না বটে, কিন্তু এখন মাধ্যমিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত চলছে, অফিস থেকে প্রশ্নপত্র, খাতা কভার এ-লো আনানোওয়া হচ্ছে বলে শ্রমিকেরা বিশেষ সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বিনা অনুমতিতে কারো সঙ্গে দেখা করা বা ওপরে যাওয়া বারণ। আপনি শিল্প দিলেই আমি ওপরে পাঠিয়ে অনুমতি আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছি, আপনি শিল্প দিন।

সদ্যোজাত এম এল এ এতে শান্ত তো হলেনই না, বরং আরো চেঁচামেচি করতে শুরু করে দিলেন। তিনি কিছুতেই শিল্প দেবেন না, কারণ তিনি সরকারী কংগ্রেসী দলের নাকি ডেপুটী চীফ হুইপ। এবং তিনি বোর্ডের সভাপতি, সম্পাদক কারোরই। পরোয়া করেন না তো এই ছাই গেটকীপারের কথা শুনবেন কি, তাঁকে অবাধে বিনাঅনুমতিতেই পর্বদের অফিসে ঢুকতে দিতে হবে। কিন্তু গেটকীপারের নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই বলে তিনি বলেন যে ওপরে ওয়ালার বিনাঅনুমতিতে তিনি কাউকেই ছেড়ে দিতে পারেন না।

বোর্ডের সভাপতি মিঃ বি সি মৃধাজী, আই এ এস এবং জনাকর কর্মচারী এই চেঁচামেচি শুনে জড় হন এবং সুব্রতবাবুর পরিচয় শুনে তাঁকে সভাপতি মহাশয়ের কামরার নিরে যেতে চান। সুব্রতবাবু তখন বেসামাল ভাবে চেঁচিয়ে চলেছেন।

সভাপতির ঘরে না ঢুকেই সুব্রত মৃধাজী সভাপতিকে নির্দেশ দেন যে এই মৃহুতে গেটকীপারকে বরখাস্ত করতে হবে। সভাপতি অবাক বিস্ময়ে জানতে চান কি হয়েছে। সুব্রত মৃধাজী চীৎকার করে বলতে থাকেন, কি হয়েছে, আমাকে গেটে আটকে দিয়েছে জানে না আমি কে? নিশ্চয় সি পি এম-এর লোক। এ লোকটাকে এক্ষুণি তাড়াতে হবে। এই অফিসে সি পি এমের মালেক

ভরতি। সবকটাকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে হবে।

সভাপতি অভিভূত সিঁড়িলাইন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি শান্তভাবে ভদ্রলোককে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে গেটকীপার তাঁর নির্দেশেই শিল্প চেয়েছে। তার তো সবাইকে চেনার কথা নয়। আর ক্রাউকে বরখাস্ত করার কারণ হিসেবে তো এটা দেখানো যায় না। পরীক্ষা চলছে বলেই এই সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। আমি ওকে গেট থেকে সরিয়ে নিতে বলছি।

এতে শান্ত হবার বদলে সুব্রত মৃধাজী আরো উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, “কী তোমারও বাড় হয়েছে, ওকে এক্ষুণি ডিসমিস করতে হবে। আমার হাতে বাহাদুর হাজার ছাত্রবৃন্দ আছে। সব পরীক্ষা আমি এই মৃহুতে

বন্ধ করে দিতে পারি জানো? বোর্ডের অফিস জ্বালিয়ে দেবো, এক্ষুণি সি আর পি ডেকে ওকে গ্রেপ্তার করতে হবে।”

অপমানে লঙ্কার প্রবীণ সভাপতি রাগা হয়ে উঠলেন। দীর্ঘদিন ধরে জেলাশাসকের দায়িত্ব পর্বন্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনো সম্ভবতঃ এ ধরনের শালীনতা বর্জিত “তুমি” “তুমি” বলে-তাঁকে কেউ সম্বোধন করে নি। তিনি সম্ভবতঃ ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু বলতে যাবার আগেই, নতুন শিং-ওঠা বাছুরের মত সুব্রত মৃধাজী তেড়ে উঠলেন, তোমাকে সাতদিন সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে ও লোকটাকে বরখাস্ত না করলে তোমাকে এই রাজ্য থেকে পাট গরুতোতে হবে। আমার নাম-সুব্রত মৃধাজী, আমি জানি মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় কমি-

উনিষ্টদের সঙ্গে তুমি খুব দহরম মহরম করতে, তোমাকে শাস্তেতা করতে আমার দুঃখটাও লাগবে না।

শাসিরে তিনি উত্তেজিত ভাবে বেরিয়ে এলেন, কেন, কী কাজে তিনি এসেছিলেন তা অপ্রকাশ্যই থাকল।

বোর্ডের সভাপতি ঘটনা জানিয়ে ক্ষুব্ধভাবে বললেন যে এভাবে কাজ করা অসম্ভব। নব-কংগ্রেসী শিক্ষামন্ত্রীকে আনুপূর্বিক

ঘটনা জানাতে, শিক্ষামন্ত্রী না কি বলেছেন যে সুব্রত ছাত্র পরিষদের নেতা এবং এম এল এ, তাকে ওভাবে গেটে আটকানোই অন্যায় হয়েছে।

আমরা জানতে পেরেছি যে সুব্রত মৃধাজীর এ ধরনের অশালীন অমার্জিত রুচি বিকারের প্রকাশ দেখে বোর্ডের কংগ্রেসী ইউনিয়নের অনেক সভ্য নাকি লজ্জিত ও মর্মাহত হয়েছেন।

কিছু পরীক্ষার্থী অন্য পরীক্ষার্থীদের ঘড়ি আংটি ছিনতাই করেছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মধ্য কলকাতার জনৈক কংগ্রেসী এম এল এ প্রায় পনেরো ঘোলাটি গত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে মিত্র ইনস্টিটিউশন পরীক্ষা কেন্দ্রে সীট বদলে দেওয়ার জোর সুপারিশ করেন। যাতে এই বিশেষ মার্কা পরীক্ষার্থীদের সীট এই বিশেষ কেন্দ্রে দেবার বন্দোবস্ত

করা হয় তার জন্যে কংগ্রেসী এম এল এ-টী তাঁর দৃষ্টান্তকে বোর্ডে তাম্বিল করতেও পাঠান।

শোনা গেল এই এম এল এ এর সুপারিশে যারা মিত্র মেইন ইনস্টিটিউশন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল তাদের তড়পানির চোটে এই কেন্দ্রে যথেষ্ট অসংগত আবদার সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে রেহাই হয় নি। কেন্দ্রটীতে বিতলভাই ইনস্টিটিউশনের ছাত্র পরীক্ষার্থীদের সীট পড়েছিল। কংগ্রেসী এম এল এ এর সুপারিশ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীরা বিতলভাই ইনস্টিটিউশনের অনেক ছাত্রের ঘড়ি আংটি নগদ টাকা এসব ছেনতাই করে কেড়ে নিয়েছে। যাদের ঘড়ি আংটি টাকা প্রভৃতি খোয়া যায় তাদের মধ্যে এক অবাংগালী খ্যাতনামা শিল্পপতির ছেলেও ছিল।

এ শিল্পপতিটী নাকি বোর্ডের কাছে জানতে চেয়েছেন যে এই সব ছিনতাইবাজ পরীক্ষার্থীকে তাদের নির্ধারিত পরীক্ষাকেন্দ্রে থেকে পরসাতলা অবাংগালী ছেলেদের (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

দুর্গাপুরে পুলিশের বেপরোয়া অত্যাচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানায় অসংখ্য শ্রমিকের উপর কতৃপক্ষের জোর জুলুমবাজী অনেক দিন ধরেই চলছে। ইদানিং তা বৃদ্ধির দিকে। অভিযোগ, সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিকের নির্ধারিত শ্রমমাত্রা পুর্লিশের তরফ থেকেই নয়, কোন এক গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে সাধারণ শ্রমিকগণকে হত্যা করার পরিকল্পনাও নির্ব্বাদে চলেছে। গত বাইশে এপ্রিল ষষ্ঠী দাশ-গুপ্তের উপর জঘন্য আক্রমণ হয়। এর মধ্যে দুর্গাপুর প্রোজেক্ট এম-প্লানিজ ইউনিয়নের নেতা বিশ্বনাথ দাসকে একুশে এপ্রিল গুপ্ত-ঘাতক দ্বারা খুন করা হয়। তেইশে মে দুর্গাপুর কোমিকেলসের শ্রমিক প্রকাশ বাগদিকেও গুরুতরভাবে জখম করা হয়। হত্যা ও জখম করার ঘটনা ঘটলেও প্রকৃত আসামী গ্রেপ্তারের কোন সংবাদ নেই। সমাজবিরোধী ও দক্ষত-কারীদের গ্রেপ্তার তো দূরের কথা, পুর্লিশ ও শিল্প নিরাপত্তাবাহিনী নিজেরাই শ্রমিকগণকে পেটানোর কাজে নেমে পড়েছে। গত পয়লা জুন এই পেটানোর কাজ শুরু হয় এবং তা পরের দিনও চলে। শব্দ শ্রমিকরাই নন, প্ল্যান্ট মেন্ডিকেল ইউনিটের ডাক্তার, ড্রেসাররাও এদের নির্ব্বচার লাঠি চার্জে আহত হন। এর ফলে কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তিও হতে হয়েছে।

সাধারণ খেটে খাওয়া মানু-ষের উপর যেমন একদিকে গুপ্ত-

ঘাতকের দল নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করছে তেমন অন্যদিকে পুর্লিশ ও শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী যৌথভাবে বেপরোয়া অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো, এ সুযোগে এক প্রণীর অসং দায়িত্বশীল অফিসারের দৃষ্টান্তের মাত্রা ক্রমশই চরম বৃদ্ধির দিকে। পুর্লিশ আছে, শিল্পনিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে, এমনকি হাজার হাজার টাকার বেতনধারী অফিসাররাও রয়েছেন, তা সত্ত্বেও কারখানার ভেতর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাইরে চলে-সাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। গত সাতাশে মে এ ধরনের এক ঘটনা ঘটে গেলো। অভিযোগে প্রকাশ, ইন্ডিয়ান স্টীল ইন্ডাস্ট্রীজ, ক্লাইভ স্ট্রীটের ঠিকানায় নয় ওয়ালান স্ক্র্যাপ স্টীল পাঠানোর কথা ছিল। অথচ পাঠানোর পূর্ব-মৃহুতে দেখা গেলো ওয়ালানে স্ক্র্যাপের পরিবর্তে ইনগট ভর্তি করা হয়েছে।

এতো ইনগট পাচারের পূর্ব-মৃহুতের খবর। এদিকে, পয়লা ও দোসরা জুন গুপ্তগোলের পরি-প্রেক্ষিতে তেসরা জুন সাধারণ শ্রমিকেরা ধর্মঘট পালন করেন। কর্মীদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিরাপত্তাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু মল্যবান টানার খোয়া গেছে বলে প্রকাশ।

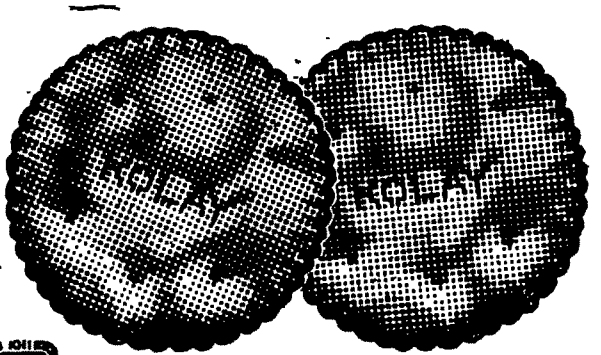
এরকম এক আধাটি ঘটনা নয়, আরও অনেক ঘটনার নজীর রয়েছে। অথচ কারখানার কতৃ-পক্ষ বছরের পর বছর কোটি

কোটি টাকার লোকসানের বোঝা শ্রমিকের উপর চাপাতে চাইছেন। তবে মদ্রের মধ্যে কতৃপক্ষের এসব চুরি দৃষ্টান্ত বৃদ্ধির জন্যে নাকি-কান্না শোনা যায়। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের প্রশ্ন, হিন্দুস্থান স্টীলের চেয়ারম্যান ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা জেগে থেকে যুঁমোবার ভাণ আর কতদিন করবেন? তারা কি সতাই জানেন না, চুরি দৃষ্টান্ত ও পুর্লিশী অত্যাচারের পরি-চলনার পরামর্শদাতা কারা?



কোলে

গাফু ম্যাক



KB/10/71 B



কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, কলি-১০

জাতীয় গ্রন্থাগারে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ

অরুণ বসু

রিভিউইং কমিটি এবং খোসলা কমিটির পেছনে প্রায় লাখ টাকা খরচ করে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনার সুদূর ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সামগ্রিক উন্নতি বিধানের জন্য সুপারিশ করেন। রিভিউইং কমিটির কাজ সুদূর হবার আগে তাদের পরিচিত এমন কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে একটি প্রশ্নমালা বিলি করে মতামত সংগ্রহ করা হয় যাদের মতামত কমিটির মতে “উইল বি হেল্পফুল টু দি কমিটি ইন ইটস ডেলিবারেশনস”। এইরূপ বিশেষ ঘনিষ্ঠ মহলের মতামত সংগ্রহ করে রিভিউইং কমিটি এমন এক বিশেষ পন্থা অনুসরণ করে তাদের সুপারিশ সমূহ প্রণয়ন করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেন যার ফলে প্রকৃত সমস্যার বিশেষ কোন সমাধান হয় নি। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালে গঠিত বিশ্বভারতীয় একটি সমিতির (স্থাপনের ৩০-৫-৭০) উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সমিতি বিশ্বভারতীয় কল্যাণকামী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের মতামত বিশেষভাবে সহায়ক হবে মনে করে যারা মতামত জানাতে ইচ্ছুক এমন সর্বস্তরের মানুষের কাছে পরিচয় বিজ্ঞাপিত দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন। এই ধরনের খোলা মনের পরিচয় রিভিউইং কমিটি প্রচারিত প্রশ্নমালায় ছিল না। জাতীয় গ্রন্থাগারের মূল সমস্যাদুটিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—(এক) গ্রন্থাগার পরিচালনার কতৃপক্ষের ব্যর্থতা, (দুই) কর্মীদের নানাপ্রকার অভাব অভিব্যক্তি, এবং (তিন) স্বজন-পোষণ নীতি। এগুলি বিশেষভাবে খুঁটিয়ে রিভিউইং কমিটি এবং খোসলা কমিটি কেউই দেখেন নি।

গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যর্থতা
গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রিভিউইং কমিটির সুপারিশক্রমে প্রচলিত উপদেষ্টা পরিষদের পরিবর্তে একটি গভর্নিং কাউন্সিল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে

ছেন। এছাড়া প্রশাসন বিভাগের মাধ্যম ভারী করে একজন ডিরেক্টর (দুই হাজার—আড়াই হাজার টাকা বেতনক্রমে) নিয়োগের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। এই ডিরেক্টর মহাশয় গভর্নিং কাউন্সিলের এক্স-অফিসিও হিসেবেও কাজ করবেন। রিভিউইং কমিটি সুপারিশ করেছেন, এই Governing Council should be a delegated autonomy and not a statutory one having the power to act as final arbiter on promotions, selection, initiation of projects etc.

এই সুপারিশ গ্রাহ্য হলে ন্যায়দাবীদাওয়া সম্পর্কে কর্মী সংস্থার বক্তব্য কতৃপক্ষ অতি সহজেই অগ্রাহ্য করার সুযোগ পাবেন। ফলে গ্রন্থাগার অভ্যন্তরে প্রশাসন বিভাগ এবং কর্মীদের মধ্যে তীব্র সম্পর্ক আরও তীব্রতর হয়ে গ্রন্থাগারের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পাঠকদের দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে উনিশশো বাট সালে নিউ দিল্লীতে “এশিয়ান গ্রন্থাগার উন্নয়ন” সম্পর্কে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সভা গ্রন্থাগার ব্যক্তির অকৃপা পর্বলোচনা করে সুপারিশ করেছিলেন “where library legislation would take time, a library directorate or unit within an appropriate Ministry should be set up to undertake the establishment and development of public library service at national, state and district levels.”

একদা কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত সভ্য কতৃক সমর্থিত এই সুপারিশ রিভিউইং কমিটির সুপারিশ সমূহের মধ্যে কেন স্থান পায়নি, তা জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য প্রচলিত কর্মীনিয়োগ নীতি এবং কর্মীদের পদের স্তর ভেদ লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। রিভিউইং কমিটি ও স্টাফ স্ট্রাকচার প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এগুলির কাঠামো প্রবর্তিত হয়েছিল গ্রন্থাগারিক শ্রীবি, এস, কেশবনের যুগে (১৯৪৮-৬০)। এবং তিনি একজন সদস্য হিসেবে রিভিউইং কমিটিতেও কাজ করেছেন।

কর্মীদের পদের স্তর ভেদ এবং নিয়োগ পন্থা

(এক) লাইব্রেরিয়ান—ইউ পি এস সি মারফত সরাসরি নিয়োগ, (দুই) ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান—অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান পদ থেকে প্রমোশন, (তিন) অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান—শতকরা পঁচাত্তর জন সরাসরি নিয়োগ এবং বাকী পঁচিশ জন জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদ থেকে প্রমোশন, (চার) জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট—শতকরা একশো জন সরাসরি নিয়োগ, (ছয়) জুনিয়র রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট শতকরা পঞ্চাশ জন সরাসরি নিয়োগ এবং বাকী

পঞ্চাশ জন অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর পদ থেকে প্রমোশন, (আট) গার্ডন সুপারিন্টেন্ডেন্ট—কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন প্রাদেশিক সরকারের অন্য কোন অফিস থেকে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগ। গ্রন্থাগার ব্যক্তিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে অ্যাসিস্টেন্ট লাইব্রেরিয়ান পদ পর্যন্ত—(এক) ল্যাংগুয়েজ এবং সাবজেক্ট স্পেশালাইজড শ্রেণী, এবং (দুই) জেনারেল।

আবশ্যিক শিক্ষাগত বোধ্যতা : (এক) লাইব্রেরিয়ান—এম এ, লাইব্রেরিয়ানশিপে ডিপ্লোমা, (দুই) অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান—এম এ ও ডিপ্লোমা, কিন্তু প্রমোশনের ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েট এবং ডিপ্লোমা, (তিন) টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট—গ্রাজুয়েট এবং ডিপ্লোমা, (চার) জুনিয়র রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট—ম্যাট্রিক, কিন্তু প্রমোশনের ক্ষেত্রে নন-ম্যাট্রিক এবং স্টার্টারের কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

উপরে বর্ণিত কর্মীনিয়োগ পন্থাতি অনুসরণ করে বিভিন্ন পদের স্তরগুলিতে কর্মী নিয়োগ কতৃপক্ষ আজ পর্যন্ত যেভাবে করেছেন তাতে বাঙালী, বিহারী, অসমীয়া, এবং উড়িষ্যাবাসীদের জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষাপারে উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতা আগামী দিনে বিশেষ থাকবে না। প্রকৃত ক্ষমতা নাকি দক্ষিণ ভারতীয়দের হাতে চলে যাবে, এবং এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সূচত্বর ভাবে করা হয়েছে। একথা সত্য যে বর্তমান ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এবং অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইত্যাদি পদগুলিতে এখনো বাঙালী অফিসার আছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এরা সকলেই খুব পুরানো স্টাফ। প্রমোশনের মাধ্যমে সিনিয়র স্টাফ হিসেবে এরা ঐ পদগুলিতে বহাল হয়েছেন। আগামী দুই তিন বছরের মধ্যেই এদের অনেকেই অবসর গ্রহণ করবেন।

অপরদিকে একজন বাঙালী ডেপুটী লাইব্রেরিয়ানকে অবসর গ্রহণের পূর্বেই সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীতে বদলী করা হয়েছে। এই ধরনের বদলী জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে এই প্রথম। বর্তমান ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার অবসর গ্রহণ করার পর সিনিয়র রিটি অনুযায়ী যারা ঐ পদগুলিতে বহাল হবেন তারা হচ্ছেন সবশ্রী এম এন নাগরাজ, এইচ সি গুপ্ত (হিরিয়ানা), এস বালসুব্রহ্মনিয়ম, এন নাগরাজন এবং এস এন খান্না প্রমুখ স্টাফগণ। এদের শিক্ষাগত বোধ্যতা এবং কর্মকুশলতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু না থাকা সত্ত্বেও ইনিশিয়াল ইনক্রিমেন্ট অনেককে বেশী দিয়ে জাতীয়

গ্রন্থাগারে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদগুলিতে সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছে।

এরা প্রায় সকলেই চরম সাল এবং তারপরে জাতীয় গ্রন্থাগারের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। এদের মতো বোধ্যতাসম্পন্ন অ-দক্ষিণ ভারতীয় ব্যক্তিদের শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জনকেই জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের চাকুরীতে প্রবেশ করতে হয়। রিভিউইং কমিটি রুলসে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে শতকরা পঁচাত্তর জন সরাসরি নিয়োগের নিয়ম প্রবর্তন করে এই সকল ব্যক্তিদের সরাসরি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদগুলিতে চাকুরী নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান পদগুলিতে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ প্রমোশনের নিয়মের মাধ্যমে ওপরে তোলার ব্যবস্থা পাকা করে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান হয়ে বসেছেন। এদের এইরূপ উন্নতি লাভে ভাষার দোহাই অনেকখানি কাজ করেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ হচ্চে এই যে, ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান এবং লাইব্রেরিয়ানের পদে (এই পদগুলি ভাষাভিত্তিক নয়) যখন তারা উন্নীত হবেন তখন তাদের ভাষাগত অথবা সাবজেক্ট স্পেশালাইজেশন সংক্রান্ত বোধ্যতার প্রয়োজন প্রমোশনের জন্য আবশ্যিক নয়।

উপরোক্ত ব্যক্তিদের যে পন্থায় ওপরে তোলা হয়েছে সেই পন্থায় সবশ্রী পি জি দাস, মীরা-পাকড়াশী, এইচ সি মন্ডল এবং বি সেনগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ অনেক পুরনো স্টাফ হওয়া সত্ত্বেও ওপরে ওঠার সুযোগ সমন্বিত পাননি। এরা সকলেই ওদের অনেক আগেই অবসর নেন। সবশ্রী বি বি চৌধুরী এবং এস এম হাসান ইউ পি এস সি কতৃক নিযুক্ত প্রথম অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান। ইউ পি এস সি কতৃক সরাসরি নিয়োগ না হলে শ্রীচৌধুরী সিনিয়র রিটি অনুযায়ী অনেক আগেই অ্যাসিস্টেন্ট লাইব্রেরিয়ান হতেন। কিন্তু ঐ পথে সরাসরি নিয়োগ করিয়ে কতৃপক্ষ একটি প্রমোশনের কোটা লাভ করেন আপনজনদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য। এস এম হাসানের কপাল ভালো। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবিরকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য কতৃপক্ষ একে অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান করলেন। শ্রীহাসান হলেন উর্দু, আরবী এবং ফরাসী ভাষা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান। এই পদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা অনুযায়ী বাংলা বিভাগের জন্য অ্যাসিস্টেন্ট লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ জনস্বার্থের খাতিরে আবশ্যিক হলেও কতৃপক্ষ তা উপেক্ষা করেন। কারণ ঐ পদের জন্য তখন কতৃপক্ষের আপনজন কেউ ছিল না।

কতৃপক্ষের অনুসৃত এইরূপ সংকীর্ণ নীতির ফলেই জাতীয় গ্রন্থাগারে অসন্তোষ এবং তীব্র সম্পর্ক এত তীব্রভাবে কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বৃত্তিকুশলী কর্মীদের কয়েকটি বিশেষ স্তরে, যেমন, জুনিয়র রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং তৃতীয় শ্রেণীর কিছু কেনারার পদে, বিহারী,

উড়িষ্যাবাসী এবং বিশেষভাবে বাঙালীদের অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় বৃত্তিকুশলী কর্মীদের সমান বোধ্যতা-বলী থাকা সত্ত্বেও অধস্তন কর্মী হিসেবে চাকুরী করতে হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতীয়গণ কখনো কখনো জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিযুক্ত হলেও দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যে তাদের উচ্চপদে তুলে নেওয়া হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এম. এন নাগরাজের কথাই ধরা যাক। ভাগ্যবশত তিনি নাকি বি এস কেশবনের আত্মীয়। শিক্ষায় ভ্রমলোক বি এস সি এবং লাইব্রেরিয়ানশিপের ডিপ্লোমাও তার আছে। শ্রীকেশবন নাকি কলকাতা এনে তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে প্রথমে বাইরের একটি গ্রন্থাগারে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই গ্রন্থাগারে কাজ করার ফলে কতৃপক্ষের কাছে তার বাজারদর বেড়ে যায়। পরে জাতীয় গ্রন্থাগারে ফিরিয়ে এনে কানাড়া ভাষার (?) একটি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে মাইনের উপর বাড়তি পাঁচটি ইনক্রিমেন্ট দিয়ে তাকে নিয়োগ করা হয়। এই একই পন্থায় পরবর্তী লাইব্রেরিয়ান ওয়াই এম মূলে তার আত্মীয় সি ডি দাতারকে জাতীয় গ্রন্থাগারে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিযুক্ত করেন। তারপর শ্রীমূলেরই প্রভাবে ফলে শ্রীদাতার অতি সম্মত জাতীয় গ্রন্থাগারে অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান পদ লাভ করেন, এবং বর্তমানে আরো উন্নতি লাভ করে লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার অফিসের লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীমূলের সুনজরের ফলে শ্রীমতী দাতারেরও জাতীয় গ্রন্থাগারে অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান হতে কোন বেগ পেতে হয় নি। শ্রীমতী দাতার বর্তমানে দেশ এবং দেশের সেবা পরিচালনা করে লন্ডনে স্বামীর সঙ্গে চলে গেছেন নিজের ভাগ্য অন্বেষণে। শ্রীমূলের প্রভাবে শ্রীদাতারের যতখানি উন্নতি হয়েছে শ্রীনাগরাজের উন্নতি ততখানি হতে এখনো কিছু বাকী। জাতীয় গ্রন্থাগারে শ্রীকেশবনের পুনরাগমনের ফলে এই বাকীটা পূরণের আরবেশী দেবী নেই। শ্রীকেশবন অবশ্য এজন্য চেষ্টা শুরু করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারে শ্রীনাগরাজের চাকুরী জীবন সুদূর হবার সময় থেকেই। শ্রীনাগরাজের আগমন জাতীয় গ্রন্থাগারে কানাড়া ভাষার রাস্তা দিয়ে। কিন্তু দেখা গেছে যখনই কোন অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ানের পদ খালি হয়েছে কতৃপক্ষ সেই পদ পূরণ না করে শ্রীনাগরাজ এবং শ্রীবালসুব্রহ্মনিয়ম এবং কখনো কখনো শ্রীকানাজী চৌধুরীকে সেই পদের দায়িত্বভার দিয়েছেন। এই দায়িত্ব তারা বহন করেন নিজেদের দায়িত্বের সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্বভার হিসাবে।

প্রকৃতপক্ষে এই অতিরিক্ত দায়িত্ব বহনে তাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এই কারণে যে, উক্ত ডায়টিসনের কাজ সেখানকার উচ্চ শিক্ষিত বৃত্তিকুশলী টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টগণই করে থাকেন। অতিরিক্ত দায়িত্বভার বলতে কিছু (শেবাংশ সপ্তম পৃষ্ঠার)

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

১৮ই জুন ১৯৭১

বার্ষিক পনেরো টাকা

সাপ্তাহিক সাড়ে সাত টাকা

প্রমাসিক চার টাকা

টাকাভিত্তিক ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, মট সেন, কলি-১৩

সি পি এম এল দলের রাজনীতির ব্যাখ্যা (২)

পিনাকী চক্রবর্তী

মিছিল ধর্মঘটের নামে বাগা-
ডম্বর সর্বস্ব শ্রেণীসংগ্রামের দিন
সি পি এম এল দলের নামে। এখনকার
শ্রেণীসংগ্রামকে সংগ্রামের উচ্চতর
পর্বায় নিয়ে যেতে গেলে শত্রুকে
শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে,
পার্টি হিসাবে নয়। সংশোধন-
বাদীরা বলে যে তারা কংগ্রেসের
বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম করে। যদিও
কংগ্রেস নেতৃত্ব বস্তুতঃ বিস্বাসা-
জ্ঞাবাদের অনুচর সংশোধনবাদীরাও
তো তাই। কংগ্রেস যেমন সাধারণ
মানুষকে প্রতারণা করে সি পি
এম, সি পি আইও, তো তাই
করে। সুতরাং যা চিহ্নিত করা
প্রয়োজন তা হলো শ্রেণীশত্রু : সাম-
ন্ততান্ত্রিক শোষণের প্রতিভূ।
সাম্রাজ্যবাদীর দালাল, বর্তমানে
পচাগলা সমাজের বিভিন্ন প্রহরী
এ সমাজের নোংরা মিতে যারা প্রতক্ষ
ভাবে জড়িত থেকে উপকৃত
হয়ে নোংরা মিকে বজায় রাখতে
বন্দ্যপরিচর্য তারা—এতে যেমন
জোতদার ও পুঁজি শ্রমিক থাকতে পারে,
তেমনি বুরজোয়ার দালালী করে
এমন ট্রেডইউনিয়ন নেতা এবং
শিক্ষক নামধারী শয়তান ব্যক্তিও
থাকতে পারে। শ্রেণীসংগ্রামের
উচ্চতর পর্বায় হিসেবে শ্রেণীশত্রু
খতম দুটো মোটা উদ্দেশ্য পূরণে
নিয়োজিত হয় (ক) শোষিত জন-
সাধারণের বৈপ্লবিক শ্রেণীসংগ্রামকে
মদত দিয়ে তার শ্রেণীপ্রত্যয়ে
বিস্ফলক জোর সৃষ্টি করা; (খ)
শোষকশ্রেণী ও তার পুঁজি মিলি-
টারী এবং বিভিন্ন রংবেরং-এর
দালালদের শ্বেতসন্ধ্যাসের বদলা
হিসাবে বিপ্লবী জনগণ কর্তৃক
লাল সন্ধ্যাসের দূর্গ গড়ে তোলা।

শোষকশ্রেণীর প্রতক্ষ অনুগ্রহ
বা কেড়ে নেওয়া উদ্দেশ্যে প্রতি-
পালিত পেটিবুরজোয়া রাজনীতির
বিভিন্ন দল ও নানা রং-এর সংশো-
ধনবাদীরা খতম অভিযানের উভয়
উদ্দেশ্যকে বন্ধ করতে পেরেছে বলেই
একে প্রচণ্ড ভয় করে, তাই এ্যাকশনে
বা জেলে বা বেকেন ভাবে বিপ্লবী-
দের হত্যা করার জন্য যখন শোষক
শ্রেণী উঠে পড়ে লাগে তখন তাদের
সঙ্গে সকলেই সামিল হয়, বিপ্ল-
বীদের হত্যায় মনে মনে আনন্দিত
হয়, পুঁজি শ্রমিক সাহায্য করে অর্থাৎ
এক কথায় শ্বেতসন্ধ্যাসের বাহিনী
হিসেবে সি পি এম শত্রু সকল
পেটিবুরজোয়া রাজনৈতিক দলই
কাজ করে।

লাল সন্ধ্যাসের নিয়ন্তা বিপ্লবী
জনসাধারণ তাই শ্রেণীশত্রু হিসেবে
শত্রুই জোতদার, পুঁজিপতি,
পুঁজি ও মিলিটারীকেই মনে করে
না, পেটিবুরজোয়া রাজনৈতিক শয়-
তানীর যে সকল অনুচর সক্রিয়-
ভাবে শোষকশ্রেণীর শ্বেতসন্ধ্যাসের
দালালী করে তাদেরকেও শ্রেণী-
শত্রু হিসেবে মনে করে এবং বিপ্ল-
বীদের খতম অভিযান সংগতভাবেই
এ দালালদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত
হয়। যেহেতু দালালদের অর্থনৈ-

তিক শ্রেণী মূলতঃ পেটিবুরজোয়া
মধ্যবিত্ত, সে হেতু ঐ মধ্যবিত্ত-
শ্রেণীর শিক্ষক, উকীল, অধ্যাপক,
উপাচার্য থেকে আরম্ভ করে তথা-
কথিত “শ্রমিক নেতা” প্রমুখ
বিস্ফলকী হত্যায় সক্রিয় শোষক-
শ্রেণীর দালালদের খতম করতে
হয়। খতম অভিযানের প্রাথমিক
পর্বায় এ অবস্থা অপরিহার্য,
স্বাভাবিক পর্বায় অর্থাৎ লালসন্ধ্যাস
বাস্তব ঘটনা হিসেবে বিভিন্ন
অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে উক্ত
দালালীর প্রকৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর
মধ্যে কমে যাবে।

খতম অভিযানের একটা বিপদ
অবস্থা ঐ পেটিবুরজোয়া মধ্যবিত্ত-
শ্রেণী থেকেই আসে। বিশেষ করে
উক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকরাই যখন
বিস্ফলকী এ্যাকশন স্কোয়াডে থাকেন।
মধ্যবিত্তশ্রেণীসুলভ পেটিবুরজোয়া
প্রবণতাকে বিপ্লবী যুবকরা যথেষ্ট
আত্মত্যাগ বিপ্লবী জীবনের কঠোর
অনুশীলন, বিপ্লবী মনোভাবের
যথেষ্ট পরিণতির দ্বারা না দূর
করতে পারলে শ্রেণীশত্রু খতম
অভিযানের মধ্যেই পেটিবুরজোয়া
চরিত্রের সংকীর্ণতাবাদী খতম চলে
আসে। ঐ প্রকার খতম শত্রু
পেটিবুরজোয়া আতঙ্ক সৃষ্টি করে,
শোষিত মানুষের বুদ্ধির বল বৃদ্ধি
করে না, খতমের শ্রেণীগত তাৎ-
পর্য শোষিত মানুষের কাছেও
ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব উপেক্ষিত হয়।
এ প্রকার খতম শ্রেণীসংগ্রামের পক্ষে
ক্ষতিকরক, লালসন্ধ্যাস সৃষ্টির
প্রতিবন্ধক ও শ্বেত সন্ধ্যাসের অনু-
কূল।

শ্রেণীশত্রু খতমের সংগে বৈপ্লবিক
গণআন্দোলনের পারস্পরিক
নির্ভরশীলতা

শ্রেণীশত্রু খতম অভিযানের
বিবিধ উদ্দেশ্যকে জোরদার করতে
গেলে অর্থাৎ শোষিত মানুষদের
মধ্যে সাহস, আত্মত্যাগের মনো-
ভাব বাড়তে ও লালসন্ধ্যাসের ঘাঁটি
স্থাপন করতে গেলে বৈপ্লবিক
গণ-আন্দোলনকে খতম অভিযানের
আধার হিসেবে ব্যবহার করতে
হয়। বস্তুতঃ বৈপ্লবিক গণ-
আন্দোলনই খতম অভিযানের মধ্যে
ব্যাক্তিকেন্দ্রিক, পেটিবুরজোয়া চরিত্র-
ের সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতাকে
নিবৃত্ত করতে পারে। কোন বিশেষ
খতম যদি লাল সন্ধ্যাস সৃষ্টির
অনুকূল না হয়ে শোষিত মানুষের
সামনে ধোঁয়া সৃষ্টি করে, বৈপ্লবিক
গণআন্দোলনই তখন উক্ত খতমের
সমালোচনা করে এ্যাকশন স্কোয়া-
ডের বৈপ্লবিক সংশোধনে সহায়তা
করে।

অপরপক্ষে বৈপ্লবিক গণ-
আন্দোলনই শ্রেণীশত্রুকে—শোষক
শ্রেণীর প্রতিভূ ও দালালদের
চিহ্নিতকরণে সাহায্য করে। বৈপ্ল-
বিক গণআন্দোলন লালসন্ধ্যাসের
ঘাঁটি স্থাপনে সহায়তা করে।

সংশোধনবাদী গণআন্দোলনের

সঙ্গে বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের
গুণগত তফাত রয়েছে। ভারত-
বর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে
শোষকশ্রেণী সংশোধনবাদী গণ-
আন্দোলনের মতোস নিজেই ব্যব-
হার করে, কংগ্রেস থেকে সি পি এম
অবধি সকলেই বড়ো বড়ো মিছিল-
ধর্মঘট, সাময়িক উত্তেজনারকারী
বিস্তারিতকর এ্যাকশন, বিপ্লবী-
জনতাকে প্রতারণা করার জন্য
“সমাজতন্ত্র” এবং এমনকি “সংশ্র
বিস্ফলক” কথা (দৃষ্টান্ত ভারত-
বর্ষে সি পি এম এবং পূর্ববঙ্গে
মুজিবর ও ভাসানীর দলগুলো)
বলে একাদিকে নিজেদের শ্রেণী-
চরিত্র ঢেকে রাখে, অপর দিকে
বর্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল
আশু বৈপ্লবিক উপপটনের প্রশ্নকে
জনসাধারণের সামনে থেকে সরিয়ে
রাখবার চেষ্টা করে এ বলে যে—
জনগণ এখনো বিপ্লবীচেতনায়
সামিল হয় নি।

কিন্তু বৈপ্লবিক গণআন্দোলন
যেহেতু বিপ্লবী জনসাধারণের
সংশ্র শক্তির মদত নিয়ে গেরিলা
গোপন কায়দায় উপস্থিত রাষ্ট্রীয়
যন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য গড়ে
ওঠে, সে জন্য শোষক শ্রেণী ও
তার দালালরা সকল গণআন্দোলনিক
মুখোমুখি হয়ে ফেলে, সকল গণ-
দরদের বুদ্ধির সরিয়ে রেখে
ফ্যাসিবাদী কায়দার একে ধ্বংস
করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাম্প্র-
তিক কালের ভারতবর্ষ বিশেষ
করে শ্রীকল্যাণ, মদ্রাশ্বারী, চম্পা-
রণ অঞ্চল ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে
নকশাল হত্যার ব্যাপক ও সুদূর-
প্রসারী, সরকারী ও বেসরকারী
উল্লেখ্য উপরোক্ত উত্তির সত্যতা
প্রমাণ করে। গত দেড় বছরে এক-
মাত্র বাংলাদেশে তিন হাজারেরও
অধিক নকশাল বিপ্লবীদের হত্যা
করেছে শোষকশ্রেণীর পুঁজি,
মিলিটারী এবং তার এ ব্যাপারে
বশব্দ দালাল সি পি এম নেতৃত্ব।
হত্যার কায়দাও হয়েছে ইতি-
হাসের নৃশংসতম, হিটলারী
গেটাপো-ও গোয়েলস, পদ্ধতি
এদের কছে পড়নো। শত্রু তিন-
হাজারের উপরে হত্যা করেছে এমন
নয়। সি পি এম ও অন্যান্য
সংশোধনবাদী দলের সহায়তায়
(যাতে ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন
দলের কৃষকসভার নেতা, ট্রেডইউ-
নিয়ন নেতা, স্কুল শিক্ষক, অধ্যাপক,
মধ্যবিত্ত কেরাণী) দশহাজারেরও
অধিক নকশাল বিপ্লবীদের বিনা
বিচারে গ্রেপ্তার করেছে শোষক-
শ্রেণীর পোষা গুন্ডা পুঁজি, মিলি
টারী।

এতদ সত্ত্বেও কি সি পি এম
এল-এর নেতৃত্বাধীন বৈপ্লবিক
গণআন্দোলন ভাটা পড়েছে? না।
আন্দোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে,
ব্যাপকতর হচ্ছে, বিভিন্ন জেলায়
ছড়িয়ে পড়েছে, গেরিলাকায়দায় যে
সমন্বিত তারও বিকাশ হচ্ছে,
ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে, পেটি-

বুরজোয়া শ্রেণীর তরুণদের মধ্যে
কলঙ্কারখানার শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত
জনতার মধ্যে বৈপ্লবিক আন্দো-
লন ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছে। অধিক-
তর নিপুণতার সঙ্গে সংগঠিত
হচ্ছে—সোভাগ্যের বিষয় এ সব
তথ্য বুরজোয়াদের পাঁচটা সংবাদ-
পত্রে থাকে না; তা থেকে সংশোধন-
বাদী কুকুরদের ধারণা হয়েছে নক-
শালার শত্রু সহরে, গ্রামে নেই।
প্রচার করছে—নকশাল মানে সমাজ-
বিরোধী, ইন্দিরা অনুচর। অথচ
নকশাল বিপ্লবীদের মোকাবিলা
করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীর কেনা
দালাল ইন্দিরা সবচেয়ে বেশি
সাহায্য পাচ্ছে ঐ সংশোধনবাদী
পার্টির কাছ থেকে।

প্রচণ্ড দমননীতি, ব্যাপকতম
হত্যার নীতি যেখানে শোষকশ্রেণী
ও তার দালালদের একমাত্র পথ সি
পি এম এল-এর নেতৃত্বে বৈপ্ল-
বিক গণআন্দোলন সম্প্রসারিত
প্রকাশ্য হতে পারে না, বস্তুতঃ

গেরিলা নেতৃত্বাধীন কোন জন-
যুদ্ধেই গণআন্দোলন সংশোধন-
বাদী প্রকাশ্য কায়দায় পরিচালিত
বিজ্ঞাপিত হবার জন্য পরিচালিত
হতে পারে না।

গেরিলা কায়দায় বৈপ্লবিক
গণআন্দোলন শত্রুই যে বিপ্লবী
মানসিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে
এমন নয়, ঐ গণআন্দোলন গণ-
ফোজ গঠনের মধ্যে দিয়ে উচ্চতর
পর্বায়ের দিকে এগিয়ে যায়। সি
পি এম এল মনে করে ঐ গণ-
ফোজ গঠনের মধ্যে দিয়ে বৈপ্লবিক
গণআন্দোলন সম্প্রসারিত রূপ নেয়।
গণফোজের আঞ্চলিক নেতৃত্ব
শ্রেণীচেতনায় ও শ্রেণীসংগ্রামে
পোড় খাওয়া ভূমিহীন কৃষকদের
উপর থাকছে, আর সর্বময় নেতৃত্ব
থাকছে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর
ওপর। শহরাঞ্চলের শ্রমিক ও
পেটিবুরজোয়া শ্রেণীর তরুণরাও
শহরের বিপ্লবী পরিস্থিতিতে
(শৈয়াং অষ্টম পৃষ্ঠায়)

জাতীয় গ্রন্থাগার

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

ফাইলপত্রে সেই করা ছাড়া আর
কিছু নয়। তাই শত্রু স্বাক্ষর প্রদান
করেই তাদের যোগ্যতা এবং উচ্চ
দায়িত্বভার বহন করার ব্যাপারে যদি
একটা বৃহত্তর প্রতিজ্ঞাবি কৃত্যপক্ষের
সম্মানে ফটে ওঠে তবে ভবিষ্যতে
লাভ ছাড়া লোকসান নেই। তাই
শ্রীনাগরাজ প্রমুখ অফিসারগণ বিনা
স্বিধায় এই অতিরিক্ত দায়িত্বভার
সুযোগ হিসেবেই সানন্দে গ্রহণ করেন
ভবিষ্যতে লাভের আশায়। এইরূপ
সুযোগ গ্রীকেশবন অনেকবার শ্রীনাগ-
রাজকে দিয়েছেন সরকারীভাবে প্রশং-
সাবাদ অর্জনের জন্য। কয়েকটি
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :—(ক)
জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে একবার
সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরী
নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল।
এই বইখানির মূলবন্ধ গ্রীকেশবন
শ্রীনাগরাজ সম্পর্কে লিখেছেন :—
“I am also very much indebted to Shri M. N. Nagraj who has been in charge of the production of this volume. His meticulous attention to detail and his alert liaison with the press have contributed greatly to the accuracy of the volume. In this work he has been ably assisted by Sarvashri N. Nagarajan, C. V. Datar and K. Subramanian.”

(b) Ashutosh Collectoin, Catalogue of Printed Books ; Vol. I. Fine Arts, etc.
সাতাল সালে জাতীয় গ্রন্থাগারের এই
বইখানিতে গ্রীকেশবন লিখেছেন :—
“This entire volume was seen through the press by Shri M. N. Nagraj, Technical Assistant.”

(c) India National Library. Another Catalogue of Printed Books in European languages ; Vol. VIII.
জাতীয় গ্রন্থাগারের এই বইখানিতে
গ্রীকেশবন লিখেছেন :—
“Shri Benoyendra Sengupta, Assistant Librarian, has been actually, responsible for the

entire execution of the work with the assistance of Shri H. K. Das and Shri M. N. Nagraj.”

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিনয়েন্দ্র
সেনগুপ্ত জাতীয় গ্রন্থাগার ছেড়ে
বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদ্যদীন
করেছিলেন, এবং বর্তমানে কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন। শ্রীদাস
মহাশয়কে টেকনিক্যাল গ্র্যান্ডস্ট্যান্ট
হিসেবেই অবসর নিতে হয় যা এখনো
কোন দক্ষিণ ভারতীয়র ভাগ্যে ঘটে
নি। আর শ্রীনাগরাজ বর্তমানে রিডিং
রুম ডিভিসনের অতিরিক্ত দায়িত্বভার
বহন করে চলেছেন স্বয়ং বাকী পূর-
ণের আশায়।

জাতীয় গ্রন্থাগারে সন্দেহ কবস্থা
প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গ্রীবি
এস কেশবনকে পুনর্বাস পাঠিয়েছেন।
গ্রীবি আর কালিয়া লাইব্রেরিয়ান
ধাকাকালে গ্রন্থাগারে অব্যবস্থা বেরূপ
প্রকট আকার ধারণ করেছিল সেগুলির
অবসান আশু প্রয়োজনীয় হওয়া
সত্ত্বেও গ্রীকেশবন প্রয়োজনীয় কোন
পরিবর্তন করতে সক্ষম হন নি।
তার কারণ এই যে, যে অব্যবস্থায়
পরিবর্তনগুলি গ্রীকালিয়ান সময়ে
সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলি শ্রীনাগরাজ
প্রমুখ কয়েকজন অফিসার সম্মিলিত
একটি কমিটির নির্দেশেই হয়েছিল।
এখন গ্রীকেশবন রিডিউইং কমিটি
এবং খোসলা কমিটির সুপারিশগুলি
কার্যে প্রয়োগ করতে গিয়ে উপলব্ধি
করছেন যে গ্রীকালিয়া যে কারণগুলির
জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হয়েছেন
আসলে সে কারণগুলির জন্য কমিটির
দায়িত্বও কম নয়। তাই তিনি সিন্ধুট
এন্ড এন্ড্রুস সেকশনটিকে এ্যাকনকস
বিস্তৃত্যে বদলী করা ছাড়া পড়নো
কবস্থা আর কিছু ভাবেন নি।
কারণ, তাতে দুটি বেরিয়ে পড়লে
শ্রীনাগরাজের ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান
অথবা রীডার পদে (বেতন—সাতশো
—এগারশো টাকা) নিয়োগে অসুবিধা
হতে পারে।

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম প্রসঙ্গে

প্রবীর বসু

দর্পণ কাগজের কয়েক সংখ্যায়ই শফিকুল হাসান পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক গণ জাগরণে বামপন্থী পার্টিগুলোর ভূমিকা নিয়ে কিছু “তথ্য” সরবরাহ করেছেন। চোঁঠা জুনের সংখ্যায় ভাসানী-তোহা মনোমালিন্যের কিছু কারণও তিনি পাঠকদের অবগতির জন্য রেখেছেন। এদিক থেকে শফিকুলের তথ্য কিছুটা বাস্তবানুগ বলে আমার ধারণা।

তবে পরিস্থিতির সামগ্রিক বিশ্লেষণে শফিকুল হাসান পুরো-দস্তুর ব্যর্থ হয়েছেন এবং স্থানীয় ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের প্রতি অধিক নজর দিতে গিয়ে নিজের বিভ্রান্তিকে স্পষ্ট করেছেন এবং বেশ খানিকটা সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন।

শফিকুল হাসান মার্কসবাদী বলে দাবী করেছেন এবং তিনি চেয়ারম্যান মাওয়ের বিখ্যাত উক্তি—“পলিটিক্যাল পাওয়ার গ্রোজ আউট অফ দি ক্যারেল অফ এ গান” বিশ্বাস করেন বলে বলেছেন। চেয়ারম্যান মাওয়ের জনস্বার্থের তত্ত্ব আস্থাবান এবং সম্ভবতঃ চীনের পার্টির আন্তর্জাতিকতার লাইনের অনুগামী শফিকুল সাহেবের গোটা বিশ্লেষণে কেন চীনের

পার্টি পূর্ববঙ্গের তথাকথিত অভ্যুত্থানকে শফিকুল বন্দিত ভাসানী সাহেব বা পূর্ব পাকিস্তানের মতিন ও দেবেন শিকদার-পন্থী কমিউনিস্টদের ভাষায় অভিনন্দন জানাতে পারেন নি তার কোন জবাব নেই।

কোন দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই মাত্র বিপ্লবের সূচনাশীল নির্ধারণক নয়। পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক আঞ্চলিক বৈষম্য সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় এক অঞ্চলের ভাষাকে অন্য অঞ্চলের ভাষার মনিব রূপে হাজির করা, এ দুটোই যদি কোন জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের একমাত্র নিয়ামক হয়, তাহলে ভারতবর্ষেও অনুরূপ জাতীয়তাবাদী স্লেগানের জন্য “বাংলালী জাগো, বাংলালী ওঠো” পার্টিকে অভিনন্দন জানাতে হয়, আঞ্চলিক বৈষম্যের জন্য ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলকে “হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ”—এর আওতা থেকে মুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হয়। দক্ষিণের তেলেগানা রাষ্ট্রের দাবীকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক লাঠির জোরে অস্বীকার করার জন্য, নাগা ও মিজো পাহাড়ের জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে মিলিটারীর স্টেনগান দিয়ে দমন করার জন্য, স্বতন্ত্র মাদ্রাজ

রাজ্যের ডি এম কে দাবীকে উপেক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার রূপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রতিটি অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার অংগ রাজ্যকেই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের জন্য লড়তে হয়।

সামন্ততান্ত্রিক ও ক্ষয়িক্ষয় জনতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতিই হলো জনসাধারণের এক অংশকে আরেক অংশের সংগে কোন না কোন ভাবে লড়িয়ে যাওয়া, কোন একটি অঞ্চলের শোষণলব্ধ রসদে অন্য অঞ্চলকে (বা শোষণ শ্রেণীকে সহায়তা করে) আপাতঃ সমৃদ্ধ করা, ধনকুবেররা যে ভাষাভাষীতে সংখ্যাধিক্য অথবা ক্ষমতাশালী, সে ভাষাকে একটু বেশি মূল্য দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবে ঐ ভাষার শোষিত মানুষকেও দীক্ষা দেওয়া। এর মানে এই নয় যে কোন ধনকুবের গোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী রীতিনীতি থাকার ফলেই সেই একমাত্র আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যায়। ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বৈষম্যের জন্য হিন্দী ভাষীদের বা গুজরাটী ধনকুবেরদের বা বম্বের ধনকুবেরদের বা হিন্দীরা সরকারকে সাম্রাজ্যবাদী বললে আসল বাস্তবতাকে লুকিয়ে রাখা হবে।

এ যুগের ক্ষয়িক্ষয় জনতান্ত্রিক

উনিবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রের কোন প্রকার প্রগতিশীল ভূমিকায় যেতে তো পারেই না, বরং পচাগলা সামন্ততন্ত্রের সংগে পারস্পরিক মৈত্রী-বন্দনে আবদ্ধ হয়ে বঙ্গপঞ্চ শোষিত মানুষের উপর আক্রমণ চালায়। এ জন্যই বর্তমান বিপ্লবের যুগে, জনস্বার্থের যুগে যে কোন জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার লাইনে পরিচালিত না হলে বিপথগামী ও প্রতীবিলম্বী হতে বাধ্য।

পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণশ্রেণী পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত জনসাধারণকে একরঙিতও রেহাই দেয় না। শোষণের ভাগ বাঁটোয়ারা কি ভারতে কি পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতা এবং দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দালালদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

সুতরাং বর্তমান পৃথিবীতে নির্বিশেষে যে কোন আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশের শোষিত জনসাধারণের মূল শ্রেণীশত্রুকে তাদের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিভূদের চিহ্নিত করা যে কোন জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অবশ্য কর্তব্য। এবং বৈপ্লবিক জনস্বার্থের এ যুগে জাতীয় স্তরে শ্রেণী সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক স্তরের শ্রেণী সংগ্রামের সংগে একসূত্রে গেঁথে নেওয়া বৈপ্লবিক লক্ষ্যসাধন ও প্রতিবিলম্বীদের সম্পর্কে সতর্ক হবার দিক থেকে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

পূর্ববঙ্গে মর্জিবর-ভাসানী নেতৃত্ব যে আন্তর্জাতিক লাইন নিয়েছে, তা প্রতিবিলম্বী সর্বাধিবাদী লাইন। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগকে গ্রহণ করে ষথার্থ বিপ্লবী পার্টির অনগ্রসরতার অবকাশকে গ্রহণ করে মর্জিবর “জয় বাংলা” স্লোগান দিয়ে বস্তুতঃ জিন্নার পথই অনুসরণ করেছে। জিন্না সাহেব ভারতীয় মুসলমানদের আপেক্ষিক দারিদ্র্য ও হিন্দু উৎপীড়নের সুযোগ নিয়ে ইসলামের নামে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর পুঁজিপতি ও সামন্ততন্ত্রকে গদীতে বসিয়েছিল। মর্জিবর সাহেবও বাংলালী জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দবস্থার সুযোগ নিয়ে আসলে বাংলালী বণিক ও মুসলমানদের শোষণের আসনে বসতে চেয়েছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাই সমৃদ্ধ জাতীয়তাবাদী বিকাশের একমাত্র গ্যারান্টি—জেনিনের এ উক্তিকে মনে রেখে পূর্ববঙ্গে শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে মর্জিবর-ভাসানী প্রতিবিলম্বী এবং ইয়া-হিয়া খানের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী দালালকে একসঙ্গে উৎখাত করাই শোষিত জনসাধারণের সদুদ্দেশ্যসারী লক্ষ্যবস্তু হওয়া প্রয়োজন। মর্জিবর সম্পর্কে শফিকুল সাহেবের কোন অশ্বকার নেই। কিন্তু পশ্চিমে মার্চের পরবর্তী ভাসানীর ভূমিকা

নিয়ে শফিকুল বিভ্রান্ত। ভাসানী সাহেব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর ও রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বংশবদ ভৃত্য হিন্দীরা সরকারকে পূর্ব বঙ্গের শোষিত জনসাধারণের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক ঠাউরে নিয়ে অশ্রুসাহায্যের জন্য তার নিকট ধর্না দিয়েছে। একদিকে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে রাঙা নিকসনের হাতকে মর্দন করতে চেয়েছে, অন্যদিকে পৃথিবীর শোষিত জনসাধারণের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও-এর নিকট সাহায্য চেয়েছে। ভাসানী সাহেব শ্রেণী রাজনীতিকে প্রতিবিলম্বীদের পায়ে বিক্ষিপ্ত দিতে চেয়েছে। মর্জিবর-ভাসানী ছাড়া যে কমিউনিস্ট গ্রুপ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের মোকাবিলা করছেন, তাদের নিকট পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের আন্তর্জাতিক লাইন সুস্পষ্ট নয়—অন্ততঃ শফিকুল হাসানের তথ্য থেকেই তা জানা গেল।

অনেক তথ্যবাহী চীনের কুওমিনটাং কমিউনিস্ট জাপিবিরাধী যুক্তফ্রন্টকে পূর্ববঙ্গের সমসাময়িক অবস্থায় মর্জিবর ভাসানী কমিউনিস্ট যুক্তফ্রন্টের সংগে তুলনা করেছেন। এ ধরনের যান্ত্রিক তুলনা তথ্যবাহীশদের বেয়াতুব বুদ্ধিধরই পরিচয় দেয়। এ সময়ে চীনের অবস্থা কি ছিল? আন্তর্জাতিক স্তরে তখন মুখ্য শ্রেণী শত্রু ফ্যাসিবাদ—যে ফ্যাসিবাদ প্রতিবিলম্বী ইংরেজ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল নামে মাত্র, আসলে তার লক্ষ্যবস্তু ছিল তৎকালীন সর্বহারার রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যতই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার ধ্বংস কামনা করুক না কেন বিশেষ পরিস্থিতি চার্চিল ও রুজভেল্টকে বাধ্য করেছিল কমরেড স্টালিনের সংগে বসতে এবং আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী যুক্তফ্রন্টের অন্ততঃ নিষ্ক্রিয় (নিউট্রলাইজড) অংশীদার হতে। জাপ ফ্যাসিবাদের আসল শত্রু চীনের অভ্যন্তরে ছিল কমিউনিস্টরা, কুওমিনটারী নয়, তবুও আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্টের লাইন অনুযায়ী মার্কিন পুঁজিবাদের কেনা গোলাম কুওমিনটাং কমিউনিস্টদের সংগে যুক্তফ্রন্টে আসতে বাধ্য হয়েছিল (যদিও যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্টদের হত্যা করার, বিজয় কমিউনিস্ট ঘাঁটি অঞ্চলকে জাপ ফ্যাসিবাদের সেনাবাহিনীর নিকট চিনিয়ে দেবার ভূমিকা নিয়েছিল)।

বর্তমানে মর্জিবর ভাসানী কোন আন্তর্জাতিকতা অনুসরণ করছে? শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিকতা যার বর্তমান আন্দোলন কেন্দ্র লাভ চীন—না সংশোধনবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের রুশ আন্তর্জাতিকতা—না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিকতা? জাতীয় ক্ষেত্রে বর্তমান (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

এম এল দলের রাজনীতি

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

বিজয় গেরিলা এ্যাকশনের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগ, ও কঠোর বৈপ্লবিক জীবনযাত্রার অভ্যস্ত হচ্ছে যাতে করে গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী গণফৌজের “সহজ শক্তি” হিসাবে শহরাঞ্চলে জনস্বার্থের অনুকূল সংগ্রাম সূর্য করতে পারে।

ভারতবর্ষের বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতি দাবী করে যে শহরের বিপ্লবীরা বসে থাকবে না, নিশ্চেষ্ট থাকবে না, কারণ পরিস্থিতির দিকে থেকে এ দেশে গ্রাম ও শহরে পার্থক্য নেই। “গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও” করার যে সময়নীতি এ যুগের সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনের রূপরেখা হিসেবে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে ঐ সময় নীতিকে স্বাস্থ্যবে প্রয়োগ করেই শহরের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ বিপ্লবীরা গ্রহণ করছে এবং করবে।

গেরিলা কায়দায় শ্রেণীশত্রু খতম-খতনই উদ্দেশ্যবাহীন হয়ে পড়ে যখন তা গণফৌজ সংগঠন এবং অশ্রুসংগ্রহের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। শ্রেণীশত্রু খতম ও অশ্রুসংগ্রহের একটি কায়দাও সি পি (এম এল) নেতৃত্ব নির্দেশ করেছে, তা হচ্ছে এ ধরনের এ্যাকশনে আশ্রয়প্রাপ্ত বস-

হার যতটা সম্ভব না করা। ভূমিহীনদের ও সাধারণ মানুষদের হাতের কাছে পাওয়া অশ্রু দিয়েই এ কাজগুলো সম্পাদনা করতে হবে। কেন? প্রধান কারণ হচ্ছে ভূমিহীনদের নিজস্ব অশ্রু ব্যবহারে শ্রেণীঘৃণা ব্যাপক হবে, বৈপ্লবিক কলাকৌশলের বিকাশ এমন চরিত্রের হবে যে সাধারণ মানুষই তাকে রপ্ত করতে পারবে। তাছাড়া বৈপ্লবিক সাহস ও আত্মত্যাগের তীব্রতা ভূমিহীন গরীব চাষীদের মধ্যে ব্যাপকতর হারে বৃদ্ধি পাবে। শহরাঞ্চলেও সি পি (এম এল) নেতৃত্ব গেরিলা এ্যাকশনে সাধারণ সহজলভ্য অশ্রুর প্রাধান্যকে জোর দিচ্ছে, এবং যে আশ্রয়প্রাপ্ত পুঁজিপতি ও তার দালালদের কাছ থেকে সংগৃহীত হবে, তাকে ভাবীকালের জন্য সংরক্ষণের নির্দেশ দিচ্ছে।

গণফৌজ গঠন করাই বিপ্লবীদের আশু লক্ষ্য

বৈপ্লবিক জনস্বার্থের জন্য, বিপ্লবী শক্তিকে রক্ষা করার জন্য গণফৌজ গঠন আশু কর্তব্য। সি পি এম এল অনুসৃত গেরিলা কায়দা খতম অভিযান ও গণআন্দোলনের আশু লক্ষ্য হচ্ছে গণফৌজ গঠনে সহায়তা করা। এর জন্য

প্রয়োজনীয় রসদ জোগাবে গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকরা তাদের ঘাঁটি অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনকে বৃদ্ধি করে এবং আশ্রয়প্রাপ্ত ছিনিয়ে নিয়ে। শহরাঞ্চলের বিপ্লবীরাও বিপ্লবী জনসাধারণের সাহায্যে এবং আশ্রয়প্রাপ্ত ছিনিয়ে নিয়ে গণফৌজ গঠনে সহায়তা করবে।

গণফৌজ ছাড়া জনগণের বৈপ্লবিক শক্তি সংহত হতে পারে না, তাদের কিছুই থাকে না, চেয়ারম্যান মাও-এর উক্ত অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশকে মনে নিয়ে গণফৌজ গঠন গেরিলা কায়দায় বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষের বিজয় অঞ্চলে এগিয়ে যাচ্ছে। গণফৌজ গঠনের রাজনৈতিক ও সময়নীতিগত তাৎপর্য শ্রেণী সংগ্রামে নিয়োজিত বিপ্লবী শ্রমিক কৃষক, ও তরুণদের নিকট স্খাখ্যা করা হচ্ছে—খতম অভিযান ও বৈপ্লবিক গণআন্দোলন যাতে পেটি বুদ্ধিজীবি সংকীর্ণতাবাদের খপ্পরে গিয়ে না পড়ে—সেজন্য নেতৃত্ব বিপ্লবীদের বরংবার সতর্ক করছে, আলোচনা সমালোচনা সিদ্ধান্তের স্বাধীনক নিয়মে পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে বিকাশ লাভ করতে সাহায্য করছে এবং জনস্বার্থের প্রয়োজনীয় রাজনীতি ও কলাকৌশলকে বিপ্লবী জনতার সামনে রাখছে।

এ কাজগুলোর আশু লক্ষ্য হলো গণফৌজ গঠন ও তার উপকরণাদি সংগ্রহকে ব্যাপক করা।

লোকায়ন অভিনীত মালিনী

ভবেশ দাশ

রবীন্দ্রনাথ “মালিনী” সম্পর্কে নাটিকা কথ্যটি ব্যবহার করেছেন। নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের সাদৃশ্য তেমন খুঁজে পাওয়া না গেলেও নাটিকার সঙ্গে ছোট-গল্পের উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে। ছোটগল্প যেমন সামান্য একফোঁটা ঘটনার আঘাতেই বৃকের মধ্যে মহাহর্ষে বিদ্যুত খেলে যায় এবং সেই বিদ্যুতের খেলাতেই গল্পের শেষ, নাটিকার এক অদ্ভুত পরিপূর্ণতার মধ্যেও কেঁথায় যেন একটি চম্পক অপূর্ণতা থেকে যায় এবং সেইটুকুতেই এর সার্থকতা ও সমাপ্তি। অতএব সেই দিক থেকে মালিনী নাটিকা ও একই সঙ্গে দৃশ্যকাব্য। কিন্তু অপর দিকে আবার কোন একাঙ্গ নাটকের পৃষ্ঠিকোণ থেকে মালিনীকে বিচার করা সম্ভব হবে না।

লোকায়নের উপরোক্ত প্রযোজনাটি নানা কারণেই নিপুণ সার্থকতায় পৌঁছতে পারে নি। প্রথমতঃ এই স্বল্পসময়কালীন নাটকে দর্শকের মন ভরে না। নাটকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে যদি এক অনির্বচনীয় আড়ম্বর, বৈভব ছড়ানো থাকে, তবে অভিনয় কিংবা সংলাপ-প্রধান নাটকের দারিদ্র্য অনেকাংশেই ঘুচে যায়। কিন্তু “মালিনী” এক অলঙ্ঘনীয় নাট্য প্রযোজনা। যেহেতু এ নাটকের পরিবর্তন কিংবা পরিবর্তনের কথা এখন ভাবাই যায় না, সেহেতু এ নাটক প্রযোজনায় অনেক ঝুঁকি আছে। সৈদিক থেকে লোকায়নের এই দুর্ভাগ্য সাহসকে নিশ্চয়ই তারিফ করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকটি শিল্পী-গোষ্ঠীর আভিনয়িক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট দলের একটি

নির্দিষ্ট এবং নিজস্ব মেজাজ তৈরী হয়। কিন্তু লোকায়ন-এর নিজস্ব মেজাজটি “মালিনী”র অন্তর্গত রসধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। অন্য দিকে কাব্য-নাটকে মঞ্চে রূপদানের ভিন্ন রীতিনীতির কথা বাদ দিয়েও রবীন্দ্র নাট্যাভিনয়ের জন্য আভিনয়িক কলাকৌশলের একটি মৌলিক ধরনা আছে। আমার মনে হয়, তার সামান্যতম গুণাগুণই লোকায়নের প্রযোজনায় ধরা পড়েছে।

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন চরিত্রের অসম কণ্ঠক্ষেপ, একেবারে শরীর-সম্মিলন (বিশেষতঃ গীতা ভট্টাচার্য [মালিনী]), মণ্ডলসজ্জায় যত্নহীনতা (ব্যাক স্ক্রীন অপরিস্কার এবং কোঁচকানো ছিল), অমার্জিত আলো প্রক্ষেপণ এই নাটকে অসুস্থ করে তুলেছে। শ্রীঅরুণ রায়ের উচ্চ-মার্গের পরিচালন-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি এই নাটকের মণ্ডলস্থাপনে পর্যাপ্ত কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এই নাটকের সব ক-খানি গানই সুনির্বাচিত এবং সুগীত। কিন্তু নাটকে যন্ত্র সহ-যোগিতার পর্যাপ্ত অভাবেই হোক অথবা যে কারণেই হোক গানগুলি নাটকের সঙ্গে একাত্ম এবং অনির্বাক্য সংযোগ স্থাপন করতে পারে নি। এ বিষয়ে শ্রীরঞ্জেন ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব দেখাবার অনেক সুযোগ ছিল। চরিত্র চিত্রণে অরুণ রায় (ক্ষেমৎকর), অতনু রায় (সুপ্রিয়) এর নাম উল্লেখ করা দরকার। শেষদৃশ্যে স্থিরচিত্রের পরিকল্পনাটি সত্যিই চমৎকার। কিন্তু আমার মনে হয় এ নাটকের ক্ষেত্রে শিল্পীদের কণ্ঠস্বরের আদল পাশ্চাত্য ফেলবার প্রয়োজন আছে।—যদিও বিভিন্ন রসের নটকের মঞ্চ দিয়েই নাটকে দলের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত; তবুও “লোকায়ন” এবারে আমাদের ভরসা দিলেও আশা মেটাতে পারেন নি।

[আলোচ্য নাটকটি অভিনীত হয়েছিল দশই মে, একাত্তর মজাঙ্গান মঞ্চে]

কালচারাল সেমিনার

“কালচারাল সেমিনার”র সফল নাটকের কথা ইতিপূর্বে কোনদিনই খুব একটা শোনা যায়নি এবং আজো সেই ধারাটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই নাটকে দলটি প্রান্ত নাট্যবোধ নিয়ে কি ভাবে টিকে আছে সেটাই আশ্চর্যের কথা।

বিগত সতেরোই মে মজাঙ্গান মঞ্চে এরা অভিনয় করলেন “চন্দ্রবিন্দু” এবং “মৃতদেহ” নামে দুটি নটক। জ্যোত্স্না বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে কুশলী নাট্যকার। তাই তাঁর নাট্যরচনার গুণে “চন্দ্রবিন্দু” নাটকটি উৎসর্গে গেছে। কিন্তু প্রয়োগপরিকল্পনায় বিন্দুমাত্র বৃদ্ধির ছাপ নেই। একমাত্র “গণা মিস্ত্রী” এই নাটকে ব্যক্তিগত অভিনয়ে সাফল্য লাভ করেছেন।

সমর মৃধোপাধ্যায়ের “মৃতদেহ” একটি যাচ্ছে-তাই নাটক; যার আদি অন্ত বলে কিছু নেই।

হাওড়ার ঘটনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী নতুন সরকার আসার পর এ পর্বন্ত শহর এলাকায় বাইশটি হত্যার মধ্যে বোলাটি সি পি এম সদস্য বা সমর্থক।

সরকার মনে করে যে, জেলায় শান্তি ফিঙ্কিরে জানতে গেলে পদলিখ থেকে সি পি এম সমর্থকদের খুঁজে বার করুন, অপসারণ করতে হবে। জেলা প্রশাসনের মতে জেলার সাড়ে তিন হাজার পদলিখের মধ্যে অন্ততঃ সাড়ে পাঁচশ পদলিখ সি পি এম-এর সক্রিয় সমর্থক।

সি পি এমকে দমাবার জন্য পদলিখ সংগঠন শৃঙ্খলকরণ অভিযান শুরু হয়েছে। প্রথমে ননগেজেটেড পদলিখ কর্মচারী সমিতির জেলা সভাপতি, সম্পাদক আর অন্য এক সদস্যকে কারণ না দেখিয়েই সর্ববিধানের বিশেষ ধারা প্রয়োগ করে বরখাস্ত করা হয়েছে। আরও অনেককে অন্যান্য জেলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সমিতির এক সদস্য বলেছেন যে সংগঠনের সঙ্গে বন্ধ এবং সক্রিয়দের নকশালী হত্যা নাম নিয়ে খুন করান হচ্ছে।

এত সত্ত্বেও কিন্তু সি পি এমকে বতটা পরিমাণ দরকার ততটা দমাতে সরকার পারে নি। তাই এখন থানা অফিসারদের নেতৃত্বে মহল্লা কমিটি হচ্ছে। এই কমিটিতে সি পি এম বাদে অন্য সমস্ত সরকার পক্ষীয় দলের প্রতিনিধিরা থাকবে।

কমিটির সদস্যদের অস্ত্র শস্ত দেওয়া হবে। আর কমিটি পদলিখকে খবরাখবর দেবে বাস্তবিত্যবস্তিদের সম্পর্কে। তার জন্য সদস্যরা বিশেষ পুরস্কার পাবে।

অর্থাৎ একটিকে কমিটির সদস্যরা নিজেরাই হত্যায় নামবেন, আর যেখানে বাধা বেশী পাবেন বলে আশঙ্কা সেখানে পদলিখ ডাকবেন।

এদিকে হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে উদ্ভাসতু। ছোকরার দল বন্দুক পিস্তল ছোরাছুরি নিয়ে লোকের বাড়ী হামলা করছে। লোকেরা কেউ পদলিখের কাছে নাগাল জানায় নি। পদলিখের প্রতি কারুর বিশ্বাস নেই। অভিযোগ করলে, হত্যাকারীদের কাছে পদলিখ সূত্রে খবর চলে যায় বলে সন্দেহ। তাতে বিপদ আরও বাড়ে।

জেলা প্রশাসনের এক মুখপাত্র বলেছেন যে, হত্যাকারীদের সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। হত্যাকারীদের কংগ্রেসী আগ্রহে রাখা হচ্ছে, আর ধরা পড়লে কংগ্রেসীরা ওদের মৃত্তির ব্যাপারে তব্বির করে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন যে, শহরাঞ্চলে গোটা আট-দশ পেশাদার খুনীকে হত্যার কাজে লাগান হয়েছে। আর বাদবাকীরা কেউ দেয়ালে শেলাগান লেখে, অপরের

বর্ধমানের ঘটনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাউসে জেলার পদলিখ সুপার এবং নব সাই এই ব্যাপারে আগেই অনেক শলাপারামর্শ করেছিলেন।

শুদ্ধবার সোমনাথবাবু খবর জানার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের পদলিখ আই জি প্রসাদ বসুকে টেলিফোনে আক্রমণ প্রস্তুতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন আর অবিলম্বে পদলিখী ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন।

সোমনাথবাবু বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৃষ্টিত ব্যানজেরীকেও টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। না পেয়ে জরুরী টেলিগ্রাম করে দেন।

পরের দিন বিকাল নাগাদ কংগ্রেসীদের বর্ধমান টাউন হলে সভা হিচ্ছিল। হলের বাইরে থিক থিক করছে পদলিখ। আর সার্কিট হাউসে বসে আছেন পদলিখ সুপার পাঁচুগোপাল মদ্যাজী।

হল থেকে দলে দলে লোক বেরিয়ে এসে লরীতে উঠতে লাগল। নব সাইকে রিডলবার বার করে সবাইকে নির্দেশ দিতে দেখা গেল। পদলিখ নির্বাক।

পাঁচ লরী বোঝাই হয়ে চলে গেল আট মাইল দূরে আহম্মাদী-পুন্ডের দিকে। আগুন লাগে, ছোরা-ছুরি ছাড়াও পেট্রল, কেরাসিনের সব ব্যবস্থাই ছিল। গ্রাম জ্বলে উঠল।

তবে নব সাই নিহত হওয়ায় রাজ্যের কংগ্রেসী কণ্ঠপক্ষ খুসী নয়। পাঁচু সৃষ্টিত চক্রের আনুগত্য থাকলেও দক্ষতায় ঘাটতি আছে বলে কংগ্রেসীদের ধারণা। তা না হলে বর্ধমানটা সি পি এমের হাতে বেমক্লা চলে যায়।

চাকরী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া যেতে পারে এরকম লোকের নামের তালিকা চেয়েছেন। বহু জেলা থেকে তালিকা এসে গেছে এবং এর মধ্যেই তিন হাজারের উপর কংগ্রেসী চাকরী পেয়েছে, আরও অনেক লোক নেওয়া হবে।

এই ক্যাম্প সহকারীদের খরচা বহন করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। এইভাবে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে না গিয়ে এবং খবরের কাগজেও বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে সরকারী চাকুরীতে লোক বহাল করায় বিভাগীয় আমলারাও বিরত। কিন্তু কিছুই করার নেই।

এ বিষয়ে শ্রীবিবাসকে সম্প্রতি সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি জানান যে “আমাদের পরিচিত কোন সমাজসেবী কোন ব্যক্তিকে রেকমেন্ড করলে তবেই তাকে নেওয়া হচ্ছে”। এঁদের পরিচিত কারা হবেন তা যদিও তিনি বলেন নি, সাংবাদিকদের বৃদ্ধিতে অসুবিধা হয় নি তিনি কি বলছেন।

বাড়ী গিয়ে জ্বলন্ত করে, আর অবসর সময়ে হত্যার ট্রেনিং নেন।

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

ইয়াহিয়াখানই বা কোন আন্তর্জাতিকতার অনুসারী?

শফিকুল সাহেব এ প্রশ্ন-গুলোর জবাব যদি খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের নিকট মাত্র দুটো বিকল্প—একটা হলো শ্রেণী সংগ্রামবিহীন বাঙালী জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুজিবর ভাসানীর প্রতিবিল্ব—যে প্রতিবিল্ব ইয়াহিয়া খানের প্রতিবিল্বেরই একটি বাঙালী সংস্করণ এবং যার মূল শত্রু ইয়াহিয়ার প্রতিবিল্বেরই মূল শত্রু অর্থাৎ বাংলাদেশের শোষিত চাষী-মজদুর মধ্যবিত্ত বৈপ্লবিক শ্রেণীসংগ্রাম, আর অন্যটি হলো শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক জন-যুদ্ধের পথ।

কোন বিকল্প পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের গ্রহণ করা উচিত, এবং করলে আবদুল মতিন গ্রুপ বা দেবেন শিকদার গ্রুপকে কেন পূর্ব পাকিস্তান সি পি (এম এল)-এর বর্তমান রাস্তায় আসতে হবে—তা নিশ্চয়ই শফিকুল হাসান বুঝতে পারবেন, কারণ তিনি মার্কসবাদী এবং আন্তর্জাতিকতার বিশ্ববী লাইনে বিশ্বাসী বলে দাবী করেছেন।

এ পটভূমিকায় পূর্ববঙ্গের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে মহম্মদ তোহার সঙ্গে ভাসানীর সংঘর্ষ অনিবার্য এবং প্রয়োজনীয়। শফিকুল সাহেব তোহার বিরুদ্ধে যে-সকল তথ্য সরবরাহ করেছেন, তা কতদূর সত্য জানি না, তবে দুটো তথ্য কেমন গোলমালে প্রকৃতির। একটা ছদ্ম-পূর্ব পাকিস্তান সি পি (এম এল)-এর গেরিলা স্কোয়াডই শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর পর্যায় হিসেবে সুদখোর, জোতদার মহাজনদের খতম করছেন বলে

জানতাম, অথচ শফিকুল বলছেন—এ কাজ করছে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। আরেকটা হলো—শফিকুল সাহেবের মতে মহম্মদ তোহা ন্যাপ-সম্পাদক থাকাকালীন অবস্থায় নাকি আয়ুব খাঁর শাসনকে “প্রগতিশীল” বলেছিলেন যেহেতু আয়ুব খাঁর সংগে লাল-চীনের রাষ্ট্রীয় আঁতাত ছিল। কিন্তু ভাসানী বরাবরই আয়ুব-বিরোধী ছিলেন বলে তোহার সংগে তাঁর মনান্তর ঘটেছিল। আমাদের খবর তোহা-ভাসানীর পার্থক্য আয়ুব খাঁর চরিত্র চিত্রণ নিয়ে নয়, শ্রেণী সংগ্রামের রূপরেখা নিয়ে এবং আন্তর্জাতিকতার লাইন নিয়ে। তৃতীয় ব্যাপার হলো—শফিকুল খবর দিচ্ছেন ভাসানী সাহেব নাকি সন্তোষে কৃষক সম্মেলনে মার্কিন সি আই এ-র চীন বিরোধী বড়বন্দার একটা দলিল হাজির করতে চেয়েছিলেন, ঐ দলিলে না কি আসাম ও দুই বাংলা নিয়ে একটি সি আই এ নিয়ন্ত্রিত পুতুল সরকার গঠনের প্ল্যান ছিল। ঐ দলিল প্রকাশে নাকি পূর্ব পাকিস্তান সি পি (এম এল) নেতা মহম্মদ তোহা শৃঙ্খলাই অনিচ্ছুক ছিলেন এমন নয়, দলিলটা চেপে দিলেন।

পশ্চিমবঙ্গেও “বিল্ববী” সি পি এম চারু মজুমদারকে সি আই এ-র লোক বলে প্রচার করতে শুরু করেছিল, আর নকশালগা নাকি সব নব কংগ্রেসেরই গুদাভাষিনী (যারা হাজারেরও অধিক নব কংগ্রেসেরই সরকারের পদলিখ মিলিটারীর হাতে প্রাণ দেন?) সি পি এম-এর সংশোধনবাদীদের নিধনকারী লিপ্ত। এসব প্রচার পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মনে দাগ কাটবে কি না ভবিষ্যতেই তার সাক্ষ্য দেবে।

বিভিন্ন বামপন্থী দল একমত

খুনোখুনির রাজনীতি বন্ধ করার

একমাত্র পথ গণ-আন্দোলন

দপন

১৪শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা ৥ শতাব্দীর ২৫শে জুন ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

কংগ্রেসের ছাত্র

ও যুব পরিষদ

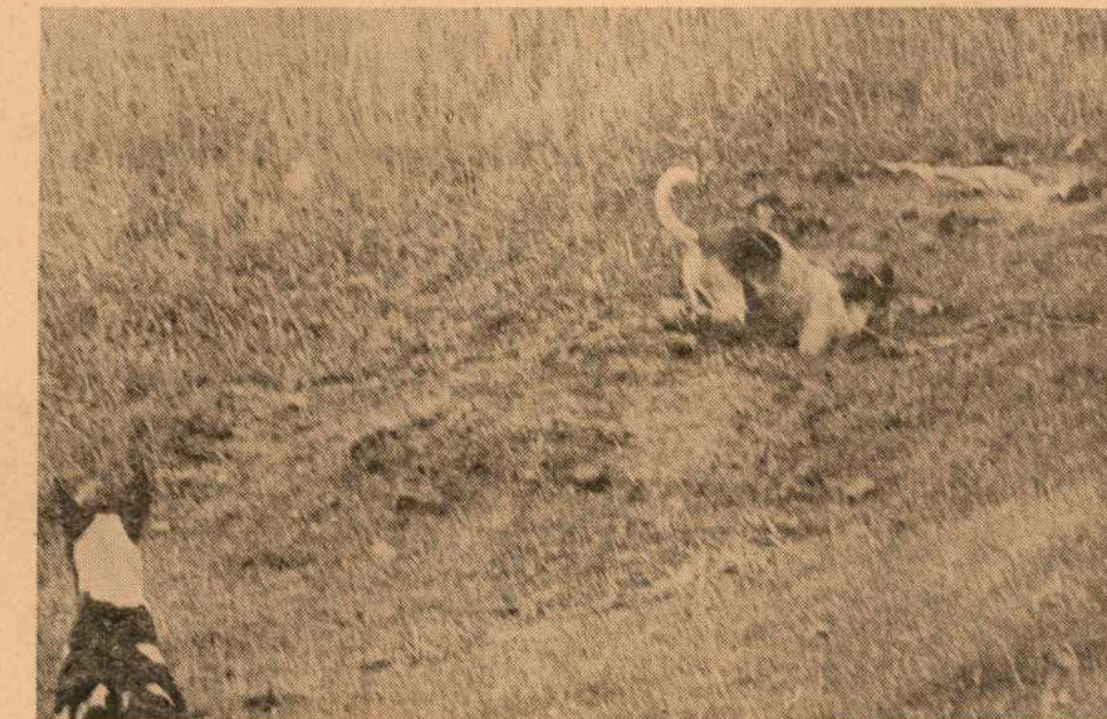
বনাম বিজয়

সিং নাহার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও কংগ্রেস পরিষদ দলনেতা শ্রীবিজয় সিংহ নাহার এবার ছাত্র পরিষদ নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমন্সী ও সুদ্রত মদুখাজীকে একটু দেখে নেবেন বল ঠিক করেছেন। অর্থাৎ রাজ্যের ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস কর্মীদের শ্রীনাহার একটু ঠান্ডা করতে চান। শ্রীনাহারের সঙ্গে ছাত্র ও যুব পরিষদ নেতাদের বিরোধ সূত্র হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরেই। সেই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে ছাত্র পরিষদের ট্রাম বাস ভাড়া প্রতিরোধ আন্দোলনের পর। এছাড়া ছাত্র ও যুব কংগ্রেস কর্মীরা ক্রমাগত একটি পদের বৈশী কারো দখল করা চলবেনা এই প্রচার অভিযানে শ্রীনাহারকে বেশ কিছুটা বিপাকে ফেলেছিল, কিন্তু শ্রীনাহার সেটী একটু সামলে নিয়েছেন। তাই ঐ কথাটা বর্তমানে একটু ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সকলকে বলা হচ্ছে আগে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনটা শেষ হোক, তারপর যা করার করা যাবে।

ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে শ্রীকৃষ্ণকুমার শঙ্কর মদুখবন্দ্য করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শ্রীশঙ্করকে খাদি বোর্ডের সভাপতি পদের



শিকারপুত্র রোডের দুধারে কলারায় মৃত শরণার্থীদের কিছুদূর পরপর কবর দেওয়া হয়। রাস্তার কুকুর-গুলো এখন সেসব কবর খুঁড়ে মৃতদেহ খেতে ব্যস্ত। ছবি : শ্যামাদাস বসু

মোটাই মাইনের চাকুরী দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছাত্র ও যুব কংগ্রেস কর্মীরা বর্তমান অবস্থায় সরকার টিকিয়ে রাখা এবং ক্রমাগত ঘুষ দিয়ে তথা মন্ত্রিত্ব দিয়ে ছুটকো দলসমূহকে বেশ আনারও ঘোরতর বিরোধী।

ছাত্র ও যুব কংগ্রেস কর্মীরা অনেকেই এখন রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। কংগ্রেস পরিষদ দলের সভাও হয়ে গেল ছাত্র যুব কংগ্রেস কর্মীদের অনুপস্থিতিতে। কাজেই ছাত্র যুব কংগ্রেস কর্মীরা ফিরে এলে তারা কি বলবে সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য একটি চেষ্টা বেশ ফলবতী হয়ে উঠেছে। সেই চেষ্টা হল ছাত্র ও যুব কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের পালা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। প্রকাশ, রাসবিহারী কেন্দ্র

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারে আলোচনার জন্য অজয় মদুখাজী সংসদীয় সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের পাঁচিশে জুন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন শ্রীধর সি পি এম নয়, আর এস পি, এস ইউ সি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং এমর্নিকি সি পি আই পর্যন্ত।

এই সভা ডাকার মতলব অজয় মদুখাজী পেয়েছিলেন সি পি আই-য়ের কাছ থেকে। সি পি আই ধরে নিয়েছিলেন হয়ত সি পি এম এই ধরনের কোন সভায় আসবেন না।

তবে অন্যান্য দলের সদস্যরা হয়ত আপত্তি জানাবে না।

কিন্তু সি পি এমের আপত্তি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের রাজনীতিতে কর্মতৎপরতা বেড়ে গেছে। এখন আর এস পি উদ্যোগ নিয়েছে কি করে বামপন্থী গণতান্ত্রিক সমস্ত দলকে একত্রিত করা যায়। এই উদ্যোগে সি পি এম সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়।

এস ইউ সি জানিয়েছে তারা বরাবরই বলেছে যে, আইনশৃঙ্খলার সমস্যায় খালি সংসদীয় দলের আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে না। সমস্যার মূলে যেতে হবে। এই মূল নিহিত আছে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের চরিত্রের মধ্যে। দলে দলে সমাজ বিরোধীরা নির্বিরোধে নিজেদের কাজকর্ম চালাবার জন্য শাসক দলে ঢুকে পড়ে আর তার সঙ্গে এদের দৃঢ় যোগাযোগ আছে পুঁলিশ এবং প্রশাসনে। প্রথম প্রয়োজন শাসক বা অন্যান্য দলের সঙ্গে এবং পুঁলিশ ও প্রশাসনে সমাজ-বিরোধীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা। এস ইউ সি মনে করে যে, রাজনৈতিক দলগুলির অপরের মতামত সম্পর্কে সহনশীলতার মাধ্যমেই আন্তর্পার্টি বিরোধ কমবে। আর এই সমস্ত দল পূর্বা-হেই ঠিক কবে নেবে যে, হিংসার রাজনীতির দায়ভাগ বন্টনের নামে পারস্পরিক দোষারোপ এখন বন্ধ থাকবে।

এই ভিত্তিতে সমস্ত বামপন্থী দল এক সঙ্গে বসতে পারলেই আজকের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান পাওয়া যাবে বলে এস ইউ সি ও আর এস পি মনে করে।

এখন ইউ এল ডি এফ পার্টি-দের মধ্যে বড় দলগুলো একমত হয়েছে যে, তারা এক সঙ্গে সি পি এম, আর এস পি এবং লোক-সেবক সংঘের সঙ্গে বসবে।

ইতিমধ্যেই সমস্ত বামপন্থী দলগুলো একমত হয়েছে যে, হিংসা ও খুনোখুনির ফলে সমস্ত বাম-পন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে এবং এই আন্দোলনকে আবার জোরদার করতে না পারলে হিংসা হত্যা বন্ধ হবে না।

অর্থাৎ হিংসা ও হত্যা সুপরি-কল্পিতভাবে সংগঠিত হচ্ছে গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য। কারা এই আন্দোলনের শত্রু তা নির্ণয় করা শক্ত নয়। তবে বামপন্থী দলগুলি এখন তা সরাসরি বলতে রাজী নয়।

এ সম্পর্কে প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসু বলেছেন যে, যুব আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার একটি ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের একটি যুক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারে শ্রমিক বিরোধী আচরণ সুস্পষ্ট আর এই আচরণের বিরোধিতার জন্য অবিলম্বে যুব আন্দোলন করা দরকার।

সি পি এম নেতারা বলেছেন যে, এই ভিত্তির ওপর আন্দোলন সূত্র করলে যুক্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হবে এবং পরে এর প্রসারের মাধ্যমেই হিংসা ও হত্যা বন্ধ করা যাবে।

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

মেডিকেল কলেজে ছাত্রভর্তির ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হুঁসীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দর্পণের কাছে বিস্তারিত তথ্য আছে এই কথা প্রমাণ করার যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয়নাল আবেদিন রাজ্যের পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে নতুন ছাত্র ভর্তির যে নীতি বরাবর চলে আসছিল তা জলাঞ্জলি দিয়েছেন নিজের এবং বন্ধুবান্ধবের পেটোয়া প্রার্থীদের জায়গা করার জন্য।

আগে নীতি ছিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই ছাত্রদের প্রি-মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি করা হবে। কোন

অনুরোধ উপরোধের সুযোগ ছিল না আর তাই অভিযোগেরও কারণ ছিল না।

এবারে কিন্তু যোগ্য প্রার্থীদের বিদায় দেওয়া হয়েছে আর যারা কম নম্বর পেয়েছে তারা জয়নাল আবেদিনের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

এই ধরনের নিকৃষ্ট ছাত্রদের ভর্তি করলে পরে গোলমাল বাড়ে। এরা গিয়েই পড়ার সঙ্গে ভাল রাখতে না পেয়ে গণ টোকা-টুকি আর হামসার পথ নেয়।

ছাত্র পরিষদের 'মহাকরণ অভিযান' সম্পর্কে

তদন্তে উদঘাটিত তথ্য

(দুর্গা শ্রাবণ সংবাদদাতা)

গত সাতাশে এপ্রিল ছাত্রপরিষদের নেতৃত্বে "মহাকরণ অভিযানের" নামে সরকারী কর্মচারীদের মারধোর দেওয়ার সময় একটি প্রাইভেট গাড়ীতে করে নানান ধরনের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র যথাকালে এসে উপস্থিত হয়।

ঐ এলাকায় মিছিলটি এসে পৌঁছানোর বেশ কিছু আগে কয়েকজন অপরিচিত যুবক-ছাত্র নর নিশ্চয়-রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ক্যানটিনে এসে বসেছিল। তাদের গতি-বিধি সন্দেহজনক মনে হয়েছিল কারও কারও। কিন্তু চূপচাপ বসে গল্প করছে, দেখে সামান্য সামনি কেউ কিছু বলেনি। ঠিক গোলমাল সুরু হতেই দেখা গেল এরা দুধের বোতল ছুঁড়ে আতঙ্কিত করে কর্মচারীদের লক্ষ্য করে।

অনেকগুলি তথ্যের মধ্যে ঐ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে ঐ দিনের হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত

করার জন্য গঠিত রায়চৌধুরী কমিটির সামনে। তথ্যগুলি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফ থেকে।

সরকারী কর্মচারীদের উপর মারধোর দেওয়ার ব্যাপারটা যে পূর্ব পরিকল্পিত সেটা প্রমাণ করার জন্য কমিটির সামনে একটা লিখিত বিবৃতি দিয়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটি দাবী করেছেন যে তদন্তকারী অফিসারের উচিত হবে রাইটার্স বিল্ডিংএ বৈঠক বসানো যাতে অনেক সরকারী কর্মচারী নিভয়ে তাঁদের নিজের অজান্তার কথা জানাতে পারবেন।

কো-অর্ডিনেশন কমিটি তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে মিছিল করে মহাকরণে যে যাওয়া হবে একথা সংবাদপত্রে ভালভাবে আগেই প্রচার করা হয়, অথচ সারা কলকাতায় একশ চর্যাঙ্গিণ ধারা যে

তখনো জারী করা ছিল একথা কারও অজানা নেই। মিছিলে যোগদানকারী অনেক যুবকের হাতে লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে চলতে দেখা গেছে।

ঘটনার সময় স্বয়ং মধ্যমন্ত্রী, উপ-মধ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব এবং পুলিশ বিভাগের বড় বড় কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ভেতরে।

কো-অর্ডিনেশন কমিটি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন কয়েকদিন আগে উপ মধ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহারের আসানসোলে দেওয়া বক্তৃতার। সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর অশোভন উক্তি কমিটি প্রকাশ্য প্ররোচনা বলে মনে করেন।

ঐ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে রায়চৌধুরী তদন্ত কমিটির কাছে ছাত্র পরিষদ কোন বিবৃতি পেশ করে নি। পুলিশ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একটি বিবৃতি পেশ

করা হয়েছে। পুলিশ ছাত্র পরিষদের পক্ষ নিয়ে নেওয়াতেই মনে হয় আলাদা ওদের আর বক্তব্য নেই। মধ্যমন্ত্রী যিনি আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও বটে-অবশ্য ঘটনার দিনই সাংবাদিকদের বলেন যে ঘটনাটি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী তথ্য উনি পেরেছেন। আরও তদন্ত প্রয়োজন।

ওর পক্ষে ঐ মন্তব্যে এর বেশী বললে অনেক সত্য কথা বলতে হত; তা হলে ওর গদী রাখাই মুশকিল হয়ে পড়ত।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিবৃতিতে আছে ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা ঐ এলাকায় মিছিল করে এসেই একজন সংবাদপত্রের হকারের উপর হামলা করেন। তারপর একজন বন বিভাগের আদালীকে মারধোর করে সাংঘাতিকভাবে।

যদিও উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের অনেকেই ওখানে উপস্থিত ছিলেন। আহত আদালীকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে তাঁরা কোন সাহায্য করেন নি। এমনকি প্রাক্তন কমার্স সেক্রেটারী মিঃ রাধ-বন ঐ বিষয় চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

কোঅর্ডিনেশন কমিটি বলেছেন যে ছাত্রপরিষদের সমর্থকেরা সোজা উপরে চলে যান এবং বিল্ডিংএর মাথায় পরিষদের ব্যান্ডা উড়িয়ে দেন। তারপর ছবি তোলেন। ওরা সবাই চলে গেলেই তারপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। প্রায় তিন ঘণ্টার উপর ওরা বিল্ডিংটা ঘিরে রাখেন এবং পুলিশ দাঁড়িয়ে সবই প্রত্যক্ষ করে। লালবাজার ওখান থেকে দৃশ্যে গজ দূরে।

তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে আগে থেকেই কড়ন করা হয়েছিল, কিন্তু কি করে ছাত্র পরিষদের সমর্থকেরা ছাদে উঠে ব্যান্ডা উড়িয়ে দিয়ে এল সে সম্পর্কে তারা নীরব।

১৪৪ ধারা যে কখন উঠিয়ে নেওয়া হল সেটা রহস্যবৃত। ওরা অবশ্য যথারীতি বত দোষ কোঅর্ডিনেশন কমিটির নেতাদের ঘাড়োঁচালিয়েছেন। ওপর থেকে জড়ো ও ঢিল না ছুঁড়লে গোলমাল হত না ঐ মামলা কৈফিয়ৎ দিয়েই তারা খালাস।

ভিজিলান্স কমিশনের দুজন অফিসারের নীতিবহিত কাজ

(দুর্গা শ্রাবণ সংবাদদাতা)

পশ্চিম বাংলা সরকারের ভিজিলান্স কমিশনার কি ঠুটো জগন্নাথ? তিনি কি জানেন, রাজ্য সরকারের একজন উর্ধ্বতন আই এ এস অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সময় তদন্তকারী অফিসারের মেয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারের ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল? তিনি কি আরো জানেন, ঐ প্রস্তাব এনেছিলেন কমিশনেরই অন্য একজন অফিসার? জনস্বার্থের প্রশ্নে আমরা ভিজিলান্স কমিশনের ঐ দুজন অফিসারের নাম প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। এরা হলেন শ্রীএ এন মধ্যমন্ত্রী এবং শ্রীএ ভি শ্যাম। দুজনেই ভিজিলান্স কমিশনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে, কমিশনার ফর ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারিজ-এর পদে নিযুক্ত। দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ।

হতভাগ্য আই এ এস অফিসারটি হচ্ছেন বর্তমান কৃষি কমিশনার শ্রীসুনীল ব্যানার্জী আই এ এস। দীর্ঘ চার বছর ধরে ১৯৬৬ সাল থেকে ঐ অফিসারটির বিরুদ্ধে ভিজিলান্স কমিশন তদন্ত চালিয়েছেন। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে ঐ তদন্ত সম্পর্কে সুনীল ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীব্যানার্জী ঐ বিষয়ে তদানীন্তন চীফ সেক্রে-

টারী এম এম বসু'র কাছে প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। কিন্তু এম এম বসু প্রশাসনিক স্তরে শুধু নিজের দলই সৃষ্টি করেছেন। তিনি রঘু ব্যানার্জীর মতো দুনীতিপরায়ণ অফিসারকে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সুনীল ব্যানার্জীর প্রতিবাদে কণ্ঠপাত করেন নি।

চার বছর তদন্ত করার পরে ভিজিলান্স কমিশন সুনীল ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ খাড়া করেছেন সেটি পড়লে মনে হবে পর্বতের মন্ডিক প্রসব। কোনো দুনীতির কোনো সরকারী অর্থ আত্মসাৎয়ের অভিযোগ নেই। আছে কেন উনি সরকারী কোটার গাড়ী কিনে তাড়াতাড়ি বিক্রী করেছিলেন? ওর স্ত্রী পোলিষ্ট করেছিলেন-সেজ্ঞে নাকি সুনীল ব্যানার্জী প্রভাব খাটিয়েছেন। সুনীল ব্যানার্জী তাঁর ভাই আর মাকে পাতিপুরুষ আর রিজেন্ট কলোনীতে কেন জমি দিয়েছিলেন ইত্যাদি। এসব অভিযোগের জবাব সুনীল ব্যানার্জী দিয়েছেন।

কিন্তু আমরা এখানে ভিজিলান্স কমিশনেরই দুজন অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে প্রশ্ন করছি : এদের বিরুদ্ধে কে তদন্ত করবে?

অভিযোগটি হচ্ছে, ১৯৬৬ সাল থেকে তদন্ত সুরু হবার

শেষে জর্দনীর পুলিশ অফিসারদের নানা প্রশ্নের জবাব দেবার পর কমিশনের অন্যতম গেজেটেড অফিসার শ্রীএ এন মধ্যমন্ত্রী স্বয়ং সুনীল ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে তদন্তের ভার গ্রহণ করেন। এ এন মধ্যমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ প্রশাসনিক মর্যাদায় ডেপুটি সেক্রেটারী ছিলেন। ডেপুটি সেক্রেটারী পর্ষায়ের অফিসার দিয়ে কমিশনার পর্ষায়ের বিরুদ্ধে তদন্ত করানো নিয়ম মারফত নয়। কিন্তু তাই করা হয়। তারপর ঘটে সেই বিস্ময়কর ঘটনা। তদন্ত যখন

চলছে তখন কমিশনের আর একজন গেজেটেড অফিসার, কমিশনার ফর ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারিজ শ্রীএ ভি শ্যাম সম্প্রদায় ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে সুনীল ব্যানার্জীর মার কাছে গিয়ে শ্রীব্যানার্জীর ছোটো ভাই মধ্যমন্ত্রী ব্যানার্জীর সঙ্গে শ্রীএ এন মধ্যমন্ত্রীর বিবর্তী কন্যার বিয়ের প্রস্তাব করেন। মেয়ের একথানা ফটোও মার কাছে দেওয়া হয়।

কিছুদিন পরে শ্রীশ্যাম বিষয়টি সম্পর্কে সুনীল ব্যানার্জীর আবার চিঠিও দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যে

গ্যারান্টি পাঠপক্ষ অর্থাৎ ব্যানার্জী পরিবার প্রস্তাবটিতে রাজী হননি। উল্লেখযোগ্য, ঐ সম্ভাব্য পাঠ মধ্যমন্ত্রী ব্যানার্জীকে জমি দেওয়া কিন্তু তদন্তের একটি অংশ ছিল। জমিটি অবশ্য তদানীন্তন মন্ত্রী স্বয়ং দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। তদন্তকারী অফিসার বোধহয় হতাশ হয়ে ঐ প্রসংগটি সম্পর্কে সুনীল ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে তাঁর মন্তব্য করেছেন।

বড় বড় হাসপাতালের

হাউস-ফার্মের

ধর্মঘট কেন

(দুর্গা শ্রাবণ সংবাদদাতা)

রাজ্যের বড় বড় হাসপাতালে হাউসফর্ম ও ইন্টার্নদের ধর্মঘট চলছে এক সপ্তাহের বেশী। এরা সকলেই পাশ করা ডাক্তার আর রোগীদের যা কিছু দৈনন্দিন চিকিৎসা ও দেখাশুনা একাই করে।

এদের অনেকেই দিনের মধ্যে বার ঘণ্টারও বেশী হাসপাতালে কাটান। কিন্তু মাসে মাইনে পান একশ পঞ্চাশ টাকা থেকে একশ নব্বই টাকার মধ্যে। বাসস্থানের ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা জঘন্য।

ওরা বলেছেন ঐ মাইনেতে ওঁদের চলে না। তাই মাইনে বাড়তে হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয়নাথ আবেদিন খাম্পা। তিনি বলেছেন হাসপাতাল উঠে গেলেও তিনি ঐ দাবী মেনে নেবেন না।

ধর্মঘটী ডাক্তাররা বলেছেন :

"আমরা একবাক্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে পরিস্কারভাবে জানাতে চাই যে, তিনি আমাদের ন্যায্য দাবী আন্দোলনকে যতই বেআইনী ঘোষণা করুন এবং কঠোর শাস্তির হুমকী দিন আমরা সেই হুমকীতে নীতি স্বীকার করব না।"

ওঁদের মাইনে জমাদার পিওনদের থেকে কম এ কথা কেউ অস্বীকার করেন নি। ধর্মঘটের ফলে জনসাধারণের নাকাল বেড়েছে। সরকার অনমনীয়।

কিন্তু জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির কোন নিশ্চয়তা থাকে না যদি না পাশাপাশি তার স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির-ও সম্যক বিকাশ ঘটে ॥

বিশ্বসংস্কৃতি প্রকাশন-এর প্রথম বই

রবীন্দ্র দাশগুপ্তের

প্রকৃতি মানুষ ধর্ম শোষণ

দাম : শোভন সংস্করণ ৪.২৫ ॥ সুভাষ সংস্করণ ৩.৭৫

পরিবেশক : দে বুক স্টোর। বংকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলকাতা ১২

পাক্ষিক

পূর্ব দিগন্ত

পড়ুন

ভারতে ও তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ও শ্রেণীসংগ্রামের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ এতে পাবেন।

পূর্ববাংলার বামপন্থীদের সম্পর্কে

শক্তি কুল হাশাম

গত সংখ্যার দর্পণে প্রকাশিত শ্রীপ্রবীর বসু কর্তৃক 'আমার লেখা "পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা" শীর্ষক নিবন্ধের সমালোচনা পড়লাম। জনগণ-তান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনার জন্য সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মাধ্যমে অবশ্যই আমাদের ভুল ত্রুটিগুলি শুদ্ধ করে নিয়ে একটি সঠিক বিপ্লবী পন্থকে আঁকড়ে ধরতে হবে। প্রবীরবাবু তাঁর সমালোচনায় সে প্রচেষ্টাই করেছেন এবং তাঁর এ প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাই। কিন্তু তিনি আমার বক্তব্যের বিপ্লবী সমালোচনা করলেই আমি ধুশী হতাম এবং বিপ্লবী জনগণও উপকৃত হতেন। যে কোন বিপ্লবী সমালোচনাই অনুসন্ধান ও তদন্ত ব্যতীত সম্ভব নয়। প্রবীরবাবুর অনুসন্ধান ও তদন্তহীন সমালোচনা তাই একটি মনগড়া ভাববাদী অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। চেয়ারম্যান মাও বলেছেন—“যে তদন্ত করে না, সমালোচনা করার অধিকার তার নেই।” সুতরাং নীতিগতভাবে প্রবীরবাবুর সমালোচনার জবাব দেবার ইচ্ছা না থাকলেও পূর্ব-বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্যক ও বাস্তব বিশ্লেষণের যারা সুযোগ পাননি তাঁদের উদ্দেশ্যে এবং উল্লিখিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের অবাস্তব মোহমুগ্ধতার কামনাশী আমি এ সমালোচনার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রবীরবাবুর সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে প্রথমেই আমি বলবো “পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা” নিবন্ধে আমি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি তোহা সাহেবদের পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) বা অন্য কোন রাজনৈতিক পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করিনি, নিজের চোখের সম্মুখে পূর্ব বাংলায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনায় বামপন্থী দাবীদার বিভিন্ন পার্টির ভূমিকাকে বর্ণনা করেছি মাত্র, এবং

এ ঐতিহাসিক বর্ণনাকে মনগড়া ভাবে বিভিন্ন পার্টির নীতি ও কর্মসূচী হিসাবে মনে করা নিছকই অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত এবং অরাজনৈতিক হবে। প্রবীরবাবুর অবগতির জন্যই জানাতে চাই যে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) এবং পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি উভয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গকে ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি এবং তাদের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আছে। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে সাধারণ একজন কর্মী হিসাবে যোগ দেবার পূর্বে আমি তোহা সাহেবদের কমিউনিস্ট পার্টিরই কর্মী ছিলাম। শুধু আমি নই, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সকল সদস্য কর্মী ও সমর্থকরাই এক কালে তোহা সাহেবদের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কর্মী ও সমর্থক ছিলেন। রুশ পন্থী সংশোধনবাদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সে তুংএর চিন্তাধারাকে পার্টির মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। পাক ভারত যুদ্ধের পর উনিশশ ছেয়টি সালে আইয়ুব সরকারের চীন ঘেঁষা নীতিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রগতিশীল বলে আখ্যা দেন এবং তাদের প্রতি কর্মে সমর্থন জানিয়ে নিজেরা কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির এ নিষ্ক্রিয়তাবাদী ভূমিকা এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে সমর্থন পার্টির বিভিন্ন কর্মী বিশেষ করে পাবনা ও চট্টগ্রাম জেলা কমিটি তীব্রভাবে সমালোচনা করেন এবং সমগ্র জনগণকে রাজনৈতিক সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে শোষণ ও শাসক শ্রেণীকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র বন্ডকে সমূলে বিধ্বস্ত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জনগণকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কয়েম করার মূল বিপ্লবী দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টার কেন্দ্রীয় কমিটির এ নিষ্ক্রিয়তাবাদকে তাঁরা নয়া সংশোধনবাদী কার্যকলাপ রূপে অভিযুক্ত করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের এ ভূমিকাকে পার্টির সিদ্ধান্ত বিরোধিতার অভিযোগে ১৯৬৮ সালে মতিন, আলাউদ্দিন, আব্দুল বাসার ও দেবেন শিকদার সহ চট্টগ্রাম পাবনা, কুমিল্লা, রংপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর এবং বগুড়া জেলা কমিটির বহু সদস্যকে পার্টি থেকে বহিস্কার করে দেন। এ সকল বিপ্লবী কর্মীরা মোঃ তোহার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিস্কৃত হয়েও শহর ও গ্রামে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৬৯ সালের মধ্যেই

এঁরা মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সে তুংএর চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে কৃষক শ্রমিক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গড়ে তোলেন পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। এ পার্টির প্রতিটি সদস্য কর্মী ও সমর্থকগণ নিঃসন্দেহে মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সে তুংএর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। শুধু তাই নয় ১৯৭০ সালে পার্টির বিশেষ কংগ্রেসে প্রচেষ্টা কমরেড চারু মজুমদারের প্ররোগ পন্থাটিকে পার্টির রণনীতি রণকৌশলের অন্যতম মূল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রবীরবাবু আমাকে শুধুমাত্র মার্কসবাদী বলে উল্লেখ করেছেন এবং বিপ্লবী মার্কসবাদী লেনিনবাদী পন্থাকে অনুসরণ না করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। সঠিকভাবে সামগ্রিক সংবাদ না জেনে মনগড়া যে কোন মন্তব্যই যে বিদ্রোহিতকর এবং অসত্য তা আশা করি এবার থেকে প্রবীরবাবু উপলব্ধি করবেন।

বস্তুতঃ মোহাম্মদ তোহার পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) এবং পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মূল নীতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোন পার্থক্যই ছিল না। উভয় পার্টিই সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও সে তুংএর চিন্তাধারা ও কমরেড চারু মজুমদারের প্ররোগ পন্থা অনুসারে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবী চিন্তায় বিশ্বাসী। কিন্তু প্ররোগের ক্ষেত্র নির্ধারণে তাদের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মোহাম্মদ তোহার পাকিস্তান ভিত্তিক কৃষি বিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন আর পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করে পূর্ব বাংলা ভিত্তিক। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থিতি ও জনগণের শ্রেণী চেতনা এবং সর্বোপরি বিপ্লবী পার্টির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ইত্যাদি কতগুলো বাস্তব অবস্থার কারণেই পাকিস্তান ভিত্তিক কৃষি বিপ্লব পরিচালনা করার পরিকল্পনাকে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্মী হিসাবে আমি অবাস্তব ও অসম্ভব এবং অতীত অভিজ্ঞতার সারসংকলন হীন বলে মনে করি। বাস্তবে পূর্ব বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমি স্বার্থহীন ভাষায় বলতে পারি কিছু কিছু অবস্থার সঙ্গে মিল থাকলেও পূর্ব বাংলার ব্যাপক বিপ্লবী পরিস্থিতি কোনক্রমেই ভারতের

অনুরূপ ছিল না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর কোন বাস্তব সম্পর্কই ছিল না।

পাকিস্তান তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর আধা সামন্ত-তান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক পূর্ব বাংলার জোতদার শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে এ সকল সামন্ত শ্রেণীর (বিশেষতঃ হিন্দু সামন্ত-শ্রেণী) দেশত্যাগের ফলে পূর্ব বাংলায় যে ধনী ও মাঝারি কৃষক শ্রেণীর বিকাশ ঘটে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ গত তেইশ বছরে পূর্ব বাংলায় একটি বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাঝে সীমিত হলেও বিপ্লবী চেতনা বিদ্যমান। ফলে শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ আন্দোলনই এ বিরাট সংগ্রামী মধ্যবিত্তশ্রেণী দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু সংগ্রামী নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা মধ্যবিত্ত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেই, বিপ্লবী নেতৃত্ব পরিচালনা করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব হচ্ছে সর্বহারা কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর। কিন্তু পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৎকালীন আবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণেই সেখানে কোন বিপ্লবী নেতৃত্বের উপস্থিতি ছিল না। পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্তশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ এ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তাদের নেতৃত্বে সমবেত করতে সক্ষম হয়। এ পরিস্থিতি জন্য আমি কোন ক্রমেই পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে দোষারোপ করবো না, বরং এর মূলে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এ কারণেই পরবর্তীকালে পার্টিতে মতান্তর ও ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানের বহু পুঁজিপতিরা (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) তাদের পুঁজিবাদী শোষণের নিমিত্ত সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়। একই সঙ্গে সেখানের জনগণের উপর বিরাজ করতে থাকে প্রচণ্ড সামন্তবাদী শোষণ। ফলে সেখানে এক বিরাট সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে সজাগ ছিল এবং এ শ্রমিক শ্রেণী যাতে সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। বেকারত্ব যাতে শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে শোষণ গোষ্ঠী বিনা প্রয়োজনেই মরুভূমির উপর মৃগালা তারবেলা ওয়াসকে

ইত্যাদি বালির বাঁধ নির্মাণ ও বিভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থানান্তরের কর্মে তাদের নিয়োজিত করে এবং অপেক্ষাকৃত বেশী পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে (একজন সাধারণ শ্রমিকের দৈনিক মজুরী পূর্ব বাংলার ২.২৫ টাকা ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪.৫০ টাকা) এ সময়ের মোকাবেলা করে আসছে। এমন কি সেখানে এখন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিও গড়ে উঠতে পারেনি।

পূর্ব বাংলার জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) যে শোষণ নিপীড়ন চালিয়ে আসছে তার চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। পাকিস্তানের বাৎসরিক আয়ের ৭০ ভাগ সম্পদই পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত, অথচ ব্যয়ের খাতে পূর্ব বাংলার ভাগে জটতো বাৎসরিক বাজেটের মাত্র ১৪.৮ ভাগ। প্রবীরবাবু একে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণকে শোষণ করে শোষণ গোষ্ঠী কখনোই তা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের জন্য ব্যয় করে নি, বরং বৃহত্তর পুঁজি গড়ে তারা তাদের শোষণের পথকে আরো প্রশস্ত করেছে মাত্র।

সুতরাং একে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য বলা কোনক্রমেই সঠিক হবে না, বরং নিঃসন্দেহে ইহা একটি পুঁজিবাদী শোষণ। এখন প্রশ্ন হলো এ শোষণের চরিত্র কি? এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) ইসলাম দ্রাঘত্ব ও সংহতি অর্থাৎ ধর্মকে পুঁজি করে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রথমেই আক্রমণ করে পূর্ব বাংলার হিন্দু প্রধান সামন্ত ও পুঁজিবাদী শ্রেণীকে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে তাদের জমি সম্পত্তি দখল করে। ক্ষমতাসীন এ পুঁজিবাদী শোষণ শ্রেণী ইজারাদারী ও তহশীসদারী প্রথার মাধ্যমে সামন্তবাদী শোষণকেও নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসে এবং দুই বৎসরের মধ্যেই বাৎসরিক দেড় কোটি টাকা দেয় রাজস্বকে বাড়িয়ে সাড়ে আঠারো কোটি টাকায় পরিণত করে। জোতদার মহাজন শ্রেণীগুলিও তাদের এ উল্লেখ্য শোষণ থেকে রেহাই পাননি। তাছাড়া আইয়ুবী আমলে “মৌলিক গণতন্ত্র” নামে এক অশুভ শাসন-শোষণমূলক আইনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রায় সকল জোতদার মহাজন শ্রেণীকেই বেতনছক সরকারী আমলায় পরিণত করা হয়। এভাবে পুঁজিবাদীরা পূর্ব বাংলায় জোতদারী ও মহাজন শোষণকে সীমিত করে নিজেদের পুঁজির শোষণের কলেবর বৃদ্ধি করতে থাকে। অপরদিকে পূর্ব বাংলার পুঁজিপতিদের (যারা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু) বিতাড়িত করে তাদের (শেখাংশ ও পুঁজি)

দর্পণ

বঙ্গবান্দা

১১ চার ১১

বার্ষিক পনেরো টাকা

পাঠ্যমূলক সাড়ে সাত টাকা

দ্রোণালী চার টাকা

কাকারি ও চিঠিপত্র পাঠ্যমূলক

টিকানা :

৩১, মট জেন, কলি-১০

গুপ্তহত্যা থেকে গণহত্যার ব্যাপক পরিকল্পনা

(দপণের পর্যবেক্ষক)

উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার সাংবাদিকদের বলেছেন যে ষোলই জুনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থির হয়েছে যে সরকারী কোয়া-লিশনভুক্ত দলগুলির সভ্যদের নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী করা হবে। এই বাহিনী ক্ষেত্রবিশেষে পদাংশের গুপ্তচরের কাজ করবে, এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পদাংশের সাহায্যে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এই বাহিনীর লোকজনদের অস্ত্র ও সর-বরাহ করা হবে।

বলা বাহুল্য এই বাঁহীনস পরিকল্পনাটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অর্থাৎ আজ পশ্চিম বাংলার মানুষের জানমালের দায়িত্বভার সরকারী ভাবে দলীয় গুপ্তাদের হাতে অর্পিত হবে। সমস্ত আইন, গণ-তান্ত্রিক ধ্যানধারণার উগ্রবিরোধী এ ধরনের উস্কানি দ্বারা দিতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি তাদের ক্ষমা করতে পারবেন?

কিন্তু বাজারী সংবাদপত্র “হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড” জনসাধা-রণের নিরাপত্তার নামে এভাবে দলীয় গুপ্তাদল তৈরী করাকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় ফেঁদে বসেছে। আঠারোই জুন কনটেনিং ভায়োলেন্স নামে যে সম্পাদকীয়টা তারা লিখেছে, তার প্রতিটি ছত্র বজ্রাতীর চূড়ান্ত পরিচয়। হিংসা প্রতিরোধের নামে বিশেষ বিশেষ দলের বাছাই করা লোক নিয়ে যে প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী হবে তারা যে শেষ পর্যন্ত সরকারী প্রত্যয়ে পরিপুষ্ট সশস্ত্র খুন্দীবাহিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? স্টেটসম্যান পত্রিকা পর্যন্ত এ ধরনের সরকারী গুপ্তাবাহিনী তৈরী করে সাধারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দেবার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। আঠারোই জুন “আরো রাজনৈতিক গুপ্তাবাজী”? (মোর পলিটিক্যাল থ্যাগারী?) নামীয় প্রথম সম্পাদ-কীয়তে তাঁরা প্রশ্ন করেছেন, এ ধরনের রাজনৈতিক দলভুক্ত সদস্য-দের সশস্ত্র করে এবং তাদের গুপ্ত-চর হিসাবে ব্যবহার করে শান্তি-শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হবে না তা ধ্বংস হবে? সম্পাদকীয়তে শেষে বলা হয়েছে, “যে গভর্ণমেন্টের এই ধরনের (রাজনৈতিক গুপ্তাবাজি কয়েম করার—মন্তব্য আমাদের) মতলব মাথায় রয়েছে, তাদের ক্ষমতা দখল করে থাকবার কোন অধিকার নেই; এই গভর্ণমেন্টের ওপর সামান্য ষেটুকু আস্থা এখনো আছে, অচিরেই তা ধুয়ে মুছে যাবে।”

বলা বাহুল্য শাসক শ্রেণীর

শ্রেণীসচেতন মনুষ্যপদ হিসেবে স্টেটসম্যান আতংকগ্রস্ত হয়েছেন, ঠিক এই গুপ্তাবাজির তাঁরা বিরোধী এ জন্যে শঙ্ক-নয়। তাঁদের আতংক তাঁরা খুলেই বলেছেন—“এর ফলে অন্য সরকারের ও এ ধরনের পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষে নজীর সৃষ্টি হয়ে থাকবে।” অর্থাৎ যদি কখনো সি পি এম ক্ষমতালান্ড করে তাহলে তারাও এই নজীর দেখিয়ে সি পি এম স্বেচ্ছাসেবকদের সশস্ত্র করে অন্যান্য দলের পক্ষে সর্বনাশ ঘটতে পারে। শঙ্ক তাই নয়, স্টেটসম্যান সম্পাদকের বোধ হয় সম্পাদকীয় লেখবার সময় বর্ধ-মানের আহ্বাদপত্র গ্রামের ঘটনার কথাও মনে পড়েছিল।

মনে পড়বার কথাই বটে। পদাংশ মিলিটারীর প্রত্যয়ে পদুট কংগ্রেসী নামধারী সশস্ত্র গুপ্তাদল যে পাঁচটি ট্রাক বোঝাই করে গিয়ে আহ্বাদপত্র গ্রাম আক্রমণ করে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, গুলী করে কৃষকদের হত্যা করেছে, সেই খবর আগের দিনই স্টেটস-ম্যানের পাতায় ছাপা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে সংগঠিত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী যে পড়ে পড়ে মার খাবেন না, অতী-তের অভিজ্ঞতা থেকে স্টেটসম্যান এটা ভালো করেই জানেন। সারা পশ্চিমবঙ্গ যে গর্জে উঠবে, হর-তাল, বশ্মে, কলকারখানা, রেল-বাসের চাকা অচল হবে, লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্ট প্রতিরোধ সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ মুখর হয়ে উঠবে, তা স্টেটসম্যান ভালো করেই জানে। তাই তাঁদের এই সতর্কবাণী। “হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড”র অল্প-বুদ্ধি সম্পাদক ততদূর বোকার ক্ষমতা রাখেন না। তাই তারা একে স্বাগত জানায়। এরা ইন্দোনেশিয়ার কথা ভাবে, ভিয়েতনামের কথা ভাবে না।

এদিকে বাংলা কংগ্রেসের গৃহ-বিবাদ চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। সুদীর্ঘ ধাড়া রাজনৈতিক রাহ-দ্রুপ্ত অজয় মুখার্জীকে পরিত্যাগ করেছেন। ফলে নব কংগ্রেস-মুশ-লিম লীগ কোয়ালিশন ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে পড়েছে। বাজেট অধিবেশনের আগেই এই কলংকিত সরকারের পতন ঘটতে পারে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন। খাস নব কংগ্রেসী এম এল এরাও অনেকে মনে করছেন যে এ সরকারের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। চারজন বিরোধী এম এল একে আটকে রেখেই এ সরকার কোনমতে আত্মরক্ষা করছে। অজয় মুখার্জী বলেছেন যে এভাবে সরকার টিকিয়ে রাখাটাকে তিনি

নৈতিক দ্রষ্টাচার বলে মনে করেন না। বাজারী কাগজগুলোও তা মনে করে না। পশ্চিমবঙ্গে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে যে সব পুলিশ অফিসার ও

সম্প্রতি

প্রশাসনিক দায়িত্বভার প্রাপ্ত উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থার সমর্থন ও প্রত্যয়ে পদুট হয়ে গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস এবং অব-শেষে গণহত্যার কর্মসূচী কার্য-

করী করতে এগিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এইসব বিক্রীত বিবেক মিথ্যাচারী সংবাদপত্র জনগণের স্বার্থের পক্ষে কখনো দাঁড়াবে না।

সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট এক আদেশ বলে মার্কসবাদী কমিউ-নিস্ট এম এল এ সরকার মর্মুর ওপর কলকাতা হাইকোর্টের জনৈক-বিচারপতি যে স্থায়ী রুল জারী করেছিলেন, তা স্থগিত রাখবার আদেশ দিয়েছেন। ফলে সরকার মর্মুর এখন বিধানসভার আসন্ন

অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পার-বেন। বিধানসভায় একজন বিরোধী সদস্য সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু কল-কাতার বৃহৎ খবরের কাগজগুলো এ সংবাদ প্রকাশ করতে লজ্জা

পেয়েছে। অথচ সরকার মর্মুর বিধানসভায় উপস্থিত না থাকবার জন্যে হাইকোর্টের আদেশ নিয়ে এরা আগে কত বড় বড় কলামে খবর ছেপেছে, মনে করে দেখুন। এবার কিন্তু সংবাদটি এরা বেমা-লুম চেপে গিয়েছে। ফলে অনেকেই জানেন না যে হাইকোর্টের পূর্ব-বর্তী আদেশ নাকচ হয়ে গিয়েছে এবং সরকার মর্মুর জনগণের রায় অনুযায়ী আবার বিধানসভায় কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

বাজারী সংবাদপত্র ও পেটোয়া সাংবাদিকেরা জেনে রাখুন যে আভ্যন্তরীণ কলহবিসংবাদে জর্জ-রিত এ শব্দতানী কোয়ালিশন সন-কারের অবসান ঘটবেই। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পশ্চিমবঙ্গের বিভীষিকা দূর হবেই। কোন ষড়-যন্ত্র, কোন জরুরী অবস্থা ঘোষণার দাবী পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী মানু-ষের বিজয় অভিযান স্তব্ধ করতে পারবে না।

পূর্ব বাংলার বামপন্থী

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

কলকারখানাগুলিও পাকিস্তানী অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজি-পতিরা দখল করে নেয়। এদের মধ্যে ঢাকেশ্বরী কটন মিল, চিন্ত-রঞ্জন কটন মিল, মোহিনী মিল, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল, চন্দ্রঘোনা পেপার মিল, দর্শনার সুগার মিল, সোনার বাংলা জুট মিল, তুলারাম জুট মিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এমনি করেই পূর্ব বাংলার ৩৭৪টি বড় ও মাঝারি মিল ফেব্রুয়ারি মধ্যে ৩৩৮ টিরই মালিক হয়েছে পাকিস্তানী তথা পশ্চিম পাকি-স্তানী পুঁজিপতিরা। এমন কি পাকিস্তানের মোট ৩৪টা ব্যাঙ্ক ও বাঁমা কোম্পানীর ৩৩টির মালিক ছিল তারা। শঙ্ক তাই নয় পুঁজিবাদী কায়দায় তারা পূর্ব বাংলার কুটির শিল্পসমূহ, যথা তাঁত শিল্প, বিড়ি শিল্প, মৃৎ শিল্প, চামড়া কাষ্ঠ ও লৌহ নির্মিত প্রবাদি ইত্যাদিকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এইসব কারণে বাঙালী সামন্ত ও পুঁজিবাদী শ্রেণী এক দারুণ সঙ্কটে নিপতিত হয়। আইয়ুব-শাহীর যে করাট কার্যকলাপকে মোঃ তোহা সাহেবরা “প্রগতিশীল” বলে আখ্যা দিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার সামন্ত ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী তথা পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজি-বাদীদের এ শোষণমূলক স্বল্প তাদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে পূর্ব বাংলার সামন্ত ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর সীমিত শোষণই পূর্ব বাংলার বিরাট এক মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর বিকাশের মূল কারণ। কিন্তু কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী জনগণকে

বিপ্লবী রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধ এবং সশস্ত্র করার পরিবর্তে সামন্ত ও উর্দা পুঁজিবাদী শোষণকে এক-চেটিয়া পুঁজিবাদী শোষণের মাধ্যমে সামগ্রিক ভাবে দীর্ঘমেয়াদে মধ্য-বিস্তৃত শ্রেণীর বিকাশ ঘটানো নিশ্চ-রই বিপ্লবীদের বৈশ্ববিক দায়িত্ব নয়, এধরনের কার্যকলাপ কখনোই মার্কসবাদী লেনিনবাদী হতে পারে না এবং একে প্রগতিশীল বলাও নিঃসন্দেহে ভুল।

রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে দেখা যাবে পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন শোষণগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার কোন শ্রেণীকেই কোনদিন রাজনৈতিক অধিকার দেয়নি। জনগণের পাঁচটি কমিউনিস্ট পার্টিকে করেছে অবৈধ, কেড়ে নিয়েছে সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগণের বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধী-নতা, মতাদর্শের স্বাধীনতা, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধী-নতা। ভারতের তথাকথিত গণতন্ত্রের মত কোন গণতন্ত্রও পূর্ব বাংলায় কখনো ছিল না, ১৯৫৪ সালে এবং ৭০ সালে তথাকথিত নির্বাচনের নামে শাসকগোষ্ঠী জনগণের সঙ্গে করেছে চরম প্রতারণা, তথাকথিত গণরায় কার্যকরী হয়নি কখনো। বরং দুঃখের, সামগ্রিক শাসন জারী করে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর সেনা-বাহিনীর দ্বারা ধানক ও সামন্ত শ্রেণী সহ পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিটি আশা আকাঙ্ক্ষাকে অন্ধুরেই নিম্নমুখ করে নিষ্পেষণের মাধ্যমে হত্যা করে, অব্যাহত রেখেছে তাদের শোষণের লুণ্ঠন কার্য। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাষার উপরও পুঁজিবাদী কায়দায় (প্রবীরবাবুর মতে সামন্তবাদী কায়দায়, কিন্তু

সামন্তবাদী কায়দায় বিশ্বের এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলে প্রতি-ষ্ঠিত হয়েছে এমন ইতিহাস আমার জানা নেই) আক্রমণ করেছে, এমন কি ইংরেজ প্রভুরা যেমন ঘৃণাভরে ভারতীয়দের “নেটিভ” ইত্যাদি বলে গাল দিত ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী কায়দায় ইসলাম দ্রোহের “ধর্জা-ধারী পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতি-ক্রিয়াজাত শাসক শোষণ গোষ্ঠী ও তাদের দালাল শ্রেণী পূর্ব বাংলার জনগণকে বাস্টার্ড সানস অফ হিন্দুজ বলে ঘৃণা প্রদর্শন করে আসছে। এমন কি ধর্মের নামে সামাজিক জীবনকেও তারা অতিষ্ঠ করে তুলেছিল (মসজিদ নির্মাণ মিলাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জোর করে চাঁদা আদায় করা, স্বাস্থ্যগত কারণে অপরাগ হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে রোজা বা উপবাস করতে বাধ্য করা ইত্যাদি) পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াজাত শোষণ শ্রেণীর (যারা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী) এ সকল শোষণকে সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করে আমি বলবো এটা নিঃসন্দেহে ঔপনিবে-শিক শোষণ এবং ঔপনিবেশিক শোষণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রবীরবাবু আমাকে পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদ বলার অভিযোগে অভি-যুক্ত করেছেন, যা আমি বলিনি। ঔপনিবেশিক শোষণ এবং ঔপনি-বেশিক চরিত্রের শোষণ—এ দুয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সর্বাদিক চিন্তা না করেই তিনি আমাকে সঙ্কীর্ণতাবাদী বলেছেন। আশা করি এরপর প্রবীরবাবুর ভুল ভাঙ্গবে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

বরানগরে বেগবোয়া গুণ্ডামী ও খুনখারাবি

খুনখারাবির ঘটনার দিক থেকে বরানগর বোধহয় পশ্চিম বাংলার প্রথম স্থান দখল করেছে। অস্তুতঃ প্রথম সারিতে তার স্থান যে নিশ্চিত এতে কেউ বোধহয় সন্দেহ করবেন না। অথচ এসব খুনের নায়ক যারা তারা বরানগর-থানাকে এমন পকেটস্থ করে রেখেছে (বিজয় সিং নাহারের কৃপায়) এবং এসব খুনের কাজ যারা হাতে কলমে সমাধা করেছে তাদের সঙ্গে থানা থেকে সরু করে মহকুমা এবং জেলা পর্যায়ের পদাধিকারীদের এতই দহরম মহরম যে, পদাধিকারীদের দেখেই না, যদিচ পদাধিকারের পাহারায় এসব খুনী গুন্ডারা প্রতিদিনই বরানগরের কোন না কোনও এলাকায় এসে বোমা, পাইপ গান, রিভলবার, এমনকি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল নিয়ে জিপে চড়ে এসে হামলা চালাচ্ছে। এক এক দিন চার-পাঁচটি অঞ্চলে একই সময় একই সঙ্গে এই গুন্ডারা এসে হানা দিচ্ছে, তাজা মানবগুণের প্রাণ ছিনিয়ে নিচ্ছে। আজও পূর্বপাড়া অঞ্চল পদাধিকার মিলিটারী সার্চ করেনি, অস্তুতঃ কুড়ি পশ্চিমাটী জলজ্যান্ত মানবকে খুন করেছে যারা তাদের জন্য পি ভি এ আইনও নেই, নিরাপত্তা আইনও নেই।

পশ্চিম বাংলার অজয়-বিজয়-মুসলিম লীগের বাবুরা মার্কসবাদের নামাবলী শোভিত দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের সাহায্যে মল্লিশভা গঠন করার পর থেকে পাঁচই জুন পর্যন্ত শব্দ বরানগরেই খুন হয়েছেন অস্তুতঃ পশ্চিম জন এবং এর মধ্যে পনেরো জনই হলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতা, বাদের বিজয় জায়গা থেকে তুলে নিয়ে কংগ্রেসী নকসালী সি পি আইর খুনীরা টেনামেন্ট অঞ্চলে, ন' পাড়া রেল লাইনের ধারে নেতাজী কলোনীর বিলের পাশে, পরামর্শিক ঘাট রোড ও শিলের ঘাটে, আলম-বাজারের রাজবাগানে ও সি সি আর লাইনের ধারে কুপিয়ে কুপিয়ে বা গুলি করে খুন করেছে। গত দোসরা জুন সাড়ে চারটার জ্যোতিনগরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে নববিবাহিত যুগ্মস্ত্রীসহ ভট্টাচার্যকে তাঁর স্ত্রীর পাশ থেকে টেনে তুলে এবং তার কাকা শ্রীবিষ্ণু ভট্টাচার্যকে গুন্ডার দল বধন খুন করেছে তখন বাইরে থেকে যাতে কেউ তাদের ধরতে আসতে না পারে তার জন্য সশস্ত্র সি আর পি-র গাড়ী বখারাতি মোড়ায়ন ছিল।

ঠিক এভাবেই নেতাজী কলোনী, দেশপ্রিয়নগর স্বাধীন পল্লী, আপন পল্লী, আগরওয়ালা লেন, বেণী কলোনী, আটা পাড়া, ন' পাড়া, আলমবাজারের নারায়ণী সিনেমার কাছাকাছি এলাকা, বরানগর বজার ও কুঠিঘাট অঞ্চল এবং অবশেষে বনহুগলীর হাসপাতাল, আনন্দম সিনেমা হল সহ সমগ্র টেনামেন্ট অঞ্চল তথাকথিত সি পি আই ও নবকংগ্রেসের খুনী গুন্ডাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এই এলাকার

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীলক্ষ্মী দাস, শ্রীশ্রীভদ্র দত্ত, শ্রীআশু নন্দী এবং বলাই দে, অমৃতবাজার পত্রিকার অবসর প্রাপ্ত সাব এডিটর শ্রীঅনন্ত বকসী মহাশয়, কলকারখানা ও বন-হুগলী হাসপাতালের প্রাথমিক কর্মচারী সহ স্কুল কলেজের ছাত্রদের এছাড়া কয়েকজন চিকিৎসক ও শিক্ষকও (বাদের মোট সংখ্যা হবে প্রায় দু হাজারের মত) এই এলাকাগুলি ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। বরানগরের পদাধিকার কর্তা থেকে সরু করে সার্কেল ইন্সপেক্টর, এস পি, এডি-শনাল এস পি, আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত বরানগরের সর্বশেষ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বি টি রোড পেরিয়ে মজিক কলোনীর মধ্য দিয়ে, গোপাললাল ঠাকুর রোডের গুন্ডাদের সঙ্গে বোগাবোগ করে ব্যাপক অঞ্চলে এই দক্ষতকারীর দল

মতামত

এক অশুভ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে এবং সমগ্র বরানগর অঞ্চলকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

ন' পাড়া অঞ্চলে সমাজবিরাোধীদের ও ওয়ানগন ভাঙ্গাদলের সক্রিয় সাহায্যে ও সহযোগিতায় পার্টি প্রভাব বাড়তে গিয়ে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেতা শিবপদ ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম যে কাজে হাত দিলেন তা হল সি পি এম-এর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রাথমিক ইউনিয়নগুলি ভেঙে দেওয়ার কাজ। ২৫-২-৭০ তারিখে সকাল বেলা ন' পাড়ার এস বি কারখানার ইউনিয়ন নেতারা গেট মিটিং করতে গেলে শিবপদবাবু এবং নব কংগ্রেসের অঙ্গুগত অমল মুখার্জী সেই গেট মিটিং ভাঙতে চেষ্টা করে। সেই গেট মিটিংয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ইউনিয়ন নেতা শ্রীসমরেশ রায় শর্মা। তখনও অবশ্য ঐ এলাকায় বোমা-পটকা-পাইপগানের এমন পাইকারী ব্যবহার শুরু হয়নি। কাজেই ন' পাড়ার সি পি এম কর্মীদের তখনও দৈহিক নিপীড়নের শিকার হতে হয়নি। কিন্তু অপমানজনক কথা-বার্তা, প্ররোচনা চলতে থাকে এবং দ্রুতগতিতে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে।

সাগর দত্ত হাই স্কুলের হেড-মাস্টার শ্রীবিনয় সেনগুপ্তর বাড়ী ছিল ন' পাড়ায়। সত্তর সালের তেসরা মার্চ গুন্ডারা বিনয়বাবুর বাড়ীর দিকে বোমা মারতে মারতে এগিয়ে যেতে থাকে। বিনয়বাবুর বাড়ীর সঁকলের আতঁচীকারে প্রতিবেশীরা বৈরিরে এলে ওরা সৈদিনের মত পাগিয়ে যায়। ক্রমশ ন' পাড়ার অবস্থা থমথমে হয়ে উঠে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাও তখন বাই বাই করছে।

বোলাই মার্চ অজয় মুখার্জী পদ-ত্যাগ করলেন। পরদিন সতেরোই মার্চ হরতালের দিনে ন' পাড়ার সি পি এম-এর মিছিলের উপর গুন্ডার

দল বোমা বৃষ্টি করে। ঐ দিনই রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় ন' পাড়া তাল-বাগান কলোনীতে ঐ দক্ষতকারীরা সি পি এম কর্মী প্রণব মজুমদার, দীপক চক্রবর্তী, পদাধিকার চ্যাটার্জীর বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর জানালা দরজা ভেঙে ফেলে। অধিক রাতে নেতাজী কলোনীর লো-ল্যান্ডের মহাজাতি কিশোর শক্তি সংঘের ঘর আক্রমণ করতে এসে দুজন দক্ষতকারী সুভাষ সাহা ও অনিল সরকার বোমা সহ হাতেনাতে ধরা পড়ে।

একুশে মার্চ সি পি এম কর্মী তপন দাস ন' পাড়ার ঘোড়ার আন্তা-বলের কাছে দক্ষতকারীদের গুলীতে আহত হয়। চব্বিশে মার্চ হাসপাতালেই তপনের মৃত্যু হয়। ছয়ই এপ্রিল তারিখে বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির টিকাদার শ্রীকাজল চক্রবর্তী ন' পাড়ার নবীন দাস রোডে টিকা দিতে গেলে

তাকে লোহার রড ও ভোজালী দিয়ে মারাত্মক ভাবে আহত করা হয়। নয়ই এপ্রিল তারিখেই আবার গুন্ডার দল সর্বজনপ্রিয় শিক্ষক শ্রীবিনয় সেনগুপ্তের বাড়ী আক্রমণ করে। তেইশে এপ্রিল সংখ্যা সাড়ে আটটার সি পি এম যুব কর্মী শ্রীমোহন দত্তকে রিভলবারের বাট দিয়ে প্রথমে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় এবং তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করার চেষ্টা করা হয়। সি পি এম-এর কর্মীরা খবর পেয়ে দলবদ্ধ ভাবে এগিয়ে গেলে একজনকে ফেলে দিয়ে গুন্ডার দল পাগিয়ে যায়। পশ্চিমে ন' পাড়ার শরণ ধর রোডের উপর অবস্থিত গণনাট্য সংঘের নাটকের মহড়া চলাকালে অমলের দল অতর্কিতে আক্রমণ করে। কর্মীরা প্রতিরোধে এগিয়ে গেলে বোমা ছুঁড়ে অফিসের আল-মারী, জিনিষপত্র সব তছনছ করে দেওয়া হয়। তিরিশে মে তালবাগানের অধিবাসী সি পি এম-এর প্রণব মজুমদারকে ন' পাড়ার দক্ষিণ কমিউনিস্ট পার্টির অফিসের সামনে ৩৪ সি বাস থেকে নামিয়ে গুন্ডার দল লাইট-পোস্টে বেঁধে ভাঙ্গা বোতল, সাইকেলের চেন, রড, ভোজালী ও অবশেষে বোমার আঘাতে সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত করে লাইটপোস্টে কলিয়ে রাখে। পদাধিকার ঘটনার বহু পরে সেখানে গিয়ে প্রণবকে নিয়ে আসে। পদাধিকার গাড়ীতেও গুন্ডারা বোমা ছোঁড়ে। রিজার্ভ পদাধিকার সঙ্গে স্থানীয় পদাধিকার কর্তার প্রচণ্ড বাদানুবাদও হয়।

এরপরে ন' পাড়া অঞ্চলে সি পি এম কর্মীদের মনে গ্রাস সৃষ্টির ক্রাপক প্রচেষ্টা দেখা যায়। সতেরোই জুন ন' পাড়ার সি পি এম অফিসে গুন্ডারা অতর্কিতে প্রচণ্ড ভাবে বোমা ও ভোজালী নিয়ে আক্রমণ করে। ফলে সি পি এম কর্মী কানাই গাঙ্গুলী অসিত দাশ, সুভাষ সর-

কার, গৌরাঙ্গ দাস, ধীরেশ মুখার্জী মারাত্মকভাবে জখম হন। এদের আহতাবস্থায় 'মৈত্রিকেল' হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর পর থেকে প্রত্যেকদিন এক এক দিন কয়েক দফার সি পি এম কর্মী ও সমর্থকদের গুন্ডাদের আক্রমণের শিকার হতে হয়।

সত্তর সালের পশ্চিমে জুন থেকে তেরোই অক্টোবর পর্যন্ত ন' পাড়ার গুন্ডাদের নেতৃত্বে নেতাজী কলোনীর গুন্ডারা নেতাজী কলোনীর অধিবাসী বিশেষতঃ সি পি এম কর্মী ও নেতাদের জীবন নাশের চেষ্টা করে ঘরবাড়ী ভাঙে ও জিনিষপত্র লুট করেছে। পশ্চিমে জুন রাত দুটো থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই গুন্ডারা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কর্মী শ্রীমতী দীপ্তি ভট্টাচার্য এবং নেতাজী কলোনী কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক, বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় কমিশনার শ্রীশ্রীভদ্র দত্তের বাড়ীতে বোমাবাজি করে ন' পাড়ার উপদ্রব নেতাজী কলোনীতে সম্প্রসারিত করে। পরদিন শ্রীদত্তর ছেলে ছাত্র কর্মী শ্রীপ্রদ্যোৎ দত্ত বধন থানায় উক্ত ঘটনার ডায়েরী করতে যায় তখন পরিচিত গুন্ডা এবং তাদের পরিচালকের নির্দেশে পদাধিকার তাকে থানায় মিথ্যা অজ্ঞহাতে গ্রেপ্তার করে। বনহুগলী হাসপাতাল ইউনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীপ্রশান্ত রায় এই গুন্ডাদেরই ভোজালির আঘাতে পঙ্গু। তাঁকে পাইপগানের গুলিতেও আহত করা হয়। পথচারী কিছুলোক গুন্ডাদের সামনে এসে পড়লে, গুন্ডার দল দৌড়ে চলে যায়। এর পরের দিনই (তেরোই জুলাই) রাত প্রায় বারোটায় আবার দুই গুন্ডা দল দুই ওয়ানগন রেকারে নেতৃত্বে জ্যোতিনগরে গিয়ে হামলা চালায়। সেখানে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীআশু নন্দী, সি পি এম কর্মী শ্রীচন্দ্র ঘোষ ও থোকন নামে একটি বালক বৃগোট বিধ্বস্ত হয়। শ্রীচন্দ্র ঘোষ অবশেষে হাসপাতালে মারা যায়। এরপর আগস্ট মাস থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এসব তথাকথিত রাজনৈতিক সমাজদ্রোহীদের বীভৎস দৌরাণ্ডা অবাধে এবং নিশ্চিতভাবেই বরানগর থানার সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে

অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কার্টার পদার কারখানার প্রাথমিক স্বদেশ দে আক্রান্ত হন, তাঁর বাড়ী ফরোয়ার্ড কলোনীতে। জয়শ্রী সিনেমার সামনে বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅজিত গাঙ্গুলী গুন্ডাদের বোমার আক্রান্ত হন পনেরোই আগস্ট তারিখে। বরানগরের বিশিষ্ট ব্রৈড ইউনিয়ন নেতা শ্রীজ্ঞান মুখার্জীও গুন্ডাদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পান না। ওরা ন' পাড়ার শ্রীকাল্যাণ সাহার দোকানের কর্মচারী সি পি এম সমর্থক শ্রীসুভাষ দত্ত, শ্রীশীতল রায় এবং বনহুগলীর বাসিন্দা শ্রীনৃপেন সাহাকে লোহার রড ও পাইপগানের গুলীতে ক্ষত-বিক্ষত করে। এই ঘটনাগুলো একই দিনে সত্তর সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। বারোই অক্টোবর তারিখে দেশপ্রিয়, নেতাজী কলোনী ও আগরওয়ালা লেনের যুব কর্মী নান্দ মুখার্জী বধন সকাল দশটার অফিসে যাচ্ছিলেন ঐ গুন্ডার দল ভোজালী ও পাইপগান সহ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পরল।

জ্যোতিনগর টেনামেন্ট অঞ্চলে ওরিয়েন্ট জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাথমিক ও ইউনিয়ন সম্পাদক শ্রীবিজয় সাহাকে তাঁর ডিউটি (বেলা দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত) থেকে বাড়ী ফেরার পথে ঐ গুন্ডার দল ডানলপ রিজের কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভি আই পি রোডে খুন করে। ছাত্র ও আর আই সি কর্মী স্বপন নাগ, রুইনা এদের হাতেই খুন হয়। বরানগর পদাধিকার একথা বিলক্ষণ জানে। তারা জানে যে ন' পাড়া অঞ্চলে সি পি এম কর্মী তপন দাশ, শেখর নাগ, রবীন নন্দী এবং সর্বশেষ নারায়ণ তালুকদারকে কারা খুন করেছে। এরা সকলেই শিবপদবাবুর লোক, তিনি একথা অস্বীকার করতে কিছুতেই পারবেন না। নেতাজী কলোনীর হাই-স্কুলের মাঠের বিলের কাছে রাজনীতির সংগ্রব বিজিত নৈনান পাড়ার সত্যেন মিত্রকেও এরা ধরে নিয়েই খুন করেছে। পাশে অবস্থিত পাল-পাড়া ফাঁড়ির পদাধিকার সত্যেন মিত্রকে ধরে নিয়ে যেতে স্বচক্ষে দেখেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। তথ্যভিজ্ঞ

কর্পোরেশন প্রসঙ্গে

আঠারই জুনের দর্পণে (শ্রীমতী?) ইন্সপেক্টর (১) চৌধুরীর চিঠিখানা যেমন সারগর্ভ তেমনি কোঁতুপ্রদ। এরকম পত্র মাঝে মাঝে ছেপে আমাদের আনন্দ বধন করবেন এটাই আপাততঃ আমাদের ঙ্গিস্ত।

কর্পোরেশনের যে অডিট রিপোর্টটি আপনারা ছেপেছেন সেটি যে সময়ের হিসাব সম্পর্কিত তখন কংগ্রেসের গণপরিষদ শ্রী, শঙ্কু বিশ্বাস, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের মত মণিমাণিক্যেরা কর্পোরেশনে মোড়ল করতেন। আরো ছিলেন নন্দদুলাল শ্রীমাণি (পেগাশ-ঘাট খানা বাড়ীর এবং শ্রীমাণি বাজীর অংশিদার); গোবিন্দচন্দ্র দে (শোনা যায় অংশি খানা বাড়ীর

মালিক এবং বিজয় সিনেমা, থিয়েটার এবং বাজারের অংশিদার) প্রভৃতি প্রভৃতি প্রভৃতি। এই প্রাতঃস্মরণীয়দের সকলের নাম দিতে গেলে দর্পণের ক্ষুদ্র কলেবরে কুলোবেন। এঁদের শাসন কালের একটি সরকারী অডিট রিপোর্ট আপনারা ছেপেছেন বলেই কি ইন্সপেক্টর চৌধুরী গোঁসা করেছেন? বাস্তবিক, কাজটা আপনারা ভাল করেন নি। জানেন তো, ইংরেজীতে বলে নোংরা ধূতি প্রকাশ্যে ধুতে হয় না, বিশেষ করে সে নোংরা ধূতি যদি এন্টারপ্রাইজমেন্টের হয়, যে এন্টারপ্রাইজমেন্টের প্রতি ইন্সপেক্টর চৌধুরীর সংগোপন আনুগত্য। এই দেখুন না, আমাদের

বাজারী কাগজগুলো কর্পোরেশন সম্বন্ধে কেমন চুপ করে গেছে। মাসাধিক কাল যাবৎ জলের হাট-কার চলেছে শহর জুড়ে অথচ যে “বাজারগুলা” প্রশান্তদার আমলে পান থেকে চুন খসলেই চেঁচিয়ে আকাশ ফটাত, তাদের জিভ কেমন গলায় ঢুকে গেছে। চাউস ছবি দিয়ে সেখানে এখন নব-মেররের বিদ্যাবস্তার বিবরণ রেরুচ্ছে।

কর্পোরেশনের দুর্নীতিটাকে শাসক ও শোষণ শ্রেণীর সামগ্রিক নীতি থেকে স্বতন্ত্র কিছু বলে জাহির ও প্রতিপন্ন করা ওদের স্বাভাবিক প্রবণতা হতে পারে কিন্তু ইঁসিতা চৌধুরী তার শরিক হলেন কী করে সেটা একটা রহস্য। কেন্দ্রীয় শিল্প লাইসেন্স নিয়ে যে টাকার খেলা হয় তার মধ্যে কাদের হাত?

পাড়ায় পাড়ায় যে-সব বিপ্লবী ও অতি বিপ্লবীদের তথাকথিত চাঁদা আদায় এবং মাথার মূল্য ধরার উল্লেখ তিনি করেছেন তাদের মধ্যে নব কংগ্রেসের কেউ আছেন কি? সারা চাঁদাশ পরগণা জুড়ে যারা ওয়াগন ভাঙে তারা কারা? এদেশের আদালতে যে-প্রণামি এবং থানায় যে “দণ্ড” দিতে হয়, তা কারা জমায়? এর কিছু কংগ্রেসের ভাণ্ডারে যায় বলে যে-জনরব আছে সে কি সত্যি?

কমিশন আজকাল কেবল বকেয়া আদায়কারীরাই পায় না, নগদ আদায়কারীরাও পায় যেমন অজয় সুশীল খেউড় থেকে আমরা এখন জানতে পারছি (দর্পণ অবশ্য আগেই জানিয়েছিল) এবং বিজয় অজয় খেউড় থেকে ভবিষ্যতে

জানতে পারব বলে সংগত ভাবে আশা করতে পারছি।

কর্পোরেশনের দুর্নীতি নিয়ে প্রশান্ত শরের আমলেই দর্পণ সব চেয়ে বেশি খবর ছেপেছে, যথা স্বাস্থ্য-বিভাগের দুর্নীতি, সচিব বিভাগের কার্যবিবরণী ঘটিত কার-চুপি ইত্যাদি। ইঁসিতা চৌধুরী বোধহয় তখন দর্পণের পাঠিকা ছিলেন না।

সরকারের অডিট বিভাগ যে আপত্তি জানিয়েছেন সে সম্বন্ধে শিবদা শ্যামদারা ব্যবস্থা নিলেই তো ল্যাটা ঢুকে যায়। ইঁসিতা চৌধুরী কিন্তু ভুলেও সেদিক মারাননি। ইঁসিতা চৌধুরীকে বাহবা দিতে ইচ্ছে হয়।

জনৈক পাঠক

মুক্তাঞ্চল সম্পর্কে কিছু তথ্য

“সমাজবিরোধী” নকশালদের সম্পর্কে কিছু বস্তব্য অপিনার পত্রিকা মারফৎ পেশ করতে চাই। আমি একজন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই, তবে পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত থাকতে যথেষ্ট আগ্রহী। আমি যে অফিসে কাজ করি সেখানকার প্রায় দুশজন কর্মচারীর সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন ও অন্যান্য ব্যাপারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় “সমাজ-বিরোধী” নকশালদের সম্বন্ধে অন্যতরকম চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি। এই সমস্ত কর্মচারীদের প্রায় সকলেই কোলকাতা ও বৃহত্তর কোলকাতার বাসিন্দা এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতামত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে কতগুলি অবিশ্বাস্য ব্যাপার তাদেরই বিবৃত স্থানীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তারই সার সংকলন করব চেষ্টা করছি। উপরন্তু আপনার পত্রিকার পাঠকদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যত্নে বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমার জানা ঘটনা-গুলির সত্যাসত্য নিরূপিত হয়।

(এক) কোলকাতা ও বৃহত্তর কোলকাতার নকশাল প্রভাবাধিত এলাকাগুলিতে সরকারী প্রশাসন যন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং পার্টির সজাগ প্রহরা ও সক্রিয় সহযোগিতায় শাসন ব্যবস্থা সাধারণ ভাবে এলাকাগত জনগণের হাতে চলে আসছে।

(দুই) পার্টি বিরোধী বা অন্য কোন চরম প্রতিক্রিয়াশীল কাজ-কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার শাস্তি মৃত্যু—এই আইন চালু থাকায় পুলিশ ও আই বি ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীগণের অধিকাংশ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, অন্য অংশ সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়।

(তিন) পকেটমার, ছিনতাই,

সমাজবিরোধীদের অত্যাচার, মদ্য-পান জনিত হট্টগোল, রকবাজদের দ্বারা স্কুল কলেজের ছাত্রী বা অন্যান্য মহিলাদের প্রতি অশ্লীল আচরণ এই এলাকাগুলিতে নেই বললেই চলে।

(চার) এলাকাগুলির সাধারণ মানুষেরাও নিজেদের স্বার্থে এই সরকারবিরোধী পাল্টা শাসনব্যবস্থা আস্তে আস্তে মেনে নিচ্ছেন। মেনে নেবেনই বা না কেন? অনেক রাতে বাড়ী ফিরলেও ঐ এলাকার মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে ঘড়ি বা মাণিক্যগণ ছিনতাই হবার আর ভয় থাকে না। বাড়ীর মেয়েরা এলাকার মধ্যে যেকোন যায়গায় নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারেন এবং রকবাজদের দ্বারা অশ্লীল আচরণে অপমানিত না হয়েই বাড়ীতে ফিরতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা একরাত বাড়ীতে না ফিরলেও রাতে চোর-বদমাস জোর করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকবেনা এই সাধারণ নিরাপত্তাটুকু আছে। এই সাধারণ নিরাপত্তাগুলির অস্তিত্ব ঐ এলাকাগুলি ছাড়া কোলকাতা ও শহরগুলির অন্য কোথাও সামান্য পরিমাণেও নেই। অবশ্য একটি চরম অসুবিধা আছে। সেটি হচ্ছে সি আর পি মিলিটারীর অকস্মাৎ হামলা। সেটাও অন্যান্য নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয় জনসাধারণের গা সওয়া হয়ে গেছে। এমন কি অন্যান্য এলাকায় সাধারণ মানুষেরাও এই এলাকায় উঠে আসবেন কিনা, চিন্তা করতে সুরু করেছেন।

(পাঁচ) স্টেনগান, রিকললেস লাইট মেশিনগান, রাইফেল, বড় বড় মিলিটারী গাড়ী ও ওয়ারলেস ভ্যান নিয়ে সি আর পি মিলিটারীর তিরিশ-চল্লিশ জনের একটা বড় দল ছাড়া বিপক্ষের আর কেউ এই এলাকাগুলিতে ঢুকতে সাহস করে না।

সন্তোষকুমার রায়

জ্যোতিবাবুর সঙ্গে সি আর পি ছিল না

আপনার কাগজের “মতামত” কলামে জনৈক অনিন্দ্য চৌধুরীর বেনামীতে একটি অসত্য ও কট্টাঙ্গ-পূর্ণ চিঠি বারোই জুন সংখ্যায় ছাপা হয়েছে দেখে আমরা স্থানীয় অধিবাসীরা বিস্মিত হয়েছি। ঐ নামে কোনো লোক এই অঞ্চলের আশেপাশেও কোনোদিন নেই।

(এক) প্রথমতঃ দুটো মারাত্মক ভুল। নেতাজীনগরে উন্নতিরশে মে গুলি চলে, তিরিশে নয়। জ্যোতিবাবু আসেন তিরিশে। তাঁর সঙ্গে কোনো পদলিখ ভ্যান সি আর পি ছিল না। আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম তারা দেখিনি। বিতীয়তঃ সি আর পি এসেছিল অর্ধশতের ওপর, গুলি করতে করতেই তারা নেতাজীনগরে ঢোকে। সঙ্গে দুই ডজন উপর গুন্ডা, যারা বাড়ী ঘর লোকজন দেখিয়ে দিচ্ছিল। কোনো কথাবার্তা যুক্তি তর্ক, সার্চ এনকোয়ারী কিছু নয়—গুলি, শব্দ গুলি। এই ছিল ঘটনা।

(দুই) আমি সঠিক জানিনা জ্যোতিবাবু পদলিখ প্রহরায় চলে কিনা। বিপন্ন ধনিকশ্রেণীর পোষা ও নিষক্ত খুনেরদের দীর্ঘদিনের টার্গেট তিনি। তাঁকে সাধারণভাবে রক্ষা করার হিম্মত নিশ্চয় তাঁর

পার্টির আছে—হাজার কয়েক নেতৃস্থানীয় কর্মীকে দিন রাত পার্টি কর্মীরা রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। এটা সকলের বোধগম্য যে অধুনা উন্নততর আন্দোলন ব্যবহার করা হচ্ছে—বিশেষতঃ জ্যোতিবাবুর মত নেতাদের উপর আক্রমণ মামুলি হয়নি, হবেও না। পালি-মেন্টারী রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ, সর্বজনমত সংগঠন প্রভৃতি কাজে যাকে অহরহ ঘুরতে হচ্ছে। তাঁর জীবন রক্ষার কাজে এই রাষ্ট্রের পদলিখই ব্যবহৃত হতে পারে এতে আশ্চর্য হবার বা কুৎসা রটবার মধ্যে যে রাজনীতি আছে তা কংগ্রেসী ধনিকদেরই স্বার্থ পূরণ করে। জ্যোতিবাবু বা তাঁর দল কখনই বলেন নি এখনই সশস্ত্র বিপ্লবের সময় উপস্থিত, রাষ্ট্র-যন্ত্রকে এই মহাহুঁড়ে ধ্বংস কর। তাঁরা পালিমেন্টারী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন, ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, বিপ্লব নিয়ে কোনো ছেলেখেলায় মাতেন নি এখনো।

(তিন) আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে পরলৈখক জ্যোতিবাবুর সি আর পি প্রীতি বা তাঁর “বৈবেক-হীনতা ও ভণ্ডামি” বা ভীরুতার সমালোচনা করেছেন। পুরো চিঠিটা কিন্তু তা নয়। তাঁর আপত্তি জ্যোতিবাবুরই বিরুদ্ধে এবং তাঁর পার্টির রাজনীতির বিরুদ্ধে। পত্রের শেষদিকে পুরানো নকশালী বুলির চোঁয়া ঢেঁকুর তুলে তাই “সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে” শাস্তি দেবার কথা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন।

(চার) এই পরলৈখকের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান, খবর বা অভিজ্ঞতার যা বহর দেখলাম তাতে জানি না তিনি নকশালী তত্ত্বগুলি সব পড়েছেন কিনা এবং কার্যকালে কী হচ্ছে তার সঠিক বাস্তব বিবরণ পাচ্ছেন কিনা। ভারতে বর্তমান স্তরে প্রীকাকুলাম বা নকশালবাড়ীর উপজাতীয় বিদ্রোহ বা অন্যান্য

কয়টি স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বন্দুক লুট, গলাকাটা প্রভৃতি সামগ্রিক ভাবে একটি রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের পরিস্থিতি আদৌ সৃষ্টি করতে সক্ষম কিনা, বা কোনো দেশেই তা হতে পারে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি তত্ত্বমূলক বিষয়গুলির এখন অন্ততঃ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। কলকাতা শহর ও কুমিলগর বা সিউড়ী বা শিবপুর বা উত্তরপাড়ার সর-গুলির আনাচে কানাচে “কৃষি-বিপ্লব” কেমন দানা বাঁধছে, পটকা মারা ও ভোজালী ছোরা ঘোরানো মায়েই তা এসে এখন ঠেকেছে কিনা রাজনীতি তাৎপর্যবহীন নিছক গুন্ডামিতে তারও পরিচয় অধিকাংশ চেতনাসম্পন্ন মানুষের নাগালের মধ্যে এসেছে। তাই এসব কথা নয়।

(পাঁচ) বলতে চাইছি নেতাজী নগর দরদী এই অপপ্রভাবস্ক নকশালদরদী পরলৈখকে। রাজনীতি করলে পুরোটাই বদ্বন্দ। ভারতের প্রধান দ্বন্দ্ব—পঃ বাংলার কে কার বিরুদ্ধে লড়াই। ধনিক প্রতিনিধি কংগ্রেসের সঙ্গে কোন পার্টির লড়াই চলেছে শহর গঞ্জ গ্রাম বাংলায়? নকশালীরা কোথায় অন্য পাড়ার কথা তুলি না। টালি-গঞ্জের চন্ডীতলা লেনের কোণায় কোলকাতা ছেড়ে বহু সংখ্যক নকশালীরা জড়ো আছে; সি আর পি প্রহরায় প্রতিদিন মুর এভিনিউ, চন্ডীতলা বাস স্টপে যাত্রীর উপর আক্রমণ থেকে শুরু করে কংগ্রেসীদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে মিটিং করে প্রতিদিন আজাদগড়, বিবেক-নগর, শান্তি নগর, অশোকনগরে হামলা করা কোন কৃষিবিপ্লবী কর্মকাণ্ড! এতদৃষ্টির শিশুরাও জানে বিজয়গড়-আজাদগড়ের কংগ্রেসী গুন্ডারাই হলো চন্ডীতলার নকশালী সমাজবিরোধী। পদলিখ প্রহরা বোঁদন চলে যাবে সেদিনই হবে এদের পলায়ন, স্থানত্যাগ, যা বিগত দু বছরে বারে বারে হচ্ছে।

প্রণব গুহ

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইন্ডিয়া

প্রেস

৭, সুবোধ মল্লিক কোয়ার
কলিকাতা-১৩

ফ্যাসিস্ট আক্রমণ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিরোধ সংগ্রামের এই সামনের সারির সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আগামী দিনগুলিতে ভারতীয় জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা থাকবে কিনা, না ফ্যাসিস্ট শকুনিদের হিংস্র, কালো বিভীষিকায় দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে,—তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরু দায়িত্বভার পশ্চিমবাংলার লক্ষ কোটি সংগ্রামী মানুষের সবল স্বকণ্ঠে অর্পিত

হয়েছে। পশ্চিম বাংলার দুর্ধর্ষ সংগ্রামী, অকুতোভয় কৃষক শ্রমিক, সংগঠিত শিক্ষক কর্মচারী নারী সমাজ সদপে এগিয়ে এসে রণ-ধ্বনি জ্বলবেন, Fascists shall not pass—“বর্বর ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে আমরা পথ ছেড়ে দেব না”।

এই ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে বিজয়ী জীবন সার্থী হবে, সমৃদ্ধিশালী হবে, মৃত্যু হবে শহীদস্মরণে মহত্তর।

এই কলকাতায়

বীরেন্দ্র মিত্র

মিসেস সিং নিজেই যেন একটা গোটা বিউটি পারলার। এই পারলারগুলির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই যে একটা বিমিশ্র সুবাস ঘ্রাণে-ন্দ্রিয়ে তাঁর আঘাত করে মিসেস সিং-এর উপস্থিতি ঠিক তেমনি একটা সুবাসিত পরিবেশ। ছিপ-ছিপে গড়ন। গালের দুপাশ সামান্য ভাঙা। চোখ উজ্জ্বল আর নাক পাতলা টিকটিকে। মিসেস সিং-এর ঠোঁটের রঙ বাহুল্য মাত্র রঙিন ঠোঁট না ঠোঁটের রঙ, কোনটা বেশি গাঢ় কে বলবে। ফ্যাশন ওকে রঙ মাখিয়েছে, নয়ত প্রকৃতির কোন অকুপণতাই ছিল না।

উত্তেজনার মিসেস সিং-এর নাসারন্ধ্র প্রজাপতির ডানার মতো কাঁপছিল। আমার হাতটা তখনও চেঁপে ধরে আছেন উনি। ‘বস-জান্না না হলে হয়ত শিহরিভ হতাম। এক্ষেত্রে আড়ষ্ট হয়ে আছি। তাছাড়া সমস্ত হল জুড়ে ব্রিদিবকে ঘিরে তখন একটা সংকট দানা বাঁধছে।

আমার কাছে আশ্বাস পেয়ে খানিকটা ধাতব হয়ে আসেন অবশ্য মিসেস সিং।

বলেন, “তোমাদের কলকাতা ঠিক ইংলিশ ফিম্বের টেন্সাস ছবির মতো। যখন বা হোক কিছু ঘটলেই হল। আমি মিঃ সিং-কে মানা করেছিলাম এদেশে আসতে। মোশ্ট আনন্দের সিটি। কৈ কানুন নেই হয়!”

“কিন্তু ব্যাপারটা নেহাতই সাধারণ।” আমি অভয় দেই, “ব্রিদিব সোম, এ নাইস। চমৎকার স্বভাব ওর। একটু যা আমুদে। জনি ওয়াকার ওন্ড স্কচ দেখেই আমাকে বলেছিল, যদি পারিস বোতল খানেক খেয়ে নে।” আমি হাসবার চেষ্টা করি।

সুন্দরী বস-জান্নার মুখে কিন্তু কাঠিন্য একই রকম, বলেন, “তবু সব কিছুর একটা মাথা থাকা উচিত নয়? বিশেষ তোমার বন্ধু যখন তার বসের বাড়ি এসেছে।”

স্ট্রীলোকের মাতব্বরী ভাবটা তার সৌন্দর্য নষ্ট করে। ভদ্র-মহিলার সৌন্দর্য আমার আর আকর্ষণ করছে না। দেখতে পাচ্ছি, তাঁর নাকের দুপাশে ধনুকের মতো দুটো রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রকাশিত হোলো

অনীক

পূর্ব বাংলা সংখ্যা

দাম : এক টাকা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১১ পাঁচ টাকা

জালস নতুন

পিকিং অপেরার বিপ্লবী গীতিনাট্য

দাম : দেড় টাকা

পিপলস বুক এজেন্সি

এক, কিশোর ঘোষ লেন,

পোঃ ষাণ্ডা মুর্শিদাবাদ

কোলকাতায় প্রাপ্তিস্থান :

র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব (কলি-১২)

নিউ বুক সেন্টার (কলি-৯)

অল্পপূর্ণা ফিল (শিয়ালদা)

যে মুখ সুন্দর মনে হয়েছিল, সেই মুখেই এখন স্বেচ্ছাচারিণী গর্বিভা এক নারীর পদমর্ষাদার দম্ভ ফুটে উঠছে। স্লিভলেস ব্লাউজ, নাভি-ছোঁওয়া শাড়ির ওপর আট ইঞ্চি পাতাল দেহ বুক, সমস্তই দৃষ্টি-কটু বোধ হচ্ছে। অথচ ওনার হাতের মতোই আমি বন্দী। আমার কিস্বা ওনার হাত ঘামছে, টের পাচ্ছি। অথচ অসহায় পাখীর মতো এখন আমি নিশ্চেজ।

বললাম, “ব্রিদিব সোমের বন্ধু হিসেবে ক্ষমা চাইছি। আপনি মিঃ সিং-কে একটু বুঝিয়ে না বললে ব্রিদিবের ওপর উনিও হয়ত খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন।”

ঠিক এই সময় ব্রিদিবের গলা শোনা গেল আবার, “মিঃ সিং স্যার! আপনার মর্ষাদর্পণে উপস্থিতির মধ্যে, দেখুন, এরা আমাকে কী ভাবে অপদম্ভ করছে। অথচ আমি ঠিকই আছি। কোয়াইট অলরাইট। ওয়ান মোর পেগ স্লিক্স! শিবু, আমাকে একটা বড় দাও, বড়।”

প্রণব অধিকারী আমার দিকে চোখ টিপল, অর্থাৎ দেখো, চমৎকার মাতালের অভিনয় করছে ব্রিদিব। এছাড়া উপায় নেই। মিঃ সিং-এর কথার পিঠে তার কথা ব্যঙ্গের মতো শুনিয়েছে। এই ভুলের প্রায়-শিষ্ট তাকে মাতাল সেজেই করতে হবে। অন্যান্যরাও সাহায্য করছে ব্রিদিবকে। হাসছে তারা। সমস্ত আবহাওয়াটা হালকা করার জন্যই হাসছে। আমিও হেসে মিসেস সিং-কে বললাম, “ওর এই মাদ্রা-হীনতার জন্য আগামীকাল ও নিশ্চয় আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে যাবে।”

মিসেস সিং আমার হাত ছেড়ে দিলেন। দৃষ্টি তাঁক্ষ। অনামনে লক্ষ্য করছেন ব্রিদিবকে। ঘটনাটা তাঁর কাছে বোধহয় স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। অথচ মিঃ সিং খুব সহজেই ব্যাপারটা হালকা ভাবে গ্রহণ করেছেন। বলছেন, “ওকে আমরা আর এক পেগ দিতে পারি, তোমাদের কেউ সোমকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে তো?”

বাড়ি পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার ওপরেই পড়বে জানতাম। ব্রিদিব ল্যান্ডডাউনে, আমি আরও একটু ডাউনের বাসিন্দা। মিঃ সিং অবশ্য অফিস কার্ডটাই ব্যবস্থা করে দিলেন। ব্রিদিবের জন্য আগেই আমাকেও পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল।

গাড়িতে উঠে ক্ষুধা স্বরে বললাম, “তোমার জন্য অমন তাজা ফিস ফ্রাই ফেলে আসলাম।”

উত্তরে ব্রিদিব একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললে, “জানি, মেরা হনি। মিঃ লাহিড়ীর জন্য মনের সুখে খাওয়াও হল না। তোকে আসছে শনিবারই পেট পুরে ফিস

ফ্রাই খাইয়ে দেব। কিন্তু আমাকে জনি ওয়াকার দেবে কে?”

“সম্ভবত মিসেস সিং!”

“হোয়াট?”

“রেগে টং হয়ে আছেন। গতকাল খুব সুবিধের মনে হল না।”

ব্রিদিব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, “ওসব মেয়েমানুষ ম্যানেজ করতে ব্রিদিব সোমের মাত্র দুটো সপ্তাহ দরকার। বেশ তো হাতে হাত রেখে দুজনে কুজন করছিলে। মিঃ সিং নজর করেছেন বলেই তোমার কাঁধে আমাকে চাপিয়ে পার্টি থেকে হাটতে দিলেন। ঘরের মেয়ে মানু-ষের স্বভাব চরিত্র ব্যাটার বোধহয় ভালোই জানা আছে।”

“যাঃ, কী বাজে কথা বলছিস। এসব লক্ষ্য করার সময় হল কৈ তোর।”

“অসময় বলে ব্রিদিব সোমের ঠিকজুড়ে কোনো অশ্লেষা মঘার অস্তিত্ব নেই। চন্দ্র কর্ণ নাসিকা ইন্ড্রিয়াদি সর্বত্র সমান সজাগ।” ব্রিদিব গলা ছেড়ে হাসছে।

বাস্তবিক ছেলেটা, যাকে বলে, চৌকস।

“কিন্তু মিঃ সিং যদি তোর রিপোর্ট খারাপ করে দেন?” আমার এখনও এই রকম আশঙ্কাই হচ্ছে। ব্রিদিব কিন্তু আমলই দিচ্ছে না, যেন আজকের ঘটনার কোনো গুরুত্বই নেই ওর কাছে।

ও বললে, “কোম্পানীকে আমি কত বিজনেস দিই জানিস? এই বেনের কোম্পানী মানু-ষের চেয়ে বিজনেসটাকে টের বড় করে দেখে। বাজে চিন্তা করিস না। বল, মিসেস সিং-কে কেমন লাগল?”

“আমি মিসেস সোমের কথা ভেবেই তটস্থ হয়ে উঠছি। তোর চোখমুখ বলছে আজ তুই বুক পর্বত পান করেছিস।”

“আজ ঠিক অন্য মর্দিত দেখাবি গ্রীমতীর। গাড়ি থেকে নামলেই বেল ফুলের মালা নিয়ে ডায়ার ডায়ার করে ছুটে আসবে।” ব্রিদিব নিশ্চিন্ত হাসছে। অথচ আমি জানি, পানদোষকে গ্রীমতী সোম কী নজরে দেখেন। দুদিন ব্রিদিবকে পৌঁছে দিয়েছি। মাদ্রাতীরক্ত পানের ফলে যখন ওর মাধ্যাকর্ষণ নড়বড়ে হয়ে যায় তখন জুনিয়র মোশ্ট এই অধমকেই সোম-গহিনীর তাড়নার সম্মুখীন হতে হয়। ব্রিদিব তা জানেও। তবু তার এই নিলিপি আমাকে বিরক্ত করে।

বলি, “না, না, ব্যাপারটা আমার মোটেও ভালো লাগে না।”

“দুনিয়ান্ন অনেক মন্দকেই ভালো লাগিয়ে নিতে হয়। এই যে তুই জার্নালিজম পড়ে ভন্দর-লোক ফেরাওয়ালার চাকরি কর-ছিস, তালুকদার সিভিল ইঞ্জ-নীর, কলকাতার পথে পথে ভারি ব্যাগ বয়ে বেড়াচ্ছে, এসবও তো

মন্দের ভালোর সঙ্গেই সমঝোতা করে চলা। কিন্তু আজ কিছু বলবে না তোর বৌদি। জানে, বসের পার্টি এ্যাটেন্ড করতে গেছি। স্বামীর মদ্যপানে আপত্তি থাকলেও, চাকরির উন্নতি হতে পারে এই সুবাদে স্বাধীরা স্বামীর হাতে এল এস ডি-র মোড়কও তুলে দিতে পারে। স্বামীর থেকে স্বাধীরা টের বড় কোরনারিস্ট, তা জানিস? ও, তুই আর জানবি কি করে? আচ্ছা, বিয়ে কর না? আমার একটি ডাগদুর ডুগদুর শ্যালিকা আছে। বেশ মানাবে।”

বিরক্ত হয়ে বললাম, “সত্যিই তোমার আজ ধরেছে ব্রিদিব। অমন আরাম করে শুওনা, মাথাটা ঝাঁকিয়ে নাও।”

ব্রিদিব শিস দিচ্ছে।

বললাম, “মিঃ লাহিড়ীর কথায় অতটা উত্তেজিত না হলেও চলত। শূদ্র শূদ্র...”

“শূদ্র শূদ্র? শালা, হিম্মৎ দেখতাম যদি লাহিড়ীকে কলকাতায় বসিয়ে বদলীর অর্ডার দিত। লোকটাকে আলোচনার নামে দিল্লী নিয়ে গিয়ে খতম করলে। এই হল এদের মুরোদ, বুকালি, কলকাতাকে এরা ভয় পায়।”

“কিন্তু মিঃ লাহিড়ীকি সত্যিই সেলস ওয়াকার্স? দুনিয়ন করতে গেছেন?” কৌতুহলী মনের প্রশ্ন তুলে ধরি আমি।

ব্রিদিব মাথা নাড়ে, “ও শূওর! শেষ পর্বন্ত মিঃ লাহিড়ীর সেটাই ছিল উদ্দেশ্য। লাহিড়ী বলতেন, ব্রিদিব, সেলসের চাকরিতে আজ-কাল তবু কিছু সুখের মুখ তোমরা দেখছ; একটু সুটেড-বুটেড হচ্ছে। আমাদের বড় দুঃখের জীবন কেটেছে। মাসের শেষে বিজ-নেস কোটা পূরণের জন্যে জীবনে কতরকম হিউমিলিয়েশন, অপমান, আর অসততার মধ্যে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছি। বাজারও তখন এমন প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। চাকরী গেলে দোসরা জায়গায় আর একটা কাজ জোটানোর আশা ছিল না। মালিকের মনোরঞ্জে তাই নিজের ব্যক্তিসত্তাকেই বেচে দিয়েছি। বুক ভরা বন্দগা জমা হয়ে আছে। আমি চাই, তোমরা নিজের শক্তিতে সংহত হও।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, “এখনো জানি না, সেলস লাইনের ঝুটিনাটি। তবে আমারও সন্দেহ হয়, এই সুট-বুটের নিচে আমাদের সত্তা প্রতিদিন কুঁকড়ে যাচ্ছে। দিনান্তে কতগুলি অপদার্থ লোককে বিজনেস গছানোর জন্য “স্যর” “স্যর” করি। কতরকম বাজারী দুর্নীতির সঙ্গে রোজ করমর্দন করতে হয় আমাদের। বাস্তবিক ব্রিদিব, তার মধ্যে অনেক সময়ই কৈশোর বোনের স্বপ্ন-সাধ মেলে না। এক এক সময় নিজেকে অপরিণত মনে হয়। যে নারী তার বোঁবন বেচে খায়, আর যে পুরুষ তার ইচ্ছা সাধ স্বপ্নকে বিক্রী করে, এ দুয়ের মধ্যে তো তফাৎ নেই। তবু গণিকাকে ঘৃণা করে মানু-ষ।” একটা দীর্ঘশ্বাস

আমার অজান্তেই শহর কলকাতার বিষাক্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। মিশে মিশে একাকার হয়ে যায়।

ব্রিদিব হাসে, “স্বপ্ন বাস্তবের দ্বন্দ্ব এখনো কিছুই টের পাওনি বন্ধু। পাবে। লাহিড়ীরও বোঁবন ছিল, স্বপ্ন ছিল। লাহিড়ী বলতেন, আজকের এই “আমিটা” তো একটা চামড়া ঢাকা মৃত বাছুরের মতো। জীবিত লাহি-ড়ীকে কোম্পানী নিশ্চুর গোলা-লার মতো কবেই খুন করেছে। ষ্ট্রাজেডী এই, অমৃত ওরাও পান করে না, আমাকেও পান করতে দেয়নি।”

“তাহলে মিঃ লাহিড়ী দুনিয়ন বানিয়ে তারই প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন?”

“র্তিনি অত ভদ্র মানু-ষ নন! তোদের মতো সাজিয়ে গুঁছিয়ে মেজে ঘষে প্রতিবাদ করেন না। কথা বলতে-গিয়ে তাঁর চোখ জ্বলত। তিনি বৃকের মাত্রখানে আগুনের ফালা ঝুঁটিয়ে বলতেন, প্রতিহিংসা কাকে বলে জানো ব্রিদিব? জ্বলছে, এইখানে তা জ্বলছে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার শক্তি নেই, অন্তত প্রতিবাদ করার সাহস যাতে থাকে, তার জন্য একটা দুনিয়ন কর, একটা সংগঠন চাই। ব্যক্তিগত স্বার্থসিঁদ্বর জন্য মিঃ লাহিড়ী কোনো সেলস ওয়াকার্স দুনিয়ন চাননি।”

বললাম, মিঃ লাহিড়ীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ব্রিদিবের। ব্রিদিব সাহসী। তাছাড়া সে নিজের মূল্য সম্পর্কে সচেতন। এমন একটা ছেলে তার শ্রদ্ধের অপমান সহ্যে না পেয়ে নোতুন এরিমা ম্যানেজার মিঃ সিং-এর অপব্যথার প্রতিবাদ করেছে তাঁক্ষ ব্যঙ্গের ছলে। সবার মধ্যে ব্রিদিব সোমকে তাই কি আমার আলাদা করে ভালো লেগে-ছিল? আমি নিজে স্বভাব-নরম, কিন্তু সত্যকার দৃষ্ট বোঁবন দেখলে কার চোখের মণি না শ্রদ্ধায় সজল হয়। শ্রদ্ধেকে আমরা ভালোও বাসি, তার কারণ, সে যে আমাদেরই বার্থ বাসনার সাক্ষর শারীর রূপ। সে আমাদেরই সত্তার অংশ। তার মধ্যে আমরা আমাদের অল্প বাস-নার ভূঁপ্তি ঝুঁজে পাই।”

এক সময় ব্রিদিব ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, “লাহিড়ীর জন্য মাঝে মাঝেই খুব ভয় করে আমার।”

“ভয়!” ভয়ানক কণ্ঠেই উচ্চারণ করি শব্দটা। যা দিনকাল, ভয় আমাদের আশ্বেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। চাকরি খোওয়ানোর ভয়, অনশনের ভয়, মিথ্যা অভিযোগ মিথ্যা শাস্তির ভয়, মিথ্যা অপবাদের ভয়, গুরুত্ব ঘাতকের ভয়, অকারণ অপমৃত্যুর ভয়।

“লাহিড়ীকে হয়ত বদলী করেই চুপ করে থাকবে না ওরা, মারবে!”

“সে কী! খুন।”

“দূর বোকো! শব্দকে বারো খুন করে তারা দুর্বল, কাপুরুষ। শব্দকে বাঁচিয়ে রাখার, তাকে বিজিত (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

গণ-আন্দোলনই একমাত্র পথ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে। সংকট কোয়ালিশন সরকারের শরিকদের মধ্যে। বিজয় সিং নাহারের নেতৃত্বে নব কংগ্রেস আর ভাঙ্গা বাংলা কংগ্রেসের অজয়বাবু ব্যবস্থা পাকা করেছেন সি পি এমের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমন নীতির। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এ ব্যাপারে পূর্ণ সম্মতি আছে।

ফাঁপরে পড়েছে সি পি আই। কারণ ভারতের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সি পি আই-নব কংগ্রেসকে সমর্থনে চুক্তিবদ্ধ। অথচ ঐ চুক্তি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে সমর্থন করার অর্থ রাজনৈতিক দল হিসেবে সি পি আইয়ের বিলুপ্তি। আর তাছাড়া যে হিংসার রাজনীতির দ্বারা বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কংগ্রেস ধ্বংস করতে বন্ধপরিষ্কার তাতে সি পি আই অক্ষত থাকতে পারে না।

গত সপ্তাহে এই পার্টির রাজ্য কাউন্সিলের দুদিন ব্যাপী সভা হয়ে গেছে। সেখানে পার্টির এই সংকটের কথা আলোচিত হয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে নাহার পরিচালিত অংশ প্রগতিশীল নয় বলে সি পি আই মনে করে। আবার প্রভাবশালী শ্রবক দলের বেশ কিছুটা অংশ সমাজ বিরোধীদের কঙ্কায়। এই কংগ্রেসকে সমর্থন সি পি আইয়ের পক্ষে দরুহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অন্যদিকে সি পি এমের হিংসাত্মক রাজনীতি সম্পর্কে সি পি আইয়ের মধ্যে কোন স্বেমত অথবা সন্দেহ নেই। কিন্তু সি পি এম বিরোধিতায় সি পি আই সংগঠন দুর্বল হয়েছে এবং পার্টির প্রভাব অনেক কমেছে। এ সম্পর্কে সি পি আই রাজ্য কাউন্সিলে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না।

রাজ্য কাউন্সিল খালি মনে করে যে, কেবলমাত্র সবল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই পার্টিকে সজীব করা যায়। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে রাজ্যের সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে। খুনোখুনি প্রবল।

তাই এক টিলে দুই পাখি সি পি আই মারতে চেয়েছে অজয় মুখার্জীকে দিয়ে সর্বদলীয় আলোচনা সভা আহ্বান করে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আলোচনার অজুহাতে। সি পি আই একদিকে নব কংগ্রেসের পাড়ায় পাড়ায় ঠাণ্ডাঘাড়ে বাহিনী গঠনের কর্মসূচী বানচাল করতে চায় আর অন্যদিকে হয় সি পি এমকে একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চায়, না হলে সি পি

এমের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চায়। কিন্তু ফল দাঁড়িয়েছে উল্টো। অজয় মুখার্জীর সর্বদলীয় সভায় নিমন্ত্রণ সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সি পি এমের জ্যোতি বসু বলেছেন এই সভায় আমরা যেতে পারি না কারণ আমরা মনে করি সরকার এই খুনোখুনির রাজনীতির জন্য দায়ী এবং এই রাজনীতি আমাদের বিরুদ্ধেই নিয়োজিত। প্রমাণস্বরূপ জ্যোতিবাবু বলেছেন যে, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মোট চারশো খুন হয়েছে, তার মধ্যে অন্ততঃ নবুই জন সি পি এমের সদস্য অথবা সক্রিয় কর্মী।

গত মঙ্গলবার (বাইশে জুন) সরকারের সমর্থক শরিকদের সভা হয়ে গেছে। সেখানে কংগ্রেসের মধ্যে উল্লাস লক্ষ্য করা গেছে। সি পি এমের সর্বদলীয় সভা করার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান কংগ্রেসকে উজ্জিসিত করেছে, কারণ কংগ্রেস ভাবছে এইবার তারা বিনা বাধায় পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ বাহিনীর নামে ঠাণ্ডাঘাড়ে বাহিনী গঠন করতে পারবে।

এই বাহিনী গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস বাদে অন্য কোন শরিকই একমত হতে পারেনি। যেমন পি এস পির (বিদ্রোহী) স্বরাজবন্দু ভট্টাচার্য জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া আজকের সমস্যার কোন সমাধান হতে পারে না। সি পি এম হিংসাত্মক এ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি নকশালী হত্যাকাণ্ড ও সমাজ বিরোধীদের দৌরাণ্যের কথা ভুলেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই সমস্ত নকশালী ও সমাজ বিরোধীদের কোয়ালিশনের কোন কোন প্রভাবশালী শরিক প্রণয় ও প্ররোচনা দিচ্ছে। তাঁর মতে, একথা পরিষ্কার রাখা দরকার যে, নকশালীরা সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রু এবং তত্বদর ব্যাহিত্যের রাজনীতির ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্বরাজবাবু তাঁর নিজের অশোকনগরের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন। সেখানে গত এক বছর ধরে সি পি এম-নকশাল সংঘর্ষে বহু হত্যা হয়েছে, জনসাধারণের জীবন পর্যুদস্ত, আর বহু শান্তিপ্রিয় নাগরিক এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। অতিষ্ঠ হয়ে শেষে সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছে হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়তে। এলাকা কমিটি গড়ে উঠেছে এবং তার মধ্যে সি পি এম নকশাল কাউকেই নেওয়া হয়নি। এই কমিটি ব্যাপক প্রচার করেছে, ফলে সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরে

এসেছে, অন্যত্র আশ্রয় নেওয়া মানুষ আবার নিজগৃহে ফিরে এসেছে, আর হত্যা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। এই রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন পালা হিংসার প্রয়োজন হয়নি। এই সৃষ্টি দিয়ে স্বরাজবাবু কংগ্রেসী প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণিশের পাড়ায় পাড়ায় সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গঠনের বিরোধিতা করেন। স্বরাজবাবুর এই অকাটা সৃষ্টির বিরোধিতা করার সাহস, সামর্থ্য বা তথ্যগত সম্বল অন্য কোন শরিক দলের প্রতিনিধির ছিল না।

স্বরাজবাবুর বক্তৃতার পরেই দেখা গেল কংগ্রেসের বিজয় সিং নাহার এবং প্রতিমা বসু, সি পি আইয়ের বিশ্বনাথ মুখার্জী ও মহম্মদ ইলিয়াস সভা ছেড়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই কোন সিদ্ধান্ত না নিয়েই কোয়ালিশন শরিকদের সভা শেষ হল।

সভা শেষে অজয় মুখার্জী উদ্বেজিত অবস্থায় রিপোর্টারদের বললেন, “রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার

অবস্থা প্রশাসন ও পূর্ণিশের আশ্রয়ের বাইরে, তবে সরকার অবস্থার উন্নতিকল্পে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিষ্কার।” ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ থেকে মুখ্যমন্ত্রী কেবলমাত্র পূর্ণিশী ব্যবস্থার কথা বললেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনাই তাঁর কাছ থেকে শোনা গেল না।

এদিকে ইউ এল এফ এবং ইউ এল ডি এফ শরিকদের শলাপরামর্শ শব্দ হয়েছে সি পি আইয়ের প্রাথমিক প্রচেষ্টার। সি পি আইয়ের বিশ্বনাথ মুখার্জী ও গোপাল ব্যানার্জী সি পি এম নেতাদের সঙ্গে নিজদের উদ্যোগে দেখা করেছেন এবং স্বীকার করে এসেছেন যে, কংগ্রেসী রাজত্ব গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই আন্দোলন প্রসারের মাধ্যমেই কেবলমাত্র খুনোখুনি বন্ধ হতে পারে।

এখন প্রচেষ্টা চলছে কি করে অন্যান্য সমস্ত বামপন্থী দলগুলো একত্রিত হয়ে সরকারকে চাপ দিতে

পারে। এই প্রচেষ্টায় সাফল্য নির্ভর করে সি পি আইয়ের দৃঢ়তার ওপর। এই দৃঢ়তা কিন্তু সরকার পক্ষের সমর্থন সংগ্রহের নীতিতে পরিলক্ষিত হয় না। সি পি আই মনে করে যে, জনসাধারণের মধ্যে সরকারের প্রভাব কমে আসছে, তাই প্রশাসন এবং পূর্ণিশ যতটা পরিমাণ সি পি এম বিরোধিতা করা দরকার ততটা করে না। সেইজন্য সি পি আইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি ত্রিদলীয় সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে সরকার পক্ষে সমর্থন বাড়ানোর জন্য এবং এই কারণে সভা ও মিছিল সংগঠনের জন্য। কমিটির সদস্য : প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (নব কংগ্রেস), বিদ্যুৎ বসু (বিদ্রোহী পি এস পি) এবং অজয় দাশগুপ্ত (সি পি আই)। এই কমিটির উদ্যোগে সরকারের সমর্থনে প্রথম সভা ও মিছিল দুবে কলকাতার ময়দানে এবং বিধানসভার সামনে আগামী আঠাশে জুন।

সরকারের প্রায় সব দপ্তরেই মন্ত্রীদের স্বজনরা চাকরী পাচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এই পরিষ্কার পাঠকদের জানা আছে, পশ্চিমবঙ্গে যত ফ্রন্ট আমলের পি এস পি মন্ত্রী শ্রীসুধীর দাস অল্প কিছু দিন গদীতে বহাল থেকে কি ভাবে স্বজন বংশল হওয়া যায় তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন।

যে কোন দিন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার আয়ত্ন শেষ হয়ে যেতে পানে—এই ভয় প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রীর মনে রয়েছে। সেজন্য “যে কদিন আছি গৃহীত্বের নি” এই মন নিয়ে যেখানে নিজের লোক আছে তাদের কিছু পাইয়ে দেওয়া এখন এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।

এ ব্যাপারে সব চাইতে কর্তৃত্বকর্মী লোক হলেন পুনর্বাসন মন্ত্রী। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের নামে নিজের দলীয় কর্মী ও বন্ধুবান্ধবের পুনর্বাসনই এর এখন প্রধান কাজ দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে ইনি পাঁচ জনকে নিয়োগ করেছেন একথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

জর্নেক এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর সহী করা সাইক্লোস্টাইল করা নিয়োগপত্রগুলি পাইকারী ভাবে ছাপিয়ে মন্ত্রী মহাশয় নিজের কাছে রেখেছেন। তিনি “প্রয়োজনীয়” লোককে নিয়োগপত্রটি দিয়ে দেন।

কৃষ্ণনগরের নাগর এস এস পির সবেধন নীলমণি শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ইতিমধ্যে আট জন বংশবদকে সরাসরি নিয়োগ করেছেন হরিণঘাটায় সরকারী ফার্মে। সরকারী

নিয়োগপত্র রাজস্ব মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের ফলে স্থগিত রাখা হয়েছে এ সংবাদও আগে প্রকাশ হয়েছে।

কয়েকটি জেলায় বিশেষ করে মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও হাওড়া ও হুগলী জেলার প্রধান কর্মচারীরা অতি গোপনে মন্ত্রীদের “নির্বাচিত” প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দিয়েছেন।

খাদ্য দপ্তরে কয়েকশত কর্মচারীকে কিভাবে নতুন করে নিয়োগ করা যায় তার জল্পনা কল্পনা চলছে। অথচ এই দপ্তরে অনেকদিনের পুরানো বোয়াল কর্মী প্রমোশনের বোয়াল আছেন। তাঁদের দাবী উপেক্ষা করে সরাসরি নিয়োগ করার কথাবার্তা উপর মহলে চলছে।

প্রাথমিক শিক্ষকরা নিয়মিত মাইনে পান না তাঁদের মাইনে হাতে হাতে পৌঁছানোর জন্য এক হাজার কর্মীকে নেওয়া হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারেও দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য পাচ্ছে।

পূর্ণিশ দপ্তরে অবশ্য কংগ্রেসী এম পি এবং এম এল-এদের সুপারিশ মানা হচ্ছে। মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়ের উপর এবার ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

দেশে বেকারী আছে। কিন্তু সেই বেকারী রোধ করতে হলে একটি সুপারিকল্পিত নীতি থাকা চাই। নিজদের পেটোরা লোকদের চাকুরী পাইয়ে দিলে এর সমাধান ত হবেই না বরং প্রশাসনিক অচল-অবস্থার সৃষ্টি হবে—একথা বলেছেন সম্প্রতি রাজ্য কর্মচারী সমিতির কো-অর্ডিনেশন কমিটির জর্নেক মুখপাত্র।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি লিখে কমিটির তরফ থেকে এই ধরনের নিয়োগ করার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

বীরভূম নকশাল দলের যুক্তাঞ্চলে

বর্তমান বণকৌশল অনেক ব্যাপক ও তুচ্ছ

MODERN BOOK STALL
Agent- BETAR JAGAT
KANTHADHAR
P.O. Ichapur, Nawabganj
24 PARGANAS

দপ্পন

১৪শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা ১১ শ্রবণ ২রা জুলাই ১৯৭১ ১১ দি ৩০ পয়সা

কোয়ালিশন সরকার ভাঙ্গার নেপথ্যে

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর নতুন চিন্তা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আবার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হল। শেষ মর্হুত পশ্চিম অজয় বিজয় চক্র চেষ্টা করেছিল এই প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। কিন্তু যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ এবং কায়মী স্বার্থের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অজয়-বিজয় চক্রের হাতে এই রাজ্য রাখার পক্ষপাতী নয়।

চক্রের দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে, আর তাছাড়া যে সমস্ত পদ্ধতিতে রাজ্যের রাজনীতিতে ওদের অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় তার অনুকূল পরিবেশ ছিল না বলে এখানকার কায়মী স্বার্থ মনে করে।

কোয়ালিশন সরকার এবং তার রাজনৈতিক পরিচালনায় কয়েকটি পার্টির কো-অর্ডিনেশন কমিটি অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে। কারণ চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত রাজনৈতিক পক্ষের সমর্থন সরকার এই কমিটির সদস্যদের। সমর্থনের পূর্বে প্রয়োজন আলোচনার। এখন যে পরিস্থিতি তাতে সরকারী ব্যবস্থার এবং দ্রুত কর্মপন্থার কোন সরকার বহির্ভূত কমিটির আলোচনার সুযোগ আছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে না। তাই অবিলম্বে কোয়ালিশন সরকার ভেঙে দিয়ে সরাসরি (শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

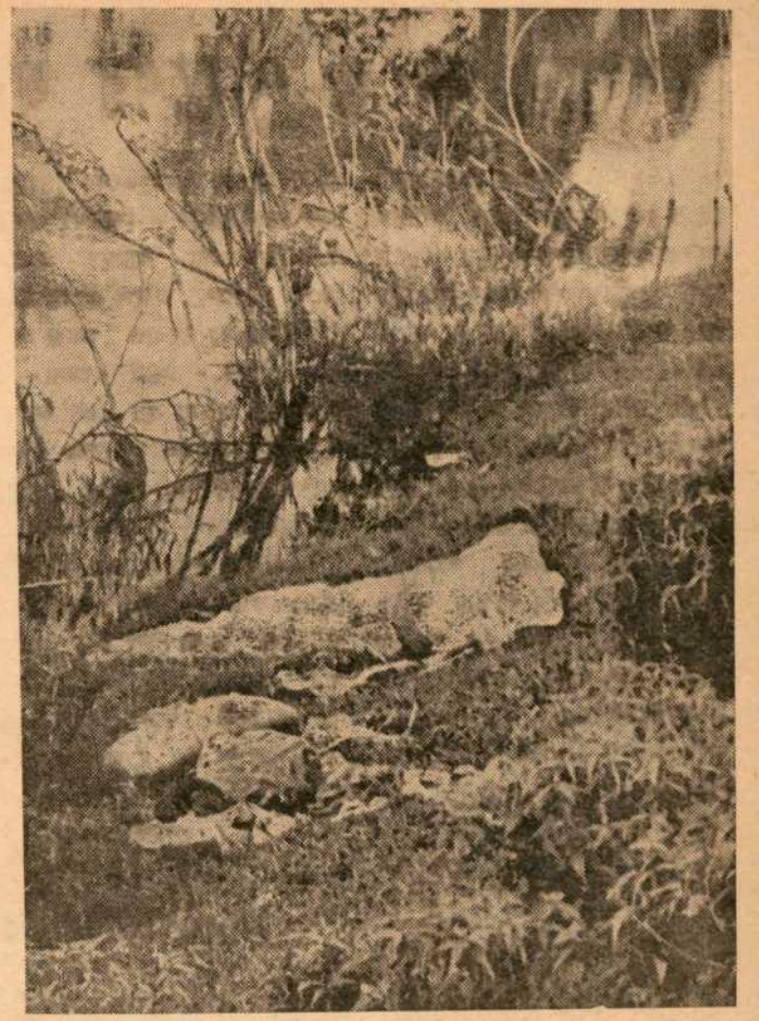
(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

নকশালবাড়ীতে যে মাওবাদী আন্দোলনের উৎপত্তি ও পরবর্তী-যুগে যে আন্দোলন চূর্ণ হয়ে গেছে মেদিনীপুরের ডেবরা ও গোপী-বল্লভপুরে সেই আন্দোলন নব-মূর্তি নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করেছে বীরভূম জেলায়।

এবারের আন্দোলন ব্যাপকতা ও সংগ্রাম কৌশলের দিক থেকে একটি উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দেয়। এবারের সংগ্রাম-কৌশল হল পদলিখী শ্বেতদ্রাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক এবং প্রয়োজন-বোধে নির্মম লাল দ্রাস। কোন ক্রমেই এই আন্দোলনকে নেতারা সংশোধনবাদী জমি বন্টনের ব্যাপারে নিয়ে যেতে দেবেন না। পাঁচটা লাল কতৃষ্ণ গড়ে উঠবে মজাগুলে। এই কতৃষ্ণের বিরুদ্ধে বলে যাদের মনে করা হবে তারাই খতমের তালিকা।

তাই এতদিন পর্যন্ত যারা খতম হয়েছে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন শ্রেণীতে তা বিচার করলে খতমের দর্শন বোঝা যাবে না। সংশোধনবাদ অন্যতম প্রধান শত্রু আর মানুষের আস্থার প্রয়োজনে প্রথম পর্যায়ে কিছু মাত্রাতিরিক্ত দ্রাসের প্রয়োগও হয়ত দরকার।

গত তিনমাসে হত্যার সংখ্যা দেড়শ জনের মত। হত্যা কৌশল কোন কোন সময় গণফৌজের বিশেষ ইউনিট দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। যারা খতম হয়েছে তাদের অনেকেই হয় রাজনীতির দিক থেকে সংশোধনবাদী, নয়ত অর্থনৈতিক জীবনে তারা ঘৃণ্য। ব্যাপক হত্যার ফলে জেলার অনেকাংশ থেকে বহুলোক



শিকারপুর রোডের দুধারে কিছুদূর অন্তর কলেরা রোগীদের শেষ শয্যা আজও দেখতে পাওয়া যায়।
ফটো : শ্যামাদাস বসু

পালিয়ে চলে গেছে। সেইসব এলাকায় লাল কতৃষ্ণ গড়ে উঠেছে।

জেলার বর্জ্যেয়া শিক্ষা ব্যবস্থা কোর্টকাছারি আর অন্যান্য সমস্ত কাজ কারবার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। রাতে ব্যাপক অশুভ শোনা যায় বহুকন্ঠের নিনাদ “মাও সে তুং লাল সেলাম, সি পি (এম এল) জিন্দাবাদ”।

পদলিখ তার বহু রিপোর্টে জানিয়েছে যে জেলার বহু জায়গায় তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের লোকেরা ভয়ে ঐ সব অশুভে যেতে চায় না। এখন প্রায় ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, হত্যার বা অন্যান্য আইনবহির্ভূত কাজকর্মের বিরুদ্ধে কোন পদলিখী ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তার ফলে লাল কতৃষ্ণ গড়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি

হয়েছে। আন্দোলনের যারা নেতা তাদের অনেকেরই অন্যান্য এলাকায় সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আছে। আর গণফৌজের সক্রিয় অংশে আছেন বহু এলাকায় হত্যায় ও দ্রাস সত্ত্বেও অভিজ্ঞ তরুণের দল।

নকশালবাড়ী, ডেবরা ও গোপীবল্লভপুরে যে ভুল ওদের আন্দোলনে হয়েছিল সেই ভুল ওরা সংশোধন করার চেষ্টা করছেন।

এখনও কিন্তু জানা যায় নি কি ভাবে ওরা উন্নততর শ্বেতদ্রাসের মোকাবিলা করবেন। শ্রীকাকুলামের আন্দোলনে সংগ্রামী চাষীর দৃঢ় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও সেখানকার আন্দোলন পদলিখ মিলিটারীর ষোথ আক্রমণ গর্ভিত হয়েছিল।

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসীবাদের পদধ্বনি

অথচ বামপন্থীদের যুক্ত আন্দোলনের উদ্যোগ ব্যর্থ

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

যুক্ত বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলে দ্রাস ও ব্যক্তি হত্যা রাজনীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত ও প্রতিরোধ সৃষ্টির প্রচেষ্টা প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যর্থ হয়েছে।

বামপন্থীরা ঠিক যে ভাবে ১৯৬৯ সালে যুক্ত ফ্রন্ট ভেঙেছিল সেই একই কায়দায় যুক্ত আন্দোলনের বিরোধিতা করছে।

এই সুযোগে ফ্যাসীবাদ তার পরিচিত রূপ নিয়ে দলিত বিকশিত করে এগিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নিজের কতৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করতে।

হত্যা ও দ্রাসের ব্যাপকতায় সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ, প্রচলিত

রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রায় দেউলিয়া, কলকারখানা বন্ধ, বেকারীর ভয়াবহরূপ, দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক হতাশা, বুদ্ধিজীবী-বিরা নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয়।

আর অন্য দিকে বর্জ্যেয়া ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন তার আগেকার সাংগঠনিক সংকট সাময়িকভাবে হলেও কাটিয়ে উঠেছে। এই শাসন এখন পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা বোধ করছে। তাই সরকার হলে ফ্যাসীবাদী কৌশল প্রয়োগেও ওরা পেছপা নয়।

বামপন্থীরা ইতিহাসের অনেক নজীরের কথা জানেন। কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গিতে ঐতিহাসিক

দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিচয় এখনও দেন নি।

কোয়ালিশন সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বা আগের মর্হুত থেকে সূর্য্য হয়েছে ব্যক্তিহত্যা ও দ্রাসের বিরুদ্ধে যুক্ত মোর্চা গড়ে তোলার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিভেদ ছাড়া আর কোন নতুন আশার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

সি পি এম তার বড় পার্টি-সুলভ মনোভাব নিয়ে বসে আছে, আর অন্যান্য সমস্ত পার্টিকে প্রায় কংগ্রেসী দালাল আখ্যা দিয়ে আত্মসন্তোষে মগ্নগুল। তারা ঠিকই বুঝেছে যুক্ত আন্দোলনের ভিত্তিতেই অবস্থার মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু কোন পর্যায়ে তাকে কৌশলের দিক থেকে নেমে আসতে হবে তা বুঝতে পারছে না।

সি পি আই কংগ্রেসকে ছাড়া (শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধার্থ রায় এবার মুখোমুখি লড়াইয়ে নামছেন

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গের সমস্যার সঙ্গে শ্রীবজয় সিংহ নাহারকেও মোকা-বেলা করতে শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় পশ্চিম বঙ্গের জমিতে ফিরে আসছেন। শ্রীনাহার ও শ্রীরায়ের মধ্যে পরোক্ষ সংঘর্ষ চলাছিল অনেক দিন। এইবার সেই সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ রূপ নেবে। শ্রীরায় দিল্লীতে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার পর শ্রীনাহার কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আরো নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ডাঃ দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিল্লী চলে যাবার পর। কিন্তু শ্রীনাহার শ্রীরায় ও শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে দিল্লী পার্টি-

য়েও শান্তি পান নি, কারণ ছাত্র পরিষদ আর যুব কংগ্রেস ফিঙের মত পিছনে লেগেছিল।

শ্রীনাহার এই কথাও জানেন ছাত্র ও যুব কংগ্রেসের বাহান্তর ঘন্টার চরম পরের পিছনে কয়েকটি অদৃশ্য হাত ছিল। শ্রীনাহার তার নেতৃত্বের মন্ত্রিসভা পাঁচ বৎসর চলেবেনা এবং যে কোন দিন ভেঙে যেতে পারে বুঝেই কোনমতেই রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি পদ ছাড়েন নি। কারণ ভবিষ্যৎ নির্বাচনে দলীয় ব্যক্তিদের টিকিট বন্টনে (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

বর্ধমান খুন ও পুলিশের অ্যাকশন স্কোয়াড

১৯৭১ সালের জানুয়ারী হইতে মে মাসের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত দশটি নৃশংস খুন বর্ধমানে অতি সুপারিকল্পিত ভাবে সংঘটিত হয়। এবং বর্ধমান সদরে পুলিশের একাংশ এই পরিকল্পনার পিছনে জড়িত আছে বলিয়া গোপন সূত্রে আমরা খবর পাইয়াছি। বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীভবতোষ রায় এবং স্বদেশী আন্দোলনের নেতা শ্রীশিব-শঙ্কর চৌধুরী ওরফে কালোদার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বর্ধমান পুলিশের অ্যাকশন স্কোয়াড জড়িত আছে। অ্যাকশন স্কোয়াড-এর সভাপতি একজন আই পি এস অফিসার। কার্যকরী সদস্যদের মধ্যে একজন সদ্য প্রমোশন প্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেকটর, একজন সদ্য প্রমোশন প্রাপ্ত দারোগা এবং ড্রাইভার ও একটি পুলিশ জীপ নং ডাবল্লু বি পি ২৭১৩ নিযুক্ত করা আছে।

এদের ট্রেনিং কার্যস্থল বর্ধমান হইতে এক মাইল দূরে একটি সরকারী প্রাসাদ। এবং এই প্রাসাদ সি আর পি হারিয়ানা পুলিশ অথবা অন্য রাষ্ট্রের পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করা আছে। এখানে পশ্চিম বাংলার কোন পুলিশ কর্মীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এই প্রাসাদে একটি ঘরে একটি কাল বোর্ড পূর্ব দিকে রাখা আছে এবং পার্শ্ব আর একটি বোর্ড সমস্ত সংকেত ও মানচিত্র দ্বারা নির্দেশ একে দেওয়া আছে। এখানে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাত-আট জন কার্যকরী সদস্যদের

ট্রেনিং দেওয়া হয়। এদের প্রত্যেকের কাছে দেশী ও বিদেশী একটি করে রিভলবার আছে। একটি বিশেষ পুলিশী জীপে এদের সহর হইতে তারের ঘেরাও দ্বারা শহরের বাহিরে নিয়ে আসা ও পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। এই বিশেষ পুলিশী অ্যাকশন স্কোয়াড একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে মনুচুট করিবার জন্য।

এইসব হত্যাকাণ্ডের বিনিময়ে এরা একটি বিশেষ রাজনৈতিক পার্টিকে ব্যাকমেলিং করে রাষ্ট্রপতির শাসনের পর থেকে মাসিক তিরিশ হাজার টাকা করে শহর থেকে বেআইনী মুনাকা আদায়

রাজনৈতিক দলকে ব্যক্তি মেলিং করিয়া মাঝে মাঝে শেম সাইড করিয়া কংগ্রেস কর্মীদের খুন করিয়া কংগ্রেস কর্মীদের উত্তেজনা বাড়াইয়া দেয়, যেমন একুশে মে তারিখে পোষ্ট অফিসের সামনে দীপক অধিকারীকে খুন করা হয়। ইনি বিশিষ্ট আইনজীবী ভবতোষ রায়ের খুনের রহস্য জানিতেন।

নিচের প্রশ্নগুলিতে এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে (এক) বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীভবতোষ রায়কে সদর থানার পিছনে প্রকাশ্য দিবা-লোকে বেলা দশ ঘটিকার সময় গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। তখন

মতামত

করছে। এর মধ্যে ওয়াগন ব্রেকার-গণ দৈন্য মাসিক দশ হাজার টাকা, প্রকাশ্য রাজপথের উপর ইসকিল গেমের নম্ব করে কাটা ও কাঁড়ি থেকে পাঙ্গা মাসিক তিন হাজার টাকা, বেশ্যাবাড়ী, মোটরগাড়ী চেক, হোটেল চেক, বেআইনী মদের দোকান (পঞ্চাশটি) ইত্যাদি থেকে পাঙ্গা প্রায় মাসিক ছয় হাজার টাকা এবং বাকী টাকা রাজনৈতিক খুনের নীলাম থেকে পূরণ করা হয়। এই সমস্ত ঘটনার প্রকাশ্য তদন্তের চ্যালেঞ্জ রাখছি। এই ভাবে এই অ্যাকশন স্কোয়াড নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য এবং একটি

সদর থানার বড়বাবু থানায় বসিয়া ছিলেন, না কাগজে কলমে বাহিরে মিথ্যা রওনা হইয়াছিলেন?

(দুই) ডাক্তারের পোষ্টমর্টেমে যখন জানা যায় নির্দিষ্ট মার্কের (৩২) রিভলভার থেকে গুলি করা হইয়াছে এবং আসামীদের নাম যখন এফ আই আর-এর কলমে ছিল এবং তাদের বাড়ীতে যখন লাইসেন্সড রিভলভার ছিল তখন (ক) তাদের রিভলভার সিজ করা হইল না কেন? (খ) রিভলভার কোমিক্যাল এক্সপার্টের কাছে পাঠানো হইল না কেন?

(তিন) এফ আই আর-এর আসামীদের ৩০২ দ্বারা অনুযায়ী কেস থাকা সত্ত্বেও পলাতক আসামীগণ কি করিয়া ২১।৫।৭১ তারিখে প্রকাশ্য দিবালোকে দীপক অধিকারীর মৃত্যুর প্রতিবাদে বর্ধমান বন্ধের জন্য মাইক নিয়ে প্রচার চালায়?

(চার) এদিনও কি পুলিশ সুপার সদরের বাহিরে ছিলেন? এবং ঘটনাস্থল থানার পিছনে (পঁচিশ হাতের) হওয়া সত্ত্বেও দেড় ঘণ্টার পর পুলিশ কি করিয়া ঘটনাস্থলে যায় এবং কার নির্দেশে? প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রীশিব-শঙ্কর চৌধুরী ওরফে কালো চৌধুরীকে বিনি বর্ধমান জেলার সি পি এম-এর প্রতিষ্ঠাতা গত ২০।৫।৭১ তারিখে সদর থানা থেকে একশো গজের মধ্যে ঐ একই প্রথায় একই শ্রেণীর আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা গুলি করে হত্যা করা হয়। পুলিশ রিপোর্টে বলা হইয়াছে আততায়ীরা অজ্ঞাত, কিন্তু এফ আই আর-এ আসামীদের নাম দেওয়া ছিল যেমন, বিজয় সাই, উদয় সাই মধু, তেরো ইত্যাদি কিন্তু তা সত্ত্বেও (ক) ২৫।৫।৭১ তারিখ বর্ধমান বন্ধের সময় ডাবল্লু বি বি ৯৬০ নং জীপে কি করিয়া তেল-মারুই পাড়ায় এবং শহরে অন্যত্র হরতাল ভঙ্গের চেষ্টা করে এরা।

(খ) ঘটনাস্থল থেকে কংগ্রেস অফিসের দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ গজ, প্রত্যেক আসামীদের নাম ও গন্তব্য-স্থল বলা সত্ত্বেও তাদের ধরার ব্যবস্থা নেওয়া হইল না কেন? (গ) সদর থানার বড়বাবু

কোথায় ছিলেন? ঘটনাস্থলে পুলিশের আসিতে রাতি নয়টা পাঁচ মিনিট থেকে দশটা পনেরো মিনিট লাগিল যদিও থানার দূরত্ব একশ গজ।

জটিল তথ্যভিত্তিক

পূর্ববাংলার সংগ্রাম শ্রসঙ্গে

দর্পণে প্রকাশিত শফিকুল হাসানের দুটি প্রবন্ধ পড়লাম। পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক বিনিময় বতরু জ্ঞান, সেই বিচারে, এম এ মতিন, শিকদার, আলাউদ্দীন প্রমুখ কমরেডদের পরিচালিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির যে বিশ্লেষণ (পূর্ব ও পশ্চিমের পার্থক্য) নিঃসন্দেহে সঠিক মনে করি। না, ব্যক্তিগত কল্পনা নয়—এটাই বাস্তব। তবুও কয়েকটি বিষয় জানতে চাই তাঁর কাছে। জানালে এ দেশের বিপ্লবী জনগণ খুবই উপকৃত হবেন।

(এক) দাঙা ও সামন্ত শ্রেণীর দেশত্যাগ প্রত্যাশার ফলে সামন্ত অবস্থার ভাঙন ঘটে; ফলে মাঝারি ও ধনী কৃষকের উদ্ভব ও মধ্য-বিত্তের বিকাশ। শ্রেণীগতভাবে মধ্য-বিত্ত নগণ্য হলেও শোষণ শাসনের ফলে তার বিপ্লবী চেতনা বিদ্যমান (বিশেষতঃ বিপ্লবী যুব ছাত্ররা, যারা অগ্রগামী অংশ, তারা তো এই শ্রেণী থেকেই এসেছেন)। অতএব, এদের সংযুক্ত মোর্চা গঠন করে গ্রামাঞ্চলে মার্কসবাদ-মাও সে তুং চিন্তাধারা জনগণের মধ্যে প্রচার, করে ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে গেরিলা প্রস্তুতি নিচ্ছেন?—না, চারুবাবুর ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি নিচ্ছেন? কেননা এই ব্যক্তিহত্যা সন্ত্রাসবাদ—মার্কসবাদ নয়। তাছাড়া সত্যিকারের ফিউডাল বলতে যা বোঝায় (ইউরোপ ও চীনে) তা দূর বাংলাতেই নেই। এরা কিছ্র জমির সাময়িক মালিক-মাত্র, নিলাম হয়ে গেলেই সব নিঃস্ব। আর একটা প্রধান কথা বাংলার কৃষি অর্থনীতি কিছ্র কিছ্র জমি নিয়ে এক একজন ছোট জোতদার বা ধনী কৃষকদের মাধ্যমে পরিচালিত। এরা কি শ্রেণী শত্রুর পর্যায়ে পড়ে? সর্বোপরি, এদের ব্যক্তি বিশেষকে হত্যা করলে রাষ্ট্র-ঘন্ত্রের কণাটুকুও খসে না। সিস্টেমের পরিবর্তনই আসল উদ্দেশ্য কমিউনিস্টদের। সেটা সম্ভব রাষ্ট্রঘন্ত্র যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে তাকে আঘাত করে। পশ্চিমী যে সব মালিকরা রয়েছে—বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে বরং তাদের আঘাত করা চলতে পারে, কিন্তু সেটা মূখ্য লক্ষ্য নয়। সশস্ত্র প্রতি-ক্রিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবী আক্রমণ এটাই বিপ্লবীদের কাজ। তা সম্ভব ব্যাপক মাও চিন্তাধারা প্রচার করে জনগণের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের সশস্ত্র করে গ্রামে ঘাঁটি (গেরিলা ট্রেনিং গোপনে সংগঠিত করে) গড়ে শহরগুলিকে দখল করা। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পরিকল্পনা নেওয়া। এ বাংলার ব্যক্তিহত্যা ও স্কুল কলেজ আক্রমণ, মর্দতি ভাঙা

প্রত্যাশিত করে বিপ্লবীরা জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। মানুষ এখন নকসাল বলে ব্যঙ্গ করে। এখনে চারুবাবুর নেতৃত্ব মূখে মাওবাদী, কাজে চে-বাদী হয়ে উঠেছে। এমন কি গত এক বছরে শহরে এই অহেতুক সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পর চীন রোডিও কোন সাড়া-শব্দ করে না। আপনারাও কি এই ভুল পথে যাবেন?

(দুই) বুর্জোয়া বিভিন্ন সময়ে সুযোগ গ্রহণ করে জনতার প্রকৃত বিপ্লবকে দমন করতে প্রতি বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলে তেমনই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে পা দিয়ে মূর্জিব বাংলার জনগণকে বিপথে চালিত করলেন। এই অবস্থায় তোহা ও আপনারা কি করছেন? এ কথা ঠিক সংগঠিত হবার আগেই এমন আক্রমণের প্রতিরোধ করা যায় না (আগুনে হাত পা বেধে কাঁপ দেওয়াও ঠিক নয়) তবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় তো দ্রুত সংগঠন গড়া যায়। তোহার সঙ্গে যত বিরোধই থাক সংযুক্ত মোর্চা গড়ে গ্রামে গেরিলা ঘাঁটি গড়ে তুলুন। গোপন তথ্য ফাঁস করতে কল্যাচনা, তবে এধরনের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন কি? না করলে তো চীন বিরোধী ভুল ঘাঁটি তৈরি হবে। হতে চলছে। চীন বিরোধী প্রচার ও চীনের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য জনগণ কিভাবে নিচ্ছেন? কমিউনিস্টরা তো সংগ্রাম করেই নেতৃত্ব চলে আসেন। আপনারা কি নিষ্ক্রিয় আছেন বা থাকবেন? যদিও এটা প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত, তবু এটা সশস্ত্র প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবী গেরিলা আক্রমণের একটা সুবর্ণ সুযোগও তো বটে? শেষ মূর্জিব যে ভয় পেয়ে-ছিলেন দুবছরের মধ্যে দেশটা কমিউনিস্ট হয়ে যাবে, একমাত্র আমিই পারি ঠেকাতে কমিউনিজ-মকে। মূর্জিবের রহমানের এ ভয় কি আপনারা আভ্যন্তরীণ বিরোধে বা সংগ্রামে সামিল না হয়ে নষ্ট করে দেবেন? সংগ্রামে সামিল হয়েছেন কি না জানি না; তবে সি পি আই (এম এল) ও দেশরতী লেখে পূর্ব বাংলার বিপ্লবীরা এ যুদ্ধে অংশ নেয় নি—কথাটা কি ঠিক? হাজার প্রামিক, কৃষক মেহ-নতী জনতা যেখানে মারা যাচ্ছেন সেখানে এদের বাঁচাতে প্রতিরোধ আন্দোলন অর্থাৎ সেনা বাহিনীর সরাসরি আক্রমণকে রোধ করা উচিত নয় আপনারা? এই বিপদে যদি না এগিয়ে আসেন তবে জনগণ কি করে সমর্থন করবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও সে তুং চিন্তা-
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসী এম এল এর অর্থোপার্জন

১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সেই সত্ত্বেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না ভোট-দাতাদের মজির অনিশ্চয়তা। কাজেই নলিনীদলগত অতি তরল জলের মত অনিশ্চিত এম এল এ পদ যদি খারিজ হয়ে যায় এই আশংকায় বোধহয় বেশ কিছ্র সংখ্যক এম এল এ আখেরের কাজ গুছিয়ে নেবার জন্যে আসরে নেমেছেন। পাপ ব্যবসায় লিপ্ত জনৈক এম এল এর সংবাদ দর্পণ কাগজে প্রকাশিত হয়েছে দেখছি।

বিস্মত সূত্রে জানা গিয়েছে শিয়ালদহের একজন এম এল এ বর্তমান বৎসরে সদ্য অনর্দীষ্ট প্রি ইউনিভার্সিটী ও বি কম (পার্ট ওয়ান) পরীক্ষায় বেশ কিছ্র টাকা-কাড়ি রোজগার করেছেন। ভদ্রলোক শিয়ালদহ এলাকার একটা বিশিষ্ট কলেজের গভর্নিং বডি'র সদস্য বলে প্রকাশ। ঐ কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালে প্রতিদিনই তাঁর দুই পুত্র আধডজন দেহরক্ষী গুন্ডা নিয়ে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করে এবং পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। পরীক্ষা হলের গার্ড, অধ্যাপক এমন কি কলেজের অধ্য-

ক্ষকেও তারা পরোয়া করে না। যারা এই অনাচারে আপত্তি জানিয়েছেন তাঁরাই অপমানিত হয়েছেন। তাদের যুক্তি খুবই পরিষ্কার। যেহেতু তাদের পিতৃদেব ঐ কলেজের গভর্নিং বডি'র সদস্য, কাজেই ঐ কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রদের দেখাশুনা করার গুরু দায়িত্ব জন্ম-সূত্রে তাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। পিতার আদেশে তারা সামান্য পারিশ্রমিকের পরিবর্তে এই মহান কর্তব্য পালনে বক্ষপত্রিকর। তাদের ফি গড়পড়তা ছাত্র পিছদ দশ টাকা মাত্র। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ঐ কলেজ থেকে এবার প্রায় দু' হাজার ছাত্র বি কম (পার্ট ওয়ান) পরীক্ষা দিয়েছে।

ছাত্র বাছকল্পপত্র সমস্যা সমাধানে দারুণ কলিকাতা বিস্ব-বিদ্যালয় যদি একটু নড়াচড়া করে খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করেন তাহলেই এই সংবাদের সত্যতা যাচাই করা হবে। বুলবুলির ব্যক্তি তো পশ্চিমবাংলার ধান অনেক-দিনই খেয়ে গিয়েছে। এম এল এ বগীর কি এবার বাস্তবভিটার যব্দ চরাতে আসরে নেমেছেন?

জটিল পাঠক

কেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা

ভেঙ্গে দেওয়া হল

(রাজনৈতিক পর্ষদে)

অবশেষে নয়াদিল্লীর নির্দেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা লীগ পদতুল মন্ত্রিসভা অপসারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে নয়াদিল্লীর চক্রান্তকারীরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার নির্দেশ দিয়ে বিকল্প গণ-তান্ত্রিক সরকার গঠনের সম্ভাবনাকে আপাততঃ ঠেকিয়ে রাখল।

পদতুল মন্ত্রিসভার শিখণ্ডী মধ্যমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন যে তাঁর মন্ত্রিসভার নিশ্চিত সংখ্যা-ধিকা ধাকা সঙ্গেও বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার ও পদত্যাগ করার কারণ প্রধানতঃ দুটাই; এক, বাংলা-দেশ থেকে আসা বিপ্লবসংখ্যক শরণার্থী চাপ এবং দুই, আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তাঁর সরকারের ব্যর্থতা।

যদি তার একথা সত্য হত, তাহলে শরণার্থীর চাপে যে বিপ্লব-রাজ্য জনসংখ্যা বিগলিত ও বেশী হয়ে পড়েছে, সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বেশ বহাল ভবিষ্যতেই থেকে যেত কি? কিংবা আসাম বা মেঘালয়ে শরণার্থীর ভিড়ও ওই রাজ্যগুলির জনসংখ্যার তুলনায় কম নয়। তবু ওখানে মন্ত্রিসভা তো পদত্যাগ করে নি!

আইন শৃঙ্খলার সম্পর্কে অগণ-কিছদিন আগেও তো তিনি এবং উপমধ্যমন্ত্রী অনবরত বলে যাচ্ছিলেন যে আইন শৃঙ্খলার আর অব-নতি হচ্ছে না, যদিও আশানুরূপ উন্নতিও হচ্ছে না।

আর যদি সত্য সত্যই তার মন্ত্রিসভা দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়ে পড়ে থাকে, তবে বিরোধী দলগুলি মন্ত্রিসভা গঠন করে সেই দায়িত্ব বহন করতে সম্মত কি না, সংবিধানসম্মত ভাবে তা নির্ধারিত হবার সুযোগ না দিয়ে কিসের ভয়ে এত তাড়াহুড়া করে বিধানসভাই বাতিল করে দেওয়া হল?

বলা বাহুল্য পদতুল মন্ত্রিসভার শিখণ্ডী মধ্যমন্ত্রী তা জানেন না, কারণ নয়াদিল্লী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কারণ তাঁকে জানায় নি। তাকে নয়াদিল্লীর নির্দেশে ঢেরা কাটা জ্ঞানগায় সই করে সরে যেতে হয়েছে। উপ-মধ্যমন্ত্রী নিজের দিল্লী-যাবার আগে পর্যন্ত জানতেন না, তাঁর বক্তব্যগুলি থেকেই তা স্পষ্ট। ছাত্র কংগ্রেসের যে নেতারা বাহাদুর ঘন্টার চরমপন্থ দিয়েছিলেন, তাঁরাও ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে বুঝতে পারেননি। তাঁদের নেতা সাংবাদিক-দের কাছে আগের দিনও তথ্য-কথিত “চরমপন্থের” ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে তাঁরা মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চান না বা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। তাঁরাও যে হরতা-লের ডাক ও চরমপন্থ পেশ করে-

ছিলেন তা সম্পূর্ণ মৌখিক এবং নয়াদিল্লীর নির্দেশে।

অজয়বাবু বলেছেন নারায়ণ করের হত্যায় তিনি বিচলিত হয়েই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘরা-ন্বিত করেন। শত শত যুবক, এমন কি উজ্জন উজ্জন গৃহম-চারণী মাতা, ভগ্নী, জ্ঞানার হত্যা-কাণ্ডে যিনি বিচলিত বোধ করেন নি, তিনি হঠাৎ একটা মধ্যমন্ত্রক বিশেষ হত্যায় বিচলিত হয়ে পদ-ত্যাগের সিদ্ধান্ত করলেন, একথা কে বিশ্বাস করবে? উনিশশো সত্তর সালের বোলই মার্চ বক্তৃষ্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে তিনি পদ-ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু বিধান-সভা ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ তো দেন নি। এবার তিনি বিধানসভাও ভেঙ্গে দেবার বন্দোবস্ত আগে-ভাগেই করে রাখলেন কেন? না, অজয়বাবু, আপনার অন্য অনেক ভাষণের মতোই এই বক্তব্যটাই সত্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা এটুকু বোঝার মতো বুঝি রাখেন।

অজয়বাবু বলেছেন যে নতুন করে জনগণের রায় নেবার জন্যেই তাঁকে বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। খুবই ভালো, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু কেরলের কংগ্রেসী পদতুল-অচ্যুত মেনন পর্যন্ত নির্বাচনের সঠিক তারিখ ঠাঠ করবার গোঁ ধরে বসেছিলেন এবং তারিখ ঘোষণা হবার আগে পর্যন্ত পদ-ত্যাগ করেন নি (অবশ্য তিনি মন্ত্রিসভা রাখতেই চেয়েছিলেন) কিন্তু অজয়বাবু কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নির্বাচনের সঠিক তারিখ নির্ধারণ করে নিয়ে-ছেন? না। বরং ইতিমধ্যেই কংগ্রেসী সংবাদপত্রগুলির প্রচার শব্দ হয়েছে আগামী তিনবছরের মধ্যে আর নির্বাচন নয়।

না, অজয়বাবু, আসল কারণ তা নয়। নয়াদিল্লীর নব-কংগ্রেসী চক্রান্তের খেলায় আপনার অভিনয় শেষ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আপ-নার রাজনৈতিক মূল্য শূন্যের কোঠায়, কাজেই বেলভেঁড়ায়ের রুদ্ধনিঃশ্বাসে আপনাকে বিজয়-বাবুর নয়াদিল্লী থেকে -সংবাদ নিয়ে ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়। অতীতে গুরু প্রফুল্ল ঘোষকেও এভাবেই নয়াদিল্লী ছেঁড়া কাঁথার মতো পরিত্যাগ করেছে।

নয়াদিল্লীর মাননীয়া ভদ্রমহিলা আপাততঃ যাদের শিরোমণি, তারা পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনমতকে ভয় পায়, ঘৃণা করে। তারা দেখেছে, একাত্তর সালের সারা ভারত সং-দায় নির্বাচনে “গরীবী হঠাৎ” এর মাল্লাকাল্লার তারা সারা দেশকে যখন বন্যার তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন এই পশ্চিম বাংলার জাগ্রত জনমত খোঁকার ভোলে নি,

বন্যাপ্লাবিত সারা দেশের রাতঘর পশ্চিমবঙ্গ বন্যার কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করেছে, সারা দেশের বিধবস্ত মানবদুগলোর বুকে আশা-ভরসা বুঁদিয়েছে, আগামীদিনের জয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে এবং বুজোঁরা জমিদার একনায়কত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের ঐক্যের সংগ্রামী পতাকা তুলে ধরেছে।

নয়াদিল্লীর চক্রান্তকারীরা বুঝতে পারল যে পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত মানুষ মাথা উচু করে থাকলে, সারা ভারতবর্ষের প্রবণতা-পূর্ণিত মানবদুগলোও মাথা তুলে দাঁড়াবে। শব্দমাত্র সংখ্যাধিক্যের জোরে পাঁচ বছর অপ্রতিহত কংগ্রেসীশাসন চালানো সম্ভব হবে না।

ভারতের গরীব, খেটেখাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে নয়া-কংগ্রেসী ধনী-বণিক-জমিদার শ্রেণীর আক্র-মণ আগামী দিনগুলিতে আরো তীব্র হতে বাধ্য। পরলো বাজেরের ধাক্কায় সাধারণ মানুষের গ্রাহি গ্রাহি ডাক উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বেঁচে থাকলে তারা প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলবে। তাই রূপ-কথার রাক্ষসী আর রাজকন্যার রূপ ধরে থাকতে পারে না। সাম-গ্রিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংক-টের ধাক্কায় তারা অতল গহ্বর রাজনৈতিক আবর্তে নিমজ্জমান। এই রাজনৈতিক সংকটের প্রতিফলন দ্রুত ঘটছে, অশ্রু, গুজরাটে, রাজ-স্থানে, পাজাবে ও এখন পশ্চিম-বঙ্গে সম্ভবতঃ আগামী দিনে উড়িয়া ও বিহারে এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের অবসান না ঘটিলে শাসকশ্রেণী সারাদেশে আধা-ক্যাসিস্ত সামরিক আমলাতন্ত্র ও একনায়কত্ব কয়েক করতে পারে না। পতনোন্মুখ এই পদতুল মন্ত্রিসভা ও প্রতিক্রিয়া-সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সুবিধাবাদী কোয়ালিশন দ্রুত বেগে অগ্রসর পশ্চিমবঙ্গের গণ-আন্দোলনের সামনে তুচ্ছ বাতির বাঁধ মাত্র।

বাতির বাঁধ এই জন্যে যে কোয়ালিশনের প্রত্যেকটি দল অন্ত-বিরোধ এবং আন্তর্দলীয় কলহে জর্জরিত। বাংলা কংগ্রেস স্বাধা-বিভক্ত, নব কংগ্রেস ও সি পি আই অন্তর্কলহে ভাঙনের মুখে দ্রুত ধাবমান। কোয়ালিশনের একদল অন্য দলকে অবিশ্বাস করে, ঘৃণা করে। মন্ত্রিসভা লীগ কংগ্রেসকে হঠিয়ে মর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, মালদহে, চব্বিশ পরগণা প্রাতিষ্ঠা লাভ করছে, বাংলা কংগ্রেস ও সি পি আইয়ের ধ্বংসপ্রায় গণভিত্তিক স্থলে নয়া কংগ্রেস ঘাঁটি গড়ে তুলছে আর ঘৃণা অবিশ্বাসের আব-হাওয়া মন্ত্রিসভার অস্তিত্বকাল ডেকে এনেছে। স্বপ্নকালের মধ্যেই

এই মন্ত্রিসভার উপদ্রুতমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে এমন কলুষিত করে তুলেছে যে স্বয়ং নব কংগ্রেসী পরি-ষদ দলের সম্পাদক পর্যন্ত দুর্নী-তির অভিযোগ করতে বাধ্য হয়ে-ছেন।

ঝাড়খন্ড দলের দুজন সদ-স্যকে ঘোড়া দরাদরির কলংকজনক পর্বারে এনে দুজনকেই উপমন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি এবং পশ্চিমে জুন তাদের শপথ গ্রহণের পাকা ব্যবস্থা করার পরও কি মধ্যমন্ত্রী বলতে চান যে তাঁর মন্ত্রিসভার বিধানসভায় মেজরিটি ছিল? সুদীর্ঘ ধাড়ার বাংলা কংগ্রেসের মন্ত্রী গ্রহণের অর্থ অজয়বাবুদের মেজরিটি ছিল? সি পি আই-এর যে বিদ্রোহী সদস্যরা এবার বিধান সভায় বিরোধী দলের পক্ষে ভোট দিতেন, তা সঙ্গেও বিধান সভায় তাঁর মেজরিটি থাকতো?

এই ঘৃণা কোয়ালিশনের বাতির বাঁধ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অজ্ঞান সমস্যা জর্জরিত সংগ্রামী মানুষের অভিমানকে রোখা যায় না।

তাই কোয়ালিশন সরকারকে বিদায় নিতে হল। আর যত পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ও সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শরিকদের যত্ন মোচার সরকার প্রায় উনিশশো সাতষটি সালের মতো ক্ষমতা দখল না করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার দুর্নি-

শাখা নিয়েই নয়াদিল্লীর মাননীয়া মহিষ্ঠাটি যাদের শিরোমণি সেই চক্রান্তকারীরা বিধানসভাও ভেঙ্গে দিয়েছে।

এরপর তারা নতুন ধারায় গণ-তান্ত্রিক সমস্ত অধিকার ধ্বংস করে, অগ্রগামী গণচেতনার বাম-পন্থী শক্তির বাহক সি পি এম ও তার মিত্র দলগুলির ওপর ব্যাপক পুঁজিশী ও ঠ্যাগাড়ে বাহিনীর আক্রমণ চালিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের জন-তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে রাইফেল, সঙ্গীন, রিভলবার, পাইপ-গান এবং বোমাবাজির বিক্রমে স্তম্ভ করতে এগিয়ে আসবে। তারই পটভূমিকা নয়াদিল্লীর চক্রান্তকারীরা তৈরী করেছে, পদতুল মন্ত্রিসভার শিখণ্ডী মধ্যমন্ত্রী সেই নির্দেশই পালন করেছেন মাত্র।

ইতিহাসের সামনে একটি প্রশ্ন বৃহদাকারে, বিরাট হরফের প্রাচীর-পর্দার মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কে জিতবে? পশ্চিম বাংলার সংগ্রামী জনতা - না নব কংগ্রেসী শোষক শ্রেণী।

কে জিতবে? বাংলা দেশের সাত কোটি মানুষ না সামরিক এক-নায়ক ইয়াহিয়া খান? কে জিতে-ছিল? হিটলার, মল্লসোলিনী, তোজোর ফ্যাসিস্ত চক্র না বিম্ব-মানবের জনবৃন্দ? ইতিহাসের এই শিক্ষা নিয়েই আজ বন্ধুর দুর্গম পথের যাত্রা আবার শব্দ হল।

অথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য কথ্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত কয়েকদিন আগে, কল-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ, এম কম পরীক্ষায়, স্মারভাঙ্গা ও আশু-তোষ বিল্ডিংয়ে এবং হাজরা সেন্টারে পরীক্ষার্থীদের সীট পড়ে-ছিল। এসব পরীক্ষার্থীদের অনে-কেই পাশ করার পর হয় কেউ শিক্ষক, অধ্যাপক, নয়ত কোন-দায়িত্বশীল কর্মচারীর পদে বহাল হবেন। অথচ এদের এক বৃহদ-শের চরম দুর্নীতি লক্ষ্য করে ভবিষ্যত সমাজের চেহারা ভেবে সত্যিই আঁকে উঠতে হয়। এদের কথা না হয় বাদই দিলাম। বিশ্ববি-দ্যালয়ের কথাই ধরা যাক না কেন তাদের প্রশাসন যন্ত্রের তো অনেক আগেই গংগাপ্রাপ্তি ঘটেছে। মাঝে মধ্যে উপাচার্য সতেন সেনের সংবাদপত্রের বাগাড়ম্বর বিবৃতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত কিছু হয়েছে বলে অনেকেই আজ আর মনে করছেন না। তিনি যতগুলো বিষয় সমস্ত পত্রিকা মারফৎ ঘোষণা করেছেন তার সবটাই হয় ভ্রমস্তে গেছে নয়ত উল্টো ঘটনার পর্ব-বসিত হয়েছে। এহেন উপাচার্য মহাশয়ের বিবৃতি ছিল পরীক্ষা

পিছোব না, ছাত্রদের দাবী নাথাকা সঙ্গেও তিনি তা যথার্থীতি পিছ-য়েছেন। এরই আমলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গৃহীত পরীক্ষার প্রকা-শিত ফলাফল প্রত্যাহার করে পুন-রায় নতুন ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা না রাখার ফলে ছাত্রদের মনকে বিচিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছামত যাকে-তাকে গ্রেস নম্বর দেওয়া হয়েছে। টোকটুকির ব্যাপারে ভাঙ্গামন্দ বাছাই না করেই পাইকারী হারে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে আদালত-কর্তৃপক্ষকে নাকানি চোবানিও কম খেতে হয়নি। তা সঙ্গেও এবারেও মফস্বলের মায় কয়েকটি সেন্টার বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া, ইনভিজিলেটর, ও এক শ্রেণীর অধ্যাপকের বিরুদ্ধে চরম দুর্নীতির অভিযোগ তো আছেই।

মজার ব্যাপার হলো, উপাচার্য মহাশয় সত্যনিষ্ঠার পরাকাস্তা (শেবাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

সংবাদপত্র, না বিজ্ঞাপনের হ্যাণ্ডবিল ?

(দর্পণের পর্ষদবৈঠক)

পাঠকেরা সংবাদপত্র কেনেন খবর পাবার জন্যে। খবর ছাড়াও সাহিত্য, সংস্কৃতি দর্শন সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ নিবন্ধও তাঁরা পড়তে চান। তাঁরা জানতে চান দেশবিদেশে যা ঘটছে তার তাৎপর্য, কি, শিল্প, ব্যবসা, অর্থনীতি, রাজনীতির নানা ঘটনার বিশেষ ভঙ্গী, কারণ ও প্রতিক্রিয়ার ফলাফল কি হতে পারে। যে কোনো সংবাদপত্র পাঠকদের এই চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করে। গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্র জনসাধারণের অধিকার রক্ষারও হাতিয়ার। গণতান্ত্রিক স্বাধিকারসমূহের মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তাই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বলেই গণ্য হয়। সংবাদপত্রকে লোকে-এই স্বাধিকার রক্ষার প্রহরী বলে মনে করেন। জনগণের যে কোনো গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সরকার

বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মহল থেকে আক্রমণ এলে তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্র জনগণের পক্ষ অবলম্বন করবে এটাই আশা করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একমাত্র জনগণের স্বাধিকার রক্ষার স্বাধীনতা। জনগণ নিরপেক্ষ অথবা জনস্বার্থ-বিরোধী কোন স্বাধীনতা সংবাদপত্রের থাকতে পারে না।

দক্ষিণের এবং স্কোভের কথা আমাদের দেশের বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি এখন সরকারী দল ও সরকার

সুদক্ষমকালিত ঘোষ ও একই পরিবারের লোক।

আনন্দবাজার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড দেশ গোষ্ঠীর মালিক অশোক সরকার মশাইও বেঙ্গল নেশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া চেনারাম্যান প্রভৃতি মালিকগণের পদ দখল করে আছেন কিংবা নিকট অতীতে ছিলেন।

সদস্য এই সব বড় বড় কাগজের নীতি শিল্পপতি ব্যব-

সম্পাদক দর্পণ

কারের মালিক বড় বড় একচেটিয়া ধনী শিল্পপতিদের জয়চাক হয়ে পড়েছে। বাঘা বাঘা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র-মালিক আজ সরকারী অনুগ্রহ ও বিজ্ঞাপন-প্রসাদের জন্যে লালায়িত। সংবাদপত্র এখন যে কোন মনোফা অর্জনকারী শিল্পের মতই একটা ব্যবসা মাত্র। দেশের বড় বড় সংবাদপত্রের মালিকদের দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে তাঁরা অন্যান্য শিল্পব্যবসার মত সংবাদপত্রকেও একটা ব্যবসা বলেই ধরে থাকেন। অন্যান্য ব্যবসার মত সবচেয়ে বেশী মনোফা অর্জন করা এবং পাঠকদের মনকে দেশের সমস্যাকবীর সঠিক সমাধানের পথ থেকে সরিয়ে বিপথে চালনা করা তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ দেশে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের মালিকানা কয়েকটি মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও রাজনৈতিক ব্যবসাদারের কুক্ষিগত। ভারতের কুড়িটা ভাগ্যান পরিবার এদের মালিক। যেমন হিন্দুস্থান টাইমস, হিন্দুস্থান, সার্চলাইট, ইন্ডিয়ান নেশন ইত্যাদি বিরলাজীর, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ফাইন্যান্সিয়েল এক্সপ্রেস, মাভুর্মি প্রভৃতি গোল্ডেনস্কজীর, টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইকনমিকস টাইমস, নবভারত টাইমস, প্রভৃতি ডালিমিয়া জৈন গোষ্ঠীর এন্ড্রু ইউল স্যার বীরেন মুখার্জী দরাভাই, কিলচাঁদ প্রভৃতি নয়টী বৃহৎ শিল্পপতি গোষ্ঠী স্টেসম্যানের মালিক। মাদ্রাজের হিন্দু, কলকাতার আনন্দবাজার গোষ্ঠী, অমৃতবাজার বৃগান্তর গোষ্ঠী সবগুলি দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজের মালিকেরাই চেম্বার অব কমার্সের সদস্য ও সভাপতি হয়েছেন। অমৃতবাজার বৃগান্তর গোষ্ঠীর সুদক্ষমকালিত ঘোষ কিছুকাল আগেও বেঙ্গল নেশনাল চেম্বারের সভাপতি ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যায়ী কংগ্রেস লীগ মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ ও তার পরিবারভুক্ত বৃগান্তর সম্পাদক

সায়ী স্টক এক্সচেঞ্জের ফাটকা-বাজী মনোফাবাজীর সঙ্গে একা-গীভূত হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য সম্পাদক, সহ সম্পাদক ও দায়িত্বশীল সাংবাদিক পদে এরা যাদের নির্বাচিত করেন, তাদের কাজ অন্যান্য ব্যবসার ম্যানেজার, সেলস ম্যানেজার বা জনসংযোগ অফিসারদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। মাইনে, চালচলন, রীতিনীতি, সব কিছুই এদের সমগোত্রীয়। অর্থাৎ জনসাধারণকে ঠিকিয়ে মনোফা করার ওপরই এদের ম্যানেজারীর স্থায়িত্ব, বেতন ও পদমর্যাদা নির্ভরশীল।

কলকাতার বড় বড় কাগজগুলির কথাই ধরা যাক। পাঠকেরা যে উদ্দেশ্যে খবরের কাগজ কেনেন, এই সব কাগজ পড়ে কি তাঁরা তা পান?

প্রথমেই ধরা যাক, পাঠ্য সংবাদ এই সব কাগজে কতটুকু থাকে? যেটুকু থাকে তাকেও কি ভাবে বিকৃত করে, সত্যাগোপন ও মিথ্যার ইঞ্জিত দেবার কায়দা অবলম্বন করে তারা অপাঠ্য করে তোলেন, কি ভাবে বিশেষ সংবাদদাতা, রাজনৈতিক সংবাদদাতার বকলমে তাঁরা সংবাদের সার সত্য গোপন ও বিকৃত করেন, তার বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া যাবে। কিন্তু এসব সংবাদপত্রে মোট বা ছাপা হয় তার মধ্যে পাঠ্য বিষয় কতটুকু আর বিজ্ঞাপন কতটুকু তার একদিনের মাত্র একটা হিসাব দিই। পাঠ্য বিষয়ের অপাঠ্য অংশও বেশ বড়, কিন্তু তাতে সংবাদপত্র মালিকের সরাসরি মনোফা কম। বিজ্ঞাপনব্যবসায় সংবাদপত্রের যে অংশ স্থিরীকৃত তার দাম কাগজমূল্যে, নগদ বিদ্যায়।

গত পশ্চিমে জুন তারিখের চারটী কাগজ, স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডকে ধরা যাক।

স্টেটসম্যানের এদিন মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা চোদ্দ, প্রতি পৃষ্ঠায় আটটী করে কলাম মোট একশ বারো কলাম। এর মধ্যে সংবাদ, সম্পাদকীয়, খেলাধুলা, সভাসমিতি

আবহাওয়া, রেডিও প্রোগ্রাম ইত্যাদি সহ পঠ্যযোগ্য বিষয় মাত্র আটটিশ কলাম, আর বিজ্ঞাপন রয়েছে চরাস্তর কলাম জুড়ে।

আনন্দবাজার পত্রিকা এদিন পৃষ্ঠাসংখ্যা দশ, মোট কলাম আশীটি। পাঠ্যযোগ্য উপরোক্ত বিষয়গুলি বাবদ গ্রিশ কলাম ও বিজ্ঞাপন বাবদ পঞ্চাশ কলাম পরিপূর্ণ।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, পাঠ্যযোগ্য বিষয়গুলির জন্যে পঁয়ষাট কলাম এবং বিজ্ঞাপন একটিশ কলাম, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা বারো, কলাম সংখ্যা ছিয়ানব্বই।

অমৃতবাজার পত্রিকার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যাও বারো, ছিয়ানব্বইটী কলাম। এর পাঠ্যযোগ্য বিষয় সাড়ে পঞ্চাশ, বিজ্ঞাপন সাড়ে পঁয়তাল্লিশ। বৃগান্তরেরও এর কাছাকাছি পৃষ্ঠা সংখ্যার তুলনায়।

এখন এদের প্রতি কলাম ইঞ্চি বাবদ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের হার এবং মোট বিজ্ঞাপনব্যবসায় কলামের হিসাব করে দেখুন কি বিপুল মনোফা এরা প্রতিদিন অর্জন করে। শোনা যায় যে পাঠকদের যাতে অত বেশী ঠকানো না হয় তার জন্যে প্রেস কমিশন নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী বিজ্ঞাপন নেওয়ার কিংবা বাধানিষেধ আরোপ করেছেন। তা সত্ত্বেও এরা সবাই সে বাধানিষেধের খুব একটা তোয়াক্কা রাখেন বলে মনে হয় না।

আর মোটা মোটা টাকার বিজ্ঞাপন যারা দেন তাঁরাও সংবাদপত্রের মাথা বন্ধ রেখেই দেন। বিজ্ঞাপনের কন্ট্রোল্টার ফরমেই তারা প্রস্তারান্তরে শত জুড়ে দেন যে বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে কোনো সংবাদ প্রকাশিত

হতে পারবে না।

তাই বিজ্ঞাপন ব্যয়ে কেনা সংবাদপত্রগুলি 'কারখানা মালিক শিল্পমালিকদের পক্ষ নিতে বাধ্য, শ্রমিকদের নয়। তারা সরকারের পক্ষ নেয়, সরকারী কর্মচারী বা অন্যান্য কর্মচারীদের পক্ষ নিতে চায় না। অথচ ভেবে দেখুন সংবাদপত্রের ত্রুটি পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী, মধ্যবিত্ত, এমন কি আজকাল ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও গ্রামীণ কৃষকও খবরের কাগজ কিনে পড়েন। এরা যদি খবরের কাগজগুলিকে শাস্ত্রের মতো করবার জন্যে এদের বর্জন করেন, এদের পরিবেশিত সংবাদভাষ্য ও সম্পাদকীয় ভাণ্ডারীকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে হয়তো বা এরা কিছুটা সংযত হতে পারে।

স্বতন্ত্রতঃ এদের পৃষ্ঠপোষক শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করেও এদের সরকারী অর্থানুকূল্য প্রত্যাহার করার পক্ষে এবং বিজ্ঞাপনব্যবসায় আয়ের ওপর উচ্চহারে কর ধার্য করে এদের হয়তো বা কিছুটা শাস্ত্রের মতো করা সম্ভব হতে পারে।

সর্বোপরি, বৃহৎ সংবাদপত্রের সংবাদপরিবেশন সম্পর্কে জনসাধারণ সदा সতর্ক থাকলেও এদের অসদৃশ্য খানিকটা পরিমাণে কম অনিষ্টকর হতে পারে।

সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ জনগণের মালিকানায় দৈনিক সংবাদপত্র স্থাপন করে এবং বর্তমান সংবাদপত্রগুলির একচেটিয়া ও ব্যক্তিগত মালিকানা ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলেই, সুস্থ, স্বাধীন সংবাদপত্র আবার সহজলভ্য হতে পারে।

ট্রামে-বাসে ছাত্র কনসেসনের দাবী প্রসঙ্গে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি ছাত্র পরিষদ ট্রামে বাসে ছাত্র কনসেসনের দাবীতে যে আন্দোলন চালাচ্ছে- তাতে নতুন করে সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে এক তিক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, বলে অভিযোগ। গত বৃহস্পতি আমলেই বসে ট্রামে ছাত্রদের আর্থিক সুবিধার্থে একটি প্রস্তাব ক্যাবিনেটে গৃহীত হয়েছিল। এবং এবিষয়ে তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু বিধান সভার কাছে এক ছাত্র সমাবেশে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করেন। এবং বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের চাপে এ সময়েরই কিছু আগে ও পরে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পূর্বুরিয়া ও চব্বিশ পরগণার কিছু অঞ্চলে ছাত্র কনসেসন চালু হয়। এরপর বৃহস্পতি মন্ত্রিসভার পতনের পর এব্যাপারে আর বেশী এগোনো সম্ভব হয় নি। অথচ তার সুযোগ

নিম্নে সরকারী প্রশাসনিক উত্তর চাপ সৃষ্টি না করে ছাত্র পরিষদ নামে কংগ্রেসী ছাত্রসংস্থা, সাধারণ ছাত্রদের সংগে ট্রাম ও বাসের সাধারণ কর্মচারীদের সঙ্গে গণ্ডগোল বাঁধানোর কাজে নৈমে পড়েছে। অথচ তাদের জন্যে এই আন্দোলন তাদের অনেকের কাছেই ছাত্র কনসেসনের স্তোকবাক্য প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কারণ, এই অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন তাদের কাছে আজ আর নেই। অজ্ঞান বিজ্ঞান মন্ত্রিসভার আমলেই প্রায় শ' দশক স্কুল কলেজ বন্ধ। প্রায় পনেরো হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষার চরম সংকটের মুখোমুখি। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন ছাত্র স্বার্থেই যদি এই আন্দোলন তবে স্কুল কলেজের বন্ধ দরজা খোলার ব্যাপারেই বা ছাত্র সংস্থাটি এত নিষ্ঠুর কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেখিলে মফস্বলের মাত্র কয়েকটি সেটোর বাতিল করে যখন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে পরিচিত হতে চাইছেন তখন কিছু দূর্নীতিগ্রস্ত ইনিভার্সিটির ও দায়িত্বজ্ঞানহীন অধ্যাপকের হাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে তিন দিল্লীর দিকে পাড়ি জমালেন। এরপর এম এ, এম কম নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটে গেলো তা অনেকেই জানা। পরীক্ষার বদলে পরীক্ষা হলে তাড়বনুত হলে। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ দাঁড়িয়ে প্রশাসকবৃন্দের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে টাকার বিনিময়ে ক্যাপক টোকাটুকি হল। নির্ধারিত সময়ের উপরেও চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাড়তি সময় ধরে পরীক্ষা প্রহসন চলল। তার পরের ঘটনা আরও মজার। সংবাদপত্রে ঘটনাগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী থেকে সত্যনিষ্ঠ উপাচার্য মহাশয় কলকাতায় এসে হাজির হলেন। তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন, মিটিং জাকলেন; কোরামের অভাবে মিটিং গেল ভেসে। উপাচার্য মহাশয় তড়িৎঘড়ি সাংবাদিকদের একগাদা বক্তৃতা দিয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি ছাড়লেন। আর এম এ, এম কম, পরীক্ষা সাতদিন পিছিয়ে দিলেন। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অপদার্থ প্রশাসকবৃন্দ ও দূর্নীতিগ্রস্ত দায়িত্বহীন মানুস-গুলো যারা এতদিন হয় তাঁর প্রত্যক্ষ নয়ত অপত্যক্ষ প্রত্যক্ষ দিনে দিনে নিজেকে শক্ত সবল করে তুলেছে, সাতদিন কেন সাত মাসেও কি তাদের দিয়ে এই বৃহৎ অপ্রকৃতিস্থ ছাত্রছাত্রীদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারবেন?

রাজধানীর চিত্র

নিরাপত্তা আইনের নেপথ্যে সরকারের আসল মতলব

রমাপ্রসাদ মল্লিক

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মুহুরত্বের আন্তর্জাতিক সফরের অব্যবহিত পরেই সরকার “আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আইন”কে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশব প্রয়োগে পাশ করিয়ে নিলেন। বাহ্যিক কারণ হিসাবে দেখান হয়েছে যে, সীমান্তের ওপার থেকে শরণার্থীদের প্রবল বন্যার ভারতের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সঙ্কটাপন্ন—রাজনৈতিক সঙ্কট তো বটেই, স্থানীয় সামাজিক অবস্থা এবং সমগ্র দেশের অর্থনীতিই নাকি বিপন্ন। সেজন্য প্রয়োজন, দেশের জনসাধারণের ওপর বিশেষ বিধিনিষেধ চাপানো এবং সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকের জীবনে বা মৌল প্রয়োজন সেই স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া!

গোবিন্দবল্লভ পন্ডের সুযোগ্য পুত্র কে সি পন্ড—যিনি একদা কংগ্রেসের মণ্ডপ ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে সমাজতন্ত্রী সমাজ বিপ্লবের মনোমোহক কপোলকল্পনা রচনাছিলেন তিনি এবং আর একজন “সমাজবাদী” গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী নেত্রপুত্র ইন্দিরাজী এই ধরনের নাগরিক অধিকার হননে আজ মূখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। দিল্লীর পথে ঘাটে আজ উদ্ভূত প্রবাসীদের দরুণ কটবিড়ম্বিত সামান্য নাগরিক ইন্দিরাজীর “গরীবী হটাও” শ্লোগানের আসল মর্ম বুঝতে গেলে যেমন মোহভ্রমের জ্বালায় তিক্ত, তেমনি অপর দিকে ইন্ডিকেট কংগ্রেস পার্টির জ্বরদন্ত ছাপ-মারা শাসনের দৌরাণ্ডে তার ব্যক্তিগত গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার মধ্যে।

আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়, কংগ্রেস দলীয় হওয়া সত্ত্বেও যে মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন এম পি উক্ত বিলের বিরোধিতা ঠিক না হলেও বিরূপ সমালোচনা করেছেন, তাদের অন্যতম শ্রীঅমৃত নাহাতা লোকসভায় বলেছেন অথবা সতের খাতারে বলতে বাধ্য হয়েছেন : “আমার আশঙ্কা রয়েছে যে পদূলি অফিসাররা ক্রমশঃ কালে সর্ব আচরণের দরুণ সুনাম অর্জন করে নি, তারা স্বখন বিবেচনাধীন আইনের বলে বলীয়ান হবে, তখন ব্যক্তিগত শত্রুতার লক্ষ্যস্থানীয়দের কেও খতম করার জন্য কদম্ব পদ্ধতি অবলম্বনে কুণ্ঠিত হবে না।” এছাড়া তিনি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পটভূমিকা স্মরণ রেখে—বলেছেন যে, সংখ্যালঘুদের মসজিদ ইত্যাদি ধর্মস্থানও, “বে-আইনী রচনা” আখ্যা পাবার পর ধ্বংস করে দেওয়া হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ শ্রীনাহাতা পশ্চিম রাজস্থানের

সীমান্তবর্তী যশম্মীর বারমোড় জেলাস্বয়ের ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত; সেখানে অনেক জায়গায়ই উটপালক গরীব অধিবাসীরা মুসলমান যাদের বড়লোক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন আগলাররা হামেশাই যথেষ্ট ব্যবহার করে থাকে।

লোকসভায় বিতর্ক এবং প্রশ্নোত্তর কালে শ্রীকে সি পন্ড যে বিবৃতি বোঝেছেন তার নির্গলিতার্থ এই যে, বাম ঘেঁষা প্রগতিশীল মুসলিম রাজনীতিকস্বরূপ জনাব সৈয়দ বদরুদ্দোজ্জা এবং গোলাম ইয়াজদানী নাকি পাকিস্তানী গুপ্তচরদের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনবিরোধী কাজ করছিলেন, অথচ কোলকাতার এক বিশেষ দৈনিকে প্রকাশিত, বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত যে সংবাদের ভিত্তিতে মহামহিমায় সরকারী দণ্ডধারীরা বিনাবিচারে উপরোক্ত দুজনকে আটক করে রেখেছেন, সেই সংবাদেই যে একজন কংগ্রেসী মন্ত্রীর গুপ্তচরী কার্যকলাপ সম্বন্ধে ইশারা করা হয়েছিল (সংক্ষেপে নামটি লুকিয়ে) সেই কংগ্রেসী মন্ত্রী ভূতপূর্ব কিংবা এখনও বহালতবিয়তে বহাল, তা জানবার উপায় নেই—নাকি সকল সন্দেহ সংশয়ের উর্ধে। কে সি পন্ডজী মহাশয় ব্যক্তিই বটে; তাঁর পার্টির ছাপ মারা থাকলে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো রকম জাতীয়স্বার্থ হননকারী স্বজাতির সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, বোধ হয় দেবাদেশ বলে।

অথচ খোদ রাজধানীতে বৃহৎ বিস্তারিত ইন্ডিকেট কংগ্রেস সমর্থক সংবাদপত্র “টাইমস অফ ইন্ডিয়া” বড় গলায় দাবী করেছিল যে, পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরগিরি করার অপপ্রমাণিত অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের খোলা বিচার হক (জুন ২, ১৯৭১)। ব্রিটিশ আইনপন্থিতর দোহাই দিয়ে এই যে আওরাজ্জ, তা আজ দিল্লীতে আর শোনা যায় না; পার্লামেন্টেও কোনো আশ্বাস মিললনা যে, উপরোক্ত সন্দেহমুক্ত রাজনীতিকস্বরূপ পক্ষপাতিত্বমুক্ত নয় বিচার পাবেন—গণতন্ত্রের যা মৌল ধর্ম সে অনুযায়ী তাঁরা আপন নির্দেশিতা প্রমাণ করবার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ফিরে পাবার সুযোগ পাবেন। হা হতোম্মি! সে আশা ভারতীয় গণতন্ত্রে দুরাশা হতে চলল। এর পর যদি জনসাধারণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বসে আরম্ভ করে যে, সরকারী শাসকদের খেয়াল ও মতামতের বিরোধী, ধারণা পোষণ

করাই এদেশে অপরাধ হিসেবে গণ্য, এবং সূতরাং বিরোধী মত রাখলেই রাজনৈতিক অসুস্থতা ও শ্রেণ্যের শিকার হবার কঠিন সম্ভাবনা—রয়েছে, তাহলে তাদের আশঙ্কা আর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সাম্রাজ্যবাদের বিষবীজ থেকে উৎপন্ন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাক-কাথ ইজম মার্কা ডাইনী শিকার ভারতে অনুপ্রবেশের মুক্ত দরজা পেতে চলেছে আজ শাসকবর্গের ক্ষমতামত্ত আইন হস্তারক আইনের সাহায্যে।

কেবল প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, শ্রীডি কে কৃষ্ণমেননই বললেন না, মনোনীত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি সারেবও বললেন উক্ত আইনের অপব্যবহারের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে। তিনি পূর্বের নিবর্তনমূলক আইনের নজর দিয়ে বললেন যে, তা বহুক্ষেত্রে “জিজ্ঞাসাবৎ এবং রিবেসপূর্ণ” ভঙ্গীতে প্রযুক্ত হয়েছে, এবং প্রস্তাবিত আইন পাশ হবার পর অনুরূপভাবে অপব্যবহৃত হবার বিপদ রয়েছে। কিন্তু ধর্মের কাহিনী যে টাইপের জীবনী কিছুতেই শোনে না তারা আজ দিল্লীর শাসকমহলে কণ্ঠধার। সূতরাং গণতন্ত্র ভারত আজ যদি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রবাদের (Totalitarianism) সঙ্গে সমগোত্রীয় হয়ে ওঠে তাহলে ভারত-মুক্তার পক্ষে শত্রু অশ্রুচোচন করা ছাড়া গতান্বর্ত নেই।

ভারতীয় নাগরিকের একমাত্র অমূল্য বস্তু স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বিচারহীন গ্রেপ্তারের থাবা থেকে রক্ষণ পাবার বিচারপন্থিত সম্মত যে উপায় এতদিন ছিল, তাও উপরোক্ত আইন পাশ হবার পর নাগরিকের বরাতে জুড়িয়ে গেল। একজন জেলাম্যাজিস্ট্রেট অথবা তাঁর সহকারীর মর্জি এবং শাসক মনোভাবের ওপর একান্ত নির্ভরশীল হবে ভবিষ্যতে ভারতীয় নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনের মজ্ব বাপনা। পাঠক শ্রুনে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হবেন যে, কতৃপক্ষ না চাইলে উক্ত আইনে আটক ব্যক্তিকে তার স্বাধীনতা হরণের কারণও বলা হবে না। কেবল তাই নয়। হতভাগ্য ঐ কয়েদীর কারাবাসের হেতু এবং ভবিষ্যৎ-রেহাই সম্পর্কে বিচার করবার অধিকারী ঐ পরামর্শদাতা সমিতি তার রিপোর্টও দেখবার অধিকার আটক ব্যক্তির নেই। অর্থাৎ একবার শাসক মহলের অথবা প্রশাসনীয় কতৃপক্ষের রামাশ্যামা বদ মধু যে কোনো শর্মারই বিরাগভাজন হলে, ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে বন্দীজীবনের শতক যন্ত্রণা অন্ত ও অস্থ অস্থায় থেকে “উপভোগ” করা ব্যতীত

আর কিছুই করার থাকবে না।

বিদেশী হলে তো কথাই নেই; পূর্ণ দৃ বৎসর অবাধি তাদের কেস কোনো পরামর্শদাতা বোর্ডের সামনে রাখবারই দরকার নেই।

“বাংলাদেশ” সরকার (অস্থায়ী হলেও বর্তমান ভারত সরকারের তা নাকি স্নেহহন্য!) এবং বাংলা-লাদেশ থেকে আগত প্রচুর প্রগতিশীল বাম ঘেঁষা নেতৃবৃন্দ আজ ভারতে উপস্থিত, এবং তাদের মুক্তি সংগ্রাম প্রসঙ্গে কার্যরত। কাল হঠাৎ যদি বর্তমান সরকারের “জাতীয় স্বাধীনতা” এবং আন্তর্জাতিক নীতি মাপকাঠি বৈদেশিক বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রে পালটে যায়, এবং বাংলা দেশের উক্ত নাগরিকেরা ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি রূপায়ণে অস্বস্তি-উৎপাদক এবং বিপাক্ষনক বিদেশী বলে পরিগণিত হন, তাহলে পাঠক তাদের সসেমীরে অবস্থা একবার কল্পনা করুন!

এমনি নীতি পরিবর্তনের ক্রান্তিবিন্দু আজ ভারত সরকারের সামনে। সঠিক অর্থে, এই ধরনের দিগদশী মোড়বদলের সম্ভাবনায়, ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রী, শ্রীস্বর্ণ সিং স্বয়ং পথিকৃৎ। তাঁর রূরোপ (সোভিয়েত রুশিয়া সহ) এবং যুক্তরাষ্ট্রে দৌত্য সফরের সঙ্গে প্রিন্স আগা খাঁর পাকিস্তান ও ভারত আগমনের তাৎপৰ্য আশা করি, পাঠকরা ধরতে পারবেন। ঠিক এমনি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্রিয়ার সঙ্গে সাধু্য রেখে, পাকিস্তানের এককালীন প্রধানমন্ত্রী এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের একান্ত অনুগত বংশব্দ মোহাম্মদ আলী মুখ খুলেছেন লন্ডনে। পূর্ব পাকিস্তানকে ক্ষতিপূরণ দেবার পক্ষে তাঁর নকলনিবিশী ওকালতী কাকতালীয় নয়। এর সঙ্গে ইসলামাবাদস্থ সামরিকতন্ত্রী সরকারের, পূর্ববঙ্গে “রাজনৈতিক সমাধানের” জন্য ব্যাকুল অশ্বেষণ যোগ করলে নিম্নলিখিত কয়েকটি সূত্র-প্রাণ্ডা যায় :—

(এক) যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার জনমত পাকিস্তানের নন বৈরচায়ে বিনাধা বিবরণ জানার ফলে সরকারের ওপর প্রবল চাপ দিচ্ছে যাতে পূর্ব পাকিস্তানে এক রাজনৈতিক রক্ষাব্যবস্থার আওরামী লীগ নেতৃবৃন্দ সেখানে ক্ষমতাসীন হতে পারে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বোঝাপড়া, চাইকি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়; কিন্তু,—

(দুই) আমেরিকার বর্তমান সরকার সাম্রাজ্যবাদের শীর্ষস্থানে থাকার দায়ে, পাকিস্তানের বর্তমান শিল্পপতি আমলা গোষ্ঠীকে হাতে রাখতে চায়, যেমন এম্বাবং রেখে আসছে। তারা বোঝে, পাকিস্তানের উগ্র সামরিক গোষ্ঠীর ক্ষমতাপ্রেম ও জেদের ওপর বেশী চাপ দেওয়া চলবেনা; মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বে অনুপ্রেরিত আওরামী লীগ সঞ্চারিত সরকার ঐ-গোষ্ঠী বরদাস্ত করতে চাইবে না; সূতরাং খোঁজ পড়েছে, পূর্ববঙ্গের উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণী

থেকে আসা অপর “নেতা” দেয়। নেপথ্যে কূটনীতির পাঁচখেলা চলছে যাতে পাকিস্তানের ভৌগোলিক ঐক্য বজায় থাকে অথচ পূর্ববঙ্গে আইনতঃ পাকিস্তানের অধীন কিন্তু কার্যতঃ স্বাধীন রাষ্ট্র, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের - বিশ্ববিস্তৃত সাম্রাজ্যবাদীর অনুকূলে পাণ্ডায়া যায়—সামরিক ঘাঁটির সুবিধাসমত।

(তিন) বর্তমানে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের “ধীর পানি পাথর কাটে” সুন্দর প্রয়াস বজায় রয়েছে, যাতে ধীরে ধীরে পাকিস্তান তো বটেই ভারত সরকারও তাদের “বাংলা দেশ” পশ্চী দরদের আড়ম্বরে ইতি কুরে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর সাম্প্রতিকতম উক্তি পাকিস্তানের দুই বিভাগের মাঝে সামঞ্জস্য ভারতের কাম্য, এবং তিনি যে দৃঢ়ভাবে স্থির করেছেন যে পাকিস্তান থেকে উদ্ভাস্ত্রদের ফেরৎ যেতে হবে—এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে, ভারতের বাংলা দেশ তথা পাকিস্তান সংক্রান্ত নীতি রূপায়ণের পথে।

(চার) জনসম্মত প্রার্থিত উগ্র জাতীয়তাবাদী (যাদের মানসিক সহচর ইন্ডিকেট কংগ্রেসের লবীতে প্রচুর) দল ও নেতাগোষ্ঠীরা খবরের কাগজে বীররস যতই প্রকাশ করুক, ভারত সরকারের বর্তমান বৃহৎ এড়ানো নীতির সঙ্গে ভেতরে ভেতরে একমত। সূতরাং ইন্ডিকেট শাসকচক্র বাংলাদেশকে ভারত-মহাসাগরে নিরঞ্জন করলে আস্তে আস্তে তারা আমেরিকার আশীর্বাদপুত্র সমাধান মেনে নেবে।

(পাঁচ) উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর লেঃ জেঃ টিকা খাঁর ইসলামাবাদে সাম্প্রতিক প্রত্যাবর্তন এবং ইয়াহিয়া খাঁর আসন্ন নীতি বিকাশী বক্তৃতা (২৮শে জুন) অর্থপূর্ণ।

কিন্তু এত সাবধান ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও এখনকার টানাটানে ভারত এবং পাকিস্তানের শাসকবর্গের মধ্যে প্রণীচির এক হওয়া সত্ত্বেও একটা সংঘর্ষ বেধে যাওয়া বিচির নয়। সে অবস্থায় দুই বাংলায়ই তাঁর সঙ্কট দেখা দেবে। ভারতের শাসকমহলে আতঙ্কের উৎস এখানে। সম্প্রতি রূরোপের “সমাবেশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠা”

দপণ

বংবাহ সামগ্রিক

২ চাঁদার হার ২

বার্ষিক পনেরো টাকা

স্বাস্থ্যবিক সাড়ে সাত টাকা

গ্রামাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবেন

ঠিকানা :

৩১, মট লেন, কলি-১৩

জাতীয় গ্রন্থাগারে স্বজন পোষণ (২)

অরুণ বসু

জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রচলিত রিক্রুটমেন্ট রুলস কম্পানি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ কনসের সীমা অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করেছেন। ফলে গ্রন্থাগারে সতেরো বছর থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত বয়স্ক প্রার্থীদের চাকুরী হতে দেখা গেছে। 'Appointment should go to the most meritorious'—নিয়মের সুবিধামত ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষ নাকি অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যতিক্রম করে থাকেন। আবার এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। উদাহরণ ডিসপেন্স এ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ হয়েছে কেরানী পদ থেকে প্রমোশনের মাধ্যমে। এই পদের বৈতনিক একশ তিরিশ—তিনশ টাকা। যিনি প্রমোশন পেয়েছেন তিনি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রকৃতপক্ষে এই পদটিতে অনেকের মতে পদে পদে করা আর্টিস্টদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ হওয়া উচিত। যিনি এই পদে বহাল হয়েছেন তাঁকে কর্তৃপক্ষ একটি টাইপ—তিন সরকারী কোয়ার্টার (বা সাধারণ নিয়ম অনুসারে গেজেটেড অফিসারদের প্রাপ্য) দিয়েছেন। এইরূপ উদার সরকারী নীতি ডিসপেন্স এ্যাসিস্ট্যান্ট মহাশয়ের জন্য গৃহীত হওয়ার আসল কারণ নাকি তিনি সৌভাগ্যবশত প্রাক্তন এ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ অফিসারের আত্মীয়।

পরিণতিভাঙ্কালস সেকসনের

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হচ্ছেন শ্রীকে বি রায়চৌধুরী। পদটির বৈতনিক তিনশ কুড়ি—পাঁচশ তিরিশ টাকা। প্রথানুযায়ী এই পদ থেকে এ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান পদে প্রমোশন হওয়ার নিয়ম। আপনজন কেউ কর্তৃপক্ষের মধ্যে না থাকার কারণেই নাকি নিয়মের সুবিধামত প্রয়োগ করে কর্তৃপক্ষ অনেক নিম্নপদস্থ কর্মীদের ভদ্রলোককে অতিক্রম করিয়ে উচ্চপদে প্রমোশন দিয়েছেন। এবং ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে স্বল্প অবসর গ্রহণের জন্যও কয়েকবার নাকি প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষের আপনজনদের স্বার্থে।

জুনিয়র রেফারেন্স এ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বৈতনিক পঁচানব্বই—একশ পঞ্চাশ টাকা। এটি একটি সাব ক্লাসিকাল পদ। প্রকৃতপক্ষে এই পদের সেমি-প্রবেশনাল কাজ করার নিয়ম চালু আছে। কর্তৃপক্ষ এই পদে ননম্যাক্সিমাম থেকে সুরু করে এম এ পাশ পর্যন্ত কর্মী নিয়োগ করে থাকেন। 'Appointment should go to the most meritorious' নিয়মের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ তাদের গ্রাজুয়েট আপনজনদের এই পদে বিনা ক্রেসে নিয়োগ করেন। আপনজন হিসেবে যে সকল গ্রাজুয়েটদের এই পদে সরাসরি ভাবে নিযুক্ত করা হয় তাদের মধ্যে অনেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট হোল্ডার অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার ফল

প্রকাশের পূর্বেই জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রবেশ করার সুযোগ পান। এতে লাভ হচ্ছে এই যে ভবিষ্যতে জুনিয়র টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পদ খালি হলে অথবা সৃষ্টি করে অনেক বিভাগীয় যোগ্য প্রার্থীদের অতিক্রম করিয়ে প্রমোশন দেওয়া হয়। আর যারা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী কোর্স পড়বার সুযোগ পান না তাদের গ্রন্থাগারের জন্য নির্ধারিত কোর্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশনে পড়তে পাঠানো হয়। ডিগ্রী কোর্স শেষ হয়ে যাবার পর তাদের প্রফেশনাল পদে তুলে নেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মীদের সিনিয়রিটি সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া অগ্রাহ্য করে।

গত পাঁচই মে ১৯৭১ তারিখে জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রায় একশ দশ জন কর্মী নিয়োগ করা হয়। সরাসরি পথে নিয়োগের ক্ষেত্রে রিভিউইং কমিটি বলেছেন—

"The policy of promotions and direct recruitment should be reviewed in such a manner that the National Library should have highly qualified staff academically and professionally—nothing short of the best available".

শ্রীবি এস. কেশবন রিভিউইং কমিটিতে থাকা কালীন অবস্থায় এই বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু পাঁচই মে তারিখে ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রবর্তন করেন নি। উদাহরণ নয়াটি টেকনিক্যাল, এ্যাসিস্ট্যান্ট সরাসরি ভাবে কর্মী নিয়োগের ঘটনাবলী। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য শ্রীমতী উমা বোস এবং শ্রীমতী তনিমা সরকারের নিয়োগ। শোনা যায় দুজনেই নিয়োগের ব্যাপারে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রাপ্ত। প্রথমজন নাকি জাতীয় গ্রন্থাগারের জনৈক প্রাক্তন অফিসারের আত্মীয়। দুজনেই গ্রাজুয়েট এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা হোল্ডার। গান্ধী সেন্টিনারী বিবলিওগ্রাফী প্রজেক্টে (একটি অত্যন্ত অস্থায়ী সংস্থা) এরা দুজনেই কিছুদিন বাবং কাজ করেছিলেন। গান্ধী সেন্টিনারী বিবলিওগ্রাফী প্রজেক্ট কোন গ্রন্থাগার নয়। এই প্রজেক্ট জন্মলাভ করার পর জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনেই এর কাজকর্ম সুরু হয়। এখানে নাকি কর্তৃপক্ষের আপনজন ছাড়া অপরিচিত কন্সার্ন চাকরী হয় নি। জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান জনৈক অফিসারের গৃহিনীরও সেখানে একটি চাকরীর ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রজেক্টটি গত বছর আগস্ট মাসে দিল্লি চলে যায়। দুই বাওয়া সম্ভব নয় বলেই নাকি উক্ত গৃহিনীর এবং শ্রীমতী তনিমা সরকারের এই প্রজেক্ট থেকে চাকরীতে ইস্তাফা দিতে হয়।

কলকাতার গান্ধী সেন্টিনারী বিবলিওগ্রাফী প্রজেক্টে কাজ করাকালীন অবস্থায় শ্রীমতী উমা বোস এবং শ্রীমতী তনিমা সরকার জাতীয় গ্রন্থাগারের চাকরীতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন ১৯৬৯ সালে। তার ফলে কর্মীসংস্থা তেইশে মে ১৯৬৯ তারিখে একটি সাধারণ সভা আহবান করে প্রতিবাদ জানান, এবং প্রতিবাদালিপি কেশবন সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন অবগতির জন্য। শ্রীকেশবন গান্ধী সেন্টিনারী বিবলিওগ্রাফী প্রজেক্টের একজন সভ্য। তখন তিনি দিল্লীতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সার্বেন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টারের ডিরেক্টর। কর্মীসংস্থা তার অবগতির জন্যও এই প্রতিবাদালিপির একটি নকল পাঠান।

শ্রীকেশবন সাহেব সর্বকিছুর জেনেশুনে বিভাগীয় মোর মেরিটোরিয়াস প্রার্থীদের অগ্রাধিকার অস্বীকার করে শ্রীমতী উমা বোস এবং শ্রীমতী অণিমা সরকারকে নিয়োগ করলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে যে শ্রীমতী উমা বোসের নাম নাকি দিল্লীতে থাকাকালীন অবস্থায় কলকাতাস্থিত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রথা অনুযায়ী থাকতে পারে না। জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে গান্ধী সেন্টিনারী বিবলিওগ্রাফী প্রজেক্টের কাজ চলাকালীন অবস্থায়ই নাকি জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার একটি সমঝোতা হয়েছিল যে কলকাতা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে তার নাম জাতীয় গ্রন্থাগারে এনে তাকে দিল্লীতে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ করে দেবেন। রাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল হিম্মী থেকে এসে কুমারী উমা বোস চাকরী লাভ করেন।

শ্রীমতী তনিমা সরকারের জন্য অন্য ব্যবস্থা হল। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী যে কোন কর্মীর ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে বদলী হওয়া হুকুম অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। শ্রীমতী সরকার বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে। বর্তমানে তিনি বিবাহিতা। শোনা যায় বিবাহিতা জীবনে কলকাতা ছেড়ে বাইরে চাকরী করতে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তিনি দিল্লী যেতে পারেন নি। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষও জানতেন যে তার পক্ষে দিল্লী বা অন্যত্র চাকরীর জন্য যাওয়া সম্ভব নয়। তাই শ্রীমতী সরকারের প্রয়োজন জাতীয় গ্রন্থাগারেই একটি চাকরীর। কুমারী বোস এবং শ্রীমতী সরকার জাতীয় গ্রন্থাগার ছাড়া অন্য কোন সরকারী গ্রন্থাগারে চাকরীর ব্যাপারে মেরিট প্রদর্শন করতে পারেন নি। জাতীয় গ্রন্থাগারের রিক্রুটমেন্ট রুলস অনুযায়ী (কর্তৃপক্ষ তাদের আশ্বাস দেওয়ার?) মোর মেরিটোরিয়াস বলে সিলেকশন পেতে তাদের অসুবিধা হবে না এই সত্য উপলব্ধি করে তারা জাতীয় গ্রন্থাগারের চাকরী সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। নিয়মানুসারে বাইরে বদলী

হওয়ার সর্বোত্তম তারা নাকি মেনে নিয়েছেন কাগজ কলমে। আসলে তারা জানেন জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতা ছেড়ে যাবে না। সুতরাং তাদের যাবারও প্রশ্ন ওঠে না।

কোন ভাল গ্রন্থাগারে দুবছরের কাজের অভিজ্ঞতা জাতীয় গ্রন্থাগারের টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ হবার জন্য যোগ্যতা হিসেবে আবশ্যিক। কিন্তু শ্রীমতী সরকার এবং কুমারী বোসের এই আবশ্যিক অভিজ্ঞতার পরিচয় নেই। এদের নিয়োগের ফলে জাতীয় গ্রন্থাগারে যে সকল গ্রাজুয়েট এবং এম এ পাশ স্নাতক কর্মীগণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী নিয়ে বহুদিন বাবং নিম্নপদে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অসন্তোষের আর একটি প্রধান কারণ, ছুটির দিনে এরাই কোন সেকসনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়াও তাদের নির্দেশ দেবেন।

এই নির্দেশ মান্য করা তাদের তরফে বাধ্যতামূলক। অন্যান্য সাপ্তাহিক দিনগুলিতে ডিভিসনাল হেডের অবর্তমানেও তাদের নির্দেশে ডিভিসনের কাজকর্ম চলবে। এর ফলে রিভিউইং কমিটির জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজকর্ম মোর এফিসিয়েন্ট করে তোলার জন্য সকল প্রয়াস ব্যর্থ হবে। এইরূপে একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কেন্দ্রীয় চীফ লেবার কমিশনারের সঙ্গে চুক্তি, রিভিউইং কমিটি এবং খোসলা কমিটি লাখ টাকা খরচ করে যে রিপোর্টগুলি প্রদান করেছেন তার সকল সদৃশ্যে বিফল হয়ে যাবে। বর্তমানে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়স সংক্রান্ত ব্যাপারে ঢালাও রিলাকসেশন দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত বয়স সীমার মধ্যে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার অনেক ক্ষেত্রে নাকচ করে নাকি এরূপ করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীসংস্থা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর নিষ্ঠুর চিত্র তুলে ধরেছেন। ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল দর্শনীতে দূর করবার জন্য কি করেন সেদিকে সকলের লক্ষ্য।

রাজধানীর চিঠি

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

নবোদীত চরম সাম্যবাদী, বৈশ্ববিক আন্দোলনের অংশীদার তারিক আলী কলকাতায় এসে যে বক্তব্য জাহির করে গেছেন (দুই বাংলা এক হয়ে সাম্যবাদী বাংলার উদ্ভব সম্ভাবনার) তা সুদূরপর্যন্ত হলেও দিল্লীর ঐ মহল আরও দিশাহারা, আরও ক্ষমতা পিপাসু হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কে সি পঞ্চ মহাশয় মন্তব্য কেবল নয়, হুকুম-ফরমান দিয়েছেন নিরাপত্তা আইনের পূর্ববধ প্রয়োগ সম্বন্ধে। "কি ভাবে আমরা এটাকে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে কাজে লাগাব সে সম্পর্কে আমাদের মনে যা আছে, তা আমরা ভাগবোনা।"

পশ্চিম বাংলার নিপীড়িত জনগণ জানে, কি সে গোপন অভিসন্ধি বা দিল্লীর মসনদ অন্তরালে নিম্নীলমান। বেআইনী আইনের বলাৎকার কেবল নয়, ডাঙার বেধড়ক প্রয়োগ পশ্চিম বাংলার আসন্ন। অবশ্য, তদুপ সপ্তদশকে পদলিখ, সি আর পি এবং মিলিটারীর যৌথ তাম্রবে

নিঃশেষ করে ফেলতে পারলে পশ্চিম বাংলার মহীরুহপ্রমাণ বেকার সমস্যার এক রূপ সমাধান হবে। কিন্তু সে রকম পরিণামে পৌঁছতে পশ্চিমবঙ্গের ইন্ডিকেট কংগ্রেসের যুবসাম্রাজ্য কর্মীরা কি করবেন? তারা কি ভুলে গেছেন, নিদারুণভাবে ঘনায়মান অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে ইস্পাত-মন্ডী ব্যক্তিগতকালানায়ীনে ক্ষেত্রে যতই ইস্পাত উৎপাদনের লাইসেন্স বিতরণ করুন না কেন, তাতে পশ্চিম বাংলার কপাল খুলেছে না; এবং উপার্জনহীন, বাণীহীন, অধিকারবির্জিত মানুষ থেকে মানব-কের পর্যায়ে অবনতিত বাংলার যৌবন যদি দমনের চরম থেসারং দিতে দিতে মৃত্যুপর্বাণে পৌঁছয়, তাহলে ঐ কংগ্রেসীদের ভাই বোন, বন্ধু বাম্ভব, আত্মীয় কুটুম্ব কেউই রক্ষা পাবে না? তখন কজন দাস-মুন্সী মহাশয়ের মত বক্তৃতা-বাগীশ অবশিষ্ট থাকবেন, অন্ধকার যুগের প্রতীক দানবীর আইনের পক্ষে পার্লামেন্টে, নির্লজ্জ ওকালতী করবার জন্য?

প্রভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডিয়া
প্রেস

৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-১৩

নকশালী বিপ্লব ও পশ্চিমবঙ্গ

বসুমিতা সেন

খুনোখুনির রাজনীতিতে জঙ্ক-
রিত পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন পূর্বে
ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীঅজিত বিশ্বাস
আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর
শোনা গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ-
নৈতিক নেতৃবৃন্দের নাকি খানিকটা
টনক নড়েছে।

এ রকম বহু নৃশংস হত্যা-
কাণ্ডের মূল কোনদিন খুঁজে পেলো
হয়ত দেখা যাবে সেগুলো তথাকথিত
রাজনৈতিক হত্যা হয়েও রাজনৈতিক
নয় কিংবা সংকীর্ণ রাজনীতি অথবা
দলীয় স্বার্থসিদ্ধির অথবা ব্যক্তিগত
স্বার্থ চরিতার্থ করার নীতি মাত্র।
আজ পশ্চিমবঙ্গে এই নীতির প্রসার
ঘটেছে ভয়াবহ ভাবে। এখন দেখা
যাক, নকশাল বিপ্লবের সঙ্গে এই
নীতির যোগ কতটুকু। আমার বিশ্বাস,
একমাত্র নিজেদের নামটুকু যথেষ্ট
ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া
ছাড়া আর বিশেষ কোন যোগ নেই।
নকশালী সংগঠন এ রাজ্যে আজ
ভাঙনের মুখে। কেন এ বিশ্বাস সেই
কথা বলবার জন্যই এই প্রবন্ধের
অবতারণা।

তথাকথিত নকশাল-নামধারী
সমাজবিরাোধীদের আমি কয়েকটি
ভাগে ভাগ করেছি।

(এক) দেশে কোনরকম বামপন্থী
গণ-আন্দোলন যাতে মাতা চাড়া দিয়ে
উঠতে না পারে সেজন্য যেসব
সমাজবিরাোধীদের দিয়ে মোটা অর্থের
বিনিময়ে রাজনৈতিক খুন করানো
হয়ে থাকে। এরা পেশাদার খুনী
এবং দুর্বৃত্ত। কাজটা তারা করে নক-
শাল বিপ্লবীদের নাম নিয়ে এবং
খুনের দায় বা দোষটা চাপানোর
চেষ্টা হয় সি পি এম-এর উপরে।
রাজ্যের বৃহত্তম এই বামপন্থী সংগ-
ঠনটিকে চূর্ণ করা অথবা তাকে ক্ষম-
তার আসনে না দেবার জন্য জনসাধা-
রণকে বিভ্রান্ত করাই এসব খুনের
একমাত্র লক্ষ্য। উদ্দেশ্য সফল না হলে
এসব রাজনৈতিক খুন নকশালদের
নামেই থেকে যায়। উদাহরণ, শ্রীহেমন্ত
বসু, শ্রীদেবদত্ত মন্ডল, শ্রীপীযুষ
ঘোষ। পুলিশ এদের ধরবার চেষ্টাও
করে না।

(দুই) পাড়ার মস্তান কিশোর ও
হুবক। যাদের পুস্তপোষকতা করে
থাকেন। পাড়ার বা এলাকার প্রতি-
পত্তিশালী রাজনৈতিক নেতারা। এরা
নকশাল বিপ্লবীদের নামাবলী গায়ে
এঁটে ছিনতাই, গুন্ডামি, রাহাজানি
ট্রাম-বাস পোড়ানো প্রভৃতি নানারকম
অপরাধমূলক কাজ করে থাকে।
কথার কথার ছোরা চালায়, পাইপ-
গান বার করে ভয় দেখায়। তবে এরা
পাড়ার বা এলাকার বাইরে গিয়ে
সাধারণতঃ কিছু করে না। দারিদ্র্য,
গৃহের অবহেলা, অফুরন্ত সমস্যা ও
শূন্য মস্তিষ্ক এদের চরিত্র ছমছাড়া
করে গড়ে তুলেছে। নেতারা তার
পুরো সুযোগ নিয়ে থাকেন। তাঁরা
এদের পুস্তপোষকতা করেন নির্বাচনে
জেতবার এবং পাড়ার বা এলাকার
অন্য রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিনষ্ট
করবার জন্য। বিশেষ বিশেষ কাজ

হাসিল কববার জন্য এরা নেতাদের
কাছ থেকে চাঁদা বা অন্য কোন নামে
আর্থিক সাহায্য এবং নিরাপত্তার
প্রতিশ্রুতি পায়। পুলিশ এদেরও ধরে
না, কারণ তারা জানে ধরে লাভ নেই।
(তিন) রাজনৈতিক নেতাদের
গোষা পেশাদার অপরাধী বা গুন্ডা।
প্রায় সব দলেরই নেতারা আজকাল
কিছু কিছু গুন্ডা পোষেন নিজের
নিরাপত্তার তাগিদে এবং রাজনৈতিক
প্রতিপক্ষকে জঙ্ক করবার জন্য। এরা
দাগী এবং সবরকম অপরাধমূলক
কাজে অভ্যস্ত। এদের দিয়ে খুন
থেকে সবরকম কাজই হাসিল করানো
যায় টাকা ও নিরাপত্তার বিনিময়ে।
এক শ্রেণীর পুলিশের সঙ্গে এদের
সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। দেশে নকশাল
আন্দোলন বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে
এরাও নকশালদের নাম নিয়ে নিজে-
দের এবং নেতাদের স্বার্থসিদ্ধি
করছে।

(চার) কিছু বিভ্রান্ত স্বল্প-
মেধার তরুণ ও কিশোর। পরীক্ষার
হলে গেলমাল বাধানো, টেবিল-
চেয়ার বেগু ভাঙা, গার্ডদের লাঞ্চিত
করা কিংবা আরও বড় রকমের কোন
গেলমাল বা বিশৃঙ্খলার মদত দেওয়া
প্রভৃতি কাজগুলো এরা সমাধা করে।
এরা কখনো নকশাল। কখনো সি পি
এম, কখনো এফ সি কখনো বি সি
কখনো বা আর সি—সব দলেই
আছে। তবে এদের কাজের জন্য এরা
কারো কাছ থেকে টাকা পায় না।
বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল এদের
পুস্তপোষকতাও করে না।

(পাঁচ) একদল শিক্ষিত বেকার
তরুণ। এরা মাসিক বেতনের চুক্তিতে
কিংবা আর্থিক লাভের বশবর্তী
“অদৃশ্য নেতার” নির্দেশে ভয়াবহ
অনেক রকম কাজ করে থাকে।
কখনো সি পি এম কখনো বা অন্য
কোন রাজনৈতিক দলের ছাপ গায়ে
নিয়ে তাদের পোস্টার বা প্রতীক চিহ্ন
ব্যবহার করে তথাকথিত নেতার ব্যক্তি-
গত স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকে। পুলিশ
এদের অপকর্মের সুযোগ পূর্ণ-
মাত্রায় গ্রহণ করে বামপন্থী দল-
গুলোকে হয়রান করবার জন্য।

(ছয়) রাজনৈতিক দলগুলোর
জঙ্গী ক্যাডাররা। এদের সব সম-
য়েই লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক প্রতি-
পক্ষ। এই ক্যাডারের দলে দুই এবং
চার নম্বরের (পূর্বে উল্লিখিত) তরুণ
ও কিশোররা আছে, আছে বিশেষ
রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ও
অনুগামী তরুণরাও। জঙ্গী ক্যাডার
সুইসাইড স্কোয়াড প্রভৃতি তৈরী
করেন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী বাম
ও অতিবাম পন্থী দলগুলো। রাজ-
নৈতিক নেতারা এদের অস্ত্র শিক্ষায়
ও ব্যবহারে সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ
করে তোলেন। খুনোখুনির রাজ-
নীতি যত বেড়ে চলেছে এই সব
সশস্ত্র জঙ্গী ক্যাডারদের প্রয়োজ-
নীয়তাও ততই বেড়ে যাচ্ছে। এক-
দলের ক্যাডারদের সঙ্গে অন্যদলের
ক্যাডারদের সংঘর্ষ উপস্থিত হলে
এবং সংঘর্ষে তারা আহত বা নিহত

হলে পুলিশ কাউকে সি পি এম
সমর্থক কাউকে ফরোয়ার্ড ব্লক
কাউকে বা নকশাল বলে চালান
দেয়। কিন্তু কলকাতার কুমোরটুলী,
বেলেঘাটা, পাইকপাড়া কিংবা
জোড়াবাগানে (সি পি এম এলাকা
বাদে) যারা নকশাল ভেদ করে থাকে
এবং সি পি এম-এর সঙ্গে সংঘর্ষে
অংশগ্রহণ করে থাকে তারা কি সবাই
সত্যিই নকশাল?

নকশাল নামের সর্বগ্রাসী অপ্র-
তিহত প্রভাবের জন্য সাধারণ মান-
বের এমন সন্দেহও মাঝে মাঝে হয়ে
থাকে যে নকশালরা আসলে সরকা-
রের গোষা গুন্ডা ছাড়া আর কিছু
নয়! কিন্তু তাও কি সত্যি? তাহলে
জেলখানাগুলোতে যে সব নিরস্ত
বন্দীদের মাঝে মাঝে পুলিশ নৃশং-
সভাবে হত্যা করে থাকে—তারা
কারা? চরের সাহায্যে চিনে নিয়ে
অথবা বিশেষ এলাকার বিশেষ বিশেষ
বাড়ীতে খানাজন্মসী চালানোর নাম
করে পুলিশ অতর্কিতে কিন্তু পরি-
কল্পিত ভাবে যে সব তরুণকে
প্রকাশ্যে গুলি করে মারে—তারা কি
কারা?

প্রকৃত নকশাল বিপ্লবী একদল
তরুণ পশ্চিমবঙ্গে ছিল। এরা
সংখ্যায় কয়েক হাজার হবে হয়ত।
সংখ্যায় কম হলেও এদের সংগঠন
অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল।

তাদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে
বিভিন্ন আন্দোলনে অন্যান্য রাজ-
নৈতিক দলের হাতে অথবা পুলিশের
গুলিতে নিহত। বিভিন্ন জেলেও
সংখ্যায় বেশ কিছু আটক হয়ে আছে।
মাঝে মাঝে পরিকল্পনা মারফত
তাদের জেলের মধ্যে পিটিয়ে মারা
হয়। এদের উপর বিদ্‌মাত্র দরদ বা
মমতা নেই সরকারের বা পুলিশের।
কারণ এদের নিজেদের ইচ্ছামত পরি-
চালনা করতে পারেন না তাঁরা।
কিছু নিহত, কিছু জেলে আর
কিছু খুব সম্ভব এখন পূর্ববাংলায়
মুক্তিবোম্বাদের পাশে।

আমার তাই জানতে ইচ্ছে করে,
“নকশাল বিপ্লবের” তাত্ত্বিক ছেয়ে
যাওয়া এই পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত
নকশাল এখন সংখ্যায় ঠিক কত?
এবং তাদের কতজনই বা কারারুদ্ধ
আর কতজন বাইরে? বেশ কিছু
সমাজবিরাোধী এদলেও অনুপ্রবেশ
করেছে এবং তখন থেকেই সূর্য
হয়েছে দলের ভাঙন—তাই সঠিক
সংখ্যাতা জানতে ইচ্ছে করে। সংখ্যাতা
যদি পাওয়া যেত তাহলেই ঠিক
বোঝা সম্ভব হতো যে পশ্চিমবঙ্গের
বর্তমান “নকশাল বিপ্লবে” তাদের
যথার্থ অংশ কতটুকু?

কিছুদিন পূর্বে রাজ্য পুলিশ
দপ্তরের জৈনিক মদ্যপাত্র বোর্ডিঙলেন
নকশাল আন্দোলন এখন তাঁরা সহ-
জেই দমন করে ফেলতে পারেন কিন্তু
রাজনৈতিক কারণে তা পারছেন না।
তাঁদের বক্তব্য থেকেই মনে হয়, রাজ-
নৈতিক কারণে নকশাল নামটা জ্বিয়ে
রাখা দরকার বলেই তা টিকে আছে
এবং নকল নকশালদের দৌলতে তা

আরও কিছুদিন টিকে থাকবেও।
পশ্চিমবঙ্গে ডুবছে কিংবা
ডুবতে বসেছে—হতাশাবাদীদের এ-
ধরণের উজ্জিক প্রশ্ন না দিয়েও বলা
যায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ
সত্যিই বড় ভয়ানক।

ছোট্ট একটি উদাহরণ দিই।
আমি যেখানে থাকি সে অঞ্চলের
আনুমানিক তিন হাজার ভোটার
অধ্যুষিত একটি এলাকা বা গ্রাম প্রায়
আমাদের চোখের উপরেই একটু
একটু করে সমাজ বিরাোধীদের আখ-
ড়ায় পরিণত হয়েছে। মাঝখানে হঠাৎ
শোনা গেল, “পিকিং রোডিও” এই
অঞ্চলটিকে (যাকে আমরা সমাজ
বিরাোধীদের আঁতুখানা বলে জানি)
“মুক্ত অঞ্চল” বলে ঘোষণা করেছে।
অতীত প্রকৃত মুক্তাঞ্চল বলতে যা
বোঝায় তার বিদ্‌মাত্র নিদর্শন এর
কোথাও নেই। তাই সন্দেহ হয়,
রোডিও বার্তা কি সত্যি পিকিং-এর
কিংবা এই দেশেরই কোথাও থেকে
এসব বার্তা রোডিও মারফৎ পিকিং-
এর নামে প্রচার করা হয়ে থাকে?

সমাজ বিরাোধীদের স্বর্গরাজ্য এ
রকম “মুক্ত অঞ্চল” পশ্চিমবঙ্গের
প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এসব
মুক্ত অঞ্চল তৈরী হয় এ ভাবে—।

প্রথমে বাইরের কিছু লোক
স্থানীয় সমাজ বিরাোধী অথবা উচ্ছ-
ঙ্খল তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ
করে। মুক্ত অঞ্চলে তাদের আনাগোনা
চলতে থাকে। বেশ কিছু স্থানীয়
কিশোর এবং তরুণ (রাজনীতির
সঙ্গে যাদের কোনদিন কোনরকম
সংগ্রাম ছিল না) হঠাৎ নকশালী
শ্লোগান ভক্ত হয়ে ওঠে। রাতারাতি
পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে যায় চারি-
দিক। “মুক্ত অঞ্চল”কে ঘাঁটি করে
সূর্য হয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক
“বিপ্লব”। এদিকে মুক্ত অঞ্চলের
অধিবাসীদের প্রাণ কষ্টাগত হয়ে ওঠে
একদিকে তথাকথিত বিপ্লবীদের
দাপটে (যার মধ্যে তাদের পাড়ার
ছেলোরা এমন কি হয়ত ঘরের ছেলে-
রাও আর বাদ নেই।) অন্যদিকে
পুলিশ সি আর পি, মিলিটারির
অহেতুক হয়রানি আর অত্যাচার।

কিন্তু আশ্চর্য এই, অপরাধীরা কোন
ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে না। যত সংগো-
পনৈই খানাজন্মসী অথবা ধরপাকড়ের
ব্যবস্থা হোক, কি করে যেন তা
আগেই অপরাধীদের কানে পৌঁছে
যায়। এমন কি কারফিউ জারী

হবার একদিন আগেই তারা এলাকা
ছেড়ে দিবা সবে পড়ে। ভোগ আর
হয়রানি যা কিছু হয় তা সাধারণ
নিরীহ মানুষদের। অন্ততঃ আমার
কথিত মুক্ত অঞ্চলে এইসব কাণ্ডকার-
খানা হামেশাই দেখছি।

ভালোকরে খোঁজ নিলে দেখা
যাবে এইসব সমাজবিরাোধী তথ-
কথিত বিপ্লবীরা কোথাও বিশেষ
বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রভাবিত
কোথাও বা খোদ সরকার প্রভাবিত।
এরা নকশাল নয়, কোনদিন ছিল না,
কখনো হবেও না।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক
দলের নেতৃবৃন্দের তাই আজ একান্ত
প্রয়োজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নিজে
দের দলে অনুপ্রবেশ সমাজবিরা-
োধীদের নিষ্কাশন করা, পারস্পরিক
নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে জঙ্গী
ক্যাডারদের সংযত করা এবং রাজ্যের
বামপন্থী আন্দোলন দমন কিংবা
চূর্ণ করার জন্য কেন্দ্রের হাঁক পন্থা
অবলম্বনের বিরুদ্ধে এককট্টা হয়ে
সোচ্চার প্রতিবাদে মুখর হওয়া
(রাজ্যের প্রাক্তন কোয়ালিশন সরকা-
রের অন্যতম শরিক নবকংগ্রেসও তার
মধ্যে থাকবেন) নচেৎ পশ্চিম-
বঙ্গে রাহু-মুস্তা করা কোন ক্রমেই
সম্ভব হবে না। আর এটা যদি
তাঁরা না করতে পারেন তাহলে গণ-
তান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে দেশের
সমৃদ্ধিসাধন কিংবা বিপ্লবের
মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—কোন
রাজনৈতিক দলের কোন উদ্দেশ্য,
লক্ষ্য কিংবা আদর্শ কোনদিনই এ-
রাজ্যে সফল হবে না। অবশ্য এটা
কিরতে গেলে আরও কিছু রাজ-
নৈতিক খুনের জন্য এ রাজ্যের
নেতাদের তৈরী থাকতে হবে। সে
বন্ধুকও তাঁদের নিতে হবে নতুবা
আগে পিছে পুলিশ প্রহরার থেকে
জনসাধারণকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব
দেওয়ার মত দুঃসহ, হাস্যকর ও
দৃষ্টিকটু অবস্থার হাত থেকে তাঁরা
কোনদিনই নিজেদের মুক্ত করতে
পারবেন না। কোন কাজের কাজই
করতে পারবেন না।

নকশাল আন্দোলন সম্পর্কেও
বলার কথা অনেক আছে। তবে সব
কথা বলার অধিকারী আমি নই।
যেটুকু পারি তাই বলছি। একদল
আদর্শবাদী তরুণ একদিন “বন্দ-
কের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার
(শেষাংশ অন্তিম পৃষ্ঠায়)

Introduction :

With a view to serve ever expanding Indian Industries, we offer to our industrial and domestic consumers 'BIDYUT' brand, trouble free, quality "Heat Sealing Machine" for Alkathene, cellophane, aluminium foil, waxed and paraffin laminated papers and all other materials which are capable of being thermally sealed.

UP TO DATE HEAT SEALER

The 'BIDYUT' hand set heat sealer is elegant in appearance and handy to use. Suitable for A.C./D.C. current. It is portable to enable it to be carried to where it is to be used. It is engineered for effective and efficient sealing of packets or bags which are unwieldy because of their weight or dimensions and for sealing long joints and seams.

Manufactured by BIDYUT ELECTRONICS.

Marketed by ANBI TRADING COMPANY

61, MOTT LANE, 1st FLOOR, CALCUTTA-13

গ্রামোফোন রেকর্ড ও ভারতীয় সংগীত

ঐতিহাসিক

১৮৭৭ সনে মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন যখন ফোনোগ্রাফ বস্তু আবিষ্কার করেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র বোল বছর হলেও গীতকার হিসেবে তার মধ্যেই তিনি পরিবারিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “সরোজিনী” নাটকের জন্য “জুড়ল জুড়ল চিতা স্বপ্নদুগ্ধ বিপ্লব” যখন রচনা করেন তখন তার বয়স মাত্র চোদ্দ। ১৮৭৭ এর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য “শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা” এবং “তোমারি তরে মা সর্পিন্দু এ দেহ”। পরবর্তী গান দুটির সুসুন্দর তিনিই তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব থাকা সম্ভব।

১৮৮১ সালে, রবীন্দ্রনাথের “বাল্মীকি প্রতিভা” রচনার বছরে, এডিসনের ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের উন্নতিসাধন করেন বেল ও টেকটার নামে দুই তরুণ বিজ্ঞানী। ধাতু-

নির্মিত চেস্টের গিল্পে মোম লাগিয়ে তার উপরে স্বরকম্পন রেকর্ড করা হত। ১৮৭৯-৮০ সনে প্রথম লন্ডন-বাসকালে রেকর্ড করা পাশ্চাত্য সংগীত রবীন্দ্রনাথ শুনছিলেন তবে তখনকার আদিম রেকর্ড সংগীত তাঁর খুব ভাল লেগেছিল মনে হয় না। তখন তিনি স্বরলিপিকরা পাশ্চাত্য সংগীত নিয়ে মন্ত। বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমঙ্গলার অনেক গান সদ্যপ্রকাশিত স্কচ ও আইরিশ মেলোডির আডাপ্টেশন।

কুস্তলীনের এইচ বোস

অধুনাবিস্মৃত কুস্তলীন পারফরমারের স্বঘাষিকারী হেমেন্দ্রমোহন বসু রবীন্দ্রনাথের স্বসমাজের এবং বস্তু লোক ছিলেন। তখনকার বাঙালী সমাজে এমন একজন স্বাধীনচেতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগী পুরুষের কথা ভাবা

যায় না। ১৮৯৮ সন নাগাদ তিনি এডিসনের স্বকীয় রেকর্ডিং মেশিনটা কলকাতায় আনিতে তার সাহায্যে মেম লাগানো চোঙা রেকর্ড তৈরী করে ব্যবসা সুরু করে দেন। এগুলোকে বলা হত cylindrical wax record এবং এই পর্ষায় ১৮৯৮ থেকে ১৯০২-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বারোটি গান ও আবৃত্তি রেকর্ড করে বাজারে ছাড়া হয়।

১৮৮৮ সালে (মাল্লার খেলা রচনা ও অভিনয়ের বছর) এমিল বেলিনার এবং ফ্রিড্রিশ গাসবার্গ নামে দুজন জার্মান বিজ্ঞানী চাকতি বা ডিস্ক রেকর্ড তৈরীর পদ্ধতি বের করেন এবং ১৯০২ সনে ভারতে এসে গহর জাঁন, মালিকা জাঁন ইত্যাদি ভারতীয় গাইয়ে বাজিয়েদের গান বাজনা রেকর্ড করে নিয়ে যান এবং হ্যানোভার থেকে ছাপিয়ে এখানে পাঠান।

ঠিক কাছাকাছি সময়েই British Talking Machine company নামে একটি প্রতিষ্ঠান এদেশে রেকর্ড ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। এটিই পরে গ্রামোফোন কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। British Talking Machine Company'র কোন প্রতীক ছিল না। প্রথম দিকে গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতীক ছিল GeminiTwin। পরবর্তীকালে, খুব সম্ভবত ১৯০৭ সালে, কুকুরের ছবি গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতীক হয়। এদেশে সংগীত রেকর্ডের ব্যবসায়, একটি ব্রিটিশ কোম্পানী যে একচেটে অধিকার আদায় করে নিতে পারবে তখনকার দিনে তা তেমন আশ্চর্য ঘটনা নয়।

কিন্তু হেমেন্দ্রমোহন বসু ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া বাঙালী। তিনি ডিস্ক রেকর্ড তৈরী করার স্বপ্ন আমদানির চেষ্টা করতে থাকলেন। কারণ ডিস্ক রেকর্ড প্রথমে এক পিঠে এবং পরে দুই পিঠেই বাজান যেত। ধূনি গ্রহণ ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তিনি সরকারী

অনুমতি পেলেন না। তবে তিনি না-ছোড়বান্দা। ফ্রান্সের প্যাথিকোম্পানীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে তিনি তাঁর ভাল ভাল সিলিন্ডার রেকর্ডগুলিকে ডিস্ক রূপান্তরিত করে বাজারে ছেড়ে গ্রামোফোন কোম্পানীকে ভাবিয়ে তুললেন। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের গাওয়া ছদ্মশিটি গান ও আবৃত্তির রেকর্ড ডিস্ক রূপান্তরিত করার জন্য তিনি ফ্রান্সে পাঠালেন। কিন্তু দুভাগ্যের বিষয় প্যাথিকোম্পানী ইতিমধ্যে রেকর্ড ব্যবসায় ছেড়ে সিনেমা ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করল এবং রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডের ছাঁচগুলো আর ফেরৎ পাওয়া গেল না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে উদ্যোগী পুরুষ কিন্তু ভ্রমস্থান হেমেন্দ্রমোহন বসুর মৃত্যু হয়।

তবে প্রবলপ্রত্যাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক পুঁজির সঙ্গে একক ভরতীয়ের এই অসম সংগ্রাম শেষে গৌরবময়। প্যাথিকোম্পানীর সহযোগিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের চোদ্দটি গান (অধিকাংশ বঙ্গভঙ্গি আন্দোলনকালে রচিত) (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠার)

নকশালী বিপ্লব

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

উৎস” এই তত্ত্ব বিশ্বাসী হয়ে এ পথে নেমেছিলেন। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে, শোষণ ও প্রতিদ্বন্দ্বীশীল গোষ্ঠী ক্ষমতা কখনো স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়না, ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হয়। কোরকম আপোষের নীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রেরণীশত্রু বোঝানে নিজের ইচ্ছের পথ ছেড়ে দেয় না সেখানে ব্যক্তি-হত্যার নীতিতেও এরা বিশ্বাসী ছিলেন। এদের কাছে একমাত্র চীন ছাড়া আর সবাই সংশোধনবাদী এবং প্রতিদ্বন্দ্বীশীল। সে হিসাবে রাশিয়া আমেরিকা থেকে সুরু করে ভারত-বর্ষের কংগ্রেস, সি পি এম, সি পি আই সকলেই এদের কাছে পরিভ্রাণ। এরই সঙ্গে “বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার

যে যত পড়ে সে ততবড় মূর্খ হয়” এই “সাংস্কৃতিক বিপ্লব”-এর আদর্শও এরা বিশ্বাসী হয়েছিলেন। এইসব বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এই কান্ডগুলি ঘটিয়েছেন :

- (ক) ব্যক্তিহত্যার নীতি প্রবর্তন।
- (খ) মৃত্ত অশ্লল সৃষ্টির মাধ্যমে শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা।
- (গ) পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা বানচাল করে দেবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা-য়তনগুলি পুড়িয়ে অথবা বিধ্বস্ত করে দেওয়ার চেষ্টা।
- (ঘ) পুরাতন বুর্জোয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করতে গিয়ে বামপন্থী বিপ্লবীরা যাকে বলেন “ট্রেন ওয়াশ” করা-পশ্চিমবঙ্গের

স্কুল কলেজের ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী, মনীষীদের রচিত দুল্লভ গ্রন্থসমূহ, গবেষণার পুঁথিপত্র যতটা পেরেছেন পুড়িয়ে ভেঙে তছনছ করেছেন।

করতে চেয়েছিলেন এরা অনেক কিছুই। কিন্তু তার ফলটা কি দাঁড়িয়েছে? ফলটা দাঁড়িয়েছে এই যে, উপরিউক্ত নীতিগুলির একটাও আজ আর এদের নিজস্ব নীতি নেই। এদের নামে এ “বিপ্লব” আজ সর্বস্তরে সর্বদলে ছড়িয়ে গেছে এবং সমাজবিরোধী ও সুযোগসম্পাদনীদের হাতে পড়ে তা চূড়ান্ত বিকৃত রূপ ধারণ করেছে।

(ক) ব্যক্তি হত্যার নীতির বল হচ্ছে সমাজের নীচস্তরের এবং খেটে খাওয়া নিরাপত্তাবিহীন সাধারণ মানুষ। প্রেরণীশত্রু খতমের নামে বেছে নেওয়া হচ্ছে ব্যক্তি শত্রুদের। শোষণ গোষ্ঠীর কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বীশীল আমলাতন্ত্রের একটি আমলার কিংবা

কোটিপতি সওদাগরের কেশও এরা স্পর্শ করেন নি কিংবা স্পর্শ করতে পারেন নি। নীচতলার মানুষ যারা নিজেরাই সমাজব্যবস্থার শিকার কিংবা একসুপলয়েটেড তাদের হত্যার মাধ্যমেই এরা শত্রু করেছিলেন সন্দ্রাস সৃষ্টির। সে নীতি এখন অনেকেরই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সিঁধির হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(খ) যথার্থ মৃত্ত অশ্লল পশ্চিমবঙ্গের কোথাও নেই। যা আছে তা সমাজবিরোধীদের আড়াল ঘাঁটি।

(গ) শিক্ষাব্যবস্থা বানচাল করতে গিয়ে এরা অবাধ এবং গণটোকা-টাকির নতুন নিয়মের প্রবর্তন করেছেন মাত্র-ছাত্রদের চোখ বুজে পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সারা বছর যাদের বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না তারাই তাঁদের নীতির পুঁথি সুযোগ নিয়ে চলেছে। হাজারের উপর স্কুল কলেজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে এরা কিন্তু তাঁদের আদর্শে বিশ্বাসী তরুণ বোম্বার দল পান নি। সমাজ পেয়েছে আরও কিছু সমাজ বিরোধী মনো-ভাবাপন্ন “বিপ্লবের শিকার”—এই মাত্র।

(ঘ) সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটতে গিয়ে এরা এ রাজ্যের ভাবী নাগরিকদের শূন্য মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা করে গড়ে তুলেছেন। দেশ-বাপী নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, যত বেশী বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারবেন ততই তাঁদের বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবে। কিন্তু সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, কেতাবী থিওরী বা তত্ত্ব যে সর্বদা, সর্বত্র একই ফল প্রদান করে না পশ্চিমবঙ্গেই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আরও উদাহরণ ঘরের পাশের সিংহলে সাম্প্রতিক বিপ্লব-প্রচেষ্টা এবং তা দমনের জন্য বিপ্লবের সমস্ত বড় বড় রাষ্ট্রের তাত্ক্ষণিক

সর্বশক্তি প্রয়োগ। বিপ্লবী বাংলা দেশের—আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য স্বাধীন বাংলার সাম্প্রতিক মৃত্তি-বুৎসের ইতিহাস থেকেও আমরা কিঞ্চিৎ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যদিও তার পটভূমিকা সম্পূর্ণ আলাদা।

নিশ্চয় প্রয়োজন আছে বিপ্লবের। প্রয়োজন আছে মৃত্তির শেষ ধাপে পৌঁছবার জন্য অবিরাম সংগ্রামের। বিশেষ করে যে দেশ একটা নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চায় তার জন্য এ সংগ্রাম একান্তই প্রয়োজন।

নকশাল আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে একটা পরম উপকার যা করেছে তা হচ্ছে, সমাজের সর্বস্তরের কাঠামোর মধ্যে প্রচণ্ড ভাবে একটা নাড়া দিয়েছে। কিন্তু তার পরেই সমাজের চেহারা হয়েছে স্ফাপা কুকুরের মত। দেখা যাচ্ছে, এই “হিংস্র সারমেরকে সামলাবার ক্ষমতা তাদের নেই। অস্ব-খামার মত তাঁরা পাশ্চাত্য অস্ত্রের প্রয়োগটাই শূন্য শিখেছেন, অস্ত্র নিবারণের কৌশল তাঁদের জানা নেই। এটা বিপ্লবী চরিত্রের নিঃসন্দেহে একটা বড় দুর্টি। এই দুর্টি সংশোধন করে নিতে হলে তাঁদের সর্বপ্রথম উচিত হবে—নিজদের নীতিগুলি সুস্পষ্ট ও স্বার্থহীন ভাষায় ব্যাপকভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। বিশেষ করে ব্যক্তিহত্যার কুটিল ও হ্রাস্ত রাজনীতিতে যদি তাঁরা আর আশ্রয়ান না থেকে থাকেন তবে তাঁদের নাম নিয়ে যেখানে যেখানে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড এখনো অবাধে চলেছে তার প্রতিটির প্রতিবাদ তাঁদের করা-দরকার। এতে একদিকে যেমন জনসাধারণের কাছে তাঁদের বিপ্লবী চরিত্রের রূপ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে, অন্যদিকে তেমনই এসব হত্যার জন্য কারা দায়ী তাও অপ্রাপ্ত ভাবে জানা যাবে।

PIONEER

VESTS

ARE HYGIENICALLY BLEACHED!

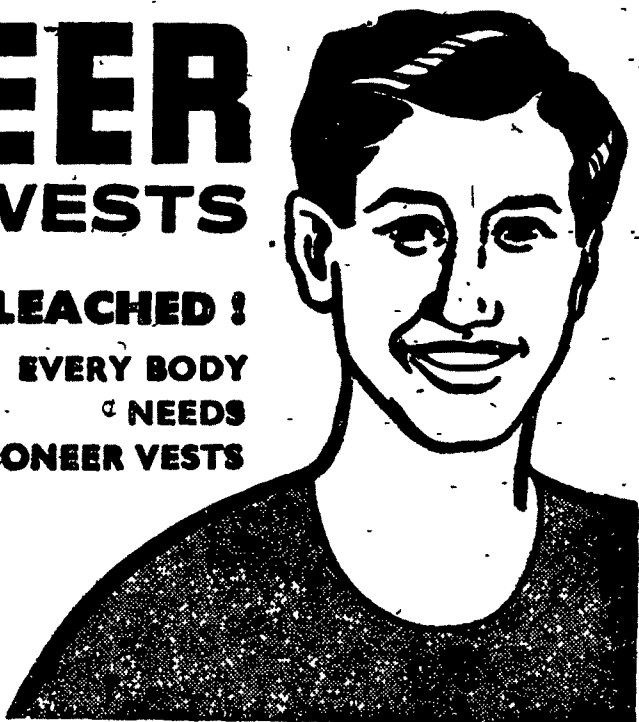
EVERY BODY

& NEEDS

PIONEER VESTS



Also Tee shirts,
Tennis shirts,
Chain Shirts,
Drawers &
Briefs



PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS, CALCUTTA-2 Phone : 24-2988

পূর্ববাংলার বামপন্থীদের সম্পর্কে (২)

শকিবুল হাসান

দ্বন্দ্ব নির্ধারণে চেয়ারম্যান মাও বলেছেন

"When reactionary forces and its running dogs stand on one pole and the people stands on the other—thus forms the principal contradiction."

পূর্ব বাংলার জনগণ এখন প্রতিক্রিয়াশীল শোষকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পক্ষ অবলম্বন করে পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা না করলে পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান মাও সে তুং এর নির্ধারিত দ্বন্দ্বিক বিশ্লেষণকেই অস্বীকার করা হবে। কিন্তু মোহাম্মদ তোহা সাহেবদের কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তব পরিস্থিতিতে অস্বীকার করে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করায় জনগণ বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্তশ্রেণীর উগ্রজাতীয়তাবাদী প্ররোচনায় সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ বিভ্রান্ত এ জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে এবং তাদের নিপীড়নের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আপোষের পথে শোষণের ক্ষেত্র ভাগের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী তোলে। তোহা সাহেবদের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের এ ভূমিকাকে প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু জনগণ তখন সংগ্রামের পথে নেমেছে, শত্রু মাত্র নিন্দাবাদেই তারা সন্তুষ্ট নয়, তাদের দাবী ছিল বাস্তব ও সুস্পষ্ট একটি কর্মসূচী। এমন এক জটিল পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার বিপ্লবীরা নিম্নের কোন ভূমিকাটি গ্রহণ করবে তা নিয়ে রহস্যবিতর্কের সৃষ্টি হয় —

(এক) ভবিষ্যতে পাকিস্তান ভিত্তিক বিপ্লব সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন শোষক পুঁজিবাদী শ্রেণীকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে আওয়ামী লীগ তথা পূর্ব বাংলার সামন্ত ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামকে বানচাল করা।

(দুই) ভবিষ্যতে পাকিস্তান ভিত্তিক বিপ্লব সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বর্তমান এ সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় থেকে পরোক্ষ ভাবে শাসক গোষ্ঠীর সহযোগিতা ও আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করা।

(তিন) আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে পাকিস্তানী শোষকদের থেকে পূর্ব বাংলা মুক্ত করে ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলা ভিত্তিক বিপ্লব করা।

(চার) পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে

পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীকে উৎখাত করে বর্তমানেই বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

তোহা সাহেবদের পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তান ভিত্তিক বিপ্লবের এক অবাস্তব এবং অসম্ভব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তব অবস্থার সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে চতুর্থ পথটি বেছে নেন। সিমান্ত অনুযায়ী তারা "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" প্রতিষ্ঠার এগারো দফা ভিত্তিক একটি কর্মসূচীও জনগণের সম্মুখে তুলে ধরেন। কমরেড চারু মজুমদারের প্রয়োগ পদ্ধতিকে রণকৌশল হিসাবে গ্রহণ করে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলারা একই সঙ্গে সামন্ত ও সেনা বাহিনীর শ্রেণী শত্রুদের খতম করতে শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে প্রবীরবাবু বলেছেন তিনি নাকি শত্রু তোহা সাহেবদের শ্রেণীশত্রু খতমের সংবাদই শুনেন। বাস্তবে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলারাই যশোর জেলাতে প্রথম শ্রেণী শত্রু খতম অভিযান শুরু করেন, তাদের প্রথম এ্যাকশন ব্যর্থ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় এ্যাকশনে যশোরের কালাগঞ্জ থানার কুখ্যাত অত্যাচারী জোতদার মদনলাল লীগের থানা প্রধান চান্দ আলীকে খতম করে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম পূর্ব বাংলায় শ্রেণী সংগ্রামের সূচনা করেন। ওয় এ্যাকশন ঘটে পাবনা জেলার চর অঞ্চলে।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির এ তিনটি এ্যাকশনের পর তোহা সাহেবদের পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) তাদের খতম অভিযান শুরু করেন এবং খুলনা যশোর ময়মনসিংহ ও নোয়াখালীতে শ্রেণীশত্রুদের খতম করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলাদের শ্রেণীশত্রু খতম অভিযান চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রংপুর, পাবনা ও যশোরের আরো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পাবনা শহরের গুডাধা প্রধান অত্যাচারী বদমাইশ, আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ সদস্য আহাম্মদ রফিককে খতম করার পর ক্ষিপ্ত আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যেই তাদের ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে বিভিন্ন এলাকার কমিউনিস্টদের উপর লেলিয়ে দেয় এবং পাবনা শহরের পার্টি সমর্থক ডাঃ দাক্ষী ও একজন ছাত্রকে হত্যা করে। ফলে পাবনা, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন

স্থানে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে কয়েক দফা সশস্ত্র সংঘর্ষেরও সূত্রপাত হয়। পুন্ড্রা এবং ই পি আর বাহিনী শ্রেণীগত চরিত্রের কারণেই আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে ও কমিউনিস্টদের উপর ব্যাপক নিপীড়ন চালাতে থাকে, পার্টির গেরিলারা সশস্ত্র ভাবেই তাদের মোকাবেলা ও প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ঢাকা শহরে এ পার্টির গেরিলা যোদ্ধারা গত মার্চ মাসের ছয় এবং নয় তারিখে সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করে যথাক্রমে একজন সশস্ত্র সেনা ও ক্যাপ্টেনকে খতম করে এবং তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ফলে সেনাবাহিনীও উক্ত পার্টির উপর তাদের বর্বর আক্রমণ অত্যাচার চালবার চেষ্টা করে। এভাবেই পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ও তাদের শ্রেণী শত্রুদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে সক্ষম হন।

অপর দিকে বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ না করেই তোহা সাহেবরা পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি ভারতের অনুরূপ, পূর্ব বাংলার বিপ্লব ভারতের বিপ্লবেরই অংশ, সুতরাং কমরেড চারু মজুমদার যখন স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ কায়েম করবেন তখন সে সঙ্গে পূর্ব বাংলাও মুক্ত হয়ে যাবে—এ ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য আমদানী করেন এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ জনগণের আস্থা হারাতে থাকেন। বস্তুতঃ নিজেদের এলাকার জনগণকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্ভুদ্ধ করে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব এলাকার পরিস্থিতি অনুযায়ী গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করার দায়িত্ব অতি সন্তর্পণে এঁড়িয়ে গিয়ে মোহাম্মদ তোহারা পূর্ব বাংলার বিপ্লবের দায়িত্বও কমরেড চারু মজুমদারের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এরাই উনিশশো ছেষটি সালে নকসালবাদীর বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে হঠকারিতা বলেছিল, আবার পাকিং রিভিউতে মহান চীনের সমর্থন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মত পাল্টিয়ে বিপ্লবী কার্য বলে অভিমান করেছিলেন, এরাই আইয়ুব ইয়াহিয়ায় চীন ঘেঁষা নীতিকে প্রগতিশীল বলে অভিহিত করে জনগণের নেতৃত্ব থেকে পার্টিকে সরিয়ে রেখেছেন, এরাই পাকিস্তানী শাসক ও শোষক চক্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে সমঝোতার মাধ্যমে একটি অবৈধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির বৈধ মতপন্থ "গণশক্তি" প্রকাশ করার অনুমতি পেরোইছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত সে পত্রিকায় পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজি-

বাদী তেইশটি পরিবারের দুই পরিবার এম এম ইম্পাহানী ও ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেডের প্রচার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হতো, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে তারা উক্ত পার্টির গোপন কার্যকলাপ, এমন কি প্রেস ও লাইব্রেরীর সম্মান এ পত্রিকা "গণশক্তি"তে প্রকাশ করে পার্টির বিপ্লবী কর্মীদের পুন্ড্রা ও মিলিটারীদের বর্বর হামলার শিকার করার মত জঘন্য কার্যে তাঁরাই লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রফেসর আসহাবউদ্দিনের হুঁলিয়াও তোহা-ইয়াহিয়া গোপন সাক্ষাৎের পর সমঝোতার মাধ্যমেই প্রত্যাহত হয়েছিল।

প্রবীরবাবু তার সমালোচনায় মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে আমার বিভ্রান্তিকর মোহের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবেই মাওলানা ভাসানীকে জাতীয় বুদ্ধোন্নতা বলে উল্লেখ করেছি। চেয়ারম্যান মাও সে তুং বলেছেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুদ্ধোন্নতাদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, তারা তাদের দোদুল্যমান চরিত্রের জন্য কিছু অংশ বিপ্লবীদের মিত্র অথবা শত্রু উভয়ই হতে পারে। সুতরাং বিপ্লব শত্রু হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীশত্রু বলার কোন অবকাশ নেই। মাওলানা ভাসানী তার রাজনৈতিক পার্টি ন্যাপে অবৈধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁদের দলসময়ে আশ্রয় দিয়ে, তাঁর কৃষক ফ্রন্ট, শ্রমিক ফ্রন্ট, ছাত্র ফ্রন্ট, এমন কি রাজনৈতিক পার্টি ন্যাপকে কমিউনিস্টদের প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে দিয়ে তিনি

কি বিপ্লবীদের মিত্র হিসাবে পরিচয় দেন নি? তাঁর এ বিপ্লবী মিত্রের পরিচয় পেয়েই মহান চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং স্বয়ং দুবার মাওলানা ভাসানীকে তাঁর দেশে আমন্ত্রণ করেছেন। গত নির্বাচনে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিমান্ত নিলেও মাওলানা ভাসানীই এককভাবে সে সিমান্তকে বাতিল করে দিয়ে বিপ্লবীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। এর জন্য হাজারী দানেশ নূরুলহুদা কাদের বক্তের মত কুপ্রভাবশালী সদস্যের পদত্যাগকে তিনি পরেয়া করেন নি। এহেন মাওলানা ভাসানীকে হঠাৎ প্রতিবিপ্লবী বলে তাঁকে শত্রু শিকারে ঠেলে দেবার অর্থ কি? আমি জ্ঞানে চাই মোহাম্মদ তোহারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করছেন, না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করছেন? বিপ্লব পরিচালনা করার দায়িত্ব কি জাতীয় বুদ্ধোন্নতাদের, না বিপ্লবীদের? দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব কর্মসূচীর অভাবে বিপ্লব পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে, বিপ্লব না করার অপরাধে জাতীয় বুদ্ধোন্নতাদের প্রতিবিপ্লবী বলে দোষারোপ করা কি নিজেদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতাকে ধামচাপা দেবার ব্যর্থ প্রয়াস নয়? তোহা সাহেবদের মত প্রবীরবাবুও মজিবুর ও ভাসানীকে একই প্রতিক্রিয়াবাদী সারিতে ফেলেছেন কিন্তু তা মোটেও সঠিক নয় কেনন মজিবুর বিশ্ব সমাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের সহযোগী পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর পরিচালক, সুতরাং শেখ মজিব প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতি-

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

গ্রামোফোন রেকর্ড

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

রেকর্ড বাজারে ছেড়েছিলেন। এ ছাড়া বদেমাতুরম্। ১৯০৫ সনে লাল বাজারের পুন্ড্রা হেমেন্দ্র মোহনের রেকর্ড কারখানা তদ্রূপ করে অনেক মেমের ছাঁচ নিয়ে যায় যার আর হিঁদিশ পাওয়া যায় নি।

International Talking Machine company নামে একটি জার্মান সংস্থাও ভারতীয় সংগীতের রেকর্ড ব্যবসারে নামে এই শতকের গোড়ায়। এদের প্রতীক ছিল জার্মান "ওর্ডিওন" নাট্যশালা। এরা তখনকার দিনের বহু গুণী ব্যক্তির গান বাজনা রেকর্ড করেছিল যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানও ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, এই ওর্ডিওন কোম্পানীই দু পিঠে রাজাবর রেকর্ড প্রথম তৈরি করে। পরে এইচ এম ভি তাকে অনুসরণ করে। প্যাথি কোম্পানীও তাই করেছিল। হেমেন্দ্র মোহন তাদের সাহায্যে দু পিঠে বাজানো রেকর্ড তৈরি করিয়েছিলেন। ১৯২৯-এর অর্থসংকটের

পরে এইচ এম ভি ওর্ডিওন কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কলকাতা কোম্পানীটির স্বত্ব তারা আগেই কিনে নিয়েছিল। অর্থনীতিতে একেই বলে monopoly through cartel and amalgamation বা একাধিক পুঁজিবাদী সংস্থার সংযুক্তির মাধ্যমে একচেটিয়া স্বার্থের আত্মপ্রকাশ। এর পরে ভারতবর্ষে আর কোন কোম্পানী লাইসেন্স পার্মিট। দেশী যে সব কোম্পানী পরে স্থাপিত হয়েছে (এবং যার অধিকাংশ প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে উঠে গেছে) তাদের রেকর্ড তৈরির উপকরণ ছাপাবার যন্ত্র আমদানীর লাইসেন্স দেয়া হয়নি। রেকর্ড ছাপাবার জন্য সবাইকে এইচ এম ভি'র স্বেচ্ছ হতে হয় এবং তারা যা সাপ ব্যাঙ ছেপে দেয় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

গ্রামোফোন কোং তথা হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোং সম্পর্কে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ইন্দিরার নতুন চিত্রা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রীয় শাসন প্রয়োজন হয়েছে।

গত সপ্তাহে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি এবং উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার দিল্লী গিয়েছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরাকে বোঝাবার জন্য যে, সংখ্যার দিক থেকে শাসক দলগুলির সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকার কোন সমস্যা নেই। শ্রীমতী ইন্দিরা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তাঁর নিজের কর্মসূচীর খসড়া শ্রীনাহারকে দেখান এবং প্রশ্ন করেন ঐ কর্মসূচী রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সক্ষম কিনা। শ্রীনাহার অবিলম্বে বুঝতে পারেন যে, আজকের সংকট গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যার ব্যাপার নয়।

কেন্দ্রীয় সরকার তথাকথিত গ্রাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক গ্রাস দিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করতে চাইছে। এবং এই গ্রাসের নেতৃত্বে আসায় ঋণ শ্রীনাহারের ঋণেই আপত্তি। বিনা বাক্য ব্যয়ে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।

এগিয়ে এসেছেন নব যুগের নেতা শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ও তাঁর যোগ্য সাগরেদ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস মন্সী।

দিল্লীর গোপন সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা মার্কসবাদী যুক্তি প্রয়োগ করে মূল বিরোধী শক্তি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন, এবং তার মতে ভারতীয় সমাজতন্ত্রের প্রধান বাধা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। দুটি প্রান্তে অত্যন্ত ক্ষুদ্র দুটি রাজ্যে এই পার্টি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এদের মোকাবিলা করা না গেলে “বিস্ফলবী” পথের প্রয়োজন। এবং রিসল্বে হিংসা অবশ্যম্ভাবী।— অতএব গান্ধীবাদী পথ আজকের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সুগম নাও হতে পারে।

এই গোপন সভার পরেই শ্রীদাসমন্সী কলকাতায় সংবাদপত্রের বিবৃতিতে বলেছেন যে,

আক্রমণের মোকাবিলায় প্রতি-আক্রমণে কংগ্রেস পার্টি পেছপা নয়, এ পথ গান্ধীবাদ সম্মত না হলেও। অর্থাৎ কংগ্রেসের নয়া রাজনৈতিক কর্মপন্থা হল সহিংস প্রতি-আক্রমণের।

এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য প্রধান বিরোধী শক্তি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং আদর্শবাদী নকশালীপন্থীরা।

শ্রীমতী ইন্দিরার বিশ্লেষণে তাঁর নিজের কর্মপন্থার বিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আসবে না। অন্যান্য সমস্ত বামপন্থী দলগুলি সি পি এমের রাজনৈতিক প্রভাব প্রসারে বিচলিত। অতএব এই দলগুলির পক্ষ থেকে জোটবন্ধ হয়ে কংগ্রেসী কর্মসূচীর বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। বরং এদের মধ্যে কেউ কেউ নীতি ও আদর্শের দিক থেকে কংগ্রেসকে সমর্থনই জানাবে।

আর আক্রমণের লক্ষ্য যারা— সি পি এম ও আদর্শবাদী নকশালী—তারা বিস্ফলবের স্তর, কর্মসূচী এবং কৌশল সম্পর্কে এত

জিহ্মরূপী যে তাদের পক্ষে জোটবন্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

তাই ইন্দিরা গান্ধীর মতে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে আইন শৃঙ্খলার নামে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। এই ব্যবস্থার দুটি দিক আছে। একটি রাজনৈতিক, আর অপরটি প্রশাসনিক। রাজনৈতিক দিক থেকে ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস ও সি পি আই প্রমুখ পার্টিদের ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর প্রশাসনিক দিক থেকে প্রয়োজন সব কিছু ঢেলে সাজাবার।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুই ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে বলে শ্রীমতী ইন্দিরার ধারণা। তাই সিদ্ধার্থ রায়কে নব ভূমিকায় নামানো হয়েছে।

সিদ্ধার্থ রায় দিল্লীতে এক বিবৃতি মারফৎ বলেছেন তার ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সজাগ এবং তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন।

মুক্তাঞ্চল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বীরভূমের ক্ষেত্রেও সরেজমিন তদন্ত করে ফিরে এসেছেন পদলিশের আই জি প্রসাদ বসু। আন্দোলন গুটিয়ে দিতে ওরা বন্ধপরি-কর। পদলিশ মনে করে যে, যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে নকশালীদের এতদিন সহ্য করা হয়েছিল সেই প্রয়োজন এখনও বিদ্যমান থাকলেও আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তাই পদলিশী ব্যবস্থা গ্রহণের সমস্ত পরিকল্পনা প্রায় তৈরী। পদলিশী কাজ সুরু হবে প্রশাসনের কিছু রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে।

মতামত

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ধারাকে। বিস্ফোজা চীন বিরোধী যে প্রচার বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে হচ্ছে তার সঠিক মূল্যায়ণ করবেন না? অথচ আপনাদের দেশের জনতা এখন প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় সেনাদের তাদের প্রধান সহায়ক ও বন্ধু মনে করছেন। ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুদ্ধোন্নাদের মধ্যে বিরোধ বাঁধানো ব্রিটিশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের (সি আই এ-এর) বড় চক্রান্ত। এই চক্রান্তের জালে বাঁধা মজিবর রহমান। কিন্তু আজকের আমেরিকা বটেনের গোপনে ও প্রকাশ্যে অস্ত্র দেওয়ায় আওয়ামী লীগ কেডাররা মনের দিক থেকে মার্কিন বিরোধী হতে বাধ্য; এই অবস্থায় তাদের মধ্যে সঠিক রাজনীতি দিয়ে সশস্ত্র করে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে বলে মনে করি। আপনার অভি-মত কি?

জনৈক কমরেড
বালিগঞ্জ

পূর্ব বাংলা

(নবম পৃষ্ঠার পর)

বিস্ফলবী মন্দেই নেই; কিন্তু পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বার সামান্যতম জ্ঞান আছে তিনি নিশ্চয়ই জানেন মাওলানা ভাসানীর সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী একটি শক্তিশালী ভূমিকা আছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন প্রসঙ্গে প্রবীরবাবুর সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে আমি বলবো বিস্ফলবী যুদ্ধ পরিচালনা করার পূর্বেই আন্তর্জাতিক সমর্থনের আশায় হা-পিটোশ করা কেন্দ্রমেই আমাদের উচিত নয়। যে রাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের জনগণকে পরিচালনা করতে অক্ষম সে অর্থব পাটিকে সমর্থন করার কি অর্থ থাকতে পারে—যেমন করছে মস্কোর সংশোধনবাদীরা? কিন্তু তাতে কি জনগণের শ্রেণী-চেতনা বিস্ফলব প্রভাবান্বিত হয়?

প্রবীরবাবু বলেছেন—“সামন্ত-তান্ত্রিক ও ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতিই হলো জনগণের এক অংশকে আরেক অংশের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে লাড়িয়ে যাওয়া।” আশ্চর্য! তিনি কি বলতে চান পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে লাড়াই করছে। তিনি কি পাকিস্তানের (পশ্চিম পাকিস্তানের) বর্বর অত্যাচারী সেনাবাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বলতে চান। আর এটা যদি সামন্ত ও ধনিক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রই হয় তবে কি বলতে হবে পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্ত শ্রেণী অর্থাৎ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে, কেননা সেনাবাহিনীর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল তাঁরাই। পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানী শোষক ও শাসকদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি ও জনগণ-তান্ত্রিক বিস্ফলবী যুদ্ধ পরিচালনা করছে। তার মানে এই নয় যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গেও তাদের বিরোধ আছে, যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কোনক্রমেই মার্কিন জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বুঝায় না। তবে “শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বৈশ্ববিক জনমুদ্রের পথেই” যে পূর্ব বাংলার জনগণের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির একমাত্র পথ প্রবীরবাবুর এ বক্তব্যে আমি সম্পূর্ণ একমত।

দ্রুম সংজ্ঞাধন

গত সংখ্যায় এই প্রবন্ধের পূর্বাংশে পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলামের সাতাশ নং লাইনে—এটা নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক চরিত্রের (ঔপনিবেশিক নয়) শোষণ পড়তে হবে।

সিদ্ধার্থ রায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি পদ হল গুরুত্বপূর্ণ। আর একই কারণে শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করে শ্রীনাহারকে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে তৎপন্ন হয়েছিলেন। যদি কিছুদিন আগে শ্রীনাহারকে সভাপতি পদ থেকে সরানো যেত তাহলে আজ মন্দির সভা ভাঙবার পর শ্রীনাহার গাড়ি ও গামছা দুই হারাতেন। কিন্তু গত চেষ্টায় সেটা পারেননি শ্রীরায়।

তাই আজ বিকল্প পথে ফিরে আসছেন শ্রীরায়। শ্রীনাহার রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি থেকে যাতে একচ্ছত্র আধিপত্যের মালিক না হন তার জন্য কার্যত মুখ্যমন্ত্রী তথা

রাজ্য প্রশাসন অধিকর্তা হয়ে শ্রীরায় কলকাতা এসে দপ্তর খুলে বসছেন।

এর মধ্যে দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথম হল, শ্রীরায় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মাধ্যম থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনের নামে রাজ্যে কংগ্রেস শাসনকেই বহাল রাখবেন আর দ্বিতীয় কংগ্রেস শাসনের প্রধান হিসাবে দলকেও তিনি হাতে রাখতে পারবেন।

এখানে একটা পুরাতন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার। শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় রাজ্যে নির্বাচনের পর লোকসভার সদস্য হয়েও রাজ্য-বিধান সভার নেতা হতে চেয়েছিলেন। বোদীন কুমার সিংহ হলে কংগ্রেস পরিষদ দলের সভা হয় সেই দিন যদি বিমান বিস্ফোত না হয়ে শ্রীরায় নবনির্বাচিত সদস্যদের সভায় সমরমত আসতে পারতেন

তাহলে সেই দিন বিজয় বাবুর স্থলে হয়ত সিদ্ধার্থ রায় দলপতি নির্বাচিত হতেন। সেই দিনের সভায় উপস্থিত সব কংগ্রেস সদস্য জানেন সেই সভা ছয়টার বসবার কথা ছিল কিন্তু অনেক দেরীতে বসেছিল এবং আরো দেরী করতে বলা হয়েছিল কারণ শ্রীরায় তখনও এসে পৌঁছান নি। অবশেষে যখন গড় ঘোষ মহাশয় বলেন দিল্লীর বিমান আসতে রাত সাড়ে নয়টা হয়ে যাবে তখন অপর পক্ষের চাপে দ্রুত সভা আরম্ভ করা হয় ও শ্রীনাহার নেতা নির্বাচিত হন। শ্রীরায় দেরীতে এসে যখন পৌঁছান তখন দেখলেন সব শেষ। তাই সেই দিন শ্রীরায় বা হারিয়েছেন আজ তা পাবার জন্য প্লাম্বী ভাবে এসে রাজ্যে বসছেন।

ক্যাসীবাদের পাদধ্বনি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এক পা এগুতে রাজী নয়। কারণ অনেক। পার্টি হিসেবে সি পি আই-এর ভিত্তি টলমল করছে, প্রভাব অনেক সংকুচিত হয়েছে, তাই সি পি এম-এর মত বড় আর সংগঠিত পার্টির মোকাবিলায় কংগ্রেসকে সঙ্গে নেওয়া দরকার।

এস ইউ সি নিজেকে মনে করে সাজা মার্কসবাদী লেনিনবাদী। তার যা কিছু অভিমান সি পি এম-এর বিরুদ্ধে। কারণ ওদের মতে সি পি এমের ভুল রাজনীতি সত্ত্বেও ওদের দিকে বেশী সমর্থন একমাত্র গানের জোরেই সম্ভব হয়েছে। আজ যদি

সি পি এম তার ক্যাডারদের মধ্যে এস ইউ সির রাজনীতি প্রচারের সুযোগ দেয় তাহলে এস ইউ সির দিকে সি পি এমের সমর্থকেরা চলে আসতে বাধ্য। কোন আলোচনার মৌলিক শর্ত হিসাবে তারা সি পি এম-এর কাছ থেকে এই গ্যারান্টি চায়।

আর এস পি অনেকদিন থেকে সি পি এম আর কংগ্রেসী জোট থেকে সমদ্রব বজায় রাখার পক্ষপাতী। তারা এই দ্রব বজায় রেখে চলেছে।

বামপন্থীদের এই বিভেদ অবিলম্বে মীমাংসার সম্ভাবনা নেই। একমাত্র কংগ্রেস নতুন কর্মপন্থার কথা ভাবতে সুরু করেছে। কংগ্রেসের তরফ সমর্থকদের মধ্যে অনেকেই সশস্ত্র এবং গত কয়েক-

মাস ধরে নকশালীদের সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে সি পি এম বিরোধে সক্রিয় অংশ নিয়েছে।

এই অংশ এগিয়ে এসেছে আর এদেরই চাপে শেষ পর্যন্ত কোলা-লিশন সরকারের পতন হল। এরা আরও এগোতে চায়। বাধা কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকারের আর বামপন্থীদের একাংশের পূর্ণ সমর্থন আছে এদের পেছনে। আর কিছুদিনের মধ্যেই ইংগিত পাওয়া যাবে এদের কর্মপন্থা কি এবং কি কৌশলেই বা তা রূপায়িত হবে।

পার্টি হিসাবে সি পি এম-এর দায়িত্ব বেশী। কি ভাবে এই পার্টি তার দায়িত্ব পালন করে তার ওপর নির্ভর করবে এই রাজ্যের রাজনীতির ভবিষ্যৎ।

সম্পাদক-হীরেন বসু

সম্পাদক কতক জড়ার্শ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজ্য সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১০ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মঠ রোড, কলিকাতা-১০ চরণ কার্জয় থেকে প্রকাশিত

MODERN BOOK STA
Agent- BETAR 11/6
KANT

সি পি এমকে কোণঠাসা করার সর্বদলীয় প্রচেষ্টা বানচাল

রাইটার্সের বৈঠকের বিবরণ

দপন

১৪শ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা ৥ শুক্রবার ৯ই জুলাই ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

পারম্পরিক স্বার্থে পুলিশ ও মারোয়াড়ীদের মধ্যে গভীর প্রণয়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীদের সংগে পুলিশের প্রণয় সম্প্রতি খুবই গভীর হয়েছে। শুধু যে মোটা ঘুঘুর বদলে পুলিশ এঁদের বিশেষ করে রক্ষা করে তাই নয়, জানা গেছে সময় সময় পুলিশের পোষা গুঁড়ারা এই ভদ্রলোকরা যাদের পছন্দ করেন না তাদের মারধোরও করছে।

সম্প্রতি এই ধরণের একটি ঘটনা ঘটেছে। জনৈক মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীকে আয়কর বিভাগের এক ইন্সপেক্টর বড় বেগ দিচ্ছিলেন। ব্যবসায়ীটির প্রচুর আয়কর ফাঁকির প্রমাণ এই ইন্সপেক্টরটির কাছে আসে এবং তিনি একে শাসিয়ে রাখেন যে “তোমাকে দেখে নেব”।

আর যাবে কোথায়। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সংগে সংগে চলে যান লালবাজার। সেখানে জনৈক ডেপুটি কমিশনার (এই ভদ্র-

লোকের নাম কাগজে প্রায়ই বেরোয়) তাঁর বিশেষ বন্ধু। তিনি সব শুনে ওই ব্যবসায়ীটির সামনেই তাঁর এক অনুগত মস্তানকে ডেকে পাঠান। ওই ইন্সপেক্টর কোথায় থাকে, তার কী নাম সব জানিয়ে মস্তানটিকে বলেন ওঁকে উচিত মতন শিক্ষা দিতে। সংগে সংগে স্থানীয় পুলিশকেও জানিয়ে দেন যে তাঁদের এলাকায় ওই ইন্সপেক্টরকে মারধোর করা হলে যেন তারা ওই নিয়ে কোন বামেলা না করে। এর দুদিন পরেই সন্ধ্যা নাগাদ যখন ভদ্রলোক বাড়ী ফিরছেন তখন কিছ্র লোক তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং প্রচণ্ড মারধোর করে যায় ফলে ভদ্রলোককে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। হাসপাতালে অবশ্য ওই ব্যবসায়ী তাঁকে দেখতে যান এবং কথা-

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

অজয়বাবু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বহু বন্ডিকে ছেড়ে দিয়ে গেছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অজয় মুখার্জী মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নেবার আগের দিন হত্যা, ছিনতাই ও অন্যান্য বিভিন্ন অভিযোগে আটক প্রায় একশ ষাট জন সমাজবিরোধীকে জেল থেকে মুক্তি দেন। তাদের মধ্যে অনেকেই উত্তর কলকাতার অধিবাসী।

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেই তারা আবার তাদের কাজে নেমেছে। পুলিশের একাংশ অভিযোগ করেছে যে, এইভাবে যদি ছাড়া হতে থাকে তাহলে সমস্ত পুলিশী প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যাবে।

গত তিনমাসে অজয়বাবু সর্বসমেত প্রায় এক হাজার আটক

লোককে ছেড়েছেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এদের ছাড়া হয়েছে। পুলিশের একাংশ এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে অজয়বাবু কণ্ঠপাত করেন নি।

ছাড়া আসামীদের মধ্যে যারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ গোপাল সেন হত্যার আসামী ছিল তারাও আছে। এক একজনের নামে দুটি-তিনটি হত্যার মামলা। কেউ কেউ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণে আটকা ছিল।

অজয়বাবুর ওপর গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের বিভিন্ন দলের চাপ ছিল। আসামীদের না ছাড়লে ঐ সব দলের কোন কোন নেতার জীবন নিয়ে টানাটানি হচ্ছিল।

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে সি পি এমকে কোনরকমে কোণঠাসা করার এস ইউ সি, সি পি আই, শাসক কংগ্রেসের মতলব বৃদ্ধবার রাইটার্স' বিন্ডিংএর সর্বদলীয় সভায় বানচাল হয়ে গেছে।

সভা ডেকেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতা-সম্পন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিন্ধার্থ রায়। আলোচনার বিষয় ছিল রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা এবং এই সম্পর্কে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

সভা আরম্ভ হওয়ার কয়েক-ঘণ্টা আগে গোপন বৈঠক হল আলিপুর বেলভেডিয়ায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর বাড়ীতে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিন্ধার্থবাবু, নব কংগ্রেসের তরুণ-কান্তি ঘোষ, সন্তোষ রায় ও প্রফুল্ল কান্তি ঘোষ, সি পি আই-এর গীতা মুখার্জী, সুকুমার গুপ্ত এবং জ্যোতি দাশগুপ্ত, ফরোয়ার্ড ব্লকের নির্মল বসু আর ভাঙ্গা বাংলা কংগ্রেসের অজয়বাবু আর হরিদাস মিত্র।

এই বৈঠকে প্রধান আলোচা ছিল কয়েক ঘণ্টার পরের সর্বদলীয় সভায় সি পি এমের দৃষ্টি-শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রবেশ দ্বারে বই ও বৈয়নট ছবি : প্রণব মুখার্জী

বিজয় সিং নাহার পাল্টা আঘাতের চেষ্টা শুরু করেছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মন্ত্রিসভা থেকে হটিয়ে শ্রীবিজয় সিংহ নাহারকে যে আঘাত দেওয়া হয়েছে তিনি তার পাল্টা আঘাত হানার কাজ শুরু করেছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসে অশান্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শ্রীসিন্ধার্থ-শঙ্কর রায় দিল্লী থেকে কলকাতা এসে শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের মহাকরণের ঘর ও চেয়ার দখল করে বন্ধিয়ে দিয়েছেন বিজয়বাবুর শেষ, সিন্ধার্থ রায়ের শব্দ। বিজয়বাবুও একটু দেরীতে হলেও বন্ধিতে পেরেছেন কেন ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব মন্ত্রিসভাকে পদ-ত্যাগে বাহ্যন্তর ঘটনার চরম পত্র দিয়েছিল, কেন বিজয়বাবুকে অনেক চেষ্টাতেও শ্রীমতী গান্ধীকে মন্ত্রিসভা বাঁচিয়ে রাখতে রাজী করাতে পারেন নি।

কিন্তু বিজয়বাবুও অত সহজে ছাড়বার পাত্র নন। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনিও সকলকে একটু দেখে নেবেন ঠিক করেছেন। ছাত্র পরিষদ ও যুব কর্মীদের যে বিকল্প নেতৃত্ব তিনি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন শ্রীলক্ষ্মী বসুর

নেতৃত্বে সেটা গড়ে উঠেছে। শুধু গড়ে ওঠা নয়, এখন থেকে ঠিক হয়েছে শ্রীলক্ষ্মী বসুর অনুগামীরা বিরতিহীন ভাবে প্রিয়-সুদ্রতর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র পেশ করে যাবে।

এই ব্যবস্থা মত গত মঙ্গলবার শ্রীসিন্ধার্থশঙ্কর রায়ের কাছে প্রিয়-সুদ্রতর বিরুদ্ধে একটি স্মারক-লিপি পেশ করা হয়েছে। যে ছাত্র ও যুব কংগ্রেসের নামে বিজয়বাবুর (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

অজয়বাবু রাইটার্স' বিন্ডিংয়ে অনেক কীর্তি রেখে গেছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মাত্র তিন মাস মন্ত্রিসভে ছিলেন অজয়বাবু। কিন্তু কীর্তি অনেক। একদিকে পুলিশ কন্টেবলদের দলে দলে সি পি এম সমর্থক বলে ছাঁটাই করেছেন। আর অন্যদিকে বশম্বদ অফিসারদের অবসরের সময় পেরিয়ে যাবার পর নতুন করে চাকরীর মেয়াদ বাড়িয়েছেন।

যেমন রাইটার্স' বিন্ডিংএর বড়ো অফিসার এস এম বসু। সেই ১৯৬৭ সাল থেকে বহু ষড়যন্ত্রে

যুক্ত এই বসু। ফিন্যান্স দপ্তরের নরেন পাল আর পুলিশের আই জি প্রসাদ বসু অজয়বাবুর স্নেহ-ভাজন হয়ে চাকরীর মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছেন।

অন্যদিকে বহু ছোকরা আই-এ এস আইন মাফিক কাজ করতে গিয়ে সি পি এম সমর্থক বলে পরিচিত হয়েছেন। তাদের দলে দলে এক পদ থেকে অন্য পদে বদলী করা হয়েছে।

রাইটার্সের বৈঠক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভগ্নী কি হতে পারে তার বিশ্লেষণ করা এবং এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কি ভাবে সি পি এমের যুক্তি কাটিয়ে তাকে কোণঠাসা করা যায় তার উপায় বার করা। এই বৈঠকেই ঠিক হয় যে, সিদ্ধার্থবাবু সর্বদলীয় সভা সূর্য হবার সঙ্গে সঙ্গে আহ্বায়ক হিসাবে একটি প্রস্তাবের খসড়া হাজির করবেন। খসড়ার বক্তব্য ও বয়ান ঠিক হয়ে গেল।

বয়ানের মূল কথা ছিল যে, রাজ্যে খুনোখুনির জন্য আন্তর্দলীয় কোঁদলই দায়ী। অতএব এই কোঁদল বন্ধ করা দরকার এবং তার জন্য প্রয়োজন সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রযোজ্য একটি আচরণবিধি। এই আচরণবিধির কথা অনেকদিন থেকেই সি পি আই, এস ইউ সি আর পরে কংগ্রেস বলে আসছে।

খসড়া প্রস্তাব চূড়ান্ত আকার নেবার পর অজয়বাবু বাড়ীর গোপন বৈঠক শেষ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সি পি আই নেতারা ছুটে আসেন এস ইউ সি আরে। তাদের বোঝান হয় যে, মোটামুটি একমত হওয়া গেছে সি পি এম বিরোধী কৌশলে।

সভা সূর্য হতেই আগেকার কর্মসূচী অনুযায়ী সিদ্ধার্থবাবু তাঁর খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। ফরোয়ার্ড ব্লক, সি পি আই কংগ্রেস প্রভৃতি দলের তরফ থেকে সূর্য হয় সিদ্ধার্থ-স্তুতি।

সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন

গভীর প্রণয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রসঙ্গে বৃষ্টিয়ে দেন যে শাসানীর কী পরিণতি।

আইন শৃঙ্খলার বর্তমান অবস্থায় এই পুর্লিশী সহযোগিতা মারোয়াড়ী ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক। এদের একটা বড় অংশ এখন বোমার মসলা সরবরাহের কাজে নেমে পড়েছেন। এই মসলার বেশীর ভাগ দক্ষিণ ভারতের একটি দিয়াশলাই কারখানা থেকে চোরা পথে কলকাতায় আসে এবং চড়া দামে বিক্রী হয়। বন্দরে বিদেশী জাহাজগুলি থেকেও কিছু চালান হয়। পুর্লিশ সবই জানে কারা এই ব্যবসায় লিপ্ত এবং কোথায় তাদের গুদোম কিন্তু কিছুই করে না কারণ লাভের একটা বড় অংশ তাদের প্রাপ্য।

১৩৪, কৈরী রোড

চ্যাটার্জি হাট, শিবপুর ও ২৪১-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-তে (কলি-৬) গীটার ক্লাশ।
শেখাচ্ছেন : শর্মিষ্ঠা বর্গণ
(অর্কেস্ট্রা ব্যালেরিণা)

দুটি কারণে : (এক) তাঁর মতে খুনোখুনি ঘটছে বিশেষ পরিকল্পনামুদ্যায়ী এবং এই পরিকল্পনার সঙ্গে সরকারী প্রশাসন ও পুর্লিশ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত (দুই) যেহেতু খুনোখুনি মূলতঃ আন্তর্দলীয় ব্যাপার নয় সেই জন্য রাজনৈতিক দলের আচরণবিধি নির্ধারণ নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হতে বাধ্য।

জ্যোতিবাবু হত্যার ঘটনা একের পর এক তুলে ধরেন। হেমন্ত বসুর হত্যা, অজিত বিশ্বাসের হত্যা, আহুদ্রাদীপরের ঘটনা বারাসতে, ডায়মন্ডহারবারে এবং কোলগরে মৃতদেহ আবিষ্কার প্রভৃতি ঘটনা। কোন কিনারা করতে পারে নি পুর্লিশ। আরও খুন হয়ে চলেছে।

জ্যোতিবাবু বলেন আচরণবিধির কথা যদি বলতেই হয় তবে সরকারের আচরণবিধি আগে নির্ধারিত হওয়া দরকার। তিনি সিদ্ধার্থবাবুর কাছে দাবী জানান যে, সরকার কি করতে চায় সেই সম্পর্কে আগে তাঁর বক্তব্য রাখুন এবং তারপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

জ্যোতিবাবু বলেন : “আমরা এখানে দর্শন আলোচনা করতে আসি নি। আমাদের আজ জীবন-মরণ সমস্যা। শুধুমাত্র আমাদের কর্মী নিহত হচ্ছে তাই নয়। মানুষের দাবী দাওয়ার সমস্ত গণ-তান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সরকারী আক্রমণে। আমাদের মতে পুর্লিশের একাংশের প্ররোচনা আছে এই আক্রমণের পেছনে। যেমন পুর্লিশ আই জি প্রসাদ বসু থেকে থেকে বন্দুক ছিনতাই সি পি এমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। আমরা আই জিকে চ্যালেঞ্জ করি এই ধরনের একটা ঘটনায় অন্ততঃ সি পি এমের যোগসাজস প্রমাণ করার। প্রসাদ বসু জানেন যে এসব মিথ্যা অভিযোগ।”

তাই জ্যোতিবাবুর কথা ছিল যে, সরকার ও পুর্লিশের আচরণবিধি আগে ঠিক না হলে রাজ্যের অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

সুধীন কুমার বলেন যে, আগে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হোক আর তারপর প্রশাসন ও পুর্লিশ বলুক সেই সময়ের মধ্যে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কি ব্যবস্থা নেবে। এই সমস্রাবন্ধ কথা ঘোষণা করলে পর রাজনৈতিক দলগুলি এই ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজেদের মতামত দেবে।

আর এস পি দলের মাখন পাল সিদ্ধার্থ রায়ের খসড়া প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে খুনোখুনি বন্ধের বিশেষ ব্যবস্থা কথা ঘোষিত না হলে প্রস্তাব আনার কোন মানে হয় না।

ভাবগতিক দেখে এস ইউ সি-র নেতা সুবোধ ব্যানার্জীও আর তাঁর দলের প্রিয় খিসিস রাজনৈতিক দলের আচরণবিধির কথা তোলেন না। তিনি বলেন সিদ্ধার্থবাবুর দৃম করে প্রস্তাব আনা ঠিক হয় নি।

এর পর সুশীল ধাড়া বলেন যে, সিদ্ধার্থবাবুর পদক্ষেপ ভাল কেন না আইন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হলে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই সফল হবে না। তবে এই আইনশৃঙ্খলার কাজ মূলতঃ সরকারের। রাজনৈতিক দলগুলি সরকারী নীতি ঘোষিত হলে তাদের সমর্থনের কথা বলবেন।

এর পর আগেকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা নির্মল বসু ও সি পি আই নেতা মহঃ ইলিয়াস তাঁদের লাইন অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের আচরণবিধি থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে থাকেন। ইলিয়াস সাহেব আবার মাঝখান থেকে বাংলা দেশ সংগ্রামের কথা অবতারণা করে একটু ভাবগম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করেন।

মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা রাম চ্যাটার্জী বলে ওঠেন যে, আগে সিদ্ধার্থবাবু তাঁর নিরপেক্ষতা এবং খুন বন্ধ করতে তিনি যে সতাই যত্নসম্পন্ন তা প্রমাণ করুন।

বিরোধী এস এস পির কে একজন পার্বতী মুখার্জী এই সময় বলতে ওঠেন। ঠুকে কেউ চিনতে পারে নি। পেছন থেকে কে বলে ওঠে : “এ কে এল বাবা।” আর কেউ কেউ হো হো করে হেসে ওঠে।

পার্বতীবাবু বেসামাল হয়ে পড়েন আশ্চর্য্য করে বলতে সূর্য করেন যে, সি পি এম-বিরোধিতাই তাঁর নিজের ও দলের একমাত্র আদর্শ। হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার বলে ওঠেন, এটা চাণ্ডামীর জায়গা নয়। জ্যোতিবাবুও পার্বতীবাবুর কথাবার্তার প্রতিবাদ জানান। কংগ্রেসী নেতা কৃষ্ণকুমার শূক্লা “চাণ্ডামী” শব্দের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ পেশ করেন।

মুসলিম লীগ নেতা সেকেন্দার মোজ্জা বলেন যে, সর্বের মধ্যে ভূত দেখা যাচ্ছে। আগে পুর্লিশের খোল নলচে বদল হওয়া দরকার।

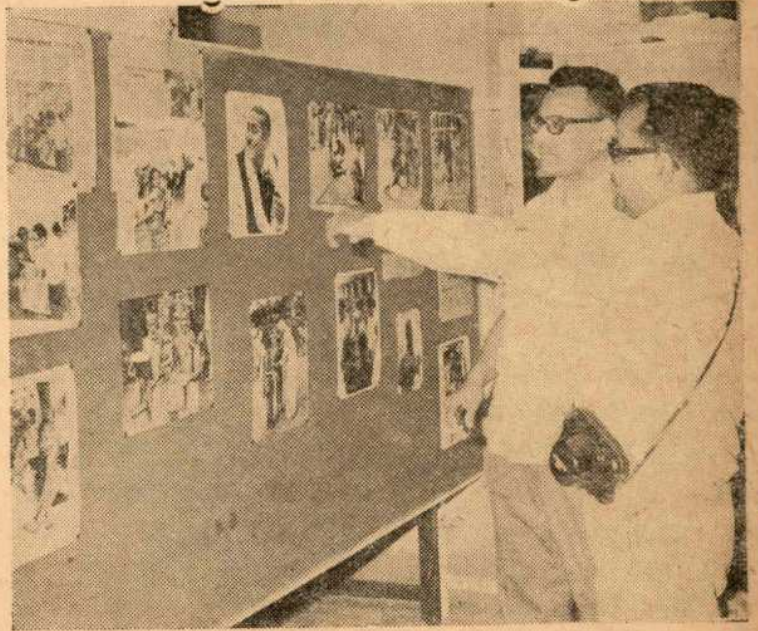
এর পর কংগ্রেসী নেতা বিজয় সিং নাহার বলেন : রাজ্যে অরাজকতার বিভীষিকা। গ্রাসের সঙ্ঘরে চারিদিকে গ্রাহি গ্রাহি রব। আনন্দের কথা যে সমস্ত সংসদীয় দল সভায় হাজির হয়েছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সব দলই হত্যা-বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণে রাজী। পরস্পরে দোষারোপে লাভ নেই। সকলে মিলে একটা প্রতিরোধের আবহাওয়া গড়ে তুলতে হবে। একে অপরের ওপর দোষ চাপিয়ে কেটে পড়লে চলবে না। সমাজবিরোধীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি ব্যবহার করছে কেউ বা প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করতে, আর কেউ বা আত্মরক্ষার তাগিদে।

বিজয়বাবু বলেন আগে সমস্ত

রাজনৈতিক দলগুলি ঘোষণা করুক যে তারা খুনোখুনি চায় না। পরে সরকার পুর্লিশ ও রাজনৈতিক দলগুলির কি করণীয় ঠিক করা যাবে। নির্দিষ্ট কর্মপন্থা বার করতে অবশ্যই সময় লাগবে।

প্রবীণ নেতা অজয়বাবু বলেন যে, “যে সভা বসাতে আমি সক্ষম হই নি সেই সভা আজ হচ্ছে দেখে আমি আনন্দিত।” তারমতে সরকারী প্রশাসন ও পুর্লিশ কেবলমাত্র নিজের প্রচেষ্টায় এ খুনোখুনি থামতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এলে তবেই এর সূর্যাহা হবে।

জ্যোতি বসু ও হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার আবার দাবী করেন যে সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হোক কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।



দিল্লীতে প্রেস ক্লাবে প্রণব মুখার্জীর বাংলাদেশ সম্পর্কিত ছবির একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উপরের ছবিতে মুখার্জী ডি এ ভি পির সিনিয়র ডাইরেক্টর শ্রীমাথুরের কাছে ছবি ব্যাখ্যা করছেন।

পাল্টা আঘাতের চেষ্টা শুরু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রিসভাকে অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছিল, ঠিক একই ভাবে ভবিষ্যতে সিদ্ধার্থবাবুর সমালোচনা, আরো পরে দরকার মত তার বিরুদ্ধেও চরমপত্র দেওয়া হতে পারে। শুধু তাই নয়, এবারে ঠিক হয়েছে খুব ঘন ঘন রাজ্য কংগ্রেসের সভা বসবে। গত কয়েক মাসে রাজ্য কংগ্রেসের খুব বেশী সভা হয়নি। এমন কি জরুরী নীতিগত প্রশ্ন বিবেচনার জন্যও পার্টির মতামত নেবার চেষ্টা করা হয় নি।

কিন্তু এবার তা চলবে না। দিল্লীর প্রতিনিধি রূপে সিদ্ধার্থবাবু খুসী মত কাজ করবেন তা চলবে না। তাকে তাঁর কাজে পার্টির অনুমোদন নিতে হবে এবং রাজ্য কংগ্রেস যা বলে দেবে সেটা রূপ দিতে হবে। দিল্লীর হুকুমে কাজ করলে চলবে না। রাজ্য কংগ্রেস থেকে সিদ্ধার্থবাবুর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে একটা গুঞ্জন তোলা হয়েছে। তা হল শ্রীরায় বসু বেশী সি পি আই ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে হবনব করছেন এবং পার্টির লোকদের যথেষ্ট আমল দিচ্ছেন না। এই সব চলবে না সেটা শ্রীরায়কে

তখন সর্বসম্মতিক্রমে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তৈরী করা হয়। তার মধ্যে খুনোখুনির রাজনীতির কথা অথবা রাজনৈতিক আচরণবিধির কথা লেখা হয় না। সেই দিক থেকে আগেকার গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্ত বানচাল হয়ে যায়। তবে ঠিক হয় যে, প্রাথমিক সভার পর আবার সভা হবে এবং সেই সভায় যে সব দলের সংসদে প্রতিনিধি নেই তারাও উপস্থিত থাকবে। সি পি আই-এর নেতৃত্বে অষ্টবামের অনেক দলের সংসদে কোন প্রতিনিধি নেই। সেই সমস্ত দল আগামী সভায় তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। এতে অষ্টবামের দলীয় সংখ্যা বাড়বে আর কোন প্রস্তাবে যদি ভোটভাঙা হয় তবে এই সংখ্যার জোরে তা পাশ করিয়ে নেওয়া যাবে।

সমঝে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। রাজ্য কংগ্রেসের বক্তব্য হল তিনি মহাকরণে বসে কাজ করুন, কিন্তু তিনি যেন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা না বলেন। এই কাজ দরকার মত যা করবার বিজয়বাবু করবেন।

এইখানেই শেষ নয়। বিজয়বাবুর মন্ত্রিত্ব কালে যে সব কংগ্রেস এম এল এ গোলমাল করেছেন তিনি তাদেরও দেখে নেবার ব্যবস্থা করছেন। বেশ কয়েকজন কংগ্রেস এম এল এ ও কর্মী ইতিমধ্যে শো-ক্জের নোটিশ পেয়ে গেছেন। আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগালিপি তৈরী করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হবে তারা রাজ্য কংগ্রেসের একটা পাল্টা নেতৃত্ব গড়ে তুলবার চক্রান্ত করেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে একদিকে বিজয়বাবু যেমন সিদ্ধার্থবাবুকে দাবিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করছেন, তেমনি তিনি সমস্ত পথের কাঁটাকে সম্মুখে এখনি উৎপাটন সূর্য্য করছেন।

রাজধানীর চিত্র

হেনরী কিসিঙ্গার : যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-উদ্ধ 'প্রধানমন্ত্রী'

রম্যপ্রসাদ মল্লিক

ভারতের রাজধানীতে বর্তমান দ্বিপ্রহরী সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটের অধোবিত্ত প্রাথমিক হেনরী কিসিঙ্গার সাহেবের পদার্পণ ঘটেছে। তাঁরা আগমনের হেতু তাঁর প্রকৃত পদমর্যাদার মতই অধোবিত্ত। তবে কূটনৈতিক মহল সরগরম। পৃথিবীর অলিখিত সংবিধানের শ্রেষ্ঠ কৌতুক রিটেনের রাজতন্ত্র। অলিখিত সংবিধানের চরম ফাঁক-তালের দৃষ্টান্ত যুক্তরাষ্ট্রের অনির্বচিত, অনির্বদ্ধ "প্রধানমন্ত্রী" হেনরী কিসিঙ্গার। তাঁর এলেমের চেয়েও বেশী শক্তিশালী তাঁর খুঁটি—ডলার সাম্রাজ্যবাদের ধারক আমেরিকার বিস্তারিত তথা সমরনারক এবং বহু আমলাবর্গের ক্ষমতা-স্র।

কাগজে কলমে কিসিঙ্গার মশায় প্রেসিডেন্ট নিকসনের পরামর্শদাতা মাত্র জাতীয় নিরাপত্তা সমিতির। কার্যতঃ তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চালিকাশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রতীক প্রেসিডেন্টের সচিবমণ্ডলীরও উর্ধ্ব। রহস্য গুট সন্দেহ নেই। কিন্তু অতি নিয়মতান্ত্রিক আমেরিকান সংবিধানের অন্তর্গত আইন প্রণয়ন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনী বিভাগগুলোর ভারসাম্য বজায়ের "ক্যাবিনেট" এমনিই যে, সেখানে রাষ্ট্রের প্রধান সচিব মিঃ রবার্টসকেও কংগ্রেসের সিনেট সমক্ষে মাঝে মাঝে তলবের জবাবে হাজিরা দিতে হয় এবং জেরার সম্মুখীনও হতে হয়।

কিসিঙ্গার মশায়ের রাজনৈতিক ভাগ্য এতই প্রোজ্জ্বল যে, এ ধরনের "হ্যাপার" সাম্রাজ্য তাঁকে দিতে হয় না; জন প্রতিনিধিদের প্রশ্নবাণ তাঁকে স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে না।

এই কিন্তু ব্যবস্থা সম্ভব কি করে? রবার্ট সাহেবকেও যখন নজরে রাখবার জন্যে প্রেসিডেন্ট নিকসনকে একটি গোপনে রক্ষিত ও চালিত খুঁদে রাষ্ট্রবিভাগ পালন করতে হয়, তখন কিসিঙ্গার সাহেব কি কেরামতীতে এ সমস্ত ফাঁকড়া অতিক্রম করলেন।

শুনুন তাহলে! জাতীয় নিরাপত্তার সকল প্রশ্নে মন্ত্রণাদাতা কিসিঙ্গারজীর জী হুজুর করবার জন্য একটি বিরাট সেক্রেটারিয়েট রয়েছে। বিশালিশ জন পাকাপোক্ত ও ঝগড়াপেশাদার অফিসার, আটটি জন করণিক, এবং অনির্দিষ্ট সংখ্যক সাহায্যকারী নিয়ে এই বিশাল কিসিঙ্গারাদীন প্রতিষ্ঠান সুসজ্জিত। এ ছাড়াও একটি সিদ্ধান্তবাহী সমিতি আছে, যার রাষ্ট্রীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অপর্যায় এবং প্রায়

অরোহণ। জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক—আজকাল তো যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বপ্রসারী ক্ষমতা রাজনীতি এবং সামরিক স্বার্থক্ষেত্রের পরিধি কোরিয়া ভিয়েতনাম কম্বোজ ইন্দোনেশিয়া বাংলা দেশ থেকে ইজরয়েল জর্ডান সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, সর্বত্রই—যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে কিসিঙ্গার সাহেবের সেক্রেটারিয়েটে প্রতিটি বিভাগে আদ্যোপান্ত আলোচিত হবে। পরে তা জাতীয় নিরাপত্তা সমিতিতে হবে পেশ, যার শীর্ষে প্রেসিডেন্ট এবং সদস্যদের মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্টের কাবিনেটের অন্য সদস্যরাও রয়েছেন।

ইতিমধ্যে শ্রীমান কিসিঙ্গার এই প্রশ্ন অথবা প্রশ্নগুলি রাষ্ট্রের প্রধান সঞ্চালকদের দ্বারা গঠিত একটি নিয়ন্ত্রিত সমিতির রঞ্জন-রশ্মির সামনে ঘুরিয়ে নিয়েছেন, যে সমিতিতে আছেন রাষ্ট্রের

আম্ভার সেক্রেটারী, প্রতিরক্ষা-মন্ত্রকের সেক্রেটারী, এবং (অবশ্যই) স্বনামধন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। সি আই এ নামক সংস্থার বিশ্ববিস্তৃত গুরুত্ব-চরগিরি এবং দুর্বল রাষ্ট্রশক্তিদেবকে উলটানো পালটানোর নিষ্ঠুর কুটনীতির পদ্ধতি আজ কে না জানে? এ হেন সংস্থার সুগুপ্ত "বুদ্ধিধর" প্যাঁচ উপরোক্ত সেক্রেটারিয়েট এবং সমিতিতে বিভিন্ন স্তরে আলোচিত হবার সময় সি আই এর আপন স্বার্থের অনুকূলে যাতে অন্তিম সিদ্ধান্ত বাহিত হয় তার যথেষ্ট অবকাশ পায়।

আজকের আসে প্রেসিডেন্টের শীর্ষ সমিতিতে বিচার। কিন্তু তখন করবার আর বিশেষ কিছু থাকে না; কারণ, ইতিপূর্বেই কিসিঙ্গারের মগজ প্রভাবিত বহু বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন এবং সম্ভাব্য পদক্ষেপ এবং তৎপরবর্তী সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া (সংক্ষেপে, পরিস্থিতি-গত সাড়া) সম্বন্ধে সকল দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার-বিমর্ষ করে ফেলেছেন। প্রেসিডেন্টের শীর্ষ সমিতির সামনে কিসিঙ্গার মহাশয়—তিনি নিয়ন্ত্রিত প্রতি সদাশয়ই বটে—কোনো সিদ্ধান্তিক মত ব্যক্ত করেন না, কিন্তু যে ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ পদ্ধতির পরিচালনা করেন, তাতে সুপারিশ নিশ্চয়ই জন হয়ে ওঠে, এবং শেষ সিদ্ধান্ত তাঁর মগজ প্রসূত ঈশারাময় আভাস

আজকের খাতে নিশ্চিতভাবে প্রবাহিত হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এই মহা ধর্ম্মের ঘৃণাকরও সিনেট বৈঠকের সামনে সাক্ষ্য বা তথ্যাদি সহ নির্দিষ্ট কোনো নিবেদন পেশ করেন না। কেনই বা করবেন? মন্ত্রী পদবাচ্য তো নন তিনি। তাঁর নেপথ্য ক্ষমতা আছে, দায়িত্বের বিধিনিষেধ বা দায়ভাগ নেই। প্রসিদ্ধ সেনেটের সিমিংটনের আক্ষেপ, অথবা সেনেটের ফুলব্রাই-টের পরাস্ত পরাক্রম ব্যর্থ ক্ষোভে নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু নজীর, হীন ক্ষমতা একচেটেপনার এই

ধাঁড়বাজ প্রয়োগকর্তা অপ্রকাশ সুযোগের চূড়ান্ত উপভোগ্যরূপে বিরাজ করতে থাকেন; ধরা দেন না। সকল প্রকার মধ্যপ্রশ্নের, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, সমাধানের আসল চাবিকাঠি যে-রাস্তার সংগোপন সিদ্ধান্তে, যিনি প্রেসিডেন্টের সমীপে অবাধগতি এবং বিস্তারিত সমর-আমলাভ্যন্তর শ্রেণীপৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য, তিনি আজ হিন্দু-স্থান এবং পাকিস্তানের দুই শাসকবর্গের মিলন-দোতো উদ্যোগী। হায়, তবে কি বাংলা দেশ ভিয়েতনাম হতে চলল।

সম্প্রদায়

এরা যুদ্ধ লাগাতে চায়

(দর্পণের পূর্ববন্ধক)

ভারত কী পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছে? এ প্রশ্ন আজকাল অনেকের মনেই জাগছে বিশেষ করে যখন কয়েকটি গোষ্ঠী পরিস্কার ভাবেই যুদ্ধ দাবী করছে। এই পরিস্থিতিতে গত বুধবারে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশিত, "না চাইলেও যুদ্ধ হতে পারে"

নামে প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধটির লেখক শ্রীপামলাল দাশগুপ্ত। তাঁর মতে চীনের প্ররোচনায় পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করতে পারে। এবং যেহেতু অতীতের বিপ্লবী পান্নাবাবু আজকাল শ্রীমতী গান্ধীর অন্যতম বেসরকারী উপদেষ্টা, বিশেষ করে পাকিস্তান সংক্রান্ত ব্যাপারে, সেইহেতু একথা মনে করা বোধহয় অনায়াস হবে না যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বকলমে একটি যুদ্ধোপযোগী আবহাওয়া তৈরী করছেন যাতে ভবিষ্যতে ভারতের যে কোন কার্যকলাপই ন্যায্য বিবেচিত হতে পারে।

পান্নাবাবু লেখা শেষ করেছেন এই বলে যে "...উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ—সর্বত্রই আমাদের আরও একটু সতর্ক ও প্রস্তুত থাকা উচিত নয় কি?" এর মানে তিনি চান এই রাজ্যে আরও সেনাবাহিনী মোতায়েন হোক। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারেরও এই অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েনের ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই, মনে হয় তাঁর এই উপদেশ কেন্দ্র সাদরে গ্রহণ করবে। তবে পান্নাবাবু কী এটা জানেন না যে যুদ্ধ হোক বা না হোক, যুদ্ধের ধুরো তুলে কেন্দ্র যে সৈন্য পাঠাবে তা শেষ অবধি ব্যবহৃত হবে দেশের ভিতরে বামপন্থী আন্দোলন দাবিরে রাখার প্রচেষ্টায়? না কি তিনি ঠিক এই কারণেই এই যুদ্ধ যুদ্ধ রব তুলছেন?

একটা ব্যাপারে চিরকাল দেখা গেছে যে যখনই দেশের ভিতরকার সমস্যাগুলি প্রবল হয়ে ওঠে তখনই কেন্দ্রীয় সরকার দেশের লোককে চীন ও পাক জুজুড় ভয় দেখান। মনে হয় এবারও ঠিক সেই একই ব্যাপার ঘটতে চলেছে। আপাতদৃষ্টিতে দলমত নির্বিরোধী পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়কে দিয়ে এই ধরনের লেখা লিখিয়ে ভারত সরকার (শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

ইন্দো-জাপানীজ ইণ্ডাস্ট্রিজ বন্ধ কেন

(বিশেষ প্রতিনিধি)

এন্টালী এলাকায় অবস্থিত ইন্দো-জাপানীজ ইন্ডাস্ট্রিজ কারখানাটি গত চম্বিশে মে থেকে এখনও বন্ধ রয়েছে। সাইকেলের ডায়নামো, লাইটিং ও ডিফেন্সের কিছু সরঞ্জাম সংস্থাটিতে উৎপাদন করা হতো। অভিযোগে প্রকাশ, কারখানাটিতে অনেক দিন ধরেই মালিকপক্ষের শোষণ নীতি অব্যাহত রাখার পরিণামেই কারখানাটির আজ এই দুরবস্থা। সাতাল্ল সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইতিমধ্যে সংস্থাটিতে লভ্যাংশের পরিমাণও কম হয়নি। তবু অর্থনৈতিক সমস্যাদির আবর্তে কারখানাটি আজ অচল। যদিও আর্থিক সঙ্কটের মূল কারণটিকে অনেকেই মালিক গোষ্ঠীর ইচ্ছাকৃত বলে মনে করেন। ইন্দো-জাপানীজের মালিক গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ভাবে আরেকটি শিল্প সংস্থা রয়েছে। দোমারকা ইন্ডাস্ট্রিজ নামে এই সংস্থাটি ইন্দো-জাপানীজ ফ্যাক্টরির প্রাঙ্গণেই অবস্থিত। মালিক গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে পরিচিত এই সংস্থাটিও সাইকেলের সরঞ্জামাদি তৈরী করে। যদিও কারখানাটি অন্য নামে ব্যবসা চালিয়ে

যাচ্ছে, তবু সিকিউরিটি ও অফিস সংক্রান্ত নান্য সুযোগ সুবিধা ইন্দো-জাপানীজের খরচা থেকেই আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, ইন্দো-জাপানীজের পরিচালকবর্গের ব্যক্তিগত সংস্থাটির লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে সংগে কানপুরেও এই মালিক গোষ্ঠী চেন ও সাইকেলের সরঞ্জামাদির নতুন কারখানা চালু করার চেষ্টা করছেন।

আশ্চর্যের বিষয়, ব্যক্তিগত মালিকাদিগের শিল্প সংস্থাটি যখন লাভজনক সংস্থাতে পরিণত হচ্ছে তখন এদের পরিচালনাধীন ইন্দো-জাপানীজের অবস্থা চরমে। ইন্দো-জাপানীজের আর্থিক সুযোগ সুবিধা অন্যায় ভাবে নিয়ে ব্যক্তিগত কারখানাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার পরিণামেই ইন্দো-জাপানীজের এই দুরবস্থা বলে অনেকে জানান।

পেটোলো লোকজন নিয়োগ করে সাধারণ কর্মচারীদের উপর আবিচারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার নজীরেরও অভাব নেই। প্রায় প্রতি বছরই ক্রোজার, লে-অফ করে কারখানায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করার

মনোবৃত্তি মালিক গোষ্ঠীর প্রায় রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। সাতটি সালেও তিরিশ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। এবারেও কারখানা বন্ধের দায়দায়িত্ব শ্রমিক সাধারণের উপর চাপিয়ে মালিক গোষ্ঠী নিজেদের গা বাঁচাতে চাইছেন। অথচ সংস্থার কর্মচারীরা জানান, বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, পরিণামে উৎপাদনও কমে যায়।

এভাবেই ইন্দো-জাপানীজকে সীক ইন্ডাস্ট্রিজের আওতায় এনে ব্যক্তিগত শিল্প সংস্থাগুলোতে সীক ইন্ডাস্ট্রিজের টাকা খাটানোর উদ্দেশ্যেই সংস্থাটিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অনেকে জানান। কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যত অপবাদই দেওয়া হোক না কেন, কিছুদিন আগে পাঁচ হাজার প্রোডাকসন বাড়ানোর জন্যে মালিক গোষ্ঠী যখন কমী ও মিসিন সংখ্যা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন, তারপর মালিকপক্ষ কথানুযায়ী কিছু না করা সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী আন্তরিকতার সংগে কাজকর্মের গতি দ্রুততর করে পাঁচ হাজার প্রোডাকসন টার্গেট সাফল্যমণ্ডিত করেন। তবু আজ মালিক গোষ্ঠী সংস্থার দুশো কর্মচারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় হাজার মানুষকে অনাহারের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছেন। অকৃতজ্ঞ মালিকপক্ষ যাই করুন না কেন, তাই বলে সরকারের শিল্প দপ্তরও কি এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকবেন?

সিদ্ধার্থ রায়কে পশ্চিমবঙ্গের ভার দেওয়া সংবিধান বিরোধী কাজ

(দর্পণের পূর্ববন্ধক)

যে ঋটিকা-গতি দ্রুততার সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও বিধানসভা বাতিলের সিদ্ধান্ত দিল্লীর শাসন-ক্ষমতার অধিকারী কংগ্রেস দল কায়ম করল তার আকস্মিকতার পশ্চিম-বাংলার রাজনৈতিক মহল বা বুদ্ধিজীবী মহল একেবারে বে-দিশা হয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এই সিদ্ধান্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরিপূরক যে ব্যবস্থাটা গ্রহণ করা হল তা যে কত গভীরভাবে সংবিধান বিরোধী সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সন্দেহ আলোচনা বা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ কোথাও হয়েছে বলে মনে হয় না। যাও বা হয়েছে তা অতি মামুলী ধরনের। আমি সিদ্ধার্থ শংকরের হাতে “ভারপ্রাপ্ত” কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে এ রাজ্যের প্রশাসন কর্তৃক তুলে দেওয়ার কথা বলছি।

কিন্তু খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও এখানে একটা কথা আলোচনা করে নিলে আসল প্রসঙ্গে আসতে চাই। দিল্লীর কর্তাদের এই চরম সিদ্ধান্তের কারণ কি হতে পারে। বিধান সভার কোয়ালিশনের গরিষ্ঠতা খুব স্বচ্ছন্দ নয় একথা স্বীকৃত। গরিষ্ঠতা হারাবার কোনও বিপদাশংকা নতুন করে দেখা দেয় নি। খাড়া-সমর্থক সদস্যরা আর যাই হোক এ মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে উদ্যোগী হবে-একথা রিসবাস করার কোনও হেতু ঘটেনি। খাড়ার মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। তাদের সুবিধা হতে পারে এমন কোনও কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব ছিল না। আর মার্কসবাদীরাও খাড়া গোষ্ঠীকে মন্ত্রিত্ব দিয়ে দলছুট করাবেন-একথা চিন্তা করার কোন কারণই নেই। কাজেই এই জাতীয় সিঁপিলন-টার গ্রুপ মন্ত্রিসভা পাবার সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিশ্রুতি ছাড়া বিধানসভার সংকট ডেকে আনতে সচেষ্ট হয় না। কাজেই সৈদিক থেকে এমন কোন ভয় ছিল বলে মনে হয় না। পরন্তু দুজন আধামন্ত্রী বাড়িয়ে কোয়ালিশনের শক্তিবৃদ্ধিরই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুজন বা তিনজন আধামন্ত্রী বাড়ান নজীরের দিক থেকে এমন কোনও গরিষ্ঠ কর্ম নয়। রাজ্য কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল এমন কোনও নতুন পর্যায়ে আসে নি যার ফলে বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার দরকার। তরুণ দলের “বাহাদুর ঘন্টা” উপদলীয় একটা স্টান্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে বিচলিত হবার মতো কিছু ছিল না। নাহায়েত মতো ঝগড়া দলবাজ এটুকু নিশ্চয়ই সামলে নিতে পারতেন, এর চেয়ে বে-কার্যদার ইস্যু “মন্ত্রিত্ব বা সভাপতিত্ব” যখন তিনি সামলে নিয়েছিলেন এ

আই, সি, সির সূচপষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও। কাজেই একথা মনে করার সংগত কারণ আছে যে গভীরতর কোনও সংকট ঘনিষ্ঠে ওঠবার আগেই মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা বাতিল করা হয়েছে।

এই আগামী সংকটের সংগে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে জরুরী অবস্থা ঘোষণার জনপ্রতি এবং জনপ্রকাশের মতো স্বভাব সূচক পাকিস্তানের বন্ধুত্বকামী নেতার কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা, লোকসভার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দৃঢ় ব্যবস্থা নেবার কথা পুনর্বিবেচিত হচ্ছে প্রভৃতি ঘোষণার যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। লক্ষ্য করার বিষয় উভয় নেতাই বাংলাদেশ ও শরণার্থী সমস্যা নিয়েই বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ ও আলোচনার পর দেশে ফিরে এই বিবৃতি দিয়েছেন। যদি সেরকম কোনও সদুর সম্ভাবনার কথাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মনে থাকে তবে অবশ্য এই সরকার ও বিধানসভা টিকিয়ে না রাখাই বুদ্ধিমানের বোধ হতে পারে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে মুসলীম লীগের মতবিরোধ সর্বজনবিদিত। তাদের সমর্থনে সরকার গড়ার সম্ভাবনাকে সেক্ষেত্রে কিছুতেই বাঞ্ছিত বলে মনে হতে পারে না। বিধানসভার বর্তমান শক্তি সমাবেশের প্রেক্ষিতে মুসলীম লীগ ছাড়া সরকার গঠন কোন দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই পটভূমিকাতেই শব্দে এতবড় একটা চরম ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে।

এবার আমাদের আলোচনার আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। সংবিধানে ব্যবস্থা আছে যে, কোনও রাজ্যে যদি এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে বিধান সভার কোনও দল বা জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখতে পারছেনা তাহলে রাজ্যপালের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজের শাসন প্রবর্তন করবেন রাজ্যপালের মাধ্যমে। অর্থাৎ কোনও দলেরই শাসন সম্ভব হলো না বলে দল-নিরপেক্ষ, সকল দলের উর্ধে “রাষ্ট্রপতির” শাসন কায়ম হবে, “কেন্দ্রীয়” শাসন নয়। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শাসন, যা কেন্দ্রে লোকসভার গরিষ্ঠ দল দ্বারা গঠিত, আর রাষ্ট্রপতির শাসনের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ পৃথক গন্ডী টানা হয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে, যে সব অধিকার রাষ্ট্রপতির পক্ষে স্বাভাবিক কোনও সময়েই ব্যবহার করার দরকার হবে না। দলীয় শাসন ব্যর্থ হলেই রাষ্ট্রপতি তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ শাসন প্রবর্তিত করবেন। রাষ্ট্র-

পতির নিরপেক্ষতাই তাঁর পদের প্রধান শর্ত। সমস্ত দল ও স্বার্থের উর্ধে উঠে তবেই তিনি তার কর্তব্য পালনে সক্ষম। এই কারণেই সংবিধান রচয়িতারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেরও একটি এমন বিশেষ পদ্ধতি রচনা করেছেন যার ফলে কেন্দ্রে ও রাষ্ট্রে কোনও একটি দলের একক গরিষ্ঠতা যদি অন্যান্য সমস্ত দলের মিলিত শক্তির অনেক বেশী না হয় তবে কোনও দলেরই একক সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবে না। তাই, রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী এরকম লোকেরই সাফল্যের সম্ভাবনা থাকবে যার দল-নিরপেক্ষ সত্যতা সমস্ত সন্দেহের উর্ধে। বিগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় শক্তির সমাবেশ ঠিক অনু-রূপ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সি পি এম প্রমুখ অনেক বামপন্থী দলের তখন কর্তব্যচ্যুততা দেখা গেল। প্রার্থীর নিরপেক্ষতা বিচার না করেই তাৎক্ষণিক দলীয় স্বার্থে বিরুদ্ধবাদী দলকে, পরাস্ত

ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি পি আই কি বামপন্থী?

(জৈনক বামপন্থী)

ফরওয়ার্ড ব্লক কি সি পি আইকে নিয়ে এখন আর লিখবার কি আছে? কিছু কিছু সমর্থক, বিশেষ করে এস ইউ সি কিন্তু এখনো সংশ্লিষ্ট। সি পি আই কি বামপন্থী ও কমিউনিজম সত্য সত্যই পরিত্যাগ করেছে? হয়ত অনেক পুরাতন সহকর্মীর মনে বাধাবেনদার জোঁয়া লাগে। কিন্তু ইতিহাসের গতি নির্মম। শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে শ্রেণীস্বার্থের বাইরে কিছুই থাকতে পারে না। একদা প্রগতিশীল বামপন্থী কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি প্রথর স্বার্থসংঘাতের পটভূমিকায় তাদের স্ব স্ব শ্রেণী বেছে নিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি পি আইও বেছে নিয়েছে।

বামপন্থী হতে হলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, শোষণ শ্রেণী ও তাদের প্রতিনিধি শাসক দলগুলির দৃঢ় বিরোধী হতে হয়। শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে প্রগতিশীলতার, বামপন্থার, সাম্যবাদী বিশ্বাসের এই একমাত্র নিরিখ। প্রচলিত শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার প্রকৃত বিরোধী কারা? শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত নেতৃত্বে গ্রামীণ গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুর ও মেহনতী মধ্যবিত্তের সান্মিলিত মোর্চা, যার লক্ষ্য-মানুষের ওপর সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটানো।

এই জন্যে বামপন্থী হতে হলে সর্বপ্রথমেই সামাজিক শক্তিগুলির

করার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সফল করেছেন। এর কুফল এখন সি পি এমকেই ভুগতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশী, দারিদ্র্য ও যেমন ছিল সবচেয়ে বেশী। যার রাজনৈতিক অস্তিত্বের একমাত্র নির্ভর ইন্দিরাবংশবদতা। তাঁকে জিতিয়ে তাৎক্ষণিক কিছুটা জয়ের আশ্বাসদায়ক হয়তো পাওয়া যায় কোনও অন্তিম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাতে সিদ্ধ হয় না।

পশ্চিমবঙ্গে শাসক জোটের নিখরযোগ্য গরিষ্ঠতা ছিল না, বা অন্য কোনও দল সে গরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম না হলে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে বিধান সভা বাতিলের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও মন্ত্রীর হাতে সর্বমুখ কর্তৃত্ব তুলে দেওয়ার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। আর এ ব্যবস্থাপন্যেই সংবিধান বিরোধী। রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে ক্ষমতা নেবেন এ কথাই সংবিধান চেষ্টাচ্ছে, তিনি সে ক্ষমতা পিছনের দরজা দিয়ে কেন্দ্রের শাসক দলের কাছে হস্তান্তর করবেন সংবিধানে সে কথা কিছুতেই স্বীকৃত হবে না। এ ক্ষেত্রে আরও মজার ব্যাপার, রাজ্যে যে দল ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হলো গরিষ্ঠতার অভাবে,

সেই দলকেই রাষ্ট্রপতি তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে গদীতে বসিয়ে দিলেন। এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সংবিধান সম্মত নয়, এবং আমার ধারণা, সুপ্রীম কোর্টে ব্যাপারটা সম্বন্ধে মত চাওয়া হলে রাষ্ট্রপতির এই কার্য সংবিধান বাহিরে বলে সাব্যস্ত হবেই।

সিদ্ধার্থ রায়ের পশ্চিমবঙ্গ সরকারে কোনও আইনসম্মত স্থান নেই। তিনি কোনও কাগজপত্র, হুকুমনামা সই করতে পারবেন না, তাঁর হয়ে সই করবেন রাজ্যপাল। তাঁর, অথবা তাঁর দপ্তরের কোন খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার করবে পারবেন না, করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও রাজ্য প্রশাসনের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করার আইনসম্মত অধিকার আছে কি না তাও বিবেচ্য। আমার ধারণা এমন অধিকার নেই। সৈদিক থেকেও আইনের প্রশ্ন তোলা দরকার। তাঁর সবার চেয়ে বড় দরকার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ও রাজনৈতিক পর্যায়ের আলোচনা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠা যাতে শাসক দল সংবিধানকে তাদের ইচ্ছাবিনোদনের হাতিয়ার করে ফেলতে না পারে এবং সংবিধান একটা প্রহসনে পরিণত না হয়।

অবস্থান বিচার করতে হয়। তার পক্ষে বা বিপক্ষে কর্মসূচী নিরূপণ করতে হয়। একে বলে শ্রেণীবিন্যস্ত ও শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত শোষণ শ্রেণীর চরিত্র নির্ধারণ ও তার প্রতিপক্ষ জনগণের স্ব স্ব শ্রেণীর কর্মসূচী স্থির করে অবিলম্বে চালিত ভাবে এ কর্মসূচীকে রূপায়িত করা।

সি পি আই বলেছে যে বর্তমান ভারতবর্ষে যারা শাসন ক্ষমতার আসীন তারা হল বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণী, জাতীয় কংগ্রেস তাদেরই প্রতিনিধি। এরা সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের চাপে সত্যত ক্লিয়ারশীল।

তাহলে এই কংগ্রেস দলের সঙ্গে যারা সহযোগিতা করে তারা তো এ বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। তারা কেমন করে কমিউনিস্ট বা বামপন্থী হতে পারে?

বামপন্থীর জ্ঞানেন যে রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যে পার্থক্য আছে। সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে স্বার্থের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত রণনীতি বদলায় না, কিন্তু এ নির্ধারিত রণনীতির লক্ষ্য সাধনের জন্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে রণকৌশল পালটাতে হয়, কারণ শত্রুশ্রেণী নিশ্চয় থাকে না, তারাও টিকে থাকার জন্যে বিভিন্ন রণকৌশল অবলম্বন করে। অবস্থা বুঝে রণকৌশল পালটাতে পারার ক্ষমতা একটা বিশেষ গুণ। প্রকৃত

বিশ্লবী দলের সেই গুণ থাকতেই হবে।

কিন্তু এই দ্রুত কৌশল পালটাতে গিয়ে যারা গোটা রণনীতি-কেই পাণ্টে দেয় তারা বামপন্থী নয়। রণনীতি ও রণকৌশলের পার্থক্য তারা বুঝতে পারে না, ফলে শেষ পর্যন্ত বিশেষ শ্রেণীগত বোঁকের দরুণ তারা শাসকশ্রেণীর দালালে পরিণত হয়। গোটা সামাজিক পরিবেশ বিচার করার অক্ষমতার দরুণই এ ধরনের বিচ্যুতি ঘটে। কাউন্ট্রি থেকে ট্রাঙ্ক, ওয়ারং মিং এবং মিন্দু মাসানী অশোক মেটা থেকে রাজেশ্বর রাও, অচ্যুত মেননেরা একই পথের পাঁখক!

এরা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও ভূমিকাকে খর্ব করতে গিয়ে, অবশেষে এক সুবিধাবাদী, সংস্কারবাদী দলে পরিণত হয়। সি পি আইয়ের ক্ষেত্রে দুঃখজনক হলেও তাই ঘটেছে। লেনিন সুবিধাবাদী বোঁক সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুবিধাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন, “সুবিধাবাদ হচ্ছে ব্যাপক প্রমজীবী জনসাধারণের মৌলিক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অতি নগণ্য অংশের সাময়িক স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করা বা অন্য কথায় ব্যাপক সর্বহারা শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে মর্দাষ্টমের শ্রমিক অভিজাত অংশের (শেখাংশ দলন পুঁজীদার)

সিদ্ধার্থ রায়ের নব কথভার

(দর্পণের পর্ববৈকক)

ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী রাজ-নৈতিক সংকটের গভীর আবর্তে পড়ে আত্মরক্ষার তাগিদে সমস্ত রক্ষিত সংসদীয় গণতন্ত্রের ভাঙে পরিত্যাগ করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচিত সরকারগুলিকে ভেঙে দেবার প্রচেষ্টা এই সংকটের একটা দিক মাত্র। কিন্তু শাসক শ্রেণীর নিজেরই সৃষ্ট সংকট তাদের নিজেদের গলায় এঁটে বসছে দেখে তারা এখন গণতান্ত্রিক সমস্ত রীতিনীতি পরিত্যাগ করেছে। সংবিধানের পরিবর্তা ও অলঙ্ঘনীয়তা সম্পর্কে এতদিন তারা যে ছেঁদো বুলি কপচাতো, তা এই সংকটের ঝড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে।

রাজনৈতিক দিক দর্শন অনুসারে সামাজিক অর্থনৈতিক সংকট নিরসন করা না হলে তা রাজনৈতিক সংকটের আকার ধারণ করে। রাজনৈতিক সংকটের প্রাথমিক স্তরে শাসকশ্রেণী সরকার বদলিয়ে, সংসদীয় নিয়মকানুন বদলিয়ে শৃঙ্খলা গণতান্ত্রিক কাঠামো পুজো করেই সংকট থেকে সাময়িকভাবে উদ্ধার পেতে চায়। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তা যখন ব্যর্থ হয় তখন তারা খোলাখুলি ভাবেই সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, সংসদীয় নির্বাচন এবং জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থাৎ সভাসমিতি সমাবেশের অধিকার, বাক, স্বাধীনতা, মতবাদ প্রচারের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে খোলাখুলি একনায়কত্ব কায়েম করে।

জনসাধারণের ওপর এভাবে নিপীড়ন চালাবার সময় তারা এর আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোট সংগ্রহ করেছিল সেই প্রতিশ্রুতিগুলির কথা পরিকল্পিতভাবেই চেপে যায়, কিন্তু ভোট সংখ্যার নজর দেখিয়েই ভোটদাতা জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করতে হাত ওঠায়। একদা জার্মানিতে নাজী দস্যু সর্দার হিটলারও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু চ্যান্সেলর নির্বাচিত হবার পর ঐ নির্বাচনের দোহাই দিয়েই সে জার্মানীতে সমস্ত নির্বাচন বাতিল করে দেয়, নাজী পার্টির ঠ্যাংগাড়ে ঝটিকা-বাহিনীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিয়ে গায়ের জোরে সে জার্মান জনসাধারণকে এবং অল্পদিনের মধ্যে পৃথিবীর বহু কোটি মানুষকে, ব্যক্তি হত্যা, গণহত্যা, গ্যাস-চেম্বরের বীভৎস মৃত্যুর কবলে ঠেলে দেয়। হিটলারী স্বৈরাচারকে ঠেকাবার জন্যে সেদিন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে আত্মবলিদান করে জনগণের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হয়েছিল।

ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীও আজ অর্থনৈতিক সংকটের স্তর থেকে রাজনৈতিক সংকটের স্তরে উপনীত। পৃথিবী সেরা সেরা পুঁজিবাদী দেশের অনুগত আর্থ-

নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট এড়াবার কোন রাস্তা তার নামনে খোলা নেই। রাজনৈতিক সংকটের প্রথম পর্যায়ে শাসকশ্রেণী নব কংগ্রেসী বামপন্থী বুলি আওড়িয়ে, জনসাধারণকে গরীবী হঠাবার নামে ধোঁকা দিয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বামপন্থী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে আত্মগোপন করে থাকা যে সংরক্ষিত রিজার্ভ বাহিনী তারা জিইয়ে রেখেছিল, সংকটের প্রথম পর্যায়ে সেই ফরওয়ার্ড ব্লক, ডি এম কে, মুসলিম লীগ, সি পি আই প্রভৃতি গরম বদকিনওয়ালা স্থানীয় এবং ছদ্মবাম পার্টিগুলিকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ এই ছদ্মবেশী শত্রুর সহযোগীদের খুব তাড়াতাড়ি চিনে ফেলেছিল। এর প্রধান কৃতিত্ব পশ্চিমবঙ্গের অনেক সংগ্রামের পোড়খাওয়া সাধারণ মানুষগুলির।

পশ্চিমবঙ্গ তাই স্বাভাবিক ভাবেই নব কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদকে রোখার জন্যে সারা ভারতবর্ষের জনগণের অগ্রগামী ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়া ফ্যাসিবাদের ঠ্যাংগাড়ে ঝটিকা-বাহিনীও পশ্চিমবঙ্গের এই দৃঢ় ঘাঁটি ভেঙে দিয়ে আগামী দিনগুলিতে সারা দেশে ফ্যাসিবাদের কালো বিভীষিকা বিস্তৃত করতে চায়।

লক্ষ্য করে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে নবকংগ্রেসী মুসলিম লীগ পুতুল সরকার যখন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের ঘণার ঝড়ে, ছাঁটাই, বেকারী, অসন্তোষের প্রবল আঘাতে ভেঙে যাচ্ছিল, তখন আর তাদের দিয়ে শাসকশ্রেণীর অবাধ শোষণের হুকুমদারী চালানো সম্ভব হবে না বুঝে, তারা পুতুল মন্ত্রিসভাকে সরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজেদের ইচ্ছামত সরকার গঠন করতে না পারে, তার জন্যে বিধান সভা পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে নয়াদিল্লীর একনায়কত্ব কায়েম করল। নির্বাচন করার সমস্ত দাবী (যা স্বয়ং পুতুল মন্ত্র্যামন্ত্রীরও লোক দেখানো দাবী ছিল) তারা উড়িয়ে দিল।

কিন্তু ক্যানিউটের হুকুমে সমুদ্র জলরাশি যেমন বাধা মানে নি তেমনি নয়াদিল্লীর মাননীয় মহিলাটি যাদের শিরোমণি, তাদের পক্ষে হুকুম চালিয়ে বাঁধাঙ্গা সংকটের মহাপ্লাবনকে রোধ করাও সম্ভব নয়। সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংবিধানের ধারা স্বীকার করলে বিকল্প সরকার গঠনের সুযোগ দান অথবা নতুন করে জনমত যাচাই করতে হয়; এই দুটোর একটা পথও তাদের অভিপ্রেত নয়। কারণ তাতে জনগণের বিচার বুদ্ধি ও অধিকার প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়ে যায়।

আবার রাষ্ট্রপতির নামে তথা-

কথিত নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন সামান্য আবরণ রেখে চালানো পর্যন্ত আজ আর সম্ভব নয়। কারণ সেক্ষেত্রে দ্রুতবেগে জনগণের ওপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। আবরণের আড়ালে কোনো কোনো বিবেকবান আমলা হয়তো বা এতো নীচ কাজ করতে রাজী হন না। হয়তো বা গলায় ছুরি বসাবার কানুনকেতা দেখিয়ে সময় কেটে যায়, বলিদানে বিষ ঘটে। অসহিষ্ণু ফ্যাসিবাদ আঘাত করার জন্যে দেরী করতে চায় না, কারণ তার ফলে শিকার আত্মরক্ষা করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।

তাই যে রাজ্যপাল কূটচক্রান্ত করে নয়া মীরজাফরদের সংগ্রহ করে, জনগণের প্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বানচাল করে দিয়ে নয়াদিল্লীর মণিবদের তুষ্ট করেছিলেন, তাকেও আর বিশ্বাস করা যায় না। রাজ্যপালের উপর খবরদারি করার জন্যে সংবিধানের নিয়মকানুন পদদলিত করে সোজাসুজি পশ্চিমবঙ্গকে দেখাশোনা করার জন্যে এমন একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নিযুক্ত করতে হয়, যিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বারে বারে গায়ের জামার মতই দল-বদল করতে শিখা সংকোচ বোধ করেন নি।

একই কারণে ওই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকেও মাননীয় মহিলাটি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। তাই কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সেক্রেটারী স্বামীনাথনকে তার উপরে নজর

রাখার জন্যে পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মতামতের তোয়াক্কা না রেখে দমন-পীড়নের ষ্টীমরোলার চালাবার গুঢ় অভিসন্ধি নিয়ে যারা পদক্ষেপ করছেন, তাঁদের হয়তো বা আওরংজেবের কূটনীতি অবলম্বনের পন্থাটাই মনে আছে, কিন্তু আওরংজেবের এই কূটনীতি যে মোগলসাম্রাজ্যের পতনের সমূহ কারণ হয়েছিল, তা মনে নেই।

আভ্যন্তরীণ কলহ বিসংবাদে জীর্ণ, ঘনায়মান সংকটের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত নবকংগ্রেসীরা যেভাবে জনগণের অধিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করে চলেছেন, যেভাবে তারা পশ্চিমবঙ্গের জনমতকে মিলাটারী বৃষ্টির তলায় গুঁড়িয়ে স্তম্ভ করতে চাইছেন, তাতে

(সম্পাদক ওষ্ঠ পুস্তক)

দিনে দিনে সব পাখার চেহারা
৫৫৫ এভারেঞ্চার মত হ'তে
চলেছে—কারণ জি. ই. সি.
এভারেঞ্চার যে কেবল কাজের
বেলায় অতুলনীয় তা' নয়,
দেখতেও অগুর্ব।



শিখ জামেজ আর নিবিড়
নরম সুখ উপভোগ করার
জন্ম চাই জি. ই. সি.-র
এভারেঞ্চার। আপনার ঘরে
আজই লাগান।

জি. ই. সি. এভারেঞ্চারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :
* নিঃশব্দে চলে
* বছরের পর বছর ব্যবহারেও পাখার চেহারা
নতুন মত থাকে
* বহু বছর নিঃশব্দে চলে

৫৫৫

৫৫৫

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

কলিকাতা • গোহাটি • ভুবনেশ্বর • পাটনা • কানপুর • নিউ দিল্লী • চণ্ডীগড়
জয়পুর • বোম্বাই • আমেদাবাদ • নাগপুর • জব্বলপুর • মাদ্রাস • কোয়েম্বাটোর
বাল্লালোর • সেকেন্দ্রাবাদ • এনিকুলাম

KALPANA GEC.570B.

TRADE MARK GEC PERMITTED USER—THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA LIMITED

আরব-ইজরাইল ও ভারত-পাকিস্তানের অশান্ত পটভূমিতে আমেরিকা

(দর্পণের বৈদেশিক ভাষ্যকার)

আমেরিকার সমরবিভাগ বেশ বিপদে পড়েছে। ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের এতদিন তাঁরা যে কারণ দেখাতেন তা হচ্ছে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতকং অনুপ্রবেশ, কমিউনিস্ট আগ্রাসী প্রচেষ্টা ইত্যাদি। মার্কিন পেন্টাগন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট উত্তর ভিয়েতনামে অহেতুক বোমাবর্ষণ, লাওস ও কম্বোডিয়া আক্রমণ প্রভৃতির জন্যও তথাকথিত কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখাতেন।

কিন্তু পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ ভিয়েতনামের ব্যাপারে “অতিশয় গোপনীয়” চিহ্নিত যে সব দলিল-পত্র সম্বন্ধে বিপুল ব্যয়ে রক্ষা করতেন তা ফাঁস হয়ে গেছে। শোনা যায় যে মার্কিন বৃহৎ শিল্পপতি রায়ড কর্পোরেশনের স্থাপিত একটা রিসার্চ ব্যুরোর গবেষকদের কাছে রিপোর্ট তৈরীর জন্যে ঐ কাগজপত্র দেখতে দেওয়া হয়েছিল। তার একটা নকল আমেরিকার বিখ্যাত সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক টাইমস পেয়ে যায় এবং ছাপিয়ে দেয়। মার্কিন সরকার বহু চেষ্টা করেও এর প্রকাশ শেষ পর্যন্ত আটকাতে পারেন নি।

ঐ রিপোর্টের যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তাতে একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে আইজেনহাওয়ার, কেনেডি জনসন এবং নিক্সন সবাই বৃড়ি বৃড়ি অসত্য কথা বলে ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণ চালিয়ে গেছেন। তথাকথিত কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের কথা একেবারেই কাল্পনিক, বানানো অজুহাত মাত্র।

ইতিমধ্যেই মার্কিন জনমত ভিয়েতনামের নোংরা যুদ্ধের বিরোধী হয়ে পড়ছিল, এবার তাদের প্রবল যুদ্ধবিরোধী মনোভাবকে সম্ভবতঃ বাঁধ মানানো আরো শক্ত হয়ে পড়বে। এদিকে প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ভিয়েতকং পক্ষ থেকে মাদাম বিন বলেছেন যে যদি আমেরিকা ভিয়েতনাম থেকে সমস্ত মার্কিন সৈন্য ও সমরোপকরণ একটা পূর্ব নির্দিষ্ট তারিখে (এ বছরের মধ্যে) সরিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে ভিয়েতকংদের ও উত্তর ভিয়েতনামে বন্দী সমস্ত মার্কিন সৈনিককে মুক্তি দেওয়া হবে। মাদাম বিনের এই সাতদফা যুদ্ধবন্ধের শর্ত আমেরিকার সাধারণ মানুষের যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবকে আরো দৃঢ় করবে, একথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ অথবা শান্তি প্রতিষ্ঠার যে মার্কিন সরকারের আগ্রহ নেই তা তাঁদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এর প্রথম ও প্রধান কারণও সদ্য প্রকাশিত গোপন তথ্য থেকে বোঝা যায়। মার্কিন সরকার তার শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কাজ করে। মার্কিন পত্রিকা “বিজনেস উইক” বলেছে যদি ভিয়েতনামের যুদ্ধবান্দ সরকারী খরচ এখনি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমেরিকার বৃহত্তম দুশটী কোম্পানীর মধ্যে একশ পঁচাত্তরটাই ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে। ভিয়েতনামের যুদ্ধে বছরে মার্কিন সরকার খরচ করত বারিশ শো কোর্টী ডলার, অর্থাৎ চব্বিশ হাজার কোর্টী ভারতীয় টাকা। এর অধিকাংশ সমরসম্ভার বাবদ খরচ হয় আর ঐ কোম্পানীগুলি এই সমরসম্ভার উৎপাদন ও সরবরাহ করে।

সুতরাং ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ করার নামে মার্কিন ধনকুবেরদের বৃদ্ধি কীপদনি ধরে। যুদ্ধের অজুহাত তরাই সৃষ্টি করেছে, যুদ্ধ তরাই চালাচ্ছে এবং হাজার হাজার তরুণ আমেরিকানের রক্ত তাদের মৃনাকার পাহাড় গড়ে উঠছে। সুতরাং যুদ্ধ তরাই বন্ধ করতে চায় না, মৃত্যু তরাই বত সিঁদুছাই প্রকাশ করুক।

কিন্তু মার্কিন সরকার আমেরিকার জাগ্রত জনমতকে ভয় পায়, বিশেষতঃ উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রতিনিধি সভা, সেনেটের এক তৃতীয়াংশ এবং রাষ্ট্রপতিসহ প্রায় ষাট হাজার স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষকে মার্কিন ভোটদাতাদের সামনে দাঁড়াতে হবে। অবশ্য আমেরিকায় এখন যে ভাবে বিপাক্ষিক পররাষ্ট্র নীতি চালু তাতে ডেমোক্রট অথবা রিপাবলিকান যে দলই জিতুক যুদ্ধ বন্ধ করার সংগত প্রস্তাব গৃহীত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। ভিয়েতনামে ভাঁটা দিয়ে অন্যতর যুদ্ধ বাঁধানোর চেষ্টা তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই আমেরিকা তার দেশের জনমতকে বিশ্বের অন্য দৃষ্টী জয়গায় সংঘর্ষের জন্যে তৈরী করছে।

গত গ্রিশে জুন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বলা হয় যে মিশর ও ইজরাইলের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিয়ে সুয়েজ খাল আবার লুপ্ত চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার চেষ্টা মার্কিন সরকার করছেন বলে যে সংবাদ রটেছে, তার মূলে কোন সত্য নেই। অথচ আমেরিকা যে সুয়েজ খাল খোলার ব্যাপারে এবং আরবদেশগুলি ও ইজরাইলের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদনের জন্যে আগ্রহী তা পররাষ্ট্র সচিব রজার্সের মিশরের সাম্প্রতিক আলোচনাসফর থেকে সমর্থিত হয়েছে। বর্তমান

মিশর সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন সম্পর্কে সন্দিহান। বিশেষ করে উনিশশো সাতাশটি সালের ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যর্থতার পর, মিশরের সাদাত পরিচালিত সরকার খানিকটা আমেরিকার দিকে চলে পড়েছে। এবং ইজরাইলের সঙ্গে বোঝাপড়া যুদ্ধ বা শান্তির জন্যেও এই সরকার সোভিয়েতের চেয়ে আমেরিকার উপর বেশী নির্ভর করছে। মিশর থেকে সাড়ে তিন হাজার সোভিয়েত বিশেষজ্ঞকে বহিস্কার করে, সোভিয়েত পক্ষপাতী প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সহ সকল মন্ত্রিকে পদচ্যুত করে এবং নাসেরের প্রতিষ্ঠিত আরব সমাজতন্ত্রী ইউনিয়নের সমস্ত সোভিয়েত সমর্থক কর্মকর্তাদের অপসারণ করে রাষ্ট্রপতি সাদাত আমেরিকার অনেকটা বিশ্বাসভাজন হয়েছেন।

অন্যদিকে “বাংলাদেশ” দখল নিয়ে ভারত-পাক সংঘর্ষের এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেও মার্কিন সরকার আগ্রহী নন। কখনো এপক্ষ, কখনো ওপক্ষকে প্রকাশ্যে বা গোপনে উৎসাহ দিয়ে যুদ্ধ বাঁধানো এবং পরে শান্তিরক্ষার নাম নিয়ে যুদ্ধরত দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চিরাচরিত মার্কিন কায়দা। বাংলা দেশ মুক্তি সংগ্রামে মার্কিন ভূমিকা ঠিক একই ধরনের। কখনো ইয়াহিয়াখানের অত্যাচার পীড়িত বাস্তুত্যাগীদের দৃষ্টিতে বিগলিত ইঙ্গ মার্কিন সমাচারে ভারতীয় জনগণের কাছে পাকিস্তানকে সাহায্য দেবার বিরোধী, আবার কখনো জাহাজ বোকাই করে অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে ইয়াহিয়া খানের মনো-রঞ্জনের তারা চেষ্টা করে। আসজ লক্ষ্য, দুপক্ষকেই মদত দিয়ে যাওয়া স্বত্তে তারা সমরমতো যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা সুরু করে মার্কিন সমরসম্ভার কেনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আরব এবং ইজরাইলের সম্পর্কেও তাদের একই দৃষ্টিভঙ্গী।

তাই গ্রিশে জুন অস্বীকার করেও তেসরা জুলাই স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে একমাস ধরে মিশরে মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ ডোনাল্ড বারিংটনকে ওয়াশিংটনে ডেকে এনে সুয়েজ খাল খোলার ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছিল এবং পঁচই জুলাই মিঃ বারিংটন এবং পররাষ্ট্র বিভাগের মিশর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মিঃ মাইকেল স্টাণার কায়রো যাচ্ছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের

এধরণের আগ্রহ কিভাবে একের বিরুদ্ধে অন্যকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে যুদ্ধ বাঁধানোর ঘটনার পর্ববিসিত হয়, কাস্মীর, কংগো ও ভিয়েতনামে তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পিরো এগনন এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী ডাঃ হেনরী কিসিংগার একই তারিখে নয়াদিল্লী পৌঁছেছেন। ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা পাক সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে ইসলামাবাদ যাবেন।

পশ্চিম এশিয়া এবং ভারত পাক উপমহাদেশে দুই দুই জোড়া বান্দ মার্কিন প্রতিনিধির আগমন নিতান্ত দেশভ্রমণের ব্যাপার নয়।

ইতিমধ্যেই মিশরের রাষ্ট্রপতি সাদাত এবং ইজরাইলের দেশরক্ষা সচিব জেনারেল ডায়ান আসিম যুদ্ধের জন্যে নিজ নিজ দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। পাকিস্তান সরকার ও ভারত সরকার গোলাগুলি বিনিময় ও আকাশ-সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ পরস্পরের বিরুদ্ধে অনবরত করে চলেছেন। পশ্চিমী দুনিয়ার রথী

সিদ্ধার্থ রায়

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

করেছে, সেই তরবারি তাদের বৃদ্ধিই আমলে প্রোথিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ অপরাধে, অমর।

একদিন হিটলার এই অপপ্রয়াস করেছিল, তার পরিণাম ইতিহাসে লিখিত রয়েছে। ইন্দো-নেশিয়াল, দক্ষিণভিয়েতনাম, পাকিস্তানে একের পর এক সামরিক-বেসামরিক একনায়কেরা রাজনৈতিক মণ্ড থেকে অপসারিত হয়েছে, এদেশেও তাদের পরিণতি একই হতে বাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গে আজ যারা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে ঘণ্যতম আক্রমণ চালাতে শিখা করে নি, সেই নব কংগ্রেসী চন্দ্র ও তাদের রংবেরং এর অনুচরদের পরিষ্কারভাবে চিনে নেবার জন্যে, তাদের প্রাপ্য শাস্তি দেবার জন্যে, সমস্ত প্রবণতা মিথ্যা ভাঁওতাকে গুড়িয়ে দেবার জন্যে আজ প্রগতিশীল সমস্ত শক্তিকে একবন্ধ করতে হবে। নয়া-ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে যে একের দৃঢ় দুর্গ গড়ে তুলতে হবে, তার মধ্যে যেন শাসকশ্রেণীর দালাল ছদ্মবাম মন্থোপসারীদের স্থান না থাকে।

নির্বাচন একটা বৃহৎ সংগ্রাম মাত্র। এই সংগ্রামে জিতলে শাসকশ্রেণীর অপসারণ ঘটে না, একচেটিয়া পুঁজি, জমিদারী শোষণ বন্ধ হয় না, কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের চেতনা বাড়ে, মেহনতী মানুষেরা শত্রুমিত্র চিনে নিতে পারেন। সমাজ বদলের তাপমাত্রা বিপ্লবের ঝটিকা-কেন্দ্রের উত্তাপাঙ্কের শেষ সীমা

মহারথীরা এসে সরেজমিন তদন্ত করে যাচ্ছেন। কেউ বলছেন ভারতেরই দোষ, কেউ বলছেন পাকিস্তান বন্ড বেশী গণহত্যা চালিয়েছে। ঠিক কাস্মীরে নিমিৎস-ওয়েন ডিকসনের বিভিন্ন বক্তব্যের মত।

সুতরাং ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ হবে কিনা বলা যায় না। কিন্তু আমেরিকান সমর নায়কেরা ও সমর শিল্পের সম্রাটেরা নতুন নতুন যুদ্ধের এলাকা খুঁজে বেড়াচ্ছেন কারণ তাঁদের ঐশ্বরী সমরসম্ভার বিক্রীর ব্যবস্থা করতে হলে যুদ্ধ বাঁধা চাই-ই।

সব দেশেই এরকম কিছু কিছু স্বার্থবান মহল দেখা যায় যারা যুদ্ধের অনুকূলে সর্বদা প্রচার চালায়। আমেরিকান স্বার্থের সঙ্গে স্বভাবতঃই তাদের ক্ষণ হলো যোগসূত্র থাকে। আরব-ইজরাইলি হোক, ভারত পাকিস্তানি হোক, যুদ্ধের ফলে শেষ মীমাংসা হয় না। উনিশশো পঁয়ষাট সালে এদেশে এবং উনিশশো সাতাশটি সালের মিশর ইজরাইল যুদ্ধে তা দেখা গেছে।

নির্ধারিত করে দেয়। শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংকটকে বিপ্লবী পরিস্থিতির সফলপ্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল, এই চার বছরে জনগণের সচেতন ক্রিয়াকলাপ ও ক্রমবর্ধমান গণচেতনাই এর প্রমাণ। এর চাইতে বেশী কিছু বলে সংসদীয় নির্বাচনকে মনে করার কারণ নেই।

সংকটের গভীর আবর্তে পড়ে শাসকশ্রেণী বুদ্ধোন্মত্তগণতন্ত্রের স্বাধীনতার পতাকাও ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। জনগণকে এগিয়ে এসে ঐ পতাকাকে তুলে ধরতে হবে, গণতান্ত্রিক স্বাধিকারকে রক্ষা করতে হবে।

যদি পশ্চিমবঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংস করা হয়, তাহলে অচিরেই সারা ভারতবর্ষেও তা বেঁচে থাকবে না। পূর্ববঙ্গে গণতন্ত্র ধ্বংস যারা করেছে, সারা পাকিস্তানেই তারা গণতন্ত্রের হত্যাকারী। নির্বাচন হলে জনগণের রায় যদি শাসকশ্রেণীর বিপক্ষে যায়, তাহলে তারা অস্ত্রের জোরেই তাকে দাবিয়ে রাখে। অবাধ নির্বাচন শাসকশ্রেণীর কোনদিনই অভিপ্রত নয়। এপার-ওপার দুই বাংলারই অভিজ্ঞতা এক।

তাই অতি সত্বর অবাধ নির্বাচনের দাবী অত্যন্ত সংগত দাবী। এবং ঐ অধিকার যে সহজে আদায় হবে না, এটাই পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। নির্বাচন আদায় করার অর্থ শাসকশ্রেণীর পশ্চাদাপসারণ মাত্র, চূড়ান্ত পরাজয় নয়। শাসন শোষণের চূড়ান্ত অপসারণের, সমাজ বদলের, দুঃখ দুর্দশা অনিশ্চয়তার চিরতরে অবসানের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের ধাপ।

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম ও চীন-বিরোধী বিযোদগার

অমূল্যরতন সেন

পূর্ব বাংলার ব্যাপারে চীনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পূর্ব-বাংলার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে চীন আশ্চর্যজনকভাবে শীতল, অথচ পাকিস্তানের অশান্ততা রক্ষা সম্পর্কে অসাধারণভাবে উদগ্রীব। পাকিস্তান পশ্চিমী জঙ্গীজোটের সদস্য, প্যান ঐশলামিক উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তির ওপর পাকিস্তান রাষ্ট্রটির উদ্ভব ও অস্তিত্ব। পাকিস্তান এমন কি বুদ্ধোন্মত্ত উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেও অনেক দূরের, অনেক পেছনের যাত্রী। বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দেশ কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে তার “দহরম মহরম” এবং এমন একটি অতীতশ্রমী রাষ্ট্রের প্রতি চীনের “বৈপ্লবিত করণাধারা” তাই সংগতভাবেই প্রশ্ন তুলেছে, চীন কি সত্য সত্যই বিশ্ববাস্তব দর্জর সহযোগী কিংবা মুক্তিযুদ্ধের মনবগোষ্ঠীর অবিসম্বাদিত দুর্গ হতে পারে? তা হলে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে চীন এতটা শীতল কেন? পাকিস্তানের ইয়া-হিয়া জহাদদের প্রতি চীনের এত “দরদ” কেন? যে সিহানুকের প্রতি চীনের অত সমর্থন সে কি মর্জিবের অপেক্ষা বেশী প্রগতিশীল? প্রভৃতি প্রভৃতি।

যে মহলে চীন সম্পর্কে উপ-রোক্ত বিতর্কমূলক চিন্তাধারা এবং প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তারা তৃতীয় মহল। প্রথম মহল যারা সরাসরি চীন বিরোধী। দ্বিতীয় মহল যারা সরাসরি চীনের সমর্থক। তৃতীয় মহল এই উভয় প্রান্তীয় মহলের সমদূরত্বে অবস্থান করছেন।

আজকের যুগে সমদূরত্বের নীতি প্রকৃত পরিণতিতে প্রতি-ক্রিয়াশীলতারই নীতি। রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা দলীয় মতবাদের ক্ষেত্রে, যে-কোনো রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমদূরত্বের নীতি আজ আর বিকাশের পর্ষায়ে নেই, তা বিপর্যয়ের পর্ষায়ে চলে গেছে। অর্থাৎ তা অবক্ষয়ী।

বুদ্ধোন্মত্ত সভ্যতা বিকাশের স্বর্ণযুগে এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তাধারার উষাকালে সমদূরত্বের নীতি মানবিক বিচার-বিবেক আর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দিক থেকে মস্ত চিন্তার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল লেনিন ও স্টালিনের নেতৃত্বে মহান সোভিয়েত ভূমির অভ্যুদয়ের পর তার প্রয়োজন স্থানান্তরিত হয়ে ব্যক্তি মস্ত চিন্তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। অর্থাৎ সমদূরত্বের নীতি আজ আর সংগঠনগত ভাবে নয়, মতবাদগতভাবে অনুধাবনের জগতে উপনীত হয়েছে। আজ আর কারোর পক্ষেই

সমদূরত্বের নীতি নিয়ে একই সঙ্গে কমিউনিস্ট বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হওয়া সম্ভব নয়; কি সাংগঠনিক পর্ষায়ে, কি ব্যক্তি পর্ষায়ে ওটা সম্পূর্ণতাই কমিউনিস্ট বিরোধীতা, কমিউনিজম বিরোধীতা এবং সাম্রাজ্যবাদের দালালী। যেমন তৃতীয় বিশ্বের ধূজাধারী নিরপেক্ষ ভারত নিলক্ষভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধে সাম্রাজ্যের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আশ্রয়দাতা ফ্যাসিস্ট সরকারকে টাটার ট্রাক আর ভিলাইয়ের ইম্পাত দিয়ে সাহায্য করে।

ব্যক্তি পর্ষায়ে মতবাদগতভাবে সমদূরত্বের নীতিটি কী? একে-বারেই পুরনো সংগঠনগতভাবে সমদূরত্বের নীতি থেকে আলাদা। আজকের সমদূরত্বের নীতি হচ্ছে সর্নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সংগঠন বা ঘটনার বিচার, সংগঠন বা ঘটনা দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর বিচার নয়, বরং ঠিক উল্টো। বুদ্ধোন্মত্ত নৈতিকতা কিংবা কমিউনিস্ট বৈজ্ঞানিকতা আজ আর কোনো প্রশ্নাধীন ঘটনা নয়, বরং “ঘটনা”ই আজ বুদ্ধোন্মত্ত নৈতিকতা কিংবা কমিউনিস্ট বৈজ্ঞানিকতার প্রশ্নাধীন। তৃতীয় মহলকে তাই ঠিক করতে হবে, কোন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তারা পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধ এবং চীনের ভূমিকার বিচার করবেন। একই সঙ্গে আমেরিকা খারাপ, রাশিয়া খারাপ, ভারত খারাপ, কিন্তু চীন সম্পর্কে সন্দেহ প্রশ্ন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আত্মক অসহায়তা কিংবা ভ্রমাময় থেকে আসে। প্রথমতঃ সবাই খারাপ হলে দুনিয়াতে আর ভাল মন্দের পার্থক্য থাকে না—ভাল-র উদয়ই হয় না। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়াতে সবাই খারাপ হয়ে শুধু নিজে ভাল হলেই দুনিয়া চলে না। কেননা নিজেকে ভাল মনে করে না এমন কোন খারাপ কেউ দুনিয়াতে হয় না।

কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধ এবং চীনের ভূমিকাকে বিচার করতে হলে একটি সুসংবদ্ধ প্রণালীতেই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। খাপছাড়াভাবে চীন-ইয়াহিয়া বা চীন-সিহানুকের নজীর টেনে পূর্ব-বাংলার মুক্তিযুদ্ধের যেমন কোনো সদর্থক মঙ্গল ঘটনো যাবে না, তেমনি পূর্ব-বাংলার মুক্তিযুদ্ধকে নতুন করে চীন বিরোধী হিস্টোরিয়া সৃষ্টির কাজে লাগালে ঘটনাগুলোই দৃষ্টিভঙ্গীকে অধীনস্থ করে ফেলবে।

২ পটভূমি

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে দেশীয় দালালদের সহযোগিতায় এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা / সংগ্রামে অহিংসবাদের স্পিরিট নিয়ে আসা

হয়। সংগ্রামে অহিংসবাদ হচ্ছে এমন এক স্থিতিশীলতার নীতি যা এক জাতি কতৃক অন্য এক জাতি, এক শ্রেণী কতৃক অন্য এক শ্রেণী শোষণ ও শাসনের নীতি, যখন প্রভুত্বপরায়ণেরা সমাজের ওপর তাদের রাষ্ট্রিক কতৃক স্থাপন করতে পেরেছে। এই উপমহাদেশীয় জীবনে ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে দেশীয় রাজন্যবর্গের হাতেই ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন কতৃক। ব্রিটিশ এসে সেই কতৃক কেড়ে নেয় এবং শ্রেণীগত শোষণের ওপরে আরও একধাপ জাতিগত শোষণের জোয়াল ভারতবাসীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের কতৃক ইংলন্ডে-স্বরীয় হাতে ন্যস্ত হবার পর এবং ভারতীয় জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিভাষণ টেনে নামানোর পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশীয় দালালদের সহযোগিতা শুরু। এই শোষণদলের সন্তান-সন্ততিরাই ব্রিটিশ ভারতের সামরিক উচ্চপদে, সিভিল এডমিনিস্ট্রেশনের সিংহাসনে, সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়, জাতীয় নেতৃত্বের মণ্ড থেকে ব্রিটিশ ও দেশীয় ধনিক শ্রেণীর দালাল প্রতিভূরূপে ভারতবাসীর ওপর শতাব্দীব্যাপী খবর-দারী করে এসেছে। ১৯৪৭ সালে আমরা অর্থাৎ এই উপমহাদেশের অধিবাসীরা—ভারত বা পাকিস্তানের জনগণ যে স্বাধীনতা পেয়েছে তাকে যদি স্বাধীনতা বলতে হয় তবে ঐ স্বাধীনতা আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিভাষণের মহত্ব থেকেই পেয়েছি; আমাদের ব্রিটিশ ভক্ত জাতীয় নেতাদের স্থিতিশীলতার দর্শনে সেই স্বাধীনতা পরিপুষ্ট হয়েছে, আর ব্রিটিশ পদলেহনের কতৃকে কাড়াকাড়ি হয়ে ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ ভাগাভাগি হয়েছে।

ইতিহাসের এই পারস্পর্য মনে রাখলে আমাদের একথা মনেতেই হবে যে, বিভক্ত এই উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনের ওপর থেকে একধাপ ওপরের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কতৃক তো শেষ হয়নি, বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমাদের আরও ক্রুর নয়। উপনিবেশিক শোষণের জোয়ালে আবদ্ধ করেছে এবং দেশীয় দালাল প্রতিভূরা সেই শোষণব্যবস্থার সঙ্গে সমতারক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরিণতিগত সহায়করূপে ১৯৪৬ সালে ধর্মীয় জাতিবিশেষ সৃষ্টি এবং কতৃকের ভাগাভাগি করে নিয়েছে।

এই উপমহাদেশকে ভাগাভাগি করে সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয়

দালাল প্রতিভুদের কোন কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যদিও বিশ্ব ফ্যাসিবাদী অভিযানের ওপর বিজয়ী, কিন্তু বিশাল চীনের ভূখণ্ড জুড়ে মাও সে তুঙের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বাহিনী চরম সাফল্যের পথে দ্রুত আগুমান। বিশ্বাস-ঘাতক চিয়াংকাইশেক এবং কুয়ো-মিন্টাং বাহিনীর প্রতি সর্বতো সাম্রাজ্যবাদী সাহায্য সত্ত্বেও চিয়াংকাইশেক অস্তিম পরাজয়ের পথে। এই ঘটনার প্রভাব বিশাল এই উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের মনে সদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায় স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল সৃষ্টি করবে; যেমন মাও সে তুঙের চীনে তেমনি এই উপমহাদেশ থেকেও যড়যন্ত্রকারী সাম্রাজ্যবাদী গ্রুপ এবং দালাল প্রতিভূরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উপমহাদেশের স্থিতিশীলতা ভেঙে চোঁচির হবার আগেই কতৃকের ভাগাভাগি করে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা হোক! এবং চীনে সর্বাঙ্গিক কমিউনিস্ট বিজয়ের আগেই তা করা হোক।

১৯৪৯-এ চীনে সর্বাঙ্গিক কমিউনিস্ট বিজয় সম্পূর্ণ হয়, তার আগেই ১৯৪৭-এ এই উপমহাদেশ কেটে ভারত আর পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়।

৩ কতৃকের অন্তর্বিরোধ

এই উপমহাদেশের জনগণকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা দালাল প্রতিভুদের কতৃক ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিল। ধর্মীয় বিশেষ সৃষ্টি করে ধর্মীয় বিশেষপ্রবণতার উস্কানি দিয়ে এই ভাগবাঁটোয়ারার কাজটি তারা ভালভাবেই করতে পেরেছিল। কিন্তু কতৃকের অন্তর্বিরোধ এতেই সম্পূর্ণ অবসিত হলো না। যে বিচিত্র ও জটিল শোষণব্যবস্থার জোয়ালে উপমহাদেশের জীবন অবরুদ্ধ হয়ে আছে বিশ্ব পট-পরিবর্তনের দ্রুত তরঙ্গাভিঘাতে বার বার সেই জীবন দুলে উঠেছে। চীনে কমিউনিস্ট বিজয়, কোরীয় যুদ্ধে নবজাত চীনের বেচ্ছাসেবী সৈন্যদের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী-রোধী বীরদর্প রক্তাক্ত অভিযান ও কোরীয় স্বাধীনতা রক্ষা, কিউবার বিপ্লব, মিশরে নাসেরের জাতি-য়তাবাদী নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অভ্যুত্থান, আলজিরিয়ায় বেন বেল্লায় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে ফ্রান্সী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি, এবং পরিশেষে মহাবলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণের জীবনপণ লড়াই একদিকে যেমন এই উপমহাদেশের নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীকে সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করেছে তেমনি কঙ্গো, বায়ফ্রা, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা এবং পার্শ্ববর্তী আরবের তৈল সমুদ্রে সাম্রাজ্যবাদী হাঙ্গরদের শয়তানি আর যড়যন্ত্র এই উপমহাদেশের নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীও করে তুলেছে। জনগণের এই ভূমিকা আন্তর্জাতিক শোষণ ও

শাসনে। সাম্রাজ্যবাদের দালাল প্রতিভু কতৃকের সম্মুখে যে সঙ্কট সৃষ্টি করে সেই সঙ্কট থেকেই কতৃকের অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। কতৃক বিভাজনের সময়ের সমাধান হতে পারে (এক) ভারত যে নীতি অনুসরণ করে অর্থাৎ সমদূরত্বের নীতিতে। পরিণতিগতভাবে এই নীতি সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষার নীতি ছাড়াও এটি হলো সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিচ্ছিন্ন কতৃক ও নেতৃত্বের মধ্যকার অন্তর্বিরোধের সমতাবিধানেরও নীতি। ভারতে এইজন্যই দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় দালাল প্রতিভুরা কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট এমন কি কমিউনিস্ট পার্টিও গড়ে তুলতে সক্ষম। বিড়লাজীও প্রয়োজনে ‘নকশালপন্থী’ হতে সক্ষম। (দুই) সমস্যার সমাধান হতে পারে পাকিস্তান যে-নীতি অনুসরণ করে অর্থাৎ সম-নৈকটের নীতিতে। পরিণতি-গতভাবে এই নীতি সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষার নীতি হলেও এটি হলো কতৃকের টবার্থে বিচ্ছিন্ন কতৃক ও নেতৃত্বের মধ্যকার বিরোধ বিকাশের নীতি। অংশতঃ এই নীতি স্বাধীন এবং সেইজন্যই এই নীতি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কিছুটা ঘর্ষে লিপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান সিনাটোর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভিয়েতনাম যুদ্ধে সাম্রাজ্য সরকারকে বিন্দুমাত্র সাহায্য পাঠায় নি।

৪ মর্জিবর নেতৃত্ব

মর্জিবর নেতৃত্বকে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বলা হয়। মর্জিবর নেতৃত্বকে যদি শুধু আঞ্চলিক অর্থেও বাঙালী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বলা হয় তবে এই নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদ থেকে অনেক দূরে। যুগের বিচারে আজকের অসার জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বেরও অনেক পেছনে।

জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের লক্ষ্য-ণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বহিরাগত শোষণকারীর শাসন শোষণের স্থিতিশীলতা ধ্বংস করা। আমরা এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংসবাদের ব্যাখ্যায় দেখিয়েছি যে, এটি একটি অন্য- (শেষাংশ অন্তিম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

গণমাধ্যম

৪ চাঁদার হার ৫

বার্ষিক পনেরো টাকা

বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা

ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাফাঁট ও চিঠিপত্র শাসিতঃ

ঠিকানা :

৬১, ব্রট জেন. কল-৬৫

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম ও বামপন্থীরা

পূর্ব বাংলার সংগ্রাম প্রসঙ্গে গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত বালিগঞ্জের জনৈক কমরেডের সমালোচনা ও প্রশ্নসমূহের জবাব দিতে গিয়ে আমি উক্ত প্রশ্ন-কর্তাকে অনুরোধ করবো কোন রচনা বা বক্তব্য সম্পর্কে সমালোচনা মন্তব্য বা প্রশ্ন করার পূর্বে ঐ রচনা বা বক্তব্যের সম্পূর্ণটুকু গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে তার মূল বক্তব্য সাম্যিক ভাবে উপলব্ধি করেই সে সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করুন এবং সে সম্বন্ধে যথাযথ প্রশ্ন তুলে ধরুন। আমার অসম্পূর্ণ বক্তব্য পড়েই আপনি যে সব প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর উক্ত রচনার শেষাংশেই দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি দর্পণে প্রকাশিত আমার অন্যান্য রচনা-গুলিতে অবশ্যই আপনার সকল প্রশ্নের জবাব আপনি পাবেন। তবুও আপনার কয়েকটি বক্তব্য নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই।

আপনি লিখেছেন, “সত্যিকারে ফিউডাল বলতে যা বোঝায় (য়ুরোপ বা চীনে) দু’ বাংলাতেই তা

নেই”। জানতে চেয়েছেন আমরা চারদিকের ব্যক্তি হত্যা রাজনীতি করছি কি না এবং গ্রামে গ্রামে গেরিলা ট্রেনিং-এর ঘাঁটি নির্মাণ করছি কি না। এ প্রসঙ্গে আমরা বলবো, যুরোপ বা চীনে যে ধরনের সামন্ত প্রভুরা ছিল দু’ বাংলায় সে ধরনের সামন্ত প্রভুরা নেই সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক সমা-

কৃষক সমাজকে ক্রমাগত শোষণ করে যাচ্ছে—এক কথায় এরা সামন্তিত ও যুক্ত প্রচেষ্টার মর্মস্বর্দ সামন্তবাদী শোষণকে বাঁচিয়ে রেখেছে। জনগণের উপর, শতধা বিভক্ত এ সামন্তশ্রেণীর শোষণ এবং দালাল ধনিক শ্রেণীর সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির কার-

মতামত

জের উপর (যারা জনগণের পঁচাত্তর ভাগ) বর্তমানে যে শোষণ চলে আসছে তা কি ঐ - সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে না? জোতদার, মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার মজতদার ঠিকাদার ও তাদের দালালশ্রেণী রূপে ক্ষয়িক্ষয় সামন্তশ্রেণী আজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সামন্তবাদের এ অপপ্রশংস শ্রেণীই রাষ্ট্রীয় সহায়তায় (পুলিশ-মিলিটারী আইন, আদালত) সামন্তবাদী কার্যদায় মেহনতী

শেই এ দেশ নিঃসন্দেহে একটি “আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ”।

এই আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক দেশের গ্রাম-গুলিতে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে মার্কস-লেনিন ও মাও চিন্তাধারা প্রচার করে জনগণকে সশস্ত্র করে গেরিলা ট্রেনিং-এর যে কোন প্রচেষ্টা এ সকল স্থানীয় শোষণ শ্রেণীর মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না? তারা কি জনগণের এ সশস্ত্র অভ্যু-

থানে ভীত হয়ে তাদের রাষ্ট্র-বাহিনী পুলিশ-মিলিটারী আইন ও আদালতের সাহায্য চাইবে না? পুলিশ মিলিটারী তথা বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তি কি জনগণের এ বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদী প্রচেষ্টা চালাবে না? এ সশস্ত্র হানাদার পুলিশ ও মিলিটারীর গদগদ তথা মিত্র হিসাবে যারা কাজ করবে তারা কি বিপ্লবী জনগণ ও বিপ্লবের শত্রু প্রতিবিপ্লবী শ্রেণী নয়? বিপ্লবী জনগণ ও বিপ্লবের স্বার্থে এসকল ঘৃণ্য প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী গণবিরোধী শ্রেণী শত্রুদের গেরিলা পদ্ধতিতে খতম করে গ্রামে গ্রামে মৃত্যু অঞ্জলি সৃষ্টি করার ও পরে গ্রাম থেকে শহরগুলোকে দখল করার এ মহান তত্ত্বকে আপনি কি ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি বা সন্ত্রাসবাদ বলে উড়িয়ে দিতে চান? শ্রেণী সংগ্রামের এ তত্ত্বানুসারে শোষণ শ্রেণীর বর্তমান শ্বেত সন্ত্রাসের বদলে মেহনতী জনতার বিপ্লবী লাল সন্ত্রাস অবশ্যই সৃষ্টি হবে—শুদ্ধমাত্র জনগণের শ্রেণীশত্রু এ সকল স্থানীয় শোষণদেরই ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলবে, জনগণকে নয়। বরং তাদের শত্রুদের নির্মূল হতে দেখে তারা উল্লাসিত হবেন এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই বিপ্লবী সংগ্রামে এগিয়ে যাবেন। তাছাড়া যে সকল গেরিলা ইউনিট এ সব শ্রেণী সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করবেন ভবিষ্যতে তাঁরাই আরো সূক্ষ্মতর হয়ে উন্নততর ট্রেনিং-এর মাধ্যমে গড়ে তুলবেন জনগণের গণফৌজ—যে গণফৌজ ব্যতীত কোনক্রমেই সশস্ত্র প্রতিক্রিয়াকে প্রতিরোধ করা এবং শহর বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়। আশা করি কমরেড চারু মজুমদারের শ্রেণী সংগ্রামের এ মহান তত্ত্বের ব্যাপক তাৎপর্য ও বিশালতা সবমুখে বালিগঞ্জের কমরেড অতঃপর একটি সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হবেন। অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদেরই শ্রেণীস্বার্থে বিপ্লবকে প্রতিহত করতে, বিপ্লবী নেতৃত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করতে এ মহান তত্ত্বকে বিকৃত করে অপব্যবহারের মাধ্যমে

জনগণকে বিভ্রান্ত করার নিত্য-নতুন অপকৌশলে সামগ্রিক পরি-স্থিতিকে ঘোলাটে করে তুলবে (যেমন করেছে কলকাতায়); কিন্তু তার জন্য নিশ্চয়ই বিপ্লবী নেতৃত্ব বা ঐ মহান তত্ত্ব দারী নয়, বরং এরূপ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে প্রতিটি বিপ্লবী কমরেডের দৃঢ় ভাবে মোকাবেলা করা উচিত।

আর এক স্থানে আপনি লিখেছেন, “তোহার সঙ্গে যত মত-বিরোধই থাক, সংযুক্ত মোর্চা গড়ে তুলুন”। দেখুন কমরেড, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় জাতীয় মুক্তি ও জনগণতন্ত্রের যে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ চলছে তা নিঃসন্দেহে একটি বিপ্লবী যুদ্ধ। বিপ্লবী যুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন বিবেকের স্থান নেই। সকল বিপ্লবী জনগণই এ বিপ্লবী গণযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা। জনগণের এ গণযুদ্ধে সকল জনগণকেই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। বিপ্লবী স্ফার রুদ্ধ করার মত ক্ষমতা (বিশেষতঃ বিপ্লবীদের জন্য) কারো নেই। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নিয়মানু-যায়ী পূর্ব বাংলার জনগণের রাজ-নৈতিক পার্টি মার্কসবাদী-লেনিন-বাদী পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র জনগণের জন্যই বিপ্লবী স্ফার উন্মুক্ত রেখেছেন। জনগণ বলতে পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক শ্রেণীকে তাঁরা বুঝিয়েছেন এবং এ জনগণের শত্রু হিসাবে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী-সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ত-বাদী, পুঁজিবাদী ও ফ্যাসিবাদী শ্রেণী এবং তাদের তাবোদার দালাল বাহিনীকে চিহ্নিত করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনগণ তাদের এ শত্রুদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং সে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এক-মাত্র সংগ্রামের মাধ্যমে (ইউনিট গু-দ্রাগল)। ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমেই তাঁরা গড়ে তুলবেন স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা।

শফিকুল হাসান

চীন-বিরোধী বিযোদনার

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

তম এবং বিরাট প্রশ্ন। জাতীয়তা-বাদী নেতৃত্ব শত্রু বুর্জোয়া পরি-চালিত নেতৃত্বই নয়, এই নেতৃত্বও জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রশ্নে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন সংগঠিত করে এবং শোষণ শ্রেণীর শোষণের উৎস, পন্থা ও উপায়গুলির ওপর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে কখনো গুপ্ত, কখনো বা প্রকাশ্য আঘাত করে। আন্দোলন বা বিপ্লবী প্রস্তুতিকে রক্ষা করার জন্য, এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য হামলাকারী শক্তির সঙ্গে নেতৃত্ব কখনো কখনো মিনি-মাম আপোষে আসতে পারে বটে, কিন্তু কখনই শত্রুর টোপ গিলে ফেলে না বা সাময়িক আপোষ পন্থার ওপর আন্দোলন বা বিপ্লবী প্রস্তুতিকে নির্ভরশীল করে তোলে না। জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাও এ-সুদূরে একটি লক্ষ্য-ণীয় দিক। মুজিবর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের করুণাভিক্ষা আছে বটে, কিন্তু বিরোধিতার কণামাত্রও নেই।

পাকিস্তানের ষ্টেরডান্ট শাস-কেরা একটি নির্বাচনের অনুষ্ঠান করেছিলেন, এই নির্বাচনী আপোষে মুজিবর নেতৃত্ব নিজের-জনিপ্রিয়-তাকে দান দিয়েছিল এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের মুক্তিকে ঐ সাম-য়িক আপোষের অধীনস্থ করে ফেলেছিল। মুজিবর নেতৃত্বের একমাত্র উৎকেন্দ্রিক শ্রমিক-কৃষক সমর্থন ছাড়া কখনো কোনো শ্রমিক কৃষক সংগঠন শক্তির ভরসা ছিল না।

তাহলে মুজিবর নেতৃত্ব কী? মুজিবর নেতৃত্ব হলো সেই সাম্রাজ্য-বাদী দালাল প্রতিভা নেতৃত্বেরই এক অংশ, পাকিস্তানের সমনৈকটোর নীতির ফলে যার বিকাশ হয়েছে, যা পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী দালাল প্রতিভা নেতৃত্বের অন্ত-বিরোধের সঙ্গে সঙ্গতকারণেই সমতাবিধান করতে পারে নি এবং প্রতিভা নেতৃত্বের শক্তিশালী অংশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।

১। উপমহাদেশের মুক্তির প্রশ্ন ১।

এই উপমহাদেশের জনগণের জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন অচ্ছেদ্য। সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় দালাল-দের সহযোগিতায় এই উপমহা-দেশের জনগণকে ভাগাভাগি করা হয়েছে এবং জনগণের শত্রুরা নেতৃত্বের বিভিন্ন ছদ্মবেশে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে জনগণকে প্রতা-রিত করে আসছে। পাকিস্তানের শাসকবর্গই তার আভ্যন্তরীণ সংকট ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে-ছেন। সংগ্রামরত জনগণকে এই উপমহাদেশের অখণ্ড অচ্ছেদ্য মুক্তির প্রশ্নে সামিল করা, সঠিক রাজনীতি ও নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিপ্লবী জনগণের দুর্গ হিসাবে চীনের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের করুণা নির্ভর মুজিবর নেতৃত্বকে সরাসরি সাম্রা-জ্যবাদী সহযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে, নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জগতে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে বিপ্লব করে তুলেছিল, আরব জগতে তৈল হাঙ্গারদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল এবং মিশরে সামা-

জিক সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত রাশিয়ার মসনদ কাঁপিয়ে তুলে-ছিল। চীনের উদ্দেশ্য শতকরা একশ ভাগ সফল হয়েছে। পূর্ব-বাংলার অভ্যুত্থান নিয়ে সোভিয়েট পার্শ্বচারি অঙ্গ, মার্কিন ঋষুদের ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে গেল। প্রকাশ্যে সোভিয়েট আমেরিকা পূর্ব বাংলা থেকে হাত - গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলো। সাম্রাজ্যবাদের তরফে অতঃপর মুজিবর দালাল প্রতিভা নেতৃত্বকে মদত দেবার জন্য ভার-তের দালাল প্রতিভা নেতৃত্বকে নিষেধ করা ছাড়া গতান্বর্ত রইল না।

চীনের এই সুস্পষ্ট ভূমিকা যারা খোলা চোখে দেখতে চান না এই উপমহাদেশের মুক্তির প্রশ্নে হাজারটা মুজিবর ড্যান্স দিলেও তারা পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধ শত্রু করতে পারবেন না, জয়লাভ তো দূরে থাকি।

হ্যাঁ, এই উপমহাদেশের জন-গণের মুক্তির অচ্ছেদ্য প্রশ্ন থেকে মুজিবর নেতৃত্ব যাদের কাছে বড় তাদের আমরা জানি এবং চিনি। তারা অনেক স্বয়ম্ভু সামরিক তত্ত্ব কথা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধের এমনকি জনযুদ্ধেরও বাস্তবতা মারেন। ঐ সব ভাড়াটে গদ্য লিখিয়েদের জিহ্বাসা করি স্ট্রাটোজিক হিষ্টারল্যাণ্ড ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ গেরিলা যুদ্ধ জনযুদ্ধ হয় কী করে হে মুখের দল? তোমরা কি তোমাদের হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে প্রাক্তন জেনারেল চৌধুরীর প্রবন্ধটাও পড়ে কিছ-শেখো নি? শেখবার এই অনিচ্ছা থেকেই তো বেশ বোঝা যায় তোমরা নিছক পায়রা নও, যুদ্ধ।

খতম অভিযানের বিরুদ্ধে

পিনাকী চক্রবর্তী নামধের জনৈক আত্মপ্রাক্ত বিপ্লবীর এম এল দলের রাজনীতির ব্যাখ্যান পড়ে কয়েকটা কথা মনে এল।

মূল সমস্যাটা হচ্ছে ব্যক্তিগত খুনের রাজনীতি। শ্রেণীসংঘর্ষ এবং ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ—এ দুয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই—দুটোর চারিদিকই আলাদা। শ্রেণীশত্রু বলে যে কাউকে চিহ্নিত করতে অসুবিধে নেই। আমি, ধরুন, চারু মজুমদারকে মহামানব বলে মনে করি না; তাহলেই আমি শ্রেণীশত্রু বলে পরিগণিত হতে পারি। পিনাকী-বাবুর ব্যাখ্যান অনুসারে শিক্ষক কেরানী, স্টেট ট্রান্সপোর্টের কর্ম-চারী, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা—

এরা সকলেই নাকি শ্রেণীশত্রুর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু ব্যক্তিগত খতম অভিযানের ওকালতী কোথাও কোন কমিউনিস্ট তর্কবিদ করেছেন বলে শুনছি নি। লেনিনের সেই বিখ্যাত বইতে (শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা) সবিস্তারে তিনি এই ধরনের চিন্তার বিপ্লববিরোধী ভূমিকা আলোচনা করেছেন। শ্রেণী সংগ্রাম কেবলমাত্র একটা কথার কথা নয়। শ্রেণীশত্রুও কেবলমাত্র একটা লেবেলের ব্যাপার নয়। ইতি-হাসের, উৎপাদন পদ্ধতির, মধ্য-কার অবস্থান কোন স্তরে তা দিয়েই মূলতঃ নির্ধারিত হয় কে শ্রেণীশত্রু আর কে শ্রেণীমিত্র।

(শেখাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

দর্পণে সপ্তাহ

শ্রীমন্ত

কথায় বলে, “নেই কাজ তো খে ভাজ”। আর আজকের রাজনীতি বলে, “নেই তাল তো হর-তাল”। এবং রোগটা সংক্রামক। একদিন দুর্বল, বিরোধী হাতে যেটা ছিল অস্ত্র, আজ সেই হর-তালই আবার ক্ষমতাসীনেরও হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হোক বিরোধী অথবা সরকারী, কোনো রাজনীতিই আর “তাল” খুঁজে পাচ্ছে না। গোটা দেশই দেউলে হলে রাজনীতির এমনি বেতালো দুরবস্থাই দেখা দেয়। পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে পূর্বাপর রাজনৈতিক অবস্থা বিপর্যয় মিলিয়ে নিন, আমার হক-কথা প্রমাণিত হবে।

গত পশ্চিমে জন “হরতাল” রাজনীতির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দিলেন গদীনসীন নব কংগ্রেসী যুব কংগ্রেস। ক্ষমা করবেন, আমার মনে হয়েছে, ঐ দিনেই কংগ্রেসের ডিসগ্রেস পূর্ণ হল বোল কলার। অবশ্য আমার তাত্ত্বিক বঙ্গজ সহযোগীরা হয়ত বলবেন : বাজে বকবেন না মশায়, ঐ একটি মোক্ষম-হরতালের অন্যতম ফলশ্রুতিতে কি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেন্দ্রের করতলগত হয় নি? সিদ্ধার্থশঙ্কর কি ব-কলমে কেন্দ্র প্রেরিত মুখ্যমন্ত্রীই স্থলাভিষিক্ত হলেন না? কেন্দ্র এতাবৎ কাল প্রাইজ পোশ্টে শৃঙ্খলিত একজন আমলারাজ রাজ্যপাল পাঠিয়ে দিতেন এবার অন্যার্থে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও প্রেরণ করছেন না কি? শৃঙ্খলিত মুখ্যমন্ত্রীই বা কেন, বলতে গেলে, সিদ্ধার্থশঙ্কর রাজ্যপালকেও টেকা দিতে অস্বস্তি রাষ্ট্রপতির শাসনকালে। পশ্চিমে জন্মের হরতাল সৈদিক থেকে কি বৈশ্ববিক নয়? প্রিয়রঞ্জন দাস-মন্সী এন্ড কোম্পানী যে বাহাতর ঘন্টার আলটিমেটাম অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, বিজয় মন্টিসভাসহ অজয় মুখার্জীর পতনের মূলে কি তারও একটা প্রচণ্ড ধাক্কা জুড়সইভাবে লাগেনি?

দেখুন, তর্ক করা আপনাদের জন্মগত স্বভাব। তর্ক ছাড়া আমরা, কেরাণী বাঙালীরা, বাঁচতে পারি না। তর্কের দ্বারা অরাজনৈতিক আক্ষালনকেও রাজনৈতিক মর্বাদা দেওয়া যায়। প্রিয়দা আপনাদের প্রিয় আপনজন, আপনারা তো ক্রেডিটের ঝোল প্রিয়দার কোলে টানবেনই। কিন্তু সাধু সাবধান, এই ফাঁকে কোয়ালিশনের সমর্থক দলগুলি পাপ মুখ ধরে ফেলবে। আর প্রিয়দার ক্ষেত্রে উল্টো ফলই হবে। দেশের লোক “উল্টো বুদ্ধিমান রাম” বনে যাবেন। প্রিয়দার প্রতি প্রীতি-প্রাচুর্যে সেই প্রিয়রঞ্জন ক্ষতি করাই হবে। কেননা অন্যান্য কারণসহ বস্তুতই

যদি প্রিয়দা আহত হরতালের সামান্য প্রভাবেও সিদ্ধার্থের ক্ষমতা (প্রিয়দা যেন তেমন ইঞ্জিতই করতে চেয়েছেন) পতন ঘটে থাকে তবে বাংলা দেশের স্বায়ত্ত শাসন লাভ ও অপদার্থ মন্টিসভার পতনের দাবীকে সামনে রেখে পশ্চিম বাঙলার মানুষ ব্যাপারটা খুব ভালো চোখে দেখবেন কী? পশ্চিম বঙ্গ ভোট দিয়ে একটা রাজ্য মন্টিসভা গড়ার অনুকূলেই রায় দিয়েছিল, কেন্দ্রের হাতে রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি তুলে দিতে চায় নি। কিন্তু মন্টিসভা দখল করে তারই পতনের গলিপথে রাজ্যস্তরে কেন্দ্রীয় নাসিকার কয়েমী অন্তঃপ্রবেশ জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণদস্ত করল। এমতাবস্থায় মন্টিসভা পতনের জন্য প্রকাশ্যে প্রিয়দার কোনো ক্রেডিট দাবি না করাই নিরাপদ। গণতন্ত্র বজায় থাকলে প্রিয়দাকে আবার ইলেকশনে দাঁড়াতে হবে। ইলেকশনে দাঁড়ালে আবার বাঙালী যুবকদের বোঝাতে হবে যে, কোনো কেন্দ্রীয় স্বার্থে নয় স্বেচ্ছা বঙ্গীয় যুবজনের মুখ চেয়েই তিনি রাজনীতি করতে নেমেছেন। সে সময় পাছে কোনো দুর্মুখ আজকের কোনোও দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে তাঁর কুসন্মার্গী পথে কলঙ্কারোপ করেন, সেজন্যই বলাই, “প্রিয়”-হিতৈষীরা ভুলেও উচ্চারণ করবেন না যে, কেন্দ্রের হাতে রাজ্যের শাসন চলে যাওয়ার ব্যাপারে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের ব্যর্থতার সঙ্গে প্রিয়রঞ্জনও কিছু অবদান ছিল।

অবশ্য হরতাল তিনিই ডেকেছিলেন। হরতাল দুটি মুখ্য প্রশ্নকে সামনে ধরেছিল। এক, খুনোখুনি বন্ধে মন্টিসভা অলস; দুই মন্টিসভার পদত্যাগ চাই বাহাঙা ঘন্টার মধ্যে। অর্থাৎ আপাত দুই হলো, আসলে একটিই দাবি, অপদার্থ মন্টিসভার পতন চাই! না, একথা স্মরণে রাখলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রিয়দার পজিশন বাড়লেও, বাঙলার তাঁর দ্রুতবানের চাকা পানচার হওয়ারই সম্ভাবনা।

আমি অবশ্য এইসব অবদান-ফবদানে অবিশ্বাসী। এক নম্বর কারণ ভারতের রাজনীতি আজ এমন একটি স্তরে, যেখানে কারও ব্যক্তিগত অবদানের কোনো স্কেপই নেই। না, ইন্দিরাজীরও নেই। ইন্দিরাজী একটা সুযোগের সম্ভাবহার করেছেন মাত্র। সবকটা ডাক সাইটে তথাকথিত নেতার ইমেজ যৎকালে মলিন হয়ে পড়েছে, ইন্দিরা গান্ধী সেই সুবর্ণ সুযোগে ভ্যাকুয়াম ভরেছেন বা শূন্যস্থান পূর্ণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। স্বতীয়ত, মৌলিক

বিবর্তনের অনুকূলে রাজনৈতিক আবহাওয়ার গতি ফেরাতে সক্ষম এমন নেতৃত্বের অত্যাশ্রয় না ঘটলে রাজনৈতিক অবদানের প্রশ্নই ওঠে না। তৃতীয়ত কোনোও কাকতালীয় ঘটনাকে অবদান বলার খুঁটতা আমার নেই।

প্রিয়দার আলটিমেটাম ও বিজয় মন্টিসভাকে ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অজয় মুখার্জীর তৃতীয় দফা পতন সম্পূর্ণ কাকতালীয় ঘটনা। কিম্বা মন্টিসভার পতন অনিবার্য জেনেই প্রিয়দার দাবি একটা ওপর চালাকি? আসলে ব্যাপারটা হল মন্টিসভার প্রাণবন্ত প্রধানমন্ত্রীর অস্তিত্বের দিন কয়েক বেশি শ্বাস টেনেছিল মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরাজীর সরেজমিন সন্দর্শনের আগেই মন্টিসভা “ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি” বলে চাঁৎকার সুরু করে দিয়েছে। ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে, হাঁফ আর টানতে পারছে না। সামনে বাজেটের ব্যাকুল আহ্বান সঙ্কেত বিজয় সিংহের সিংহ নিনাদ সম্ভবত হল; তবে, সে কি শৃঙ্খলিত হরতালে?

হরতাল আজ তৈরি যখন তখন যে কোনো গ্রুপ লীডারই ডেকে দেন। সরকার তড়িৎঘড়ি যানবাহন অফিস কাছারী, ইন্সকুল কলেজ, পরীক্ষাদি বন্ধের ব্যবস্থা পাকা করে সেই হরতালকে হাকিমার অধীক সাকসেসফুল করে তোলেন। হরতালের বাজার দর, রাজনৈতিক এফেক্ট, আজ তাই “নীল” বললেই

মতামত

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলার আমরা যে শ্রেণীকে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত বলে থাকি তারা সংজ্ঞানুসারে কিন্তু প্রলেতারিয়েতের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত ভাবে তারা কেউ কমিউনিজমের বিরোধিতা ইতিহাসের এক যুগে করলেও— কারণ তাদের ভাববাদিতা এবং বর্তমান সমাজে তাদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার কিছু কিছু অবকাশ অবশিষ্ট আছে বলেই— তাদের বিরুদ্ধে লাল সন্ধ্যা সৃষ্টির কোন অজুহাত থাকতে পারে না। ওটা লাল সন্ধ্যা নয়, ওটাকে সাদা কথায় বলে গুন্ডাবাজী। গুন্ডা-বাজীকে কোন ক্ষেত্রেই শ্রেণীসংগ্রাম বলে চালানোর চেষ্টা নিরর্থক। শ্রেণীসংগ্রামের মূল বিষয়টিই তখন বানচাল হয়ে পড়ার সম্ভব সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই ধরনের ব্যক্তিগত সন্ধ্যাবাদ ও যাকে তাকে হত্যা করা কাপুরুষের মত কেবলমাত্র নৈরাজ্যবাদীদের কম্পনীয় হতে পারে। এতে ইতিহাসের অগ্রাভিধান ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয়। যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক দূত সঙ্কল্প নিয়ে একজোট হয়ে শোষণ এবং শ্রেণীশাসনের অত্যাচারের মোকাবিলা করতে অনুপ্রাণিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেখানে নেমে এসেছে এক গভীর হতবুদ্ধিকর কিংকর্তব্যবিমূঢ় সন্ধ্যা। প্রকাশ্য দিবালোকে পাঁচ জন গুন্ডা একজন লোককে পিটিয়ে মারছে—

চলে। আসলে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা স্তম্ভ করা হরতালের উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই নেই, সুতরাং তো আবার স্তম্ভ হয় কেমন করে? তাই অস্বাভাবিক জীবন বণ্ণভূমিতে হরতালের কোনো বিশেষ ভূমিকাও নেই। প্রিয়দার হরতালও এই রকম ইন-এফেকটিভ হরেক হরতালেরই অন্যতম। অতএব লজিক্যাল কনক্লুশন হল, হরতালের দ্বারা সাধারণত যা হয়, সেই সাধারণের হয়রানি ছাড়া পশ্চিমে জন্ম ও স্বতীয় কোনো এফেক্ট সৃষ্টি করতে পারেনি। এবং পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসন আমন্ত্রণ করে আনার জন্য প্রিয়দারও কোনো দায় দায়িত্ব নেই। (সর্ব-রক্ষে!)

“হরতাল” দুর্বলের হাতিয়ার। হরতাল আজ আর কোনো সরকারের সঙ্গে মোকাবিলায় দঃসাহসী মহাপ্র নয় (এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই স্মর্তব্য)। কারণ সরকার নিজেই নড়বড়ে এবং দুর্বল। হরতাল রোখার কোনো ক্ষমতা সরকারের নেই। হরতালের হয়রানী মূলতঃ সাধারণের ওপরেই নেমে আসে, এই অভিজ্ঞতার পর, হরতাল প্রতি-রোধের জন্য প্রভাবশালী মহল থেকে সরকারের ওপর কোনো চাপও নেই। হরতাল যেন রুট মেজরিটি ধন্য পার্লামেন্টে কতিপয় বিরোধী সদস্য আনাত সর-

কারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের মতই ফালতু একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নিয়মতান্ত্রিক লড়াইয়ের পন্থা। তবে ফাঁকিবাজ রাজনীতি হরতালের আলোকেই এখনও চমক লাগতে চায়।

এই একেজো হরতালের দেউলিয়া মরচে-পড়া হাতিয়ার তুলে নিয়ে যুব কংগ্রেসী নেতার পরাক্রান্ত আক্ষালন তাই বিরোধী রাজনীতির অবলম্বনে দুর্বল নিয়মতান্ত্রিক নিষ্পত্তি হরতালীয় গৌলি মতোই “নেই কাজ তো খে ভাজ” কম্ম।

হরতাল শৃঙ্খলিত আহ্বানকারী অস্তিত্ব জাহির করে, নিখরচার পাবলিসিটি দেয়। অস্বাভাবিক অবস্থায় হররোজ হরতালের এর বেশি অন্যতর অপকর্ম করার যোগ্যতাই নেই।

এতোদিন ধারণা ছিল, যৌবন যে শিবিরেই থাক, যৌবনের চিন্তা সর্বদাই কতকাংশে বিপ্লবী হতে বাধ্য। কিন্তু প্রিয়দার “হরতাল” সেই ক্ষীণ আশাদীপেও বড় করে একটা ফু দিয়েছে।

তবুও নিরাশ হইনা। নিভু নিভু দীপও কাঁপতে কাঁপতে জ্বলে ওঠে। বাঙলার যৌবন আজ নিভন্ত-প্রায়। জাতীয় জীবন দেউলিয়া। তাই বলে কি নতুন করে দেউটি জ্বালাতে নবযৌবনের উদয়-উল্ভব আর হবেই না?

সবাই যার যার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচবার ভালে আছে। প্রতিরোধ নেই, এমন কি প্রতিবাদের কণ্ঠও জ্বরে শব্দিকরে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। আর এই মণ্ডকায় একদিকে শাসক-কুল সি আর পি পুলিশ দিয়ে সাধারণ মানুষকে যথেষ্ট পেটোচ্ছে,

অন্যদিকে গুন্ডারা, বদমাসেরা যা খুশী তাই লুটের কারবার চালাচ্ছে। এই ত্রু বাস্তব পরিস্থিতি। ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনারা বড় বিপজ্জনক রাস্তা বাতলে দিয়েছেন সত্যিকার শ্রেণীশত্রুদের।

দেবদাস মন্ডল

সমাজের দর্পণ

(৩ম পৃষ্ঠার পর)

কার নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টায় আছে।

পান্সাবাবুর মতে “ভারত পাকিস্তানের চেয়ে দ্রুত বেশী প্রগতিবাদী” এবং সেই কারণে চীনের চোখে বড় শত্রু। মানে সোজা কথায় চীন প্রগতির পশ্চিমপন্থী-মার্কসীয় দর্শন বদহজমের ফলে কী অবস্থা দাঁড়ায় এই লেখার ফলে পান্সাবাবু তার চরম উদাহরণ হয়ে দাঁড়ালেন। শৃঙ্খলিত যে তিনি ইন্দিরা সমর্থক তাই নন মনে হয় মাসানী-বাজপেয়ীর সঙ্গেও তাঁর রাজনৈতিক মতামতের ব্যবধান ক্রমাৎ কমে আসছে। তাঁর মতে চীন এশিয়ায় ভারতকেই তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। কোথায় সমাজতান্ত্রিক চীন আর কোথায় একচেটিয়া পুঁজিপতি, জোতদার মহাজনের প্রতিনিধি ভারত সরকার, বিদেশী সাহায্য ছাড়া যে পদক্ষেপ করতে পারে না।

পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে কোথায় তা প্রথমে করবে তাও শ্রীদাশগুপ্তর অজানা নয়।

তাঁর মতে ত্রিপুত্র হবে প্রথম লক্ষ্য। আর এই ত্রিপুত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়েই তিনি একটু গোলামাল করে ফেলেছেন। তিনি প্রায় স্বীকার করে ফেলেছেন যে ত্রিপুত্র থেকে, অর্থাৎ ভারতের ভিতর থেকে, মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আক্রমণ চালাচ্ছে। এখন তাঁর লেখার এই অংশটিকে যদি পাক সরকার তার “আভ্যন্তরীণ” ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করে তখন তিনি কী করবেন? জাতীয়তাবাদের উৎসাহের আতিশয্যে তিনি যে পাকিস্তানের প্রচার দপ্তরকেই সাহায্য করে বসলেন এটা কী পান্সাবাবু বঝতে পারছেন? আনন্দবাজার পত্রিকাও কী সেই সম্পর্কে সচেতন? অবশ্য বৃহৎ দৈনিকগুলি যে ভাবে দিনের পর দিন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধার রণকৌশল সম্পর্কে লিখে গেছেন যাতে পরোক্ষ ভাবে পাক সেনাবাহিনীকেই সাহায্য করা হয়েছে, তাতে এদের সচেতনতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ জাগে।

ভিন্নবর্ণের বাংলাদেশ সিনেমা

শ্রীসামাজিক

ইউরোপীয় সংমিলিত বন্দ-সংগীতের গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ সিমফনি অর্কেস্ট্রা। বাংলা একতান শব্দের দ্বারা এর প্রকৃতি এবং স্বরূপ বর্ণিত হয় না। অর্কেস্ট্রা তো নয়ই, এমন কি যে কোন কনচাটো, কুইনটেট, কোর্সেট্ট, ডুয়েট পর্বন্ত একতান বাজান না—বিভিন্ন বন্দ যুগপৎ বিভিন্ন তান এবং গত বাজান। এই পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন সুরের সমন্বয়েই হার্মনির সৃষ্টি—একতানে নয়। ইউরোপীয় অর্কেস্ট্রা এবং সিমফনির রস গ্রহণ করতে হলে এই মোক্ষা কথাটা মনে রাখতে হবে। এবং এই মূল কথাটা মনে রাখলেই আমাদের সংগীতে ইউরোপের মত অর্কেস্ট্রা রচনা এবং পরিচালনা কেন সম্ভব হয়নি তার ব্যক্তিসংগত হেতু বোঝা এবং বোঝান সহজ হবে।

রবিশঙ্করের “নির্বাকের স্বপ্ন-ভঙ্গ” ভি বালসারার “দেবতার গ্রাস” এবং ভিন্নবর্ণের তদবধি রচিত ও পরিচালিত একতানিক বন্দবাদের আলোচনা উপলক্ষে মধ্য যুগীয় ইউরোপের পোলি-ফোনিক সংগীত থেকে আধুনিক কোরাল সংগীত এবং অর্কেস্ট্রার উদ্ভব ও বিকাশ বিস্তারিত ভাবে কয়েক কিস্তিতে আলোচনা করে-ছিলাম (দর্পণ, নবেম্বর ১৯৬৪)।

ভারতীয় সংগীতে অর্কেস্ট্রার অনুভবের হেতু সংক্ষেপে (এক) অর্কেস্ট্রার টেম্পার্ড ডায়ালটোনিক

স্কেলের স্বরাস্তকের প্রতিটি সমা-নার্থে বিভক্ত; কিন্তু ভারতীয় স্কেল একেক রাগে একেক রকম যেমন কাফি এবং দরবারী কানাড়া, ভৈরব এবং ভৈরবী, দেশী টোড়ি এবং মিঞা কী টোড়ি। (দুই) স্বরাস্তর সমান না হলে কড় রচনা বা বিবিধ ধরনের (key) বন্দ এক-সঙ্গে ব্যবহার করা যায় না। তা যদি না যায় তাহলে, যে-জনসমূহের কলকণ্ঠের উচ্ছ্বাস সিমফনি অর্কে-স্ট্রায় আভাসিত করার চেষ্টা করা হয় তা ব্যর্থ হয়ে যায়। পুরুষদের মোটা (ব্যাস), মাঝারি (ক্যারিটোন) ও সরু (টেনর) আওয়াজ অনুসারে অর্কেস্ট্রার বন্দ সাজান থাকে; তার পরে আছে মেয়েদের মোটা (অল্টো), মাঝারি (কন্ট্রাঅল্টো) ও সরু (সোপ্রানো) আওয়াজ অনু-সারে যন্ত্রের ভাগ; তার পরে বালক কণ্ঠের অনুসারী বন্দ; তার সঙ্গে কোন কোন সিমফনিতে (যেমন ক্রিচাফেনের “নাইম্ব সিম-ফনি”) এই সমস্ত আওয়াজের কোরাস-গায়ক দল। ব্যাপারখানা বন্ধন একবার। সংখ্যায় আমাদের নগর কীর্তনের মত দেখালেও রচনা এবং পরিচালনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধারণ অর্কেস্ট্রার বন্দ-সংখ্যা এক কালে ছিল নব্বুই। অধুনাতন ফিলহার্মনিক অর্কে-স্ট্রার বন্দসংখ্যা শুধুমাত্র এক শ পাঁচ।

এতগুলি বন্দকে এক সুরে বেঁধে (ধরুন পিয়ানোর মাঝের সি)

সকলে মিলে লীলা-গোঁরীর গণ-বাজলে এত কাল ধরে এত বিচিত্র আওয়াজের, ধরনের এবং ঘনত্বের বন্দ উদ্ভাবনের প্রয়োজন হত না। উনিশ শতকের যে নাপোলিয়ন-নীয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সিম-ফনির বিকাশ তা নাটকীয় ভাবরসে সমৃদ্ধ। সেই জন্য একক গণ বা মেলডি সিমফনির উপজীব্য নয়। একটা বিশেষ স্কেল বা ঠাটের অন্তর্নিহিত স্বরসম্মতের সম্ভা-বনাকে উজাড় করে নেওয়াই সিম-ফনির উপজীব্য।

তালবাদ্য-কাছেরি?

শ্রীতিমিরবর্ণের সাম্প্রতিক রচনা “বাংলাদেশ” সিমফনি শুনলে এসেও আমাদের পূর্ব ধারণার পরিবর্তনের কারণ ঘটেনি। তার বন্দসংখ্যা পঞ্চাশ অতিক্রম করেনি—তার মধ্যে এমন দুই পরিবারের বন্দ ব্যবহৃত হয়েছে অর্কেস্ট্রার জন্মদাতারা যাদের সম্বন্ধে পরিহার করেছেন—টম্কার বন্দ বা স্ট্রাকিং ইন্সট্রুমেন্ট এবং তালবাদ্য যথা সেতার (পাঁচ), সরোদ (পাঁচ), তবলা, ঢোল, ঢোলক, ঢাক, ডমরু, দল্‌দল্‌ভি ইত্যাদি (প্রায় কুড়ি)। তার সঙ্গে ছিল জলতরঙ্গ, কাঠ-তরঙ্গ মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, করতাল, খমক, বাঁজ, কাসি ইত্যাদি। অর্থাৎ এমন সব বন্দ, ভারতীয় সংগীতে যাদের ভূমিকা ছন্দ রাখায় যেহেতু ভারতীয় সংগীত ছন্দ প্রধান নয়—সুর ও মীড় প্রধান। পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রা ছন্দ প্রধান বলে তাতে তালবাদের আধিপত্য নেই—সুর-যন্ত্রেই ছন্দ রাখা যায়, আলাদা তালবাদের প্রয়োজন হয় না।

ডবল ব্যাস, চেলো এবং বেহালা থাকা সত্ত্বেও বিবিধ আও-রাজের উড উইন্ড এবং ব্রাস ব্যাণ্ডের অভাবে যতটুকু আদিম কাউন্টার, গয়েস্ট এবং হার্মনি সংযোগের প্রয়াস হয়েছিল তাও সঠিক পথে পরিচালিত হয় নি। রচনার ক্ষেত্রে শ্রীতিমিরবর্ণ মূলত গত এবং স্লেইন সঙ্কের অনুসরণ করেছেন—ব্যবহৃত স্কেলগুলির কড় সম্ভাবনাকে উদ্ঘাটন না করে। তবে একথা স্বীকার্য যে, বেহা-লাকে নেতৃত্ব দিয়ে বাদন বিষয়ে অনেক বেশী গতি সঞ্চার করা হয়েছে। বেহালার সংখ্যা চোন্দর জায়গায় গ্রহণ করে তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই দলে ভাগ করে ব্যবহার করতে পারলে আরো ফল-প্রসূ হতে পারত। রাজনৈতিক কনসার্টের তুলনায় অনেক অগ্রসর হলেও আলোচ্য সিমফনি ভার-তীয় সংগীতের রাগ, তাল ও মেলডিঅবসেশন থেকে মুক্তি পায় নি। তালবাদকে এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, সিমফনির বদলে কারো কাছে এটা “তালবাদ্য-কাছেরি” মনে হলে দোষ দেওয়া যায় না। মনে হয় অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তিন দশক আগে যেখানে ছিল তার থেকে অগ্রসর হয়েছে সামান্য।

এ ছাড়া শ্রীতিমিরবর্ণের পরি-চালনায় তার দল সুরেশ সংগীত সংসদের উদ্যোগে গ্রহণ জন সম্মার কলাম্বিনের আরও চারটি রচনা পরিবেশন করেন—বন্দমাত্রম, আবাহন, মানভজন এবং বঙ্গ-জননী। গীতাংশে যারা কন্ঠ দান করেছেন তারা কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি। গানের সুরগুলিকেও অর্কেস্ট্রার বিষমরূপে

ব্যবহার করা হয়েছে পুরোপুরি এবং দল হিসাবে না—বাজিয়ে এক-সঙ্গে ইউনিমেন পদ্ধতিতে বাজা-নোর উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে—যা সিমফনি অর্কেস্ট্রার পরিপন্থী। তবে পরীক্ষা হিসাবে জিনিষটা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় এবং মোটামুটি জিনিসটা মন্দও হয়নি, যদিও একে “সিমফনি” বললে সত্যের অপলাপ হবে।

অভিনেতা সংঘ প্রযোজিত অক্ষয়ুগ

স্বপ্নাঙ্কশেখর ভাস্কর

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ দিন থেকে প্রভাসতীর্থ শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু পর্যন্ত মহাভারতের ঘটনা ভিত্তি করে রচিত ধর্মবীর ভারতীয় হিন্দী নাটক “অক্ষয়ুগ”। স্বাপরযুগ শেষ হয়ে কলির আরম্ভ তখন। সেই ক্রান্তিকালের যন্ত্রণা ক্রন্দ আর তামসিলপ্ত মানসিকতার দক্ষ প্রতি-রূপ এই নাটক আধুনিক চোখ দিয়ে অতীত বিশ্লেষণের এক উজ্জল সৃষ্টিশীল উদাহরণ।

নাটকের প্রথমার্শে বিজিত কোঁরব পক্ষের বিভিন্ন চরিত্রের আনাগোনা এবং তাদের অস্থিরতা, আক্ষেপ ও ক্ষোভের ঘাত-সংঘাতে বিচিত্র নাটকীয় উপাদানের সৃষ্টি। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র পুরুষকে কাতর অর্ধচৈতন্যবিশী, মহিষী গান্ধারী প্রতিশোধপূহায় আকুল, তাঁর বিদ্রূপের কণাঘাতে কৃষ্ণকে জর্জরিত করে অভিশাপ দেন তিনি। অশ্বথামা নিঃসঙ্গ বিদ্রোহী। সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সত্যকে চ্যালেঞ্জ করে একাকীত্বের যন্ত্রণায় বিম্ব হতে থাকে। সঞ্জয় এতদিন ছিল নিরপেক্ষ দর্শক। কিন্তু আজ বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়ার তার নৈর্ব্যক্তিক ইমারত চোঁচির হয়ে ভেঙে পড়ে। অন্ধকার যুগের পশ্চাৎপটে বিদ্রূপের অচঞ্চল বিশ্বাসও ক্রমশ মল্যাহীন হয়ে যায়।

নাটকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাণ্ডবপ্রাসাদে যুধিষ্ঠিরের চিন্তা-ক্লিষ্ট জনান্তিকে বিজয়ীপক্ষের মানসিকতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুদ্ধে জিতেও পাণ্ডবেরা আজ সুখী নয়, যুদ্ধশেষের ক্লান্তি আর বিনষ্টের বোঝা তাদের মাথার ওপর চেপে বসেছে। এই দুই অধ্যায়ের মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদের দুই প্রহরী নাটকে কোরাস-এর কাজ করে। শেষ দৃশ্যে সমস্ত আবেগ সংহত হয়ে আসে—অশ্বথামার বিকৃত আত্মনাদ যুগান্তের ওপার থেকে এসে আমাদের মনে আঘাত করে। নাটকের মধ্যে অনেক সম-য়েই বর্তমান যুগের চেহারা খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না।

এই নাটক নির্বাচন করে অভি-নেতৃসম্মত তাদের পূর্বতম প্রযোজনা-গুলির স্লাইদ অনেকাংশেই দূর করেছেন। বাজার চলতি “পুন-র্জন্ম” আর “তাইতো” ধরনের শ্বলতা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা

যে “অক্ষয়ুগ” প্রযোজনায় র্ত্তী হয়েছেন সেটা নিশ্চয়ই প্রশংসার ব্যাপার। কিন্তু পুরোনো অভ্যাসের দাসত্ব থেকে এখনও পুরো-পুরি মুক্ত হতে পারেননি তাঁরা। নবনাট্যের অন্যতম শরিক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনাও তাই দ্বিধাগ্রস্ত। স্টাইলাইজেশন এবং আতিশয্যবহুল অঙ্গভঙ্গী ও বিকৃত কণ্ঠবাদের মধ্যে কোন তফাৎ করতে পারেন নি অধিকাংশ অভিনেতৃবর্গ। আলোকসম্পাতের প্রয়োগে সম্ভা ভেল্কিবাজির প্রকোপ দৃষ্টিকটু। আবহসঙ্গী-তেও পরিমিত ও সংহতির অভাব লক্ষণীয়। সুগ্রথার নৈপথ্যভাষণ একঘেয়ে ও পারস্পর্যবিহীন। সবচাইতে হাস্যকর অবশ্য বংশী-ধারী বদন্ত কৃষ্ণমূর্তির কাট-আউট। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার বনমালীর মধ্যে যে যোজনপ্রমাণ পার্থক্য এই সহজ বোধ নাট্যপরিচালকের থাকা উচিত।

১৩ই জুলাই '৭১

লোকায়নের জন্মদিন

সবার শুভেচ্ছা কাঙ্ক্ষীয়

লোকায়ণ ● সভাপতি

১৪ই মহিম হালদার স্ট্রীট, কলি-২৬

আগামী প্রযোজনা ● অবন স্রণে

ছুত পঙ্কজ বাত্রা

কঃ রক ও সি পি আই

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

মৈত্রী স্থাপন—পুঞ্জিবাদ যে সমগ্র-যুগ ধরে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ অবস্থায় বিকশিত হচ্ছিল সুবিধা-বাদ সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। ঐ সময়ে প্রমিক-শ্রেণীর একাংশ তুলনামূলক ভাবে শান্তিপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের অবস্থায় বর্জ্যোরা শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ছিল, নিজেদের দেশের জাতীয় বর্জ্যোরা শ্রেণীর ভোজন-পাত্র থেকে ছুড়ে দেওয়া খাদ্যের দূ-একটা টুকরো তাদের ভাগ্যে জুটছিল এবং সর্বহারার দারিদ্র-ক্লিষ্ট দুঃখ দুঃশায় পতিত হয়েও বিপ্লবী চেতনায় সক্ষম প্রমজীবী শ্রেণী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন, পঃ আর্টগ্রিশ)

ডাঙা, যোশী, রাজেশ্বর রাও, অচ্যুত মেনন, ভূপেশ গুপ্তদের মধ্যে লেনিনের এই সংজ্ঞা আধুনিক ভারতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি কি?

এরা বর্জ্যোরা গণতন্ত্রের পতাকা-বহনকারী গণতান্ত্রিক দল? না তাও নয়। গণতন্ত্র অর্থ জোড়া-

তাল দেওয়া কোয়ালিশন নয়, যাদের মধ্যে নতুনতম আদর্শের মিলও নেই। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে তবু কর্মসূচীগত দৃষ্টিভঙ্গীর একতা ছিল, প্রমিক-কৃষক আন্দোলনের প্রতি সবদলের অন্ততঃ মৌখিক অনুকূল দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল, জনগণের সমর্থনের জোয়ার ছিল।

গণতান্ত্রিক দলের মধ্যম্নমী কি সরকারী অনুগ্রহ বিতরণ করে পাঁচশ লাখ টাকা ঘুষ নেবার চেষ্টা করে বে-আইনী ভাবে আত্মীয় স্বজনের চাকুরী ও কন্ট্রাক্ট বিতরণের নোংরা কাজে লিপ্ত হয়? পুর্লিশ সন্দ্রাস, জেলের ভেতরে, থানা লকআপে, পথে ঘাটে গুলী করে লোক মারার ব্যবস্থা সমর্থন করে? বর্তমান কেরল ও পশ্চিম-বঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

সুতরাং বর্জ্যোরা গণতন্ত্রের মাপকাঠি অনুসারেও সি.পি.আই একটা গণতান্ত্রিক দল বলে গণ্য হতে পারে না। এরা বামপন্থীও নয়, গণতান্ত্রিকও নয়, তবু নির্ল-ক্ষের মত এরা বামপন্থী গণ-তান্ত্রিক সংহতির কথা বড় গলায় ঘোষণা করে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কতৃক সভাপতি ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ লালিক স্কেনার কলিকাতা-১০ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১০ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

ভূমি তো তাঁদেরই বংশধর মা, ধারা অসীম স্নেহে লালন করতো বিপ্লবকে; ধারা বিপ্লবকে ভাল-বাসতো সন্তানের চেয়েও অধিক।
মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদ
প্রযোজিত
প্রবাহ
পঞ্চাশ বছরী অতিক্রান্ত
নাটক । অমিতাভ গুপ্ত
পরিচালনা । ইন্দ্রজিত সেন
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬। টায়
রবিবার ও ছুটির দিন
৩ ও ৬। টায়
মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮১

জেল-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ

রক্ষীরা ওপরাড়লার আদেশ মানতে চাইছে না

দপন

জেল থেকে পালানোর

ঘটনা রহস্যবৃত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এ পর্যন্ত অন্ততঃ চল্লিশ জন নকশালপন্থীকে জেলে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অভিযোগ : নকশাল বন্দিরা বিভিন্ন জেলে ওয়ার্ডারদের আক্রমণ করেছে আর জেল ভেঙ্গে পালাবার চেষ্টা করেছে। ঘটনা-গুলি ঘটতে শুরুর করেছে গত বছরের শেষ দিক থেকে। হত্যা ছাড়াও বহু বন্দি গুরুতর আহত

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত সপ্তাহে আলীপুর স্পেশাল জেলে ছয়জন যুবক বন্দীর জেল-রক্ষীদের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কতগুলি প্রশ্ন উঠেছে, যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এরা কী সত্যিই পালাবার চেষ্টা করেছিল? ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে তিনজন ওই জেলেই গুলী খেয়ে মারা যায় এবং বাকী তিনজন প্রাণ হারায় পর্লিশ কেস হাসপাতালে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে এদের

দেহে গুলীর চিহ্ন ছিল না, ছিল প্রচণ্ডভাবে লাঠি দিয়ে মারার দাগ।

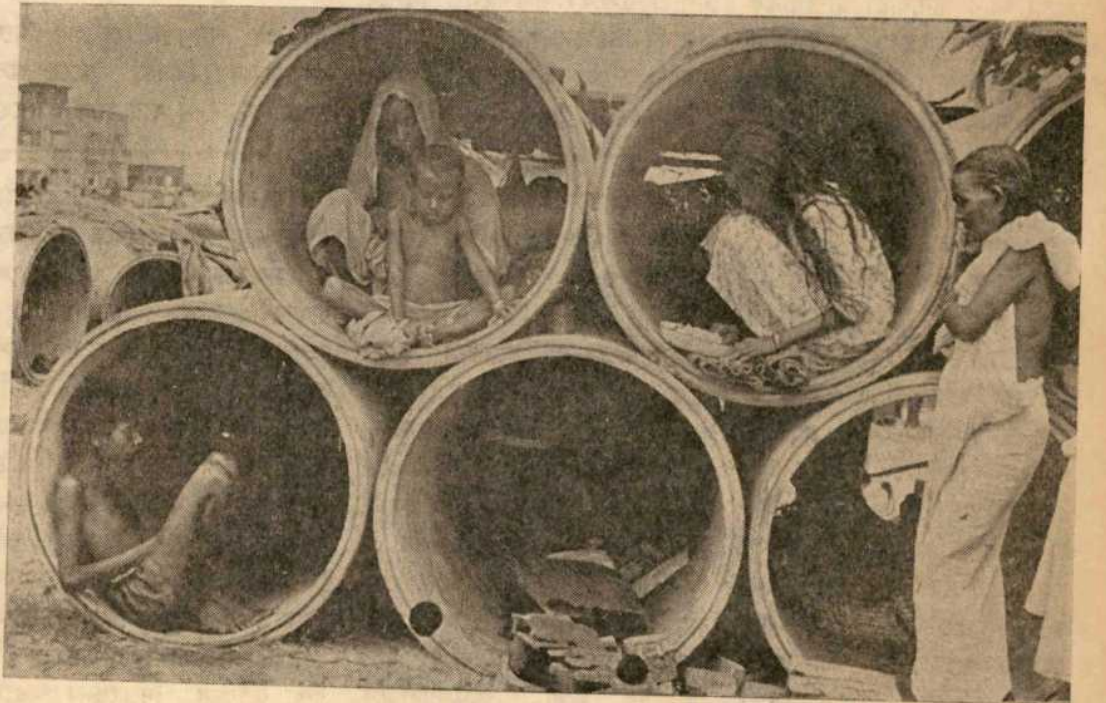
স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে এদের জেল থেকে পর্লিশ কেস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোল কেন যখন আহত ওয়ার্ডারদের নিয়ে যাওয়া হয় সুখলাল কার-নানী হাসপাতালে? এদের দেহে কি এমন কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল যা জেল কর্তৃপক্ষ চান নি যে অন্য হাসপাতালের ডাক্তার জেনে ফেলে? সেই ধরণের আঘাতের চিহ্ন থেকে কী অভিজ্ঞ ডাক্তাররা বুঝতে পারতেন যে এই যুবকদের ঠাণ্ডা মাথায় ধরে পিটিয়ে মারা হয়েছে? এইটুকুই শব্দ জানা গেছে হাসপাতালে ভর্তি যুবক-দের দেহে বহুবিধ আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং প্রতিটি ক্ষতচিহ্ন হয় কোন ভারী অস্ত্র দিয়ে মারার ফলে।

পর্লিশের মতে বন্দীরা ভেতর থেকে লোহার ট্রাপ গেটে টোকা

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বাংলা দেশের শরণার্থীরা জাম্মগার অভাবে কংক্রিটের পাইপের ভেতর বসবাস করছেন। একটি পাইপও খালি নেই। এমন কি খোলা মাঠেও লোক রয়েছে। দর্পণের জন্য ছবি তুলেছেন : প্রণব মদ্বাজী।



১৪শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা ১১ শ্রুতবার ১৬ই জুলাই ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

সরকারী চাকরী দেওয়ার ব্যাপারে

কোয়ালিশন সরকার রেকর্ড করে গেছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সমস্ত নিয়মকানুন আর ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে পশ্চিম বঙ্গের বিগত কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভা সরকারী চাকরী দেবার এক রেকর্ড স্থাপন করে গিয়েছেন। কোন ইন্টারভিউ না নিয়ে বা যোগ্যতা বিবেচনা না করে হাজার হাজার নিয়োগপত্র বিলি করা হয়েছে। বিলি করা নিয়োগপত্রের মধ্যে মৃত মানুষের নামও আছে। অনেক

দরখাস্ত আবেদনকারীর স্বাক্ষরও নেই। মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পরেও পিছনের তারিখ দিয়ে মন্ত্রীরা চাকরী দেবার আদেশ দিয়েছেন। সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা ঘটেছে পুনর্বাসন দপ্তরে। নতুন শরণার্থীদের জন্য নতুন কর্মচারীর সংখ্যা তেরো হাজার হবে বলে স্থির করা হয়েছিল। এখানে পুনর্বাসন দপ্তর

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বিড়লারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে

মূলধন সরিয়ে নিচ্ছেন

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন

রামের প্রত্যক্ষ সহায়তা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা মন্ত্রী জগ-জীবন রামের প্রত্যক্ষ সহায়তায় কলকাতা থেকে মূলধন সরানো হচ্ছে। ঘটনাটি হচ্ছে, কলকাতার ক্যামাক স্ট্রীটে বিড়লাদের প্রাসাদো-পম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অট্টালিকা 'ইন্ডাস্ট্রীজ হাউসটি' দেশরক্ষা দপ্তর কিনবে বলে স্থির করেছে। দাম প্রায় পোনে দু কোটি টাকা। এখানে নাকি ডিরেক্টর জেনারেল, অর্ডিন্যান্স ফ্যাকটরির জের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হবে।

এই বাড়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে বিক্রয় করা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিড়লা-

বাড়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কে তৎপর হয়েছে। বিড়-লারা এই বাড়ী বিক্রয় করতে পারলে একটা মোটা টাকা সরিয়ে নিতে পারবে এবং ধর্মঘটী বিড়লা শ্রমিকদের ধ্বংস করা সম্ভব হবে। পাছে "ইন্ডাস্ট্রী হাউস" বিক্রী নিয়ে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে সেজন্যে বিড়লাবাড়ী ইতিমধ্যেই কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চেষ্টা করেছেন। ব্যাপারটি গোপনই ছিল। কিন্তু

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসীরা

শিল্পপতিদের কাছ থেকে টাকা তুলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসীরা রাজ্যের শিল্পপতিদের কাছ থেকে টাকা দাবী করে "সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার" এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নব কংগ্রেসীদের প্রতি-ষ্ঠান যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের কাছে টাকা দাবী করা হয়েছে। ওরা বলেছেন, সি পি এমকে হঠাতে হলে প্রত্যেকটি

শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীকে নব কংগ্রেস তহবিলে টাকা দিতে হবে। এই দাবীর ফলে বিভিন্ন চেম্বার এখন টাকা সংগ্রহ করছেন এবং সদস্য ব্যবসায়ীদের কাছে টাকার লোভ তুলছেন।

মৌখিক ভাবে যুব কংগ্রেসী নেতারা শিল্পপতিদের বলছেন, সি পি এমকে ঠেকাতে হলে "মালমশলা" চাই আর "মালমশ-

লার" জন্যে দেবার টাকা চাই। সমস্ত শিল্পপতিই যে নব কংগ্রেসীদের এই চাপে খুশি হয়েছেন তা নয়। কেউ কেউ বলেছেন, "মালমশলা" সরবরাহে রাজ্যের আইন ও শৃংখলার আরও অবনতি ঘটবে। কিন্তু কোন উপায় নেই। কেন্দ্রে নব কংগ্রেসী সরকার আর পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ সরকার। তাই টাকা ওদের দিতেই হবে।

জেসপ কোম্পানী মজদুর ইউনিয়ন অফিসে

কংগ্রেসী গুণ্ডাদের তাণ্ডব

(দপ্পনের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসী গুণ্ডারা বিভিন্ন জায়গায় বেপরোয়া গুণ্ডামী শুরু করেছে। গত মঙ্গলবার রাতি দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ দমদম অঞ্চলের কংগ্রেসী গুণ্ডারা এই অঞ্চলে অবস্থিত জেসপ কোম্পানীর মজদুর ইউনিয়নের অফিস আক্রমণ করে জিনিসপত্র তছনছ করে, দখানা ফ্যান, একটি টাইপরাইটার ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে যায় এবং কয়েকজনকে আহত করে। আহতদের মধ্যে গ্রামোফোন কোম্পানী ইউনিয়নের সহ সভাপতিও আছেন।

অতঃপর গুণ্ডারা অফিসের সমস্ত কাগজ ও ফাইলপত্র রাস্তায়

সুপায়িত করে আগুন ধরিয়ে দেয়।

জানা গেছে এই ইউনিয়ন অফিস থেকে থানার দূরত্ব মাত্র একশ গজ। অথচ পদলিখকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও তাদের টিকি দেখা যায় না। গুণ্ডাদের তাণ্ডব শেষ হওয়ার অনেক পরে বুধবার সকাল দশটা নাগাদ, অর্থাৎ বারো ঘণ্টার পর পদলিখ ঘটনা স্থলে হাজির হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিন আগে এই গুণ্ডারা জেসপ কোম্পানীর কারখানায় ঢুকে শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে এবং বোমা ফাটিয়ে আসে।

রাজ্যপাল প্রতিদিন দুবার রাইটার্সে যাচ্ছেন

(দপ্পনের সংবাদদাতা)

রাজ্যপাল ধাওয়ানজী বোধহয় সিম্বার্থশংকর রায়কে নিরংকুশ ক্ষমতায় বসতে দেবেন না। সিম্বার্থ রায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ বসবার দিন থেকে ধাওয়ানজীও রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাচ্ছেন। একবার নয়, দু'বার। সকালে বিকালে নিয়মিত যাচ্ছেন।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির শাসনে রাজ্যপালই সর্বস্ব। সেখানে কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আইন মারফক ক্ষমতা নেই।

সিম্বার্থ রায় রাজ্য সরকারের ফাইলে কোন আদেশ দেবার অধিকারী নন। সে অধিকার একমাত্র রাজ্যপালের আছে। ধাওয়ানজী আইন জানেন, হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। সিম্বার্থ রায়ও ব্যারিস্টার। সুতরাং আগামী দিনে নিশ্চয়ই আইনের লড়াই নিয়ে দু'জন চিঠি-চাপাটি চলবে। মাঝখানে বিপদে পড়বেন উর্ধ্বতন সরকারী অফিসাররা। তাঁদের অবস্থা হবে শ্যাম রাখি না কুল রাখি।

সরকারী চাকরী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দ বিশ্বাস প্রায় উনিশ হাজার নিয়োগপত্র দিয়ে গিয়েছেন। তাও বিভিন্ন পদের জন্যে নয়। যেমন প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষকের। নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে ক্যাম্প অ্যাসিস্ট্যান্টের। এই বাড়তি নিয়োগপত্র পাওয়া ছেলেদের নিয়ে এখন সরকারী অফিসাররা আশংকায় পড়েছেন। ছেলেগুলো গিয়ে ধমকাচ্ছে। অন্যদিকে পদই নেই। কোথায় চাকরী দেওয়া হবে?

নিয়োগপত্র দেবার ব্যাপারটিও অভিনব পদ্ধতিতে করা হয়েছে। কোন নব কংগ্রেসী এম এল এ, কিংবা কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভার

বিভিন্ন দলীয় এম এল এ-দের সুপারিশ থাকলেই হোল। যোগ্যতার মাপকাঠি শব্দে দলীয় এম এল এ এর স্বাক্ষর। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার, কোন 'প্রয়োজন' নেই। শব্দে পুনর্বাসন দপ্তরেই নয়, অন্যান্য দপ্তরেও এই বেকান্দরী নিয়োগ ব্যবস্থা চালাও পদ্ধতিতে করা হয়েছে। একজন অফিসার, পঞ্চায়েত দপ্তরের ডিরেক্টর এ, আর, শ্যাম, মন্ত্রিসভার পদত্যাগের আগের দিনে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সেইদিনই পাঁচ মিনিটের মধ্যে অফিসারটিকে বদলী করা হয় এবং চীফ সেক্রেটারী এন সি সেনগুপ্ত ও মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী তা অনুমোদন করে দেন। খাদ্য দপ্তরের ভূতপূর্ব মন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্র

ওয়ার্ডাররা গুলী চালায়। কিছুদিন আগে দমদম জেলে এই ধরনের ঘটনা ঘটান পর সেখানকার জেল কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছিল যে ওয়ার্ডারদের কাছে কোন আশ্রয়স্থল থাকে না। তবে কী জেল কোডে ভিন্ন ভিন্ন জেলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা? নাকি জেল আইন অমান্য করে কলকাতা পদলিখের লোকই ভেতরে ঢুকে গুলী চালায়?

এই সব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য সরকারী তরফে পাওয়া যাবে কিনা জানি না।

জেল-কর্মচারীদের অসন্তোষ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে, কেউ কেউ চিরকালের জন্য পঙ্গু।

দিনের পর দিন এত হত্যা হয়ে চলেছে, এই ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে সরকারের কাছে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবী জানানো হয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে নীরব।

জেলের ঘটনা সম্পর্কে গোপন তদন্ত অবশ্য হয়েছে, করেছেন ডিভিশনাল কমিশনাররা। তারা কি রিপোর্ট পেশ করেছেন সে সম্পর্কে সরকার গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেছেন। শোনা গিয়েছিল, চার জন সদস্যের একটি কমিটি সরকার নিয়োগ করেছেন।

কমিটিতে আছেন হোম সেক্রেটারী, আই জি পদলিখ, আই জি (জেল) এবং আর একজন উচ্চপদস্থ পদলিখ অফিসার। কমিটির একজন সদস্য বলেছেন যে, নিয়োগের কথা শুনিয়ে কিন্তু কোন আনুষ্ঠানিক পত্র পাইনি। মনে হয়, সমালোচনা এড়াবার জন্যে এটা একটা প্রচার ব্যবস্থা।

দলে দলে ছেলে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেউ বা বিচারার্থী 'আর' অন্যেরা নিরাপত্তার কারণে বন্দী। জেলে বন্দির ঠাসাঠাসি, আর বন্দিদের ভরণপোষণের ব্যাপারে যে খরচ দেখানো হচ্ছে তা নিয়ে নাকি অনেক দুর্নীতি।

এই ব্যাপারে জেলের মধ্যে কর্মচারীদের বিভিন্ন স্তরে অসন্তোষ বহু দিন ধরে চলে আসছে।

তারই জের হিসেবে, বন্দিদের সঙ্গে জেলকর্মীদের নানাসূত্রে বিরোধ দেখা দিচ্ছে।

কারারক্ষীরা জেলার ও সুপারিন্টেন্ডেন্টদের ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ, ওপর তলার অভিযোগ করে সূরাহা হয়নি। তাই রক্ষীরা আর উর্ধ্বতন অফিসারদের আদেশ মানতে চায় না। জেল প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

রোজ সকালে জেল কর্মীদের প্যারেডের যে ব্যবস্থা ছিল তা এখন সংগঠন করা যায় না। প্যারেডে যোগ দিতে বেশির ভাগ কর্মচারী হাজির হয় না। অনুপস্থিত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

এই নিয়ে জেলে কর্মচারীদের বিভিন্ন স্তরে অসন্তোষ বাড়ছে। কোন কোন সময়, এমনকি দৈনিক সংঘর্ষও হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে কুচবিহারের এক জেলারকে রেলের অন্যান্য কর্মচারীরা ধরে পিটিয়ে দেয়। জেলার অভিযোগ করলে কোন তদন্ত হয় না। জেল-অফিসারদের সংগঠন হোম সেক্রেটারীর কাছে বিচারের দাবী জানান। বিচার না পেয়ে আদালতে মামলা দাখিল করে। শেষ পর্যন্ত মামলায় দোষীর সাজা হয় এবং ফলে চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়।

হাল আমলে জেল পালানোর প্রথম ঘটনা ঘটেছে আসানসোল জেলে। গত বছর দোসরা অক্টোবর ছয় জন দাগী ডাকাত বিচারার্থী মামলায় বন্দী ছিল। রহস্যজনক অবস্থায় তারা জেল থেকে উধাও হয়ে গেল, কোন তদন্ত হল না। পলাতকদের পাক্ষা নেই।

তারপরের ঘটনা মৌদীনীপুর জেলে। প্রাক্তন সি পি আই এম এল এ দেবেন দাশ জেল শ্রমণে এসে প্রচণ্ড মার খান। জেলে পাগলা ঘণ্টা বেজে ওঠে এবং নকশাল বন্দীদের প্রচণ্ড পেটানো হয়, বহু আহত হয়।

এই একই জেলে কিছুদিনের মধ্যে আবার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দশ জন নকশাল বন্দিকে হত্যা করা হয় এবং অন্ততঃ পঞ্চাশ জন আহত হয়। জেলের দুই হাজার বন্দির মধ্যে আটশ জন নকশালী। হত্যার ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, নকশাল বন্দিরা নাকি জেলের টোঁটর লুণ্ঠ করে আর কোথা থেকে খড় জমা করে বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে। সেই অবস্থার মধ্যে বন্দিরা গেট ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে। তখন তাদের ওপর নাকি গুলি চালানো হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার মৌদীনীপুর জেলের খবর এল, এবার নকশাল বন্দিরা নাকি শাবল দিয়ে মাটিতে সাত ফুট নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে জেল থেকে পালানোর ব্যবস্থা করেছে। দশ বারো দিন ধরে বহু বন্দি এই সুড়ঙ্গ

খোঁড়ার কাজে ছিল, অথচ কেউই এই প্রচেষ্টার কথা ধরতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অন্য এক বন্দি গোপনে এই খবরটা দিয়ে দেয়। কি ভাবে জেলের মধ্যে এত শাবল এল, অত গভীর সুড়ঙ্গের মাটির স্তূপ কিভাবেই বা কর্তৃপক্ষের নজর এড়ালো তার কোন হাদিশ অথবা কৈফিয়ত এখনো মেলেনি।

এর পরের ঘটনা জানদুয়ারী মাসে আলীপুর প্রেসিডেন্সী জেলে। আট জন উগ্রপন্থী বন্দি জেলের সীমান্ত প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরে অপেক্ষামান লরী ও মোটর বাইক করে পালিয়ে গেল। পালানোর ভঙ্গীতে কৌশলপূর্ণ পরিকল্পনার ছাপ আছে। বাইরের লোকের সঙ্গে বন্দিদের যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকলে পালানো সম্ভব হাত না। কি ভাবে যোগাযোগ হল জানা যায়নি।

ফেরদুয়ারী মাসে ঘটল বহরমপুর জেলে তথাকথিত বন্দি পালানোর ঘটনা। নকশালীরা প্রচণ্ড মার খেল আর কর্তৃপক্ষের মতে আটজন নিহত হয়েছে।

একুশে ফেরদুয়ারী শিলিগুড়ির ট্রেনশাল জেল থেকে সদর দরজা দিয়ে সোজা পথে হেঁটে বোল জন নকশাল বন্দি উধাও হয়ে গেল। কোন সরকারী কৈফিয়ত পাওয়া যায় নি।

চোন্দাই মে দমদম জেলে বিরাট ঘটনা ঘটল। অন্ততঃপক্ষে বোল

বিড়লারা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কয়েকদিন আগে লোকসভায় সি পি এম সদস্য জ্যোতির্ময় বসুর এক প্রশ্নের জবাবে বাবু জগজীবন রামকে বিষয়টি কবল করতে হয়েছে।

বিড়লাদের খুশি করার জন্যে বাবু জগজীবন রাম সব সময়েই তৈরী থাকেন একথা রাজনৈতিক মহলের সবাই জানেন। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসীদের সবচেয়ে হজ্জাকারী সংগঠন যুব কংগ্রেস আর ছাত্র পরিষদও এ ব্যাপারে নরম হয়ে রয়েছে। সিম্বার্থশংকর রায় বিড়লাবাড়ীর মামলা করে থাকেন। ও'র কাছে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আশা করা ঠিক নয়।

কিন্তু এই বাড়ী বিক্রী নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন উঠছে, সেগুলো হচ্ছে, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ীতে সরকারী অফিস বসবে কেন? স্বতীয়, ডিরেক্টর জেনারেল, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টারিজের বড় অফিস তো আছেই। আবার নতুন জায়গার দরকার কেন? তৃতীয়তঃ, বিড়লারা এই মূলধন সরানোর পর পশ্চিমবঙ্গে থেকে আর কি কি সরিয়ে নিয়ে যাবে তার কোন সম্ভান করা হয়েছে কি? চতুর্থ একবার বাড়ী বিক্রী হয়ে গেলে ধর্মঘটী বিড়লা শ্রমিকদের কি অবস্থা হবে? পঞ্চম, বাবু জগজীবন রামের এই বিড়লা প্রীতি কি নিম্নস্বার্থ দেশসেবা?

জেল পালানো

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মারে এবং প্রহরী খুলে দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার। এই ধরনের কথা কী বিশ্বাসযোগ্য! তবে কী মনে করতে হবে যে জেলের আইন এতই শিথিল যে, যে কেউই যে কোন দরজা টোকা দিলে তা খুলে দেওয়া হয়? নাকি পুরো ব্যাপারটাই সাজান?

আর একটি ব্যাপারেও অবাক লাগে? বলা হয়েছে যে জেলের

রাজধানীর চিত্র

বাংলাদেশের 'মিটমাট' আসন্ন ?

কিসঙ্গার কেন এসেছিলেন ?

রমাপ্রসাদ মল্লিক

হেনরি কিসঙ্গারের ভারত এবং পাকিস্তান পর্যটন আকর্ষক বা অহেতুক নয়। "বাংলা দেশের" ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শাসকবর্গ বহুদিন থেকেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পূর্বপ্রস্তুতি চালিয়ে আসছিল। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাম্প্রতিক ওয়াশিংটন দৌতা এরই পথ সুগম করার অন্যতম উপকরণ।

মন্ত্রী মহাশয় স্বর্ণ সিংয়ের দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের সামরিকচক্রী সরকারকে আমেরিকার কতৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত শস্য সাহায্যের গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেল। বিশাল আমেরিকী জনগণের মাঝে আজও এমন অনেক সত্যার্থী প্রকাশক, সম্পাদক বা জননেতা প্রণতির পথে অবিচল রয়েছেন, যারা বাংলা দেশের ওপর পশ্চিম-পাকিস্তানের বহু ধনিকবর্গের চাপানো ঔপনিবেশিক শোষণ এবং সামরিক বলাৎকার সম্বন্ধে প্রকৃত চিত্র বিশ্বের চোখে উদ্ঘাটিত করতে স্বেচ্ছা বা দেরী করে নি। এবারও তাই পাকিস্তান সরকারকে দেওয়া সামরিক সাহায্যের পরিমাণ (কেবল পরিত্রাশ মিলিয়ন ডলার মূল্যেরই নয়, এই অঙ্কের আড়ালে অনেকগুণ বেশী সামরিক শস্ত্রসাহায্যের স্রোত অব্যাহত) জানাল ন্যা ইয়র্ক টাইমস, এবং সেনেটর চার্ট, এডওয়ার্ড কেনেডী আদি সত্যবতী লোকসেবকরা। স্বর্ণ সিং এই অকাল উদঘাটনের দ্রুততায় এতই ভাবাচেকা খেয়ে গেছিলেন যে, তাঁকে স্বদেশে পার্লামেন্টের সামনে নিকসন প্রশাসনের বিরুদ্ধে ছন্দ উদগারের পরিশ্রমে গলদঘর্ম হতে হয়।

এ প্রসঙ্গে সামরিক সাহায্যের পরিমাণ-টাকার অঙ্ক-কোনোই গুরুত্ব রাখেনা। আধুনিক যুগের যুদ্ধ প্রকৃতি, অস্ত্রবিক্রয় ব্যবহৃত না হলেও, এত জটিল এবং দ্রুত সম্প্রসারণশীল প্রয়োজনের পটভূমিকায় রচিত যে, উক্ত সাহায্যের কার্যকরিতা একাধিক কার্যকারণের সমাবেশের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং ১৯৫৪ এর পর পাকিস্তানকে দুই হাজার মিলিয়ন ডলার মূল্যের সাহায্য দেওয়া হয়েছে, কিংবা, তারও পরেকার অধ্যায়ে অর্থাৎ ১৯৬৭ এবং তিরিশে এপ্রিল ১৯৭০ এর মাঝে ৪৭,৯৪৪,৭৬১.৭৬ ডলার মূল্যের সমরোপকরণ দেওয়া হয়েছে, সে বিবেচনা অবান্তর। মধ্যপ্রাচ্যে যেমন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ভারত পাকিস্তান উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে

আমেরিকী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কয়েকটি বাঁধা নীতির কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে —

(এক) সুদূর প্রাচ্য থেকে এগিয়ে আসা কমিউনিজমের প্লাবন রোধ করার কাজে বর্তমান পাকিস্তান সরকার ভারত অপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য; পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তথাকথিত "সামরিক" জাতির লোক দিয়ে গঠিত, যারা নাকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জবানদের তুলনায় বেশী দক্ষ, সাহসী ও দৃঢ়; ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষে লাহোরের লড়ায়ে তা নাকি প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং, চীনের সঙ্গে পাকিস্তানী সরকারের "মিতালীর" জনরবে যুক্তরাষ্ট্র মোটেই বিচলিত নয়। তারা জানে, পাকিস্তানের বর্তমান শাসকশ্রেণী তাদের বিস্তৃতিার্থে খাতিরে যেমন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে উপনিবেশ করে রাখতে বাধ্য ঐশলামিক সম-ধর্মের বেলচাল এবং ভণিতা সঙ্গেও তেমনি তারা চীনের সঙ্গেও বন্ধুত্বের ভাণ বজায় রেখে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে প্রস্তুত (অধিকৃত কাম্মীরে, গিলগিটের উত্তরাঞ্চলে যে এক ফালি জমি চীনকে নাকি খসরাং করা হয়েছে তা পাকিস্তানী সরকারের বহু ব্যবসায়ী-বর্গের স্বার্থে—সিংকিয়াং থেকে অনুমানিক একশ পঞ্চাশ মিলিয়ন চৈনিক মূল্যমূল্যের পণ্য সাহায্যের স্বপ্ন কম লোভনীয় নয়। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চ হাত ছাড়া যাতে না হয়, সে উদ্দেশ্যে ভারত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার জুজু দেখিয়ে চীনের পরোক্ষ কূটনৈতিক সমর্থন এবং প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক সাহায্য আদায় করে নেওয়া উক্ত শাসক-বর্গের অনুসৃত চীনকে ব্ল্যাকমেইস করা নীতির অন্তর্গত।)

(দুই) ১৯৬৬ সালে তাশখন্দে সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক মূরব্বিরানা মেনে নিয়ে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পস্তোছিল; পরে তারা পেশোয়ারের অনতিদূরে "বাদবেরা" উড়োজাহাজ ঘাঁটি আমেরিকার মৌরিসপ্যাট্রাচ্যত করিয়ে আশা করেছিল যে সোভিয়েত রাশিয়াকে তোলাজ করে কাম্মীর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে। কালক্রমে যখন দেখা গেল তা দুরাশা যাত্র, কারণ সোভিয়েত রাশিয়া কেবল যে সকল জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রয়োগ হতে দেওয়ার লেনিনপন্থী নীতি থেকেই সরে এসেছে তা নয়, এই বহু রাষ্ট্র এখন মধ্য-দক্ষিণ এশিয়ার শক্তি-ভারসাম্যের হানি ঘটতে দিতে নারাজ, এবং

সেজন্য কাম্মীরের জনগণ প্রকৃত-পক্ষে কি চায়, ভারতে চিরন্তন অর্বাধীনতা, পাকিস্তানে বিলম্ব না স্বাধীন রাজসত্তা, তা নিয়ে কোন প্রশ্নের পুনরাবস্থাপন হতে দেবে না—সে সময় থেকেই পাকিস্তান সরকারের সোভিয়েত রুশ নীতি ঘুরতে আরম্ভ করেছে। বর্তমানে পাকিস্তানী শাসক মহল রাশিয়ার কোন রকম মধ্যস্থতার ভূমিকা সহ্য করবে না; গত এপ্রিল মাসে রুশী প্রেসিডেন্ট পদগোঁড়ি চিঠির প্রায় অপমানকর অবজ্ঞা এই মনোভাবের সূচক। যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও রাশিয়ার সরকারী স্তরে মনোমালিন্যের সুযোগ চূড়ান্ত ভাবে নিতে উদ্যত।

(তিন) অথচ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সেখানকার জনগণের সুব্যক্তি অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন নগ্ন ঔপনিবেশিক শাসন চলতে দেওয়া ডাহা অববেচনা; অভিজ্ঞ-তাই যুক্তরাষ্ট্রকে বুদ্ধি দিয়েছে যে নোগো-দিরেম সরকারের (দক্ষিণ ভিয়েতনামে) মত, অস্বাভাবিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী কায়মী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে টিকতে সাহায্য তো করেই না, উপরন্তু প্রতিস্বম্বী রাষ্ট্র ব্যবস্থার জিত স্বরাশ্বত করে। সুতরাং "স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার" সম্ভব না হক, একটা এমন মন্দের-ভাল বোকাপড়া হওয়া এখন যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য, যাতে বাংলাদেশে সম্ভাব্য গণ-অভ্যুত্থান যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক হিসাব বানচাল করে না দেয়। কারণ গেরিলা মুক্তি বাহিনীর লড়াই জনগণভিত্তিক সশস্ত্র সংগ্রামের পরিণতির দিকে বতাই যাবে, ততই ভিয়েতনাম অপেক্ষা অনেক গুণ বলশালী, সম্পদপূর্ণ এবং ভৌগোলিক-সামরিক-রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ এক সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব অনিবার্য হয়ে উঠবে।

কিসঙ্গারের দৌতা ঠিক তাই এমন সঙ্কট-কুটিল ক্ষণ ঘটেছে, যার পূর্বাঙ্ক রচনা করে গেছেন, ইউ এন ওর ছন্দ-প্রতিনিধিরূপে সদরুদ্দিন সাহেব—যিনি যুক্তরাষ্ট্রের একচেটে বিস্তৃতিশীলপন্থি প্রণয়ী এবং পাকিস্তানের বহু ব্যবসায়ী তথা সামরিক অফিস-রশাহীরা মধ্যে সেতুবন্ধ বিশেষ।

(চার) যে অভিব্যক্তি প্রণোদিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রয়োগ স্তম্ভিত ও রুদ্ধ করে দিতে চায়, ঠিক সেই করণে ভারতের সরকারী মহলও চায়না, বাংলাদেশে স্বাধীন এবং

সর্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়।

(পাঁচ) উপরোক্ত কারণ সমাবেশের ফলে ভারতীয় শাসকমহলে তাই এখন এক নতুন সুর—"রাজনৈতিক সমাধান" : পার্লামেন্টে, ইন্ডিকেট কংগ্রেসের বৈঠকে, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের গোপন ও অনুমোদন, সাপেক্ষ প্রকাশ্য আলোচনার এ সময় ধীনিত হচ্ছে ভারতের অর্থনৈতিক দর্বিপাক (উৎসাহতদের প্রচণ্ড সংখ্যায় আগমন-জানিত), ভারতের পূর্বাঞ্চলে সম্ভাব্য "বিশৃঙ্খলতা"র বিপদ এবং জনগণের মুক্তি সংগ্রামের ভয়াবহ পরিণাম থেকে অব্যাহতি ও তদুদ্দেশ্যে এক মীমাংসা।

কিসঙ্গারের দৌতা সফল ?

বলা বাহুল্য, কিসঙ্গার সানন্দে দিল্লী ত্যাগ করেছেন। ভারতের বাক্যবাগীশ মন্ত্রীদের দৌড় তাঁর মত ঘোড়েল মতলব-বাজের পক্ষে অর্চ করা মোটেই কঠিন হয়নি। সর্বাপেক্ষা হাস্যকর হয়েছে, তাঁর আগমনের সঙ্গে সময়-সাময়িক বজায় রেখে উড়োজাহাজ আক্রমণের প্রতিবন্ধনার্থে নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা ও বেসামরিক প্রতিরক্ষার মহড়া অনুষ্ঠান। বস্তুতঃ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্ভাবনার জুজু দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ মরণ-ব্যবসায়ীদেরকে প্রভাবিত কর দ্বন্দ্ব কথা, সমান্য বিচলিতও করা যায় না, এ সত্য বুঝতে ভারত সরকারের মহামহীরহসম বিভাগীয় মাথা এবং নীতি-নিয়ন্ত্রতাদের এখনও অনেক বাকি। একসুর যে পন্থাটি নয় তা আমেরিকার সময়-

অভিজ্ঞ সেনানারা জানে; তারা এও জানে, ভারতের প্রতিরক্ষা-উৎপাদনমন্ত্রী বতাই সময়-সম্ভর সম্পর্কে ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবী করুন না কেন, যুদ্ধ বেঁধে গেলে ভারতের পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট থেকে অব্যাহত সরবরাহ না পেলে অন্য কোন উপায় থাকবে না।

সোভিয়েত রাশিয়া স্বাভাবিক কারণেই এমন এক চরম পরিণতির বুদ্ধি নিতে অপ্রস্তুত।

সুতরাং, নিকসনের ব্যক্তিগত বিশ্বাসভাজন দূত এবং আমেরিকার সংবিধান-উদ্ভূত "প্রধানমন্ত্রী" মোর্টামুটি ভাবে হিসেব করে নয়া দিল্লী থেকে ইসলামাবাদে গেছেন ভারতের শাসকমহল কতদূর পর্যন্ত ছাড়তে রাজি আছে, কোন রাজনৈতিক শর্তে তারা "অস্থায়ী বাংলা-দেশ সরকার"কে নতুন বন্দোবস্তে খাপিয়ে নিতে ও পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে মীমাংসায় প্রস্তুত এবং কি ভাবে তাদের সরকারী অস্ত্রমর্ষাদার মানরক্ষা সম্ভব। অসংশয়ে বসা চলে, কিসঙ্গারী ফর্মুলা চোকাঠের ওপারেই ঠিক দেখা দিল বলে।

মুর্শকিলের প্রশ্ন বাকি বাংলা দেশের আপামর জনসাধারণ, ক্রম-ঘনায়মান অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং আরম্ভ মুক্তিযুদ্ধের বৈশ্বিক ভাবিতব্য।

দুই বাংলার মানুষই সাগ্রহে এই প্রশ্নের প্রতীক্ষা শূন্য করছে না, অন্তিম নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে অংশ গ্রহণে প্রস্তুতও হচ্ছে।

মার্টিন রেল আজও বন্ধ

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে

যাত্রীদের দুর্ভোগ ও গ্রামাঞ্চল থেকে পণ্যসামগ্রী আসছেনা

হাওড়া ও হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলের সংগে শহরের একমাত্র যোগসূত্র ছিল মার্টিন রেল। অর্থ ঘাটতির অজুহাতে কোম্পানী তাও বন্ধ করে দিলেন। এই রেলপথ-গুলি জাতীয়করণ ও আধুনিকীকরণের দ্বারা এই রেলপথের লক্ষাধিক যাত্রীর দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে গত দশ-বারো বছর ধাবৎ গণস্বাক্ষর, রুডপটেশন ও জনসভার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত জনসভায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণরঞ্জন বসু, রমা চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও উপরোক্ত বিষয়ে তাঁদের আন্তরিক সমর্থন জানান। পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলিও দীর্ঘদিন ধাবৎ এই রেলের সংস্কারের দাবী জানিয়ে আসছেন। কিন্তু পরি-তাপের বিষয় এতদসম্বন্ধে রেলপথের সংস্কার দূরে থক, অর্থ ঘাটতির অজুহাতে কোম্পানী চির-তরে এই রেলপথ বন্ধ করে দিয়ে-

ছেন। ফলে এই রেলপথের বিপুল সংখ্যক নিত্য-যাত্রী বর্তমানে অসহ-ণীয় দুর্ভোগের মধ্যে যাতায়াত করছেন। আজ পর্যন্ত এর বিকল্প পরিবহনের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

এই রেলপথে যে সব পণ্য-সামগ্রী সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আসত যানবাহনের অভাবে বর্তমানে তার যোগান অস্বাভাবিক ভাবে কমে গেছে। ফলে যেমন ছোট ছোট অসংখ্য ব্যবসায়ী ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছেন, তেমনি শহরাঞ্চলের ক্রেতাদের চড়া দামের শিকার হতে হচ্ছে। শূন্য তাই নয়, সংবাদে প্রকাশ এই রেলপথের সংগে যুদ্ধ কমীদের বড় রেলো নিয়োগের ব্যাপারে ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও নাকি আজ পর্যন্ত কার্যকরী করা হয়নি। যাহোক, আশু প্রতিকারের আশায় এই উপেক্ষিত বিষয়টির প্রতি পশ্চিমবঙ্গের নব-নিযুক্ত দপ্তরবাহীন মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কেরল বিহার ও পাঞ্জাবে অনিশ্চয়তা এবং দুর্নীতি

(দর্পণের পর্ষদে)

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল এবং প্রজাসমাজতন্ত্রী দল আবার একটী ঐক্যবদ্ধ সমাজতন্ত্রী দলে সংযুক্ত হবার পর বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এই দুটী দল সংযুক্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে খুব একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবু তাঁরা অন্ততঃ দুটী রাজ্যে নতুন করে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। একটী কেরল, অপরটী বিহার।

এই দুটী রাজ্যেই সি পি আই ও নব কংগ্রেস পরস্পরের সহযোগী মিত্র, তারা একসঙ্গে সরকার গঠন করেছেন এবং সরকার পরিচালনা করছেন। কিন্তু দুটী রাজ্যেই সি পি আই-এর সি পি মন্ত্রী রয়েছেন, যাঁদের একুশে জুলাইয়ের মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে বলে সি পি-এর জাতীয় কর্মটী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি নব-সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের গৃহীত নীতি কার্যকরী করা হয়, তাহলে এই নতুন দলের সদস্যরা নবকংগ্রেস, সি পি আই, আদি কংগ্রেস, সি পি এম প্রভৃতি দলের বিবোধিতা করবেন এবং সর্বপ্রকারে নব কংগ্রেস সী সরকারের পতন ঘটতে সচেষ্ট হবেন। ফলে ঐ দুটী রাজ্যেই নব-কংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারগুলি বিপন্ন হয়েছে।

কেরলে নব-কংগ্রেস সমর্থিত অচ্যুত মেনন সরকারের সমর্থক দলগুলির মিলিত সদস্য সংখ্যা উনৈশসত্তর, বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা একশো চৌদ্দ। অর্থাৎ মেনন সরকারের মনোনীত এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য নিয়ে মাত্র তিন জনের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এদের মধ্যে সরকার সমর্থক সি পি এম দলভুক্ত সদস্য সংখ্যা তিন। এরা বিবোধীপক্ষে চলে গেলে অচ্যুত মেনন আবার দলছাড়ের নানা ফিফিরে টোপ ফেলে আত্মরক্ষা করতে চাইছেন। প্রথমতঃ সি পি আই দলপতি সি পি এম এল এর, যাকে দল-নেতৃত্বের নির্দেশ অর্জন করেন তার চেষ্টা করছেন, স্বতীয়তঃ তিনি নব-কংগ্রেসীদের এবং কেরল কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় নিতে চান। নব-কংগ্রেসীদের মন্ত্রিসভায় নিলে তাঁদের অস্তিত্ব দুইদিনটী গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দিতে হবে। স্বরাষ্ট্র অর্থ, শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতি দপ্তর সি পি আই, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরাজস্ব, বন, শ্রম ও কৃষি দপ্তর আর এস পি, সি পি এম দলের হাতে। এদের কেউই নিজ নিজ দপ্তর ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক নন। কেরল কংগ্রেসের চৌদ্দজন এম এল এ, তাঁদের কনপক্ষে দুটী গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দিতে হয়, কিন্তু অন্যান্য দল এতে রাজী নয়। অথচ কেরল কংগ্রেস, বিরোধী পক্ষে ভোট দিলে অচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভা একঘণ্টাও টিকবে না। তাই

ভয়ত দর্পণ

অসুস্থ অচ্যুত মেনন মধ্যমার্গে বাঁচাতে চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখেই মস্কা থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন নব কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন। প্রয়োজন হলে আর এস পির ছয় জন এম এল এর ভরসা ছেড়ে তিনি কেরল কংগ্রেসের চৌদ্দজন এম এল এ-কে সম্মুখিত করতে প্রস্তুত। কিন্তু বখেড়ঃ মিটেও মিটেছে না। একদিক সামলাতে গেলে অন্যদিকে রহস্যময় হয়ে যায়।

সি পি এম দল এই সংকটের সুযোগে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান ন বলে শ্রীনাথস্বামীপাদ জানিয়েছেন। সি পি এম গত লোকসভা নির্বাচনে চল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়ে এখন অশা করছে, কেরলে নির্বাচন ঘটে পেরলে তাদের ফ্রন্ট একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে, তাই সি পি এম নতুন নির্বাচন চান, আর অচ্যুত মেনন, নব-কংগ্রেসীদের ভয়ও সেখানে।

বিহারে নব কংগ্রেসী দলের সঙ্গে সি পি আই-এর মতবিরোধ

এমন পর্যায়ে গিকে উপনীত যে সি পি আই বিহার মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবার জন্যেও প্রস্তুত। দুপক্ষেরই আগ্রহ থাকার ফলে একটা জোড়াতালি দেওয়া আপোষসূত্র হয়ত বা খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। কিন্তু তাহলেও বিহার মন্ত্রিসভায় আর খুব বেশী দিন আছে বলে কেউই ভাবতে পারছেন না।

পাঞ্জাবে সম্প্রতি আকালী দলের মন্ত্রিসভার পরামর্শে রাজ্য বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন কার্যে করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতই বাজেট অধিবেশনের মত একদিন আগে রাজ্যপাল মধ্যমন্ত্রীর পরামর্শে বিধান সভা ভেঙ্গে দেন।

সম্প্রতি পাঞ্জাবের মন্ত্রীদের অজ্ঞান দুর্নীতি, স্বজন পোষণ ও বেআইনী কার্যকলাপের দৃষ্টান্তে চণ্ডীগড়ের ও দিল্লীর রাজনৈতিক মহল মূগ্ধ হয়ে উঠেছেন। বঙ্গা বাহুল্য স্বয়ং মধ্যমন্ত্রী পর্বন্ত নানা দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং সংসদে পাঞ্জাব মন্ত্রী

সভার বিবিধ দুর্নীতির তদন্তের জন্য একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন প্রস্তাব করা হয়েছে। অবশ্য কংগ্রেসী সদস্যদের সম্ভবতঃ মনে ছিল না যে তাঁদের রাজ্যে সর্দার প্রতাপ, সিং কায়রো এবং তার পুত্রদের কীর্তিকলাপও এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে প্রতাপসিং কায়রোকে তদন্তের সম্মুখীন হতে হয় এবং তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁকে পদত্যাগ করে চলে যেতে হয়। কংগ্রেসী নায়কদের এমন অসংখ্য দুর্নীতির উদাহরণ আকালী মন্ত্রীদের বর্তমান দুর্নীতির দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, সবগুলি নোংরা জীব একই খোঁয়াদের বাসিন্দা।

তবে ককেটী দৃষ্টান্ত দিলে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন যে কংগ্রেস, লীগ, সি পি আই ডি এম কে আকালী ও সরগুদী দলই দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও উৎকর্ষ অর্থ আত্মসাৎের ব্যাপারে প্রায় সমান সমান যান। কেরলের অচ্যুত মেনন পঁচিশ লাখ টাকা আত্মসাতের চেষ্টায় ধরা পড়ে এখন “আবিমাখি মেনন” (চোর মেনন) বলে কেরলে পরিচিত, ষেট ব্যংক অব ইন্ডিয়া থেকে ষাট লক্ষ টাকা আত্মসাতের দায়ে ধৃত নাগরওয়ালী মাসহোদার সঙ্গে স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীর নাম জড়িত থাকা সত্ত্বেও

তিনি নিজে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাতে পারছেন না, পশ্চিমবঙ্গে নব-কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দুর্নীতির ও বে-আইনী কার্যকলাপের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাঞ্জাবের আকালী মন্ত্রীদের কার্যকলাপের সঙ্গে সঠিকভাবেই তুলনীয় হতে পারে।

একজন পাঞ্জাবী মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে টেলিফোন করে তার অনুগৃহীত জৈনক ম্যাট্রিকুলেটকে “রীডার” পদে নিযুক্ত করতে নির্দেশ দেন। যখন তিনি শুনলেন যে রীডার পদে নির্দিষ্ট যোগ্যতার মানসম্পন্ন নই, তখন তিনি তাজব্ব হয়ে যান এবং বলেন, “আমার হুকুমে যে কোন ডেপুটি কমিশনার, এতক্ষণে একজন রীডার নিয়োগ করে ফেলতেন!” অর্থাৎ তিনি ইউনিভার্সিটির রীডার ও প্রফেসরদের মধ্যে পার্থক্যটুকুও জানেন না। আরেকজন মন্ত্রী বক্তৃতা দিতে গিয়ে তাঁর সভায় লোকজন হয় নি দেখে প্রচার বিভাগীয় অফিসারের কৈফিয়ত চান। আরেকজন মন্ত্রী আরো এককণ্ঠি সরেস, জৈনক অফিসার তাঁর নির্দেশ যথাযথ পালন করতে পারেন নি বলে ঐ অফিসারকে ডেকে গোটা কয় খাম্পড়ই লাগিয়ে দেন! নব-কংগ্রেসীরা কি আকালী মন্ত্রীদের চেয়ে কিছু কম যাবেন?

বাঁড়িশার সমাজবিরোধীদের বেপনোয়া রাজত্ব

সভ্যাত্মবোধী

বাঁড়িশা সাউথ সুবারবণ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত একটি গ্রাম। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অবদান হিসাবে ঐ এলাকায় অন্য সব-কিছুর সঙ্গে সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য আছে। বর্তমানে ঐ সমস্ত সমাজ বিরোধীদের একটি অংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। আর একটা অংশ কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও দলদ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়ে বিভিন্ন পাড়ায় জাঁকিয়ে বসে বহাল তবিয়তে তাদের কাজ হাঁসল করে চলেছে। কেবলমাত্র একটি জায়গায় তাদের কোন পরিবর্তন হয়নি, সেটি হলো পদলিশের সঙ্গে যোগাযোগ। ঐ যোগাযোগের ব্যাপারে সর্বপ্রথম থেকে আজ পর্বন্ত অগ্রণী ভূমিকা যাদের তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বেহা-হার কোন বিশিষ্ট বিন্ধ্যশালী পরিবরেব একজন কংগ্রেসী পাণ্ডা।

নকশাল রাজনীতির আবির্ভাবের পর যখন ঐ এলাকার সমাজ বিরোধীরা দেখতে পেলো যে নকশালীদের এক অংশের কাজের সঙ্গে তাদের কাজের কোন তফাৎ নেই তখন তাদের একটি অংশ নক-

শালীদের সঙ্গে মিশে গেল এবং আর একটি অংশ কংগ্রেস ও তার লেজুড়দের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন পাড়ায় আগ্রয় নিল। আর ঐ সমাজবিরোধীদের পরিচালক অংশটি (যারা পাড়ার মধ্যে সভ্য ও ভদ্র বলে পরিচিত) আলাদা থেকে ঐ দুই অংশের সঙ্গে ও পদলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে লাগলো এবং ঐ যোগাযোগ রক্ষার সেতু হিসাবে কাজ করতে লাগলেন সেই সমস্ত বিন্ধ্যশালী কংগ্রেসী পাণ্ডা এবং কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি।

তারপর অন্যান্য জায়গায় মত এখানেও আরম্ভ হলো সি পি এম নিধন রাজনীতি, কারণ ঐ এলাকাটি সি পি এম প্রভাবাধীন। অপ্রকাশ্যভাবে ঐ নিধনধ্বজে ইন্ধন যোগাতে লাগলো কংগ্রেস, সি পি আই প্রভৃতি দলগুলি এবং কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি। নকশাল নামধারী সমাজ বিরোধীরা পাড়ার মধ্যে আমন্ত্রিত আগ্রয়প্রাপ্ত সমাজবিরোধীদের যোগসাজসে যথেষ্টভাবে ঐ এলাকায় চুর্নি, ছিনতাই রাহাজানি, স্কুল জ্বালানো, বোমা ফাটানো, পরীক্ষা পড়, বিশেষ

বিশেষ ব্যক্তি ও দলকে, হুমকী প্রদান এবং পরিকল্পিত ভাবে কয়েকটি হত্যাকাণ্ডও সমাধা করলো।

এরপর ঐ সমস্ত সমাজবিরোধী কাজের মোকাবিলা করার জন্য যখন সি পি এম স্থানীয় জনসাধারণ ও যুবকদের সংগঠিত করে এগিয়ে এল তখন কংগ্রেসী ও তার লেজুড়েরা এবং কিছু স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদীরা গগনভেদী চীৎকার করে সি পি এম-এর ঘাড়ের সমস্ত দোষ চাপিয়ে পদলিশকে সজাগ করে তুললো। পদলিশ তখন যোগাযোগ করলো সেই সমস্ত পাণ্ডাদের সঙ্গে যাদের মাধ্যমে পদলিশের ঐ সমস্ত সমাজবিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও মাসিক বরাদ্দ ঠিক হয়। সেই সমস্ত পাণ্ডাদের নির্দেশে (আদেশে বললেও ভুল হয় না) পদলিশ অপরাধীদের নাম-ধাম-আড্ডা জানা সত্ত্বেও তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলো লোকদেখানো অপারেশন এবং তার

ফলে আসল উদ্দেশ্য য, তা সফল হলো অর্থাৎ কিছু সি পি এম সমর্থক যুবক হরণ হলো এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কাজ ব্যাহত হলো।

সি পি এম দমনের জন্য কংগ্রেসীদের দ্বারা আমন্ত্রিত, আগ্রহিত ও পুষ্ট কিছু নকশাল নামধারী সমাজ বিরোধী গত উনিশশে জুন মঙ্গলবার রাতে বাঁড়িশার বৈদ্যপাড়া স্কুলটিতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করেছে। যথারীতি পদলিশও এসেছিল, কিন্তু অগ্নয়দাতারা দক্ষতারীদের জানা সত্ত্বেও পদলিশকে তাদের নামধাম দেয়নি বা অনুসন্ধান উৎসাহিত করেনি।

এরপর স্থানীয় জনসাধারণ ও যুবকদের উচিত প্রতিটি এলাকায় ঐ ধরনের সমাজ বিরোধীদের আগ্রয়-প্রগর্য দানে বিরত থেকে সাহসের সহিত ঐ সমস্ত দুষ্টকার্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা। হয়ত ঐ মোকাবিলায় এগিয়ে এলে কংগ্রেসী ও তার লেজুড়েরা এবং পদলিশ মোকাবিলাকারী সংগঠিত জনগণকে সি পি এম আখ্যা দেবে-হয়তো কেন দেবেই, অস্ততঃ ইতিহাস তাই বলে।

কারা খুনীদের আড়াল করছে?

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

পশ্চিমবঙ্গে মার্কিনী মহলের লবী আনন্দবাজার-যুগান্তর গোষ্ঠী বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে চীনা অস্ত্র ব্যবহারের কাহিনী বেশ ফলাও করে প্রচার করছিলেন। প্রচারের ধারাটা বেশ জমে আসছিল।

হঠাৎ তাদের যথেষ্ট বেকুব বানিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব ভ্যান হোলেন থোলাখলি বলে দিলেন, আমেরিকা ইয়াহিয়া খান সরকারকে প্রায় চম্পাশ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে, এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দানের চুক্তি আমেরিকা সর্বতোভাবে পালন করবে। ইতিমধ্যেই জাহাজ বোকাই অস্ত্রশস্ত্র করাচী বন্দর অভিমুখে রওনা হয়েছে! সরকারী ভাবে আমেরিকা একথা বলে দেওয়ার পর আনন্দবাজার-যুগান্তর গোষ্ঠী নরম নরম অভিমানী সুরে সুরোরাণীর মত গোসা ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছেন। মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতিটি প্রথমে তারা প্রকাশই করে নি, যখন দেশের অন্যান্য কাগজে পুরো বিবৃতিটি প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তারা কাটছাঁট করে খানিকটা ছেপে, মৃদু প্রতিবাদ জানিয়েই চুপ করে থাকল।

পাঠকেরা শুনেন থাকবেন যে প্যারিস আলোচনা বৈঠকে ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে মাদাম বিন ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে সাতদফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমেরিকা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এখানকার কোন কাগজই সাতদফা প্রস্তাব যে কী তা পাঠকদের জানানয় নি, কারণ তাহলে পাঠকেরা হয়তো বা বরুণ ফেলবেন যে আমেরিকার ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ করার আদৌ কোন অভিপ্রায় নেই। “দর্পণ” এই সংখ্যায় ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাদাম বিনের ঐ সাতদফা প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে। প্রস্তাবগুলি পড়লে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন যে মার্কিন কর্তৃপক্ষের এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার কোন যুক্তি নেই; যদি তাঁরা তাঁদের মূল শর্ত মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নকেই যুদ্ধ বন্ধ করার প্রধান বাধা বলে যা বলছিলেন, তার মূলে কোন সত্য থেকে থাকে। কাজেই মার্কিন লবীর ধরম্মর চেলা গোষ্ঠী মাদাম বিনের প্রস্তাবকে একদম-চেপে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে খুনোখুনির রাজনীতি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গত সাতই জুলাই রাইটস বিল্ডিং-এ যে সর্বদলীয় বৈঠক বসেছিল, সেই বৈঠকে সি পি এম-এর পক্ষ থেকে পাঁচ পৃষ্ঠার একটি চিঠি সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মশাইকে দেওয়া হয়েছিল। ঐ চিঠিতে যা বলা হয়েছিল, তা শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ও তাঁর দল এবং সরকারের বিরুদ্ধে চার্জ-

শীট বলে ট্রেনেল করা যায়। আগামী উনিশে জুলাই আবার যখন বৈঠক বসবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই সি পি এম নাম করে দফায় দফায় যে অভিযোগ এনেছে তার একটা মনানসই জবাব দেবার দায়িত্ব নব কংগ্রেস নেতা সিদ্ধার্থ বাবু ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের উপর বর্তছে।

তাই আনন্দবাজার যুগান্তর গোষ্ঠী এখন পৌঁ ধরেছে যে কোন

সম্পাদক দর্পণ

অভিযোগ প্রত্যাবিযোগ নয়, সর্বদলীয় আচরণবিধি চাই যাতে খুনোখুনি বন্ধ হতে পারে। অর্থাৎ এতদিন নব কংগ্রেস ও অষ্টবামের সম্মিলিত কুৎসা মিথ্যা প্রমাণিত হলেও, সি পি এম যেন চুপ করে থাকে। মিথ্যা প্রচার করার বিরুদ্ধে কোন কৈফিয়ত না চায়। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসী সমাজ বিরোধীদের মিতারা যে হত্যাকাণ্ড ও বাস্তবিত সন্দাস চালিয়ে যাচ্ছে, তা যে আসলে দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মচারীদের একাংশ স্বারা সুপারিকল্পিত ভাবে সংগঠিত এবং নয়া দিল্লী কর্তৃপক্ষের আশীর্বাদপুষ্ট, এর সম্পর্কেও নাকি চুপ করে থাকতে হবে! হেমন্ত বসুর মত প্রবীণ প্রমথ্য নেতাকে কে হত্যা করেছে, উথরা, দমদম কেন্দ্রে প্রাণীদের কারা হত্যা করেছে, নেপাল রায়, অজিত বিশ্বাস এঁরা কাদের গুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করতে প্রাণ দিলেন, একথা আলোচনা করে লাভ নেই। সি পি এমের গায়ে কর্ম নিষ্কপের নোংরা কাজ যারা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে করেছে, তাদের জবাবদিহি না চেয়ে, যারা প্রকৃত খুনি এবং তাদের মন্ত্রণাদাতা, সংগঠক এবং রক্ষক, তাদের মনোহাস উন্মোচিত না করে, কি করে খুনোখুনির রাজনীতি বন্ধ হবে? সুতরাং আজ ববদ সেনগুপ্ত মহেন্দ্র চক্রবর্তীরা যা বলে সাধু সাজতে চাইছেন, তা তো চলবে না, জনসাধারণ তা চলতে দিতে পারেন না।

এই রোগকে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে জবাব দিতে হবে যে কলকাতায় তাঁর খাস দপ্তরের হুঁ রিসার্চ ও এনালিটিক্যাল ডিভিসন রয়েছে তার ডেপুটি ডিরেক্টরের চিঠি নং সি ৪/সি ৭১ তাং ৩রা এপ্রিল যা তিনি পশ্চিমবঙ্গে ডি আই (সি আই ডি)-কে লিখেছিলেন তা সত্য কি না? কেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে এত দীর্ঘদিন ধরে চুপ করে আছেন? পুলিশের

আমলা রাজিত গুপ্ত, প্রসাদ বসুদের জবাব দিতে হবে যে হেমন্ত বসু থেকে অজিত বিশ্বাস পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডগুলিতে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নব কংগ্রেসীদের নির্দেশ কি ঘৃণা ভূমিকা নিতে হয়েছিল। যে সব পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে খুন করার এবং খুনে সংগঠন তৈরী করার অভিযোগ রয়েছে তাদের অবিলম্বে সাসপেন্ড করতে হবে, এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত

হলে খুনী হিসেবে তাদের আদালতে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

আরো তদন্ত করতে হবে, কি ভাবে আইন অমান্য করে নব-কংগ্রেসী মন্ত্রীরা, নিয়োগপত্র সাইক্লোস্টাইল করে বিলিবিবরণ করেছে। কি ভাবে তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এরা লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় ও আত্মসাৎ করেছে বা করার চেষ্টা করেছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের বিবৃতি থেকে জানা গেছে যে নকশালী খুনেদের পুলিশ ধরলেই নব-কংগ্রেসী জমিদারেরা তাদের মৃত্যু করতে ছুটে যায়। জানা গেছে যে আদর্শবাদী কিছু তরুণ নকশালী হত্যাকারী আসলে কংগ্রেসী চাইদেরই ভাইবেরাদর। সুতরাং

গোপন যোগসূত্র প্রকাশ্যে জনসাধারণের সামনে উন্মোচিত করতে হবে। তাহলেই দেখা যাবে কারা আসল খুনে এবং খুনেদের মদ্রবদী।

সিদ্ধার্থবাবু বে-আইনী ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তৃত্ব দখল করে বসেছেন। তাঁর দল বিশ্বস্ত আমলা রাজ্যপাল এবং কর্মচারীদের ডিঙ্গিয়ে সংবিধান বাহিতভাবে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের আজ কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। নব-কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ পশ্চিমবঙ্গের সংবিধানগত অধিকার ভঙ্গ করে, গানের জোরে নব-কংগ্রেসী নেতা সিদ্ধার্থ রায়কে পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকেই এই ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া অবাঞ্ছিত বোঝাকে সদলে ভূমিতলে নিক্ষেপ করতে হবে।

এ ভাবে বারে বারে কংগ্রেসীরা সংবিধান অমান্য করেছে, আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে এবং শুধু পুলিশ মিলিটারীর জোরে, সংবাদপত্রের সহযোগিতায় নানা ধোঁকা-বাজী করে ক্ষমতার আসন বেদখল করেছে।

আনন্দবাজার-যুগান্তর গোষ্ঠী একথাগুলি ঢেকে রাখতে চায়। তারা তাদের মদ্রবদী নব-কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদকে জনগণের ঘৃণা ও ক্রোধ থেকে আড়াল করতে চায়। তাই তারা কাতারে কাতারে সাইক্লোস্টাইল করা চাকুরীর নিয়োগপত্র দেওয়া যে বে-আইনী ও নিয়ম-বাহিত তা গোপন করে। তারা গোপন করে যে নব-কংগ্রেসীরা যে নিলক্ষজন্মে দলীয় স্বার্থে সরকারী প্রশাসনব্যবস্থাকে ব্যবহার

করছে, তার সামান্যতম দৃষ্টান্তও জ্যোতি বসুদের মন্ত্রিসভার আমলে পাওয়া যাবে না। তারা নব-কংগ্রেসী নকশাল নামধারী খুনে-গুন্ডাদের ঢেকে রাখতে চায় যে ভাবে একদিন তারা বেলঘরিয়ার হাস, ডিকসন লেনের খুনে গুন্ডাদের ঢেকে রেখেছিল। কলকাতা শহরের সেরা সেরা খুনে গুন্ডার কাদের দলের লোক? বিধানবাহু থেকে বিজয় নারায়ণ সবাই কাদের প্রায় দিয়ে এসেছিলেন? কংগ্রেস পি ডি এফ আমলে ইন্দু মিত্রদের দল স্টেনগান নিয়ে ট্রাক বোকাই করে বেলঘরিয়া আক্রমণ করার পেছনে কারা ছিল, সেদিনও কোন খুনের দল বধমানের আহ্বাদিপূরে ট্রাক বোকাই করে গিয়ে আক্রমণ করে শত শত ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে?

আজকের দিনে সংবাদপত্র-গুলো কংগ্রেসী জয়ঢাকের ভূমিকা ছেড়ে কি করে জনসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করবে? তাই কি তারা এসব ঘটনায় নীরব?

তাই সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত ঘোষ চক্রবর্তী ভাড়াটে সাংবাদিকরা আসল খুনীদের আড়াল করার জন্যে কুস্তীরাস্ত্র বিসর্জন করছে, আর বলছে কোনো অভিযোগ প্রত্যাবিযোগ করা উচিত নয়। যেন তারা এতদিন একতরফা মিশ্র অভিযোগ চালিয়ে যায় নি, যা এখনো চালিয়ে যাচ্ছে না? যেন তারা সত্য সত্যি খুনোখুনির বিরুদ্ধে।

পেট্রিয়ট ও লিঙ্ক পত্রিকা এবং অরুণা আসফ আলীর প্রগতিশীলতার স্বরূপ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া প্রভাবান্বিত নয়া দিল্লীর দৈনিক পেট্রিয়ট এবং সাপ্তাহিক লিঙ্ক পত্রিকার প্রকৃত মালিকানা কার এই প্রশ্নের সদৃশ পত্রিকা দুটি প্রতিষ্ঠিত হবার দিন থেকেই কখনও পাওয়া যায় নি। পত্রিকা দুটির প্রাণদায়ী বলে পরিচিত বিরাগ্লিশ-এর এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেত্রী শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি কখনও বলেন নি কি ভাবে কোথা থেকে কার কাছ থেকে প্রায় তেরো বছর আগে আট লাখ টাকার মত বৈদেশিক মদ্রা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এই টাকার জোরেই স্থাপন করা হয় রাইসিনা পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড বারী হলেন পেট্রিয়ট এবং লিঙ্ক পত্রিকার প্রকাশক। শ্রীমতি আসফ আলি এর

পরেও বাষাট্ট সালে ডিফেন্স এন-টাইটেলমেন্ট স্কীমের আনুকুল্যে নাকি প্রায় পঁচিশ লাখ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। অন্ততঃ কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের নির্ভরযোগ্য মহলের খবর তাই। এই এনটাইটেলমেন্ট স্কীমের সুবিধে হচ্ছে যে প্রাপক বৈদেশিক মদ্রাদাতার পরিচয় ইচ্ছা করলে গোপন রাখতে পারতেন এবং তাঁর সংগৃহীত বৈদেশিক মদ্রার অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রী করতে পারতেন। মনে রাখতে হবে ভারত সরকার এই স্কীম চালু করেছিলেন চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় যখন ভারতের আশু বৈদেশিক মদ্রার প্রয়োজন ছিল।

পেট্রিয়ট এবং লিঙ্ক পত্রিকা দুটি চালু হবার পর থেকে কর্তৃপক্ষের প্রমিকাবিরোধী মনোভাব দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এবং এ পর্যন্ত প্রায় তিনশ জন কর্মচারীকে চাকরী ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। বরখাস্ত কর্মচারী এবং পদত্যাগে বাধ্য করা কর্মীর মধ্যে অন্ততঃ বিশ জন হলেন প্রতিষ্ঠিত এবং বর্ষীয়ান সাংবাদিক। এঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই পত্রিকা দুটির কোন না কোনটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁরা অনেকেই চাকরী ছেড়েছেন বা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন কর্তৃপক্ষের অনমনীয় প্রমিকাবিরোধী মনোভাব এবং আচরণের প্রতিবাদ করার ফলস্বরূপ। এঁদের মধ্যে সর্বাপ্রগণ্য হলেন সি এন চিত্তরঞ্জন। ইনি গত বছর লিঙ্ক পত্রিকার সম্পাদক পদে অভিষিক্ত হন।

মুক্তাঞ্চল ও খুনোখুনি প্রসঙ্গে

পাঁচশে জুনের “মতামতে” সন্তোষকুমার রায়ের লেখা “মুক্তাঞ্চল সম্পর্কে কিছু তথ্য” প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

স্বাধীনভাবে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে আজকের অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়। গণ-আন্দোলন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সি পি এমের গুন্ডামী বাড়ার অভিযোগও বাড়ছে। অন্য দলগুলোও একই অভিযোগে অভিযুক্ত। নকশাসিদ্ধের জন্ম তো খুনোখুনির মধ্যে। তারপর দেওয়ালে বন্দুক ঝাঁক তাদের বাহা শব্দ হয়। আজ হয়ত সেই ছবি থেকে কিছু বন্দুক তারা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া শব্দ করেছে, কিন্তু অন্যান্য চপ করে বসে নেই। সবাই সংগ্রহে তৎপর। শ্রেণী-শত্রু খতম করার নামে বদলা নিতে হবে যে। আর এই বদলা নেবার রেশোরেশি থেকে সর্বাধা বাড়ছে অপর একটা দলের, খাঁরা রাজনীতিকের গ্রাহ্যই আনে না; যে কোন লোকের, এমন কি সাধারণ শ্রমজীবীর সারা সপ্তাহের মজুরীটুকু ছিনিয়ে নিয়েও তারা ফর্ত করে চলেছে। এদের আবার মদদ যোগাচ্ছে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাধারণ মানুষদেরই পকেট কেটে যে বিরাট বাহিনীকে পোষা হয়, সেই মহামান্য ব্যক্তিরা। তাই সাধারণ মানুষ আজ ভীত, নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রহ। এ অবস্থা থেকে একমাত্র সাধারণ মানুষের শত্রুদেরই লাভ হতে পারে।

কিন্তু তবু সন্তোষবাবু আশা দিয়েছেন, মুক্তাঞ্চলের সাধারণ মানুষ এত সুখী যে অন্যান্য অঞ্চলের লোক সেখানে উঠে যেতে চাইছে। একথা যদি সত্য হয়, তবে তো খুব আনন্দের কথা। কিন্তু এ-আনন্দের স্থায়িত্ব কতটুকু তা একবার তিনি ও তার বিশ্বাসের শরিকেরা ভেবে দেখবেন কি?

মুক্তাঞ্চলের আসল চেহারা

আপনাদের কাগজে জনৈক সন্তোষ কুমার রায় লিখিত একখানা চিঠিতে কলিকাতা ও আশেপাশের কোন কোন মুক্তাঞ্চল সম্পর্কে বর্ণনা পড়লাম।

বাস্তবের সঙ্গে রায় মহাশয়ের মুক্তাঞ্চলের বিবরণের মিল নাই। কোন একটি তথ্যার্থিত মুক্তাঞ্চলের এককালের বাসিন্দা হিসাবে দীর্ঘদিন ধাবণ কৃষিবিস্তারীদের বিপ্লবী কার্যকলাপ লক্ষ্য করার ও ভোগ করার দুর্ভাগ্য আমার হইয়াছে। সেই সুবাদে সভয়ে বলিতে পারি এই মুক্তাঞ্চল আসলে খুন, বোমাবাজী, জুলুম করিয়া টাকা আদায় ও আরও বহুবিধ অপরাধমূলক কাজের লীলাক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এসকলই অবশ্য করা হয় বিপ্লব বা তথ্যার্থিত কৃষিবিস্তারের নামে। যদিও এই অঞ্চলে দশ মাইলের মধ্যে কোন কৃষিকার্য

মুক্তাঞ্চল হয়ত স্বর্গরাজ্য; কিন্তু সেখানে আবস্থ থাকলে মানুষের তো চলবে না। পেটের দায়ে সবাইকে বাইরে আসতে হবেই আর সরকারী বা বেসরকারী পুঞ্জিপতিদের পদসেবা করে যেতে হবেই। কেউ কেউ হয়ত আসবেন না; তারা অপরের শ্রমে ভাগ বাসিয়ে নিজেদের পেট ভরাবেন এবং এইভাবে, এক নয়া-শোষণের রাজত্ব কায়ম করবেন। এদিকে অবস্থার যেভাবে অবনতি ঘটছে, পুঞ্জিপতিরা এখন তাদের ধন-মান নিয়ে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। যদি

না, আজকের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চরিত্র দেখে তা আর মনে হয় না, ওই দেশগুলোর লক্ষ লক্ষ বিপ্লবীর আত্মদান ব্যর্থ হয়েছে। তাইতো দেখি, চুরাম বছরের বড়ো সোভিয়েত দেশ পুঞ্জিপতিদের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে চলেছে, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ এমন দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য করছে; আর সে দেশের মানুষ চোরাপথে বিদেশী বিলাসদ্রব্য পাবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাঁচশ বছর পরে পোলাণ্ডে শব্দ খেতে চেয়ে মিলিটারীর গুলিতে শ্রমিকেরা

মতামত

কখনও সেদিন আসে, তখন নয়া-শোষণের আর পেটে দানা-পানি পড়বে না। সবারই শাসনে অস্থকার ঘনিষে আসবে।

বিপ্লবীরা হয়ত ঠিক এই অবস্থাকে স্বাগত জানাবার জন্যই অপেক্ষা করে আছেন। ভাবছেন, তখনই বিপ্লব হয়ে যাবে। তাঁদের হাতে রাষ্ট্রকমতা এসে যাবে। জনগণের দৃষ্টি তাঁরা চিরদিনের জন্য ছুঁচিয়ে দেবেন। অবশ্য তাঁরাও জানেন, জিনিষটা এত সোজা হবে না। প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রশক্তি বিপ্লবীদের সমস্ত আশা মূছে দিতে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাঁরা তার মোকাবিলা করবেন ভিয়েতনামের মত সংগ্রাম করে। যেদিন এ সংগ্রাম শেষ হবে সেদিন শ্মশানে চন্ডাল ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গ কুকুর শিয়ালের মত বেঁচে থাকবে কিছু মানুষ। তারপর, তারা কি সবাই সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদে উত্তরণের পথ ধরবে?

হয় না। ইহা যদি বিপ্লবের ফলস্বরূপ মুক্তাঞ্চল হয় তবে আমি বা আমার মত আরও অসংখ্য মানুষ কোন মুক্তাঞ্চল চাই না। সোভিয়েত-বংশীয় বিপ্লব বা মুক্তাঞ্চল সম্পর্ক অন্য জিনিষ। এই সকল মুক্তাঞ্চলের সমর্থকদের আমি চিরদিনই দেখিয়াছি কায়মী স্বার্থের প্রতিভূ শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল ও তাহাদের সেবাদাসদের সমর্থন করিতে।

ভারতে বর্তমানে কোন মুক্তাঞ্চল নাই। মুক্তাঞ্চল গাড়িয়া ওঠার মত কোন বাস্তব ভিত্তিও নাই। বর্তমান ভারত উনিশশো তিরিশ বা চল্লিশ সালের চীন দেশ নয়। তথ্যার্থিত মুক্তাঞ্চলের প্রবক্তাদের সম্পর্কে শব্দ মহান লেনিনের একটি কথাই বলা চলে “শিশু-সুলাভ বাচালতা”।

অরুণকুমার সেন

প্রাণ দিচ্ছে। চীনের শ্রমিকেরা হয়ে পড়েছে মিলিটারী আর পার্টি সদস্যদের দাস; তাদের হুকুম, খবরদারী ও রক্তচক্ষুর সামনে শ্রমিকদের মূখ বৃজে কাজ করে যেতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও নতুন এক একটা বিপ্লবের নামে প্রায়ই হাজার হাজার স্বদেশবাসীকে খুন হতে হচ্ছে। অত আত্মত্যাগের পরে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আজ আমাদের দেশে এত দলাদলি, খুনোখুনি, বিশেষ করে এককালের বন্দ বা পরিচিৎকে শ্রেণীশত্রু নাম দিয়ে খুন করার মধ্যে কি সার্থকতা থাকছে?

আজকের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিপ্লবী আন্দোলনের শব্দ থেকে এমন কোন হুটি থেকে গিয়েছিল বার ফলে আজ তাদের নানা বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে। তাই আজ শ্রেণী শত্রু হত্যার নামে গরীব পরিবারের ছেলেদের অকারণ হত্যা বন্ধ করে সেই হুটিটা আগে খুঁজে বার করা উচিত। ঘুরে ফিরে সেই আবিচারই যদি বজায় থাকে, তবে কিসের জন্য এই সংগ্রাম।

যেমন লৌহশলাকার একটা ক্ষুদ্র অংশে অনবরত তাপ দিয়ে গেলে সেই অংশটুকুই পড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনি, ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে শব্দ পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে গেলে এই অঞ্চলটাই পড়ে ছাই হয়ে যাবে, ভারতের কিছু হবে না, মেহনতি মানুষদের তো কিছুই হবে না। যতই শ্রমিক কৃষক বলুন, বিপ্লবী আন্দোলনের মূলে থাকে ছাত্র ও শিক্ষিত লোকেরা। অথচ ভারতের অন্য অংশের এই শ্রেণীর মানুষদের চেতনা এতই দীন যে অস্তিত্ব আগামী দশ বছরে তারা কমিউজমের কথা ভাববে না, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। তাই এই অবস্থায় বন্দুহত্যা আর মুক্তাঞ্চল করে শব্দ হত্যা আর

ধবংসের আগুনেই ইন্দ্রন যোগানো হবে।

এত বিপ্লবী কথার মাঝে যে-জিনিসটা সবচেয়ে গোলমালে ঠেকে তা হচ্ছে, বিবদমান দলগুলো অনেকেই মার্কসবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু তবু তারা এক নয়। এর থেকে তাদের সত্যতায় সন্দেহ জাগে। মার্কসবাদ চায় মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণের অবসান। কিন্তু আজও প্রতিটি মার্কসবাদী দলের অধিকাংশ সদস্য ও সমর্থক তাদের নিজেদের বাড়ীর ক্ষুদ্র গন্ডীটুকু থেকেও শোষণের অবসান ঘটাতে পারেন নি যা করা সহজ ছিল। সেখানে, মেয়েরা আজও মধ্যবিত্ত দাসীবৃত্তি করে যাচ্ছে, ভাড়ার কাছ থেকে হারে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, বিবাহে যৌতুক আদিও চলছে, এছাড়া প্রাম্ভ, পুজা ইত্যাদি বারো মাসে তের পার্বণ তো লেগেই আছে। আমার মনে হয়, এই রকম মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কাজ হাসিল করার ধাম্ভ্য থাকার ফলেই কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে প্রায় পঞ্চাশ বছরের বড়ো হবার পরেও নিত্য-নতুন সম্ভান প্রসব করে যাচ্ছে। ফলে, সমস্যা, হুটি ও বিচ্যুতি আরো বেড়ে যাচ্ছে।

তাই আজ সবার আগে, সব-দিক বিবেচনা করে কালমার্কসের মতের অনুগামী ব্যক্তি ও দলগুলো প্রতিভ্রম্যশীল দলগুলোর সঙ্গে অনর্থক গাটছড়া বাঁধার প্রবণতা ত্যাগ করে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের সংহত করে তুলুন। তৎপর প্রথমে নিজেদের ও পরিবারবর্গকে মার্কসবাদে পুরোপুরি দীক্ষিত করে তুলুন। দেখবেন, তখন এত

লেখালিখি আর গলাফাটনের দরকার হবে না। আপনাদের দৃষ্টান্তই নিচের তলার মানুষদের উদ্দেশ্য করবে।

এসব কথা থেকে আমি শান্তিপূর্ণ কোন পরিবর্তনের কথা বলতে চাইছি না। সংঘর্ষ হবে। তবে সোঁদনের সেই সংঘর্ষে সারা ভারতের মেহনতী মানুষকে সঙ্গো পাওয়া যাবে। আজকের সংঘর্ষ আত্মঘাতী।

পেটের কলের মজুর কদিন সি পি এমের মিছিলে থাকলে বা মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রটা নকশালদের দুটো পোপটার মারলে শ্রেণী-শত্রু হয়ে যায় না। আজকের দিনের সবচেয়ে বড় শ্রেণী শত্রু সেইসব বড় বড় অনমনীয় মালিকরা যারা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী মেনে না নিয়ে মাসের পর মাস তাদের ধর্মঘটের মুখে ঠেলে দিয়ে অনশনে মারার চক্রান্ত করে। অথচ মজুর ব্যাপার, এরা বেশ বহাল তবিয়তেই আছে।

অনুরোধ মার্কসবাদী হয়ে ঘটনাবলীকে স্রোতের মত বয়ে চলে হাঁতের বাইরে যেতে দেবেন না। মার্কসবাদ যদি বিজ্ঞান হয়, প্রতিটি মার্কসবাদীর বিজ্ঞানীর মত সহনশীলতা, অধ্যবসায় ও সত্যের প্রতি আনুগত্য থাকা উচিত। আর এই দৃষ্টিভঙ্গীতে, বৃহত্তর জনসমষ্টির অনগ্রসরতার দিকে তাকিয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীতে, বৃহত্তর জনসমষ্টির অনগ্রসরতার দিকে তাকিয়ে নিজেদের সুসংহত করে দেশোপযোগী সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করুন। তবে সবার আগে, আজকের আত্মঘাতী সংঘাত বন্ধ করুন।

একজন সাধারণ শ্রমিক

সংবাদপত্র ও আমরা

গত দোসরা জুলাইয়ের দর্পণে “সমাচার দর্পণ” স্তম্ভে প্রকাশিত “সংবাদপত্র, না বিজ্ঞাপনের হ্যান্ডবিল” শীর্ষক মূল্যবান রচনাটি পড়লাম। লেখক পশ্চিমবঙ্গের অর্থলোলুপ জনৈক সংবাদপত্র মালিকগণের দেশপ্রেমিকের মূখোশ খুলে দেওয়ায় খুশী হয়েছি। শব্দ পাঁচশে জুন কেন, যে কোন দিনের কাগজ দেখেই মনে হবে সংবাদপত্র নয়, বিজ্ঞাপনের হ্যান্ডবিল। পাঁচই জুলাইয়ের আনন্দবাজারের অষ্টম পৃষ্ঠার মধ্যে প্রায় তিরিশ কলাম বিজ্ঞাপনে ঠাসা। শেষ পৃষ্ঠার “আনন্দমেলা”র তিন চতুর্থাংশই বিজ্ঞাপন। বলা বাহুল্য, ছোটদের জন্য নির্দিষ্ট এই পৃষ্ঠাটি সপ্তাহে মাত্র একদিন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই পৃষ্ঠাটিকে বিজ্ঞাপন মস্ত রাখার জন্য “নিখিল ভারত ডানপিটের আসর” বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। সম্ভবতঃ একচেটিয়া ব্যবসার জন্য এরা জনমতকে তোয়াক্কা করে না।

পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক সংবাদপত্রগুলি শব্দ যে পাঠকদের প্রতি

দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে দীর্ঘদিন ধাবণ চরম অবহেলা দেখিয়ে আসছেন তাই নয়, যে কোন লেখা এমনকি পাঠকদের মতামত প্রকাশের ব্যাপারেও এরা কোন রীতিনীতির ধার ধারে না। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কোন লেখা সম্পর্কে পাঠকদের সুচিন্তিত অভিমত সংশ্লিষ্ট পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করার রীতি দীর্ঘদিন ধাবণ চলে আসছে। কিন্তু দৃষ্টির বিষয়, আলোচ্য সংবাদপত্রগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে সে রীতিনীতিও মানে না। কোন লেখা সম্পর্কে পাঠকগণ সাধারণতঃ দুই ধরনের চিঠি লেখেন (এক) প্রশংসামূলক (দুই) নিন্দাসূচক। প্রশংসামূলক চিঠিগুলি প্রকাশে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে একথা সুবিদিত। কিন্তু নিন্দাসূচক চিঠি অথবা কোন চিঠি পত্রিকা পরিচালকগণের অনুসৃত নীতি-নিয়মবাহী হলে তা প্রকাশের সংসাহস কদাচিৎ দেখানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পাঠকদের চিঠিগুলি কাজে লাগান হয়। কমিউনিজমের ঘোর- (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ও সিংহল

সন্ধানী

পাকিস্তানে জঙ্গীশাহী কাগজে-
কলমে মার্কিন মোড়লের দাঁটি জঙ্গী
জোটে (সেন্টো ও সিনাটো) দস্ত-
খত করেছে আজ অনেকদিন হোল।
কিন্তু জঙ্গী জোটে সরকারী সদস্য
থেকেও পাকিস্তান আজ পর্বন্ত
ঘুমন্ত শরিক হয়ে আছে। কোরিয়া,
ভিয়েতনাম, কঙ্গো মধ্যএশিয়া বা
সিংহলে, কোথাও সে ভারতের মত
সাম্রাজ্যবাদীদের সাক্ষরদী করতে
যায় নি, চীনা বিরোধী চক্রান্তেও
নয়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে
পাকিস্তান ভারতের চেয়ে বেশি
যুগোচিত প্রগতিশীল রাষ্ট্র। আসলে
পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী নিজেদের
রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ও অন্যান্য অসু-
বিধা বিচার করে কোন জঙ্গী-
জোটে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি এবং
ভারতের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক
থাকার দরুণ আত্মরক্ষার তাগিদে ও
চীনে পণ্যের বাজার পাবার আশায়
চীনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্তরে স্বাভাবিক
সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ভারত চীন
এবং আমার, দুজনেরই শত্রু; সুতরাং
জ্যামিতির সূত্র অনুসারে (দুটি
জিনিষ, তৃতীয় জিনিষের সমান হলে,
নিজেও সমান) আমরা বন্ধু ঠিক
যেমন সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল,
ব্রিটিশ, ভারত ও জার্মানীর শত্রু;
সুতরাং জার্মানী ভারতের বন্ধু।

পূর্ব বাংলার জনতা নয়া উপ-
নিবেশবাদের এক আধা-উপনিবেশের
উপনিবেশ স্বরূপ এবং পশ্চিমবঙ্গও
তাই। অই “দেনো” রাজনৈতিক
স্বাধীনতা জনতাকে শোষণমুক্ত করা
দুরে থাক, তাদের ঘাড়ে চাপিয়েছে
শোষণের ডবল জোয়াল, স্বদেশী
একচেটিয়া মনোভাব পৃষ্ঠার সঙ্গে
গেরো-দেওয়া বিদেশী নয়া-উপনিবেশ-
বাদী মহাজনী পৃষ্ঠা এবং এই স্বাধা-
রের সঙ্গে আরো যোগ করুন আধা-
সামন্ত-যুগোচিত ভূমি ব্যবস্থার
জোয়াল। কী দূরটো, জোয়াল তিনটে।
এই তিন জোয়াল মেহনতী জনগণের
ঘাড়ে চাপিয়ে নয়াদিল্লী পূর্ব-বাংলার
স্বাধিকারের শোকে মায়াকাম প্রচার
করে যাচ্ছে বেতার ও একচেটিয়া
কাগজ মারফৎ। মায়াকামের অশ্রুপাত
করছে দুনিয়ার যেখানে যত প্রতি-
বিলম্বী ও নয়া-উপনিবেশবাদী আছে
সবাই—কে কাকে টেক্কা দিতে পারে।
কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণের ন্যাক
স্বাশাসনের দাবির হয়ে যে মনোভাব
এ “অক্ষ” বা “ত্রিকোণ” এত ওকা-
লিত করেছে, সেই মনোভাব এই ত্রি-
মুখিত প্রত্যক্ষ সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করেছে
সিংহলীদের মস্তিষ্ক দাবি রক্তগঙ্গার
ভূবিদ্যে দিতে এবং পশ্চিমবঙ্গে
কার্ত্ত জঙ্গী বধেছাচারের স্বারা জন-
গণের বাঁচার দাবি পিষে মারতে।
এর চেয়ে বেশি ভয়ানক আর কি
হতে পারে। কিন্তু এটাও ঠিক যে
পশ্চিমবঙ্গের পাখা গজাচ্ছে। এপার ও
ওপার বাংলার কোটি কোটি প্রাণ
নিরে হিনিমিনি খেলা হচ্ছে বুর্জোয়া
শ্রেণীস্বার্থে। কিন্তু নিউটনের সূত্র
অনুসারে প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সমান ও
বিপরীত ক্রিয়া আছে এটা নাভিশ্বা-

সের যুগে ভুলে গিয়েছেন তাঁরা।
নয়াদিল্লী পূর্ব ভারতের
সীমান্তে সাম্য আইন ও “দেশের
নিরাপত্তার” (কোন দেশ, কিসের দেশ,
দেশ মানে মাটি না মানুষ?) খাতিরে
নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন
যার প্রকল্পে সুদূর হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।
দেশের নিরাপত্তা বিধিত কোন দিক
থেকে? বাইরে থেকে না ভিতর
থেকে? কাগজে বীরভূমে সামরিক ও
সাজোয়া যানের বহর থেকে কি এই
প্রশ্নের জবাব মেলে না, মেলে না
রোজ সৈনিক ও পুলিশের গুলিতে
ডজন ডজন যুবকের অকাল মৃত্যু
থেকে? কিন্তু এটা তো প্রমাণিত সত্য
যে শাসক শ্রেণী যখন সংসদীয় ধারার
শাসনে গদী বাঁচাতে পারে না, তখনই
তার গণতন্ত্রের পেম্বাক খুলে যায়,
প্রজন্ম ফ্যাসিবাদী চেহারা আত্মপ্রকাশ
করে এবং সে উৎকট জাতীয়তাবাদ
খুঁচিয়ে তুলে বাইরে থেকে “দেশ
বিপন্ন” ধরা তুলে জঙ্গীশাসন
লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এটা
বলিষ্ঠতার লক্ষণ নয়, দুর্বলতার।
তবে এইভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী যদি
মেহনতী মানুষের বাঁচার লড়াই-এর
অধিকার কেড়ে নিতে সক্ষম হয়,
তাহলে সেটা বামপন্থী আন্দো-
লনেরও দুর্বলতার পরিচায়ক কারণ
সেই আন্দোলনের নেতারা মেহনতী
জনতাকে বোকাতে পারেন নি যে
প্রত্যেক জাতির মধ্যে দুটি জাতি
থাকে—“ধনিক-ঋণিক শোষণ-
কারীর জাতি” যারা অন্যটিকে জোঁকের
মত শুষে, রক্ত কাড়ছে থালার ভাত”
(নজরুল)। স্বদেশী বুর্জোয়া নেতৃত্ব
লম্ব জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা
আজকের দিনে দেশে এ প্রথম জাতি-
টির হাতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ
ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে কারণ
আন্দোলনে মেহনতী জনতার পাটির
প্রাধান্য থাকে না। জাতীয়তার প্রগ-
তিশীল ভূমিকা আজ আর নেই।
বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী দেশের স্বশাস-
নের অধিকার বলতে বোঝায় শাসক
শ্রেণীর অবাধ শোষণের ও মনোকা
কামাকার স্বাধীনতা। এ স্বতীয়
জাতিটিই কিন্তু আসল দেশ বাদের
প্রথম জাতিটি প্রতারণার স্বারা যুদ্ধের
খোরাক বানায় “দেশের” নামে যে
“দেশের” নামে কুখ্যাত কাউটিকী
জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম-
র্থন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আত্ম-
পরিচয় লিখছেন,

“দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ
মুখের নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি
প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত।
সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা ভূমির
কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই
জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে
প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা
নিরে মানুষের সম্পদ কতটা গড়ে
তোলা হোল। মানুষের হাতে দেশের
জল যদি যায় শূন্যকরে, ফল যদি যায়
মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে
মারীবিজে শস্যের জমি যদি হয় বন্যা,
তবে কব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা

পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়,
দেশ, মানুষের তৈরী।”
রবীন্দ্রনাথ এ স্বতীয় দেশটির
কথা বলছেন যার নিরাপত্তার জন্য
আবার বাবাটি সালের মত অর্ডিন্যান্স
জারি হয়েছে, বিনা বিচারে আটক
আইন চালু হয়েছে, পূর্ব সীমান্তে
সাম্য আইন কার্যে করা হয়েছে।
আমাদের ধারণা শরণার্থীদের ফেরৎ
না নিলে ভারত যদি পূর্ব বাংলার
পিটুনি জাতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন
করে, তাহলে পাকিস্তান কাম্মীরে
বদল নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং
তারই জন্য আমেরিকা আট জাহাজ
অস্ত্র তাকে পাঠিয়েছে। আমেরিকা ও
ফ্রান্স বরের ঘরে মাসি, কনের ঘরে
পিসি। সাম্য-আইন ভারত-পাক
সীমান্তের যে অংশে বলবৎ অস্বাভাবিক
দুই মাসের জন্য সেটা লক্ষণীয়। নয়া
দিল্লী দুই বাংলার সীমান্তে গাল-
মোহর করেছে কি ওপার বাংলা
থেকে ইয়াহিয়াহা এপার বাংলা
আক্রমণ করতে পারে, এই আশঙ্কা?
ইয়াহিয়াহা কি এতই নিবোধ যে
পূর্ব-বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান
অর্থাৎ সেটি যে ভারত পরিবেষ্টিত
একটি পকেট স্বরূপ তা বোঝেন
না? কিন্তু যে গেরিলারা লড়াই
ইয়াহিয়াহা দসু্যদের বিরুদ্ধে তাদের
প্রয়োজনমত পিছু হটের বা আশ্রয়
নেবার পথ তো বন্ধ হয়ে গেল।
চট্টগ্রাম প্রীহটে ও কুমিল্লা অঞ্চলে
হালে যে চাবীরা গেরিলা যুদ্ধে নামছে
তারা যাতে সংক্রমণাত্মক রাজনীতি-
সম্মত প্রয়োজন মত ভাবতে কৌশল-
গত পশ্চাদপসরণ করতে না পারে
তার জন্যই এই সাধনানতা? এখানে
উল্লেখযোগ্য যে সীমান্তের আলোচ্য
অংশ একেবারে নাগাভূমি ও মণি-
পুরের (এই অঞ্চলের আদিবাসীরা
নয়াদিল্লীর উপর প্রসন্ন নয়) লাগোয়া
বলা যায় এবং তার পরেই রক্তের
কিছু মূত্র এলাকা আছে। পূর্ব-
বাংলার মস্তিষ্ক সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ-
বিরোধী গেরিলা জাতীয় ও দীর্ঘ-
স্থিত না হলে আসল বৈশ্বিক
জয়লাভ অসম্ভব অথচ আওয়ামী
লীগের ছয় দফা প্রস্তাবে সাম্রাজ্য-
বাদ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য নেই,
এমনকি শ্রেণী শব্দটি পর্বন্ত জনাব
মুজিব কোথাও উচ্চারণ করেন নি।
সত্যিকার মস্তিসংগ্রামে (আখ
কোটি শরণার্থীর সেই সংগ্রামে
গেরিলা যোদ্ধা হওয়া উচিত ছিল)
পেশাদার সৈন্য কখনো গেরিলা রাজ-
নীতি সচেতন মস্তিষ্ক যোদ্ধা হতে
পারে না।

স্বতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদ
অর্থাৎ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বর্ষা
ধ্বংস হওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গে
পূর্জিবাদী নন্দনকাননে লংকাকান্ড
সুদূর হয় এবং প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদের
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় বললেই চলে। তাই
সাম্রাজ্যবাদ (পূর্জিবাদের চরম পর্বায়)
প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ চলে যায়
(নয়া উপনিবেশবাদ) এবং তৃতীয়
দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের বুর্জোয়া-
সামন্ত গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক স্বাধী-

নতা দিতে বাধ্য হয়। এতে আপামর
জনসাধারণের মস্তিষ্কলাভ হয়নি। সেই
মস্তিষ্ক একমাত্র পথ গৃহযুদ্ধ যার
বর্ষাঘের লক্ষ্য দুটি—বুর্জোয়া-
সামন্ত মনোভাব গোষ্ঠী ও তাদের
মুদ্রবদী আত্মসমী নয়া-উপনিবেশ-
বাদ। এই বয়স হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর
নেতৃত্ব কৃষক গেরিলাবাহিনী। এদের
যুদ্ধই জনযুদ্ধ এবং বর্তমানে আন্ত-
জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্ত্রবল
অনেক বেশি বলে আচমকা আঘাত ও
পশ্চাদপসরণের স্বারা শত্রুক্ষয় ও
নিজেদের শক্তি দীর্ঘকাল বৃদ্ধি করতে
করতে শেষ পর্বায় নিজেরা যখন দলে
ভারি হওয়া যাবে তখনই আসবে চরম
মোকাবিলায় জন্য পাট্টা আক্রমণের
শব্দ সূচক। শেষ পর্বন্ত শত্রুর
অবস্থা ঘটবে চিয়াং কাইশেকের মত
এবং জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে।
বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা
আর অবশিষ্ট নেই বলেই আজ আর
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন
ওঠে না। কামিনফর্মের মনোভাবের
নাম ছিল এক জোড়া স্লোগান—
“অটুট শান্তির জন্য, জনগণতন্ত্রের
জন্য।” প্রথমটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও
তার দালাল সরকারগুলির বিরুদ্ধে
মস্তিষ্ক সংগ্রামের আহ্বান কারণ
আত্মসমী চরিত্র সাম্রাজ্যবাদের মস্তজাগত,
স্বতীয়রাই হচ্ছে এ যুদ্ধের চরম লক্ষ্য
জনগণতন্ত্র। এই থেকেই বোঝা যায়
যে আজ কোথাও, কোনো দেশে
বুর্জোয়া শ্রেণী প্রকৃত মস্তিসংগ্রামের
বল্লা গ্রহণ করবে না, করতে পারে
না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কিন্তু

বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। আও-
মামী লীগের নেতৃত্বের জন্য নয়া-
দিল্লীর এত “দরদর” কারণ এই যে
তাঁরা সবাই এক খোঁয়াড়েরই গরুর
সামিল এবং রতনে রতন চেনেন।
পূর্ব-বাংলার পশ্চিম বাংলার ও
সিংহলের ঘটনা একই সাম্রাজ্যবাদী
সূত্রে গাথা “অক্ষ, ত্রিকোণ”, “চতুষ্কোণ,
ইত্যাদি যা ইচ্ছা বলুন। এই তিনটি
জয়গার মস্তিষ্ক সংগ্রামের গর্ভপাত
কাঁরয়ে তালে গোলে হরিবোলের
অন্তরালে ভারত মহাসাগরে বিনা-
কাথার সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ঘাঁটি
খাড়া করা এবং সেই ঘাঁটি থেকে
দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যেকটি আসন্ন
মস্তিষ্ক সংগ্রাম অংকুরে বিনাশ করা,
এটাই সাম্রাজ্যবাদ ও তার পোষা
কুকুরদের (গ্রিমটিওর) চরম লক্ষ্য।
অমর ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত থেকে
কোন শিক্ষাই তাঁদের হয়নি। তালে
গোলে হরিবোলই শেষ পর্বন্ত সার
হবে, তাতে সন্দেহ নেই। আরো
আগে হোত যদি এই সব দেশের
প্রগতিশীল পার্টিগুলি মনে রাখত
যে বিনা ব্যতিক্রমে বিশ্বের সমস্ত
দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী বুর্জোয়া গণ-
তান্ত্রিক ধ্বংসা যুদ্ধে ছুঁড়ে ফেলে
দিবে ডলারের পারে স্বদেশের
স্বাধীনতা নজরানা দিয়ে বসে আছে।
এ সব দেশের প্রগতিশীলরা যদি
সত্যই দেশপ্রেমিক হতে চান, জনগণকে
নেতৃত্বদানের উচ্চাশা রাখেন তাহলে এ
ধ্বংসা তাঁদেরই কাঁধে তুলে নিতে হবে
কারণ তুলে নেবার আর কেউ নেই।

মতামত

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

তার বিরোধী স্টেটসম্যান কামিউ-
নিজমের নিন্দাসূচক অসংখ্য চিঠি
মাঝে মাঝে পাঠকদের কলমে প্রকাশ
করা হয়। অথচ কোনদিন এর
সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিরোধিতা-
মূলক একটি চিঠিও দেখা যায় না।
এ সম্পর্কে স্টেটসম্যান সম্পাদককে
প্রশ্ন করেছিলাম, আমার চিঠির
ফটোনোটের উত্তরে লেখা হয়,
“This column is what our
contributors make it” কিন্তু
একথা কি সত্য? স্টেটসম্যান
মালিকের অনুসৃত নীতির পরি-
পন্থী কোন মতামত কোন পাঠক
তার পরে প্রকাশ করলে সেই চিঠি
ওয়েবসাইটের বক্সে ফেলে দেওয়া
হয় না? এ ব্যাপারে অন্যান্য
সংবাদপত্র মালিকগণও কম যান
না। পাঠকগণ অবগত আছেন যে,
আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি
সংবাদপত্রগুলি সরকারী কর্মচারী-
দের বেতন বৃদ্ধির ঘোরতর
বিরোধী। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকার
পে-কমিশন নিয়োগের আদেশ
দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-
বাজারের “সম্পাদক সমীপেব্দ”
স্তম্ভে ও অন্যান্য ভাবে এর বিরো-
ধিতা শূন্য হয়। সরকারী কর্মচারী-
দের মাহিনাবৃদ্ধির চরম বিরোধি-
তামূলক জনৈক পত্রলেখিকার
একটি চিঠি প্রকাশের পর বর্তমান
পত্রলেখক পত্রলেখিকার যুক্তি খণ্ডন

করে একটি চিঠি লেখেন। কিন্তু
সে চিঠিটি প্রকাশ না করার এরূপ
সন্দেহ পোষণ করা কি অমূলক
হবে যে, বর্তমান পত্রলেখকের
জবাবটি পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নীতির
সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার তা
প্রকাশ করা হয় নি? বলাবাহুল্য
পশ্চিমবঙ্গের সচেতন পাঠকগণের
সংবাদপত্র মালিকদের এইসব
চালাকি ধরতে বেশী দেরি হয় না।
অজিতকুমার দাস

দর্পণ

দেবদাস লাক্ষ্যাহক

১১ চাঁদর হার

বার্ষিক পনেরো টাকা
বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা
দ্রোমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠানোর
ঠিকানা :
৩১, মট লেন, কলিকাতা-১৩

গ্রন্থ সমালোচনা

ভারতবর্ষে মাওবাদ প্রসঙ্গে

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ীতে যে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল তার থেকেই ভারতে মাওবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত এ-রকম প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করেছেন মাওইজম ইন ইন্ডিয়া * গ্রন্থের লেখক দিল্লীর বিখ্যাত সাংবাদিক মোহন রাম। ভারতে মাওবাদী বিপ্লবী চিন্তার সূত্র ঋজুতে গিয়ে তিনি চলে গেছেন আরও বছর কুড়ি আগের ঘটনাবলীতে। তেল-গানার কৃষক বিদ্রোহের ষাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অশ্বের সেই কমিউনিস্টরাই তাঁর মতে চীনের বাইরে পৃথিবীতে প্রথম মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মাও সে তুং-এর নয়া-গণ-তন্ত্রের তত্ত্বগত উত্থাপনা করেন আটচল্লিশ সালে কলকাতায় সি পি আই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে। বলা বাহুল্য চীনের মৃদু তখনও আসে নি। পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বি টি রণদিভে অশ্বের কমরেডদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে তাঁদের তত্বকে নাকচ করে দিয়ে মাওকে টিটো ও ব্রাড-ডারের পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন। পরে পার্টির সেই “বাম সংকীর্ণতাবাদ” শেষ হলে রণদিভের পদ-চ্যুতির পর অল্প কিছুদিনের জন্যে পার্টিতে মাওবাদী চিন্তা প্রাধান্য পেয়েছিল। তাও শেষ হয়ে গেল চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী একস্র সালে সোভিয়েট হস্তক্ষেপের ফলে। তেলগানার বিপ্লবী আন্দোলন গুলিটিকে নেওয়া হল। এ-দেশের কমিউনিস্টদের গায়ে তখন সংসদীয় গণতন্ত্রের দীক্ষা বাতাস লাগতে শুরু করেছিল।

এ-সব কথা বলেছেন মোহন রাম প্রচুর প্রামাণ্য দলিল ও বিবৃতির সমাবেশ ঘটিয়ে। অবশ্য সাংবাদিক হিসেবে তাঁর লেখার সংগে যাদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। এ গ্রন্থে তিনি যেসব কথা বলেছেন তার কিছু আভাস তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থ “ইন্ডিয়ান কমিউনিজম—স্প্লিট উইদিন এ স্প্লিট”-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। তিনি স্বীকারও করেছেন “দিস স্টাড ইজ এ ফলো অপ অন মাই অর্গানাইজার বুক, ইন্ডিয়ান কমিউনিজম—স্প্লিট উইদিন এ স্প্লিট...”। এ থেকে মনে হয় ভারতীয় কমিউনিস্টদের বহুধাভিত্তিক বিষয়টি দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আছে এবং এর সংগে এদেশে কমিউনিস্টদের আন্দোলনের বর্তমান খণ্ডিত রূপটির সংগে যে মাওবাদী আন্দোলন একেবারে

নিঃসম্পর্ক নয় তাও তাঁর বিশ্বাস। এবং এই মাওবাদী আন্দোলনের যে একটি সার্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন এ কথাও তিনি বলেছেন। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই পাঠক তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু আশা করে। বিশেষ করে সে-পাঠক যার কাছে এ দেশে মাওবাদী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নেহাৎ গোপল-মেলে ঠেকে এবং যাকে নির্ভর-যোগ্য সংবাদ, তথ্য ও আলোচনার অভাবে বাধ্য হয়ে বুদ্ধোন্মাদ সংবাদ-পত্রে কর্মরত সাংবাদিক, আমলা, পুলিশ, প্রতিনিধিবর্গ ও নয়া-সংশোধনবাদী এদের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও মোহন রাম সে পাঠককে নিরাশ করেছেন।

সাতাষটি সালের পর ভারতে মাওবাদী আন্দোলনে যে নতুন ঢেউ লেগেছে তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে একমাত্র সাক্ষ্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাও সে তুং চিন্তা অনুসরণকারী পার্টি হিসেবে যে-দাবী করছে সি পি আই (এম এল) চীনের স্বীকৃতির প্রমাণ দেখিয়ে, সে দাবী তিনি মোটেই মানতে রাজী নন। সি পি আই (এম এল)-এর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ নিম্নরূপ :

(এক) এ পার্টি বিপ্লবী কর্ম-কাণ্ডের মধ্য থেকে জন্ম নেয় নি। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সি পি এম-এর বিপ্লবী ঠাট বজার রাখা রাজনীতি থেকে যে সব মাওবাদী কমিউনিস্টরা সরে এসে অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ কমিউনিস্ট রেভলিউশনারী গঠন করেছিলেন তাঁদের মধ্যকার একটি উপদল নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে গিয়ে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে হঠাৎ জোর করে সি পি আই (এম এল)-এর পশুন করেন।

(দুই) এ পার্টির ভুল রণনীতি ও রণকৌশল বর্তমানে এ দেশে বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুরবস্থার কারণ।

(তিন) অশ্বের মাওবাদী বিপ্লবীরা যে রণনীতি ও রণকৌশল অবলম্বন করে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, সে পথেই একমাত্র ভবিষ্যতে ভারতে মাওবাদী বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সি পি আই (এম এল)-এর দ্বারা আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ এ পার্টি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

(চার) এ সবার জন্যে দায়ী চারু মজুমদার নামক একজন ছদ্ম মাওবাদী এবং পশ্চিম বাংলার তাঁর সমর্থক গোষ্ঠী।

(পাঁচ) চীন নেহাৎ দায়ে পড়ে এক সময়ে সি পি আই (এম এল)-কে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কখনও অন্যান্য

মাওবাদী গোষ্ঠীগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করে নি অথবা ভবিষ্যতে সমর্থন জানাবে না এ রকম ইংগিতও দেয় নি। সুতরাং তার এখন উচিত সমস্ত মাওবাদী গোষ্ঠীগুলিকে একত্র জড়ো করে একটি নতুন পার্টি তৈরী করে সি পি আই (এম এল) ও পশ্চিমবঙ্গের পার্টি বুদ্ধোন্মাদের হাত থেকে বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বাঁচানো।

ওপরের এই কথাগুলিই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোহন রাম তাঁর গ্রন্থে মূদ্রবন্ধ থেকে আরম্ভ করে ১৮৮ পৃষ্ঠার মধ্যে শতাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে বলে গেছেন। কিন্তু কোনরকম সিরিসস আলোচনার বা বিশ্লেষণের—যা এ মূহুর্তে ভীষণ প্রয়োজন—তাগিদ অনুভব করেন নি। ফলে বক্তব্যগুলি অতি সরলী-

করণের পর্যায়ে চলে গেছে। বর্তমান সমালোচকের বার বার মনে হয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থক একজন। সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও লেখক কেন অন্ততঃ সাংবাদিকতার খাতিরেও তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির জন্যে আর একটু বেশী পরিশ্রম করলেন না। বিশেষ করে, যে যে অঞ্চলগুলিতে বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে সে অঞ্চলগুলিতে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার এবং ইনটারভিউ ইত্যাদির পরিবর্তে তিনি দিল্লীর এক গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়ে কাজটি সেয়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন। লক্ষ লক্ষ কাঁচিওলা সংবাদপত্রের হুইস্কি গেসা সাংবাদিকেরাও তাই করে থাকেন। এঁদের পশ্চিম অথবা গণকংসদলভ আচরণকে লেখক প্রশংসাই বিদ্রূপ করে থাকেন। কিন্তু এ গ্রন্থে তাঁর নিজের সংগে এ-প্রকার সাংবাদিকদের ফারাক কোথায়?

অশ্বের মাওবাদীদের লাইনটি যে নিম্নরূপ একথা মেনে নিয়েও একটি প্রশ্ন থেকে যায় : এ দেশে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের বর্তমান

বিপর্যয়ের জন্যে একমাত্র চারু মজুমদার এবং তাঁর সমর্থক পশ্চিম বাংলার মাওবাদীরাই দায়ী—এ উক্তি কী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিচার পদ্ধতির অনুসারী? এবং মজুমদারকে এ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে কালো রং লাগিয়ে ভিলেন হিসেবে চিহ্নিত করার আতিশয্যে তিনি এ-রকম উক্তি করেন

“The removal from the scene of Mazumdar's detractors and critics in the party was too much of a coincidence and the mystery deepened with the arrest of Kanu Sanyal late in August because it was linked up with the reported differences between him and Mazumdar who had found West Bengal too difficult to operate from and has retreated to East Nepal”.

এরকম উক্তি আর ষাঁরা করে থাকেন তাঁদের মধ্যে আছেন বাজার-গরমকরা সাংবাদিক, পুলিশ ও সি পি এম-এর অন্ধ ক্যাডার।

অনৈতিহাসিক ইতিহাস-চর্চা

হীরেন্দ্র চক্রবর্তী

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ মতবাদের উদ্ভব শ্রুত এ-দেশের নয়, বিশ্বমানবের ভাবনার ক্ষেত্রে সদৃশপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যে কালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অপরাপর দেশে দাস প্রথাভিত্তিক সামন্ততন্ত্রের প্রাবল্য সে-কালে বৌদ্ধ তন্ত্রের মত কল্যাণমূলক লোকায়ত দর্শনের উদ্ভব এক ঐতিহাসিক প্রতীক। এই রহস্যের আলোচনা করতে গিয়ে এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন যে, এ প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ধর্মের মত অগ্রসর মতবাদের বিকাশ সামাজিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন করে।

একথা আজ আর তর্কের অপেক্ষা রাখে না যে, যে কোন ধর্মীয় বা দার্শনিক মতবাদের পশ্চাতে একটা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেরণা বর্তমান থাকে। সত্যানুসন্ধান করলে এই প্রেরণার পেছনেও সেই বিশেষ সমাজের উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থাকে ক্রিয়াশীল দেখা যায়।

এই হিসাবে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকের কোন কোন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হেতুপরিপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের পশ্চাতে শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছিল তা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনার কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হওয়া উচিত।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম : ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮০, দাম ছয় টাকা।

কিন্তু দৃষ্টির বিষয়, বৌদ্ধ ধর্ম বা তার প্রচারক রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের পারিবারিক জীবন এবং দার্শনিক মতবাদ, বৌদ্ধ সাহিত্য, সংঘ, ব্রতপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে যত আলোচনা, তার তুলনায় তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কিত গবেষণা এবং আলোচনার পরিমাণ নগণ্য।

গৌতমের সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি এই সাক্ষ্য দেয় যে, তৎকালীন ভারত রাজনৈতিকভাবে দাসতন্ত্রভিত্তিক বিভিন্ন স্বরাষ্ট্র রাজতন্ত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতন্ত্রে বিভক্ত ছিল। এই রাজনৈতিক চিত্রের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম রাজগৃহ মগধের পরাক্রান্ত রাজতন্ত্র বা গৌতম বুদ্ধের কার্যকলাপে তাঁর পৈত্রিক শাক্যগণরাজ্যের চেয়েও অধিকতর সহায়ক হয়েছিল। সমকালীন নিয়ত পরস্পর বুদ্ধবান বোলটি ভারতীয় রাজশক্তিকে একটি ঐক্যবন্ধ কেন্দ্রীয় রাজশক্তিতে ঐক্যবন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালে (আঃ শৃঃ পূঃ ১৪-৮ম শতক) কিন্তু কী পুরাণ কী আধুনিক ঐতিহাস কোথাও আলোকজালার পূর্ববর্তী ভারতে কোন সার্বভৌম রাজশক্তির দেখা পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক কেন্দ্রিকতার সংহতিসাধনে বৌদ্ধ ধর্মের ভূমিকা বিচারের বিষয়। আরো-বিচার্য যে, গ্রীক ভাবাধারার সংগে পরিচয়ের পূর্বপশ্চাত কোন চক্রবর্তী রাজশক্তির উদ্ভব ভারতে ঘটে নি। মোর্ষ চন্দ্রগুপ্ত ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক পুরুষ যিনি এ দেশকে রাষ্ট্রিক ঐক্য এবং স্থিতি দান

করলেন। কিন্তু গৌতম এবং চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে ব্যবধান দুই শতকেরও অধিক।

প্রাচীন সামন্ত-সাম্রাজ্য স্থাপনে বৌদ্ধ ধর্মের ভূমিকা কী? সমকালীন সামন্ত রাজশক্তি যথা মগধ কৌশল, পুর সেন, বৈশালী প্রভৃতির আনুদ্যুত প্রাধান্যবোধ।

আলোচ্যমান গ্রন্থ ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধের সমকাল, জীবনী, মতবাদ, সংঘ, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ও অন্তর্ধান প্রভৃতি প্রসঙ্গ স্বাদশটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক মানসিকতার ছিঁটে ফোঁটাও তাঁর আলোচনায় পাওয়া গেল না। তবে যারা সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, বইখানি তাদের কাজে লাগবে। এটিই যখন তাঁর বিষয় তখন এর চেয়ে ভাল কাজ তাঁর হাত থেকে বেরোন উচিত ছিল। রচনারীতি কলেজীয় নোট-পদ্ধতি দৃষ্ট। ইচ্ছাকৃত শব্দের শৃঙ্খল বানান তিনি জানেন না, না প্রুফ সংশোধন তিনি নিজে করেন নি?

আলোচ্যমান ব্যক্তি যদি হন কোন মহান পুরুষ বা ধর্মীয় অবতার এবং আলোচকের মনীষি যদি হয় তাঁর প্রতি ভক্তিসমাজ্য তাহলে সমালোচনা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। লেখক জ্ঞাপনীয় তথ্যের সমাবেশ যত ঘটিয়েছেন, সমালোচন তত্ত্বের দেখা তেমন করতে পারেন নি।

বইটির মূদ্রণপারিপাট্যের প্রশংসা করতে হয়। আরতনের তুলনায় মূল্যও সুলভ।

ভিয়েতনাম

কর্ণেল ডেভিড হ্যাকওয়ার্থের বয়স চল্লিশ। গত পাঁচ বছর তিনি ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকার পরে হঠাৎ পদত্যাগ করেছেন। প্রচুর সম্মানের অধিকারী হ্যাকওয়ার্থের এই সিদ্ধান্তে যারা বিস্মিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছেন তাঁদের তিনি একটি কথাই বলেছেন, “আমাদের এই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত হয়নি।”

হ্যাকওয়ার্থের মতে মিততীয় মহাযুদ্ধ মার্কি যে মানসিকতা নিয়ে মার্কিন সেনাবাহিনী ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ দেয় তা একেবারেই অচল প্রমাণিত হয়েছে এবং মার্কিনীদের বিপর্যয়ের মূল কারণ তাই তাঁর মতে গেরিলা কায়দার অনভ্যস্ত একটি ক্রিয়ার সেনাবাহিনী ভিয়েতনামে গিয়ে আর তাল সামলাতে পারে নি। তাঁর ভাষায়, “আমরা কখনও শত্রুর কায়দা বুঝে উঠতে পারি নি। সে তার নিজের সুবিধামতো আমাদের আক্রমণ করেছে ও মেরেছে।”

সোভিয়েত ইউনিয়ন

এখানে সম্প্রতিকালে অশ্লীল

পুস্তক বিক্রীর সংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে। খোদ ক্রেমলিনের খুবই কাছে একটি গলিতে প্রতি রবিবার এই ধরনের বই ও ম্যাগাজিন-এর ক্রেতা ও বিক্রেতাদের হাট বসে যায়। বইগুলি বেশীর ভাগই ডেনমার্ক, সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে চোরাপথে আসে। রুশ কতৃপক্ষ যে এখ্যাপারের কথা জানেন না তা নয়। তবে তাঁরা যে কোন ধরনের ব্যবস্থা এখনও নেওয়ার বিরুদ্ধে তা খুব সম্ভব এই ভেবে যে সাধারণ লোক যদি এইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে তাহলে তারা আর নিজ দেশে মার্কসবাদ প্রয়োগের ব্যাপারে যে প্রচণ্ড গৌজামিল চলছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

ইটালী

গত ছাব্বিশ বছর ধরে ইটালীর

বিদেশ দর্পণ

বোলোনা শহর পরিচালনার ভার রয়ে গেছে কমিউনিস্টদের হাতে। এবং আজ বোলোনা যে কোন দেশের নগর পরিকল্পনাকারীর কাছে একটি আদর্শ শহর হিসাবে পরিচিত।

বোলোনার, বর্তমান অধিবাসী সংখ্যা ছয় লক্ষ এবং নতুন যারা আসছেন তাঁদের জন্য আশেপাশে সতেরোটি উপনগরী গড়ে তোলা হয়েছে। তবে এর কোনটোতেই লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের উর্ধ্বে উঠতে দেওয়া হবে না। বোলোনা বোধহয় একমাত্র শহর যেখানে অনাথ শিশুদের অনাথ আশ্রমে না পাঠিয়ে সাত জনের এক একটি গ্রুপে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি গ্রুপ তিনজন করে সমাজসেবীর অধীনে রাখা হয় যারা অভিভাবকের অভাব দূর করার চেষ্টা করেন। অতি যুধদের জন্যও তাঁদের নিজ গৃহেই নগরপালের

দপ্তরের তরফ থেকে দেখাশুনা করার ব্যবস্থা আছে।

আয়ারল্যান্ড

হাউস অব কমন্সের সর্বকনিষ্ঠা সদস্যা কুমারী বার্নাডেই ডেভেলিন, যিনি সম্প্রতিকালের আলস্টার আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, এখন সন্তানসম্ভবা। কিছুদিন আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কুমারী ডেভেলিন তাঁর আগত সন্তানের পিতার নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন “আমার নীতিবোধ আমার নিজস্ব ব্যাপার।” এর পর আর কোনও প্রশ্ন হয় নি।

আমেরিকা

এককালের প্রচণ্ড যুদ্ধবাজ রবার্ট ম্যাকনামারা এখন ভিয়েত-

নামে মার্কিন জয় সম্পর্কে ‘সন্দেহান এবং অনেকাংশে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিরোধী। যে ম্যাকনামারা ১৯৬১ সালে আর্টই নভেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে বলেছিলেন যে “হ্যান্সকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তারা যদি ভিয়েতকংদের সমর্থন জানিয়ে চলে তাহলে আমরা উত্তর ভিয়েতনাম আক্রমণ করব এবং এ কাজের জন্য দু লক্ষের বেশী মার্কিন সৈন্য লাগবেনা”, সেই ম্যাকনামারাই ছ বছর পরে প্রেসিডেন্ট জনসনকে জানান “যে ভাবে আমরা একটা ছোট দেশকে মেরে শাস্ত্রতা করার চেষ্টা করছি তা মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না। ভিয়েতনামে সীমার বাইরে চলে গেলে সারা বিশ্ব আমাদের খিঙ্কার দেবে। আর ভিয়েতনামে আমাদের থাকার ব্যাপারটাই বিতর্কের বিষয়”।

এই দুটি বক্তব্যের খবরই জানা গেছে সম্প্রতি প্রকাশিত পেন্টাগন পেপারস থেকে।

প্যারিস বৈঠকে মাদাম বিনের সাত দফা প্রস্তাব

[সম্প্রতি প্যারিসে মার্কিন ও তাইবদার খিউ সরকারের সঙ্গে উত্তর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম জাতীয় মন্ত্রি ফ্রন্টের যুক্ত বৈঠকে উত্তর ভিয়েতনামের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাদাম বিন ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সাতদফা প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এতদিন মার্কিন কতৃপক্ষ বলতেন যে উত্তর ভিয়েতনামে বন্দী মার্কিন সৈন্য ও বৈমানিকদের মুক্তি দিতে উত্তর ভিয়েতনাম রাজী না হওয়ায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্যপসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর উত্তরেই মাদাম বিন-এর এই সাতদফা প্রস্তাব পেশ করা হয়।

দুইয়ের বিষয় কোন অদৃশ্য হস্তের ইচ্ছাতে সম্ভবতঃ আমাদের এখানকার কাগজে প্রস্তাবটি প্রকাশ করা হয় নি, যদিও প্রস্তাবের ভিত্তিতে মস্তব্য, রাজনৈতিক ভাষ্য প্রভৃতি অনবরত প্রচারিত হচ্ছে। তাই ঐ সাতদফা প্রস্তাবের পূর্ণ বঙ্গানুবাদ দর্পণ প্রকাশ করছে।

(এক) যদি মার্কিন কতৃপক্ষ একাত্তর সালের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সমস্ত মার্কিন ও মার্কিন পক্ষে যুদ্ধরত সমস্ত বৈদেশিক সৈন্যকে সরিয়ে নেবার নির্দিষ্ট কোন তারিখ ঘোষণা করেন, তাহলে যুদ্ধরত সকল পক্ষই একই সঙ্গে সৈন্যপসারণের সম্পর্কে নিম্নলিখিত কর্মসূচী পালনে সম্মত হবেন :

(ক) মার্কিন পক্ষভুক্ত সমস্ত মার্কিন ও অন্যান্য বৈদেশী সৈনিকদের নিরাপদে অপসারণ;

(খ) উভয় পক্ষের সমস্ত সামরিক বন্দী এবং যুদ্ধকালে ধৃত

অসামরিক বন্দীকে (উত্তর ভিয়েতনামে বন্দী মার্কিন বৈমানিক সহ) নিরাপদে যথাসম্ভব শীঘ্র দেশে ফেরার সুযোগ দেবার জন্যে অবিলম্বে মুক্তিদান। এই দুটি ধারা সম্পর্কিত শর্ত এক সঙ্গে একই দিনে পালন করতে হবে।

উভয় পক্ষ দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সমস্ত মার্কিন ও বৈদেশী সৈন্যপসারণ সম্পর্কে সম্মত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মন্ত্রি ফ্রন্টের সামরিক বাহিনী এবং মার্কিন ও অন্যান্য বৈদেশী সেনাবাহিনীর মধ্যে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি কার্যকরী করা হবে।

(দুই) মার্কিন কতৃপক্ষকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের স্বাধিকারকে কার্যকরী ভাবে মেনে নিতে হবে, এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারের সমস্ত প্রয়াস থেকে বিরত হতে হবে; বর্তমানে সাইগনে ক্ষমতাসীন যুদ্ধবাজ নগরেন ভ্যান থিউ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত গোষ্ঠীকে সমর্থন করা বন্ধ করতে হবে; এবং নির্বাচনে জালজুয়াচার সহ সর্ববিধ চালাকি অবলম্বন করে সাইগনে আমেরিকার পুতুল নগরেন ভ্যান থিউকে ক্ষমতা দখল করে থাকার অপচেষ্টার সাহায্য করা তাঁদের বন্ধ করতে হবে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শক্তিগুলি শান্তি ও জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার আগ্রহী তাঁরা সাইগনে একটা নতুন শাসন কতৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাঁদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করবেন; সঙ্গে

সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মন্ত্রি ফ্রন্টের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ঐ নতুন শাসন কতৃপক্ষের সঙ্গে বিবিধ উপায়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সমাধানের জন্যে আলোচনা সুরু করবেন :-

(ক) দক্ষিণ ভিয়েতনামে সম্পূর্ণ শান্তি ফিরিয়ে আনা থেকে অবাধ সাধারণ নির্বাচন অবধি সময় জুড়ে কাজ চালাবার জন্যে প্রসারিত ভিত্তিতে একটি ত্রিদলীয় সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, যে মহত্ব জাতীয় ঐক্যমতের নতুন সরকার গঠিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মন্ত্রি ফ্রন্টের সেনাবাহিনী এবং সাইগন কতৃপক্ষের অধীন সেনাদলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করা হবে।

(খ) যে সমস্ত ব্যক্তি যুদ্ধরত যে কোন পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক সমস্ত আচরণ, প্রতিশোধাত্মক কার্যকলাপ এবং সকল প্রকার সম্ভাসমূলক কার্যকে নিষিদ্ধ করা হবে এবং এই সমস্ত বন্ধ করার জন্য যথোপযুক্ত গ্যারান্টি-সহ সর্বপ্রকার কার্যকরী কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে।

(গ) দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়সঙ্গত সাধারণ নির্বাচন ধার্য করার জন্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁরা পারস্পরিক আলোচনা আরম্ভ করবেন।

(তিন) যুদ্ধ পরবর্তী কালের উপযোগী অবস্থানসারে ভিয়েতনামী পক্ষগুলি সবরকম বৈদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া, জাতীয় ঐক্যমত একতা ও পারস্পরিক আস্থা

ভিত্তিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনী সম্পর্কিত প্রশ্নটির সমাধানে রতী হবেন।

(ক) বৈদেশী প্রভাবমুক্ত হয়ে, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম উভয় এলাকার কতৃপক্ষ কোন প্রকার আগ্রাসী আক্রমণ বা জবরদস্তি দখল না করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও সর্বসম্মত চুক্তির ভিত্তিতে ধীরে ধীরে উভয় ভিয়েতনামের ঐক্য ও সংহতি সাধনের লক্ষ্য পূরণ করার প্রচেষ্টা করবেন। পুনরায় দেশের ঐক্য স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, দক্ষিণ ও উত্তর উভয় এলাকার মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অবাধ যাতায়াতের এবং, অবাধে বার্তাবিনিময়ের সুযোগ, যে কোন এলাকায় বিনাবাহার বসবাসের অধিকার সম্পর্কে গ্যারান্টি এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সমান্যধিকারের নীতি অনুসারে উভয় এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা;

(খ) ভিয়েতনাম সম্পর্কে চার্লস সালের জেনেভা চুক্তির ধারানুসারে বর্তমানে দেশের যে অস্থায়ী বিভাগ উত্তর ও দক্ষিণে দুটি আলাদা এলাকায় পরিণত, তার কোন অংশ কোন বৈদেশী শক্তির সঙ্গে কোনপ্রকার সামরিক মৈত্রী স্থাপন করতে পারবে না, কোন বৈদেশী শক্তিকে উত্তর এলাকার কোন অংশে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করতে দেবে না, অথবা সৈন্যদল, কিম্বা সামরিক লোকজনকে ভিয়েতনামের ভূমিতে আশ্রয় গাড়ে দেবে না এবং প্রতিরক্ষা বা সামরিক সাহায্যের জন্যে কোন দেশ অথবা বৈদেশিক

জোটের সাহায্য ভিক্ষা করতে পারবে না।

(পাঁচ) দক্ষিণ ভিয়েতনাম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পশ্চশীল নীতি অনুযায়ী, সমস্ত দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থানের তারতম্য না করে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং শান্তির স্বপক্ষে তার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত করবে।

(ছয়) ভিয়েতনামের উত্তর এলাকার জনগণের ওপর মার্কিন সৈন্যদল যে বিপুল ক্ষতি ও ধ্বংস-কাণ্ড চাপিয়ে দিয়েছে তার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হবে।

(সাত) যে চুক্তি সম্পন্ন হবে তা পালন করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি আদায়ের জন্যে চুক্তি ভুক্ত সকল পক্ষ সর্বসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

জেলকর্মচারীদের অসন্তোষ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

জন নকশালপন্থীকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে বলা হল যে পয়তাল্লিশ জন বন্দী নাকি পিটিয়ে মারা গেল। পরে দাবী করা হল, একুশ জনকে খরা হয়েছে।

কিভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটছে তার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া হচ্ছে না। বন্দীদের পিটিয়ে হত্যা করার কোন অধিকার সরকারের নেই, একথা সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা নাকি কয়েকটি রাজনৈতিক দল করছেন।

সিদ্ধার্থ রায়ের কাজের দায় রাজ্য কংগ্রেস নেবে না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য কংগ্রেসের একটি অংশ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে, সেই সঙ্গে দিল্লীর কতৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা শ্রীরায়ের সঙ্গে কোনক্রমে মিলেমিশে কাজ করতে রাজী নন। রাষ্ট্রপতি শাসনে পুন্নিশী জুলুম অত্যাচার প্রভৃতি বাই ঘটুক তার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি শাসন তথা রাজ্যপালের উপর চাপানো যেত এবং নির্বাচনের সময় বলা যেত রাষ্ট্রপতি শাসনকালে যা কিছু ঘটেছে তার জন্য কংগ্রেস দায়ী নয়। কিন্তু সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাকরণে বসে রাজ্য প্রশাসনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতি শাস-

নের উপর দোষ চাপাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন থেকে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দপ্তরবিহীন মন্ত্রী রূপে পশ্চিমবঙ্গে যা করবেন, তিনি চলে গেলেও তার সমস্ত কাজের দায়িত্ব কংগ্রেস সংগঠনের উপর বর্তাবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শাসনকে কেউ 'রাষ্ট্রপতি শাসন' বলবে না, বলবে কংগ্রেসের শাসন।

তাই বিজয় সিংহ নাহার গোস্বামী বক্তব্য হল কংগ্রেসকে বর্তমান শাসন পরিচালনা থেকে দূরে রাখতে হবে। দিল্লী যেমন তাদের কথা শোনে নি, তেমনি

তাদেরও দরকার নেই দিল্লীর প্রতিনিধির সঙ্গে সহযোগিতার। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিজয় সিংহ নাহার ও অন্যান্যরা গণ-তান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার ভেঙে দেবার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও তার অনুগামী ছাত্র ও যুব কংগ্রেস কর্মীরা চাপ সৃষ্টি করেই সরকারের পতন ঘটান। তারপর যখন দিল্লী থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিয়োগের প্রশ্ন ওঠে তখন বিজয় সিংহ নাহার বলেছিলেন কখনই যেন সিদ্ধার্থ রায় ও দেবী চট্টোপাধ্যায় মত কাউকে নিয়োগ করা না হয়। নাহার বলেছিলেন কে সি পক্ষ বা বি সি শুল্ক কাউকে নিয়োগ করা হোক। পশ্চিম বাংলার কাউকে নিয়োগ করলে শাসন ব্যবস্থার সব দায়ভাগ রাজ্য কংগ্রেসের ওপর পড়বে। তাতে ভবিষ্যতে নির্বাচনে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী সেই কথা শোনে নি, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও সেই যুক্তি মানেন নি।

শ্রীনাহার এখন কংগ্রেস সংগঠন নিয়ে খুব ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন আর সকলকে বলে দিচ্ছেন, ও-ঘাটে কেউ জল আনতে যেয়ো না, গেলে বিপদ হবে। সিদ্ধার্থ রায় কয়েকজন কংগ্রেস নেতা যারা প্রাক্তন মন্ত্রী বা বর্তমান এম পি তাদের নিয়ে একটি সেল গঠন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস নেতারা বলে দিয়েছেন, তাদের পক্ষে নিজের সরকারী কাজে জড়ানো সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে যারা শ্রীরায়ের দিকে একটু ঝুঁকিয়েছিলেন তাদেরও বেশ টাইট দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কয়েকজন কিছুদিন আগে কাগজে কিছু গরম কথা বলেছিলেন। রাজ্য কংগ্রেস সম্পাদক কৃষ্ণকুমার শুল্ক একটা শো-কজ নোটিশ দিতেই সকলে ঠান্ডা মেরে গেছেন। বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় দেড় পাতার এক পত্র লিখে বলেছেন, তিনি খবরের কাগজকে কিছু বলেন নি আর বিজয়দাকে কিছু বলা সে তো স্বপ্নেরও বাইরে। আরো দুই একজন যারা অনুরূপ দুই একটা গরম কথা বলেছিলেন তারাও একই ভাবে এখন লজ্জাবতী লতা হয়ে গেছেন।

শুধু তাই নয়, বিজয় সিংহ নাহার ও তার দলবল যতদিন মন্ত্রী ছিলেন ততদিন তাদের রাজ্য কংগ্রেসের সভা ডাকার কথা মনে পড়ে নি। সরকারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারেও কোন দিন একটা সভা হয় নি। এমন কি মন্ত্রীরা সবাই কংগ্রেস ভবনে আসাও ভুলে গেছিলেন। কিন্তু এখন ঘন ঘন রাজ্য কংগ্রেসের সভা ডাকা হবে। এর অর্থ, সিদ্ধার্থ রায় রাইটার্সে বসে যা করার করুন, কংগ্রেস চলবে নিজের মত এবং দরকার মত সেখানেও সিদ্ধার্থরায়কে সেনসর করা হবে।

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার কমিটি গঠনে নীতিহীনতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ভূক্ত কোন ছবির সঙ্গে কোনভাবে প্রদান সম্পর্কে নানান কৌতূহলোদ্দীপক কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। যখন বিভিন্ন পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তখন এবং তৎপূর্বেও। অনেকের হয়ত জানা নেই যে সরকারী বিধান অনুসারে মর্যাদা নির্ধারণের যে কমিটি নিয়োগ করা হয় বছরের পর বছর দেখা গেছে তার সদস্যদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বা অধিকাংশেরই চলচ্চিত্র শিল্পবোধের কোন পূর্বপরিচয় সাধারণের কাছে অজ্ঞাত। এই সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় বহুবার লেখালেখি হয়েছে। অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। সরকার সম্ভবতঃ নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমেই এখনও পর্বত প্রতিবার মর্যাদা কমিটি গঠন করতে ইচ্ছুক। আবার দেখা যায় যে এক বা একাধিক ব্যক্তি বারে বারে পুনর্নির্বাচিতও হচ্ছেন। জাতীয় কমিটির চাইতে রাজ্য কমিটিগুলির নির্বাচনে অধিকতর গোলমাল লক্ষ্য করা গেছে।

এবারকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিতে এমন এক ব্যক্তিকে নেওয়া হয়েছে কাহিনীকার বলে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত এক ছবিতে যার নাম আছে। সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক রূপে এর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। আমাদের প্রশ্ন একে কমিটিতে নির্বাচন করাটা কি আইনানুগ এবং তা যদি হয়েও থাকে তাহলে তা কি নীতি বিগর্হিত নয়। শোনা যাচ্ছে যে স্থানীয় কতৃপক্ষ নাকি আইনের এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে প্রতিযোগিতার অন্ত-

র্ভুক্ত কোন ছবির সঙ্গে কোনভাবে জড়িত কাউকে যে কমিটিতে নেওয়া চলে না তা নয় তবে ঐ ছবি সম্পর্কে কমিটিতে যখন আলোচনা চলতে থাকবে তখন তিনি অনুপস্থিত থাকলেই হবে অথবা উপস্থিত থাকলেও তাঁর নীরবতাই কাম্য। কয়েক বছর আগে বাংলার এক প্রতিষ্ঠাবান চলচ্চিত্র সমালোচকের এই কমিটিতে নির্বাচন সম্পর্কে একটি প্রভাবশালী বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা বেশ কিছু মন্তব্য করেছিলেন। কারণ সমালোচক মহাশয়ের কন্যা এমন একটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন প্রতিযোগিতার তালিকায় যার নাম ছিল। আমরা তখন পত্রিকাটির বক্তব্যের মধ্যে কোন গরমিল খুঁজে পাইনি। সেই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েই আমরা প্রশ্ন করছি যে এবারের মর্যাদা কমিটির নির্বাচনে এই গোলমালের জন্য দায়ী কে? এখান থেকেই তো কমিটির সম্ভাব্য সদস্যদের তালিকা কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। তাহলে কেন্দ্র না এখানকার সংশ্লিষ্ট অধিকর্তাকে দায়ী করব?

আর এটা আশা করা কি অনায়াস হবে যে আমাদের সাংবাদিক সাহিত্যিক বন্ধু অন্ততঃ নীতিগত প্রশ্নে এই কমিটিতে আর অংশ গ্রহণ করতে তাঁর অসামর্থ্য জানাবেন। আমরা তাহলে তাঁকে দৃষ্টান্ত তুলে অভিনন্দন জানাব। অবশ্যই আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ব্যাপারটা স্থানীয় কতৃপক্ষ তাঁর গোচরে আনেন নি।

চলচ্চিত্রে 'বাংলাদেশ' সমস্যা

স্বপ্নাঙ্কশেখর সান্না

যখন ইয়াহিয়া খান মিলিটারী শক্তি বাংলা দেশের গণসংগ্রামকে হত্যা করবার জন্য কাঁপিয়ে পড়ল, তার কিছু আগে থেকেই বাংলা দেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে সিনেমার পর্দায় ধরে রাখবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। প্রথম পর্বত্রে বিদেশী টেলিভিশনের মাধ্যমে ইয়াহিয়া-মুজিবর আলোচনার অধ্যায়গুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। তারপর মৌল মিলিটারীর এক অসম্পাদিত নির্বাচ চিত্রসমাবেশে দেখা যায় গণআন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলি এবং ফৌজী তাড়বের কিছু ভয়াবহ দৃশ্য। এরপর থেকেই আমাদের ফিল্মস ডিভিশন বাংলা দেশ সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরবার চেষ্টা করে আসছেন এ সম্পর্কে সংবাদ চিত্রের নির্মিত সরবরাহের মাধ্যমে। যুদ্ধের বিশদ দৃশ্যাবলী কিংবা মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতির বিবরণ বিভিন্ন কারণে অনেক সময়েই চিত্রায়িত করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কিত সবকিছু নিউজরীলই ভাবালুতা বর্জিত পরিমিতবোধে উজ্জ্বল এবং মানবিক আবেদনে সম্পূর্ণ। সম্প্রতি বাংলাদেশ উদ্ভাস্তদের বিষয়ে কয়েকটি সংবাদচিত্র নির্মিত হয়েছে এবং "রিফ্লেক্স, একান্তর" চিত্রসংকলনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশাল সমস্যার বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সমস্যার নাতিকখনও নেই, আবার সরকারী দীনমাহাওয়ার অবস্থা গুণকীর্তনেও সংবাদ পরিবেশন অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত নয়। শিল্পপরাই সহজ অথচ অর্থপূর্ণ। ক্যামেরা দূর থেকে শুধু নৈর্ব্যক্তিক বিব-

রণই চিত্রবন্ধ করে না, লোকের ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়, তাদের অন্তর্লীন মানসিকতার অংশীদার হয়ে কমুনিকেশনের এক নতুন মাত্রা তৈরী করে। বাংলাদেশ সমস্যার চিত্রায়ণে ফিল্মস ডিভিশন সংস্বাদচিত্র প্রযোজনার যে ঐতিহ্য তৈরী করলেন, আশা করি তা থেকে তাঁরা কখনোই বিচ্যুত হবেন না।

ফিল্মস ডিভিশনকৃত বাংলা দেশ সংক্রান্ত ছবিগুলিতে যখন সত্যের নতুন অধ্যায় সূচিত হচ্ছে, তখন ঐ সংস্থার উদ্যোগে পরিবেশিত ও স্বাতন্ত্র্যক পত্রিকাচিত্র "দুর্বার গতি পক্ষা" ছবি দেখে প্রচণ্ড হতাশ হতে হয়। সমস্ত ছবিটি অসংলগ্ন চিত্রমালার সমাবেশে, ছেলেমানুষি আবেগে টিউটবুর, শুল্ক নাটকীয় উপাদানে ভর্তি। বাংলাদেশ সমস্যার আসল চেহারা ধরবার কোন চেষ্টাই নেই, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন মিথ্যার প্রলেপে ছোপানো। বিবজিত্ব সেজেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা, নাগিস বিম্বজননীর রূপে আবির্ভূত। বোম্বাই-কলকাতার নামীদামী আরো অনেক চিত্রতারকা ভাড় করেছেন এ ছবিতে—প্রায় শঙ্কর-জয়কিশন নাইটের মেজাজে। অপটু কারিগরের কাঁচা হাতের ছাপ ছাড়িয়ে রয়েছে ছবির সর্বত্র। আর আছে উৎকট প্রতীকবাহুলা এবং ছবির শেষে রক্ত-রাগা পুমার চিত্রকল্পের সংযোজনে শৈল্পিক সংঘর্ষের সিনিনাদ বিসর্জন। ছবির শেষে সত্যিই ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। এখানে কোথায় স্বাতন্ত্র্য ঘটক? এতো "অযান্ত্রিক", "কোমল-গান্ধার" প্রচার প্রত্যাশা!

"অনীক" "বিপ্লবের গান" "চীন : ঘটনা ও রচনা"

প্রকাশক-সংস্থা পরিচালিত

সামাজ্যবাদবিরোধী প্রবন্ধ-সংকলন

পূর্ব দিগন্ত

॥ ২০শে জুলাইয়ের দ্বিতীয় সংকলনের বিশেষ আকর্ষণ ॥

বীরভূমে নকসাল আন্দোলনের নতুন অধ্যায়

পূর্ববঙ্গের আন্দোলন ও চীনের বক্তব্য

পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সাহায্যের তাৎপর্য

চীন-প্রত্যাগত দুজন মার্কিন সাংবাদিকের বিবরণ

২০১৭ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট কলি-৭ থেকে

১৮ই জুলাই থেকে বিলি হবে।

সম্পাদক-হীরেন বসু

সম্পাদক কতৃক স্বাক্ষর ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং স্ট্রীট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

পুলিশ ও প্রশাসনের গাফিলতিতে বা প্রত্যক্ষ যোগাযোগে

পশ্চিমবঙ্গে ত্রাসের রাজত্ব

বাইটার্জে সর্বদলীয় সভায় সাধারণ জ্বর

দপন

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

সিদ্ধার্থ রায়ের উদ্যোগে সর্বদলীয় শান্তি সভায় একটি সাধারণ সুর শোনা গেছে যে, পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের গাফিলতিতে ও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব চলছে, খুন জখম করার কোন লক্ষণ নেই, দোষীরা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভয়ে

ঘোরাফেরা করছে, আর নিরীহ সাধারণ মানুষ পুলিশের হাতে আর অন্যান্য ব্যাপারে প্রচণ্ড হয়রানির মধ্যে পড়ছে।

গত সপ্তাহের সর্বদলীয় সভায় আঠাশটি ছোট বড় রাজনৈতিক দল হাজির ছিল। জনসংঘ থেকে সুর করে সি পি এম পর্যন্ত প্রায় সবদলই পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে কিছুর না কিছুর বলেছে আর দাবী জানিয়েছে খোল নলচে না বদলালে অবস্থার উন্নতি হওয়া দৃষ্কর।

এত সত্ত্বেও কিন্তু সি পি আই নব-কংগ্রেস আর ফরোয়ার্ড ব্লক তাদের সি পি এম বিরোধী ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে

ভোলেন নি। এই দলের প্রতি-নিধিরা তাঁদের পুরানো কথা বলেছেন যে, হিংসার ও খুনোখুনির রাজনীতি সি পি এমই এই রাজ্যে প্রবর্তন করেছে। এখন অবশ্য নকশাল আর সমাজবিরোধীরা যদি এর সুযোগ নেয় তার দায়িত্ব বর্তাবে সি পি এম-এর ওপর।

এস ইউ সিও তার তথাকথিত তাত্ত্বিক বক্তব্যে অটল থাকে। হিংসার রাজনীতির মোকাবিলা করা যায় কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলগুলি যদি নিজেদের একটি আচরণবিধি ঠিক করে নেয়। অর্থাৎ আজকের খুনোখুনি মূলতঃ রাজনৈতিক দলগুলির আন্তঃসংঘর্ষের পরিণতি

(শেখাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

১৪শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা ২৩শে জুলাই ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

বীরভূমে 'শান্তি ফিরিয়ে আনা'র প্রচেষ্টা ব্যর্থ

পুলিশের আচরণে মিলিটারী ও প্রশাসনের কর্তারা বিক্ষুব্ধ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বীরভূম জেলায় "শান্তি ফিরিয়ে আনা" সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশ মিলিটারীর যৌথ অভিযানের ফলে শৃঙ্খলা সাধারণ মানুষের হয়রানি বেড়েছে, ধরা পড়েছে কিছুর নিরপরাধ যুবক। সারা জেলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এই ব্যর্থতার ফলে জেলার পুলিশও অন্যান্য বিভাগের মধ্যে প্রচণ্ড তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। জেলা শাসক প্রকাশ্যেই পুলিশকে বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী করছেন। তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে মিলিটারী অফিসাররাও একমত। এমনকি পুলিশের উপর মিলিটারী এমন চটে গিয়েছে যে তারা বলছে যে এধরণের নিষ্ফল অভিযানে তারা আর নিজেদের "ইমে-

জের স্বার্থে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়।

জেলা শাসকের মতে গত এক বছর ধরে পুলিশ নকশালী কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও কিছুর করে নি। এই অভিযোগও করা হয়েছে যে এই জেলার এস পিরা শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত যোগদান করে সুরদরী তরুণীদের সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্য, শিল্প নিয়ে আলোচনা করা ছাড়া আর কিছুর করেন না। এবং কর্তাদের এই অবহেলার সুযোগ নিয়ে থানা অফিসাররা নিজ নিজ এলাকায় নকশাল এবং সমাজবিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত করে নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে বাস করেন। অবস্থা বর্তমানে এমন দাঁড়িয়েছে যে এই

(শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বীরভূমের একটি গ্রামে ঘেরাও অভিযানের সময় পুলিশ এঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়

ওয়াগান ভাঙা ও রেলের সম্পত্তি চুরির কাজে লিপ্ত এক বিরাট চক্র

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত সপ্তাহে পশ্চিম বঙ্গ সরকার, পুলিশ, রেল এবং বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের একটি বৈঠক রাইটার্স বিল্ডিং-এ হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ রায় সভাপতিত্ব করেন।

রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নানা তথ্য হাজির করা হল এই কথা প্রমাণ করার জন্য যে, ওয়াগান-

ভাঙা আর রেলের সম্পত্তি চুরির ব্যাপারে একটি বিরাট চক্র কাজ করছে। এই চক্রে আছে রাজনৈতিক নেতা, সরকারী প্রশাসন আর পুলিশের একাংশ এবং বড় বড় ব্যবসাদাররা।

এই চক্র নানা জায়গায় পয়সা খরচ করছে ত্রাসের রাজত্ব কয়েম করার জন্য যাতে ওয়াগান ভাঙার কাজ নির্বিঘ্নে চলে। যখন নানা

জায়গায় হত্যা চলতে থাকে তখন হত্যায় বিরত থাকার অজুহাত দেখায় পুলিশ। আর রেল চুরি বাড়ে পুলিশের চোখের সামনে।

আরও দেখা গেছে যে, যারা মণ্ডবাদের নামে হত্যার রাজনীতি চালায় তাদেরই একাংশ রেল চুরির সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ সমস্ত জানে, কিন্তু কিছুর করে না।

(শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সাংবাদিক রাখাল নাহার হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়ায় স্থানীয় তদন্তে জানা গেল যে, সাংবাদিক রাখাল নাহা হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে হত্যার ভয় দেখান হচ্ছে, কারা এই ভয় দেখাচ্ছে তার কিছুর ইঙ্গিতও তিনি দেন। ম্যাজিস্ট্রেট মশায় যথারীতি এই খবর পুলিশকে জানান। কিন্তু দেখা গেল তিনদিন পরে রাখালবাবু ব্যাটারায় নিজ এলাকায় নিহত হয়েছেন।

তদন্তে আরও জানা যাচ্ছে

যে, রিপোর্টার হিসাবে তিনি পুলিশের বিভিন্ন স্তরে নানা যোগাযোগের কথা জানতেন। কি কিভাবে কংগ্রেসী নেতা বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় খুন হয়েছেন, আর হালেই কি অবস্থায় আরেক কংগ্রেসী নেতা শরদিন্দু শেঠ নিহত হলেন।

রিপোর্টার হিসাবে উদ্যোগী রাখাল নাহা পুলিশের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠছিলেন। শেষে নিজের জীবন দিয়ে রাখালবাবু তাঁর সাংবাদিক সত্যতা রাখার চেষ্টা করেছেন।

দর্পণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত।

খুনীদের ঢেকে রাখতে চাইছে

কংগ্রেস-লীগ প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে পড়ার মধ্যে অনেকগুলি অভাবনীয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে অজয় চাকুরী পেটোয়া স্বজনদের মধ্যে বিতরণ। রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের ঘোষণা রাইটার্স বিল্ডিং-এ এসে পৌঁছান দপ্পর পোশে বারোটা নগাদ। অজয় মদুজো এবং বিজয় নাহার মশাই রাইটার্স ছাড়লেন বেলা তিনটেয়, আর পাঁচ-মন্টীরা তখনও লুট-পাটের বথরা বিতরণ শেষ করতে পারেন নি, তাঁরা প্রায় সবাই সম্মুখ ছটায় যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল তখন মন্ত্রী কামরা ছেড়ে অনিচ্ছুক ভাবে চলে যেতে বাধ্য হলেন। এ প্রসঙ্গে অনেকেরই ডঃ নলিনাক্ষ সান্যালের কথা মনে পড়বে। ভদ্রলোক মন্ত্রিসভা খারিজ হবার পরের দিনও অফিসে এসে কাগজপত্র ঘাঁটিছিলেন। এঁরা শ্রদ্ধা কয়েক ঘণ্টা মাত্র বেশী “জনসেবা” করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এই বিসদৃশ বেহায়া-পনার কারণ ছিল। একজন তো খুলেই বলে ফেললেন যে হঠাৎ মন্ত্রিসভা চলে গেল, গৃহোত্তর সময় তো পাওয়া যায় নি, অন্ততঃ যে ছেলেগুলিকে চাকরী করে দেব বলে ইলেকশনে খাটিয়েছি; তারা তো এবার মাথার চাঁদ খুলে নেবে।

তাড়া খেয়ে, ভীত তস্কর যে ভাবে অপহৃত জিনিষ ছিড়িয়ে ছিটিয়ে দৌড়ে পালায়, এদের অবস্থা অনেকটা সেরকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খাদ্য দপ্পর আর উম্বাস্ত্র দপ্পরের মন্ত্রীদের পকেটে পকেটে চাকরীর এ্যাপলেন্টমেন্ট লেটরের গোছা, নাম প্রসাদ-প্রার্থীরা বসিয়ে নিচ্ছে। কেউ এমন নাম বসিয়েছে যিনি পর-লোকবাসী, কেউ বাবাটি বছরের বৃন্দ, কোন ভাগ্যবান এই চাকুরীর হরির লুটে গোটা চারেক চাকরী একাই বাগিয়ে নিয়েছেন। ফলে উম্বাস্ত্র দপ্পরে সাড়ে তেরো হাজার অস্থায়ী দিন মজুরের জন্য মন্টী এবং কংগ্রেস-লীগ “করাপশনে”র এম এল এরা ষোল হাজার নিয়োগ-পত্র বিলি করেছেন।

যে সৌভাগ্যবানরা এই তথ্য-কাথিত নিয়োগপত্র পেলেন, তাঁরা বদ্বর্তেও পারলেন না যে এটা তাঁদের বৈধ নিয়োগপত্র নয়, তাঁদের কোন মাস মাইনে নেই। তাঁদের কাজও নিতান্ত আশানুরূপ নয়। মাথার চাঁদ বাঁচাতে কংগ্রেসী ও তাদের দালাল দলগুলি প্রবঞ্চিত তরুণদের আরেকবার ঠিকিয়ে গেল মাত্র।

কারণ, দেখা গেল পুনর্বাসন দপ্পরের কর্মশনার তাঁদের বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে তাঁর দপ্পর চাকুরীর প্যানেল তৈরী করছেন। এতে যারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে-ছেন, গত নির্বাচনে যারা অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে কাজ করেছিলেন, এবং সদ্য মৃত মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা

যাদের নিয়োগপত্র দিয়ে গিয়েছেন, এই তিন ধরনের লোক নিয়ে প্যানেল তৈরী হবে এবং প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মানানসায়ী এই অস্থায়ী চাকুরী দেওয়া হবে। অর্থাৎ যেসব ভূয়ো নিয়োগপত্র এই হতভাগ্যদের দেওয়া হয়েছিল তা প্রায় চোখা কাগজে পরিণত হয়েছে।

শ্রদ্ধা এই নয়, খাদ্যদপ্পরে চারশ কাজ খালি, সেখানে দরখাস্ত পড়েছে একলক্ষ। এর মধ্যে কংগ্রেস-

সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা কি তুমুল কোলাহলই না শুরু করত?

সম্প্রতি আবার গ্রামাঞ্চলে ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গ মস-নদের নবনিযুক্ত সুবেদার সিম্ধার্থ রায়ের নির্দেশে ফৌজী অভিযান আরম্ভ হয়েছে। নির্বাচনের আগে ঠিক এমনি ধারায় শহরাঞ্চল-গুলিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সরকার এমনি ভাবে দেশের মানুষের ওপর সি আর পি, পুলিশ, মিলিটারী লেলিয়ে দিয়েছিল। এবার

সম্প্রতি দপ্পর

লীগ মন্ত্রিসভার এম এল এ ও মন্ত্রীদের সুপারিশযুক্ত দরখাস্তের সংখ্যা পনেরো হাজার। বেকার ছেলেদের ঘৃণ্য বণ্ডনার এ যেন একটা করুণ ইতিহাস।

এখানকার কোন সংবাদপত্র কংগ্রেসী ও তাদের মিতাদের এই ঘৃণ্য বণ্ডনা, সরকারী চাকুরীর সমস্ত আইনকানুন ভগ্নের, স্বজন পোষণের কাহিনী সম্পর্কে কি একটা মন্তব্যও করেছে?

একবার ভাবুন, যদি যুক্তফ্রন্ট আমলে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের দপ্পরে এ রকম কোন কাণ্ড ঘটতো তাহলে এইসব রক্ষিতা

গ্রামের কৃষক ও গরীব মানুষের ওপর হামলা চলেছে, নকশাল ধরার অজুহাতে।

মনে পড়ার কথা, পূর্ববঙ্গে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী এবং তারো আগে দক্ষিণ ভিয়েতনামে নো গো দিয়েমের খুনেরা ঠিক একই ধরনে কুস্মিং ও ঘেরাও অভিযান চালিয়ে, জনগণের মনোবল ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু এতসব অভিযান সত্ত্বেও নাকি আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে সরকারী কর্তৃপক্ষ হতশ হয়ে পড়েছেন। এখন এই অভিযান হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমে চালিয়ে যাওয়া

হচ্ছে। আমলারা কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন যে “ইনটেলিজেন্স গ্যাপ” এতো বেশী যে আসল অপরাধীদের না কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এ ইনটেলিজেন্স গ্যাপ থাকবে কারণ যে বড় বড় আমলাদের কোন ইনটেলিজেন্সই (বৃন্দ) নেই তাদের শূন্যতার ফাঁক কোনদিন পূরণ হবে না। যুগান্তরের বীরভূম পরিদর্শন-রত সংবাদদাতা খুলেই বলেছেন যে পুলিশ অফিসাররা নিজেরাই এর সঙ্গে জড়িত, তারাই অপরাধীদের সম্বন্ধে রক্ষা করেছে। সুতরাং অপরাধীরা যে বিরাট ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার সবটাই সরকারী “বৃন্দের ফাঁকি”?

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের স্টাফ রিপোর্টারটি কিন্তু সোজাসুজি পুলিশের পক্ষে সাফাই গেসে চলেছেন। তাঁর মতে (অথবা তাঁর বকলমে পুলিশ কর্তৃপক্ষের মতে) বর্ধমান জেলায় সি পি এম এবং সি পি আই (এম-এল) দুদলই সমান বিপজ্জনক! এখন বৃন্দে দেখুন, কারা আত্মসম্মতিপূরে শতাব্দিক ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছিল, নব কংগ্রেসী গৃহদার দল ও তাদের সহায়ক পুলিশ বাহিনী নয় কি? বর্ধমান শহরে থানার সামনে প্রবীণ নেতা শিবশংকর চৌধুরীকে গুলী করে কারা হত্যা করেছে? কালনার অবিসংবাদী নেতা মহাদেব বসুনা-জীকে কুপিয়ে কুপিয়ে কারা হত্যা করেছে। কালনা বা বর্ধমানের সাধারণ মানুষ তাদের চেনেন, পুলিশ কর্তৃপক্ষও চেনেন কিন্তু তাদের আড়াল করে রাখেন। সাংবাদিক

বঙ্গোত্তর শিরোমণি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের এই সংবাদদাতাটি বলতে চেয়েছেন যে এরা সি পি এম নকশাল সংঘবর্ষের ফলেই নিহত হয়েছেন। অথচ এই খুন্দাগুলি যারা করেছে তারা যে নব কংগ্রেসী, ধনর ডায়েরী থেকেও তিনি তা জানতে পারতেন। প্রকৃত খুন্দীদের আড়াল করার বদমায়েসী প্রচেষ্টা ছাড়া এ আর কি হতে পারে?

নব কংগ্রেসী নব-নায়েক সিম্ধার্থশংকর রায়, এবং তার পেটোয়া আমলাদের মনে রাখা দরকার যে তাদের বিচারের দিনও আসতে বেশী দেরী নেই! যে অজয় মদুজো বেইমানী করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাকে সদলে ইতিহাসের আঁতাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। নব কংগ্রেসীদেরও পশ্চিমবঙ্গবাসী ঘৃণাভরে আবর্জনা স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তাদের সব কাঁচী দৃষ্টিমের গুণাগার কড়ায় গন্ডায় শোধ দিতে তাদের বাধ্য করবে। আজ তারা বাংলাদেশের মানুষের যে রক্ত ঝরাচ্ছেন সারা বঙ্গোপসাগরের লোনা জলেও তা ধুয়ে মছে যাবে না। কলকাতার সংবাদপত্রগুলিকেও একথা সমঝিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে, কারণ তারা হত্যাকারী, বেইমানদের ঢেকে রাখার চূড়ান্ত বঙ্গোত্তর চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সাতবারিট সাল থেকে যারা কারণে অকারণে কুস্মীরাত্রী বর্ষণ করে এসেছে, সেই রক্ষিতা সংবাদপত্রগুলি এখন নীরব কেন?

সুধীর চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানী বন্ধ পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় গুণাদের হামলা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

দশ নম্বর গণেশ চন্দ্র এভেনিউ-স্থিত সুধীর চ্যাটার্জী এন্ড কোম্পানীতে গত চার বছর ধরেই গন্ডগোল চলছিল। কয়েকদিন আগে সেই অবস্থা চরমে ওঠে। অভিযোগে প্রকাশ, মালিকপক্ষ গত কয়েকদিন ধরেই প্রত্যক্ষ প্ররোচনা দিয়ে শ্রমিক অশান্তিতে ইশ্বন জুগিয়ে কোম্পানীতে এক অচলা-বস্থার সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত মুনাম্ফার আশায় কর্মী ছাঁটাই ও ইচ্ছাকৃত লোকসান দেখিয়ে মালিক গোষ্ঠী কর্মচারী মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তবে প্রথম থেকে সংস্থার কর্মচারী ইউনিয়ন সতর্কতার সংগে ঘটনার মোকাবিলা শুরু করে। ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব ইউনিয়ন অগ্রাহ্য করে এবং কোম্পানীর বিবিধ খাতে অহেতুক খরচের পরিমাণ কমিয়ে সংস্থাকে সচল করার প্রস্তাব দেয়। এমন কি মালিক গোষ্ঠীর ছয় মাস কোনও রকম দাবী দাওয়া পেশ না করার প্রস্তাবও ইউনিয়ন সংস্থাকে টিপিকয়ে রাখার স্বার্থে মেনে নেয়, তবুও কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারী মহল, “মালিকগোষ্ঠীর অন-গৃহীত গৃহদাবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পায় নি।

অভিযোগে আরও প্রকাশ, উপরোক্ত চর্চাপত্র মালিকপক্ষ শেষ মর্হুর্ভে সই করতে অগ্রাহ্য করেন। এবং তার পরদিন অর্থাৎ উনিয়শে জুন অফিসের একজন ডিরেক্টর শ্রীমতুজয় চট্টোপাধ্যায়, ইউনিয়নের সহ-সভাপতি শ্রীহরিন্দাস চক্রবর্তী মারফৎ অফিসের বেতনের বই ও চেকবক সই করানোর জন্যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীসুধীর চ্যাটার্জীর বাড়ীতে পঠান। কিন্তু কাগজপত্রে সই করাতো দুইরকম কথা, অত্যন্ত অন্যান্য ব্যবহারের সংগে সেসব কাগজপত্র মালিকপক্ষ আটকে রাখেন। ফলে কর্মচারীদের বেতন নিয়োগ গন্ডগোল শুরু হয়। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ইউনিয়ন ঘটনার দিন থেকেই অন্যান্য কাগজপত্র সরিয়ে নেওয়ার আশঙ্কায় রাগিতে অফিসে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

এর পরেই ঘটে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় গৃহদাদের বেরোয়া হামলা। তিরিশে জুন রাগি প্রায় সাড়ে এগারোটায় সময়ে চার্জিশ পণ্ডাশ জন গৃহদা অফিসে পাহারারত স্বেচ্ছাসেবকদের বেদম প্রহার করে। এদের মধ্যে এখনও কয়েকজন অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। প্রকাশ, গৃহদাদের অফিস তখনও কর্মচারী পেটা-

নোর সময়ে ধারে কাছেই অফিসের জনৈক ডিরেক্টর উপস্থিত ছিলেন। সমাজ বিরোধীদের কাজকর্ম শেষ হবার পর ক্রোড়ার নোটিশ লাগিয়ে আগন্তুকদের দল চলে যায়। আশ্চ-

ওয়ানগনভাজা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আর ব্যবসাদাররা খুন্দীদের মাসকাবারী মাইনে দেয়।

রেল কর্তৃপক্ষ বলেন যে, মাইলের পর মাইল তামার তার চুরি হচ্ছে। সংগে সংগে চুরি করা তার কলিকাতা ও আশেপাশের অন্যান্য জায়গায় ছোট বড় কারখানায় গুলিয়ে ফেলা হয়। একমাইল রেলের তারের দাম সাড়ে তিন হাজার টাকা আর এর জন্য ব্যবসাদারের খরচ হয় আনুমানিক পাঁচশ টাকা। এই টাকা পাশ্চাত্য তার কাটে, পুলিশ আর কিছু রেল কর্মচারীও।

পুলিশ সমস্ত ঘটনা যদি না জানে তবে পুলিশকে অত্যন্ত অদক্ষ বলতে হবে। তবে না জানার কোন কারণ নেই, সমস্তই ত চোখের উপর ঘটছে।

ওয়ানগন থেকে মূল্যবান সম্পত্তি বেরিয়ে যাচ্ছে। কাদের হাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়ছে তা পুলিশের জানা। এই শেষ পর্যায়ের লোকেদের ধরতে না পারলে চুরি বন্ধ হবেনা, শান্তি ফিরবেনা।

বীরভূমে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থানা অফিসাররা আর কোন নির্দেশই মানতে রাজী নন। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে এঁরা নিজেরাই ঝামেলা এড়াবার জন্য বন্দুক পিস্তল ইত্যাদি নকশালীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামাঞ্চল থেকে কোন খবরই সিউড়িতে জেলা হেড কোয়ার্টার্সে এসে না পৌঁছানোর ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট “ইনটেলিজেন্স গ্যাপ”।

কিছুদিন হল সরকারের চাপে পড়ে পুলিশ কিছু কিছু তল্লাসী চালাতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু সেগুলি নেহাতই গা-ছাড়া ভাবে। দিনের পর দিন একই গ্রামে যাচ্ছে, একই বাড়ীতে অল্পবয়স্ক ছেলেদের সম্পর্কে খোঁজ করছে, একই উত্তর পাচ্ছে, ফিরে আসছে। রামপদ্র-হাটের এক ভদ্রলোক সম্প্রতি তল্লাসীর সময় পুলিশকে বলেন “মশায় আর কতবার বলব আমার ছেলে এখানে থাকে না সে অন্য জায়গায় লেখাপড়া করে। মাঝখানে আপনাদের এই অনবরত তল্লাসীর ফলে আমার বড়ী মায়ের জ্বর এসে গেছে।”

বীরভূমে নকশালী আন্দোলনের রিপোর্ট

(জৈনিক পর্ববেশক)

বীরভূমে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে সি পি এম এল নেতৃত্বে ঘাঁটি এলাকা গড়ে উঠেছে। গরীব চাষী মধ্য চাষী এবং এমনকি মধ্যবিত্তের সহায়তায় নকশালী আন্দোলন সঠিক শ্রেণী সংগ্রামের পথে পরিচালিত হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন।

একথা ঠিকই যে গ্রামাঞ্চলের দিকে কোনও কোনও স্থলে এম এল এর স্লোগান দিয়ে কিছু জোতদার শ্রেণীর ডাকাত ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিল। একথাও ঠিক যে এই ডাকাতির ফলে গ্রামাঞ্চলে ধনী গৃহস্থের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সংবাদপত্র-গুলো এ খবর চেপে গিয়েছিল যে এই ডাকাতির উপদ্রবের পাশাপাশি সি পি এম এল-এর এ্যাকশন স্কোয়াড এরকম বহু ডাকাতকে খতম করে গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনাছিল। যে সকল দুর্বৃত্ত নকশালীদের নাম করে ব্যবসায়ী বা অবস্থাপন্ন গৃহস্থের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছিল, তাদের মধ্যে বেশ কিছু গেরিলা স্কোয়াডের হাতে ধরা পড়ে সমুচিত শাস্তি পেয়েছিল। এছাড়া ঘাঁটি এলাকাগুলোতে ছোট সদুখোর ও মহাজনদের ব্যবসায় বন্ধ করতে আদেশ দিয়ে, বড় সদুখোর ও মহাজনদের "আলটিমে-

টাম" অতিক্রম করার পরে খতম করা হয়েছিল।

সি পি এম এল-এর বীরভূম আন্দোলনের এখন যে পর্যায় চলেছে, তা হলো তৃতীয় পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে পার্টিকে সামান্য কিছু আন্তঃদলীয় সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল, বিশেষ করে সিউড়ি এলাকায় ছাত্র পরিষদ বা কংগ্রেসীদের সংগে এবং রামপুরহাট এলাকায় সি পি এম নামধারী কিছু সুবিধাবাদী দুর্বৃত্তদের সংগে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পার্টি শ্রেণীশত্রু খতমের সংগে সংগে রাজনৈতিক প্রচার চালাতে থাকে, প্রতিটি খতমের পরেই জনসাধারণকে খতমের রাজনৈতিক ও শ্রেণীগত তাৎপর্য বোঝাতে থাকে। এই দ্বিতীয় পর্যায়েই পার্টির সংগঠন গরীব কৃষকদের মধ্যে, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে, এমন কি গ্রামের কিছু কিছু বেকার অধীশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধ পেতে থাকে, এমনকি শহরাঞ্চলেও অনুরূপভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে মন্ত্রণাগত হতে বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, এমনকি ছাত্র পরিষদের একাংশও ধীরে ধীরে পার্টির সমর্থন ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ সংগঠন বৃদ্ধির পর্যায়ে উক্ত মন্ত্রণাগত কারণ হলো এই যে, রাজ-

নৈতিক প্রচার ও এ্যাকশনগুলোর মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হয়ে অনেক জায়গায় বিশেষ করে শহরাঞ্চলগুলোতে সত্যিই নকশাল আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। উক্ত আতঙ্কের ফলে ও রাজনৈতিক প্রচারের অনুপস্থিতির ফলে সংগঠনের বিকাশ আশানুরূপ হয় না।

এ অবস্থা ছিল এ বৎসরেরই জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী অবধি। শহরাঞ্চলে নকশাল আতঙ্ক বাড়তে থাকে সকল শ্রেণীর মধ্যে, এমনকি গরীব জনসাধারণের মধ্যেও। গ্রামের দিকেও গেরিলা এ্যাকশন এবং গেরিলা গণআন্দোলনের মধ্যে ফাঁক থেকে যাওয়া পার্টি তখনও গরীব জনসাধারণের প্রকৃত আস্থা বিশেষ অর্জন করতে পারেনি।

কিন্তু গত মার্চ মাস থেকে রাজনৈতিক প্রচারের গুরুত্ব পার্টি বাড়িয়ে দেয় এবং গ্রামাঞ্চলে গেরিলা এ্যাকশনগুলোকে বিপ্লবী কৃষকদের মারা সংগঠিত করতে থাকে। শব্দ তাই নয়, পার্টির নির্দেশানুযায়ী প্রতিটি এ্যাকশন স্থানীয় গরীব জনসাধারণের সম্মতি নিয়ে করার প্রচেষ্টা হয়। যেখানে অত্যাচারী জোতদারকে গণআদালত খতম করতে নিষেধ করেছে, সেখানে তাকে নিষ্কৃতি দিয়ে লম্বা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে গরীব চাষী এগিয়ে এসে গেরিলা-ফোঁজে বোমা দিয়েছে, গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ সাগ্রহে পার্টির বৈপ্লবিক রাজনীতি বুঝতে চেয়েছে এবং ফলে সমর্থকের সংখ্যা হ্র হ্র করে বেড়ে গেছে। বোলপুর, সিউড়ী, রামপুরহাট, ইলামবাজার, লাভপুর প্রভৃতি ছোট বড় শহরে পার্টির গেরিলা এ্যাকশন রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার এবং আই বি খতমের মধ্য দিয়ে এবং শহরাঞ্চলের সদুখোর লম্পট, দুর্ভা-রিয়া মাতাল মহাজন, কালোবাজারী ব্যবসায়ী খতমের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

গত দু মাসে প্রতিটি শহরের পার্টি সাংগঠনিক কমিটিগুলো নিয়মিত প্রতিটি কর্মসূচীর ব্যাখ্যা করেছে, ডাকাতদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে, অভয় দিয়েছে। এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির বেকার যুবকদের এক অংশকে নিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নকশালীদের আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য নকশাল স্লোগান দিয়ে ডাকাতি, ছিনতাই ও টাকা আদায় করতে আরম্ভ করল। পার্টি এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। সিউড়ী শহরে গত একমাসে এমন ডাকাতি ও লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে প্রায় জন আট দশ সি পি এম এল-এর গেরিলা স্কোয়াডের হাতে উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে, পালের গোদাদের খতম

করা হয়েছে, অন্যদের সং পথে না চললে খতমের সতর্কবাণী দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক স্থানে জনসাধারণ ডাকাতদের দলের সকলকেই খতম করতে বলেছে, যেমন সদরুল গ্রামের পাশে বাঁধাগাড়ায় একদল ডাকাত লুণ্ঠের মাল সমেত যখন গেরিলা ফোঁজের হাতে ধরা পড়ে, জনসাধারণ এদের সকলকেই খতম করতে বলেছিল, পার্টির এ্যাকশন স্কোয়াড বলে যে, দুজন পালের গোদাকেই খতম করা ভাল, অন্যদের সাবধান করে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ভালো। আলোচনার পর এ প্রস্তাব সকলে মেনে নেয়। এ প্রসঙ্গে স্কোয়াডের নেতা জনসাধারণকে বোঝায় যে এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ডাকাতদের হাতে, পুর্লিশ মিলিটারীকে দিয়ে এ রাষ্ট্র ডাকাতি করে, কিন্তু সকল পুর্লিশ-মিলিটারীকেই খতম করে ফেলতে হবে এটা সঠিক নয়, কারণ ওরা তো পোষা গুন্ডা, মাংস খান্ন আর প্রভুর আদেশ পালন করে, কিন্তু ওরাও জাগতে পারে, বিশেষ করে বিপ্লবী গণফোঁজ যখন ওদের প্রভুদের কোমর ভেঙ্গে দেবে।

গত মে দিবস উপলক্ষে বীর-

ভূমের সি পি এম এল ক্যাডারগণ গোটা জেলার এ যাবত কার্যবাহীর আলোচনা সমালোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়ের গণফোঁজ গঠনের কাজ সুরু করেন। গণফোঁজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক বৈপ্লবিক গণচেতনা চাষীদের স্বতঃস্ফূর্ত এ্যাকশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল বলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ ফোঁজ গঠনের কাজ ব্যাপক আকারে সুরু করা হয়।

অন্যদিকে পার্টিও ক্রমশঃ পুর্লিশ আই বির কাছে গোপন থেকেও জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্য হতে থাকে। অর্থাৎ কোনও অঞ্চলে জনসাধারণ যদিও জানে পার্টির বিপ্লবী ক্যাডারদের, পুর্লিশ এ অঞ্চলের "ইনফরমার" বোকাড় করতে পারে না, আর ইউনিফর্ম সহ পুর্লিশ অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করতেও সাহস করে না। ফলে এই সকল অঞ্চল, এলাকায় বা শহরে পার্টির ক্যাডারদের সংগে গরীব চাষী, সাধারণ মধ্যবিত্তের পরস্পর নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে এবং পূর্বোক্ত নকশাল আতঙ্কের জায়-

(শেখাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

চটকল মালিকরা ফাঁপে উঠছেন কিন্তু শ্রমিকরা সেই তিমিরে বিক্ষোভ দানা বাঁধছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ওপার বাংলার যুদ্ধের সন্ধ্যোগে এখানকার সন্ধ্যোগস্থানীয় মহাজন, পাটের দালাল, চটকলের মালিকেরা পূর্ব পাকিস্তানের উৎকৃষ্ট কাঁচা পাট নামমাত্র মূল্যে এপারে নিয়ে আসছে। ফলে এখানকার চটকল-গুলোতে এক শিফটের বদলে তিন শিফট কাজ করানো হচ্ছে। ছুটির দিনেও অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। উৎপাদনের মাছাও বহুগুণ বেড়েছে। এক-কথায় চটকল শিল্পপতিরা বিপ্লব-বাজারের এখন অধিপতি। আর মনুষ্য স্বাধীনতা লাভের পর কখনই এত গগনচুম্বী হয় নি। অথচ অভিযোগ, চটকল কর্মীদের দাবী দাওয়ার সম্পর্কে মালিকেরা এখনও নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় রয়েছেন।

উনসত্তর ও সত্তর সালে দু-দু-বার চটকলে ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটের ফলে দু-একটি দাবী আদায় করা সম্ভব হলেও কর্মীদের স্বার্থে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দাবী দাওয়ার এখনও কোন সন্ধান নেই। কড়পক্ষের উপর কর্মীদের ঘন ঘন চাপ সৃষ্টি করার ফলে একটি বেতন কমিটিও গঠিত হয়। করিং-কর্মী সরকারের সেই কমিটি গঠন করতে চৌদ্দ মাস সময় লেগেছিল। কমিটির ছ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ফলে কর্মীদের বর্ধিত হারে বেতন কাঠামো, স্থায়ী

শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ, বদলী শ্রমিকদের কাজ না থাকার সময়ের ভাতা, গ্র্যাচুয়িটির হার পরিবর্তন, নাইট অ্যালাউন্স, বাৎসরিক ছুটি, প্রিভিলেজ লিভ প্রভৃতি অন্যান্য দাবীগুলোর আজও পর্যন্ত কোন সন্ধান নেই।

এদিকে মালিক শ্রমিক সরকার পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত বেতন কমিটির কার্যকাল আরও ছ মাস বাড়ানো হয়েছে। কমিটি এর মধ্যে যদি কোন প্রস্তাবে ঐক্যমত না হতে পারেন তবে বিষয়টি পুনরায় সরকারের কাছে পাঠানো হবে এবং তারপর সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রস্তাব সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হতে হতে মাসের পর মাস পার হতে থাকবে। এবং এতে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের কম পয়সা দিয়ে পাহাড় প্রমাণ মনুষ্য ঘরে তুলতে পারবেন। নির্বাচনে শত কাজ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক প্রতিনিধিগণ কমিটির সভায় উপস্থিত হয়ে দাবীদাওয়ার মীমাংসার জন্য নিয়মিত কাজ করেছেন অথচ মালিকপক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে কমিটির সময় নষ্ট করে চলেছেন। তাই চটকল কর্মীরা কমিটির অসারতা বুঝতে পেরে ক্রমশই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। এসময়ে সরকারের নিরলস উদাসীনতা কেউই ক্ষমার চোখে দেখছেন না।

গুণ ও পুলিশের যৌথ আক্রমণকে পরিবহন কর্মীরা প্রতিরোধ করবেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শোভাবাজার, মুর এভিনিউ, সরকার বাজার, আজাদগড়, ইডেন গার্ডেন ও কয়েকটি অঞ্চলে যানবাহন কর্মীদের উপর পুর্লিশ ও সমাজবিরোধীদের জঘন্য হামলার প্রতিবাদে ভারত সভা হলে কয়েকদিন আগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব হামলাতে আহত কর্মী সংখ্যার সংগে নিহত পরিবহন কর্মীদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন কর্মীকে হয় গুলিগ্রস্ত হতে নয়ত পুর্লিশের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিছুদিন আগেও ইডেন গার্ডেনের কাছে বেসরকারী বাসের জৈনিক কর্মীকে পুর্লিশ গুলি করে মেরে ফেলে। বাস, ট্রাম ও ট্যাক্সির কর্মীদেরকে কেউই এধরনের হামলার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। অথচ আজও পর্যন্ত প্রকৃত আসামী গ্রেপ্তার তো দূরের কথা, বাস-কর্মীদের অনেককেই নানান অভিযোগে পুর্লিশী ব্যামেলা পোষাতে হচ্ছে।

অভিযোগে প্রকাশ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগে জড়িত যানবাহন

সংস্থার প্রায় দুশো জন কর্মীকে এখনও পুর্লিশী ব্যামেলা পোহাতে হচ্ছে। কয়েকজন হাজতেও আটক রয়েছেন। তাই গুলিগ্রস্ত হামলা ও কর্মীদের উপর পুর্লিশী নিপীড়নের বিরুদ্ধে সভায় রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানান হয়, "বাসস্থান, বাসস্থান থেকে কর্মস্থলে যাতায়াতের পথে এবং কর্মস্থলে যানবাহন শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে অবশ্যই করতে হবে। আর যদি রাজ্য সরকার সে ব্যবস্থা করতে না পারেন এবং শ্রমিক কর্মচারীরা যদি আক্রান্ত হন তার ফলে কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের চলাচলের সূচন ব্যবস্থার দায়িত্ব শ্রমিক কর্মচারীরা গ্রহণ করবে না এবং অদর্শনিত পরিস্থিতির পরিপূর্ণ দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপরই বর্তাবে শ্রমিক কর্মচারীদের উপর নয়।" এর সঙ্গে যাত্রী সাধারণকেও এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি উপলব্ধি করে; কর্মীদের বেঁচে থাকার আন্দোলনকে সমর্থন করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মহারাজের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুগাতিহু : রাজস্থানে মুখাদিয়ার গভনের নেপথ্যে

(দর্পণের পূর্ববক্ষক)

মহারাজ হুগুপতি নকল শিবাজী যশোবন্ত রাও চাবনের খাসতালুক। মহারাজ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের আদারিণী কন্যা। বোম্বের কোটীপতি একচেটিয়া শিল্পপতিরা যাদের মধ্যমি টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, সরভাই, কিল্যাচাঁদ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের আসল মালিক। মহারাজ শিল্পপতির জন্যে পশ্চিমবঙ্গের মতো কখনো ভিক্ষের খুঁটি নিয়ে দিল্লীর দরবারে ধণী দেয়নি, দিল্লী সর্বদা প্রসারিত উদার হস্তে মহারাজের ভ্যানিটী ব্যাগ ভরে দিয়েছে, আরো বেশী দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে। কারণ মহারাজ ধনকুবের মালিকদের আবাসস্থল। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে বেশী শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য হিসেবে একদা ভরতবর্ষে আখ্যাত হলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের কৃপণ মুষ্টিভিক্ষা বার্ষিক পরিকল্পনাবাবদ যেখানে দশ কুড়ি কোটী টাকা, সেখানে মহারাজের জন্যে বরাদ্দ প্রায় নয়শো কোটী।

বলা হত যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে অশান্তি ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্যে শিল্পে লক্ষী হবার উপযোগী আবহাওয়া নেই, তাই শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে ছেড়ে মহারাজে চলে যাচ্ছেন। কথাটা যে, অসত্য, তা সম্প্রতি প্রকাশিত কেন্দ্রীয় প্রমদপ্তরের হিসাবে পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে। শিল্পে অশান্তির জন্যে কাজের দিন নষ্ট হবার যে হিসাব কেন্দ্রীয় প্রমদপ্তর দিয়েছেন তাতে মহারাজ প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে। কি কৃষ্ণম উপায়ে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় অর্থিক ও শুল্ক নীতি প্রয়োগ করে স্বাভাবিক শিল্পসংগঠনের একাধিকারকে বাণ্ডিত করে, কল্যা, ধাতু, লৌহ আকর প্রভৃতি বিজিত ধনকুবেরদের লীলা ভূমিতে কৃষ্ণম উপায়ে সস্তা কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন, কিভাবে মহারাজ গুজরাটের একমাত্র অর্থকরী ফসল তুলোকে মিলমালিকদের কল্যাণে এনে দিয়ে সস্তার কাপড় উৎপাদন করতে তাদের সুযোগ দিয়েছেন, অথচ অন্যান্য রাজ্যগুলি যাতে একই দরে তুলো পেয়ে কাপড়ের কল চালাতে না পারে তার জন্যে মহারাজ বন্দুক-মালিকদের পক্ষে আন্তঃরাজ্য একপ্রকার শুল্ক আরোপ করেছেন, কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীরা ও তাদের দপ্তরের আমলারা অস্বাভাবিক আগ্রহের সঙ্গে মহারাজে শিল্পস্থাপনে ছুঁ কৌশলীগুলির সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন অথচ পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে লাইসেন্স মঞ্জুরী করতঃ শত বাধার সৃষ্টি করেছেন, সেই কাহিনী আরো বিশদভাবে পাঠকদের গোচরে

আনার চেষ্টা দর্পণ করবে। আপাততঃ শব্দ এহেন মহারাজ রাজ্যের সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেই তাকে ক্ষান্ত হতে হবে। মহারাজের আর্থিক পরিচালনার ব্যাপারে একটা খ্যাতির প্রচার ছিল, তাও রাজ্য বিলীনপ্রায়। মহারাজের কংগ্রেসী (এখন নব-কংগ্রেসী) লুটপাটের ফলে রাজ্য সরকারের রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে এবছর

ছেন, মন্ত্রীরা অন্যরকম বোঝাতে চাইলেও, একথা আজ গোপন করা যাবে না যে মহারাজ রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। সরকারী ঋণ যাতে দিতে না হয়, সেই মতলবে মহারাজের ধনী কৃষক জমির মালিকেরা (যারা এখন মধ্যম নব-কংগ্রেসী) রাজ্য সরকারকে পঁচিশটি জেলার "অভাবগ্রস্ত এলাকা" বলে ঘোষণা

ভরত দর্পণ

ওভারড্রাফট ঋণের পরিমাণ পঁয়তাল্লিশ কোটী টাকা। এছাড়া রাজ্য সরকারের সিকিউরিটী বাবদ দায় গ্রিশকোটী টাকা। এবছর জুন মাসের শেষের দিকে কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থাগুলির কাছে রাজ্য সরকারের অনদায়ী লক্ষী ও সুদের পরিমাণ একশত কোটী টাকারও বেশী। অর্থনৈতিক পূর্ববক্ষক মহল বল-

করতে বাধ্য করেছে। যদিও কোন ফসলহানির লক্ষণ এ জেলাগুলিতে দেখা যায় নি, তবু মহারাজ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দু কোটী স্বল্পমেয়াদী অগ্রিম তিন কোটী টাকা তাকাতি ঋণ এবং উনিশশ একাত্তর সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত রবি শস্যের দরদুণ পোনে পাঁচ কোটী টাকা-হাতিয়ে নিয়েছে। এই রাজ্যে-সরকারী কংগ্রেস

মুষ্টিমূল্য সংবাদ

কংগ্রেসী গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীদের সহায়তায় আউসগ্রাম থানায় ব্যাপক পুলিশী সন্ধান

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বেশ কিছু দিন ধরে কংগ্রেসী গুন্ডা ও সমাজ বিরোধীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই এলাকায় ব্যাপক পুলিশী সন্ধান চালানো হচ্ছে। স্কুল কলেজের ছেলেদের ক্লাস রুম থেকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং মারপিট করা হচ্ছে। তজ্জাসীর নামে ঘরে ঘরে প্রবেশ করে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে অত্যাচার চালানো হচ্ছে এবং সন্ধান সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই সন্ধান এমন পর্যায়ে গেছে যে স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি অত্যন্ত সামান্য, সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনে বাইরে যেতে সাহস করছেন না, এমন কি হাট বাজারও বন্ধ হতে চলেছে। একদিকে পুলিশ যেমন সন্ধান সৃষ্টি করে সন্ত্রাস্ত মানবের বাড়ীগুলি তজ্জাসীর নামে নিত্য ব্যবহার জিনিস থেকে আরম্ভ করে টাকা-পয়সা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে তেমন কংগ্রেসী গুন্ডা সমাজ বিরোধী ওয়াগন রেকারদের পুলিশের সঙ্গে মাসেহারা চুক্তির মাধ্যমে অবাধে ছিনতাই ও রাহাজানি চালিয়ে যাওয়ায় সাহায্য করা হচ্ছে।

গত সাতই জুলাই তারিখ রাতে কংগ্রেসী গুন্ডা ও সমাজ বিরোধীদের প্ররোচনায় পুলিশ এই এলাকায় বাড়ী বাড়ী তজ্জাসী চালায়। স্থানীয় কলেজ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সহ বহু ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকাল কমিটির অফিস ভেঙে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও কাগজপত্র তছনছ করা হয়েছে। মোটর ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের সংগৃহীত টাকা লুট হয়েছে। এই একই দিনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সদস্য মহাবুব জাহেদীর বাসস্থানে তজ্জাসী চালিয়ে আইসক্রীম কারখানার টাকা লুট করা হয় এবং একজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়।

এলাকার ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীরা এই পুলিশী অত্যাচারের প্রধান শিকার হয়েছেন। ছাত্রদের পরীক্ষারত অবস্থায় ক্লাস রুম থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কয়েকদিন আগে গুরুসকরা স্কুলের কৌশিক দাস নামক একটি ছাত্রকে পরীক্ষার হল থেকে তাড়া করে পুলিশ পুরুষের জলে ফেলে প্রচণ্ড মারপিট

নেতাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য আগ্রহ নানা পথ খোলা। নব কংগ্রেসী জনৈক নেতা, কয়েকটি কো-অপারেটিভের পদাধিকারী শ্রীশংকররাও তামানে পুরের বিবাহভোজে একলক্ষ লোককে নৈমন্ত্য করে খাইয়েছেন, রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা অতিথি আপ্যায়নে নিযুক্ত ছিলেন এবং স্বয়ং হুগুপতি চাবন বিবাহবাসরে উপস্থিত থেকে এর শোভা বর্ধন করেছিলেন। কিন্তু মহারাজের সাধারণ সংলোকের মনে প্রশ্ন উঠেছে লক্ষ মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করার আর্থিক সংগতি এই ভদ্রলোকের কোথেকে এল? প্রশ্নটা নতুন নয়, উত্তরও পূরনো সেই একই।

উত্তরটা এবার খানিকটা অভাবনীয় ভাবে এসেছে। বোম্বে শহর সাগরতীরে, সান্তারদুজ বিমান ঘাঁটী আন্তর্জাতিক বিমানপথে অবস্থিত। এখানে কেরল ও মাদ্রাজের মতই চোরাই চালানদারদের ঘাঁটী। দেশ বিদেশের স্বাগলাররা এসহরে ঘাঁটী স্থাপন করেছে। এরি অনুসন্ধান করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মহারাজের জনৈক নব-কংগ্রেসী মন্ত্রীর গ্রামের বাড়ীতে নগদ উদ্ধার করেছে দুকোটি উনআশি লক্ষ টাকা। বোম্বের কোন কোন পরিব্রাজ্য এর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য মধ্যমন্ত্রী একটা ধর্মাত্মিক প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু সি বি আই কিংবা কেন্দ্রীয়

করে এবং বিনা কারণে তাকে পি ভি এ্যাকটে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্কুল-কলেজের মেস-বোর্ডগুলিও এই পুলিশী তাণ্ডব থেকে রেহাই পাচ্ছে না। প্রতিদিন রাতে পুলিশ মেসে ঢুকে ছাত্রদের মারপিট করছে এবং টাকাপয়সা ঘড়ি ইত্যাদি ছিনিয়ে নিচ্ছে। সাতই জুলাই তারিখে স্থানীয় একজন শিক্ষককেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার বাড়ীঘর তজ্জাসীর নামে তছনছ করা হয়। কৃষক কর্মী ও গরীব কৃষকরাও এই নিষীতন থেকে বাদ যাচ্ছেন না। চাষের সময় গরীব কৃষকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং গ্রামের বৃহৎ জমির মালিকদের সহায়তায় মূলতঃ সেই সব কৃষকদেরই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে যারা উপরোক্ত বৃহৎ জমির মালিকদের সরকারে ন্যস্ত হওয়া জমিগুলি লাইসেন্স নিয়ে চাষ-আবাদ করছেন। গত এগারই জুলাই তারিখে পুলিশ হুবার গ্রামে ব্যাপক তজ্জাসী চালিয়ে সন্ধান সৃষ্টি করে। আউসগ্রাম থানা কৃষক সমিতির সম্পাদক মহাবুব আলম সহ অন্যান্য কৃষক কর্মীদের বাড়ী তজ্জাসী করে বাড়ীতে কর্মীদের না পেয়ে গরু মহিষ এবং চাষের বলদগুলি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ব্যাপক অত্যাচারের হাত থেকে শিশু বৃদ্ধ মহিলারাও রেহাই পান নি। ভৌদিয়া অঞ্চলেও এই রকম হিংস্র থানা-তজ্জাসী চালিয়ে কৃষক কর্মীদের বাড়ী তছনছ করা হয়েছে।

সরকার এর কোন প্রতিবাদ করেন নি। হঠাৎ মধ্যমন্ত্রী পি পি নায়ক মৃদু হৃদয়োগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগ্রহণ করেছেন। এই হল কেন্দ্রীয় নব-কংগ্রেসী সরকারের আদারিণী কন্যা মহারাজ রাজ্যের চলতি কাহিনী। মহারাজে এর ফলে একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন আসবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু রাজস্থানে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমনভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে, যে সতেরো বছর মধ্যমন্ত্রী থাকার পর শ্রীমোহন লাল মুখাদিয়া পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ ব্যাপারটা সংবাদ প্রকাশের কালদায় এমন ভাবে দেখানো হয়েছে যাতে মনে হয় যে শ্রীমুখাদিয়া মন্ত্রিযে অরুচি আসায় সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্যেই পদত্যাগ করেছেন।

ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। রাজস্থানের কিছু কিছু শিল্পপতিদের সহায়তায় রাজস্থান নব-কংগ্রেসী দলে একটা কয়েমী স্বার্থের চক্র সৃষ্টি হয়েছে। উনিশশ সাতষটি সালের নির্বাচনে কংগ্রেস রাজস্থানে সংখ্যাধিক্য লাভ করতে পারে নি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যপালের সহায়তায় সর্ববৃহৎ সংখ্যা কিন্তু সংখ্যালঘু দলের নেতা শ্রীমুখাদিয়া মধ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন (যাঁ জ্যোতি বসুদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় নি) এবং কিছু কিছু দলছুট এম এল এ কিনে নিয়ে মন্ত্রিসভা চালিয়ে যান। কিন্তু দলছুট ব্যক্তিরা তো আর শব্দ হাতে সমর্থন জানাতে আসেন নি এবং নবকংগ্রেসী চাইলেও শব্দ শব্দ নিরামিষ জনকল্যাণে তো আর বিশ্বাসী নন, তাই অজস্র দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও লুটপাটের কাহিনীতে রাজস্থান রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশ কলুষিত হয়ে উঠে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের রন্যতম মন্ত্রীর আত্মীয় শ্রীনাথরাম মধ্যর নামে সরকারী সেচবিভাগের বহু লক্ষ টাকা মূল্যের জল নিজের জমিতে বিনামূল্যে আত্মসাতের অভিযোগ আসে। রাজস্থান উষর মরুভূমির দেশ, পানীয় জলের জন্যে গায়ের মেয়েরা ছসাতমাইল দূর থেকে জল আনতে বাধ্য হন। জমিতে জল পাওয়া সেখানে সোনা পাওয়ার মত। রাজস্থান কংগ্রেসের মধ্যপন "কংগ্রেস পত্রিকা" খোলাখুলি ভাবে কয়েমী স্বার্থে গদীয়ান মধ্যমন্ত্রী ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের কঠোর সমালোচনা করে। শোনা যায় এর পেছনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কলকাতা নাড়ীছিলেন। এবং যেভাবে সাত তাড়াহুড়া করে শ্রীমুখাদিয়া পদত্যাগ পত্র গৃহীত হল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নাটকীয় ভাবে জনাব বরকতউল্লা খানকে মধ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন, তাতে এটা যে রাজস্থানে কংগ্রেসী কেছা গোপন করার একটা প্রয়াস তা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

রাজধানীর চিঠি

গোপনীয়তার অভূহাতে সত্যের কণ্ঠরোধ

রমা প্রসাদ মল্লিক

অতি সম্প্রতি, আবার সেই পুরোনো সরকারী কায়দায় ভারতের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দরকারী খবর গোপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে বহু শক্তিবর্গের অন্তরালবতী খেলায় এবং ভারত ও পাকিস্তানের সরকারী মহল থেকেই তৈরি করা রাজনৈতিক টানাগোড়নের ফলে ভারতের প্রতিরক্ষাগত ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারতের পার্লামেন্টে গুঞ্জন উঠলে অভ্যাস মারফক রুটিন জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষার স্বার্থে গোপনীয়তা কি কেবল দেশের জনতাকে অজ্ঞ রাখবার জন্য? ভারতের পশ্চিম সীমান্তে, বিশেষতঃ কাস্মীরের সঙ্কটপ্রবণ অঞ্চলে পাকিস্তানের এবং “আল ফাতা” নামধারী তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর ক্রিয়াকলাপের পটভূমিকায় ভারতের প্রস্তুতি কতদূর এগিয়েছে? ১৯৬৫-র মত হিন্দুস্তান পাকিস্তান অঘোষিত যুদ্ধ বেধে গেলে, সে সম্পর্কে সরকারী নীতি কি হবে—(এক) এড়াবার, (দুই) এড়ান না গেলে, তা সামরিক নিষ্পত্তি অবধি জয়ের মনোভাব নিয়ে এগোনের, (তিন) অথবা, বহু শক্তিবর্গের মোড়লি মেনে আর এক তালখন্দ চুক্তি টাইপের ধোঁকা দেওয়া শান্তি স্থাপনার?

বলা বাহুল্য, সরকারী মন্তব্য থেকে উপরোক্ত কোনো প্রশ্নেরই সদুত্তর দেওয়া হয় নি। সম্ভাব্য শত্রুবাহিনীর সৈন্যচলচল, সংস্থাপনা, রণকৌশলগত আক্রমণ বৃদ্ধি তথা পাল্টা আক্রমণের পদ্ধতি সম্পর্কে নাকি সমস্ত তথ্য ভারতের সামরিক গুপ্ত ও গোয়েন্দা বিভাগের করতলগত! কিন্তু জনস্বার্থে কিছুই বলা চলেনা। অথচ সামরিক গুপ্ততথ্য আহরণের কৃতিত্ব এত ভয়ানক দক্ষ যে, কাস্মীর থেকে ভারতীয় উড়োজাহাজ ভারতেরই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন কর্মচারী উড়িয়ে নিয়ে গেল পাকিস্তানের খর্বদারিতে, কিন্তু বিভাগীয় অধিকর্তারা কিছুই আঁচ করতে পারলেন না। বস্তুতঃ আন্তর বিভাগীয় অসহযোগ (সঠিক বলতে গেলে, গোলযোগ ও ঝগড়া) এতদূর গড়িয়েছে যে, কাস্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে কাস্মীরের ইনটেলিজেন্স বিভাগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ইনটেলিজেন্সের ক্রিয়া-সংগতি না থাকায় ঐ বিভাগকে কেন্দ্রের সঙ্গে এক করে দেবার আভাস দেন। তথাপি কেন্দ্র এ ধরনের একীকরণ যে চায়না তা পার্লামেন্টে মাননীয় সদস্য শ্রীগঙ্গাদেবের তোলা প্রস্তাবের উত্তরে বেশ বোঝা গেল। গোপনীয়তার খেসারৎ কিন্তু উক্ত বিভাগেই সীমাবদ্ধ নয়।

বিশ্বশক্তিবর্গের আহুত এবং নিখুঁত ও নিপুণ তথ্য পর্যালোচনান্তে প্রকাশিত সামরিক “গুপ্ত তথ্যের” খবর ভারতে অনেকেই মাঝে মাঝে চমকে যান; যেমন কিছুদিন আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা, ডিভিশন অনুযায়ী গঠনপ্রণালী, অস্ত্রসজ্জা, এবং আধুনিকতম শাস্ত্রের সরবরাহ সংক্রান্ত অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক লোকেরা জিনিষ জানতে পেরে হৈচৈ উঠেছিল। বহুরে, শত্রুসম্ভারের বাহারে না হক, ভারতের সেনাবাহিনী পৃথিবীতে চতুর্থ—আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের পরই নম্বর। অথচ একথা কবুল করতে গেলে ভারত সরকারের “গণ-তান্ত্রিক, গান্ধিপন্থী” শান্তিকামিতার ছবি ম্লান হয়। এমনি আর এক নৈতিকপণার প্রদর্শন মাঝে মাঝে সরকারী স্তরে ঘটে, যখন শোনা যায় যে, ভারত নাকি আণবিক অস্ত্রের ধারে কাছে ঘেঁষবেনা। কিন্তু মাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত ট্যাঙ্ক ধ্বংসী (এবং সম্ভবতঃ উড়োজাহাজ ধ্বংসী) যে রকেট ক্ষেপণাস্ত্র আজ ভারতে ব্যাপক হারে উৎপন্ন হচ্ছে, সেগুলির অগ্রভাগে কি সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন আণবিক বিস্ফোরক জড়তে দেওয়া হয় না? প্রতিরক্ষা গবেষণার খাতে যে দ্রুত বর্ধিষ্ণু খরচ (বাৎসরিক সাড়ে এগার থেকে সাড়ে সতেরো কোটি তার বৃহত্তম অংশই তো ব্যয়িত হয় উপরোক্ত ক্ষেপণাস্ত্রের রেঞ্জ এবং ধ্বংসী ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। তবু, বিদ্যাচরণ শূক্ৰাজী (প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী) স্বীকার করলেন যে, ভারতে উৎপন্ন এমনি রকেটের রেঞ্জ এখনও তিন কিলোমিটার মাত্র!

গোপনীয়তার গুনাগার ভারতের জনতাকেই শেষ পর্যন্ত কিভাবে দিতে হয়ে থাকে, তার চমকপ্রদ উদাহরণ ভারতীয় মহাসাগরে বিচরণশীল বহু শক্তিবর্গের রণতরীগুলির ক্রিয়াকলাপ ও শক্তিসমাবেশ সম্পর্কে সরকারী অজ্ঞতা। বিদেশী সাবমেরিন আজ এই অঞ্চলে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরাই করছে তা নয় উন্নতমানের টেলি-কমিউনিকেশন যন্ত্রসজ্জিত বয়া পেতে পরস্পরের সামরিক গুপ্ত চলাচলের সংবাদ যোগাড় করছে। ১৯৬২ সালের উত্তরসীমান্ত সংঘর্ষের সময় এবং তারপরে সেনাবাহিনীর হাইকমান্ডস্থিত কিছু অফিসার ও সামরিক ইনটেলিজেন্সের অধ্যক্ষ তাদের অজ্ঞান-অপ্রতীতির সাফাই যে ভাবে পারস্পরিক কাদা ছিটানো দ্বারা উগ্রবাবার চেষ্টা করছেন, তাতে পুরোনো প্রবচনই স্মরণে আসে। যুদ্ধ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য যে

সরকার আপন দেশের জনগণকে অবিশ্বাস করে লুকিয়ে রাখে তাদের গোপন বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

সম্প্রতি এক বিদেশী সাংবাদিকের সামরিক তথ্য আহরণের ক্ষমতা দেখে নয়াদিল্লীর সরকারী মহলে তাক লেগে যাবার যোগাড় হয় (ম্যাক্সওয়েলের ইন্ডিয়াজ চায়না ওয়ার স্মৃত্য)। সাধারণতঃ চিহ্নিত করা সকল “গোপন” সূচনা বিভাগীয় খিড়কী-দরজা দিয়েই পাচার হয়ে থাকে।

আমেরিকার জনস্বার্থ ও সামরিক মন্ত্রণালয়

হালে আমেরিকার ভিয়েতনাম সংক্রান্ত প্রচুর গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবার ব্যাপার নিয়ে সেখানকার জনগণই কেবল উদ্বেল হয়নি, সারা পৃথিবীর প্রগতিকামী মানুষ এবং সত্যার্থী সাংবাদিক, সম্পাদক, ও প্রকাশকদের জগৎ আলোড়িত হয়েছে। সম্ভবতঃ পাঠকদের জানা আছে, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত গুরুতর প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চকোটির সামরিক প্রশাসক গোষ্ঠিকে পেন্টাগন বলা হয়ে থাকে। এই পেন্টাগনের সম্বন্ধাঙ্কিত প্রচুর সামরিক মন্ত্রণা ও গোপন মতলব সে-দেশের প্রখ্যাত পত্রিকা “ন্যা ইয়র্ক টাইমস” ক্রমশঃ আকারে প্রকাশ করতে থাকলে রাষ্ট্র-

নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে উৎপন্ন হয় এবং তথাকার সুপ্রিম কোর্ট অবধি মামলা গড়ায়। উদ্দেশ্য ঐ এবং অনুরূপ প্রকাশেচ্ছা পত্রিকার সামরিক “গুপ্ত তথ্যের” প্রকাশনী বন্ধ করা। এই নিয়ে সেখানে প্রচণ্ড আইনের লড়াই হয়ে গেল এবং শেষে শেষ নিষ্পত্তি ও সং সাংবাদিকতারই জয় হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ, কোন সামরিক তথ্য গোপনীয়তার যোগ্য এবং কোনটা নয়, তা নিয়ে মতবৈধের অবকাশ থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এবং লেখক, চিন্তক ও সাংবাদিক মণ্ডলী মোটামুটি এক মিলিত মতের মধ্যে পৌঁছতে পেরেছেন। তা হল, জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রনিরাপত্তার প্রসঙ্গে বাস্তবিকই কোন তথ্যের মন্ত্রণালয় প্রয়োজন এবং (শেষাংশ অস্টিন পুস্তক)

দিনে দিনে সব গাখার চেহারাই
এ.এ.সি এভারেস্টের মত হ'তে
চলেছে—কারণ জি. ই. সি.
এভারেস্ট যে কেবল কাজের
বেলায় অতুলনীয় তা' নয়,
দেখতেও অগুর্ব।

জি. ই. সি. এভারেস্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

- * নিঃশব্দে চলে
- * বছরের পর বছর ব্যবহারেও পাখার চেহারা নতুন মত থাকে
- * বহু বছর নিঃশব্দে চলে

এ.এ.সি

দ্বি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড

কলিকাতা • গোহাটি • ভুবনেশ্বর • পাটনা • কানপুর • নিউ দিল্লী • চণ্ডীগড়
জয়পুর • বোম্বাই • আমদোবাদ • নাগপুর • জবলপুর • মাদ্রাজ • কোয়েম্বাটোর
মাদ্রাজ • সেকেন্দ্রাবাদ • এনিকুলাম

জেল পালানোর ঘটনা প্রসঙ্গে

গত এগারোই জুলাই আলিপুর স্পেশাল জেলে নকশা বন্দীদের পালানোর ঘটনাটা প্রত্যেক মানুষের মনে আতঙ্ক ও সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। এই জেল পালানোর ব্যাপারটা সাজানো গণহত্যা বলেই মনে হয় নিম্নলিখিত কারণে—

(ক) যেখানে জেলের বন্দীদের সঙ্গে দেখা করে কিছু খাদ্য বা জামাকাপড় দেওয়ার সময় প্রতিটি জিনিসই নিখুঁত ভাবে দেখে তবে ভেতরে দেওয়া হয়, এমন কি একটা পট্টের টিকে যে ভাবে দেখে ভেতরে দেওয়া হয় তা সাধারণ মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। এত কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও বন্দীদের কাছে ধারালো অস্ত্র কি করে যায় তা সভাই ভাববার বিষয়।

(খ) আজকাল যেখানে সাধারণ গৃহস্থের ঘরের দরজায় কড়া নাড়লে তারা পাঁচবার করে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে তবেই দরজা খোলেন, সেখানে রেলখানার বন্দীদের দরজায় শব্দ করা হল আর ওয়ার্ডাররা কোন কিছু না জিজ্ঞাসা করেই দরজা খুলে দিল। এ কথা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অবাস্তব বলেই মনে হয়।

(গ) লোহার মই আর রডই বা পেল কোথা থেকে বা স্ভারা তাদের পালানোর সুবিধা হয়। জেলখানা নিশ্চয় কারখানা নয় যে যেখানে শুল্ক বড় আর লোহার টুকরো পড়ে থাকবে। আর ওয়ার্ডাররা মৃত্যুঞ্জয়ী কিনা তা জানা গেলে না কারণ সারা মোটা লোহার রডের বা স্ভারের খেঁয়ে বা ধারালো ছুরিতে শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়েও মরেন না, তাদের এ ছাড়াই বা কি বলব বলুন। আমরা সাধারণ মানুষ যে তখনই মারা যেতাম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(ঘ) সাধারণ পশুকে অনেকক্ষণ বন্দী করে রাখলে তারপর যদি দরজা খুলে দেওয়া হয় তবে সে নিশ্চয় পালাবে। সেখানে মানুষ শুল্ক জীববৃত্তির অধিকারী নয়, বর্নধর্মবৃত্তির অধিকারী। তাদের মৃত্যুর সামনে দরজা খুলে দিলে সে নিশ্চয় চুপ করে থাকবে না। এই রকম জেলের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল আর মইয়ের ব্যবস্থা ছিল এই সময় জেলের বাহিরে ষড়যন্ত্রকারী ছাতকের দল রক্তের হোলী খেলার জন্য অপেক্ষা করছিল।

(ঙ) ঘটনাগুণি পূর্বপরি-কল্পিত না হলে পালানোর দৃশ্য ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ধরা পড়ল কি করে (ঘটনার পরদিন কলিকাতার একটি বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্রে যা ছাপা হয়েছিল)। যদি ফটোগ্রাফার পূর্ব থেকেই না জানতেন তবে এত তাড়াতাড়ি তুললেন কি করে? এর জবাব কি পার? নিশ্চয় ফটোগ্রাফার ভবি-

মতামত

বাংলাদেশ সরকার থেকে ফটোগ্রাফারকে পদলিখের পাহারাদানের মত জেলের বাহিরের সব সময়ের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার চিত্র ক্যামেরায় তুলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় নি?

এর পরও কি বলব ঘটনাগুণি পূর্বপরি-কল্পিত নয়? কিন্তু ভারত সরকারকে একটা কথাই বলব এই ধরনের চোরা পথে গণহত্যার মাধ্যমে হিংসা বড়বে বই কমবে না। শেষে একদিন বৃহৎ আকারের গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করবে। তখন সরকারের সকল চেষ্টাই আলস্যের বাহিরে চলে যাবে এটা নিশ্চিত। তাই আমার আবেদন ভারত সরকার এই বিষয়ে ভালভাবে তদন্ত করে ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি দিন।

সবাসাচী বসু

কল্যাণীতে পুলিশী অত্যাচার

প্রায় ছয়-সাত বছর হল কলিকাতা পদলিখের একটি দলকে কল্যাণীতে এনে রাখা হয়েছে। এদের অত্যাচারে স্থানীয় জনগণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমরা এর আগে কমিশনার সাহেব, সরকার, ডি এম নদীয়া, এস পি নদীয়া এবং ও সি কল্যাণীকে তিন-চারখানা চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

এদের ভয়ে স্থানীয় মেয়েরা রাস্তায় বার হতে পারে না, কারণ এরা টিটকারি মারে হাত ধরে টানে। যখন তখন মদ খেয়ে রাস্তায় মারামারি, কুৎসিত গালাগালি, উল্লাস নৃত্য নিত্যকার ব্যাপার, এদের ঘরে ঘরে ঢোলাই মদ তৈরী হয় এবং সেই মদ খেতে বাইরে থেকে নানা ধরনের লোক আসে। মদ খায়, হৈহুজা করে। এখানকার তৈরী মদ নিয়মিতভাবে বাইরেও চালান করা হয়। এই পদলিখ ক্যাম্প বেপাড়ার মেয়েদের স্বর্গরাজ্য। নিয়মিত ভাবে সম্মার পর দলবদ্ধ ভাবে আসে আবার ভোর বেলায় চলে যায়। এমন কি ঘর ভাড়াও দিতে হয় না। এছাড়া দলবদ্ধ ভাবে বাসে ভাড়া না দেওয়া, সিনেমা হলে গিয়ে মারপিট করা হাঁস, মুরগী ইত্যাদি চুরি করা হামেশাই হয়। এদের অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের আরো হাজারো নিদর্শন আছে। এদের অত্যাচারের প্রতিবাদে কল্যাণীতে দুই বার বাস ধর্মঘট হয়েছিল। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় কিছু ভদ্রলোক স্থান-ত্যাগের কথা ভাবছেন। আমাদের প্রশ্ন পদলিখ নামক এই রকম এক সংঘবদ্ধ অসামাজিক জীবের হাতে যদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার

দায়িত্ব থাকে তবে সেই সমাজে কি কখনও শৃঙ্খলা ফিরে আসতে পারে? সিদ্ধার্থবাবুকে আমরা অনুরোধ করছি আপনি দয়া করে এখন থেকে এদের সরিয়ে নিন। শান্ত কল্যাণীতে আমাদের শান্তিতে থাকতে দিন।

স্থানীয় জনগণ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় অধ্যাপকবৃন্দ

ছাত্র পরিষদের নামে টাকা আদায়

ছাত্র পরিষদের নামে কলেজ পাড়ায় কি ভাবে বলপূর্বক চাঁদা আদায় করা হচ্ছে তা নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে জানতে পারবেন।

কলেজ পাড়ায় বিশেষ করে সিটি কলেজে যখন আমার ভাই পরীক্ষা দেবার জন্য হলে প্রবেশ করতে যাবে সেই সময় ছাত্র পরিষদের কতকগুলো ছেলে এসে বলে “আমাদের চাঁদা না দিলে তুমি হলে ঢুকতে পারবে না।” আমার ভাই চাঁদা দিতে নারাজ। তখন তারা পকেটে হাত চালিয়ে জোর করে অ্যাডমিট কার্ড বের করে নিল। বলে গেল যে, আশুপট্টা পরে এসে তারা টাকা নিয়ে যাবে, যদি টাকা না পায় তবে পরীক্ষার খাতা কেড়ে ছিঁড়ে ফেলবে এবং “মুন্ডু থাকবে না।”

এতো ছোট্ট একটি উদাহরণ। এই রকম আরো কত ঘটনাই না ঘটেছে। আমার মনে হয় ছাত্র পরিষদের নামে কতগুলি সমাজ-বিরোধী এভাবে টাকা আদায় করেছে। তাই প্রকৃত ছাত্র পরিষদের নেতাদের কাছে আমার এই আবেদন যে তারা যেন এ ব্যাপারটী তলিয়ে দেখেন, না হলে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষই এর প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং এ বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকেও অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করছি, কারণ গরীব ছাত্রদের পক্ষে এভাবে টাকা দিয়ে পরীক্ষা দেওয়া বড়ই মর্স্কল হয়ে পড়বে।

জনৈক পাঠক

নোরাপাড়ার সমাজবিরোধীদের তাণ্ডব

গত তেরোই জুলাই তারিখে রাতের অন্ধকারে কংগ্রেস ও নকশাল নামধারী সমাজবিরোধীরা ইছাপুর বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে বহু ব্যয়ে নির্মিত ল্যাবরেটরী বিভাগটিতে আগুন ধরিয়ে বহু টাকার মূল্যবান যন্ত্রপাতি ভস্মীভূত করে দেয়। কয়েকদিন আগে ঐ সমাজ বিরোধীরাই নর্থল্যান্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ঘরে আগুন লাগায় এবং অফিস ঘরটি তখনই করে এবং

স্থানীয় বিভূক্তিকর উচ্চ বিদ্যালয়ে বাস্মাসিক পরীক্ষা সূত্র হওয়ার দিন বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে ফলে বিদ্যালয়ের বাস্মাসিক পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আজ দীর্ঘদিন ধরে নোরাপাড়ার বৃদ্ধ ঐ সমাজ বিরোধীরা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন প্রায় বন্ধ, বহু শিক্ষক নিরাপত্তার অভাবে বিদ্যালয়ে যেতে পারছেন না, সাধারণের জীবনে কোন নিরাপত্তা নেই, অথচ ঐ সমস্ত সমাজবিরোধীদের সম্বন্ধে স্থানীয় থানা ও প্রশাসন যন্ত্র সম্পূর্ণ নীরব। বরং একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় স্থানীয় থানা, শাসকগোষ্ঠী যন্ত্র হিসাবে ঐ সমস্ত সমাজবিরোধীদের লালন পালন করেছে। আর সমাজ বিরোধীদের ধরার নামে নিরীহ সাধারণ মানুষকে হয়রানী করেছে—ঘরের মেয়ে বউও রেহাই পাচ্ছেন না।

জনৈক পাঠক

সেনর্যালের গ্রুপের ক্রোজারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক

গত উনিতিশে মার্চ উনিশশ একাত্তর থেকে সেন র্যালের গ্রুপের মালিকরা সেন-র্যালের (আসানসোল) সেন পণ্ডিত এ্যানিসলারী (কল্যাণী) কারখানাগুলিকে বে-আইনী ভাবে ক্রোজার করে দিয়েছে।

মালিকদের প্রস্তাব : প্রায় এক হাজার শ্রমিক ছাঁটাই, মাসিক চাঁদা হাজার টাকা হারে বেতন কম, অতিরিক্ত কাজের বোঝা ও পুরাতন সুযোগ সুবিধাদির বিলোপ। স্বাভাবিক কারণেই শ্রমিকরা মালিক পক্ষের এই অন্যায় দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই ক্রোজারের মধ্য দিয়ে আক্রমণ শুরুর হয়েছে।

বিগত তিন মাস ধাবং সেন-র্যালের গ্রুপের শ্রমিক কর্মচারীরা মালিকগণের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে অটুট মনোবল নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। মালিকপক্ষের আচরণে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই সংগ্রাম আরও দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন কঠোর হবে। সেন-র্যালের গ্রুপের সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীর কাছে আবেদন সমস্ত প্রকার অপপ্রচার ও বিভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একাবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করুন।

তিন মাস কেটে যাবার পর স্বাভাবিক কারণেই সংগ্রাম পরিচালনা ও শ্রমিকদের পরিবার পরিজনদের বাঁচাবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সমস্ত গণসংগঠন ও গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে আবেদন সেন-র্যালের গ্রুপের সংগ্রামী শ্রমিকদের অর্থ সাহায্য করুন। যে সমস্ত গণসংগঠন ও গণতান্ত্রিক মানুষ ইতিমধ্যে অর্থ সাহায্য করেছেন সেন-র্যালের গ্রুপ টি ইউ কো-অর্ড-

মেডিকেল কলেজে দুর্নীতি প্রসঙ্গে

দর্পণ পুথিকান্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতি ও অব্যবস্থার যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তারই শেষাংশে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিহীন আরও একটু বস্ত্য জুড়ে আমাকে জড়িয়ে ফেলার জন্য প্রতিবাদ জানানি।

হাসপাতালের বিভিন্ন অব্যবস্থা ও দুর্নীতির যে চিত্র সংবাদদাতা পরিবেশন করতে চেয়েছেন সে সম্বন্ধে আমরা তার মূল উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ জানাই। যদিও দুর্নীতির মূল শেকড় আরও গভীরে প্রোথিত এবং বিভিন্ন কার্যকারণে যে সব রই কাতলা এর সঙ্গে জড়িত সেই বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত-টুকু সামগ্রিকভাবে সংবাদদাতার সংবাদে অনুজ্ঞিতই রয়ে গেছে।

সংবাদে বলা হয়েছে সুশীল বসু নামে বহিরাগত জনৈক ব্যক্তি বীথিকা দত্ত ইত্যাদি কর্মচারীদের সহযোগিতায় কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদপরাশ্রয়তা প্রদান দিচ্ছে এবং সম্প্রদায়, বোমাবাজ ইত্যাদিতে এক অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।

সুশীল বসু হাসপাতালসমূহের এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সংগঠনের নির্বাচিত নেতা। বিভিন্ন হাসপাতালের সমস্ত কর্মচারীরা সুশীল বসুর নেতৃত্বে নিজস্ব সংগঠনে একাবদ্ধ। এটা বিভিন্ন ইউনিয়নভুক্ত কোন কোন কর্মচারীর কাছে ঈর্ষার কিংবা আক্রোশের কারণ হতে পারে কিন্তু সংগঠন করা এবং সংগঠনভুক্ত ব্যাপক কর্মচারী সাধারণের আত্মশাশীল হওয়াটা বোধহয় সুশীলবাসুর অপরাধ নয়।

সংবাদদাতা যদি হাসপাতালে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেতেন কিংবা এ পরিপ্রদায় করার দায়িত্বটুকু নিতেন তাহলে জানতে পারতেন এবং সঠিক ভাবেই বুঝতে পারতেন যে কমলা সেন এবং যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তার ভেতরের সামগ্রিক চেহারাটুকু। ওই বদলীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের গোষ্ঠীবদ্ধতা আমলাতন্ত্রের প্রিয়পাত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে দীর্ঘদিন একই জামগায় স্বপদে বহাল থাকার নোংরা ব্যাপার-গুণ্ডা আমরাই প্রথম প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছি।

বীথিকা দত্ত

সেক্রেটারী ওয়েস্টবঙ্গাল স্টেট গভর্নমেন্ট নার্সেস এসোসিয়েশন, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্টাফ, কলিকাতা।

নেশন কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হচ্ছে।
বিমল রায় চৌধুরী
আহবায়ক
সেন-র্যালের গ্রুপ টি ইউ
কোঃ অঃ কমিটি

বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সম্পর্কে

অসীম মুখোপাধ্যায়

একই চিত্র একটা গোটা পরিবারকে ওঠানো হোল। বাপ, মা, ছেলে, ছেলের বউ একটা মেয়ে এবং দু' তিনটি নাতি নাতনী। কেউ বাদ যায়নি, সবাই কলারায় মরেছে। ওপারে মধ্য-যুগীয় বর্বরদের হাত থেকে পালিয়ে এসে এপারে মহামারীর হাতে ধরা পড়ে গেছে এবং এখন গাদাগাদি করে ভেজা আম কাঠের চিত্র চড়ে পরলোকের যাত্রী। এই রকম আরও বহু পরলোকযাত্রীর চিত্র জ্বলছিল বাদুড়ির নোতুন রাস্তার ধারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

এই এক ধরনের উদ্ভাস। মানু-ষের মতই দেখতে, কিন্তু ঠিক যেন মানু-ষ নয়। ভীষণ ক্রিষ্ট, ভীষণ অপরিচ্ছন্ন, ভীষণ নির্বোধ। বোধ আছে কেবল একটা বিষয়ে, তা হোল ক্ষুধা। ক্ষুধার তাড়নায় রাতদিন হাঁ করেই আছে। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা। রাগ নেই, স্বেষ নেই, কোনও তাগিদ নেই। হাত বাড়িয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। ভাবতে কষ্ট হয় ওদের নিয়েই জীব-নানন্দ একদিন কবিতা লিখে-ছিলাম।

এক জায়গায় একটা অতি ছোট চাটাই বা তাঁবুর নীচে কেমন করে কুড়ি বাইশজন লোক স্বচ্ছন্দে শুয়ে বসে থাকতে পারে তা এদের না দেখলে বোঝা যাবে না। যক্ষ্মা রোগী বড়োর পাশে কোলের বাচ্চা মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছে। ভিনদেশী পুরুষের পাশে অপরের যুবতী বউ পরম নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শুষে আছে। কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কাউকে জানেনা। হাঁড়-কুড়ি, চটের বস্তা, ছেঁড়া কাঁথা আর তোষড়ানো টিনের বাস্র ঘাড়ের কাছে রেখে, সামান্য একটা ছাউনীর তলায় অসংখ্য মানু-ষের মত দেখতে এই জন্তুরা মৃদু হাঁ করে দিন কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু করে হাওয়াই জাহাজে চড়িয়ে অনেক দূরের এক চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হোচ্ছে এদের। কিন্তু আরও এক-দল উদ্ভাস এসেছে, বাদের অবস্থা ও মনোভাব নিয়ে কেউ তুলিয়ে ভাবছে না। এই স্বতীয় শ্রেণীর উদ্ভাস্তুরা হোল পূর্বপাকিস্তানগত উঠতি মধ্যবিত্ত। এদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী আছেন ব্যবসায়ী আছেন, চিত্রতারকা আছেন, সাংবা-দিক আছেন, আইনজীবী আছেন, এক কথায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সোজা, বাঁকা সব পেশার সব মানু-ষই আছেন এদের মধ্যে। আমার কথা এদের নিয়েই।

এমন সময় খবর এল “জরুরী তলব” অমৃদু দলের দুই বিখ্যাত নেতা কলকাতায় এসেছেন, উঠেছেন ঐ হোটেল, তারা অনেক বাহানা করে শেষমেষ দর্শন দিতে রাজী হয়েছেন কাজেই সাক্ষাৎকারের জন্য যেতে হবে।

গেলাম নেতৃদর্শনে। হোটেলের দোতলার ঘরে দু' পাশে দুটি খাটে দুই নেতা চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন, একজন যুবক রোগা (রোগা বলব না স্লিম বলব? সাধারণ মানু-ষ হয় “রোগা” আর নেতারা হয় “স্লিম”) আর একজন যুব মোটা। মোটা যিনি তার কোমরের লুপ্ত বিপজ্জনক ভাবে নীচের-দিকে নেমে গিয়ে বিশেষ একটা জায়গায় এসে হোচট খেয়ে হাঁ হয়ে আছে। নেতার দেহের মধ্যাংশটুকু আমাদের গণেশ ঠাকুরের মত এবং শূন্যে থাকার দরুণ পাশ-বালিশ বলে মনে হচ্ছিল। দু-জনেই চপচাপ এবং চিৎপাত হয়ে-ছিলেন। আমাকে দেখেও দেখলেন না যেন! স্বতঃপ্রসূত হয়ে ঘরে ঢুকব সে সুযোগও হচ্ছিল না। কেননা ঘরময় অজস্র ফিলটার-টিপড্ উইলসের প্যাকেট ছড়ানো। পরে একসময় গুরুগোঁড়ায় ঘোলাটা মাঝে মাঝে দু' একটা বিলাতী সিগারেটের প্যাকেটও নজরে আস-ছিল। মোটা যিনি তাঁর খাটের তলায় একটা অধঃখণ্ড জিনের বোতল। টেবিলের ওপর সদ্য কিনে আনা বাটা কোম্পানীর জুতো এবং বেশ কয়েকজোড়া টেরিগলি শার্ট ও টেরিকট প্যান্ট, আলনার বেশ কিছু বস্ত্র ডায়িং মার্কা তোয়ালে এবং বেডকভার বদলেছে। এগুলিও সদ্য কেনা। ও হ্যাঁ, টেরি-লের উপর এসপ্ল্যান্ডের ফুটপাত থেকে কেনা কয়েকটা সেন্ট, অফ-টার শেভিং লোশন এবং গন্ধ তেলের শিশিও দেখতে পেলাম। চেয়ারের উপরেও বেশ কিছু যোপা-বাড়ী থেকে কাঁচিয়ে আনা জামা-কাপড় ছিল।

সুতরাং ঘরে ঢুকলেও বসব কোথায় তাই ভাবছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা উপায় বার করলাম। যদিও আমার ঠাণ্ডা লাগেনি তাও কাশতে লাগলাম। অচিরেই ফল ফলল। এক নেতা চোখ খুললেন, ঘাড় ফেরালেন এবং শ্রু কুচকোলেন। বকলাম নেতা পরিচয় জানতে চাইছেন। পরিচয় দিলাম। নেতা ভিতরে আসতে আদেশ করলেন। ভিতরে ঢুকলাম। নেতা আদেশ করলেন চেয়ারের ওপর থেকে কাপড়গুলো সরিয়ে টেবিলে রাখতে। রাখলাম। তিনি আবার আদেশ করলেন “বসুন”। বসলাম। ঐ নেতা এবং তার বন্ধু অপর নেতাটি কি বল-লেন তা এখানে না বললেও আপ-নারা আন্দাজ করতে পারবেন। ওরা চিৎপাত হয়ে শূন্যে কড়িকাঠ গদনতে গদনতে গোরিলা যুদ্ধ কি

এবং তা কি করে করতে হয় তা বোঝালেন এবং সেইটে করতেই যে কলকাতায় আসা তাও বোঝা-লেন। কিন্তু আমি চলে আসার ঠিক আগেই যে কান্ডটি করলেন তা পাঠক পাঠিকাদের জানা দর-কার। রোগা নেতা বললেন, “ওহে একটা সিগারেট দাও”, মোটা নেতা বললেন, “খুঁজে নিতে হবে। এত সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে, কোনটা খালি, কোনটা ভর্তি বুদ্ধি কি করে?” অতঃপর দুজনে খাট থেকে ঝুঁকে পড়ে সিগারেটের প্যাকেটগুলি খুলে দেখতে লাগ-লেন। হঠাৎ মোটা নেতাটির হাতের ধাক্কা লেগে তার খাটের তলায় রাখা জিনের বোতল মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে এল। হত-চ্ছাড়া বোতলটি একেবারে লেবেল সহ ডাব ডাব করে তাকিয়ে আছে দেখে মোটা নেতা সদ্য যৌবন তাড়িত নারীর মত সলজ্জ হাসি হেসে বললেন “এটা মোডিসন”!

এরপর আরও অনেকবার ঐ দলের অনেক নেতা দেখেছি। এরা জামাই আদরে আছে। হাসছে, খাচ্ছে, গাড়ী চড়েছে, মোটা গদী পাতা বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমের মধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছে গিয়ে লড়াই করছে, “খান সেনা” মারছে আতঁকে রক্ষা করছে, দেশ স্বাধীন করছে, কত কি করছে! এবং ঘুম ভেঙে সকাল সাড়ে সাতটায় উঠে বাজারী পত্রিকার গরম খবরে কামড় বাঁসিয়ে, তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছে। কলকাতার দুটি বিশেষ জায়গায়, দুটি বিশেষ বাড়ীতে এই রকম অনেক নেতা আছে। সুসজ্জিত ঘরে, স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের যাবতীয় উপকরণ পেয়ে এরা অতি দ্রুত বিপ্লব করে যাচ্ছে।

এবার সাংবাদিক উদ্ভাস্ত! যার কথা বলছি তার পিতা আমদু-খার বুদ্ধিদায়ী গণতন্ত্রের এক অন্য-তম ধন্যধারী ছিলেন। এবং এদের আর্থিক উন্নতির জন্য আমদু-খি দায়ী। এই সাংবাদিক উদ্ভাস্তটি একদিন আমাকে বললেন—“কেন যে আপনারা রিফিউজী, রিফিউজী করে হাফানচ্ছন, বুদ্ধি না। আরে মশাই আপনারা হোল অনেক বড় লোকের দেশ। আপনারা অনায়াসে এক কোটি রিফিউজীকে প্রোভা-ইড করতে পারেন”। চমৎকার যুক্তি! কার মাসুল কাকে দিতে হচ্ছে! এই সাংবাদিক উদ্ভাস্ত বর্ত-মানে আরও কয়েকজন “দেশের ভাই”কে নিয়ে বই লেখার ব্যবসায় নেমে গেছেন। বাজারে ইতিমধ্যে বহু বঙ্গবন্ধুর জীবনী : ও বাংলাদেশের সংগ্রাম কাহিনী বেরিয়ে গেছে। এরাও তাই কর-ছেন তবে ইংরেজীতে। কেননা, তা-হলে বিলেতের বাজারটা ধরা যাবে! পার্শ্বসার্কাসের এক ধনীর বাড়ীতে নিয়মিত সাহেবী খানা খেয়ে, পাখার তলায় বসে এই সাংবাদিক উদ্ভা-স্তুরা দেশরক্ষার সুমহান দায়িত্ব

পালন করছেন। সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখছেন ইতিহাসের প্যতার। এদেরই একজন স্থানীয় একটি বাজারী সাপ্তাহিকে নিয়-মিত অগ্নিস্রাবী কাব্য পরিবেশন করে থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই তার চোখে জল আসে। অথচ জানা গেছে যে সর-কারের রবীন্দ্রনাথ বিরোধী আন্দো-লনের ইনি ছিলেন একজন মধ্যা-হোতা।

চিত্রতারকা উদ্ভাস্তও দেখছি। কয়েকদিন আগে বর্ষগম্বুখর এক দুপুরে চোরগাঁর একটা নামী রেস্টোরাঁর এদের কয়েকজনকে দেখলাম। একজন চিত্রপরিচালক, একজন উঠতি নামক (অত্যন্ত নারীসুলভ চেহারা) একজন টেক-নিসিয়ান এবং বাকীসব সহকারী বা স্তাবক। টেবিলে চাপড় মেরে আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে জোর আলোচনা চলছিল। সবাই একমত। “গোটা দুনিয়া শীগগিরই স্বীকৃতি দিচ্ছে, খান-সেনারা তখন পালাতে পথ পাবে না। ভারত সরকার তো আছেই” ইত্যাদি। বার কয়েক চা এবং মোগলাই পরোটা এল এবং প্রচন্ড সংগ্রামরত মৃদু বোম্বা-র সহজেই সেগুলি উড়িয়ে দিলেন। কি খেলায় হল, পরদিন আবার গেলাম সেই রেস্টোরাঁর। গিয়ে দেখি, ঠিক ঐ একই কোণায়, একই টেবিল ঘিরে একই সব মানু-ষ। এরপর দিনও গেলাম—সেই একই দৃশ্য! কদিন বাদে আবার গেলাম। দেখলাম ঠিক এসেছে সবাই এবং যথাস্থানে বসে সংগ্রাম চলছে। একবার এক চিত্রতারকা তো দেশের জন্য শোক প্রকাশ করতে গিয়ে মৃৎখের ম্যাক্স ফ্যাক্ট-রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলে গেলেন। রোডওতে তার গভীর বিনুনি শোনা গেল। এই সৌন্দর্য মার্কিন কনসাল ভবনের সামনে কয়েকজন চিত্রতারকা কেঁদে উঠ-লেন। যথারীতি বাজারী পত্রিকায় তাদের ফোলা চোখ-মুখের ছবি উঠল, যেমন করে মন্ত্রী বা মেয়র রাস্তার ময়লা সাফ করতে এলে তাদেরও ছবি ওঠে, ঠিক তেমনি করে।

পূর্ব পাকিস্তানগত মধ্যবিত্ত হিন্দু বা মুসলমান এইসব উদ্ভাস্তুরা, বিশেষ করে যারা শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত তারা প্রায় অনে-কেই টাকা এবং সোনার গয়না যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ে আসতে পেরেছেন। অন্ততঃ আমার অভি-জ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি। স্বচ্ছন্দ মধ্যবিত্ত হিন্দুরা তাদের টাকা নিয়ে ইতি-মধ্যেই বাড়ীঘর বানাতে শুরু করেছেন, কেউ কেউ বাড়ী বানিয়ে ভাড়া দিচ্ছেন। কেউ আবার ব্যব-সায় নেমে পড়েছেন। অসুবিধা হচ্ছে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের নিয়ে, কারণ হিন্দুরা যত সহজে মেলা-মেশা করতে পারছেন বা মেলামে-শার সুযোগ পাচ্ছেন এরা ঠিক ততটা, যুবই স্বাভাবিক কারণে, পারছেন না। কিন্তু তা হলেও এদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, চিত্রতারকা, সাংবাদিক ইত্যাদিরা অপেক্ষাকৃত

ভাল অবস্থায় আছেন। চিত্রতারকা-দের কেউ, কেউ ইতিমধ্যেই এখান-কার চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বোগাবোগ করে ফেলেছেন। গায়ক গায়িকারা তো রেকর্ড এবং জলসা দুই-ই করতে পারছেন, কয়েকজন সাংবাদিক আবার গৃহীয়ে বসেছেন, এবং বুদ্ধিজীবীরা “স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস”, “বঙ্গবন্ধুর জীবনী” বাজারী পত্রিকায় কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে লক্ষ্যের পাঁচ-পা আবার দেখতে পাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, এদের কেউ কেউ নাকি বিভিন্ন কলেজে চাকরী পেয়েছেন এবং আরও পাবেন।

বুদ্ধিজীবী পূর্বপাকিস্তানী-দের সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি চমৎকার ঘটনা মনে পড়ে গেল। উপভোগ্য নিঃসন্দেহে। কিছুদিন আগে খবর পেলাম যে বিখ্যাত এক বিদেশী কৃষি অর্থনীতিবিদ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি নিজেই তাঁর কাছে গেলাম। তিনি উঠেছিলেন পার্ক স্ট্রীটের এক অভিজাত ফ্ল্যাটে। সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের একটি তরুণ মুসল-মান অর্থনীতিবিদও ছিল। বিদেশী ভদ্রলোক একসময় তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। আমরা বসে কথা বলছি। হঠাৎ কোনও এক প্রসঙ্গে আমি “বাংলা দেশ” না বলে পূর্ব পাকিস্তান বলে ফেল-লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঐ তরুণ অর্থ-নীতিবিদটি দু' হাতে নিজের বুক চেপে ধরে চেয়ারে ঢলে পড়ল। আমি হতবাক! থমবসিস হোল নাকি? কি করব? একটু পরে ছেলোট সোজা হয়ে বসতে বসতে বলল—“আর কখনও পূর্বপাকি-স্তান বলবেন না বুদ্ধে বড় লাগে। বলবেন “জয় বাংলা”। সে তখনও বুদ্ধে হাত বোলাচ্ছিল। এবার আমারই ঢলে পড়ার পালা। জানতে পারলাম ছেলোট বর্তমানে ফ্রান্সে যাচ্ছে, সেখান থেকে অক্সফোর্ডে যাবে। বললাম “জয়বাংলা না বললে বুদ্ধে লাগে, অথচ জয়বাংলা ছেড়ে বিদেশে যেতে আপত্তি নেই কেন? আপনার মত শিক্ষিত অনেকেই তো এখানে এসেছে, তারা তো কেউ বাইরে যাচ্ছে না?” স্বতীয় “বঙ্গবন্ধু” কোনও উত্তর দিতে পারলেন না!

যদিও আমার অভিজ্ঞতা থেকে (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

নবাব সাপ্তাহিক

১১ জানুয়ারি ১১

বার্ষিক পনেরো টাকা

সাপ্তাহিক সাড়ে সাত টাকা

প্রমাসিক চার টাকা

টাকাকতি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, মট লেন, কলি-১৩

দর্পণে সপ্তাহ

শ্রীমন্ত

রাজ্যপালক (রাজ্যপাল নয়) সিদ্ধার্থশঙ্কর রাইটার্সে বসতে-না-বসতেই “বাংলা পিপলে”র জন্য “করো করো” “ধরো ধরো” রব পড়ে গেছে দৈনিক সংবাদ সমাচারে। খবর কাগজের হেড লাইন জুড়ে সংবাদের রবরবা। আব কুছ ভি না কুছ তো জরুর মিল যারগী পশ্চিম বাঙ্গালকী নসীম মে। যেমন একটি সংবাদের নমুনা এই রকম :

হলদিয়ায় নাকি জাহাজ তৈরীর কারখানা বসবে। কারখানায় গাড়ি গাড়ি বেকারের কাজ জুটবে। টাকার হিসেব হয়ে গেছে। স্ট্রেক্টারী বাছাই-ও কর্মসিটি।

তবে পরিকল্পনা এখনো কেন্দ্রের বিবেচনাধীন এবং হলদিয়া প্রকল্প অগাধ জলে। তাছাড়া হলদিয়ায় এখনও যতটুকু বা কাজ হচ্ছে, তাও বঙ্গজ মাটিতে অবগজ কমীর মারফতেই তোলা হয়ে থাকে অর্থাৎ বাঙ্গালীর মূখে সেই একটিই পেটের বোল বাজবে : “বদলে নটবর, তুমিও বাবে না আমিও বাব না।” বাজবে শ্রদ্ধা পাবলিসিটির ঢোলক এবং সিদ্ধার্থ-শঙ্কর আসবেন যাবেন দিল্লী-কলকাতা।

পরিকল্পনাও চলবে। পরশু-রামের গল্প, “সরলাক্ষ হেমের” পরিকল্পনা : সেই যে, চাই কমলা লেবু? তাহলে কাটাও পড়ুক।

খোঁড়ামাটি খাড়া করে বানানো পাহাড়। পাহাড়ে ফলবে কমলা, গলবে বরফ—ইত্যাকার পরিকল্পনা। এ রাজ্যেও তেমনি, চাই চাকরি? লে আও জাহাজ।

অবশ্য কাজ কিছ, হচ্ছে। যেমন বীরভূমে পুর্লিশ লাইন ঢেলে সাজানো। হেড লাইন : “সব ধানার ও-সিদের ওপর বদলির হুকুম।” এবং মিলিটারী আমদানি। এর পর কাছে পিঠে ‘বর্মান’ (আসানসোল)। এগুতে এগুতে মিলিটারী চন্দননগর ফরাস ডাঙা-রও পৌঁছে যেতে পারে। ওখানের সংবাদ যে সাধারণিক। চন্দননগর পৌর নির্বাচনে “মারকুটে” সি পি এম-এর জয়জয়কার।

কিন্তু আদার ব্যাপারীর লাল-বাজারী খবরে কাজ নেই। খবর আছে অন্যর : সংবাদ শীর্ষ হিসেবে টপ বক্স নিউজ, আকাশবাণীর নয়া গণহিতৈষী পরিকল্পনা সম্পর্কে। চমকপ্রদ এই সংবাদে চন্দ্র ছানা-বড়া।

আকাশবাণী কলকাতা নাকি রাজ্য সরকারী উদ্যোগে নয়া এক সংবাদ পরিকল্পনা আসর সাজাতে আগ্রহী। উদ্দেশ্য, নিরীহ “বাংলা পিপল”কে সতর্কীকরণ। কোথায় কাঁদাজলে যানবাহন অচল, আকাশ-বাণী জানাবে তারই তাৎক্ষণিক সংবাদ। কোথায় মিছিল মানুষের

বাহিনী দিয়েছে ট্রাফিক জ্যাম করে কর্তব্যপারায়ণ সংবাদ ভাষ্যকার তারই ওপর টিপ্পনী দিয়ে যাবেন। আসলে পশ্চাতের সাধু সংকল্প হল, এ মিছিলের ওপর টিপ্পনী দেওয়া। মশাইগণকে মালুম করিয়ে দেওয়া, মিছিল কেমন অনিচ্ছাকারী, “মিছিল হইতে সাবধান”।

তা সরকার তাঁর পাবলিসিটি বস্ত্রের চোঙায় “বাংলা পিপলে”র হিতৈষী হিসেবে পাবলিকলি নিয়-মিত (কারণ এ রাজ্যে মিছিলও নিয়মিত) হুঁসিয়ারী দিলেই বা শ্রীমন্তের কী বলার আছে? এ তো খুব সুখের কথা। তবে জমা জলের সমস্যা নিয়ে বোধহয় বিশেষ সুবিধে হবে না। কারণ এ ব্যাপারে সি এম ডি এ দুইবন পোর কর্তৃ-পক্ষকে, পৌরসভা কেন্দ্রকে এবং কেন্দ্র ভগবানকে। কেননা বৃষ্টি একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। মিছিল-টাই সুতরাং হবে কচলাবার বিষয়। আর এই কচলা কচলিতে আকাশ-বাণীর সংবাদ পরিকল্পনার যথেষ্ট পারদর্শিতাও আছে। “সংবাদ পরিকল্পনা” বিভাগ আয়োজিত পাকি-স্তানের গণতন্ত্র হরণ সম্পর্কে ধারাবাহিক গবেষণায় বেশ ধার আছে। মিছিলের ওপরেও আকাশ-বাণীর ভাষ্যকারের কম্পিত কন্ঠ প্রোভাব হতে পারে। প্রশ্ন হল, শুনবে কে? যাদের জন্য সংবাদ, আশা করা যায়, তারা তখন অফিস কাছারিতে কাজ শেষ করে রাস্তায় নেমেছেন। তাহলে শুনবেন কি গৃহবধুরা? ফল কি হবে? স্বামী-পুত্রের বাড়ি ভাতে জল ঢেলে হাপদুস নয়নে পথ চেয়ে বসে থাকার অপেক্ষা?

কিন্তু এই সাধু পরিকল্পনা-নাই তো পাবলিক মানি ওয়েন্ট না করে পাবলিকের স্বার্থ ওয়েল বাইং-এর প্রতিই নজর দিতে পারত। যেমন ধরুন, হরতাল হাঙ্গামা মিছিল বৃষ্টি না থাক-লেও যখন বিশেষ রুটে ট্রাম বাসের টিকি দেখা যায় না, তখন সেই আধা সরকারী গাড়িগতির সংবাদ ঘোষণা করে আকাশবাণীর প্রস্তা-বিত হুঁসিয়ারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃ-পক্ষকে সচেতন করতে পারে। সরকারী দুধ কেন নিয়মিত ব্যবধানে খোলা ক্যানে পরিবেশিত হয় তাই নিয়ে আকাশবাণীর নয়া ফীচার মাথা ঘামালে সর্বের মধ্যে ভূত নাড়ানো সম্ভব হত।

যেমন ধরুন, নির্দিষ্ট “কোটা”র যোগান পাওয়া সত্ত্বেও বিশেষ অঞ্চলে বিশিষ্ট দ্রব্য যখন ব্যাক মার্কেটে মুখ লুকায়, তখন আকাশবাণীর প্রস্তাবিত গণ-হিতৈষী সংবাদভাষ্যকার উপাদক-দের সতর্ক করে সেই সব অসং-কোটাপ্রাপকদের কোটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকারী উপদেশ দিতে পারেন। কালোবাজারী আক্রমণে কখনো বেবী ফুড, কখনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী, এমন কি এপিডেমিক শ্রদ্ধা হলো, টি এ বি সি কলারার ইনজেকশনও কালো বাজারের বোরখা পরে বাজারে নামে। সাধু সংকল্প থাকলে এসব বিষয়েও নজর দেওয়া যায়।

যেমন ধরুন, তদামীতন যুক্ত-ফ্রন্টের মানসিকভাবে বিষমুদ্র মৃদু-মন্দ্রী অভয়কুমারের নাটকীয় অন-শনের পর যখন বস্তৃতই শহরে

অবাধ জঙ্গলের শাসন শ্রদ্ধা হয়ে গেছে, তখন আকাশবাণীর প্রস্তা-বিত তাৎক্ষণিক সংবাদ ফীচার গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা অবশ্য পালন করতে পারে। গণহিতৈষ-গার ক্ষেত্রে সেটাই তো আগে করা উচিত। কলকাতার বৃকে ও আশপাশে দিনদুপুরে কিম্বা রাত বেরাতে লরি ভিড়িয়ে ডাকাতি হল পর পর। লুট হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। লোকাল লোকে নাকি ধান পুর্লিশে সংবাদ দিয়েও সময়মত সাহায্য পেলেন না। আকাশবাণীর গণহিতৈষী সংবাদ ফীচার এখন ডায়াল “পিউ” ফর “ডেকরাটি”র উদ্ঘোষন করে তাম্রা জনসাধারণের মনে ভরসা দিতে পারেন। সংবাদ পুর্লিশে ন দিয়ে অতঃপর আকাশবাণীর তাৎক্ষণিক এমারজেন্সী সংবাদ বিভাগকে দেওয়া যেত। তারা বেতারে লালবাজার শখের বাজার সচেতন করে পুর্লিশকে সরেজ-মিনে হাজির হতে নির্দেশ দিতেন এ নির্দেশ সর্বোচ্চ সরকারী নির্দেশ বলে মানতে হত। লাল-বাজার থেকে স্বয়ং কমিশনার ছুট-তেন সদলে। উপদ্রুত অশ্র-লের টেলিফোনে পুর্লিশের কানে জল ঢেকে না। আকাশবাণীর নির্দেশ গল্পের সেই “চলমান অশরীরী অরণ্যদেবের” অমোঘ নির্দেশের মতো পুর্লিশকে গা নাড়তে সাহায্য করত।

করবার মতো কাজ ঢের পড়ে আছে। করবে কে? কলবেই বা কে? সিদ্ধার্থশঙ্কর দিল্লী যাবেন, ফেরং আসবেন। মহাস্থাবির প্রশাসন কিন্তু না যবো, ন তসে

রাজধানীর চিঠি

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

কোনগুটির উদ্ঘাটনে ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ জনতাকে অবহিত করে শক্তি-শালী করে, সে সম্পর্কে বিচার করবার দায়িত্ব সাধারণ পাবলিকের ওপরই ছেড়ে দেওয়া ভাল, কারণ তাদের সম্মিলিত শ্রুতবুদ্ধি ও দায়িত্ববোধ এ সম্বন্ধে প্রখর। জনগণ যে আপন অমঙ্গল আপ-নিই ডেকে আনে না, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের লেখক ও সাংবাদিক মহলে সুস্থ বিশ্বাস যে জাগ্রত তা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ভাস্বর : “এই সকল বিবরণী প্রকাশ করার আমাদের উদ্দেশ্য নয় কোন বিত-কগত যুক্তির অবতারণা করা, প্রমাণ করতে কি ভাবে এই যুদ্ধে আমেরিকার অংশ গ্রহণ ঘটলো এবং বেড়ে চললো। আমাদের এও উদ্দেশ্য নয়, কোন অ-সামরিক অথবা সামরিক ব্যক্তি বিশেষের প্রতি এর জন্য অভিযোগের তর্জনি উঁচানো। যে সকল জরুরি প্রশ্ন আমাদের জীবন, আমাদের ভাগ্য, আমাদের পবিত্র সম্মানবোধকে প্রভাবিত করে, তেমনি প্রশ্নে সব-কারের উচ্চতম মহলে সম্মানিত গ্রহ-ণের ইতিহাস (অবশ্যই তা অস-

ম্পূর্ণ) আমেরিকী জনগণের সম্মুখে রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য”। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সত্যিকারের সাংবাদিক স্বাধীনতা কি তার সক্রিয় প্রয়োগে এই পত্রিকা এবং তার অনুপ্রেরণায় অন্য সংবাদ-পত্রও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়-য়েছে।

প্রসঙ্গভঃ স্মরণে আসে ভারতে তথাকথিত স্বাধীন সংবাদপত্র-গুলির ঢাকঢাক গুড়গুড় ভূমিকা। আজও ভারতের বৃহৎ সংবাদপত্র-গুলিতে সরকারের আমলাতন্ত্রী অত্যাচারের ফলে যে অহেতুক এবং অযথা সত্যগোপনের জের চলছে, তার প্রতিবিধানার্থে প্রকা-শনার সাহস দেখাতে পারে নি। তাই যখন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাজ্যে, যেখানে গোপনীয়তার বাড়াবাড়ির ফলে প্রায় দশো লক্ষ ডকুমেন্ট (যার মধ্যে ব্যবসায় সংক্রান্ত সূচনা এবং খবরের কাগজের কাটিংও গণ্য) অপ্রকাশ্য দলিল রূপে চিহ্নিত, সেখানেও সর্বস্থানপ্রদত্ত অধিকার রক্ষার জন্য প্রেসকে আপন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হয় রাষ্ট্র বিভাগের এবং সর্বশক্তিমান পেশীগণের বিরাগভাজন হয়ে, তখন কিন্তু ভারতে অনুরূপ কোন সংগ্রাম চোখে পড়ে না। শ্রদ্ধা দেখা

যায়, সরকারী শাসকবর্গের একান্ত সমর্থক, বিশ্ববানদের অঙ্গুলি-চালিত সংবাদপত্রগুলি নমো-নমো গোছের সমর্থন জানাচ্ছে ভালভাবে বুঝে যে, তাদের পবিত্র সাংবাদিক স্বাধীনতার খাতিরে সরকারের সঙ্গে টঙ্কর নিতে হবে না। কোন ভারতীয় সংবাদপত্র বা প্রকাশন সংস্থা ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতিতে উত্তর-সীমান্ত পারের দেশগুলি সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন উন্মোচন সাল থেকে বাবাটির মধ্যে ঘটেছিল, তার তথ্যমূলক বিবরণী কি ছেপেছে? সরকারের দৃষ্টি সম্পর্কে সদর্পক সমালোচনা সেই জনতাই করতে পারে, যার নিকট থেকে প্রকৃত অবস্থা এবং বাস্তবতা ভিত্তিক তথ্য গোপন করা হয়নি। বস্তৃতঃ আমেরিকার ন্যা ইয়র্ক টাইমস বিচার বিভাগীয় রায় স্বপক্ষে পাবার জন্য যে সংগ্রাম করেছে, তাতে তার সম্পাদকীয় অভিমত মানায় : “সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সূচিত হবার নিশ্চিত অধিকার আমেরিকী জন-তার রয়েছে এবং সরকার যদি তির্যক পন্থাতি নেয় তাহলে দেখবে কোন সর্বিধানের অনুমোদন তাদের নেই যার বলে তারা সেন্সরমূলক

জবরদস্তি এবং সত্যগোপন করতে পারে”। জনমতেরই জয় শেষ পর্যন্ত!

ওরাশিয়ান পোস্ট থেকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল কেউই বৈশ্ব-বিক পত্রিকার দাবীদার নয়, তবু তারা জনগণের প্রতি দায়িত্বকে সর-কারের প্রতি আনুগত্যের তুলনায় বড় করে দেখেছে। এখনেই উপ্ত আমেরিকান জাতির অস্বীকৃত স্বাধীনতাপ্রিয় মন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী, যা আমেরিকার সরকারের বিশ

হাজার কোটি ডলার মূল্যের ভিয়েনাম যুদ্ধে চরম শিক্ষালাভ করেছে। এ অনুবঙ্গে আমেরিকার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারক জাস্টিস ব্ল্যাক যা বলেছেন তা উদ্ঘাটন অপেক্ষা রাখে : “প্রেসের মূখ্য ভূমিকা হল শাসিতদেরকে সেবা করা, শাসককে নয়। প্রেসের ওপর সরকারের সেন্সর ক্ষমতার খবদারি এই জন্যে তুলে দেওয়া হয়েছিল যাতে প্রেস চিরদিনই সরকারকে নিন্দা করবার স্বাধীনতা পায়।”

ছোট ঘটনা, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

জিন্নাগঞ্জ। মর্শিদাবাদ জেলার একটি ছোটো শহর। সময় : মার্চ উনিশশ একাত্তর, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাজেট প্রকাশের কাছাকাছি সময়। বাজার থেকে সমস্ত রকম বেবী ফুড ফাটকাবাজ ও মুনাক-বাজদের কল্যাণে প্রায় অদৃশ্য। দুয়েকটা দোকানে যাও বা পাওয়া যাচ্ছে, তা-ও অনেক বেশি দামে। স্বভাবতই শিশুরা বিপদগ্রস্ত, শিশুদের মা-বাবারা দৃষ্টিস্তাগ্রস্ত। হঠাৎ বাজারের আশপাশে একদিন কটা পোস্টার দেখা গেলো।

বক্তব্য : “যারা শিশুদের খাদ্য নিয়ে ফাটকাবাজী ও মুনাকাবাজী করে, তারা জনগণের শত্রু। তাদের এক-মাত্র শাস্তি—মৃত্যু”—সি পি আই (এম-এল)।

আশ্চর্য ব্যাপার। পরের দিস-থ থেকেই বাজারে সমস্ত রকম বেবী ফুডের পুনরাবির্ভাব। এবং ন্যায্য দামেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর “সমাজতান্ত্রিক” বক্তৃতার বা পুর্লিশ আমলাদের প্রগতিশীল হুমকিতে যা হোলোনা, কয়েকটি পোস্টারেই তা হয়ে গেলো।

বিদেশ দর্পণ

নিকশনের চীন সফর প্রসঙ্গে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

সত্তরের দশক মন্ত্রির দশকে পরিণত হবে কী না জানি না তবে এই দশকে এরই মধ্যে দুটি ঘটনা ঘটেছে যার গভীর তাৎপর্য অনস্বীকার্য। প্রথমটি মান্দুকের চাঁদে পদার্পণ এবং দ্বিতীয়টি মার্কিন প্রেসিডেন্টের চীন সফরের ঘোষণা। আপাতদৃষ্টিতে চমকপ্রদ হলেও এ ঘটনা দুটির কোনটিই একদিনে ঘটেনি। চাঁদে যাওয়ার প্রস্তুতিকল্পে যেমন ছিল বহু বছরের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা তেমন নিকসনের ঘোষণা এসেছে গত কুড়ি বছরের আন্তর্জাতিক

রক্তক্ষয় এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম যুদ্ধ। এই ব্যাপারে এখনো শীর্ষস্থানে রয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত এই যুদ্ধে মার্কিন হতাহতের সংখ্যা কোরীয় যুদ্ধের দ্বিগুণেরও বেশী। ভিয়েতনাম যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা প্রথম মহাযুদ্ধের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হয়ে

দাঁড়িয়েছে।

এই যুদ্ধে গত সাত বছরে অর্থব্যয় হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি পাউন্ড। অর্থাৎ প্রতিটি আমেরিকান নাগরিকের এই যুদ্ধ বাবদ খরচা পড়েছে আড়াইশ পাউন্ড।

গত ১৯৬১ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দশ বছরে ভিয়েতনামের মন্ত্রিব্যবস্থার হাতে নিহত হয়েছে ৪৪-৬১০ জন মার্কিন এবং ১৩৬,৯৭০ জন দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য।

রাজনৈতিক পটভূমির দ্রুত পরিবর্তনের ফলস্বরূপ।

প্রেসিডেন্ট নিকসনের ঘোষণা সারা বিশ্বে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। যে চীনকে মার্কিন সরকার কোনদিন স্বীকৃতি দেন নি, যে চীনের তথ্য কমিউনিস্টদের প্রভাব থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টায় ভিয়েতনাম, লাওস, থাইল্যান্ডে তাদের অনুপ্রবেশ হঠাৎ সেই চীনে নিকসন তাঁর জাতীয়

নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ হেনরী কিসিংগারকে পাঠালেন কেন? কেনই বা ডঃ কিসিংগার চীনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর প্রেসিডেন্টের চীন সফরের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন এবং কেনই বা চীন এন লাই সাদরে আমন্ত্রণ জানান? প্রশ্নগুলির উত্তর হয়ত পাওয়া যাবে বর্তমান পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক

চীনের নিজ নিজ অবস্থার কথা ভাবলে।

ভিয়েতনামের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আজ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমাগত ব্যর্থতার ফলে অধিকতর সৈন্য ও অর্থ নিয়োগ করে আজ ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি জালে জড়িয়ে পড়েছে যেখান থেকে সসম্মানে বেরবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এক প্রচণ্ড দৌটানায় পড়েছে মার্কিন সরকার। একদিকে নিজ দেশের জনগণের কাছ থেকে অবি-লম্বে ভিয়েতনাম ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ এবং অন্যদিকে বিশ্বের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয়। প্যারিস বৈঠকে মাদাম বিন যে সাত দফা শান্তি প্রস্তাব দিয়েছেন তাকে মার্কিন সরকার গোপনে অভ্যর্থনা জানালেও প্রকাশ্যে মানতে পারছে না কারণ নিজের মিত্র শক্তিগুলির কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়।

মার্কিন সরকার এটি বুঝেছে যে এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হল চীনের সঙ্গে দোস্তি। একবার চীনের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা সহজ করতে পারলেই, চীনের সঙ্গে যুদ্ধ ভাবে ভিয়েতনাম সমস্যা আলোচনাকল্পে একটি সভা ডাকা যেতে পারবে যেখানে হয়ত দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। মানে এটি হবে প্যারিস বৈঠকের একটি বড় সংস্করণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশা যে এই ধরনের একটি আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি ফর্মুলা বার করা যাবে যাতে করে ‘বিশ্ব শান্তি’ প্রাপ্ত হবে ইত্যাদি দোহাই দিয়ে ভিয়েতনাম থেকে বেরিয়ে আসা খুব একটা কঠিন হবে না। তা ছাড়া চীনের সঙ্গে একবার বন্ধুত্ব করতে পারলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে শত্রু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মিত্র স্থানীয় দেশগুলি নয়, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম প্রমুখ দেশগুলির সঙ্গেও ব্যবসা বাণিজ্য শুরুর কথা যাবে।

এবার চীনের দিকটা দেখা যাক। নিকসনের এই প্রস্তাবের ফলে প্রথম রাউন্ডে নিশ্চয় চীনের জয় হয়েছে। মার্কিন সরকার চীনকে একটি বৃহৎ শক্তি বলে মানতে বাধ্য হয়েছে এবং শত্রু পক্ষের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি লাভ কম নয়। চীন নিজেও এটা বুঝছিল যে বর্তমান পৃথিবীতে তার পক্ষে আর একা চলার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তারও আজ প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিজের বিশেষ স্থান দখল করে নেওয়া। এ সবই প্রয়োজন তার নিজের জাতীয় স্বার্থে।

যে যতই আপত্তি করুক না কেন এ কথা আজ অস্বীকার করা চলে না যে চীন লাই খেন নিকসনকে অভ্যর্থনা জানালেন ডঃ

কিসিংগারের মাধ্যমে, তখন এই জাতীয় স্বার্থের কথাই তাঁর মনে ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বর্তমান তত্ত্ব সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত খুব বেশী ভাবেই মনে ছিল। আজ সোভিয়েতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অকম্বানিস্ট দেশগুলিতে, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে যদি চীনকে প্রভাব বিস্তার করতে হয় তবে তার প্রথম কর্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে সোভিয়েত রাশিয়াও এই জাতীয় স্বার্থের তাগিদেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করে তুলেছিল।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে চীন মার্কিন কোন মৈত্রীর ফলে এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামগুলির বাদের প্রতি চীন অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এসেছে এতদিন, তাদের কী হবে। আমার মনে হয় এদের খুব একটা অসুবিধা হবে না। যে জাতীয় স্বার্থের তাগিদে চীন আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চলেছে সেই একই স্বার্থের তাগিদে (শেবাংশ শেখ পুস্তার)

বাংলাদেশ থেকে

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

খুব সামান্যই বললাম তাহলেও এই স্বল্পতম বিবরণকে সামনে রেখে ভাবা উচিত কারা কে, এবং কে কি পাচ্ছে? সত্য নন্দ অথচ নন্দ নয়। কারণ সত্য নিরাবরণ, তার আবরণের দরকার নেই, তার পরিচয় সে নিজেই। কিন্তু আমরা অসভ্য সমাজের অসভ্য মানদ্বারা প্রকৃত অর্থে নন্দ বলেই সত্যের সামনে দাঁড়াতে চাইনা। ভয় পাই। তা না হলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতাম যে কাদের বদলে কারা কি করে নিচ্ছে, কাদের মাথায় কারা কাঁঠাল ভেঙে থাকছে। ইয়াহিয়ার এবং তার “দুঃশমন দাদা”দের চক্রান্তের বলি হোল পূর্ব পাকিস্তানের কোন আর্থিক স্তরের মানুষ এবং কি পরিমাণে? ইয়াহিয়ার চক্রান্ত সফল হোল কাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় এবং তাদের কি শাস্তি দেওয়া উচিত? এবং অজস্র রক্তপাত, প্রাণহানি ও বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে যদি কোনওদিন কোন ব্যবস্থা হয় তবে কারা ‘আম’টি পেড়ে খাবে এবং “অজগর তেরে আসবে কাদের”?

এপারেও দেখছি সমস্ত বুকে মনিয়ে ইস্তফা দিয়ে পরের বারের জন্য গদী পাওয়ার রাজনীতি চলছে। ওপারেও দেখছি লোক তেঁপিয়ে দিয়ে জেলে বসে রথ দেখা কলা বেঁচা দই হচ্ছে! কেননা, দুপারেই এক কথা—“আন্দোলন করা ভাল যদি করে পরের ছেলে মেয়ে। আমরা মজা দেখব, মিছিল করব, কাঁদিনি গাইব, বই লিখব, সংগ্রামের সিনেমা করব এবং সময়ে পাকা আমটি পেড়ে খাব”!

বীরভূম

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গায় নকশাল সমর্থনের ব্যাপকতা বিপুলবেগে বেড়ে যায়।

আজকের বীরভূমে প্রায় প্রতিটি এলাকাতেই নকশালদেব জনসমর্থন ব্যাপক হওয়ায় শহরের হাটবাজারের কাজকর্ম অত্যন্ত সুস্থ ও স্বাভাবিক চলতে আরম্ভ করে, গ্রামের মধ্যেও ব্যাপক নকশাল প্রীতি গেরিলা গণফৌজকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করতে থাকে।

বীরভূমে নকশালদের এই ব্যাপক গণসমর্থনের খবর দিয়ে জেলা কংগ্রেস কর্মিটি মে মাসের শেষের দিকে এবং জুন মাসের মাঝামাঝি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সিদ্ধার্থশংকর রায় দুর্ভাগ্যবশত জেলা ঘুরে যান; কৃষ্ণকুমার শুল্লা বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেসকর্মীদের সংগে বৈঠক করে।

জুনের তৃতীয় সপ্তাহেই রাইটার্স বিল্ডিং বীরভূমে মিলিটারী নাবানোর পরিকল্পনা করে আই বির বাঘা বাঘা লোককে পাঠান, তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে যে পরিকল্পনা হয়, প্রসাদ বসু তাই জেলা কর্তৃপক্ষকে জুলাই মাসের প্রথম দিকে জানিয়ে যান।

মিলিটারী সি আর পির পরিকল্পনা হলো : যেহেতু নকশালদের খুঁজে বের করা মর্শাল, সেইহেতু মন্ত্রাঙ্গল বলে বর্ণিত এলাকাগুলোতে দশ থেকে দ্বিশ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক কিশোর ও যুবককে থানায় নিয়ে এসে বেদম প্রহার করতে হবে। যদি প্রহারে কেউ মারা যায় তাতে সরকার দেখবে যে কোন পুলিশ বা অফি-

সার বেকায়দায় না পড়ে, কারণ “মৃত” ব্যক্তিকে বা যুবককে নকশাল বলে চিহ্নিত করলেই যদিও আইনের হত্যা হবে, আইনই উক্ত পুলিশ বা অফিসারকে বাঁচিয়ে দেবে। মাস তিনেক এ অত্যাচার চালালে সাধারণ লোক প্রাণের দায়ে নকশালদের নাম বলে দেবে, ধরে আনা লোকদের মধ্যে কে কে প্রকৃতই নকশাল তা বলে দেবে। সতরাং এই নকশালদের ঘাঁটি এলাকাগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, লোকে মিলিটারী পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে আতংকে নকশালদের বিরুদ্ধে চলে যেতে বাধ্য হবে।

এই ফ্যাসিস্ট কায়দায় নিপীড়নের ফর্মুলা নিয়ে এখন মিলিটারী পুলিশ বীরভূমের গ্রামে গ্রামে নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে। সিউড়ীর পাশে একটি গ্রামে পুলিশ একটি গর্ভবতী চাষী রমণীকে উলংগ করে দেখেছে বোমা লুকিয়ে রেখেছে কি না, হয়তো মার্কিন জল্পাদেবের অনুকরণে উক্ত রমণীর গর্ভে শায়িত শিশুকেই আগামী দিনে মিলিটারী হত্যা করবে। সুন্দুল গ্রামে, সুকুর অঞ্চলে, বোলপুর শহরের মিশন কম্পাউন্ডের বাড়ীতে বাড়ীতে সার্চ করে সকলকে থানায় নিয়ে গিয়ে প্রথমে একজন একজন করে মারধোর করা, তারপর ঘুর নিয়ে নিয়ে কিছু কিছু ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, আর বাকীদের বিশেষ করে জোয়ান বয়সের ছেলেদের সিউড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফলে গরীব জনসাধারণের অল্প বয়েসী ছেলেদের এবং যুবক পুরুষদের কেউই বাড়ীতে রাখে থাকতে পারছে না। প্রতিদিন সকালে ও দুপুরে রাস্তায়ও লোক চলাচল প্রায় বন্ধ, বিকেলের দিকে একেবারেই জনশূন্য রাস্তা, দোকান

পাট বন্ধ, অধোবিত হরতাল, সিনেমা বন্ধ। প্রতি সপ্তাহে বীরভূমের প্রতিটি ছোট শহর ও গঞ্জে দুদিন হাট হয়, গ্রাম থেকে লোক আসার কথা, কিন্তু গত চোঁঠা জুলাই থেকে মিলিটারী সি আর পির দাপটে গ্রামের লোক শহরে আসে না, হাট বসে না।

অথচ স্টেটসম্যান ও যুগান্তরের রিপোর্টার লিখছেন, মিলিটারী নাকি শান্তি আনছে। জনসাধারণ নাকি মিলিটারী আসায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। যদি তারা টাকাপন্নসা দিয়ে কেনা কায়মীস্বার্থের গোলাম না হয়, তাহলে তারা দেখে আসুক মিরজাপুর অঞ্চলের, মিলিটারী পুলিশের দেওয়া শান্তির নমুনা যেখানে মদসলমান চাষী-বউ কাঁদছে। তার দশ বছরের ছেলে কোনদিন মিলিটারী দেখে নি। ভয়ে পালাচ্ছিল, ওকে গুলি করে মেরেছে মিলিটারী, চলে যাক বাঙ্গালীর বুড়ো বাপের কাছে, চায়ের ষ্টলে কাজ করে বেকার ছেলে, এমন ভাবে ওকে মেরেছে যে রোগা ছেলেটা সিউড়ী হাসপাতালে গত দশই জুলাই মারা গেল। ঐ সাংবাদিকরা যাক বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে, যেখানে ছাত্ররা উপাচার্যকে বলছে, “আমাদের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করুন, পুলিশ মিলিটারী গুল্লাদের অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না, আচার্য ইন্দিরাকে জানান তা না হলে পরিণাম খারাপ হবে। ঐ সাংবাদিকরা যাক ইলামবাজারের কাছে নাসরিপুত্র গ্রামে, ওখানে ঘরে ঘরে কত্কা। মদসলমান গ্রাম—বৃন্দ থেকে আরম্ভ করে কিশোর সবাইকেই ধরে নিয়েছে। ওখানে মাসখানেক আগে একটি হিন্দু জোতদারকে খতম করা হয়েছিল।

রাইটসে' সর্বদলীয় সভায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এই কথা এস ইউ সি বলতে চায়। এতে নব-কংগ্রেস আর তার মিত্র দলগুলি একমত।

এদিনের শান্তি বৈঠক সুরু হয় সি পি এম নেতা জ্যোতি বসুর বক্তব্য দিয়ে। নতুন কথা জ্যোতি-বাবু কিছু বলেন নি। খুনোখুনি সম্পর্কে সি পি এম তার বক্তব্য সিদ্ধার্থবাবুর কাছে লিখিতভাবে রেখেছে এবং সেই বক্তব্য ছাপা বই হয়ে পাঁচ পয়সা দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। জ্যোতিবাবুও সেই কথাই আবার বলেন।

জ্যোতিবাবু বলেন যে, সরকার খুনোখুনি বন্ধ করতে চায় কিনা সেটা আগে জানা দরকার। ঠুঁট দলের সরকারী মতিগতি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর সন্দেহের ভিত্তি হচ্ছে সারা রাজ্যে ছড়ানো বিভিন্ন ঘটনাবলী। তার-পর উনি একটার পর একটা ঘটনা বলে চলেন। সারা সভা নিস্তব্ধ। ঘটনার পর ঘটনা, কেউ প্রতিবাদ করছে না, বিরোধী কোন বক্তব্য বলতে চেয়ে কথার মাঝখানে কেউ বাধা দিতে চায় নি।

জ্যোতিবাবু কথিত দু একটি ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। তিনি কাশীপুরে উন্মত্ত পুলিশের গুলিচালনার কংগ্রেসী কর্মী নিহত হওয়ার মর্মান্বিত আর সঙ্গে সঙ্গে দোষী পুলিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্পে আনন্দিত, কিন্তু বিস্মিত এই কারণে যে, টালিগঞ্জ ও যাদবপুরে অনুরূপ অনেক ঘটনার পুলিশের বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। তাঁর মনে হয়েছে এই বিসদৃশ ব্যবহারের কারণ বোধ হয় নিহতরা সি পি এম কর্মী।

বিভিন্ন এলাকায় বেপরোয়া পুলিশী গ্রেপ্তারের কাহিনী বলতে গিয়ে জ্যোতিবাবু বলেন, আসানসোলে একজন উকিল স্থানীয় থানার অফিসারের বিরুদ্ধে আদা-

লতে মামলা রুজু করেন তাঁর বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ এনে। কিছুদিনের মধ্যেই উকিল মহাশয় জেলে চলে গেলেন সি পি এম আইনের আওতায়।

জ্যোতিবাবু সভা ডাকার অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নে সিদ্ধার্থবাবুর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পদ-মর্যাদার প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন যে, রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন কালে রাজ্যের আসল কর্তা রাজ্যপাল। এই রাজ্যপালই সভায় অনুপস্থিত আর ছিড়ি ঘোরাচ্ছেন নব কংগ্রেস দলীয় নেতা সিদ্ধার্থ রায়। এটা সংবিধান সম্মত নাও হতে পারে।

সিদ্ধার্থবাবু তৈরী হয়ে এসেছিলেন, তাঁর হাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ গেজেট ঘোষণা। কিন্তু এই ঘোষণাতেই ত আর সংবিধান বিরোধী কোন কাজ সংবিধান সম্মত হতে পারে না। সিদ্ধার্থবাবু কিন্তু এ সম্বন্ধে গেজেট-ঘোষণা ছাড়া আর কিছু বলতে চান নি। সভায় এ নিয়ে কথাবার্তা আর বেশী এগোয় নি, কারণ আসলে এ ব্যাপার পার্লামেন্টের আলোচ্য।

সি পি আই নেতা বিশ্বনাথ মদ্যাজী স্বীকার করেন যে, রাজ্যপালের সভায় উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুর নিয়োগ সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। মনে হয় এই সম্পর্কে উনি নিজের দলের দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক জানতেন না। পরে অবশ্য পার্লামেন্টে এই সম্পর্কে আলোচনার সি পি আই নেতা ভূপেশ গুপ্ত বলেছেন সিদ্ধার্থবাবুর নিয়োগ সংবিধান সম্মত নয়, যতই গেজেট ঘোষণা হোক না কেন।

বিশ্বনাথবাবু বলেন খুনোখুনিতে পুলিশ আর প্রশাসনের একাংশ যে জড়িয়ে পড়েছে সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে, জ্যোতিবাবুর সি আর পি, রাজ্যপাল আর মিলিটারী প্রত্যাহারের দাবী তিনি মানতে পারেন না। কারণ, এই প্রত্যাহারে সি পি এম-এর সুবিধে হবে—এই দল অন্য পার্টিতে পিটিয়ে মারবে।

সুশীল ধাড়া মশায় হাল আমলে খব নীতিবাগীশ হয়ে উঠেছেন। তিনি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের বহু দূর্নীতির কথা বলেন। এই সরকার কি ভাবে শরিক দলের স্বার্থে চাকরী বিতরণ করেছেন তার কথা বলেন। নিয়োগপত্র তাড়াতাড়ি সই করে পার্টিদের হাতে দেওয়া হয়েছে।

আর খুনের প্রসঙ্গে সুশীলবাবু বলেন যে, বহু খুন হয়ে চলেছে আর সরকার নির্বাক। কোন তদন্তের ব্যবস্থা নেই এর ফলে যারা খুন করে তারা আরও নির্ভরশীল।

সংগঠন কংগ্রেস নেতা অশোক দত্তের বক্তৃতা এই দিন নাকি সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি বলেন যে, সিদ্ধার্থ রায়ের উদ্যম তিনি প্রশংসা করেন। খুনোখুনির ব্যাপারে তিনি বলেন সি পি এম-এর চার শ জন কর্মী নিহত হয়েছে, খুবই দুঃখের ব্যাপার। সংগঠন কংগ্রেস ছোট দল এবং এই দলেরও অনেকে নিহত হয়েছে, আর নিহতদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ আছেন। যেমন, বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শরাদিন্দ্র শেঠ, সাংবাদিক রাখাল নাহা, আর দমদমের পীযুষ ঘোষ।

অশোক দত্ত বলেন যে হাইকোর্টের বিচারক কে এল রায় খুন হলেন নিজ গৃহে। পাড়ার সব লোক জানে কারা আততায়ী। খুনের পর একই আততায়ীর দল বৃক ফুলিয়ে আবার কে এল রায়ের বাড়ীতে এসেছে তাঁর ছেলের কাছ থেকে সাতশ টাকা চাইতে। পরিবারের সমস্ত লোক পুলিশী নিষ্কল্যতার উত্তাপ হয়ে নিজ গৃহ ছেড়ে ভিন্ন অঞ্চলে অন্য আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। অনুরূপ আরও ঘটনা দিয়ে পুলিশ আর প্রশাসনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

অশোকবাবু বলেন, সিদ্ধার্থবাবু রাজ্যে এসেই চমক লাগানো কথা বলতে সুরু করেন। তিনি নাকি ছয় মাসে এক লক্ষ চাকরীর ব্যবস্থা করবেন। কিভাবে করবেন? যদি পারেন ভালই। কিন্তু অশোকবাবু মনে করতেন এই ধরনের ফাঁকা কথায় কোন কাজ হবে না।

অশোকবাবু বলেন, মার্টিন রেল উঠে গেল, সেখান থেকে চার হাজার কর্মচারী চাকরী হারাল। সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল বিকল্প চাকরী দেওয়া হবে। কিছুই করা হয় নি। তাই ফাঁকা কথায় কোন কাজ হবে না। সরকারকে খুনোখুনি সম্পর্কে আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে বাস্তব ছবি রাখতে হবে।

এস ইউ সির সুবোধ ব্যানার্জী পুলিশী খামখেয়ালীর কথা বলতে গিয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। কোন এক সময়ে ঠুঁটের পার্টির সর্বোচ্চ নেতা শিবদাস ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয় একটি টুপী চুরির অভিযোগে।

বিস্ময়ী বাংলা কংগ্রেস নেতা সুকুমার রায় হিংসাত্মক কাজে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভিযোগে আটকান ছয় জন বন্দীকে কোয়ালিশন সরকারের আমলে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এই সরকার তার অস্তিত্বের শেষ তিন দিনে একশ ষাট জন দাগী আসামী ছেড়ে দেয়। স্বয়ং অজয় মদ্যাজীর আদেশে এদের ছাড়া হয়। প্রশ্ন করেন, এদের কি সি পি এম পেটানোর জন্যে ছাড়া হল।

তারপর প্রশ্ন করেন সুকুমারবাবু অফিসার বদলের ব্যাপারে।

কেন বদলী করা হল হোম সেক্রেটারী বি আর গুপ্তকে। শ্রীগুপ্ত এই বেপরোয়া যুক্তি দেওয়া বে-আইনী বলে মনে করেছিলেন। আর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা থেকে বদলী হলেন শরাদিন্দ্র দত্ত মজুমদার। এই অফিসার নির্বাচন কমিশনার থাকা কালে কংগ্রেসী নেতা বিজয় সিংহ নাহারের এক আত্মীয়ের চাকরীতে উন্নতির ব্যাপারে কোন সাহায্য করেন নি। বিজয় সিং নাহার নাকি দত্ত মজুমদারকে ব্যক্তিগত অনুরোধ করেন আত্মীয়ের পদোন্নতির জন্য। দত্ত মজুমদার অনুরোধ না রেখে নাহার মশায়ের রোষে পড়েছেন। তাই এখন বদলীর আদেশ।

অন্যান্য পার্টির সর্বদলীয় শান্তি সভায় বর্তমান আগ্রহে সুকুমারবাবু কিছুটা বিস্মিত বোধ করেন। তিনি বলেন যে, নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশনার শ্রীরাঘবন সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে একসঙ্গে বসিয়ে সর্বদল সম্মত একটি আচরণবিধি রচনা করতে চেয়েছিলেন। তখন ত কই আজকের মত উৎসাহ দেখা যায় নি? সুকুমারবাবু বলেন যে, তখন এই সমস্ত দল মনে করেছিল, সি পি এম বিরোধী প্রচারে ঐ দল নির্বাচনে কোণঠাসা হয়ে থাকবে। কিন্তু বিধি বাম। ঠুঁটা কোণঠাসা হলেন—যেমন বাংলা কংগ্রেস তেঁদিশটি আসন থেকে মাত্র পাঁচটি আসন পেল। তাও আবার পার্টি এখন ভেঙে গেছে। সি পি আই ফরোয়ার্ড রকের একই অবস্থা।

সুকুমার রায় বলেন কেবল স্বাধীসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মতলব ভাজলে রাজ্যের অবস্থার উন্নতি হবে না। তিনি দাবী করেন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অবি-লম্বে নির্বাচন দরকার।

আর সি পি আই নেতা সুধীন কুমার স্পষ্ট বক্তব্য রেখে বলেন যে, সরকারী উদ্দেশ্য সং নয়। তবে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের থেকে যদি বিভিন্ন দল সভায় এসে থাকে তা এই কথা বোঝাতে যে সরকার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আসলে মোটেই আগ্রহী নয়। সরকার আর তার সমর্থকদের অন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এই সভা

ডাকার পেছনে। সুধীনবাবুও অবিলম্বে নির্বাচন-সংগঠিত হওয়ার দাবী জানান।

নব কংগ্রেসী নেতা তরুণ-কান্তি ঘোষ বলেন যে, খুনোখুনির জন্য অনেকে কংগ্রেসী সরকারকে দোষী করেছে। তিনি বলেন মূলত সি পি এমই এর জন্য দায়ী। বিহারে, উত্তর প্রদেশে আসামে আর অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার আছে, কই খুনোখুনি ত হচ্ছে না। প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট আমলেও পশ্চিমবঙ্গে এত খুন বাড়ে নি, কারণ স্বরাষ্ট্র বিভাগ আর পুলিশ বিভাগ ছিল মধ্য-মন্ত্রী অজয় মদ্যাজীর হাতে। কিন্তু শ্বিতীয় যুক্ত ফ্রন্টের আমলে জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র ও পুলিশ দপ্তর কন্ডা করলেন আর খুনোখুনি বাড়ল।

হরেকৃষ্ণ কোণার এবং সি পি আই নেতা মহম্মদ ইলিয়াস এই সময় সভা একটু গরম করে দিলে পারস্পরিক বাদানুবাদে। কোণার বলেন তরুণবাবুর প্রচার অনেক দিনের, জনসাধারণ সি পি এম-এর বিধান সভার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে এর জবাব দিয়েছে। মহম্মদ ইলিয়াস বলেন যে, হিটলারও ইহুদী মেরে জনসমর্থন বাড়িয়েছিল। এই উক্তিভেদে ঝগড়া বাড়ে। সভার কাজ যেখানে শুরুর হয়েছিল সেই-খানেই থাকে।

বিদেশ দর্পণ

(নবম পৃষ্ঠার পর)

দেই চীনের পক্ষে কোন আদর্শগত বিচারিত সম্ভব নয়। এবং একথাও মনে রাখতে হবে এযাবৎকাল প্রতি-দেশের মুক্তি সংগ্রামই চলেছে মূলত নিজ নিজ ক্ষমতার বলে এবং সেইভাবেই চলবে। সেইটাই কাম্য। ভারতবাসী হিসাবে আমাদের নিকসনের এই ঘোষণায় আনন্দিত হওয়া উচিত। কারণ যদি নিকসন চু এন লাই বৈঠকের ফলে ভারত-চীনা সম্পর্কে উন্নতি ঘটে তবে ভারতের পক্ষে তা হবে মণ্ডলজনক কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে চীনের মতন শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে চলা কোনমতেই সম্ভব নয়। এবং চীনও তা চায় বলে মনে হয় না।

দর্পণ বিক্রয়ের জন্য

নিম্নলিখিত স্থানে এজেন্ট চাই:

আসামের লামডিং তিনসুকিয়া গৌহাটি, পাণ্ডু; কোচবিহারের দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ; পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর; বীরভূমের রামপুরহাট; মেদিনীপুরের তমলুক; হুগলীর আরামবাগ এবং নিউ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং শহর।

যোগাযোগ করুন:

সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ

৬১, মট লেন,

কলকাতা-১৩

প্রকাশিত হোলো

পূর্ব বাংলা প্রসংগে
পূর্ব বাংলা 'অন্য' পত্রিকা

থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধ-সংকলন

দাম: এক টাকা।

বিপ্লবের গান

সমাজতান্ত্রিক চীনের বিপ্লব উপন্যাস

দ্বিতীয় সংস্করণ

দাম: ছ'টাকা।

সিপলস বুক এজেন্সি

এক, কিশোর ঘোষ লেন,

পোঃ খাগড়া II মুর্শিদাবাদ জেলা

২০১।এ মুক্তারামবাবু স্ট্রিট,

কলকাতা-৭

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে সর্বদলীয় কমিটি পুলিশের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ ও সমাজবিরোধী অফিসারদের অস্তিত্ব স্বীকৃত

দপন

১৪শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা ১১ শ্রবণ ৩০শে জুলাই ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান কংগ্রেসী কৌদলের নেতৃত্ব কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসীদের রায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এক প্রভাবশালী অংশ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান সূত্র করে দিয়েছেন। খোলাখুলিভাবে এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নব-কংগ্রেসের রাজ্য শাখার সভাপতি বিজয় সিং নাহার। আশা করা যাচ্ছে, আগামী সাতই আগস্ট নব-কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিতে বিজয় সিং নাহার সরাসরি সিদ্ধার্থ

রায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ পেশ করবেন। অভিযোগের প্রধান কথা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের “দায়িত্ব” নিয়েই রাইটার্স বিল্ডিং-এ বসে সিদ্ধার্থ রায় নব কংগ্রেসী ডেপুটি স্পীকার পদে মনোজ্ঞীকে “জোচ্চার” বলে অপমান করেছেন। এই অপমান করবার ঘটনার সময় আরো দুজন নব-কংগ্রেসী (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন সূত্রে খবর নিয়ে জেনেছেন যে, প্রশাসন, পুলিশ এবং পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের হাতে এ রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছেড়ে রাখলে শান্তি ফেরা দুষ্কর। কারণ, এরা সকলেই কোন না কোন প্রকারে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির ব্যাপারে দায়ী।

তাহাড়া তাঁর আরও খবর যে, সিদ্ধার্থ রায় বামপন্থী পার্টির ছাড়াও নব কংগ্রেসের বিভিন্ন বিবদমান গোষ্ঠীর আস্থাভাজন নয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এমন খবর পৌঁছেছে যে, নব কংগ্রেসের নানা মাস্তান গোষ্ঠী সিদ্ধার্থর বিরুদ্ধে সেনহাশ্রয় লাভ করেছে।

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

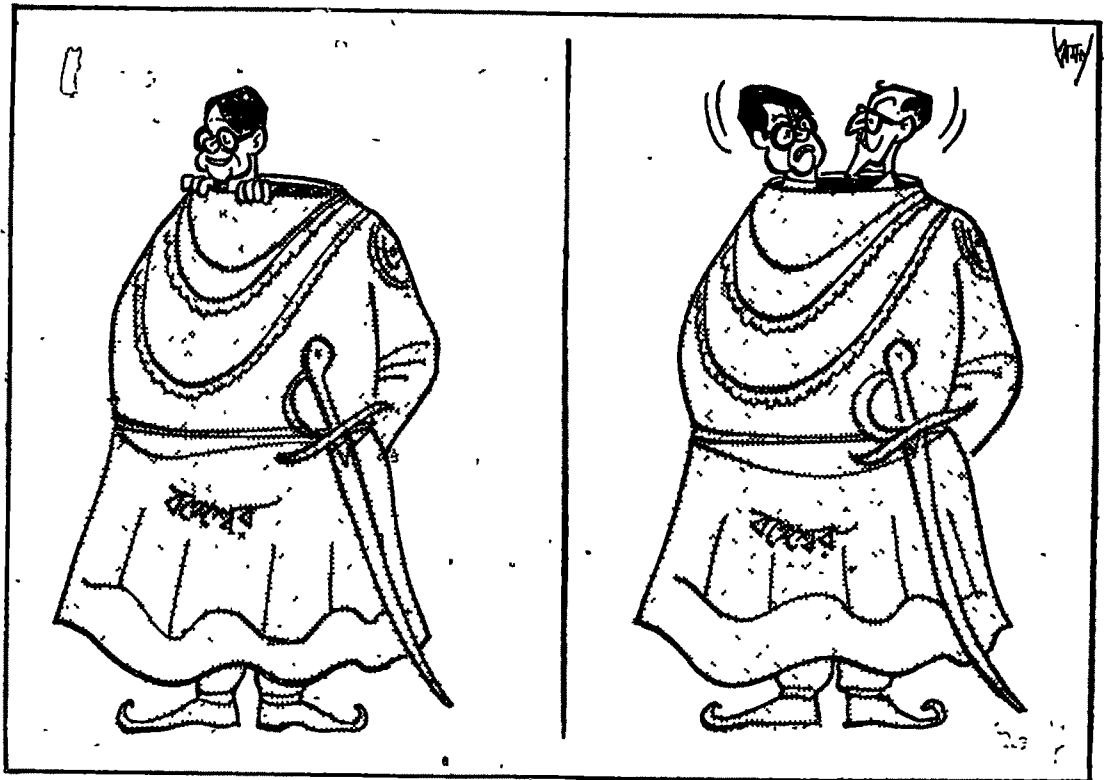
জেলে নকশালী হত্যার অন্তরালে হাজারীবাগের ঘটনার প্রকৃত তথ্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাজারীবাগ জেলে গত সপ্তাহে নকশালী হত্যার কাহিনী আবার সাধারণের মনে সন্দেহ জোরদার করবে যে, গোপন সরকারী নির্দেশেই হয়ত জেলের ভেতরে ও বাইরে বিশেষ ধরনের নকশাল-

পন্থীদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে।

গত ডিসেম্বর থেকে শুরুর করে এ পর্যন্ত মোট ছাপান্ন জন নকশালপন্থী জেলে নিহত হল। হাজারীবাগ জেলে মরেছে মৌলজন, (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



আমেরিকান টেলিভিশন কোম্পানী সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত এলাকার ছবি তুলেছে

আগরতলা এবং গৌহাটিতে বাংলা দেশের শরণার্থীদের ছবি তোলার নামে দুটি আমেরিকান টেলিভিশন দলের ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত এলাকার ছবি তোলার ব্যাপারে দর্পণ করেছে দুটি গুরুতর অভিযোগ জানতে

পেরেছে। দর্পণ জানতে পেরেছে, আমেরিকান টেলিভিশনকে সাহায্য করেছেন রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী-পত্নী শ্রীমতী মীরা তালুকদার। ঠিক সন্ধ্যা ছিলেন কলকাতার চলচ্চিত্র জগতের একজন ফটোগ্রাফার ফান কুন্ডু।

ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছে, আমেরিকান টেলিভিশনকে প্রথম দিকে সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত এলাকার ছবি তুলবার অনমতি দেওয়া হয় না। তখন টেলিভিশন কোম্পানী দুটো আমেরিকান কনসাল্টেন্টের মারফৎ শ্রীমতী মীরা তালুকদারকে (দর্পণ) মীরা তালুকদার আমেরিকান লবীর সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ ঘনিষ্ঠ। তিনি চলচ্চিত্র জগতের একজন ফটোগ্রাফার ফান কুন্ডুকে ঠিকের সঙ্গে যুক্ত করান। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংরক্ষিত এলাকার ভারতীয় ফটো-

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

৮০০ বাসের লাইসেন্স ও ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের দুর্গাপূজা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঘরে ঘরে সম্প্রতি একটা গুরুত্ব ছড়িয়েছে। গুরুত্বটি এমন কৌতুকজনক যে দর্পণ সেটি পাঠকদের পরিবেশন করছে।

গুরুত্ব হোলো, আগামী পূজোর সময় পশ্চিম বঙ্গের ট্রান্সপোর্ট কমিশনার আর ঘোষের বাড়ীতে এক

বিরাট দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হবে। উপলক্ষ্য, ট্রান্সপোর্ট দপ্তর আরো আটশো প্রাইভেট বাসের লাইসেন্স দেবেন। এই লাইসেন্স দেওয়ার বিরাট দায়িত্ব পালনের পর আর ঘোষ দুর্গোৎসব করবেন। আটশো বাস বেরুবার পর পশ্চিম বঙ্গের যানবাহন সমস্যার সমাধান হবে। আর, ঘোষেরও অনেক সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই হবে। ঠিক বিরুদ্ধে ভিজিলাস কমিশনের গুরুতর অভিযোগগুলোর বিচার এখন হাইকোর্টের আদেশে বন্ধ আছে। আশা করা যাচ্ছে, এর মধ্যে সেসম্পর্কেও একটা মীমাংসা হবে। তাই এমন সব উজ্জ্বল সম্ভাবনার জন্যে আর ঘোষ নিশ্চয়ই বাড়ীতে দুর্গোৎসব করবেন।

আটশো বাস পারমিট দেওয়া তো সামান্য ব্যাপার নয়।

আমেরিকান মহিলা মিসেস থ কেন কলকাতায় এসেছিলেন আর গোপনে গ্র্যাণ্ড হোটেলে ছিলেন?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কে এই আমেরিকান মহিলা মিসেস এল সি থ? বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমেরিকা যখন পাকিস্তানকে পুরো মদদ দিচ্ছে তখন এই মহিলা অকস্মাৎ কেন কলকাতায় এসেছিলেন?

উনি ছিলেন গোপনে কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলের একজন

আঠারো নম্বর সুইটে। এই সুইটটি নাকি গ্র্যাণ্ড হোটেলের ডিরেক্টরের থাকবার জায়গা! কিন্তু দর্পণের কাছে খবর হচ্ছে, একশ আঠারো নম্বর সুইটটি কলকাতার আমেরিকান কনসাল্টেন্টে লীজ দেওয়া আছে। কোনো উল্লেখযোগ্য আমেরিকানকে গোপনে

রাখতে হলে সুইটটি ব্যবহার করা হয়। এই সুইটে থাকলে হোটেলের কর্মচারীরা নামধাম জানতে পারেন না।

তাই এই সুইটেই ছিলেন মিসেস এল সি থ স্বয়ং আমেরিকান কনসাল জেনারেলের ব্যক্তি-

গত অতিথি হিসেবে। ওখানে থাকবার সময় শহরের কিছু “গণ্যমান্য” নাগরিকদের সঙ্গে উনি সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, উনি কেন এসেছিলেন কলকাতায় আর কি করে গেলেন তার খবর কে রাখে?

হাজারীবাগের ঘটনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে চাক্ষুশজন।

মেদিনীপুর জেলে গুলিতে মরেছে দশজন নকশালী গভ ডিসেম্বরে; ফেরারী মাসে বহু-রমপুর জেলে আটজন (লাঠির আঘাতে); দমদম জেলে চোদ্দই মে লাঠির আঘাতে ষোল জন; এবং এগারই জুলাই আলিপুর স্পেশাল জেলে গুলিতে ছয়জন।

পশ্চিমবঙ্গের পদলিখিত কতৃপক্ষ কোর্সে কয়েকটি দৈনিক সংবাদ-পত্র মারফৎ একটি প্রচার গুল্লন তুলেছিল যে, রাজ্যে পদলিখিত ওয়া-ডাররা মার্কসবাদীদের পরিচা-লিত কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য। ওয়াডাররা মার্কসবাদী, তাই ওদের নকশালীদের ওপর আক্রমণ।

এ প্রচার হাজারীবাগের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে না। কারণ, ওখান-কার ওয়াডারদের মধ্যে কোন মার্কসবাদী প্রভাব নেই। হাজারী-বাগের ঘটনার তাৎপর্য অনেক।

এই সূত্রে সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কে সি পণ্ডের লোকসভার উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি নকশালপন্থীদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন : (এক) তাত্ত্বিক নকশাল-বাদের উগ্রপন্থা থেকে ফেরানো মনস্কল; (দুই) সমাজ বিরোধী যারা নকশালদের সঙ্গে ভিড়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে; (তিন) রোমান্টিক তরুণের দল যারা এ্যাডভেঞ্চারের মোহে হিংসার পথে ঝুঁক পড়ে।

শেষোক্ত দুই শ্রেণীর নক-শালকে উগ্রপন্থা থেকে সরানো যায় বলে পন্থ মহাশয় মনে করেন। এবং এই দুই শ্রেণীর অনেকেই সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, কেউ বা মদ্যচলকা দিয়ে, আবার কেউ কেউ নব কংগ্রেসের হয়ে সি পি এম বিরোধী কাজ চালিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, কলকাতা ও শহরতলীর অনেক অঞ্চলে দলে দলে নকশা-লীরা নব কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠনে যোগ দিয়েছে।

অর্থাৎ পন্থের ঘোষিত কেন্দ্রীয় সরকারী নীতি অনুযায়ী আদর্শবাদী কটর নকশালপন্থীদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। আর অন্যান্যদের কোলে টেনে নেওয়া সম্ভব এবং এই অন্যান্যদের সঙ্গেই নব-কংগ্রেসীরা গোপনে আলোচনা চালাচ্ছেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের জেলা পদলিখিত নিম্নস্তরেও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গুলি করে হত্যা করার। দপণে এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে এই পদলিখিত গুলিতে গোপন হত্যার অনেক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

অনেকের সন্দেহ যে, কেন্দ্রীয়

সরকারের একটি বিশেষ নির্দেশের বলে জেলের মধ্যে পর পর হত্যা সংগঠিত হয়ে চলেছে। হাজারী-বাগ জেলে হত্যা এবং এই ব্যাপারে সরকারী কৈফিয়ৎ এই সন্দেহকে প্রত্যক্ষের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

বিহার জেল কতৃপক্ষ বলে-ছেন যে, আশী জন নকশালী বন্দী হাজারীবাগ জেলে বোমা, লোহার রড ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জেলের ওয়া-ডারদের আক্রমণ করে এবং জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করে।

এই অবস্থায় ওয়াচ টাওয়ারে কতৃবারত সশস্ত্র ওয়াডাররা ষোল রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। আর এই গুলির ফলে ষোল জন নকশালী বন্দী নিহত হয় এবং পণ্ডারের বেশী আহত হয়।

ষোল রাউন্ড গুলির অর্ধ ষোলটি গুলি; সেই গুলি আশী জনের একটি উল্লম্ব দলের ওপর ছোঁড়া হল আর তাতে নিহত ও আহত নিয়ে ছেঁষাটি জন ঘায়েল হয়ে পড়ল।

সাধারণত জেলে ওয়াডারদের হাতে রাইফেল দেওয়ার নিয়ম নয়। আর যদি দেওয়া হয় তা অত্যন্ত প্রাচীন প্রকৃতির। টাওয়ার

থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, এবং টাওয়ার সাধারণত জেলের সীমান্ত প্রাচীরে গুলে, এবং প্রহরীদের লক্ষ্যের সুবিধার জন্য বেশ কিছুটা উচ্চত্রে তাদের থাকার ব্যবস্থা। সেখান থেকে মাত্র ষোলটি গুলিতে ছেঁষাটি জন ঘায়েল হওয়া বিস্ময়-কর এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা।

দপণ তদন্তে জানতে পারে, সেখানে সমস্ত নকশাল বন্দীকে পায়ে বেড়ী পরিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে খুপরী ঘরে। প্রাতঃকৃত্যের আগিদে দিনে একবার বেড়ীপরা ও বন্দীদের এক একজন করে কড়া পাহারায় বার করা হয়। তারা তাড়াতাড়ি চলতে পারে না পায়ে বেড়ী ও ভারী চেন নিয়ে।

কিভাবে আশীজন বন্দী এই অবস্থায় একত্রিত হল এবং বোমা তৈরী করে ছুঁড়তে আরম্ভ করল তা বোঝা দুষ্কর। বাইরে থেকে একটা পুঁউরটি নিয়ে এলে তাকে রগড়ে ময়দার তাল করে দেওয়া হয়, পাছে তার মধ্যে বোমা পিস্তল লুকিয়ে চলে আসে।

পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলের নকশালী বন্দীদের অবস্থা হাজারীবাগ জেলের মত নয়। এখানে জেলে বহু আন্দোলন হয়েছে রাজ-নৈতিক কারণে ধৃত বন্দীদের অবস্থার উন্নতির জন্য। কিন্তু এখানেও কড়া পাহারা আর অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। তার মধ্যে

থেকে পালাবার এবং ওয়াডারদের আক্রমণের কাহিনী অবিশ্বাস্য। তাই ভেতরে ও বাইরে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে তা একই সরকারী নীতির প্রয়োগ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

বারাসতে আর্টিট নকশালী তরুণের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গেল। বিভিন্ন সংবাদপত্রে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে, নিহতরা পদলিখিত হত্যার ষড়যন্ত্রেই মরেছে। বিচার-বিভাগীয় তদন্ত দাবী করা হয় এবং অনেক গাড়িমসি করে একজন বিচারকও নিয়োগ করা হয় তদন্তের জন্য। কিন্তু এই বিচারক আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চলে গেলেন, এবং তিনি ষড়যন্ত্রের কথা বঝতে পেরে আর তদন্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চান নি।

বাইরে হত্যার কোন তদন্ত হয় নি, আর জেলের ভেতরের হত্যা-রও কোন কিনারা হয় না। বিভা-গীয় তদন্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জেলে হত্যা সম্পর্কে, কিন্তু সেই তদন্তে বন্দীদের কাউকে গিঞ্জা-সাবাদ করা হয় নি।

সবই একই পরিকল্পনা মার-ফৎ।

ছবি তুলেছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গ্রাফার অনেক সহজে ঢুকতে পার-বেন।

কিন্তু জ্ঞান কুণ্ডকেও সাম-রিক বাহিনী ছবি নেবার অনুমতি দেন নি। তখন আমেরিকানরা নয়াদিল্লী থেকে এই অনুমতি সংগ্রহ করে। এরপর জ্ঞান কুণ্ড সংরক্ষিত এলাকার ছবি তোলেন। শব্দ ছবি তোলাই নয়, নিয়ম অনুযায়ী সং-ক্ষিত এলাকায় তোলা ছবির ফিল্ম সামরিক বাহিনীর হাতে দিতে হয় এবং সামরিক বাহিনী ফিল্ম ডেভালপ করার দায়িত্ব নেন এবং ছবিগুলো পরীক্ষার পর যোগদলি প্রকাশ করা সম্ভব সেগুলো ফটো-গ্রাফারকে দেয়। কিন্তু এখানে জ্ঞান কুণ্ডের তোলা ফিল্মগুলো কোনো পরীক্ষা না করেই বোম্বাইতে পাঠাতে দেওয়া হয় এবং সেখানে এগুলো ডেভালপ করা হয়।

এইভাবে দুজন ভারতীয় নাগ-রিকের সাহায্যে আমেরিকান টেলি-ভিশন ভারতীয় সেনা বাহিনীর সংরক্ষিত এলাকার ছবি নিয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেসী কৌদল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেসী ঘরে উপস্থিত ছিলেন।

পীযুষ মুখার্জী অপমানিত হবার পর লিখিতভাবে সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে বিজয় নাহারের কাছে অভিযোগ পেশ করেছেন। অভিযোগ পাবার পর বিজয় নাহার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থ রায়ের জাতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত পর্ষায়ের কিছু অভিযোগ ইত্যাদি নিয়ে নব-কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জীবায়ী এবং প্রধান মন্ত্রী ইন্দি-রাকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু সেখানেই ঘটনা শেষ হয়নি। বিজয় সিং নাহার রাজ্য কংগ্রেসের কার্য-করী কমিটিতেও বিষয়টি তুলবেন বলে ঘনিষ্ঠমহল থেকে জানা গিয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, বিজয় সিং নাহার প্রকাশ্যে এগিয়েছেন। কিন্তু তার পেছনে অনেকে আছেন। আছেন নব-কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক তরুণকান্তি ঘোষ, কোষা-ধ্যক্ষ বরকত খানচৌধুরী প্রভৃতি রাজ্যের নব-কংগ্রেসীদের একটা মোটা অংশ। ওরা কেউই সিদ্ধার্থ রায়ের মতিবদরী বরদাস্ত করতে পারাছিলেন না। এই সময় রসদ যুগিয়েছেন পীযুষ মুখার্জী।

পীযুষ মুখার্জী গিয়েছিলেন নব কংগ্রেসের ভূতপূর্ব পদমন্ত্রী সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে দলনীতির অভিযোগ জানাতে। সন্তোষ রায় মন্ত্রী হবার আগে পদ-দপ্তরের

একজন কন্সট্রাক্টর ছিলেন। মন্ত্রী হবার পর ওঁর নামে বহু দলনীতির অভিযোগ উঠেছে। দপণ এগুলো এখন সংগ্রহ করছে। অভিযোগ উঠেছে বাংলা দেশের শরণার্থীদের প্রয়োজনে তাঁর মাদরাস লন্টন ইত্যাদির লক্ষ লক্ষ টাকার ঠিকা-দারী দেবার সময় সন্তোষ রায় “কাজ গুছিয়েছেন”। পীযুষ মুখার্জী আর সন্তোষ রায় দুজ-নেই উত্তর বঙ্গের লোক। দুজ-নেই “পরস্পরকে ভালোভাবে জানেন। পীযুষ মুখার্জী তাই সিদ্ধার্থ রায়কে বলতে গিয়েছিলেন যে, সন্তোষ রায়ের মতো লোককে প্রাধান্য দিলে নব-কংগ্রেসের-“ইমেজ” থাকবে না ইত্যাদি। সন্তোষ রায় আবার উত্তর কলকাতার প্রফুল্ল-কান্তি ঘোষের অনুগত। প্রফুল্ল-কান্তির সঙ্গে সিদ্ধার্থ রায়ের ঘনিষ্ঠতা আছে। তাই পীযুষ মুখার্জী যখন সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো পেশ কর-ছিলেন তখন অকস্মাৎ সিদ্ধার্থ রায় দায়িত্ব রেগে উঠে বলেন, “আপনাকেও তো অনেকে জোঁচোর বলে? আপনি আবার অন্যের নামে বলছেন কেন?”

পীযুষ মুখার্জী বসে-প্রবীণ দীর্ঘদিন কংগ্রেস করছেন। তিনি এই কথা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বিজয় নাহারের কাছে যান। বিজয় নাহার ঘটনাটি লিখে দিতে

বলেন। পীযুষ মুখার্জী লিখে দেন। লিখিত অভিযোগে সিদ্ধার্থ রায় কতবার দল বদল করেছেন ইত্যাদি উল্লেখ করেন। লিখিত অভিযোগ পাবার পর বিজয় নাহার প্রকাশ্যে এগিয়েছেন সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে।

কিন্তু আগেই বলেছি পীযুষ মুখার্জী শব্দ রসদ যুগিয়েছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সিদ্ধার্থ রায়কে বৈদ্যন পশ্চিম বঙ্গের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে সেদিন থেকে বিজয় নাহাররা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ওরা মনে করছেন, আগামী নির্বা-চনে যদি নব-কংগ্রেসীরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয় তবে সিদ্ধার্থ রায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবেন। এই অবস্থা ওরা কিছুতেই মানতে রাজী নন। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে ওরা নানাভাবে জানিয়ে-ছেন, পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে অতীত দিনের কংগ্রেসী নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। আগে যেমন শব্দ অতুল্য ঘোষের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কথা শোনা হতো, এখন সেখানে সিদ্ধার্থ রায়ের মার-ফতে করা হবে। এই অবস্থা কাম্য নয়। দ্বিতীয়তঃ রাজনীতির দিক দিয়ে সিদ্ধার্থ রায়ের কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। উনি চারবার দলত্যাগ করেছেন। সেদিনও অতুল্য প্রফুল্লর সঙ্গে ছিলেন। তারপর নব-কংগ্রেসে এসেছেন। সিদ্ধার্থ রায়ের কোনো সংগঠনী ক্ষমতা নেই ইত্যাদি।

অবশ্য সিদ্ধার্থ রায়ও বসে নেই। ওঁর হাতে এখন পশ্চিমবঙ্গ

সরকার। কোনো আইনগত ক্ষমতা না থাকলেও বকলমে উনিই এখন বঙ্গেশ্বর। তাই সিদ্ধার্থ রায় নব কংগ্রেসী যুব কংগ্রেস আর ছাত্র পরিষদকে হাত করতে চেষ্টা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার সি পি এমের সঙ্গেও একটা বন্দো-বস্ত করার চেষ্টা করছেন। এর মধ্যে অন্ততঃ দুবার ডান জ্যোতি বসুর সঙ্গে গোপনে দেখা করে-ছেন। জ্যোতি বসু প্রমোদ দাশ-গুপ্তও রাজনীতিতে স্বান্দ। ওরা দুজনেও নব কংগ্রেসীদের এই খেয়ালেইতে ইশ্বন যুগিয়ে যাচ্ছেন। সিদ্ধার্থ রায় নয়াদিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে জ্যোতি বসুর সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন। নিজেও তখন উপস্থিত ছিলেন। আশা করেছিলেন, ইন্দিরার কথায় জ্যোতি বসুকে নরম করা যাবে। প্রধান-মন্ত্রীর কাছে কদর বাড়বে। কিন্তু জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রীর কোনো অনুরোধ মানতে রাজী হন নি। সাক্ষাৎকারের পরই পশ্চিমবঙ্গে নভেম্বরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন দাবী করেছেন। জ্যোতি বসুরা জানেন, সাতাশ দিন পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লীগের সঙ্গে নব কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট প্রভৃতির যে মন্ত্রিসভায় চালিয়েছেন তার রেকর্ড হচ্ছে এক নোংরা রেকর্ড। কোটি কোটি টাকার কন্সট্রাক্টরী আর হাজার হাজার লোককে চাকরী দেবার ব্যাপারে যে বেকান্দনী স্বজন তোষণ করা হয়েছে তার প্রতিরীক্ষা আগামী নির্বাচনে দেখা দেবেই।

রবীন্দ্র সদনে দুর্নীতি

আধিকারিক বঞ্চিত করছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রবীন্দ্র সদন যখন তৈরি হয় এবং উদ্বোধন হয় তখন ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভাবীকালে রবীন্দ্র সদন শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং সংস্কৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হবে। কংগ্রেস সরকার এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার উভয়েই নীতিগত দিক থেকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, এই সদন ভাড়াটে বাড়ি কিম্বা ব্যবসায়িক ভিত্তিক কেন্দ্র না। এমন কি কিছুদিন আগেও ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলে গিয়েছিলেন যে এই সদন যেন জাতীয় নাট্যশালারূপেই কাজ করে যায়।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাংলার বিভিন্ন জাতীয়গুরুজন নিয়ে যে কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং যে কমিটি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে নানাবিধ পরামর্শ দেবেন সেই কমিটিকেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তথা আধিকারিক তপতী রায় কোন পোস্তাই দিচ্ছেন না। তার পরিবর্তে সরকারী আমলাদের একটা আড্ডাথলে পরিণত হয়েছে এই রবীন্দ্র সদন।

কার্যকরী সমিতির সভায় যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সেইসব প্রস্তাবগুলিকে মিসেস রায় ইচ্ছা মতন অদল বদল করে আমলাদের মনরক্ষা করার জন্যে পেশ করেন। তবে কি ধরে নিতে হবে যে সরকার কার্যকরী সমিতিতে বিশ্বাস

করে না? উপরন্তু সভায় আধিকারিক যেসব রিপোর্ট দেন সেইসব রিপোর্টেরও কোন অফিস রেকর্ড রাখা হয় না। শিক্ষা সচিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিসেস রায় এই ধরনের কর্মপ্রণালী অবলম্বন করেছেন।

কিছুদিন পূর্বে কার্যকরী সমিতির এক সভায় সভারা যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, প্রথম স্টেজগান “জাতীয় নাট্যশালা” রূপায়ণে বিলম্ব ঘটছে কেন, তখন সেই সভায় উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সচিব সরাসরি উত্তর দিলেন যে সেই মূল প্রস্তাব নাকি খারিজ হয়ে গেছে। আশ্চর্য, সভারা এ ব্যাপারটা জানতেনই না। লোক দেখানো এই কার্যকরী সমিতি রেখে লাভ কি।

রবীন্দ্র সদনের আধিকারিক তপতী রায়ের নিয়োগ এক রহস্যপূর্ণ ঘটনা। মিসেস রায়ের কাজের রীতিও লক্ষ্য করার মতো। হালে তিনি এমন এক পরিচিত অফিসকে রবীন্দ্র সদন ভাড়া দিলেন যারা ক্যাবারে ও নশন নাচ-গানের আসর করে গেল। এবং এই অনুষ্ঠানে মিসেস রায় উপস্থিত থেকে উপভোগ করলেন ও তারিফ করলেন।

এই ভদ্রমহিলা রবীন্দ্র সদনের বিভিন্ন কর্মীর কাছে সব সময়ে এই অপপ্রচার করে থাকেন যে কার্যকরী কমিটির বিভিন্ন সদস্য একেবারে অকেজো। আবার কার্য-

করী কমিটির সদস্যদের কাছে কর্মীদের সম্পর্কে একই রকম মিথ্যা পরিবেশন করেন। কোন সদস্য কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত তাই নিয়ে তিনি শিক্ষা সচিবের কাছে বলে থাকেন। এই রকম ভাবে নিজের একটা তাবদার গোষ্ঠী রবীন্দ্র সদনে তিনি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। যে জায়গায় ভদ্রমহিলা তাঁর বর্তমান স্বামীকে নিয়ে বসবাস করেন সেই এলাকার কংগ্রেস এম এল এর হয়ে যে সব ছেলে কাজ করেছিল সেইসব অসংস্কৃতিক জগতের কিছু ছেলেকে তিনি অস্থায়ী চাকরি দিয়েছেন রবীন্দ্র সদনে যাতে পুরনো কর্মীরা জ্বল থাকে। এইসব পুরনো কর্মীরা এসেছিল বিভিন্ন সংস্কৃতিক সংস্থা থেকে রবীন্দ্র সদন প্রতিষ্ঠার সময়ে। এদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা সর্বজনবিদিত। কথা ছিল, দৃষ্ট শিল্পীদের মধ্য থেকে বাছাই করে রবীন্দ্র সদনের কাজে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু বর্তমানে যেসব ছেলেদের চাকরি দেয়া হচ্ছে তারা দৃষ্ট হওয়া ত দূরের কথা অনেকে বিভিন্ন অফিসে চাকরি করে।

বিগত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব ছিল, যে সব সংস্থা নাটোৎসবে ভোগ দেবে সেই সংস্থাকে বিক্রয়মূল্য অর্ধের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দেয়া হবে, আর রবীন্দ্র সদন নেবে পঞ্চাশ ভাগ। কিন্তু দুটি বিশেষ সংস্থাকে

পুরো টাকা দিয়ে আনা হয়েছিল আধিকারিকের পরিচিত দল বলে। বঙ্গ সংস্কৃতি দিবসে সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা নাকি চূরি হয়ে গিয়েছিল। কেননা এ প্রস্তাবে অনেক কিছু ব্যাপার ছিল যা পরোক্ষে আধিকারিকের বিপক্ষেই যায়।

উৎসব উপ-সমিতির সভাপতি নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়কে রীতিমত অপমানিত করে বিগত শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তি দাশগুপ্তকে যে প্রাধান্য দেয়া হয় তার কারণ সরকারকে হাতে রাখা।

সেক্রেটারিয়েটের এক ভদ্রমহিলা নিজের কাজ ফেলে প্রতিদিন দুপুরে একটা থেকে রাত দশটা অবধি আধিকারিকের ঘরে বসে প্রসাধন করেন এবং বিভিন্ন লোকের সঙ্গে, রবীন্দ্র সদনের কর্মীরা চলে যাবার পরেও, খোশগল্প করেন। এই অবাস্থিত দৃশ্য প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে এবং গাড়িওয়ালা করেকজন ভদ্রলোক মিসেস রায় ও এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ঘরে বসে হাসিগল্প করেন।

গত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে দেখা গেল কমপ্লিমেন্টারী কার্ড বহন করে আসছেন বিভিন্ন দর্শকেরা। জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল এগুলো তাঁরা পাঁচ টাকা করে কিনেছেন এবং আধিকারিকের কাছ থেকে। আশ্চর্যের বিষয় এবার প্রেসে কোন কার্ড যারনি। অথচ দৈনিক সত্তর থেকে আশীটি কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল। কমপ্লিমেন্টারী কার্ড দেয়ার ক্ষমতা কেবল মিসেস রায়েরই আছে।

কার্যকরী সমিতি প্রতিমা সেনগুপ্ত নাম্নী এক মহিলাকে রবীন্দ্র সদনের কর্মীদের খাবারের জন্যে ক্যান্টিনের অনুমতি দেন। এই ভদ্র-

মহিলা বহুদিন ধাবৎ কর্মীদের ভালো খাবার বিক্রি করে সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু মিসেস রায় এ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে এসে এই ভদ্রমহিলাকে বিতাড়িত করে নিজের পরিচিতা অপর একজন মহিলাকে নিয়োগ করেন। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আধিকারিকের পরিচিত আত্মীয়-স্বজনদের স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা নিয়োগ করা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবক সেবিকাদের জন্যে যে কি পরিমাণ চরচরামা লেহা পেয় ভূরিভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল তা রবীন্দ্র সদনের যে কোন পুরনো কর্মীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে। এই উৎসবে মিসেস রায়ের একার আলোকচিত্রের বিল হয় আড়াইশো টাকা। তিনি বিভিন্ন ভঙ্গীতে ছবি তুলেছিলেন।

এবার উৎসবের যে স্মারকগ্রন্থ বের হয়েছিল তা ভুল মদ্রণে পরিপূর্ণ। এতকাল টেন্ডার কল করে কাজ দেয়া হত। সরস্বতী প্রেস কিম্বা উষা প্রিন্টিং এই কাজ করে সুনাম অর্জন করে। অথচ এই স্মারকগ্রন্থ ছাপানোর ভার দেয়া হয় এবার মিসেস রায়ের এক বাস্তবীকে।

প্রশ্ন হচ্ছে, রবীন্দ্র সদন কি এখন জাতীয় নাট্যশালার পরিবর্তে নারীঘটিত প্রমোদ, নশন নৃত্যের অনুষ্ঠান, স্বজন পোষণ ইত্যাদির স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে? আর শিক্ষা-সচিবই বা কি বলে এসব প্রশ্ন দিচ্ছেন?

পুরনো কর্মীরা যখন ইউনিয়ন তৈরি করে নিজেরা বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করছেন তখন এই মিসেস রায় কোন অধিকার বলে রোজ বলেন—“ওই হারামজাদাদের সব তাড়িয়ে ছাড়বো”।

ভবানী ব্যানার্জী ও বলিরাম ভগত নাগিকজোড়

পশ্চিমবঙ্গে কি করছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দর্পণের চোঁটা জুন সংখ্যায় জানানো হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ কলহ দানা বেঁধে উঠেছে। সিদ্ধার্থ-বিজয় সংঘের এবার প্রচণ্ড উত্তাপে ফেটে পড়ছে। কায়দা করে বিজয়-বাবুকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরানো হচ্ছে বলে দর্পণ যে সংবাদ দিয়েছিল তা এখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হল। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতার বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি তা প্রকাশ করেছে।

স্থানীয় একটা সংবাদপত্র গোষ্ঠী বিজয়বাবুর সমর্থক এবং বিজয়বাবুকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হবে না বলে এ সংবাদপত্র গোষ্ঠী মনে করছেন এবং সেইভাবে সংবাদ রচনা করে পরিবেশন করছেন। আরেকটা সংবাদপত্র গোষ্ঠী তাদেরই অন্যতম মালিককে কংগ্রেস সভাপতির পদে বসাবার

জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। মিউ মিউ করে দু-একজন আবদুস সাভার, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভবানী ব্যানার্জী, পূরবী মুখার্জী এদের নাম প্রস্তাব করছেন, কিন্তু যিনি শেষ কথা বলে দেবেন, সেই প্রধানমন্ত্রী মুখ খুলছেন না।

ভবানী ব্যানার্জী নামে যে ভদ্রলোকের কথা পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্যে প্রস্তাবিত হয়েছিল তিনি কে? তা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ অনেকেই জানেন না। ভবানী ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গের লোক শ্রদ্ধা নামে, তিনি ও তাঁর স্ত্রী দিল্লীতে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সদর দপ্তরের কর্মচারী ছিলেন। ভবানীবাবুর স্ত্রী মুকুল ব্যানার্জী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিস সেক্রেটারী ছিলেন। কংগ্রেস বিভক্ত হবার আগে প্রবীণ কংগ্রেসী নেতারা যে আলোচনা করতেন তা নাকি প্রধানমন্ত্রী সবিস্তারে জানতে পেতেন এদের কাছ থেকে। মুকুল

ব্যানার্জী এবার প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহে নব-কংগ্রেসের এম পি হয়েছেন। গোপন সংবাদ দেওয়ার পুরস্কার বটে।

শ্রীমন্ত ভবানী ব্যানার্জী মশাইও বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতায় এসে আড্ডা গেড়েছেন। প্রকাশ্যে ভাবে তিনি বাংলাদেশের শরণার্থী পুনর্বাসনের ব্যাপারে প্রাক্তন মন্ত্রী বলিরাম ভগতের সঙ্গে একযোগে কাজ করছেন বলে শোনা যায়। কিন্তু তাঁর আসলকাজ ইন্দিরা গান্ধীর কতগুলি বিশেষ নির্দেশ পালন করা। শ্রীভবানী ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গের তত্ত্বাবলাস করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেন।

সিদ্ধার্থবাবু ও বিজয়বাবুর সংঘর্ষে ভবানীবাবু ও বলিরাম ভগত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ভবানী ব্যানার্জী ছাত্র পরিষদ ও বঙ্গ কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয় তাদের জানিয়ে বিশেষ কর্মধারা অনুসরণ

করতে নির্দেশ দেন। বলিরাম ভগত এবং ভবানী ব্যানার্জী শরণার্থীদের সাহায্যকল্পে একসঙ্গে কাজ করেন, তাঁদের হাতে প্রধানমন্ত্রী অটেল অর্থভান্ডার অর্পণ করেছেন। শরণার্থী শিবিরে কাদের কাদের চাকুরী দেয়া হবে, কোন নীতি অবলম্বন করা হবে, বাংলাদেশের সরকার ও মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্ব কে নেবেন এসব ভার নাকি এই দুই ব্যক্তি অলিখিত আদেশ বলে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু তাঁদের আরেকটি গোপন দায়িত্ব আছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন ও প্রদেশ রাজনীতি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ওয়াকিবহাল রাখা। ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল খাওয়ান বৃহত্তে পেরেছেন যে কেন এতভাবে সেবা করেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর মন পেলেন না, কেন তাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে যেতে হচ্ছে। যে সিদ্ধার্থ শংকর রায় প্রমুখের হেমন্ত

বসন্ত হত্যার জন্যে সি পি এমকে দায়ী করে বিবৃতি ঝেড়েছিলেন তিনি কেন আজ জ্যোতি বসন্ত গালগালি খেয়েও সর্বদলীয় বৈঠকের প্রহসন ডাকতে বাধ্য হয়েছেন, তা বঝতে হলে ব্যানার্জী দম্পতি ও বলিরামজীর কাজের দিকে তাকাতে হবে।

সম্ভবতঃ এসংবাদ সি পি আই নেতাদের অনেকেই জানেন, তাদের অনেকেই সর্বদা এই দুই ব্যক্তির আন্তানায় আনাগোনা করে থাকেন।

প্রদেশ রাজনীতির দিকনির্ণয়ে এরা প্রধানমন্ত্রীর কলকাঠি নাড়ছেন দেখেই কোন অবাচীন সাংবাদিক হয়তো ভেবে নিয়েছেন যে ভবানী ব্যানার্জীকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে বসাবার জন্যে ইন্দিরাজী আগ্রহী। কথাটার মূলে কোন ভিত্তি নেই। তরুণবাবুরও কোন আশা নেই। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এখনও মনস্থির করেন নি। তবে বিজয়বাবুকে তিনি আর বিশ্বাস করেন না, তাকে আদি কংগ্রেসের ষ্টোজান হর্স মনে করেন এবং তা হয়েছে শ্রীভবানী ব্যানার্জীর রিপোর্টের ভিত্তিতে।

সংবাদভাষ্যে সত্য গোপন ও মিথ্যার ইঙ্গিত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বুজেরা গণতন্ত্রের ফোর্স এন্টেট সংবাদপত্র; পার্লামেন্ট পার্টি এবং জয়মতের সঙ্গে পাতা দিয়ে সংবাদপত্র নাকি স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অবাধ আধিকারের সদাঙ্গ প্রহরী। তাই সংবাদপত্রগুলি আজকালকার যুগে এই সনদের আড়ালে অবাধ মুনাকা ও অবৈধ ধনলালসা চরিতার্থ করে চলে, তার কাহিনী সম্ভবতঃ পাঠকদের অজানা নয়। বিজ্ঞাপনবান্দ ঘর, সরকারী প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ঋণ ও অর্থসাহায্য বিদেশের, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার গোপন অর্থভান্ডারে পরিপুষ্ট হয়ে এই সব সংবাদপত্রের মালিক ও সাংবাদিকেরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সনদ দেখিয়ে অনবরত জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যায়।

এর মধ্যে সেরা হচ্ছে যুগান্তর আর আনন্দবাজার দুটো গোষ্ঠী। স্টেটসম্যান দেশী বিদেশী এক-চোটরা পুঞ্জির ভাগের কারবার, আর যুগান্তর আনন্দবাজার ঐ বাঘা বাঘা পুঞ্জিপতিদের সেবাদাস। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এই পত্রিকা গোষ্ঠীগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্য চিরাচরিত ভাবে সত্য-গোপন ও মিথ্যার ইঙ্গিত দেবার অসৎ কায়দা নিয়ে, রচিত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তি-হত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, সরকারী প্রতিহিংসামূলক বন্দী হত্যা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র কঠোর জনমত গড়ে উঠেছে। ফলে এই সংবাদপত্রগুলি এখন আসল খুনিদের আড়াল করার জুঁমকা নিয়েছে, কারণ তারা যাদের সেবাদাস সেই কংগ্রেস দল ও তাদের সরকারই হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি দীর্ঘকাল ধরে যে চালিয়ে যাচ্ছে, একথা জনসাধারণের চোখে আড়াল করতে তারা এখনই তৎপর হয়ে ওঠার আদেশ পেয়েছে।

যুগান্তরের তেইশে জুলাই তারিখের সংখ্যায় মহেন্দ্র চক্রবর্তী মশাই “খুন বন্ধের জন্য সি পি এম-এর দাওয়াই-নির্বচন” শিরোনাম দিয়ে যা লিখেছেন এবং ঐ একই তারিখের আনন্দবাজারে রাজ্য রাজনীতির কলামে বরুণ সেনগুপ্ত যা লিখেছেন তার বক্তব্য প্রায় এক। সচতুর ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে তারা দুজনেই চেয়েছেন খুনোখুনি, ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতির দায় থেকে কংগ্রেস ও তাদের অনুচর দল-গুলিকে আড়াল করতে। দুজনেরই একটা নমনা পাঠকদের উপহার দিচ্ছে। “খুনোখুনি বন্ধ করার জন্য উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্প্রতি যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন, সেখানে আর সি পি আই ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের নেতাম্বর সুধীন কুমার ও সুকুমার রায় এই কথাই (অবিলম্বে নির্বাচনের—লেখক) বলেছেন

কিন্তু আশ্চর্যের কথা মার্কসবাদী নেতা জ্যোতি বসু কিম্বা হরেকৃষ্ণ কোঙার কেউই নিজেরা তাদের পার্টর স্মারকলিপিতে বা ঐ উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে মদ্য ফুটে এই ধরনের কথা বলেন নি বা বলার সাহস পাননি... আজ সাধারণ লোকের কাছে একটাই প্রশ্ন বড় ভাবে ফুটে উঠেছে এবং তা হচ্ছে সত্য যদি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতালব্ধ আসে, তা হলে তারা খুনোখুনি বন্ধ করতে পারবে কি? ...এ প্রশ্নে উনিশশ উনসত্তর সালের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো দরকার। ঐ সময়ে অর্থাৎ তেরো মাস রাজস্ব চলার সময় জ্যোতি বসু পুরো ক্ষমতায় ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার একদিনে ভেঙ্গে যায় নি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বৈঠক চলেছিল। দীর্ঘসময় আলোচনা করে সবাই মিলে তারা শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করার চেষ্টা করে-ছিলেন... শরিকী সংঘর্ষ তো মোটেই বন্ধ হয়নি; তা বেড়ে ব্যক্তি হত্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেই সময় জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে শরিক দলের নেতাদের কাছে সম্মত নিয়েছেন : একমাস, সময় দিন, সব ঠিক করে দেবো। কিন্তু পরপর তিনমাস কেটে গিয়েছে, কিন্তু ফল হয় নি। তাই পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় আজ সি পি এম-এর এই কথার উপর নির্ভর করতে পারছে না। তাদের অতীতের তিন অভি-জ্ঞতা রয়েছে।”

বঙ্গোত্তর কায়দাটা একবার দেখুন, উনিশশ উনসত্তর সালে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অন্য-তম দলনেতা তাঁর মালিক, তাই মহেন্দ্রবাবুকে নিমকের হালাল করার জন্যে মনিবকে ঘটনার বাইরে রাখতে হয়েছে বাকি, কিন্তু জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকার সময় ব্যক্তিহত্যা গণহত্যা চলেছিল এর একটা দৃষ্টান্তও কি মহেন্দ্রবাবু দেখাতে পারেন? কৃষক জমি দখল করতে গিয়ে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙার কাজে মালিকের পোষা গুন্ডাদের সঙ্গে সংগঠিত শ্রমিক-দের সংঘর্ষ হয়েছে—কখন কখনো যুক্তফ্রন্টের শরিক কোন কোন দল জ্যোতিবাবুর মালিকের পক্ষ অবলম্বন করে দল বাড়াতে চেয়েছে আর মহেন্দ্রবাবুর মনিবেরা একে শরিকী সংঘর্ষ বলে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে গেছেন। বেইমান শিরোমণি অজয় মুখার্জীর সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর মনিবরা যে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন একথাও না হয় মহেন্দ্রবাবু চেপে গেলেন, কিন্তু মহেন্দ্রবাবু কেন বলছেন না যে তেরোমাসে যা হয় নি, তাঁর মনিব দলের অর্থাৎ কংগ্রেস লীগ মন্ত্রিসভার তিন মাসেই তার ছয়গুণ ব্যক্তিহত্যা, নারী হত্যা, শিশু হত্যা ঘটেছে? পুলিশ কনস্টেবল খুন হয়েছে ঘাটের মত, সমস্ত আইনকানুন

প্রত্যাহত (যেমন পুলিশের গুলি চালানোর হিসেব নেওয়া হবে না, বিভাগীয় তদন্ত পর্যন্ত হবে না) এবং তখনও জেলের ভেতরেও বিচারাধীন অথবা করেদী বন্দীদের নিস্তার ছিল না। হাতে রিভলবার দিয়ে দলীয় যুবক, গুপ্তচর ও পুলিশকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা ছিনতাই করেছে, গুলী করে তরুণ ছেলেদের হত্যা করেছে বলছে এরা নকশাল, ওয়াগন ভাঙা দলের

সম্প্রতি দর্পণ

সহায়তা করছে এবং মেয়েদের সম্ভ্রম ইচ্ছিত খুলায় লুটিয়ে দিচ্ছে। তেইশে জুলাই যুগান্ত-রেরই নয়ের পাতায় যে “অপহৃত কিশোরীর করুণ কাহিনী” বলে স্টাফ রিপোর্টারের হৃদয় বিদারক কাহিনী বেরিয়েছে, মহেন্দ্রবাবু কি জানেন খুঁত দুর্বৃত্তেরা কংগ্রেসী নকশাল নামে এলাকায় পরিচিত? আনন্দবাজারের বরুণ সেনগুপ্ত মশাই-এর টিকি বহু জায়গায় বাঁধা। অতুল্য ঘোষের প্রচার সমিতির সদস্যপদ থেকে রঘু ব্যানার্জীর আসন্ন কোথায় তাঁর আনা-গোনা নেই? তিনি প্রশাসনের উপরতলা নিয়ে তুঘলকী কাণ্ড” শিরোনামে চালাকি করে লিখেছেন, “বিধানবাবু এবং প্রফুল্ল সেনের

রাজস্ব পরিস্থিতিটা একেবারে ফার-স্টু ক্লাশ ছিল, এমন কথা তাঁদের কোনও অন্ধ ভক্তও বোধ হয় বলতে পারবেন না। কিন্তু উনিশশ সাত-ষাট সালের প্রথম যুক্ত ফ্রন্টের আমল থেকে এখানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার চেয়ে যে ওই দুই রাজস্ব অবস্থা ভাল ছিল, সেটা নিশ্চয়ই অনেকেই স্বীকার করবেন। তখনও স্বাধীনসুস্থান, থেয়ালখুশী, ধরাধরি এবং তৈল-মর্দন চলত; কিন্তু উনিশশ সাত-ষাট সন থেকে যা চলেছে ও চলছে তার তুলনায় ওসব নগণ্য।” হয়

বরুণবাবু আপনি যখন মাতৃকোড়ে তখন কী নিষ্পাপই না ছিলেন, আর আজ? শৈশবকাল থেকে আপনার পরিণতবয়সকে তো ছেঁটে ফেলা যাবে না।

বরুণ সেনগুপ্ত বলতে চান যে উনিশশ সাতষাট সালের আগের অবস্থা ততটা খারাপ ছিল না, যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করেছে। তিনি গোপন করতে চান যে অতুল্যবাবু প্রফুল্লবাবুদের এবং আনন্দবাজারের মালিকদের এই অবনতির জন্যে কি দায়িত্ব ছিল। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর কেন্দ্রীয় সরকার, তাদের দল কংগ্রেস ও দালাল গোষ্ঠী এই অবনতির প্রক্রিয়ায় কি ভূমিকা

গ্রহণ করেছে? কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের পোষা গুন্ডা, ওয়াগনভাঙা তার কাটার দল কি ভাবে ছোট ছোট শরিক দলের পতাকা উড়িয়ে কংগ্রেসী গুচ্ছ অভিসন্ধিকে কার্যকরী করে চলেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের তুঘলকী নির্দেশে কি ভাবে আমলা ও পুলিশের একাংশ নকশালী নাম নিয়ে ব্যক্তিহত্যা, গণহত্যার অভিযান চালিয়ে বিপ্লবী গণচেতনাকে খুঁস করে দিতে চাইছিল, একথা বরুণবাবুরা গোপন করতে চান।

কংগ্রেসী রাজস্বের দীর্ঘদিনের অশ্রদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের সাধারণ মাননীয় উনিশশ সাতষাট সাল থেকে যে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত, তাকে পথদ্রষ্ট করে কংগ্রেসী রাজস্ব ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টা কি ভাবে তাঁরা প্রতিহত করেছেন, এ বছর তিনমাসের কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভার অবসান তার প্রমাণ। কিন্তু স্বল্পকালের এই কংগ্রেসী রাজস্বই ব্যক্তিহত্যা গণহত্যায় রূপান্তরিত হয়েছে, দীর্ঘদিনের ত্যাগী পরীক্ষিত জননেতা মহিলা নেত্রীবন্দ আহত নিহত হয়েছেন, আসন ও সর্বাধীন নির্দিষ্ট স্বল্প সুযোগ সুবিধা থেকেও জনসাধারণ বঞ্চিত হয়েছেন, জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম পণ্যের সামগ্রীও তারা হারাতে বাধ্য হয়েছেন—কংগ্রেসী রাজস্বের এই অভিশাপগুলির বিরুদ্ধে তবু তাঁরা অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংগ্রাম-রত একথাগুলি গোপন করার জন্যেই বরুণবাবুরা এই সাংবাদিক বঙ্গোত্তর পথ ধরেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ও জ্যোতি বসুর মধ্যে কি কথা হল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দীর্ঘস্থায়ী সাক্ষাৎকার হয়েছে। শ্রীবসু ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক খুনের দায়িত্ব পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের উপর চাপিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে একটী পত্র দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ঐ পত্রের উত্তর না দিয়ে শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মাধ্যমে শ্রীবসুকে সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ জানান।

এ মাসের পলিটব্যুরো সভা উপলক্ষে যখন জ্যোতি বসু দিল্লী যান, তখন প্রধানমন্ত্রী তাঁকে তেইশে জুলাই নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করেন। ঐ নৈশভোজে পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় মহাশয়ও আমন্ত্রিত ছিলেন।

দর্পণের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে বৈঠকে সি পি এম নেতা পশ্চিমবঙ্গে খুনোখুনির ব্যাপারে নবকংগ্রেসী নকশাল ও পুলিশের একাংশ যে দায়ী তার অকাটা প্রমাণ দাখিল করেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কোন কোন পদস্থ কর্মচারীও যে অর্থানুকূল্য স্বারা

এই খুনোখুনি বাড়িয়ে চলেছেন, তার প্রমাণ দাখিল করেন। বিশেষ করে এই প্রসঙ্গে মহিলা নেত্রী সন্তোষ বরুণা শ্রীমতী জ্যোতি চক্রবর্তীকে প্রকাশ্য দিবালোকে সি আর পি ক্যাম্পের উপস্থিতি সত্ত্বেও বাড়ী ঢুকে হত্যার চেষ্টা ও সম্প্রতি কালনায় সি পি এম নেতা মহাদেব ব্যানার্জীর হত্যার ব্যাপারে নব-কংগ্রেস ও পুলিশের ষোণা-ষোণের কথা জ্যোতি বসু উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে বাংলা দেশ সংগ্রামের পটভূমি এবং চীন মার্কিন আসন্ন বোঝাপড়ার পরিপ্রেক্ষিতে, লোকসভায় স্বতীয় বৃহত্তম দল এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের সর্ববৃহৎ দল হিসেবে তাঁর সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার আবেদন জানান। সিদ্ধার্থবাবু যে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন তা সর্বসম্মত একটা উপায় নির্ধারণের ব্যাপারে যাতে সফল হয় তার জন্যেও জ্যোতি বসুর দলের সহযোগিতা চান।

শ্রীজ্যোতি বসু নাকি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছেন তাতে সহযোগিতার কথা উঠে না। কারণ সি পি এম এর

কমী ও সমর্থকদের যখন সরকারী পরোক্ষ সাহায্যেই হত্যা করা হচ্ছে বলে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ করেছেন, একমাত্র তখনই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। তবুও সি পি এম চায় যে এই ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ হোক, তাই তার পার্টি বৈঠকে যোগ দিয়েছে, কিন্তু এর প্রথম কাজ হচ্ছে সত্যি, কারের অপরাধীদের চিহ্নিত করা। তার পরে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করে একটা শক্তিশালী জনপ্রিয় সরকার গঠন করা হলে সেই সরকারই দুর্ভাগ্যে এই খুনোখুনি বন্ধ করতে পারে।

বাংলাদেশের আসন্ন পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য পাক-আক্রমণ সম্পর্কে শ্রীবসু সমস্ত ব্যাপারটা পলিটব্যুরোর কাছে উপস্থিত করে পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের মতামত প্রধানমন্ত্রীকে জানানো বলেছেন। শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় উপস্থিত থাকার সত্ত্বেও তিনি আলোচনার খুব কমই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি একটি সংবাদপত্রের নয়াদিল্লীস্থিত সংবাদদাতার কাছে আলোচনার ধারাটা কিছুটা আভাসে প্রকাশ করেন। তারই ভিত্তিতে স্টেটসম্যান পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ (শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

রাজধানীর চিঠি

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি

রমা প্রসাদ মল্লিক

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যসম্পাদনা গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট এই যে, পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী কৃষকদের মধ্যে যে বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষমতা উনিশশ সাতাশটি সাল থেকে ক্রম-বর্ধমান ছিল সম্প্রতি বীরভূমে ও পশ্চিম বাংলার লাগোয়া উড়িষ্যা ও বিহার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যুগপৎ মিলিটারি, রিজার্ভ পুলিশ এবং ভিন্ন প্রান্তীয় পুলিশের প্রয়োগে তা ধ্বংস করে দেওয়া গেছে।

কেন্দ্রে ইন্টেলিজেন্স এখন থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স সংস্থার প্রতিটি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করবে। রাজ্য পুলিশ বিভাগে প্রাক্তন কমিশনার রিজিড গুপ্তের এবং প্রাক্তন আই জি এস এম ঘোষের অধ্যক্ষতায় যেটুকু প্রাদেশিক স্বাভাব্য ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের নবতম অধ্যায়ে তার বিলোপ ঘটাবার সমস্ত সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। অস্ত্র-বদলি, এবং মর্যাদা হানিকর রিপোর্টের মাধ্যমে পদাবনতির সূক্ষ্ম অন্তর টিপুনি। শোনা যাচ্ছে, বীরভূম জেলা পুলিশ এতদিন নকশালি আন্দোলন দমন করতে পারেনি, তার কারণ তাদের এক স্থানে বহুকাল বহাল থাকা। এতে নাকি তাদের পুলিশী লৌহ-মনোবৃত্তিতে জনসংযোগের মোলায়েম স্পর্শ হেতু দুর্বলতাদোষের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। অবশ্যই নতুন দিল্লী এটা চায় না যে, পশ্চিম বাংলার পুলিশ সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে মাঝামাঝি করে। গণতান্ত্রিক সংযোগের কেতাদুরস্তপণা কেবল শাসক-দলের নেতাদের জন্য, রাষ্ট্র কর্মচারী-

দের জন্য নয়—তারা কেন্দ্র বা রাজ্যসরকার যারাই অধীন হক না কেন। অথচ, এতদিন যে ভয় ছিল—নির্বাচনের মাধ্যমে সি পি এম এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলজোড়ের পুনরায় রাজ্য-ক্ষমতায় ফিরে আসা—সে ভয়ও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়নি। যদিও সরকারী দলের সমর্থক বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি গত বছরের মত এবছরও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আটকে রাখতে চায়, কিন্তু সরকার জানে তা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ, এবছর নভেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না দিলেও আগামী বাহাত্তরের শুরুর তার ছাড়পত্র দিতেই হবে। সুতরাং, নতুন দিল্লীর নতুন রাজনৈতিক শাসন পদ্ধতি ও কূটকৌশল এমনভাবে রচনা করা হচ্ছে, যাতে শত্রু শত্রু (সি পি এম এল) এবং শত্রু (সি পি এম) দুইই পারস্পরিক হানাহানিতে দণ্ডদমনের স্টীম রোলারে নিশিচহ্ন হয়ে যায়।

উনিশশ সত্তর-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত কেন্দ্রের শাসক লবীতে একটা অস্বস্তিকর আশংকা ছিল সি পি এম এবং সি পি এম এল দল দুটির অন্তর্বিরোধ হয়ত লোক দেখানো, ভেতরে এদের গুচ্ছ সংযোগ আছে। কিন্তু বারাসত বসিরহাট হত্যা, বেলেঘাটার সি আই টি অঞ্চল এবং অন্যত্র তরুণ নকশালী কর্মীদের পুলিশের দ্বারা নৃশংস খতম অভিযানের সাফল্যের আগে এবং পরে সি পি এম নেতৃবর্গের মনোভঙ্গী কেন্দ্রকে আশ্বস্ত করেছে। অপরপক্ষে সি পি এম এল দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে সি পি এম বিরোধী মনোভাব নির্বাচনের পরেও কর্মোনি। প্রেসিডেন্টের শাসন পুনঃপ্রবর্তনের পর বামপন্থী শিবির-বিভেদের চিত্র প্রায় আগের মতই বজায় রয়েছে।

বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানার্থে কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে না পারায় ভারত সরকার ল্যাজে গোবরে অবস্থায় পড়েছে সত্য, কিন্তু তার দরুণ তাদের গৃহনীতিতে কোনো চুল পরিমাণ পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর নয়। বরং শাসকদলের মধ্যেও উপদলীয় অন্তর্বিরোধের সংকট উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও শাসকমহল তাদের বর্তমান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—(এক) প্রত্যেকটি রাজ্যসরকারকে কেন্দ্রের ঐককেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখা এবং সে নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিন্দুমাত্র সূচনা দেখা দিলে বিদ্রোহী রাজ্যসরকারের তৎৎ উলটে দেওয়া; (দুই) প্রকৃত বামপন্থী বিরোধিতার আদর্শ ও কর্মসূচী নিয়ে ক্রিয়ামূল দলের জনসংযোগকারী সংগঠনগুলির ভিত্তি পর্যন্ত পুলিশী তাণ্ডবে, ভাড়াটে গুন্ডাদের হামলায় এবং ছদ্মবেশী গোয়েন্দা পুলিশদের দ্বারা

সংগঠিত সশস্ত্র ও উপর্যুপরি খুনী আক্রমণে শেষ করে দেওয়া। বলার প্রয়োজন রাখেনা, দ্বিতীয় পন্থাটি কয়েকমাস হল, সি পি এম দলের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এখন পার্লামেন্টে অপ্রতিহত। সাম্প্রতিক নির্বাচনে রহস্যময় ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ফলে ইতিপূর্বে (আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের কারণে) সোভিয়েত রাশিয়া প্রভাবান্বিত সি পি আই দলকে যেটুকু রেয়াৎ করে চলার দরকার ছিল, এখন তাও নেই।

তাই পার্লামেন্টে বক্তৃতার লড়াই চলার সময় গৃহমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে সি পন্থ মহোদয় ঠৌককাটা ভঙ্গীতে বর্ষীয়ান এম পি ভূপেশ গুপ্তকে জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের “বিশেষ সমস্যা” দেখাশুনা করার জন্য কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট একজন বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন মন্ত্রীকে নিয়োগ করেছেন। বৃথাই গুপ্তজী ন্যায়শাস্ত্র আওড়ালেন সংবিধানের দোহাই দিয়ে।

সিদ্ধার্থ রায়কে “বিশেষ মন্ত্রী” হিসেবে নিযুক্ত করার কথা ঘোষণার সময় সুপ্রসিদ্ধ আইনবিদ এবং সংবিধানগত সকল প্রশ্নের বিশেষজ্ঞ, শ্রীএল এম সিংভি এই অভিমত দেন—“যদিও এই নিযুক্তি সংবিধানের আক্ষরিক অর্থে অসঙ্গত নয়, তথাপি এর গর্ভে নিহিত রয়েছে ভবিষ্যৎ বাদ-বিসম্বাদের বীজ এবং

জননৈরাশ্য; সুদূরপ্রসারী জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনাও এর প্রচণ্ড।”

কিন্তু সংবিধানের চুল-চেরা বিশ্লেষণে নয়, প্রতিক্রিয়াশীল কায়মীস্বার্থের সাহায্যে ক্ষীতিকার্য জনস্বার্থবিরোধী ভাড়াটে গুন্ডা-বাহিনী, গুপ্ত শাসনোপায়ী পুলিশের এবং তৎসহ সি আর পি এবং অংশতঃ মিলিটারী দমন-নিপীড়নী অভিযান আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই প্রমাণ করতে তৎপর হবে, পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী ও অগ্রগামী শক্তিকে মেরে ঠান্ডা করে দেওয়া হয়েছে। তখনই আসবে রাজ্যের সকল কর্মচারী, রাজ্যপুলিশ এবং ব্যাপক পরিসরে জনগণের অগ্নিপরীক্ষা। দেখা দেবে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ নিবাসীদের জাতিধর্মনির্বিশেষে মরণ-বাঁচন সওয়াল।

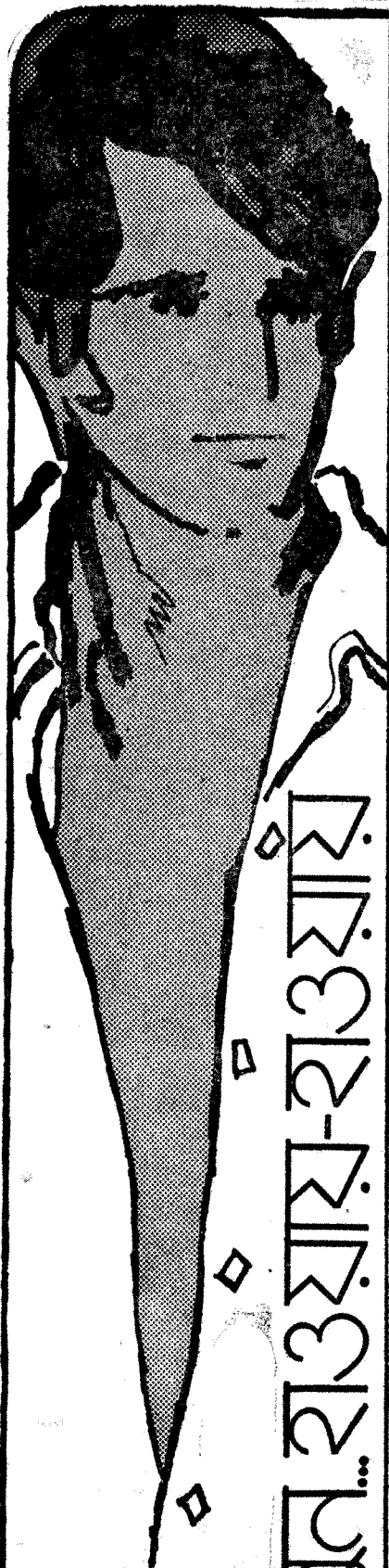
কি কথা হল

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

শিত হয় যে প্রধানমন্ত্রী নাকি ভীষণ রুদ্ধ হয়েছেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গের দুজন নেতা (প্রমোদ দাশগুপ্ত ও হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার?) সম্পর্কে বিশেষ সন্দিহান এবং এগারোই আগস্ট সিট্রা প্রস্তাবিত হরতালকে তিনি নাকি এ্যান্টি-নেশনাল আখ্যা দিয়েছেন।

স্টেটসম্যানের সংবাদদাতা শুধু জানান নি যে জ্যোতি বসুকে কে নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ করেছিলেন? প্রধানমন্ত্রী না জ্যোতিবাবু নিজেই নিমন্ত্রণ খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন?

আসল কথা, নব কংগ্রেসী নেত্রী রাজনৈতিক সংকটের ঝড়ের মধ্যে কোন সুস্থির নীতি গ্রহণ ও কার্যকরী করতে অপারগ হয়ে পড়েছেন। তাই একবার আপোষ-আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আবার দমন নিপীড়ন চালিয়ে জনগণকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা এই গভীর সংকটেরই চিহ্ন।



চন্দ্রহাওয়া-হাওয়ায়

আরো আরামভরা, আরো শৌখিন, বাটার সানওয়ে স্যান্ডাল যুগপৎ স্নিগ্ধ, বিলাসী ও হালকা। যেখানে-খুঁশি যখন-খুঁশি পায়ে দিন—দেখবেন কখনো আর পা থেকে খুলতে হচ্ছে করছে না। এতই ভালো। স্যান্ডাল পরার এ এক নতুন শৌখিন সুখ—স্বচ্ছন্দ্যের এক নতুন আবেশ। আজই পায়ে গালিয়ে নিন বাটার সবাধুনিক স্যান্ডাল : তার নকশায় সুদৃষ্টি, নকশায় আরাম।

বাটা সানওয়ে



Bata

পলাশী অঞ্চল ওয়াগন ব্রেকারদের স্বর্গরাজ্য

পুলিশ সাহায্যকারী : জনজীবন বিপর্যস্ত

দীর্ঘদিন যাবৎ নদীয়া জেলার অন্তর্গত নাকাশীপাড়ার সার্কেল ইন্সপেক্টর ও কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জের যোগসাজসে প্রায় চারিশত মানুষের একটি দল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পলাশী রেলওয়ে স্টেশন হইতে রেলের লাইন, স্লিপার ইত্যাদি রেলওয়ে সম্পত্তি প্রকাশ্যেই অপহরণ করিত। এদের অত্যাচারে স্থানীয় জনজীবন অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে, এমন কি নারীরও সন্ত্রাস হানির ঘটনা ঘটে। ঐ সমস্ত ঘটনা বিভিন্ন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট জনোনো হয়, কিন্তু কোন ফল হয় না। গত নব্বই মে, তারিখে নাকাশীপাড়ার সার্কেল ইন্সপেক্টর পলাশীতে আসিলে স্থানীয় যুবকেরা (দল-মত নির্বিশেষে) এই ঘটনার প্রতি-কারের জন্য দাবী জানান এবং রেল ওয়ের কয়েক লক্ষ টাকার চোরাই সম্পত্তিতে বোঝাই গুদাম ঘরে লইয়া যান। তখন সার্কেল ইন্স-পেক্টর মহাশয় উক্ত গুদাম ঘর পাহারা দেবার জন্য স্থানীয় যুবক ও বিশিষ্ট নাগরিকদের নিকট আবেদন রাখেন এবং দুইজন পদলিখকে উক্ত জায়গায় মোতায়েন করেন এবং জেলা শাসক মহাশয়ের নিকট হইতে পরের দিন সার্চ-ওয়ারেন্ট আনিয়া তালা ভাঙিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়া চলিয়া যান। কিন্তু দুই দিন দিনের ভিতরে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন না, বরং শোনা যায় তিনি পরোক্ষে উক্ত মাল স্থানান্তরে পাচার করিবার জন্য দূর্বৃত্তদেরই উৎসাহিত করিতে-ছেন। আমরা এই ঘটনা তৎকালীন মধ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীকে এগারেই মে টেলিফোনে জ্ঞাত করি। তাছাড়া পলাশীর পার্শ্ব-বর্তী পাগলাচন্দীতে শংকরদাস ব্যানার্জীর বাগানে অবস্থিত সাম-রিক ক্যাম্পের উচ্চতর অফিসার-দের বিভিন্ন সময় এই সমস্ত ঘটনা জানানো হয়।

এতে কোন ফল না হওয়ায় পলাশীর নাগরিক কুমিটির পক্ষ থেকে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বারোই মে তারিখে পলাশীতে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘটের দিন সকালের দিকে পাগলাচন্দী সামরিক ক্যাম্পের কয়েকজন সামরিক অফিসার ঘটনা-স্থলে আগমন করেন এবং তারা সমুদয় ঘটনা উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি নৈগরিক কুমিটির সম্পাদক মহা-শয়ের কাছে রাখিলে জাতীয় সড়-কের অবরোধ মুদ্র করা হয়। এই সময় কালীগঞ্জ থানার একজন অফিসার কয়েকজন পদলিখ সহ সার্চ ওয়ারেন্ট লইয়া আসেন এবং গুদামের তালা ভাঙিতে আরম্ভ করেন। তালাভাঙা এবং চোরাই মালের তালিকা প্রণয়নের কাজ চলাকালীন অবস্থায় সামরিক

অফিসারদের উপস্থিতিতে হঠাৎ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এক-জন পদলিখ যার নাম সর্বল হালদার (১২৭৯নং) তার ১০০ নং রাই-ফেল হইতে শান্ত ও নিরীহ মানু-ষের উপর গুলি বর্ষণ করে। এক-জন সামান্য আহত হন। সৌভা-গ্যের কথা, কেউ নিহত হননি। সামরিক অফিসার সেই পদলিখকে ধরিয়া ক্যাম্পের দিকে লইয়া যান এবং পুনরায় তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরুর হয়।

কিন্তু প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নাকাশীপাড়ার সার্কেল ইন্স-পেক্টর এবং কালীগঞ্জ থানার অফি-সার ইনচার্জ দুই গাড়ী সি আর

ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পদলিখ এই অঞ্চলে ঘাসের সৃষ্টি করিয়াছে। এ অঞ্চলের সর্বজন-প্রমুখ যুব নেতা সমরনারায়ণ ঘোষালের বাড়ী তখনই করিয়া সার্চ করিয়াছে। এবং নিরীহ ছেলেদের উপর অমানুষিক অত্যা-চার করিতেছে। অথচ আসল দোষীদের পদলিখ কিছুই করিতে-ছেন। কয়েকজন রেলওয়ে সম্পত্তি অপহরণকারী ও কালোবাজারী এবং পদলিখ একটি সভায় স্থির করিয়াছেন যে তাহাদের কার্যে বাধাদানকারীদের যেভাবেই হোক শাস্তেতা করিতেই হইবে। এই

মতামত

পি লইয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং স্থানীয় নিরীহ ছেলেদের উপর এমন কি ভিত্তারীর উপরও অমানুষিকভাবে লাঠি চার্জ করে এবং চার জনকে মারাত্মক আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, স্থানীয় অঞ্চলপ্রধান ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সমরনারায়ণ ঘোষাল, লোকনাথ আগরওয়াল প্রভৃতিদের উপর চুরি, খুন, ইত্যাদির বহু ধারায় মামলা দায়ের করে।

সম্প্রতি ছয়ই জুলাই দূর্বৃত্তদের দ্বারা বন্দক ছিনতাই ও রাইফেল

সব ব্যাপার দেখিয়া স্থানীয় জন-সাধারণ আশ্চর্য, হতবুদ্ধি ও বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছে, সংযুব-কেরা বিস্মান্ত ও বিচলিত বোধ করিতেছে। পলাশীর এই ঘটনায় সমস্ত রাজনৈতিক (অসাম্প্রদায়িক) দলই একত্রিত হইয়াছে এবং স্বরাষ্ট্র সচিব, আই জি প্রভৃতিদেরও জানা-ইয়াছে। তবুও এইরূপ পরিণতি ঘটিতে থাকায় সকলেই তাহাদের সততা এবং ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করিয়া কাঁচবার অধিকার সম্পর্কে সংশয় বোধ করিতেছে।

জৈনক ভুক্তভোগী

প্রেসিডেন্সী জেল গেটের সামনে পুলিশী অত্যাচার

আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে প্রেসিডেন্সী জেল গেটের সামনে একটি বর্বরোচিত-ঘটনার কথা আপনাদের জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত তদন্ত ও দোষী ব্যক্তি-দের উপযুক্ত বিচারের দাবী রাখছি। আমি এবং আমার স্ত্রী আমাদের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাই। নিম্ন মতো পয়লা জুলাই সকাল বেলাই ইন্টারভিউয়ের এ্যাপলিকেশান জমা দিয়ে আসি এবং পরের দিন দোসরা জুলাই শ্রদ্ধাবার জেল গেটে পৌঁছাই।

পাঁচটা পনেরো মিনিটে আবদুল জব্বারের ইন্টারভিউয়ের একটি ছোট-কগজ কর্তব্যরত কর্মচারী দিয়ে গেল, জব্বারের ছেলে এবং এক ভাই গেটের সামনে যেতে প্রহরারত জেল পদলিখ তাঁদের ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে চাইলো না। তখন জব্বারের ছেলে প্রতিবাদের সুরে বলল, “আপনি কেন যেতে দেবেন না, অফিস থেকে ইন্টারভিউয়ের স্লিপ দিয়েছে।” স্লিপটি ছোট কাগজে লেখা ছিল, সেই অজুহাতে (অথবা

অন্য কোন কারণ থাকতে পারে) তাদের ভেতরে যেতে দেওয়া হবে না। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়, তারপর দেখলাম প্রহরারত পদলিখ টিনের গুদামটির ছাউনির তলা থেকে দুইখানি লাঠি দুইজন বার করে ছেলোটিকে ধাক্কা দিতে দিতে গেটের ছয়-সাত হাত দূরে নিয়ে যায়। তখন আবদুল জব্বার ও তার ভাই জিজ্ঞেস করে, “কেন আপনারা আমাদের ছেলেকে মারছেন।” এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই দুইজন পদলিখ লাঠির দ্বারা তাদের প্রহার করতে করতে রাস্তায় শূইয়ে ফেলে। জব্বারের ভাইয়ের আঘাত কম লাগে, কারণ সে সরে যায়। কিন্তু জব্বারের ছেলে প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে আর জব্বারেরও ওইরূপ অবস্থা। ওই কান্ড করেও তারা ক্ষান্ত হয় নি। ইতিমধ্যে আরও দুইজন পদলিখ এসে কুকুর, বিড়াল ঘরে পরে থাকলে যেমনভাবে পা ধরে টেনে নিয়ে যায়, সেইরূপ টানতে টানতে জেল গেটের ভিতরে নিয়ে যায়।

আমি বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র, কিন্তু কোন ছাত্র ইউনিয়নের সভ্য নই। আমার দৃষ্টান্ত যে আমি এ বৎসরের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ওয়ানের পরীক্ষার্থী। কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ বৎসর কয়েকটি কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করেছেন, কিন্তু কি গোপন কারণে জানি না আজও বঙ্গবাসী কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল হয়নি। এ কলেজের অধ্যক্ষ, উপা-ধ্যক্ষ ও অনেক অধ্যাপক শূন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বর্নিষ্ট ভাবে জড়িত। তারা কি সকলেই চক্ষু-রোগে ভুগছেন? তাঁদের চোখের সামনে ব্যাপক গণটোকাটিক ও বাইরে থেকে উত্তরপত্র সরবরাহ হচ্ছে অথচ তাঁরা বোম ভেঙেনাথ সাজিয়া বসে আছেন, যে সব অধ্যাপক ঘরে গাড়ি দিচ্ছেন তাঁদের কিবেকে কি কিছুই বাঁধে না।

এই কেন্দ্রের হা কথাতা তাতে পি-উ থেকে শুরুর করে আজ পর্বন্ত বত পরীক্ষা হয়েছে তা সবই বাতিল ঘোষণা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে এই কেন্দ্রে কোন পরীক্ষা না হওয়া উচিত। কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে কোন দিন গোপনে ছাত্র সেজে এই কেন্দ্র পরি-দর্শন করলে দেখতে পেতেন : (এক) এ কলেজে যাদের সিট পড়ে নি তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়াই এই কেন্দ্রে বসে পরীক্ষা দিচ্ছেন। (দুই) কলেজের তিনটি লোহার গেট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু ছাত্র যারা পরীক্ষার্থী নন, প্রতিটি ঘরে অধ্যাপকদের সামনেই অব্যে প্রবেশ করছে ও নকল সর-বরাহ করছে। (তিন) কলেজের মধ্যেই ইউনিয়ন ঘরে, ছাদে ও কয়েকটি ছোট ঘরে নকল সরবরা-হের অফিস বসে গেছে। (চার)

একতাল্ল রসায়ণ বিভাগের সামনে পদলিখ আছে কিন্তু নির্বিকার। (পাঁচ) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অনেক অধ্যাপকই এই সব ছাত্রদের চেনেন ও নাম জোনেন কিন্তু তাদের কিছুই বলেন না বরং প্রশ্রয় দেন। (ছয়) ঘরে পরীক্ষার্থীদের সিট নম্বরের খেলাই নেই। এক একটি বেঞ্চে কম করে তিন জন ছাত্র বসেছে যদিও সামনের দিকে বহু বেঞ্চে খালী পড়ে থাকে (সাত) হাই বেঞ্চে উপরই বই রেখে ছেলেরা টুকছে। কোন শিক্ষক ঘরে ঢুকলে তাঁকে দেখেও এতটুকু সংকোচ বোধ নেই। (আট) প্রতি পরীক্ষার দিনই গড়ে চল্লিশ-পঞ্চাশটি খাতা উত্তর লিখে বাইরে থেকে সরবরাহ করা হয়। পরে হলে “কভার”টি বদল করা হচ্ছে। যদি কভার বদল করার সুযোগ না থাকে তো সেই ঘরের অধ্যাপককে দিয়ে সেই করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যদি কোন অধ্যাপক সেই করতে রাজি না হন তাহলে সেই খাতা অন্য ঘরে জমা দেওয়া হয় ও তাদের প্রশ্রয়দাতা অধ্যা-পককে দিয়ে সেই করিয়ে নেয়া হয়। (নয়) সব কটি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ এবং ঘরে আলো নেই বন্ধেই হয়। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ঘর-গুলি হচ্ছে পাঁচ, ছয়, এগারো, তেরো, আঠারো, উনিশ ও বিশ-নম্বর। (দশ) চোখ খোলা রাখলে টাকাপসসার লেনদেনও দেখতে পাবেন। (এগার) অধ্যাপকরা নিশ্চিত মনে ঘরের সামনে বারান্দায় বসে গল্প করছেন আর চা, বিস্কুট ও সিগারেট খাচ্ছেন। আরও দেখতে পাবেন, (বারো) রাস্তা থেকে কিছু ছেলে পদলি-শের নাকের উপর দিয়েই কলেজের দৌতালয় ঢিলে মর্ড়ে নকলের কাগজ ছুড়ে দিচ্ছে।

যে পরীক্ষা কেন্দ্রের এই চেহারা, সেখানে যে অল্প ছাত্র সং ভাবে পরীক্ষা দিতে চায় তাদের অব-স্থাটা একবার চিন্তা করুন। জানি না বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা তাদের প্রতি কি উপায়ে ন্যায়বিচার কর-বেন।

জৈনক পরীক্ষার্থী

নির্বাচন ও সি পি এম

আবার হয়তো আমরা নির্বা-চনের দিকে এগুচ্ছি। নির্বাচন ও সি পি এম সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

নির্বাচনের সময় মার্কসবাদী পার্টি যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তাতে ফলাও করে অনেকগুলি আশ্র দাবীর ফর্দ থাকে এবং জন-সাধারণকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে এই দাবীগুলি মেটানো হবে। এই প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এই দাবীগুলির একটিও শ্রমিক বিপ্লব ছাড়া হতে পারে না। বর্তমান শাসনতন্ত্রে এই দাবী- (শ্রমবিপ্লব সন্ত্রাস পন্থায়)

কমলকুমার ভট্টাচার্য

কারান্তরালে হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি

অভিজিৎ সেন

মনে হচ্ছে সরকারপক্ষ এখন জেলের ভেতরেও নকশাল-আন্দোলনকে কভার করতে চাইছে। দম-দম জেলের ঘটনা ঘটে যাবার পর বাংলাদেশের সব কটি বড় জেলে নকশালপন্থীরা অনেকেই নিহত অথবা গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন বলা যায়। এ জাতীয় হত্যাকাণ্ড ভারতবর্ষে ইংরাজ আমলেও ঘটেছিল শৃঙ্খল নয়, আজকের তামাম দুনিয়ায়ও যেখানে মোটামুটি ভাবে একটি সরকার কালেক্ট আছে, সেইরকম কোথাও এরকম স্বাভাবিক হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা শুনিনি। যে সব দেশে এখন যুদ্ধ চলেছে সেখানেও জেলে মানুষ আটকে রেখে, যেমনই হোক তার একটা বিচার করে তারপর হত্যা করা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এদিক থেকে একটা নজির সৃষ্টি করলো বলা যায়।

সরকার বতই মদ্য ঢাকতে চেষ্টা করুক, জনমানসে এ ঘটনা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছে। বাইরের বাতাসে কেবলই ধুলো উড়ছে এরকম একটা ধারণাকে যদি ছেঁটে ফেলা যায় তাহলে দেখা যাবে, এরকম চিন্তার সংগত কারণ আছে। মূল প্রশ্নটা বোধ হয় এই ভাবে সম্মুখে রাখলে সুবিধা হবে যে, নকশালপন্থীদের সঙ্গে সরকারের মন্বন্ট বর্তমানে কোথায় এবং অন্ততঃ শৃঙ্খলা এই প্রশ্নে নকশাল আন্দোলনের মূল দৃষ্টিগোচর কি কি। সম্ভবতঃ এই ধরনের আলোচনা থেকেই সরকার পক্ষ কেন এইভাবে এই আন্দোলনকে কভার করেছে, তাও অনেকখানি ফুটে উঠবে।

একথা আজ অত্যন্ত পরিষ্কার যে শাসক শ্রেণী তার ভেতরকার মন্বন্ট ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। কংগ্রেস তথা বর্তমান পুঁজিবাদীদের এ সত্য বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না যে, শোষণের মূল যন্ত্রটা ক্রমেই অকেজো হয়ে পড়ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র আন্দোলন তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

সরকারপক্ষ বা শাসক শ্রেণী বলতে আমরা কংগ্রেসের কথাই বলছি। কেননা যুক্তফ্রন্ট জাতীয় যেসব শাসক তৈরি হলো তারা কেউই টিকলো না। মোটকথা, এই সব নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস নিশ্চিত হতে পেরেছে যে সরকার চালাবার মত ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই এইসব বামপন্থীদের নেই। কারণ সরকারে থাকার চেয়ে বিরোধী পক্ষে থেকে রাজনীতি করার অনেক সুবিধা এবং লাভ। কংগ্রেস এ অবস্থার সুযোগ পুরোপুরিই নিয়েছে। এরই মধ্যে এই অবস্থার অনিবার্য এবং ঐতিহাসিক সৃষ্টি নকশালবাদের অভ্যুত্থান। এই প্রথম সরকারপক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামের সম্মুখীন হলো পশ্চিমবঙ্গে এবং সহজেই বুঝতে পারলো

এর অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি। আর এ জন্যই তাকে প্রথমাবধি অসাধারণ ঋষি এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে। এক বিস্ময়কর চাতুর্যে সবকটি বামপন্থী দলকে শাসকপক্ষ নকশাল বিরোধিতার সম্মুখে ঠেলে দিতে পেরেছে। তারা খুব ভাল করেই বুঝেছে, সশস্ত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র প্রতিরোধ নিরর্থক। আবার এও জেনেছে যে কিছুটা জনসমর্থন না পেলে, ওদের নিশ্চিহ্ন করতে যাওয়া হবে এক বিরাট ভুল। তাই তাদের কৌশল হলো, হত্যা করবে তারা, কিন্তু ছোরা বা চাকু লোকে দেখবে বামপন্থীদের হাতে। এই উপায়েই শাসকশ্রেণীর লাভ হবে চূড়ান্ত। সে একই সঙ্কেত বামপন্থীদের সামান্য রাজনৈতিক মূলধনকে বিনষ্ট করতে পারবে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানকেও দ্বিমুখে রাখতে পারবে। বলা যায়, নকশাল দমনের ভূমিকাপর্বে বামপন্থীদের সাহায্যে জনগণকে চূপ করিয়ে রাখার কঠিন কাজ, যা তাদের চিন্তার কারণ ছিল, এখন তা অনেকখানি সম্ভব হয়েছে।

এই অসাধারণ সাফল্যের সূত্র ধরেই পশ্চিমবঙ্গে প্রথমে সি আর পি, পরে সৈন্যবাহিনী এসেছে। জ্যোতিবাবু ইন্টার্ন ফ্রন্টের রাই-ফেলস এনেছেন, এ সত্যকে মুখের ওপর ছুড়ে মেরে সি আর পি নামানো হয়েছে। তবু, শাসকপক্ষ দেখতে পাচ্ছে, হিসাব যেন মিলেও মিলছে না। এর কারণ মিলিটারী দিয়ে নকশালদের আক্রমণ করলে কতটা লাভ হবে অথবা ক্ষতি হবে, সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। নানারকম পন্থাতি বিশেষ করে কড়ন করেও দেখা গেল আন্দোলন কমছে না কিছুতেই। এখন সৈন্যবাহিনী দিয়ে রাস্তাঘাটে যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করাও বোকামো হবে; সৈন্যবাহিনীও এতে রাজী হবে বলে মনে হয় না, হলেও আনিচ্ছন্ন হবে। কাজেই বর্তমান সম্ভব সৈন্যবাহিনীকে শান্তির দূত হিসাবে রেখে পন্থীর আড়ালে ম্যাকবেথ সেজে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বারাসাত, বহরমপুর, মেদিনীপুর এবং দমদমে এই পন্থীতরই সহায়্য কমবেশী নেওয়া হয়েছে। এরকম সময় ভারতবর্ষ বিশেষকরে পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে “বাংলাদেশের” ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর পুরো লাভ এখন সরকার পক্ষের ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে—সবকটি বামপন্থী দলকে একহাতে বোঁধে রেখে আরেক হাতে মর্জিবরকে সাহায্য, চীনকে শত্রু চিহ্নিতকরণ এবং দেশের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা রক্ষার কায়দার নকশাল দমন। এরকম চমৎকার সুযোগেও যে শাসকশ্রেণী সোজাসুজি কাজ সারতে পারছে

না, তার কারণ তাহলে তা থেকে বিরোধী দলগুলো খুব বেশীরকম মনোফা লুটবে। তাছাড়া ইন্দো-চীনের পরিসর পৃথিবীতে ক্রমশই বেড়ে চলেছে, একথাও তাকে মনে রাখতে হয়েছে। এইসব মন্বন্ট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেলে, এই সরকারকে ম্যাকবেথ সেজে দমদম জেলে ঢুকতে নাও হতে পারে।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্ন ভাবে নকশালপন্থীদের ভুল-ত্রুটি আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাঁরা ভুল অনেক করেছেন এবং এখনো করছেন কিন্তু তাঁদের আন্দোলন একটা মস্ত লাভকে অর্জন করেছে, সে হলো সশস্ত্র আন্দোলনের সূত্রপাত এবং জনগণের সম্মুখে এর অবধারিত প্রয়োজনকে ফুলে ধরা। প্রশ্ন হলো, এ কাজ যারা করতে নেমেছেন কিছ্র ক্ষয়-ক্ষতিতো তাঁদের হবেই কিন্তু সে বিচারে আমরা বারাসাত, মেদিনীপুর, বহরমপুর এবং দমদমের ঘটনাকে মনে নিতে পারি না। সামগ্রিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ঠিক এই মূহুর্তে তাঁদের ক্ষতির পরিমাণ কিছু বেশীই। এর অনেক কারণ আছে—এরা এখনো শ্রমিক-কৃষককে তেমন করে সঙ্গে নিতে পারেন নি। এই কারণে আন্দোলনের গতিবেগ প্রথম দিকে বতটা দূর্বল ছিল এখন আর তা নেই। মোটা ভালের সরু অংশে যেমন কাঠুরিয়া কোপ মেরে কাটে, বিপ্লবের দুর্বলতম পর্যায় খুঁজে তাকে কেটে ফেলবার সুযোগ খোঁজে প্রতিক্রিয়াশীলরা। আজকে নকশালরা যে মার খাচ্ছেন, সে সেই দুর্বলতার জন্যেই। তাঁদের অন্য অনেক দৃষ্টির কথা ছেড়ে দিলেও জনসমর্থন সম্বন্ধে অবজ্ঞার কথা কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না; উড়িয়ে দেওয়া যায় না, জনগণ-তান্ত্রিক বিপ্লবও যেখানে আসেনি সেখানে ইস্কুল-কলেজ পড়িয়ে দেবার বা মূর্তি ভাঙার কৌশল-গত দৃষ্টির কথা।

সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় দলের বাইরের অংশকে এমন সময় সম্মুখ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো যখন সাধারণ লোকের তাঁদের সম্বন্ধে কৌতূহল সীমাহীন। তাঁরা অনেক কিছুই দেখলেন, অনেক কিছুই বুঝতে চাইলেন। কিন্তু কে তাঁদের বোঝাবে, কে তাঁদের জানাবে। প্রতিদিন পথে ঘাটে মিসিংগান উঁচিয়ে সৈন্যবাহিনীকে যেতে দেখলেন সবাই। প্রচারে এবং ভয়ে জনগণের এই মনটা এখনো জড়োসরো হয়ে আছে কিন্তু আজও নকশালপন্থীদের এ সম্বন্ধে কোন হুঁস হলো না। এই সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কৌশলে জনগণের সহানুভূতির ওপর একটা পাতলা আবরণ তৈরি করে দিতে পেরেছে।

নকশালপন্থীদের মস্তবড়

দুর্বলতার ফাটল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্কলহের ফাঁদে পা দিয়ে। শাসক শ্রেণী এই চেষ্টাছিল এবং একথাও ঠিক একদিন তাঁদেরকে শোষণবাদ এবং সংশোধনবাদের সঙ্গে সম্মুখ সম্মুখে নামতে হতোই। কিন্তু একবারে সূর্যতেই এই কলহে লিপ্ত হয়ে তাঁদের বিস্তার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আবার কৌশলের প্রশ্ন, একবার শহর, একবার গ্রাম এরকম মৈত্র-প্রকৃতিই দুর্বলতার লক্ষণ। ক্যাডারদের ঠিক মতো তৈরি করার কাজও ব্যাহত হয়েছে; বিপ্লবমাত্র রাজনীতি না দিয়ে এ্যাকশনে নামাতে গিয়ে বিপদ হয়েছে, পুলিশ অনেককেই পিটিয়ে খবর বের করে ফেলেছে; পাটিতে পুলিশের লোক বিস্তার ঢুকে পড়ছে। শত্রু বেলে-ঘাটায় নয়, অনেক জায়গায়ই বোরখা পরা নকশালপন্থীরা আসল নকশালদের সমূহ বিপদের কারণ হচ্ছে। এই সঙ্গে আছে অতি সহজে পুলিশকে বিশ্বাস করা ও তাদের ফাঁদে পা দেওয়ার ব্যাপার। কারা-অভ্যন্তরে যারা আছেন, তাঁরা এ ভুলটা যেন কিছু বেশীই করছেন। বাইহোক এর ফলে যেভাবে জেলের মধ্যে গোপনে তাঁদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, এ মূহুর্তে জনগণ কিছুটা প্রতিবাদ করলেও তা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

বরং সংবাদপত্রগুলি এসব খবর যেভাবে ছাপছে, তাতে ব্যাপারটিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক করে দেখানো হচ্ছে। বহরমপুর জেলের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে দুঃখ প্রকাশ করে থাক, সরাসরি এরকম ঘটনার সমর্থন করতেও তাদের সংকোচ হয়নি। কথা হলো যারা কাজ

মতামত (ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

গুলি পূরণ করা যে অসম্ভব তা কেউলা ও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে।

নির্বাচনে কতগুলি আসন পাওয়া গেল, কটা হার হলো—এটা লেনিনের নিকট বড় প্রশ্ন ছিল না। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে পাটিকে গড়ে তোলা, তাকে শক্তিশালী করা, দেশের চতুর্দিকে তার শাখা বিস্তার করা। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে আসনের নামে ভোট দাও, ভোট দাও চীৎকার করা নয়। মার্কসবাদের মহান বৈপ্লবিক আদর্শকে, পাটির কর্মসূচীকে জনসাধারণের নিকট প্রচার করার উপরই জোর ছিল বেশী। পার্লামেন্টে গিয়ে ভাল ভাল আইন পাশ করা নয়, পার্লামেন্ট দখল করা নয়, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা নয়, লেনিনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল শ্রমিক বিপ্লব।

নির্বাচনের সময় সি পি এমের মধ্য কাজ ভোট সংগ্রহ, প্রয়োজন

বিক্রি করে মনোফা করে, দেখা যাচ্ছে তারা প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় নেমেছে। এত সাহস নিশ্চয়ই তারা এমনি পারেনি।

মোটকথা এইসব অসুস্থ হাতে না থাকলে এখনকার দিনে সশস্ত্র আন্দোলনের মোকাবিলা করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদের এই পতনের যুগে বিপ্লবীদেরও তাই যথেষ্ট সচেতন না হলে চলে না। কই তাঁরাতো আজ দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন না যে প্রতিক্রিয়াশীলদের চেহারা পৃথিবীর সব জায়গায়ই একরকম। কিম্বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কাগজগুলোতে আহত এক পূর্ব বাংলার কিশোরের মাথায় হাত-বোলানো অবস্থায় ইন্দ্রি গান্ধীর ছবি বেরিয়েছে, তার দৃষ্টি আগে ঐ হাতেই দমদম জেলের ভেতরে পনেরো জন কিশোর এবং তরুণকে গুলি চালিয়ে এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। তাই বলছিলাম, যতোদিন আন্দোলনে তাঁরা তাঁদের এই সমস্ত দৃষ্টিগোচরকে উপেক্ষা করবেন, এদেশের গান্ধীবাদীদের ম্যাকবেথের ভূমিকা অচিন্তনীয় চলতেই থাকবে। বিপ্লবীদের এ তথ্যটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার, এ যুগে সম্মুখ সংঘর্ষ এড়াতে তাঁদের থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রহও কিছুমাত্র কম নয়। এই আগ্রহ নিয়েই তারা বহরমপুর, মেদিনীপুর, আলিপুর এবং দমদমের জেলখানাগুলিকে “স্বজন হারানো শ্মশানে” পরিণত করে চলেছে কারণ তারা মনে করছে, এই সব শ্মশানে মৃতের কয়েকজন আত্মীয় তাদের “চিঁতায়” তোলবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেও বিশেষ কিছু এসে বাবে না।

হলে কংগ্রেসীদের সঙ্গে পাক্সা দিয়ে অসং উপায় অবলম্বন করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না তাঁরা, পাটি সংগঠন, মার্কসবাদ প্রচার ইত্যাদি মূল কাজগুলি গৌণ হয়ে যায়। কংগ্রেসকে হাটিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্নটা এত বেশী প্রাধান্য পায় যে মার্কসবাদ, শ্রমিক বিপ্লব ইত্যাদি মূল কথাগুলি গভীরভাবে ওঠে না। লেনিনের নিকট নির্বাচন ছিল একটা কৌশলের প্রশ্ন, নীতির প্রশ্ন নয়। কিন্তু সি পি এম নেতাদের নিকট সি পি আই নেতাদের মতই নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন হলো নীতির প্রশ্ন। তাঁদের পাটির কর্মসূচীতে রয়েছে যে “তাঁদের পাটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটানো চেষ্টা করবে”। অর্থাৎ সি পি এমের প্রধান উদ্দেশ্য জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

জনৈক পাঠক

দপর্ণে সপ্তাহ

শ্রীমন্ত

যত ছোটই হোক, সংবাদটা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। গত তেইশে জুলাই “দপর্ণ” পত্রিকার আটের পাতায়, ঠিক ডান চিবুক ধরে জিয়াগঞ্জের ছোট্ট এই খবরটা বের হয়। শ্রীমন্তের হাত-দপর্ণে সে খবর একটা রাগী মূখ ভাসিয়ে তুলেছে। সে মূখ নকশালের। না, নকশাল বললেই যে রীতিনীতি ও রাজনীতির চেহারা আকৃতি নেয়, তেঁলপাড় প্রশ্ন ভুলোয় মনে অলোড়িত করে মন ও মনন, এ খবরে সেইসব দুরূহ প্রশ্নের উত্থাপনা নেই। এ সংবাদ আপামর সামাজিকের কাছেই চমকপ্রদ।

গত মার্চ মাসে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরের বাজারে ইটাং কতকগুলো প্রাচীরপথ স্থানীয় সংবাদ প্রেরকের নজরে আসে। তিনি জানাচ্ছেন, বাজার থেকে বাজেট স্পেকুলেশনের ধাক্কা খেতন শিশুশ্রমদাতা ফাটকাবাজার গদামে ফালতু মুনাকার আশায় মূখ লুকিয়েছে, মানবজন বেবী ফুড খুঁজে হস্তরান; ঠিক সেই সময় দেওয়ালের গায়ে ভেসে উঠল, নেপথ্যচারী অমোঘ এক ভয়াল সতর্ক বাণী : ফাটকাবাজার মুনাকার জনগণের শত্রু। তাদের শাসিত মৃত্যু—সি পি আই, এম এল।

অর্থাৎ, মৃত্যুর কারবারীকে মৃত্যুভয় প্রদর্শন। বে-আইনীভাবে যে পিশাচ চক্র শিশুর খাদ্য ফালতু মুনাকার লোভে একটা স্বাধীন দেশে নিশ্চিন্তে লুকিয়ে রাখতে পারে, তারা হাজার শিশুর গলা টিপে ভবিষ্যৎ ভারতকে নির্বিকার যমালয়ে পাঠাতে নিষ্ঠুর নিষ্কম্প। তাদের ধারণা নিজেদের ক্ষেত্রে মমের দুরারে তারা টাকার কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। পাণাচার তাদের দেবে গাড়িভাঙা, প্রাসাদ-বাড়ি, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা সম্মান এবং অমরত্ব। মরেও কখনো দৃষ্টিভঙ্গি জবাবদিহি করতে হবে না তাদের। সুতরাং “সমাজতান্ত্রিক বাজেট” ঘোষণার আগে সুখেই নিদ্রা যাচ্ছিলেন এই সম্ভ্রান্ত কংস-মার্মারা। এমন সময় জিয়াগঞ্জের প্রাচীরে গর্জন : পাপের সাজা মৃত্যু!

বে-আইনী ব্যবসার বিরুদ্ধে কী সাংঘাতিক “বে-আইনী” শাসন! আইন এমন কথা কখনো বলে না। কালোবাজারী ঘটনাচক্রে কখনো ধরা পড়লেও অন্যান্য স্বাধীন দেশের অনুকরণে তাকে প্রকাশ্যে বেদান্ত পর্বন্ত করা হয় না। অসং ব্যবসায়ীর নাম সাবধানে গোপন থেকে যায়। প্রেস ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় চেহারা ধরা পড়লেও চোখের ওপর কালি ঢেলে শয়তানকে সনাক্ত করার উপায়টুকুও আর রাখা হয় না।

যে দেশে এটা চলে আসছে,

সে দেশে ঐ ধরনের দেওয়াল বিজ্ঞাপন সাড়া জাগানো সর্বনাশ বৈকি।

সুখ-নিদ্রাবাসানে মুনাকার-শিকারী ফাটকাবাজার সকালে উঠে হটাৎ প্রাচীর গায়ে সারি সারি সর্ষপ পুষ্প সন্দর্শন করে স্বভাবতই বড় সামাজিক চেতনায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। পড়িমাড়ি ছুটে গেছিলেন নিজের নিজের গদামে। আগে প্রাণ, তবে ফালতু মুনাকার কেননা, সংবাদ প্রেরক আরও জানিয়েছেন, ঐ দেওয়াল বিজ্ঞাপন পরেই লুকোনো মাল বোরখা খুলে প্রকাশ্য বিপণীতে বিক্রয়যোগ্য ভাবে উপস্থিত হতে থাকে। ফালতু মুনাকার চুলোয় গেল, ন্যায্য দামে নিজেকে পাণ্ডস্থ করে গদামবাজ শয়তানের জানরক্ষার জন্য তখন গদামজাত বেবী ফুডের ঠেলা-ঠেলি গুতোগুদাতি শুরুর হয়েছিল। সি পি আই (এম এল) ঘোষিত প্রাচীর ঘোষণা ডানমতীর খেলার মতো সব মজুত মাল টেনে বার করিয়ে আনল। খবরটা ছোট্টো হলেও, বেশ জবরদস্ত খবর, সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত অনেকেরই হয়ত “দমদম দাওয়াই”—এর কথা মনে পড়বে। সে অভিযোগ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক চিকিৎসা। মাল গাপ হচ্ছে শুনলেই দোকান ঘেরাও করে পল্লীবাসীই মুনাকারখোরের খাঁই মিটিয়ে দিচ্ছিল মোক্ষম “দমদম দাওয়াই” প্রয়োগ করে। প্রহারেণ পরম শিক্ষা সৌদিনও কারো কারো ভাগ্যে জুটছিল।

কিন্তু বে-আইনী ব্যাপারকে এইভাবে বে-আইনী শিক্ষার সিঁথে করার সংবাদে যে শাসন প্রশাসনের আর সম্মানই থাকে না। সম্মানের লোভও অবশ্য লোভী প্রশাসনকে কখনো গার সপ্তালনে উদ্বেগ করে কতব্য পালনে উৎসাহিত করে না। কালোবাজার এবং খোলা বাজারে নিষিদ্ধ বিকিকিনিই হাল আমলের এই দেশে অবাধ হাট-বাজার হাঁকিয়ে বসেছে। প্রশাসন নির্বিকার!

চীনা বই ধরে থাকলে নাকি পদলিঙ্গ ধরে, ওদিকে চীনা-জাপানী দ্রব্যের পসরা নিয়ে বড়বাজারের ক্যাপিটাল চোরগাঁর ফটোপাথ অচল করে দিল। অবাপ্গালীর বিজনেস রাজ্য সরকারকে ফাঁকি দিয়ে বে-পরোয়াভাবে শহরের হুপিপে ফেঁপে উঠছে। প্রশাসনের সামান্য সন্দেহবোধ থাকলে ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় সওদা ক্রমে ঠানদীর গল্প-কথা হয়ে দাঁড়াত না।

এখন মুর্শিদাবাদের খবরটা মননদীর্ঘাসীদের সঠিক মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হলে সামাজিক সাধারণের খেঁদে পরে বাঁচে।

কেন্দ্রীয় সরকারই সংবিধান মেনে না

(দপর্ণের পর্ববৈকক)

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তারিই জনৈক ভক্ত এম পি নাকি বলেছেন যে উনি খেঁট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার থেকে ষাট লক্ষ টাকা তুলে—নেবার ব্যাপারে একদম চুপ করে আছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে কথা উঠলেই সভাগৃহে আসেন না। দুটি আলাদা ব্যাপারেই তার আশ্চর্য নীরবতা তার ভক্ত এম পি কে ব্যথিত করে তুলেছে।

খেঁট ব্যাংক থেকে নাগরওয়ালার নামে জনৈক ব্যক্তি নয়াদিন্দী শাখার চীফ ক্যাশিয়ার মিঃ মালহোয়ার সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর নাম করে ষাট লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে যান।

ভয়ত দর্পণ

ব্যাংক থেকে কারু নাম করে এতো টাকা তুলে নেওয়া যার এটা অবি-শ্বাস্য, অবশ্য যদি আগের থেকে এরকম টাকা তোলার কানুন ও বন্দোবস্ত থেকে থাকে তাহলে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু রাস্তা থেকে একজন লোক এসে বললো যে প্রধানমন্ত্রী আমাকে ষাট লক্ষ টাকা দিতে বলেছেন, অর্মান ব্যাংকের চীফ ক্যাশিয়ার খেঁট ব্যাংকের গাড়ী বোঝাই করে টাকা দিলেন এবং গাড়ী তাঁকে প্রধান-মন্ত্রীর বাড়ীতে নামিয়ে দিল—এসবগুলি ঘটনা জেমস বন্ডের কাহিনীর সঙ্গেই তুলনীয়।

ঘটনাকে আরো সন্দেহজনক করে তুলেছে প্রধানমন্ত্রীর নিজের অশ্রুত নীরবতা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে দিল্লীর জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযুক্ত শ্রীনাগরওয়ালাকে দীর্ঘ কারাদণ্ড দান। শ্রীনাগরওয়ালার আপীলের ফলে সেসন-জজ ঐ বিচার বাতিল করে পুনর্বিচারের আদেশ দিয়েছেন। এই পুনর্বিচারে যে বিষয়গুলির সন্তোষজনক মীমাংসা খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন তা নিশ্চয়ই আদালতের জীক্ষা নজর এবার এড়িয়ে যাবে না। প্রধানমন্ত্রী কোন গোপন রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এভাবে টাকা ওঠান কিনা, তা রাষ্ট্রীয় স্বার্থেই গোপন থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এটাও জানা চাই যে প্রধান-মন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রের অর্থ দলীয় কোন স্বার্থে নিয়োগ করেন না। কারণ কংগ্রেসী আমল এ সন্দেহের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গে আমরা তার বহু প্রমাণ পেয়েছি। পাবলিক গ্র্যাকুন্টস কমিটি ও ভিজিল্যান্স কমিশনের বহু নথিপত্রে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি চিরদিনই অভিনব পথ ধরে চলে। কেন্দ্রীয় সরকারের দৌলতে এবার

দেখতে পেলাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমস্যা বলে একটা কেন্দ্রীয় দপ্তর রয়েছে সংবিধানের কোন তালিকায় বার নাম নেই, এবং সেই দপ্তরের একজন ফাঁকা মন্ত্রী (মানে দপ্তর-বিহীন) আছেন, যার জন্যে একটা বিরাট সরকারী অফিস খোলা হবে। কংগ্রেসীদের লাজলজ্জা কোনদিনই ছিল না, মৌলানা আজাদের ইন্ডিয়ার উইনস স্ট্রীড থেকে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলবে। পরলোকগত জওহরলাল নেহরুর আমল থেকেই সংবিধান অগ্রাহ্য করা, সংসদীয় রীতিনীতি বাতিল করা চলছিল। কেরলে নাসুদ্দিন-পাদ সরকারকে বরখাস্ত পরিকল্পনা কমিশন ও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ

স্থাপন, সংবিধানের যে কোন ধারাকে যেভাবে ইচ্ছা সংকুচিত প্রসারিত করা—এসব কীর্তি স্বর্গত জওহরলাল নেহরুই শুরুর করে গিয়েছিলেন। রাজ্যে তাঁবেদার অনুগ্রহীত ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে তিনি সংবিধানের নির্দেশ-গুলিকে এভাবে এড়িয়ে যেতেন। জওহরলালজীর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সর্বদা পিতাকে সাহায্য করেছেন। আমাদের মনে আছে উনিশশ সাতাত্তর সালে শ্রীমতী গান্ধীর সভানেত্রীত্ব কংগ্রেস, আর এস পি, মুসলিম লীগ, পি এস পি প্রভৃতি দলগুলি বিমোচন সংগ্রামের তামাসা শুরুর করে, আর পিতা জওহরলালজী প্রথম কমিউনিস্ট সরকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বরখাস্ত করেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্রী। তিনি সংবিধানকে ছিঁড়ে দমড়ে আরো এড়িয়ে চলার পথ খুঁজে পেয়েছেন। সংবিধানে আইন শৃঙ্খলা রাজ্যসরকারের এজিয়ার, কিন্তু তিনি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ তৈরী করেছেন, শিল্প নিরাপত্তা-বাহিনী সৃষ্টি করেছেন। সংবিধানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সময় রাজ্যপাল সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে থাকেন। ইন্দিরাজী দলীয় স্বার্থে সংবিধান অমান্য করে একজন মন্ত্রীকে তাঁর ওপরে বসিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যপাল যদিও অনেক কুক্রম করে তাঁর মনোরঞ্জনের কৌশল করে চলেছিলেন, তাঁকে এবার ছেঁড়া জুতোর মত পায়ে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

এবার তিনি হাত দিয়েছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত এলাকাগুলি সম্পর্কে। একটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ স্থাপন করে ঐ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়,

আসাম, নেফা ও নাগাল্যান্ড সরকার-গুলিকে সংবিধান বাঁহুত কেন্দ্রীয় ক্ষমতার তাঁবে আনার চেষ্টা তিনি আরম্ভ করেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে পূর্বাঞ্চলীয় উপরি-লিখিত রাজ্যগুলিতে একটা হাই-কোর্ট ও পাবলিক সারভিস কমিশন কাজ করবে, সবগুলি রাজ্যে যৌথ আই এ এস ক্যাডার নিয়ম চালু হবে অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যৌথ ক্যাডারভুক্ত হলে রাজ্য সরকারগুলি তাদের বদলী, পোস্টিং প্রভৃতি ব্যাপারেও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বেন। সবচেয়ে মারাত্মক প্রস্তাব করা হয়েছে, “প্রয়োজনবোধে” কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার-গুলিকে যে কোনভাবে পরিচালিত করতে পারবেন সরাসরি নয়াদিন্দী থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে। অর্থাৎ এই রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনের যেটুকু সামান্য বা অবশিষ্ট ছিল তা এবার থেকে আর থাকবে না। ফলে আসাম ও নাগাল্যান্ড সরকার এর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মণিপুরও তাঁর বিরোধিতা করেছে। তারা তাদের সংবিধানগত ক্ষমতা হারাতে চান না। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তা হরণ করতে চান।

আসলে এই কেন্দ্রিকতার বৌকটা এসেছে অনেক দিন আগেই। প্রথমে কেরলে এবং পরে পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রধানমন্ত্রী সংবিধান ভঙ্গ করে পছন্দসই সরকার বসিয়ে-ছিলেন তখন তাঁর কংগ্রেসী সাক-রেদরা দুহাতে তালি বাজাতে শুরুর করে দিয়েছিলেন। এবার খাস কংগ্রেসী রাজ্যসরকারগুলিও রেহাই পাচ্ছে না। এবং পাবেও না। সংবিধান ও আইনের যথেষ্ট প্রয়োগ করার ফলে একদিন তা জনসমক্ষে হের, অর্থহীন হয়ে পড়ে, লোকে সংবিধান আইন শৃঙ্খলার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এদিক দিয়ে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর সবাই প্রায় নকশাল। তাঁরা যত দ্রুত সংবিধান ও আইনের প্রতি লোকের অগ্রস্থা ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সহস্র নকশালী প্রচারেও তা হত না।

কিন্তু রাজ্যের অধিবাসীদের এই কেন্দ্রিকতার বৌককে প্রতিহত করতেই হবে। আজ পশ্চিমবঙ্গে যে প্রায় ঔপনিবেশিক কায়দার শাসন ও শোষণ করা হচ্ছে, অন্য রাজ্যের নাগরিকেরাও তার থেকে রেহাই পাবেন না। হিরান্য, অন্ড, আসামের পদলিঙ্গ যোজ্ঞা এখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করছে বা করার ভাগ করছে, বাঙালী পদলিঙ্গ নাকি বিশ্বাসের অযোগ্য এবং অকর্মণ্য। দীর্ঘ দূশো বছরের পর “ভারত ছাড়” আন্দোলনের সৈনিক ও নেতা বাঙালীকে আবার সি আর পি বাঙা ছাড় বলে দাবী তুলতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি ও আইনভঙ্গের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।

বিদেশ দর্পণ

(দর্পণের পর্ষদে)

নিকসনের চীন যাত্রার ঘোষণার খবরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি খবরও প্রকাশিত হয়, যেটি অবশ্য দেশী সংবাদপত্রগুলিতে খুব একটা গুরুত্ব পায় নি। সেটি হচ্ছে আধুনিক চীনের অন্যতম নেতা চেন পো তার পার্টি থেকে বহিস্কৃত হওয়া। উনিশশো সাত-ষটি সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর থেকেই চেনরম্যান মাও-এর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সঙ্গী চেন পো তার এই পতনের খবর নিকসনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়ার মনে হয় একটিই মানে। সেটি হচ্ছে, চীনা পার্টিতে বাস্তববাদী যে অংশটি আছে প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই-এর নেতৃত্বে তারা ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরবর্তী ঘটনাবলির মধ্যেই এই বাস্তববাদীদের ক্ষমতাসালী হয়ে ওঠার বীজ অন্তর্নিহিত ছিল। এই বিপ্লবের ফলে যেমন একদিকে লি শাও চি-র মতন “রূপপন্থী” শোখনবাদীদের সমস্তরকম ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় তেমনি

আরেকদিকে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে বর্তায় সেনাবাহিনীর হাতে। মাও চিরকাল পিপলস লিবারেশন আর্মিকে জনগণের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে দেখে এসেছেন এবং এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তাকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রচালনার ব্যাপারে পার্টির প্রভাব ও ক্ষমতাও অনেকাংশে কমে যায় এর ফলে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। শুধু পরবর্তীকালে দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় যে তরুণ গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা চলে যায় তারা বিশুদ্ধিকরণের নামে, তার অপব্যবহার শুরু করেছে। ইদানীংকালে চীনা কতৃপক্ষও এ কথা স্বীকার করেছেন। মনে হয় বাস্তববাদী অংশের আবার মধ্যে অবতীর্ণ হওয়া এরই রিঅ্যাকশন। প্রচণ্ড বুদ্ধিমান চু এন লাই বুঝেছেন যে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নয়, পররাষ্ট্র নীতিতেও খানিকটা মধ্যপন্থা, অন্তত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গে,

অনুসরণ করা প্রয়োজনীয়। এবং যদি চু এই নীতিতে সফল হতে পারেন তবে উনিশশ সাতষটি-র আগেকার দিনগুলির মতন পার্টি আবার সেনাবাহিনীকে সরিয়ে তার পুরানো ক্ষমতায় আসীন হবে।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে লি শাও চি আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে। কারণ চীনের বর্তমান মার্কিন নীতির মূল কারণ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠেকিয়ে রেখে অন্তত পূর্ব এশিয়ায় নিজ প্রভাবের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া। এই অবস্থায় চীনা সরকার কখনই লির মতন কটর সোভিয়েত-পন্থীকে সহ্য করতে পারবে না।

প্রসঙ্গত একটা কথা উল্লেখযোগ্য। সেটি হচ্ছে “সোভিয়েট আমাকে আক্রমণ করতে পারে”, চীনের এই ভয় মোটেও অমূলক নয়। চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনা এবং উনোস্তুর সাল থেকে চীনের সীমান্তে সোভিয়েতের থেকে থেকেই ঠেলা দেওয়ার নীতিই চীনের মনে এই ভয় ঢুকিয়েছে। এবং এই ভয়ের কারণেই চীন আজ “স্বাভাবিকীকরণ” তার পররাষ্ট্র-

নীতির মূলমন্ত্র হিসাবে নিয়েছে। তাই “আদি শোখনবাদী” যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে দোস্তী, কানাডার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনা ও সর্বশেষে নিকসনকে আমন্ত্রণ জানানো।

নিকসনের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করাও মার্কিন নীতির একটি পরিবর্তনের ইংগিত। মনে হয় মার্কিন যুদ্ধ দফতর পেন্টাগনের ক্ষমতায় কিছুটা ভাটা পড়েছে, অন্তত রাষ্ট্রচালনার ব্যাপারে তার প্রভাব এখন কিছুটা নিম্নমুখী। এখানেও মধ্যপন্থীরা আপাতত কিছুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যেটা সম্ভব হয়েছে বিশেষ করে ভিয়েতনামে বিপর্যয়ের ফলে। তবে তার মানে এই নয় যে মার্কিন সরকার রাতারাতি তার সমাজ্যবাদী নীতি পালটিয়ে ফেলবে। চু-নিকসনের বৈঠকের ফলে হয়ত মার্কিন সরকার নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে কিন্তু এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবে না। চীন সরকারও তা খুব ভাল ভাবে জানে।

এই আশ্রিত বৈঠক প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। কোন কোন মহলে মার্কিন সরকার সম্পর্কে চীনের এই “হঠাৎ নীতি পালটিয়ে” ফেলায় সমালোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি হঠাৎ নয় এবং কোন নীতিও পালটায় নি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরও বেশ কয়েক বছর আগে বিখ্যাত সাংবাদিক এড-

গার স্নোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে চু এন লাই বলেন :

“There is no conflict of basic interest between the peoples of China and the United States and friendship will eventually prevail.”

(চীন ও মার্কিন জনগণের মধ্যে কোন মৌলিক বিবাদ নেই এবং এদের মধ্যে বন্ধুত্ব হবেই)। অবশ্য চু বারে বারে বলেন যে এই বন্ধুত্ব হতে পারে যদি মার্কিন সরকার তাইওয়ান (ফরমোসা) থেকে সমস্ত সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয় এবং চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে বিবাদকে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মেনে নেয়। ‘এই শর্ত’ চু এবারও আরোপ করেছেন।

চু এই সাক্ষাৎকারে আরও বলেন যে চীন পৃথিবীতে বিশ্বাসী যার মূল কথা হল অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চলেবে না। এখানে সমালোচনা করা যেতে পারে যে যদি তাই হয় তাহলে চীন কীভাবে মার্কিন সরকারের সঙ্গে বসতে যাচ্ছে যার আগ্রাসী নীতি পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী? এই বৈঠকে কেন্দ্র করে চীনের তরফে এখনও কোন বিস্তারিত বিবৃতি বেরোয়নি কাজেই এই প্রশ্নের উত্তরও মেলে নি। জানি না আগামী দিনে তা মিলবে কী না।

সর্বদলীয় কমিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তাই তিনি ঠিক করেছেন যে, এ রাজ্যের প্রশাসন তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন থাকা দরকার। তিনি ঘন ঘন পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত করবেন আর সব কিছু নিজে দেখাশোনা করার চেষ্টা করবেন।

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারী স্বামীনাথন আর হোম সেক্রেটারী রাঘবন রাজ্যের প্রশাসন আর পুলিশ ব্যবস্থার প্রাথমিক তদন্ত করে গেছেন। তাঁরা বিশেষ জুলাইয়ের সর্বদলীয় সভাতেও উপস্থিত ছিলেন।

তদন্তে এবং সভায় অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের ধারণা হয়েছে যে, এ রাজ্যে প্রশাসন ও পুলিশ কেবলমাত্র অপদার্থ নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা নানা সমাজবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

এই দুই অফিসার দিল্লীতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন, আর বলেন যে মানুষের মনে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ সম্পর্কে যে ব্যাপক অভিযোগ বর্তমান তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়।

শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্নে এর পর প্রধানমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত রিপোর্ট আলোচনার অনেক সাহায্য করে। কারণ, জ্যোতি

বসুর বক্তব্যের সরমর্মের কথা প্রধানমন্ত্রীর মোটামুটি জানা ছিল। আর এই বক্তব্যের কিছুটা সমর্থন দুই অফিসারের রিপোর্টেও পাওয়া যায়।

জ্যোতি বসু প্রধান মন্ত্রীকে পুরানো কথা বোঝানোর চেষ্টা করেন। প্রীমতী ইন্দিরা বলেন যে, তিনি জ্যোতি বসুর বক্তব্য আংশিকভাবে মেনে নিচ্ছেন এবং স্বীকার করছেন পুলিশ প্রশাসন রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়, এবং এদের মধ্যে দূরনীতিপরায়ণ ও সমাজবিরোধী অফিসারদের অবিলম্বে অপসারণ প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে স্বার্থক ভাষায় ঘোষণার প্রয়োজন আছে যে তারা রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

তাই আলোচনার দশ মিনিটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও জ্যোতি বসুর তথ্যগত একমত লক্ষ করা যায়। দুজনেই একমত যে, নকশাল রাজনীতির নামে যে খুন চলেছে তা মূলতঃ সমাজবিরোধীদের কাষে কলাপ, আর এই অবস্থা চলতে পারত না যদি তাড়াতাড়ি পুলিশ খুনের তদন্ত করার ব্যবস্থা করত। এরপরেই আলোচনা হয় রাজ্য রাজনীতি নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী বলেন

এবং জ্যোতি বসু একমত হন যে, প্রশাসন পুলিশকে ঢেলে সাজানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানও দরকার।

প্রশাসন ও পুলিশের হাতে রাজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাই এমন ব্যবস্থা দরকার যাতে জনপ্রতিনিধিদের পরিচালনায় রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে রাজ্যের শাসন সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে সর্বদলীয় কমিটির কথা ওঠে, অর্থাৎ আটশ দলের একটি রাজ্য কমিটি যা মাঝে মাঝে বসবে আর আলোচনা করবে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, কোথায় গোলমাল থেকে গেছে এবং সেই সম্পর্কে দলের কি অভিমত।

এতবড় কমিটি ত আর দৈনন্দিন কাজের উপযোগী হবে না, তাই দরকার একটি ছোট কমিটি। প্রস্তাব হয়েছে, নয় জন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হবে যা প্রশাসনকে উপদেশ নির্দেশ দেবে।

নয়জন সদস্য বেছে নেওয়া হবে মূলতঃ গত বিধানসভায় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে। আটজন আসবেন বিধান সভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে আর একজন বিধানসভার বাইরের কোন একদল থেকে।

এ ব্যাপারে সম্ভাব্য ফরমুলা হল : ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন

দলের তিন, সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের তিন, এই দুই গোষ্ঠীর বাইরের দলের দুই, আর বিধানসভার বাইরের দলের মধ্যে থেকে এক।

মাত্র পঁচিশ মিনিটে মোটামুটি একটা রফা হয়ে গেল। একটি ব্যাপার পরিষ্কার যে, প্রধানমন্ত্রী বুঝেছেন রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থায় কেবলমাত্র গভর্নর অথবা প্রশাসন থেকে নেওয়া কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের উপদেষ্টা করলে কোন লাভ হয় না। আর গোষ্ঠীর উপদেশে চললে অশান্তি বৃদ্ধি হতে পারে।

সবচেয়ে মন্থক ও মধু কালো হয়েছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের। তাদের পরামর্শের উপর কোন গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রী দেন নি। কেনই বা দেবেন, তারা ত প্রধানমন্ত্রীর কথা এমনিতেই শুনবেন।

শেষে প্রধানমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্বাচন দাবীও সমর্থন করেন। রাজ্যে যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন করা দরকার। তবে একথাও দুজনে স্বীকার করেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাথমিক প্রয়োজন হল এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

দর্পণ বিক্রয়ের জন্য

নিম্নলিখিত স্থানে এজেন্ট চাই :

আসামের লামজিং তিনসুকিয়া গোঁহাটি, পাণ্ডু ; কোচবিহারের দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ; পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর ; বীরভূমের রামপুরহাট ; মেদিনীপুরের তমলুক ; হুগলীর আরামবাগ এবং নিউ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং শহর।

যোগাযোগ করুন :

সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ
৬১, মট লেন,
কলকাতা-১৩

বিড়লাদের কর্মচারী-বিরোধী কার্যকলাপ

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

একচেটিয়া পুঞ্জিপতিদের শিরো-
মণি বিড়লারা তাদের হেড অফিসের
কর্মচারীদের নবগঠিত ইউনিয়নকে
ভেঙ্গে দিয়ে কর্মচারীদের ক্রীত-
দাসের জীবন কাটাতে বাধ্য করবার
উদ্দেশ্যে উনিশশ সত্তর সালের
তেইশে ফেব্রুয়ারী থেকে কল-
কাতার সমস্ত হেড অফিসগুলি
বন্ধ করে রেখে দিয়ে মোট দুই
হাজার কর্মচারীকে পথে নামি-
য়েছে। প্রথমে বিড়লারা ভেবে-
ছিল কিছুদিন বন্ধ রাখলেই কর্ম-
চারীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য
হবে। কিন্তু কংগ্রেসী পশ্চিম-
বাংলার সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী
ও মেহনতী মানবের অকুণ্ঠ সম-
র্থন সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ
করে সংগ্রামী বিড়লা কর্মচারীরা
আজ দীর্ঘ সত্তেরো মাস ধাবৎ
ছাটাই ও ক্রোড়ারের বিরুদ্ধে অটুট
মনোবল নিয়ে অভূতপূর্ব লড়াই
চালাচ্ছে যাচ্ছেন।

বিগত—মধ্যবর্তী নির্বাচনের
পর পশ্চিমবঙ্গে জনবিরোধী প্রতি-
ক্রিয়াশীল কংগ্রেস মসলীম লীগ
সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর
বিড়লারা নতুন উৎসাহে শুরু
করেছে তাদের বিভিন্ন চক্রান্ত।
গত চোদ্দই জুন হাইকোর্টের এক-
তরফা আদেশ বলে এক বিরাট
পুলিশ ও সি আর পি বাহিনী
নিয়ে কিছু ভাড়া করা সশস্ত্র গুন্ডা
দিয়ে বিড়লারা তাদের ইন্ডিয়া
এক্সচেঞ্জ স্টেশনের অফিস খুলে
দেয়, কিন্তু ইউনিয়নের সঙ্গে সমস্ত
বিরোধের আপস নিষ্পত্তি না করে
একতরফা ভাবে অফিস খুলে দেও-
য়ারে কোন কর্মচারী কাজে যোগ-
দান করেন না, বাইরের যে লোক
আসে তা সদর দপ্তরে ঝাড়ু দেও-
য়ার জন্যও যথেষ্ট নয়। তবুও
পরিচালিতভাবে বিড়লার সৃষ্টি
করে সংগ্রামী কর্মচারীদের প্ররো-
চনার ফাঁদে ফেলার সমস্তপ্রকার

চেষ্টা হচ্ছে। এই জঘন্য আক্রমণের
সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কে-
স্টাইল ফেডারেশনের নেতৃত্বে দলে
দলে সওদাগরী কর্মচারীরা বিড়লা
অফিসের সামনে জমায়তে হয়ে এই
ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে
তুমুল বিক্ষোভ জানাতে থাকেন।
এই বিক্ষোভ, সারাদিন চলতে
থাকে।

পরদিন (পনেরই জুন) ডাল-
হোসী ও চৌরঙ্গী অঞ্চলের সর-
কারী ও বেসরকারী সমস্ত কেন্দ্রীয়
ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির
নেতৃত্বে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্ম-
চারীরা মিলিতভাবে পুলিশ ও
সি আর পি-র সাহায্যে ন্যায়সঙ্গত
গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো-
লনের উপর এই আধা ফ্যাসিবাদী
আক্রমণের বিরুদ্ধে এক সুবিশাল
জমায়তে উপস্থিত হয়ে মালিক
শ্রেণী এবং তার রক্ষক সরকারের
বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ ও আক্ৰ-
মণের প্রতিরোধে বিড়লা কর্ম-
চারীদের পাশে দাঁড়বার সংকল্প
ঘোষণা করেন। অতঃপর সমস্ত
কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ
এক যৌথ বিবৃতি প্রচার করে
লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচীর
মাধ্যমে এই চক্রান্ত প্রতিরোধে সর-
কারী, বেসরকারী, সর্বস্তরের
শ্রমিক কর্মচারীদের এগিয়ে আসার
আহ্বান জানান।

উপরোক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী
গত দোসরা জুলাই জীবনবীমা
কর্মচারী সমিতির নেতৃত্বে জীবন-
বীমা কর্মচারীরা পাঁচই জুলাই
মার্কেস্টাইল ফেডারেশনের নেতৃত্বে
সওদাগরী কর্মচারীরা, ছয়ই জুলাই
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী
সমিতির নেতৃত্বে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা
সাতই জুলাই কেন্দ্রীয় সরকারী
কর্মচারীরা, আটই জুলাই রাজ্য
কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে
রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ও নয়ই
জুলাই ইনল্যান্ড ও ওভারসীজ
বীমা কর্মচারী সমিতি, সার্ভিসটার
কর্মচারী সমিতি, পেট্রোলিয়াম
ওয়ার্কারস ইউনিয়ন, হিন্দুস্থান
স্টীল কর্মচারী সমিতি ও কলি-
কতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্মচারী
সমিতির নেতৃত্বে শ্রমিক কর্মচারীরা
প্রতিদিন বেলা একটা থেকে
তিনটা পর্যন্ত বিড়লা অফিসের
সামনে বৌধ বিক্ষোভ সংগঠিত
করেন। ঐ সমস্ত বিক্ষোভ সমাবেশে
যথাক্রমে নবেন্দু গুহচৌধুরী, সমীর
মুস্তাফী, নরেশ দাস ও সুশীল
ঘোষ, দীপেন ঘোষ, ভবতোষ রায়,
অতুল কুম্ভু, সঞ্জয় সেনগুপ্ত ও
সুদর্শন ভট্টাচার্য্য তাদের ভাষণে
মালিক শ্রেণীর এই জঘন্য আক্ৰ-
মণের বিরুদ্ধে দিকে দিকে মেহ-
নতী মানবের সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধ
প্রতিরোধের আহ্বান জানান। অব-
শেষে দশই জুলাই বিভিন্ন

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এক যুগ্ম
কনভেনশনে মিলিত হয়ে বিড়লা
মালিকদের এই শ্রমিক স্বার্থ
বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার
দাবীতে ও সম্মানজনক সর্ব সম্মত
কর্মচারী সই বিড়লার বন্ধ অফিস
খোলার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর
আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের
সংকল্প ঘোষণা করেন। ভারত
সভা হলে আয়োজিত এই কন-
ভেনশনে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃ-
বৃন্দ বলেন—একচেটিয়া পুঞ্জিপতি
গোষ্ঠীর শিরোমণি বিড়লারা চেষ্টা
করছে শ্রমিক কর্মচারীদের গণ-
তান্ত্রিক আন্দোলন চূর্ণ করতে,
এই চ্যালেঞ্জ আমরাও গ্রহণ করছি।
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রদ্যোৎ
ঘোষ।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের *
ইতিহাসের আগে প্রকাশিত ভারতে
মে দিবসের ইতিহাস ছাড়াও
আরো বই গোপালবাবুর এ আই টি
ইউ সির ইতিহাস ও ভারতে প্রথম
ধর্মঘট ও শ্রমিক ধর্মঘটের দিন-
লিপি (ইং ও বাং) আছে।

প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ শ্রীসদ্র-
কাশ রায়ও ভারতে শ্রমিক আন্দো-
লনের একটি মার্কবাদী ইতিহাস
লিখেছেন যা অবশ্যপাঠ্য। কোন
দেশেই সর্বহারা শ্রেণী ও কৃষক
সম্প্রদায়ের মর্জি বিপ্লবের সঠিক
পন্থা নির্ণয় করা, সেই দেশের
জন-আন্দোলনের অতীত সম্পর্কে
পারদর্শী না হলে, সম্ভব নয়।
অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে
আন্দোলনের বর্তমান অধ্যায়ের
নীতি ও কৌশল ঠিক পায়
যায় এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের
ইতিহাসও অবশ্য যদি নেতৃত্বের
মার্কসবাদী অন্তর্দৃষ্টি থাকে এবং
তাঁরা জ্ঞানপাপী-সুবিধাবাদী না
হন। এই সৈনিক এ দেশের
মুষ্টিসংগ্রাম সম্পর্কিত সাহিত্যের
মধ্যে মার্কসবাদী শ্রেণী সংগ্রামের
ইতিহাসের জায়গাটা ছিল একে-
বারে ফাঁকা বার ফলে সময় বিষয়ে
প্রধান শত্রু-মিত্র বাছাই করা ছিল
এক দুরূহ ব্যাপার। রুশিয়া ও
চীনের দিকে তাকিয়ে দেখুন—
দেখবেন সেখানকার বিপ্লবী সংগ্রা-
মের প্রতিটি অধ্যায়ের অভিজ্ঞতা ও
শিক্ষা লেনিন, স্তালিন ও মাও সে-
তুং প্রবন্ধ বা পুস্তকাকারে বিশ্লে-
ষণ করে গিয়েছেন, প্রত্যেকটি
লেখাই ছিল গাইড বকের মত
পথপ্রদর্শক অর্থাৎ আন্দোলনের
পদনির্দেশক, মার্কসবাদের এক
একটি পরিপ্রকাশ। সোভিয়েতের
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেনিনের
ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতি-
হাস : গোপাল ঘোষ। লোক
ইতিহাস প্রকাশন। দাম : তিন টাকা

ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্র ও বিপ্লব বই-
খানির বিতরণ খণ্ড লেখা কিন্তু
তাঁর অকালমৃত্যুতে সেই ইচ্ছা চির-
তার্থ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর
দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক
রাষ্ট্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠার ও প্রতিরক্ষা-
বাবস্থা অঙ্গের করে তোলার কাজের
জন্য সময় এত কম ছিল যে তখন
নতুন কোন বিশদ ইতিহাস লেখা
হয়ে ওঠেনি। ফ্যাসিবিরোধী
বরুখের জের কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে
সঙ্গে, স্তালিন বলশেভিক পার্টির
নতুন ইতিহাস রচনার জন্য তাগিদ
দেন কারণ তখন দম নবার সময়
(রেস্পাইট) ছিল। চীনেও বিপ্ল-
বের অধ্যায়ে অধ্যায়ে পার্টির
তরফ থেকে প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লেখা
হয়েছে। হয়নি শুধু আমাদের
এই দুর্ভাগ্য দেশে সুবিধাবাদী
নেতৃত্বের দরুণ। এতদিনে টনক
নড়েছে—সেটা আশার কথা কারণ
কখনো না লেখার চেয়ে বিলম্বে
লেখাও বাঞ্ছনীয়। দায়িত্ব নিয়ে
এগিয়ে এসেছেন সুপ্রকাশাবাদ ও
গোপালবাবু। এজন্য তাঁরা প্রশংসা
পাবার যোগ্য নিশ্চয়ই।

গোপালবাবু কিন্তু আমার
আশা পূর্ণ করতে পারেনি। তবু
রেফারেন্স বই হিসেবে এর মূল্য
সামান্য নয়।

আমার বক্তব্য কেউ যখন কোন
কিছু লিখতে বসেন তখন তিনি
লেখেন বর্তমানের তাগিদে। নিরু-
দ্দেশ্য লেখা পুস্তক মাত্র। কী
লিখবে, কেন লিখবে এবং কোন
ব্যাপারের অগ্রগতিকে সাহায্য করার
জন্য লিখবে, লেখকমাত্রেরই এগুনি
আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে লেখার
হাত দেওয়া উচিত। শ্রমিক আন্দো-
লনের উন্নতিলাভের সহায় হবার
যোগ্যতা একমাত্র সেই লেখাই অর্জন
করতে পারে যার মধ্যে ভারতের
শ্রমিক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ ও
বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দো-
লনের মোটামুটি সুস্থ অতীতের
সঙ্গে বর্তমান শোচনীয় অবস্থার
তুলনা করা হবে এবং কেন এই
অধ্যুপতন ও শতযাবিভক্তি তাও
বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে যাতে
সামান্য সংগ্রামীরা কৃত ভুলপ্রান্তিকগুলি
শুধুরে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে
মনে হয় সবচেয়ে অনিষ্টকর দুটি
ব্যাপার হচ্ছে যে ট্রেড ইউনিয়ন
আন্দোলনকে কৃষক সম্প্রদায়ের
সামন্তর্ভাগীয় ভূমি সম্পর্কের
বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে এক-
সুতায় গাঁথার কোন চেষ্টা হয়নি
এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে
নিছক রুজি-রুটির লড়াইয়ের মধ্যে
অর্থাৎ “কমিউনিজমের স্কুলে”
অর্থনীতিবাদের মধ্যে সীমিত রেখে
তাকে রাজনীতির কলেজে প্রোমো-
শন দেবার দিক মাদানো হয় নি।
তাই আজ ঐ আন্দোলন স্কুল থেকে
টোলার স্তরে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে।
তাই বলছি গোপালবাবু বইটিতে
আরো রাজনীতি ও শ্রেণীভিত্তিক
বিশ্লেষণের খোরাক দিলে আন্দো-
লনের উপকার হতো।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ধনী মেয়ে

কমেডি'র অপমৃত্যু

সুপারিশকৃত ক্রান্ত

এ সমগ্র আলোচ্য বাংলা
ছবির প্রধান উপকরণ কৌতুক;
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত
“ধনী মেয়ে” ছাড়াও গায়ের
ডানপিটে মেয়ে মনসার গল্প। কল-
কাতার নামজাদা ব্যবসায়ী ফুটবল
পাগল কালী দত্তের ভাই বগলা
সেই গ্রামে শীল্ড খেলতে এসে
প্রথম দর্শনেই মনসার প্রেমে
পড়ল। খেলার হেরে, গিয়ে গ্রামের
মোড়ল মনসার মামা প্রতিশোধ
নিলেন জোর করে মনসার সঙ্গে
বগলার বিয়ে দিয়ে। বগলার তো
পোলাবারো, মনসাও খুশী। বগ-
লার বৌদিও বৌ দেখে আনন্দে
গমগম, কিন্তু বাদ সাধলেন কালী

দত্ত; নানা প্যাঁচ খেলে বৌকে বাড়ী
থেকে চলে যেত বাধ্য করলেন।
তারপর চিরচরিত হাহুতাশ-মান-
অভিমানের পালা, কালী দত্তের
অনুশোচনা পর্ব, এবং পরিশেষে
সপ্রেম বধুবর্গের মিলনান্ত পরি-
ণতি।

ফুটবল খেলা নিয়েই ঘটনার
বিস্তার এবং প্রথম পর্বে কমেডি'র
মেজাজ কিছুটা থাকলেও শেষের
দিকে পারিবারিক নাটকের টানা-
পোড়েনে হাস্যরসের অপমৃত্যু
ঘটেছে। প্রথমার্ধের কমেডি উপ-
স্থাপনেও সিনেমার চরিত্র বিশেষ
নেই, ঘটনার কারিকুরিতেও খুব
একটা মনসায়ানা চোখে পড়ে না,
শুধু কিছু মোটাটাকের সংলাপের
মাধ্যমে কাকতাল দিয়ে হাসাবার
অপচেষ্টা। মনসা ও বগলার প্রেম-
বিরহের পর্যায়ে বোষ্টম বাবাজীর
সঙ্গীত ভাষাও চূড়ান্ত বিরক্তিকর।
সাধারণ বাংলা হাসির ছবিতে
অভিনয় যেমন হয়, এখানেও তার
কোন ব্যতিক্রম নেই। সেই অশালীন
ভাড়ামো আর প্রমত্ত অঙ্গসঞ্চালন,
ছবির বিন্যাসরীতিও একেবারেই
মামুলীয়গণের। তার মধ্যে আবার
যখন টেলিফোনের ক্রশ-কানেকশনের
দৃশ্যে ফ্রেমকে চারভাগে ভাগ করে
এক এক খোপে এক একটি চরিত্রকে
বিস্তারিত দৃশ্যরচনা করা হয় কিংবা
স্বপ্নদৃশ্যে বিভিন্ন চরিত্রের কাণ্ড-
কারখানাকে গুলিয়ে দেবার মধ্যে
আধুনিক চলচ্চিত্র রীতির অপ-
প্রয়োগ করা হয়, তখন সত্যিই
পীড়াদায়ক।

প্রকাশিত হোলো

পূর্ব বাংলা প্রসঙ্গে
পূর্ব বাংলা “অন্যক” পত্রিকা
থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধ-সংকলন
দাম : এক টাকা

বিপ্লবের গান

সমাজতান্ত্রিক চীনের বিপ্লবী উপন্যাস
দ্বিতীয় সংস্করণ
দাম : ছ'টাকা

পিপলস বুক এজেন্সি

এক, কিশোর ঘোষ লেন,

পাঃ বাগড়া ৯ মুর্শিদাবাদ জেলা

২০১৭ মুক্তারামবাবু স্ট্রিট,

কোলকাতা-৭

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কতক মর্ডার ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মলিক স্কোয়ার

কলিকাতা-১০ থেকে মদ্রাস এবং ৬১নং মঠ লেন, কলিকাতা-১০ দপ্তর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

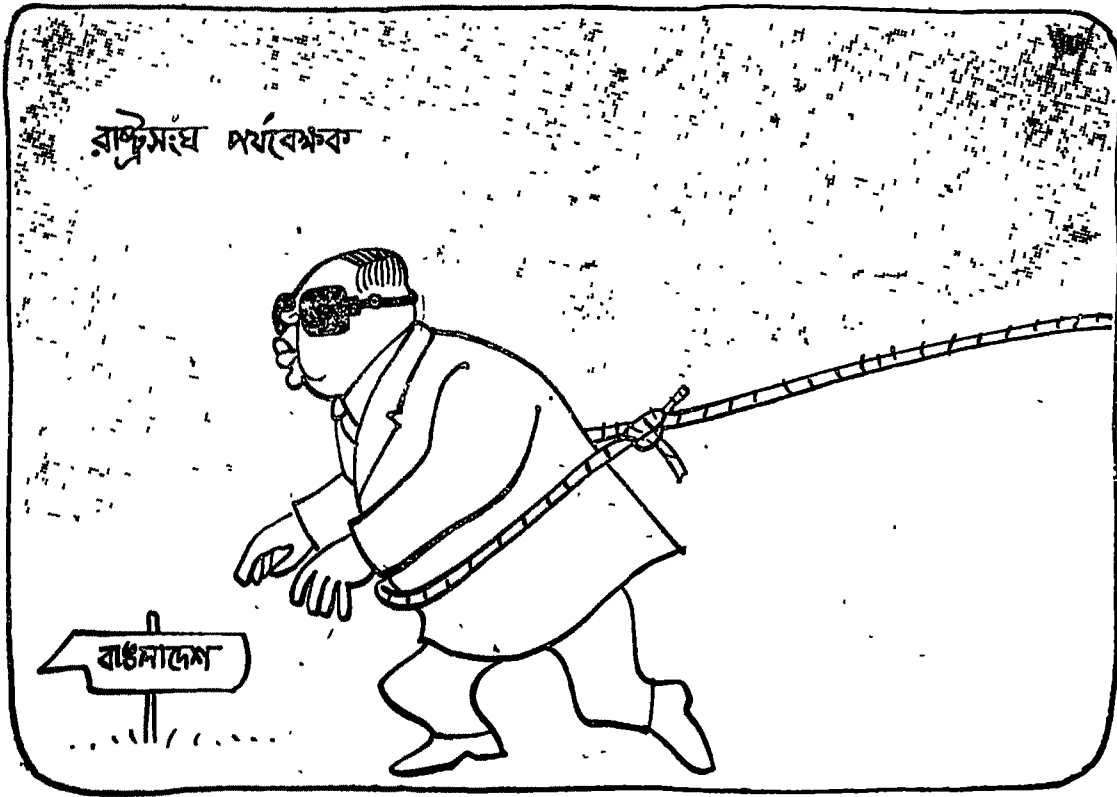
সভাপতির পদ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে চূড়ান্ত খেয়োখেয়ি

দপন

১৪শ বর্ষ ২৮শ সংখ্যা ১১ শ্রবণ ৬ই আগস্ট ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর আলোচনার অপ্রকাশিত তথ্য

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)
গত সপ্তাহে দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী-জ্যোতি বসু সাক্ষাৎকারের পরেই কলকাতায় আটশ পার্টির সম্মিলিত বৈঠকে সরকারের নরম সুর লক্ষ্য করার বিষয়। কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্য প্রশাসন ও পুন্নিশে ওলোট-পালোট হচ্ছে। প্রীমতী (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



রাজ্যের পুলিশ ক্লিক এবার জিতল দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে তালুকদারকে যেতে হল

(দর্পণের সংবাদদাতা)
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই এ এস অফিসারদের অবগতির জন্যে দর্পণ জানাচ্ছে, এই রাজ্যের পুলিশ ক্লিকই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জে সি তালুকদারকে সরাতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে পুলিশ ক্লিকের এই জয় নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা। জে সি তালুকদারের সঙ্গে আই জি পুন্নিশ প্রসাদ বসুর প্রথম থেকেই বিনিবনা হচ্ছিল না। তালুকদার সাহেব কিছুটা নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করছিলেন।

এর ফলে নব কংগ্রেসী কয়েকজন নেতারও তিনি বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। আই জি পুন্নিশ কুশলী ব্যক্তি। তিনি সেই সুযোগ নিয়ে জে সি তালুকদারকে হঠাতে সক্ষম হয়েছেন।

দর্পণ পুলিশ ক্লিক কি পশ্চ- তিতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারীকে পর্বন্ত সরাতে সক্ষম হয়েছে তার যে কাহিনী সংগ্রহ করতে পেরেছে তা হচ্ছে, বীরভূমের ব্যাপার নিয়ে (শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

নাবালক ছেলেদের অনর্থক গ্রেপ্তার করে পুলিশ বেপরোয়া ঘুষ নিচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যে চরম অশান্তির সন্নিবেশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাহিনীর একটা মোটা অংশ দেদার পল্লসা লুটে চলেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে দর্পণের কাছে সংবাদ আসছে। বর্তমানে পল্লসা কামানোর একটা প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে ব্যাপকহারে নাবালক ছেলে গ্রেপ্তার। নাবালক ছেলে গ্রেপ্তার হবার পর আত্মীয়-স্বজনরা পুন্নিশের পিছ পিছ ছুটেছেন আর ওদের মুক্ত করার জন্য পুন্নিশ অফিসাররা দেদার

টাকা ঘুষ নিচ্ছে। বিবরণটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাহিনীর ওপরতলাও রিব্রত বোধ করছে। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। কেননা, আই জি পুন্নিশ নাকি মনে করছেন, ঘুষ বন্ধ করতে গেলে তার বাহিনীর মনোবল (মোরেল) ক্ষুণ্ণ হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পুন্নিশের, দমদম বেহালা, যাদবপুর, হাবড়া, ব্যারাক-পুন্নিশের প্রম অংশ থেকে ভূরি ভূরি নাবালক গ্রেপ্তারের খবর আসছে।

কিন্তু প্রতিকারের কোন পথ নেই। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পুন্নিশ অফিসারদের নানা দাবী। নাবালককে না পেটানোর জন্যে একশো টাকা ঘুষ, ছেড়ে দেবার জন্যে দেড়শো থেকে দুশো টাকা ঘুষ দাবী করা হচ্ছে। অসহায় আত্মীয় স্বজনকে যে কোন ভাবে টাকা সংগ্রহ করে ঘুষ দিতে হচ্ছে। অভিযোগ করলে তদন্ত হবে না। একটা অসহনীয় অবস্থা চলছে।

পিকিং রেডিও মারফৎ চীনের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

চীন গত পল্লসা আগস্ট গণ-মুক্তি ফোঁজ প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসব পালন করল। তেতাল্লিশ বছর আগে এই ফোঁজের পতন হয়েছিল। উৎসব উপলক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা চীনের তরফ

থেকে পিকিং রেডিও মারফৎ করা হয়েছে।

এই ঘোষণা অনুযায়ী চীনের বৈদেশিক নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আর সেই সঙ্গে নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তিসামর্থ্যও। দোর্দল্য ও ভীতি থেকে যে বিকৃত নীতির প্রকাশ ঘটে সেই অবস্থা চীন কাটিয়ে উঠেছে বলে বৈদেশিক ঘোষণায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখন লক্ষ, সোভিয়েত ইউনিয়নের মত স্থায়ীত্বের আর কেনাবেচার ক্ষমতার টোপ দিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্তি।

নিশ্চয়তার সঙ্গে চীন ঘোষণা করে যে, সমস্ত দেশের সঙ্গে সহ অস্তিত্বের নীতি অনুযায়ী সম্পর্ক স্থাপনে সে আগ্রহী। চীনের কোন আগ্রাসী নীতি নেই। নিজে আক্রান্ত না হলে চীন অপর কাউকে আক্রমণ করবে না।

এই ঘোষণা করা হয় মিডিয়াম তরঙ্গে যাতে পূর্ব ভারতে ভাল-ভাবে শোনা যায়। ঘোষণার গুরুত্ব ভারতের পক্ষে অনেক, কারণ ইঙ্গিত আছে যে, ভারতের সঙ্গে সহ অস্তিত্বের ভিত্তিতে চীন (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভা

বেপরোয়া চাকরী দেওয়ার ব্যাপারে জেলা প্রশাসকের অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভার বেকান্দু পদ্ধতিতে সরকারী চাকরী দেবার এক বিরাট ফিরিস্তি দিয়ে চম্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিদায় নেবার আগে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারকে সতর্ক করে গিয়েছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর এন সেনগুপ্ত এক গোপন রিপোর্টে চীফ সেক্রেটারীকে বলেছেন, চম্বিশ (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

রাজ্যপালের অন্যায়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল প্রীশাস্তিস্বরূপ খাওয়ান রাষ্ট্রপতির শাসন কালেম হওয়া কিছুদিনের মধ্যেই একটি গাড়ী বিক্রী করেছেন প্রায় দু লাখ টাকায়। গাড়ীটি বিক্রী করা হয়েছে সমস্তরকম আইন লঙ্ঘন করে।

দর্পণ জানতে পেরেছে যে এই এয়ারকন্ডিশন্ড মার্সি-ডিজ গাড়ীটি খাওয়ান সাহেব তাঁর ছেলের মারফৎ বিলেত থেকে আনান। সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বিদেশী

গাড়ী বিক্রী করা চলতে পারে একমাত্র স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের মাধ্যমে। কিন্তু রাজ্যপাল তা না করে এটি সরাসরি বিক্রী করেন এক ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছে। যতদূর জানা গেছে সেই ভুললোকও নাকি আবার গাড়ীটি বিক্রী করেছেন আরেক জনের কাছে।

অপ্রকাশিত তথ্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইন্দিরার কাছে পঁচিশ মিনিটের বৈঠকে জ্যোতিবাবু বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বাংলা দেশের মস্তি সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বে ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি বর্তমান।

এই অবস্থায় খুনোখুনি চলতে থাকলে বিপজ্জনক। প্রশাসন ও পুলিশ ঠিক থাকলে আর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর বাধা-নিষেধ তুলে নিলে অবিলম্বে “এক মাসের মধ্যেই” খুনোখুনি বন্ধ করা যায়। জ্যোতিবাবু বলেন, তথাকথিত নকশালীদের নামে শ্রীমতী ইন্দিরার দলের লোকেরা খুন করে চলেছে, পুলিশ ও প্রশাসন এ ব্যাপারে নির্বাক। খুনের কোন তদন্ত হয় না। এ ব্যাপারে পুলিশী ও প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। সমাজ বিরোধী ভাড়াটে গুন্ডাদের আমদানী করা হয়েছে। মাসিক একশো

পাঁচ টাকা মাইনে দিয়ে পুলিশের হোম গার্ড হিসেবে। এরা একটার পর একটা খুন করে চলেছে নির্বিঘ্নে। নির্বিঘ্নে মূলত কংগ্রেসীদের সংকীর্ণ রাজনীতির সহায়তার উদ্দেশ্যে। হত্যার মূল লক্ষ্য মার্কসবাদীরা।

ঘটনার উল্লেখ করে জ্যোতিবাবু বলেন, দুর্গাপুরে একজন বাদে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়াতে ফেরার। অথচ গত দু মাসে বর্তমান শহরে ও আশেপাশে চোদ্দটা খুন হল, কিন্তু কোন গ্রেপ্তার পুলিশ করেনি। নিহতরা অনেকেই মৃত্যুর পূর্বে জীবনবন্দীতে খুনীদের নাম ঠিকানা দিয়েছে। খুনীর সন্ধান পালিশের সমর্থনপুষ্ট ভাবার কারণ আছে। এর পর আরও বহু ঘটনার কথা জ্যোতিবাবু উল্লেখ করেন। আর সেই সঙ্গে স্বরিতগতিতে বিভিন্ন অফিসারের বদলীর কথাও।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে খেয়োখেয়ি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দুই পক্ষেরই সমর্থনকামী হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হতে চাইছেন।

কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিজয় নাহারকে নিয়ে। তিনি কি স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক নির্বাসন মেনে নেবেন? অনুমান করা হচ্ছে বিজয় নাহারের অনুগামীরা তাঁর পদত্যাগ গ্রহণই করবেন না এবং বিজয় নাহারকে সভাপতি থাকতে বাধ্য করবেন। দ্বিতীয় অনুমান, বিজয় নাহার যদি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন তবে তিনি তাঁর অনুগত ডেপুটি স্পীকার পীযুষ মুখার্জি কিংবা নারায়ণ চৌধুরীকে সভাপতি নির্বাচন করে ‘সিদ্ধার্থ’ রায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযান শুরু করবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে ‘সিদ্ধার্থ’ রায় কিছুদিন আগে পীযুষ মুখার্জিকে অপমান করেছিলেন এবং সে সংবাদ দর্পণে গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ‘সিদ্ধার্থ’ রায়ই নয়। দিল্লী আর এখানে কলকাতা নেড়ে বিজয় নাহারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন।

বিজয় নাহারও কম ব্যাপদ নন। তিনি পীযুষ মুখার্জির অভিযোগ নয়। অন্যদিকে ‘সিদ্ধার্থ’ রায় পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনে বসে উপ-অধ্যক্ষরূপে বিজয় নাহার বা বা কাজ করেছিলেন তা বাতিল করে দিচ্ছেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অপসারিত সেক্রেটারী বি. আর গুপ্তকে কেন্দ্রীয় দপ্তরের এডিশনাল সেক্রেটারী করেছেন। অপসারিত পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তকে আবার পশ্চিমবঙ্গে পুলিশে ফিরিয়ে আনলেন।

‘সিদ্ধার্থ’ রায় চূড়ান্ত অপ-

মানের ঘটনা ঘটিয়েছেন সম্প্রতি। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জে সি তালুকদারকে সরিয়েছেন খুনে বিজয় নাহার গিরেছিলেন ‘সিদ্ধার্থ’ রায়ের কাছে। অনুরোধ করেছিলেন যেন সরানো না হয়, তাহলে ইমেজ খারাপ হবে, জানা গিয়েছে, সকালে ‘সিদ্ধার্থ’ রায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অনুরোধ রক্ষার। কিন্তু বিকেলে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লী রওনা হবার পরই এই বদলীর আদেশ বের করে বিজয় নাহারের গালে চড় মেরেছেন।

এই অপমান বিজয় নাহার নীরবে সহ্য করতে রাজী নন। ছয়ই তারিখে বিকেলে ‘সিদ্ধার্থ’ রায় কলকাতার ফিরলে তিনি এর একটা মোকাবেলা করতে চাইবেন বলে জানা গিয়েছে। কংগ্রেসী মহল বলছেন, এই মোকাবেলা এমন ধরণের হতে পারে যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাতাই আগুনের মিটিং পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যেতে পারে। মোট কথা, বিজয় নাহার তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে প্রকাশ্যেই বলছেন, ‘সিদ্ধার্থ’ রায়কে দেখে নেবেন।

অন্যদিকে ‘সিদ্ধার্থ’ রায়ও পাঁচ খেলছেন। তিনি একদিকে তরুণকান্তকে সমর্থন করবেন বলে কারো কারো কাছে বলছেন। আবার কারুর কাছে বলছেন, দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জীকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে দেখতে চান।

যদি কংগ্রেস আর ছাত্র পরিষদও এখন লাজে খেলছে। ওরা এখন আর প্রিয়দাস মুন্সিকেও চাইছে না। বিজয় নাহার, ‘সিদ্ধার্থ’ রায় আর তরুণকান্ত তিন পক্ষেরই মধ্য রক্ষ করে চলেছে।

আন্দোলনের সময় পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ‘সিদ্ধার্থ’ রায় নীরবে উপস্থিত ছিলেন।

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের মাত্র তিন মাসের অস্তিত্বে পশ্চিমবঙ্গে সর্বনাশের কথা জ্যোতিবাবু উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, উনিশশ উনসত্তর সালের একতরিশে জুলাই পুলিশের মিছিল বিধানসভা আক্রমণ করল, জ্যোতিবাবুর ঘরে হাজির হল পুলিশের ঠাণ্ডাড়ে বাহিনী, ওরা বিধানসভা চলাকালে সেখানে ঢুকে পড়ল, স্পীকারকে তাড়া করে নিয়ে গেল। স্পীকার জানালা দিয়ে লাফিয়ে কোন রকমে আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেলেন।

এই ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত হয়েছে আর দোষী পঞ্চজন পুলিশের লোককে সবিধানের বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী বরখাস্ত করা হয়েছে। সেই সব বরখাস্ত পুলিশের লোকদের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার চাকরীতে পুনর্বহাল করেছে। আর যারা পুলিশের ন্যায় দাবীর কথা বলে তাদের হয় চাকরী থেকে তাড়ানো হয়েছে, নয়তো কোর্শলে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এভাবে চললে কোন সমস্যার সমাধান হবে না।

তাই জ্যোতিবাবুর দাবী ছিল : এক, একশো চুয়াত্তিশ ধারা প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার সুযোগ দিতে হবে; দুই, সি আর পি আর ‘মিলিটারী’ নিয়োগ বন্ধ করতে হবে; তিন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত সমস্ত কর্মীদের পুলিশের নির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলে জেল থেকে ছেড়ে দিতে হবে; চার, আসলে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির বিবাসের ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ার কাজের সুযোগ দিতে হবে।

এর পরেই তিরিশে জুলাইয়ের সর্বদলীয় শান্তিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের বক্তব্য স্বীকার করে নেয় যে, পুলিশ ও প্রশাসনে দমনীতপরাঙ্গ ও সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ঐ সভায় অন্যান্য দলের তরফ থেকে অভিযোগ শোনা যায় যে, মার্কসবাদীদের কথা অনুযায়ী সব কিছু নির্ধারিত হচ্ছে।

গত সপ্তাহে প্রশাসনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে—হোম সেক্রেটারী বদল, আগেকার সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বদলী দুজন অফিসার, বি আর গুপ্ত এবং কলকাতার পূর্বতন পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্ত পুনর্বহাল হয়েছেন অধিক ক্ষমতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ নির্দেশে।

বেপরোয়া চাকরী দেওয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরগণায় চাকরীর সংখ্যা হচ্ছে চার হাজার একশো। সেখানে শুধু এই জেলাতেই কংগ্রেস-সীগ মন্ত্রিসভার সাব-কমিটি দশ হাজার ছেলেকে নিয়োগপত্র দিয়ে গিয়েছেন। বিভিন্ন সূত্র ধরে আরো নিয়োগপত্র নিয়ে ছেলেরা আসছে। অনুমান করা হচ্ছে পনেরো হাজার ছেলে এখানেই নিয়োগপত্র পেয়েছে। প্রতিদিন এরা জেলার অফিসারদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে। কিন্তু অফিসাররা নিরুপায়। শেষ পর্যন্ত হতাশ এই হাজার হাজার ছেলে জেলার অফিসারদের উপর হামলা করে তাঁদের নিরাপত্তা বিঘাত করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারকে এক্ষণি বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। অন্যথায় জেলার অফিসাররা নির্ভয়ে কাজ করতে পারবেন না।

জেল ম্যাজিস্ট্রেট রথীন সেন-গুপ্ত স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে বদলী হয়েছেন। বিদায় নেবার আগে চীফ সেক্রেটারীর কাছে পাঁচ পাতা টাইপ করা ফলস্কেপ কাগজে এক গোপন রিপোর্টে কি ভাবে বেকানুদারী পদ্ধতিতে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না রেখে বিগত মন্ত্রিসভা হাজার হাজার ছেলেকে চাকরীর নিয়োগপত্র দিয়েছেন তার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিকে জেলা কর্তৃপক্ষ পুনর্বাহ-

সন দপ্তর থেকে ‘লফায় লফায়’ লিষ্ট পাচ্ছেন। অন্যদিকে অজানা সূত্র থেকে নিয়োগপত্র পাওয়া ছেলেরা তাঁর জেলারই বিভিন্ন মহকুমায় গিয়ে হাজির হচ্ছে। নিয়োগপত্র ওদের মহাকুমাগুলিতেই যেতে বলা হয়েছে। পুনর্বাসন দপ্তর যে সিরিয়াল নম্বরের তালিকা দিচ্ছে তার মধ্যেও মাঝে মাঝে কতকগুলো নম্বর বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে তালিকা প্রকাশ করার পর অনেক ছেলেই ভাবছে বাদ দেওয়া নম্বর-গুলিতে বৃষ্টি ওদের নাম ছিল। জেলা কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়েছেন। ফলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ওপর বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে যে কাজের জন্য লোক প্রয়োজন সেই কাজের জন্য লোক মনোনয়ন না করে অন্য কাজের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। অনেক জামগায়, যার যে যোগ্যতা নেই তার চেয়ে বেশী যোগ্যতার নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। মোট কথা, রিপোর্টে রথীন সেনগুপ্ত বলেছেন, মন্ত্রিসভার এই ধরণের চলাচল নিয়োগপত্র দানে জেলার প্রশাসন ব্যবস্থার নিরাপত্তা বিঘাত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

পাঠক, কম্পনা করুন, শুধু চাবিশ পরগণাতেই এই অবস্থান। অন্যান্য জেলাগুলিতে তাহলে কি হয়েছে?

চীনের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। আর ভারত পূর্বে বাংলার যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক না কেন তাতে চীনের তরফ থেকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এই ঘোষণার নিজনের সঙ্গে চীনের আলোচনা প্রস্তাবের কোন উল্লেখ ছিল না, তবে চীন বুঝেছে যে, এই নিয়ে হয়ত বা সারা পৃথিবীতে মন্তিকামীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। তাই ঘোষণার বেশির ভাগ অংশই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্পর্কে চীনের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, কোরিয়া, কিউবা এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চলছে তার প্রতি চীনের অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো হয়। এই সঙ্গে মাত্র একবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের কথা এসে পড়ে। শোষণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আগের সেই উগ্রতা লক্ষ্য করা যায় না।

তবে চীন যে আলাদাভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে চায় তার কথা

ঘোষণায় উল্লেখ থাকে। বলা হয় যে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় যে সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গড়ে উঠেছে তাদের চীন সমর্থন করে। এশিয়া সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ করা হয় প্যালেস্টাইনে গেরিলা যুদ্ধের। ভারত ও পূর্ববঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির কোন কথা চীনের ঘোষণায় ছিল না। পূর্বে বাংলার যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চলছে তার কথাও চীন বলেনি।

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস

৭, স্ববোধ ব্লক মোরার কলিকাতা-১৩

হাজারীবাগ জেলে ভয়াবহ অবস্থা

কয়েদীদের জন্তুর মত রাখা হয়েছে

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

জেলা-পালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারকীয় হত্যাকাণ্ড এখন আর শব্দমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের অন্যান্য প্রদেশেও প্রসারিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে হাজারীবাগ জেলের সাম্প্রতিক ঘটনা একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে বর্তমানে বন্দীর সংখ্যা প্রায় দুই হাজার চারশো। তার মধ্যে নকশালপন্থীর সংখ্যা আড়াইশোর কাছাকাছি। জেলের অভ্যন্তরে ইদানীং সমস্ত নকশালপন্থীদের পারে ডাঙাবেড়ী পরিবেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই সংগে দুই পায়ের মাঝখানে লম্বা লোহার রড দিয়ে সর্বক্ষণের জন্য ফাঁক করে রাখা হয়েছে। ফলে নিয়মিত ভাবে প্রত্যেকের পারে ঘাঁবিষাক্ত বিস্ফোটকের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। যার জন্য এইসব বন্দীদের দৈনিক কষ্টের সীমা নেই। চিকিৎসার জন্যও জেল-হাসপাতালের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তদুপরি এই শ্রেণীর প্রত্যেক বন্দীকেই এক একটি ঘরে চাবিশ ঘণ্টার জন্য সেলবন্দী করে রাখা হয়। তারা সূর্যের আলো হাওয়া-বাতাস কিছুই গ্রহণ করবার সুযোগ পায় না বললেই হয়। একমাত্র জন্তু-জানোয়ার ছাড়া কোন মনুষ্যজীব এই ভাবে কিছুতেই বাঁচতে পারে না। বন্দীদের প্রত্যেকের মধ্যে একই কথা : এর চেয়ে আমাদের গুলি করে মেরে ফেলা ভাল। জেলের অভ্যন্তরে এই অমানবিক বিধিব্যবস্থার ফলে অনেক সুস্থ বন্দীই উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে।

যে সমস্ত কয়েদী পনেরো-কুড়ি বছর ধরে শাস্তি ভোগ করে আসছে তাদের অনেককেই বিনাকারণে এবং ব্যক্তিগত আক্রোশে নকশালপন্থীদের সংগে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পারে ডাঙাবেড়ী পরিবেশ সেপারেট সেল-এ বন্দী করে রাখা হচ্ছে। কেউই জানেন না যে তারা কবে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। একটা বীজবস অনিশ্চয়তার মধ্যে এদের দিন কাটাতে হচ্ছে। কোন বন্দীর কাছেই এক টুকরো সাদা কাগজ কিংবা কলম থাকতে পারবে না, সেটিও নাকি আইন বিরুদ্ধ। সুতরাং একজন বন্দীর সংগে অপর একজন বন্দীর যোগাযোগের কোন সুযোগই নেই। এ অবস্থায় জেল থেকে একশো জন বন্দী সম্মিলিতভাবে কি করে পালানোর চেষ্টা করতে পারে? এছাড়া খাওয়া-দাওয়া নিয়ে প্রত্যেক জেলেই প্রত্যেক বন্দীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও হাজারীবাগ জেলের ডায়েরি ব্যবস্থা চূড়ান্ত ব্যতিক্রম। সাধারণ কয়েদীদের

সকাল বেলায় খাদ্য অল্প কাঠি ও কাঁকড় মেশানো ভিজে ছোলা এবং তার সংগে গরুর খাদ্যপোষ্যগী চিটে গুড়। দুপুরে এগার ছটাক পরিমাণ ফেনাভাত, অখাদ্য ডাল ও পচা আলুর বোল। রাতিতে ছুটির রুটি আর পাট পাতা সিদ্ধ। এই খাদ্য খেয়ে দিনের পর দিন কোন মানুষেরই শরীর সুস্থ থাকতে পারে না।

কিন্তু কয়েদীদের এমনই পোড়া কপাল, অসুস্থ হলেও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ জেলের ভিতর হাসপাতাল ডাক্তার সবই রয়েছে। অধিকাংশ সময়ই তারা উদাসীন এবং নিশ্চেষ্ট। যখনই পাহারা কিংবা ওয়ার্ডারের মাধ্যমে ডাক্তারের খোঁজ করা হয়, তখনই শোনা যায়, তিনি ছুটিতে গেছেন। এক কথায় মৃদু দিয়ে রক্ত না ওঠা পর্যন্ত কোন চিকিৎসাই হয় না। অর্থাৎ জ্বর, কিংবা পেটের অসুস্থ-এসব তাদের চোখে কোন অসুস্থই নয়। সৈদিক থেকে বোধহয় চিড়িয়াখানার জন্তুরাও অনেক যত্ন পায়। আর জেলে মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করা হয় না। হয়তো বিচারে দেখা যাবে, যারা পরবর্তীকালে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে, তারাও এই অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে না।

এখানে কয়েদী, সিপাই, জমাদার, জেলারের সংগে একত্রে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের গুপ্ত ব্যবসা আছে। যেমন জেলের অভ্যন্তরে যে সমস্ত আন্ডার, ট্রায়েল নতুন বন্দীরা রয়েছেন, তারা অনেকেই জেলের আভ্যন্তরীণ নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবহিত নন। সুতরাং তাদের বন্দী হিসেবে কি প্রাপ্য কিছুই জানেন না। আন্ডার ট্রায়েল বন্দীর ক্ষেত্রে নিয়ম আছে তারা প্রত্যেকেই একটা গামছা, আন্ডারওয়্যার ও একটা গেঞ্জী পাবে। যেহেতু এসব বন্দীরা এই সমস্ত ব্যাপারে অজ্ঞ, অতএব তাদের অজ্ঞাতসারেই যথাস্থান থেকে এ সব সংগ্রহ করে অন্যান্য বন্দীদের কাছে কিংবা জেলের বাইরে বিক্রী করার গোপন ব্যবসা চলছে।

জেলা গুন্ডিটে বন্দীদের জন্য আনিত কাঁচা তরকারীর অঙ্কেই গোপনে প্রতি সপ্তাহে উধাও হয়ে যাচ্ছে। ফলে কয়েদীরা অর্থহারা, অনাহারে মৃদু বজ্রে পড়ে আছেন। ষাঁরই সহ্য করতে না পারে প্রতিবাদ করছেন, সংগে সংগেই তাকে নকশালপন্থী অভিযোগে ডাঙাবেড়ী পরিবেশ দিয়ে সেলবন্দী করে রাখা হচ্ছে। দিনের পর দিন এই সমস্ত অপকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ বেড়েই চলেছে বলে জেলার মিঃ আলেকজান্ডার আতঙ্কে বন্দীদের সংগে তাদের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সময়ই দেখা

করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

কিন্তু আমাদের স্বাধীন দেশে অত্যাচারের এখানেই শেষ নয়। কাহিনী আরো আছে। ইদানীং কোন বন্দীর সংগেই তার আত্মীয়-স্বজনকে দেখা করতে দেওয়া হয় না। অথচ সি আই ডির সামনে মোল্যাকাত করতে দেওয়া হবে এই অজ্ঞহাতে দর্শনাধীর কাছ থেকে চার টাকা-পাঁচ টাকা করে নিয়ে সারাটা দিন তাদের বৃথা অপেক্ষা করিয়ে রাখা হয়। যদি কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করেন, তবে সাফ জবাব : সি আই ডি না এলে কি

করে দেখা করতে দেওয়া হবে? আত্মীয়-স্বজনের সংগে চিঠিপত্রে যোগাযোগ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে যদি কোন বন্দী তার বাড়ীতে চিঠি লেখে অথবা বাড়ী থেকে যদি কোন চিঠি আসে সবই জেলার ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষত বাংলায় হাতের লেখা হলে পড়ে দেখবারও প্রয়োজন মনে করেন না। কয়েদীদের চিঠি লেখবার জন্য আজকাল পোস্টকার্ড পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ। বিশেষত বাঙালী বন্দীদের ক্ষেত্রে সব রকম সুযোগই বন্ধ। কেননা ওদের চোখে বাঙালী মানেই “খতরনক আদমী” অর্থাৎ নকশাল। আর কলকাতাবাসী হলে তো কথাই নেই।

খবরের কাগজ পড়া বন্ধ, মাইক্রোস্কোপে বেতার সংবাদ শোনানো বন্ধ, এমনকি সময়ের ক্রান্তি দূর করার জন্য লাইব্রেরী থেকে বই পর্যন্ত পড়তে পারবে না। এইভাবে মানসিক অত্যাচারের মধ্যে পড়ে কয়েদীদের উন্মাদ হওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে?

শোনা গেল গত জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে আই জি এসেছিল লেন পাটনা থেকে পরিদর্শনের জন্য। তার কাজ ছিল বন্দীদের অভাব অভিযোগগুলি আন্তরিকতার সংগে শুনে তার প্রতিকারের সুব্যবস্থা করা। কিন্তু আশ্চর্য সংবাদ এই, জেল কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েক হাজার টাকা দিয়ে আই জিকে জেলের দরজা থেকেই বিদায় করে দিয়েছেন।

বসুমতী খোলার ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত কিন্তু

(দপণের সংবাদদাতা)

বসুমতী কোম্পানীর কয়েকজন সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মচারীর (এর মধ্যে বসুমতী প্রেস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় দুজন কর্মী আছেন) সংগে বসুমতীর মালিকপক্ষ ও ক্রোজারের পর তাঁদের সৃষ্ট দাবিদল সংগঠন কর্মী সংঘের গোপন বোর্ডপদ্ধতির ফলশ্রুতি হিসেবে গত উনিতিশে জুন অস্বাভাবিক তৎপরতার মধ্যে বিদায়ী অজয়-বিজয় সরকারের প্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগের উদ্যোগে বসুমতীর বে-আইনী ক্রোজার তুলে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এক দ্বিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছে। চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দীর্ঘ আট মাস ধরে অশোক সেন-ভূপাল বোসের জঘন্য প্রতিশোধমূলক চক্রান্তের বিরুদ্ধে বসুমতীর যে কর্মচারীরা লড়াই করেছেন, সাহসের সংগে সি আর পি ও গুন্ডাদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে অতন্ত প্রহরীর মতন বসুমতীর গেট আগলে থেকেছেন, আন্দোলনের শেষপর্যন্তই ইউনিয়ন নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার আজ তাঁরা ছত্রভঙ্গ। তাঁদের অনেকের মধ্যে এক কথা : তবে দিল্লীতে চুক্তি (এগ্রিমেন্ট) হলো না কেন? ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে গুজরাল সাহেব (তদানীন্তন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী) বিবেকানন্দ মদ্যাজী, ললিত ব্যানার্জী প্রমুখের সহযোগিতায় মালিক অশোক সেনকে দিয়ে বসুমতী খোলার ব্যাপারে যে চুক্তি করার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা তো অনেক সম্মানজনক ছিল। তখন বর্তমানের চুক্তির পাশ্চাত্য তথা স্বাক্ষরকারীরা কেন বাগড়া দিয়েছিলেন?

যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাতে আছে : (এক) কর্মচারীদের দেড় মাসের পাওনা বেতন থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ছাড় দিতে হবে। পরে কোম্পানীর যদি লাভ

হয়, তখন এই টাকা কিস্তিতে ফেরত দেওয়া হবে।

(দুই) পনেরোই নভেম্বর (উনিশশ সত্তর) পর্যন্ত যে সকল কর্মচারী কাজে ছিলেন, তাঁরা যোগ দেবেন; কিন্তু যারা অপর কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তাঁদের দশ দিনের মধ্যে অপশন নিতে হবে। বসুমতীতে সাংবাদিকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যারা সকালে করপোরেশন স্কুলে কাজ করেন, দুপুর থেকে রাত অবধি বসুমতীতে কাজ করেন। দীর্ঘ আঠারো থেকে কুড়ি বছর এভাবে কাজ চলছে, কারণ বসুমতীর বেতনহার খুবই কম। এই ব্যবস্থায় কর্মচারীদের সমর্থনে হাইকোর্টের রায় রয়েছে এবং কিছুদিন আগে বর্তমান মালিক অশোক সেন লিখিত চুক্তির মাধ্যমে তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

(তিন) পনেরোই নভেম্বরের আগে যারা সাসপেন্ড অথবা বরখাস্ত হয়েছিলেন, তাঁরা কাজ পাবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বসুমতীর সম্পাদক বিবেকানন্দ মদ্যাজীকে গত বছর বরখাস্ত করা হলে আন্দোলন করে বরখাস্তের নোটিশ প্রত্যাহার করানো হয়। কিন্তু এই আন্দোলন করার জন্য সাংবাদিক কর্পোরেশন সেনগুপ্ত

কর্তৃপক্ষের রোষ নজরে পড়ে ছাটাই হন। ক্রোজারের সময় থেকে কর্মচারীদের অন্যতম দাবি ছিল—ছাটাই কর্মীদের ফিরিয়ে নিতে হবে। মালিক অশোক সেন কলকাতার এক দৈনিক পত্রিকা “কালান্তর”—এ বিবৃতিতে স্বীকার করেছিলেন যে, কর্পোরেশন সেনগুপ্তের ছাটাই বে-আইনী হয়েছে। দিল্লীতে তথ্যমন্ত্রীর ঘরে আলোচনার সময়ও এই ছাটাই বে-আইনী স্বীকার করে নোটিশ প্রত্যাহার করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু ইউনিয়ন নেতাদের যোগসাজসে অশোক সেনকে রাজ্যের বিদায়ী প্রমমন্ত্রী সেই স্বীকৃতি থেকে রেহাই দিয়ে কর্মচারীদের জব্দ করে মীমাংসা করতে বাধ্য করেন। ছাটাই কর্মচারী-মদন প্রামাণিককে পুনর্নিয়োগের দাবি ছিল, তাঁকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং-সকল কর্মচারীদের নিয়ে বসুমতী খোলা হচ্ছে—এই প্রচার কর্মচারী ও জনসাধারণকে খোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টা মাত্র।

(চার) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র শিল্পের স্পেশ্যাল অফিসার এ বসুকে মাসিক দু হাজার টাকা বেতনে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা তদন্তের জন্য “ওয়ানম্যান কমিশন” (শেবাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

পূর্ব দিগন্ত

তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রচনা সংকলন
৭ই আগস্টের মধ্যে বেরুচ্ছে ॥ দাম ৩০ পয়সা
॥ বিশেষ আকর্ষণ ॥

মহাপ্রভু নিকসন পিকিঙে যাচ্ছেন কেন?
পুলিশী সন্ত্রাস ও বামপন্থী রাজনীতি
আলিপুর জেলে বন্দী হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ
অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

বাইটাসে বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে

(দর্পণের পূর্ববন্ধক)

পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মোট আঠাশটি রাজনৈতিক দল অবশেষে এই ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন যে তাঁরা সবাই এখনকার রাজনীতিকে সম্বলিত নিন্দা করতে প্রস্তুত। আঠাশটি দলের মধ্যে প্রায় পাঁচটি দলই খুনোখুনি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কয়েম করার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব সম্পর্কে একমত এবং পদলিখ ও প্রশাসনের একাংশ যে এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল দায়-ভাগী তার সম্পর্কেও অধিকাংশ দলই নিঃসন্দেহ। দর্পণ একথা বারবার পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছে যে পদলিখের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া এসমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি অবাধে সম্পন্ন হতে পারে না। ওয়াগল রেকার, ছিনতাইবাজ, স্মাগলার গুন্ডা বদমায়েসদের সঙ্গে পদলিখের আঁতাত যে পরিষ্কৃষ্ট সেক্ষেত্র কেন্দ্রীয় রেলবোর্ড থেকে শুরুর করে ছোটবড় রাজনৈতিক দল ও মতামত নির্বিশেষে মানব একমত। একথা ভাবা ঠিক নয় যে গোটা পদলিখ প্রশাসনটাই এই সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সাধারণভাবে পদলিখ ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মচারীদের একাংশ—এবং বেশ

বড় একাংশ যে এর সঙ্গে যুক্ত তা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। এই পদলিখ কর্মচারীদের সায়ের্তা করার বদলে যে দলগুলি এদের উৎসাহ দিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমতালোভ করা থেকে বঞ্চিত করার মহদৃষ্টান্তে পদলিখ ও প্রশাসনকে রাজনৈতিক কাজে লাগিয়েছেন, তাঁরাও যে সমান অপরাধী একথা যে কেন চাপা পড়ে

নামজাদা গুন্ডা ও খুনের থানা-গুলির প্রত্যয়ে পড়ে রাখা হয়েছিল এবং পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের ঐ বিশেষ দল ও দল-জোটের পক্ষে কাজে লাগানো হয়েছিল সে সম্পর্কে জনসাধারণের অজানা নেই।

সুতরাং একথা তাঁরা জানেন যে এই ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাস সহ নানারকম সমাজবিরোধী কার্যকলাপ

সমাজের দপন

যাবে তা জনসাধারণ বুঝতে পারবেন না।

পদলিখের পক্ষে থেকে বল্য হয়েছে যে উনিশশ উনসত্তর সালে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার নির্দেশে যত নকশালপন্থী বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া এবং উনিশশ একাত্তর সালে শ্রীঅজয় মুখার্জী কর্তৃক প্রায় ছশ পি ভি এ এ্যাক্টে যত চিহ্নিত খুনে গুন্ডাদের মুক্তি-দানের ফলে বর্তমান সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির আমলেও কেন্দ্রীয় সরকারের দলীয় স্বার্থে যে অসংখ্য

বন্ধ করার ব্যাপারে পদলিখ ও প্রশাসনের এক প্রভাবশালী অংশ আগ্রহী নয়। অজয় মুখার্জী বেছে বেছে যে সব পদলিখ-বিধানসভা ভবন আক্রমণ করেছিল তাদের পুনর্বহাল করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন গণ-তান্ত্রিক অধিকারের বিধানসভা মারা আক্রমণ করে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মৃদু চাই বলে হুকুমার ছেড়েছিল তারা তার প্রিয়জন, ষড়-যন্ত্রের সঙ্গী। আর যে সব পদলিখ কর্মচারী সাধারণ মানবের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নিজেদের সাংগঠনিক স্বার্থের প্রতি আগ্রহ-শীল ছিলেন, অজয় মুখার্জী তাদের বেছে বেছে বরখাস্ত করে দিয়েছেন। এই অজয় মুখার্জীকে যে দলগুলি ইতিহাসের আবর্তনাস্তর থেকে সাময়িকভাবে তুলে এনে মধ্যমস্তরী আসনে বসিয়েছিল, দায়ভাগের অধিকাংশই তাদের ঘাড়ে বর্তাবে।

ফলে খুনোখুনির রাজনীতির অভিযোগে কাঠগড়ায় আসামী হয়ে দাঁড়িয়েছে নব কংগ্রেস এবং নব-কংগ্রেসী সরকারের পদলিখ ও প্রশাসন কর্মচারীদের একাংশ। নব-কংগ্রেস যে মতলবে অর্থাৎ জনসাধারণের চোখে নিরাপরাধ সাজবার উদ্দেশ্যে যে বৈঠকের ভড়ৎ করেছিল, পশ্চিমবঙ্গের সচেতন রাজনৈতিক প্রভাবে তা ব্যর্থ হয়েছে।

এর ফলে নবকংগ্রেসী লেজুড় খবরের কাগজগুলি ষেউ ষেউ শুরুর করে দিয়েছে। এই সংবাদপত্রগুলি বুঝতে পেরেছে যে তাদের পরিবেশিত সংবাদ ও মন্তব্য আজ সারা পশ্চিমবঙ্গে উপহাস ও বিদ্বেষের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব-কংগ্রেসের পক্ষে এবং প্রধান বামপন্থী শক্তি সি পি এমের বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘদিন ধরে যে প্রচণ্ড-উচ্চ চাপের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল তা একদম ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। হেমন্ত বসু, পীযুষ ঘোষ, অজিত বিশ্বাস সহ বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীবৃন্দকে কেন প্রাণ দিতে হল, সর্বগ্রাণ্য বামপন্থী পার্টি সি পি এম-এর অসংখ্য নেতা ও কর্মী কাদের হাতে নিহত হলেন, সেই ঘটনা হত্যা ও সন্ত্রাসের ষড়যন্ত্রের নবকংগ্রেসী

নায়কদের জনসাধারণ চিনে ফেলছেন।

‘তাই সংবাদপত্রগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা বলতে চায় যে, এই বৈঠকের ফলে কী লাভ হল? শ্রদ্ধা জনসাধারণের চোখে আসল প্যাপীরা ধরা পড়ে গেল।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড তার পয়লা আগস্টের প্রথম সম্পাদকীয়তে বিষয় সূত্রে লিখেছে “এই বৈঠক বৃষ্টির খেলায় পরিণত হয়েছে এবং মিঃ রায় (সিদ্ধার্থ রায়) এই খেলায় বিজয়ী হতে পারেন নি বোকা গেল। রাষ্ট্রপতির শাসনের একমাস পেরিয়ে গেল, মিঃ রায়ের ভুলে যাওয়া উচিত নয় এই সম্ভাবনামূলক আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্যে অটল সময় তাঁর হাতে নেই। অর্থাৎ সি পি এম-কে বৈঠকে ডেকে ছুঁমি বাপদ বোকা বনেছো, তোমার কপালে অপরাধীর ছাপ একে দেওয়া হয়েছে, তাহলে এ আলোচনা আর চালিয়ে লাভ কি?

স্টেটসম্যান আরেকটু ব্যাপ্ত, একচেটিয়া মালিক গোষ্ঠীর ভাড়া-করা সানাই তো। তারা নানা সূত্রে বাজাতে জানে। স্টেটসম্যান লিখেছে (একই তারিখে প্রথম সম্পাদকীয়তে) “রাজনীতি এবং প্রশাসনের

এস্থ সমালোচনা

দুই বাংলা এক

“রবীন্দ্রনাথকে, নজরুলকে আমরা খুঁজ করে ভাবতে পারি না। দু’ বাংলা নয়, ‘এক’ বাংলাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিন্তালোকে প্রতিষ্ঠিত।” বলা বহির্ভূত, কি এপার কি ওপার, যে কোনো পারের বাংলায় মাত্রই এই একান্ত সত্যকে মনে প্রাণে লালন করে থাকেন। রাজনীতিকদের ক্ষমতালোভ পন্থা-গঙ্গাকে আলাদা সূত্রে যতই চিহ্নিত করুক, রাজনৈতিক ভূগোল দু’ বাংলার মধ্যে যতই সীমারেখা টানুক তবু প্রবাহিত দ্রব সূত্রে, হৃদয়ের জাগরণে মাতৃভূমির প্রেমে এপার ওপার একাকার; সাহিত্য সংস্কৃতি ভাবার একাবন্ধনে অভিন্ন। বাংগালীর স্বপ্নের বাংলা দেশ, বাংগালীর ধ্যানের বাংলা দেশ এবং ভাবার একাবন্ধনে গ্রথিত বাংলা দেশ এখনো তাই আছে এবং চিরকাল তাই থাকবে।

এপার থেকে রক্তে আমরা অনুভব করি পশ্চিমাপারের মর্মীরিত দ্রবসুখ, ওপার থেকেও বাংগালী শব্দে পান গঙ্গাবিধৌত প্রাণ-প্রেরণার প্রতিধ্বনি। এপারের কবি বলেন, জয় বাংলা; ওপারের মানসিকতায়ও বাংগালী সন্তান বাংলারই স্বার্থে প্রেরণায় প্রদীপ্ত হয়ে উচ্চারণ করেন : জয় বাংলা! ওপারে যখন বাংগালীরই আত্ম-প্রতিষ্ঠার অধিকারে যে মহদুর্ভেদ দীপ্ত আন্দোলন মাতৃভূমির মাতৃ-

মধ্যে পার্থক্য না টানার ফলে এবং এবারকার রাষ্ট্রপতির শাসন যে একটা অস্থায়ী ব্যাপার নয় তা পরিষ্কার বুদ্ধি দিয়ে না দেবার ফলে হতাশার সম্ভার হবে।” বঙ্গজাতির ধরণটা দেখুন। রাজনীতি এবং প্রশাসনের পার্থক্য ব্যাপারটা হল প্রশাসনকে দায়ী না করে শ্রদ্ধা পার্টিগুলোকেই (অর্থাৎ সি পি এম-কেই) দায়ী করতে হবে এবং পার্টিগুলোকে সমঝিয়ে দিতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন অস্থায়ী নয়, স্থায়ী ব্যাপার।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন স্থায়ীকরা, পদলিখ প্রশাসনকে খুনের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া এক কথায় নব কংগ্রেস ও পদলিখ প্রশাসনকে আড়াল করার অপচেষ্টায় হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড আনন্দবাজার গোষ্ঠী ও স্টেটসম্যান যে কোমর বেঁধে লেগেছে এই সম্পাদকীয় দুটি তার নমুনা মাত্র।

বদমায়েসদের বঙ্গজাতির রোগ সারাবার উপায় কি বা প্রয়োজনই বা কি? পশ্চিমবঙ্গের সদাজাগ্রত গণ-তান্ত্রিক চেতনাই এই সংবাদপত্র মালিকদের বদমাইশী চরমার করে দিতে পারে।

বসুমতীর ব্যাপার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শন” নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে স্থির হবে কত কর্মচারী রাখা হবে এবং বেতনের কি হার হবে। কর্মচারীদের অনেকেই মনে করছেন, তিন-মাস পরে আরো ছাটাই ও বেতন কমানোর চেষ্টা হবে। দীর্ঘ আট-মাস ক্রোজারের পরে দেড় মাসের বকেয়া বেতন দেওয়া হবে কয়েক কিস্তিতে। আগের পাওনা, ওভার-টাইমের মজুরী ইত্যাদি বকেয়া পাওনা সম্পর্কে কোন কথা হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অর্ধেকের বেশি কর্মচারীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়নি, যার ফলে মাসে মাসে টাকা কাটা হলেও প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে তাঁদের নামে হিসাব নেই। এ কারণে ক্রোজারের আটমাস অর্ধেকের মতো কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ভুলতে না পেরে দুর্গতি ভোগ করেছেন।

মীমাংসাপত্র স্বাক্ষর করেছেন আইএন টি ইউ সি এবং ইউ টি ইউ সি ভুক্ত দুটি ইউনিয়নের প্রতিনিধি, ভারতীয় বাতাজীবী সংঘের প্রতিনিধি এবং ক্রোজারের পরে গড়ে তোলা মালিকের পেটোয়া সংগঠন কর্মীসম্বন্ধ প্রতিনিধি।

উনিশশে জুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে

বসুমতীর মালিকপক্ষ, বিশেষ করে ভূপাল বোস স্বমুর্তি ধারণ করেছেন। বসুমতীর গেটের ভেতর থেকে সংগ্রামী কর্মচারীদের হাট্টিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে তথাকথিত একদল স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছে। এরা বসুমতীর কর্মচারীদের দেখলেই ভীতি প্রদর্শন করছে, বসুমতী খুললে ইউনিয়ন করা ঘটিয়ে দেওয়া হবে বলে শাসাচ্ছে।

কর্পোরেশন প্রাইমারী স্কুলের তিনজন মাস্টার (এর মধ্যে কে একজন আবার নিজেকে পি আর ও এবং “উড-বী ডিরেক্টর” বলে ভাবেন) গেটে অবস্থানকারী গুন্ডা-বাহিনীর তদারক করছেন। কর্মী ইউনিয়নের সর্বোচ্চ নেতা আই এন টি ইউ সির কালী মুখার্জীকে সব জানালে তিনি নাকি মর্চকি হেসে বলেন—কিছ, কিছ, তো ওরা করবেই। আর সি পি এম-এর লোকদের তাড়াতে হলে ও ছাড়া পথ নেই। ওদের নিয়ে বসুমতী খোলা যায় না। দৈনিক বসুমতী ও সাপ্তাহিক বসুমতীতে কর্মরত সি পি এম-এর লোকগুলোকে বিদায় দেওয়ার পর অশোকবাবুর সঙ্গে বসে অন্য সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারব।

ভাবার সম্মানকে বিশ্বদরবারে অনন্য আলোকে চিহ্নিত করতে চলেছে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে এপারের বাংগালী প্রেমী কবি দক্ষিণারঞ্জন বসুর সম্প্রতি প্রকাশিত “পদ্মা আমার গঙ্গা আমার” কাব্য সংকলন নানা কারণেই আন্তরিক ভাবনায় তাৎপর্যময়।

“পদ্মা আমার গঙ্গা আমার” সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকাশিত একক সংকলন যার প্রতিটি রচনাংশ বাংগালী, বাংলা ভাষা এবং অবিস্তৃত বাংলাভূমির স্মৃতিচারণেই উৎসর্গীকৃত। কবি তাঁর আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদার্থ, যেহেতু আজকের বাংলার সাংস্কৃতিক মানসিকতায় “পদ্মা আমার গঙ্গা আমার” সংকলনের কাব্য-ভূমিকা দুই বাংলার ভাবচৈতন্যকে আরো নিকটতর করার পক্ষে সহায়ক। সম্রিপতি হৃদয়ে কবি যখন বলেন, “আমাদের সকলের হৃদয়ের / ভালোবাসা দিয়ে গড়া বাংলা, / আমাদের সকলের স্বপ্নের / সুস্বপ্ন সূর্যোভিতা বাংলা; / জননী জন্মভূমি অগ্নি বাংলা, / জয় হিন্দ, জয় বাংলা!”—তখন এপার ওপারের বাংগালী হৃদয়ে উচ্চারিত হয় “জয় বাংলা!” কবির প্রার্থনা বুদ্ধি সফল হতে চলেছে; “আবার আমরা বন্ধু হবো দু’ বাংলায়, / ভাই-বোনরা যেমন ছিলাম দু’ বাংলায়।” (আবার বন্ধু) বাংগালী মায়েই মনের কথা যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে “পদ্মা আমার গঙ্গা আমার কাব্য গ্রন্থে।”

* পদ্মা আমার গঙ্গা আমার—দক্ষিণারঞ্জন বসু। মধুরেশ সিং-কেট, কলি-৩৭। তিন টাকা ৥

মল্লশঙ্কর দাশগুপ্ত

কেন্দ্র কি পশ্চিম বাংলাকে সত্যি উপনিবেশ মনে করে?

রমাপ্রসাদ মল্লিক

কেন্দ্রীয় সরকারের গোপন ক্যাবিনেট বৈঠকে এটা স্থির হয়ে গেছে যে, আর্মি এবং সি আর পি, বর্তমান সিকিউরিটি ফোর্স সহ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন প্রাদেশিক পদ্রিগ বাহিনী-গুলিকে এখানে পাকাপাকিভাবে মোতায়েন রাখতে হবে। কিন্তু এমনি কারেন্সী বন্দোবস্ত চলাতে থাকলে ব্যাপারটা কেবল দুটি কটকটাই হবে না, পশ্চিম বাংলার বাইরেও জনমত বিরূপ হয়ে উঠবে অবিশ্যি না হক অদূর ভবিষ্যতে তো বটেই, বিশেষতঃ যখন উত্তর প্রদেশের মত ইন্ডিকট কংগ্রেসের পকেট রাজ্যও প্রমিক (বিদ্রোহ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অসুস্থ সূতী ও চিনি মিল-গুলির) এবং সাধারণ বুদ্ধিজীবী জনতা আন্দোলনের পথে যাবার সম্ভাবনা আছে।

কেন্দ্রের দুর্ভাবনার আসল উৎস এখনও গোপন, কিন্তু তা ক্রমাগত ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। নরাদিগ্নিতে এসংবাদ আজ অব্যাহত নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরাগান্ধী কংগ্রেসে তথাকথিত নকশালীরা প্রচুর সংখ্যায় অন্তর্প্রবেশ করে গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রবক্তারা অবস্থার উল্লেখজনক দিকটাকে মোলারেম করে দেখাবার ছলে বলেছেন রাজনৈতিক বাতর্জি বিনিময়ের কথা এবার নকশালীদের সঙ্গে। ফলে রাজধানীতে শাসকমহলে অনেকেই পিলে চমকে গেছে। তাহলে বড়ি পশ্চিমবঙ্গ হাতছাড়া হয়ে যায়। এ-প্রসঙ্গে উদীয়মান শিল্প ধনপতি গোষ্ঠীর মতপন, টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় মন্তব্য কোতু-হলোদীপক এবং সরকারী মনো-ভাবের ইশারা দেয় "প্রেসিডেন্টের শাসন চাপানর পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে তার কার্য-কারিতা সম্পর্কে নিষ্করণ হতপ্রস্থা বা বিশ্বাসপারায়ণতা দুইই সহজিরা পশ্চিতি। (২৮-৭-৭১) তাহলে কিম্ কতব্যম!

এই মতপত্রের সম্পাদকীয়তে যেমন, তেমনি অন্য মতপত্রগুলিতেও সরকারকে যে সমস্ত মহামূল্যবান পরামর্শ বিতরণ করা হচ্ছে, তা একা-ধারে যেমন আর্মি এবং সি আর পি ইত্যাদি কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত দমন বস্ত্র-গুলির বদল ও দীর্ঘমেয়াদী প্রয়ো-গের পক্ষে ওকালতী, তেমনি অপর-দিকে নকশালী নামে অভিযুক্ত গুন্ডা-দেরকে রাজনৈতিক কর্মীর জাতি-তুলে তাদের সঙ্গেই "রাজনৈতিক" আলোচনার মতচন্দ্রিকা। ব্যাপারটা অনেকের হজম না হলেও রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকে সি পল্লের অনুরোধিত পথ বলেই তা শেষ পর্যন্ত মালুম হচ্ছে। কিন্তু যোরপ্যাচের পর, এবং সি

পি আই এম পি শ্রীহরেন মুখার্জী প্রমুখ হঠাৎ-দরদী (নকশালীদের প্রতি) রাজনীতিজ্ঞদের ইঞ্জিতময় প্রশ্নের জবাবে তিনি বা কবল করে-ছেন, তাতে বোকা যার কেন্দ্রের আদি ও অকৃত্রিম প্ল্যান এবার গণতন্ত্রের ওড়না ঢেকে প্রয়োগ হতে চলল। লক্ষ্য বাংলাকে স্থানীয় সমাজদ্রোহী-দের সঙ্গে যোগসাজসে কেন্দ্রের গুস্ত পদ্রিগ সি আর পি, আর্মি ইত্যাদি দমনব্যবস্থা দিয়ে চিট করা। তিনি নকশালীদের নামে চালিয়ে দেওয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের পোষ্যগুলিকে রাজনীতির ভয়বশে পুরিয়ে শাসকদলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত-বিনিময়ের (ডায়লগ) পথে শাসক-গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি করতে চান। কেননা তিনি মনে মনে জানেন, প্রেসিডেন্টের শাসনাধীন ব্যবস্থায় কোন রাজ্যই কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের বিশেষ মন্ত্রীকে গভর্ণরের মাথার ওপর চাপানো সাংবিধানিক অন্যান্য। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রগড় থেকে প্রকাশিত, "দি ট্রিবিউন" পত্রিকাও প্রধান সম্পা-দকীয়তে এমনি গৌজামিল প্রশা-সনিক ব্যবস্থাকে গোলমেল অস-পাতি রূপে বর্ণনা করেছে।

কিন্তু ইন্ডিকট-মার্কা আশ্র-প্রচারিত গণতন্ত্রী সমাজবাদীরা আজ সি পি আই দলকে নকশাল খোলাই-এর মহৎ কাজে ব্যবহার করতে উদ্যত। সাবধানতা এবং প্রশাসনিক নির-পেক্ষতা অবলম্বনের পরামর্শ তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হবে কেন? দানবীর ক্র্যাঙ্কেন-স্টাইনের প্রচণ্ড চারনি তার বিকট অপক্ৰমতার হাতিয়ারকে সংযত করতে। বিশাখাপত্তনম জেল থেকে সাজানো নকশালীদের চিঠি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, এই সংবাদ রটনার পরই "নকশালী"-কংগ্রেস (শা) মিলনদোতোর খানাই-পানাই শব্দ হল। অথচ, পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, সি পি আই (এম এল) দলের প্রকৃত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য কোন কথাই উঠতে দেওয়া হল না। পার্লামেন্টে মেকী দরদী এম পিরা—ভূপেশ গুস্ত থেকে হরেন মুখার্জী মহাশয় পর্যন্ত, যারা অকস্মাৎ নকশালীদের উদ্দেশ্যে বিনোবা ভাবেজীর চেরেও সহৃদয়তার দাবীদার হয়ে উঠছেন—তবু এ দলের জানাশোনা নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব মত্থেও আনেন নি।

প্রস্তাব করা চলত, কেননা কয়েক-জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা তো সর-কারেরই জেলে এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তার সুত্রপাত অন্ততঃ করা চলতো। তাতে নিশ্চয়ই আকাশ ভেঙে পড়তো না। কিন্তু এমন পন্থা সরকারের কণ্ডমনিপরাসী শাসক-

মহলের পছন্দ হবে না। তাঁরা প্রশা-সনের বৃহৎ আমলাবর্গকে নিছক "আইন ও শৃঙ্খলা" চাপানর পন্থাতিই চালিয়ে যেতে এ ধাবৎ আদেশ দিয়ে এসেছেন। চিন্তার স্বাতন্ত্র্য যদিও স্রাজ্ঞ ও অক্ষুন্ন, তেমনি কংগ্রেসী এম পিরা কিন্তু আজ এই ধরনের আধি-কারিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন শাসন পন্থা-তিতে বিক্ষুব্ধ। উদাহরণতঃ, শ্রীচন্দ্র-শেখর ("ইয়ং ইন্ডিয়ান" পত্রিকার সম্পাদক এবং এম পি)। তিনি হালে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, পশ্চিম বাংলার সমস্যাকে কেবল আইন এবং শৃঙ্খলার নজর দিয়ে দেখলে প্রশা-সনিক জবরদস্তিই করা হবে সমাধান মিলবে না।

রাজ্য পদ্রিগ বিষ-নজরে?

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ধীরে ধীরে এমন পর্বায়ে নিয়ে চলেছে, যখন উপনিবেশিক প্রশাসন থেকে বর্তমান রাজ্য পরিচালনা ব্যবস্থা আর বিশেষ তফাতে থাকবে না। মূলে কাজ করছে রাজ্যের প্রশা-সনিক কাডার, কর্মচারী বিশেষতঃ পদ্রিগের ওপর নিদারুণ সংশয়। "নকশালপন্থী এবং অন্যান্যরা অতি সহজে অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পেরেছে, তার কারণ অস্ত্র লাইসেন্সের অধিকারীদের নাম ও ঠিকানা তারা নিশ্চয়ই পেয়ে যায়। স্পষ্টতঃ, বাহিনীর কোন কোন সদস্য, যাদের পাকড়াবার কথা তাদের সঙ্গেই যোগ রেখে চলছে বলে মনে করা চলে।" এই মন্তব্য কেবল সংবাদপত্রের নয়, শাসকমহলেরও। সৈন্যবাহিনীকে বীর-ভূম এবং অপর জেলার প্রয়োগ করে নাহক খরচের চড়াপ্ত হয়েছে যেমন, বড়সড়দের ধরতে না পারায় বহু-রম্ভে লঘুকিরাজনিত খেদও হয়েছে তেমনি তিত্ত।

কিন্তু ফলজাতে বণ্ডিত হওয়ার গর্জন এবং বর্ষ-দরূপ তিত্ততাই কেন্দ্রের উদ্দেশ্যের প্রধান কারণ নয়। রাজ্য পদ্রিগের মনোবল ভেঙে গেছে বলে যে এই শাসকমহলের প্রেরিত গগনভেদী প্রচারে নিনাদিত, তা এক মারাত্মক সদৃশপ্রসারী কেন্দ্রীয় মতলবের প্রথম ধাপ। শাসক মহল জানে যে, বতই ছাটাই বাছাই, বদলাবদলি এবং ওপর-তলার কেন্দ্রের বশব্দ অফিসার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পদ্রিগ বিভাগকে বাগে রাখবার চেষ্টা করা হক না, বত বেশী রাজ্যের নির্দেশ আপামর জনসাধারণ কেন্দ্রের পরিকল্পিত ছাঁকনি ঘেরাও তল্লাসী প্রেস্তারী এবং গুলি-গোল-ন্দাজীর শিকার হবে, ততই রাজ্য-পদ্রিগের সকল কর্মচারী স্তরে অ-প্রকাশ বিক্ষোভ দানা বাঁধবে। আজ শাসকদলের লবীয়তে পশ্চিমবঙ্গ পদ্রিগ সম্পর্কে প্রায় তেমনি তাচ্ছিল্য এবং অবিশ্বাসের মনোভাব, যেমন ইরানিয়া খাঁর সামরিক শাসকগোষ্ঠীর মনোভঙ্গী ভূতপূর্ব ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজি-মেন্টের সদস্যদের প্রতি। ভবিষ্যতে, বাতে কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ পদ্রিগকে নাম-ক-ওয়াসেত বজায় রেখে—অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলাগত তুচ্ছ দৈনন্দিন খণ্ডিনাটির কাজে আবশ্য রেখে—দণ্ডময়নের আসল কাজ কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত পদ্রিগ, নিরাপত্তা, অর্থ-সামরিক এবং সামরিক বাহিনী দিয়েই চালাতে পারে, তার মতবন্ধ-পাকা-পোস্ত ভাবেই তৈরী হচ্ছে। সরকারী উচ্চমহলের ধারণা এখনও রয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রশাসনীয় কাডার এবং পদ্রিগ কর্তাদের বিশ্বস্ততার চাবীকাঠি তাদের মতোয়। সুতরাং নিচের স্তরে পদ্রিগ ও রাজ্য কর্ম-চারীরা যদি, রাজ্যের জনগণের ব্যাপক ক্রেশ, দারিদ্র্য ও নিপীড়নজনিত সম-বেদনার কিছু সংখ্যায় কেন্দ্র-বিরোধী হয়ে ওঠেও, তাতে অসে বাবে না।

কিন্তু শাসক শ্রেণীর বড় চিহ্না-ঠিক ততটা নিশ্চিত নয়। তাই কি তাদের মতপত্রে আশঙ্কার স্পষ্ট সূর ধনিত—"বর্তমান আর্মি-ক্রিয়াকলা-পের উদ্দেশ্য এমন এক শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে পরিণত হচ্ছে, যে-শত্রুকে ধরা ছোঁয়া যায় না।"

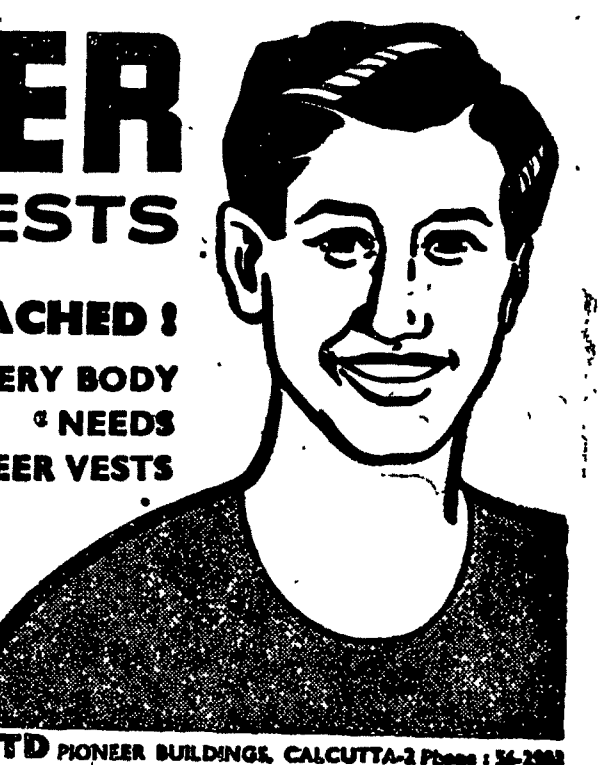
গৃহ-মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে সি পি মহোদয় সম্প্রতি সি পি এম দলকে রাজনৈতিক ধরনের ঘোমটা ঢাকা হুমকি দিলেন আসন্ন রাজ্য-কাপী হরতালের পারিপ্ৰেক্ষিতে। কিন্তু সে ধমক জুড়োতে না জুড়ো-তেই, প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া দিলেন দর্শন সি পি এম দলের অন্যতম নেতা জ্যোতি, বসকে। কোতুকের বিষয়, পার্লামেন্টে এর ফলে সি পি আই দলের দশািসই এম পিদের ক্ষম্ব অভিমানের সে কি প্রযাতি। ইন্দিরাজী দ্বীদিক সামলাবার ভঙ্গীতে বজ্রেন, সি পি এম দল যে-যে দাবী করে আসছিল, তিনি নাকি সেই সকল দাবীই মেনে নিয়েছেন; অর্থাৎ হিংসা ও খনের গভলিকা বন্ধ করবার উচিত ব্যক্ধা—এখন তারা সহযো-গিতা করছে না কেন? ইশারা—দেখ, সি পি আই কেমন সুবোধ ছেলে। বস্ত্তঃ সি পি আই মার্কা কেনালা সরকার একমত্থে প্রস্তাব সমর্থন করে "আজ্ঞান্তরীণ নিরাপত্তা-রক্ষা আইন"র প্রত্যাহার সুপারিশ করে, অপরমত্থে বলে : "কোন রাজ্য সরকারই কেন্দ্রীয় সরকারের অবাধ্য হতে পারে না।" মোম্বা কথা, আইনের লগড় চলাতে কেরালায় সি পি আই যখন প্রস্তাবের আফ্ফেট সত্থেও স্বিধা করে না, তখন সি পি আই এম-ই বা পোষা মানবে না কেন।

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া এবং কেন্দ্রের রথী মহারথীদের হিসেবে ভুল শব্দ এই যে, সারা পশ্চিমবঙ্গের জনতাই আজ তাদের উপনিবেশিক চালাকী ধরে ফেলেছে—কোন দলই কেবল নয়। কতদিন যে তাঁরা, মালিকবর্গের যেমন প্রমিক বিরোধী "লেবর" অফি-সার দিয়ে প্রমিক-সংহতি ভাঙ্গবার কায়দা, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর (যাঁর মহতী, বৈশ্বলিক শিক্ষা পরিকল্পনার জারিজুরি আজ রাজধানীতে চিচিং-ফাঁক) কটকৌশল মাথায়, পশ্চিম-বঙ্গের বামপন্থী কমীজগতে বিভেদ ও অনৈক্যের স্বপ্ন দেখবেন, তা নিষ্ঠর করছে এখন, টাকার কুমীরদের দম্ব ও জেদের ওপর।

PIONEER

VESTS

**ARE
HYGIENICALLY BLEACHED !
EVERY BODY
& NEEDS
PIONEER VESTS**





Also Tee shirts,
Tennis shirts,
Chain Shirts,
Drawers &
Briefs

PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDING, CALCUTTA-2 Phone : 54-2983

আওয়ামী লীগ সম্পর্কে কয়েকটি কথা

আওয়ামী লীগ কি পাকিস্তানী ফৌজের বিরুদ্ধে জনতাকে একাত্ম করতে পেরেছে? এক-কথায় জবাব, না, বরং বিস্মস্ত ও খণ্ড খণ্ড করেছে। আওয়ামী লীগ কি কি শরতানী করেছে তার একটা ফিরিস্তি দেওয়া গেল :-

(এক) আগাগোড়া গান্ধী-পন্থার ভাঙ দোঁথয়ে শান্তিজন ছিটিয়ে শেষ সময়ে আচমকা সশস্ত্র লড়াইয়ের ডাক দিয়ে অসংগঠিত নিরস্ত্র জনতাকে হঠকারিতার সঙ্গে সশস্ত্র ফৌজের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে শোচনীয় মতুর মুখে।

(দুই) তথ্যে দখল কয়েম করে রাখবার জন্য মুক্তি সংগ্রামের স্বার্থে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন না করে সাততাত্ত্বি কেবল মাত্র নিজ দলের লোকজন নিয়ে বাংলাদেশ সরকার গঠন করলেন।

(তিন) মুক্তি বাহিনীতে রিক্রুটিংয়ের ক্ষেত্রে নোংরা দলীয় রাজনীতির প্রকাশ দেখা যায়। আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাড়া রিক্রুটমেন্ট হওয়া শক্ত।

(চার) নিলক্ষের মত ও বেই-মানের মত সংগ্রামরত অন্যান্য পার্টির অবদান অস্বীকার।

(পাঁচ) মস্তিভা গঠন, শপথ গ্রহণ ও বেতার প্রচারে সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বিশেষ সুস্পষ্ট। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের প্রসঙ্গ এসব ব্যাপারে ছিল না বা নেই।

বেলেঘাটার তথাকথিত বিপ্লবীদের কথা

গত দুর্গাপুজার আগে পর্যন্ত আমি বেলেঘাটার থাকতাম। কিন্তু দুর্গাপুজার সময় থেকে তথাকথিত কৃষি বিপ্লবীদের বিপ্লবের ঠেকার আমাকে গত এক বৎসর যাবৎ আমার বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আশ্রয়দেয় বাড়ীতে দিন কাটাইতে হইতেছে। কারণ আমি একজন সামান্য সি পি এম সমর্থক ছিলাম। সি পি এমকে প্রণীশয় আখ্যা দিয়া গত পুজার সময় এই বিপ্লবীরা (এখন অহিংসার পুজারী) কৃষি-বিপ্লবের আশ্ববে সি পি এমকে অণ্ডল (চৌরিশ নং ওয়ার্ড) ছাড়িতে বাধ্য করে। আমি যেহেতু এই দলের সমর্থক, সুতরাং “ভূমিও প্রণী-শয়”। অবশ্য সি পি এম বাড়ে অন্য সব দলের কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল। জনগণ কিন্তু তাহাদের শত্রু-মিত্র চিনতে ভুল করেন নাই। অন্ত-বর্তী নির্বাচনে সরাসরি প্রতি-স্ব-স্বিত্যর কেষ্ট ঘোষের জয়লাভ তাহারই প্রমাণ।

কিন্তু আজ সেই তথাকথিত বিপ্লবীরা কি ভূমিকায় অবতীর্ণ সেটাই লক্ষণীয়। স্থানীয় জনসাধ-রণের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, জানতে পারবেন সেদিনের সেই কৃষিবিপ্লবের কমেডরুই আজ যুব কংগ্রেসের সদস্য।

এ অভিযোগ আমার নয়, এ অভিযোগ জনৈক নকশালপন্থী

(হয়) নন্দভাবে আওয়ামী লীগ নেতারা এমন সব দেশের সাহায্য নিচ্ছেন ও চাচ্ছেন যারা নিজ নিজ দেশে গরীব জনতার স্বাধীনতা হরণ করেছে ও তাদের ওপর স্বদেশী মিলিটারী দিয়ে ইন্-সিয়্যার মতই অত্যাচার চালাচ্ছে।

এসবই অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ আওয়ামী লীগ আসলে কয়েমী স্বার্থের লীগ—জনদরদের সুদূর কোটিং দেওয়া। দুটি প্রদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও

সমাজসাম্প্রদায়িক বৈষম্য পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মনে। যে বিষয় ও ক্রোধ সঞ্চিত করেছিল তাকে আওয়ামী লীগ সুকৌ-শলে নিজেদের গদী দখলের স্বার্থে চ্যালেঞ্জ করছে পেরেছিল মাত্র। নির্বাচনী কর্মসূচী বা বহুপ্রচারিত ‘ছয় দফা কর্মসূচী’ নামে পরিচিত তা আসলে একটি বিরাট ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানে কিছু বাগবিড়ান ছড়ান যা দিয়ে শোষণিত পাকিস্তানের বা পূর্ববঙ্গের গরীব জন-তাকে শোষণমস্ত করার কোন সুনির্দিষ্ট পথ বা পন্থা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই ছয় দফাতে

যুবকের মনের। এই নকশালপন্থী যুবক আজ বাড়ী ছাড়া—জুলাই-মাসের প্রথম দিকে দলের প্রাক্তন কমেডর (যাহারা আজ যুব কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া নিজেদের অমূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছে) সি আর পি লইয়া স্বপন চক্রবর্তী নামক (নকশালপন্থী) যুবকের বাড়ী যায়, কিন্তু তাহাকে না পাইয়া তাহাদের বাড়ীর চালে পর্যন্ত উঠিয়া খোঁজ করিয়া গেছে। বিছানাপত্র ওলোট পালোট করিয়া রাখিয়া গেছে। কারণ মাধববাবু গার্ডেন লেনের এই যুবক এখনও কংগ্রেসে যোগদান করে নাই এবং সেই ভয়েই সে বাড়ীছাড়া, কারণ তাহাকে বাঁচাইবে কে? এই সব যুবকেরা, যাহারা এক সঙ্গে থাকিয়া খুন খারাপিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারাই আজ স্বপনের মাকে খুনের মা বলিয়া অপমান করিয়া আসিয়াছে। যোগ্যর সময় তাহারাই বলিয়া গিয়াছে যে, স্বপনকে তাহারাই ছাড়বে না। অবশ্য সে যদি খুনখারাবি করিয়াও অহিংসায় বিশ্বাসী বলিয়া যুব কংগ্রেসের সভ্য হইতে চায় তবে তাহাদের আর কোন রাগ থাকবে না। তবে নামের আগে কমেড শব্দটি আপাতত আর ব্যবহার করা চলিবে না।

জনৈক পাঠক

পূর্ববঙ্গের জন্য বড় জোর একটি ফেডারো ইউনিটারী গোছের শাসন ব্যবস্থার দাবী ছিল।

তারপর সহসা রাতারাতি স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রাম জঘন্য প্রাদেশিক ও ভাষাভিত্তিক দাঙ্গার চোরা নিল। দরিদ্র শ্রমজীবী উদ্ভাবী জনতা উন্মত্ত অশ-জাতীয়তাবাদের বলি হল মিলি-টারী অত্যাচার শূরু হবার আগে, এ তথ্য সবারই জানা।

আওয়ামী লীগ লড়াই করেছে

কার বিরুদ্ধে? ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগ কোর পক্ষে লড়াই? বাঙ্গা-লীর পক্ষে যার মধ্যে সেই সব বড় বড় ধনীরা রয়েছেন যারা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী নৌকা অর্থে ভরেছিলেন। তাই বাঙ্গালী শোষকদের বিরুদ্ধে তার কোন বক্তব্য নেই। আওয়ামী লীগকে সাহায্য করেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে কারা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্ত-রাজ্য, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় ভারতের মধ্যমে পরোক্ষভাবে। তাই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের কোন বক্তব্য নেই, বরং কিছু অভিমান ভরা অনুরাগ আছে। বিপ্লবী লড়াই-করা আও-য়ামী লীগের উদ্দেশ্য ছিলও না এবং এখনো নেই। আসল কথা, যেন তেন প্রকারে গদী দখল করে রাজা হওয়া। তাই স্বকণ্ঠে ও বন্ধকণ্ঠে ওঠানো হচ্ছে আপোসের সুর।

তাই বাংলা দেশের সংগ্রামী জনতা সাবধান। মিষ্টি বলির ভাঁওতার আড়ালে চিনতে ভুল কর-বেন না যাদাদলের সেনাপতিদের শৃঙ্খলের চেয়ে হাততালি, হাত-তালির চেয়ে রোজগার যাদের বেশী কাম্য। মনে রাখতে হবে যে সব দেশের সরকার ষড়যন্ত্রনামের অস্থায়ী সরকার, পূর্ব জার্মানীর সরকার বা কোন দেশের কোন সত্যকার মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন বা স্বীকার করে না বরং ধবস করার পক্ষে তারা আজ কোন যাদুমন্ত্র বলে বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থক হয়ে গেল?

আওয়ামী লীগের অদূরদর্শী স্বার্থাশ্ব নেতাদের ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। নির্বাচনে বাস্তববাহী ভোট পেলেই গণ-ভিত্তিক প্রমাণ হয় না। তাই যদি হয়, তবে কামারুজ্জামান সাহেবের কথা মতই বিশ্বাস করলে মাত্র তিনটি সীটের অধিকারী বঙ্গো-দের ভোটদাতা জনসংখ্যার শতকরা একভাগ বেইমানদের ক্ষমতার সীমা

নেই। সেই শতকরা একভাগ বেই-মান সহসা কেমন করে এত প্রবল হল যে, ই সি আর, আন্সার, মুজাহিদ বাহিনী সুর শতকরা নিরস্ত্রবাইকে বিশবাণ্ড জলের নীচে ঠেলে দিল? তাই বলা যায় বজ্রোন্মাদ গণতন্ত্রের ব্যালটবক্স ওজন করে বিপ্লব বা জনমানসের মাপ কয়েন যারা তারা হয় বঙ্গোত্তি করেছে, নয় মুখের স্বর্গরাজ্যে বাস করেছে। আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে যদি স্বিতীয়টা সত্য হয়, তবে বল এখনো সময় আছে।

পৃথিবীর কোন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস একক লড়াইয়ের ইতিহাস নয়। সর্বত্রই দেখা যায় সংগ্রামী জনতার মুক্তি ফ্রন্ট সম্মি-লিত ভাবে লড়াই করে জিতেছে। আওয়ামী লীগ যদি ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ না করে তবে জন-গণই পরিণামে তাকে ছেঁড়া সড়ক-লার মত পরিত্যাগ করবে। কারণ পরিশেষে বিপ্লবী জনতার জয় অনিবার্য। এবং সেই বিজয়ী বিপ্লবী জনতার গণআদালতে মুস-লীম লীগ, জামাতে ইসলামের মত বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতা সাহেবদেরও বিচার হবে। অতএব সাবধান।

বৈরম খাঁ লস্কর

বড়িশার প্যারিস পাড়া

বেহালা থানার অন্তর্গত বড়িশা গ্রামের জগৎ রায়চৌধুরী রোডের শেষ প্রান্তে অবস্থিত “প্যারিস পাড়া”। এই পাড়ার এই নাম যে কেন হলো বা কে করলো তা ঠিক জানা নেই। তবে এই পাড়ায় গেলে যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে সদা-নির্মিত বেশ কয়েকটি প্রাসাদতুল্য বাড়ী আর বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী বারান্দা। এই পাড়ার বাসিন্দারা যে বেশ আর্থিক সম্ভ্রতিপূর্ণ সেটা এই অঞ্চলে গেলেই বেশ বোঝা যায়। আমরা দেখতে পাই ওপর মহলের বড় বড় চাকুরিয়া ও ব্যবসা-দারগণ স্বাভাবিক কারণেই কংগ্রেসের ভক্ত। বর্তমান সমাজ কাঠামোতে অর্থবানের তাদের অর্থবল প্রয়োগের দ্বারা সবকিছুকেই কৃষ্ণগত করে রাখতে চেষ্টা করে—এমনকি হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবসমাজকেও। এই পাড়াটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এই পাড়ায় বেশ কিছু দিন যাবৎ একদল যুবক প্যারিসী কায়দায় প্যাডার মস্তান সেজে প্যাডা গুল-জার করে রেখেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ পাড়ার লোকেরা এদের বিভিন্ন খাতে চাঁদার নামে মাসিক অর্থদিয়ে বিভিন্ন সময়ে এদের দিয়ে নিজে-দের স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে নিয়েছে। তারপর যখন থেকে বিভিন্ন জার-গায় নকশালী কায়দায় সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার যুবকদের একটি অংশের অর্থ সংগ্রহের রাস্তা খুলে গেল তখন এই পাড়ার মস্তা-

নোরাও হিসেবী সুযোগ হয়তছাড়া-করতে রাজী—হলো না। সি পি এম-এর গুডামী ঠেকাবার নামে তারা গোপনে গোপনে প্রথমে পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে নকশালী প্রচারপত্র ছাড়িয়ে দিল। তারপর মাঝে মাঝে রায়ের অশ্বকারে দুই একটি পটকার আওয়াজ দিল। পাড়ার বিত্তশালী বাসিন্দারা একটু ভীত হয়ে পড়লো আর সেই ভীতির সুযোগ নিয়ে ঐ মস্তানের দল পাড়ার - প্রায় প্রত্যেক বাড়ী থেকেই মাসিক লেভী বাবদ বেশ মোটা টাকার বরাদ্দ করে ফেললো। মাঝে মাঝে হুমকী দিয়ে টাকার অঙ্ক বাড়াতোও লাগলো।

সম্প্রতি কয়েকদিন আগে ঐ পাড়ার কোন এক উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রমহিলার কাছে ঐ দলটি গিয়ে তাঁর দেয় লেভীর টাকার অঙ্কের পরিমাণ বাড়াতে বলে। ভদ্রমহিলা বলেন, “তোমরা পাঁচ টাকা থেকে থেকে পঞ্চাশ টাকায় উঠছে, ব্যাপা-রটা কি?” তারপর যা হয়—কথা কাটাকাটি অশালীন ব্যবহার, গালি-গালাজ ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত ভদ্র-মহিলা অত টাকা দিতে অস্বীকার করেন এবং মস্তান দলের ঘৃণ্য, অশালীন আচরণের প্রতিবাদ করে তাড়িয়ে দেন। মস্তানরাও “আচ্ছা দেখে নেবো” বলে চলে যায়। ভদ্রমহিলা ফোন করে তাঁর স্বামীকে (তিনি সেই সময় অফিসে ছিলেন) সমস্ত ঘটনা জানান। ঐদিনই রাতে ঐ মস্তানদলটি বোম্ব ফাটিয়ে বাড়ীর জানালা ও দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে ছুরি, ছোরা প্রভৃতি নিয়ে উক্ত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোককে আক্রমণ করে ও আহত করে চলে যায়। পরে যথারীতি পুলিশ আসে, কিন্তু পাড়ায় কোন তরাসী হয় না বা মস্তানদের ধরার কোন ব্যবস্থা করা হয় না। পাড়ার লোকেরাও সমস্ত জানা সত্ত্বেও ঐ দলটিকে শাস্তেস্তা করার কোন ব্যবস্থা করেছে না। তবে ঐ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাকে নির্বিশেষে ঐ পম্পা ছেড়ে চলে যেতে পুলিশ সাহায্য করেছে বলে জানা গেছে।

জনৈক পাঠক

দর্পণ

বংবাদ সাপ্তাহিক

১১ চাঁদর হার :

বার্ষিক পনেরো টাকা

সাপ্তাহিক সাড়ে সাত টাকা

ত্রৈমাসিক চার টাকা

ঐক্যকণ্ঠ ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৬১, নট সেন, কলি-১৩

প্রবোধ মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজ

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

আজকের পশ্চিমবঙ্গের কোন তরুণের পক্ষে তার হতাশাজনক সামাজিক অবিচারকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সত্যিই রায়েক সর্বশেষ ছবি “প্রতিদ্বন্দ্বী” বাংলার যুব সমাজের এই অবস্থাকে বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিফলিত করেছে বলে শোনা গেছে। ছবির নায়ক সিদ্ধার্থ চাকরির খোঁজ করছে; তার বোন এবং বন্ধুরা নীতিহীন এবং অশ্লীল জীবনযাপন করে। তার বিপ্লববাদী ছোট ভাই তার চাকরির ধান্দায় ঘোরাকে ঠাট্টা করে এবং বিপ্লবের আগুন জ্বালাবার জন্য গ্রামে যেতে প্রস্তুত। বিপ্লবের স্বপ্ন সিদ্ধার্থও দেখে কিন্তু দিব্য-স্বপ্ন ভেঙে মধ্যবিত্ত জীবনের একঘেয়ে বাস্তবতায় যখন সে জেগে ওঠে তখন তার বিপ্লবেচ্ছা নিভে যায়। সংগত কারণেই সে তার বোনের “বসের” উপরে প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তার একমাত্র ভরসা থাকে ভালবাসার উপরে। যেইমাত্র সে কলকাতার বাইরে একটা চাকরি পেলে তখনই কেমন এল তার জীবনে ঠিক সেই হারিয়ে যাওয়া পাখিটার মত যা ছোট বেলায় তার বোন টুকু তাকে দেখিয়েছিল। সেই অবাধ এই পাখিটার প্রিয় স্মৃতিকথা সে জালন করে এসেছে।

গল্পটার আমার পরের মূখে শোনা এবং অসম্পূর্ণ বর্ণনা যা পাওয়া যায় তাও কলকাতার বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী হিংসা সম্পর্কে সাংবাদিক বিবরণের চেয়ে বেশী। কারণ সাংবাদিকের বিবরণে এই মানবিক অবস্থার সত্যিকারের উপস্থাপনা পাওয়া যায় না। এই সব সাংবাদিক অনবরত পড়লে এই ধারণা জন্মায় যে, কলকাতার ছেলেরা দানবে পরিণত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা ভাল যে, সম্প্রতি ভারতের সাংবাদিক প্রতিবেদনের মান নিম্নাভিমুখী। পশ্চিমী সাংবাদিকতায়ও এই অভিশাপ দীর্ঘ কালের ঘটনা। যোগ্য পর্ববন্ধকেরা দৃষ্টের সঙ্গে এই নিম্নাভিমুখী মানের কথা স্বীকার করেছেন। এদের অন্যতম জি এইচ ব্যানটক লিখেছেন :

“নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শূন্যতার যে-পরিচয় নথীকরণের মত ব্যক্তিগত বা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পাওয়া যায় তার প্রতিফলন নানা ভাবে ঘটতে দেখা যায়। সংবাদসংগ্রহকালে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যে ধরনের মানবিক সম্পর্কে সাংবাদিকেরা আসেন তার তুলনায় সংগ্রহ রচনা এবং পরিবেশনার মধ্যে সাংবাদিককে গুরুত্ব দেওয়ার ধরনে যে-প্রামাণ্যতা, তুচ্ছতা বা চমকসর্বস্বতা অন্তর্নিহিত থাকে—তাকে অনেক লম্বা মনে হয়।”

দেশীয় সাংবাদিকের চেয়ে

ইংগ-ভারতীয় সাংবাদিকেরই এ জিনিষটা বেশী লক্ষ্য করা যায়। অধুনা ব্যবসায় পরিণত হয়ে ভারতীয় সাংবাদিকতার চরিত্রান্তর ঘটেছে। আজকের দিনে ইচ্ছা করলেও কোন সাংবাদিক মানবীয় সম্পর্কের ব্যাপারে পুরো সত্য লিখবার হিম্মৎ রাখেনা। ফলে ভারতের এবং পশ্চিমবঙ্গের যুব-সমাজের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হচ্ছে। সাংবাদিকদের জনপ্রিয় লেখার মধ্যে আজকের যুবসমাজের নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের কোন পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

ছবির নায়ককে বিবস্ত্র ভাবে প্রতিবিম্বিত করার চেষ্টা করলেও সিদ্ধার্থ একটা ছাঁচে ঢালা চরিত্র যদিও এই প্রথম এদেশের যুব-চরিত্র সহানুভূতি এবং অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে পর্দায়িত হয়েছে। নাট্যকেপনা এবং তুচ্ছ ধ্যানজ্ঞান হল টিকিট-ঘর। সমাজের কাস্তব অবস্থাকে সে যেমন সংবেদন করে না তেমনি পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎকে অনুধাবন করতে সে দর্শকদের কোন সাহায্যও করে না। পলায়নপর দিব্য-স্বপ্নের অগ্নিতে ইন্দ্রন অচেতন ভাবে তা জনসাধারণকে এমন আদিমের নেশা ধরিয়ে দেয় যাতে তাদের চৈতন্য হয় অসাড় আর বৃষ্টি হয় পঙ্ক।

জন ডিউই-র মত দার্শনিকেরা আশা করেছিলেন যে, ব্যবসায়ী সাংবাদিক এবং স্রষ্টা জনসংযোগ ব্যবস্থার ফলে একটা চিন্তাগত বিপ্লব সাধিত হবে। কিন্তু ভারতে এই সব ব্যবস্থা যে জনসংস্কৃতির রূপ নিয়েছে তা সেই আশা পূরণ করেনি। আমার মনে হয় কুশিল্প সম্বন্ধে আই-এ রিচার্ডস যা বলেছেন তা ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

“আজকাল কুসাহিত্য, কুশিল্প, চলচ্চিত্র প্রভৃতির প্রভাব এমন প্রচণ্ড যে তার ফলে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে লোকের মনোভাব এত অপরিপক্ব হয়ে ওঠে যে, কোন ব্যাপারেই তাকে প্রশ্ন করা চলে না। কি কি হলে একটা মেয়েকে সুন্দরী বা একটা ছেলেকে সুঠাম বলা যায়, সেই বিতর্কের—যা নেহাৎই ব্যক্তিগত—মীমাংসা করতে হয়—জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের কভারের ছবি নতুবা চলচ্চিত্র তারকার নিজের দেখিয়ে।”

চলচ্চিত্রের ছায়া-জীবনের গল্প-গাথা মানুষকে এমন প্রলুপ্ত করে তুলেছে যে, সমাজের অনেকেই এই অলীক জীবনের দ্বারা আকৃষ্ট। এই রকম জীবন সমাজ-বাস্তবকে জেনে তার সাহায্যে স্বাধীন সৃষ্টিকর্মে প্রবৃত্ত হতে মানুষকে কদাচ সাহায্য করে থাকে। ফলে হল চলচ্চিত্র প্রভৃতি জন-প্রচার মাধ্যমের ছাঁচে ঢালা অনুকরণ।

যে নৈতিক অস্থিরতা আজকের জীবনের বৈশিষ্ট্য তাতে মোচড় দিয়ে নিজেদের মনোফা

বাড়ায় ব্যবসায়ী সমাজ। গণ-প্রচারের এই অতিকার মাধ্যম-গুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসায়ীরা নিজেদের মনোফা বাড়াবার জন্য এমন ভাবে এইগুলিকে পরিচালিত করে যাতে এই জন-সংস্কৃতি থেকে পাঠক, দর্শক শ্রোতার জীবন সম্পর্কে কোন গভীরতর ভাব লাভ করতে পারে না। লেখক এবং শিল্পীদের সামনে এই অবস্থা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে, মহৎ শিল্পীরা বরাবর অনুভব করে এসেছেন যে, জীবন-ধারার উৎসর সংগে যে যোগ ছিল তার মূল ছিন্ন হয়ে গিয়ে আজকের মানুষ বিচ্ছিন্ন। এই যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে তখন যখন লেখক এবং শিল্পীরা এই সমাজবাস্তবতার মোকাবেলা সাহসের সঙ্গে করবেন। শিল্পীকে আজ এই প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হতে হবে যে, বিজ্ঞানী বা দোকানদার

সাংবাদিকের তুলনায় তার দায়িত্ব অনেক বেশী।

রায় তাঁর সগোত্রদের এই বিষয়ে পথ দেখিয়েছেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তিনি তার কণ্ঠমেরাকে সব চেয়ে সংবেদনশীল বাস্তব-কলকাতার রাস্তার কাছে নিয়ে গিয়েছেন। তরুণ জীবন সম্পর্কে কাল্পনিক অথবা বিকৃত প্রতিরূপ অংকিত করা তার উদ্দেশ্য নয়। তিনি তার প্রকৃত সমস্যাকে ধরতে চেষ্টা করেন—বাইরের এবং ভেতরের দুইই। অবশ্য এই আপাতঃ দলিল-সমর্থিত গল্পে তিনি তার ব্যক্তিগত দিব্যস্বপ্ন বা ব্যর্থতাকে স্থান দিতে স্থিতি করেন না। কিশোর বিপ্লবী টুনু পরিচালকের নজর কম পেয়েছে মনে হয়। এর দ্বারা তার সহানুভূতির অঞ্চলের সীমা এবং অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তিনি তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করেন নি। সমস্ত জটিলতাই এই বিদ্রোহের রূপায়ণ এই শিল্পমাধ্যমের সাধ্য কিনা সেই প্রশ্নও উঠতে পারে। আমার মনে হয় শিল্পী যদি “চেতনাপ্রবাহ” ধরনের কোন

উপন্যাসের মাধ্যমে এই বাস্তবতাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তাঁকে সম্পন্ন করার জন্য এই অভিজ্ঞতায় অবগাহন করার এবং অভিজ্ঞানিক ভাবে তাঁকে জিপিবন্ধ করার ধৈর্য এবং ধীশক্তি যদি তার থাকে তাহলে তিনি এই প্রচেষ্টায় সফলকাম হতে পারেন।

আজকের ভারতের একজন সাংবাদিক কখনো শিল্পী বা সাহিত্যিকের সমকক্ষ হতে পারেন না। তার মাধ্যম বহু পূর্বেই ব্যবসায়-বুদ্ধির দ্বারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়েছে; সাংবাদিকের ব্যবহৃত ভাষায় বড় জোর একটা দোকানদারের হিসেব লেখা যেতে পারে—তার বেশী কিছু নয়। ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে খুব কম লোকই সাহিত্যিক মর্বাদা অর্জন করেছেন। সৃষ্টিশীল শিল্পীকে তাই একলা পথ চলতে হয় এবং একমাত্র নিজের চেষ্টায় সমাজ-বাস্তবতা সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ হাজির করতে হয়। এমন শিল্পীর কাছে কোলকাতা একটা চ্যালেঞ্জ বৈকি।

বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের প্রবাস

(অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা)

প্রেসিডেন্ট নিকসন গত এপ্রিল মাসে যখন মার্কিন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে বাজেটে বিপুল পরিমাণে ব্যয়বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তখন বহু মার্কিন অর্থনীতিবিদ এর বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের অভিমত ছিল যে আমেরিকার এই বিপুল আভ্যন্তরীণ ব্যয় মূল্যবৃদ্ধির ফলে উত্তপ্ত মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতা আরো কমিয়ে দেবে। ফলে আন্তর্জাতিক মদ্রা হিসেবে ডলারের প্রতি আস্থা কমে যাবে। আন্তর্জাতিক মদ্রা বিনিময় হার ও আর্থ-ব্যবস্থা বিকল হয়ে যাবে।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডন, নিউইয়র্ক, বন, টোকিও, প্যারিস মদ্রার বাজারে ডলারের দাম কমে যেতে থাকে। বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীর মার্ক মদ্রা ও জাপানের ইয়েন মদ্রার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এর ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির ডলার মজুতের বিনিময়মূল্য অনেক কমে যেতে থাকে অথচ ঐ দেশগুলিকে ডলার মজুত হাতে ধরে রাখতে হয়। কারণ ডলার মজুতের পরিমাণ কমিয়ে মূল্যহ্রাসের ক্ষতির পরিমাণ কমাতে গেলে মার্কিন পণ্য ইউরোপের দেশগুলির পণ্যের চেয়ে সস্তা হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হ্রাস পায়। কাজেই নিজ নিজ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাঁচাবার জন্যে তারা আমেরিকার উপর চাপ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মার্ক মদ্রাকে বাজার দরের নির্দিষ্ট

সীমায় বেঁধে দিয়ে সাময়িকভাবে এই সংকটের প্রকোপ কমিয়ে আনা হয়। অন্য কথায় জাপান ও পশ্চিম জার্মানীকে নিজের পণ্যের বাজার দর খানিকটা চাড়িয়ে মার্কিন সংকটের ধাক্কা সামলাতে হয়।

কিন্তু এই সাময়িক ব্যবস্থা যে নিতান্তই ঠেকো দেওয়া গোছের ব্যাপার, মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান নয়, অনেক অর্থনীতিবিদই সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং কয়েকমাসের মধ্যেই আরেকটা প্রবলতর বিশ্বজোড়া সংকট, ব্যাপ্তি এবং গভীরতায় সমাধিক বিপজ্জনক আকারে দেখা দেবে এ সম্বন্ধে নৈরাশ্যময় ভবিষ্যতের ইংগিত পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল।

সম্প্রতি জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এই সংকট গভীরতরে প্রবেশ করার পরিষ্কার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম নিউইয়র্কের শেয়ার বাজার ওয়ালস্ট্রীটে চলতি শেয়ারের দর পড়ে যেতে আরম্ভ করেছে। ফলে মার্কিন শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজনীয় আর্থিক উৎসাহ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছে। ওয়ালস্ট্রীট নৈরাশ্যের সাগরে ক্রমশঃ নিমজ্জমান।

এর প্রতিক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক দেশসমূহে সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ কমিয়ে সোনা মজুত করার কোঁক বেড়েছে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মদ্রার বাজারে আলোড়ন শরৎ হয়েছে এবং লন্ডন বাজারে সোনার দাম সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে। উনিশশ সত্তর সালের সংকটের পর সোনার দাম

এত বাড়ে নি। এক দিনের মধ্যে সোনার দাম আউন্স প্রতি কুড়ি সেন্ট হারে বৃদ্ধি পাওয়া একটা অভাবিত ঘটনা।

ফলে আন্তর্জাতিক মদ্রা বিনিময় হার আবার ভেঙে পড়ার মূখে গিয়ে পড়েছে। সংগে সংগে আন্তর্জাতিক ফাটকাবাজরা ডলার ও অন্যান্য মদ্রা ভাঙিয়ে সোনা মজুত করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সমস্ত পুঁজিবাদী উন্নত রাষ্ট্র এই আসন্ন সংকটের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে পুঁজিবাদী দুনিয়ার শিল্পবাণিজ্যের রীতিনীতি ত্যাগ করে আতঙ্কিত এবং অস্থির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে।

প্রথম দফায় প্রেসিডেন্ট নিকসন উনিশশ বাহাত্তর সালে অন্ততঃ দুলাক্ষ নতুন চাকুরী সংস্থানের জন্যে চলতি বছরে অতিরিক্ত এক-হাজার ছশ সাতাশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা (ভারতীয় মদ্রার হিসাবে) ব্যয় বরাদ্দ ব্যবস্থা করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের অর্থ-মন্ত্রী বছরের মাঝামাঝি নতুন মিনি-বাজেট এনে বৃটিশ শিল্প কারখানাগুলির অলস উৎপাদন ক্ষমতা কমানোর কতগুলি ব্যবস্থা নিয়েছেন। বর্তমান বৃটেনের তালিকাতত্ত্ব বেকার সংখ্যা সাড়ে আট লক্ষ। বৃটেনের আর্থিক বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমে পাঁচ শতাংশের জায়গায় তিন শতাংশেরও নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী হীথ তাঁর আর্থিক নীতির সালের সংকটের পর সোনার দাম

দপণে সপ্তাহ

শ্রীমন্ত

কালো টাকার মালিক ও সরকার

(দপণের সারসংক্ষেপ)

বদজ্ঞাতের পেটে শব্দ বজ্রাতাই পয়দা হয়; আর গুণী জ্ঞাতের ঘরে জন্মায় গুণধর গুণধরী।

আমেরিকানদের গুণ একাধিক। আজকের শ্রেষ্ঠ বণিকজাতি তারা। আন্তর্জাতিক বাজারে তাঁদের বাড়-বাড়ন্ত লক্ষ্য করলেই এটা অনায়াসে বোঝা যায়। আবার তাঁরাই যে সবচেয়ে চতুর রাজনীতিক চীন সফরে প্রেসিডেন্ট নিকসনের সাদৃশ্য তারই সাম্প্রতিকতম সাক্ষ্য।

জাতিপুঞ্জ লালচীনের আসন নিয়ে চোঁচিয়ে মরল আ-নেহরু আমলের চীনা-ভ্রাতার হিন্দী ভায়েরা; অঞ্চল এশীয় জাতিগুলির অন্তর্ভুক্তের প্রশস্ত সড়ক দিয়ে চীনে যাচ্ছেন এখন রিচার্ড নিকসন।

বিশ্বগণতন্ত্রের বড়দা হলেন বিপ্লবালী যুক্তরাষ্ট্র। অগ্রসরমান কমিউনিস্ট ডিক্টেটরী রোখার জন্য সেই যুক্তরাষ্ট্রের দিবানিশি ঘুম নেই; আবার ইয়াহিয়া খানের গণতন্ত্র বিধ্বংসী নোংরা হাতে শক্তি যোগান দিতে দিতে সেই মার্কিন মজলুকই যুক্তি সাজাচ্ছেন দিনের পর দিন। কম সেয়ানা এরা! পদে পদে বিরোধভাস।

কোনো এক মহান জাতির গুণগণার কথাই নিতান্ত চোখ এড়ানো সংবাদের গর্ভেও চাপা থাকেনা। আধার-মাণিক জোনাকির মতো জ্বলে ওঠে গুণের কথা। গুণ শতধা বিচ্ছুরিত হতে থাকলে তাকে কী আর আড়াল দিয়ে আগলে রাখার উপায় আছে?

এমনি এক খবর ফ্লোরিডার মিয়ামি বিচ থেকে বাইশে জুলাই ছাড়া হয়েছিল। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের দ্বারা বিশ্বের সেরা মানব নির্বাচনের সংবাদ। এ হেন অব্যচীর্ণ নির্বাচক কর্তৃক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাছাই কতদূর সমীচীন তা অবশ্য জানিনা, তবে বিশ্বের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসায়ীর ফিতের মাপে যারা বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হন, তাঁদের ভোটের দর কদর নিশ্চয় আছে। নইলে দর্শনার নিউজ এজেন্সী টকটক খবরটা কাগজওয়ালাদের পাঠাবেন কেন? খবর এলে যেখানে সব খবরই ছাপা হয় না, সেখানে খবরের কবরে না গিয়ে এ সংবাদ “টপ হেড” হয়ে পর দিবস স্পেস অধিকার করবে কেন? হেড লাইন বলবে কেন, সুন্দরীদের ভোটে “নিকসন প্রথম” (অর্থাৎ “হিরো”)।

যদিও নির্বাচক এই সুন্দরীরা দেহ জরিপ করিয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে উত্তীর্ণ কতিপয় মহিলা মাত্র। বিশ্বের সুন্দরী-অভিজ্ঞ অসুন্দর পুরুষের লম্বা ফিতের বাদের দেহ (শ্রী?) মাপ্ত হয়। বিশ্ব সম্পর্কে বাদের কিছু মাত্র বিচিন্তা না থাকলেও ক্ষতিবৃষ্টি নেই। তাদেরই ভোটে

“নিকসন প্রথম”। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব। যেমন স্টেনো টাইপিস্ট কেরিয়ার-কন্যার ভোটে অবশ্যই তার অফিস-বসই শ্রেষ্ঠ পুরুষ?

এই ভোট খেলায় সৌভাগ্য হেরে গেছেন বর্তমান বিশ্বের সর্ব-লোচিত সেই মানবটি, মাও সে তুং। এর কপালে এক ভোট। যিনি দিয়েছেন, সন্দেহ নেই, তিনি তাঁর নিজের কপালই পড়া দিয়েছেন। নিকসন না হয় গুণী জ্ঞাতের গুণনিধি; কিন্তু আমাদের ইন্দিরা গান্ধী? দম্ব করে তিনিও দুটো ভোট “ব্যাগ” করলেন? খেলাটা যেহেতু আন্তর্জাতিক, তাই পিকচারে এসে গেলেন উথল্ট মহোদয়! চার ভোট। এমন কি পবিত্র ষষ্ঠ পোপ পলকেও অব্যাহতি দিলেন না সুন্দরীরা। তাঁকেও দিয়ে দিলেন চার ভোট।

নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে একে-বারেই বিদ্যুৎ আভাষ ছিল এমন কথা অবশ্য বলা যাবে না। কারণ কেউ কেউ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সোয়াইতজার-সাহেবকে স্মরণ করেছেন। ভোট পড়েছে শল্য চিকিৎসক ডাঃ ক্রিস্টিয়ান বার্নার্ডের পক্ষেও। কিন্তু রিচার্ড নিকসন? সকলকে ছুঁপিয়ে ছটা ভোট।

বিশ্বের-সেরা জাতির প্রেসিডেন্ট সেরা মানব হিসেবে গণ্য হয়েছেন, এতে শ্রীমন্তের ভারতীয় সেন্সিটিভিটি বিচলিত হলে বাকি দর্শনার ব্যয়েই গেল। কেননা একমাত্র ভারতীয়ের দৃষ্টিতেই সেরা মানব নির্বাচিত হন অব্যাসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গিয়েও ধান ভাগে, ব্যবসায়ী জাতি তেমনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব বাছার সময়ও ঘোর ব্যবসায়িক হিসেবে নিকেই কষে নেয়। এক মার্কিন সুন্দরীর ভোট সেকথাই প্রমাণ করল।

মার্কিন সুন্দরী ভোট দিয়েছেন খুব সাবধানে। হিসেব করে। স্বদেশে তিনি স্বজাতির প্রেসিডেন্ট নিকসন সাহেবকে ভুট করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে চিহ্নিত করলেও বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার আসরে ভোট দিলেন নিজের বাবাকে। এর চেয়ে চমকপ্রদ নিউজ বর্তমান মনোহর চন্দ্র-বক্ষে মোটর চালনা ছাড়া আর কী আছে, শ্রীমন্তের জানা নেই।

নিকসন সাহেবের এহেন উত্থান পতনের পরও বিশ্বের “শ্রেষ্ঠ মানব” বাছাই-এর এমন প্রহসন নিয়ে ভবিষ্যতে কি বিশ্ব প্রেস-রিপোর্ট কোঁড়ক করার আর শ্বিতীয় সুযোগ পাবে?

মার্কিন সুন্দরী আর এক ধরনের মার্কিনী গুণগণার খবর দিলেন। বাস্তবিকই বিশিষ্ট গড়-হিউমারের অধিকারী হলেন আমাদের এই সিসটারস এন্ড ব্রাদারস অব আমেরিকা।

অবশেষে ছত্রপতি নকল শিবাজী চাবন সাহেবকেও স্বীকার করতে হল যে ভারত সরকারের পক্ষে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাজেট পেশ করার সময় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর অর্থমন্ত্রী চাবন যে বীরত্ববাজক আত্মত্যাগ করেছিলেন এবং দ্রব্যমূল্য তাদের সরকার রোধ করতে সক্ষম বলে যে স্তোত্রবাক্য উচ্চারণ করে জনগণকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন শাসকশ্রেণীর সর্বোত্তম কুলীন একচেটিয়া মালিকেরা তা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

ভেজাল সমাজতন্ত্রের নকল ধন্যধারীরা এদেশের সরল মানবকে ধোঁকা দিতে চুড়ান্ত ভাবেই যে ব্যর্থ হয়েছেন একথা আজ দিবালোকের মতই পরিষ্কার। আজ

তুলতা ও তাঁর শ্রেণীস্বার্থসুলভ শ্বিত্য-স্বল্পকেও নাড়িয়ে দেবে। প্রধানমন্ত্রী কি তার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন?

নব কংগ্রেসী কার্যকরী সমিতির সভায় কোন কোন সদস্য কালো টাকার বাজার এবং তার প্রভাব সম্পর্কে অভিযোগ করেন। অর্থবিল সম্পর্কে বিতর্ক কালে বহু সংসদ সদস্যও কালোবাজারী টাকার সর্বশেষ প্রভাব সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বয়ং অর্থমন্ত্রী পর্যন্ত স্বীকার করেন যে খোলাবাজারের আর্থিক ব্যবস্থার পাশাপাশি অসদুপায়ে উপার্জিত কালোবাজারী আর্থিক ব্যবস্থা এদেশে বিরাজমান। তিনি বলেছেন ডাক্তার, ব্যারিস্টার, উকীল, ফিল্ম স্টারদের নগদ টাকায় ফাঁজ

বকেয়া ট্যাক্সের সিংহভাগ ফাঁকি দিয়ে চলেছেন এবং এর ফলে সরকার আর্থিক অসচ্ছলতা মেটাতে গিয়ে দ্রুতদর্শনাগত সাধারণ মানবের ঘাড় ট্যাক্সের বোঝা, দামের বোঝা চাপিয়ে চলেছেন।

সরকার আইনের দণ্ড মূল্য-গুলি যদি জনসাধারণের দিকে উদ্ভাট না করে এ চোরাকারবারী, কালোটাকার মালিক ও-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া গুটিকয়েক লোকের দিকে উদ্ভাট করতেন তাহলে জনসাধারণের দ্রুতদর্শনা খানিকটা লাঘব হতে পারত।

কিন্তু তাতো হবে না। কারণ আমাদের দেশের সরকার যে ঠিক এ চোরাকারবারী কালোটাকার মালিক ট্যাক্স ফাঁকিবাজ একচেটিয়া পুঞ্জিপতিদেরই সরকার। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অথবা নকল শিবাজী চাবন সাহেব যদি এদের গায়ে হাত দিতে যান, তাহলে দুদিনেই গদী হারাতে হবে। যে শ্রেণীর হাতে সমাজ চালানোর ব্যবস্থা, সেই শ্রেণীর সরকার কি করে মালিকদের গায়ে হাত দেবে?

তাই পুঞ্জিপতিদের কাছে যখন বছরের পর বছর নয়শো বাট কোটী টাকা অনাদারী থেকে যায়, তখন এই সরকার টু শব্দটি করে না, তাদের রক্তিতা সংবাদপত্রগুলি অর্থনৈতিক উন্নতির মিথ্যা ভাষণে পাতা ভরায় এবং সংসদীয় গণতন্ত্র যে অপার মহিমা মণ্ডিত ভারতীয় সংবিধান তার জরখনি দেয়।

কিন্তু যদি অসীম ক্রেতাভারে পীড়িত, দ্রুতদর্শনাগত জীর্ণ মানব-গুলি একটু হাত বাড়ায় সামান্যতম দাবীদাওয়া পেশ করতে চায়, যদি নিরস্ত, রক্তহীন পঞ্চদশ-গুলি সামান্যতম চাহিদা মেটাবার জন্যে মজরী বৃষ্টি দাবী করে, কাজ পাবার আবেদন করে, তখন এই শ্রেণীসরকারের লক্ষ আয়ুধ লক্ষ লক্ষ সি আর পি মিলিটারীর অসংখ্য বন্দকের নলে গর্জে ওঠে। এরই নাম নাকি মহিমান্বিত সংসদীয় গণতন্ত্র।

জনসাধারণ বন্ধুত্ব শিখছে ইন্দিরা গান্ধী যে শ্রেণীর প্রতি-নিষিদ্ধ করেন, বন্দকের নলই তাদের ক্ষমতার উৎস। পশ্চিমবঙ্গের—শব্দ পশ্চিমবঙ্গের কেন সমগ্র পূর্ব ভারতের রাজ্য রাজ্য সেই বন্দকের নল উদ্ভাট জনগণের দিকে। শাসকশ্রেণী ব্যালট ছেড়ে বুলেটের পথ ধরছে, তাই তারা আজ পূর্ব ভারতে আংশিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সংসদীয় গণতন্ত্রের খোলাস শেষ ভুজ-টুকু ছেড়ে দিতে চাইছে।

ভরত দর্পণ

আর তাঁরা বলতে পারছেন না যে তাঁদের নব কংগ্রেসী ভেজাল সমাজতন্ত্র জনগণের দ্রুতদর্শনা লাঘব করতে সক্ষম। জুলাই মাসের শেষ দিকে নব কংগ্রেসী সংসদীয় কার্যকরী সমিতির এক সভায় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করা সরকারের সাধ্যাত্মক নয়, এর-জন্যে জনসাধারণকেই অগ্রণী হয়ে আন্দোলন করে ক্রেতাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেছেন যে ঘাড়ে-বসা (সুপার ইমপোজড) আমলাতন্ত্রের ওপর ভরসা করে কিছু হবে না।

চোখ রগড়ে বারবার সংবাদটির দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল, ঠিক এই কথাটি বলার জন্যে তিনি নিজেই পশ্চিমবঙ্গের শ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের বড়ো শরিক সি পি এম দলকে কি কড়া নিন্দাটাই না করেছিলেন। ভয় হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী না গোপনে হরেক্ষ কোণারের ভক্ত হয়ে পড়েন কারণ হরেক্ষবাবুই প্রথমে বলে-ছিলেন আইন-আদালত করে কৃষক জমি পাবে না, তাকে সংগঠিত ভাবে জমি দখল করতে হবে এবং ফসল রক্ষা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর অনুচররা তখন বলতেন যে এটা ঘোর অন্যায় কথা, আর আজ তারাই হরেক্ষবাবুর কৃষক প্রতিরোধের মতই ক্রেতাপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে আহ্বান জানাচ্ছেন। দেরীতে হলেও জ্ঞান অর্জন ভালো।

ক্রেতা প্রতিরোধ মানে শব্দ জিনিষ না কেনা নয়, পর্যাটী সালের “দমদম দাওয়াই” দিয়ে পাইকারী বিক্রেতা ও মজদদারদের ন্যায্য দরে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করা বোঝায়। এবং স্বভাবতই সংঘবদ্ধ ক্রেতা প্রতিরোধ সরকারী প্রতিরোধ ব্যবস্থার অপ্র-

দেওয়া কালোটাকা জমানোর একটা উপায়। সরকার নাকি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে কালো টাকার অর্থ-ব্যবস্থা প্রায় সরকারী অর্থব্যবস্থার মতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

এ ছাড়া সরকারী ও বেসরকারী মালিকানা ছাড়া এদেশের অর্থনীতিতে নাকি চোরাই চালান-দারদের মালিকানার একটা সেকটর গড়ে উঠেছে। সরকারী হিসেব থেকেই জানা গেছে যে প্রতিবছর ভারতের চোরাকারবারীরা (এর মধ্যে বাঘা বাঘা একচেটিয়া মালিকেরা প্রধান) আন্তর্জাতিক বাজারে একশ সত্তর কোটী টাকা এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে চারশ কোটি টাকা একুনে পাঁচশ সত্তর কোটি টাকা মূল্যের পণ্য অবৈধভাবে বেচাকেনা করে থাকে। ভারতীয় শব্দক বিভাগ গড়পড়তা বছরে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকার চোরাই মাল ধরতে পারেন। এই হচ্ছে হিসাব।

আরেকটি উপায় ট্যাক্স ফাঁকি। ভারতের অডিটর জেনারেল তাঁর উনসত্তর-সত্তর সালের বার্ষিক বিবরণীতে বলেছেন যে সত্তর সালের একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত ভারত সরকারের প্রাপ্য বকেয়া ট্যাক্সের পরিমাণ নয়শো বাট কোটি টাকা। এর বিরোধী শতাংশ অর্থাৎ আটশ এক-চল্লিশ কোটি টাকা শব্দ মাত্র আয়-কর বাবদ পাওনা। এ টাকা কাদের কাছে বহুদিন ধরে বাকী পড়েছে? অডিটর-জেনারেল বলছেন, মাত্র ০.৪ শতাংশ করদাতা মোট ট্যাক্স বাকী ফেলেছেন চারশ কোটি টাকারও বেশী, এদের মোট সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার; মোট ট্যাক্স বাকী পড়েছে কোম্পানী ও ব্যক্তি বিশেষ মিলে প্রায় ষোল লক্ষ সাতশ হাজার জন করদাতার কাছে। অর্থাৎ গুটী কয়েক পরিবার মোট

চীনা নেতৃত্বের বিশ্বাস ভাজন ওয়াশিংটন কথা

(দর্পণের পূর্ববর্তক)

চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই ও হেনরী কিসিংগারের বৈঠকের আয়োজন করা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বর্তমানে কানাডার চীনা রাষ্ট্রদূত হুয়াঙ হুয়া। চীন-আমেরিকা সম্পর্ক স্থাপনে এই ভূমিকার একাধিক বিশেষ ভূমিকা থাকবে বলে আশা করা যায়।

মার্কিনীদের সম্পর্কে হুয়া প্রথম আসেন উনিশশ তিপ্পান সালে পানসুনজস বৈঠকে। এবং আজ তিনি নিজ দেশে মার্কিন ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। মনে হয় যদি চু-নিক-সন বৈঠকের ফলে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তবে হুয়াঙ হবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম চীনা প্রতিনিধি।

ছাত্রাবস্থায়ই হুয়াঙ রাজনীতির

সম্পর্কে আসেন ইয়েনচিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে-জাপানী সমাজবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ সংগঠন করার মধ্য দিয়ে। এর ফলে তাঁকে দুবার কারাবাসও বরণ করতে হয়। উনিশশ ছয়শ সালে বিশ্বাত সাংবাদিক এডগার স্নোকে তিনিই চীনা বিপ্লবীদের ঘাঁটি ইয়েনচিং প্রদেশে নিয়ে যান যেখানে তিনি মাও সে তুং ও অন্যান্য নেতাদের নজরে আসেন। বিপ্লবের পর চু এন লাই প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি হুয়াঙ-কে নিজের বিশ্বস্ত সহ-কর্মী হিসাবে নানাধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেন যার মধ্যে অন্যতম হল প্রথম ঘানা ও পরে ইজিপ্টে রাষ্ট্রদূত হিসাবে থাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হুয়াঙই একমাত্র চীনা রাষ্ট্রদূত যাকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় পিকিংয়ে আদর্শগত শিক্ষার জন্য ডেকে পাঠান হয় নি। এর থেকেই বোঝা যায় তাঁর কর্মক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে চীনা নেতৃবৃন্দ

বিদেশ দর্পণ

কী গভীর প্রজ্ঞা পোষণ করেন। এবার কি ধোঁয়াশা নামবে?

আজ থেকে এগার বছর আগে একটি নাম সংবাদপত্রে কিছুদিন ধরে রোজই বেরিয়েছিল এবং সেই নামটির সঙ্গে যুক্ত ছিল মার্কিন-সোভিয়েত সংঘর্ষের সম্ভাবনা। নামটি হচ্ছে ফ্রান্সিস গ্যারী পাওয়ার্স যার ইউ-২ বিমান সোভিয়েত এলাকার ওপর ওড়তে তুলকালম কাশড হয়—একটি সোভিয়েত রকেট পাওয়ার্সকে জমিতে নামিয়ে আনে।

পাওয়ার্স আজও উড়েছে তবে ডাঙা থেকে বারো মাইল উপরে ঘন্টার চারশো মাইল বেগে নয়। বর্তমানে সে একটি ছোট বিমানে লস এঞ্জেলস শহরের মাত্র দেড় হাজার ফিট উপরে ঘন্টার একশ পঁচিশ মাইল বেগে ধীরগতি খায়, ফুঁটি নয় কাজের তাগিদে। তার কাজ একটি বেতার কেন্দ্রের পক্ষে কোথায় কোন রাস্তায় গ্রাফিক জাম হয়েছে তা ঘোষণা করা। লস এঞ্জেলসে মোটর আরোহীরা তাদের নিজস্ব বেতারে শুনতে পান পাওয়ার্সের গলা, “...এইমাত্র একটি কমলালেবু ভর্তি ট্রাক স্যান ডিয়েগো ফ্রীওয়েতে উল্টে গেল” বা ওই ধরনের কিছু। যারা শোনেন তাঁরা নিশ্চয় উপকৃত হন।

একচল্লিশ বছরের গ্যারী পাওয়ার্স বিশ্বাত লক হীড বিমান কোম্পানী থেকে ছাটাই হয়ে এই কাজ নিতে বাধ্য হন। যদিও কাজটি সাময়িক এর ফলে পাওয়ার্সের নাম আবার খবরের কাগজের পাতায় উঠে গেল। একটি সংবাদপত্রের প্রশ্ন “উনিশো ঘণ্টা সালে পাওয়ার্সকে নামিয়েছিল একটি রকেট। এবার কি ধোঁয়াশা (স্মগ) তাকে নামতে বাধ্য করবে”? কোন বক্তব্য ঠিক?

উনিশশো বার্ষিকী সালে “কিউবা সংকট” সমাধানের পর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে তাঁর অন্যতম উপদেষ্টা ডীন অ্যাচিসন একটি চিঠি লেখেন যাতে তিনি কেনেডীকে তাঁর “দূতৃত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্বের” জন্য অভিনন্দন জানান। অ্যাচিসনের মতে “বহুদিন পরে আবার একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যে এই গুণগুণ দৃশ্য গেল।”

সম্প্রতির বি বি সির একটি ইন্টারভিউতে অ্যাচিসন কেনেডী প্রসঙ্গে বলেন, “কেনেডী কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন না। তাঁর শৌচনীয় মতুই (ডালাসে, আততায়ীর গুলীতে) তাঁর খ্যাতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। কেনেডী আরও দু দফা প্রেসিডেন্ট থাকলে এই খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না।”

কোন বক্তব্যটি সত্য?

মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট-কেলেঙ্কারী

প্রেসিডেন্ট নিকসন যখন তাঁর চীন সফরের আলোচনার ডঃ কিসিংগারের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন তখন তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পিরো অ্যাগনিউ কোথায় ছিলেন? স্পিরো, যিনি এ ব্যাপারের কিছুই জানতেন না, তখন কেনিয়ার জঙ্গলে তাঁর

সুন্দরী লালচুল সেক্রেটারী ও ব্যক্তিগত চিকিৎসকের সঙ্গে বসে দুটি সঙ্গমরত গম্ভীর দেখছিলেন। তাঁর আফ্রিকা সফরের কারণ, জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের মতে মার্কিন ও আফ্রিকান দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর করে তোলা। আফ্রিকা থেকে অ্যাগনিউ মধ্য প্রাচ্যের কয়েকটি দেশেও যান। সেখানে তিনি সৌদী আরবের রাজাকে “খুবরাজ ফৈজাল” বলে সম্ভাষণ করে এক কেলেঙ্কারী করেন। এর আগেও অবশ্য তিনি কেনিয়ার জোমো কেনিয়াটাকে ইয়োমো-কেনিয়াটাকে বলে উল্লেখ করেছিলেন। এর ফলে মার্কিন সরকার খুবই বিরত বোধ করছেন।

পুলিশ ক্লিক জিতল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তালুকদার সাহেব আই জিকে চাপ দিয়েছিলেন। তালুকদার চেয়েছিলেন, বহু বদলী ঘটাতে আই-জি রাজী হননি। জে সি তালুকদার স্বয়ং ওয়াগন ভাঙার বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েছিলেন। ওয়াগন রেকারদের কাছ থেকে পুলিশ মোটা টাকা পায়। পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাই তালুকদারের উপস্থিতি পছন্দ করেন নি। তালুকদার চেয়েছিলেন, মদের দোকান, হোটেল ও বার লাইসেন্সের ক্ষমতা পুলিশের হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে নিয়ে আসতে। এগুলো থেকে পুলিশের মোটা আবাদানী হয়।

তাই এই সংক্রান্ত ফাইলে পুলিশ তাঁর আপত্তি জানায়। ওরা বিরক্তও হন। আশা করা যাচ্ছে, ফাইলটি এবার চাপা পড়বে। তালুকদার চেয়েছিলেন, কোম্পানি-নবগ্রামে খুনের ঘটনায় স্পীকার অপদেব মজুমদারের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করতে।

আই জি রাজী হচ্ছিলেন না। কেন না, তাহলে ওদের থিয়েটারী অন্তরঙ্গী সি পি এম-কে এই ব্যাপারে দায়ী করা যাবে না। তালুকদার আরো অনেক ব্যাপারে আই জিকে বেগ দিচ্ছিলেন। রাইটস বিল্ডিং-এর ওপরতলা এ কাহিনী ভাসা ভাসা জানেন।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, নব কংগ্রেসী কয়েকজন নেতার বিরাগ। এরা চাইছিলেন, নামজাদা কয়েকজন গম্ভীর মজি। তালুকদার সাহেব সহজে রাজী হচ্ছিলেন না। ফলে কংগ্রেসীরাও খুশি ছিলেন না। এই সুযোগটি পুলিশ ক্লিক গ্রহণ করে ওকে সরিয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, দর্পণ তালুকদার সাহেবের সমর্থক নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে আই এ এসদের হারিয়ে পুলিশ ক্লিকের এই বিরটি জয় সম্পর্কে বিস্তারিত কাহিনী সংগ্রহ করার জন্যে দর্পণ চেষ্টা করবে।

লিনোকোট ছবিতে সুকান্তর রচনা

(দর্পণের সমালোচক)

সম্প্রতি একাডেমী অব ফাইন আর্টস হলে সুকান্তর রচনা-কর্মকে কেন্দ্র করে এক অনন্য চিত্র-প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছিলেন শিল্পায়ন আর্টিস্ট সোসাইটি। পরিচালনা, বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকে এই প্রদর্শনী একটি বিরল প্রচেষ্টা।

শিল্পী সঞ্জয় সেনগুপ্ত “লিনোকোট” কলাচাতুর্যে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রেষ্ঠ কবিতাগুলির কেন্দ্রীয় ভাবানুসরণে প্রাতিটি চিত্ররচনায় যেমন একদিকে আজকের পৃথিবীর সাধারণ মানু-ষের আশ্রয়-বুদ্ধি, বিক্ষুব্ধ দশাকে মূর্ত করে তুলেছেন, অপরদিকে তেমনি সুকান্তর কবিতা-কর্মের আধুনিকতম মূল্য-বোধকে অপরিমেয় সুখম কল্পনা-শক্তিতে নবতর সমীক্ষায় দর্শ-

কের মনে নির্বিশ্রাম রেখাপাত করিয়েছেন।

শ্রদ্ধামাত্র “সাদা-কালো” সন্নি-গ্রহে “লিনোকোট” ভাষ্যমায় “সিরিও-কার্যিকটিওরা” প্রধান-সরণে যে পরিমিতবোধের পরিচয় দিয়েছেন, সেটাই সর্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয়।

আজকের এই নিউ ইমপ্রেশ-নিষ্টিক, কনট্রাপারসপেকটিভ এবং নন-ফিগারেটিভ চিত্রচর্চার দিনে শ্রীসেনগুপ্তের “লিনোকোট” প্রথায় মানুুষের আধুনিকতম সংগ্রামী জীবন-জিজ্ঞাসার চিত্রকর্ম নিঃস-ন্দেহে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

কবির “বোধন”, “প্রসন্নতমাস”, “ছাড়পত্র”, “একটি মোরগের কাহিনী”, “চিস”, “রানার”, “দুর্মর”, “হে মহাজীবন”, প্রভৃতি কবিতার ভাবানুসরণে অশ্লীল ছবিগুলি সহজে ভোলবার নয়।

আর্থিক সংকটের পূর্বাভাস

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

বার্খজা দেখে তড়িৎমিড়ি এসব নম্র-বাজেটের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই বাজেটে বিক্রয় কর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের ক্ষমকতি পূরণের হার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিস্তিতে পণ্য বিক্রয়ের নিষিদ্ধ ব্যবস্থাগুলিকে আবার জিইয়ে তোলা হয়েছে। গত আঠারো বছরের মধ্যে কুটনৈতিক কোনো অধরণের জরুরী আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয় নি।

প্রতিক্রিয়া অনুসারে জাপান ব্যাঙ্ক রেটের হার কমিয়ে আসন্ন সংকটে তার দেশের পণ্যের দাম যাতে ততটা না বাড়ে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টের বিদেশী মুদ্রা বিনিময় বাজারে মার্কের তুলনায় ডলারের দাম দ্রুতবেগে পড়তে শুরু হয়েছে। অর্থাৎ সংকটের এই চেহারা সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার পতন ক্ষণ সন্নিবিষ্ট করে তুলছে এবং বিশ্ববাজারীতর পর্বাণে এই অস্থির আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করেছে। জার্মান, ফ্রাঙ্কফোর্ট, লন্ডন, প্যারিস, নিউ-ইয়র্ক সমস্ত বাজারে অস্থিরতার সূচনা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর পিকিং সফরের কথা ঘোষণা করেন। বৃটেন টোরী মন্ত্রিসভা ও লেবার পার্টির মধ্যে ইউরোপের কমন মার্কেটে প্রবেশ করার ব্যাপারে গভীর মতভেদ দেখা দেয়।

প্রেসিডেন্ট নিকসন ও তাঁর

পরামর্শদাতারা হয়তো মনে করেছেন যে চীনের সঙ্গে ভিয়েতনাম ও তাইওয়ানের ব্যাপারে, এমন কি সমগ্র এশিয়ার রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন আপোষে উপনীত হতে পারলে যে সামরিক ব্যয় কমানো সম্ভব হবে, তার ফলে মদ্রাস্থিতির উত্তাপ অনেকটা কমবে এবং আমেরিকার আভ্যন্তরীণ আর্থসংকটকে মদ্রাবিনিময় হারের রদবদল করে অর্থাৎ মদ্রামূল্য হ্রাস ইত্যাদি উপায় চাপিয়ে দিয়ে ভারত সহ এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ঘাড়ের চাপিয়ে দেবার সময় পাওয়া যাবে।

অন্যদিকে দেশগুলির ঘাড়ের এই বিপদ চাপিয়ে উন্নত-পুঁজিবাদী দেশগুলি রেহাই পাবার যে চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে কিছুদিনের মধ্যেই এই দুর্বল দেশগুলিকে দ্রুত মূল্য-বৃদ্ধির চাপে পড়তে হবে। ফলে এই সব দেশে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও অস্থিরতা স্থায়ী হয়ে দেখা দেবে।

ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী আরো করভার আরোপের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী দেশগুলির চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ইংগিত বাস্তবে পরিণত হতে বাধ্য এবং দেশজোড়া বিক্ষোভ, অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই বর্তমান শাসকদের হাতে থাকবে না।

সি পি এমের ক্যাসিয়ারকে থ্রেপ্তার করার নেপথ্য কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নয় সন্তানের জননী বিশাল বন্দু চঞ্জিশোখ সায়েরা খাতুন প্রেমে জড়িয়েছে নিষ্ঠাবান অবিবাহিত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট রমেন সেনকে। পরিণামে একদিশ বছর কমিউনিস্ট আন্দোলনে থাকার পর রমেন সেন পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। তাঁর বিরুদ্ধে পার্টির তহবিল তছরূপের অভিযোগ।

উনিশশ চঞ্জিশ সালের ঘটনা। কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনী। সতেরো বছরের তরুণ রমেন্দেহ রমেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন গোপন দলিলপত্র আদান-প্রদানের দায়িত্ব নিয়ে। তাঁর অদ্ভুত নিষ্ঠার পার্টির শীর্ষ স্থানীয় নেতা মজুমদার আমেদ অভিভূত। দু-বছরের মধ্যে রমেন পার্টির সদস্যপদ পান।

গোপন কাজে বিশ্বাসভাজন বলে রমেনকে কখনওই কোনও সম্মুখ আন্দোলনে নিয়ে আসা হয়নি। বেআইনী পার্টির যা কিছু গোপন তথ্য সবই রমেনের জিম্মায়। উনিশশ আটচাল্লিশ সালে যখন পার্টি শ্বিতীয়বার বেআইনী ঘোষিত হল তখন অত্যন্ত সুসংগঠিত ভাবে পার্টির সদর দপ্তর গোপন আস্তানায় চলে গেল রমেনেরই দপ্তর সংগঠন কৌশলে।

উনিশশ চৌষটি সালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর রমেন দলের নতুন দপ্তরে আগেকার মতই তহবিলের দায়িত্ব রইলেন। দিনে দিনে পার্টির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, সেই সঙ্গে অর্থ সমাগমেরও। সবই রমেনের নখদর্পণে।

কোথা থেকে টাকা আসে এবং

কি ভাবে তা খরচ হয় তার হিসেব রমেনের হেপাজতে। গত পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতার নেতারা রমেনের কাছে কোন গাফিলতি দেখেন নি। ব্যক্তিগত খ্যাতির কোন মোহ নেই। নিরলস অধ্যবসায়ী কর্মী। সকাল দশটার অফিসে আসত আর সন্ধ্যা সাড়টার নীরবে অপরের অলঙ্ঘ্য বেরিয়ে চলে যেত। বিশেষ কারুর সঙ্গে কথা বলত না। নেতাদের সান্নিধ্যে আসার কোন মোহ কখনও দেখা যায় নি।

হঠাৎ অঘটন ঘটল আকস্মিক পরিস্থিতিতে। গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওয়েলেসলির মুসলিম অঞ্চলে চোরাচালানের কি একটা ঘটনায় তদন্তে গিয়েছিল। সেই অঞ্চলে আন্দাজে দু'একটা বাড়ি টাকা দিতে দিতে সায়েরা-রমেনের ডেরায়

হাজির। কে'চো খুঁজতে সাপ বেরোলো। রমেনের বাগিশের তলায় নগদ চব্বিশ হাজার টাকা আর দুটি রসিদ, একটি ট্রাক কেনার আর একটি অ্যাম্বাসাডার গাড়ির।

পুলিশ জানতে চায় কি ভাবে টাকা এল। রমেন নিজের নাম ভাড়ায় ওয়াজুদ হক নামে পরিচয় দেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সন্দেহ হয় পাক চক্রের গুপ্তচর বোধহয়। ধরে নিয়ে যায় ওদের দুজনকে গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তর লালবাজারে।

স্বয়ং দেবী রায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। রমেন আসল পরিচয় গোপন করে না। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাসিয়ার এবং কিছুদিন থেকে সে পার্টি তহবিল ভাঙাতে শুরু করেছে আর বেশ কিছুদিন হল সায়েরা খাতুনকে নাকি বিয়ে করেছে। সায়েরা এখন গর্ভবতী।

কিভাবে রমেন সায়েরার সান্নিধ্যে এল তার কাহিনী খুব প্রাসঙ্গিক

নয়। তবে চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত কিছু লোক বোধহয় সায়েরার অন্তর্গত।

গোয়েন্দাদের কর্তা দেবী রায় একদল পুলিশ নিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে গভ সপ্তাহে আসেন আর খোদ প্রমোদ দাশগুপ্তকে রমেনের স্বীকারোক্তির কথা জানান। দেবী রায় পার্টি অফিসে রমেনের নিজস্ব আলমারীর সাঁচ করতে চান। আলমারীর চাবি দেবী রায়ের হাতেই ছিল রমেনের কাছে পাওয়া।

আলমারীর মধ্যে একটাকার নোটের ছ হাজার টাকা আর অনেক হিসাবপত্রের খাতা। খাতাগুলো পুলিশ নিয়ে যায়— গুরুদ্বন্দ্বপূর্ণ দলিল, কে টাকা দেন, কি কি খাতে খরচ হয় সবই ঐ খাতায় লেখা। পার্টি নেতারা আপত্তি জানান না। দর্পণের এক সংবাদদাতাকে এক নেতা জানান পুলিশ খাতা দেখলে পার্টির অসুবিধে নেই। তবে রমেনের আকস্মিক বিবর্তনে ওরা হতবাক।

পশ্চিমবঙ্গে যাত্রাশিল্পের হালচাল

যাত্রারসিক

বাংলার জনপ্রিয় প্রাচীনতম লোকনাট্য যাত্রাশিল্প আজ এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। সাধারণতঃ শারদীয় পূজা থেকে জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরার সহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিন যাত্রার আসর বসে। রহু শিক্ষায়তন, ধর্মমন্দির এবং অন্যান্য চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান যাত্রানুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল।

গত বছর দেশের অস্বাভাবিক অনিশ্চিত অবস্থায় এই যাত্রা শিল্প ভীষণ চোট খেয়েছে। দু'একটি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা যাত্রার দল গানের আসরের অনিশ্চয়তার জন্য মাঝ মরশুমে বন্ধ হয়ে গেছে। আগামী মরশুমেও (শারদীয় পূজা থেকে) এই সঙ্কট কাটবে বলে যাত্রার দলের মালিকগণ মনে করেন না। তবে প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিটি যাত্রার দলগঠনও প্রায় হ্রাসে গেছে। কিন্তু প্রত্যেক যাত্রার দলের গদীতেই আজ অল্প বিস্তর বিবাদের ছায়া।

দলগঠনে যে কোন দলের মালিককে চড়া সুদে চঞ্জিশ থেকে ষাট হাজার টাকা ধার করতে হয়। ঐ ধার করা টাকা দিয়ে দলের পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন শিল্পীদের অগ্রিম দান দেওয়া, বাড়ীভাড়া করে দু'বেলা সমস্ত শিল্পীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নতুন নাটকের রিহাসাল চালানো, নাট্যকার-সুরকারের টাকা দিতে পোষাক প্রভৃতি করতে হয়।

এই চড়া সুদে টাকা আসে

কালো টাকা খাটাবার মহাজন বা খুদে মহাজনের কাছ থেকে।

এদের এই সুদের টাকা ও শিল্পীদের বেতন দিতেই মরশুম শেষে অধিকাংশ যাত্রার মালিকও নিঃস্ব হয়ে যান। অথচ প্রতিষ্ঠান বাঁচাবার টানে আবার পরবর্তী বছরে চড়া সুদে টাকা ধার করে তাঁরা দল গঠনের চেষ্টা করেন। বাংলা, আসাম, ত্রিপুরার প্রতি বছর প্রথম শ্রেণীর যাত্রাপার্টিগুলি গড়ে প্রায় নয়-দশ লক্ষ লোককে তাদের যাত্রাগান শোনায়। অথচ মরশুম শেষে সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতিত প্রায় প্রতিটি দলের মালিককে অর্থ সমস্যায় বিবর্ত দেখা যায়।

যাত্রা গানের অবদান, এর জনপ্রিয়তা আজ সর্বত্র স্বীকৃত। অনেক ক্ষেত্রে দেশের নেতারা জনসমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে যে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেন না যাত্রার দলের পালা দশকমেনে সেই প্রভাব সৃষ্টি করে। গত বছর মহাজ্ঞাতি সদনে বিপ্লবী নেতা দ্রৌলোকা চক্রবর্তী (মহারাজ) নাট্যভারতী থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টির “বিনয়-বাদল-দীনেশ” দেখে বলেছিলেন, স্বাধীনতালাভের পর স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদদের জীবনী বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় স্থান পাওয়া উচিত ছিল। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে স্বাধীন ভারতের, বিশেষ করে বাংলার বিদ্যালয়ে এই বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা বলা হয় না। যাত্রার মাধ্যমে “বিনয়-বাদল-দীনেশ” পালাভিনয়

করে নাট্যভারতী এক বিরাট শিক্ষারতীর দায়িত্ব নিয়েছে।

নাট্যভারতীর বিনয়-বাদল-দীনেশ বাদেও ভারতী অপেরার “সুখ সেন”, নিউ প্রভাস অপেরার “বিন্ধ্যী ভিলেনাম”, তরুণ অপেরার “লেনিন”, সত্যম্বর অপেরার “জালিওনালাকুগ” উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতার কাহিনী সম্বলিত পালা।

কিন্তু এই যাত্রাশিল্পকে বাঁচাবার কোন সরকারী প্রচেষ্টা নেই। সিনেমা, থিয়েটার, বিভিন্ন ধারার সংগীত লোকসংগীত প্রভৃতির জন্য সরকারী সাহায্য বা গ্রান্ট দেওয়া হয়, প্রয়োজনবোধে বহু টাকা ধারও দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু যাত্রাশিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার একেবারে উদাসীন। পরশু চড়া সুদে টাকা ধারের থেকে রেহাই পাবার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার দেবার কোন ব্যবস্থাও নেই। অথচ পশ্চিম বাংলার প্রায় পাঁচ হাজার শিল্পীর সংসার

নির্ভরশীল এই যাত্রা গানের উপর। শুনছি শ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মধ্যমন্ত্রী ডালহৌসী স্কোয়ারের নাম পরিবর্তনের উৎসবে নাট্যভারতীর “বিনয়-বাদল-দীনেশ” পালাভিনয়ের পর নাট্যভারতীকে ঐ দেশাঙ্গবোধক পালা প্রযোজনার সমস্ত খরচ সরকার থেকে দেবার ইচ্ছিত দিয়েছিলেন এবং ঐ উৎসব আয়োজন বিভাগের

তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী সেই টাকা দেবার সুপারিশও করেছিলেন। কিন্তু সেই দরখাস্ত বোধহয় নিয়মিত সরকারী ফাইলে চাপা পড়ে আছে।

রাজ্য সরকার যদি আজও যাত্রার প্রসারে উদাসীন থাকেন তবে হয়তো এই চরম সঙ্কটে যাত্রাশিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

দর্পণের পাঠকদের প্রতি

দর্পণের বন্ধুদের পাঠক ও গ্রাহকরা ভাকযোগে গ্রাহকচাঁদা দর্পণ অফিসে পাঠিয়ে সরাসরি গ্রাহক হতে পারেন। গ্রাহক চাঁদা ভাকমাস্তুল সহ যথাক্রমে বার্ষিক, বাৎসরিক ও ত্রৈমাসিক গনের, লাঞ্চে লাভ ও চার টাকা। এ ছাড়া আপনার শ্রু-পত্রিকা সরবরাহকারী মাধ্যমে অথবা স্থানীয় এজেন্টের কাছ থেকে নিয়মিত দর্পণ সংগ্রহ করতে পারবেন। এজেন্টের নাম ঠিকানা: জিপুরা মেসার্স বাপী মন্দির আশাউরা রোড, আগরতলা; জামলকুমার ঘটক, ধর্মনগর; মেসার্স নিউজ শেপার্ড এজেন্ট, রাধাকিশোরপুর; শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অরুণভট্ট নগর; রমিকলাল চৌধুরী, বিনোনিয়া। কোচবিহার জেলা পি, এন, লাহিড়ী, কোচবিহার শহর; উমেশচন্দ্র দে, তুফানগঞ্জ; সচিদানন্দ হুত, বাধাভাড়া, জলপাইগুড়ি জেলা; গণেশচন্দ্র রায়, জলপাইগুড়ি শহর; এ, ধর চৌধুরী আলিপুর হুয়ার; সুরেশ পণ্ডিত, সীতালপুর; মেসার্স লোকবাণী, ফালাকাটা; তরুণ লাহিড়ী গুণগুড়ি। দার্জিলিং জেলা: শঙ্কুনাথ কব শিলিগুড়ি পশ্চিম দিনাজপুর জেলা: সুনীলকুমার ঘোষা (খাদিমপুর বস্তিতলা) বাবুর বাট; অরুণ উপাধ্যায়, বীরপাড়া; মণিক গাঙ্গুলী কবদহ।

। অন্যান্য জেলার এজেন্টদের নাম আগামী সংখ্যায়।

ইতিহাস

প্রমোদকুমার রায়চৌধুরী
কবক বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে
লেখা সুন্দর একখানি নাটক
নাম ভিন টাকা যাত্র
রাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা-১২
ও অন্যান্য সস্তা পুস্তকালয়ে
পাওয়া যায়।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কতক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মূল মেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

জেলে পিটিয়ে মারার আদেশ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আবার জেলে হত্যা—পিটিয়ে
মারা হয়েছে নয়জন নকশালী
বন্দীকে। আরও অনেকে গুরুতর
আহত। সেই এক সরকারী ব্যাখ্যা :
ওরা জেল থেকে পালাতে চেষ্টা
করেছিল।

গত ডিসেম্বর থেকে সরকারী
হিসেব অনুযায়ী জেলে সাতচল্লিশ
জন বন্দীকে হত্যা করা হয়েছে।
হত্যার আসল সংখ্যা কত তার
কোন খবর দর্পণের পক্ষে দেওয়া
সম্ভব নয়। কারণ, অন্যান্য
যাদের পাওয়া যাবে না তারা জেল
থেকে পালিয়েছে বললেই কতৃপক্ষ
মকুব।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, যোল
জন বন্দী পালানোর চেষ্টা করে
এবং তখন প্রায় ষাট জন জেল কর্ম-
চারী বন্দকে আর লাঠি নিয়ে
ওদের আক্রমণ করে। বন্দীরা নিরস্ত
ছিল। ওদের নির্দয়ভাবে প্রহার
করে হত্যা করা হল। যারা মরল
না তারা গুরুতর আহত।

প্রশ্ন হল, কেন ষাট জনের
সশস্ত্র বাহিনী ওদের ধরে আবার
সেলে পরে দিল না।

তাহলে কি পিটিয়ে মারার
আদেশ ওপর থেকে এসেছে?

দর্পণ

১৪শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা ৥ শক্রবার ১৩ই আগস্ট ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

ঢাকার অবস্থা

সায়গনের থেকে খারাপ

গেরিলা যুদ্ধ ব্যাপক হচ্ছে

মার্কিন বুদ্ধিজীবী গ্রিকিথের

মতে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

মার্কিন দেশ থেকে এক জাঁদ-
রেল বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক উই-
লিয়াম গ্রিকিথ, গত সপ্তাহে ঢাকা
থেকে বাড়ী ফেরার পথে কলকাতায়
এসেছিলেন।

ঢাকায় যা দেখেছেন সেই সম্পর্কে
এক সাক্ষাৎকারে তিনি আলোচনা
করেন। তাঁর অভিমত : (এক)
পূর্ববঙ্গে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা
যুদ্ধ উত্তরোত্তর ব্যাপক হচ্ছে, আর
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)



শরণার্থী পরিদর্শণে কেনোডি। ছবি : শ্যামল মৈত্র

এডওয়ার্ড কেনোডকে নিয়ে অশোভন মাতামাত

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

মার্কিন সেনেট সদস্য এডওয়ার্ড
কেনোডি পূর্ববঙ্গের উদ্ভাসত
সম্পর্কে জানার জন্য ভারতে আসার
সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সংবাদপত্র
প্রচারে ফেটে পড়েছে।

মঙ্গলবার দমদম বিমান বন্দরে
নামার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউ-
নিয়নকে তিনি একটি চ্যালেঞ্জ দিয়ে
বসেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারত
সোভিয়েত চুক্তি যেন সোভিয়েতের
আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের
চ্যালেঞ্জে পরিণত না হয়।

তিনি বলেন, মার্কিন সোভি-
য়েত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক উদ্ভাসত
গ্রাণের ব্যাপারে, দেখা যাক এই দুই
দেশের মধ্যে কে কত বেশী গ্রাণের

ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে।
এই চ্যালেঞ্জ মার্কিন দেশ গ্রহণ
করতে প্রস্তুত।

এতদিন পর্যন্ত মার্কিন
সোভিয়েত এবং চীনের মধ্যে প্রতি-
দ্বন্দ্বিতা চলছিল কে কত বেশী
অস্ত্রসস্ত্র দিতে পারে পাকিস্তানকে।
সেই অস্ত্র পাকিস্তানী জঙ্গী-
শাহীকে গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে
তের বছর কায়ম রাখতে সাহায্য
করেছে। পূর্বাংশে মার্চ থেকে
বাংলা দেশে যে গণহত্যা সুরু হয়
তাও এই অস্ত্র দিয়ে।

এখন একদিকে সোভিয়েত
ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে চুক্তি করে
বাজার মাত করার চেষ্টায় ব্যাপ্ত,
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

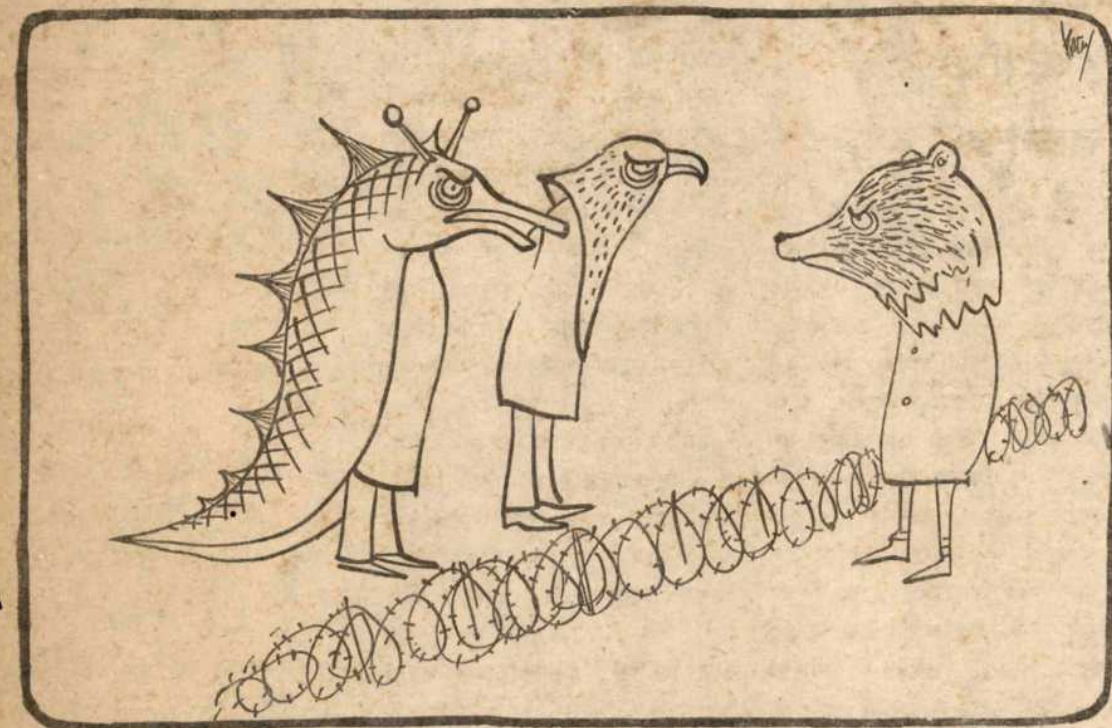
রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধার্থ রায়ের অন্যায় হস্তক্ষেপ

সিদ্ধার্থশংকর রায় পশ্চিম
বঙ্গের নাদশনালাইজড ব্যাংক-
গুলির আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে
হস্তক্ষেপ করতে সুরু করেছেন
বলে ব্যাংক মহল থেকে গুরুতর
অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ-
যোগ্য, এই কাজটি সম্পূর্ণভাবে
তাঁর এজিয়ার বহির্ভূত হলেও
নয়াদিল্লীর মারফত উনি কলকাতা
নাড়ছেন।

খবর পাওয়া গিয়েছে পশ্চিম-
বঙ্গে এলাহাবাদ ব্যাংক কর্মচারী
নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিযোগিতা-
মূলক পুরীক্ষার পর একটি তালিকা
রচনা করেন। কিন্তু নব কংগ্রেসী-

দের চাপে সিদ্ধার্থ রায় এলাহাবাদ
ব্যাংক কতৃপক্ষকে তালিকার
শীর্ষস্থান অধিকারী সাতটি
ছেলের নাম বাদ দিতে অনুরোধ
করেন। কেননা নব-কংগ্রেসীদের
মতে ওরা নাকি যথেষ্ট কংগ্রেসী
নয়। ব্যাংক কতৃপক্ষ স্বভাবতই
সিদ্ধার্থ রায়ের অনুরোধ মানতে
স্বীকা করে জানান, এর আইনগত
প্রশ্নও আছে।

তখন সিদ্ধার্থবাবু বলেন,
তালিকাটি পুর্লিশের কাছে পাঠানো
হোক। পুর্লিশ ভেরিফিকেশনের
সময় তিনি ঐ সাতটি নাম বাদ
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)



পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতির পদ নিয়ে হতুদ্বন্দ্ব অব্যাহত

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

সিদ্ধার্থ রায় ও বিজয় নাহার
বতই বলুন না কেন যে সর্ব-
সম্মতিক্রমে বা বেশীর ভাগ কংগ্রে-
সীর সম্মতি নিয়ে তারা পশ্চিমবঙ্গ
কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করতে
পারবেন কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা
দেখা যাচ্ছে না।

তরুণকান্ত যাতে সভাপতি হন
তার জন্য তার ভাই প্রফুল্লকান্ত
দ্বারা অর্থাৎ শতাব্দী জোর চেষ্টা

চালিয়ে যাচ্ছেন। তরুণবাবুর হয়ে
বেশ কয়েকটি জেলা কমিটির
প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীকে সেখান-
কার সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর
অজিলায় মোটা মাসোহারার প্রতি-
শ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ছাত্র পরি-
ষদ বা যুব কংগ্রেস দেবীপ্রসাদ
চট্টোপাধ্যায়কে কংগ্রেস সভাপতি না
করতে পারলে তরুণবাবুকে হয়ত
সমর্থন জানাবে। তাছাড়া সিদ্ধার্থ
রায়ও চান যে তরুণবাবুই কংগ্রে-

সের সভাপতি হোন। সিদ্ধার্থ-
বাবুর সঙ্গে দেবী প্রসাদ চট্টো-
পাধ্যায়ের ঠোকাঠুকি নাকি লেগে
উঠেছে। দেবীবাবু নাকি বলে-
ছেন যে তিনি বেশীরভাগ কংগ্রে-
সীর সমর্থন না পেলে নির্বাচনে
দাঁড়াবেন না, দিল্লীর তদবিরে তিনি
এই পদে অধিষ্ঠিত হতে চান না।
ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেস
দেবীবাবুকেই চান কিন্তু দুঃখের
বিষয় তিনশ পঞ্চাশ জনের প্রাদে-
শিক কংগ্রেস কমিটিতে তাদের
সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাছাড়া
তাদের নিজেদের ভেতরেও গণ্ডগোল
লেগেছে। অনেক জেলার ছাত্র
সংগঠন ও যুব কংগ্রেস জানিয়ে
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মচারী সামতির অভিযোগ

(দপর্ণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ নন গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সিজার্থ শঙ্কর রায়ের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। উক্ত স্মারকে তাদের আভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধা, বিভিন্ন বাস্তব অভিযোগ এবং পুলিশ কর্মচারীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আশু সুব্যবস্থার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অরাজকতা এবং সন্ত্রাসী রাজত্ব সুরু হওয়ার ফলে দিনের পর দিন সাধারণ পুলিশ কর্মচারীদের জীবনে যে অনিশ্চিত অন্ধকারের কালো ছায়া নেমে এসেছে, তাতে সাধারণ পুলিশ কর্মচারীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ক্রমশঃই বিপর্যয় হয়ে পড়ছে।

পুলিশ কর্মচারীদের এই সংগঠনটি আন্তর্জাতিক ক্ষমতা হলেও দীর্ঘ দিনের। উনিশশ উনসত্তর সালে বৃহত্তম সরকার কর্তৃক এই সংগঠনটি স্বীকৃত হবার পর থেকেই গোয়েন্দা দপ্তরের কিছু কিছু স্বার্থদুষ্ট অফিসার ও কোন কোন সাংবাদিক অত্যন্ত কৌশলে একে

অন্ধুরেই বিনাস করবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। তৎকালীন আই জি-কে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল হয়নি, বরং কোন কোন সংবাদপত্রে এই সংবাদকে বিকৃত করে ছাপানো হয়েছে। এর পর সমিতির সদস্যদের ব্যাপক হারে জেলা ও বিভাগের বাইরে বদলী এবং অন্যান্য বিভাগীয় শাস্তি দিয়ে কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকেন। এ বিষয়ে কোর্টে মামলা দায়ের করলে ইনজাংশন জারী করার ফলে ঐ নির্দেশ তখনকার মতো বন্ধ থাকে। তার পর রাজ্যপালের আমলে পয়লা নভেম্বর তারিখে এই সমিতির স্বীকৃতি নাকচ করা হয়। এবং আবার কোর্টের শরণাপন্ন হলে কোর্ট এবারো ঐ আদেশ কার্যকরী করা বন্ধ রাখেন। ফলে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কিছুতেই এই সমিতির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিলেন না।

বিগত উনিশশে মে তারিখে পরিকল্পিত পুলিশ হত্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশ কর্মীদের স্ট্রী ও মেয়েরা বর্ধমান পুলিশ লাইনে যে স্বাভাবিক বিক্ষোভ জানায় কর্তৃপক্ষ তাকে একটি "ইসদা" তৈরী

করে অন্যান্য জেলার নিরপরাধ পুলিশ কর্মীদের উপর এক চূড়ান্ত আঘাত হানেন।

উক্ত স্মারকলিপিতে পুলিশ কর্মচারীদের উপর আরো একটি অমানবিক ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়। বিগত আঠাশে মে তারিখে বর্ধমানে সাতজন বিচারাধীন আসামীকে পাঁচ জন পুলিশ কর্মীর প্রহরায় টেনে কাটোয়া পাঠানো হয়। সেই কারণে পুলিশ দল আসামী নিয়ে যাওয়ার জন্য একখানা গাড়ী চেয়েছিল। পুলিশ লাইনে বহু গাড়ী থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এদের গাড়ী দেন নি এবং টেনে যেতে বাধ্য করেছিলেন। ফলে শ্রীখন্ড স্টেশনে বাহিরগত উগ্রপন্থীদের পরিকল্পিত আক্রমণে তিনজন পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে নিহত ও অপর দুজন আহত হন। দুর্ঘটনা ঘটান পরই কাটোয়া থেকে জেলা সদরে সংবাদ পাঠান হয়। কিন্তু পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন ঘোষণা করেন নি। এই অবস্থায় জনিত দুর্ঘটনায় সর্হকর্মীদের বিক্ষোভ অব্যাহত নয়। তারপর পোস্টমর্টেম করা ছিন্ন ভিন্ন লাশের সংকলের ব্যবস্থা না করে পুলিশ সুপারের দুর্গাপুর ভ্রমণ কি প্রমাণ করে তাও বিবেচ্য। এই ঘটনা নিয়েই পরদিন পুলিশ লাইনে আবার পুলিশ কর্মীদের স্ট্রী ও মেয়েরা বিক্ষোভ জানাতে সমবেত হয়। বারবার সংবাদ পাঠানোর পাঁচ

(শেখাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারীর বন্ধুত্ব

(দপর্ণের সংবাদদাতা)

বাংলা দেশের - শরণার্থীদের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নয়াদিল্লীও সমর্থন করেন। কলকাতা আগের রাজ্য সরকার ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্ডিয়ান জি বি বি মন্ডলকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করে সমগ্র দায়িত্ব দিয়েছেন পুনর্বাসন কমিশনার ডঃ বি কে ভট্টাচার্যকে। কিন্তু আমেরিকান সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় নয়াদিল্লী নির্দেশ দিয়েছিল, বি বি মন্ডলকে এই সফরের দায়িত্ব দিতে হবে, ডঃ ভট্টাচার্যকে নয়। নয়াদিল্লী পরিষ্কারভাবে বলেছেন, তাঁরা মনে করেন, বি বি মন্ডল শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল।

জানা গিয়েছে, শরণার্থীদের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে অদলবদলের পিছনে রয়েছেন চীফ সেক্রেটারী এন সি সেনগুপ্ত স্বয়ং। তিনি তাঁর সহপাঠী বিশিষ্ট বন্ধু ডঃ বি কে ভট্টাচার্যকে একটা ভালো পদ দিতে চেয়েছিলেন। তাই প্রথম স্তরে বি বি মন্ডলকে পুনর্বাসন কমিশনারের পদ থেকে সরিয়ে নতুন পদ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্ডিয়ান জি বি বি মন্ডলকে কোনো অফিসার বা অধস্তন কর্মচারী দেওয়া হোলো না। অথচ কাগজে কলমে তিনিই শরণার্থীদের দায়িত্বে। বি বি মন্ডল দীর্ঘদিন যাবৎ পুনর্বাসন কমিশনার হয়েছেন। বৃহত্তম রাজ্যপালের শাসন, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলেও তাঁকে কেউ সরাননি। কোনো রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও নেই। কিন্তু কংগ্রেস-জাগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে চীফ সেক্রেটারী এন সি সেনগুপ্ত কায়দা করে ডি জি ইন্ডিয়ান জি বি বি মন্ডলকে সরিয়ে তার প্রিয় বন্ধু ডঃ বি কে ভট্টাচার্যকে পুনর্বাসন কমিশনার পদে নিয়োগ করেন।

তখনই রাইটার্স বিল্ডিং-এর উচ্চতম আমলারা বিস্মিত বোধ করেছিলেন। কেননা ডঃ বি কে ভট্টাচার্য অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত হলেও তাঁর প্রশাসনিক যোগ্যতার কোনো সন্ধান নেই। সরকারী মহলে ঠাট্টা করে তাঁকে বলা হয় "বোকা ভট্টাচার্য"। ডঃ ভট্টাচার্য সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত। সম্ভবতঃ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হবার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। কিন্তু উনি কুশলী মানুষ। চীফ সেক্রেটারীকে ধরে আছেন। তাই পুন-

র্বাসন কমিশনার হলেন। অন্যদিকে বি বি মন্ডল অফিসার ও কর্মচারীর অভাবে তাঁর বিরাট দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না। এই সম্পর্কে সরকারী আদেশও খুঁত ছিল। তাই বারবার অসুবিধে দেখা দিতে লাগলো। চীফ সেক্রেটারী বড়ি সেই খুঁত তৈরী করে রেখেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত ডি জি ইন্ডিয়ান জি বি বি একেবারে বিলোপ করে বি বি মন্ডলকে রেভিনিউ বোর্ডের এডিটর সন্যাল মেম্বর করলেন আর বি কে ভট্টাচার্যকে উষ্মাসু ও নবাগত শরণার্থীদের সমগ্র দায়িত্ব দিলেন। সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা চমক খেলো। কানাকানি চলছে, "বোকা ভট্টাচার্য কি এই দায়িত্ব নিতে পারবেন?"

কিন্তু কলকাতার কেন্দ্রীয় অফিসাররা বসে আছেন। তাঁরা চীফ সেক্রেটারীর স্বজন তোষণেব খেলা দেখছিলেন। এই সময় এলেন এডওয়ার্ড কেনেডি। ভারতের পক্ষে এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কেন্দ্রীয় অফিসাররা নয়াদিল্লীকে জানানো, ডঃ বি কে ভট্টাচার্যকে দিয়ে চলবেন। বি বি মন্ডলকে চাই। নির্দেশ এলো চীফ সেক্রেটারীর কাছে। তিনি বি বি মন্ডলকে অনুরোধ করলেন। মন্ডল সাহেব প্রথমে রাজী হননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নয়াদিল্লীর অনুরোধ শুনেন এডওয়ার্ড কেনেডির দায়িত্ব নিরেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য, চীফ সেক্রেটারীর এই স্বজন-তোষণের খেলার সিদ্ধান্তশংকর রায় নীরব দর্শক মাত্র।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতি শ্রীশান্তি সচিবের অবিচার

(দপর্ণের সংবাদদাতা)

মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ যে অকরণ তা সবারই জানা আছে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের বর্তমান সেক্রেটারী শ্রীসেনগুপ্ত মশায়ের হৃদয়হীনতা আগেকার সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে।

উনিশশো সাতাশটি সালের আগেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বি টি কলেজগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক সীট যাতে পাওয়া যায় তার জন্য শিক্ষারত শিক্ষকদের দাবী পূরণ করতে অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরিবর্তে একটা বিকল সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করতে সরকার রাজী হন। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বি টি পরীক্ষা ছাড়াই বি টি পাশ করা শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা দিতে সরকার সিদ্ধান্ত করেন।

নীতি হিসাবে সরকার ঘোষণা করেন যে, চল্লিশ বছরের বেশী বয়স্কদের বয়স হয়েছে এবং পাঁচ বছর ধরে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা যারা সমগ্র করেছেন অথবা চল্লিশ বছরের কম বয়স্ক যে সব শিক্ষক দশ বছরের অভিজ্ঞতা সমগ্র করেছেন তাঁদের সকলকেই বি টি পাশের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক বলে ধরে

নেওয়া হবে। ফলে তারা বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবেন। বর্তমানে বি টি পাশ না করা পর্যন্ত এঁদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রয়েছে।

কিন্তু বর্তমান শিক্ষা সচিব মহাশয় ও শিক্ষা অধিকর্তা সরকারের এই নির্দেশটিকে অকেজো করে দেবার জন্যে ফন্দী এঁটেছেন। যিনি আই এ এস অফিসার হিসেবে অকারণ বছরে অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকা গলাধঃকরণ করতে লজ্জা বোধ করেন না তিনি বছরে দশ টাকার কুপন বৃদ্ধি যাতে কিছু শিক্ষক না পান তার জন্যে অনবরত চেষ্টা করে চলেছেন।

তিনি বৃহত্তম ও গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন দরটো মন্ত্রিসভারই শিক্ষামন্ত্রীদের সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যাখ্যার জোরে অমান্য করে চলেছেন। সরকারের নির্দেশ ছিল উনিশ শ' ছিষটি সালের পয়লা এপ্রিল থেকে আদেশটি কার্যকরী করা হবে। কিন্তু সেনগুপ্ত মশাই ও তাঁর অধস্তন আমলারা একে ব্যাখ্যা করছেন যে উনিশ শ' ছিষটি সালের পয়লা এপ্রিল তারিখে বা তার আগে যাঁদের বয়স চল্লিশ হয়েছে এবং একই সঙ্গে পাঁচ বছরের শিক্ষকতার

অভিজ্ঞতা থাকবে কেবলমাত্র সেই সব শিক্ষকরাই বি টি না হয়েও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা পাবেন, অন্যরা নয়। অর্থাৎ এই সুবিধা তাঁরাই পাবেন যারা এই দেবদুল্লভ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন একই সঙ্গে পাঁচ অথবা দশ বছরের অভিজ্ঞতা সমগ্র করেছেন কিন্তু চল্লিশ বছরের অথবা তার চেয়ে বেশী বয়স্ক কেউ যদি ঐ নির্দিষ্ট তারিখের আগে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন এবং দুই বছর পরে তাঁদের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা হলে তিনি তা পাবেন না।

ফলে এই সুবিধা বড় কেউ পান নি, পাবার কথাও নয়। গত মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত মশাই বলেছিলেন যে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার কানুনটিকে তিনি সামন্ত মনোভাব সুলভ এবং অন্যায় বলে মনে করেন, তাই এই প্রথা তুলে দেওয়ার জন্যে তিনি আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেনগুপ্ত মশাই নির্বিকার, শিক্ষকদের দশ টাকা বার্ষিক বৃদ্ধি চেয়ে যাওয়ার চেষ্টায় তিনি এখনো তৎপর।

দপর্ণ

সংবাদ দাপ্তারিক

৪ চাঁদার হার ৫

বার্ষিক পনেরো টাকা
সাপ্তাহিক সাড়ে সাত টাকা
প্রমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, লট সেন, কলি-১৩

চীফ সেক্রেটারীর একগুঁয়েমার ফলে জুনিয়ার সিভিল সার্ভিসের কর্মীরা ক্ষুব্ধ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীরা আজ বিক্ষুব্ধ। বর্তমানে যখন পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসকগণ আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে এবং খুনোখুনির রাজনীতি বন্ধ করার জন্যে লোক দেখানো কর্মতৎপরতা দেখিয়ে চলেছেন তখন এরই আড়ালে পশ্চিমবঙ্গের গোটা প্রশাসনিক কাঠামো ধ্বংসে পড়ার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন স্তরের গেজেটেড অফিসার ও রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেসব সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, রাজ্যের প্রশাসনিক পরিস্থিতি যে অচলাবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে তা জেনেশুনেও কয়েকজন একগুঁয়ে জেদি মনোভাবাপন্ন আমলা ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। শেষ বলসের এসব আমলারা এখন নিজ নিজ আখের গুছোতেই ব্যস্ত। পরিশেষে রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরের কর্মীবৃন্দ ইতিমধ্যেই কঠোর মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন।

এদের বিভিন্ন অভিযোগ প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, রাজ্য সিভিল

সার্ভিস পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ) এবং পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র সিভিল সার্ভিস এ দুটো ভাগে বিভক্ত। সিভিল সার্ভিসের (এক্সিকিউটিভ) কর্মীসংখ্যা পাঁচশো এবং জুনিয়র সিভিল সার্ভিসে রয়েছেন তিরানব্বইজন। দুটি সার্ভিসেরই শিক্ষানবীশ কর্মীদের এক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। সার্ভিস কমিশন পরিচালিত একই বিভাগীয় পরীক্ষার পাশ করতে হয়। এবং প্রথম আট দশ বছর দুটো সার্ভিসের কর্মীদের একই পদে কাজ করতে হয়। এসব পদ-গলোর মধ্যে জেলা স্তরে লোন, মেজার ও রিলিফ বিভাগের ডেপুটি কালেকটর, ট্রেজারী অফিসার, আদিবাসী, ও উপজাতি-কল্যাণ অফিসার, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ভাই-রেজিষ্টার, স্পেশ্যাল অফিসার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদও রয়েছে।

অভিযোগে প্রকাশ, এসব দায়িত্বপূর্ণ পদে তথাকথিত সিনিয়র ও জুনিয়র সিভিল সার্ভিসের দুটো বিভাগ থেকেই কর্মী নিযুক্ত করা হলেও এবং চাকরীর অভিজ্ঞতা ও এক ধরনের কাজ করা সত্ত্বেও দুটি

ক্ষেত্রে দূরকমের বেতন। এবং একজন ডব্লিউ বি সি এস কর্মীর অপর একজন ডব্লিউ জে সি এস কর্মীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তুলনা-মূলকভাবে এক হওয়া সত্ত্বেও সামান্য নামের হেরফেরের জন্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় জনের চেয়ে দশগুণ আড়াইগুণ টাকা বেশী পান। পদমর্যাদার দিক দিয়েও জুনিয়র সিভিল সার্ভিস কর্মীদের হেনস্থা করা হচ্ছে। যেমন বছর দশেক একই পদে কাজ করার পর একমাত্র ডব্লিউ বি সি এস কর্মীরাই সাব-ডিভিশনাল অফিসার, এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন, অথচ জুনিয়রদের ক্ষেত্রে এসব পদ লাভ করতে হলে আরো দশ বারো বছর কাজ করানোর নীতি চালু হয়ে আসছে। যদিও আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যার সিভিল সার্ভিসের কর্মীরা গত নির্বাচনে কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার ফলে দুই সার্ভিসের সংযুক্তিকরণের আশ্বাস পেয়েছেন, কিন্তু পশ্চিম বাংলার জুনিয়র সিভিল সার্ভিস কর্মীদের এ দাবী এখনও উপেক্ষিত।

অবশ্য ১৯৬৭ সালে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে তৎকালীন সরকার

কর্তৃক নিযুক্ত পে-কমিশনে বিষয়টি উপস্থাপিত করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং পরবর্তী ধাপে উনসত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে পে-কমিশন দ্বারা সার্ভিসের সংযুক্তিকরণের পক্ষে সরকারের কাছে জোরালো সুপারিশ করেন। চেয়ারম্যান প্রবীণ আই সি এস প্রীকে কে হাজরা ছাড়াও কে জি বন্দ কপিল ভট্টাচার্য, সত্যেন সেন ও অন্যান্য কমিশনের সদস্যরা এ ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হন। তবুও সরকারী তরফে এ বিষয়ে আজও পর্যন্ত কোন সক্রিয় ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। গত তেরোই ফেব্রুয়ারী এক ডেপুটি সেক্রেটারী পে-কমিশনের রায়ে উল্লিখিত দুই সার্ভিসের সংযুক্তিকরণের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্যে চীফ সেক্রেটারীকে অনুরোধ জানানো হলে তিনি 'নীতিগত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম' জানিয়ে ঘটনাটি এড়িয়ে বান এবং নির্বাচিত সরকারের কাছে সমস্যাটি তোলায় আশ্বাস দিলেও গত কোলা-লিশন সরকারের আমলেও বিষয়টি, মন্ত্রিসভার কাছে উপস্থাপিত না করে কর্মীদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন।

জানা যায় জুনিয়র সিভিল সার্ভিস ছাড়াও আরও ছয়টি সার্ভিসের কর্মীদের মধ্যে সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ, কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, একসাইজ অফিসার, এগ্রিকালচারাল ইনস্পেক্টর অফিসার, এমপ্লয়মেন্ট ও লেবার অফিসারদের মোট দারুণ সার্ভিসের কর্মীরাও পে-কমিশনের সুপারিশমত সংযুক্তিকরণের দাবী নিয়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অচিরেই নেরে পড়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পে-কমিশন এসব সার্ভিসেরও সিনিয়র ও জুনিয়র ক্যাডার তুলে দিয়ে একটি মাত্র ক্যাডার করার সুপারিশ করেছেন। সরকারের তরফ থেকে এক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।

এছাড়া জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসাররা চীফ সেক্রেটারী এন সি সেনগুপ্তের সংগে দেখা করেন। তিনি দাবীদাওয়া শুনে সরকারের পক্ষে তা মেটানো বাধ্যতামূলক নয় বলে জানিয়ে দেন। অথচ উনিশশ উনসত্তর সনে বৃহত্তম স্তরের মধ্যমস্তরী ও উপমধ্যমস্তরী এদের সংগে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং অর্থদপ্তরের কমিশনার জিখিতভাবে জানান যে, পে-কমিশন সুপারিশ করলে সংযুক্তিকরণের দাবী সরকার মেনে নেবেন। কিন্তু অভিযোগে প্রকাশ, চীফ সেক্রেটারীর নিলম্বিত উদাসীনতার জন্যেই সংযুক্তিকরণ ও সমকাজে সম বেতন দেওয়ার নীতি কার্যকর হতে পারেনা। এক্ষেত্রে কোন সময়ে তিনি কর্মীদের দাবীদাওয়া নির্বাচিত সরকারের কাছে পেশ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আবার কোন সময়ে নিজেই বিষয়টিকে সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয় বলে সাফ জবাব দিয়ে বসছেন।

তাই কর্মীরা উত্তোজিত। প্রশাসনিক স্তরে মোট সাতটি সার্ভিসের কর্মী সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। খবর হলো, আগষ্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যে সার্ভিসের সংযুক্তিকরণ, সমকাজে সমবেতন ও পদমর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদির প্রবর্তন না করা হলে বা সরকারের তরফ থেকে নিশ্চিত কোন আশ্বাস না পেলে জেলাস্তরে, ব্লক পর্যায়ে, রাজস্ব আদায় ও আইন শৃঙ্খলার রক্ষায় সংগে জড়িত দায়িত্বশীল কর্মীরা রাজ্যসরকারকে দাবী মেনে নিতে বাধ্য করানোর জন্যে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নামছেন।

এদিকে রাইটার্সে শোনা গেলে, চীফ সেক্রেটারী এতদিনের একগুঁয়েমি বজায় রাখার জন্যে সিদ্ধান্ত রায়ের সংগে তাঁর অতিরিক্ত বিনষ্টতার সুযোগ নিতে চাইছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত রায় কি বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক কাজে জড়িত বিরাট সংখ্যক কর্মীদের দাবীদাওয়াকে উপেক্ষা করে চীফ সেক্রেটারীর ফাঁদে পা দেবেন?

নকশালদের শায়েস্তা করার জন্য সরকারের গোপন পরিকল্পনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইদানীংকালে জেল-পালানোর ঘটনাগুলির অজুহাতে রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রদেশের নকশালপন্থীদের শায়েস্তা করার জন্য একটি গোপন মার-দুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যদিও জনসাধারণের বক্তৃতে অসদ্বিধে হচ্ছে না যে, জেল ভাঙার প্রচারা এবং বন্দী হত্যার ব্যাপারে প্রতিটি ঘটনাতেই জেল কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার রয়েছে। এ বিষয়ে সর্বশেষ জব্দলন্ত প্রমাণ রয়েছে আসানসোলার ঘটনায়।

দর্পণ নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছে যে বিভিন্ন জেলে নকশালপন্থীদের সঙ্গে অন্যান্য যে সব সাধারণ বন্দী রয়েছে, তারা যাতে নকশালদের দ্বারা প্ররোচিত কিংবা সংগঠিত না হতে পারে তার জন্য একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যে সব জেলে বর্তমানে নকশালপন্থীর সংখ্যা অধিক, সেই সব জেলে সম্পূর্ণভাবেই নকশাল বন্দীদের আটক

রাখা হবে। অন্যদ্য, সাধারণ বন্দীদের দূরবর্তী ছোটখাটো জেলগুলিতে প্রেরণ করা হবে।

সরকার আরো বুঝতে পেরেছে যে, ক্রমে ক্রমে বন্দীর সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে, জেলের বন্দীসংখ্যা না কমালে আর নিস্তার নেই। তদুপরি দিকে দিকে বিজলবী আবহাওয়া আরো প্রবল হয়েছে। তাই সাধারণ বন্দীদের তাজুতাজু ছেড়ে দিতে হবে। যে সমস্ত সাধারণ বন্দী পনেরো কুড়ি বছরের শাস্তি নিয়ে রয়েছে, তাদের "স্বাধীনতা দিবস মার্কা", "গান্ধী মার্কা", "আই জি মার্কা" প্রভৃতির সাহায্যে ছয়, সাত বছরের হিসেবেই ছেড়ে দেওয়া হবে। সব চাইতে বড় কথা, আগামী বছর স্বাধীনতার "জুবিলি ইয়ার" ঘোষণা করে এই সব বন্দীদের শাস্তির কাল যাতে দুই তিন বছরে গিয়ে দাঁড়ায়, তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এছাড়া এক রাজ্যের নকশাল বন্দীদের অপর রাজ্যে চালান করে স্থানীয় বন্দী-অভিভাবকদের

আন্দোলন ব্যাহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা বন্দীকে নিজের রাজ্যে রাখলেই অভিভাবকদের সঙ্গে সরকারের তুলকালাম বেধে যেতে পারে। যে কারণে বেশ কয়েকমাস পূর্বে আসানসোলার বেশ কয়েকজন প্রথমসারির বন্দীকে হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হয়েছে। এর ফলে অভিভাবকেরা বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বদগোড়ার ঘটনায় খুঁত মিসেস টেলারের সঙ্গে তার এক আত্মীয় লন্ডন থেকে হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে দেখা করতে এসেছিলেন, কিন্তু তাকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। এই সব নানা কারণ-ণেই হাজারীবাগ জেলের সাধারণ বন্দীদের শীঘ্রই ভাগলপুরে জেলে প্রেরণ করা হবে। কেননা শোনা যাচ্ছে, বিহারের হাজারীবাগ জেল এবং বক্সার জেল নকশাল পন্থীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। সেখানে অন্য কোন বন্দীকে রাখা হবে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বুঝতে হচ্ছে বাংলাদেশের লেখকদের বই পড়ুন

● বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা-
দেশ সহায়ক সমিতি সম্পাদিত

● রক্তাক্ত বাংলা

—বাংলাদেশের খ্যাতনামা
লেখকদের প্রবন্ধ-সংকলন

● প্রতিরোধ সংগ্রামে

বাংলাদেশ
—সত্যেন সেন

● জাগ্রত বাংলাদেশ

—আহমদ হুদা

● তিনমাসের দিবসিপি

—আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

● বাংলাদেশ কথা তবু

—মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে
বাংলাদেশের বিশিষ্ট গল্প-
কারদের গল্প-সংকলন

তা' ছাড়া

বাংলাদেশে একাধিক
প্রগতিশীল গ্রন্থসমূহ

মুক্তিযুদ্ধ

দ্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১ গ্রান্ডি বাগান সেন, কলিকাতা-১
ফোন : ৩২ ৬৭২
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ বকিং স্ট্রাট
কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৩-২৭৪

অনুগম ভা

দড়ই
আজকাল দেশের সংবাদপত্র থেকে
অসংলগ্ন করে আকাশবাণী প্রত্যেকেই
সি পি আই এর এল-এর নামে বিভিন্ন
রকমের কুৎসা ও অপপ্রচার চালাচ্ছে।
এক ভাবে সাধারণ মানুষ মিশে-
হারা হয়ে পড়ছে। সম্প্রতি বীরভূমের
ঘটনাবলী সম্পর্ক যুক্তান্তর আলম-
বাজার প্রকৃতি পরিদপ্তার একই
ভাবে সংবাদ পরিবেশন করেছে। বহু
কল্প বহু ঘটনা যা বিশেষ তাৎ-
পর্যপূর্ণ তা কিন্তু এ সব পরিকাতে
জাপা হলনি। তার কয়েকটি নমুনা
তুলে ধরি।

বিগত জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বীরভূমে চারি জনকাত্তর হার প্রচণ্ড বেড়ে যায়। তার পেছনে কিন্তু বহু পদলিখ অফিসার এবং স্থানীয় জোতদারের হাত বেশ ভালো রকম ছিল। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে বীরভূমের বহু গ্রামেই লাল সন্ধ্যাস সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতীশদর বেশ আতঙ্কিত হয়েছিলেন এবং তাদের গতিাবিধি নিরান্বিত হয়েছিল। সবে তখন কৃষক দ্রমিকরণ ক্ষমতার স্বাদ পেতে সদর করেছেন এবং মোটামুটি ভাবে বেশ অনুকূল অবস্থা ছিল সি পি আই এম এলের। ঠিক এই সময়ে কংগ্রেসী বিচক্ষণ জোতদারের পরোচানায় বহু পদলিখ অফিসারদের উচ্চনীতিতে চারি ডাকাতের হিড়িক পড়ে যায়। এইসব কংগ্রেসী জোতদাররা এবং পদলিখ অফিসারগণ মনে করেছিলেন যে এই সময়ে যদি ডাকাত, চারি ইত্যাদিতে কৃষক তথা মুহনতী মানদ্রদের লিপ্ত করা যায়, তাহলে নকশালী আন্দোলন চোরাবাগিতে আটকে যাবে। তাদের অনুমান ঠিকই, কারণ অতি আয়সে যদি কেহ উপার্জন করতে পারে তাহলে সে ত্যাগ স্বীকার করতে কোনক্রমে রাজী হবে না।

একথাও সভ্য যে এই সময়ে নক-
শালী যুব ছাত্ররা একেবারে নিরাশ
হয়ে গিয়েছিল এবং সি পি আই
আই এম এলের রাজনীতির প্রচার
প্রসারও তখন সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু-
কেন্দ্রমারী মাঠের মধ্যে স্থানীয় কমিটি
থেকে আদেশ জারী করা হয় যে
চুরি ডাকাতি বন্ধ করার জন্য জন-
গণকে সাহায্য করুন। এই সময়ে
দলের ক্যাডারগণ প্রচণ্ড ভাবে সজ্জা
দিয়েছেন এবং জনসাধারণ সহযোগিতা
করেছেন। বহু জায়গায় বহু সংঘর্ষ
হয়েছে এই ডাকাত গুরুত্ব জোতদার-
দের সঙ্গে। বেশ কিছু ডাকাতকে
খতম করা হয়েছে। কয়েকজন পকেট-
মার ও ছিনতাইকারীদের মার দেওয়া
এক খতমও করা হয়েছে। বেশ কিছু
ছিনতাইকারীদের প্রকাশ্যে নাম ঘোষণা
করা হয়েছে তাদের সাবধান করে
দেবার জন্য। লিউডী শহরে রাম
ডাকাতকে খতম করা হয়েছে। এই
শহরে ছিনতাইবাজ নীলু সেখকে
(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠার)

ମହାମତ

বেঙ্গোছিয়া অঞ্চলে শুভ্রানী

আমার আশঙ্কা যে, প্রশাসনের
দায়িত্বে বঁরা আছেন তাঁদের পরি-
চিত এবং আপনদের দ্বারা সং-
গঠিত এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ-
বন্দি এইভাবে অস্বাভে চলতে থাকে
এবং বন্দি সরকার ও পদলিখ প্রশা-
সন অনুদ্রুপ কার্যকলাপ অবসানের
জন্য আন্তরিকভাবে আগ্রহী না হন
তাহলে সর্বদলীয় সম্মেলনে
গৃহীত সিদ্ধান্ত ফাঁকা বদলিতে
পরিণত হবে।

পরিবেশে একটা কথা উল্লেখ করে
লেখা শেষ করব। 'রামপদ্রহাটে সি.
পি. এম নামধারী 'দুবু'বুদের' সঙ্গে
নাকি ওদের লড়তে হয়েছে। পর্ব-
বেক্ষক তাদের পরিচয় জানালে ভালো
হত। আমরা জানি উল্টো কথা।
রামপদ্রহাটে ধানার ব্যাপক অঞ্চলে
সি. পি এম-এর নেতৃত্বে সংগঠিত
কৃষক আন্দোলন থাকতে ওদের
অনুপ্রবেশে অসুবিধা হাছিল। তাই
ওরা সি. পি. এম এর যুবকমণী মাধা-
নিক শিক্ষক হাষিকেশ দত্তের জীব-
নের উপর কংগ্রেসীদের সঙ্গে মিশে
দই দইবার হামলা করে। সি. পি
এম-এর শক্ত ঘাঁটি কল্লগড়া গ্রামের
কংগ্রেসী জ্যোতদারদের প্ররোচনার ও

যুগান্তরের নিরপেক্ষতার নমুনা

মজাব ব্যাপারটা একবার দেখুন।
ইঙ্গিতের ধর্মঘটের উদ্যোগীদের কোন
নাম উল্লেখ নেই অথচ কৌশলে ছাত্র
পরিষদের নামটা একাধিকবার উল্লেখ
করা হয়েছে। ছাত্রপরিষদের প্রচারপত্র
যুগান্তরের কাছে জানতে ইচ্ছে হয়
প্রগতিশীল ছাত্র সংস্থাগুলির নামে
ক' তাদের এতই ভয়? নিরপেক্ষতার
আড়ালে যুগান্তরের এই ভণ্ডামি
আর কতদিন চলবে?

ଅରୁଣ ବନ୍ଦ,

দাশকুমারী সেন.

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়

শকিল হাশান

পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তানের শনিক শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব আজ সমগ্র আপোষের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে পূর্ব বাংলার বকে এক সশস্ত্র সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে। আর এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রাণবলি দিতে হচ্ছে পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরীহ মেহনতী জনগণকে। সৃষ্টির পর থেকেই আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক পাকিস্তানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় যে সকল দ্বন্দ্ব প্রাধান্য লাভ করে তাদের মধ্যে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের শনিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব অন্যতম। এই দ্বন্দ্ব বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ এবং স্থানীয় সামন্তবাদী শোষণেরই ফলস্বরূপ।

উনিশশ সাতচল্লিশ সালে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের চক্রান্তে স্বাধীনতার নামে আপোষে পাক-ভারতের শনিক ও সামন্ত শ্রেণীর নিকট পাক ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ বিন্দুমাত্র কমেই, বরং তাদের এ নয়া ঔপনিবেশিক শোষণে উভয় দেশই অদ্যাবধি জর্জরিত। সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে পড়ে পাকিস্তান উনিশশ সত্তর সালের জুলাই মাস পর্যন্ত মোট পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে প্রতিবছর এই পর্বত-প্রমান ঋণ ও তার সুদ হিসাবে নয়া ঔপনিবেশিক কালদার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ২২.৫ ভাগ সাম্রাজ্যবাদীদের কুক্ষিগত হচ্ছে। উনিশশ সত্তর সালের জুলাই মাসে দেউলিয়া পাকিস্তান সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ দাবী করলে পাকিস্তানে 'ঘনীভূত আর্থিক সঙ্কট' (saturated point of Economic debt servicing charge, অর্থাৎ যখন কোন দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা পঁচিশ ভাগ ঋণ ও সুদ হিসাবে দেয়া হয়) সৃষ্টির আশংকায় বিশ্বব্যাঙ্ক তা প্রত্যাখ্যান করে। বাস্তবপক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণে বহুপূর্ব থেকেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল এবং ক্রমশই তা তীব্রতর হচ্ছিল, উনিশশ সত্তর সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানকে ঋণদানে বিশ্বব্যাঙ্কের অসম্মতিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ফলে পাকিস্তানী শনিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার শনিকশ্রেণী সহ সমগ্র পাকিস্তানের জনগণকে অস্বাভাবিক হারে শোষণ করতে থাকে। বার পরবার পাকিস্তানী শাসক শনিক ও পূর্ব বাংলার শনিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলেছে এবং বর্তমানে তা সশস্ত্র রূপ লাভ করেছে পূর্ব বাংলার শনিকশ্রেণীর যা কখনোই কাম্য ছিল না।

পাকিস্তানী পূর্ব বাংলার উর্দু-শনিক শ্রেণীকে শোষণের ক্ষেত্রে অধিকার অর্থাৎ বাণিজ্যিক সুবিধাদি থেকেও বঞ্চিত করে পূর্ব বাংলার কাঁচা মাল ও বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের বিকাশ ঘটতে সচেষ্ট হয়ে উঠে। তারা পূর্ব বাংলার প্রায় সমগ্র শিল্পকে হয় নিজেরা একচেটিয়া ভাবে দখল করেছে (যেমন পাট, তুলা, চা-ইত্যাদি শিল্পের সমগ্র কলকারখানা ও বাগানের মালিক হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিপতিরা), নতুবা সংকোচন নীতির মাধ্যমে তাদেরকে উচ্ছেদ করেছে (যেমন পূর্ব বাংলার লুপ্তপ্রায় বিভিন্ন কুটিরশিল্প)। এমনকি পাকিস্তানের সমগ্র ব্যাঙ্ক ও বাঁমা প্রতিষ্ঠান সমূহের মালিকরাও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। বাস্তবপক্ষে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানী শোষক-ও শাসকেরা একটি কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্র এবং নিজদের উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজার হিসাবে ব্যবহার করে আসছে।

সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পাকিস্তানের শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর পূর্ব বাংলার জনগণের উপর এই ঔপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ (অসামঞ্জস্যপূর্ণ একচেটিয়া পুঁজির শোষণ, কুক্ষিগত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শোষণ, সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার শোষণ অগন্তান্ত্রিক দমনমূলক রাজনৈতিক শোষণ) পাকিস্তানের শাসক শনিক শ্রেণী ও পূর্ব বাংলার শনিক শ্রেণীর মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। উনিশশ পঁয়তাল্লিশ সালে পূর্ব বাংলার সামন্ত ও শনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার শনিকট শোষণের অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের একচেটিয়া শাসক শনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। উগ্রজাতীয়তাবাদের আড়ালে ছয় দফার এ আপোষের রাজনীতি পূর্ব বাংলার শোষিত জনগণকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু উনিশশ একাত্তর সালে পূর্ব বাংলার রাজনীতি সচেতন এই সংগ্রামী জনগণের চাপে পড়েই পূর্ব বাংলার শনিক শ্রেণীর নেতা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব সরাসরি আপোষের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী তাদের শাসন ও শোষণ বজায় রাখার স্বার্থে উলঙ্গ ভাবে শনিক শ্রেণী সহ পূর্ব বাংলার জনগণের উপর চালিয়েছে পৈশাচিক আক্রমণ।

বর্তমান যুদ্ধ ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়

পূর্ব বাংলার মুক্তি যুদ্ধ চলছে এবং চলবে। পূর্ব বাংলার

শোষিত নিপীড়িত জনগণের এই বিপ্লবী যুদ্ধের আঘাতে ভেঙ্গে পড়ছে শোষক ও শাসক শ্রেণীর প্রতিটি শোষণের দেয়াল। শোষণ ও শাসন রক্ষা কল্পে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টরা পূর্ব বাংলার বকে আজ যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে সে সঙ্কটের বেড়াডালে তারাও আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পূর্ব বাংলার ব্যাপক কৃষক ও শ্রমিক ইত্যাদি ফলে পূর্ব বাংলার 'কৃষিকর্ম' হয়েছে ব্যাহত, কলকারখানা হয়েছে বন্ধ। রপ্তানীযোগ্য পণ্য পাট, তুলা, চা, চিনি, চামড়া, কাগজ, নিউজ প্রিন্ট সার ও সিমেন্টের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবার ফলে পাকিস্তানী শোষক ও শাসকেরা (শতকরা তিয়ান্নর ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারছেন না। শব্দ তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও শিল্পের সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে, কারণ সেখানকার কলকারখানার অধিকাংশ খুচরা অংশই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়, রপ্তানী বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমদানী বন্ধ হওয়ায় খুচরা অংশের অভাবে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয় কেন্দ্র ছিল পূর্ব বাংলার

বাজার সমূহ; বর্তমানে উক্ত বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত সামগ্রী অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে। উৎপাদিত পণ্যের কার্টা না হওয়ায় ঐ স্থানের বস্ত্র শিল্প, রেশম শিল্প বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মেশিন টুলস, চীনা মাটির ঠেজসপত্র, ইলেকট্রিক সরঞ্জাম ও খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রস্তুত কারক কলকারখানা গুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাটাই যা পশ্চিম পাকিস্তানের মেহনতী মানুষকে সংগ্রামী ও বিপ্লবমুখী করে তুলছে। বর্তমানে পূর্ব বাংলা ও একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের এই তীব্র শিল্পসঙ্কট পাকিস্তানী শাসক শনিক গোষ্ঠীকে বিরত ও দিশেহারা করে তুলছে।

এছাড়া পূর্ব বাংলা থেকে রাজস্ব খাতে বৎসরে আদায়ীকৃত যোল কোটি টাকা, সড়ক পরিবহণ, রেল, নৌপরিবহণ, ডাক ও তার, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সরকারী সংস্থাগুলি থেকে আদায়ীকৃত বৎসরে প্রায় তিরিশ কোটি টাকা থেকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী হচ্ছে বঞ্চিত। ইতিমধ্যেই পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ব্যক্তিসমূহ থেকে প্রায় ষাট কোটি টাকা হয়েছে অপহৃত। পূর্ব বাংলার যুদ্ধ পরিচালনা করতে শাসক গোষ্ঠীর দৈনিক খরচ করতে হচ্ছে প্রায় এক কোটি টাকা। নর-পিণ্ডাচ ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার, নির্মম গণহত্যা, অগ্নি-

সংযোগ লুটপাট ও নারী নির্যাতনের সংবাদ আজ বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের জনগণের তাঁর ঘৃণা কুড়োচ্ছে, তাই পাকিস্তানের শাসক ও শোষক ক্ষমতাসীনদের শর্ত আবেদন সত্ত্বেও বৈদেশিক সাহায্য লাভে পাকিস্তান হয়েছে ব্যর্থ। মোটকথা উপরোক্ত কারণে পাকিস্তান আজ একটি সম্পূর্ণ দেউলিয়া স্থিতিহীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমান আর্থিক সঙ্কট আজ পাকিস্তানের শাসক ও শোষক শনিক শ্রেণীকেও গ্রাস করতে উদ্যত। এমনি দিশেহারা অবস্থায় তারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য ধর্ণা দিয়ে বেড়াচ্ছে। বৈদেশিক ঋণের দেয় সুদ পরিশোধে অক্ষমতা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নিকট সময়ে চেয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে, এমনকি সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীদের নির্ধারিত পারিশ্রমিক প্রদান করতেও পাকিস্তান সরকার অক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। অবশেষে একশ টাকা ও পঁচিশ টাকার নোট বাতিল করে দিয়ে আর্থিক সঙ্কটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত পাকিস্তানের শোষক শ্রেণী এটাই প্রমাণ করে চলেছে যে, বিশ্ব-ইতিহাসের পরিচালক শক্তি জনগণের সামনে অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের মত তারাও আজ এক কাগুজে বাঘ ছাড়া কিছুই নয়।

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে অচলাবস্থা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্টস এ্যান্ড ড্রাফটসম্যানশিপ' এর অবস্থা মর্মান্তিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে। দীর্ঘ ৭৮ বছরের ঐতিহ্যবাহিত চারুকলা শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। এক সময় অবনীন্দ্রনাথ, চৈতন্য ক্রামরিশ, ও সি গাঙ্গুলী এবং প্রদ্যোৎ ঠাকুরও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমন কি অধ্যক্ষের আসনে স্থান পেয়েছিলেন অতুল বসু থেকে শূরু করে নীরদ মজুমদার প্রমুখ দিকপালেরা।

বিস্তৃত উনিশশ উনসত্তর সাল থেকেই এই বিপন্ন অবস্থার সূচনা। তৎকালীন পরিচালক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল। কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাদের খামখেয়ালীপনা এবং তহবিল তহরুপ। তবুও তখনকার মতো প্রতিষ্ঠানের কাজ কোন রকমে চালিয়ে নেওয়ার জন্য একটি রিঅরগানাইজিং কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু হা হতোস্মি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে গেল। শিক্ষকরা তো নিম্ন-মির বেতনই পান না, তদুপরি তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোন হিসেব পাওয়া যাচ্ছিল না। তার-

পরেই রিঅরগানাইজিং কমিটির সঙ্গে পরিচালক মন্ডলীর মারমার কাটকাট অবস্থা। ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-কর্মচারীরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাই নিয়ে শূরু হল মামলা মোকদ্দমা।

তখন হাইকোর্ট কতৃক রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ শ্রীহরমন্ড বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করে আবার একরকম জোড়াতালি দেওয়া হল। ক্ষমতা পেয়ে হিরমন্ডবাবু কিছু উন্নতির চেষ্টা অবশ্য প্রথম প্রথম করলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ভাঙা নৌকায় পাল তোলার মতো। তবু তখন রবীন্দ্রভারতী এই প্রতিষ্ঠান অনুমোদন করে এবং এখানকার স্নাতকেরা রবীন্দ্রভারতী প্রদত্ত ডিগ্রীমা পেতে থাকেন। কিন্তু তারা আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার আসল ব্যাপারটাই এড়িয়ে যান।

সুতরাং এক কথায় বলতে গেলে বেতন ছাড়াই দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষকরা অনটনের মধ্যে দিয়ে ছাত্র প্রীতি এবং শিল্প প্রীতির দায়ে সেবা করে আসছেন। কিন্তু পেট খালি রেখে এই সেবা আর কতদিন? সত্যি বলতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে এমন পারস্পরিক প্রীতি আজকের দিনে লক্ষ্য করা যায় না। বর্তমানে প্রাক্তন পরিচালক-

মন্ডলীর অন্যতম জে পি. মিত্র এবং রিঅরগানাইজিং কমিটির অন্যতম ডঃ ভূপাল বসুর মধ্যে মোকদ্দমা চালু থাকার জন্য আদালতের নির্দেশানুসারে এই বিরোধের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারছেন না। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ সুহাস রায় আমাকে জানানেন, সরকার যদি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অবিলম্বে না গ্রহণ করেন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ধ-করী সাহায্য যদি না পাওয়া যায়, তবে এ প্রতিষ্ঠান কিছুতেই টিকতে পারে না। তিনি আরো বলেন, এই কলেজ পরিচালনার ভার এমন ব্যক্তিদের হাতে যেন সরকার দেন, যারা শিল্পী না হলেও অন্তত মনেপ্রাণে শিল্পদরদী।

এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিল্পী চিন্তামণি কর বললেন, যদি সরকার এই প্রতিষ্ঠানটির দিকে কোন দৃষ্টি না দেন এবং গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে উঠতে না দেন, তবে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা শিল্পের স্বার্থে তীব্র আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

এখন এই চারুকলা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা চারশো, শিক্ষক পনেরো এবং কর্মচারীর সংখ্যা দশ। (শেষাংশ লুপ্ত পৃষ্ঠায়)

ভারত সরকারের একচেটিয়া পুঁজিপতি তোষণের চেহারা

(অর্থনৈতিক সংবাদদাতা)

আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্প্রসারণ রোধ করার গালভরা কথা শোনা যাচ্ছিল। মহলানবিশ কমিশনের রিপোর্ট এবং পরে ডঃ আর কে হাজারীর রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর গোটা কয়েক একচেটিয়া পুঁজি-মালিকানা দেশের শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রিকতা কি ভাবে দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে, এবং কি ভাবে দীর্ঘকাল ধরে আমলাতান্ত্রিক সহায়তা ও রাষ্ট্রীয় আর্থিক নীতির ফলে দেশের লক্ষ্যীকৃত মূলধন গরীবের পরিবারের কৃষ্ণিগত হয়ে পড়েছে তা জেনে জনসাধারণ স্তম্ভিত হয়েছেন।

বঙ্গ বাহুল্য ভারতের অর্থনীতি বিকাশের যে পুঁজিবাদী ধারা দেশের সমগ্র মূলধন এবং সম্পদকে কয়েকটা মাত্র পরিবার ও তাদের সেবাদাস কয়েক হাজার আমলা এবং নানা স্তরের উচ্চবিস্তারিত পরিবারের করতলগত করতে সহায়তা করেছে, তার ভয়াবহ শোষণের রূপ দেশের কোটি কোটি মানুষের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই দেশের একচেটিয়া পুঁজি মালিক টাটা, বিড়লা, মার্টিং বর্ণ প্রভৃতি শোষকদের শোষণকে সীমিত করার দাবী বারে বারে দেশের স্পোর্টসমেন্টে ও তার বাইরে বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে।

এই একচেটিয়া শোষণকে সংকুচিত করার পক্ষে জনমত প্রবল হয়ে উঠার ফলে, দেশের শাসকশ্রেণীর প্রধান দল কংগ্রেস তার রাজনৈতিক কৌশল বদলে, নব-কংগ্রেস রূপ ধারণ করে, নবরূপে একচেটিয়া তোষণ নীতি কি ভাবে অনুসরণ করে চলেছে তা দেখলে তাক্তব বনে যেতে হয়।

এতদিন ধরে দেশে পুঁজিবাদী পথে সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের যে ধারা অনুসরণ করা হয়েছিল, সেটা যে আকস্মিক কোন ঘটনা নয়, রাষ্ট্রীয় সাহায্যেই একচেটিয়া পুঁজির প্রসার ঘটেছে সেই কথাটা গোপন করার জন্যে হঠাৎ কংগ্রেসের একদল তথাকথিত প্রগতিশীল ভদ্রলোক বিষম চীৎকার শুরু করে দিলেন। সংসদে একটা আইন পাশ হল, সেই আইনে একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা যাতে আর না বাড়তে পারে, তার জন্যে নতুন শিল্পপ্রসারের লাইসেন্স দেবার সময় এই বৃহৎ কোটিপতিদের বাদ দেবার নির্দেশ দেওয়া হল।

সঙ্গে সঙ্গে নব-কংগ্রেসী 'প্রগতিশীলরা' এবং তাদের বাজনদারেরা দেশের লোককে বোকাতে চাইলেন যে এই আইনের ফলে একচেটিয়া পুঁজির প্রসার বন্ধ হবে, ছোট ও মাঝারি শিল্পগুণ্ডিল বিকাশ হবে। দেশে সমাজতান্ত্রিক

ব্যবস্থা কয়েক হবার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু পুঁজিবাদী পথে পা বাড়ানোর পর আর যে একচেটিয়া পুঁজির বিস্তারের হাত থেকে রক্ষা পাবার পথ খোলা থাকে না, সে কথা লুকিয়ে রাখার নব-কংগ্রেসী প্রচেষ্টা অত্রের ব্যর্থ হয়েছে।

নব কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারকে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা রক্ষিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে যদি একচেটিয়া পুঁজি সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে বড় বড় একচেটিয়া মালিকেরা পশ্চিমবঙ্গের মত আইনশৃঙ্খলাহীন রাজ্যেও বেশ বড় বড় কারখানা স্থাপন করার উপযুক্ত লক্ষ্যী করতে প্রস্তুত। এবং কেন্দ্রীয় সরকার নাকি এতে গর-রাজী নন। তাহলে কি বঝতে হবে যে এই একচেটিয়া মালিকদের প্রসাদপূর্ণ যে সব সংবাদপত্র দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্যী উঠিয়ে শিল্পপতিরা চলে যাচ্ছে এবং তার ফলে বেকারী বাড়ছে বলে প্রচার চালাচ্ছিল তা আসলে অবাধ একচেটিয়া পুঁজি প্রসারের ব্যবস্থা পাকা করে নেওয়ার জন্যে একটা চতুর চালান কি মাত্র?

এ সব কথা বাদ দিলেও, কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রদত্ত বিবরণ থেকে এই সব একচেটিয়া মালিকদের প্রতি যে দরাজ হাতে দাক্ষিণ্য বিতরণ করা হয়েছে, এবং যেভাবে সংসদের আইনকে বৃদ্ধাগুষ্ঠ দোখিয়ে তা করা হয়েছে সেটা জানলে এদেশের মানুষ স্তম্ভিত হবেন।

উনিশশ একাত্তর সালে সংসদীয় নির্বাচন ঘোষণা করার পর মাত্র চার মাসে একচেটিয়া আইন লঙ্ঘন করে স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকার এই সব ঘোষিত একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের যে সব নতুন শিল্প-স্থাপন ও প্রসারের লাইসেন্স দিয়েছেন, তার একটা তালিকা আমরা পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। এই তালিকা দেখলেই তারা বঝতে পারবেন যে বর্তমান নব-কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার কোন শ্রেণীর সেবাদাস, কাদের নির্দেশে ও সমর্থনে তারা গরীবী হঠাৎয়ের ধুরা তুলে গরীব হঠাৎয়ের পথে অর্থনীতিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন।

আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় যে একাত্তর সালের নির্বাচনের ঠিক আগে এবং পরে মোট চারমাসের মধ্যেই এই লাইসেন্সগুণ্ডি ও নতুন অনুমতি পত্র দেওয়া হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে গরীবী হঠাৎয়ের নামে যখন দেশে প্রচারের ঝড় বইছিল তখনই গোপনসূত্রে কাঁধা এই নব-কংগ্রেসী সরকার দরাজহাতে একচেটিয়া মালিকদের এই লাইসেন্স ও অনুমতি পত্র বিতরণ করে চলেছিলেন। ফলে বাঘা বাঘা শিল্পপতিরা কি দরাজ হাতে

তাদের নির্বাচনী ভাণ্ডার ভরে দিয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। পাশের তালিকার আমরা পুঁজির একচেটিয়া মালিকদের নাম ও লাইসেন্স ও অনুমতিপত্র বিতরণের সংখ্যা উপস্থিত করছি। পাঠকেরা নিজেরাই মন্তব্য প্রকাশ করার অধিকারী।

উনিশশ একাত্তর সালের প্রথম চার মাসে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের লাইসেন্স ও অনুমতিপত্র বিতরণ করা হয়েছে যথাক্রমে সাতবার ও পনেরো, অথচ উনিশশ আটবার উনসত্তর ও সত্তর এই তিন বছরে এদের মোট লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল মাত্র বারোটি।

এছাড়া শিল্পস্থাপনের অনুমতিপত্র পেয়েছেন সরাভাই দইটী, এ এফ হার্ভে দইটী, এবং মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্র, সুব্রজমল নাগরমল, ওয়ারাদিয়া, মার্টিন বার্ণ, সিংহানিয়া, মোদী, খাপার, রইয়া, মফতলাল, র্যালি বাদাস এবং সরাভাই প্রত্যেকে একটা করে।

সুতরাং নব-কংগ্রেসী সরকার আসলে কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি তা কি আবার খুলে বলতে হবে?

মতামত

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তাছাড়া রাজনগর থানার ও পি-সি পুত্রকে সি পি আই এম এল-এর উচ্চানীভেই জনসাধারণ উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়েছেন। এই শহরেই আরো কয়েকজনকে উত্তম-মধ্যম মার দেওয়া হয়েছে; আরো কয়েকজনকে মার দেবে বলে এক দেওয়ালে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এই নামের মধ্যে ছাত্র পরিষদের কয়েকজন আছে। অন্যান্য জায়গায় যেমন তাঁতপাড়ায় একজন ছিনতাইকারী নকশালার নাম নিয়ে টাকা আদায় করতে এসেছিল একজনের বাড়ীতে তাকে সি পি আই এম এলের চারজন ক্যাডার গৃহস্থের সহযোগিতায় খতম করে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেয়। এইরকম একটি চোরকে কোমাগ্রামে সি পি আই এম এলের ক্যাডারগণ ধরে কেলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা নাড়া করিয়ে দেন এবং বলেন যে সকাল থেকে গ্রামের প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে কমা চোরে আসতে হবে। চোরটি ভয়ে তা করে। পুলিশ জানে চুরি ডাকাতিতে বন্ধ করতে নকশালার বন্ধপরিষদ।

পুলিশ মহল যে চোর ডাকাতকে শব্দ শ্রোতৃক সাহায্য করে তাই নয়

মালিকের নাম	নতুন শিল্প স্থাপন	প্রসারণ	নতুন পণ্য তৈরী	বর্তমান একচেটিয়া ব্যবসা	মোট
এসোসিয়েটেড সিমেন্ট	—	—	—	২	২
এস্টর ইউল	—	—	—	১	১
বাহুব	—	—	—	৩	৩
বার্ড হেইলবার্গ	—	২	১	৭	১০
বিড়লা	—	১	—	৫	৬
গোবিন্দা	—	১	—	—	১
আই, সি, আই	—	১	১	—	২
সিংহানিয়া	১	—	—	৪	৫
কিল্লিক	—	—	—	১	১
সাহ জৈন	—	—	—	৩	৩
সারাভাই	—	২	—	—	২
শ্রীরাম	১	১	—	২	৪
সুব্রজমল নাগরমল	—	১	—	—	১
টাটা	—	২	১	৩	৬
খাপার	—	—	—	৩	৩
ওয়ারাদিয়া	—	—	—	৩	৩
বাহাজ	—	—	—	১	১
ভালমিয়া	—	—	—	২	২
কম্বলভাই লালভাই	—	—	১	—	১
কিলোদ্বার	—	—	—	১	১
মুকগাঙ্গা-চেট্টিয়ার	—	—	—	১	১
পারী এণ্ড কোং	—	১	—	১	২
শেখারী	—	—	১	—	১
ধাপুরজি পালনজি	—	—	—	১	১
সিম্পসন	—	—	১	—	১
ভি, রামকৃষ্ণ	—	—	১	—	১
জাউন হেওয়ারসন	—	—	—	১	১
মফতলাল	—	১	—	—	১
মোট	২	১৩	৬	৪৬	৬৭

অগ্রশস্ত্র দিয়েও সাহায্য করে। নল-হাটি থানার এক গ্রামে একদিন কয়েকজন দূর্বৃত্ত বন্দুক নিয়ে ডাকাতি করতে যায়। গৃহস্থের বাড়ীতে ঢোকার পরই গ্রামবাসীরা জানতে পারে এবং তারা বাধা দেয় ফলে এই ডাকাতগুলো তখন একটি বন্দুক ফেলেই চলে যায়। কোন কিছু নিতে পারে নি। গৃহস্থামী বন্দুকটি দেখে অবাক। এ যে তারই থানায় জমা দেওয়া বন্দুক। কিন্তু থানায় জমা দেওয়া সত্ত্বেও এই সব গন্ডাদের হাতে বন্দুক এল কী করে গ্রামবাসী ডি এমের কাছে সমস্ত স্তাপার জানান। ডি এম অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে এই থানার (নলহাটি) ও সির হেফাজতে বন্দুক ছিল এবং ৩ সি মহাশয়কে প্রোস্তার করা হয়।

বীরভূমের কোন গ্রামে প্রকাশ্যে জোরজব্দম করার সাহস কংগ্রেসী গন্ডা কেন, পুলিশেরই নেই। বীরভূমের আন্দোলন অতি উচ্চপর্যায়ের এবং নিভুল। শেষ লড়াই শুরু হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম এলাকা ছেড়ে শ্রেণীশত্রুরা পালাচ্ছে। তাদের আতঙ্ক এবং পালানো দেখে সাধারণ মানুষ

উল্লসিত। জমি তো বহু গ্রামেই রাজনীতি সচেতন কৃষকগণ বাজেয়াপ্ত করেছেন। তাঁরা চাষ আবাদ শুরু করেছেন। বহু অগ্রশস্ত্র (আগ্নেয়াস্ত্র) কেড়ে নিয়ে গণমুক্তি ফৌজ গড়ে উঠেছে। বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়েছে।

নির্বাচনের পর থেকে বীরভূমের এমনই অবস্থা যে সি পি এম তো দূরের কথা, কোন রাজনৈতিক দলই প্রকাশ্যে মিটিং করতে পারেন নি। কোনো নেতা একা একা বাহির হন না। আগে এস ইউ পি এবং সি পি এম প্রভাবিত যে সব গ্রাম ছিল এখন সেগুলি নকশালদের অন্যতম ঘাঁটি বলে পরিচিত এবং সেখানে কৃষকগণ বহু শ্রেণীশত্রু খতম করেছেন। সি পি পি এম বহু জায়গায় বলছে নকশাল না কংশাল। ভাবতেও অবাক লাগে বীরভূমে জ্যোতদার ছাড়া যারা খতম হয়েছে তাদের অধিকাংশই কিন্তু কংগ্রেসী। সিউড়ীতেই দুজন ছাত্র পরিষদ নেতা এবং একটি গ্রামে আর একজনকে খতম করা হয়। বহু কংগ্রেসী জ্যোতদার খতম হয়েছে।

কল্যাণ রায়

বীরভূম

ভারত দর্পণ

কেন্দ্র

কেন্দ্রের অচ্যুত মেনন সরকার নব-কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় যোগ দানের জন্যে যে ঢালাও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তা দেখে অনেকেই শিয়ালার বক পাখিকে নৈমন্তিক করে খালায় ঝোল পরিবেশনের কথা মনে পড়বে। আমন্ত্রিত বক যেমন তার দীর্ঘ ঠোঁট দিয়ে খালায় ঝোল খেতে পারে নি আর শিয়াল যেমন চেটেপুটে ঝোল খেতে খেতে মজা দেখছিল, তেমনি নবকংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে বলে আর গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি নিজেদের ও সাঙাতদের হাতে রেখে ছোট ছোট কয়েকটা দপ্তর নব-কংগ্রেসের সামনে ঝুলিয়ে অচ্যুত মেনন তোফা নৈমন্তিকের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু নব-কংগ্রেসী বক তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে দপ্তরগুলি ঠুকরে দেখছিল শুধু, আশ্বাদগ্রহণে অপারগ হয়ে পড়ছিল। সুতরাং এবার অচ্যুত মেননকে নব কংগ্রেসী কলসীতে ঝোল খাবার নৈমন্তিক করা হবে কি না কেন্দ্রের মানব সেই মজা দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন।

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

এখানে একদিকে যেমন ক্যান্টিন নেই, লাইব্রেরী নেই, পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য নিজস্ব কোন রুটিনও নেই, এমন কি পানীয় জলের পরবর্তী সুব্যবস্থা নেই, তেমনি অন্যদিকে এই প্রাচীন বাড়ীটির ভূমিদশা দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

আজ অবনীন্দ্র শতবর্ষে যদি এই প্রতিষ্ঠানটি সত্যিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসে, তবে তার চাইতে বড় কলঙ্ক আর কিছ হতে পারে না, বিশেষতঃ তিনি যখন একদা এই প্রতিষ্ঠানটির মণ্ডলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

ভাল ছাপার জন্য

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস

৭, স্ববোধ মল্লিক ফোয়ারা কলিকাতা-১৩

শেষ পর্যন্ত দপ্তর বস্তুনিষ্ঠ নবকংগ্রেস কেন্দ্রের মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে পারল না। সুতরাং মন্ত্রিসভায় যোগদানের ব্যাপারে অনাসক্তি প্রকাশ করা ছাড়া আর কি করা যায়?

অন্যদিকে ঘোর আদি কংগ্রেস ও কেন্দ্র কংগ্রেসের একজন দলছুট নিয়ে নতুন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হয়েছে। এদের বর্তমান সদস্যসংখ্যা চার। অচ্যুত মেননকে এরা সমর্থন জানাবেন ঠিক করেছেন। অচ্যুত মেননও দাবাহ প্রসারিত করেছেন কারণ শেষ পর্যন্ত সামান্য তিনজনের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকবে কি না সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং আদি কংগ্রেস সদস্যকে নাম ভাড়ির দলে নেবার আগ্রহ মেনন সাহেবেরই বেশী। এ যেন বৈষ্ণবের সুরাপানের ব্যাপার। গঙ্গাজলের কম-ডলতে সুরা রক্ষিত হলে, তা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। আদি কংগ্রেসও যদি নামটার সমাজতন্ত্রী রং লাগায় তাহলে চেক পন্থী কমিউনিস্ট অচ্যুত মেননদের বৈষ্ণবী গোড়ামিতে বাঁধা থাকে না।

আসাম

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কৌশলকরে পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি রাজ্যকে নিয়ে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি আধিপত্য স্থাপনের পাকা বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছিলেন এ এলাকার সবকটী রাজ্য তার বিরোধিতা করায় তা আপাততঃ ভেস্তে গেছে।

নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয় এবং আসাম সম্বন্ধে এই যড়বন্দ্য মূলক ক্ষমতা হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। যে ধারাগুলি সম্পর্কে রাজ্যগুলি আপত্তি জানিয়েছে তা হচ্ছে :

(এক) এলাকার রাজ্যপালদের বিশেষ ক্ষমতা থাকবে, এবং মন্ত্রিসভার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই তিনি তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(দুই) সবগুলি রাজ্যের জন্য একটামাত্র ক্যাডারভুক্ত কেন্দ্রীয় আই এ এস অফিসার থাকবেন। তাঁদের একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বদলী করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে।

(তিন) উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের একটি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সেক্রেটারিয়েট থাকবে, এলাকার রাজ্যগুলিকে আর্থিক ও প্রশাসন সংক্রান্ত নির্দেশ দেবার ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে।

(চার) সবগুলি রাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট এবং একটি পারিষদ সার্ভিস কমিশন থাকবে।

বলাবাহুল্য আসামের নব-কংগ্রেসী সরকারও এ ধরণের কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ মেনে নিতে পারে নি। মণিপুর, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ড তো নয়ই। কোন রাজ্যই কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে রাজ্যগুলির ক্ষমতা হরণ করে তাদের মিউনিসিপ্যালিটির মত ক্ষমতাহীন করতে তারা বিরোধিতা না করে পারেন নি।

বিহার

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সংবিধান নির্দিষ্ট অধিকারে অসংখ্য হস্তক্ষেপ করেছেন। তাঁরা আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের একটিমাত্র ভূমি বিবরণ হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ, শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী, প্রভৃতি সৃষ্টি করে চলেছেন। এখন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের বিমান ক্ষেত্রকর্তৃপক্ষকে আইনবলে কেন্দ্রীয় অঞ্চল বলে ঘোষণা করে রাজ্য রাজ্যে একটা করে কেন্দ্রীয় শাসনভুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করতে চাইছেন। একমাত্র একচেটিয়া পুর্জিগত শ্রেণীর সরকার এভাবে কেন্দ্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং রাজ্যগুলির স্বশাসনের অধিকার ক্রমশঃ উত্তরোত্তর খর্ব করে চলে। কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী নির্বিশেষে সমস্ত রাজ্যগুলিকে একাধিকভাবে এই কেন্দ্রীয় আভিসন্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকার মোটামুটি নব-কংগ্রেসের শ্রেণী-নীতির বিরুদ্ধে না হলেও এই সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে নব-কংগ্রেসীদের চেষ্টার হুটী নেই। মধ্যমস্ত্রী বিশ্বনাথ দাস আভিজ্ঞ লোক, তিনি কেন্দ্রীয় নব-কংগ্রেসী সরকারকে না চটানোর অনেক চেষ্টা করে চলেছেন। উড়িষ্যার ওপর বিভিন্ন ব্যাপারে যে কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য হস্তক্ষেপ করে চলেছেন সে সম্বন্ধে বিশ্বনাথবাবু দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকলেও, শিল্পমন্ত্রী শ্রীসি দেও চূপ থাকেন নি। তবু বিশ্বনাথবাবু কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার উড়িষ্যার কোন হস্তক্ষেপ করেন বলে তিনি মনে করেন না।

কিন্তু এবার নব-কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক শ্রীশংকরদয়াল শর্মা জুবনেশ্বরে সাংবাদিক সম্মেলনে উড়িষ্যার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন আগামী মার্চ মাসের আগেই হবে (অর্থাৎ রাজ্যগুলিতে সাধারণ নির্বাচন হবার আগেই) সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অর্থাৎ কংগ্রেসীরা আর কোন অকংগ্রেসী সরকারকেই বরদাস্ত করবেন না। যে কোন অকংগ্রেসী সরকারের পতন ঘটাতে তাঁরা স্বেচ্ছা করবেন না। এবং করেনও নি। শুধু কেন্দ্রের অচ্যুত মেনন সরকার এবং তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকারকে এখন তাঁরা হয়তো কিছু করবেন না। কারণ তাঁরা খান না গুণ বলে আর খান না শক্ত বলে। দুর্গন্ধ পুরীষ এবং কঠিন লোহ দুইই তাঁদের অভক্ষ্য।

পল্লী দর্পণ

সুস্থ সাংবাদিকতা !

কৃষকদের ওপর

আক্রমণ

বেশ কিছুদিন ধরেই নবম্বীপের সংবাদ পরিবেশনে যদ্যন্তর, আনন্দ বাজার ইত্যাদি কাগজের কিছু সম্প্রদায় (?) সাংবাদিকতা নবম্বীপের লোকের নজরে পড়ছে। সকলেই জানেন যে নবম্বীপে এই সব কাগজের নিজস্ব প্রতিনিধি আছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে নবম্বীপের খবর কৃষ্ণনগর থেকে পাঠান হচ্ছে। যেমন পরলা আগস্ট যদ্যন্তরে খবর বেরিয়েছে, নবম্বীপে দুটি খবরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। অথচ ওই দুটি খবরের খবর নবম্বীপবাসীর জানা নেই।

পরিচয় ওই ধরণের আর একটা খবর বেরিয়েছিল। নব-কংগ্রেস কমী অরুণ ব্যানার্জি নিহত এবং আর একজন অজ্ঞাতনামা যুবক নিহত। বলা বাহুল্য অরুণ ব্যানার্জী বহাল তবিয়তেই আছেন। অজ্ঞাতনামা নিহত যুবকের সংবাদ নবম্বীপে থানারও জানা নেই। অথচ ওই সংবাদ পাঠিয়েছেন কৃষ্ণনগর থেকে আনন্দ বাজারের সংবাদদাতা। নবম্বীপবাসীর জিজ্ঞাস্য স্থানীয় সংবাদদাতা থাকা সত্ত্বেও বাইরের সংবাদদাতা মারফত এই বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ?

—তর্জনী থেকে

আমলাদের যোগসাজসে

কৃষক উচ্ছেদ

এই আগস্ট, বারাবণী (আসাম-সোল)—সম্প্রতি বারাবণী থানার অন্তর্গত মদনপুর গ্রামের মণিক মন্ডল ও আশু রুইদাসের পরিবারের তিনজনকে পুর্লিশ বিনা কারণে গ্রেপ্তার করে। এ কৃষকেরা স্থানীয় বি, ডি, ও; জে, এল, আর, ও এবং এস, ডি ও-র নিকট উচ্ছেদ রদের মামলা যথারীতি করা সত্ত্বেও পুর্লিশ ও প্রশাসকগণ রহস্যজনকভাবে জমির মালিকদিগকে প্ররম্ব দিয়েছে। জমির মালিকেরা দলবদ্ধভাবে বোমা ফাটিয়ে ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ গুন্ডাদের নিয়ে কৃষকদের আক্রমণ করলেও পুর্লিশ নীরব। এই অন্যান্য গ্রেফতারের ফলে উক্ত অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে।

ইতিহাস

কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে লেখা মঞ্চ-সফল একখানি

সরস নাটক

প্রমোদকুমার রায়চৌধুরী

ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখক শ্রীসুপ্রকাশ রায়, প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসুবোজকুমার রায় চৌধুরী প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীঅবনী মোহন ওহ মজুমদার প্রভৃতি বহু সুশীলন প্রশংসাপ্রাপ্ত। ক্রমে ক্রমে গ্রামে গ্রামে অভিনয় করার উপযুক্ত একখানি নাটক।

দাম তিন টাকা মাত্র

রাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা-১২

ও অন্যান্য সস্তা পুস্তকালয়ে

পাওয়া যায়।

চাকরির জন্য তথ্য চেনে কেন?

কাজ আসে যে কোন বেতন ও তথ্য ট্রানজিস্টার সেট তৈরি ও মেরামতের কাজ শিখতে পারবে!

স্বদেশ সে.সি.সি.

বেতার বিজ্ঞান

(ট্রানজিস্টার প্রিন্সিপলস)

১ম খণ্ড ১০০ পৃষ্ঠা ১০/-

আধুনিক ট্রানজিস্টার বিজ্ঞান

(ট্রানজিস্টার সেট তৈরি করার নির্দেশাবলী প্রদত্ত)

২য় খণ্ড ১০০ পৃষ্ঠা ১০/-

পাণ্ডুলিপি ও নকশা

২৭/৫, তারক চ্যাটার্জী হোল, কলিকাতা-৫

বিদেশ দর্পণ

ভারত-সোভিয়েত চুক্তির তাৎপর্য

(দর্পণের পর্ববৈক্ষক)

নয়া দিল্লীতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার স্বরূপ সিং এবং সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রামিনকো দীর্ঘ আলোচনান্তে কুড়ি বছরের জন্য স্থায়ী সোভিয়েত-ভারত শান্তি, সহযোগিতা এবং মৈত্রীর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। চুক্তির লিখিত ধারাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে চুক্তি অন্তর্ভুক্ত : (এক) সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ভারত পরস্পরকে আক্রমণ করবে না এবং উভয় দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষা করে চলবে বলে অঙ্গীকার করেছে। (একনং ধারা) বলা বাহুল্য ভারত সোভিয়েত যুদ্ধের কোন সম্ভাবনার কথা কখনও ইঙ্গিতেও উচ্চারিত হয় নি। তেমনি কোন সম্ভাবনা, কোনদিন ছিল, অথবা এখন উঠতে পারে এমন চিন্তার কোন কারণ নেই। সেই হিসাবে এই ধারাটির কোন মূল্য নেই।

(দুই) বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রকৃতির রাষ্ট্রের মধ্যে সহাবস্থান, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি, পারা-স্পরিক আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার উপনিবেশিকতাবাদ ও জাতিভিমানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ, বিশ্বশান্তি রক্ষা ও নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন, পারস্পরিক সম্পর্কের আরো উন্নতি বিধান প্রভৃতি ধারা (দুই থেকে সাত নং ধারা) কাষতঃ কোন রকম লিখিত চুক্তি ছাড়াই এতদিন ধরে অনুসৃত হয়েছিল, এই চুক্তির ফলে তার কোন বিশেষ গুরুত্ব পরিবর্তিত করা হয়েছে, তাও মনে করা চলে না।

আটনং ধারায় বলা হয়েছে যে চুক্তিবদ্ধ দুটি দেশ যে এই দুই দেশের কারো বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক অভিসন্ধি রয়েছে এমন কোন তৃতীয় দেশ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে কোনরকম সামরিক চুক্তি করবে না। ভারত কোন বৃহৎ দেশের সঙ্গেই সামরিক চুক্তিতে আরদ্ধ নয়, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে ওয়ারশ সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এদিক দিয়েও চুক্তির ধারাবিটি অর্থহীন।

নয়নং ধারায় এই দুটি দেশের কোনটি আক্রান্ত হলে “আক্রমণের আশংকা দূরীকরণের” এবং “নিজ নিজ নিজ দেশের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও শান্তি সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে পারস্পরিক পরামর্শ আরম্ভ করবে এই ব্যবস্থা-টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্টেটসম্যান পত্রিকা যেমন হেডলাইনে, একদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ অন্য দেশের আক্রমণ বলে

মনে করা হবে বলে বোঝাতে চেষ্টা-ছেন চুক্তির ধারা তা বলে না। আক্রমণ ঘটলে নিরাপত্তা ও আক্রমণের আশংকা দূরীকরণের জন্যে অবিলম্বে দুটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শের ফলে উনিশশ পঁয়ষাট সালের মত পাক-ভারত যুদ্ধের পরিণামে আরেকটি “তাসখন্দ চুক্তির” উদ্ভব হতে পারে মাত্র। ভারত আক্রান্ত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সাহায্যে সামরিক বল সমাবেশ করবে একথার উল্লেখ মাত্র চুক্তিতে নেই। বরং এই ধারার ফলে ভারতকে সামরিক আক্রমণ চলাকালে সোভিয়েত পরামর্শ পাবার অপেক্ষায় থাকতে হবে এবং কাষতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপের আশায় দিন গুণতে হবে। অন্যদিকে এই চুক্তি করার ফলে চীনের মত শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নত করার সম্ভাবনা রুদ্ধ হবে, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের যদি চীনের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ লিপ্ত হবার সম্ভাবনাও দেখা দেয় তাহলে চুক্তি অনুযায়ী ভারত চীনের সঙ্গে কোন সম্প্রীতিমূলক চুক্তি করতে পারবে না।

দশনং ধারায় এই কথাটিই আরো একটু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে যে ভারত ও সোভিয়েত দেশের ওপর সামরিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে এমন কোন দেশের সঙ্গে দুটি দেশের কেউই কোনরূপ প্রকাশ্য অথবা গোপন সামরিক বা ঐ ধরনের কোন চুক্তি করতে পারবে না। ভারতের ওপর চীন ও পাকিস্তান এবং সোভিয়েতের ওপর চীন সামরিক ক্ষয়ক্ষতি চাপিয়ে দিতে পারে এই-অজুহাত দেখালে ভারত কিংবা সোভিয়েত চীন বা পাকিস্তানের সঙ্গে কোনরূপ সামরিক সাহায্য চুক্তি করতে পারবে না। বলা দরকার যে বাস্তব ঘটনা বিশ্লেষণে এই ধারাটিরও কোন কার্যকরী মূল্য থাকে না। কারণ চীন অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েত কোনরূপ সামরিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ নয় এবং ভারতও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চীনের সঙ্গে কোন সামরিক আঁতাতের সম্ভাবনা স্বীকার করে না।

এগারো নং ও বারো নং ধারায় চুক্তির মেয়াদ ও চুক্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা সম্পর্কে উভয় দেশের মতানৈক্য ঘটলে তা কি ভাবে মীমাংসা করা হবে, সেই সম্পর্কে রচিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েত ভারত শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি নতুন কোন রাজনৈতিক ঘটনা নয়। বাস্তবক্ষেত্রে দীর্ঘকাল

ধরে সোভিয়েত ভারত সম্পর্ক যে পথ ধরে চলেছিল, সেই ঘটনাটিকেই নথিভুক্ত করা হয়েছে মাত্র।

চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেকার কয়টি দিন ধরে ভারত সরকার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে যে ভাবে বিবৃত হয়ে পড়েছিলেন, বিশেষ করে আমেরিকা পাকিস্তানকে ক্রমাগত সামরিক সাহায্য দিয়ে যাওয়ায়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের ভারত-পাক সীমান্তের উভয় দিকে (যাকে আমরা বাংলাদেশের সীমান্তের উভয়দিক বলে মনে করি) রাষ্ট্র-সংঘের একশ তিপান্ন জন পর্ব-

মার্কিন-চীন সম্পর্ক ও জাপান

(দর্পণের পর্ববৈক্ষক)

এশিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চীন সম্পর্কিত নীতির সব থেকে ঘনিষ্ঠ পর্ববৈক্ষক হল জাপান। শুধু যে জাপান চীন সরকারকে কোনদিন স্বীকৃতি জানায় নি তাই নয়, অপরদিকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে জাপান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় নিজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মিলন-সম্ভাবনাকে জাপান যে খুব ভাল চোখে দেখবে না তা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

যদিও জাপান সরকার প্রকাশ্যে এই বিষয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলেন নি, টোকাওতে একাংশের ধারণা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন নয়া চীন নীতি গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরদিকে জাপানকে বোঝানো যে দরকার মত সেও নতুন বন্ধু খুঁজে নিতে পারে।

আপাততঃ মনে হয়, প্রেসিডেন্ট নিকসন এই চালে খানিকটা সফল হয়েছেন। তাঁর চীন সফরের কথা ঘোষণার কিছুদিনের মধ্যেই জাপানী মন্ত্রিসভা এমন কতগুলি পরিকল্পনা অনুমোদন করেন, যেগুলির ফলে আমেরিকান পণ্যের আমদানীর পরিমাণ অনেকাংশে বেড়ে যাবে। বর্তমানে জাপানী শিল্পপতিদেরও মার্কিন অর্থনীতির সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তোলা হচ্ছে যাতে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় থাকে।

তবে জাপান সরকার যতই চেষ্টা করুক না কেন দেখানোর যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে কোন অবনতি ঘটে নি, মনে হয় না তারা বেশীদিন এ ভাবে চালাতে পারবে। ঐতিহাসিক কারণেই জাপানের পক্ষে মার্কিন

বেক্ষক নিয়োগ (এর মধ্যে ছিন্নাশি জনই চলাচল ও বার্তা ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ) এবং চীন কর্তৃক পাকিস্তানকে আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের অঙ্গীকার—এসব ঘটনার ফলে ভারত সরকার প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল, বর্তমান চুক্তির ফলে তাঁরা তার থেকে খানিকটা অব্যাহতি পাবেন বলে মনে করেছেন। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন নতুন বাধ্যবাধকতার মধ্যে না গিয়ে ভারত সরকারকে তাঁদের চীনবিরোধী ভূমণ্ডলীয় নীতির আওতে জড়িয়ে ফেলেছেন

বাংলাদেশ সম্পর্কে এই চুক্তির প্রত্যক্ষ ফল ইয়াহিয়া খানের ওপর মর্জিবর রহমানের সঙ্গে একটি আপোষ মীমাংসায় উপনীত হবার জন্যে চাপ সৃষ্টি হতে পারে। পরোক্ষভাবে এই চুক্তির চাপ ইয়াহিয়া মর্জিবর আপোষ মীমাংসার জন্যে আমেরিকার চাপকে শক্তি-

শালী করবে। এবং সম্ভবতঃ এই চাপকে ফলপ্রসূ করার জন্যে সোভিয়েত মার্কিন যৌথ স্বার্থের পরিপূরক ভারত পাক সংঘর্ষ এবং তারপর উভয় বৃহৎ শক্তির চাপে তাসখন্দের মত আরেকটা চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনা ঘটতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিরতি চুক্তির মত পাক-ভারত উপমহাদেশেও ক্রমাগত সংঘর্ষ ও চুক্তির ঘটনার উদ্ভব হতে পারে।

অন্যদিকে চীনের সঙ্গে ভবিষ্যত আপোষ মীমাংসার পথ বেশ কিছুটা কষ্টকাকীর্ণ হল বলে ভারতের পররাষ্ট্রীয় নীতি রক্ষণগতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশ প্রকট হয়েছে।

যদি এই চুক্তির ফলে চীন ও পাকিস্তান আরো বেশী পারস্পরিক বাধ্যবাধকতার পথে চলে যায়, তাহলে ভারতের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে পড়বে এবং ভারতকে আরো (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চীন অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা সম্ভব নয়। অতএব এশিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখতে গেলে জাপানকে হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই আগবিক শক্তি গোষ্ঠীভুক্ত হতে হবে। এবং এর ফলে জাপান আবার একটি অশান্তির কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষকরা খুবই বিপদে পড়েছেন। কারণ চাকরীর অভাব। জীবিকার তাড়নায় গত বছর একলাখ শিক্ষক ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ছাড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন এবং এখনও তাঁরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন। সরকারী তরফ থেকে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হঠাৎ কমিয়ে দেওয়ার ফলেই এই সংকট।

শিক্ষকরা দেশ ছেড়ে প্রধানত যাচ্ছেন পশ্চিম জার্মানীতে যেখানে এখনও প্রচুর চাকরী খালি আছে। তবে সেখানে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের অনেক সময় মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের পদে যোগদান করতে হচ্ছে এবং মাইনেও অনেক কম। কিন্তু অন্য যাবার কোন উপায়ও নেই। এছাড়া ভাষা ও বাসস্থানের সমস্যাও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দলে দলে শিক্ষক প্রতি সপ্তাহে পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ এবং অন্যান্য শহরে এসে উপস্থিত হচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট নিকসনের চীন সফরের কথা ঘোষণার সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ চিন্তিত কারণ সে দেখছে যে চীনকে সবদেশের থেকে আলাদা করে রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে মস্কোর ভয় পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্পর্কে। মস্কো জানে

যে ওই দেশগুলি যদি একবার চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তাহলে সোভিয়েতের একছত্র আধিপত্যের উপর যবনিকা পড়তে বেশী দেরী হবে না।

মস্কোর বিশেষ ভয় রুম্যানিয়াকে নিয়ে। এই একটি দেশ যার নেতৃবৃন্দ কোনদিনই পুরোপুরি সোভিয়েতের বশব্দ হতে রাজী হন নি। এবং গত সপ্তাহে বুখারেস্টে “কমিকন”-এর বৈঠকের পর যে যুদ্ধ বিবৃতি বেরায় তাতে রুম্যানিয়া সফল হয়েছে জাতীয় সার্বভৌমতার কথা টুটাকাতে।

সোভিয়েতের পর রুম্যানিয়াই প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ যারা আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত করেছে। এবং ডঃ কিসিংগারের পিকিং ভ্রমণের আরো-জনে রুম্যানিয়ার নিকোলাই চৌসেসকুর প্রচুর অবদান ছিল। এই প্রতিটি কাজই মস্কো তার নিজ স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে মনে করে।

তবে মস্কোও বসে নেই। চেকোস্লোভাকিয়ার মতন রুম্যানিয়াকে সে সরাসরি আক্রমণ না করলেও ভয় দেখাতে কসর করবে না। এই মাসের শেষের দিকেই ওয়ারশ চুক্তি অনুযায়ী সামরিক মহড়াকল্পে তিন ডিভিশন সৈন্য রুম্যানিয়ার সীমান্তে মোতায়েন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্কো তার পুরানো কায়দা অনুযায়ী রুম্যানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতেও চৌসেসকুর বিরোধী একটি শক্তি গঠনের চেষ্টা শুরু করেছে। এবং এই কাজের উপরন্তু কোন বাস্তব সম্মান পেলে সোভিয়েত যে তাকে পুঞ্জোপুঞ্জ সমর্থন জানাবে, যেমন চেকোস্লোভাকিয়ার ডুবচেকের বিরুদ্ধে সোবোদাকে করেছে, তাতে কোন সন্দেহই

ঢাকার অবস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকার অবস্থা-দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিকদের থেকেও খারাপ; (দুই) পূর্ববঙ্গে এখন থেকে নভেম্বরের শেষে আমন ধান না ওঠা পর্যন্ত সাত লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি।

অধ্যাপক গ্রিফিথ বলেন যে, বিদেশ থেকে আমদানী করা প্রচুর খাদ্য সম্পদ চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে জাহাজে এসে আটকে পড়েছে। স্থলপথে রেল কিম্বা লরীতে এই খাদ্য দেশের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, কারণ রেল লাইন গেরিলা বাহিনী অনেকাংশে উপড়ে ফেলেছে। আর রাস্তার অবস্থাও খারাপ কারণ পল, কালভার্ট সবই একে একে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

একমাত্র নদীপথে ছোট ছোট জাহাজে এই খাদ্য দেশের বিভিন্ন অংশে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু নদীর দুপাশ থেকে জাহাজের ওপর কামানের গোলা পড়ে। জাহাজ যেতে পারে না।

মুক্তি বাহিনীর এক সেনাপতির সঙ্গে দর্পণের এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন পূর্ববঙ্গে খাদ্য পরিস্থিতি ভয়াবহ। গেরিলা বাহিনী খাদ্য চলাচলে অবশ্যই কোন বাধা দেবে না। কিন্তু মরিস্কল হল, মার্কিনী খাদ্য সরবরাহের নামে জঙ্গীশাহী অস্ত্র পাচার করে। তাই তথাকথিত খাদ্যবাহী জাহাজ আর লরী ওপর গেরিলা আক্রমণ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

অধ্যাপক গ্রিফিথ বলেন যে, মার্কিন রাষ্ট্র সম্প্রতি বিশ লক্ষ ডলার সাহায্য দিয়েছে পাকিস্তান সরকারকে। এই টাকা দিয়ে অন্যান্য দেশের কাছ থেকে নদীতে বাতা-

য়ালের অনুদান ছোট ছোট জাহাজ ভাড়া করার জন্য। কিন্তু জাহাজ এলেই বা কি হবে? খাদ্য আনা নেওয়ার বিশেষ কোন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

তাই গ্রিফিথের মতে দার্ভক্ষ অনিবার্য। আর তাছাড়া যে পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে তাতে পূর্ববঙ্গের অনেকাংশে এখন বন্যা। তার ওপর আবার স্টেম্পেড অক্টোবর মাসে বড়ের আশঙ্কা থাকেই। এর ফলে দার্ভক্ষ আরও তীব্রতর ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। দার্ভক্ষ হলে ভারতে উদ্ভাস্তর সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। হয়ত কয়েক মাসে এই সংখ্যা দেড় কোটিতে পরিণত হতে পারে।

আমেরিকার এই বন্ধুজীবী ওখানকার প্রভাবশালী মহলের বিশেষ আস্থাভাজন। তাঁকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ঢাকায় পাঠান হয়েছিল। তিনি ওখানে সামরিক কতৃপক্ষের কাছে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পথ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন।

ক্ষমতাম্ভ সামরিক-নেতারা শুকে সাফ কথা বলে দিয়েছে যে, এ ধরনের সমাধান অসম্ভব। কারণ, বাংলাদেশীরা স্বাধীনতা ছাড়া কোন সমাধানেই রাজী নয়। আর তাছাড়া এখন সমাধানের কথা সামরিক কতৃপক্ষের তরফ থেকে বলার অর্থ হল বশ্যতা স্বীকার করা।

সমর নেতারা অধ্যাপককে বলেন, “আলোচনা করার অর্থ মনের দিক থেকে নিজের আড়কোষ বাদ দিয়ে খোজা হওয়ার সামিল।” গেরিলা বৃদ্ধের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানী সৈন্যের মনোবল খুব শক্ত বলে মনে হয় না। বহু সৈন্য সরকারী ভবন পাহারা দিতে আর রাস্তাঘাটে টহল দিতে

ব্যস্ত। সৈন্যেরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন।

গেরিলারা এখন হাজারে হাজারে প্রচারপত্র বিলি করে, এমন কি ঢাকা সহরেও। কোন আক্রমণের আগে এরা সময় ঘোষণা করে নাগরিকদের সাবধান করে দেয়। ঘোষিত সময়ে এই আক্রমণ সূর্য হয়। সামরিক বাহিনীর এই আক্রমণ বন্ধ করার ক্ষমতা নেই।

ঢাকা সহরে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বাড়ীর সামনে, থানার বাইরে এমন কি ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনেও সৈন্য মোতায়েন। সহরের জীবন যাত্রার অস্বাভাবিক ভাব।

কিছুদিন আগে অধ্যাপক সামরিক গিয়েছিলেন। সেখানে কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে এই গ্রাসের ভাব লক্ষ করেন নি। সেখানে কেবলমাত্র প্রেসিডেন্টের বাড়ীর সামনে সৈন্য মোতায়েন করা আছে।

কংগ্রেস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দিয়েছে যে তারা প্রিয়দাস মুন্সী ও সুরত মুখার্জীর নেতৃত্ব মানে না। দিল্লীকে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুরত দেবী-বাবুর নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

তিনশ পঞ্চাশ জন লোকের ভেতর অমতপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সভা বিজয়বাবুর সমর্থক। তারা কেউ তরুণবাবুকে পছন্দ করেন না। তাদের বক্তব্য হলো যে দুটি কাগজের মালিক বলেই তিনি কি বড় কংগ্রেসী হয়ে গেলেন। কংগ্রেস সংগঠনের জন্য তিনি কি ব্যয় করেছেন আর স্বাধীনতা আন্দোলনেই বা তার কি অবদান আছে। তাদের মতে নারায়ণ চৌধুরীই বড় কংগ্রেসসেবী। অবিস্তৃত কংগ্রেসে তিনি শক্ত মানব অতুল্য ঘোষ ও বন্দু কোম্পানীর সঙ্গে লড়ে গেছেন। আর তাছাড়া জেলায় জেলায়ও তার পরিচিতি আছে। দেবীবাবু লোক ভাল শিক্ষিত কিন্তু কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভিন্ন তার নারায়ণবাবুর মত পরিচিতি নেই। তাছাড়া তিনি নাকি আবার কমিউনিস্ট (ডান) ঘেঁষা।

এদিকে সিদ্ধার্থবাবুর ওপরেও অনেক কংগ্রেসী এবং বিশেষ করে যারা ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের মন্ত্রী ছিলেন তারা অসম্ভব চটে গেছেন। সিদ্ধার্থবাবুর নিজস্ব লোক বলে পরিচিত জয়নাল আবেদিন, বরকত আলী ও অনেকে গত সাতই আগস্টের প্রশাসনিক ব্যাপারে ওপরের তলার অফিসারদের রদবদলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাদের মতে এই সিদ্ধান্তের জন্য শুধু যে কংগ্রেসেরই মান বিপন্ন হয়েছে তা নয়, ওই কোয়ালিশনে যারা অংশীদার ছিলেন তাদেরও বেইজ্ঞতা করা হয়েছে। তারা বিশেষ করে এ ব্যাপারে হোম সেক্রেটারী জে সি

পুলিশ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

হয় ঘটনা পরে পুলিশ সুপার ক্রোধ-মত্ত অবস্থায় লাইনে এসে একজন স্বামীহারা রমণীকে পদাঘাত করেন এবং সাত আট রাউন্ড গুলি ছুঁড়লে দুজন মহিলা, একজন আইসক্রিম বিক্রেতা গুলিবিদ্ধ হয়।

সংবাদে প্রকাশ, এই ঘটনার পর নিজেদের অপকীর্তি ঢাকবার জন্য চোন্দ জন পুলিশকে পরপর তিনটি ফৌজদারী মামলার আট-দশটি সেকশানে জড়িয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে তার নিজের অধীনস্থ কর্মীদের জামিনের বিরোধিতা করা হল। বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের রায় প্রশাসন কতৃপক্ষের পক্ষে নিতান্ত অগৌরবজনক হওয়ায় জামিনপ্রাপ্ত সকল পুলিশ

কর্মীকে তৎক্ষণাৎ পি ভি এ-তে আবার আটক করা হল। এই কর্মীদের কয়েকজনকে আবার রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাবলে ৩১ই ধারায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল। বর্ধমানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককেও ৩১ ধারাতেই গ্রেপ্তার করা হয়। এই ভাবে প্রায় চল্লিশ জন কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়। এখনো নাকি আরো বেশ কয়েকজনের উপর খাঁড়া রয়েছে।

কেনেডি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আর মার্কিন দেশ উদ্ভাস্ত্র গ্রাণের ব্যাপারে কুম্ভীরপ্রাণ বর্ষণ সূর্য করেছে। চীন ত এখনও ইয়াংহুয়া সন্ত্রাস সমর্থক।

কেনেডির জলে ভেজার ঘটনা সমস্ত দৈনিকের পাতায় পাতায়। নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি কাদ কাদ মদ্য করে উদ্ভাস্ত্র ক্যাম্পে ঘুরছেন আবার কোথাও মাথা নামিয়ে কোন বৃষ্টির আশীর্বাদ কুড়িয়েছেন।

অনেক কথা এখার ওখার বলছেন, কিন্তু যখন তাঁকে মুজিবের বিচার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল তখন তাঁর মূখে কোন কথা নেই। মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ ব্যাপারেও তিনি নীরব।

আজ পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী তার পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছে। কোথা থেকে পাকিস্তান এ সাহস পায়?

মনে হয় আগে থেকেই এ সব ঠিক ছিল। তা না হলে দরবল পাকিস্তানের পক্ষে এই দুঃসাহস সম্ভব হত না। ভ্রমণ বাতিল করার ব্যাপারে কেনেডির প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মৃদু। তিনি বলেছেন যে, মানবিকতা বোধ থেকে তিনি তাঁর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পাকিস্তান কতৃক ভ্রমণ বাতিলের সংবাদে তিনি ক্ষুব্ধ।

ইনটাকের নেতারা সি পি এমের সঙ্গে এক বৈঠকে বসে পশ্চিম তীরে বন্ধ করার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার কংগ্রেসীরা ইনটাকের দুই নেতার ওপরে গত সভাতে একহাত নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে দুই নেতা কালী মুখার্জী ও ফণী ঘোষের কাছ থেকে এই ব্যাপারে জবাবদিহি চাইতে হবে আর তাঁকে তাদের পার্টি থেকে বহিস্কার করার জন্য এ আই সি সিতে দাবী জানানো হবে।

আমরাও দর্পণ বিক্রয় করি

প্রোলেটারিট বন্ধ এজেন্সীজ ২২/৬ এস বি রাহা লেন, আসানসোল

ভারত-সোভিয়েত

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

খোলাখুলি সোভিয়েত মার্কিন ভূমণ্ডলীয় নীতি সম্পর্কিত খেলার দাবার খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হবে। সোভিয়েত ও আমেরিকা নিজ নিজ দেশের স্বার্থে সামরিকভাবে হলেও দুই বিপরীত মেরু থেকে প্রায় একই পরিণতির অপেক্ষায় নিজ নিজ পররাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালনা করছে। ফলে সোভিয়েত ও আমেরিকা বর্তমান মহরতে

সিদ্ধার্থ রায়ের হস্তক্ষেপ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেবার জন্যে পুলিশকে বলে দেবেন। কিন্তু এতেও ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ রাজী হন না। বলেন, এসম্পর্কে কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষের কোনো নির্দেশ নেই। স্বাভাবিকই সিদ্ধার্থ রায় রুদ্ধ হন। তাই তিনি নরাদিল্লী গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চবনকে ধরে নির্দেশ নিয়ে এসেছেন। নির্দেশের ফলে প্রতিযোগিতার উত্তীর্ণ হলেও ছেলেরা চাকরী পাবে না। ওদের আগে নব-কংগ্রেসী হতে হবে।

আলাদাভাবে হলেও চীনকে ঘিরে ফেলার নীতি অনুসরণ করেছে। বর্তমান চুক্তিতে ভারতের এই নীতির পরিপূরক ভূমিকা গ্রহণ সম্পর্কে ব্যবস্থা পাকা হল।

বর্তমান চুক্তি দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত চীন-বিরোধী নির্বোধ জড় নীতির বহিঃপ্রকাশ, ভারতের বর্তমান নিঃসঙ্গতা ও নির্বাসিততাকে দুরীকরণের একটা ক্ষীণ, অসার্থক প্রয়াস মাত্র। সত্য সত্য যদি ভারত তার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে চায় তাহলে ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির মোড় ঘুরিয়ে তাকে চীনের সঙ্গে এবং এশিয়ার ছোটবড় সবদেশের সঙ্গে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার উদ্যোগী হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

যদি সমদ্রবর্ত্তের নীতির বদলে চীন ও সোভিয়েতের সঙ্গে একযোগে ভারত সম-সাম্মিখ্যের নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে পারে তাহলেই এই বর্তমান চুক্তির সার্থকতা প্রমাণিত হবে এবং ভারত পুনরায় বিশ্বসভায় উপযুক্ত স্থান লাভ করতে সক্ষম হবে। অন্যথায় সোভিয়েত নির্ভরতা ঠিক মার্কিন নির্ভরতার মতই ফাঁকা আওয়াজে পর্যবসিত হবে।

যাত্রাশিল্পের গৌরবজনক ভূমিকা

সরকার অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে উদাসীন

যাত্রাশিল্পিক

যাত্রাশিল্প চিরকাল দেশের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নাটক পরিবেশন করে যাত্রার অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। পুরাতনের কাহিনী নিয়ে নীতিগত ও আদর্শমূলক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল সেকালের যাত্রার আসর। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের স্থান নিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি ও সমাজব্যবস্থার উপর, পালাগান। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকও যাত্রায় সমভাবে জনপ্রিয়। কয়েক বছর ধেকেই এই রূপ পরিবর্তনের সূচনা বিশেষভাবে দেখা যায়। একদিকে সত্যস্বর অপেরার “একটি পল্লব”, তরুণ অপেরার “ধুম ভাঙার গান” নাট্য ভারতী থিয়েটার-কাল যাত্রা পার্টির “বাঁশের কেলা” যেমন সংগ্রামী মানবের চিত্র তুলে ধরেছিল, অন্যদিকে ক্লাসিকাল নাটক হিসাবে নবরঞ্জন অপেরার “মাইকেল মধুসূদন” ও নট কোম্পানীর “করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর” যাত্রার আসরে উন্নত অভিনয় ধারাকে প্রাণবন্ত কবে তুলেছে। সেদিনের আর্থ. অপেরার “রাইফেল”, ভারতী অপেরার “গরীব কেন মরে” গণ আন্দোলনে প্রভূত উপাদান দিয়েছে। উনিশশ সাতবাঁট সালের নির্বাচনের পূর্বে বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় “রাইফেল” পালাগান বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং উক্ত জেলায় নির্বাচনে

কংগ্রেস বিরোধী বক্তৃষ্ট মোচাঁ কাষতঃ ঐ ধরনের পালাগানে সত্যই লাভবান হয়েছে বলে শুনছি। বর্তমানের কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নিউ প্রভাস অপেরার নাটক “রক্তে রাঙা মাটি”ও ছিল একটি সফল পালা। গত দু বছর যাত্রায় প্রধানতঃ বৃটিশ আমলে বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ সম্বলিত পালায় প্রাধান্য ছিল। এই পালাগুলি মূলতঃ দেশাত্মবোধক। কোন কোন আসরে পর পর তিন-চার দিন ঐ সব নাটক পরিবেশিত হয়েছে। জনতা অপেরার “ফাঁসির মণ্ড” ও নাট্যভারতীর “বিনয়-বাদল-দীনেশ” এদিক দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। প্রমিক-কৃষক

আন্দোলনের আন্তর্জাতিক নেতা লেনিনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তরুণ অপেরার “লেনিন” যাত্রাকে আন্তর্জাতিক গৌরব এনে দিয়েছে। সোভিয়েত দেশ পুরস্কার পেয়ে এই নাটকে লেনিনের চরিত্র রূপায়ণের জন্য শান্তিগোপাল সোভিয়েত দেশে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলার যাত্রার মানকে উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইতিপূর্বে “ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ (বড় ফণী) নাট্যভারতীর “বাঁশের কেলা” ও অন্যান্য নাটক পরিচালনা করে দিল্লীতে যাত্রাশিল্পীদের মন্থ করেন এবং তারই স্বীকৃতি হিসাবে যাত্রায় প্রথম তিনি একাদামী পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

কিন্তু যাত্রার এত অবদান সত্ত্বেও দর্শকের কথা যে, যাত্রাশিল্পকে বাঁচাবার ব্যাপারে সরকার উদাসীন গড়ে সাত মাসের কিছু বেশি এই যাত্রার আসর চলে। বাকি প্রায় চার বা সাড়ে চার মাস যাত্রাশিল্পীরা

থাকেন বেকার। কলকাতা শহরে যদি কোন যাত্রার মণ্ড থাকত তবে নিয়মিত ভাবে জ্যেষ্ঠ-আষাঢ়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ঐ মণ্ডে যাত্রার আসর বসতে পারত। এদিক দিয়ে যাত্রার কর্ণধারদের মধ্যেও কোনরকম বোঝাপড়া বা ঐক্য নেই। তাই নতুন নাটক খুলতে হলে হয় কোন ঠাকুরবাড়ী নতুবা মালিকের পরস্যা থাকলে মণ্ড ভাড়া কবে নাটকের শ্রুত উদ্বেদন করতে হয়।

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রচুর জমি পড়ে আছে। সরকারী সাহায্য ও কর্পোরেশনের প্রচেষ্টায় যদি আজ কোন যাত্রামণ্ড তৈরী হয় তবে সেখানে নিয়মিত যাত্রা হলে দর্শকের অভাব হবে না বলেই

সকলের ধারণা। কিন্তু যেখানে সরকার ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থ ও স্বজন পোষণে ব্যস্ত সেখানে এটা দরোশা ছাড়া কিছু নয়। যদি যাত্রা-দলগুলির মালিকরা সমবেতভাবে এই নিয়ে আন্দোলন করতে পারেন এবং শিল্পীরা নিজেদের বাঁচার তাগিদে তাঁদের স্বার্থ ত্যাগ করে এবিষয়ে কার্যকরী সহযোগিতা কবেন, তবে হয়তো কলকাতায় একটা যাত্রামণ্ড তৈরী করা অবাস্তব নয়। যাত্রার মালিক ও শিল্পীরা কি এবিষয়ে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে আসবেন?

উদাসীদের জন্ম বিদেশ থেকে আনা ট্রাণসামগ্রী পাচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)-

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্ভাস্তদের জন্য বিদেশ থেকে আনা ট্রাণ সামগ্রীর বেশ কিছু অংশ পাচার হয়ে চোরাবাজারে বিক্রী হচ্ছে কলকাতায় আর পূর্ববঙ্গের অন্যান্য শহরে।

গত সপ্তাহে দর্পণের নজরে একটি সন্দেহজনক ঘটনা এসেছে। সুইজারল্যান্ড থেকে পাঠানো দুই

লরী ভর্তি চকোলেট হটাৎ দেখা গেল বেলতলা রোডে মোটর ভিহিকলস্ বিভাগের সামনে। অফিসের ছুটি হয়ে গেছে, কর্মচারীরা নেই।

দ্রুত মাল লরী থেকে উঠে গেল বিভাগের তিনতলার বাড়ীর ওপর। যে ফ্ল্যাটে গিয়ে মাল জমা হল সেখানে থাকেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে সহকারী সচিব অজিতকুমার ব্যানার্জী। হটাৎ ওই ভদ্রলোকের বাড়ীতে মাল ওঠায় অনেকের মনে সন্দেহ হয়েছে।

এই ভদ্রলোক সম্পর্কে দর্পণ গোপনে তদন্ত করে জানতে পারে যে, ব্যানার্জী সাহেবের অতীত রেকর্ড খুব ভাল নয়। তিনি আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষের অফিসার হিসাবে বর্তমান গৃহে এসে বাস করেন। এই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লরী মালিকদের লেনদেন থাকে।

কোন কারণে ব্যানার্জী সাহেবকে পরিবহন বিভাগ থেকে বদলী করে স্বরাষ্ট্র বিভাগে আনা হয় প্রায় এক বছর আগে। তখন থেকে কিছুতেই ওকে তার বর্তমান গৃহ থেকে সরান যাচ্ছে না।

তাছাড়া মোটর ভিহিকলস্ বিভাগের ডিরেক্টর সরকারের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, লরী মালিকদের ব্যাপার সম্পর্কিত প্রায় বিশটি ফাইল ব্যানার্জী সাহেব কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন তার হাদিস মেই। এই ফাইলে লরী মালিকদের কাছ থেকে সরকারের পাওনার হিসেব আর সেই সংক্রান্ত কাগজ-পত্র ছিল।

॥ আসামের ডাকে ॥ ৭৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় সত্যস্বর অপেরা

৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ ফোন-৫৫-৮১১০

নবনাট্য আন্দোলনের ঐচ্ছিক বিজ্ঞান ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত

—নতুন বাংলার জগলধের শম্ভবানি—

সোনার বাংলা

যুগসচেতক নাট্যকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় ২য়ীত

—যুগযুগপার আত্মনায়—

কালী যাম রক্ত

নাট্যপরিচালনা—পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনপ্রিয় নাট্যকার কানাই নাথের

—যাদের নথ্যাব্যতে সমাজ ক্ষতবিক্ষত—

রাতের হায়না

নাট্য-পরিচালনা—পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদেশী শাসনের অত্যাচারের বাস্তবধর্মী ঘটনায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

এক কলঙ্কময় কাহিনী * মিল বদলের ডাক

জালিয়ানওয়ালাবাগ

অজকের দিনের গ্রাম বাংলার ডাক স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ

শহর থেকে দূরে * মঙ্গল পাণ্ডে

সিপাহী বিদ্রোহ

— : রূপায়ণে : —

সর্বস্ত্রী পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় * শান্তনু ঘোষ * স্ববীন

চ্যাটার্জী * অচীন মৈত্র * মাখম সমাদ্দার * ভক্ত মল্লিক *

দেবেন্দ্রনাথ মাথ * প্রবীরকুমার * দেবশিশি গাঙ্গুলী * দিবাকর

সিংহ * জয়দেব গাঙ্গুলী * শৈবাল ঘোষাল * জয়ন্তী মুখার্জী,

মীনা দে * কল্পনা মায়েক * উমা ব্যানার্জী * মীরা অধিকারী

মহুয়া, এবং নমিতা চক্রবর্তী ও শেখর গাঙ্গুলী।

নৃত্য :—অমল শঙ্কর, নুপুর, সিদ্ধেশ্বর, ভ্রমর, বুয়ুর ও অরুণ শঙ্কর

বস্ত্রসজ্জাতে :—সত্যস্বর অপেরার কৃতি ও কুশলী যশীলজ্য।

অধ্যক্ষ :—সুবল অধিকারী

কার্য্যাধ্যক্ষ :—যামিনী গুপ্ত

সংযোজক :—মধু বড়াল।

—ব্রাহ্ম অফিস—

ভিনমুক্তিকিয়া কামাখ্যা হিন্দু হোটেল (আলম)

ফোন—ভিনমুক্তিকিয়া ৪৫৩

বুকিং এজেন্ট—অশ্বিনীকুমার দাস

নব্যরিকল্পনায় নতুন শিল্পীসমাবেশে নাট্যভারতী

বিষেট্রিকাল যাত্রাপাটি-২৪-৩২৬৯

১০৭ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

বিপ্লবীদের জীবন কাহিনী নিয়ে পুরস্কৃত পালা

বিনয়-বাদল-দীনেশ

নতুন নাটক—আনন্দময়্যেব লালকেলা

৮বিভূতি আদর্শ হিন্দু কমলেশ কালো টাকা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের হোটেল বাঁচার লড়াই

নাট্যরূপ ও পরিচালনা :—গোপাল চ্যাটার্জি সহস্রকর্তা : অমিয় ভট্টাচার্য

নির্দেশনা ও অভিনয়ে—দিলীপকুমার। সঙ্গীতে

—ক্ষিতিশ রায়। হাশুরসে—অনিল ভট্টাচার্য।

শ্রেণী—ভবানী সরকার, রণজিৎ সেন, শান্তি

ভট্টাচার্য, অনিতা ঘোষ, বেলা সরকার, মধুজী

দেবী। নৃত্য—আরতি বসু, আবহ সঙ্গীতে—

শোকা মল্লিক

পশ্চিম বঙ্গে বায়নার জন্ম হেড্ অফিসে অথবা ব্রাঞ্চ অফিস ৩৮এ ক্রীক

রো, কলি-১৪ (২৪-৩২৬৯) এ যোগাযোগ করুন। ম্যানেজার—

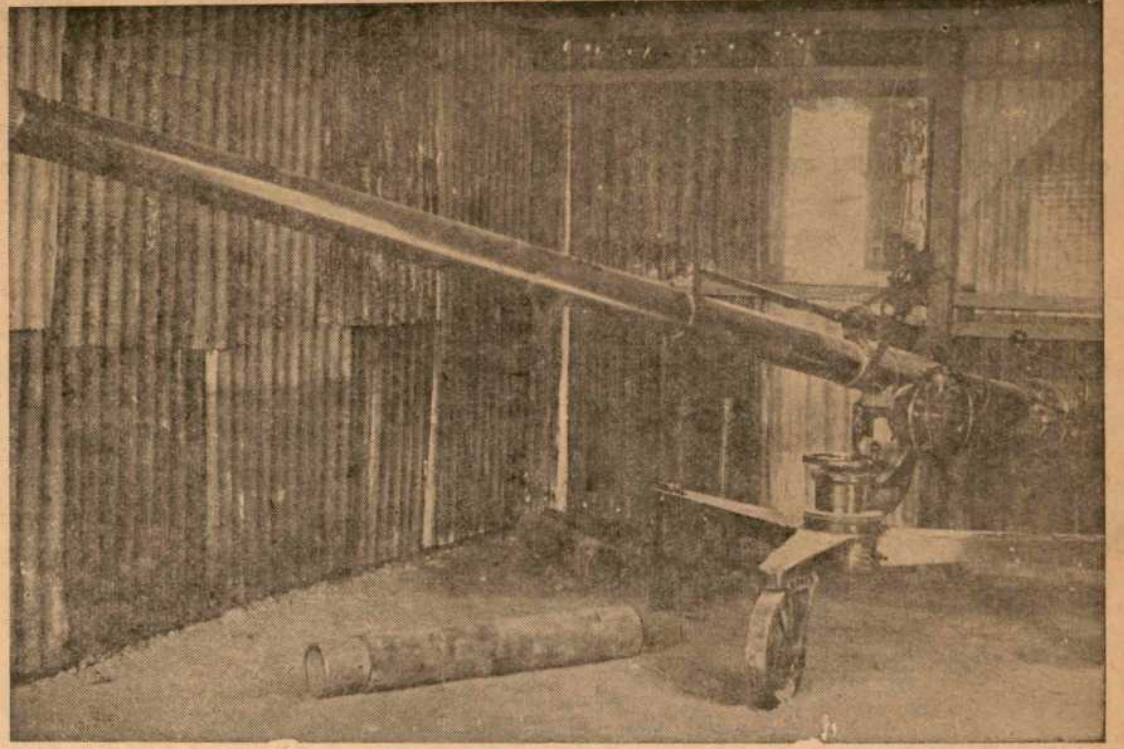
মুখেন্দ্রবিকাশ রায়। প্রচার সচিব—শিশির সেন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৫ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

দপ্পন

১৪শ বর্ষ ৩০শ সংখ্যা ৥ শনিবার ২০শে আগস্ট ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা



বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার কতৃক দখলীকৃত কামান। ছবি : প্রণব মুখার্জী

বরানগর কাশীপুরে নরমেধ যজ্ঞের পূণ্য বিবরণ পুলিশ হত্যাকারীদের সাহায্য করেছে

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) অথবা অন্যান্যকেও ব্যাপক সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করে খুনে বাহিনীর সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ দিগে এবং পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতায় মাত্র। নয়া রাজনীতি হল, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, প্রতিপক্ষকে নকশালীদের একাংশের মধ্যে

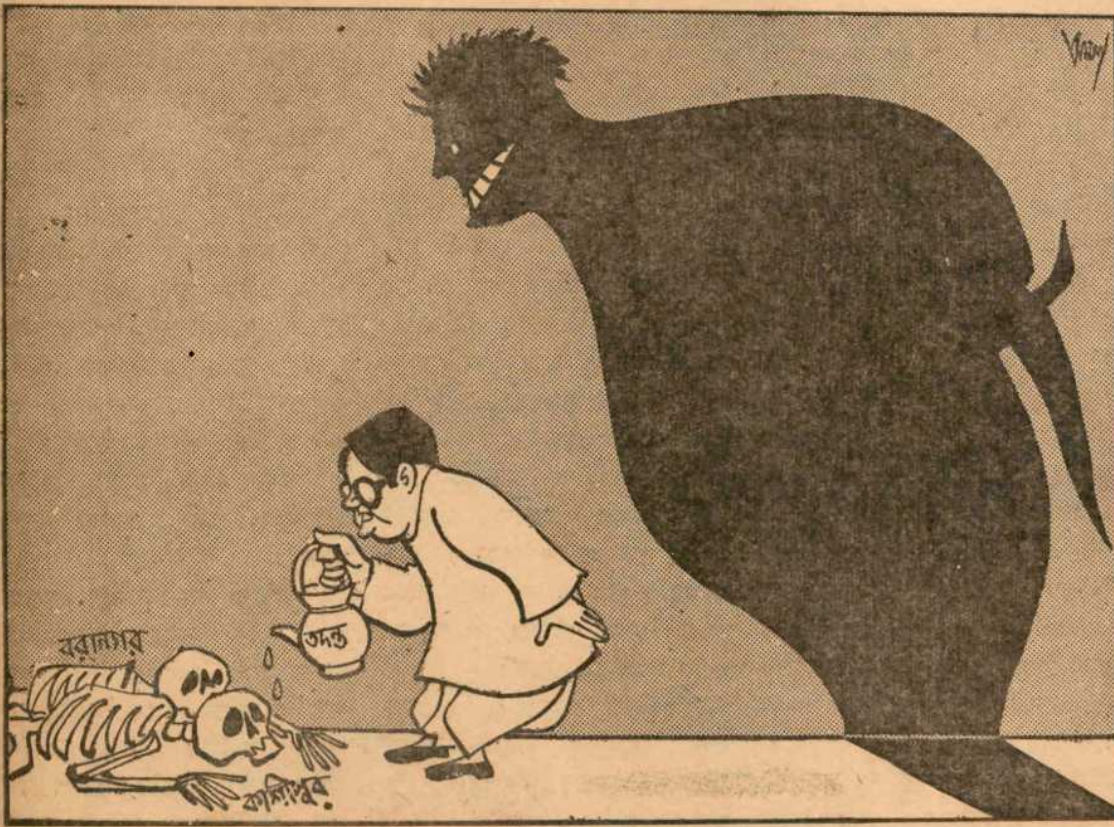
বিশেষ করে সি পি এম প্রভাবান্বিত অঞ্চলে নব কংগ্রেসের অনুপ্রবেশ এবং সেই সব এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী সন্ত্রাস এবং পুলিশের একাংশের এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা এখন আর পশ্চিমবঙ্গবাসীর অজানা নয়। যে সব অঞ্চল নকশালীদের সাহায্যে সি পি এম মুক্ত হয়েছে, সেখানে এখন প্রয়োজন নকশালীদের খতম করার; সেই অভিযান সুরু হয়েছে।

কাশীপুরের হত্যা এই অভিযানের প্রথম প্রকাশ। এতে আঁকে উঠে লাভ নেই—ভাবার সময় এসেছে কিভাবে গণতান্ত্রিক (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর কাছে চারজন বংগের নেতৃবৃন্দের অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গের নব কংগ্রেস মন্ত্রী সেই চিঠির জবাব দেননি। কমিটির পদত্যাগী সভাপতি বিজয় চিঠিতে বিজয় নাহার বলেছেন, সিং নাহার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে সিদ্ধার্থ রায়কে তিনি দ্বিতীয় এক চিঠিতে স্পষ্ট জানিয়েছেন, অতুল্য ঘোষ হতে দেবেন না। যদি সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কথায় চিঠির সঙ্গে বিজয় নাহার ভারত সরকার পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম বঙ্গের আরও চারজন নব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করতে থাকেন কংগ্রেস নেতার চিঠিও জুড়ে দিয়ে- তবে তিনি প্রকাশ্যে সিদ্ধার্থ রায়কে দিয়েছেন। এঁরাও সিদ্ধার্থ রায়ের চ্যালেঞ্জ জানাবেন এবং প্রয়োজন বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন হলে নব কংগ্রেস ছেড়ে আসল অভিযোগ এনেছেন। এঁরা হলেন, কংগ্রেসে (রিয়াল কংগ্রেস) চলে এ আই সি সি সদস্য, ভূতপূর্ব যাবেন। বিজয় নাহার চিঠিখানা ডেপুটি স্পীকার উত্তর বংগের লিখেছিলেন সতেরোই জুন উনিশ পীষ মুখার্জী, এ আই সি সি শ একান্তর সালে। আজও প্রধান- (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়)



পশ্চিম বঙ্গের নব কংগ্রেসীদের খেরোখেরির প্রতিক্রিয়া

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গে নব কংগ্রেসীদের সন্তোষ রায় পেয়েছিলেন মোট মধ্যে খেরোখেরির প্রতিক্রিয়ায় প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রার্থী ভূতপূর্ব পূর্ব মন্ত্রী সন্তোষ রায় পরাজিত হয়েছেন। নব কংগ্রেসী

দার নির্বাচনেই দাঁড়াননি। এই চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যাপারে নব কংগ্রেসীদের খেরোখেরি জমেছিল ভাল। কংগ্রেস লীগ মন্ত্রিসভার কো-অপারেটিভ (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

মাত্র সাত লক্ষ টাকায় লীগের সমর্থন মিলেছিল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বেশী নয়, মাত্র সাত লক্ষ টাকায় পশ্চিম বঙ্গে বিগত কংগ্রেস লীগ মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগের সমর্থন কেনা হয়েছিল বলে দর্পণ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ জানতে পেরেছে। এই লেনদেন হয়েছিল, নয়াদিগ্গীর উইন্ডসর প্লেসে রাজ্যসভার নব কংগ্রেসী সদস্য দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জীর ঘরে। উপস্থিত ছিলেন, কেরালার মুসলিম লীগের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহম্মদ কয়া, সিদ্ধার্থশংকর রায়, শ্রীমতী পূর্ববী মুখার্জী, পূর্ববঙ্গের দেবেন মাহাতো এবং শংকর নারায়ণ সিং দেও। এখানে লেনদেনের ব্যবস্থা পাকা হবার পর দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জী ফোনে নয়াদিগ্গীর থেকে

পশ্চিম বঙ্গের নব কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রচণ্ড খেরোখেরির প্রতিক্রিয়া এখন অনেক গোপন তথ্য বেরিয়ে আসছে। নির্বাচনের সময় দিল্লী থেকে অটেল টাকা এসেছিল। সেই টাকা কারা কারা মেরেছেন তার কাহিনীও আলোচিত হতে সুরু হয়েছে। দর্পণও খবর-গুলোর জন্যে কান পেতে আছে।

বরানগর-কাশীপুর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলন এর মোকাবিলা করতে পারে।

নব কংগ্রেসী নয়া নেতারা, যেমন সিদ্ধার্থ রায়, প্রিয়রঞ্জন দাশ-মুন্সী আরও অনেকে কাশীপুরের গণহত্যাকে উল্লাসের সঙ্গে গণ-অভ্যুত্থান বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সিদ্ধার্থবাবু রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সর্বদলীয় সভায় বলেছেন কাশী-পুরের ঘটনায় স্থানীয় অধিবাসীরা আনন্দিত হয়েছেন আর ঐ অঞ্চল “সমাজবিরোধী” মন্ত্র হওয়ার অধিবাসীরা স্বাধীন নিবাস ফেলেছেন।

এই নিবাসের উত্থাপ তিনি অনুভব করলেন গত রবিবার হত্যা যেখানে সংঘটিত হয়েছে সেখানে থেকে এক মাইল দূরে বরানগরের এক অঞ্চলে কয়েক মিনিটের গোপন ভ্রমণ মাধ্যমে। কাশীপুরে হত্যা হল, তিনি গেলেন বরানগরে ওখানকার থানার অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল কোনওকিছরে সি পি এমকে জড়ান যেন কিনা তার মতলব ভাজতে। ও সি বলেন তা করার ঝুঁকি অনেক। তাই অধিবাসীদের স্বাধীন নতুন শ্লোগান।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সভায় তিনি যা বলেন নি তা হল : এই কাশীপুরে সম্প্রদায় সদৃশ হয় উনিশশ উনসত্তরের শেষ দিক থেকে। সম্প্রদায়ের উদ্যোক্তা নব কংগ্রেসের নামধারী স্থানীয় মাস্তানরা। তথাকথিত নকশালপন্থীরা অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসে, স্থানীয় কংগ্রেসী সমর্থকরা আর সমাজ-বিরোধীরা সম্প্রদায়ের পথে নামে। সি পি এম-এর ওপর আক্রমণ সদৃশ হয়। ওদের কর্মীরা নিহত হতে থাকে, স্থানীয় পার্টি অফিস বোমা অগুনে বার বার বিধ্বস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত পাততাড়ি গতিয়ে সি পি এম পেছন হটে। এর পরেই উত্তরে বরানগর, পূর্বে সিপি, দক্ষিণে বাগবাজার, জোড়াবাগান অঞ্চলে একই কায়দায় নকশালী-নব কংগ্রেস আঁতাতে সি পি এম-বিরোধী অভিযান সদৃশ হয়।

এ অভিযানে জোড়াবাগান, বাগবাজার চাঁপের অঞ্চল বেশী প্রাধান্য পায় কারণ নির্বাচনে নব কংগ্রেসীরা এই সব এলাকায় প্রার্থী দাঁড় করানোর পরিকল্পনা করে। এই দুই অঞ্চলে অবশ্যম্ভাবী নব-কংগ্রেসী প্রার্থী নেপাল রায় আর শত ঘোষ (প্রফুল্লকান্ত ঘোষ)। এরা দুজন দোস্ত বনে যার-মেজাজে, সংগঠনিক শক্তিতে, উচ্চাশায় আর রাজনীতিতে যে কোন পন্থীত অবলম্বনের ব্যাপারে দুজনের অনেক মিল। উচ্চাশায় কৌশলের তাগিদে ওদের দুজনের অস্তিত্ব কিন্তু চেপে রাখা যায় নি।

কাশীপুর, জোড়াবাগান বাগ-বাজার অঞ্চলের নব কংগ্রেসী ভলান্টিয়ার্স বাহিনী এক বোম্বো কাজ করেছে নির্বাচনী প্রচারাে। নকশা-

লীরা সি পি এম বিরোধিতায় ও হত্যায় এদের সহযোগিতা করেছে। কাশীপুরে নির্বাচনের পূর্বে সংগঠন কংগ্রেসের প্রার্থী সদৃশীল পালকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করার স্বল্প সম্ভাসের কৌশল কার্যকর ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। প্রথমে সদৃশীলবাবুর গাড়ী জ্বলে গেল, সকলের চোখের সামনে প্রকাশ্য রাস্তায়। তারপর তিনি চিঠি পেলেন—তাতে তাঁকে হত্যার হুমকী ছিল।

সদৃশীলবাবু শত ঘোষের ভোট ভাঙতে পারেন এই ছিল নব কংগ্রেসীদের ভয়। সদৃশীলবাবু শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ালেন—শত-বাবু নির্বাচনে জয়ী হলেন।

এর পর নেপাল রায় নিহত হলেন আর মাস্তানদের মধ্যে অনেক মন কষাকষি দেখা দিতে লাগল। কিছুদিন পরে কাশীপুরে অমৃত-বাজার-বাগানের মালিক ঘোষ পরিবারের একজন সদস্যরূপে ঘোষ নিহত হলেন। শত ঘোষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হল। পদলিখী প্রহরা ছাড়াও নিজের দেহরক্ষী বাহিনী সর্বদা তাঁকে আগলে রাখল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কাশীপুরের গণহত্যার ছবি পরিষ্কার। ওই অঞ্চলের সংগঠিত প্রতিষ্ঠান নব-জীবন সংঘ—রাজনীতির দিক থেকে ঘোর সি পি এম বিরোধী নিহত নির্মল চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে নব কংগ্রেসীদের কক্ষায়, আর সদস্যদের মধ্যে আছে নকশালপন্থীরা সি পি আই, বিদ্রোহী পি এস পি এবং অবশ্যই নব কংগ্রেসের সমর্থকেরা।

নবজীবন সংঘের সম্পাদক এবং ঐ অঞ্চলের প্রভাবশালী ব্যক্তি নির্মল চ্যাটার্জী মহাশয় বিয়াল্লিশ বছর বয়সের যুবক, বরানগরের অধিবাসী। কাশীপুরে অঞ্চলে ইউনিয়ন কারবাইডের কারখানায় কাজ করতেন। সংগঠনীয় দিক দিয়ে তিনি উদ্যমী তরুণদের সি পি এম-বিরোধী রাজনীতিতে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই তরুণদের মধ্যে অবশ্যই নকশালীরা ছিল।

নির্মলবাবু শত ঘোষের নির্বাচনী প্রচারণার ও সংগঠনের প্রধান নেতা। সেই হিসাবে শত ঘোষের স্নেহপুষ্ট। এবং সেই একই কারণে স্থানীয় বরানগর ও কাশীপুর থানায়ও দোদুন্দ্ব প্রতাপ।

সম্প্রতি কিছুদিন ধরে নির্মলবাবু যেন একটু আনমনা ছিলেন। তাঁর মনে মনে আশঙ্কা হচ্ছিল বোধ হয় নেপাল রায়ের পরিণতি তাঁরও হতে পারে। কাশীপুরে হয়ত আবার নির্বাচন হবে, এবং নির্মলবাবুর মত প্রভাবশালী লোক থাকার অর্থ কংগ্রেসী প্রার্থী যিনিই হবেন তাঁকে নির্মলবাবুর ওপর নির্ভর করতে হবে। এবং হয়ত নির্মলবাবু নিজেই ভবিষ্যতে

নির্বাচন প্রার্থীরূপে নব কংগ্রেসী মনোনয়ন দাবী করতে পারেন। এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়।

তাছাড়া নির্মলবাবু জীবিত থাকতে অন্য কেউ ওই অঞ্চলে তরুণদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই উচ্চাশায় সম্প্রদায় কোন প্রভাবশালী নেতার পক্ষে নির্মলবাবু মোটেই নিরাপদ নয়।

কিছুদিন থেকেই শত ঘোষ মহাশয় কাশীপুর ও বরানগর থানার ও সিনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা পাকা করেন। ওরই অনুরোধেই দুই অঞ্চলে একশ পাঁচ টাকা মাইনের বহু তরুণ স্পেশাল হোম গার্ড হিসাবে চাকরী পায়। শত ঘোষ মহাশয় নিজের বাহিনী গোপনে সংগঠন করতে থাকেন।

নির্মলবাবু শংকিত হয়ে ওঠেন নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে। সংগঠন শক্তি থাকলেও প্রতিপক্ষের অর্থের সামর্থ্য তার ছিল না। তাঁকে সাইকেলে করে চাকরী করতে যেতেই হবে—তার নিরাপত্তায় পদলিখ প্রহরা থাকবে না। নিজের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করতে উদ্যোগী হলেন।

নির্মলবাবুর সঙ্গে নকশালীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হল। ওর তথ্য-বাহানে পদলিখী মতে “বিপ্লবজনক” নকশালীরা ছাড়া পেতে লাগল। শেষ দল ছাড়া পেয়েছে উনি নিহত হওয়ার মাত্র সাত দিন আগে। এই দলে ছিল তরুণ নকশালী সম্প্রদায় বাবলা বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে নকশালীরা দেখে হঠাৎ ওদের ওপর নজর যেন বেড়েছে। ওদের গোপন আস্তানা ছিল কাশীপুরের মন্সীর মাঠ এলাকায়। সেখানে ওদেরই পরিচিত নব কংগ্রেসী ছেলেরা কিছুদিন ধরে আনাগোনা করতে থাকে। কাশীপুরের অন্যান্য এলাকাতেও নকশাল গোপন আস্তানার ওপর নজর বাড়ল।

নকশালীরা আসে নির্মলদার কাছে, অভিযোগ জানায় এই নজর রাখার ব্যাপারে, বলে ব্যাপার গোলমালে। নির্মলদা বুঝতে পারেন না আসল ব্যাপার, খোঁজ খবর নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে নকশালীদের বিদায় করেন। ওদের বলেন যে, সন্দেহ অমূলক। কিন্তু নির্মলদার শংকা আরও ঘনীভূত হয়।

এই অবস্থায় নির্মলদা তাঁর নিজের দেহরক্ষীর সংখ্যা বাড়ান। কাশীপুরে ও বরানগর থানায় যোগাযোগ করেন হঠাৎ নকশালীদের ওপর নজর বাড়ান হয়েছে কিনা। নবজীবন সংঘ ও নিজের বিশ্বস্তদের এ ব্যাপার গোপনে জানান। নকশালীরা কিন্তু ক্রমশঃ নির্মলদাকে বেশী সন্দেহ করতে থাকে।

গত বৃহস্পতিবার (বারই আগস্ট) সকালে তাঁর দেহরক্ষীরা কি যেন বিশেষ কারণে সকালে হাজির হল না। মনে ভাবলেন, কে এদের আসতে বারণ করল? সন্দেহ নিয়ে নির্মলবাবু একাই সাইকেলে বেরিয়ে পড়লেন—সংঘ,

ক্লাব, সরস্বতী পুজো, কালীপুজো ইত্যাদি নিয়ে মেতে ছিলেন, কখনও রাজনীতি করেন নি। তাই এর মধ্যে চক্রান্তের কোন খবর তার জানা ছিল না। কেবলমাত্র কিছুদিন ধরে কেমন যেন অস্বস্তি বেড়েছে।

সাইকেলে ফেরার সময় কাশী-পুরের রতনবাবু রোডের কাছে নিজের প্রভাবশালী এলাকার পরিচিত ছেলেরা তার দিকে এগিয়ে এল। রাস্তার মোড়ে একটি দোকানে তারা বসেছিল নির্মলবাবুর অপেক্ষায়।

নির্মলবাবু আসতে ওরা পাঁচ ছয় জন ঠেকে থামল। একজন বলল : “গুরু, তুমাকে আজ মারতে হচ্ছে, উপায় নেই।” মর্মে-তের মধ্যে ওঁর রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল, হত্যাকারীরা পাকা খুনী, হাত কাঁপে না। নির্মলবাবু কোন প্রতিরোধের চেষ্টা করেন নি, হত্যাকারীদের খুনের পাকা হাতের কথা তার জানা ছিল।

আগে থেকে সব যেন প্রস্তুত ছিল। ওদিকে বরানগরে মার্কসবাদীদের একজনকেও ঐ দিন হত্যা করা হল। মার্কসবাদীরা তাদের নিজস্বের কায়দায় বরানগর বন্ধ করিয়ে দিল। পদলিখী কিন্তু এই দুই হত্যায় কোন আগ্রহ দেখেন না।

বিশেষ করে নব কংগ্রেসী নেতা নির্মলদার হত্যায় পদলিখী সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থানে এসে কেন তদন্তের ব্যবস্থা বা হত্যাকারীদের পরিচিত আস্তানায় হানা দিল না।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অসম্ভব কান্ড ঘটতে লাগল। লরী লরী তরুণের দল এসে পৌঁছতে লাগল। সেই পরিচিত চেহারা, বেঁটে রোগা রোগা শরীরে চেহারা, চল রুদ্ধ, চেঁচাড়ে মুখ, সরু প্যান্ট, চোখের কোলে ঘন কালি।

ওদের হাতে পাইপগান, রিভলবার, খোলা তরুণাল, বড় বড় ছুরি, কারও হাতে পেটলের টিন, এমনকি পিচকারী পর্যন্ত।

স্থানীয় অধিবাসীরা দোকান-পাটে বন্ধ করে অনেকেই সরে পড়ল। অনেকে বুঝল আজ আর রক্ষে নেই। যাদের যাওয়ার উপায় নেই তারা আটক পড়ল।

নকশালীরা অনেকে সরে পড়ল, কিন্তু আবার অনেকেই দেখল পথ আটকে গেছে। এখন তাদের সম্ভব ফিরল—তারা বুঝল কেন সম্প্রতি তাদের আস্তানার ওপর নজর বেড়েছিল।

স্থানীয় লোকেরা দেখেছে, সাদা পোষাকে পদলিখী খোলা রিভলবার হাতে বিশেষ বিশেষ জায়গায় মোতায়েন আছে, বিশেষ করে পদলিখীর কাজ ছিল এলাকা থেকে পালানোর পথ রুদ্ধে দাঁড়ানো। উত্তরে বরানগর পদলিখী আর এদিকে কাশীপুর পদলিখী।

সন্ধ্যা থেকে তাম্বব সরু হল। নকশালীদের আর নির্মলবাবুর যারই কাছের লোক তাদের বাড়ীতে আস্তানায় বেপরোয়া আক্রমণ। দ্রুত হত্যা চলতে লাগল, একের পর

এক, গুলি, লাঠি, ছোরা সব কিছুই ব্যবস্থা হল। সারা এলাকায় আগুন জ্বল উঠল।

অত্যন্ত সংগঠিত ব্যাপার। একদল নিহতদের জড়ো করে মৃত্যু অলকাতরা মাথাতে লাগল, আর একদল ঠেলাগাড়ী আর রিক্সায় করে মৃতদেহ সরাবার কাজে লেগে গেল।

বেথনে বাড়ীতে গিয়ে ওরা ছেলেদের পেল না, সেখানে বাবা মা বোন বা অন্যান্য আত্মীয়দের নির্বাচন করে খুন করল। কোন কোন জায়গায় খড় মন্ড অলাদা করে তিন-তলা বাড়ীর ওপর থেকে ছুঁড়ে নীচে রাস্তায় ফেলতে লাগল।

বাবলা বিশ্বাস নামে নকশালী তরুণকে নির্মলবাবু মাত্র সাতদিন আগে পদলিখীর হাত থেকে খালাস করেছেন তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল খুনেরা।

বাবলার বাবা ভবানী বিশ্বাস এক কাঠের গোলার সামান্য কর্মচারী। কর্মস্থল কাশীপুর। তিনি ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন রাজেন্দ্র লাল রায়চৌধুরী রোডে এক পাঁচ তলার বাড়ীর একদম ওপর তলায় একটি আত্মীয়ের ফ্যাটে। খুনেরা ওকে ওপর থেকে খুঁজে বার করে নৃশংসভাবে হত্যা করল।

এদিকে দর্পণ খবর পেয়েছে বাবলা পালাতে গিয়ে সাদা পোষাকের পদলিখীর হাতে ধরা পড়ল। ওরা বাবলাকে খুনের হাতে তুলে দিল। বরানগর বাজারের কাছে ওকে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা দর্পণকে জানিয়েছে।

নিহতের সংখ্যা কত তা হিসেব করে লাভ নেই। স্থানীয় লোকদের মতে দেড়শ জনের কম নয়। আহত বেশী নেই, কারণ ওরা হত্যা করতে এসেছিল, জখম করে ছেড়ে রাখতে নয়।

রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী রোড সংচাষী পাড়া রোড, রতনবাবু রোড আর আশপাশের এলাকায় পুরো চাঁদাঘ ঘন্টা একটানা হত্যা তাণ্ডব লুট চলল। বরানগর বাজার থেকে কয়েকগজ উত্তরে কাপড়ের মদীর দোকান একের পর এক লুট হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এর মাঝে একটা মদের দোকান পড়েছিল। সে দোকান কিন্তু অক্ষত।

তারাপদ ব্যানার্জীর দোতলা বাড়ী নাকি নকশালীদের গোপন আস্তা ছিল। দর্পণের সংবাদদাতা শূক্ৰবার রাতে ওখানে গিয়েছিলেন। কাউকে বাড়ীতে দেখা যায় নি। দরজা খোলা, বাড়ীর লোক কেউ নেই। সমীর ভণ নাকি নকশালী ছিল—সে নিহত, তার মা কোন কথা বলতে পারেন নি, চোখে ভয়ের ছাপ। এ অবস্থা সারা অঞ্চলে। দর্পণের সংবাদদাতাকে স্থানীয় ভীত সম্ভ্রান্ত লোকেরা কোনক্রমে ওখান থেকে বার করে দিয়েছে।

এত বড় কান্ড হয়ে গেল পদলিখী কিন্তু কোন রেকর্ড নেই। কাশী- (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

দুর্গাপুরে বেপারোয়া ছাঁটাই ও পি ভি আইনের প্রয়োগ সমাজাবিরোধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে উগ্র-রাজনীতির আড়ালে গুপ্ত হত্যা ও নেতৃত্বের উপর পদলিখী অত্যাচারের প্রচণ্ড রূপ ক্রমশ প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে।

অভিযোগ, বিশেষ করে সি পি এমের শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ-র কর্মীদের বিরুদ্ধে এধরনের পদলিখী নিপীড়ন ও বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়ে কর্মীদের ভাতে মারার সুপারিকর্ষিত ষড়যন্ত্র এখন দুর্গাপুরের নিত্যনৈমিত্তিকের ঘটনা। হিন্দুস্থান স্টীল এম্পলয়ীজ ইউনিয়নের জয়েন্ট সেক্রেটারী জীবন রায় ও বাসুদেব চ্যাটার্জী গত বছর থেকেই শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা হিসাবে পদলিখী প্রশাসনের বিষয় নজরে পড়েন। গত বছর দুর্গাপুর ধর্মঘটের কিছুদিন পর একাধিক আগস্ট উনিশশ সত্তর সালে স্টীল প্রোজেক্টের জীপ চারি ও অন্যান্য তিনটি মামলায় (দুর্গাপুর পি, এস, কেস নং ৬৬ অফ ২০৮-৭০) নাজেহাল করেন। যদিও ম্যাজিস্ট্রেট পদলিখী প্রশাসনের বজ্রাতির সংগে একমত না হয়ে পরে এদের ছেড়ে দেন। তবে এরা ছাড়া পাননি পি ভি এ্যাক্টের হাত থেকে। ছাব্বিশে জুন এদের গ্রেপ্তার করে এদের পি ভি এ্যাক্টের আওতায় আনা হয়েছে।

গত চৈতন্যই ফেব্রুয়ারী তারিখে

মার্কনী এভেনিউর কাছে জনৈক বাস্তি কয়েকজন দৃষ্টান্ত দ্বারা ছত্রিকা হত হন। কর্তৃকর্মী পদলিখী বাহিনী চব্বিশে ফেব্রুয়ারী তারিখে হিন্দুস্থান স্টীল এম্পলয়ীজ ইউনিয়নের এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী ফণী-ভূষণ ভট্টাচার্য সহ সি আই টি ইউ-র কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মীকে আদালতে উক্ত অভিযোগের (দুর্গাপুর পি এস কেস নং ৩৯ অফ ১৪-২-৭১) সংগে জড়িত করে মামলা রুজু করলেন। হাজতে থাকার জন্যে এসব কর্মীদের পক্ষে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হলো না। আদালতে অভিযোগ প্রমাণ করার মত ক্ষমতা পদলিখী প্রশাসনের হলো না। বিচারক এদেরও মজুরি আদেশ দিলেন। তবুও কিন্তু এরা ছাড়া পেলেন না। জেলা শাসকের সেই করা পি ভি এ্যাক্টের আদেশে এদের আটকে রাখা হলো।

হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন এম্পলয়ীজ ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী রূপক রায় ও উজ্জ্বল দাসকে বারোই মার্চ তারিখে মর্ডার চার্জ (দুর্গাপুর পি এস কেস নং ৫০ অফ ১৪ ২ ৭১) আদালতে আনা হলো। সনাক্তকরণ প্যারেডের আদেশ দেওয়া হলো। এক্ষেত্রেও এরা নির্দোষ বলে ছাড়া পেলেন। কিন্তু পি ভি এ্যাক্টের হাত থেকে তারা নিস্তার পেলেন না। জেল

থেকে বেরিয়ে আসার আগেই এদের এই আইনে বন্দী করা হলো। এই একই কেসে অভিযুক্ত করে হিন্দুস্থান স্টীল এম্পলয়ীজ ইউনিয়নের দায়িত্বশীল নেতা সুনীল সেন, অল বেঙ্গল প্রাইমারী টীচার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ধমান জেলার সেক্রেটারী কল্যাণ রায়, দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড এম্পলয়ীজ ইউনিয়নের নেতা সুরেশ ভট্টাচার্য ও বাদল ঘোষকে চব্বিশে এপ্রিল তারিখে পদলিখী আবার গ্রেপ্তার করে। এরা সবাই জামিনের আবেদন করেন। জামিন মঞ্জুরও হয়। কিন্তু জেল গেট থেকে বেরিয়ে আসার আগেই এদের পি ভি আইনে আবার জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

পদলিখী প্রশাসনের বজ্রাতির এখানেই শেষ নয়। যখনই এরা বেরিয়ে সাধারণ আইনে কর্মীদের শাস্তি করা যাবে না তখন মজুরি অথবা জামিন পাওয়ার আগেই পি ভি আইনে তাদের বন্দী করা হচ্ছে। এমন ঘটনা আরও অনেক রয়েছে। অম্লভূত ব্যাপার হলো, সুপারিকর্ষিতভাবে এধরনের পদলিখী হয়রানি, সিটু শ্রমিক সংগঠন ও সি পি এম নেতৃত্বের উপরেই প্রয়োগ করা হচ্ছে বেশী। শ্রমিক কর্মচারীদের উপর পি ভি আইনের ছড়াছড়ি হলেও বর্ধমান জেলায় সতেরো আঠারোটি খুন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অভিযোগে প্রকাশ, প্রকৃত আসামীর প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে নাম উল্লেখ করা হয়েছে এমন অনেক অপরাধীই পদলিখীর নাকের ডগায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পি ভি এ্যাক্ট ছাড়াও গরীব শ্রমিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দাঁড়ি করিয়ে এদের নাজেহাল করা হচ্ছে। অভিযোগ, গ্রাফাইট লিমিটেডের তেত্রিশজন কর্মীর বিরুদ্ধে মোট সাতাশটি ক্রিমিনাল কেস রুজু করা হয়েছে। এদের মধ্যে এমন কর্মীও রয়েছে যার বিরুদ্ধে নয়টি কেস রয়েছে।

বিভিন্ন শিল্প সংস্থার কর্তৃপক্ষরাও পিছিয়ে নেই। মামলা মোকদ্দমায় জড়িত থাকার ফলে কাজে অনবস্থিত কর্মীদের ছাঁটাই করতেও এরা স্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন না। এ ভি বি কোম্পানীতে ছাঁটাই হয়েছে সাতচল্লিশ জন। গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড সাতাশ জন।

এসব ঘটনায় দুর্গাপুরের কর্মীমহল ভীষণ বিক্ষুব্ধ। আরও অনেক অভিযোগ তাদের রয়েছে। সবার উপরে এদের অন্যতম প্রশ্ন হলো, গরীব কর্মীদের বকে বেয়নেট ঠেকিয়ে, মিথ্যা মামলায় নাজেহাল করে, দিনের পর দিন জেল হাজতে পাঠিয়ে রোটান্ডায় শান্তি বৈঠক বসালেই কি প্রকৃত শান্তি ফিরে আসবে?

নোয়াপাড়া অঞ্চলে বিভাগীয়কার রাজত্ব

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

সম্প্রতি কয়েকমাস ধরে নোয়াপাড়া অঞ্চলে বেশ কয়েকজন সমাজ-বিরোধী, পদলিখী এবং সি আর পির যোগসাজসে বেশ কয়েকটি উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটে চলেছে।

নোয়াপাড়া থানা থেকে একশ গজ দূরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ডানবার কটন মিলস। এখানে ছ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নোয়াপাড়া থানার স্বৈরাচারী ও সির প্রকাশ্য সহযোগিতায় দুটি রাজনৈতিক দলের গুন্ডারা পরিকল্পিত ভাবে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ছয়ই জুন থানা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ইউনিয়ন অফিসের মধ্যে ঢুকে এক গুন্ডা বাহিনী শ্রমিক ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ সুবোধ দাসকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইতিপূর্বে বারোই মার্চ উক্ত সমাজ-বিরোধীরাই ডানবারের কর্মচারী শৈলেন ভট্টাচার্যকে কাজে যাওয়ার পথে অপহরণ করে হত্যা করেছিল। আবার সতেরোই মে কর্মী নিকুঞ্জ দেবনাথকে পার্শ্বিক ভাবে হত্যা করে সোঁতলা ট্যাকের কাছে ফেলে রেখে যায়। আঠারোই জুন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক বলিরাম সিংকেও উক্ত গুন্ডা বাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওয়াক-আউটের সদস্য প্রাণেশ শর্মাকে বলিরাম সিংয়ের হত্যাকারী হিসেবে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। প্রকাশ, থানার অভ্যন্তরে গ্রীষ্মকে নাকি জেরা করেন স্থানীয় দক্ষিণ পন্থী কমিউনিস্ট পার্টির এক নেতা। এই ঘটনার পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন : থানার ও সি স্কোশিশ নাগ, ঐ বিশেষ নেতা? বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে শ্রমিক আন্দোলনের আলিকে হত্যা এবং উনতিরিশে মে মিলের শ্রমিক সহদেব মালাকে নির্মমভাবে প্রহার করার ঘটনার সংগেও ঐ সমস্ত সমাজবিরোধীরাই জড়িত।

নোয়াপাড়া অঞ্চলে এই সমস্ত দৈনন্দিন বিভাগীয়কার সুযোগ নিয়ে মিস মালিক শ্রমিক শ্রেণীর উপর আক্রমণকে আরো কেন্দ্রীভূত করেছে। ক্রমাগত লে-অফ শুরুর হয়েছে, মেডিকেল সার্টিফিকেট না নিয়েই শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। শ্রমিক নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে ওয়াক-আউটের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

উক্ত অঞ্চলে কিছুদিন আগে আরো একটি পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছে। অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার জন্য স্থানীয় কিছু মহিলা এবং যুবক সশস্ত্রিত ভাবে গড় শ্যামনগরের গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারের মধ্যে থেকে কয়েকজন সমাজ বিরোধীকে পদলিখীর হাতে তুলে

দিয়েছিল। এই অপরাধের প্রতিদানস্বরূপ গভীর রাতে নৈহাটি সি আই এর নেতৃত্বে এক বিরাট সি আর পি বাহিনী এসে গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার অঞ্চল ঘেরাও করে বৃদ্ধ-যুব-ছাত্র-মহিলা নির্বিশেষে বেপারোয়া প্রহার শুরুর করে। যুব ফেডারেশনের সম্পাদক সমীর চট্টোপাধ্যায়, কর্মী গিহির চৌধুরী ও দলীল দত্ত সহ অনেককে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। এছাড়া ষাট বছরের বৃদ্ধ গৌরী-শঙ্কর মিলের নিরীহ শ্রমিক গুরুদাস ঘোষকে বন্দুকের নল দিয়ে পার্শ্বিক ভাবে প্রহার করা হয়। পরে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পর ছয়ই আগস্ট তিনি মারা যান।

ক্রমাগত এই সন্ত্রাসী আবহাওয়া সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের প্রশ্ন : স্থিতিস্থাপক কি অচিরে এই বিভাগীয়কার অবসান ঘটতে পারবেন?

ফেরিওয়ালাদের ওপর পুলিশী হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ কবে ধর্মতলা, চৌরঙ্গী ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউ প্রভৃতি স্থানে পদলিখী ফেরিওয়ালাদের ওপর নির্বাচন চালিয়েছে পাইকারী হারে। যার ফলে ফেরিওয়ালারা সং উপায়ে রুজি রোজগার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এইভাবে ভাগ্যহত এই লোকগুলোকে জেরা করে অসামাজিক জীবনের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

কংগ্রেস সরকারের “সুশাসনে” জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে, দীর্ঘকাল বা বন্যার কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ লোক গহরে ছুটে আসে জীবিকাজনের আশায় তার ওপর শহরের অনেক কলকারখানা বৃদ্ধ, ছাঁটাই ও লে-অফের ফলে বহু লোক জীবিকাচ্যুত হচ্ছে। এই সব দরিদ্র লোকের কিছু অংশ সংভাবে বাঁচার তাগিদে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ফুটপাথ বা রাস্তার বসে সামান্য রোজগারের পথ খুঁজে বার করে।

কিন্তু তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে রাস্তা ও ফুটপাথ থেকে তাদের বিতাড়িত করার জন্য সরকার উঠেপড়ে লেগেছেন। তাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফোর ওলা সমিতি ঠিক করেছেন যে, আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা রুজি রোজগারের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য সচেষ্ট হবেন। তাঁরা সরকারের কাছে এই প্রস্তাব দিচ্ছেন যে, ফেরিওয়ালারা এই সমস্যার সুস্থ সমাধানের জন্য অবিলম্বে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করা হক।

কৃষ্ণ গ্লাস ফ্যাক্টরীর মালকরা

গোলমাল করছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দীর্ঘ কয়েকমাস বৃদ্ধ থাকার পর যাদবপুরের কৃষ্ণ গ্লাস ফ্যাক্টরী খুলেছে। কয়েকটি চক্রির ভিত্তিতে ক্রোড়ার তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ, বর্তমান মালিকগোষ্ঠীর ডাইরেক্টর গ্রীষ্মাণী কার্যত সেই চক্রি মানতে নারাজ হচ্ছেন। বেতন এ্যাডভান্স প্রভৃতি বিষয়ে নানা অজুহাত তুলে কর্মীদের হয়রান করা হচ্ছে। এছাড়া ষাঁচা এতদিন ফ্যাক্টরীতে স্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করে আসছিলেন এখন তাদের ক্যাজুয়াল কর্মীরূপে কাজ করতে বাধ্য করান হচ্ছে। এবং কর্মীদের চাকুরীতে যোগ দিতেও নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। সংস্থার জনৈক দায়িত্বশীল কর্মীকে পনেরোই জুন তারিখের এক নোটিশে কাজে যোগ দিতে বলা হয়। নোটিশ পিরিয়ডের মধ্যে কর্মীটি কাজে যোগদান করেন। কিন্তু মালিক গোষ্ঠীর একজন একান্ত অনুগত কর্মী এ্যাসিস্টেন্ট ওয়াক-আউট ম্যানেজার অপারেশন বসু, উক্ত কর্মীটির

হাজিরা খাতায় উপস্থিতির সেই কটে দেন। যদিও নিয়মিত ভাবে উক্ত কর্মী এখন কাজ করে যাচ্ছেন, তবু মালিক গোষ্ঠী এখন তাকে পাওনা বেতনও দিতে চাইছেন না। এই ধরনের অবিচারের ঘটনা আরও অনেক রয়েছে। ইউনিয়নের নেতা সুরেশ বণিক, অল বেঙ্গল গ্লাস ওয়াক-আউট ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী পণ্ডু ভট্টাচার্য ও দায়িত্বশীল নেতা রাজদেও গোয়ালা মালিক গোষ্ঠীর সংগে এসব নিয়ে বহুবার আলোচনা করেছেন। প্রমদপ্তরেও আলোচনা হয়েছে বার কয়েক। তবু মীমাংসা কিছু হয়নি। জানা গেল কর্মীদের দাবী দাওয়ার যৌক্তিকতা প্রমদপ্তরও অস্বীকার করতে পারছেন না। তবু মালিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া অসম্ভব কারণ সম্ভব হচ্ছে না। দেশের কাঁচ শিল্পের একটি অন্যতম কাবা থানা ধর্মসের মধ্যে। সরকার নির্বিকার।

পুলিশের আগ্রাসন নিয়েই গুণ্ডার সজ্জিত হচ্ছে

(দপর্ণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত প্রতি-
রোধবাহিনী গড়ার গোপন যে
পরিকল্পনা কুখ্যাত কংগ্রেস লীগ
মন্ত্রিসভা করেছিল, এখন কেন্দ্রীয়
কংগ্রেসের সরাসরি শাসনে তা
দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়েছে।

বর্ধমানের পুর্লিশ সদপার পাঁচ-
গোপাল মধ্যাজীর নেতৃত্বে প্রায়
দশ হাজার সমাজ বিরোধীকে নিয়ে
এক তথাকথিত প্রতিরোধ বাহিনী
গঠনের সংবাদ এসেছে। স্বয়ং
পুর্লিশ সদপার এই সংবাদ অস্বী-
কার করেন নি। বর্ধমানের আহাদী
পুর্লে কিছুদিন আগে যে ঘটনায়
সরকারী বাহিনীর নেতৃত্বে পাঁচ
শ্রীক বোঝাই কংগ্রেসী গুণ্ডা সমস্ত
গ্রাম জ্বালালে দিয়েছিল, তাদের
প্রায় সবাই এই তথাকথিত প্রতি-
রোধ বাহিনীর লোক। এদের হাতে
পুর্লিশের রিভলবার, পিস্তল ও
অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়েছে
এবং এরা বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে সি
পি এম কর্মী ও নেতাদের হত্যা
করার পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশ
গ্রহণ করছে বলে সংবাদে প্রকাশ।
কালিনায় পর পর কয়েকজন
সি পি এম নেতা ও কর্মী নিহত
হবার নৃশংস ঘটনার পেছনে এবং
বর্ধমানে থানার সামনে ডজনেকেরও
বেশী হত্যাকাণ্ডে এই পুর্লিশ
পরিপক্ক প্রতিরোধ বাহিনী
নিষ্পত্ত বলে জনসাধারণ মনে কর-
ছেন।

সম্প্রতি কলকাতার বিভিন্ন
এলাকায় পুর্লিশ কর্তৃক সংগঠিত
এই সব সমাজ বিরোধী পুর্লিশের
সরবরাহ করা আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত
হয়ে ক্রমাগত সাধারণ মানুষের
ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।
মধ্য কলকাতা, উত্তর কলকাতার

কয়েকজন প্রাক্তন নব-কংগ্রেসী এম
এল এ এই সব আক্রমণের পেছনে
সহায়তা করছেন। কোন
কোন প্রাক্তন এম এল এ, তাদের
পরে কন্যা পর্বন্ত সমাজবিরোধী-
দের সঙ্গে থানার ফাঁড়িতে হাজির
থেকে ধরে আনা বামপন্থী দলের
কর্মী ও ছাত্রদের ওপর নিপীড়ন
চালাতে উৎসাহ দিচ্ছে।

নব কংগ্রেস ও পুর্লিশের বেশ
বড় একটা অংশ অসদপারে অর্থ
আদায়ের জন্যে পুর্লিশের বিশেষ
ক্ষমতা ও কুখ্যাত অভিন্যাসের
সুযোগ নিচ্ছে। নিরীহ মানুষকে
ভয় দেখিয়ে থানার প্রদ্রয়ে ঘড়ি
টাকা পরস্যা ছিনতাই থেকে, পি
ডি এ আইনে আটক করার ভয়
দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা আদায়
করা হচ্ছে।

অবিলম্বে পুর্লিশের আগ্নেয়াস্ত্র
ও বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহার করার
বৃদ্ধি এর থেকে দৃঢ় হয়ে উঠছে।

খুনেখানি ও অপরাধমূলক
ক্রিয়াকলাপ বন্ধের জন্যে পোলান্ডের
মত এখানেও আইন করা উচিত যে
সমস্ত অপরাধ যে এলাকায় ঘটে
সেই এলাকার ভারপ্রাপ্ত পুর্লিশ
অফিসার অন্যতম প্রধান আসামী
করে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু
করা যাবে। এখানেও এরকম একটা
বিধান কার্যকরী করা প্রয়োজন,
কারণ পুর্লিশের অস্ত্রাভে অপরাধ
সংগঠিত হওয়া অথবা সংঘটিত
অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তি পুর্লিশ-
শের কাছে ধরা না পড়া একরকম
অসম্ভব ব্যাপার। এরকম ভাবে
ফৌজদারী আইন সংশোধন করলে
খুন ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ
লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে যাবে বলে
অনেকেই এখন মনে করছেন।

অর্থনৈতিক টুকিটাকি

(দপর্ণের সংবাদদাতা)

ভারত সরকারের পাবলিক
একাকউন্টস কমিটি জানিয়েছেন যে
উনিশশ উনসত্তর সালের পয়লা
এপ্রিল তারিখে দুশো কোটি টাকা
মূল্যের এগারো কোটি তিস্পায়
লক্ষ টন কৃষিসার অবিক্রীত অব-
স্থায় পড়েছিল। অর্থাৎ এই ভারত
সরকারেরই নির্দেশে উনিশশ
সত্তর সালের পয়লা আগস্ট পর্বন্ত
একশো সাতাশ কোটি টাকা
মূল্যের এগারো কোটি আট লক্ষ
টন কৃষি সার দেশে আমদানী
করা হয়েছে। অর্থাৎ দেশের উৎ-
পন্ন কৃষিসার যখন বিক্রী হচ্ছে না
তখন দল্লভ বিদেশী মদ্রার অপ-
ব্যয় করে প্রায় দুশো কোটি টাকার
বিদেশজাত কৃষিসার আমদানী করা
হয়েছে।

এদেশের বর্তমান আর্থিক

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবিক্রীত
মজুত পড়ে থাকা সঞ্চেও বিদেশী
সাব আমদানী বাবদ প্রায় দুশো
কোটি টাকার দল্লভ বিদেশী মদ্রা
ব্যয় অপরাধের সামিল। পাবলিক
একাকউন্টস কমিটির এই হুঁশি-
য়ারীর পরও ভারত সরকারের
আর্থিক ও বাণিজ্য নীতির প্রতি
দেশের মানুষের আস্থা থাকা কি
সম্ভব? না এমন সরকারকে
অমানবদনে ট্যাক্স দিয়ে যাওয়া
উচিত?

ভারত-সোভিয়েত শান্তি,
মৈত্রী, ও সহযোগিতার চুক্তির
সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ এসেছে যে
সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয়
দেশসমূহের সাধারণ বাজার কোমি-
কণেব কর্তারা ঠিক করেছেন যে
তারা আর বেশীদিন অন্য দেশের
(শেবাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

বর্ধমান জেলার জে কে নগরে

দ্বিতীয় 'বাংলাদেশ'

দ্বিতীয় "বাংলাদেশ" তৈরী
হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে।
দলে দলে শরণার্থী আসছেন
বর্ধমান জেলার জে কে নগরে;
বাংলা দেশের নয় পশ্চিমবঙ্গেরই
হতভাগা অধিবাসী তারা। সম্প্রতি
পুর্লিশের গুলি বর্ষণে নিমচা
কোলিয়ারীতে সাত ব্যক্তির মৃত্যুর
পর থেকে এরাও ছেড়েছে তাদের
বাসস্থান।

সংঘর্ষ হয়েছিল বাণ্ডিত শ্রমিক
শ্রেণী ও কোলিয়ারীর এজেন্ট
(নাম বলব না) কর্তৃক নিষ্পত্ত
তিনশ' সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী ও
কিছু সংখ্যক পুর্লিশের মধ্যে।
শ্রমিক শ্রেণীর সম্বল ছিল শূন্য
শাবল আর হাটকা অস্ত্রশস্ত্র এবং
প্রতিপক্ষের ছিল ভারী রাইফেল।
ফলে মরতে হয়েছে সাতজন শ্রমি-
ককে, অবশ্য তারা আহত করেছে
বেশ কয়েকজন।

এতক্ষণ মিলিটারীর কোন
চিহ্ন ছিল না। হঠাৎ ঘটনাস্থলে
প্রচুর মিলিটারী এসে পেঁপীছাল।
শুরু হল ব্যাপক ধরপাকড়, অত্যা-
চার। ভীত, সশস্ত্র, নিরীহ মানু-
সগুলো নিজেদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করে
প্রাণের ভয়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে
যেতে লাগল।

গত শ্রুতবার গেলাম জে কে
নগরে। দেখলাম ছিন্নমূল শরণা-
র্থীরা স্রোতের মত এসে ঢুকছে
শহরে। যেখানে পারছে আশ্রয়
নিচ্ছে। স্থানীয় এক যুবক জানা-
লেন যে সাড়ে তিন হাজারের মত
শরণার্থী এসেছে, আরও আসছে
এবং আসবে। এদের মধ্যে বেশীর
ভাগ বৃদ্ধ, নারী এবং শিশু। একটা
বাড়ির বারান্দায় তিনটি শিশু
ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাদের মা তার
ভাবায় সন্তানদের সাম্না দিচ্ছে।
একজন বাঙালী যুবক জানালেন
যে ঐ শিশু তিনটির খেলার সাথী
ছিল কয়েকটা মদ্রগী আর ছাগল।
আসার সময় তারা তাদের নিয়ে
আসতে পারে নি।

যুবকটির সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।
একটা গাছের ছায়ার নীচে কুড়িজন
মেয়ে বসেছিল। তারা সেই দিনের
কথা মনে করতে পারে না, যেদিন
মানুষের খোলশ পরা পশুগুলো
তাদের নারীত্বের চরম অবমাননা
ঘটিয়েছে। তাদের চোখে জলের
পরিবর্তে আছে জমাট আঁতকে।

একটা শেডের নীচে কিছু
সংখ্যক বৃদ্ধ বসেছিল। শুনলাম
তাদের মধ্যে একজন বলছে,
"আম্মাকো নাম লে ভাইয়া।" বলতে
বলতে তার কুঁচকানো গালের উপর
দিয়ে জল গাড়িয়ে পড়ল। বাকীরাও
ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।
সবাই কাঁদছে। অনেকের

চোখে জল নেই। থাকবেই বা কি
করে? চোখের জল তো তাদের
শরিকিয়ে গিয়েছে। ক্ষুধার্ত শিশু
গুলো কান্না ভুলে বোবা দৃষ্টিতে
এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে। হয়ত
ভাবছে এ কোথায় এলাম, কেন
এলাম? খানিকটা তফাতে একটি
যুবতী বসেছিল। পরণে সাদা
ধান, কিন্তু সিঁথিতে লাল আভা
রয়েছে তখনও। ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে
চুপ করে বসে আছে। সে জানে
সেই ভয়াবহ দিনটিতে তার সব
গেছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে টানা
চোখ দুটো ভুলে তাকাল, পাতলা
ঠোঁট দুটো একটু কাঁপল, কিছু
বলতে পারল না। হয়ত বলতে
চেষ্টাছিল, জান, পশুগুলো আমার
সব কেড়ে নিয়েছে?"

এই নিঃসহায় মানুসগুলোকে
সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে জে
কে নগরের যুব সমাজ। চাঁদা ভুলে
খাদ্য সমগ্রী দিয়ে এই সর্বহারা
মানুসগুলোকে কাঁচিয়ে রাখবার
চেষ্টা করছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে
একজন বললেন, অসুবিধা তো
হচ্ছেই। কিন্তু এরাও তো মানুস,
এদের তো বাঁচতে হবে। আর
একজন প্রশ্ন করলেন, কেন এমন
হচ্ছে বলতে পারেন? এই মানুস-
গুলো কি দোষ করেছে? কেন
এত অত্যাচার করছে সরকারী
পক্ষ?

এস ইউ সির ডাকাত

বীরভূম থেকে প্রকাশিত ময়-
রক্ষী এই তিনটি খবর দিয়েছে।
গত জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহ।
অধীর ঘোষ নামে এক ব্যক্তির
দঃসাহসে ধরা পড়ল একজন
নিখোঁজ ডাকাত। নাম, অশ্বিনী
ডেম; বাড়ী, জানুয়া। গ্রীষ্মের
বন্দকের গুলিতে আহত হবার পর
ডাকাত দলের লোকেরা তাকে
সিউডি হাসপাতালে ভর্তি করেছিল
রমেন সিং ভূয়া নাম দিয়ে। আহত
অশ্বিনী অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে
অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর স্বীকা-
করেন যে, তিনি বহু আন্দোলনে
সঙ্গে জড়িত একজন এস ইউ সি
কর্মী। স্থানীয় পুর্লিশের প্রশ্ন :
এখনো কি পার্টির নেতারা বসবেন,
অশ্বিনী আমাদের কেউ নয়?

পল্লী দর্পণ

অন্যদিকে সিউডি কোর্ট এলাকার
লোকদের অভিমত : অশ্বিনী
পার্টির পল্লীদর্পণে পড়ে ভুল পথে গিয়ে
সারাজীবনের জন্য চোখ হারাল।

ক্ষমাপ্রার্থী

একটিশে জুলাই। সকাল সাতটা
কি আটটা। আচমকা এক টুকরো
কাগজ এসে পড়ল সিউডি বৈশী-
মাধব স্কুলের সম্পাদক অসিতরঞ্জন
মন্থোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। ঐ কাগজে
লেখা ছিল : "শ্রী একমাসের জন্য
স্কুল বন্ধ না করলে আগনার বৈঠক-
খান' পোড়ানো হবে এবং সেই সঙ্গে
আপনাকেও হত্যা করা হবে।"
কয়েকদিন বাদেই আবার এক
বিপরীত চিঠি। বক্তব্য : আমাদের
পূর্বোক্ত চিঠি স্কুলেরই এক প্রবীণ
শিক্ষকের প্ররোচনার ফল। স্কুল
চলু রাখা হোক। পূর্বোক্ত চিঠির
জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

সংবাদে প্রকাশ, উক্ত প্রবীণ
শিক্ষকটি নাকি ইতিপূর্বে স্কুলের
হেডমাস্টারকেও ভীতি প্রদর্শন
করেছিলেন।

রাণীমার কোণে শান্তি

সম্প্রতি দবরাজপুরে থানার
সেকেন্ড অফিসার সাসপেন্ড হসে-
ছেন। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে রাণী-
মার অভিযোগ। রাজ্য পুর্লিশের
আই জি বীরভূম পরিদর্শনে এলে
দারোগাবাবুকে ডাকা হয় একজনকে
থানার নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু
দারোগাবাবু আই জি-কে নিয়ে
ব্যস্ত এবং গাড়ী না থাকার ফলে
সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারেন নি।
এতে "মা" ক্ষুব্ধ হয়ে আই জি-
কে জ্ঞানাজেন। ফলে এক সন্তান
শান্তি পেল।

ইতিহাস

কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে
লেখা মঞ্চ-সফল একখানি
সবুস নাটক
প্রমোৎসবের রায়চৌধুরী
দাম তিন টাংকা মাত্র
ম্যাডিক্যাল বুক স্টোর, কলিকাতা-১২
ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে
পাওয়া যায়।

চাকরির জন্য জাচ্ছে কেন?

কিন্তু যখন যে কোন রেডিও ওয়ামা ট্রানজিস্টর সেট তৈরী ও মেসজারের কাজ দিয়ে দিন।

জাই, সি.সি.সি.

বেতার-বিজ্ঞান

(ট্রানজিস্টর শিরোনাম)

১৯৭১-১৯৭২, ১৯৭৩-১৯৭৪

প্যারিস-১৯৭১ ও ১৯৭২

আধুনিক ট্রানজিস্টর বিজ্ঞান

(ট্রানজিস্টর সেট তৈরী করার নির্দেশাবলী প্রদান)

১৯৭১-১৯৭২, ১৯৭৩-১৯৭৪

২৭/১, ডাক্তার ডাক্তারী লেন, কলিকাতা-১২

ছাত্রপরিষদের সঙ্গে সংস্কার

(দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি)

গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক অবস্থা বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রশ্ন নিয়ে নব-কংগ্রেসী ছাত্র সংগঠন “ছাত্রপরিষদের” প্রতিনিধির সঙ্গে আমি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলাম। আমাদের প্রশ্নগুলি ছিল : (এক) কলেজ ইউনিয়নে ছাত্র পরিষদের প্রভাব (ক) কলকাতায় (খ) জেলায়; (তিন) অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক; (চ.র) নব-কংগ্রেসী রাজনীতিতে ছাত্র পরিষদের প্রভাব; (পাঁচ) প্রাচীন নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘর্ষ—এই সম্পর্কে ছাত্র পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে সংগঠন প্রতিনিধি জানান : উনিশশ একাত্তর সালের বিশেষ জানুয়ারী শহীদ মিনারের পাদদেশে আমরা ছাত্র পরিষদের একটি বিশেষ জমারতে অহুদান করি। সেই জমারতে রাজ্যের অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলির কাছে, বিশেষত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (বাম) কাছে আমরা বিভিন্ন স্কুল-কলেজ সংগঠনকে কেন্দ্র করে আমাদের সংগঠন শক্তি নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানাই। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে তাদের সহস ছিল না। অবশ্য আমরা আমাদের ছাত্র সংগঠন বলতে শুধুমাত্র স্কুল কলেজের ইউনিয়নগুলিতেই নিজেদের একাধিপত্য বিস্তার করা বদ্বিনা। আমরা বুদ্ধি, ছাত্র পরিষদ যে সব জায়গায় তাদের কর্মপন্থার মধ্যে দিয়ে বৃহৎ ছাত্র সমাজকে প্রভাবিত এবং পরিপূর্ণ সেবা করে চলেছে, সেখানেই আমাদের ছাত্র সংগঠন জোরদার। কলকাতার মধ্যে মধ্য কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুচন্দ্র কলেজ এবং হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে পরপর তিন বছর ইউনিয়ন অধিকার না করা সত্ত্বেও এবং উত্তর কলিকাতার আরো কয়েকটি কলেজে আমাদের সংগঠন আশ্চর্য রকম শক্তিশালী। তবে স্বীকার করতে বাধ্য নেই

আশুতোষ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, বদরপুর বিশ্ববিদ্যালয়, স্কটিশচার্ট কলেজ, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজে আমাদের সংগঠন একেবারে নেই বললেই হয়। তবে শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে।

জেলাভিত্তিক বিচার করে দেখতে গেলে, হাওড়া সম্পূর্ণ, হুগলী (তাছাড়া বিশেষ করে আন্দুল, বাগনান, উলুবেড়ি, শ্যামপুর), উত্তর চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড দাবাদ এবং উত্তর বঙ্গের কুচবিহার ছাড়া প্রত্যেকটি জেলার আমাদের সংগঠন যথেষ্ট শক্তি নিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে বর্তমানে কংগ্রেসী সংগঠন যেমন একেবারেই নেই, তেমনি আবার ছাত্র পরিষদের সংগঠন অত্যন্ত ভাল। এই ঘটনা দিয়ে আমরা এই কথাই প্রমাণ করতে চাই, কংগ্রেস প্রভাবিত এলাকাগুলিতেই যে ছাত্র পরিষদ শক্তিশালী, সে কথা সত্যি নয়; বরং ছাত্র পরিষদ আপন ক্ষমতার তার প্রভাব বিস্তার করেছে এবং কোন কোন জায়গায় ছাত্র পরিষদের জন্যই কংগ্রেসের ঠাই হয়েছে। আমরা শ্রদ্ধা কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাস করি মাত্র, কিন্তু ছাত্র পরিষদ একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সংগঠন। অন্যদিকে বীরভূম আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। ওখানকার সংগঠন একমাত্র নকশাল-পন্থীদের। আমাদের যেসব কর্মী ওখানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তার মধ্যে অমল মুখার্জী এবং সাক্ষীগোপাল তেওয়ারীকে হত্যা করা হয়েছে। অন্যান্য কর্মীরা প্রকাশ্য দিবালোকে পথে বেরিয়ে পড়েন না। জেলা-বাড়ীর সংগঠনও ক্রমে ক্রমে শেষ হয়ে গেছে।

তবুও আমরা এই কথা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, গত একবছরের মধ্যে আমাদের ছাত্র-সংগঠন বেভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাছে তাতে অগামী নির্বাচনে আমরা প্রমাণ করে দেবো বি পি এস এফ “গণশক্তি” কিংবা “দেশহিতৈষী” পরিচায়ক কলেজ

ইউনিয়ন অধিকারের যে হিসেব দিয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে পরিষদ প্রতিনিধি পাঠো অভ্যোগ জানালেন : কংগ্রেসী ছাত্ররা নকশালদের সঙ্গে আঁতাত করে সি পি এম বিরোধিতা করছে—এই কথা যারা বলে থাকেন বুঝতে হবে প্রচার ছাড়া তাদের আর কোন অস্ত্র নেই। প্রথম কথা, নকশালদের সঙ্গে আমাদের যেমনি আদর্শগত বিরোধ রয়েছে, তেমনি তাদের মার্কসবাদী বলেও আমরা মনে করিনা। বরং আমরা বিশ্বাস করি তারা চারু মজুমদার শোষিত গুন্ডা বাহিনী। তাছাড়া যখন তাঁরা প্রকাশ্যে জনসাধারণের জ্ঞাতসারেই হেমন্ত বসু, নেপল রায়, গোপাল সেনকে হত্যা করে থাকে, তখন তাদের সঙ্গে আমাদের সমঝোতার প্রশ্ন নিতান্তই হাস্যকর লাগে। সি পি এম যে এই ধরনের প্রচার করবে, তা আমাদের অজ্ঞাত নয়, কেননা সি পি এম কর্মীরা মার্কস লেনিনের পুস্তকোত্তর আশ্রয় করেছেন। সুতরাং তাঁরা জ্যোতিবাবাদী-কেন্দ্রবাদী হতে পারেন, কিন্তু মার্কসবাদী নয়। যেহেতু আমরা জানি মার্কসবাদ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জ্যোতিবাবাদ হরেক্ষণবাবাদও তাদের কর্মীদের শোষণ করছেন। তা না হলে রাজনীতির রণমাঠে তাদের সন্তানরা অনুপস্থিত কেন? সি আর পি মিলাটরী প্রত্যাহার করার স্লোগানে দিয়ে কোন লজ্জায় আবার এই সমস্ত নেতৃত্ব সর্বকরের কাছে আত্মরক্ষার জন্য সি আর পি শিক্ষা করেন। সুতরাং আমরা বুদ্ধি, যাদের নিজেদের প্রচারেই সত্যতার অভাব, অন্য সংগঠনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটতে তাদের আর গারে লাগে না।

তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তরে প্রতিনিধি জানান : রাজ্যের অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে আমরা গোড়া থেকেই একটি সুসম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে আসছি। যেমন উনিশশ বাহার সালে বেতন-বৃদ্ধি আন্দোলনের সময় সব ছাত্র সংগঠনগুলি সম্মিলিত হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের (পরবর্তীকালে যে সংগঠন দৃষ্টিগত হয়েছে) বিশ্বাসঘাতকতায় সে আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে ছয় পার্টি জোট বাহিনীতে অন্যান্য দলের ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে আমরা কখনো কখনো একত্র হতে উৎসাহবোধ করছি। এমনকি সি পি আইয়ের ছাত্র সংগঠনও কোন কোন কর্মসূচীতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়। আমাদের চোখে সি পি আই এমনই একটি দল যার কোন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে বলে আমরা মনে করিনা। ওরা এক অচূত অভিজাত ইন্টে-লেকচুরাল গোষ্ঠী। লেনিনের পুস্তক থেকে সুরু করে নাট্য আন্দোলন পর্যন্ত সর্বত্রই এদের অবাধ গতি। সুতরাং এই কৃষ্ণ হাউসনিবাসী নমনীয় ছাত্র নেতারা সহজেই আমাদের দলে ভিড়তে চান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমরা কয়েক মাস আগে “বাংলা দেশের” উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম। তখন সি পি আই এর ছাত্র সংগঠন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিল। তবে এই প্রসঙ্গে সি পি আই-এর ছাত্র সংগঠনকে একটি ঘটনার উল্লেখ করে সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে চাই। মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগে মোদিনীপুরের ছাত্র পরিষদের সংগঠন পঞ্চাট সংস্কারের একটি ছোট কাজ হাতে নিয়েছিল। কাজ সুরু হলে সি পি আই কর্মীরা অকারণে নানা অজুহাত দিয়ে আমাদের কাজে বাধা দান করে। আমরা এই কথা সোচ্চারে ঘোষণা করতে চাই যে, সি পি আই নেতারা কলকাতার বসে শিক্ষার্থীবাবুর পদলেহন করলেই কি তাদের ছাত্র কর্মীরা যেখানে সেখানে বা খুঁশী তাই করতে পারবেন।

কংগ্রেসী রাজনীতিতে ছাত্র সংগঠনের প্রভাব সম্পর্কে বিগত উনিশশ সাতষাট সালে থেকেই আমরা আমাদের সংগঠন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে সুরু করি। পরিপূর্ণভাবে কংগ্রেসী নেতৃত্বের অক্ষমতা, অকর্মণ্যতার জন্য আমাদের সংগঠনের প্রভাব বিভিন্ন জায়গায় অনেকাংশে কমে গিয়েছিল। সাতষাট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় কর্মপন্থা গ্রহণ করে আমরা কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করি এবং কখনো কখনো তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করি। ফলে অনেক সুবিধাবাদী নেতারা সেরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। সত্যি কথা বলতে, এখনো নেতাদের অক্ষমতার জন্য অনেককেই আমাদের মধ্য চেরে বসে থাকতে হয়।

প্রাচীন নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণ জানতে চাইলে পরিষদ প্রতিনিধি অকুপণ ভাবে তাদের দুর্বলতার কথা তুলে ধরেন : তথাকথিত কংগ্রেসী নেতারা সাতষাট সালের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের একেবারেই নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। এরা গান্ধীবাদ এবং অহিংসবাদ প্রচার করে এসেছেন বটে। কিন্তু গান্ধী বলতে তারা শ্রদ্ধা বুদ্ধিতে হাটুর উপর কাপড়, টায়ার ঘড়ি, চামড়া-ঝোলা শরীর আর কেউ এক গালে চড় দিলে আর এক গাল পেতে দেওয়া। আমাদের চোখে প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী তা নয়। তাঁর “আমার জীবন”ই আমার বাণী” কিংবা “মধ্যপন্থা” প্রভৃতি আদর্শ অনেকেরই বোঝেন না, বোঝাবার চেষ্টা করেন না। আমরা বিশ্বাস করি গান্ধীজীকে নাথুরাম গডসে মারেন নি, মেরেছেন জহরলাল থেকে সুরু করে তথাকথিত গান্ধী-মার্কী উত্তরসূরীরা। আজ আর অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য নেই, যে ওরা এতদিন আমাদের দলোতৈরী করে রেখেছিল। আমরা সম্মত ওদের গদীতে বসিয়ে দেওয়া ছাড়া কোন কাজই করিনি। সাতষাটতে আমরাই নতুন চেতনা নিয়ে আবার মধ্য দাঁড়াই অহিংসবাদের অপব্যবহার বিরুদ্ধে। আমাদের এই এত বছরের অজ্ঞতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আজ অসংখ্য কর্মীর জীবন দিয়ে। সুতরাং আমরা গান্ধীর মধ্যপন্থানুসারে প্রয়োজন হলে শীঘ্রই অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত। এক কথায় আমরা অস্ত্র ধরতে বাধ্য হবো। তাতে হয়তো বাংলাদেশে গৃহ-

যুদ্ধের সূচনা হতে পারে কিন্তু আমাদের করার কিছু নেই। ব্যক্তি হত্যার বিশ্বাস করি না এই অজুহাতে, আমরা আর কতদিন আমাদের কর্মীদের জীবন নিয়ে ছিন্মিনি খেলতে দেবো? তবে একথা ঠিক আমরা এখনো প্রতিশোধের পথে পা বাড়াই নি। আজ সি পি এম-এর নেতৃত্ব আমাদের চোখে যে প্রেণীর শত্রু, অতুল্য ঘোষ, প্রতাপ চন্দ্রও সেই একই প্রেণীর শত্রু।

গত মার্চে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আমরা একটি কনভেনশন ডেকেছিলাম। সেখানে আমরা আমাদের প্রস্তাবে দাবী জানিয়েছি; (ক) শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করার জন্য (খ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা হোক (গ) গৃহশিক্ষারী শিক্ষাব্যবস্থার উচ্ছেদ করো। সি পি এমের ছাত্র সংগঠন কি মনে করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার দাবী তাদের একটোট্টা সম্পত্তি? অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার মোট খরচ লাগে দ্ব কোটি টাকার মতো। সাতষাট সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন গদি পেলে তখন তাঁরা পদলিখী খাতে চার কোটি খরচ না করে দ্ব কোটি টাই মিটিয়ে নিতেন। তখন তার কি অসুবিধে ছিল?

যাই হোক, এই বিচিত্র অভিমত দানের পরেও আমরা এই কথাই সোচ্চারে জানিয়ে দিতে চাই : নিরস্ত্র থাকার মতো অহিংসবাদী আমরা নই, আবার শান্তিপূর্ণ ভাবে দেশের কল্যাণ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতেও আমরা পশ্চাদপদ নই। কেননা আমরা বিশ্বাস করি, সি পি এম কিংবা নকশাল, যে দলের কথাই বলুন না কেন, এরা প্রত্যেকেই আমাদের চোখে রেডফ্যাসিস্ট; সরকার হলে এদের শাসনোত্তা করার জন্য আমাদের কাউন্টার ফ্যাসিজম আনতে হবে।

অর্থনৈতিক টুকটাকি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

মদ্রাস পণ্য কেনার ব্যবস্থা বজায় রাখবেন না। এখনই তুলে না দিলেও উনিশশ তেহান্তর সালের মাঝামাঝি তাঁরা সোভিয়েত মদ্রা রুবলের মাধ্যমে লেনদেন করবেন।

অবিলম্বে না হলেও ভারতকে এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ এখন ভারতের বেশ বড় রকমের বাণিজ্যিক অংশীদার। বর্তমানে এই সব দেশের সঙ্গে লেনদেন ভারতীয় টাকায়ই করা চলে। অর্থাৎ অন্যকথায় যত টাকার পণ্য ভারত কেনে, তত টাকা মূল্যের পণ্য ভারত এঁদের কাছে বিক্রীও করে। একে বলা যায় টাকার হিসাবে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা।

এখন যদি রুবল আন্তর্জাতিক মদ্রা ডলারের মত এইসব লেনদেন ব্যবহৃত হয় তাহলে বাণিজ্যের পরিমানে সমতা বজায় নাও

থাকতে পারে। কারণ অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের “কোমিকশ” রুবল মদ্রা ঠিক ইউরো ডলার মদ্রার মতই ভারতের ঋণাত্মক বাণিজ্য ঘাটতির সমূহ কারণ এনে দিতে পারে। ইতিমধ্যেই যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে আমাদের টাকায় লেনদেন বন্ধ করার চুক্তি হতে চলেছে। এখন সোভিয়েত নেতৃত্ব পরিচালিত পূর্ব ইউরোপও এই পন্থা অনুসরণ করতে যাচ্ছে।

আসল কারণ সম্ভবতঃ ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির দরুন টাকার দাম কমে যাচ্ছে বলে কোন দেশই আর ভারতীয় টাকায় পাওনা নিতে রাজী হচ্ছে না। কিন্তু এরোগ সারাবার দাওয়াই বর্তমান ভারত সরকার কিংবা তাদের মদ্রাবাদীদের জানা নেই মনে হয়।

দর্পণ

সংবাদ সাত্যাহিক

৪ চাঁদার হার :

বার্ষিক পনেরো টাকা

ষাণ্মাসিক সাত সাত টাকা

ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিগর পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, নট লেন, কলি-১০

আওয়ামী লীগ প্রসঙ্গে

খাঁ সাহেব লিখেছেন, আওয়ামী লীগ পাকিস্তানী ফৌজের বিরুদ্ধে জনতাকে একত্ববদ্ধ করতে পারে নি। জানি না জনতার ব্যাখ্যা তাঁর কাছে কি। কিন্তু দেশের শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ শতকরা আশি ভাগ জনগণ যদি জনতা হয় তাহলে তাঁর তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। প্রমাণ—ইয়াহিয়া-হুসাইন তীব্রদাররা এস এস সি (অর্থাৎ এস এফ) পরীক্ষার শতচেহা করেও অনুদ্বিষ্ট করতে পারলো না। বাংলাদেশের জনজীবন এখনও স্বাভাবিক করতে পারলো না।

ফিরিস্তির এক নম্বরে লিখেছেন আওয়ামী লীগ গান্ধী পন্থায় শান্তি-জল ছাঁটের নিরস্ত জনগণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। ঘটনা কি তাই? সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে মজিবুর রহমান জনগণকে বলেছিলেন “তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে তৈরী হও। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো,” এর পর আর যাই হোক মজিবুরকে গান্ধীবাদী বলা যায় না। আর জনগণের মৃত্যুর উত্তরে বলতে হয়—আক্রান্ত হওয়াই আপনাদের কাছে অপরাধ—তাই না?

আমি ময়মনসিংহ শহরে ছিলাম। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানী জঙ্গী বাহিনী বাংলাদেশের জনগণকে আচমকা আক্রমণ করেছে—এ সংবাদ ছাড়িয়ে পড়ার পরই মজিবুর বাহিনী গঠন করা হতে থাকে। সাতাশে মার্চ শুনলাম মাইক করে ছাত্রলীগের

ছেলেরা শহরে বলে বেড়াচ্ছে, “যেটা বৎসরের উদ্দেশ্য যে সমস্ত যুবকরা আছেন তারা ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে সামরিক ট্রেনিংয়ে অংশ গ্রহণ করুন। সকাল বিকাল ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।” সেখানে দেখলাম শহরের অনেক যুবক ট্রেনিং নিচ্ছে, শুধু যুবক নয় লন্ডনিগ পরে অনেক বয়স্কও। তারপর বারোই এপ্রিল। ময়মনসিংহ জেলার দিকে পাক বাহিনী মধ্যপূর্ব জঙ্গল হয়ে এগিয়ে আসছে। ঐ দিন সকালে ট্রেনিং সেন্টারে ই পি আরকে

সেখান থেকে গীতাও পাঠ হয়। কি করে এটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব হল? যখন ঘোর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরা সাম্রাজ্যবাদীদের পরিচালকের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করছে, আলোপ আলোচনা করছে, মার্কস ঘোর সাম্রাজ্যবাদীদের নিজ দেশ সফরের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, তখন খাঁ সাহেবরা চুপ করে থাকেন কিংবা বলেন এটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের একটি কৌশল সাম্রাজ্যবাদীদের পরাস্ত করার। অথচ যখন অক্রান্ত দেশ সাহায্য নিচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য তখনই তাদের সব মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। আমরাও বলতে পারি এটা আক্রান্ত দেশের

একটি রণকৌশল, যাতে সিংহলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। মৃত্যুর ভাষা কেড়ে নিলে, মৃত্যু-ভাষা কেড়ে নিলে এবং তার প্রতিবাদ করলে যদি খাঁ সাহেবরা তাকে জখম দাওয়া বলেন তাহলে একথা স্বভাবতই মনে হয় খাঁ বাবো হয়ে থাকতে বলছেন। অর্থাৎ শেখ শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৃত্যু খোলাকেই অনাদয় বলছেন।

আর একথাই সবার জানা আছে উদ্ভাষী লোকেরা উনিশশ আটশ সালের সামরিক শাসন শুরুর হওয়ার পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের ন্যায়সংগ্ৰামে সামিল হওয়াতো দূরের কথা, শাসক শ্রেণীর তাবোদার হয়ে কাজ করেছে। জনগণের উপর অত্যাচার চালিয়েছে।

আওয়ামী লীগ যদি সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য পুষ্ট হতো তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়াকে অন্য সাহায্য দিতো না। শতকরা একভাগ বেইমানরা প্রবল কারণ শাসকশ্রেণী (শেখ শ্রেণী) তাদের সহায়। আর ঐ শেখ শ্রেণীর “ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল” প্রসঙ্গটা উল্লেখ করা যেতে পারে হো-চি মিন বলেছিলেন—বিশ্ব অ্যাটমের চেয়েও একটি প্রবল শক্তি আবিষ্কার হয়েছে তা জনশক্তি। তাই বাদের “ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল” তারা আপাতত প্রবল হলেও জনশক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী।

রাবিউল কামাল

বীরভূম

মতামত

বয়ানগরের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

কমান্ডার এ খবর দিলেন। এবং আরও বললেন আমরা প্রথমে তিরিশ জন কমান্ডারকে পাঠাবো। সঙ্গে সঙ্গে তিরিশ জন যেতে সম্মতি জানালো। তখনই ঐ তিরিশ জন যে যে পোষাকে ছিল রওনা দিল ট্রাকে করে তিরিশ মাইল দূরে অবস্থিত মধ্যপূর্ব জঙ্গলের দিকে শত্রুসেনা খতমে। কি উদাত্ত আহ্বান আর কি প্রাণবন্ত সাড়া! এরপরও কি বলা যায় মজিবুর বাহিনীর রিক্রুটিংয়ে দলীয় রাজনীতি কাজ করেছে?

খাঁ সাহেব বিবিসি মনোভাব নিয়েও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনলে শুনতে পাবেন

গত বৃহস্পতিবার বারোই আগস্ট কাশীপুরে বিশিষ্ট সমাজসেবী(?) নির্মল চ্যাটার্জী আততায়ীর হাতে খুন হওয়ার কিছুক্ষণ পরে (সন্ধ্যা সাতটা হইতে প্রায় তিরিশ ঘণ্টা ব্যাপী) ঐ অঞ্চলে কংগ্রেসী গুন্ডাদের যে ভাঙব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহার কিছু বিবরণ ও তথ্য জানাইতে চাই। কারণ যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকা মারফৎ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা জানা সম্ভব নয়, ব্যবসার খাতিরে যেটুকু না প্রকাশ করিলে নয় সেটুকুই তাহারা প্রকাশ করিয়াছে। অথচ সাঁই বাড়ীর ঘটনার এক সপ্তাহ ব্যাপী বড় বড় অক্ষরে নানা ঘটনা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, এমন কি সাঁই-বাড়ীর রাস্তাঘরে উনানে চাপান ভাতের হাঁড়ির ছবিও পত্রিকায় ছাপা হইয়া গেল।

গত নির্বাচনের আগে ঐ অঞ্চলে কংগ্রেসী গুন্ডাদের সহযোগিতায় নকশালপন্থীরা সি পি এম সমর্থকদের বিভাডিত করিয়া প্রফুল্ল বাবুর জন্মের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। তাহান্ন পর হইতে ঐ অঞ্চলে কোন সি পি এম সমর্থক প্রবেশ করিলে জান লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিত না। অথচ নব-কংগ্রেসীরা ঐ অঞ্চলে অবোধে ঘোরাফেরা, এমনকি ভোটের সময় অবোধে প্রচার অভিযান চালাইয়াছে। কোন নকশালপন্থী পদলিখের হাতে ধরা পড়িলে ঐ নির্মলবাবুই ভাল ছেলের সার্টিফিকেট দিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নির্মলবাবুর সাঙ্গপাঙ্গরা জানিত কে কে নকশালপন্থী কার্ণ-কলাপে লিপ্ত এবং কোন কোন বাড়ীর ছেলে। তাই নির্মলবাবুর হত্যার কিছু পরেই ঐ সাঙ্গপাঙ্গরা কাশীপুর অঞ্চল সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চল হইতে কংগ্রেসী গুন্ডা ও সমাজ বিরোধীদের সংগঠিত করিয়া পদলিখের সক্রিয় সহযোগিতায় তথাকথিত খুনী খোঁজার নামে সংঘাতীপাড়া, রতনাবাদ, রোড ও কুটীঘাটের নানা

অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী প্রবেশ করিয়া যে বাড়ীতে ঐ সব যুবককে পাইয়াছে তাহাদিগকে এবং যে বাড়ীতে সেই বাড়ীর যুবকদের পাওয়া যায় নাই তাহাদের মা, বাবা, দাদা, ভাই ও বোনদের বাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিয়া ঠেলা ও রিক্সা ভর্তি করিয়া বৃন্দেভাতরম ধানি দিতে দিতে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছে। আমার মতে কমপক্ষে আশি নবদই জনকে হত্যা করিয়া গঙ্গায় ফেলা হইয়াছে।

আমরা পূর্ব বাংলায় পাক বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর হত্যাকাণ্ডে বিচলিত এবং প্রতিবাদে মৃত্যুর অথচ এই কংগ্রেসী গুন্ডা বাহিনীর হত্যাকাণ্ডে যে কত পৈশা-

চিক ও মমান্তিক তাহা দোখলাও উপেক্ষা করিয়া যাইতেছি।

আমার কয়েকটি প্রশ্ন (এক) নির্মল চ্যাটার্জী খুন হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কাশীপুরের নব-কংগ্রেসী এম এল এ মহাশয় ঐ অঞ্চলে গিয়া কংগ্রেসী যুবকদের কি উত্তেজিত করেন না? (দুই) ঐ অঞ্চলে নকশালপন্থীদের সহিত কংগ্রেসীদের কি ঘনিষ্ঠ বোগা-বোগা ছিল না? (তিন) পদলিখ তিরিশ ঘণ্টা সময় না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে কারফিউ দিয়া ঐ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে ছাড়িত না? (চার) ইহা কি সত্য যে ডি সি নথের উপস্থিতিতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে?

কনক রায়

আসানসোল জেলের ঘটনা

বেশ কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত একই ধরনের একটি খবর যে বিভিন্ন জেলে কারারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থীর মৃত্যু হয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে আসানসোল জেলে বেশ কিছু উগ্রপন্থীকে আটক করা হয়। শুনছিলাম তাঁদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর হাসানপাদনকারী এক সাংঘাতিক ব্যক্তি আছেন। এই বন্দীরা আত্মসম্বন্ধের সাক্ষ্য পেতেন না, কোন বইও তাঁদের পড়তে দেওয়া হত না। যাই হোক ঐ “সাংঘাতিক ব্যক্তি”টিকে দেখবার কৌতুহল দমন করতে না পেয়ে জেলারের বিশেষ অনুমোদন ক্রমে একদিন উপস্থিত হলো তার সেলের সম্মুখে। স্বীকার করতে বাধ্য হইছি যে তাঁকে দেখে আমি নিতান্তই হতাশ হয়েছিলাম। মোটা লোহার গারদের অন্তরালে একটি চেয়ারে বসেছিলেন তিনি। দরজা হাত আর-একটা পা চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা। খুব শীর্ণ চেহারা, চোখে কালো চশমা, মাঠ পনেরো মিনিট কথাবার্তার মধ্যে এইটুকুই জানতে পারলাম যে বাঁধিত মানবের নীরব ক্রন্দন-তাঁকে ডেকেছিল সংগ্রামের পথে। তাই চাকরী ছেড়ে স্থানীয় নকশালপন্থীদের নেতৃত্ব দান করেছিলেন। এই তার অপরাধ। তাই ধরা পড়ার পর যক্ষ্মারোগী হয়েও

বারোদিনের মধ্যে একদিনও ঔষধ পাননি। তারপর প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক উৎপীড়নের ফলে একটি পা এবং একটি চোখ চিরদিনের মতো অকাজ্যে হয়ে গিয়েছে। ফিরে আসার সময় হেসে বললেন, “আবার আসবেন”।

আবার দেখা হল এই ভয়াবহ রাগিতে। অসময়ে ডাক পড়তেই ছুটে গেলাম জেলের অভ্যন্তরে। একজন ওয়ার্ডারকে অনুসরণ করে উপস্থিত হলো একটি নির্জন স্থানে। বিক্ষোভিত মনে তাকিয়ে দেখলাম বাঁধানো চকরের উপর অনেকগুলি রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। একটু তফাতে “সাংঘাতিক” ব্যক্তিটির দেহও আছে। তাঁদের প্রত্যেকের হাত পা শক্ত করে বাঁধা এবং কাপড় দিয়ে মুখ বাঁধা। আমাকে জেলার নির্দেশ দিলেন যে বাদের দেহে একটু প্রাণ আছে তাদের যেন হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরীক্ষা করে দেখলাম নেতার সঙ্গে আরও আটটি তরুণ প্রাণ ধমিয়ে পড়েছে। এদের প্রত্যেকের মাথা আঘাত করে খেতলে দেওয়া হয়েছে।

তার পরের খবর আপনারা নিশ্চয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু এখন বলুন যারা দেশের যুব-শক্তিকে এইভাবে স্তম্ভ করে দিতে চান তাদের কি শাস্তি দেওয়া যায়? জটিল পাঠক

ছাত্র পরিষদের গুণ্ডামী

বৃহস্পতিবার পাঁচই মে তারিখে বঙ্গবাসী সাখ্য কলেজে ছাত্র পরিষদের এক সাধারণ সমর্থকের সঙ্গে অপর একটি সাধারণ ছাত্রের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছু বাকবিতণ্ডা ও মৃদু হস্তাহাতি হয়। এই ঘটনার পর রাগি পোনে নটায় অতীশ চ্যাটার্জী, উমাপদ ভট্টাচার্য, বরুণ সর্বাঙ্গ, শিবু, সাধন প্রমুখ সাখ্য কলেজের সুপরিচিত ছাত্র পরিষদ নেতাদের নেতৃত্বে বিরাট সংখ্যক বাহুরাগত গুন্ডার দল শিয়ালদহ স্টেশনে নিতান্ত সন্দেহের বশবতী হয়ে আশ্রয়প্রাপ্ত, ছোরা প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ মানুষকে ভীতি-প্রদর্শন করে ট্রেন থেকে কলেজের নিরাই ছাত্র স্বপন রায়কে জোরপূর্বক অপহরণ করে এবং তাকে মারতে মারতে একটি ট্যাঙ্কে তুলে আমহার্ট স্ট্রীট সংলগ্ন সিটি কলেজের নিকটবর্তী কুখ্যাত কংগ্রেসী গুন্ডা ফাঁটা কেঁদো, সোমেন প্রমুখদের ক্লাবে নিয়ে যায় সেখানে তাকে প্রচণ্ড মারখোরের ফলে তার একটি হাত গরুতর-রূপে জখম হয়। রাগি সারে

বারোটা পর্বন্ত অধিরাম অত্যাচারের পর গুন্ডারা তার হাতঘাড়, বইপত্র, টাকা পয়সা প্রভৃতি ছিনতাই করে নিয়ে তাকে মৃত্যু দেয়। এরপর স্বপন মচিপাড়া থানায় অভিযোগ করতে গেলে পদলিখ উল্লেখ্য তাকেই গ্রেপ্তার করে ও সম্ভবতঃ পদলিখের কাছ থেকে খবর পেয়ে এসব গুন্ডারা থানায় এসে তাকে শাসাতে থাকে এবং পরে পদলিখ তাকে মিথ্যে মামলার জড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে বি পি এস এফ (এস এফ আই)-এর সাখ্য কলেজ শাখার পক্ষ থেকে সাখ্য কলেজে সাতই আগস্ট শনিবার ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়। যদিও সাড়ে পাঁচটা থেকে সাখ্য কলেজ শুরুর হওয়ার কথা তা সন্ধ্যা পাঁচটা থেকেই প্রচুর পরিমাণে বাহুরাগত গুন্ডা অসংখ্য সাদা পেটাকের এবং ইউনিফর্ম পরিহিত পদলিখ সহযোগে কলেজে প্রবেশ করে এবং বি পি এস এফ কর্মীদের খুঁজে বেড়াতে থাকে। খুনের মামলার (শেখাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অপকীর্তি

এখনই দূর করা দরকার

মদনমোহন চন্দ্র

উনিশশ সত্তর সালের নভেম্বর মাস থেকে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে যে গোলমাল শুরু হয়েছে তার জের আজও মেটে নি। শুনতে পাই, কিছু স্কুলের দরজা আজও খোলা আছে বটে, তবে তা নামে-মাত্র। বইয়ের এক পাতাও পড়া হয় নি। প্রত্যহ স্কুলের শব্দ থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দ হৈ হৈ রৈ রৈ গোলমাল চলে।

অভিভাবকরা দিশেহারা। তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলেগুলোর কী দশা হবে। এর প্রতিকার কে করবে? সরকার তো এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। খবরের কাগজগুলোতে এমন একটা গুরুতর সমস্যার কোন প্রতিফলন নেই। জেলায় জেলায় স্কুল ইন্সপেক্টরগণ রুটিন ওয়ার্ক করে যাচ্ছেন। দেখেছেন মনে হচ্ছে, ডি পি আই দপ্তরেরও ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ অবসর নেই।

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে দেখছিলাম, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নাকি এ বিষয়ে কিছু মাথা ঘামাচ্ছে। পর্ষৎ নাকি পাঠ্য সংস্কারের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেছে। পাঠ্যবস্তুর গুরুত্ব হ্রাস করার জন্যই নাকি পর্ষৎ এ ব্যবস্থা নিয়েছে। এবং, খবরে প্রকাশ, আগামী জানুয়ারী মাস থেকে নতুন লব্ধতার পাঠ্য চালু হবে।

ব্যাধির কারণ নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত সঠিক চিকিৎসা হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষাও আজ ক্যান্সারের তুল্য এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত। বহুবিধ কারণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য একটি কারণ মাত্র। অতএব ব্যাধির একটি কারণ দূর হলেই ব্যাধি নিরাময় হবে, এমন আশাই করা যায় না।

দেশের পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ইংরেজের তৈরি শিক্ষাব্যবস্থাটা একদম খাপ খাচ্ছে না। বিক্ষমচন্দ্র বি এ পাস করে সহজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁর নাতিরা বি এ পাস করে ঠাকুরদার মতো। ডেপুটিটিগারি না পেলেও কেরানিগারি পেতে অসুবিধে বোধ করেন নি। কিন্তু নাতীদের নাতিরা আজ বি এ পাস করে চাপরাসীর চাকরিও পায় না। শিক্ষা এইভাবে শিক্ষার্থীর কাছে দাম হারিয়েছে। এটা স্বাভাবিক। তবে, সব জেনেশুনেও আমরা হাতের পাঁচ হিসাবে শিক্ষাটাকে রাখতে চাই, হাতছাড়া করতে চাই না। কারণ এর বিকল্প নেই।

স্কুল কলেজের প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে ছাত্রদের, অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও মনোভাবটা যখন এই রকম, তখন শাসক শ্রেণী শিক্ষাটাকে করে তুলে গুরুত্ব

ও ব্যয়বহুল। এর ফলে ছাত্র অভিভাবক উভয়েরই শিক্ষার প্রতি বিরূপতা বাড়লো।

এ বিষয়ে আজ আর সম্ভেদের কোন অবকাশ নেই যে, হাজার সেকেন্ডারী ব্যবস্থা চালু করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য, এই দক্ষমের ফল চোখের সামনে দেখেও কর্তাব্যক্তিরা না দেখার ভাগ করে দিয়া চোখ বুজে বসে আছেন।

সর্বোপরি, এই সত্যটা আজ অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বৃহদায়তন কারখানা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সুফল প্রসব করে; শিক্ষায়তনের ক্ষেত্রে ঘটে তার উল্টোটা। কর্তাব্যক্তিরা যে এটা জানেন না, তা নয়। ভাঙই জানেন। নইলে তাঁদের ছেলেরা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে যে সব স্কুলে পড়ে, সেখানে ছাত্রসংখ্যা কঠোরভাবে সীমিত রাখা হয় কেন? এই ডামাডোলের বাজারেও ছোট আয়তনের স্কুলগুলোতে দৈনন্দিন কাজ চলছে, আর বৃহৎ কারখানা মাফিক বড় স্কুলগুলোতে চলছে দক্ষমন্ত কাণ্ড। বড় স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে এতদিন যারা আঙ্ক-শ্লাঘা বোধ করছিলেন, আজ তাঁরা বেসামাল হয়ে অসহায় বোধ করেন।

যদি স্কুলগুলিকে স্বাভাবিকভাবে চালু করতে হয়, সে রকম সদিচ্ছা যদি সরকারের থাকে, তাহলে অবিলম্বে এ কারণগুলি দূর করতে হবে।

প্রথমত, স্কুলের আয়তন ছোট করতেই হবে। তিনশর বেশি ছাত্র কোন স্কুলে থাকা উচিত নয়। তাহলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে স্বাভাবিক হবে। স্কুলের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা সহজসাধ্য হবে।

দ্বিতীয়ত, হাজার সেকেন্ডারী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটতে হবে। আমেরিকা ও রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ভারতের কোন মিল নেই। অতএব এসব দেশে যা আছে এখানেও তাই করতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে, এটা অবাস্তব। এদেশের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা দরকার। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিহার রাজ্যে হাজার সেকেন্ডারী ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, পাঠ্যের বোকা কমাতে তো হবেই, সহজও করতে হবে। শিক্ষার মান গেল বলে যারা চিৎকার করে, মনে রাখতে হবে তারা বাস্তব সম্পর্কশূন্য বাতিলকল্পিত ব্যক্তি। ভুলে চলে না, আজ ছেলেরা আদৌ কিছু না শিখে আগাগোড়া নকল করে পরীক্ষা পাস করতে চাইছে। এর জন্য একতরফা ওদেরকে দোষ দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। পাঠ্য পরিমাণে বেশি ও মানে কঠিন হওয়ার জন্য ওরা

আরও করতে পারে না। স্কুলের ছেলেমেয়েদেরকে অর্থনীতি, পৌর-বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় শেখানো শক্ত। ইংরেজি সাহিত্যের যে পাঠ্য বরাদ্দ করা হয়েছে, তা শেখানো ও শেখা অসম্ভব। সংস্কৃতের কথা না তোলাই ভাল। সংস্কৃতের শিক্ষকরাই হিমশিম খাচ্ছেন, শিক্ষার্থীদের অবস্থা তো অবর্ণনীয়।

অতএব সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিষয় কমাতে হবে, পাঠ্য কমাতে হবে, ইংরেজি, অঙ্ক ও বাংলা ব্যাকরণকে সহজ করতে হবে। আদৌ কিছু না শেখার চেয়ে অল্প শেখা ভাল। পর্ষৎ নিযুক্ত কমিটি যেন বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই কাজটি সম্পন্ন করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, আগের মতো ছেলেরা আর সাত পিরিয়ড পর্যন্ত স্কুলে আটকে থাকতে চায় না। বিষয় ও পাঠ্যের বোকা কম হলে পাঁচ-ছয় পিরিয়ড পর্যন্ত স্কুলে কাজ চলেই হবে। সরকারী দফতরখানা আর স্কুল এক নয়। সরকারী দপ্তরখানার দরজা খোলা রাখলেই চলে, পাখার তলায়

বসে এক ঘণ্টা খবরের কাগজ পড়লেও কিছু এসে যায় না, টিফিনের জন্য এক ঘণ্টা জায়গায় দেড় ঘণ্টা কটিয়ে এলেও কিছু গোলমাল বাধে না। কিন্তু স্কুলটা রেলের রানিং সার্ভিসের মতো। অতএব সরকারী অফিস আওয়ার্সের সঙ্গে স্কুলের ওয়ার্কিং আওয়ার্সের তুলনা করলে ভুল হবে।

চতুর্থত, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ডাইভার্সিফিকেশন দরকার নেই। ওটা কলেজে করলেই চলবে, যেমন আগে ছিল। তাতে স্কুল অরগানাইজেশনের জটিলতা কমবে। বয়ঃসম্মিলিত বালক বালিকাদের চিন্তাশক্তি ও সংঘত রাখাটাই স্কুলের মূল্য কাজ। কলেজে যখন ওরা যাবে তখন স্কুলের ওপর বেশি বোঝা চাপলে চলবে না, স্কুল সামলতে পারবে না, যেমন আজ পারছে না।

পঞ্চমত, মোটা মোটা বইয়ের বোকা কমাতে হবে। এক কালে ইউরোপের প্রকাশকরা যেমন মোটা নভেল ছাড়া ছাপতে চাইতো না, একালে আমাদের দেশের প্রকাশকরা ব্যবসার সুবিধের জন্য মোটা মোটা পাঠ্য পুস্তক ছাপছেন। পাঠ্য শক্ত হওয়ার জন্যই ছেলেরা নোট বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়। আর সেই সুযোগে পুস্তক ব্যবসায়ীরা মোটা মোটা নোট বই, রচনা বই, গ্রামার ট্রান্সলেশনের বই প্রকাশ করেন।

ষষ্ঠতঃ পর্ষদের প্রকাশিত ইংরেজি বইগুলি ভাল নয়। তাতে এমন বিষয়বস্তু থাকে, যার সঙ্গে

গ্রামের বা মফস্বল শহরের ছেলেদের পরিচয় থাকে না। মিস্টার, মিসেস মিস ডিনার, অরেঞ্জ স্কোয়া—এ সব ব্যাপারের সঙ্গে দেশের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের পরিচয় আদৌ থাকে না। এর চেয়ে বাজারে পাঁচ খানা বই থাকলে বেছে নেওয়া যায়। তাতে কাজের সুবিধে হয়।

সপ্তমত, ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন করার রেওয়াজ পর্ষদকে বন্ধ করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার ফলে স্কুলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে পরীক্ষা গ্রহণ এখনকার মতো অসুবিধাজনক থাকবে না। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য, আদিকালে পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।

আলোচনা শেষ করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শেষ পরীক্ষা পাস করে যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসে, তাদের বেশির ভাগই থাকে দুর্বল। হালের আজোবাজে বিষয়গুলি বাদ দিয়ে আগের দিনের মতো শব্দ “থ্রী আরস্” (Three R.S.)—অর্থাৎ পড়তে, লিখতে আর সামান্য গণিত শেখালেই যথেষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষান্তরে হাতের লেখার উপর জোর দেওয়া দরকার। নইলে শিক্ষার গোড়া থেকেই গলদ জন্মে যাচ্ছে, যা পরে গরলে পরিণত হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে।

মতামত

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

আসামী এবং ছাত্র পরিষদের রাজ্য কমিটির নেতা দলীল রায়কে উক্ত গৃহবাহিনীর নেতৃত্ব করতে দেখা যায় এবং এসব গৃহবাহিনীর মধ্যে অনেকেই কিছুদিন আগে পর্যন্ত সুপরিচিত নকশালী ছিল। তারা কলেজ সংলগ্ন এলাকাটিকে প্রায় সামগ্রিকভাবে অবরোধ করে ফেলে এবং সাধারণের স্বাভাবিক চলাচল পর্যন্ত ব্যাহত হয়। তারপর তারা কয়েকটি মারাত্মক ধরনের বোমা ফাটিয়ে বি পি এস এফ পরিচালিত ইউনিয়নের আলমারী তছনছ করে, কলেজ অফিস ভাঙাচুর করে এবং বি পি এস এফ-এর পোস্টার, প্রাচীরপত্র ইত্যাদি যথেষ্টভাবে ছিঁড়ে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। এতদসঙ্গে বি পি এস এফ (এস-এফ-আই) আহত ছাত্র ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়। অতঃপর তারা কমঃ বাদশা আলম জগন্নাথ ভদ্র, কমঃ স্বপন ব্যানার্জী, কমঃ তাপস রায় প্রমুখ আট নয় জন বি পি এস এফ কর্মীদের অপহরণ করার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যক্রমে কমঃ পঙ্কজ দে বাদে সবাই

পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়। পরে কমঃ পঙ্কজকে গুরুত্বরূপে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। কমঃ জগন্নাথ ভদ্র পালিয়ে পুন্ড্রিশের কাছে সাহায্যের আবেদন করলে পুন্ড্রিশ তাকেই উল্টে থানায় নিয়ে যায় এবং রাত এগারোটা পর্যন্ত কমরেড জগন্নাথকে থানায় আটকে রেখে অথবা হয়রানি করে। পরে পুন্ড্রিশ বি পি এস এফ (এস এফ আই)-এর সান্দ্য কলেজ শাখার নেতৃস্থানীয় কর্মী, প্রাক্তন সান্দ্য কলেজ ছাত্র সংসদের সহকারী শাখার পক্ষে

সম্পাদক ও বর্তমান বছরের পাট ওয়ান পরীক্ষার্থী কমঃ বিলাস ব্যানার্জীকে অন্যান্যদের সঙ্গে অহেতুক গ্রেপ্তার করে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

জগন্নাথ ভদ্র
সুপ্রিয় ধর
তাপস রায়
স্বপন ব্যানার্জী
বি পি এস এফ (এস এফ আই)
এর বঙ্গবাসী কলেজ (দিবা সান্দ্য) শাখার পক্ষে

বিচার

(সরোজ দত্ত-কে নির্বোধিত)

অন্যায় মানুষ করে,
বিচারের ভার দেবতার

নাকি দানবের?

আপনি জীবিত নাকি মৃত তার প্রশ্ন
অর্থহীন;

চোখের সামনে কত নিষ্পাপ শিশুরা গর্লবিদ্ধ হয়েছে
প্রশ্ন করিনি, প্রশ্ন কাকে করবো?

এদেশে মানুষ কেউ আছে নাকি? আমিই কি
এখনো মানুষ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভয়ত দর্পণ

পশ্চিমবঙ্গ

স্বাধীনতা দিবসের পূর্বাঙ্কে খাস কলকাতা সহরে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী শাসনের পক্ষপট ছাত্র গুন্ডা ও পদূলিশ বাহিনীর একাংশ গণহত্যার যে নশন বাঁধসতা ও ঘৃণ্য আক্রমণ চালাল, তার আগের দিন মাত্র নব কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব কে সি পথ, পশ্চিমবঙ্গে পদূলিশের অত্যাচার ও গুন্ডাদের আক্রমণের অভিযোগ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শত শত খুনের রক্ত ধারায় শিশু নারী বৃদ্ধ নির্বিশেষে, অসংখ্য সাধারণ নাগরিকের রক্ত-রঞ্জিত হাত ধুয়ে ফেলার জন্যে রাইটস বিল্ডিংএর কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আমলা ও পদূলিশ কর্তাদের বৈঠকে যখন পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি কমে গেছে বলে প্রচার করা চলছিল তখনই নব-কংগ্রেসী ফ্যাসিজম কাশীপুর ও বরানগরের সংলগ্ন অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী আক্রমণ চালিয়ে নকশাল খোজার নামে শত শত নাগরিকের গৃহ ভস্মীভূত, শিশু নারী বৃদ্ধ নির্বিশেষে নাগরিকদের ওপর নৃশংসভাবে আক্রমণ

চালিয়ে যাচ্ছিল। সতেরো ঘণ্টা ধরে এই ঘৃণ্য ফ্যাসিস্ট আক্রমণ চলছিল বলে নব-কংগ্রেসী সমর্থক বড় বড় স্থানীয় কাগজকেও স্বীকার করতে হয়েছে।

এই আক্রমণের অজুহাত হিসাবে জনৈক নব-কংগ্রেসী নেতার হত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্রাং কার্যতঃ নব কংগ্রেসী সমর্থকদের ওপরই এর দায়িত্ব বর্তায়। পদূলিশ কর্তৃপক্ষও সেরকম বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে যে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পদূলিশ মিলিটারী এবং অসংখ্য আন্যেয়াস্কারী সাদা সাদা থাকী নানা রংয়ের পদূলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে, সেই তখন ভোগী ভুতোর দল কোথায় ছিল? কোথায় ছিল উত্তর কলকাতার কুখ্যাত পদূলিশ ডেপুটি কমিশনার আর তার কাশীপুরের ও সি? না কি তারা এই খুনের সাহায্য করছিল?

পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য ঘটনায় নব-কংগ্রেসী ফ্যাসিস্ট বর্বরতার সঙ্গে পদূলিশের একাংশের বোম্ব, সাজসের প্রমাণ আছে বলে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ মনে করেন। কাশীপুরের অভূতপূর্ব হৃদয়-

বিদ্যাক পাইকারী হত্যাকাণ্ড মনে হয়, খবরের কাগজে পড়া বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের ওপর ইয়াহিয়া খানের পশ্চিম আচরণকে স্মান করে দিয়েছে।

যতবড় আক্রমণই হউক, আজ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ ভাবে এই পদূলিশ কংগ্রেস বোম্ব আক্রমণের মোকাবিলা করতেই হবে। আজ নাগরিকদের বুদ্ধিতে হবে নব-কংগ্রেসী পদূলিশের এই বোম্ব আক্রমণকে বন্ধ অর্গল ঘরে বসে প্রতিরোধ করা যায় না। প্রতিটি এলাকার গণতান্ত্রিক মানুষকে এই ধরনের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজন হলে লক্ষ লক্ষ কৃষক মজুর ছাত্র কেরাণী মধ্যবিত্তকে এই ফ্যাসিস্ট শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করার সমস্ত পক্ষা অবলম্বন করতে হবে। এই নয়া ফ্যাসিস্টদের পথ রোধ করে দাঁড়াতে হবে। ঘরে বসে থেকে ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে বাঁচা যায় না। ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করেই নাগরিকদের আত্মরক্ষা, গৃহরক্ষা সম্মান ইচ্ছাকে রক্ষা করা সম্ভব। কলকাতার বৃকে অসংখ্য নাগরিকের রক্তধারা নয়া ফ্যাসিস্টদের কুখ্যাত মদ্য এবং ভরাল রক্তাক্ত নখর দেখে আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা মূখর হয়ে উঠুক : ফ্যাসিস্টদের পথ ছেড়ে যে না। ভয়-হাঁনের দর্জর প্রতিজ্ঞার দৃঢ় মূর্তি কোটি হস্ত উত্তোলিত হউক, ক্ষেতে

খামারে, কলে কারখানায়, অফিস আদালতে, স্কুল কলেজে পথে প্রান্তরে এই নয়া ফ্যাসিবাদের প্রতি ঘৃণাজ্ঞার, সংগ্রামের শপথ ধনিত হউক, পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতবর্ষ থেকে এই নয়া ফ্যাসিবাদকে আমরা উচ্ছেদ করবই। উনিশশ উনসত্তরের গণবিজয়ের দীপ্ত দিনগুলি নতুন ভাবে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক মানুষের জয়-যাত্রায়।

অন্ধ্র

নব-কংগ্রেসের গোরাগে সর্বত্র আগুন লেগেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, আজ আর তা সীমাবদ্ধ নেই। অন্ধ্রের জমিদাররা, অর্থাৎ রেড্ডিরা প্রধানতঃ সেখানে আদি-নব দ্বয় কংগ্রেসেরই কণ্ঠধার। কিন্তু রেড্ডিদের মধ্যেও বিভেদের বিষ কিছু কম নয়। তেলেগানা প্রজাসমিতির নেতা প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী চেম্মা-রেড্ডি অন্ধ্রের মধ্যমন্ত্রী একদা আদি অধুনা নব-কংগ্রেসী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির মস্তকটি উপহার চান। প্রজা সমিতির স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের আন্দোলনকে লাঠি গুলি টিয়ার গ্যাসের জোরে দাবিয়ে দিলেও তেলেগানা ও সিরকার অঞ্চলে নব-কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে দমাতে পারে নি। একান্তরের সংসদ নির্বাচনে ঐ এলাকার নব কংগ্রেস প্রচণ্ড মার খেয়েছে। সংসদে প্রজা সমিতির দশজন সদস্য স্বতন্ত্র তেলেগানার

দাবী নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

আমাদের মহীসসী প্রধানমন্ত্রী অন্ধ্রের মধ্যমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডিকে বলি দিয়ে তেলেগানার স্বাভাবিক দাবীকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর নব কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এখন প্রায় স্থির করে ফেলেছেন যে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডিকে সরিয়ে অন্য কাউকে অন্ধ্রের মধ্যমন্ত্রী করা হবে।

এদিকে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডিও অন্য-সত্তভাবে বসে নেই। তাঁর দলও বেশ ভারী। অন্ধ্র বিধান সভার নব-কংগ্রেসী সদস্যরা এক প্রস্তাব পাশ করে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির প্রতি তাঁদের অবিচল আশ্রয় প্রকাশ করেছেন। শব্দ তাই নয়, অন্ধ্র প্রাদেশিক নব-কংগ্রেস কমিটি এক প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডের নির্দেশ লঙ্ঘন করে তাঁদের প্রস্তাবিত আলোদা তেলেগানা প্রদেশ নব-কংগ্রেস কমিটি গঠন করতে দিতে অস্বীকার করেছেন।

বাহাদুর সালের আসন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অন্ধ্র কংগ্রেসের এই খেলোয়াড়ের নব কংগ্রেসের বিপদ ডেকে আনবে বলে অনেক নব-কংগ্রেসী নেতা উদ্বেগ। কিন্তু নব-কংগ্রেস সভাপতি ডি সঞ্জীবায়া ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির ওপর তাঁর পূর্বনো প্রতিশোধপূর্ণ চরিতার্থ করার সুযোগ হাত ছাড়া করতে চান না। সূত্রাং দলীয় কলহের অবস্থা আবার পূর্বনো কংগ্রেসের মতই তীব্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিদেশ দর্শন

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মধ্য প্রাচ্য

(দর্পণের পর্ববৈষ্ণব)

ইজিপটের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। নাসেরের মৃত্যু ও আনোয়ার সাদাতের প্রেসিডেন্ট হবার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে যে কূটনৈতিক সংঘাত দেখা দেয় সম্প্রতি তা বিশেষ বেড়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে কায়রোয় দুজন মস্কোপন্থী-শ্রমিক নেতার গ্রেপ্তারে মস্কো ভীষণ ক্ষুব্ধ এবং এমনও শোনা যাচ্ছে যে সোভিয়েত সরকার হয়ত তাঁদের রাষ্ট্রদূত ভ্রাদিমির ভিনোগ্রাদোভকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন-ইজিপ-

শর্মিষ্ঠা বর্মণ

সুপরিচিতা গীটার শিল্পী।

গীটার শেখাচ্ছেন।

২৪১-এ, চিত্তরঞ্জন এন্ডার্নিউ,

(লিবার্টি সিনেমার কাছে),

কলিকাতা-৬

আমরাও দর্পণ বিক্রয় করি

প্রোলেটারিয়েট বুক এজেন্সীজ

২২/৬ এস বি রাহা লেন,

আসানসোল

টের বর্তমান ঠান্ডা লড়াইয়ের সুত্র-পাত সুদানকে নিয়ে যেখানে সম্প্রতি জেনারেল নুমেয়ী একটি অভ্যুত্থানকে দমন করেন এবং অভ্যুত্থানের নেতাদের হত্যা করেন। এরই প্রতিবাদে উপরোক্ত দুই শ্রমিক নেতা ইজিপটের জেনারেল ওয়া-কীস ফেডারেশনের তরফে একটি বিবৃতি দেন, যাতে সাদাত ভীষণ চটে গিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করেন। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন খালেদ মহীউদ্দিন, পরলোকগত প্রেসিডেন্ট নাসেরের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সোভিয়েত ইউনিয়নের আস্থাভাজন। এই গ্রেপ্তারের ফলে সাদাত পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধুত্বের চাইতে সুদান সহ অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে অনেক বেশী আগ্রহী।

বস্তৃতপক্ষে মধ্য প্রাচ্য নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ বেকারদার পড়েছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে যে প্রভাব মস্কো ওই অঞ্চলে বিস্তার করেছিল তাতে এবার ভাটা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সোভিয়েত সরকার বিশেষ করে তাঁদের জার-

গায় চীনাাদের “অনুপ্রবেশ” আশংকা করছে।

এই আশংকার কারণ ঘটেছে সুদান নিয়ে। সুদান সরকার সম্প্রতি একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন পিকিংয়ে চীন সরকারকে একদল বিশেষজ্ঞ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করতে। রাজনৈতিক পর্ববৈষ্ণবদের মতে এই বিশেষজ্ঞরা সুদানে রুশ সামরিক উপদেষ্টা ও টেকনিশিয়ানদের জায়গায় নিয়োজিত হবেন। এবং জানা গেছে বর্তমানে জেনারেল নুমেয়ী রুশদের আদেশ করেছেন সুদানে তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে ততদিন না দুই দেশের সম্পর্কে উন্নতি ঘটছে।

শব্দ চীন নয়, নুমেয়ী স্থির করেছেন যে সুদানের রাহাদ সেচ প্রকল্পের জন্য শব্দমাথ পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলির সাহায্য নেওয়া হবে। বিশ্ব ব্যাংকের একটি দল সম্প্রতি সুদানের রাজধানী খারতুমে এই প্রকল্পটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং জানা গেছে বৃটেন সহ কয়েকটি পশ্চিম দেশ যৌথভাবে এই কাজটি করবেন। অপরদিকে শীঘ্রই সুদানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিচার খারতুমে শব্দ হবে

এবং অন্তত চারজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এই চারজনকে অবশ্য সুদান সরকার এখনও ধরতে পারে নি এবং এদের মধ্যে আছেন কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ মহম্মদ ইব্রাহিম নগুদেই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছে সুদানে এই কমিউনিস্ট হত্যা বন্ধ করতে। মস্কো শব্দ নিজেই এর প্রতিবাদ করেছে তাই নয়, প্রেসিডেন্ট সাদাতকে দিয়েও জেনারেল নুমেয়ীকে বঙ্গানোর চেষ্টা করেছে এইগুলি বন্ধ করার জন্য। কিন্তু মনে হয় না খুব একটা ফল হয়েছে কারণ সাদাতও নুমেয়ীকে এই ধরনের অনুরোধ করে সুদানের বন্ধু হারাতে চায় না। উপরন্তু সাদাত দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করে যখন নুমেয়ী টেলিফোন করে তাঁদের বিবৃতির প্রতিবাদ জানায় ও জানতে চায় এ সম্পর্কে ইজিপট সরকারের কি বক্তব্য।

তবে সুদানের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকটের সমাধানের জন্য নুমেয়ী হয়ত সোভিয়েতকে একেবারে বাদ দিতে পারবে না। না পারার রাজনৈতিক কারণও যথেষ্ট। সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি এখনও বেশ শক্তিশালী এবং নুমেয়ী জানে যে আরেকটি কমিউনিস্ট বিদ্রোহ ঠেকাবার একমাত্র উপায় হল সোভিয়েতের অর্থনৈতিক সহযোগিতা। এবং বর্তমানের ঘটনাবলি স্বয়ং সোভিয়েতও নিজ স্বার্থে এই সহ-

যোগিতা করতে নিশ্চয়ই প্রস্তুত থাকবে।

সুদানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী মার্কিনীদের খুশী করলেও তাদের প্রভাব বৃদ্ধির কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। বরং সম্প্রতি সুদান সরকার একটি জার্মান প্রাক্তন নাৎসীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে যে নাকি কয়েকটি সংস্থার হয়ে দক্ষিণ সুদানে একটি অ-মুসলিম নিগ্রো বিদ্রোহের প্ররোচনা জাগাচ্ছিল। সরকারের বক্তব্য এই সংস্থাগুলির অন্যতম হল মার্কিন সি আই এ। অন্যান্যদের মধ্যে আছে পশ্চিম জার্মানীর হাণ সংস্থা, ক্যারিটাস ইন্টারন্যাশনাল। (প্রেস-গত উল্লেখযোগ্য যে ক্যারিটাস কিছুদিন আগেও পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাংলা দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে কাজ করছিল। এদের সকলকেই অবশ্য ভারত সরকার সম্প্রতি চলে যেতে বাধ্য করেছে।) শব্দ তাই নয়। সুদান যদি প্রস্তাবিত আরব ফেডারেশনের সদস্য হয় তবে যতদিন ইজরাইলের সঙ্গে সংঘর্ষ থাকবে ততদিন তাকে তার আরব বন্ধুদের খাতিরেই মার্কিনীদের এড়িয়ে চলতে হবে। প্রস্তাবিত এই ফেডারেশনের অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছে, লিবিয়া, ইজিপ্ট ও সিরিয়া।

মিনার্ভা 'প্রবাহ'

(দর্পণের সমালোচক)

সত্তর দশকের বলিষ্ঠ নাটক হিসেবে "প্রবাহ"কে চিহ্নিত করা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে এই নাটকের বলিষ্ঠতা এবং সত্তরদশকের রূপচর্চাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। উল্লিখিত নাটকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ এবং অত্যাচারের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের তিরিশ দশকীয় ঘটনা-ক্রমের সঙ্গে আজকের সত্তর দশকের সাজব্যা রচনা করা হয়েছে। তখনকার সময়ে ক্ষুদ্রিরাম, যতীন দাস, সূর্য সেন, ভগৎ সিং প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী তরুণের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ও তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস চক্র চরম ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ কিভাবে হিজলী হত্যাকাণ্ডকে অস্বীকার করল তার তুলনা মানব-ইতিহাসে বিরল।

বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিরিশ দশকের ভুবন মাষ্টার, সঞ্জীব আজিজল, রজত, সত্যরত যে সংগ্রামী চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে, তার সঙ্গে সত্তর দশকের শোষণ নিপীড়নের ছবি সৌমিত্র, পদলিখ সন্দাপার, সৌমিত্রের মা ও যুবকের মধ্যেও ফুটে উঠেছে। এই সত্তরের পটভূমিতেই প্রতিটি সন্তানের মাকে বিস্ফাবী সন্তানের দৃঢ়তা নিয়ে জেগে উঠতে আহ্বান জানানো হয়েছে। আজকের এই দশক বেন সন্তানের চাইতেও বিস্ফাবকে ভাল-বাসবার দশক। আমরা সৌমিত্রকে

(সত্তর দশকের যুবক) এ নাটকে সেই কথাই বলতে শরেনিছি।

তবুও তিরিশ থেকে সত্তর করে সত্তরের এই শোষণ নিপীড়নের প্রবাহে আজকের পটভূমি চিত্রণে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতার অভাব রয়েছে। বিশেষত তৎকালীন বৃটিশীয় অত্যাচারের তুলনায় আজকের অত্যাচার যে আরো মারমর্দী ও বিপজ্জনক এবং তার গভীর বড়লোক কোথায় নিহিত তা শ্রদ্ধা-মাত্র সূত্রধারের ভাষ্যে প্রকাশ পাওয়ায় চাইতে চরিত্রাভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠলে মনে অনেক বেশী দাগ কাটতো। তাছাড়া সম্প্রতিক কালে পদলিখী অত্যাচারের বিধিব্যবস্থাও পালটে গিয়ে আরো তীব্র হয়েছে।

অন্যথায় এ নাটকের বলিষ্ঠতাকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। "মিনার্ভা থিয়েটার কম্পী সংসদ" যে দৃঢ়তা আজকের মানবের কাছে উপস্থাপন করলেন, তা একব্যাক্যে প্রশংসার যোগ্য। অভিনয়ে এবং পরিচালনায় ইন্দ্রজিত সেন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া সমীর চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু দাশ, দেবাংশু ভট্টাচার্য ভাল অভিনয় করেছেন। তবে সংলাপ উচ্চারণে এবং স্বরনিষ্ক্ষেপে প্রত্যেকেরই মাঝে মাঝে অনিশ্চয়তার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত সৌমিত্রের ভূমিকায় প্রশান্ত রায়। সুধর অরুণ চ্যাটার্জী একেবারেই তৈরী হনি বললেই চলে, মণ্ড পরিচালনা-নায় শৈলেন দের কাজ যথোপযুক্ত। সেই সংগে আলোকসম্পাতে মিনার্ভার আলোক বিভাগ অসম্ভব

ক্ষমতা দেখিয়েছে। বিশেষতঃ ইউরোপীয়ান ক্লাব ধবংসের দৃশ্য।

নাটকের আলোচনা শেষে মিনার্ভা থিয়েটার কম্পী সংসদ নিয়ে কয়েকটি কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন। বর্তমানে মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক কস্তুরচাঁদের বড়লোক এবং পদলিখী অত্যাচারকে কেন্দ্র করে এই প্রবাহ নাটকের অভিনয় গত দু সপ্তাহ ধরে বন্ধ ছিল।

লিটল থিয়েটার গ্রুপ যে আমলে কল্লোল নাটক শ্রদ্ধা করেছেন তার অনেক অনেক আগে থেকেই উৎপল দত্তের সঙ্গে মালিক কস্তুরচাঁদের মামলা চলছিল এবং মালিক নাকি তখন মিনার্ভা থেকে প্রীদত্তকে বহিস্কার করার ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু প্রীদত্তের সঙ্গে মালিকের আবার আঁতাতের কারণেই হোক বা যে কারণেই হোক মালিক কস্তুরচাঁদ সে ডিগ্রী কার্যে প্রয়োগ করেন না।

কিন্তু তৎকালীন সংস্কৃতিমান ও প্রগতিশীল শিল্পী উৎপল দত্ত মিনার্ভা কম্পীদের তিনচার মাসের বেতন বাকী রেখে এবং প্রতিডেট ফান্ডের কোন হিসেব না দিয়ে মিনার্ভা ছেড়ে চলে যান। তখন কম্পীদের অবস্থা খুবই মর্মান্তিক। পরিবর্তে তাদের অন্য পেশা গ্রহণ করারও কোন উপায় নেই। তাই কর্মচারীরা এবং এ ছাড়া আরো কয়েকজন শিল্পদরদী নাট্যকর্মী নিয়ে তারাই মিনার্ভা থিয়েটার কম্পী সংসদ নাম নিয়ে অঙ্গার প্রযোজনা করতে থাকেন। তারপর প্রবাহ নাটকের অভিনয় শুরু হয়।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে হঠাৎ হলের মালিক কস্তুরচাঁদ তার সেই ডিগ্রীটি প্রয়োগ করেন এবং যথারীতি পদলিখ এনে কম্পীদের হল থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারপর কম্পীরা এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে যখন তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে, তখন ছজন নাট্যকর্মীকে পদলিখ গ্রেপ্তার করে অসম্ভব অত্যাচার করে এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তিন চারটে নন-বেইলবল কেস দিয়ে দেওয়া হয়। পরে কোর্ট ইনজামশন জারী করলে নাট্যকর্মীদের অনেক কাঁঠড় পড়িয়ে জামিনে ছাড়িয়ে আনা হয় এবং পাঁচই আগস্ট থেকে পুনরাভিনয় শুরু হয়।

বরানগর কাশীপুর

(২য় পৃষ্ঠার পর)

পূর্বে আর বরানগর থানায় কেউ আসে নি ডায়েরী করতে অথবা নিখোজ আত্মীয় স্বজনের খবর নিতে স্থানীয় লোকেরা জানে পদলিখের কাছে গিয়ে লাভ নেই।

পদলিখের বক্তব্য সোজা : আমাদের কাছে কেউ আসে নি অভিযোগ নিয়ে—থানার ডায়েরী খাতা পরিষ্কার। তাই কতলোক নিহত হয়েছে বা কার কি ক্ষতি লুপ্ত হয়েছে তা বলা পদলিখের পক্ষে সম্ভব নয়। পদলিখ খালি মৃতদেহ ধুয়ে পেলে বুঝবে নিশ্চয় কেউ নিহত হয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র ষোলটি মৃতদেহ নাকি পদলিখের সম্মানে এসেছে।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রেবার ঘটনার পরেও শনিবার বিক্ষিপ্ত হত্যা চলতে থাকে এখার ওখার। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের তাদের কাজ মোটামুটি ঠিকভাবেই করেছে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আগের দিন লালবাজারে পদলিখের এক কর্তাব্যক্তি রিপোর্টারদের বলেন যে, কাশীপুর অঞ্চল নকশাল মন্ডল করতে বেশী সময় লাগবে না। অবশ্য তার পরের দিনই যে এই নকশাল মন্ডল অভিযান শুরুর হচ্ছে তার কোন হাদিস তিনি রিপোর্টারদের দেন নি।

শুক্রেবার রাতে, চব্বিশ ঘণ্টা হত্যা চলার পর, আবার পদলিখ মুখ খুলল। লালবাজারের এক কর্তা বলল : "এটা একটা অশুভ ব্যাপার যে, সতের ঘণ্টা পদলিখ নিষ্ক্রিয় রইল।" সংবাদপত্রে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ চালিয়ে দেওয়া হল; একবারও যাতে সন্দেহ না হয় যে, পদলিখের নেতৃত্বে একশ পাঁচ টাকার স্পেশাল হোম গার্ডদের নানা জায়গা থেকে জোগাড় করে মূল বাহিনী গড়া হয়েছে। তাদের সাহায্যে এসেছে বাগবাজার, জোড়া-বাগন, আটপাড়া কাশীপুর সিং প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় ছেলেরা।

ঘটনার পর পদলিখের আই জি বলেছেন "আমার এলাকা বরানগরে কিছু হয় নি, অতএব নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আমার পদলিখে বর্তায় না।" আবার কলকাতার পদলিখ কমিশনার বলেন হত্যার বেশীর

ভাগ ঘটেছে বরানগরে আর মৃতদেহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কাশীপুরে।

রাববার সর্বদলীয় জরুরী সভায় ঠিক হল যে, ছয় জনের একটি কমিটি গিয়ে তদন্ত করবে আর দুই রিপোর্ট পেশ করবে। প্রায় ঠিক হয়ে এসেছিল—কে কে সদস্য হবেন তাও। বিজয় নাহার, জ্যোতি বসু, যতীন চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ মখাজী, নির্মল বসু আর সুবোধ ব্যানার্জীকে নিয়ে কমিটি হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় হতে চলেছে এই সময়ে বিদ্রোহী পি এস পির অশোক দাশগুপ্ত হঠাৎ বাগড়া দিলেন। তিনি বললেন সদস্য খাড়াও নেওয়া দরকার। তর্ক শুরুর হল—অজয় মখাজীর প্রতিনিধি হরিদাস মিত্র বললেন, আর নব কংগ্রেসীরা সমর্থন করল যে সদস্য খাড়ার ব্যাপারে তাদের আপত্তি আছে। আবার একজন সংগঠন কংগ্রেসের অশোক দত্তকে কমিটিতে নেওয়ার কথা বলল। সভা ভেঙে গেল—ঠিক হল পরের দিন আবার সভা বসবে।

অবশ্য সিদ্ধান্তে একথাও ছিল যে, পদলিখ এই ঘৃণ্য হত্যার নিষ্ক্রিয় থেকে কাজে গাফিলতি দেখিয়েছে, তাই পদলিখের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সিদ্ধান্তবান রাজী হলেন যে দুইটি থানার ও সি, উত্তর কলকাতার ডেপুটি কমিশনার আর ব্যারাকপুরের এডিশনাল পদলিখ সন্দাপার সাসপেন্ডেড হবেন। তবে তিনি অনুরোধ করলেন লিখিত ভাবে এদের নাম রাখার দরকার নেই, কারণ এতে আইনগত বাধা আছে।

এই সিদ্ধান্ত অনবদ্যী সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেডিও মারফৎ ঘোষণা করল যে, দুজন ওসিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলেরা ভাবল অত্যন্ত প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা নেওয়া হল।

ইতিমধ্যে রাববার অধিক রাতে পর্বন্ত সিদ্ধান্তবাদের বাড়ীতে গভীর শলাপারামর্শ চলল। সমস্ত ভেঙে গেল।

সোমবার সর্বদলীয় সভায় সিদ্ধান্তবান আর কোন আলোচনার সুযোগ দিলেন না। বললেন যে, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাক্তন বিচারককে তদন্ত করানোর আর দুজন ও সি-কে সাসপেন্ড না করে ওদের বদলী করার। সভায় চেঁচামেচি—সভা ভেঙে গেল।

দুজন ও সি-কে বলা হল তারা ছুটিতে চলে যাক। এত কাজের পর কি করেই বা সাসপেন্ড করা যায়।

তদন্তে নিষেধ হয়েছে এলাহাবাদের প্রাক্তন বিচারক বি বি মল্লিক। অভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য : মল্লিক পন্থ পরিবারের আর নেহেরু পরিবারের খুব অনুগত। কেউ কেউ বলেছেন যে, মল্লিক সাহেব গোবিন্দবল্লভ পন্থ উত্তর প্রদেশে এলে গুঁর মাথায় ছাতা ধরতেন।

দর্পণের পাঠকদের প্রতি

দর্পণের মফঃসলের পাঠক ও গ্রাহকরা ডাকযোগে গ্রাহকচাঁদা দর্পণ অফিসে পাঠিয়ে সরাসরি গ্রাহক হতে পারেন। গ্রাহক চাঁদা ডাকবাস্তুল সহ যথাক্রমে বার্ষিক, বাৎসরিক ও ত্রৈমাসিক পনের, লাঞ্চে সাত ও চার টাকা। এ ছাড়া আপনার পত্র-পত্রিকা সরবরাহকারীর মাধ্যমে অথবা স্থানীয় এজেন্টের কাছ থেকে নিয়মিত দর্পণ সংগ্রহ করতে পারবেন। এজেন্টের নাম ঠিকানা আলমহু জেলা : কালিদাস শর্মা; মুর্শিদাবাদ জেলা : দীপককুমার ভৌমিক, বহরমপুর; গুলাম রসুল, কান্দি; গিরীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কাশীমাজার রাজবাড়ী; অসীমকুমার আচার্য গণকর; হরিপদ সাহা, ত্রিগঙ্গা; এস. কে. দে, কবাকা ব্যারেন্স; প্রভাতকুমার সিন্ধা, জেমো; সুধেন্দুবিশাল দত্ত গোপবান (খাগড়া); সুধীরকুমার দাস, রত্নাধগঞ্জ; বীরভূম জেলা : কালী বন্দোপাধ্যায়, সিউড়ি; এন. কে দাস, বোলপুর; অসীমকুমার সাহা, বজ্রপুর; শশনপ্রসন্ন রায়, রামপুরহাট; মদীরা জেলা : ক্ষীণবিশ্বাস, তেহাটা; হরিশ্রবণ পরামণিক, নবদ্বীপ, শিশিরকুমার চৌধুরী, বেণুয়াডহরী; বর্ধমান জেলা : বিমলকুমার তা, বর্ধমান শহর; সুখময় মিত্র, প্রলেভারিয়েট বুক এজেন্সী, আসানসোল; এস. পি, চ্যাটার্জী, দুর্গাপুর-৪; এস. দে, দুর্গাপুর-২; প্রোগ্রেসিভ বুক ষ্টল, দুর্গাপুর-৫; এ. বি, মজুমদার, বরাকর; দেবনাথ বিশ্বাস, সীতারামপুর; মজু গোস্বামী, কালনা; চক্রবর্তী এ্যাণ্ড বসাক, বর্নপুর; পরেশচন্দ্র রায়, রানীগঞ্জ; বি. এন্. মল্লিক, গুসকারা।

৥ অন্যান্য জেলার এজেন্টদের নাম আগামী সংখ্যায়

নাটক বন্ধ করার,
শ্রমিক কর্মচারীদের উচ্ছেদ করার
চক্রান্ত বানচাল করে

প্রবাহ

চলছে চলবে

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি আটায়
রবি ও ছুটির দিন ৩ ও আটায়
প্রযোজনা ৥ মিনার্ভা থিয়েটার কম্পী সংসদ
পরিচালনা ৥ ইন্দ্রজিত সেন

মিনার্ভা থিয়েটার

ফোন ৫৫-৪৪৮১

বিজয় সিং নাহারের হুমকী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস কমিটির ভাবী সভাপতি নির্বাচনের কলকাতা এখনও সম্পূর্ণভাবে পদ-ত্যাগী সভাপতি বিজয় নাহারের হাতে বলে দর্পণ কংগ্রেসী মহল থেকে জানতে পেরেছে। জানা গিয়েছে, সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানার জন্যে বিজয় নাহার সভাপতি পদের প্রার্থী তরুণকান্তি ঘোষকে খোলাখুলিভাবে সতর্ক দিয়েছেন, তিনি (শ্রী-মোষ) যদি সিদ্ধার্থ রায়কে ছেড়ে আসেন তবে বিজয় নাহারের দল তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি এবং নারায়ণ চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করবেন। সতর্ক রাজী না হলে নারায়ণ চৌধুরীকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হবে এবং তরুণকান্তিকে সাধারণ

সম্পাদকের পদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে। উল্লেখযোগ্য, বিজয় নাহারের সতর্ক ফাঁকা হুমকী নয়। নব কংগ্রেস কমিটির চার ভাগের তিন ভাগই বিজয় নাহারের অন্তর্গত এই তথ্য নব কংগ্রেসীরা ভালোভাবেই জানেন।

বিজয় নাহারের এই হুমকির ফয়সালা করার জন্যে কোন কোন নব কংগ্রেসী চেষ্টা করছেন, বর্তমান অস্থায়ী সভাপতি সাধারণকে স্থায়ী সভাপতি এবং তরুণকান্তিকে সাধারণ সম্পাদক করার জন্যে। প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গের জয়নাথ আবেদিন এই চেষ্টা করছেন। কিন্তু কংগ্রেসী রাজনীতির বর্তমান গতি-বিধি দেখে মনে হচ্ছে, জয়নাথ আবেদিনের চেষ্টা ফলবতী হবে না।

সিদ্ধার্থ রায় আন্তরিকভাবে চাইছেন অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জীকে কংগ্রেস সভাপতি পদে। অবশ্য, তরুণকান্তিকেও তিনি মৌখিক ভরসা দিয়েছেন। সিদ্ধার্থ রায়ের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যে কেউ কেউ আপোষ প্রস্তাব এনে বলছেন, নারায়ণ চৌধুরীকে সভাপতি এবং দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জীকে সাধারণ সম্পাদক করা হোক। এঁদের যুক্তি নারায়ণ চৌধুরীর কোন ইমেজ নেই। বাবুসারী-দের কাছ থেকে টাকা তুলতে পারবেন না। দেবীপ্রসাদকে সাধারণ সম্পাদক করলে শিক্ষাপতি আর ব্যবসায়ীরা বেশী টাকা দেবেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, পশ্চিম বঙ্গের নব কংগ্রেসের এই খেলোয়াড়ের মধ্যে দেবীপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে আসতে চাইছেন না।

তবে যাই প্রস্তাব হোক না কেন, সবাই একটি বিষয়ে একমত। সেটি হচ্ছে, কলকাতা বিজয় নাহারের হাতে।

অভিযোগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সদস্য বর্ধমানের নারায়ণ চৌধুরী, পুরুলিয়া জেলা নব কংগ্রেস কমিটির সদস্য এবং লোকসভা সদস্য দেবেন মাহাতো এবং নয়াদিল্লী থেকে আগত ভবানী ব্যানার্জী।

বিজয় নাহারের চিঠির বয়ান দর্পণ দেখেছে। চিঠিতে বিজয় নাহার প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, মোরারজী দেশাই প্রভৃতিকে তাড়ানোর সময় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম বঙ্গ থেকে তাঁকে (নাহারকে) এবং নারায়ণ চৌধুরীকে ডেকেছিলেন। তারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে পশ্চিম বঙ্গে অনকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরপর নব কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে বিজয় নাহারকে সদস্য হবার আমন্ত্রণ জানালে বিজয় নাহারই মনোনয়ন দেন সিদ্ধার্থ রায়কে ওয়ার্কিং কমিটিতে।

তখন বলেছিলেন, তাঁর (নাহারের) পক্ষে নয়াদিল্লী যাতায়াত করা সম্ভব নয় বলে সিদ্ধার্থ রায়ের নাম করছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ রায়কে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করানোর অর্থ এই নয় যে, শব্দে তাঁর মারফতেই কেন্দ্র পশ্চিম বঙ্গের কথা শুনবে। অতীতে অতুল্য ঘোষের মাধ্যমে কেন্দ্র পশ্চিম বঙ্গের কথা শুনতো এবং সেজন্যে তাঁর বিক্ষোভ ছিল। এখন যদি কেন্দ্র সিদ্ধার্থ রায়কে পশ্চিম বঙ্গের স্থিতীয় অতুল্য ঘোষ করতে চান তবে তিনি (নাহার) প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে বিন্দ্র গ্রহণ করে সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন। এরপরেও যদি কেন্দ্র কথা না শোনেন তবে নব কংগ্রেস ছেড়ে তিনি আসল কংগ্রেসে ফিরে যাবেন। (আসল কংগ্রেস মানে কি তা অবশ্য বিজয় নাহার বলেননি—সম্পাদক দর্পণ)

এই চিঠির সঙ্গে আর চারজন নব কংগ্রেস নেতার অভিযোগ যুক্ত করা হয়েছে। পীযুষ মুখার্জীর কি অভিযোগ তা দর্পণের পাঠকরা জানেন। পীযুষ মুখার্জী গিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে উত্তর

বঙ্গের সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে। জবাবে পীযুষ মুখার্জীকে সিদ্ধার্থ রায় বলেছিলেন, “আপনাকেও তো অনেকে জোড়োর বলে থাকে।”

নারায়ণ চৌধুরী তাঁর অভিযোগপত্রে বর্ধমান থেকে লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের জন্যে সিদ্ধার্থ রায়কে দায়ী করে বলেছেন, নির্বাচনী জনসভায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধে সিদ্ধার্থ রায় কিছুর বলেন নি। বলেছিলেন তাঁর (নারায়ণ চৌধুরী) বিরুদ্ধে। স্থিতীয়তঃ এই কেন্দ্র অতুল্য ঘোষকে দাঁড় করানোর জন্যে সিদ্ধার্থ রায়ের কোনো হাত ছিল কিনা তাও তদন্ত করা দরকার। কেননা সেদিন পর্যন্তও সিদ্ধার্থ রায় অতুল্যবাবুদের লোক ছিলেন।

দেবেন মাহাতো তাঁর অভিযোগে বলেছেন, দক্ষিণ পশ্চীম কমিউনিস্ট পার্টির ভূতপূর্ব কার্ড হোল্ডার সদস্য অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জীকে রাজ্যসভার নিম্নমেনশন দেবার জন্যে সিদ্ধার্থ রায়ই অনুরোধ করেছিলেন। তাঁকেই আবার নব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করার জন্যে সিদ্ধার্থ রায় চেষ্টা করছেন। তিনি (মাহাতো) লোকসভার অন্যান্য নব কংগ্রেসী সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁরা কেউই সিদ্ধার্থ রায়কে পছন্দ করেন না। এ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনার জন্যে বৈঠক ডাকা উচিত ইত্যাদি।

ভবানী ব্যানার্জী বলেছেন, পশ্চিম বঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় তার সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করছেন না যদিও প্রধানমন্ত্রী তাঁকে (ব্যানার্জীকে) পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসকে জোরদার করার জন্যে পাঠিয়েছেন। আরও অভিযোগ আছে।

দর্পণের কাছে আরো খবর আছে, প্রধানমন্ত্রী কয়েকবার বিজয় নাহারকে দিল্লী আসার অনুরোধ করেছেন এবং বিজয় নাহার আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দিল্লী যাচ্ছেনও।

কেন্দ্রীয় সরকার আনন্দবাজারে বজাপন বন্ধ করেছেন

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্লেষাত্মক ভাষায় গালাগাল দেবার অভিযোগে ভারত সরকার আনন্দবাজার পত্রিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছেন। আনন্দবাজার প্রতি মাসে গড়পড়তা পঞ্চাশ হাজার টাকার কেন্দ্রীয় বিজ্ঞাপন পেতো। এই খবরটি গত মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকার মালিক সম্পাদক অশোক সরকার পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র মালিকদের রিজিওনাল কমিটির সভায় জানিয়ে মালিকদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মতামত জানানোর অনুরোধ করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

অবশ্য, ভারত সরকার আনন্দবাজার পত্রিকায় কেন্দ্রীয় বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ বন্ধ করলে পাছে হেঁচকি হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেছেন। সেজন্যে সামান্য কিছু বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার পরিমাণ হচ্ছে, প্রতিমাসে আগে যে পরিমাণ বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

আনন্দবাজারের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞাপন বন্ধ করার কারণ সম্পর্কে দর্পণ জানতে পেরেছে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার বিগত পশ্চিম বঙ্গ সফরের সময় আনন্দবাজারের একজন জাদিরেল সাংবাদিক ‘খোলা চিঠি’ নাম দিয়ে বাংলা দেশের শরণার্থী

ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে শ্লেষাত্মক ভাষায় একটি রচনা প্রকাশ করেন। আনন্দবাজার চিরকালই ইন্দিরার বিরোধী। প্রধানমন্ত্রীর নজরে ব্যাপারটি আনা হলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বিষয়টি সম্পর্কে গোপন তদন্তের নির্দেশ দিয়ে যান। এরপরে হয় গোপন তদন্ত। যে সাংবাদিকটি এই রচনাটি লিখেছিলেন তিনি বুটেন মার্কিন লবীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি “স্বাধীন সাহিত্য সমাজ” নাম দিয়ে সাহিত্যিক সাংবাদিকদের মগজ খেলাইয়ের জন্যে নানা “গোপন সূত্র” থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। এখন আবার শরণার্থীদের নিয়ে একটি কমিটিরও মাতব্বর হয়ে টাকা তুলছেন। যাই হোক, এই সাংবাদিকটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গোপন রিপোর্টে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টটি দিল্লী যাবার পথেই ভারত সরকার বিজ্ঞাপন বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

বিজ্ঞাপন আবার চালু করার জন্যে তখন আনন্দবাজার থেকে তাঁদের তদারক সূত্র হয়। কিন্তু কিছুই হয় না। শেষ পর্ষায় আনন্দবাজার গোষ্ঠীর মালিক-পত্রে অভীক সরকার নয়াদিল্লী যান এবং সঙ্গে নিয়ে যান “খোলা চিঠির” লেখক সাংবাদিকটিকে। দিল্লী গিয়ে ওঁরা তথ্য ও বক্তার মন্ত্রী নন্দিনী সংপতির সঙ্গে দেখা করে “খোলা চিঠির” জন্যে দ্রুত প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু নন্দিনী সংপতি কোনো দ্রুতপ্রকাশকে আমল দেন না এবং অভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করে ওঁদের ঘর থেকে একরকম বের করে দেন।

এখনও আনন্দবাজারে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞাপন কার্যতঃ বন্ধ হয়ে আছে।

খোয়াখোয়ির প্রতিক্রিয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রী জগদানন্দ রায় প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ডিরেক্টর পদের জন্যে দক্ষিণ পশ্চীম কমিউনিস্ট পার্টির দুটি ডিরেক্টর পদের একটি কেটে দেন এবং ভাগ বাটোয়ারা অনবদ্য নব কংগ্রেসী সন্তোষ রায় এবং চণ্ডী মিত্রকে ডিরেক্টর মনোনয়ন করেন। প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাংক কংগ্রেসীদের অন্যতম মধ্যভান্ড। ব্যোমকেশ মজুমদার দীর্ঘদিন প্রফুল্ল সেনের অন্তর্গত এখানে অনেক গৃহীত হয়েছেন। এটা সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসীদের করতলগত। কো-অপারেটিভ সম্প্রসারণের নামে লাখ লাখ সরকারী টাকা পাওয়া যায় এবং তা নিয়ে চলে গৃহস্থানোর পালা। এইরকম মধ্যভান্ডের চেয়ারম্যান করা হবে বলে সন্তোষ রায়কে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সন্তোষ রায় এখন সিদ্ধার্থ রায় আর তাঁর সহযোগী প্রফুল্লকান্তি ঘোষের “ন্যাওটা” হয়েছেন। তাই প্রকাশ্যে

আশ্বাস দিলেও বিজয় নাহারের দল সন্তোষ রায়কে হারিয়ে দেবার জন্যে প্ল্যান করেন। সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে ওঁরা অনেক দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন। যাইহোক, আশ্বাস পেয়ে পরম পুলকিত চিত্তে সন্তোষ রায় চেয়ারম্যান নির্বাচনে মাত্র চার ভোট পেয়ে ধরাশায়ী হন।

পরাজিত হবার পর সন্তোষ রায় গিয়েছিলেন, এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে অভিযোগ জানাতে। সিদ্ধার্থ রায় সঙ্গে সঙ্গে অপর নব কংগ্রেসী ডিরেক্টর চণ্ডী মিত্রকে ডেকে পাঠান। আলোচনার সময় সিদ্ধার্থ রায় অকস্মাৎ চণ্ডী মিত্রকে ধমকে বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমপ্লেন করবেন। চণ্ডী মিত্রও কম ঝগড়া নন। তিনিও সিদ্ধার্থ রায়ের মতো দলত্যাগী হয়ে এখন নব কংগ্রেসী হয়েছেন। তাই জবাবে বলে এসেছেন, সিদ্ধার্থ রায় বা তাঁর মারফৎ প্রধানমন্ত্রীর ধমকানির তিনি পরোয়া করেন না। “জনগণের” কথা শরনে চলবেন তিনি।

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় যে কথা বলা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা। আজ সেই কথাই বলছেন জেনারেল কাউল, ব্রিগেডিয়ার দালভি এবং প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক নেভিল মাক্সওয়েল। এদেরই হেওয়া সীমান্ত যুদ্ধে সেই প্রকৃত ভাষ্যে শৃঙ্খল গ্রহণ করায়-এর

ভারতের চীন যুদ্ধ

দাম ১২.০০

মার্কিনী দৃষ্টিতে গান্ধীবাদের তথ্যানির্ভর এধরনের এই প্রথম গ্রন্থ সৈয়দ শাহেজ্জাহ-র

লেনিনবাদের চোখে গান্ধীবাদ

দাম ৭.০০

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে পূর্ব বাংলার রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকে বুঝতে হলে একটি অবশ্যপাঠ্য বই বদরুদ্দীন উমর-এর

পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট

দাম ৭.০০

নবজাতক প্রকাশন এ ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কতক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মালিক স্কোয়ার কলিকাতা-১০ থেকে দ্রুত এবং ৬১নং মঠ রোড, কলিকাতা-১৫ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

দপন

৩৪শ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা ২২শ অক্টোবর ১৯৭১ ২০ পৃষ্ঠা

বেশী ক্ষমতা পেয়ে পুলিশ নকশালি সন্দেহে যাকে তাকে হত্যা করছে হাওড়া স্টেশনে অসাম চ্যাটার্জী সম্পর্কে রহস্য

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ-
নৈতিক গোয়েন্দা পুলিশের বার্তা
এখন আর নিছক গাফিলতির
পর্যায় নেই, ক্রমশঃ তারা অধিক
ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাকে তাকে
মিথ্যা সন্দেহে প্রকাশ্যে হত্যা করে
বেড়াচ্ছে।

গত সপ্তাহে হাওড়া স্টেশনে যে
দুজনকে পুলিশ মিথ্যা সন্দেহে
খুন করল তা থেকে প্রমাণ হয় যে,
তারা হনো হয়ে ঘুরছে কত তরুণ
প্রাণকে এভাবে নেওয়া যায়। এখ-
টনা প্রমাণ করল যে, তাদের মামলৌ
ব্যাপারেও কোন তথ্য নেই, আর
ঘটনা ঘটে বাবার পর নানা মিথ্যা
তথ্য দিয়ে কাজের যুক্তি খাড়া করে।
আঠারই আগস্ট সকাল আটটা।

স্থানঃ লোকারণ্য থার্ড ক্লাশ ওয়েটিং
রুম। কয়েকজন তরুণ দাঁড়িয়ে
সিগারেট ফুকছে আর হাসি ঠাট্টার
বাস্ত। একজন আর একজনকে
“সকুমার” বলে ডাকল।

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে থেকে
হাতে পিস্তল নিয়ে গোটা দশেক
লোক বেরিয়ে তরুণের দলকে
ঘিরে ফেলল। অতি দ্রুত পিস্তল
গর্জে উঠল। দুটি তরুণ লুটিয়ে
পড়ল, আর সকলে ভীত সন্ত্রস্ত—
—যে যদিকে পারে সরে পড়তে
বাস্ত।

স্টেশনের বাইরেই পুলিশের
গাড়ী অপেক্ষা করছিল। মৃত তরু-
ণদের লাশ ওরা ধরাধরি করে

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধার্থবাবু ফাইল চেপে রেখেছেন

কংগ্রেসী কোন্দলের পরিণতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সিদ্ধার্থ রায় কি অধুনা মৃত
কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভার আর একটি
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে চলে-
ছেন? ঐ মন্ত্রিসভা তার শেষ বৈঠকে
স্থির করেছিলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন
সংস্থা (নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপ-
মেন্ট অথরিটি) নামে একটি প্রতি-
ষ্ঠান গঠন করা হবে এবং ভূতপূর্ব
ডেপুটি স্পীকার পীযুষ মুখার্জী
তার চেয়ারম্যান হবেন। কিন্তু
সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করার মতো
আদেশ মন্ত্রিসভা দিয়ে যেতে পারে
নি। এখন দেখা যাচ্ছে, সিদ্ধার্থ
রায় ঐ ফাইলটি চেপে রেখেছেন।

নব কংগ্রেসী মহলের খবরঃ
সিদ্ধার্থ রায় চাইছেন, ভূতপূর্ব
পূর্তমন্ত্রী সন্তোষ রায়কে চেয়ার-
ম্যান করতে। কেননা, সন্তোষ রায়
হচ্ছেন সিদ্ধার্থ রায়ের দলের প্রফুল্ল
কান্তি ঘোষের “ন্যাওটা”। অন্য-
দিকে পীযুষ মুখার্জী লিখিত
আভিযোগ করেছিলেন সিদ্ধার্থ
রায়ের বিরুদ্ধে। সিদ্ধার্থ রায়ও
চাইছেন পীযুষ মুখার্জীকে শিক্ষা
দিতে। ফলে ফাইলটি চাপা রয়েছে
সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে আর সিদ্ধার্থ
বিরোধী নব কংগ্রেসীরা গুণগদন
করছেন।

নতুন রাজ্যপাল ডায়াস আসার ফলে সিদ্ধার্থ রায়ের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হচ্ছে?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নতুন রাজ্যপাল ডায়াস কি
সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের ক্ষমতা সংযত
করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গে এসে-
ছেন? সোমবার রাইটাস বিল্ডিংয়ে
রাজ্যপাল বিভাগীয় সেক্রেটারীদের
নিয়ে বৈঠক করার শেষে অন্ততঃ
দুজন সেক্রেটারীকে এই প্রশ্ন করতে
আমি শুনেছি। রাজ্যপালের এই
বৈঠকে যে বক্তৃতার বিবরণ সংবাদ-
পত্রে বেরিয়েছে তা সম্পূর্ণ নয়।

জানা গিয়েছে, ডায়াস সাহেব
পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, অফি-

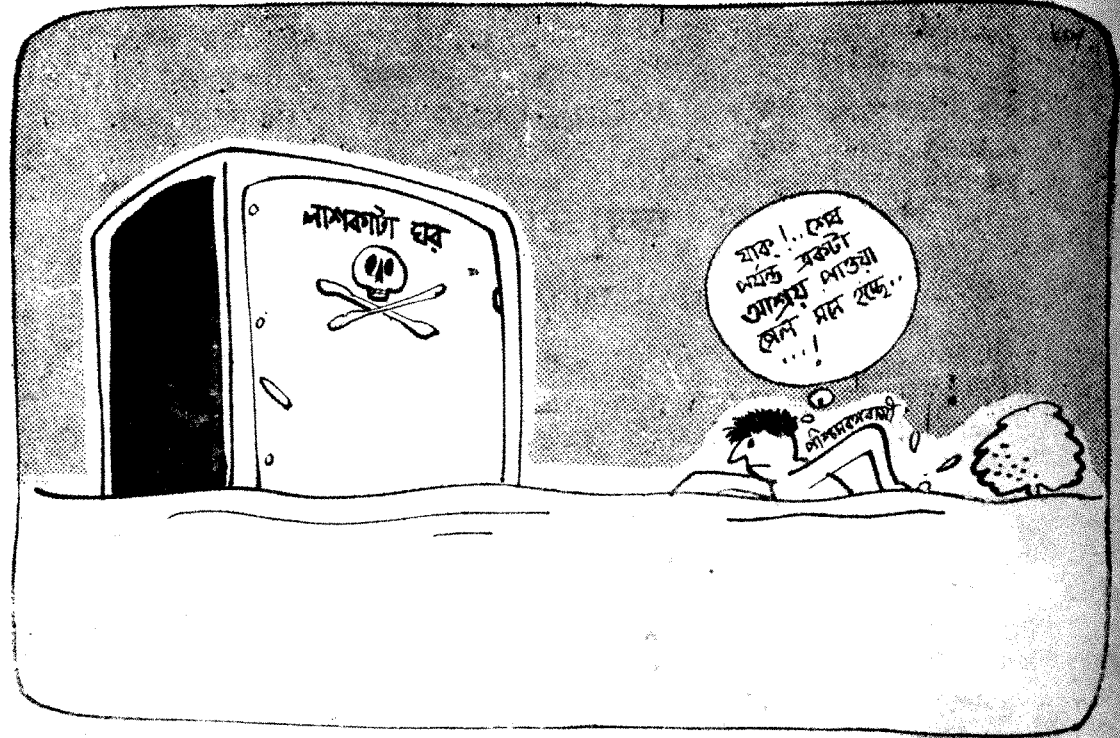
সারদের কোনো অসুবিধে মনে হলে
তারা যেন সোজা তাঁর কাছে চলে
আসেন। আর আলোচনার সময়
তিনি একবারও সিদ্ধার্থ রায়ের
নাম করেন নি।

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে
প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙ্গবার
কিছুদিন আগে তৎকালীন রাজ্য-
পাল ধর্মবীর ও অফিসারদের একথা
বলেছিলেন। ধর্মবীরের পেছনে
ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

দর্পণ বিশ্বস্তসূত্র আরো

জানতে পেরেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র
দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে সি পণ্ডিত
এখন সিদ্ধার্থ রায়কে “টাইট” করার
পরিকল্পনা নিয়েছেন। পরলোকগত
গোবিন্দবল্লভ পণ্ডিতের পুত্র কে সি
পণ্ডিত পরিষ্কার করে সিদ্ধার্থ
রায়কে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর
(সিদ্ধার্থের) সমস্ত প্রস্তাব কেন্দ্রীয়
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মারফৎ পাঠাতে
হবে। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সেক্রে-
টারিয়েটে পাঠানো চলবে না।

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)



ষ্টেটসম্যানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইরাণীর আচরণে সংবাদপত্রের মালিকরা ক্ষুব্ধ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সংবাদপত্রের মালিকানা প্রসার
সম্পর্কে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় আই-
নের তীব্র বিরোধিতা করে মালিক-
দের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেবার
আগে স্টেটসম্যান পত্রিকার মালিক-
দের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি সি আর
ইরাণী সংবাদপত্র জগতের অন্যতম
সম্রাট রামনাথ গোয়েঙ্কার সঙ্গেই
শুধু পরামর্শ করেছিলেন বলে
জানা গিয়েছে। ইরাণী সাহেব আর
কোনো মালিকের সঙ্গে পরামর্শ
করেন নি।

জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত বিলটি
যেদিন স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকা-
শিত হয় সেদিনই দপ্তরে ইন্ডিয়ান
এক্সপ্রেস সংবাদপত্র গোষ্ঠীর একচ্ছত্র
মালিক রামনাথ গোয়েঙ্কা স্টেটস-
ম্যান অফিসে গিয়ে ইরাণী সাহে-
বের সঙ্গে দীর্ঘসময় আলোচনা
করেন। সি আর ইরাণী হচ্ছেন
সংবাদপত্র মালিকদের প্রতিষ্ঠান
ইন্ডিয়া এ্যান্ড স্ট্রিটস নিউজপেপার
সোসাইটির চেয়ারম্যান এবং স্টেটস-
ম্যানের বেতনভুক কর্মচারী—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর। মাসে সাড়ে
আট হাজার টাকা মাইনে পান।
বিবৃতিটি বাজারে ছেড়েই ইরাণী
সাহেব প্রেস ফাউন্ডেশন অব
এশিয়া নামে একটি আমেরিকান
অর্থপুঙ্ক্ত সমৃদ্ধজনক প্রতিষ্ঠানের
আলোচনা সভায় যোগদানের জন্যে
ম্যানিলা-বালী রওনা হয়ে যান।

ইতিমধ্যে সংবাদপত্র মালিকরা
এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে
ঢালাও তীব্র অভিযানের সিদ্ধান্ত
নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
ইরাণী সাহেব তাঁর বিবৃতিতে
“সংবাদপত্র কর্মচারীরা রাজনৈতিক
দলগুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত” বলে
মন্তব্য করায় কোনো কোনো মালিক
খশী হন নি। তাঁরা বলছেন, ও
যুক্তি ধোঁপে টিকবে না। কেননা,
ইরাণী সাহেব স্বয়ং স্বতন্ত্র দলের
পশ্চিম বঙ্গ শাখার জয়েন্ট সেক্রে-
টারী ছিলেন। তাঁর মালিক নভাল
টাটা স্বতন্ত্র দলের হয়ে নির্বাচনে
দাঁড়িয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান এক্স-
প্রেস গোষ্ঠীর মালিক রামনাথ

গোয়েঙ্কা জনসংঘের প্রার্থীরূপে
লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে-
ছেন। হিন্দুস্থান টাইমস সার্চ-
লাইট প্রভৃতি সংবাদপত্রের মালিক
বি এম বিড়লা স্বতন্ত্র দলের হয়ে
নির্বাচনে লড়েছিলেন। অমৃত-
বাজার গোষ্ঠীর মালিক তরুণ-
কান্তি ঘোষ নব কংগ্রেসীদের এক-
জন নেতা এবং সেদিনও অর্থমন্ত্রী
ছিলেন। তার কোম্পানীর আর
এক ক্ষেত্রে মালিক জেনারেল ম্যানে-
জার প্রফুল্লকান্তি ঘোষ নব
কংগ্রেসী টিকিটে বিধান সভার
নির্বাচিত হন এবং বিগত মন্ত্রি-
সভায় চীফ হুইপ ছিলেন। আনন্দ-
বাজার গোষ্ঠীর ভূতপূর্ব মালিক
স্বর্গীয় সুরেশ চন্দ্র মজুমদার
কংগ্রেসী নিম্নেশনে দীর্ঘদিন রাজ্য-
সভার সদস্য ছিলেন। বর্তমান
মালিক অশোক সরকারও অতুল্য
ঘোষের আনন্দুলো কংগ্রেসের কত
না কমিটির চেয়ারম্যান আর সভ্য
ছিলেন।

চুরি করে যাদের চাকরী গিয়েছিল মেয়র তাদের আবার চাকরী দিলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গঙ্গপ্ত কতকগুলো বে-আইনী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ইতিপূর্বে চুরির দায়ে যাদের চাকরী গেছে তাদের পুনর্নিযুক্ত করে তিনি বদনজরী সৃষ্টি করেছেন। এরকম তিন ব্যক্তিকে তিনি চাকরী দিয়েছেন। এদিকে শিবকুমার খাম্বাও কয়েকজন পরিচিতকে এ্যাসফাল্টন বিভাগে গার্ডের চাকরী দিয়েছেন।

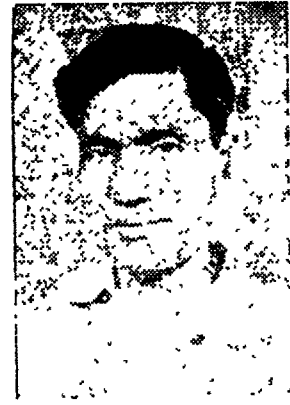
উনিশশ ছেইটি সালের ডিসেম্বরের পনেরোই তারিখে আনঅথরাইজড বিল্ডিং সেকশনের গার্ড মদনমোহন গঙ্গপ্তর চাকরী যায়।

কারণ আট-বি মদন রায় লেনের বাড়ীর বেআইনী নির্মাণের কাজে তিনি ঘুষ নিয়ে ধরা পড়েন। শ্রীগঙ্গপ্ত ঘুষ নেওয়ার কথা স্বীকারও করে। শ্রীগঙ্গপ্ত চাকরী ফিরে পাওয়ার জন্য তদানীন্তন ডেপুটি মেয়র এবং বর্তমানে ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান শিবকুমার খাম্বার কাছে আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু খাম্বা সাহেব তখন শ্রীগঙ্গপ্তকে চাকরী দিতে সাহস পাননি। এই বছরের মে মাসের পাঁচ তারিখে শ্রীগঙ্গপ্ত মেয়রের কাছে আবেদন করলে তিনি শ্রীগঙ্গপ্তকে চাকরী দেবার আদেশ দিয়ে কমিশনারের কাছে ফাইল পাঠালেন। কিন্তু কমিশনার জুলাই মাসের দুই তারিখে ফাইল ফেরত

পাঠিয়ে লিখলেন যে, মেয়রের এই আদেশ প্রশাসনে খারাপ নজর সৃষ্টি করবে। তথাপি খাম্বা সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়র কমিশনারকে লিখলেন চাকরী দিতেই হবে। ঘুষ নিয়ে ধরা পড়ে চাকরী খোঁওয়ানো মদনমোহন গঙ্গপ্ত বর্তমানে মোটর ভেইকলসে চাকরী করছেন। বিষয়টি বিরোধী দলের কাউন্সিলার প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় পেরিসভার মিটিংয়ে তুলবেন।

প্রাক্তন মেয়রের অর্ডারলি কানাইয়া প্রনাদের চাকরী যায়, কারণ উনিশশ উনসত্তর সালে দুর্গাপূজার সময় ডেপুটি মেয়রের ঘরের স্টীলের আলমারী খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে। বর্তমানে মেয়র তাকে কেয়ারটেকারের বোয়ারা নিযুক্ত করেছেন।

কালেকশান বিভাগের বেলিফ শঙ্কররঞ্জন ভট্টাচার্য কর্পোরেশনের ছয়শিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে নিজের একটি বাড়ি তৈরি করেছে। পরে অবশ্য টাকাটা সে ফেরত দেয়। বর্তমান মেয়র তাকে পুনর্নিযুক্ত করেছেন।



শুশীল খাড়ার বিবর্তন

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

ভাঙ্গা বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক, শ্রীশুশীল খাড়া নিজেকে শব্দগান্ধীবাদী বলে ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গে হিংসা সন্থাসের আবহাওয়ার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার জন্য আমরণ অনশনে নেমেছেন।

এখন ঠুর ষাট বছর বয়স, জীবনে এই প্রথম আমরণ অনশনের সংকল্প—ঠুর মতে এর আগে কখনও এ রকম অবস্থা আসে নি। সমস্ত রাজনৈতিক দল ব্যর্থ হয়েছে অবস্থার উন্নতি সাধনে, তাই প্রয়োজন আত্মহত্যার।

কেন এই আবহাওয়ার সৃষ্টি হল তা অবশ্য এখন আর ঠুরকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই।

উনিশশ ছেইটি সালে অতুল্যবিরোধী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও বাংলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত কৃতিত্বের দাবী শুশীলবাবুই। এ ব্যাপারে অজয়বাবুকে সামনে রেখে তাঁকে চলতে হয়েছে, কারণ তাঁর তখন ধারণা ছিল সামনে একজন নামকরা কেউ না থাকলে মানুষকে আকর্ষণ করা যায় না।

উনিশশ সাতষাটি সালে বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচনী জয়, অজয়বাবুর মধ্যমশিক্ষিত ইত্যাদি বাংলা কংগ্রেসের দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা বাড়িয়েছে। এতে সংগঠক শুশীলবাবু খসেই, কিন্তু নতুন পরিপ্রতিষ্ঠাতে সারা রাজ্যব্যাপী সংগঠন প্রসারের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না।

শুশীলবাবুর বোধের প্রয়োজন ছিল যে উনিশশ সাতষাটি এবং উনিশশ উনসত্তর দুই বছরের নির্বাচনেই বাংলা কংগ্রেসের জয়ের কারণ বামপন্থার প্রতি মানুষের ব্যাপক সমর্থন।

শুশীলবাবুই পারতেন নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বামপন্থীদের এক প্ল্যাটফরমে রাখতে। কিন্তু সূর্য থেকেই বাংলা কংগ্রেস ষড়যন্ত্র করেছে বামপন্থীদের ঐক্য বিনষ্ট করার। এ ব্যাপারে তাদের সাথী ছিল দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টরা এবং আরও কিছু ছোট রাজনৈতিক দল।

সমস্ত রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের

কোণঠাসা করার জন্য। উনিশশ উনসত্তর সালে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সমর্থনে দশ আঠারো জন সদস্য থাকা সত্ত্বেও সে মন্ত্রিসভা অজয়বাবু ভেঙে দিলেন।

কারণ তখন ভাবা গিয়েছিল যুক্ত ফ্রন্টের অন্যান্য পার্টির যুক্ত মোর্চা মার্কসবাদীদের দাবিয়ে দিতে পারবে—তাই ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙ্গার পরেই বা ভাঙ্গার কিছু আগে থেকেই শুশীলবাবুর নেতৃত্বে সূর্য হল মার্কসবাদী। বিরোধী তাঁর প্রচার অভিযান। মাড়োয়ারী ও অন্যান্য পুঁজিপতির দল আর জোতদারেরা লাখ লাখ টাকা নিয়ে এগিয়ে এল শুশীলবাবুর সমর্থনে। শুশীলবাবু ফুলে ফেঁপে একাকার।

তিনি ভাবলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির তিনিই নিয়ামক। তিনি ক্রমশঃ তার নিজের দলে একজন খুদে ডিক্টেটরে পরিণত হলেন, অন্ততঃ তাঁর পার্টির সদস্যরা অভিযোগ করলেন। পরে অবশ্য একই অভিযোগ অজয়বাবুও করেছেন।

উনিশশ একাত্তর সালের নির্বাচনে শুশীলবাবুর ঘোর কাটে নি। তার দরজায় ধরনা দিল মার্কসবাদী বিরোধী সমস্ত সংগঠন ও নব কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি সমস্ত দল। সামনাসামনি কোন বোঝাপড়া না হলেও ভেতরে ভেতরে আসন নিয়ে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

এদিকে নকশালীদের সবাই মিলে মদত দিতে লাগল মার্কসবাদীদের বিভিন্ন অঞ্চল স্থানীয় নেতাদের হত্যার জন্য। হত্যা সূর্য হল আর নির্বাচনে প্রচারের সুবিধার জন্য আরও অনেকে খুন হলেন। এই খুনের অন্যতম বলি শ্রদ্ধায় হেমন্ত বসু।

তখন কিন্তু শুশীলবাবু মদমত্ত—জয়ের নেশায় মগন। নির্বাচনী ফলাফল তাঁর নেশা কাটল।

বাংলা কংগ্রেসের আসন সংখ্যা তেত্রিশ থেকে পাঁচে নেমে এল।

তাঁর আর কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব রইল না। মন্ত্রিসভায় উনি জায়গা পেলেন না। হতাশায় মদ্যমত্ত, কিন্তু তখনও ধারণা যে, দল থেকে পদত্যাগের হুমকি দিলে হয়ত মন্ত্রিসভা মিলবে। দল ভেঙে গেলে, মন্ত্রিসভা এল না।

যাদের বিরুদ্ধে ঠুর সংগ্রাম তারা আরও শক্তিশালী হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেসীরাও। তাই একদা যারা ঠুরকে অর্থ আর অন্যান্য সাহায্য দিয়েছিল তারা এখন নব কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকল।

তাদের টাকায় ষড়যন্ত্রে হত্যা চলতে লাগল এবং সেই হত্যা ব্যাপক হল। মার্কসবাদী বিরোধীরা তাদের সঙ্কীর্ণ রাজনীতিতে এখনও দৃঢ় বিশ্বাসে অচল রইল যে, মার্কসবাদীদের সব কিছুই জন্মে দারুী করে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

নব কংগ্রেসীদের এখনকার অবস্থা দেখে ঠুরা শিউরে উঠেছে। বিশেষ করে কশীপুত্র গণহত্যার পর। এ জিনিষ আরও চলবে।

অসীম চ্যাটার্জীর রহস্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গাড়ীতে তুলল আর উধাও হয়ে গেল।

সম্মান অন্য দিনের মত পল্লিশ রিপোর্টারদের টেলিফোনে জানালঃ হাওড়া স্টেশনে পল্লিশের ওপর উরুগদের বোমা আক্রমণ, আত্মরক্ষায় পল্লিশের গুলি চালনা, ফলে দুটি উরুগ নিহত।

এ ব্যাপার ত রুটিন, কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন রিপোর্টার খোঁজ নিয়ে দেখে না সতাই লোকারণ্য হাওড়া স্টেশনে সাদা পোষাকের পল্লিশের ওপর কেউ বোমা ছুঁড়েছিল কিনা অথবা পল্লিশকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল কিনা।

বিশে আগস্ট এ ব্যাপার নিয়ে জল ঘোলা হল। হঠাৎ হাওড়া পল্লিশ ও প্রশাসন থেকে বলা হল যে, নিহতদের মধ্যে একজনকে সহজেই সনাক্ত করা গেছে—সে নাকি হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে কোন কালে পড়ত, এখন “নকশালী খুনে”।

অন্যজনকে ঘিরে তর্ক উঠেছে। যারা হত্যা করেছে তাদের কারুর মনে হয়েছে মৃত তরুণ পল্লিশী মতে “কুখ্যাত” নকশালী নেতা অসীম চ্যাটার্জী। এবং সেই ভেবেই তাকে হত্যা করা হয়েছে (অতএব আগেকার বোমা আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় পল্লিশী হত্যার কাহিনী মিথ্যা, বানানো আঘাতে)।

পল্লিশ স্বীকার করেছে যে, আগে থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সাদা পোষাকের সশস্ত্র পল্লিশ দল হাওড়া স্টেশনে নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছিল অসীম চ্যাটার্জীর জন্য।

যারা অসীম চ্যাটার্জীকে হত্যা করতে গেল তারা কিন্তু কেউ

অসীমকে, চেনে না, তারা জানে হত্যা তাদের করতে হবে সন্দেহের ভিত্তিতে। হত্যার পর বলে দিল যে, অসীমকে হত্যা করা হয়েছে। যদি সত্যি তা হত তাহলে পল্লিশ রাষ্ট্রপতির পদকে পেয়ে যেত এ রকম অব্যর্থ গুলির জন্য।

সনাক্ত করার ব্যাপার নিয়ে ঝামেলা হল। পল্লিশের কাছে অসীমের যে ছবি আছে—ছবি আদৌ আছে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে—তা অনেক আগেকার। আগেকার মতাকৃতির সঙ্গে অসীমের বর্তমান মতের নাকি কোন মিল ছিল না।

পল্লিশের খবর অনুযায়ী অসীম তার জন্মগত বিকৃত মতাকৃতিতে অনেকটা সংশোধন করে নিয়েছে পল্লিশের সার্জারীর সাহায্য নিয়ে। এই অস্ত্রোপচার নাকি উনিশশ উনসত্তর সালে করা হয় আর বিখ্যাত সার্জন মরারী মতাকৃতির কোন এক সহকারী নাকি এই অস্ত্রোপচার করেন।

মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য ডাকা হল। ইতিমধ্যে লাস ফুলে ফেঁপে ঢোল। কেউই সঠিক বলতে পারে না। কোন কোন পল্লিশ অফিসার বলল তারা অসীমের সহপাঠী ছিল। তারা বলল, “এই মৃতদেহ অসীমের নয় বলতে আমরা রাজী নই।” তবে সঠিকভাবে অসীমের একথাও জোরের সঙ্গে বলতে পারা যায় না।

অসীমের বাবা মাকে পল্লিশ তলব করল মৃতদেহ দেখে সনাক্ত করলে পল্লিশকে সাহায্য করতে। তাঁরা এ ব্যাপারে বীরভূম থেকে ছুটে গিয়ে ছেলের লাস দেখতে পাওয়ার কোন উৎসাহ বোধ করলেন না। বিশেষ করে, ঠুরের

তলব করা হয়েছিল হত্যার ছয়দিন পরে।

তখন ঠুরের কাছে মৃতদেহের ছবি পাঠানো হল। সঙ্গে সঙ্গেই ঠুরা জানিয়ে দিলেন যে, ছবিতে যে ব্যক্তির আকৃতি আছে তার সঙ্গে তাঁদের ছেলের কোন মিল নেই।

আশা করা যায় দুবছর আগে পল্লিশের সার্জারীর পরও অসীমের সঙ্গে তার বাবা মার দেখা হয়েছে। অতএব বাবা ও মায়ের কথা নিশ্চিত গ্রাহ্য বলে পল্লিশ ধরে নিল।

এই ব্যাপারে কিন্তু পল্লিশের গোলমাল হওয়ার কথা নয়। কারণ, পল্লিশের হাতে বহুলোক বন্দী হয়ে আছে যারা অসীমকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনে, এমনকি ঘনিষ্ঠও।

যেমন দার্জিলিং জেলার নকশালী নেতা সৌরীন বসু। তিনি এখন জেলে। তাঁকে জেল থেকে এনে মৃতদেহ দেখান যেতে পারত।

ধরে নেওয়া হল যে, মৃতদেহ অসীমের নয়। অর্থাৎ যে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সশস্ত্র গোয়েন্দা পল্লিশের দল হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিল তা মিথ্যা। আর তাছাড়া কেন এমন দলকে পাঠান হল যার মধ্যে কেউই অসীমকে চেনে না?

আর একটা প্রশ্নঃ সত্যি যদি অসীম চ্যাটার্জী উপস্থিত থাকত নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে তাহলেও কোন অধিকারে পল্লিশ তাকে গুলি করে হত্যা করবে?

এই ধরনের হত্যা চলছে চার দিকে—বহু তরুণ প্রাণ নষ্ট হচ্ছে। অপদার্থ পল্লিশ ও প্রশাসন নিজের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে নিচ্ছে আরও বেশরোয়া হত্যা চালাবার জন্য।

গোগো অফিস
০০.১৫

রাজধানীর চিত্র

রুশ-ভারত মহাসন্ধি কিসের পূর্ব ভূমিকা ?

রমাপ্রসাদ মল্লিক

কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসম্মতিভিত্তিক মহাসন্ধি অনুষ্ঠিত। বিশ্বের তিন বৃহৎ শক্তিগণের একটির মধ্যে অন্ততঃ বিশ বছরের জন্য পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা এবং শলাপরামর্শ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন করে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওপর টেকা দিয়েছে। স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই ভারত এবং পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীস্বরের পারস্পরিক রেষারেষি, এবং কয়েকটি স্বার্থের সংঘর্ষ জনিত যুদ্ধাধীন মনোভাবের খেসারৎ এই উপমহাদেশের শান্তিকামী জনগণ অনেক ভাবেই দিয়েছে। জম্মুনাগড়, কাশ্মীর, সিন্ধু নদের (এবং পরে গঙ্গার) জল ভাগাভাগি, কচ্ছের রণ এলাকা এবং অবশেষে বাংলা দেশ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্যা ও ফ্যাসিদের সূত্রপাত দুই শাসকশ্রেণীর নাছোড় মনোবৃত্তি, এবং ফলে দুপারের মানবের নাহক ভোগান্তি।

নয়ই আগস্ট তারিখে কয়েক লক্ষ জনতারকে, বাসে ট্রাকে এবং ট্রেনে (কোনো কোনো ট্রিপে বিনা টিকেটেই) দিল্লীতে হাজির করিয়ে শাসকদল দুনিয়ার সমক্ষে চমৎকারী প্রদর্শন দেবার চেষ্টা করল। বর্ষা বা তাদের সরকারের নীতি সমর্থন

করার মানসেই তারা হাজির হয়েছে। আসলে কিন্তু জন-সমাগমের পেছনে ছিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তর প্রদেশী সরকারের বহু গ্যাডাকল-বাস-চালাবার পারমিট দেওয়া, বিনা পারমিটে লোকভর্তি ট্রাকের কাঁক দিল্লীতে ঢোকাবার সন্নিবেশ করা, কলকারখানা অফিস ইত্যাদি থেকে শ্রমিক ও ভালপোশাক পরা কর্মচারীদের ফরাসী কায়দার ছুটি ইত্যাদি। সর্বোপরি, সোভিয়েত রাশিয়া থেকে হঠাৎ আগত ভি আই পি, মিস্টার গ্রোমিকোর দর্শনাভিলাষ। নয়াদিল্লীতে ইন্ডিকেট কংগ্রেসী নেতারাও ভীড়ের বহর দেখে বিস্ময়ে হতবাক। অবশ্য সরকারের ধরমধর নেতারা আপন পাতে ঝোল টানতে কসর করতেন, যদিও জনসাধারণ সাদিচ্ছাপ্রণোদিত ভাবেই দেশের প্রতি টান বিস্তৃততা এবং মমত্ববোধ দেখিয়েছে; না জানি পাকিস্তানের তরফ থেকে কোন বিপদ আসল। ভারত-রুশ চুক্তি অনুমোদনের সাফল্য জনতার দেশপ্রেম।

একথা মোটামুটি সকলেই জানে যে, ভারতের রুশকে প্রয়োজন রাষ্ট্র-নিরাপত্তার খাতিরে;

এবং রাশিয়ার ভারতকে প্রয়োজন দক্ষিণ-এশিয়া অঞ্চলে তার বিশ্ব-বিস্তৃত রাজনৈতিক এবং সামরিক স্বার্থে।

কিন্তু যেখা ভারতীয় জনতার অগোচরে রেখে দেবার সরকারী কৌশল জারি রয়েছে তা হল এই অঞ্চলে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক ভূমিকার পরিবর্তন। মধ্যপ্রাচ্য থেকে সদূর প্রাচ্য অবধি রাশিয়া এক অবিসম্বাদী শক্তি-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে আজ সক্রিয়। এই প্রতিষ্ঠার তিনটি কেন্দ্র বিন্দু—(এক) সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র প্যালেস্তিন ইস্রায়েল; (দুই) ভারত পাকিস্তান; এবং (তিন) বাংলা দেশ। বস্তুতঃ, ক্রুশ্চিভের যুগের পর এই প্রথম সোভিয়েত রাশিয়ার এক স্পষ্ট বলিষ্ঠ এবং বাকি দুই বৃহৎ-শক্তির ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরী জোট বাঁধার প্রয়াস দেখা গেল।

যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত রাশিয়ার এই পরিবর্তনশীল ভূমিকার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বহুদিন থেকেই উদ্ভব। মর্মে শান্তি প্রয়াসী, আণবিক শাস্ত্রপ্রয়োগ পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণগত (S.A.L.T.) চুক্তির খোঁজে প্রচারণা বজায় থাকলেও, যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গির কারণ সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত বর্ধমান নোশক্তি। সম্প্রতি এক ওয়াকিবহাল পাশ্চাত্য রণশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ তাঁর প্রবন্ধে তিন বৃহৎ শক্তির নোবাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে জানান যে, রাশিয়ার বর্তমান নোবাহিনীতে রয়েছে তেরাশিটি আণবিকশক্তিচালিত ডুবোজাহাজ। তিনশ আঠারটি সাধারণ ডুবোজাহাজ, ছাব্বিশটি ক্রুজার রণতরী, একশটি ডেস্ট্রয়ার, তিনশ পঁচিশটি টর্পেডো বোট, একশ পঁচিশটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকারী দ্রুতগামী বোট একশ তিরিশিটি ফ্রিগেট টাইপের ক্ষুদ্রাতন ও স্বল্পপাল্লার আক্রমণকারী রণতরী, দুশো সত্তরটি এসকট বা রক্ষাকারী জাহাজ, তিনশ কুড়িটি মাইন তোলা মনোয়ারি, এবং দুই স্কোয়াড্রন হেলিকপটারবহন সক্ষম রণতরী সহ দুশো পঞ্চাশটি উভচর পোত। এছাড়াও আছে এক হাজারেরও ওপর সহায়ক রণপোত। কেবল তাই নয়। রাশিয়ার নোবাহিনী গতিশীলতায় এবং সুদৃগু সমাবেশের শক্তিতে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল ভূমধ্যসাগরে নয় (যেখানে আমেরিকার ষষ্ঠ নোবাহিনী আজ তুলনায় অপারেশন) ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরেও আমেরিকার নোশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীয়মান। ব্রিটেনের পশ্চাদপসরণ (সুয়েজের পূর্ব পার থেকে) ভারত মহাসাগ-

রীয় অঞ্চলে আমেরিকার রণকৌশলগত পরিকল্পনায় এক প্রচণ্ড অসদ্বিধার সৃষ্টি করেছে। আমেরিকার রণতরীর সংখ্যা কি ক্রুজার, কি ডেস্ট্রয়ার সকল টাইপেই হ্রাসমান। একমাত্র আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনের (“পোলারিস” জাতের দুই পাল্লা সম্ভরণ ক্ষমতাবিশিষ্ট) এবং উড্ডোজাহাজবাহী ক্ষেপণাস্ত্র সম্বিষ্ট মনোয়ারি জাহাজের রুখিই আমেরিকার রণবিশারদদের লক্ষ্য-নবায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এগুলির পক্ষে ছোট পাল্লার কিন্তু অধিকতর ক্ষিপ্ত এবং ক্ষেপণাস্ত্রে সুসম্বিষ্ট যুদ্ধ জাহাজগুলির শক্তি তথা আক্রমণ ক্ষমতাকে পর্বদস্ত করা সম্ভব নয়।

সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এক নতুন ভারসাম্য, যার ফলে ঐ ক্ষেত্র থেকে সপ্তম নোবাহিনীর কিয়দংশ প্রত্যাহার করে মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষতঃ পারস্যোপসাগরে এবং পশ্চিম ভারত সাগরে বৃহত্তর পরিসরে শক্তিসমাবেশ করা চলবে। তার এটা আশ্রয় প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন চীনের সঙ্গে একটা সেয়ানে সেয়ানে বোঝাপড়া, শত্রুতাবসানের অধ্যায় বা detente সম্ভব না হলেও এই উদ্দেশ্য দুটি পূর্ণ করার লক্ষণ ইরাককে পুনর্বীর ফ্যানটম জেট উড্ডোজাহাজ এবং ট্যাঙ্ক দিয়ে সুসম্বিষ্ট করা। ইরানের আকাশ বাহিনীতে এফ-৮ উড্ডো জাহাজ আগে থেকেই আছে এবার একশ পঁচিশটি ফ্যানটম ফাইটার বম্বার যোগ হল আমেরিকী সাম্রাজ্যবাদের বদান্যতায়। উপরন্তু দেওয়া হচ্ছে ছৌ মারা উড্ডো জাহাজ (Hovercraft) হেলিকপটার এবং ট্যাঙ্ক। শেখোস্ত গ্রহণকারী সর্বোচ্চ সংস্কার আশীর্বাদ ধন্য ছিল—কেন্দ্রীয় ইনটেলিজেন্স এজেন্সীর এক উচ্চমহলের গবেষণাপ্রসূত বিশ্ব ক্ষমতা রাজনীতির সচল ভারসাম্যগত ধারণার প্রয়োগপন্থা। কিন্তু এই ধারণা কার্যকরী করার পথে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রথম এবং প্রধান বাধা এল যখন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ক্ষমতাবাহী গোষ্ঠীর এক বিশিষ্ট সদস্য জেনারেল হামিদ খাঁ বাংলা দেশে সামরিক নিপীড়নের ঠিক পূর্বেই পিকিংয়ে উড়ে গিয়ে, তাদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপে চীন সরকারের সমর্থন সম্পর্কে আশ্বাস আদায় করে নেয়।

তাহলে আমেরিকা পুরোনো গ্রন্থ-সাতচল্লিশ মাঝারি ট্যাঙ্ক, গুলিকে নতুন ইঞ্জিন এবং কামান দিয়ে পুনর্বীর সম্বিষ্ট করে ইরাককে দিতে যাচ্ছে কেন? সংখ্যাও খুব নগণ্য নয়, মোট আটশ পঞ্চাশটি। কারণ, (এক) উনিশশ পঁচাত্তর সালের মধ্যেই ব্রিটেন তার নোবাহিনীর পারস্যোপসাগরস্থ ঘাঁটি বাহরেনইন থেকে পাতাড়ি গুটোবে, যার উপক্রমণকা ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছে, ফলে ইরানের পার্শ্ববর্ত অঞ্চলে ঘটেছে শক্তিশূন্যতা ও ভারসাম্যের অভাব; (দুই) ইরানের বকলমে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য জুগিয়ে চলা ওয়াশিংটনের বহুকাল পরীক্ষিত একটি সুগোপন পদ্ধতি, যার কার্যকরী ফললাভ হল, দক্ষিণ ভিক্রেনামস্থ বশ্ববদ সরকারের অনুরূপ একটি ক্ষমতাবাহী গোষ্ঠীকে ইসলামাবাদে রাজসত্তারূপে রাখা এবং সোভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে ক্ষমতা রাজনীতির একটি শক্ত এ্যাক্সেল তৈরী রাখা।

সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃমণ্ডলী কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুর ওপর

তাদের বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা রাজনীতির মৌল কার্যকারিতা স্থির করেছেন—(এক) নিকট প্রাচ্য, প্যালেস্তিনে হারানো অঞ্চলের ওপর আরবদের দাবী সমর্থন করে এবং আমেরিকাস্থ ধনী ইহুদীদের তৈরী ইহুদী সাম্রাজ্যবাদের প্রসার প্রতিরোধে সংযুক্ত আরবরাষ্ট্র, সিরিয়া, ইরাক এবং যিমেন পর্যন্ত সোভিয়েত প্রভাবাধীন এক-ক্ষুদ্র রাজ্যের জোট বাঁধা, সে উদ্দেশ্যে মিশরে, সুয়েজ ক্যানেলের নিকটবর্তী অঞ্চলে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি সমেত আধুনিকতম জঙ্গী উড্ডো জাহাজের আড্ডা স্থাপন করা যাতে প্রয়োজন হলে সুয়েজ ক্যানেল এলাকা থেকে এডেন অবধি এক সদূর “বন্দু” রাষ্ট্রদের ক্ষেত্র পাকা করা যায়।

(দুই) দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ও ভারতকে সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করার তাসখন্দী নীতি পরিচালনা করে পাকিস্তানের সামরিকতন্ত্রী সরকারের প্রতিপক্ষ বৃজ্জারা গণতন্ত্রী ভারত-সরকারের প্রতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্যভিত্তিক সমর্থন এগিয়ে দেওয়া।

(তিন) বাংলা দেশে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের বিকাশ স্বরাস্ত্র করা, যার সরকার পরিচালিত হবে তথাকার উদীয়মান মধ্যবিস্তার উদারপন্থী, গণতন্ত্রী সমাজবাদী-ধারার প্রাণী অংশ দ্বারা এবং যা পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ধনপতি আমলাবর্গের বিরুদ্ধে এক পাট্টা শক্তির বৌক সৃষ্টি করবে।

শেখোস্ত পরিকল্পনা, যুক্তরাষ্ট্রের পেন্টাগনের মত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সর্বোচ্চ সংস্কার আশীর্বাদ ধন্য ছিল—কেন্দ্রীয় ইনটেলিজেন্স এজেন্সীর এক উচ্চমহলের গবেষণাপ্রসূত বিশ্ব ক্ষমতা রাজনীতির সচল ভারসাম্যগত ধারণার প্রয়োগপন্থা। কিন্তু এই ধারণা কার্যকরী করার পথে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রথম এবং প্রধান বাধা এল যখন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ক্ষমতাবাহী গোষ্ঠীর এক বিশিষ্ট সদস্য জেনারেল হামিদ খাঁ বাংলা দেশে সামরিক নিপীড়নের ঠিক পূর্বেই পিকিংয়ে উড়ে গিয়ে, তাদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপে চীন সরকারের সমর্থন সম্পর্কে আশ্বাস আদায় করে নেয়।

পরবর্তীকালে চীনের দ্বারা পাকিস্তান সরকারকে দেওয়া কূটনৈতিক সমর্থনের পাট্টা তুরূপ হিসাবে আমেরিকা তার বর্তমান পাকিস্তান নীতি শূন্য করতে বাধ্য হয়। নিকসন প্রশাসনের সমস্ত হিসেব নিকেশ জলাঞ্জলি দিতে হল। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী যে শেষ অবধি পূর্ব পাকিস্তানের উদীয়মান মধ্যবিস্তারগণের সঙ্গে কোনোরকম রফাব্যবস্থায় রাজী হবে না, উপরন্তু ওপনিবেশিক ভঙ্গীতে অর্থনৈতিক ও “উচ্চ জাতের” শাসন চালিয়ে যাবার মত অনমনীয় জেদ বজায় রাখবে, তা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি—

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল বন্ধ কেন?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিখ্যাত হোটেল গ্রেট ইষ্টার্ন এখন কার্যত বন্ধ। সাতষাট সন থেকেই হোটেলে গণ্ডগোলের শুরুর। এরপর কম্মীদের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষও ঘটে। অভিযোগ, মারামারি ও কয়েকটি ঘটনার সংগে জড়িত কয়েকজন কম্মীকে মালিকপক্ষ ছাটাই করেন। হোটেলে বিহরগতদের বিরুদ্ধে উৎপাদন ও কম্মীদের মধ্যে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলো ঘটনার জন্যে একান্তর সাল পর্যন্ত কয়েক দফায় সাতচল্লিশ জন কম্মীকে হোটেল ছাড়তে হয়। অবশ্য এর মধ্যে কয়েকজন স্ব-ইচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং রিটারায়র করেন। এছাড়া আরও কয়েকজন মালিক গোষ্ঠীর সংগে টাকাকড়ি মিটিয়ে হোটেলের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তারপর ছাটাই কম্মীদের ব্যাপারটি শিল্পদপ্তরে যায় এবং এসব কম্মীদের পক্ষে বিজয় সিং নাহার তৎপর হয়ে ওঠেন। যে কারণেই হোক না কেন, ডেপুটি লেবার কমিশনার এসব কম্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্যে সুপারিশ করেন।

এর পরে আঠারোই জুলাই সকাল দশটায়, ছাটাই ও অন্যান্য প্রায় চল্লিশ জন কম্মী হোটেলের বিভিন্ন কামরায় হামলা করে ও

অন্যান্য কম্মীদের ইউনিফর্ম কেড়ে এক তাণ্ডব চালায়। সেদিন থেকে এসব কম্মীরা এখন হোটেলের ভিতরেই রয়েছে। কোন কম্মীকে কাজ করতে দিচ্ছে না। সময় বিশেষে অন্যান্য কম্মীদের উপর হামলা করতেও ছাড়ছে না। স্থানীয় থানা হেয়ার গুটীট এবং লালবাজারে নির্দিষ্ট অভিযোগ করা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে সবাই চূপচাপ।

হোটেলের এক বৃহদংশ কম্মীর আরও অভিযোগ, রাজ্যের বন্ধ কারখানাগুলোর অসংখ্য ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ সম্পর্কে যখন শিল্প দপ্তর অসহনীয় নীরবতা পালন করেন তখন এসব কম্মীদের নিয়োগের ব্যাপারে তাদের অতিরিক্ত সক্রিয়তা সম্পর্কে তাঁদের কিছর বলার নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিভিন্ন কেসে অভিযুক্ত, এবং টাকাকড়ি মিটিয়ে চলে যাওয়ার পরেও যদি কোন কম্মী শিল্প দপ্তর থেকে পুনর্নিয়োগের সুপারিশ পেতে পারেন তবে জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন না পেয়ে হোটেলের বিপুল সংখ্যক কম্মী যে আজ অনাহারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে সে ব্যাপারেই বা কার্যকর ব্যবস্থা নিতে শিল্প দপ্তর এত উদাসীন কেন?

অর্থনৈতিক দর্পণ

ডলার সংকট কিসের ইঙ্গিত ?

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

কয়েক সপ্তাহ আগে দর্পণের অর্থনৈতিক স্তম্ভে যখন আসন্ন ডলার সংকটের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন অনেকেই সম্ভবতঃ কল্পনা করতে পারেন নি যে এত শীঘ্রই সত্যে পরিণত হবে। আন্তর্জাতিক লেনদেনে সর্বজনস্বীকৃত প্রধান মুদ্রা মার্কিন ডলারের এই বিপর্যয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করবে, একথাও দর্পণের পাতায় ঘোষণা করা হয়েছিল।

গত পনেরোই আগস্ট ভারতে আমরা যখন নিয়মান অনিশ্চয়তার মধ্যেও চব্বিশ বছর আগেকার প্রায় বিস্মৃত স্বাধীনতা দিবস মামুলীভাবে উদ্‌যাপন করছিলাম, তখন মার্কিন সরকারের প্রধান রাষ্ট্রপতি নিকসন, সারা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে একটা অভাবিত অস্ত্র প্রয়োগের ঘোষণা প্রস্তুত করে তৈরী করেন।

বলা বাহুল্য, প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই ঘোষণা তিনটা ভাগে বিভক্ত। প্রেসিডেন্ট বলেন যে তাঁর সরকার মার্কিন ডলার মুদ্রা ভাঙিয়ে সোনা দেবার গ্যারান্টি বর্জন করেছেন এবং আমেরিকার মূল্যবস্ত্র ও বাণিজ্য সংগতি রক্ষার জন্যে শতকরা দশ ভাগ আমদানী শুল্ক বসিয়েছেন এবং আমদানী দ্রব্যের নির্দিষ্ট কোটার বেশী কোন পণ্য আমদানী না করার সিদ্ধান্তে অবতরণ করেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে মার্কিন ডলারের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা এর ফলে আর কমবে না, যদিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ডলারের দাম কিছুটা পড়ে যেতে পারে।

প্রেসিডেন্ট নিকসন বিশ্বের বাজারে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণ হিসাবে বলেছেন, মার্কিন মুদ্রা ডলার বারে বারে ফাটকা-বাজদের হাতে মরা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ফাটকাবাজদের ডলারের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে আনার জন্যে তিনি এই ঘড়ঘড়কে প্রতিহত করতেই হবে। কী এই ফাটকা-বাজ? তারা আমেরিকান নয়, শত্রুই বিদেশী? প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেন নি বিরাট আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক বীমা ও জাহাজ কোম্পানী, তৈল কোম্পানীগুলি এবং আই সি আই জেনারেল মোটরস, জেনারেল ইলেকট্রিকের মত প্রায় দুশো অতিকায় আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজি মালিকরাই এই ফটকা-বাজ। কারণ বিশাল পুঁজি নিয়ে এই সব কোম্পানী বিভিন্ন দেশে শাখা স্থাপন করে, এই সব দেশীয় মুদ্রার তহবিল রাখে। তারা আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থার দর ওঠানামার সুযোগ নিয়ে বিনা পরিশ্রমে, বিনা লক্ষ্যীতে ছম্পর ফুড়ে মূল্য

কমিয়ে নেন, কারণ যে কোন পুঁজি বাদী লক্ষী ও উৎপাদনের সর্বপ্রধান নীতি হল সর্বাধিক মূল্য অর্জন, এতে দেশ নেই, জাতি নেই, নীতিবোধ, বাধ্যবাধকতা নেই। এটা পুঁজি বৃদ্ধির নিয়ম। এই সত্য কথটা প্রেসিডেন্ট নিকসন আমেরিকার জনসাধারণকে বলতে চান নি, তাই তিনি সত্য গোপন করেছেন।

প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেছেন যে কুড়ি লক্ষ মার্কিন বেকরের কর্মসংস্থান করতে হলে দেশে কলকারখানা বাড়তে হবে (যেমন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী - সিংধার - রায়েরা বলেন) তাই মোটর গাড়ী উৎপাদনে শুল্ক গাড়ী প্রতি দশ ডলার কমানো হল, অরকর রেহাই এক বছরের মেয়াদ বাড়ানো হল, এবং নতুন শিল্পের ছাড় ও রিবেট দশ শতাংশ উনিশশ পঁচাত্তর (সাল পর্বন্ত থাকবে এবং তার পরেও সাত শতাংশ হারে কর রেহাই দেওয়া হবে। যদিও এসব আভ্যন্তরীণ মার্কিন অর্থনীতির ব্যবস্থাগুলি অলোচনার অপেক্ষা রাখে, তবু সেটা পরে বিস্তৃতভাবে করার অঙ্গীকার করে, শ্রদ্ধা এটুকু বলা যায় যে এই বিশাল কর্মসংস্থানের আশ্বাসও একটা বিরাট ধাম্পা ও ধোঁকাবাজি বলে শীঘ্রই প্রমাণিত হবে।

প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেছেন, এই অতিক্রান্ত ঘোষণার তিনটা উদ্দেশ্য : (এক) বেকর সংখ্যা হ্রাস ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, যুদ্ধ ছাড়াই, শান্তির সময়ে এই বিশাল অকারে বেকরী বিলোপের মহৎ লক্ষ্য সাধনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট অঙ্গীকার বন্ধ, (দুই) মূল্যবৃদ্ধি কমিয়ে আনা, ডলারের ক্রয়ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ বাজারেও কম গিয়ে দূর কোটী পেন্সনভোগী এবং অটকোটি বেতনভোগী মানব স্বেভাবে পারিবারিক খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে, তার খানিকটা লাঘব করা, (তিন) আন্তর্জাতিক লেনদেনে ডলারের মূল্য কমে যাওয়ার ফলে মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে আনা।

প্রেসিডেন্ট নিকসন ডলার সংকট নিরসন করার জন্যে যে আদেশ জারী করলেন, তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর একটা অভাবিত অঘাত আসবে। এবং এই অঘাত প্রধানতঃ জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, ব্রিটেন ও সুইডেনের ওপর সবচেয়ে বেশী প্রবল হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে এই সব দেশের পণ্যের তুলনায় মার্কিন পণ্যের দাম বেশী। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন পণ্য কিছুটাই প্রতিযোগিতায় দাঁড়তে পারছিল না। উনিশশ

একশতর সালের জন্মমাস পর্বন্ত ছয় মাসে মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি তিনশো বিরানব্দুই মিলিয়ন ডলার। ডলারের মূল্য হ্রাস করে নিকসন এই ঘাটতি অবস্থার প্রতিক্রমের চেষ্টা করতে পারতেন, মার্কিন কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে ভারত ব্রিটেন, ব্রাজিল, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের ক্ষেত্রে মূল্যমূল্য হ্রাসের দাওয়াই ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তাতে সুরাহা হয় নি। প্রেসিডেন্ট নিকসন জানেন যে মূল্যমূল্য হ্রাসের ফলে এই সব দেশের রপ্তানী বাণিজ্য আর্থিক মূল্যের হিসাবে কিছুটা বাড়লেও মোট পণ্য বেশী পরিমাণে একই দামে বিক্রী করে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ স্থির রাখতে হয়েছে। তার ফলে দেশের অভ্যন্তরে অভাব সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে এর ফলে আমদানী পণ্যের দাম বেড়ে গিয়েছে দেশের উৎপাদন খরচ বেড়েছে, মূল্যস্ফীতি ঘটেছে। অর্থাৎ মূল্যমূল্য হ্রাস করে স্থায়ীভাবে বাণিজ্য সংকটের সমাধান যে হয় না, সেটা অন্যের বোঝায় না বরং চাইলেও, নিজের দেশের বোঝায় প্রেসিডেন্ট নিকসন বরংতে পারেন।

তাই তিনি প্রধানতঃ দুটা চাপ সৃষ্টি করেছেন যাতে তাঁর বাণিজ্য প্রসারের প্রতিশ্রুতি, জাপান, পশ্চিম জার্মানী প্রমুখ দেশগুলি আমেরিকার বাণিজ্য প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করতে পারে। প্রথম চাপ : ডলার ভাঙিয়ে সোনা দেবার প্রতিশ্রুতি তিনি স্বাগত রেখেছেন, দ্বিতীয় চাপ : মার্কিন দেশে আমদানী পণ্যের ওপর শতকরা দশভাগ শুল্ক বসিয়ে তিনি এই সব দেশের পণ্য আমদানীতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছেন। ফলে এই সব দেশের রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পাবে।

প্রথম চাপের ফলে পৃথিবীর যেসব দেশ পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বাণিজ্যের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তারা সবাই কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ তাদের হাতে জমা ডলার ভাঙিয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সোনা পাওয়ার উপায় থাকবে না। অন্য দেশের মুদ্রার ডলার বিনিময় অবশ্য করা যাবে, কিন্তু কে আর বেশী করে ডলার জমাতে চাইবে? যে ডলার ভাঙানো যাবে না, তা কোন দেশ বেশী করে মজুত করতে বাবে? বরং হাতের মজুত ডলার কমিয়ে ফেলার ঝোঁকই বেশী দেখা দেবে।

সুতরাং হাতের জমা ডলার খরচ করতে হবে আমেরিকার পণ্য কিনে ডলার মজুত কমিয়ে ফেলা ছাড়া; বিভিন্ন দেশের আর কোন পথ থাকবে না। এতে আমেরিকার রপ্তানী বাণিজ্য বাড়বে, কিন্তু অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের রপ্তানী

বাণিজ্য কমে যাবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলিকে মার্কিন পুঁজিবাদের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিয়ে, ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। ব্রিটেন আমেরিকার বাজারে ছোট মোটর গাড়ী রপ্তানী করে প্রায় ষট লক্ষ বছরে এখন মার্কিন গাড়ীর দাম প্রতিটী দশো ডলার কমিয়ে দেওয়া হল বলে ব্রিটেন প্রতিযোগিতায় পিছ হঠতে বাধ্য।

পশ্চিম জার্মানীও মোটরগাড়ী থেকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আমেরিকার বাজারে বেশীদিন রপ্তানী করতে পারবে না। জাপানের সুতী বস্ত্র, জুতা, কামেরা, টেলিভিশন সেট বিক্রী করা এখন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। জাপানী বস্ত্রকল মালিক সমিতির চেয়ারম্যান বলেছেন যে মার্কিন দেশে বস্ত্রাদি রপ্তানী করে শতকরা দশটাকাও মূল্য হ্রাস হত না, এখন আমদানী শুল্ক দশ শতাংশ দিলে ওদেশে জাপানী বস্ত্র রপ্তানী সম্ভবই হবে না।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ রপ্তানী দ্রব্যই আমেরিকার বাজারে পূর্ব নির্ধারিত "কোটা" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোটার বাইরে আছে কিছু পাটজাত দ্রব্য, হাতে বোনা কাপড় ও পরিধেয়, ইনজিনিয়ারিং শিল্পজাত-পণ্য কফি ও কাজুবাদাম নারকেলের শাঁস প্রভৃতি পণ্যের ওপর এই শুল্ক আমাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। তা ছাড়া, আমাদের পরিকল্পনাবাদ ব্যয় অনেকটা বেড়ে যাবে কারণ আমরা যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, যাতা ও শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল ডলার এলাকা থেকে আমদানী করি।

আমাদের অর্থমন্ত্রী চাবন সাহেব বলেছেন যে ইউরোপের ও জাপানের শিক্ষালী মূল্যগুলির সঙ্গে মার্কিন ডলারের সংঘাতে আমাদের দেশের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কথটা ঠিক নয়। ডলারের সঙ্গে ইউরোপীয় মূল্যব্যবস্থার যে সংঘর্ষ শুরু হল, তা আসলে পূর্বতন বাণিজ্য ও মূল্য যুদ্ধেরই পরিণাম। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কঠোর মধ্যে থেকে আমাদের দেশ এই সংঘর্ষ থেকে কী করে দূরে থাকতে পারবে। এখনই তো আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে কমবেশী ত্রিশকোটি ডলার জমা আছে, আমাদের মোট রিজার্ভের এ হল এক তৃতীয়াংশ। এ ডলার বদলে আমরা সোনা পাব না, বেশী দামে আমাদের মার্কিন পণ্য কিনতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে বার্ষিক সাত শতাংশ রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি এখন আকাশকুসুম হয়ে দাঁড়াল।

এটা চিরকল ধরে চলে এসেছে যে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীরা যখনই কোন সংকটে পড়ে, তখনই তারা সংকটের গুরুভার অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাক্তন উপনিবেশগুলির ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে এইসব দুর্বল প্রাক্তন উপনিবেশগুলি অপেক্ষাকৃত কম সংগতি নিয়ে সংকটে পড়ে হব্দুহব্দু খেতে থাকে। আমাদের মত প্রাক্তন উপনিবেশ

আগে সরাসরি এখন স্বাধীন হবার পর, সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট এই দুরূহ বোঝা কান্দা করে দেশের সাধারণ মানবের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। প্রথম আঘাত পড়ে স্বল্প বেতনভোগী প্রমিক কর্মচারীর ওপর, তার পরে আসে ছোট ব্যবসা শিল্পের ওপর আকারি বৃহৎ শিল্পও এর থেকে রেহাই পায় না। কৃষিজাত পণ্যের দাম, শিল্পের কাঁচামালের দামে কৃষক একটু বেশী মার খায়। এই দেশগুলি অর্থনৈতিক সংকট থেকে রাজনৈতিক সংকটের আবর্তে নিষ্কণ্ট হয়।

আমাদের দেশের বর্তমান শাসকশ্রেণীও পুঁজিবাদী নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং চাবনসাহেব স্তোক বাক্যে ভোলাতে চাইলেও, দেশের মানবকে বরং নিতে হবে যে পর্বন্ত আমাদের শাসকশ্রেণী ক্ষমতাসীন থাকবে, ততদিন পর্বন্ত সমাজতন্ত্রের গালাভরা বুকনি ছাড়া এদেশের মানবের কপালে আর কিছু জুটেতে পারে না। বেকারী হ্রাস, লক্ষ লক্ষ কাজ সৃষ্টি, মানবের দুঃখ দর্দশা লাঘব এগুলো পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী করতে পারে না, কারণ তাহলে পুঁজিবাদকেই তুলে দিতে হয়। আমাদের দেশের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদেরও অংশ। আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সংঘর্ষ থাকবে কারণ শোষণের এলাকা নিয়ে, পদ্ধতি সম্পর্কে তারা সবাই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে।

ডলার সংকটের ফলে অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদীদের মধ্যেও সংঘর্ষ বাড়বে। প্রথমদিকে তারা বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অনুন্নত দেশগুলির জনসাধারণের ঘাড়ে এই সংকটের বোঝা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। যদি জনসাধারণের প্রতিরোধের ফলে তাতে অক্ষম হয়, তাহলে তারা নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু করবে। এই বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের প্রথম দিকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসন প্রথম গোলা নিক্ষেপ করলেন। আমাদের এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ চাঁদর হাফ

বার্ষিক পনেরো টাকা

ঋণাত্মক সাড়ে সাত টাকা

প্রমাসিক চার টাকা

টিকাকার ও চিঠিপত্র পাঠানোর

প্রিয়তা :

৩১, বট লেন, কলি-১৩

সিদ্ধার্থবাবু ভুল পথ নিয়েছেন

আপনাদের পত্রিকা মারফৎ, বরানগর, কাশীপুরের ঘটনা সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করতে চাই। কেননা এত বড় একটা কান্ড ঘটে গেলে, আর আমাদের দৈনিক নিরপেক্ষ (?) সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা দেখেন; ঘটনার পরের দিন যুগান্তর লিখল : সত্যেরোটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। অন্যান্যকে আনন্দবাজার নাক-কান বুজে লিখে ফেলল যেটাটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। অথচ নিহতের সংখ্যা এর তিনগুন। প্রতিটি সংবাদের ছেদে ছেদে শাসক শ্রেণীর অপকান্ড ঢাকবার চেষ্টা। কিন্তু সত্যেরোটা মার্চের সাইবাড়ীর ঘটনা এবং তার পরের দিনগুলিতে এই সংবাদপত্রগুলির কি ভূমিকা ছিল, সেটা একবার চিন্তা করুন। সাইবাড়ীর দেওয়ালে রক্তের ছাপের ছবি, সাই প্রাত্যহিক বদ্যাস্ত্রের ছবি ইত্যাদি আরো কত ছবি; কতসোমহর্ষক কাহিনী, এমনকি মলয় সাই-এর মা-কে মাঠে ময়দানে ঘুরিয়ে তার বিভিন্ন রকমের ছবি তোলায় প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছিল।

আর আজ যখন বরানগরে নকশালপন্থীকে খুঁজতে গিয়ে, তাকে না পেয়ে তার বৃদ্ধ ববাকে আগুন পুড়িয়ে মারা হল, নকশালপন্থী

ভাইকে না পেয়ে তার আট বছরের বোনের হাত দুটো কেটে ফেলা হল। তখন এই সংবাদপত্রগুলির একটিতেও সত্যের সত্য ঘটনার উল্লেখ তো নেই, উপরন্তু নিহতের সংখ্যা যত কমকরে দেখানো যায়, তার চেষ্টা। পশ্চিমে মার্চের পর থেকে এরাই কিছু পূর্ব-বাংলার জন্য কেঁদে চলেছে, কেঁদে চলেছে ইয়াহিয়ার অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গ লাল হয়ে গেল বলে। আর এপারের শাসকশ্রেণী যখন একই উদ্দেশ্যে ভিন্ন

মতামত

কৌশলে পশ্চিমবাংলার মানুষের রক্তে গম্মার জল রাস্তা করে তুলেছে, তখন এরা নীরব।

এই বাংলার মহামান্য সুবেদার সিদ্ধার্থবাবু নাকি এজন্য গভীর চিন্তা করছেন। প্রসঙ্গত তিনি একথাও বলেছেন; এই ঘটনায় বরানগরের সাধারণ মানুষ সমাজবিরোধী মর্মে হয়ে স্বস্তি পেলে। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুর কাছে আমাদের প্রশ্ন (এক) ঐ একশো জন কংগ্রেসী হত্যাকারী যদি কাশীপুর বরানগরের জন-

সাধারণ হয়, তবে সত্যেরোটা মার্চের বর্ধমানের বিশাল মিছিলটিকে আপনি কি বলবেন? (দুই) যে শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যাকরা হয়েছে, তাদের মধ্যে না হয় পঞ্চাশ জনই নকশালপন্থী; কিন্তু অনেককে না পেয়ে তাদের আত্মীয় স্বজনকে হত্যাকরা যদি স্থানীয় জনসাধারণ ও প্রশাসনের খুশীর কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয় তবে সত্যেরোটা মার্চ সি পি এম-এর বিশাল মিছিল কতৃক আক্রান্ত সাই-প্রাত্যহিক (যাদের আদালত কতৃক গ্রামে ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল) মৃত্যুতে

কি স্থানীয় জনসাধারণ প্রকৃতই খুশী ছিল না? মধ্যবর্তী নির্বাচনে কি তার প্রমাণ পান নি? কিন্তু এই হত্যার অভিযোগই আপনারা এখনও বিনয় কোত্তারকে জেলে আটকে রেখেছেন। সেদিনের ঘটনার আপনাদের জনসভা, মিছিল সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। আর আজ? বরানগরের ঘটনা, যাতে বিক্ষোভ আন্দোলন না হয়, সেজন্য ঐ অঞ্চলে জারি করেছেন একশো চম্পাশ ধরা, কার্ফু প্রভৃতি বাধানিষেধ।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, সিদ্ধার্থবাবু যে পথ বেছে নিয়েছেন, তা তাদেরই ধর্মসের পথ, ওটা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পথ নয়, ও পথে সংগ্রামী মানুষকে ধ্বংস করা যায় না। যেমন যারিন ভিক্রেতনামে, যেমন যাচ্ছেনা পূর্ব-বাংলায়।

তপন রায়চৌধুরী

হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

গত সোমবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় দিলীপ সেনের 'জেলের হলে' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া জাবিলাম জেলখানায় গুলি এখন চাঁড়িয়াখানায় পরিণত হইয়াছে। ইংসাজক কার্যকলাপে লিপ্ত সরকার হাজার হাজার শিক্ষিত যুবককে দিনের পর দিন আটক করিয়া রাখিয়াছে এবং মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে ইহাদের কুকুর বিড়ালের মত পিটাইয়া হত্যা করিতেছে। বর্তমানে জেল পালানো নিয়ে জেল কতৃপক্ষ বেশ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার জন্য এক উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। এই তদন্ত কমিটিতে নানান মূনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন, তার মধ্যে একটি হইল "জেলের পাঁচিলের উপর কাটা তারের বেড়া দিয়া বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ করা হোক, যাতে সময়ে সুইচ টিপলেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এবং জেল পালানো সম্ভব না হয়।" এই কথা যিনি বলিয়াছেন তিনি মনে হয় মানুষকে মানুষ খলিয়া মনে করেন না। অবিলম্বে এই সব অফিসারদের বরখাস্ত করা উচিত। জেলের ভিতরে অবস্থা হইতে মনে হয় কতৃপক্ষ যেন তাহাদের জন্তু জানোয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। দুবেলা সময় মত আহাঁরের ব্যবস্থা নাই, জেলের অবস্থাও সেই রূপ। অনেকেই দিনের পর দিন অন্মাত অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন। তার ফলে তাহারা নানা ধরনের চর্ম-রোগে ভুগিতেছেন। ইহা ছাড়া রাগিতে অনেককে বসিয়া ঘুমাইতে হয়, শইবার জারগাটকুর অভাব। জেল কতৃপক্ষ এই সম্বন্ধে এক বর্ণও দৃষ্টিপাত করেন না। বর্তমানে মাসে একবার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পরও দেখা পাওয়া দায়। এই অলসতার কখনও জেল পালানো বন্ধ হইবে না। যারা মানুষকে মানুষ

বলে জান করে না সেই অবস্থায় জেল কতৃপক্ষের হাতে তিল তিল করে মরার চেয়ে একদম মরা শ্রেয়। গত কয়েক দিনে কারারক্ষীদের হাতে বাইশ জন নিহত হইয়াছেন। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিতেছে দমদম সেনটোল জেলে, পাঁচিল টপকাবার সময় কারারক্ষীরা লারিট দিয়ে ষোল জনকে পিটাইয়া হত্যা করিয়াছে। আবার গত বৃহস্পতিবার আসানসোল জেলে নয় জনকে পিটাইয়া হত্যা করা হইয়াছে। কিন্তু এই হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কেহই নেই। বর্তমানে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই (সি পি এম, কংগ্রেস) সুবিধাবাদী। তাহার এই হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবেই বা কেন, এ যে মজির সংগ্রাম।

তাই জনগণের কাছে আবেদন, এই হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, আপনাদেরই জেলেদের তো হত্যা করছে। ওপার বাংলার যে মজির সংগ্রাম চলছে, এপার বাংলারও সেই মজির সংগ্রাম অসম।

বর্তমানে একটি রাজনৈতিক দল সি পি এম বলিতেছে যে, রাইফেল ছাড়াও সংগ্রাম করা যায়, কিন্তু আমরা প্রশ্ন আমরা প্রশ্ন চাঁচিশ বছর খালি হতে সংগ্রাম করিয়া কি পাইলাম? এর জন্যই আমরা বলিতেছি যে "রাইফেলই শক্তির উৎস"। বর্তমানে আর একটি দল (কংগ্রেস) বলিতেছে, "চৈরাম্যান মাও সে তুং-এর নাম ভুলে গিয়ে গান্ধীর নাম বল" তাহারা জেনে রাখুক আমরা কখনও আমাদের ভারতবর্ষকে চীনের হাতে বিলিয়ে দিতে চাই না কিংবা মাও সে তুংকে আমাদের দেশের সিংহাসনে বসাইতে চাই না। আমরা কেবল বলিতেছি মাও সে তুং-এর নীতিতে আমরা বিশ্বাসী এবং তার নীতি অনুসরণ করে আমরা দেশের শ্রমসংগ্রাম পরিচালনা করা হোক।

পি এন (সি পি আই এম এল)

শান্তি বৈঠকের নামে প্রহসন

সম্প্রতি সরকার এবং বিরোধী পক্ষে মিলেমিশে শান্তি স্থাপনের যে বৈঠক চলেছে, তার ইতিবাচক ফলাফল আশা করেছেন খুব কম লোকই। বর্তমান বিশৃঙ্খলা কাদের নিয়ে? নিশ্চয়ই তাঁদের নিয়ে নয়, বাঁদের সঙ্গে আলোচনা টেরিগে বসা গিয়েছে। তাহলে বাঁকি থাকেন নকশালপন্থীরা। ভাঙ্গনের চাবিকাঠি আছে এদের হাতে আর তালা খেলবার আয়োজন চলছে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। তাহলে কি ধরা যেতে পারে, ওখানে তালা ভাঙবারই আয়োজন চলছে। স্বভাবতই প্রতিদিন ডাছা মিথ্যা কথা বলে পুলিশ যেভাবে এদেশের বর্বরজাতিকে গুলি করে মারছে, তাতে তো সেই আয়োজনেরই আশঙ্কা হচ্ছে। এ যদি পরিকল্পনা হয়, তাহলে বলতেই হবে, এ পরিকল্পনা খুবই দর্বল।

সিদ্ধার্থ রায়ের এই কলকাতা-বৈঠকের দর্বলতা দিল্লীর দুইটি এড়াতে পারেনি বলেই পার্লামেন্টে মন্ত্রী সাহেবকে নকশালপন্থীদের সঙ্গে "ডায়ালগ" চালানোর কথা ঘোষণা করতে হয়েছে। এই ডায়ালগ নিয়ে কলকাতার কাগজগুলোর ধর্ম নেই। আসলে এই কুৎসা রসানোর জন্যেই এই ডায়ালগের ব্যাপারটা রটানো হচ্ছে। যেখানে এক-একজন নেতার মাথার ওপর পাঁচ দশ হাজার টাকা ঘোষণা করা আছে সেখানে আলোচনার কথাই বাতুলতা মাত্র।

কংগ্রেসের নেতারা নাইর অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারা অনুধাবন

করতে অপরাগ, তা বলে, কি সি পি এম নেতারও সেই মৃত্যুর অংশীদার হবেন। তাঁরা কি জানেন না যে, যেহেতু ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে ঘোরানো সেই হেতুই বর্তমান অবস্থার পূর্বতন অবস্থা থেকে উন্নততর বলেই স্বীকার করতে হবে। নকশালপন্থীদের এত যে দরজোগ তার একমাত্র কারণ তাঁরা গণসংযোগে একেবারেই নামতে চাইছেন না, সে জন্যে অকাতরে মরতে হচ্ছে তাঁদের। সি পি এম নেতারা যে শূন্য সশস্ত্র আন্দোলন থেকে সরে গেছেন তাই নয়, নির্বাচন আর অর্থনৈতিক আন্দোলনের নেতায় অনেক অমার্কসীয় কথাও তাঁরা বলে ফেলছেন। তাঁদের বিচারে নকশালদের যদি উগ্রপন্থী বলেও মনে নেওয়া যায়, তাহলেও তাঁদের মনে রাখা দরকার, উগ্রপন্থীরা বিপ্লবের ক্ষতি করে বটে, কিন্তু তারা কোনো সময়েই দালাল নয়।

মনে রাখতে হবে "যে প্রতি-ক্রিয়ালীদের প্রতিভুরা সেইসব মাত্রার উপর পুরুষকার ঘোষণা করে যাদের থেকে বিপদ কমবার কোনো সম্ভাবনাই আর নেই; অন্যান্যকে, অন্যান্যদের তো টেবিলে বসিয়ে কফি খাইয়ে দিলেই চলে। সিদ্ধার্থবাবুর হিসাববোধ খুব নিপুণ, তিনি ঠিকই জানেন, এক কাপ কফির দাম নিশ্চয়ই দশ হাজার টাকা নয়।

মায়ী রায়

জেলে হত্যাকাণ্ড এসছে

আবার আসানসোল জেলের ভিতর নকশালপন্থী নয়জন বন্দী হত্যা করা হোল লাঠিপেটা করে। অভিযোগ সেই একই, জেল থেকে পালানোর চেষ্টা। যে কোন বন্দীই পালানোর সুযোগ পেলে পালাবে এতে আর আশ্চর্য কি আছে। কিন্তু এই পালানোর সুযোগ আসে কোথা থেকে?

কারারক্ষীরা সজাগ থাকলে কৈনরকম সুযোগই আসতে পারে না। কিন্তু তবুও সুযোগ আসছে, হয়তো আরও আসবে এবং আরও নকশালপন্থী বন্দী মরবেন। কেননা এটুকু অন্ততঃ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে জেলপালানো এবং হত্যার মধ্যে খুব সংগতি আছে এবং যেসব ক্যাডার মারা যাচ্ছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় এবং পার্টির মধ্যেও সুপ্রসিদ্ধিত ও প্রিয়। কাজেই এখরপের ক্যাডার মারা গেলে স্বভাবতই ঐ সব এলাকায় হতাশা আসবে এবং নকশালপন্থী রাজনীতি ধ্বংস

হবে। কাজেই মনে হয় পুলিশের পক্ষ থেকেই ইচ্ছে করে পালানোর সুযোগ করে দিয়ে পালানোর সুযোগে সেই অজ্ঞহাতে বন্দীদের হত্যা করতে সুবিধা হচ্ছে। এই ঘটনা চক্রান্তের শিকার হয়ে অনেকেই মরছেন হয়তো আরও অনেক নেতাই মৃত্যুবরণ করবেন। আটক আইনে ওদের বন্দী করেও শাসককুলের শান্তি নেই, তাই বিচার বাদ দিয়ে সরাসরি হত্যার পথকেই বেছে নিয়েছে গণতন্ত্রের মৃত্যুশয্যারী শাসককুল।

এই শাসককুল গণতন্ত্রের খুব ভক্ত। তাই গণতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে তারা এরকম কয়েক হাজার কয়েক লাখকে মারতে কসর করবে না। শাসককুলের দ্বারা পরিবদ পুলিশের পক্ষ-পুটে থেকে বিভিন্ন জাঙ্গার ভিন্ন-মতাবলম্বী বিভিন্ন বামপন্থী দলের সাতা সাতা ক্যাডারদের গুলি করা হচ্ছে, পুলিশের সাহায্যে পোড়ার লিখছে (নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে এখরপের একটা ঘটনা ঘটেছে এক

সপ্তাহ আগে) বিভিন্ন বামপন্থী গুচ্ছদের সাহায্যে খুনও করছে। শাসককুল এভাবে পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্র রক্ষা করছেন। নকশালপন্থীদের সাপ্তাহিক মৃত্যুপত্র "দেশরতী" ছাপাখানা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওদিকে বৌদ্ধবিস্বক পত্র পত্রিকার জলাও বিক্রয় ব্যবস্থা রয়েছে। এভাবেই গণতন্ত্র (?) রক্ষা করবেন নাকি শাসককুল ও তার জেজুড়ো দলগুলি? মানুষ যে দিন দিন মৃত্যুশয্যের ফাঁক দিয়ে প্রতিদিনের মতো চারিদিক আবিষ্কার করে ফেলছে। কাজেই সরাসরি পুলিশ মিলাটারী দিয়ে গরীব জনতাকে হত্যা (সাপ্তাহাতে না ঐকান্ত পেয়ে কত মানুষ খুন হচ্ছে কে তার হিসেব রাখা) করে গণ-আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চাইছে বজ্রাত শাসকরা। কিন্তু এটা সত্ত্বের দশক—জনতার ক্যাপক জয়ের দশক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মজি না পাওয়া পর্যন্ত জনতার এ লড়াই চলবেই।

জৈনক পাঠক

মহাশয়

পুলিশ কর্তৃক হয়রাণি

গত অটাই আগস্ট দুর্গাপুরে হইতে আমি হাওড়া-জনতা এক্সপ্রেসে হাওড়া আসি। আমার সঙ্গে একটি ফেম লেদারের ব্যাগে দু-কেজি চাল কিছু আলু ও পেঁয়াজ ছিল। হাওড়া স্টেশনে নামার পর একজন ডবল দু বি এন ভি এক আমাকে ডাকেন ও গেটগুলির লাইনে একটি টেবিলের সামনে একজন পুলিশের কাছে নিয়ে যান। পুলিশটির কাঁধে লেখা ছিল ডবল দু বি পি এবং বকে লেখা ছিল এক্স এন ও। পুলিশটি আমায় ব্যাগে কি আছে জিজ্ঞাসা করায় আমি যথার্থ উত্তর দিই। তাঁর আরও প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, আমি দুর্গাপুর চাকরী করি, এখন কলকাতায় ভাইয়ের বাড়ি যাচ্ছি। ওর নির্দেশে ব্যাগ খুলি। উনি বলেন “এতে চার কেজি চাল আছে। আমি বলি “চার কিলো থাকলে আপনি সবটা নিয়ে নিন। কিন্তু মাপে দেখুন থলেটায় দু-কিলোর এক ছটাক বেশী চাল নেই। যদি এক ছটাক বেশী থাকে নিয়ে নিন।” তখন চালের ব্যাগটা খুলে চল দেখে উনি বলেন “ওঃ এষে গোবিন্দভোগ, এর এক গ্রামও ছাড় নেই।” তখন আমি বলি, “আমার দু কেজি চাল আছে, আপনি দেখান যে দু কেজি ছাড় নেই, দরকার হয় কেস লিখুন।” তখন পুলিশটি বলেন “বেশী তড়পাবেন তো বুলিয়ে ছাড়ব।” বাধ্য হয়ে শেষে আমি চাল ছেড়ে এসে গেটে টিকিট কালেকটরকে জিজ্ঞাসা করি যাত্রীদের কতটা করে চাল ছাড় আছে। সবাবরন গেটের পাশের ঐ গেটে দুজন টিকিট কালেকটর ছিলেন। একজনের হাতে সবুজ ব্যাজ বধা ছিল। একজন টিকিট কালেকটর বলেন “ওসব পুলিশের ব্যাপার, আমরা কিছু জানি না।” এ অবস্থায় মাননীয় সরকার বাহাদুর নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলি জানাবেন কি?

(এক) টিকিট হোল্ডারদের দু কেজি চাল ছাড় আছে কি না? (দুই) যদি না থাকে তবে মাঝপথে যখন চেকিং হয় তখন তারা দু কেজি করে চাল ছাড় দেয় কোন অর্থারিটিতে? (তিন) আত্মীয় স্বজন আসার সময় যদি দু কে জি চাল আনতে না পান তবে তিনি কলকাতায় এসে থাকেন কি? (চার) সরকারী ব্যবস্থা কি এমনই চমৎকার যে লোক এসে এক সপ্তাহ থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই রেশন কার্ড ও রেশন পাওয়া যায়? (পাঁচ) যখন পাওয়া যায় না তখন সাধারণ গৃহস্থকে কালোবাজারে (বর্তমানে খোলাবাজারে) চাল কিনতে বাধ্য করা ছাড়া এটা কি? (ছয়) ঐ চালটার হবে কি? ওটা কি সরকারী দপ্তরে জমা করবে? না কি ভাগ বাঁটোয়ারা হবে?

প্রথমেই বলে রাখি ঐ পুলিশকে বার বার বলা সত্ত্বেও তিনি

কিছুতেই কিছু লিখে দিলেন না। এখন দয়া করে জানাবেন কি সাধারণ লোকের কাছে এক্স ৩৯৩-এ মতো পুলিশেরা ও সরকার এবং তার প্রশাসন যন্ত্রটি কি? শৃঙ্খলার রক্ষক না ভক্ষক?

জনৈক ভুক্তভোগী

বরানগরের ঘটনা

আর মন্থোশ ঢেকে রাখা গেল না, সাম্রাজ্যবাদের পা চাটা কুকুর ভারত সরকার ও তার দালাল রক্তচুষ্টে পাটিং-গলো এতদিন গণতন্ত্রের নাম করে তাদের মন্থোশের সামান্য অংশ অগলে রেখেছিল, কিন্তু কাশীপুর বরানগরে তাদের এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ভারতীয়

জনগণের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সাম্রাজ্যবাদের পা-চটা কুকুরদের আসল চেহারাটা কী।

এইপ্রকার গণহত্যা শুধু যে আজই ঘটেছে তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন এঘটনা ঘটছে। পথে ঘাটে, জেলে জলস্রোত সর্বত্রই শাসকশ্রেণী মরণ-জয়ী বিপ্লবীদের হত্যা করেছে। এই কাপুষের দল ভাবছে, এইভাবে গণহত্যা করে তারা বিপ্লবের গতিরোধ করতে পারবে। এই কুকুরগুলিকে ভাল করে জানিয়ে দিতে চাই, আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত ও সম্পূর্ণ পতনের যুগে হত্যা করে কোন বিপ্লবী জেয়ার সত্বধ করা যায় না, আজ আর ভারতবর্ষে ইন্দোনেশিয়া ঘটানো সম্ভব নয়।

কারণ আজ এখানে ঘটে গেছে নকশালবাড়ী মাও সে তুং চিন্তা ধারায়, তৈরী হয়েছে সচা বিপ্লবী পার্টি সি পি আই (এম-এল), অক্টোবর বিপ্লবের লাল মশাল আজ জ্বলছে ভারতের মাটিতে কমঃ চরু মজুমদারের হাতে। তাঁর সযোগ্য পরিচালনায় কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম মাগুরজনের রাইফেল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে মুক্তি সংগ্রামে পরিণত হয়েছে, তাঁর হয়েছে গণমুক্তি ফৌজ। পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের কৃষকশ্রেণী শত্রুর কাছ থেকে ছিন্‌দায় আনা বন্দুক রাইফেল স্টেনগানে সজ্জিত হয়ে সেই অস্ত্র দিয়ে ক্রমাগত শত্রুর উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন, পা বাড়িয়েছেন ভিয়েতনামের রক্ত-

রাঙা পথে, পশ্চিমবঙ্গের ভিয়েতনামে পরিণত হতে চলেছে। তাই আজ সাম্রাজ্যবাদীরা পাইকারী হারে বিপ্লবীদের হত্যার মধ্য দিয়ে কোনমতে মরণের হাত থেকে বেঁচে থাকতে চাইছে। আজ যারা ভাবছে, বরানগর কাশীপুর এলাকায় বিপ্লবী শেবতসন্তাস কয়েক হল তারা দিকান্দ্র দেখছে। তারা যেন মনে রাখে, এই হত্যাকাণ্ড বিপ্লবী জনগণের মনে প্রচণ্ডতম ঘৃণা সঞ্চিত করবে, তারা এই হত্যাকাণ্ডের বদলা নেবেন, শত্রু শ্রীবরে আত্মকের সৃষ্টি করবেন। এই ইতিহাসের নিয়ম, এবং এর ব্যতিক্রম এখানেও হবে না।

অসীম চ্যাটার্জী

৩. ডিগ্রি বেবার দিব। মঞ্জুদেবী তাঁর সন্তানের বি.এ.

পাশের খবরে খুব খুশি হয়েছেন।

সব মা ই চান তাঁদের সন্তানরা ভাল পাশ করুক, দেশের ঐক হোক।

কিন্তু পরিবার বড় হলে বাগ মায়ের ইচ্ছে থাকে সন্তোষে ছেলে মেয়েদের ঐই সুযোগ সুবিধে দেওয়া সম্ভব হয়না।

ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা দিতে হলে দুটি বা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট।

লাল ত্রিকোণ চিহ্নিত পরিবার কল্যাণ
কেন্দ্রগুলি আপনাকে পরিবার নিয়ন্ত্রণের সমস্ত
সুযোগ সুবিধে দেবে—নিখরচায়।

সুকপিত
পরিবার
সুশিক্ষিত পরিবার

দিনের
মত
দিন



পুস্তক পরিচয়

সাহায্যের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যবাদ

গ্রন্থকর্তা

[Aid as Imperialism
By Teresa Hayter]

উনিশশো একষাট সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন ফিটজেরাল্ড কেনেডী বিদেশী সাহায্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন—“বিদেশী সাহায্য হচ্ছে এমন একটি উপায় যার দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজ প্রভাব অটুট রাখে এবং এমন অনেকগুলি দেশকে বাঁচিয়ে রাখে যারা এই সাহায্য ছাড়া চলতে না পেরে কয়েকদিনেই গোল্ডবার্গের আগুনে পড়ত।” বিদেশী সাহায্য সম্পর্কে মোটামুটি একই কথা বলেছেন এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী অর্থ সাহায্যের একটি স্বতন্ত্র সংস্থা) এর উচ্চপদস্থ অর্থনীতিবিদ, প্রফেসর চেনেরী।

উপরোক্ত বইটির উদ্দেশ্য এই একই বক্তব্য রাখা। ধনতান্ত্রিক সম্পদে নিঃস্বার্থ অর্থ সাহায্য বলে যে কিছু নেই সেইটাই শ্রীমতী হেইটার দেখিয়েছেন প্রধানত লাতিন আমেরিকার দেশগুলির, যথা কলম্বিয়া, ব্রাজিল, পেরু, অর্থনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শ্রীমতী হেইটারের বক্তব্য মোটামুটিভাবে ভুলে ধরা কোন ধরনের মন্তব্যের মধ্যে না গিয়ে।

সাধারণভাবে দেখা দিয়েছে যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থ সাহায্য সংস্থাগুলিকে ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী ব্যবহার করে নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাহায্য গ্রহণকারী অথবা অনুন্নত দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টির জন্য। যেমন উদাহরণস্বরূপ বিশ্ব ব্যাঙ্কের এমন কোন নিজস্ব ক্ষমতা নেই যার দ্বারা সে দেয় ঋণ বা বদ আদায় করতে পারে। কিন্তু এই সুদ আদায়ের থাকলে ব্যাঙ্কটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে যা কোন পশ্চিমী দেশই চায় না। অতএব এই দেশগুলির পররাষ্ট্র নীতির একটি মূল্য উদ্দেশ্য হল দেখা যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক যেন পরোক্ষভাবে সাহায্যের মাধ্যমে করায়ত্ত করে ফেলতে পারে প্রতিপক্ষ অথবা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

সাহায্যকারী সংস্থাগুলির সর্বদাই প্রচেষ্টা থাকে কী করে সাহায্যকারী দেশগুলির নীতি নিজেদের নীতির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। যদি এই সংস্থাগুলি দেখে যে এই ধরনের কোন দেশের সরকার গোড়া থেকেই এমন একটি নীতি অনুসরণ করে চলেছে যা তাদের নিজ নীতির অনুরূপ তাহলে তখন কোন গোলমালই থাকে না। কিন্তু

যদি তা না হয় তবে এই সংস্থা সমূহের মূল্যপাটদের দেশ বিশেষ-টির সরকারের নীতি পরিবর্তন না হোক পরিমার্জিত করাটাই বিশেষ কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। দারুণ অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত একটি দেশের নাকের সম্মুখে মোটা অঙ্কের ঋণ ও অন্যান্য সাহায্যের খণ্ড বন্ডিলে রেখে বলা হয়, নীতি পালটাও, এইট পাবে। অবশ্য তালি-ত একহাতে বাজে না কাজেই সময় সময় এই সংস্থাগুলির কিছু কিছু ব্যাপারে মাথা নোয়াতে হয় কিন্তু সেগুলি নেহাতই গোণ। সাহায্য দানের পিছনে যে প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য তা থেকে এরা কখনোই বিচ্যুত হন না।

এই সাহায্যকারী সংস্থাগুলির নীতি কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়? একটিই মাত্র ব্যাপার সেটি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজের উন্নতিকল্পে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনকানুন আছে সেগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন। কোন সাহায্যকারী সংস্থা অনুন্নত দেশগুলির নীতির এমন কোন পরিবর্তন সমর্থন করতে পারে না যার দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের বর্তমান কঠোর ফাটল ধরেতে পারে। এই জন্য এই সংস্থাগুলির সবচেয়ে পছন্দ দক্ষিণপন্থী সরকার অথবা জঙ্গী শাসন যাদের নিজ দেশের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি নিয়ে কোন মাথা ব্যাথাই নেই।

যেমন ধরা যাক লাতিন আমেরিকা। এইখানে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি সাহায্য দেবার ব্যাপারে যে নীতি নিয়েছে তা জনসাধারণের স্বার্থের একদম পরিপন্থী। এ দেশগুলিতে সব থেকে জোর দেওয়া হয় নিজ নিজ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (স্টেবিলিটি)র উপর। এবং অনুন্নত এই দেশগুলির এই স্থিতিশীলতা অর্জন করার প্রচেষ্টার ফলে যে অবস্থা দাঁড়ায় তাতে দেখা যায় তাদের প্রচুর তৈরী মাল বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়, অর্থের দাম কমে এবং প্রবাসীরা হু হু করে বেড়ে গিয়ে শ্রম জনসাধারণের একটি ক্ষুদ্র অংশের পুঁজি বৃদ্ধি করে। যদিও সাহায্যকারী সংস্থাগুলি বলে যে তারা অধিকতর কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করছে এই ক্ষেত্রে তারা সময় সময় অর্থ ঋণ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না।

সাহায্যকারী সংস্থাগুলির নীতির ফলে শ্রম যে শহরে বেকারী বাড়ে তাই নয় গ্রাম থেকে প্রচুর সংখ্যক লোক শহরে চলে এসে বস্ত্রী-গুলিতে ভীড় জমায়। এই সংস্থা সাহায্যকারী সরকারগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে, বাজেটে বাটতির পরিমাণ কমাতে যাতে “অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা” বজায় থাকে। এই ঘটনাটি কমান হয় একমাত্র অনু-

পাদনকারী যথা সোশ্যাল সার্বভাস মাইন, বড়ীঘর, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ভূমি সংস্কার ইত্যাদি খাতে সরকারী ব্যয় সংকোচের মাধ্যমে। এই সংস্থাগুলি লাতিন আমেরিকার বিশেষ করে ভূমিকা সংস্কারের পরিপন্থী যার ফলে কৃষিজাত লাভের বড় অংশ চলে যায় কতিপয় ভূস্বামীর হাতে যাদের উপর এই সংস্থাসমূহ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের বিদেশী সাহায্য লাতিন আমেরিকার (এবং বিশ্বের অন্যান্য) বর্তমান অর্থনৈতিক অসাম্যকে শব্দ টিকিয়ে রাখে না বাড়তেও সাহায্য করে। “অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা” বজায় রাখার নামে এই সংস্থাগুলি বিভিন্ন লাতিন আমেরিকান দেশে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলে যে সরকারী শিল্প লোক ছাটাই করতে যার ফলে বেকারী ক্রমেই বেড়ে

চলেছে। মাইন বৃদ্ধি বৃদ্ধি করার এবং জিনিষপত্রের দাম কোনরকম সরকারী কন্ট্রলের অবর্তমানে বেড়েই চলায় সাধারণ মানুষের দুরূহ দুরূহা চরমে ওঠে। এ ছাড়া আছে সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ পরলেই ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য যার বোঝাও অধিকাংশে বইতে হয় গরীব শ্রেণীকে।

লাতিন আমেরিকার যে দেশগুলি নিয়ে শ্রীমতী হেইটার বিশদ আলোচনা করেছেন সেখানকার তথাকথিত সংস্থাগুলি এবং তাদের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে অপারগ তাদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বিদেশী সাহায্যকারীদের স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিশদ আলোচনায় দেখা যায় যে সাহায্যকারী সংস্থাগুলির চাপে পড়ে যে নীতি এই দেশগুলি অনুসরণ করতে বাধ্য হয় তা বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন এই দেশগুলি যে সব পণ্য রপ্তানী করে বিদেশে তার চাহিদা খুবই সীমাবদ্ধ। শব্দ তাই নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই পণ্য উৎপাদন করে কোন বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থা যারা লাভের একটা বড় অংশ নিয়ে

নেয়। এবং এর থেকে যে বৈদেশিক অর্থ বিনিময় সংকট উপস্থিত হয় (যেখানে আমদানী রপ্তানীর চাইতে বেশী) তা কাটিয়ে উঠতে এই দেশগুলি আবার সাহায্যকারী সংস্থাগুলির উপদেশে যে সকল পণ্য গ্রহণ করে যেমন নিজ মূল্যের অর্থ হ্রাস, তাতে করে সংকট অন্নও বেড়ে ওঠে।

এই অবস্থার লাতিন আমেরিকার দেশগুলি বাঁচতে পারে কী উপায়? শ্রীমতী হেইটার এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণের কিউবার কথা বলেছেন। কিউবার অর্থনীতি নিয়ে খানিক আলোচনা করে, যাতে প্রগতির চিহ্ন স্পষ্ট, তিনি বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাবদার সংস্থাগুলি কিউবাকে শব্দ পরিত্যাগই করে নি তারা তাকে ভয়ও করে।

“Since the Cuban revolution the United States has been more wary than ever of governments which might follow the Cuban path.”

বিশেষ করে কিউবার পর লাতিন আমেরিকায় যাতে অন্য কোন দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে না যেতে পারে তার জন্য সাহায্যকারী সংস্থাগুলি অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলা বই প্রকাশনায় সঙ্কট

(দর্পণের পর্ববন্ধক)

ইতিপূর্বে কয়েকমাস আগে দর্পণে “বাংলা বইয়ের বাজার” বিষয়ে একটি সেখা প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তক ব্যবসায়ী এবং প্রকাশকদের নানা সমস্যা উল্লেখ প্রবন্ধে ভুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু ইদানীং সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অরাজকতা এবং অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তার জন্য ঐ সমস্যাগুলি নতুনরূপ নিয়ে আরো তীব্র হয়েছে।

বইয়ের বাজারে যারা সাধারণ বা ক্ষুদ্র প্রকাশক হিসেবে পরিচিত তাদের অবস্থা সবচেয়ে মর্মান্তিক। সাধারণতঃ এই সব প্রকাশকেরা কখনোই গল্প-উপন্যাস বা প্রবন্ধের বই প্রকাশে আগ্রহী নয় এবং জীবনধারণের ক্ষেত্রে সেটা তাদের অবলম্বন নয়। তাদের একমাত্র অবলম্বন স্কুল-পাঠ্য-বই। তবে যারা প্রথম সারির বড় বড় প্রকাশক তারা খ্যাতিসম্পন্ন লেখকের গল্প-উপন্যাস প্রবন্ধ প্রকাশেই সর্বশেষ আগ্রহী। কিন্তু তাদের অবস্থাও শোচনীয়। কারণ, প্রথমতঃ অরাজকতার গল্প উপন্যাসের বইগুলি সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার উর্ধ্বে। সেজন্য বাজার এমনিতেই মন্দ। দ্বিতীয়তঃ আনন্দ পাবলিশার্স এবং অন্যান্য প্রকাশন ঐ সব প্রথম সারির প্রকাশকদের বাজার অনেকটাই নিজেদের হাতে একচেটিয়া করে নিয়েছেন। ফলতঃ তাদের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়।

অন্যদিকে ক্ষুদ্র প্রকাশকদের

সঙ্গে এদের কোন ভুলনাই হয় না। স্কুলে ক্লাশ ওয়ান থেকে স্ক্রু করে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত সরকারী বই পাঠ্য। সুতরাং সেখানে এরা দাঁত ফোটাতে পারেন না। তারপর বাকী রইল ক্লাশ সিক্স থেকে ইন্ট্রেন পর্বন্ত। এই সব প্রকাশকদের যদি নইন টেনের বই বার করতে হয় তবে বারো হাজার থেকে পনেরো হাজার পর্যন্ত কপি অবশ্যই ছাপা দরকার, তা না হলে খরচ মুল্যও ওঠেনা। সুতরাং নাইন টেনের বইয়ের আশা তাদের ছেড়েই দিতে হয়েছে। আর বাকী রইল সিক্স, সেভেন, এইট। এই তিনটে ক্লাশের বইয়ের উপরই তাদের একমাত্র ভরসা। তার উপরে যদি আবার শিক্ষাক্ষেত্রে এই অরাজকতা দেখা দেয়, তা হলে তারা দাঁড়াবেন কোথায়? প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে এই সব প্রকাশকদের সঙ্গে তাদের পরিবার রয়েছে, রয়েছে মদ্রন কার্যালয়ের কর্মী এবং তাদেরো পরিবার।

পাঠ্য বইয়ের বাজারে এই অরাজকতা দেখা দেবার জন্য তারা যে অন্য কোন বিকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন, তারও কোন উপায়

নেই। আগে ধরে কাগজ কেনা সম্ভব ছিল, প্রেসের কাছে টাকা বাকী রাখা যেত; কিন্তু আজ আর সে কথা ভাবাই যায় না। কাগজের দাম দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। এখন কেউই এই সব ক্ষুদ্র প্রকাশকদের ধার দিতে সাহস করেন না। যেমন, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্র জীবনী” আগে একটি সংখ্যার দাম ছিল পনেরো টাকা। ইদানীং ঐসংখ্যার পরিমার্জিত সংস্করণের দাম হয়েছে তিরিশ টাকা। এটা যে প্রকাশকদের খামখেয়ালীপনা, একথা ভাবলে ভুল হবে। এছাড়া তাদের কোন উপায় নেই।

এখন প্রশ্ন হল, এই অবস্থার লক্ষ লক্ষ জীবনকে বাঁচানোর জন্য কারা এগিয়ে আসবেন? শিল্পের মালিকরা সরকারী সাহায্য পেতে পারেন, চাষীরা নাকি ইচ্ছে করলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারেন; তবে প্রকাশকেরা কি দোষ করেন? সরকার ক্লাশ ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তারা বই ছাপছেন সরাসরী প্রেসে। তার মনে তেঁলা মাথায় তেল দেওয়া। কিন্তু এর ফলে কত মদ্রন-কর্মচারীর জীবনে যে অন্ধকার নেমে এসেছে, তা কি সরকারের চোখে পড়ে? তাই আবার নতুন আশা নিয়ে এই সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়ার আর কি কোন অর্থ আছে?

চাকরির জন্য ভাবছেন কেন?

আজ যদি আপনি চাকরি চান তবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ভারত দর্শন

তামিলনাড়ু

তামিলনাড়ুর মধ্যমন্ত্রী শ্রী-করণানিধি, নব-কংগ্রেস, সি পি আই, মদ্রশালিম লীগ অঙ্গগর বাঁধনে বন্ধ হয়ে খুব মশকিলে পড়েছেন। তামিলনাড়ুর ছাত্র সম্প্রদায় সাধারণভাবে কংগ্রেস বিরোধী এবং তামিলনাড়ু ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস, বিরোধী শ্রাবন এসেছিল তারই তরঙ্গাশীর্ষে বসে শ্রীকরণানিধির পরলোকগত জিতা আম্মাদুরাই ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হন।

দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাকাগাম (ডি এম কে) আর্থ প্রাধান্য অর্থাৎ হিন্দীভাষাভাষী উত্তর ভারতের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষাভাষীদের আশাআকাংক্ষার প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কংগ্রেসী অনাচার, দমননীতি ও ঔষ্মত্যা উন্মাদিতার বিরুদ্ধে ডি এম কে তামিল ভাষাভাষী জনগণের প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং একদা মাদ্রাজ রাজ্যের মুকুটহীন রাজা কামরাজও সেই কংগ্রেস বিরোধিতার প্রচণ্ড ক্ষেত্রে সামলাতে পারেন নি।

ডি এম কে নির্বাচনের আগে রাজ্য দপ্তরগুলিতে এবং শিক্ষার বাহন হিসাবে সারা রাজ্যে তামিল ভাষা ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তামিল ভাষার ওপর

জাতীয় গ্রন্থাগার

(অক্টব পৃষ্ঠার পর)
পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য প্রদেশের গ্রন্থাগারগুলি অথবা হরটিকাল-চার্লি গ্র্যাজুয়েটগণ জাতীয় গ্রন্থাগারে চাকরীর অধিকার থেকে প্রত্যক্ষভাবে বঞ্চিত হয়েছেন।

এই পদটিতে অফিসার নিয়োগের ঘটনাবলীর মধ্যে যে অস্বাভাবিক অথচ রুঢ় চিহ্নটি ফুটে ওঠে হচ্ছে এই যে, জাতীয় গ্রন্থাগারের গার্ডেন বিভাগের খরচ-স্বত্বের দায়িত্ব রয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উপর। কিন্তু দেখাচ্ছে চাকরী এবং প্রমোশনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন একমাত্র সি পি ডবলিউ ডির অফিসারগণদের নিজস্ব বিভাগে স্বাভাবিক যোগ্য সুবিধাগত অবস্থার অধীনত।

এই সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদগ্ৰহণে বৈতনিক হচ্ছে সাড়ে তিনশ রুপায় টাকা। কিন্তু লক্ষ্যেতে যে ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন (সি এস আই আর মন্ত্রণালয়) গার্ডেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদটির বেতন হচ্ছে সাড়ে তেরোশ আশি টাকা। দুটো পদের জন্য প্রার্থীর আবেদন যোগ্যতাবলীর তুলনায় নেই।

জোর দেওয়ার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের মধ্যে অসন্তোষ ধুমায়িত হতে থাকে। ছাত্ররা চান যে সর্বভারতীয় ব্যবহার প্রচলনে ইংরেজী ভাষার প্রতি সরকারের উৎসাহ দেওয়া উচিত। কারণ সর্বভারতীয় পরীক্ষাবিধি ও শিল্পবাণিজ্যে ইংরেজী এখনও প্রয়োজন। কিন্তু ডি এম কে সরকার সমস্ত সরকারী কলেজে তামিল ভাষায় শিক্ষাদানের আদেশ জারী করেন। সম্প্রতি তামিলনাড়ু বিধানসভায় একটা প্রস্তাবে বাকী সমস্ত কলেজে অবিলম্বে তামিল ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এই বছরের মধ্যে কার্যকরী করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। বাগাড়ম্বর অত্যন্ত মধ্যমন্ত্রী করণানিধি বিধানসভায় বলেন যে তাঁর সরকার প্রয়োজন হলে রাজ্যের সব প্রতিষ্ঠানে শব্দমাধ্যম তামিল ভাষায় শিক্ষিত গ্রাজুয়েটদের নিয়োগ করতে বাধ্য করার জন্য আইন প্রণয়ন করবেন।

কিন্তু ছাত্র-বিক্ষোভের সামনে হটে গিয়ে তিনি এরপরেই স্যার রামস্বামী মদালিসর কমিশনের রায় অনুযায়ী ইংরেজী অথবা তামিল যে কোন ভাষার মাধ্যমে ছাত্রেরা নিজেদের ইচ্ছামত, শিক্ষালভ করতে পারবে, এ দাবী মেনে নেন। প্রি-ইউ ক্লাশের সাতচল্লিশ হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ তামিল ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, বাকী সবাই চান ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। বে-সরকারী কলেজে এর সংখ্যা আরো বেশী। তামিল চান সাত হাজার আটশো বিরাশি জন আর ইংরেজীতে শিক্ষা চান চর্যাঞ্জিশ হাজার নশো পাঁচ জন।

ছাত্র বিক্ষোভের সামনে দাঁড়িয়ে গৃহীত নীতি এভাবে বর্জন করা ঠিক হল কি না, ডি এম কে সরকার অভিযন্তের দলের গণ্যমান্য সদস্যেরা এই প্রশ্ন তুলেছেন। করুণানিধি এখন নকশালদের ধুয়া তুলে এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ করে বিরোধবাদীদের স্তম্ভ করতে চাইছেন। তিনি প্রায় কারণ-অকারণে তামিলনাড়ুতে নকশালীদের আক্রমণ সম্পর্কে গালগল্প রটনা করে। তামিল জনসাধারণের ওপর আক্রমণ চালাবার সাফাই গেয়ে চলেছেন। ডি এম কে অভিযন্তেরও এই ধরনের নীতির বিরুদ্ধে মত-ভেদ দেখা দিয়েছে।

হরিয়ানা
শব্দমাধ্যম নোতিবাচক কংগ্রেস বিরোধিতা সম্বল করে হরিয়ানার সুবিধাবাদী দলগুলির জোট কংগ্রেস (শা)এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আজ পরিষ্কার যে নব কংগ্রেস দলের মধ্যেও প্রচণ্ড বিভেদের ফাটল দেখা দিয়েছে। ফলে এক কৌতুককর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

বিরোধী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদল-

গুলি একদিকে গোপনে দিল্লীর নব কংগ্রেসী হাই কম্যান্ডের কাছে নব কংগ্রেসে যোগ দেবার অনুরোধ চাইছেন, অন্যদিকে মধ্যমন্ত্রী বংশীলাল নব কংগ্রেস থেকে তাঁর অনুবর্তী নল্ল এমন সবাইকে বিভাজন করে চলেছেন। আজ বিরোধী দলের নেতা বলে কেউ হরিয়ানা বিধানসভায় নেই, কারণ বিরোধী গ্রুপগুলি নেতা নির্বাচনে একমত হতে পারেন নি। অন্যদিকে প্রাক্তন বড় বড় নামকরা নেতা ভগবতদরাল শর্মা, রিজাক রাম ও দেবীলাল বিধানসভায় নির্বাচিত হতে পারেন নি। শব্দমাধ্যম চৌধুরী রণবীর সিং একা বিধানসভায় বাঁচি জুড়ালিয়ে রেখেছেন। মধ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই এখন তাঁকেও তাচ্ছিল্য দেখাতে শুরু করেছেন অথচ একদিন পর-লোকগত নেহরু ও মধ্যমন্ত্রী কায়রনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক আজকের মধ্যমন্ত্রী বংশীলালের স্বপ্নেরও অতীত।

বংশীলাল একটা কাজ ভালো করেই করে চলেছেন। প্রতাপ সিং কায়রনের সংগঠন প্রতিষ্ঠা তাঁর না থাকলেও দমননীতির ব্যাপারে তিনি

বিদেশ দর্শন

নিকসনের ঘোষণার প্রতিক্রিয়া

(দর্পণের পূর্ববন্ধক)

গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট নিকসনের অর্থনীতি সংক্রান্ত নাটকীয় ঘোষণার ফলাফল স্বরূপ শব্দ একটা কথাই বলা যায় এবং তা হল শেষ অবধি মার্কিন সরকার ডলারের মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হল। যদিও প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর টেলিভিশনে বক্তৃতার কোন জ্ঞানগায়ই এই মূল্য হ্রাসের কথা বলেন নি তবুও রপ্তানীর উপর দশ শতাংশ সারচার্জ ধারের আর অন্য কোন মানে হতে পারে না। এ ছাড়াও আছে অন্তত সাময়িকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমস্ত সোনা রপ্তানী বন্ধের আদেশ যাও ওই মূল্য হ্রাসের দিকেই আগুদল দেখায়।

নিকসনের এই ঘোষণা তাঁর গত দেড় বছরের নীতি সম্পর্কভাবে পাশে দিল তাই নয় নিজ সরকারের ব্যর্থতার কথাও প্রকাশ্যে তুলে ধরল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া, বেকারী বৃদ্ধি পাওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতির আশংকাই তাঁকে এই নতুন নীতি ঘোষণা করতে বাধ্য করে। এবং এর ফলে এটাও পরিষ্কার যে নিকসন কিছুদিন আগেও যে বড়াই করতেন মার্কিন অর্থনীতি ঠিক পথেই চলেছে তা কতখানি ভুল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই নীতি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান সম্পর্কে একটি নতুন সংকেতের সৃষ্টি করবে (পাঠকের মনে থাকতে পারে যে দু সপ্তাহ আগে এই দু দেশের সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার কথা বিদেশ দর্পণে উল্লেখ করা হয়।) এ কথা আজ পরিষ্কার যে

শীঘ্রই তাঁকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবেন, এটা প্রায় নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই তাঁর সারা হরিয়ানার প্রাতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের আশাটে গল্প প্রচার করে কোটি কোটি টাকা অপব্যয়ের ফিরিস্তি তৈরী করেছেন এবং প্রতিটি মঞ্চক্ষেত্রে নিজের বংশবদ লোক ও ঠিকাদার বসিয়ে নিয়ত মন সংগ্রহের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। অবিভক্ত পাজাব থেকে স্বতন্ত্র পাজাব ও হরিয়ানা আরো অনেক গভীর দমননীতির পংককুণ্ডে নিমজ্জমান, একথা অনেক পুরনো কংগ্রেসী (যারা এখনও নব কংগ্রেসে) বিষ্ময়চিত্তে স্বীকার করছেন।

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের নব-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিপাকে পড়েছেন। কংগ্রেস ভাগ হবার আগেও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সং ও নীতিপরায়ণ বলে কোন সন্দেহ ছিল না। বর্তমান মধ্যমন্ত্রীর পিতা রবিশংকর শব্দা যখন মধ্যপ্রদেশের মধ্যমন্ত্রী তখন থেকেই কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দমননীতি

তীর কাহিনী লোককাহিনীতে পর্ববসিত হয়েছে। পশ্চিম রবিশংকর শব্দা পরলোকগত, তাঁর একপুত্র মধ্যপ্রদেশের মধ্যমন্ত্রী অপর পুত্র কেন্দ্রীয় সামরিক উপপাদন দপ্তরের মন্ত্রী। পশ্চিম শব্দা রায়পুরের সাধারণ কম-রোজগারে উকীল হয়েও, কি ভাবে পুত্রদের জন্যে বিপুল বৈভব রেখে গিয়েছিলেন, এবং সেই সম্পর্কে পরলোকগত পশ্চিম নেহরু কি মন্তব্য করেছিলেন, সে আজ লোককথার সামিল।

কিন্তু আজ নেহরুপুত্রী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও শব্দাতনয় মধ্যপ্রদেশের মধ্যমন্ত্রী ও নবকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সম্পর্কে অনুরূপ সংশয়াকুল। এ যেন সেই ওয়াজেদ আলির সনাতন ভারতবর্ষ। পিতার পুত্র মননে বসবেন, একই দমননীতি, বিলাসপংকের শব্দায় কঙ্ককরেখা গভীর হয়ে উঠবে এমন অবধারিত। ইন্দিরা, শ্যামাচরণ, বিদ্যাচরণ শব্দা নন কে সি পন্থ থেকে সিদ্ধার্থ রায় এবং নেপাল রায়ের বিধবা পশ্চত একই (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

তিকে ক্ষেত্রে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে তার কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের হাতেই প্রচুর পরিমাণ ডলার মজুত আছে। যদি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে একটি ষিরাট দেশের অর্থনীতি বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে ডলারের বর্তমান সংকটকে ধরতে হবে সেই দেশের ব্যাঙ্কসমূহের সংকট। তাই এই আলোড়ন।

এই সংকটকে কেন্দ্র করে পশ্চিমী দনিয়াল যে সব প্রশ্ন উঠেছে তার মধ্যে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে ভবিষ্যতেও কী বিভিন্ন দেশ বর্তমানের মতন ডলার সংগ্রহ করে যাবে, নাকি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে? কিছু কিছু মহল থেকে এরই মধ্যে বলা শুরু হয়েছে যে যেহেতু ডলারের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের সঞ্চিত অর্থের (যা নাকি ডলারেই আছে) মূল্য হ্রাস হবে সেইহেতু কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে উনিশশ চর্যাঞ্জিশ সালে বটেন উডস বৈঠকে কানিসের প্রস্তাবিত “বিশ্ব” কারেন্সীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে এই কারেন্সী এমন হবে যার সরবরাহ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রিত হবে একটি আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা। কিন্তু সেও ভবিষ্যতের কথা। যদি এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলেও বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে ডলার সঞ্চিত হয়ে আছে, যার মূল্য পঞ্চাশ হাজার মিলিয়ন, তার কী হবে?

নিকসনের ঘোষণা আন্তর্জা-

একটি কাল্পনিক সংলাপ

অজাতশত্রু

প্রগতিশীল কবির বৈঠকখানা :
রবিবার সকাল : এখন পর্যন্ত ভীড়
জমে নি। কবি এবং জনৈক লিটল
ম্যাগাজীনের সম্পাদক (ইনিও
কবি) সময় কাটানোর জন্য গল্প
করছেন :

সম্পাদক : কেমন লিখছেন?
পুঙ্জোর তো এবার সাড়ানন্দ নেই।
সবাই যেন মনমরা—

কবি : প্রশ্নের উত্তর তো তুমিই
দিবে দিলে।

সম্পাদক : এমন হচ্ছে কেন?
লিটল ম্যাগাজীনের সংখ্যাও যেন
কমে যাচ্ছে।

কবি : কিনবে কে? ভোর-
বেলায় তো চলে এসেছে, নিশ্চয়
বাজার যাও না...

সম্পাদক : তাই একমাত্র কারণ
মনে করেন?

কবি : একমাত্র কারণ নয়, তবে
এটি প্রধান। লিটল ম্যাগাজী
তোমাদের মত ছেলে-ছোকরারাই
সচরাচর বের করে। বেশীদিন
টেকে না, তবে নতুন পত্রিকাও
প্রতিবছর গজায়। এখন তোমরা
পাড়ান পাড়ান নিজেদের অস্তিত্ব
বাঁচাবে, না পত্রিকা বের করবে?

সম্পাদক : মিত্রীয় কারণটি
বললেন। তারপর?

কবি : সত্যভাষণ বড় নিষ্ঠুর,
তা অপরকে এবং নিজেদেরও আঘাত
করে। তৃতীয় কারণ, আমাদের মান-
সিক হতাশা বা ক্রৈব্যা। আমাদের
ক্রমেই এই অনুভব হচ্ছে যে কোন-
রকম ন্যাস্ত দায়িত্বই আমরা পালন
করিছি না। তরুণ লেখক : যারা,
এমনকি হাররী, বাট, অ্যারী, তারা
পর্বন্ত বর্তমান ঘটনাবলীর কোন
সুত্র ধরে পাচ্ছে না। পশ্চিম
বাংলার এখন প্রতিদিন যা ঘটছে,
তা এইদেশে কোনদিন ঘটে নি।
বুটীশ আমলে না, তার আগেও
না। সবাকছই যেন কেমন এলো-
মেলো হয়ে যাচ্ছে—

সম্পাদক : আপনি নিশ্চয়
রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কথা বল-
ছেন। সাহিত্যের সঙ্গে তার কী
সম্পর্ক?

কবি : সাহিত্য কি রাজনী-
তির বাইরে? রামায়ণ, মহাভারত,
শেকসপীয়রের নাটক, টলস্টয়ের
উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কি
তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? বিশেষ
করে আজকের কবি সাহিত্যিকরা
দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে প্রত্যেকে
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এমনকি জীব-
নানন্দ দাশকেও একসময় অস্ত্র-
বাস ছেড়ে জনতার মধ্যে এসে
দাঁড়াতে হয়েছিল। দু-একজন ব্যতি-
ক্রম, যেমন শিল্পী রামকৃষ্ণকর।
কিন্তু মহত্তর শিল্পী যারা, আজ-
কের পিকাসো বা রবীন্দ্রনাথ, তারা
প্রায় প্রতিদিন আমাদের হাড়ির
খবর রাখতেন, এবং আমাদের দৈন-
ন্দিন সমস্যায় বিচলিত হতেন।
একালে তাই নিয়ম।

সম্পাদক : হাররী অথবা

অ্যারীর বেলান এ নিয়ম খাটে
না।

কবি : আলবৎ খাটে। কত
হাররীকে এসময় পুঙ্জোর ভয়ে
দাড়ি কেটে ফেলতে দেখলাম।
অ্যারীরও এখন বহু চিহ্নিত-
এসকাকে সমস্ত পরিহার করে
রাস্তা হাঁটে, এমনকি দিনে-দুপুরে।
এসব ঘটনার কোন ছাপ তাঁদের
কবিতায় বা আশ্রয় পড়ে না, এমন
কথা তুমি কী করে ভাবতে পারো?

সম্পাদক : আপনি যে দায়িত্ব
পালনের কথা বলছিলেন, যে
ব্যাপারে আপনি এবং আমি দুজ-
নেই আসামী, সে ব্যাপারটা কি?

কবি : কবিধর্ম বড় কঠিন।
সুসময়ের আমরা অনেক বড়
বড় কথা বলি। আমরা মানুষের
দৃষ্টে বিগলিত হই, তার সুখে
উদ্দীপ্ত হই। কবি সারাজীবন ধরে
নিজেকে পরিশুদ্ধ করেন; এটা
মোটাই তাঁর সমস্যা নয়, তার
তপস্যা। যিনি এ ধরনের কোন
চিন্তা মনে না রেখেই কাগজে তাঁর
কবিতা বের করাই বছরের পর বছর
একমাত্র ধর্ম মনে করেন, তিনি
কম্পনকালে কবি ছিলেন না, কবি
হবেন না। মনগড়া কিছু ঠান্ডা-
গরম বুলি আঙুলেও কবি হওয়া
যায় না। বড় জোর তাঁকে প্রগতি-

শীল বা হাররী বলা যায়। তুমি
একজন লিটল ম্যাগাজীনের সম্পা-
দক, বলতে পারো তাতে কটি
কবিতা ছাপা হয়? কোন সংখ্যায়
হয়তো একটিও না। কিন্তু তব
এ-ধরনের পত্রিকা থাকা দরকার,
কেননা তপস্যায় সিঁধলাভ বহু-
দিনের ব্যাপার, এবং কোথাও কোন
কবিতা ছাপা না হলে কবি তাঁর
সাধনায় অগ্রসরই বা হবেন কী
করে? এই তপস্যা কিন্তু একজন
কবির ক্ষেত্রে দিনের পর দিন এক-

বর রহমানের বিচার দাবী করে
পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে সভা
ডেকেছেন। এদের একজনও কি
সত্যিকারের পরিশুদ্ধ হয়েছেন?
পশ্চিম বাংলায়ই একজন কবি
সরোজ দত্ত হয়তো পুঙ্জোর হাতে
নিহত হয়েছেন, পত্রিকায় তার
সংবাদ বেরিয়েছে। আমরা তো
কবিতা লিখি। এর কোন প্রতিবাদ
করছি?

সম্পাদক : কবির কাজ কি
কবিতা লেখা নয়? অন্য কিছু?

সাহিত্য দর্শন

নিষ্ঠ, একগ্রন্থের দাবী করে। তাঁর
চিন্তার ক্ষেত্রে কোন ভেজাল থাকলে
চলবে না। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর
চিন্তাভাবনা পরিশোধিত হতে
হতে এক মানবিক ঐশ্বর্যে দীপ্য-
মান, রূপমান হবে, এই কবির এক-
মাত্র প্রাপ্তি, এখনই তার একটি-
মাত্র সুচেতনা। কিন্তু আমাদের
ক্ষেত্রে তা কতটুকু রূপান্তরিত হতে
পেরেছে? আমরা যে ভিতরে সেই
ভিতরেই আছি। চোখের সামনে
ভ্রমবহ, প্রায় গণহত্যার সমান,
পুলিশী হত্যাকাণ্ড দিনের পর দিন
ঘটে চলেছে; আমাদের কবির
নীরব। অথচ এদেশের একজন
কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক মর্জি-

কবি : কিন্তু মর্জিবের মর্জি
দাবী করে আমাদের কবিরও তো
সভা ডেকেছিলেন। অস্ত্রে তিনজন
কবিকে বিনা বিচারে জেলে দেওয়া
হয়েছে। তা আমাদের স্পর্শ করে না
অথচ ভিয়েতনাম-কে সামনে রেখে
আমরা কবিতা সংকলন বের করছি,
প্যাট্রিস লম্বাকে নিয়ে আমরা
সংগত কারণেই বিচলিত হয়েছি।
কবি চিরদিনই নির্বাসিত মানুষের
পক্ষে।

সম্পাদক : আমি এখনো একমত
নই। অবনীন্দ্রনাথ আমাদের অন্য-
তম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, এবং কবি।
আপনি রামকৃষ্ণকরের কথা বলে-
ছেন। বিভূতিভূষণ ছিলেন। তখনো

অনেক রাজনৈতিক সমস্যা ছিল;
এখন বিশ্বভারতীতে, বা রামকি-
ষ্ণকরের ঘর, মাঝেমাঝেই আগুন
জ্বলছে। শিল্পীর কাজ আগুন
নেভানো নয়।

কবি : আমার তাতে সান্তনা
কোথায়? আমি অবনীন্দ্রনাথ বা
রামকৃষ্ণকর নই। সারা জীবন
নিজেকে প্রগতিশীল কবি বলে
জাহির করছি। এজন্য কিছু কষ্টও
বরণ করেছি। কিন্তু আজ যখন
অগ্নির সামনে আমাকে
দাঁড়াতে হয়, আজ ভীষণ ইচ্ছে
করে আয়নটাকে ভেঙে চরমার
করে ফেলতে! আমরা কি কবি?
যে-হাতে এতকাল কলম ধরেছি,
সত্যিকারের কবি হলে আজ
পশ্চিমবঙ্গের পুঙ্জি সে হাত
ভেঙে গুড়িয়ে দিত। আমরা বহাল
-তবিরতে আছি।

কথোপকথন এখানেই সমাপ্ত।
কর ডজন তরুণ কবি সাহি-
ত্যিক একসঙ্গে হুড়মুড় কীর
ঘরে ঢুকলেন। একজনের
সঙ্গে টেপ রেকর্ডার। “দাদা
আপনার শ্রেষ্ঠ কবিতা বের
করুন...” কবি আসিন ছেড়ে
মুক্তকচ্ছ হয়ে ছটলেন পাশের
ঘরে; শোনা যেতে লাগলো
তিনি কনিষ্ঠ কন্যাকে তির-
স্কার করছেন, বই বধ্যস্থানে
থাকে না কেন ইত্যাদি ॥

জাতীয় গ্রন্থাগারে দুর্নীতি

অরুণ বসু

রিভিউইং কমিটি এবং ফেসলা
কমিটির সুপারিশগুলি জাতীয়
গ্রন্থাগারে প্রবর্তন করার জন্য
নতুন কর্মী নিয়োগে স্বজনপোষণ
নীতির যে নশন ও নিলম্ব নজীর
দেখা গেল তার দৃষ্টান্ত বিরল।
শিক্ষাগত যোগ্যতার সাধারণ মান-
সম্পন্ন এবং বয়সে উর্জ সীমারেখা
পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের
আপনজন হিসাবে যারা চাকরী
পেরিয়েছেন তাদের নাম উমা বসু,
নীলোৎপলা সেনগুপ্ত, এন বালকু-
মারী, নুপেন মিত্র, নমিতা মুখার্জী
নীলিমা সেনগুপ্ত, অঞ্জন-চ্যাটার্জী,
অঞ্জলি ভদ্র, অবিনাশ শর্মা, নীলিমা
রানী রায়, দীপ্তি ঘোষ দাস্তিদার
এবং প্রবীর ঘোষের সঙ্গে অন্য
আটজন ডাক্তার বৈয়ারার। এদের
চাকরী কোন প্রফেশনাল পদে হয়
নি। তাই “বিশেষ দৃষ্টিকোণ
থেকে বিশেষভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন”
বলে ব্যাখ্যা করে খসমিত কর্তৃ-
পক্ষ এদের চাকরী দিয়ে নিঃসন্দেহে
সরকারী নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন।
কিন্তু এতটুকু অনিয়মের জন্যে
মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।
কারণ, শ্রীবি এস কেশবনের কেন্দ্রীয়
শিক্ষা দপ্তরের উপর যথেষ্ট প্রভাব
আছে। তাছাড়া সরকারী আইনে
আছে (যা সম্ভবত আপনজনদের
স্বার্থে বেশী ব্যবহৃত হয়) ‘cases
of relaxation of age limits,

সরকারী রিপোর্টে বলেছেন—
which are covered by any
general orders of relaxation
(i.e., relaxation of age limit
in the case of displaced Gov-
ernment servants, retrained
Central Government employ-
ees, scheduled caste candi-
dates) should be referred to
the Government of India for
concurrence before the age
limits are relaxed in indi-
vidual cases in exercise of the
authority delegated to the
Heads of Department under
Fundamental and Supplemen-
tary Rules”.

এই আইনের জোরে এবং
শ্রীবি এস কেশবনের কেন্দ্রীয়
সরকারের সঙ্গে দহরম মহরমের
ফলে অনেকেই আজ জাতীয় গ্রন্থা-
গারে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে তাদের
হারানো বয়স ফিরে পাবার
সুযোগ পেজ। চাকরী পাবার বয়স
পেরিয়ে যাবার পরে প্রফেশনাল
পদে এসেছেন শ্রীমতী উমা বসু।
তাকে নিয়োগ করে কর্তৃপক্ষ
অনেক উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন বিহ-
রাগত এবং বিভাগীয় প্রার্থীদের
ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে-
ছেন। শ্রীমতী বসু নারী শ্রীআদিত্য
কুমার ওদেদার মহাশয়ের (জাতীয়
গ্রন্থাগারের প্রাক্তন অফিসার এবং
বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রধান গ্রন্থাগারিক) আত্মীয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারে তার অতিরিক্ত
সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির পেছনে এই
আত্মীয়তার সূত্র অনেকখানি সাহায্য
করেছে বলে শোনা যায়। এদিকে
স্বাধীন ভারতে জাতীয় গ্রন্থাগারের
কর্তমান চাকরীকায়ম রূপ ও কলে-
বর প্রাপ্তি যে সকল কর্মীবৃন্দের
বছরের পর বছর অক্লান্ত পরি-
শ্রমের দ্বারা সম্ভব হয়েছে তারা
অনেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী
নিরে বৃত্তিতে অগ্রজ হয়েও কত-
পক্ষের কাছে অস্পৃশ্য অথবা অব-
হেলিত। এদের মধ্যে যারা সবার
পিছে এবং সবার নীচে রয়ে গেল
এবং এখনো কোন প্রফেশনাল পদ
পেল না, এবং বয়স বেড়ে যাওয়ার
কারণে অন্য কোনখানে গ্রন্থাগার
বৃত্তির চাকরী জোটাতে পারল না
তাদের সুপ্ত ও অগ্রসিদ্ধ নামগুলো
পিঁকে হালদার; এস কে ভৌমিক;
এস এন ভৌমিক, সবিতা রায়,
অচিন্ত্য মল্লিক; এম আর মন্ডল;
রমেন আচার্য এবং এম হেম্বরাম।

কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে
স্বজন পোষণের সবচেয়ে দুঃসাহসী
ও নিলম্ব ঘটনা জাতীয় গ্রন্থা-
গারে ঘটে ১৯৬৩ সালে। কর্তৃপক্ষ
সরকারী রিপোর্টে বলেছেন—
“The Library has taken over
the responsibility of the main-
tenance of the lawns and
gardens in Belvedere Estate
from the C.P.W.D. A Sepa-
rate Garden Division has
been created for the purpose.
An officer, designated Gar-
den Superintendent (Central
Services Class II—Gazetted)
is in charge of the Division”

এই পদে নিযুক্ত হয়ে এলেন সি
পি ডবল ডি থেকে বদলীর
মাধ্যমে শ্রীএইচ কে গুপ্তা। শোন
যায় তিনি তৎকালীন কেন্দ্রীয়
শিক্ষাদপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারী
শ্রীভি পি অগ্নিহোত্রীর আত্মীয়
হওয়ায় এই সুযোগ সুবিধা পেয়ে
ছিলেন। কয়েক বছর জাতীয়
গ্রন্থাগারে কাজ করে তিনি পেন-
রায় সি পি ডবল ডি-তে আরে
উচ্চ পদে যখন ফিরে গেলেন তখন
দেখা গেল যিনি গার্ডেন সুপা-
রিন্টেন্ডেন্ট পদে এলেন তিনি
শ্রীএইচ কে গুপ্তার ছোট ভাই
তিনিও এসেছিলেন সি পি ডবল
ডি থেকেই। কয়েক বছর কাক
করার পর যখন দেখা গেল এই ভা-
লোকও ফিরে গেলেন সি পি
ডবল ডি-তে তার দাদার মতো
একটি উচ্চপদে তখন আসল স-
বোঝা গেল যে সি পি ডবল
ডি-তে কর্মরত কর্তৃপক্ষের আপ-
জনদের স্বার্থে জাতীয় গ্রন্থাগা-
গার্ডেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদ
একটি মই হিসাবে সৃষ্টি
হয়েছে তাদের চাকুরী জী-
পদোন্নতির উদ্দেশ্যে। এবং
উদ্দেশ্যে এই পদে অ-
নিয়োগও অশুদ্ধ ভাবে অন্য
কারী সংস্থা থেকে
মাধ্যমে পদার্থ হিসাবে
হয়েছে। এর ফলে গুপ্তা
চলে যাবার পর যিনি
কর্তমানে এসেছেন তিনিও
ডবল ডি থেকেই এসে
(শেষাংশ ১ পৃষ্ঠা)

পুস্তক সমালোচনা

চিত্তরঞ্জনের জীবনী গ্রন্থ

(দর্পণের সমালোচক)

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে ক্রমাগত যে সব দৃঢ়মূল মানবিক চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলেছিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তার মধ্যে প্রথম সারির একজন। পরবর্তীকালে যে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার নবতর মন্ড্রে দেশের মানুষকে সংগ্রামের নতুন প্রেরণায় সজীবিত করলেন, তার সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে দেশবন্ধুর জীবনদর্শন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদী আইনজীবী হিসেবে চিত্তরঞ্জনের যে খ্যাতি, তা শুধুমাত্র তার বাসিতা এবং প্রথর যুক্তিবাদীতার জন্যই নয়, তৎকালীন ব্রিটিশরাজের বিধিব্যবস্থা ও আইনগত অস্তঃসারণনাত্মক এবং শাসনপদ্ধতির মানবিকতা-বিরোধী চাতুর্যকে দেশের মানুষের কাছে প্রমাণ করে দেবার জন্যও বটে। উদাহরণ স্বরূপ অরবিন্দ মামলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাহিত্য শিল্প, আইন, দেশপ্রেম প্রভৃতি একাধিক গুণের সম্মিলনেই দেশবন্ধুর চরিত্র এক অনন্য জাতীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। তাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা ছিল “জীবনে যে সাধনা সে তো স্বপ্ন নয়, এই বিশ্ব যে অনুপম ‘বিশ্ব-মিথুন’ বিরাট শিল্প, এ মহাকাব্যে সকলেরই স্থান আছে, আলোও আছে, আধারও আছে। আদর্শ জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মাস্তাবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এরূপ সত্য প্রতি অগুরোধ ধূলিকণা হইতে এই ‘মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য।’”

আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক দেশবন্ধুর জীবনের ইতিবৃত্ত পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বংশ পরিচয়, জীবনের উপাদান, ছাত্র-জীবন, আইনজীবী, রাজনৈতিক-জীবন, সাহিত্য জীবন, মানুষ চিত্তরঞ্জন, রসরাজ চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধুর জীবনপঞ্জী, তাঁর প্রতি দেশ-বিশ্বের প্রভাবজালী, কবিতাকুলের প্রভাবজালী, সংবাদ-পত্র জগতের

ভারত দর্পণ

(নবম পৃষ্ঠার পর)

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কে ও উত্তরাধিকারের চিহ্ন নব কংগ্রেস পুরনো কংগ্রেসের মতই বহন করে চলেছে। বলাবাহুল্য মধ্যমশ্রেণী শত্রুও পুতুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণে বাসায়। গিড়বন্দ, হারকাপ্রসাদ প্রভৃতি তিন কোণঠাসা করার জন্যে প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণে বীতরাগ নয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ‘বিস্তারিত’ প্রদর্শন করেছেন এবং মধ্য-প্রাচ্য নব কংগ্রেস সভাপতি মিশ-হীল গাঙ্গোয়াল পদত্যাগ করেছেন এবার বোধ হয় স্বয়ং মধ্য-প্রাচ্য পাল্লা।

শোকপ্রকাশ প্রভৃতি সব ঘটনাই সংযোজিত হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি বছরে দেশবন্ধুর শতবর্ষ উপলক্ষে বেশ কয়েকটি জীবনী গ্রন্থ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং অপরাপর গ্রন্থগুলিতে যদি উক্ত বিষয়গুলির অভাব ঘটে থাকে, তবে আলোচ্য গ্রন্থটিই দেশবন্ধুর পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিশ্লেষণের দাবীতে সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত।

তবে সত্তর দশকের রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে গ্রন্থটি প্রণয়নে আরো যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ একালের তরুণ-সমাজের বৃহদাংশ তথাকথিত স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক পুরোধাকেই আর যুক্তি দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে চাইছেন না। সুতরাং কোন মনীষীর জীবনদর্শন বিষয়ে আলোকপাত করতে গেলে বর্তমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক আবহাওয়ায় উপেক্ষা করার অর্থ উন্নয়ন সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ দূরদর্শিতার অভাব। জীবনীগ্রন্থে আলোচ্য ব্যক্তির জীবনোপলব্ধিকে যেমন পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করতে হবে, সেই সঙ্গে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় তার দক্ষ এবং নিপুণ মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বর্তমান সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার একেবারে উপেক্ষিত থেকে গেছে।

অন্যদিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক শুধুমাত্র ঘটনাগুলিরই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর রচনা কৌশলে ঘটনাগুলি ক্রীমিশ্রিত হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন “রসরাজ চিত্তরঞ্জন” পর্বে দেশবন্ধুর কৌতুক প্রিয়তার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি উপস্থাপনার সিন্ধতা এবং রসময়তার অভাবে ঘটনাগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে নি। এক কথায়, ঘটনা সংগ্রহে লেখকের নিষ্ঠা থাকলেও রচনাশৈলীতে আরো যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় সাধ-ভাষা প্রয়োগও এক্ষেত্রে বোধহয় খানিকটা বৃথা সৃষ্টি করেছে।

তবুও আমার বিশ্বাস লেখক আলোচ্য গ্রন্থে দেশবন্ধুর যে পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন, অনেক গ্রন্থেই তার অভাব থাকার জন্য, আগামীদিনের গবেষকদের কাছে গ্রন্থটির মূল্য অপরিহার্য।

গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশটি মূল্যবান এবং চিত্তরঞ্জনের উন্নত সাহিত্যবোধের পরিচায়ক।

চিত্তরঞ্জী চিত্তরঞ্জন / ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ / জয়প্রকাশন / কলিকাতা-নয় দাম / কুড়ি টাকা।

পল্লী দর্পণ

রায়পুরে গুণ্ডাদের বেপারোয়া তাণ্ডব

রায়পুর সোনারপুর থানার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের কয়েকজন ব্যতীত অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায়ের। গত কয়েক মাস যাবৎ এই গ্রামের একদল গুণ্ডা (রমেশ্বর, ভিকুরাম, দুর্গা, শিবদাস, ভূমালি ইত্যাদি) একটি রাজনৈতিক দলের নাম নিয়ে বড়লোকদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সাধারণ মানুষের উপর অবাধে অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের একজন কুখ্যাত জোতদার এই সমস্ত গুণ্ডাদের দিনের পর দিন এই দুষ্কর্মের মদত জোগাচ্ছে।

এই গুণ্ডাবাহিনী জোতদারদের দেওয়া বন্দুক, পাইপগান, ছুরি প্রভৃতি মারণাস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে অবাধে ঘোরাঘুরি করছে এবং নানা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সব গুণ্ডাদের কারুর না কারুর নামে ওয়ারেন্ট আছে। দু'একজন জেল ফেরৎ, এদের কাজ হল দিনের বেলায় ধরে ধরে সি পি এম কর্মীদের প্রহার করা এবং রাতের অন্ধকারে ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙ্গা, দোকান লুণ্ঠ প্রভৃতি দুষ্কর্ম চালিয়ে যাওয়া। কয়েক মাস আগে এই গ্রামের শশীভূষণ নামে একজন সি পি এম নেতাকে সাংঘাতিক ভাবে প্রহার; নরেন নামে আরও একজন সি পি এম কর্মীকে ভীষণ ভাবে প্রহারের ফলে তাঁর একটা হাতের কিয়দংশ বাতিল; খেটে খাওয়া সাধারণ ব্যবসায়ীদের বাসের মধ্যে পাইপগান, ছুরি প্রভৃতি দৌঁড়ে কয়েক হাজার টাকা লুণ্ঠ, গ্রামের পার্শ্বস্থ চম্পাহাট বাজারে সি পি এম সমর্থক জড়ো বিক্রেতার দোকান থেকে বলপূর্বক কয়েকজোড়া জুতো নিয়ে যাওয়া; মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খেয়ে পয়সার বদলে ছুরি দেখান, বাসের মধ্যে সম্প্রদায়ের মহিলায় গলা থেকে হার প্রভৃতি গহনা ছিনতাই; রাতের অন্ধকারে পল্লিশের প্রত্যক্ষ এইসব গুণ্ডাবাহিনীর নিয়মিত কাজ।

এখানে বলা যেতে পারে যে, আজ দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ঐ সমস্ত সমাজ বিরোধীরা এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। রাস্তায় নির্বিঘ্নে চলা বন্দ, নিজেদের মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা নেই, সামান্য পুঞ্জি নিয়ে যারা ব্যবসায় নেমেছেন তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। এই ভাবে পারিপার্শ্বিক এলাকায় ও রায়পুর গ্রামের বকে ঐ সমস্ত গুণ্ডারা জনজীবনকে করে তুলছে দুর্বিষহ।

অর্থাৎ এদের সম্বন্ধে পল্লিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব।

অশোকনগরে হত্যার প্রতিবাদে হরতাল

গত বারোই আগস্ট কল্যাণী স্পিনিং মিল (দুই নং)-এর শ্রমিক সুবোধ বিশ্বাসকে পল্লিশ গ্রেপ্তারের পরে খুন করে। তেরোই আগস্ট তার মৃতদেহ বারাসাত মর্গে আবেষ্কারের খবর পাওয়ার সংগে সংগে অশোকনগরস্থ স্পিনিং মিলের শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে বেরিয়ে

রাজধানীর চিঠি

(১১ পৃষ্ঠার পর)

নিম্নস্তাদের গোড়ায় অনমনা করা ছিল না।

যারা ভারত সরকারের রুশিয়া প্রীতিক্রমে কোনো যুগান্তকারী নীতি পরিবর্তনের দ্যোতক মনে করছেন, তাঁদেরকে স্মরণ করানো দরকার যে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কিছদিন আগে “আমেরিকা চীনের পুনর্বাসিকার” করার মত বিস্ময়কর বিচার পার্লামেন্টে রেখেছিলেন; তিনি এও বলেছিলেন, আমেরিকা চীনের নিকটবর্তী হচ্ছে কোনো ক্ষমতা রাজনীতির তাগিদে নয়। তবে কিসের প্রয়োজনে? নাকি শান্তির সম্ভাবনাই বাড়ছে ওয়াশিংটন পিকিং কন্ট্রোল। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়াও, ভারত রুশ মৈত্রী-চুক্তি যে জোট নিরপেক্ষতার বিসর্জন নয় বরং তা আমেরিকা ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রতি পূর্ব-সম্বন্ধের সঙ্গে সুসংগত, তা বোঝাবার জন্য গলদঘর্ম পরিশ্রম করেছেন। পার্লামেন্টে প্রচুর প্রশ্ন, উত্তর ও জল্পনা কল্পনার ডামা-

আসেন। কংগ্রেস, সি এস পি, সি পি আই পরিচালিত ইউনিয়নের প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রমিকরা চম্বিশ ঘন্টা সফল ধর্মঘট করে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতি বিদ্রোহ জ্ঞানান। অশোকনগর স্টেশন-বাজার, গোলবাজার সহ সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। অশোকনগরের সর্বত্র অনেকগুলি বিক্ষোভ মিছিল করে শ্রমিকরা শাসকশ্রেণীর এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে চোম্পাই আগস্ট কল্যাণীর এক নং মিলের শ্রমিকরা চম্বিশ ঘন্টার ধর্মঘট পালন করেন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে পনেরোই আগস্টের আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীবিশ্বাসকে তারকাটাল দলের লোক বলে উল্লেখ করে সংবাদ পরিবেশন করায় তাঁর ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে।

ডোল থেকে মোটামুটি কয়েকটি উদ্দেশ্য স্বার্থ এবং হেতুর যুগপৎ স্বল্প ও সহাবস্থানের চিত্র দেখা যায়। প্রথম, আমেরিকার জনমতকে ভারত-রুশ মৈত্রীর অক্ষুণ্ণে বিশ্ব করে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ হয়, এবং তাকে বাধ্য করে, মর্জিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলা দেশে কোনো প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক আপোসে রাজি হতে; দ্বিতীয় পাকিস্তানের শাসকবর্গের মাঝে ভারত-রুশ মৈত্রী রূপী জুজ্বল আতঙ্ক পয়সা করা, যাতে তারা চীনের চোকাঠ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের দরজায় দরবার করে; তৃতীয়, যেহেতু ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের রসদ, বৈদেশিক পুঞ্জি সাহায্যের শতকরা পঁচাত্তর ভাগেরও বেশী সৌভিল্যে রাশিয়া ও তার প্রভাবিত পূর্ব স্লোভেন দেশ-গুলির বাহির থেকেই আসে, সেহেতু ভারত-রুশ মৈত্রী, ভারত আমেরিকা প্রীতিসম্বন্ধকে পুনর্বীর চাংগড় দিয়ে বাড়িয়ে তুলুক এটাও সরকারী মহলের হিসাব।

নতুন রাজ্যপাল

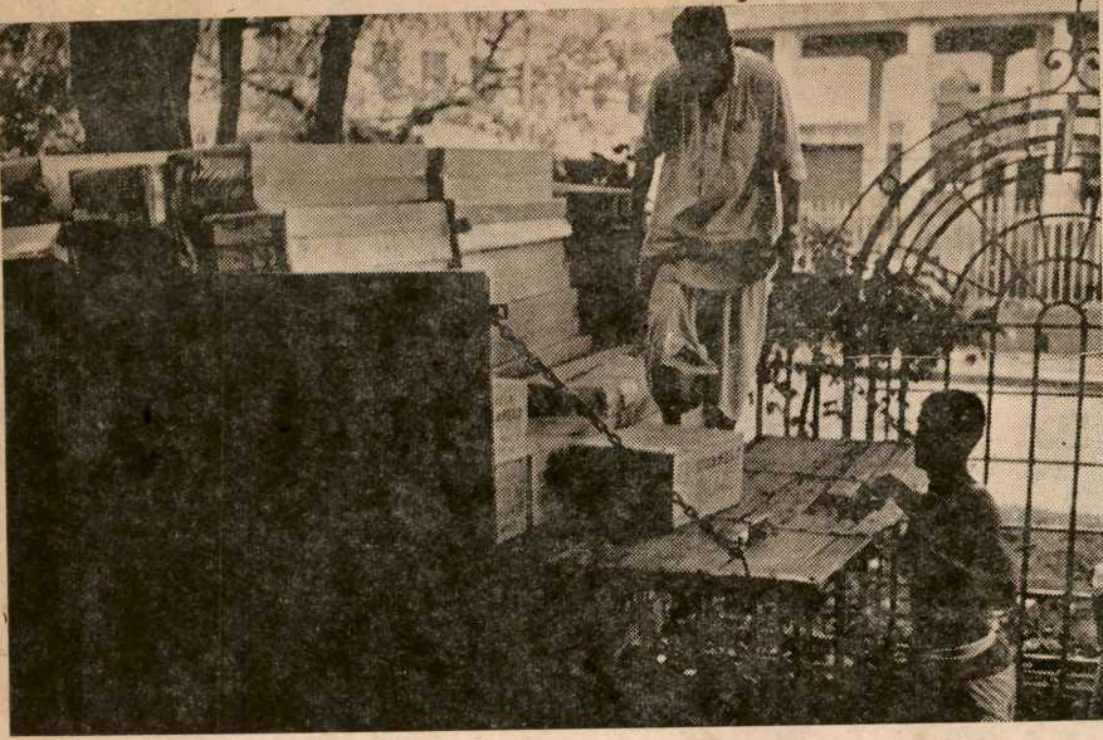
(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কেননা সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির শাসন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনেই পরিচালিত হয়। পশ্চিম সাহেবের রাগের কারণও আছে। পশ্চিম বঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পাঠানোর প্রস্তাবে প্রথম পন্থ সাহেবের নাম উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করে ঐ নাম কাটিয়ে নিজের নাম বাসরে নিয়েছিলেন।

ধাবান সাহেব চলে যাবার পর একটা ধারণা হয়েছিল, সিদ্ধার্থ রায় এবার রাজ্যের নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। কিন্তু এখনই দেখা যাচ্ছে, নতুন রাজ্যপাল ডায়াল সাহেব ঠোটো জগন্নাথ হবার জন্যে আসেন নি। তিনি প্রথমেই বিভাগীয় সেক্রেটারীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, বৈঠকে সিদ্ধার্থ

রায়কে ডাকা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ স্থির করেছেন, নিয়মিত রাইটাস বিল্ডিংয়ে বসবেন। ডায়াল সাহেব আই সি এস ছিলেন। শাসনমন্ত্র পরিচালনায় প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। ধাবান সাহেবকে “আধ পাগলা” বলে অস্বীকার করা যদি বা সম্ভব হতো ডায়াল সাহেবকে তা করা চলবেনা। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রপতির শাসনে রাজ্যপালই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ডায়াল সাহেব নিশ্চয়ই সেই ক্ষমতা ছাড়বেন না। সবশেষে রাজ্যপালের নিয়োগকর্তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর। সেই দপ্তরের মন্ত্রী পন্থ সাহেব যখন মদদ জোগাবেন তখন সিদ্ধার্থ রায়কে টাইট করতে কতদিন আর লাগবে?

অন্যদিকে বিজয় সিং নাহারের দল তো সিদ্ধার্থ রায়ের পিছনে ফিঙের মতো লেগে আছে।



গত ১৩ই আগস্টে দর্পণে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, বেলতলা রোডে অবস্থিত মোটর ভেহিকলসের বাড়ির ওপর তলায় পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী এ বি মদুজারী ফ্যাটে শরণার্থীদের কিছন্ন গ্রাণসামগ্রী পাচার করা হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে সেই গ্রাণসামগ্রী লরী বোঝাই হচ্ছে সেখান থেকে অন্যত্র পাচার করার জন্য।

যাত্রার সংবাদ

কে কোন পালা নিয়ে ব্যস্ত

যাত্রাসিক

যাত্রার মরশুম শুরু হয় শারদায়ী পূজা থেকে। শ্রাবণ-ভাদ্র দুই মাস চলে বিভিন্ন নাটকের মহড়া বা রিহাসাল। এবছরে বিভিন্ন যাত্রার দল গঠন-পর্ব শেষ হয়ে এখন নতুন পুরাতন পালাগুলির রীতিমত রিহাসাল চলছে। কলকাতার ফুটবল দলের মতও চলে এখানে দল পরিবর্তন। বিভিন্ন দলের নতুন পালা ও দলগত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিবছর পনেরোই আগস্টের মধ্যে।

পশ্চিম বঙ্গের অনিশ্চিত অবস্থার উপর ভরসা করতে না পেরে এবছর বেশ কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর যাত্রার দল গোড়া থেকেই আসাম পরিভ্রমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মনে হচ্ছে এবছর আসাম গ্রিপদায় যাত্রার আসর জমে উঠবে। সাধারণতঃ লক্ষ্মীপূজার পর থেকেই আসানসোল ধানবাদ কোলিয়ারী অঞ্চলে যাত্রার আসর থাকত জমজমাট। কিন্তু কয়েকবছর যাবৎ উক্ত অঞ্চলে যাত্রা বা কোনরকম উৎসবের আয়োজন যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। বর্তমানে পূজা থেকে টাটানগর রাঁচি-ঝাড়গ্রাম অঞ্চলেও যাত্রার চাহিদা বেড়েছে।

এবছর পূজা থেকেই আসাম পরিভ্রমার যাচ্ছে সত্যম্বর অপেরা, নাট্যভারতী নিউ রয়েল বীণাপাণি, মাধবী নট্য কোম্পানী, শিল্পতীর্থ প্রভৃতি দলগুলি। কালীপূজার পর তরুণ অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা প্রভৃতি দলও আসাম সফরে যাবে বলে শোনা যাচ্ছে।

এতদিন যাত্রায় পুরুষ অভিনেতা দিয়ে নারী চরিত্রের অভিনয় করিয়ে নট্যকোম্পানী যাত্রার পুরনো বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন কিন্তু বর্তমান বছরে তারা নারী চরিত্র দ্বা একজন মহিলা শিল্পী দিয়ে অভিনয় করবেন।

পশ্চিমবঙ্গে ও ডুয়ার্সে এবার আসর জমাবার জন্য থাকছে নট্য কোম্পানী নিউ প্রভাস অপেরা, নিউ আর্থ অপেরা, ভারতী অপেরা অম্বিকা নাট্য কোম্পানী প্রভৃতি দলগুলি। লোকনাট্য ও জনতা অপেরা পশ্চিম বঙ্গে কিছুদিন গাওয়ার পরে আসাম যাবে বলে শোনা যাচ্ছে।

কুহেলী

রহস্য সৃষ্টিতে ব্যর্থতা

মৃগাঙ্কশেখর রায়

“কুহেলী” ছবির আরম্ভে অন্ধকারের বক চিরে এঞ্জিনের হেডলাইট যখন ক্যামেরার দিকে তেড়ে আসে রহস্যের সূর্য তখন থেকেই। নিব্বদমগড়ের প্ল্যাটফর্মে গভীর রাতে একজন মাত্র মহিলা ট্রেন থেকে নামেন, গা-ছমছমে অন্ধকারে তাঁর নৈশ অভিযান শুরু হয়। গাড়ী এসে থামে একটী বড় প্রাসাদের কাছে, মহিলা ভেতরে ঢোকেন আর অর্মানি সূর্য হয় অদৃশ্যকন্ঠের গান, শোঁ শোঁ হাওয়া

এই সপ্তাহ থেকেই কলকাতার বিভিন্ন যায়গায় বিভিন্ন দলের নতুন পালার উদ্বেদন হয়েছে। ইতিমধ্যে নিউ প্রভাস অপেরার নতুন নাটক “রাহু-মুন্ড রাশিয়া” নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে। একুশে আগস্ট মহাজাতি সদনে লোকনাট্য তার নতুন পালা “কালিন্দী” অভিনয় করেছে। নাট্য ভারতীর “আদর্শ হিন্দু হোটেল”এর শ্রুত উদ্বেদন হলো গত বৃহস্পতিবার পাঁচশে আগস্ট। মঙ্গলবার চব্বিশশে আগস্ট মহাজাতি সদনে হচ্ছে নাট্যভারতীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী দেশাত্মবোধক পালা বিনয়-বাদল-দীনেশ।

বইতে থাকে, দৃশ্য শেষে স্বভাবতই মহিলাটি ভিরিমি খেয়ে পড়েন। মহিলার নাম সেবা মিত্র, উনি এসেছেন এই প্রাসাদের মালিক শঙ্কর রায়ের একমাত্র মেয়ের গর্ভনৈস হয়ে। শঙ্কর রায় সব সময়ই কেমন উদ্ভ্রান্ত, উন্মনা। খোঁজ নিয়ে সেবা জানতে পারে যে সবাইয়ের সন্দেহ হয় শঙ্কর তার স্ত্রী অপর্ণাকে খনন করেছে। যদিও প্রমাণ-ভাবে আদালত তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এক দুর্বল মনুষ্যের

শারদীয় দর্পণ

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে

॥ তিনটি উল্লেখযোগ্য রচনা ॥

নকশালী আন্দোলনের রিপোর্ট

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি

অঞ্চলে এই আন্দোলনের

শুরু, তারপর এম এল পাটি

গঠন, জোতদার খতম

অভিযান, শহরে স্কুল কলেজ

পোড়ানো, শ্রেণীশত্রু খতম

অর্থাৎ নকশালী আন্দোলনের

একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র

লিখছেন চাণক্য সরকার

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক

আবর্তন

পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেসের একাধিপত্য

শেষ হল : ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে।

তারপর ঘটনার গতি অতি দ্রুত।

এই রাজনৈতিক ঘটনার তথ্যচিত্র

তুলে ধরেছেন

কাজল সেন

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম

লিখছেন শফিকুল হাসান

অষ্টাঙ্ক রচনার বিবরণ আগামী সংখ্যায়

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা

মফঃস্বল এজেন্টরা কে কত কপি চান

দর্পণের সাকুলেশন মানেজারকে

লিখুন।

কলকাতার এজেন্টরা কে কত চান

দর্পণের কলকাতা এজেন্ট

ভগবত ওয়াকে জানিয়ে দিন।

শঙ্কর সেবার কাছে তার নির্দোষতা সমন্বয়ে অপরাধীর সমস্ত কম প্রমাণের জন্য সমস্ত কথা খুলে কাণ্ড বিশ্বাসযোগ্য হয়ে তারও কোন চিহ্ন নেই ছবিতে বলে এবং ঘটনার পশ্চাৎপটও তার কোন চিহ্ন নেই ছবিতে আমাদের জানা হয়ে যায়। সেবার যদিও শেষ অর্ধি অপরাধী একটু গোয়েন্দাগিরির শখ চাপে। মরখোস খোলে না। তবুও এ ছবি বহু আগড়ম্ব-বাগড়ম্ব ঘটনাবলীর অনেক উপাদানই বহু বাবু শেষে আসল অপরাধী ধরা পড়ে। এমনি প্রতিনিয়র গান এবং যম চরিত্রের অনুপ্রবেশ। ক্যামেরা শব্দ চরিত্রের অনুপ্রবেশ। ক্যামেরা শব্দ মাত্র আলো-অন্ধকারে অর্থহীন প্যাটার্নের অদৃশ্য কারকুর রচনা ব্যস্ত থেকেছে। সত্যিকারের ভয় রহস্যের আবহাওয়া তৈরি করে পারেন। দুটি জিনিস থেকে অন্ধদের রক্ষা করেছেন পরিচালক শঙ্কর-সেবার প্রেমপর্ব এবং শেষে অবধারিত চোর পদূলিশের লুচর চরিত্র বাদ দিয়ে। নাহলে অন্য বিচারে “কুহেলী” একেবারেই রহস্যময় ছবি।

সম্পাদক—হীরেন বসু

প্রকাশক—কর্তৃক মডার্ন ইন্সটিটিউশন প্রেস এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১০ থেকে মূল্য ৩১নং মঠ সেন, কলিকাতা-১০ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

প্রধানমন্ত্রী খুশি

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

শোনা যাচ্ছে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কাশীপুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিশেষ তদন্ত করেন। নানা রিপোর্ট সংগ্রহ করে দেখেন সমস্তই স্বাভাবিক। পুলিশ ঠিয়ামত কৈফিয়ৎ দিতে পারে নি চাঁবদশ ঘণ্টার একটানা হত্যাকাণ্ড কেন ওরা নিষ্ক্রিয় ছিল।

শেষ পর্যন্ত নিজ দলের রিপোর্টের ওপর ঠুকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। ইন্দিরাজী খুশি হয়েছেন শরনে কাশীপুরের ঘটনা নব কংগ্রেসী নেতৃত্বে উদ্ভাল গণ-অভ্যুত্থানেরই প্রকাশমাত্র।

দর্পণ

নব কংগ্রেসের ভবানী ব্যানার্জী রাজনীতির খেলা খেলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৪শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা ৥ শ্রুতবার ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন

প্রধানমন্ত্রীর 'ইংগিতের' পর অতৃপ্ত তীব্রতর

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসের ভাবী সভাপতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার "ইংগিতের" পর প্রধানমন্ত্রীর নব কংগ্রেসীদের খেয়ালে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংবাদপত্রে বেরিয়েছে ইন্দিরা নাকি অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জীকে নতুন সভাপতিরূপে দেখতে চান। খবরটি বেরবার সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেসীদের এক বিরাট অংশের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ইন্দিরাজীর "ইংগিতকে" চ্যালেঞ্জ করতে পারেন বর্তমান অস্থায়ী সভাপতি আবদুস সাব্বার। সাব্বার সাহেবের পেছনে দাঁড়াচ্ছেন সিদ্ধার্থ রায়ের বিরোধীরা। অবশ্য আগেই দর্পণে বেরিয়েছে, কলকাতা এখনও বিজয় সিং নাহারের হাতে। দর্পণের আর একটি সংবাদেরও সমর্থন মিলেছে। সেটি হচ্ছে, সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী বিজয় নাহারকে প্রধানমন্ত্রী নয়াদিম্মী ডেকে পাঠিয়েছেন। সেখানে বিজয় নাহার যদি কড়া মনোভাব দেখাতে পারেন তবে দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জীর কংগ্রেস সভাপতি হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রীর ইংগিত কাগজে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থ-বিরোধী নব কংগ্রেসীরা প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছেন, এটি সিদ্ধার্থ রায়ের "ম্যানিপুলেশন"। পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনে এভাবে ওপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপানো কিছতেই সহ্য করা হবে না। দর্পণে আগেই বেরিয়েছে, সিদ্ধার্থ রায় মুখে তরুণকান্তিকে সমর্থন করার কথা বললেও আন্তরিকভাবে চাইছেন দেবী চ্যাটার্জীকে। কেননা, দেবী চ্যাটার্জীকে রাজ্যসভার সদস্য উনিই করিয়েছেন। আগে দেবী চ্যাটার্জী ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কার্ড হোল্ডার সদস্য। অতুল্য ঘোষ ঠুকে কংগ্রেসে আনেন। পরবর্তী পর্যায়ে সিদ্ধার্থ রায় ঠুর পৃষ্ঠপোষক হন এবং সিদ্ধার্থ

রায়ই প্রধানমন্ত্রীর মারফৎ ঠুকে কংগ্রেস সভাপতি করতে চান। কেননা, এটি হলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেস সংগঠনও (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

পশ্চিম বাংলার নব কংগ্রেসী মহলে নবাগত কে এই ভবানী ব্যানার্জী? বাংলা দেশের শরণার্থীদের নিয়ে রাজনীতি করার জন্যে উনি কোথা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন? বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির মাতব্বর এই ভবানী ব্যানার্জী শরণার্থীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত (পলিটিক্যাল মোটিভেশন) করার জন্যে তিন মাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় এক বাজেট রচনা করেছেন। বাজেটের বরাদ্দ টাকা হচ্ছে এগারো লক্ষ চৌদ্দ হাজার। এই বাজেটের কাঁপ দর্পণের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, ভবানী ব্যানার্জী কোথা থেকে এই বিপুল টাকা সংগ্রহ করছেন।

স্ট্রীর পরিচয়ে ভবানী ব্যানার্জীর পরিচয়। ওর স্ত্রী মকুল ব্যানার্জী অবিভক্ত কংগ্রেসের এ-আই সি সিএ কর্মচারী, অফিস সম্পাদক ছিলেন। শোনা যায় তখন ইন্দিরা গান্ধীকে কংগ্রেসী নেতাদের শলাপরামর্শ সংক্রান্ত খবর গোপনে সরবরাহ করতেন। তার বিনিময়ে মকুল ব্যানার্জীকে গত লোকসভার নির্বাচনে নব কংগ্রেসী টিকিট দেওয়া হয় এবং মকুল ব্যানার্জী দিল্লী থেকে নির্বাচিত হন। ওরা দিল্লীতেই থাকতেন এবং পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে কোন যোগসূত্ৰই ছিল না।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনের পর থেকে মকুল ব্যানার্জীর (শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর তিনদিনব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ সফর শেষ করলেন গত বৃহস্পতি বিস মিনিটের এক প্রেস কনফারেন্সে।

কনফারেন্স আরম্ভ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে ইন্দিরাজী হাজির হন। আগে রাজভবনে ওঁকে সরকারী কর্মচারীরা প্রেস কনফারেন্সের শরৎ হওয়ার সময় বার বার স্মরণ করিয়ে দেন।

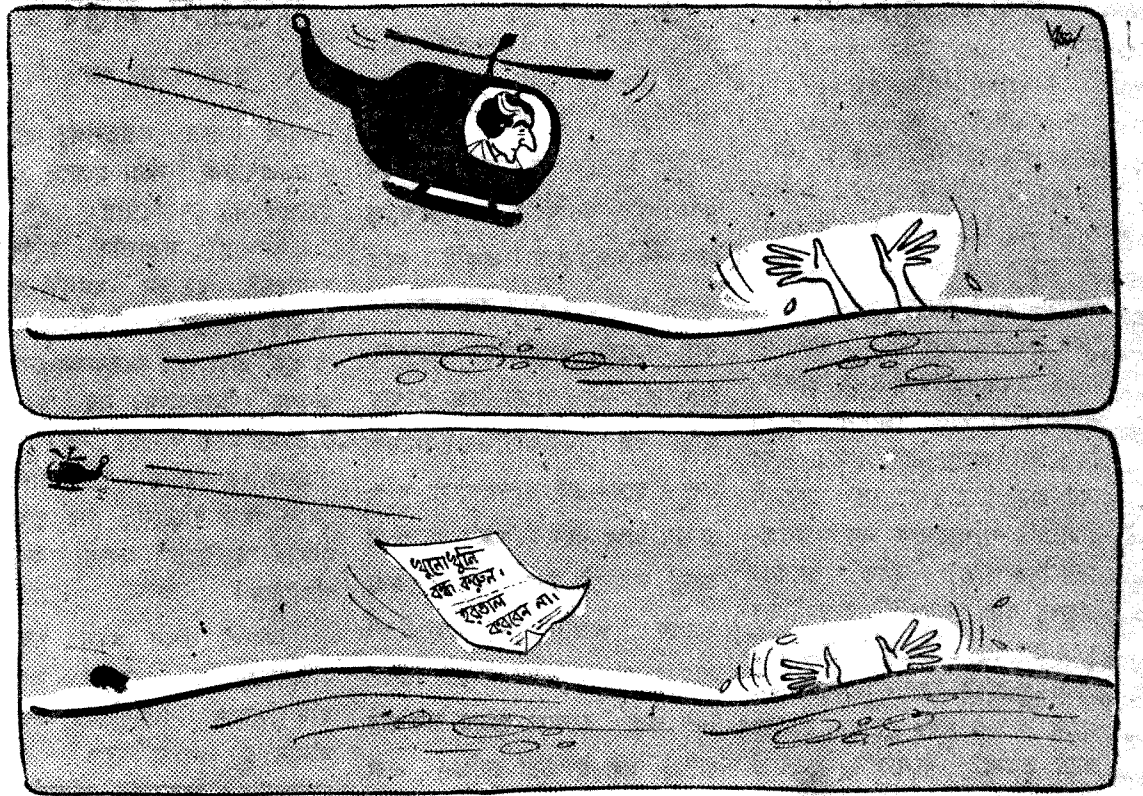
অবিচলিত ইন্দিরাজী বলেন, "ওরা আমার জন্য বসুক।" গলার সঙ্গে প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য-ঠিক ওর বাবার মত।

বাবার নাটুকেপনা সব আয়ত্ত করেছেন ইন্দিরাজী—তাড়ৎ গতিতে বন্যাগল আর উন্মত্ত শিবির পরিভ্রমণ, ঝটপট সমস্ত প্রভাবগোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে এবং আলাদাভাবে দশ-পাঁচ মিনিটের সভা, সমস্ত কিছু ঠিক করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, আর প্রচারমুখী সচেতনতা—বাবার সব গুণই ওঁর আয়ত্তাধীন।

তবে যেহেতু উনিবিংশ শতাব্দীর জের হিসাবে যে আবেগপ্রবণতা নেহেরুজীকে অনেক সময় বিপদে ফেলেছে, সেই দোষ মেয়ের মধ্যে নেই। ইংরাজীতে যাকে বলে রথলেস।

খবে প্রাকটিক্যাল—ধরে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রধান শত্রু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। তাই যখন বিভিন্ন দলের সঙ্গে যুক্ত বৈঠকের প্রহসন করেন তা থেকে মার্কসবাদীদের বাদ দিয়ে দেন।

এই পদক্ষেপ নব কংগ্রেসের এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



নবকংগ্রেসীদের ফ্যাসিবাদী আচরণ আভা মাইতিদের জ্ঞানোদয়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আভা মাইতি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি করে তিনি এ ধরনের জঘন্য, ইতর ব্যবহারের সম্মুখীন কখনও হন নি। নব কংগ্রেস অফিসে তরুণ তরুণী কম্পীরা আভা মাইতির শাড়ী খুলে নিয়ে চ্যাংদোল্লা করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

শ্রীমতী মাইতি নব কংগ্রেস অফিসে অনশন করতে এসেছিলেন গান্ধীবাদী কায়দায় মেদিনীপুরে সংগঠন কংগ্রেসের অফিস নব

কংগ্রেসীদের দ্বারা জবর দখলের প্রতিবাদে। লাঞ্ছিতা মাইতি এখন চৌরঙ্গীতে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সেই অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীমতী মাইতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর কাছে এক পত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন যে নব কংগ্রেসী অসভ্য ছোকরাদের ফ্যাসিবাদী আক্রমণের কোন নিন্দা ইন্দিরাজী করেন নি। এর পরিণাম ভয়াবহ।

ঠেলায় পড়ে আজ শ্রীমতী

মাইতির জ্ঞানোদয় হচ্ছে এটা আশার কথা। বিশ বছর ধরে অতুল্যাবাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসীদের পশ্চিমবঙ্গে নবাবীর কাহিনী আভা মাইতির ভোলায় কথা নয়। নোংরামী, যৌন বিলাস, ধনবানের অর্থ সাহায্যে পার্টির জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদোপম গৃহ ইত্যাদি নানা দুর্নীতির ছাপ অতুল্য ঘোষের স্বকীয় অবয়বে প্রতিফলিত। মানুষ ভোলে না, তার প্রমাণ (শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

বঙ্গালীর লজ্জা

অশালীনতার 'রেকর্ড' স্থাপন করেছে পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসের দলের ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেস। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেত্রী অনশনরত আভা মাইতিকে ওরা শূন্য অসম্মানই করেনি, তাঁর পর-ণের শাড়ীটি পর্যন্ত খুলে নিয়ে বাঙ্গালীর শালীনতাবোধে চরম আঘাত করেছে। এই ঘটনা যখন গত মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতায় নব কংগ্রেস অফিসে ঘটিছিল তখন ওখানে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত যুব কংগ্রেসের সভাপতি, লোকসভা সদস্য প্রিয় মন্সী এবং ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুরত মুখার্জী। এই দুই 'উর্জিত নেতা' কিন্তু একবারও বাইরে এসে জাতির এই চরম লজ্জাকে প্রতি-রোধ করেন নি।

আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা

হচ্ছে, একজন মহিলার অপমানের পরেও ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত দুই 'উর্জিত নেতা'কে বিন্দোমাত্র ভৎসনা করেন নি। বরং ওঁদের নিয়ে খোলা জীপ গাড়ীতে ঘুরেছেন। গাড়ী চালিয়েছেন সিদ্ধার্থ রায়। কি বিচিত্র এই দেশ! আভা মাইতির সঙ্গে রাজনৈ-তিক মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু একথা কে না জানেন, আজীবন কংগ্রেসকর্মী আভা মাইতি একদা অবিভক্ত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমি-টির সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ছিলেন এবং মেদিনীপুরের মেয়ে আভা সবসময়েই কংগ্রেসী। 'উর্জিত নেতা'দের রাজনৈতিক জীবন শূন্য হবার অনেক আগে থেকেই আভা মাইতি পশ্চিম বাংলায় প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদের একজন। সেই

আভা মাইতিকে সেদিন মাটির খুঁড়ি, সিঁগারেটের টুকরো, অসভ্য কথা আর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী দিয়েই ওরা ক্ষান্ত হয়নি, প্রকাশ্য রাজপথে ওর পরণের শাড়ীটি পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল। আরো যে কুৎসিত আচরণ করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সহকর্মী বিভা মিত্র শাড়ীটি ত্যাগ-তাড়ি কুড়িয়ে এনে শ্রীমতী মাইতির লজ্জা নিবারণ করেন। কিন্তু ওঁর লজ্জা নিবারণ হলেও বাঙ্গালীর লজ্জা হরণ হয়েছে। আমরা এই ঘটনায় স্তম্ভিত। কোন সমবেদনা জানাবার ঘটনা এটি নয়। 'তবু আভা মাইতিকে বলতে চাই এ আপনার অসম্মান নয়। বাঙ্গালী জাতির অসম্মান।

এই প্রসঙ্গে প্রফুল্ল সেনকে একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলা দর-কার। আপনি কি এই কাজ করার জন্যেই কুখ্যাত নব কংগ্রেস-জীং মন্ত্রিসভাকে আদি কংগ্রেসের দুই জন এম এল এর সমর্থন দিয়ে-ছিলেন? আপনার লজ্জা করছে না?

উত্তরবঙ্গ সমাচার

সরকারী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

কোচবিহার ম্যাজিস্ট্রেট অফি-সের জনৈক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ছয় লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভি-যোগ পাওয়া গেছে। মজুরদের টাকা দেবার অজুহাতে বিভিন্ন সময়ে ঐ টাকা প্রায় এক বৎসর বাবং স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয়েছে। ড্রাশবের বিষয়, কর্মচরীটি নাকি মাস দুই আগেই পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন। অথচ এই দুই মাসে এ ডি এইচ ও সাহেব তা ট্রেজারীকে জানাননি এবং দীর্ঘদিন কাগজপত্রও না দেখে চেপে ছিলেন।

আরও জানা গেছে, অফিসারটি নাকি অগ্রিম বিলের ফরমে সই করে রাখতেন, যা সরকারী রীতি বিরুদ্ধ। তিনি গত এক বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার বাড়ী, ট্রাক, ট্যাক্সি, মোটর, সাইকেল এতসব করেও আমাদের চোখস ভিজিলেন্স বিভাগ এবং পুলিশের নজরে পড়েন না।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু কর্মচারী সন্দেহভাজ্য: পাঁচই আগস্ট তারিখে এ ডি এইচ ও কে ডাকেন। অথচ তিনি দেখা করেন নয় তারিখে এবং উপরোক্ত বিলের সই যে তার নয়, তিনি তাও স্বীকার করেন।

শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র

শিলিগুড়িতে একটি বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিছুকাল আগে। কিন্তু এটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র নয়। এটি রিলে স্টেশন। সপ্তাহে দুদিন পনের মিনিট করে প্রান্তিক নামে একটি নিজস্ব অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। তবে এটি অত্যন্ত একঘেয়ে, কোন বৈচিত্র্য নেই। প্রচার অর্থব্যয়ে এই রিলে স্টেশন করা হয়েছে, অথচ এর সাধকতা কোথায়। এখানে বেতার কেন্দ্রের নিজস্ব কোন স্টুডিও নেই। অথচ স্থানভাব নেই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছা থাকলে অর্থভাব হওয়ারও কথা নয়। কিন্তু কে উদ্যোগী হবে? অবি-লম্বে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটিকে পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। এই বেতার কেন্দ্রে প্রতিমহাতে অজস্র শান্তিক ঘটি লক্ষিত হয়। সবচেয়ে অসুবিধে, বৈদ্যুতিক গোলযোগ। যখন তখন বন্ধ হয়ে যায় অনুষ্ঠান এবং নিরুপায় ঘোষক ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত হতে হতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে

যায় এবং আধুনিক সঙ্গীতের সরে টেপে বাজান হয়। অন্য-স্থান করলে শোনা যায় ওটি 'ফিলার'। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে সুরই তো ফিলার হতে পারে।

শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের অঘো-ষিত রাজধানী। এখানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বেতার কেন্দ্র অনায়াসে চলতে পারে। কাশীনাথ-এর মত ছোট শহরে একটি পূর্ণাঙ্গ-বেতার কেন্দ্র আছে। তবে সেখানে 'নেপালী হিন্দী তিব্বতী' সিকিমী ভূটানী ভাষাই বেশি শোনা যায়। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায়, বহু শিল্পী, কবি সাহিত্যিক আছেন। তাদের কলকাতার মুখ চেয়ে থাকতে হয়—অনেক প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে। ওখানে ঠাই নেই, সুযোগ পাওয়া কঠিন। শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে উত্তরবঙ্গের নিজস্ব সংস্কৃতি প্রচা-রের ও প্রসারের মাধ্যম পওয়া বাবে।

কলিকাতায় ইন্দিরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। মনে হয় শান্তির উদ্দেশ্যে ছাব্বিশ পার্টির বৈঠক আর ডাকা হবে না।

আগেকার সেই একই কায়দায় সরকারী পরসায় নিজ দলের কাজ কর্মের ব্যবস্থা। যেমন নব কংগ্রেসটি যবে ছাত্র সভায় যোগদান ইত্যাদি।

কলকাতায় অবস্থানকালে ইন্দি-রাজী সব চেয়ে বেশী সময় দিয়ে-ছেন মহাজাতি সদনে যুব ছাত্রদের সভায়। অনেকক্ষণ ধরে বসে শূন্য ও শেষের গান শোনার পর্যন্ত সময়ের অভাব তাঁর হয় নি।

আর যারা অনেক আশা করে পশ্চিমবঙ্গের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গেছেন তাঁদের জন্য পাঁচ-দশ মিনিটের সময় দিতে পারেন নি।

সারা দেশে ইন্দিরাজীর জয়-জয়কার—খালি পশ্চিমবঙ্গে একটু গোলমাল। তাই এই রাজ্যে তিন দিনের সফর আর এত ঢাকঢোলার বাদ্য।

আভা মাইতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আভা মাইতি ও তাঁর দলের বর্ত-মান অবস্থা।

তবে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ শূন্য হয়েছে বলে আভা মাইতি যে অভিযোগ করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। এই আক্রমণের নশন প্রকাশ কিছু-দিন ধরেই লক্ষ করা যাচ্ছে। বধ-মানের আহ্বাদীপদের আর কাশী-পরি-বরানগর অঞ্চলে ব্যাপক হত্যায় এই আক্রমণের ভয়াবহ রূপের ভয়-ঙ্কর প্রতিফলন।

আভা মাইতি অভিযোগ করে-ছেন যে, নব কংগ্রেসী যুব নেতা ও ছাত্র নেতাদের উপস্থিতিতে তাঁকে অশ্লীল আক্রমণ করা হয়েছে, নানা অশ্লীল ইঙ্গিত ও অঙ্গ-ভঙ্গী করা হয়েছে সারা রাত ধরে। আহ্বাদীপদের, কাশীপদের পর এই ঘটনা নব কংগ্রেসীদের নতুন কর্মপন্থার পরিচয় দেয়।

ভবানী ব্যানার্জী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্বামী এই ভবানী ব্যানার্জী কল-কাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিজাম প্যালেসের হোটেলে বাস করছেন। যে ফ্ল্যাটে আছেন স্টেট বলীরাম ভগতের নামে ভাড়া। মাঝে মাঝে খবর বের করা হয়, ভবানী ব্যানার্জী নাকি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আস্থা-ভাজন এবং তার গোপন দূত। কিছুদিন আগে এই মর্মেও খবর বের করা হয়েছিল যে, ভবানী ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রে-সের সভাপতিও হতে পারেন। অবশ্য, যারা কংগ্রেসী রাজনীতির খবর রাখেন তাঁরা এই সংবাদে কোন গুরুত্বই দেননি। কয়েকদিন আগে আবার খবর বেরোল, কে বা কারা ভবানী ব্যানার্জীর ফ্ল্যাটে ঢুকে তাঁকে অজ্ঞান করে কিছু কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু টাকা পরস্যা ছোঁয়নি। মোট কথা ভবানী ব্যানার্জীর নাম বাজারে চালু করা আছে।

নবাগত এবং রহস্যময় এই ভবানী ব্যানার্জী সম্পর্কে দপর্শ খোঁজ করেছিল। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওঁর হাতে অচেল টাকা। যুব কংগ্রেসের প্রিয়দাস মনসি আর ছাত্র পরিষদের সুরত মুখার্জীকে প্রায়ই ওর ফ্ল্যাটে আনা-গোনা করতে দেখা যায়। ভবানী ব্যানার্জী বাংলাদেশ সহায়ক সমি-তির মাতাম্বর। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি নামে একটি কমিটি করে উনি সি পি এম বিরোধী কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে কয়েকবার বৈঠক করে বাংলাদেশ শরণার্থীদের রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত করবার জন্যে এক বাজেট তৈরী করেছেন। বাজেটেই উপরোক্ত তথ্য দেওয়া

হয়েছে। বাজেটে আরও বলা হয়েছে, এই কাজ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় এবং চীফ সেক্রেটারীর আলোচনা হয়েছে। নদীয়া, মর্শিদাবাদ, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়িতে একটি করে ক্যাম্প স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত করার জন্যে কিছু সংখ্যক সক্রিয় কর্মী (এ্যাকটিভিস্ট) নিয়োগ করতে হবে। এই ক্যাম্পগুলো পরি-চালনা এবং ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থার জন্যে বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া দশ লক্ষ টাকা লাগবে বলা হয়েছে। আরও সুপা-রিশ করা হয়েছে, প্রচার ব্যবস্থার দায়িত্ব অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং এদের ফিল্ড পাবলিসিটি ইউনিট-গুলির ওপর দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য খরচ ধরে মোট এগারো লাখ চরাস্তর হাজার টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে।

দপর্শ এখনও সন্নির্দিষ্ট ভাবে বুঝতে পারছে না, এই বাজেট কবে কার কাছে পেশ করা হয়েছে। তবে বাজেটের ভাষা দেখে মনে হচ্ছে, এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যোগাযোগ আছে এবং গোপন সূত্রে ভবানী ব্যানার্জীকে টাকা দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, টাকা কি শূন্য শরণার্থীদের নিয়ে কংগ্রেসী রাজনীতি করার জন্যে ঢালা হচ্ছে কিংবা পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসের যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদকে আরো 'সংগ্ৰামী' করার জন্যে খরচ করা হচ্ছে।

কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধার্থ রায়ের করতলগত হবে। আর এখানেই সুরত হয়েছে নব কংগ্রেসীদের খেয়োখোয়ি।

অস্থায়ী সভাপতি আবদুস সাত্তারকে এতদিন সমর্থন কর-ছিলেন উত্তরবঙ্গের বরকত খান-চৌধুরী এবং আর কয়েকজন নেতা। অবশ্য, উত্তরবঙ্গের নব কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বানবনা নেই। কিন্তু তরুণকান্তি ঘোষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর প্রধান-মন্ত্রীর 'ইংগিত' অবস্থা অনেক পালটেছে।

অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, আবদুস সাত্তার যদি সিদ্ধার্থ বিরোধীদের একমাত্র মনোনীত প্রার্থীরূপে দেবী চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন তাহলেও আমরা বিস্মিত হবো না। কেননা, সাত্তার সাহেব অমায়িকতার জন্য নব কংগ্রেসী মহলে জনপ্রিয় এবং সংগ-ঠনে তাঁর অবদানও আছে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ইংগিতটি সত্যিকারের ঘটনা কিনা। এখনই তরুণকান্তির সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হচ্ছে, 'ইন্দিরাজী কোনো বৈঠকেই মতা-মত জানাননি।' এই সংবাদ প্রকা-শের একটিমাত্র উদ্দেশ্যই থাকতে পারে। সেটি হোলো, ইন্দিরাজীকে না জড়িয়ে কংগ্রেস সভাপতি পদে দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জীকে নির্বাচিত না হতে দেওয়া এবং সেই খেলায় তরুণকান্তি ঘোষেরও যোগদান। উল্লেখযোগ্য, ইন্দিরা গান্ধী কল-কাতায় থাকতেই তাঁর 'ইংগিতের' কথা সন্নিহিত সংবাদপত্রে বেরি-য়েছে এবং তিনি সংবাদটির কোনো প্রতিবাদ করে যাননি।

বি আর গুপ্তের প্রমোশন নিয়ে দারুণ বিক্ষোভ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রশাসনে একটি প্রমোশন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উর্ধ্বতন পর্যায়ের দারুণ বিক্ষোভ এবং নব কংগ্রেসী মহলে তাঁর প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে। আলোচ্য প্রমোশনটি হচ্ছে বি আর গুপ্তকে (আই এ এস) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এডিশনাল সেক্রেটারী করে কেন্দ্রের পশ্চিম বঙ্গ সেলের ভারপ্রাপ্ত করা। উনি সিদ্ধার্থশংকর রায়ের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় দপ্তর পরিচালনা করবেন। অর্থাৎ সরকারের আটজন কমিশনার পর্যায়ের অফিসারকে ডিঙিয়ে বি আর গুপ্তকে প্রমোশন দেওয়া হবে। ফলে এই

আটজন অফিসার এখন একরকম প্রকাশ্যেই সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে সুরু করছেন। কেউ কেউ হাইকোর্টেও যেতে পারেন। কংগ্রেসীদের প্রতিবাদের কারণ হচ্ছে, অধুনামত কুখ্যাত কংগ্রেসী-লীগ সরকার বি আর গুপ্তকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারীর পদ থেকে সরিয়েছিল। সেই বি আর গুপ্তকে প্রমোশন দিয়ে ফিরিয়ে আনার অর্থ হবে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে অপমান করা।

বি আর গুপ্ত সম্পর্কে দর্পণ কোনো বিরূপ সমালোচনা কর-

ছেন। সাধারণ সিভিলিয়ন অফিসারদের অন্যতম বি আর গুপ্তের সত্যতার সন্ধান আছে। ঠুকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী পদ থেকে সরানো নিশ্চয়ই সঙ্গত হয়নি। কিন্তু একটি অসংগত কাজের প্রতি-কারের জন্যে সিদ্ধার্থ রায় যে পদ্ধতিতে বি আর গুপ্তকে কেন্দ্রীয় দপ্তরের এডিশনাল সেক্রেটারী পদে প্রমোশন দেবার প্রস্তাব করে-ছেন তা প্রশাসনিক স্তরে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। সরকারী চাকরীতে প্রমোশনের সময় সিনিয়রিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি। একমাত্র উপযুক্ত কারণ ভিন্ন সরকারী চাকুরিয়ারদের সিনিয়রিটি উপেক্ষা করা হয় না। যদিও কোথাও হয় তাও দুই একজন চাকুরিয়ার ক্ষেত্রে।

কিন্তু এখানে দু একজন নয়। আটজন কমিশনার পর্যায়ের অফিসারের সিনিয়রিটি উপেক্ষা করা

হচ্ছে। এই আটজন আর্টটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। সিনিয়রিটি অনুযায়ী বি আর গুপ্তের ওপরে যাদের নাম আছে তাঁরা হচ্ছেন অমিতাভ নিয়োগী, এস বি রায়, ভি এস সি ব্যানার্জী, আর ঘোষ, বি সি গাঙ্গুলী, এস কে ব্যানার্জী, শর-দিশ্দু, দত্তমজুমদার এবং জে সি তালুকদার। এঁরা সবাই কেন্দ্রীয়

দপ্তরে এডিসনাল সেক্রেটারী নিয়োগ প্রসঙ্গে দাবীদার হতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ রায় তাঁদের দাবী অগ্রাহ্য করতে চলেছেন। ফলে উচ্চতম পর্যায়ের দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে বি আর গুপ্ত নাকি সিদ্ধার্থ রায়ের আত্মীয় আর সেজন্যেই এই আনন্দোৎসব!

ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কিছু দমকল-কর্মীর অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের ফায়ার ওয়ার্কাস ইউনিয়নের বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য ইউনিয়ন কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিক বিরোধী দনীর্ষি এবং ইউনিয়নের তহবিল তছরূপের অভিযোগ করেছেন। উনিশ শো উনসত্তর সালের রাজ্য সম্মেলনের মাধ্যমে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার কার্যকাল ছিল সত্তর সালের জুলাই মাস পর্যন্ত। কিন্তু ঐ সদস্যদের অভিযোগ, ইউনিয়ন কতৃপক্ষ আজো পর্যন্ত নতুন কমিটি গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না। সাধারণ সদস্যদের পক্ষ থেকে যতবারই নতুন কমিটি গঠনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, ততবারই ইউনিয়ন কতৃপক্ষ কোন সন্তোষজনক উত্তর দেন নি। হচ্ছে হবে করেই কাটিয়ে আসছেন।

ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে ফায়ারম্যান, লিডার, ড্রাইভার, ক্রিনার এবং ওয়ার্কশপের বিভিন্ন কর্মচারীরা রয়েছেন। এদের প্রত্যেকের স্বার্থই জড়িত রয়েছে ইউনিয়নের কর্মসূচীর সঙ্গে। বেশ কিছুকাল আগে ফায়ারম্যানদের দিয়েই ক্রিনারের কাজ করানো হতো। কিন্তু পরে উপরমহলে চাপ সৃষ্টি করা হলে নতুন ক্রিনার নিযুক্ত করা হয়। ফলস্বরূপ বেশ কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন ফায়ারম্যানের চাকরী চলে যায়। ইউনিয়নের চাপে অবশ্য তাদের পুনর্নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে দক্ষ শ্রমিকের কাজ করানো, প্রাপ্য বেতন না দেওয়া, ডিউটি আওয়ারের সময় বৃষ্টি, কাজদুলাল লিভ কিংবা কমপেনসেটরী লিভ সংক্রান্ত সংযোগ সুবিধা চুক্তি মত পালন না করার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের ভেতরে এমনিতেই অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ঐ সদস্যরা আরও অভিযোগ করেন, ইউনিয়ন কতৃপক্ষ যখন আন্দোলনের মাধ্যমে উপর মহলের সঙ্গে চুক্তিতে আসেন, তখন তারা মূল সমস্যাকে দূরে সরিয়ে রাখেন, অথচ সাধারণ সদস্যদের কাছে চুক্তির সার্থকতার কথাই উল্লেখ করা হয়।

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রামেশ্বর ব্যানার্জীর উনিশশো ছেষটি ও সাতষটি সালে ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপের অভিযোগও করা হয়। ব্যাঙ্ক প্রকৃতপক্ষে ছত্রিশ

টাকা চল্লিশ পরস্যা জমা থাকা সত্ত্বেও উনিশশো আটষটি সালের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিশ হাজার তিনশো তেতাল্লিশ টাকার হিসাব দেওয়া হয় এবং ব্যাঙ্ক জমা দেখানো হয় সাত হাজার চৌদ্দ টাকা তিন পরস্যা। আসলে তারা যে দমকল ইউনিয়নের তহবিল তছরূপ করেছেন তা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এই ফায়ার ওয়ার্কাস ইউনিয়ন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গে যুক্ত। এ বিষয়ে ইউনিয়নের সভাপতি অরবিন্দ ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি এখনো পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়নের কিছু সংখ্যক সদস্যের পক্ষ থেকে বলাই ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন দত্ত জানিয়েছেন উনিশশো ছেষটি থেকে একাত্তরের আগস্ট পর্যন্ত কতৃপক্ষকে পরিষ্কার হিসাব দিতে হবে এবং একত্রিশে আগস্টের পরে বর্তমান কমিটিকে যদি সাধারণ সভাগণ অনুমোদন না দেন, তবে এই কমিটিকে অবৈধ গণ্য করা হবে এবং সংগঠনের স্বার্থে নতুন কমিটি গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হবে। প্রয়োজন হলে কমিটির অর্থসংক্রান্ত হিসাব বন্ধে নেওয়ার জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে।



সব বয়সের ছেলেদের জুতো

ছেলেদের জুতোর বিচিত্র ও সুন্দর সমাবেশ এখন বাটার দোকানে-দোকানে। ছেলে বলতে—ইস্কুলে যাওয়া ছোটো ছেলে, দৌড়াপ করে বেড়ানো দুরন্ত ছেলে, ফ্যাশন-সচেতন তরুণ এবং সেই সঙ্গে বয়স্ক সবাই—সকলের জন্যই হাল আমলের যাবতীয় জুতোর সমাবেশ এখন বাটার দোকানে। সব আলাদা আলাদা রঙের ও আলাদা আলাদা নকশার, যাকে যেটা সাজে। সুন্দর গড়ন, মার্জিত রুচি—সব মিলিয়ে চোখে-পড়া স্বাস্থ্য—যেরকম চাইবেন সেই রকমেরই পাবেন। সেই সঙ্গে প্রতি জোড়া বাটার জুতো আগাগোড়া আরাম দিয়ে গড়া।

পি-টু ৭৩ ৮.৯৫

জুনিয়র ২০ ১৪.৯৫—২০.৯৫

৩৯৫৫-১০০ ১৯.৯৫—২৬.৯৫

জুনিয়র ৫৯ ১৭.৯৫

স্টেপমাস্টার ৬২ ৩০.৯৫

এক্সট্রাসিড ৩৫ ৪৬.৯৫

এক্সট্রাসিড ১৯ ৪৬.৯৫

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ দিনের হার

বার্ষিক পনেরো টাকা

বাস্তবিক সাড়ে সাত টাকা

গ্রেমাসিক হার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, ৪১ লেন, কলি-১৩

Bata

অর্থনৈতিক মর্শন

জাপান-আমেরিকা নতুন স্বীকার কণ

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

মার্কিন চাপের কাছে আপাততঃ নতুন স্বীকার করে জাপান ইয়েন-ডলার বিনিময়ের হার আন্তর্জাতিক স্থির দর এক ডলার সমান তিনশো ষাট ইয়েন, এই হার অত্যন্ত পরাজয় দর অনুযায়ী ওঠানামা (ফ্লোট) করবে বলে স্বীকার করে নিল। আমেরিকা চেয়েছিল যে জাপান তিন ইয়েন মদ্রার দর আরো উচ্চ হারে বেঁধে দিক অথবা বাজার দর অনুসারে বেশ খানিকটা ওঠাপড়ার ব্যবস্থা স্বীকার করে নিক। এগারো দিন প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থেকে অবশেষে জাপান দ্বিতীয় শর্তটি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল।

গত এগারো দিন ধরে জাপানের ওপর আমেরিকা যে কি ভয়ানক আর্থিক চাপ দিয়েছিল তার একটা নমুনা : জাপানী ব্যাংকগুলি পরিবর্তিত অবস্থায় ডলার-ইয়েন বিনিময় হারে লোকসান হবার সম্ভাবনা দেখে, রপ্তানী বাবদ পাওনা ডলার ব্যাংক অব জাপানের কাছে বিক্রী করে ইয়েন সংগ্রহ করে নিচ্ছিল। ফলে ব্যাংক অব জাপানের হাতে বর্তমান সংকটের প্রথম সপ্তাহেই অতিরিক্ত চার হাজার ডলার কিসে জমা করতে হয়েছিল। অতএব বর্তমানে জাপানের হাতে মোট মার্কিন ডলার জমেছে সাড়ে বাঁচো হাজার মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ মার্কিন সরকারের হাতে যত সোনা ও ভাঙ্গানীর যোগ্য বিদেশী মদ্রা আছে তার সমান।

মার্কিন সরকার আন্তর্জাতিক অর্থ ভাঙ্গারের (আই এম এফ) সবচেয়ে বৃহৎ অংশীদার। মার্কিন ডলারের দাম পড়ে যাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং প্রতিটি দেশের অর্থ সমস্যার উপর যে প্রচণ্ড টন পড়েছে তা সামলে নেবার জন্যে একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। ঐ প্রস্তাবে বল: হয়েছিল যে জাপান ইয়েনের বিনিময় হার পনেরো শতাংশ, পশ্চিম জার্মানী মার্কমদ্রা বিনিময়ের হার তেরো শতাংশ এবং ফ্রান্স ও ব্রুটন পাউন্ড ও ফ্রাঁ মদ্রা বিনিময়ের হার সাত শতাংশ বাড়িয়ে দিক এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষও ডলারের দাম কিছুটা কমিয়ে দিক। তার ফলে, আমেরিকার জিনিষপত্রের দাম বিদেশের বাজারে বেশ কম হবে এবং জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ব্রুটন ও ফ্রান্সের তৈরী জিনিষপত্রের দাম খানিকটা বেড়ে যাবে। সুতরাং আমেরিকার লেনদেন ঘাটতি কম হবে বা থাকবে না কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমার দরুণ মার্কিন পণ্য বেশী বিক্রী হবে এবং জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ব্রুটন ও ফ্রান্সের পণ্যের সঙ্গে বাজারে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে। এই দেশগুলির পণ্য বেশী দামের জন্যে তুলনায় কম বিক্রী হবে।

বলা বাহুল্য, জাপান বা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি এতে খুশী মনে রাজী হতে পারে নি। কারণ এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অর্থ তাদের দেশের রপ্তানী কম যাবে এবং রপ্তানী শিল্প ও তার ওপর নির্ভরশীল সমস্ত শিল্পে মদ্রার অবস্থা দেখা দেবে। ফলে তাদের দেশে বেকার হবে বেশী, দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে লোকের দৃষ্টিকষ্ট বাড়বে, রাজনৈতিক বিক্ষোভ দেখা দেবে।

সোজা কথায় আমেরিকা তার দেশের আর্থিক সংকটের বোঝা অন্যান্য দেশের ওপর চাপিয়ে দেবার জন্যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। আমেরিকা খোলাখুলি বলে দিয়েছে যে সেখানে কুড়ি লক্ষ নতুন বেকার আর্টচমিশ লক্ষ পুরনো বেকার, দু কোটি অবসরভোগী এবং আট কোটি শ্রমিক-কর্মচারী মূল্য বৃদ্ধি ও চাকুরী সংস্থান না থাকার জন্যে যে অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে, তার কিছু ভার বাকী দেশগুলিকে নিতে হবে। এই ভার নেওয়ার মানে হচ্ছে ঐ সব দেশে বেকার বাড়ানো, শিল্পবাণিজ্যে মন্দা ডেকে আনা।

আমেরিকা দু দিকেই চাপ সৃষ্টি করেছে। এক, আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের মারফত, অন্যদিকে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন, নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে আমেরিকায় আমদানী বিদেশী পণ্যের ওপর দশ শতাংশ হারে আমদানী শুল্ক ধার্য করে। এর আরেক অর্থ হচ্ছে আমেরিকা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানী শুল্ক ধাপে ধাপে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত কেনেডি বাউন্ড বলে বিখ্যাত ছিল, তা কার্যতঃ নাকচ করে দিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে ডলার ভাঙিয়ে সোনা দেবার যে আইনগত প্রতিশ্রুতি আমেরিকা দিয়েছিল তা মানতে অস্বীকার করল। ফলে যে সব দেশের হাতে ডলার জমেছে তারা আপাততঃ ডলার খরচ করতে হলে প্রধানতঃ আমেরিকার পণ্য কিনেই তা খরচ করতে বাধ্য হবে। আর বেশী দামে মার্কিন পণ্য যদি তারা কিনতে না চায় তাহলে তাদের ডলার অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে। কারণ আমেরিকা আগের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সোনা দেবে না বলে গাজোয়ারী হুকুম জারী করে দিয়েছে।

সুতরাং জাপানকে হয়, হাতে সাঁড়ে বারো হাজার মিলিয়ন ডলার অকেজো ভাবে ধরে রাখতে হবে, অথবা বেশী দামে মার্কিন পণ্য কিনে তা খরচ করতে হবে। কোন দেশের পক্ষেই এটা সম্ভব নয়, কারণ এর ফলে শেষ পর্যন্ত তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার হাতে এসে পড়বে, তাকে চিরদিনের জন্যে মার্কিন

আর্থিক ক্ষমতার তাবেদারী করতে হবে। অন্যদিকে মার্কিন ডলারের তুলনায় নিজ দেশের মদ্রার দাম বাড়িয়ে দেবার অর্থ আমেরিকার বাজারে মার্কিন পণ্যের দাম কম হবে বলে তা বেশী বিক্রী হবে, প্রতিযোগিতার দেশীয় পণ্য টিকতে পারবে না।

দুটোই সমান ক্ষতিকর, তাই কোন দেশের পক্ষেই মনোনিবেশ করা খুব কষ্টকর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বেছে নিতেই হবে, কারণ আমেরিকা আন্তর্জাতিক সংকটে মরীয়া হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত সোজাসুজি গায়ের জোর দেখাতেও তার পিছপা হবার কথা নয়।

জাপান তাই আপাততঃ বাজার দর অনুযায়ী চাহিদা ও যোগানের নিয়মে অর্থাৎ আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের ওঠানামার সঙ্গে ইয়েনের ও ডলারের মধ্যে বিনিময় হার অবাধে নির্ধারিত হবে বলে মনে নিল। ফলে ডলারের তুলনায় ইয়েনের দাম বেড়ে যাবে, কিন্তু ঠিক কতটা বাড়বে এখনো জানা নেই। জাপান মনে করে যে আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের সুপারিশ শতকরা পনেরোর চেয়ে কম বাড়বে। তাহলে জাপানের কম ক্ষতি হবে। অবশ্য জাপান ধরে নিয়েছে যে আমেরিকার এই শর্ত মেনে নেবার ফলে এখন আমেরিকা জাপানী পণ্যের উপর যে দশ শতাংশ আমদানী শুল্ক ধার্য করেছে তা তুলে নেবে এবং ডলার ভাঙিয়ে সোনা দেবার প্রতিশ্রুতি বহাল রাখবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা আমেরিকার ইচ্ছানুসারে ঢেলে না সাজালে আমেরিকা আমদানী শুল্ক ও ডলার ভাঙিয়ে সোনা দেবার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহ দেখাবে না।

মুদ্রাক্ষেপে পড়েছে ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি উন্নয়নকামী দেশগুলি। যে সব দেশ আমেরিকা ও পশ্চিমী দুনিয়ার সাহায্যের আশায় নিজেদের আর্থিক বিনিয়োগ গড়ে তুলেছে, তাদের সামনে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

দিশেহারা হয়ে উন্নয়নকামী দেশগুলি বাণিজ্য ও শুল্ক বিষয়ক সাধারণ সম্মেলনের (গ্যাট) কাছে এভাবে ধনী দেশগুলির আর্থিক লম্ফনের নীতির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে। কিন্তু মার্কিন প্রতি-নিধি মিঃ স্যামুয়েলস উদ্ভট ভাবে বলে দিয়েছেন, তারা যতই চাইকর করুক, প্রেসিডেন্ট নিকসন যে দশ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন তার নড়চড় হবে না। সভার শেষে হিনি-দাদও টোবাগোর স্থায়ী রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি মিঃ চার্লস আর্চবোল্ড সখেদে বলেছেন যে মার্কিন লেনদেন ঘাটতির বোঝা এবার উন্নয়ন-

কামী দেশগুলির ঘাড়ে চাপলো, অথচ এই ঘাটতির জন্যে এই দেশগুলি কোনভাবেই দায়ী নয়। ইউরোপীয় কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিও এই মার্কিন বেসরকারী আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে সম্মেলনে মত প্রকাশ করেছে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশই মনে করছে যে সারা দুনিয়ায় সামরিক শক্তি ও প্রভাব অপ্রতিহত রাখতে গিয়েই মার্কিন সরকার এমন সব সামরিক কার্যকলাপ ও সমরোপকরণের উৎপাদনের উপর এমন বিপজ্জনক ভাবে তাদের অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়েছেন যার ফলেই মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতা কমে কমে এখন সমগ্র বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। বর্তমান সংকট ঐ মূল মার্কিন সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

তাছাড়া আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মদ্রা হিসাবে ডলার ছাপাবার একমাত্র মালিক হিসাবে আমেরিকা সারা ইউরোপে ডলার ছাড়িয়ে বিভিন্ন দেশের বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেভাবে কৃষ্ণগত করেছে, তাতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিও প্রচণ্ড ভাবে মার্কিন প্রভাবের বিরোধী হয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিটি ইউরোপীয় দেশেই মার্কিন বিরোধী পুঁজিপতিদের লবী গড়ে উঠেছে।

আজ আমেরিকা এবং জাপান ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের তীব্রতা এমনভাবে

আত্মপ্রকাশ করছে যে একে যুদ্ধের কিনারায় ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। কারণ বেসরকারী ভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে দশ শতাংশ আমদানী সার-চার্জ বসিয়েছেন তার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শেষ পর্যন্ত জাপান ও ইউরোপের দেশগুলি নিজ দেশের রপ্তানী বাণিজ্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সমপরিমাণ সাব-সিডি বা অনুদান চালু করলে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না। তেমন ক্ষেত্রে আমেরিকা আরো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। মূল্যবৃদ্ধি থেকে বাণিজ্য-যুদ্ধ বৃহদাকার ধারণ করে শেষ পর্যন্ত সামরিক বল পরীক্ষার পথে চলে যাবার বিপদও আজ কিছু কম নয়।

যদি তেমন বিপদ সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে তার দায়ভাগ প্রধানতঃ বড় বড় আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির, বিশেষ করে তৈল কোম্পানীগুলি, সমরশিল্প এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির মালিক যারা আজ মার্কিন এবং জাপান ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সক্ষম—তাদের ওপরই বর্তাবে। কারণ পৃথিবীর বাজার দখলের জন্য সবাই উদগ্রীব। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের ফলে, তাদের বাজার আজ আরো অনেক বেশী সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

পরীক্ষা বাতিলের বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলনে নামছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উগ্র রাজনীতির বলিতে এখন পশ্চিম বাংলার প্রায় পাঁচশো স্কুল কলেজ বন্ধ। এর ফলে প্রায় এক-লক্ষ দশ হাজার ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে তো রয়েছেনই, উপরন্তু এর সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষের চরম অপদার্থতার আরও কয়েক হাজার পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ আজ গভীর অন্ধকারে। টোকা-টুকির অভিযোগে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কলেজের পরীক্ষা বাতিল। কিছু ছাত্রের হোম সেন্টারের দাবীতে সমগ্র পাট টু পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের আজ এক চরম অবস্থা।

আরও অভিযোগ, ছাত্র সংগঠনগুলোর তরফ থেকে এধরনের বেআইনীভাবে ও খামখেয়ালীপনায় সেন্টার বাতিলের প্রশ্ন ও হোম সেন্টারের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্যে ভাইস-চ্যান্সেলরের সঙ্গে ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের যৌথ আলোচনার জন্যে বারবার অনুরোধ জানানো হয়,

তবুও কার্যত কিছুই হয় নি। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পি এস ইউর ক্ষতি গোম্বামী, ডি এস ওর ছায়া মুখাজী, এফ আর এসের অশোক দত্ত, এ আই এস এফের শফিয়াজী আলম, ছাত্রদের ভোলা কুন্ডু উপরোক্ত দাবীতে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এরই সঙ্গে ডি এস ওর ছায়া মুখাজী প্রসঙ্গতঃ জানান, পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে এ আন্দোলনকে জনসাধারণের সহযোগিতায় এক বৃহত্তর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এস এফ আই-রের বিমান বন্দু প্রায় পাঁচশো বন্ধ স্কুল কলেজ পনেরায় খোলার ব্যাপারে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের অপদার্থতার কথা উল্লেখ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালীপনায় কিভাবে মরশুমের সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ প্রহসনে রূপান্তরিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো যাদের বিরুদ্ধে এতসব অভিযোগ সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ কি সে সব বিষয়ে সমগ্র থাকতে সজাগ হবেন?

মাধ্যমিক শিক্ষকদের সমস্যা

ট্রেনিং না নিলে ইনক্রিমেন্ট হবে না অথচ ট্রেনিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে না

মদনমোহন চন্দ্র

সরকারী হোক, বেসরকারী হোক, প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট বেতনহার আছে, এবং বেতনহারের নিয়ম অনুযায়ী এক বছর বা দু বছর অন্তর প্রত্যেক কর্মী নির্দিষ্ট হারে বেতন বৃদ্ধির বা ইনক্রিমেন্টের সুযোগ পান। এই বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে, তার জন্য কোনো কলাকৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরির ক্ষেত্রে তা নয়। এখানে অন্য নিয়ম, এবং বড় বিচিত্র সে নিয়ম। কংগ্রেসী শাসকরা ব্যবস্থা করেছেন, ট্রেনিং না নেওয়া পর্যন্ত একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে বরাবর প্রারম্ভিক হারে বেতন পেতে হবে। তিনি ইনক্রিমেন্টের সুযোগ পাবেন না।

যেহেতু এই বিধান, সেই হেতু শিক্ষকশিক্ষিকাগণও ট্রেনিং নিতে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু যাতে তারা সহজে ট্রেনিং নেবার সুযোগ না পান, সে-ব্যবস্থা কংগ্রেসী শাসকরা করে রেখেছেন।

বিষয়টা একটু খুলে বলা দরকার। একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা কোনো বিদ্যালয়ে একটি স্থায়ী পদে নিযুক্ত হওয়ার পর কর্মকাণ্ডে এক বছর পূর্ণ হলে ট্রেনিংয়ের জন্য স্কুল কমিটি কর্তৃক প্রেরিত (ডেপুটেড) হওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। ট্রেনিংবিহীন শিক্ষকের সংখ্যা বেশি হলে ন্যায়পরায়ণ স্কুল-কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ প্রাইওরিটি অনুযায়ী প্রতি বছর ডেপুটে করেন। এক সপ্তকে দুজন শিক্ষককে ডেপুটে করার ক্ষমতা কমিটির আছে। এই দুজনের মধ্যে যিনি আগে কাজে যোগ দিয়েছেন, ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে তাঁকে প্রথম প্রফারেন্স দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত গেল ট্রেনিংয়ের বিষয়ে স্কুল কমিটির করণীয় ব্যাপার।

সমস্যাটা আসে এর পর। ডেপুটেশন পেলেই যে ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হওয়া যাবে, এমন বিধান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নাই। প্রতি বছর যত জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ট্রেনিং গ্রহণের জন্য ডেপুটেড হন, তার তুলনায় ট্রেনিং কলেজগুলির আসনসংখ্যা অনেক কম। সমস্যার শেষ এখানেই নয়। কংগ্রেসশাহীর বিধানে, প্রত্যেক ট্রেনিং কলেজের মোট আসনের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা সেইসব ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, যারা কোনো অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন না। অর্থাৎ যারা ভবিষ্যতে স্কুলে চাকরি পাও-

য়ার আশায় নিজ ব্যয়ে ট্রেনিং নেবেন তাদের জন্য। সরকারী হুকুমনামার পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় 'ফ্রেজার'। এই ব্যবস্থার ফলে ডেপুটেড শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ট্রেনিং কলেজগুলিতে আসন-সংখ্যা কমে গেছে।

স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য ট্রেনিংটা যদি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে সরকার মনে করে থাকেন, তাহলে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ট্রেনিংয়ের সুযোগ সঙ্কুচিত করার কারণ কী? কার ট্রেনিং আগে দরকার—যিনি শিক্ষকতা করছেন তাঁর? না যিনি শিক্ষকতা করবেন তাঁর।

আসলে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় হ্রাস করার মতলবেই ফ্রেজারদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমত একজন ডেপুটেড শিক্ষক যখন ট্রেনিং নেন, তখন একটি পদের জন্য দু জন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে দশ মাস বেতন ও দুমুদ্রা ভাতা দিতে হয়। কারণ জুলাই থেকে পনেরই মে পর্যন্ত ডেপুটেড শিক্ষকের সাময়িক শূন্যপদে অস্থায়ীভাবে একজন শিক্ষক (সরকারী পরিভাষায় 'সাবস্টিটিউট') না নিলে স্কুলের কাজ চালাতে পারেন না। অতএব ডেপুটেড শিক্ষক ট্রেনিং কলেজে ভর্তি কম হলে সরকারী অর্থব্যয় কম হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক-শিক্ষিকারা ট্রেনিং গ্রহণের সুযোগ যত কম পাবেন, তাঁদেরকে বছর বছর ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে না। তাঁরা প্রারম্ভিক হারে বেতন নিয়ে বছরের পর বছর কাজ করে যেতে বাধ্য হবেন। এর ফলেও সরকারের টাকা বাঁচবে। এমন দুর্বুদ্ধি মাথা থেকে বেরিয়ে বলেই বোধ হয় সরকারী আমলাদেরকে মোটা মোটা বেতন দেওয়া হয়।

সরকারের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনিং কলেজগুলির কর্তৃপক্ষগণও মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করছেন। সব কলেজেই আসনসংখ্যার তুলনায় ভর্তির দরখাস্ত বেশি আসে। অতএব ভর্তির জন্য বাছাই করার প্রশ্ন নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে তাঁরা বাছাই করেন? অবশ্যই উচিত দরখাস্তকারীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাই করা। এম-এ, এম-এসসি বা অনার্স গ্রাজুয়েটকে কম অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আগে ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে কেন? বেশি অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও পাস-গ্রাজুয়েটের ভর্তির দরখাস্ত বাতিল হবে কেন? ভর্তির জন্য কেন অ্যাডমিশন টেস্ট

হবে? সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্ব কি ট্রেনিং কলেজগুলোর নয়?

আশ্চর্য এই, এ বিষয়ে সরকারী কোনো নীতি বা নির্দেশ নাই। ট্রেনিং কলেজগুলির কর্তৃপক্ষরা নিজেদের খোয়ালখুশি অনুযায়ী ভর্তির জন্য প্রার্থী বাছাই করে থাকেন। তার ফলে বহু পাস-গ্রাজুয়েট শিক্ষক বছরের পর বছর দরখাস্ত করেও ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হতে পারছেন না। অথচ প্রতি বছর দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করা থেকে সরু করে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে ইন্টারভিউ দিতে এবং ভর্তির জন্য অধ্যক্ষের পায়ে তেল মাখাতে আসার জন্য নিত্যন্ত অকারণে তাঁদেরকে অর্থব্যয় করতে হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বহরমপুর ইউনিয়ন খ্রীষ্টান ট্রেনিং কলেজের কর্তৃপক্ষের নীতিহীন কাণ্ডকারখানার কথা উল্লেখ করছি। এখানে ভর্তির জন্য প্রার্থী বাছাই করার নীতির কোনো বালাই নাই। ছয়-সাত বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকের দরখাস্ত বাতিল হয়ে গেছে। অথচ দু-তিন বছরের অভিজ্ঞ শিক্ষক ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। যার বাড়ি বহরমপুর শহরে, তাঁকে বলা হয়েছে কলেজের ছাত্রাবাসে থাকলে ভর্তি করা হবে। কলেজে একটি আসন পাওয়ার জন্য যারা অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তাঁদেরকে দিনের পর দিন আসতে বলে আশা দিয়ে বদলিয়ে রেখে অবশেষে বলা হয়েছে—সিট নাই। অতি নিম্নমভাবে এক নিষ্ঠুর খেলা খেলেছেন বহরমপুর ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ দরখাস্তকারী শিক্ষকদের সঙ্গে। কলেজটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, অথচ সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। মাসিক টিউশন ফীর হার অবিবশ্য্য রকমের বেশি। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পঁচিশ টাকা, আর্টস এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাইশ টাকা! তাছাড়া, কত রকমার ফী আদায় করা হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে বেকায়দায় পেয়ে। ছাত্রাবাসে থেকে এই কলেজে ট্রেনিং নিতে চান এমন একজন শিক্ষককে ভর্তির সময় ব্যয় করতে হয়, চার শতাধিক টাকা। অথচ ভদ্রলোক মাসিক বেতন পান গ্রাজুয়েট হলে একশো সাত-ষাট টাকা, অনার্স গ্রাজুয়েট দুশো ফুড়ি টাকা, এম এ বা এম এস সি হলে দুশো চাষাশ টাকা। এই টাকাটাও তিনি মাসে মাসে পান না, এবং স্ট্রী-পদ্য পরিবারের ভরণ-পোষণ তাঁকে করতে হয়। এই রকম আর্থিক অবস্থা বীর, তাঁকে চার-

শোর বেশি টাকা জোগাড় করে এনে কলেজে ভর্তি হতে হবে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। নইলে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ থাকবে। কংগ্রেসী শাসকদের বিধান।

ট্রেনিংটা যে কী কদের বস্তু, কী যে তার সাধকতা, সে-প্রশ্ন এখানে তুলছি না, কারণ তা তুলতে গেলে আলাদা একটি প্রবন্ধ ফাঁদতে হবে। আপাতত প্রশ্নটা হচ্ছে, ট্রেনিং না নেওয়া পর্যন্ত একজন মাধ্যমিক শিক্ষক বা শিক্ষিকার ইনক্রিমেন্ট বন্ধ থাকবে, অথচ সেই ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগের একান্ত অভাব।

এই ব্যবস্থার আশু অবসান দরকার। ট্রেনিংয়ের সঙ্গে বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্টের সম্পর্ক কিছুতেই থাকা উচিত নয়। বিশে-

ষত, ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ যেখানে অত্যন্ত সীমিত ও সঙ্কুচিত, সেখানে ইনক্রিমেন্ট ট্রেনিংয়ের ওপর নির্ভরশীল রাখাটা অন্যায় ও অবিচার।

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মাসের পর মাস বেতন পাবেন না, বছরের পর বছর চেষ্টা করেও ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হতে না পারার ফলে সাত-আট বছর ধরে ইনক্রিমেন্টের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন, সরকার যখন সুযোগ-সুবিধা হবে তখন অনুগ্রহ করে বখশিস দেওয়ার মতো ডি-এ দেবেন, সরকারী "সদিচ্ছার" ফলে পেন্সন প্রহসন হয়ে, থাকবে—কংগ্রেসী শাসকগণ আর কত কাল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সঙ্গে প্রবণতা চালিয়ে যেতে চান?

পল্লী দর্পণ

সুন্দরবন অঞ্চলে

খাদ্যের জন্য হাহাকার

দক্ষিণ-পূর্ব সুন্দরবনের গরীব চাষী-মজুরের ঘরে আজ অম্মের জন্য হাহাকার। গত তিন-চার মাস যাবত তারা ফ্যানের মুখ দেখেনি। আটা আর ছুট্টারগোলা খেয়ে দিন চলছিল। আজকাল আবার তাও জুটছে না। এক টাকা কিলো দরে ছুট্টা কিনে খাবারও সামর্থ্য তাদের নেই। কোথাও কোন কাজ নেই। গত বছরের আগ্রাসী বন্যার জন্য ফসলের দারুন ক্ষতি হয়েছিল, ফলে মহাজনদের ঘরও আজ কম বেশী শূন্য। আবার এ বছর আগাম বর্ষণের ফলে চাষের কাজ শ্রাবণের মাঝামাঝি শেষ হয়েছে, তাই বর্তমান অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা অবর্ণনীয়। এক বাট ফ্যান বা একটা রুটির জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে অনাহারী মানুষগুলোর কাড়াকাড়ি লেগে গেছে।

কিন্তু সরকার নীরব। সে দেখেও দেখছেন না। স্থানীয় সরকারী আমলাগণ কেবল নিজেদের বদলি নিয়েই ব্যস্ত। সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের কথা ভাবতে তাদের মোটেও সময় নেই। আর সরকারী কর্মচারীরা তো ভ্রমণেই অভ্যস্ত। কিন্তু এ দৃশ্য বোধহয় তাদের চোখে পড়ে না। এ বিষয়ে উপর মহলের অর্থাৎ মহকুমা বা জেলা স্তরের আমলা বা সরকারী কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা আরও লক্ষ্যণীয়। সরকারী বেতারযন্ত্র ও খবরের কাগজে বহু পাকিস্তানি কথার শোনা যায়, কিন্তু বাস্তবে কেন মোটেই রূপায়িত হয় না—এটাই আজকের সুন্দরবনবাসীর জিজ্ঞাস্য। তাই উল্লেখ্য সরকারী কর্তৃপক্ষ যদি অনতিবিলম্বে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তাহলে সারা সুন্দরবন ব্যাপী যে দর্ভিক্ষ

নেমে আসবে তার জবাব তাদেরকেই দিতে হবে একদিন এই অনাহারী মানুষগুলোর কাছে, যারা দেশের মানুষের খাদ্য যোগান দিলেও আজ অধ্বাধারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

শান্তিপুর অঞ্চলের

বন্যাদুর্গতদের প্রতি

সরকার উদাসীন

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

রাজ্যের অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় এবারে শান্তিপুরে রাগাঘাট এলাকাতেও বন্যার ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের উপজীবিকা যেমন বন্ধ হয়েছে, তেমনি নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে দৈনন্দিন জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং বাসস্থান। তাঁতী, কামার, কুমোর প্রভৃতি কুটীর শিল্পী, ক্ষেত মজুর এবং শান্তিপুর কালনা ও শান্তিপুর গাঁপ-পাড়া খোয়াঘাটে বাতায়তকারী মতিগঞ্জ রিক্সা স্ট্যান্ডের রিক্সাচালকগণও উপজীবিকাহীন অবস্থায়, পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য এবং সহযোগিতার অভাবে, অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

সরকারী পক্ষের এই উদাসীনতাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সংগঠন "শান্তিপুর সৈচ্ছাসেবক বাহিনী"র উদ্যোগে সম্প্রতি এক জরুরী সমাবেশ আহ্বান করা হয়েছিল। বন্যাপীড়িতদের প্রতিনিধিরাও এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন এবং তারা সম্মিলিত এক প্রস্তাবে জানিয়েছেন : (এক) অবিলম্বে শান্তিপুর থানাকে বন্যাপীড়িত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হোক। (দুই) বাহিনীর কেন্দ্রীয় শিবির মতিগঞ্জের (শেখাংশ অঞ্চল পৃষ্ঠায়)

ভারত দর্শন

নয়াদিল্লীর আমলাকূলে খেয়োখেয়ি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভারত সরকারের মোটা মাইনের প্রশাসন কর্মচারীদের মধ্যে ষাট জন উচ্চদরের এমন আই এ এস ও আই সি এস অফিসার রয়েছেন যাঁদের মাসিক বেতন আড়াই হাজার টাকার ওপরে এবং এঁরা সবাই রাষ্ট্রীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ডেপুটেশনে কাজ করছেন। আরো ছয়শো অফিসারও ডেপুটেশনে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করছেন, যাঁদের মাইনে বেশ মোটা, কিন্তু আড়াই হাজার টাকার কম। এই আমলাদের অসামান্য “কর্মদক্ষতা”র ফলে মোট আটাত্তরটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আটষাট-উনোত্তর এবং উনোত্তর-সত্তর মাত্র এই দু-বছরে মোট লোকসানের পরিমাণ এখন তিন হাজার একশো সত্তর লাখ পঁয়ষাট হাজার টাকা। এই হচ্ছে ভারতের অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট। সরকারী কোম্পানী-গুলির লাভলোকসানের খতিয়ান দেখে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী খুব চটে গেছেন। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে ডেপুটেশনে যাঁরা গিয়েছেন হয় তাঁরা তাঁদের পূর্বতন পদে ফিরে আসেন না হয় স্থায়ীভাবে তাঁদের ভাগ্য সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত করেন।

এ বিষয়ে অফিসারদের মন-স্থির করে ফেলার শেষ তারিখ দুটি। যাঁরা আড়াই হাজার টাকার বেশী মাইনে পান, তাদের এ বছর একত্রিশে আগস্টের মধ্যে এবং যাঁরা এর কম পান, তাঁদের বাহান্তর সালের উনত্রিশে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ভারত সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে, এবং সময়সীমা কিছুতেই আর বাড়ানো হবে না।

ফলে প্রথমোক্ত ষাট জন আই এ এস অফিসারদের মধ্যে একমাত্র শিপিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সি পি শ্রীবাস্তব ছাড়া সবাই নিজ নিজ পূর্বপদে ফিরে যেতে চেয়েছেন। এম এম টি সির চেয়ারম্যান শ্রীআর আর বাহল, এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র। তিনি আমলাদের পরমকাম্য সেৱাপদ ক্যাবিনেট সেক্রেটারী হবার আশা রাখেন। অন্যান্যরাও অধিকতর উচ্চপদ লাভের আশায়ই ফিরে আসতে ইচ্ছুক। এদিকে এদের ডেপুটেশনে যাওয়ার ফলে যাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তরে উচ্চপদ দখল করেছিলেন, তারা আজ আতর্কিত। আটষাট সাল থেকে বার বার মনস্থির করার শেষ সময়সীমা বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাঁরা আত্মরক্ষা করে চলেছিলেন। এবার আর সময় বাড়ানো যাবে না। সুতরাং ডেপুটেশনের অফিসাররা ফিরে এসে চেয়ার দখল করতে

চাইবেন। আমলাকূলে এর ফলে প্রচণ্ড দলাদলি ও খেয়োখেয়ি শুরু হয়ে গেছে। যাঁরা অস্থায়ীভাবে চেয়ার দখল করে রয়েছেন, তাঁরা বলেছেন যে ডেপুটেশনে যাঁরা গিয়েছিলেন, সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচণ্ড লোকসান করে তাঁরা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, সুতরাং নতুন করে যোগ্যতার ভিত্তিতে পদাধিকার স্থিরীকৃত হউক। এমনিতে যে আমলাতন্ত্র অপদার্থতা ও দীর্ঘসূত্রী মনোভাবের জন্যে কুখ্যাত, তাদের মধ্যে এই কলহ বিসংবাদ নয়াদিল্লীর প্রশাসনিকক্ষেত্রে একদম অকেজো করে ফেলবার উপক্রম করেছে।

উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কে ইন্দিরাজীর মতলব

ইন্দিরা গান্ধী উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাতে চাইছেন। এই মতলবের পেছনে যে প্রধান মস্তিষ্কটি ষড়যন্ত্রের জাল বনে চলেছে, তা হল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীউমা-শংকর দীক্ষিত। মধ্যমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠী আগে ছিলেন আদি কংগ্রেসী নেতা চন্দ্রভান গুপ্তার যোগ্য সাকরেদ। কংগ্রেস যখন দল-ভাগ হল তখন তাঁকে মধ্যমন্ত্রী করা হবে এরকম প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি ইন্দিরাজীর দিকে ঢলে পড়েন।

সম্প্রতি ইন্দিরা গান্ধী কমলাপতি ত্রিপাঠীর প্রতি নারাজ হয়েছেন। ত্রিপাঠীকে উত্তর প্রদেশ ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে সরিয়ে ইন্দিরাজী নিজের একান্ত বশব্দ কাউকে বসাতে চান। সুতরাং শাসক কংগ্রেস দলের কোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কমলাপতি ত্রিপাঠীর বিরুদ্ধে বলে বেনামী লড়াই শুরু করে দিয়েছেন। কমলাপতি ত্রিপাঠীর ছেলে একটি খুনের মামলার সঙ্গে জড়িত ও তার পত্রবন্ধু সম্পর্কে লক্ষ্মী রাজনৈতিক মহলে নানা কথা চালু ছিল। তখন কমলাপতি ত্রিপাঠী ছিলেন উপ-মধ্যমন্ত্রী। কিন্তু তিনি চন্দ্রভান গুপ্তাকে ছেড়ে “প্রগতিশীল” ইন্দিরা গান্ধীর দলে চলে আসার ফলে একথা চাপা পড়ে যায়। সম্প্রতি সি পি আই দলের নেতা ঝাড়খণ্ডে রায় ত্রিপাঠীজীর কাছে এক চিঠি লিখে তাঁর পুত্র ও পুত্র বন্ধু সম্পর্কে অভিযোগ পুনরায় উত্থাপন করেছেন। এমনভাবে সেই চিঠির নকল বি কে ডি নেতা চরণ সিং-এর হাতে পেঁছে যায় এবং এমনভাবে তিনি তার সম্ভাবহার

করেন যে লোকের ধারণা দিল্লীর কোন বিশেষ নির্দেশই মধ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এ আক্রমণ চলেছে।

এরপর হঠাৎ উত্তর প্রদেশ শাসক কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে দশ-জন নতুন সদস্য গ্রহণ করা হল। এরা সবাই মধ্যমন্ত্রীর বিরোধী। এদের কার্যকরী সমিতিতে নেবার আগে মধ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোন পরামর্শ দূরের কথা, তাঁকে কোন কিছু জানানোই হয় নি। এমন কি তাঁর মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী রাজেন্দ্র কুমারী বাজপায়ী, উত্তর প্রদেশ শাসক কংগ্রেস কর্মিটির সভানেত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এ ব্যাপারে কিছু জানান নি। অথচ কমলাপতি ত্রিপাঠীর সুপারিশে তিনি একই সঙ্গে নিষিদ্ধ দুটি পদ—অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব ও কংগ্রেস সভানেত্রীর পদ কংগ্রেসের নীতি বিরুদ্ধ বলেও, ধরে রাখতে পেরেছেন, যা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিজয় সিং নাহার পারেন নি। কমলাপতি ত্রিপাঠী একথা শুনেনি নয়াদিল্লী ছুটে যান, কিন্তু সেখানে কোন আমলাই পান না। দিল্লী থেকে ফেরার পথে তিনি কাশী চলে গিয়ে সেখানে নিজেকেই কাশী বিদ্যাপীঠের ভাইস-চ্যান্সেলর নির্বাচিত করে নেন।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মী সচিবালয়ে

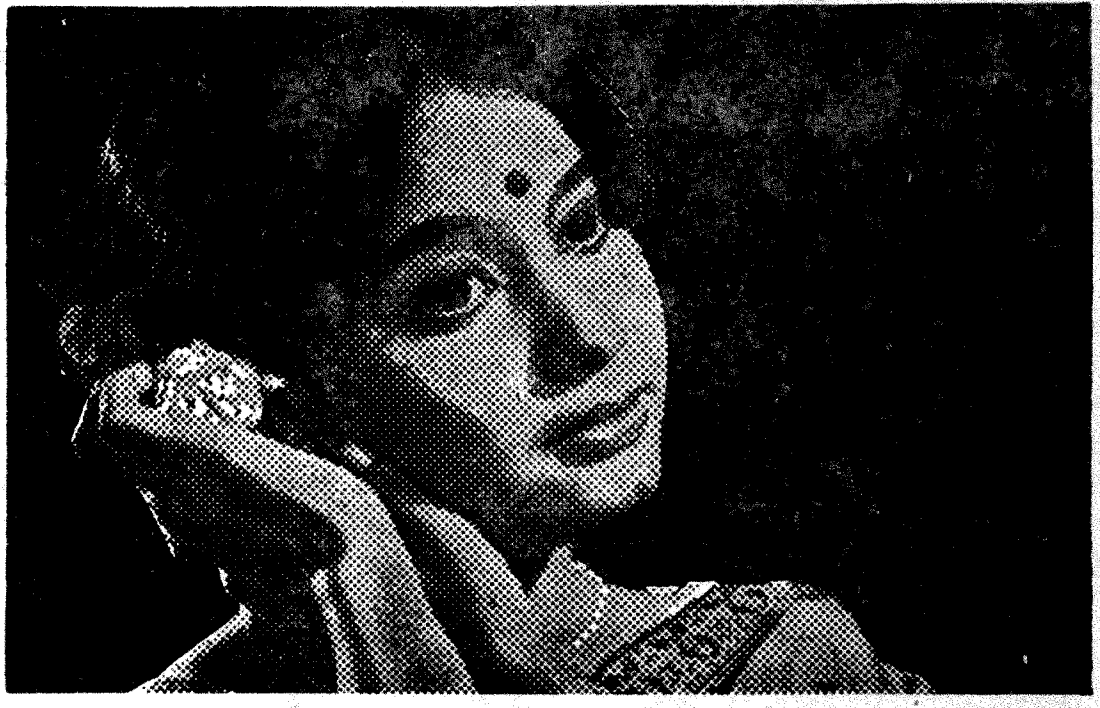
নিয়মিত হাজির হলেও বিধানসভায় তিনি আসা বন্ধ করে দিয়েছেন।

বিধানসভায় বারে বারে বিরোধী সদস্যেরা প্রশ্ন তুলেছেন মধ্যমন্ত্রী আসছেন না কেন। স্বয়ং স্পীকারও প্রশ্নটার উত্তর চান, তিনি নিজেই মধ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন। আরেকটা কাণ্ড নিয়ে উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় তোলাপাড় হয়ে গেছে। শ্রীদেহসভী নামে জনৈক বিরোধী কংগ্রেস সদস্যকে কানপূরে সংঘটিত একটা হত্যার দায়ে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অথচ বিধানসভার বিবরণী অনুযায়ী কথিত হত্যাকাণ্ডের দিন শ্রীদেহসভী লক্ষ্মী বিধানসভার অধিবেশনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন ও বিধানসভার পরিচালনায় অন্ততঃ তিনবার অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিরোধী দলের বক্তব্যঃ শাসক কংগ্রেস দল সম্পূর্ণ ফ্যাসিস্ট কায়দায় বিরোধী দলকে নির্মূল করার জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়ে পুলিশ যাতে মিথ্যা অভিযোগে মামলা সাজিয়ে অযথা হয়রানি করে তার জন্যে গোপনে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন।

উত্তর প্রদেশে ঠিক পুরনো কংগ্রেসী আমলের মতই আবার আকাশ-বাতাস, ষড়যন্ত্র ও কুটচক্রান্তের হাওয়ায় দূষিত ও ভারী হয়ে

উঠেছে। শোনা যাচ্ছে কমলাপতি ত্রিপাঠী উত্তর প্রদেশে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলে ধরতে পারেন, যেমন পারেন পশ্চিমবঙ্গে শ্রীবিজয় সিং নাহার। তাই ইন্দিরা গান্ধী ভারতের বহু-স্তম প্রদেশ, যেখান থেকে তাঁর দলের প্রায় বিরোধী জন সদস্য পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন, সেই উত্তর প্রদেশে সন্দেহভাজন কাউকে মধ্যমন্ত্রী রাখতে চান না। উত্তর প্রদেশে বিদ্রোহ সফল হলে দিল্লীর মসনদ ভেঙ্গে পড়তে দেবী হবে না, একথা ইন্দিরাজী জানেন। শোনা যাচ্ছে তিনি চান যে পরলোক-গত পিতৃবন্ধু গোবিন্দবল্লভ পণ্ডের পুত্র বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রতিমন্ত্রী কে সি পণ্ড উত্তর প্রদেশে মধ্যমন্ত্রীর পদটা গ্রহণ করুন। অন্যদিকে উমা-শংকর দীক্ষিত চান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিত যাদবকে। অন্যান্য ককেজনের নামও শোনা যাচ্ছে। গোটা আবহাওয়াটাই আবার কংগ্রেসী ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি ও চক্রান্তের ফলে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। লোকের মোহগ্রস্ত ভাবও দ্রুত কেটে যাচ্ছে। এখনই লোকে রাস্তাঘাটে বলতে শুরু করেছে—উত্তর প্রদেশে নব কংগ্রেসের উৎপত্তি, এখন থেকেই অবলুপ্তির পথেও এগোচ্ছে।

ফুলের মত স্নিগ্ধ কামল
আমার এই অপকৃদ লাবণ্য



দিনের পর দিন

সাধনা

বিউটি

ক্রীম

মোখেই হয়েছে

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক অঙ্গরোগ

সাধনা ওষধালয়
কলিকাতা-৩

পুস্তক পরিচয়

গেরিলা যুদ্ধ ও মার্কসবাদ

গ্রন্থকর্তা

[Guerrilla Warfare and Marxism :- Edited with an introduction by William J. Pomeroy.]

বর্তমান যুগে এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গেরিলা সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে। আলোচ্য বইটিতে প্রথমাংশে গেরিলা যুদ্ধ কী এবং কেন তার সাফল্যের জন্য সঠিক মার্কসবাদী নেতৃত্বের প্রয়োজন তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে মার্কস থেকে শুরু করে রেজি ডেরে, ফিদেল কাস্ত্রো অবধি বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে গেরিলা কায়দার যে জনবৃদ্ধ সংগঠিত হয় তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। এখানে প্রথমাংশে বক্তব্যের মূল কথাটি রাখার চেষ্টা হয়েছে যে, প্রতিটি দেশের বিপ্লব হবে তার নিজস্ব অবস্থা অনুযায়ী এবং মার্কসবাদী বিপ্লবীদের চেষ্টা করতে হবে মনুষ্য সংগ্রামে যতদূর সম্ভব জনসাধারণের প্রতিটি অংশকে নিয়ে চলতে।

উনিশশো সত্তরের রুশ বিপ্লবই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সফল বিপ্লব। স্বাভাবিক ভাবেই তৎকালীন বামপন্থী মহল মনে করতে থাকেন যে নিজ দেশের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য রুশ বিপ্লবের কায়দাটিই প্রশস্ত। এই ধারণা জন্মায় যে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি যে কায়দায় বিপ্লব করলেন তাঁর অমূল্য অনুলোপন করতে পারলেই ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটবে।

এ প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য পরিষ্কার। তাঁর মতে রুশ বিপ্লব সফল হয় কতগুলি বিশেষ অবস্থার ফলে যা ঐতিহাসিক কারণেই অন্য কোন দেশে (সেই সময়) বর্তমান ছিল না। অন্য কোন দেশে পার্টি সোভিয়েত পার্টির মতন বিপ্লবের প্রতিটি স্তরের অভিজ্ঞতা (দৈনন্দিন থেকে অ-দৈনন্দিন, "ন্যায়সংগত" থেকে "অ-ন্যায়সংগত") অর্জন করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে বামপন্থী হঠকারিতার বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত ব্যতীত শ্রমজীবী ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বিপ্লব করা যায় না। এর পর বিপ্লবী অবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন বলেন যে বিপ্লব সম্ভব এমন একটি অবস্থায় যেখানে শ্রমিকদের একটি বড় অংশ নিজ শ্রেণীঅবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে তাকে বদলাতে চাইছে এবং যেখানে ক্রমবর্ধমান

সংকটের ফলে শাসক শ্রেণী আর পরানো কায়দায় শাসন করতে পারছে না।

লেনিনের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলিতে। বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন নতুন, মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করে কিন্তু সবখানেই বিপ্লবী অবস্থার এভাবে সঞ্চার বিপ্লব সংগঠিত হয় না। তবে এই সময়ে বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদী বিপ্লবীরা গণসংগঠন ও সংগ্রামের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার ফলেই তাঁদের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে নিজ নিজ দেশে গেরিলা কায়দায় ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এবং ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করার এই আন্দোলনগুলির অবদান কম নয়। ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়াতেও এই একই সময়ে গেরিলা সংগ্রাম শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাদেশেই এই সংগ্রামের ভিত্তি রূপে কাজ করে স্থানীয় কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে গণ-সংগঠনগুলি।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ইউরোপে দ্বিধা ধারা দেখা দিল। পশ্চিম ইউরোপে বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের সংগ্রামের ফলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর করা সম্ভব হল না। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে অবশ্য, যেখানে গেরিলা সংগ্রামের তীব্রতা সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল, সোভিয়েত রেড আর্মির সহায়তায় এই কাজ খুব সহজেই সংগঠিত হয়। আর এশিয়ায় কী ঘটল?

এশিয়ার কথা উঠলেই আসে চীন বিপ্লবের কথা। কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চীনা পার্টি বিপ্লব সংগঠিত করে নিজ দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী, যদিও কোন মূল প্রশ্নেই মাও সে তুং ও অন্যান্য নেতারা সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসীয় নীতি থেকে কখনওই বিচ্যুত হন নি।

চীনা বিপ্লবের কতগুলি নিজস্ব দিক আছে যেমন শাসক শ্রেণীর শাসনের কেন্দ্রস্থল থেকে বহু দূরে মৃত্ত ঘাঁটি এলাকা তৈরী করা যে এলাকাগুলি থেকে গেরিলা সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেশে এবং সর্বশেষে সহরাষ্ট্রল অথবা শাসক শ্রেণীর শাসন শোষণের কেন্দ্রস্থলগুলি ঘিরে ফেলে। চীন দেশের বিশালতা ও অসম্পূর্ণ সরকারী যোগাযোগ ব্যবস্থাই এই ঘাঁটি এলাকা স্থাপনে সহায়তা করে। দ্বিতীয় চীনা বিপ্লবের অগ্রভাগে থাকে গরীব চাষী সম্প্রদায়—সহরাষ্ট্রল শ্রমিকদের মধ্যে চীনা কম্যুনিষ্টদের যে ঘাঁটি ছিল

কুওমিনট্যাং প্রতিবিপ্লবীরা তা নির্মূল করতে সক্ষম হওয়ার চীনা নেতৃবৃন্দ এই কায়দা গ্রহণ করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে চীনা বিপ্লবের নিজস্ব দিকগুলি তৎকালীন চীনের বিশেষ অবস্থা থেকেই উদ্ভূত।

চীন ছাড়া লেখক বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা ও কিউবার মনুষ্য সংগ্রামগুলি। এই তিনটিই কায়দার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভিয়েতনামের সংগ্রাম প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় মনুষ্য সংগ্রাম যে সংগ্রামে শহরাষ্ট্রল ও গ্রামদেশের গেরিলারা সমানভাবে জড়িত। আর্জেন্টিনায় জাতীয় মনুষ্য আন্দোলন (১৯৬৪-৬৫)-এর নেতৃত্বে প্রধানত থাকেন সেই দেশের পার্টি বর্জেরারা, ফরাসী ঔপনিবেশিকরা যাদের বিপ্লবী সচেতনতা জাগিয়ে তোলে। আর্জেন্টিনায় কম্যুনিষ্ট পার্টি শ্রম যে নেতৃত্বে ছিল না তাই নয়, গোড়ার দিকে কম্যুনিষ্টদের জাতীয় মনুষ্য ফ্রন্টে যোগদান করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়। পরবর্তী কালে অবশ্য আর্জেন্টিনায় শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার ব্যাপারে কম্যুনিষ্টরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখান। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও আর্জেন্টিনার মনুষ্য বোম্বাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। যেমন, প্রতিবেশী মরক্কো ও টিউনিশিয়ায় কাছ থেকে সাহায্য লাভ এবং খোদ ফ্রান্স (যার বিরুদ্ধে লড়াই) ফরাসী শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মনুষ্য বোম্বাদের স্বপক্ষে ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

কিউবারাও ফিদেল কাস্ত্রোর ছায়াবশে জুলাই আন্দোলন, যার পরিণতি সশস্ত্র সংগ্রামে, প্রধানত কিউবার জাতীয় পোর্ট বর্জেরা সমাজের বিক্ষোভের প্রকাশ। দেশের অভ্যন্তরে বাতস্তার ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়েই কিউবার বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ—কোন প্রত্যক্ষ ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনুষ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয়। এবং এখানেও কিউবার কমিউনিষ্ট পার্টি, যার নাম ছিল পপুলার সোস্যালিস্ট পার্টি, বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে শেষের দিকে শহরাষ্ট্রল কতগুলি সাধারণ ধর্মঘট সংগঠন করার মাধ্যমে।

কিউবার বিপ্লবের একটি বিশেষ দিক হল কোন না কোন ভাবে জনসাধারণের প্রতিটি অংশের থেকে সাহায্য লাভ। বিপ্লবের বহু আগে থেকেই কিউবার "বিপ্লবী অবস্থা" বর্তমান ছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাংগঠনিক ও গণসংগ্রামের অভিজ্ঞতা বর্তমান থাকার ফলেই কাস্ত্রো, গন্সেভারো এবং

অন্যান্য নেতারা বিপ্লবের জন্য একটি রাজনৈতিক পার্টি এবং তার গণ সংগঠনমূলক কাজের খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। কিউবার বিপ্লবের আর একটি নতুন দিক হল বিপ্লবের পর পোর্ট বর্জেরা শ্রেণী ও কম্যুনিষ্টদের সংহতি যা কিউবাকে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে চলে। আর্জেন্টিনায় এই ব্যাপার ঘটে নি। সেখানে বর্জেরা জাতীয়তাবাদীরা ফরাসীরা হটে যাওয়ার পর বরাবর কম্যুনিষ্টদের বিরোধিতা করে আসেন। কিউবারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আক্রমণের ভয় এবং জাতীয় বর্জেরা শ্রেণীর একটা বড় অংশের অ-ধনতান্ত্রিক পথে উন্নতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়ার ফলেই এই সংহতি প্রধানত সম্ভব হয়।

এই সব বিপ্লবের সাফল্যে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে ক্রমবর্ধমান সংকটে উদ্ভূত হওয়ার ফলে স্লোগান উঠেছে—"বিপ্লবী দায়িত্ব বিপ্লব করা"। স্লোগান হিসাবে এটি ঠিক কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। শ্রমজীবী এই স্লোগানের ভিত্তিতে অগ্রসর হলে কী হয় তার সব থেকে মর্মান্তিক উদাহরণ বলিভিয়ায় চে গন্সেভারার মৃত্যু। বলিভিয়ায় চে'র ব্যর্থতার কারণ সেখানকার বিপ্লবী পরিণতি সম্পর্কে ভুল ধারণা এবং গেরিলা লড়াই-এর জন্য মানুষকে পরোপদ্রির সংগঠিত না করেই ঝাঁপিয়ে পড়া।

লেখক বইটিতে শহরাষ্ট্রল গেরিলা লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এইগুলি (তাঁর মতে) জনগণের আন্দোলনের একটি অংশ হিসাবে কার্যকরী হতে পারে এবং

মার্কসবাদীদের এই লড়াইগুলিতে সেইভাবেই অংশ গ্রহণ করা উচিত এবং বৃহত্তর সংগ্রামের কথা মনে রেখে এই লড়াইগুলি সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।

মনুষ্য সংগ্রামগুলি যে সব জায়গায় সফল হয়েছে তা নয়। এশিয়ায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মালয় ও ফিলিপাইনের মনুষ্য বোম্বাদের এ পর্যন্ত ব্যর্থতা। প্রধানত দুই দেশেই যখন গেরিলা সংগ্রাম শুরু হয় তখন কোন বিপ্লবী পরিণতি (মার্কসীয় অর্থে) বর্তমান ছিল না। আশা করা গিয়েছিল যে এই সংগ্রামগুলি ছাড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিণতি তৈরী হবে। কিন্তু তা হল না। শাসক শ্রেণীর সংকটকে অনেক বাড়িয়ে দেখা হয়েছিল, লড়াই-এর কায়দা গেরিলা নীতি অনুযায়ী বৃহত্তর করা হয় নি এবং মনুষ্য সংগ্রামীরা জনগণের প্রতিটি অংশকে, বিশেষ করে জাতীয় বর্জেরা শ্রেণীকে সঙ্গে নিতে ব্যর্থ হন। এক কথায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিগুলি অনুসৃত হয় নি। মালয়ের মনুষ্য সেনারা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থনের অভাবে—ফিলিপাইনের কম্যুনিষ্টরাও গোড়া থেকেই নিজেদের "নতুন গণতান্ত্রিক বিপ্লব" নেতা হিসাবে ঘোষণা করে জাতীয় এবং পেটি বর্জেরা শ্রেণীকে সরিয়ে রাখে। এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিপ্লবীদের শাসনস্তা করার কাজে এঁদের পূর্ণ সমর্থন পান—শরৎকে কোণঠাসা করার বদলে বিপ্লবীরাই কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এর ফলে যে বিপ্লব নেমে আসে তা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে, অবশ্যম্ভাবী।

বামারলরীতে

বেআইনী ছাঁটাই

চলতি বছরের উনিশে জানুয়ারী অর্থাৎ কাজকর্মের অজুহাতে বামারলরীর পরিচালনাধীন টি ওয়ার হাউস কোম্পানী অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্রোজার ঘোষণা করে। এ অবস্থায় শ্রমিক সংগঠন, বামারলরী এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্র ও রাজ্য শ্রমদপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফলস্বরূপ, উক্ত ডিপার্টমেন্ট তিরিশে এপ্রিল/আবার চালু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিহবগিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীএল এম মিশ্র লোকসভায় ডিপার্টমেন্টটি ন্যাশনালাইজড করার প্রতিশ্রুতি দেন। তদনুযায়ী রাজ্য সরকার অন্তত এক বছর টি ওয়ার হাউসে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু কোম্পানীর মালিক তার অনেক শ্রুতিমতের ভাষণ এবং বহুবিধোচিত শ্রমনীতিক উপেক্ষা করে একশো বারো জন শ্রমিক কর্মচারীকে ছাঁটাই করেন। রাজ্য সরকার

এ ব্যাপারে নীরব। এই বেআইনী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে পাঁচশে আগস্ট একদিনের প্রতীক ধর্মঘট কর্মচারীরা সাফল্যের সঙ্গে পালন করেন।

পল্লী দর্পণ

(গল্প পড়ার পর)

মোড়ে দ্রুত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হোক। (তিন) ক্ষতিগ্রস্ত কুটির শিল্পী এবং ক্ষেতমজুর ও শ্রমজীবীদের অবি-লম্বে খরচাতি দিতে হবে। (চার) সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণ পৌরপতির সঙ্গে রাণাঘাট মহকুমা শাসকের বাদ-প্রতিবাদের শীঘ্রই অবসান ঘটতে হবে। (পাঁচ) বন্যাপীড়িতদের উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌকা, উপযুক্ত পরিমাণ গমের সঙ্গে চাল, গমভাঙ্গা ও জ্বালানী খরচ, গবাদি পশুর খাবার, সেনিটেশন ও ম্যাডিকেল ইউনিটের ব্যবস্থা করা হোক।

বিদেশ দর্শন

চীনের উদ্দেশ্য কি?

(দর্পণের পর্ববন্ধক)

আফ্রো-এশীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় চীনের ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্বরণ থাকতে পারে যে ডঃ হেনরী কিসিংগার ও চঃ এন লাই-এর বৈঠকের ঠিক আগেই একটি মার্কিন টেবিল টেনিস দল চীন সফর করে। এ ক্ষেত্রেও হয়ত দেখা যাবে যে চীন-ভারত যোগাযোগ শৃঙ্খমাত্র টেবিল টেনিসের সবকিছু বোঝেই 'সীমাবদ্ধ' না থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে পড়বে। "হিন্দী চীনি ভাই ভাই"-এর যুগ যদি এখনই না ফিরে আসে অন্তত বর্তমান বৈরী মনোভাবের যুগ শেষ হবে।

এ পর্যন্ত যেসব সংবাদ বোঝায়ছে তাতে মনে হয় ভারত সরকারও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। শ্রদ্ধা যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী চোঁ এন লাইয়ের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন তাই নয়, ভারত সরকার চীনে তাঁদের দূত শ্রীকেশ মিশ্রকে ডেকে পাঠিয়েছেন আলোচনার জন্য। শ্রীমিশ্র বর্তমানে নয়াদিল্লীতে এবং মনে হয় দুই দেশের সম্পর্ক উন্নতিকরণের ব্যাপারে ভারতই প্রথম পদক্ষেপ নেবে।

চীনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে থেকে ইন্দিরা গান্ধীর চিঠির কোন উত্তর শ্রীমিশ্র নিয়ে এসেছেন কী না তা জানা যায় নি। চীন সরকারও এই চিঠির কোন উত্তর করেন নি। তবে সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়ার জাগরেব শহরে চোঁ এন লাই একটি ইন্টারভিউ প্রদানকালে কয়েকটি কথা

বলেছেন যা "পলিসি স্টেটমেন্ট" বলে ধরে নেওয়া যায়। কথাগুলি শ্রদ্ধা ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ভাবা ভুল হবে। এই ইন্টারভিউ মাধ্যমে চোঁ এন লাই আফ্রো-এশীয় দেশগুলি সম্পর্কে তাঁর সরকারের নীতি পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

চীনা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে চীন ভারত উপ-মহাদেশকে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুইটি বৃহৎ শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে চীন কখনোই একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হবে না এবং মাঝারি ও ছোট দেশগুলির দাবী প্রতি তার সমর্থন অটুট থাকবে।

ভারত উপমহাদেশকে সোভিয়েত ও আমেরিকার হাত থেকে মুক্ত করার কথা বলে চোঁ এন লাই দেখিয়েছেন যে তিনি চীন-ভারত বিরোধের আশ্রয় সমাধানের জন্য আগ্রহী। কারণ দু'দেশের সম্পর্ক সহজতর না হলে, চীন ভারত-সরকারের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার না করতে পারলে কী করে তাকে রশ-মার্কিন আওতা থেকে বের করে নিয়ে আসবে? প্রশ্ন জাগে অন্য জায়গায়। চোঁ এন লাই বলেছেন যে তিনি ভারতকে এই দুই শক্তির হাত থেকে মুক্ত করবেন, ভারতকে বর্তমান শাসক শ্রেণীর হাত থেকে মুক্ত দেখবেন অথবা দেখতে চান এ কথা বলেন নি। তাহলে কী বুঝতে হবে যে চীন এখন থেকে ভারত সহ অন্যান্য আফ্রো-এশীয় দেশগুলিতে এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে যার ফলে সোভিয়েত

ও মার্কিন সরকারের সঙ্গে টেকা দিয়ে সে একটি তৃতীয় শক্তির নেতৃত্ব করতে পারে। এবং সেইজন্যই কী চীন ভারতে মনোনিবেশ করেছে? - সে কী সোভিয়েত ইউনিয়নের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে সোভিয়েতকে ঘায়েল করতে চাইছে?

কটর চীনা সমর্থকরা হয়ত বলবেন যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক সহজতর করেছে চীন এখানকার মনোনিবেশ (যার প্রসব অবশ্য এখনও ঘটে নি) আরও ভাল ভাবে সাহায্য করতে পারবে। তৎক্ষণাত্ ভাবে এ জিনিষ হয়ত সম্ভব কিন্তু বাস্তবে আমরা সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা দেখছি 'সিংহ' ও 'পাকিস্তানে'। সন্দানের জেনারেল নুসেরীকে, কম্যান্ডেন্টের রক্তে যার হাত লাল হয়ে আছে, সাহায্য করার কথাও কাগজে পড়েছি। কতিপয় অসুস্থ-মস্তিষ্ক অবাচীনের কথা বাদ দিলে আজ এ কথা সকলেই মানবেন যে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে কী সোভিয়েত কী চীন এই দুই "সমাজতান্ত্রিক সিংহ"ই জাতীয় স্বার্থকে সুবোদ্ধ মূল্য দেয়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই তার প্রমাণ।

আর "আমরা বৃহৎ শক্তি হতে চাই না" চোঁ এন লাই-এর, এই আশ্বাসবাণীর প্রধান লক্ষ্য মনে হয় উত্তর ভিয়েতনাম। চোঁ-কিসিংগার বৈঠক এবং নিকসনের যোষণার পর হ্যানয়ের সরকারী মন্তব্য "নানদান" চীন-মার্কিন যোগাযোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখে যে বৃহৎ শক্তির যদি নিজেদের মধ্যে আপোষের মাধ্যমে ছোট দেশগুলির সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে চায়, যেমন ভিয়েতনামের যুদ্ধ, তবে তা এই দেশগুলি মেনে নেবে না। যদিও লেখাটিতে চীনের নাম ছিল না তবু খোঁচাটি সুস্পষ্ট এবং চোঁ এন লাই তার পর থেকেই উত্তর ভিয়েতনাম সরকারকে নানাভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন। জাগরেবে তাঁর সর্বশেষ বক্তব্যের উদ্দেশ্যও তাই।

তবে চীনের উদ্দেশ্য যাই হোক ভারতবাসীদের এই ইন্টারভিউতে খশী হওয়া উচিত। কারণ চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভারতের নিজ স্বার্থেই প্রয়োজন। আর ভবিষ্যতে ভারতের মনোনিবেশ সংগ্রামে শাসক শ্রেণী যদি চীনা রাইফেল এবং মর্টার ব্যবহার করে, যেমন করেছে ইরাকিয়া, তাতেও আবার সেই বাংলাদেশের সংগ্রামের উদাহরণ দিয়েই বলতে হয় মৃত্যুকামী মানুষকে কোন অস্ত্রই দমাতে পারে না।

বাংলা ছবির সাম্প্রতিক সঙ্কট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলা ছবির জগতে সঙ্কট প্রায় বাৎসরিক মহামারীর মত নিয়মিত ঘটনা। গত দু-তিন বছর ধরে এ সম্পর্কে বহু আলোচনা, লেখালেখি, কমিটি, রিপোর্ট ইত্যাদি হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ যে বিশেষ কিছুই হয়নি, তার প্রমাণ সাম্প্রতিক অচলাবস্থা। সম্প্রতি বাংলা ছবির প্রযোজনাক্ষেত্রে প্রায় নাভিস্থাবস উঠেছে, স্টুডিওগুলো টিমিটিম করে চলছে, নিম্নমূল্যে ছবির সংখ্যাও কমে কমে সাতখানাতে এসে ঠেকেছে। মনে হয় এবার সত্যিই পালে বাধ পড়েছে।

এই সংকটের মূল কিন্তু বেশ গভীরে। বাংলা বিভাগের দরুণ স্বাধীনতা উত্তর যুগে বাংলা ছবির বাজার বেশ সঙ্কুচিত। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিনশ পঞ্চাশটি চিত্রগৃহের মধ্যে বাংলা ছবি দেখানো হয় মাত্র ষাটটিতে। তাও অনেক সময়েই এই প্রদর্শন বেশ অনিয়মিত। প্রদর্শক গোষ্ঠীই ব্যবসাক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ এবং সিনেমার লাভের সিংহ ভাগ তাঁদের ধরে গিয়েই জমা হয়। যদিও খাতাকলমে প্রযোজক-পরিবেশক এবং প্রদর্শকের মধ্যে লাভের বন্টন আধাআধি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রদর্শক প্রায় শতকরা আশি ভাগ বন্টন নিজের কোলে টেনে নেয়। আইনের ফাঁকের সুযোগ নিয়েই বহু খরচই প্রযোজকের ঘাড়ে চলে যায়, এমন কি সরকারী নিউজরীল, যার আর্থিক প্রদর্শনীর ভাড়া ইল মালিকের দেয়, তারও সম্পূর্ণ বোঝা বহিতে হয় প্রযোজককেই এরপর কালো টাকার লেনদেন, চড়া সরদে দাদনকারী হুন্ডিওয়ালাদের উপপাত তো আছেই।

প্রদর্শকদের কোনরকম বুদ্ধিই নিতে হয় না। কারণ তাঁদের ক্ষতি পূরণে নেবার জন্য সপ্তাহান্তিক "প্রটেকশন মানি"র নিম্নতম গ্যারান্টি দেবার দায়িত্বও প্রযোজকেরই। চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশক প্রদর্শকদের সম্মিলিত সংস্থা ই আই এম পি-এ-তে প্রদর্শকেরাই সবচেয়ে শক্তিশালী দল, সুতরাং সেখানেও তাঁদের অবাধ প্রতাপ। ছবির ব্যবসায় তাই প্রযোজকের লাভের ঘরে প্রায়শই শূন্য। এই জন্যই ক্রমশই প্রযোজকেরা ছবির ব্যবসায় টাকা খাটতে বিব্রাভ্রান্ত হচ্ছেন এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ছবির সঙ্গে জড়িত অসংখ্য কলাকুশলী ও অন্যান্য কর্মীরা, যাদের মাসিক আয় একেবারেই অনিশ্চিত।

সরকারের দায়িত্বও এক্ষেত্রে কম নয়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী দীর্ঘ চব্বিশ বছরে সরকার বাংলা চলচ্চিত্রের শিক্ষণগত ও ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য বিশেষ কিছুই

করেন নি ("পঞ্চম পাঁচালী" ছবিতে সরকারী আনকুল্যের কথা মনে রেখেও এ মন্তব্য সঙ্গত বলেই মনে হয়), যদিও ছবির জগত থেকে প্রচুর অর্থ সরকারী তহবিল পুষ্ট করে। একাধিক কমিটি তৈরী হয়েছে, 'তর্কবিতর্ক' হয়েছে, রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তারপর যথারীতি সেই সুপারিশগুলো কালান্তক লালফিতার বাঁধনে বন্দী হয়ে সরকারী দপ্তরে গাদা হয়ে পড়ে আছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্ত হয়েছিল যেমন (এক) বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি চিত্রগৃহে বাংলা ছবির আর্থিক প্রদর্শন (দুই) বাংলা ছবির সেন্সর-ভিত্তিক মন্ত্রীর ব্যবস্থা (তিন) বাংলা চলচ্চিত্রের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে সরকারী উদ্যোগে একটি "চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা" গঠন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যুক্তফ্রন্টের অবসানে এই সিদ্ধান্তগুলো যথারীতি সরকারী নথিপত্রের আড়ালে মথ লুকোয়।

সুতরাং সংকটের চেহারা একই রকম থেকে যায়। চলচ্চিত্র কর্মীদের মধ্যেও নানাধরনের বিভেদ ও নৈরাশ্য থাকায় তাদের পক্ষেও সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। তবে আশার কথা এই যে গত কয়েকদিনে সংকটের চরমতম ধাক্কায় চলচ্চিত্র কর্মীরা সবাই জোট বেঁধেছেন এবং গত সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে অনতিমিত প্রযোজক, কলাকুশলী, শিল্পী ও কর্মীদের এক সম্মিলিত সভায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংকটের সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্র কর্মীদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৃহৎ কমিটি গঠিত হয়েছে। পরবর্তী সপ্তাহগুলিতে এই কমিটির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদ জানা যাবে।

"নব উদীয়মান বধ্য শ্রেণীগুলির নেতা হিসেবে বদবন্ধু আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক নো-ভাউট। কিন্তু....."

গোলাপ
কাঁটার
মৃত্যু
সব্যসাচীর সন্তানের নাটক
১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার
সন্ধ্যা ৭টা।
মুক্ত অঙ্গনে। অগ্রিম টিকিট হলে

'কম্বার পদ্ধতিতে ভারতে সর্বপ্রথম অভিনব'

পরিকল্পনা

NYC (পূর্বতন আশনাল ইয়ুথ কম্বার) নির্বেদিত

ঘুম ভাঙার গান

হেই সামালো ধান হো

অবাক পৃথিবী

আবু কোমর বাঁধ তৈয়ার

ও বোদের দেশবাসীকে

বাঁধ ভেঙ্গে দাও

আমাদের সংগ্রাম চলছে

ঐতিহাসিক গণসঙ্গীতসহ ২১টি গণসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান,

নৃত্য ও ব্যালে

অংশ গ্রহণে ১০ জন কম্বার শিল্পী

নির্দেশনা : শ্রীঅরুণকুমার বসু

আলোক সম্পাদ : শ্রীকণ্ঠ সেন

গ্র্যাকাডেমি অফ্‌ ফাইন আর্টস্‌ হল, ১২ই সেপ্টেম্বর

রবিবার সকাল দশটা

টিকেট : ১০, ৫, ৩, ২

প্রাপ্তিস্থান : হলে ও ব্লক নং ৫, রুম নং ৫ ও

লেক্‌ স্টেডিয়াম

আমরাও দর্পণ বিক্রয় করি

প্রোসেলটারেট বক এজেন্সীজ

২২/৬ এস বি রাহা লেন,

আসানসোল

পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির নতুন গতিপথ

চাণক্য সরকার

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নতুন মোড় নিতে শুরুর করেছে। বাম-পন্থীরা অসংগঠিত, লোকচক্ষে প্রায় অপদার্থ, অস্তিত্ব রাজ্যে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম এবং নিজেদের সংঘবদ্ধ শক্তি গঠনে ব্যর্থ। সেই সুযোগে স্বাভাবিকভাবেই নব কংগ্রেস নব উদ্যমে এগিয়ে এসেছে কংগ্রেসের হতগরিব পুনরুদ্ধারে।

নতুন নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অন্য রাজ্যসমূহ নিয়ে বিশেষ কোন সমস্যা নেই। পশ্চিম-বঙ্গে তাঁর সংগঠনে বিশেষ দূর্ব-লতা, তবে বামপন্থীর নানা বিচ্যুতি প্রমিত, পারস্পরিক কলহ নব কংগ্রে-সের সামনে নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে।

এই সুযোগ কিভাবে সম্বা-বহার করা যায় আর সরাভারতে কংগ্রেসী আধিপত্য বিস্তার করা যায় সেই পরিকল্পনায় ইন্দিরাজী উদ্যোগী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর তিনদিনব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ সফর এবং নিরলস সভাসমিতির ব্যবস্থা।

মনে রাখা ভাল, ইন্দিরাজী জনমানসে দাগ কাটার উপযোগী শ্লেগান উদ্ভাবনে নিজ বোগ্যতা প্রমাণ করেছেন, আর সমরোপ-যোগী নিজ সংগঠনের কল্যাণে সঠিক কর্মপন্থা নির্ণয়ে যথেষ্ট দক্ষ। সঠিক সময়ে প্রাচীন কংগ্রেস সংগ-ঠনে ভাঙ্গনের ব্যবস্থা, সারা ভারত মধ্যবর্তী নির্বাচন সংগঠন, আর "গরিবী হঠাৎ" শ্লেগানের মাধ্যমে বিরাট নির্বাচনী জয়—এই সবই তাঁর নেতৃত্বের সুনিপুণতা প্রমাণ করে।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম আর এই আন্দোলন সম্পর্কে ইন্দিরাজীর সতর্ক পদক্ষেপ, হালে সোভিয়েত ভারত মৈত্রী চুক্তি আর চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নীতি বিষয়ে ঘোষণা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত নীতি নব কংগ্রেসের নতুন আত্মবিশ্বাস আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

আভ্যন্তরীণ নীতিতেও অনেক ঘোষণা ইতিমধ্যে করা হয়েছে যা বামপন্থীদের মধ্যে সংশয় এনেছে এবং জনসাধারণ ভাবতে শুরুর করেছে ইন্দিরাজীর পথই সঠিক। সংবাদপত্রের মালিকানা ও ব্যবস্থা-পনার শ্রমিক, কর্মচারী ও সাংবা-দিকদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা মানবের মনকে নাড়া দিয়েছে; বামপন্থীরা বরষে

উঠতে পারছে না এই সমস্ত ঘোষ-ণার তাৎপর্ষ্য অথবা প্রণীতির। তারপর আবার সংবিধান সংশোধ-নের নানা প্রস্তাবাবলী পেশ করা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রায় দিশেহারা; তাদের তরফ থেকে এই সমস্ত বিষয়ে কোন নেতৃত্ব আসে নি। নতুন উদ্যমের কৃতিত্ব সমস্ত ইন্দিরাজী কক্ষা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাম-পন্থীদের অস্তঃসারশূন্যতার কথা একটু বলা দরকার। উনিশশ সাত-ষাট সালের নির্বাচনে বামপন্থায় বিভেদ থাকা সত্ত্বেও এবং গ্রিমথী

যুক্তফ্রন্টের দখলে থাকা সত্ত্বেও, সরকার টেকে না, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে থাকে, আন্তঃ-পার্টি কলহ তীব্র হিংসাত্মক মার-পিটে পরিণত হয়, আর শেষ পর্যন্ত সরকারের পতন ঘটে। নেতৃত্বের অভাবে, সমস্ত বামপন্থীদের নিছক সংকীর্ণতায় যুক্ত বামপন্থী মোর্চা সম্পর্কে জনসাধারণের সংশয় জাগে।

উনিশশ একাত্তর সালের নির্বা-চনে নব কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচনী আবির্ভাব কিছুটা স্তিমিত হলেও খুব সতর্ক পদক্ষেপ। এই নির্বা-চনে কৌশল ছিল কোন মতেই যেন

বঙ্গদর্শন

নির্বাচনী লড়াইয়ে কংগ্রেস-বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসীদের পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে অক্ষমতা মানবের মনে নতুন আশার জোয়ার এনে দেয়—বাম-পন্থীরা নিজেদের নেতৃত্বের দক্ষতায় নয়, অবস্থার চাপে। সুবিধাবাদী ঐক্য স্থাপন করে রাজ্য সরকার দখল করে।

ঐক্য সুবিধাবাদী হওয়ার আর সঠিক নেতৃত্বের এবং কর্ম-পন্থার অভাবে বামপন্থীরা সর-কারে গিয়ে নিজেদের আরও অপ-দম্ব করে। তবে কৃষক, শ্রমিক, শ্রমজীবী আর ছোট মালিক ইত্যাদি সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণ বরষে নেয় যে কংগ্রেসের নেতৃত্বের নীতি ফলিয়েছে, দেশে নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকা-রের পতন হয় নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্য-দিয়ে। কিন্তু তখনও জনসাধারণ বামপন্থায় বিশ্বাস হারায় নি, বরং প্রচণ্ড রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভূত হয়ে উনিশশ উনসত্তর সালের নির্বাচনে বামপন্থী ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টকে বিপুলভাবে জয়ী করে।

এ জয় জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর বলে প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সর-কারের এক বছরের ইতিহাস পার-স্পরিক কলহের এবং নেতৃত্বের দেউলিয়াপনার কলঙ্কময় কাহিনী। বিধানসভায় দূশো আঁশ আসনের মধ্যে দূশো আঠারোটি আসন

বামপন্থীরা আবার ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। কৌশলের দিক থেকে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে নব কংগ্রেস নিজে কোন নির্বাচনী জোটে না গিয়েও বামপন্থীদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং কংগ্রে-সের আসন সংখ্যা-মাত্র চল্লিশ-পঁয়-তাল্লিশ থেকে একশ পাঁচ-এ উন্নীত করে।

এই নির্বাচনে রাজ্য রাজনীতির নতুন চেহারা প্রকাশ পায়। রাজ-নীতি সরাসরি দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে—একদিকে আছে নব কংগ্রেসীরা আর অন্যদিকে মার্কস-বাদী কমিউনিস্ট দল।

ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ সফরে রাজনীতির এই দুই শিবির ভাগ মেনে নিয়ে তাঁর কর্মসূচী শুরুর করেন। বহু আলোচনা তিনি করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী আর অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

লক্ষণীয় যে, এই আলোচনায় তিনি মার্কসবাদীদের সতর্কতার সঙ্গে বাদ দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় তিনি এ কথা পরিষ্কার করেছেন যে "মার্কসবাদীরা বিরোধীপক্ষে" আর তাদের সেই ভাবেই বিচার করে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। ইন্দিরাজী শুনেন খুঁসি হয়েছেন যে, রাজ্যের অনেক দলই তাঁর নেতৃত্বে মার্কসবাদী বিরোধী কর্ম-পন্থায় সন্নিবিষ্ট হতে প্রস্তুত।

এদিকে মার্কসবাদীদের সম্ভবত ফিরে আসছে মনে হয়। তারা এখন বুঝতে পারছে রাজনীতি কি গতিতে চলেছে, নতুন চ্যালেঞ্জের

কি বিশাল শক্তি, আর এর সম্ম-খীন হওয়ার ক্ষমতা মার্কসবাদী-দের একক ভাবে নেই।

তারা বুঝতে শিখছে যে, রাজনীতিতে সকলকে দালাল আখ্যা দিলে আর সেই বিচার থেকে ঐক্যে কোন সফল হয় না। এর ফলে যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তারাই উদ্যোগী হয়ে পড়ে, মানবের মনে নতুন আশা জাগায়।

আর একটা বিষয়ও পরিষ্কার যে, হাসের প্রসার ও ব্যাপকতায় মানব প্রভাবান্বিত হয় না, যারা হাসের ব্যবসায়ী তারাই জনসাধা-

রণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় আর শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। শ্বেত সম্ভা-সের বিরুদ্ধে লাল-সম্ভাস প্রচলিত মার্কসবাদী নীতি, কিন্তু, শ্বেত হাসের পরিমাণ ও পরিধি অন্-ধায়ী লাল হাসের বিস্তার ঘটে নিছক হাস সঞ্চারের জন্য নয়। নিয়-মিত এবং ক্রমশঃ ভয়ঙ্করভাবে প্রকাশমান শ্বেত হাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আকারে লাল হাসের জন্ম ও প্রসার।

লাল হাস কখনও আক্রমণাত্মক নয়, এ জনসাধারণের প্রতিরোধের প্রকাশ মাত্র।

শারদীয় দর্পণ

বর্ধিত কলেবরে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে
৥ তিনটি উল্লেখযোগ্য রচনা ॥

নকশালী আন্দোলনের রিপোর্ট

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি

অঙ্কলে এই আন্দোলনের
সূত্র, তারপর এম এল পাটি
গঠন, জোতদার খতম
অভিযান, শহরে স্কুল কলেজ
পোড়ানো, শ্রেণীশত্রু খতম
অর্থাৎ নকশালী আন্দোলনের
একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র

লিখছেন চাণক্য সরকার

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবর্তন

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের একাধিপত্য শেষ হল ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে। তারপর ঘটনার গতি অতি দ্রুত। এই রাজনৈতিক ঘটনার তথ্যচিত্র তুলে ধরেছেন

কাজল সেন

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম

লিখছেন শফিকুল হাসান

তাহাড়া সমকালীন রাজনীতি অর্থনীতি
সাহিত্য নাটক চলচ্চিত্র সংগীত
প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা
এই সংখ্যার মূল্য এক টাকা

নিয়মিত সংবাদ, ফিচার ও কার্টুন

মফঃরুল এজেন্টরা কে কত কপি চান
দর্পণের সাকুলেশন ম্যানেজারকে
লিখুন।
কলকাতার এজেন্টরা কে কত চান
দর্পণের কলকাতা এজেন্ট
ভগবত ওয়াকে জানিয়ে দিন।

চাকরি জন্ম জাচ্ছে কেন?

কল্পে বলে যে লেন বেডিও তুমি ট্রানজিস্টর সেট তৈরী ও মেরামতের কাজ শিখবে!

আই.বি.এস

বেতার-বিজ্ঞান

(ট্রানজিস্টর শিখনপত্র)

১৪.৫০, ২৪.৫০, ৩৪.৫০

আধুনিক ট্রানজিস্টর বিজ্ঞান

(ট্রানজিস্টর সেট তৈরী শিখার নির্দেশাবলী গ্রন্থ)

১৪.৫০, ২৪.৫০, ৩৪.৫০

সাবানিয়ার ওনানি

২৭/এ, ডাকচ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫

দপন

১৪শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা ৥ শ্রুতবার ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

সি পি এম ও সি পি আইয়ের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি পি আইয়ের সাতদিন-ব্যাপী রাজ্য সম্মেলন শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। প্রায় একই সঙ্গে চলছে সি পি এমের রাজ্য কমিটির অধিবেশন। দুই দলেরই এক কথা গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রায় ডুবে গেছে পশ্চিমবঙ্গের আইন, শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ও পদলিখী সমস্যার দরদর।

দুই দলই মনে করে যত্ন গণ-তান্ত্রিক সংগ্রাম ছাড়া মানুষের অধিকার রক্ষা করা যাবে না। দুই পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্য তফাৎ আছে গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন সম্পর্কে।

সি পি আই মনে করে যে, উনিশশ সাতাশটি-উনসত্তর সালে যত্নসন্নিবিষ্ট সরকারের পতন ঘটে সি পি এমের আগ্রাসী নীতির দরদর। আর সি পি এম সি পি আইকে কংগ্রেসী দালাল অভিহিত করে।

দুই দলেরই মধ্যে কিন্তু প্রভাবশালী নেতারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনার ওপর জোর দিচ্ছেন। সি পি আইয়ের বিশ্বনাথ মদ্যাজী, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ নেতারা সি পি এমকে গণ-তান্ত্রিক ফ্রন্টের বাইরে রাখার বিরোধী।

সি পি আইয়ের অন্য এক গোষ্ঠী মনে করে যে সি পি এমের নিছক কংগ্রেস বিরোধিতার ওপর ভিত্তি করে কোন ফ্রন্ট গঠন রাজনৈতিক বাস্তবতা বিরোধী। সি পি আই নেতা কানাই ভৌমিক তাঁর রাজনৈতিক রিপোর্টে বলেছেন যে, উনিশশ উনসত্তর সালে কংগ্রেস দুই টুকরো হয়ে যাবার পর এবং উনিশশ একাত্তর সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী নব কংগ্রেসের নির্বাচনী জয় দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে এক বিরাট (শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী এম এম বসুর বাড়িতে

এখনও দুজন দেহরক্ষী!

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু সমালোচিত সেই অবসরপ্রাপ্ত চীফ সেক্রেটারী এম এম বসু আজও স্পেশাল ব্রাণ্ডের দুজন দেহরক্ষীকে ডিউটিতে বহাল রাখায় পদলিখী মহলে বিক্ষোভের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বসু সাহেব অবসর নিয়েছেন প্রায় এক বছর। কিন্তু চীফ সেক্রেটারী হিসেবে তিনি যে দুজন দেহ-

রক্ষী পেতেন তাঁদের আজও ছাড়েন নি। এ দুজন বোচারা পদলিখীকে রোজ সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বাস সাহেবের বাড়ীতে ডিউটি দিতে হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য, বাস সাহেবের বাড়ীতে সশস্ত্র পদলিখী কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরো দুজন দেহরক্ষীকে তিনি আটকে রেখেছেন। অন্যদিকে পদলিখী কর্তৃপক্ষ ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে শিখা করছেন।

আইন কলেজে নির্বাচন

ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে ভীতিপ্রদর্শনের অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত-মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে কংগ্রেস ছাত্রপরিষদ প্রার্থীদের বেশির ভাগ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে নিরস্ত একজন অধ্যাপক রিটার্নিং অফিসার বলেন যে, অন্যান্য দলের সব প্রার্থীরা নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন ছাত্র পরিষদের মারের হুমকীতে।

এই অধ্যাপক অভিযোগ করেন যে, তাঁর ক্লাসে একজন ছাত্র প্রার্থী শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নির্বা-

শারদীয় দর্পণ

দর্পণের আগামী সংখ্যা

বিশেষ শারদীয় সংখ্যারূপে

শুক্লাব প্রকাশিত হচ্ছে

..লেখক ও বিষয়সূচী..

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আব-
তন : কাজল সেন ॥ নকশালী
আন্দোলনের রিপোর্ট : চাণক্য
সরকার ॥ পূর্ব বাংলার মন্দির
সংগ্রাম : শফিকুল হাসান ॥
নিকশনের চীন যাত্রা : রত্ন-
চীন-মার্কিন স্বপ্নেরই নবপর্ষায় :
রঞ্জন নাগ ॥ নকশালী আন্দো-
লন সম্পর্কে একটি দলিল ॥
সি পি আই (এম-এল)-এর
রাজনীতি প্রসঙ্গে : কৌস্তব ॥
পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের মৃত্যু :
বিবেকানন্দ মল্লিকপাধ্যায় ॥
যৌবনের সংকট : বাংলা দেশ :
অজুন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পশ্চিম-
বঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য :
নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ॥ নিরপেক্ষ
সাংবাদিকতা : হীরেন বসু ॥
একটি বিজ্ঞানবিষয়ক আলো-
চনা : রণজিৎকুমার সেন ॥ রুচি
কুরচি ও বিকৃতি : বীরেন্দ্র
মিত্র ॥ পূর্বোক্ত বিলম্বমুখী :
রমাপ্রসাদ মল্লিক ॥ বাংলা দেশ,
১৯৭১ : নিবারণ চক্রবর্তী ॥
অর্ধশতাব্দীর খিয়েটার এবং
আমাদের খিয়েটার : অমিতাভ
মৈত্র ॥ লোকটা : প্রজ্ঞা সেন ॥
শ্রেণী সংগীত ও সমাজ :
হীরেন্দ্র চক্রবর্তী ॥ চলচ্চিত্র
সম্পর্কে লিখছেন মৃগাঙ্ক-
শেখর রায় ও রাজনীতির
পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের হাল-
চাল সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী
তাছাড়া নিম্নমিত সংবাদ ফিচার
ও কার্টুন ॥ দাম এক টাকা

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে অ্যাড হক কমিটি গঠনের নেপথ্য কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে
অ্যাড হক কমিটি গঠিত হয়েছে।
এর নেপথ্যে সভাপতির পদ নিয়ে
রাজ্য কংগ্রেসে এই সপ্তাহে যে

কৌদল চলছিল তার সম্পূর্ণ বিব-
রণ দর্পণ সংগ্রহ করেছে। এই
কৌদলের ফলশ্রুতি অ্যাড হক
কমিটি।

পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেস দলের
সভাপতি নিয়ে মঙ্গলবার সিদ্ধার্থ
শঙ্কর রায় বনাম বিজয় সিং নাহা-
রের দলের মধ্যে তুমুল ঝগড়া
হয়েছে। সিদ্ধার্থ রায় পরিষ্কার
ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে
বলেছেন, যদি অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ
চ্যাটার্জীকে কংগ্রেস সভাপতি না
করা হয় তবে নরাদিল্লীর হাই-
কমান্ড পশ্চিমবঙ্গে দেবী চ্যাটা-
র্জীকে সভাপতি করে আড-হক
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধার্থ রায়ের একটি অন্যায়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়ায় স্থিতীয় রাজ
তৈরীর কল্যাণ ষাতে একটি
মারোয়াড়ী কোম্পানী পায়
তার জন্য সিদ্ধার্থ রায় তর্জির
করছেন। এই মারোয়াড়ী
কোম্পানীটির মালিক হলেন
ভগীরথ কনোরিয়া। ইনি
সিদ্ধার্থ রায়ের পূর্বনো
মুন্ডেল।

বুধবার রিজ কন্সট্রাক্টাল
হোটলে এক সাংবাদিক সম্মে-
লনে ভারত সরকারের প্রতি-
ষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট
(ইপিডিয়া) লিঃ-এর পক্ষ থেকে
সরকারীভাবে বলা হয় যে, বে-
সরকারী কোম্পানী টেন্ডার
দেওয়া সত্ত্বেও একটি প্রভাব-
শালী মহল তর্জির করছেন,
যাতে ছাব্বিশ কোটি টাকার
কল্যাণটি একটি প্রাইভেট
কোম্পানীকে দেওয়া হয়।

বে-সরকারী ভাবে তারা
বলেছেন, এই প্রভাবশালী
মহল আর কেউ নয়, স্বয়ং
সিদ্ধার্থ রায়। সাংবাদিক
সম্মেলনে নব কংগ্রেসের সভা-
পতি আবদুস সম্মার, উত্তর-
বঙ্গের জয়নাল আবেদিন ও
সন্তোষ রায় এবং লোকসভার
সদস্য শক্তি সরকার উপস্থিত
ছিলেন।

আদালত জামিন দিতে অস্বীকৃত তবু কংগ্রেসী চাপে খুনের আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কাশীপুরে প্রাণনাথ চৌধুরী
লেনে সম্প্রতি একজন খুন হয়।
সেই সূত্রে পদলিখী দুজনকে গ্রেপ্তার
করে। এদের মধ্যে আছে রাম-
শঙ্কর দীক্ষিত। যে চাঁপের মণ্ডল
কংগ্রেস সভাপতি উমাশঙ্কর
দীক্ষিতের ছেলে।

পদলিখীর অভিযোগে প্রকাশ
যে, তার কাছ থেকে একটি বে-
আইনী রিভলভার ও কিছু বে-
আইন অস্ত্র পাওয়া যায়। পদলিখী
ওকে গ্রেপ্তার করে নির্দিষ্ট অভি-
যোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের
করে। অভিযোগ দুটি। প্রথম,
হত্যা ও স্থিতীয় বেআইনী অস্ত্র-
শস্ত্র রাখা।

রামশঙ্করকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে

সঙ্গে নব কংগ্রেস মহলে সাড়া পড়ে
যায় এবং থানার ওপর নানা ধরনের
চাপ সৃষ্টির চেষ্টা হয়। শেষ
পর্যন্ত পত্রিকা ভবনের প্রফুল্লকান্তি
ঘোষের নেতৃত্বে একদল কংগ্রেসী
সমর্থক রামশঙ্করের মন্দির দাবী
করে অনশন করে। নানা চাপে
কাশীপুরে থানা ওকে মন্দির দিতে
বাধ্য হয়।

কি ভাবে খুনের অভিযোগে
খুদ আসামী-যাকে একবার কোর্টে
হাজির করা হয়েছিল এবং যার
জামিন আদালত অগ্রাহ্য করে-
ছিলেন-থানা থেকে কংগ্রেসী
প্রভাবে ছাড়া পেয়ে যায় তা নিয়ে
হাইকোর্টের আইনজ্ঞ মহলে নানা
আলোচনা শোনা যায়।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

বসুমতী ও অশোক সেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্র যে একটা ধাপ-বাজী মাত্র এবং দর্পণীতির প্রপ্রয় দানে তিনি প্রাক্তন কংগ্রেসী প্রধান-দের থেকে কম যান না তার একটি প্রমাণ। বসুমতী প্রতিষ্ঠানে অশোক সেনের যথেষ্টাচার। অশোক সেন কয়েকমাস আগে বসুমতীর কয়েকজন কর্মীকে ছাটাই করেন এবং হঠাৎ বিনা নোটিশে গত বছর পুজোর ঠিক আগেই বসুমতীর গেটে তালা বদলিয়ে দেন। কর্মচারীরা পড়েন অকূল পাথারে। তাদের মাইনে বাকী, সামনে পুজো। তারপর এই দীর্ঘ সময় 'অনেক টানা'পড়েন, অনেক আলাপ-আলোচনার পর বসুমতীর দরজা খুলেছে এবং চোঁটা আগস্ট থেকে দৈনিক বসুমতী প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু প্রথম দিনই সম্পাদক বিবেকানন্দ মজুমদারকে ছাটাইয়ের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং ভেতরে গুন্ডা বাহিনী বসানো হয়। যেসব সাংবাদিক ও কর্মচারীর গায়ে সামান্যতম বামপন্থী গন্ধ আছে তাদের নিষাধিত করা হচ্ছে। ফলে দর্পণ অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ও দুজন সাবএডিটর পদ-ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অশোক সেন নিজে মগ্ধে অনুপস্থিত। বসুমতীতে তাঁর আড়কাঠি ডাঃ

ভূপাল বসু।

বসুমতী প্রতিষ্ঠান ও তার কর্মীদের দর্পণীতির জন্য দায়ী মালিক অশোক সেন। তিনি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী থাকার সময় বেনামে বসুমতী প্রতিষ্ঠান ক্রয় করেন। টাকা দেয় সব অসাধু ব্যবসায়ীরা যাদের বিরুদ্ধে সরকারী মামলা বদলিছিল। বসুমতী অশোক সেনের হাতে আসার পর পূর্বনো কর্মচারীদের সঙ্গে সেখানে তাঁর বহু সাক্ষরদণ্ড প্রবেশ করল। তাদের অনেকেই লক্ষ্য অসদুপায়ের টাকা কামানো। অশোক সেনের লক্ষ্যও একই। প্রকৃতপক্ষে অশোক সেন বসুমতীকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে না চালিয়ে যেন তেন প্রকারের প্রচুর অর্থ আহরণের একটি বস্তুরূপে ব্যবহার করেন। বসুমতীর ব্যবসা বাড়ানো বা একে আরও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বাসনা তাঁর নেই। বিবেকানন্দ মজুমদারের নাম এবং তাঁর উচ্চ সম্পদকীয়কে ভাঙিয়ে তিনি দৈনিক বসুমতীকে বাজারে চালু করেছেন। এবং আইন মন্ত্রীরাপে পদমর্যাদার সন্ধান নিয়ে প্রচুর বিজ্ঞাপন জোগাড় করেছেন। অপরদিকে নিউজ প্রিন্ট বেচেও তিনি প্রচুর টাকা কামিয়েছেন।

তাঁর এইসব কার্যকলাপ তাঁকে

একজন অসৎ ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করেছে। এটা বড় কথা নয়, কারণ ভারতবর্ষে এই ধরনের দর্পণীতি-পরায়ণ ব্যক্তির অভাব নেই এবং ব্যবসা করতে গিয়ে তাঁরা অনেক রকম দর্পণীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অশোক সেনের দর্পণীতির সঙ্গে হাজার কয়েক লোকের রুটির প্রশ্ন জড়িত এবং অশোক সেনের অর্থলোভ ব্যবসায়িক প্রায় লাটে তুলে দিচ্ছে। সতরাং তাঁকে সংযত করা দরকার। কর্মচারীরাই তাঁকে সংযত করতে পারে। কিন্তু সেখানে তিনি বিভেদের বীজ রোপন করেছেন।

আর পারেন কেন্দ্রীয় সরকার। অশোক সেনের বিরুদ্ধে সি বি আই ও আয়কর বিভাগের তদন্ত বদলিছিল। জানিনা ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করে সেগুলো তিনি ধামাচাপা দিতে পেরেছেন কিনা। তবে তিনি লোকসভার গত নির্বাচনে নব কংগ্রেসের টিকিট পেয়েছিলেন। অতএব বসুমতীর সর্বশ্রেণীর কর্মচারীরা বিভেদের শিকার না হয়ে যদি অশোক সেন ও তাঁর সাক্ষরদেদের অপকর্মের প্রতিরোধ করেন তবেই বসুমতীর এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ভাগ্য সুনিশ্চিত হবে। না হলে অশোক সেন তাঁর অবাঞ্ছিতদের বসুমতী থেকে বাদ দিলেও তাঁরা সখে চাকরী করতে পারবেননা। কারণ অশোক সেনই বসুমতীর শনি। তাঁর অর্থলোভই বসুমতীকে ডোবাবে।

সি পি আই সি পি এম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উনিশশ সাত-ষাট ও উনিশশ ঊনসত্তর সালের মত কংগ্রেস বিরোধিতার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন রাজনীতির দিক থেকে সম্ভব অথবা বাস্তব নয়।

নব কংগ্রেসে অবশ্যই মনোপালি ধনীরা আছে, কিন্তু নেতৃত্ব জাতীয় বুদ্ধোন্মত্ত ও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর প্রতিনিধিদের হাতে। বর্তমান অবস্থায় বৃহৎ বুদ্ধোন্মত্ত এবং সামন্ত শ্রেণী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রু। এদের বিরোধিতায় অন্যান্য শ্রেণীকে এক জোটে আনা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্তব্য। তাই কংগ্রেস বিরোধিতার কথা বললে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল অংশের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন হয় না।

সি পি এমও মনে হয় কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল অংশের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু প্রশ্ন, কি ভাবে এই অংশকে কংগ্রেস দল থেকে আলাদা করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল করা যায়।

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে সি পি এমের প্রমোদ দাশগুপ্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলেন যে, সমাজের সমস্ত প্রগতিশীল ও

সংগ্রামী অংশ এক সঙ্গে না এলে আন্দোলকে ঝাঁচনো শক্ত। একদিকে শাসক শ্রেণীর সন্ত্রাস আর অন্যদিকে পুলিশ ও প্রশাসনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিষিদ্ধ আক্রমণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি করেছে।

কিন্তু মূল প্রশ্ন হল যদি ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন হয় তখন সি পি আই এবং সি পি এম কি এক পক্ষে থাকবে। মনে হয় সি পি এম কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্ট প্রসারের চেষ্টা করবে যাতে এই ফ্রন্টে অন্ততঃ এস ইউ সি, আর এস পি ও ফরোয়ার্ড ব্লকে আনা যায়। আর সি পি আই নব কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি এম বিরোধিতার ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়বে।

আসামী ছাড়া পেল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাদী, জলদস্যুর প্রতিক্রিয়া মাত্র।

এবারে আইন কলেজে ইউনিয়নের নির্বাচনে একটি তথাকথিত নির্দলীয় আইন কলেজ ছাত্র সংগঠন নামে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রার্থীরা ছাত্র পরিষদের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। ছাত্র পরিষদ এই সংগঠনকে সি পি এম কৃষ্ণগত বলে শুরু থেকে প্রচার চালায় এবং প্রার্থীদের বিবেকের কাছে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের আবেদন জানান।

এই সমস্ত প্রার্থীদের বিবেক আবেদনে সাড়া না দেওয়ার শেষ পর্যন্ত ছাত্র পরিষদ সমর্থকদের হুমকীর পথ নিতে হয়। অনুরূপ হুমকীর দ্বারা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনেও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে ছাত্র পরিষদ। এই অভিযোগ বর্তমানের কিছর ছাত্র ও অধ্যাপক মহল দর্পণের কাছে করেছে। কলকাতা ও শহরতলীর আরও কয়েকটি কলেজেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে।

এই সমস্ত অভিযোগ থেকে একথা ধরে নেওয়া যায় যে, ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে সামনে অন্যান্য বেশির ভাগ ছাত্র সংগঠন পশ্চাদপসরণ করেছে।

আইন কলেজে নির্বাচন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনেকের মতে এইভাবে আইন আদালত জলাঞ্জলি দিলে পরিণাম ভয়াবহ হবে। সমাজ বিরোধীরা শাসক দলের সহায়তায় শান্তিশৃঙ্খলার বিষয় ঘটালে জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হবে না।

বিদেশ দর্পণ

সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান গতিবিধি

(দর্পণের পর্ববন্ধক)

গত সপ্তাহে বার্লিন সমস্যা সমাধানের পক্ষে একটি চুক্তির খসড়া তৈরী হয়েছে। এই চুক্তির বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রথম রাজী হয়েছে পশ্চিম বার্লিনের অধিবাসীদের শহরের পূর্বাংশে বিনা বাধ্যন আসতে দিতে যার বদলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম বার্লিনে নিজেদের একটি দূতাবাস খুলতে পারবেন।

দেড় বছর ধরে টানাহাঁচড়ার পর সোভিয়েতের হঠাৎ বার্লিন সমস্যা মিটিয়ে ফেলার আগ্রহের কারণ আছে। যতদিন ইউরোপে এই সমস্যার সমাধান না হচ্ছিল ততদিন অবাধ অন্যান্য দেশগুলির যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স এবং সর্বোপরি পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েতের সম্পর্ক ঠিক পুরোপুরি সহজ হচ্ছিল না। এবং চীনের সঙ্গে বিরোধের ফলে সোভিয়েতকে একটি বিশ্বদুখী লাড়াই চালাতে হচ্ছিল।

নিকিতা ক্রুশ্চফের পর থেকেই আদর্শগত পরিবর্তনের ফলে মস্কো বর্তমানে এমন একটি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যেখানে

কমিউনিস্ট চীনের থেকে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তার কাছে অনেক বেশী কাম্য। মস্কো চায় নিজেকে ইউরোপে অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রে অধিষ্ঠিত দেখতে এবং এই কারণেই সে যে শব্দ বার্লিন চুক্তিতে রাজী হয়েছে তাই নয়, সম্প্রতিকালে সারা ইউরোপ নিরাপত্তা বৈঠকের ব্যাপার নিয়েও খুব মনো উত্তেজিত। আঠাশে অক্টোবর রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী লিওনিড ব্রেজনেভ প্যারিসে যাবেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট পম্পিদুর সঙ্গে এই বৈঠক সম্পর্কে আলোচনার্থে। বতদূর জানা গেছে পশ্চিম জার্মানীও এখন এই ধরনের বৈঠকে রাজী।

মার্কিন-চীন সম্পর্ক উন্নতির সম্ভাবনাই সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই বৈঠকের ব্যাপারে আরও বেশী আগ্রহী করে তুলেছে—মস্কোর মতে এই ধরনের কোন নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস পাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হবে বলে মনে হয় না। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি নিরাপত্তার ব্যাপারে কিছুতেই

আমেরিকাকে সরিয়ে রাখতে পারবে না। বরং এই ধরনের চুক্তির ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ক্রমাগতই বর্ধিত হতে থাকবে তার জাতীয় স্বার্থের কাছে। ইউরোপে যে শান্তির কথা সোভিয়েত ইউনিয়ন বলছে সেই শান্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হল ধনতন্ত্রকে আরও কিছুদিন বাঁচতে সাহায্য করা।

অপরদিকে চীনের রোখার জন্য সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ উঠে পড়ে লেগেছেন। সম্প্রতি রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন তাঁর কূটনৈতিক দিগবিজয়ের জন্য যে ভ্রমণসূচী ঘোষণা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি কানাডা ও কিছ ইউরোপীয় দেশ ছাড়া হ্যানয়ও যাবেন। আর এই হ্যানয় যাওয়ার পরিকল্পনার পিছনে মনে হয় একটি গভীর চাল আছে। দর্পণের পাঠকদের মনে থাকতে পারে যে গত সপ্তাহে উত্তর ভিয়েতনামের সরকারী মত্বপণ্ডে চীনের পরোক্ষ সমালোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। মনে হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর ভিয়েতনামের এই মনোভাব নিজ

স্বার্থে কাজে লাগাতে চাইছে। যে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ এখনও সোভিয়েত-চীন বিরোধে নিরপেক্ষ আছে উত্তর ভিয়েতনাম হচ্ছে তার অন্যতম। এখন যদি তার সবচেয়ে বড় শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সম্ভাব্য যোগাযোগের ফলে হ্যানয় পিকিংয়ের উপর বিরূপ হয় তাহলে তাকে সোভিয়েতের উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল হতে হবে। এবং কোসিগিনের হ্যানয় ভ্রমণের উদ্দেশ্য আর কিছই না শুধু চীন সম্পর্কে উত্তর ভিয়েতনামের নেতৃবৃন্দকে একটু সন্দেহান করে তোলার চেষ্টা। তবে বহু পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ উত্তর ভিয়েতনামের নেতৃবৃন্দকে বর্তমানের নিরপেক্ষ অবস্থা থেকে সোভিয়েত কতটা নিজের দিকে টানতে পারবে তা এখনই বলা কঠিন। বরং মনে হয় সোভিয়েত ও চীনের সাম্প্রতিক কার্যাবলী হ্যানয়কে শব্দে নিজ লাইনের সঠিকতা সম্পর্কেই নিশ্চিত করবে।

পৌর গণতান্ত্রিক জোটে ফাটল

শিবকুমার খান্না বনাম কুমার দত্ত

ওয়ার্কস কমিটির সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি

(দপনের সংবাদদাতা)

ভাড়া লরি নিয়োগকে কেন্দ্র করে দুই নং ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বনাম কংগ্রেস দলের নেতা শিবকুমার খান্না লড়াইয়ের ফলে খ্রীখান্না উক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে বদলি করতে চাইলেন। খান্না সাহেবের নেতৃত্বাধীন অর্থকমিটিতে সেই মর্মে প্রস্তাবও পেশ করা হল। কিন্তু এই কোয়ালিশনেরই অপর কয়েকজন সদস্যের বাধার ফলে কমিটির পর পর তিনটি সভাতেও প্রস্তাবটি পাশ হল না—পেশ হয়েই রইল। তার পরে এক সভায় দলগত সমঝোতার ভিত্তিতে স্থির হল (এবং সেই মর্মে প্রস্তাবও পাশ করান হল) যে, সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকেই বদলি করা হবে। কিন্তু প্রস্তাবটি শাসক কংগ্রেস দলের সচিবদানন্দ পাণ্ডে ও সুরেশ রায় এবং বলশেভিক পার্টির আবদুস সম্মারের মনঃপূত হল না। অপর দিকে কুমারবাবু অর্থকমিটির উক্ত প্রস্তাবকে তাঁর ওয়ার্কস কমিটির অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে

করলেন। কারণ তাঁর মতে এই দপ্তরের কাজকর্ম তাঁর ওয়ার্কস ও টাউন প্লানিং কমিটির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তিনিও এই একই বিষয় বিবেচনা করার জন্য তার কমিটির সভা ডাকলেন পঁচিশে আগস্ট। কমিটি তাদের প্রস্তাবে কমিটির আলোচনাসাপেক্ষে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারদের বদলি স্থগিত রাখতে কমিশনারকে নির্দেশ দিলেন। পরলা সেপ্টেম্বর সমস্ত বয়রা কমিটিগুলির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানদের যে সভা হল তাতেও উক্ত প্রস্তাব অননুমোদিত হল। পরবর্তী সভার দিন স্থির হল দোসরা সেপ্টেম্বর; কিন্তু সেদিনের সভায় গিয়ে সদস্যরা শুনলেন যে, পরলা সেপ্টেম্বরই ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারদের বদলি করে দেয়া হয়েছে। কৈফিয়ৎ তলব হল কমিশনারের। তিনি জানালেন—দুটো কমিটির পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত থাকায় তিনি এ ব্যাপারে মেয়রের নির্দেশ চেয়েছিলেন। মেয়র তাঁকে

অর্থ কমিটির প্রস্তাবকেই অননুমোদন করতে বলেছেন। বাস, সভায় বেন বাজ পড়ল। সচিবদানন্দ পাণ্ডে, সুরেশ রায়, ফরোয়ার্ড ব্লকের কুমার দত্ত সম্মুখে চিৎকার জুড়ে দিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের মেয়রের অন্যান্য আদেশের বিরুদ্ধে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, কমিটি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে হল। অন্তর্ভুক্ত বহিঃপ্রকাশ সি পি এম সদস্যরা সমস্ত ঘটনাই জানতেন। তারা বোধ হয় হাজির হয়েছিলেন গজকচ্ছপের লড়াই আরও একটু জমিয়ে তুলতে। সুতরাং কমিটির সামনে খবর কান্দা করে বক্তব্য রাখলেন অশোক বন্দ, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, নিজামুদ্দিন, পবিত্র ব্যানার্জী, সত্য মদ্যাজী, রথীন ঘোষ, বারীন চ্যাটার্জী প্রভৃতি সি পি এম কাউন্সিলারেরা। সি পি এমের চীফ হুইপ অশোক বন্দ বললেন : বদলী করার প্রকৃত অধিকারী হচ্ছেন কমিশনার। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি

একটা কমিটিতে আলোচনার পর্বেই আছে এবং যেহেতু তারা সাময়িক ভাবে বদলি স্থগিত রাখতে কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন সেই হেতু মেয়রের এই ধরনের নির্দেশ দেয়া এবং তদনুসারে কমিশনারের বদলির আদেশ কার্যকর করা কেবল অশোভনই নয়, রীতিবাহিতও বটে। প্রশান্ত চ্যাটার্জী মতে কমিশনারের এ ব্যাপারে নিজস্ব বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করা উচিত ছিল। অতএব বদলির আদেশ স্থগিত বৈধে দুটি কমিটির প্রস্তাবই পৌর সভার বিবেচনার জন্য পেশ করতে বললেন তিনি। কিন্তু কমিশনার জানালেন যে, তাঁর পক্ষে মেয়রের নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। পল্লভের আগমন লেগে গেলে কুমার দত্ত মশাই তাঁর বাজখাই নন-স্টপ বক্তৃতার তুবাড়ি ছোটালেন এই বিষয় কোন কমিটির এজিয়ার-ভুক্ত? খান্না সাহেবের, কী অধিকার আছে এই ধরনের নির্দেশ দেওয়ার? মেয়র শ্যামসুন্দর গুপ্ত কমিশনারকে এই রকম নির্দেশ দিয়ে যে অন্যান্য আচরণ করেছেন তার কৈফিয়ৎ চাই। শেষে উত্তেজনা আরও চরমে উঠলে তিনি ঘোষণা করলেন : যে পর্যন্ত এই বদলির আদেশ প্রত্যাহত না হবে তত দিন ওয়ার্কস ও টাউন প্লানিং কমিটির সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত অশোক বন্দ কুমারবাবুর কথাটি লুফে নিলেন এবং সরকারী ভাবে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে, যে পর্যন্ত মেয়র উক্ত বদলির আদেশ প্রত্যাহার করে বিষয়টি কপেরেশনে পেশ না করছেন সে পর্যন্ত ওয়ার্কস এবং টাউন প্লানিং কমিটির সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকবে। সুতরাং কলকাতা পৌর সভার স্থায়ী কাজকর্ম এবং নগরপরি-কল্পনা কমিটির সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে আছে। গণ-তান্ত্রিক কোয়ালিশনের অন্তর্ভুক্ত এত কাল ছিল নেপথ্যে; এবারে একটু পর্দার বাইরে মুখ দেখিয়েছে। কালক্রমে ব্যাপার যে আরও অনেক দূর গড়াবে তাতে সন্দেহ নেই। পশুপাণ্ডবের সুখের ঘর বোধ হয় ভাঙতে সুরু করল। শেষ সংবাদ শাসক কংগ্রেসের সুরেশ রায় বদলির আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের খ্রীঅজয় দে এই আদেশ প্রত্যাহত না হওয়া পর্যন্ত অর্থ-কমিটির সভায় যোগদান করবেন না বলে চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। মেয়র নাকি বলেছেন : চলোয় যাক ওয়ার্কস কমিটির মিটিং। বদলি আদেশের যাতে হের-ফের না হয় সে জন্য খান্না সাহেব কমিশনারকে শাসিয়ে রেখেছেন। এ দিকে কর্পোরেশনের চব্বিশ জন কাউন্সিলার কর্পোরেশনে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য পৌর আইনের ৮৮(৯) ধারা অনুযায়ী পৌর সভার বিশেষ অধিবেশন দাবি করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনব কাণ্ড

(দপনের সংবাদদাতা)

শোনা গেল, উত্তর কলকাতার, বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা বারিদবরণ দাস ও একজন কর্মী উনসত্তর সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং অকৃতকার্য হন। পিছন দরজা দিয়ে পাশ করার জন্যে তখন থেকেই শূর হন তাঁদের তদারক। বিশেষ সন্নিধা হিজল না নানা কারণে। কিন্তু কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অরবিন্দনাথ বোসের তৎপরতার ওদের ফেলের দরুণ মরেছে যায়। ছাত্র দুটিকে পাশ করিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শোনা যায়, রীতি-মত বিজ্ঞান সূত্রে প্রতিদিন কতৃপক্ষ স্থানীয়দের অপদৃষ্ট করার হুমকি দেখানোর জন্যেই নাকি এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। টাকা পরসার লেন-দেন, কংগ্রেসী মহলের চাপা কিংবা হুমকি দেখানোর অভিযোগ যেটাই সত্য হোক না কেন পাশ ফেল নিয়ে এ ধরনের ঘটনা অনেকেই কাছে মনে হচ্ছে রহস্যজনক।

রিলিফ ফাণ্ডের টাকা তছরুপ ?

(দপনের সংবাদদাতা)

রিলিফের টাকা পরসার অপ-ব্যবহারের এক গুরুতর অভিযোগ দপনের কাছে এসেছে। চৌদ্দিশ নং ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটে গোপালচন্দ্র কুমারের বাড়ীর দোতলাতে অনেক দিন আগে “বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক কমিটির” এক অফিস বসে। ভদ্রলোক নিজে গভর্ণমেন্ট কনট্রাকটর। চালাক চতুর মানব। রিলিফ ফাণ্ডের অফিসের জন্যে নিজেই উদ্যোগী হয়ে বাড়ীর একাংশ ছেড়ে দেন। বিজ্ঞান সূত্রে থেকে টাকাপরসার আনাগোনাও এরপর শুরুর হয়। গত জুন মাসের শেষের দিকে রিলিফের কাজে মশারি জামাকাপড় কেনার জন্যে এক টেন্ডার ডাকা হয়। তিরিশে জুন টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। যদিও টেন্ডার খোলা হয়নি তবু প্রায় লাখ টাকার মাল বিনা টেন্ডারেই কেনাকাটা হয়ে গেছে। তবে সুরের কথা, শোনা গেল, উক্ত গোপালকুমার কমিটির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, এবং রিলিফ কমিটির অফিস প্রতিষ্ঠার পর ইতি-মধ্যেই তিনি নাকি তার স্বপ্নের বোঝা অনেক কমিয়ে ফেলেছেন। আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কমিটির প্রেসিডেন্ট হলেন অজয় মদ্যাজী।

সেলস ট্যাক্স দপ্তরে বাষক গোপন রিপোর্টের কারচুপ

সরকারী দপ্তরের বড় বড় অফিসাররা নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বার্ষিক গোপন রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে নিজের মর্জিমারফিক মন্তব্য প্রকাশ কল্পে থাকেন এটাই শোনা যায়। তাতে বশবদ ভোষামুদ্রের হয় পোয়াবারো আর সর্বনাশ হয় তাঁদের যারা আত্মসম্মান বজায় রেখে অফিসের কাজ করে চলতে চান, নিয়ম মারফিক কাজ করেন। কিন্তু যেহেতু গোপন রিপোর্ট অত-এব প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার উপায় থাকে না। নানাসূত্রে খোঁজখবর পেলেও কর্মচারীরা কিছু বলতে সাহস করেন না, ফলে নীরবে প্রমোশনের ক্ষেত্রে বণ্ডনা সহ্য করতে হয়। সেলস ট্যাক্স দপ্তরে ইন্সপেকটরদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে উনোসত্তর ও সত্তর সালে ব্যাপক হারে সুপারসেশন করা হয়। কিন্তু একজন বণ্ডিত ইন্সপেকটরের বিরুদ্ধেও কোন প্রকার অযোগ্যতা বা দলনীতির অভিযোগ ছিল না—প্রমাণ করা তো দূরের কথা। তখন প্রায়ই তাঁদের গোপন রিপোর্টে গোপন কারচুপের কথা শোনা যেত। এবং একবার চব্বিশে এপ্রিল উনোসত্তর তারিখে ইন্সপেকটরদের এক ডেপুটিশনকে অর্থ কমিশনার জানিয়েছিলেন এবং পত্রে লিখিতভাবেও স্বীকার করেছিলেন যে, কয়েকজন ইন্সপেকটরের পরাতন গোপন

রিপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার নতুন করে রিপোর্ট লেখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে জনৈক বণ্ডিত ইন্সপেকটর হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং হাইকোর্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর রুল জারি করা হয়। গোপনসূত্রে জানা যায়, সেই সময় এই ইন্সপেকটরের আটবাড়ি-উনোসত্তর সালের গোপন রিপোর্টটি, যাতে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে উচ্চ সুপারিশ ছিল, সরিয়ে ফেলা হয় এবং সর্বশেষে রিপোর্টদানকারী অফিসারের অজ্ঞাতসারে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অজিত দাশগুপ্তকে দিয়ে জাল করে লেখান হয়, যাতে হাইকোর্টে নকল রিপোর্টটি এই ইন্সপেকটরের সুপারসেশনের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে সাহায্য করে। শোনা যায়, সেলস ট্যাক্স কমিশনার অননুমোদিত এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের বৈঠকে সঙ্গী-পরামর্শ করে এই কারচুপের কাজ কার্যকরী করেন। কিন্তু এই বৈঠকের গোপনতা কোন কারণে কীস হয় যায়। এই পরিস্থিতিতে গত এক-মিশে জুলাই ইন্সপেকটরগণ প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। দোষী অফিসারকে নিয়ে প্রথমে কমিশনারের অননুমোদিত এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কৃষ্ণচন্দ্র সাহার চেম্বারে বিক্ষোভ চলে। অন্যান্য সকল শ্রেণীর কর্মচারীরাও এই

গণডেপুটেশনে অংশ গ্রহণ করেন। এক সময় সাহা মহাশয় অভিমত প্রকাশ করেন যে, সি এ আর প্রথা তুলে দেওয়া উচিত। উপস্থিত সকলে তাঁকে অনুরোধ করেন তাঁর এই মতটি সরকারকে জানিয়ে কর্মচারীদের দাবী সমর্থন করা হোক। তখন তিনি ব্যক্তিহীন অজুহাত দেখিয়ে নিজের কথাই এঁড়িয়ে যান। ঐদিন কমিশনার সত্যেন বসুর কাছে ডেপুটেশন দাবী করেন, এ্যাসিসিয়েশনের প্রতিনিধির সামনে সংশ্লিষ্ট অফিসারের উপস্থিতিতে বিতর্কিত রিপোর্টটি খোলা হোক। কিন্তু কমিশনার তাতে স্বীকৃত হননি। অর্থদপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্যামসুন্দর দত্তও এ বিষয়ে একই মত প্রকাশ করেন। তখন সকলের সামনে বিতর্কিত রিপোর্ট সীল করা হয় এবং এই বিষয়ে অননুমোদনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের হস্তক্ষেপের জন্য তাঁর সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করে ঐ দিনই সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু যথাসময়ে গিয়ে স্লিপ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সাক্ষাৎ না করে চলে যান। এই পরিস্থিতিতে ইন্সপেকটরদের এ্যাসিসিয়েশন বিষয়টি রাজ্যপালের নজরে এনেছেন এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষী অফিসারদের শাস্তিবিধানের জন্য দাবী জানিয়েছেন।

স্বাধীনতা চিহ্ন

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির আড়ালে

রমাশ্রমিক মল্লিক

ভারত-রুশ মৈত্রীসন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত উদ্দেশ্যের বিপরীতমুখে পদক্ষেপ নেবার পায়ত্যাড়া কষছেন। অর্থাৎ ঘটনা উত্তরকালীন দিব্যদৃষ্টি নিয়ে তিনি পিছদ ফিরে ফিরে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছেন। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত, স্বাধীন প্রেস এবং কয়েকজন সেনেটর মারফৎ যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে ছদ্ম-ভৎসনা এবং ভারতের সঙ্গে হাদ্য সম্পর্কের পাছে অবসান ঘটে সেজন্য সজ্ঞারে অভিসম্বাদন প্রচার আরম্ভ হয়ে গেছে। সেনেটর কেনেডি যত্নে যাবার পরই ঘটল সেনেটর পার্সির আগমন। পরোক্ষ রাজনৈতিক কেনেডির মত “আদর্শবাদী” নন, ইনি উদার-পন্থীর ভঙ্গীতে মনোজ্ঞ সমবেদনার কথাই বলেন নি কেবল যাচাই করে নিয়েছেন যে, ভারত-রুশ সন্ধির চরিত্র সামরিক সাহায্যের শর্তাধীন নয়।

এটা যে নিছক রক্ষাকবচ, ভবিষ্যতের তারিখ লাগানো চেক বা ভাঙান প্রশ্ন নিয়ে ভারত সরকার এখন ভাবছেই না, তা সম্বন্ধে নেবার পরই তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগামী নভেম্বরে ওয়াশিংটন-পার্টন সম্মেলনে গদগদ হয়েছেন, এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যাতে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য-খার পরিমাণ নাকি নিতান্তই নগণ্য মাত্র ০-৬ মিলিয়ন ডলার ১৯৬৫-র পরে আজ পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ করে, তার জন্য তিনি অপরাপর সেনেটর সমাভিযাহারে সচেষ্ট হবেন। এর পরে আরও মধু খুলে তিনি বা বলেছেন, তা এক অতি-মোক্ষম বাংলাদেশ বিরুদ্ধের পাক-ব্যবস্থা। বলেছেন, সেখানে সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের উপস্থিতি মাধ্যমে

রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। কাম্মীর নিয়ে বহু বছর ইউ এন ও-তে খেলোয়াড় করার পর এবার বাংলা দেশের ওপর সুনজর পড়ল।

তফাৎ এক্ষেত্রে মন্ত; কাম্মীরের ব্যাপারে ইউ এন ওর নামগন্ধে ভারত সরকার হত স্পর্শকাতর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তারা পূর্বাঙ্গী রাজি। এ সব চলছে অবশ্য গোপনে, অতি সাবধানে। জুলাই মাসে কিসিগারী মার্কা বিশ্ব-দৌত্যে ভারতের শাসকবর্গ প্রথমটা হতচকিত হয়ে গেলেও তার অব্যাহিত পরেই বিশ্বদূষী কূটনৈতিক অভিযান শুরু করে দেয়। প্রথম বাংলা দেশের ঘটনাবলী পাছে এক আচমকা বন্ধ বাধার, সে জন্যে আগে ভাগেই কলিঙ্গত পাকিস্তানী আক্রমণের প্রতিবেদক রূপে অন্যতম বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত রাশিয়ার বর্ম জোড়াড় করে রাখা। স্বিভীয়, ভারত-রুশ সন্ধির প্রদর্শনী দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত এবং সেই সঙ্গে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে সেখানে, ভারতকে হারাবার আশঙ্কায় সরকারী নীতির পনমূল্যায়ন হয়, এবং ওয়াশিংটন প্রবৃত্ত হয় ইস-লামাবাদের সামরিক স্বৈরশাসক গোষ্ঠীকে পরিত্যাগ করতে।

এই প্রত্যাশার আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে কাকে দিলে আমেরিকার মনোরঞ্জনার্থে এক বিশেষ আশ্বাসবাণী জানান হয় যার মোহা কথা হল যে, ভারতের পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক সাহায্য বাচনা করার কোনো হেতু ঘটবেনা, তেমন সাহায্যের কোনো নিগূঢ় শর্তও সন্ধি চুক্তিতে নেই। প্রায় একই সময়ে পাকিস্তানী রাজদূত আগা হিলালী অনুরূপ উপ-বাচকী ভঙ্গীতে আমেরিকার শাসক

মহলকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে, যে, চীন অথবা অপর কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষাগত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ পাকিস্তান হবে না।

ভারত সরকারের “রুশপ্রীতি” পাকিস্তান সরকারের বহুবিঘোষিত চীন প্রীতিরই প্রতিভূত্যা; উপরি হাতের ভাস। এ-তাসের একমাত্র উপযোগিতা আমেরিকার কাছ থেকে অধিকতর অর্থানুকূল্য লাভের ভূমিকা তৈরী করার। সম্প্রতি পাকিস্তানী প্রেসের একাংশে (উদাহরণতঃ “নওয়ারী রকুৎ”) পাকিস্তান-চীন সন্ধি সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা সুরু হলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কূটনৈতিক ধূর্ততার সঙ্গে সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে হয়। তিনি বলেন, পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যে বিদ্যমান হৃদ্যতা নাকি এতই প্রগাঢ় যে, তা সন্ধি-চুক্তির অপেক্ষা রাখে না। এরই সঙ্গে পাঠকগণ যোগ করুন উক্ত মন্ত্রী সাহেবের আসন্ন মস্কো সফর। পাকিস্তান সরকার জানে যে, সোভিয়েত রাশিয়া (আমেরিকার মত) চায় না যে, এই উপমহাদেশে ভারতের রাজনৈতিক বা সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ঘটুক, যে উদ্দেশ্যে সে ভারতকে সামরিক সহায়তার ছাতা এগিয়ে দিতে প্রস্তুত।

রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের প্রীতিমূল্যবান হলেও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে একই সিদ্ধান্ত-বিন্দুতে উপনীত। এদের কাউকে এতদূর শক্তি অর্জন করতে দেওয়া হবে না, যাতে এরা এই দুই বৃহৎ মরুভূমির আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় মনে না করে। বাংলাদেশ উপলক্ষে হঠাৎ বৃদ্ধ এদের অনাড়িপ্রত বলে এরা সম্প্রতি পাকিস্তান শাসক-

বর্গের ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়িয়েছে। ফলে মজিবর রহমানের “সামরিক বিচার” দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়ত হয়ে চলেছে। পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্যে, এই “বিচারের” অজহাত এবং অবকাশে এমন বাস্তব ভিত্তিক তথ্যের উন্মোচন করে দেওয়া যাতে প্রমাণিত হয় মজিবর অতীতে বাংলা দেশকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীন করতে চান নি।

এর পরে শুরু করা যাক, মজিবর ও তার ঘনিষ্ঠ মহল (কামাল হোসেন ইত্যাদি) থেকে আওয়ামী লীগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট মজিব বাহিনীর মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীদার বামপন্থী নেতৃবৃন্দকে আলাদা করে দেওয়া। ফলে একটা রাজনৈতিক রক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হবে, যার অন্তিম পরিণতি পাকিস্তানের বিশ্ব-রাষ্ট্র ভিত্তিক ফেডারেশন। এমন পাকা-

পাকি বন্দোবস্তের পূর্বাধ্যায় রূপে এসেছে, পূর্ববঙ্গে জেনারেল টিক্কা খাঁর অপসারণ এবং বৈ-সামরিক গভর্নর আবদুল মোতালেব মালিকের নিষ্পত্তি। সম্ভবতঃ এমনি রাজনৈতিক খানাপিনা পরিবেশন করতে ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক আমলাতন্ত্রী গোষ্ঠী এবং পাকিস্তানের বিস্তৃতিত শাসকগোষ্ঠী সফল হবে—অবশ্যই যদুপণ্য যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তরালবর্তী আশীর্বাদ নিয়ে। এমন বন্দোবস্তে ইন্দিরাজীর ইন্ডিকেট শাসকচক্র নিমরাজী থাকবে, মধু উল্টোপাল্টা কথা বললেও।

পূজা ভারত মহাসাগর যে কোন বৃহৎ বিশ্বশক্তির রণতরীর বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠুক না কেন, তাতে ভারত ও পাকিস্তান সরকারী বর্গস্বরের আপত্তি থাকবার কথা নহ্ন। চীনকে ঠেকানো বাবে, তাতেই রক্ষে।

ভারত কোম্পানীর মালিক চুক্তি মানতে নারাজ

(দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধি)

লাভজনক সংস্থা ডাবর কোম্পানী মালিক গোষ্ঠীর চক্রান্তে আবার বন্ধ হওয়ার মধ্যে। দারিদ্র-শীল কমীদের কাছে জানা গেল, কমীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে আদারীকৃত সমস্ত প্রতিশ্রুতি মালিকগোষ্ঠী এখন ম্যানতে নারাজ হচ্ছেন। কিছুদিন আগে মালিক পক্ষের ও সংস্থার প্রমিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কমীদের স্কেল, গ্রেড নতুন করে চালু করার চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ছাড়া চুক্তিতে কমীদের একবছর চাকুরীর পর স্থায়ী করা ছাড়াও সমস্ত কমীদের ইন-সেনটিভ স্কিমের আওতার আনার কথা। এবং কমীদের কোয়ার্টার দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও এই চুক্তিতে রয়েছে। এ ছাড়া চুক্তি অনুবায়ী, হেড অফিসে ই এস আইয়ের সুবিধাদির পরিবর্তে মোডিকেল বেনিফিট হিসেবে যে পরিমাণ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, মালিক পক্ষ এখন তা মানতে চাইছেন না। ডাবর কোম্পানীর দেওঘরে রাষ্ট্র অফিসের কমীদেরও ইউনিকর্ম ও বোনাস দেওয়া এখন বন্ধ। এমন কি এখানকার কমীদেরও পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিও মালিক গোষ্ঠী বিনা বিধায় উপেক্ষা করে চলেছেন।

অভিযোগের এখানেই শেষ নয়, একান্তর সনের ডিসেম্বরের মধ্যে চুক্তি অনুবায়ী দাবীদাওয়া মিটিয়ে ফেলা তো দূরের কথা, মালিক গোষ্ঠী এখন কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। এবং বিভিন্ন ভাবে কমীদের প্ররোচনা দিয়ে চলেছেন। ইতিমধ্যে আই, বি, এম সেক্সনের কমীর যে বিশেষ বোনাস পাচ্ছিলেন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পূজা বোনাস নিয়েও নানা কারসাজী চলেছে। গত বছর, ছয় মাস কারখানা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও

কমীর আন্দোলন করে সতেরো পার্সেন্ট বোনাস আদায় করেছিলেন এবং এ বছর যখন কমীবৃন্দ সংস্থার লাভের পরিমাণের ভিত্তিতে বিশ পার্সেন্ট বোনাস আদায়ের কথা চিন্তা করছেন ঠিক তখনই মালিকপক্ষ কমীদের আট পার্সেন্ট বোনাস অগ্রিম হিসেবে নেওয়ার জন্যে এক সারকুলার জারী করে বসে আছেন।

এসব ছাড়াও নানা অভিযোগে কমীর আজ বিক্ষুব্ধ। এদের তরফে মালিক গোষ্ঠীর কাছে একমাত্র দাবী বোনাস ও সম্পাদিত চুক্তির ক্ষেত্রে গণ্ডগোলের পথ পরিহার করে তারা বেন প্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য দাবীদাওয়াকে অবিলম্বে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদর্শন করেন।

পাতিপুকুরে সত্রাসের আবহাওয়া

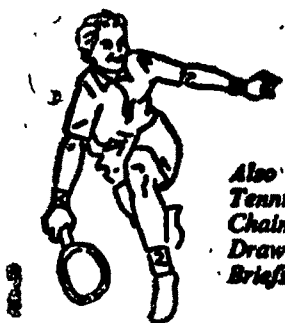
(দপ্তরের সংবাদদাতা)

দমদমের অন্তর্গত পাতিপুকুর দক্ষিণদাঁড়ির প্রমিক অধুষিত এলাকাগুলিতে নকশাল নামধারী কংগ্রেসী সমাজবিরোধী এবং পলিশী যোগসাজসে এক সম্ভাসী আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়ার ফলে জনজীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

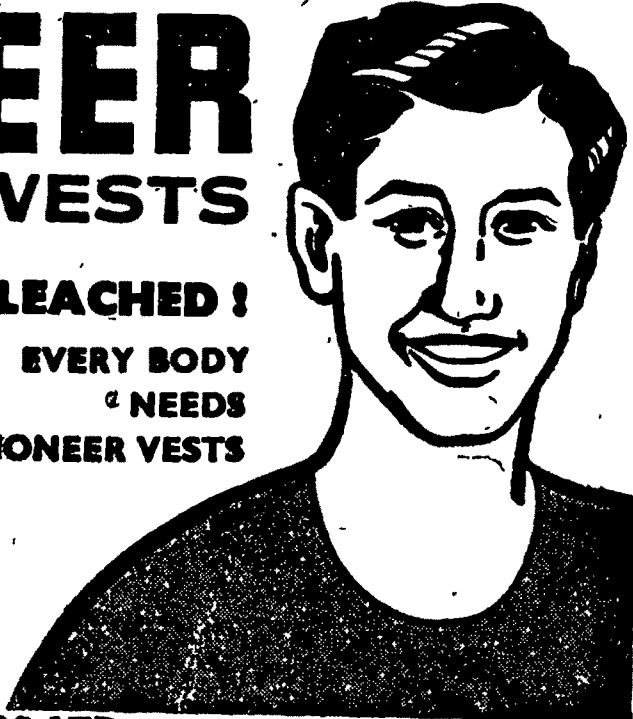
চার নং পাট্টাট্রী কলোনী এবং শ্রীমুখি অঞ্চলের কিছু কুখ্যাত সমাজবিরোধী স্থানীয় কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির উৎসাহিত একশো দশ ও একশো বারো নং এস কে দেব রোড ও পার্শ্ববর্তী সুতাকল সমূহের প্রমিকদের পাক্কি মাইনে চাঙ্গশ-পুস্তাঙ্গশ টাকা থেকে জোর করে দশ-পনেরো (শেষাংশ ওম পুস্তার)

PIONEER VESTS

ARE HYGIENICALLY BLEACHED!
EVERY BODY
NEEDS
PIONEER VESTS



Also Tee shirts,
Tennis shirts,
Chain Shirts,
Drawers &
Briefs



PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS CALCUTTA-2 Phone : 24-2388

ভ্রম দর্শন

মধ্যপ্রদেশ

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে বিরাট রাজনৈতিক জাল ছাড়িয়ে বসেছেন, তা গুটিয়ে তোলার সাধ্য যে তাঁর নেই, সে কথা স্পষ্ট হতে সুরু করেছে।

বুর্জোয়া জমিদারদের রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসকে বাম-পন্থী ফোর্টা-তিলক সাজিয়ে বাম-মাগী চেহারা দিতে গিয়ে তিনি নানা কটেকৌশলের জাল ছাড়িয়েছিলেন। বামপন্থী দলগুলির অনেকেই সে জালে ধরা পড়ে খাবি খাচ্ছেন। এদের রাজনৈতিক অন্তিম সুনিশ্চিত করে গ্রীষ্মতী গান্ধী আপন সংগঠনের দিকে নজর দিয়েছেন।

প্রথমেই ধরা পড়েছেন মোহনলাল সুখাডিয়া, সন্দেহপ্রবণ আওরংজেব যেমন কোন কিছু শিখতেন না, এবং কোন ঘটনা ভুলতেন না, নয়াদিল্লীর নয়া-সুলতানাও ঠিক সেরকম। সুখাডিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, রাজস্থানে এড হক কংগ্রেস গঠন প্রায় নিশ্চিত। এর পরে কার পালা? কমলাপতি ত্রিপাঠি? বিজয় সিং নাহার? শ্যামাচরণ শরুনা না ভি পি নায়ক?

আসল কথা এঁদের যেতে হবে। সুলতানার অভিপ্রায় সিদ্ধ করে এরা অনেক বিশ্বাসহীনতার কলংকে কলংকিত হয়ে এদের সবাইকে রাজনীতির মণ্ড থেকে বিদায় নিতেই হবে; কেউ দুদিন আগে, কেউ দুদিন পর।

বিজয় সিং নাহার এবং কমলাপতি ত্রিপাঠি অবস্থা বদ্বতে পেরেছেন। তাঁরা জাল কেটে বেরবার তালে আছেন। শ্যামাচরণ শরুনা এখনও করুণার আশা রাখেন, কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত দ্বারকা-প্রসাদ মিশ্রের কট জালে মধ্যপ্রদেশের প্রায়-নাবালক মধ্যমন্ত্রী জড়িয়ে পড়েছেন।

মধ্যপ্রদেশের মধ্যমন্ত্রী বদ্বতে পারছেন না যে পণ্ডিত ডি পি মিশ্রের কাছে তিনি একটা পিগমি, শুধুমাত্র হাইকোর্টের রায়ে পণ্ডিত মিশ্র নির্বাচনে দুনীতি অবলম্বনের দায়ে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষিত হওয়ায় শরুনাশায়ের মধ্যমন্ত্রিত্ব আজো টিকে আছে। আর নয়াদিল্লীর সুলতানার কাছে পণ্ডিত ডি পি মিশ্র ও তার পুত্র রজেশ মিশ্র (চীনে ভারতের চার্জ দ্য এম্বাসি) এখন অপরিহার্য।

মধ্যমন্ত্রী শ্যামাচরণ শরুনা আজ সাহস করে বলতে পারছেন না যে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে কাকে তিনি চান! তবে এ আই সি সি অধিবেশনে তাঁর বিরুদ্ধে যে সব কংগ্রেস নেতা প্রকাশ্যে অসাধুতা ও দুনীতির অভিযোগ এনেছিলেন সেই

রুক্মিণীরমণ প্রতাপ সিংকে যে তিনি চান না তা বোঝা সহজ। অথচ হয় গোতম শর্মা, না হয় রুক্মিণীরমণ প্রতাপ সিং দুজনের একজনকে কংগ্রেস সভাপতি করতে হবে বলে ডি পি মিশ্র জিদ ধরেছেন।

মধ্যমন্ত্রী নয়াদিল্লী এসে প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে একজন কাউকে অবিলম্বে সভাপতি মনোনীত করে ফেলা দরকার। মন্ত্রিসভার রদবদল ও মধ্যমন্ত্রীর বিদায় সম্পর্কে ক্রমাগত গুজব রটছে এবং মধ্যপ্রদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমশরীলাল গাংগওয়ালের পদত্যাগ থেকেই এ ধরনের গুজব ছড়াচ্ছেন। শ্রীডি পি মিশ্র এখন আপাততঃ অস্থায়ী সভাপতি গোতম শর্মাকে স্থায়ী করতে আপত্তি করবেন না, যদি গোতম শর্মা মধ্যমন্ত্রী শরুনার বিরোধী ষড়যন্ত্রের নায়ক হন। সুতরাং বাহান্তর সালের নির্বাচনের দৃষ্টিতে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ললাটে দৃষ্টিস্তার গভীর রেখাগুলি এঁকে দিয়েছে।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবে এখন রাষ্ট্রপতির শাসন চলেছে। ফলে আমলাতন্ত্রের আজ পোয়াবারো। পাঞ্জাবের সমস্ত সমস্যা শিকয়ে উঠেছে। প্রশাসন ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ার মধ্যে। শিল্পপতি গোষ্ঠি পর্যন্ত এখন আশা ছেড়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি শাসনে পাঞ্জাবে দ্রুত শিল্পায়নের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। অন্যান্য সমস্যাও ঝুলে আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখন অফিসার গোষ্ঠির কোন্দল।

পাঞ্জাবের আকালী মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতির শাসন যখন জারী হল, তখন রাজ্যপাল ডাঃ পাভাতে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি অবিলম্বে ক্ষমতালোভ ও দুনীতিগ্রস্ত আমলা গোষ্ঠীকে সরিয়ে উপযুক্ত অফিসারদের যোগ্য পদে দায়িত্ব দিয়ে বসাবেন এবং ছয় মাসের মধ্যেই পাঞ্জাবের শিল্পায়ন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করবেন।

কিন্তু দু মাসের ওপর হয়ে গেল, রাজ্যপাল অফিসারদের বদলীর তালিকা পর্যন্ত সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। কারণ পাঞ্জাবের আমলাতন্ত্র নানা উপদলে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ রাজ্যপালের পরামর্শদাতা ও নতুন চীফ সেক্রেটারী নিয়োগ করেছেন। এ দুজন উচ্চপদস্থ অফিসারই রাজ্যপালের ওপর খবরদারি করার জন্যেই তাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন বলে মনে করছেন। পরামর্শদাতা ও চীফ সেক্রেটারী কে কত ক্ষমতার মালিক,

তা নিয়ে অনবরত কলহ করে চলেছেন, কিন্তু তাঁরা দুজনেই আবার রাজ্যপালের ক্ষমতা খাটো করতে চাইছেন।

ফলে উপরতলার তিন জন আমলা, রাজ্যপাল, রাজ্যপালের পরামর্শদাতা ও চীফ সেক্রেটারীর পরস্পর মতানৈক্যের ফলে সমস্ত প্রশাসনে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

এই সুযোগে, কেন্দ্রীয় সরকারের আমলারাও এক একজনের পৃষ্ঠপোষক করে উস্কানিমূলক কার্যকলাপ শুরু করেছেন। ফলে, যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার আগে চণ্ডীগড় ও নয়াদিল্লীর মধ্যে ক্রমাগত দৌড়বাপ করতে হচ্ছে।

পাঞ্জাবের আমলাদের দুনীতিগ্রস্ত আই এ এস, আই পি এস অফিসারেরা দুটি প্রধান উপদলে বিভক্ত। উপদলগুলির মধ্যেও আবার

উপদল আছে। আই এ এস গোষ্ঠী, দেশীয় রাজ্যের প্রাক্তন আমলাগোষ্ঠি প্রমোশনপ্রাপ্ত পাঞ্জাব সার্ভিসের গোষ্ঠী, সামরিক বিভাগ থেকে নিয়ে আসা বিশেষ অফিসার গোষ্ঠী।

শরনে অবাধ হবেন যে যখন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপালদের বিশেষ পতাকা তুলে দিয়ে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন পাঞ্জাবের জেলা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনারেরা পর্যন্ত গাড়ীতে নিজেদের স্বকীয় পতাকা উড়িয়ে যাতায়াত করেছেন।

রাজ্যপাল ডাঃ পাভাতে পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি আমলাতন্ত্র ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারেন নি। তাই, রাষ্ট্রপতির শাসনে তিনি সংবিধান অনুসারে সর্বপ্রধান হলেও, কার্যতঃ আমলাতন্ত্রই সর্বসর্বা হয়ে

উঠেছে। যে চারজন বিভাগীয় কমিশনারকে বদলী করার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন, তাঁরা কেউই যান নি, কারণ চণ্ডীগড়ের আমলাগোষ্ঠি তাঁদের স্থলাভিষিক্তদের নাম ঘোষণা করে শি। কুড়ি জন পুলিশ অফিসার বদলী হয়েছেন, কিন্তু তাদের নাম ঘোষণা সম্বন্ধে তারা যান নি কারণ কোথায় তাঁরা যাবেন তা নাকি স্থির হয় নি।

আজকের যুগে আমলাতন্ত্র যে সামান্যতম সংস্কারমূলক কাজেরও প্রতিবন্ধক পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্ন রাজ্যপাল এতদিনে তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

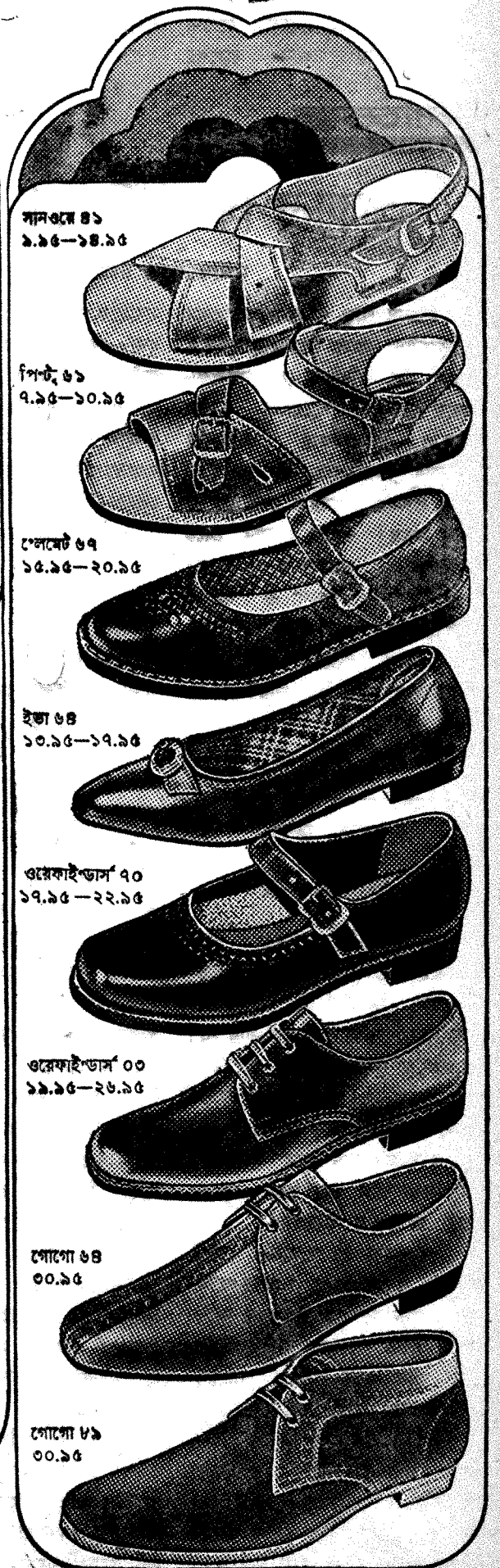
চণ্ডীগড়ে এক প্রেস কনফারেন্সে তিনি মথেন্দে রিপোর্টারদের বলেছেন যে আকালী মন্ত্রিসভার আমলে যে আমলাগোষ্ঠি প্রকৃত শাসন চালাত, তাদের বদলে (শেবাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)



আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতিগতির নকশা

যেমন তরুণ মনের, তেমনি তরুণ পায়েরও তল পাওয়া ভার। বাটার কারিগরদের সারা জীবনের সাধনাই তো এই নিয়ে। বাটার দোকানে এলে তাঁদের সেই গবেষণা, অনুশীলন আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল পাবেন হাতে হাতে। আরামভরা ও টেকসই, বাহারেও মানানসই। কাজও দেয়, আরামও দেয় একই সঙ্গে। বাড়ন্ত পায়ের দুরন্তপনার সকল ধকল সহিতে পারে এমনভাবেই এই জুতো তৈরি। ছোটোদের যার যার নিজের জুতো বেছে নিতে দিন।

Bata



সংগীত সভা

রামপ্রসন্ন ও সংগীত মঞ্জরী

বিস্মদপুরে দিল্লীর ধ্রুপদী সংগীতের আমদানি হয় আঠার শতকের শেষ দিকে গদাধর খাঁর নাতি বাহাদুর খাঁর দ্বারা। তার প্রধান শিষ্য ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী। এই গদাধর চক্রবর্তীর শিষ্য প্রশিষ্যের দ্বারা এই অধুনা-বিখ্যাত বিস্মদপুরী ধারার সৃষ্টি। “সংগীতমঞ্জরী”-র সংগ্রহকার রামপ্রসন্ন ছিলেন গদাধর শিষ্য অনন্ত-লাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং শিষ্য। উনিশশ-সাত সালে সংগীত মঞ্জরীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাহাদুর খাঁর ধ্রুপদ ধামার খ্যাল টপ্পা ছাড়াও যদু ভট্ট মহাশয়ের ব্যক্তিগত তালিম বহুগান এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার প্রেরণা সংগীতমঞ্জরীর গান। দর্পণের

বিষয় বইটি বর্তমানে অপ্রাপ্য। এই স্মরণীয় সংগ্রহকর্তার জন্মশত বার্ষিকী পালন করলেন ইন্দীরা শিল্পীগোষ্ঠী বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে উদ্বোধন আদর্শে আগন্তু সন্ধ্যা বেলায়। রামপ্রসন্নবাবুর উত্তরসাধকেরা গীত-বাদ্য পরিবেশন করলেন যার মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নিত্যানন্দ গোস্বামীর মৃদঙ্গ এবং অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এস্রাজ (ভাই পলাশী, আলাপ ও গং)। অশেষ-বাবু সত্যি একজন গুণী ব্যক্তি। যদিও ঠিক দর্পণ বেলায় ভাইপলাশীর আলাপ মনে একটু খাঙ্কা দিয়েছে।

অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় যে খানাপুরী বিলম্বিত গান করলেন তা রামপ্রসন্নর আমলে ছিল না। এই ধরনের গান এই আসরে গাওয়ার

সার্থকতা ছিল না। অমিয় যে গান করেন বিস্মদপুরী ধারার সঙ্গে তার আর যোগ নেই। অবশ্য এ কালের হিন্দুস্থানী গানের সঙ্গে যোগস্থাপন করে তিনি ভালই করেছেন কিন্তু বিস্মদপুরী ধারার প্রবক্তা তাকে বলা যায় না। তবু তিনি যদি সংগীতমঞ্জরীর গান সেই রূপে পেশ করতেন তাহলে তার একটা মূল্য হত।

অনুষ্ঠানসূচীটিকে পরিষ্করণ-নাট্যক সাঙ্গালে আরও বৈচিত্র্য-পূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী করা যেত। সংগীতমঞ্জরীর গান অবলম্বনে অন্যান্য রচয়িতার স্বাধীন রচনা (যেমন রবীন্দ্রনাথ) পাশাপাশি পেশ করলে উভয়ের তুলনামূলক মূল্যায়ন শিক্ষণীয় হতে পারত।

সংগীত

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ্রের নেতৃত্বে সুরঙ্গমার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় রবীন্দ্রসরোবর প্রেক্ষাগৃহে বিশেষ আগন্তু সন্ধ্যায়। সভাপতি শ্রীযুক্ত শৈলজ্যোত্স্ন মজুমদার সমরোচিত ভাষণ দান করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামীজী রবীন্দ্রসংগীতের বিকৃতিরোধে সুরঙ্গমার ভূমিকার প্রশংসা করেন। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকশিক্ষিকার একটি নৃত্যগীতালৈখ্য পরিবেশন করে যার মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় তাল সংগতের সঙ্গে গাওয়া শ্রীমতী উর্মিলা ঘোষের “মেঘের পরে মেঘ জমেছে”। গদ্য ছন্দে গান সম্পর্কে আমারও সম্ভেদ জেগেছে এবং ব্যক্তিগত অলঙ্কারের চেয়ে স্বরলিপি অনুসরণ করাই বোধ হয় নিরাপদ।

রোড ও সঙ্গীত

কোলকাতা বেতারের উদ্যোগে মিঞা বিসমিল্লাহ বাদ্যনুষ্ঠান হয়ে গেল কলামার্টের ছবিদর্শে আগন্তু সন্ধ্যায়। তিনি বিলম্বিত এবং দ্রুত গং বাজালেন হংসনারায়ণ রাগে। তাঁর গং দুটো কিন্তু মসীদখলী বা রোজাখানী গং বলে মনে হল না—অধুনাতন বিলম্বিত একতালের গানের সুরকে গং রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। রাগবিক্ততার তালিম তেমন না থাকলেও তাঁর সুর লাগাবার কয়েকটি ভাল, রসবোধও আছে। ধ্বনির তীব্রতার (intensity) ক্রম-বর্ধিত সংগীতের সৌন্দর্য-সম্পাদন এবং রসোদ্‌ঘাটনে কত কার্যকর তা তিনি অনুধাবন করেছেন। পাশ্চাত্য সংগীতে মৃদ (পিআনো), মৃদতর (পিআনিসিমো) মৃদতম (পিআনিসিমো) বলী (ফোর্টি), বলিতর (ফোর্টিসিমো) এবং বলিতম (ফোর্টিসিমো) ধ্বনির প্রয়োগ সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন ইনটেনসিটির ধ্বনিকে সংগীতে বিশেষ যত গানে ব্যবহার করার কৌশল এবং উপযোগিতা আমাদের সংগীতজ্ঞরা আজও আবিষ্কার করতে পারেননি বলেই অনেকের গান-বাজনা একঘেয়ে লাগে।

শ্রীসামাজিক

গুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মেয়েদের লাজনা, অবিচার ও ছাত্র-সংসদের উপর গুন্ডাদের কয়েকটি হামলার অভিযোগের খোঁজ করতে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় বেশ কয়েকদিন ধাব কয়েকজন সমাজবিরোধী গুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে করে ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপর হামলা অব্যাহত রেখেছে। এ অবস্থা থেকে সাধারণ ছাত্ররাও বাদ যাচ্ছে না। কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন কয়েকজন জানান, প্রকাশ্য রাস্তায় এলাকার ছাত্র পরিষদের কয়েকজন মাস্তান ধরনের ছেলে ও এলাকার গ্রাস সৃষ্টিকারী ফাটা কেউ নামে জটনক

ব্যক্তি ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বি পি এস এফের কোন না কোন ছাত্রকে লালিত করছে।

অভিযোগ, প্রকাশ্য রাস্তায় পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করে এমন কয়েকজন সমাজবিরোধীর সঙ্গে আমহাট স্ট্রীট থানার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করে ছাত্ররা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতেও সাহস পাচ্ছেন না। কলেজের ছাত্র নেতৃবৃন্দের দৃঢ় ধারণা, পুলিশ যদি এসব গুন্ডাদের প্রশস্ত না দেয় ও তাদের সহযোগিতায় পাশে এসে না দাঁড়ায় তবে যে কোন দিন এই এলাকার ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপর হামলাকারী সমাজ বিরোধীদের মোকা-বেলা করা সম্ভব। সিটি কলেজের সাধারণ সম্পাদক চন্দন ঘোষ দর্পণের প্রতিনিধিকে সাধারণ ছাত্র ও নেতৃবৃন্দের প্রাণনাশের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করে জানান, “হয় ফাটা কেউ, নয়ত থানার পুলিশের হাতে আমাদের প্রাণ যাবে”। তাই সাধারণ ছাত্রছাত্রী বৃন্দের কাছে তাঁর আবেদন প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী যেন প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে অবিলম্বে এ সব গুন্ডা ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

চলচ্চিত্র

অকালপক্ক বালিকা বধূ

মুগাঙ্কশেখর রায়

দীনে গল্প পরিচালিত “প্রথম প্রতিশ্রুতি” বাংলা সিনেমায় ইদানীং কালে বহু পরিচিত সেই বালিকা-বধূর গল্প। পুরোনো যুগের গ্রামাঞ্চল পটভূমিকায় কাহিনীর বিস্তার, বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা তখনও সমাজে বেশ জেঁকে বসে আছে। গাঁয়ের বাচ্চা মেয়ে সত্যবতী, অকালপক্ক দরলত প্রকৃতির। সে অবশ্য ঐ যুগেই নারীপ্রগতির ধ্বজাধারিনী। লেখা-পড়া শেখে, বড়দের সঙ্গে মৃদু মৃদু তর্ক করে এবং নারীজন্ম যে শুধু রান্নাঘর আর স্বামী সেবার মধ্যেই শেষ নয় সে সম্পর্কে

সবাইকে জ্ঞান দিয়ে বেড়ায়। বিয়ে হবার পর স্বশরৎবাড়ীতে গিয়েও বুলি কপচানো ছাড়া সত্যবতী। মাতাল স্বশরৎকে নেশা ছাড়ায়, দম্ভজাল শ্বশুরবাড়ীকে বাগে আনে আর জড়ভরত স্বামীটিকেও মানুষ করে তোলে।

এই হল ছবির সারাংশ। গ্রামজীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে পরিচালক প্রচুর খুঁটিনাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, অটেল চরিত্রের আবির্ভাব ঘটছে এবং অতীতের নানা সামাজিক রংবসন্তের নকশা তৈরী করতেও সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। কিন্তু কোনটাই বিশেষ কার্যকর হয়নি একটি মোল ট্রাটির জন্যে; তা হল সমস্ত ছবিতে একটা সদৃশত বস্ত্রব্যবহার। চরিত্রগুলো নানা খাপছাড়া ঘটনার অলিগলিত ভেতর দিয়ে ঘোরাফেরা করেছে মাত্র, কিন্তু তাদের অন্তর্লীন পারস্পরিক সম্পর্কও বিশেষ একটা প্রকাশ পায়নি কিংবা পটভূমিকার সঙ্গে চরিত্রের আঙ্গিক সংযোগও একেবারেই স্পষ্ট নয়।

ক্যামেরার কাজ ফটোপাথের ক্যালেন্ডারের মত রুটিনবাধা কারিগরি, নিষ্প্রাণ, রচনামূলক। স্পষ্ট সম্পাদনার জন্য গল্পের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্যে ধ্বনির অভাব, অভিনয়েও সেই ছকবাধা ধরণ। নায়িকা সত্যবতীর ভূমিকায় সোনালী গুপ্ত সংলাপের মানে না বুঝেই তোতাপাখীর মত শেখানো বুলি বকবক করে (অবশ্য যদিও অভিনেত্রীর বয়স ও অভিজ্ঞতা বিচার করলে সমস্ত দোষটাই পরিচালকের) আর বসন্ত চৌধুরীর চরিত্রের গাম্ভীর্য পরো-টাই আরোপিত বলে মনে হয়।

ভারত দর্পণ

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

অনেকটি গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করেছে মাত্র। রিটপার্টাররা যখন জিজ্ঞেস করলেন যে আমলাদের গোষ্ঠীকে কি বাদ দেওয়া যায় না? রাজ্যপাল উত্তর দিলেন, তা বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ ওদের স্বার্থেই গ্রুপ বা গোষ্ঠী গড়ে তোলা। এখন তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে নির্বাচিত মন্ত্রিসভা কবে ভার তুলে নেবেন, তার অপেক্ষায় রয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মানব ও রাষ্ট্রপতির শাসন বনাম আমলা-পুলিশের শাসন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির অভিজ্ঞতা সপ্তম করছেন। তাই পাঞ্জাবের ঘটনা তারা বন্ধুত্ব পাবেন। এবং এটাও তারা বুঝেছেন যে আমলাতন্ত্র নয়, নির্বাচন ও নির্বাচিত মন্ত্রিসভা ছাড়া প্রশাসনের দুনীতি, অপদার্থতা যেতে পারে না। সাম্প্রতিক বন্যায় একথা তাঁদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দ্বন্দ্ব বাজপাখী মৌন মঞ্জরী

(দর্পণের সমালোচক)

“দ্বন্দ্ব” নাটকসংস্থা সম্প্রতি তিনটি একাঙ্ক নাটক প্রযোজনা করলেন রঙমহল মঞ্চে। “আড়াল” “বোহেমিয়ান”—এই নামের দুটি ড্রাম গোষ্ঠী এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

“আড়াল” পরিবেশিত “স্বল্প” নাটকটিতে তথাকথিত খ্যাতিমান লেখকদের আন্তঃসারস্বত্যাচারে উদ্ভাটন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী নামের একজন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক মানবের মর্মে পৌঁছতে না পেরেও যশের অধিকারী এবং তিনি সেই যশেই মোহগ্রস্ত। তাঁর পুরস্কৃত উপন্যাস “রতির আরতি”র নায়িকার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এবং পাবনারিক ঘটনা ও বহিজগতের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লেখকের জনবিচ্ছিন্ন চরিত্র মৃত হয়ে উঠেছে।

লেখক চরিত্রে হিমাংশু দাসের (নির্দেশক হওয়া সত্ত্বেও), অভিনয় চরিত্রোপযোগী হয়নি। বরং “মল্লিকা” চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন এবং নাট্যকার সুরুমার সরকারের অভিনয় অনেকটা প্রশংসনীয়। নাটকের শেষ দৃশ্য গতানুগতিক হলেও সুপারিকল্পিত সম্ভেদ নেই। লেখকের এবং নেপথ্যের কিছুর সংলাপে কাব্যিক মেজাজের বাড়ি-বাড়ি প্রায়শই যন্ত্রণা দিয়েছে।

অন্যদিকে বোহেমিয়ান গোষ্ঠী যে দুটি নাটক পরিবেশন করলেন, তার কোনটিই সার্থক নয়। অশোক চক্রবর্তী রচিত “এটা কি নাটক?”

এ নাট্যকারের বস্তব্য স্পষ্ট নয়। অভিনেতার একেবারেই অকেজো। তবে জনৈক ভদ্রলোকের (রঞ্জিত দে) উপস্থিতি বেশ মজার। নাটকটি একাঙ্কের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেও ‘পরিমার্জনার’ অভাবে সফল হয়নি।

এরপর মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের “বাজপাখী” নাটকটির মর্মার্থ বোধ হয় নির্দেশক এবং অভিনেতা কেউই বুঝে উঠতে পারেননি। উপস্থাপনার শিথিলতা এবং আভিনয়িক অক্ষমতা নাটকটিকে নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে। বরং “লোকালগন”—এর প্রযোজনায় এই নাটকটিই অনেক সুস্থ ভঙ্গীতে উপস্থিত করা হয়েছিল।

ইউনিটি থিয়েটারের “মৌন মঞ্জরী” নামের একটি নতুন নাটক সেদিন মঞ্চস্থ হল রঙনায়। গোষ্ঠী কতৃপক্ষ তাদের এই প্রযোজনাকে একটি ড্রাম স্বাদের বলিষ্ঠ নাটক হিসেবে দাবী করেছেন। নাটকের ঘটনা অত্যন্ত মামলী এবং জলো। সংলাপের বাহার দেখে মনে হয়েছে নাট্যকারকে কবিতার ভূতে পেয়েছে বস্ত্রব্যবহার কোন সামাজিক মূল্য নেই। এমনকি চরিত্রগুলিরও সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে আরো পরিশীলিত চিন্তা প্রয়োগ করলে হয়তো নাটকটি মনস্তাত্ত্বিক রূপ পেতে পারতো। মঞ্চ এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে গোছানো ছিমছাম ভাব থাকলেও তা নাটকের কোন কাজে লাগেনি।

অর্থনৈতিক দর্শন

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে মুদ্রাযুদ্ধ

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

দৌর্ভাগ্য প্রাপ্ত ডলারের দাপট কমে গেছে বটে কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা যে ভেঙ্গে পড়ছে তাতে আর ভুল নেই।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল কেন? এর থেকে বাঁচার কি কোন রাস্তা আছে? এ প্রশ্ন সংগত ভাবেই উঠতে পারে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার ডলারের ক্ষমতা ছিল অপরিমিত। কারণ মার্কিন পণ্যের চাহিদাও ছিল সর্বত্র। আমেরিকা মার্কিন স্প্যানের কোটি কোটি ডলার টেলে ইউরোপের স্বাধীনবিস্তৃত দেশগুলিকে পুনর্গঠনে সাহায্য করেছে।

তাই আজ ডলারের বিপদের দিনে আমেরিকা চায় যে জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন প্রভৃতি দেশগুলি আজ তার পাশে এসে দাঁড়াক।

পাতিপুকুরে সম্ভ্রাস

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

টাকা করে “গণ্ডাকর” আদায় করছে। এছাড়া কারখানার সূতা-চরির, মেশিনের মোটর চরির, লরি আটক করে কারখানার মালিকদের কাছ থেকে শত শত টাকা লুট, কারণে অকারণে বোমাবর্ষণ—এসবই নিত্যকার ঘটনা।

এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকাতে কয়েকটি পার্শ্বিক হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারেও এদের বর্বরোচিত ভূমিকা রয়েছে। বলহরি সর্দার এ্যান্ড ব্রাদার্স-এর প্রমিক রতন রায়, পাতি-পুকুর হাউসিং এজেন্টের নিধু দাস রাবি মজুমদার প্রভৃতি স্থানীয় উৎসাহী কর্মীরাও এই হত্যাকাণ্ডের বলি হয়েছেন। এক নম্বর পল্লীশ্রী কলোনীর হীরালাল ভট্টাচার্যের বাড়ীটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করা হয়েছে। বহু বাড়ী দোকান, স্কুলে অগ্নি সংযোগ ও বোমাবাজী করে তার আংশিক বা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছে।

সম্ভ্রান্ত হয়ে এলাকার অনেকেই ক্লান্ত, দগ্ধে নিজেদের ভাগ্যকে দায়ী করে এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন স্থায়ী ভাবে। পনেরো-ষোলটি টেনেন্ট কেন ফ্রাট ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন, তা নিয়ে সরকারের কোন মাথা ব্যথা নেই। ছেড়ে দেওয়া ফ্রাটগুলোর তালিকাভুক্ত সমাজ বিরোধীরা সেখানে দের আড্ডাখানা বানিয়েছে এবং নিয়মিতভাবে একাধিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকছে।

স্থানীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলেই এলাকার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কিন্তু সে ইচ্ছে কি তাদের আছে? অন্তত পদলিখের ভূমিকা দেখে তো তা মনে হয় না।

একথা সবাই বলছেন যে আমেরিকা তার রাজনৈতিক সামরিক প্রভুত্ব বিস্তৃত করার জন্যে সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার বিমান ঘাঁটি, সেনানিবাস, রাসদ মজুতভান্ডার অস্ত্র ভান্ডার ইত্যাদি গড়ে তুলে, ভিয়েতনামের স্বল্পে অতলগহ্বর পাঁকে জড়িয়ে গিয়ে অনবরত সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে বলেই ডলারের ক্রয়ক্ষমতা আজ এত কমে গেছে। সুতরাং ডলারের সংকট কাটাতে হলে আমেরিকার প্রভুত্বের নীতি বদলানো প্রয়োজন। খোলাখলিভাবে ফ্রান্স একথা বলেছে, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি নীরবে সায় দিয়েছে।

কিন্তু আমেরিকার অর্থনৈতিক কাঠামো যে সামরিক ব্যয়ের উপরেই নির্ভরশীল, একথা বদলেও কেউই খলে বলতে চাইছেন না। অধ্যাপক গলব্রেথের ভাষায় আমেরিকা উনিশশো তিরিশ সাল থেকে কেইনসীয় পদ্ধতিতে সরকারী ব্যয় বাড়িয়ে চলেছে। ভোগ্যপণ্যের উপর এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে মূল্য-বৃদ্ধি।

ফলে আমেরিকার তৈরী মালের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত হারে। অন্যান্য দেশের তৈরী মাল তুলনায় সস্তা, তাই আমেরিকার তুলনায় তাদের মাল বাজারে বেশী কাটতি হচ্ছে, আমেরিকার মাল তুলনায় কম কাটছে। তাই আমেরিকার আমদানী বাড়ছে, রপ্তানী কমছে। এর উপর নানাদেশে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যে সাহায্যদান, মার্কিন ধনকুবেরদের বিদেশে জম্মী করার ঝোঁক, মার্কিন টারিস্টদের বিদেশ ভ্রমণের খরচ ইত্যাদি খাতে অতিরিক্ত ডলার বিদেশে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ মার্কিন লেনদেনে ঘাটতি হচ্ছে।

এই ঘাটতির ফলে যে সব দেশ আমেরিকার কাছে টাকা পাবে, তাদের পাওনা মেটাবার জন্যে আমেরিকাকে হয় সোনা, না হয় ডলার দিতে হবে। ডলার দিলে মোট ডলার যা পাওনাবাদ দেশের বাইরে চালান হয়ে যাবে, তা আমেরিকায় ছাপিয়ে পূরণ করতে হবে। না হলে দেশের ভেতরে লেনদেনে মুদ্রার প্রয়োজন মিটবে না। কিন্তু ডলার ছাপালে, সেই হারে আমেরিকায় তৈরী জিনিষের দাম বাড়বে, তার বাণিজ্য ঘাটতি আরো বেড়ে যাবে। অর্থাৎ যে পাগচক্রে ডলারের বর্তমান দর্শনা ঘটেছে তা আরো গভীর হয়ে পড়বে।

এটা কি এমন সংকট যে একে এড়ানো যায় না? বড় বড় অর্থনীতিবিদ কি এর একটা ফয়সালা করতে পারেন না?

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এতদিন বলতেন যে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের মোট মজুত তহবিল মোট আমদানীর সমান হলে মুদ্রা সংকট ঘটত না।

তাদের বক্তব্য ছিল যে পৃথিবীর সব দেশের মজুত তহবিলে টান পড়লে তারা আমদানী সংকোচ করতে বাধ্য হয়। ফলে প্রত্যেক দেশেরই রপ্তানী কমে যায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মন্দা আসে।

বলা বাহুল্য অভিজ্ঞতা থেকে এ ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি। উনিশশ-আটত্রিশ সালে পৃথিবীর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সোনা, ডলার, স্টার্লিং, আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের সম্মিলিত কোটা সব মিলিয়ে-যা ছিল, উনিশশ উন-সত্তর সালে তার চেয়ে প্রায় কুড়ি শতাংশ বেশী ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মুদ্রাসংকট দেখা দিয়েছে ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে, প্রায় প্রতি বছরেই। ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের বর্তমান সংকটও আন্তর্জাতিক মোট মজুত তহবিলের বৃদ্ধি সঙ্গেও ঘটল।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা আসল কথা চেপে যেতে চান। তার বলতে চান না, যে এই মুদ্রা-সংকট আসলে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সংকট, পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সংকট।

আমেরিকার ডলার তার ক্রয়-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে দর্শন্য মার্কিন পণ্য বাজারে কম বিক্রী হচ্ছে এবং যে সব দেশের হাতে ডলার মজুত রয়েছে তারা তাদের কন্ট্রোল তহবিলের ক্রয়-

ক্ষমতা কমে যাক এটা চায় না। তাই তারা হয় ডলার ভাঙিয়ে সোনা মজুত করতে চাইছে না হয় আমদানী কমিয়ে সম্মিলিত তহবিল বাঁচাতে চাইছে।

যাই তারা করতে থাক, ডলারের ক্রয়ক্ষমতা কমছেই, কারণ আমদানী কমালে মার্কিন ও অন্যান্য দেশের রপ্তানীও কমে যাচ্ছে ফলে তাদের লেনদেনে ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। আর ডলার ভাঙিয়ে সোনা দেবার ক্ষমতা যে আমেরিকার নেই সে কথা তো নিকসন সাহেবের ঘোষণায়ই প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং এখন সূর্য হরছে মুদ্রা নিয়ে লড়াই। পশ্চিম জার্মানী জাপান ও ফ্রান্স তুলনায় উৎপাদন খরচ কম ও পণ্য সস্তা। বৃটেনও স্টার্লিং এর মুদ্রার মূল্য কমিয়ে পণ্যকে সস্তা করে দিয়েছে। এতে আমেরিকা অসন্তুষ্ট হয়ে দাবী করছে যে মার্ক, ইয়েন, ফ্রাঁ প্রভৃতি মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমাতে হবে বা অন্যকথায় এসব দেশের পণ্যের দাম বাড়াতে হবে, না হলে আমেরিকা বাজারে মাল বিক্রী করতে পারছে না। আমেরিকা আবার আমদানী কমাবার জন্যে দশ শতাংশ আমদানী সারচার্জ বসিয়েছে, এর ফলে জাপান, জার্মানী, বৃটেন সবদেশের রপ্তানী বাণিজ্য কমে যাবে বলে তারা উদ্বেগিত।

এমাসে দু দুবার আন্তর্জাতিক বৈঠক হয়ে গেল। কিন্তু সবদেশ কিছুতেই একমত হয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারল না। আবার বারোই সেপ্টেম্বর দশটি উন্নত ধনী দেশের গোপন বৈঠক হচ্ছে। তাতেও বিশেষ সুরাহা হবে বলে কেউ ভরসা পাচ্ছেন না।

এদিকে সমাজতান্ত্রী দেশগুলির

আর্থিক সাহায্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সুতরাং সমাজতান্ত্রী দেশগুলির সঙ্গে, বিশেষ করে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্যে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশই লালায়িত। চীন নগদ টাকার মাল কেনে এবং বিক্রী করে। কিন্তু চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করতে হলে তার শর্ত মানতে হয়। শর্তগুলি কঠিন কারণ চীন বলেছে যে তাইওয়ানের সঙ্গে বাণিজ্য করলে কিংবা ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনে সাহায্য করলে চীন বাণিজ্য করবে না।

অথচ পুঁজিবাদী দর্শনায় বাণিজ্য সংকট, মুদ্রা বিনিময় সংকটের ফলে পুঁজিবাদী লেনদেনের গোটা কাঠামোই আজ ভেঙে পড়ার মুখে একথা ডেভেনপোর্ট থেকে গলব্রেথ সবাই এখন স্বীকার করছেন।

লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর পনেরই আগস্টের অভাবনীয় ঘোষণার আগেই চীনের সঙ্গে আপোষরফা আলোচনার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন।

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা পুঁজিবাদীদের নিজেদের সংঘর্ষের ফলেই ভেঙে পড়ছে, আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংকটবাহীন অবস্থার দরুন তারা সোদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এর ফলে রাজনৈতিক ভারসাম্যেরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার জন্যে ভারত থেকে আমেরিকা সবাই ছুটোছুটি হাস্যকর হলেও আজ এছাড়া উপায় নেই। সব দেশই তাই আজ পিকিং-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বরানগরের অমল মুখার্জী কাদের লোক?

অবশেষে বরানগরের কুখ্যাত সমাজবিরোধী অমল মুখার্জীকে পদলিখ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে। যদিও এই গ্রেফতারের পেছনে সি পি এম-এর ষোণসাজস আছে—সি পি আই এবং কংগ্রেসী মহল থেকে এরকম মন্তব্য করা হয়েছে। স্থানীয় দক্ষিণপন্থী নেতা শিবপদ-ভট্টাচার্য থেকে শব্দ করে শাসক কংগ্রেসের হিম্মতশূন্য ব্যানার্জী এবং ছাত্র পরিষদের সূরত মুখার্জী পক্ষ স্কলেই এই গ্রেপ্তারের জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।

ইতিমধ্যে তিনি জামিনে মুক্ত হয়ে গেছেন। বেল পিটিশনে বলা হয়েছে শ্রীমুখার্জী ছাত্র পরিষদের সদস্য। প্রিয় দামমুন্সী “গড় মরাল ক্যারেকটার” বলে তাকে সার্টিফিকেটও দিয়েছেন যা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

অথচ কয়েকদিন আগে সর্বদলীয় কমিটির সভায় শাসক কংগ্রেসের নেতা মৃগেন জাহিড়ী, অমলকে সমাজবিরোধী বলে স্বীকার করেছেন এবং সেই সভাতেই সি পি আই প্রতিনিধি তরুণ মৈত্রাও বলছেন, “এরা আমাদের নিয়ন্ত্রণের

বাইরে, এরা সমাজবিরোধী, আমাদের কেউ নয়।”

উপরোক্ত মন্তব্য যদি সত্যি হয়, তাহলে শিবপদবাবু, গীতা মুখার্জী প্রমুখ নেতারা অমলের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন কেন? আবার ছাত্র পরিষদের সূরত মুখার্জীই বা তাদের দলে ভিড়লেন কি করে?

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বছর দেড়েক আগেও এই শিবপদবাবুরাই তাদের পার্টিকে ন-পাড়া অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অমলকে এবং তার শিষ্য ভপন চন্দ্রকে নিজেদের দলের কর্মী বলে প্রচার করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে এসে জুটছিলেন নরেন সেনের সাক্ষরিত সনদ এবং মনু। তাছাড়া গোপাললাল ঠাকুর রোড এবং পাইকপাড়া থেকেও বেশ কয়েকজন কুখ্যাত গুন্ডা আমদানী করেছিলেন।

এমন কি সি পি আই-এর মুখপত্র “কালান্তরে” সত্তরের তেরেই অকটোবর তারিখে অমল প্রমুখদের নিজেদের কর্মী বলেই জাহির করা হয়েছিল। কিন্তু আজ

গ্রেপ্তারের পর তাদের সূর পালটেছে। তারা এখন বলছেন : অমল, চুনীরা হল আসলে নকশাল নামধারী বেনামী সি পি এম-এর লোক। বক্তব্য হল শিবপদবাবুরা এ রকম ডুপলিসিটি আর কতকাল চালাবেন?

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, অমল, ভপনরা যখন সি পি আই থেকে নাম কাটিয়ে দিয়েছেন, তখনো অমলের গুন্ডা অমল দাস (কালা) শিবপদবাবুর অনুগত। কিন্তু অমল এদিকে শাসক কংগ্রেসের স্বদ-শাখায় যোগ দেওয়ার ফলে কালা খানিকটা ভীত হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া অমলকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন পদলিখ লোক দেখানো টপ্পে কালার বাড়ীও তল্লাসী চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। যদিও কালাকে পাওয়া যায়নি। পরে থানায় নিয়ে গিয়ে ঐ দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুতরাং অমলকে গ্রেপ্তারের পেছনে কালার ষড়যন্ত্র থাকা অস্বাভাবিক হতে পারে কি? তাহলে কি বলতে হবে শিবপদবাবুরা নিজেদের অপকর্ম ঢাকবার জন্যই অমল মুখার্জীর গ্রেপ্তারে শোক প্রকাশ করছেন আর কাঁদুনি গাইছেন?

শান্তি কমিটির পাণ্ডারাই অশান্তির স্রষ্টা

বরানগর-কাশীপুরে নির্বাচার ও নৃশংস গণহত্যার পর সর্বদলীয় তদন্তের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়ে নব কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থবাধু বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা ঘোষণা করেন। এবং তারপরেই সেই “গণ হত্যা নয়—গণ অভ্যুত্থান” শীর্ষক একটি ইস্তাহার বরানগর বাজারে বিলোনে হয়। তাতে বলা হয়েছে, “কিসের তদন্ত? কার বিরুদ্ধে তদন্ত?” এই গণহত্যা যে ভাগ্যের জ্বলন্ত হুঁসিড়ে এবং ফলও ভাল হয়েছে, একথা এদেশের কিছু কিছু ভাড়াটে সংবাদপত্র বলতে আরম্ভ করেছে। এবং প্রকারান্তরে তারা এই ইস্তাহারকেই সমর্থন করে বলতে চাইছেন, “কিসের তদন্ত? কার বিরুদ্ধে তদন্ত?”

এই ধরনের গণহত্যার ফলে কতটা ভাল হয়েছে, তা প্রচার করতে গিয়ে যুগান্তর এবং আনন্দবাজার পত্রিকার দাঁটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। কিছু রিপোর্টার এককালীন উপদ্রুত এলাকায় নৈশ ভ্রমণে বের হয়ে কি সুন্দর অভিজ্ঞতা তারা লাভ করেছেন, তা আবার গল্পের আকারে তারা বলেছেন।

কিন্তু যারা ওখানে বসবাস করেন, যারা রাজনীতির সম্পর্ক বিজ্ঞ, তাদের অভিজ্ঞতা এই আবার গল্পের সঙ্গে মেলে না। অবশ্য মেলার কথাও নয়। কারণ আমাদের দেশে রিপোর্টারদের

চাকুরী-বজায় রাখতে অনেক অসত্য কথাই বলতে হয়।

অশ্বিনীর রাজত্বকালে যারা বসবাস করতে পেরেছেন, জয়ন্তর রাজত্বকালেও যাদের বসবাসের কোনো অসুবিধা হয় নি, এই গণহত্যার পরে, সেই সাধারণ অরাজনৈতিক নাগরিকদেরও বসবাস কঠিন হয়ে পড়ছে। শান্তির নামে পাইপগান রিভলবার খন্দীদের

বাড়ীতে এনে ওদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বর্তমানে তিনি শান্তি কমিটিতে নিষ্ঠাবান। সহঃ সভাপতি দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দম্যাদিক। নানা রকম রাজনৈতিক টপিক পকেটে থাকলে রাজনৈতিক নেতারা সব কিছুই ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু অরাজনৈতিক জনসাধারণ তা ক্ষমা করতে পারেন না বলেই গত পৌর নির্বাচনে এই

হাতে হাতে ঘুরছে। তাদের সঙ্গে সামিল হবার জন্য সকল মানুষের ওপর চাপা সৃষ্টি করা হচ্ছে। টাকা আদায় করা হচ্ছে এবং ওই এলাকার প্রশাসন-কর্তা এখন ওরাই।

এই প্রশাসন চালাতে গিয়ে তারা একটি কমিটি গঠন করেছেন। তার নাম দিয়েছেন শান্তি কমিটি। এই শান্তি কমিটিই এখন এই অঞ্চলের ডিক্টাটো প্রশাসক। খন্দীদের ইচ্ছাপূরক এই শান্তি কমিটি কি জিনিষ এটা জানা দরকার। এই শান্তি কমিটির সভাপতি হয়েছেন, দিগম্বনাথ পাঠক। ইনি জ্যোতিষী করেন। এবং এর ছেলে শেখর। অশ্বিনীর বন্দুবান্ধব বা সাক্ষরদের এদের বাড়ীতে আহার আশ্রয় এবং বন্দু বরাবর পেয়ে এসেছে। পদলিখ এলে এদের

ব্যক্তিটির জামানত জব্দ হয়ে গিয়েছিল। এই আক্রোশ এখন তিনি পুরাতন স্বার্থ চরিতার্থ করছেন।

আজ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, নব কংগ্রেস যুব কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ একটি কুৎসিত অনৈতিকতাকে যুব মানসে যুব-চরিত্রে রোপন করতে চাইছে। যুবসাধারণকে বিষিয়ে না তুলে তার বাঁচার কোনো পথ নেই। এই কুৎসিত ইচ্ছা আজ তাদের এতো প্রকট যে, পলিট অফিসেও বন্দুহরণ করানো হচ্ছে। এটি পরিব্যাপ্তও হচ্ছে। এবং গণহত্যার পরে মেয়েরা সম্মান নিয়ে রাস্তায় হটিতে পারছেন না। এটি একটি নতুন উৎপাত সুন্দর হয়েছে।

আজ এই শান্তি কমিটির বিরাট স্তম্ভ যারা তারা এই অঞ্চলের

এক একজন দিকপাল গুন্ডা, মাস্তান। পদলিখের খাতায় এরা নতুন নয়। এই গণহত্যার নির্মম নায়ক এরাই। পদলিখের সহায়তায় এদের হাতেই সৌদীন বহু মানুষকে হত্যা করেছে। আনন্দবাজারের গান্ধীবাদী সাংবাদিক তো বরানগরের বাজারের ওপরেই থাকেন। সাংবাদিক হিসাবে এসব তথ্য তার অজানা থাকার কথা নয়। উল্লিখিত ইস্তাহার মধ্য হালদার নিজে তার ঘরের সামনে বিলি করে। এবং এই জনাই কি আনন্দবাজার যে

রিপোর্ট দিলো, তার মূল মর্ম হলো, “কিসের তদন্ত? কার বিরুদ্ধে তদন্ত?” নব কংগ্রেস নেতারা এদের সঙ্গে দহরম মহরম করছেন বলেই কি এসব গল্প-কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে? কিন্তু অরাজনৈতিক জনসাধারণ জানে যে, গুন্ডা দিয়ে কোনো দিন শান্তি আসে না। আনন্দবাজার যুগান্তর বললেও না, নব কংগ্রেস নেতারা বললেও না।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

মতামত

দীপু মৈত্র হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে

গত নয়ই আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রামলাল বাজার নিবাসী দীপু মৈত্র নামে পঁচিশ বছর বয়স্ক এক যুবক বাড়ী ফিরছিলেন বালিগঞ্জ থেকে। এক নম্বর রওটের বাসে করে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ কসবার একদল চিরপরিচিত সমাজ-বিরোধী দীপুকে বাস থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দীপুর বাবা বাসযাত্রীদের কাছে খবর পেয়েই ছুটে যান কসবার এবং সেখানে গিয়ে নব কংগ্রেসী নামধারী সমাজবিরোধীদের কাছে দীপুর সংবাদ জানতে চান। তারা জানান দীপুকে পদলিখের হাতে জমা দেওয়া হয়েছে। কসবার নব কংগ্রেস এম পি শান্তি সরকারের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হলে তিনি তখন মাথা ব্যথার অজুহাত দেন। এমনকী স্থানীয় প্রতীবেশীদের দিয়ে থানায় বার দশেক ফোন করা হলেও পদলিখ কর্তৃপক্ষ জানান যে তারা উক্ত নামের কোন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়নি। সৌদীন হাজার খোঁজাখুঁজি করেও কোন খবর জানতে পারলেন না দীপুর বাবা।

পরদিন সকালে স্থানীয় জনসাধারণ জানতে পারে যে কসবা পদলিখ নাকি রাত দেড়টার সময় দীপুকে কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে গরফায় রেড করতে যায়। সেখানে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই পাঁচজনকে নিয়ে একটি পদলিখ-ভান কসবার দিকে চলে যায়, আরেকটি ভান দীপুকে একা নিয়ে চলে যায় বাদবপুরের দিকে। আশ্চর্যের বিষয় তখনো কসবা থানায় ফোন করা হলে পদলিখ সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করে এবং কোন সংবাদ জানান না।

এরপর হঠাৎ সংবাদ আসে দীপু পদলিখের গুলিতে আহত হয়ে বাগদুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার পরেই এল মৃত্যু সংবাদ। সবশেষে মৃতদেহ যখন পোস্টমর্টেম হয়ে মশানে এলো, তখন দেখা গেল, দীপুর গায়ে বোলাটি গুলির চিহ্ন, রাইফেল পিস্তল এমনকি স্টেনগানের গুলি, ভোজালির কোপ, সারা গায়ে সিগারেটের ছাঁকা। স্থানীয় জনসাধারণ কান্ড দেখে স্তম্ভিত। এভাবে কি মানুষ মারা হয়েছে, না বাধ শিকার করা হয়েছে?

এই ঘটনার বিবরণে এগারোই আগস্ট যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল : “কসবা এলাকায় এক ঝোপের মধ্যে প্রায় একটা নাগাদ এক পদলিখ বাহিনী তলাসী চালাতে গেলে একদল সশস্ত্র লোক পদলিখের উপর রিভলভার বোমা নিয়ে আক্রমণ চালায়। একজন এ এস আই বোমার গুরুতর জখম হয়। পদলিখ রাইফেল ও রিভলভার থেকে দশরাউন্ড গুলি চালায়। গুলিতে দীপু মৈত্র (আঠারো) নামে এক যুবক মারা যায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি রিভলবার, একটি পাইপগান, চারটি বুলেট, বারোটি বোমা এবং বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরীর মশলা উদ্ধার করা হয়েছে বলে পদলিখ জানিয়েছে।”

জানা গেছে, কসবা ও গরফা রামলাল বাজারের গুড়ারা এই ঘটনাছাড়া আরো নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। পদলিখের খাতায় এদের প্রত্যেকের নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে। সতরাং প্রশ্ন হোল, এই সব সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে পদলিখকে যদি এদের সঙ্গে আড্ডা দিতেই দেখা যায়, তবে দেশে কোর্ট-কাছারী কিংবা আইনের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

জনৈক তথ্যাভিজ্ঞ

কলকাতা পুলিশ কল্যাণিতে গেল কি করে?

আজ থেকে ছ সাত বছর আগে কলকাতা পদলিখের চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের দপ্তরটি কলকাতা থেকে কল্যাণীতে স্থানান্তরিত করা হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে সরকারী আইন এবং পদলিখী প্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পদলিখের এই দপ্তরটিকে এস পি নদীর প্রাশাসনিক এলাকার অধীনে স্থানান্তরের কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। কিন্তু কোন আইনের বলে একাজ সম্ভব হল সে বিষয় আমার কাছে অজ্ঞাত। কমিশনারের এমন কোন অধিকার আছে কি, যার মাধ্যমে তিনি যে কোন দপ্তর তাঁর প্রশাসনিক এলাকার বাইরে যে কোন জায়গায় চালান দিতে পারেন?

আমি কতগুলো যুক্তির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে কলকাতা পদলিখের এই দপ্তরটি কল্যাণীতে স্থানান্তর একটি বে-আইনী কাজ। প্রথমতঃ এই দপ্তরটি কলকাতা পদলিখের অধীনে কিন্তু কল্যাণী কলকাতা থেকে চঞ্জিশ মাইল দূরে। প্রত্যেকদিন অতদূর থেকে চাকুরী করার জন্য কর্মীদের যাতায়াতের অসুবিধে ছাড়া সুবিধে কিছু আছে কি?

দ্বিতীয়তঃ কলকাতা পদলিখের

কিছু কিছু কর্মী কলকাতা শহরে চাকুরী করার জন্য কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে। যেমন সার্জেন্ট। কিন্তু বেঙ্গল পদলিখে সার্জেন্টের কোন পদ নেই। অথচ কলকাতা পদলিখের সার্জেন্টরা বছরের পর বছর বেঙ্গল পদলিখের এলাকায় চাকুরী করে শহর জীবনের সুবিধাগুলি ভোগ করে চলেছেন।

তৃতীয়তঃ কোন পদলিখ কর্মী আইনত বিনা অনুমতিতে তার হেড কোয়ার্টার ত্যাগ করতে পারে না। অথচ বছরের পর বছর এই সমস্ত কর্মী তাদের হেড কোয়ার্টারের বাইরে পড়ে আছেন কি যুক্তিতে? তবে ধরে নিতে হয় কল্যাণী তাদের হেডকোয়ার্টার। কিন্তু সে রকম অনুমতি কি সকলের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে? যেমন চব্বিশ পরগণার কোন পদলিখ অফিসারকে যদি নদীর কাছ করতে হয় তবে তাকে লিখিত ভাবে বদলীর অথবা ডেপুটেশনের আদেশ দিতে হয়। যদিও এক্ষেত্রে আমরা জানিনা যে এই দপ্তরটিকে পুরোপুরি অন ডেপুটেশন টু ক্যালকাটা ফ্রম কল্যাণী অথবা অন ডেপুটেশন টু কল্যাণী ফ্রম ক্যালকাটা দেখানো আছে কিনা।

চতুর্থত আমি জানি কল্যাণীতে এই দপ্তরের কিছু কর্মীকে কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে। স্লেস অব ডিউটির কাছাকাছি যদি কোয়ার্টার দেওয়ার নিয়ম থাকে তবে এক্ষেত্রে স্লেস অব ডিউটির (কলকাতা) থেকে চঞ্জিশ মাইল দূরে কোয়ার্টার দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে?

পঞ্চমত আমি জানিনা এই দপ্তরের মাসিক বেতন কোথা থেকে হয়। সাধারণতঃ কলকাতা পদলিখের অন্যান্য দপ্তরের বেতন এ জি বেঙ্গলের অফিস থেকে দেওয়া হয়। এদের হেড কোয়ার্টার যদি কল্যাণী হয়, তবে এদের মাইনে ডিউটি ট্রেন্ডারী থেকে হওয়া উচিত এবং কোন কর্মীরই অপরাপর কলকাতা পদলিখের মত বিশেষ আর্থিক সুযোগ পাবার কথা নয়। আর তা না হয়ে এ জি বেঙ্গল থেকেই যদি এদের মাইনে দেওয়া হয়, তবে তা আইনবিরুদ্ধ।

আমি সরকার, পদলিখ কমিশনার তথা সিদ্ধার্থবাধুকে অনুরোধ করছি যে তাঁরা ব্যাপারটা তলিয়ে দেখুন। তাঁরা যদি সব এক্ষেত্রে সরকারী আমলাদের উপর নির্ভর করেন, তবে তাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

জনৈক তথ্যাভিজ্ঞ

দুর্গা

সংবাদ সাপ্তাহিক

৪ চাঁদার হয়ে

বার্ষিক পনেরো টাকা
সাপ্তাহিক সাড়ে সাত টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা
টাকাভিত্তিক ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা :
৩১, নট লেন, কলি-১০

শিয়ালদহ ই এস আই হাসপাতালে দুর্নীতির রামরাজত্ব প্রতিবাদে অনশন চলছে : সরকার এখনও নির্বিকার

(বিশেষ প্রতিনিধি)

শিয়ালদহ ই এস আই হাসপাতালে দুর্নীতির রামরাজত্ব চলছে। হাসপাতালের বিধিব্যবস্থা এবং চিকিৎসাগত অপদার্থতার জন্য বর্তমানে আটজন রোগী অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন।

হাসপাতালের এই অব্যবস্থা আজকের ঘটনা নয়। চলতি বছরের নয়ই জুন স্বাস্থ্য দপ্তরের সরকারী প্রতিনিধি আই জি, টার্কি, হাসপাতালের ডিরেক্টর কাদের নোয়াজ, স্পেশ্যাল অফিসার এম এল ভৌমিক এবং পশ্চিমবঙ্গ ই এস আই কমিউনিটি বিউটিস এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মলয় রায়ের উপস্থিতিতে এক জরুরী সভায় উভয়পক্ষ থেকেই একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

ইমার্জেন্সী রোগীদের প্রাথমিক সুবিধা, শোবার জন্য পর্যাপ্ত চাদর, বালিশ, বিছানা, যথার্থ পরিমাণ ওষধ খাদ্য এবং মাছের সরবরাহ, রোগীদের ওয়ার্ড সংলগ্ন বারান্দার আবরণ, একটি অব্যবহৃত এ্যাম্বুলেন্সের আর্থশ্যাক ব্যবহার, খাবার জন্য থালা-প্লাস্টের উপযুক্ত ব্যবস্থা, ডাক্তার, মেট্রন, সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং ওয়ার্ডমাষ্টারের নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রোগী পরিদর্শন, ওয়ার্ডগুলির স্বাস্থ্য উপযোগী পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কার্যকরী সিদ্ধান্ত উক্ত চুক্তিপত্রে গৃহীত হয়েছে।

চুক্তির বিষয়গুলি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় উক্ত হাসপাতালে রোগীদের উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা বলতে কোনদিনই বোধ হয় কিছু ছিল না। বর্তমানে আটজন রোগীর অনশনের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে কমিউনিটি বিউটিস এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আমায় জানালেন : (এক) নয়ই জুন তারিখে অনর্দিত স্থিতিপাশ্চিক চুক্তি অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে। (দুই) ইমার্জেন্সী সমেত হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, এবং সমস্তরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। (তিন) অন্যান্য দুর্নীতি সমেত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে গত বাইশে জুলাই এবং তিরিশে আগস্ট তারিখে দুজন রোগীর মৃত্যুর অবিলম্বে তদন্ত চাই, (চার) হাসপাতালে পড়ে থাকা এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবহার চাই। (পাঁচ) শ্রমিকের অর্থে কেনা এক্স রে মেশিন, ক্লোরোফর্ম মেশিন অব্যবহৃত রয়েছে জানতে চাই, (ছয়) হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং মেট্রনের আইন কানুন বহির্ভূত স্বেচ্ছাচারিতা এবং পরিচালন পদ্ধতির চূড়ান্ত অব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবিলম্বে বদলি করতে হবে।

আশ্চর্যের বিষয় রোগীরা যে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন, কর্তৃপক্ষের তাতে কোনই ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ অনশনের দিন থেকেই (একটিশে

আগস্ট) পুলিশ বাহিনী ঠিক মোতায়েন রাখা হয়েছে। এবং প্রয়োজন বোধে অনশনকারীদের ভয়ও দেখানো হচ্ছে।

অন্যদিকে হাসপাতালের সাধারণ কর্মচারীরাও (পারেনোজন) ঐ একই দিনে অনশন শুরু করেছেন। ই এস আই এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়ে-

শনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে সম্প্রতি হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুবোধ বেদজকে বছরের মাঝামাঝি সময়ে কে-আইনী ভাবে মেদিনীপুর ডিগ্রী টি বি হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে। কর্মীদের অভিযোগ, শ্রীবৈদ্যর যেহেতু ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন, সে-

হেতু সংগঠনের বিভিন্ন আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

তাছাড়া জি ডি এ, বাসন্তী বোসকে হঠাৎ বদলি করে একজন গুন্ডা প্রকৃতির ব্যক্তিকে ঐ পদে বহাল করা হয়েছে। মহিলা জি

ডি এ-র পরিবর্তে মহিলাই নিয়োগ করার নিয়ম স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ জি ডি এ পদে পুরুষ নিয়োগ করা হোল কেন? তাছাড়া সাইকেল এ্যাম্বুলেন্স, এ্যাম্বুলেন্স ক্রিনারদের ওভারটাইম, কর্মীদের কোয়ার্টার কোন কিছরেরই সুরাহা হচ্ছে না।

কর্মীদের এবং রোগীদের অনশনরত অবস্থাতেও যখন কর্তৃপক্ষের টনক নড়ছে না, তাহলে এখন তারা কি ওদের মৃত্যুর জন্যই দিন গনছেন?

ভিগ্নি নেবার দিন। মঞ্জুদেবী তাঁর সন্তানের বি.এ.
পাশের খবরে খুব খুশি হয়েছেন।

সব মা ই চান তাঁদের সন্তানরা ভাল পাশ করুক,
দেশের এক হোক।

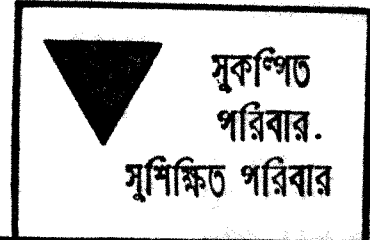
কিন্তু পরিবার বড় হলে বাগ মায়ের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও
হেলে মেয়েদের এই সুযোগ সুবিধে দেওয়া সম্ভব হয়না।

হেলে মেয়েদের সুশিক্ষা দিতে হলে দুটি বা তিনটি
সন্তানই যথেষ্ট।

লাল ত্রিকোণ চিহ্নিত পরিবার কল্যাণ

কেন্দ্রগুলি আপনাকে পরিবার নিয়ন্ত্রণের সমস্ত

সুযোগ সুবিধে দেবে—নিখরচায়।



দৈনিক ছ কোটি গ্যালন পরিষ্কৃত জল সরবরাহ প্রকল্প উদ্বোধনের বহুশ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রাক্তন মেয়র শ্রীপ্রশান্তকুমার শূরের নেতৃত্বে বিগত যত্ন ফল্টের উদ্যোগে যে নতুন পানীয়জল প্রকল্পটির কাজে হাত দেয়া হয়েছিল, তার কাজ প্রশান্ত শূরের কার্য-কালের মধ্যে শেষ হওয়ার যৌক্তিকতা থাকা সত্ত্বেও কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের চক্রান্তে তা শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। নতুন মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত গদীতে বসেই এই অসমাপ্ত প্রকল্পটির উদ্বোধন করে অন্যের পাওনা কৃতিত্ব মেয়ে দেবার তাল করলেন। পীরের দরগাহ শিনি দেবার কথাটাও - ভুললেন না নানা ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী শ্রীগুপ্ত, প্রধান

মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে দিয়ে উদ্বোধনের ব্যবস্থাটা তড়িৎগতিতে ফেললেন। পলতা জল-কারখানার কোন প্রবীণ শ্রমিককে দিয়ে এই সরবরাহ উদ্বোধন করানর যে প্রস্তাব বিরোধী দল থেকে ধরা হয়েছিল, শ্রীগুপ্ত তাতে কানই দিলেন না। উদ্বোধন উপলক্ষে যে স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে প্রাক্তন মেয়রের বা তাঁর প্রচেষ্টার নামগন্ধও নেই। তার পরিবর্তে আছে করিতকর্মী চীফ ইঞ্জিনীয়ারের আলোকচিত্র। এই প্রকল্প সফল হলে মানব যে বাড়তি জল পেতে তার প্রতীক-স্বরূপ একটি ফোয়ারা তৈরি হল,

তার উদ্বোধনও হল; শ্রীমতী গান্ধী এই ফোয়ারার ধারায় আশ্রিত হয়ে ভাবলেন, শহর-বাসীর জলাভাব ঘুচল। আসল ব্যাপার কিন্তু চাপা থাকল না। সি পি এম দলের চীফ হুইপ শ্রীঅশোক বসু পয়লা সেপ্টেম্বর মেয়রকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে, উদ্বোধনের ঘণ্টা খানেক পরেই নতুন প্রকল্পটির সুইচ গীয়ারে যান্ত্রিক গোলযোগ হয়ে প্রতিরুদ্ধ জলস্রোতের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রতিরুদ্ধ এবং শহর-বাসীর বহুপ্রতীক্ষিত অতিরিক্ত পানীয় জলসরবরাহে এই রূপ বিপর্যয় নিঃসন্দেহে এক গুরুতর ঘটনা। সুতরাং তিনি দাবী করলেন

যে, এ বিষয়ে দ্রুত তদন্ত করে ফলাফল কর্পোরেশন সভায় উপস্থিত করা হোক। পরের দিন দিল্লী যাওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মেয়র মশাই কমিশনারকে তদন্ত করতে বললেন। কমিশনার মশাইও দিল্লী যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তিনি বরাত দিলেন চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে; তিনি আবার বরাত দিলেন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে। কিন্তু চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে থেকে কোন রিপোর্ট পাওয়ার আগেই কমিশনার সাংবাদিকদের জানিয়ে দিলেন—সব ঠিক হ্যাঁ, জলপ্রকল্প ঠিক মত চলছে। পরের দিন ডেপুটি মেয়র শ্রীপ্রজ্ঞালাল দাশ সরজমিন তদন্তে গিয়ে বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে দেখলেন যে, নবাবগঞ্জের পড়ে-যাওয়া যে সুইচ গীয়ারটি পালটানো হয়েছে তাতেও গোলমাল। কবে পর্যন্ত এই গোলমাল দূর

হবে সে কথাও চীফ ইঞ্জিনীয়ার তাকে জানাতে পারলেন না। পলতার লগ বকে দেখা গেল—উদ্বোধনানুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়া মাত্র চীফ ইঞ্জিনীয়ারের নির্দেশে পলতার পাম্পটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আরও দেখা গেল—এদিন একশ চল্লিশ মিলিয়ন গ্যালনের জায়গায় একশ সতেরো মিলিয়ন গ্যালন পরিষ্কৃত জল সরবরাহ করা হয়েছিল। ফোয়ারার জল দেখিয়ে মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত ইন্দিরাজীকে খুশি করেছেন কিন্তু এখন কলকাতার মানবকে কী জবাব দেবেন? আর কমিশনার যে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন, তারই বা কী জবাব দেবেন কমিশনার শ্রীমজুমদার? চীফ ইঞ্জিনীয়ার অবশ্য তাঁর কর্মতৎপরতার জন্য এর আগেও একবার সাসপেন্ড হয়েছিলেন। অতএব তাঁর কথা না বলাই ভাল।

এ্যাডহক কংগ্রেস

(প্রথম পৃষ্ঠার পল)

কমিটি করার কথা ভাববেন। জবাবে বিজয় সিং নাহার আরো পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, “এ্যাড-হক কমিটির চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।” বিজয় নাহার আরো বলেছেন, “সিদ্ধার্থ রায় ওয়াকিং কমিটির সদস্য। উনি যেন নরাদিঙ্গীকে জানিয়ে দেন যে, পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসীদের অধিকাংশই এ্যাড-হক কমিটি চান না। উল্লেখযোগ্য, সিদ্ধার্থ রায়ের বেলতলা রোডের বাড়ীতে এই বৈঠকে বর্তমান

জেলা কংগ্রেসের নেতা নারায়ণ চৌধুরীকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। বৈঠকের সরুতেই সিদ্ধার্থ রায় বলেন, সমস্ত জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদকরা অধ্যাপক দেবী চ্যাটার্জীকে কংগ্রেস সভাপতি ও আবদুস সাত্তারকে সাধারণ সম্পাদক রূপে দেখতে চান বলে তিনি মনে করছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা সরু হয় এবং বিরোধীরা বলেন, তাঁরা সাত্তার সাহেবকে সভাপতিরূপে দেখতে চান। একজন বলেন, সভাপতি পদে নিম্ননেশন দাখিলকারী নারায়ণ চৌধুরীকে বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। তাঁর অন্তর্নিহিতভাবে সভাপতি নির্বাচন নিয়ে কিভাবে আলোচনা চলতে পারে? জবাবে সিদ্ধার্থ রায় বলেন, এটি ভুল হয়েছে। এরপর প্রিয় মুন্সি বলেন, নারায়ণ চৌধুরীর যোগ্যতা বা গুণ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু তার সঙ্গে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের বনবে না। উত্তরবঙ্গের সন্তোষ রায় বলেন, নারায়ণ চৌধুরী মানুষ খারাপ নন। কিন্তু নতুন সংগঠনের সঙ্গে তাঁর কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই এবং পশ্চিমবঙ্গের কম্যান্ডিং বিপদের মোকাবেলা করার মতো

যোগ্যতা ওর নেই। এরপর সিদ্ধার্থ রায় আবার দাঁড়ান। প্রথম দিকে গান্ধীবাদ, কম্যান্ডিং ও মার্ক্সবাদ সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা করে বলেন, অধ্যাপক দেবী চ্যাটার্জী অল্পদিনে নরাদিঙ্গী থেকেই নিজেই প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন এবং সেখানে ঠেকে “আন্তর্লেকচারাল” বলে গ্রহণ করা হয়। তাই নরাদিঙ্গী চাইছে দেবী চ্যাটার্জীকে সভাপতি এবং সাত্তারকে সম্পাদক দেখতে। নরাদিঙ্গী মনে করছে, এতে সংগঠন শক্তিশালী হবে। ছাত্র ও যুব সমাজও এটাই চাইছে। এই কথা বলার পর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে সিদ্ধার্থ রায় বলেন, নরই সেপ্টেম্বর ওয়াকিং কমিটির বৈঠক হবে। এই বৈঠকে রাজস্থান, বিহার ও উড়িষ্যা এ্যাড-হক কমিটি গঠনের কথা চিন্তা করা হবে। পশ্চিমবঙ্গেও যদি সভাপতি নিয়ে মতৈক্য না হয় তবে এখানেও এ্যাডহক কমিটির কথা চিন্তা করা হতে পারে।

যদি দেবী চ্যাটার্জীকে সভাপতি না করা হয় তবে “আমরা দিল্লীকে বলবো দেবী চ্যাটার্জীকে সভাপতি করে এ্যাড-হক কমিটি করতে।” জলপাইগুড়ির একজন কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভবানী পাল বলেন, দেবী চ্যাটার্জী সম্পর্কে নরাদিঙ্গীর ধারণা নিয়ে সিদ্ধার্থ রায় ও প্রিয় মুন্সী যা বলেছেন সেই কারণেই দেবী চ্যাটার্জীর নয়। দিল্লী থাকা উচিত। ডঃ বিধান রায়ের আমল থেকেই কেন্দ্র পশ্চিম বঙ্গকে উপেক্ষা করেছে। তাই দেবী চ্যাটার্জীর মতো লোক দিল্লী থাকলে পশ্চিমবঙ্গ আরো বেশী টাকা পয়সা পেতে পারবে এবং ইত্যবসরে দেবী চ্যাটার্জী পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে আরো পরিচিত হবেন। এখন যখন ছাত্র ও যুবকরা ভিন্নপথে চলছেন তখন দেবী চ্যাটার্জীর উচিত হবে ওদের নিয়ে ক্লাশ করা, ওদের রাজনীতিতে শিক্ষা দেওয়া। এটি করলে দেবী চ্যাটার্জী ভালো কাজ করবেন। সিদ্ধার্থ রায়কে উদ্দেশ্য করে ভবানী পাল বলেন, নরাদিঙ্গীকে জানাবেন “আমরা অনেক এ্যাড-হক দেখেছি। এই এ্যাড-হকও আমরা মেনে নেবোনা।” আবদুস সাত্তার অস্থায়ী সভাপতি হয়ে কাজ করছেন। তাঁরই সভাপতি হওয়া উচিত।

উত্তরবঙ্গের জয়নাল আবেদিন : আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই। প্রসন্ন ঘোষ : আপনার কথা তো বলিনি। একজন জার্নালিস্ট জয়নাল আবেদিন আছে। এইভাবে কি সংগঠন গড়া যায়? তাছাড়া আমরা যতটা জানি তাতে বেশী ভাগই তরুণকান্তি ঘোষকে সভাপতি করার জন্যে রাজী হয়েছিল। কিন্তু এখন তরুণবাবু দাঁড়াতে চাইছেন না। তাই সাত্তার যখন অস্থায়ী সভাপতির কাজ করছেন তাঁকে সভাপতি করা হোক।

এবারে উঠলেন, অধ্যাপক দেবী-প্রসাদ চ্যাটার্জী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কারুর কাছে সভাপতি পদের জন্যে নির্দিষ্ট নাম করেন নি এটা ঠিকই বটে। কিন্তু অনেক মেম্বারের কাছে কথাগুলো ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন যে, তিনি আমাকেই চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী চান আমি যেন সভাপতি হই। তা যাই হোক না কেন আমি দাঁড়াবোই। ছাত্র ও যুবকরা আমাদের সঙ্গে আছে।

শেষের দিকে উঠলেন, বিজয় সিং নাহার। তিনি বলেন, “আমি রিজাইন করেছি পদটি খালি হয়েছে। ভেবেছিলাম মিলে মিশে ছেলে-বড়ো মিলে চলতে পারবো। কিন্তু এখন দেখছি এ্যাড-হক কমিটির ভয় দেখানো হচ্ছে। সিদ্ধার্থ রায়কে বলা হচ্ছে, উনি ওয়াকিং কমিটির একজন মেম্বর। উনি যেন দিল্লীকে জানান, এখানকার বেশী ভাগ লোকই এ্যাড-হক চান না। এই বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও যদি এ্যাড-হক চাপানো তবে আমরা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয় তা জানি।” বিজয় নাহার আরো বলেন, এখন ছাত্র ও যুবকদের অনেক প্রশংসা করা হচ্ছে। এখানে জয়নাল আবেদিন ও সাত্তার আছে। তাঁদের তো ওদের হাতে শব্দে অপমানই নয়, অল্প-বিস্তর মারধোরও খেতে হয়েছিল।

এ-বছর পূজায় ছোটদের জন্য এক বাজ উপহার। এই বাজ আছে রত্নী হবি দেওয়া আটখানা

মিনি বই

সংকলন ও চিত্রাংকনে
রঘুনাথ গোস্বামী

দাম ৩.৫০

পরিবেশক :

মুখার্জী ব্রাদার্স । কলকাতা ২৮
দে বুক ষ্টোর । কলকাতা ১২

বিজ্ঞাপনের চমক নয়, মৌলিক বাঙলা সাহিত্যে এই ধরনের রচনা নিঃসন্দেহে এই প্রথম।

প্রকৃতি মানুষ ধর্ম শোষণ

রবীন্দ্র দাশগুপ্ত

প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিস্তৃত পটভূমিতে
ধর্ম সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা।

দাম ৩.৭৫

পরিবেশক :

দে বুক ষ্টোর । বংকিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট । কলকাতা ১২

মুখার্জী ব্রাদার্স । কাজিপাড়া । দমদম । কলকাতা ২৮

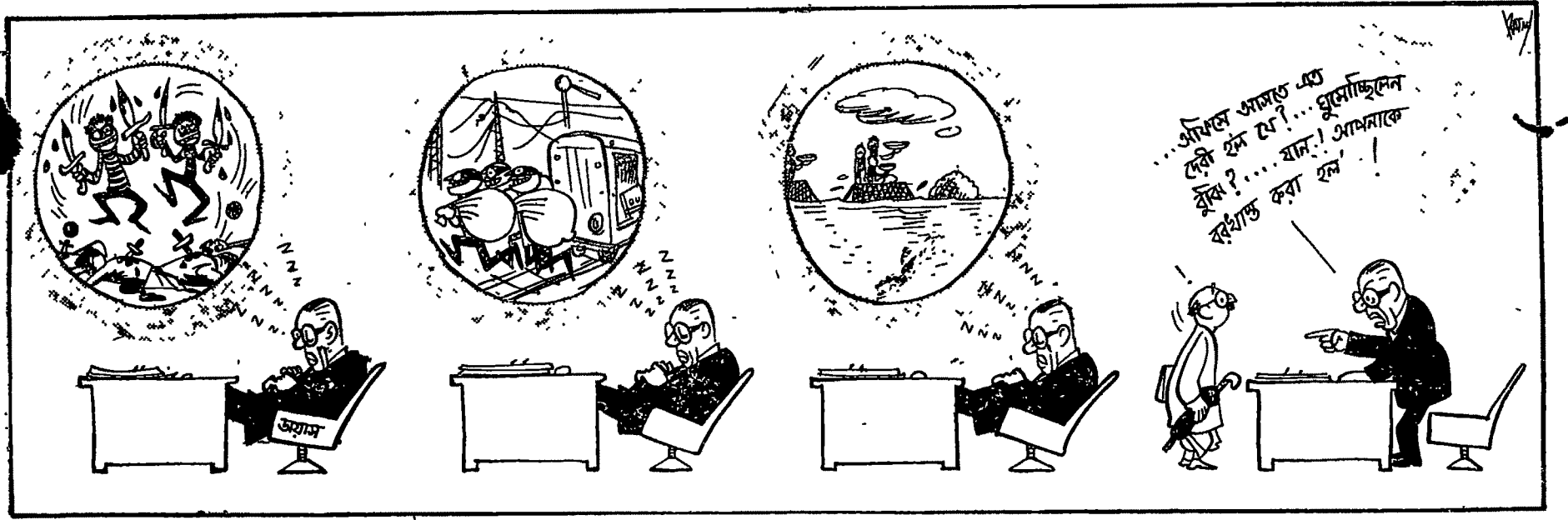
সমালোচকদের মতে :

“আমরা যেন করি, এই মূল্যবান গ্রন্থ নতুন বিশ্বাসে আত্মাঙ্গীল হোতে পাঠকদের সাহায্য করবে। তাই গ্রন্থটি সকলেরই অবশ্যই পড়া উচিত।

—বাঙলা দেশ

সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীরা বলে ওঠেন : এটা কি ভয় দেখানো হচ্ছে? সিদ্ধার্থ রায় বলেন, তিনি শব্দে নরাদিঙ্গীর চিন্তাধারার কথা বলছেন। এই সমস্ত প্রিয় মুন্সি বলেন, তাঁর অল ইন্ডিয়ান ব্যাপারে একটা মিটিং আছে সেজন্যে আগে বলতে চাইছেন। এই বলে প্রিয় মুন্সি বলতে থাকেন, ছাত্র ও যুবকরা যদি এগিয়ে না আসতো তবে আজকের উপস্থিত নেতারা কোন্সায় থাকতেন? যেসব নেতার রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নেই তাঁরা কোন্সায় থাকতেন? পশ্চিমবঙ্গে এখন যে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি রয়েছে সেটিও একরকমের এ্যাড-হক কমিটি। এই কমিটির নেতারা এখন তাঁদের সিদ্ধান্ত “আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন।”

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রসন্ন ঘোষ বলেন, সিদ্ধার্থ রায়কে লোকে বাংলাদেশের লাট সাহেব বলেই জানে। তাই তিনি লাট হিসেবেই থাকুন আর দেবীবাবু ক্লাশ খুলে ছাত্র ও যুবকদের রাজনীতি শেখান। দেবীবাবুর পশ্চিম বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে বেশী পরিচিতি আছে বলে জানি। তবে চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে খবরদারী করার জন্যে জয়নাল আবেদিন বলে এক জনকে রেখেছেন।



১২ জনকে
ছাঁটাইয়ের
নেপথ্যে

দপন

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের
প্রতিবাদ বিক্ষোভ
রাজ্যপালঃ ভেবে দেখব

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৪শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা ২ শ্রবণ ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ৥ দাম এক টাকা

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে

খেয়োখেয়ির প্রথম পর্যায়ে
সিদ্ধার্থ রায়ের জয়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রদায়ের করণ আছে যে, গভর্ণর কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেতৃস্থানীয় কর্মী ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে দিল্লীতে গভীর শূলাপরা-মর্শের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ছাঁটাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে ইন্দিরা গান্ধী নব কংগ্রেসী নেতা-দের ছড়ানো ভূতপূর্ব ডেমোক্র্যাটিক কোয়ালিশনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন।

সকলেই একমত যে, সি পি এম-কে কেণ্টাসা করার রাজনীতি যতটা সফল হবে আশা করা গিয়েছিল ততটা হয় নি। তথাকথিত নকশাত্মী হত্যাকাণ্ডের ফলে সি পি এম-এর সাংগঠনিক শক্তি বেড়েছে বই কমে নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে নির্বাচন রাজনৈতিক ভারসাম্যে খুব বেশী পরিবর্তন আনবে না।

তার উপর আছে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর মার্কসবাদীদের ব্যাপক প্রভাব। বরাবরই মার্কসবাদী-বিরোধী দলেরা অভিযোগ করে এসেছে যে এই সমস্ত কর্মচারী নির্বাচন কেন্দ্রে ডিউটিতে গিয়ে মার্কসবাদী প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করে। এদের দিয়ে নির্বাচন করলে অন্য কোন দলের নির্বাচনী ভবিষ্যৎ খুব খারাপ।

গত নির্বাচনের পূর্বে অজয় মুখার্জীর বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি এম-এই প্রমুখ দলেরা সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা বিষয়ে অনেক অভিযোগ করেন। সে নিয়ে অনেক সোরগোল। এক সময়ে প্রস্তাব হয়েছিল অন্য রাজ্য থেকে কর্মচারী এনে নির্বাচন করানো হোক। উত্তরে জ্যোতি (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

পশ্চিম বঙ্গে নব কংগ্রেসীদের খেয়োখেয়ির প্রথম পর্যায়ে সিদ্ধার্থ-শংকর রায় নিশ্চিতভাবে জয়ী হয়েছেন। এই রাজ্যে এ্যাড-হক কংগ্রেস কমিটির যে তিরিশ জন সদস্যের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অন্ততঃ অঠরো জন সিদ্ধার্থ রায়ের দলের। বাকী বারোজনেরও সবাই শেষ পর্যন্ত বিজয় নগর-তরুণকান্তির দলে থাকবেন কিনা

সমসংস্পর্কে সন্দেহ আছে। কেননা, সিদ্ধার্থ রায়ের হাতে সরকারী মধ্যভাণ্ড। অ.প.তঃ আটশো প্রাইভেট বাস পারমিট, কোটি কোটি টাকার বাংলাদেশের শরণার্থীদের ব্যাপারে কন্ট্রোল এবং আরো কত কিছন্ন।

শুধু এ্যাড হক কমিটিতে সংখ্যাধিকাই নয়। সিদ্ধার্থ রায় এই (শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

অবশেষে দর্পণের আশঙ্কা ঘটনার পর্যবসিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলার সম্ভবতঃ প্রমুখ আলো-লনের উপর ইন্দিরা সরকারের ফ্যাসিবাদী কালোহাত সরাসরি নেমে এসেছে। নিয়মানুযায়িত প্রবর্তনের অফিসে বৃটিশ সরকারের প্রকৃত বৈতনভোগী আমলা রাজ্যপাল ডায়াস রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির বারোজন প্রথম সারির নেতাকে সংবিধানের ৩১১(২) ধারায় আত্ম-পক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়ে রাতারাতি বরখাস্ত করেছেন।

এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী হামলার মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের দু লক্ষ সরকারী কর্মচারী ও লক্ষ লক্ষ অধা-সরকারী ও বেসরকারী এবং বেসরকারী শ্রমিক কর্মচারী যেভাবে বিদ্রোহগীতের রুখে দাঁড়িয়েছেন শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা

অভূতপূর্ব। ঐ দিক্‌তে বরখাস্ত আদেশ জারী হওয়ার পরদিন মঙ্গলবার রাজভবনের পূর্বদিকের ফটকে লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী জমা-য়েত হয়ে শ্রীডায়াসের আক্রমণ প্রতি-হত করার জন্য বজ্রকঠিন প্রতি-প্রতি গ্রহণ করেন। প্রভাতী সংবাদ-পত্রে ঐ ঘৃণিত ছাঁটাই আদেশ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের প্রিয় নেতাদের উপর এই হামলা স্তম্ভ করার জন্য তৈরী হন। সারাদিন কল-কাতার কোন সরকারী অফিসে কোন কাজ হয় না। রাইটার্স বিল্ডিং, নিউ সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য অফিসে এমনকি খেদ রাজ-ভবন ও লালবাজারেও কর্মবিরতি চলে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডকে এবং সমস্ত সরকারী কর্মসূচীকে পদদলিত করে দু লক্ষ সরকারী কর্মচারী কলকাতা ও অন্যান্য জেলা-শহরে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠেন।

সন্ধ্যায় সর্বশ্রী কে জি বসু, দীপেন ঘোষ, সমীর মস্তাফি, কেষ্ট ঘোষ, সুশীল ঘোষ প্রভৃতি সাতজননের এক প্রতিনিধিদল রাজ-ভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে এক স্মারক-লিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে রাজ্যপালের আচরণকে খিঙ্করজ্ঞাপন করে বলা হয়ঃ শ্রীডায়াস, আপনি অত্যন্ত নিলক্ষভাবে রাজ্যপালের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। এই আচরণের ফলে আপনি সরকারী কর্মচারীদের শ্রমিক-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবার ন্যায্য অধিকারের উপর বেআইনী হস্তক্ষেপ করেছেন। এছাড়া, এটা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের (শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধার্থ রায় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র
দপ্তরের মন্ত্রী কে সি পণ্ডের বিরূপ মন্তব্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গের সিদ্ধার্থশংকর রায়কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী কে সি পণ্ড "একজন পচা ও নীতিহীন নশূন্য মানুষ" বলে অভিহিত করেছেন বলে জানা গিয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের ব্যাপার নিয়ে কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী অমিয় কিসকুর নেতৃত্বে এক প্রতি-নিধিদল কে সি পণ্ডের কাছে গেলে পণ্ড সাহেব উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

দর্পণের পাঠকদের অবদিত নয় যে, কে সি পণ্ড স্পষ্টভাবে সিদ্ধার্থ রায়কে বলে দিয়েছেন, পশ্চিম বঙ্গের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মারফৎ যেতে হবে। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়া চলবে না। তখন থেকেই দপ্তরের সম্পর্ক তিক্ত। সেই তিক্ততা আরো বেড়েছে একটি ঘটনা নিয়ে। ঘটনার কথা

পণ্ড সাহেবই প্রতিনিধিদলকে বলেছেন। সেটি হচ্ছে, পশ্চিম বঙ্গের আইন ও শৃংখলার উন্নয়নে তিনি নকশালীদের সঙ্গেও আলোচনা করছেন বলে পণ্ডসাহেবের বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর সিদ্ধার্থ রায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই বিবৃতির প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এতে কাজের অসুবিধে হবে এবং আইন (শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

সি পি আই আরও কংগ্রেসমুখী হচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে সি পি আইয়ের রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। এই রাজ্যে সি পি আইয়ের কেন্দ্রীয় লাইনের অর্থাৎ ঘাট খরচা দিয়ে নব কংগ্রেসের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধার নীতির বিরুদ্ধে বেশ বড় একটা অংশ রয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে স্বয়ং ভবানী সেন জেলা ও রাজ্য সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত থেকে এসব বিরোধী সভ্যরা যাতে প্রবল হতে না পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধারণা যে নব কংগ্রেসের সঙ্গে খোলাখুলি আঁতাত গড়ে না তুলতে পারলে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই-এর কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই তারা মৃদুতম কংগ্রেস বিরোধী হলেও সি পি আই-এর কর্মপরিষদগুলিতে তাঁদের স্থান দিতে চাইছেন না। নব কংগ্রেসের উচ্চতম কম্যান্ড সি পি আই-

এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গেও কেরালার মত তাদের দলকে খোলাখুলি নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে গিয়ে সব কাজে সাহায্য দিতে হবে। সি পি আই-এর নতুনভাবে কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার কাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার জন্যে নব কংগ্রেস সি পি আই নেতৃত্বকে ব্যবহার করছে। এভাবেই নব কংগ্রেস-বিরোধী বমপন্থী জোট গড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব বলে তারা মনে করছেন।

সুতরাং সি পি আই-এর সর্বস্তরে কংগ্রেসী কুশলনের মৃদুতম সমালোচনাকেও আর স্থান দেওয়া হবে না বলে উচ্চতম সি পি আই নেতারা সিদ্ধান্ত করেছেন।

সি পি আইয়ের কলকাতা জেলা পরিষদের সহ-সম্পাদক নন্দ গোপাল ভট্টাচার্য, কাউন্সিলার

পল্টন দাশগুপ্ত, যুবসংঘ নেতা গরুদাশ দাশগুপ্ত, মানিকতলা ইউনিটের শিবু বর্ধন এরা কেউই জেলা পরিষদে নির্বাচিত হতে পারেন নি। এদের অপরাধ যে এরা সম্মেলনে নব কংগ্রেসের একচেটিয়া পুঞ্জ ও সামন্ত শোষণের পক্ষপাতী নীতিগুলির বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন।

রাজ্য সম্মেলনেও গীতা মুখার্জী, কানাই ভৌমিক সুকুমার গুপ্ত প্রভৃতি নেতাদের রাজ্য পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীতে না নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই ভাবে জেলাপরিষদগুলির সদস্য সংখ্যাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গ বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে সি পি আইয়ের সর্বশেষ শক্ত ঘাঁটি মেদিনীপুরে সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নব কংগ্রেসের লেজেন্ড-বাস্তি করার নীতির বিরুদ্ধে, অপর ঘাঁটি মালদহ জেলাপরিষদ ইতিমধ্যেই ভঙ্গ প্রাপ্ত। কোন কোন সদস্য বসছেন যে তবে আর পাঁচি রাখারই দরকার কি, কুমারমঙ্গলম, চন্দ্রজিত বাদবের মত দলশুদ্ধ নব কংগ্রেসে যোগ দিলেই তো ভাল হয়।

প্রতিবাদ বিক্ষোভ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সম্ভবত আন্দোলনের উপর একটি সুপারিকম্পিত আক্রমণ। যদিও ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বহুবার আশ্বাস দিয়েছেন যে, সংবিধানের ৩১১(২) ধারাটি সরকারী কর্মচারীদের শ্রমিক-আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হবে না, তথাপি আপনাদের এই আচরণ ঐ আশ্বাসগুলিকে তামাশায় পরিণত করেছে।

স্মারকসিপিতে শ্রীভাসকে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক শ্রেণী ইতিপূর্বে কখনই এই ধরনের প্রত্যাশামূলক ঘৃণা আক্রমণকে মেনে নেয়নি এবং এবারও মেনে নেবে না। যদি অবিলম্বে এই ন্যায়জনক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া না হয়, তাহলে সরকারী কর্মচারীরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবে এবং সকল সরকারী কাজকর্ম ভেঙ্গে পড়বে।

প্রকাশ, শ্রীভাস সরকারী কর্মচারী প্রতিনিধিবৃন্দকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, সরকারী কাজকর্ম সদৃশভাবে পরিচালনা জনাই তাঁকে ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। এবং কোনরূপ প্রত্যাশাধার বশবর্তী হয়ে তিনি নাকি ঐ ব্যবস্থা নেননি। এমনকি সরকারী কর্মচারীদের শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের অধিকার খর্ব করার ইচ্ছাও নাকি তাঁর নেই। যাই হোক, সরকারী কর্মচারী প্রতিনিধিদল তাঁর কোন যুক্তিতেই আশ্বস্ত হন না এবং জানিয়ে দেন যে, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী ও বন্যাতরঙ্গের সেবার জন্য বর্তমানে জরুরী ভিত্তিতে যে-সরকারী কার্য চালান হচ্ছে, তা অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে যদি না তাঁদের নেতৃত্বের উপর থেকে এই বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

প্রকাশ, শ্রীভাস যদিও দু'দু'দু'র রাজ্যে সাংবাদিকদের কাছে বৃক ফুলিয়ে বলেছিলেন এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তের আর কোন নড়চড় হবে না, কিন্তু অপরাহ্নে রাজ্যভরম সামনে লক্ষ নরনারীর ঐ উত্তাল

বিক্ষোভ দেখে একটু ঘাবড়ে যান। এছাড়া, প্রতিনিধিদলের অনমনীয় মনোভাব দেখে শেষে বলতে বাধ্য হন : “আচ্ছা, ব্যাপারটী আমি আর একবার ভেবে দেখব।”

দার্জিলিং মেল নিয়ে কর্তৃপক্ষের রহস্য

রেল কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালির একটি নমুনা দিচ্ছি। তাদের কাছে এটি সাধারণ ঘটনা হলেও কর্মচারীদের কাছে মোটেই সাধারণ নয়। তাদের স্বার্থ ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে জড়িত। দার্জিলিং মেল, যেটি শিয়ালদহ থেকে ছাড়ে এবং যার শেষ সীমা দার্জিলিং সেটি কিন্তু আদৌ পরোপদার দার্জিলিং মেল নয়। সাধারণ লোকে জানে না এবং জানার সুযোগও নেই। শিয়ালদহ থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পর্যন্ত এটি দার্জিলিং মেল, তারপর ন্যারো গেজের ছোট রেল। যেটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাত্রা সেটি আর মেল নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেন। যদিও লাল মার্কা গাড়ি জোড়া থাকে, তাতে ডাক যাত্রা এবং আনন্দপাটিক হারে ভাড়াও বেশি, তবু এটি মেল নয়।

রেল কর্তৃপক্ষ এই রহস্য সৃষ্টি করেছেন কর্মচারীদের ন্যায় পাওনা থেকে বঞ্চিত করার জন্যে। মেল ট্রেন নাম দিলে এ ক্লাশ গার্ড দিতে হয়, বি ক্লাশ সিনিয়র গার্ডরা প্রমোশন পাচ্ছেন না। এই অবিচার দূর করা দরকার। আমরা অবাক হই দার্জিলিং যাবে না যে ট্রেনে সেটি কি করে দার্জিলিং মেল হয়? তাহলে কিন্তু জলপাইগুড়ি মেল বলা হোক। তা যদি না হয় তাহলে শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত একই শ্রেণীভুক্ত হোক, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দার্জিলিং মেল। এই প্রবণতা, শঠতার প্রয়োজন কি?

পহু ও সিদ্ধার্থ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও শৃঙ্খলার উন্নয়নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নিয়ে আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী সেই কথা কে সি পক্ষকে জানান। এইভাবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে “চরুলি” কাটার কে সি পক্ষ দারুণ চটে যান এবং তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেন অমিয় কিসকুর কাছে। সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে পক্ষ সাহেব বলেন, “হি ইজ এ রটনম্যান, আনস্ক্রুপল্যাস পার্সন।”

ইতিমধ্যে আরো জানা গিয়েছে, পক্ষ সাহেব পশ্চিম বঙ্গের রাজ্য পাল ডায়ালকে আরো স্বাধীনভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শমিষ্ঠা বর্মণ

সুপারিচিতা গীটার শিল্পী।

গীটার শেখাচ্ছেন।

২৪-এ, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ,

(লিবার্টি সিনেমার কাছে),

কলিকাতা-৬

সিদ্ধার্থ রায়ের জয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কমিটিতে অধ্যাপক দেবী চ্যাটার্জী, যুব কংগ্রেসের প্রিয় মনুসি আর ছাত্র পরিষদের সর্বতম মুখার্জীকেও চুকিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের অজানা নয়, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আবদুস সাত্তার দর্বল চরিত্রের মানদণ্ড। অন্যদিকে যুব কংগ্রেস আর ছাত্র পরিষদের “মার মার কাট কাট” ভাবের সঙ্গে দেবী চ্যাটার্জীর সমঝোতা। পিছনে থাকবে সিদ্ধার্থ শংকরের সরকারী ক্ষমতা। সবটা মিলিয়ে ওরাই হলেন এখন পশ্চিম বঙ্গের নব কংগ্রেসীদের কণ্ঠধার। বিজয় নাহার তরুণকান্তিরা কি করবেন তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে।

সিদ্ধার্থ রায়েরা শব্দ একটি ক্ষেত্রে আপোষ করেছেন। সেটি হচ্ছে সাত্তার সাহেবকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করা। এছাড়া ওরা বিজয় নাহারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

করে এ্যাড হক কমিটি বানিয়েছেন। বিজয় নাহার তরুণকান্তির দলের আটজন চাই নয়াদিঙ্গী গিয়েছিলেন এ্যাড হক কমিটিতে তাঁদের সংখ্যাধিক্য করার জন্যে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। এরা চেষ্টা করেছিলেন যুব কংগ্রেসের প্রিয় মনুসিকে কমিটি থেকে বাদ দিতে। সফল হননি। প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত বিজয় নাহার তরুণকান্তির বারোজন এবং সিদ্ধার্থ রায়-দেবী চ্যাটার্জীর বারোজনকে কমিটিতে নিয়ে বাকী ছয়টি সদস্যপদ দিয়েছেন যুব কংগ্রেস আর ছাত্র পরিষদকে। যুব কংগ্রেস আর ছাত্র পরিষদ তো সিদ্ধার্থ রায়ের সমর্থক। তাই তুরূপের তাস এখন ওঁদেরই হাতে।

তবে সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে বিজয় নাহার-তরুণকান্তির দল নয়াদিঙ্গীতে একটা কাজ করে এসেছেন। সেটি হলো, নয়াদিঙ্গীর প্রতিটি নব কংগ্রেস নেতার কাছে ওঁরা সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে ‘ক্যানডাস’ করে এসেছেন।

হোটেল ও বার

কর্মচারী ইউনিয়নের

বার্ষিক সম্মেলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি মনোহরপুকুর ময়দানে কলকাতা হোটেল এ্যাড বার এম-প্লয়িজ ইউনিয়নের প্রকাশ্য বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভেই পুলিশ, সি আর পি, মিলিটারী প্রতিক্রিয়াশীল সরকার স্ট্রট দালালদের আক্রমণে নিহত সহকর্মী অরুণ রায় এবং সাদিক আলির উদ্দেশ্যে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। তারপর বার্ষিক কার্যবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সম্পাদক অনিরুদ্ধ সিং। সম্মেলনের প্রধান বক্তা সিতাংশু দাশ (ইউনিয়নের সহ-সভাপতি) তাঁর সমীক্ষা ভাষণে সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী প্রশাসনকে তাঁর ভাষণ সমালোচনা করেন। শ্রমিক আন্দোলনকে মেকী মার্কসবাদীরা কিভাবে বিপথগামী করে তুলছে, তার অসংখ্য নজীর তারা তুলে ধরেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম কোন পর্যায়ে তারও ব্যাখ্যা করেন। তাছাড়া বঙ্গদ্রাম ও গোপাল দে তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে সরকারের খাদ্যনীতি এবং বস্ত্র ব্যবস্থার তাঁর সমালোচনা করেন।

সবশেষে, আগামী বছরের কার্যপরিচালনার জন্য সতেরো জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয় এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১২ জন ছাঁটাই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বস্তু বলোছিলেন যে, তাহলে অন্য রাজ্য থেকে ত ভোটার এনে ভোট দেওয়া ভাল হয়।

আসল কথা এই সরকার কর্মচারীদের নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়েছেন। পাঁচটা সংগঠনের চেষ্টা হয়েছে কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রভাব থেকে কর্মচারীদের সরিয়ে আনার সুবিধে হয় নি।

শেষ পর্যন্ত বরখাস্তের সিদ্ধান্ত এবং আদেশ। দেখে মনে হয় উনিশশ বাহাসের সালে ফেরারারী-

মাঠে নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ। এই আদেশ বলবৎ রাখতে পারলে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন কাজ কর্মের ওপর সরকারী খবরদারী বাড়ানো যাবে বলে সরকারের আশা।

সরকার আশান্বিত এই বিশ্বাসে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও তাদের প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নের মার্কসবাদীদের সঙ্গে বরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন যুক্ত আন্দোলন করবে না। অন্যান্য দলগুলির এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়নের অচরণ দেখে মনে হয় সরকারী বিশ্বাসের যথেষ্ট ভিত্তি আছে।

কর্পোরেশনের কমিশনারের পদ নিয়ে জল ধোলা

(দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি)

কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনারের চেয়ারটার উপরে সকলেই বলে শানির দৃষ্টি আছে। কিন্তু রাহ-কেতুদের দৃষ্টিও ওদিকে কম নয়। চেয়ারটার তনুখা না হোক, ক্ষমতা এবং পদমর্যাদা বিলক্ষণ লোভনীয়।

বর্তমান কমিশনার শ্রীমজুমদার বিপ্রামের প্রয়োজনে আগামী পাঁচই অক্টোবর থেকে দশ সপ্তাহের ছুটি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে যেই দরখাস্ত করলেন অমনি সম্ভাবিত শূন্য ঐ আসনটির জন্য জোর তদ্বির শুরু হয়ে গেল। রাজ্য সরকার নিয়ম-মারফক এ বিষয়ে কর্পোরেশনের অভিমত জানতে চেয়ে চিঠি পাঠালেন কারণ 'কলকাতা পৌর আইনের একুশ (এক) ধারা অনুসারে কমিশনারের ছুটি মঞ্জুর করার মালিক কর্পোরেশন, যদিও কমিশনারের নিয়োগকর্তা এখন রাজ্য সরকার। কিন্তু খবরই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে দশ সপ্তাহ আগে রাজ্য সরকারের চিঠি মেররের কাছে এসে গেলেও আজ পর্যন্ত তা কর্পোরেশন-সভার আলোচ্যসূচীতে (এজেন্ডা) স্থান পায়নি এবং স্বভাবতই, কর্পোরেশন সে বিষয়ে তার অভিমত গঠন বা জ্ঞাপন করতে পারেনি।

করিংকর্মা তালেবর

এ সংসারে এক ধরনের লোক আছে যারা নাকি ডালে-ডালে

হাঁটে; আর এক ধরনের লোক আবার এদের ওপরে যায়—তারা হাঁটে পাতায় পাতায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর তালেবর হচ্ছেন কলকাতা কর্পোরেশনের করিংকর্মা। দ্বিতীয় ডেপুটি শম্ভুনাথ বসু। পদত্বের নামে খোঁজ নেই, আগেই মাছ ধরার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন শম্ভুনাথ বসু। সংবাদে প্রকাশ কমিশনার শ্রীমজুমদারের দশ সপ্তাহ কাল ছুটির সময়ে অস্থায়ী কমিশনার-নিয়োগের জন্য মেয়র নাকি শম্ভুনাথ বসুর নাম প্রস্তাব করে একটি সুপারিশপত্র রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। কমিশনারের নিয়োগ যখন কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তখন এ ব্যাপারে মেয়রের পক্ষে কোন সুপারিশ অবান্তর। তবে তা সত্ত্বেও তিনি যদি তা করেন তা হলে রাজ্য সরকার তাকে কতখানি মূল্য দেন তা দেখবার জন্য আমরা অপেক্ষা করব।

এড়িয়ে যাওয়া

কিন্তু মেয়রের পক্ষে তার চেয়ে জরুরী ছিল কর্পোরেশনের সভায় এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা। রাজ্য সরকারের চিঠি পাওয়ার পর দাঁটি শ্রবণের অর্থাৎ বর্তমান মাসের তিন এবং দশ তারিখে কর্পোরেশনের সভা হতে পারত কিন্তু হয়নি। কেন সভা ডাকা হয়নি সেটি জিজ্ঞাস্য। বলা হতে পারে যে, মেয়র তখন শহরে ছিলেন

না। কিন্তু ডেপুটি মেয়র তো ছিলেন। তাহলে এ বিষয়ে কর্পোরেশনের অভিমত কেন নেয়া হল না? বোধহয় তা করতে গেলে সুপারিশিত ব্যক্তিটির সুবিধা হত না এবং সেই জন্যই কর্পোরেশনের অভিমত-সাপেক্ষে রাজ্য সরকারকে দিয়ে এই কাজটি করিয়ে নেবার তাগিদ আছেন দই ধরনের শ্যাম-সুন্দর গুপ্ত এবং শম্ভুনাথ বসু। অথচ দশ দিন আগে প্রথম ডেপুটির শূন্য পদটি পূরণের জন্য নাম সুপারিশের বিষয়টি যখন অর্থকর্মিটির সামনে এসেছিল তখন সেই কর্মিটি সেই পদের জন্য কোন অফিসারকেই সুপারিশ না করে বিষয়টি পাবলিক সারভিস কমিশনের ওপরে ছেড়ে দিয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে সেই কর্মিটি শম্ভুনাথ বসুর নাম ঐ পদের জন্য সুপারিশ করতে পারতেন কিন্তু করেননি। সুতরাং অন্তর্ভুক্তি স্বাভাবিক যে, কর্পোরেশনের সামনে এলে শম্ভুনাথ বসুর নাম সুপারিশিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম ছিল বলেই পর পর দুটি সপ্তাহ কর্পোরেশনের সভা না ডেকে দই তালেবর এই কৌশল করেছেন কর্পোরেশনের বিরোধিতাকে এড়ানোর জন্য। প্রজার ছুটির আগে যে সভাটি ডাকা হয়েছে তা স্বর্গত মহম্মদ ইসমাইলের সম্মানার্থে শ্রবণিত হয়ে যাবে। অতএব শম্ভুনাথ বসুর কেল্লা ফতে।

কিন্তু ইতিমধ্যে কাউন্সিলার প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে একটি মোশান দিয়েছেন এবং ডেপুটি মেয়র শ্রীপাণ্ডালাল দাশ সেটিকে কর্পোরেশনের আগামী সভার এজেন্ডা ভুক্ত করেছেন। অতএব বিষয়টি কর্পোরেশনের বিচার্যধীন। এ অবস্থায় কমিশনার পদটির কী হয় সবাই সাগ্রহে লক্ষ্য করবে। একে কমিশনারের ছুটিই মঞ্জুর হবে না। কারণ মঞ্জুর-কর্তা কর্পোরেশনের সভাই বসবে না ছুটির আগে। দ্বিতীয়ত কমিশনার ছুটি নিলে রাজ্য সরকার কাকে অস্থায়ী কমিশনার নিযুক্ত করবেন সে বিষয়ে মেয়রের কোন সুপারিশ করার অধিকার নেই।

এই প্রসঙ্গে কর্পোরেশনের বহুদূপী শম্ভুনাথ বসু মহাশয়ের সর্বশেষ হালচাল খুব লক্ষণীয়। একদা গোবিন্দ দাস এই ভদ্রলোক কিসের তাগিদে অথবা শ্যামদাস হয়েছেন তা অচিরেই জানা যাবে।

কলকাতার নাগরিকদের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে মনে হয়। এই প্রায়শ্চকার ও দুর্গম জঞ্জাল-নগরী ইতিমধ্যেই দুর্দৃষ্টিতার কারণ হয়ে উঠেছে যার জন্য এই পৌর তথা চৌর প্রতিষ্ঠানটির দান সামান্য নয়। তার উপরে এই ধরনের আশ্র-সর্বস্ব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যদি নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দখল করে বসে তাহলে নাগরিকদের দুর্গতি যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা অন্তর্মান করাও দুঃসাধ্য।

ট্রান্সপোর্ট কমিশনার আর ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত থামাচাপা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

একটি গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশ্চর্যজনক নীরবতা অবলম্বন করে আছেন। এই দুর্নীতির অভিযোগে জড়িত আছেন বর্তমান ট্রান্সপোর্ট কমিশনার আর ঘোষ। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার একটি বৈঠকে ওর বিরুদ্ধে নানা গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে আলোচনার পর ভিজিল্যান্স কমিশনকে দিয়ে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তদন্ত যখন শুরু হবে তখন ঘোষ মশায় হাইকোর্টে আবেদন করে তদন্ত মূলত্ববী করার জন্য ইনজাংশন পান। এরপর প্রায় এক বছর শেষ হতে চলেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ইনজাংশন নাকচ করার জন্য আদালতে কোন আবেদন করা হয়নি। রাইটার্স বিল্ডিং-এর ওপকৃতলায় বলাবলি চলছে, যেহেতু ঘোষ মশায় নব কংগ্রেসীদের বিম্বস্তজন্য সেজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে চান না। উল্লেখযোগ্য, কুখ্যাত কংগ্রেস-লীগ সরকার আর, ঘোষকে ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের

পদে বসিয়েছিলেন এবং এখন ওরই অধীনে প্রায় আটশো প্রাইভেট বাস পারমিট দেওয়া হচ্ছে। পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন, বাস পারমিট দেবার ব্যবস্থা কত লাভজনক।

প্রকৃতপক্ষে, আর, ঘোষের তদন্তটি থামাচাপা দেবার জন্যে কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভা চেষ্টা করে গিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, ভূতপূর্ব উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় নাহার তদন্ত বন্ধ করার জন্যে কেন্দ্রের কাছে চিঠিও দিয়েছিলেন। তবু কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হচ্ছেন না। বলছেন, ওকে রিটার্ন করার কোনো হুক।

কিন্তু উর্ধ্বতন সরকারী মহল বলছেন, যার বিরুদ্ধে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তাকে রিটার্ন করতে দেওয়া কোন শাস্তিই নয় বরং পদস্কার। দ্বিতীয়তঃ আর, ঘোষ হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশন পেলেও রাজ্য সরকার থেকে ইনজাংশন নাকচ করানোর জন্যে আবেদন করা হচ্ছে না কেন? এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা।

সংবাদপত্র মালিকেরা একজোট হতে পারেনি যে যার মুরুবি পাকড়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সংবাদপত্রের মালিকানা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাবিত বিলটির বিরুদ্ধে সংবাদপত্র মালিকরা এখনও একজোট হতে পারেননি বলে দর্পণ বিভিন্নসূত্রে সংবাদ পড়েছে। মোটামুটিভাবে মালিকরা এখন 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণ করছেন। একদিকে বৃহৎ শিল্পপতিদের কাগজগুলো তৈরী হচ্ছে লোকসভার সদস্যদের প্রভাবিত করতে এবং সুপ্রীম কোর্টে মামলা করার জন্যে স্টেটসম্যানের পালকিওয়ালা সাহেব তৈরী হচ্ছেন। অন্যদিকে হিন্দু, অমৃতবাজার, এবং অন্যান্য কয়েকটি গোষ্ঠী নরাদিক্রীর প্রভাবশালী মহলে নিভুতে তাম্বর করে যাচ্ছেন। মাদ্রাজের হিন্দু পরিবার মালিকরা ধরেছেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ রায়কে। 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠী ধরেছেন ভূতপূর্ব তথ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ মন্ত্রী আই কে গজরালকে। গজরাল সাহেব যখন তথ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনই আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ছিল। অমৃতবাজার গোষ্ঠী ধরেছেন বর্তমান তথ্যমন্ত্রী নন্দিনী সংপাথ এবং আরো কয়েকজনকে। ইতিমধ্যেই নন্দিনী সংপাথ মালিকদের পক্ষে একটি বিবৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু সেই

বিবৃতিতে মালিকরা পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেননি। কেননা, কিছুদিন আগে ইন্দিরা গান্ধীর সংবাদপত্র ন্যাশনাল হেরাল্ডে নন্দিনী সংপাথকে সমালোচনা করে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে এবং নন্দিনী রাজনীতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, নন্দিনীকে আবার উড়িয়া রাজনীতিতে ফিরে যেতে বলা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা দরকার। সংবাদপত্র শিল্প সম্পর্কে কিন্তু কলকাতার সংবাদপত্রগুলো কোনো সম্পাদকীয় মন্তব্য করেনি।

যারা পৃথিবীর যেকোনো সমস্যার ওপরে মন্তব্য করে থাকে তারা কিন্তু নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে একেবারে নীরব হয়ে আছে। ঘটনাটি আশ্চর্যজনক নয় কি?

পূর্বদিগন্ত প্রবন্ধ-সংকলন
আর প্রকাশিত হবে না
এখন থেকে প্রকাশিত হবে
পূর্বতরঙ্গ
রেজিস্টার্ড পাব্লিক
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পত্রিকা
প্রথম ও বিশেষ সংখ্যা ২২শে
সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে

চিড়িয়াঘোড় অঞ্চলে সি আর পির অত্যাচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উত্তর কলকাতার কাশীপুর এবং চিৎপুর্ন থানার অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ এলাকা চিড়িয়াঘোড় থেকে গত আঠাশে আগস্ট বিকেল চারটের সময় সি আর পি বাহিনী হঠাৎ বাড়ী বাড়ী তল্লাসী চালিয়ে চল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করে। সেখানে ইদানীং এমন কোনই উদ্বেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটেইনি, যাতে সি আর পির এই আচমকা তাণ্ডব শব্দ হতে পারে।

সি আর পি কর্তৃক ধৃত চল্লিশ জনের মধ্যে কয়েকজন মহিলা ও কিশোরী ছিলেন। তাছাড়া দমদম রোডের উপর সি পি এমের অফিসে ঢুকেও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে, দই নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অধ্যাপক দীপেন ঘোষকেও গুলি করার জন্য সি আর পি রাইফেল তাক করেছিল।

এই তাণ্ডব দেখে এলাকার সব মানবই আশ্চর্য হয়ে যান। কেন

এমন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে জানতে চাইলে পুলিশ চোখ রাগিয়ে তার প্রত্যুত্তরে বলে : "হাম লোগকো উপর অর্ডার হয়।"

পুলিশ ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারেনি বলে সেইদিনই কয়েকজনকে বেদম প্রহার দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। একমাত্র কিছু মহিলা সমেত চিৎপুর্ন থানার প্রায় দশজনকে ছাড়া হয় নি। তিরিশে আগস্ট তাদের কোর্টে উপস্থিত করা হলে ঐ দশ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনা হয় একমাত্র অভিযোগ : "পুলিশের কাজে এরা বাধা দিয়েছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এই ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের কর্মীও ছিলেন।

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, সেদিনের এই সব পাশবিক ঘটনার নাটের গুরু ছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ সার্জেন্ট মিষ্টার ঠকুর।

মতামত

এস ইউ সির পোষ্টার প্রসঙ্গে

হঠাৎ দেখা যাচ্ছে চম্পা পরগণা জেলার জনগণের খানার বিভিন্ন এলাকায় এস ইউ সি বেশ কিছু পোষ্টার লাগিয়েছে। পোষ্টারে লেখা হয়েছে— বীরভূম এলাকায় নাকি সি পি এম নব কংগ্রেস, পলিশ মিলিটারীর সাহায্যে নকশালী ছন্দবেশে তাদের সংগঠনকে শেষ করে দিচ্ছে।

আজ যে সি পি এমের নামে এই অপপ্রচার করা হচ্ছে তারা কি জানে যে এই পার্টির নেতা, কর্মী এবং সমর্থকদের বাংলার মাটি থেকে মুছে ফেলার জন্য কি জঘন্য ষড়যন্ত্র চলেছে। এর তো একটি মাত্রই কারণ, তা হল বামপন্থী পার্টি বলতে এই একটি মাত্রই পার্টি আছে বাংলাদেশে, যে পার্টি বাংলা দেশের সমস্ত গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বে। তাইতো তার এত সমর্থক। শ-পাটকে কর্মীকে হত্যা করার পরও এই পার্টি আরো শক্তিশালী হচ্ছে, আরো জংগী হয়ে উঠছে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মেহনতী মানুষের একমাত্র প্রিয় সংগঠনকে শেষ করার জন্য নকশালী ছন্দবেশে শাসক শ্রেণী থেকে শরদা করে মেকী বামপন্থীরাও চেষ্টার ঘন্টি করছে না। আর সেই পার্টির বিরুদ্ধে এস ইউ সির যে একথা বলে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

বীরভূমের মাত্র কয়েকটি সীমান্ত এলাকায় এস ইউ সির সংগঠন আছে। আর সারা বীরভূম জেলাতেই সি পি এমের জংগী সংগঠন বর্তমান। সেখানে পলিশ, মিলিটারী, সি আর পি শাসক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত গন্ডাদের সাহায্যে কুসংস্কারের নামে প্রতিদিনই সি পি এমের অসংখ্য কর্মীকে মিথ্যা মামলার জড়িয়ে জেল হাজতে পড়িয়ে রাখছে, (এক্ষেত্রে এস ইউ সিরের দৃঢ় চারজন কর্মীকে ধরেছে না যে তা নয়) সি পি এম থেকে তখনতো এস ইউ সিরের নামে মিথ্যা প্রচার করা হয়নি। বরং সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু তথাকথিত শান্তি বৈঠকে বারোবারে বীরভূমের কথা তুলেছেন। এমন কি

সর্বোচ্চ ব্যানাজীর বক্তব্যকেও সমর্থন করেছেন। সর্বোচ্চবাবু দলের যদি সং সাহস থাকে তাহলে ষেখট নির্ভর-যোগ্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করুন সি পি এম কর্মীরা কোথাও ছন্দবেশে তাদের কর্মীদের ওপর হামলা করেছে।

এস ইউ সি নেতাদের এখনো চিন্তা করার ষেখট অবকাশ আছে যে তাদের এই অস্বাভাবিক সি পি এম বিরোধিতার জন্য তাদের সংগঠন ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে কি না? একথা কি সত্য নয় মাত্র কয়েকদিন আগে জয়নগরে তাদের জনৈক নেতৃস্থানীয় নির্ভরযোগ্য পার্টি সংগঠক তাদের এই ভুল লাইনের জন্য আরসেনিক খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন? কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন—যখন এলাকার সাধারণ মানুষ জানতে চাইল এবং পার্টি-আয়োজিত

এম এল দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

সম্প্রতি এই খবরটি প্রায় সব কাগজেই দেখা গেছে—“সি পি আই (এম এল) দলে ভাঙন। অসীম চ্যাটার্জী (কাকা) ও সন্তোষ রায়ের সমর্থক কেন্দ্রীয় কমিটিতে অধিক থাকার দলের সদস্য পদ থেকে চারদ্বাবকে বহিস্কার।” কান্দু সান্যালের প্রস্তাবের আগেও তার সঙ্গে চারদ্বাব মজুমদারের মত-পার্থক্যের সংবাদ বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ কাগজগুলিতেই কিছুদিন পরে প্রকাশিত হয় যে, কান্দু সান্যাল স্বয়ং বলেছেন চারদ্বাবই তাঁদের অবিসংবাদিত নেতা। সত্যনারায়ণ সিংকে দল থেকে বহিস্কারের কথা যে কাগজগুলিতে বেরিয়েছে সেখানেই দেখা গেছে তিনি নাকি বিহার কমিটির সম্পাদক, এবার তিনিই

শোকসভায় দলের জনৈক সদস্য কর্মী এই অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে নেতাদের কাছে চ্যালেঞ্জ জানাল যখন অসংখ্য কর্মী প্রশ্ন তুলল এতদিনের পরীক্ষিত কর্মী, অনেক পোড় খাওয়া, মার্কসবাদ সম্পর্কে বার নাকি ষেখট পড়াশুনা ছিল কেন তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন? কর্মীরা আরো দাবী করল এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হোক, দেশের মানুষের কাছে সঠিক তথ্য দেওয়া হোক।

জয়নগর এলাকার এস ইউ সি পার্টির জনৈক নেতৃস্থানীয় কর্মী কয়েকদিন আগে নব কংগ্রেসের খাতার নাম লিখিয়েছেন। এই ব্যক্তিটি এতদূর মানবের কাছে খানার টাউট বলেই পরিচিত ছিলেন। বিগত কয়েক বছরের এস ইউ সির অসংখ্য কলঙ্কজনক ঘটনাকে পলিশের দালালী করে তিনি আড়াল করে রেখেছিলেন। এখন তিনি বেরিয়ে এসে বলছেন—এস ইউ সি পার্টিতে জন্ম করার মত ষেখট তথ্য তার হাতে আছে। এবং কিছুদিনের মধ্যেই আরো অনেকে দলত্যাগ করবে।

অরবিন্দ পৈলান

ছাত্রের ওপর পুলিশি অত্যাচার

গত তেরোই জুলাই হাওড়া অঞ্চলের নিধিরাম মাঝি লেন ও রাজবল্লভ সাহা লেনের সংযোগস্থল দিয়ে ষাট্টিলাই বন্দুর বাড়ী পড়াশুনোর কাজেই। বাস থেকে নেমেই রাস্তা ফাঁকা মনে হল। তবু সাহসে ভর করে পা বাড়াল। হঠাৎ এক মার বয়েসী ভদ্রলোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল; আমি কোথায় যাব, আমার ভাল নাম কি, খারাপ নাম কি? ভয়ে ভয়ে সব কথাই জবাব দিলাম। এর পর ভদ্রলোক আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল একগাদা সি আর পির মধ্যে। সেখানে দাঁড়ানো দারোগা আমি কি করি জিজ্ঞেস করতই আমি যখন বজ্রাম প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, তখনই তিনি ভীষণ রেগে উঠে বলেন, “এসব নকশালী আছে।” আমার তখন কাঁদাকাঁদো অবস্থা।

তারপর শূন্য হোল মারখোর, লাথি, বন্দুকের গুলো। আমাকে নিয়ে যাওয়া হোল গোপাল ব্যানাজী লেনের অনেক ভিতরে। তারপর এক সাদা পোষাকের লোক গম্ভীর স্বরে আমাকে আদেশ করল : যা এই লাল ব্যান্ডাটা নিয়ে পাঁচিলের পাশে গিয়ে দাঁড়া; এই কথা বলেই একটা লালবান্ডা আমার হাতে গুঁজে দিতে চাইল। আমি

আপত্তি করলাম। ওরা জোর করে লাগল।

আমার মনে পড়ল বেলেঘাটা, ভবানী দত্ত লেনের ঘটনাগুলো। ভাবলাম, আগামীকাল খবর কাগজের পাতায় বেরোবে : “Alleged Naxaliet shot dead” আসল ঘটনার খবর কেউ জানবে না।

ইতিমধ্যেই আমার বন্ধুর মা কিভাবে যেন খবর পেয়ে পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোককে নিয়ে এসে হাজির হলেন। বন্ধুর মা আমায় এসে জড়িয়ে ধরলেন। ভদ্রলোক পলিশের সঙ্গে কি কথা বলে আমাকে কোন রকমে ছাড়িয়ে নিলেন।

আজ আবার কয়েকমহুতের জন্য মৃত্যু হয়ে ভাবছি; যে সব মানুষ এইভাবে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়েছে, সমাজতান্ত্রী সরকারের “শান্তিরক্ষা বাহিনী” তাদের কি এই ভাবেই বিচার করবে? আমাদের দেশের তথাকথিত দৈনিক পত্রপত্রিকাগুলোই বা কোন মতে ইয়াহিয়া বব্বর অত্যাচারকে প্রতিবাদ জানায়? সরকার কি এই ভাবেই নির্দোষ ছাত্র-শ্রমিকদের নির্বিশেষে খতম করে পশ্চিম বাংলায় শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান?

জনৈক ছাত্র

মুসলিম লীগের প্রতিবাদ

বিশে আগস্ট, উনিশশ একাত্তর তারিখে দপদে প্রকাশিত “মাত্র সাত লক্ষ টাকার লীগের সমর্থন মিলেছিল” শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম হাসানুজ্জামান জানাচ্ছেন যে, বিগত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা অর্থের বিনিময়ে বা অন্য কোন অবৈধ পথে গঠিত হয় নি। বরং তেরো দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দশ পার্টির গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ে জবর দখলীকৃত মসজিদ, ইদগাহ, কবরস্থান প্রভৃতি উদ্ধার, মহসীন ফাউন্ডার অর্থের সম্ভাবহার, মাদ্রাসা বোর্ডের উন্নয়ন প্রভৃতি দাবীর সঙ্গে মুসলিম লীগের মূল দাবী ছিল, মুসলমান, খৃষ্টান, তপশীলি প্রভৃতি অন্তর্গত সম্প্রদায়ের জন্য চাকরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের অন্যান্য শরিক দল মুসলিম লীগের উপরোক্ত দাবীসমূহ মেনে নেওয়ার ফলেই মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় মুসলমান, খৃষ্টান, তপশীলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের চাকরীতে সংরক্ষণের জন্য জে এন তালুকদার কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিশে আগস্ট, উনিশশ একাত্তর তারিখে দপদে প্রকাশিত “মাত্র সাত লক্ষ টাকার লীগের সমর্থন মিলেছিল” শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম হাসানুজ্জামান জানাচ্ছেন যে, বিগত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা অর্থের বিনিময়ে বা অন্য কোন অবৈধ পথে গঠিত হয় নি। বরং তেরো দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দশ পার্টির গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ে জবর দখলীকৃত মসজিদ, ইদগাহ, কবরস্থান প্রভৃতি উদ্ধার, মহসীন ফাউন্ডার অর্থের সম্ভাবহার, মাদ্রাসা বোর্ডের উন্নয়ন প্রভৃতি দাবীর সঙ্গে মুসলিম লীগের মূল দাবী ছিল, মুসলমান, খৃষ্টান, তপশীলি প্রভৃতি অন্তর্গত সম্প্রদায়ের জন্য চাকরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের অন্যান্য শরিক দল মুসলিম লীগের উপরোক্ত দাবীসমূহ মেনে নেওয়ার ফলেই মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় মুসলমান, খৃষ্টান, তপশীলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের চাকরীতে সংরক্ষণের জন্য জে এন তালুকদার কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জনাব হারুন অর রশিদ সাহেব দলত্যাগ করেছিলেন সি পি এম-এর অপকৌশলের খপ্পরে পড়ে।

রক ও মুদ্রণের জন্ম

★

দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী

১৫, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

ফোন : ২৭-৪৫১৫

...একালের গবেষণা গ্রন্থগুলি শুধু পেশারকাটিং ও রেকর্ডের সংকলন। জীদাশগুপ্তের গ্রন্থে তথ্য আছে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ফলে নিজস্ব সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছতে পেরেছেন। অন্তর্গত গ্রন্থগুলির সংগে জীদাশগুপ্তের গ্রন্থের মৌল পার্থক্য এখানেই। আশ্রয় মনে করি, এই মূল্যবান গ্রন্থ সত্ত্বন বিশ্বাসে আত্মশীল হোতে পাঠকদের বিশেষ ভাবে সহায়তা দান করবে। এই গ্রন্থটি সকলেরই অবশ্যই পড়া উচিত।

: বাঙলাদেশ

প্রকৃতি মানুষ বর্ম শোষণ

রবীন্দ্র দাশগুপ্ত

দাম : ৩.৭৫

প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিস্তৃত

পটভূমিতে বর্ম সম্পর্কে

একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা

পরিবেশক

দে বুক স্টোর ১১ বংকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ১২

মুখার্জী ব্রাদার্স ১১ কাজিগাড়া ১১ দমদম ১১ কলকাতা ২৮

জনৈক পাঠক

গণতন্ত্রের মৃত্যু

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য ও শ্রম-শিল্প—এককথায় সম্পদ ও ঐশ্বর্যের বাহনগুলি সবই অবাংগালীর করায়ত্ত এবং এই অবাংগালী সমাজ বামপন্থী মতবাদের ঘোরতর বিরোধী। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে যদি কংগ্রেসবিরোধী কোন কোনা-লিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং সেই মন্ত্রিসভার যদি ইন্ডিগলজির দিক থেকে সমতত্ত্ব ও কর্মসূচী সম্পর্কে মতৈক্যসম্পন্ন দলগুলির একত্র সমাবেশ না ঘটে, তবে সেই মন্ত্রিসভার পক্ষে বেশী দিন টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। অথচ রাজ-নৈতিক দলগুলি ক্রমাগত ক্ষমতা-শূন্য হয়ে যদি “বেকার” দশায় থাকে, তাদের ক্যাডারদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আসতে বাধ্য। কারণ তাদের তো একটা কিছুর করা চাই। অর্থাৎ নিয়মিত নির্বাচিত মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্টারী শাসনের অভাবে যে ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই শূন্যস্থানে ডান্ডাধারী ও ছোরাধারীরা দেখা দিচ্ছে। পশ্চিম-বঙ্গের অরাজক অবস্থার যে প্রতি-কার হচ্ছে না তার অন্যতম কারণও এখানে।

বামপন্থী মতবাদ ও বামপন্থী দলগুলির প্রতি শত্রুতা, অথচ পশ্চিমবঙ্গের বাংগালীর অর্থ-নৈতিক ও বৈষয়িক অবস্থার নিদারুণ অধোগতি—এই দুই মিলে সমগ্র পরিস্থিতিতে ক্রমাগত দরুসহ ও বিস্ফোরণমণ্ডলী করে তুলেছে। ব্যাপক বা গভীর হতাশা থেকে চরম বা উগ্র মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং এই মতবাদ ব্যক্তিহত্যা ও রক্তাক্ত সন্ত্রাসের আত্মঘাতী পথ ধরেছে। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন বামপন্থী বা সাম্যবাদে বিশ্বাসী দলগুলির মধ্যে যে খুনোখুনি সরু হয়ে গেল তার ফলে সমগ্র পরি-স্থিতি অত্যন্ত জটিল, হতবুদ্ধিকর এবং আতঙ্কজনক হয়ে উঠলো। গণ্ডা বদমায়েস ও সমাজবিরোধীরা এই অবস্থার সুযোগ নেওয়ার জন্য এগিয়ে এলো এবং বিভিন্ন মহল—ব্যবসায়ী, চোরাকারকারী ও পুঁজি-এদের কাজে লাগাতে শরু করলো। অপেক্ষণ্ড এবং কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পনেরো কুড়ি বছর বয়সের ছেলে-দের দিয়ে মার্ভার স্কোয়ার্ড তৈরী হল। আর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যব-স্থার এজেন্টরা এই পরিস্থিতির

ঘোলাজলে মৎস্য শিকারের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। ফল দাঁড়ালো শত শত যুবকের ও নির্দোষ মান-বের প্রাণনাশ। সম্ভবতঃ একমাত্র নকশালপন্থী ও সি পি এম পন্থী যুবকদের মধ্যে আটশো ব্যক্তি খুন হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য পার্টির ও পার্টি বাহিন্যে ব্যক্তিদের কথাও যোগ দিতে হবে। অথচ এর শতকরা পঁচানব্বইজনই বাংগালী এবং শেষোক্ত প্রণেীর অন্তর্গত। সুতরাং নির্বিচারে এই বাংগালী হত্যার সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রবিশ-বের সম্পর্ক কোথায়? অথচ পূর্ববঙ্গের বাংগালী আর পশ্চিম বঙ্গের বাংগালী যেন এক অদৃশ্য হীনকারী শক্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। কারণ পূর্ববঙ্গের মত পশ্চিমবঙ্গেও পুঁজিদের গলিতে প্রধানতঃ প্রাণ দিয়েছে বাংগালী ছেলে। কারণ বাংগালী যুবকেরাই গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়েছে।

স্বভাবতঃই গবর্ণমেন্টের পক্ষে বড় সব চেয়ে সাফাই এই যে “ল এ্যান্ড অর্ডার” তাকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু এই “ল এ্যান্ড অর্ডার” রক্ষা করতে গিয়ে বিরোধী-রাজ-নৈতিক শক্তিগুলিকে দমন করার জন্য কংগ্রেসী আমলে পুঁজি ও প্রশাসনের একাংশকে যে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল, আজ সেই দীক্ষা

ঘোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। আর পুঁজি ও প্রশাসনের মধ্যে দূর্নীতি চাকুরী ও পদ নিয়ে বিরোধ এবং নানাদরনের দলবাজি সমগ্র পুঁজিশী প্রশাসনবল্লভকে যেমন অপট্ট এবং কর্তব্য বিমুখ করে তুলেছে, তেমনি অপরাধ দমনের বদলে অনেক সময় অপরাধ বৃদ্ধির সহায়ক করে তুলেছে। ফলে সত্যকারের বিপ্লব-ব্যক্তির সাহায্য খুব কম পান। আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পুঁজিদের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ও কলকাতা পুঁজিদের বৃহত্তম অংশই আমাদের “ঘরের লোক”। অর্থাৎ বাংগালী। কিন্তু ইদানীং গবর্ণমেন্ট বা কেন্দ্রীয় সর-কার যেন এঁদের উপরেও নির্ভর করতে পারছেন না। বা এঁদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না। সুতরাং স্বৈরাচারী শাসকেরা গণতান্ত্রিক শাসনের গঙ্গাধারা ঘটিয়ে যেমন সর্বত্র পুঁজিরাড্ডা ডেকে আনে পশ্চিমবঙ্গেও আজ সেই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। হাজার হাজার কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুঁজি বা সি আর পি (প্রকাশ যে, সারা ভারতের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক সি আর পিই পশ্চিমবঙ্গে) ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউ-রিটি ফোর্স বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং সে সঙ্গে নিয়মিত মিলি-টারী ফোর্স বা সৈন্য পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েন করা হয়েছে। এত পুঁজি, এত সৈন্য অথচ বাংলায় বোধহয় স্যার জন এন্ডারসনের কুখ্যাত হাস সৃষ্টির রাজস্বও দেখা যায় নি। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে এভাবে পুঁজি ও সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছে। অথচ এরা কিন্তু মৃত্যুতঃ সকলেই অবাংগালী। এভাবে অবাংগালী পুঁজিশী শক্তি আমদানী করার পিছনে বোধহয় এমন ধারণা আছে যে, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে এদের বাড়ীঘর নেই এবং স্থায়ী পুঁজি পরিবার নেই সেহেতু এরা নির্বিধায় ও নির্বিবেকে সক-লকে পিটিয়ে সিধা করতে পারবে! (পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী অবাংগালী পুঁজি ও সৈন্যদের এই মারাত্মক ধারণা থেকেই বাংগালীকে ঠান্ডা করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল এবং এখনও সেই তান্ডব চলছে।) কিন্তু এর পরিণাম কি?

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে পুরোপুরি কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনাধীন এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে প্রধান-মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্ট তৃতী-য়াংশ মেজরিটি। সুতরাং পশ্চিম-বঙ্গের ওপর ডিক্টেটর শাসন চালা-বার আর কোন অসুবিধা নেই। পশ্চিমবঙ্গে থেকে কংগ্রেসের বংশ-বদ লোকেরা আগেও তৈরী ছিলেন এখনও আছেন। যদিও কেন্দ্রের উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। একদিকে পুঁজি মিলিটারী, অন্য দিকে কেন্দ্রীয় ডিক্টেটর—পশ্চিম-বঙ্গের গণতান্ত্রিক শাসনকে সাঁড়া-শির চাপ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বা হচ্ছে। বামপন্থী শক্তিকে এখানে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হবে না—যে কোন উপরেই হোক তাকে উৎখাত করা যাবে। এমন কি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের

স্বাধীনতা পর্যন্ত এখানে বিপ্লব! প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য চাপ দিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীর, তীক্ষা ও তিক্ত সমালোচনা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে—সে সমালোচনা ইতিহাসের দিক থেকে যতই বুদ্ধিসম্মত হোক। পশ্চিমবঙ্গের ঘাড় ঘাট লক্ষাধিক শরণার্থীর দায়িত্ব চেপে বসেছে এবং পূর্ব বঙ্গে বাংগা-লীর ভবিষ্যতও ঘোলাটে হয়ে উঠছে।

এই অবস্থায় সমস্ত বামপন্থী দল এবং নকশালপন্থী যুবকদের কাছে একটি আন্তরিক আবেদন জানাতে চাই। এ পর্যন্ত শতশত যুবকের প্রাণ গিয়েছে খুনোখুনির রাজনীতিতে এবং পুঁজিদের হাতে। ক্রমেই পুঁজি ও অত্যাচারী শক্তি মরীয়া হয়ে উঠছে এবং গণতন্ত্রের সমাধির উপর ফ্যাসিজমের ভৌতিক নৃত্য সরু হতে চলছে। সারা ভারত-বর্ষের মধ্যে বাংগালীর আজ সব-চেয়ে দুরূহের লঙ্ঘনার স্বর্ণময় ও শোকের দিন। যে বিপ্লবের নামে ছিমমস্তা রাজনীতির এই আসন্নিক রক্তপান চলছে, তার আসল লক্ষ্য ক্যাপিটালিস্ট শক্তির গায়ে কিন্তু বিস্ময়াহু আঁড়ও লাগছে না। সত্য-কার বৈশ্ববিক শক্তির এক ইণ্ডি-অগ্রগতিও ঘটছেনা। বরং জন-গণ বিমূঢ়, বিভ্রান্ত এবং আত-ঙ্কিত। সমাজজীবন হতভব এবং বাড়ীতে অনঢ়া কন্যাগণ পর্যন্ত নিরাপত্তাশূন্য। ব্যাপক অরাজ-কতার অশ্বকারে বহু কুমারী মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে, এমন রিপোর্ট সংবাদপত্রে বেরি-য়েছে। সুতরাং দর্ভাগা পশ্চিম-বঙ্গে এবং ততোধিক দর্ভাগা জন-গণের দিকে তাকিয়ে আবেদন জানাই—আপনারা খুনোখুনির রাজনীতি ত্যাগ করুন এবং যারা সত্যকার বামপন্থী মতবাদের ও কর্ম-পন্থায় আন্তরিক বিশ্বাসী তারা ঐক্যবদ্ধ হোন, সংহত হোন এবং জনগণের শক্তিপীঠের উপর দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করুন। ফ্যাসিজমের কালোছায়া রোধ করুন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কাঁচার আর কোন পথ নেই।

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

কম গুণবিলিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্রত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। রসায়ন, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে যেহেতু ক্ষমকতি প্রকট পূরণ হয়, হজম শক্তি ও জ্বা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কিয়ে আসে এক অতি অমূল্যের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভ্রম যেহেতু সূতন সজীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্য
(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ বোমেন্দ্র চৌধুরী এম.এ.,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এক.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের কৃতপূর্ব অধ্যাপক।

চায়ের চামচের ৪ চামচ
মহাদ্রাক্ষারিষ্যের সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সম পরিমাণ জলসহ
প্রত্যহ্ন দু'বার আহায়ে
পর সেব্য।

চলিকাজ কোড : ডাঃ বরেন্দ্র চৌধুরী, এম.বি.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য



শ্রীমতী প্রকাশিত হচ্ছে
শক্তিহীন হাশানের
মুক্তির সংগ্রামে পূর্ব বাংলা
পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধ
সম্বন্ধে একটি অনবদ্য রচনা সঙ্কলন
প্রকাশক : রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রাপ্তিস্থান : ৩১ নং মট লেন,
কলিকাতা-১৩

কম্পানী আন্দোলনের রিপোর্ট

চাঞ্চল্য সরকার

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি কমিউনিস্ট পার্টিতে তাদের নিজ নিজ পরি-কল্পিত বিপ্লব কতদূর এগিয়েছে এবং এই বিপ্লবের প্তর উন্নয়নে ভুলভ্রান্তি দূর করে কি পথে এগনো যায় এই বিষয় নিয়ে নানা সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা সূত্র হয়েছে। সি পি (এম-এল) পার্টির তরফ থেকে এক ও দুই নম্বর দলিট আন্তঃপার্টি দলিল পার্টি সদস্যদের আলোচনার জন্য উপ-স্থাপিত করা হয়েছে। সি পি এম-এর রাজ্যকমিটির বৈঠক শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার (নয়ই সেপ্টেম্বর) এবং সি পি আই-এর এক সম্মেলনব্যাপী রাজ্য সম্মেলন শেষ হল শনিবার (এগারোই সেপ্টেম্বর)। তিন কমিউনিস্ট পার্টিতেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে ফ্যাসি-বাদী আক্রমণের বিষয় দীর্ঘ আলো-চনা চলছে।

এই আক্রমণে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ও জীবনহানি ঘটেছে সি পি (এম-এল) এর, তারপরেই মার্কস-বাদী পার্টির। এম-এল পার্টি অবশ্য এই আক্রমণে বিপর্যস্ত হলেও, বিস্মিত নয়। মার্কসবাদীরা মনে হয় এই আক্রমণে একটু বিরত। এই অবস্থায় মার্কসবাদীরা বুঝতে শুরুর করেছেন যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেহারা কত দুর্বল, আর শাসকশ্রেণী কত সংগঠিত এবং তাদের আক্রমণের কায়দা কত অভিনব।

এম-এল পার্টি শ্বেত ঘাসের বিরুদ্ধে লাল ঘাস সংগঠনের নীতির ভিত্তিতে খতম অভিযান শুরুর করে, বর্জ্যোয়া শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানের ওপর আক্রমণ চালায়, মূর্তি ভাঙে এবং রাজ্যের ব্যাপক অঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। চক্-চকে পদলিখ ও প্রশাসন এর মোকা-বিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। শাসক-শ্রেণী ও তার পার্টি তখন নতুন কৌশল নেয়—বিভিন্ন এলাকায় এম-এল অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে নিজে-দের ভাড়াটে গুন্ডা ঢুকিয়ে দেয়। সেই অবস্থায় সন্ত্রাস আর রাজ-নৈতিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; ব্যাপক ছিনতাই, খুনজখম এবং সাধারণ ক্রাইমে পরিণত হয়।

নির্বাচনে জিতেও দুইটি যুক্ত-ফ্রন্ট সরকার টিকল না আর উনিশশ একাত্তর সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়েও রাজ্যে সর্ব-স্বাধীন হয়ে বসল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতায় জনসাধা-রণের একাংশ দিশেহারা অবস্থায় এম-এল সন্ত্রাসকে স্বাভাবিক পরি-ণতি হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্ব-লতায় যখন এম-এল সন্ত্রাস সাধারণ ক্রাইমে পরিণত হয়ে জনজীবনে অনেক জায়গায় প্রভূত ক্ষতি সাধন করল, তখনই শাসকশ্রেণী সুযোগ বুঝে তার আক্রমণ শুরুর করেছে।

এই আক্রমণে জনসাধারণ মনে মনে সন্তোষ অনুভব না করলেও আক্র-মণের বিরোধিতায় এগিয়ে আসবে না। এ অবস্থা শাসকগোষ্ঠী ও তার পার্টি নব কংগ্রেসের পক্ষে অনুকূল এবং সেই অনুপাতে বিরোধী শক্তি পরাজিত, কোন কোন জায়গায় সংগঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

এখানে লেনিনের একটি উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক। উনিশশ এক সালের চোটা মে লেখা লেনিনের ছোট্ট একটি প্রবন্ধ “কোথেকে শুরুর করতে হবে”। এই প্রবন্ধে সন্ত্রা-সের রাজনীতি সম্পর্কে লেনিন বলেছেন : “নীতিগতভাবে সন্ত্রা-সকে কখনই বর্জন করতে পারি না এবং করিও না। বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর একটি বিশেষ অব-স্থায় এবং সমাজের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে সন্ত্রাস যুদ্ধ-কৌশল হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এবং এমনকি যুদ্ধের এক বিশেষ উত্তরণের অবস্থায় এ কৌশল অপ-রিহার্যও হতে পারে।—কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর কৌশল হিসাবে সন্ত্রাস প্রয়োগ কোন মতেই ঠিক হবে না। সংগ্রামের সামগ্রিক-রূপের সঙ্গে বিভিন্ন কৌশল অব-চ্ছেদ্য অংশ হিসাবে জড়িয়ে থাকে এবং সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক-হীন কোন বিশেষ আক্রমণে সামগ্রিক সংগ্রামবিভূত একটি কৌশল হিসাবে সন্ত্রাস প্রয়োগ হয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সন্ত্রাস সৃষ্টি কেবলমাত্র সেই অবস্থাতেই যুদ্ধকৌশল হয়ে দাঁড়ায়, যে অব-স্থায় বিপ্লবের কোন কেন্দ্রীয় সংগ-ঠন থাকে না আর আঞ্চলিক বিপ্লবী সংগঠনগুলি যখন দুর্বল। সেই-জন্য জোরের সঙ্গে আমরা ঘোষণা করছি যে, এই অবস্থায় এই ধরনের সংগ্রামী কায়দা সমরোপযোগী নয় এবং বর্জনীয়। এই কৌশল প্রয়োগ করতে গিয়ে সমগ্র আন্দো-লনের স্বার্থে যে কর্তব্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই কর্তব্যসম্পাদনে আন্দোলনের সবচেয়ে সক্রিয় কর্মীরা বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এবং এর ফলে বিপ্লবী শক্তিই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, সরকার দুর্বল হয় না। সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাবে যে, শহরের “সাধারণ মানুষ” আর শ্রমিকরা দলে দলে সংগ্রামের জন্য এগিয়ে এসেছে, আর বিপ্লবীরা সেই সংগ্রামে নেতৃত্ব অথবা সাংগঠ-নিক রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থায় যদি বিপ্লবের সবচেয়ে উদ্যমী কর্মীরা সন্ত্রাসের পথে যায় তাহলে কি আন্দোলনের নির্ভরশীল সংগ্রামী অংশই দুর্বল হয়ে পড়ার বিপদ থাকবে না? এই সন্ত্রাসের ফলে কি একবিহীন অথচ বিক্ষুব্ধ সংগ্রামমুখী জনসাধারণের সঙ্গে বিপ্লবী সংগঠনের ঝগড়াযোগ্য বিচ্ছিন্ন হবে না, বিশেষ করে জন-

সাধারণের মধ্যে অনৈক্যের পরি-স্থিতিতে? অথচ বিপ্লবী সংগঠন ও সংগ্রামমুখী মানুষের নিকট সম্প-কই আমাদের সাফল্যের একমাত্র গ্যারান্টি হতে পারে।”

সি পি এম-এর কলকাতা জেলা কমিটি সম্প্রতি একটি ট্রেড ইউ-নিয়ন সম্পর্কে খসড়া বক্তব্য ও প্রস্তাব রেখেছে। তার মধ্যে দেখা যায় শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন কত দুর্বল। শহর আর শহরতলীতে এগার লক্ষাধিক শ্রমিক ও কর্মচারী। তার মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ কোনও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের আওতার বইরে। বাদবাকী চার-লক্ষের মধ্যে মার্কসবাদীদের প্রভা-বান্বিত সিটুর আওতায় শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা দেড় লক্ষের কিছু বেশী। এরা কেবলমাত্র বাৎসরিক চাঁদা দেয় আর বেশীর ভাগই সাংগ-ঠনিক কোন কাজ করে না। শ্রমিক-

কর্মচারীদের মধ্যে মার্কসবাদী পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের সংখ্যা হাজার সাতেকের মত। মার্কস-বাদীদের সংগঠনই এ অঞ্চলে সব-চেয়ে শক্তিশালী। তাদেরই যখন এই অবস্থা অন্যান্যদের সংগঠনের কি অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়।

মার্কসবাদীরা তাই তাদের খসড়া প্রস্তাবে নিচুর তলায় যুক্ত সংগ্রাম আর প্রোগ্রামের ভিত্তিতে সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

সি পি আই-এর রাজ্য সম্মে-লনে বামপন্থীদের দুর্বলতা প্রসঙ্গ হিসাবে আলোচনায় এসেছে। অনেকে শাসক গোষ্ঠীর ফ্যাসীবাদী আক্রম-ণের তীব্রতার কথা বলেছেন। কিন্তু পার্টির জাতীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য কমিটিকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত মোচার কথা বলতেই হবে। তবে সি পি আই-এর মধ্যেও বিতর্ক এবং দ্বন্দ্ব-থেকে যাচ্ছে কি ভাবে অসংগঠিত অথচ সংগ্রামমুখী জনতাকে ফ্যাসি-বাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সামিল করা যায়।

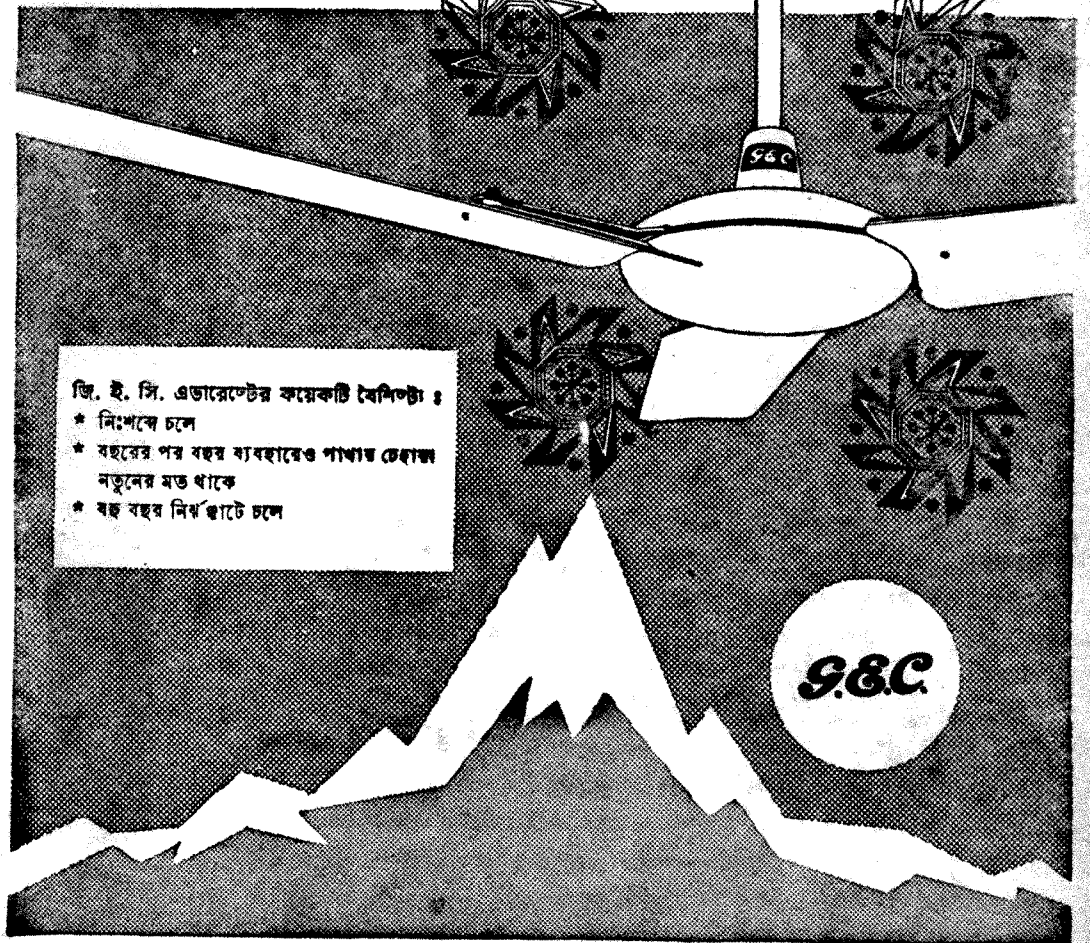
সি পি এম এবং সি পি আই

দুই দলই মনে করে যে, নিজেদের মধ্যে ঐক্যের পথেই সমস্যার সমা-ধান নিহিত আছে, কিন্তু সাম্য-বাদীরা কখনই নিজেদের তথাকথিত নৈতিক বিবদ মেটাতে পারে না আর এই অক্ষমতাই ক্ষয়িষ্ণু শাসক শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখে, কোন কোন সময় ওদের নতুন প্রাণ সঞ্চারও হয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেস নতুন উদ্যমে নেমেছে নিজে-দের সংগঠনকে উঠতি যুবকদের সাহায্যে টেলে সাজবার জন্য। এর নেতৃত্ব আসছে স্বয়ং প্রধান-মন্ত্রীর কাছ থেকে এবং এ ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে কোন পন্থাটিই, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও গায়ের জোরের ভিত্তিতে হলেও, প্রয়ো-জনের তাগিদে গ্রহণযোগ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কাশীপুর-বরানগর আর হাওড়ার শিবপুর-বাটরা অঞ্চলে পদলিখের সহযোগিতায় “ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান”র নামে ব্যাপক হত্যা ব্যবস্থা। শোনা গেছে যে, কাশীপুরের ঘটনার পর ঐ অঞ্চলের কিছু অধিবাসী কালী-

‘হুমায়ুন ওম্মেদ’

দিনে দিনে সব পাখার চেহারা
৫৫৫ এভারেস্টের মত হ’তে
চলেছে—কারণ জি. ই. সি.
এভারেস্ট যে কেবল কাজের
বেলায় অতুলনীয় তা’ নয়,
দেখতেও অগূর্ব।



জি. ই. সি. এভারেস্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :
* নিঃশব্দে চলে
* বছরের পর বছর ব্যবহারেও পাখার চেহারা
নতুন মত থাকে
* বহু বছর নিখুঁত চলে

৫৫৫

দ্য জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড

কলিকাতা • গোহাটি • ভুবনেশ্বর • পাটনা • কানপুর • নিউ দিল্লী • চণ্ডীগড়
অমৃতসর • বোম্বাই • আমেদাবাদ • নাগপুর • জবলপুর • মাদ্রাস • কোয়েম্বাটর
মাদ্রাস • সেকেন্দ্রাবাদ • এনিকুজাম

KALPANA GEC 5708

TRADE MARK GEC PERMITTED USER—THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA LIMITED



পূর্ব বাংলার বীর বিপ্লবী জনগণ আজ তাদের জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামকে এক দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার লাঞ্চিত নিপীড়িত মেহনতী জনগণ সৃষ্টি করে চলেছেন এক যুগান্তকারী সংগ্রামী ইতিহাস। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও প্যালেস্টাইনের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হলো আর একটি সংগ্রামী নাম—পূর্ব বাংলা। আজ পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনগণ যে শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করছেন তার চরিত্র কি এবং কোন ধরনের শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি জাতি (যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ) সামগ্রিক ভাবে অস্ত্র ধারণ করেছেন? এ সম্পর্কে সম্যক ও বাস্তব জ্ঞান না থাকলে শোষণ শ্রেণীর সঙ্গে জনগণের সঠিক দৃষ্টি নির্ধারণে ভুল হতে পারে এবং দৃষ্টি নির্ধারণে ভুল হলে এ সংগ্রাম যথার্থ সার্থকতা বহন করতে ব্যর্থ হবে। কারণ জনগণের গণযুদ্ধ হচ্ছে অত্যাচারী শোষণ-শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত নির্বাসিত শ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী যুদ্ধ, আপোষ-হীন সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম—মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্মত একটি প্রয়োগশীল বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুনগুলো (সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও মূলনীতি, সুস্পষ্ট রণনীতি, সময়োপযোগী রণকৌশল, যথোপযুক্ত রণক্ষেত্র ও সঠিক শত্রু-মিত্র নির্ধারণে এবং রাজনৈতিক সচেতন-সুশৃঙ্খল গণবাহিনী পরিচালনায় সক্ষম সর্বহারা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শনিষ্ঠ একটি বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব) অবশ্যই বিপ্লবী জনগণকে যেনে চলতে হবে, তা না হলে সামগ্রিক বিজয় লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে। বর্তমান গণযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভের জন্য পূর্ব বাংলার জনগণকেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। পূর্ব বাংলার বর্তমান গণযুদ্ধের ঐতিহাসিক শটভূমি খুঁজলে দেখা যাবে যে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ছিল এই সংগ্রামের সূচনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কবলিত ভারত-বর্ষের জনগণের মূল সমস্যা ও করণীয় ছিল—(১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন ও শোষণের কবল থেকে জাতীয় মুক্তি তথা পাক-ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন এবং (২) সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অভিধাপ থেকে সামাজিক মুক্তি তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে জনগণের স্বনির্ভরশীল উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

কিন্তু ভারতবর্ষের ধনিক ও সামন্তশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজদের মধ্যে শোষণের ক্ষমতা ও ক্ষেত্র বন্টন করে নেবার উদ্দেশ্যে দ্বিজাতি তত্ত্বের উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে আপোষের পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে শোষণ ক্ষমতাকে পূর্ণভাবে বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শোষকেরা আপোষের পথে পাকভারতের শাসন ক্ষমতা তাদের স্বার্থরক্ষাকারী শ্রেণীমিত্র এই দুই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের হাতে হস্তান্তর করে। আপোষের পথে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অমার্কসীয় অবৈজ্ঞানিকভাবে অর্জিত পাকিস্তান ও ভারতের তথাকথিত এই স্বাধীনতা জনগণকে বিদেশী পুঁজির শোষণ থেকে বিন্দুমাত্র

রেহাই দেয়নি, বরং নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে শোষকশ্রেণীর সংখ্যা এবং শোষণের তীব্রতাই বৃদ্ধি করেছে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ক্ষমতাসীন পাকিস্তানের আমলা মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণী (যারা রাষ্ট্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেও স্বাধীন নিজস্ব জাতীয় পুঁজির বিকাশ না করে, স্বীয় স্বার্থে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকেই নিজ দেশে বিনিয়োগ করে) তাদের নিজ স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পূর্বের চেয়েও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শোষণ কবলিত পাকিস্তান তথাকথিত স্বাধীনতার নামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এক নয়া-উপনিবেশ বা আধাউপনিবেশে পরিণত হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানের এই শাসক ধনিক ও সামন্তশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও স্বীয় পুঁজিবাদী শোষণকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে স্বনির্ভরশীল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন প্রচেষ্টা

করে নি (মুৎসুদ্দি চরিত্র বিশিষ্ট শোষক ও শাসকরা তা করতে পারেও না), কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের নামে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দু সামন্তশ্রেণীকে উৎখাত করে নিজেরাই সে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সংস্কারবাদী প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলে তৎকালীন জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় সত্য, কিন্তু সরকার অনুগত জোতদার মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার, ঠিকাদার, মজুতদার ও তাদের তাঁবেদার বাহিনী রূপে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণী শতধাবিভক্ত হয়েও সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় (পুলিস, মিলিটারী, আইন-আদালত) বাঁচিয়ে রেখেছে সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থাকে যার প্রচণ্ড শোষণ পূর্ব বাংলার জনগণকে এক সর্বহারা জাতিতে পরিণত করেছে। ফলে পাকিস্তানে সত্যিকার জাতীয় মুক্তিবিপ্লব বা গণতান্ত্রিক বিপ্লব কোনটাই সম্পন্ন হয় নি। এভাবে জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক।

(শেষাংশ ২৫শ পৃষ্ঠায়)

**যখন যেমন
তখন তেমন**

লিলিপেট ৮০
৮.৯৫

ওয়েফাইন্ডার্স ৭০
১৭.৯৫—২২.৯৫

ইভা ৬৪
১০.৯৫—১৭.৯৫

ফ্যানফোর ০১
১৭.৯৫

কুমকুম ৩০
১৪.৯৫

সিতারা ৬৭
১২.৯৫

Bata

আপনার পছন্দমতো বাটার দোকানটিতে একবার এসে দেখুন, উৎসবের জন্য সদা-আনা রকমারি জুতোর যেন মেলা বসে গেছে। রঙে-নকশায় সর্বাধুনিক। ফ্যাশনের জগতে যা আগামী কালের, সেখানে তা আগেভাগে আজকেই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। পাবেন এমন জুতো যা একাধারে আটপোরে আর পোশাকী—যেমন সব মেজাজে তেমন উৎসবের সকল সাজেও দিবা পরা যাবে। আর সেই সঙ্গে বাটার জুতোর সেই উপভোগ্য আরাম তো আছেই।

নিকসনের চীন যাত্রা

রুশ-চীন-মার্কিন ত্রৈভুজের নব পর্যায়

রুনে নগ

চিত্তাব্যবহাৰ গায়ের কালো কুটুকি যেমন বদলায় না, সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রও কখনও বদলায় না। সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন দেশকে পদানত ও শোষণ করার নানা পদ্ধতি, নানা নীতি বারবার গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদীরা চায় সম্ভব হলে আক্রান্ত দেশগুলি বিনাযুদ্ধে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করুক। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথে সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত হউক যাতে অবিলম্বে তাদের শোষণ করার কাজ অব্যাহত শুরু করা যায়। কিন্তু যদি পদানত দেশ মাথা তুলে দাঁড়ায়, যদি দেশ আত্মসমর্পণ করতে না চায় তবে তারা সামরিক বলপ্রয়োগ করতে দ্বিধা করে না।

যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী নীতির লক্ষ্য থাকে একই, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শোষণের কর্মপদ্ধতি অব্যাহতাবে চালিয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমবায়ের উদ্ভবের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়েছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ক্রমশ সঙ্কুচিত বাজার নিয়ে সংঘর্ষ ও রিবাদের সূচনা দেখা দিয়েছে।

গত মে মাসে সঙ্কটের ফলে এবছর পনেরোই আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসনের অভাবনীয় পদক্ষেপ এই দ্বৈতবাহী একদিক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীর তিনশো পনেরো কোটি মানুষের মধ্যে একশো দশ কোটি মানুষ এখন সমাজতান্ত্রী দেশগুলিতে বাস করে। তাদের বেকারী নেই, আর্থিক সঙ্কট নেই, ভবিষ্যত সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নেই। তারা সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধ মানবজীবন তৈরী করে চলেছেন।

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেকারী, উৎপাদন সঙ্কট, আর্থিক সঙ্কট, দুর্নীতি, ব্যাভিচার ও সামাজিক দুর্ভিক্ষ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

এর প্রধান কারণ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ শাষণমূলক আর্থনৈতিক ব্যবস্থা, একথা পরিষ্কার ভাবে গোটা দুনিয়ার মানুষকেই হৃদয়ঙ্গম করতে হয়েছে। তাঁরা তাই বেশী করে এই শোষণব্যবস্থার অবসান ঘটাবার জন্যে নিজ নিজ দেশের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছেন। শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজকে উৎপাটন না করলে আজ আর কোনো দেশের মানুষই নিজেদের চিরন্তন বেকারী, অনিশ্চয়তা ও দারিদ্র্যের অসহনীয় আলা

থেকে মুক্তি পেতে পারেন না।

ফলে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী পন্থের পথিকেরা নিজ নিজ দেশের জনসাধারণের উপর ক্রমাগত আর্থিক সঙ্কটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং এর প্রতিক্রিয়ার ঐ সব দেশের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন উপায়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন।

আমেরিকার মানুষও এ সংগ্রামের বাইরে থাকেন নি। লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসী রাজধানী ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। হাজার হাজার যুদ্ধে যাবার নির্দেশনামা প্রকাশ্যে অধিকৃত নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমেরিকার সাধারণ মানুষও বুঝতে শুরু করেছেন যে সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো বজায় আছে বলেই আজ আটচালিশ লক্ষ মার্কিন যুবক বেকার, হু কোটি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও আট কোটি কর্মে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীর জীবনযাত্রার মান মূল্যহীনতার কারণে বিপর্যস্ত।

মার্কিনী “গরীবী হঠাৎ” পরিকল্পনা (গোভার্ট, প্রোগ্রাম) “ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ” (ওয়ার এগেনসটি হাওয়ার) প্রভৃতি গালভরা পরিকল্পনা আজ পরিত্যক্ত। মার্কিন জনজীবনে হতাশা, দারিদ্র্য ও বেকারীর কালোছায়া ঘনিয়ে এসেছে দেখে গীর্জার ধর্মবাক্য থেকে প্রেসিডেন্ট নিকসন সবাই উদ্বিগ্ন, ভীত হয়ে পড়েছেন।

সমরোপকরণ, নির্মাণকারী একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বেতনভুক সামরিক জেনারেলরা কোথাও একটা যুদ্ধ না বাধালে এ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ নেই মনে করছেন। কিন্তু আজ আটম ও হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও শক্তিশালী জনমত যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির স্বপক্ষে গড়ে উঠছে, তাঁরা এই যুদ্ধবাজ সমরনেতাদের হাত চেপে ধরতে এগিয়ে এসেছেন। দেশে দেশে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার যুগেধরা কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে। সারা বিশ্বজুড়ে বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব শুরু হয়েছে।

আজ বিপ্লবী পরিস্থিতির সামনে প্রায়-বিপর্যস্ত একচেটিয়া পুঁজিবাদের সর্বশেষ আকৃতি রাষ্ট্র-একচেটিয়া পুঁজি সমাবেশ, দেশে দেশে প্রতিবিপ্লবের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসছে।

তারা একই সঙ্গে শান্তির বাণী আওড়াচ্ছে, পাদ্রীর মতো সাম্রাজ্যবাদের সেনাবাহিনীর আগে আগে শান্তির পতাকা উড়িয়ে চলেছে আবার পেছন দিকে সামরিক বায় একটানা বাড়িয়ে চলেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মতভেদকে অশান্তিপূর্ণ পথে ঠেলে নিয়ে তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রী করে মুনাফা করছে এবং তাকে “অস্ত্রসাহায্য” বলে বর্ণনা করছে।

লণ্ডনের ইন্সটিটিউট অফ ডিফেন্স স্টাডিজ এক সমীক্ষায় জানিয়েছেন যে একমাত্র ১৯৬১ সালে পৃথিবীর বড় বড় ৬৬টি রাষ্ট্র মোট একলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার কোটি (ভারতীয় টাকায়) টাকা সামরিক বায়-ব্যয় খরচ করেছে। এদের মধ্যে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান সাগরের এলাকাভুক্ত দেশগুলি, ভারত-মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও পারস্য

উপসাগর এলাকাভুক্ত দেশগুলি এবং আরবের সুলতানশাসিত এলাকাকে ধরা হয়নি। ১৯৬৮ সালের সামরিক ব্যয়ের তুলনায় ১৯৬৯ সালে সামরিক ব্যয় শতকরা পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধ্যাপক এমিল বেহুইটের নেতৃত্বে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা রিসার্চ টিম সামরিক বায় ও সমরোপকরণ নির্মাণ সম্পর্কে একটা রিপোর্ট দাখিল করেছেন। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভিয়েতনামে যুদ্ধ শুরু হবার আগেই পৃথিবীর সবদেশ মিলে মোট সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ছিল বছরে এক লক্ষ তেরিশ হাজার মিলিয়ন ডলার (টাকার অঙ্কে এরও সাড়ে সাতগুণ বেশী) এবং এর তিনচতুর্থাংশই ছিল আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যয়বৃদ্ধি। এই বিপুল সামরিক ব্যয়ের ফলে যা উৎপাদন হত, তার মধ্যে সমস্ত হাজার মিলিয়ন ডলারের গণ্য বে-সামরিক লোক-জনের অভাব পূরণের কাজে লাগানো সম্ভব ছিল। অধ্যাপক, বেহুইট তাঁর মন্তব্যে বলেছেন যে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নকারী গরীব দেশগুলিকে যত সরকারী ও বেসরকারী “সাহায্য” দেওয়া হয়েছে এই সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ তার চেয়ে নয়গুণ বেশী।

১৯৬৪-৬৫ সালে আমেরিকা মোট সামরিক বায় করে একলক্ষ হাজার মিলিয়ন ডলার। ১৯৬২ সালে একা সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক বায় ব্যয় মোট বিয়াল্লিশ হাজার মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। ১৯৭০ সালের ২১শে মে মার্কিন একচেটিয়াপতিদের মুখপত্র বিজনেস্ উইক সমরাজ্য ব্যবসায় আমেরিকার অংশ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জানায় যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রথম পঁচিশ কোটি টাকা মূল্যের প্রচলিত সমরাজ্য (অর্থাৎ ক্ষেপণাস্ত্র, আণবিক অস্ত্র ইত্যাদি বাদে কনভেনশনাল অস্ত্র) পৃথিবীর বাজারে ছাড়া হয়েছে। এর মধ্যে একা আমেরিকাই বিক্রী করেছে ৫০০০ কোটি ডলার সাইব্রিয়ান হাজার পাঁচশ কোটি টাকা মূল্যের প্রচলিত সমরাজ্য। তাছাড়া ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার সামরিকবায় বছরে তিন হাজার দুশ কোটি ডলার বা টাকার অঙ্কে চব্বিশ হাজার কোটি টাকা (ভারতের গোটা চতুর্থ পরিবহন খরচের চেয়েও বেশী।)

এই অর্থনীতি সামরিকীকরণের ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির মুদ্রাস্ফীতি এমন ভয়ংকর অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সমগ্র মুদ্রাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। পৃথিবীব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ও সমাজতান্ত্রিক সুখী সমাজের অভ্যুত্থানের সুবর্ণ সন্ধিক্ষণ ক্রমবেগে এগিয়ে আসছে।

স্বাভাবিক ভাবেই কোন পুরনো সমাজ-ব্যবস্থাই সহজে নতুন সমাজ-ব্যবস্থাকে পথ ছেড়ে দেয় না। সাম্রাজ্যবাদী, রাষ্ট্র-একচেটিয়া সমবায় ও নানা রংয়ের নয়া ঔপনিবেশিকবাদ, তাদের অনুচর ও সমতুল বুদ্ধোন্মাদ-জমিদার চক্র ও বিলুপ্তি এড়ানোর সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যায়।

যদিও আশুন লাগলে বোঁটার বাঁধা পত্তর মত পুরনো সমাজ ব্যবস্থার মালিকেরা ছোটোছুট শুরু করে। তারা ক্রমাগত নীতি পালটায়, কোন স্থির নীতি অনুসরণ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব থাকে না। তারা যুদ্ধ বাধিয়ে, মানুষ খুন করে হাজার হাজার কোটি টাকা সমরাজ্য ব্যয় খরচ করে যে সংকট কাটাতে চেষ্টা করেছিল, অর্থনৈতিক সূত্রের অব্যবস্থায় নিয়মে সেই ব্যবস্থা তাদের নিজেদের গলায় ভারী পাথরের মতো চেপে বসেছে।

আজ তাদের সামনে অবলুপ্তির অন্ধকার ষাট; ইতিহাসের এই নিশ্চিত নিশানা তাদের উদ্গাদ করে তুলেছে। তাই পুঁজিবাদীরা আজ যুদ্ধ বাধাতে পারছে না দেখে নিজ নিজ দেশের সাধারণ মানুষের ওপর সামরিক অস্ত্র প্রয়োগ করে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সম্ভাবনাকে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী যুদ্ধ বাধাবার এ অক্ষমতাকে নিজেদের শাস্তির ইচ্ছা বলে বাঁধা সৃষ্টি করতে চাইছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকসনের পিকিং দর্শনের অভিলাষকে বিচার করতে হবে।

—সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে যুদ্ধের সম্ভাবনাও ততদিন থাকবে, লেনিনের এই দিকনির্দেশ দেশে দেশে জনগণকে শান্তির স্বপক্ষে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে সমবেত করেছে।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে মাও সে তুং বলেছেন, “শান্তি আলোচনার প্রস্তাব স্থানীয়ভাবেই আসুক আর সামগ্রিক ভিত্তিতেই আসুক আমাদের এরকম ঘটনার জগ্রে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। শান্তি আলোচনায় যোগ দিলে জটিলতার সৃষ্টি হবে বলে আমাদের ভয় করা উচিত নয়, আবার নিজেদের মানসিক অবস্থা ও দৃষ্টি পরিষ্কার না করে শান্তি আলোচনায় যোগ দেওয়াও আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না। আমাদের প্রয়োজন মতো অনুমোদন-যোগ্য নমনীয়তাও বজায় রাখতে হবে” (মাও সে তুং, নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পিকিং পৃ: ৩৭২)।

আবার ১৯৫১ সালে ২৪শে অক্টোবর রেগমিনজিপায়ে প্রকাশিত বিবৃতিতে মাও সে তুং বলেন, “আমরা বহুদিন আগেই বলেছি যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কৌরীয় সমস্যার সমাধান করা উচিত। একথা আজও সমানভাবেই খাটে। যে পর্যন্ত মার্কিন সরকার অতীতে তাঁরা যে রকম সমস্ত শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছেন এবং নিলজ্জভাবে আপোষ আলোচনা ভেঙ্গে দেবার অপকৌশল অবলম্বন করেছেন তা থেকে নিবৃত্ত হয়ে তাঁরা শ্রায় ও যুক্তির ভিত্তিতে কৌরীয় প্রশ্নের মীমাংসার মনোভাব যদি দেখান, তাহলে নিশ্চয়ই কোরিয়ান যুদ্ধবিরতি আলোচনা সফল হবে, নতুবা নয়।”

১৯৬০ সালে সোভিয়েত-মার্কিন (শেবাংশ ৩০শ পৃষ্ঠায়)

নব কংগ্রেসী রাজনীতি
নব পদ্ধতি ও শৈল্পিক
যুক্ত যুক্ত / প্রসিদ্ধ

“সরকার এবং কংগ্রেস দলের নিজেদের স্বার্থেই আজ কংগ্রেসকে তাদের বিপজ্জনক পথ পরিহার করতে হবে এবং তাঁদের নীতির প্রকৃত পরিবর্তন ঘটতে হবে।” (সাতই জুলাই একাত্তর তারিখের সর্বদলীয় বৈঠকে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কাছে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পক্ষে জ্যোতি বসু ও হরেকৃষ্ণ কোণ্ডারের চিঠির শেষ লাইন।)

এই কথাই বলেছিলেন নব কংগ্রেসের জনৈক উদীয়মান নেতা পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস নেতৃত্বের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেস নেতৃত্বের “দুই লাইনের” কলহ ব্যাপকতর আকার ধারণ করেছে। নকশালদের সম্পর্কে সঠিক কি দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্যক্রম নব কংগ্রেস সংগঠনের হওয়া উচিত এ নিয়েই কলহের সূত্রপাত। বিবদমান দুই দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস হচ্ছে বর্তমান শাসকশ্রেণীর ভেতরকার দুর্বলতা বা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। অবশ্য এ দ্বন্দ্ব সূর্য হইছে তীব্রতর অর্থনৈতিক সংকটের আবেতে এবং সংকট থেকে পরিগণের বিভিন্ন পথ নির্দেশকে কেন্দ্র করে। ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ মদুখাপেক্ষী ধনতন্ত্রের এ সংকটে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে কংগ্রেসের মধ্যে দুই লাইনের ঝগড়া আরম্ভ হয় প্রতি-বিপ্লবকে শক্তিশালী করবার নীতিগত প্রশ্নে বা বিপ্লবী পরিস্থিতিতে এঁড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্নে। আদি ও নব কংগ্রেসের মধ্যে তাই কৌশলগত যে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল, তাতে নব কংগ্রেস সাময়িক ভাবে জয়ী হয়ে গেল “সমাজতন্ত্রের” বালি আউড়ে এবং আদি কংগ্রেস, জনসংঘ প্রভৃ-তিকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে। ভারতবর্ষের শোষক শ্রেণীও দেখলো বিপ্লবী পরিস্থিতিতে এড়াতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন “গরীব হটাও”-এর স্লোগান দেওয়া এবং মধ্যবিত্ত বাম রাজনীতিকে টেকা দিয়ে বিভিন্ন আর্থিক সংগঠনকে (ব্যাংক, বাঁমা, বাহুর্বাণিজ্য) জাতীয়করণ করা। শোষণের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থাকে জাতীয়করণ এবং সাম্যায়িত অর্থনৈতিক সংস্কারের দ্বারা আড়াল করা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে শোষকশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা চতুর নীতি—নব কংগ্রেস তাই করেছিল এবং সর্বহারার বিপ্লবী রাজনীতির নামে যে সকল মধ্যবিত্ত বাম রাজনীতি পার্লামেন্টারী সংগ্রামের পথে শাসনব্যবস্থায় কলঙ্ক পাওয়ার চেষ্টা করেছিল—উক্ত নীতি সারাস্বত্ব ভাবেই সেই বাম রাজ-

নীতিকে ঘায়েল করেছিল। ইন্দিরা প্রচুর অর্থব্যয়ে, প্রচুর ক্ষমতা প্রয়োগ করে পার্লামেন্টারী রাজনীতির ভৌতিক দিয়ে শাসনব্যবস্থায় একাধিপত্য বিস্তার করলেন এবং শোষকশ্রেণীর উপরোক্ত চতুর নীতিকে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন।

শোষকশ্রেণীর এই চতুর নীতির প্রবক্তা ইন্দিরা গান্ধী বা নব কংগ্রেস নেতৃত্ব গত সাধারণ নির্বাচন অবধি মূলতঃ যে নির্বাচনী কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল পার্লামেন্টে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন। তাই আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টির ন্যায় শোষকশ্রেণীর ভোঁতা চেলাদের পার্লামেন্টারী শক্তি কমানোর জন্য বাম রাজনীতির ভেঁকধারী সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, কেরল কংগ্রেস বা বাংলা কংগ্রেস প্রমুখ দলগুলোর সঙ্গে আসন রফা বা নির্বাচনী মৈত্রী করে পার্লামেন্টে নব কংগ্রেস নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। বাম রাজনীতির ঐ পণ্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নব কংগ্রেসের আঁতাত পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে শোষকশ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো সাফল্য কারণ উক্ত আঁতাতের ফলে শোষকশ্রেণীর বিশ্বস্ত দালালদের অর্থাৎ নব কংগ্রেস নেতৃত্বের ক্ষমতায় আসা সহজতর হয়েছিল এবং অন্যদিকে বাম রাজনীতির প্রবক্তারাও স্বীয় অস্তিত্বের খাতিরে নেড়ীকুকুরের মতো নব কংগ্রেস নেতৃত্বের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিল।

শোষকশ্রেণীর নিকট—নব কংগ্রেস

নেতৃত্বের নিকট তখন একমাত্র বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছিল সি পি এম রাজনীতি যে রাজনীতি অন্ততঃ তাত্ত্বিক দিক থেকে বর্তমান শোষণ ব্যবস্থায় হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে—যে রাজনীতি অর্থনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিল্প মালিকদের বলপূর্বক ঘেরাও করবার কথা বলে এবং চাষীর ফসল আদায় বা রক্ষার জন্য হিংসার পথ গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়।

তাই বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ও কেরলে শোষকশ্রেণীর বিশ্বস্ত দালাল হিসেবে নব কংগ্রেস নেতৃত্ব সি পি এম বিরোধিতায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। সি পি এম নেতৃত্ব পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার ক্ষমতায় আসার সুযোগ যাতে গ্রহণ না করতে পারে, সেজন্য নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করে।

১১ দুই ১১

নির্বাচনান্তর ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার ফলে যদিও নব কংগ্রেস নেতৃত্ব আজ নিশ্চিত তবুও শোষকশ্রেণীর সম্ভাব্য বিপদ কোন দিক থেকে আসতে পারে, এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয় এবং তা নিয়েই বর্তমান কলহের সূত্রপাত। বর্তমান নব কংগ্রেস দুই লাইনের ঝগড়া উপরোক্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব নিয়েই। এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এমন একটা পরিপ্রেক্ষিতে, যে পরিপ্রেক্ষিত প্রাক নির্বাচন স্তরের তুলনায় অধিকতর ভয়াবহ। বর্তমান শোষকশ্রেণী অর্থনৈতিক সংকটের কোন সাময়িক সমাধান তো দিতেই পারেনি, বরং উনিশশ আটব্বি-উনসত্তর সালের তুলনায় সমগ্র ভাততবর্ষে নীট শিল্পোৎপাদনের গতি শতকরা পঞ্চাশভাগ কমে গেছে, কৃষি উৎপাদনের যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তার উৎপাদন হার উনিশশ আটব্বি-উন-

সাত সালের অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, দ্রব্যমূল্য মাত্র গত দুই বছরে যে হারে বেড়েছে, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সেরকম ইতিপূর্বে দেখা যায় নি, সর্বোপরি বেকার সমস্যা, শ্রমিক অশান্তি এবং সরকারের প্রশাসনিক ও দেশরক্ষার ব্যয় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

অর্থনৈতিক সংকটের এই তীব্রতার মধ্যে নব কংগ্রেস নেতৃত্ব গণতন্ত্রের মদুখোস যে রাখতে পারবে না, গরীব হটাও-এর স্লোগান যে আর দেওয়া যাবে না এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পার্লামেন্টারী রাজনৈতিক দলকে যে যেন তেন প্রকারে ধ্বংস করতে বন্ধ পরিকল্পনা হবে—এ সবই সহজে অনুমেয়।

কারণ শোষক শ্রেণী নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটে বেপরোয়া হয়ে ফ্যাসিবাদীর জঘন্য ভূমিকায় চলে আসে—নব কংগ্রেস নেতৃত্বও বর্তমাণে রাজনৈতিক দিক থেকে ফ্যাসিবাদের ভূমিকায় চলে আসছে। উনিশশ তেতিসর সালে রাইখে ক্ষমতায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বড় প্রবক্তা হিটলারও জার্মান ফ্যাসিবাদকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল। ফ্যাসিবাদের আশ্রয় দত্ত্ব দৈন্যে পীড়িত স্বার্থপর হীনমনা মধ্যবিত্ত পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা এবং ফ্যাসিবাদের পুতুল হলো উক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে বেরিয়ে আসা যুবসমাজ। বামরাজনীতির বেলে-জ্ঞাপনা, সাম্যবাদী রাজনীতির পেটিবুর্জোয়া পার্লামেন্টারী দাসত্বকে ঘৃণা করে ঐ যুব সমাজ স্বাভাবিক কারণেই শোষকশ্রেণীর ফ্যাসিবাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। জার্মান ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের ইতিহাস থেকেই আমরা এসব দেখেছি। নব কংগ্রেস নেতৃত্বও ইন্দিরা গান্ধীর পরিচালনায় মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মধ্যে “জনপ্রিয়” হয়েছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে বেরিয়ে আসা যুব সমাজের মধ্যে ইমেজ

সৃষ্টি করেছে। ক্ষমতায় আসীন নব কংগ্রেস নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অর্থাৎ পুঁজি মিলিটারীর সাহায্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিবাদের দিকে প্রয়োজনমতো এঁগিয়ে যেতে বাধ্য—এটা নব কংগ্রেস নেতৃত্বের কেউই কার্যত অস্বীকার করে না। উনিশশ সাতাত্তর সালে বহু বছর আগেই ফ্যাসিবাদী কায়দায় কেরলে বাম রাজনীতির শাসনকে এই ইন্দিরা গান্ধীই নাকচ করিয়েছিল, সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি গভর্ণরের দ্বারা কিভাবে নব কংগ্রেস শাসনক্ষমতা থেকে উৎখাত করেছে, তার কাহিনী সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই জানেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে সরানোই ফ্যাসিবাদের নিশ্চিত চিহ্ন নয়, বিপ্লবী পরিস্থিতিতে প্রতিবিপ্লবী পরিস্থিতির দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে কোন ছল, বল বা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ এবং জনসাধারণকে দিয়ে তা নীরবে মানিয়ে নেওয়াই হলো ফ্যাসিবাদের চরিত্র।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে—নব কংগ্রেস বর্তমানে দুই লাইনের ঝগড়া কি বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে। খুব সাধা-সিধে জবাব হলো—নকশাল আন্দোলন বা সি পি এম আন্দোলন—কোনটি শোষকশ্রেণীর বড়ো চ্যালেঞ্জ তা নিয়ে।

১১ তিন ১১

এ প্রশ্ন এসেছিল বস্তুতঃ বছর দুয়েক আগে উনিশশ উনসত্তর সালের মে মাস থেকে, যখন নকশালবাদী আন্দোলনের নেতা ও ক্যাডারগণ সি পি আই এম এল পার্টি প্রতিষ্ঠা করলেন। শোষকশ্রেণীর প্রতিভূদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই নকশালবাদী আন্দোলনের জন্ম। (শেষাংশ ২৮শ পৃষ্ঠায়)



ওলো গাই ভোরে
গাগিন কথাবই

পরিবার পরিকল্পনায় সংসারের খরচ কমে

আপনার বাড়ীর কাছের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে অথবা মাতৃমঙ্গল এবং শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ সম্পর্কে পরামর্শ করায় সুযোগ দুটিই আপনাকে নিখরচায় পাবে।

রাজনীতির অসুস্থতা

একজন সাহিত্যিকের

দৃষ্টিভঙ্গি

আমি নিজে রাজনীতি করি না, বরং যেখানে রাজনীতি হয় তার চৌহদ্দি থেকে শতহস্ত দরে থাকবার চেষ্টা করি। আমার যাঁরা বিরুদ্ধবাদী তাঁরা বলেন এটা আমার দায়িত্ব এড়াবার প্রয়াস, আপনাকে মূলতঃ সাহিত্যসেবী বলে পরিচয় দিয়ে তার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকবার কৌশল। তাঁদের মতে জনজীবনের শতবিধ সমস্যা ও কর্তব্যকে পাশ কাটিয়ে চলবার সবচেয়ে মোক্ষম অছিলা যদি কিছু থেকে থাকে তা হ'লো বিশদ্রব্দ সাহিত্যসেবার অছিলা। তাতে সাহিত্যিকের লেবেল গায়ে এঁটে যেমন একপ্রকার কল্পিত আত্ম-প্রসাদ অনুভব করা যায়, তেমনি নানা প্রশ্ন-সমস্যা কল্টকিত বর্তমান সমাজের ডামাডোলের মধ্যে বাস করেও যেন কিছুই আমাকে স্পর্শ করে না, কোনো কিছুতেই আমার কিছু করণীয় নেই, এই মনোভাবের বশে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানোও চলে। আমাকে আমার সমালোচকেরা এই দলেই ফেলতে চান।

সমালোচকদের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই। তাঁদের অভিযোগ আমি নতমস্তকে মেনে নিচ্ছি। বাস্তবিক আমি একজন দীন সাহিত্যসেবী ভিন্ন আর কিছুই নই। সাহিত্যসেবাই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, আশ্রয়, অস্তিত্বের সার্থকতা অনুভব করবার উপায়। এ ভিন্ন আর কোনো কাজে আমি উৎসাহ পাইনে, সে কাজে সামর্থ্যও আছে বলে বোধ করিনে। যে কাজে আছি তাতে নিবিষ্ট থাকাই উচিত এই ধারণাই আমাকে বরাবর সাহিত্যানুশীলনে সংলগ্ন করে রেখেছে। বাঁচতে হলে সাহিত্যকে অবলম্বন করে বাঁচবো, মরতে হলেও সাহিত্যকে অবলম্বন করেই

মরবো—এই হলো— সাহিত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকবার 'rationale' বা যুক্তিযুক্ততা।

প্রতিবাদীরা বললেন, এটা কেমন কথা, সাহিত্যচর্চা করলে আর কিছু করা যাবে না এটা এক অশুভত যুক্তি। যে রাঁধে, সে কি আর চুল বাঁধে না! লেখক সাহিত্য-সেবার পাশে পাশে একই সঙ্গে রাজনীতি করেছেন, প্রয়োজনে জন-জীবনের সামিল হয়ে প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তি বা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে হাতিয়ার কাঁধে লড়াই করেছেন, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি। একই সঙ্গে রাজনীতি আর সাহিত্য করছেন আমাদের দেশেও এমন লেখকের অভাব নেই। তা যদি হয় তাহলে আমি এই স্বেত ভূমিকা থেকে ছাড়া পেতে চাই কোন অজুহাতে?

উত্তরে বলি, সাহিত্যসেবা সম্পর্কে আমার ধারণা কিছু ভিন্ন। আমার বিনীত অভিমত এই যে, এটা একটা সাধনা, সর্বক্ষণের কাজ, এ কাজে দিব্যারত্নের ধ্যান না হলে এ কাজে সাফল্যলাভের আশা সদূর পরাহত। দেবী সরস্বতী বড়োই কঠোর কঠোরীকরণ, কাজে একটু ঢিল বা ফাঁকি দিলে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা পড়ে পড়ে। তাঁর প্রসাদ পেতে হলে তাঁকে সর্বক্ষণ ভজনা করতে হবে, এ ভিন্ন দ্বিতীয় রাস্তা নেই। আর তাছাড়া, আমরা যে যে কাজেই নিযুক্ত থাকি না কেন, প্রত্যেকেরই আমাদের ক্ষমতা সীমিত। ওই সীমাবদ্ধ শক্তির সঙ্কেত হিসাব করে খরচ করতে হয়, একাধিক কাজে মাথা দিলে সীমিত শক্তির উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয়। তাতে এ কূল ও কূল দুই কূলই হারাবার সম্ভাবনা। শক্তির উপযুক্ত গৃহস্থাপনার অভাবে কতো লোকের

জীবন যে "ইনস্ট্যান্ট-ডেথ" হয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যায় তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই।

কাজেই আমি যদি সাহিত্যেই তদগত থাকাটাকে আমার অবলম্বনীয় পথ বলে গ্রহণ করে থাকি, সেটা জনজীবনের সহস্রবিধ দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে চলার অছিলা হিসাবে গ্রহণ করিনি, আত্মপক্ষ নম্রভাবে এইটুকু মাত্র বলতে পারি। বরং এতে আমার বিনয়ের ভাবই বোধ হয় বেশী প্রকট। দুনিয়ার সবার জন্যে সব কাজ নয় বা সবার সব কাজে যোগ্যতা নেই, এই নম্রতার চেতনটুকু থাকলে অনেক অনর্থের হাত থেকে সংসারে অব্যাহতি পাওয়া যেতো। আমি সাহিত্যকে অবলম্বন করে আছি এটা ঠিক, সক্রিয় রাজনীতির পারতপক্ষে কাছ ঘেঁষি না এটাও ঠিক; তা বলে এটা বোধ হয় ঠিক নয় যে, রাজনীতি বিষয়ে আমার কোন ওৎসুক্যই নেই। তা যদি হতো তাহলে আজকের এই প্রবন্ধ লেখবারই কোন প্রয়োজন হতো না। যে বিষয়টিতে হাত দিয়েছি সেটি রাজনীতির সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নির্ণয়। এমন বিষয় বাছবার কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যেতাই কেন না নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনায় তলিয়ে থাকবার অভিমান পোষণ করি, আজকের সমাজটাই নানা গোল-মালে এমন তালগোল পাকিয়ে গেছে যে তার এক কাজ থেকে অন্য কাজকে বিশ্লিষ্ট করা একটু কঠিন। আজকের সাহিত্যের পাকে-পাকে রাজনীতির উষ্ণ নিঃস্বাস। চেষ্টা করলেও সে সম্পর্কে অন-বহিত থাকা যায় না। আমি হয়তো এই ভেবে নিশ্চিন্ত আছি যে, আমি ঘরে বসে চুটিয়ে বাণী বীণাপাণির সেবা করছি, দেবীর কৃপাদৃষ্টি লাভে আর আমার বিলম্ব নেই। কিন্তু যখনই আমার নিভৃত সাধনা-প্রসূত রচনাবলী পণ্য হিসাবে বাজারে বিকোতে যাই, দেখি যে সেখানে হাজারটা গোষ্ঠী, তার হাজার রকমের রাজনৈতিক মতামত এবং ওই সব গোষ্ঠীর পরস্পরের

মধ্যে রেবারেঁষের অন্ত নেই। খেয়োখোয়ি বললে শব্দপ্রয়োগ আরও লাগসই হতো কিন্তু কঠিন শব্দ-প্রয়োগের অভ্যাস আজকাল ছেড়ে দিয়েছি। দেখি যে, সকলেই চায় গোষ্ঠী আনুগত্য, "দলছাড়া" নিরপেক্ষ লেখককে কেউ বড়ো-একটা পাস্তা দিতে চায় না। বরং তাঁকে সকলেরই সন্দেহ : মনে করে, আমাদের গোষ্ঠীতে যখন নেই, তখন নিশ্চয়ই বিপক্ষ গোষ্ঠীর লোক, ফলে দল-নিরপেক্ষ অসংশ্লিষ্ট লেখকের পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগই সার হয়। স্বাধীন লেখক হওয়ার কল্পনাটা যেতাই মনোহারী হোক, তা দিয়ে তো আর পেট ভরে না, বাস্তব ক্ষেত্রে এসে দেখা যায় দল বা গোষ্ঠীর খাতায় নাম লেখালে তবেই কোন লেখক এ সাহিত্যে পাংক্তের বলে গণ্য হয়, অন্যথায় তাকে সব পক্ষেরই কমবেশী অসহ-যোগিতার সম্মুখীন হয়ে কষ্ট পেতে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সে ওই গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার কারণেই বর্জিত হয়।

সুতরাং রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকবার জো কোথায়? পূর্বেই বলেছি, আজকের সাহিত্যের পরতে পরতে রাজনীতির হাওয়া, রাজনীতি বাদ দিয়ে বোধহয় আজকের দিনে সাহিত্য করাই সম্ভব নয়। যে-কোন কাগজে লিখতে যান খোঁজ নিয়ে জানবেন, হয় সেটা কংগ্রেসের এ-দলের বা ও-দলের কাগজ, নয়তো সি পি আই বা সি পি এম-এর পত্রিকা, নয়তো তার পিছনে সোশ্যালিস্টদের মদত আছে নয়তো আর এস পি এস-কাগজ চালাচ্ছে, নতুবা, এটা হালের ব্যাপার, নকশালরা এর পেছনে রয়েছে। বিশদ্রব্দ সাহিত্য পত্রিকা বলতে আর এ কালে কোন পত্রিকা আছে কি না সন্দেহ, সব পত্রিকাই কম-বেশী রাজনীতির ক্ষরে মাথা মুড়িয়ে জাত খুঁয়েছে। এমনকি যে-সব পত্রিকাকে আপাতদৃষ্টিতে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য পত্রিকা বলে মনে হয়, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তার পশ্চাতেও কোন-না-কোন রংয়ের রাজনীতির পোষকতা রয়েছে। সেটা হঠাৎ বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু একটু আঁচড় কাটলেই ভিতরের রূপ বোঁরিয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় রাজনীতি সম্বন্ধে নিষ্পত্তি থাকবার কি উপায় আছে। নিজে না চাইলেও নিছক বৈষয়িক কারণেই রাজনীতির সঙ্গে অসম্পৃক্ত লেখককে রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দেয়। প্রায় ঘাড়ের ধরে তাঁকে বুদ্ধিয়ে দেয়, তুমি যে রাজনীতির প্রভাব থেকে গা বাঁচিয়ে বিশদ্রব্দ সাহিত্য চর্চা করবার আনন্দে আছো, কে তোমার ওই বিশদ্রব্দতার মূল্য দেয়? "এস্টাব্লিশ-মেন্ট"-এর কাগজেই লেখো, আর প্রগতিপন্থীদের কাগজেই লেখো, সেই সেই কাগজের "লাইন অব থিংকিং"-এর অনুমত ও মনোমত না হলে তোমার রচনা সে কাগজে গৃহীত হবার সম্ভাবনা অল্প। শব্দ বিশদ্রব্দ সাহিত্যে তদগত থাক-

বার আনন্দে বগল বাজালেই তো হলো না, যে-লেখা লিখেছো তার তো সম্মতি হওয়া চাই। আর যদি শব্দিকরে আমসি হয়ে জীবন ধারণ করাটাকেই বরণীয় আদর্শ বলে মেনে নিয়ে থাকো তা হলে থাকো তোমার নিরপেক্ষতার অভিমান নিয়ে, কেউ তোমাকে ঘাঁটতে আসবে না। কিন্তু রচনাকে বিক্রয়-যোগ্য পণ্য হিসাবে চালাতে গিয়েছ কি তোমাকে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কমবেশী রফা করতে হবে, তোমার অনমনীয় আদর্শকে কিছুটা নমনীয় করে তুলতে হবে। নইলে এ সমাজে তুমি টিকতেই পারবে না। ঢাকী শব্দ বিসর্জনের মতো তোমার আদর্শ সমেত তুমি অতলে তলিয়ে যাবে।

তাই বলছিলাম, দায়ে পড়ে আমার মতো রাজনীতি-নিরপেক্ষ লেখককেও রাজনীতি সম্বন্ধে সচে-তন হতে হয়। তার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করতে হয়। কোন পত্রিকা কোন প্রকাশক কোন সাহিত্য-গোষ্ঠী কোন মতাদর্শের দ্বারা চালিত বা কী রাজনৈতিক মতলবে চলে, তার খোঁজখবর রাখতে হয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এটা করতে হয়, কেন না গরজ বড়ো বালাই। আত্মরক্ষার গরজেই আমাকে বুদ্ধিসূত্রে হিসাব করে ওই সাহিত্যিক দল-দলগুলোর মধ্য দিয়ে পথ করে নেবার চেষ্টা করতে হয়। কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠীকেই আমার চটাবার উপায় নেই, তা হলে সে গোষ্ঠী ভাবলে তাঁদের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর সঙ্গে আমরা গোপন বোঝাপড়া রয়েছে আর তারই প্ররোচনায় তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত করছি। দল, দল, আর দল—সমস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রটাই দলীয় আবহাওয়ায় বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। নির্দলীয় ভূমি থেকে কোন একটা সত্য কথা বলবার উপায় নেই, হলেই তার কদর্থ করা হবে এবং উক্তিটি এ-দল বা ও-দলের কু-মন্ত্রণাপ্রসূত এই রকম মনে করা হবে। কিন্তু যাঁরা দলভুক্ত লেখক তাঁদের পারস্পরিক বিরুদ্ধাচারণে কেউ কিছু মনে করে না, কারণ তাঁদের মতামত তো জানাই আছে আর তাঁরা এক দল আরেক দলের নীতি বা কর্মপন্থার সমালোচনা করবে এ তো ধরে নেওয়াই আছে, শব্দ তাই নয়, এটাই একে অপ-রের কাছ থেকে তাঁরা প্রত্যাশা করেন।

দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হবে। যেমন সি পি আই ও সি পি এম। এই দুইটি রাজ-নৈতিক দল বাষাটি সালের পর থেকে পরস্পরের ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁদের নিজ নিজ আওতাধীন সাহিত্য পত্রিকায় প্রায়শঃ একে অপরের মূণ্ডপাত করেন। ইদানীং কালে সম্পর্ক এত-টাই তিক্ত হয়েছে যে, এক দল আরেক দলের শাপ-শাপান্ত না করে জল গ্রহণ করেন না। কিন্তু মজা এই যে, এঁদের এই পারস্প-রিক তিক্ত সমালোচনায় দু'দলেরই নির্লিপ্ত মনোভাব, যেন তাতে (শেষাংশ সত্যাপ পৃষ্ঠায়)

৥ সুলেখা মানই উৎকর্ষ • উৎকর্ষ মানই সুলেখা ৥



সুলেখা স্পেশ্যাল
পার্মানেন্ট : স্লু-স্ল্যাক
রয়েল স্লু * স্ল্যাক
ব্রাউন
ওয়াশেবল : রয়েল স্লু
রেড * গ্রীণ



সুলেখা এক্সিকিউটিভ
পার্মানেন্ট : স্লু-স্ল্যাক
নেডি স্লু * সুপার স্ল্যাক
ওয়াশেবল : রয়েল স্লু
এমারেল্ড
গ্রীণ * স্টারলেট রেড



সুলেখা জেভেল
পার্মানেন্ট : স্লু-স্ল্যাক
ওয়াশেবল : রয়েল স্লু * রেড * স্ল্যাক

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড,
কলিকাতা • গাজিয়াবাস

SW-4/71

সুলেখা
ভারতের সর্বাধিক বিক্রয়ের
গৌরবধন্য কালি

সি পি আই (এম-এল) এর রাজনীতি নিয়ে কৌতব

১৯৬৭ সালে জন্ম হয় নকশাল-বাড়ীর কৃষক আন্দোলনের। গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত আন্দোলনের বাঁক এই প্রথম ঘুরিয়ে দিলেন নকশালবাড়ীর বিপ্লবী কৃষক জনতা এবং প্রমাণ করলেন যে ভারতবর্ষ বিপ্লবের গর্ভে অবস্থান করছে। ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এদেশে এখন শাসক শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব, যার প্রমাণ নকশালবাড়ীর ঘটনার অব্যবহিত পরে কংগ্রেস স্বিধাবিভক্ত। শাসকশ্রেণীও আর পুরোনো কায়দায় শাসন করে না, কিংবা শোষিত ও আগের মতন শোষিত হতে চায় না। প্রথমটির প্রমাণ পাই শাসক গোষ্ঠীর ক্রমাগত মনোযোগ পাটানোর ঘটনায় এবং দ্বিতীয়টির প্রমাণ রাখে নকশালবাড়ীর বিপ্লবী কৃষক জনতা। একদিকে দেখি আমাদের বর্তমান ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক যুগ্মকাণ্ডে মাথা দিয়ে গরীব ক্রমশ গরীব হয়ে যাচ্ছে আর অন্যদিকে বড়লোক ক্রমশ বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের মহান সরকার মধ্যবিত্ত সমাজকে কিছু পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

মহামতি লেনিনের নির্দেশ অনুসারে কোন দেশের বিপ্লবী পরিস্থিতি বর্তমান কি অবর্তমান তা সঠিকভাবে জানা যায় যদি সে দেশের বাল্যব পরিস্থিতি আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির কঠিনপাথরে যাচাই করে নি। সুতরাং এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আমাদের এই উপমহাদেশ ভারতবর্ষে আজ বিপ্লবিক পরিস্থিতি বর্তমান।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শতকরা সত্তর-আশি ভাগ লোক কৃষিজীবী। অতএব এদেশে সশস্ত্র বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়াও কৃষক শ্রেণীর সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। কারণ আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে মহান জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করতে পারে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং কৃষক শ্রেণীর সহায়তায়।

ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে বহু ভূমিহীন এবং দরিদ্র কৃষকের বাস। সুতরাং যে সমস্ত রাজনৈতিক দল মনে করেন যে জমিদার-আন্দোলন পরিচালনা করে সর্বোচ্চ ভূমি ব্যবস্থা চালু করলে কৃষকের মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তারা আর কিছু করুন বা না করুন শূন্যে প্রাসাদ তৈরীর পরিকল্পনাই করছেন।

মনে করা যাক একটা গ্রামে বেশ কিছু জমি ভূমিহীন কৃষক জনতার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো। কিন্তু জমি চাষ করতে যে

জমিহীনদের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী সেই লাঙল, হাল, বা বলদ ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক কোথায় পাবেন? বাঁজ-ধানই বা কোথায়? ধরে নেওয়া যাক তাও পাওয়া গেল। এখন যদি কৃষকের বলদটি মারা পড়ে কিংবা লাঙল বা হাল অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে সেগুলি নতুন করে কিনবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। গরীব কৃষকের হাতে ধান ওঠবার আগে সে পরিমাণ অর্থ না থাকাই স্বাভাবিক। বাধ্য হয়েই তখন তাকে যেতে হয় মহাজন কিংবা ধনী চাষীর কাছে। চড়া সন্দেশ টাকা ধার নিয়ে তার এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে হয়। পরে ধান উঠলে সে যা টাকা পায় তাতে তার সম্বৎসর চলে না। এছাড়া খরা বা দারিদ্র্য তো আছেই। সুতরাং আবার তাকে নতুন ধার করতে হয় এবং এই ভাবে সন্দেশ ঠেলেতে ঠেলেতেই তার আসল বাঁক থেকে যায়। অবশেষে আসল দিতে গিয়ে তার সামান্য পরিমাণ প্রাপ্ত জমি আবার মহাজন বা ধনী চাষীর হাতে চলে যায়। এছাড়া আমাদের ভারতের গ্রামে প্রচুর বেকারত্ব তো রয়েছেই। সুতরাং যতদিন না শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানব্বের রাজত্ব কায়ম হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ভূমির কোন মূল সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সুতরাং কৃষকের একমাত্র কাজ তার নিজের রাজত্ব কায়ম করার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে বিপ্লবী ঝাঁটি তৈরী করা।

কি ভাবে এই বিপ্লবী ঝাঁটি তৈরী করা যায় তা প্রথম দেখিয়ে দিলেন নকশালবাড়ীর বিপ্লবী কৃষক জনতা, গ্রামে গ্রামে শ্রেণীশত্রু অর্থাৎ জোতদার, জমিদার, মহাজন ও তাদের দালালদের খতম করে। গ্রামে যেহেতু শাসকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা দর্বল সেহেতু গ্রামে লাল সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সর্বাপেক্ষা সহজ। কিন্তু প্রশ্ন, ব্যক্তিহত্যা করে কি শোষক শ্রেণীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা যায়? যদি কোনো ভূমিহীন কিংবা দরিদ্র কৃষক তার চরম শ্রেণী-ঘৃণা বশে কোন শ্রেণী শত্রুকে খতম করে তাহলে সেখানে তাকে বাধ্য দিতে যাওয়া মানে তার শ্রেণী ঘৃণার প্রকাশকে ব্যর্থ করে দেওয়া এবং এর ফলে তার বিপ্লবী মনোবল ভেঙে দেওয়া। এ ধরনের সবচেয়ে বড় মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতা মহান চেয়ারম্যান মাও সে তুংও একথা স্বীকার করেছেন তাঁর হুনানের কৃষক আন্দোলনের রিপোর্টে। যদি ভূমিহীন কৃষকদের সাহায্যে ছোট ছোট গেরিলা দল সংগঠন করে অ্যাকশান করানো যায় তবে গ্রামে শত্রু ঝাঁটি তৈরী করা সম্ভবপর। তবে এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন ও দরিদ্র

কৃষকের ওপরে নির্ভর করে। কিন্তু কোন শ্রেণী-শত্রুকে খতম করার আগে তার শ্রেণীচরিত্র সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। নকশালপন্থীরা শ্রেণীশত্রু নির্ধারণ করেন জনতার আদালতে। এই আদালতে রায় দেবার ভার থাকে সম্পূর্ণ ভাবে সেই অঞ্চলের শোষিত কৃষকজনতার উপর। কোন জমিদার কতটা জমির মালিক কিংবা সেই অঞ্চলের জোতদার মহাজনরা কিভাবে কতটা পরিমাণ শোষণ করে তার উপর ভিত্তি করে বিপ্লবী কৃষকরা জনতার আদালতে রায় দেন যে তাকে খতম করা হবে কিনা। এছাড়া এদের দালালদেরও শ্রেণীশত্রু বলে ধরে নিয়ে খতম করা হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে জনতার আদালত কিছু কিছু জমিদারকে খতম করার নির্দেশ দেন না। যদি কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারী প্রাপ্ত হয় কিন্তু সে কৃষক জনতাকে শোষণ না করে থাকে তবে সেক্ষেত্রে জনতার আদালত তার উপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেন না। এ সমস্ত অ্যাকশান সাধারণত ছোট ছোট গেরিলাদলে বিভক্ত হয়ে করা হয় এবং যে সমস্ত অস্ত্রের উপর নির্ভর করে করা হয় সেগুলি সাধারণত দা, খন্ডা, কাস্তে। নকশালপন্থীরা চারু মজুমদার প্রথমে এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছিলেন যে আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে আধুনিক অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। কারণ তাহলে অস্ত্রই প্রাধান্য পেয়ে যায়। শ্রেণীশত্রুর চরম প্রকাশ ব্যাহত হয় এবং অস্ত্রের উপর নির্ভরশীলতার ফলে আন্দোলন পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু উনিশশ একাত্তর সালে যখন মাগুরজান থানার বিপ্লবী কৃষকরা পলিশ শের হাত থেকে রাইফেল ছিনতাই করলেন তখনই নকশালপন্থীদের পার্টির নেতা চারু মজুমদার গ্রামে এবং শহরে শ্রেণীশত্রুর কাছ থেকে রাইফেল ছিনতাই করার নির্দেশ দিলেন এবং এইভাবে গণমুক্তি ফৌজ গড়ার আহ্বান জানানেন। কারণ একথা ঠিকই, গণমুক্তিফৌজ ছাড়া জনগণ নিঃস্বঃ।

শ্রমিকের প্রতি সি পি আই (এম-এল)এর নির্দেশ যে তারা শ্রমিকের মধ্যে তাদের রাজনীতির প্রচার রাখবেন এবং শহরের শ্রেণী-শত্রু (পলিশ, মিলিটারি ও তাদের দালাল কিংবা সদখোর মহাজন ফ্যাকটরির মালিক) খতম করবেন এবং তাদের কাছ থেকে রাইফেল ছিনতাই করবেন। এভাবে তারা গড়ে তুলবেন লাল সন্ত্রাস, তবে তা সংঘটিত হবে মূলতঃ গেরিলা কায়দায়। রাইফেল ছিনতাই সম্বন্ধে অনেক বামপন্থী দলের মতবৈধ থাকে। তাদের জেনে রাখা ভাল যে বলশেভিক পার্টির ইতিহাস পড়লে জানতে পারা যায় যে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের সময় শ্রমিকরা ফ্যাকটরির ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং গ্রামে অনেক কুলকদেরও শেষ করেন ও সঙ্গে সঙ্গে শহরে পলিশ মিলিটারির কাছ থেকে রাইফেল ছিনতাই করেন। রাইফেল

ছিনতাই সম্পর্কে লেনিনের সমর্থন তার লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব মানে কেউ যেন আশা করেন না যে, শহরে কোন ফ্যাকটরির শ্রমিক ঘাড়ে বন্দকে নিয়ে গ্রামে লড়তে যাবেন, তবে তিনি অপরদিকে অর্থনৈতিক আন্দোলনে ভুবে যাওয়া শ্রমিক সংগঠনেও যোগদান করবেন না। বর্তমানে বামপন্থী পার্টিগুলোর ইউনিয়ন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বন্ধ বা হরতাল পালন করেন। সাতষাট সালের পরের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে কিছু দিন আগে সি পি আই এম দর্গাপুরে শব্দমাত্র একবার একাত্তর সালে এই প্রথম রাজনৈতিক কারণে বন্ধ ডেকেছিল। এছাড়া কোন ট্রেড ইউনিয়ন আজ পর্যন্ত নির্বাচনের তারিখ ছাড়া বন্ধ ডাকে নি। তবে অনেক বামপন্থী পার্টি গ্রামে এই ধরনের ব্যক্তি হত্যা করার বিরোধী এবং তারা এই সি পি আই এম দলকে রাশিয়ান নারদনিকদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাদের অবগতির জন্য এক্ষেত্রে নারদনিকদের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

রাশিয়ান বলশেভিক পার্টির ইতিহাস পড়লে সঠিকভাবে এই নারদনিকদের সম্বন্ধে জানতে পারা যায় তবে তার আগে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু চীনের মতন ভারতবর্ষ কিংবা অন্য কোন আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশে বর্তমানে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবে এবং যেহেতু ভারতবর্ষে কৃষিজীবী জনতার সংখ্যা শতকরা সত্তর-আশি ভাগ, সেহেতু আমাদের বহুলাংশে কৃষকের ওপরই নির্ভরশীল হতে হবে। কিন্তু নেতৃত্ব দেবেন শ্রমিকশ্রেণীই। চীন বিপ্লবের ইতিহাসের চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর সংগঠন গড়ার মূলে এই তত্ত্বই কাজ করেছিল।

কিন্তু রাশিয়ান নারদনিক পার্টি মনে করত যে “একমাত্র কৃষকের উপর নির্ভর করেই জারতন্ত্র এবং জমিদারদের উচ্ছেদ করা সম্ভবপর। তারা জারতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব স্বীকার করতে কিংবা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে মোটেই রাজী ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের সি পি আই এম এল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং সহযোগিতায় বিশ্বাসী।

স্লেখানভ নারদনিকদের ভুলদ্রুটি সম্বন্ধে সমালোচনা কালে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেন।

(এক) নারদনিকরা বিশ্বাস করত যে রাশিয়াতে ধনতন্ত্র একটি “দ্রুটন” মাত্র। এবং এর কোন বিকাশ হবে না এবং সেহেতু প্রলেতারিয়েতের উৎপত্তি কিংবা বিকাশ হবে না;

(দুই) নারদনিকরা শ্রমিক শ্রেণীকে অগ্রবর্তী শ্রেণী হিসাবে

স্বীকার করে না, তারা প্রলেতারিয়েতদের ছাড়াই সমাজতন্ত্রের চিন্তা করত;

(তিন) মানব ইতিহাসের প্রতি নারদনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিকারক। তারা জানত না কিংবা বস্তুত না সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নীতিগুলি এই পরিপ্রেক্ষিতে খব পিছিয়ে ছিল। তাদের মতে, কোন শ্রেণী কিংবা শ্রেণীসংগ্রাম ইতিহাস সৃষ্টি করে না, কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তিরাই “হিরোরাই” ইতিহাস সৃষ্টি করে।

খব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে স্লেখানভ নির্দেশিত নারদনিকদের চরিত্রের সঙ্গে সি পি আই এম এল লাইনের কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না একমাত্র ব্যক্তিহত্যা ছাড়া। তবে ব্যক্তিহত্যার বিষয়ে মহামতি লেনিনের কিছু কিছু উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

গেরিলা লড়াই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটি বিশেষ রচনায় লেনিন বলেন য সশস্ত্র সংগ্রামের দ্রুটি ভিন্ন দিক আছে। “...প্রথম পর্যায়ে একটি দিক ব্যক্তিহত্যা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং পলিশ মিলিটারির নিচর তল্লাশ কর্মচারীদের হত্যা করা।” ভিয়েনায় একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এক ব্যক্তিকে চিঠি লিখতে গিয়ে (২৫শে অক্টোবর ১৯১৬) লেনিন বলেন “সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদের পুরনো ইস্তফা লেখে “খতম মানেই খুন নয়, আমরা ব্যক্তিহত্যার বিরোধী, কিন্তু বিপ্লবী কায়দা হিসাবে ব্যক্তি হত্যা হচ্ছে ক্ষতিকারক।... কিন্তু গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের দাম আছে”। “ব্লাডি সানডে” ঘটনা প্রসঙ্গে লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে লিখেছিলেন, “প্রত্যেক কোম্পানীকে ছোট এবং সাধারণ বোমের ফরমুলা শিখিয়ে দাও। কিছু কিছু এই মূহুর্তে স্পাই খতম করবে কিংবা পলিশ স্টেশন উড়িয়ে দেবে এবং অন্যরা সংগঠিত হয়ে ব্যাঙ্কের উপর আক্রমণ করবে আপরাইজিংয়ের জন্য টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।”

সাতষাট সালে নকশালপন্থীরা “নির্বাচন বয়কট করুন” এই শ্লোগান তোলেন। এ বছরেও নির্বাচনের সময় নকশালপন্থীরা ওই একই শ্লোগান তোলেন। জানি না তারা এই শ্লোগান তুলে কতটা সফল হয়েছেন, তবে পার্লামেন্ট যে একটি শূন্যের খোঁয়াড় মহান নেতা লেনিনের এই উক্তি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে সি পি আই এম বা সি পি আই ইয়ত্ত প্রশ্ন তুলবেন যে লেনিনও “ভুমাতে” যোগদান করেছিলেন, কিন্তু লেনিন যখন ভুমাতে অংশগ্রহণ করেন তখন কি দেশে বিপ্লবী জোয়ার বর্তমান ছিল? উনিশশ পাঁচ সালের সশস্ত্র আন্দোলনের পর রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বিপ্লবী (শেষাংশ ২৩শ পৃষ্ঠায়)

যৌবনের সংকট : বাংলা দেশ

অর্জুন বল্লোপাধ্যায়

যুব বিদ্রোহ, যুব অসন্তোষ বা ছাত্র বিদ্রোহ আজ যেমন সারা বিশ্বের ঘটনা, তেমনই বিশেষ করে বাংলা দেশেরও ঘটনা। আর এ ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, জারতের মত দৈর্ঘ্য-আসলা কোন দেশই ব্যতিক্রম নয়,—যাঁরা কর্তা, ক্ষমতায় আসীন তাঁদের প্রসঙ্গে, আমলাতন্ত্রের বিপক্ষে, সমগ্র সমাজের অর্থোত্তিকতার প্রতিবাদে যৌবনের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ নতুন টেনশনের সৃষ্টি করেছে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, এবং একমাত্র চীনেই বোধ হয় কতৃষ্ণের উচ্চতম পর্যায় থেকে এই যুব বিদ্রোহকে উৎসাহিত করা হয়েছে, বম্বার্ড দি হেড কোয়ার্টার্স বলে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বদা আর্থনৈতিক বৈষম্য বা দারিদ্র্যই যে কারণ হিসাবে এখানে ক্রিয়ারশীল, তা নয়, অন্যান্য আরও বহু চাপ ভাবাদর্শগত সংঘাত বিশিষ্ট রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, বা যৌবনের নিয়ম ভাঙ্গার প্রবণতা, আনানিকর্ষিত বোঁক এর পিছনে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করেছে অথবা মার্কস-কথিত চূড়ান্ত সামাজিক তথা নৈতিক বিষণ্ণীকরণ বা অ্যালিয়েনেশনও বিক্ষোভে বিদ্রোহে নিয়ে যাচ্ছে, অস্তিত্ববাদী ভাবনাও পশ্চিমে এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কার্যকর। কিন্তু অনন্তর দেশগুলিতে এই যুব বিদ্রোহ মূলতঃ তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকেই উঠে আসছে—প্রত্যক্ষ চতুর্দিকে পরিকণ দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক সংকট পরিপ্রেক্ষিত তৈরী করেছে এখানে নিশ্চিতভাবে, এর সঙ্গে আরও নানা প্রসঙ্গ অবশ্যই জড়িত। তবে বাংলাদেশে যুব বিদ্রোহ বা ছাত্র বিক্ষোভ প্রধানতঃ একটি শ্রেণীর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। এখনও পর্যন্ত বিদ্রোহের মূল

প্রাণিত হয়ে আছে শহরের অ-কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। বস্তুতঃ বিশেষ শতকের গোড়া থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, আরও ঠিক ভাবে বলতে গেলে, যাকে আধুনিক সামাজিক ঐতিহাসিকরা “ভদ্রলোক” বলছেন তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা, মনোবল, কলোনীর ক্রোধান্ত বিকাশ এবং সর্বোপরি ব্যর্থতাই এই যুব বিদ্রোহের পটভূমি রচনা করেছে। নেহরুর প্রথম পঞ্চবার্ষিকের স্বর্ণগোধূলির পর হতাশ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তর-বাহীনতার বংশধররা ইতিহাসের নিয়মেই জড়লে উঠেছে, তার পিতৃ-পিতামহের সমগ্র উত্তরাধিকারকেই অস্বীকার করতে চাইছে—এমন কি বাঙালী মধ্যবিত্তের উনিশের শতকের যে উৎসমূল, রামমোহন, বিদ্যাসাগর তাঁরাও অস্বীকৃত হচ্ছেন বর্তমানের যৌবকোষে, বাঙালী মধ্যবিত্তের নিজেদেরই স্বার্থে এতাবৎ তাদের বিকৃত ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায়।

বাঙালী মধ্যবিত্তের জন্ম কোন স্বাধীন বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্ক প্রচেষ্টায় নয়, এমন কী কলোনির সীমার মধ্যেও স্বদেশীয় উদ্যোগেও নয়, নিতান্তই ইংরেজীর শিক্ষার সরোগ নিয়ে চাকুরীর আশায়, নিজস্ব স্ট্যাটাস বাড়ানোর। তাদের জাতিবর্ণগত শ্রেণীগত স্বার্থ যতদিন বৃটিশ সরকার রক্ষা করেছে ততদিনই বাঙালী ভদ্রলোকেরা সহযোগিতা করেছে। আর এই সহযোগিতায় অন্য জাতি বর্ণ বা শ্রেণীর স্বার্থবিরোধিতায় তারা কুণ্ঠ ছিল না। বস্তুতঃ উনিশের শতকের শেষের দিকে বৃটিশ রাজ ও তার শিক্ষিত প্রজাদের মধ্যে এই স্বার্থগত ফাঁক উপস্থিত হওয়াতেই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাস

জের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ একই সঙ্গে সাধারণ জাতি বর্ণ ধর্ম এবং শিক্ষা ও রাজনৈতিক মত নির্ভর সংগঠনের সভা ছিল—অর্থাৎ শাসকদের ভাষায় অর্থাৎ ইংরেজীতে শিক্ষিত হওয়াই এখানে বড় কথা ছিল। বাংলা দেশে এই শিক্ষার প্রথম সুযোগ নিয়েছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা—বস্তুতঃ একই সঙ্গে উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা। এই ভদ্রলোকেরা সাধারণ ধর্ম, ভাষা, সামাজিক প্রতিপত্তির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ছিল—আর শিক্ষা, উচ্চবর্ণ, অনেক ক্ষেত্রেই অর্থসম্পদ তাদের সমাজের অন্য স্তর থেকে তাদের পৃথক করেছিল। তাদের অপাকৃত ভাষা, জমি থেকে মনোমুগ্ধ জনসাধারণ থেকে কৃষকদের থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল—স্পষ্টতঃ বাঙালী মধ্যবিত্তের জন্ম বৃটিশ সরকারের আমলাতান্ত্রিক উৎসাহে, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে চাকুরীর উন্নতির, কেরিয়ার তৈরীর আশায় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতার, প্রায় নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়াতে। অবশ্য এই ইংরেজী শিক্ষার উৎসাহই এসেছিল ১৭৯৩-র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমি অর্থনীতির বিচিত্র দুর্দশায়, ভাঙনে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেহেতু বৃটিশ সরকারের কলোনির নীতির অন্যতম ফল, তাই তাদের চাকুরীগত হতাশা যখন দেখা দিল, তখনও তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তারা হতে পারল না, কারণ কেবল চাকুরী পাওয়ার জন্য যে শ্রেণীর উত্থান, তার এত বড় ভূমিকা পালনও সম্ভব নয়। বস্তুতঃ জন্মক্ষণ থেকেই বাঙালী মধ্যবিত্তের শিক্ষা, চিন্তা, ভাবনা এই চাকুরী, কেরিয়ার নিয়ে গঠিত—তাই সে একদিকে শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের যেমন “বন্দমূল ভৎসনাকারী”, তেমনি “বিশিষ্ট সেবাইত”ও বটে। (অনিল শীলের দি ইমার্জেন্স অব ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিজম গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।)

এই বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণী প্রথমাবধিই কোন প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনের পথে না গিয়ে আইনসভার রাজনীতিতে আস্থা রেখেছিল। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাই

ছিল, আর্থনৈতিক রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তিই ছিল আমদানী করা আমলাতান্ত্রিক, শিক্ষাবিভাগ, আইনসভা প্রভৃতি লিবারেল প্রতিষ্ঠানসমূহে সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করায়। এই সাফল্যের মূলকথা ছিল বৃটিশ আমলে প্রাপ্ত নতুন স্ট্যাটাসকে বজায় রাখা, সংস্কার ইত্যাদি এমন ভাবে করা যাতে সমাজের অন্য স্তরের ব্যক্তিরা যেন সামনে না আসতে পারে। তাই ভোটাধিকারের সীমা বাড়ানোতে তাদের ছিল ঘোরতর আপত্তি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ই এই ভদ্রলোকেরা জনসমর্থন সেভাবে জোগাড় করতে পারেনি, কারণ জনগণের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগের মাধ্যম ছিল না—বৃটিশদের কাছে থেকে শেখা আইনসভা ইত্যাদির রাজনীতি প্রথমাবধিই জনসাধারণের কাছে বাধার সৃষ্টি করেছিল—বস্তুতঃ এই সৌদির পর্যন্ত বাঙালী ভদ্রলোক নেতৃত্বে স্বাম্পন্থী দল-গুলোও গ্রামাঞ্চলে কিছু করতে পারেনি, তার মূল এই মধ্যবিত্তের বিকাশের মধ্যেই নিহিত। তারওপর পাশ্চাত্য শিক্ষায় পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত এই ভদ্রলোক শ্রেণীর বহু সাধারণ বস্ত্যও অ-ভদ্রলোকদের কাছে দূর্বোধ্য ছিল। তারা যে জাতীয়তা, রাষ্ট্র, স্বাধীনতা, ইত্যাদি ধারণার কথা বলত কৃষকদের কাছে তার অর্থই ছিল না—কারণ কৃষকরা শোষক হিসাবে প্রত্যক্ষতঃ জমিদারদেরই অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে ঐ ভদ্রলোকদেরই দেখত। তদুপরি মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে তাঁদের রাজনীতি, তাদের চিন্তাভাবনা আরও সংকটের সৃষ্টি করেছিল। আসলে যদিও ভদ্রলোক শ্রেণীর সৃষ্টি জমির সূত্রে গ্রামের সংযোগ ছিল, তথাপি তাদের শ্রেণীস্বার্থেই তারা কৃষকদের রাজনৈতিক সমর্থন সংগ্রহ করতে পারেনি। “ছোটলোক”দের থেকে সর্বক্ষণই দূরে থেকেছে—অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বে যে দেশব্যাপী আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় অঙ্কুরিত হবার সম্ভাবনা থাকে তাও এই ভদ্রলোকদের, মধ্যবিত্তদের ক্ষমতায় ছিল না। বস্তুতঃ তাদের জাতীয় চেতনাও তাই হয়ে দাঁড়ায় ফ্যানটাস ফ্যানোর ভাষায়, “an empty shell, a crude and fragile travesty of what it might have been” বলাই বাহুল্য, এই ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ শতকের কুড়ির দশক থেকেই তাদের ক্ষমতার সংকট দেখতে সুরু করে—উনিশশ ছাব্বিশ-এর পর থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে পরিপ্রেক্ষিতের উদ্ভব হল তাতে হিন্দু ভদ্রলোকদের আশার যুগ শেষ হতে চলল। উনিশশ পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ও উনিশশ বারো খৃষ্টাব্দে বঙ্গ যুদ্ধ হওয়ার সাফল্যে বাঙালী ভদ্রলোক যে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখেছিল, তা উনিশশ তিরিশ-এর দশকে ভাঙতে শুরু করে। প্রাদেশিক আইনসভা, নানা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের চলে আসতে হল। তদুপরি

গান্ধীর রাজনীতি নিদারুণ আঘাত হানল এই ভদ্রলোক এলিটদের ক্ষমতার ভিত ধরে। আসলে নিজ বাসভূমে পরবাসী এই শ্রেণী বঙ্গভঙ্গে তাঁদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সুরু করেছিল, তা চুরমার হয়ে গেল সাতচল্লিশ-এর দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গে। উনিশশ তেতাচল্লিশ-এর বারোই ফেব্রুয়ারী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর পদত্যাগের কারণ বোঝাবে বর্ণনা করলেন তাতেই বোঝা গেল যে, যে আইনসভার রাজনীতিতে হিন্দু ভদ্রলোক তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বেঁধেছিল তার ওপর তারা আস্থা হারিয়েছে। বাংলার ভবিষ্যতের সম্পর্কে প্রধান সিদ্ধান্ত গুলিকেও তারা আর প্রভাবিত করতে পারবে না। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতিই হিন্দু ভদ্রলোকের সংকটকে তীব্রভাবে দেখায়—হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণে চেষ্টা চালানেন প্রথমে আইনসভায় ও পরে কর্পোরেশনে, ব্যর্থ হল, অন্যবিধ উদ্বেজনার বিক্ষোভে। সাতচল্লিশ-এ স্বাধীনতার সমগ্র বাঙালী ভদ্রলোক হতাশ, বিরক্ত এবং বিক্ষুব্ধ। (বাঙালী ভদ্রলোকের এই রূপান্তরের জন্য জে এচ রামফিল্ড-এর এলিট কনক্লিকেট ইন এ স্পেরিয়াল সোসাইটি টোয়েন্টিয়েথ সেণ্ডুরী বেঙ্গল দ্রষ্টব্য। আর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্য বি ডি গ্রাহাম-এর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অ্যান্ড দি কম্যানালিস্ট অলটারনেটিভ প্রবন্ধ।)

বর্তমান বাংলা দেশের যুব বিদ্রোহের পশ্চাতে এই ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি গঠন, দৃষ্টিভঙ্গী, তার আশা ও ব্যর্থতার পটভূমি সর্বদাই স্মরণীয়। এই ধরণের শ্রেণীর মধ্যে সর্বদাই দোটাধাকে—লিবারেল কনসিটিটিউশনালিস্ট এবং রোমান্টিক রেসোলিউশনারির মধ্যে মনোবল এই ভদ্রলোক শ্রেণীর অবশ্যই আসবে। কারণ যখনই পরিবর্তন রাজনীতির নানা কাটাকুটিতে তারা হতাশ হয়ে ব্যর্থ হয়, তখনই চমকে চমকে ওঠে পরিবর্তনের বাইরে। আন্দোলনের বোঁক, কখনও সশস্ত্র সন্ত্রাস। বস্তুতঃ আমাদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বা টেররিস্ট মনোভ্রমণ ভদ্রলোকের ঐ রোমান্টিক বিপ্লবীর বিদ্যৎ চমক—তাঁদের নিভীকতা, আত্মত্যাগের আদর্শ অবশ্যই স্মরণীয়, স্মরণীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দের তাদের ডাকাত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা—কিন্তু এ সন্ত্রাসও নিতান্তই হতাশ হয়ে, প্রতিক্রিয়ায়, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভদ্রলোক রাজনীতির সীমার মধ্যেই। বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রেরণা ভদ্রলোকের সীমা লঙ্ঘনে সহায়তা করতে পারে নি। ভদ্রলোকের বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে কৃষক সাধারণের সঙ্গে সংযোগে নতুন আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টাই এদের মধ্যে ছিল না। ছিল না বঙ্গেই গান্ধীর আন্দোলনের সামনে তারা শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না।

বস্তুতঃ বাংলা দেশের গান্ধী (শেখার ২৪শ পৃষ্ঠায়)

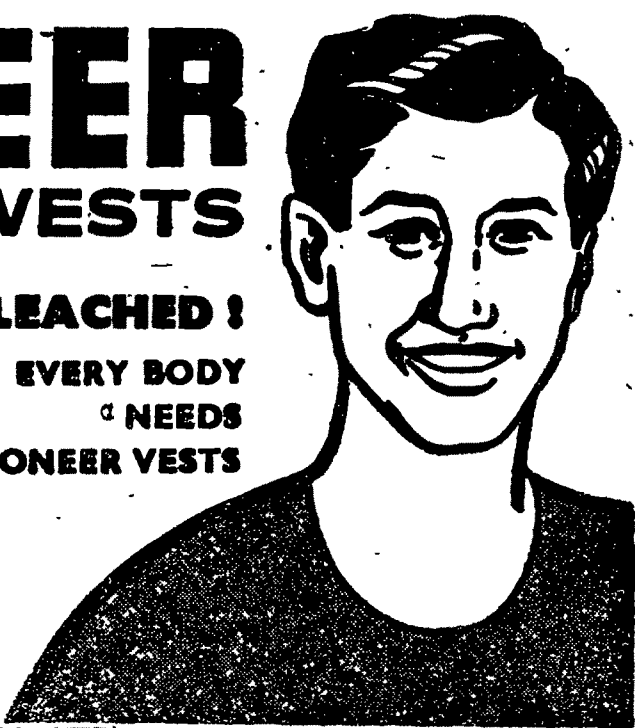
PIONEER

VESTS

ARE
HYGIENICALLY BLEACHED !
EVERY BODY
NEEDS
PIONEER VESTS



Also Tee shirts,
Tennis shirts,
Chain Shirts,
Drawers &
Briefs



PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS, CALCUTTA-2 Phone : 34-3888

রুচি কুরুচি বিকৃতি

বীরেন্দ্র মিত্র

"... bad films, plays, novels and articles, if we do not examine them, criticize them and boycott them, will poison our minds, gradually transform us and lead us on to the wrong track. Historical experience proves that no enemy, however ferocious and whatever his tricks, is to be feared. What is to be feared is that we ourselves should relax vigilance and let ourselves be disarmed mentally".

সুচিন্তা-উত্তম জর্জিটর একটা পরোনো ছবি পদনশ দেখে ফেললাম। নাম, "পথে হল দেবী"। পরলা আশ্বপ্রকাশের যুগে এছবি দারুণ "হিট" করেছিল। আজ সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে কিন্তু সেই ছবির প্রদর্শনীতেই শিহরিভ-বোধ করছে। সেদিনের রুচি আর আজকের রুচিতে রীতিমত দৃষ্টি উপস্থিত হওয়াই শিহরিভের কারণ। এমনকি সেদিনের তম্র দর্শকেরও আজ ভীতহত অবস্থা। ব্যাপারটা বাস্তবিক উপভোগ্য।

বিভিন্ন দৃশ্যে সেদিনের তরুণী সুচিন্তা সেনের মেক-আপ দেখে দেখে আজকের মহিলা দর্শকবৃন্দ সলজ্জ চীৎকারধ্বনি তুলছেন, "ও-মা!" অনেকের হসত মনে পড়ে যাচ্ছে, সেদিনের সর্বকনিষ্ঠ যে রুচির সঙ্গে তাল ঠেকে তাঁরা কপালের ওপর গম্ভীর গম্ভীর চুলে ছোট্ট ফেলেছিলেন, চুলের রিং চোখের ওপর দু'দিকে দিয়েছিলেন, আজকের চোখে তা আর মানাচ্ছেনা। আজ শুল্কলারীতিতে দপাশে পাতা চুলেই চকিতপ্রেক্ষার সর্বাধুনিক ফ্যাশন। তাই সেদিনের রিং-দোলানো পাতকাটা কেশদাম আজকের ষোড়শীর শীৎকার সংকর্ষক বাতিল রুচিমায়া।

আজকের নায়ক "উত্তম-কেশ"র দীর্ঘায়ত সিংগাড়াটি বর্জন করে নাছাটা চুলের অবিন্যস্ত শোভা আপন করে নিয়েছে বিদেশী ফিল্মী নায়ক এবং এদেশী হিপ-স্টাইল বা হিপিস্টাইল অনাকারকদের কায়দার। তরুণ দর্শকও তাই গতায়ু রুচি-জ্ঞানের উদ্দেশে চুলের জট আঙুল চালিয়ে পদীর ওপর মন্তব্যের গজনা ছুড়ে মারছে। সে কালের তারুণ্য গেছে; একালের তারুণ্য-চোখে তারই ট্রাজেডী বড় করণ লাগিছিল। এভারগ্রীণ নায়ক উত্তম-কেশের যখন তাঁর বিশাইণ্ড ঘরের মলমলে ট্রাউজার হাতীর কানের মতো আন্দোলিত করতে করতে প্রবেশ প্রস্থান করছেন, তখন প্রেক্ষাগৃহে মধুর হয়ে উঠছে হাস্য রোলে। কস্তুতঃ ড্রেনপাইপ-সহ চোখে দশ ইঞ্চির ওপর আর ইঞ্চি-দুইরেক আধিক্যও যেমানান ও বোকা বোকা লাগছে। অথচ কটা দিনই বা। এই আমরাই তো বড় ঘরের পরোনো প্যাণ্ট বছর দুই তিন

হল অলটার করিয়ে নিয়েছি দর্জিবাড়ি থেকে। এমনিই হয়। গতকালের রুচি সমকালে হাস্যকর ঠেকে। তবে সেই গতায়ু রুচিকে অবশ্য কুরুচি বলা যায় না।

"পথের পাঁচালী" রুচি পাল্টে না দিলে "পথে হল দেবী"র মতো ছবিকে আজ নিছক বোম্বাই মার্কা "তেরে-মেরে" শ্রেণীর ছবি বলে মনে হত না কারও। কিন্তু বাংলা ছবির বর্তমান অগ্রগতির নিরিখে এছবি এখন স্মৃতির রেকর্ড রুমে ময়লা ফাইলের মতো। তবে মজা এই যে, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে রুচি পাল্টেছে বলেই কিন্তু হিন্দী ছবির রাজ্যে রুচি বিবর্তন ঘটে নি। রুচি জিনিসটা কেবলমাত্র কালের ব্যবধানই পাল্টায় না। তার ওপর আঞ্চলিক এমন কি স্বেচ্ছ ব্যক্তিগত প্রভাবও পড়ে। ঠাকুরবাড়ির রুচি ব্রাহ্মসমাজ তো বটেই, শিক্ষিত বঙ্গ সমাজের ওপরও একদিন প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল। তেমনই গরু-দেবের শান্তিনিকেতন একটি বিশিষ্ট রুচি ও স্টাইল প্রবাহের উৎসভূমি। সাংস্কৃতিক চিন্তার বদাগতর আনয়নে এই রুচিবিবর্তন সাহায্য করেছিল।

বিশ শতকের শেষ পাদে কিন্তু বিদেশী রুচিপ্রবাহ সব কিছু ভুবিয়ে ভাসিয়ে কদমাজ করে দিয়েছে। আরও নির্দিষ্টতর গণ-নাম বলা যায়, ক্ষমতা হস্তান্তরের (যাকে আমরা স্বাধীনতা বলে শিখে জেনে আসছি) পর থেকেই বিদেশী রুচির প্রতি ভারতবাসীর আকর্ষণ তীব্রতা লাভ করেছে। ইতিপূর্বে স্বদেশীয়ানার বদগ বোধ-হর পরম্ব্যাপেক্ষী ভারতীয় মননের ওপর অবদমন ও অত্যাচার চালিয়ে আসছিল। দিল্লীর তখত-এ লাল-মুখের বদলে কালামুখের অধিকার কয়েম হওয়ার পরেই তাই দেখা গেল, ভারতবাসী পাল্লা দিয়ে সাহেব সাজার মাতলামিতে মেতে ওঠে। উত্তর ভারতের মসনদ বিলাসীরা পশ্চিমাদের মনে প্রাণে ভক্তিপ্রদা করেছেন এককালে। ইঠাৎ সমগ্র ভারতের মালিকানা করতল-গত হতে তাঁরা সাহেব বনার কস-রং শব্দ করে দিলেন। আর বাংলায়? নিজের জাতের ওপর যে জাতের তিলমাত্র ভক্তিপ্রদা নেই, সে কাঁপ করতে নেমে পড়ল বোম্বাই কালচারের। এরুচি কোনো সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি নয়, শ্রেণী বিশেষের বিলাসিতা মাত্র। পশ্চিমা-রুচি বোম্বাইয়ের দিল্লীর ডকে এ্যারোড্রোমে নেমে উত্তর ভারত দখল করল। বঙ্গ বিজয়ও সমাধা করল। আজকের দেশীয় রুচি পশ্চিমেরই মুখাপেক্ষী। আর কলকাতার কালচার ও রুচি তার ভারতীয় প্রভুর অনুকারী।

বাঙালী তরুণ তরুণী তাদের ভারতীয় প্রভুর অনুকরণে পোষাক-

রুচি পাল্টে নিচ্ছে। হীনম্মন্যতার এমন নিকটতম বাস্তব উদাহরণ এতো স্পষ্টভাবে অন্য প্রকট নয়। মানব অননুসরণ করে মহাজনকে। কিন্তু না ভারতবাসী ভারতীয় হিসেবে, না বাঙালী বাংলার সন্তান হিসেবে গর্বিত। তাই তাঁদের অনকরণক্ষেত্র জন্মভূমির গম্ভী অতিক্রম করে পশ্চিম মহাজনতুল্য-দের পেছনে নিতান্ত হ্যাংলার মতো ঘুরে বেড়ায়। নব রুচির প্রভাবও স্বরিত পায়ে তাদেরই সর্বগ্রাে আক্রমণ করে, যারা নিজের প্রতি কম আস্থাশীল ও প্রজ্ঞাবান, কিন্তু যাদের এ্যাম্বিশন স্বীয় আকর্ষণী ক্ষমতার অতিরিক্ত আশা করে। নিজেকে বিকৃত ও বিকৃত করার জন্য এদের অধৈর্য অতুলনীয়। ভারতের সেই শ্রেণীর জীবই সাত তাড়াতাড়ি পশ্চিমা রুচিকে আলিঙ্গন করে নেয় ও নিচ্ছে।

কিন্তু সেকথা থাক, যে কথা বলছিলাম :

বলছিলাম, রুচির অভিন্নরুচির কথা। রুচির অভিন্নরুচি প্রতিপত্তি-শালী শ্রেণী, বিশেষ অঞ্চল এবং সামাজিক স্তরের মূখ্যাপেক্ষী। রুচি জিনিসটা কেবলমাত্র কালের ব্যবধানই মনে চলে না। বিশেষ কালই যদি বিশেষ রুচির একমাত্র প্রবর্তক হত তবে বিশেষ রুচির প্রভাবও হত সার্বজনীন। কিন্তু তা তো হয় না। যা পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গী পাড়ায় নিত্যবিচরণশীল নাগরিকের রুচি, তার পক্ষে যথার্থভাবে উত্তর মধ্য পূর্ব এমনি দক্ষিণ কলকাতার মধ্য ও নিম্নমধ্য-বিত্ত পরিবারেও ঠাই করে নেওয়া খুব সহজ হয় না। যা ইংরেজি মাধ্যমের ও বিড়লা স্কুল কলেজের রুচি, তা আমাদের সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিরস্কারযোগ্য। এদেশে বিশেষ সুবিধাভোগী এবং পরগাছা সমাজে জাকচল রুচি, কিন্তু ধনাঢ্য বনেদী পরিবারে তা নিন্দ্যনীয় বিকৃতিমাত্র। বিশেষ দেশকালের গম্ভীতেও কোনো রুচিই তাই সার্বজনীন নয়। তবে সংখ্যানুপাতে যে রুচি-প্রবাহ অধিকাংশের ওপর প্রভাববিস্তার করে, একমাত্র তাই-ই আলোচ্য।

সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাবিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে যে রুচিবিবর্তন, বহু ক্ষেত্রে তাই-ই সার্বজনীন স্বীকৃতি পেয়ে যায়। ড্রেনপাইপ ট্রাউজার তার আবির্ভাব মূহুর্তে দৃষ্টিকটু বোধ হয়েছিল। অনেক কাগজে মন্তব্য সহ্য করতে হয়েছে তাকে। এমনকি কিছু ছেলেছোকরাকে ঐ প্যাণ্ট পরার দরুণ ডিটেনশনের শাস্তিও পেতে হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এর জনপ্রিয়তা প্রশস্ত ঘরের প্যাণ্ট হিটয়ে দিল বাজার থেকে। সাংস্কৃতিক দাবি ছিল না বটে, তবে সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ড্রেনপাইপের রুচি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ট্রাম বাসের ভিড় ভাঙাকার লড়াই সামলে নিয়েছে রোমান বীরের পাচাপা পোষাকের মতো। আগুন স্ট্রী খরচারও সাশ্রয় হয়েছে। সরু কাটে ইস্ত্রী না চালালেও চলে। অর্থনৈতিক

অবস্থা ও পরিবেশ এই নয়া রুচিকে একটা সার্বজনীন ঠাই করে দিল। কিন্তু লম্বা জুলাপী? বাঙালীর পালোমানীমুখে ও জিনিসটি ক্লাউনিশ রুপছটা সৃষ্টি করে মাত্র। জুলাপীর পেছনে অর্থিক সাংস্কৃতিক কোনো দাবিও নেই। বরং তা সুন্দর মতকে কুশী করে। সুকুমার মনে লম্বা জুলাপীর প্রভাব কুশীতা থেকে বিকৃতিরও সৃষ্টি করে। কদম্ব ও বীভৎস দৃশ্য মনকে যেমন ভাবে নাড়ায়, লম্বা জুলাপী, কপচানো রন্ধ চুল নিভাজ পোষাক পরা মানবের চেহারায় তেমনি ভয়াবহ অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে, দর্শকমনে তার প্রতিচ্ছবিও অসুন্দর ছায়াপাত করতে বাধ্য। রসজ্ঞান ও সৌন্দর্য বোধবিবর্তিত এমন কদম্ব রুচিকে কুরুচি বলতে বাধ্য নেই। তবে নিজেকে সাজাবার আরো ডের উপায় থাকতে বিশ শতকের তরুণ অকস্মাৎ নিজেকে কুশী করে তোলায় দিকেই নজর দিল কেন? নিজেকে নোংরা সাজানোর ফলে চতুর্দিকের পরিবেশও যে নোংরা হয়, হিপ-স্টাইল বা হিপিস্টাইল অনুকারীরা কি সেই বোধটুকুও অর্জন করেন নি? ভারতে ভ্রম্য-চ্ছাদিত চিমটে জটীকারীর তো অভাব ছিল না; ময়লা দাঁত, বাকিমুখ জংলী মানবের ছবি বিদেশী ফিল্মে তো প্রচুর দেখা যায়। তবে নোংরা সাজার আগ্রহটা এতোকালে এমন হঠাৎ উদ্ভূত হয়ে ওঠার কারণ কি? প্রশ্নটা স্বভাবতই উঠতে পারে। এর পেছনে কোনোও কুমলবী শ্রেণী স্বার্থ কাজ করছে না তো? অসম্ভব কি! ইতিহাসে চোখ ফেরালে দেখা যাবে শ্রেণী-স্বার্থ বহু সময় রুচি-নিয়ন্ত্রণে

কৌশলী হস্তক্ষেপ করে এসেছে। চীনা সামন্ততান্ত্রিকরা চৈনিক পরম্ব্যসমাজকে অনগ্রসরতার অন্ধকারে আটক রাখার জন্য চন্দ্রচয়সে ডুবিয়ে পিঠে লম্বা বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছিল। নিপীড়নের পাইকারী শিকার চীনা নারীর নরম পদ্ম-খানি লোহার জুতো পরিয়ে ছোট করে রাখাই ছিল তাদের মল্লবী কৌশল। ভারতীয় ললনার আবক্ষ ঘোমটা, মসলিম নারীর বোরখা, নারীকে যেমন পরম্ব্য মালিক শ্রেণীর পদানত করে রেখে ছিল; মৃদুশ্রুত মস্তক বিধবা যেমন পরম্ব্য শ্রেণীর জীবন্ত সম্পত্তি, পশ্চিমে নারীকে তেমনি স্বল্পকৃষ্ণা করে পরম্ব্যের উপভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছে। নারীর ক্ষেত্রে এর অন্যথা এমন কি পৃথিবাঠ পর্যন্ত ছিল রুচি-বিগর্হিত কাণ্ড। আজও আমাদের দেশে বিধবার ওপর বিধিনিষেধের "রুচি" চালু আছে। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই মল্লবী শ্রেণী কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া রুচি প্রবাহ। এর ফলে এক শ্রেণী (পরম্ব্য ও স্ট্রীকে যদি দৃষ্টি ভিন্ন শ্রেণী হিসেবে গণ্য করি) অপরের ওপর অবাধ শোষণ নিপীড়ন চালিয়ে এসেছে। সমাজে বিশেষ বর্ণভেদে পরস্পর বিপরীত রীতিনীতি ও রুচির প্রচলনও তৈরি হয়েছিল মল্লবী শ্রেণীর কৌশলী মগজ থেকে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কিছু কিছু রীতিনীতিও ক্রমে রুচির পর্যায়ে গণ্য হয়। বিধবার বিধিনিষেধকে সেই অর্থেই রুচি বলে উল্লেখ করছি।

বিকৃতির পৃষ্ঠপোষক অপরিচ্ছন্নতা ও কুশীতার রুচি প্রকর্তমার মধ্যে এইভাবেই কোনো সুকৌশলী (শেষাংশ বাইশ পৃষ্ঠায়)

কোলে

বাজারের শ্রেষ্ঠ বিক্রেতার ডালি

গ্লুকোজ

হৃদে ও মাথনে ভরা
আপনারই প্রিয় বিকৃতি



বান্ধু-নিরোধক মৃদু ক্রাটনে পাওয়া যায়

সব লোকেরই পাওয়া যায়

সাতঘণ্টা সালের মে মাস থেকে একান্তর সালের এপ্রিল মাস, সময়টি খুবই স্বল্প। কিন্তু এই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে ভারতের রাজনীতির এক দীর্ঘ ইতিহাস। নকশালবাড়ির পথিকেরা সারা ভারতে সৃষ্টি করেছেন সেই ইতিহাস। এই ইতিহাস যে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছে ভারতের প্রত্যেক বিপ্লবীর উচিত তার পর্যালোচনা করা। বিপ্লব এবং বিপ্লবীর পক্ষে এই কর্তব্য অবশ্য, জরুরী, অনিবার্য।

সাতঘণ্টা সালের মে মাসে নকশালবাড়ির কৃষক প্রচণ্ড আঘাতে ভারতের জনগণের সামনে ভুলে ধরেন একটি প্রশ্ন। সে প্রশ্ন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন, তাই গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা—অর্থাৎ সশস্ত্র কৃষক বিপ্লবের স্লোগান সামনে রেখে শুরুর হয় গ্রামে গ্রামে কৃষকের সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি। লড়াই ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক অঞ্চলে। সৃষ্টি হয় শ্রীকাকুলাম, মশাহারি, ডেবরা ও গোপীবল্লভপুর। এই লড়াই এবং তার প্রস্তুতির পর্বে শহরের পেটি বর্জ্যেরা, এবং বিশেষ করে স্বব-ছাত্ররা, বিপ্লবের পক্ষে এবং সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক লড়াই সংগঠিত করেন। কাছাকাছি সংশোধনবাদ ক্রমশ মরিয়া হয়ে ওঠে। তাত্ত্বিক লড়াইয়ে আঁটতে না পেরে, তারা শুরুর করে শারীরিক আক্রমণ। বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের ফারাক স্পষ্ট হতে থাকে শহরের জনগণের সামনে।

ইতিমধ্যে বাইশে এপ্রিল উন-সত্তর সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিপ্লবী পার্টি—ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)। নকশালবাড়িতে বিপ্লবী কৃষক হত্যা এবং শহরাঞ্চলে বিপ্লবীদেরকে আক্রমণ সংশোধনবাদীদের প্রতি-ক্রিয়াশীল রূপটাই খুলে ধরে এবং দলে দলে ছাত্র-কৃষকেরা জমায়েত হন সি পি এম এলের পতাকা তলে। কৃষক, শ্রমিক পেটি বর্জ্যেরা সকল ক্ষেত্রেই একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন বড় হতে দেখা দেয়। সে প্রশ্ন সশস্ত্র কৃষক বিপ্লবের প্রশ্ন। চেয়ার-ম্যানের শিষ্যরা এই রণধানি মধ্যে নিয়েই শহর ছেড়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন। এবং সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করতে শুরুর করেন।

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই সংগ্রাম ছিল অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সময় থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবীতালিকা আমাদের ভিতরে কাজ করছিল। যে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের লড়াই, সেই সংশোধনবাদ ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে আমাদের অবিরাম আক্রমণ করে চলেছিল। তাই কিছুদিনের মধ্যেই প্রচার প্রোপাগান্ডা, তাত্ত্বিক লড়াই, শ্রেণী বিশ্লেষণ এবং শ্রেণী মিত্রদের সংগঠিত করা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজ কোথায় তালিয়ে গেল। একটি প্রশ্ন—মাত্র একটি প্রশ্নই মাথা তুলে দাঁড়াল। সে হল খতম বা অ্যাকশন। কেবলমাত্র অ্যাকশনের চিন্তাতেই আমরা বিভোর হয়ে গেলাম। মূলতঃ দীর্ঘ বিলম্বিত

নকশালী আন্দোলন সম্পর্কে একটি দানল

লড়াইয়ের কথা বললেও, কার্যত সব কিছু দ্রুত অতিদ্রুত সমাধা করার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমরা ভুলে গেলাম বিপ্লব করে জনগণ—পার্টি ক্যাডারেরা নয়। আমাদের দ্রাবিত জন্মাল বন্দকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস, ভুলে গেলাম, “বন্দকের নলের ভিতর দিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে।”

এই রকম একটা অবস্থার মধ্যেই সত্তর সালের মে-জুন মাসে শুরুর হল শহরের অ্যাকশন। স্কুল, কলেজ, মন্দির, দপ্তরখানা, পল্লিশ, ব্যবসাদার, দালাল ও সি পি এম হল আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। আমাদের সমস্ত শক্তি বা এনার্জি আমরা এই কাজে নিয়োজ করলাম। গ্রামে যাওয়া বন্ধ হল। গ্রামে যাবার চিন্তাকেও আমরা আর আমল দিলাম না।

কিন্তু কেন? কেননা, ততক্ষণে আমাদের রাজনীতি আর অ্যাকশন-প্রধান নেই, অ্যাকশনসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। “একমাত্র গেরিলা যুদ্ধ পাত্রে জনগণের সমস্ত ক্ষমতাকে সমাবেশ ও সংহত করতে,”—লিন-পিঙ্গাওয়ের এই বক্তব্যকে বদলে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলাম। আমরা ভুলে গেলাম গেরিলাযুদ্ধ অনিবার্য ভাবেই জনগণের যুদ্ধ। ফল যা হবার তাই হল। শহর গ্রামের পার্থক্য রইল না। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার বার্তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। শ্রেণী বিশ্লেষণে গোলমাল ঘটল। প্রধান ও অপ্রধান শব্দের তারতম্য ঘুচে গেল। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠল না। যেটুকু চেষ্টা এর আগে আমাদের ছিল শ্রমিকদের কাছে যাবার তাও অপ্রয়োজন বোধে বন্ধ হয়ে গেল। শ্রমিকেরা আমাদের দেখে ভয় পেতে শুরুর করলেন এবং আমরাও বিরক্ত হয়ে বলতে থাকলাম শ্রমিকেরা সংশোধনবাদী রাজনীতি-র পার্কে রীতিমত আবদ্ধ। সহসা তাঁদের বদ্বিধ মন্থি ঘটবে না। তাঁদের চিন্তার মন্থি ঘটতে চাই অ্যাকশন, আরও অ্যাকশন। আমরা পেটি বর্জ্যেরা, ছাত্র-স্বব-কেরা নিজেদের মন্থিবাদি বিপ্লবী ভাবতে লাগলাম আর শ্রমিকদের সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম প্রতিজ্ঞার সংশোধনবাদের শিকার।

এদিকে এক এক করে শ্রীকাকুলাম, ডেবরা ও গোপীবল্লভপুর পরাজিত হল। অন্য কোন নতুন অঞ্চল গড়ে উঠল না। বিহার আমাদের ছেড়ে গেল। অন্য অনেক জায়গায় দেখা দিল বিদ্রোহ। আমরা আবদ্ধ হলাম শহরে। বিশেষ করে কলকাতায় ও আশেপাশে। অর্থাৎ শহুরে রণবাহুর মাক্ষানে। সি পি এম এল শ্রমিক কৃষকের মধ্যে তার ব্যাপ্তি ঘটতে পারল না। বরং পুরো-পারি নির্ভরশীল হয়ে পড়ল শহ-

রের পেটি বর্জ্যেরা স্বব-ছাত্রদের উপর। আমরা পরিণত হলাম এক পেটি বর্জ্যেরা পার্টিতে।

সত্তর সালে ডিসেম্বরের শেষে আমরা হঠাৎ ঘোষণা করে দিলাম, ভারতের মন্থিফৌজ তৈরি হয়ে গেছে। শ্রীকাকুলামেও আমরা প্রায় এই ধরনের কথাই বলেছিলাম। এই ঘোষণা আমাদের দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়। যেমন ঘটেছিল আমাদের রোডও প্রচারের ঘোষণায়। মাগুরজান এবং রূপসীকুন্ডীতে কৃষকেরা পল্লিশের রাইফেল কেড়ে নেওয়ার নিশ্চয়ই লড়াই—এর এক উন্নত মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায় যেমন পাওয়া গিয়েছিল তে-ভাগা আন্দোলনের সময়, কৃষকেরা যখন কিছু রাইফেল কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার দ্বারাই প্রমাণ হয় না গণমন্থি ফৌজ গড়া হয়ে গেছে বা হচ্ছে। এর দ্বারা শুধু এটাই প্রমাণ হয় যে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং জনগণের ফৌজ গড়ার কাজকে সংশোধনবাদী এবং বিপ্লবী এই উভয় তরফই অবহেলা করে এসেছেন।

মন্থিফৌজ গড়বার কাজকে কিছুতেই মন্থিফৌজ সৃষ্টি না করে কৃষকের পাণ্ডা রাষ্ট্র ক্ষমতা তৈরি করার কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কৃষকের শ্রেণীসংগ্রাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংগ্রাম ব্যতিরেকে এ কাজ কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়। তবে কি শহরে, গ্রামে এমন কি বেহালাতে যেসব বন্দক কেড়ে নেবার সংবাদ বেরিয়েছে তা সব মিথ্যা ভাঁওতা। মোটেই নয়। এগুলিই হচ্ছে এবং আরও হবে। কিন্তু প্রশ্ন করি কারা এ কাজ করছেন। এ কাজ করছে শহরের পেটি বর্জ্যেরা স্বব-ছাত্ররা। একাজ তাঁদের খুব মনের মতো কাজ। একাজ জীবন দেওয়া নেওয়ার মতো রোমাঞ্চকর কাজ। একাজে বীরত্ব

লাগে, পৌরুষ লাগে, আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়। শব্দ প্রয়োজন হয় না দৃষ্টো জিনিষের—দীর্ঘ বিলম্বিত লড়াই আর বোকা বৃদ্ধের মতো শান্ত দৃঢ়, স্থির প্রাজ্ঞ ধৈর্য। একাজে মৃত্যু বরণ—শহীদের বীরত্ব-গর্বে মৃত্যুর মতো জ্বলজ্বল করে। এ কাজের মৃত্যু, উন্নত তৈরি করতে গিয়ে শহীদ না হয়ে মারা যাবার মতো তুচ্ছ নিশ্চিন্ত নয়।

আমরা বদলা নিতে চাই, শহীদ হতে চাই। কিন্তু কিছুতেই মারা যেতে চাই না। আমরা কমরেড চাং শি-দে হতে চাই না। আমাদের মৃত্যুও বড় আকারের হওয়া দরকার। ছোট মৃত্যু আমরা একদম বরদাস্ত করতে পারি না। সর্বদাই আমরা বড় বড় কাজ চাই। ছোট কাজকে আমরা ঘৃণা করি। মনে প্রাণে ঘৃণা করি। অথচ আশ্চর্য, আমরাই আবার তিনটি লেখার আদর্শের বড়াই করি।

কিন্তু কেন এমন হল? কেন এমন হতে পারল? আমাদের কম্যুনিষ্টদের এমন অশ্রুত বীরত্ব, অজস্র আত্মত্যাগ, এমন অপারিসীম পৌরুষ, এত রক্তদান সত্ত্বেও কেন এমন হতে পারল? এ প্রশ্নকে আজ আর পাশ কাটাবার উপায় নেই। যদি আমরা বিপ্লবী থাকতে চাই, যদি আমরা ভারতের জনগণের মন্থি চাই, যদি আমরা বিপ্লব চাই, তবে এ প্রশ্নের জবাব আমাদের বার করতেই হবে। বিপ্লব বিপ্লব করে চলেছে, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের অজস্র উদাহরণ সৃষ্টি করলেই বিপ্লব হয় না। শহীদের রক্তের বদলা যদি আমরা সত্যিই নিতে চাই তবে আমাদের সব চাইতে ঘৃণিত শত্রু ও প্রকৃত মিত্রদের মধ্যে পারি-স্কার, সম্পর্ক ভেদ রেখা টানতে হবে। এবং শ্রেণী সমাবেশের স্তর অনুযায়ী শত্রুকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, একেবারে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়ো-জনে, মিত্রদের বদ্বিহ সাজাতে হবে। দায়িত্বহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন বাল-খিলা চীৎকার ও অসহিষ্ণু পেটি বর্জ্যেরা অ্যাকশন দিয়ে সে কাজ হবে না।

এ সব কথাই আমাদের জানা। তবে এ ভুল কী করে হল। কেমন

করে হতে পারল? অ্যাকশন প্রাধান্য পেতে পেতে কোন এক সন্ধ্যা আমাদের রাজনীতি-অ্যাক-শন-সর্বস্ব হয়ে ওঠবার একটা কারণ সি পি এম, শ্রেণীশত্রু এবং রাষ্ট্র-বশ্তের যৌথ আক্রমণ। আত্মরক্ষার তাগিদেই আমরা পাণ্ডা আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছি। নতুবা আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। কিন্তু প্রশ্ন এই যে আমরা কি আত্মরক্ষা করতে পেরেছি। অর্থাৎ আমরা কি বিপ্লবী রাজনীতি রক্ষা করতে পেরেছি।

সশস্ত্র শহুরে মোকাবিলা কে করবে? নিশ্চয়ই সশস্ত্র জনগণ। কিন্তু আমরা কি জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছি। জনগণকে কি আমরা রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে হাতিয়ার বন্দু করেছি। তাছাড়া শহুরে তো আমাদের আক্রমণ করবেই। আমরা কি সে কারণে রাজনীতি পরিত্যাগ করে, জনগণকে ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ অস্বা-নির্ভর হয়ে উঠব। না, শহুরে আক্রমণই আমাদের ভুলের একমাত্র কারণ নয়। এ ভুল প্রধানত বাইরের শহুরে আক্রমণের জন্য নয়। এ আক্রমণ হয়েছে পার্টির ভিতর থেকে। এ আক্রমণ ঘটেছে আমার, আপনার এবং পার্টির সংশোধনবাদী, অস-হিষ্ণু, বোকাবৃদ্ধের কাহিনী ভুলে যাওয়া পেটি বর্জ্যেরা-সলভ চিন্তা-ধারা থেকে। এসেছে সংক্ষেপে কাজ সারবার, ইতিহাসে নাম রাখবার পেটি বর্জ্যেরা মনোভাব থেকে। এসেছে দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধের কষ্টকর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার তাগিদ থেকে। এসেছে জন-গণের উপর আকাঙ্ক্ষা ও অবিশ্বাস থেকে। জনগণকে ঘৃণা করার সংশোধনবাদী চিন্তা থেকে।

এই কারণেই সি পি এম এল নেতৃত্ব যখন ঘোষণা করেন যে বিশেষ বিশেষ মন্থিফৌজ সৃষ্টি কর-বার আর প্রয়োজন নেই এবং শহ-রেও আমরা সমানভাবে অ্যাকশন করে যাব তখন আমরা তালিয়ে দেখতে চাইনি। আমরা তাঁদের এই নতুন ফর্মুলেশনকে রাজনীতি ও রণনীতির দিক থেকে না দেখে (শেষাংশ ২০শ পৃষ্ঠায়)

আজ:



১৬ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

হেড অফিস : ৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত স্ট্রিট, কলিকাতা-১



লোকটা অর্থাৎ যুবকটি কিংবা ছেলেটা আসলে মানুষটি আপাতত লাশটা রেল লাইনের ধারে চিৎ হয়ে পড়েছিল। লাশটার মাথা লাইনের খোসায় ধড় লাগেয়া ঘাস জমিতে এবং দুপা পাশের ডোবার কাদা-জল অন্ধি ছড়িয়েছিল। সাদাচোখে লোকটির সঠিক বয়স আন্দাজ করা যায় না। নাকটা খ্যাতলানো। গালের নরম অংশ বসে গিয়ে চিবুকের হাড় জেগে উঠেছে। একটা চোখ খোলা। দৃষ্টি ভেতরে গোটানো। দৃশ্যমান সাদা অংশ পচা ডিমের মত নীলচে হয়ে এসেছে। আর একটা চোখ বোজা। আসলে চোখটা নেই। উপড়ে ফেলা হয়েছে। পাতায় চলকে চলকে রক্ত উপচে গেঁজে উঠে অক্ষিকোটর একটা জবাফুলের আকার ধারণ করেছে। কপালময় মাথার চল থিক থিক করছে। গলায়, কন্ঠনালী এবং শ্বাসযন্ত্রের ঠিক মাঝখানে, একটা গভীর ক্ষত। সহজেই অনুমান করা যায়, আততায়ীর সংখ্যা একাধিক ছিল। জনকয়েক লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে চেপে ধরেছিল। আর একজন, নিপুণ-হাতে, ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে লোকটার প্রাণটাকে বকের গোপন কুঠার থেকে সামান্য চেষ্টায় বাইরে বের করে এনেছিল।

লোকটার গলা থেকে মুখ আঘাতে আক্রমণে ধ্বংস এবং স্নান-করণের অযোগ্য হলেও শরীরের বাদবাকি অংশ বেশ সুঠাম। অক্ষত এবং সুপরিচ্ছন্ন। গায়ের চকচকে খয়েরী রংয়ের জামা প্যান্টের ক্রিজ এমনকি ডান হাতে চেপে বসা রাখীটার রংতা এবং রেশমি আঁশের উজ্জ্বলতা, সব কিছুই যথাযথ এবং নিখুঁত। শুধু যা পায়ের চটি-জোড়া দেহবিমুগ্ধ। মেঘলাদিনের খেয়ালি হাওয়ার টানে ডোবার মাঝ

বরাবর নেচে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় লোকটার পায়ের পাতা জোড়া। জলের স্নেহে সাদা ধপ-ধপে। গোড়ালিতে ইতস্ততঃ পানার গাড় সবজ রঙের কুচি ছড়িয়ে আছে। সব মিলিয়ে সজল প্রকৃতি মমতায় ধন্য। যা লাশটাকে মানুষ বলে ভেবে নিতে সাহায্য করে।

লোকটাকে এখানে প্রথম আবিষ্কার করে এক বড়ী। রেল লাইনের ওধারে সারি সারি প্ল্যাটফর্মের চটা দরমার বেড়া কিংবা কেরাসীন কাঠের টুকরো টাকরা দিয়ে তৈরি এক বিচিত্র জনপদ। এদিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরের লেভেলক্রসিং পর্যন্ত ছড়ানো। শহরতলীর ভদ্রপঞ্জীর লোকেদের পরিভাষায় এই জনপদের নাম রেল কলোনী। মোটামুটিভাবে এই রেল কলোনীকে এক জলজ্যান্ত নরক বলা যেতে পারে। মদ চোলাই, মালগাড়ি লন্ঠিত জিনিষপত্রের খোলা বাজার, নষ্ট মেয়ে মানুষদের দেদার দেহব্যবসা, দুপাশের ভদ্র-বাড়িগুলোর জন্য ঝি-চাকর জোগান দেওয়া—এককথায় এতদ-অঞ্চল অষ্টপ্রহর রীতিমত রমরমা। বিশেষ করে, ইদানীং কালের রাজ-নৈতিক ডামাডোলের দিনে বিভিন্ন দল উপদল এবং মতলববাজদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রস্থল এই রেল কলোনী।

বড়ী বাড়ি বাড়ি ঠিকে ঝির কাজ করে। সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসি মখেই কোন একটা খুপরি থেকে বেরিয়ে রেল লাইনে পড়ে কাজে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওধারে পড়ে থাকা মানুষটার দিকে চোখ পড়ায় বড়ী বিকট চোঁচিয়ে উঠেছিল। তার সেই চিৎকারে, যদিও বয়সোচিত অক্ষমতার কারণে বড়ীর স্বরগ্রাম তেমন তেজি ছিল না, তবু সদাসতর্ক রেল কলোনীর

বাসিন্দাদের বেশ একদা বড় অংশ দেখতে দেখতে খুপরি থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণের ভেতরেই লাশটার দুধারে একটা দর্শনীয় জটিলার সৃষ্টি করেছিল।

বড়ীটা একপশলা হাউমাউ করে উঠে, “কে এমন সর্বনাশ করল গো! দেশে কি আর মানুষ নাই গো” ইত্যাদি কয়েকটা বহুল প্রচলিত উক্তি আউড়ে তড়িঘড়ি, কেননা দেবী হলে ভদ্র লোকের জাহাজ বউ খিস্ত দিতে শুরুর করবে,—এই ভেবে লাইন পেরিয়ে বাড়ি ঘরের জটিলতায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর যেমনটা হয়, বসন্তের গড়ির মত বড়ীর মুখ থেকে কথাটা এ বাড়ি সেবাড়ি করে বেলা একপ্রহর গড়াবার আগেই গোটা শহরতলীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। এবং সংবাদটা ছড়িয়ে পড়তে দম চাপা ঘড়ির মত তামাম এলাকার বাস্তু ছেলে বড়ো বাচ্চা কেরাণী শিক্ষক দোকানদার—কিছু-ক্ষণ কেমন থাতিয়ে রইল। অভাব-নীয় না হইলও আকর্ষণীয় এই সংবাদটাকে নানাভাবে নানাভাবে চটকতে লাগল।

রায়গিন্নী, যিনি সবে গরম তেলে ইলিশ মাছের দলুভ পিস-গলো ছেড়ে দিয়ে খুন্তী নাড়ায় অনন্যমনা ছিলেন, তিনি খবরটা পেয়ে মুখ তেতো করে বললেন, কি আপদ! মরবার আর জায়গা পেল না। শেষটায় রেল লাইনের ধারে। কথাটা শেষ করে সতর্কতার সঙ্গে উন্ননে চাপানো ভাঁজ ইলিশসমত কড়াইটাকে মেঝেতে নামিয়ে বিরস্তির সঙ্গে উঠে রান্না ঘরের পূর্ব দিকের জানলাটা,—যেদিক থেকে রেল লাইন চোখে পড়ে, বন্ধ করে যথাস্থানে ফিরে এলেন।

রজগোপাল চাটখন্ডী, যিনি অফিসের কর্তব্যাক্তিদের তোয়াজ তোষামোদ করে দশবারো বছরের ভেতরেই একটা ডিপার্টমেন্টের সর্বসর্বা বনে গেছেন, মাইনে ছাড়া বাঁ হাতের যৎপরোনাস্তি কসরৎ দেখিয়ে রাতারাতি বেশ কিছু

টাকা কামিয়ে এই শহরতলীর এক মনোরম পরিবেশে চমৎকার একটা দোতলা বাড়ি বানিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে বহাল তবিয়তে কালতি-পাত করছেন, হঠাৎ খবরটা পেয়ে অফিসে বেরুতে গিয়েও দোড় গোড়া থেকে ফিরে এলেন। তাই দেখে তার বো, শ্রীমতী শোভারানী, যিনি সম্প্রতি ডাক্তারের কড়া নির্দেশে রক্তচাপের আধিক্যবশত পাখা ছেড়ে সোফায় গা এলিয়ে বিশ্রাম সন্ধ্য ভোগ করছিলেন,—তিনি বললেন, কি ব্যাপার, ফিরে এলে যে, অফিস যাবেন? শোভারানীর কাছে রজগোপালের অফিস না যাওয়া ব্যাপারটা রীতিমত হতাশার কারণস্বরূপ। কেননা, রজগোপাল একবার অফিস ঘুরে এলেই যেহেতু তিনি পারচেজ ডিপার্টমেন্টের বস, কিছু নগদ পয়সা ঘরে আসে। রজগোপাল মুখখানাকে ভাতের হাড়ির মত মিশ্র কালো করে পাজাবাটা গা থেকে খসিয়ে থমথমে গলায় বললেন, যাবার কি আর উপায় আছে। রেল লাইনের কাছে নাকি আজ সকালে একটা মার্ডার হয়েছে। দেশটা উচ্ছিন্নে গেল। না আছে কোন আইন না আছে রিয়েল লীডারশীপ।—শোভারানী মেঝের পা ছড়িয়ে দিলেন, তাতে তোমার কি। তোমাকে অফিস যেতে কেউ বারণ করেছে!—রজগোপাল খাটের ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন, তুমি এর বুঝবে কি। বলেই তো খালাস,—অফিসে যাও। ঘরে দুদুটো ছেলে আছেন। পুন্নিশ নিশ্চয়ই এসে গেছে এত-ক্ষণে। দুপদের দিকে কুন্নিং হতে পারে। সি আর পি ঘরে ঢুকলে তোমার ছেলে বলে তো ছেড়ে দেবে না। নিয়ে যাবে থানায়।—শোভারানীর ইদানীং চড়া গলার আওয়াজ সহ্য হয় না। তিনি মুখ ব্যাজার করে বললেন, তা ছেলে-পুন্নির বাপ হতে কে তোমায় মাথার দিবা দিয়েছিল?—একথায় রজগোপাল আরো চোঁচিয়ে উঠবেন না কেঁদে ফেলবেন বুঝতে না পেরে উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

দস্তবাড়ির বড় মেয়ে অঞ্জলি সবে কলেজে ঢুকেছে। সে ভীষণ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বই-খাতা নিয়ে বের-ছিলা। এমন সময় স্বয়ং দস্ত সাহেব যিনি এ তল্লাটের একজন নামডাক-ওয়ালা ব্যক্তি, হাওড়ার ব্যাটরা অঞ্চলে লোহার কারখানা, বললেন, আজ আর কলেজ গিয়ে কাজ নেই অতন। পাড়ায় গন্ডগোল। বাড়িতে থাকো।—পাশের ঘরে অঞ্জলির মা, বয়স চল্লিশ ছুঁইছুঁই হলেও যিনি শরীরটাকে এখনো শাঁসজলে ভরন্ত রেখেছেন, সদ্য বাথরুম থেকে বেরিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় সরিয়ে খোলা বুকে অনর্গল পাউডার ঢেলে যাচ্ছিলেন। এঘর থেকে দস্ত সাহেবের কথা শনেতে পেয়ে চড়াগলায় বললেন, ওকে আটকাছ কেন। কোথায় কি না কি হয়েছে। মিছেমিছি কলেজ কামাই করার কোন অর্থই হয় না।—সেকথা শুনে অঞ্জলি মূর্চকি হেসে খোলা গলায় দস্ত সাহেবকে বলল, কি

হয়েছে বাপি। যাইনা। আজ মিস চৌধুরী আমাদের স্পেশাল ক্লাশ নেবেন যে! আসলে দস্ত গিন্নীর কথায় অঞ্জলি আশ্বাস পেয়ে গিয়েছিল। অঞ্জলি বেশ ভাল করেই জানে, দুপদর বেলা বাড়ি যখন ফাঁকা, তার ছোট ভাই অভীকের ছোকরা মাষ্টারমশাই এবাড়িতে এসে তার মাকে কিছুটা সময় বেশ লোভনীয় সাহচর্য জোগায়। তাছাড়া অঞ্জলির নিজের দিক থেকেও বের-বার তাড়াটা যথেষ্ট। স্পেশাল ক্লাশটাশ বাজে কথা। দিন কয়েক আগে সে নিজেই উপযাজক হয়ে ডেটিং করেছিল। সহপাঠী শান্ত-নন্দর সঙ্গে আজ দুপদুরে সাহেব পাড়ায় গিয়ে ম্যাটিনী শো দেখবে। দস্ত সাহেব দুদিকের চাপে থেমে গেলেন। অঞ্জলি ছুটে রাস্তায় নামল। তারপর, মোটরে উঠে মিষ্টি-গলায় ডাকল, বাপি, শিগগিরই এসো।

মিস্ত্রিবাড়ি মেজময়ের বিয়ে হয়েছে কাল। বর-বউ উঠানে পিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে। নানা বয়সের মেয়েরা ওদের চারপাশে দাঁড়িয়ে রংমসকরা করছে। বাড়ির বউরা কলসী ভর্তি জল আর কাঁচা হলদ বাটা নিয়ে তৈরি। ওদের মধ্য থেকে কেউ একজন বলে উঠল, শাঁখ বাজা।—এখনই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান শুরুর হবে। এমন সময় খিড়িকির দরজা দিয়ে ছুটেতে ছুটেতে এগিয়ে এল তোতা, কনের ছোটভাই। চোঁচিয়ে বলল, রেল লাইনের ধারে একটা লোক মরে পড়ে আছে।—তখন সবে বরের গায়ে হলুদ লেপা হচ্ছে। সে আঁৎকে উঠল, সেকি! গাড়ি চাপা পড়েছে, না খন?—দোতলার ঝুলবারান্দা থেকে বাড়ির কর্তা জগা মিস্ত্রি তোতার দিকে তাকিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে হুংকার ছাড়ল, রাসকেল কোথাকার। এই সময় উনি যত বাজে খবর নিয়ে এলেন। সরে যা, সরে যা ওখান থেকে। তারপর ছাদের দিকে মুখ তুলে আর এক প্রশ্ন চোঁচালেন, এই মাইকটা চালানা। জোরে—কিছু-ক্ষণের মধ্যেই গগনবিদারী হিন্দী গানের আওয়াজে কানের পর্দা ফটার উপক্রম।

ঘোঁটা সবচেয়ে বেশি পার্কিয়ে উঠছিল মেজদার চায়ের গুলে। বাজার এবং বাস রাস্তার মাঝামাঝি এই চায়ের দোকানটাতে এ তল্লাটের ছেলেবুড়ো সকলের সার্বজনীন আনাগোনা। একজন বলছিল, চারপাশ দিনকেদিন কেমন খারাপ হয়ে উঠছে। আগে আমাদের এদিকটা কত ভাল ছিল।—আর একজন কথাটা লুফে নিল, ভাল থাকার দিন কি আর আছে।—একজন বলল, লোকটা আসলে কে এতবেল অন্ধি তার হাদিশ পাওয়া গেল না আশ্চর্য! এক বড়ো বলল, আমি তো স্বচক্ষে দেখে এলাম। রেল কলোনীরই কেউ হবে মনে হয়। ওয়াগনরেকার ট্রেকার। বখরা নিয়ে গন্ডগোল হওয়ায় সাবাড় করে দিয়েছে মনে হয়। মাঝবয়সী এক নিষ্কর্মা ভদ্রলোক, যিনি এই (শেষাংশ ১৮শ পৃষ্ঠায়)

ওদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সফল করতে শেখান!

আজ ওদের কোন ভাবনাচিন্তা নেই। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তো? ওদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শেখান। ভবিষ্যতের জ্ঞান সফল করতে শেখান।
টেট ব্যাকে টাকা জমাতে শেখান।

সকলের সেবায় টেট ব্যাক

হীরেদ্র চক্রবর্তী শ্রেনী সমাজ ও সংগীত

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সর্ব-প্রকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মত সংগীতও শাসক শ্রেণী বা শ্রেণী-সমূহের স্বার্থবাহী। শ্রেণীহীন সমাজ ঐতিহাসিক যুগের পূর্বে দেখা গেছে আদিম বর্বর সমাজের মধ্যে। মানবের সভ্যতার ইতিহাসকে বলা যায় শ্রেণীগঠন এবং শ্রেণীসংস্থানের ইতিহাস। বৈদিক আর্বদের ভারতগমনের কালে তাদের নিজেদের মধ্যে শ্রেণীভেদ এত তীব্র এবং জটিল না হলেও একথা অসংশয়ে বলা চলে যে, আদি বৈদিক সমাজ মোটামুটি আর্ব এবং দস্য বা দাস (অনার্ব) এই দুই শ্রেণীতে প্রধানত বিভক্ত ছিল। তার পরে তাদের মধ্যে উদ্ভব হয়েছে রাজতন্ত্র এবং আদিম সামন্ততন্ত্রের। এই যুগের সংস্কৃতিই হল বৈদিক সাহিত্য ও সংগীত। সেকেন্দারের ভারত-ভিজ্ঞান পর্যন্ত এই সংস্কৃতি অব্যাহত ভাবে চলেছিল। গৌতম বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান খ্রিঃ পূঃ ৬-৫ম শতকে ঘটে থাকলেও বৈদিক যজ্ঞাদির সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে বুদ্ধদেব সামিক বা বৈদিক সংগীতকে তাঁর সংঘে প্রাপ্ত দেননি।

যে সব সংগীতঐতিহাসিক প্রচার করেন যে, আমীর খ্রিস্টের আগে পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতে কোন বৈদেশিক প্রভাব ঘটেনি তারা জানলে দৃষ্টান্ত হবেন যে, ভারতীয় সংগীতের উপরে গ্রীক প্রভাব অদ্ব্যাপ্য জাজ্বল্যমান। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে যে প্রমাণপ্রদাত্তর কথা বলা হয়েছে, গিথোগোরিয়ান কোমার সংগে তার সাদৃশ্য দেখে স্বর্গভঃ সংগীতবিজ্ঞানী রবীন্দ্রলাল সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভারতই গ্রীক সংগীতের ঐ প্রতিটিটিকে তাঁর প্রদাত্তর পরিমাপ রূপে গ্রহণ করেছেন ('শাস্ত্র, কলাবিদ ও সংগীত')। ভারতীয় ভাস্কর্য, চিত্র এবং নাটকের উপরে গ্রীক প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত।

আমীর খ্রিস্টো ভারতীয় সংগীতকে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করে তাকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণীয় করে তুলেছিলেন। তিনি কোন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষকের কাছে ভারতীয় সংগীত শিখতে পারেননি। তার প্রমাণ আলাউদ্দীনের সিংহাসনের পেছনে লুটিকয়ে থেকে তাঁর নামক গোপালের গান শোনা ও কন্ঠস্থ করে নেওয়ার কাহিনী। নামক গোপাল যদিও আমীর খ্রিস্টোর প্রায় শত বৎসরের পরবর্তী ব্যক্তি তবু এটুকু সত্য এই কাহিনী থেকে বেরিয়ে আসছে যে নামক গোপাল যদি আমীর খ্রিস্টোর কালে বর্তমান থাকতেন তাহলে তাঁকে সংগীতশিক্ষা দিতেন না বা দেবার অনুরোধ পেতেন না। কারণ কোন বিদেশী বা বিধর্মীকে কোন জ্ঞান দান করণে অস্বাদ্যতা রাজার অনু-

মতিসাপেক্ষ ছিল। কারা কারা বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ করবে তাও ছিল শাসক এবং তার শ্রেণীর প্রথর দৃষ্টির বিষয়বস্তু।

যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের ভূমিকা খ্রিস্টোর উপরে অর্পিত হয়েছিল তা হল ক্ষয়িক্ষয় সংস্কৃত সাহিত্য ও সংগীতের জয়গায় হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য লৌকিক ভাষা, সাহিত্য ও সংগীতের ভিত্তি স্থাপন করা। হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের গোড়া পত্তনে খ্রিস্টোর দান কেউ অস্বীকার করে না। দিল্লী-আগ্রা-মথুরার কথা ব্রজভাষাকে তিনিই ভারতীয় রাগসংগীতের বাহন করেছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় লিখতেন কিনা আলাউদ্দীনের হিন্দু-বিরোধী সামরিক নীতির বিরোধিতা করতে পেরেছিলেন কিনা অবস্থা নিজেই একজন ভারতীয় বলে মনে করতেন কিনা এসব প্রশ্ন মধ্যযুগীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসংগিক নয়। কারণ মধ্যযুগীয় সুলতানশাহী আমলে দিল্লীর একজন সভাসদের পক্ষে আলাউদ্দীনের সামরিক ও রাষ্ট্রনীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করে নিজের মস্তক রক্ষা করা সহজ ছিল না। খলজী আমলে ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র বৈদেশিক ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ (বাগদাদের খলিফা) থেকে মুক্ত হয়ে একটা দেশীয় সামন্ততন্ত্রের যুগে প্রবেশ করছিল। বলা বাহুল্য, এর বাহ্যিক রূপ ছিল একনায়কতন্ত্র যার বিরোধিতা করা একজন সামান্য ওমরার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

আমীর খ্রিস্টোর আমলে জাতি বা জাতীয়তাবোধের জন্ম পৃথিবীর কোন প্রান্তেই ঘটেনি। জাতীয়তাবাদের জন্ম নাপোলিয়ন-পরবর্তী ইউরোপেই প্রথম ঘটেছিল ঊনবিংশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে। অতএব ঊনবিংশ শতকের আমীর খ্রিস্টো যদি জাতীয়তার প্রেরণা, অন্তরে অনুভব না করে থাকেন তার জন্য তাঁকে খুব দোষী করা যায় না।

কিন্তু দোষী করেছেন কয়েকজন তথাকথিত হিন্দু সংগীতঐতিহাসিক যারা কলকাতার একটি সনাতনপন্থী মালিকী পরিকাগোষ্ঠীর প্রায়শ্চেষ্ট। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, আমীর খ্রিস্টো নাকি নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করতেন না। যদি তিনি সত্যি সত্যি তা না করতেন তাতেও বোধ হয় তাঁকে দোষ দেওয়া যেত না কারণ তাঁর জন্ম হয়েছিল বিদেশী পিতার গুঁরসে। কিন্তু তাঁর মত ফারসী পড়ার মত ফারসী না পড়লেও একথা আমরা জানি যে, খ্রিস্টো তাঁর একটা বয়েস-য়ে এই অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন : আমি তুরক (মুসলমান) হতে পারি কিন্তু আমি এ দেশেরই লোক। অনেকে বলেন যে, মুসলমানের চেয়ে সাধারণত হিন্দুরা বেশী

সম্প্রদায়িক। কথাটার সত্যতা প্রায়ই চাক্ষুষ দেখা যায়।

চিত্তের বিজয়ের সময় আলাউদ্দীনের রাজপুত রক্তপাতে আমীর খ্রিস্টো কেন বাধা দেননি এ অভিযোগও উক্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিটি লিপিতভাবে করেছেন। ভারি মজার কথা—হাজার হাজার রাজপুত বীর যা করতে পারলেন না তা করতে হবে একজন সভাকবিকে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, খ্রিস্টো তাঁর ঐতিহাসিক রচনায় এই রক্তক্ষয়ের যে চাক্ষুষ বর্ণনা রেখে গেছেন আলাউদ্দীনকে ভাবী কালের আদালতে অভিযুক্ত করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। সে তুলনায় তৎকালীন হিন্দু লেখকেরা কী করেছেন? সুলতানের রোষ জন্মাবার ভয়ে তারা তাদের মনোভাব লিপিবদ্ধ করার সাহস পর্যন্ত দেখাতে পারেন নি।

এর চেয়েও বড় কথা হল খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে রামানন্দের দ্বারা উত্তর ভারতে যে ভক্তি আন্দোলনের সূচনা হয় তার প্রেরণা ছিলেন খ্রিস্টো, তাঁর গুরু নিজামুদ্দিন আউলিয়া এবং তাঁদের সূফীবাদ। তাঁরা রাজশক্তির বিরোধিতা করেন নি একথাও সত্য নয়। খিজির দেবলা দেবী ব্যাপারে বন্দী খিজিরের পক্ষাবলম্বন করার অপরাধে নিজামুদ্দিন এবং খ্রিস্টো দুজনেরই প্রাণদণ্ড হয়েছিল। নিজামুদ্দিন সম্মুখমুখ প্রাণত্যাগ করেন এবং খ্রিস্টো গোড়ে পালিয়ে গিয়ে তা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। তখনও রাজনৈতিক পার্টির উদ্ভব হয়নি, কাজেই - রাজশক্তির প্রকাশ্য বিরোধিতা করা কোন ব্যক্তির পক্ষে তখন সহজ ছিল না।

হিন্দু এবং মুসলিম উভয়ই ঈশ্বরের সত্যতার বিশ্বাসী বলে খ্রিস্টো এবং সূফী সম্প্রদায় যেমন তুর্ক-আফগান শাসক শ্রেণীর অপ্ৰীতিভাজন ছিলেন তেমনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী বলে তাঁরা কট্টর হিন্দুদেরও প্রীতিভাজন ছিলেন না। সে যুগে ধর্মসম্বন্ধের কথা যারাই বলেছেন তাদের জীবনেই বিপদ ঘনিষে এসেছে। শ্রীচৈতন্য গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা নিহত হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বলে জনপ্রতি আছে; কবীরকেও নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

হিন্দু ও পারশিক এই দুই সংগীতকে খ্রিস্টো তাঁর সংগীত-সাধনার দ্বারা সমন্বিত করেছিলেন—এটাই হল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তিনি হিন্দুদের দৃষ্টিতে কতখানি কাঁদতেন বা কাঁদতেন না সেটা বড় কথা নয়। সেই খাঁ ওরফে ফকিরজা ব্যক্তিগত জীবনে কতটা সাম্প্রদায়িক-মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁর রাগদর্পণের মূল্যায়নে সেটা বিচার্য নয়। বিচার্য তাঁর সাংগীতিক বিব-

রণের ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি নেই।

২ দুই ২

মুসলিম সামন্ততন্ত্রের উন্মেষ-কালে আমীর খ্রিস্টোর সংগীত-সাধনায় হিন্দু পারশিক সংগীতের বিরোধ এবং অভিমতের যে ঘটনা ঘটেছিল তার সংশ্লেষ হয়েছিল আকবরের রাজত্বকালে মিশ্র তানসেনের সংগীত সাধনায়।

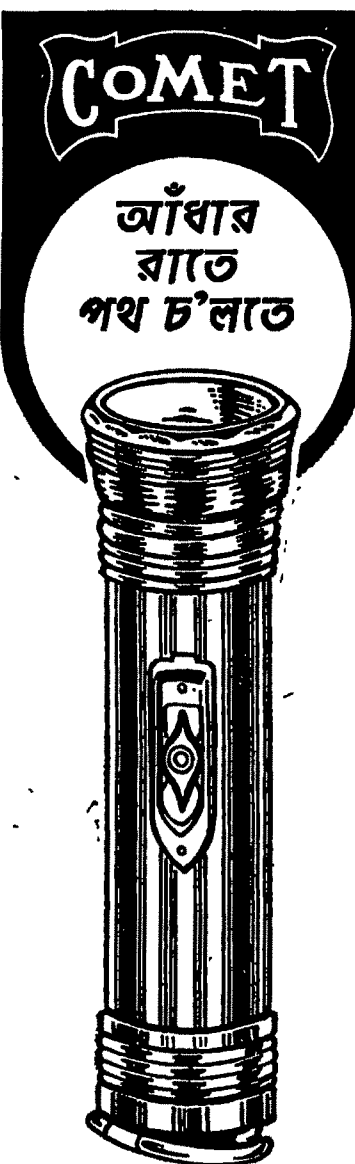
আর একজন তথাকথিত বাজারী ইতিহাসিক আকবরের ব্যক্তিগত আচরণ দিয়ে তাঁর কালের সংগীতকে বিচার করেছেন। আকবরের অপরাধ তিনি রানী দুর্গাবতীকে পরাজিত করে গোন্ডারানা রাজ্যকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং রাজপুতনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এই সব তথাকথিত ইতিহাসিকদের মন্তব্য এই যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে যুগের যে তাগিদ চঞ্চল হয়ে ওঠে তার মর্ম তারা সঠিক অনুধাবন করতে পারেন না। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে জর্জ প্রায় মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথার স্থলে এক প্রবল সার্বভৌম একরাট সামন্ততন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে আকবর ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতি দান করেছিলেন যার সফল পরিসমাপ্তি ঘটতে তার উত্তর সাধকেরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর যদি এত অপদার্থ না হতেন তাহলে সপ্তদশ শতকের ভারত বৈদেশিক ভাগ্য-স্বৈরীদের লীলাক্ষেত্রে পারিণত হতে পারত না। এই আশ্বিক ঐক্য এবং ভাবসংহতির গান গেয়েছেন মিশ্র তানসেন। আকবরের হারায়ে কতজন বেগম ছিলেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এই যে, যে কালে তৎকালীন ইউরোপে ধর্মের নামে ইনকুইজিশন চলছে সে কালে আকবরের হারায়ে তাঁর বিভিন্নধর্মীয় বেগমেরা পাশাপাশি মন্দিরে-মসজিদে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনা করতে পারতেন। সর্বধর্ম-সহিষ্ণুতার যে পরিবেশ তানসেন আকবরের দরবারে পেয়েছিলেন তা তিনি রেওয়ার সামান্য সামন্ত রাজারাম বা খেলার দরবারে পেতেন না। রাজারামের দরবার ছেড়ে তানসেনের মন নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল—জ্ঞানেক বাজারী ঐতিহাসিক জানিয়েছেন। অসম্ভব নয়। নরকেও যদি মানব দীর্ঘকাল থাকতে বাধ্য হয় তাহলে তাকে ছেড়ে আসতেও মন কেমন করে। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, সেটা অভ্যাসের লক্ষণ, প্রীতির নয়।

২ তিন ২

সংস্কৃতি মাগ্রেই শাসক শ্রেণীর অনুমোদন সাপেক্ষ। বর্তমান কালের সংস্কৃতি যেমন বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা এবং শ্রেণী সংস্থানের প্রতিচ্ছবি। ভারতের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা কী? তত্ত্ববিদেরা বলেন—এটি আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক। আধা-ঔপনিবেশিক ব্যাপারটা শিল্প-ব্যবসায়, অর্থনীতির সালতামামি থেকেই মালুম হয়—বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের

একাধিপত্য থেকে। সামন্ততান্ত্রিক কেন? এ নিয়ে তর্ক আছে। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, বহুকাল যাবৎ সামন্ত শ্রেণী শিল্প-পটুজিরও মালিক হয়ে আসছে। সেই জন্য রাষ্ট্রশক্তি সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায়ও সর্বিশেষ মনোযোগী। ইউরোপে শিল্প-পটুজি সংগৃহীত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে আর এ দেশে সামন্ত-স্বার্থকেই নানাভাবে জীয়ে রাখা হয়েছে—দুর্ভাগ্যবান রামগড়ের রাজ পরিবার। পঞ্চাশ সালের পর থেকেই সামন্তরা একাধারে সামন্ত, পটুজিপাতি এবং সরকারের আমীর-ওমরাহ।

বলা বাহুল্য এমন একটা ব্যবস্থার ছাপ তার সংগীত-সংস্কৃতির উপরে না পড়ে পারে না। দেশের যাবতীয় সংগীত সংস্থায় শাসক শ্রেণী এবং তার বশব্দ বাবদদের প্রভুত্ব। পাড়ার গানের ইন্সকুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য আকাদেমি, কেন্দ্রীয় আকাদেমি পর্যন্ত এমন একটি সূনিয়ন্ত্রিত রাজ্য কায়ম হয়েছে যে, শাসক শ্রেণী এবং তার বশব্দদেরা ছাড়া আর কেউ সেখানে নাক গলাতে পারবে না। সংগীত-নৃন্দানের এজেন্সিগুলি পৃষ্ঠপোষক, অর্থদাতা এবং বিজ্ঞাপন-দাতাদের দ্বারা এমন নিপুণ কৌশলে কবজা হয়ে আছে যে, তার মধ্যে দিয়ে অনাভিপ্রেত মাছিটিও গলাতে পারবে না। রোডিও, গ্রামাফোনের অডিশন বোর্ড, কেন্দ্রীয় স্কলারশিপ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা (শেখাংশ ১৮শ পৃষ্ঠায়)



ডজ্ এণ্ড কোং,
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১৪

শ্রেণী সমাজ ও সংগীত

(১৭শ পৃষ্ঠার পর)

ইত্যাদির কর্মীটিতে শাসক শ্রেণী এবং তার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির সতর্ক প্রহাররত যাতে ছোট লোকেরা সেখানে ঢুকতে না পারে। অবশ্য বংশবদ মধ্যবিস্তৃত শ্রেণী নিজেদের কিছু কিছু লোক ঢোকাতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে শাসক শ্রেণীর অথবা তাদের মনোনীত কোন প্রার্থী থাকলে তাকে পল্লী মার্কা দিতে অনুগত ভূতোর কখনো যদি ভুল করে, পর মূহুর্তে প্রভুদের রক্ত চক্ষু দেখে তা শব্দরেও নেয়।

এ তো গেল সাংগঠনিক দিক। সংগীতের সৃষ্টির দিকেও এই শ্রেণীস্বার্থই কাজ করে। মোগল আমলে সামন্ত ভাবাদর্শে যে সব গান লেখা হয়েছিল তার জাবর-কাটা আজও অব্যাহত ভাবে চলেছে। 'সাইয়া' আর 'পিয়া' ছাড়া খ্যাল গান হয় না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে দেশে এতসব বড় বড় ঘটনা ঘটে গেল—তেতাল্লিশ-এর মন্বন্তরে পনেরো লক্ষ মানুষ উজাড় হয়ে গেল, ছোঁচল্লিশ-পাঁচাশ সনের দাঙ্গায় কোটি কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হল,

বাংলা-পাঞ্জাব টুকরো টুকরো হয়ে গেল কিন্তু ভারতীয় সংগীতে তার কোন প্রতিধ্বনি উঠল না। আজ বাংলাদেশে অমানুষিক ঘটনা ঘটে চলেছে, ভারতীয় সংগীতে বিশেষত রাগসংগীতে যার কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভারতীয় রাগ সংগীতের উপজীব্য এখনও সেই মধ্যযুগীয় দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকা, ভাবাদর্শ এবং প্রেম-প্রবণতা। আধুনিক কাল এবং সমকালীন মানবের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সে তার শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে কোন এক সংগীত সম্মিলনীর মেজো কতী টিটকারি দিয়ে বলেছিলেন : তাহলে কি লেনিনের জন্ম গাইতে হবে? ভদ্র-লোক গানের ব্যবসা করেন বটে কিন্তু গান করেন না। করলে জানতেন যে, নিজামউদ্দিন খাউলিয়া, রাজা রাজারামকে নিয়ে রাগসংগীত লিখেছেন স্বয়ং তানসেন; আকবরের প্রশস্তির তো লেখাজোখা নেই। বাদশা মহম্মদ শা রিওগলে যার অসদাচারের জন্য হাজার হাজার দিল্লীবাসী নাদীর শার

হাতে কচ-কাটা হয়েছিল, তার নামে হাজার খ্যাল গান লিখেছেন স্বয়ং সাদারঙ্গ (ন্যামং খাঁ)। লেনিন বা হো-চি মিন কি গানের বিষয় হিসাবে তার চেয়েও অব্যোধ্য?

আসল কারণ তা নয়। শাসক শ্রেণী চিরকাল তার যোগ্য নায়ক সৃষ্টি করে এবং তার প্রশস্তি গায়। গান্ধী বা নেহরু সেই নায়ক হতে পারতেন। কিন্তু তথাকথিত স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ঝাপটায় তাঁদের ভাবমূর্তি থেকে মাটি খসে গিয়ে খড় বোঁসিয়ে পড়েছে বলেই তাঁরা নতুন গানের নায়ক হতে পারেন নি। এক সময়ে বিনোবা ভাবের কিংবদন্তি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল কিন্তু তিনি আজ পূর্বন্ত তেমন কোন ভেলকি দেখাতে পারেন নি। মর্জিবর রহমানের কিছু সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইয়া-হিয়া যদি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে তাহলে তাঁর মূর্তিরও খড় বোঁসিয়ে যেতে পারে।

মোম্বা কথা হল—এ দেশের সংগীতের কতৃৎ যত দিন সাধারণ খেটে-খাওয়া মানবের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না হবে তত দিন তাদের কথা ভারতীয় সংগীতে শোনা যাবে না। ততদিন ভারতীয় সংগীত কলরব বলাদের মত সামন্ত ভাবাদর্শের

গাড়ীর মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে মরবে।

৥ চার ৥

ভারতীয় সংগীতের জনসংযোগের চেষ্টা বার বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শিবজেন্দ্রলাল, নজরুল সংগীতে সমকাল এবং আধুনিকতার যে উদ্বেগধন ঘটিয়েছিলেন তাকে প্রায় বৈশ্ববিক বলা চলে। কিন্তু পরিবর্তন, নিয়মের ব্যতিক্রম এবং বিলম্ব কথা-গুলো ভারতীয় শাসকশ্রেণী-গুলোর কাছে চিরকাল শূন্যের মাংসের মত। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সংগেই তথাকথিত আধুনিক গান এবং গীতের মধ্যে দিয়ে কাব্য-সংগীত সমাজসচেতনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষয়িষ্ণু পাশ্চাত্য সংগীতের জৈব-যৌনতার স্রোতে গা ভাসিয়েছে। পঞ্চম দশকে আই-পি-টি-এর মধ্যে দিয়ে যে নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, মৌলিক সংগীতের উদ্যোক্তাদের বিমত্বতা এবং অনাভিজ্ঞতা হেতু তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। এই আন্দোলন কতিপয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সোপান রূপে ব্যবহৃত হয়।

এরা যে লোকসংগীতকে রবীন্দ্রনাথের মত নতুন ভাবের বাহন রূপে ব্যবহার করে নতুন রূপবস্ত্র সৃষ্টি করতে পারলেন না তার কারণ

এই যে, সংগীতের প্রকরণের দিকে এদের মোটেই দৃষ্টি ছিল না। বুদ্ধোন্মাদের সংগে দহরম-মহরম এদের স্বত্বা ছিল তাদের সংগীত-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার দিকে ততটা নয়। সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিহ্না মিত্র, হেমন্ত মথো-পাধ্যায়, সকলেই আন্দোলনকে একটা ফ্যাশানেবল ভঙ্গী রূপে ব্যবহার করে নিজ নিজ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তকরণে মনোযোগী হলেন। প্রগতিশীলতার একমাত্র প্রমাণ হল উৎকট বাদ্য এবং ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের গানকে বলাৎকার করে শিল্পীর স্বাধীনতার পরিচয় রাখা। নিম্নলিখিত চৌধুরী লোকসংগীতে নতুন বস্ত্র আনতে পারলেন না কিন্তু তার মধ্যে রাগপ্রধানসম্ভব গিটকারি এবং তরকিপ লাগিয়ে তাকে আধুনিক শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় করে তুললেন। এই জনপ্রিয়তা থেকে মুনোফা তুলল সাম্রাজ্যবাদী পুঞ্জির অন্যতম স্তম্ভ হিঙ্গু মাষ্টার ভয়েস কোম্পানী। সাম্যবাদী নেতা বা কম্মী যখন স্বধর্মচ্যুত হয় তখন সে সবচেয়ে বেশী বাহবা পায় শাসক শ্রেণীর প্রচারযন্ত্রের কাছে। মিলিয়ে দেখুন ব্যাপারটা।

রাগ সংগীতে যাতে নতুন বস্ত্র প্রবেশ লাভ করতে না পারে তার জন্য নতুন ভাবে গুরুবাদের প্রচার শুরু হয়েছে। বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রেও কতিপয় ভূতপূর্ব সাম্যবাদীর ভূমিকা সর্বশেষ লক্ষণীয়। এই বদলির আড়ালে কয়েকজন সুরহীন এবং সম্পূর্ণ-তালিমহীন পশ্চিমা ওস্তাদ প্রায় ধর্মগুরুর আসনে জাঁকিয়ে বসেছেন। তারা নাকি ঘরানাদার সংগীত শেখাচ্ছেন। প্রচারকেরা একটা মৌলিক কথা ভুলে যান যে, ভারতীয় সংগীত যে-মূহুর্তে পুঞ্জিবাদী বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ যখন থেকে যে কেউ নগদ দক্ষিণার বিনিময়ে সংগীত শেখার অধিকার লাভ করেছে সেদিন থেকে তথাকথিত গান্ধা বাঁধা সঙ্ঘেও ঘরানার অবসান হয়েছে। বিশেষ ঘর অর্থাৎ বংশপরম্পরার মধ্যে যখন সংগীতকে আটকে রাখা যায় না তখন আর ঘরানা থাকা সম্ভব নয়। আজকের দিনে কোন বিশুদ্ধ ঘরানা নেই। কেন না, সকলেই সকল ঘরের বাজ বা গান্ধিক নকল করেন। অতএব ঘরানার অবিম-প্রিতা থাকা আর সম্ভব নয়। রাগের অপরিবর্তনীয়তা এবং ঘরানার বদলি শাসক শ্রেণী এবং তাদের বংশবদ-দের নতুনতর ধাপ্পা। একজন তথাকথিত সাহিত্যিককে জানি যিনি গুরুবাদের অকুণ্ঠ বিশ্বাসী। কিন্তু গুরুর পায়ের ধূলো খাবলা খাবলা নিজেও তাঁর গলার সাতটি স্বরের একটিও সুরে বলে না। ঘরানা জিনিষটা সামন্ত আমলের সৃষ্টি—পারিবারিক শৃঙ্খতা এবং আভিজাত্যের মতো তা তো অতীতের বস্তু হওয়া উচিত বহু দিন আগে। আর গুরুবাদ তো ধর্মীয় বস্তু। ধর্ম নিয়ে যেমন বুদ্ধোন্মাদ সমাজে প্রশ্ন চলে না তেমনি গুরুবাদ (শেষাংশ ২২শ পৃষ্ঠার)

লোকটা

(১৬শ পৃষ্ঠার পর)

দোকানের সকাল সন্ধ্যার খন্দের, বললেন, তা কি করে হবে। রেলকলোনীর লোকেরা বলছে তাদের পরিচিত কেউ নয়। আর আপনি। থামোতো, বড়ো ধমকে উঠল, ওদের ভূমি ধম্মোপদ্রব্বর ঠাউরেছ নাকি। চিনলেও বলে কখনো। থানা পদলিশের হুজুর্দার ভয়ে এখন সব উল্টো সুর গাইছে। পেছন থেকে কেউ একজন বিষয়টাকে ঘোরাবার চেষ্টা করল, আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হয়। লোকটা এদিককারই নয়। রাতে ফর্তি করতে খুঁপিরিতে ঢুকেছিল। টের পেয়ে কেউ টাকা পয়সা সব হাতিয়ে মেরে লাইনের ধারে ফেলে রেখে গেছে। বড়ো মাথা নাড়ল, তা-ও বিচিত্র নয়। হাঁর হে, কি দিনকাল শুরু হল—এক ছোকরা চোঁচিয়ে উঠল, একি দাদ। চললেন কোথায়। বসুন না আর একটু—বড়ো বিরস মুখে বলল, নাহ। শাই। বাজারের দিকটাতে ঘুরে আসি একটু। কিছু আনাজ তরকারি কিনতে হবে। বলা তো যায় না বিকেলের দিকে যদি বেরুতে না পারি—। পাশের ছোকরা বলল, আমার কি মনে হয় জানিস গুপী, এ স্জা ছিনতাই পার্টির কাজ। স্টেশনের দিকটাতেই ওদের ঘাঁটি। লোকটা আসলে ট্রেনে করে আসাছিল। রাস্তারের দিকে। ওকে নামিয়ে ওদিকটার টেনে নিয়ে গিয়ে সব কেড়েফুড়ে শেষ করে দিয়েছে। একজন প্রতিবাদ করল, তা কেন হবে। টাকা

পয়সা জিনিষপত্র ছিনিয়ে নেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে আর খামাকা খুন করতে বাবে কেন? সবকিছু নিয়ে লোকটাকে ছেড়ে দিলেই তো পারত। মাঝবয়সী নিস্কর্মা ভদ্রলোক বললেন, আরে মশাই নেশা। খুন একটা ভয়ঙ্কর নেশা। একবার স্বভাবে চেপে বসলে আর ছাড়তে চায়না। একজন মাথা নাড়ল, ঠিক বলেছেন। মানুষ কি আর মানুষ আছে, জানোয়ার হয়ে গেছে সব। তাছাড়া, দেশে যা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলছে—তাতে তো সমাজ বিরোধীদের পোয়াবারো। এই ধরুণ না, এখন এইখানে আপনাকে আমাদের সকলের সামনে কেউ যদি খুন করে যায়,—তার প্রতিকার কি কিছু হবে? পদলিশ আসবে। আমরা সবাই মূখে কুলুপ এঁটে থাকব। বেশি জেরা করলে বড় জোর বলব, কিছুই জানিনা। আমি কাউকেই দোষিন। —গুপী নামধারী ছোকরাটি বলে উঠল, দূর মশাই, পদলিশ আসতে বাবে কোন দরুখে। দেখুন না, এই লাশটা সরতেই কতটা সময় লাগে। বড়ো এক পা এগিয়েও ঘুরে দাঁড়াল, তার মানে! ভূমি বলল, পদলিশ এখনো আসে নি?—গুপী কনুই দিয়ে পাশের ছোকরার পাঁজরায় একটা খোঁচা মেরে রহস্য করে বলল, শোন বে কালু, দাদু বলছে পদলিশ নাকি এসে গেছে। তারপর গুপী হাতের চারামিনারটায় ফুকফুক করে গোটাকয় টান দিয়ে বড়োর দিকে মদ্য তুলে বলল, কোন পদলিশ আসবে, সেটা ঠিক হতেই যে শূদ্রের কাবার হয়ে বাবে। থানায় খবর দিলে বলবে রেল পদলিশের কাছে যান। লোকটার

মুখু আর ধড়টা যে রেলের জমিতে পড়ে আছে। ও লাশ আমাদের এস্তিরয়ে নেই। আবার রেলপদলিশ উল্টো সুর গাইবে। বলবে, লোকটার প্যু দরুটো যে ডোবায়ে। ডোবাটোতো আর রেলকোম্পানীর নয়। ল্যাও ঠালা। কালু উঠে দাঁড়াল, চল গুপী। শালা, আমাদের ছেলেছোকরাদের হয়েছে মরণ। সবাই বাঁকা চোখে তাকায়—

ছোকরা দরুণ উঠে যেতে, এতক্ষণ যে ভদ্রলোক কোণার টেবিলে বসে নিবিষ্ট মনে ডবল ডিমের ওমলেট গলাধরুণ করছিলেন, তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, না মশায়, এসব কিছুই না। এটা স্রেফ একটা পলিটিক্যাল মার্ভার। মাঝবয়সী নিস্কর্মা ভদ্রলোক চোখ বড় করলেন, পলিটিক্যাল মার্ভার বলছেন। তা আপনি জানলেন কি করে? ডিমের টুকরো শব্দ কাচের জলের গেলসে চমকু দিতে কোণার ভদ্রলোক বিষম খেলেন। কোনমতে গেলসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, না-না, আমি ঠিক তা বলছি। তবে চারদিকে যা ঘটছে তাতে করে এরকম একটা কিছু আন্দাজ করে নেওয়া হবে। এতক্ষণে মেজদা, যিনি এই চায়ের দোকানের মালিক, হঠাৎ চোয়ার থেকে সমস্ত উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন, হয়েছে, হয়েছে, হয়েছে। এবার উঠুন আপনারা। মশাই, ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করি। এখানে বসে পলিটিক্স ফলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করে আর আমার সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।

বেলা বাড়তে দূরের লেভেল

ক্রিসংয়ের দিকটার পরপর কতগুলি বোমা ফাটল। ওদিকে এক রাজনৈতিক দলের শব্দ ঘাঁটি। আর এদিকে, মানে স্টেশনের দুধারে ওধারের ছেলের বিপরীতপক্ষের ছেলেরাও বোমা পাইপগান পিস্তল ইত্যাদি নিয়ে যথারীতি তৈরি। দূর দূরই গুপ্তচর পাঠিয়ে লাশটাকে সরেজমিনে দেখে গিয়ে জেনে ফেলোছিল যে, লোকটা তাদের দলের কেউ নয়। তবে লাশটা বিপক্ষ দলের কেউ কিনা একথা নিশ্চিত করে বুঝতে পারিনি।

দুপুরের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই শহরতলীর মানুষ লোকটার কথা ভুলে গেল। এমনকি রেল কলোনীর লোকগুলো, যাদের নাকের ডগায় লাশটা পড়ে ছিল তারাও ক্রমশ উত্তেজনাহীন বোধ করতে করতে এক সময় যে যার কাজে মন দিল। শূদ্রমাত্র একজন, এক বিধবা মহিলা, যার বাড়ি স্টেশনের সন্নিহিত, এবং যার একমাত্র ছেলে, যে কোন একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, আজ তিন মাসের ওপর হল নিরুদ্দেশ, অনেক থানা-পদলিশ করেও যিনি ছেলের কোন খোঁজ পাননি, তিনি পদলিশের লোক যখন লাশটাকে একটা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে দরুটো লোকের কাঁধে চাপিয়ে স্টেশনের দিকে এগুচ্ছিল, তখন নিজের নিরীশ্বষ্ট ছেলের কথা মনে পড়ায় লাশটাকে লোকটা কিংবা শব্দকাটি অথবা ছেলেটা আসলে একটা মানুষ ভেবে বার-বার কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মূছে বাচ্ছিলেন।

বাংলাদেশ

নিবারণ চক্র

এই যে দাদা আসন্ন আসন্ন। দেখেছেন আজকের কাগজ? কী ঠাট্টা করেন দাদা, খবর কাগজের লোক আপনি, আর কাগজ দ্যাখেন না, তা কি হয়। রসিকতা ছাড়ুন। এই পেঁচা, বাবুকে এক কাপ চা দাও। বউদি কী বাপের বাড়ি? হ্যাঁ হ্যাঁ। বাড়ি চলবে?

কী বলছিলেন? হ্যাঁ এই যে খবরটা। জেলখানার মধ্যে তেরোজন কয়েদীকে স্ট্রেফ লাঠিগেটা করে সাবাইড করে দিলে। হ্যাঁ এই যে দেখুন না ডি এম বলেছে জেল-রক্ষীরা গুলি ছোড়েনি। ডি এম-এর ব্যক্তি মানতেই হবে। তা গুলি তৈরী, তো দস্তুর মতো খরচ আছে, না কি বলেন? দুর্দিনে সরকারের খরচ বাঁচল, এটা কম বড় কথা নয়। লাঠি পিটিয়েই যখন মানব নিষ্পত্তি মারা যায় তখন খামোকা গুলি খরচের আমি বিরোধী। আমাদের মফস্বল শহরে ছোটবেলায় দেখেছি মিউনিসিপালিটির ডোমেরা ইয়া কুঁদো লাঠি নিয়ে রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের ঠোঁটগে মেরে ফেলত। উফ, তাদের সে সময়ের কান্না যদি শব্দে থাকেন। মিউনিসিপালিটির উচিত ছিল সঙ্গে এক দল লোককে ক্যানিস্টার নিয়ে পাঠিয়ে দেয়া। ক্যানিস্টারের শব্দে কুস্তাদের বেলান্না কান্নাকে চাপা দেয়া যেত। তা ওই ছেলেগুলো কী কেঁদেছিল? জেলখানার পাঁচিল ফাড়ে কী ওদের কান্না বাইরে আসতে পথ পেয়েছে? তবু মানুষ কাঁদে, শোভাবার লোক না থাকলেও কাঁদতে হয়।

কী বলছেন? ওরা লোহার রড সংগ্রহ করেছিল? মাইরি দাদা আপনারা কাগজের লোক, আপনাদের ক্ষরেক্ষরেক দণ্ডবৎ। আপনারা কান দিয়ে দেখেন, চোখ দিয়ে শোনে, আপনাদের বাহাদুরির সীমা নেই। হলফ করে বলুন দেখি : আপনারা লোহার রড দেখেছিলেন? কী বলছেন? আহা, তার মানে আপনারা সেই মতো রিপোর্ট পেয়েছেন, এই তো? তা লোহার রড কেন, ওদের হাতে পিস্তল, রাইফেল, কী লাইট মেশিনগান তুলে দিলে কী খুব আশ্বাসবোধ্য হত? দাদা ঠাট্টা করবেন না, এক মাস শ্রীঘরে কাটাবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, জেল গেটের খাতার নাম লেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রায় ল্যাংগো করে ভেতরে পাঠানো হয়েছিল। শালা, একটা বাড়ি লোকোবারও উপায় ছিল না। কী বলছেন? সে দিনকাল আর নেই। হ্যাঁ দিনকাল বদলেছে স্বীকার

করতেই হয়। নাহলে লালমুখে সাহেবরা টেরিস্টদের কেবল লাঠির ঘায়ে সাবাইড করে দেবার কথা চিন্তাও করত না।

কী বলছেন? টেরিস্টদের কথা আলাদা? আলাদা তো বটেই। ওদের সহকর্মীরা এখনো বেঁচে আছেন, যারা মারা গেছেন তাঁদের রক্তপাত যে বিফলে গেছে, সেটা এঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। আজকের দিনে ইস্কুলের ছেলেরা কথটা মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করে যে, অহিংসার পথে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কী বলছেন টেরিস্টদের কথা থাক? আচ্ছা থাক। হ্যাঁ এসব কথা বলারও বিপদ আছে। শব্দ শব্দ বিপদ কে ঘাড়ে নিতে চায় বলুন? না আর বলব না।

কী বলছেন ব্যক্তিগত সন্দ্বাদে কিছু হয় না? এরা দ্রাস্ত! এই পর্যন্ত আপনার বক্তব্য হলে আমরা আলোচনা করে দেখতে পারি। কথটা কী জানেন? এদেশের সাধারণ মানুষ বহুকাল থেকেই ব্যক্তিগত সন্দ্বাদের শিকার। জমিদার চাষির কাছে নিয়ত এক অত্যাচার, জোতদার মহাজন, কারখানার মালিক, যে কোনো বড় প্রতিষ্ঠান টিকেই আছে এই সন্দ্বাদের ওপর। যাকে আমরা এস্টাব্লিশমেন্ট বলি তার বিভিন্ন চেহারা এগরলো। আপনি আমি কেউ কী এই সমাজের কাছে কোনো নিরাপত্তা বোধ করি? করিনা। এই সন্দ্বাদের উপরই সমাজ টিকে আছে। এস্টাব্লিশমেন্ট তেত্রিশ কোটি দেবতার মতোই মূর্তি ধরে সন্দ্বাস সৃষ্টি করে। এস্টাব্লিশমেন্টের স্বার্থ থেকে আপনার স্বার্থকে জিম্ম করে দেখতে গেলেই আপনি আর নেই। এটাই নিয়ম। ফলে প্রতিনিয়ত আমরা একটা ভয়ের সাইকোসিসে ভুগছি। একথা ঠিক আমরা এতদিন যেভাবে ভেবে এসেছি, ভাবতে ভালোবাসি তার সঙ্গে এদের চিন্তার মিল নেই। স্বীকার করতে হয় ভাবনাটা ওদের কাজটাও ওদের সেখানে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। পিতৃপিতামহসঙ্গে আমাদের চিন্তাগুলো যদি ধারাবাহিক ওদের রক্তে চালান করে দিতে পারতাম তাহলে সংসার ধেমল চলছে তেমনি চলত। আমাদেরো ঘুমের ব্যাঘাত হত না। দুর্ভাগ্য, ওরা বাপ, ঠাকুরদার কথা শুনল না। কী জানি হয়তো বিশ্বাসই করে না। আমরা তো জন্ম দেয়া ছাড়া আর কিছু করিনি। একটা ছোট্ট দুটো দিই। গান্ধীমহারাজ বলেছিলেন স্বাধীন ভারতে মাদক-

দ্রব্য বর্জন করা হবে। বলেন নি? তা কি হল? মিনিষ্টাররা বার-কাম হোটেল উদ্বোধন করছেন। গভর্ণরের পার্টিতে মদ পরিবেশন করা হচ্ছে। কেন, না, জাতীয় আয় বাড়ছে। খুশি, কাপো কোন শালার চুল লেপটে রয়েছে। কী বলছেন পণ্ডিতজী? আহা, তাঁর কথা আর কেন, তিনিই তো নবীন ভারতের কর্ণধার। ক্ষমতা পেলেই, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ব্র্যাক মার্কে-টিয়ারদের নিকটবর্তী ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে মারবেন! কথা কথাই বুঝলেন না? যদিচ শাস্ত্রে বলেছে শব্দরঙ্গ। এই কথাগুলোই যদি কাজ হত তাহলে হিন্দুস্থানের তামাম মানচিত্র পালটে যেত। দেখতেই পাচ্ছেন, যায় নি। যায়নি কারণ কথাগুলো কাজ নয়। এখন বাংলা দেশ নিয়ে আপনারা যথেষ্ট হুইচই করছেন। ভালোই হচ্ছে কাগজের সারকুলেশন ধাঁধিধি করে বাড়ছে। লক্ষ্যদায়ী বলতে পারেন দেশ ভাগটা হল কার সুপারিশে? মহাজ্ঞানী অবশ্য প্রথম দিকে বাধা দিয়েছিলেন, পরিষ্কার করে বলেছিলেন “ইন্ডিয়া ভাগ করবার আগে আমাকে ভাগ করো।” তবু দেশভাগ হল। জিন্মা সাহেবও এতটা আশা করেন নি। গান্ধীজী কী শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে মেনে নিয়েছিলেন? থাকগে পূরনো কাসন্দ্রি যেটে লাভ নেই। কী কথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম। বুড়ো লোকের এই ধর্ম, কিছু মনে করবেন না।

আমি মোন্দা কথা বা বলতে চাইছিলাম : আমরা বয়স্করা কথায় এবং কাজে উত্তরাধিকারীদের কাছে এক ফাদিঁও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠিনি। তার জন্যে আজকের ছেলেদের দোষ দেবেন না। আসলে আমরা ভয় পাচ্ছি, আমাদের তো কিছু আছে। ধরুন আপনার চাকরি, কারুর ব্যবসা, কারুর জমি, কারুর কারখানা। আমরা ভয় পাচ্ছি এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে বলে। ভয়টা যথার্থ। কিন্তু ওরা, ওদের সামনে আমরা কী আশ্বাসের ছবি মেলে ধরতে পারছি। কী বলছেন? চাকরির ব্যবস্থা করা

হচ্ছে? নাঃ ব্যাপারটা আর এর মধ্যে আটকে নেই। ওরা বুঝতে পেরেছে আমেরিকা রাশিয়ার আদলে জোড়াতালি মার্কা যে কাঠামো আমরা তৈরি করেছি সেখানে সুযোগ্যশিকারী তথাকথিত ভাগ্যমন্ত ছাড়া কারুর কোনো সুবিধে হতে পারে না। এই কৃষিপ্রধান দেশে চাষীর অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে জাতীয় সম্পদ কোনোদিনও বাড়বে না। তাই ওরা মূল ধরে টানছে, কৃষি বিপ্লব চাই। গ্রাম থেকে শহর ঘুরো। তা আপনি মানন বা না মানুন ওরা এইভাবেই ভাবছে। আপনার আমার মতো ব্যক্তিগত সুবিধের ওরা কাঙাল নয়।

না না আমাকে ভুল বুঝবেন না। ওরা যেভাবে ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা করছে সেটাই বলবার চেষ্টা করছি। আপনার আমার বিপ্লবের দরকার কী মশায়, আপনার চাকরি আছে, আমিও বিয়াল্লিশটাকা তিন আনা পেনশন পাই, ড্যাং ড্যাং করে কাটিয়ে দিলাম, আর ক দিনই বা মেয়াদ। ওদের তো অনেকদিন বাঁচতে হবে, পৃথিবীটা ওদেরই। আমরা ভাঙা টিনের চেন্নার আটকে আর ক দিন থাকব। বুঝলেন না?

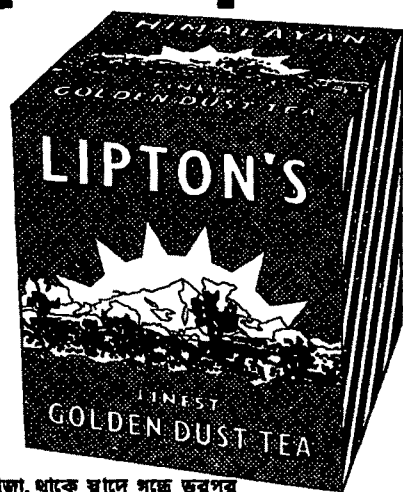
কী বলছেন সমাজবিরোধী? এই তো দাদা আপনি রাগ করছেন। রাগ করলে আর কথা হয় না। কী বলছেন সমাজ বিরোধী? তা সমাজে বিরোধটা সত্য কিনা? ধনী আরো ধনী হবে গরীব আরো গরীব—এ ব্যবস্থা কী আপনি অনুমোদন করেন? আহ হ্যাঁ আর পিপড়ের কথা ভুলবেন না। মনুষ্য সমাজে ও ধরণের উপমা চলে না। চললেও উদ্দেশ্যমূলক। কথটা হচ্ছে সমাজে বিরোধ আছে, আপনি চান বা না চান আছেই। আমি মনে করি সমাজটা অন্যায় আর বৈষম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর তখন আমার কর্তব্য কী হবে? সমাজটাকে রাখা না বদলানো? সমস্যটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির। আপনার আমার কাছে সমাজপরিবর্তনের কোনো মূল্য নেই, আমরা জানি বিপ্লবে আমাদের উপকার

নাও হতে পারে, কাজেই আমরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অসুখী নই।

কাজেই ভেবে দেখতে গেলে ওরা সমাজবিরোধী তো। একশো-বারই। অবশ্য আপনি যদি গালাগালি দেবার জন্যেই শব্দটা ব্যবহার করে থাকেন তাহলে ওদের সমর্থনে আমাকে কিছু বলতেই হয়। নাঃ ওরা ওয়গন-রেক করেনি, ছিনতাই করেনি, মেয়েদের শলীলতাহানিও নয়। ওদের সঙ্গে ওয়গন-রেকারদের এক ব্যাকেটে বেঁধে দিলে হয়তো ফান্দবাজ লোকের কোনো উদ্দেশ্য হাঁসিল হয়। অবশ্য এমতলব ধোঁপে টেকেনা। আপনার কাগজেই দেখি এইসব ছেলেদের সমাজের ক্রিম বলা হচ্ছে। বিদ্যাবান্ধ পড়াশোনা আদর্শে ওরা নাকি রিলিয়েন্ট ছেলে সব! খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনার ভাই কী আমার ছেলে, অমরকের বোন। কী বলেন, আমরা তো আর সমাজবিরোধী মস্তানদের জন্ম দিইনি। এটা আপনার রাগের কথা। রামকেস্ট বলেছেন ক্রোধ চন্ডাল মানে অসুস্থ্য। কী বলছেন? ওদের মধ্যে সমাজবিরোধী নেই কিনা এমন হলফ করে বলতে পারি না। থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। তবে এটা বাক্য একজন ওয়গন-রেকারের সঙ্গে ওদের চেহারার আমূল অমিল। একজন ওয়গন-রেকার কতদূর এগোতে পারে আমরা জানি, কিন্তু একজন বিপ্লবী স্ববককে জানি না। এমনও হতে পারে ব্যক্তিগত ফিকির গোছাবার জন্যে কিছু ওয়গন-রেকার ওদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারপর অনিবার্য বিরোধিতা শুরু হয়েছে। ওয়গন-রেকাররা এক সময় টাকা খেয়ে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়েছে অথবা অসতর্ক মহত্বের খন করে ছেলেদের। বর্ষার তোড়ে অনেক পান্না ভেসে আসতে পারে স্রোতের সঙ্গে কিন্তু সমুদ্রে মিশবার মহত্বের তাদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

নাঃ ওয়গন-রেকাররা সমাজের পরিবর্তন আনবে না, এ ব্যাপারে (শেষাংশ ২০শ পৃষ্ঠায়)

যে সব বাড়িতে জালো চায়ের বেওয়াজ - সেখানে সবাই প্রিয় লিপটনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট



একমাত্র প্যাকেটের চাই থাকে ভরতাজা, থাকে স্বাদে গন্ধে ভরপুর

লিপটন বলতেই জালো চা



LIPTON

বাংলা দেশ ১৯৭১

(১৯শ পৃষ্ঠার পর)

আমি নিশ্চিত। যেহেতু তারা এই সমাজ ব্যবস্থাই চায়। ওয়াগন-ট্রেকিং তো উপার্জনের একটা ধান্দা হিসেবে কেউ তুলে দিচ্ছেনা। ধরা না পড়লেই হল। তাই না? আপনাই ভেবে দেখুন সমাজে ওয়াগন-ট্রেকিং নেই, তার-হেঁড়া নেই, তাহলে রেলরক্ষীর প্রয়োজন কী। ওয়াগন-ট্রেকারও থাকবে রেল রক্ষীও থাকবে, উভয়ের স্বার্থই থাকবে, নয় কী?

আসুন, আরেক কাপ চা হোক। বড়িড তো বাপের বাড়ি। কী বলছেন? আমি বড় ওদের দিকে টেনে কথা বলছি। দাদা লজ্জা দেবেন না আর। দেখুন এ-সমাজ থেকে আমার আর কিছ, পাবার নেই, আমি সার বুকে ফেলছি আমাদের আর কিছ, করারও নেই। ওইসব তাজা জোমানদের না মেরে যদি আমার মতো বড়ো হাবড়াকে মারলে চলে তো আমার আপত্তি নেই। কে লিখেছে কবিতাটা? যবক বয়েসে মৃৎস্ত করেছিলাম : Does living means, simply mother, to die very young! কী বলছিলেন পক্ষপাতের কথা? হ্যাঁ আপনি কী চান সমাজের এই সেরা ছেলেরা শেষ হয়ে যাবে? না : আমি তা চাই না।

যা বলছিলাম সকালের কাগজে খবরটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। জেলখানায় পর পর এ ধরনের মৃত্যু দেখলাম কি না। সমাজের বৃদ্ধি-জীবী যাদের বলে তাঁরা দিব্য ঘুমিয়ে আছেন, বাংলাদেশের জঙ্গী-শাহীরা অভ্যচার নিয়ে সভাসমিতি করছেন, রাতে স্থায়ী সঙ্গে সহবাসও করছেন। তা করুন। সবচেয়ে তাজব করেছেন আমার প্রিয় রাজনৈতিক নেতাটি। তিনি সরকারের কাছে তদন্ত চেয়েছেন এই সকল নিহত-দের মধ্যে তাঁর দলের ছেলেরা আছে কি না! অর্থাৎ সমাজ বিরোধীরা মরুক আপত্তি নেই, তাঁর দলের ছেলেরা না মরলেই হল। এই নেতা

সম্প্রতি যে কখন কী বলছেন তার হিসেব নিয়ে রামায়ণ হয়ে যায়। একবার বলছেন ওরা পদ্রিশের লোক। তা পদ্রিশের লোক হলে পদ্রিশ ওদের ঠ্যাঙ্গাবে কেন? আবার যখন সত্যিই পদ্রিশ ওদের সাবাড় করছে তখন ঠাট্টা করা হচ্ছে গদ্রিতে কী নিরোধ লাগানো আছে! এ-এক চাষাড়ে পরিহাস। আপনি কি বলেন? নাঃ চপ করে থাকবেন না। কথা বলুন। কেউ কী সংসারে নেই যারা এই রাজ-নৈতিক দাদাদের বোঝাতে পারেন অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির হাতের রাই-ফেল কোন বাছবিচার করে না। অবশ্য আপনি যদি সত্যিই রাষ্ট্র-শক্তির উচ্ছেদ চান। শান্তিপূর্ণ পথে আপনি যদি বিধানসভা লোক-সভা দখল করতে চান সে কথা আলাদা। দেখুন মশায় বড় রকমের একটা কিছ, করতে চাইলে তার রু প্রিন্টটা আগেই ছকে নেয়া দরকার। বিপ্লবের বেলাতেও তাই, বিপ্লবী মতবাদ ছাড়া বিপ্লব হয় না। পেটি বর্জেরা মতবাদ সম্বল করে বিপ্ল-বের কঠিন কাজ সমাধা করা যায় না। আপনি কী বলেন? অবশ্য এ সব কথার কথা। আপনি আমি কেউই বিপ্লব করতে যাচ্ছি না, যাব না। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

কানাইয়ের মা, মানে আমার ইন্সট্রার কথা বলছি, ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই কাক-তাড়ানো চিৎকার। বলে, আমরা মিনসে না মাগী, শুনছেন একজন ভদ্রমহিলার শ্রীমতের উচ্চারণ, ওই “আপনজন” “এখনই” সিনেমা দেখার ফল আর কী। বিষয় কী? না, পাশের বাড়িতে বলাই আর তপদ সবে ভারতের থালা নিয়ে বসেছে, অমনি পদ্রিশ ঢুকে লাথি মেরে ভারতের থালা সরিয়ে দিয়ে এঁটো মৃৎস্থে ছেলে দড়টোকে ধরে নিয়ে চলে গেল। তো ওয়াইফ বলছে, আমরা মিনসে না মাগী। বললাম : অ্যান্ডিন পরে হঠাৎ লিঙ্গ সম্পর্কে এমনত সন্দ?

—ভারতের থালা থেকে ছেলে দড়টোকে তুলে নিয়ে গেল, আর তোমরা চপ করে বসে আছ? বললাম : তোমার কোনটাতে আপত্তি? ভারতের থালা থেকে অথবা ধরে নিয়ে যাওয়াতে? স্থায়ী ধাক্কা খেয়ে পোরুষ জেগে উঠল। বললাম : এর বিহিত না করে ফিরছি না। বউ বললে : হ্যাঁ ফিরো না। গেলাম পাড়ার পার্টি অফিসে। ওরা বললে : কালকেই বন্থ ডেকে দিচ্ছি—বন্থ ডেকে কী হবে? দিন এনে দিন খায় গরীব লোকদের কষ্ট হবে। ওরা বললে : গণতন্ত্র আমাদের অধিকার দিয়েছে। প্রতিবাদ করতেই হবে। এই সময়ে নেতৃস্থানীয় একজন মাস্টার এসে হাজির। বললে : কী হয়েছে? পদ্রিয় বলল, তপদর গ্রেফতারের কথা বললাম ওকে।—এখানে এসেছেন কেন? বললাম : কোথায় যাব বাবা? মাস্টার ঝাঁকিয়ে উঠলেন : এইসব সমাজবিরোধীদের প্রপ্রয় দিয়ে আপনারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বারোটা বাজাচ্ছেন। কে হয়, আপনার ছেলে? বললাম : না কেউ হয় না।—তবে? যান। এ জাতীয় আবদার নিয়ে আমাদের কাছে শ্বিতীয়বার আসবেন না।—কী বলব দাদা, ল্যাজ গদ্রিয়ে পালিয়ে এলাম। এখন আমি কোন মৃৎস্থ বউয়ের কাছে যাব, বলতে পারেন? কে জানে, পাড়ার বউ-মাগীদের ঝেঁটিয়ে থানায় গিয়ে চড়াও হবে কি না। আমার কানাই টাইফয়েডে মারা যাবার সময় ওরা রাত জেগে পাহারা দিয়েছিল কি না। বড় ভালো ছেলে সব। চোখে যে কী পড়ল। ধর, বড়ো মান-বের চোখ কি না। কথায় বলে না, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বনে—আমারো তেমত অবস্থা। দিব্য সংসার চলে যাচ্ছে, কোথাও টসকে যাচ্ছে না। আপনার চাকরি, আমার পেনশন, ওর ব্যবসা। আর এই তো সভ্যতার রীতি, কী বলেন? যার যার বৃত্তির মধ্যে আটকে থাকো। করে খাও। কেউ মাথা গলাবে না। বৃত্তির বাইরে অন্য কথা ভাবতে গেছ কী ব্যস। আমরা সেই অবস্থা, ঘরে বউ মানে না, বাইরে কেউ পোছে না।

তাই অক্ষম ক্রোধে নিজেই রক্তারক্তি হচ্ছে। একটা বাড়ি দেবেন? সিগ্রেট, আচ্ছা তাই দিন। গত বছরে ঠিক এমনি সময়ে আমার কানাই মারা গেল। ও বেঁচে থাকলে, আহ। কী বলছি?

এরই মধ্যে উঠলেন নাকি? হ্যাঁ আপনার তো এখনো ফ্লোরী করা হয়নি দেখছি। আজ কী বউ-দর ওখানে যাবেন? আপনার ছেলের বয়েস কত হল? নয়? কী নাম? সৌম্য? হ্যাঁ ও বাপের নাম রাখবে। বেঁচে গেছেন দাদা বারো থেকে পঁচিশ এই বয়েসটাই আজকাল বিপদের। কানাই বেঁচে থাকলে ওরও এই বয়েস হত। আমি হালফ করে বলছি ও বেঁচে থাকলে

আর বাই হোক, টাইফয়েডে ওকে মরতে দিতাম না। বলাই তপদ ওর বন্থ কি না।

কিছ, মনে করবেন না। সকাল থেকে মেজাজটা ভালো নেই। বাইরে এই সকল কাণ্ড আর বাড়িতে ওয়াইফের গজনা, বুকতেই পারছেন কার মাথা ঠিক থাকে? বউকে বোঝাতে পারি না, মায়ের প্রাণ তো, কান্না, শোক করে ওদের আমরা উপকার করতে পারব না। তার দরকারও নেই। আর, বড়ো বয়েসের ক্রোধ আত্মঘাতী। আপ-নাকে অনেক বিরক্ত করলাম। বকুনি এই বয়েসের ধর্ম আর কী।

পেঁচো, চায়ের পয়সাটা নাও।

নকশালী আন্দোলনের দলিল

(১৫শ পৃষ্ঠার পর)

কেবলমাত্র রণকৌশলের দিক থেকে দেখলাম। আমরা একবারও এই নতুন ফর্মুলেশনটিকে খাঁতিয়ে দেখলাম না। কেননা ভাবনা চিন্তার সব দায় আমরা মাত্র একজনের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছিলাম। আমরা ভাবলাম না কেন না চিন্তা ভাবনা করে দীর্ঘ কষ্টকর পথে অবিরাম চলা পেটি বর্জেরা পক্ষে খুব অস্বস্তিকর, পীড়াদায়ক। আমরা ভাবলাম না কেন না ‘বদলা’ এবং ‘খতম’ আমাদের সকল চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আমরা ভাবতে পারলাম না কেন না জন-গণের উপর নয়, অস্ত্রের উপর এবং যুব-ছাত্রের উপর আমরা পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। ফলতঃ আমরা আজ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। একেবারেই বিচ্ছিন্ন।

আর যত বেশি বিচ্ছিন্ন হয়েছি ততবেশি বোকাম মতো কাজ করছি। আহম্মকের মতো আমরা ঘোষণা করলাম, চীন বিরোধী যুদ্ধের বিরোধিতার জন্য পাল্টা যুদ্ধের প্রয়োজনে কৃষকদের টেনেস খোঁড়ার রাজনৈতিক-সামরিক প্রয়ো-জনীয়তা ও তাৎপর্য বোঝাতে হবে। আর তা যদি না পারি তবে কৃষককে ভাঁওতা দিতে হবে যে এ টেনেস জমিতে জলসেচের কাজে লাগবে। জনগণের প্রতি অনাস্থা, তাঁদের প্রতি অসম্মানের প্রকাশ এর চাইতে বেশি আর কিসে হতে পারে। এটা কি ইকনমিজম নয়? বিপ্লব কি ম্লুকসে হয়? জনগণের রাজনীতি আমরা পরিত্যাগ করেছি তাই আমরা ঘোষণা করি, “বন্দীদের মৃত্যু না করে ভোট দিতে গেলে ভোটের দণ্ড মৃত্যু!” বা “ভোটপ্রার্থী সবার গলা কেটে ফেলব!” আমরা বেমালাম ভুলে গেলাম এই সবে সেদিন সাতষটি সাল পর্যন্ত আমরাও একই ভূটরে (ভোটের) রাজনীতি করছি। আমা-দের নেতা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৌরেন বসু শিলিগুড়িতে নির্বাচন প্রার্থীও হয়েছেন।

আমরা আমাদের সাহস, বীরত্ব, অগ্রদ এবং রক্ত দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম জনগণের বিপ্লবী

পার্টি কম্যুনিষ্ট পার্টি। কিন্তু, পরিবর্তে গড়ে তুললাম এমন এক পার্টি যা জনগণের পার্টি নয়, —এক পেটি বর্জেরা সংশোধন-বাদী, হঠকারী পার্টি, আমরা গড়ে তুললাম মাও সে তুং চিন্তাধারার পার্টি নয়, গড়ে তুললাম কমবেশি পরিমাণে চে-পন্থী এক পার্টি। আমরা সৃষ্টি করলাম নতুন আর একটা নজীর—যা বিপ্লবের নাম নিয়ে বিপ্লবের বিরোধিতা করে। যা মাও সে তুংয়ের নাম নিয়ে মাও-য়েং বিরোধিতা করে।

ভারতের বিপ্লবী ভবিষ্যৎ তবে কি অন্ধকার। না, কখনোই না। আজ দুনিয়ায়, বিপ্লবের বিরোধিতা নয়, বিপ্লবের প্রবণতা-টাই আসল শক্তি। বড় শক্তি। সেই বিপ্লবী চেতনা, বিপ্লবী শক্তি জাগ্রত, সংহত করা আশ্র প্রয়োজন। জরুরী প্রয়োজন। আপনার, আমার, ভারতের সকল বিপ্লবীর উপর সেই প্রয়োজনের দায়িত্ব বর্তাচ্ছে! বর্তেছে! তিনটি লেখার আদর্শ সামনে রেখে সাহসের সঙ্গে এগোলে জয় আমাদের হবেই। কারণ বিশ্ব জনগণের মহান নেতা চীনা পার্টির চেয়ারম্যান যে আমা-দের চেয়ারম্যান। জয় আমাদের হবেই কারণ বিপ্লবের কোন ইজা-রাদার নেই। জয় হবেই, কেননা কম্যুনিষ্টরা কখনও নিজেদের মগজ প্রতিক্রিয়াশীল মহাজনদের কাছে বন্থক রাখে না। তারা মগজ খাটায়। মস্তিষ্ক খাটিয়ে শব্দ তত্ত্বের প্রয়োগে বিশ্বের তাবৎ সমস্যার সমাধান করে বিপ্লব জরী হয়।

(এক) প্যারী কম্যুনের রাস্তায় চল-মুক্তিফৌজ গড়ে তোলা, (দই) বলশেভিক বিপ্লব জিন্দাবাদ—বিপ্লবী সোভিয়েত গড়াই কাজ, (তিন) চেয়ারম্যানের পতাকা তুলে ধর গ্রাম দিয়ে শহর ধেরা মস্তাঙ্গল তৈরি কর।

SP
STUDIO PATRICK
PHOTOGRAPHERS

একটি বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা রনজিতকুমার সেন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এক বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও যুগোপযোগী বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ সাধন করাই পরিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিষদ বহু বছর যাবৎ নানা কর্মপ্রয়াস চালিয়ে আসছে। পরিষদ-সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রতি সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, সাধারণ মানুষের কাছে সহজ সঙ্গুল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের কথা পৌঁছে দিতে না পারলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হবে না। জনগণের অন্তর-লোকে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটলে অলৌকিক বিশ্বাস ও অর্থহীন আচার অভ্যাসের দাসত্ব বিমুক্ত হয়ে তাঁরা কালের সঙ্গে সমতালে চলতে পারবেন। আর তা করতে হলে বিজ্ঞানকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রতি মানুষের একেবারে হাতের কাছে এনে দিতে হবে।

এ সম্পর্কে সাহিত্যিকদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে কথা-শিল্পী অনুদাশঙ্কর রায় বলেন যে, সাহিত্যিকদের আজ বিজ্ঞানীদের মতো চিন্তা করতে হবে। তা ছাড়া বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা না হলে মাতৃভাষারও উন্নতি সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্বদের প্রধান অধিকর্তা ডক্টর আত্মারাম বলেন : মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের শিক্ষা ও অনুশীলন চাই; তাতে সময় ও সৃজনশক্তি দুয়েরই সমুচিত সদ্ব্যবহার হবে। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষালাভ হয়, তা পরীক্ষা পাশের সহায়ক হলেও মৌলিক কিছু সৃষ্টির অনুপ্রেরণা কমই দেয়। এতদিন ইংরেজিতে তত্ত্ব ও ফলিতবিজ্ঞানের চর্চা করেও ভারতবর্ষ এই জনেই দুনিয়ার সামনে গণনীয় কোনো ঐশ্বর্য তুলে ধরতে পারে নি।

কথাগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সময়ে-পযোগী হলেও এসব কথা আজকের নতুন নয়। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশ করে একদা রামেন্দ্রসুন্দর গ্রিবেদী ও জগদানন্দ রায় যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন, তার তুলনা নেই। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর “অবাস্ত” গ্রন্থখানি তো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেই সমৃদ্ধ। “বিশ্ববপরিচয়” রচনা করে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনার দৃষ্টের পথকে আরও অনেকখানি সহজ করে দিলেন। এরকম আরও কিছু কিছু প্রতিভাধর বিজ্ঞানসচেতন ব্যক্তির নাম করা যায়। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের কয়েকখানি ছোট গ্রন্থে বাংলায় বিজ্ঞানের নানা বিচিত্র ব্যাখ্যা রয়েছে। সাম্প্র-

তিক কালে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র কুমার সেন, রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল প্রমুখ বিজ্ঞান অনুশীলনকারীর লেখনীতে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান একটা বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এ সবই আশা এবং আনন্দের কথা সন্দেহ নেই।

কিন্তু দৃষ্টির বিষয় যে, এদেশের জনসাধারণ দূরের কথা, উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই অপূর্ণতার সার্থক প্রচার ও অনুশীলন হয়নি। ফলে বিজ্ঞানানুভূতির দিক দিয়ে দেশ এখনও যে তিমিরে, প্রায় সেই তিমিরে। অথচ লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ইতিমধ্যে ভারত সরকার “বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রাকৃতিক সম্পদ” নামে নতুন দপ্তর খুলেছেন এবং বৈজ্ঞানিক অনু-সন্ধিৎসা প্রচারের জন্য “ন্যাশনাল কেমিক্যাল লেবরেটরী” প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্ররা সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকলেও এদেশের জনসাধারণ তাদের সম্বন্ধে যেমন সচেতন নয়, তেমনি জন-গণের জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব অদ্যাবধি তেমন ভাবে এসে নিপতিত হয়নি। ফলে জনজীবন এখনও চিরকালের অভ্যাসমতো ঢিলে-ঢালা ও আটপোরে শৌখীন স্ফূর্তিতে মসগল হয়ে আছে। তা থেকে ফিরিয়ে তাদের বিজ্ঞানমুখী করে তুলবার মতো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। আজ সমাজে বিজ্ঞান-চেতনা যত বাড়ছে, শিক্ষিত ব্যক্তি-দের মধ্যে ততই তাকে নানা আঙ্গুলিক ভাষায় প্রকাশ করে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রচারের উদ্যোগ দেখা দিয়েছে।

এ কাজের পুরোধা হচ্ছে ভার-তীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস। বিজ্ঞানের ছাত্র ও গবেষণাকারীরা আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছড়িয়ে আছেন; তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নিজে-দের জন্য সত্য আবিষ্কার সম্পর্কে সহযোগিতামূলক আলোচনার জন্যই প্রধানতঃ বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রবর্তন হয়। বৃটিশ বিজ্ঞান-সমিতির অনুপ্রেরণায় গঠিত ভার-তীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এমন অধি-বেশন অনুষ্ঠিত হয় এশিয়োটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ভবনে উনিশশ চোদ্দ সালে। সভাপতি-পদে বৃত্ত হন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন —

‘...to give a stronger im-
pulse and a more systematic
direction to scientific enquiry,
to promote the intercourse
of societies and individuals
interested in science in diffe-

rent parts of the country, to
obtain a more general atten-
tion to the object of pure and
applied Science and the re-
moval of any disadvantages
of a public kind which may
impede its progress.’

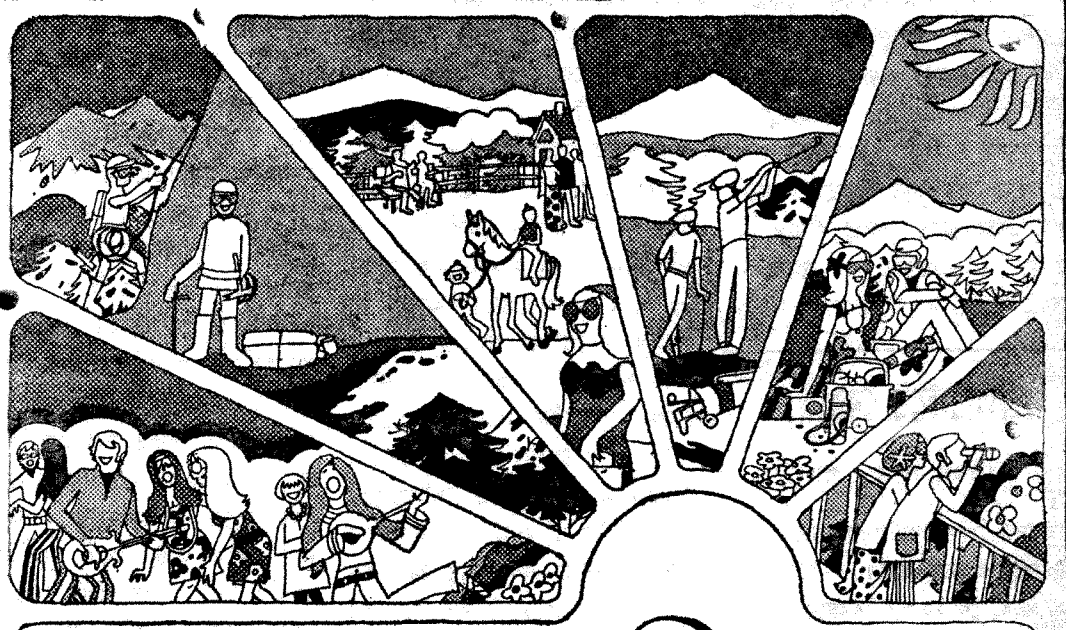
বিজ্ঞান কংগ্রেসের সঙ্গে এশিয়োটিক সোসাইটির সম্পর্ক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ এশিয়োটিক সোসাইটি থেকেই বিজ্ঞান কংগ্রেসের জন্ম। উনিশশ এগারো সালে অধ্যাপক এম এস ম্যাকমোহন এবং অধ্যাপক জে এল সাইমনসেন ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞা-নিকের নিকট এ ধরনের একটি বিজ্ঞান সম্মেলন আহ্বানের প্রয়ো-জনীয়তা বিবৃত করে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। এশিয়োটিক সোসা-ইটি এই প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করতে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করেন। তার ফলেই উনিশশ চোদ্দ সালে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। প্রথম মহাদুর্ভাগ্যে আরম্ভ হবার পর ভারতে বৈজ্ঞানিক গবে-ষণার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসও এ দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন এবং ভারতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও গবে-ষণাকারীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে বিজ্ঞান অনুশীলন ও গবেষণা চর্চার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আক-র্ষণ করেন। দ্বিতীয় মহাদুর্ভাগ্যের সময়ে নানা বাধাবিপত্তি ও অসু-

বিধের মধ্যেও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বিজ্ঞানকে নানা কল্যাণের আদর্শে বিপর্ষিত মানবতার সেবায় নিয়োগ করবার জন্য বৈজ্ঞানিক ও দেশের জনসাধারণের মধ্যে সহ-যোগিতামূলক মনোভাব স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে গবেষণা-মূলক আলোচনা ও অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন সম্মেলনের আয়োজন করে। বিগত দুই শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিজ্ঞানের যে অত্যাশ্চর্য উন্নতি পৃথিবীর সভ্য-তার চেহারা পরিবর্তন করে দিয়েছে, এশিয়ার দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রাকৃ-তিক দুর্যোগ বিধবৃত্ত দুর্যোগে কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সেই বৈজ্ঞানিক আশীর্বাদকে কার্যে পরিণত করা আশু প্রয়ো-জন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রতিবছর আন্তর্জা-তিক বিজ্ঞানী ও ভারতীয় বিজ্ঞা-নীদের সম্মেলন আহ্বান করে সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের কার্য-কারিতা সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। মূলতঃ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদেরও এই একই উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কল্যা-ণের কর্মে নিয়োজিত করাই আধু-নিক বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান এ যুগে শুধুমাত্র গবেষণাগারে ধ্যা-নিমগ্ন একদল বৈজ্ঞানিকের সত্য-সাধনার বস্তু নয়, সেই আবিষ্কৃত

সত্যকে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করে সর্বজনবোধ্য করে তোলাই আজকের যুগের বিজ্ঞান সাধকদের আদর্শ হওয়া উচিত। এ কথার সপক্ষে রায় দিয়েছেন এ যুগের অন্যতম বিজ্ঞানী এলবার্ট আইন-স্টাইন থেকে শুরু করে প্রত্যেকে। ডক্টর আত্মারাম ও জাতীয় অধ্যা-পক সত্যেন্দ্রনাথ বসুও সেই কথা-রই উল্লেখ করেছেন। পরিসংখ্যান বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, কিস্বা ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান—যে কোনো বিজ্ঞানসাধনারই আবি-ষ্কৃত সত্য আজ জনগণের কল্যা-ণের পদপ্রদর্শক হয়ে উঠুক, এই-টেই সকলের কাম্য।

বিজ্ঞান আজ অনেক ক্ষেত্রেই সভ্যতাদুঃসংকারী মারণাস্ত্র নির্মাণ-কার্যে নিয়োজিত। যে বিজ্ঞানের সাধনায় মানবসভ্যতার এই অগ্র-গতি, আজ সেই বিজ্ঞানেরই বিরুদ্ধ আক্রমণে এই সভ্যতা আসন্ন বিপ-র্ষয়ের সম্মুখীন। পৃথিবীর বৃহত্তর দেশগুলির পক্ষ থেকে নির-স্ত্রীকরণ নীতিকে কার্যকরী ও বাস্তবায়িত না করলে পৃথিবীর ধ্বংস যে অনিবার্য, তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানকে তাই মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে মানব-কল্যাণে প্রয়োগ করবার জন্য আজ শুধু বিজ্ঞানীরাই সচেষ্ট হয়ে ওঠেননি, উঠেছেন পৃথিবীর বুদ্ধি-জীবী ও সুস্থ ব্যক্তিমাত্রেই। সভ্য-
(শেষাংশ ২২শ পৃষ্ঠায়)



যদি হয় দার্জিলিং

মেঘের আবরণ সরিয়ে চলে আসুন
নীল আকাশের নীচে বকসকে পৃথিবীর
আলোয়। দার্জিলিং থেকে যখন ফিরবেন
তখন প্রতিটি দিন আপনার স্মৃতিতে
গাঁথা হয়ে থাকবে। এমনই জায়গা
দার্জিলিং।

আর নতুন খবর শুনেছেন। সিল্কে
লেকের কাছেই যে একটি শ্যালে
(বিশ্রাম কুটির) তৈরি হয়েছে। এখানে
দিল্লি পিকনিক করুন; রাজে থাকুন।

টাইগার হিল থেকে তুষারমোচি
কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখুন, আর দেখুন এভারেস্ট
বিজয়ীদের পাছাড়ে চড়ার কৌশল।
টেনিস, বিলিয়ার্ড, রেস আর হৈ-
হল্লোড়ে মেতে উঠুন, পরিবারের
সবাইকে নিয়ে।

কালিম্পাং, গ্যাংটক, সিংলাবাজার ঘুরে
আসুন আর নয়ত লাক্সারি ট্যুরিস্ট
লজে চুপচাপ বিশ্রাম নিন।
লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার

(ফোন ৬৫৬) 'শৈলাবাস' (ফোন ৬৮৪)
সিল্কে শ্যালে বা যে কোন সম্ভ্রান্ত
ট্র্যাবেল এজেন্টের কাছে কিংবা নীচের
ঠিকানায় খোঁজ নিন :

ট্রাভেল্‌স্‌ ন্যুরো
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২ বিনয়-বাগল-দীপেশ বাগ
(ডালহৌসি স্কোয়ার) ইন্ট. কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : 'TRAVELTIPS'
অথবা দার্জিলিং ফোন : ৪
গ্রাম : 'DARTOUR'

TCR/TS 195

রুচি বুদ্ধি বিকৃতি

(১৩শ পৃষ্ঠার পর)

মৎলব কাজ করছে কিনা, জুলপা, হিপ-স্টাইল হিপ রমণীতুল্য বেশ-বাস ও রুচি লক্ষ্য করে বুদ্ধিমান সামাজিকের মনে সে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক।

মানুষের ইতিহাস জীবনের প্রতিফলিত সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার ও সামাজ্য সন্ধানেরই ইতিহাস। সে ইতিহাস ব্যক্তি ও সমাজ মানবকে সদরতর, সুবিন্যস্ত এবং সামাজ্য-পূর্ণভাবে সাজাতে চেষ্টাছিল। আজ অতি আধুনিক এক রুচি প্রবাহকে দেখছি ঠিক সেই সাধনার সাফল্যকে সর্ববোধে অস্বীকার করার জন্য প্রস্তুত ও রণোন্মত্ত হয়ে উঠতে।

আজকের নায়িকা নাভিমূল, কক্ষবয় এবং আর আর দেহাংশসহ বক্ষলক্ষ উপত্যাকাপ্রদেশ সম্পূর্ণ উন্মত্ত রাখার রুচি অনুশীলনে ব্যস্ত। এ হেন রুচি মনোবিকার সৃষ্টিতে কতদূর সহায়তা করে, কিছুকাল আগেই তার বাস্তব পরীক্ষা হয়ে গেছে। অনেকেই মনে করতে পারবেন, শহর, কলকাতায় কিছুদিন ধাব রেড চালনার উৎপাদ শব্দ হুজুগেছিল। মেয়েদের উন্মত্ত দেহাংশ অজ্ঞাত পরিচয় কোনো বিকৃত মস্তিষ্ক যবক শাণিত রেড দিয়ে চিহ্নিত দিচ্ছিল। পুন্নিশ তার হৃদয় সংগ্রহ করে। এই ঘটনা অবশ্যই প্রমাণ করে যে অত্যাধুনিক স্বল্পাভরণ কোনো কোনো মনে বস্তুতই বিকারের সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ এমন এক রুচির প্রচলন হয়েছে যা মানুষকে বিকারগ্রস্ত করে মাংসাশী ও শোণিতলোভী করে তুলতে পারে। প্রশ্ন, এমন রুচি চালু রাখার কি সত্যি বিশেষ প্রয়োজন নিশ্চয় আছে, না হলে মানব মনো-

বিকারকে আরও উৎকর্ষ করার জন্য হঠাৎ একটা সার্বিক আয়োজন শুরুর হবে কেন?

প্রয়োজন না থাকলে সেক্স এবং ভায়োলেন্স অর্থাৎ যৌনতা ও খন্ড খারাবি-রক্তলোলুপতা সাহিত্যের সৌন্দর্যকে গ্রাস করবে কেন? মৎলব না থাকলে পঞ্চাশ কিসিমের পাঁচশ পাতার সেক্স ম্যাগাজিন অবাধে পথঘাট ভরিয়ে দেবে কেন? যে ফটোগ্রাফী একদিন বিকৃতমন যৌনাচারীকে গোপনে এবং বহু-মূল্যেও বিশেষ বিশেষ স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হত, আজ তাই-ই সবার নাগালের, আঙুলের নিলঞ্জিত নির্ভাবনার সঙ্গে কুৎসিত যৌন-লিপ্সার উদগ্ন পরিচয় সর্বত্র ওতোপ্রোতো এঁকে নিলে অনারাসে হাজির হচ্ছে। সমস্ত সমাজ দেহকে যৌনবাধার স্বারা অবাধে আক্রান্ত হতে দেওয়ার এই নয়া রুচি প্রকল্পকে কে বা কারা চালু করে দিলেন সে প্রশ্ন এখানে আলোচ্য নয়। কিন্তু পরিকল্পনা-কারীরা যে বিশেষ কট্ট উদ্দেশ্যেই সামাজিক সৌন্দর্যবোধকে অতিচারী ব্যাভিচারী ও উৎকর্ষ যৌনবুদ্ধির জ্ঞানব বন্যায় আচ্ছন্ন করতে পৃথিবীব্যাপী একটা সংস্কৃতি প্রায় চালিয়ে যাচ্ছেন, বুদ্ধিমান দায়িত্ব-শীল সামাজিকের পক্ষে তা উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়।

যৌনবিকার ও যৌনতাকেন্দ্রিক রুচি মানুষকে জন্তুর মতো আত্ম-সুখ সন্ধানী আত্মকেন্দ্রিক করে। বিশ শতক সামাজ্যতান্ত্রিক চিন্তা-ধারায় প্রাগসর। সেই প্রগতির পথে অবাধ সৌন্দর্যবোধহীন উৎকর্ষ যৌনাচার ও মনোবিকার মস্ত-বড় একটা অন্তরায়। মানব যে সময় আত্মসুখী সে সময় তার মনো-জগৎ সঙ্কীর্ণ। এই সঙ্কীর্ণতা তাকে বোধহীন জন্তুতে পরিণত করে; দাসত্বশৃঙ্খলে ক্রীতদাস বানায়। মনোবিকার ও যৌনাচারের রুচি অর্থাৎ যা সামাজিক মানুষের বিচারে কুরূচি এবং বিকৃতি তাকে চালু করার পেছনে বিশ শতকের এই নবলব্ধ চেতনায়রূপের জন্য একটা সক্রিয় সাংস্কৃতিক অভিধান বিশেষ মৎলবী প্রণেীর চক্রান্তে শব্দ হয়েছে বলে বিশ্বাস করার তাই যথেষ্ট কারণ আছে। জীবনের প্রতিফলিত বিষাক্ত রুচি মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে খর্ব করবে। আর সেই সংগ্রামবিমুখ স্বর্বাধিকারের নিস্তেজ দেহ মনের ওপর তখন সহজেই প্রভুত্ব করবেন মুষ্টিমেয় একপ্রণেীর মৎলববাজ। পরিকল্পনাটা বোধহয় এই রকমই।

আজকের তারুণ্য না বরষে সেই রুচিবিকৃতির ফাঁদে পা পেতে দিচ্ছে। কেননা ব্যাপারটা ভারি উত্তেজক ও মনোহরোচক। সবাই সমানভাবে লোভ সন্বরণ করতে অপারগ। বিকৃত রুচি তাই তার ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে জীবনের প্রায় সবকিছু ক্ষেপেই।

অনেকে শীল অশীল রুচি

কুরূচির প্রশ্নে পৌরাণিক রচনা-বলীকে টেনে এনে নন্দিতার পক্ষে যুক্তি সাজান। দেহ বর্ণনার, যৌনাচারের ডিফেন্স নিয়োগ করেন পুরনো পুঁথির ওকালতি। অনেকে আদম-ইভের যুগে ফিরে গিয়ে মানবের আদিম পবিত্রতা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রবণ ছুটিয়ে বলতে চান, সে অরণ্য ছিল শিশুর মতো সদর। অস্বীকার করার হেতু নেই যে, মানুষের ইতিহাসে সেটা সত্যিই শৈশবকাল এবং নন্দ শিশু বস্তুতই নিপ্পাপ। কিন্তু হাজার বছর পথ হেঁটে সেই শিশু মানুষের শৈশব আজ ভরন্ত যৌবনে টলটল করেছে এবং উলঙ্গ শিশু আর উলঙ্গ যৌবন মানব মনে নিশ্চয় একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। সুতরাং বন্য মানুষের সরলতার সঙ্গে শহুরে জ্ঞানপাপীর অতি-চারিতার তুলনা যুক্তি হিসেবে খাটে না। ওটা মৎলবী যুক্তি।

সভ্য মানুষের রুচি যৌবনকে সু-দৃশ্য সজ্জায় আবৃত করেছিল যৌন-বোধ তার মনকে বৈদ্যন আচ্ছন্ন করেছে সেই দিনই। সভ্য মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, সমাজ-জীবনকে পার্থক্য দাবিদাওয়ার স্তর থেকে উন্নীত করে তাই সে একটি শাসন অনুশাসনের নীতির মধ্যে ক্রমশঃ উন্নয়নশীল সহনশীলতার আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছে। পশুর মতো স্বার্থান্ধ সংঘাতকে যতদূর সম্ভব শৃঙ্খলাবদ্ধ করাই ছিল তার মধ্য উদ্দেশ্য। এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ না হলে অপেক্ষাকৃত দুর্বলের ওপর সবলের শোষণ নিপীড়ন অবাধ হয়ে ওঠে। জগতের আইন কান্নেম হয়। অতি আধুনিক মানবতাবোধ প্রণেী নিপীড়নের সেই করাল গ্রাস থেকে মানব-মুক্তির সাধনায় ব্যস্ত। যৌনাচার, বলাবাহুল্য, এই সামাজিক চিন্তার পরিপন্থী। যৌনাচারী স্বভাবতই অসামাজিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কারণ তার জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষা যৌন-তৃপ্তির মধ্যে বিকৃত সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। মানুষের মনে সমাজ কল্যাণের জাগ্রত আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে নষ্ট করতে তাই অবাধ যৌনাচার একটি সবল সুকৌশলী উপায়। সমাজ মনকে যে রুচি বিকৃত যৌনাচারের দিকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে তার সংগৃহীত ইচ্ছাই হল, মানুষের নবলব্ধ সামাজিক চেতনাকে গলা টিপে হত্যা করা।

এই অপকৌশল সমগ্র সাংস্কৃতিক আবহাওয়াকেই বিষাক্ত করতে উদ্যোগী। বিদেশী চলচ্চিত্রে যে কোন একটি দৃষ্টি দৃশ্যে অজ্ঞি উলঙ্গ নারী ও যৌন ক্রীড়াপ্রদর্শন একটা "মাস্ট" হয়ে দাঁড়াল। এই দৃশ্যাবলী মানুষের যৌনলিপ্সাকে উগ্র বিকৃতির দিকেই ঠেলেছে। পুরুষপ্রধান সমাজ নারীকে ভোগ্য বস্তুর মতো কেবলই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রদর্শিত করছে ও উপভোগ করছে। অবদমিত প্রণেী চেতনার (নর ও নারীকে যদি দৃষ্টি পৃথক প্রণেী হিসেবে ধরে নেওয়া যায়) দরুণ নারীও যেন তার অবমাননা উপলব্ধিতে অক্ষম। সে ক্রমশই আজ-

কের সমাজে নিজেকে একটি জীবন্ত ভোগ্য দেহবস্ত্র হিসেবে দেখছে এবং তাতে অভ্যস্ত হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, কোন নারী সংগঠনের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধাচারণ দূরে থাক, মৃদু প্রতিবাদ পর্যন্ত করা হয় না। কিন্তু মতলবী সমাজ সর্বত্র নারীর মর্ষাদাকেই আঘাত করে। জননীর মূল্য দূরে থাক, প্রেমসীর মূল্যও তারা তাঁদের দেন না। কারণ কি? কারণ এই যে, জন্মদায়ী নারীর প্রতি যে মনুষ্যসমাজ বীতশ্রদ্ধ, আত্ম-অবমাননা তাকে স্পর্শ করে না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তাই মৃত্যুকামী মানুষ নারীর মূল্য স্বীকৃতি দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে নারীকে দেয়া হয়েছে বিশিষ্ট

বিজ্ঞান আলোচনা

(২১শ পৃষ্ঠার পর)

তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, বিপর্যস্ত মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে বিজ্ঞানকে বিশ্বশাস্তি ও সমাজবাদের আদর্শে উন্মত্ত হতে হবে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রিয়াকান্ড হয়ে বিশ্ববন্ধের মারণাস্ত্র প্রস্তুতির কার্যে আত্মনিয়োগ করে বলেই আজ পৃথিবীর এই দুর্দিন। একে প্রতিরোধ করার জন্যেও সত্যসম্মত বৈজ্ঞানিকদের প্রয়োজন।

তেমনি প্রয়োজন বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় সহজ করে বিজ্ঞানের কল্যাণকামী কার্যকারিতা প্রকাশ। বাংলায় এ পর্যন্ত কিছু কিছু বিজ্ঞানগ্রন্থ রচিত হলেও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের মতো বিজ্ঞানগ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। তার উপযোগী ভাষা ও প্রকাশ ব্যঞ্জনার অভাব ছিল। আজ জাতির মননশক্তি অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। প্রচারমূলক পুস্তক প্রণয়ন করে একদিকে বিজ্ঞানের কৃষ্ণল, অন্যদিকে তার প্রয়োজনীয়তা ও সারবস্তা তুলে ধরে জনসাধারণকে গঠনমূলক ও কল্যাণকামী বিজ্ঞানানুশীলনে উন্মত্ত করে তুলতে হবে। বিজ্ঞান পরিষদ যদি একাজে অগ্রণী হয়ে তাঁদের প্রতিশ্রুত কৃমকে সার্থক করে তুলতে পারেন, তবে আমরা বিশ্বাস করি না যে, একাজে উপযুক্ত লোকের অভাব ঘটবে।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে ছাত্রসমাজে বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যয়নের দিকে একটা ব্যাপক প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই বিজ্ঞানের পাশাপাশি চলেছে প্রযুক্তি বিদ্যা। সর্বক্ষেত্রেই যদি তা জীবিকাজনের সহজ পথ বলে বিবেচিত হয়, তবে প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা বহুদূরের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ শিক্ষার পরে থাকে গবেষণার কাজ। কিন্তু এ কাজের জন্যে এখনও ভারতবর্ষে উপযুক্ত ল্যাবরেটরি গড়ে ওঠেনি। যদি উঠতো, তবে ডক্টর খোরাগার মতো ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে বিদেশের আশ্রয় নিতে হতো না। পৃথিবীর এত বড় বিজ্ঞান প্রসারের যুগে ভাবতে কষ্ট হয় যে, ভারত-

মর্ষাদার আসন কিন্তু মৎলবী শোষণপ্রণেী এই মর্ষাদাদানে অস্বীকৃত তাঁরা জানে, মানুষের মনে আত্মমর্ষাদার অবলম্বিত ঘটনো সম্ভব হলে তবেই তাকে শোষণ নিপীড়নের শিকার বানানো যায়। মতলবী প্রণেী এজন্যই সমাজে ব্যাভিচারকে অব্যাহত করে, ব্যাভিচারী রুচির প্রচলন ঘটায়, নারীকে করে পণ্য এবং রুচিকে করে বিকৃত। বিকৃত রুচি ফ্যাসিবাদ তথা শোষণ অবদমনের বিন্যাসকে দৃঢ় রাখে।

আধুনিক উপন্যাসে গল্পে নাটকে চলচ্চিত্রে এবং সমাজজীবনে নারীর মর্ষাদাহরণ আর বিকৃত

বর্ষ এখনও বহু দেশের পশ্চাতে পড়ে আছে। অথচ এখানে ডক্টর ভাবার আদর্শে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং পরমাণু-বিষয়ক গবেষণার কাজ শুরুর হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও উপযুক্ত আঞ্চলিক ভাষায় রচনা সৃষ্টি হবার অভাবে জনজীবন তা থেকে বহু দূরে পিছিয়ে আছে। পরিভাষা কমিটি এজন্য যে পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই তা ইংরেজির তুলনায় দুর্বোধ্য ও গোলমালে, তাকে সহজবোধ্য করে না তুলতে পারা পর্যন্ত ইংরেজি গ্রন্থ চর্চা থেকে এদেশের বিজ্ঞান-মুখী ছাত্র এবং গবেষকদের ফেরানো যাবে না। বাংলার ক্ষেত্রেও তাই। বিজ্ঞান বিষয়ক উদ্ভটন ছাত্র সমাজকেও একাজে তাই অংশ নেবার প্রয়োজন। শব্দ একটানা মৃদুস্থ বিদ্যার জোরে পাশ করে বেরিয়ে চাকরীর উন্মেষদায়ী এবং তজ্জনিত অভাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব নয়। তার জন্যে একাজে যেমন গভীরভাবে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে, তেমনি গভর্ণ-মেন্টকে এজন্যে অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে একাজে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। এ সম্পর্কে আর বিলম্ব করা চলে না। বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার যারা অনুগামী, তাঁদের সমধিক দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা যত বেশী অবহিত হয়ে উঠবেন, দেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতি তত বেশী স্বরাস্ত হতে পারে।

শ্রেণী সমাজ সংগীত

(২০শ পৃষ্ঠার পর)

সম্বন্ধেও না। কিন্তু সংগীতকে যদি এগোতে হয়, এই বন্ধ জলা থেকে মুক্ত করে তাতে যদি গতি সঞ্চার করতে হয় তাহলে এই মধ্যমণীর গুরুবাদ এবং ঘরানার ধাম্পা থেকে তাকে সরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষক নিশ্চয় চাই—কিন্তু গুরু চাই না। সব ঘরের অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য চাই—বিশেষ কোন ঘরের ফাঁকা আত্ম-ভিমান এবং আত্মপ্রচার নয়। ঘরানার মৃত্যু হয়েছে দশ বছর আগে। তার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য

(১৪শ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের শিক্ষাদরদীদের চোখে কত সহজেই এড়িয়ে যায়।

শব্দ যে সমস্ত শিক্ষকের এখনও এই কনজুমার সোসাইটির নেশায়, বৈবয়িক সাফল্যের সবজরী মহিমায় প্রলোভনে নিজেদের মন-বাক্যকে, আত্মমর্ষাদাবোধকে বিকিয়ে দিতে পারেন নি, তাঁদের মস্তগার শেষ নেই। সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা, এমনকি শিক্ষাজগতের প্রশাসকেরাও দূর থেকে পরম প্রাজ্ঞতায় এ সম্বন্ধে বাণী বিতরণ করে আত্ম-প্রসাদ লাভ করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়, তারা এক বিরাট অপচয় ও মর্ষান্তিক প্রবণতার সাক্ষীমাত্র নন, তার অংশীদারিত্বের স্প্যানি ও অপরাধবোধ কোনও সান্দ্রনা খুঁজে পায় না। তাঁদের দৈনন্দিন সম্বন্ধ সজীব মানুষের সঙ্গে, তার তারুণ্যের সঙ্গে, যেখানে আত্মাভিমান, আদর্শবাদের ভান, ক্ষমতার অহংকার কোনও কিছুই আড়াল তুলে পরিচয় পাবার উপায় নেই।

সি পি আই (এম-এল)-এর রাজনীতি

(১১ পৃষ্ঠার পর)

জনতাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই ডুমার জন্ম। তখন বলশেভিক পার্টি ডুমা বর্জন করে। বলশেভিক পার্টি মনে করেছিল যে তখন ডুমা বর্জন করেই জনসাধারণকে জ্বরের সংবিধানের মোহ মস্ত করবার একমাত্র উপায়। যা কি না তখন সৃষ্টি হয়েছিল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। ডুমা বরকটের অভিজ্ঞতা থেকে লেনিন তখন লেখেন, “ঘটনার দ্বারা ইহাই সঠিক প্রমাণিত হয় যে তৎকালীন সময়ে এটাই ছিল একমাত্র সঠিক পথ।” (লেনিন, ‘সিলেকটেড ওয়ার্কস’, ইং এডিশন, মস্কা ১৯৪৭, ভলুম-১, পৃঃ-৪৫০) বলশেভিক পার্টির ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায় যে এই বরকট সফল হয়েছিল পরোমোদায়, কারণ এটা পরিচালনা করা হয়েছিল বিপ্লবী জোয়ার বখন তুঙ্গে। স্বতন্ত্র রাজ্য ডুমা সম্বন্ধে মহামতি লেনিন মন্তব্য করেন যে যেহেতু অবস্থার এখন বদলে পেরিবার্তন সংঘটিত হয়েছে এবং বিপ্লবী জোয়ার আর এখন বর্তমান নেই তখন বলশেভিকরা নিশ্চয়ই ডুমা বরকট করা হবে না সে সম্বন্ধে বদলে চিন্তা করবেন (বলশেভিক পার্টির ইতিহাস, ইং পৃঃ-চল্লিশ)। এই প্রসঙ্গে লেনিন লেখেন ‘ইতিহাস দেখিয়েছে যে ডুমা ডুমার বাইরে এবং ভিতরে থেকে সংগ্রাম করবার সুযোগ দিচ্ছে...। [ই পৃঃ-৪৫০]

সুতরাং বলশেভিকরা স্বতন্ত্র ডুমার নির্বাচনে যোগদান করেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে বলশেভিকরা শব্দ-মাত্র কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মেনশেভিকদের মতন লেজিসলেটিভ কাজ পরিচালনা করতে যাননি। গিয়েছিলেন শব্দ বিপ্লবের স্বার্থে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। এ সম্বন্ধে বলশেভিক পার্টির ইতিহাস পড়লেই সঠিকভাবে জানতে পারা যায়। এর কিছুদিন বাদেই বৈধ কার্যকলাপের সঙ্গে যোগসাজসে অবৈধ কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার কথা লেনিন বলেন।

তবে বর্তমানে আমাদের ভারত-বর্ষের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে সি পি আই এম-ই একমাত্র পার্টি যারা নিজেদের একমাত্র বাম-পন্থী বলে প্রকাশ করে। লেনিন যেহেতু স্বতন্ত্র ডুমাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেহেতু তারাও ভারতীয় লোকসভায় অংশ গ্রহণ করেছেন, এভাবে বক্তব্য রাখে। কিন্তু তারা কি তাদের রাজনীতির ভিত্তিতে ইন্দিরা গান্ধীকে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবটির জন্য স্বাগত জানাচ্ছেন এবং ইন্দিরা গান্ধীকে জ্যোতিবাবু কি রাজনীতির ভিত্তিতে (হয়ত পরোনো বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে) ধন্যবাদ

জানালেন তা আদৌ আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

তবে “ভোট দিলে আস পড়বে” নকশালাপন্থীদের এই স্লোগান মোটেই চিন্তাপ্রসূত নয়। জনগণের উপরই যে রাজনীতির অগ্রগতি নির্ভর করে সেখানে জনগণকে নির্বাচন বরকটের কারণটা না বদিয়ে তাদের ভয় দেখিয়ে নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রাখাটা তাদের সঙ্গে বৈরিতামূলক সম্পর্কই গড়ে তোলে। নির্বাচনের ফলে শাসক পল্লটায় কিন্তু শোষণ যে দূরীভূত হয় না এই মূল কারণটাই জনগণকে বদিয়ে দিতে হবে।

“চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান” এই সম্বন্ধে এবারে বক্তব্য রাখছি। নিঃসন্দেহে এটি একটি আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বহন করছে। চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং সেখানকার সমস্ত শোষিত জনতার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান। যেহেতু বিশ্বের সমস্ত শোষিত মানবের চরিত্র এক সেহেতু এক দেশের শোষিত মানবের নেতৃত্ব দিয়ে অন্যদেশের মানবকে নেতৃত্ব দেওয়া মাও সে তুং-এর মতন বিপ্লবীর পক্ষে নিতান্তই কি অসম্ভব?

বিপ্লবী ছাত্র বরকটের আন্দোলনের প্রথমত তিনটি দিক আছে। (এক) তারা মূল জনগণ শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার লক্ষে এবং তাদের মধ্যে চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর চিন্তাধারা প্রচার করে তাদের সশস্ত্র সংগ্রামে জাগ্রত করতে বিপ্লবীর জীবন বরণ করে গ্রাম অঞ্চলে চলে যাচ্ছেন। (দুই) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য স্থানে যেখানে সম্ভব দালাল পুঞ্জিপতিদের ছবি বা মূর্তি ভাঙার উৎসব পালন করছেন, গেরিলা কায়দায় লাল পতাকা তুলে দিচ্ছেন। শিক্ষাব্যবস্থাকে অচল করে দেবার লক্ষ্যে যেখানে যেখানে সম্ভব ল্যাবরেটরি ভেঙ্গে দিচ্ছেন, টেবিল চেয়ার ভেঙ্গে দিচ্ছেন, স্কুল রেকর্ড ধ্বংস করছেন, পরীক্ষা ভুল করে দেবার চেষ্টা করছেন। (তিন) লাল সন্দেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জনগণের সংগ্রাম দমনের জন্য শাসক শ্রেণীর সশস্ত্র শক্তিগুলির সি আর পি, ই পি আর গোয়েন্দার দল ইত্যাদির উপর গেরিলা কায়দায় আঘাত হেনে খতম করছেন। যে সমস্ত মূর্তি ভাঙা হচ্ছে বা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে গান্ধী ও গান্ধীর সংস্কৃতির ধারক ও রাহক প্রধান কংগ্রেসী নেতাদের মূর্তি এবং ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পুরানো আমলের বর্জ্যরা শ্রেণীর কিছু বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিদের মূর্তিও আছে। যেমন রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত।

কিন্তু আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে কি রূপ বিপ্লবে কি চীন বিপ্লবে মূর্তি

ভাঙা ও আমাদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাকশনের কোন রকম ঘটনা সংঘটিত হয়নি এবং এ ধরনের তত্ত্বও উদ্ভূত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তুফান ওঠার কাল সূচিত হয়েছিল সেখানকার ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। চীনে বিপ্লবী ছাত্র বরকটের চোঁটা মে উনিশশ উনিশ সালে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে দেশের ন্যাগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে।

ধনতান্ত্রিক যুগে কলকারখানা যন্ত্রপাতি ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর হাতে থাকে। এবং ঐগুলি শ্রমিক শোষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ধনিক শ্রেণী তার ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে সেগুলি তার ভাবাদর্শ প্রচারের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও সে তুং কোথাও যে এই সমস্ত কলকারখানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর অ্যাকশনের তত্ত্ব তুলে ধরেছেন তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে যদি কোন প্রতিষ্ঠান পদলিখ বা মিলিটারি ব্যারাকে পরিণত হয় তাহলে নিশ্চয়ই তা ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে। কেননা তখন তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চরিত্র পাল্টে দেয়।

এই বর্জ্যরা শিক্ষাব্যবস্থায় যে বত পড়ে সে ততো মূর্খ হয় একথা খুবই বুদ্ধিগর্ভ। কিন্তু যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজে এখনও পড়েন তারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত নয়, নয় তাদের এখনও ডিগ্রীর মোহ আছে। সে ক্ষেত্রে স্কুল কলেজের উপর আক্রমণ করে স্কুল কলেজ ভেঙ্গে দিলেই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বিপ্লবী কাজে রতী হতে দেখা যায় না। অনেকের কাছেই পরিষ্কার যে ধর্ম একটা আফিমের নেশা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি কারোর পক্ষে কালিঘাট মন্দিরের ওপর অ্যাকশান করা সম্ভবপর? এমনকি চীন দেশীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত হানা হয়নি। এবং আমেরিকান সাংবাদিক এডগার স্নোর “দি আদার সাইড অফ দি রিভার” গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বর্তমানে চীন দেশে বৌদ্ধ মঠ আছে। তবে বর্তমানে সেখানে শতকরা পাঁচ-দশ ভাগ লোক মঠে বান। সমাজব্যবস্থা না পাল্টে শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টানো মোটেই সম্ভবপর নয়।

“ধ্বংস ছাড়া গঠন সম্ভব নয়”—এই কথা যখন চেয়ারম্যান বলেছেন তখন তার মানে সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততান্ত্রিক দালাল পুঞ্জিবাদী বাদী ব্যবস্থা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে নতুন (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক) ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পরোক্ষ তাদের নিজেদের অস্তিত্ব এবং প্রসারের

পথে যে জিনিষ তৈরী করে সেগুলি ধ্বংস করা অত্যাশঙ্ক্য (কারখানা, যন্ত্রপাতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভবনাদি)।

যদি চারুবাড় কেবলমাত্র বর্জ্যরা নেতৃত্বের সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তিকে (যেমন প্রতিক্রিয়াশীলদের কুশপদলিকা দাহ, সাম্রাজ্যবাদী প্রচার ভবন সমূহের তছনছ ইত্যাদি ইত্যাদি) ধ্বংসের কথা বলেন তবে সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু চারুবাড় শূন্যমাত্র ভাবমূর্তিসমূহ ধ্বংসের কথা বলেন নি। তিনি মনে করেন তাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদি ধ্বংস করা অপরিহার্য। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ হামলা চালানোর জন্য এসব দেশের সাধারণ বিকাশকে বিপথগামী করে সামন্ততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখে, তেমনি অন্য দিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সুদ্রপাত করতে বাধা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার বিরোধী পক্ষ বর্জ্যরা শ্রেণী, পেটিবর্জ্যরা শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

মার্কসবাদের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত ইউরোপে বর্জ্যরা বিপ্লবের আমলে বর্জ্যরা সৃষ্টি ভাবাদর্শ পরম সত্য বলে বিবেচিত হতো। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশিক দেশের যে সব বুদ্ধিজীবীরা বিদেশে যেতেন স্বাভাবিকভাবে তারা সেই বর্জ্যরা ভাবাদর্শের কবলে পড়তেন এবং নিজেদের দেশে সেই ভাবাদর্শ অনুযায়ী উপরি কাঠামোর সংস্কার সাধনের চেষ্টা করতেন। তার ফলে বিপ্লবী কৃষকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই থাকত না। এই সব দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা অনেক সময় গোড়ার দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রত্যক্ষ সাহায্য করত। ফলে এই সব দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের আসল চরিত্র সম্পর্কে এক মোহের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সব ক্ষেত্রে তাদের পরিচালিত আন্দোলন গুলি হয় বিপ্লবের প্রকৃত বিকাশের পক্ষে বাধা স্রব্দ। তবুও জনগণের উপর তাদের প্রভাব পড়ছিল।

বর্তমান পর্যায়ে আমাদের

অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই নকশালাপাড়ার সংগ্রাম সৃষ্টি করতে আমাদের কৃষক জনগণকে রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের প্রভাব থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় নি। সুতরাং যে ভাবে বলা হচ্ছে যে বর্জ্যরা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা বাহ্যিক করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তা ভুল। তবে আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল গান্ধীর চরিত্র মোটামুটি সকলের কাছে পরিষ্কার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিদ্যাসাগর কিংবা রামমোহন কি একই ভাবে পরিষ্কার? নিশ্চয়ই না। সুতরাং গান্ধীমূর্তি ভাঙতে গেলে বিশেষ ভুল করা হয় না। তবে অবশিষ্টদের মূর্তি ভাঙার আগে জনতার নাড়ীর স্পন্দন সঠিকভাবে নির্ণয় করা একান্তই আবশ্যিক।

“সশস্ত্র কৃষক বিপ্লবী সংগ্রামে ভিত ভাঙছে এবং তার ফলে ইমারত ঘা খাবে। ভিত ভাঙার প্রক্রিয়া থেকেই আসছে ইমারতের উপর আক্রমণ। আবার ইমারতের উপর আক্রমণ ভিত ভাঙার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করছে।”

ইমারত (উপরি কাঠামো) কতগুলি জিনিষমাত্র নয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইমারত বলতে বোঝায় ভাব-রাজির সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাকে। তাকে তাকে ভাঙতে হলে দরকার প্রথমত ও প্রধানত নতুন ভাবরাজির সুসংবদ্ধ কাজের বিকাশ ঘটানো।

বর্জ্যরা তাদের মনোমত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেগুলি ধ্বংস করতে হবে, তারপর আসবে গঠনের কাজ একথা বোধহয় ঠিক নয়। ব্যারাক-পুন্ডের গান্ধীঘাট ভেঙ্গে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলপাড়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে সেই বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে বাধা কোথায়?

পারিস্রাব্য প্রসঙ্গে

বর্তমানে পূর্ব বাংলায় তথাকথিত বুদ্ধিজীবী চলেছে সেই প্রসঙ্গে এখানে কিছু বক্তব্য রাখছি। মজিব কোম্পানী উনিশশ উনসত্তর সালে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন (সেপ্টেম্বর ২৪শ পৃষ্ঠার)

রুচি কুরচি বিকৃতি

(২২শ পৃষ্ঠার পর)

রুচির প্রচলন তাই কোন বিশেষ মতলবী কুচক্রের নেপথ্য পরিচালনার ক্রমশ মানবের মনকে দখল করার নিয়ত চেষ্টার ব্যাপ্ত আছে। সেই আবহাওয়া সৃষ্টির স্বপক্ষে অনেক বুদ্ধি, অনেক নজর, অনেক দর্শন তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে। মতলবী শ্রেণী রুচিবিকৃতি সৃষ্টির জন্য দালাল সাংস্কৃতিক কর্মীকে মোটা বেতন প্রদান উপঢৌকনে মূগ্ধ করে মানবের মন শিকারে নিযুক্ত করেছে।

রুচি পরিবর্তনের প্রবাহে অসতর্কভাবে গা ভাসানো তাই শূন্য আত্মসর্বনাশই ডেকে আনে না, নর-রুচি গ্রহণ করে নিজের অজ্ঞাতে অনেকে সামাজিক অপরাধে আপনাকে অপরাধী করেন। হাওয়ার গা ভাসানোর আগে রুচি কুরচি বিকৃতি সম্পর্কে ধীর বিবেচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। অন্যথায় নিতান্ত অনিচ্ছকও হয়ত শেষ পর্যন্ত অসতর্কতার জন্যই কুমতলবীর পরিকল্পনাকে সার্থক করতে আত্মহুতি দেবেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে।

মৌবনের সংকট

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিরোধিতা নতুন নয়—সেই উনিশশ বিশ থেকেই। এ বিরোধিতার মূল কেবল বাংলার ভদ্রলোক নেতৃত্বের সর্বভারতীয় নেতার আশাভঞ্জেই নেই—সরেন্দ্রনাথ বা চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধীর নেতৃত্বের সামনে, তাঁর সর্বভারতীয় ইমেজের সামনে দাঁড়াতে পারেন নি, এ কথা ঠিকই। এ কথাও ঠিক, গান্ধীর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বভারতীয় স্তরে বাংলায় ভদ্রলোকের রাজনৈতিক প্রভাব কমে থাকে, গান্ধীকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে উনিশশ সাত খৃষ্টাব্দে লেবর দলের এম পি কে হার্ডি যে উত্তরপ্রদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা সর্বাপেক্ষা কম দেখেছিলেন, সেই উত্তর প্রদেশেই ক্রমশঃ প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু বাংলায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের গান্ধী বিরোধিতার মূল আরও গভীরে। তিলক ইত্যাদির চরম-পন্থা এবং মডারেটদের রক্তহীন সংবিধানসম্মত আবেদন নিবেদন, এই দুই থেকেই গান্ধীর রাজনীতি ভারতীয় কংগ্রেসকে মর্জিত দিয়েছিল। গান্ধীর নেতৃত্ব পাশ্চাত্যভা-

বন্য বর্মান্বজীবী, ব্যবসায়ী শিল্প-পাতি আবার সাধারণ কৃষক—এই সবার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। তাঁর অহিংসা বাঙালী ভদ্রলোকের সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত, অন্যদিকে তাঁর প্রাচীন গ্রাম-সমাজেও পুনরুজ্জীবনে আস্থা, পোষাকে বাহ্যিকভাবে ভারতীয় কৃষকের আদর্শকে বড় করা এ সবই বাঙালী ভদ্রলোকের সমস্ত ধ্যানধারণা মূল্যবোধের প্রচণ্ড প্রতিবাদ। অবশ্যই নিরুপায় হয়ে বলপূর্বক কৃষকদের নিজেদের দাবীর প্রতিষ্ঠাকে তিনি ফ্যাসিজম বলেছিলেন, উনিশশ খ্রিষ্টাব্দে সালেও আশঙ্কা করেছিলেন হয়তো স্বাধীন ভারতবর্ষে জমিদারদের বিলোপ সাধন করা হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী-সংগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজ-তান্ত্রিক ধারণাকে নিন্দা করতেও তিনি পিছপা হন নি। তবু কৃষকদের সম্পর্কে তাঁর, বস্তব্য নিঃসন্দেহে বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের স্বার্থ বিরোধী মনে হয়েছিল, তারা প্রাণপনে যে কোন কৃষক স্বার্থের অনুকূল আইন কানূনের

বিরোধিতা করছিল। আবার ভারতের ধনিক শ্রেণীরও গান্ধীর মতবাদে ঘাবড়াবার কিছু ছিল না, তাঁর “বাই ইন্ডিয়ান”-এর সূত্র বৃষ্টিপ্ৰতিযোগিতাকেই কমাতে সাহায্য করেছিল : বা গান্ধীর শ্রমিকদের ধর্মঘট বিরোধিতাতেও তারা খুশী ছিল। স্বাধীনতার পর খাদ্য ইত্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যবসায়ীরা যে আক্রমণ সূর্য করে প্যাটেলের মাধ্যমে, এবং নেহরু-প্যাটেল মতবিরোধ সূর্য হয়, তাতে গান্ধী প্যাটেলকেই সমর্থন করেন। বস্তুতঃ ‘গান্ধীর নেতৃত্ব, অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী শ্রেণীর গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে—বস্তুতঃ গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে কংগ্রেসী প্রভাব সেখান থেকেই গড়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য, বাঙালী ভদ্রলোক নেতৃত্বের মূল সীমাবদ্ধতাই ছিল এটা—তাদের সব আন্দোলন কলকাতা ও শহরেই সীমায়িত, এমন কি এই ভদ্রলোক নেতৃত্বই যখন বাংলার বামপন্থী, কমিউনিস্ট আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে, তখনও এই বাঙালী ভদ্রলোকের গ্রামবিন্দিতা থেকেই যায়, কলকাতা ও তার আশেপাশেই তাদের প্রভাব মূলতঃ গড়ে ওঠে। সুতরাং গান্ধীর প্রতি এই গভীর কারণেই বিরোধিতার বাঁজ বাংলার মাটিতে গড়ে ওঠে। বর্তমানে গান্ধী বিরোধিতা নিয়ে যখন বিরাট হৈ চৈ-এর সময় এই কথা সর্বদাই স্মরণে থাকা উচিত। অবশ্য বর্তমানের গান্ধী বিরোধিতার তফাৎ আছে। কিন্তু এই বিরোধিতা প্রাথমিক ভাবে বাঙালী মধ্যবিত্তর ইতিহাস থেকেই এসেছে। (গান্ধী সম্পর্কে মতামত ব্যারিষ্টার মুরের সোশ্যাল অরিজিনস অব ডিকটেশনশিপ গ্র্যান্ড ডেমক্রেসী থেকে নেওয়া।)

সাতচল্লিশ-এ বাঙালী হতাশ, তিস্ত, অতীত সাফল্যের স্মৃতি-বাহী, পারিপার্শ্বিকের ওপর নিয়ন্ত্রণহীন তাদের সব মূল্যবোধের কার্যকারিতা তখন অবসিতপ্রায়। স্বাভাবিক ভাবে সাতচল্লিশ-এর পর যাদের জন্ম বা যারা যুবক হয় তাঁরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে এই নপুং-শক অবস্থাকেই পেল—চাকুরী নির্ভর স্ট্যাটাস সন্ধানী বিচ্ছিন্ন ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত তাঁর নতুন পুরুষদের জন্য ভুল শিকড়হীন উদ্ভাসিতকেই রেখে গেল। লক্ষণীয়, বিষয়, এই পরবর্তী পুরুষদের, এ সময়কার যুবকদের বিদ্রোহ ক্রোধ অন্যতম প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে সেই শিক্ষাব্যবস্থার ওপর, যে শিক্ষা একদা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জন্ম লেনে উপরে ওঠার অন্যতম প্রধান বা একমাত্র পথ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। পঞ্চদশ ভদ্রলোক উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করার প্রাথমিক ধাপেই তাদের একমাত্র মূল্য-ধন শিক্ষা, কলোনীয় উত্তরাধিকারকেও তারা প্রত্যক্ষ আঘাত হানতে চাইল। বস্তুতঃ চাকুরী ভূমিত মধ্যবিত্তের এই ক্রোধ যুবকদের বিদ্রোহের পশ্চাতে একে একে চাকুরীর সব দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া খান-

কটা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ব্যাপারটা কেবল চাকুরী না পাওয়ার বলে অনেকে যে ব্যাখ্যা করে তা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, বাঙালী মধ্যবিত্তর কাছে চাকুরী তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার অঙ্গ। প্রশ্ন উঠতে পারে, উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে ক্রমে ক্রমে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আরও হতাশায় নিমজ্জিত সম্প্রদায়, তখন যুবকেরা বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইল, কেন, তাদের বিদ্রোহের উৎস কোথায়? প্রথমে স্মরণীয়, মৌবনের সাধারণ ভাবেই সংকট আসে ইগো-ইন্টিগ্ৰিটি-টির আত্মকেলোর—ব্যক্তিগত জীবনের পর্বে পর্বে এই সংকটই মর্জিত চায় বৃহত্তর কিছু-একটি—চার্চ, ধর্ম, পার্টি ইত্যাদির সঙ্গে একাত্ম-বোধে। ইতিহাসের কোন না কোন শক্তির সঙ্গে ঐক্যচেতনায়। সাতচল্লিশ-এর পর মধ্যবিত্ত যুবকদের তাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত আত্ম-প্রতিষ্ঠার, নিজে উত্তীর্ণ হবার পথ সামনে ছিল না। ধর্ম, সমাজ, পারিপার্শ্বিক, নিজ শ্রেণী সবই তার আত্ম-অভিজ্ঞান আবিষ্কারের পরিপন্থী। সে অবস্থায় হতাশ এক শ্রেণীর ধারাকে বহন করছে; অন্যদিকে যে চাকুরী মধ্যবিত্তর অভিজ্ঞান আবিষ্কারের বাংলা দেশে একমাত্র পথ নির্ধারিত হয়েছিল, তাও হারাল স্বাধীনতার পর। অর্থাৎ সমস্ত সংকট এল বাঙালী যুবকদের, মৌবনের এই ইগো-ইন্টিগ্ৰিটি-টির সমস্যায়। বস্তুতঃ এ-ব্যাপারে বিভিন্ন বামপন্থী দল-গুলোও কোন সাহায্য করতে পারল না—প্রথমতঃ, তাদের প্রত্যেকের ছাত্রাধা থাকলেও, এই সমস্যা সম্পর্কে কোন সচেতনতা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এই দলগুলোও মোটামুটি ভদ্রলোক নেতৃত্ব সমন্বিত, ভদ্রলোক দোতানায়—কখনও দারুণ সংবিধান সম্মত, কখনও আচমকা বিপ্লবী ভাবভঙ্গীর ধাক্কায় ধাক্কায় চলেছে। ফলে উনিশশ ষাট-এর দশকে সচেতন যুবকদের কাছে এসব পার্টিরও তাৎপর্য হারিয়েছে তদুপরি ফ্রান্স, ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী সাম্যবাদী দলের ভূমিকার কথাও এখানে স্মরণীয়। সুতরাং বঙ্গীয় যুবকদের নিজস্ব পথ বাছা ছাড়া উপায় ছিল না—প্রচলিত দলসমূহের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব তাদের এমন কী আনন্দের দিকেও ঠেলে দিয়েছে।

এ ছাড়াও যুবকদের বিদ্রোহের অন্য কারণ রয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র যুবক-স্তরই সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয় নি—চাকুরী ইত্যাদির মাধ্যমে—বস্তুতঃ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর অন্যান্যস্তরের কিছু গাছিত স্বার্থ, পিছর্তন থেকেই আছে। তাদের জীবন ধারণও সমকালীন ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত—তাদের এই হতাশ অবস্থার করার কিছু নেই, পারিপার্শ্বিকের কারুণ্যের শিকার হওয়া ছাড়া, স্ট্যাটাস কুয়ো-কেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে রক্ষা করার আশ্রয় চেষ্টা ব্যতীত। কিন্তু যুবক ছাত্রদের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে কোন ঝুঁকি নেই, বাধা

নেই—তারা নিশ্চিন্দায় কাঁপিয়ে পড়তে পারে। এই খানেই ছাত্রদের বিপ্লবী ভূমিকা বাংলা দেশে ঘোঁরাঘোঁরা নিজ শ্রেণীর বিরুদ্ধেই উচ্ছ্বাসিত হয়েছে প্রথমে—নিজের বিকৃত উত্তরাধিকারকে টেনে ফেলে দিতে চাইছে হয়তো অনেক সময়ে বিচার-বিবেচনা ছাড়াই। তাই বিদ্যাসাগর প্রমুখ সম্পর্কে তাদের যে জিজ্ঞাসা, তার মূল্য অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, কিন্তু একথাও ভুলে গেলে চলবে না এই বিদ্যাসাগরেরই শেষ জীবনের তিস্ততা মধ্যবিত্ত সমস্ত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে সাঁওতালদের মধ্যে ফিরে যাওয়া। যেমন এই যুবকেরাই চলে যাচ্ছে গ্রামে গ্রামান্তরে, ভদ্রলোকদের চোখে তথাকথিত ছোটলোকদের মধ্যে।

বলাই বাহুল্য বাংলা দেশে যুব বিদ্রোহ এখনও অনেকটা আনন্দের ধারা ধৌসে—বস্তুতঃ যুব বিদ্রোহের এই প্রথম স্তরে সর্বব্যাপী আমলা-তান্ত্রিক অনাচারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই নৈরাজ্য হয়তো অনিবার্য। তবে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের “গ্রেমার্টিক বিপ্লবী” মানসিকতা থেকে তারা এখনও মুক্ত নয়—বাইরের উত্তরাধিকারকে যত দূর ভাঙা যায় দলের ভিতরের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করা এত সহজ নয়, দীর্ঘ প্রক্রিয়া-সাপেক্ষ। তাই তারা মাঝে মাঝেই বিচ্ছিন্নতায়, ভদ্রলোকদের বিচ্ছিন্নতার সংকটেই আক্রান্ত হয়—মনে হয় তাদের বিদ্রোহে জনসাধারণের স্রোতধারা অপর্যাপ্ত, যে স্রোত-ধারায় তারা মাছের মত থাকবে।

তবে সম্যাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এই বিদ্রোহের তফাৎ সর্বদাই মনে রাখতে হয়। আমাদের সম্যাসবাদ ভদ্রলোক সীমাকে স্বীকার করেই—বস্তুতঃ বাক্ষমচন্দ্র বিবেকানন্দের বাঙালী ভদ্রলোকের চিন্তাই ছিল সে আন্দোলনের ভাবাদর্শগত পটভূমিতে। সে সম্যাসে গ্রামে আন্দোলন বিস্তারের কোন পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু, সমকালীন যুব বিদ্রোহে ভদ্রলোকের সব ভাবাদর্শগত পটভূমিই অস্বীকার করা হচ্ছে—মূলতঃ মাও-সে-তুং-এর রচনাবলীই নানা-ভাবে এ বিদ্রোহের তত্ত্বগত-কাঠামো তৈরীতে সাহায্য করেছে। অবশ্যই পরিণত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বোধে, তা সর্বদাই হচ্ছে, একথা সকলে হয়তো স্বীকার করবে না। কিন্তু মাও-সে-তুং-এর রচনাবলী বাঙালী ভদ্রলোকের সমস্ত মূল্যবোধ, চিন্তাধারার বিপরীত মেরুর। বস্তুতঃ তত্ত্বগত ভাবেই এই যুবকেরা ভদ্রলোক—সীমা অতিক্রম করতে চায়—আর এ ব্যাপারে সংসদীয় কোনরকম আপোষই তারা সহ্য ক'না। আসলে ভদ্রলোক মধ্যবিত্তর সীমা ভেঙ্গে তারা যেতে চায় জন-গণের কাছে—এমনকী মধ্যবিত্ত পরিবেশ পিছনে ফেলেই চলে যায় তারা কৃষকদের মাঝখানে। অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের এই নব্যপুরুষের দেশের সঙ্গে তাঁদের ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতা কাটাতে চায়, গান্ধীর জমিদার (শেষাংশ ২৭শ পৃষ্ঠায়)

এম এল রাজনীতি

(২০শ পৃষ্ঠার পর)

লনের সুযোগ নিয়ে নেতৃত্ব দখল করে এবং এই সময় মর্জিবদের ছয় দফা দাবী খুব জোরালো হয় এবং এর ফলে আয়তন পদত্যাগ করলে ইয়াহিয়া ক্ষমতা দখল করে। সুতরাং ইয়াহিয়ার ক্ষমতায় আসার মধ্যে বুর্জোয়াদের কোন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংঘটিত হয় নি। আমাদের দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলই আজ “বাংলা দেশের” এই মর্জিত সংগ্রামকে স্বীকৃতি দানের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অনান্য সমস্ত দলই চাইবে মর্জিব কোম্পানি রাজত্ব করুক কারণ মর্জিব কমিউনিস্ট বিরোধী। কিন্তু সি পি আই কি ভাবে এই বস্তব্যকে সমর্থন করে তা মোটেই পরিষ্কার নয়।

মর্জিব কোনদিনই চায়নি যে দেশে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হোক। কারণ সে জানত যে রক্তাক্ত সংগ্রাম হলেও এ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিশ্চই শ্রমিক কৃষকের হাতে চলে যাবে। এবং এর ফলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের উপর নির্ভরশীল এই আন্দোলন বিপ্লবী যুদ্ধে পরিণত হবে। বাংলা দেশের জনগণ শোষিত একথা ঠিক কিন্তু একথাও তো কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে পশ্চিম পাকিস্তানেও একই কায়দায় শোষিত শ্রমিক কৃষক আছে। বাংলা দেশে নিঃসন্দেহে ইয়াহিয়া এক বর্বরোচিত আক্রমণ পরিচালনা করছে। ইয়াহিয়া কমিউনিস্ট পার্টি'কে বে-আইনী করে রেখেছে। শব্দ তাই নয় জমিদার শ্রেণীর উপরে সে তার শক্তিকে সংহত করার চেষ্টা করছে তার হাতিয়ার উগ্র ধর্মাত্মতায়। সুতরাং বাংলা দেশের কমিউনিস্ট

পার্টির এখন দম্ভে নীতি পরিচালনা করতে হবে। একদিকে তাদের ইয়াহিয়াকে রাখতে হবে, এবং অন্যদিকে তাদের মর্জিবের বস্তব্য রাজনীতির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। চীনের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে উনিশশ একাত্তিশ সালে জাপানী আক্রমণের পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'কে একদিকে কুওমিন্টাংয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে এবং অন্যদিকে ঐতিহাসিক লং মার্চ করে জাপানী আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে হয়েছে। তারই ফলে চিয়াং-এর সেনা বাহিনী বিদ্রোহ করে চিয়াংকে বাধ্য করে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আপোষ করতে। এবং এই আপোষের পরেও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'কে এই দম্ভে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। চেয়ারম্যান মাও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেও কমিউনিস্ট পার্টির এই স্বাধীন স্বতন্ত্র কাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী দিয়েছেন। প্যাংলোইনের ক্ষেত্রে আমরা এই ঘটনার ছায়া দেখতে পাই। প্যাংলোইন মর্জিত সংগঠনকে ইয়াংলোর বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হচ্ছে, তেমনি জর্ডানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাশীলদেরও মোকাবিলা করতে হচ্ছে যদিও জর্ডানের একটা অংশ ইয়াংলো দখল করে রেখেছে। চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন জাতীয় মর্জিত সংগ্রাম মূলতঃ শ্রেণী সংগ্রাম এবং এর ফলেই শ্রমিক কৃষকের রাজত্ব কামের হবে। বাংলা-দেশের তথাকথিত সংগ্রাম বর্তমানে আমাদের বাই শিক্ষা দিক না কেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তা উগ্র ধর্মাত্মতার ওপর এক কঠিন আঘাত হেনেছে।

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আমলা মুংসুদি পুঁজিবাদীদের দ্বারা কখনোই সে দেশের জাতীয় পুঁজি বিকশিত হতে পারে না। মুংসুদি পুঁজিপতিরা ঋণের মাধ্যমে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি সংগ্রহ করে নিজদেশে খাটিয়ে তার লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেয় এবং এর পারিশ্রমিক হিসাবে নিজেরাও সে লভ্যাংশের কিছুটা পেয়ে থাকে। এভাবে নিজস্বার্থে এরা নিজদের দেশের জনগণের সামগ্রিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের এক্ষেপ্ত হিসাবে কাজ করে থাকে। এরা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল, এরা জাতীয় শত্রু তথা জনগণের শত্রু। পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন মুংসুদি পুঁজিপতিরাও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যেই তারা সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের কাছ থেকে মোট পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে (যার পরিমাণ পাকিস্তানের বাৎসরিক জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ) এবং পরিণামে বিরাট অংকের সুদ দানের মাধ্যমে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা করে আসে। অবশ্য এই ফাঁকে তারা নিজেরাও নিজদের ব্যক্তিগত পুঁজি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের ঋণ গ্রহণ করে তার লভ্যাংশের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ ক্রমাগত সফরের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি দাঁড় করানো এক বিরাট কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই দ্রুত পুঁজি গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুংসুদি পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদী কায়দায় নিজ দেশেরই জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা উৎপাদনশীল অংশ পূর্ব বাংলার সকলশ্রেণীর জনগণের উপর চালাতে থাকে প্রচণ্ড এক ঔপনিবেশিক শোষণ। শোষণের রূপ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ তাদের এ একচেটিয়া পুঁজির শোষণ থেকে বিন্দু মাত্র রেহাই পায় নি। ইসলাম, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি, শক্তিশালী কেন্দ্র এবং শিশুরাফের নামে এই ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে তারা কেড়ে নিয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণের সকল মৌলিক অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, মতাদর্শের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিল্পীর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তাদের প্রতিটি আশা আকাঙ্ক্ষাকে বুলেট, বেয়নেট দ্বারা নির্মম ভাবে দমন করা হয়েছে, গৈশাচিক বর্বরতা স্তব্ধ করে দিয়েছে এ শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মুখর প্রতিটি সংগ্রামী কণ্ঠকে। কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী জনগণ যাতে শ্রেণীচেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে শ্রেণী সংগ্রাম তথা বিপ্লবী যুদ্ধের সূচনা করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে অকথা শোষণ নিপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়েছে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার অধিকার। কায়েরী স্বার্থবাদী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রাম যাতে সূচিত ও সংগঠিত হতে না পারে সে জন্য মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জঘন্য উদ্দেশ্যে অতি সুপরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ চালানো হয় পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষা, শিল্প কৃষ্টি-সংস্কৃতি, গণবাদপত্র এবং রাজনৈতিক মতামতের উপর।

পূর্ব বাংলার উঠতি বনিক শ্রেণী (যারা পূর্ব বাংলার জাতীয় এবং মুংসুদি বনিক) ও সামন্ত শ্রেণীর উপর যুগপৎ আক্রমণ করে পূর্ব বাংলার অর্থনীতির উপর হানে মারাত্মক আঘাত। জরিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল সরকার নিজেই সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় অতি কদর্য শোষকের চেহারায়। শিল্প-কলকারখানাগুলি থেকে সুকৌশলে বাঙালী মালিকদের অপসারণ করে সেগুলোকেও তারা দখল করে নেয়।

নিজেদের পুঁজির বিকাশের জন্য তারা পূর্ব বাংলার কৃষির শিল্পকেও ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। শুধু তাই নয় ক্ষমতাসীন কায়েরী স্বার্থবাদী পাকিস্তানী শাসক ও শোষক গোষ্ঠী সমাজের প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে বিরাট এক বৈষম্যমূলক আচরণে লিপ্ত হয়, এবং শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে যাতে তারা বিপ্লবী বিদ্রোহ করতে না পারে তার জন্য প্রথম থেকেই অতি সতর্কতার সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণকে নিরস্ত্র করে রাখে।

কিন্তু শোষকদের প্রতি ইতিহাসের রায় বড় নিষ্ঠুর। যেখানেই শোষণ নিপীড়ন সেখানেই শ্রেণীভেদ, আর এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণীচেতনাই শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মাঝে প্রথমে শ্রেণীঘন্থ এবং পরবর্তী-কালে সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের সূচনা করে। পূর্ব বাংলার ইতিহাসও এই একই ধারায় প্রবাহিত। দমন গীড়ন দ্বারা শোষক ও শাসকরা সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার বনিক ও সামন্তশ্রেণীকে দমন করেছে, পূর্ব বাংলার বাঙালী বনিক শ্রেণীর (মুংসুদি বা জাতীয়) পুঁজিকে বিকশিত হতে দেয় নি, এবং বাঙালী সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়েছে সত্য, কিন্তু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের দমন বা নিষ্টির্ণ করতে তারা পারে নি। বরং গত তেইশ বৎসরের ক্রমাগত শোষণ নিপীড়নের ফলে পূর্ব বাংলার জাতীয় বনিকরা তাদের পুঁজি হারিয়ে, সামন্ত বনী কৃষকরা তাদের জমি হারিয়ে এবং কিছু সংখ্যক বনী ও মারারী কৃষকদের সন্তান সন্ততিরা লেখাপড়া শিখে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব বাংলার এই জাতীয় বনিক ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য এবং তাদের গুরুত্ব ছিল অপরিণীয়। অপর দিকে পূর্ব বাংলার মুংসুদি বনিক ও সামন্তশ্রেণী তাদের শোষণের ক্ষেত্রে পুন-কৃত্যের আশায় তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ ও দফার মাধ্যমে পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন আমলা মুংসুদি বনিকশ্রেণীর সঙ্গে এক আপোষের প্রচেষ্টা চালায়। “জয় বাংলা” উগ্র জাতীয়তাবাদের আডালে বিভ্রান্ত করে তারা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সহ পূর্ব বাংলার জনগণের একটা বিরাট অংশকে তাদের সপক্ষে টানতে সক্ষম হয়। মুংসুদি চরিত্র-বিশিষ্ট পূর্ব বাংলার বনিক ও সামন্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ কখনোই পূর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ এবং সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কোন আহ্বান জানায় নি, শ্রেণীগত চরিত্রের জন্য তা জানাতেও পারে না। বাস্তবে পাকিস্তানী শাসক, শোষক গোষ্ঠীর মিত্র রূপেই তারা চেয়েছিল একই পাকিস্তানের কাঠামোতে আপোষের পথে শোষণের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতি-বিপ্লবী। তারা তাদের শ্রেণী চরিত্রের জন্যই সর্বদা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি-কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র বিরোধিতা করেছে, অনেকক্ষেত্রে তাদেরকে আক্রমণও করেছে, জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে, জনগণ-তান্ত্রিক চীন ও সামাজিকতান্ত্রিক সোভিয়েটের বিরোধিতা করেছে এবং পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতি তাদের সৌহার্দ্য, নির্ভীকতা এবং আনুগত্য প্রকাশ করেছে। ফলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সশস্ত্র শত্রু হিসাবে চিহ্নিত না করে তাদেরকে দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি হিসাবে ধরে নিয়ে, তাদের দেয়া তথাকথিত নির্বাচনের প্রহসনে অংশ গ্রহণ করে, “স্বাংসা ও অসহযোগের” গান্ধীবাদী সত্যগ্রহের পথে আওয়ামী লীগ ও দফা আদায়ের দাবীতে আত্মনিয়োগ

করে। কিন্তু পূর্ব বাংলারবার বিপ্লবী জনগণ “স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা” প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র গণ-যুদ্ধের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ফলে আওয়ামী লীগের ও দফার আপোষ কমুলার দফারফা করে পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনী তাদের সামগ্রিক মারণাজ্ঞ নিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গেরিলা পদ্ধতিতে জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ, যা বর্তমানে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গণযুদ্ধের রূপ লাভ করেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পাকিস্তানী শাসক, ও শোষক গোষ্ঠী মেহনতী জনগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রীর সেতুবন্ধ কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে তাদের শ্রেণী সংগ্রামের পথে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। গোপনে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও বাস্তবতার কঠিনপাথে সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে জনগণকে পরিচালনা করার পরিবর্তে তারাই জনতা দ্বারা বাহিত হতে থাকে এবং ঘটনার পেছনে লেজুর বৃত্তিই তাদের প্রধান কর্ম হয়ে দেখা দেয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে দেউলে নীতির পরিচয় দেয় মস্কোপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (বর্তমান বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি)। প্রথম থেকেই এরা আওয়ামী লীগের লেজুর বৃত্তি করতে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে তাদের ও আওয়ামী লীগের মধ্যে “পার্টির নাম,” “কমিউনিজম” “মার্কস-লেনিন” ইত্যাদি প্রয়োগহীন শব্দসমষ্টি ছাড়া আর কোন পার্থক্যই ছিল না। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল.) নামধারী পার্টি পূর্ব বাংলার সামগ্রিক ও বাস্তব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ না করে পূর্ব বাংলার ভারতের বিপ্লবী রাজনীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করে এবং তা স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করে। তারা অবিভক্ত পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাসিস্ট সেনাবাহিনীর ইতিহাসের ঘৃণাত্মক কার্যাবলীকে প্রগতিশীল বলে বর্ণনা করে। জনগণের শত্রু হানাদার সেনাবাহিনীর ঘৃণাত্মক কার্যাবলীকে তাদের নিঃশর্ত সমর্থন পূর্ব বাংলার জনগণেরই বিরুদ্ধে কার্যকরী হয়েছে এবং তারা তাদের এ বামপন্থী বিচ্যুতির জন্য পূর্ব বাংলার ইতিহাসে সেনাবাহিনীর নৃশংস গণহত্যা, লুণ্ঠরাজ, অগ্নি সংযোগ এবং নারী ধ্বংসের মত ঘৃণাত্মক কার্যাবলীর সমর্থনকারী সহযোগী হিসাবেই পূর্ব বাংলার জনগণের ঘৃণা কুড়াবে। মহামতি লেনিনের বক্তব্য

“It is beyond doubt that any national movement can only be a bourgeois democratic movement, since the overwhelming mass of the population in the backward countries consist of peasantry who represent bourgeois-capitalist relationships. It would be utopian to believe that proletarian parties in these backward countries can pursue communist tactics and a communist policy, without establishing definite relations with the peasant movement and without giving it effective support... We, as the communists, should and will support Liberation movements—only when they are genuinely revolutionary, and when their exponents do not hinder our work of educating and organising in a revolutionary spirit the peasantry and the masses of the exploited”—(Lenin, Collected Works, Vol-31, P-241 on Report of Commission on the National and the Colonial Questions)

একে তারা উপলব্ধির অভাবে নীতিগতভাবে বর্জন

(শেষাংশ ২৬শ পৃষ্ঠায়)

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম

(২৫শ পৃষ্ঠার পর)

করে মহান লেনিনের মূল্যবান উপদেশ তথা লেনিন-বাদের মৌলিকতাকেই অস্বীকার করে চলেছে।

আবার পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট সমন্বয় কমিটি এবং বাংলার শ্রমিক আন্দোলন এই উভয় গ্রুপই শুধু মাত্র পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতার কথা বলে কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে সামন্তবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে তাদের কোন সম্পর্ক বক্তব্য নেই। ফলে তারাও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিতে নিপাতিত এরাও মহান মাও সে তুংএর মূল্যবান উপদেশবলী

"In a struggle that is national in character, the class struggle takes the form of national struggle, which demonstrates the identity between the two. On one hand, for a given historical period the political and economic demands of the various classes must not be such as to disrupt co-operation; on the other hand, demands of the national struggle should be the point of departure for all class struggle. Thus there is identity in the united front between unity and independence and between the national struggle and class struggle." (Selected Works, Vol. 2, P-215),

এবং অগ্রসর

"The same is true of the relationship between the class struggle and the national struggle. It is an established principle, that in the war of resistance everything must be subordinated to the interests of resistance. Therefore the interests of the class struggle must be subordinated to and must not be conflict with, the interests of the war of resistance. But classes and class struggles are facts, and those people who deny the facts of class struggle are wrong, we do not deny the class struggle, we adjust it." (Selected Works, Vol. 2, P-200)

একে উপপঞ্জির অভাব হেতুই বাস্তব প্রয়োগে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে বস্তুত: বর্তমান যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদকেই অস্বীকার করে চলেছে।

পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থী নামধারী এ সকল সংগঠনের নেতৃত্বদ্বয় এখনো অনুধাবন করার প্রচেষ্টা করছেন না যে পাকিস্তানী শাসক ও শোষক সাম্রাজ্যবাদী শোষক ও সামন্তবাদী শোষকগোষ্ঠী পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে আক্রমণ চূড়ান্ত ভাবে বিপ্লবের সাফল্য আনতে সক্ষম হবে না। পূর্ব বাংলার পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনীকে অক্ষত রেখে যেমন সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে উৎখাত করা সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় সামন্তবাদী শোষণকে বজায় রেখে পাকিস্তানী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে উৎখাত করে পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এ তিন শক্তির যে কোন একটির বর্তমান থাকার অর্থই হলো শোষণের অবস্থান তথা জনগণের দুঃখ দুর্দশার উপস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রামকে অবশ্যই চালিয়ে নিতে হবে এবং শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতেই এই তিন শোষক শক্তি শ্রেণীকে মোকাবেলা করতে হবে। অষ্টচ বামপন্থী নামধারী উপরোক্ত পাটি ও গ্রুপগুলি তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞান ও সামগ্রিক পরিস্থিতির বাস্তব বিচার বিশেষণের হ্রদর্শিতার অভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের সামগ্রিক মুক্তির সঠিক পথে অগ্রসর না হয়ে দক্ষিণ ও বামপন্থী বিচ্যুতিতে ভুগছেন।

১৯৬৮ সালের শেষভাগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুংএর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পূর্ব বাংলার শ্রমিক কৃষক সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র গণযুদ্ধের পথে "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। এতদসত্ত্বেও এই পার্টির কর্মীদের মধ্যে, পাকিস্তানী শোষণের চরিত্র, জনগণের সঙ্গে শোষক শ্রেণীর মূল দ্বন্দ্ব, বিপ্লবের চরিত্র, বিপ্লবের অবস্থা পরিস্থিতি, বিপ্লবের সঠিক পথ ও রণনীতি রণকৌশল নির্ধারণে ছিল দোহুলামানতা। তারাও পূর্ব বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তথাপি তারা পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে জনগণের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু প্রথম থেকেই জাতীয় মুক্তির প্রসঙ্গে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি, আবার অনেকেই শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পণ করেন। ফলে পার্টির ভিতরেই বামপন্থী ও ডানপন্থী বিচ্যুতি বিরাজ করতে থাকে। তবে বেশ কিছু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মী সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে একটি সঠিক মার্কসবাদী লেনিনবাদী পথে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টদের এমনিতর সাংগঠনিক দুর্বলতার সূচক পূর্ব বাংলার সামন্ত-ধনিক শ্রেণী তথা আওয়ামী লীগ পুরোপুরি গ্রহণ করে এবং উগ্রজাতীয়তাবাদের আড়ালে পূর্ব বাংলার জাতীয় ধনিকসহ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদেরকে তাদের নেতৃত্বে সমবেত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু জাতীয় মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র গণযুদ্ধের সূচনা হতেই নেতিবাচক আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জনগণের নিকট মর্যাদা হারাতে থাকে। পূর্ব বাংলার সর্বহারা জনগণের রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে এমনি এক সমস্যাপূর্ণ বিপ্লবী অবস্থায় পূর্ব বাংলার জনগণের এই সংগ্রামকে সশস্ত্র দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী গণযুদ্ধে রূপ দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সঙ্কল্পে সশস্ত্র শক্তি শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজনীতি সচেতন জনগণকে সশস্ত্রভাবে পরিচালনা করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে একটি প্রয়োগসাপেক্ষ সৃজনশীল বিজ্ঞান। সঠিক পথে পরিচালিত হলে ইহা অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে। তাই জনগণের বিজয় অর্জনের জন্য চূড়ান্ত সফলতার জন্য, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পূর্ব বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতি, জনগণের সঙ্গে মূল দ্বন্দ্ব, বিপ্লবের চরিত্র, শক্তি মিত্র ও কর্তব্য নির্ধারণ ইত্যাদি অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে।

পূর্ব বাংলার বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা হলো পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের প্রেক্ষিতে "ঔপনিবেশিক", সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের প্রেক্ষিতে "আধা বা নয়া ঔপনিবেশিক" এবং আভ্যন্তরীণ রহ বিতর্ক সামন্তবাদের প্রেক্ষিতে "আধা সামন্ততান্ত্রিক"। এরূপ সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় পূর্ব বাংলার বর্তমান বিপ্লবের চরিত্র দুটি (১) পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তির প্রসঙ্গে ইহা "জাতীয় মুক্তি বিপ্লব" এবং (২) আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদের শোষণ থেকে মুক্তির প্রসঙ্গে ইহা "গণতান্ত্রিক বিপ্লব"। পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি পরিচালনা করা অসম্ভব এবং এই দুই বিপ্লবকে একই সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে বলে একত্রে একে "পূর্ব বাংলার

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব" বলা যেতে পারে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলত "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব," যা জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সম্পন্ন হবার কথা। কিন্তু বহুদিন আগে থেকেই বিশ্বব্যাপী পরিসরে এই বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে নিজস্বার্থে উক্ত বিপ্লবী দায়িত্ব পালনের নেতৃত্ব থেকে সরে গেছে। পূর্ব বাংলার জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীও এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে না এবং ঐতিহাসিক ভাবেই এ দায়িত্ব পালনের ভার মেহমতী জনগণের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির উপর অর্পিত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় উহা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই একটি স্তর। কমরেড মাও সে তুং এ বিপ্লবকে "নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব" বা "জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব" বলে আখ্যায়িত করেছেন। পূর্ব বাংলার এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তি প্রধানত: তিন গোষ্ঠী—(১) পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক শোষক গোষ্ঠী, (২) নয়া ঔপনিবেশিক শোষক গোষ্ঠী-তথা সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত: মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং (৩) দেশীয় সামন্তবাদ তথা জোতদার, মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার, মজুতদার ইত্যাদি।

এই তিন শক্তির পরস্পরের স্বার্থ কিছুটা ভিন্ন হলেও শোষণের ক্ষেত্রে এরা অভিন্ন। পূর্ব বাংলার জনগণের দুঃখ কষ্টের মূল এই তিন শক্তিকে একই সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে হবে, সমাজ জীবন থেকে সমূলে উৎখাত করতে হবে, চূড়ান্তভাবে নির্মূল করতে হবে। একমাত্র তখনই পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যলাভে সক্ষম হবে। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই তিন শক্তি পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, পরস্পর পরস্পরের মিত্র। এদের যে কোন এক গোষ্ঠীকে আঘাত করার উপর কম গুরুত্ব অর্পণ করলে সমগ্র শক্তিগোষ্ঠীকেই বাঁচিয়ে রাখা হবে, যার অর্থ হবে বিপ্লবী শক্তির মৃত্যু, বিপ্লবের পরাজয়। কিন্তু এই তিন শক্তির মধ্যে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর সঙ্গে বর্তমান মুহুর্তে পূর্ব বাংলার সর্ব শ্রেণীর জনগণের সংঘাত সবচেয়ে তীব্র। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের রক্ষক ও সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তানী এই মুংসুদি শোষক ও শাসক শ্রেণীকে অবশ্যই বর্তমান মুহুর্তে পূর্ব বাংলার জনগণের মূল শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে বর্তমান মুহুর্তে মূল দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর। যারা পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্যতমও অবহিত আছেন এবিষয়ে তাদের দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই।

শুধু এই তিন শক্তিই নয়, এই শক্তিদ্বয়ের দেশী বিদেশী সকল সহযোগীরাও (তা তারা যে শ্রেণীরই হোক না কেন) পূর্ব বাংলার জনগণের শক্তি। এই প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলায় এই শক্তদের সহযোগী ভাবেদার বাহিনী—মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, সি, ডি, পি, ইত্যাদি গণবিরাগী ফ্যাসিস্টদের বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত "রাজাকর বাহিনী" ও তথা কথিত "শান্তি কমিটি" (এরা কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণী নয়), যারা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সক্রিয় সহায়তায় ক্রমাগত গণহত্যা লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্ধাতন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের নির্মূল করার প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের বিপ্লবী বাহিনীকে সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পণ করতে হবে। হানাদার পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনী অতর্কিতে পূর্ব বাংলার জনপদ আক্রমণ করে কিছুক্ষণ ধরে চালিয়ে যায় তাদের ধ্বংসলীলার কুকীর্তি। তাদের এই বর্বর সামরিক আক্রমণের হাত থেকে যারা অব্যাহতি পায় তাদেরকেও উক্ত রাজাকর বা শান্তিকমিটি নামধারী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর (শেখাংশ ২২শ পৃষ্ঠার)

বাংলা সাহিত্য

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

তাদের কিছুর আসে-যায় না, কারণ দুইয়েরই ভূমিকা দুইয়ের জানা এবং দুইই সেটা একে অপরের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত প্রত্যাশা করতেই অভ্যস্ত। বরং শত্রুতাচরণের বদলে এরা যদি এখন পরস্পরের প্রশংসিত গাইতে আরম্ভ করেন তা হলেই ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে অভাবনীয় ও অস্বাভাবিক।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মতো অসংশ্লিষ্ট ও রাজনীতি-অনপেক্ষ লেখক যদি হঠাৎ কোন আলোচনার সুযোগে আবশ্যিক বোধে সি পি এম-এর সাহিত্যিক বন্ধ-দের ইন্দিরা-চালিত কংগ্রেসের প্রতি আকস্মিক আত্যন্তিক দরদে উথলে ওঠার সমালোচনা করি, তা হলে আমি জানি অবধারিত ভাবে আমাকে তাঁরা সি পি এম-এর চর আখ্যা দেবে এবং আমার মতদর্শন করতে চাইবে না। অন্যপক্ষে, সমালোচনার মোড় ঘুরিয়ে আমি যদি সি পি এম-এর উপর আমার মনো-যোগ অর্পণ করি এবং বলি যে, সি পি এম-চালিত সাহিত্য পত্রিকা-গুলি নামেই সাহিত্য-পত্রিকা, আসলে গুণদলি পার্টি বরলটন ছাড়া আর কিছুর নয়, সংস্কৃতি জগতের সহিত সম্পর্কবিহীন জাতীয় ঐতিহ্য চেতনা রহিত এত বড়ো কাঠখোঁটা রাজনৈতিক দল আর পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় নেই, সেই স্থলে নিশ্চিত বলতে পারি, ওরা আমাকে সি পি আই-এর দলের লোক ভেবে আমায় প্রতি অবস্থা রুশ্ট হবে। অথচ আমি নিজে তো জানি, আমি ওই দুই দলের কোনটির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নই, বস্তুতঃ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই আমার কোন যোগ নেই। নির্দলীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে অপ্রিয় সত্য কথা বলার অনেক ঝুঁকি, তাতে প্রত্যেককেই ভুল বোঝাবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তার ফলে নিজে হাতে নিজেদের আখেরটি নষ্ট করা হয়। নির্দল থাকবার কী মজা, বোঝা একবার। সকল দলেরই ঠেলা-সামলাতে সামলাতে প্রাণান্ত পরি-চ্ছেদ।

সি পি আই-এর লেখক বন্ধ-দের এমনিতে আমার বেশ লাগে, কিন্তু তাঁরা যখন কংগ্রেসের নীতির মধ্যে “প্রগতিশীলতা” আবিষ্কার করেন এবং সেই সুবাদে যতো রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে গা-সোঁকাসদ্ধি করে বেড়ান, আমার সেটা আদপে বরদাস্ত হয় না। বামপন্থার নামাবলী গায়ে চাঁড়িয়ে এই যদি তাঁদের আচরণ হয় তা হলে আমি বলবো, ওটা তাঁদের ভেদ, এমন বামপন্থার চর্চা না করই ভালো। তাতে নিজেদের মুখেই যে শব্দ চুনকালি লেপে দেওয়া হয় তা নয়, খাঁরা প্রকৃত বামপন্থী তাঁদেরও বিপাকে ফেলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাম একো সি পি আই-এর মতো ফাটল ধরিয়েছে আর কোন দল?

আর এস পি আরেকটি রাজ-নৈতিক দল, যাদের গণ-সমর্থনের বৃন্দসিটি গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে একেবারেই ফেটে গেছে। এই নির্বা-চনে কংগ্রেস, সম্মিলিত গণতান্ত্রিক বামপন্থী ফ্রন্ট ও সম্মিলিত বাম-পন্থী ফ্রন্ট—এই তিন মোর্চার থেকেই সমান দুরত্ব রক্ষা করে একা লড়তে গিয়ে এরা তিনটি আসনের বেশী লাভ করতে পারেনি। অথচ পূর্ব-পূর্ব বারের নির্বাচনে এরা এর চেয়ে অনেক বেশী আসন লাভ করে পশ্চিমবঙ্গে একটি গণনীয় দল হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিল। পূর্ব-পূর্ব বারের জয় আর এবা-রের পরাজয়ের মূল রহস্য হলো এখানে যে, পূর্ব-পূর্ব বারের তাঁরা সি পি এম-এর সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে নির্বাচন লড়েছিল আর এ-বারে তাঁদের সি পি এম-এর সমর্থন না পেয়ে একাই লড়তে হয়েছে। এতে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় এই কথাই যে, বিপ্লবী সমাজ-তন্ত্রীরা মূর্খে যতোই আশঙ্কন করুন, তাঁদের পিছনে সত্যিকারের গণসমর্থন নেই, তাঁরা এতোকাল খুঁটির জোরে লড়ে এসেছেন। সেই খুঁটিটি আর কেউ নয়—সি পি এম। অথচ আর এস পিএর পত্র-পত্রিকা খুলে দেখুন বা তাঁদের নেতাদের সঙ্গে কথা বলুন, দেখবেন সি পি এম-এর মতো এই দলের আর বড়ো শত্রু কেউ নেই। গোটা বছর ধরে এরা সি পি এম-এর শাপমনি করে বেড়ান, শব্দ নির্বাচনের সময় হলে সন্ডুং করে সি পি এম-এর দলে ভিড়ে পড়েন। এবারে সে সুযোগ হয়নি, তাই এই বিপর্যয়।

এটাকে আপনি কী বলবেন? আমি বলবো এতে করে এই দলের ‘চুড়ান্ত অসত্যতারই শব্দ প্রমাণ হয়’ এত বড়ো সুবেগসম্মানী দল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আর দাঁটি নেই, অথচ মূর্খে এদের বড়ো বড়ো বৃকনি লেগেই আছে। এমন একটা ভাব করেন যেন অপ্রান্ত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এই দলেরই শব্দ একচেটিয়া আর গ্রিদিব চৌধুরী তার বিধাতৃ নির্দিষ্ট জিম্মাদার। মূর্খে ওরা কংগ্রেস বিরোধিতায় সোচ্চার কিন্তু কুলোকে বলে প্রয়ো-জন হলেই এরা তলে তলে কংগ্রে-সের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধেন। মোট কথা, যেন-তেন-প্রকারে সি পি এমকে জব্দ করাই এদের নীতি।

আর এস পিএর বিরুদ্ধে এ-সব কথা বলবার জন্যে সি পি এম-এর সমর্থক হবার আদৌ আবশ্য-কতা নেই। আমি সি পি এম-এর কানাকাড়িও ধারি না, সত্য কথা বলতে, ওই গোঁয়ার-গোবিন্দ কাঠ-খোঁটা দলের ছায়া মাড়াতেও আমার ভয়। যে দলের নেতাদের মাথায় হাড়ুড়ির বাঁড় ঠুকলেও এক চিলতে সংস্কৃতির নির্ভাস বেরবার সম্ভাবনা নেই, সে দলকে আমার মতো গোবেচারা সাহিত্যসেবীর দূর থেকে দণ্ডবৎ করাই নিরাপদ। তবু যে মার্কসিস্টদের সমর্থনে আর বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের প্রতিকূলে এত কথা লিখলাম সে শব্দ এই

জন্য যে, ভণ্ডামি জিনিষটা সর্বত্র এবং সর্বাবস্থায় থিকারযোগ্য। সি পি এম-এর দৌলতে বিধানসভার আসন লাভ করবো, মন্ত্রিস্বের গদিতে চড়ে বসবো, আর কার্যকালে সম্বৎ-সর ওই দলের মূন্ডগাত করে বেড়াবো—এটা মৌলিক অসাধুতার একটা চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত। চোর-ডাকাতরাও নিজেদের মধ্যে এর চেয়ে অধিক সাধুতা রক্ষা করে।

এ সব কথা বলবার আমার প্রয়োজনই হতো না, আমি আদার ব্যাপারী, আমার এসব জাহাজের খবরে কী কাজ? থাকি সাহিত্য-সেবা নিয়ে, ক্ষমতার রাজনীতির জটিলতার মধ্যে আমার মাথা গলা-বার কী দরকার। কিন্তু যেহেতু কি না আর এস পিএর পত্র-পত্রিকা-গুলি আমার ঠিকানায় আসে আর তাতে অনেক গালভরা বৃকনির বিস্তার দেখতে পাই—সংসদীয়-রাজনীতি-নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, পিপলস রিভলিউশন, হ্যানো-ত্যানো; সেই কারণে এন্টি-স্মার-বিহীন জেনেও এদের সম্বন্ধে দু-চার কথা না লিখে পার-লুম না। এদের দলের আবার সাংস্কৃতিক অভিমান আছে বিল-ক্ষণ। সেটা আরও অসহ্য।

এবারে “এন্টারিশমেন্ট”-এর কাগজগুলির দিকে এক-নজর চোখ বুলানো যাক। তার থেকে অনেক মজার মজার তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

“দেশ” নামে একটি সাড়ে-বিশ ভাজার সাপ্তাহিক আছে, তাতে “রূপদশী” না কে এক চালিয়াং চন্দর প্রতি হপ্তায় মালি-কের ফরমায়েস অনুযায়ী সি পি এম-এর বাপান্ত করেন। মনে হয় এই ডাডুটে লেখকটিকে বিশেষ এই উদ্দেশ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁর কাজই হলো মাস মাহিনার বিনিময়ে মার্কসিস্টদের কাজের খুঁত বার করে দেখানো। রূপদশী না বলে কুরূপদশী বললেই বোধ করি এর স্বার্থ নামকরণ করা হয় এবং এর ভূমিকার সঙ্গে সেটা চমৎকার মানিয়ে যায়। কেবলমাত্র একটি দলের বিরুদ্ধেই দিনের পর দিন এই আদাজল খেলে লাগবার কী অর্থ, যদি-না এর পিছনে গুরুতর কোন উদ্দেশ্য থাকে? পশ্চিমবঙ্গে আরও তো রাজনৈতিক দল আছে, কই তাঁদের বিরুদ্ধে তো একে সোচ্চার হতে দেখি না? এই গুরুতর উদ্দেশ্যের সম্মান কে আমাদের বলে দেবে? এর পিছনে সি আই-এর নোংরা হাত কাজ করছে না তো? কিংবা আর কোন বৈদেশিক এজেন্সির কুটক-চালে মন্থণা? জনজীবনে আনন্দ-বাজার, দেশ পত্রিকাগোষ্ঠীর যা ভূমিকা, তাতে এইসব নেপথ্যবি-হারী শক্তিগুলির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের সম্ভাবনা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শব্দেতে পাই ওই নিয়মিত মাসোহারার বদলে সি পি এম-এর খিস্তিকরা মালিকের অজ্ঞবহ কলমচালিরেটির লেখা গল্প থেকে “সাগিনা মাহাতো”

না কী একটা নামের সিনেমা-ছবি তোলা হয়েছে এবং সেটি নাকি সৌভাগ্যে রাশিয়া কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম সৌভাগ্যেটের এ ছবিটি বিশেষ পছন্দ হবার কারণ এর মধ্য দিয়ে কোর্শালে প্রচারিত সি পি এম-বিশেষ। বলোছি তো আজকালকার অধিকাংশ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃ-তিক তৎপরতার পিছনে এই রকমের সব কুট-ক্রিমার ভূমিকা থাকে, সাহিত্যের নিরিখে সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ—সে সব পাট কবে উঠে গেছে। সাহিত্য গ্রন্থের পুর-স্কার বা সিনেমা-ছবির পুরস্কারের পিছনকার ইতিহাসও একই প্রকার অবান্তর বিচারক্রিমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বলে গিয়ে নোবেল প্রাইজের মতো ডাকসাইটে আন্ত-জাতিক পুরস্কারের বেলাতেই অভিসন্ধিমূলক রাজনীতির গোপন হস্ত ক্রিয়া করে, আর এ সব তো ঝড়-ত-পড়-ত ফচকে শিল্পকর্মের মূল্যায়নের ব্যাপার। কোন দেশের কুট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হলে রাতকে দিন বানাতে কতক্ষণ লাগে!

আনন্দবাজার পত্রিকায় একা-ধিক রাজনৈতিক ভাষ্যকার সমসাম-য়িক রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের উপর ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। পাঠ্যবস্তু হিসাবে ওই সব ভাষ্য-প্রবন্ধের সবই গেলো মাল তা বলবো না, কিন্তু কোন দিন কি দেখেছেন আনন্দবাজারে অভুল্য ঘোষের সমালোচনাচ্ছে একটি লাই-নও বেরিয়েছে? না মশায়, তা হবার নয়, কেন না আনন্দবাজার পত্রিকার আর যতো বিচ্যুতিই থাক, কৃত-জ্ঞতাবোধের কর্মীত নেই। অভুল্য ঘোষের সূদীনে আনন্দবাজার-মালিক তাঁর কাছ থেকে নানা রক-মের সর্বাধা বাগিয়ে নিয়েছিলেন, সেই ঋণের বোঝা বৃক্কের উপর ভারী হয়ে থাকার সমালোচনার কারণ থাকলেও সমালোচনা করা যায় না এমনি কৃতজ্ঞতার প্রাণান্তিক দায়। আজ অভুল্য ঘোষের ভ্রম দশা, ইচ্ছা করলেই তাঁকে খারিজ (শেষাংশ ২৮ পৃষ্ঠায়)

যৌবনের সংকট

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

দরদী কৃষক আন্দোলনের বিপরীত পথে। বস্তুতঃ বাঙালী ভদ্রলোকদের সাম্যবাদী আন্দোলনও এর আগে গ্রাম সম্পর্কে উদাসীন ছিল, কৃষক-দের কলকাতা শহরে নিয়ে আসতে আন্দোলনের ধন্য—কিন্তু এই যুব-কেরা সে সীমা ভেঙ্গে ফিরতে চায় দেশজ মূলে, শিকড়ে। গান্ধীর অতীন্দ্র কৃষক আন্দোলনের বিপ-রীতে তারা রাখে ঝাও-সে-ছুং-এর কুর্বিবপ্লবের দৃষ্টান্ত। উনিশ সত্যটি-র পর, এই যুবকদের বিদ্রোহের পরেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী দল গ্রামে যেতে চায়—গান্ধী যেখানে কংগ্রেসের জন্য স্থায়ী আসন পেতেছিলেন। বর্ত-মানের যুব বিদ্রোহের মূল তাৎ-পর্য এখানেই—বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের সীমাবদ্ধতার উত্তরাধিকারকে কাটিয়ে শ্রিধা স্বস্থকে দূর করে তার নতুন প্রবাহ আনার বাসনা। সন্দ্যাসবাদীরা এই কাজ করতে পারে নি। বাঙালী মধ্যবিত্তের জন্মলগ্ন থেকে বিচ্ছ-ন্নতা উপনিবেশের গভীর ক্ষতদুর্দ-তাদের যে অস্তিত্ব তার বিরুদ্ধে যুবকদের এই বিদ্রোহ তাই গভীর ভাবায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায় : ১৯৪৮-৫০-এর ক্ষণমরীচিকাতেই মধ্যবিত্ত সংসদীয় নিরাপদ প্রত্যা-বর্তনেই এর শেষ হবে কিনা। সম-দের আন্দোলনে বাংলা দেশ উন্ম-লিত হবে, না বানডাকা সন্দ্যাসেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর কেবল বাঙালী মধ্য-বিত্তেরই নয়, বাংলা দেশের ভবি-ষ্যও নির্ভর করছে।

বলাই বাহুল্য এ আলোচনার বাংলা দেশের যুব বিদ্রোহকে তার শ্রেণীগত ইতিহাসের পৃষ্ঠে দেখার

চেষ্টা হয়েছে মাত্র। এই বিদ্রোহের আরও বহু নানাদিক সম্পর্কে অনালোচিতই থেকে গেছে। বিশে-ষতঃ তাদের প্রোগ্রাম ও বাস্তব কার্য-পদ্ধতি, তাদের সম্পর্কে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব অন্যান্য ভদ্রলোক নেতৃস্থ সম্মিলিত কিন্তু ইদানীং গ্রামা-ণ্ডলে প্রভাবিত্তারী বামপন্থী দলের দৃষ্টিভঙ্গী, এই সব গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় অবশ্যই আলোচনার বিষয়বস্তু। তার থেকেও বড় কথা আমরা যুব বিদ্রোহ বলতে এক শ্রেণীর বিদ্রোহকেই ধরেছি, কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে আরও অনেক রকম বিদ্রোহের কথাই বলা হয়। এক অর্থে উনিশের শতকের ইয়ং বেঙ্গলদের ব্যাপারও যুব বিদ্রোহই—ডিরোজিওর নেতৃত্বে তাঁরা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সবটাই অস্বী-কার করতে চেয়েছিলেন, পোষাকে আশাকে ডিরোজিও extreme of foppery-তে গিয়েছিলেন। এ বিদ্রোহের পরও ইয়ং বেঙ্গলরাও অমিতব্যয়ী পদ্যের মত ভারতীয় ঐতিহ্যেই, ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের স্রোতেই ফিরে এসেছে। বস্তুতঃ পোষাকে আশাকে বা your sons and daughters are beyond your command মা-বাবার উদ্দেশ্যে বলে নিজের শরীমত চলার বিদ্রোহ বা যৌন বিদ্রোহ, উত্তম্যন রেভলিউ-শনকে বাংলা দেশের পটভূমিকায় আদৌ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় নি যে কারণেই এই আলোচকের বিবেচনায় তারা অপাত্তে। আসলে বাংলা দেশের যুববিদ্রোহ তাৎপর্য-পূর্ণ হয়ে ওঠে তার তাঁর রাজনৈ-তিক কণ্ঠস্বরে, সমাজ অর্থনীতির পটভূমিকায়। বিদেশের অনেকাংশের এমন কী ভারতবর্ষেরই অন্যান্য অনেক প্রদেশের যুববিদ্রোহ থেকে বাংলা দেশের বিদ্রোহের তফাৎই এইখানে। তার দায়িত্বও তাই বেশী।

নব কংগ্রেসী রাজনীতি

(নবম পৃষ্ঠার পর)

নকশালবাদীর ঘটনা গোটা ভারত-বর্ষ বা পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক কেন্দ্রে একটা অতীতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করলেও ভারত-বর্ষের শোষক শ্রেণী একে আমল দেয় নি। এমন কি উনিশশ উন-সত্তর সালে চার মজমদারের নেতৃত্বে যখন সি পি আই (এম এল) সংগঠিত হলো, তখন শোষক-শ্রেণীর দালালবৃন্দ উক্ত পার্টির হিংসাত্মক কৃষি বিপ্লবের কর্ম-সূচীকে প্রায় অগ্রাহ্য করলো। কিন্তু এ অবস্থায় বেশীদিন চলে নি। কয়েকমাসের মধ্যেই শ্রীকাকুলামে গিরিজান বিপ্লবীদের দমন করতে গিয়ে শোষকশ্রেণীর টনক নড়লো, সোজাসুজি বেআইনী ঘোষণা না করে সি পি আই এম এল-এর কাগজপত্র যে ব্যক্তির কাছেই পাওয়া যাবে, তাকে গ্রেপ্তার করে নিবর্তন মূলক আটক আইনে আটকে রাখার ব্যবস্থা করলো। বিশেষ করে অল্প ও কেরলে বিপ্লবীদের দমন করার জন্য শাসকশ্রেণীর পলিশ মিলিটারী নানাপ্রকার কুর্সিত ও জঘন্যতম পদ্ধতি অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র বিধাবোধ করলো না।

শ্রীকাকুলামে যখন সি পি আই (এম এল) নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে তখনো যুক্ত ফ্রন্টের আমল। বিপ্লবী স্লোগানে তখন সি পি এম নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় ক্ষমতা খর্ব করে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির আন্দোলন করছে। পাশাপাশি, উনিশশ উন-সত্তর সালের পরলা মে তারিখে ব্রিগেড প্যারেডের সভায় জ্যোতি বসু ঘোষণা করলেন—নকশালরা মূলতঃ “সমাজবিরোধী”; সি পি এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করলেন—নকশালরা সি আই এর অন্তর্ভুক্ত, ভারতীয় বিপ্লবকে শোষক শ্রেণীর প্ররোচনায় বিপর্যস্ত করার জন্য এরা কাজ করছে। ময়দানের একই তারিখ ও একই সময়ের সভায় সি পি আই (এম এল) নেতৃত্ব দ্বারা ঘোষণা করলেন—সি পি এম রাজনীতি বস্তুতঃ সংশোধনবাদীর পতাকা নিয়ে ভারতীয় বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ পারিস্থিতিকে বান-

চাল করবার চেষ্টা করছে। পর-বর্তীকালে ডেবরা গোপীবল্লভপুরে নকশাল আন্দোলন দমনের জন্য সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু যখন ইন্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস পাঠা-লেন, তখন কোলকাতার রাস্তায় গোষ্ঠীর দেখা গেল—“জ্যোতি-চ্যবন ভাই ভাই” অর্থাৎ সংশোধনবাদীরা আসলে শোষকশ্রেণীরই প্রতিবিম্বী দালাল।

পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় অন্য কোথাও সি পি এম ও সি পি আই (এম এল) এর মধ্যে আন্তঃদলীয় উত্তে-জনা ও পারস্পরিক আক্রমণের তীব্রতা দেখা যায় নি। বস্তুতঃ কোলকাতা শহর বা শিল্পাঞ্চলে সি পি এম ক্যাডারদের একটা অংশ সি পি আই (এম এল)-এ যোগদান করলেন।

একথা সত্য—শাসক কংগ্রেস সি পি এম-কে সুনজরে কখনোই দেখে নি, যদিও সি পি এম নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে খিস্তিখেউড় প্রতিটি জনসভায়, বিধানসভার অধিবেশনে করে যাচ্ছিল। শূন্য তই নয়, কোলকাতা শহরের অনেক অঞ্চলে সি পি এম নকশাল সংঘর্ষে নব কংগ্রেসের সমর্থক বৃদ্ধ-করা হয় নিরপেক্ষ নতুবা নকশাল-দের হয়ে সি পি এম বিরোধী ভূমিকায় নেমেছিল।

উনিশশ উনসত্তর থেকে গত নির্বাচন অবধি নবকংগ্রেস নেতৃ-বৃন্দ নকশালদের কাষাবলী নিন্দা করেও একথা বলেছে যে নক-শাল সৃষ্টি করেছে সি পি এম তার হিংসাত্মক রাজনীতি দিয়ে। কংগ্রেস এবং সি পি এম-এর মধ্যে এমনো প্রিয় বিতর্কের বিষয় হলো নক-শাল সৃষ্টির কারণ। কেননা সি পি এম নেতৃত্ব মনে করে—সি পি এম-এর ক্যাডারদের হত্যা করার জন্য নব কংগ্রেসই নকশালদের সৃষ্টি করেছে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা-পরম্পরায় বিচার করলে এটা সত্যই মনে হবে যে সোভিয়েত সংশোধন-বাদীর বিরুদ্ধে চীন নেতৃত্বের বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিকতাবাদের একদা অনুসারী সি পি এম-ই হিংসাত্মক কৃষি বিপ্লবের প্রয়োজ-নীতির কথা ঘোষণা করেছিল, নকশালবাদী রাজনীতি তারই ফল-প্রতি, যদিও সি পি এম নেতৃত্ব পালার্মেন্টারী রাজনীতির মধ্যেই নিজেকে ঢুকিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে বাস্তব ঘটনা বিশেষ করে কোল-কাতা শহরে এমন বহু ঘটনা, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আধিকারী সি পি এম ক্যাডারদের নকশাল-বিরোধী অভিযান রুদ্ধ করে গিয়ে সি পি আই (এম এল) ক্যাডারগণ নব কংগ্রেসের ছেলেদের সাহায্য নিয়েছে। এসব ঘটনা থেকে এ মিথ্যা রটনা অসং ও বিবেকহীন রাজনীতি-বিদের নিকট লোভনীয় যে নকশাল সৃষ্টি হয়েছে শোষকশ্রেণীর প্রয়ো-জনে।

আসল ঘটনা অন্যরকম। বাস্তবে

উনিশশ সাতষটি সাল থেকে উনিশশ উনসত্তর সাল অবধি সি পি এম হঠাৎ “ম্যাস পার্টি” হয়ে গিয়ে নানা প্রকার অরাজনৈতিক স্বার্থপর, এবং সুযোগ সন্ধানীর আশ্রয়স্থল হয়ে গিয়ে নানাভাবে বিভিন্ন মহল্লায় সাধারণ মানুষদের ওপর এবং প্রতি-স্বল্পবী রাজনৈতিক দলের ক্যাডার-দের ওপর (যা এখন নব কংগ্রেস করছে) হামলাকে প্ররম্ব দিচ্ছিল। এর অসংখ্য অগ্নিনির্ভিত দৃষ্টান্ত প্রতিটি এলাকার (বিশেষ করে কোলকাতার) সাধারণ মানুষ জানেন। উৎকোচ গ্রহণ, সুযোগ সুবিধা আদায়, প্রতিবিপ্লবী কাম-দায় শুল্ক কমিটি, মহল্লা কমিটি বা কলোনী কমিটিতে যাওয়া এবং অত্যন্ত উল্লংঘভাবে সঠিক প্রাধিকার বণিত করে দলীয় লোককে বা দলের মধ্যে আবাস নিজের বন্ধুকে চাকুরীতে ঢোকানো—এসব হাজার রকম অভিযোগ সি পি এম নাম-ধারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে অহরহই শোনা যেত।

উক্ত “ম্যাস পার্টি”র মধ্যে যারা ছিলেন রাজনৈতিক ভাবে শিক্ষিত ও জনসাধারণের আস্থাভাজন, তাদের মধ্যে প্রথমদিকে বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও নকশাল প্রাণীত বস্তু ছিল, অথ নকশাল বিপ্লব ততটা ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে সি পি এম নেতৃ-ত্বের একটানা নকশাল-বিরোধী অপপ্রচারে এবং বিশেষ করে আন্তঃ-দলীয় সংঘর্ষ ব্যাপকতর হওয়ায় সি পি এম-এর সক্রিয় শিক্ষিত ক্যাডার-দের মধ্যেও নকশাল বিপ্লব প্যাথ-লজিকাল স্তরে চলে যায়।

অন্যদিকে সি পি আই (এম এল) ক্যাডারগণ প্রথম থেকেই সি পি এম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রচার সংগ্রাম আরম্ভ করে, প্রতিবিপ্লবী শক্তি হিসেবে নব কংগ্রেস ও সি পি এম নেতৃত্বকে একই কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে সি পি এম নেতৃত্বকেই পরলা নম্বরের শ্রেণীশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। সি পি আই (এম এল) রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে সি পি এম রাজনীতি যে মূলতঃ চতুর প্রতিবিপ্লবী রাজ-নীতি এবং এ প্রতিবিপ্লব নব কংগ্রেসী প্রতিবিপ্লবের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতালালী—তা বলা যায়। কিন্তু সি পি আই (এম এল) নেতৃত্ব যেখানে পার্থক্য করেনি, তা হলো সি পি এম-এর নেতৃত্বের সঙ্গে তার সর্বনিম্নস্তরের ক্যাডার-দের, ফলে এম এল এর রাজনৈতিক-ভাবে অপরিণত আবেগ প্রবণ ক্যাডারদের সংগে সি পি এম-এর ক্যাডারদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। অঞ্চল অধিকার এবং শহর কেন্দ্রিক এ্যাকশনের কর্ম-সূচীও এ ধরনের আন্তঃদলীয় সংঘর্ষের ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর ও জটিলতর করে তোলে। কোন এ্যাক-শনের মধ্যে যদি বিপ্লবী চেতনার পরিবর্তে পেটি বর্জের প্রবণতা কাজ করে, তাহলে তা প্রতি-বিপ্লবকেই সাহায্য করে—চার মজমদারের এ উপদেশকে সি পি আই (এম এল) এর ক্যাডারগণ সর্বত্র মেনেছেন বলে স্বীকার করা যায়

না। অবশ্য কোন একজন অত্যা-চারী বা শোষকশ্রেণীর কেউ যদি সি পি এম রাজনীতির পক্ষপাটে আশ্রয় নেয়, তাহলে তার ওপর এ্যাকশন আন্তঃদলীয় সংঘর্ষের সূচনা করে ফেলেছে এরকম ঘটনাও ঘটেছে।

সি পি আই (এম এল)-এর নেতৃত্ব গত নির্বাচনের প্রাক্কালে নব কংগ্রেস ফ্যাসিবাদী বাহিনীর ব্যাপারে নিজের ক্যাডারদের সুস্পষ্ট লাইন দিয়েছেন বলে জানা যায় নি। ফলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে কিছ, কিছ, সুবিধাবাদকে প্ররম্ব দিয়েছে অঞ্চলের বিপ্লবী ক্যাডারগণ—বিশেষ করে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে।

সি পি আই (এম এল) এবং সি পি এম-এর মধ্যে উপরোক্ত ধর-ণের আন্তঃদলীয় সংঘর্ষের পূর্ণ-মাত্রায় সুযোগ নিয়েছে নব কংগ্রেস তার নির্বাচনী অবস্থাকে উন্নততর করার জন্য। এমন কি নির্বাচনের পরেও উক্ত আন্তঃদলীয় সংঘর্ষে সি পি আই (এম এল) ক্যাডারগণ যে মনোভাব নিয়ে নব কংগ্রেসের ফ্যাসিবাদী বাহিনীর সহায়তায় সি পি এম-এর ফ্যাসিবাদীদের ঠেকাতে চেয়েছে, নব কংগ্রেস নেতৃত্বও একই প্রকার মনোভাব ও পরিকল্পনা নিয়ে ঐ সংঘর্ষে মদত দিয়েছে। নকশালদের সোজা হিসেব ছিলো—কোন এলাকা থেকে সি পি এম ও নব কংগ্রেস প্রতিবিপ্লবী-দের একটাকে যদি উৎখাত করা যায় অন্যদিকে (অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে নব কংগ্রেসকে) উৎখাত করতে বেশি সময় লাগবে না, কারণ সি পি এম-এর বিপ্লবী আবেগ রয়েছে, নব কংগ্রেসের নেই। আঞ্চলিক নব কংগ্রেস নেতৃত্বও ভেবেছিল যে যদি সি পি এমকে উৎখাত করা যায়, তাহলে অঞ্চলের দণ্ডমন্ডের কর্তা ওরাই হবে, নকশালদের সামাল দেওয়া হবে পলিশ মিলিটারীর দ্বারা এবং অনীতিবিলম্বেই। নক-শাল ও নব কংগ্রেসের আঞ্চলিক নেতৃত্ব তাদের স্ব স্ব পরিকল্পনা মারফত কাজ করেছে বলেই বর্তমানে নকশাল এ্যাকশনের লক্ষ্যবস্তু প্রা-ণতঃ নব কংগ্রেসের পালের গোদারা আর ফলে নব কংগ্রেসও কাশীপুর বরানগরের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ব্যবস্থা করেছে।

১১ চার ১১

নব কংগ্রেস নেতৃত্বের যে অংশ এখন ইন্দিরার বশব্দ বা ইন্দিরা যে অংশের কথা শোনে, তাদের মতে উনিশশ একাত্তর সাল থেকে নব কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রচার পরিচালিত হওয়া উচিত হিংসাত্মক বিপ্লবের বিরুদ্ধে এবং নব কংগ্রেসের ফ্যাসিবাদী বাহিনীর কাজই হবে পলিশ মিলিটারীর সহায়তায় প্রতিরোধবাহিনীর ছদ্ম-বেশে নকশাল ক্যাডার, নকশাল সমর্থক এবং যে কোনও প্রকারে নকশালদের সঙ্গে জড়িত তাদের হত্যা করা। যেখানে হত্যা সম্ভব নয় গ্রেপ্তার করা। নকশালদের শক্তিকে উপেক্ষা করে, ছোট করে

দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিগত নব কংগ্রেস নেতৃত্ব অর্থ সি পি এম বিরোধিতার মোহে তাদের নিজেদের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। আজ নকশালদের হাতে নব কংগ্রেসের বড় বড় নেতা খুন হয়ে যাচ্ছেন। ব্যাপক নকশাল বিরোধী অভিযানের মহড়াই সিদ্ধার্থশংকর রায় দিতে চেয়েছিলেন একদিকে—আটশটি রাজনৈতিক দলের শান্তিরক্ষার সম্মেলনে; অন্যদিকে কাশীপুর বরানগরের হত্যাকাণ্ডে নব কংগ্রেসের ভূমিকাকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করার জন্য। নকশালবিরোধী যড়যন্ত্রের উক্ত নরম গরম দাওয়াই বর্তমান শোষকশ্রেণীরই নীতি। নকশাল-বিরোধী অভিযানে সি পি এম-কেই প্রধানতম মিত্র হিসেবে নব কংগ্রেসের ঐ অংশ এখন মনে করছে।

অন্য যে লাইনটি রয়েছে, তা পূর্বকার। ঐ লাইন অনুযায়ী সি পি এমও বিশ্বাসযোগ্য নয়। যে কোনদিন নকশালদের সঙ্গে একত্র হয়ে নব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সি পি এম এগিয়ে আসতে পারে। সুতরাং এই লাইন অনুযায়ী, নব কংগ্রেসের প্রধানতম শত্রু উভয়েই নকশাল এবং সি পি এম। নব কংগ্রেসের বর্ত-মান রাজনীতিতে এ লাইনটি গৃহীত হয় নি, হয়েছে পূর্ববর্তিত বিকল্প লাইন—অর্থাৎ নকশাল-বিরোধী কংগ্রেস-সি পি এম সি পি আই মোর্চা। পূর্বেই বলেছি—বিকল্প লাইনটি বস্তুতঃ ভারতীয় শোষক-শ্রেণীর নরম-গরমের লাইন। নব-কংগ্রেস রাজনীতি আজ নকশাল রাজনীতিকেই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক বলে মনে করছে তার প্রধান কারণ পালার্মেন্টারী রাজনীতি যে আজ বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের শোষকশ্রেণীর সাজানো অভিনয়, সাধারণ শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে পলিশ মিলিটারী ব্যতীত পালার্মেন্টারী নির্বাচন হতে পারে না, তথাকথিত গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের খেমটা নাচ পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ এবং একমাত্র মিলিটারী দ্বারা বেষ্টিত না থাকলে এমনকি কোন মার্কসবাদী বিপ্লবীও যে মিছিল বা বিক্ষোভে সামিল হতে পারে না, তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রহসন আজ ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সকলের কাছেই এত স্পষ্ট যে শিক্ষার নামে প্রচলিত খেলাগুলোও আজকাল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমছেনা। যে শূন্য-তার পরিমন্ডল আজ পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক জীবনে—যেখানে একমাত্র সত্য হয় পলিশ মিলিটারী নতুবা নকশালী ক্রিয়াকর্ম, আর সবই অনিত্য ও মিথ্যা সেই শূন্যতার বাস্তব অর্থনৈতিক সামাজিক কারণ ঘাই থাকুক না কেন, সি পি আই (এম এল) রাজনীতিই এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। সি পি আই (এম এল) এখনো যা করতে পারেনি, তা হলো ঐ শূন্যতার মধ্যে পার্টির বিপ্লবী প্রত্যয়কে ব্যাপক করে তোলা এবং সমাজের প্রতিটি (শেষাংশ ৩২ পৃষ্ঠার)

বাংলা সাহিত্য

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

করে দেওয়া যায় কিন্তু পিছটানের জন্যেই তা করতে পারা যাচ্ছে না। খবরের কাগজের নিয়মই হলো আজ যাকে রাজা বানানো হচ্ছে কাল তাকে আবজনার আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে তার নিয়োজিত সাংবাদিকের লেখনী একটুও কাঁপে না। এ ক্ষেত্রেও তাই হতে পারত, কিন্তু হয়নি। কৃতঘাতার প্রলোভন সংবরণ করে আনন্দবাজার বাজারী সংবাদপত্রের জগতে এক মহাসংঘর্ষের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম

(২৬শ পাতার পর)

ক্রমাগত নির্ধাতন ও অত্যাচারের শিকার হতে হয়। নিজেদের হীনম্মার্জ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এরা নিজ এলাকারই জনগণকে ঠেলে দেয় তীব্র অত্যাচারনিপীড়নের মুখে। হানাদার দস্যু সেনাবাহিনী অপসারণের পরও এরা জনগণের উপর সে অত্যাচার সর্বক্ষণ চালিয়ে যায়, স্থানীয়ভাবে ক্রমাগত উত্তেজনা বজায় রাখে। শোষক শাসক শ্রেণীর অত্যাচার নির্ধাতনের বিরুদ্ধে এরা জনগণকে সংগঠিত হতে দেয় না, বরং অত্যাচারী শোষকদের এরাই সংবাদ সরবরাহ করে, পথ দেখায়। জনগণের মনোবলকে উগ্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বিপ্লবী জনশক্তিকে নিমূল করতে এরা খুবই সচেষ্ট এবং সক্রিয়। এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রনরা পূর্ব বাংলার জনগণের ভয়ঙ্কর বিবাক্ত শত্রু, এবং জনগণের শত্রু পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীর ও সামন্তবাদী শোষক শ্রেণীর বিশ্বস্ত মিত্র। পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল ঝাঁটি হবে গ্রামাঞ্চল, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই ভয়ঙ্কর বিবাক্ত স্থানীয় শত্রুদের বাঁচিয়ে রেখে সত্যিকারের বিপ্লবী ঝাঁটি এলাকা গড়ে তোলা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হবে না। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনগণের প্রাথমিক কর্তব্য হবে, পাকিস্তানী হানাদার শত্রুসেনাদের আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে বা তার পূর্বে তাদের স্থানীয় সহযোগী মিত্রদের সমূলে ধ্বংস করা। মনে রাখতে স্থানীয় শত্রুদের বাঁচিয়ে রেখে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ পরিচালনা করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

পূর্ব বাংলার জনগণের এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুদ্ধ হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়, দীর্ঘ দিন ধরে শাসক ও শোষকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের উপর শোষণ-নিপীড়ন-অত্যাচার ও লাঞ্ছনার যে কলঙ্ক-ময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মুক্তিপাগল জনগণের আঙ্গ এই অজ্ঞধারণ গৌরব-উজ্জল ইতিহাসের এক নব সূচনা। এই ঐতিহাসিক বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর এক আপোষহীন শ্রেণীদ্বন্দ্ব—পরস্পর হিংসাত্মক রক্তপাত যা দ্বারা লাঞ্ছিত শোষিত জনগণ উগ্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের শত্রু শোষক শ্রেণীকে সমূলে উৎখাত করে অর্জন করবে নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা করবে জনগণের গণতন্ত্র, শোষণহীন সুখী সমাজ ব্যবস্থা। নিঃসন্দেহে এটা হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম, এবং বর্তমান বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামেরই এক পর্যায়।

এই বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণকে সঠিক শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে, দেশী-বিদেশী সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমূলে উৎখাত করে জনগণের সামগ্রিক বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন সঠিক পথে পরিচালিত একটি বিপ্লবী নেতৃত্বের। ঐতিহাসিকভাবে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই কৃষক-শ্রমিকের সুদৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে এই নেতৃত্ব দিতে পারে। অবশ্যই এই নেতৃত্ব হতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও সে তুংএর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে কৃষক শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বমূলক। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে থাকলেও এর মূল শক্তি হচ্ছে পূর্ব-বাংলার ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক সমাজ। বুদ্ধিজীবী, কুটির শিল্পী, মাঝারী কৃষক ও বিপ্লবী নারী সমাজ এই বিপ্লবের দৃঢ় মিত্র হিসাবে কাজ করবে। পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক (যারা কোনমতেই মুনসুফি নয়) ও ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এরা শ্রেণী হিসাবে শোষক এবং শোষিত উভয়ই। এরা

কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী জনগণকে নির্মমভাবে শোষণ করে, আবার মুনসুফি একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণে নিজেরাও জর্জরিত। তাদের নিজস্ব পুঁজির বিকাশে সামন্তবাদ সহ এই দুই শোষক শ্রেণীই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। সে স্বল্পের প্রেক্ষিতে তাদের একটা বড় অংশ আংশিকভাবে হলেও (জাতীয় মুক্তির প্রাঙ্গণে সক্রিয়ভাবে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সাময়িকভাবে বা নৈতিক ভাবে) বিপ্লবের সহযোগিতা করবে, কিন্তু নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এরা সামগ্রিক বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত না হলেও বর্তমান পর্যায়ে তাদের এই সহযোগিতা বিপ্লবী জনগণের গ্রহণ করা উচিত এবং নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভূমিকায় বর্তমান পর্যায়ে তাদের দোহুলামান মিত্র হিসাবে স্থান দেয়া উচিত। কিন্তু বিপ্লবী জনগণকে অবশ্যই তাদের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তারা তাদের স্বার্থে প্রতিক্রিয়ার পুনর্জন্ম না দিতে পারে, শ্রেণী হিসাবে যা তারা করতে চেষ্টা চালাবে। যখনই তেমন কোন পথ তারা গ্রহণ করবে ঠিক তখনই তাদের বিপ্লবী জনগণের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত, তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত তারা পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পথে আপোষহীন লড়াইতে অংশ গ্রহণ করবে ততদিন পর্যন্ত তাদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করার কোন অবকাশ নেই এবং তা করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। পূর্ব বাংলার প্রতিটি বিপ্লবীকে মনে রাখতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মধ্যবিত্ত সুলভ অস্থিরতা, তাড়াহুড়া, একগুয়েমী, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, অগণের বক্তব্যকে উপেক্ষা বা ব্যক্তিগতভাবে অমুসরণ এবং নানা প্রকারের দোহুলামানতার ফলে বিপ্লবে সমূহ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। সুতরাং প্রতিটি বিপ্লবীকে কঠোর বাস্তবতার ভিত্তিতে খুব ধীর স্থিরভাবে এই সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। সে দিকে দৃষ্টি রেখে জাতীয় ধনিকরা আগামী দিনে যাতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে তার জন্য এখন থেকেই জনগণের রাজনৈতিক চেতনার স্তরকে উন্নত করার জন্য বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এই রাজনৈতিক সচেতন জনগণকে আরো সক্রিয়ভাবে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার সপক্ষে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা এবং মধ্যার্থ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে কিছু সংখ্যক দেশী-বিদেশী ব্যক্তি ও সংস্থা, বিদেশী কিছু রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থে পাকিস্তানী সামরিক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণীগতভাবে এদের অধিকাংশই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতি-বিপ্লবী, কিন্তু পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে স্বীয় স্বার্থের দ্বন্দ্বই তাদেরকে পূর্ব বাংলার জনগণের বিপ্লবী মিত্র শিবিরে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের একটি স্তর পর্যন্ত তারা মিত্র হিসাবে কাজ করে বাবে এবং পরবর্তী কালে এরাই বিপ্লবের বিরোধিতা করতে পারে এবং করবে। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বর্তমান মুহূর্তে বিপ্লবের এই সকল দোহুলামান মিত্র শক্তিকে যথাসম্ভব ব্যবহার করা উচিত। প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে, সে সুযোগকে পুরোপুরি ভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে সামগ্রিক ভাবে জনগণের বিপ্লবকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া অত্যন্ত বিপ্লবী রণকৌশল। কিন্তু এই রণকৌশল প্রয়োগ করতে বিপ্লবী জনগণকে অবশ্যই যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে বিপ্লবের বর্তমান দোহুলামান মিত্ররূপী এসকল প্রতি-

ক্রিয়াশীল শক্তি পরবর্তীকালে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। এখন থেকেই এই সমস্যার রাজনৈতিক মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুং-এর সঠিক চিন্তাধারার আদর্শনিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিপ্লবী পার্টি, যা কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিপ্লবীকে অবশ্যই ধৈর্য ও মনোবোঁগ সহকারে অধ্যয়নের মাধ্যমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল শিক্ষা—“জনগণের সেবা করার” মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তব বিপ্লবী জীবনে কঠোর আত্মত্যাগের মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে কমরেড স্তালিনের সতর্কবাণী—“বিপ্লবী অশুশীলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলে তত্ত্ব উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে”। এই মহান আত্মত্যাগের আদর্শে সুসজ্জিত হয়ে গ্রামের কৃষক, শহরের শ্রমিক তথা পূর্ব বাংলার মেহনতী জনগণ এবং অগ্ন্যান্য মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীগণকে শ্রেণী সংগ্রামের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের রাজনৈতিক চেতনার স্তরকে উন্নততর করে, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণযুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল করে, তাদের উপর নির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাস হয়েই কেবল এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কমরেড মাও সেতুং বলেছেন—“বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ, কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।” সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে অবশ্যই বিপ্লবীদের জনগণের উপর আস্থা রাখতে হবে, নির্ভরশীল হতে হবে, তাদের অফুরন্ত সৃজনী শক্তিকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে বিপ্লবী কর্মে নিয়োজিত করতে হবে, এককথায় সর্বকক্ষে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শত্রুদের নিমূল করে জনগণের বিজয়কে সুসম্পন্ন করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই হচ্ছে সঠিক মার্কসবাদী লেনিনবাদী পথ। পূর্ব বাংলার “জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব” সুসম্পন্ন করতে, স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে সকল প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর জনগণের শ্রেণীসংগ্রামকে চূড়ান্ত ভাবে সফল করে তুলে কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মেহনতী জনগণের পার্টি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সহ পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণীর দেশপ্রেমিক জনগণকে এই সঠিক পথেই এগিয়ে আসতে হবে। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার মুক্তি-যুদ্ধ একমাত্র এই পথেই বিজয় অর্জন করবে। এ ছাড়া পূর্ব বাংলার জনগণের সার্বিক মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই।

অনীক

জুলাই-অক্টোবর ১৯৭১

- ‘একদিন সাংহাই বন্দরে’ (পিকিং অপেরার নাটক)
 - ‘ভারত সোভিয়েত’ চুক্তি প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)
 - ‘চীন মার্কিন সম্পর্ক’ প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)
 - চিংক্যাং পাহাড়—বিপ্লবের পথ (চীনের প্রবন্ধ)
 - একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচী (চীনের দলিল)
 - বাংলা শিল্প সাহিত্য কোন পথে (প্রবন্ধ)
 - চীন, আলবানিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোদিয়া, প্যালেস্টাইন ও ভারতের গল্প
 - চীন, আলবানিয়া, প্যালেস্টাইন, গিনি, পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের কবিতা
- দাম : হ’ টাকা ॥ গ্রাহক চাঁদা : পাঁচটাকা
- পিপলস বুক এজেন্সি
- ৮০ সি নেতাজী রোড ॥ পোঃ ষাগড়া ॥
- মুর্শিদাবাদ জেলা

২০১৭ মুক্তারাম বাবু লেন, কোলকাতা-৭

নিকসনের চীনযাত্রা

(৮এর পাতার পর)

আলোচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাও সে তুং একই পত্রিকায় লেখেন : “আমরা শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব সমর্থন করি। ঐ শীর্ষসম্মেলন সাফল্য আনবে কি না, কিংবা সাফল্যের পরিমাণ কতটুকু তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু মূলতঃ বিশ্বশান্তি রক্ষা করতে হলে সবার আগে আমাদের পৃথিবীর জনগণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের ওপরেই নির্ভর করতে হবে।” (রেনমিন-জিপিও ১৫ই মে, ১৯৬০)

অর্থাৎ চীনের কমিউনিষ্ট নেতৃত্বদ্বয় যে কোন স্তরে শত্রুর সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক কিন্তু নীতি বিসর্জন দিয়ে নয়। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যাপারে সর্বাত্মক রয়েছেন বলে দাবী করেন। তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে বিশ্বশান্তি রক্ষা করতে হলে সাম্রাজ্যবাদী গুচ্ছ অতিসজ্জিত মুখোশ খুলে দিতে হবে, এবং ক্রমাগত একাধি চালিয়ে পৃথিবীর সকলদেশের জনগণকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ‘শান্তির অস্ত্র-লাঘব’ উপর নির্ভর না করে, সমাজ-তাত্ত্বিক দেশগুলির মিলিত শক্তি, সমস্ত দেশের সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যেহনতী মানুষের স্বাধীন দেশের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম, নির্ধাতিত জাতি-সমূহের মুক্তি সংগ্রাম এবং পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী মানুষের এক সম্মিলিত প্রসারিত যুক্তমোর্চার ওপর নির্ভর করতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাবদ্বারদের বিরুদ্ধে এই বহল-প্রসারিত যুক্ত মোর্চাই একমাত্র তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করতে পারে, শান্তি সুরক্ষিত করতে পারে।

নীতিতে অবিচল থেকে শত্রুর সঙ্গেও
অকুণ্ঠ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে
সাম্রাজ্যবাদীদের শাস্তির বুলি আঁওড়ানে
ভগ্নাবি, তাদের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির
গুরুভার কি ভাবে সব দেশের মানুষের
গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করার
অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে, কি ভাবে এই
সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ও শোষণ নিজ
নিজ দেশের জনগণকেও ছর্ব্বহ, কষ্টকর
জীবনযাপনে বাধ্য করে, তা পরিষ্কার করে
বুলে দেয়। জনগণ বুঝতে পারেন যে
নিজ নিজ দেশের সরকার জনগণের দেওয়া
ট্যাক্সে যে বিপুলায়তন সামরিকবাহিনী
পোষে, প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধের নামে সেই
সেনাবাহিনীকে সৃষ্টি করে দেশের জনগণের
বিক্রছেই লেগিয়ে দেওয়া হয়। ফলে
ভীরা সরকারের সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ
ও অঙ্গসজ্জার বিক্রেছে দাঁড়ান এবং বিশ্ব
শান্তির বিক্রেছে একটা মূল হাতিয়ারকে
ভেঙ্গে দিতে এগিয়ে আসেন।

নীতিতে অবিচল থেকে শত্রুর সঙ্গেও
অকুণ্ঠ আলোচনার বসতে প্রস্তুত থাকলে
শত্রুর শিবিরেও বিভ্রান্তি ও বিসংবাদের
সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে
পরস্পর জোটে থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা
সম্ভব হয়।

নীতিনিষ্ঠ থেকে শত্রুর সঙ্গে আলোচনা
সফল হলে কোরীয় যুদ্ধের মত যুদ্ধবিরতি
চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়। আংশিক ভাবে
হলেও বিদ্রোহ জয়লাভ করে। সমাজতান্ত্রিক
মনোভাবের প্রতি পশ্চাদপদ মানুষ আকৃষ্ট
হন।

বিপ্লব সম্পন্ন করার দৃঢ় নীতি বজায় রেখে শত্রুর সঙ্গে আপোষ আলোচনার অর্থ তার অর্থোক্তিক মনোভাব, জনবিরোধী অপকৌশলকে উদ্ঘাটিত করা, উন্মোচন করা। এবং ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন দেশের এবং নিজ দেশের জনগণ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং সেখানেও জনগণ প্রকৃত ক্ষমতা দখলের পথে অগ্রসর হতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ অপ্রতি-
বোধ্য সংকটই তাকে যুদ্ধের পথে নিয়ে যায়
অথবা শান্তি-আলোচনার দ্বৈতনীতি অব-
লম্বন করবার মতলব এনে দেয়। যুদ্ধ অথবা
শান্তি উভয়ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদ একই লক্ষ্য
রেখে অগ্রসর হয়। তার এই দুই ধরনের
কৌশলকে পৃথিবীর জনগণের সামনে খুলে
ধরার ফলে সাম্রাজ্যবাদ জনগণ থেকেও
এমন কি নিজের দেশের জনগণ থেকেও
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক অনগ্রসর
চেতনাসম্পন্ন মানুষও শান্তির লক্ষ্যের সঙ্গে
সামরিকায়ণের অসংগতি বুঝে ফেলতে
সক্ষম হন। বিশ্বব্যাপী পুঞ্জিবাদী আর্থিক
সংকট কেন বাবে বাবে তাদের আঘাত
করে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

একদিকে অনবরত সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সর্বত্র মানুষের জীবনযাত্রার মানের নিম্নমুখী গতি, দুঃখদর্দনা ক্রম হারে বৃদ্ধি, অন্যদিকে সামরিকীকরণ ছাড়া পুঁজিবাদী কাঠামো রক্ষা করতে অপারগতা এই দ্বৈত সংকটের ফলেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণ উদ্বুদ্ধ হন।

সুতরাং যুদ্ধ বাধালে তাকে দেশে দেশে
বিপ্লবের জোয়ারের সম্মুখীন হতে হবে,
এবং যুদ্ধ সম্ভাবনা প্রতিরোধ করতে পারলে
তাকে অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখে বিপ্লবের
সাক্ষ্য নিশ্চিত হয় দেখে, সাম্রাজ্যবাদ এই
দৈত নীতি অবলম্বন করে।

এই সাম্রাজ্যবাদী দৈতনীয়তার মাঝে
বিশ্বের জনগণ, বিশ্বের কমিউনিস্ট-সামাজ-
তান্ত্রিক আন্দোলনকেও দৈতনীয়তা অবলম্বন
করে এর মোকাবেলা করতে হয়।

তাই একত্রিশ বছর আগে মাও সে তুং যে দ্বৈতনীতির নমনীয়তা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করেছিলেন, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র রেডফ্ল্যাগ আবার লেকখা জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রেডফ্ল্যাগ আগস্ট মাসের শেষদিকে এক প্রবন্ধে লিখেছেন, “সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক চরিত্র কখনও বদলায় না। বদলাতে পারে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ক্রমাগত তার রণনীতি পাল্টায় এবং দ্বৈত-কৌশল অবলম্বন করে।” রেডফ্ল্যাগ প্রবন্ধে স্পষ্ট বলা হয়েছে, “শত্রুর এই প্রতিবিপ্লবী হুঁহুখো কৌশলের বিরুদ্ধে আমাদের বিপ্লবী দ্বৈত কৌশলের হাতিয়ার

তুলে নিতে হবে। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান উপায় সশস্ত্র সংগ্রামের পদ্ধতি ত্যাগ না করে, আমরা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ধরণেও শত্রুর বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে সর্বস্বার্থ শ্রেণীকে যতরকম নমনীয় কোর্শুল অবলম্বন করা প্রয়োজন সবই গ্রহণ করতে হবে।”

অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের পদ্ধতিকে
সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংগ্রাম হিসেবে তুলে
ধরেও চীনা নেতৃত্ব অন্যান্য সমস্তরকম রণ-
কৌশলের নমনীয় প্রয়োগপদ্ধতিকে
অবহেলা না করার জন্যে সর্বদ্বারা প্রেক্ষিকে
পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের দেশের মাও-
বাদীদের এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করা
প্রয়োজন।

সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনবাদী নেতৃবৃন্দের স্বজাভারীদের 'সব গেল', 'সব গেল'—চীৎকার জনমনে কোঁতুকের সঞ্চারও করে।

সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকি-বহাল না থেকে তারা শুধুমাত্র বৃহৎ দুটি তিনটি শক্তির মধ্যে বোঝাপড়ার মারফতে বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব বলে আশ্বাসন করেন। ক্যাম্পডেভিড থেকে গ্রাসবরো পর্যন্ত শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা ও বোঝাপড়া সত্ত্বেও কিউবা, ডমিনিকান বিপ্লবিক, ভিয়েতনামে, আরব এলাকায় সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও আগ্রাসন কি বন্ধ হয়েছে? বিয়াক্রা, বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক আক্রমণ ও নিষ্ঠুরতার পেছনে সাম্রাজ্যবাদের উসকানি কি বন্ধ হয়েছে? হয়নি।

ইতিহাস থেকেও তারা শিক্ষা নিতে পারে। ব্রিটিশ, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের তৎকালীন অমুচর সোশ্যাল ডেমোক্রেট লিগ হুম, বেনো এটিলি ফ্যাকার্ড ফ্রিপ্সেরা হিটলারী ফ্যাসিবাদীদের তোষণ করে আক্রমণ থেকে বিরত করতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি। তারা অবিলিনিয়া, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়াকে নীতিহীন ভাবে ফ্যাসিস্টদের হাতে ভুলে দিয়ে বিশ্বশান্তির স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের দেশও আক্রান্ত হয়েছিল। বিশ্বশান্তির এই নীতিহীন আলোচনা বিশ্বযুদ্ধ ডেকে এনেছিল।

সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র কখনো বদলায় না, একথা ধরে নিয়েই তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। নীতিগত প্রশ্নে কোন আপোষ হবে না। দৃঢ়ভাবে একথা তাদের জানিয়ে দিতে হবে। তাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে (১) জনগণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বা আক্রমণ কোনটাই চায় না; (২) তবু যদি আক্রমণ ঘটে তাহলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিপক্ষে তাকে দাঁড়াতে হবে। এই দুটি মৌলনীতির ভিত্তির ওপর দৃঢ় থেকেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আলোচনা অথবা শীর্ষ সম্মেলন চালানো যায়।

নিকসনের সঙ্গে আলোচনার জগ্গে
চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই একটা
নোট তৈরী করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের চীনদূত-
দের কাছে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে
আটটা মূল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।
এই বিষয়গুলি সম্পর্কে চীনা নেতৃত্ব কোন

আপোষ করবেন না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়গুলি হচ্ছে (১) আমেরিকাকে
 জিয়েতনামের ৭ দফা শাস্তি প্রস্তাব মেনে নি-
 হবে। (২) ১৯৪৯ এ তাইওয়ান জাপানের
 পরাজয়ের ফলে চীনের কর্তৃত্ব ফিরে আসে,
 চীনের অচ্ছেদ্য অংশ তাইওয়ান থেকে
 মার্কিন সৈন্যপ্রসারণ (৩) চীনসাপর অঞ্চল
 থেকে মার্কিন সপ্তম নৌবহর অপসারণ
 (৪) তাইওয়ানে চীনের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার
 (৫) নিরাপত্তা পরিষদ সহ জাতি সংঘে
 চীনের ল্যায়া আসন ফিরিয়ে দেওয়া
 (৬) জাপানী সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে উৎসাহ
 না দেওয়া (৭) আগবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ বিলোপ
 এবং (৮) সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে
 পৃথিবীর ছোট বড় সবদেশের সম্মেলন
 আহ্বান।

এই আট দফা বিষয়ের ভিত্তিতে
নিকসনের সঙ্গে আলোচনায় বসলে চীনা
নেতৃবৃন্দ কিভাবে সোভিয়েত সংশোধন-
বাদীদের ক্রোধ এবং বিরাগভাজন হ'তে
পারেন ?

সম্প্রতি প্রাপ্তদা নিউটাইমস, প্রভৃতি
সোভিয়েত পত্র পত্রিকায় চীন-মার্কিন
আলোচনা সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করা
হয়েছে, তা থেকে কি মনে হয় ?

সোভিয়েত ইউনিয়নও তা বলেছেন
 তাঁরা (১) ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ হোক এটা
 কামনা করেন, (২) তাঁরা তাইওয়ানকে
 চীনের অংশ বলেই মনে করেন (৩) তাঁরা
 জাপানের পুনরায় সামরিক সাম্রাজ্যবাদী
 শক্তি হিসেবে প্রাচ্যে পুনরুত্থান অকাম্য
 মনে করেন (৪) তাঁরা আণবিক যুদ্ধের
 ও অস্ত্রশস্ত্রের বিরোধী (৫) তাঁরা সম্পূর্ণ
 নিরস্ত্রীকরণ চান।

তাহলে তাঁরা কিসের ভিত্তিতে চীন-মার্কিন আলোচনাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার বড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছেন ?

তবে কি ধরে নিতে হবে যে সর্ববৃহৎ শক্তি ছুটির (আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করার ভাগবীটোয়ারা করা হয়েছে বলে চীন যে অভিযোগ করে তার মূলে সত্য আছে ? ক্যাম্পডেভিডে জুশ্চেভ আইজেনহাওয়ার কি আলোচনা করেছিলেন, কিংবা গ্রাসবরোতে কোসিগিন জনসন কোন গোপন আলোচনা করেছিলেন তা তো চীনের মত খোলাখুলিভাবে আজো তাঁরা পৃথিবীর মানুষের সামনে রাখতে পারেন নি ।

তাহলে কি একথা ধরে নিতে হবে যে
তৃতীয় সর্বস্বং শক্তি হিসাবে চীনের
অভ্যুদয় প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই
বাস্তব ঘটনা স্বীকারে বাধ্য হওয়া।
সোভিয়েত নেতৃত্বের মনঃপুত হয় নি।
তারা কি আশংকা করছেন, পৃথিবীর
বিভিন্ন দেশে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারে এ
আলোচনা বাধা হয়ে দাঁড়াবে ?

(শেষাংশ ৩১ পৃষ্ঠায়)

পল্লী দর্পণ

রামপুরহাট কলেজে সি আর পির অত্যাচার

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

বীরভূমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিতে শান্তি রক্ষার নাম করে কেন্দ্রীয় পুলিশ সদৃশকর্তৃপক্ষ ভাবে স্কুলে, কলেজে হামলা চালিয়ে পঠন-পাঠন বন্ধ করে দিতে চাইছে। অধিকাংশ স্কুলেই কেন্দ্রীয় পুলিশের অত্যাচারের ধরণ-ধারণ প্রায় একই রকম।

গত দশই ফেব্রুয়ারী কলেজে অগ্নিসংযোগের ঘটনার সূযোগ গ্রহণ করে রামপুরহাটে অবস্থানরত সি আর পি ব্যাটেলিয়ান কলেজ সংলগ্ন ছাত্রাবাস-ঘেঁটা ইউ জি সির টাকায় তৈরী-দখল করে নেয়। ছাত্ররা ছাত্রাবাস থেকে বাহিন্যকৃত হয়, এমন কি হুস্টেল-সদৃশের কোয়ার্টার্সে বসবাসকারী চারজন অধ্যাপকের অনুরোধ না নিয়েই সি আর পি প্রভুরা অবৈধ-ভাবে প্রবেশ করে এবং অধ্যাপকদের জিনিসপত্রের যেমন খুশী ঘর থেকে বার করে দিয়ে কোয়ার্টার্সে দখল করে নেয়। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের কলেজ কর্তৃপক্ষ বাড়ী চলে যেতে বলে, ঐ উৎসাহে অধ্যাপকদের জন্য মৌখিক সমবেদনা জানানো হয় এবং প্রায় দু'মাসকাল কলেজ বন্ধ রাখা হয়।

এপ্রিলের শেষের দিকে কলেজ খোলে। কিন্তু তখনও সি আর পি রয়েছে। উনতিরিশে এপ্রিল কলেজ প্রাঙ্গণে একটি পটকা ফাটে। একটু

ধোঁয়া উঠেছিল মাত্র। কেউ আহত হয়নি। তা হলে কি হবে। সঙ্গে সঙ্গে সি আর পির ঠ্যাংগাড়ে দলে দলে ঢুকে পড়ে ক্লাস রুমগুলিতে। অধ্যাপকরা বাধা দেবার চেষ্টা করে অপমানিত হন। লাঠি আর বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ক্লাসরুমের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছাত্র পিটানোর পালা চলতে থাকে। ছাত্রীরা বেগের তলায় আশ্রয় নিয়ে মারের হাত থেকে বাঁচে। অধ্যাপক বন্দুকের নলের মুখে অসহায় দর্শকের ভূমিকা নিতে বাধ্য হন। প্রচণ্ড মার দেবার পর সি আর পি সিপাইরা প্রায় দেড়শ ছাত্রকে হাত তুলে দাঁড় করিয়ে রাখে কলেজ ময়দানে বীরভূমের ঝলসানো গ্রীষ্মের আগরনে। সার্চ করার ভাণ করে সি আর পি পঞ্চদশের ছাত্রদের অকথ্য গালিগালাজ করে সমস্ত ঘটনা অধ্যক্ষের সামনেই ঘটে। অধ্যক্ষ পরের দিন থেকেই গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করে কলেজ বন্ধ করে দেন।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলল। সি আর পি বাবাজীবনের ছাত্রাবাস শোভা করে তখনও বিরাজমান। ছাত্রীদের প্রতি সি আর পি সেন্সিটাইভ রুট জেরা করা ক্লাস চলাকালীন সময়ে ক্লাসরুমের গায়েই সিপাইদের কুচকাওয়াজ জনিত বাজখাই হুঙ্কার প্রভৃতি

বহুবিধ প্রতিকূল ও অস্থাস্থ্যকর পরিবেশকে উপেক্ষা করে ছাত্র-শিক্ষক সহযোগিতায় সমগ্র আগস্ট মাস পঠন-পাঠন চালিয়ে যাওয়া হয়।

হঠাৎ পরগনা সেপ্টেম্বর বেলা বারোটা নাগাদ কলেজ প্রাঙ্গণে একটি পটকা ফাটে। সি আর পি সিপাইদের একজনেরও সেই বিস্ফোরণের জন্য দেহে একটি আঁচড় লাগেনি। কিন্তু তবু সি আর পির কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। দলে দলে তারা লাঠি, বন্দুক, কোমরের বেট মোরাতে মোরাতে ঝম-ঝমের মত ঢুকে পড়ল ক্লাসরুম-গুলিতে। সূর্য হল প্রহার। ক্লাস থেকে আতঙ্কে পালায়ে কিছু ছাত্রছাত্রী টিচার্সরুমে আশ্রয় নেয়। বীর, কর্তব্য পরায়ণ সি আর পি সিপাই কিন্তু রেহাই দিল না। টিচার্সরুমে ঢুকে পেটাতে সূর্য করল ছাত্র, শিক্ষক, বেসারা সবাইকে। রক্ত বরতে লাগল। ছাত্র-ছাত্রীদের আতর্জন আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ কলেজের দিকে এগোবার চেষ্টা করে। কিন্তু বন্দুকধারী সি আর পি ঘাতকদের সম্মুখীন হয়ে তাদের থামতে হয়।

প্রচুর মার দেওয়ার পর সি আর পি বাহিনী বন্দুক উঁচিয়ে রক্তাক্ত ছাত্রদের হাত তুলে এক মাইল পথ দুপুর রোদে হাঁটিয়ে

থানা লক-আপে নিয়ে যায়। মারের চোটে কয়েকজনের মৃত্যুকার হয়েছে। একজন ছাত্রের অবস্থা উদ্বেগজনক। এখনও লক-আপে কয়েকজন আটক আছে। ঘটনার সময় অধ্যক্ষ কলেজে ছিলেন না। তার কোয়ার্টার্স থেকে এসে তিনি কলেজ অফিসে প্রবেশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এগারোই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলেজ বন্ধ করে দেন। রামপুরহাট কলেজে এই এক অশুভ ফর্মুলা পটকা বিস্ফোরণ, সি আর পি জানোয়ারদের বর্বর তান্ডব, অধ্যক্ষের হুকুমে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া।

পরোনো পরিচালক সমিতি খাওয়ানজীর হুকুমে অকালে বাতিল হওয়ার পর আজও কলেজে নতুন পরিচালক সংস্থা গঠিত না হওয়ায় এস ডি ও এবং অধ্যক্ষ যৌথভাবে কলেজের সর্বস্বত্ব। সি আর পি দ্বারা প্রহৃত অধ্যাপক বন্দুটি স্থানীয় এস ডি ও বাহাদুরের দরবারে হাজির হন। কিন্তু শূন্য সহানুভূতি জানিয়ে এস ডি ও পাল্লা প্রশ্ন করেন যে, সি আর পি প্রত্যাহার করে নিলে ঐ প্রহৃত অধ্যাপক কলেজের সম্পত্তির নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারবেন কিনা। এই অপদার্থ প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। তাই ছাত্রের তাজা তপ্ত রক্তে হাত লাল করে, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে পিটিয়ে, রামপুরহাট কলেজ চক্রে এবং ছাত্রাবাসে সূর্য আর সাকীর গুল-বাগিচা রচনা করে। সি আর পি সৈন্যরা আজও শক্তিরূপে সংস্থিত।

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে দিই যে গত এপ্রিল মাসে রামপুরহাট

কলেজ সংলগ্ন হাইস্কুলে একদিন স্কুল প্রার্থনার সময় একটি বোমা ফাটে। স্কুলের ছাত্রদের বাড়ী চলে যেতে বলা হয়। কিছু পরেই সৈন্যবাহিনীর এক অফিসার দ্বজন সশস্ত্র সৈন্যকে নিয়ে স্কুলে প্রবেশ করে উপস্থিত শিক্ষকদের ছাত্রদের বাড়ী চলে যেতে দেওয়ার জন্য চোখা চোখা খিস্তিতে আপ্যায়িত করে শাসিয়ে যান, পুনরায় যদি কোনদিন পটকা পড়ার ঘটনা ঘটে, শিক্ষক, ছাত্র দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে তিনি গুলি করে মারবেন সবাইকে। পরগনা সেপ্টেম্বরে ধৃত কলেজ ছাত্রদের ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে এক অধ্যাপককে সি আর পি প্রধানের কাছে শনতে হয় যে সি আর পি বাহিনী দুবার গভীর পরোচনার মধ্যেও অত্যন্ত সংযত আচরণ করেছে এবং তৃতীয়বারে কিছু তারা গুলী করতে বাধ্য হবে।

রামপুরহাট কলেজের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী গ্রামাঞ্চল থেকে আসে। সি আর পি এর পরের বার গুলি করবে একথা তাদের কানেও গেছে। শোনা যাচ্ছে তারা আর কলেজে আসবে না। উনিশশ একাত্তর সালে কদিনই বা ক্লাস হলো! পূজোর ছুটি এসে গেল। এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় যদি যদি বই খুলে লিখতে চায়, খুব অন্যান্য করবে কি তারা?

নব কংগ্রেসী রাজনীতি

(২৮শ পৃষ্ঠার পর)

শোষিত শ্রেণীর আস্থা ও আশীর্বাদ অর্জন করা।

পাশাপাশি সি পি এম রাজনীতি মূলতঃ মিছিল ও বাঁধ কেন্দ্রিক হওয়ায়, পাল্লিমেন্টারী রাজনীতির চক্রে আবদ্ধ থাকায় এবং সি পি আই (এম এল) কর্মসূচীর ব্যাপক বিরোধিতা করার পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়ার ব্যাপক শূন্যতার কারণেই শোষক শ্রেণীর দালাল নব কংগ্রেস সি পি আই (এম এল)-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে এসে পড়েছে। স্বাভাবিক কারণেই ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে শোষকশ্রেণীকে নিজের শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে সংশোধনবাদী বাম পার্টি গুলো বিশেষ করে সি পি এম-এর সঙ্গে নকশাল বিরোধী যুক্তফ্রন্টের সমঝোতা আসতে উৎসাহিত করেছে। জ্যোতি বসু ও হরেকৃষ্ণ কোণ্ডারও সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে লেখা চিঠিতে তথ্য প্রমাণ সহ একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে নব কংগ্রেস নকশালদের প্রশ্রয় দিয়েছিল

এবং প্রশ্রয় দিয়ে নব কংগ্রেসের শ্রেণীস্বার্থের বিপরীত কাজ করেছিল তাই বসু-কোণ্ডারের নব কংগ্রেসকে আবেদন : “সরকার এবং কংগ্রেস দলের নিজেদের স্বার্থেই (অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর স্বার্থেই) আজ কংগ্রেসকে তাদের বিপক্ষজনক পথ (অর্থাৎ নকশালবাদীদের প্রশ্রয় দেওয়ার পথ-এ ব) পরিহার করতে হবে এবং তাঁদের নীতির প্রকৃত পরিবর্তন করতে হবে।”

ইন্দিরা সরকার নকশালবাদীদের সি পি এম বিরোধিতার পক্ষপাত দৃষ্ট ব্যবহার করেছে, এমন প্রমাণ একমাত্র আঞ্চলিক ভিত্তিতে কোলকাতা শহরের কোন কোন এলাকায় সি পি এম বিরোধী নকশাল নব কংগ্রেস সাময়িক সুবিধাবাদী সহযোগিতা ছাড়া আর কিছু রয়েছে বলে কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু একই সময়ে সি পি এম পুলিশ নব কংগ্রেস সহযোগিতার ফলে নকশাল কর্মীরা গ্রেপ্তার হয়েছে বা খন্দে হয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত তথ্যভিজ্ঞদের অনেকেই জানে, যদিও গোপন সংগঠনের ফলে নকশালবাদীরা জনসমক্ষে

সি পি এম ও পুলিশ সহযোগিতার তথ্যাদি জনসাধারণকে জানাতে পারেন নি।

সূত্রের বিষয়—কাশীপুরে বরানগরের নারকীয় ঘটনা প্রমাণ করেছে যে ইন্দিরা সরকার সাদা পোষাকের পুলিশ জনতাকে দিয়ে নকশালদের সংগে গৃহযুদ্ধে নিযুক্ত করেছে এবং গত তিনমাস যাবৎ নকশাল সি পি এম সংঘর্ষে ভাঁটা পড়ে নকশাল-পুলিশ বা নকশাল-নব কংগ্রেস সংঘর্ষ ক্রমশঃ ব্যাপকতর হচ্ছে। অন্যদিকে নব কংগ্রেস সি পি এম আন্তঃদলীয় সংঘর্ষও উভয় দলের নেতৃত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ব্যাপকতর হচ্ছে।

এ ব্যবস্থায় নব কংগ্রেস রাজনীতি নকশাল বিরোধী কংগ্রেস-সি পি এম যুক্তফ্রন্টের ওপর যেমন একদিকে জোর দিচ্ছে, অন্যদিকে নকশাল অঞ্চল বলে খ্যাত এলাকায় সাদা পোষাকের পুলিশ ও নব কংগ্রেসের ফ্যাসিবাদী বাহিনীর সহায়তায় কাশীপুরে বরানগরের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডকে পুনরায় আয়োজিত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ অবস্থায় সি পি এম নব কংগ্রেস আন্তঃদলীয় সংঘর্ষের অবসান শোষকশ্রেণীর স্বার্থেই কামা এবং নকশাল বিরোধী যুক্তফ্রন্টের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তার দিকে

পশ্চিমবঙ্গে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সি পি এম নেতৃত্ব প্রকাশ্যে নকশালবিরোধী যুক্তফ্রন্টে যোগ দেবে কি দেবে না তার ওপর সি পি এম রাজনীতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে। অন্যদিকে ঘনায়মান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে শোষকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ দালাল নব কংগ্রেস ফ্যাসিবাদী কায়দায় নকশাল হত্যা করে আবার উদারনৈতিক কায়দায় মধ্যবিত্ত বাম বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের গণতান্ত্রিক ভাবে ধ্বংস করে নকশালবাদী আন্দোলনের বৈশ্বিক পদচিহ্নকে মছে ফেলে প্রতিবিলম্বী জোয়ার আনতে পারবে কি না তা আগামী দিনের ঘটনা স্রোতই বলতে পারবে।

লেনিন বলেছিলেন—পৃথিবী-বাদীরা যখন ভোলা অবস্থায় থাকে তখনই (ক) বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে নৃশংসতম ব্যবস্থা করে, (খ) সাধারণ মানুষের জন্য কিছু কিছু অর্থনৈতিক উপকারের ছিটে ফোঁটা বিতরণ করে। ভারতবর্ষের পৃথিবীবাদী দালাল একচেটিয়া পৃথিবীবাদ ও সূচতুর সামন্তবাদ বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে প্রথম

কাজে আপাতদৃষ্টিতে সফল হলেও দ্বিতীয় কাজে অর্থাৎ অর্থনৈতিক সুখসুবিধার কাজে এগরতে পারছে না। এ অবস্থায় সি পি এম-এর মধ্যেও যে বিপ্লবী কর্মী ও সমর্থক রয়েছেন, তাঁরা যদি নকশালদের সংগে যুক্তফ্রন্ট ভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী প্রকৃত বৈশ্বিক কর্মসূচী গ্রহণ না করেন, তবে তাঁরা ভারতবর্ষে বিপ্লবী সম্ভাবনার অপমৃত্যুর দায়ে অভিযুক্ত হবেন। বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গে শোষকশ্রেণী পরিচালিত শ্বেতসন্ত্রাসের বদলা হিসেবে বিপ্লবীদের লাল সন্ত্রাস সৃষ্টি অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার ও জ্যোতি বসুর উপরোক্ত উক্তি শ্বেতসন্ত্রাসের সহায়ক এবং লাল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। বিপ্লবী ক্যাডারদের, বিপ্লবী জনসাধারণের যুক্তফ্রন্টই শ্বেতসন্ত্রাসকে রুদ্ধতে পারে এবং লাল সন্ত্রাসকে ব্যাপক করতে পারে। সি পি আই (এম এল) ও সি পি এম ক্যাডারদের একথা না বঝলে ভারতীয় বিপ্লবের অপরিমেয় ক্ষতি হবে।

(ਬਧੈ ਜ੍ਧੈਥਾਨੁ ਜਰ)

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও সরকার এই আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি বিশেষ যুগের সূচনার ইঙ্গিত পান। এই সময়ে চীনের তরফ থেকে একটি নতুন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গঠনের আহ্বান জানানো হয়। চীনা প্রচার ভারতীয় সরকার, ডাঙা চক্র ও জ্যোতি বসু, নান্দুদ্রিপাদ গোস্বামীর বিরুদ্ধে চালিত হয়। সাতবাঁটা সালের সাতই আগস্ট সংখ্যায় চীনা সংবাদপত্র পিপলস ডেলি “নকশাবাড়ির লাল পতাকা আরও উর্ধ্বে উঠুক” এই শিরোনামে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে “বিস্তারী”দের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সাংগঠনিক এবং আদর্শগত সংগ্রামের আহ্বান জানান। তারা বলেন, সোভিয়েত সংশোধনবাদী চক্রকে ঘিরে নয়া-সংশোধনবাদ ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষতি করেছে এবং এর বিরুদ্ধে কঠিন আপোষহীন সংগ্রামের প্রয়োজন। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এই চীনা আক্রমণের (শেখাফল শেষ গড়ান)

ସ୍ଥାପିତ ୧୯୧୦

বরকৎ আলি এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

আধুনিক রুচির খ্যাতনামা পোষাকশিল্পী

৯এ; চৌরঙ্গী প্রেস, কলিকাতা-১৩

টেলিফোন : ২৩-৩০৫০

নকশালী আন্দোলনের রিপোর্ট

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

জবাবে দ্রুতি দলিল প্রকাশ করে—
“বামপন্থী বিচ্ছিন্নতা, না-বামপন্থী
সুবিধাবাদ” এবং “আমাদের পার্টি
ও চীন পার্টির মধ্যে নীতি ও কার্য-
ক্রম সংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক
প্রশ্নে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি।”

মার্কসবাদী সেন্ট্রাল কমিটি
ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে
চৈনিক মূল্যায়নের সঙ্গে একমত
হতে পারে না। ভারতীয় ধন-
তন্ত্রের এবং ভারত সরকারের
শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে চীনা পার্টির
বক্তব্য ছিল : ভারতীয় বর্জ্যেরা
সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল পর-
গাছা এবং এর চরিত্র হল মৎস্যসূচী
এবং আমলাতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের :
ভারতীয় সরকার এই ধনতন্ত্রেরই
রক্ষক এবং প্রবক্তা। এই বক্তব্যের
তাৎপর্য হল যে, চীনা মূল্যায়ন
অনুসরণী ভারতীয় বিপ্লবের মূল্য
দ্বন্দ্ব হবে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্য
বাদের বিরুদ্ধে, যদিও সামন্ততন্ত্রের
বিরুদ্ধেও সংগ্রাম মৌলিক। মার্কস-
বাদী সেন্ট্রাল কমিটির মতে ভার-
তীয় ধনবাদ ও বর্জ্যেরা চরিত্রের
চীনা বিপ্লবের আগে চীনা ধন-
তন্ত্রের বিকাশ ও চীনা বর্জ্যেরা
চরিত্রের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই।
ভারতীয় ধনতন্ত্রের আমলাতান্ত্রিক
ও মৎস্যসূচী চরিত্র থাকলেও ভার-
তীয় পরিস্থিতিতে এর তাৎপর্য
বিশেষ করে লক্ষণীয় নয়।

এই দুই বিরোধী চিন্তাধারা
পার্টির মধ্যে পার্টির জন্ম থেকেই
দানা বাঁধতে থাকে। পার্টি নেতৃত্ব
এই বিরোধ সম্পর্কে অবহিত
হলেও এ ব্যাপারে আলোচনা দীর্ঘ-
দিন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।
নকশালবাড়ির ঘটনার পর বিরোধী
মতবাদ প্রায় সংঘর্ষের আকার নেয়।
উনিশশ আটবটি সালের শুরুর
মার্কসবাদী নেতৃত্ব স্বীকার করেন
“পার্টির মধ্যে বামপন্থী বিচ্ছিন্নতা

কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ
নয়, নৈরাশ্যবাদী কিছু সংখ্যক
নেতার এটি একটি আদর্শ-
গত রোগ এবং পার্টির মধ্যে কিছু
সংখ্যক জগী যব কমী এই রোগে
আক্রান্ত। এই সমস্ত যব কমী-
দের জগী দৃষ্টিভঙ্গী শ্রেণী-
সংগ্রামের তত্ত্ব ও প্রয়োগ মারফৎ
পরিণতি লাভ করে নি আর সেই-
জন্য এদের মধ্যে কমিউনিস্ট নিয়-
মানবর্তিতারও অভাব। আমাদের
পার্টির মধ্যে বহু জগী ও সং-
কমী আছেন যারা নকল বিপ্লব-
বাদের দিকে আকৃষ্ট হন, কারণ
এর মধ্যে উচ্ছ্বাস উদ্বেজনা ও
আবেগের ছোঁয়াচ আছে। কিন্তু
এই বিপ্লববাদের অর্থনৈতিক ও
রাজনৈতিক কারণও বর্তমান। ক্রম-
বর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট হতাশা
ধৈর্যের অভাব আর এই সঙ্গে সর-
করের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামকে বিশেষ
পর্যায়ে উন্নীত করার রাজনৈতিক
বার্থতা—সব মিলিয়ে যবকদের
মধ্যে নৈরাশ্য আসে। মার্কসবাদী
লেনিনবাদী শিক্ষার অভাব, জগী
মনোভাবকে বিপ্লবী চেতনায় রূপা-
ন্তরিত করতে পার্টির ব্যর্থতা
অতিবিপ্লবী আকর্ষণের তীব্রতা
বাড়ায়।”

ইতিমধ্যে নকশালবাড়ি আন্দো-
লনের নেতারা এবং আরও অনেকে
আদর্শগত ও সংগঠনিক বিচ্ছিন্নতার
জন্য পার্টি থেকে বহিস্কৃত হয়ে-
ছেন আর সারা ভারত কমিউনিস্ট
বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি গঠিত
হয়েছে। আদর্শগত বিবাদের এই
চরম মূহুর্তে মার্কসবাদী কেন্দ্রীয়
কমিটি উনিশশ আটবটি সালের
এপ্রিল মাসে কমিটির একটি
বর্ধিত অধিবেশনের আয়োজন
করেন বর্ধমান শহরে। এই অধি-
বেশনে সংঘর্ষ হয় নাগি রেড্ডির
নেতৃত্বে মাওবাদীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয়

কমিটির নেতাদের। বিরোধের বিষয়
ছিল ভারতীয় অবস্থায় মাওবাদের
প্রয়োগ এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট
আন্দোলনের অবস্থা। অধিবেশনে
বিরোধ মিটল না, বরং আরও তীব্র
হল, ফলে নাগি রেড্ডি অস্ত্রের প্রায়
বারো হাজারের মধ্যে আট হাজার
মার্কসবাদী পার্টির সদস্যদের নিয়ে
পার্টির বাইরে চলে গেলেন।

বর্ধমান অধিবেশনের পরেই
জম্মু কশ্মীর মার্কসবাদী রাজ্য
কমিটি পার্টি থেকে বেরিয়ে যাও-
য়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতীয়
পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক সাম্য-
বাদী আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘ
বক্তব্য পেশ করে কমিটি বলে
“আমাদের নির্ভুল সিদ্ধান্ত হল যে
এই অবস্থায় সংশোধনবাদী নেতৃত্বের
সঙ্গে কোন বোগাযোগ নিছক
সুবিধাবাদের নামান্তর। তাই
আমরা পার্টি থেকে বেরিয়ে যাও-
য়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর পরেই
অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয় কেরলা
উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র অন্ধ্র বিহার
এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মার্কস-
বাদী গোষ্ঠীরা। অনেকেই সমন্বয়
কমিটিতে এসে যোগ দেন।

উনিশশ আটবটি সালের মে মাসে
কলকাতায় সমন্বয় কমিটির অধি-
বেশনে তৃতীয় একটি কমিউনিস্ট
পার্টির প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা
করে এক বিবৃতি প্রচার করা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয় : “আজকের
পৃথিবী দুই প্রধান বিরোধী শিবিরে
ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে আছে
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর তার
প্রধান অনুচর সোভিয়েট নয়া
উপনিবেশবাদ। আর অন্য শিবিরে
নেতৃত্ব দিচ্ছে সমাজতান্ত্রিক চীন
আর মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও
সে তুং। এ যুগ চেয়ারম্যান মাও-
য়ের যুগ এই জন্য যে, চেয়ার-
ম্যানের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ তার
মৃত্যুর দরজায় এসে পৌঁছেছে
এবং সমাজতন্ত্র বিশ্বব্যাপী চূড়ান্ত
জয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই
ঐতিহাসিক মূহুর্তে ভারতীয়
বিপ্লবের জয় ঘরান্বিত করার
স্বার্থে আমরা সমস্ত মাওবাদী
বিপ্লবীদের একত্র ও শক্তি সম-
ন্বয়ের আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন,
আমরা চেয়ারম্যান মাওয়ের চিন্তা-
ধারায় বলীয়ান হয়ে লাল পতাকার
নীচে সমবেত হই আর নির্দিষ্ট
অবস্থায় এই চিন্তা প্রয়োগ করে
নকশালবাড়ির সংগ্রামের অনুরূপ
সংগ্রাম দিকে দিকে সংগঠিত করে
তার মধ্যে থেকে প্রকৃত একটি
কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলি।
মনে রাখা দরকার বিপ্লবী পার্টি
ছাড়া বিপ্লব জয়যুক্ত হয় না।
সমন্বয় কমিটি বর্জ্যেরা সংসদীয়-
গণতন্ত্রকে ইতিহাসের বস্তাপচা
মূল আখ্যা দিয়ে বর্জন করল।
এবং কমিটির মতে বিপ্লবের অগ্র-
গতির পথে এ গণতন্ত্র প্রকৃত বধা।
সমন্বয় কমিটি কৃষক এলাকায় মাও-
বাদী কায়দায় সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম-
কেই বিশেষ কর্মসূচী বলে ঘোষণা

করল। কমিটির মতে নকশালবাড়ির
সংগ্রামী কৌশল বিপ্লবীদের কাছে
দৃষ্টান্ত রেখেছে।

এই সময়ে নকশালপন্থীদের
মুখপত্র “লিব.রেশনে” চারু মজুম-
দার নকশালবাড়ির বিপ্লবী কৌশল
সম্পর্কে এক বিতর্কমূলক প্রবন্ধ
প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন,
“নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামের
শিক্ষা হল : এ সংগ্রাম জমির বা
ফসলের লড়াই নয়। এ সংগ্রাম
রাষ্ট্রশক্তির দখলের। নকশালবাড়ি
সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য এখানেই। বিভিন্ন
অঞ্চলে কৃষকরা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেবে
এমনভাবে যাতে নিজ নিজ এলাকায়
তারা রাষ্ট্রশক্তিকে বিকল করে দিতে
পারে। ভারতের কৃষক আন্দোলনের
ইতিহাসে নকশালবাড়িতেই প্রথম
এই পথ অনুসৃত হয়।”

কৃষক সংগ্রাম কেবলমাত্র রাষ্ট্র-
শক্তির দখলের সংগ্রাম, জমি বা
ফসল অধিকারের দিকে এ সংগ্রাম
পরিচালিত হতে পারে না, সংগ্রা-
মের এই সংজ্ঞা নিয়ে চারু মজুম-
দার এবং অন্ধ্র গোষ্ঠী ও অন্যান্য
মাওবাদী গোষ্ঠীরা মধ্যে বিরোধ
উপস্থিত হয়। আসলে এ বিরোধ
কৌশলগত। মাওবাদী জনবুদ্ধির
এবং কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের মূল
মাওবাদী রণনীতি মেনে নিয়েও
অন্ধ্র গোষ্ঠী স্বীকার করতে পারে
না যে, ভারতবর্ষে অবিসম্ভব সশস্ত্র
বিপ্লবের প্রস্তুতি আছে। তাছাড়া
এই গোষ্ঠীর সমন্বয় কমিটিতে
যোগ দেওয়া সম্পর্কেও নানা শিথ্য
দেখা দেয়, কারণ গোষ্ঠীর মতে
কমিটির সমস্ত নেতাদের বিপ্লবী
চরিত্র সম্পর্কে ওদের সন্দেহ ছিল
এবং ওরা মনে করে যে, এই সমস্ত
নেতাদের উপস্থিতিতে এবং বর্ত-
মান অবস্থায় কৌশলগত নানা
খোলাখুলি আলোচনা সম্ভব নয়।
অন্ধ্র গোষ্ঠী অভিযোগ করে যে
সমন্বয় কমিটির মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য
কমিটির যে প্রতিনিধিত্ব দেখানো
হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক কমি-
টির খাতাপত্রে ছড়া অন্য কোন
অস্তিত্ব নেই আর, তাঁদের অনেক
নেতার চরিত্র সন্দেহাতীত নয়।
এরপর অন্ধ্র গোষ্ঠী সমন্বয়
কমিটিতে আসেন। কিন্তু এই
গোষ্ঠীর মতামতের সঙ্গে অন্য
অনেকে একমত হয় এবং প্রভাব-
শালী চরুপন্থীরা আরও বেশি
সজাগ হয়ে সাংগঠনিক গোপনীয়-
তার দিকে নজর দেন। উনিশশ
উনসত্তর সালের বাইশে এপ্রিল
যখন মার্কসবাদী লেনিনবাদী
পার্টির সৃষ্টি হল এবং পয়লা মে
কলকাতা ময়দানে কান্দু সান্যাল
সাঙ্ঘবরে এই সম্পর্কে ঘোষণা
পেশ করলেন তখন অনেক মাও-
বাদী গোষ্ঠীই বিস্মিত হল। এই
সমস্ত গোষ্ঠী আবার আলোচনা
চালাল নতুন করে সমন্বয় কমিটি
গঠনের। এই সব বিভিন্ন গোষ্ঠী
অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে একমত
ছিল। (ক) পার্টি গঠনের এখনও
সময় আসেনি; (খ) নতুন পার্টির

কৌশলগত লাইন ভুল এবং (গ),
কৃষক ও সামন্ততন্ত্রের দ্বন্দ্বই প্রধান
দ্বন্দ্ব হিসাবে মূল্যায়ন দ্রাব্য,
কেননা এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও জন-
গণের মধ্যে যে গরম্পূর্ণ দ্বন্দ্ব তা
বাদ পড়ে যায়।

সংগ্রামী কৌশল সম্পর্কেও
তিনটি মূল বিরোধ ছিল। (ক)
ভারতীয় অবস্থায় কমিউনিস্ট বিপ্ল-
বীদের রণকৌশল কি কেবলমাত্র
গেরিলা যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকবে?
(খ) গণ-সংগঠনের ভূমিকা কি?
(গ) গণ-সংগঠন ও পার্টির গোপন
সংগঠনের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে?
নতুন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী
পার্টির মতে বর্তমান ভারতীয়
অবস্থায় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষ-
কের সশস্ত্র সংগ্রাম কেবলমাত্র
গেরিলা যুদ্ধের কায়দাতেই সংগ-
ঠিত হতে থাকবে। আর পার্টি
শ্রেণী ইউনিয়ন-এবং কৃষক সভা
প্রভৃতি সমস্ত গণসংগঠনের
বিরোধী।

[আগামী সংখ্যায় গণসংগঠন
সম্পর্কে চরুবাবুর বক্তব্য, এম-এল
পার্টির আকর্ষণ এবং পার্টির
মধ্যে আদর্শগত সংগ্রামের তথ্য-
ভিত্তিক আলোচনা থাকবে। সং দঃ]

প্রকাশিত হল

সুপ্রকাশ রায়ের লেখা

মাও সে-তুঙ

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

মাও সে-তুঙের শৈশব, যৌবন ও
রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী
(সাংস্কৃতিক বিপ্লব পর্যন্ত)।

দাম : ৫.০০

আরও পড়ুন :

চীনের চলমান বিপ্লব—হিনটন
(৭৫); জাতি সংগ্রাম মার্কস-
বাদ—বিজ্ঞান সেন (১০০);
কর্ল মার্কসের ক্যাপিটাল—
বিজ্ঞান সেন (৫০); কমিউনিস্ট
ম্যানিফেস্টোর শিক্ষা—বিজ্ঞান
সেন (৭০); তেলেকান বিপ্লব
—কা ফা (৮০); শিল্পীর
নবজন্ম—২য়। রলী (৭৫০)।

নিউ বুক সেন্টার

১৪, বমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-১

শারদীয় অভিনন্দন

গ্রহণ করুন

মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস

৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৪১১৪৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

জেল প্রশাসনে চুরি-জোচ্চুরি

কয়েদীদের অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি জেল প্রশাসনে ব্যাপক দাতার কাছে নানা অভিযোগ দ্রি-জোচ্চুরির অনেক সংবাদ করেছে।

গাওয়া আছে। কয়েদীদের দৈনন্দিন আবাসের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে বলে অনেক অভিযোগ করেছে। সম্প্রতি আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিচারার্থীরা কয়েকজন কয়েদী দর্পণের সংবাদ-

কম। এই নিয়ে জেলে সম্প্রতি কয়েদীরা নানা আন্দোলন করেছে। ফলে ওদের প্রচণ্ড পেটানো হয়েছে।

এখন অনেক কয়েদী বেঁচে থাকার প্রয়োজনে হেড জমাদারদের ঘৃষ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যারা ঘৃষ দেয় তাদের সর্বাধিক অনেক। যারা দেয় না তাদের মাঝে মাঝে পেটানো হয়, কম খাবার ও অন্যান্য অসুবিধাতো আছেই।

এই ঘৃষের এবং দুর্নীতির চক্রে জেলের উর্ধ্বতন কর্মচারীরাও

জড়িত বলে কয়েদীদের অভিযোগ। এমন কি রোগে জেল হাসপাতালে জায়গা পেতে হলে ঘৃষ দিতে হয়। থাকার অব্যবস্থা, জেলে কয়েদীদের ভীড়, এবং পায়খানা-প্রস্রাবের নানা অসুবিধার জন্য কয়েদীদের চর্ম-রোগ প্রায় মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

কয়েদীরা অভিযোগ করলে জেল কর্তৃপক্ষ বলে যে, তাদের করণীয় কিছু নেই, কারণ, সেন্ট্রাল জেলে চৌদ্দশত কয়েদীর স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বর্তমান কয়েদীর সংখ্যা ছাব্বিশ শত। সংখ্যা বাড়লে অসুবিধা হয় নিশ্চয়ই কিন্তু সেই কারণে দুর্নীতি অথবা ঘৃষ

দর্পণের ছুটি

শারদীয় পূজা উপলক্ষে

দর্পণের প্রকাশ ছুই সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। দর্পণ পুনরায় প্রকাশিত হবে আগামী ১৫ই অক্টোবর।

বাড়ীর কি যুক্তি তার কোন ব্যাখ্যা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

এ ব্যাপারে কয়েদীরা সরকারের কাছে অবিলম্বে তদন্তের দাবী জানিয়েছে।

এবার কেন্দ্রীয় সরকারী

কর্মচারীদের পালা

ছাঁটাইয়ের তালিকা তৈরি হচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পরে এবারে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পালা। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত কলকাতায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন এবং ঐক্যকে ভাঙার জন্য সরকারী তৎপরতা সূত্র হয়ে গেছে। এ বিষয়ে সম্ভাবনা ও সরোগ কতটুকু তার প্রাকসমীক্ষা করার জন্য জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বর্তমানে কলকাতায় অবস্থান করছেন। এই সম্ভাব্য গোড়ায় অর্থমন্ত্রকের অধীন অফিসগুলির বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রকের বাজেট ব্যয় শাখার রাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীগণেশ সংশ্লিষ্ট অফিস-গুলিতে কতজন “অবাধ্য” কর্মচারী (কংগ্রেস বিরোধী সাদা কথার সি পি এম সমর্থক) আছেন তাদের সংখ্যা ও নামধাম জানতে চান। এদের একটি সুসংবদ্ধ তালিকা তিনি সকল বিভাগীয় প্রধানদের কাছে অবিলম্বে চেয়েছেন। রাজ্য সরকারের মত কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলিতেও এই ৩১১ ধারা প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। এই বিজ্ঞপ্তি অবশ্য সাধারণ মানবের জন্য নয়। তিনি নাকি আরও জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা এই যে, ডায়াল সাহেবের “ইউনিয়ন ভাঙা” নীতি এই রাজ্যে নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করবে এবং এই খবর দিয়েই ইন্দিরা গান্ধী ভারতের একমাত্র “বিদ্রোহী” রাজ্যকে জয় করবেন।

রাজনৈতিক পর্যায়েও ইন্দিরা সরকার অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম বিরোধী দল এবং তাদের প্রিভ ইউনিয়ন-সংস্থা-গুলির সঙ্গেও ইন্দিরা গান্ধী দ্বন্দ্বীতে কথা বলেছেন। তারা এমন কিছু করবে না বলে কথা দিয়েছে যার দ্বারা সি পি এমের কোন আন্দোলনের কোনরূপ সাহায্য হতে পারে। অর্থাৎ সি পি এম বিরোধিতার অছিলায় ঐ সব দল এবং সংগঠন সি পি এমের যে কোন প্রতি-রোধ-আন্দোলনের সঙ্গে কোন সংগ্রহ রাখতে অস্বীকার করে প্রকারান্তরে ইন্দিরা-রাজকে সাহায্য করবে। অবশ্য এই আচরণের একটা বংশই মার্কসবাদী ব্যাখ্যা দিতেও তারা ভুলবে না যথা সি পি এমের খনোখনির রাজ-নীতি, বামমার্গী সংকীর্ণতা, যুক্ত মেচাকে টিকিয়ে রাখার অসামর্থ্য ইত্যাদি। মার্কসবাদের নামাবলী পরা তথাকথিত কয়েকটি পেটি বুদ্ধিজীয়া “সমাজবাদী” দলের হালচাল থেকেও প্রমাণ হয় যে,

(শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

খোকা বোসকে খোকা চক্রবর্তী

ভেবে হত্যা করা হল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নামের ফেরে মানব মরে। যাদবপুরের আনন্দ পল্লীতে সি আর পি খোকা বোসকে খোকা চক্রবর্তী ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। ঘটনা হল এই যে, গত উনিশে সেপ্টেম্বর যাদবপুরের পদলিখ এবং সি আর পি খোকা চক্রবর্তী নামে এক সমাজবিরোধীরা স্থানে আনন্দ পল্লীর আশেপাশে গুপ্ত পেতে থাকে। এর নামে নাকি অনেক দিন ধরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা

বুলাচ্ছে। সেখানে খোকা বলে একটি ছেলে শেষ রাতে মহালয়ার রেডিও ফিচার শ্রবণে সকাল বেলা বাড়ী ফিরছিল। বন্ধুরা ওকে “খোকা” বলে ডেকেছে শ্রবণেই কতরা ঠিক করল ওই খোকা চক্রবর্তী। ব্যস চসল গুলি। ছেলোটো পায়ে গুলি খেয়ে পড়ে গেল। পদলিখ তাকে হিঁচড়ে নিয়ে চলল ভানের দিকে। ও নাকি জল খেতে চেয়েছিল। পদলিখ ওর মখে দিল—জল নয়,

(শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

১৪শ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা ২২ শ্রবণ ২৪শ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ২২ দাম ৩০ পঃ

পশ্চিমবঙ্গ নব কংগ্রেসে

এখন তিনটি বিবদমান গোষ্ঠী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসীদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী এখন পরস্পর বিবদমান তখন আর একটি গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এই তৃতীয় গোষ্ঠী বলছে তারা সিদ্ধার্থ রায় কিংবা বিজয় নাহার, তরুণকান্তির লোক নয়। তারা খাঁটি কংগ্রেসী, কংগ্রেসের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের অবদান আছে। এই গোষ্ঠীর নেতা হচ্ছেন বর্ধমানের নারায়ণ চৌধুরী, শিয়ালদার বিনয় ব্যানার্জি এবং আর কয়েকজন। এরা নবগঠিত অ্যাড হক কমিটির সদস্য তালিকা বিশ্লেষণ করে

প্রধানমন্ত্রী এবং নব কংগ্রেসী হাই-কমান্ডের কাছে এক মেমোরেন্ডামে বলেছেন, দেখা যাচ্ছে, কমিটির তিরিশ জন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই খাঁটি কংগ্রেসী নন, কংগ্রেসের জন্য কোন কাজ করেন নি, স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেন নি। মেমোরেন্ডামে বলা হয়েছে, নতুন কমিটির সদস্যদের দেখে মনে হচ্ছে, নব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অ-কংগ্রেসীদের হাতে চলে যাচ্ছে।

অবশ্য এই মেমোরেন্ডামে কোন কাজ হবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন না। কেননা, রাষ্ট্র-ক্ষমতা এখন সিদ্ধার্থ রায়ের কন্ঠ আর কংগ্রেসীরা সব সময়েই ক্ষমতার অনুরাগ। তবে এই তৃতীয় গোষ্ঠীকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যাবে না। কেননা, এদের মধ্যে কিছু খাঁটি কংগ্রেসী আছেন।

রাজ্যে অ্যাড-হক কমিটির এখন কর্মকর্তা স্থির করার পালা চলছে। বৃহস্পতি সকালে এই খবর লেখা পর্যন্ত অবস্থা হচ্ছে, একটা লোকদেখানো সমঝোতা করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রস্তাব আছে, দুজন জেনারেল সেক্রেটারীর মধ্যে একজন বিজয় নাহার-তরুণকান্তির দলের হবেন। সেই হিসেবে বরকত খান চৌধুরীর নাম উঠেছে। অন্যজন সিদ্ধার্থ রায়ের মনোনীত ব্যক্তি হবেন। খানচৌধুরী নিয়ে সম্ভবতঃ সিদ্ধার্থ রায়েরা বেশী মাথাব্যথা

(শেখাংশ ১ পৃষ্ঠায়)

মেয়রের

নির্লজ্জ

আচরণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার তালেবুর মেয়র শ্যামসুন্দর গঙ্গপ্ত নাকি আধ ডজন নৈমন্ত্য বাগিয়েছেন। নৈমন্ত্যটা অবশ্য এমন কিছু খবর নয় কারণ খোদ কলকাতার প্রথম নাগরিকের পক্ষে নৈমন্ত্য পাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু যে ভাবে এই নিমন্ত্রণগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাসগুলিতে পত্রাব্যাহার করে যোগাড় করা হচ্ছে তা খুবই কৌতূহজনক। মেয়র সাহেব ইউরোপের ডজন-খানেক রাষ্ট্রের স্থানীয় দূতাবাসে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, কলকাতার মাননীয় মেয়র ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রমোদপ্রমণার্থে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন; আপনারা কে কে তাঁকে নিঃখরচায় আতিথ্য প্রদান করতে প্রস্তুত আছেন, জানান।

(শেখাংশ ১ পৃষ্ঠায়)

বরাহনগর-কাশীপুর

গণহত্যার তদন্ত

ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে

কাশীপুর-বরানগরের গণহত্যার তদন্ত কি ফেঁসে যাচ্ছে? দর্পণ যতদূর সংগ্রহ করেছে তাতে জানা যায়, ব্যাপারটি সম্পর্কে ইচ্ছে করেই দেরী করা হচ্ছে। কেননা জনসাধারণের ক্ষতি যত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাবে ততই এই তদন্ত ফাঁসিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। স্বয়ং বিজয় নাহারই বলেছেন, নব কংগ্রেসীদের একাংশ এই গণহত্যার সঙ্গে জড়িত। তাই এখন তদন্ত রোধ করার চেষ্টা চলেছে। সি পি এম নেতারা তদন্তের দাবী জোরদার করছেন না কেন?

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি ক্রটি

চাপকা সরকার

গত সপ্তাহে মার্কসবাদী প্রভাবিত ট্রেডইউনিয়ন সংস্থা সিটর তিন দিন ব্যাপি অধিবেশন আসানসোলে শেষ হয়েছে। গত বছর মে মাসে দক্ষিণপন্থী সি পি আই পার্টির অধীন এ আই টি ইউ সির ভাঙনের ফলে সিটর জন্ম। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সিটুই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। বর্তমানে এক হাজার ইউনিয়ন সিটর অন্তর্ভুক্ত এবং এর সদস্য সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কিছু বেশী।

অধিবেশনে নানা আলোচনা ও প্রস্তাব হয়েছে, বেশির ভাগই শ্রমিকদের অর্থনৈতিক এবং কিছু কিছু রাজনৈতিক অধিকার দাবী করে। প্রস্তাব বা আলোচনার মধ্যে কোথাও শ্রমিকদের উৎপাদন সংক্রান্ত কর্তব্য সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয়নি। অথচ শ্রমিক অধিকার দাবী করে সেই সঙ্গে আন্দোলনিক কর্তব্যের কথা না বলা আজকের অবস্থায় সামাজিক দায়িত্ব পালনে ট্রেড ইউনিয়নের অবহেলা বলে অনেকের মনে হতে পারে। দায়িত্ববোধের অভাব, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সংগঠনের, আন্দোলনের ব্যাপকতার পরিপন্থী এবং অন্তিম বিশ্লেষণে বিপ্লবী শক্তির সংহতি বিরোধী।

কিছু দিন আগে রাজ্য কর্মচারী সংগঠনের তের জন নেতৃস্থানীয় কর্মচারী ছাটাই সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শ্রেণী বন্ধে যে সরকারের এই আক্রমণ যদি প্রতিহত করা না যায় তা হলে শ্রম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই নয়, সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ওরা স্তব্ধ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই ব্যাপক উপলব্ধি সত্ত্বেও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা নিজেদের দলীয় স্বার্থে একাবদ্ধ ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের বিরোধিতা করছে। সরকার ছাটাই করেছে এই অভিযোগে যে সরকারী কাজকর্মের যে গোপনীয়তা বা নিরাপত্তা প্রয়োজন তা মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন থাকলে রক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। আবার ইউনিয়ন বিরোধী কিছু কিছু উর্ধ্বতন অফিসাররা প্রচার চালাচ্ছে যে ইউনিয়নের ফলে সরকারী কাজকর্মের কোন উন্নতি হয়নি বরং বেপরোয়া কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রে কাজের পরিমান ও সময় কমিয়ে দিয়েছে। ফলে মানব্বের দর্গীত বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে দোকানদার বিভিন্ন পেশার লোক এবং যারা সরকারী কর্মচারী নয় তাদেরও সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে যথেষ্ট বিরূপ অভিজ্ঞতা আছে। স্বাভাবিক কারণে আজকের অবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ অনেক বেড়েছে এবং এর ফলে সরকার-মানুষ লেনদেন এখন আর পরোক্ষ পর্যায়ে নেই। এই সরকারী তত্ত্বাবধানের অক্ষমতা

বা ব্যর্থতা শ্রমিক বর্জ্যেয়া সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক সংকট বলে উড়িয়ে দিলে সাধারণ মানুষের কাছে তা নিছক সরলীকরণ বলে মনে হবে। আজ কর্মচারীরা সংঘবদ্ধ এবং তাদের একা-শক্তির জোরে বহু অধিকারই তারা আদায় করে নিচ্ছে। কিন্তু এই একা-শক্তি সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে যদি প্রতিফলিত না হয় তাহলে

সরকারী কর্মচারীরা সুযোগ পেলে ঘৃণ ও অন্যান্য অসদপায় অবলম্বনে মোটেই পশ্চাদপদ নয়।

এই সমাজ ব্যবস্থায় কর্মক্ষমতা বাড়তে পারে না ধরে নিয়েও ট্রেড ইউনিয়নের তরফ থেকে কেন মানুষের হয়রাণী হয় অথবা সেই হয়রাণীতে কর্মচারীদের দায়িত্ব কতখানি সেই সম্পর্কে বক্তব্য না থাকলে মাঝে মাঝে শ্রমিক বেতন

বঙ্গদর্শন

সরকারী তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সন্দেহ দেখা দিতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষকদের একাবদ্ধ শক্তি ওদের অনেক দাবী দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে সুবিধা করেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে অবশ্যই শিক্ষাদানের অথবা শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের কোন উন্নতি হয়নি, বরং এর মান ক্রমশ নামতে নামতে অবলুপ্তির পথে। ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন বাস চালানো নিজের হাতে নিয়ে নিল তখন সাধারণ মানুষের অনেক আশার উদ্বেক হয়েছিল। সে আশা চূর্ণ হয়েছে। শহরে বাসের চেহারা সরকারী তত্ত্বাবধানের ব্যর্থতার সাক্ষ্য দেয়। এই ব্যর্থতার সঙ্গে কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা অগাণ্ণভাবে জড়িত। সরকারী পরিবহনে প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে বাস ধোয়া হয় না। কর্মচারীরা আপাতদৃষ্টিতে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে না। খাদ্য দপ্তরে, আদালতে, এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগে

বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের দাবী মানুষের কাছে নিছক দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদী আন্দোলন হিসাবে পরিগণিত হবে।

গত দেড় বছর ধরে বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে এক নৈরাজ্যের অবস্থা। মাওবাদের নামে ছাত্ররা স্কুল কলেজ পড়িয়েছে, পরীক্ষা ভুল করে দিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রদের বিপ্লবী ঐতিহ্যে কলঙ্ক এনেছে। এই নৈরাজ্যের অবস্থার জন্যে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষকদের অসততা এবং নিজেদের শিক্ষাসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা বহুলাংশে দায়ী। অথচ বিগত কয়েক বছর ধরে শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়ন একা মজবুত হয়েছে, তাঁদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। সেই সঙ্গে এই আন্দোলন যদি শিক্ষকদের কর্তব্য সম্পর্কে ওদের সজাগ না করে তবে শিক্ষকদের সততা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সন্দেহ জাগবে। প্রতি বাড়ীতেই ছাত্রছাত্রী আছে, এবং অভি-

ভাবকদের শিক্ষকদের সম্পর্কে ধারণা খুব ভাল বলে মনে হয় না। এই ধারণা পরিবর্তনের জন্য শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোন চেষ্টা করেনি। তাই যখন সন্ত্রাসবাদী কায়দায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নকশালী আক্রমণ শুরু হলো এবং দলে দলে ছাত্ররা বিশেষ করে শহরে নকশালী আন্দোলনে যোগ দিল তখন এই আক্রমণের বিরোধী শিক্ষক প্রতিষ্ঠান অথবা ছাত্র ফেডারেশন বিশেষ কোন সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে নি। শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য এই আক্রমণে নিহত হলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়ে নি। ছাত্র জগতেও নকশালীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি।

আজ সময় এসেছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে নতুন করে ভেবে দেখার। সিটর অধিবেশনে সঠিক ভাবেই বলা হয়েছে যে, সমাজের অর্থনৈতিক, সংস্কৃত রাজনৈতিক সংকটের রূপ নিচ্ছে, এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে কেবলমাত্র অর্থনীতির আবর্তে রাখলে চলবে না, এ আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র সৃষ্টি হওয়া দরকার। সমাজের শত্রুশ্রেণী অনেক সংগঠিত, তার আক্রমণের ক্ষমতাও অনেক বেশী এবং ক্রমশই এই আক্রমণ অত্যাচারের পর্যায়ে যাবে। এর মোকাবিলায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে একাবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সিটু ওয়াকিবহাল। এই আন্দোলন কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই ব্যাপক রাজনৈতিক চরিত্র নিতে শুরু করেছে। এই সত্য মনে রেখে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা কি হবে সেই বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখা অন্ততঃ সিটর তরফ থেকে প্রয়োজন।

কারণ মার্কসবাদী পার্টি'কে আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খালি সুবিধাবাদী আন্দোলনের পার্টি বলে অবশ্যই মনে করে না। এই মানুষের বৃহদংশই রাজ্যের ক্ষমতার আসনে মার্কসবাদী পার্টি'কে বসাতে চায়। ক্ষমতার দায়িত্ব গ্রহণে মার্কসবাদী পার্টি'কে সক্ষম হতে হলে এই পার্টির দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সুনিশ্চিত নিদর্শন রাখা দরকার। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে নির্বাচন মারফত রাজ্য ক্ষমতা দখলের ভূমিকার কথা পার্টি তার বক্তব্যে অনেকবারই রেখেছে। এই বিপ্লবে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্বে চারটি শ্রেণীর একাবদ্ধ ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কায়মী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবে। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব যেহেতু কৃষক-শ্রমিকের হাতে থাকবে, সেই হেতু এই দুই শ্রেণীর সামাজিক রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের উপর ভবিষ্যতের ব্যাপক একা নির্ভরশীল। সেই কারণে আজকের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কেবলমাত্র দাবী দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, কর্তব্য সম্পর্কেও এই আন্দোলনকে সোচ্চার হতে হবে।

বিদ্রোহী লেখক

সপ্তবহির

অভিশপ্ত বাংলা ৬'০০

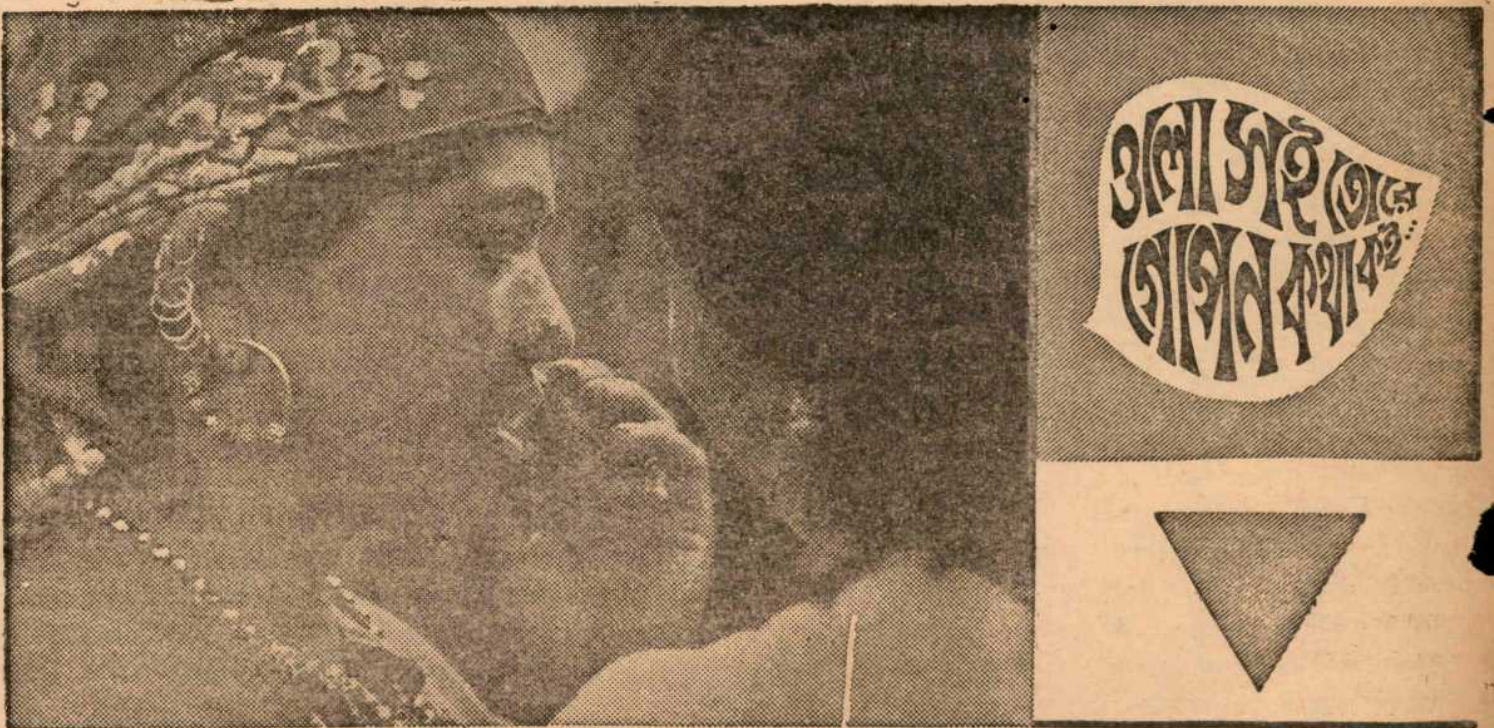
স্ববোধ চক্রবর্তীর

আমাকে গোরিলা

করেছে ৪'০০

আদিত্য প্রকাশালয়

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২



পরিবার পরিকল্পনায় সংসারের খরচ কমে

আপনার বাড়ীর কাজের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র অথবা মাতৃমণ্ডল এবং শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ সম্পর্কে পরামর্শ করার সুযোগ হইবে আপনি নিবন্ধন পাবেন ৪

স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর (অ্যাডমিনিস্ট্রাটিভ) হলেন শ্রীঅক্ষয় রায়। পদমর্যাদার দিক দিয়ে এর দায়িত্ব কম নয়। এই বিভাগেই কলকাতা ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার হিসাবে কাজ করেন ডঃ মীরা রায়। ডেপুটি ডাইরেক্টর হলেন ভদ্রমহিলা পিসেমশায় এবং ভাস্কর। দর্পণের কাছে বিভিন্ন সূত্রে এদের বিরুদ্ধে কতকগুলো গুরুতর অভিযোগ এসেছে। ভদ্রমহিলা চাকুরী করছেন প্রায় চৌদ্দ বৎসর। কলকাতাতেই রয়েছেন বছরের পর বছর। কোন অসুবিধা নেই। সরকারী নিয়ম-কানুনে কিছুদিন অন্তর বদলীর ব্যবস্থা আর যার ক্ষেত্রেই খাটক না কেন এর বেলায় সে নিয়ম খাটানোতে মনোনিবেশ রয়েছে। পেছনে রয়েছেন ডেপুটি ডাইরেক্টর, তার আবার আত্মীয়। আর এর ফলেই, বিভাগীয় প্রায় সবগুলো ট্রেনিং একের পর এক নিতে তার কোন অসুবিধাই হয়নি। এর মধ্যে সাত আট রকমের ট্রেনিং একসঙ্গে লাভ কর। সম্ভব নয়।

এছাড়া, এবিষয়ে কিছু বিধিনিষেধও রয়েছে। ব্যক্তিগত কাজে অফিসের ছুটি নিয়েই কাজ চালান। নিয়মবিরুদ্ধ হলেও এতে তার কোন অসুবিধা হয় না। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে ধারা মোড়কে অফিসার হিসেবে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গোও এর আচরণ রীতিমত উদ্ভট ও রীতিবাহিত। প্রতিবাদে কেউ মন্থ খুলতেও সহজে সাহস পান না। কারণ সবাই জানেন, এর পিসেমশাই হলেন

ডেপুটি ডাইরেক্টর মিঃ রায়।

সরকারী আইনকানুনে ও অর্থ বিভাগের মতে দেখা যায়, কোন গেজেটেড অফিসার যদি ছুটিতে কিংবা ট্রেনিংয়ে যান তবে যাওয়ার আগে স্টোর ও টাকা পরসার চার্জ বন্দি দিয়ে যেতে হয়। অন্যথায় তহবিলের দায়ে পর্বত অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্মীকে অভিযুক্ত হতে হয়। নিদেন পক্ষে, এ জি থেকে বেতন পেতে গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু সরকারী আইনকানুন অন্য যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হোক না কেন, ডঃ মীরা রায়ের বেলায় ওসবের প্রয়োজন হয় না। তাই, উনিশশ সত্তর সালের মার্চ ও নভেম্বর এবং একাত্তরের ফেব্রুয়ারীতে যখন তিনি ট্রেনিংয়ের জন্যে অন্যত্র যান তখন একে চার্জ বন্দি দিয়ে দেওয়ার জন্যে আইনের পরোয়া না করলেও চলে।

ভদ্রমহিলার কান্ড কারখানার এখানেই শেষ নয়। ইনি হলেন কাজের মানদণ্ড। তাই মিটিংয়ের নামে অধিকাংশ সময়ই তার বাইরে কাটে। ফলে, যেসব সোস্যাল অরগানাইজেশনের অর্থ সংক্রান্ত বিলে তার সই করার কথা, তাতেও তার সই করার সময় নেই। পরিণামে, এমন সেন্টারও রয়েছে যেখানে প্রায় চৌদ্দ মাস আগের বিল পৌঁছয়নি ফলে কর্মীরাও বেতন পায়নি। বিক্ষুব্ধ কর্মীরা এখন পথ চেয়ে বসে আছেন, কবে তাদের বিলে সই হবে, কবে এরা টাকা পাবেন।

কর্মীদের অসুবিধা বাই হোক না কেন, ভদ্রমহিলা নিজের অসুবিধা একেবারেই সহ্য করতে পারেন।

মা। তাই কিছুদিন আগে মেটার-নিটি লীভ নিলেন। ছুটিতে যাওয়ার আগে স্বহস্তে স্টোরের খাতাপত্রের রকমফের করে, এমনকি অক্ষর অক্ষি ওলটপালট করে অন্যান্য জিনিষপত্রের সংকে কিছু ওষধ পত্রও সবতনে বি টি রোডের বাড়ীতে নিয়ে এসে তুললেন। ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে সরকারী গাড়ী চড়ারও কোন অসুবিধা হয়নি তাঁর।

উল্লেখ্য, এরই আমলে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কাজ সবচেয়ে কম হয়েছে। অথচ কাজ কম হওয়ার দায়দায়িত্ব এক্সটেনসন এডুকটরের উপর চাপিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা নিজের সেরে, পড়তে চাইছেন। কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। উনসত্তর সনেও রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দেয়ালে এর নামে অনেক অভিযোগ সম্বলিত পোস্টার পড়েছে। তবে কিছুতেই কিছু হয় নি। ডেপুটি ডাইরেক্টর মিঃ রায়ও সব জানেন। অজ্ঞাত কারণে সব ধামাচাপা।

স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে জড়িত দায়িত্বশীল কর্মীরা উপরোক্ত সব অভিযোগ শোনার পর জানানলেন, মিঃ রায় নিজের এক মেয়েকেও সোস্যাল ওয়ার্কার পদে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে মতলব ভাঁজছেন। তাছাড়া, তাঁর ভাগনী শ্রীমতী বসু স্বাস্থ্য বিভাগের সোস্যাল ওয়ার্কার। অন্যান্য কর্মীর পক্ষে অসম্ভব হলেও কর্তব্যাক্তির কুপাদৃষ্টিতে তিনি নাকি ট্রেনিং নিতে আমেরিকা যাচ্ছেন। অনেকেই বলছেন, গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এমন কেন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ উঠলে নিশ্চয়ই তার জন্যে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর যদি তা না হয় তবে বঝতে হবে দর্পণীতির শক্ত শেকড় স্বাস্থ্য বিভাগের বড় কর্তাদেরও জড়িয়ে ফেলেছে।

কলকাতা জেলা স্কুল পরিদর্শকের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত কলকাতা জেলা স্কুল পরিদর্শক শ্রীক্ষতিশ ধর সম্পর্কে এক গুরুতর অভিযোগ দর্পণের কাছে এসেছে। কিভাবে একজন দর্পণীতি-গ্রস্ত লোক দিনের পর দিন শিক্ষা বিভাগের সংগে যুক্ত থেকে অধস্তন কর্মীদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ রবে চলেছেন সে সব অভিযোগ জানাতে গিয়ে বিবস্ত্র মহল থেকে বলা হয়, ব্যক্তিটি কর্মক্ষেত্রে একজন গুণধর ব্যক্তি। অনেক ঘটনার সংগেই তিনি রয়েছেন জড়িয়ে। কিছুদিন পূর্বে “কেসারের” চালা তার গাড়ীতে ধরা পড়ে। পরিণামে গাড়ীটি বাজেয়াপ্ত হয়। এছাড়া এর নামে দু'তিনটি ক্রিমিনাল কেসও আদালতে রয়েছে।

কর্তৃত্বমান ব্যক্তিটির গণপনার এখানেই শেষ নয়। একবার প্রেসিডেন্সি কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সমালোচনায় এর বিরুদ্ধে মন্তব্য

করতে গিয়ে বলেন, বিস্মিত হয়ে যেতে হয় যে শিক্ষাবিভাগে এতবড় দায়িত্বশীল পদে এমন দর্পণীতি-পরায়ণ লোক থাকেন কী করে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হয়ত এমন ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গেছেন, কিন্তু রাজ্যের পোড় খাওয়া মানুষ জানেন শক্ত খুঁটির জোর বড় জোর। তাই তার পক্ষে পূরনো পদে টিকে থাকা খুব কষ্টকর হয় নি।

শোনা গেল, স্কুলের অনুরোধদান ও শিক্ষকদের অনুরোধদান দানের ব্যাপারেও এই স্কুল পরিদর্শকের আচরণ বেশ সন্দেহজনক। এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বেরও অভিযোগ রয়েছে। প্রায় আট দশ বৎসর আগে যে সমস্ত শিক্ষক নিয়োগপত্র পেয়েছেন এখনও তাদের অনেকেই সরকারী অনুরোধদান পাননি। অথচ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে নিয়োগপত্র অনুরোধদিত হওয়ার ঘটনাও রয়েছে।

এই সন্দেহজনক ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে

আরও অনেক গুরুতর অভিযোগ আছে। সে সব বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ এখানকার কর্মীমহল রাজ্যের অপদার্থ শিক্ষাঙ্গণের কাছে করতে চান না। কারণ সে অনুরোধ রক্ষা হবে না বলেই তাদের ধারণা। যদি হত তবে অনেক আগেই লোকটিকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হতো।

তাছাড়া একে শিক্ষাঙ্গণের বড় কর্তারাও নাকি অনেকে সমীহ করে চলেন। কর্মীমহলের প্রশ্ন হল, ইদানিং ডি আই সাহেব যে ধরণের অন্যান্য অশোভন আচরণ অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে করে চলেছেন এবং কর্মীদের যেভাবে হেনস্থ করার অশুভ চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন, তাতে এই ব্যক্তিটিকে সংযত করার মত ক্ষমতাও কি শিক্ষাঙ্গণের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা হারিয়ে ফেলেছেন?

পুলিশ নকশালাদের যেসব গোপন আড্ডায় হানা দিয়েছে

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল রাণ্ড সম্প্রতি নকশালা নেতা চারু মজুমদার এবং অন্যান্য উচ্চদরের নেতাদের গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী চালায়। এই তল্লাসীর স্থানগুলিকে পুলিশ নকশালাদের গোপন আড্ডা বলে অভিহিত করে।

এর একটা গোপন ঘাঁটিতে সি পি আই এম-এল-এর চেয়ারম্যান চারু মজুমদারের অবস্থানের চিহ্ন হিসেবে তাঁর চশমা, কলিক ব্যথার উপশমের জন্যে পেরিথিন্ডিন ইনজেকশন, তাঁর ও অন্যান্য সি পি আই (এম-এল) নেতাদের হাতে লেখা চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদি এবং নেতাদের নাম লেখা কারেন্সী নোটের প্যাকেট ও কিছু মূল্যবান জহরত, অলংকারাদি পাওয়া গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

যে তথাকথিত গোপন নকশালা ঘাঁটিগুলিতে পুলিশ হানা দিয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে অশুচর-জনক স্থানগুলি হচ্ছে স্টেটসম্যানের অন্যতম সহ-সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গে মার্কিন লবীর প্রবক্তা শ্রীহরিশম্বর কারেলেকারের বাড়ীর ইনি সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণাকে সম্বলিত তার কলমের মাধ্যমে স্টেটসম্যান (এবং পূর্বে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড) পত্রিকায় সমর্থন করে থাকেন। শ্রীকারেলেকার স্পেশ্যাল রাণ্ডের পুলিশ তাঁর বাড়ী তল্লাসী করতে গেলে চীফ সেক্রেটারী মিঃ এন সি, সেনগুপ্তকে টেলিফোন করেন। কিন্তু ততক্ষণে স্পেশ্যাল রাণ্ডের কাজ শেষ হয়েছে। অতঃপর গরিয়াহাট রোডের কেন্দ্রীয় পুলিশ দপ্তরের হস্তক্ষেপের ফলে স্পেশ্যাল রাণ্ড শ্রীহরিশম্বর কারেলেকারকে গ্রেপ্তার করে নি বলে প্রকাশ।

আরেকটি ঘাঁটি নাকি রি-মাইন্ট রোডের জনৈক ডাঃ বসুরায়ের পত্রের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে। কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে এক সপ্তাহের পর পুলিশ ওখানে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যায়নি। এর কারণও রহস্যবৃত।

ডাঃ বসুরায়ের এক পত্র নব কংগ্রেসী ভবানী ব্যানার্জীর প্রাইভেট সেক্রেটারী বলে পরিচিত। উক্ত ভবানী ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের (নব) সভাপতি হবার সংবাদও একবার সব কাগজে বেরিয়েছিল। ভবানীবাবু দিল্লীর নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে আস্তানা গেড়েছেন এবং শোনা যায় তাঁর হাত দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা অজ্ঞাত গোপন কাজে খরচ করা হচ্ছে। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে পরিচিত।

ইতিপূর্বে যুগান্তর পত্রিকার অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীশচীবিলাস রায়চৌধুরীর বোহালাস্থিত বাসভবনে হানা দিয়ে পুলিশ কয়েকজন

উচ্চ নকশালা নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং পাইপগান, রিভলবারের গুলি ইত্যাদি হস্তগত করে। অজ্ঞাত কারণে ইনিও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন নি।

একথা আজ সুবিদিত যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কে সি পট্টশ্বর বক্তব্য অনুসারে নকশালা যুবকদের বেশ বড় একটা অংশ নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে এবং যে সব আদর্শবাদী দ্রাস্ত তরুণ নব কংগ্রেসে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে, তারা ষতম হয়ে যাচ্ছে। কাশীপুর-বরানগর এবং সম্প্রতি হাওড়ায় নব কংগ্রেসী ও পুলিশের এই যৌথ সন্ধানের ঘটনা, পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসিবাদী আক্রমণের সূচনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে রাজনৈতিক তথ্যভিজ্ঞ মহলের দৃঢ় ধারণা।

উল্লিখিত ঘটনাগুলিতে এক দিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগ ও কলকাতা স্পেশ্যাল রাণ্ডের মধ্যে মনোমালিন্য ও অশান্তি অন্য দিকে মার্কিনী লবী ভুক্ত সি আই এ প্রভাবিত উচ্চদরের সাংবাদিক, পত্রিকা মালিকগোষ্ঠি, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর এবং কতিপয় নকশালা নেতার যোগসাজসের তথ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার দর্পণে প্রকাশিত ‘পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রাম’ শীর্ষক প্রবন্ধে ছাব্বিশ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের তৃতীয় লাইন থেকে প্যারাগ্রাফটি নিম্নরূপ হবে—লেখক

আবার কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সম্বন্ধে কমিটি পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পাকিস্তানী শোষণকে ঔপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ বলে মনে করেন, ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসন নয়, তারা এখন পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথাও বলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো পশ্চিমে মাচের পর কি পূর্ব বাংলা উপনিবেশ হয়ে গেলো? না প্রথম থেকেই এই ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসন চলে আসছে? আর পূর্ব বাংলা যদি উপনিবেশ না হয়ে থাকে তবে তাঁরা জাতীয় স্বাধীনতার কথা বলছেন কেন? কেনই বা বর্তমান যুদ্ধকে বলছেন মুক্তিযুদ্ধ? উপনিবেশ না হলে জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন আসতে পারেক? অপর পক্ষে পূর্ব বাংলার প্রমিত আন্দোলন নামক গ্রন্থটি সঠিকভাবে প্রথম হতেই পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশ বলে আসছেন। তাঁরা পূর্ব বাংলার শত্ৰুমাঠ জাতীয় স্বাধীনতার কথা বলেন, কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে সামন্তবাদী শোষণদের বিরুদ্ধে তাঁদের সম্পৃক্ত বক্তব্য নেই।

অর্থনৈতিক দর্পণ

সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে পুরনো কারখানা পাঠাচ্ছে

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

এবার ভারত সরকারের আর্থিক নীতির খড়মাটি ধুয়ে মছে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আশ্রিত বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির স্বেচ্ছা ভারত সরকার ভুয়া প্রগতিশীলতার মধুস্রোত বোকাধীন ধারণ করতে পারল না।

একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এস এস কানোরিয়া (সোমালি, দামানি-দের মতই এরাও বিড়লাদের অধীন উপগোষ্ঠী) পরমানন্দ ঘোষণা করেছেন যে বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের বড় বড় শিল্পপতিরা ভারতে তাদের কারখানাগুলো সরিয়ে আনতে চান। আনন্দবাজার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের জ্ঞানপাপী অথবা গো-মুখ সাংবাদিক প্রবর সম্ভবতঃ বলতে চাইবেন বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী ও জাপানেও সি পি এম প্রভাবিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভয়েই এসব দেশের শিল্পপতিরা ইন্দিরা গান্ধীর নিরাপদ রাজত্ব আশ্রয় খুঁজতে চাইছেন। কেননা একই কারণেই তাঁরা পশ্চিম-বঙ্গ থেকে বাঘা বাঘা মাড়োয়ারী

শিল্পপতি ভারতের অন্য চলে যাচ্ছেন।

তবে বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের এসব উঠিয়ে আনা কারখানাগুলির একটীও পশ্চিমবঙ্গে বসাতে দেওয়া হবে না বলে কানোরিয়াজীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ভালো কথা, কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটল যে, বৃটেন, জার্মানী বা জাপানের মত উন্নত ধর্মী দেশের শিল্পমালিকেরা দেশ ছেড়ে হঠাৎ এই হতভাগা দেশে ছুটে আসছেন? কারখানা তুলে এনে এখানে বসিয়ে মালতৈরী করবেন এবং উৎপন্ন মাল সবটাই বিদেশে (এমন কি নিজের দেশেও) রপ্তানী করবেন?

ভারত সরকার নাকি চেম্বার অব কমার্সকে জানিয়েছেন যে এধরণের যে কোন প্রস্তাবকে তারা স্বাগত জানাবেন এবং প্রস্তাব পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে কারখানা বসানোর এবং সহযোগিতার (অর্থাৎ ভারতীয় পুঁজিপতিদের অংশীদারিত্ব) সম্পর্কে অনুমোদন মঞ্জুর করবেন।

ইতিমধ্যেই পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত ব্যাকার শিল্পপতি হের এ্যাবস্ এবং জাপানের সর্ববৃহৎ

একচেটিয়া মালিক জাহবাংস্ অর-শেষ মিস্ত্রিবিশী বাণিজ্য মিশন নিয়ে এদেশে ঘুরে গেছেন।

এরা মনে করছেন যে ইন্দিরাজীর বর্তমান সরকারের কল্যাণে ভারতবর্ষে বিদেশীদের জেকে বসে ব্যবসা করার সীমিত আবার ফিরে এসেছে। বর্তমান ভারত সরকার খুবই যুক্তিবদ্ধ ভাবে বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহ দিচ্ছে। শ্রদ্ধে তাই নয়, ভারতীয় পুঁজিপতি ও বিদেশী পুঁজিপতিদের সম্মিলিত প্রয়াসে তৃতীয় কোন দেশে পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারেও ভারত সরকার সবরকম উৎসাহ যোগাচ্ছে। সুতরাং ভাবতবর্ষে দেশ থেকে কারখানা তুলে এনে বসানো তারা সানন্দচিত্তেই করবেন।

আসল ব্যাপারখানা কি? হঠাৎ মাছের শোকে কুমীরের চোখে জল? ব্যাপার খুবই মজার।

চতুর্থ পরিকল্পনার কালে বছরে ষাট কোটি টাকা বিদেশী পুঁজি এদেশে লক্ষ্য করা হবে বলে পরিকল্পনা রচয়িতারা ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দ বছরে এর পরিমাণ দশবারো কোটি টাকার বেশী হয় নি।

ইউরোপে ও জাপানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দ্রুতবেগে যে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল, তাদের কর্মক্ষমতার মেয়াদ বাবদ ক্ষয়ক্ষতি পরেের মার্শাল আদায় হয়ে গেছে। এখন ঐ গুলি বদলে নতুন ধরণের আরো উন্নত মেশিন বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

ঐ বাতিল সেকেন্ডহ্যান্ড কারখানার মেশিনপত্র ভারতে পাঠিয়ে মাল তৈরী করার কাজ চালিয়ে যাওয়া এই মহানুভবতার প্রথম উদ্দেশ্য।

মেশিন বাতিল হলেও, ভারতের কারখানা তো নতুন ভাবে বসবে। তাই ঐ মরা বাতিল মেশিনারীর ওপর দ্বিতীয় দফার ক্ষয়ক্ষতি পরেের মার্শাল আদায় করা হবে। একই মর্গকে দবার জবাই করা হবে।

উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। মর্দ্রাস্থিতির ফলে মূল্যবৃদ্ধি এবং তার ফলে বেতনবৃদ্ধির দাবী ও শ্রমিক বিক্ষোভ ঐ সব উন্নত দেশে প্রায় লাগোয়া ব্যাপার। ভারতে মজুরীর হার কম, কাঁচামাল ও সস্তা মজুর এবং নিপুণ কারিগরী শ্রমিকও পাওয়া যায়। কাজেই ভারতে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানী করা অনেক বেশী লাভজনক। বিশেষতঃ স্বল্প আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা টলটলমান এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলির বিভিন্ন দেশের মর্দ্রা বিনিময়ের অস্থির হারের সুযোগও এখন বেশী।

এটা নতুন ব্যাপার নয়। মার্কিন কোম্পানীগুলির অনেকেই ইউরোপে কারখানা বসিয়ে অতিরিক্ত মর্দ্রাফা করছে। আর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্র খুলে মর্দ্রাহারের ফাটকাবাজী ওঠানামার দরদুগ শ্রদ্ধে খাতায় দেনা-পাওনা লিখে অতিরিক্ত মর্দ্রাফা কমাচ্ছে।

আরেকটী বড় কারণ হচ্ছে যে ডলারের পতনের সময় মার্কিন বাণিজ্যের উপর বেশী ভরসা আর রাখা যাচ্ছে না। জাপানের বৃহত্তম পুঁজিপতি মিস্ত্রিবিশীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ টি ওনাকা খোলাখুলিই বলেছেন যে ডলার ও ইয়েনের লড়াই চলার ফলে জাপান তার ডিমগুলি মার্কিন বাস্কেট থেকে যথাসম্ভব সরিয়ে আনতে চায়। আর জাপান নাকি এখন বৃহত্তে পেরেছে যে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে—জাপানীদের ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে ভারত এখন সোনার খনি। তাই তারা বছরে যে দুশো কোটি ডলারের জাপানী পুঁজি এশিয়াতে লক্ষ্য করা হবে তার বেশী ভাগই পাবে ভারত।

আবার জাপান, জার্মানী ও বৃটেন কোন কোন শিল্প জন-স্বাস্থ্যের হানিকর এবং কারখানার উৎপাদনের ফলে আবহাওয়া মন্ডল দূষিত হয়ে উঠে বলে দেশের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা রয়েছে। ঐ সব শিল্পের কারখানাগুলি দেশের বাইরে কোথাও স্থাপন করবার জন্যে বেশ কিছুদিন ধরে, বৃটেন জার্মানী ও জাপান স্থান অন্বেষণ করছে।

এদেশের আবহাওয়া দূষিত হলে বা জনস্বাস্থ্যের চরম ক্ষতি হলেও বর্তমান ভারত সরকার বিদেশী পুঁজির স্বার্থে তা মেনে নেবে বলেই ঐ সব দেশের শিল্পপতিদের ধারণা হয়েছে।

শিল্পগুলি হচ্ছে স্বাধাতু শিল্পের ফলে উৎপন্ন পাত, কাঁচ ও চীনা মাটির বাসন তৈরীর মেশিন কোল্ড রোল্ড স্ট্রিপ, ইলেকট্রনিকস, হাই প্রেসার ভালভ, কাগজ ও মন্ড তৈরীর যন্ত্রপাতি, ফটোগ্রাফিক কাগজ, প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি, কাঁচের (সেবাংশ ও পুঁজার)

সরকারী নীতির বিরুদ্ধে টেলিগ্রাফ কর্মীদের বক্তব্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

টেলিগ্রাফ বিভাগের কার্যসময় হ্রাস করার প্রতিবাদে সর্বভারতীয় টেলিগ্রাফ ট্রাফিক এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীরা সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন।

দুপাশ্ট এ্যান্ড টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রবিবার কিংবা ছুটির দিনে চৌদ্দ থেকে পনেরো ঘণ্টা এবং অন্যান্য দিন-গুলিতে চার থেকে ছ ঘণ্টা করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যসময় হ্রাস পাবে। কর্তৃপক্ষের ধারণা, বর্তমান আর্থিক সংকটের সময়ে এই কার্যসময় হ্রাস করার ফলে একদিকে যেমন আর্থিক সাশ্রয় ঘটবে অপর দিকে তেমনি কর্মীদের পরিশ্রমও অনেকটা লাভব হবে।

কিন্তু বিভাগীয় কর্মচারীরা এই সিদ্ধান্তের গোপন উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে টেলিগ্রাফ অজকের দিনে সাধারণ মানবের জীবনে যে কোন সময়ের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শিলি-গাড়ি, আসানসোল, দুর্গাপুর, হাওড়া ও কোলকাতার মত শিল্পা-গুলিতে বিভিন্ন স্থানে যোগা-যোগের মাধ্যম হিসেবে টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রয়োজন চরিত্র ঘণ্টা। তাছাড়া দৈনিক সংবাদপত্র কিংবা রেলওয়ে বিভাগের অসুবিধের কথা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে শিলিগাড়ি সীমান্তের

সংলগ্ন রয়েছে চীন, নেপাল, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি দেশগুলি এবং শিলিগাড়ির সঙ্গে কোল-কাতার টেলিফোনে প্রত্যক্ষ যোগা-যোগ ব্যবস্থা থাকার ফলে বিভাগীয় কার্যসময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য দেশরক্ষা বিভাগের জরুরী কাজ-কর্মও বিকল হয়ে পড়তে বাধ্য।

এমনিতেই টেলিগ্রাফ কর্মীদের একাধিক অসুবিধের মধ্যে দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করতে হয়। পূর্ণাঙ্গ পরিমাণে চেয়ার নেই, টেবিল নেই, বসে কাজ করবার মত বিস্তৃত পরিসর নেই, ডাইনিং রুমের সুযোগ সুবিধা নেই, ভাল টেলি-প্রিন্টার মেশিনের অভাব। এর মধ্যেই কর্মীরা মৃদু বজ্রে কাজ করে যাচ্ছেন। তার উপরে যদি আর্থিক সাশ্রয়ের অজুহাতে কার্য-সময় হ্রাস করে পরবর্তী কালে অনেক কর্মীকে উদ্ভূত প্রমাণ কবে ছাটাইয়ের পরিকল্পনা নেওয়া হয় তবে এই বিভাগটি আচরেই অচল হয়ে যেতে বাধ্য।

ইউনিয়নের সম্পাদক জানিয়েছেন : “সরকারের উচিত অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া। তা না হলে শিলি-গাড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং, খড়গ-পুর, দুর্গাপুর, আসানসোল, ব্যারাকপুর, হাওড়া এবং কোল-কাতার আন্দোলন আরো তীব্রতর হবে। কেননা এখানে টেলিগ্রাফ কর্মীদের চাইতেও সাধারণ মান-বের স্বার্থে প্রশ্নই অধিক জড়িত।”

সি আই টি ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত চৌদ্দই সেপ্টেম্বর শিয়াল-দহে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ইমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে “সিটু”র তরফ থেকে সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে মহঃ ইসমাইল এম পি তার দীর্ঘ ভাষণে মালিকশ্রেণীর নতুন হিংস্র আক্র-মণকে প্রতিহত করতে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে আহ্বান জানান।

“সিটু”র রক্তপাতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মালাদানের পর কমরেড হাবি, ব্যানাজীর সভাপতিত্বে সভার কাজ সুদূর হয়। সাধারণ সম্পাদক কমল ভট্টাচার্য তার রিপোর্টে পশ্চিম বাংলাসহ ভারতে শাসকগোষ্ঠী যে হিংস্রতা ও খনের রাজনীতি কয়েম করেছে তার বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রমিক শ্রেণীকে এই পরিস্থিতিতেই আগামী দিনের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে নতুন পথে লড়াইকে পরিচালনার জন্য প্রস্তাব নেবার আহ্বান জানান। তিনি সি আই টিতে শ্রমিক কর্মচারীর গ্রেড স্কেল সম্বন্ধে নগণ্যতম অর্থনৈতিক দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষ যে চক্রান্ত চালাচ্ছে তাকে ব্যর্থ করার জন্য সংগঠনকে মজবুত করে তোলার আবেদন জানান।

সভায় বারোই জুলাই কর্মীটির পক্ষ থেকে কে জি বসু বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটে

রাজনীতি বিবর্জিত অর্থনৈতিক লড়াইয়ের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে শ্রমিক কর্মচারীকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। তিনি তার বক্তব্যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নেতা-দের উপর বরখাস্তের নোটিশ জারী শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির উপর আক্রমণ বলে অভি-হিত করেন এবং এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। অপর বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মার্কে-ন্টাইল ফেডারেশনের সভাপতি প্রদ্যোৎ ঘোষ ও ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক মনোতোষ চক্রবর্তী। আলোচনায় যোগ দেন সদস্য ছোট্ট সিং ও পরিচ্ছন্ন সিং। সভায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নেতৃবৃন্দের উপর থেকে বরখাস্তের নোটিশ প্রত্যাহার, বাংলা দেশের স্বীকৃতি, মধ্যবর্তী নির্বাচনের অনুষ্ঠান, দমনপীড়ন মূলক ব্যবস্থা ও সন্ত্রাস বন্ধ, বন্ধ কলকারখানা খোলা, শর-গাথীদের ও বন্যাপীড়িতদের জন্য যথোপযুক্ত সরকারী সাহায্যব্যবস্থার দাবীতে কয়েকটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

হাবি ব্যানাজীকে সভাপতি, অশোক বসু, দেলগোবিন্দ বারিক রমাকান্ত প্রামাণিককে সহ-সভা-পতি, কমল ভট্টাচার্যকে সাধারণ সম্পাদক, মনোতোষ চক্রবর্তীকে যুগ্ম সম্পাদক, দেলাল দেকে কোষাধ্যক্ষ করে একগ্রন্থ জনের এক শক্তিশালী কার্যকরী সমিতি নির্বা-চিত হয়।

নেপালী আন্দোলনের রিপোর্ট

চাণক্য সরকার

৥ দই ৥

গণসংগঠন হবে কি হবে না এই প্রশ্নের উত্তরে চারদ্বাব্দুর পাণ্ডা প্রশ্ন ছিল : সবাই যদি গণসংগঠন নিয়ে মাথা ঘামায় পার্টির গোপন সংগঠন গড়বে কে? “গণ সংগঠন কৃষি বিপ্লব সংগঠিত করবে বলে কি আশা করা যায়? অবশ্যই কেউই এই ধরনের চিন্তা করেনা এবং এই ধরনের চিন্তা না করাটাই ঠিক।” তাঁর মতে “চাষী জনগণের মধ্যে গোপন পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমেই কৃষক আন্দোলনের উপর গরীব ও ভূমিহীন চাষীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।” চে গুরুভারার নীতি অনুসরণের যে অভিযোগ চারদ্বাব্দুর বিরোধী গোষ্ঠীরা আনেন তার উত্তরে চারদ্বাব্দু বলেন যে, চে গুরুভারাবাদ কৃষক আন্দোলনে গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতাকে অস্বীকার করে। অবশ্যই সারা কৃষক সমাজ গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে সামগ্রিকভাবে যুক্ত হবে এমন কথা নয়। “কৃষক জনসাধারণের মধ্যে শ্রেণী সচেতন অগ্রণী অংশ গেরিলা যুদ্ধ শুরুর করবে। এই কারণে সূচনার অবস্থায় গেরিলা যুদ্ধকে অল্প কয়েকজনের যুদ্ধ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে চে গুরুভারার—তত্ত্বের কোন মিল নেই। কারণ চে গুরুভারার গেরিলা যুদ্ধ পার্টি বরজোয়া বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে চালায় এবং এর সঙ্গে কৃষক সমাজের কোন যোগ থাকে না। অপর পক্ষে আমরা যে গেরিলা যুদ্ধের কথা বলি তা শুরুর হবে শ্রেণী সচেতন ভূমিহীন কৃষকদের অগ্রণী অংশ নিয়ে এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক সমাজের সক্রিয় সহযোগিতায় এই যুদ্ধ চলতে থাকবে। এই ধরনের গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে চে গুরুভারার পারিকল্পিত যুদ্ধের কোন মিল নেই, কারণ আমাদের যুদ্ধ গুরুভারাদের মত অস্ত্র ও সাজ সরঞ্জামের উপর নির্ভরশীল নয়। আমাদের যুদ্ধ অস্ত্র না নিয়েই শুরুর হবে এবং কৃষক সমাজের সক্রিয় সহযোগিতার উপর দৃঢ় আস্থা রেখে এগিয়ে চলেবে। ঠিক এই কারণে আমরা বলি যে, এই যুদ্ধ কেবলমাত্র কৃষক সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের বিষয়ে জোর এবং তাঁর প্রচারের মাধ্যমেই শুরুর হতে পারে।” চারদ্বাব্দু মনে করেন যে গ্রামে দরিদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্ব কেবলমাত্র গেরিলা যুদ্ধ মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। গণ সংগঠনের মস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এ কাজ কোন দিনই করা যাবে না।

হলেও অন্যান্য মৌলিক দৃষ্টিকে তিনি মূল দৃষ্ট থেকে আলাদা করে দেখছেন না। অবশ্য অন্যান্য দৃষ্টের সমাধান করতে হলে “আমাদের প্রথম প্রধান দৃষ্টটি খুঁজে বের করতে হবে এবং আমাদের মূল শক্তি এই দৃষ্ট সমাধানে নিয়োজিত হবে। কেবলমাত্র এই ভাবেই আমরা আমাদের সমস্ত শত্রু খতম করতে পারবো।” ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের বিরোধী তিনি। কারণ এ ধরনের সংগঠন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার সংগ্রামে নিবদ্ধ থাকে। গোপন পার্টি সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কাজের মধ্যে যুক্ত না হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে গোপনে বিপ্লবী রাজনীতি প্রচার করবে। তাঁর মতে কৃষি বিপ্লবের রাজনীতি শহরের সর্বহারার মধ্যে বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে। এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ থাকবে না। এর জন্য প্রয়োজন মাওবাদী চিন্তাধারার দীক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ক্যাডার। তার ভিত্তি হলো যখন আমরা বলি ভারতে বিপ্লবী পরিস্থিতি বর্তমান তখন এ থেকে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, আমাদের কর্তব্য হবে অবিলম্বে গোপন বিপ্লবী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা, গণ সংগঠন নয়।”

উনিশশ উনসত্তর সালে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের নির্বাচন বয়কট শ্লোগান উপেক্ষা করে সাধারণ মানব আগের মত ভোট দিতে এলো আর পশ্চিমবঙ্গে সর্বদলীয় যুক্ত ফ্রন্টের বিরাট জয় (দুশো আশিটি আসনের মধ্যে দুশো আঠারটি আসন) একটি নতুন পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিল। মার্কসবাদীদের আসন সংখ্যা দাঁড়ালো তেরাশি আর কংগ্রেসীদের মাত্র পঞ্চাশটি। সারা পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদীরা একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছে আর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মার্কসবাদীদের অসীম প্রভাব। মন্ত্রিস্ব গঠনের শুরুর থেকেই যুক্ত ফ্রন্টের অন্যান্য দলের মার্কসবাদীদের সম্পর্কে নানা সন্দেহ ও আশঙ্কা। যুক্ত প্রচেষ্টা চললো কি ভাবে জ্যোতি বসুকে মধ্যমশ্রিত্ব এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে দূরে রাখা যায়। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হলো—জ্যোতিবাবু মধ্যমশ্রিত্বের দাবী ছাড়লেন, কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর ঠিক হাতেই রইলো। ঠিক প্রস্তাবে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরা সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পেলো, সেই সঙ্গে আদালতে অভিযুক্ত নকশাল বন্দীরাও। যারা মুক্তি পেলেন তাদের অন্যতম হলেন কান্দু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল। চারদ্বাব্দুর আর গোপন সংগঠন করার বিশেষ কোন প্রয়োজন রইলো না, শহরে শহরে মাওবাদী শ্লোগান দেয়ায় ভরে উঠতে লাগল। ডেবরা গোপীকৃষ্ণভদ্রের

গেরিলা ইউনিট তৈরী হয়ে গেলো। এই সময়ে বিহারের কয়েকটা অঞ্চলে এবং অশ্বের শ্রীকাকুলামেও মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। বিহারের সত্যনারায়ণ সিংহই প্রথম পার্টির গেরিলা কোশল সম্পর্কে নির্দিষ্ট একটি ছক উপস্থাপিত করলেন। এবং বললেন যে, বিহারের মজাফরপুর জেলায় মুশাহারী অঞ্চলে তাঁর নির্দিষ্ট গেরিলা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। গেরিলা কাজকর্মের পেছনে ব্যাপক জনসমর্থনের উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন। এই সমর্থন প্রয়োজন শত্রু এবং পুলিশের অবস্থান সম্পর্কে গোপন সংবাদের জন্য, এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় চলাচলের সুবিধার জন্য, রসদ সংগ্রহের জন্য এবং সর্বোপরি সঠিক অক্রমণ চালানোর জন্য। তিনি বড় বড় গেরিলা ইউনিটের বিরোধী, কারণ এই ধরনের বড় ইউনিট চলাচল ও গোপনীয়তা ব্যাহত করে। তাঁর মতে—ইউনিট কখনো সাত জনের বেশী নিয়ে হবে না, কারণ খতম অভিযানের পর পুলিশ যখন “ঘিঘি ফেলার ও নিপীড়নের অভিযান” চালাবে, তখন ইউনিট ছোট হলে তার গতিবিধি ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তাঁর মতে কোন জায়গার ভৌগোলিক অবস্থা অথবা সেখানে বনজঙ্গল কিংবা পাহাড় আছে কিনা এর উপর গেরিলা রণকৌশল প্রয়োগবিধি নির্ভরশীল নয়, কারণ গেরিলাদের গোপন রাখতে পারে কেবলমাত্র জনসাধারণ, অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান নয়। তিনি বলেছেন, যেই পুলিশ তার অভিযান শুরুর করবে সঙ্গে সঙ্গে গেরিলাদের মূল এ্যাকশন ইউনিট পাশের অঞ্চলে উবে যাবে। কিন্তু গোপন প্রচার চসতে থাকবে দুইটি রাজনৈতিক কর্তব্য ও তিনটি সাংগঠনিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য। মাও চিন্তাভিত্তিক রাজনীতি এবং খতমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচার হলো রাজনৈতিক কর্তব্য। সাংগঠনিক কাজের মধ্যে আছে পার্টি, গেরিলা ইউনিট এবং গোপন কিশণ সংগঠন গড়ে তোলা। সাংগঠনিক কাজ অত্যাৱশ্যক, কারণ এ ছাড়া পার্টির বিপ্লবীভিত গড়ে ওঠে না। মূল কথা হলো এই যে, পার্টির দৃষ্টি গোপন শাখা থাকবে।—সত্যনারায়ণবাবু বলেছেন যে, পার্টির এবং গেরিলা ইউনিটের মূল শক্তি আসবে গরীব এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্য থেকে। আর এদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা প্রয়োজন। কারণ এরা অসাধারণ সাহসের সঙ্গে শত্রুর এবং পুলিশের আক্রমণ ও নিপীড়নকে মোকাবিলা করতে পারে। যদিও পার্টি বরজোয়া বুদ্ধিজীবীদের সূচনার অবস্থায় প্রয়োজনীয়তা আছে পরবর্তী অকস্মাৎ তারা অপ-

দার্থে পরিণত হবে, কারণ পুলিশী আক্রমণ ও গ্রাম ঘেরার সময় তারা কোন সময়ই গরীব কৃষক সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে পারবে না। কিন্তু নেতৃত্ব ও ক্যাডার যদি গরীব চাষীদের মধ্যে থেকেই আসে তাহলে যে কোন প্রতিদুল অবস্থায় তারা গ্রামীণ জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। তাই পার্টি বরজোয়াদের একমাত্র কাজ হলো প্রারম্ভিক অবস্থায় দরিদ্র কৃষককে মাওচিন্তায় দীক্ষিত করা। এবং তাদের নেতৃত্বের গণ বিকাশে সাহায্য করা। স্পষ্টই দেখা যায় যে, সত্যনারায়ণবাবু গ্রাম এলাকায় কৃষক জনসাধারণের মধ্যে ভিত গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজের উপর বেশ জোর দিয়েছিলেন। কারণ এর উপরই গুরুত্ব উঠবে গেরিলা ইউনিট অথবা শত্রু হবে গেরিলা এ্যাকশন।

চারদ্বাব্দু, সত্যনারায়ণের এই কৌশলের বিরুদ্ধ সমালোচনা করলেন। সত্তর সালে ফেব্রুয়ারী মাসে “গীলবারেশান” পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি বললেন যে, গেরিলা ইউনিট গড়ে উঠবে “একমাত্র যড়যন্ত্রমূলক উপায়ে।” তিনি বললেন—এ যড়যন্ত্র কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। গেরিলা ইউনিট গঠনের পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও তাঁর বক্তব্য ছিল “গেরিলা আক্রমণ শুরুর করার পূর্বে গভীর প্রচার চালানোর গুরুত্বের উপর বেশী জোর দেওয়া ভুল।” হঠাৎ আক্রমণে দু একজনকে খতম করার উপরই চারদ্বাব্দুর জোর। এই খতম অভিযান চলবে ছোট ছোট গেরিলা ইউনিটের দ্বারা সহজে পাওয়া এবং সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত অস্ত্র প্রয়োগে। তিনি পরিস্কার বলেছেন যে, আক্রমণের এই স্তরে কোন মতেই আশ্রয়স্থান ব্যবহৃত হবে না। কাস্তে কুড়ল, বর্শা, কাটারী প্রভৃতিই হবে একমাত্র অস্ত্র। পার্টিকে তিনি সতর্ক করে দেন যে, কোনক্রমে যেন বন্দক বানানো বা লুটের বোঁক না দেখা দেয়। তিনি বলেন যে, সকলকে বোঝানোর দরকার আছে যে আশ্রয়স্থান সংগৃহীত হলেও তা ধরে রাখা যাবে না, পুলিশী আক্রমণের সময় সবই ধরা পড়ে যাবে আর তাছাড়া অস্ত্রের উপর বোঁক বাড়লে মানুষের আস্থা কমে যাবার প্রবণতা দেখা দেবে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির বাইরে মাওবাদীরা চারদ্বাব্দুর তত্ত্বকে পার্টি বরজোয়া বিপ্লববাদের প্রতিফলন আখ্যা দিয়েছেন। অশ্বের নাগি রেশ্মী তাঁর “প্রলেটারিয়ান পথ” নামে একটি তাত্ত্বিক জার্নালে চারদ্বাব্দুর তত্ত্বকে চে গুরুভারার আতিবিশ্বববাদ আখ্যা দিয়েছেন। একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে, “সংশোধনবাদের সবরকম প্রকাশের বিরুদ্ধে যেমন অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে কিউবান লাইন যার সঙ্গে চে গুরুভারার ও ফিডেল কাস্ত্রোর নাম জড়িত তার বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকতে হবে। কারণ কিউবান বিপ্লববাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও

চিন্তা বিরোধী। ‘এই ধরনের বিপ্লববাদের উৎস পার্টি বরজোয়া রোমাণ্টিক চিন্তাধারা থেকে। এই চিন্তাধারায় সর্বহারার নেতৃত্ব বিশ্বাস নেই, এ নির্ভর করে গুটি কতক লোকের উপর, বিপ্লবী পার্টিতে সংগঠিত এবং রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ভূত জনসাধারণের উপর নয়। মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও চিন্তাধারা অনুযায়ী জনবহুল বিরোধী এরা।”

নাগি রেশ্মী এবং অন্যান্য অনেক মাওবাদী নেতারা চারদ্বাব্দু এবং তাঁর গোষ্ঠীকে হঠকারিতা এবং সঙ্কীর্ণতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে কৃষক ও শ্রমিকদের গণসংগঠনে বিপ্লবীদের কাজ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। অবশ্যই এই কাজের সময় সংশোধনবাদ সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছেন। এত বিরোধিতা সত্ত্বেও “পিকিং রিভিউ” মারফৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির জোর প্রচার চলতে থাকে, অন্যান্য মাওবাদীরা পিকিং স্বীকৃতির অভাবে মুষড়ে পড়ে। বেশির ভাগ জায়গায় তার বসে যায়। উনিশশ সত্তর সালে দোসরা জানুয়ারী একটি সংখ্যায় “পিকিং রিভিউ” শ্রীকাকুলামের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সেই প্রবন্ধে বলা হয়—যে, “মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতা চারু মজুমদার সশস্ত্র সংগ্রামের শিখা প্রজ্বলিত করেছেন নিজের উপস্থিতিতে। উনিশশ উনসত্তর সালের মার্চ মাসে সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি জেলা কমিটিকে নির্দেশ দেন কিভাবে তখনই গেরিলা স্কোয়াড তৈরী হবে এবং সংগ্রাম শুরুর হবে। জনবহুল জয় দীর্ঘজীবী হউক এই রচনায় কমরেড লিন পিয়াও যে নির্ভুল তত্ত্ব রেখেছেন সেই তত্ত্বের বাণী তিনি ঐ জেলা কমিটির কাছে পৌঁছে দেন। কমরেড লিন পিয়াও এর তত্ত্ব হলো গেরিলা যুদ্ধই একমাত্র কান্দা যা দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে জনসাধারণের সমস্ত শক্তিকে সমাবেশ ও প্রয়োগ করা যায়।”

পিকিং রিভিউর এই রচনা ... (শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

অর্থ নৈতিক দর্পণ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

পাত, কৃত্রিম সূতা, এবং ছাপাখানার বন্দপাতি।

বলাবাহুল্য, এসব মেশিন আমাদের দেশেই এখন তৈরী হয়, কোন দেশ থেকে পুরনো বাতিজ মেশিন আনার দরকার পড়ে না। আমাদের বস্ত্রশিল্পের ক্ষমতার মধ্যেই এসব শিল্প স্থাপন সম্ভব।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আঁগ্রস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নব কংগ্রেসী সরকার এ্যাবস মিৎসুবিশী সি বি আইদেরও সেবা করতে চায়। কানোরিয়াজী শত্রু সেকথাটাই বাৎসেছেন। কিন্তু এর অর্থনৈতিক ফলাফল যে ভারতের জনসাধারণের পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠবে, তা তাঁরা গোপন করতে চন।

নকশালী আন্দোলনের রিপোর্ট

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

অন্যান্য সমস্ত মাওবাদীদের স্তম্ভিত করলেও চারাবাবুর বিপ্লবী আকৃতি বহু গণ পরিবর্তিত হলো। পিকিং রিভিউর চারাবাবু সম্পর্কিত বক্তব্য ভুল তথ্যপূর্ণ, কেননা শ্রীকাকুলামে কৃষক আন্দোলন বহুদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম অনেক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। শ্রীকাকুলামের আন্দোলনে চারাবাবুর অবদান হলো এই যে, ঐ অঞ্চলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের হাতে নেতৃত্ব যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আন্দোলন ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো, সমস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মীরা হয় নিহত হলো, না হয় গ্রেপ্তার হলো।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এর পরের ইতিহাস হলো কসকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি শহর অঞ্চলে ছোট ছোট এ্যাকশন স্কোয়াড মারফৎ ব্যাপক সন্ত্রাস বিস্তারের কাহিনী। সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্য হলো পদলিখ কর্মচারীদের মধ্যে সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা আর বিভিন্ন এলাকায় মার্কসবাদী নেতৃস্থানীয় কর্মীরা। কসকাতা পদলিখ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দর্পণে প্রকাশিত এক বক্তব্যে বলেছেন যে, তার এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মের অভিযোগে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো যে, যারা তথাকথিত নকশালী আক্রমণে রাস্তাঘাটে নিহত হচ্ছে, তাদের বেশীর ভাগই এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য। তিনি এই হত্যাকে বিশেষ ঝড়ের অংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। এম-এল পার্টির তরফ থেকে কিন্তু এ সমস্ত হত্যার দায় নিজেদের কাঁধে নেওয়া হয়েছে।

আগেকার এত তাত্ত্বিক আলোচনা এবং কৃষি বিপ্লবের সমস্ত বক্তব্য জঙ্গাঙ্গলি দিয়ে এম এল পার্টি শহরের এ্যাকশন বাড়ালো, স্কুল কলেজ পড়ুলো, বন্ধ হলো, পরীক্ষা ব্যবস্থা ভাঙল, ব্যাপক সন্ত্রাস ও জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এম এল পার্টি সম্পর্কে তখন পর্যন্ত

সংবাদপত্রে এবং মার্কসবাদী বিরোধী অন্যান্য সমস্ত দলের নানা স্নেহশীল কথাবার্তা, এমন কি বিড়লা গোষ্ঠীর মাথা বি এম বিড়লা সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বক্তব্যে বললেন যে, স্বাভাবিক কারণে পশ্চিম বঙ্গে তরুণ সমাজ বিক্ষোভ থেকে বিক্ষোভের পথে গেছে। তিনি বললেন তরুণ হলে তিনি নিজেও হয়তো এম এল পার্টিতে যোগ দিতেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এম এল পার্টি সেই সমস্ত জায়গায় তাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের শক্ত ঘাঁটি গড়ার চেষ্টা করলো যে সব অঞ্চল সাধারণভাবে মার্কসবাদী প্রভাবাধীন বলে পরিচিত। খতমের তালিকা মার্কসবাদীদের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নামে ভরে উঠলো। পদলিখ এই পর্ষায় প্রায় নিশ্চয়ই থাকলো; অন্যান্য রাজনৈতিক দল “মার্কসবাদীরাই হিংসার রাজনীতি প্রবর্তনের জন্য দায়ী”, এই কথা বলে দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করলো।

এদিকে মার্কসবাদ বিরোধী অভিযানে দেখা গেল নানা ধরনের লুপ্তপন এসে পার্টিতে জড় হচ্ছে এদের অনেকেই দাগী আসামী, লুটেরা ডাকাত খুনী বদমাইশ। ইতিমধ্যে পার্টির সমস্ত সংগঠন ভেঙে পড়েছে। চারাবাবু বিপ্লবী সংগঠনের নতুন কার্যদা বার করলেন, যে কার্যদা লেনিনবাদ বহির্ভূত। এই কোশল অনুযায়ী পার্টি ইউনিট গুলো স্ব স্ব প্রধান। পার্টির প্রায় কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন। রইলো না আর ইতিমধ্যে “দেশবর্তী” “লিবারেশনের” নিয়মিত প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পার্টির যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হলো। পার্টি এই পর্ষায় লুপ্তপনদের কব্জার চলে গেলো। আদর্শের দিক থেকে যারা তখনো পার্টিতেই নানা আত্মত্যাগ করে বিপ্লবের তাগিদে রয়ে গেছেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগ নিহত হতে লাগলেন অথবা পদলিখের হাতে ধরা পড়লেন। পদলিখের গ্রেপ্তারের পরেও নানা অজহাতে তারা নিহত হয়ে চললেন। এ দিকে লুপ্তপন সর্বস্ব এম এল পার্টি মার্কসবাদীদের হত্যা করে চলেছে। এই এ্যাকশনের পিছনে সক্রিয় মদত ছিল নব কংগ্রেসের আর হয়তো বা কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য দৃষ্টি দলের। নব কংগ্রেস বলছি এই জন্যে যে, পরবর্তীকালে এম-এল পার্টি যখন ভাঙতে শুরু করলো তখন এম-এল পার্টির অনেক এ্যাকটিভিস্ট নব-কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে।

এম-এসদের উনিশশ একাত্তর সালের নির্বাচন বিরোধী অভিযান প্রায় সবটাই মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। স্পষ্ট-তই ওরা নির্বাচনের বিরোধিতা করতে চায়নি, ওরা চেয়েছে মার্কসবাদীরা নির্বাচনে যেন না জেতে। এই প্রচেষ্টা অন্যান্য সমস্ত দলে-

রই ছিল। তাই এম-এল অভিযানে অন্যান্য দল সুবিধাবাদী মিত্রতায় আসার চেষ্টা করেছে।

এম-এল পার্টির মধ্যে নানা আদর্শগত সংকটের কথা বর্তমানে শোনা যাচ্ছে। মনে হয় পিকিংএর আগেকার সেই অকুণ্ঠ সমর্থন এখন আর চারাবাবুর পেছনে নেই। প্রকৃতপক্ষে, পিকিং রেডিও এখন আর ভারতীয় এম-এসদের সম্পর্কে দীর্ঘদিন কোন কথাই বলে নি। শোনা যায়, গত বছরের মঝামাঝি নাগাদ এম-এল পার্টির শীর্ষস্থানীয় এক নেতা সৌরীন বসু নাকি ইউরোপ ঘুরে পিকিং গিয়েছিলেন এবং সেখানে মাওবাদের নামে পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যক্তিহত্যা সন্ত্রাস ও লুপ্তপন রাজনীতি চলছে তার বিরুদ্ধে তিনি অনেক কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হন। দেশে ফিরে এই সম্পর্কে পার্টিতে সব কথা বলেন। আশ্চর্যজনকভাবে ঠিক এর পরেই পদলিখ তার গোপন ঘাঁটির কথা জানতে পারে, তিনি গ্রেপ্তার হন।

উনিশশ সত্তর সালে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে এম এল পার্টির শহরে এ্যাকশনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, কোন মতেই পার্টি ক্যাডারদের গ্রামে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নাই এদিকে চারাবাবু মজুমদারের নতুন তত্ত্ব “সত্তর দশকে মন্ত্রির দশকে পরিণত কর” শহরের দেওয়ালে আত্মপ্রকাশ করে। মূর্তি ভাঙা, ব্যক্তিহত্যা, স্কুল কলেজ আক্রমণ প্রভৃতি শহরে এ্যাকশন বাড়তে থাকে। দেখা যায় সি পি এম প্রভাবিত অঞ্চলেই এম এল পার্টির কাজকর্ম অধিক। সত্তরের মাঝামাঝি নাগাদ হঠাৎ বিহারের মাগুরজানে কয়েকজন কৃষক এলাকার কর্মী পদলিখের নয়াটি বন্দুক ছিনিয়ে নেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার চারাবাবুর নতুন তত্ত্ব “গণফৌজের যুগ এসে গেছে”। ফৌজ গঠনের ডাক শহরের আর আশপাশে এবং কোন কোন জেলায় বন্দুক লুটের নতুন আন্দোলন সূচনা করে।

ইতিমধ্যে একাত্তর সালে পশ্চিমবঙ্গে আবার নির্বাচনের দিন দাখ্য হল। আগের মতই এম এল পার্টি নির্বাচন বিরোধী, কিন্তু এবারে বয়কটের শ্লোগান দিয়েই নকশালরা ক্ষান্ত নয়। তাদের এখন অস্তিত্বের সমস্যা—ওদের ধারণা হল সি পি এম জোট নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করলে ওদের মর্যাদা হবে। ওরা উঠে পড়ে লাগল কি করে সি পি এমকে কোণঠাসা করা যায়। বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে চব্বিশ পরগণা, কলকাতা, হাওড়া এবং বর্ধমানে নকশালী হত্যা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলল। এ সমস্ত এলাকা সি পি এম প্রভাবিত বলে পরিচিত। কিছুদিনের মধ্যেই নকশালীদের সমর্থনে অনেকে কথা বলতে শুরু করল কংগ্রেসীরা, সি পি আই নেতারা এমনকি শিল্প জগতের সেরা মালিক বিড়লারাও। রোজই পদলিখ খবর। কলকাতা

পদলিখ এসোসিয়েশনের সম্পাদক চিন্তাহরণ দত্ত এক বিবৃতিতে বলেন নকশালী হত্যার নামে গভীর চক্রান্ত মারফৎ এসোসিয়েশনের সক্রিয় কর্মীদেরই হত্যা করা হচ্ছে। নকশালী মতপন “দেশবর্তী” কিন্তু খবরের ন্যস্ত দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নেন।

এত খবর হতে থাকে—পদলিখ ও প্রশাসন মোটামুটি নিশ্চিন্ত। তদানীন্তন কলকাতা পদলিখ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্ত নিজেকে তাত্ত্বিক বলে জাহির করতে ব্যস্ত। তিনি এক থিসিস দিলেন। সরকার তা গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে চালু করে দিল। তার মতে নকশালীদের সমর্থন মোটামুটি এসেছে শহরে লুপ্তপনদের কাছ থেকে—অর্থাৎ কোন শ্রেণী সংগঠনে নেই এই ধরনের ছদ্মছাড়া গরীবদের মধ্যে থেকে। * এই গরীবদের সবচেয়ে সক্রিয় অংশকে পদলিখের নেতৃত্বে হোমগার্ড নিয়ে আসতে পারলে তাত্ত্বিক নকশালদের খতম করা যাবে।

অর্থাৎ গুপ্ত সাহেবের মূল বক্তব্য ছিল যে, তাত্ত্বিক নকশালদের বাউন্ডুলেদের দিয়ে খতম অথবা গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের সাদা পোষাকের হোমগার্ড বাহিনী গঠন নাকি আইন বিরোধী। অনেক এলাকায় হোমগার্ড কম্যান্ডান্টরা এতে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু সরকার আপত্তিতে আমল দেয় নি। সরকার তার নিজের শ্রেণী চরিত্র ও কর্তব্য থেকে গুপ্তসাহেবের তত্ত্বের গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলে। পাড়ায় পাড়ায় গোপনে মাথাপিছ মাসিক একশ পাঁচ টাকা মাইনের হোমগার্ড গঠন চলতে লাগল।

এদিকে এম এল পার্টি তাদের হত্যা নীতির প্রাথমিক সাফল্যের নেশায় মগন। আরও বেশী খুন হতে লাগল, বিভিন্ন এলাকায় সি পি এম বিরোধীরা ওদের সঙ্গে এ্যাকশনভিত্তিক যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে আক্রমণ চালাতে লাগল কাশীপুর বরানগরের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা, বেলেঘাটার কিছু এলাকা, বেহালা, যাদবপুর টালিগঞ্জ। কসবা প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি হল।

এম এলরা ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মৌলিক সংগঠনিক নীতি বিসর্জন দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় স্ব স্ব প্রধান ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে পার্টির লুপ্তপন চরিত্র আরও জেঁকে বসল। ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় সংগঠন ভেঙে পড়ল। দলে দলে সাধারণ ক্রিমিন্যালরা নকশালী নাম নিয়ে সাধারণের কাছে জ্বলম্ব চালাতে লাগল। ব্যাপক সন্ত্রাস সর্বত্র। এম এল-দের এতে দৃকপাত নেই—তারা নতুন তত্ত্ব দিল। ওদের কাছে মর্মেদ সমাজ ভাঙার কাজে তথাকথিত সমাজ বিরোধীরাই বিপ্লবী বন্ধু। ইতিমধ্যে কিছু কিছু শিক্ষিত নকশালপন্থীরা নিহত হতে শুরু করেছে। বারাসতে আর্টসি তরু-

ণের মৃতদেহ পাওয়া গেল—সকলেই উগ্রপন্থী। অভিযোগ এল এই হত্যার দায় পদলিখের। পদলিখ অভিযোগ অস্বীকার করে নি—নীরব ছিল। এই রকম আরও অনেকে নিহত হতে লাগল। কিন্তু এম এল রা তখনও বুঝতে পারছে না এর পরিণতি কি দাঁড়াবে। যারা নেতৃত্বে আছে তাদের কেউই কোন রকম দীর্ঘমেয়াদী সাংগঠনিক কাজে ছিল না। এ্যাকশনের নেশায় পাগল। এখানে ওখানে খুন হচ্ছে প্রশাসন পদলিখ সামলাতে পারছে না এতেই ওরা খুশী।

সেই পুরানো কথা—বিপ্লবী পরিণতির লেনিনবাদী সংজ্ঞা। পুরানো অর্থনৈতিক কার্যদায় সমস্যার সমাধান হবে না তাই অর্থনৈতির সংকট রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছে; প্রশাসন পদলিখ নাভিস্বাস, মানব্বের বিক্ষোভ শেষ সীমায়, সমাজে গণগত পরিবর্তন সাধনে মানব্ব উন্মুখ। এই সবই বিপ্লবী পরিণতির পরিচায়ক। কিন্তু একটা কথা এম এল-এরা বলে নি বা বলতে চায় নি সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মানব্ব বিক্ষুব্ধ বা সংগ্রামমুখী হলেই বৈজ্ঞানিক পরিণতি সূচিত হয় না। অন্যান্য অবস্থার সঙ্গে প্রয়োজন বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী মানব্বের শ্রেণী সংগঠন। এই বিপ্লবী সংগঠন ছাড়া কোন পরিণতিই বিপ্লবী আত্মা পেতে পারে না। সন্ত্রাস ও ব্যক্তিহত্যার এ্যাকশন এ সংগঠন সৃষ্টি করতে পারে না। এর জন্য চাই ব্যাপক প্রাথমিক কৃষকের গণ সংগঠন যার মধ্যে থেকে আসবে পার্টি গঠনের জন্য শ্রেণীসচেতন বহুপরীক্ষিত ক্যাডার। এম এল পার্টি গণ-সংগঠন বিরোধী, তাই পার্টি ক্যাডার তথাকথিত এ্যাকশনে সাহসীদের মধ্যে থেকেই আসতে বাধ্য। আর যে ধরনের এ্যাকশন তাতে পেশাদার গুন্ডা বদমায়েশরা যারা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এম-এল পার্টিতে কভার হিসাবে ব্যবহার করেছে তারা পার্টির পড়া ইউনিটের শীর্ষে। আর যারা মাওবাদী আদর্শের কথা শুনে অথবা “লাল কেতাবে” ছাড়া ছাড়া উদ্ধৃতি পড়ে পার্টির কাছাকাছি এসেছে তারা প্রায় ঐ শীর্ষ স্থানীয়দের চাকর বাকরে পরিণত হয়েছে।

শহরে পার্টির নেতৃত্ব এইভাবে সম্পূর্ণ লুপ্তপনদের হাতে চলে গেল—এদের নব কংগ্রেসী নেতারা কাশীপুরে জোড়াবাগান আর অন্যান্য অঞ্চলে প্রাক নির্বাচনী যুগে ব্যাপক সন্ত্রাসের জন্য ব্যবহার করেছে। পরে এদের এক বৃহৎ নব কংগ্রেসী যুব বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। যারা দেয় নি তাদের খতমের চেষ্টা এখনও চলেছে।

সম্প্রতি এম এল পার্টির মধ্যে আত্মবিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। জাতীয় ট্যাকটিকস ও আন্তর্জাতিক নীতির ওপর এম-এল পার্টির নামে দাঁটি থিসিস তার মধ্যে শহরে ব্যক্তিহত্যা, পার্টি-সংগঠন, গণ-সংগঠন বর্জন প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে পার্টির তাত্ত্বিকদের মধ্যে নানা বিতর্ক। (শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ চাঁদার হার ১১

বার্ষিক পনেরো টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, মজি লেন, কলি-১৩

ভয়ত দর্শন

কেবল

অবশেষে কেরলে নতজান্দ অচ্যুত মেননের প্রতি সদয় হয়ে নব কংগ্রেস সাংগাতেরা কেরল মন্ত্রিসভার আয় আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিতে সম্মত হয়েছেন। অচ্যুত মেনন নব কংগ্রেসের সমর্থনে কেরলে যে সংখ্যালঘু মন্বিগণসভা চালায় যাচ্ছিলেন, এবার নব কংগ্রেস সরকারী ভাবে তাতে যোগ দেবে ঠিক হয়েছে।

একশ চৌত্রিশ জন বিধনসভা সদস্যের মধ্যে মাত্র ষোল জনের নেতা অচ্যুত মেনন মধ্যমশ্রেণী লাভের জন্যে এত ব্যগ্র ছিলেন যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নব কংগ্রেস দলকে মন্ত্রিসভার বাইরে রেখেই তিনি তাদের সমর্থনের উপর ভরসা করে মন্ত্রিসভা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধমান নব কংগ্রেস, সি পি আই, মুসলিম লীগ, আর এস পি ও পি এস পি মন্ত্রীদের হাত দিয়ে কাজ করতে নিচ্ছিল আর বদনাম হচ্ছিল সব দলের। পুতুল মন্ত্রিসভা তাই চাইল নব কংগ্রেসও মন্ত্রী হয়ে যাক, লন্ঠনপাটের বখরা এবং বদনাম সবাই একসঙ্গে মিলেই নেওয়া যাক।

অচ্যুত মেনন যে পঁচিশ লাখ টাকা গাঁপ করতে গিয়ে “চোর মেনন” বা “আধিকারিক মেনন” বলে কেরলের জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছেন, অথবা মুসলিম লীগ নেতার পুত্র চোরাই চালানোর দায়ে ধরা পড়ার পর মুসলিম লীগ মন্ত্রী তাকে ছেড়ে দেবার বেআইনী নির্দেশ দিয়েছেন—এসব কথা বারে বারে তুলে কেরলের নব কংগ্রেসীরা অচ্যুত মেননকে বেশ দূর-হাতে দূরিয়ে নিচ্ছিল।

অচ্যুত মেনন চাইছিলেন যে নব কংগ্রেসীরা লোকের কাছে এসব দুষ্কর্মের দায়ভাগী হচ্ছেন না, অথচ দূর্ভাগ্যের স্রষ্টা হয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে তারা সব দায় মিনি ফ্রন্টের সাংগাতদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা নির্দোষ সাজতে চাইবে।

অনেক টানা হেঁচড়া, ভয় দেখানো মানভঙ্গনের পর নব কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে রাজী হয়েছে, নিজেদের শর্তে। তেরো জন মন্ত্রীর মধ্যে পাঁচ নব কংগ্রেসের, তিন সি পি আই, আর এস পি এবং মুসলিম লীগ দুটি করে ও পি এস পি একজন মন্ত্রী করবেন।

সি পি আই-এর বর্তমান তিনজন মন্ত্রীকে অপসারণ করে সি পি আই নেতা গোবিন্দ মেনন এবং টি ভি টমাস ভাড়াটিয়া মন্ত্রিসভায় ঢুকে পড়ছেন। বেলা যে বয়ে যায়। সবর সইছে না।

এই মিনি ফ্রন্টের বেইমানদের প্রণয়ে কেরলেও নব কংগ্রেসী গুন্ডার দল কেন্দ্রীয় সরকারের

নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের মত ব্যক্তি-হত্যা ও সম্রাসের পথ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই ত্রিচূড়ের ইরিয়াদ হাই-স্কুলের ছাত্রদের ধর্মঘটে বাধা সৃষ্টি করে নব কংগ্রেসী গুন্ডার দল। প্রান্তন এম এল এ আবদুল কাদের সংঘর্ষের সংবাদ শুনে সেখানে গেলে তাঁকে গুন্ডারা গুলি করে হত্যা করে এবং আরেকজন ছাত্র নেতাও তাঁদের গুলিতে নিহত হন।

কিন্তু কেরলের বীর জন সাধারণ এই নব কংগ্রেসী এবং মিনি ফ্রন্টের বেইমানদের শেখাচ্ছেন যে বেইমানরা ইতিহাস সৃষ্টি করে না, তারা শুধু ইতিহাসের আবর্জনা।

কেরলের ছয় হাজার কলেজ শিক্ষক সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট করছেন। পাঁচশত হাজার ননগেজেটেড সরকারী কর্মচারী, আট হাজার বিদ্যার্থী পর্বদের কমী চল্লিশ

হাজার টোড়, শ্রমিক, ছয় হাজার পরিবহন শ্রমিক, পাঁচ হাজার ইন-জিনিয়ারিং ছাত্র, হাসপাতাল কর্মী ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন, বেইমানদের কবর খননের কাজ সম্পূর্ণ করবেন বলে। কেরলে শ্রমিক-কৃষক জনতার ঐক্যবদ্ধ মোর্চা প্রতিক্রিয়াশীল অচ্যুত মেনন মুসলিম লীগ, নব কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ

একদিকে কেরল, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ আবার দু'দিক থেকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট নব কংগ্রেসী সরকারের মধ্যমশ্রেণী দাঁড়িয়েছে। সারা ভারতবর্ষে ইন্দিরা সরকারের এনামেল-ওঠা চেহারা কদর্ভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে, কারণ কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের সংঘবদ্ধ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত দৃঢ়পণে রাজকন্যার ছদ্মবেশ ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং রাষ্ট্রসী রক্তক্ষোভ পুথাবাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দণ্ডায়মান হয়েছেন।

ভারতের নব কংগ্রেসী কেন্দ্রীয়

সরকার বাঙালীদের স্বাধীনতা অথবা গণতান্ত্রিক অধিকার পাবার যোগ্য মনে করে না। বারে বারে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করে তারা তা প্রমাণ করেছে। বাঙালী জাতির আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীকে তারা সি আর পি মিলিটারী ও সরকারী প্রশস্তপন্থ গুন্ডাবাহিনী দিয়ে ভেঙে দিতে চায়। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা যে দ্বন্দ্ব-শেন্ন রাষ্ট্রের অন্ধকারের মধ্যে নিষ্কপ্ত আঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের মান-ষও কেন্দ্রীয় দুঃশাসনের সেই দূর-পন্থের কলংক বহন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নানা নামে, খন্দরের আবরণে পশ্চিম-বঙ্গের মানুষ ঢাকা কুমিল্লা, যশোরের জামিয়াতী মুসলিম লীগের গুন্ডাদের চিনে নিতে পারছেন।

রাজভবনের অঙ্কিত ঢাকা গভর্নমেন্ট হাউসের সদস্য অভিনীত নাটকের পুতুল অভিনেতা ডাঃ আবদুল মোতালিব মালেককে যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় চাপরাশিধারী আমলাদের রাইটার্স জেকে বসার ধরণ ধারণ দেখে

মনে হয় তাঁরা যেন নিয়াজ মহম্মদ খান, আজিজ আহমেদ-এর ডাই বেরাদর। ইসলামাবাদ আর নয়াদিল্লী দুইই বাঙালীর ওপর অপ্রসন্ন খজা হস্ত। বাংলাকে শোষণ কর, এক্ষোটা রক্তও যেন অবশিষ্ট না থাকে।

দুটি কেন্দ্রীয় সরকারই গণ-তান্ত্রিক রীতিনীতি পরিচালনা করে বাঙালী জাতির সামান্যতম বাঁচার অধিকার, জীবনজীবিকা, চলাফেরা, রাজস্বোজগার, স্বাধিকার দূরে থাক অন্যান্য রাজ্যের জনগণ যে নূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে থাকেন তাও বাঙালী হবার অপরাধ বাতিল করে দিয়েছেন। নির্বাচিত প্রতিনিধির মারফতে শাসিত হবার অধিকার কোন বঙ্গেই নেই।

ওপার বাংলায় মিলিটারী ও জামিয়াতী গুন্ডার দল বাঙালী নাগরিকের রক্তে পূর্ববঙ্গের সবুজ শ্যামল মাটিকে সিক্ত করেছে, এপার বাংলায়ও বিনাবিচারে অটক, খেদীমত গুন্ডা লোলিয়ে খন অথবা থানায় লক আপে, কারা-প্রচীরের অন্তরালে সান্নিধ্য (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

নকশালী আন্দোলনের রিপোর্ট

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

মূল বিবাদ লেগেছে চারদ মজুমদার গোষ্ঠীর সঙ্গে অসীম চ্যাটার্জী ও তার সহযোগীদের। অসীম চ্যাটার্জীরা প্রায় আলাদা পার্টি হিসাবে ইতিমধ্যে কাজ করতে শুরু করেছে। বাংলা-বিহার উড়িষ্যা সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির নামে। পার্টির নদীয়া কমিটিও অসীমের বক্তব্যের সমর্থক। অসীমের অভিযোগ যে অনেকদিন থেকেই পার্টির মধ্যে বিতর্ক চলছে আর নেতৃত্ব বারবান্দ মৌলিক প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। অসীমের দল অনেক বার দাবী করেছে পার্টির সাংগঠনিক মিটিং ডাকার জন্য, কিন্তু চারদ মজুমদার বেকন সভাতেই আসতে রাজী হয়নি। বোধহয় চারদাবান্দ ভয় হয়েছিল অসীমের সঙ্গে বিবাদ এমন পর্যায়ে উঠেছে যেতে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় সাক্ষাৎকার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়। সভা না হওয়ায় অসীমের দল বিহার এবং উড়িষ্যার নকশালীদের সঙ্গে একজোট হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতি জেলাতেই নিজেদের আলাদা সংগঠন তৈরি করেছে। পদলিঙ্গের খবরে প্রকাশ দই বিবদমান গোষ্ঠীতে সম্পর্ক আর বিতর্কের পর্যায়ে নেই। কোন কোন জায়গায় একে অপরকে হত্যা করছে।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এক ও দই নম্বর দুটি দলিল প্রকাশিত হয়েছে। এবং দই দলিলেই পূর্ব বাংলার সংগ্রাম নিয়ে দই দলে তাঁর বিতর্ক। অসীম এই দলিলে চারদাবান্দ এবং তার গোষ্ঠীকে সরাসরি চীন বিরোধী এবং সংশোধনবাদী

আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ চারদাবান্দ এখন ওদের চরম শত্রু, এমন কি খতমের তালিকাতেও উঠে থাকতে পারেন।

বিতর্ক শুরু হয়েছে পিকিং রিভিউতে এগারোই এপ্রিল প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ নিয়ে। প্রবন্ধের শিরোনামে ছিল “ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা কি করার চেষ্টা করছে?” এই প্রবন্ধে পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে চীনা দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত পরিষ্কার। প্রবন্ধে বলা হয়েছে “পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরি-স্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে পাকিস্তানের পুরোপরি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং অন্য কোন দেশেরই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। কিন্তু ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য সাত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে।”

প্রবন্ধ অনুযায়ী পূর্ব বাংলার ঘটনায় “ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের চরিত্র নতুন করে উন্মোচিত হয়েছে।” আর পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণ-সংগ্রাম শুরুর হয়েছে সেই সম্পর্কে প্রবন্ধের বক্তব্য হল, পাকিস্তানের ভূখন্ডের অভ্যন্তরে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য সাদা পোষাকে সশস্ত্র অন্তঃপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রবন্ধের শেষ স্তবকের বক্তব্য হল : “পাকিস্তানী জনগণ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধিতায় মহান বিপ্লবী ঐতিহ্যের অধিকারী এবং তারা বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে

অনমনীয় সংগ্রাম চালিয়েছে। চীনা সরকার ও চীনা জনগণ বরাবরের ন্যায় বিদেশী আক্রমণ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার ন্যায্য সংগ্রামে পাকিস্তানী সরকার আর পাকিস্তানী জনগণকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবে।”

পাকিস্তানের বর্তমান জুগী-শাহীর শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে দই গোষ্ঠীতে প্রচণ্ড বিবাদ। অসীমের দল দেশেরতী ও জিবোরশনে এই সম্পর্কে চারদাবান্দ গোষ্ঠীর বিভিন্ন মতামতের উদ্ভূতি দিয়ে বলেছে যে, এ সমস্ত বক্তব্য “মধ্যপন্থা, এটা চীন বিরোধিতা।” অসীমের মতে পাকিস্তানের সরকার মূলতঃ জাতীয় বুদ্ধোন্মত্ত সরকার; যে সরকার “পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি মহান সমাজতান্ত্রিক চীনের সহযোগিতায় ক্রমাগত শক্তি সংহত করেছে।” আবার অন্যদিকে অসীম বলেছেন, “পাকিস্তানের ছোট ও মাঝারি বুদ্ধোন্মত্ত ও অল্প-জমির মালিকগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা মহান সমাজ-তান্ত্রিক চীনের সহযোগিতায় ক্রমেই স্পষ্টতর হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই ছোট ও মাঝারি বুদ্ধোন্মত্তরাই পাকিস্তানের জাতীয় বুদ্ধোন্মত্ত। এবং জনাব ভুট্টোর নেতৃত্বে এই জাতীয় বুদ্ধোন্মত্ত ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি বারবার রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য কম্প্র-ডর বড় বুদ্ধোন্মত্ত ও বড় জমিদার-দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে।” চারদাবান্দ অসীমের সঙ্গে একমত নন। তিনি ইয়াহিয়া সরকারকে প্রগতিশীল জাতীয় বুদ্ধোন্মত্ত সরকার বলে মনে করেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষের সম্প্রসারণবাদ সম্পর্কে চীনের অভিমত তাঁকে মেনে নিতেই হবে। অসীমের উত্তরে তিনি যে

বক্তব্য রেখেছেন সেই অনুযায়ী, “তাই কমিউনিস্ট পার্টিকে দৃঢ়মতো সংগ্রামের সাক্ষাৎকার করতে হবে—একদিকে বিদেশী আক্রমণ, অন্যদিকে ইয়াহিয়া খানের অক্রমণ।” ইয়াহিয়া খান চরিত্র সম্পর্কে চারদাবান্দ অভিমত হল : “ইয়াহিয়া কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী করে রেখেছে, শুধু তাই নয়, জমিদার শ্রেণীর উপর নির্ভর করেই সে তার শক্তিকে সংহত করার চেষ্টা করেছে। এবং তার হাতিয়ার তাঁর ধর্মাত্মতা। একদিকে সে যেমন মার্কিনী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে আত্মরক্ষার তাগিদে, অন্যদিকে সে মার্কিনীদের কাছে দরবারের জন্য লোক পাঠাচ্ছে। কাজেই এ দুটি চরিত্র এক নয়।” চারদ গোষ্ঠীর অন্যতম এক প্রধান নেতা সন্নীতি ঘোষ যিনি পার্টি মহলে সৌম্য নামে পরিচিত ছিলেন তিনি বলেছেন থোকনের (অসীম) বক্তব্য অনুযায়ী “ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের হস্তক্ষেপের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম বন্ধ রাখতে হবে, পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীকে সমর্থন করতে হবে, এবং তার পেছনে জমিয়েত হতে হবে। এর অর্থ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের হস্তক্ষেপের জন্য পাকিস্তানের জনগণের বিপ্লব করার কোন অধিকার নেই, এবং সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের আওয়াজ তোলা হচ্ছে চীন বিরোধিতা। এ লাইন স্পষ্টই শ্রেণী সহযোগিতার লাইন, বিপ্লব বিরোধিতার লাইন।”

অর্থাৎ অসীমের মতে চারদাবান্দ এবং তার গোষ্ঠী হচ্ছেন চীন বিরোধী মধ্যপন্থী। আর চারদাবান্দ সৌম্যের মতে অসীম হল শ্রেণী সহযোগিতার লাইনে বিশ্বাসী এবং বিপ্লব বিরোধী। (সমাপ্ত)

রবীন্দ্র সদনে দুর্নীতি

রবীন্দ্র সদনকে জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত করার জন্য এর পরিচালনাভার রেজেক্টারীকৃত সংগীত, নৃত্য ও নাটক প্রভৃতি সংগঠনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে দেবার যে চেষ্টা প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মনোনীত পরিচালক সমিতির সদস্য মন্মথ রায়, সর্ধীন প্রধান ডাঃ বসুদেব ভট্টাচার্য ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির করছিলেন তা পশ্চিম বাংলা রাজনীতির উত্থান পতনের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর দপ্তরে এই মণ্ডিট থাকায় তিনি এটাকে স্বয়ংশাসিত সংস্থা করার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি আবার লেডী রাণে মুখার্জীকে টেনে নেন। তারপরে রাষ্ট্রপতির শাসনে এবং ডেমো-কোয়া সরকারের যুগে কার্যকরী সমিতিতে সোমেন বসু, ক্ষীতিশ রায় প্রমুখ বিশী ইত্যাদি স্থান পেলেন।

সম্প্রতি যে ভদ্রমহিলা প্রশাসন অধিকারিকা হয়ে এসেছেন, তাঁর গণের সীমা নেই। তিনি ওখানকার কর্মচারীদের হাতে পাত্তার জন্যে তাদের সব উচ্চপদে বসাবেন বলে লোভ দেখালেন কিন্তু দেখা গেলে যে আসলে তিনি কমিটির বদলে নিজের ইমেজ খাড়া করার চেষ্টা করেছেন এবং চিঠি পত্রও প্রচারে নিজের কাজের প্রশংসা নিজেই করে যাচ্ছেন। তার প্রথম কৃতিত্ব (?) ধরা পড়লো বাংলা ভাষার উন্নতি নিয়ে রবীন্দ্রসদন যে আলোচনা সভা করে। সেখানে পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় দইশত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি বাংলা ভাষার প্রসারকল্পে চান্দ-পনেরিটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রশাসন অধিকারিকা সেই প্রস্তাব-

গুলি এক মিনিটের মধ্যেই হারিয়ে ফেলেন এবং তারপর স্মরণশক্তি বলে এবং কেমন ভাবে তিনি রবীন্দ্র সদন সাজিয়ে ছিলেন তার প্রশংসাসূচক বিবৃতি লিখে সংবাদপত্রে পাঠালেন। এই বিষয়ে কমিটিতে আলোচনা উঠলে সরকারী ও বেসরকারী কয়েকজন সদস্য অধিকারিকার স্মরণশক্তি ও মেধার

প্রশংসা করেন। দ্বিতীয় বিষয়, এই সব সদস্যরা বাংলা ভাষার উন্নতির সভায় উপস্থিতই ছিলেন না।

রবীন্দ্র সদনে গত রবীন্দ্র ও নজরুল উৎসব নিয়ে শিল্পী নির্বাচন, সংবাদপত্রে প্রচার, টিকিট এবং সৌজন্যপত্র বিতরণে যে সব স্বেচ্ছাচারিতা করেছেন তা জঘন্য। পাছে এই সব কেলেকারী প্রকাশ পায় সেই জন্য গত কয়েকমাস উৎসব কমিটির মিটিং ডাকেননি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে তাঁর প্রথম স্বামীকে যে দুখানা সৌজন্য পত্র দেন তারই একখানা বিক্রি করা হয়েছিল, এবং হাতে হাতে ধরা পড়ে যায় ব্যাপারটা। দোষ কাটাবার জন্যে তিনি এই দোষ চাপিয়ে দেন হোস্টিংস থানার পলিশদের উপরে। হোস্টিংস থানার পলিশরাই নাকি সৌজন্যপত্র বিক্রির কারবার করেছে। হোস্টিংস থানার কাছে জিজ্ঞাস্য যে তারা কি সত্যই মিসেস রায়ের কুকর্মের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন? যদি না থাকেন তবে এই ভদ্র-মহিলাকে জবাবদিহি করেছেন না কেন? রবীন্দ্র সদনের সহসভাপতি এবং শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীজে, সি

সেনগুপ্ত মহাশয় কড়া অফিসার হিসাবে পরিচিত। তিনিই বা কোন এবং পরিচিত। তিনিই বা কোন অনিবার্য কারণে এই মহিলাকে প্রশয় দিয়ে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক পীঠস্থানকে কলঙ্কিত করতে অনুরোধ দিচ্ছেন?

অধিকারিকা সাম্প্রতিক যাদের বহাল করেছেন কংগ্রেসী নেতাদের লোকহিসাবে, সেই সব অধনবহাল ছেলেরা কমিটির পদানো সদস্যদের অনেকেই নানা রকম ভয়

দেখাতে অবাধি সুরু করেছে। এই সব অসাংস্কৃতিক লোক যদি রবীন্দ্র-সদনের গুণী সদস্যদের অধিকারিকার উচ্চানিতে অপমানিত করতে থাকে তবে সদন কলঙ্কিত হবে নিশ্চিত।

দমদম সেন্ট্রাল জেলে বড়যন্ত্র

গত পনেরোই সেপ্টেম্বর তারিখে দমদম সেন্ট্রাল জেলের বন্দীরা (পি ভি এ) বলে যে জেল কর্তৃপক্ষ রটাচ্ছেন যে “আমরা নাকি সাতাশে আঠাশে তারিখে পালাবার চেষ্টা করবো”, পরে কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনো একজন ঐ একই কথাই বলেন যে পরজোর মধ্যে ওরা অর্থাৎ পি ভি এ বন্দীরা পালাবে। আমাদের আশঙ্কা যে কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এই কথা প্রচার করছেন এবং এই অজুহাতে ওদের পিটিয়ে মারার ষড়যন্ত্র করছেন। আশা করি এই পৈশাচিক ষড়যন্ত্র থেকে সুসভ্য সরকার নিবৃত্ত হবেন।

বিভাগ প্রসঙ্গে

বছরের ডিপ্লোমা কোর্স তিন বছর পূর্বে অন্তিমোদন করেছিলেন। বর্তমানে বহু বয়স্ক ছাত্রও সাম্য-কালীন চারুকলা বিভাগে এই পাঠক্রম অনুসারে অধ্যয়ন করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট তাই জিজ্ঞাস্য যে আপনারা কি নতুন করে ঐ কলেজে সাম্য-কালীন চারুকলা বিভাগে পাঁচ বছরের ডিপ্লোমার পরিবর্তে বর্তমানের অন্তিমোদন সাত বছরের ডিপ্লোমা অন্তিমোদন করেছেন এবং ভর্তির বয়সের মাপকাঠি ঠিক করে দিয়েছেন? যদি সত্যি নতুন করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে আপনারা ঐ সব নতুন নিয়মের ফলে ঐ কলেজে সাম্য চারুকলা বিভাগের প্রথম বর্ষে এ বৎসর এ পর্যন্ত একজন ছাত্রও ভর্তি হয়েছে কিনা?

দীপঙ্কর সরকার
পি সি ব্যানার্জী

নকশালী রাজনীতি প্রসঙ্গে

নকশালী রাজনীতির উপর দর্পণে একটি রিরূপ মতামত প্রকাশিত হয়েছিল গত তেসরা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় “কাশীপুরের ঘটনা ও নকশালদের প্রতি কিছ্র প্রশ্ন” শিরোনামায়। এই প্রসঙ্গে আমার এক আধটা প্রশ্ন রাখছি।

নকশালীরা বিপ্লবী কি অবিপ্লবী কিংবা আদৌ বিপ্লবী কিনা এরূপ অন্তঃসারশূন্য মতবাদের অন্তরালে আসল ঘটনাগুলি। যে বাদ পড়ছে সেই বাস্তবতাকে বাতিল করে বা পাশ কাটিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান ছুঁল। এই গুরুপাটি সম্বন্ধে জানতে হলে আরও অনেক তথ্য দরকার যা লোকচক্ষে এখনও ভাসভাবে ব্যস্ত নয়।

নকশালী কর্মতৎপরতা সুরু হয় প্রাথমিক পর্যায়ে পোষ্টারিং ছাড়িয়ে নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলনের সুর ধরে। তারপর যা যা ঘটল বিদ্রোহ গতিতে এত দ্রুত যে তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য সাধারণ মানব এখনও অনুধাবন করতে সমর্থ হয় নি। তাদের সভাসমিতি মিছিল বাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড নিষিদ্ধ মুখপত্র “দেশবর্তী” স্তম্ভ, নেতাদের আত্মগোপন ও এক একজনের মাথার উপর পাঁচ দশ হাজার টাকা পরস্কার ঘোষণা, বহু নেতার মাথার উপর মৃত্যুর পরোয়ানা বসলন্ত, বহু নিহত ও আহত, হাজার হাজার বন্দী—এ রহস্যের পিছনে কি ইতিহাস, কি তার জবাব বলতে পারেন কি? কেনইবা ইন্দিরাজীর ঢালাও গুলির হুকুম, গুলি করে হত্যা করলেও গণতন্ত্রের মর্যাদা ধারী শোষককুলের পলিশের বিরুদ্ধে কেন তদন্ত হবে না? এটা মামলা প্রশ্ন নয় যখন সংবাদপত্র-গুলিতে খবর থাকে প্রতিদিন এক, দুই, তিনজন নকশাল নিহত।

শাসক প্রভুরা ঠিকই বিপ্লবীদের চিনে নিয়েছে, তারা কিন্তু অনেক আগেই বিপ্লবীদের আবিষ্কার করে ফেলেছে। সেদিন পল্লী সাহেব পালামেটকে জানাজান “নকশালরা এদেশে ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধ ডেকে আনতে চাইছে”। বিপ্লবীদের চিনেছেন বলেই অকাতরে নকশাল হত্যা প্রতিদিন চলছে। তাতেও তাদের শাস্তি নেই যত ভয় লাল ঘাঁটির। তারা ঠিকই বুঝেছেন এই লাল ঘাঁটি দেখা দেবে একদিন মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে তাদের উপরে। ইতিহাস তারা জানেন। শহরাঞ্চলে বেহাত হয়েছে লাল ঘাঁটি বারবার যার দরুন বিপ্লবীদের অনেক মৃত্যু দিতে হয়েছে। কাশীপুরের ঘটনা একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

অপর একটি প্রশ্নের উত্তর—নকশালদের পরিচয় বাহাই হোক না কেন তারা সি পি এম মার্ক্স অর্থ-করী আন্দোলনে যেমন বিরোধী তেমন ভোট, নির্বাচনে বিশ্বাসী নয়। তাদের প্রচারপত্রে আছে “ভোট বয়কট করুন, সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম মন্ত্রির পথ”। সংগ্রামের ময়দান

পরিহার করে বর্জোয়া পালামেটকে মেনে নেওয়া সংশোধনবাদী পথ। তারা বিপ্লবী জনতাকে চিনিতে দিতে পেরেছে মর্যাদাধারী এই দালালকুলকে এবং সংগ্রামের পথ সংশোধনবাদী পথ এই মত দৃষ্টা আলাদা ও পরস্পর বিরোধী জনগণের কাছে ভুলে ধরতে পেরেছে। এটাই তাদের ল্যভ।

জনৈক পাঠক

ভারত দর্পণ

(দশম পৃষ্ঠার পর)

পদ্ধতি অনুসারে বাঙালীর রক্ত ঝরানো চলছে অবিরত। বাঙালী যে কয়েকটি স্বার্থকে মানে না, বিদ্রোহ করে।

পূর্ববঙ্গের বীর বাঙালী সন্তান বীরের মতই লড়ছেন। এপার বাংলায়ও সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক শ্রেণী গ্রাম থেকে শহরে প্রতিরোধের দৃঢ় বৃহৎ গড়ে তুলছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের ইঙ্গিতে পটুল রাজ্যপাল ডায়াল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নেতৃত্বকে বে-আইনী বরখাস্তের আদেশ দিয়েছে। ডায়াল আর সিদ্ধার্থ রায়ের বরখাস্তের আদেশনামা জারী করতে লক্ষ লক্ষ বাহু এগিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে।

সংগ্রাম নির্মম, আক্রমণকারী নিষ্ঠুরতম। কিন্তু বাঙালীর সংগঠনী প্রতিভা সাহসও দরজর। আগামী দিনে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট হবে কি হবে না, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক শ্রেণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সম্ভবতঃ এবার ধর্মঘটের আওতা থেকে কেউই বাদ পড়বেন না—সংবাদপত্র, বিদ্যুত সরবরাহ, পরিবহন, ব্যাঙ্ক, বাঁমা, পোর্ট, কেউ না। এবং যে পর্যন্ত ডায়ালের ডায়ালিক এবং সিদ্ধার্থ রায়ের অসহ্য ফ্যাসীবাদী ইয়ার্কি শেষ না হয়, ততদিন এই সংগ্রামে বাঙালী রক্ত ঢালতে পেছবে না।



ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের সাম্য চারুকলা

সম্প্রতি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অন্তিমোদিত ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে সাম্য চারুকলা বিভাগে অন্তিমোদিত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য অন্তিমোদন করতে গিয়ে হতাশ হতে হয়েছে। কারণ আমাদের বয়স তেইশ বৎসরের বেশী এবং পাঁচ বছরের পরিবর্তে সাত বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে স্বীকৃত হতে হবে।

সাম্য বিভাগের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলি দেশের সমাজে শিল্প-শিক্ষা প্রার্থীদের প্রতি আঘাত স্বরূপ নয় কি?

পূর্বে জানতাম যে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ আমাদের দেশে এমন একটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে বর্তমানে সাম্যকালীন চারুকলা বিভাগে বয়স্ক শিক্ষাপ্রার্থীরা শিক্ষাশেষে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তিমোদিত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা পেতে পারে। ইহা শিক্ষা জগতে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

দেশে শিক্ষার প্রসার সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই কারণে বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্য বিভাগে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দিনে কর্মজগতে ব্যস্ত কিন্তু শিক্ষালাভের আগ্রহীদের কাছে সাম্যবিভাগ ছাড়া শিক্ষা লাভের উপায় কি? তাই স্বাভাবিক ভাবে সাম্য বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়সসীমার মাপকাঠি আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। বিভিন্ন শিক্ষায়তনের সাম্যবিভাগে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রেও একই কারণে এই প্রকার বয়সসীমার কড়াকড়ি নেই।

সমাজে, দিনে কর্মব্যস্ত শিল্প শিক্ষাপ্রার্থীদের বৃহত্তর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেই শিল্প শিক্ষাপ্রসারের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সব দিক বিবেচনা করে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে সাম্য চারুকলা বিভাগে বহুবৎসর ধাবৎ প্রচলিত তিন বছরের সার্টিফিকেট কোর্সের পরিবর্তে দ্বিবিভাগের সমান সিলেবাস ছুঁ পঁচ

বিদেশে দর্শন

আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান ক্ষুব্ধ

(দপ্তরের পর্ববৈক্যক)

জাপান-মার্কিন যুদ্ধরাত্তির সম্পর্কের অবনতির কথা দপ্তরে আগেই বলা হয়েছিল। সম্প্রতি এই অবনতির আরও সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া গেছে। গত সপ্তাহে দুই দেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর যুদ্ধ বৈঠকে জাপানী পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাকেও যুদ্ধের পরিষ্কার বাক্য দিয়েছেন যে জাপান আর সর্ববিষয়ে মার্কিন তাবোদারী সহ্য করতে প্রস্তুত নন। এর কারণও আছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে জাপান আজ তার একদা প্রধান সাহায্যকারী ওয়াশিংটনকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। সে এখন মার্কিন যুদ্ধরাত্তির কাছ থেকে ন্যায্য সম্মান পেতে চায় যার ফলে ধন-তান্ত্রিক শিবিরের এই দুই পাশ্চাত্য মধ্যে সংকট আজ তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

গত সপ্তাহের বৈঠকে যুদ্ধের পরিষ্কার বাক্য দিয়েছেন যে মার্কিন যুদ্ধরাত্তি যদি আমদানী

প্রবোর উপর সদ্য ঘোষিত দশ পাসেন্ট সারচার্জ উঠিয়ে না নেয় তাহলে রপ্তানীকারক দেশগুলি এমন ব্যবস্থা নিতে পারে যাতে বর্তমানের “বাধাহীন ব্যবসা”র নীতি ভেঙে দৃ টুকরো হয়ে যাবে।

জাপান যে শব্দ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রুদ্ধ দাঁড়িয়েছে তাই নয়। যুদ্ধের এ কথাও পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর দেশ কমর্ডিনিস্ট চীনকে জ্যুতিসংঘের সদস্য করার জন্য মার্কিন প্রস্তাবের সামিল নাও হতে পারে।

জাপানের বর্তমান স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণ আছে। জাপানীরা, বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায় যারা ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমো-ক্র্যাটিক পার্টির মেরুদণ্ডস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রী সাতোকি সাবধান করে দিয়েছেন, মার্কিন কৃষিজাত পণ্যের আমদানীর উপর কোনরকম বিশেষ

সুবিধার বিরুদ্ধে। এবং সাতোর উপদেষ্টারা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে জাতীয় সংঘে চীন ও তাই-ওয়ান দুটি দেশই সভ্য থাকবে, এই ধরনের কোন মার্কিনী প্রস্তাব সমর্থন করে জাপান যেন পিকিংয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পথে কোন বাধার সৃষ্টি না করে।

জাপান সরকার মার্কিনীদের উপর বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ কারণ নিকসন তাঁর সর্বশেষ দুটি বৃহৎ ঘোষণার (পিকিং যাত্রা ও নয়া অর্থ-নীতি) আগে এদের কিছুই জানতে দেন নি। এর ফলে জাপানীরা এখন তাদের একদা মিত্র আমেরিকাকে কুমাগতই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। জাপানী মনোভাব সব থেকে পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে মাইনিচি সিম্বাইনের একটি সম্পাদকীয়তে। বলা হয়েছে, “জাপানকে এখন থেকে মার্কিনী সাহায্যের আশা ছেড়ে দিয়ে স্ব-নির্ভরতার নীতি গ্রহণ করতে হবে”। এবং কিছু মার্কিনী অভিজ্ঞ মহলের মতে জাপান আমেরিকার অর্থনৈতিক ভিত্তিতনামে পরিণত হতে চলেছে।

টেলিফোনে ক্রশ কানেকশন যে কী বিপজ্জনক হতে পারে সম্প্রতি তার একটি উদাহরণ পাওয়া গেছে আরব রাষ্ট্র ইয়েমেনে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী হাসান আমরী টেলিফোনে কথা বলার সময় বোম্বের একটি তৃতীয় ব্যক্তি লাইনে ঢুকে পড়েছে। রোগতভাবে তিনি বলেন “আমি প্রধানমন্ত্রী বলাছি, লাইন ছেড়ে দাও।” তৃতীয় ব্যক্তিটি, হারাজী নামে এক ফটোগ্রাফার, ভাবে কেউ বুদ্ধি রসিকতা করছে এবং সম্মতিত জবাব দেয়। প্রচণ্ড রেগে উঠে আমরী আদেশ দেন তৃতীয় ব্যক্তিটিকে খুঁজে বের করার জন্য। যখন হারাজীকে তাঁর সামনে নিয়ে আসা হয় তখন আমরী তাঁর রক্ষীদের আদেশ দেন ওকে গুলী করে মারার জন্য। রক্ষীরা আদেশ মানতে রাজী না হলে আমরী নিজেই ওকে হত্যা করেন। এই ঘটনার সমস্ত ইয়েমেনে হৈ চৈ পড়ে যায় এবং আমরীকে দেশে ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তিনি এখন নির্বাসনে আছেন।

কংগ্রেসে তিন গোষ্ঠী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করবেন না। কেননা তাঁদের ধারণা, ওর ব্যক্তিত্বের অভাব আছে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তরুণকালিতকে নিয়ে। কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্টের কোন ক্ষমতাই নেই। ওটা একটা অলংকার। প্রস্তাব হচ্ছে, তরুণকালিত কোষাধ্যক্ষ হবেন। কিন্তু ছাত্র নেতা সর্বত্র মুখার্জি যদি অন্যতম সাধারণ সম্পাদক কিংবা অন্যতম সম্পাদক হন তবে তাঁর অধীনে কি তরুণকালিত কোষাধ্যক্ষ হতে রাজী হবেন?

মোট কথা নব কংগ্রেসীদের খেয়ালেখিয়েতে এখন তিনটি গোষ্ঠী বিরাজমান।

হাওড়া অঞ্চলে সন্ত্রাস ও পাল্টা সন্ত্রাস

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

হাওড়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছে নকশালীদের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ডঃ কানাই ভট্টাচার্য। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনেকদিন থেকেই উপদ্রুত এলাকায় মানুষের মনে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। পনেরোই আগস্ট থেকে এই ক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত সাংগঠনিক রূপ নিতে থাকে। ঐ তারিখে রাজবল্লভ সাহা লেনে একজন নকশালীকে কয়েকজন পিটিয়ে মেরে ফেলে।

পুলিশ এই ঘটনা ব্যাপকভাবে প্রচার করে অনুরূপ হত্যার উৎসাহ দিতে থাকে। এই হত্যা অবশ্যই অনেকের মনে সাহস আনে এবং ডঃ কানাই ভট্টাচার্যের এলাকায় একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ-বাহিনী গঠন করতে সাহায্য করে।

সঠিকভাবেই নকশালীরা বুঝতে পারে যে তাদের উপর আক্রমণ আসন্ন, তাই প্রতিরোধ সংগঠনের বিরুদ্ধে ওরা সন্ত্রাসবাদী কায়দায় আক্রমণের সুযোগ খোঁজে।

সম্প্রতি প্রতিরোধ বাহিনীর সম্পাদক বলাই চৌধুরী এবং অপর এক নেতৃস্থানীয় কর্মীকে ওরা দিন-দুপুরে সকলের চোখের সামনে হত্যা করে তাদের মর্দু নিয়ে রাস্তায় নাচানাচি করে। ওরা ভেবেছিল এই ঘটনার পর ওদের সম্পর্কে মানুষের ভয় বাড়বে এবং ওদের ঘাসের রাজত্ব কয়েম থাকবে।

বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষ এই হত্যার রুষ্ট হয়েছেন এবং ইতিমধ্যে তাদের সামনে হাজির হয়েছে সশস্ত্র যুবকের দল। মন্দের ভলো হিসাবে এই যুবক দলকেই তারা এখন সমর্থন জানাচ্ছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা বুঝতে পারছে যে এই প্রতিরোধ বাহিনীও কোথাও কোথাও অনুরূপ পাল্টা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে

জনজীবন ব্যাহত করতে পারে। হাওড়া, শিবপুর এবং ব্যাটরা থানা এলাকায় অনেকটা জায়গা জুড়ে নকশালীরা “মুক্তাঞ্চল” সৃষ্টি করে। এদের হত্যা শুরু হয় শিবপুর অঞ্চলে, প্রবীণ মার্কসবাদী নেতা জীবন মাইতি ওদের আক্রমণের প্রথম বলি। এই হত্যা গত বৎসর আগস্ট মাসে ঘটে। এক বছরে এর পর ওরা মোট পঁয়ষাট জনকে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে মার্কসবাদী ছাড়াও সংগঠন কংগ্রেসের বিখ্যাত নেতা বিজয়ানন্দ চ্যাটার্জিও আছেন।

নির্বাচনী প্রচারের সময় থেকে কিছু দিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় নকশালীরা নব কংগ্রেসের একাংশের সক্রিয় সাহায্য, আশ্রয়, ইত্যাদি সব কিছুই পেয়েছে। যখন নকশালীরা হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে তখন নব কংগ্রেসীরা পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করে ওদের মুক্ত করেছে।

হাওড়ার পূর্বতন পুলিশ সুপার নিরুপম সোম (প্রচণ্ড মার্কসবাদী-বিরোধী) নকশালী হত্যার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলার অপরাধে কোম্পালিশন সরকারের আমলে জেলা থেকে বদলী হয়ে যান। হাওড়া জেলাকে নিজেদের হাতে রাখার জন্য নব কংগ্রেসীরা এক নতুন ডি আই জিও নিয়োগ করে।

আজকের নকশাল বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে অনেক যায়গায় সমাজবিরোধীরা নব কংগ্রেসী ব্যাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে এসেছে, এবং নানা জায়গা থেকে এদের জলদস্যুর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

তালিকা তৈরি হচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দিগ্ভীর জল্পনা নেহাৎ কবিকল্পনা নয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ কি এতই বোকা যে, ইন্দিরা সমাজবাদ এবং তথাকথিত বামপন্থার ধূর্তািম তারা ধরতে পারবে না? সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের উপরে যে আঘাত সমাজবাদিনী ইন্দিরা গান্ধী করেছেন তা ভারতের বিপ্লবকামী বামপন্থাকে ভীতিপ্রদর্শনের দিক; এর আর এক দিক হল পলিশ, সি আর পি, ও মিলিটারী; অপর দিকে আছে প্রতিরোধবাহিনীর নামে পুলিশের ও কংগ্রেসের পোষা গুন্ডাবাহিনী বাদের তৎপরতা দেখা গেছে কাশীপুর এবং শিবপুরের নাৎসীসুলভ পাইকারী হত্যালীলার। শিবপুরের কংগ্রেসী বীরপুঙ্গবেরা বুদ্ধিতে নরমর্দু নিয়ে পাড়ার ভিতরে দৌঁখিয়ে বোঁড়িয়েছে এবং এবং পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র থানায় ফেরৎ দিয়ে এসেছে।

বাজারী সংবাদপত্রের ভূমিকা

কেবল তথাকথিত কমিটি বামপন্থী দলই নয়—পশ্চিমবঙ্গের গণ সংগ্রামকে সর্বপ্রকারে বিঘ্নিত করার কাজে এখানকার বাজারী খবরের কাগজগুলোও একটী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে স্থির হয়েছে। কাশীপুর শিবপুরের ব্যাপারে বাজারী সংবাদপত্রগুলো যে ভূমিকা নিয়েছিল এখানেও তারা তাই করবে। কাশীপুরের নরকায় হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে

প্রচুর ধানাই পানাই করল তারা ঠিকই কিন্তু যখন লোকেরা আসামীর নাম জানতে চাইল তখন তারা একেবারে চুপ করে গেল। আনন্দবাজার প্রথম দিনে অবশ্য একটা বেকাঁস কথা বলে ফেলেছিল। তার পরে আর প্রভুদের সম্বন্ধে রা করল না। এদের কাজ হবে সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যেকটী ইশুকে গুলিয়ে দেওয়া, সত্যমিথ্যার মিশাল দিয়ে অপপ্রচার করা এবং প্রকারণতরে সরকারী হঠকারী নীতির সমর্থন যোগান।

মেয়রের আচরণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শব্দ তাই নয়। এর পরে আর একটা চিঠি গেল যে, মেয়র মহোদয়ের সঙ্গে কর্পোরেশনের কমিশনার সাহেবেরও প্রমোদপ্রমণের সবিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অতএব তাঁকেও আপনারা আমন্ত্রণ জানান এবং আতিথ্য অফার করুন। এর সঙ্গে থাকবেন একজন মাত্র কাউন্সিলার

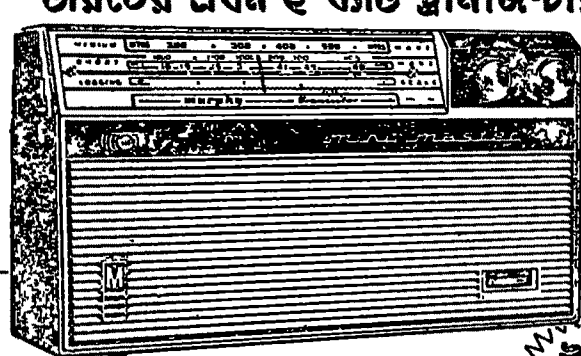
কিন্তু বাদ সেখেছেন পশ্চিম জার্মানী। তারা নাকি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা মেয়র সাহেবকে আতিথ্য দান করতে অপারগ।

কাউন্সিলার প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় একজন বেরসিক লোক। তিনি নাকি সরকারী কর্মচারীদের ইশু নিয়ে কর্পোরেশনের আশু অধিবেশন দাবি করে এবং এই পুঙ্জার মধ্যে শহরের নরকায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেয়রের প্রমোদপ্রমণের সমালোচনা করে মেয়রকে চিঠি দিয়েছেন।

মারফি

মিনি মাস্টার

ভারতের প্রথম ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর



* হাম এনাইন ডিউটি সমস্ত।
অন্তান্ত টায় বতর।

টাকা ২১০

মারফি সর্বপ্রথম প্রকাশ!

NAS-C-34C

বাংলা চলচ্চিত্র ও কেন্দ্রের দক্ষিণ্য

শুভকর

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান গভীর সংকটের মধ্যে দাঁড়ি সংবাদ কিছুটা আশার সঞ্চার করেছে। কেন্দ্রের তথ্যমন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সঙ্গীতা বাংলার দুর্ভাগ্য প্রযোজকদের আশ্বাস দিয়েছেন যে প্রযোজক এবং ছবি-করিসেদের দ্বানন দেবার কেন্দ্রীয় সংস্থা ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশন কলকাতার একটি শাখা খুলতে মনস্থ করেছেন। আর এই সংস্থার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শ্রীকরণজিয়া, যিনি বোম্বাইয়ের "টাইমস অফ ইন্ডিয়া" গোষ্ঠীর "ফিল্ম ফোরাম" পত্রিকার সম্পাদকও বটে, সেদিন কলকাতায় বলে গেলেন যে কলকাতার একটি আরট থিয়েটার চালু করবার কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে।

ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশন গত তের বছর ধরে প্রধানত হিন্দী ছবির টাকা জোগানোর জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। পঞ্চাশ লাখেরও বেশী টাকা অনাদায়ী থেকে গেছে এমনকি দশ বছর আগে যে ছবির জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল এরকম যোল

খানা ছবি শেষ করাই হয়নি। যে সব ছবি তৈরী হয়েছে সেগুলো তৈরী করতে গড় সময় লেগেছে পাঁচ বছরের ওপর। এছাড়া তৈরী ছবি প্রদর্শিত হবার ব্যবস্থা না থাকায় অর্থাৎ নিজেদের চিত্রগৃহ না থাকায় সমস্ত প্রচেষ্টাই ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার মত হয়েছে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিবেশক ও চিত্রগৃহ মালিকদের সঙ্গে কোন-মতে এগুতে উঠতে না পেরে এবং প্রথম দশ বছরে কোটি খানেক টাকা সুযোগ সন্ধানী প্রযোজকদের পাইয়ে দিয়ে দিল্লী আর বোম্বাই-এর কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যমন্ত্রণালয়ের কর্তারা স্থির করলেন যে আর বড় ঘোড়ার পেছনে বাঁজি না ধরে লস্করী পরিমাণে কমিয়ে ফেলা যাক। না কমিয়ে উপায়ও ছিল না কারণ সংসদে অনেক চেঁচামেচি শুনতে হল যে গরীব দেশবাসীর পয়সায় কিছু-চোরাকারবারীর ছবি তৈরী বিলাসিতাকে সরকার প্রদ্রয় দিয়ে চলেছেন। তাই তিন বছর আগে কর্তাদের হঠাৎ বদলে গেল মতটা।

এর কতটা শৃঙ্খলিত ফল আর কতটা ঠেলায় পড়ে তা বোঝা খুব কঠিন কি?

গত তিন বছরে মাত্র তিনটি বাংলা ছবির জন্য অর্থ দান দেওয়া হয়েছে। মোট ছবির সংখ্যা ত্রিশ-এর মধ্যে হিন্দীরই সিংহভাগ মোট সতেরটি। আর তামিল, মালায়ালম, মারাঠি, গুজরাটি ও ওড়িয়ার বাকী দশটি। এর অর্থ কি এই যে সংস্থার কর্তৃপক্ষ মনে করছেন যে একমাত্র হিন্দী ছবির ক্ষেত্রেই বণিক ধর্ম এমনই বিস্তৃত যে মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা ঋণ-এর ব্যাপারেও হিন্দী ছবিই প্রাধান্য পাবে। না কি অন্য ভাষার ছবির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সংখ্যা হিন্দী ছবির চাইতে তুলনামূলকভাবে অকিঞ্চিৎকর? যদি প্রথমটি সত্যি হয় তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে সারা ভারতের জনগণের পয়সায় বিশেষভাবে হিন্দী ছবির পৃষ্ঠপোষকতা কতটা যথাযথ? আর যদি তথাকথিত আঞ্চলিক ভাষার ছবির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সংখ্যাল্পতা থেকে থাকে

তাহলেও এই সংস্থা সারা ভারতের চলচ্চিত্রের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব পালনে যে বিশেষ সক্ষম হন নি তাই প্রমাণিত হয়। কলকাতার শাখা অফিস খুললে যদি কিছু সরাসরি হয় তবে ভালই। তবে গত তিন বছরে পর পর চারটি অল্প খরচের ছবি (এই পর্বের সূচনা করেছেন মৃণাল সেন তার "ভুবন সোম" ছবি দিয়ে) দর্শক এর আগ্রহ আকর্ষণ করতে পারায় কর্তৃপক্ষ মহলে কিছুটা আশ্বাসভূষ্টি দেখা গেছে।

পশ্চিম বাংলার মন্মথ চলচ্চিত্র শিল্পে যে অনতিবিলম্বে জোরার আসবে এটা অবশ্যই অকল্পনীয়। প্রেক্ষাগৃহ মালিকের একচেটিয়া প্রভুত্বের অবসান হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প আছে বলে মনে হয় না। আরো অনেক বেশী সংখ্যায় চিত্রগৃহ নির্মাণ এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পরিমিতািত বেশী ছবি তৈরীর অন্তর্কালে হওয়ার পরিপন্থী এব্যাপারে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সমানভাবেই উদাসীন। রাজ্য সরকার প্রাপ্য প্রমোদকর পেলেই সন্তুষ্ট। আর কেন্দ্র ফিল্মস ডিভিশন এর অবশ্য প্রদর্শনীর ছবির জন্য নির্ধারিত মাসিক অঙ্ক আদায় করে কর্তব্য সমাধা করেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্য ক্ষেত্রেও যেমন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তেমনি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাব অবস্থা আরও গোচনীয় করে তুলেছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সবগুলি সংস্থার প্রধান কর্মকেন্দ্র বোম্বাইতে হওয়ায় পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত উপেক্ষিত হচ্ছে।

ফিল্মস ডিভিশন সারা ভারত জুড়ে ছবি বাধ্যতামূলকভাবে দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল স্ফীত করছেন কিন্তু কলকাতার ছোট ছবিকরিসেদের অসুবিধার দিকে কখনও দৃষ্টি দেন নি। গত পাঁচ ছয় বছর ধরে আমরা শুনে আসছি যে এই সংস্থার কাজ বিকেন্দ্রীকরণ করে কলকাতার পূর্ব অঞ্চলে সরকারী ছবি তৈরীর প্রধান কেন্দ্র করা হবে। কিন্তু কাগজে আশ্বাস ছাড়া বেশী কিছু এগোয়নি। কেন্দ্রের আর একটি একটি সংস্থা চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। গত পনের বছরে এই প্রতিষ্ঠান গড়িগড়ি বাংলা ছবি প্রযোজনা করেছেন আর অদৃষ্টের এমনই ফের যে কোনটিই এ তত্ত্বাটে নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়নি। আবার টেলিভিশনের কথা ধরুন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে দিল্লীর পর বোম্বাই কলকাতায় এই বছরে একই সঙ্গে টেলিভিশন চালু করা হবে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল বোম্বাই পূর্ণা এমনি কি শ্রীনগরও অগ্রাধিকার পেল। কিন্তু কলকাতার টি ভি দ্ব বছর পেছিয়ে দেওয়া হল। দিল্লী বোম্বাইতে ফিল্মস ডিভিশন সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহ তৈরী করেছে সরকারী ছবি দেখাবার জন্য। কলকাতার জন্য মন্ত্রী ও

বড় আমলারা গত পাঁচ ছ বছর ধরে ছেঁদো কথার জাল বুনছেন। এই মন্ত্রনালয়ের বড় আমলাদের মধ্যে কিন্তু গত কয়েকবছর আবার বাঙালীদেরই প্রাধান্য।

কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে পশ্চিমবঙ্গ এখন পরিচালিত হচ্ছে। তাই হয়ত শিল্প বাণিজ্য, নগর উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যাপারের মত চলচ্চিত্র বিষয়েও কেন্দ্রের উৎসাহবাজ্যক উক্তি শোনা যাচ্ছে। এর কতটা কাজে রূপায়ণের জন্য আর কতটা শৃঙ্খলিত জন-সংযোগের উদ্দেশ্যে ফাঁকা কথার ফুলঝড়ি সেটা প্রমাণিত হতে বেশী দেরী হবার কথা নয়। গত দু দশকে দিল্লীর কর্তারা শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প বাণিজ্য, নগরউন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং জনসাধারণের সামান্যতম প্রয়োজনের জন্য যা করেছেন তার সাক্ষ্যপ্রমাণ চোখের সামনেই রয়েছে। আর বাঙালী শিল্পপ্রতিভার অভিব্যক্তির একটি প্রধান উৎস যে চলচ্চিত্র সেই ক্ষেত্রেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সাক্ষাৎ প্রদ্রয় নিছক অর্থলোভী, অশালীন একদল শাসীলো ব্যক্তি তরুণ সমাজকে কুরচি ও যৌন বিকারের এক অন্ধকার বিবরে ঠেলে দিচ্ছেন।

খোকা বোস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লাখি, তার পরে কী দিয়েছিল বুঝে নিন। কারণ যে খোকাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল সে মৃত।

ঘটনার সবচেয়ে করণ এবং কৌতুককর অংশে এবারে আসছি। খোকার বাবা গিয়ে যখন হাসপাতালে মৃতদেহটা ফেরৎ চাইল তখন পুলিশ তার নাম জানতে চাইলে ভদ্রলোক যখন জানালেন যে, তার ছেলের নাম খোকা বোস। তখন সেখানকার পুলিশ খেঁকিয়ে উঠল—খোকা বোস এখানে কেউ নেই, আমরা খোকা চক্রবর্তীকে নিয়ে এসেছি। এবারে ভদ্রলোক একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললেন যে, তিনি যখন বোস এবং মৃতদেহটি বেছে ছেঁতার ছেলের সেইহেতু এ খোকা বোস—খোকা চক্রবর্তী নয়। এবারে পুলিশের বোকা হওয়ার পালা।

যাদবপুরের নতুন ও সি যিনি বরানগর না কাশীপুর থেকে সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছেন, তিনি নাকি বলে দিয়েছেন যে, ওয়ারেন্ট যাদের নামে আছে তাদের দেখান মাত্র গুলি করবে। অফিসারদের কর্তব্যপরায়ণতার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি আমরা রাজ্যপাল ডায়াস এবং তস্য তালবর চীফ সেক্রেটারিকে উপহার দিচ্ছি।

স্বপ্ন ও সংকল্পের অন্তরায় দূর হোক

আকাশে হালকা মেঘের আসেজ।
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার স্বপ্ন।
আপনাদের সেই স্বপ্নকে সফল করার সংকল্পে
আমরা রেলের দু লক্ষ মানুষ অটল।
সমস্ত ন্যায় ও নীতির পরিপন্থী
কিছু মানুষ আজ আপনাদের ও
আমাদের অনেক স্বপ্নের অন্তরায়।
ওরা রেলের তার, কামরার আলো পাখা ও অন্যান্য সরঞ্জাম
চুরি করে বারবার বিখ্যাত করছে
ট্রেনের নিয়মিত চলাচল।
এতে শব্দ বাতী হিসেবে আপনারাই বিপদাপন্ন নন।
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও এর ফলে বিপর্যস্ত।
এরা সমস্ত সুস্থবৃত্তি মানুষের শত্রু।
আপনাদের সকলের সহযোগিতায়
এদের হীন চক্রান্ত ব্যর্থ হোক।

পূর্ব রেলওয়ে



সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মার্গা ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজ্য সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১০ থেকে মদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১০ দপণ কাৰ্যালয় থেকে প্রকাশিত

দপন

১৪শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা ৥ শ্রুতবার ১৫ই অক্টোবর ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

এবারের বন্ধের চেহারা ও চরিত্র আলাদা

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

বন্ধবাদের পশ্চিমবঙ্গ বন্ধ-শ্রমজীবী জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে একটি রাজ-নৈতিক প্রতিবাদের প্রকাশ। সেই হিসাবেই এই বন্ধের গুরুত্ব—এ কেবল পশ্চিমবঙ্গের জন বরখাস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম-চারীদের পদনবহালের দাবীতেই সংগঠিত হয় নি। সেই পারিপ্রেক্ষি-তেই এই বন্ধ আংশিক হলেও এর তাৎপর্য আছে।

এই বন্ধ কতটা আংশিক সেই সম্পর্কে মতভেদ আছে—উদ্যোক্তা এবং সমর্থকরা অবশ্যই সাফল্য বিষয়ে অত্যাশঙ্কিত করে পারেন, আর বিরোধীরা ব্যর্থতার কথা ঘোষণা

করে উৎফুল্ল। তবে ধর্মঘট অন্য-বারের তুলনায় অন্য ধরনের—এর চরিত্র আলাদা এবং এবারের বন্ধের সমর্থন ও বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের রাজনীতির ছবি প্রকাশিত হতে শুরুর হয়েছে।

বন্ধের দিন অনেক বছর পরে এই প্রথম শহরে ট্রাম-বাস চলল বিশেষ নির্বাচিত রুটে। প্রতিটি ট্রাম-বাসে বাইরে থেকে আনা ড্রাইভার, কন্ডাক্টর নেই। এই প্রথম বিনা ভাড়ায় শহরে ট্রামবাসে যাতা-য়াতের সুযোগ দেওয়া হল। প্রতিটি গাড়ীতে সাদা পোষাকের রিভলবারধারী পলিশ পাহারা, আর নব কংগ্রেসের তরুণ নব সমর্থকের দল।

সকাল থেকে এই সমর্থকের দল ট্রাম-বাসের সমস্ত আসন দখল করে বসে থেকে মোড়ে মোড়ে জমাট বাঁধা লোকজনকে দেখাতে লাগল যে, ট্রাম-বাস চলছে, আর যাত্রীরাও যাতায়াত করতে পারেন ইচ্ছা করলে। মানুষের আস্থা ফেরানোর চেষ্টা। বন্ধ উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে পূর্বে ঘোষণানুযায়ী এবারের বন্ধ সমর্থনে কোন পিকিটিং করা, বারণ ছিল, এমন কি এ সম্পর্কে প্রচার পর্যন্ত।

আজকের শ্রমজীবী মানুষ বোকা নয়, তারা দেখলেন যানবাহ-নের যাত্রীরা বদল হচ্ছে না। ট্রাম, বাস অফিস পাড়া পর্যন্ত মাঝ পথ থেকে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে, যাত্রীর সিটে সেই একই মুখ। তারা ব্যাপারটা বঝলেন।

শহরে ট্রাম, বাস মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার গাড়ী স্বাভাবিক দিনে যাতায়াত করে। এ দিন কিন্তু বেলায় দিকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সরকারী হিসেব মত আড়াই শোর মত গাড়ী ছিল। অর্থাৎ শতকরা প্রায় সতের ভাগ। তাও আবার এই সমস্ত ট্রাম-বাসের সব কর্মচারীরা কাজে আসেন নি, চালান হয়েছে অনেক বাইরের লোক দিয়ে।

অর্থাৎ বলা যায় যানবাহনের ক্ষেত্রে চারভাগ বন্ধ ছিল আর এক ভাগ চালান। এই অনুপাত কলকাতা ও শহরতলীর অফিস

চীফ সেক্রেটারী ক্ষমতা অপব্যবহারের নতুন নজীর সৃষ্টি করলেন

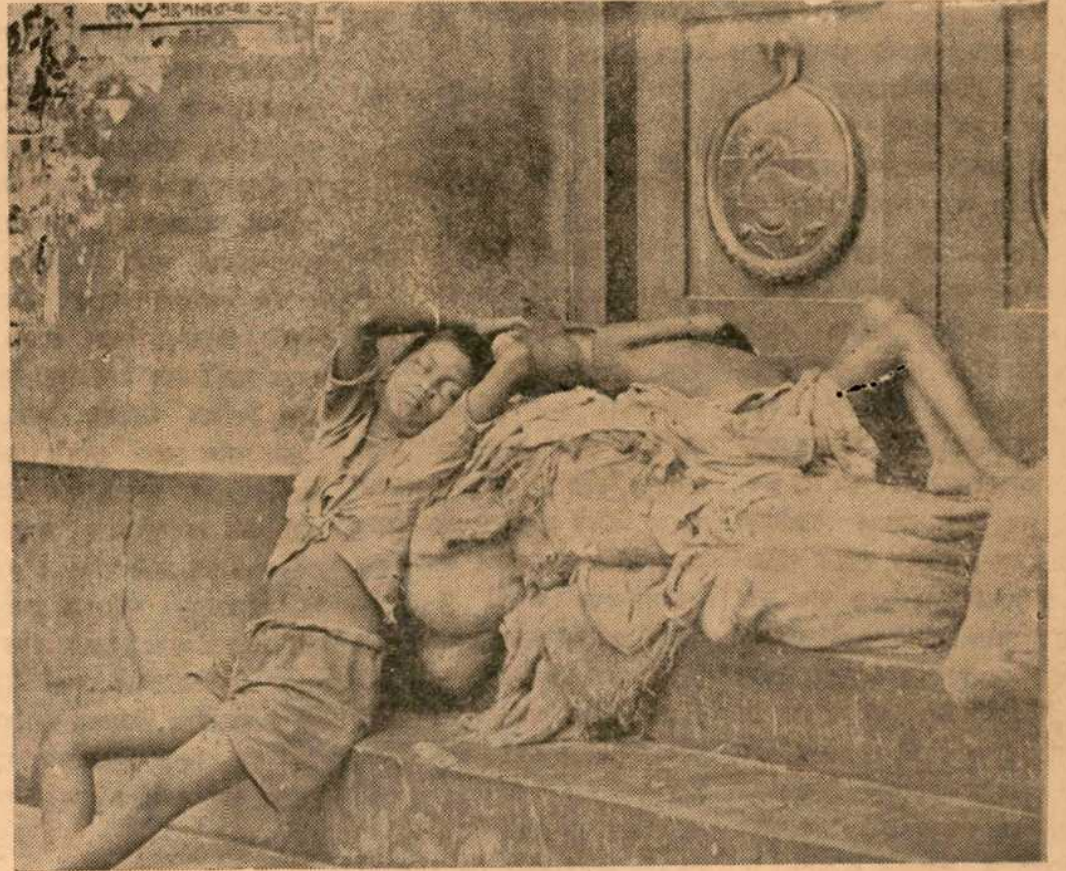
(দর্পণের সংবাদদাতা)

ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি নতুন নজীর সৃষ্টি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী এন সি সেনগুপ্ত। উনি থাকেন দক্ষিণ কলকাতার আলি-পুরে বর্ধমান রোডে। সেজন্যে পলিশকে আদেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ ঠিক গাড়ী বর্ধমান রোড থেকে ডালহৌসী যাবে আর ফিরে আসবে ততক্ষণ পূর্ব দিক থেকে বর্ধমান রোডে কোনো গাড়ী ঢুকতে পার-বেনা। চীফ সেক্রেটারীর এই আদেশ কার্যকরী করার জন্যে এখন বর্ধ-মান রোডের মোড়ে প্রতিদিন চার-

জন পলিশ মোতায়ন থাকছে। অন্যদিকে বর্ধমান রোডের বাসিন্দা এবং বেহালা যাতায়াতকারী মোটর আরোহীরা তারস্বরে চীৎকার করে যাচ্ছেন। কিন্তু চীফ সেক্রে-টারীকে সংযত করবে কে? রাজস্ব তো ঠিকই এখন।

চীফ সেক্রেটারী থাকেন বর্ধমান রোডে পোর্ট কমিশনারের চেয়ার-ম্যানের বিরাট বাড়ীতে। নতুন চেয়ারম্যান কে কে রায় তাঁর যৌ-পন্ন পার্কের বাড়ীতে থেকেই

চেয়ারম্যানী করছেন। এই সুযোগে এন সি সেনগুপ্ত পোর্ট কমিশনারের কোয়ার্টারে থাকছেন। কোয়ার্টার থেকে বর্ধমান রোডে বেরিয়ে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে ডায়মন্ডহারবার রোড। ঐ রাস্তা দিয়েও ডালহৌসী আসা যায়। কিন্তু এন সি সেনগুপ্ত তো হেঁজপেঁজ লোক নন। তাঁর গাড়ীকে আলীপুর বেলভেডিয়ার দিয়ে যেতেই হবে। নইলে আভি-জাত্য থাকে না। কেননা প্রায় প্রতিটি বাসিন্দার দৃষ্টিতে গাড়ী আছে।



কলকাতার একটি পরিচিত দৃশ্য

হাওড়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সন্ত্রাস

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বেশ কিছুদিন যাবৎ হাওড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়ম হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন আহত ও নিহত। এছাড়া, পলিশের বিরুদ্ধে সাধা-রণ মানুষের উপর নিপীড়ন ও অবিচার করার অভিযোগ তো রয়ে-ছেই। বর্তমানে কয়েক ক্ষেত্রে পলি-শের সন্দেহজনক আচরণে শিবপরে রামকণ্ঠপুর এলাকার সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। বিশ্বস্ত মহ-লার খবর হলো, হাওড়ায় নতুন করে গণ্ডগোল সৃষ্টি করার অপ-চেষ্টা শুরুর হচ্ছে। ইদানিং শিব-পুর থানার ও সি বিনয় বর্মণের জাঁপে যাব কংগ্রেসের এক নেতা ও অন্যান্য কয়েকজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। এদের সহ-কর্মীদের অতীত কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত এমন অনেক মান-বই পলিশের সঙ্গে এদের এত ঘনিষ্ঠতা ভাল চোখে দেখছেন না। ইতিমধ্যে, কয়েকদিন ধরে বিনানী, রেমিংটন ইত্যাদি কয়েকটি কার-খানার কর্মীদের নানারকম প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে।

আদালত কারখানা ইত্যাদি চালু থাকার ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন যানবাহনে লোকজন অলপই ছিল, তেমনি খোলা অফিস ও কারখানায় কর্মচারীর সংখ্যাও।

হাওড়া, দর্গাপুর, আসান-সোল, চব্বিশ পরগণা, উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি সব জায়গাতেই বন্ধ আংশিক। লোকজন অনেকে এসেছে আবার ততোধিক আসেন নি। অন্যান্যবার বন্ধের ঘটনায় অবশ্যই বন্ধ এবারের থেকে বেশী পরিমাণ সফল হয়েছে, কিন্তু এবারের রাজ-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি বন্ধ শতকরা ষাটভাগও সফল হয়ে থাকে তবে তার মূল্য কম নয়।

একটা ব্যাপার বন্ধ সমর্থক ও বিরোধীদের কাছে পরিষ্কার যে, নব কংগ্রেসীদের তরুণ সমর্থকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, এবং ঐ দলের তরফ থেকে আরও চেষ্টা হবে তরুণের সক্রিয় সমর্থন বাড়ানো। বিভিন্ন জায়গায়, অফিস আদালত, কাছারীতে কয়েকটি পাড়ায় এই তরুণ সমর্থকের দল এগিয়ে এসেছে বন্ধ বিরোধিতায়। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সর-

কারী অফিসে তরুণ সমর্থকেরা ধর্মঘটীদের শূন্য চেয়ারে গিয়ে বসেছেন, শোনা যায় এমন কি খোদ রাইটার্স বিল্ডিং-এও। কোন কোন অঞ্চলে আবার কর্মচারীদের বাড়ী থেকে তুলে আনা হয়েছে অফিসে কাজ করার জন্য। অন্যান্য অনেক জায়গায় শাসন হয়েছে যে ধর্মঘটী-দের সম্পর্কে পরে “উপযুক্ত” ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধর্মঘট বিরোধিতায় এই সক্রিয় কর্মসূচী সত্ত্বেও কিন্তু বন্ধ, দ-একটি ঘটনা বাদ দিলে, মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই সংঘটিত হয়েছে বলা যায়। কারণ ধর্মঘট উদ্যোক্তারা আগে থেকেই এই ধর-ণের সক্রিয় বিরোধিতা ঘটতে পারে এই ভেবে সমর্থকদের নিবৃত্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে সংঘর্ষ হয় নি।

তবে, দক্ষিণদাড়ির ব্যাপারটা একটু গোলমালে। স্বয়ং পলিশ কর্তা প্রসাদ বসু মহাশয় বলেছেন যে, কংগ্রেসীরা এখানে একটু বেশী বাড়াবাড়ি করেছে। এ অঞ্চলে বার্ড কোম্পানীর লোকজনের কয়েকটি বসতিতে কেউই কাজে যায় নি।

(শেখাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

নন্দিনার ছেলের ভালই হিলে হল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সং-পতি মন্ত্রী হয়েই তাঁর বেকার ছেলের সন্ধান করিয়েছেন। সর-কারী ক্ষমতাকে ব্যবহার করে শ্রীমতী সংপতি তাঁর ছেলেকে আমেরিকান কোম্পানী ইউনিয়ন কারবাইড অব ইন্ডিয়ান একটি উচ্চ পদে নিয়োগ করিয়েছেন। ইউ-নিয়ন কারবাইড কোম্পানীও বোকা নয়। তারা এই মন্ত্রিপুত্রকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার পদে বসিয়েছে। আশা, মায়ের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ছেলে কোম্পানীর আরও ব্যাটারী তৈরীর লাইসেন্স যোগাড় করে দেবে।

শুনছি, নন্দিনীর এই ছেলেরিট এখনও বি, কম পাশ করেনি।

মতামত

সরকারের ক্যাসীবাদী আক্রমণ

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকে সরকার যে ভাবে তার কর্মচারীদের উপর হিংস্র আক্রমণ শুরু করেছিল তা ক্রমেই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আছে। বিশেষ করে সরকারী কর্মচারী সমিতি সদস্যদের সমন্বয় কর্মিটির অনঙ্গমীদের উপর এই আক্রমণ অনেক বেশী। ইতিমধ্যে পদলিখের হাতে এবং পদলিখের চক্রান্তে সমাজ বিরোধীদের হাতে এই সমিতির বহু কর্মী প্রাণ দিয়েছেন। আজ পশ্চিম সরকারী কর্মচারীরা যেটুকু সংযোগ সুবিধা পেয়েছেন তা সরকার স্বেচ্ছায় দেয়নি আন্দোলনের মাধ্যমেই আদায় করতে হয়েছে। পে-কমিশনের রায়কে সরকার কোন সময়ই মানতে চাননি, যেটুকু মেনেছে তা কর্মীদের ব্যাপক ধর্মঘট ও আন্দোলনেরই ফল।

মত লোকই কি আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তার গ্যারান্টি?

ডায়াস সাহেবের জেনে রাখা ভাল পশ্চিমবঙ্গের ইচ্ছে করলেই সব কিছু করা যায় না। মহীশূরের বর্তমান রাজ্যপাল ধর্মবীর্যর কাছ থেকে আপনি এ বিষয়ে অনেক কিছু জ্ঞানতে পারবেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি সমন্বয় সমিতির নেতাদের বরখাস্তের আদেশ দিয়েছেন সরকারী কর্মচারীরা তা ব্যর্থ করে দিতে বন্ধপারিকর, উপায়সূত আপনার আদেশ সরকারী কর্মীদের অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জনৈক সরকারী কর্মচারী

কেন এই তারতম্য

বিগত সাতই সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় শিয়ালদহ স্টেশনে হঠাৎ তুমুল হট্টগোল। কিছুক্ষণ পরে জানা গেল ওটা হট্টগোল নয়, আন্দোলন। ছাত্র পারিষদের (নব) কর্মীরা ষাটী সাধারণের দাবী দাওয়ায় ভিত্তিতে “কাউন্টার ব্লকট” অর্থাৎ টিকিট না কেটে ট্রেনে চড়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন। পরদিন যখন খবরটি তথাকথিত বাজারী পত্রিকা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হোল, তখন জানা গেল ছাত্র পারিষদের এই আন্দোলনের ফলে সরকারের ছত্রিশ হাজার টাকা লোকসান।

যদিও সাধারণত ষাটীরা ঠিক মত ট্রেন না চলার কারণে অনেকেই টিকিট কাটকে দায়িত্ব মনে করেন না, তাই, রেলকর্তৃপক্ষের লোকসানের সূচনা অনেক আগে থেকেই।

অশ্চর্য ব্যাপার, কিছুদিন আগে এই ছাত্র পরিষদের কর্মীদেরই সাদা পোষাকে টিকিট আদায়ের জন্য চেকার বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর সে জন্য সেদিন অনেক ষাটী তাদের শিকার হয়েছিলেন। তাই সমাজবাদী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রশ্ন : আজ টিকিট আদায়ের আন্দোলন, কাল টিকিট ব্লকটের আন্দোলন—এর নাম কি গান্ধীবাদ?

প্রসঙ্গত সাতাশে অগস্টের বাংলা বন্ধের দিনটিতে স্মরণ করা যেতে পারে। সরকারী কর্মপক্ষ সেদিনের সেই লোকসানের হিসাব দিলেন পনেরো কোটি টাকা। বন্ধের ঐ অভিযোগটি তুলে তারা রাস্তা পরিষ্কার করে রাখলেন। কিন্তু মাস দুয়েক আগে যখন ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের ডাকে বারো ঘণ্টার কলকাতা বন্ধ ডাকা হয়েছিল তার জন্য ক্ষতির পরিমাণ অর্ধেক না হলেও দুই তিন কোটি অনুমান করা যায়। কই

তখন তো সে সম্পর্কে সরকারের কোন বিবৃতি বা বাজারী কাগজ-গুলোর কোন সম্পাদকীয় চোখে পড়েনি। সেদিনের বারোঘণ্টা বন্ধে তো সরকারী কর্মচারীদের কোন মাইনেও কাটা যায় নি? এ তারতম্যের অর্থ কী? এই তারতম্যেরই কি অপর নাম গান্ধীবাদী ইন্দিরাজীর সমাজবাদ?

জনৈক পাঠক

বামার লরীতে যথেষ্টাচার

বামার লরি কোং শিল্প বাণিজ্য কেবল বাংলাদেশ নয় সারা ভারতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। বছর কয়েক আগে ইংরাজেরা যখন এর প্রভুত্ব ছেড়ে গেলেন তখন ভারতের অন্যতম বিখ্যাত শিল্পপতি আর পি গোয়েস্কা এর মালিক হন। কিন্তু আমরা কর্মচারীবৃন্দ আঁচরে দেখতে পেলাম যে কোম্পানী বিভিন্নরূপ ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। তার ব্যবসায় ভাঁটা পড়লো। অল্পদিনের মধ্যে এই কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ লাভজনক সংস্থাপনটি হস্তান্তরিত হলো (মালিকের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বেনামী করে)। দৈনন্দিন কাজে গ্রাহকদের সঙ্গে অপ্রীতিকর ব্যবহার, হয়রাণি, ফিরিয়ে দেওয়া, নিজেদের গদাম খালি রেখে বেশী ভাড়া দিয়ে অপরের গদামে মাল পাচার করা, অন্য প্রদেশ থেকে অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ মোটা মাইনার অফিসার নিয়োগ, সর্বশেষে প্রমিত কর্মচারীদের মধ্যে থেকে কতিপয় গুঁড়া প্রকৃতির লোক বেছে নিয়ে এদের নানারূপ প্রলোভন ও মোটা টাকা খবর দিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদ, ভয়, অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

গোয়েস্কা সাহেব এই সংস্থা নেওয়ার পর থেকেই আমরা কর্মচারীবৃন্দ লক্ষ্য করেছি তিনি প্রমিত কর্মচারী ছাঁটাইয়ের প্রতি মনসংযোগ করেছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে সুনীল দাস, প্রণগোপাল ঘোষ, জুড়ান গাঙ্গুলী প্রভৃতির নেতৃত্বে একটি গুঁড়াশাহী দল সৃষ্টি করে নানারূপ ভীতির সঞ্চার করে নির্বাদের তেরোশ লোক ছাঁটাই করেছেন। এখনও এই মালিকের ছাঁটাইয়ের পিপাসা না মেটার, যারা সিনিয়র এখনও কোনরূপ ছাঁটাইয়ের আওতা পড়ে না তাদের ঐ গুঁড়াদের দ্বারা নানারূপ ভীতি, জলদুম, অপমান, গালিগালাজ করে দৈনিক কর্মজীবন অতিষ্ঠ করে এখনই চাকরীতে ইস্তফা দেবার চেষ্টা চলেছে।

বর্তমানে আমরা উপায়সূত না দেখে অসহায় অবস্থায় সরকার এবং জনসাধারণ, বিশেষ করে ডালহৌসী স্কোয়ারে যে সব কেন্দ্রীয় সংস্থা আছে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বামার লরি প্রমিত কর্মচারীবৃন্দ

বৈতপুর অঞ্চলে সম্রাসের রাজত্ব

সংবাদপত্রে দেখলাম, মাননীয় চীফ সেক্রেটারী শ্রীএন সি সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন, আইন শৃঙ্খলা উন্নতি হয়েছে। আমরা বুঝতে পারি না এই সমস্ত আমলাদের উপর দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দিয়ে রাজ্যপাল কি ভাবে নিশ্চিন্ত থাকেন।

গত প্রায় ছয় মাস যাবৎ কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুত্র অঞ্চলে “ফ্যান্সী ক্লাব” নামক একটি ক্লাবের সদস্যরা যার অধিকাংশই সমাজবিরোধী, ক্রমাগত গ্রামীণ অর্থসংযোগ জোর জুলুম পূর্বক চাঁদা আদায়, হত্যা, লুণ্ঠন, নারীর সম্ভ্রমহানি প্রভৃতি জঘন্য ফ্যান্সীবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত কার্য কালনা থানার ও সির হাথে উপর সংঘটিত হচ্ছে। সাধারণ ব্যবসায়ী, শিক্ষক, গরীব চাষী, সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, মহিলারা অতিষ্ঠ হয়ে এলাকা ছেড়ে হয় চলে যাচ্ছেন অথবা জোর জুলুম ও ঘাসের শিকার হচ্ছেন।

এখানে হত্যা লুণ্ঠন প্রভৃতি নিত্যকার ঘটনা। কেউ এদের সমালোচনা করলে অথবা এদের বিরুদ্ধে কথা বললে—এরা তাকে হত্যার হুমকী দেখাচ্ছে ও বাড়ীতে হামলা করছে। এরা চিঠিপত্রাদি সেন্সর করছে। বৈদ্যপুত্র পোষ্ট অফিসটি এদের দখলে আছে এবং এরা কর্মচারীদের ভীতি প্রদর্শন করছে।

এই সব ছেলেদের গলায় একটি ক্রশ চিহ্ন ও হাতে লোহার বালা। এদের অধিকাংশই এখানকার অপরিচিত। অতীত লজ্জা আর আশ্চর্যের বিষয়, পদলিখ এদের প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করেছে। এই সব ছেলেরা প্রকাশ্য রাস্তায় বোমা, ছোরা, পাইপগান প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। কিছুদিন আগে এরা জামাল নামে এক সমাজসেবী জনপ্রিয় যুবককে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করে। খুনীদের জানলেও জুরে এদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে সাহস করছেন না। আমি মাননীয় রাজ্যপালের নিকট এর প্রতিকার প্রার্থনা করছি।

বৈদ্যপুত্র অঞ্চলের জনৈক মহিলা

অহিংসার নামাবলী

আজ আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব বাংলার ঘটনার গদগদ ভাব। তারা বলছেন, স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত হোক। কিন্তু কাম্মীর কিংবা হামদারাবাদের বেলায় তারা বলছেন, স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত হোক। কিন্তু কাম্মীর কিংবা হামদারাবাদের বেলায় তারা কি কান্ড করেছিলেন, তা কি আমাদের অজ্ঞাত? আজ যদি পশ্চিম বাংলা স্বাধীনতা চায়, তবে? সুতরাং ইয়াহিয়া তার নিজেদের ইউনিয়ন

নের মধ্যে বাংলাকে রাখতে চাইবে এতে আর আশ্চর্য কি?

ভারত ভাগ হবার পর থেকেই আমাদের দেশে উদ্ভাস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু পাজাবও তো ভাগ হয়েছিল, কিন্তু তারা তো রাজার হালে আছেন, যেখানে বাঙালী উদ্ভাস্তদের জন্য টিনের থালা কিংবা টিনের মগ পর্বন্ত জোটেতে পারেন না, অথচ পাজাবীদের স্টীলের বাসন মেলে কি করে? তার কারণ কি স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল? ইংরেজরা বেশী ভয় পেতো নেতাজীর জুতো মারাকে, না এলিজাবেথকে গান্ধীর রুমাল উপহারকে?

‘আসল’ কথা, কেন্দ্রীয় সরকার অহিংসার নামাবলী শতই গিয়ে দিক না কেন মন্থন খুলে গেছে। আজ কি এ কথা আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে, যে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি থানাই এক একটি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, জেলগলো এক একটা গ্যাস চেম্বার? জেল পালা-নোর ঘটনাকে জনসাধারণের চোখের সামনে রেখে সরকারের এই সদপরি-কল্পিত হত্যাকাণ্ডকে কি তারা বলবেন, “নন্ডা ভায়োলেট মার্ভার”?

শ্রীমতী দত্ত

প্রতিবাদ

আপনার “দর্পণ” পত্রিকায় গত দশই সেপ্টেম্বর একান্তর শব্দবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্র পরিষদ ভীতি প্রদর্শন করে জয়লাভ করেছে বলে কিছু ছাত্র ও অধ্যাপক অভিযোগ করেন এই মর্মে এক সংবাদ (দুই-তিন লাইন) প্রকাশিত হয়েছে।

আপনাকে জানানোর জন্য লিখি যে সে অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। আমাদের বিরোধী কোন ছাত্র সংস্থা আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করেনি। তাঁরা হয়ত বুঝেছিলেন যে এবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্র পরিষদকে পরাজিত করা অসম্ভব।

সুস্বপ্ন বিশ্বাস
সম্পাদিত

সমাজসেবী!

গত দশই সেপ্টেম্বর তারিখের দর্পণে যুব কংগ্রেস নেতা শ্রীবারিদ-বরণ দাসের সম্পর্কে একটা খবর প্রকাশিত হইতে দেখিলাম। শ্রীবারিদবরণ দাস আমার, কেবল আমার কেন কাষটি-চৌখটি সালে বাহারা শিবপুত্র বি ই কলেজে পাড়তেন তাহাদের অধিকাংশই পূর্বপরিচিত। শ্রীদাস তখন হইতেই পরম-সমাজসেবী ছিলেন। তাঁহার সমাজ-সেবায় আমরা অতিষ্ঠ হইয়া পাড়িয়াছিলাম। দঃখের বিষয় তিনি বেশীদিন ওখানে সমাজসেবা করিতে পারেন নাই। চৌখটি সালে তিনি কলেজ হইতে বহিস্কৃত হন। তখনই আমরা বহিস্কৃত ছিলাম যে কাল-ক্রমে তিনি কংগ্রেস নেতা হইয়া যাইবেন।

পি সি মজুমদার

সদ্যমুক্ত জেলবন্দীর ডায়েরী

বসুদেব মুখোপাধ্যায়

বেরবার সময় ওরা আমাকে ছাড়া আনা পয়সা আর একটা চিরকুট দিয়েছিল। স্টেশনের বাকিং কাউন্টারে সেটি দেখাতে আমাকে আমার গন্তব্যস্থলের একখানি টিকিট দিল। টিকিট দেবার সময় বাকিং ক্লার্ক ঝুঁকে জালের ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখবার চেষ্টা করছিল। সদ্যমুক্ত কয়েদীও একটি দ্রুতব্যবস্থা! আমরা মনে হচ্ছিল, ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান সকল যাত্রীই আমাকে দেখছে। কোথাও নিজেকে আড়াল করার মত স্বয়ংগা পাচ্ছিল। কারো চোখে চোখ পড়তেই অতি দ্রুত চোখ নামিয়ে নিচ্ছিলাম। চোখের পলক খুব বেশী ফেলছিল। একটা চোখ বজলেই মনে হচ্ছিল জেলে আছি। আমি যে মস্ত সেটা অবিশ্বাস্য ঠেকছিল। চেয়ে থাকলেও, লাইফার (যাবজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের জেলের ভাষায় লাইফার বলা হয়) শাদ্দুল সিং শের আলী তার কাটার আসামী বৈচারাম, অশোক নগরের অনিমেঘ, বৃদ্ধ জেলার আরও কত স্মৃতি সামনে দিয়ে পেঁজা তুলোর মত ভেসে যাচ্ছে। মার কথা মনে হচ্ছে, দিদি কি রকম আছে জানি না। ওর বিয়ে দেওয়াটা আমার কর্তব্য ছিল। ছিল, এইজন্য ভাবছি এটা বেশ স্পষ্ট বস্তুতে পারছি, আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না। ছোট ভাইটার ভাগ চিকিৎসা হওয়া দরকার। ওর নাকি শরীরে কোন একটা শিরা শক্তিরে যাচ্ছে।

স্টেশনে নেমে আমাকে সেই থানার পাশ দিয়ে যেতে হবে, যেখানে পদলিখ অফিসারের সামনে কৃত্তি দেখাবার জন্য একটা চোয়ারে কনস্টবল আমার ডান হাত মচড়ে ভেঙ্গে দিতে চাইছিল। আমার করুণ আত্ননাদে পদলিখ অফিসারটি মজা পেয়ে বলছিল, “ছিঃ ছিঃ অত অলপ কাতর হলে চলে। আপনাদের জন্য আমাদের ছেলে মেয়েবা স্কুলে যেতে পারে না। আমাদের সহকর্মীদের একে একে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, আর সেখানে এইটুকু আঘাতেই অত ভেঙ্গে পড়লেন।” আমি অনুন্নয় করছিলাম। স্যার এই হাতে করে খাই। কথা শেষ করতে পারি নি। তার আগেই পদলিখ অফিসারের সবটুকু লিখি আমায় মুখে এসে পড়েছে। জ্ঞান হ'লে, তাকিয়ে দেখি পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোককে পদলিখ অফিসার হাত পা নেড়ে কি বোঝাচ্ছেন, আর ওনারা বিস্ময় প্রকাশ করছেন। আমরা বিধবা মা দুই দাঁড়িয়ে, আজকে রেশন আনার কথা, জানিনা, কে এনে দেবে। মার মৃশটা এত শব্দে নো ছিল। আমি মার মৃশের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। বুঝলাম মা আমাকে ছাড়বার জন্য পাড়ার গণ্যমান্য কয়েকজনকে নিয়ে এসেছে। তাদের প্রভাবে যদি আমি ছাড়া পাই। এই সব গণ্যমান্য

ব্যক্তির মার সঙ্গে শব্দ দৃষ্টি বিনিময় করে বঝিয়ে দিল, তাদের কিছু করার নেই। আপনাদের ছেলে অতি ভয়ানক অপরাধে অপরাধী। মা কান্না চাপতে চাপতে থানা থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও কান্না চাপতে পারছিলাম না। বৃকে স্বপ্নগা হচ্ছে। কালকে ওদের রেলের গর্তে দিয়ে বৃকে কয়েকবার লেগেছে।

মা চলে যেতেই বাবার কথা মনে এল। জেলা হাসপাতালে বাবার অপারেশন হবে। মার বালা দরটো বিক্রী করে কোলকাতা থেকে অনেক কষ্টে গ্রুপা মিলিয়ে রক্ত কিনে এনেছি। বাবাকে অপারেশন টেবিলে তোলা হয়েছে। সব প্রস্তুত। নার্সের হাতে রক্তের বোতল। ডাক্তারের সঙ্গে চটুল মস্করা রত নার্সের হাত থেকে রক্তের বোতল সহসা মেঝের পড়ে গেল।

বাবাকে দাহ করে আসতে রাত তিনটে বেজে গিয়েছিল। সেদিন থেকেই সংসারের বিরাট জোয়ালটা আমার কাঁধে এসে বসল।

হাজতে ঘুম বলতে কিছুই হয়নি। সারা শরীরে ব্যথা আর স্বপ্নগা। তাছাড়া দরটো ওয়গন রেকার ধরা পড়ার জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করে এমন অশ্লীল আচরণ করছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের গলা দুটো দূর হাতে টিপে ধরে চিরদিনের মত নীরব করে দি। হাজতের কোণে বসে কাঁদছিল বোমার মামলার আসামী চৌদ্দ বছরের কান্দি। ওর ঘটনাটা হাজত থেকে বসেই দেখেছি। কান্দির একটা পদলিখ প্রচণ্ড পিটতে পিটতে থানায় নিয়ে এল। মার খেতে খেতেই ও প্রাণপণে বলে চলে, স্যার ওগুলো বোমা নয়, ওর একটা আমায় ছুঁড়ে মারুন। কিছু হবে না। ও তরু তরু করে পিণ্ড-প্রায় কাগজের উপরের বাঁধন খুলে দেখাল ভেতরে পাথর। ও এমনি খেলার ছলে এগুলো তৈরী করেছে। অফিসাররা নীরবে মুখ চাওয়া চাওয়া করল। কিশোর কান্দির মুখে একটা সাফল্যের উজ্জ্বলতা। আমি আনন্দিত হচ্ছিলাম এই ভেবে, যাক ও ছাড়া পেল। কিন্তু পরক্ষণেই পদলিখ অফিসারদের আচরণে বিস্ময়ের অবধি রইল না। ওরা পরস্পর আলোচনা করে ঠিক করল, শিবতলায় যে বোমা পাওয়া গেছে, সেই কেসে এই ছেলেটাকে বৃদ্ধিয়ে দেওয়া হবে।

আমাকে আগেই জানানো হয়েছিল আমি হিংসাত্মক আইনের গ্যা পি ডি এর আসামী। যেহেতু আমি (পদলিখের মতে) জনগণের শত্রু এবং শান্তিকামী জনগণের নিকট উৎপাত বিশেষ এবং আমার হিসাব্যক (!) কার্যাবলীর দ্বারা ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক সরকার বিব্রত, সেই হেতু আমাকে কোর্টে হাজির করার দরকার নেই। আমাকে সোজা জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। কালো প্রিজন্স ভ্যানটা

আসতে যা দেবী। আমাকে অনেক আগেই প্রস্তুত হতে হয়েছে। ওরা আমার কোমরে দাঁড়, হাতে হ্যান্ড-কাপা লাগিয়েছে। ঐ সব অলঙ্কার পরিয়ে আমাকে ওরা বসবার জন্য চেয়ার দিল। ও সি বিপরীত দিকে বসে। পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে গুনতে গুনতে বললো, “মশাই আপনারা পদলিখ মেরে কি আনন্দ পান, আপনারাই জানেন। চীনে কি পদলিখ নেই? নাকি আপনাদের রাজত্ব পদলিখ থাকবে না। দেশটা কোথায় যাচ্ছে, একবার ভেবে দেখেছেন। আর আপনাদের মত ক্রিমিনাল হচ্ছে মণ্ডার। ছ্যাঃ ছ্যাঃ যেনা ধরিয়ে দিল।” সহসা উনি ব্যস্ত হয়ে, ভ্রূয়ার খুলে সীজ করা চেয়ারম্যানের বই-খানা সামনে ফেলে দিয়ে ফোসলায়, “এই ত মাউ সে তুং-এর বই। কোথায় উনি পদলিখ মারতে বলে-ছেন।”

ও সির কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমার তখন ভারবর্ষের কোন এক ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের ভারপ্রাপ্ত বিচারকের রায়ের কথা মনে পড়ছিল, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পদলিখ হচ্ছে সংঘবদ্ধ অসুস্থসজ্জিত গৃহভাবাহিনী। পেছনে আই. বি ইন্সপেকটর কখন এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করি নি। সামনে এগিয়ে উনি বললেন, এখনও বলেন কনস্টবল শ্যামসুন্দরকে কে খুন করেছে। না বললে, সারা জীবনের মত জেলের পাঁচলের বাইরে আসা ঘটিয়ে দেব। পাকা অভিনেতার মতো গলা নামিয়ে আমার কানের কাছে হুখ নিয়ে বললো, “আপনার চাকরীটা যাতে যায় সে ব্যবস্থাও করছি। আপনার প্রকৃত চরিত্র যখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ জানবে, তখন আপনাকে কি আর স্কুলে রাখবে”..

প্রথমে যে ঘরটায় আমাকে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে নিয়ে এল, সেই ঘরটার নাম আমদানী ঘর। শুনলাম কেস্টবিল হল (জেলে কয়েদীরা কেস টেবিলকে কেস্টবিল বলে) তারপর নির্দিষ্ট সেলে পাঠানো হবে। ঘরের ফিরে হিংসাত্মক নিরোধ আইনের কথা মনে পড়ছে। হিংসে বড় একটা জীবনে কাউকে কারিনি কেবল সেদিন কাঁধ হাউসে সর্বিমলের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়, ওর ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম। এম এতে ওর মতো খারাপ রেজাল্ট কারোর বোধ হয় হয়নি। অনার্সও একই হাল। পড়ার চেয়ে টোকার দিকে ছিল ওর বেশী নজর। এখন কলকাতার একটা নামী কলেজে ও ইংরাজীর অধ্যাপক। আমি যেমন প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, সর্বিমল অধ্যাপক হয়েছে। সর্বিমলও বিশ্বাস করতে পারছিল না, আমি একটা স্কুলে পড়ে আছি। ওর মত খারাপ রেজাল্ট করলে, আমার বোধ হয়, আমদানী

ঘরে বসে শাদ্দুল সিং-এর কাছ থেকে, থালা-বাটি কম্বল, জেলের সম্বল নিতে হত না।

জেলের পরিভাষা বস্তুতে আমার বেশ সময় লেগেছিল। প্রথম দিনই “জোড়ায় জোড়ায় বসে পর। গুনতি হবে”। এই কথাটা বস্তুতে না পাবার জন্য শাদ্দুল সিং-এর একটা লিখি খেয়েছিলাম। অবশ্য পরবর্তীকালে আমাকে মাণ্ডার মশাই জেনে ওকে ক্ষমা করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। আর একখানা লিখি খাওয়ার ভয়ে আমি ওকে ক্ষমা করেছিলাম।

শাদ্দুল সিং একসঙ্গে, চারটে খুন করে যাবজীবন জেল খাটছে। জেলে ওর দৌর্দণ্ড প্রতাপ। যে সময় আমরা দখানা বজরার রুটি আর কুমড়োর তরকারী চিবাচ্ছি, সেই সময় আমদানী ঘরের কোণে অকালে কাঁপা ভেজে খাচ্ছে। এক ঘটি দুধ ঢক ঢক করে খেয়ে নিচ্ছে। সম্ভ্যে ছটার সময় আমাদের শোবার অর্ডার দিয়ে, ও ঘরের মধ্যে ছোট ছোট করে শরীর ঠিক রাখছিল। তারপর দরটো ছেলেকে হিচকা মেরে টেনে তুলে, শাদ্দুল বললো, “গা হাত-পা টেপ, আমি ঘুমিয়ে না পড়া অবধি টিপে ধাবি”।

ছোট ছোট ছেলেরা শাদ্দুলকে বড় ভয় করত। কখন যে ওদের মধ্যে কাউকে শাদ্দুলের প্রয়োজন হবে, সেই ভয়েই অস্থির। একুশটা খুনের আসামী শেখ আলী হল জেলের মহারাজ। জেলে খুনীদের বড় সম্মান, তার চরিত্রের অপরাধে জেলখাটা কয়েদী নতুনদের কাছে নিজেকে মার্জার কেসের আসামী বলে পরিচয় দিয়ে পাজিশন পাবার চেষ্টা করে।

সেই শাদ্দুল সিংকেও প্রাণ দিতে হল শের আলীর হাতে। একটা টুকটুক কিশোর কয়েদী নিয়ে ওদের লড়াই বেঁধে উঠল। একদিন সকাল বেলায় খোঁবখানার উন্নদের ভেতরে মুখ ঢোকানো অবস্থায় পাওয়া গেল শাদ্দুলকে। জেলার সাহেব শাদ্দুলের বিকৃত মৃগমুণ্ডল দেখে গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন।

জেলার আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করছিল, “কোন দলের? না বললে, আপনারই বিপদ হবে। যদি সি পি এম হন, তবে নকসালদের সেলে দিলে আপনার বিপদ হতে পারে। আবার যদি নকসাল হন, তাহলে সি পি এমের সেলে দিলে একই বিপদ হতে পারে।” আমি শিউরে উঠলাম। বাইরের আগুন ভেতরেও জ্বলছে।

আমাকে যে সেলে জেলার সাহেব দিলেন, নেহাতই সেখানে কয়েকজন গোবেচারা থাকে। তার মধ্যে রয়েছে একজন ব্যাস্কের কম্মী। তাকে কেন সি পি ডি এতে ধরা হয়েছে আজও সে বস্তুতে পারছে না। তার স্ত্রী আবার গর্ভবতী। ভদ্রলোক স্ত্রীর চিন্তায় পাগল, ভদ্রলোক বলছিলেন, মাও সে তুং-এর বই এর আগে কখনও পড়িনি। জেলে এসে প্রথম পড়ল। দুজনে সারাদিন গল্পগুজব করে সময় কাটাই। একদিন দপদরের খাওয়া নিয়ে দারুন গম্ভগোল বেঁধে

গেল। ডালের মধ্যে পোকা কিল-বিল করছে। অনেকেই ডাল খেয়ে বমি করল। আমরা সকলে জেলারকে ঘেরাও করলাম। জেলারের গায়ে অশোকনগরের অনিমেঘ একবাটি ডাল ছুঁড়ে মারল। চারদিকে থম-থমে ভাব। পাগলা ঘণ্টা বাজে আর কি। বারাসাতের বিনয় চাঁৎকার করে বলছে, “বসুন, আমাদের খাবার দেওয়া সম্পর্কে নিম্নম কী? শব্দে মৃগে বললে হবে না, এ ব্যাপারে কাগজপত্র দেখতে চাই।” জেলার একবার চারদিক তাকিয়ে বললো, “আমি জানি চুরি হচ্ছে, কন্ট্রাকটর খারাপ জিনিষ সাপ্লাই দিচ্ছে। কিন্তু আমি যদি কমপ্লেন করি, ওপন থেকে যদি একোয়ারী আসে, তাহলে কি এই ওয়ার্ডারদের কেউ সাক্ষী দেবে? কেউ দেবে না, দিলে তাহলে জেলের ঐ অবস্থা হত না।” হেড ওয়ার্ডার বিনয় আর অনিমেঘকে আড় চোখে শব্দ একবার দেখে নিল।

কাগজে উঠেছে বিনয় অনিমেঘ কারারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। কিন্তু নিজের চোখকে, নিজের কানকে কিভাবে অবিশ্বাস করি। দাঙ্গা লাগাবার আগে যেমন গুজব ছড়ায়, তেমনি সন্দেহ হতে না হতেই শোনা গেল, আজ জেলে একটা কিছু ঘটবে। আমাদের দ্রুত লক আপে ঢুকিয়ে দেওয়া গেল। ওয়ার্ডাররা বিনা কারণে যাকে তাকে পিটতে লাগল। কিন্তু সহজে কেউ ওদের ফাঁদে পা দিচ্ছে না। সহসা পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল। গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম। অনিমেঘ, বিনয় শেষ।

পরদিন জেলে কারো মৃগে কথা নেই। চারদিকে শোকের ছায়া। তার কাটার আসামী বেচা ওদের বড় ভাল বেসেছিল। বেচা কাঁদছিল আর বলছিল, “মাণ্ডার-বাবু, আমি অন্যান্য করছি, শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের দিনে যে কালী-বাবু, তার কাটাতো, কই তার তো কিছু হল না।”

বেচারামের মৃগে এ কাহিনী যতবার শুনি, ততবারই চমকে উঠি। ভেতরটা কেপে ওঠে। মানুষ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। কালী-বাবু ওদের দিনে রেলের ওভার হেড তার কাটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছে। আর ওদের যা দিত, তাতে ওদের পেট ভরতো না। কালীবাবু নিজের চাল ওয়গন ভর্তি কবে চালান করে, নিজের নিজের লোক দিয়ে মাঝপথে ওয়গন ভেঙে। সেই চাল গোড়াউনে ফিরিয়ে এনে রেলের কাছে ক্ষতি-পূরণ আদায় করেছে। তাছাড়া ওনাব রয়েছে মেয়ে মানুষের ব্যবসা। চারদিকে কালীবাবুর লোকেরা গ্রামা মেয়ে সংগ্রহ করে কোলকাতায় সাপ্লাই দিচ্ছে। “জানেন, মাণ্ডারবাবু কতবার ভেবেছি, লোকটাকে মেরে ফেলে নিজেরাই একটা দল করবো। কিন্তু পারিনি। অনেক সময় উনি নিজের আমাদের পদলিখে ধরিয়ে দিয়ে আবার ছাড়িয়ে আনতেন।”

(শেষাংশ স্বপ্ন পৃষ্ঠায়)

অর্থনৈতিক দর্পণ

নিদারুণ অর্থনৈতিক শোষণের দুটি চিত্র

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

সম্প্রতি দুটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান তাঁদের উৎপাদন, মজুরী ও লোক নিয়োগ সম্পর্কে কতগুলি তথ্য দিয়েছেন। একটা হল দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন, রয়েল এক্সচেঞ্জ, কলকাতা, অপরটি হল আধা সরকারী খাদি ও গ্রামোদ্যোগ এসোসিয়েশন, বোম্বে।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে দুটো প্রতিষ্ঠানই কতগুলো দাবী করেছেন; তার মধ্যে চাকুরী ও আর সংস্থান সম্পর্কে উভয়েই বড় গলায় বলেছেন। জুট মিলস এসোসিয়েশন পাটজাত পণ্য রপ্তানীর প্রথম স্থান সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যা তাঁরা বলেন নি সেটা হল মনোফ্যাক্টর হার ও পরিমাণ এবং প্রথমমূল্য শোষণের তীব্রতা, যা প্রতিটো পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল কথা।

ইন্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় তাঁদের মিলগুলির বাৎসরিক মোট উৎপাদন খরচ এরকম :

(এক) (ক) কাঁচা পাটের দাম বাবদ পাট উৎপাদকদের দিয়েছেন ২০০ কোটি টাকা

(খ) শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরী বেতন ইত্যাদি বাবদ দিয়েছেন ৫২ কোটি টাকা

(গ) ইলেকট্রিসিটি ও অন্যান্য স্টোরস বাবদ দিয়েছেন ১৬ কোটি টাকা

(ঘ) অতএব মোট উৎপাদন খরচ হয়েছে ২৬৮ কোটি টাকা

(দুই) এই উৎপাদন খরচের ওপর মনোফ্যাক্টর যোগ করে মোট উৎপাদনমূল্য দাঁড়িয়েছে ৩৬০ কোটি টাকা

(তিন) অর্থাৎ তাঁরা মোট মনোফ্যাক্টর দিয়েছেন

১২ কোটি টাকা (চার) এবং সরকারকে তাঁরা ট্যাক্স ও উৎপাদন শুল্ক ইত্যাদি বাবদ দিয়েছেন ৬০ কোটি টাকা

অর্থাৎ আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিকের গড়পড়তা মজুরী, বোনাস, চিকিৎসাবাবদ ব্যয় ইত্যাদি সব মিলিয়ে মোট পাওনা বাহান্ন কোটি টাকা বা মাথা পিছদ মাসিক একশ তিরাত্তর টাকা। এর মধ্যে সুপার-ভাইজার ও অন্যান্য উচ্চপর্ষায়ের কর্মচারীদের বাদ দিলে মজুরীর পরিমাণ মাথা পিছদ পঁচিশ শতাংশ কমে একশ চল্লিশ টাকায় দাঁড়ায়। তা দিয়েই এই দমনমূল্যের বাজারে গড়পড়তা পাঁচজনদের একটি পরিবারকে দিন গজারণ করতে হয়।

তিনশ ষাট কোটি টাকা মূল্যের পাটজাত পণ্য থেকে রপ্তানী হয় আড়াই শ কোটি টাকার সমান। বাকী একশ দশ কোটি টাকা মূল্যের পাটজাত পণ্য দেশের অভ্যন্তরেই বিক্রয় হয়।

সরকারকে যে ষাট কোটি টাকা ট্যাক্স ও শুল্ক বাবদ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আয়কর, ও কর্পোরেশন ট্যাক্স বাবদ যা দেওয়া হয়েছে তা মোট মনোফ্যাক্টর থেকে বাদ যাবে, কিন্তু বিক্রয় কর ও অন্যান্য শুল্ক তাঁরা নিয়ম মাসিক ক্রেতাদের ঘাড়ের চাপিয়ে দিয়েছেন, সেই টাকটা আসলে ক্রেতারাই দিয়েছেন।

এক কথায়, চটকলগুলির মালিকেরা এই শিল্পের অর্জিত মোট উৎপাদনমূল্য একশ চল্লিশ কোটি টাকার দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ছেইটি, শতাংশ আত্মসাৎ করে এবং শ্রমিকদের দেয় মাত্র তেত্রিশ শতাংশ বা এক তৃতীয়াংশ। নিম্ন শোষণের এই চিত্রটি প্রকাশ করে শ্রমিক কর্মচারীদের বক্তব্যকেই ইন্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন সমর্থন করেছেন।

গান্ধীবাদের কর্মকাণ্ড হিসাবে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে বলে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ এসোসিয়েশন অন্তর্ভুক্ত ফার্মার্স দিলে বিজ্ঞাপিত প্রকাশ করেছেন। ইন্ডিয়ান জুট মিলস-এসোসিয়েশনের মূল দৃষ্টি-কোণ থেকে তাঁরা যে ভিন্ন নন, তাঁরাও যে পুঁজিবাদী উৎপাদন নিয়মে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের শোষণের থেকে বিরত নন, তা এর থেকে বোঝা যায়।

এঁরা ১৯৫৫-৫৬ সালের উৎপাদন, মজুরী ও লোকনিয়োগের সংগে ১৯৬৯-৭০ সালের পরি-সংখ্যানের তুলনামূলক হিসাব দাখিল করে দাবী করেছেন যে এই সময়ের মধ্যে প্রারম্ভিকালের তুলনায়

উৎপাদন বেড়েছে খাদি শিল্পে সাড়ে চারগুণ ও গ্রামীণ শিল্পে সাতগুণ, মজুরী বেড়েছে খাদিশিল্পে চারগুণ গ্রামীণ শিল্পে সাড়ে তিন গুণ লোক নিয়োগ বেড়েছে খাদি শিল্পে শিবগুণ, গ্রামীণ শিল্পে তিনগুণ। হিসাবটা তলিয়ে দেখা যাক।

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট খাদি উৎপাদনের মূল্য ছিল মোট পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ, খাদি উৎপাদনে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ আটশ হাজার, এঁদের মোট মজুরী দেওয়া হয় তিন কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মাথা পিছদ মাসিক মজুরী মাত্র চার টাকা একষটি পয়সা। মাসে চার টাকা একষটি পয়সা গড় মজুরী দিয়ে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ এসোসিয়েশন বাহাদুরী নেবার কেরামতি দেখিয়েছেন। অথচ এই খাদি ও গ্রামোদ্যোগের নামে করদাতা হিসাবে প্রতিটো ভারতীয়কে যে টাকা মাথাপিছদ গণাগার দিতে তার উল্লেখ করার সংসাহস এই গান্ধীবাদীদের থাকা উচিত ছিল।

১৯৬৯-৭০ সালে এই খাদি উৎপাদনের মোট মূল্য পঁচিশ কোটি চৌষটি লক্ষ টাকা, কর্মী সংখ্যা এগারো লক্ষ এবং মোট মজুরী চৌষ কোটি তিরানব্বই লক্ষ অর্থাৎ মাথাপিছদ মাসিক মজুরী এগারো টাকা চৌষিশ পয়সা।

প্রামাণ্য শিল্পে ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট উৎপাদন দশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকা, কর্মী সংখ্যা তিন লক্ষ এক হাজার, মোট মজুরী তিন কোটি ষাট লক্ষ টাকা অর্থাৎ

মাসিক মাথা পিছদ মাত্র নয় টাকা ঊনষাট পয়সা। ১৯৬৯-৭০ সালে মোট উৎপাদন মূল্য সাতাত্তর কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকা, কর্মী সংখ্যা নয় লক্ষ, মোট মজুরী বারো কোটি একুশ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মাথাপিছদ মাসিক এগারো টাকা ব্রিশ পয়সা।

সাতাত্তর কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদনের মজুরী মোটে বারো কোটি একুশ লক্ষ টাকা। ইন্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন মজুরীর চেয়ে প্রায় সাতগুণ উৎপাদন মূল্য আদায় করে। খাদি ও গ্রামোদ্যোগের গান্ধীবাদী বাবাজীরাও প্রায় ছয় গুণ উৎপাদন মূল্য আদায় করে। মজুরী ও উৎপাদনের এই আকাশ পাতাল ফারাক উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়।

অর্থাৎ এই নব কংগ্রেসী সরকারের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সমাজের আসল মালিক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দৃষ্টিভঙ্গীর সংগে একদম মিলে যাচ্ছে।

ভারতীয় করদাতারা প্রশ্ন তুলতে পারেন এই খাদির তামাসা চালাবার জন্য তাদের আর কতদিন পকেট থেকে গণাগার দিয়ে যেতে হবে। মাসে চার টাকা একষটি পয়সা থেকে এগারো টাকা ব্রিশ পয়সা মজুরী দিয়ে তা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জাহির করার স্পর্ধা কবে শেষ হবে? ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই নব-কংগ্রেসী গরীবী হঠাৎ এর ফাঁকি এবার ধরে ফেলতে পারছেন, বিজ্ঞাপনের ভাঁওতা দিয়ে আর কি তাদের ভোলানো যাবে?

জেলবন্দীর ডায়েরী

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

বেচা দবার নাকি কালীবাবুকে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে বক্তৃতা দিতে দেখেছে।

কালো এ্যামবেসডরের মাইনে করা প্রাক্তন ড্রাইভার করিম আম্মাদের ঘরের কুঁজো ভেঙ্গে গেলে পাণ্টে দিত।

ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম, “বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ্যামবেসডর গাড়ী ব্যবহার হয় কেন? গাড়ীর কালো রঙের ব্যাপারটা বুঝতে পারি। কালো হলে সুবিধে হয়, লোকের চোখে পড়ে না।”

করিম এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বললো, গাড়ী কেউ কিনলে, তবে তো নাম্বার হবে। নতুন যখন তৈরী হয়, টেস্টিং এর জন্য শত শত গাড়ী হাজার হাজার মাইল ছুটে চলে। তার মধ্যে কোন গাড়ীটা কি কান্ড করতে চলেছে কে জানে। দেখেছেন তো, গাড়ী সব সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। মালিক কোথাও ধরা পড়েছে কী? ও অপ্ন মনেই বললো। সব গাড়ীর যে মালিক, সে তো সব কিছুই মালিক।

কিসের একটা ইঙ্গিত করে ও দ্রুত ঘর থেকে বাইরে চলে গিয়েছিল। একটা ডাকতি দলের ও ড্রাইভার ছিল। পুরো দলটা ধরা পড়ায় ও ধরা পড়ে যায়।

সমাজতান্ত্রিক সরকার ও আমাদের সরকারের সংগে এক জারগায় মিল আছে। উভয় সরকারই ভুল হলে স্বীকার করে, ভুল হয়েছে।

জেলার সাহেব একদিন ডেকে বললেন, আপনার রিলিজ অর্ডার

এসে গেছে। আমি ছাড়া পাঁচ ছদ্ম নামে ব্যাকের কর্মী ভুললোক আনন্দিত হলেন। আবার নিজের কথা ভেবে কাদিলেন। আমি সামান্য দিলাম, দুঃখের দিন বেশীদিন থাকে না।

থেয়াল নেই কখন গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর পথ ধরেছি। পশ্চিম দিকে সুব বিদ্যারের মুখে। মনে হচ্ছে, কেবল সুবটিকে মাংসের ঝোলে ডুবিয়ে রেখেছে।

যেদিন আমাকে পদলিখ ধরে নিয়ে গেল, সেদিন থেকে পাশের বাড়ী কুসুবাঘর উপর প্রচণ্ড প্রতি-হিংসা জেগে উঠেছিল। ভাবছিলাম, একটা লোক কত নীচে নামতে পারে, আমাদের বাড়ীটা কিনবার জন্য কি না করছে। আমি জানি আমাকে ধরানোর ব্যাপারে ওর সবচেয়ে বেশী হাত। পদলিখকে মোটা টাকা খাইয়ে - আমাদের অর্থনৈতিক জীবন শোচনীয় করে বাড়ীটা বিক্রী করতে বাধ্য করার জন্যই আমি পি, ভি এর আসামী। কিন্তু কাকে বলবো, কেউ বিশ্বাস করবে না। উনি একজন প্রগতিশীল লোক বলে পরিচিত। পাড়ার লোকেরা ওনার গণতান্ত্রিক চেতনার গর্বিত কথায় কথায় মার্কসএর কোটেশন দেন।

কিন্তু আজ আর কুসুবাঘর উপর আমার রাগ নেই। জীবনের এত বড় সম্পদ অহরণে উনি আমাকে সাহায্য করেছেন। কুসুবাঘরই আজ জেলের বাইরে থাকবেন। অপরাধ না করলে, বাইরে স্বাধীন ভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে দেওয়া খুব মনস্কল।

নির্ভেজাল সং লোকদের প্রাচীর ঘেরা অন্দরে প্রবেশ আসন্ন।

পশ্চিমবঙ্গ

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

গুলোর এই জড়তাকেই কাজে লাগাচ্ছে শাসক কংগ্রেস আর বাজারী সংবাদপত্রগুলো। সংবাদপত্রগুলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে একের বিরুদ্ধে অপরকে স্টেটমেন্টকে কাজে লাগাচ্ছে। বিভিন্নভাবে প্ররোচনামূলক আবহাওয়া সৃষ্টি করে ঐক্যের কাজে বিঘ্ন ঘটচ্ছে। নেতৃবৃন্দও জানেন এদের বজ্জাতির কথা, তবু এদের কাজে অনেকেই পারলিশিটির লোভ সামলাতে পারেন না। ফলে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মাঝে যে বিরোধ ঘনিয়ে উঠছে তারই সুযোগ নিচ্ছে শাসক কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ-ডায়াল।

আর এরই অন্যতম ফলশ্রুতি হলো, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বেপরোয়া ছাঁটাই ও বরখাস্ত আদেশ। প্রগতিশীল ইন্দিরার আমলে এসব বরখাস্ত কর্মীদের অনেকেই আদালতের বিচার পর্ষন্ত পাওয়ার অধিকার পর্ষন্ত হারিয়েছেন। যদি এসব কর্মী প্রশাসনে

মারাত্মক ধরণের অন্যান্য কিছু করে থাকেন, তবে তাদের আদালতের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করলেই তো হতো। কিন্তু শাসক কংগ্রেসের নশ্বরূপ এমনই আকার ধারণ করেছে যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের তাঁদের “অপরাধ” সম্পর্কেও কিছু জানতেও পারলেন না। আশঙ্কা আরও ছাঁটাই হবে। তবু আশ্চর্যের বিষয়, বামপন্থী দলগুলোর অনেকেই যেন চেতনা নেই। যদিও এরা কেউই বরদাস্ত করতে রাজী নন, তবু আক্রমণের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে মনে হয় এরা উদাসীন। নচেৎ অন্য কোন কর্মসূচীতে নাই বা হোক, শুধুমাত্র বরখাস্ত কর্মীদের ফিরিয়ে নেওয়ার আন্দোলনের কর্মসূচীতেই বা ঐক্য আসবে না কেন? পদলিখী অত্যাচার, গুপ্ত হত্যা ও অন্যান্য ইস্যুতে বামপন্থী দলগুলো যে ঐক্যবদ্ধ হয়নি বা হতে পারে তবে মেহনতি মানুষের উপর অকথা অত্যাচার ও নিরম মানুষগুলোর হাহাকারেই বা কেন বামপন্থী দলগুলো শাসক কংগ্রেসের ফ্যাসিস্ট মূলভ আচরণের বিরুদ্ধে এককাটা হতে পারবে না।

ভারত দর্পণ

উড়িয়া

চারটি বিধানসভা উপনির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের পরাজয় ইন্দিরার গরীব হঠাৎ এর বদল সম্পর্কে পশ্চাদপদ উড়িয়ায় জনসাধারণের মধ্যেও যে মোহ বিচ্যুতি কাটতে শুরুর করেছে তার প্রমাণ। যুক্ত-ফ্রন্ট নেতা ও মন্ত্র্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসের কাছে শাসক কংগ্রেস দলপতি বিনায়ক আচার্যের শোচনীয় পরাজয় এবং প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রেই বিরাট সংখ্যক ভোটের ব্যবধান শাসক কংগ্রেসের হাইকমান্ডকে বিচলিত করে তুলেছে।

ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সংপতি উড়িয়ায় চারটি উপনির্বাচনের দায়িত্ব সম্পর্কে ভার নিয়োজিতেন। তাঁর স্বামী দেবেন্দ্র সংপতি এম পিকে এই পরাজয়ের জন্যে উড়িয়া শাসক কংগ্রেসের কোন কোন নেতা দোষ দিয়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধী এই পরাজয়ে বেশ কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েছেন বলে দেখা যাচ্ছে। উড়িয়া শাসক কংগ্রেসকে বাতিল করে নতুন এড হক কমিটি গঠন করতে তিনি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে দশটি রাজ্য বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন হবে। এই দশটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন কতটা কমছে তার নিশানা পাওয়া যাবে। পাজাব, রাজস্থান, অন্ধ ও মধ্যপ্রদেশে ইন্দিরা কংগ্রেসকে যে পিছ হঠতে হবে, তার লক্ষণগুলি সুপরি-ক্ষুট। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হলে শাসক কংগ্রেসের ভরাডুবি হবার আশঙ্কায় ইন্দিরা কংগ্রেস নির্বাচনের নামে ভীত হয়ে পড়েছে।

সংসদীয় নির্বাচনে চমক লাগানো বিজয়ের পর ইন্দিরা কংগ্রেস এবার প্রকৃত সংকটের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। কারণ, উড়িয়ায় সব কয়টি উপনির্বাচনে পরাজয়ের পর, শাসক কংগ্রেসের জনবিরোধী নীতিগুলির সম্পর্কে মোহ দ্রুতবেগে কেটে যাচ্ছে। দত্তের বিষয়, ইন্দিরা কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে প্রকৃত বামপন্থী শিবির গড়ে না ওঠার ফলে উড়িয়ায় কুখ্যাত বিজু গুপ্তনায়ক ও স্বতন্ত্র দলের বিকল্পকেই জনতা বেছে নিয়েছে।

ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রতি মোহ-ব্রণের ফল ভারতীয় রাজনীতিতে নিদারুণ সংকটের সূচনা করতে বাধ্য।

যে সরল মানুসগুলি ইন্দিরা কংগ্রেসের মোহজাল গরীব হঠাৎ এর মিথ্যা কুহকে ভুলে ইন্দিরা কংগ্রেসকে জয়ী করেছিল, আজ নির্বাচনের পর ইন্দিরা কংগ্রেস দল যে ভাবে প্রতিপ্রতিভগ করে দমন-

পাড়ন নির্বাচনের উপায় অবলম্বন করে বিভিন্ন রাজ্যে গণআন্দোলন ও মূল্যবৃদ্ধি বেকারীর বিরুদ্ধে ঘনায়-মান বিক্ষোভকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ঠিক অতীতের কংগ্রেসী কায়দা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে তারা মোহমুগ্ন হয়ে যখন এই ভাঁওতাবাজির নব-কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতি-হিংসা নিয়ে এগোচ্ছেন, তখন ভুল করে যদি তাঁরা মূলশত্রু নব-কংগ্রেসকে আঘাত করতে গিয়ে অন্যান্য মূলশত্রু স্বতন্ত্র, জনসংঘকে প্ররোচ দিয় ফেলেন, তাহলে তার মূল দায়িত্ব ভারতের গোটা বামপন্থী সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের উপরেই বর্তাবে।

তাই সারাদেশে নব-কংগ্রেসী ভাঁওতাবাজি এবং চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও ছদ্ম বামপন্থী জোট-গুলির বিরুদ্ধে প্রকৃত বামপন্থী শক্তিকে সংহত করে এগিয়ে আসতে হবে। উড়িয়া উপনির্বাচনের এই-ই শিক্ষা।

পাজাব

পাজাব শাসক কংগ্রেসের দলাদলি এমন আকর ধারণ করেছে যে শাসক কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য দরবারা সিং তাঁর দলবল সহ প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাজীর দরবারে ধারণা দিয়ে পড়েছেন।

পাজাবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মতই রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে। বলা বাহুল্য সংবিধানের অগণতা-লিঙ্ক ৩৫৬ ধারাকে দলীয় স্বার্থে প্রয়োগ করে করে কংগ্রেস দল বহু আগেই সংবিধানের প্রতি লোকের সংশয় ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

পাজাবে নব কংগ্রেসের বিকল্প আকালী দল। গত বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাধিক্য লাভ করা সত্ত্বেও আকালী মন্ত্রিসভা নিদারুণ অন্তর্বিরোধে জর্জরিত হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। আকালী মন্ত্রীর সবাই যে ধর্মপথে বর্ধিত নন একথা ভাবার মতো কারণ দেখা দিয়েছে। মন্ত্র্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল ও অন্যান্য মন্ত্রী-দের দমননীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কমিশন বসিয়েছেন। উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আকালী দলকে কালিমালিপ্ত করে নির্বাচনী পালে হাওয়া তোলা।

দরবারা সিং চান যে বিধানসভা নির্বাচনে আকালীদের কোন অংশের সঙ্গেই-সহযোগিতা না করে শাসক কংগ্রেস যেন এককভাবে, কিছুটা সি পি আই-এর সঙ্গে আসনবন্টনে ভাগবাটোয়ারা করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অন্যদিকে ভূতপূর্ব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জৈল সিং, জ্ঞানী গরুদুখ সিং মসফির এবং পর-রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং চান যে আকালী দলের সঙ্গে একটা

বোঝাপড়া করে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন করা হউক।

সি পি আই এতে প্রমাদ গণছে। যদি শাসক কংগ্রেস ও আকালী দলের এক-ংশের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যায় তাহলে চিনির বলদ সি পি আই-কে কে পুছবে?

সি পি আই এম বলেছে যে সাধারণভাবে তারা সাম্প্রদায়িক আকালী দলের সঙ্গে অথবা প্রতি-ক্রিয়াশীল নব-কংগ্রেস বা জনসংঘের সঙ্গে কোন সমঝোতা করবে না। তবে কোন কোন আসনে নব-কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্যে তারা আকালী দলের সঙ্গে আসন বাটোয়ারা করতে পারে যদি আকালী সামগ্রিকভাবে নব কংগ্রেসকে পরা-জিত করার জন্যে দৃঢ় থাকে।

পাজাবে কৃষিজমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ নিয়েও বিভিন্ন দলের মধ্যে আলোড়ন চলছে। এখানেও সি পি আই এর আচরণ নীতিহীন ভাবে সুবিধাবাদী। সি পি আই কৃষিজমির সীমা কমানোর পক্ষে নয়

বিদেশ দর্পণ

চীনে বড় রকমের পরিবর্তন আসন্ন? চৌ এন লাইয়ের মধ্যপন্থা শক্তিশালী হচ্ছে

(দর্পণের পূর্ববক্ষক)

চীনে যে একটা বড় রকমের রদবদল হতে চলেছে তার ইংগিত পাওয়া গিয়েছিল সেই সময়েই যখন ডঃ কিসিংগার প্যাকিস্তান থেকে লুটিকয়ে পিকিংয়ে যান, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর সঙ্গে প্রায় আঠারো ঘণ্টা আলাপ করেন এবং তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর চীন সফরের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন।

সেই সময়েই এটা বোঝা গিয়েছিল যে চীন আজ আর নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চায় না এবং অর্থনৈ-তিক রাজনৈতিক কারণেই ধনতা-লিঙ্ক গোষ্ঠী বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা সমঝোতার আসতে চায়। এটাও বোঝা গিয়েছিল যে এই নীতি প্রবর্তনের মূলে আছে চীনা পার্টির মধ্যপন্থার বিশ্বাসী অংশটি যারা চৌ এন লাই-এর নেতৃত্বে নিজেদেরকে প্রধান শক্তি করে তুলতে চাইছে।

তখন থেকে আজ অবধি চীনে নিশ্চয় এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যার ফলে এ বছর পিকিংয়ে অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী কুচকাওয়াজ বন্ধ রাখা হয়। চীনে ক্ষমতার লড়াই চলছে মনে হয় না বরং মনে হয় যে উচ্চ নেতৃবর্গের মধ্যে একটি প্রচণ্ড বিতর্ক শুরুর হয়েছে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ নিয়ে। অবশ্য এ বিতর্কে যারা জয়ী হবেন তারাই ক্ষমতায় এসেছেন বলা যাবে। তবে এ বিতর্কের সূত্রপাত যেমন বহুদিন আগে তেমন এটি থেমে যাবে বলে মনে হয় না।

বলে পার্টি নেতা অবতার সিং মাল-হোয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। অথচ কেবলে তার জমির সীমা কমিয়ে দেবার দাবী জানিয়েছে।

শাসক কংগ্রেসের বিসংবাদ আপাততঃ দিল্লীর দরবারে ফলশালা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন করবেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং নির্বাচনের পর বিধানসভায় কংগ্রেস দলপতি কে হবেন তাও তিনিই ঠিক করে দেবেন। এই শর্তের ভিত্তিতে পাজাবে শাসক কংগ্রেসের উপদলীয় কলহের আপাততঃ অব-সান হয়েছে।

কিন্তু সব রাজ্যেই ইন্দিরা বিরোধী মনোভাব শাসক কংগ্রেসের মধ্যেই যে দানা বাঁধছে তার প্রমাণ ইন্দিরাজীর সনির্বন্ধ অনুরোধ ও হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও নব কংগ্রেসী হাই কম্যান্ডের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও নির্বাচনী কমিটিতে শ্রীচন্দ্রশেখ-রের জয়লাভ। রাজ্য কংগ্রেসের

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক পনেরো টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা :

৩১, মল্ল লেন, কলি-১০

বিস্কন্ধ নেতাদের গোপন সহায়তা না পেলে, চন্দ্রশেখরের এভাবে জয়লাভ অসম্ভব হত।

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী কি দেয়ালের লিখন পাঠ করতে পারবেন?

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাত থেকেই মাওয়েস নির্দেশ এবং নেতৃত্বে সব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে সেনাবাহিনী। এখন মনে হচ্ছে যে পার্টি আবার তার লুপ্ত ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস মানেই হল শত্রু লিন পিঙ্গাও নয় সঙ্গে সঙ্গে মাও সে তুংয়েসও ক্ষমতা কমে যাওয়া। তবে আবার মনে রাখতে হবে যে বর্তমান অবস্থা হচ্ছে একটি ধারাবাহিক বিতর্কের একটি স্তর এবং নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এটিও পাল্টে যেতে পারে।

তবে এ সবার ফলে চীনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় নি। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সব থেকে উল্লেখযোগ্য খবর হচ্ছে যে চীন সরকার ফরাসী ককর্দ জেট বিমান প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে এবং এ সপ্তাহেই একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল প্যারিসে এই বিমান-গুলি দেখবেন। অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁরা বিলেতের হকার সিডলী গ্রুপের কাছ থেকে ছটি ট্রাইডেন্ট জেট বিমান কিনেছেন এবং ভারী ট্রাক ক্রয়ের উদ্দেশ্যে জাপানের টয়োটা কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। ব্যাঙ্ক অব চায়না আজ পিকিংয়ের অন্যতম ব্যস্ত দপ্তর।

পুস্তক পরিচয়

পরিবর্তনের যুগে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া

(দর্পণের সমালোচক)

The turning point of Socialism—Roger Garudy

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া আজ এক পরবর্তনের মূহুর্তে এসে অপেক্ষমান। রজার গারুদীর মতে সমাজতন্ত্র এক সংকটের মূহুর্তে। দাঁড়িয়েছে যে সংকটের পরিষ্কার চিহ্ন। তিনি দেখেছেন রশ-চীনে বিরোধে, চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনালীতে। গারুদীর মতে এই সংকটের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন। বিশ্বের সব প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ আজ নিজ স্বার্থের তাগিদে মার্কসবাদকে বিসর্জন দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতন কম্যুনিজমের জায়গায় আরেকটি শক্তিশালী সামরিক-আমলা-তান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে যার একমাত্র পরিণতি নিজ দেশে একটি সামরিক একনায়কত্ব।

এই বইটি লেখার ফলে গারুদীকে ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টি দল থেকে বের করে দেয়। তাঁর মতে—“It is no longer possible to remain silence”, আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন যে অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে তাতে

আর চুপ করে থাকা যায় না। আজ যারা এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত দায়িত্ব এর সমাধান খুঁজে বের করা, যে সমাধানের উপরই নির্ভর করবে পৃথিবীর ভবিষ্যত।

গারুদী প্রথমেই নিজ দেশের সমকালীন কয়েকটি ঘটনা এবং কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ফ্রান্সে আট-ষাট সালের মে এবং জুন মাসে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের অংশীদার হিসাবে ছিলেন এক কোটি কর্মচারী, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং শেখের দিকে কৃষক সম্প্রদায়। এই বিপ্লবই প্রথম দ্য গলের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের চ্যালেঞ্জ।

কিন্তু কী হোল? কিছু দিন পরেই যে নির্বাচন হয়, তাতে দ্য গলের পার্টি বিজয়ী হয় এবং পরের বছরের রেফারেন্ডামে যদিও দ্য গল পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়; তাঁর মনো-নীত উত্তরাধিকারীই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হন। এই “প্যারাডক্স” দেখতে পাওয়া যায় বিরোধী পক্ষের মধ্যেও। কম্যুনিষ্ট পার্টি সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হয়েও ক্ষমতাহীন, কোনও

মিট্রের অভাবে একা।

কিন্তু বর্তমানের এই অনড় অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবে কে? কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া আর কেউ নয়; যে পার্টিরই একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। ফ্রান্সে কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া কোন সত্যিকারের বিপ্লবী কাজ আর কেউই সম্পন্ন করতে পারবে না। আবার এই কাজ করতে গেলে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন।

ফরাসী দেশে বিপ্লবের বর্তমান অবস্থাজনিত যে সমস্যা তা একটি বিশ্বব্যাপী সাধারণ সমস্যারই অঙ্গ মাত্র। অতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী শক্তিগুলি সংখ্যায় কম হলেও কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিও তাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। বর্তমানে এই শক্তিগুলি কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে পশা কাটিয়ে তাদের সাহায্য ছাড়াই বেড়ে উঠতে চাইছে। তাই না, অনেক সময় জেগে উঠছে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির বিরোধী শক্তিরূপে।

যেমন ধরা যাক লাতিন আমেরিকা। আজ অবাধ সেখানে একটি

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই সম্ভব হয়েছে, কিউবার। এবং সেখানে বিপ্লবী শক্তির জন্ম কমিউনিষ্ট পার্টি দেয় নি; কমিউনিষ্ট পার্টি শব্দ পরবর্তীকালে এই বিপ্লবের অংশীদার হয়। এই উপমহাদেশের অন্যত্র যেখানে সমাজ ক্রমশ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে, সেখানেও কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি নেতৃত্বে না এসে শব্দমাত্র বিপ্লবের কাজে একটি সামান্য সহায়ক হিসাবে রয়েছে। আফ্রিকাতে যেখানে জাতীয়, ঔপনিবেশ-বিরোধী শক্তিগুলি নয়া ঔপনিবেশবাদের সঙ্গে এক মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত সেখানে মার্কসবাদী দলগুলির অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। এশিয়ায়, একমাত্র ভিয়েতনাম ছাড়া, এই সমস্যাগুলি সর্বত্র প্রতীয়মান। একদিকে চীনা পার্টির বিশ্ব নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্টদের প্রায় বিলুপ্তি এবং জাপান ও ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব এই সব মিলিয়ে একটি প্রায় নাটকীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপের উন্নত দেশগুলি সম্পর্কেও কী বলা যায় যে সেখানেকার কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি সমস্ত বিপ্লবী শক্তিগুলিকে একত্র করে নিজ পতাকাতলে আনতে পারবে?

সমস্যাটি জটিল এবং পুরো-পরি না বুঝলে এর সমাধান সম্ভব নয়। আজ আমরা এক নতুন

পরিমিত মনোমুখী। আণবিক শক্তির করাস্তকরণ, মহাকাশ শ্রম এবং কমপিউটারের উন্নতির ফলে এক বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত দেখা দিয়েছে। এই ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে কী ভাবে?

এই ভবিষ্যত নির্ধারণে আমাদের কাজ হবে এই নতুন বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র ও ফলাফলের সঠিক বিশ্লেষণ, যে বিশ্লেষণ সম্ভব হয় নি মস্কো কনফারেন্সে। এই বিশ্লেষণের কাজ মনে রাখতে হবে কার্ল মার্কসের কথা, যে উপাদানকারী শক্তিগুলির উন্নতির ফলে নতুন দৃশ্য দেখা দেবে। নতুন শ্রেণী সম্পর্ক গড়ে উঠবে যার ফলে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে নতুন কায়দায় গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমান পুস্তকে গারুদী এই কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন : (এক) বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র ও তার ফলে (দুই) ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন দৃষ্টান্ত সূত্রপাত (তিন) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই দৃষ্টান্তের সূত্রপাত ও কীভাবে, সোভিয়েত, চীন অথবা যুগোস্লাভিয়ার কায়দায় তার সমাধান সম্ভব। আগামী সংখ্যার দর্পণে গারুদীর বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা চেষ্টা হবে।

কিউবার চলচ্চিত্র

মুগাঙ্কশেখর রায়

কিউবার নব্যধারার চলচ্চিত্রের ধারী কিউবার বিপ্লব। বিপ্লবের পরে কিউবার সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন ঘটে। নতুন চিন্তা-প্রবাহ জন্ম নেয় এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারা কাটিয়ে প্রচলিত ধ্যানধারণার নতুন মোড় ফেরে। চলচ্চিত্রেও এই নব্যভাবনার প্রভাব পড়ে এবং সিনেমার মাধ্যমে বিপ্লবী তত্ত্বকে কাজে লাগানোর সক্রিয় প্রয়াসে অংশগ্রহণ কিউবার বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি বড় অংশ, এবং এ কাজ তারা সর্জনভাবে সম্পন্ন করেন, মাথায় হাতুড়ি মেরে নয়, শিল্পের সমস্ত সত্য সার্থকভাবে পালন করেই। বাস্তবতার স্বৈর-তন্ত্রী আমলেই কিউবার সিনেমাজগতে এই নতুন আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল ফিল্ম ক্লাব সংগঠন ও কিছু সৃষ্টিশীল স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরীর মাধ্যমে। এই ছবি-গুলো করবার সময় হাতেকলমে কাজ করে ছবি তৈরীর কারিগরি দিকটা সম্পর্কে নির্মাতারা যেমন ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিলেন, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রচারেরও অনলস চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এদের তৎকালীন কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই ছিল গোপন এবং এবং এদের তৈরী কিছু ছবি

বাস্তবতা সরকার নিষিদ্ধ করে দেয়। এই আন্দোলনের পরোক্ষা ছিলেন সান্টিয়ানো আলভারেজ, টমাস এলিয়া এবং আরো অনেক চলচ্চিত্রবিদ ও শিল্পী। পরবর্তীকালে কিউবার চলচ্চিত্রের প্রগতিশীল বিবর্তনের ইতিহাসে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিপ্লবী শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী উদ্যোগে উনিশশ উনষাট সালে “কিউবান ইনস্টিটিউট অফ আর্ট এ্যান্ড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রী” প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে এই সংগঠনের মারফতেই কিউবার চলচ্চিত্রের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিপ্লবোত্তর দশ-বারো বছরের মধ্যেই কিউবার চলচ্চিত্র একধাপেই বয়স্ক পরিণতিতে পৌঁছে যায় এবং কাহিনীচিত্র শু-প্রামাণ্যচিত্র, চলচ্চিত্রের দুই শাখাতেই এই অসামান্য অগ্রগতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। শিল্পবোধ, সমাজ সচেতনতা ও কারিগরি নৈপুণ্য এই ত্রিধারার সুসম সম্মিলনে কিউবার চলচ্চিত্র অল্পদিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক দরবারে নিজের জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত প্রদর্শনীতে কিউবার চলচ্চিত্রের কয়েকটি বিশিষ্ট নিদর্শনের সাথে

পরিচয়ের সুযোগ হল।

টোমাস এলিয়া পরিচালিত “মেমরিজ অফ আন্ডার ডেভেলপ-মেন্ট”-এ বিপ্লব-পরবর্তী জটিল মানসিকতার বিক্ষম, বিক্ষিপ্ত চেহারা পাওয়া যায়। ছবিবনায়ক সার্জিও উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের লোক; বিপ্লবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সে অপারগ, বিপ্লবের পরে নতুন সমাজ গঠনের কাজেও সে রণছোড়, অথচ তার সমাজের অধিকাংশ লোক যখন কিউবা ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি জমাতে ব্যস্ত, সে কিন্তু দেশত্যাগী হবার কথা ভাবেই না, বরং তার কথাবার্তায় পলাতক বন্দবাসবের প্রতি অবজ্ঞাই প্রকাশ পায় বেশি। তবুও সে বিপ্লবী জনতার একজন হয়ে উঠতে পারে নি, পরিবর্তমান মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছে না তাব; অথচ আর পাঁচজন বিপ্লববিরোধী পাতি-বুর্জোয়ার মনের সঙ্কীর্ণতা থেকে সার্জিও কিন্তু একেবারেই তার এই দৃষ্টি-বুদ্ধিবাদী মনেরই আত্মপ্রকাশ। কখনো বা অতীত স্মৃতিচারণে, কখনো বা বর্তমান জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবির মধ্যে সার্জিওর বিক্ষোভ চলচ্চিত্রভাষায় আভাসিত। ছবির শেষে অবশ্য সার্জিও এক চূড়ান্ত পরিণতিতে এসে পৌঁছোন, যখন উনিশশ বাষাটি সালে মার্কিন ক্ষেপনাস্র আক্রমণের মোকাবিলায় সমস্ত কিউবা উদ্বেল হয়ে ওঠে। ঘটনাবলীর নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে সার্জিওর জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে

ওঠে। শেষ অবধি অবশ্য সার্জিও কোন রাস্তা বেছে নেয়। বিদ্রোহ, আত্মসমর্পণ অথবা নির্লিপ্ত আত্ম-কণ্ডুরণ, তার কোন হাদিস পরিচালক আমাদের দেননা, তত্ত্বগত বিচারে ছবিতে একটী দোলাচল মেজাজ দেখা যায় কিন্তু বিষয়বস্তুর ধোয়া টেপনার ক্ষতি পুষ্টিয়ে যায়, ছবি তৈরী করার কলাকৌশলে। টুকরো টুকরো, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ঘটনার ঠাস-বুনোটে তৈরী এক অখণ্ড দৃশ্য-কাব্য, আধুনিক চলচ্চিত্র-প্রকরণের দক্ষ প্রয়োগে উজ্জ্বল। বাইরের ঘটনার নাটকীয় উত্থানপতন তেমন কিছু নেই, কিন্তু মানবমনের টানা-পোড়েনের চলচ্চিত্ররূপের এরকম উজ্জ্বল উদাহরণ খুব সহজে চোখে পড়েনা। মেমরিজ অফ আন্ডার ডেভেলপমেন্ট-এ মনের অন্তরঙ্গ দিকটি যেমন প্রতিফলিত, হৃদয়-বার্তা সোলাসেব দুটি ছবি “লুসিয়া” ও “ম্যানুয়েলা” কিউবার সমাজজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে জীবন্ত দলিল। সোলাস সব সময়েই সোজাসুজি কথাবলার বিশ্বাস করেন এবং তাঁর দুটি ছবিরই বিষয়বস্তুই কিউবার বিপ্লবের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস আশ্রিত।

“লুসিয়া” ছবিতে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে কিউবার নারীসমাজের আত্মবিকাশের প্রয়াস ধরা পড়েছে। তিনটি অংশে বিভক্ত এই ছবিটির তিন যুগের নায়িকার নাম লুসিয়া। উনিবংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রো-

হের পাটভূমিকায় প্রথম গল্প, বিবর্তীয় গল্পেব সময় হচ্ছে এই শতাব্দীর তিরিশের দশক, যখন কিউবাতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসনের পত্তন হয়েছে আর তৃতীয় কাহিনী বিপ্লবোত্তর আধুনিক কিউবার নারীপ্রগতির উন্মেষকে কেন্দ্র করে রচিত। প্রতিযুগেই লুসিয়া তার সমস্যার সমাধান করেছে যুগোপযোগী ভঙ্গিতে এবং এই যুগের পাটভূমিকার ব্যবহারে সোলাসের সমাজসম্পর্কিত গভীর অন্তর্দৃষ্টি বিশেষ কবে নজরে পড়ে এবং মাধ্যমের ওপর তার অসামান্য দখলও চমকে দেবার মত। “ম্যানুয়েলা”য় ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে বিপ্লবী গেরিলা সংগ্রামের গল্প, খুব সহজ সরল ভাষায় বলা হয়েছে, কিন্তু মানবিক আবেগের চমৎকার শিল্প-সম্মত প্রকাশ ঘটেছে এ ছবিতে। ছবির গঠনরীতিতে একটা নতুন ধারার প্রয়োগ দেখা গেল।

ম্যানুয়েলা গোমেজ নির্মিত “দি ফাস্ট চার্জ অফ দি ম্যাচেতে” ছবির মধ্যে আঠারশ আটষাট সালে স্পেনের বিরুদ্ধে কিউবার বিদ্রোহের কাহিনী ভিত্তিক এ ছবি দেখে মনে হয় যে আজকের যুগের একদল ক্যামেরা রিপোর্টার যেন হঠাৎ ঐ যুগে ফিরে গেছেন এবং ঐ বিদ্রোহের একটা চিত্রায়িত ধারাবিবরণী যেন দর্শকের সামনে পেশ করা হচ্ছে। অতীত ইতিহাসের চিত্রণে সমকালীনতার অন্তর্ভবে ছবিটি দর্শকের মনে বিশেষ করে ধাক্কা দেয়।

রাজধানীর চিত্র

কেন্দ্রের সর্বোচ্চ ইন্টেলিজেন্স টেলে সাজান হচ্ছে

রমাপ্রসাদ মল্লিক

প্রধান মন্ত্রীকে নতুন করে কেন্দ্রীয় গুপ্ত তথ্য ও নিরাপত্তা বিভাগ টেলে সাজাবার কথা ভাবতে হল কেন? “জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগ” নাম দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরের এক সংস্থা সৃষ্টি করাই শব্দ নয়, বর্তমান কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স বোর্ডের অধিকর্তাকে প্রকৃতপক্ষে সরিয়ে দেওয়াই হল—যদিও নাম কা-ওলাস্তে অধ্যক্ষ বানানো হচ্ছে তাঁকে জাতীয় পদাধীশ কমিশনার। এখানে রহস্য গঢ় হচ্ছে এজন্য যে, তিনি সিনিয়র অফিসার এবং অপরাপর পদমর্যাদাগত গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রধান মন্ত্রীর খাস তত্ত্বাবধান অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-মণ্ডলীর একান্ত সচিব গোষ্ঠীর অধীনে কার্যরত “তথ্য গবেষণা এবং বিশ্লেষণ” শাখার ভারপ্রাপ্ত বিশেষ সচিব (একজন অপেক্ষাকৃত জুনিয়র পদাধীশ অফিসার) দ্বারা অতিক্রান্ত হ'লেন।

কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স বোর্ডে, বৈদেশিক এবং সামরিক গুপ্ত তথ্য আহরণে যে অপারগ এ তথ্য কয়েক বছরের ঘটনাচক্রে ধরেছে। পাকিস্তানী গুপ্তচর দ্বারা ভারতীয় এয়ার লাইনস-এর বিমান অপহরণের ঘটনাটিই কেবল এই বোর্ডের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করেনি, তারও পূর্বে উনিশশ পঁয়ষাট সালের ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষের সময় এটা স্পষ্ট দেখা গেছিল যে, পূর্বে ব্যারাকপুর, কলাইকুন্ডা এবং পাশ্চিমে যোধপুরে পাকিস্তানী বিমানবহরের আক্রমণ সঠিক সামরিক ইন্টেলিজেন্সের ওপর ভিত্তি করা। অর্থাৎ, সামরিক তথ্য সংগ্রহ তথ্য বিদেশী গুপ্তচরদের অনুপ্রবেশ নিরোধ—এই দুইয়ের কোনো কাজই উক্ত বোর্ডে করতে পারছিলনা। তাছাড়া আর্মির নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য ইন্টেলিজেন্স এবং কেন্দ্রের বিশাল অস্ত্রোপাস সম গোয়েন্দা-বিভাগ হিমালয়ী বিন্দু এদের মাঝে পারস্পরিক কার্য সংহতির অভাব দেখা যাচ্ছিল। কেবল তাই নয়, কেন্দ্রের ইন্টেলিজেন্স প্রধান বি এন মল্লিকের আমলেই বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল বিভিন্ন বিভাগীয় অফিসারদের মধ্যে রেবারেই এবং লুকোনো ল্যাগ মারামারি। হাজার আমলেও এ অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। এবার নতুন অধিকর্তা এসে কতটা সামগ্রিক দক্ষতা এবং আন্তরিকতা বাড়িয়ে তুলতে, তা নিছক জল্পনা কল্পনার ব্যাপার।

ইতিমধ্যে পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তা-বিষয়ক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। ট্রেন-উড়োনো ছাড়া অন্যান্য সাবো-তাজ এবং “বাংলা দেশ” সরকারের সূত্রে সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের হত্যার ঘটনা কেন্দ্রকে বাকিয়ে দিতে দেবী

করেনি যে, “মুক্তবাহিনী” গেরিলাদের পূর্ববঙ্গে অনুপ্রবেশের পাশ্চাত্য জবাব হিসেবে পাকিস্তান সরকার প্রতিঅনুপ্রবেশের এবং ভারতের অভ্যন্তরে গোপন যুদ্ধের ও সংগঠন মারফৎ সাবোতাজ ও সংঘর্ষের পাকা ব্যবস্থা করেছে।

এ উদ্দেশ্যে তারা কয়েকমাস পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমেরিকার সি আই এ দ্বারা পাকা-পোস্ত প্রশিক্ষণ পাওয়া গুপ্তচর এবং রাজনৈতিক সামরিক গোয়েন্দাদের পূর্ববঙ্গে আমদানী করেছে। এদের সংখ্যা বলা খুবই কঠিন; একজন বিদেশী রিপোর্টার ঢাকায় এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন এবং তার সূচনামূলক লেখা ছাপাও হয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এমনি সর্বাঙ্গিক পাকিস্তানী গুপ্ত-চর তথ্য রাজনৈতিক গোয়েন্দাদের সংখ্যা তিন হাজার থেকে ছয় হাজারের মধ্যে, তাহলে এত অধিক সীমান্ত রক্ষাবাহিনী ভারতের পক্ষে মোতামেন রাখা সম্ভব নয় যে, তাদের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ করে সীল করে বন্ধ রাখতে পারে।

তাছাড়া, তাদেরকে সাহায্য করার মত অসাধু ব্যবসায়ী (স্মাগ-লার) ও ধর্মীয় মতান্ধতার-সংকল্প-বদ্ধ সম-সম্প্রদায়ভুক্ত লোক প্রচুর বিরাজমান, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে, আসামে, ত্রিপুরায়, বিহারে, পঞ্জাবে এবং রাজস্থানে। আরও উল্লেখ-পূর্ণ বিষয় হল যে, এই সমস্ত ছদ্মবেশী, পাকিস্তানী পশ্চিম-বাহিনীর সমর্থকরা অধিকাংশক্ষেত্রে শাসক ইন্ডিকেট দলের-সঙ্গে আঁতাত রেখে চলে, কারণ তারা জানে এভাবেই রাষ্ট্রশক্তির বিরাট দণ্ডদমন হাতিয়ার—পদাধীশ, সি আর পি, গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগ এবং আধা-মিলিটারী নজর এড়ান যায়। কেন্দ্রীয় সরকার, ও শাসক দল বর্তমানে একচক্র হরণের মত উগ্রপন্থীদেরকে নিশ্চিহ্ন করা এবং বামপন্থী বিরোধীদেরকে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগে জন-সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মত স্বিমুখী অভিযানে ব্যস্ত। এতেই ক্ষমতাস্বার্থীদের সরকারী সময়, শক্তি এবং আনন্ডগিক সকল উপকরণ নিষ্পত্ত ও ব্যয়িত। তাছাড়া, রাজ-নৈতিক কারণে (লব্ধ সম্প্রদায়ের ভোট টেনে নেওয়া, বিধান সভায় বিরোধীদেরকে কোণঠাসা করা ইত্যাদি) মুসলিম লীগ, মজ-লিস-এ মুশাওয়াররাং জামায়েত ইত্যাদি বহুবিচিত্র কংগ্রেসের মৌখিক সমর্থনকারী সুবিধাবাদী রাজনৈতিকদের সঙ্গে সরকার ও সরকারী দল এখন গাঁটছড়া বাঁধা। এমনি সুবিধাসন্ধানী রাজনৈতিক পার্টির ডের কাটাও কঠিন, কেননা অপরাধকে রয়েছে ধর্ম-নিরপেক্ষতার নামে সস্তার “মুস-

লিম স্বার্থের” রক্ষাকারী হিসেবে এক নাছোড়বান্দা-ভূমিকা, যা ছাড়তে চেষ্টা করলে ধর্মীয় গোলামাল পাকিয়ে বদনাম দেবার প্রচ্ছন্ন ধমকী রয়েছে।

উনিশশ সত্তর সালের এপ্রিল মাস থেকেই কেন্দ্র একতরফা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পূর্বাঞ্চলে, বিশেষতঃ বামপন্থী দমন অভিযানের এবং ইন্ডিকেট দলের পার্লামেন্টারীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। এমনি রাজনৈতিক সার্বিকতা বা টোটালিটারিয়ানিজম আজ ইন্ডিকেট কংগ্রেসকে, ডিস্ট্রিক্টশিপে যে পরিমাণ ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয়, তারও বাড়া ক্ষমতা প্রসারের সুযোগ দিয়েছে। সি পি এম বাদে সমস্ত বামপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী

যক্ষ্মা রোগীদের মিছিল ॥ বোম্বাল হাসপাতালে অব্যবস্থা সম্পর্কে বিক্ষোভ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত পঁচিশে সেপ্টেম্বর কল-কাতা কংগ্রেসের বোম্বাল হাস-পাতালের যক্ষ্মারোগীরা মিছিল করে মেয়র শ্যামসুন্দর গুপ্তর সঙ্গে দেখা করে এই হাসপাতালের অব্যব-স্থার বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিশেষজ্ঞদের ফলে বহু রোগী চিকিৎসা শেষ হওয়ার আগেই বাড়ী চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যাদের যাওয়ার-উপায় নেই তারা পড়েছেন মহা সঙ্কটে। তাদের যে ধরণের খাবার দেওয়ার কথা তা তারা পাচ্ছেন না। মাছের টুকরো ছোট হতে হতে প্রায় নিরা-কার হওয়ার দাঁতল।

হাসপাতালে রোগী ও নার্সদের রান্না একই হেসেলে হয়। রোগী-দের মাছে ভাগ বসিয়ে নার্সরা সিংহের ভাগ নিয়ে বলে রোগী-দের মাছের; টুকরো ছোট হতে থাকে। সব মিলিয়ে জায়গাটা তীক্ষ্ণের ধরমশালা হয়ে উঠেছে।

রক্ত পরীক্ষা বন্ধ
নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করা যক্ষ্মা চিকিৎসায় অন্যতম শর্ত। কিন্তু বোম্বালের রোগীদের রক্ত পরীক্ষা হচ্ছে না। কারণ সেখান-কার প্যাথলজিস্ট বদলি হওয়ার পরে আজ পর্যন্ত তার জায়গায় অন্য কোনো প্যাথলজিস্ট বাননি। তার পরে কয়েক মাস পার হয়ে গেছে, রোগীরা কতদূর দাঁষ্ট আকর্ষণ করেছে কোন ফল পাননি।

প্রমোদে চালিয়া দিন
মেয়র গুপ্ত মহাশয় তখন ইউরোপে প্রমোদভ্রমণার্থে যাচ্ছিলেন। মহা ঋমেলায় পড়লেন তিনি। রোগীদের সন্ধান করতে

দলগুদলি হয় বিধবৃত, না হয় পরোক্ষ রূপে বশব্দদের ভূমিকায়। ফলে এক অবিশ্বাস্য রকম মাথা-ভারী দলীয় আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, যার সহযোগী উদীয়মান বিস্তৃ শিল্পপতি (শহরাঞ্চলে) এবং অতি-ধনী কৃষি-উৎপাদকবর্গ (গ্রামা-ঞ্চলে)। এই জোটের পারিগতি, শেষ পর্যন্ত হয়ে থাকে অনিবার্য আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ। আপাতভঃ বিরোধী মনে হলেও বাস্তব সত্য এই যে, কেন্দ্র স্বাধীনতায় প্রশাস-নিক লটবহর এবং দানবীয় রাজ-নৈতিক ক্ষমতার একছত্র স্বাধিকারী মন্ডলিমের গোষ্ঠীর শক্তিসংকোচ ও শক্তিসংঘর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী ফেটে বেরোচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়ি-য়েছে যে কেন্দ্রের বহু প্রতীক্ষিত ক্যাবিনেট সম্প্রসারণ আর ঘটে উঠছে না। ইন্দিরাজী কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখবেন, কাকে অন্ত-ভুক্ত করে কোন পাশ্চাত্য গুপ্তকে নিরঙ্কুশ এবং নিবীৰ্য করে দিতে পারবেন, এটা কেবল মহীরুহ সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়নি, পার্টির অন্তিম অধ্যায়ের সূচক হিসেবেও।

আজ রাজধানীতে সকল ইমেজ-সম্পন্ন দলীয় প্রভু এবং প্রশাসনিক কৈলাসবাসীরা আপন আত্ম-গর্ভস্থে নিতে উদ্ভগ, কেননা সময় তো অল্পই, যতদিন প্রধানমন্ত্রীর নেকনজর থাকে। এহেন দ্রুততাল-পটপরিবর্তনের অঙ্কে শ্রীমান ডি পি দার আজ উদীয়মান তারকা-একাধারে আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে শ্রীমান, বৈদেশিক সম্বন্ধ নিরূপক সংস্থাগুলির গঠন বিন্যা-সের রূপকার, অন্যথায় “জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের” সর্বোচ্চ নিয়ামক। বলা বাহুল্য, অনেক কেজো শর্মার এতে চোখ টাটাকে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পদাধীশ এবং ইন্টেলিজেন্স বিভাগকে কেন্দ্রের সর্বগ্রাসী পাইথন হজ্জ্ব করে ফেলতে পারবে, নয়া দিল্লীর তাই অনুমান। হিসেবে শব্দ একটু খিঁচ থেকে যাচ্ছে—রক্তের টান বড় টান বলে—প্রশাসনিক-রাজ-নৈতিক হত্যা ও দমনের বাড়াবাড়ি চলতে থাকলে, তাদের বিস্মৃতিতা বজায় থাকবে তো?

বললেন দু সপ্তাহের জন্য। রোগীরা মানতে রাজী নন। উপস্থিত কার্ডিন্সলার প্রশান্ত চ্যাটার্জী বললেন, মেয়র যখন দু সপ্তাহের সময় চাইছেন তখন তার কথা রাখেন।

দু সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। মেয়র আজো ফেরেননি। কিন্তু

অনুপূর্ণ কটন মিল বন্ধ কেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সত্তর সনের উনিশে অক্টোবর থেকে অনুপূর্ণ কটন মিলের মালিক চক্রবর্তী ব্রাদার্স কারখানার মধ্যে সি আর পি মোতামেন করে মিলের ক্রোজার ঘোষণা করেন। ফলে বাইশ শত শ্রমিক কর্মচ্যুত হন। মিলটি আর্থিক সংকটে বন্ধ হয় নি। এমনকি উৎপাদিত সামগ্রীর বাজা-রের অভাবের জন্যও ক্রোজার ঘোষণা করতে হয় নি বলে অভি-যোগ। জানা যায়, বন্ধের আগে উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্য ছিল। অভিযোগ, শ্রমিকের রক্ত জল করা মনোফা থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা নিয়ে রিজার্ভ ফান্ড করা হয়েছে। তা থেকে প্রায় দুই লক্ষ বাষাট হাজার চৌদ্দ টাকা দিয়ে শেয়ার হোল্ডারদের দশ পারসেন্ট ডিভিডেন্ট দেওয়া হয়েছে। এবং প্রায় ৩, ১০, ২০৪ টাকা ডিপ্রি-সিয়েশন দেখিয়ে উনিশশ উনসত্তর সালে প্রায় ১০ ৭১৮ টাকা লোকসান দেখান হয়।

অথচ অন্যদিকে, রিজার্ভ ফান্ডের টাকা থেকে প্রায় পঁয়ষাট লক্ষ টাকা দিয়ে কোয়েম্বটরে আরেকটি সুতাকল ইতিমধ্যে কেনা

হয়ে গেছে। অশ্রুত ব্যাপার হ'লো, মালিক গোষ্ঠী যখন আর্থিক অভা-বের অজুহাত দেখিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেন, ঠিক তখন মিলের অফিসার ও হেড অফিসের প্রয়ো-জনীয় অর্থের জন্য প্রতিমাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করতে মালিক গোষ্ঠী দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন না। শ্রমিক কর্মচারীদের মতে তাদের বোনাসের দাবী মেনে নিতে হলে মালিককে খরচ করতে হয় মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা।

অভিযোগ আরও অনেক। কারখানার উপবাসী কর্মীদের, বিভিন্ন মামলার জড়িয়ে হেনস্থা করাও শব্দ, হয়ে গেছে। এর ফলে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ কয়ে-কজন কর্মী প্রায় তিরিশ পঁয়ষাট জনকে পনেরো বোলাটি মামলায় জড়ান হয়েছে। জানা গেল, এযাবৎ যত ঘটনাই ঘটুক না কেন, শ্রমিক কর্মচারী সব সময়েই উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত। কিন্তু অভিযোগ হল, মালিক পক্ষ কিংবা শ্রমদপ্তর কোনপক্ষই ক্রোজার তুলে নেওয়ার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নন।

এবারের বন্ধের চরিত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দোকান বাজারও সব বন্ধ ছিল। তরুণ কংগ্রেসীরা এতে একটু রুষ্ট হয়ে সব কিছু খোলাবার চেষ্টায় দল বেঁধে আসেন। বেশীর ভাগই কর্মহারাগতদের দল, হাতে অস্ত্রশস্ত্র, আর পেট্রল প্রভৃতি জ্বালানি। স্থানীয় অধিবাসীরা এর আগে অনেক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন—এবারেও তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন বন্ধ বিরোধীদের মোকাবিলা করতে।

এই থেকেই সংঘর্ষের সূত্র। বন্ধ বিরোধীরা জানতেন যে, বন্ধ সমর্থকরা অবশ্যই বাধা দিতে পারেন। তাই আর সময় নষ্ট করেন নি ওরা—কয়েকটি বসতিতে আগুন জ্বলে, পটলিশ অনেকক্ষণ পরেই নিশ্চিন্ত থাকে। শেষ পর্যন্ত পটলিশ যখন এল তখন পটলিশ দলই আক্রান্ত হয়েছে, তখন পটলিশ গুলী চালায় আর জন চিল্লশেক লোক গ্রেপ্তার করে।

পারিস্কার দাড়াই হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি—এরই ছবি বন্ধের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সি পি এম প্রভাবিত সিটু আর অন্যান্য সংগঠন এবং আর এস পি পরিচালিত ইউ টি ইউ সি। শেষ মুহুর্তে সি পি এম বিরোধী কয়েকটি বামপন্থী দলের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও আলাদা বন্ধ ডাক দেন, অবশ্যই চাপে পড়ে।

তবে দেখা যায় সি পি এম-এর একক ট্রেড ইউনিয়ন যেখানে শক্তিশালী সেখানেই বন্ধ জোরদার—আর যেখানে সি পি এম অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনে আছে সেখানে বন্ধ আংশিক। অর্থাৎ অন্যান্য বামপন্থী দল বন্ধ শেষ পর্যন্ত সমর্থন করতে বাধ্য

হলেও নিজেদের প্রভাবিত শ্রমিক-কর্মচারীকে ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায় নি।

অনেকদিন থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রাজনীতির প্রভাব বাড়ছে এই রাজ্যে। সেই সূত্রেই এ আই টি ইউ সি ভেঙ্গে সিটুর জন্ম। এবং তারপর সি পি এম বিরোধিতার অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নের কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন।

এবারে যখন রাজ্য সরকার সি পি এম প্রভাবিত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের তেরজন নেতার বিরুদ্ধে সংবিধানের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বরখাস্তের আদেশ দিলেন, তখন থেকেই সূত্র হল কি করে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সি পি এম প্রভাব কমানো যায় তার চেষ্টা।

বেশীর ভাগ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন একথা প্রচারের চেষ্টা করেছে যে, এই আক্রমণ সি পি এমের বিরুদ্ধে অতএব এ ব্যাপারে অন্য দলের মাথা ব্যথার প্রয়োজন নেই। সূত্রভেদেই তাই বন্ধের প্রস্তাবে অনেক টাল-বাহানা চলতে থাকে।

সরকারী আমলারা আর দিল্লীর কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় লক্ষ্য করেন যে, সি পি এম রাজনীতির দিক থেকে কোণঠাসা হয়েছে এবং এখন এই পার্টির পক্ষে কোন সার্থক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়া সম্ভব নাও হতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাই আবার আক্রমণ এলো এবার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। মোট বহিঃ জন বরখাস্ত হল। এতে কিন্তু আন্দোলন জোরদার হবার সম্ভাবনা বাড়ল। সি পি এম বিরোধীরা ভাবতে শুরু করল যে, হয়ত আক্রমণ সি পি এম এর বিরুদ্ধেই সমীচীন থাকবে না। কিন্তু মুস্কিল হল সি পি এম-এর সঙ্গে এক প্ল্যাটফর্মে আন্দোলন করলেও বিপদ, আন্দোলনের ফলে সি পি এম-এর প্রভাবই বাড়বে। অন্যরা যে অবস্থায় সেই অবস্থাতেই থেকে যায়।

তখন সি পি এম বিরোধীদের পাশ্চাত্য সি পি আই আন্দোলনে সি পি এম-এর নেতৃত্ব খর্ব করার প্রয়াসে একটি ফরমুলা উদ্ভাবন করল। ফরমুলা : সমস্ত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন অবশ্যই যুক্ত আন্দোলনে নামবে, তবে একটি পূর্ব শর্তে, এবং তা হল সি পি এম প্রভাবিত রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতির কো-অর্ডিনেশন কমিটির হাতে কর্মচারীদের নেতৃত্ব থাকলে চলবে না—কর্মচারীদের যুক্ত আকশন কমিটি করতে হবে। এই কমিটি গঠন নিয়ে অনেক দিন ধরে জল-ঘোলা হল। কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা এ ব্যাপারে সংকীর্ণতা

অথবা কৌশলগত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

একদিকে এই নেতারা যেমন সর্বভারতীয় কর্মচারী নেতৃত্বকে কলকাতায় এনে আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ব্যাপক চরিত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে তাঁদের উচিত ছিল ছোট বড় অন্যান্য সমস্ত কর্মচারী সমিতির কাছে সব সময় চিঠি দেওয়া, লোক পাঠানো। হয়ত এই সমস্ত ছোট ছোট সমিতির কাগজে অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই নেই, কিন্তু তবুও আন্দোলনের ব্যাপকতার খাতিরে এবং কৌশলগত কারণে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের গুরুত্ব ছিল।

যুক্ত আকশন কমিটি গঠন নিয়ে অনেক গোলগোলি চলতে থাকার সময় সিটু আর সি পি এম প্রভাবিত অন্যান্য সংগঠনরা আর অপেক্ষা করতে পারে নি। তারা আটাই অকটোবর বন্ধের ডাক আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করল। সি পি আই নেতৃত্ব তখনও বন্ধের সামিল হওয়ার ব্যাপারে ঘোর বিরোধী।

এদিকে আর এস পি প্রভাবিত ইউ টি ইউ সি আন্দোলনে বন্ধের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহান ছিল। সি পি এম বন্ধ ডাকার সঙ্গে সঙ্গোই কিন্তু ইউ টি ইউ সি আর অপেক্ষা করে নি, তারাও বন্ধের অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন।

এই অবস্থায় সি পি এম বিরোধীরা আর একজোট থাকতে পারল না। আই এন টি ইউ সি আর মাখন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে হিন্দু মজদুর সভা বন্ধের বিরোধিতায় বিবর্তিত দিল। ফরোয়ার্ড ব্লক আর এস ইউ সি প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নরা শঙ্কিত বোধ করল, তারা সি পি আইকে জানাল বন্ধের সমর্থন না করলে বামপন্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আর তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না।

সি পি আই-এর রাজ্য শীর্ষ নেতারা তখন সবাই বাইরে। একমাত্র বসে আছেন সোমনাথ লাহিড়ী। বিত্তীয় শ্রেণীর সি পি আই নেতারা সোমনাথবাবুর পরামর্শ চাইলেন। সোমনাথবাবু ঘোড়েল লোক, তিনি বললেন পরামর্শ নাও কেবল থেকে টেলিফোন যোগে। টেলিফোনে পরামর্শ এল—পার্টি রাজনীতি হল কংগ্রেস সমর্থন আর সি পি এম বিরোধিতা। এই কথা মনে রেখে রাজ্য রাজনীতিতে যা কিছু করার দরকার করুন।

কিন্তু এই সময় বোম্বাই শহরে এক কাণ্ড ঘটে গেল। স্বয়ং সি পি আই চেয়ারম্যান ডাঙ্গো পার্টি কংগ্রেস ছেড়ে চলে এলেন কাপড়ের মিলে বোনাস আন্দোলন পরিচালনা করতে সরাসরি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাদিলকরের বোনাস ফরমুলার বিরোধিতায়।

এই আন্দোলনে সি পি আই আর সি পি এম যুক্ত প্ল্যাটফর্মে আর আই এন টি ইউ সি বিরোধী পক্ষে। ধর্মঘট সূত্র হল বেশী

বোনাসের দাবীতে। পার্টিট মিলের দৃ-একটি বাদে সব কটিই বন্ধ। জোরদার যুক্ত আন্দোলন।

গ্রীডাঙ্গের এই নেতৃত্ব পশ্চিম-বঙ্গে প্রভাব বিস্তার করল। যারা সি পি এম-এর সঙ্গে বন্ধ ডাকার ব্যাপারে গড়িমসি করছিল তারা বন্ধে সামিল হল। তবে শিথিল সঙ্গো—ভয় ছিল যদি এস ইউ সি, ফরোয়ার্ড ব্লক বেরিয়ে যায় তবে সি পি আই-এর কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা হয়ত কমে যাবে।

একটা ব্যাপার কিন্তু লক্ষ্যীয়। বোম্বাই আন্দোলন পরিচালনার জন্য সূত্র থেকেই গ্রীডাঙ্গো পার্টি কংগ্রেস ছেড়ে আন্দোলন পরিচালনা করতে এগিয়ে এলেন। এখানে

কিন্তু সি পি আই নেতারা কেউই সময়ের আগে ফিরলেন না।

বরং এখানে সি পি এম বিরোধী প্রচার চলতে লাগল সি পি আই দৈনিক কালান্তরে। প্রচার যুক্ত কাউন্সিল গঠনের ব্যাপারে আর দুর্গাপুরে নব কংগ্রেসীদের বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নে নেতাদের আক্রমণ করা নিয়ে।

দুর্গাপুরে নিহতদের মধ্যে ছিলেন পুরানো সি পি আই ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জিতেন চৌধুরী।

কালান্তর প্রচার করল সি পি এম-ই জিতেন চৌধুরী হত্যার ব্যাপারে দায়ী। এ প্রচার আকস্মিক নয়। এখানকার রাজনীতি এই গতিতে কয়েক বছর ধরেই চলেছে।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রবন্ধকারদের লেখা অনবদ্য প্রবন্ধ সংকলন

রক্তাক্ত বাংলা

মূল্যপত্র

বঙ্গবন্ধু ও রক্তাক্ত বাংলা। রঞ্জন

আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচী। শেখ মুজিবুর রহমান
পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তসংগ্রামের গতিপ্রকৃতি। রণেশ দাশগুপ্ত
পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ। জহির রায়হান
রাষ্ট্রভাষা ও প্রাথমিক বিদ্যুৎ। ডঃ আনিসুজ্জামান
বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। শওকত ওসমান
বাংলাদেশ স্বীকৃতি চায়। রামেন্দু মজুমদার
বাংলাদেশ পরিস্থিতি : একটি সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণ। বুলবন ওসমান
মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিক : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম। সত্যোত্তম গুপ্ত
বাংলাদেশ : অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত। মতিলাল পাল
ওদের ফেলে চলে এলাম। সত্যেন সেন
বাংলাদেশ সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি। অমৃণম সেন
দ্বি-জাতিতত্ত্বের অপব্যবহার। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
পাকিস্তানের শিক্ষানীতি। আবদুল হক
সংস্কৃতির বিকাশধারা। আহাদ চৌধুরী
বাঙালীর আত্ম-অনুসন্ধান ও লোক-ঐতিহ্যেব চর্চা। আবদুল হাফিজ
বাংলাদেশ আন্দোলন : সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র।

সৈয়দ আলী আহসান

বাংলাদেশে গণহত্যা। জাকির সাদেক

পরিশিষ্ট : ঘটনাপঞ্জী। ফেরদৌসী মজুমদার

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

সুন্দর প্রথমদিক ও মনোরম বাঁধাই। মূল্য পনের টাকা

দেশবিভাগের শুরু থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসন-শোষণ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন উনিশ জন সংগ্রামী ও চিন্তাশীল লেখক।



স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ

৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলি-৯ • ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কৃষ্ণ মজুমদার হীন্ডিয়া প্রেস ৭, 'রাজা' সড়ক মিল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে প্রদ্রষ্ট এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দপন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

দর্পন

১৪শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা ২২শ অক্টোবর ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

প্রচণ্ড দলাদলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই



(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)
পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই-এর মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল। অভিজ্ঞ, আন্দোলনে পরীক্ষিত নেতারা প্রায় বেশীর ভাগই নব নির্বাচিত জাতীয় কাউন্সিলে অথবা জাতীয় এক্সিকিউটিভ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নি। এই নিয়ে চরম দলাদলি সরু হয়েছে, আর মন কষাকষিও।
আবার অন্যদিকে পার্টির রাজনীতি নিয়েও গোলমালের শেষ নেই। কংগ্রেসের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধা নিয়ে নানা ঝামেলা। যারা পার্টির জাতীয় নীতির পক্ষে তাদের বক্তব্য : নব কংগ্রেস আন্ত-

র্জাতিক নীতিতে প্রগতিশীল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সাম্প্রতিক চুক্তি এই প্রগতিশীলতার সাক্ষ্য দেয়। যারা বিপক্ষে তাদের কথা হল : এই ধরনের চুক্তি বর্জ্যের সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত, কোন প্রগতিশীলতা থেকে নয়। হিটলারও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করেছিল, তাতে তার শ্রেণী চরিত্র অথবা আচরণ বদলায় নি।
আর তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে শত'হীন যুক্ত ফ্রন্ট পার্টির পক্ষে কল্যাণকর হবে বলে অনেকেই মনে করে না। এদের মতে সি পি আই বরাবরই

লেজুডবুস্তি করে আসছে, উনিশশ সাতষাট থেকে সি পি এম-এর, আর এবার কংগ্রেসের। নিজস্ব কোন সত্তার কথা যেন সি পি আই ভাবতে পারে না।
নীতির কথা অবশ্য পরে। জাতীয় কাউন্সিলে কেন সবাইকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র রেনু চক্রবর্তী, জ্যোতি দাশগুপ্ত, ভবানী রায়চৌধুরী কানাই ভৌমিক ইত্যাদিকে নেওয়া হল এই নিয়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে পার্টির মধ্যে।
যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁদের অনেকের গণ আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ অনেকদিন নেই (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধার্থ রায়ের ভাগ্যবি অস্তাচলগামা : সরকারে ও প্রদেশ কমিটিতে সংখ্যালঘু

(দর্পণের সংবাদদাতা)
পশ্চিম বাংলায় নব কংগ্রেসীদের খেয়োখোয়ির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। এই নতুন পটভূমিকায় সিদ্ধার্থ শংকর রায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কেউ নন এবং নব গঠিত এ্যাড-হক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যাধিক্য হারিয়েছেন। অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের সরকারে বা কংগ্রেসী সংগঠনে তাঁর আর কোনো কর্তৃত্ব নেই। এরই প্রতিক্রিয়ায় সিদ্ধার্থ রায় এখন আর কলকাতায় প্রায় থাকছেনই না, ঘন ঘন দিল্লী-কলকাতা করছেন না, বাংলা বনধের দিনে কলকাতায় ছিলেন না এবং সিমলাতে নব কংগ্রেসী এ আই সি সির মিটিংয়ের পর কলকাতায় আসেন নি। ঐ মিটিং হয়েছিল সাতই অক্টোবর।
দর্পণ এতদিন পাঠককে সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে সিদ্ধার্থ-বিরোধী গোষ্ঠীর জোর তৎপরতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিক (নব) কংগ্রেস কমিটি বাতিল করে দিয়ে এ্যাডহক কমিটি গঠন করায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষ করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে দলের একটি বড় অংশের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দেয় সম্প্রতি তারই প্রকাশ ঘটেছে সিমলা অধিবেশনে।
সিমলা প্রত্যাগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার ফলে জানা গিয়েছে যে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিশনে সদস্য নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ প্রতিনিধিই ভোট দেন ইন্দিরা বিরোধী তরফে তুর্কী চন্দ্রশেখরকে যার ফলে তার প্রায় অভাবনীয় জয় সম্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া শ্রীচন্দ্রশেখর বিপুল সমর্থন পান ওড়িশার নন্দিনী সংপথী বিরোধী বিনায়ক আচার্য গ্রুপের কাছ থেকে।
পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ বিরোধী গোষ্ঠীর জনৈক প্রভাবশালী সদস্যের মতে চন্দ্রশেখরের নির্বাচনের মাধ্যমে, “আমরা ওঁদের

হলেও এই গোষ্ঠী বোঝাতে সক্ষম হবেন যে তাঁরা কোন কিছই মদ্য বৃদ্ধে সহ্য করেন না।
এ্যাডহক কমিটিতে বি সি গাঙ্গুলীর ব্যাপারটি তোলার প্রস্তাব নাকি করেছেন যুবনেতা সুরত মদ্যজী। এটি আশ্চর্য ব্যাপার, কারণ সুরতকে পরোপদ্রি ইন্দিরা গোষ্ঠীভুক্ত বলেই সকলে জানে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে সুরত এটি করেছে অপর যুবনেতা, সমগোষ্ঠীভুক্ত প্রিয়রঞ্জন দাশমন্সীর প্রতি ঈর্ষাবশত। সংসদ সদস্য হয়ে প্রায় ক্রমাগত দিল্লীতে থাকার ফলে প্রিয় যে ভাবে “বেড়ে উঠেছে” সুরত সেটা মোটেও ভাল চোখে দেখছে না বলে প্রকাশ। সেও চাইছে প্রিয়কে একটু শিক্ষা দিতে। মনে হচ্ছে এই দুজনের কলহের ফলে যুব কংগ্রেসে শীঘ্রই ফাটল দেখা দেবে।
পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ বিরোধী এই গোষ্ঠী অন্যান্য কয়েকটি ব্যাপারেও চিন্তিত। এর একটি হচ্ছে রাজনৈতিক বক্তব্যের ব্যাপারে। এদের মতে এ রাজ্যে নব কংগ্রেস যেভাবে শূদ্রমাত্র সি পি আই (এম) বিরোধিতা কর বলে চেঁচাচ্ছে তাতে (শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

দিয়েছে, এ্যাড হক কমিটিতে সিদ্ধার্থ রায়ের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারী যন্ত্রে তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও অবস্থার রূপান্তর হয়েছে। কংগ্রেস সংগঠন থেকে সিদ্ধার্থ রায়কে ক্ষমতাহীন করেছেন বিজয় সিং নাহার, তরুণ কান্তি গোষ্ঠী। আর রাজ্য সরকারে (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সম্ভাবনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইন্দিরা সরকার কী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার কথা ভাবছেন? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং শ্রীমতীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় সম্প্রতি দু'এক জায়গায় বলেছেন বলে জানা গেছে যে এ বিষয় সংক্রান্ত আইন দেখা হচ্ছে এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি কিছ একটা ঘটতে পারে।
যেভাবে অন্যান্য সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি সহ পশ্চিমবঙ্গেও যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে তাতে এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সীমান্তে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করা হচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট কামান বসানো হয়েছে, সর্বত্র একটা সাজ সাজ ভাব। যুদ্ধ যদি নাও হয় একটা যুদ্ধকালীন অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার একটা অজুহাত পাওয়া যায়। ইন্দিরা সরকার জানে যে একবার এই ঘোষণা করতে পারলেই বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতন রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন খতম করার খেলা আরও জোরদার করা যাবে।

সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

(দপদের পূর্ববর্তক)

সাম্প্রতিককালের অশ্রুত বন্ধ গত তেরোই অক্টোবর অনশ্রুত হয়ে গেলো। বন্ধের সাফল্য অসাফল্য সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। কারণ জনগণ, উভয় তরফের দাবীদারদের কাছ থেকেই ইতিমধ্যে প্রচুর অভিনন্দন লাভ করেছেন। এছাড়া, অফিস খোলা, কর্মচারীদের উপস্থিতির সংখ্যা, বাস গ্রাম চলাচল এবং তার যাত্রী সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে কোন কথা বললেই নানা কথা উঠবে। কেউ বলবেন, বন্ধ ব্যর্থ করে দেওয়ার মূলে রয়েছে আমাদের সক্রিয় কর্মীরা, কেউ বলবেন, বাস চলাচলের কথা তো বললেন তাতে প্রকৃত যাত্রী-সংখ্যা কতজন ছিলেন বলুন তো! হয়ত অন্য কেউ আরো একটু

এগিয়ে বলবেন, ছাত্র পরিষদ, যুব-কংগ্রেসের কর্মীদের বাসে ঘ্রোমে দেখে তাদেরই সাধারণ যাত্রী আখ্যা দিয়ে বসছেন। হিসেবটা নিজে জানুন না, কত টাকা সেদিন বাসে-ঘ্রোমের টিকিট বিক্রী হয়েছিল। আর, রাইটার্সে উপস্থিত কর্মী সংখ্যা বলে যত দেখানো হয়েছে তার মধ্যে কতজনই বা যুব কংগ্রেসের কর্মী ছিল, একটু খোঁজ করে দেখুন না। এছাড়াও আরও নানা প্রশ্ন উঠবে।

প্রয়োজন নেই সেই বিতর্ক-মূলক আলোচনায় গিয়ে। বরং রাজ্যের সাম্প্রতিক কালের অশ্রুত বন্ধ কেন হল, কি পরিস্থিতিতে হল, নিজে কিছুটা আলোচনা করা যাক। গত তেরোই সেপ্টেম্বর রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের কো-

অর্ডিনেন্স কমিটির নেতৃস্থানীয় তেরোজনকে ৩১১ (২) ধারায় বরখাস্ত করা হয়। এর কিছুদিন পর অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরীর আরও বহিঃ জনকে ৩১০ ধারাতে বরখাস্ত করা হল। রাজ্যের সাধারণ মানদ-ষকে প্রথম ধাক্কা একেবারে হতবাক করে দিয়েছিলেন নবগত রাজ্যপাল এ এল ডায়াস। তবে একথা ঠিক, নাটের গুরুত্ব তিনি একা নন, সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিম-বঙ্গ বিষয়ক মন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়। পশ্চিমবঙ্গে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দরা মনে করলেন রাজ্যে এধরনের স্বৈরাচারী ঘটনা বোধ হয় এর আগে আর ঘটেনি। তাই তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, ঘনঘন সাংবাদিক বৈঠকে একের পর এক ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানা-নোর জন্যে নানাদরনের কর্মসূচী প্রচার করতে লাগলেন। রাজনৈতিক দলের নেতারাও পিছিয়ে রইলেন না, তাঁরাও বেপরোয়া ছাঁটাই ও বরখাস্তের ঘটনার নিন্দা করে একের পর এক বিবৃতি দিতে লাগলেন। ফলে রাজ্যের সাধারণ মানদ-ষও জানতে পারলেন সরকারী কর্মচারীরা সরকারের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের শিকার হয়ে ছাঁটাই ও বরখাস্ত হয়েছেন। ঘটনাটি এমন; প্রত্যেকটি মানদ-ষই দলমত নির্বিশেষে এর নিন্দা করলেন। এমনকি রাজভক্ত রাজনৈতিক দলগুলো ও কর্মচারীসংস্থাও ঘটনার বিরোধিতা না করে পারলেন না।

তবু রাজ্যের সাধারণ মানদ-ষের মনে একটা প্রশ্ন উঠছে, কই, তত বিক্ষোভ ও বিক্ষুব্ধ মানদ-ষের সোচ্চার প্রতিবাদকে তো কোন সাংগ-ঠনিক তাঁর আন্দোলনের পর্ষায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। কেন এমন হলো? কারণ-ই বা কি? যদি এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়, তবে রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে একের পর এক বেপরোয়া পদলিখ কর্মচারী ছাঁটাইয়ের নিরলস ঘটনাগুলোর মধ্যে চোখ ফেরাতে হয়। বামপন্থী-মহল নিজেদের যতই সতর্ক ও সচেতন বলে ভাবুন না কেন, শাসক চক্র বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃ-বৃন্দকে কর্মচ্যুত করার অনেক আগেই পদলিখ ছাঁটাই করে নিজে-দের পাকাপোস্ত করে নিয়েছেন। একজন নয়, দশজন নয়, উনচল্লিশ-চল্লিশ জনেরও বেশী পদলিখ বর-খাস্ত হয়ে গেলেন, বামপন্থী মহল গুলো একটা কথাও বললেন না। একথা হলফ করে বলা যায়, এর আগে যে আরও চল্লিশজন পদলিখ কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গেছেন সে সম্পর্কে রাজ্যের সাধারণ মানদ-ষ প্রায় কিছুই জানতেন না বলা চলে। যদি বরখাস্ত করার প্রতিবাদে তখন থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজ-নৈতিক সংস্থাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠতো তবে বোধহয় আজকের বেপ-রোয়া ছাঁটাই ও বরখাস্তের আদেশ প্রগতিশীল ইন্দিরা এজেন্ট সিদ্ধার্থ-ডায়াস দিতে সাহস পেতেন না।

এখানেই শেষ নয়, অবস্থার চাপে তেরো, বহিঃ, চল্লিশ জনের

সি পি আই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বললেই চলে। যেমন, রেণু চক্রবর্তী বেশীর ভাগ সময় দিল্লীতে থাকেন। কোন মহিলাকে নিতে হলে, প্রথমেই গীতা মদ্যাজীর নাম ওঠে। সমস্ত মহিলা এবং অন্যান্য আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি।

শোনা যায় যে, ক্ষমতাশালী ভবানী সেনের যে কোন কারণেই হোক রেণু চক্রবর্তীর প্রতি দূর্ব-লতা আছে আর সেই অনুপাতে গীতা মদ্যাজীর সম্পর্কে বীত-শ্রদ্ধা। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু ভাব ভালবাসা আর দেখতে-নারি—তাই চলন বাঁকা এই দিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব গঠিত হচ্ছে এখনও সি পি আই-এর মধ্যে।

অরুণ সেন, কল্যাণ রায় প্রভৃতি অভিজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা যারা নিজেদের এলাকায় মাটি কামড়ে পড়ে আছেন দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা কেউ জাতীয় কাউন্সিলে অন্ত-র্ভুক্ত হলেন না, নতুন এলেন ভবানী রায় চৌধুরী। ভবানীবাবু নিজেই লালিত এই ব্যাপারে।

তারপর পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞ মসলমান নেতারা—মহম্মদ ইলি-য়াস, আবদুর রেজ্জাক খান, আব-দুল গণি প্রভৃতি কেউই পাস্তা পান নি। এতে মসলমান কমরেডরা হতভম্ব। হয়ত কোন কর্মীউনিষ্ট পার্টিতে সাম্প্রদায়িকতা নেই। কিন্তু এখনও মসলমান অধ্যুষিত এলাকায় মসলমান নেতা নিয়ে যেতে হয় বৃত্ততা এবং প্রচারের জন্য।

কংগ্রেসের প্রগতিশীলতার নমুনায় আবার অনেকেই, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, আঁতকে উঠছেন। সরকারী কর্মচারীদের ছাঁটাই করার ব্যাপারে সি পি আই-এর নীচু মহলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। আর তারপর কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের এবং যুব কংগ্রেসের যে চেহারা ফটে উঠছে তাতে কংগ্রেসের প্রগ-তিশীলতার পরিচয় নেই, আছে ক্ষুদ্রে ফ্যাসীবাহিনীর।

এই ব্যাপারে সি পি আই ট্রেড ইউনিয়নের কি কর্তব্য তা নিয়ে পার্টির মধ্যে ভীষণ মতভেদ। নীচু মহল থেকে দাবী উঠছে এই সম্পর্কে পার্টির নীতি ঠিক করার জন্য অবিলম্বে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে নিষেধ পার্টির সমস্ত কর্মী-দের সভা করতে হবে। সভার তারিখ ঠিক হয়েছে তেইশে অক্টো-বর।

মাসের শেষ দুদিন পার্টির রাজ্য কমিটির সভা—সেখানেও এই সমস্ত ব্যাপারে আলোচনা হবে। তবে সভার আসল কাজ হল রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করা।

এই নির্বাচন নিয়ে পার্টির মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। যারা জ্ঞানপ্রিয়, আন্দোলনে অভিজ্ঞ তাদের অনেকেই ত কমিটিতে নেই, তাই তাঁরা সম্পাদকমণ্ডলীতে যেতে পারবেন না।

কমিটিতে বিশ্বনাথ মদ্যাজীর

সম্পাদক মণ্ডলী ঠিক প্রভাবিত লোকদের দিয়েই গঠিত হবে বলে অনেকে ধরে নিয়ে হাত গড়িয়ে বসে পড়েছে।

বিশ্বনাথবাবুর সম্পর্কে পার্টির অনেকের ধারণা হল যে, তিনি সোজাসৃজি কোন কথা বলতে পারেন না। ফলে পার্টি সব সম-য়েই কি ভাবছে আর কি করছে তার কোন ঠিক পাওয়া যায় না।

যেমন গত নির্বাচনে ভেতরে ভেতরে নানা আসনে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া হল, অথচ বাইরে একটা কংগ্রেস বিরোধী ভন্ডামী। লোকের চোখ এ দিয়ে এড়ানো যায় না। নির্বাচন ফলাফলে তার প্রমাণ মিলল। সি পি আই-এর আসন সংখ্যা দ্রিশ থেকে নেমে তের হয়ে গেল। এর দারিদ্র্য বিশ্ব-নাথবাবুর কম নয়।

চটশিল্পে লাগাতার ধর্মঘট হতে চলেছে

(দপদের সংবাদদাতা)

চটশিল্পে নিষেধ কর্মীদের শোষণ করার ঘটনা আজকের নয় চ ইদানীং ওপার বাংলার যুস্মের সুযোগে এপার বাংলার মিল মালিকরা সেই শোষণ এক চরম পর্ষায় নিয়ে এসেছে। বিশ্বের বাজারে ভারতীয় চটশিল্প এখন প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করেছে। পরিণামে মিল মালিকদের মনোফাও পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু অভিযোগ হল, শ্রমিক-দের তবুও কোনরকম আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার তালিকাও খব বড় নয়, তবু মালিকরা সেই দাবী মানতে রাজী হচ্ছে না। পরি-ণামে, জট শিল্পের কর্মীরা ক্রম-শই বিক্ষোভে সোচ্চার হয়ে উঠছেন। বর্তমান অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে কর্মীদের কাছ থেকে মালিকের কাছে সর্বনিম্ন বেতন তিনশো চার টাকা দাবী করা হয়েছে। দ্রবছর আগে এই দাবীর পরিমাণ ছিল দশশো পঁয়ষাট টাকা।

এছাড়া, বদলী শ্রমিকদের খেসা-রং দেওয়ার এবং কর্মীদের পার-মানেনসি সম্পর্কেও কর্মীদের কয়ে-কটি দাবী রয়েছে। আসল কথা হল, একটি আধুনিক শিল্পে কর্মীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ সুবি-ধার জন্যে কয়েকদিনের মধ্যেই কর্মীরা বিক্ষোভের পথে যাচ্ছেন। উনিশশ সত্তর সনের ডিসেম্বরে আঠারো দিনের ধর্মঘট হয়েছিল। শোনা গেল, আগামী নভেম্বর থেকে দাবী আদায়ের জন্যে আবার এই শিল্পে লাগাতার ধর্মঘট হতে

অস্তাচলগামী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কার থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী কে সি পণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালাচ্ছে এখন রাজ্যপাল ডায়াস সাহেব। তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েও সিদ্ধার্থ রায়কে এখন ডায়াস সাহে-বের প্রশংসা করতে হচ্ছে। রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারটি শুধু সিদ্ধার্থ রায়ের হাতে ছিল। কিন্তু বন্ধ কল কারখানা খোলার নামে ডায়াস সাহেব সেখানেও হাত বাড়িয়েছেন।

কংগ্রেস সংগঠন থেকে কিভাবে সিদ্ধার্থ রায় ক্ষমতাহীন হলেন তার কাহিনী হচ্ছে, বিজয় নাহার, তরুণকান্তি গোস্বামী প্রথমে সিদ্ধার্থ রায়ের মনোনীত অধ্যাপক দেবী চাট্টোজ্যে কে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হতে না দিলেও এ্যাড হক কমিটির তিরিশ জন সদস্যের মধ্যে সূনির্দি-কভাবে আঠারোজন সদস্য সিদ্ধার্থ রায়ের দলের ছিল। কিন্তু দেবী চাট্টোজ্যে কে সভাপতি করতে না পারায় তাঁর দলের লোকজন সরতে থাকেন। গুরা বদ্বতে পারেন, সিদ্ধার্থ রায়ের সেই প্রভাব ইন্দিরা গান্ধীর ওপর নেই। তাই প্রথমে গুর দল ছাড়েন মালদার বরকত খান চৌধুরী। তারপর পশ্চিম দিনাজ-পুত্রের জয়লাল আবেদিন। এদের দেখাদেখি আরও ভাঙন হয়।

এখন অবস্থা হচ্ছে, তিরিশ জন সদস্যের মধ্যে কুড়িজন বিজয় নাহার-তরুণকান্তি গোস্বামীর হাতে। সাতজন সিদ্ধার্থ রায়ের দলে। তার মধ্যে একজন প্রফুল্লকান্তি ঘোষ

আমেরিকায়। বাকী তিনজন নির-পেক্ষ। এঁরা হলেন, ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শান্তি দেশগুপ্ত, মৃত্যু-ঞ্জয় প্রামাণিক আর উত্তর বঙ্গের একজন সদস্য। এমন কি ছাত্র পরিষদের নেতা সুব্রত মদ্যাজীও এখন পুরোপূর্ণ সিদ্ধার্থ রায়ের দলে নেই। গুর অভিমান, সিদ্ধার্থ রায় প্রকাশ্যে যুব কংগ্রেস নেতা প্রিয়দাস মুনশিকে স্বয়ং নেতাজীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। গুর সম্পর্কে কোনো বিশেষণই দেন নি।

সংগঠনে এই ক্ষমতা বদলের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে আগামী চব্বিশে অক্টোবর কার্যকরী কমি-টির বৈঠকে। এইদিন জেলায় জেলায় এ্যাড-হক কমিটি গঠনের বিষয়টি উঠবে এবং এখন সম্ভবতঃ বিজয় নাহার-তরুণকান্তিরা উপ-যুক্ত জবাব দেবেন।

সরকার থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার কাহিনীর সঙ্গে পাঠকের কিছু পরিচিতি আছে। পাঠক জানেন, পশ্চিম বঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে প্রথম দিকে কে সি পণ্ডের নাম উঠেছিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ রায় তাস্বির করে পণ্ডের নাম কাটিয়ে নিজের নাম বসিয়ে নেন। কে সি পণ্ডও কম নন। উত্তর প্রদেশের বাগদ কংগ্রেসী মন্ত্রী তিনি। তাই প্রথম থেকেই পণ্ড অসহযোগিতা করছিলেন সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে ডায়াস সাহে-বকে এনে পণ্ড সাহেব তাঁর মন-স্কামনা পূর্ণ করেছেন। ডায়াসই এখন সরকারী যন্ত্রের সর্বসর্বা। তাই বাংলা বন্ধের দিনেও সিদ্ধার্থ রায় পশ্চিমবঙ্গেই আসে-ননি। এখন তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরটি যাতে হাতছাড়া না হয় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেননা, সেখানেও ইন্দিরাজী একজন স্টেট

আমরাও দপদ বিক্রয় করি

প্রোলেটারিয়েট বুক এজেন্সীজ

২২/৬ এস বি রাহা লেন,

প্রেসিডেন্সী জেলে দুঃসহ অবস্থা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রেসিডেন্সী জেলে আটক বন্দীদের যে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তার বিবরণ জানা গেছে। এ অনমানস্ব্যাবস্থায় যে অন্যান্য জেলেও একই অবস্থা চলছে। অল্প যে কয়জন বন্দী সম্প্রতি মৃত্যু পেয়েছেন তাদের কাছ থেকে এবং আটক বন্দীদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে এই বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে।

জেল কর্তৃপক্ষের মতে প্রেসিডেন্সী জেলে মাত্র এক হাজার সাতশো জন বন্দীর জায়গা আছে। অথচ সেখানে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার জন বন্দী রয়েছেন এবং এই সংখ্যা রোজই বাড়ছে। আবার বাসযোগ্য তিন-চারটি ওয়ার্ডকে গদাম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে ওয়ার্ডে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ জনের বেশি থাকা সম্ভব নয় সেখানে একশো দ্বিশ-চল্লিশ জন বন্দীকে রাখা হয়েছে। রাতে কেউ যদি জেল পরিদর্শন করেন তাহলে তার শিয়ালদহ স্টেশনের হতভাগ্য মানুষদের কথা মনে পড়বে। অবস্থা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, জায়গার অভাবে বন্দীরা কেউ রাতে কেউ দিনে পালা করে শোয়। একতলার বন্দীদের অবস্থা আরও শোচনীয় কারণ নদমার পচা গন্ধ সহ্য করে সাতসাতাতে মেঝেতেই তাদের শতে হয়। এক দিন রাতে নদমা থেকে সাপ বেরিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকে পড়েছিল। বিড়ালরাও রাতে ঘরে ঢুকে পড়লে বেরোবার পথ না পেয়ে বন্দীদের নখ দিয়ে আঁচড়ে দেয়।

জল-প্রসঙ্গ
জেলের ভিতরে পাম্পটার ফিল্টার খারাপ হবার ফলে যে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা প্রায় গাঙ্গাজলের মত ঘোলা। প্রতি দশ-পনেরো জন বন্দী পিছন একটি করে ছোট কলসী দেওয়া হয় যাতে দুই-তিন জনের মাত্র এক রাতে জল রাখা সম্ভব। জেলের বন্দীরা অনশন ধর্মঘট করার ফলে জেল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেককে পৃথক কলসী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু আজও পর্যন্ত তা কেউ পায়নি। রাতে কলসীর জল ফুরিয়ে গেলে বন্দীরা প্রায়ই সিপাইজী সিপাইজী বলে চিৎকার করে। ওয়ার্ডের ভদ্রলোক সে রাতে যদি ভাল অবস্থায় থাকেন তাহলে বাইরের চৌবাচ্চা থেকে জল এনে দেন। বন্দীরা বাধ্য হয়ে অনেক সময় তাও খান। চৌবাচ্চাটিতে কোন ঢাকা না থাকার ফলে কাক-পক্ষীর বিষ্ঠা সহ সমস্ত রকম ময়লাই তাতে পড়ে। অথচ সেটিকে পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা নাই। পাম্প অচল হয়ে গেলে পি ভি এ ওয়ার্ডের একটি মাত্র টিউবওয়েলের জলই দেড় হাজার বন্দীর পানীয়ের একমাত্র ভরসা।

খালাসটি ও কম্বল প্রসঙ্গ
জেল-আইন অনুসারে পি ভি এ এবং এম আই এস এ বন্দীদের

প্রত্যেককে তিনটি কমপক্ষে দুটি করে কম্বল, একটি করে থালা, বাটি, চাদর দেবার কথা। প্রথম প্রথম দু-চার জন বন্দী তা পেয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই মাত্র একটি কম্বল ছাড়া আর কিছুই পায় না। শোনা যায় অনেক বন্দীকেই কাগজে ভাত ঢেলে খেতে হয়। আঁজলা ভেজে জল খেতে হয়। জেল কর্তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, অর্ডার দেওয়া হয়েছে, মাল এলেই পাওয়া যাবে। মাসের পয় মাস এই ভাবে চলছে। বিচারার্থী বন্দীদের অবস্থা আরও দুঃসহ। তারা বৃটিশ আমলের কেনা ছেঁড়া কম্বল পায় যা সিফলিস, গনোরিয়া, থাইসিস প্রভৃতি মারাত্মক রোগের বীজাণুতে ভরা। কিছুদিন আগে জেলের ভিতরে পি ভি এ আইনে আটক সি পি আই এম বন্দীরা বিচারার্থী বন্দীদের এই দরবস্থা সম্পর্কে অনশন ধর্মঘটের হুমকি দেবার ফলে পয়-তাল্লিশ জনের মধ্যে মাত্র বিশ জন একটি করে কম্বল এবং দশ জন মাত্র একটি করে থালা পেয়েছেন।

খাবার দাবারের পরিস্থিতি

জেলে তিন দফা খাবারের মধ্যে সকালে জল খাবার, দুপুরে ভাত ও বিকাল চারটায় রাতের খাবার সকালের জল খাবার সাত দিনে সাত রকম। কোন দিন মটর, কোন দিন ছোলা, চিংড়ি ইত্যাদি। জেলের মটর ও ছোলার মান সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে যে, দু লরি মালের মধ্যে এক লরি চাঁড়িয়াখানায় যায় আর অপরিষ্কার জেলে আসে। অর্থাৎ পশুপক্ষীদের খাদ্য আজ কংগ্রেসী রাজস্ব মানুষের খাদ্য। তাও আবার পোকায় ভর্তি। দুপুরের ভাতের পরিমাণ একজন মানুষের আধপেটা খাবার। আধা সেম্প আনাজের নাম তরকারি। বিকালের রুটি সম্পর্কে জেলের বন্দীরা বলেন যে, সেগুঁড়ি গম না তেঁতুল বিচি থেকে তৈরি তা বোঝা মুশকিল। সকাল বেলায় রান্না ডাল তরকারি রাতেও বন্দীদের খেতে দেওয়া হয়। রুটি গিলে খেতে হয় কেননা সেগুঁড়ো বালিতে ভর্তি। প্রেসিডেন্সী জেলে একটি মাত্র জেলে বন্দীরা নিজেরা রান্না করে খান বলে সেখানকার অবস্থা একটু পৃথক। পি ভি এ ও অন্যান্য কেসে যারা আটক রয়েছেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সি পি আই এম দলের। তারা প্রত্যেকেই গরীব ও সাধারণ পরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও জেলের ভিতরে এ ধরনের খাবার ও ব্যবস্থা তাদের প্রত্যেকের জীবনেই সরকারী হৃদয়হীনতার ও বন্দীদের প্রতি চরম অবহেলার অভিজ্ঞতাকে জোরদার করছে।

রোগ ও চিকিৎসা

জেলের সাড়ে তিন হাজার বন্দীর জন্য মাত্র একটি ডিসপেনসারি আছে যা সপ্তাহের প্রায় তিন-চার দিন ওষুধের অভাবে বন্ধ থাকে। বহির্বিভাগে দুইজন ডাক্তার চিকিৎসা করেন যাদের রোগীর সংখ্যা প্রায় চারশ। সময় মত দু-ঘণ্টা। সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা। এর মধ্যে জেলের কর্মচারীরাও চিকিৎসা করান। এইসব কারণে জেলে কারও কোন অসুস্থ করলে তার চিকিৎসা একরকম হয় না বললেই চলে। জেলের মধ্যে যে সব রোগ বেশী হয় তা হল ভিডি, খোসপাঁচড়া, অম্বল, টিবি, জ্বর, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, এবং কিছুর কিছু লেপারসি। এক কথায় রোগের অভাব নেই, অভাব কেবল প্রতিবিধানের। একমাত্র এ পি সি এবং এস ডি পাওডার ছাড়া আর কিছুই জেলে তখন তখন পাওয়া যায় না। চর্মরোগের মলম বা ব্যাণ্ডেজের তুলার মত সাধারণ জিনিস বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনরা যদি বাইরে থেকে দিতে চান তাহলে কড়া আইনের দোহাই দিয়ে তা ফেরত পাঠান হয়। হঠাৎ প্রয়োজন হলে আর্জেন্ট ইনডেন্ট মারফৎ ডাক্তার স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু সরকারী

ফাইলের বেড়া ডিঙিয়ে রোগীর কাছে সে ওষুধ পৌঁছতে তিন মাস লেগে যায়। এপ্রিল, মে, জুন মাসের আর্জেন্ট ইনডেন্টের ওষুধ রোগীরা আজও পায়নি। ছয় মাস যাবৎ জেলে পেনিসিলিনের ইনজেকশন ছিল না। এক্স-রে করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় বন্দীদের চিকিৎসার খুব অসুবিধা হয়। চীফ মেডিক্যাল অফিসার কাকে দেখাবেন তা ঠিক করে দেবেন জেল কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের চরম পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়।

শ্রীঠাকুরচাঁদ দাস নামে বেলগাছার একজন বন্দী মারাত্মক রোগে ভুগছেন। তার এক্সরে করা দরকার কিন্তু ব্যবস্থা হয়নি। জেল কর্তৃপক্ষ জানালেন : বাইরের হাসপাতালে চিকিৎসার অনুমতির জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে লেখা হয়েছে কিন্তু অনুমতি আসেনি। ভুল চিকিৎসার বহু ঘটনা শোনা যায় যেমন মাণিক মুখার্জী নামে উনিশ কুড়ি বছরের একজন পি ভি এ বন্দীর নিউমোনিয়া রোগ হলে কিছু দিন পরে তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর দেখা যায় আবার তার কাশির সংগে রক্ত পড়ছে। আবার ভর্তি করেই দুই তিন দিন পরেই ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থায়

এক দিন তার শরীরে ভীষণ ব্যথা হয় এবং আবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করলে দেখা যায় ঘুমের ইনজেকশনের পরে তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। দু-তিন দিন পরে যখন তার স্মৃতিশক্তি ফিরে এল তখন দেখা গেল তার বাকশক্তি চলে যাচ্ছে। জেলের বন্দীরা অনশনের সিদ্ধান্ত নিল। বর্তমানে সে একটু সুস্থ হলেও মাঝে মাঝেই সে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং তার একটি অঙ্গ ক্রমশঃ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে আসছে। তার সূচিকৎসার দাবি আজও অবহেলিত। শিবরাম ব্যানার্জী ও বিকাশ রায়কে এক্সরে করার পর তাদের টিবি রোগ ধরা পড়ে। চিকিৎসা সরবরহ হয় এবং বেশ কিছু দিন পরে বলা হল তাদের টিবি রোগ নেই। বন্দীদের সবার ওজন কমে গেছে বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে।

এই দরবস্থাকে কোন মানুষ হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না অথচ এই পরিস্থিতির মধ্যেই বন্দীদের দিন কাটাতে হচ্ছে। বিনা বিচারে আটক রয়েছেন গণ আন্দোলনের নেতা সহ বহু সাধারণ কর্মী অথচ তাদের রাজবন্দীর মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। বহু সংগ্রাম করে জেলের ভিতর রক্ত ঢেলে অতীতে

শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়

আরও একটি সম্ভাব্য চাওয়ার আগে ভাব দেখুন

যেটি আছে তাকে ঠিক মতো লালন-পালন করতে পারছেন কি না



আপনার মনের সাথ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনা ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ করে তাকে মানুষ করে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা জিনিষ্য কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা উঠা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হল, সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, রবারের জন্মনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় বলে জন্মনিরোধের ক্ষেত্রে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার করে আসছেন। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?



সরকারী অর্থসাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়
আরেকটি সম্ভাব্য না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন
নিরোধ
লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ, রবারের জন্মনিরোধক
মনোহারী লোকান, মুখীর লোকান, কেমিকের লোকান একত্রে সর্বত্র পাওয়া যায়

রাজধানীর চিহ্ন

কংগ্রেসের সিমলা অধিবেশন

(বিশেষ প্রতিনিধি)

নয়াদিল্লী, পনেরোই অক্টোবর, উনিশশ একাত্তর : প্রচুর অর্থব্যয়, জটিল ও অসফলতার মধ্য দিয়ে সিমলাতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হল। রাজধানীর সাংবাদিকেরা বহু আশা নিয়ে সিমলা হাজির হয়েছিলেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, ইতিমধ্যে—বাংলা দেশে মুক্তি সংগ্রাম, ভারত-সোভিয়েত চুক্তিপত্র ও স্বতন্ত্র-বিবৃতি, শাসক কংগ্রেসের প্রাক-নির্বাচনী অর্থ-নৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভবিষ্যৎ, দলের আন্তঃতরঙ্গ সাংগঠনিক পরিবর্তন ইত্যাদি নানা বিষয় সিমলা অধিবেশনের আলোচনাসূচীতে ছিল, ফলে গরম খবরের স্বপ্ন অনেক সাংবাদিককেই উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু যা ঘটল, তা সেই চির-চরিত আদম কংগ্রেসের অধিবেশনেরই ঐতিহ্যবাহী। বক্তৃতা, টাকার, লেন-দেন, আপোষ ও বিতর্কমূলক বিষয়ের ওপর ভাসা-ভাসা প্রস্তাব গ্রহণ।

এ অধিবেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতে—তরুণ তুর্কী শ্রীচন্দ্রশেখরের নির্বাচন। কংগ্রেসের বড় কর্তারা, শ্রীমতী গান্ধী স্বয়ং পর্যন্ত, দলের নির্বাচন কমিটিতে শ্রীচন্দ্রশেখরের অন্তর্ভুক্তির বিরোধী ছিলেন। এই

বিশেষ কমিটির দায়িত্ব হবে আগামী বছর, প্রদেশ বিধানসভার জন্য কংগ্রেসের প্রার্থীদের লিস্ট তৈরী করা। সুতরাং এর গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। শ্রীচন্দ্রশেখরের অতীতের ইতিহাস এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। একদা পি এ এস পি দল-ভুক্ত, ইনি অশোক মেহতার সঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরে বিড়লা বাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে কমিশন নিয়োগের ব্যাপারে ইনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বিড়লার বিরুদ্ধে এক নাগাড়ে অভিযোগ পেশ করে অনেক সময় ইনি ইন্দিরাজীকে বিশেষ বিরত করেছেন। কারণ কংগ্রেস তহবিলে বিড়লাজীর অর্থের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। ফলে বিড়লার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া সব সময় দলের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। সুতরাং চন্দ্রশেখরের মত একরোখা লোককে কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটিতে রাখা দলের বড় কর্তাদের পক্ষে কিছুটা অস্বস্তিকর। বিড়লার মনঃপুত কংগ্রেসী প্রার্থীদের নির্বাচনী টিকিট দেওয়া হয়তো কিছুটা অসুবিধাজনক হয়ে উঠত। পশ্চিম বাংলার সিদ্ধার্থ রায়ও কিছুটা অসুবিধায় পড়তেন। বিড়লার হয়ে 'সদ্রীশ' কোর্টে ওকালতী করে প্রচুর অর্থ উপার্জনের বে রো-রাজ এতদিন ধরে চালিয়ে আস-

ছিলেন, তাতে ভীটা পড়তে পারত। ফলে চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে আক্রোশ স্বাভাবিক।

বড় কর্তাদের প্রচুর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও চন্দ্রশেখর জিতে বেরিয়ে গেলেন। ভোটের আগের দিন বসে তাঁরা ভোট ভাগাভাগি পর্যন্ত করেছিলেন। সিমলায় আগত প্রতিনিধিদের আলাদা প্যানেল দেওয়া হয়েছিল। ঠিক ছিল উমাশংকর দীক্ষিত, স্বরণ সিং, ব্রহ্মানন্দ রোহি ও সুখাদিয়া প্রত্যেকে পঞ্চাশটি ভোট পাবেন। কিন্তু ভোটের দিন দেখা গেল ব্রহ্মানন্দ রোহি এবং সুখাদিয়ার ভাগ্যে ভোট অনেক কম পড়েছে। নির্ধারিত ভোটের বার্ষিক স্পষ্টতাই চন্দ্রশেখর পেয়েছেন।

অবশ্য এ থেকে যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে কংগ্রেসের বড় কর্তাদের বিরুদ্ধে তরুণ বামপন্থী তুর্কীরা ছোট বেঁধেছে, তাহলে কিছু ছুল হবে। চন্দ্রশেখরের জেতবার পিছনে সেই পুরাতন কংগ্রেসী খিচড়ি রাজনীতি কাজ করেছে। রাজনীতি বা আদর্শ বিবর্তিত দলাদলির পূর্ণপ্রকাশ দেখা গেল। চন্দ্রশেখরের স্বপক্ষে যেমন কতিপয় তরুণ তুর্কী ছিল, সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিক্ষুব্ধ, মস্তিষ্ক না-পেয়ে হতাশ ও ক্রুদ্ধ এবং ইন্দিরাজীর স্নেহ থেকে খসে পড়া কতিপয় সুবিধাবাদী নেতাও ছিলেন। তাই দেখা গেল, একদা ইন্দিরা স্নেহন্য এবং বর্তমানে একধারে "রাজা" দীর্শ সিং হঠাৎ তরুণ তুর্কী হয়ে চন্দ্রশেখরের সমর্থক হয়ে গেলেন। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী নেতা শ্যামাচরণ শঙ্কর আশংকা যে তাঁর রাজ্য কংগ্রেস থেকে তাঁকে অপসারণ করবেন ইন্দিরাজী। তিনিও চন্দ্রশেখরের পিছনে এসে জড় হলেন। মহারাষ্ট্রের মধ্যমণ্ডী শ্রীনারায়ণেরও অনুরূপ আশংকা। তাই মহারাষ্ট্রের দলবল মোহন খাড়িয়ার নেতৃত্বে চন্দ্রশেখরকে মদৎ দিল। এই খিচড়ি গোষ্ঠির ভোট পেয়ে চন্দ্রশেখর জিতে গেলেন। এখন দেখতে হবে যে প্রদেশ কংগ্রেসের কর্তারা তাঁকে ভোট দিয়ে জেতালেন—শত্রু বা নায়ক—তাঁরা আগামী নির্বাচনে চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে তাঁদের নিজেদের নির্বাচনী টিকিট আদায় করতে পারবেন কিনা। চন্দ্রশেখরের এতদিনের বিদ্রোহী মনোবৃত্তি কেবল মাত্র বিড়লার বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ না প্রদেশগুলির সামন্ততান্ত্রিক কংগ্রেসী নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হবে সম্ভাবে, তা এইবার বিচার্য হবে।

মাইক্রো, ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে এই সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ, যদিও গোপন পদক্ষেপ আপাততঃ খুব একটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি। তবে দলের মধ্যে ভাঙন ধরতে শুরুর করেছে। তরুণ তুর্কী নিজেরাও

স্বধা বিভক্ত। এবং এই বিভেদের মূলে আবার কমিউনিস্ট পার্টি ও পি এস পি অতীতের ঝগড়ার রেশ। অর্থাৎ তরুণ তুর্কীদের মধ্যে কেউ কেউ পি এস পি এবং কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে এসেছেন। বারী পি এস পি থেকে এসেছেন—যেমন চন্দ্রশেখর বা মোহন খাড়িয়া, তাঁরা ইন্দিরাজীর বিরোধী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে বিরক্ত। আবার বারী পুরাতন কমিউনিস্ট যেমন শ্রীঅমৃত মাহাতো বা চন্দ্রজীৎ বাদব—তাঁরা প্রচণ্ড ইন্দিরা ভক্ত। মূলতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের ইন্দিরা সমর্থন এর কারণ বলে মনে হয়।

ইন্দিরা কংগ্রেসের বড় কর্তারাও স্বধা বিভক্ত। ইন্দিরাজী চাইছেন প্রদেশগুলিতে সংগঠনে তাঁর নিজের লোকেরা নেতৃত্বে আসুক এবং পুরোন কর্তারা অপসারিত হোক। এতে বিপদ বেধেছে। মহারাষ্ট্রে শ্রীনারায়ণ, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রীচাবনের লোক। তাঁকে সরাবার চেষ্টার ফলে শ্রীচাবন বিরক্ত। বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাই এই অবস্থা স্ব স্ব প্রদেশে নিজেদের লোকেরা এতদিনের মৌরসীপাট

ছাড়তে চাইছে না। ফলে প্রদেশ-গুলিতে আগামী নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসকে নতুন সাজে সজ্জিত করার যে পরিকল্পনা ইন্দিরাজী নিয়েছিলেন, তা কতদূর এগোয় দেখা যাক।

এছাড়াও প্রদেশগুলিতে পুরোন নেতৃত্বকে সরিয়ে নতুন নেতা কোথা থেকে নেওয়া হবে—এ প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে। পশ্চিম বাংলার এ পরীক্ষা খুব লাভজনক হয় নি। বিজয় সিং নাহার প্রমুখ পুরোন নেতাদের অপসারণ করে সিদ্ধার্থ রায়কে আনার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তরুণসদৃশ চাপল, ব্যারিস্টার জৌলুস ও পারিবারিক বনেদি-রানা সত্ত্বেও সিদ্ধার্থবাবু এ ক্যাম্পে বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। ইন্দিরাজীর স্নেহ থেকে সিদ্ধার্থবাবু বঞ্চিত হতে শুরুর করেছেন। রাজ্যপাল ডায়াস এবং আমলাতন্ত্রের উপরই ইন্দিরাজী বেশী নির্ভর করতে আরম্ভ করেছেন।

এ অবস্থায় মনে হচ্ছে ইন্দিরাজীর কংগ্রেসের আবার সেই পন-মর্দনিক বৎ অবস্থা। আর কিছুকাল পরেই সেই আদি কংগ্রেসের দশা হবে। নিম্নলিখ্যাপা কংগ্রেসের (শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

জানেন কি ?

সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতবর্ষের সবগুলি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে মোট তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা :—

১৯৬৮ সালে ৩০ লক্ষ

১৯৬৯ " ৩৪ লক্ষ ৩০ হাজার

১৯৭০ " ৪০ লক্ষ ১০ হাজার

৩১শে জুলাই পর্যন্ত ১৯৭১ সালে ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার এবং প্রতি মাসে গড়ে এক লক্ষ হিসাবে বেকার বাড়ছে ?

এর মধ্যে ১৯৭১ সালে

তথু পশ্চিমবঙ্গেই ৭৬৮৩৪ জন তালিকাভুক্ত বেকার, তালিকার বাইরে কত এখনও আজানা। কিন্তু অন্ত্যস্ত রাজ্যেও কি বেকার কম ? না।

৩১শে জুলাই ১৯৭১এ মহারাষ্ট্রে তালিকাভুক্ত বেকার সংখ্যা ৪০৭০৮৪

তামিলনাড়ুতে	"	"	৪৫৪৬২৫
উত্তর প্রদেশে	"	"	৪৪৬৩২৫
বিহারে	"	"	৩৫২১৫২
কেরলে	"	"	৩২৩৭৭১
মধ্যপ্রদেশে	"	"	৩২১৭৪৩
অন্ধ্রদেশে	"	"	৩০৮৪৪৪
মহীশূরে	"	"	২৫৭১৭৫
গুজরাটে	"	"	১৭৩৬৮১
উড়িষ্যায়	"	"	১৬৪০৭৩
রাজস্থানে	"	"	১৩৮২৬২
পাঞ্জাবে	"	"	১১৩৪৭০
হরিয়ানায়	"	"	৯৮২৪৭
আসামে	"	"	৭০৬৮৪
হিমাচলে	"	"	৪৭৩৭৯
জম্মু ও কাশ্মীরে	"	"	২০৭১১
দিল্লীতে	"	"	১৩৪৬১৮

প্রতিমাসে এর সঙ্গে একলক্ষ নতুন বেকার যুক্ত হচ্ছেন। নব কংগ্রেসী প্রগতিশীল অর্থনীতির আড়ালে একচেটিয়া পুঁজিবালিকের শ্রীরক্তি ঘটছে, ভারতের সাধারণ মানুষ দিন দিন কব্জারে, ঋণভারে জীবনের হুঃসহসারে জর্জরিত।

প্রেসিডেন্সী জেলের অবস্থা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যে সব অধিকার অর্জন করা হয়েছিল আজ তা পদদলিত। কিন্তু আটক বন্দী রাজবন্দীর মর্ষাদা পাবেন কিনা তা ঠিক হবে কোন আইনে তিনি ধরা পড়েছেন, আম-লারা কী ধরনের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে এনেছে তার উপরে—এ বিষয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও কার্যকলাপের কোন মূল্য নাই।

জেল আইন অনুসারে আত্মীয়-স্বজনদের সপ্তাহে এক দিন করে আটক বন্দীর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। অথচ তাঁরা মাসে মাত্র একবার করে সেই সুযোগ পান তাও আবার অনেক কাঠখড় পড়ায়ে। বিনা বিচারে দীর্ঘ দিন ধরে যারা আটক রয়েছেন তাদের পারিবারিক ভাতা সরকার মঞ্জুর করছেন না। ফলে আটক বন্দীদের পরিবার-বর্গকে প্রচণ্ড আর্থিক দর্গতির মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। অনেকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সরকারী মনো-ভবের কোন পরিবর্তন ঘটছে না।

এই সমস্ত দুঃস্বপ্নের অব-সানের জন্য যেমন জেলের ভিতরে সংগ্রাম হচ্ছে তেমনি বাইরেও সি পি আই এমের পক্ষ থেকে বার-বার

রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালান হচ্ছে ও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ তাতে বিশেষ কোন ফল হচ্ছে না। সমগ্র পশ্চিম বাংলার শাসক কংগ্রেসী গুণ্ডাদের সংঘ-বদ্ধ করে মিলিটারী ও সি আর পি দিয়ে যে সন্ত্রাস ও আধা ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে দেশবাসী তা লক্ষ্য করেছেন। ভিত্তিহীন অভিযোগে গণআন্দোলনের কমী-দের গ্রেপ্তার করে থানা লক আপে তাদের উপর যে অত্যাচার করা হয় তা বর্ণনাতীত। তার পরে আবার তাদের বিনা বিচারে আটক করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হচ্ছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল তিলে তিলে এদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। এই অবস্থা আর কিছু-তেই বরদাস্ত করা যায় না। দেশ-বাসীকে এর বিরুদ্ধে আজ, সরব হতে হবে। জেলের ভিতরে বন্দীরা যাতে মানবের মত ব্যবহার পায়, তারা যাতে মানবের মত বাঁচার সুযোগ পায় সে জন্য জনমতকে সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাই গণ আন্দোলনের স্বার্থে কংগ্রে-সের এই প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বত্র রক্তে দাঁড়ান দরকার।

শ্রবণ ২২শে অক্টোবর ১৯৭১

শোনা যায়, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা-রাজী তাঁর জীবনের সামান্য অংশ শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর বিশ্ববিস্তৃত সংপ্রত্যক্ষ অনুরাগী জ্ঞান-তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন—বিশ্ববন্দিত কবি এবং শিক্ষারতী রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে না এলেও। নতুবা আজ পৃথিবীর তিন বৃহৎ শক্তি তাঁর পদামৃত পাবার জন্য ব্যাকুল কেন? কিসঙ্গার দিল্লীতে এসে “নতুন জগতের” পুরোধা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ্য তাঁকে নিবেদন করে গেছেন। এবার যুগপৎ সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের পালা। প্রথমোক্ত সন্ধি সমাপনান্তে হুট, উৎফুল্লচিত্ত; পরোক্ত রাষ্ট্র পাকিং থেকে নাকি “অগোপন” দূত পাঠাতেছে বার-বার! অথচ প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া উনিশশ বাষটি সালের দেয় রাজ-নৈতিক দক্ষিণা চীনের চ্যু এন লাইকে না দেয়া পশ্চাত ভারতের কূটনৈতিক রথ নড়বেনা, অর্থাৎ দেশের (এশিয়ার বিশালতম) রাজ-দূত বিনিময়ের অঙ্ক উদঘাটিত হবে না। এই সেদিন তিনি তাঁর বৈদেশিক সম্বন্ধ বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সর্দার স্বরণ সিংয়ের উক্তিকে সাব্যস্ত করেছেন যে, আপাততঃ চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ, এ্যাম্বাসাডর মাধ্যমে উন্নীত করার কথাভাবা হচ্ছে না।

অবশ্য বাংলাদেশের প্রতি তাঁর করুণা অপারিসীম। বিশেষ করে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিথ্য পরম্পরা বজায় রেখে যখন আজ “বিশ্বনগরী”, আন্তর্জাতিক জীবন-চর্যার নিরীক্ষাক্ষেত্র নয়াদিল্লী এক উন্নতমানের শিল্পে, পরিণত হয়েছে। আর কিছু না হক, গুরুদেবের আত্মকুঞ্জ পাওয়া নাই যাক, নব-ইন্দ্রপ্রস্থের নবোদীয়মান বিস্তৃতি-তনয়দের শিক্ষাব্যবস্থার কম্পিত গুরুদেব সুলভ ছাঁওয়া লাগা চাই। চাই বশ্ব ক্লাসর থেকে বেরিয়ে নীল আকাশের নিচে শিক্ষকের সঙ্গে সহাবস্থান, চাই গানের তালে তালে বাজাদের দোদুল অঙ্গ আন্দোলন (কখনও বা সঙ্গে তাদের মাস্তুলেরও) চাই হিপীদের ক্লাছ থেকে ধরে-আসা সহজিয়া বেশপ্রধার ঋণ, চাই প্রদর্শনবিলাস নৃত্যনাট্য, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনতীর্থে সমাবিষ্ট হবার জন্য আবশ্যিক ঐক্যতান।

তবে কিনা বিশ্বভারতীর অন্য-তম ক্ষেত্র মধ্য ছিল এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র ভারতীয় এবং চৈনিক সভ্যতার ধারাসংগম ঘটানো। ঋষি কবি এজন্য চীনের প্রতি সূক্ষ্ম ও সম্মত একান্ততা অনুভব করতেন। জাপানের প্রতিও তাঁর দরদ ছিল, যদিও সে-দেশের স্বারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সহারী ক্ষাণবৃত্তির—আজকাল যা ডুইফোড়-সাম্রাজ্য-

বাদী দেশে মিলিটারী ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স বা সামরিক ধনতন্ত্রের মহিমা অর্জন করেছে—অনুদ্রবণ তিনি আদপেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু নৈহরুদ্রী, আন্তর্জাতিকতার একনাগাড় আহরণবিলাসে বিলাসী রাজধানী দিল্লী নগরীর সুখ্যা প্রতিভু ও বরদাত প্রধান-মন্ত্রী মহাশয়া তাঁর রাজসভার বরগ জাপানের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেবেন বৈশ্য শক্তির লীলা ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে, কিন্তু চীনের সঙ্গে নৈব চ। এতদিন ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-কাঁচা-মাল, খনিজাত লোহার সর্বোত্তম ক্রেতা ছিল জাপান; এবার শোনা যায়, বিনিময়ে ঐ দেশের পুর্জি নাকি বিনা লাভের ভিত্তিতেই ভারতের মাটিতে কোনো কোনো বাছাইকরা শিল্পে নিবিষ্ট হতে যাচ্ছে? একে-বারে নিছক প্রেমের টানেই বন্ধি এই পুর্জিবিশেষ! কিন্তু চীনের সঙ্গে ব্যবসা অচিন্ত্যনীয়; শব্দ পিঙ্কপঙ খেলাই কেবল চলে।

বাংলা দেশের জন্য।

আমরা এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বপ্নকে। এক এমন বন্দোবস্ত আওয়ামী লীগের সঙ্গে করা হক, যা মূলতঃ স্বগীয় বালগঙ্গাধর তিলকের স্বপ্নে। স্বরাজ-মন্ডলী থেকে ভিন্ন নয়।

“We are for a political settlement, a settlement with the Awami League, which in substance is no different from the Home Rule League of Bal Gangadhar Tilak”—2nd August '71.

উপরোক্ত বাণী কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের স্বনামধন্য মন্ত্রী খাদিলকর সাহেবের, যাঁর ওপর দুটি বিশিষ্ট বিষয় সমেত মন্তব্যের ভার অর্পিত আছে। তাঁরই নয় কেবল, এ যুগের সর্ব স্বীকৃত বোধ দারিত্বের নীতি অনুরায়ী এতে সমগ্র কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমতই প্রতিফলিত। অথচ, আমরা মার্চের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের ওপর সামরিকতন্ত্রী বলাৎকার শব্দ হবার মহত্ব থেকেই শব্দে আসছি, বাংলাদেশের বিমুক্তি ও স্বতন্ত্র্যই নাকি কেন্দ্রের কাম্য। অস্থায়ী বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হল বলে। কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময় চির-স্থায়ী নয়। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া তা জানেন। এ প্রসঙ্গে স্ব-বিরোধী উক্তি তিনি প্রভুত করেছেন—ভারত-রশ মৈত্রীসন্ধির আগে এবং পরেও। যখন অনুরোধ এসেছে পাকিস্তান-ভািতর, তখন তিনি বলেছেন তিনি কাউকে ডরান না। যখন জন-রব উঠেছে, ভারত রশ চুক্তির সময় অলিখিত রুশী শর্ত গ্রহণ করা হয়েছে এই মর্মে যে, ভারত

বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ-সম্ভাবনা স্বা-বিত করবে না, তখন তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছেন তিনি, এমন শর্ত অভাব্য! তবে কিসের বাধা? শেষাবধি, অনেক বিলম্বিত ভণিতার পর বলা হয়েছে, বাধা কোনো কিছুই নয়, বাধা শব্দ সময়ের।

হায় রবীন্দ্রনাথ! তুমি অতীতের কানে কানে বয়ে আসা কত কথাই না শুনতে! তোমার অদৃষ্ট, সুযোগ্য শিক্ষার্থিনী, বাংলা দেশের মরণ বাঁচন প্রস্নে ভবিষ্যতের কানে কান লাগিয়ে বসে আছেন, কবে সেই প্রতীক্ষিত লক্ষের সূচনা আসবে যখন বাংলাদেশ ভারত সরকারের নিকট থেকে স্বাধীন সত্তার বরাভয় পাবে। ততদিন তিষ্ঠ তিষ্ঠ!

“রাজনীতি সকল সম্ভাবনার এক শিল্প বিশেষ।”

একথা কেবল উলিয়ম ম্যাগে-স্টার সাহেব তাঁর বিখ্যাত বই “ডেথ অফ এ প্রেসিডেন্টেই” লেখেন নি। এরও বাড়া আপ্ত সত্য, মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের পরম ধুরন্ধর ম্যাকিয়েভেল থেকে এমগের নবকলবর-প্রাপ্ত সাম্রাজ্যবাদের পাকা খিড়বাজ কিসঙ্গার-তক অনেকে রকমারি ভাষায় দিব্যজ্ঞানের মতই দিয়ে গেছেন। একালের ভয়াবহ যুদ্ধাশ্ব-শব্দাদি এবং ততোধিক ভয়ঙ্কর নীতিহীন রণকৌশলপদ্ধতির নির্বাধ প্রয়োগ তথের তাত্ত্বিক কিসঙ্গার সাহেব প্রবীণ বয়সে নতুন আলোক বিতরণ করেছেন তাঁর বই “আমেরিকার বৈদেশিক নীতি”তে।

“For the first time, foreign policy has become global... Now the smallest nation participates in international relations. For many of the leaders of the new nations, the bureaucratic - pragmatic approach of the West is irrelevant, because they are more interested in the future which they wish to construct than in the manipulation of the environment which dominates the thinking of the pragmatists.”

অর্থাৎ, এই প্রথম বৈদেশিক নীতি, দেখা গেল, সারা দুনিয়া বেয়ে গিয়েছে। আজকাল ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করে থাকে। নবীন জাতিগুলির মধ্যে অনেকের নেতারা ই : ‘পশ্চাত্যের বাস্তবসম্মত, আমলাতন্ত্রী এগোবার’ ভঙ্গীকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে থাকেন, কারণ তাঁরা ভবিষ্যতের নির্মাণে আগ্রহী। কিন্তু তাঁরা বাস্তব-প্রয়োগবাদীদের চিন্তা সম্পর্কে আগ্রহ রাখেন না, যে চিন্তার পারিপার্শ্বকে কৃতিত্বের সঙ্গে হের-ফের করাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

নতুন দিল্লী নতুন করে এই “বাস্তব প্রয়োগবাদ”, এবং নিছক উপযোগিতাই যে কূটনীতিশাস্ত্রে স্বীকৃত মান, তার তত্ত্ব দীক্ষাগ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ার দানই বর্তমানে সরকারের কূটনৈতিক পাথর।

আতলান্তিকের ওপারে বাংলা দেশের জনসাধারণ সম্পর্কে সমবেদনার অভাব যে নেই, তা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসাদারী চমক-প্রেমী টেলিভিশন ও কিছু সত্যার্থী সাংবাদিকের সংসাহসের দরুণ এদেশে চাউর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু লেখক ও বক্তার শব্দ নির্ঝরে যতনা বর্ষণ, তার অধিক প্রচার-চারণ বৃষ্টি আমেরিকী রাজনীতিকদের। তাঁরা উদারপন্থী; তাঁরা মানবদরদী তাঁরা গণতন্ত্রপ্রেমীও বটে। গল-ব্রেকের ঘুম চটে যাবারই কথা; তার ভারতে রাজদূত হয়ে থাকা-কালীন, যুক্তরাষ্ট্রকে অটেল পি এল ৪৮০ মার্কী সহায়তা সহ ভারতের নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে বদান্যতার প্লাবন প্রদর্শনী ক্ষণস্থায়ী হলেও শব্দ হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা প্রশাসনের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সংস্থা পেন্টাগনের মাথা আরও কঠিন বাস্তব-প্রয়োগবাদী হিসেবে ভরপুর।

সুতরাং ভারত-প্রেমী আমেরিকান জননায়কদের রাশ শব্দ হাতেই ধরা রইল। গলব্রেক সাহেব বই এবং প্রবন্ধ লিখেই আপন খেদ উদগার করে ক্ষান্ত রইলেন। কেনেডি সাহেব সেনেটের জম্বাট বৈশ্যবুদ্ধির গর্ভগৃহ থেকে বিবেকের বলকানি দেখালেন ওদেশে এবং এদেশেও। সেনেটর পার্সি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসকদলের নীতি প্রতিনিধিত্ব করলেন, এদেশে এসে, সরকারী। বললেন, সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের উপস্থিতিতে বাংলা দেশের রাজনৈতিক সমাধান সম্ভাবনা কথা। এরা অনেকেই ভারতের মাটিতে পা দিতে না দিতেই দর্শন পেলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ওমরা-চোমরা উজ্জী আমাতাদের এবং বলা বাহুল্য মাই-ডায়ার এম পি-দের। শব্দ হল পশ্চাদগামী আলোক সম্পাত; সারা আন্তর্জাতিক পারিপ্ৰিতি সম্বন্ধে নতুন দিল্লীতে নব-মূল্যায়ন। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া নবলব্ধ সাধারী মাথার ওপর দিয়ে ক্রেমলিনের দুর্ভেদ্য দৃষ্টির দেয়াল ভেদ করে দৃষ্টিপাত করলেন ওয়া-শিংটনের দিকে। ঘোষিত হল তার, আগামী নভেম্বরের আমেরিকা যাত্রা। দেখা গেল দক্ষিণা দিতে তিনি জানেন, সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠ গুরুকে।

রি-মের, রাজনীতির সন্ধিক্ষে

রাজধানীর সবাক লবী মূল্য পাশ্চাত্যের নব প্রাগম্যাটিজম (বাস্তব প্রয়োগবাদ) থেকে নতুন দীক্ষা নিতে সঙ্কুচিত হয়নি। হাজার যুক্তি খাড়া করা হক, জোট নিরপেক্ষতা ধোপে টেকেনা, এমনি এক অন্তর্লীন বিশ্বাস সম্প্রতি ডান থেকে বাঁয়ে সরে এসে শাসক-দলকে অভিভূত করেছে। অথচ মত্থে কেউ ফাঁস হতে দেবে না যে, গান্ধীজির আদর্শবাদ যেমন রাজ-ঘাটের সমাধিতে শীর্ণীভূত হয়ে গেছে, তেমনি নৈহরুজীর জোট-নিরপেক্ষতাও। কারণ কি, তা এক বিদেশী সংবাদপত্রের মন্তব্যে সুস্পষ্ট : জোট নিরপেক্ষতা সর্ধক

ছিল সীমিত অর্থে; শ্বি-মেরুসম দুই বৃহৎ বিশ্ব-শান্তি প্রভাবিত গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র, অন্য রাষ্ট্র-দের এক “তৃতীয় জগৎ” রচনা করতে পড়লে তা ক্ষুদ্র এবং বিকাশমান দেশগুলির নিরাপত্তা ও আশ্রয় জোগাতে সফল হত। আজ-কের রি-মেরুসদৃশ তিন বৃহৎ শক্তির ত্রিভুজ রাজনীতিতে কিভাবে আক্রমণ বা আগ্রাসন থেকে রক্ষা-ব্যবস্থা সম্ভব? এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রী মহাশয়া, এবং তার সমযোগ্য বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রক সহকর্মী বিম্ময়কর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ভারত-রশ মৈত্রীসন্ধির কালী শব্দকে তা না শব্দকেই তাঁরা বলেছেন যে, এর ফলে ভারতের পক্ষে অপরাপর শক্তিবর্গের সঙ্গে শান্তিচুক্তি বা অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা অপসারিত হবে।

কি ডাবে? কোন সূত্র অনু-যায়ী, তা খুঁজতে হলে এক প্রান্তন চেক, বর্তমানে পশ্চিম যুরোপীয় রাজনীতিক টিপ্পনীকারের মন্তব্য স্মরণ করতে হয় : ত্রিভুজাত্মক রাজ-নীতির নিয়ম হল, তিন বিন্দুতে অবস্থিত প্রত্যেক শক্তিই চেষ্টা করে বাকি দুই শক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ যে পর্যায়, তার চেয়ে ভাল সম্বন্ধ তাদের দুজনকার সঙ্গে স্থাপন করতে। মোসাদ কথা—দুই বৃহৎ শক্তি পরস্পর সংঘর্ষে অথবা বৈরিতামূলক তানাপোড়েনে বজ্রক্ষয় করে মরুক, তৃতীয় বড় মিত্রা দু-জনের ওপরেই টেকা মেয়ে আপন আখের গুঁড়িয়ে নেবে। বলার অপেক্ষা রাখেনা, যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি এই সূত্র অনুযায়ী চীনের সঙ্গে “মিঠে বন্দোবস্তের” তাল কষছে রুশিয়া এবং চীনের পারস্পরিক বিকর্ষণ এবং সংঘর্ষ-সম্ভাবনার সুযোগ নিয়ে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া উক্ত ত্রিভুজকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট তিন শক্তির সঙ্গেই দহরম-মহ-রমের সচল সম্ভাবনা বজায় রেখে। আগষ্ট মাসে প্রথম সপ্তাহের শেষে তাঁর উক্তি অর্থব্যঞ্জক : “চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে মন-কষাকষির অবসান এবং বোঝাপড়ার ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি কি রূপ নেবে তা ভবিষ্যদবাণী করার সময় এখনও আসেনি। চীন যুক্ত- (শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

রাজধানীর চিঠি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

অনেকেই আবার ইন্দিরা-কংগ্রেসে ভোগ দিতে চাইছেন। রামসুভগ সিং এর নিজলিঙ্গাপার বিরোধিতা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তারকেশ্বরী সিংহ এবং নিজলিঙ্গাপা কংগ্রেসের অপেক্ষাকৃত তরুণ সম্ভরা বিপ্লবী রাজনীতির কথা বলতে শব্দ করেছেন। সুতরাং ইন্দিরা কংগ্রেসে এদের যোগদান নিকট ভবিষ্যতে খব অসম্ভব নয়।

এর পরে কংগ্রেস আবার তার সেই অতীতের চরিত্র বজায় রেখে বিরাজমান হবে বলে মনে হচ্ছে।

নকশালী কার্যকলাপের আত্মসমালোচনা

আজ যখন শত্রুরা বিপ্লবীদের ওপর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচণ্ডভাবে বাঁপিয়ে পড়ছে তখন বিভিন্ন অঞ্চলের কমরেডরা কে কীরকম চিন্তা করছেন জানা প্রয়োজন বলে মনে করি। নীচের বিশ্লেষণে আমাদের আত্মসমালোচনা আছে এবং বর্তমান ঘটনা সমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা (অবশ্যই দুটি-তিন নয়) আছে।

(ক) উনপঞ্চাশ এবং উনপঞ্চাশের কাছাকাছি সময়ে তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যখন তেলঙ্গানা কাকেশ্বীপ ডেমজড় সন্দেহখালি ইত্যাদি মন্তব্য করছে তখন লন্ডনে-স্থিত কিছুর ভারতীয় ছাত্র চীনে গিয়েছিল চু-তে-কে বোঝাতে কী করে তারা একটার পর একটা গ্রাম শহর দখল করে চলেছে। চু-তে সব শব্দে অতঃপর মন্তব্য করেছিলেন, “you have liberated everything but could not hold on” আমাদের হোল সেই হোল্ড অন-এর সমস্যা। আমরা কোথাও কোথাও মজ্জাগুলি তৈরী করছি কিন্তু কোথাও কিছুর স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে পারছি না। এটা আমাদের রণকৌশলগত দুটি অবশ্যই। আমরা মজ্জাগুলিকে স্থায়ী করতে পারিনি, কারণ ক্যাপক জনগণের আমাদের প্রতি সমর্থনের অভাব

অথবা আমরা প্রয়োজনানুযায়ী “লাল সন্ধ্যাস” তৈরী করতে ব্যর্থ হয়েছি। এখানে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে “লাল সন্ধ্যাস” অর্থ সন্ধ্যাসের খাতিরে সন্ধ্যাস তৈরী করা নয়। লাল সন্ধ্যাস কখনই আক্রমণাত্মক হয় না। ক্রমবর্ধমান ও ব্যাপক হারে শ্বেত সন্ধ্যাসের প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আকারে লাল সন্ধ্যাস জন্ম নেয় এবং বর্ধিত হয়। সন্ধ্যাস

শ্রেণী তত্ত্বের সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে (উৎপাদন সম্পর্কেও উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার ওপর ভিত্তি করে) শ্রেণীমিত্র ও শ্রেণীশত্রুর নিখুঁত পার্থক্য তৈরী করা আবশ্যিক কর্তব্য। কৃষকের বিরুদ্ধে কৃষককে, শ্রমিকের বিরুদ্ধে শ্রমিককে, বন্যেকের বিরুদ্ধে বন্যেককে, ছাত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রকে সংঘর্ষে লিপ্ত করা আবশ্যিক প্রতি-বিপ্লবী কাজ।

মতামত

সত্যিই “লাল সন্ধ্যাস” কিনা তা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি এই সন্ধ্যাসের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া। লাল সন্ধ্যাস সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া। লাল সন্ধ্যাস সাধারণ মানুষকে কখনই ভীত ব্যতিব্যস্ত ও উদ্বেগিত করেনা বরং সাহসী ও এই সন্ধ্যাস তৈরী ও প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে।

(খ) পেরেক কলের মজুর কদিন সি পি এম-এর মিছিলে থাকলে অথবা মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র এস ইউ সি বা আর এস পি সি পি আই এমন কি নব কংগ্রেসের পোস্টার মারলেই শ্রেণীশত্রু হয়ে যায় না। মার্কসের সংজ্ঞানুযায়ী

(গ) আমাদের অনেকগুলো শ্রোয়াদের যেমন “বন্দকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে,” “যে বত পড়ে সে ভত মর্খ হয়” প্রভৃতির যথার্থ ব্যাখ্যা জনসাধারণ সমস্ত স্তরের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়নি। অনেক রকম অসুবিধা ছিল সত্যি কথা, কিন্তু শ্রোয়াদের প্রকৃত তাৎপর্য জনসাধারণের মধ্যে যদি আমরা যথাসময়ে ছড়িয়ে দিতে না পারি তবে তাঁদের মধ্যে আমাদের রাজনীতি ও রণনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক যার সোজা অর্থ তাদের সমর্থন আমরা আদায় করতে ব্যর্থ হব। আর এটাও সত্যি কথা

নারদনিক ও নকশাল

দপ্তরের “বিশেষ শারদ সংখ্যা” (সত্যেরই সেন্টেম্বর একান্তর) পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। এই সংখ্যায় প্রকাশিত কৌশলভের প্রবন্ধ সি পি আই এম এল-এর রাজনীতি প্রসঙ্গে ‘লেখকটির’ সম্পর্কে দু’একটী বক্তব্য রাখছি। এ বিষয়ে লেখকের মতামত জানতে পারলে বাধিত হব।

কৌশলভ তাঁর লেখায় সি পি আই এম এল-এর সঙ্গে রাশিয়ান নারদনিকদের তুলনা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে নারদনিকদের সঙ্গে সি পি আই এম এল লাইনের কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না একমাত্র ব্যক্তি হত্যা ছাড়া। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেছেন, রাশিয়ান নারদনিক পার্টি মনে করত যে “একমাত্র কৃষকদের উপর নির্ভর করেই জারতন্ত্র জামিদারতন্ত্র উচ্ছেদ করা সম্ভবপর তাঁরা জারতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব স্বীকার করতে কিংবা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে মোটেই রাজী ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের সি পি আই-এম এল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং সহযোগিতায় বিশ্বাসী। আমার বক্তব্য প্রকৃত ঘটনা কি তাই? আমার মনে হয় ঠিক এর বিপরীত। ভারতে সি পি আই-এম এল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব স্বীকার করেনি ঠিক নারদনিকদের মতই। এর প্রমাণ তাদের লেখা, প্রচার ইস্তেহার ইত্যাদিতেই পেরেছে। তারা

বলেছেন, শ্রমিকরা স্বতন্ত্রভাবে পালকে রীতিমত আবদ্ধ, সহসা তাদের মন্থিত ঘটবে না। তাদের বাদ দিয়েই কৃষি বিপ্লব সম্ভব। এর বাস্তব দৃষ্টান্তও আমরা পেরেছি। আটব্রিটিউনসত্তর সালে দেখেছি তাঁরা দলে দলে গ্রামে বিপ্লবী ঘাঁটি করতে গেছেন কিন্তু কলে, কারখানার শ্রমিক সংগঠনে মোটেই উৎসাহী হননি। বরং শ্রমিকদের তারা প্রতিক্রিয়ায় সংশোধনবাদে শিকার বলেই মনে করেছেন। তারা নারদনিকদের মতোই ধরে রাখতে পারি নি। এটা আরাদের সঙ্গে সি পি আই এম এল পূর্জির মালিকেরা আমাদের গ্রামা-প্রলেতারিয়েত বলতে কৃষককেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শ্রমিক-শ্রেণীকে তারা অগ্রবর্তী বাহিনী বলে স্বীকার করেন নি।

দ্বিতীয়ত, নারদনিকদের মতই এম এল দলও বিশ্বাস করে (অন্তত কার্যকলাপ দেখে মনে হয়) “শ্রেণী বা শ্রেণী সংগ্রাম ইতিহাস সৃষ্টি করে না, কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তিরাই “হিরোরাই” ইতিহাস সৃষ্টি করে”। এর প্রমাণ দেখতে পাই চার মজুরদারের ডিক্টেটরশিপের কাছে সবার আত্মসমর্পণে। একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোন সদস্য (এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও) চার মজুরদারের বিন্দুমাত্র সমালোচনা বা তার উদ্ভিন্ন বিরোধিতা করলে (যদিও যেকোন কমিউনিস্ট পার্টির

গঠনতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত) তাকে সংশোধনবাদী এই আখ্যা দিয়ে বিভাঙিত করা হয়েছে। এটা কি “হিরো” প্রধান পার্টি বলে মনে করার সুযোগ করে দেয় না? তাহলে নারদনিকদের সঙ্গে তফাৎ কোথায়?

তৃতীয়ত, ব্যক্তিহত্যার প্রসঙ্গে লেখক লেনিনের একটি উক্তি রেখেছেন—প্রথম পর্ষায় একটি দিক ব্যক্তি হত্যা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং পূর্জির মালিকেরা নিচতলার তলার কর্মচারীদের হত্যা করা। এই উক্তি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই। যদি উক্তিটি মেনেও নেওয়া যায় তাহলেও দেখা যাবে আমাদের এখানে এম এল দল যাদের “খতম” করেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিরোধী রাজনীতির (সি পি এম) সদস্য, কর্মী ও নেতারা আছেন। এর দ্বারা কি লেনিনের বক্তব্য (আমার সন্দেহ আছে) অনুসরণ করা হয়েছে? সবশেষে “পাকিস্তান প্রসঙ্গে” যে অনুচ্ছেদটি লিখেছেন তাতে পাকিস্তানের বর্তমান লড়াই প্রসঙ্গে সি পি আই এম এল-এর কোন বক্তব্যই দেন নি। শত্রুমাত্র কিছু কথা মারপট্ট আছে। এব্যাপারে লেখক কি এম এল দলের বক্তব্য জানেন না, না জেনেও প্রকাশ করতে চান না?

দেবশঙ্কর দত্ত

জনসাধারণের ক্যাপক অংশের সমর্থন ছাড়া যে কোন রণকৌশল অপরিণামদর্শী প্রান্ত বলে বিবেচিত হবে যার ফলে বিরাট সংস্কার বিপ্লবীদের অমুখ্য প্রাণ হারাতে হয়, সংগঠনের ভিত একদম নড়বড়ে হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের সমস্ত শ্রোয়ান গুলোর ব্যাখ্যা ছড়িয়ে দিয়ে শ্রোয়ানগুলোর পক্ষে তাঁদের সমর্থনপন্থ হয়ে তবেই একমাত্র আমাদের রণকৌশলে শ্রোয়ান-গুলোর বাস্তবায়ন ঘটানো উচিত হবে।

(ঘ) সংগঠনের প্রতিটি সেকা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৈপ্লবিক তত্ত্ব, বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের বাস্তব ধ্যানধারণা বিস্তৃত করবে, জনসাধারণের মধ্যে থেকে মতামত সংগ্রহের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে। জনসাধারণের ভেতর থেকে সংগৃহীত মতামত-গুলো আলোচনার জন্য সংগঠনে যথেষ্ট অবকাশ রাখবে তার সেই মতামতগুলোর ওপর নির্ভর করেই একমাত্র বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য, প্রস্তুতি ও কর্মপদ্ধতি তৈরী করবে। “কমিউনিস্টরা প্রতিদিনই জনসাধারণের শিক্ষক আবার প্রতিদিনই তাদের ছাত্র।”

(ঙ) পূর্জির মালিকেরা আই-বিদের অবশ্যই শ্রেণীশত্রু হিসেবে দেখতে হবে, কারণ তাঁরাই হল বর্জ্যোন্মী রাষ্ট্রকঠামোর সশস্ত্র রক্ষা।

(চ) শহরাঞ্চলে আমাদের শত্রু হবে : পূর্জির মালিক, আই বি ও বড় পূর্জির মালিক। গ্রামাঞ্চলে আমাদের শত্রু : পূর্জির মালিক, আই বি ও বড় পূর্জির মালিক। গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে উভয়ক্ষেত্রেই ছোট ও মাঝারি পূর্জির মালিকেরা আমাদের শত্রু নয়। এই প্রসঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে পূর্জির শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে সমস্ত কমরেডরা বিশদভাবে পড়বেন, আলোচনা করবেন ও বর্তমান পরিস্থিতিতে বড় পূর্জির সঙ্গে ছোট ও মাঝারি পূর্জির পার্থক্য করার সময় অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। বড় পূর্জি অবশ্যই দালাল পূর্জি।

(ছ) সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বর্তমান অবস্থায়; পার্লামেন্টারী রীতিনীতিকে যারা অস্বীকার করে মার্কসবাদী লেনিনবাদী কায়দায় সশস্ত্র সংগ্রামের পথ তথা নকশাল-বাড়ীর পথকেই ভারতীয় বিপ্লবের পথ বলে গ্রহণ করেছেন সেইসব সমস্ত স্তরের মানুষের একব্যক্ত ফল্ট তৈরী করা। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে অন্যান্য বামপন্থী দল-গুলোর (সংসদীয় সংজ্ঞানুযায়ী) সাধারণ কর্মীরা কখনই আমাদের শত্রু নয়। মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে তাদেরও একে একে ফল্টে জড়ো করা হবে আমাদের কর্তব্য।

(পাঁচ) বর্তমানের কতগুলো ঘটনা (যেমন কাশীপুর বরাহনগর, হাওড়া বন্দ্রামান, বীরভূম, টালিগঞ্জ চণ্ডীতলা প্রভৃতি অঞ্চলে বিপ্লবীদের ওপর শত্রুদের বিভিন্ন কায়দার

আক্রমণ) একথা পরিষ্কার করে দিল যে বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ তীব্রতর হচ্ছে। আমরা বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের মধ্যে অবস্থান করছি। কিন্তু এখন শত্রুর আক্রমণের পাল্লা। বিপ্লবীদের ওপর তারা তাদের সমস্ত রকম শক্তি নিয়ে বাঁপিয়ে পড়েছে। “শত্রু যখন আক্রমণ করে তখন আমরা আত্মগোপন করি, শত্রু যখন বিশ্রাম করে তখন আমরা আক্রমণ করি।” আমাদের এখন আত্মগোপনের সময়। তার মানে এই নয় আমাদের লড়াই এখন শেষ হয়ে গেল। বরং ঠিক এই সময়টাই “লাল সন্ধ্যাস” তৈরীর সবচেয়ে অনুকূল সময়। আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে। শত্রুর সঙ্গে এখন কোন কারণেই সময়েই মর্শ্বোন্মী লড়াইয়ে নামা চলবে না। বিপ্লবীদের সুদৃষ্টি গোয়েন্দাদের এখন অত্যন্ত সক্রিয় হওয়ার সময়। সময়ে ঠিক উপায়ে শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়াই হবে আমাদের বর্তমানের রণকৌশল। শত্রু যতই হস্তে হয়ে ব্যর্থকাম হবে ততই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে যার ফলে “লাল সন্ধ্যাস” তৈরীর কাজ দাউদাউ করে এগিয়ে যাবে।

(ঝ) এখন আমাদের রণকৌশল হওয়া উচিত রক্ষণাত্মক। সবচেয়ে বেশী নজর দিতে হবে সংগঠনের ওপর, জনগণের ভেতর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাবার ওপর, ব্যাপক জনগণের সমর্থন আদায়ের ওপর। কিন্তু সচেতনভাবে যে কৃষ্টি বা দল এককভাবে অথবা পূর্জির মালিকেরা আই-বিদের সহায়তায় বিপ্লবীদের আক্রমণ করবে তাদের অবশ্যই খতম করতে হবে। এই রকম দালাল ও শ্রেণীশত্রু খতম লাল সন্ধ্যাস সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে; শ্রেণী-শত্রু খতম করতে গিয়ে উদ্বেজনার বশে আমরা এমন কোন সিদ্ধান্ত নেবনা যা যথেষ্ট ঝুঁকি বহন করে এবং সংগঠনের বিস্তৃতিতে দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। প্রয়োজন হলে সংগঠনের বিস্তৃতির স্বার্থে দু’একটি শ্রেণীশত্রু বা দালালকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব, কারণ সংগঠন (তথা ক্যাপক জনগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবার, তাঁদের সমর্থন অর্জন করার অন্যতম পন্থা) বিস্তৃত হলে, শক্তিশালী হলে শ্রেণীশত্রু ও দালালেরা অবশ্যই খতম হবে। আবার একথাও মনে রাখতে হবে শ্রেণীশত্রু এবং দালাল খতমের মাধ্যমে লাল সন্ধ্যাসের তীব্রতা বৃদ্ধি করা সংগঠনকে শক্তিশালী করার অন্যতম হাতিয়ার।

(ঞ) মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সে তুং এর চিন্তাধারার নিরিখে প্রত্যেকটি নগণ্য ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতি সবসময় বাস্তবের অনুপন্থী করে তুলতে হবে। আমাদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটি ক্রমবিকাশশীল বিজ্ঞান।

(শেখাংশ জস্টম পুস্তক)

ভরত দর্পণ

সিয়ল্লার নব কংগ্রেসের এ আই সি সির বৈঠকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহের ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর বিশেষ প্রতিকূলতাসত্ত্বেও নির্বাচনী কর্মটি নির্বাচনে চন্দ্রশেখরের জয়লাভ, নব কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ মন্বব কলহেরই অভি-ব্যক্তি, কারণ রাজ্য কংগ্রেসের নেতা-দের স্পষ্ট সমর্থন না পেলে শ্রীচন্দ্র-শেখর যে ক্ষিততে পারতেন না, তা একবারেই সর্বোচ্চ স্বীকার করে-ছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে যে দশটি রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ বাদে) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তাতে নব কংগ্রেসের জয়লাভ আজ একেবারে সুনিশ্চিত নয়, সি পি আই এর মত দলছত্র বামপন্থীদের সেবা-সাহায্য সত্ত্বেও, একথা আজ রাজনৈতিক মহলে প্রকাশ্যেই উচ্চা-রিত হচ্ছে। উড়িষ্যা চারটি উপ-নির্বাচনেই ইন্দিরা কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় এই সম্ভাবনাকে দৃষ্টিগোচর করে দিয়েছে।

যদি ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে ইন্দি-রাজীর কংগ্রেস মার খায়, তাহলে আইনগতভাবে বাই হুঁক, নৈতিক-ভাবে লোকসভার নব কংগ্রেসী সংখ্যাধিক্য নিশ্চয়ই হয়ে পড়বে। নব কংগ্রেসী অনেক আরারাম গলা-

রাম তখন আবির্ভূত হবেন। ইতি-মধ্যেই উড়িষ্যা, পাজাব, বিহার, মহাশূর, আসাম, অন্ধ্র, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে নব কংগ্রেসীদের নিজেদের খিস্তি খেউড়ে আকাশ-বাতাস আগেকার মতই ভরপুর।

মহাশূর

মহাশূরের বেলগাঁওয়ে মহা-শূর রাজ্য পলিটিক্যাল কনফা-রেন্সে এই খিস্তি খেউড় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে কেন্দ্রীয় ডেপুটী মন্ত্রী শ্রীশংকরানন্দ এবং লোকসভার নব কংগ্রেসী সদস্য শ্রীনাগেশ্বর শিবাপ্পা এম পি দ্বজনের মধ্যে ঘূষোষার পর্যায়ে গিয়ে হাজির হয়। প্যাণ্ডেলের ভিতরে তখন উপরের সমর্থকরাও হাতাহাতি মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

এম পি মশাই বলেছিলেন যে আদি কংগ্রেস, সি এস পি, এস এস পি, স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘ থেকে যেসব ভদ্রলোক একান্তর সালের লোকসভা নির্বাচনের পর নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, তাদের সক্রিয় কংগ্রেস সদস্য অথবা কার্-করী কমিটিতে সদস্য করা চলবে না কিংবা তাদের বিধানসভা নির্বা-চনে মনোনয়ন দেওয়া হবে না। বলা বাহুল্য এই প্রস্তাব গৃহীত হলে মহাশূর নব কংগ্রেসে ঠগ

বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায়। কারণ সবাই তো ওই সব দল থেকে আরারাম। বাতিল বিধানসভার বিরোধী দলপতি শ্রী এস শিবাপ্পাও দল ছেড়ে নব কংগ্রেসে যোগ দিয়ে-ছেন।

মহাশূর থেকে নির্বাচিত ডেপুটী মন্ত্রী শ্রীশংকরানন্দ, রাজ্য নব কংগ্রে-সের সভাপতি বহু কণ্ঠে মারা-মারি ধামিয়ে সভার কাজ তাদা-তাড়ি শেষ করে দেন এই বলে যে সমস্ত প্রস্তাবই পরবর্তী কালে বিবেচনা করা হবে।

আসাম

আসামের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার মৃত্যুর পর শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী মুখ্য-মন্ত্রী হয়েছেন। চৌধুরী মশাই মনেপ্রাণে আদি কংগ্রেসী সর্বাধা-বুকে আদি কংগ্রেস ছেড়ে নব-কংগ্রেসী হয়েছেন।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শ্রীচৌধুরীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের সংখ্যাধিক্য লাভের আশা ক্ষীণ। তাঁর মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ঞ উপদলীয় অবস্থাস ও কলহের উপজাত ফল।

শ্রীদেবেশ্বর শর্মা কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জনাব ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের চিরশত্রু। ফকরু-দ্দিন সাহেবের জন্যেই তাঁকে বিমলাপ্রসাদ চালিহা অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ফকরুদ্দিন আলি আহ-মেদের মন্ত্রাঙ্ক জনাব মঈনউল হক চৌধুরী মশাই বর্তমানে

কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন। জনাব মঈনউল হক চৌধুরী প্রকাশ্যেই শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর বাঙালী বিরোধী মনো-ভাবের সমালোচনা করে এবং বাঙা-লীভাষী কাছাড় জেলার শিল্পো-ন্নয়নের প্রতি আসাম সরকারের বিমাতৃসদৃশ মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস (শা) এবং কাছাড় জেলা কংগ্রেস (শা) কার্যকরী সমিতির জনৈক সভ্য পাকিস্তানের শ্রীহট্ট জেলার গিয়ে ইয়াহিয়া খানের সপক্ষে প্রচর করছিলেন। তিনি মৃত্তি ফৌজের হাতে নিহত হয়েছেন। কিন্তু তার মৃত্যু সংবাদ পেলেও কাছাড় জেলা কংগ্রেস শোক জ্ঞাপনের জন্য সভা ডাকতে পরছেন না। কার্যকরী কমিটির সভ্য মারা গেছেন, জেলা কমিটির সভা ডাকলেই সৌজন্য-মূলক শোক জ্ঞাপনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। সতরাং সভা না ডাকাই ঠিক হয়েছে।

আসামে খাদ্য ও সমস্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জনগণের বিক্ষোভ ও চূড়ান্ত আকার ধারণ করছে। প্রায় চার হাজার মহিলা ধবড়ী থেকে বাইশ মাইল দূরে আগমনী রকের বি ডি ও অফিস ঘেরাও করেন এবং বারোই অক্টোবর তাঁরা গোলোকগঞ্জ থানা ঘেরাও করেন এবং আগমনীর কাছে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বেলা তিনটা থেকে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেন। নব কংগ্রেসী সরকারের নির্দেশে ধবড়ীর ডেপুটী কমি-শনার ও পুলিশ সুপার বহু সংস্কক সশস্ত্র বাহিনীর লোক নিয়ে তাদের সরিয়ে দেন।

এই ক্রমবর্ধমান জনবিক্ষো-ভের মধ্যে নব কংগ্রেসী জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। সমস্ত কংগ্রেস বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসামের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্যে যত্ন ফল্ট গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী ও এম পি শ্রীদেবেশ্বর শর্মা।

নাগাল্যান্ড

নাগাল্যান্ডের চারজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহোর্কিস সেমা যে নির্দেশ দিয়ে-ছিলেন তা প্রতিপালিত হয়েছে। এই পদত্যাগকারী মন্ত্রীদের মধ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আগামী নাগাদের গোষ্ঠি নেতা শ্রীটি আগ্য-মীও রয়েছেন।

নাগাল্যান্ড বিধানসভার বিগত অধিবেশনে তেইশে সেপ্টেম্বর একটি প্রস্তাব এনে বলা হয় যে বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আবায় আরম্ভ করা এবং নাগাভূমির রাজনৈতিক মীমাংসা স্বরাস্ত্রিত করার জন্যে ভারত সর-কারকে অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিরোধী যুক্ত ফ্রন্টের জনৈক সদস্য সংশোধনী এনে যোগ করেন যে ভারত সরকার যেন

শ্রীমহেন্দ্র ফিজোপান্থী বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গেই আলোচনা করেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ডেপুটী মন্ত্রী শ্রীচন্দ্রবাতোশি জমির সংশোধনী প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে ইনি পরাজিত হন।

শ্রীটি আগ্যামী চান যে সমস্ত বিদ্রোহী নাগা গ্রুপের সঙ্গেই আলোচনা করতে হবেই অর্থাৎ কাইটো, অংডি চাং প্রভৃতি যেসব “বিদ্রোহী” নেতা ভারতের অন্তর্ভুক্ত থেকেও পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, চলাচল ও অর্থ ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার, (শেবাংশ সপ্তম পৃষ্ঠার)

গুরু দক্ষিণা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

রাস্ত্রের সামগ্রিক ভিত্তিতানামে একটা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা বাড়িয়েছে। তাঁর এই উত্তির পেছনে গত বছর ধরে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্ন্যাসের উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টার প্রতিফলন দেখা যায়। ঠিক যবে থেকে ওয়া-রশ নগরীতে যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত বিশেষ গোপনীয়তার সঙ্গে চীনের রাজদূতের সঙ্গে আলাপ আলো-চনা শুরু করে, তখন থেকে ভারতের শাসকমহলেও চীন সম্পর্কে স্বতীয় চিন্তাধারার পূরণপাত! প্রায় বছর-খানেক পূর্বে রাজধানী দিল্লীতে এক “চীন পর্যালোচনা কেন্দ্র”র বৈঠকে ধরেশ্বর বুদ্ধিজীবীরা আপনাপন পর্যবেক্ষণের ফলাফল ব্যক্ত করেন। তাতে বোঝা যায়, সর-কারী মহল এখন তাদের চীন-নীতির পুনর্নির্মাণ করতে চায় মোটামুটি এইভাবে—(এক) ভারত এবং চীনের মধ্যে রাজদূত বিনি-ময়ের দ্বারা বর্তমানে চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার অথবা “বিষয় ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি” মাধ্যমে যে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে তার উন্নতিবিধান নিষ্প্রয়োজন; কারণ, তার ফলে চীন আন্তর্জাতিক স্তরে অধিকতর মর্যাদা লাভ করবে, চাই কি হয়ত বা ভারতে-রই প্রতিষ্ঠাবলে বৃহৎ দুই শক্তির বিরুদ্ধে এক নতুন সংস্থা গঠনের সুযোগ পেয়ে যাবে। (দুই) কিন্তু চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবার উদ্দেশ্যে সংযোগ এবং স্বিম্বদ্বী আলোপ আরম্ভ হওয়া অবিলম্বে দরকার, যদিও তা হবে স্বনামধন্য ব্যক্তির মাধ্যমে ও সুগো-পনে। (তিন) চীনকে ভেজাবার জন্য কিছু কিছু “কনসেশন” দেওয়া দরকার—যথা, ভারতস্থ তিব্বতীদের সরকারী পৃষ্ঠপোষ-কতাদান বন্ধ করা, ফরমোজা সর-কারের সঙ্গে দহরম মহরমে ক্ষান্ত দেওয়া, এবং সোভিয়েত রাশিয়ার ওপন অতিরিক্ত নিভরতা কমান; পরিবর্তে চীনের তরফে যাতে বিদ্রোহী উপজাতি এবং বিপ্লবী চরমপন্থীদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ হয়, তার জন্য দাবী করা; কাশ্মীর সম্পর্কেও চীনের মনোভঙ্গী বদ-লান চাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিদেশ দর্পণ

যুগোশ্লাভিয়া এবং সোভিয়েত ও চীন

(দর্পণের পর্ববেক্ষক)

প্রায় বিশ বছরেরও বেশী ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন-যুগোশ্লাভি-য়ার যে তাত্ত্বিক বিরোধ চলেছে, মস্কো এখন মনে হয় তার অব-স্থান ষটাতে উদগ্রীব। তার কারণও আছে। প্রধান কারণ যুগোশ্লাভি-য়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির মাধ-মেই মস্কো মনে করে যে বলবান চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব হ্রাস করা যাবে।

বস্তুত পক্ষে যুগোশ্লাভিয়া নিয়ে এই দুই সমাজতান্ত্রিক সিংহ বড় মজার খেলা খেলছে। যে দেশ এতদিন আপাতস্ত্রে ছিল, আজ দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত ও চীন উভ-য়েই তার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি-করণের ব্যাপারে আগ্রহী। পারস্প-রিক রেবারেই এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শনময় ক্ষমতা দখলের খোড়দো-ড়ের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ইউরোপে চীনের পরোপদ্রি মিত্র হচ্ছে আলবানিয়া এবং রুম্যানিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। এর সঙ্গে যদি টিটোকে আনা যায় তাহলে চীন ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক

গোষ্ঠীতে প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারে মস্কোর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারবে। মস্কোও তা ভালভাবেই জানে, তাই হঠাৎ রেজনেভের বেল-গ্রেড যাত্রা।

অবশ্য হঠাৎ সম্পর্ক সহজ করতে যাওয়ার অনেক অসুবিধা আছে এবং রেজনেভও নিশ্চয়ই সেটা অনু-ভব করেছেন। এই ধারণাই জন্মায় বেলগ্রেডে তাঁর পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা থেকে। ওখানে পৌঁছেই তিনি, প্রথমে বললেন যে “সীমিত সার্বভৌমত্ব” বলে কোন নীতি মস্কো মানে না—অথচ এই নীতির জোরেই ক্রেমলিন এতদিন ধরে প্রতিবেশী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলির উপর নিজের প্রভাব ক্রমেই রেখেছে এবং দরকার পড়লে সৈন্য পাঠাতেও ছাড়ে নি, যেমন চেকো-শ্লোভাকিয়ায়। হতবাক যুগোশ্লা-ভরা যখন মস্কোর নীতির কোন আমূল পরিবর্তন হল কী না চিন্তা করছে তখনই তিনি বলে বসলেন যে যুগোশ্লাভিয়ার গোষ্ঠী নির-পেক্ষতা নীতির একটা সীমা থাকা

উচিত। তিনি আরও বলেন যে উনিশশ পঞ্চাশ সালের “বেলগ্রেড ডিক্লারেশন” যার ফলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ব্রুচভ সমস্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির পূর্ণ স্বাধী-শ্রীতা মেনে নিয়েছিলেন, তা আজ একমাত্র যুগোশ্লাভিয়ার সংশোধনের পরই অনুসরণ করা যেতে পারে।

রেজনেভের এই পরস্পর বিরোধী উক্তি না করেও উপায় ছিল না। কারণ একদিকে যেমন তিনি যুগো-শ্লাভিয়ার বন্ধন কামনা করেন সঙ্গে সঙ্গে যুগোশ্লাভ সরকারের বর্তমান নীতিসমূহ মেনে নিয়ে তাঁকে অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি নিয়ে বিপদে পড়তে হবে যাদের উপর তাঁর সরকার এবং পার্টি যখন তখন ডান্ডা ঘোরান। কাজেই এই সব নরম-গরম কথার একমাত্র উদ্দেশ্য যেনতেন ভাবে দলভারী করা। এবং তৎপত্তভাবে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আজ কতখানি দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এ তারই আর একটা প্রমাণ।

অর্থনৈতিক দর্পণ

বেকারী কেন হয়?

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

এবছরের সেন্সাস রিপোর্টে জানা গিয়েছে যে উনিশশ একশটি সালে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা তেতাল্লিশ কোটী বিরানব্বই লক্ষের মধ্যে ষোলকোটী চৌষাট লক্ষ লোক কর্মরত ছিলেন, উনিশশ ছেয়াট সালে এই কর্মরত লোকের সংখ্যা আঠারো কোটী চা্লিশ লক্ষে পৌঁছে, কিন্তু উনিশশ একশতর সালে সেন্সাসে দেখা যায় যে কর্মরত লোকের সংখ্যা কমে গিয়ে আবার ষোল কোটী আশি লক্ষে নেমে এসেছে। অথচ লোকসংখ্যা প্রায় একাত্তর কোটী হয়েছে।

এক কথায় কংগ্রেসী সমাজ-তন্ত্রের ঢাকের বাড়িতে চাকরী-বাকরী দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। “গরীবী হঠাৎ” এর ধ্বজা-ধারীরা দূর কোটীরও বেশী লোকের কর্মসংস্থান ধ্বংস করেছে, এদের ওপর নির্ভরশীল আরো প্রায় দশ-কোটী মানুষকে অনশন অর্ধাশনের করাল গ্রাসে নিষ্ক্ষেপ করেছে।

ঠিক এই কথাটাই ঢেকে রাখার অপচেষ্টায় তারা একশ্রমীর বেকার যুবকদের বুদ্ধিয়েছে যে তাদের বেকারীর জন্যে দায়ী নব কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক নীতি নয়, যারা এখন কর্মরত তারাই নাকি বেকারদের বেকারীর দরজাগ্যের জন্যে দায়ী। তাই নব কংগ্রেসীরা কখনও “স্থানীয় যুবকদের চাকুরী দিতে হবে”, “চার ঘণ্টা করে কাজ ও বেতন কর্মরত ও বেকারদের মধ্যে ভাগ করে দাও”, “ধর্মঘটী অথবা অনুপার্জিত শ্রমিক কমচারীর চেয়ার দখল করে”—এ ধরনের কতগুলি উস্কানিমূলক শ্লোগান তুলছে। বলা বাহুল্য এর পেছনে নব কংগ্রেসী রাজনৈতিক বৃন্দ, একচেটিয়া পুঁজি মালিক, এবং শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সমস্ত অংশের স্পষ্ট সমর্থন রয়েছে।

এই প্রতিক্রিয়ার শক্তিদলি জোট বোধে অনগ্রসর ও অপেক্ষাকৃত অসংগঠিত ভারতবাসীর নজর প্রকৃত শত্রুদের দিক থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়, তারা চায় এই সরল নির্বিরোধ মানবগুলি তাদের বেকারী, অনশন ও দর্দশার জন্যে যারা আসল দায়ী সেই একচেটিয়া পুঁজিপাতি জমিদার চক্র এবং তাদের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন দালালকে যেন চিনতে না পারেন।

সেন্সাস রিপোর্টে পাশ্চিম-বঙ্গের অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে উনিশশ একশটি সালে লোকসংখ্যা ছিল তিন কোটী চা্লিশ লক্ষ, এর তেত্রিশ শতাংশের কিছু বেশী লোক কৃষি, শ্রমিক, কৃষক এবং শিল্প বাণিজ্য সহ সমস্ত অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। উনিশশ একশতর সালে লোক সংখ্যা বেড়ে চার কোটী

চতুয়া্লিশ লক্ষ হয়েছে, কিন্তু কর্মরত লোকসংখ্যা তেত্রিশ শতাংশ থেকে কমে আটশ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

কলকাতা শিল্প এলাকার উনিশশ একশটি সালে লোকসংখ্যা ছিল সাতাশ লক্ষ, কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল এগারো লক্ষ বিরানিশ হাজার সাতশ উনিব্বই জন। উনিশশ একশতর সালে লোকসংখ্যা একত্রিশ লক্ষ কিন্তু কর্মরত লোকের সংখ্যা এগারো লক্ষ তেয়াট হাজার আটশো উনিশ জন। অর্থাৎ লোক বেড়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থান কমে গেছে। ফলে বেকারীর হতাশার জনজীবন ভারাক্রান্ত।

শুদ্ধ কলকাতায় কেন, আমাদের সমৃদ্ধ এলাকা আসানসোল-রানীগঞ্জ কয়লাখনি এবং দুর্গাপুর হীরাপুর কুলাটি শিল্প এলাকায়ও একই দুরবস্থা। এই দশ বছরে লোক সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ থেকে চা্লিশ লক্ষে পৌঁছেছে। এই নতুন দশ লক্ষ লোকের মধ্যে কাজ হয়েছে পঁচাত্তর হাজার লোকের, বাকীরা বেকার। মোট কর্মসংস্থানের হার উনিশশ একশটি সালের উনিশশ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ছাব্বিশ শতাংশ।

শিল্প এলাকাবহীন কৃষিপ্রধান মেদিনীপুর জেলার লোক সংখ্যা এই দশ বছরে তেরো লক্ষ বেড়েছে, এবং এই তেরো লক্ষের মধ্যে কাজ ছুটলে তিরানিশ হাজার জন লোকের। এর মধ্যে প্রায় সবাই ভূমি হীন কৃষক।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কর্মহীন ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বেড়ে গেছে। এরা শহরে শিল্পাঞ্চলে এসে বেতন মজুরীর পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে, বেকারী বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে—শুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে কেন, সারা ভারতেই এই দ্রুত বেকারী বৃদ্ধির মূল কারণ কংগ্রেস সরকারের আর্থিক নীতি। এই বধ্যা ধনিক-মালিক তোষণ নীতির ফলশ্রুতি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বেকারী এবং মজুরী হ্রাস।

বেকার সৃষ্টি হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ নিয়মে। পুঁজিবাদী মালিক যতদিন থাকবে, বেকারীও ততদিন থাকবে। কেন?

পুঁজিবাদী মালিক যে মনোফা কল্পে তার একটা মোটা অংশ কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাবার কাজে লাগায়, বা নতুন কারখানা করে। ফলে যন্ত্রপাতি মেশিনারী প্রভৃতিতে লব্ধি বেড়ে যায়। তখন মজুরের চাহিদা বাড়ে। কোন পণ্যের চাহিদা বাড়লে তার দাম বাড়ে। সুতরাং মজুরের চাহিদা বাড়লে মজুরীও বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। চাহিদার সঙ্গে/তাল

য়েখে মজুরী বৃদ্ধি পেলে মালিকের মনোফা কমে যায়।

অন্য পণ্যের বেলায় চাহিদা বাড়লে, যেমন কাপড়ের চাহিদা বাড়লে, উৎপাদন বাড়িয়ে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটানো সম্ভব হয়, কিন্তু মজুরের শ্রমশক্তি এমন একটা পণ্য যে তার উৎপাদন বাড়তে গেলেই শ্রমশক্তির মালিক মজুরের খাটবার ক্ষমতা বাড়তে হয়। তাকে ভালো খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, আনন্দের উপকরণ সংগ্রহের মত মজুরী দিতে হয়। অন্যকথায় মজুরী বাড়তে হয়। ফলে বাজার দাম ও উৎপাদন খরচ প্রায় সমান হয়ে যায় এবং মনোফা থাকে না। মনোফাই হল পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য বা একমাত্র লক্ষ্য।

সুতরাং অন্যান্য উপকরণের মত মজুরের সংখ্যা বাড়িয়ে চাকুরী সংস্থান করলে পুঁজিবাদী উৎপাদনে মনোফা থাকে না। মজুরীর হার কম রেখে বেশি খাটিয়ে মনোফা করাই পুঁজিবাদী উৎপাদনে পদ্ধতি।

অথচ যন্ত্রপাতি, কলকারখানা বসালেই মজুর লাগবে। দাসপ্রথা বজায় থাকলে মানুষকে নিয়ে পুঁজিবাদী মালিক মজুর বাড়িয়ে নিত। ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর সম্তানসম্ভারিতাও মজুরের চাহিদা নিয়মিত ভাবে পূরণ করতে পারত। আধুনিক যুগে তা তো আর সম্ভব নয়।

তাই মজুরী যাতে না বাড়ে, অথচ কাজের জন্য মজুর পাওয়া সম্ভব হয়, তার জন্যে মালিকশ্রেণী বিরাট বেকার বাহিনী করার কৌশল অবলম্বন করে। সেই উদ্দেশ্যেই তাদের শ্রেণী-সরকারের সমস্ত অর্থনৈতিক নীতি পরিচালিত হয়। বেকার না থাকলে, সব লোকের কাজ থাকলে মালিকশ্রেণী মজুর পাবার জন্যে মজুরী বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। তা হলে তাদের মনোফা থাকে না বা কমে যায়। একমাত্র লক্ষ লক্ষ লোককে বেকার রাখতে পারলেই পুঁজিবাদী মালিক মজুরী কমাতে পারবে এবং স্বত মজুরী সে কমাতে পারবে তত বেশী তার মনোফা হবে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় থাকা মানেই হল বেকারীকে চিরস্থায়ী করা। বেসব পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকেরা সংগঠিত শক্তি সেখানে মজুরী কমানো যায় না। আবার বেশী লোক বেকার থাকলে, রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তখন সংগঠিত শ্রমিক শক্তির সামনে পুঁজিবাদী সরকারকে বাধ্য হয়ে বেকার ভাতা, বিনামূল্যে সকলের জন্যে চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রভৃতি সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।

আমাদের দেশের একচেটিয়া পুঁজিমালিক ও জমিদারদের শ্রেণী সরকার—নব কংগ্রেসী সরকার এই কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলিকে গ্রহণ করতে চায় না।

তাই তারা শ্রমিকদের শক্তি যাতে সংগঠিত না হতে পারে,

বেকারীর আসল কারণ যে সরকারের মালিক শ্রেণীর নীতি তা যাতে গোপন থাকে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক অপকৌশল গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে নির্বোধ অনগ্রসর বেকার যুবকদের ভুল বুদ্ধিয়ে, “স্থানীয় লোকের কাজ চাই,” “চারঘণ্টা করে কাজ ও বেতন ভাগ করে দিতে হবে,” “ওভার টাইম চলবে না, ধর্মঘটী শ্রমিক-কর্মচারীদের চেয়ার দখল কর” প্রভৃতি ছেঁদো বলি চালু করে।

নব কংগ্রেসীরা জানে যে তাদের সরকার কোন শ্রেণীর সেবা করেছে। তারা জানে যে বেকারী দূর করার

ক্ষমতা তাদের নেই, বেকার-ভাতা প্রভৃতি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও তাদের ইচ্ছে নেই। একমাত্র সংগঠিত শ্রমিক শক্তিই বেকারী দূর করতে পারে এবং সম্পূর্ণ বেকারী দূর করতে পারার আগেও বেকার-ভাতা, বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করতে পারে। তাই সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীদের একা ও সংহতি ধ্বংস করার জন্যে তারা একদিকে ছাঁটাই, বরখাস্ত, পদলিখ মিলিটারী লেলিয়ে দেওয়া এবং অন্যদিকে যুব কংগ্রেসের নামে আধ্যাত্মিক কর্মনীতি গ্রহণ করেছে।

মতামত

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা বিজ্ঞানীর মতো অধিবসারী, যুক্তিনিষ্ঠ ও সত্য এবং বাস্তবতার প্রতি একাগ্র হবেন।

অর্জুন সরকার

নকশালী আন্দোলনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে

চব্বিশে সেপ্টেম্বরের “দর্পণে” নকশালী আন্দোলনের রিপোর্ট পড়লাম, চণ্ডাল সরকার বোঝাতে চেয়েছেন নকশাল মানেই লুপ্তপূর্ণ স্বর্ষ্য পার্টি, যা মার্কসবাদীদের জহাদ ও অন্যান্য দের পরম মিত্র। এই সি পি এমই নকশালবাদী, আন্দোলন থেকে শত্রু করে আজ পর্যন্ত পদলিখের সাহায্যে নকশালদের হত্যা করতে ধরিয়ে দিতে এমনকি ঘরবাড়ি ও ঘাঁটি চিনিরে দিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে। যখন নকশাল পার্টি বিজয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে তখন সি পি এমের পার্টির অফিস থেকেই নির্দেশ দেওয়া হয় “নকশালদিগকে বস্তাপুরে বেদম প্রহার করে ফেলে দাও।” অথচ নকশালরা যদি সি পি এমের সেই সব কর্মীকে হত্যা করে তবে দোষটা কোথায়? শত্রুদের বাঁচিয়ে রাখার অর্থই মৃত্যু। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন গুন্ডারাই নকশালদের নেতা এবং তাত্ত্বিকরা তাদের চাকরে পরিণত হয়েছে। প্রীসরকার এটা জেনে রাখুন যে, কোন প্রতিবিল্বী বা অবিল্বী চেয়ারম্যানের পার্টিতে থাকতে পারে না বা নেতৃত্বে উঠতে পারে না, কারণ এ পার্টিতে সদ্য স্বাচ্ছন্দ্য বা আত্মোন্নতির কোন সুযোগ নেই। যে দেশে ব্যাপক জনগণ বিল্ববী, সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমর্থিত এই পার্টি কি ভাবে অবিল্ববী প্রতিবিল্বীদের শিবির হয়?

নকশালরা সি পি এমের ভয়ে ভোট বয়কট করতে বা তাদের হত্যা করতে বন্ধপরিকর নয়। নকশালরা জানে সংশোধনবাদীরা, প্রতিক্রিয়াশীলরা ও সাম্রাজ্যবাদীরা দেখতে যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন, আসলে তারা কাগজে বাধ। নকশালদের এ্যাকশন সি পি এম, কংগ্রেস ও অন্যান্য পার্টির মত বিভ্রান্তিকর এ্যাকশন নয়। শ্রেণী সংগ্রামে সচেতন এই এ্যাকশন সর্বহারাদের বৃদ্ধ দর্জয় সাহস ও বিল্ববী পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট।

চারবাবু ও অসীমের কলহ এমনকি পার্টি বিল্ববীত ও আত্মঘাতী ধ্বংসবাদী এসব প্রচার করে চণ্ডালবাবু কংগ্রেসীদের প্লাটফর্মে এসেই দাঁড়িয়েছেন। পার্টির মধ্যে মতানৈক্য হওয়া সম্ভব, তাই বলে পার্টি ভাঙবার জন্য নয়। পার্টি গড়বার জন্য। নকশালরা গণযুদ্ধ শত্রু করে বিল্ববী সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদী লাইনই মেনে চলেছে। আর সি পি এম বিনা গৃহযুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষ বন্ধ করার নীতি মেনে কোন আন্তর্জাতিকতাবাদী লাইন মেনে চলেছে?

জৈনক পাঠক

ভারত দর্পণ

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

তাদেরও আলোচনায় আহ্বান করা দরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে একমাত্র রাজ্য সরকারই নাগা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি, সুতরাং যে ফিজো-পম্খীরা এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা চান তাদের সঙ্গে কোন আলোচনা হতে পারে না।

, নাগাল্যান্ডে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে শান্তি আলোচনা ও রাজনৈতিক মীমাংসার উপনীত হবার দাবী আজ প্রবল। এই রাজনৈতিক দাবীই নাগাল্যান্ডে সংকট ডেকে এনেছে।

পুস্তক পরিচয়

পরিবর্তনের মুখে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া (২)

গ্রন্থকোট

[The Turning Point of Socialism Roger Garudy.]

ধনতান্ত্রিক দুনিয়া বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লব সম্ভব কী না এবং তা কী ভাবে সম্ভব এই প্রশ্ন নিয়ে আজ অনেকেই চিন্তা করছেন। গারুদী তাঁর পুস্তকে বিষয়টি বিশদ আলোচনা করেছেন। মোটামুটি ভাবে তাঁর বক্তব্য যে মার্কিন বিপ্লব হবে একান্ত ভাবে মার্কিন সামাজিক, অর্থনৈতিক কাঠামোর বিবর্তনের যে ধারা তার থেকেই উদ্ভূত, কোন আমদানী করা কায়দার মাধ্যমে নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজ স্বাধীনতার যুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ সংকটের সম্মুখীন যে সংকট রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক দলের আপোষে লড়াইয়ের আড়ালে ক্রমাগতই গভীর হচ্ছে। যে বিরাট প্রশ্নে আজ মার্কিন সমাজের চিন্তাশীল অংশ আলোড়িত তা হচ্ছে, এই মমন্তব্যাবস্থা এবং তার ফলে এই যে জীবনযাত্রার ধরণ এর মানে কী? যে তরুণ আমেরিকা আজ বিক্ষুব্ধ তার বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটবে কী ভাবে?

আমেরিকান সমাজের জন্ম ও বেড়ে ওঠার মধ্যেই আছে একটি বিপ্লবী ঐতিহ্য। তার স্বাধীনতার ঘোষণাতে, বিদ্রোহের অধিকার লিখিত ভাবে দেওয়া আছে। আমেরিকান গণতন্ত্রের প্রধান হোতা টমাস জেফারসন মনে করতেন যে প্রতি বিশ বছর সংবিধান বদলানো উচিত। তার মতে "And what country can preserve its liberties, if its rulers are not warned from time to time that this people preserve the spirit of resistance? Let them false arms...."

গারুদীর মতে এই বিপ্লবী চেতনার ওপর ভিত্তি করেই নতুন সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

বর্তমান আমেরিকায় অর্থনৈতিক অবস্থায় একটি বিরাট প্যারাডক্স লক্ষ্য করা যায়। একদিকে বিরাট একচেটিয়া শিল্প গড়ে উঠেছে অপরদিকে কিছুর আইন আছে যেগুলি একান্তভাবেই কৃষিভিত্তিক সমাজের পক্ষে প্রযোজ্য। এই আইনগুলি বাস্তব অবস্থার পরিপন্থী কারণ যদি দেশের স্বার্থে এগুলি আরোপ করতে যাওয়া হয় তাহলে আজ শুল্ক বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বেড়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা, বাধা হবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের অগ্রগতির পথে। অপরদিকে এর ফলে একটি অ্যানার্কিস্ট অবস্থা সৃষ্ট হয়েছে।

গারুদীর মতে বর্তমান আমেরিকান সমাজের রূপান্তর সম্ভব সমাজতন্ত্রের দিকে নয় বরঞ্চ এমন

একটি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপের একটি উন্নয়নমূলক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। মার্কিন দেশে আজ নিগ্রো সমস্যা একটি বড় সমস্যা, বিশেষ করে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে যেখানে এখনও কৃষিপ্রধান সমাজের রেশ রয়ে গিয়েছে। গারুদী বলছেন যে অবিলম্বে এই রাজ্যগুলিতে শিল্প বিস্তার ঘটা দরকার যাতে বেকার নিগ্রোরা শুল্ক চাকরী পায়। তা নয়, প্রভু-দাস এই সম্পর্কের বদলে একটি অন্য শ্রেণীসম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বতীয়ত এমন একটা আয়কর নীতি গ্রহণ করতে হবে যার ফলে অনুৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর জোর চাপ পড়ে। যেমন বিজ্ঞাপন ও জন সংযোগকারী ব্যবসায়ের উপর এমনভাবে কর ধার্য করা উচিত যাতে এদের শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে টাকা খাটাতে হয়।

সবথেকে বড় সমস্যা অবশ্য দেখা দেবে অস্ত্র শিল্পে। কিন্তু মুনোফা সম্পর্কে বিস্মৃত না হয়েও আমেরিকান বিমান প্রস্তুতকারকরা দেখতে পাবেন যে ভিয়েতনামে ধ্বংস হবার জন্য বোমারু বিমান তৈরী না করে ওই টাকায় তারা একটি বিরাট অসামরিক, কবসায়িক বিমান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন।

এ সর্বকিছুরই আমেরিকান সরকার করতে পারেন তাঁদের কোন মৌলিক নীতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে। বরঞ্চ এর ফলে যে নতুন দিগন্তের কথা প্রেসিডেন্ট কেনেডী বলতেন সেই দিগন্ত বাস্তবে রূপায়িত হবে। হয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হবে না কিন্তু এই হচ্ছে একমাত্র উপায় যাতে একটি গঠনমূলক ভবিষ্যতের পথ তার সামনে খুলে যেতে পারে। এমন একটি ভবিষ্যত যেখানে সমাজ তার বর্তমানের কারণহীন, নেতিবাচক অবস্থা কাটিয়ে উঠে অনেক বেশী মানবিক হয়ে উঠতে পারে যেখানে তরুণ আমেরিকা তার নিজস্ব স্থান খুঁজে পায়।

আমেরিকার প্রসঙ্গের পর গারুদী আলোচনা করেছেন বর্তমান দুনিয়া ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সম্পদ বন্টনের বৈষম্য এমনভাবে বেড়ে গিয়েছে যে পৃথিবী আজ তিন ভাগে বিভক্ত। বিংশ শতাব্দীর এই শেষপ্রান্তে আজ আমাদের সামনে সব থেকে বড় সমস্যা কীভাবে এই বৈষম্য এবং সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংঘাত কমানো যায়। তাঁর মতে এটি অসম্ভব কোন পরিকল্পনা নয় কারণ উন্নত দেশগুলি তাদের নিজস্ব স্বার্থেই এ কাজে রতী হবে—পৃথিবীর একটি বড় অংশ অনুন্নত

থাকলে অন্যর উন্নতি সম্ভব নয়। প্রয়োজন শুল্ক কোন অবাস্তব ধারণাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। যেমন একথা ভাবা চলবে না যে সমাজতন্ত্র একদিন ধ্বংস হবে, তেমনি এটাও মনে রাখতে হবে যে ধনতন্ত্রও একদিন উন্নয়নমূলক শক্তিগুলির উন্নতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

যে নতুন দুনিয়ার কথা গারুদী বলেছেন তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন বর্তমানের গোষ্ঠীভুক্ত রাজনীতি পরিভাষা করা। কী মার্কিন গোষ্ঠী কী সোভিয়েত ইউনিয়নের

নেতৃত্বে ওয়ারশ প্যাক্ট গোষ্ঠী দৃষ্টিতেই দেখা গিয়েছে, উদ্দেশ্যে এই গোষ্ঠীগুলি গঠিত হয়েছিল তা সর্বক্ষেত্রেই বার্থ হয়েছে। এক একটি গোষ্ঠীর দেশগুলির মধ্যে সংঘাত, অবিশ্বাস বেড়েই চলেছে। একদিকে আমেরিকা যেমন নিজ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কয়েকের পথ নিয়েছে তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ারশ প্যাক্টভুক্ত দেশগুলিকে বারবার নিজের তাবয় রাখার চেষ্টা করে চলেছে যে নীতির চরম প্রকাশ সম্প্রতি ঘটেছে চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

এই গোষ্ঠীভুক্ত রাজনীতির আরেকটি ফল হল পৃথিবীর দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনই একথাতে হয় না যার ফলে সংঘাত বেড়েই চলে।

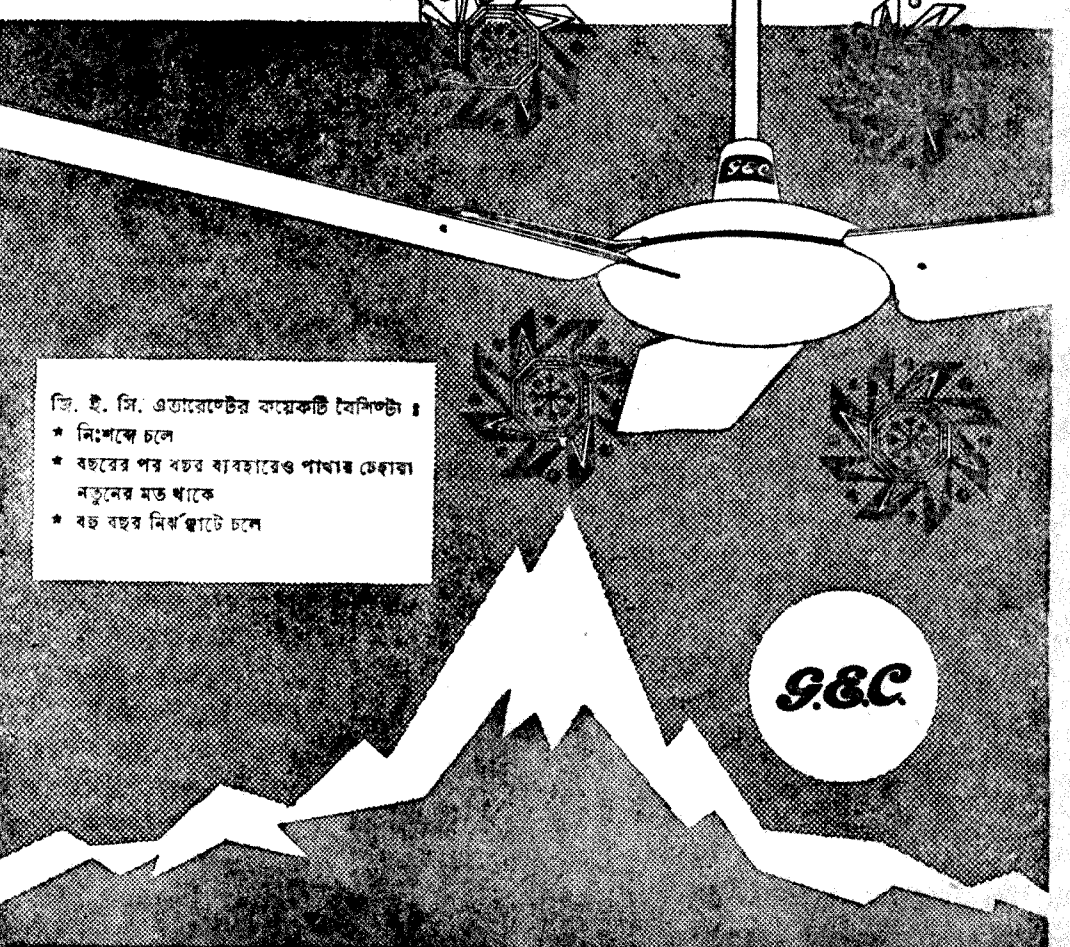
গারুদীর নতুন পৃথিবী বেড়ে

উঠবে আন্তর্জাতিক সংহতির উপর ভিত্তি করে যে সংহতি সম্ভব হবে তখনই। যখন মার্কিন ধনতন্ত্র মানবতা বোধে লাভবান হবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মার্কসীয় আদর্শে আরও গণতান্ত্রিক করে তুলবে এবং তৃতীয় বিশ্ব নতুনতর উন্নতির পন্থা আবিষ্কারে কাজে লাগবে।

এই নতুন বিশ্ব গড়ে তুলবে কারা? গারুদীর মতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যাদের ওপর খুব ন্যায়-সংগতভাবেই মার্কস এবং লেনিন এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। তবে এ দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দুই বিশাল শক্তি মস্কো ও চীনের বর্তমান নেতৃত্ব পালন করতে অক্ষম কারণ তাদের একমাত্র চেষ্টা কী ভাবে অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর নিজ নিজ

(শেখাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

দিনে দিনে সব গাখার চেহারাই
GEC এভারেস্টের মত হ'তে
চলেছে—কারণ জি. ই. সি.
এভারেস্ট যে কেবল কাজের
বেলায় অতুণবীর অ'র,
দেখতেও মগ্ন।



জি. ই. সি. এভারেস্টের কয়েকটি বিশিষ্টতা :
* নিঃশব্দে চলে
* বছরের পর বছর ব্যবহারেও পান্থ্য চেহারা
নতুন মত থাকে
* বছ বছর নিরঙ্কুশ চলে

GEC দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
কলিকাতা • গৌহাটি • ভুবনেশ্বর • গাউন • কানপুর • নিউ দিল্লী • চণ্ডীগড়
জয়পুর • বোম্বাই • আমেদাবাদ • নাগপুর • জমশেদপুর • মাদ্রাস • কোয়েম্বাটোর
বাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ • এনিকুলাম
KALPANA GEC.570B TRADE MARK GEC PERMITTED USER—THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA LIMITED

সত্যজিৎ রায়ের সীমাবদ্ধ

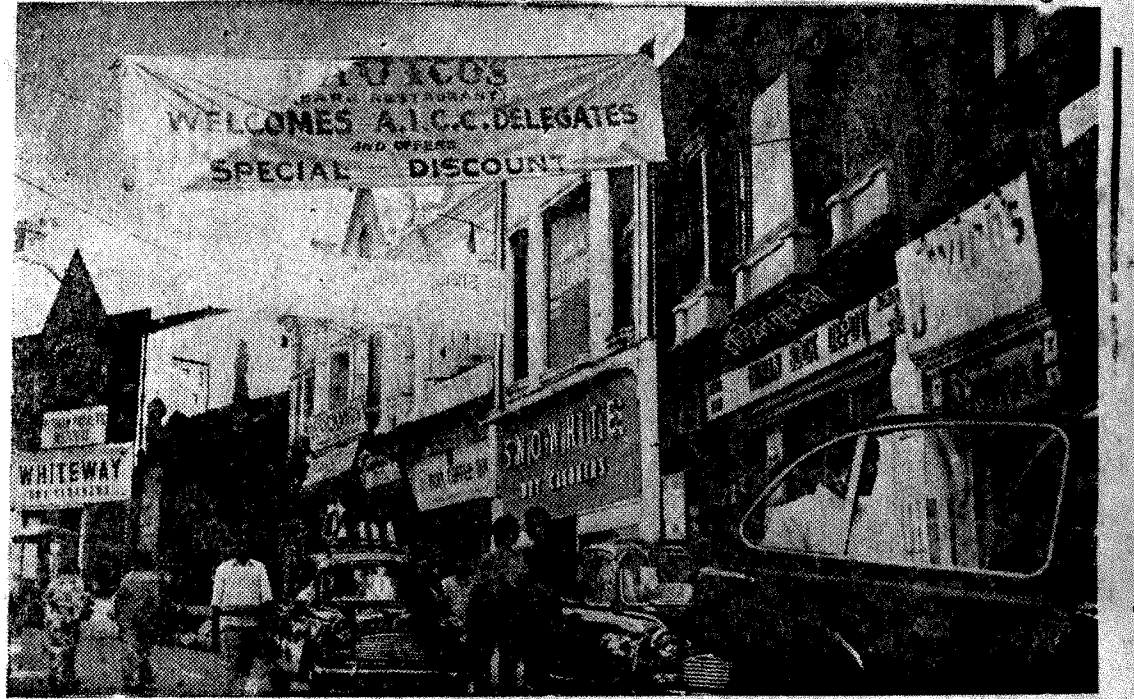
(দর্পণের চলচ্চিত্র সমালোচক)

অকিঞ্চৎকর সাহিত্য-উপাদান থেকে শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণের উদাহরণ ইতিহাসে অজস্র। এড্‌ ম্যাকবেন-এর চোর পুর্লিশ গল্প নিয়ে কুরুসোয়া “হাই এন্ড লো”র মত প্রথম শ্রেণীর ছবি তৈরী করেছেন, হিচককের অনেক ভাল ছবির উপকরণও সম্ভ্য গোয়েন্দা কাহিনী থেকে নেওয়া, ফরাসী নব্যধারার অনেক পরিচালকও বাজারী জনপ্রিয় সিরিয়াল থেকে তাঁদের মালমশলা সংগ্রহ করেন। সত্যজিৎ রায়ের

সাম্প্রতিক ছবি “সীমাবদ্ধ” শঙ্করের একটি নিকৃষ্ট কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হলেও বলবার কিছু থাকে না। কারণ, কাহিনী চলচ্চিত্র-কারের পক্ষে একটি কাঠামো মাত্র। সার্থক চলচ্চিত্রশিল্পী ঐ কাঠামোটিকে মাথায় রেখে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিশীল কল্পনার চিত্ররূপ দিয়ে থাকেন, তার ফলে কাহিনীর দোষগুণে চলচ্চিত্রের ধর্মচর্চা হয় না। কাহিনীর বহিঃরং বাদ দিয়ে তার ভেতর থেকে একটা বস্তুর বা থীম খুঁজে বার করেন পরিচালক এবং সেই থীমকেই বিচিত্র কারুকাজে অলঙ্কৃত করেন তার নিজস্ব শিল্পভাবনার মাধ্যমে। সত্যজিৎ রায় এভাবে যখনই অন্য কারো গল্প নিয়ে কাজ করেছেন, সেখানে তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্কল্প বোধের প্রতিফলন ঘটেছে। এর ফলে মূল কাহিনীর চরিত্রবিচারিত ঢাকা পড়ে গেছে এবং সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র সবসময়েই স্বাধীন শিল্প-সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবারই প্রথম সত্যজিৎ রায় তাঁর মূল উপকরণের সীমাবদ্ধতা পরিহার করতে পারেন নি এবং শঙ্করের গল্পের নাটককেপনা আর সম্ভ্য পাঁচ সত্যজিৎ রায়ের শিল্প-কর্মকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

শঙ্করের গল্পের প্রধান পাত্র-পাত্রীরা সবাই সওদাগরী অফিসের উচ্চমধ্যবিত্ত একজিকিউটিভ সমাজের অন্তর্ভুক্ত। শঙ্করের মূল লেখায় এ সমাজের প্রতি লেখকের একটা নিরুচ্চার মোহের ভাব আছে এবং ওপরতলার লোকজনের ফাঁকা অন্তঃস্বল্পের সরলীকৃত বিবরণে পাতা ভরিয়েছেন লেখক। সত্যজিৎ রায় যখন শঙ্করের গল্প নিয়ে ছবি করবেন বলে জানা গেল, আশা করা গিয়েছিল গল্পের কাঠামো অবলম্বনে তাঁর ব্যাঙের কশাঘাতে তিনি এই জারজ সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরবেন তাঁর শিল্পকর্মে। এমন কি ছবির গোড়াতে যখন দলিলচিত্রের ভঙ্গীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ফারাক এবং নায়কের মধ্যবিত্ত অতীত ও বর্তমান সচ্ছলতা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, তখন সত্যিই বড় কিছুর একটা আশা ছিল। কিন্তু ছবি কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল যে সেই সামাজিক তদ্বান-সন্ধান কোথায় উবে গেছে আর গতানুগতিক গল্পের ফাঁকে পড়ে ছবি চলছে প্রচলিত ধারায়।

ছবির নায়ক শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি সওদাগরী অফিসের দম্ভী চাকুরে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের উচ্চাশীল ছিলে, নিজের চেষ্টাতেই তার উন্নতি। তার অপেক্ষে দুঃখ নেই তাই আরো উচ্চতলার তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু পরিচালক অবশ্য নায়কের চরিত্রের মধ্যে এক



ওপরের ফেস্টনে দেখা যাচ্ছে সিমলায় এ আই সি সির অধিবেশন উপলক্ষে ওখানকার একটি বার ডেলিগেটদের সন্তায় মদ সরবরাহের ঘোষণা করেছে।

নিরুদ্ধ যন্ত্রণা ও বিক্ষোভ আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। কিন্তু শঙ্করের মূল গল্পেও যেমন সেই আক্ষেপের একটা সূনির্দিষ্ট চেহারা পাওয়া যায় না, ছবিতেও তাই। আসলে একটি নিটোল গল্প বলার প্রলোভনে চরিত্র-বিশ্লেষণে সত্যজিৎ রায়ের স্বাভাবিক প্রবণতা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং তার ফলে গল্পও সবসময় সূত্রযুক্ত ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। নায়কের বিবেক হিসেবে কাজ করার জন্য একটি শ্যালিকা চরিত্র আমদানী করা হয়েছে, কিন্তু নিরর্থক বাকচাতুরী ও শর্মিলা ঠাকুরের প্রাণহীন অভিনয়ে এই চরিত্রে কোন গভীরতাই সঞ্চারিত হয়নি। সওদাগরী অফিসের চিত্রায়ণে সত্যজিৎ রায়ের ডিটেলের দক্ষতা এবার খুব একটা নজরে পড়ে না এবং কাহিনীর ক্লাইমাক্স হিসেবে ফ্লাস্টবাক্সের লক-আউটের ঘটনা প্রায় গল্পের গরদ গাছে ওঠার মত। তাছাড়া ছবির শেষে শ্যামলেন্দুর কোম্পানী-ডিরেক্টর পদে প্রমোশনের পর তার আটতলার সিঁড়িভাঙার দৃশ্য প্রতীকের স্থূল ব্যবহার পীড়াদায়ক। তাছাড়া মূখ্য চরিত্রে বরণ চন্দ্রের আড়ষ্ট অভিনয়ে ছবির বিশেষ রসহানি ঘটেছে। ছবির কিছু ব্যাপার অবশ্যই তারিফ করার মত, যেমন অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয়ে পার্সোনাল অফিসারের ফন্দীবাজ চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠছে, বা পারমিতা চৌধুরীর কথাবার্তা, চালচলনে বড় চাকুরের আদুরে, মোমের পুতুল-মার্কা বো-এর চেহারা স্পষ্ট। ছবির আরম্ভে অফিসের পদমর্যাদার বিবরণীতে অফিসক্যালের সূক্ষ্ম ব্যবহার অবাধ হয়ে দেখতে হয় এবং ছবির মধ্যে ছোট্ট যে বিজ্ঞাপন চিহ্নটি চলচ্চিত্র মাধ্যমের নিপুণ কায়দায় রং ও সঙ্গীতের ব্যবহারে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু ছবিটির সার্বিক তুচ্ছতার তুলনায় এ গণগদুলো কিছুই নয়।

কর্মচারী ছাঁটাই

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বরখাস্ত আদেশ তুলে নেওয়ার জন্যে আন্দোলন চলছে কিন্তু প্রশ্ন হলো, তেরো, বত্রিশ, চল্লিশ জনের জন্যেই বা কেন আন্দোলন হবে। যে রাজ্যে হত্যার বিচার নেই, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সরকারী বাহিনীই যেখানে হত্যাকারী, যেখানে হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নিষেধ বিচারকে ছুরি মেরে আহত করলেও রহস্যের উন্মোচন হয় না, জনসাধারণের প্রাণ ও সম্পত্তি উভয়ই যেখানে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন, সেখানে কয়েকজনকে ছাঁটাই করার ঘটনাতো নিতান্তই সামান্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। ফ্যাসীবাদে বিশ্বাসী যে কোন সরকারের পক্ষেই এধরনের ঘটনা ঘটানো কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তবে আগামীদিনের চরম বিপদের কথা ভেবে এর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে হবে। তাই যদি হয়, এবং আন্দোলনকে যদি বৃহত্তর পর্যায়ে নিয়ে যেতেই হয় তবে কয়েকজন কর্মীর ছাঁটাইও বরখাস্তের প্রশ্নটিকেই শব্দমাত্র ইস্যু না করে, রাজ্যের শিল্পপতিদের চক্রান্তে বন্ধ কারখানার হাজার হাজার ছাঁটাই, লে-অফ কর্মীদের পুনর্বহালের দাবীকেও আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে নেওয়া হোক না কেন? লাখ লাখ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ন্যায্য দাবীটুকুও বা সংগ্রামের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্তি থেকে বাদ যাবে কেন। আন্দোলন সামগ্রিকভাবেই হওয়া দরকার। তা হলে রাজ্যের প্রত্যেকটি নিষ্পাতিত মানব্বের কাছে এই আন্দোলন তার নিজের বেঁচে থাকার লড়াই বলে ভাবতে সূবিধা হবে। এবং সমগ্র আন্দোলনকে সুনিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্যের বৃহত্তম সুসংগঠিত সি পি আই এম দলকে। এবং সবসময়ে একাবদ্ধতার ফাটলে

যেন কেউ আচড় ধরতে না পারেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব ও তাকেই নিতে হবে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেলো, গত এগারোই অক্টোবর শহীদ মিনারে সারাভারত সরকারী কর্মচারী সমাবেশে একটি ঘটনার কথা। প্রকাশ্য সমাবেশে কো অর্ডিশন কর্মীদের জনৈক দায়িত্বশীল নেতা অপর একটি দলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, মীন একাবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তায় সৈনিক মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন, তার নাম ধরে কয়েকটি অপ্রিয় কথা বলে বসলেন। বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়। ঘটনাটি সৌজন্য মূলক তো নয়ই, বরং একাবদ্ধ আন্দোলনের নামে চরম ক্ষতিকারক।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

শফিকুল হাসানের

মুক্তির সংগ্রামে

পূর্ব বাংলা

পূর্ব বাংলার সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুক্তি-যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির ভূমিকা, সংগ্রামী জনতা ও বিপ্লবী কমিউনিস্টদের ভূমিকা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বর্তমান পরিস্থিতি ও সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ, মুক্তির পথ এবং গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি রণকৌশল সম্পর্কে বহুল তথ্য সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য রচনা সংকলন।

প্রকাশক : রবীন মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান :

৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক-হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস এ. রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

দপন

বৈশিষ্ট্য

পুলিশ ও সমাজ বিরোধীদের গোপন আঁতাত

(দর্পণের পর্ববৈশিষ্ট্য)

১৪শ বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা ২২শে অক্টোবর ১৯৭১ ২ দাম ৩০ পয়সা

কয়লা খনি অঞ্চলে
রেলের মালগাড়ীর
বিলি ব্যবস্থায় দৈনিক
দশ লক্ষ টাকা ঘুষ
দুষ্ট চক্র ভাঙতে গিয়ে
বি সি গান্ধুলীকে যেতে হল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে কয়লা খনি অঞ্চলে রেলের মালগাড়ী বিলি ব্যবস্থায় রেলের অফিসাররা দৈনিক দশলক্ষ টাকা ঘুষ হিসাবে পেয়ে থাকেন। এই ঘুষ না দিলে ওয়াগন পাওয়া যায় না, খনিমুখে কয়লা জমে পাহাড়াগুটি স্তুপ হয়ে যায়—ফলে এক বিষম সংকট। এই ঝামেলা এড়াতে খনি মালিকদের সঙ্গে ঘুষ ব্যবস্থা পাকাপাচি করে একটা রফা হয়েছে।

কল্যাণকর অনুরোধ প্রতি

মালগাড়ীর জন্য খনি মালিকরা রেলের নির্দিষ্ট অফিসারের উদ্দেশ্যে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবে। প্রতিদিন প্রায় সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার মালগাড়ী কয়লা খনি অঞ্চলে পাঠান হয়। প্রতি গাড়ী পিছ পাঁচ হাজার টাকা হিসেবে মোট ঘুষের পরিমাণ দাঁড়ায় দৈনিক দশ লক্ষ টাকার কাছাকাছি, অর্থাৎ মাসে তিন কোটি টাকা আর বছরে ছত্রিশ কোটি টাকা।

এই অভিযোগ এসেছে কয়লা (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধার্থ রায় অন্য
রাস্তা নিয়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায় এবার তাঁর বিরোধী-পক্ষকে শাস্তি করার অন্য রাস্তা নিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি কলকাতার দলীয় সভায় বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টিতে যে দেশের এই বিপদের সময় কংগ্রেসের একটা অংশ ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না।

সিদ্ধার্থবাবুর বক্তৃতায় পশ্চিম-বঙ্গ নব কংগ্রেসী একটা অংশ চিন্তিত। এদের মতে দিল্লী থেকে খাঁড়া হয়ত শীঘ্র নেমে আসবে। অনেকে এই কথাও বলেছেন যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা হলে শত্রু সি পি আই-এম নয়, এরা নিজে-রাও বিপদে পড়বেন। সিদ্ধার্থ-বাবুর বক্তব্যে নাকি সেই ইংগিত ছিল।

তিনি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে দলীয় নীতি পরিষ্কার করে দেন। তাঁর মতে, “ওরা দেশ-দ্রোহী এবং কোন অবস্থায়ই ওদের সহ্য করা হবে না”। মনে হয় এত যে যুদ্ধের প্রস্তুতি তা মূলত এই দলের বিরুদ্ধেই, একটা যুদ্ধ-কালীন আবহাওয়া তৈরী করে “জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে” এদের মার দেওয়া।

কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা যে ঘটল তার পরে স্থানীয় পুলিশ না করল তাকে গ্রেপ্তার, না করল কোন জিজ্ঞাসাবাদ। পরে রবি আবার কংগ্রেসে ফিরে যায়। মস্তান-দের সংগে পুলিশের যোগাযোগ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি অবশ্য নতুন কথা নয়।

নিহত জিতু মন্ডলের বাবা নাকি প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী অর্ধেন্দ্রশেখর নন্দকের ড্রাইভার। এবার ওরা ছ হাজার টাকা খরচ কবে ধুমধাম করে কালীপূজা করেছে। কালী অবশ্য মস্তান-

দেবী হয়ে গেছে। কোন দল তুলেছে এক লাখ বিশ হাজার। সে তুলনায় ছয় হাজার টাকা কিছন্ন নয়। চাঁদার ব্যাপারে জ্বরদিস্ত যেমন হয়েছে তেমনি কালোবাজারীরা স্বেচ্ছায় মস্তানদের মদত দিয়েছে এ কথাও মিথ্যে নয়। দু দলের স্বার্থই তো এক।

যা হোক, পূজার উদ্দেশ্যে অনুরোধে প্রিয়রঞ্জন দাশমন্ডলি এবং সুব্রত মন্ডল উল্লিখিত ছিলেন। অর্ধেন্দ্র নন্দকর মশাইও গরহাজির থাকেন নি। সুব্রত (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

রাইটার্স বন্ডিংসের সরকারী
ফাইল নবকংগ্রেসের অফিসে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাইটার্স বন্ডিংসের সরকারী ফাইল, নব কংগ্রেসীদের অফিসে। ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার পশ্চিম-বঙ্গ নব কংগ্রেসের এ্যাড হক কমিটির প্রথম বৈঠকে। ফাইলটি নিয়ে আসেন প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস।

শ্রীবিশ্বাস ফাইলটি আনেন দেখাতে যে ডেমোক্রাটিক কোলা-লিশন সরকারের অপদ্রুত দুইজন নব কংগ্রেসী মন্ত্রী ডঃ জয়নাথ আবে-দিন ও সন্তোষ রায়ের স্বাক্ষরিত নির্দেশের বলেই তিনি শরণার্থী শিবিরসমূহে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করার জন্য পাঁচিশ হাজার লোক নিযুক্ত করেন—সরকারের হঠাৎ পতনের ফলে এদের অধিকাংশই চাকরী পায় না, যার ফলে বিক্ষোভ এবং শ্রীবিশ্বাসকে দলীয় সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

সে যাই হোক, সরকারী ফাইল কী ভাবে তিনি আনলেন আনন্দ-বাবুকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি

বলেন, “আমাকে ফাইল দেবে না কে”?

সেদিন অ্যাড হকের বৈঠকে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে বোঝা যায় যে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে কোন সম্ভাব নেই। যেমন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলছিলেন, “শ্রীবি, আর, গুপ্ত একজন প্রকৃত মার্কসবাদী বিরোধী, যোগ্য অফিসার”, তখন হঠাৎ জয়নাথ সাহে-বকে বলতে শোনা যায়, “আমি ও কথা মানি না”। শ্রীগুপ্ত শ্রীরায়ের আত্মীয়।

এর পর যুব কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমন্ডলী বলেন, “বাংলা-দেশ থেকে যে সব মানুষ এসেছেন তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগা-যোগের দায়িত্ব ছিল সন্তোষ রায়ের কিন্তু তিনি ত শত্রু পদনর্বাসন শিবিরে ত্রিপল সরবরাহ করতে কস্ট”। সভা শেষে যখন দাশ-মন্ডলীকে এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন জনৈক সদস্য বলে ওঠেন, “এবার তুমি ত্রিপল সরবরাহ কর”।

সি পি এমের কেন্দ্রীয় সমাবেশ
বানচাল করার তেঁড়জোড়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আগামী সাতই নভেম্বর কল-কাতার মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমাবেশকে বিপ-লম্বিত করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসী মহলে গোপনে তেঁড়-জোড় করা হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে। এ সম্পর্কে নব কংগ্রেসীদের বিগত কার্যকরী কমিটির বৈঠকে এক প্রস্তাব আলো-চনাও হয়ে গিয়েছে।

এই “বিপলম্বিত” করার খুঁটি-নাটি পরিচালনা এখনও তৈরী

হচ্ছে। তবে বতদর খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে জানা যায় নব কংগ্রেসীদের যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ এই দায়িত্ব নেবে এবং তাদের প্রধান কাজ হবে কলকাতার বাইরে থেকে শোভাযাত্রা এবং দল-বন্ধ জনতাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। কলকাতায় যাতে কেউ আসতে না পারে সেজন্যে যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ থেকে হামলা করার কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে।

সিদ্ধার্থ রায়ের ভাগ্যবি কি
নয়া দিল্লীতেও অস্তাচলগামী ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সিদ্ধার্থ রায়ের ভাগ্যবি কি নয়াদিল্লীতে অস্তমিত হতে যাচ্ছে? জানা গিয়েছে, আন্তর্জা-তিক সাহায্য সংস্থা, “ইউনেস-কোর” আগামী রজত জয়ন্তী উৎসবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক নরুল হাসান ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা বিদেশ যাবার আগে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হচ্ছেন সিদ্ধার্থ রায়। সেই দাবীতে এত বড় আন্ত-র্জাতিক সংস্থার তাঁরই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী

বাদ সেধেছেন। তাই লক্ষণ দেখে অনুমান করা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের মতো নয়াদিল্লীতেও যুব সিদ্ধার্থ-রবি অস্তমিত হওয়ার মুখে।

উল্লেখযোগ্য, শিক্ষা দপ্তরের নব নিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী (মিনিষ্টার অব স্টেট) অধ্যাপক নরুল হাসান কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতার সিদ্ধার্থ রায়ের অনেক ওপরে। অধ্যাপক হাসান অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট এবং শিক্ষাবিদরূপে তাঁর সুনাম আছে। বিতরণিত তিনি উত্তর প্রদেশের লোক, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর আরও ঘনিষ্ঠ।

বঙ্গদর্শন

চাপক্য সরকার

রাজনীতির দিক থেকে সি পি আই নব কংগ্রেসের যে পরিমাণে কাছাকাছি চলে আসছে ঠিক সেই পরিমাণে ঐ দলের মিত্র দলগুলির সি পি আই সম্পর্কে সন্দেহ বাড়ছে। সন্দেহ বাড়ার কারণও আছে। এই পার্টিগুলি এখন বুঝতে পারছে সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে বামপন্থী চরিত্র বজায় রাখতে গেলে নব কংগ্রেসের স্বার্থহীন বিরোধিতা ছাড়া রাস্তা নেই। আবার কিছু কিছু ছোট দল কংগ্রেসের সঙ্গে এক যোগে চলার পরিকল্পনাও নিচ্ছে, বাহ্যতঃ কংগ্রেসকে বামপন্থায় টেনে আনার জন্য। শেষোক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে আছে এস এস পি, পি এস পি অংশ বিশেষ।

সম্প্রতি ফরোয়ার্ড ব্লক দলের কার্যনির্বাহক সমিতির তিনদিন ব্যাপী অধিবেশন হয়ে গেল চট্টগ্রাম শহরে। সেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে দলের প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রিত

হয়ে এসেছিলেন। তাঁদের পার্টি নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রচণ্ড বিস্কোভ। কেন নেতৃত্ব একান্তর সালের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরিচালিত কোয়ালিশন সরকার সমর্থন করল এই প্রশ্নে নেতৃত্বের প্রচণ্ড সমালোচনার মধ্যে নেতৃত্ব অকপটে নিজের প্রান্তিক স্বীকার করে। দলের কর্মীরা বলে ফরোয়ার্ড ব্লক সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেস বিরোধিতা করার জন্য। এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন কিছু বদলায় নি যাতে কংগ্রেসের সমর্থন করা যায়।

ফরোয়ার্ড ব্লক জেলা প্রতি-নিধিরা একের পর এক ঘটনার উল্লেখ করে নব কংগ্রেসের “ফ্যাসিবাদী” চরিত্রের নব প্রকাশের নমুনা দেন। তাদের দাবী ছিল পার্টি নেতৃত্ব যেন অবিলম্বে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একবাক্য বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার কার্যসূচী গ্রহণ করে। এই সঙ্গে সি পি আই দল

সম্পর্কেও নানা সমালোচনা শোনা যায়। সভায় প্রায় সকলেই একমত যে, সি পি আই যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে তাতে ঐ পার্টিতে আর বামপন্থী বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। অনেকে টাটকা করে সি পি আইকে “নব কংগ্রেসের সহায়ক সমিতি” আখ্যা দেন।

জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ প্রচণ্ড সি পি এম বিরোধী। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সি পি এমের “সংকীর্ণতাবাদ” সম্পর্কে জোর সমালোচনা করেন, তারা যুক্তি দেন যে, বর্তমান কংগ্রেসী আক্রমণ সি পি এম-এর আগেকার আক্রমণের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। অতএব কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ, সি পি আই-এর শোষণবাদ আর সি পি এম-এর সংকীর্ণতাবাদ—এই তিন রাজনৈতিক ঝোঁকের বিরুদ্ধে একসঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হবে ফরোয়ার্ড ব্লকে। সভায় এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে। সবাই একমত যে, দল হিসেবে আন্দোলনের ভিত্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে ফরোয়ার্ড ব্লকের গুরুত্ব থাকবে না। তাই ফরোয়ার্ড ব্লকের এখন কাজ হবে আন্দোলন গড়ে তোলার। কি নিয়ে আন্দোলন

করবে তার কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী এখনও তৈরী হয় নি।

আর এখনকার বা প্রধান রাজনৈতিক কাজ সেই সম্পর্কে পার্টির কি করণীয় তারও কোন হাদিস পাওয়া যায় নি। পশ্চিমবঙ্গে জরুরী অবস্থার ধূসরা তুলে গণতন্ত্রের সবকিছু রীতি পন্থাটিকে ঠান্ডা ঘরে জমা রাখা হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ওপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়েছে। কংগ্রেসী যুব-ছাত্র বাহিনী সরকারী অফিসে কর্মচারীদের চরিত্র শূন্যতে নিক্ষেপেছে। পদাধিকার বিরুদ্ধে নানা আক্রমণের অভিযোগ। সমস্ত রাজনৈতিক দলই, অবশ্য কংগ্রেস বাদে, বুঝতে পারছে যে, একাবাক্য রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া এই আক্রমণের মোকাবিলা করা যাবে না। এই সম্পর্কে ফরোয়ার্ড ব্লকের কি দৃষ্টিভঙ্গী তা সঠিকভাবে বোঝিয়ে আসে নি।

আর এস পি পার্টির বক্তব্য বরাবর একই আছে। তারা আন্দোলনে বিশ্বাসী কিন্তু এখনই কোন শিবিরে যোগদানের বিরোধী। তারা মনে করে বামপন্থী ফ্রন্ট গড়ে ওঠে নীচু থেকে আন্দোলনের ভিত্তিতে। ওপর থেকে যে ফ্রন্ট গড়ে তা নির্বাচনী দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত এবং

সেই জন্য এই ফ্রন্ট টেকে না। এ যুক্তি ঠিক, কিন্তু যখন আন্দোলনে আমার জন্য সি পি এম আহ্বান জানায় তখন কিন্তু আর এস পি নানা অজুহাতে সরে যায়। এই দল এখন নিজের তাগিদে যা করা যায় তাই করবে।

এস ইউ সি প্রচণ্ড সি পি এম বিরোধী আর এই দলের ভয় যে সি পি এম-এর সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনে গেলে সি পি এম-এরই সুবিধা হবে। তাই যখন যুক্ত আন্দোলনের কথা ওঠে তখন আন্দোলনের কর্মসূচীর চেয়ে পার্টিগুলির আচরণ-বিষয়ক দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে চায় এস ইউ সি। যেমন সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের ব্যাপারে। কেবল যুক্ত বৈঠক হচ্ছে, কথা হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আচরণ কি হবে তা আগে ঠিক করার অজুহাতে আন্দোলন পোছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

সিটু নেতা নীরেন ঘোষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সেদিন। তিনি বললেন : “আমাদের সংকীর্ণতাবাদী বলে ওরা। আমার কথা ওরাই সংকীর্ণতাবাদী, একাবাক্য বামপন্থী আন্দোলন বিরোধী।”

রেলের ঘুম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

খনির প্রভাবশালী মালিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে। ওদের সঙ্গে সেদিন আলোচনা হচ্ছিল সরকারের কিছু খনির ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া সম্পর্কে। কথায় কথায় এই ঘুঘুর ব্যাপারটা বেরিয়ে এল।

এই ব্যাপার এখন আর ফিসাফিসানির পর্যায়ে নেই। বেশ সুরবে ঘুঘু লেনদেন হচ্ছে। এক পক্ষ দাবী করছে, প্রায় যেন অধিকার হিসাবে, আগাম ঘুঘুর টাকা, অপর পক্ষ দিয়ে যাচ্ছে। কুমিলার দাম হিসেব করার সময় এই ঘুঘুর টাকা নিয়মিত খরচের অন্তর্ভুক্ত

হয়ে সাধারণ মানুষের বোঝা হয়ে যাচ্ছে।

মালিকরা জানে প্রতি মালগাড়ীতে পাঁচ হাজার টাকা ঘুঘুর কিছুটা খনির অফিসাররা মারে আর এক অংশ যায় এই অফিসারদের বশব্দ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পকেটে। রেলের অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট টাকার অংশীদার অনেক। যাঁরা ওয়াগন বিলির বিভাগে আছেন তাঁদের প্রধান অংশ। অবশিষ্ট রেলের পদাধিকার এবং জেলার পদাধিকার ও প্রশাসনের কিছু কিছু লোক-জনের।

এই সম্পর্কে খনি মালিকরা ধান্যবাদে এক বিশেষ সভা করে এবং সমস্ত ব্যাপারটা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারকে একটি প্রস্তাব মারফৎ জানান। এই ব্যাপারে তদন্ত সুরু হয়—এবং অভিযোগের সত্যতা মোটামুটি স্বীকৃত হয়।

তখনকার মত কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় নি। তারপর আবার এ বছরের গোড়ার দিকে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সুরু হয় সরকার ও রেলের অফিসারদের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক হিংসাত্মক কাজকর্মের ব্যাপারে এই প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

রেলের কতৃপক্ষ বলে যে, ওয়াগন ভাঙা বাড়ছে আর ওয়াগনের নানা মূল্যবান অংশ চুরি হয়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রিক ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে, ওপরের তার মাইলের পর মাইল চুরি হয়ে যাচ্ছে।

তদন্তে আরও প্রকাশ পায় যে, ঘুঘুর যে টাকা আদায় হয়—আগেই ক্লাস হয়েছে এর পরিমাণ দৈনিক দশ লক্ষ টাকা—তার একাংশ যায় ওয়াগন রেকারদের পকেটে। দলে

দলে যে সমস্ত উগ্রপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে মাথাচাড়া দেয় তারা একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টির উস্কানী পায়। এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হলে ওয়াগন বিলি ব্যবস্থায় গোলমালের যুক্তি খাড়া করা যায়।

সমস্ত অভিযোগ নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করেন রেলবোর্ড চেয়ারম্যান শ্রীগাঙ্গুলী। তিনি চৌদ্দশ বছর রেলের চাকুরে—কোথায় পাপ চক্র সে বিষয়ে তার জ্ঞানের অভাব নেই। ক্ষমতা হাতে পেয়েই তিনি অফিসারদের রদবদল সুরু করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের গোলমাল ডেকে আনলেন।

পরে বোঝা গেল যে, ঘুঘুর টাকা কেবল অফিসার কর্মচারীদের পকেটই ভর্তি করে না। অবশ্যই এর একটা মোটা অংশ দিল্লীর বড় কর্তাদের পকেটেও যায়। গাঙ্গুলী মহাশয়ের অফিসার বদলীর আদেশ একেবারে ভিন্নরকমের চাকে ঢিল মারার অবস্থা সৃষ্টি করল। রেল মন্ত্রী হনুমন্তিয়ার গাঙ্গুলীকে তাড়ান ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

গাঙ্গুলী নাটক আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, কল্যাখনি অঞ্চলে যে ব্যাপক পাপচক্র গড়ে উঠেছে তা ভাঙতে গিয়েই তিনি মন্ত্রীর রোষে পড়েছেন।

গাঙ্গুলী চেয়ারম্যান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলের সিনিয়র অফিসার ও খনির মালিকদের সঙ্গে বিশেষ সভা করেন। সেই সভায় স্থির হয় যে, রেলের তরফ থেকে অন্ততঃ পক্ষে দৈনিক সাত হাজার মালগাড়ী খনি অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ করা হবে। গাঙ্গুলীর ব্যক্তিগত

তত্ত্বাবধানে জুলাই মাসে গাড়ীর সংখ্যা সাড়ে চার-পাঁচ হাজার থেকে বেড়ে প্রায় সাড়ে ছয় হাজারে দাঁড়ায়। শোনা যায়, ঘুঘুর পরিমাণও কমে আসে।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার মালগাড়ীর টানটানি দেখা দেয়। রেল কতৃপক্ষ বলে যে, গাড়ী পাঠান হয় কিন্তু খনির মালিকরা সব গাড়ী বোকাই করে উঠতে পারে না। খনির তরফ থেকে পাঠা অভিযোগ যে, বোকাইয়ের কোন গোলমাল হয় নি। গাঙ্গুলীর সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল করার চেষ্টা সুরু হয়েছে। এর পরেই গাঙ্গুলী নাটকের সুরু।

বেলেঘাটা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মুখার্জী তার কুস্তার উপসংহারে নাকি এই সদাভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন যে, কালীপুজার পরেই বেলেঘাটা থেকে সি পি এম-কে উৎখাত করতে হবে।

ফলে টাকা-পয়সা ও মাল-মশলার আমদানি হল, তোড়জোড় সুরু হল, বাইরে থেকে মস্তানও এসে পড়ল পাড়ায়। এর সাক্ষ্য বেলেঘাটা-নারকেলডাঙা অঞ্চলে গত কয়েক দিনের প্রচণ্ড যুক্ত পদাধিকার-মস্তান আক্রমণ।

এখন নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে যে খুব বেশী শক্তির একটা বোমা বানান হচ্ছিল। যেটি হঠাৎ ফেটে যাওয়াতে নব কংগ্রেসকে এমন কয়েকটি বীর বোম্বা হারাতে হল।

কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার বহু ক্ষণ পরে পর্যন্ত পদাধিকার, কোন তৎপরতা

দেখা যায় নি। অনেক পরে পর্যন্তও দেখা যায় নি। তারও পরে পদাধিকার আসে বটে কিন্তু তদন্তের অভিনয় করে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করে। পদাধিকার দেরি করে আসার উদ্দেশ্য হল মালমসজা সরিয়ে ফেলতে মস্তানদের সময় দেওয়া, যাতে তারা লিখতে পারে যে, সন্দেহজনক কিছু তারা দেখতে পায়নি। পদাধিকার জ্ঞাতসারে এবং নির্দেশেই যে বোমার কারখানা এবং পরে তা দিয়ে আক্রমণ চলে সে বিষয়ে ভুল নেই। নিহত দু জনের নাম পদাধিকার আসামীর খাতায় ছিল এবং তাদের কেস নং হল পি ১/১৭৪ তার ১০-৭-৭১।

তবু তাদের গ্রেপ্তার না করা আজকের দিনে বোধ হয় কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। রবিবার শিয়ালদা পদাধিকার কোর্টে গিয়ে আসামীর তালিকা থেকে ওদের নাম বাদ দিয়েছে বেলেঘাটার পদাধিকার কতৃপক্ষ। অথচ এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন গত কয়েক দিনে সন্তোষপুর এবং ঢাকুরিয়ায় রাষ্ট্র-বেলার পদাধিকার পাড়া ঘেরাও এবং পাইকারী গ্রেপ্তারের তৎপরতা। প্রকাশ উক্ত বিস্ফোরণের সময় প্রিন্স-দাস মুন্সি এবং সুরুত মুখার্জী কাছেই ছিলেন। কোন ধরনের অভিযান পরিচালনা করার জন্য তারা সেখানে গিয়েছিলেন তা জানবার অধিকার জনসাধারণের থাকতে পারে।

এ আর আনসারি সাহেব হিংসা অহিংসা নিয়ে খুব গলা-বাজি করেন। এ কল্যাণ ঘটনা তাকে উপহার দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি—হিংসার বা ধাম্পার আগ্রহ না নিয়ে কংগ্রেস এক দিনও টিকতে পারে?

পুরোগামী গ্রন্থাবলি বই

বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সংযোজন

উবারজ্ঞান ভট্টাচার্যের

সিক্কুল ইয়াকুরিকা

দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলু জাতির
মহাজন বৈপ্লবিক আন্দোলনের
প্রাথমিক পর্যায়ের জীবন্ত কাহিনী

দাম : পাঁচ টাকা

নীলসমুদ্রের পাণ্ডুলিপি

নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত
নৌ সৈনিকদের মুক্তির লড়াই।
তৃতীয় সংস্করণ শিল্প প্রকাশিত।

দাম : পাঁচ টাকা

বিক্রেতা :

স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশাস

কলেজ স্ট্রীট, মার্কেট, কলি-১২

রাজধানীর চিত্র

যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য

(বিশেষ প্রতিনিধি)

নয়াদিল্লী, বাইশে অক্টোবর, উনিশশ একাত্তর : রাজধানীর আকাশে বাতাসে কিছুদিন ধরে যুদ্ধের দামামা বা ইংরেজীতে বাকে বলা হয় sabre-rattling-এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। প্রতি-রক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম জল-ন্থরে এক কষ্টভার্য গত সপ্তাহে ঘোষণা করলেন যে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী প্রয়োজন হলে পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে লড়াই করবে; এবার লাহোর বা শিয়ালকোট ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পদার্পণ করলে এ অঞ্চলগুলি নাকি ভারতবর্ষ ছেড়ে দেবে না। সাংঘাতিক হুমকি! পশ্চিম পাকিস্তানে ভারত বিরোধী জিগিরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখা-নেও প্রায় অনুরূপ একটা যুদ্ধোন্মাদনার আবহাওয়া তৈরী হচ্ছে। ব্ল্যাকআউট একসেসাইজের তোড়-জোড় চলছে।

ব্যাপারটা আসলে কি? সত্যিই কি ভারতবর্ষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে? আগে-ভাগে ঘোষণা করে এইভাবে কি কেউ প্রতিবেশী রাষ্ট্র আক্রমণ করে?

এখানকার রাজনৈতিক মহলে, এই যুদ্ধের হুমকির নানা রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। প্রথম, প্রায় গত মার্চ-এপ্রিল মাস থেকেই—অর্থাৎ বাংলাদেশে পাক সৈন্যের আক্রমণের পর থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা শোনা যাচ্ছে। তার-পর বর্ষা নামল। বলা হল, যে বর্ষার

পর, যুদ্ধ হবে। এখন শোনা যাচ্ছে, নভেম্বরে লড়াই লাগবে। এই প্রচারের অনেকগুলি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ, ভারতীয় জন-সাধারণকে, এইভাবে বার বার যুদ্ধের হুমকি শুনিয়ে বোঝানো যায় যে ভারতীয় সরকার বাংলা-দেশের সমস্যার প্রতি উদাসীন নয়; বরং যথেষ্ট সজাগ বলেই যুদ্ধ করে বাংলা দেশকে মুক্ত করতেও প্রস্তুত। এইভাবে জনসংঘ প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিকেও কিছুটা নীরব করানো যায়। সম্প্রতি ইন্দিরা সরকারের এই জাতীয় হুমকি দেবার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে, ভারত-সোভিয়েত চুক্তির পর এই চুক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনেক দেশী বিদেশী ভাষ্যকারেরা মনে করেন যে এর দ্বারা ভারত সরকারের স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার পথ অনেকাংশে বন্ধ হয়ে গেছে। এই প্রচার যে ঠিক নয়, সেটা প্রমাণ করার জন্যই যেন আরও জোরের সঙ্গে ইন্দিরা সরকার উঠে পড়ে লেগেছে লড়াই-লড়াই আওয়াজ করতে।

আমাদের সরকারের যুদ্ধের হুমকির ফলে কিছুটা কাজ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সোভিয়েত পর-রাষ্ট্র মন্ত্রী ফেরদৌন আজ দিল্লী ছুটে এসেছেন। দুদিন পরে মার্কিনী মূলক থেকেও ঐরকম হোমরা-চোমরা কেউ এসে পড়তে পারে। ইন্দিরাজী শিগগীর-ই রুরোপ ভ্রমণে বার হচ্ছেন। যুদ্ধের

হুমকির ফলে সেখানে জনমত কিছুটা তৈরী হচ্ছে। সোভিয়েত মার্কিন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের নেতাদের আবেদন হবে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান-উভয়ের প্রতিই শান্তির মাধ্যমে সব কিছু মিটিয়ে ফেলা। এবং আজকের এই যুদ্ধোন্মাদনার মূল কারণ—বাংলাদেশ—তার সমস্যা সমাধানের জন্য, পাকিস্তানের মধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের ফর-মূলা তো বাংলাদেশের জন্য বাধাই আছে। ইয়াহিয়া খাঁ তো বলেই দিয়েছেন (ফরাসী সংবাদপত্র লা মোঁদের (le Monde) সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে) যে শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি মার্জনা করতে রাজি আছেন। ইন্দিরাজীও সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেও তিনি গরুরাজী নন।

অর্থাৎ, বিদেশী বহু রাষ্ট্রদের এতদিনের বাসনা—“রাজনৈতিক সমাধান”—সেই দিকেই সব কিছু এগুচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। পাকিস্তানের ভিতর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শাসিত বাংলাদেশ মনে নিতে ভারতীয় সরকারেরও কোন আপত্তি নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার স্বরণ সিং একটি অসতর্ক মন্তব্যে সিমলায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনে খোলাখুলি এই মতটা ব্যক্তই করে ফেলোছিলেন। তারপর হৈ রৈ কাণ্ড। শেষে আবার পুনর্ব্যাক্ষা করতে হল। ভারতীয় সরকারের এই আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে লোকমনে সন্দেহকে চাপা দেবার জন্যই এত জোরের সঙ্গে যুদ্ধের কথা বলতে হচ্ছে।

অনেকের মতে এই সময় যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রচারের আর একটা উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত অঞ্চল, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় এমার্জেন্সি ঘোষণা করে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করার বাসনা দিল্লীর ইস্তে-টারি মহলে বহুকালাবধি রয়েছে। পশ্চিমবাংলাতে এমনিতেও ইন্দিরা সরকার বামপন্থী দল-গুলিকে ঠুটো করে দিতে সক্ষম হয়েছে। ছাত্রপরিষদ নামধেয় ফ্যাসিস্ট দলটি সি পি এম ও নক-শালী সক্রিয় কর্মীদের একে একে খতম করেছে। কলকারখানাতেও রাজনৈতিক কর্মীদের ছাঁটাই শুরু হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছল করা যায় যদি এমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয়। লোকসভার তাহলে আর মাঝে মাঝে যে বিরোধী পক্ষের সমালোচনা শোনা যায়, তাও আর শুনতে হবে না প্রধানমন্ত্রীকে। সমস্ত কিছুই এমার্জেন্সির খাতিরে প্রয়োজন বলে সমর্থন করা যেতে পারে। যুদ্ধের আবহাওয়া যদি সৃষ্টি করা যায়, তাহলে সারা দেশকাপী যে অর্থ-নৈতিক দাবি দাওয়ার আন্দোলন,

তাকেও কিছুকালের জন্য বন্ধ করে রাখা যায়। গত ভারত-চীন ও ভারত-পাক যুদ্ধের নামে কলকার-খানায় হরতাল বন্ধের জন্য যে Industrial Truce হরোছিল, সেই জাতীয় একটা চুক্তি এবারও সরকারের প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এবার বোনাসের জন্য ৮-৩০% দাবি উঠেছে। এক সময় এ দাবি সরকার ন্যায্য বলে মেনেও নিরে-ছিল। কিন্তু বাবা বাবা মুনফা-খোর শিল্পপতিরা বেকে বসেছে। সরকার তাদের কথা না শুনলে capital strike বা পুঁজির নিরোগ বন্ধ করে তারা শিল্পপতিদের কাজকে প্রায় অচল করে দিতে পারে।

ফলে প্রমমন্ত্রী খাদিলকার যিনি একদা শাসিয়েছিলেন মালিকপক্ষকে

প্রমিকদের ন্যায্য দাবি না মেনে নিলে, তাদের ক্ষমতা করার জন্য সরকার অর্ডিন্যান্স আনবেন, আজকে ল্যাজগুটিয়ে তিনি আবেদন-নিবেদন শব্দ করেছেন।

এই সব কিছুর জন্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হলেও দেশের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করা আজ ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ প্রয়ো-জন। এর ফলে বাংলাদেশের মুক্তি ফোঁজ—যাদের দাবীলা খাদ্যও ঠিক-মত জুটবে না—তাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় সাহায্য না করেও, একটা পাকবিরোধী জগী-চেহারা বজায় রেখে তাদের সহানুভূতি আদায় করা যায়। এবং দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধের নাম করে জন-সাধারণকে সমস্ত আন্দোলন থেকে বিরত করা যায়।

তথাকথিত নির্ভীক নিরপেক্ষ কাগজ অনেক খবর চেপে যাচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন বলে প্রতিদিনই প্রচারিত হয়ে থাকে। অথচ, নিরপেক্ষভাবে সেই সব সংবাদপত্রে কোন সংবাদই প্রকাশিত হয় না। তাঁরা দলীয় ও কামেমী স্বার্থেই সংবাদগুলি প্রধা-নতঃ প্রকাশ করে থাকেন। এ ব্যাপারে বহু নজরও আছে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কোন সংবাদ তাঁদের স্বার্থ বিরোধী হলে তা একদম চেপেও যাওয়া হয়। এরও বহু প্রমাণ আছে।

গত একুশে অক্টোবর বিকেলে মেদিনীপুর জেলার কোতোয়ালী থানার ঝুমঝুমির দুই নং অঞ্চলে শাসক কংগ্রেস এবং সি পি আই সমর্থকদের মধ্যে দারুন মারপিট হয়েছে। উভয় পক্ষের অভিযো-গের ভিত্তিতে দু'দলের মোট বোল জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ খবরটি যদিও পূর্বাঞ্চল সংশ্লিষ্ট

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে বথা সময়ে বেলেছে তথ্যাপ খবরটি আজও প্রকাশিত হয় নি।

এ ছাড়া, গত বাইশে অক্টোবর ভোরে চব্বিশ পরগণা জেলার ভাঙ্গা থানার কাঁটাতলার শাসক কংগ্রেসের সমর্থকরা সি পি আই-এর একজন সমর্থককে প্রচণ্ড মার-ধোর করে তান্ন কাছ থেকে কিছু মাছ কেড়ে নিয়ে গেছে বলে পূর্বাঞ্চল জানিয়েছে। অবশেষে, গুরুতর আহত অবস্থায় সি পি আই-এর ঐ সমর্থককে ভাঙ্গা এ জি হাস-পাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

পূর্বাঞ্চল এ ব্যাপারে পরে শাসক কংগ্রেসের চার জন সম-র্থককে গ্রেপ্তার করেছে। পূর্বাঞ্চল বলেছে যে, খত ব্যক্তিরা “গুন্ডা”। শেষোক্ত এই খবরটিও “নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন মতবাদ সম্পন্ন” সংবাদপত্রগুলিতে স্থান পায়নি।

সন্ত্রাসের পারবেশ সত্ত্বেও

দুর্গাপুরে সি আই টি ইউ-র জয়লাভ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দুর্গাপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে সি আর পি ও গুন্ডাবাহিনীর অত্যা-চারের কথা আজ আর কারো অজানা নেই। একদিকে যেমন সি পি এমের নেতাদের বেপরোয়া পি ভি এ্যাঙ্কে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হচ্ছে, অন্যদিকে সক্রিয় কর্মী-দের হত্যা করার বা ক্রানোর প্রয়াস দুর্গাপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক সন্ত্রাসের পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন শিল্প সংস্থাগুলোর এরই সঙ্গে চলেছে ছাঁটাই ও বর-খাস্ত।

এমন এক সংস্থা হলো এ সি সি ভিকার্স। বেব কক কোম্পানী। অনেকদিন ধরেই এখানে পূর্বাঞ্চল অত্যাচার ও সি

আই টি ইউ-র সঙ্গে জড়িত নেতৃ-বন্দকে ছাঁটাই করার ঘটনা সর্ব-জনবিদিত হয়ে উঠেছে। তবুও শ্রমিকশ্রেণীর জগী মনোভাবকে দমিয়ে রাখা মালিক গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কয়েকদিন আগে এ সি সি ভিকার্স বেব কক এম্পল-য়ীজ কো-অপারেটিভে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে যে প্রার্থী দিয়ে-ছিলেন তাদের সম্পূর্ণভাবে পরা-জিত করে সি পি এমের শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ-র নির্ধা-রিত কর্মীরা বিপুল ভোটে জয়-লাভ করেন। মোট আসন সংখ্যা পনেরোটির মধ্যে পনেরোটিই সিটু সংগঠন লাভ করেন।

বন্ধের দিনে বাস চালানোর নেপথ্যে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলো কর্তৃক আয়োজিত গত তেরোই অক্টোবরের “বাংলা বন্ধ” ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য সরকারী চেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। সি আর পি ও পূর্বাঞ্চল বিভাগ এবং প্রচার বন্দকে ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজে লাগানো হলেও তাদের সমস্ত নজরকে ম্লান করে দিয়েছে অন্য একটি সরকারী আদেশ। জানা গেল, ট্রান্সপোর্ট কমিশনার যার ঘোষ এক আদেশ দিয়ে আদেশ নং ৮০০২/১ (২) (২) (২) (২) কালকাটা ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের চেনারম্যান এ কে কিস্তকে জানান যে সব কর্মী তেরোই অক্টোবরের ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজে নিষেধ হবেন তাদের অন্যান্য সুবিধা ছাড়াও পে কমিশনের সুপারিশ তাদের ক্ষেত্রে যেন ১।৪।৭০ তারিখ থেকে মেনে নেওয়া হয়।

এরই সঙ্গে আরো একটি সংবাদ এসেছে। তা হলো ধর্মঘটের দিন ট্রান্সপোর্টে উপস্থিত কর্মীর সংখ্যা মোট বারো হাজারের মধ্যে এগারোশ বলা হলেও তা নাকি ভিত্তিহীন। কারণ ধর্মঘটের উদ্যোক্তারাই ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ডের লোকদের ধর্মঘটের বাইরে রেখে-ছিলেন, তাদের সংখ্যা হলো প্রায় চারশো। সরকারী প্রচারবন্দ, এগারোশ উপস্থিত কর্মীর মধ্যে ধর্মঘটের আওতার বাইরে ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ডের চার শো জনকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে তাদের প্রচার চালিয়েছেন। অভিযোগ, পূর্বাঞ্চলের ড্রাইভার, ও অন্যান্য অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত এমন অনেকেই সৌদি ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজে নেমে-ছিলেন। এবং তাদেরই সাহায্যে সরকারী বাস চালু রাখার ছবি বাজারী পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল।

নব কংগ্রেসের দেওয়ালী উপহার

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার কোন শ্রেণীর সেবা করে, সেটা অনেক অপচেষ্টা সত্ত্বেও আজ আর গোপন নেই। নব কংগ্রেস যে আদি কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী নীতিগত-লোকেই আরো সফলভাবে কার্যকরী করেছে, সে বিষয়ে আজ মোরারজী দেশাই, কিংবা এস কে পাতিলেরও কোন সন্দেহ নেই। ইন্দিরা সরকার যেভাবে অম্লান বদনে জনসাধারণকে নানাভাবে আক্রমণ করেছে, স্বয়ং মোরারজী দেশাই তা কম্পনায়ও আনতে পারতেন না।

আমরা এতদিন জানতাম যে অর্থবিশয়ক ব্যাপারে অর্থ ট্যাক্স বসানো বাজেট নীতির অদলবদল, খরচের মঞ্জুরী এসব ব্যাপারে অর্ডিন্যান্স জারী করা এবং পার্লামেন্টের মঞ্জুরী দেবার সার্বভৌম অধিকারকে চোখা কাগজের মত অবহেলা করা—এ ধরনের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি একমাত্র ফ্যাসিস্ট, আধা-ফ্যাসিস্ট সরকার-গুলিই করে থাকে। যেমন দক্ষিণ ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ

কোরিয়া প্রভৃতি দুনিয়ার ওঁছা তাবদার সরকারগুলি সর্বদাই এ ভাবে অর্ডিন্যান্স বা ডিক্রি জারী করে কর বসায়, ব্যয় মঞ্জুরীর নামে চূড়ান্ত দুর্নীতিমূলক কাজে সরকারী আইনের ছাপ লাগায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এদেশে অর্ডিন্যান্সের বলে কর বসানোর ঘটনা ঘটে নি। এটাও ইন্দিরাজী রেকর্ড!

আমাদের দেশে ন্যাকি একটা সংসদ রয়েছে। নভেম্বর মাসেই এই সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বসবে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতির খোড়াই তোয়াক্কা করেন। তাই সংসদে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে, তিনি অর্ডিন্যান্স জারী করে ট্যাক্স বসিয়েছেন—আর এই অতিরিক্ত মাশুল দেবেন সাধারণ গরীব মানুষ, তিনি যে বড়-লোক-জমিদারদের সেবা করেন, তার নয়। গরীবী হঠানোর কি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি একমাত্র অপরূপ কায়দা?

টেলিগ্রাম, মণিঅর্ডার, খাম, ইনল্যান্ড লেটার—এক কথায় পোস্ট-কার্ড বাদে আর সব বিষয়ে ডাক-

মাশুল পাঁচ পয়সা করে বেড়েছে, ট্রেনের যাত্রী মাশুল এক টাকার বেশী হলেই শতকরা পাঁচ টাকা অতিরিক্ত কর দিতে হবে; সমস্ত বসিঙ্গ, ইন্সওরেন্স পলিসি, প্রমিসরী নোট, ইত্যাদির ওপর অতিরিক্ত দশ পয়সা রেভিনিউ ট্যাক্স লাগাতে হবে; সমস্ত খবরের কাগজ, পত্রিকার পাঠকদের অতিরিক্ত দুপয়সা মাশুল গুণতে হবে; এই অতিরিক্ত মাশুল বাবদ সমস্ত কোর্টী টাকা যাদের পকেট থেকে তুলে নেওয়া হবে, তাঁরা সাধারণতঃ মেহনতী গরীব মানুষ, তাঁদের এম-নিতাই দিন চলে না, জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাবার ফলে ঘরে ঘরে আধপেটা খাওয়া, ছেঁড়া কাপড়-জামা পরা এবং অসুখবিসুখে ঔষধ না খেয়ে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে চলা, তাঁদের পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক।

এই কর আগামী পনেরোই নভেম্বর থেকে বাড়বে। গরীব মানুষদের আরেক মূঠো ভাত,

আরেকখানা রুটী খাবারের থালায় কম হবে। তাতে নব কংগ্রেসী বড় লোক ও তার দালালদের কি আসে যায়? তাই তারা নভেম্বরের আর এক সপ্তাহ পরে সংসদ বসার জন্যে অপেক্ষা করে নি, গরীব মানুষের উপর খড়্গঘাত নেমে এসেছে।

এখানেই এই আঘাতের শেষ হবে না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মশাই রাজ্যের মধ্যমস্তরীদের বলে দিয়েছেন যে রাজ্য রাজ্যেও নতুন নতুন ট্যাক্স বসাতে হবে।

সবার আগে পথ দেখাবে পশ্চিম-বঙ্গ, পঞ্জাব, মহীশূর এবং গুজরাট। এই রাজ্যগুলিতে কোন নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার নেই। আছে আমলাতন্ত্র।

বৃটিশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পেটোয়া আমলাতন্ত্র এখানে বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিমালিক ও জমিদারদের সেবা করে চলেছে। এই আমলারা স্বাধীনতার আগে দেশের শত্রু হিসাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা করত, ভারতীয় স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের রক্তে হাত রঞ্জিত করে বিদেশী মশিবেদের অনগ্রহ প্রসাদ কুড়িয়ে নিত। এই জঘন্য লোকগুলিই নবরূপে নয়া শোষক দেশীয় বিদেশী এক-চোঁটীয়া পুঁজি ও সামন্ত জমিদারদের সেবাদাসের কাজ করছে। ভারতের গরীব মানুষকে কি করে দাবিয়ে রাখা যায় কি করে তাদের রক্তের বন্যায় সমস্ত ন্যায়বোধ নীতিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের ধ্যান ধারণা ভাসিয়ে দেওয়া যায়, এই আমলার দল সেই শ্রেণী স্বার্থের লক্ষ্যকেই কার্যকরী করেছে।

এই ধরনের ট্যাক্স বসানো এই বিশেষ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আসে। আই সি এস, আই পি প্রভৃতি বৃটীশ আমলের পোষা কুকুরদের মতই আজকের স্বাধীন ভারতে আই এ এস, আই পি এস আমলার দল জনস্বার্থের বিরুদ্ধে বড়লোকদের পাহারাদার।

নইলে তারা ও তাদের ঘণ্য নব কংগ্রেসী মালিকেরা দেখতে পেত যে তাদের প্রভু নিকসন, আমেরিকার স্বার্থে প্রয়োজন মনে করায় আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বোঝাপড়া নস্যাৎ করে ডলারের বদলে সোনা দেবার প্রতিশ্রুতি অম্লানবদনে ভঙ্গ করেছেন।

আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যদি জনসাধারণের দরদী হত, যদি তারা দেশের কল্যাণের প্রতি মনোযোগী হত, তাহলে তারাও নিকসনের মত বলতে পারত যে আমরা বর্তমান অবস্থায় বিদেশী ঋণের সুদ ও কিস্তি শোধ করতে পারব না। একমাত্র যে সব পাণ্ডানদার এদেশে শিল্পস্থাপনে লগ্নী করবেন, তাদের ভারতীয় টাকায় পাওনার একাংশ দেব। তাহলে প্রায় আটশো কোর্টী টাকা বাইরে যেত না। ট্যাক্স বসাবার দরকার হত না।

তারা বলতে পারত যে ট্যাক্স বসাতে হলে বসানো হউক ডিজেল কেরোসিন বাদে সব জ্বালানী তেলের উপর, মদের উপর, আমদানী পণ্যের উপর, পাট, চা মাইকা প্রভৃতি একচেটিয়া ভারতীয় পণ্য

রপ্তানীর উপর—এবং উচ্চ আয়ের উপর আরো কর বসানো হউক। বকেয়া পাঁচশ কোর্টী টাকা আয়কর আদায় করা হউক, হাজার হাজার কোর্টী কালো টাকা খুঁজে বের করা হউক।

আরো অনেক ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করত যাতে জনসাধারণের উপর শিক্ষা স্বাস্থ্য বেকারীর চাপ হ্রাস পায়, অত্যাবশ্যক পণ্য নিয়ন্ত্রিত দামে সরবরাহ করার দায়িত্ব নিয়ে, স্কুল কলেজে শিক্ষার খরচ কমিয়ে, খাদ্যের দাম কমিয়ে,—বাজারে অপ্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ কমিয়ে, পুঁজি মিলিটারীর অহেতুক খরচ কাটছাঁট করে, উচ্চ বেতনের আমলাদের বেতন অর্ধেক কমিয়ে অথবা তাদের অবসর গ্রহণ করিয়ে তাদের জায়গায় বুদ্ধিদীপ্ত দেশপ্রেমিক শিক্ষিত যুবকদের দায়িত্ব দিয়ে খরচ কমানো যেত।

কিন্তু নব কংগ্রেসীরা তা করবে না, করতে পারে না। কারণ এ যে সেই নতুন বোতলে পুরনো মদ নব কংগ্রেসী খোলসে আদি কংগ্রেসেরই আত্মপ্রকাশ।

তাই তারা রাজ্য মধ্যমস্তরীদের বলে দিয়েছে যে জনসাধারণের মেরদণ্ড ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে ভেঙ্গে দাও, অভাব অনটনের জ্বালায় ক্ষুধায় তারা যেন মাথা তুলতে না পারে। এ সত্ত্বেও যদি তাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা ফোটে, তাহলে সরকারী গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দাও আইনের প্রশাসন প্রত্যাহার করে তাদের পিটিয়ে মারো।

তাই আগামী কয়েক দিনের মধ্যে হয়ত শোনা যাবে গৃহস্থের ব্যবহার্য বিদ্যুৎ শক্তি, খাদ্য দ্রব্য, চলাচলের যানবাহন, খাদ্যাশস্য, পুঁজিরুটী, ডিম, মাছ মাংস এগুলিও ট্যাক্সের কবলে পড়বে। কারণ এই রাজ্যের হতভাগ্য রাজ্যপাল এন্টনী ল্যান্সলট ডিয়াস (নামটী কি মধুর বিদেশী বিদেশী শোনায়ে) সাহেব ঠিক করেছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরো পঁয়ত্রিশ কোর্টী টাকা কর তোলা হবে।

নতুন শয়তানী হচ্ছে, কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বাজারে বাজারে অনশন করে “ছাত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার” হাস্যকর মহড়া দিচ্ছে।

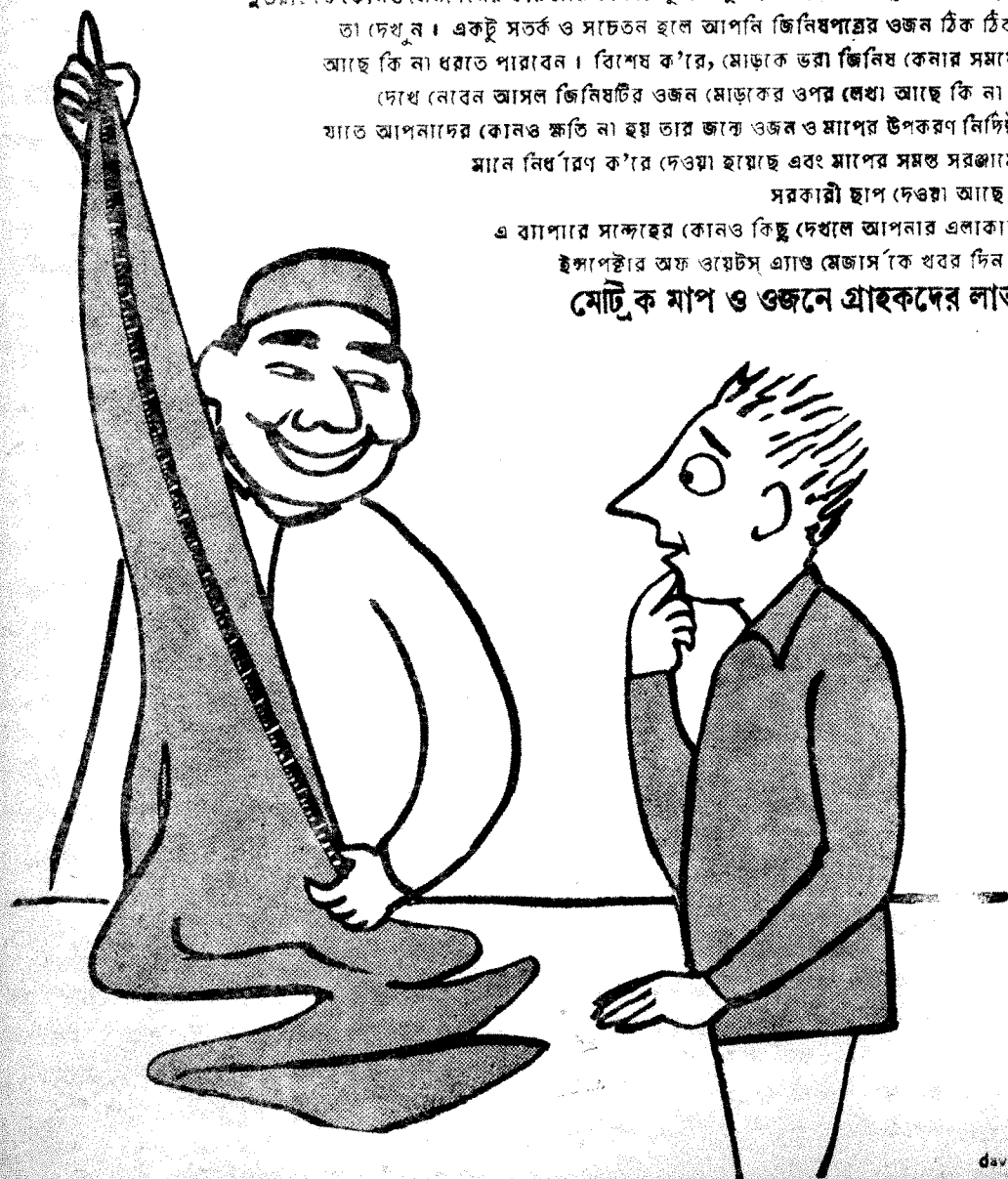
তাদের বলতে হয়, যদি সংহন, যদি বাঙালীদের এই দঃখ-দর্দশার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থেকে থাকে, তাহলে বাজারে অনশন নয়, ইন্দিরা গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালী জাতিকে ধ্বংস করার জঘন্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন। আর তা যদি দলীয় স্বার্থে না পারেন তাহলে হাস্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবেন না। বাঙালীরা এই নীতিগুলিকে চূর্ণ করবেই। এবং এই শোষণমূলক কেন্দ্রীয় নীতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করেই তারা সারা দেশকে অর্থনৈতিক মস্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।

শুধু টাকার প্রশ্নই নয় একটু লক্ষ্য রাখাও দরকার...

আপনি যা কিছুই কিনুন বা বেচুন সবোতাই আপনার কষ্টার্জিত অর্থ জড়িত। সুতরাং যে কোনও লেনদেনের কারবারে টাকার মূল্য অনুযায়ী জিনিষ পাচ্ছেন কি দিচ্ছেন তা দেখুন। একটু সতর্ক ও সচেতন হলে আপনি জিনিষপত্রের ওজন ঠিক ঠিক আছেন কি না পরীক্ষা করতে পারবেন। বিশেষ করে, মোড়কে ভরা জিনিষ কেনার সময়ে দেখে নোবন আসল জিনিষটির ওজন মোড়কের ওপর লেখা আছে কি না। যাতে আপনারা কোনও ক্ষতি না হয় তার জন্য ওজন ও মাপের উপকরণ নির্দিষ্ট মানে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং মাপের সমস্ত সরঞ্জাম সরকারী ছাপ দেওয়া আছে।

এ ব্যাপার সন্ধেহর কোনও কিছু দেখলে আপনার এলাকার ইন্সপেক্টর অফ ওয়েটস্ গ্রাণ্ড মেজারসিক খবর দিন।

মোটক মাপ ও ওজনে গ্রাহকদের লাভ



শ্রবণ ২১শে অক্টোবর ১৯৭১

চীন এবং পাকিস্তান সম্বন্ধে অনমনীয় মনোভাবের জন্য দায়ী যুদ্ধবাজ এবং শোণ-পাখীরা। ভারতীয় সরকারী মহসের নীতি-নির্ধারণের পাক্সা উল্টোদিকে ভারি করে বিবর্তকর অবস্থা যে তারা মাঝে মাঝে সৃষ্টি করে, এ তথ্য আজ সর্বাধিক। একথা প্রধান-মন্ত্রী মহাশয়াও জানেন এবং জানেন বলেই এতদিন পরে মরাসের মত অর্থহীন, কলম্বো পরিত্যক্ত “কলম্বো প্রস্তাব”কে জলাঞ্জলি দিতে পেরেছেন। চীনের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলার মনোবৃত্তি আজ হঠাৎ রাজধানীতে প্রত্নতমান। নাহলে যে আকসই-চীন অঞ্চল নিয়ে শাসক মহলের এত স্পর্শকাতরতা বিগত সাত-আট বছর ধরে চলে আসছিল তার ওপর থেকে সমস্ত দাবী তুলে নিয়ে যাতে ভারত সরকার এক “দ্বিধাহীন এবং সং ঘোষণা” করে সেজন্য পরামর্শ দিয়ে লেখা শাসক-বর্গেরই মূল্যপত্র, “টাইমস অফ ইন্ডিয়া” পত্রিকা ছাপতে যাবে কেন? (উনিতিরশে আগস্ট, উনিশশ একাত্তর)। পরিবর্তে অবশ্য ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে চীন ম্যাকমোহন লাইনকে মেনে নিক, একথাও উঠেছে। কিন্তু কৌতুকের বিষয় চীনের প্রধানমন্ত্রী চো এন লাই বহু বছর পূর্বেই এটা মেনে নিয়ে আলাপ আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দেবীতে হলেও অবশেষে প্রশাসনিক ক্ষমতাস্বার্থীদের তা মনে পড়ছে। আলাপ-আলোচনা এবং প্রধানমন্ত্রীর চিঠির উত্তর-প্রত্যায় আরও “কূটনৈতিক পদক্ষেপ” তো বটেই, এমন কি ভুলে যাওয়া বান্দুর সম্মেলনের ও পশ্চিমীলের গুঞ্জন ধ্বনিও আছে নতুন দিল্লীতে মর্ম-রিত।

কেন এমন হল? তবে কি শাসকশ্রেণীর মধ্যে অবস্থানকারী শোণপাখীরা মৃত কিংবা মূর্খবর্গ? তাও তো নয়। কেননা, রাজসন্তার আর এক স্তম্ভ যে সমরবাহিনী, সেই আর্মির রিটার্ড অফিসারদের উক্তি, বৃত্তা এবং লেখা থেকে ভাস্বর হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তান সম্পর্কে শোণপাখীদের অনমনীয় শত্রুমনোভাব, বাংলাদেশের ওপর অবমাননামূলক সামরিক অত্যাচার পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শত্রু করবার পূর্বে থেকেই বিদ্যমান ছিল। রিটার্ড মেজর জোহরী এমনি এক বাজপাখী গোষ্ঠীর প্রবক্তারূপে তাঁর “দাঁড় কণার অফ ইন্ডিয়া” বইতে শত্রু অভিমত নয়, সরকারকে প্রস্তাব-করা সুপারিশ হিসেবে জানান যে পূর্বে পাকিস্তানকে সামরিক অর্থে সম্পূর্ণ অকেজো (Cripple শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি) করে দেওয়া, ভারতের পূর্বে এবং উত্তর

পূর্বে অঞ্চলের নিরাপত্তা-স্বার্থে চাই।

সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর “কন-ফ্রন্টেশন উইথ পাকিস্তান” বইতে বহু-বিতর্কিত জেনারেল বি এম কাউল সাহেব পূর্ববার মত খুলে-ছেন : “যদি আমরা সেনাবাহিনী মার্চ পাঁচশ তারিখের অব্যবহিত পরেই পূর্বে পাকিস্তানে যেত... তাহলে আমরা সেখানে দু ডিভিশনেরও কম পাকিস্তানী সৈন্য দেখতে পেতাম... তাদেরকে ধরতে পারতাম জাহাজ থেকে উপকূলে অবতরণের মত... এ সময়টাই ছিল সমরান্ধকারের পক্ষে প্রকৃষ্ট... আমরা পাকিস্তানী আর্মির একটা উল্লেখযোগ্য বড় অংশকে শেষ করে ফেলতে পারতাম।”

কিন্তু হায়, কাউল সাহেব হয়ত জানেন না যে পাকিস্তান বাংলা দেশে আগে থেকে মোতামেন চোন্দ নং ডিভিশন বাহিনী ছড়া আরও দুটি বাহিনী মাত্র চোন্দ দিনের মধ্যে আকাশপথে আনতে পেরেছিল কেবল সীমিত সংখ্যক বোয়িং পরিবহনকারী ডোডোজাহাজ দ্বারা। পরে অবশ্য উক্ত সৈন্যরাচারী গোষ্ঠী ইরান ও তুরস্ক মারফৎ আরও যুদ্ধ জাহাজ এবং পরিবহনকারী ফাইটার-বম্বার পায়, কিন্তু প্রথমে তারা অত্যন্ত দ্রুত সংগঠনশক্তির পরিচয় দেয়, যখন বাস্তবিকই সামরিক অর্থে তারা ছিল দুর্বল, ইন্ট-বেংগল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পদলিঙ্গ মূর্খ হিন্দ ইত্যাদি সামরিক ও অর্থ সামরিক লড়য়েদের তুলনায়। পরোক্ষ বোদ্ধাদের সম্মিলিত সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ ছিয়ন্তর হাজার। দ্রুতের বিষয়, তাদেরকে দ্রুত এবং অনমনীয় আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত করবার মত নেতৃত্ব পাঁচশে মার্চের আগে এবং পরেকার সেই সঙ্কট জর্জটল দৃশ্যপটের মধ্যে দেখা দেয়নি। ভারত শত্রু হাত কচলেছে।

কেন যে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে সজ্ঞানে বিরত থেকেছে তা আজ আর রহস্য ঢাকা নেই। স্বীকৃতি দেওয়ার অনিবার্ণ পরিণতি পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিকতন্ত্রী সরকারের যুদ্ধাবতরণ এ সত্য গোড়ায় ভারতের শাসক মহলকে ততটা বিচলিত করেছিল, যতটা করেছে এর অস্তিত্ব অধ্যায়ের (বাংলা দেশে যখন চরম সাম্যবাদী অভ্যুত্থানকে ঠেকানো হবে না) দৃষ্টান্ত। তাছাড়া এমনি বৈশ্ববিক পরিণতি নিয়ে আসতে পরোক্ষে সহায়ক হবে ভারতেরই উচ্চমধ্যবিত্ত শাসিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পরম্পরায় শিক্ষিত সেনাবাহিনী। সুতরাং আর্মিকে নিরোগ করতে ভারতের শাসকমহল এখন তাঁর অনিচ্ছক, পাকিস্তানের ভয়ে ঠিক নয়।

এমনি অনীহা, পাকিস্তানের সামরিক বিস্তারিত শ্রেণীরও রয়েছে। তারা ইয়াহিয়া খাঁকে ততটা গর্জন করতে অনুরোধ দেবে, যতটা করলে ভারত সরকারকে তাদের মতে ভয় দেখানো চলে। তাই সাম্প্রতিক ভারত-রূশ মৈত্রীসন্ধি এবং তার ফলশ্রুতি রূপে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মহলেও ভারত-মৈত্রী ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুলতা চাগাড় দিয়ে ওঠায় পাকিস্তানী শাসকমহলকে খানিকটা থমকে নীতির পনমূল্যায়ন করতে হচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ার রাজনৈতিক ভাগ্য এর ফলে আরও প্রোঙ্গদল হয়েছে বলে প্রতীয়মান। সুতরাং তিনি আসন্ন হিসেব-নিকেশ ও দর-কষাকষির সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাবার প্রত্যাশাই করেন, দেবার আশঙ্কা নয়। যদিও বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়াই বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের “এশীয় রাষ্ট্রদের দ্বারাই এশিয়ার সামূহিক নিরাপত্তা”র নীতি অনুসারে স্বীকৃত, তথাপি ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানেন যে, এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ, বিস্তারিত শিক্ষা স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব পাকিস্তানের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের “গণতন্ত্র”, অর্থাৎ উঠতি পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত সরকারকে বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং সে কারণে ভারতকে পুনরায় পক্ষপটী-প্রিত করতে চায়।

কয়েকমাস পূর্বে মিঃ লুইস-য়ান পাই নামক যুক্তরাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণীর এক বুদ্ধিজীবী প্রফেসর (ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের) ভারতে এসে ভারতীয় শাসকবর্গকে তাঁর দেশের সরকারী মহলে যে নতুন চিন্তাধারা উৎপন্ন হয়েছে (ভিয়েতনাম থেকে পশ্চাদপসরণের পর দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাজনীতির ক্ষেত্রে ফাঁক-পরেণের জন্য) সে সম্বন্ধে সূচনা দিয়ে যান। ভারত সরকার আজ তাই জানে যে, আমেরিকার ভারতকে প্রয়োজন রুশিয়ার অনুরূপ প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক বেশী। আশ্চর্যের কিছু থাকবে না যদি প্রধানমন্ত্রী তাই মনে করে থাকেন যে, বাংলা দেশের ব্যাপারে কোনো-রকম সক্রিয় পদক্ষেপ না নিয়ে, অর্থাৎ সামরিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন যে কোনো কাজ প্রয়োজন সঙ্গেও মূলত্বি রেখে তিনি আগামী ইউ এন ওর সাধারণ এবং অছি পরিষদের বৈঠকে আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনার দ্বারা বাংলাদেশে এক সমাধান ঘটতে পারবেন। বলাবাহুল্য এমনি সমাধানের অর্থ বাংলাদেশে তথাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষ্ণগত এবং ভারতীয় শাসকশ্রেণীস্বার্থের প্রতি অনুকূল এক সরকারের স্থাপনা।

এবার বাংলার প্রতি “দক্ষিণ্য”

রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক কল্পনায় কীড় ও কোমলের সংমিশ্রণ ছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনের প্রান্তন ছাত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী-রূপে তাঁর গুরুদেবের দেশকে

যে দক্ষিণার দক্ষিণ দেখিয়ে চলে-ছেন আজ, তার চরিত্র মিঠে-কড়া—মিঠে অংশ প্রাপ্য পশ্চিমবঙ্গে তাঁর ইন্ডিকেট দলের মধ্যে তাঁরই একান্ত বশব্দ গোষ্ঠীর এবং তস্য সহৃদয়, প্রতিষ্ঠিত বড়বাজার-কেন্দ্রিক শিল্প-বাণিজ্যপতি যুগের। কড়া অংশ রিজার্ভ করা হয়েছে, এ প্রজন্মের হতভাগ্য তরুণদের ভাগ্য—যাদের একমাত্র অপরাধ, সামাজিক অবিচার, অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক অন্যায় তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিবেকের নিভীক আও-রাজ তোলা। তাই তাদেরকে যখন যেমন সুবিধে খেতাব দেওয়া হয় “নকশালী” এবং দুটি নিবর্তন-মূলক আইনের বলে বিনাবিচারে, এমন কি, সরকারী অভিযোগ না জানিয়েই করা হয় আটক। হিংসা-ম্বক কার্যকলাপ নিরোধ আইন ফাঁদবার গোরচিন্দ্রিকা কেন্দ্রীয় সরকার গত বছর এপ্রিল মাস থেকেই করে আসছিলেন।

এই আইন এবং পরে “আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন”র কঠিন প্রয়োগে এপ্সান্ত যথাক্রমে চার হাজার পাঁচশ ব্রিটিশ এবং দুশো আশি জনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। প্রথম আইনের আওতা থেকে ছাড় পেয়েছে প্রায় পাঁচশ ব্যক্তি অধিকাংশের মাঝে যাদের পেছনে শাসক দলের এবং কেন্দ্রীয় গুপ্ত পদলিঙ্গের অভিসন্ধিমূলক মেহের-বাণী বিদ্যমান। বন্দী অবস্থায় এবং গ্রেপ্তার করবার পূর্বেই দেবতার মত সর্বশক্তিমান ও ছাড়ছট-প্রাপ্ত কেন্দ্রের আশীর্বাদধন্য পুঁজিবাহিনী কত তরুণ প্রাণকে এই দীন দীনরা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা জানেন মর্মে মর্মে! তবে এধরণের বিপ্লবী দমন অভিযান কেবল বাংলার কপালের গেরোই নয়। পঞ্জাবে প্রায় সমভাবেই নকশালী অপবাদ দিয়ে সরকার বিরোধীদের হত্যা শুরুর হয়েছে বহুদিন। গত সত্তর সালের মার্চের পর পাঁচশ এবং সাতাশ তারিখে রূপাঢ় জেলার সলাবতপুর্বে খেরি গ্রামে ও পাতিয়ালা জেলার সাগানায়, পদলিঙ্গ পাঁচ ব্যক্তিকে ঠান্ডা মাথায় গ্রেপ্তারের পরই শেষ করে দেয়। এই বছরই ছাব্বিশে জুলাই তারিখে আশি বৎসর বয়স্ক স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক শ্রীভূজা সিংকে জলন্ধর জেলার ফিলাউড় গ্রামে গ্রেপ্তার করার পর লাগদেও গ্রামে নিয়ে গিয়ে রাঠোর অম্বকারে পদলিঙ্গ শেষ করে। প্রায় ঐ সময়েই বাবা হরি সিং নামক একজন অশ্রীতপর বৃদ্ধ, যিনি পূর্বে করদ রাজ্যে প্রজামন্ডলী আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছিলেন, তাকেও পদলিঙ্গ পাতিয়ালা জেলার বৃগিয়া গ্রামে গ্রেপ্তার করার পর উগানা গ্রামে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। উল্লেখ্য, এই সকল প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ করার জন্যই নকশালী অজুহাত নিয়ে যে প্রাদৌশিক সর-

কার খতম করে তাদের সরকারী দল সেসময় কেন্দ্রের শাসকদল ইন্ডিকেট কংগ্রেসের সমর্থন প্ৰদেত। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, বিশাখাপত্তম-জেলে তিরিশ জন গিরিজান উপজাতির রাজনৈতিক বন্দীকে ধীরে ধীরে বিনা চিকিৎসায়, এবং পরোক্ষ অত্যাচারের কায়দায় মেরে ফেলা হয়েছে। অম্বরাজ্যের সরকার শাসক কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আইন ও শৃঙ্খলা রূপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পুত অছিল। এবং জিগীর তুলে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার—শীর্ষে যার প্রধানমন্ত্রী—বামধারার বাহক, সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদেরই বেছে বেছে পৃথিবী থেকে সরাতে উদ্যত। ভারত সরকারের মনঃপুত “গণতন্ত্রের” ধ্বজাতলে কি তাহলে বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শবাদীদের জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা শত্রু মরবার? মৌলিক অধিকার সীমিত সীমাহীন ক্ষমতাসম্পন্ন গুপ্ত পদলিঙ্গের খেলা-ধুসী এবং সৈন্যরাচারী মর্জির বাঁধনে?

হায় রবীন্দ্রনাথ, তুমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট আইন শৃঙ্খলার প্রহসনকে তাঁর ভৎসনা তোমার কব্ধকণ্ঠে করে থাকলেও তোমার স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া সেই জবরদস্ত নিপাড়নের উত্তরাধিকারকে আজ সরকারী প্রশাসনের পরম্পরায় পোক্ত করে তুলেছেন। এই তাঁর গরু খণের পরিশোধ-মহিমা। গুরুদেবের বাংলা ধন্য।

পশ্চিমবঙ্গবাসী, অপেক্ষা করুন এপ্রিল বাহান্তর-এর পূর্বেই, বর্তমানে চালু “হিংসাত্মক কার্যকলাপ” দমনের অজুহাতে পাশ করা “অহিংস” আইনের মেয়াদ ফুরোবে। তখন কিংবা তার পূর্বেই আপনারা হয়ত দেখতে পাবেন, ভারতের সংবিধানের কারচুপীকৃত সংশোধনান্তে ৩৫২ (এবং সম্ভবতঃ ৩৫৩) ধারার নবকলেবর। দেখে বিমূঢ় হবেন যে, সারাদেশে আপৎকালীন অবস্থা সমরপস্থিত বলে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের বিবেচনায় স্থির হলেও, তার প্রয়োগ হবে দেশের বিশেষ অংশে বাছাই করা ভাবে। আইনবিদ এবং বিচারপন্থিতর শাস্ত্রজ্ঞ তাত্ত্বিকরা ভিন্নমত পোষণ করতে চান করুন ভারতের শাসকদলীয় শক্তিদম্ব অন্য পদ্ধতি আবিষ্কার করবে। নিহত গণতন্ত্রের বৃদ্ধে ফটবে একনায়কতন্ত্রের মারণ অর্কিড।

আওয়ামী লীগ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

গত ছয়ই আগস্ট দপর্শে প্রকাশিত আমার বক্তব্যের জবাবে বীর-
কুমের জনৈক রবিউল কামাল যে
বক্তব্য পেশ করেছেন (বিশেষ আগ-
স্টের দপর্শ) তা কিন্তু আমার
বক্তব্যকেই প্রমাণ করেছে। কামাল
সাহেব, সিন্ধেছেন এবং এটা ঘটনাও
যে সত্যই মাচ মজিবুর রহমান
সর্বপ্রথম বলেন “তোমাদের যা
কিছু আছে তাই নিয়ে তৈরী হও,
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়।” আর
আমিও বলেছি যে “আগাগোড়া
গান্ধীপন্থার ভাঙে দেখিয়ে শান্তি-
জল ছিটিয়ে শেষ সময়ে আচমকা
সশস্ত্র লড়াইয়ের ডাক দিয়ে অসং-
গঠিত নিরস্ত্র জনতাকে হঠকারি-
তার সঙ্গে সশস্ত্র ফৌজের মুখে
ঠেলে দেওয়া হয়েছে.....”। সত্যই
মাচের আগে পশ্চিম ঘরে ঘরে দুর্গ
গড়ার চিন্তা মজিবুর রহমানের
ভাই মজিবুর উল্লাহ জাতীয়তাবাদী
পার্টি আওয়ামী লীগের ছিল না।
মজিবুর রহমান অত্যন্ত স্পষ্ট
ভাবেই “অহিংস অসহযোগ”
আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন এবং
জনগণ যাতে শত প্ররোচনাতেও
হিংসার পথে না বাড়াই সেজন্য
মজিবুর রহমান বারংবার উৎসাহ-
কূল আবেদন প্রচার করেছেন।

কামাল সাহেব নিজেই জানাচ্ছেন
যে “পাঁচশে মার্চের রাতে পাকি-
স্তানী জঙ্গী বাহিনী বাংলা দেশের
জনগণকে আচমকা আক্রমণ করেছে—
এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পরই মজি-
বাহিনী গঠন করা হতে থাকে।
আমারও সেই একই বক্তব্য যে
আক্রান্ত হবার আগে আত্মরক্ষা বা
পাল্টা আঘাতের কোন পূর্ব-
প্রস্তুতি ছিল না। না কামাল
সাহেব “আক্রান্ত হওয়াই” অপরাধ
নয়, আক্রান্ত হতে দেওয়া—আপ-
নার ভাষায় “আচমকা আক্রমণ”
করতে দেওয়া আমার আপনার মিশ্র
বক্তব্য অনুসরণী “অসংগঠিত নিরস্ত্র
জনতাকে আচমকা আক্রমণের”
মুখে ঠেলে দেওয়াটাই হঠকারিতা
বা অপরাধ এবং জঘন্যতম অপ-
রাধ।

আমার বক্তব্যে রিক্রুটিং করতে
আমি পশ্চিমবঙ্গে যেসব রিক্রুটিং
সেন্টার খোলা হয়েছে সেগুলির
কথাই বলেছি। আমি ক্যাম্পওয়ারী

রিক্রুট শিকারদের তালিকা পেশ
করতে প্রস্তুত আছি বারা দলীয়
নোংরা রাজনীতির জন্য সেইসময়
মজি বাহিনীতে বোগদান করতে
পারে নি। অতি সম্প্রতি সাপ্তা-
হিক পিপলস ডেমোক্রেসিস (হাতের
কাছে সংখ্যাটি না থাকার তারিখটা
দিতে পারলাম না) পত্রিকায় শর-
ণাধী শিবিরে উপদেষ্টা নিয়োগ

মতামত

সংক্রান্ত ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
সরকারের উচ্চতম আমলাদের সঙ্গে
কিছু গোপনীয় পর বিনিময়ের
ফটোস্টাট কপি সহ চাপ্ত্যাকর
সংবাদ বেরিয়েছে। আওয়ামী লীগ
এদেশের প্রতিরক্ষাশীলদের ও
শোধানবাদীদের মধ্যমে প্রত্যক্ষ বা
পরোক্ষ ভাবে শিবিরগুলির ওপর
ও রিক্রুটমেন্টের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ
রাখতে চায় তা ঐ তথ্য থেকে দিবা-
সেকের মত স্পষ্ট। কারণ আও-
য়ামী লীগ মনে প্রাণে আপোষপন্থী
—বিশ্ববী গণমজি সংগ্রামের পথে
এ লড়াই যাক এটা তার কাম্য নয়।
“মজিবুর-ইন্দিরা ভাই বোন”—এই
শ্লোগান নিতান্ত আবেগ প্রসূত
নয় বরং গভীর অর্থবহ।

পূর্ববঙ্গের গণমজি সংগ্রা-
মের প্রতি আমার মনোভাব বিম্বষ্ট
নয়, কারণ আমিও একজন
সংগ্রামী। আমার বক্তব্য যে, মজি-
বনগরে যে স্বাধীন বাংলা সরকারের
প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন গ্রহণ করলেন,
সেখানে কোন ধর্মশাস্ত্রই পাঠ করা
উচিত নয়, তবুও দেখলাম, পাঠ
হল এবং কেবল মাত্র কোরাণ শরীফ,
অন্যান্য ধর্মমতকে সেখানে অগ্রাহ্য
করা হল অর্থাৎ সোশাল ডেমো-
ক্রাটরা যে সেকুলারিজমের কথা
বলেন আওয়ামী লীগের তাতে
কেন্দ্র কুষ্ঠা। স্বাধীন বাংলা বেতার
কেন্দ্র নিয়মিত শোনার অবকাশ
নেই, লড়াইয়ের জীবনে তবুও
প্রায়ই যা শুন তাতে দেখি শব্দ
হয় “আসছালাম উ আলাইকুম”
(বঙ্গ সংস্কৃতির কোন অঙ্গ জানি
না, জানি না এটা কেমন বাংলা
ভাষা), কখনো শুন “আল্লাহ
রহমুল আলমিন বসেছেন” ইত্যাদি
(এইসব ধর্মীয় প্রচারের উদ্দেশ্য
আমার অজ্ঞাত), কখনো কখনো
গ্রাম বাংলার মানুষদের জন্য অন-
র্ধান “সোনার বাংলা” যাতে কোন-
দিনই কোন অমসলমান চারিয়ার
নাম শুনিনি (হয়তো ওদের সোনার
বাংলার সোনারা কেউ অমসলমান
নয়)। বই হোক মাঝে মাঝে গীতা
বা দ্বিগিতক বা বাইবেল পাঠ করে
তীর ঐশ্বর্যময় অর্থতা (যা ইয়া-
হিরও ডোজ) যদি ডায়ালগ করার
চেষ্টা হয় কামাল সাহেবের বক্তব্য
অনুসরণী তবে নিশ্চয়ই তা মন্দের
ভাল। কিন্তু কামাল সাহেব বাংলা
দেশের অস্থায়ী মন্ত্রিসভাতে এক-

জনও অমসলমান কেন নেই তার
জবাব দিতে আপনি পারেন নি—
যদিও অন্ততঃ পনেরো-বিশ জন
অমসলমান এম এল এ, এম পি ও
ছিলেন আওয়ামী লীগে—নয় কি?

কামাল সাহেব আবার সিংহ-
লের প্রসঙ্গ আনলেন কেন? আও-
য়ামী লীগ বা তার মন্ত্রীরা
আজ অবধি সিংহলের গণহত্যা
সম্পর্কে কিছু বলেছেন বলে মনে
পড়ছে না।

ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিক যে
দাণ্ডার কথা আমি বলেছি—কামাল
সাহেব তা বেশ আবেগের সঙ্গেই
সমর্থন করেছেন ন্যায়সংগ্ৰামের
নামে, অশ্রু জাতীয়তাবাদের চশমা
পরে। “উদ্ভাষী লোকেরা”—এই
বন্দনীর মধ্যে উদ্ভাষী তাৎপ-
র্য লোককে ফেলেছেন। আমি কিন্তু
বলেছিলাম শ্রমজীবী উদ্ভাষী
জনতার কথা। শ্রমিক শ্রেণীর
স্বার্থরক্ষার এবং শোষণ বিরোধী
সংগ্রামের অংশীদার হিসাবে যদি
জাতিধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সকল
মেহনতী মানুষকে একটি পাতাকার
তলে একত্রিত করতে না পারা যায়,
তবে তার জন্য দায়ী নেতৃত্ব ও তার
নীতি—মেহনতী জনতা নয়। শোষণ
শ্রেণী ভাষাকেও যে ধর্মের মতই
শোষণের হাতিয়াররূপে ব্যবহার
করে থাকে, এই ঐতিহাসিক তথ্য
সম্পর্কে যে আওয়ামী লীগের
মানব নেতারা অচেতন ছিলেন তা
মোটেই নয়, বরং তারা অত্যন্ত
সচেতন ভাবেই বাংলা ভাষা তথা
উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে তাদের
রাজনীতির মূলধন করেছিলেন।
কাজেই অবাংলাভাষী দরিদ্র মান-
বরাও তাঁদের দৃষ্টিতে শত্রু হয়ে-
ছিল—আরো স্পষ্ট করে বলা যায়,
তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই অবাংলা-
ভাষী মেহনতী মানুষকে শোষণ
শ্রেণীর অপর ক্যাম্পে ঠেলে দিয়ে-
ছিলেন। কামাল সাহেব তো এখন
পশ্চিম বাংলার বসে আছেন ভা-
ভাবে চোখ খুলে সেদেশের রাজ-
নৈতিক সংগ্রামকে দেখলেই দেখতে
পাবেন হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালী
অবাংলা নৈপালী সাওতাল সকল
জন বা ধর্ম বা ভাষা গোষ্ঠীর শ্রম-
জীবী মানুষ কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই
করছেন। কামাল সাহেব উদ্ভাষী
জনতাকে এক কথায় শাসক শ্রেণীর
তাবাদার বানিয়ে নিশ্চিন্ত হতে
চেষ্টাছেন এবং এই তাবাদারীর
পেছনে “বন্দকের নল”র তত্ত্বকে
লাগান নি। এবারে আমি সর্বিনে
কামাল সাহেবকে কয়েকটি প্রশ্ন
করতে পারি কি?

(এক) মহাবিশ্ববী মজিবুর
রহমানের পার্টি আওয়ামী লীগের
নেত্রী বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ
এম এল এ প্রমুখ বেশ কিছু
নেতার সীট বাতিল নয় বলে ঢাকা
বেতার ঘোষণা করেছে অনেকদিন
ধরে—বেগম সাহেবা ইয়াহিয়া
বন্দকের নল থেকে নিরাপদ দূরত্বে
থেকেও আজ পশ্চিম তার প্রতিবাদ
করছেন না কেন?

(দুই) খোদ মজিবুর রহমানের
আসনই বা বাতিল ঘোষিত নয় কেন

একনম্বর প্রধান “দেশদ্রোহী” হওয়ার
সঙ্গে?

(তিন) আওয়ামী লীগের
কয়েকজন বিশ্লবী (যথা ওবাইদুল্লা
সরকার, সামসুল হক) ইয়াহিয়ার
পন্থুল মন্ত্রিসভায় স্বেচ্ছায় বোগ
দিলেন কেন? এবং আওয়ামী
লীগ তাদেরকে আজো দল থেকে
বাহিস্কার করেনি কেন?

(চার) মজিবুর রহমানকে ইয়া-
হিয়া খাঁ শেষ করেন নি বা করছেন
না কেন? মজিবুর নাকি পাকি-
স্তানের পরলানম্বর দশমন, কাকের
হিন্দুস্তানের চর আর মজিবুর
শ্রেষ্ঠ হবার তিন চারদিন পর
পশ্চিম তার হৃদয় ছিল অজ্ঞাত
(অন্ততঃ দেশবাসীর কাছে)। কয়েক-
লক্ষ নিরপরাধ নিরস্ত্র অসহায়
নাগরিককে খুন করতে যার হাত
কাঁপেনা, বিশ্ববিরোধ, আন্তর্জা-
তিক মতামতের ধার ধারতে হয় না
সে তার প্রধান দৃশমনকে জীইয়ে
রেখেছে কেন? বিশ্ব জনমতের
চাপের ভয়ে অথবা দরকষাকষির
সুবিধার জন্য? লক্ষ্য প্রমুখ
বহু নেতাকে সর্বকিছু উপেক্ষা করে
হত্যা করতে তো সাম্রাজ্যবাদী ও
তার অনুচরদের বাঁধে নি। ইয়া-
হিয়ার এবারের বেতার ভাষণে
“আওয়ামী লীগ বা মজিবুর
বিরোধী কোন তিষ্ঠ কথা” নেই
কেন?

মজিবুর রহমান কি মনেপ্রাণে
কমিউনিস্ট বিশ্ববী নন? তিনি
কি বলেন নি যে পাক ভারত উপ-
মহাদেশের এই অংশে একমাত্র
তিনিই কমিউনিস্টকে রক্ষণে
পারতেন? মজিবুর রহমান কি
চক্ৰবর্তী মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে
নিয়মিত ঘনিষ্ঠ বোঝাবোঝ রেখে
চলছিলেন না? মার্কিন দূত মিঃ
ফারল্যান্ড কি প্রথমাবস্থায় মজি-
বরকে সাহস ও মদত দেন নি?

শোষণ শ্রেণীর ক্ষমতার উৎস
চিরকালই বন্দকের নল, কারণ
রাষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণী কতৃক
অপর শ্রেণীকে বলপূর্বক শাসনে
রাখার ও শোষণ করার বস্তু। তাই
শ্রমিক শ্রেণীর জনশক্তির ও ক্ষমতার
উৎস কাজে কাজেই বন্দকের নল।
তবে এক ক্ষেত্রে বন্দক নিয়ন্ত্রণ করে
চালককে আর অপর ক্ষেত্রে চালক
নিয়ন্ত্রণ করে বন্দককে।

তবে একটা কথা কি জানেন ঐ
যে জনশক্তির কথা বলেছেন ঐ
জনশক্তিটা আশমান থেকে আসে না।
জনতাকে রাজনীতি, রণনীতি, রণ-
কৌশল ও অস্ত্র দিয়ে বহুদিন
ধরে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সংগঠিত
করতে হয়। বাংলাদেশের অভ্য-
ন্তরে যারা সংগ্রাম করছে তারা
আওয়ামী লীগের মরোদ ও
উদ্দেশ্য বুঝে গিয়েছে, তারা
তাদের নিজেদের কারদায় নতুন
করে সংগঠিত হয়ে গণমজি ফৌজ
গঠনের পথে এগিয়ে চলেছে। এই
ফৌজ জানবেন একাধারে ইয়াহিয়া
ও আওয়ামী লীগ উভয়েরই শত্রু।
আমরা জনতার সঙ্গে আছি ও
থাকব। আওয়ামী লীগ তার আন্ত-
র্জাতিক প্রতিরক্ষাশীল বন্দকের

সরোজ দত্ত সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করুন

দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে
পুলিশী নিষাভন, অবাধ শ্রেণ্যার,
খানা-তল্লাসী, জেল ও হাজতে
প্রকাশ্যে ও গোপনে খুন ইত্যাদির
ভিতর দিয়ে যে আবহাওয়া নাগ-
রিক স্বাধীনতাকে শব্দ ধ্বংসই
করেনি সেই সঙ্গে সন্তানদেরও ইশ্বন
জর্গিয়ে সাধারণের জীবনকে অস-
হনীয় করে তুলেছে, তার পটভূমি-
কার কবি সরোজ দত্তের নিখোঁজ
হবার ব্যাপারটিকে আমরা হত্যাকাণ্ড
বলে সন্দেহ না করে পারছি না।

গত আটই আগস্ট “অমৃত
বাজার পত্রিকা”র স্টাফ রিপোর্টার
গুরুত্বপূর্ণ সরোজ দত্তের শ্রেণ্যারের
সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর
বারোই আগস্ট “দৈনিক কালান্তর”
এর সংবাদদাতা সমস্ত ঘটনা
বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ
করেন : “তাকে হত্যা করা হয়েছে
বলে সন্দেহ করার কারণ আছে।”
চব্বিশ তারিখে “আনন্দবাজার
পত্রিকা”র স্টাফ রিপোর্টার জানান
“পুলিশ প্রথমে বলে, সরোজ
দত্তকে শ্রেণ্যারই করা হয়নি। পরে
জানায়, তারা পাঁচই আগস্ট দক্ষিণ
কলিকাতা থেকে এক ভদ্রলোককে
ধরে আনে। কিন্তু না চিনতে
পেরে তাকে ছেড়ে দেয়।
অনুসন্ধান করে অবশ্য জানা
গিয়েছে যে সরোজবাবুকেই সরোজ
দত্ত বলে পুলিস তাকে শ্রেণ্যার
করেছিল। তারপর থেকে কেউ
নাকি সরোজবাবুর কোন খোজ
পাননি।”

কলিকাতার দৈনিক পত্রিকা-
গুলিতে প্রকাশিত উপরোক্ত সংবা-

দের ভিত্তিতে তাকে যে পুলিস
হেপাজতে হত্যা করা হয়েছে, এই
খবর সত্য বলে ধরে নেবার কারণ
ঘটেছে।

রাজনৈতিক মতামত নির্বি-
শেষে সরোজ দত্ত একজন প্রবীণ
কবি, লেখক, সাংবাদিক বলে জন-
প্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তিনি
“অমৃতবাজার”, “স্বাধীনতা”
ইত্যাদি সংবাদপত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে
সাংবাদিকতা করেন। অনুবাদক
হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

এখন সরকারের কাছে আমা-
দের দাবী—ব্যাপারটি সম্পর্কে সত্য
ঘটনা কি তা প্রকাশ করে এবং
অবিলম্বে এই রাজ্যের পুলিসী
নিষাভন বন্ধ করে এবং অবাধ
শ্রেণ্যারে হস্তক্ষেপ করে জনসাধা-
রণের আশঙ্কা দূর করুন। সম্প্রতি
কাশীপুরে—বরাহনগর ঘটনার
পুলিশের ভূমিকাও এই দেশের
গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের
আতঙ্কিত করে তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের লেখক, শিল্পী,
বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে আমরা
বিজ্ঞ রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন
এবং গণতান্ত্রিক আইনজীবীদের
বিজ্ঞ সংগঠনদের কাছেও আবেদন
জানাই—তারা অবিলম্বে আমাদের
উপরোক্ত দাবীর প্রতি কার্যকরী
সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসুন।
এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের লেখক ও
শিল্পী সমাজ সর্বতোভাবে তাঁদের
সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

মৈত্রেয়ী দেবী, সুভাষ মুখো-
পাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

সহযোগিতায় পশ্চিমী খান সেনা
তাড়বার নাম করে যাতে আবার
বাংসার মেহনতী মানবের মর্জি
সংগ্রামকে আক্রমণ করতে না পারে
সে সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং
জনতাকেও সচেতন করছি।

বৈরাম খাঁ লস্কর

ফেরীওয়ালাদের ওপর

পুলিশী জুলুম

কলিকাতা নগরের বৃকে হেয়ার
স্ট্রীট থানা এলেককর ফেরীওয়ালার
দের উপর পুলিশী জুলুম বাড়িয়া
গিয়াছে। ফলে এই সরকার বেকার
সমস্যা সমাধান করিতে পারিতে-
ছেন, অন্যদিকে বেকারের সৃষ্টি
করিতেছে। ফেরীওয়ালাগণের
মাধ্যমে যে সমস্ত কুটীর শিল্প
গাড়িরা উঠিয়াছিল তাহারাও আজ
বেকার হইবার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে
এবং কলিকাতা শহরের বৃকে
বিভিন্ন থানা অংশে বিভিন্ন কর্তৃ-
পক্ষ ফেরীওয়ালাদের উপর কোন-
রূপ অন্য জুলুমবাজী করিতে-
ছে না কিন্তু হেয়ার স্ট্রীট থানা
অন্যভাবে ফেরীওয়ালাদের প্রতি
জুলুম করিতেছে। এর মূল
উদ্দেশ্য কি? ইহার সদৃশ
দিবেন কি?

আমরা ইউনিয়নের পক্ষ হইতে
সিদ্ধান্ত নিয়াছি যে অবিলম্বে
আমাদের দাবী আদায় না হইলে
আমাদের দাবী আদায়ের জন্য
আন্দোলন করিয়া বাইব কিন্তু
এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী পুলিশ
শাসন ব্যবস্থা। শব্দ তাহাই নহে
যে সমস্ত ফেরীওয়ালাকে হস্তা
গাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হয় তাহা-
দিগকে সারাদিন লক আপে বন্ধ
করিয়া রাখিয়া তাহাদের রুজী
রোজগারের পথ স্তব্ধ করিয়া
দেওয়া হয়। আমরা ইউনিয়নের পক্ষ
হইতে পুলিশীর এই মনোভাবের
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছি।

অনিলকুমার পালিত

সম্পাদক

কলিকাতা স্ট্রীট হকার্স ইউনিয়ন

বন্ধ প্রসঙ্গে আনন্দবাজার

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের
তেরো জন নেতাকে বরখাস্ত, পর-
বর্তীকালে একে রোধ করার জন্য
তাদের আন্দোলন এবং সবশেষে
তেরোই অক্টোবরের “বাংলা বন্ধ”
প্রসঙ্গে কলকাতার দুটি প্রধান
বাংলা দৈনিক যুগান্তর ও আনন্দ-
বাজারের ভূমিকা আমরা কিছুটা
হতবাক করি।

তেরো জন সরকারী কর্মচারী
বরখাস্তের সংবাদ যুগান্তর খবর
মনে নিতে পারে নি। পর পর দুটো
সম্পাদকীয় এই বরখাস্তকে কেন্দ্র
করে সরকারী কর্মচারীদের গড়ে
ওঠা আন্দোলনকে স্বাগত জানানো
হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যুগান্তর
কংগ্রেসী সংগঠন রাজ্য সরকারী
কর্মচারী ফেডারেশনের কারোকে
বরখাস্ত না করার সরকারের নির-
পেক্ষ নীতির প্রশ্নে সন্দেহ প্রকাশ
করেছে। অপরদিকে এই ছাঁটাই
আনন্দবাজারকে উৎফুল্ল করে
তুলেছে। এই কাগজের সম্পাদকীয়
ধন্য ধন্য করেছে ডায়াল তথা কেন্দ্রীয়
ইন্দিরা সরকারকে অনেকদিন পর
তাদের মনোমত একটা কাজ কেন্দ্রীয়
সরকার করেছে বলে। তারা কর্ম-
চারীদের আন্দোলনকে সি পি এম-
এর পার্টি আন্দোলন বলে প্রচার
করে আন্দোলনকারীদের মধ্যে
বিভেদ আনতে চেষ্টা করেছে এবং অন্য-
দিকে সরকারকে কর্মচারীদের প্রতি
আরো কঠোর হতে প্ররোচিত
করেছে।

তেরোই অক্টোবরের “বাংলা
বন্ধ” প্রশ্নে এই দুই কাগজের
ভূমিকা আমরা আরো চমৎকৃত
করেছি। আমার স্মরণকালের মধ্যে
এই প্রথম বামপন্থীদের দ্বারা ডাকা
বাংলা বন্ধকে উপস্ক্র করে যুগা-
ন্তরে কোনও সম্পাদকীয় লেখা হয়
নি। অন্যদিকে আনন্দবাজারে লেখা
হয়েছে পর পর দুটি। দুটোই বন্ধের
ওপর। এই দুটো সম্পাদকীয়তে
বাংলা বন্ধকে অর্থোত্তিক, সি পি
এম-এর পার্টিবাজী, এবং এই বন্ধ
বিফল হয়েছে বলে বলা হয়েছে। এ
সম্বন্ধে আমি কোনও মন্তব্য করতে
চাই না। ওই সম্পাদকীয় দুটোতে
তেরো তারিখের বন্ধকে বানচাল
করার জন্য সরকার কঠোর মনো-
ভাব গ্রহণ করায় সরকারকে ধন্যবাদ
দেওয়া হয়েছে। এবং ভবিষ্যতের
আন্দোলনের ক্ষেত্রেও যাতে একই
ধরনের কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা
হয় তার জন্য সরকারকে সতর্ক করে
দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গেও
আমার কোনও মন্তব্য নেই। কারণ
আনন্দবাজার তার স্বাভাবিক চরিত্রে
অভিনয় করেছে এই বন্ধকে কেন্দ্র
করে। তবে আমার কিছুটা বক্তব্য
আছে সতেরোই অক্টোবরের লেখা
সম্পাদকীয়র শেষ অনুচ্ছেদ
প্রসঙ্গে। এই অংশে আনন্দবাজার
বাহ্যিক লাইন ব্যয় করেছে এই বন্ধ
বিরোধী ছাত্র পরিষদের ভূমিকাকে
প্রশংসা করে। জানিনা স্বতন্ত্র-সংগ-
ঠন কংগ্রেসী মতবাদে বিশ্বাসী
আনন্দবাজারের প্রশংসায় ছাত্র পরি-

ষদ নেতা সূত্রত মুখার্জীর বৃক
কতটা ক্ষুদ্র। বামপন্থীদের সব
কিছুর জোর (!) করে বন্ধ করবার
একচেটিয়া কারবারে ছাত্র পরিষদ যে
বাধা দিতে পেরেছে (অবশ্য প্রত্যক্ষ-
দর্শীর অভিজ্ঞতায় বলে, দমদম
অগ্নলের কিছু কিছু দোকান পাইপ-
গান ও পুড়ে যাওয়ার ভয়ে খোলা
হয়েছিলো) তার জন্য আনন্দবাজার
খুসী। অবশ্য আনন্দবাজার তাদের
আন্দোলনেরও উপদেশ দিয়েছে।
শব্দমাত্র “দেশদ্রোহী সরকারী
কর্মচারীদের” প্রতি কঠোর হলেই
চলবে না, গঠনমূলক কাজও কিছু
চাই। শব্দমাত্র খালি চেয়ার দখল
আন্দোলন নয়—মূল্য বৃদ্ধির
বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে
হবে (এই ক্ষেত্রেও ছাত্র পরিষদ যে
কর্মসূচী ঘোষণা করেছে তা ক্ষুদ্র
ব্যবসায়ীদের নিয়ে টানাটানি হবে
মাত্র। সাধারণ বাজারের দরজার
অনশনের পরিবর্তে বড়বাজার,
শেয়ার মার্কেটে অনশন করলে তো
আর আনন্দবাজারের প্রশংসা পাওয়া
যাবে না—তাই না?) আনন্দ-
বাজার আরো উপদেশ দিয়েছে
ছাত্র পরিষদের সভ্যদের—পাড়ার
পাড়ার আলো জ্বলে না কেন,
মোড়ে মোড়ে জমাট আবর্জনা কেন
ইত্যাদি দেখ, ব্যস।

এই প্রসঙ্গে আমার একটা
প্রস্তাব আছে। একাত্তর সালের
নির্বাচনে জয়ী হয়ে নব কংগ্রেসী
ছাত্র পরিষদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
সপ্তাহব্যাপী এক অনুষ্ঠান করে।
সেখানে ঘোষিত বহু কর্মসূচীর
মধ্যে একটি ছিল—ছাত্র পরিষদ

অশ্লীল পত্র-পত্রিকা এবং সমাজ
জীবনে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে
আন্দোলন করবে। দ্বিতীয়তঃ কিছু
দিন আগে এক বৃষ্টি ভেজা বিকেলে
সর্বোচ্চ মল্লিক স্কোয়ারে কিছু
যুবকের সামনে যুব কংগ্রেস সভা-
পাতি প্রিয়রঞ্জন দাশমন্সী ঘোষণা
করেছিলেন, ইনকাম ট্যাক্স বারা
ফাঁকি দেয় তাদের যুব কংগ্রেস
কমীরা ঘেরাও করে বাধ্য করবেন
বকেসা ট্যাক্স দিয়ে দিতে। আনন্দ-
বাজারের কাছে আমার প্রশ্ন, সত্যি
যদি ওপরে উল্লিখিত আন্দোলন
ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস সংগ-
ঠিত করতো তবে কি সতেরোই
অক্টোবর আনন্দবাজার বাহ্যিক
লাইন ব্যয় করত এই দুই সংগ-
ঠনের প্রশস্তি করে? না, আনন্দ-
বাজার বন্ধতে পেরেছে, তা ওদের
স্বারা হবে না। আনন্দবাজার এটা
এখন স্পষ্ট ভাবে অনুধাবন করেছে
যে, গত তেইশ বছর ধরে কংগ্রেস
অনেক কিছু বলেও যেমন বৃজোয়ী-
দের কোনও অসুবিধার ফেলে নি
এই নব কংগ্রেসও বৃজোয়ীদের
ক্ষেত্রে সেই পুরানো পথই অনু-
সরণ করবে। তাই এখন ইন্দিরা
গান্ধী, প্রিয়রঞ্জন দাশমন্সী এবং
সূত্রত মুখার্জীর প্রশংসায় আনন্দ-
বাজার বিগলিত। এবং আনন্দ-
বাজারের এই বিগলিত ভাব দেখেই
যুগান্তর বিচলিত। এত তাড়াতাড়ি
সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ায় যুগা-
ন্তর কিছুটা মনমরা, এবং চুপচাপ।

সমর সেন

বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কাস ইউনিয়ন অফিসে হামলা

গত তেরোই অক্টোবর সরকারী
কর্মচারীদের বরখাস্তের প্রতিবাদে
যে ধর্মঘটের আহবান জানান হয়ে-
ছিল তাতে সাড়া দিয়ে সমস্ত
বাইন্ডিং শিল্পে সফল ধর্মঘট
প্রতিপালিত হয়। এতে ক্ষিপ্ত
হয়ে শাসক দলের কিছু কর্মী
স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায়
আমাদের ইউনিয়ন অফিসে হামলা
করে এবং ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয়
কয়েকজন কর্মী ও স্থানীয় কিছু
যুব কর্মীদের গ্রেপ্তার করে মিথ্যা
মামলায় জড়ন হয়।

ইউনিয়ন লক্ষ্য করেছে ধর্মঘটের
পরেও কিছু কিছু কারখানায়
মালিকদের উপস্থিতিতে কোথাও
তাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের
ইউনিয়ন সভ্যদের ভয় দেখান হচ্ছে
এবং কাজে যোগদানে বাধা সৃষ্টি
করা হচ্ছে।

সভা এই জুলুম বন্ধ করার
দাবী করেছে এবং মালিক সমিতিতে
অবিসম্বে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ
করতে অনুরোধ জানাচ্ছে। নতুবা
এই জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ
প্রতিরোধ আন্দোলনে ইউনিয়ন
নামতে ব্যর্থ হবে। এলাকার সমস্ত
শ্রমবৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছেও
ইউনিয়ন আবেদন করছে অবিলম্বে
পুলিশ ও শাসকদলের এই যৌথ
আক্রমণ বন্ধ করতে এগিয়ে আসনে।

মোক্ষদা চক্রবর্তী, সভাপতি
কলিকাতা বৃক বাইন্ডিং
ওয়ার্কাস ইউনিয়ন

ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্টস কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত
বাদবন্দরের ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস
কারখানার বাহ্যিক জন ক্যান্টিন
কর্মী প্রায় সাড়ে আট মাস ধরে
তাদের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে
আন্দোলন করে চলেছেন। সংস্থা-
টিতে প্রায় বারোশত শ্রমিক কর্ম-
চারী কাজ করেন। এর মধ্যে
ক্যান্টিন কর্মচারী হলেন বাহ্যিক
জন। এরা পাঁচ থেকে বাইশ বছর
যাবৎ এখানে কাজ করে চলেছেন।
তাই বলে কর্মীদের বেতন ইত্যাদি
মোটোও আশানুরূপ নয়। দৈনিক
এক টাকা পঁচিশ পয়সা থেকে শব্দ
করে সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ টাকা
মাত্র।

বলা প্রয়োজন, কর্তৃপক্ষ সরা-
সরি ক্যান্টিন পরিচালনা করেন।
এবং শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রকের এক
আদেশানুযায়ী উনিশশ তেরটি সাল
থেকেই ক্যান্টিন কর্মীরা কেন্দ্রীয়
সরকারের কর্মচারীদের ন্যূনতম
বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা
পাবার যোগ্য। আশ্চর্যজনক হলেও
একথা সত্য কারখানার এই

ক্যান্টিন কর্মীদের ক্ষেত্রে সেই আদেশ
এখনও কার্যকরী হচ্ছেনা। কর্মীরা
উনিশশ সত্তর সনের প্রথম দিকে
এব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সজাগ করে
দেন। ব্যাপারটি শ্রমদপ্তর পর্যন্ত
গড়ায়। কর্তৃপক্ষ বারংবার সেখানে
অনুপস্থিত থাকে। ফলে কোন
সম্মিমাংসা করাও সম্ভব হয় না।
পরিশেষে, দাবী আদায়ের জন্য
ক্যান্টিন কর্মীরা বারোই জানুয়ারী
থেকে কর্মবিরতি আন্দোলনে
অংশ গ্রহণ করেন। অনেক ঘটনার
পর, তদানীন্তন রাজ্যপালের উপা-
দেষ্টা প্রীএ এন কিদোয়াই কর্তৃ-
পক্ষকে একাত্তরের পঞ্চাশ এপ্রিল
তারিখে ক্যান্টিন কর্মীদের কেন্দ্রীয়
কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা
দেওয়ার শর্ত মেনে নিতে অনু-
রোধ জানান। কিন্তু ন্যাশনাল
ইনস্ট্রুমেন্টসের কর্তৃপক্ষ রাজ্য
সরকারের এই সুপারিশ মেনে নিতে
অনাগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয়
শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী মৈনুল হক

চৌধুরীর গোচরে আনা হয়। তিনি
ক্যান্টিন কর্মীদের দাবী দাওয়া
যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত বলে জানান এবং
চোঁটা আগষ্টের এক চিঠিতে
রাজ্যের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট
পার্টির লোকসভা সদস্য শ্রীমদো-
রঞ্জন রায়কে জানান যে, কর্তৃপক্ষ
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুপারিশ
কার্যকরী করবেন। অথচ আশ্চ-
র্যের বিষয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া
সঙ্গেও এখনও সেই নির্দেশ কার্য-
করী হয় নি।

এদিকে ক্যান্টিন কর্মীরাও
তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়া
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বন্ধপরিকর।
এখন প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্য সরকারের
সুপারিশ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নির্দেশ
একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পক্ষে
অমান্য করার সাহস কোথা থেকে
আসে! রাজ্য সরকারের সুপারিশ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সবই
কি তাহলে অনাহারে বিপর্ষিত
ক্যান্টিন কর্মীদের কাছে নির্জলা
ভাঁওতা মাত্র।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ চাঁদার হার ১১

বার্ষিক পনেরো টাকা

ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকারিড ও চিঠিপত্র পাঠবার

ঠিকানা :

৬১, মল্ল লেন, কলি-১০

প্রতিরোধ কমিটি প্রসঙ্গে

বিমল পাল

সাম্প্রতিক “প্রতিরোধ কমিটি” পশ্চিমবঙ্গে এক বিতর্কিত রাজনৈতিক সংস্থা। সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নকশাল-বাড়ীর যে চমৎকার অভ্যুত্থান দেখা গিয়েছিল, তার আগুনকে মানবের ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে অসফল হয়েছে সি পি আই (এম এল); বৈজ্ঞানিক পথে বিপ্লবকে স্বতঃস্ফূর্ত করতে না পেরে অনেক ক্ষেত্রেই গায়ের জোড়ে বিপ্লব করতে হয়েছে এবং সেই সুযোগে পুঁলিশ এবং কংগ্রেসী সমাজতান্ত্রীরা পাটিতে ঢুকতে পেরেছে। একই ছাদের তলায় থেকে তারা অসল-নকল চিনতে শিখেছে এবং ধীরে ধীরে নির্ভেজালদের নির্বিচারে গুলির মধ্যে অথবা জেলের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত সি পি আই এম এলের আন্দোলনের এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই ইতিহাস থেকেই জন্ম নিয়েছে আর একটি গোলমালে এবং রাজনৈতিক ভাবে জারজ সন্তান, এই প্রতিরোধ কমিটি।

এই কমিটিকে আবার অনেক জারজায় শান্তি কমিটিও বলা হচ্ছে। প্রধানতঃ এলাকাভিত্তিক শক্তির উপর নির্ভর করে এই কমিটি-গুলিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে নব কংগ্রেস এবং সি পি এম। অন্যান্য যেসব দল এই কমিটিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে তাদের মধ্যে আদি কংগ্রেস এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই বিচিত্র সম্মিলন স্বভাবতই অনেককেই অবাক করেছে। এঁরা বলেছেন যে নকশাল আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, অতএব এদের প্রতিরোধে আমরা সবাই রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে যাব। এঁরা এও বলেছেন যে নকশালরা অসামাজিক, খুঁনে এবং গুন্ডা। তাই এই অসামাজিকদের দমনে পশ্চিমবঙ্গের সবকটি স্বীকৃত দলের ঐক্য হতে দেরী হয়নি। প্রতিরোধ বাহিনীর বাস্তব অবস্থা এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করে দেখতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে যে অদ্রান্ত নয় তা প্রধানতঃ দুটি রাজনৈতিক দলের নকশাল আন্দোলনের মূল্যায়নে সহজেই ধরা পড়েছে। নব কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সি পি এম নকশালদের জন্ম দিয়েছে। তারা এও বলে যে এই খুনোখুনির রাজনীতির সবচাইতে বড় পাণ্ডা সি পি এম। সি পি এম মূলতঃ কংগ্রেসেরই একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল এবং নকশালরা যদি তাদেরই সন্তান হয় তাহলে তারা অরাজনৈতিক হবে কেমন করে। অন্যদিকে সি পি এমের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বড় অশুভ। এম এলের ছেলেদেরকে এরা বরাহনগর-কাশী-পুন্ড্রের ঘটনার পরেও “কংশাল” বলে থাকে। যখন এইসব ছেলেরা

গ্রামে গিয়ে জোতদার খতম করেছিল তখন সি পি এম ওদের হঠকারী বলেছিল; ওরা যখন শহরে এল তখন ওদের দালাল বলা হলো আবার যখন বরাহনগর-দমদম ইত্যাদি মাসাকার হলো তখন বলা হলো, এটা বুমেরাং হচ্ছে। এমনকি দমদমের ঘটনার পর “গণশক্তি”র সম্পাদকীয়তে বলা ‘হয়েছিল, এই ছেলেরা এখন আর দালালী করতে চাইছে না, তাই এদেরকে কংগ্রেস এখন এইভাবে খুন করছে। বই-হোক এইরকম বিশ্লেষণের যদিও কোনো মাখামন্দু নেই তবু এটা খুব পরিষ্কার যে ব্যাপারটিকে সি পি এম রাজনৈতিক ভাবেই দেখে। বিশেষকরে নকশালদের সি আই এর দালাল বলার পর কি করে আর অরাজনৈতিক ব্যাপার বলা সম্ভব। তাহলে এখন বলা যায়, একটি রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রতিহত করতে অন্য সবাই রাজনৈতিক হলে ছড়ো হয়েছে। এর চেয়ে হাস্যকর অপচেষ্টা আর কি হতে পারে। এখানে উল্লেখ্যকর যেতে পারে যে স্বাধিক বস্তুবাদ আমাদের শিখিয়েছে যে একমাত্র এক জাতীয় লক্ষ্যের বাদ দিলে এ যুগের সব সমস্যাই একান্তভাবে অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক সমস্যা।

এছাড়া যে “অসামাজিক, খুঁনে, গুন্ডা” ইত্যাদি বিশেষণগুলি সমুদয় রাজনৈতিক দলগুলোকে এক লাইনে দাঁড় করিয়েছে, তার বৌদ্ধিকতাও ভেবে দেখতে হবে। আমাদের ভাবতে বিস্ময় লাগে, ধরা পড়া নকশালদের বিচারের আসনে বসে পার্শ্বপাশি কংগ্রেসী বিচারকদের দিকে তাকিয়ে সি পি এম নেতারা কথালের অইন্ডিয়াটাকে কেমন করে হজম করেন, উল্টোদিকে কংগ্রেসী বিচারকদের গণতান্ত্রিক বিচারবোধের প্রক মনুহুতে “এরা সি পি এম সন্তান” এই সত্যই বা কোন সূরে গনগুনিয়ে ওঠে?

সবচেয়ে বড় কথা নকশালদের অনেক আগাছাই কাজ সেরে বিজয়ীর মত এখন নব কংগ্রেসের ঘরে ফিরে এসেছে। মালচন্দনে এদের বরণ না করে কি করে এখন তারা এদের বিচারের কাঠগড় দাঁড় করাতে পারে। কাজেই প্রতিরোধ কমিটির উদ্দেশ্যের মধ্যেই মিথ্যার চারু রয়েছে, জড়তা রয়েছে এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস রয়েছে। সবচেয়ে বেশী করে রয়েছে নির্বাচনী দর্পণ। নকশাল এলাকা থেকে সরে যেতে হয়েছিল সবাইকে; এখন স্বমর্বাদায় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্মে হনো হনো উঠেছে সবাই। এই রাজনৈতিক মনোফা প্রতিটি দলের একমাত্র লক্ষ্য। যারা সিদ্ধার্থ রায়ের দামি কফি খেয়েও কিছুতেই এক হতে পারলো না, তারা আজ এমনি এক হয়নি। ভোটের ব্যাংকে সপ্তর বাড়ানোর

চেষ্টা সবারই। তারপর নকশাল-ঘোমটা উঠে গেলে আমরা আবার খোঁদ্র মার সন্দর মুখ দেখতে পাব।

উদ্দেশ্যের এই গোলজাল প্রয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য আকারে দেখা দিয়েছে এবং এর নেট মনোফাটা পুঁলিশের ঘরে চলে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ রামরাজ্যতলার প্রতিরোধ কমিটির একটি সমীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ও সি পি এম এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে চৌধুরীপাড়ার এদের কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি হয়েছে। এর আওতায় বিভিন্ন লোকাল কমিটিও গঠিত হয়েছে। প্রতিটি বাড়ী থেকে দিনে রাতে পাহারা, আলো জ্বালানো, চাঁদা দেওয়া—এ সমস্ত কবন্ধার নির্দেশকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এদের কাজ নকশালদের খুঁজে বের করা, প্রকৃতপক্ষে যারা এখানে এখন আর কেউই নেই।

সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই কমিটির অন্যতম দুটি কেন্দ্রীয়-কমিটি তথা চৌধুরীপাড়ার কয়েকজন কৃষ্ণির মাতবর। লোকাল কমিটিগুলোকে এরা কার্যতঃ পঙ্গু করে রেখেছে এবং এদেরই কয়েকজন অতি অশোভনভাবে লোকাল কমিটিকে অস্বীকার করে যখন তখন যার-তার বাড়ীতে যাচ্ছে, মারধোর করছে, হুমকি দিচ্ছে এবং অনেকক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের প্রতিও অতি অশালীন আচরণ করে চলেছে। এদের এই কেন্দ্রীয় অফিসের পাশেই সি আর পি অফিস শোভা পচ্ছে।

ইতিমধ্যে একদিন জঘন্য ঘটনা ঘটে গেছে। নকশালরা এদের দুজন নেতাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এবং এই হত্যার ঘটনা যেমন জঘন্য তেমন নিন্দার। কিন্তু যে গরম মাথা নিয়ে তারা এইসব অপকীর্তি করে বেড়াচ্ছে সেই মনোবৃত্তি নিয়েই দেখা গেল প্রতিরোধ কমিটি বাড়ী গিয়ে জঘন্যভাবে হামলা এবং একগাদা হত্যার মহৎ সমাধান করে এল। এক অপরাধ থেকে আর এক অপরাধের সৃষ্টি হলো। প্রতিরোধ বাহিনী তাহলে কেন সৃষ্টি হয়েছে—একের বদলে দশ অথবা দইয়ের বদলে কুড়িকে খুন করে বদলা নেবার উদ্দেশ্যে কি? অনেক ক্ষেত্রেই নেতারা বলে রেড়ছেন যে মাস্ খেপে গেলে আর কিছু করার থাকে না। এইসব নেতাদের মনুটকে ঐ তথাকথিত “মাসে”র মনুখের দিকে ঘুরিয়ে দিলে দেখা যাবে, যারা বাড়ী বাড়ী মা বোনকে ঠেংগিয়ে বেড়চ্ছে, গালিগালাজ করছে, একের বদলে আর এককে হত্যা করছে, তারা তাদের পন্নম আদরের পোষ্যপুত্র পাটির মহান কমীবৃন্দ।

শত্থলা ফিরিয়ে আনতে না পেরে যারা “মাসে”র খাড়ে দোষ চাপাচ্ছে, আগুন নেভাতে গিয়ে যারা ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে বেড়চ্ছে, ছেলেকে না পেয়ে যারা বাবা-ভাই মা-বোনদেরকে মেয়ে খুঁড়ছে, তারা যতই শান্তি কমিটির বাজনা বাজানক ইতিহাসে তাদের বিচারের দিন খুব দূরে নয়।

এর অন্যদিকে বিচার সভা বসেছে। স্বভাবতই এ্যাক্টিভিস্টরা এখন আর কেউই ধরা ছোঁয়ার মধ্যে নেই। কিন্তু বিচারকেরা তো আছেন কাজেই বার-তেরো বছরের ছেলেগুলোকে ধরা হচ্ছে। সেই এক ফরমুলায় কাউকে প্রহার, কাউকে পুঁলিশ এবং কাউকে দিয়ে দেওয়াল মোছান, এসব করা হচ্ছে। সবচাইতে অত্যাচারিত হচ্ছেন সেইসব পরিবারের লোকজনেরা যাদের অন্ততঃ একজন নকশাল আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। ছেলে না এনে দিলে বাড়ী ছেড়ে যাবার নির্দেশতো দেওয়াই হয়েছে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে যেসব ছেলে আট-ন মাস জেলে আটক আছে, তাদেরকে “তুই না করিস তোর বাপ করেছে” এই অনুসিদ্ধান্তে নকশাল বলে অভিহিত করে নিগ্রহ করা হচ্ছে। এই তো সোদিন এই কাজীদের বিচারে এখন থেকে একটি পরিবার উঠে গেলেন, যারা সবাই নকশালদের অর্বেজ্ঞানিক পথের বিরোধিতা করে

আসছিলেন। তবু তাঁদের ওপর এই হামলা করা হলো, তার এক নম্বর কারণ তাঁদের পরিবারের একটি ইনজিনিয়ারিং ছাত্র আজ নম্বর মাস জেলে আটক আছে এবং দ নম্বর কারণ তাঁরা কেউই নকশাল দমনের এই প্রতিক্রিয়ায় আথা গুন্ডামীতে যোগ দিতে স্বীকার করেন নি। এঁরা পরিষ্কার ডঃ কানাই-লাল ভট্টাচার্যকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আদর্শভিত্তিক বিরোধিতায় না গিয়ে দেওয়াল মুঁছিয়ে আর পুঁলিশের হাতে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এতে আগুন আবার ধুমায়িত হতে থাকে। যে বিচার শেষ পর্যন্ত পুঁলিশের পাশে লুটিয়ে পড়ে, যে বিচারবোধ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বাদ দিয়েছে তা দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে, গুন্ডামীও করা যেতে পারে কিন্তু একটি আদর্শ ও তার পথকে সংশোধন করা যেতে পারে না। পারে না বলেই আজ মার্কস-লেনিনের অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলিকে দেওয়ালের ওপর থেকে আলকাতরায় আবৃত করার কথ চেষ্টায় রত হয়েছে এইসব তথাকথিত শান্তি সৈনিকেরা। তাই বলছিলাম, বিবেচনা থেকে শতযোজন দূরে যাদের অবস্থান, বিচার আসনে বসবার অধিকার তাঁদের কে দিল। এত তো দেখছি, সেই নকশাংশ নবম পুঁঠার)

ডাবর কারখানার কতৃপক্ষের ছেঁচাচারিতা

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ডাবর কারখানার কতৃপক্ষ তাদের দেওঘরস্থিত কারখানার পাঁচজন শ্রমিককে বিনা কারণে ছাঁটাই করে এবং আরও ষাট জন শ্রমিককে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেন্ড করে। এদের অপরাধ ছিল এই যে এঁরা ডাবর মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে নয় দফা দাবীর ভিত্তিতে কতৃপক্ষের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। বিষয়টি বিহার সরকারের শ্রমদপ্তরে পাঠানো হয় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য। কিন্তু মাসিক শ্রেণীর সেবাদাস ঐ শ্রমকর্মিনার এবং রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী কিছুই করেন না। উল্টে তাঁদের বিরুদ্ধে পুঁলিশ ও গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বর্তমান জগী ইউনিয়ন ছেড়ে আগের দালাল ইউনিয়নে যোগ দিলে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে। কিন্তু সংগ্রামী শ্রমিকরা ঘৃণাভরে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্বহাল ও সাসপেনশন আদেশ প্রত্যাহার ও নয় দফা দাবী আদায়ের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিহার ইউনিটের শ্রমিক কর্মচারীদের দাবীর সমর্থনে কলকাতার অবস্থিত ইউনিটগুলিতেও প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এর আগে থেকেই কতৃপক্ষের সঙ্গে উনিশশ সত্তর সালের বোনাস এবং কোম্পানীর সঙ্গে সম্পাদিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির

শর্তাবলী কার্যকর করার প্রস্নে ইউনিয়নের বিরোধ চলছিল। উনিশশ সত্তর সালের প্রথম কয়েক মাস কারখানা বন্ধ ছিল এই অজুহাতে কোম্পানী বোনাস দিতে অসম্মত হয় এবং অ্যাডহক কিছু টাকা দিতে রাজী হয়। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির অন্যতম দুটি প্রধান শর্ত, যথা সূচী ইনসেন্টিভ প্রথা চালু করা এবং সর্বরকমের অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের প্রস্নে টালবাহানা করতে থাকে। কতৃপক্ষের এই শৈবচারা মনোভাবের বিরুদ্ধে যখন ডাবরের শ্রমিক কর্মচারীরা ইউনিয়নের নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন গত পনেরোই অক্টোবর তারিখে কতৃপক্ষ সি আর পি বাহিনী নিয়ে কলকাতার হেড অফিসে এবং গাড়িয়া কারখানায় গিয়ে হাজির হয় ও শ্রমিক কর্মচারীদের নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করে। অবশ্য শ্রমিক কর্মচারীদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা শ্রমিককর্মচারীদের মনে তাঁর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং তাঁরা আজ যখন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁদের দাবী আদায়ের সংগ্রামকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে কৃতসংকল্প, তখন ব্যাপকহারে চার্জশীট সহ শ্রমদপ্তরের মাধ্যমে চেষ্টা হচ্ছে তাঁদের শর্তাবলী মেনে নিতে নতুবা লক আউট ক্লোজার করে দিতে।

ভ্রম দর্পণ

বিভিন্ন রাজ্যে নব কংগ্রেসে অসুস্থ

ইন্দিরা গান্ধীর অপ্রতিহত বিজয় অভিযান মন্দগতি, শিথিল হয়ে পড়ছে দেখে তিনি নিশ্চয়ই উদ্ভিষ্ট বোধ করছেন। প্রতিটি রাজ্যে তাঁর নিজেরই সংগঠন নব কংগ্রেসে যে ভাবে বিরোধী শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাতে উদ্বেগ হওয়ারই কথা। ভাঁওতা দিয়ে কিছু লোককে সব সময়ের জন্য ভোলানো যায় সব লোককেই কিছু সময়ের জন্যে বোকা বানানো সম্ভব হয়, কিন্তু সব লোককে সবসময়ের জন্যে প্রতারিত করা যায় না। আজ কয়েকমাসের মধ্যেই সারা ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে এই নিদারুণ ঐতিহাসিক সত্যটা আত্মপ্রকাশ করেছে।

ইন্দিরা গান্ধীর নব কংগ্রেসী সরকার নির্বাচনের কালে প্রদত্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে একচেটিয়া মালিক ও সামন্ত শ্রেণীর শ্রেণী সরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই সরকার ধাপে ধাপে জনসাধারণের উপর তার আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছে। একটী একটী করে সেই আক্রমণ সাধারণ মানু-ষের চোখ খুলে দিচ্ছে। তেল, ডাল মশলাপাতি, কাঁচা আনাঙ্গপাতি থেকে কাপড়, সাবান, শিশুদের দুধ, ঔষধ সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দুর্ভিক্ষ, বেকারী আধা-বেকারীতে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। স্বল্পবিক্রয় গরীব মানুষেরা গরীবী হঠাৎ-এর অপূর্ব নীতির চাপে গ্রাহি গ্রাহি ডাক ছাড়ছেন। এরই মধ্যে নেমে এসেছে আরো সস্তুর কোটী টাকা নতুন ট্যাক্স বসাবার অর্ডিন্যান্স। এই ট্যাক্স বড় বড় পুঞ্জিপতি, জমিদার, চোরাকার-বারীদের স্পর্শ করবে না, নিরম, চরম আর্থিক দর্দশাগ্রস্ত গরীব মানুষগুলির উপরই নব কংগ্রেসী ইন্দিরা সরকারের খাঁড়া নেমে

এসেছে। সত্তরাং সারা দেশেই আজ ইন্দিরা গান্ধীর নব কংগ্রেসী ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গ

এই ক্রোধ ও ঘৃণার বিস্ফোরণ কেন্দ্র স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গে ধুমায়িত। এখানে রাজনীতি সচে-তন জনতাকে মহামান, নির্বাক করার সংকল্প নিয়ে ইন্দিরা সরকার দু লক্ষেরও বেশী সশস্ত্র পুলিশ, সি আর পি, মিলিটারী লেলিয়ে দিয়েছে। এখানেই সরকারের প্রত্যক্ষ উৎসাহে নব কংগ্রেসী ঠাঙ্গাড়ে বাহিনী জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ পুলিশ মুখপাত্র বলেছেন যে তাঁরা কল-কাতা ও পশ্চিমবঙ্গ জেলাগুলিতে ষোল হাজার প্রতিরোধ বাহিনীর গ্রুপ তৈরী করেছেন, এদের সভা সংখ্যা নাকি তিন লক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গের মানু-ষ এদের পরিচয় জানতে উদগ্রীব। এদের অতীত কার্যকলাপ এবং রাজনৈ-তিক আনুগত্যের পরিচয়ও জানা প্রয়োজন। এদের মধ্যে কতজন পুঞ্জিশের নিয়ামিত বেতনভোগী গুপ্তচর, কতজন নথিভুক্ত সমাজ-বিরোধী ও পুলিশের অপরাধমূলক কাজের সক্রিয় সহযোগী, তা মুখ-পাত্র মশাই খুলে বলেন নি।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানু-ষ এদের চেনেন, প্রায় প্রতিটি থানা অঞ্চলে এরা কাদের লোক, কোন ধরনের কাজকর্মে এদের আসক্তি তা জনসাধারণ জানেন। সত্তরাং দু লক্ষ সশস্ত্র ফোজের সঙ্গে আরো তিন লক্ষ সাদা পোষাকের রক্ষী দল নিয়োগ করলেই, পশ্চিমবঙ্গের মূল রাজনৈতিক মনোভাব বদলাবে না। বরং নব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তা আরো জম্জমাট, অরো গভীর, আরো বিস্ফোরণমুখী হয়ে উঠবে।

অসতী নারীর স্বামীই শৃঙ্খ-ল জানে না যে তার স্ত্রী অসতী, আশেপাশের আর সব প্রতিবেশী কিন্তু তা জানে।

সিম্ভার্ন রায় কিংবা হতভাগ্য ডায়াস, তাঁরা তাই জানেন না যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নব কংগ্রেসের ধ্বংস নামছে। অদূরবর্তী দিনে এই সর্বগ্রাসী ধ্বংস পশ্চিম-বঙ্গে নব কংগ্রেসের আক্রমণকে চিরদিনের মত স্তম্ভ করে দেবে।

সারা পশ্চিমবঙ্গকে একটি জোঁহ কারাগারে পরিণত করে, বাঙালী জাতির সর্বাত্মক শৃঙ্খলের শক্ত বাঁধন দিয়ে, সাধারণ ন্যায়-বিচার, নীতিবোধ, গণতন্ত্র ও আই-নের শাসন প্রত্যাহার করে, কয়েকটা বেইমানের জোরে বাঙালী জাতিকে, তার স্বাধিকার বোধকে দমিয়ে রাখা যায় না—একথা, ন্যায়দণ্ডের আঘাতে বিধ্বস্ত কংসরাজত্বের ভাগ্যদারেরাও অচিরেই বুঝতে পারবেন। ইতিমধ্যেই একদা তাদের মিত্র ফরওয়ার্ড ব্লক চুচড়া অধি-
(দেখাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)।

বিদেশ দর্পণ

রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রবেশ

(দর্পণের সর্ববৈক্ষক)

বাইশ বছর ধরে টানাটানা-নে-পর সমাজতান্ত্রিক চীন রাষ্ট্র-সংঘের সদস্য হতে পারল। অবশ্য বিনা বাধার নয়। যে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র গোড়া থেকেই চীনের সদস্য-পদের বিরোধিতা করেছে সে শেষ-পর্যন্ত বাধা দিতে ছাড়ো নি। সংঘে ছিল জাপান, অস্ট্রেলিয়া সহ আরও কয়েকটি ছোট দেশ। তবে ব্যালটে এই বিরোধিতা টিকল না।

চীন এল, বিদায় নিল তাই-ওয়ান। আলবানিয়া আনাত প্রস্তা-বটি গ্রহণ করে। রাষ্ট্রসংঘ মেনে নিল যে চীন বলতে একটি দেশই বোঝায়, চিয়াং কাইশেক কোন চীনের অধিপতি নন। অবশ্য তাই-ওয়ান একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে সদস্যপদ দাবী করতে পারে কিন্তু তা করলে দাঁড়াবে এই যে চিয়াং নিজেও রাষ্ট্রসংঘের বিধান মেনে নিলেন। তিনি তা করবেন মনে হয় না।

আলবানিয়ার প্রস্তাব জয়ী হওয়ার ফলে একটি বড় বৈষম্য দূর হল। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশকে সরিয়ে রেখে রাষ্ট্রসংঘ যে বিশ্ব শান্তির প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন তা ইদানীং বড়ই হাস্য-কর লাগছিল বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে চীন আজ অর্থনৈতিক-সামরিক-রাজনৈতিক দিক থেকে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

এই কথাটি মনে রেখেই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ছাড়া অন্যান্য শক্তিগুলিও, যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, আলবানিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করে। ধর্মতান্ত্রিক দুনিয়া আজ বুঝেছে যে সমাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, বরং তার সঙ্গে শান্তি-পূর্ণ সহবাসের প্রচেষ্টাই হবে নিজেদের পক্ষে মঙ্গলজনক। তাই শৃঙ্খ-ল ব্রিটেন অথবা ফ্রান্স নয়, ইসরায়েল এবং লাওসের সরকারও প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানায়। এর কারণ সুস্পষ্ট। ইসরায়েল জানে যে আরব দেশগুলির সঙ্গে সংঘা-তের সম্পর্ক কাটিয়ে ওঠার এক-মাত্র উপায় সমাজতান্ত্রিক শক্তি-গুলির সঙ্গে সমঝোতা। ঠিক এই একই কারণে লাওসও, যে দেশের সরকার বর্তমানে কমিউনিস্ট বিপ্ল-বীদের হাতে নাজেহাল হচ্ছেন, চীনকে ষোষামোদ করতে চাইছে, নিজের বাঁচার তাগিদে। এবং আমেরিকা যদিও আলবানিয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, সেটা অনেকটা করতে হয় বলে করা। তা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ত চীনের সদস্যপদে আপত্তি ছিল না, সে চাইছিল তাইওয়ানও থাকুক। অবশ্য যখন মার্কিন প্রতি-নিধি চীনের বিপক্ষে ভোট দিচ্ছেন

সেই একই সময় ডঃ কিসিংগার চু. এন লাইয়ের সঙ্গে পক্ষিৎসে আলোচনার মন ছিলেন। কাজেই মার্কিনীদের আসল ইচ্ছা বোকা শক্ত নয়।

রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রবেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অনেক অদলবদল ঘটতে পারে। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তার আচরণ। এতদিন সোভিয়েতই ছিল রাষ্ট্র-সংঘে একমাত্র বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক শক্তি। চীন যতই ক্ষমতামালা হোক সে ছিল রাষ্ট্রসংঘের বাইরে, একা, নিঃসঙ্গ, ভুগছিল বিচ্ছিন্নতাবোধে। এর ফলে সংঘাত অনিবার্য। দুটি দেশ একত্রে বসবে এবং আশা করা যায় বিভিন্ন বিষয়ে একত্রে লড়বে তখন পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নতির আশা করা কী অনায়াস? অবশ্য সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে সোভি-য়েতের দায়িত্বও ক্রম নয়। মস্কো যদি পূর্বে ইউরোপের মতন চীন-কেও দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে, যদি তাকে তার প্রাপ্ত মর্যাদা দেয় তাহলেই সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। এবং এর জন্য রাষ্ট্রসংঘই উপযুক্ত স্থান। যেখানে মস্কোকে পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে ক্রমাগত পাঞ্জা লড়তে হয়, সেখানে যদি সে চীনকে নিজের সমপর্যায়ের সাথী বলে গ্রহণ করে তাতে ক্ষতি কারুর হবে না বরং সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিই জোরদার হবে।

রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রবেশ, অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির তার সাথে সম্পর্ক সহজীকরণের পথে একটা বিরাট পদক্ষেপ। অতি-বিস্তারী বা খুশী বলতে পারেন কিন্তু পৃথিবীর জনগণের পক্ষেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যান্ত্রিক সভ্যতা বর্তমানে যে স্তরে পৌঁছেছে সেখানে কোন মৌলিক প্রশ্নে রফা না করে, আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাথে সহ-যোগীতাই সমাজতন্ত্রের প্রসারে সহায়ক হবে। আজ বিপ্লবী অহ-মিকায়, শৃচিবাই গ্রস্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন থাকা আত্মহত্যারই সামিল। বিশেষ করে যেখানে ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী নিজ স্বার্থেই সীমিতভাবে জরি ছাড়তে প্রস্তুত। সমাজতন্ত্রের জয় এই আপোষের মনোভাবের সন্মিলন নিয়েই সম্ভব একে অগ্রাহ্য করে নয়।

প্রতিরোধ কমিটি

(জম্মু পৃষ্ঠার পর)

শালী হামলারই অন্যাপট। অসম বিচারের অলিগতিতে পাড়ার ছেলে, অত্যাচারের ছেলে কিম্বা পাটির ছেলে কিরকম সুন্দর ছেলের প্রশং-সাপত্র পেয়ে যাচ্ছে, তাওতো কার-দু-রই দুর্ভাগ্য এড়িয়ে যাচ্ছে না। এইসব তথাকথিত বিদ্রোহ-বিচার শেষ পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায়, দলে-দলে অশান্তির আগুন ছড়ায় এবং ক্রমেই তা আধা-সিভিল ওয়ারের দিকে চলে যায়।

আসলে অজ্ঞাতার করে কোন আদর্শকেই প্রতিহত করা যায় না, ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ মিলবে। এদেশে তা যদি সম্ভব হতো তাহলে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার পুঞ্জিশ মিলিটারী ছেড়ে শান্তি বাহিনীকে মদত দিত না। পুঞ্জিশকে ডানে-বামে রেখে যে প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী হয়েছে, তাতে দেশে অশান্তি লাগবে বই কমবে না। আজ একথা নিশ্চয় করে বিশ্বাস করবার দিন এসেছে যে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোকে আর শোষণ করা যাবে না, কোন কারদারই না। ইন্দিরা সরকার নকশাল দমনে বামপন্থী দলের সাহায্য চাইছে তাদের ভেতরে অন-প্রবেশ করবার জন্যে। তারা এখনো বিশ্বাস করে যে ওরা কেউ এদেশে বিপ্লব করতেও পারে, তাই তাদেরকে দিয়েই এখন বিপ্লব দমনোর এক চমৎকার কৌশল আবিষ্কার করা হয়েছে। নকশাল আন্দোলন আপাততঃ সফল করা গেল না;

কেন গেল না, সে বিচার মার্কস-লেনিনের চিন্তাধারা থেকেই করতে হবে। নকশাল সংশোধনের কাজে সে কেউই লাঠি এবং পিস্তল হাতে বেরতে পারে, কিন্তু সংশো-ধকের আসনে একমাত্র তাঁরাই বসতে পারেন মার্কসবাদ ও লেনিনবাদে যাঁদের দখল আছে, বিশ্বাস আছে। বিদ্রোহ বিপ্লবীকে কেবল সুস্থির বিপ্লবীই পথ দেখাতে পারেন, প্রতিদ্বন্দ্বির দালা-লরা সেই কাজে যোগ দেয় প্রতি-বিপ্লবকে স্বরাষ্ট্রবৃত্ত করবার জন্যে।

ইতিহাসে যেসব উগ্রতা দেখা গেছে, তার দমণে মার্কসবাদীরা মাঝে মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বির সাহায্য নিয়েছেন, এর প্রমাণ আছে। কিন্তু এযুগে এই কাজটি অত্যন্ত অন-চিত। কেননা পুঞ্জিবাদ এখন এক-চেটিয়া পুঞ্জিবাদ থেকে নয়া-উপনি-বেশবাদে উন্নীত হয়েছে এবং সে কারণেই তাকে নতুন নতুন সংশো-ধনবাদের ধাঁধা তৈরী করতে হচ্ছে। তাই আজ কলকাতার রাস্তায় শুব কংগ্রেসের এরকম পোষ্টারও দেখা যায় “মার্কসবাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র, পথ গণতন্ত্র এবং নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী”। এই বিবাস্ত্র ওষুধে চিকিৎসা করতে গিয়ে রোগ আজ রুগী থেকে ডাক্তারেও সংক্রমিত হয়েছে, এমন উদাহরণ বিরল নয়। আমাদের দেশে সেই উদাহরণের গদনরাবৃত্তি ঘটিলে বিপ্লবকে যারা পেছনে টানবার চেষ্টা করছে, প্রতি-রোধ কমিটির আড়াল রচনা করেছে বিশ্বাসঘাতকের পরিচিতি থেকে কিন্তু তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না।

সি পি এম বিরোধীরা ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে মদত দিচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ক্রাউন্সগার প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়কে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টার ঘটনা নিয়ে বাইশে অক্টোবরের কংগ্রেসশনের সভায় ঝড় বরিষণ হয়ে গেল। প্রস্তাব উঠল এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের। কিন্তু তার বিরোধিতা করলেন কংগ্রেসদলনেতা শিব খান্না এবং আনসারি।

আনসারি সাহেবের বক্তব্যটি বেশ মজার। তিনি তার স্বভাব-সুলভ ভঙ্গীতে এবং অনন্যকরণীয় ইংরেজীতে যা বললেন তার সার মর্ম হল এই—“আমরা তো বলে

দিয়েছি আমরা গান্ধীজীর অহিংসায় বিশ্বাসী। অতএব আমাদের চালাদের হাতে কেউ যদি গুলি-বিদ্ধ হয় তাহলে সে অহিংস মৃত্যু বরণ করেছে বলেই ধরে নিতে হবে। কথা প্রসঙ্গে তিনি প্রাক্তন মেয়র প্রশান্ত শুরের উপরে ছাত্র পরিষদের আক্রমণের উল্লেখ করে বলেন, “সেদিন সি পি এমের লোকেরা কী রকম নিমর্ম ভাবে ছাত্রপরিষদের ছেলেদের ধোলাই দি়েছিল তা আমরা এখনো ভুলে যাইনি।”

চেয়ার দখল আন্দোলন ব্যয়সম্পত্ত

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সার্টিফিকেট দিলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সেদিন গ্রেট ইন্টার্ন হোটেলে একটি নৈশ ভোজের শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রাজবাহাদুর জোরের সঙ্গে বলেন, ছাত্র ও শ্রমিক কংগ্রেসের তরফ থেকে সরকারী অফিসে যে চেয়ার দখল আন্দোলন সবুদ হয়েছে, তা তিনি অন্তর দিয়ে সমর্থন করেন।

এই ব্যাপারে যদি ছাত্র যুবকরা একটু “আক্রমণাত্মক” হয়েও থাকে তবুও তাদের উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম

প্রশংসার যোগ্য। মন্ত্রী বলেন : “কমিউনিস্ট প্রতিবিশ্ববের বিরুদ্ধে বাংলার যুব-ছাত্রের এ এক নয়া বিপ্লবী অভিযান।”

অর্থাৎ কমিউনিস্টরা ক্ষমতাসীন অবস্থায় জ্যোতদারের সীমিত্তিরক্ত জমি দখল করেছিল, হয়ত অনেক ক্ষেত্রে ছোট জ্যোতদারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট কথা এই “প্রতিবিশ্ববের” বিরুদ্ধে কেরাণীর চেয়ার দখল হল “নয়াবিশ্বব”।

স্বর্গত বিনয়ভূষণ ঘোষ সম্পর্কে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কর্মময় জীবনের মাঝে শ্রীবিনয় ভূষণ ঘোষ গত বুধবার হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের নিউ আলিপুর্ বাড়ীতে পরলোকগমন করেন।

শারদ-সংকলন দৃষ্ট

(দর্পণের সমালোচক)

নৈহাটী সিনে ক্লাবের মুখপত্র “দর্পণ” এ বছরের শারদসংকলন একটি উল্লেখযোগ্য রচনাসংগ্রহ। সত্যজিৎ রায়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সংখ্যায় সিলেছেন হীরেন্দ্র চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। অশোক মজুমদার আধুনিক হিন্দী ছবির ওপর লিখেছেন। চলচ্চিত্র বিষয়ে এমন সিরিয়স চিন্তাভাবনার সাক্ষাৎ খুব কমই মেলে। হীরেন্দ্র চক্রবর্তীর বাংলার ছবির সংগীত ও সত্যজিৎ রায় বিষয়ক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্ৰচন্দ্র প্রহ্মদের জন্য শান্তিকুমার বিশ্বাস প্রশংসা পাবেন। আমরা এই পরিচয় শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

গত চল্লিশ বছর উনি সরকারী কাজ করেছেন নানা দায়িত্বশীল পদে। অনেকে, বিশেষ করে অফিসার মহল বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এত সং অফিসার কি করে এতদিন ধরে নানা দায়িত্বশীল পদে কাজ করার সুযোগ পেলেন।

এ ব্যাপারে একটা ঘটনা জানা গেছে। স্বাধীনতার পর উনিশশ সাতচল্লিশ থেকে উনিশশ ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত প্রতিক্ষা দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী থাকার সময় শ্রীঘোষ প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর কক্ষা-কাছ এসে পড়েন। ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে ব্রিটিশ প্রভাব তখনও প্রচণ্ড। শোনা যায় যে, ষড়যন্ত্র হয়েছিল শ্রীনেহেরুকে সরিয়ে দিয়ে সৈন্যবাহিনীর একনায়ক প্রতীষ্ঠা করার। এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে শ্রীঘোষ পূর্বাচ্ছেই শ্রীনেহেরুকে সতর্ক করে দি়েছিলেন।

নেহেরু পরিবার এই কারণে ঠুর কাছে কৃতজ্ঞ। তারপর যখন উনিশশ আটান্ন সালে পাকিস্তানে সৈন্যবাহিনী ক্ষমতা দখল করল, তখন শ্রীনেহেরু নিশ্চিত হলেন যে, ভারতেও অনন্যরূপ কান্ড ঘটতে পারত।

সংবাদপত্র পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, সেই উপলক্ষে যারা ধরা পড়েছিল তারা যে কোন শিক্ষায়তনের ছাত্র এমন প্রমাণ সেদিন তারা দিতে পারে নি। প্রিয়দাস মন্সী মশায়ও এক বিবৃতি দি়ে জানিয়েছিলেন যে, ছাত্রপরিষদের সঙ্গে এই আক্রমণকারীদের কোন সম্পর্ক নেই। মেয়র প্রশান্ত শুরকে আক্রমণের চেষ্টা যারা সেদিন করেছিল তারা যে ছাত্র পরিষদেরই লোক সে কথাটা আনসারি সাহেব এতদিনে কবুল করলেন। বাছাদের সেদিন যে জামাই আদর করা হয়েছিল তারই বদলা আজ কংগ্রেসীরা নিচ্ছে পুর্লিংশ-সি আর পির আড়ালে থেকে এ কথাটাও তিনি কবুল করলেন প্রকারান্তরে। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হল বদলা হিসেবেই কংগ্রেস আজ এই রকম হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে। আনসারি সাহেব অল্পদিনের কণ্ঠস্বর বলেই হয়তো জানেন না যে, উনিশশ সাতচল্লিশ সনের আগে থেকে কংগ্রেস হিংসার আশ্রয় নিয়েই প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। তাদের হিংসা যথানি এবং যেখানেই প্রতিপক্ষের তুলনায় দুর্বল হয়েছে সেখানেই এবং তথানি তারা পরাজিত হয়েছে।

প্রতিরোধী সহযোগ

সি পি আইয়ের নতুন রণকৌশল “বিরোধিতা ও সহযোগিতা”-র চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া গেছে সেদিনের সভায় উক্ত দলের আচরণ থেকে। বি সি গান্ধুলীর ব্যাপারে তদন্তের প্রস্তাব তারা সমর্থন করল বটে, কিন্তু তার পুনর্বহাল লের তারা বিরোধী। পুনর্বহাল দাবি করার যুক্তি যদি না থাকে তাহলে তার প্রতি প্রদত্ত আদেশের বৌদ্ধিকতাই মেনে নিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রসঙ্গে ডেপুটি মেয়রের সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকার প্রস্তাবেও তারা কোন সাড়া দেননি। কেবল তফাৎ এই যে, তেইশ তারিখের সর্বদলীয় সভায় এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে কংগ্রেস হাজির হয়েছিল, কিন্তু সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক হাজির হয় নি। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষাপারটা বোধহয় তেমন জরুরী নয়। খান্না সাহেব বললেন ওতে নাকি পৌর সংস্থার কোন স্বার্থ নেই। কলকাতার নাগরিকদের বা করদাতাদের মধ্যে সরকারী কর্মচারীর সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলেও বেশ কয়েক লক্ষ যে আছে তা অনায়াসে ধরে নেওয়া যায়। এদের স্বার্থ যদি পৌরসভার স্বার্থ না হয় তা হলে ভাড়া লারির স্বার্থকেই পৌরসভার একমাত্র চিন্ত্যনীয় বিষয় বলে ধার্য করতে হয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিতে সি পি এম সদস্যরা যখন অভিযোগ করছিলেন তখন তথাকথিত কয়েকটি বামপন্থী দলের সকোটুক চোখ-

চারাটারি অনেকেরই নজরে পড়েছে। তারা হয়তো ভাবছেন কংগ্রেসী হিংসার দ্বারা ওরা যখন কোণঠাসা হবে তখন তারা তাদের বিপ্লবী কেরামতি দেখাতে পারবেন। জামা নির কমিউনিস্ট ঘুটে যখন হিটলারের হিংসার পড়েছিল তখন সোশাল ডেমোক্র্যাট গোবর এমনি করেই হেসেছিল। শেষ আশ্রয় অবশ্য দুজনেই পেয়েছিল—গ্যাস চেম্বারে। ইতিহাসটা কমিউনিস্টদের অজানা থাকবার কথা নয়। সভার সময় উদ্ভীর্ণ করে দি়ে শাসক দল শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব নেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেল।

কমিশনারের ছুটি

কমিশনারের ছুটির ব্যাপার

ভারত দর্পণ

(নবম পৃষ্ঠার পর)

বেশনে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করেছে। এ প্রবণতা আরো তীব্র হবেই।

কেরল

বামপন্থী সরকারকে সরিয়ে কংগ্রেসী রাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্যে সি পি আই এবং আর এস পি কেরলে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, উনসত্তর সালেও তারা তা প্রকাশ্যে অস্বীকার করত। সেদিন দলছুট বেইমান অচ্যুত মেনন বলত, যদিও তার মন্ত্রিসভা কংগ্রেসের ভোটের উপর নির্ভরশীল হবে, সেদিনই সে পদত্যাগ করবে। সেটা যে মিথ্যে ভাওতামাত্র ছিল, কোচিন শহরে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

এখন আর শ্রেণী সংগ্রাম নয়, শ্রেণী সহযোগিতার কমিউনিস্ট বিরোধী রাস্তায় তারা চলবে বলে ঘোষণা করেছে।

কোন রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের মূল্যায়ন না করে কোন কমিউনিস্ট নামধারী পার্টি রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করে না। যদি কোন কমিউনিস্ট পার্টি রণকৌশলগত কারণে শ্রেণী সরকারের আভ্যন্তরীণ স্বল্প বিকশিত করার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারের কোন কোন কাজ সমর্থন করে, সেটা তবু বোধগম্য হয়, কিন্তু মূল রণনীতি হিসাবে যদি কোন কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী সহযোগিতার চোরাগলি অবলম্বন করে তাহলে সেই পার্টি আর কমিউনিস্ট থাকে না। কোচিন পার্টি কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা অগ্রগামী জনতার শিবির পরিভাগ করে শত্রুশিবিরে প্রকাশ্যে যোগ দিয়েছে। তাদের প্রকাশ্য অধিবেশনে সাধারণ মানু-ষের যোগদানের স্বগপতা থেকেও এ সভা স্পষ্ট বোধগম্য হয়ে উঠেছে।

দর্পণেই প্রথম বেরিয়েছিল। তবু কমিশনার ছুটিতে গিয়েছিলেন। রাজ্য সরকার কার সুপারিশে তার ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন আমরা জানতে চেয়েছিলাম। তিনিই আবার কেন যে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ কাজে যোগ দিলেন তা কেউ জানে না। কিন্তু গোল বাঁধিয়েছেন চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তার মতে কমিশনারের ছুটি যেমন রাজ্য সরকার মঞ্জুর করেছেন, ছুটির মধ্যে হঠাৎ এসে কাজে যোগ দেওয়ার আগেও রাজ্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন। তা তো তারা করেনি। এখন দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। কংগ্রেসনে কমিশনারের ছুটির আইটেম কিন্তু আজও উপস্থিত করা হয় নি।

অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দলছুট কংগ্রেসী পুতুল অচ্যুত মেননের মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসীরা যোগ দিলেও, অন্তর্মুখের ফলে তারও আরু যে সীমিত হয়ে এসেছে, সি এস পি দলের মন্ত্রীদের পদত্যাগের নির্দেশ তার সূচনা করেছে। অচ্যুত মেননের মন্ত্রিসভা আজ কুটনাদের জ্যোতদার এবং বিদেশী রবার বাগিচা, কফি, কাজুবাদাম, দাড়ি শিপ্পের মালিকদের সেবাদাসে পরিণত।

কেরলে গিচুড়ে একটি উপনির্বাচন হবে। সেই উপনির্বাচনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে কেরলের সাধারণ মানু-ষ কি চান? বেইমানী না বিশ্বস্ততা, শাসক শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ না জনসাধারণের স্বার্থে শাসকশ্রেণীর শোষণের অবসান।

আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে

শফিকুল হাসানের

যুক্তির সংগ্রামে

পূর্ব বাংলা

পূর্ব বাংলার সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুক্তি-যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির ভূমিকা, সংগ্রামী জনতা ও বিপ্লবী কমিউনিস্টদের ভূমিকা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বর্তমান পরিস্থিতি ও সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ, মুক্তির পথ এবং গৌরীলা যুদ্ধের রণনীতি রণকৌশল সম্পর্কে বহুল তথ্য সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য রচনা সংকলন।

প্রকাশক : রবীন মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান :

৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মাসিক এক ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

দুপল

১৪শ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা ২২ শ্রবণ ৫ই নভেম্বর ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

শরণার্থীদের বঞ্চিত করে দৈনিক এক কোটি টাকা চুরি

শিবিরে বলেরায় লোক মরছে আর তাদের জন্য প্রেরিত স্যালাইন বাইরে ১২ গুণ দামে বিক্রী হচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সেই পুরাতন গল্প—এবারে একটু বৃহদাকারে এই বা. আর মৃত্যু ক্লর ক্ষতি তারও পরিমাণ ভয়াবহ। আত্ম শরণার্থী মানুষের গ্রাণের নামে এরা মৃত্যুর ব্যবসা চালাচ্ছে। পাপচক্রে আছে সরকারী আমলাদের ঘৃণ্য অংশ, কনট্রাক্টর, আর শরণার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ এবং নব কংগ্রেসের নয়া ভলান্টিয়ার বাহিনীর নেতারাও ছিটে ফোঁটা পায়।

পূর্ববঙ্গের প্রায় এক কোটি লোক আজ ভারতে শরণার্থী। এদের পাঁচাত্তর ভাগই পশ্চিমবঙ্গে। রেশন, ওষুধ, মাথা গোঁজার কাপড়, শীতে কম্বল ইত্যাদি ব্যবতরী বন্দোবস্ত করা দরকার এদের জন্যে। বিরাট কতক, হুটী হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু যা হচ্ছে তাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী মহলের অনেকে চিন্তিত। মাথা পিছু শরণার্থীদের দৈনিক তিনশ গ্রাম চাল, আর ডাল, চিনি তেল প্রভৃতি খাবার জিনিষ পাওয়ার কথা। খালি চাল পায় ওরা, তাও দশ গ্রামের বেশী নয়। খাতাপরে কিন্তু তিনশ গ্রামই দেখান হচ্ছে।

অন্যান্য জিনিষের ব্যাপারেও ঐ একই অবস্থা। সব কিছুই খাতায় দেখান হচ্ছে, কিন্তু শরণার্থীর হাতে জিনিষ পৌঁছচ্ছে না একদমই, অথবা দু একটা জিনিষ খুব কম পরিমাণে কোন সময় হয়ত ছিটকে এসে পড়ছে।

দৈনিক প্রায় তিন কোটি টাকা

খরচ এই শরণার্থীদের জন্য, অন্ততঃ সরকারী হিসাব তাই। সন্দেহের ভিত্তি আছে যে, এর মধ্যে কম করে এক কোটি টাকা চুরি হয়ে যায়।

চালের ব্যাপারেই ধরা যাক। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ প্রাপ্ত-বয়স্ক শরণার্থীকে দৈনিক তিনশ গ্রাম হিসাবে চাল দেওয়ার কথা। বেশীর ভাগ শরণার্থী শিবির থেকে খবর এসেছে যে, চাল কম দেওয়া হয়। শরণার্থীরা আপত্তি করলে বেদম প্রহার করা হয়।

এই চাল বিতরণের ভার কন-ট্রাক্টরদের হাতে দেওয়া হয়েছে। এরা ক্যাম্প ইউনিটের সাহায্যে চাল বিতরণ করে। বিভিন্ন শিবিরে মোট পনেরো হাজার নতুন লোক নিয়োগ করা হয়েছে ক্যাম্প এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। শাসক কংগ্রেসের জেলা শাখার অনুমোদনে এরা নিয়োগ পত্র পেয়েছে সেই কোয়া-লিশন সরকারের আমলে। এদের অনেকেই স্থানীয় মাস্তান।

এই মাস্তানরা, কনট্রাক্টররা, পুলিশের ও আমলাদের একাংশ যাদের পাপ চক্রের কথা এই রাজ্যে বহুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে তারা আজ প্রকাশ্যেই সবকিছু চালচ্ছে।

লাখ লাখ টাকা তহরুপ হচ্ছে আর শরণার্থীরা কলেরায় অজীর্ণ-তায় আরও অনেক অনেক রোগে বিনা ওষুধে হাজারে হাজারে মরছে।

মেঘালয়ে এক শিবিরের একটি ঘটনা। ওখানে থেকে তিন লাখ শরণার্থী। মহামারী আকারে

সংবাদপত্রের মালিকরা জনসাধারণের আর এক দফা পকেট কাটার ব্যবস্থা করছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভূয়া প্রচার সংখ্যার ওপরে কর দিতে হবে বলে সংবাদপত্র ও সাম-য়িকীর উপর কেন্দ্রীয় কর ধার্যের সুযোগে ভারতের বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর মালিকরা আর এক দফা মুনাম্বাজী করতে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ সংবাদপত্র মালিকরা গত মঙ্গলবার এক গোপন বৈঠকে স্থির করেছেন, প্রতি কপিতে দু পয়সা করে কেন্দ্রীয় কর ধার্য হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সংবাদপত্রের দাম আরো কিছু বাড়িয়ে দেবেন।

আনন্দবাজার মালিক বলে-ছেন, বর্তমান দাম বাইশ পয়সার ওপরে কেন্দ্রীয় কর ধার্য হলে

চব্বিশ পয়সা হবে। এর ওপর ওঁরা ছয় পয়সা বাড়িয়ে আনন্দ-বাজারের দাম তিরিশ পয়সা করতে চান। বঙ্গান্তরের মালিক সাতাশ বা আঠাশ পয়সা করতে চাইছেন। স্টেটসম্যান তিরিশ পয়সা করতে রাজী। অমৃতবাজার অতটা বাড়িতে রাজী হচ্ছেন না। তবে ওরাও কেন্দ্রীয় করের ওপরে কিছু বাড়াবে। ভারতের অন্যান্য বৃহৎ সংবাদপত্রও এই হারে দাম বাড়াবে বলে দর্পণের কাছে খবর আছে। অবশ্য বিস্তারিত জানা যায়নি।

কিন্তু কেন এই অস্বাভাবিক হারে দাম বাড়ানো হচ্ছে? উত্তরে আগেই বলেছি, ভূয়া প্রচার সংখ্যার

ওপরে কর দেবার ভয়ে। সংবাদপত্র জগতের ওরাকিবহাল মহল জানেন, বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি যখন দু লক্ষ লক্ষ প্রচার সংখ্যা ঘোষণা করে তখন তার একটা মোটা অংশই ভূয়া। কিন্তু প্রকৃত প্রচার সংখ্যার সঙ্গে ভূয়া সংখ্যা দিয়ে প্রচার সংখ্যা বাড়ানো হয় - এবং সেই ফাঁপানো সংখ্যার হিসেবে ভারত সরকার নিউজপ্রিন্ট বরান্দ করেন। তখন ও প্রচার দপ্তর থেকে এটি করা হয়। দপ্তরের কর্মকর্তারা বৃহৎ সংবাদপত্র মালিকদের এই কাণ্ড-করখানার খবরও রাখেন। কিন্তু মালিকদের প্রচণ্ড ক্ষমতা এবং তার ওপর মালিকদের কাছ থেকে খানাপিনা পেয়ে অফিসাররা ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটখাটি করেন না। অনুসন্ধানকারী অফিসাররা অধিকাংশ সময়েই মালিকদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। খানাপিনা, দক্ষিণা, মোটরগাড়ী পাওয়া যায়। ওরা জানেন, কোন সাংবাদিকেরই এই খবর সেখবার ক্ষমতা নেই। তাই পরম নিশ্চিন্তে এই সহাবস্থান চলছিল। নিউজপ্রিন্ট কোটা পাওয়া একটা দারুণ সৌভাগ্যের বিষয়। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী কোটা পেলেও লাভ। কেননা, চোরাবাজারে বিক্রয় করা যায়। তাতেও দারুণ মুনাম্বা। অন্যদিকে ছোট সংবাদপত্র আর সাময়িকীগুলো নিউজপ্রিন্ট কোটা একরকম পায়ই না। ওদের কপালো ছিটেফোঁটা জোটে। বাকীটা বৃহৎ সংবাদপত্রের কোটা থেকে ব্র্যাকমার্কেটে কিনতে হয়। ছোট সংবাদপত্র আর সাময়িকী যদি কংগ্রেসী সরকারের সমালোচক হয় তবে তাদের অবস্থা আরও খারাপ।

(শেখাংশ শেখ পদ্মার)



কলেরা দেখা দেয়। রোজ প্রায় দুশ লোক মরতে থাকে। চিকিৎসার জন্য স্যালাইন পাঠান হয়। কিন্তু দেখা গেল প্রতি বোতল ক্যাম্পের বাইরে তিন টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। শরণার্থীদের কেউ কেউ নিজেদের শেষ সম্বল কিছু টাকা অথবা গহনা এনেছিল। এই গহনা কন-ট্রাক্টরদের কাছে জলের দামে বেচে চার আনার স্যালাইন ওরা তিন টাকা বোতল পিছু কিনেছে। যাদের ওই সম্বল ছিল না তারা বিনা চিকিৎসায় মরেছে।

সেদিন ভারত সেবাশ্রম সংঘের একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। স্বামীজী বহু শিবিরে কাজ করে-ছেন। উনি এসেছিলেন রাইটাস' বিন্ডিংএ অভিযোগ করতে। বাঁভংস ছবি তিনি তুলে ধরলেন এই চরির বাটপাড়ির। "কোন মনুষ্য এদের আছে বলে মনে হয় না, জন্তুদেরও কেউ এই ভাবে রাখার ব্যবস্থা করে না আর ওদের মতের খাবার নিয়ে এই কাবসা চলে না।"

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই সমস্ত

(শেখাংশ শেখ পদ্মার)

এস এস পি দলগতভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেনি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অনেক দিনের আশা পূর্ণ করে কাশীকান্ত মৈত্র কংগ্রেসে যোগ দিলেন। "সমাজবাদী" কাশীবাবু এই যোগদানের কাপারে পূরনো সাথীদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। কাশীবাবুর দলের, অর্থাৎ বিদ্রোহী এস এস পির চেয়ারম্যান অরুণ মুখার্জী, রাজ্য কমিটির সম্পাদক যিনি বিগত কোয়ালিশন সরকারের আমল থেকে দলকে চালিয়ে আসছেন ও আঠারো জন রাজ্য কমিটির সদস্যদের মধ্যে চোদ্দ জন সদস্য কি কাশীবাবুর সঙ্গে?

কারা তারা যারা একত্রিশে অকটোবরের কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন? বিদ্রোহী এস এস পি কর্মীদের বক্তব্য—ক্ষমতাসীন বড় দল কংগ্রেস লোকজন পাঠিয়ে

আনন্দোৎসব করে কাশীবাবুকে নিয়ে গেল। সঙ্গে কাশীবাবুর দু-একজন সাথী গেল মাত্র। দল-গতভাবে এস এস পি বিদ্রোহী কংগ্রেসে যোগদান করেনি।

কাশীবাবু চম্পসারে কংগ্রেসে গেছেন। জেলা ভিত্তিক ভাবেও যোগদান হয়নি। কাশীবাবুর বিধানসভা কেন্দ্রে গত বোম্বাই অক্টোবরের সভায় স্থানীয় সদস্য ও নেতা এ্যাডভোকেট সত্যরঞ্জন দাশ-গুপ্ত, পৌর কমিশনার চিরসহৃদ খাঁ, দিকেন্দ্র ভট্টাচার্য, ভজন বিশ্বাস ও রবি ভট্টাচার্য কংগ্রেসে যোগদান করেন নি এবং এরা পাকপাকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ঐ কেন্দ্রে আগামী নির্বাচনে বিকল্প প্রার্থী দেওয়া হবে। রাজ্য কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া হবে না।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির নেপথ্যে

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

সম্প্রতি কলকাতার একাধিক সংবাদপত্রে বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অঙ্গের মহত্বের খবর খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে কিছুকাল ধরেই সংবাদপত্রগুলিতে নানা ধরনের আলোচনা ও আশঙ্কা ছড়ানো হচ্ছে। তবে এই শেষের প্রচারটির চেহারা একটু ভিন্নধরণের। এতদিন কেবল “গেল গেল” বলে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছিল, এবারে সমাধানের একটা সহজ রাস্তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

খবরের সূচনাতেই সূর্য ধরা হয়েছে, আর ভয় নেই, সিদ্ধার্থ-বাবু আসছেন, একেবারে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, পাঞ্জা নিয়ে। তিনি এসেই সব গোলযোগের মূল সেই মার্কসবাদী এবং উগ্রপন্থীদের উৎখাত করবেন, তাহলেই বিশ্বভারতীতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নাকি দৃঢ়নিশ্চিত যে মার্কসবাদী ও উগ্রপন্থীদের অন্তঃপ্রবেশই সব গলদের মূল। সুতরাং লাগাও দাওয়াই তিনশ দশ আর তিনশ এগারো ধারা!

বিশ্বভারতীর আদর্শচ্যুতি ঘটেছে, শিক্ষার মান নেমে গেছে,

প্রশাসনে গলদ ঢুকেছে, সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকার প্রাক্ক হাচ্ছে এই অভিযোগগুলিই সব পক্ষ থেকে আনা হয়েছে। এদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিশ্বভারতীর আদর্শচ্যুতি ঘটেছে কোন পক্ষে? ওই যে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশকারীরা কমী ও শিক্ষকদের সভা করেছেন, বিভিন্ন পরিচালন সংস্থায় প্রতি-নিষিদ্ধ চাইছেন, কারেমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করছেন—এগুলিই বিশ্বভারতীর আদর্শচ্যুতির সুস্পষ্ট লক্ষণ। আর ছাতিম ভৈলয় উপাসনার সময় পুলিশের উপস্থিতি, আচার্যের ভাষণে রাজনৈতিক, প্রসঙ্গ, ঘৃষ নিয়ে দপ্তরে দপ্তরে নিয়োগ, উত্ত-রায়ণে পুলিশ ক্যাম্প করা, পরীক্ষার টোকাটুকির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ও প্রাক্তন গোষ্ঠীর যোগাযোগ, একদা রথীনবাবুর ফাইলবক্সে গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ করা, ইংরেজিতে ফেল করা ব্যক্তিকে বিশ্বভারতী নিউজের সম্পাদক করা কল্যাণবনের আশেপাশে বারো ফুট কাঁটাতারের বেড়া এগুলি আদর্শচ্যুতি নয়।

শিক্ষার মান অবনতির কাপারেও কেন্দ্রীয় সরকার ভাবনায় পড়েছেন।

এর জন্যও, রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ-কারীরা দায়ী কিনা সে গবেষণাও নিশ্চয়ই করা হচ্ছে। শিক্ষার মান রক্ষা হয় কিসে? যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, নিয়মিত পঠন এবং শিক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষাবিধির সংস্কার ও উন্নতিতে নিশ্চয়ই। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ইতিহাসটা দেখা যাক। গণিতবিভাগে প্রফেসর নেই আজ চার বছরের উপর, সি.এ.এস. অর্থাৎ দর্শনের অ্যাডভান্স সেক্টরে যিনি অধ্যক্ষ তাঁর যোগ্যতা নিয়ে বর্ধমান লোকালেও অনেকে মূচকি হাসেন, ইতিহাস বিভাগের প্রধান যিনি তিনি একদা সি.আই.এ-র আশী-বাদ পদে ব্যক্তি (কেন্দ্রীয় সরকারের সোভিয়েত লবীর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কি বলেন?) তিনি আবার সম্ভায়ে তিনদিনের বেশি শান্তিনিকেতনে থাকাটা তার মানসিক স্বাস্থ্যের অনুরূপ নয় বলেন, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিভাগের দুই প্রধান কর্তৃপক্ষের উপর বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেছেন, অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত যিনি, রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং এখনও যিনি রবীন্দ্র-অধ্যাপক রবীন্দ্র গবেষণায় তাঁর প্রবেশ স্কীন ডীপও নয়, সংস্কৃত বিভাগের যিনি প্রধান তাঁর সংস্কৃতের ডিগ্রী অত্যন্ত নিম্ন মানের, জুওলজীর যিনি প্রধান তাঁর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা একদা আত্মমিক সংঘের এক প্রভাপ-শালীর ভাই হিসেবে তিনি বিশ্বভারতীতে প্রবেশ করেছিলেন, হিন্দী ভবনে একাধিক প্রফেসর রাখা আছে যদিও পড়ানোর কোন ব্যবস্থা নেই। এগুলির জন্য নিশ্চয়ই রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ দায়ী নয়, তারপর বিদ্যাব্যবস্থার অধ্যক্ষের পদ আজ এক বছরের উপর শূণ্য। নিয়মিত পঠন-পাঠন সম্বন্ধে একটা কথা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন যে বিশ্বভারতীর সাধারণ শিক্ষকেরা ক্লাস নেন না এ অভিযোগ কখনো ওঠে নি, দ-চারজন ওপরতলার অধ্যাপক ছাড়া। সিলেবাস ও পরীক্ষা বিধির সংস্কার নিয়ে আর যাদেরই মাথা ব্যথা থাক, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের যে নেই তা সকলেই জানেন। বরং পরীক্ষার কাঁটপত্র যিনিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র প্রহরা দিলে। টোকাটুকির সুবিধা হতে পারে এই তথ্যটি কর্তৃপক্ষের মাথাতেই আসে এবং সেইমতো কবস্থাও হয় এ বছরের কয়েকটি পরীক্ষার। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গতানুগতিক সিলেবাস ও প্রহরাধীনে গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষই চালু রেখেছেন। মার্কসবাদীরা নন।

প্রশাসনের গলদের কথা সবি-স্তারে বলা কঠিন। কয়েক মাস ধরে রেজিস্ট্রার নেই, যদিও তাঁর পদ-

ত্যাগ পত্র গৃহীত হবার পরেও তাঁকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে, কন্স্টেবলার অব একজামিনেশন নেই প্রায় পদটি তৈরি হবার পর থেকেই, শ্রীমিকে-তনের অধ্যক্ষ নেই চার বছরের উপর। ফাইনাল অফিসার নেই, আডভান্সড অডিট অফিসার নেই। তবে যে বিশ্বভারতী চলছে, অর্থাৎ এক তারিখে কমীরা বেতন পচ্ছে, দশটার সময় অফিসের জানলা খোলা হচ্ছে সেটাই অশ্চর্য। এ দেখে মনে হয়, হয় সাধারণ কমীরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, না হয় উচ্চ পর্বতার অফিসারেরা নিছক অলং-কার, কোন প্রয়োজন নেই তাঁদের। প্রশাসনের আডভান্সড গলদের কথা বলতে গেলে ইতিহাস নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের আমল থেকেই জমিদারী চড়ে বহু অযোগ্য, অর্থ-শিক্ষিত, খোসামুদে, মতলববাজ চাকরি পেয়েছিলেন। তবে তার মধ্যেই কিছু কমী দীর্ঘদিন কাজ করার ভিতর দিয়ে এবং শান্তিনিকেতনের প্রতি বধ্যার্থ মমত্ববশে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। সর্বাঙ্গীন দাসের আমলে শূরু হল প্রশাসনের নতুন ব্যবস্থা। গোষ্ঠী পোষণ পাকা হল আর হল বিরোধী অথচ যোগ্য কমী অপসারণ বা নিগ্রহ। অব্যোগ্য লোকের অভাবিত প্রমোশনে যোগ্য লোকেরা স্বভাবতই দমে গেলেন। এ জাতীয় ঘটনা সমস্ত বিভাগে ও সমস্ত স্তরে ঘটল।

জমিদারী চালের সঙ্গে জুড়ল আমলাতান্ত্রিক শরতানী। আজকের বিশ্বভারতীর প্রশাসন তারই অবশ্য-ম্ভাবী পরিণতি। এখানে প্রায় এক-জন অফিসারও নেই যে এই ক্রেদান্ত পথে হেঁটে এবং হতে ক্রেদ না মেখে উঠেছেন। ফলে সর্ব প্রাশ-

সন অসম্ভব হয়ে পড়েছে বিশ্বভারতীতে। এর সঙ্গে আছে প্রাক্তনদের কারেমী স্বার্থের ছাঁড় ঘোরানো। এগুলি যে কেউ জানেন না তা নয়। কিন্তু আজ সব আবি-ষ্কার করা হচ্ছে যে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশই প্রশাসন অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

বিশ্বভারতীর অপব্যয়ের তালিকা করতে লজ্জা হয়। প্রায় সমস্ত লক্ষের মতো টাকা বাৎসরিক খরচ করা হয়। হাজার টাকার উপর বেতনভোগী অফিসার ও প্রফেসর আছেন প্রায় তিরিশ জন। এক একটি তিন ঘরের কোয়ার্টার বাইশ-চল্লিশটি লাইট পয়েন্ট, ছটি জলের ট্যাপ এবং ওভারহেড ট্যাক্স, সিন্ধ, বেসিন। পাশের সাঁওতাল পল্লীর কথা ছেড়েই দিলাম। চতুর্থ শ্রেণীর কমীদের ঘরে ইলেকট্রিক নেই, জল নেই, পায়খানা নেই। কনট্রাক-টররা সিমেন্ট, লোহা, সুরকি বাবদ বছরে বেশ কয়েক লাখ টাকা নিয়ে যান বিশ্বভারতী থেকে। সম্প্রতি জাল, রৌপ্য, গোট লাগ-নোর ধুম পড়েছে। এগুলির জন্য ওই সমস্ত লক্ষের বাইরে টাকা আসছে। এত ব্যয় তার ফল কী? সে প্রশ্ন স্বভাবতই করতে পারে সাধারণ মানুষ, কারণ টাকাটা তাদের পকেট থেকেই আসে। কিন্তু জবাব দেবে কে?

কেন্দ্রীয় সরকার, কতখানি বে-সামাল অবস্থায় এসেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তাঁরা বিশ্বভারতীতে লে-অফের কক্ষ ভাবেন। ভুলে যান এটা টাটা-বিড়লা পরিচালিত কোন করখানা নয়, এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণশক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিবপুর বি.ই. কলেজ অধ্যক্ষের খামখেয়ালীপনা

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা সংঘেও পরে নানা কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার ঘটনা হামেশাই ঘটছে। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে, তার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরেও, তাকে বাতিল করে, পুনরায় পরীক্ষার দিন ধার্য করার মতো আকস্মিক ঘটনার কথা আমরা আগে শুনি নি। সম্প্রতি এই আকস্মিক ঘটনাটি ঘটেছে শিবপুর বি.ই. কলেজে।

অধ্যক্ষের নির্দেশানুযায়ী ছাত্ররা টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলেন বোলই আগষ্ট এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বরে এবং নভেম্বরে যথাক্রমে পঞ্চম বর্ষের বাৎসরিক পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার দিন ধার্য হয়েছিল। তারপর পূজোর ছুটি পড়ল। কলেজ কর্তৃপক্ষ হঠাৎ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন টেস্ট পরীক্ষা নতুন করে আবার নেওয়া হবে উনতিরিশে অক্টোবর। প্রত্যেক ছাত্রের অভি-ভাবকের কাছেও একটি করে চিঠি গেল; চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন ছাত্রদের বন্ধিমে বসেন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। পূর্বে গৃহীত পরীক্ষা বাতিল করার কারণ

হিসেবে বলা হয়েছে, বোলই আগ-ষ্টের পরীক্ষার ফল মোটেই সন্তোষ জনক নয়। কলেজের ছাত্ররা এই ঘটনার প্রত্যেকেই বিস্মিত। তাঁরা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে, তিনি তো কোন ব্যক্তিই দেখান না বরং ভীতি প্রদর্শন করে বলেন : “নতুন টেস্ট পরীক্ষা না দিতে দিতে চাইলে কলেজে পড়াশুনা বন্ধ করে দেওয়া হবে।”

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্ররা গভ্র উনতিরিশে অক্টোবর রাজ্যের শিক্ষা সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তিনিও কোন শেষ কথা বলতে পারেন না।

এমনিতেই সমস্ত বছর কলেজের অভ্যন্তরে কর্তৃপক্ষের ছাত্রবিরোধী চক্রান্ত এবং পুঙ্খিল মিলিটারীর তাড়বের ফলে এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। তার উপরে অধ্যক্ষের খামখেয়ালী-পনার জন্য এই এক বছরের অপ-চর গণতন্ত্রের কোন রীতির অন্ত-গত? এর সমাধানই বা কিসে? রাজ্যের একমাত্র শান্তির দূত ছাত্র পরিষদ কি তাদের চেয়ারম্বলের রাজনীতির মাধ্যমে এর সমাধান করতে পারবেন?

দুনীতিপন্থা ব্যক্তিকে হেলথ ডিরেক্টর করা হচ্ছে

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

স্বাস্থ্য বিভাগের এ্যাডমিনি-স্ট্র্যাটিভ রামের ডেপুটি ডিরেক্টর বহু কলেস্কারীর নায়ক ডাঃ অক্ষয় রায় এখন হেলথ ডিরেক্টর হতে চলেছেন। এর সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ কিছুদিন পূর্বে দপ্তরের পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগের তদন্ত কতটুকু হয়েছিল, তার উল্লেখ না করেও বলা যায় শ্রীসিদ্ধার্থ রায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের অতি-রিক্ত সচিব শ্রীবি আর গুপ্তের সুপা-রিশে ডাঃ রায়, ডাঃ জে বি চ্যাটার্জী, ডাঃ কে সি বসুমতী, ডাঃ সরসী মুখার্জী ও অপর অনেকে ডিঙিয়ে হেলথ ডিরেক-টর হতে চলেছেন।

ডাঃ অক্ষয় রায়ের বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সরকারী কমী এবং নেতাদের জন্ম করার কৌশল সর্বজনবিদিত। রাইটার্সে “ইনীকলাব জিন্দাবাদ” ধ্বনি শ্রুনে ইনি কিছুদিন আগে অশ্রুতন কেরাণীদের কিভাবে চোখ রাগি-য়েছিলেন তা অনেকেরই জানা।

এমন কি তাঁর দুনীতির বিরুদ্ধে নিবৃত্ত তদন্তকারী অফিসারদের বশীভূত করার ক্ষমতাও তাঁর অসীম। রাজ্যপাল ডায়াস, যিনি সফ্ট ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন কয়েক করার নামে সরকারী কমী ছাঁটাই করে চলেছেন, তিনি কি সরকারী কর্মচারীদের শাসনোক্ত করার যোগ্য লোক মনে করেই অক্ষয় রায়ের মত একজন দুনীতিগ্রস্ত অপদার্থ ব্যক্তিকে হেলথ ডিরেক্টরের পদ উপঢৌকন দিচ্ছেন? কয়েকদিন আগেও অক্ষয় রায় গোপনে কি-ভাবে সোস্যাল ওয়ার্কার একটি মেয়েকে স্পেশাল ট্রেনিং (বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার স্কলারশিপে) নেওয়ার জন্যে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, তা ধরা পড়ে গেছে। এ কাপারে ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহারের জন্যে যার শাস্তি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনের কল্যাণে সিস্থার্থ রায়, বি আর গুপ্তের মতন মদ্রবিশ্বের জোরে তাঁর পদোন্নতি হবে এটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যেই সোভিয়েত গদ্যপুস্তক
(দেখাংশ ৫য় পৃষ্ঠায়)

বেকারী ও অনাভাবের জালা কি করে দূর হবে ?

(অর্থনৈতিক ডায়াক্রান)

বেকারী, ছাটাই এসব সামাজিক ব্যাধি পুঞ্জিবাদী সমাজের অপরি-
হার্য অঙ্গ। সমস্ত সুস্থ, সবল-
দেহ যুবকেরা পুঞ্জিবাদী উৎপাদন
ব্যবস্থা বজায় থাকলে কাজ পাবে
না। বেকার না থাকলে মনোহা
থাকে না কারণ 'পুঞ্জিবাদী মালি-
ককে' বাধ্য হয়ে তখন মজুরী
বাড়াতে হয়। আমাদের দেশেও
অর্গণিত মানুষ যে বেকার রয়েছেন,
তারও মূলে একই কারণ। কাজে
কাজেই একচেটিয়া পুঞ্জি মালিক ও
গ্রামীণ জমিদার জোতদারদের
শোষণ বজায় রেখেই বেকার
সমস্যা সমাধান করার নব-কংগ্রেসী
“পিং টিং ছাট” মার্কী বুলি কোতু-
কেরই উদ্ভাবন করে।

কিন্তু যদি বর্তমান পুঞ্জি-
মালিক শ্রেণী ও সামন্ত জোঁদাদার
জমিদারদের হাতের উৎপাদনের
উপকরণগুলি যেমন জমি, যন্ত্র-
পাতি মূলধন সমাজের মালিকানায়
নিরে আসা যায়, তাহলে দেশের
বর্তমান বেকারেরাই যে শব্দ কাজ
পেতে পারে তা নয়, ভবিষ্যতে যে
সব ছেলেমেয়ে বড় হবে, তারাও
নিশ্চিত কাজ পাবে, এই বিশ্বাস
নিরে জীবনে প্রবেশ করতে পারবে।
সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সংবিধানে
তাই একথা লিখে দেওয়া হয় যে
আঠারো বছর বয়স হলে ছেলেমেয়ে
যে কোন নাগরিক গুণানুযায়ী
কাজ পাবার দাবী করতে পারবে
এবং রাষ্ট্র তা পূরণ করতে বাধ্য।

কি করে এমন দৃঢ় আশ্বাস,—
সংবিধানগত প্রতিশ্রুতি দেওয়া
সম্ভব হল? কেন সমাজতান্ত্রিক
দেশে, কেউ, বেকার থাকে না, লেখা
পড়ার সুযোগ সবাই পায় এবং
রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা সকলের
জন্যই বিনামূল্যে দেওয়া সম্ভব
হয়?

পুঞ্জিবাদী সমাজে মালিক কারখানা থেকে শ্রমিক খাটিয়ে, যে মুনামফা অর্জন করে তার একটা অংশ সে ভোগে খরচ করে। কিন্তু দৃঢ় একজন মালিকের ভোগে আর কত খরচ হয়? একজন তো আর দখানা মোটর গাড়ী চড়তে পারে না একসঙ্গে, কিংবা চারজোড়া ধূতি প্যাণ্টও একসঙ্গে পরে না—অনেক বেশী করে ভোগ করলেও কত আর ভোগ করার ক্ষমতা থাকে দু'চারজনের? ধরা যাক মোটে মুনামফার দশ ভাগ তারা ভোগের উপকরণ বাবদ খরচ করে, বাকী নয়টি ভাগ তারা আরো টাকা, —আরো মুনামফা করার লোভে নতুন নতুন কলকারখানায় নিয়োগ করে। ফলে তাদের শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শ্রমিকের চাহিদা বাড়লে অন্যান্য পণ্যের দামের মত, শ্রমিকের মজুরীও বাড়তে বাধ্য। তাহলে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ইত্যাদি বাদে মজুরী বাবদ খরচ বেড়ে যাওয়ার

দরদর মদনাফা কমে যায় বা কাঁচামাল ইত্যাদি বাড়ে মজদুরী বাবদ খরচ বেড়ে বাওন্নার দরদর মদনাফা কমে যায় বা কলকারখানা বেশী বেড়ে গেলে মদনাফা একদমই থাকে না তাহলে পুঁজির মালিক কেন উৎপাদন করতে যাবে? তখন সে মজদুর ছাটাই করে, উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং সারা দেশে ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। কিন্তু মজদুরী কমাতে হলে শ্রমিক কলকারখানা বন্ধ করলেই তো হয় না কারণ তাহলে তো উৎপাদন বন্ধ হওন্নার সঙ্গে সঙ্গে মদনাফাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই পুঁজিবাদীরা লক্ষ লক্ষ লোককে বেকার করার সমস্ত স্বপ্না গ্রহণ করে। তার স্বার্থের পাহারাদার সরকার বাজেট, মদ্রা আইন প্রভৃতি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতি এমন ভাবে প্রয়োগ করে যে জমি থেকে যেন কৃষক উচ্ছেদ হয়, শিক্ষিত যুবকেরা, যেন বেকার থাকে এবং চাকুরীর চেয়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা যেন খুব বেশী হয়।

তখন তারা মজুররা হার
কমিয়ে 'মদ্রাফা' বাড়িয়ে নিতে
পারে। এই শ্রমতানী উদ্দেশ্যে
আড়াল করার জন্যে তারা তাদের
সেবাদাস মন্ত্রী অফিসারদের মুখ
দিয়ে, "গরীবী হঠাৎ" ইত্যাদি
নানা রং বেরং-এর বেকার বিরোধী
পরিকল্পনা দাখিল করে। বড় বড়
গালভরা পরিকল্পনা আওড়ান যেটা
তারা নিজেই বুদ্ধিতে অক্ষম। সঙ্গে
সঙ্গে দেশের পদ্মজি মালিকদের
খবরের কাগজ ও ভাড়াটে লেখক-
সাংবাদিকেরা হিং টিং ছুটের অপূর্ব
ক্যাথাক্স আকাশবাতাসে সোঁরগোল
তোলে। বেকার সৃষ্টির নীতিকে
তারা গরীবী হঠাৎ মার্কা সমাজ-
ভন্দ্র বলে জোর গলায় প্রচার করে,
অবাধ শোষণকে তারা স্বাধীন
অর্থনীতি বলে বর্ণনা করে, নিরম
অনশনক্লিষ্ট থাকাই প্রকৃত 'স্বাধীন-
মতা বলে তারা বলি। আওড়াতে
থাকে—এক কথায় তারা শ্রমতানীকে
সাধুতা বলে চিহ্নিত করে। সরল
বিশ্বাসী সাধারণ মানব অল্প
সময়ের জন্যেও তাতে ভুলে গেলে,
তাদের পোস্তাবারো, অবাধ শোষণ-
পের নিরক্ষুশ-অধিকার তারা বেশ
কিছুদিনের জন্যে পেয়ে যার।

কিন্তু যদি এসব, ছেঁদো কথা
আর ফাঁকা বুলিতে না ভুলে দেশের
মানুষ একজোট হয়ে সমাজ বদলের
কাঞ্জে হাত লাগান, তাহলে কি হয়
আজকের চীনের দিকে তাকালেই
বোঝা যায়। 'দুর্নিয়্যার' সেরা সেরা
পন্থীজবাদী দেশ আমেরিকা, বৃটেন,
জার্মানী ফ্রান্স সবাই তার অনগ্রহ
প্রার্থী হয়ে লাইন দিয়েছে। অথচ
কুড়ি বছর আগেও চীনের মানুষ
ছেঁড়া কাপড়ে শীত কাটাতে, গরম

জল খেয়ে চায়ের পিপাসা মিটাতে।
আজ তাদের দেশে বেকার নেই,
অমাব্যাস নেই, শিক্ষা স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ-
জ্বল চীন আজ পৃথিবীর অন্য-
তম প্রধান শক্তি বা অর্থনৈতিক ও
সামরিক বলে আমেরিকা ও সোভি-
য়েত ইউনিয়নের প্রায় সমকক্ষ।

আমরা যদি স্বাধীনতার পরে
 প্রুজিবাদ ও জোতাদারদের হাটিলে
 সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠন করতে
 পারতাম, তাহলে আজ বিশ্বসভায়
 নিজের শক্তিতেই ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ
 আসন লাভ করতে পারত। তা না
 করে আমাদের কংগ্রেসী শাসকেরা
 প্রুজিবাদ ও সামন্তবাদী শোষণের
 পথ গ্রহণ করল। আজ চব্বিশ বছর
 পরে কংগ্রেসী বিশ্ববৃক্ষে যে তিস্ত
 ফল ধরেছে তার বিষ দেশবাসীকে
 জর্জরিত করছে। ১- যদি কংগ্রেস দল
 অর্থাৎ প্রুজিবাদীদের দল শাসন
 ক্ষমতায় থাকে তাহলে কিছদিন
 পরে সারাদেশে পদলিশের থানা
 আর শ্মশান ছাড়া কিছু থাকবে
 না।

যদি আমরা সমাজতন্ত্রের পথ
সত্যি সত্যি গ্রহণ করতাম তাহলে
এই চরিক্সা বছর পর কোন তরুণ
বেকার থাকত না, কোন বান্দব
নিরস্ত থাকত না,—সংবিধানে তাদের
এই দাবীকে মেনে নেওয়া হত।
কি করে তা সম্ভব হত ?

ধরুন পুঞ্জিবাদী কেউ নেই, মনুসাকার ধাবা কেউ বাড়িয়ে নেই। গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাই জনসাধারণের দখলে। নৃশংসপাতি, মৈশিনারীজ, কাঁচামাল বাবদ যে খরচ তার সঙ্গে মজদুরী যোগ করে মোট উৎপাদন খরচ ধরা হল। পক্ষ বিক্রয় হয়ে দাম পাওয়া গেল, দেখা গেল এক কোটি টাকা (ধরা যাক) লাভ হল। কোন একজন মালিক থাকলে এই এক কোটি টাকা থেকে হয়ত দশ লক্ষ টাকা সে গাড়ী-বাড়ী বিলাসবাসন পানভোজনে, খরচ করত, বাকী নব্বই লক্ষ টাকা নতুন কলকারখানা মৈশিনারীতে লাগানী করত। এই লাগানী থেকে যাতে আবার মনুসাকা উঠানো যায়, তার জন্যে তার দরকার বেকার সৃষ্টি করা।

কিন্তু যদি সমাজের মালিকানা থাকে তাহলে এই এক কোটি টাকা মদ্রনাফার একাংশ শ্রমিকের বুদ্ধি-রোজগার বাড়াবার কাজে স্ববহুত হইবে। প্রথমে তাদের হ্রস্ত অল্প মজদুরী বাড়বে, সামান্য সামান্য সর্বাধা হবে; কিন্তু বেশী ভাগ মদ্রনাফাই আবার নতুন কলকারখানা তৈরী করতে খরচ হবে। কত টাকা মজদুরী দেওয়া হবে, কত টাকা নতুন কারখানার লক্ষ্যী হবে, তা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং সরকার এক সঙ্গে বসে ঠিক করবে। তার জন্যে পরিকল্পনা রচনা করবে।

এবার যে নতুন কলকারখানা

হল, তাতে আবার ঠিক একই ভাবে
উৎপাদন হল উদ্ভূত হল এবং
আবার নতুন কারখানা হল। এবার
আর মানদুর্ভিক্ষ বেকার রাখার দর-
কার নেই কারণ মজুরীর হার ইউ-
নিয়ন মজুরদের সম্মতি নিয়ে
বেঁধে দিয়েছেন। মজুরী ক্রমশঃ
বাড়ছে, এবং সমস্ত দেশের শ্রমিক
কর্মচারীরা যা রোজগার করছেন
তার একাংশ পণ্যাবাদ খরচ কর-
ছেন অন্য অংশ সঞ্চয় করে ক্যাকে
রাখছেন। দেশের সবলোক যে খরচ
করছেন তা আবার পণ্যের চাহিদা
বাড়াচ্ছে। যেমন ধরুন জুতো বা
কাপড় এখন আমাদের দেশে যথেষ্ট
কেউই ভোগ করতে পান না। জন-
সাধারণের রোজগার বাড়লে, তাঁরা,
হেঁড়া জুতো বদলে নতুন জুতো,
হেঁড়া কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন
কাপড়গোপড় কিনতে চাইবেন।
আমাদের দেশে এখনও গ্রামের সব
লোক জুতো পরতে পান না, হেঁড়া
কাপড় পরেন। দেশের সবলোক
যদি এগুলো কিনতে চান তাহলে
যে বিপুল চাহিদার সৃষ্টি হবে,
তার জন্যে অনেক, অনেক কল-
কারখানা খুলতে হবে। অনেক

অনেক লোকের চাকরী হবে। এই পণ্য পরিবহন করার জন্যে রেল-লাইন, রেলগাড়ী, মোটর ট্রাক, ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ সংখ্যক প্রকার হবে, এগুলি চলানো, খোঁরামোছা পরিষ্কার করে চাল, রাখা, কাজে লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত হবে। এ ভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রতিমুহুর্তে অসংখ্য কাজের সৃষ্টি হবে, লোকের চাহিদা বাড়বে। সারা দেশের লোক যখন কাজ পায়, রোজগার করে, তখন তারা তা পণ্য কেনার জন্যে খরচ করে। সেই টাকা আবার পণ্যোৎপাদনে খাটানো হয় ক্রমবর্ধমান হারে। ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যের নিম্নম উঠে যাওয়ার ফলে জনসাধারণের ভোগব্যবধ খরচ এবং সমস্ত দই-ই-অর্থাৎ সমগ্র জাতীয় আয়ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরো বেশী উৎপাদন করার কাজে লাগে। অর্থাৎ উৎপাদনের সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর হয়ে যায়।

পুঞ্জিবাদী মালিক চায় সর্ব-
মুনাফা, তাই যে কবসায়
কম তাতে টাকা খাটায় না,
(শেবাংশ জটন পুতায়)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা-
চার্য সন্তোষ সেনের প্রশাসনিক
অদক্ষতা এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের উপাচার্য কে কে সেনের
হয় স্বার্থবিরোধী একরোখা মনো-
ভাবের ফলে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ই
অচলাবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে।
সন্তোষ সেন সম্পর্কে কিছু সংবাদ
দর্পণের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে।
কিন্তু ইতিমধ্যে কল্যাণী বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব-
শীল মহল থেকে গুরুত্বস্বপূর্ণ
অভিযোগ এসেছে।

একথা কারও অজানা নেই যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বহুদিন যাবত গণ্ডাগোল চলছে। ইদানিং তা চরমে। সাম্প্রতিক গণ্ডাগোলের সুদৃশ্যে ঘটে পুজার কয়েকদিন আগে। সে সময় পি জি এক নং হোষ্টেলে পাঙ্গা খারাপ থাকার ফলে প্রায় দশদিন ধরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা বান্ধা হয়ে যায়। অবশ্য একই পাঙ্গা পি জি এক নং এবং বেনিয়ান হোষ্টেলে জল সরবরাহ করা হত। ফলে মাঝে মাঝেই পাঙ্গাটি বিকল হয়ে যেত। দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এবং ছাত্ররা নিজেরাই পাঙ্গা চালানো ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা নিজেদের হাতে গ্রহণ করেন। তখন উপাচার্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উপাচার্য পি জি এক নং হোষ্টেলে পদলিখ পাঠান।

ঘটনার 'এখানেই' শেষ নয়।
ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে
দেওয়া হয়। এবং পুজোর ছুটির
পর এ ঘটনারই জের টেনে উপাচার্য
পি জি এক নং হোস্টেলের আবাসিক
রসায়ন বিভাগের তৃতীয়
বর্ষের ছাত্র দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এবং অনিল ঘোষালকে এক বৎসরের
জন্মো সাসপেন্ড করেন। তাছাড়া
কয়েকজন ছাত্রের সমস্ত রকম
অর্থনৈতিক সন্মোহন সন্মোহনা বাতিল
করে দেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদে প্রকাশ, শব্দমাত্র কলেক্‌জন ছাত্রকে সাসপেন্ড করেছেন তাই নয়, তৃতীয় বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্ররা তাদের পরীক্ষা সঠিক সময়ে গ্রহণের জন্যে দাবী জানালেও পদরো ক্লাসকে উপাচার্য সাসপেন্ড করে রেখে-ছেন। এর সঙ্গে বিহৃষ্কারের ঘটনাও রয়েছে। প্রায় এক বছর আগেকার একটি ঘটনার জেরে টেনে সমাজতত্ত্ব বিভাগের ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র পরিমল মজুমদারকে কলেজ থেকে বিহৃষ্কার করা হয়েছে।

এদিকে ছাত্রছাত্রীরাও কতৃ-
পক্ষের ছাত্র 'স্বার্থ' বিরোধী অগণ-
তান্ত্রিক কাজকর্ম মেনে নিতে
কিছুতেই রাজী নন। নানা কর্ম-
সূচীর মাধ্যমে এরা এখন বিক্ষোভ
প্রদর্শন করবেন। সব মিলিয়ে
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অরা-
জক অবস্থা। ইতিমধ্যে সশস্ত্র
পদাংশের আনাগোনাও শুরু হয়ে
গেছে। এবং কলেজের ছাত্রীদের
প্রতি এসব সশস্ত্র পদাংশের আচার
আচরণও তেমন সূবিধার নয় বলে
তীব্র বিক্ষোভ ক্রমশ সোচ্চার হয়ে
উঠছে।

শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত এমন দায়িত্বশীল অনেক ব্যক্তিই বলাছেন, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধু-মুদ্রাক পরিবেশে সমস্যা সমাধানের সহজ সূত্র উদ্ভাবন না করে উপাচার্য মহাশয় এবং তার পরিচালন কতৃপক্ষের সহকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র পুলিশ আমদানী করে সত্যিই কি বিজ্ঞোচিত কাজ করছেন ?

স্বাধীনতার চিহ্ন

অর্থনৈতিক কারণে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধছে

(বিশেষ প্রতিনির্ঘ)

নব্বাশিলী, ২৯শে অক্টোবর : ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলনের একটি চিরাচরিত দাবী—ভারত-বর্ষে সেনাবাহিনী সম্পর্কে ঊদাসীনি। উনিশশ ছেচল্লিশ সালে নো-বিদ্রোহ মূলতঃ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল; কোন সাংগঠনিক প্রস্তুতি বড় একটা ছিল না। পরে অবশ্য অন্যান্য দল সমেত কমিউনিস্টরা কাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বিদ্রোহের নেতৃত্ব কখনই তারা নিতে পারে নি।

পরবর্তী যুগেও, সেনাবাহিনীর কর্মচারীদের প্রতি কিছুটা অচ্ছন্ন—এই ভাব অবলম্বিত হয়েছে বাম-পন্থী আন্দোলনে। যেহেতু সেনাবাহিনীতে সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নেই, ভারতীয় রাষ্ট্র ক্ষমতার এই অঙ্গটি বহু বছর ধরে অবহেলিত হয়ে আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি মাদ্রাজে, মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের কয়েকদিন ব্যাপী এক সমাবেশে, অন্যান্য বহু সমস্যার সঙ্গে, সেনাবাহিনীর শ্রেণী চরিত্র ও সমস্যা নিয়ে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এবং তার উপর বিশদ আলোচনা

হয়। এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে এতদিন পরে এদেশের মার্কসবাদীরা এই উপেক্ষিত মানবগুণ সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছেন। আশা করা যায় নিকট ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা সবক্ষেণে বাম-পন্থীরা আরও সচেতন হবেন।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সৈন্যবাহিনীর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় সেনাবাহিনী স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমান বাহিনী মিলিয়ে পৃথিবীর প্রথম বৃহৎ চারটি সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি। অন্য তিনটি মার্কিন, চীন ও রুশ। এর ভরণ-পোষণের উপর আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করা হয়।

উনিশশ সাতচল্লিশ সালের পর, দেশরক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় সেনাবাহিনী নিয়োগ করা ছাড়াও, সম্প্রতি, দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা গণ-আন্দোলন দমন করার ব্যাপারেও সরকার সেনাবাহিনীকে ক্রমশই বেশী করে নিয়োজিত করেছে। গত দশ বছরে (উনিশশ একষাট থেকে উনিশশ সত্তর পর্যন্ত) কমপক্ষে চারশ ছিয়ান্ডর বার এরকম স্থাপারে সেনাবাহিনীর তলব হয়েছে। এছাড়া, নাগাল্যান্ড বা মিজো পাহাড়ে বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তো সদাসর্বদই সেনাবাহিনী মোতায়েন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সরকারের ক্রমশই সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভরতা বেড়ে চলেছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় যে, সেনাবাহিনীর ভিতরে বিক্ষোভও দানা বেধে উঠছে, মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে এবং উন্নতি লাভের, পথের সীমাবদ্ধতার জন্য। দুর্যোগ্যশোভা ভারতীয় বামপন্থী নেতৃত্ব সেনাবাহিনীর সবচেয়ে নিম্নস্তরের সৈন্য-অর্থাৎ জোয়ানদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফলে তাদের সম্বন্ধে কোন আবেদন সরকারের প্রতি করা কোন দিনই হয় নি বামপন্থীদের তরফ থেকে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকলেও অসন্তোষ তো আর চেপে রাখা যায় না। কিছুকাল পূর্বে দু-একটা জয়গায় স্বতঃস্ফূর্ত ছোটখাটো বিদ্রোহ ঘটে গেছে। সেনাবাহিনীর এক গোপন তথ্যপত্র থেকে জানা যায় যে উনিশশ পঁয়ষাট থেকে উনিশশ উনসত্তর পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কতপক্ষে ১৩২৬৭টি কোর্ট মার্শাল বা সেনাবাহিনীর নিয়মানুসারে শাস্তি বিধান করতে হয়েছে। এই শাস্তির রূপ ছিল

কোথাও কোথাও পদ থেকে অপসারণ বা কারাদণ্ড বা কখনও কখনও চোদ্দ বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

এই অসন্তোষ যাতে ব্যাপক অভ্যুত্থানে ফেটে না পড়ে, তারই জন্য সম্প্রতি সেনাবাহিনীর তিন অধ্যক্ষ-বিশেষ করে জেনারেল মানেকশ যিনি ধর্মপুত্র কুটনৈতিক রূপে এবং ব্রিটিশ মার্কিন শিবিরের অন্তর্গত বলে পরিগণিত, সরকারের কাছে এক গোপন দলিল পেশ করেছেন, সেনাবাহিনীতে কিছু পরিবর্তন এবং মাহিনা বৃদ্ধির সুপারিশ করে।

এই দলিল থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বার হয়ে আসে। ভবলে অবাক লাগে যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ঘেঁটা মেরুদণ্ড অর্থাৎ ইনফেন্টারি—তার সৈনিকরা সবচেয়ে কম মাহিনে পান। তাঁর মাহিনের বর্তমান স্কেল—চল্লিশ-দুই-ষাট টাকা। অথচ এই ইনফেন্টারির জোয়ানদের উপরই যে কোন যুদ্ধের সমস্ত বর্ডিক পড়ে। গত শ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় ইনফেন্টারির ৭৩.৫% হয় আহত বা নিহত হয়। জম্মু-কাশ্মীরে যুদ্ধের সময় এর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৯৫.২%। মিজো ও নাগা পর্বতে বিদ্রোহীদের দমনের কাজেও প্রায় ৯৫% ইনফেন্টারি হতাহত হয়।

ইনফেন্টারির জোয়ান ছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আর এক ধরনের কর্মচারী আছেন, যারা প্রচণ্ড অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করেন। এরা non-combatant বা বেসামরিক নিরস্ত্র কর্মচারী। আর কোন দেশে এমন কি পাকিস্তানেও সেনাবাহিনীর মধ্যে অর্থাৎ সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে—এই জাতীয় বেসামরিক কর্মচারী নেই। এ এক সামন্ততান্ত্রিক যুগের ঐতিহ্য এখনও চলে আসছে। এই বেসামরিক কর্মচারীরা অধিকাংশই নাপিত, মচি, মেথর, ইত্যাদি এবং এরা হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেও এদের অস্ত্রধারণের অধিকার নেই। শ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রায় চার হাজার পাঁচশ নন-কমবেটেন্ট প্রাণ হারান।

গোপন দলিলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দলপতির সরকারকে সাক্ষাৎ করে দিয়ে বলেছেন যে অবস্থা ক্রমশই সংকটাপন্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশের অন্যত্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে মাহিনে বাড়ানোর যে নজর সচিৎ হয়েছে, তার আঁচ ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও এসে লাগছে।

এই দলিলে এ কথাও বলা হয়েছে যে আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বে আকর্ষণ ছিল। উত্তর ভারতে, তা ক্রমশই কমে আসছে। পাজাব, হারিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে অধিকাংশ জোয়ান নির্বাচিত হত। সেনাবাহিনীর প্রতি এই সব অঞ্চলের কৃষক সন্তানের আকর্ষণের কারণ ছিল মূলতঃ দুটো। এক, আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ এবং এই সব অঞ্চলে অস্ত্রধারণ ও লাড়াই করার বংশ পরম্পরাগত ঐতিহ্য। আজকে তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব' বা গ্রীণ রেভলুশন হবার ফলে, উত্তর ভারতের অনেক কৃষক অন্ততঃ সৈন্যবাহিনীর সামান্য মাহিনে থেকে কিছু বেশী উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে। শ্বিতীয়তঃ, দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সৈন্যবাহিনী নিয়োগের ফলে, দেশরক্ষার যে সম্মান এতদিন সৈন্যবাহিনী অর্জন করত, তা অনেক পরিমাণে কমে গেছে। স্বদেশের মানব হত্যা করছে যে সৈনিক, তার নিকটজনের কাছে সে, অনেক হের।

এসবের ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নতুন যে সব জোয়ান নিযুক্ত হচ্ছে, তাদের মান নাকি আগের থেকে অনেক নিম্নের এইরকম একটা অভিযোগ করা হয়েছে উক্ত দলিলটিতে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে জোয়ান এবং নিম্নস্তরের কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ যদিও এই দলিলটিতে করা হয়েছে, সৈন্যধ্যক্ষরা কিন্তু মূলতঃ সুপারিশ করেছেন উচ্চস্তরের অফিসারদের অর্থাৎ লেফটেনেন্ট কর্নেল, কলনেল, মেজর, ইত্যাদিদের মাহিনে বাড়ানোর জন্য। দাবি করা হয়েছে যে এদের গ্রেড যেন আই.এ এস অফিসারদের সমপরিণ করা হয়।

সুতরাং স্পষ্টতই সেনাবাহিনীর বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মধ্যবিত্ত

উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী। জোয়ান বা নন-কমবেটেন্টদের দাবি পেশ করতে বড় একটা কাঁউকে দেখা যাচ্ছে না। ওপরতলার মন্ড্রিটমেন আমলাতান্ত্রিক দলপতির নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে সক্ষম। পাকিস্তান-বিরোধী যুদ্ধের আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে সরকারের উপর তারা যথেষ্ট চাপ দিচ্ছে। অথচ সেনাবাহিনীর যে অধিক সংখ্যক জোয়ান তাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

মজা হচ্ছে, দেশের বামপন্থী নেতারা, এমনকি যারা ভবিষ্যতে বিপ্লবের কথা চিন্তা করেন, তাঁরাও এই সৈন্যদের কাছে রাজনৈতিক প্রচার কোনদিন করেন নি, আজও করছেন না। তাদের অসন্তোষের রাজনৈতিক সুযোগ নিচ্ছে জনসংঘ প্রমুখ দক্ষিণপন্থী প্রতি-ক্রিয়ালীল দলগুণ। লোকসভা এবং জনসভার জনসংঘী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় জোয়ানদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সোচ্চার। স্বভাবতই সেনাবাহিনীর কিছু অংশে, বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে, জনসংঘের প্রভাব দেখা যায়। বছর কয়েক পূর্বে লাদাক ও অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলে লোকসভার সদস্যদের একটি দল যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির সদস্যরা তাতে ছিলেন এবং সীমান্তে প্রতিরক্ষারত সৈনিকদের কাছে বক্তৃতাও করেন। সবচেয়ে বেশী প্রশংসিত হয় জনসংঘের নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ীর বক্তৃতা।

অবস্থা কোন দিকে যাচ্ছে, ভারতীয় বামপন্থীদের বোঝা উচিত। সেনাবাহিনীর উপর তুলায় যদি ব্রিটিশ মার্কিন শিবিরের অন্তর্গত কিছু আমলাতান্ত্রিক অফিসারের নেতৃত্ব থাকে এবং নীচের তলার সৈনিকদের উপর জনসংঘের প্রভাব থাকে, তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতি-বিপ্লবের একটি নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দমদমে সন্ত্রাসের রাজত্ব

কলকাতা ও তার আশপাশ অঞ্চলে কলেজ নির্বাচনে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর হাত থেকে ছাত্রসংসদ দখল করার যে অভিযান ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস নামধারী কিছু ব্যক্তি চালিয়েছে, ইদানীং তা বৃদ্ধির দিকে। প্রতি-নিয়ত অভিযোগ আসছে, এরাই মধ্য কলকাতার কয়েকটি কলেজে সন্ত্রাস ও জোর জুলুম করে সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছে। এধরনের জোরজুলুম মধ্য কলকাতায় মারাত্মক রকমের বেশী হলেও শহরতলীর কিছু কলেজেও এরা আক্রমণ ক্রমশ কেন্দ্রীভূত করছে।

বিগত কিছুদিন ধরে দমদমের সমগ্র অঞ্চলে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের নামে একদল কুখ্যাত সমাজবিরোধী জনজীবন রিপার্সন করে তুলেছে। দমদম মতিবিস কলেজও এর আওতা থেকে বাদ যায়নি। অভিযোগ, দমদমের ছাত্র

ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রীকটু বসুকে ছাত্র পরিষদ ও কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত কতিপয় সমাজ বিরোধী গুরুতর ভাবে আহত করে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গত ছাব্বিশশে অক্টোবরও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। প্রায় পঞ্চাশজন সশস্ত্র সমাজবিরোধী এই কলেজের নেতৃস্থানীয় তিনজন ছাত্র এবং দমদম ছাত্র ফেডারেশনের তপন দত্ত রায়, মৃণাল ভৌমিক ও অন্য একজন সক্রিয় কর্মীকে প্রচণ্ডভাবে মারধার করে। এরপরে পুলিশের হাতে আহতদের তুলে দেয়। বহিরাগত এসব সমাজবিরোধীরা কলেজের ছাত্রসংসদের অফিসটিকেও বাদ দেয় না। কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে ও অন্যান্য জিনিসপত্র তছনছ করে প্রচুর ক্ষতিসাধন করার পরে তারা চলে যায়। পুলিশ সব জানে। কিন্তু কেউই ধরা পড়ে নি। বরং সমাজবিরোধীদের হাতে প্রহৃত তিনজন ছাত্র এখনও মর্জি পারানি।

বিধানসভা নির্বাচন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিভাগ, কলকাতার বহু সংখ্যক এক জি বি গণ্ডের নিয়োগ করেছে; মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাও থাই-ল্যান্ড ও আফ্রিকার কোন কোন দেশ থেকে কলকাতায় লোকজন বদলী করেছে। শোনা যায় এদের কেউ কেউ রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঘন ঘন যাতায়াত করছে এবং সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরে সংযোগ স্থাপন করেছে।

আর নির্বাচনের আতঙ্কে আনন্দবাজার গোষ্ঠী, যুগান্তর প্রভৃতি একবাক্যে রা তুসেছে যে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ঐক্যের সম্ভাবনা সদূরপরহত। এই বৃহৎ গোষ্ঠী পরিচালিত কংগ্রেসী সংবাদপত্রগুলি জানে কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী ঐক্য পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের নিশ্চিত পরাজয়ের গ্যারান্টি। সুতরাং ধীরে ধীরে সি পি আই বাদে আর সব বামপন্থী দল মোর্চা গঠনের ব্যাপারে আগ্রহী দেখে তারা প্রমাদ গুণছে। কোন কোন বামপন্থী দলের কট্টর সি পি আই বিরোধী নেতাকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং নতুন খোলা কলকারখানাতে উচ্চপদে নিযুক্ত করার শ্বব ইতিমধ্যেই কবল করা হয়েছে।

বর্ধমান চাঁদা আদায়ের জুলুম ও প্রণাসন

গত সপ্তাহে “যুগান্তর” পত্রিকার দেখিলাম মদের চাঁদা না দেওয়ার অপরাধে কলিকাতায় কয়েকটি সূতা ও চটের গদগদে সমাজ-বিরোধীরা আগুন লাগাইয়া সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। তাছাড়া বিভিন্ন শহরে ও গ্রামাঞ্চলের হাটে, গঞ্জে এইরূপ চাঁদার দাবীতে নানা রূপ অত্যাচার চলিতেছে। এ খবর বাজারী পত্রিকাদুলিতে প্রায় প্রত্যহই চোখে পড়ে। এখন প্রশ্ন, এই চাঁদা আদায়কারীগণ কাহারা? এবং কেনই বা ইহাদের স্পর্ধা এইরূপ দিনের পর দিন জনসাধারণের সহ্যের সীমা ছাড়াইতেছে? ইহার এক মাত্র কারণ দুইটি—প্রথমতঃ এই সকল সমাজবিরোধীরা বর্তমানে কংগ্রেস (শা) সমর্থনপুষ্ট, দ্বিতীয়তঃ প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা। এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত না দিয়া পারিতেছি না।

গত আটই অক্টোবর তারিখে বর্ধমান শহরে কালী পুজার চাঁদার অঙ্ক লইয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সহিত কালী ভক্তদের মনোমালিন্য ঘটে—ফলে কালী ভক্তের দল নানা রূপে শাসন ও অত্যাচারের ভয়

দেখায়। ইহাতে শহরের সমস্ত ব্যবসায়ীগণ স্বতকৃতভাবে এই অত্যাচারের প্রতিবাদে নয়ই অক্টোবর তারিখে শহরের সমস্ত দোকান বন্ধ করিয়া দেয় এবং স্বদলবলে বর্ধমানের জেলা শাসক মহাশয়ের নিকট ইহার প্রতিকারের জন্য দুইটি দাবী লইয়া (হয় প্রতিকার করণ, না হয় আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য দোকান বন্ধ রাখিব)

দিবেন।” এখন জনসাধারণ নিশ্চয়ই প্রশ্ন করিবেন ইহার অর্থ কি? কেনই বা জেলা শাসক মহাশয় ঐ বিশেষ ক্লাব চারিটির পুজার চাঁদার জন্য ব্যবসায়ীদের নিকট ওকালতি করিলেন? তাহলে কি এই বিশেষ ক্লাব চারিটির সভ্যগণ সকলেই “সভ্য-ব্রাহ্মণ”? এবং পুজা করিবার অধিকার কি কেবল এই বিশেষ ক্লাব চারিটিরই আছে? তা হলে

মতামত

উপস্থিত হয়। জেলা শাসক মহাশয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঢোক গিলিয়া জবাব দিলেন, “ঠিক আছে আপনারা নিশ্চিন্তে দোকান খুলুন, আমি কড়া ব্যবস্থা নিছি যাতে আর কোন দল জোর করে চাঁদা আদায় না করতে পারে” তবে তিনি বিশেষতঃ চারটি বৃহৎ সংঘকে এই আওতা হইতে বাদ রাখিয়া বলিলেন, “এই সংঘ ও ক্লাবগুলিকে আপনারা কালী পুজার চাঁদা

কি বর্ধমান শহরের অন্যান্য সংঘ বা ক্লাবের সভ্যগণ “অসভ্য শূদ্ৰ” (অবশ্য জেলা শাসকের মতে), তাহাদের কি পুজা করিবার কোন অধিকার নাই? উত্তর—আছে। পুজা করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

তবে বর্তমানে জনসাধারণের দৃষ্টি হইতে প্রশাসনের দৃষ্টি একটু আলাদা ধরনের। কারণ উক্ত বিশেষ চারটি সংঘ বর্ধমানের

কয়েকজন জাদিরেল কাসেমী স্বার্থান্বেষী দেবতাদের হাতের মন্দির মধ্যে এবং উক্ত সংঘগুলি বর্ধমানের কংগ্রেস (শা) সমর্থনপুষ্ট। ঐ সংঘগুলির বর্তমানে যাহারা সভ্য ও সমর্থক আছে বর্ধমানের প্রশাসন বিভাগ হইতে ইহাদের সাত খুন মাপ। এবং সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করিয়া যতগুলি অপ্রীতিকর ঘটনা কবসাদারদের সহিত ঘটিয়াছে সবগুলিতেই ঐ বিশেষ চারটি ক্লাবের সভ্যগণ জড়িত। জেলা শাসক মহাশয় ঐ ক্লাবগুলির জন্যই ওকালতি করিলেন।

নিজদের বাঁচাইবার জন্য যত গন্ডা, ওয়ানগন বেকার, ছিনতাইকারী ও খুনীরা উক্ত চারটি সংঘে ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস ও দাদাদের সমর্থনে পুষ্ট হইতেছে। এই সংঘগুলিই বর্তমানে বর্ধমান শহরকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই সমাজবিরোধীদের টাকা দিয়া পোশা বেশীদিন সম্ভব নয়। কমিউনিস্ট ঠেংগাইবার জন্য সমাজবিরোধীরা পুন্ডিশের সাহায্য পাইতেছে, নিজদের ডিউটি মত কমিউনিস্ট ঠেংগাইতেছে। এবং স্বাভাবিক ভাবে ওভার ডিউটি হিসাবে ছিনতাই, জোরপূর্বক মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করিতেছে। এমনকি কংগ্রেস সমর্থক বহু দোকানদার, সাধারণ মানুষও বিক্ষুব্ধ। কমিউনিস্ট প্রধান অঞ্চলগুলিতে পুন্ডিশী অত্যাচারের কথা তো অবগত। প্রশাসন এতদ্ব্যপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। যদিবা জনসাধারণের চাপে এক আধজনকে পুন্ডিশ গ্রেপ্তার করিতেছে, পরমহুত্বেই কংগ্রেসী চাঁদার তাহাকে থানা হইতেই মুক্ত করিয়া আনিতেছে।

বর্ধমানের জনৈক ব্যবসায়ী

গণতন্ত্রের মুখোমুখি থলে গেল

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিবর্তিত দালাল এবং অধুনা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বন্ধজোটের অংশীদার, প্রতিক্রিয়াশীল ইন্দিরা সরকার ভূয়া গণতন্ত্রের, মুখোমুখি হিঁড়ে ফেলে হিংস্র ফ্যাসিস্ত কান্দায় পশ্চিমবঙ্গের জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এই হিংস্র ফ্যাসিস্ত সরকার নিজদের শাসনব্যবস্থা ও ধনবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে বহাল রাখবার জন্যই যে সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার সাধারণ মানুষকে দিয়েছিল, সেটুকুও একমুহূর্তে কেড়ে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে রাই-ফেলের মুখে স্তম্ভ করে রাখতে চাইছে। হিংস্রতায় এরা হিটলারের নাজী বাহিনীকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হিটলার বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে মানুষ খুন করত আর এই সরকার থানা ও জেলাখানার মধ্যে বন্দী করে অসহায় নিরস্ত্র মানুষকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ধোঁলে ধোঁলে খুন করছে স্বপশাচিক ভাবে। নিজদেরই সৃষ্ট প্রশাসন, আইন, বিচার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিপ্লবীদের যেখানে পাচ্ছে সেখানেই নৃসংশ ভাবে গুলি করে মারছে। কিন্তু বিপ্লবীদের খুন করে বিপ্লব রোখা যায় না—এই খুনীরা তা জেনেও জানতে চায় না। সপ্তে সপ্তে শেত বাহিনীকে সংগঠিত ও অস্ত্রসজ্জিত করে লেলিয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে। সাম্প্রতিককালে কাশীপুরের নিষ্ঠুরতম গণহত্যার মধ্যে এই ফ্যাসিস্ত বাহিনী বীভৎস রূপ ফেটে উঠেছে। সেখানে তারা ভাইকে না পেয়ে মামাকে পিটিয়ে অস্ত্রান করেছে, তারপর সেই অস্ত্রান শরীরে রাজপথে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে আর হিংস্র পশুর দল সেই আগুনকে ঘিরে গোলা হয়ে দাঁড়িয়ে

বীভৎস উল্লাসে নৃত্য করেছে। এই অবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন—যারা এখনও ফেটন হাতে নিয়ে, গলার শিরা ফুলিয়ে রাস্তার রাস্তার চাঁকান করছে কাশীপুরের ঘটনা ফ্যাসিবাদের সূচনা তারা কি এখনও বন্ধতে পারছে না, নিরস্ত্র মানুষকে জমায়ত করে ডেউটিবলবের রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে? সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষের যুদ্ধ ঘোষণার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব চিত্র তো চোখের সামনেই রয়েছে। জনগণের শত্রু মর্জিবর রহমানের চক্রান্তে পূর্ব বঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষ কি কামানের খোঁরাকে পারিণত হননি? কিছু দিনের মধ্যেই এমন অবস্থা আসছে যে, রাস্তায় বেরিয়ে শাসক শক্তির বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে গেলেও গুলি খেতে হবে। তখন তারা কি অস্ত্র নিয়ে লড়বেন? কিন্তু অস্ত্র কোথায় পাবেন, সে প্রশ্নটি কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ শত্রুমাত্র অস্ত্র নিয়ে লাড়েনা, লড়ে সশস্ত্র শত্রুর বিপ্লবী রাজনীতি নিয়ে, সে রাজনীতি তারা গ্রহণ করেছেন কি? পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কি এখনও ভেট-রাজনীতির কানাগলিতে আবদ্ধ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ইন্দো-নেশিয়াল পরিণত হতে দেবেন, না বিপ্লবী রাজনীতির সশস্ত্র ন্যায়-যুদ্ধের কর্মসূচী গ্রহণ করে এশিয়ার বৃকে আরেকটি ভিয়েতনাম সৃষ্টি করবেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল স্বত্ব-বাজদের যুদ্ধের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দেবেন?

সত্যোৎকৃষ্ট রায়

নোয়াপাড়ার বিভীষিকার রাজত্ব

দীর্ঘ এক বৎসর ধরে সমগ্র নোয়াপাড়ার বৃকে পুন্ডিশ সি আর পি ও সমাজ বিরোধীদের প্রত্যক্ষ আক্রমণে এক বিভীষিকার রাজত্ব কাসেম হস্তেছিল, জনজীবনে নেমে এসেছিল এক চরম বিপর্যয়। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষেরা রাতের অন্ধকার তো দূরের কথা প্রকাশ্য দিবালোকেও প্রাণ হাতে করে চলাফেরা করত। আজ কিছুদিন হল মাকসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ও গণতান্ত্রিক মানুষের কার্যকরী প্রচেষ্টার ফলে এলাকার পনরার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে গত উনিতিশে অক্টোবর ভোরবেলায় পলতার সেবাগ্রাম ও আমবাগান কলোনীতে নোয়াপাড়া থানার নেতৃত্বে এক বিরাট সি আর পি বাহিনী সাধারণ নরনারীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তাদের এই বর্বরোচিত আক্রমণের হাত থেকে মহিলারাও রেহাই পায় নি। উষারাগী কর্মকার, গীতা কর্মকার, নরেন শর্মার স্ত্রী ও ষাট বছরের বৃদ্ধা মা ও নরেন দাসের বৃদ্ধা মা সি আর পি ও পুন্ডিশের প্রহারে গুরুতর রূপে আহত হন।

পুন্ডিশদের উপর আক্রমণের চেহারা ছিল আরও বীভৎস। আক্রমণের বীভৎসতা মধ্যযুগীয় প্রথার চেয়ে দানবীর ছিল। প্রচণ্ড প্রহারের ফলে অনেকে গুরুতর আহত হন। একজন মহিলা সমেত মোট তেইশ জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গিয়ে থানার মধ্যেও তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। আহতদের বহুদুশ পর্বন্ত কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা

করা হয়নি। প্রচণ্ড প্রহারের ফলে অমর গাঙ্গুলী, জীবন ঘোষ ও অরুণ দাস সজ্জাহীন হয়ে পড়েন। এখনও তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সি আর পি আমবাগানে সাত-আটটি ঘরের দরজা জানালা ভেঙে চরমার করে ও দশ-বারোটি ঘর তছনছ করে। এমনকি ফিরে যাবার সময় সি আর পি সূচোতা শর্মার বাড়ী থেকে চারটি আঁটি, একটি হার ও ছয়শত চৌষটি

টাকা লুট করে নিয়ে যায়। ফলে মানুষ ঘৃণা ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সমগ্র পরিস্থিতি দেখে মনে হয় এদেশে কোন সভ্য সরকার নেই। সাধারণ মানুষকে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই, সি আর পি মিটিটারী ও পুন্ডিশ নিয়োগ করা হয়।

বামিনী সাহা

বৈদ্যপুরে সন্ত্রাসের রাজত্বের কথা সত্য নয়

গত পনেরোই অক্টোবর দুর্গার মতামত বিভাগে প্রকাশিত “কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব” সম্বন্ধে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কিছু বক্তব্য রাখিতে চাই। আমি বৈদ্যপুর নিবাসী ও রাজরাজেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষিকা। নিম্নমিত বিদ্যালয়ে বাই। আমি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানাই, সেদুপ কোন সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয় নাই যাতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাতায়াতে কোনরূপ বিঘের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ণিত ফ্যান্সী ক্লাবের সভ্যবৃন্দ দ্বারা কোনরূপ নারী নির্যাতন বা নারীদের প্রতি অশালীন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়ে নাই। সভ্যবৃন্দের দ্বারা যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলিতেছে বলিয়া লেখিকা মন্তব্য করিয়াছেন তাহাঁত অবগতির জন্য জানাই যে বৈদ্যপুরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অকাতত রহিয়াছে। দোকান, বাজার, বিদ্যালয়, বসচলাচল সব কিছুই স্বাভাবিক নিয়মেই হইতেছে। সম্প্রতি

জামালউদ্দিন নামে যে বৃহৎকটি নিহত হইয়াছে কাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ ছাড়াই লেখিকা মন্তব্য করিয়াছেন। বৈদ্যপুরের পোষ্ট অফিস ইহাদের কুক্ষীগত, চিঠিপত্র নিয়মিত বিলি হয় না ইহার কোন প্রমাণ নাই। কারণ এ সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যক্তিগত এবং বৈদ্যপুর নিবাসী জনসাধারণের কোন অভিযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ নিয়মিত চিঠিপত্র আদান প্রদানে কোনরূপ অস্বাভাবিকতা আমার চক্ষে পড়ে নাই। আরও জানাই ফ্যান্সী ক্লাবের সভ্যবৃন্দ ছোরা, পাইপগান সহ প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরিয়া বেড়ায় এই উত্তির সত্যতা থাকিলে সেখানকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কিরূপে অব্যাহত থাকে? সতরাং জনৈক ভদ্রমহিলা পরিবেশিত সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

জনৈক শিক্ষিকা

ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের আন্দোলন প্রসঙ্গে

তামস গুপ্ত

যুব কংগ্রেসেরও যুব ও ছাত্র সংগঠন ছিল, যুব কংগ্রেসগুলিরও আছে। তফাৎ এই যে যুব কংগ্রেস বলতো ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়, আজকের এরা তা বলেন না, উপরন্তু অনাগামী যুব ছাত্রদের রাজনৈতিক ভিটামিন খাইয়ে এমন চাপা করে তুলেছেন যে তারা ধরাকে সরাসরি দেখছে। নব কংগ্রেসের “নবত্ব” তার পার্টি কর্মসূচীতে নেই, আছে তার আধা ফ্যাসিস্ট গোছের এই দুটি সংগঠনে যারা গান্ধীবাদেও বিশ্বাসী, কল-প্রয়োগেও বিশ্বাসী। ওদের এককালের নেতা শ্রীমতী আভা মাইতির লাজনার দাগ-মুহুরে না মুহুরেই তেরোই অক্টোবরের হরতালকে কেন্দ্র করে যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ প্রমাণ করেছে যে মুখে তারা শাই বলছে অহিংসার ওদের আস্থা নেই, আইনের প্রতিও তাদের আস্থা নেই, লোকের চাকুরী খাওয়ার তারা পিছ পায় নয়, এমন কি ছাঁটাই ইত্যাদির তারা স্বপক্ষে। সুশীল খাড়া প্রদর্শিত পথ ধরে তারা চেয়ার দখল মারফৎ “সমাজতন্ত্র” কামের করবেই। তাই হরতালের দিন তারা নিজেদের হাতেই যাবতীয় আইন ভুলে নিয়ে সরকারী অফিসে ঢুকে ফাইল খেঁটেছে, ব্যাঙ্ক জালা মেরেছে, তালা খুলে বস-পূর্বক অফিসে ঢুকেছে, বাড়ী থেকে ছপোষা কর্মচারীকে ধরে নিয়ে এসে ডাকঘর চালু করেছে, এমন কি সংরক্ষিত এলাকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ঢুকেছে, চাবি কেড়েছে, হরতাল সমর্থক মিছিলে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছে, দোকান খোলবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করেছে এমন সব ঝাঁঝালো খবর ওদের পরিচয় দর্শনীয় স্থানে মর্দিত হয়েছে। গানের জোরের বিচারে যে ওরা খুব পালোয়ান তা নয়, তবে প্রশাসনসহ পদলিখ, মিলিটারী, কার্ফি, একশ চুয়াশিশ ধারা, সংবাদপত্র, রেডিও যখন মনত দেয় তখন পালোয়ানী করায় সুযোগ ছাড়বার মত গণ-দরদী আর যেই হোক ওরা নয়।

এসব কথা নিছক নিন্দাবাদ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হতে পারে। তাই সাধুবাদ দেওয়ার কোন যুক্তি আছে কি না দেখা দরকার। যেহেতু ওরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রুতায় লিপ্ত তাই দেশবাসীর কাছে এই দিল্লীর চরদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়া দরকার। ওরা এক গভীর ষড়যন্ত্রের সাক্ষরদ। কি এবং কেন এই ষড়যন্ত্র, কারা তার সংগঠক, কি চায় ওরা, কার জন্যে, দেশ গঠনের সঙ্গে এদের কোন যোগ আছে কি না, ওদের ভবিষ্যৎ কিছ, আছে কি না—এসব একবার বিচার করাই ভালো।

তেরোই অক্টোবর ওদের মহান উদ্দেশ্য ছিল—হরতালভাঙা যা এতদিন ছিল পদলিখের কাজ। যে হরতাল, ধর্মঘট, বিক্ষোভ, সভা-সমিতি গণতন্ত্রের অপরিহার্য ও সর্বজনস্বীকৃত অঙ্গ, সেই সবে, ওপর আঘাত হানা, হামলা করার অর্থ গণতন্ত্রের উচ্ছেদ। নিজেরা করলে হরতালে ওদের অর্দ্রাচি নেই। জনৈক যুব নেতার হত্যার বিরুদ্ধে তারা তো বিনা বাধায় “কলকাতা বন্ধ” করেছিল এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দাবীও ছিল বাহাস্তর ঘণ্টার মধ্যে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। ষড়যন্ত্র খুবই পরিষ্কার। সর্ববিধ উপায়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে খতম কর। ষড়যন্ত্র এই জনক যে প্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত মূল জনতার সঙ্গে ওদের কোন যোগ নেই, নীতির কোন বালাই নেই, মিল নেই কথার সঙ্গে কাজের, জনহিত-কর আন্দোলন একটাও এরা অদ্যা-বধি করে নি, করার কোন কথাও ওদের সদৃশ্যে ঘোষণাগুলিতে নেই। কেন এই ষড়যন্ত্র?

বৃহৎ বুদ্ধোন্মাদা চালিত বুদ্ধোন্মাদা জমিদার রাষ্ট্র আজ দারুণ সংকটের মুখে। পট বণ্ড ও কেরালায় গড়ে উঠছে দুর্বীর গণ আন্দোলন। অন্যান্য রাজ্যে ওদের দলীয় কোন্দল ও দুঃস্থ জনসাধারণের অসন্তোষ-ধুম্রমান। এমতাবস্থায় যদি পশ্চিমবঙ্গে এগিয়ে যায় সারা ভারতে জ্বলবে উঠবে দাবানল। পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে শৈশবের স্বর্ণ সিংহাসন। সংকটের যাবতীয় দুর্গতি গরীব জনসাধারণের ঘাড়ে চাপতে না পারলে মনোফার পাহাড় উচু হবে না। কিন্তু সংকটের মর্জাই এই যে প্রচলিত পথে আর তা হচ্ছে না। কাজেই মতটাকে ঠিক রেখে পথটাকে কিছু বদল করা দরকার। উনিশশ বার্বাট থেকেই পথ বদলের চিন্তা কংগ্রেসে ঢোকে। একদল বলে, চালাও চাবুক, বন্দী করো, মেরে ফেল ওই সব গণ-আন্দোলনের কর্মী ও নেতাকে, চূর্ণ করো ওদের সংগঠন এবং এক্ষণি। অপর দল বললো, অবশ্যই, কিন্তু এক্ষণি নয়। ভেঁক না হলে ভিখ মেলে না। ভেঁকখারণের একটু সময় চাই। এই প্রশ্নে কংগ্রেসে ভাঙান ধরলো। বুদ্ধোন্মাদা জমিদার স্বার্থের চতুর রক্ষক হিসেবে ইন্দিরা কংগ্রেসের জন্ম হোল। “সমাজতন্ত্র” ও “গরীবী হঠাৎ” এর ভেঁক বেশ বৃহৎই বলে গত লোকসভা নির্বাচনে প্রতিপন্ন হোল। এবং অচেনা রক্তের নিরে যুব কংগ্রেস, ছাত্র-পরিষদ রাজ-নৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হোল। গণ আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ বিনিময় শোষণশ্রেণীর অধিকার কুঠুরীতে ওদের আসর। আসরের প্রথম,

শ্রিতীয়, তৃতীয় এবং শেষ পাঠ ষড়যন্ত্র, যেনতেন প্রকারে গণ-আন্দোলনকে খতম কর। তথা-কথিত এই যুব ছাত্রদের সংগঠক কামের স্বার্থের সেবক তো বটেই। তার সঙ্গে আছে সি পি আইয়ের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাটুকারিতা। কোন কোন বামপন্থী ভেঁকখারী নেতা এদের সঙ্গে রাজনৈতিক কালোবাজারীর অংশীদার। এমন যখন সোনার সোহাগা, তখন বিদেশী চররাও চপচাপ থাকবে কেন? তারাও আছে। হতাশয় হত্যোদ্যম কিছু যুবক, কিছু ভাগ্য-বেষী, নকশালী নামধারী কিছু অধঃপতিত হঠকারী ইনামলোভী কিছু সুদ্বিধাবাদীরা এসে ভীড় জমিয়েছে ওদের আসরে। ওদের বাগাড়ম্বর বিদ্রান্ত হয়ে, চাকুরী করে দেবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে কিছু সং যুবকও আছে। আর আছে পূর্বনো ঝাণ্ড কংগ্রেসী ও আমলা-দের সন্তান, যারা পিতাদের কলঙ্ক ঢাকতে, কিংবা নিজেদেরই আত্ম-কলহে বর্ধিত আয়ের সুযোগ হারিয়ে ক্ষিপ্ত হয়েছে।

কিন্তু তর্কের খাতিরেও ওদের দাবীগুলির সারবত্তা বিচার করা যাক। ওরা বলে, (এক) বেকার-দের চাকুরী, দিতে হবে, স্থানীয় যুবকদের চাকুরী দিতে হবে, ওভার-টাইম তুলে দিয়ে নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে। (দুই) বাসে ট্রামে ছাত্রদের (যুবকদের নয়) কনসেশন দিতে হবে (তিন) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের জন্য গণ অনশন করতে হবে, (চার) সরকারী কর্মচারীদের ওদের জেহাদ মাফিক হাজর করতে হবে, নতুবা চেয়ার দখল (পদলি-শরা কেন নয়-তার ব্যাখ্যা পদলিখের একাংশের সঙ্গে বসেই তো এসব ঠিক করা হয়) (পাঁচ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, শিক্ষক-দের মার্স পরম্পা বেতন, জাতীয় ইতিহাস পড়তে হবে।

মনে হতে পারে এসব তো ভারী জনহিতকর। কিন্তু তা যে নয়; বরং বিপরীত একটা চিন্তা করলেই বোঝা যাবে।

এই “হবে হবে” গুলো হবে না জেনেই বলা। নইলে, বাহাস্তর ঘণ্টার মধ্যে অজয়কে পদত্যাগ করতে হবে বীরভূমে মিলিটারী পাঠাতে হবে যেমন বলা তেমনই হয়ে গেল। আর এই পাঁচদফাটা হচ্ছে না কেন? তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায় হবেও তাতেও সমস্যার এক কণাও ঘুচবে না, বরং জটিল হবে। তবু দাবীগুলো করা হয় তিনটি কারণে—(এক) জনমতকে খোঁকা দেওয়া (দুই) সমস্যার প্রকৃত সমাধানে বাধা দেওয়া (তিন) আত্মকলহ লাগিয়ে দিয়ে নেপোর দই মারা।

কাজ বা চাকুরী কোথায় হয়? জমিতে, কলকারখানায়, কুটির-শিল্পে। ভূমিহীনদের জমি দেও-য়ার কথা, বেনামী জমি দখলের কথা ওরা ভুলেও বলে না। “চেয়ার দখলে”র এই বীরপদগবগণ বেনামী জমি দখলের বেলায় অত লক্ষ্য পান কেন? কেন তখন “আইন মাফিক”? জমি বন্টনের ধরা তোলায়? চেয়ার দখলের সময় তো আইনকে কাঁচকলা দেখাতে এরা অভিজ্ঞ। এরা ভুলেও বলে না বন্ধ কারখানা খুলতে হবে, নতুন কারখানা খুলতে হবে এবং তার জন্য ফি বছর কেন্দ্র পশ্চিম-বঙ্গের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যে চার শতাধিক কোটি টাকা নিয়ে যায় তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ রাজ্যকে দিতে হবে। তখন ওরা বলে, ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ (অর্থাৎ কেন্দ্রকে কিছু বললে কান মলে দেবো), ওভার টাইম তুলে দিয়ে নতুন লোক নিতে হবে। ওভারটাইমের ওপর এত চোট কেন? মালিকগণ খরচা কমাতে, ছাঁটাইয়ের পথ সুগম করতে, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের শাস্তে করতে ওটা না হয় চাইতে পারেন, কিন্তু বেকার যুবক তা চাইবে কেন?

ওভারটাইম যারা খাটে তারা পেটের দায়েই খাটে—দুটো বাড়তি পয়সা পেলে হয় তো বেকার দুটো ভাইয়ের ইন্টারভিউয়ের রাজ খরচাটা উঠবে। এক নাগড়ে বারো চোদ্দ ঘণ্টা কাজে বন্দী থাকা সখের ব্যাপার নয়, নির্ভরশীল পোষাদের মুখ চেয়েই করতে হয়। সেই ওভার টাইম তুলে দিয়ে বেকার-দের কাজ দিতে হবে। না হয় হোলই কিন্তু ক’ গন্ডা চাকরি ওতে, হবে এবং কোন বেকার তা পাবে? ওরা তো বলে না প্রমিক-কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীল পোষাদের সেই চাকুরী দেওয়া হোক। ওরা হয়তো ধর্মপত্র সেজে বলবে যে একই পরিবারের দুজনের চাকরির চেয়ে যে পরিবারে একজনও নেই, তাকে দেওয়াই ন্যায় ধর্ম। অর্থাৎ আর্থ-পেটের অধিকার না হয় পেতে পার, পুরো পেট চাইলেই “হাতুড়ী দখল”। এতই যদি ওরা ন্যায়পরায়ণ তবে ছাত্রদের বাস কনসেশন চাইছে, বেকার যুবকদের কেন নয়? আসলে শয়তানের ছেলের অভাব হয় না। বেকারীরোধে এই হাতুড়ে দাওয়াই দিয়ে ওরা বেকারদের বিদ্রান্ত করতে চাইছে মূলত এই উদ্দেশ্যে যে প্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে তাদেরই আত্মীয় অথবা নির্ভরশীল পোষা বেকারদের সম্বন্ধ বাঁধিয়ে ছাঁটাই, লক আউটের পথ প্রশস্ত করা।

গণতন্ত্র অধিকার রক্ষার দাবীতে হরতাল হলে ওরা চেয়ার দখলের দাওয়াই বাতলায় অর্থাৎ বলপ্রয়োগ, কিন্তু দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধের বেলায় নির্মল অনশনের পবিত্র অহিংসা। মূলটুল্যের ব্যাপারে টাকার খেল আছে; তাই টাকাওয়ালাদের জন্য ওদের নরম পন্থা আর ইউনিয়ন ভুক্ত প্রমিক কর্মচারীদের বেলায় গরম পন্থা। বেনামী জমি দখলের বেলায় ওরা আইনভুক্ত, চেয়ার দখ-

লের বেলায় আইনশৃঙ্খলা। হরতাল ও গণ-আন্দোলন চূর্ণ-করার সময় ওরা সশস্ত্র, কেন্দ্রের কাছে মাত্র দু কোটি টাকা নিয়ে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালুর ব্যাপারে ওরা নিরস্ত, ইন্দিরা কী জয়! অর্থাৎ কেন্দ্রকে কিছু বলা হবে না অর্থাৎ শিক্ষাটিকার তা হলে দরকার নেই। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধের বেলায় তো ওরা গদ্যম দখল বলতে পারতো, কিন্তু বলবে না, কারণ মজুতদার, কালোবাজারী, পুঁজিপতি জমিদার ছাড়া তো অন্যের গদ্যম নেই। এদের কাছে জাতি বলতে যে মর্দুইয়ের মনোফা-খোর এতে আর কি সংশয় থাকতে পারে! এরা আবার কোন মুখে জাতীয় ইতিহাসের কথা বলে? ঘেরাও বৈআইনী বলে ওদের পরা-মর্দাতারা যুক্তফ্রন্টের আমলে খুব হৈ চৈ করেছিল, আজ রাজ্য পালের আমলে অফিস তছনছ, চেয়ার ভাঙাটা ওদের কাছেই বৈধ করণ এসব তো গরীব মধ্যবিত্তদের জীবিকা।

ওদের দাবীগুলির পরস্পর বিরোধিতা আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এখন জিজ্ঞাস্য—কংগ্রেসী যুব ছাত্রগণ পশ্চিমবঙ্গের হয়ে মাতব্বরী করে কোন অধিকারে? স্বচ্ছন্দে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে ওরা সারা পশ্চিমবঙ্গে যুব ছাত্র সমাজের মূল প্রতিনিধি নয়।

এখন জিজ্ঞাস্য—(এক) ব্রক প্রতি একশ করে চাকুরীর কি হোল? (দুই) পশ্চিমবঙ্গকে দিল্লীর উপনিবেশ করার ষড়যন্ত্রে ওরা লিপ্ত না থাকলে রাজ্যের ন্যায় দাবী কেন উচ্চারণ করছে না, অথচ স্থানীয় যুবকদের চাকুরী বলার সময় ওরা দিব্য স্থানীয় প্রেমী? (চার) পদলিখের সঙ্গে এত দহরম মহরম কেন? (পাঁচ) চেয়ার দখল, তালা মারা ভাঙা, ধরে আনা ওরা চালাতে পারে, জীবিকার স্বার্থে অন্যেরা কিছু করতে পারে কি না? (ছয়) যাদের কথায় বাহাস্তর ঘণ্টার মধ্যে মন্ত্রিসভা যায়, একটি জেলায় মিলিটারী ছোটে, তাদের কথায় তাদেরই অন্য-দাবীগুলো (হাফ কনসেশন, ইত্যাদি) পূরণ হয় না কোন কারণে? (সাত) সংবাদপত্র অফিস ও রেডিও অফিসের চেয়ারগুলো তো নিরাপদ?

আর একটি লক্ষণীয় বিষয়—নকশাল হামলা যখন পড়তির মুখে ঠিক তখনই কংগ্রেসী যুব-ছাত্রের হামলা বাড়তির পথে। উভ-য়েই হামলা বিশারদ, নির্বাচন-বিরোধী। উভয়েরই চক্ষুশূল গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ও নেতা। উভয়েরই পিঠ চাপড়ায় সিঁস্বার্থ কোং, যুগান্তর, বসুমতী, আনন্দবাজার, আকাশবাণী। উভয়ের দাবীগুলিও সমগোত্রীয়—যখন ধরা সমাজের গণে হাত নয়, মাছি মারতে কামান দাগা (স্কুল পোড়ানো, অফিস হামলা, স্বামী-স্ত্রী দুজনের (শেবাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

ভারত দর্পণ

উত্তর পূর্ব প্রদেশীয় পুনর্গঠন বিল কেন

(দপ্তরের পূর্ববর্তক)

সংবাদটী নিশ্চয়ই পাঠকদের নজর এড়ানি, কারণ বহু সংবাদ-পত্রগুলি প্রথম পৃষ্ঠায়ই খবরটা ছেপেছে।

আধা ফ্যাসিস্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পল্লিশ লক আপে জনৈক ভারতীয় শিক্ষকের মৃত্যু সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করবার ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করেছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে সাতাশে অক্টোবর বৃহস্পতি, জোহান্সবার্গ শহরের পল্লিশের সদর দপ্তরে। মিঃ আহমেদ তিমজ বলে গ্রিশ বছর বয়স্ক জনৈক ভারতীয় শিক্ষকের পল্লিশের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে দপ্তরের দশতলা থেকে তার মৃতদেহ ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। মিঃ মহম্মদ ইউসুফ বলে জারেকজন একুশ বছর বয়সের মোডিকেল ছাত্রকেও পল্লিশের দপ্তর থেকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখা যায়। তার সর্বাপেক্ষা ক্ষতিবিক্ষত এবং সে প্রায় অর্ধশতাব্দির মত আচরণ করেছে। ইউসুফের পিতার আবেদন ক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা সুপ্রীম কোর্টের জজ মিঃ সি

মাগো বলেছেন, “পল্লিশের বিরুদ্ধে এধরনের নৃশংস আচরণের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যাচ্ছে এবং এগুলো যে সত্য, তা ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে”। তিনি অবিলম্বে ইউসুফকে তার পিতা কর্তৃক নিহত ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ দেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের পশ্চিম-বঙ্গের পল্লিশ প্রশাসন ও বিচার বিভাগের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

ফ্যাসিস্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবিপ্লবী, সারা পৃথিবীর জনগণের ঘৃণ্য ভেরণ্টার সরকার যে ভাবে ভারতীয়দের প্রতি পল্লিশী নিষেধন চালাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন আমলে তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নিষেধন হচ্ছে না। সি পি এম অথবা নকশালপন্থী নাম দিয়ে কত তরুণকে থানার পিটিয়ে অথবা গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে তার তো সীমাসংখ্যা নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার অস্তত্য একজন বিবেকবান বিচারক রয়েছেন যিনি শাসন বিভাগের এই জঘন্য অত্যাচারের তদন্ত করবার নির্দেশ দিয়েছেন। সমগ্র মানবজাতি এই বিবেকবান বিচারককে সাধুবাদ জানাবে।

আমাদের দেশেও হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট রয়েছে। জনগণের আইনগত দৈহিক নিরাপত্তার অধিকার আমাদের সাংবিধানিক অধিকার; কিন্তু শাসন কর্তৃপক্ষের অভিসন্ধিমূলক জনবিরোধী কার্যকলাপের ক্ষিপ্রস্থে সংবিধানের দেওয়া অধিকার রক্ষার পক্ষে কোন বিবেকবান বিচারক এভাবে আবির্ভূত হবেন আশা করা কি দুরূহ?

সংবিধানে দেওয়া অনেক ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবহার করে চলেছেন, রাজ্যগুলির ক্ষমতাসংকোচন করার জন্যে। সংবিধানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, শ্রম বিরোধ সালিশী প্রভৃতিও রাজ্য সরকার-গুলির এজিয়ারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের সমস্ত ধারা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পদদলিত করে ক্রমাগত রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন। অথচ, ভারতীয় সংবিধানে এই দেশকে ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গরাজ্য-গুলির ইউনিয়ন বা সমবায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শব্দ তাই নয় ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে একযোগে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলির উপর। অথচ

কেন্দ্রীয় সরকার বারে বারে রাজ্য বিধানসভাগুলির সার্বভৌম অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে অনেক বিধানসভাকে খেলাসখদশীমত বারে বারে বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য বিধানসভাগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও লোকসভা সদস্যদের পনেরার নির্বাচনে দাঁড়াতে বাধ্য করতে পারে না। সংবিধানকে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট ভাবে ব্যবহার করে এভাবে সংবিধান ও সংসদীয় গণতন্ত্রকে জনসমক্ষে হাস্যাস্পদ ও তুচ্ছ করে তুলেছে। যে সংবিধান আপন ক্ষমতাবলে অত্যাচারী পীড়ক সরকারের হাত থেকে জনগণের দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তা দিতে পারে না, তার প্রতি আহ্বার মনোভাব না থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়।

আসাম বিধানসভায় তাই ঝড় উঠেছে। এতদিন আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর নেফা প্রভৃতি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের সদস্য ছিল, অন্যান্য সদস্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা।

শেষোক্ত তিনটী রাজ্যে নব কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি জনগণের মনোভাব এতো বিরূপ যে বিহারে নব কংগ্রেসকে একটা জোড়াতালি কোয়ালিশন চালাতে হচ্ছে, উড়িষ্যায় নব-কংগ্রেস ক্ষমতাহীন এবং পশ্চিমবঙ্গে জোর করে নির্বাচন বন্ধ করে রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে দিয়ে বঙ্গবাহীন অত্যাচার নিপীড়নের স্রোত বইয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার তাই এই রাজ্যগুলিতে ক্ষমতা ফিরে পাবার বিশেষ ভরসা করতে পারছে না। আর এই তিনটী প্রধানতঃ কংগ্রেস বিরোধী রাজ্যের সঙ্গে থেকে বিভিন্ন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে বিরোধে, আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরাও এই তিনটী রাজ্যের সঙ্গে প্রায় একমত হয়ে চলেছে। ক্রমে গোটা পূর্বাঞ্চলই নবকংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবহীন হয়ে পড়তে পারে। অথচ সারাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল হল এই কর্ণাট রাজ্য। এখন ভারতের সমস্ত লোহা, কয়লা, জিপসাম, বক্সাইট, প্রায় সমস্ত খনিজপদার্থ, বনসম্পদ, প্রধান বন্দর, ও নদীমালার মোহানা। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চলও বটে।

কংগ্রেই ভারতের নব কংগ্রেসী সরকার আসাম রাজ্যকে খণ্ড খণ্ড করে ও ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম ও অরুণাচল (নেফা) কে নিয়ে একটী উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ গঠন করার প্রস্তাব করেছে। আসলে নাগাল্যান্ড হল আসামের প্রাক্তন কোহিমা জেলা, লোক সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কিছু বেশী, মেঘালয় হল আসামরাজ্যের প্রাক্তন খাস ও জয়ন্তিয়া হিলস ও গারো হিলস জেলা দুটী, লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ, মিজো হিলস জেলা, লোক সংখ্যা তিন লক্ষের সামান্য বেশী, বাকী ত্রিপুরা লোক সংখ্যা পনের লক্ষ

ও মণিপুর লোকসংখ্যা দশ লক্ষের সামান্য বেশী এবং অরুণাচল প্রাক্তন আসামের শাসনবিহীন অঞ্চল (এক্সক্লুডেড এরিয়া) আবার ও মিশরিম হিলস প্রভৃতি এখানকার লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লাখ।

অর্থাৎ আসামকে খণ্ড খণ্ড করে তার জেলাগুলিকে রাজ্য বানিয়ে, সবরাজ্যের জন্যে একজন রাজ্যপাল (বা বহু রাজ্যপাল), একটী মাত্র হাই কোর্ট এবং আসাম মেঘালয় ও ত্রিপুরা মণিপুরের সাধারণ জেলা ও মহকুমা অফিসার থাকবেন। গোটা ক্যাপারটাই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য রিস্তারের লালসা থেকে উদ্ভূত বলে আসামের অধিবাসীরা মনে করছেন।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলে নব কংগ্রেসী মহলও আতঙ্কিত। আসাম বিধানসভার ঝড় এরই পূর্বাভাস।

সংবাদের প্রতিবাদ

গত দশই সেপ্টেম্বর তারিখে দপ্তরে প্রকাশিত “রিলিফ ফন্ডের টাকা তছরূপ” শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদে জনৈক পত্রলেখক জানিয়েছেন যে উক্ত সমিতির প্রীোগোপাল চন্দ্র কুমার অতীতে কেন্দ্রীয় কনট্রাক্টর ছিলেন না; এমনকি তার পরিবারেরও কেউ কখনও কনট্রাক্টর ছিলেন না। প্রতিবাদকারী আরও জানিয়েছেন যে, বিগত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে গঠিত উপরোক্ত সহায়ক কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি বহু দলের প্রতিনিধিই যোগদান করেন। বাংলা কংগ্রেসের প্রীঅজয়-কুমার মুখোপাধ্যায় উক্ত কমিটির সভাপতি মনোনীত হন এবং তার একান্ত অনুরোধেই চৌগ্রিশ নম্বর ইন্ডিয়ান মিরার স্ট্রীটের কিয়দংশ উক্ত কমিটিকে কবহার করার জন্য মনুমতি দেওয়া হয়। সীমান্তে নিযুক্ত মজিফোর্জ এবং হাং চলে থাকা উম্বাসুদের সাহায্যার্থে নিতান্ত জরুরী প্রয়োজনে কমিটি গঠিত হওয়ার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি কিছু অত্যাচার্য্য-কারী জিনিসপত্র কেনা হলেও জুন মাসে যথারীতি টেন্ডার আহবান করেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হতে থাকে। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে উক্ত প্রতিষ্ঠান নিজেরা কখনও কোন রিলিফ বিতরণ করে নি। নামমাত্র বা কিছু বিতরণ করা হয়েছে তাও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির মাধ্যমেই বিতরণ করা হয়েছে। এ বাবত প্রীোগোপালচন্দ্র কুমারের কোন ঋণ ছিল না এবং দপ্তরের সংবাদে তার ঋণের বোকা লাঘব হয়েছে বলে যা প্রকাশিত হয়েছে তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা।

অর্থ নৈতিক দর্পণ

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

বেখানে সে টাকা খাটার সেখানেও কাঁচামালের উৎস ও বাজার দখল করে তার একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে, সে সর্বাধিক মূল্যাকাঁচামার চেষ্টা করে। সবচেয়ে বেশী মূল্যাকাঁচামার জন্যে প্রয়োজন হলে পণ্যের উৎপাদন কমিয়ে দাম বাড়িয়ে রাখে। তা সত্ত্বেও কিছু দিন পর পর তার হাতে উৎপন্ন মাল জমে যায়, কারণ দেশের মানুষের জিনিষ কেনার ক্ষমতা নেই, পুঁজিবাদী মালিক আগেই তা মূল্যফার আকারে তুলে নিয়েছে। লোক দরকার হলেও মালপত্র কিনতে পারে না, অর্থাৎ অনটনে দিন কাটায়। তখন স্টকে মাল জমে যাচ্ছে দেখে পুঁজিবাদী মালিক মজুর হাটাই করে, কারখানায় বেশী খাটিয়ে কম মজুরী দেবার কবন্ধা চালু করে, লক-আউট, ক্রোজার ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে বেকার বাড়তে থাকে; বেকার বাড়ার মানে পরিবারে রোজগারে লোক কমে যাওয়া। তার অর্থ আধা-উপবাসী মানুষ আরো কম কেনাকাটা করতে পারে, ফলে মালিকের তৈরী মাল আরো কম বিক্রী হয়। এক দিকে বেকারী বাড়িয়ে দেশের ক্রয়শক্তি হ্রাস, অন্যদিকে ক্রয়শক্তি হ্রাসের দরুন মালিকের মাল বিক্রী না হওয়ার অবস্থার উদ্ভব—এই হল চিরন্তন পুঁজিবাদী সংকট, যা দেশের প্রতিটি মানুষকে আঘাত আঘাতে অস্থির করে তুলছে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে এই সংকট নেই। সেখানে বেতন মজুরী বাড়ালে ভোগ বাড়বে, জিনিষপত্রের চাহিদা বাড়বে; চাকুরী বাড়বে আবার লোকের আয় বাড়বে, আবার লোকের চাহিদা বাড়বে, আবার কলকারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাকুরী সংস্থান বাড়বে—অব্যাহত গতিতে এই ধারা চলতে থাকে।

তাহলে দেখা যায় যে বাদ দেশ থেকে বেকারী দূর করতে হয়, অর্থাৎ অনটন দূরীকরণ করতে হয় তাহলে পুঁজিবাদকে বিসর্জন দিতে হবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রাজনৈতিক ভাবে তাহলে জনসাধারণকে পুঁজিবাদী সমাজ কবন্ধা বারো চালু রাখছে সেই ইন্দিরা কংগ্রেস ও তার অনুগামী সমমতাবলম্বী সমস্ত দলকে ক্ষমতার আসন থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এবং যারা জনগণতান্ত্রিক পুনর্গঠনে বিশ্বাসী বারা বর্তমান পুঁজিবাদী সরকারের হাতে সব চেয়ে নিষেধিত হয়েও নিভীক চিন্তে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা বহন করছেন জনগণের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেই রাজনৈতিক সংগঠনের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। এ ছাড়া নিরমতার অভিশাপ, বেকারীর দরবহ জ্বালা থেকে আত্মরক্ষার অন্য কোন পথ নেই।

সি পি এমের সভা

গণ কল হুছে

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

সি পি এম নেতৃত্বের উপর আঘাত হানার জন্যে কয়েকটি তথাকথিত বামপন্থী দলের সহযোগিতায় শাসক দলের যে অপচেষ্টা শব্দ হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে তা আরও বাড়লে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ইতিমধ্যে সি পি এমের সমস্ত রকম সক্রিয় কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত সূত্র হয়েছে। কর্মীদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, নেতৃস্থানীয়দের ছাটাই বরখাস্ত করা হচ্ছে এবং এরই সঙ্গে চলেছে বিক্ষোভ ও সমাবেশ বন্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টা।

ইতিমধ্যে চাকুরীয়া ব্রীজের কাছে জ্যোতি বসুর একটি মিটিং ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে পল্লিশের পারামিশন পাওয়া সত্ত্বেও গেরাবাগানে যখন মিটিং চলছিল তখন জনসভাটি বানচাল করে দেওয়া হয়। তাই, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে প্রস্তাবিত সি পি এমের কেন্দ্রীয় সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

বিদেশ দর্পণ

(দর্পণের পর্ববৈক্ষক)

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সম্প্রতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন-গুলির কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ঝড় বয়ে যায়। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ছাত্র ইউনিয়নগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এই ধরনের একটি আইনের কথা সরকার ভাবছেন।

বিতর্কের শুরুর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে। সেখানকার ছাত্র ইউনিয়ন সম্প্রতি বাংলাদেশে মজি বোম্বারদের জন্য প্যারিসে পাউন্ড চাঁদা তুলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাক প্যাম্পার গ্রুপ (সক্রিয় নিগ্রো বিদ্রোহী দল) এবং আইরিশ প্রজাতন্ত্রীদের জন্যও এরা অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

ব্রিটিশ সরকারের মতে এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে দেওয়া যায় না। তারা মনে করেন যে কোন ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে অর্থ সংগ্রহের অধিকার কোন ছাত্র ইউনিয়নের নেই। তাই ওই হুকুম।

এ বছর যারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর ভিলি ব্রাণ্ট। ইনি পুরস্কার পেয়েছেন শান্তি প্রচেষ্টার জন্য।

ব্রাণ্টের নোবেল পুরস্কার পাওয়া মেটেও বিস্ময়কর নয়। কারণ যে রাজনৈতিক শক্তি নোবেল পুরস্কার কমিটিকে চালনা করে তাদের কাছে ব্রাণ্ট আজ আদর্শ পুরুষ। একদিকে তিনি অস্ট্রো-পোলিটিকের মাধ্যমে, কমিউনিস্ট দেশগুলিকে খুশী রাখার চেষ্টা করছেন এবং অপরদিকে কমন মার্কেট করে পশ্চিমী শক্তিগুলির সংহতি বাড়িয়ে চলেছেন। নিজ স্বার্থের তাগিদে সহাবস্থানকারী পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দর্শনীর কাছে আজ ব্রাণ্টের মতন লোকের দাম অনেক। তাই মনে হয় এই পুরস্কার।

পূর্বে ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে শান্তি রক্ষার্থে ব্রাণ্টের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মান সরকার পোল্যান্ড এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন এবং পূর্বে জার্মানীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরুর হয়েছিল।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভিলি ব্রাণ্টের জীবনী খুব একটা চমকপ্রদ কিছু নয়। পিছু পরিচয়হীন (তাঁর মা একটি দোকানে কাজ করতেন) ব্রাণ্টের নাজী শাসন কাল

এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সারা সময়টাই কাটে স্কাডেনবার্গের নির্বাসনে। যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে ফিরে ক্রমাগত চেষ্টার পর ছেয়টি সালে ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রট ও সোস্যাল ডেমোক্রট দলের যে যুগ্ম মন্ত্রিসভা হয় ব্রাণ্ট তাতে উপ-চ্যান্সেলর হিসাবে বোগ দেন এবং উনিশশ উনসত্তর সালের নির্বাচনের পর চ্যান্সেলর হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি গ্রীক সৈন্যচাচারী শাসকগোষ্ঠীকে অধিকৃত সামরিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। গ্রীক নেতাদের জানানো হয়েছে যে যদিও নিজ দেশে কংগ্রেস এর বিরোধিতা করছেন, তাহলেও নিকসন সরকার মনে করেন এই সাহায্য ন্যাটোর স্বার্থ রক্ষার্থে প্রয়োজন।

সম্প্রতি মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি স্পিরো অ্যাগনিউর গ্রীসে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী জর্জ'প্যাপা-দোপুলোস নব্বইটি ফ্যানটম জেট বিমান চেয়েছেন এবং মনে হয় তিনি অত না হলেও কিছু পাবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আচরণে অনেক গ্রীক ক্ষুব্ধ। তারা মনে করছেন যে প্যাপাদোপুলোস যখন একবার মার্কিন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন তখন তিনি আর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার কোন চেষ্টাই করবেন না।

আর এক মুনসেফের কাহিনী

দেবেশ্বর ভরদ্বাজ

তিন বছরের কিছু আগে (দর্পণ একগ্রন্থে মে, উনিশশ আটবাঁটি) আমরা “একটি মুনসেফের কাহিনী” প্রকাশ করে মনে করেছিলাম, এই ধরনের কোন বিষয় নিয়ে আর আমাদের লেখনী চালনা করতে হবে না। যার সম্বন্ধে লিখেছিলাম, তার অপরাধ ছিল সহ-মোহরের নকল বেরিয়ে যাবার পর তিনি সাক্ষীর জবানবন্দী পালটে দিয়েছিলেন। অপরদিকে নিঃসন্দেহে গুরুতর। আইনের ভাষায় একে জালিয়াতী বলে। ভারতীয় দণ্ড-বিধি আইনে এই প্রণেীর অপরাধের জন্যে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। মুনসেফবাড়ীর চাকরী যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা যায়নি। তিনি এখনও অপ্রতিভত প্রভাবে মুনসেফী করে যাচ্ছেন। তাঁর নাম এস কে সিংহ। তিনি আলিপুরের পঞ্চম মুনসেফ ছিলেন। সীতাই আজকাল মাকড় মারলে ধোকড় হয়।

কিন্তু আমাদের মনে করাটা ভুল প্রতিপন্ন করার জন্যেই যেন আর একটি মুনসেফবাড়ী রঙ্গ-মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এর নাম শ্রীমদুরারমোহন দাস। ইনি আলিপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ। মফস্বলের কোন একটি মহকুমা থেকে উনিশশ সত্তর সালের মাঝামাঝি তিনি আলিপুরে বদলি হয়ে আসেন। আলিপুরে এসে তিনি মুনসেফপদে পড়লেন বাড়ী নিয়ে। ধারে কাছে কোন বাড়ী বোগাড় করতে পারলেন না তিনি। কাজেই তাঁকে শিবপুরে নীলকমল কুণ্ডু লেনে আশ্রয় নিতে হল। কবে এলেন এখানে আর কতদিন থাকলেন, তিনি তার কোন হাদিস দেননি। তারপর দেখা যাচ্ছে, তিনি শিবপুরের বাড়ী ছেড়ে উনিশশ সত্তর সালের পনেরোই জুন থেকে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে চাতার দেওয়ান বাগানে বাড়ী নিয়েছেন। কিন্তু তখন বোধহয় তাঁর খোরাল হয় নি যে, যে এলাকায় সরকারী বাড়ীভাড়া পাওয়া যায় না।

এইভাবে উনিশশ সত্তর সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কেটে গেল। উনিশশ একাত্তর সালের পরলা জানুয়ারীতে তিনি লিখে জানালেন যে, শ্রীরামপুরে ছেড়ে তিনি পি ১৬০ নং ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলিকাতা-চব্বিশ, এই ঠিকানায় বাড়ী নিয়েছেন। এইখানে তিনি মূলে একটু ভুল করে ফেললেন। ব্রাহ্মসমাজ রোড যে কলিকাতা চব্বিশ নয়, কলিকাতা চৌতিরিশে এ খোরাল তাঁর হল না। না হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি যদি বাস্তবিকই ব্রাহ্মসমাজ রোডে থাকতেন, তা হলে, শিক্ষিত তিনি, নিশ্চয়ই তাঁর এ খোরাল হত। যাক, তাতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। উনিশশ একাত্তর সালের জানুয়ারী থেকে প্রথমে ষাট টাকা এবং পরে তেরটি টাকা

হিসাবে ফি মাসে তিনি বাড়ী ভাড়া পেয়ে যাচ্ছেন।

ব্যাপারটা এইভাবে চলতে থাকলে ভালই হত। কিন্তু তা হল না। সম্প্রতি আলিপুরের একজন উকিল-বাবু, শ্রীমদুরারমোহন দাস মুনসেফবাড়ীর নামে, এই মর্মে এক অভিযোগ করেছেন যে, তিনি বেহা-লার অন্তর্গত ব্রাহ্মসমাজ রোডে না থেকে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরস্থ চাতার দেওয়ান বাগানে থেকে আলিপুরের এলাকায় বাস করছেন, এই মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে সরকারের কাছে থেকে মাসে মাসে বাড়ী ভাড়া আদায় করছেন। উক্ত উকিলবাবু তাঁর অভিযোগপত্রে বলেছেন যে, মুনসেফবাড়ী আদালতের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর যে বেহালা ব্রাহ্মসমাজ রোড অবস্থিত, সে দিকে না গিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধরেন। উকিলবাবু একাধিকবার মুনসেফবাড়ীর অনুসরণ করে এরূপ দেখেছেন। একদিন উকিলবাবুর এক বন্ধু মুনসেফবাড়ীকে অনুসরণ করে তাঁকে তাঁর চাতার বাড়ীতে চুকতে দেখেন। এ বাড়ীর সামনে বাগান, তারপরে রাস্তা এবং রাস্তার অপর দিকে একটি ওভারহেড ট্যাক। এ অভিযোগে আরো প্রকাশ, চাতার মুনসেফবাড়ীর পরিবারস্থ সকলের রেশন কার্ড আছে, তাঁর একটি ছেলে স্থানীয় একটি স্কুলে পড়ে।

মুনসেফবাড়ী যে শ্রীরামপুরে থাকেন, তা প্রমাণ করতে বেশীদূর যেতে হবে না। তাঁর সেরেস্তাদার ও পেশকার একাধিকবার তাঁর শ্রীরামপুরের বাড়ীতে গেছেন। সেরেস্তাদার প্রকৃতিবাদ গতাঃ আটাই অক্টোবর শ্রীরামপুর থেকে মুনসেফবাড়ীর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে আসেন। তবে মুনসেফবাড়ীকে আলিপুর থেকে না সরালে সেরেস্তাদার বা পেশকারবাড়ীর মুখ থেকে সত্যি কথা বেরবে না। কারণ কতৃপক্ষের অজানা নয়।

মুনসেফবাড়ী আর একটি অপরাধ করেছেন। যে এলাকায় তাঁর চাকরী, তার বাইরে থাকতে হলে তাঁকে জেলা জজের মারফত হাইকোর্টের অনুমতি নিতে হয়। এই আইনটি অন্তর্জাসদৃশক (mandatory)। কিন্তু বৈপর্যয় মুনসেফবাড়ী সজ্ঞানে এই আইনটি লঙ্ঘন করেছেন।

মুনসেফবাড়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি যে গুরুতর সে বিষয়ে সম্প্রদায়ের অবকাশ নেই। এর তদন্ত হওয়া দরকার। তার আগে দরকার মুনসেফবাড়ীকে অন্তর বদলি করা। সরকারের অধীনে একটি তদারকি বিভাগ (ভিজি-লেন্স ডিপার্টমেন্ট) আছে। কতৃপক্ষের নিকট অনুরোধ, তারা যেন অবিলম্বে এই অভিযোগগুলির তদন্তের ভার উক্ত তদারকি বিভাগের উপর ন্যস্ত করেন।

দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে চাকরী গেল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্রীবি পি মদুখাজী মেকফারলেন পেন্টসে চাকরী করতেন। সতেরো বছর চাকরী করার পর গত উনিশশে মার্চ তিঁপায় বছর বয়সে তাঁর চাকরী যায়। তাঁকে এখনও গ্রাচুয়টি দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি বরখাস্তের জন্য ক্ষতিপূরণ বা পাওনা ছুটির জন্য বেতন।

শ্রীমদুখাজী বলেছেন, তাঁর চাকরী যাওয়ার কারণ, তিনি ঐ কতৃপক্ষের দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছিলেন। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল টিটানিয়াম ডায়স্কাইড রিউটাইল পনেরো টন পরিমাণ আলকালি

কেমিক্যালস ও শালিমার পেন্টসকে বেচে ষাট হাজার টাকা কমিয়েছেন এবং এই টাকা ফ্যাকটরীর হিসেবে জমা করেন নি। শ্রীখান্না স্টোর ডিপার্টমেন্টকে চালান তৈরীর আদেশ দিয়ে শ্রীমদুখাজীকে সেই চালানে সই করতে এবং মাল আলকোই ও শালিমারে পঠাতে বলেন। বিক্রির টাকাটা শ্রীখান্না স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং ফ্যাকটরীর অ্যাকাউন্টে জমা করেন নি দেখে তিনি সই করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর শ্রীখান্না কমার্শিয়াল

ম্যানেজার শ্রীসুন্দরম ও কমার্শিয়াল একজিকিউটিভ শ্রীএন প্রামাণিককে দিয়ে সই করিয়ে নেন।

কতৃপক্ষের অনেক লাইসেন্স আছে যাতে তারা অনেক দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল কম দামে পায়। এর একটা মোটা অংশ বেশি দামে বাজারে বিক্রয় করা হয়। শ্রীমদুখাজী এতেও আপত্তি জানিয়েছিলেন। কারণ এর ফলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয় এবং ফ্যাকটরীর প্রয়োজনের সময় বাজার থেকে বেশি দামে জিনিসগুলি কিনতে হয়।

ছাত্র পরিষদের আন্দোলন

(সম্প্রদ পৃষ্ঠার পর)

চাকুরীতে বাধা দান, ওভারটাইম তোলা ইত্যাদি ইত্যাদি)।

উভয়েরই প্রচার বহুলতায় ও মারমুখী ভঙ্গীর জন্য কিছু সংযুক্ত সামরিক ভাবে বিভ্রান্ত হতে পারেন, কেউ মতাদর্শগত সংকটের সস্তা সমাধানের লোভে, কেউ বা চাকরী বা আশ্রয় সাংসারিক সুবিধার ভরসায়। তাঁদের দ্বিতীয় চিন্তার সময় এসে গেছে।

যারা গরীবের আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে সম্মত, শুধু তাদের মনে রাখা উচিত ক্ষুদ্র দেশ ইন্দোনেশিয়ায় যা সম্ভব, অপর ক্ষুদ্র দেশ ভিয়েতনামে তা সম্ভব নয়, ভারতের মত বৃহৎ দেশে তো নয়ই। ওরা বেকারদের ওপর চনকাম করতে চায়, দূর করতে নয়, উৎপাদনকে লুণ্ঠিত করতে চায়,

বাড়াতে নয়, শিক্ষাকে জাহান্নামে দিতে চায়, বাড়াতে নয়, ঠিক সেই সময় যখন পশ্চিমবঙ্গে একাত্তর সালেও সত্তর ভাগ নিরক্ষর। ওরা চায় ইতিহাসের চাকাকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিতে। ইতিহাস ওদের মিত্র নয়। অচিরেই ওদের ভৌতিক পরাস্ত হবেই, কিন্তু তার জন্য চাই লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, ছাত্র, কর্মচারী, শ্রমিক কৃষকের সতর্ক প্রতিরোধ। আবার হরতাল, ধর্মঘট, বড় বড় মিছিল, সমাবেশ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা আসে আদর্শকে বৃকের পাঁজর করে, লাভের বা ইনামের বধুরা নিতে নগ্ন। “সোনার টুকরো” ছেলেরা গিল্টি সোনা চিনতে পারলে থাকবে না আর গিল্টি করা ছেলেরা, কেননা তারা ইতিহাস সৃষ্টি করে না।

দর্পণ

সংবাদ, সাপ্তাহিক

১১ চাঁদার হার ১১

বার্ষিক পনেরো টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৬১, মট্র লেন, কলি-১০

বঙ্গদর্পন

চলক্য সরকার

নব কংগ্রেসের এখন জন্মজন্মট অবস্থা। প্রশাসন পদলিখ হাতে। শরণার্থী রাণে দৈনিক পশ্চিম-বংশেই খরচ হয় প্রায় দু কোটি টাকা। এর ছিঁটেফোটাও দলের কল্যাণে এলে বহু টাকার ব্যবস্থা হয়। তদন্তে দেখা গেছে বহু টাকা চুরি হচ্ছে কল্টাকটর, পদলিখ-আমলাদের একাংশ আর নব কংগ্রেসীদের একাংশের যোগ-সাজসে।

এই অর্থ নব কংগ্রেসে তারণ্য এনে দিয়েছে। শহরে শহরে, কার-খানায় আর কয়েকটি জেসায় গ্রামেও নব কংগ্রেসের নয়া উদ্যম লক্ষণীয়। পার্টির স্বব ও ছাত্র নেতারা প্রচণ্ড পরিপ্রসন্ন করছেন নতুন সংগঠন মজ-বুত করার জন্য। কিছুটা মজবুত অবস্থাই করেছেন। জঙ্গী এ সংগ-ঠন, কোন বিরোধিতা কেউ করুলেই তার আর নিন্দার নেই। প্রকাশ্যে প্রহার, গোপন, হত্যা, দলবোঁধে জুজুদের, ঘটনা ক্যাপক নিত্য নৈমিত্তিক।

এখন আর নব কংগ্রেস সি পি এম বিরোধী অন্য দলের উপর নির্ভরশীল নয়। নিজের তাগদেই এখন সি পি এমকে রুখতে পারবে বলে ওরা মনে করছে।

নব কংগ্রেসের নয়া জুজুদে খালি সি পি এম নয় অন্যান্য দলও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সি পি এম নিজের সংগঠন মারফৎ এই আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। অনেকদিন থেকেই এই আক্রমণ শব্দ হয়েছে, সি পি এম-এর কাছে এই আক্রমণ কোন কিসমতের ব্যাপার নয়। বরং এই আক্রমণ সি পি এম-এর সংগঠন আরও মজবুত করেছে বলে পার্টি নেতারা দাবী

করেছেন। নেতারা বলেছেন, এত আক্রমণ সত্ত্বেও পার্টির সভা সংখ্যা একশ হাজার থেকে বেড়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজারে পৌঁছেছে।

কিন্তু অন্যান্য কংগ্রেসী সম-র্থক দলের অবস্থা শোচনীয়। যেমন সি পি আই-এর কথা ধরা যাক। এই দলের সদস্য সংখ্যা উন-তিরিশ হাজার থেকে কমে একশ হাজারে নেমেছে। আর কংগ্রেসের যে প্রগতিশীল অংশের সহযোগী-তার ওরা সি পি এম বিরোধী গণতান্ত্রিক মেচা গড়ে তুলবে বলে কার্যক্রম নিয়েছে তা বাস্তবে রূপ-ায়িত হচ্ছে না। নব কংগ্রেসের প্রগতিশীল যুব-ছাত্র অংশের কার্য-কলাপে ওরা ভীত সম্মত বোধ করছে। এই প্রগতিশীল অংশের আক্রমণের হাত থেকে সি পি আই-এর ছেহেলা নিস্তার পাচ্ছে না। পার্টির নীচু স্তরের কর্মীরা বিভ্রান্ত। কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সি পি এম-কে রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পার্টির যে নতুন লাইন তাতে ওরা আর আস্থা রাখতে পারছে না।

সি পি আই-এর রাজ্য এক্সি-কিউটিউ কমিটির দুর্ভাগ্য ব্যাপী সভা সম্প্রতি হয়ে গেল। সেখানে এই সম্পর্কে পার্টির বিভিন্ন শাখা থেকে প্রেরিত নানা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হয়। নেতৃত্ব প্রচণ্ড বিব্রত। ওরা খোলাখালি এর নিন্দা করতে প্রস্তুত নয়। অথচ নিন্দা না করলে পার্টি উঠে যাবে। পার্টির একাংশ হয়তবা কংগ্রেসে যোগ দেবে আর বারো এখনও কমিউনিষ্ট থাকতে চায় তার সি পি এম-এ।

এ এক ভয়াবহ অবস্থা। সি পি আই তার গৃহীত প্রস্তাবে বলেছে যে, নব কংগ্রেসের মধ্যে এক কয়েমী স্বার্থ কাজ করছে। এই স্বার্থ মেহনতী মানুষের ওপর ক্যাপক আক্রমণ শব্দ করেছে তারা গত কয়েক বছরে যে দাবীদাওয়া আদায় করেছিল তা থেকে বঞ্চিত করার জন্য। এই সব আক্রমণের নেতৃত্ব করছে নব কংগ্রেসী প্রাক্তন বিধানসভার সদস্যরা। যেমন পটেশপরে ও হাসনাবাদে।

সি পি আই এক্সিকিউটিভ কমিটি এই ব্যাপারে পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক গোপাল ব্যানার্জীকে ভার দিয়েছেন নব কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। যদি আক্রমণ বন্ধ করা অবিলম্বে সম্ভব নাও হয়, অন্যত কংগ্রেসী নেতৃত্ব একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিক এই আক্রমণের বিরুদ্ধে। সি পি আই এই দাবী জানাবে কংগ্রেসী নেতৃত্বের কাছে।

প্রস্তাবে এই কথা আছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, কোয়ালিশন সরকারের আমলে কংগ্রেস-সি পি আই যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আজ, তিস্ততার পর্ববসিত হতে চলেছে। প্রস্তাবে এর জন্য গভীর দঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এক সময় যখন নব কংগ্রেসীরা ঠিকমত সংগঠিত হয় নি সি পি এমকে আক্রমণ করার জন্য। এখন কংগ্রেসী সংগঠন জোরদার, রসদ সরবরাহ প্রচুর আর কয়েমী স্বার্থ দেখে অন্য পার্টির সাহায্যের আর দরকার নেই। কংগ্রেসী অভিজ্ঞতা হল সি পি আই-এর সংগঠন বহুতে কিছু নেই। ওদের সঙ্গে হাত মেলানোর তাই আর দরকার নেই। বেচারী সি পি আই।

ফরোয়ার্ড ব্লকের অবস্থা আরও শোচনীয়। এই দল এখন বুঝছে যে নিজের সংগঠন না থাকলে নির্ভরশীল অবস্থায় বেশী দূর যাওয়া যায় না। তাই দল এখন দু ভাগ হয়ে গেছে। একপক্ষ সি পি এম-এর কাছাকাছি আসতে চায় আর এক দল সি পি আই বা করবে সেই অনুযায়ী নিজের কতক ঠিক করবে।

এস ইউ সি, আর এস পি এই দু দলের বামপন্থী ভাবমূর্তি সম্পর্কে মোহ কাটে নি। কিন্তু শব্দ কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থা করলে সি পি এম-এর সুবিধা হয়ে যায়। তাই একটা মধ্যপন্থা খুঁজছে। আর এই খোঁজার মধ্যবর্তী সময়ে বা কিছু সাংগঠনিক কবস্থা নিচ্ছে তা প্রায় সবই মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে। কোন সভা সমিতি বা সংবাদপত্র বিবৃতি মারফৎ নব কংগ্রেসী আক্রমণ সম্পর্কে এরা জোরালো কোন বক্তব্য রাখছে না। যখন রাখছে তখন সি পি এম বিরোধী প্রসঙ্গ আরও জোরের সঙ্গে বলছে।

কিছু কিছু ছোট ছোট রাজ-নৈতিক গোষ্ঠী ঠিক করেছে যে, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় নিজে-দের পৃথক সভা রাখার মানে হয় না। তারা কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে।

সি পি এম-এর কেন্দ্রীয় কমিটি আলোচনার বসেছে কল-কাতার, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজের কতক ঠিক করার জন্য।

পার্টির অনেকের ধারণা এই ডামাডোলে হয়ত বা কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃত্ব রাজ্যে নির্বাচন করার আদেশ দিয়ে ফেলতে পারে। কংগ্রেসের এখনই সবচেয়ে ভাল সময়। পরসা কড়ির অভাব নেই। ছাত্র-যুব-সমাজবিরোধীরা সবাই পার্টির পতাকার নীচে জড়ো হয়েছে। সি পি এম বিরোধী অন্যান্য দলের কংগ্রেসের অজ্ঞাবহ। এই অবস্থায় নির্বাচন সুবিধে।

যদি নির্বাচন এক বছর পৌঁছিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু রাজ-

পকেট কার্টার ব্যবস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিউজপ্রিন্ট প্রায় দেওয়াই হয় না।

যাই হোক, এই অবস্থায় বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিকদের মোঁচাকে বোধহয় অজ্ঞাতে টিল মেরেছেন কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তর। তারা আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোকে তাদের প্রচার সংখ্যার উপর নতুন কর ধর্য করতে চলেছেন। প্রচার সংখ্যাগুলো কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরে আছে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী কোন সোরগোল হওয়া উচিত নয়। কেননা, সমস্ত প্রণয়ী কগজের দাম দু পয়সা বৃদ্ধি পাবে। কর দেবেন পাঠক। কিন্তু বৃহৎ সংবাদ-পত্রের মালিকরা এখন চেখে সর্বের ফল দেখছেন। ওদের ঘোষিত প্রচার সংখ্যার একটা মোটা অংশই যে ভুলো। এখন বলতেও পারেন না যে, এই সংখ্যা ভুলো। তাহলে সরাসরি মিথ্যে বলার দায়ে পড়তে হবে। ভুলো সংখ্যার জোরে ফাঁপানো প্রচার সংখ্যা দেখিয়ে ওরা দেশের মোটা বিজ্ঞাপনের শতকরা নব্বই ভাগ বেগাড় করে থাকেন। এখন ভুলো সংখ্যার হিসেব দিলে বিজ্ঞা-পনদাতারা টাকা ফেরৎ চাইতে পারেন। অন্যদিকে ভুলো সংখ্যার ওপর কর দিলে মালিকদের নাতি-শ্বাস উঠবে। কেননা, ঐ সংখ্যাটি নিতান্ত সামান্য নয়। কোন কগ-জের দৈনিক, পঞ্চাশ হাজার, কোন কগজের চঞ্জিশ হাজার পর্যন্ত ভুলো সংখ্যা দেখানো আছে। এখন দৈনিক চঞ্জিশ পঞ্চাশ হাজার ভুলো সংখ্যার ওপর প্রতি কপিতে দু-পয়সা কর দিতে হবে। পাঠক অনুমান করুন টাকার অংক।

কিন্তু বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিকরাও বোকা নন। ওরা প্রতি-যোগিতা করলেও এ ব্যাপারে সম-কথী। তাই স্থির করেছেন, ভুলো প্রচার সংখ্যার ওপর কেন্দ্রীয় কর দিয়ে যে বিরাট লোকসান হবে সেটি পঠকদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। শব্দ লোকসানই আদায় নয়। লোকসান পুষিয়ে আরো কিছু মুনাম্বাবাজী ও ওয়া করতে চলেছেন। সেই সিমান্তই মঙ্গলবার হয়েছে, বৃহৎ মালিকদের প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়া গ্র্যান্ড ইন্টার-নিউজপেপার সোসাইটির পূর্বা-শূল কমিটির গোপন বৈঠকে। বৈঠক হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রি-কার অফিসে।

এখন দেখা যাবে, বৃহৎ মালিক-দের এই মুনাম্বাবাজীর বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর “সমাজতান্ত্রিক” সরকার কোন নীতি গ্রহণ করেন

নৈতিক দিক থেকে কংগ্রেস বিরো-ধীতা সাংগঠনিক রূপ নেবে এবং তাতে সি পি এম-এর সমুহ সুবিধে।

আর পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসীদের যুব কংগ্রেস আর ছাত্র পরিষদ কোন অভিযান শব্দ করেন কিনা। ওরা তো এখন শাকসবজি বিক্রে-তাদের মুনাম্বাবাজীর বিরুদ্ধে গণ অনশন করছেন।

কোটি কোটি টাকা চুরি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগের কথা শুনেছেন। গত সপ্তাহে তিনি সরকারী ও বেসরকারী দুটি দ্রুত তদন্তের ব্যবস্থা করেন। একটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যক্ষ্ম সচিব শ্রীপি এন চৌপরা আর অপরটি ইন্দিরা-জীর বিশ্বাসভাজন শ্রীভবানী ব্যানার্জী।

দুজনেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, চুরি ক্যাপক, কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। এতে শর-গাখীরা হাজারে হাজারে মরছে। অনেকে বহুদিন হেঁটে এসে শিবিরে বাইরে বসে থাকছে। দিনের পর দিন খাবার না পেয়ে মরে যাচ্ছে।

ভবানী ব্যানার্জী বলেছেন, “এর ফল সদরপ্রসারী। প্রথমতঃ মানুষের এই কষ্ট অসহ্য। দ্বিতী-য়তঃ, স্বাধীন বাংলাদেশে যখন নাগরিকরা ফিরে যাবে তখন এই ভারতবর্ষ সম্পর্কে কি ধারণা নিয়ে যাবে সেটা ভাবার কথা। এর ফলে হয়ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কও তিস্ত হতে পারে।”

প্রকাশিত হল

শক্ষিকুল কাসানের

মুক্তির সংগ্রামে

পূর্ব বাংলা

পূর্ব বাংলার সামগ্রিক সামা-জিক-অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুক্তি-যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির ভূমিকা, সংগ্রামী জনতা ও বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের ভূমিকা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বর্তমান পরিস্থিতি ও সঠিক মার্কসবাদী-লেনিন-বাদী বিশ্লেষণ, মুক্তির পথ এবং গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি রণকৌশল সম্পর্কে বহুল তথ্য সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য রচনা সম্বলন।

দাম : আড়াই টাকা

প্রকাশক : রবীন মুখোপাধ্যায়

প্রাণিস্থান :

৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

পিপলস্ স্টার

কবিতার্থ

প্রাণিস্থিত

সৌরীন-সেনের ১৯৬০ সনের

বিস্মৃক কঙ্কোর ঐগ্নবিক

পটভূমিতাঃ নাটক

সূর্য-হা-রা

১২ই নভেম্বর : শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টা

মুক্তাঙ্কন

টিকিট-১৩ ২ টাকা

হলে টিকিট ও

প্রধান কার্যালয়

৬০/এ ভারমণ্ড হারবার রোড

কলিকাতা-২৩

ফোন : ৪৫-৩৬১৬

সম্পাদক-হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস এ, রাজ্য সুবোধ মল্লিক চেকমাস্ত কলিকাতা-১৩ থেকে মাদ্রাস্ত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দপণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

দপন

১৪শ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা ৥ শত্ৰুবার ১২ই নভেম্বর ১৯৭১ ৥ দাম ৩০ পয়সা

ছাত্র পরিষদের বিরোধী তুই গোষ্ঠীর সম্মুখ সমরের নেপথ্য কাহিনী

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

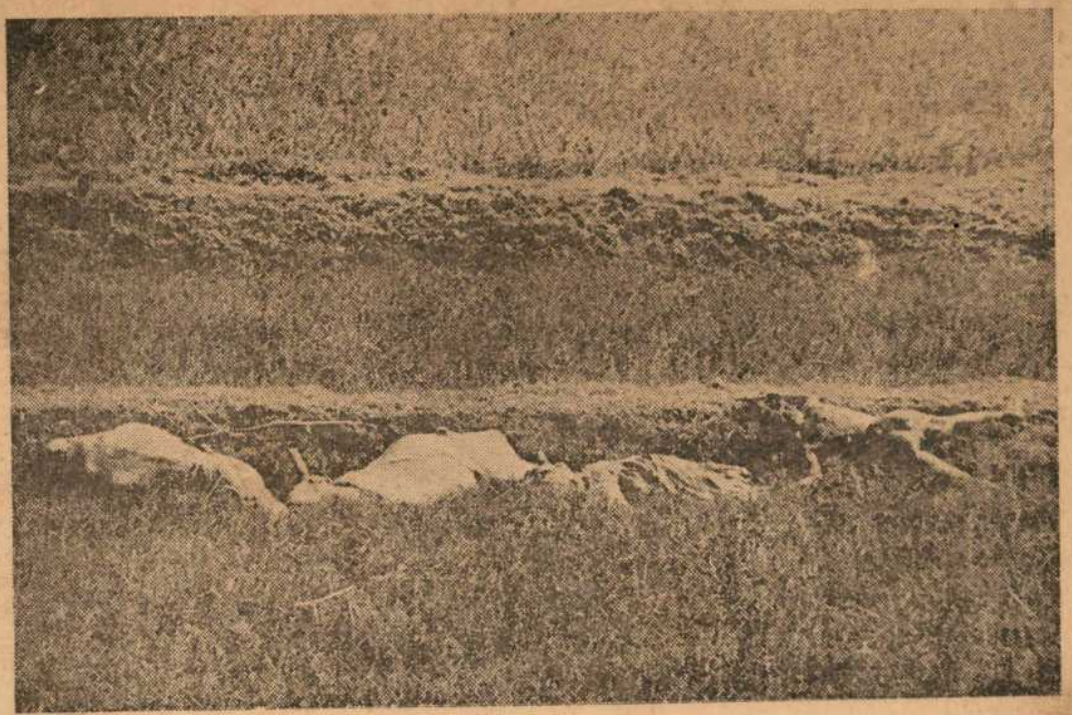
পশ্চিম বঙ্গের নব কংগ্রেসীদের ছাত্র পরিষদ উত্তর কলকাতার এক কংগ্রেস নেতাকে কংগ্রেস থেকে তাড়ানোর জন্যে আবার সেই বাহান্তর ঘটনার নোটিশ দেওয়ায় এই রাজ্যের নব কংগ্রেসীদের মধ্যে খেয়েখেয়ির এক নতুন অধ্যায় সূর্য হোলো। দর্পণ বাহান্তর ঘটনা পরে প্রকাশিত হবে। তাই বাহান্তর ঘটনার নোটিশের নেপথ্য কাহিনী দিচ্ছি। এবার পাঠকের তৃষ্ণা

মেটাবো। বাকী আগামী সংখ্যায়। এই নতুন খেয়েখেয়ির এক-দিকে আছেন উত্তর কলকাতার ভূতপূর্ব কংগ্রেসী এম এল এ এবং অমৃতবাজার পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার প্রফুল্লকান্তি ঘোষ। অন্যদিকে দাঁড়িয়েছেন রাজ্যের নব কংগ্রেসী ছাত্র পরিষদের সভাপতি এবং ভূতপূর্ব কংগ্রেসী এম এল এ সুরত মুখার্জী। সুরত মুখার্জী-দের অভিযোগ, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ

সদলবলে গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে নব কংগ্রেসের নতুন অফিস লোয়ার সারকুলার রোডে হামলা করেছেন, কয়েকজন ছাত্র পরিষদ নেতাকে মারধোর করেছেন।

দর্পণের কাছে অবশ্য খবর আছে, সুরত মুখার্জী নিজেও প্রফুল্লকান্তির দলের কাছে মার খেয়েছিলেন এবং টেবিলের তলায় ঢুকে আত্মরক্ষা করেন।

এই মারামারির পটভূমিকা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসীদের এ্যাড হক কমিটিতে সুরত মুখার্জী অন্যতম সম্পাদক হবার পর ধরাকে সরাসরি জান করছেন। তিনি কারকে মানতে চান না এবং দলের মধ্যে (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)



উড়িয়ার সাইক্লোনে যে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তার প্লাবনে একটি শিশুর মৃতদেহ কয়েকটি গরুর শবের সঙ্গে একই জায়গায় ভেসে উঠেছে। প্রায় দু'সপ্তাহ পরেও এদের সরাবার ব্যবস্থা হয়নি।

নকশালাদের খেয়েখেয়ি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

সম্ভ্রাসবাদী রাজনীতির যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাই ঘটল নকশালী আন্দোলনে। সশস্ত্র বিপ্লবের নামে ব্যক্তি হত্যা রাজনীতির কথতায় নকশালী পার্টিতে খেয়েখেয়ী শব্দ হয়েছে অনেকদিন, প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীরা প্রতিপক্ষকে টিট করতে বাংলাদেশে আগের যুগে সম্ভ্রাসবাদীরা যে কায়দা নিয়েছিল সেই কৌশলই নিতে শব্দ,

করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশ অসীম চ্যুতাজীর গতিবিধি সম্পর্কে খবর পাওয়া আর পরে ওকে আর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। এখন খবরে প্রকাশ অসীম বিহারে গিয়েছিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য।

এই বৈঠকে গুরুত্ব ছিল অনেক, কেন না আগে থেকেই ঠিক ছিল (শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায়)

নারকেলডাঙ্গা থানায় একটি মেয়ের ওপর অমানুষিক অত্যাচার

অরুণাভ সেন

—তুই কমিউনিস্ট?
—না।
—চোপরাও শালী। বল্ মাল-পস্তর কোথায় রেখেছিস।
বল্লম তো আমি পার্টি করিনা। আমি কিছু জানিনা।
জানিস না মাগী। জানাচ্ছ তেকে। ডিউটি।
পর্দার আড়াল থেকে ডিউটি এগিয়ে এসে স্যালুট করে।
—নিয়ে যা মাগীকে। জমাদার-পীকে মাল খাইয়ে তার হাতে ছেড়ে দে। খানিক দল্লাই মলাই করে নিয়ে আয়। দোখ কোন বাপ বাঁচায়।

না। ভিয়েতনামে কোন মার্কিনী পুলিশের ক্যাম্প নয়। এটা কোন অনুতপ্ত মার্কিনী সৈন্যের জবান-বন্দী নয়। এ ঘটনার দ্বিতীয় অঙ্কের এটাই প্রথম দৃশ্য। প্রথম অঙ্ক হয়ে গেছে বেলেঘাটার মিয়া-বাগান বস্তীতে। দ্বিতীয় অঙ্ক নারকেলডাঙ্গা থানার ও সির ঘরে। মেয়েটির নাম অসীমা পোন্দার।

মেয়েটিকে অপকৃতিস্থ জমাদারগীর হাতে সঁপে দেওয়া হল। সঙ্গে সিপাই বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ। এক-ঘন্টা ধরে অসীমাকে বাঁটা দিয়ে পিটানো হল। ওর মুখে হাতে দেহের অনাবৃত অংশগুলোতে চাবুকের মতো কেটে বসতে লাগলো বাটার শলাগুলো। মারের ঘোরে প্রায় অজ্ঞান মেয়েটিকে আবার ও সি-র ঘরে নিয়ে আসা হল। আবার একদফা অশ্রাব্য খিস্তির সঙ্গে

সাব ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ধমান শহর থেকে দর্পণের কাছে বহু অভিযোগ এসেছে যে, শহর-থানার শংকর মুখার্জী নামে এক সাবইন্সপেক্টর সাধারণ মানুষের বাড়ী বাড়ী ঢুকে অত্যাচার চালাচ্ছে আর বেপরোয়া ঘৃষ খাচ্ছে।

অভিযোগ এই যে, অফিসার মহাশয় গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় বাড়ী বাড়ী হানা দেয় নকশাল

প্রশ্নপূর্ব সূর্য হল—এবার বল, তুই সি পি এম করিস কিনা। অবসন্ন হতচেতন মেয়েটি আবার বল্ল—না না, আমি কিছু জানিনা। আবার তাকে টর্চার রুমে পাঠানো হল। আরেকদফা মাল খেয়ে নিল জমাদারগী। এবার বিন্ধ্যেশ্বরীর লাইসেন্স অনেক বেশি। লোভে তার চোখ দুটো চকচকে। মেয়েটির কাপড় টেনে খোলা হলো। ব্লাউজ খোলা হল। উল্গা। আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত মেয়েটিকে আবার প্রহার পূর্ব সূর্য হল। থানার সেকেন্ড অফিসার চাঁকার করে উঠলো। ও সি-কে বল্ল—আর কোথায় মারবেন স্যার? মেয়েটির নীচে দেহ তখন রক্তাক্ত।

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়)

নকশালদের দলে টানার চেষ্টা করছেন সি পি আইয়ের এক নেতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতায় নকশাল নামধারী সমাজবিরোধীদের একটা মোটা অংশ যখন দলে দলে নব কংগ্রেসীদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে তখন দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির একজন সর্বভারতীয় নেতা নকশালদের সি পি আইতে নেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। রাজসভার সদস্য শ্রীভূপেশ গুপ্ত এখন বারবার পশ্চিম বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছেন যে, নকশালদের যেন ছেড়ে দেওয়া হয়, আর যেন গ্রেপ্তার না করা হয়। কেননা, ওরা সি পি আইতে যোগ দেবে বলে তিনি আশা করছেন। শ্রীগুপ্ত অনুরোধ জানাবার সময় বলেছেন, ইন্দিরার সঙ্গেও নাকি তাঁর এই মর্মে কথা হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকারের কোনো নির্দেশ না থাকায় চীফ সেক্রেটারী এই অনুরোধকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ভূপেশ গুপ্ত কিন্তু এখনও প্রচেষ্টাটি চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে কলকাতার বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, নকশাল নাম ধরে যে সমাজবিরোধীরা এতদিন সমাজবিরোধী কার্যকলাপ আর সি পি এম হত্যা অভিযান চালাচ্ছিল তাদের একটা মোটা অংশ নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। ওরা এখন মাও সে তুইয়ের পোষ্টার ছেড়ে ইন্দিরা গান্ধীর পোষ্টার লাগাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, আত্ম-রক্ষা! নব কংগ্রেসীরা বলেছেন, তাদের সঙ্গে থাকলে পুলিশ ধরবেনা।

তাই সুরত মুখার্জী যখন বলেছিলেন, কংগ্রেস অফিসে হামলাকারীদের মধ্যে নকশালী এবং সি পি এম ছেলেরাও ছিল তখন তার মধ্যেও কিছু সত্যি আছে। তবে সি পি এমের কোনো ছেলে ছিল না। একথা সুরত নিজেও জানেন। রাজনীতি করবার জন্যে ঐ কথা বলেছেন। ছিল কিছু নকশালী ছেলে যারা সম্প্রতি নব কংগ্রেসী হয়েছে।

বঙ্গদর্শন

চাঞ্চল্য সরকার

সমস্ত সরকারী এবং শাসক শ্রেণীর চক্রান্ত ব্যর্থ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আহত ব্রিগেড প্যারেডগ্ৰাউন্ডে বিশাল জনসমাবেশ (গত রবিবার সাতই নভেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে লক্ষণীয় ঘটনা।

মার্কসবাদী পার্টি সমেত সমস্ত রাজনৈতিক দল এই অপ্রত্যাশিত বিশাল জনসমাবেশে বিহবল। পশ্চিমবঙ্গের নয়া অধীশ্বর সিদ্ধার্থ রায় বলেছিলেন সমাবেশে পনের হাজারের বেশী লোক হতে পারে না। বেচারীর দোষ নেই। আমলাদের কথা বিশ্বাস করেছিলেন, ভেবেছিলেন মারের চোটে মানুষ প্রতিবাদের ভাষা হারিয়েছে। অন্যান্য বামপন্থীদের মন্ডিকল হল ওরাও ভেবেছিল বোধ হয় মার্কসবাদীরা রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ব্রিগেড প্যারেড গ্ৰাউন্ডে বিশাল সমাবেশ পশ্চিমবঙ্গের

রাজনৈতিক চিন্তায় নতুন ধারা আনবে। মুষড়েপড়া মার্কসবাদীরা, বিশেষ করে নেতারা, নয়া উদ্যমে কাজে নামবেন। তাদের বোধ ফিরে এসেছে যে, মানুষের চেতনার সঙ্গে তাল রেখে প্রতিবাদ আন্দোলনকে সংগঠিত করেই শেষ পর্যন্ত দুর্বীর প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে ওঠে।

আজ পশ্চিমবঙ্গের ক্যাপক

জনসাধারণের কাছে স্বচ্ছ যে, রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত সংগঠিত রাজনৈতিক দলের একমাত্র চিন্তা কিভাবে মার্কসবাদীদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। চিন্তা মগ্ন এই বিভোর অবস্থায় এই রাজনৈতিক দলেরা শাসক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমস্ত আক্রমণকে স্বাগত না জানালেও মেনে নিচ্ছে, কোন প্রতিবাদ

আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট নয়।

ব্রিগেড সমাবেশ তাদের মোহ-মন্দির ঘটাতে। শাসক শ্রেণীর লেজুড়বৃষ্টি মারফত বেশীদূর যাওয়া যায় না এই বোধোদয় কিছু কিছু বামপন্থী নেতাদের মধ্যে হতে শূন্য করেছে। অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলই নতুন করে আত্মবিশ্লেষণে নেমেছে। এখনই নিজের মত ও পথ পাণ্টাবে এমন কথা নয়। কিন্তু লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

নকশাল পার্টি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। ফরোয়ার্ড ব্লকে পরিষ্কার শিবির ভাগ হয়ে গেছে। এই

রাজনীতি হল মার্কসবাদীদের বিরোধিতা করা আর এই বিরোধিতায় এই দলের নেতারা সি পি আই-এর থেকেও বেশী উগ্র। এর ফলে পার্টির অভিজ্ঞতা হল যে, পার্টির নতুন কোন প্রসার হচ্ছে না। নিজেরদের সীমিত ঘাঁটি এলাকা থেকেও পার্টি হটে যাচ্ছে।

সি পি আই সম্পর্কে বলার কিছু নেই। কেননা এই দলের নেতাদের রাজনৈতিক লাইন ঠিক হয় মস্কোয় অধিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্যাপক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এরা বিগত বিশ্বযুদ্ধে নাজীবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সোভিয়েত মিত্র-

সঙ্গে সামিল হয়ে যাচ্ছে। এই পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব ব্রিগেড প্যারেড গ্ৰাউন্ডের সমাবেশের তাৎপর্য বুঝতে না পারলেও দলের সাধারণ সদস্য ও সমর্থকেরা পার্টির রাজনীতিতে বেশীদিন আস্থা রাখতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গে এই দলের অবস্থা ফরোয়ার্ড ব্লকের পর্ষায় চলে যেতে বাধ্য, এই বোধ দলের অনেক নেতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। মন্ডিকল হল ওরা আন্তর্জাতিকতায় বেশী বিশ্বাসী তাই দেশের কোন ঘটনার বিচারিত বোধ করলেও ওদের কবান কিছু নেই।

এই রাজ্যে অন্য কোন দল সম্পর্কে বলা নিঃপ্রয়োজন, কেননা তারা প্রায় সকলেই এখন নিশ্চিন্ত হতে চলেছে।

নব কংগ্রেসে কিছুদিন ধরে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কিন্তু রাজনীতি ছাড়া এই চাঞ্চল্য টেকে না। ওদের মধ্যে শূন্য হয়েছে নেতৃত্বের লড়াই। ভাঙ্গনের এই সূচনা। কি দিয়ে ঠেকাবে ওরা বাংলার বিপ্লবী অগ্রগতিকে?

মার্কসবাদীদের ঘাড় দায়িত্ব অবশেষে এসে পড়ছে সারা বাংলার বিপ্লবী নেতৃত্বের। নানা চাপ আছে পার্টিকে উগ্রপন্থার গাডায় ফেলে দেওয়ার। আবার অন্যদিকে খালি সংসদীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক কর্মসূচী নির্ধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী।

বাংলায় আজ নেতৃত্ব চায়। অন্যান্য সকলেরা কথ্য, মানুষের কাছে মনোহাস খোলা। সঠিক ক্যাপক আন্দোলন-ভিত্তিক রাজনীতি মারফত মার্কসবাদী পার্টিই শাসক শ্রেণীর একমাত্র চ্যালেঞ্জ এই সচেতনতা মানুষের অগ্রণী অংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মার্কসবাদী পার্টির আসন্ন রাজ্য সম্মেলনে ও পরে সর্বভারতীয় সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা অবশ্যই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হবে।

পুঁজুগামী প্রত্নতার বই
বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সংযোজন
উবারজন ভট্টাচার্যের
সিক্ক্যাল ইয়াফরিকা
দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলুভাতির
সম্প্রদায়িক আন্দোলনের
প্রাথমিক পর্যায়ের জীবন্ত কাহিনী
দাম : পাঁচ টাকা

নীলসমুদ্রের পাণ্ডুলিপি
নির্ধাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত
নৌ সৈনিকদের মুক্তির লড়াই।
তৃতীয় সংস্করণ সচ প্রকাশিত।
দাম : পাঁচ টাকা

বিক্রয়স্থল :
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশাস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

ব্রিগেড সমাবেশের তাৎপর্য

দলের সবাই এখন স্বীকার করতে সুরু করেছে যে মার্কসবাদীদের বাদ দিয়ে এই রাজ্যে রাজনীতি করা যাবে না। অথবা নব কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেরদের ভাগ্য জুড়ে দিলে রাজনীতিতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মার্কসবাদী বিরোধীরা ফরোয়ার্ড ব্লকে স্তিমিত হতে শুরুর করেছে।

এস ইউ সি পার্টির একমাত্র

শক্তি আঁতাতের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় “জনযুদ্ধের” নামে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদে লেজুড়বৃষ্টি করেছে। আর আজ সোভিয়েতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্য ইন্দিরা তোষণের তাৎপর্য না বুঝেই সি পি আই নব কংগ্রেসের অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে নয়া ফ্যাসীবাদের

বাংলা দেশে মুক্তি বাহিনীর দুর্বীর অগ্রগতি পরাজয় ঢাকতে পাকিস্তানীরা ভারত আক্রমণ করতে পারে

(দর্পদের সংবাদদাতা)

মুজিবনগরে এক বিশেষ সাক্ষাতকারে বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী বলেন, বিধ্বস্ত মনোবল পাকিস্তানী দখলদার সৈন্যবাহিনী পূর্ব-

রণাঙ্গনে যে কোন মুহূর্তে ভারত আক্রমণ করতে পারে। এই আক্রমণ পশ্চিম, রণাঙ্গনেও শূন্য হওয়া বিচ্যন্ন নয়।

কর্ণেল ওসমানীর মতে পাকিস্তানীরা বাংলা দেশে তাদের বিলুপ্তির দিন ঘনিষ্ঠ এসেছে এই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে শেষ মরীয়া চেষ্টা করবে সরাসরি ভারত আক্রমণ করে যাতে বাংলাদেশ আন্দোলন গোপন হয়ে যায় আর বিশ্ব জনমতের সামনে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ সম্ভব হবে এবং এই হস্তক্ষেপে অখণ্ড পাকিস্তান তত্বের মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তান মীমাংসার কথা ওঠানো যেতে পারে।

প্রবীণ সেনাপতি কর্ণেল ওসমানী বহুকাল পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিয়ালটো, সেটো প্রভৃতি পশ্চিমী যুদ্ধ জোটে তিনি বহুকাল পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করে এসেছেন। তাই পাকিস্তানি গতিবিধি ও আচার আচরণ সম্পর্কে তাঁর অজানা কিছুই নেই।

কয়েকদিন আগে তিনি মুক্তি বাহিনীর কার্যকলাপ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সমস্ত সেক্টর ঘুরে তিনি গত সপ্তাহে ফিরেছেন মুজিবনগরে। সব সেক্টরেই পাকিস্তানিরা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করছে আর মুক্তিবাহিনীর

দুর্বীর অগ্রগতির সামনে দখলদাররা অনেক সময়ে বিনা প্রতিরোধেই পলায়মান।

মুক্তিবাহিনীর দুই পৃথক অংশ অবশ্য একই অধিনায়কত্ব সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী আর গোপন গেরিলা সংগঠন। সৈন্যবাহিনীতে আছে চল্লিশ হাজার সুশিক্ষিত এবং সমস্ত রকম আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত দৃঢ় মনোবল মুক্তিকামী তরুণ সেনানী। এদের নেতৃত্বে আছেন পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর প্রাক্তন মেজর আর ক্যাপ্টেনরা।

গেরিলারা সংখ্যায় প্রায় একলক্ষের মত। ঢাকা শহরেই আর অন্যান্য শহরকে ঘিরে আছে প্রায় পঁচিশ হাজারের মত অস্ত্র দীক্ষিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়া গেরিলারা।

গত সপ্তাহেই গেরিলাদের এক শাখা সংবাদ দেয় সৈন্যবাহিনীকে চট্টগ্রামে খাদ্যবাহী এক মার্কিন জাহাজ পৌঁছানো সম্পর্কে। আরও দু'একটি জাহাজ একই সঙ্গে এসে পৌঁছায় চট্টগ্রাম বন্দরে। সংবাদ পাওয়ায় মুক্তিবাহিনীর কমান্ডেরা আক্রমণ শুরুর করে বন্দরে বাঁধা জাহাজের ওপর।

বর্তমানে ঢাকায় অবস্থিত সানডে টেলিগ্রাফের বান্দু মহিলা সাংবাদিক ক্রেয়ার ইলিংওয়ার্থ এই জাহাজ আক্রমণের বিশদ সংবাদ পরিবেশন করেছেন গত রবিবারের সংবাদপত্রে। তিনি বলেছেন জাহাজ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ও

চট্টগ্রামের বহু জায়গায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ গেরিলা ও কমান্ডেরা বিদেশী খাদ্যশস্য গুদামজাত করেছে, বিলিব্যবস্থার কোন উদ্যোগ নেই। কারণ, পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর স্থির বিশ্বাস যে, খাদ্য বিতরণ মানেই গেরিলাদের পরোক্ষ সাহায্য। ওদের হাতেই অথবা ওদের প্রভাবিত এলাকাতেই খাদ্যশস্য পৌঁছে যাবে। ইলিংওয়ার্থের মতে খাদ্যবাহী জাহাজ ও খাদ্যগুদাম আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সহায়ক রাষ্ট্রদের বোঝাতে চাইছে যে, তাদের পাঠানো কোন সাহায্যই বাংলাদেশ মানুষের কল্যাণে আসছে না।

বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বশীল নেতাদের এবং মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারদের তথ্য অনুযায়ী মুক্তি অভিযানের চড়াওত পর্বের শুরুর হচ্ছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ।

মুক্তিবাহিনীর এখন আর অস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে বিশেষ কোন অভিযোগ নেই। মুক্তিবাহিনী এখন সম্মুখ সমরে নামবে বিভিন্ন সেক্টরে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আশঙ্কা যে, পাকিস্তানিরা ভারত আক্রমণের চেষ্টা করতে পারে পরাজয় সুনিশ্চিত জেনেও। ওরা মুক্তিবাহিনীর হাতে পরাজিত হওয়ার অপবাদ নিতে চায় না। ওরা দেখাতে চায় ওদের পরাজয় হয়েছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হাতে।

প্রকাশিত হল

শফিকুল হাসানের

মুক্তির সংগ্রামে

পূর্ব বাংলা

পূর্ব বাংলার সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির ভূমিকা, সংগ্রামী জনতা ও বিপ্লবী কমিউনিস্টদের ভূমিকা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বর্তমান পরিস্থিতি ও সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ, মুক্তির পথ এবং গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি রণকৌশল সম্পর্কে বহুল তথ্য সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য রচনা সঙ্কলন।

দাম : আড়াই টাকা

প্রকাশক : রবীন মুখোপাধ্যায়
প্রাপ্তিস্থান :

৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

স্বার্থস্বার্থী ও দুর্নীতিগরায়ণ ব্যক্তিদের কবলে যাদবপুর টি বি হাসপাতাল

(দুর্গার সংবাদদাতা)

কয়েকজন স্বার্থস্বার্থী ও দুর্নীতিগরায়ণ ব্যক্তিদের কবলে যাদবপুর টি বি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ হওয়ার বেসরকারী উদ্যমে স্থাপিত স্বাস্থ্যসেবার চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে ভারতের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির অতীত গৌরব ম্লান হয়ে গেছে।

এই হাসপাতালকে কেন্দ্র করে কি করে নিজেদের পসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা যায় এই মতলব-বাজদের প্রধান উদ্দেশ্য। রোগীদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এদের কোন নজরই নেই।

গত বিশেষ অক্টোবর এই অবস্থা চরমে ওঠার ফলে রোগীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সাধারণতঃ নিয়ম আছে, কোন দিন (যা কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে মেনে নিয়েছেন) যদি রোগীদের স্বিপ্রার্থনিক খাদ্য সরবরাহে কোন কারণে দেরী ঘটে তবে কিচেন ইনচার্জকে সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে সে সংবাদ রোগীদের জানাতে হবে এবং তার পরিস্থিতিতে রোগীদের নিজস্ব সংগঠন আরোগ্যকামী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে সে সংবাদ প্রত্যেক রোগীকে জানিয়ে দেওয়া হবে। অন্যথায় স্বিপ্রার্থনিক খাদ্য সরবরাহের নিয়ম রয়েছে এগারোটো থেকে বারোটোর মধ্যে। কিন্তু বিশেষ অক্টোবর বৃদ্ধবান (সোদীন মাংস দেওয়ার কথা ছিল) প্রত্যেক রোগীই দুপুরের খাবারের জন্য অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ সারে এগারোটোর খবর এলো—আজ দুপুরের খাবার বেলা তিনটোর আগে পাওয়া যাবে না।

স্বভাবতই এ সংবাদে ক্ষুব্ধ রোগীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তারা দলবদ্ধভাবে আরোগ্য সমিতির প্রতিনিধিসহ হাসপাতালের সেক্রেটারী ডাঃ সুবলচন্দ্র লাহার সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু তিনি তখন অনুপস্থিত থাকায় দুপুরারিন্টেনডেন্ট ডাঃ এইচ এন. দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি রোগী-প্রতিনিধিদের কাছে ঘটনাটি শোনবার পর কিচেন ইনচার্জ ডাঃ কে গোম্বামীকে ডাকেন। শ্রীগোম্বামী আসবার পর তাকে দাশগুপ্তের ঘরে রোগী-প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে উত্তেজিত এবং ক্ষুব্ধ কয়েকজন রোগীর সামনে উল্লসিত অবস্থায় বলেন : “যখন সামলাই আসবে, সেই অনুযায়ী খাবার মিলবে; এ নিয়ে কোন হাঙ্গামা করা চলবে না।” তিনি সুপারিন্টেনডেন্ট ডাঃ দাশগুপ্তকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন : “এই হাঙ্গামার নেতা ক-জনের নাম লিখে রাখুন তো; পরে এদের কি করে শাস্তি দেওয়া হবে, আমি দেখে নেবো।” কথা শুনে মনে হয় কিচেন ইনচার্জ শ্রীগোম্বামীই যেন হাসপাতালের বিধাতা। অথচ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীদাশগুপ্ত নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। ডাঃ গোম্বামীর উপরোক্ত মন্তব্যে রোগীরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে তার দিকে এগিয়ে যান এবং যতদূর জানা যায় সামান্য হাতাহাতিও হয়তো হয়েছিল। কিন্তু অবস্থা বদলে পেরে রোগীদেরই কয়েকজন প্রতিনিধি ডাঃ গোম্বামীকে এই স্থান ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তার উত্তেজনা তবুও কমেনা।

এই ঘটনার মধ্যেই তখনকার ঘটনায় ছেদ পড়ল। এরপর বিকেল পাঁচটার হঠাৎ নোটিশবোর্ডে ছয়জন রোগীর নামে ডিসচার্জ অর্ডার দিয়ে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতাল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হল। ঘটনা শুনে আমাদের মনে হচ্ছে কলকারখানার মতো হাসপাতালেও কি রোগীদের লে-আফ কিংবা ছাটাই করার নির্দেশ দেওয়া যায়? রোগীর আরোগ্য-অনারোগ্যের কথা ভেবে ডাক্তারদের মধ্যে কি কোনই মানবিকতা কাজ করে না? হাসপাতালের কোন নিয়মে এই কথা বলা আছে আমাদের জানা নেই।

যথারীতি, উল্লিখিত ছয়জন রোগী বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতাল ত্যাগ না করার ফলে কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসকরা (একমাত্র ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড বাদে) কুড়ি তারিখ থেকেই কর্মবিরতি শুরু করেন। ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডেও কাজ হচ্ছিল একেবারে না হবার মতোই। কিন্তু ইতিমধ্যে আরোগ্যকামী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে ঐ দিনের ঘটনার জন্য তারা কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত ভাবে দৃষ্ট প্রকাশ করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাও কাজে যোগদান করতে, অস্বীকার করেন। রোগীরা তাদের অব্যবস্থার জন্য বারবারই ডাঃ সুবল লাহার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি কোন ফোন রিসিভ করেন না। অন্যদিকে পরের দিন বেতারের স্থানীয় সংবাদে জানানো হয়, যে কুড়ি তারিখের উক্ত ঘটনার জন্য রাজপাল একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করবেন।

কমিশন গঠিত হয়েছিল ডাঃ সুবল লাহার, ডক্টরস ক্লাবের সভাপতি, ডাঃ বি পি. নিয়োগী (এই দুজনের বিরুদ্ধে রোগীদের পূর্বেই অভিযোগ রয়েছে) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ এল কে সুকুল, চব্বিশ পরগণা স্বাস্থ্য বিভাগীয় প্রধান, ই এস আই-এর স্পেশাল অফিসার ডাঃ এম

এল ভৌমিককে নিয়ে। প্রথমোক্ত দুজনের বিরুদ্ধে রোগীদের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বাকী তিনজনের সত্যতা কথা ভেবে তারা এই কমিশনকে মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু রোগীদের না জানিয়েই কমিশনের প্রথম বৈঠক শেষ হয়েছে তারা কমিশনের অস্তিত্ব পরে জানতে পেরেছেন। শত অনুরোধ উপরোধেও চিকিৎসকরা কাজে যোগদান না করার জন্য উল্লিখিত ছয়জন পশ্চিমে অক্টোবর থেকে অনিদিষ্ট কালের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। এবং তাদের সমর্থনে অপরাপর সাতশ জন

রোগী আঠাশে অক্টোবর প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। পরে উনত্রিশ তারিখে প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রশান্ত শূর এবং রমেশ সরকার ও শচীন সেনের অনুরোধে ঐ ছয়জন রোগী অনশন ভঙ্গ করেন।

অবশেষে গত চোঁঠা নভেম্বর সকালে তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে রোগীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের একটি মীমাংসা হয় এবং চিকিৎসকদের পাঁচ তারিখ থেকে যথারীতি কাজে যোগদান করার কথা।

কিন্তু প্রশ্ন হল মীমাংসা যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তাহলে তাতে তো বাড়তি ঝামেলায় অবসান হল। কিন্তু রোগীদের আসল সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

স্মরণ করা যেতে পারে, চিকিৎসকদের কর্মবিরতি পালনের সময় রোগের যত্নগার অতিষ্ঠ হয়ে মূল্যবান (সি আর সি ওয়ার্ড; পয়-তিরিশ নং বেড) নামে হাসপাতালেরই একজন চতুর্থ বিভাগীয়

কর্মী রেড দিয়ে নিজের গলা কাটেন এবং তারপরেও ঐ আহত রক্তচিট উপস্থিত চিকিৎসার অভাবে কয়েকদিনের মধ্যে মারা যান। এ ছাড়া উজ্জ্বল মিত্র, দিলীপ চক্রবর্তী, মনোজিং খাম্পা প্রমুখ আরো কয়েকজন রোগী মারা গেছেন।

সুতরাং এই যদি অবস্থা হয়, হাসপাতালটি দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার কোন গ্যারান্টি আছে কি? কেননা গত জুন মাসে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রোগীদের কাছে যে দশ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেটের মধ্যে পচা মাংস সরবরাহের যে ঘটনা ঘটেছে, নোংরা জল নিষ্কাশনের যে অব্যবস্থা; তাছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারী এপ্রিলে খাদ্য এবং ওষুধ পত্র বিষয়ে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, আগষ্টে কিচেনকে কেন্দ্র করে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়ার কথা ছিল—এসবই তো আজ ভাঙতাবাজীতে পরিণত হয়েছে।

সেল ট্যাক্সের বরাকর চেকপোস্টে সরকারী ডামাডোল

(দুর্গার সংবাদদাতা)

সেল ট্যাক্স দপ্তরের চেকপোস্টে গুলি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিস্বরূপ। কিন্তু কলকাতার চারিপাশে যে তেরটি চেকপোস্ট আছে, সেগুলোর ব্যবস্থা লক্ষ্য করলে আশ্চর্য হতে হয়, যেন কমিশনারের এদিকে কোন দৃষ্টি নেই। কয়েকটি অফিসের চেহারা হল রেল ও পোষ্ট কমিশনারের অফিসের ভিড়ের মধ্যেই একটি টেবিল ও দুটি চেয়ার। হাওড়া স্টেশন চেকপোস্টে ভালভাবে চলা-ফেরা করার জায়গা নেই, আর সামনেই রেলের আমদানী পচা মাছ ও অন্যান্য বস্তু স্তুপীকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং দুর্গন্ধময় অবস্থার অবস্থার সৃষ্টি করেছে। মেছুয়াবাজারে যদিও বা অনেকদিন পরে একটি গুদামটি ঘর মিলেছে তাও আবার আবজ্ঞার জগলের ধারে। অফিস ঘরগুলির দিকে তাকালে মনে হয় বৃহত্তম রাজস্বসংগ্রাহক দপ্তরের কর্মক্ষেত্রে গুলি মনুষ্য অবস্থানের উপস্থিতি কিনা। সেল ট্যাক্স কমিশনার তাঁর সদস্য ক্রিট চেম্বারে বসে এসবই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এইবার বরাকর চেকপোস্টের পরিস্থিতির কথাই আসি। এহেন অবস্থা কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। তবে অন্যান্য চেকপোস্টের চেহারা দেখে স্বাভাবিকভাবেই বোধ হয় সেল ট্যাক্স বিভাগে এর থেকে ভাল আর কি হতে পারে? প্রথমতঃ আটক করা মালপত্রের চাপে বরাকর চেকপোস্টের অফিস ঘরগুলি গুদামে পরিণত হয়েছে, তারই মধ্যে দুটি চেয়ার একটি টেবিল। বারান্দায় পর্বত আলপত্র জমা করা আছে খোলা অবস্থায়। তাতে

ওষুধ গুড়োদুধ থেকে সরু করে তেলের পিপে পর্বত; কি নেই। বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম ঐ একই ব্যবস্থা, যতদিন না মাল খালী হলে। সেই ওষুধ রোদজলে একেবারে তৈরী হয়ে থাকে মানুষের রোগ সারাবার জন্যে। চতুর্দিকে ইঁদুর, ছুঁচো আর সাঁপের উপদ্রব। কর্মচারীরা পর্বত ভরে ভরে থাকেন। প্রায় মাইল খানেক দূরের গো ডাউনে আলো নেই, আগুন লেগে গেলে নেভানোর সরঞ্জাম কোথাও নেই।

আট ঘণ্টাকরে তিনটি শিফটে দিনরাত কাজ চলছে। জি টি রোডের উপর অবস্থিত হওয়ার প্রচুর যানবাহনের চাপ। প্রতি শিফটে একজন ইন্সপেক্টর কাজ করেন, কিন্তু একজনের পক্ষে চেকিংয়ের পর গাড়ী ছাড়া, পারমিট দেখা, আটক করা মালপত্র খালীসের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে যেখানে প্রায় এক মাইল দূরে গোডাউন; তার ফলে যাদের স্রফ বা বিরতি থাকে তাদের বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয়। এখানে প্রতি শিফটে দুজন করে ইন্সপেক্টর দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কমিশনার খালি স্তোক দিয়ে চলেছেন, অথচ এর ব্যবস্থা করা তাঁরই ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এ ব্যাপারে অর্থকমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও নাকি কোন ফল হয়নি।

করার জন্যে লরী থেকে মাল নামানোর খরচের দায়িত্ব সাধারণতঃ সরকার বহন করেন। দৈনিক গড়ে তিন চারটি আটক হয়, ফলে কুণি খরচ লাগে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকার মত। এই নিয়মিত খরচের জন্যে কোন কন্ট্রোলসী ফান্ডের ব্যবস্থা নেই, ফলে মাঝে মাঝে ইন্সপেক্টরদের এই খরচের ভার বহিতে হয়।

গোডাউন দেখাশোনার জন্যে কোন গোডাউন কিপার বা নাইট গার্ড নেই।

এই পরিস্থিতির মধ্যে আসানসোলার ভারপ্রাপ্ত কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার আবার ইন্সপেক্টরদের দু-চার দিনের ছুটি নেওয়ার ক্ষেত্রেও অহেতুক বিধিনিষেধের বেড়া জাল দিয়ে তাঁদের অসুবিধের ফেলছেন।

গত মে মাসে আসানসোলের এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রমেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে কমার্শিয়াল ট্যাক্স ইন্সপেক্টরস এ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন এবং উল্লিখিত সকল বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু আজ পর্বত জরুরী বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি আর উদ্য-বাচা করছেন না; কমিশনার সাহেবও নীরব।

এইভাবে রাজস্ব আয়ের একটি নিষ্ঠুরযোগ্য আশ্রয়স্থলের প্রতি সরকারী আমলাদের এত ওদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বাধ্য সৃষ্টি করছে নাকি? খোলা জায়গায় পড়ে থাকা মালের ক্ষয়ক্ষতি হলে ডেমারেজ কি সরকারকে দিতে হচ্ছে না, নাকি চুরি গেলে সম্পূর্ণ খেসারৎ দিতে হয় না?

অর্থনৈতিক দর্শন

কেন্দ্রীয় আর্থিক নীতির ফলেই
অর্থনীতি অধোগামী হচ্ছে

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এত বেশী চিন্তিত যে তাঁরা টন টন কাগজে পরিকল্পনা, অজ্ঞান ভাষণ এবং ততোধিক সফরের মাধ্যমে তাঁদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে চলেছেন।

ডজন ডজন মন্ত্রী, জনপ্রতি গোটা তিরিশেক সেমিনার বৈঠক, তথাকথিত দোকানদার শিল্পপতিদের বড়ি করে মন্তব্য এবং খাদেম তলপীবাহক সাংবাদিকদের উদ্ভাসিত চাটকথনের দ্বারা যদি পশ্চিমবঙ্গের বেকার ও শিল্পোন্নয়ন সমস্যার সমাধান সম্ভব হত তাহলে মনে করা যেত যে পশ্চিমবঙ্গের দূর্দশামুক্তির দিন অতি নিকটে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য এবং দোকানদার শিল্পপতিদের বক্তব্য প্রায় এক। এই বক্তব্যকে নীতিরূপে হাজির করা এবং কাজে রূপ দেওয়ার কাজ মোটা মোটা মাইনেভোগী গোটাকলেক্ট নির্বোধ আমলার।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের অধোগতি কেন হয়েছে? শিল্পপতিরা বলবেন স্বতন্ত্র সরকারের আমল থেকে শিল্পে শ্রমিক অশান্তি, ঘেরাও, সাধারণভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এসব কারণেই শিল্পকারখানার লোকসান হচ্ছে—উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, বেকারী বাড়ছে। কেন্দ্রীয়-সরকার প্রশ্নপট্ট ইতিগতে মাথা নাড়লেন। গণিকা-সাংবাদিকরা বড়ি বড়ি প্রবন্ধ ফাঁদল, একদিনের হরতালের ফলে কত কোটী টাকার উৎপাদন কমল, দেশের কি কি সর্বনাশ হল—এবং এর জন্যে কেমন করে একমাত্র দায়ী সি পি এম প্রভাবিত স্বতন্ত্র সরকার।

এবার মাথা মোটা আমলার দল দিস্তা দিস্তা কাগজে পরিকল্পনা ফাঁদল কি করে হুজুরমণিবা মা বাপদের হাতে সরকারী অর্থ-ভান্ডারটী তুলে দেওয়া যায়। কাল্প, সাহায্যসংযোগগুলির বড়-

কর্তারাও আমলাদের সমগোত্রীয়। তারা বেকার সমস্যা হ্রাস এবং শিল্পোন্নয়নের নামে কোটী কোটী টাকা তুলে দিল এসব দোকানদার শিল্পপতি নামে চালু কালো-বাজারী ট্যাক্স ফাঁকিদেনেওলা জঘন্য সমাজবিরোধীদের হাতে। এই লোকগুলি, তখন টাকাটা লেজার ক্যাশ বইয়ে গোজামিল দিয়ে পুরোপুরি আত্মসাৎ করল।

আহমদপুরের সুগারমিল, বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, শ্রীদর্গা, অম্পূর্ণা—কত আর! নাম করা যায়—সব ক্ষেত্রেই তদন্ত করলে দেখা যাবে আগেকার মালিক পরিচালকদের দুর্নীতি, অযোগ্যতার দরুন লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি, জালিয়াতির মারফতে আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং তার গুণাগার গণ্যে হুজুরমণিবা শ্রমিকদের এবং পরে কোটী কোটী করদাতাদের পকেট কেটে শিল্পগুলিকে বাঁচানোর নামে, হাজার হাজার বেকারের চাকরী যোগাড়

করার নামে এই সব চোর জোচ্চোর মালিকদের পকেটে তুলে দিয়ে।

ব্যাঙ্কগুলি ছোট ছোট শিল্প কারখানাগুলিকে অল্প ঋণ দিতে যে পরিমাণ গড়িমসি করে, যে পরিমাণ জামান চায় তা সবাই জানে, বিশেষ করে সত্যি সত্যি যারা কাজকারবার করতে চান, কাজ জানেন বাদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু বাদের সংগতি নেই, তাদের তো ঋণ পাওয়া দম্ভকর।

কিন্তু চোরাকারবারী, অসং মালিকরা দীর্ঘকাল ধরে নানা অসুদপুঞ্জী শেল্লার হোল্ডারদের টাকা মেরে বাড়ী গাড়ী শেল্লার-ডিবেন্চার করেছে, তাদের বেলার এই-তথাকথিত নিয়মকানুন, জামান-জামানত এসবের প্রয়োজন হয় না। কারণ তাঁরা যে বিখ্যাত শিল্পপতি।

এই শিল্পপতিদের চমড়া একটুখানি খুলে নিলেই দেখা যাবে যে সিংহ চর্মাবৃত গর্দভের চেহারা। পরলোকগত পণ্ডিত জগদহরলাল নেহরু একবার সখেদে বলেছিলেন ভারতবর্ষে বড় বহনের ক্ষমতা আছে এমন কোন শিল্পপতি নেই, সবাই আদুরে থোকা শিল্পপতি—একটু লোকসানের সম্ভাবনা দেখলেই সরকারের আঁচল ধরে এসে দাঁড়ায়।

সুদুমার রায়ের সেই বিখ্যাত ছড়ার সাপ মারিয়ে বাবুর মতই এঁরা চান যে পছন্দসই সাপ হলে তারা মেরে ঠান্ডা করতে পারবেন, না হলেই মর্শকিল।

অর্থাৎ শিল্পোন্নয়ন করার জন্যে তাদের প্রয়োজন : এদেশের বাজারে তাঁদের পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না অর্থাৎ আমদানী বন্ধ করে এদেশের বাজার তাদের শোষণের জন্যে সংরক্ষিত রাখতে হবে, তাদের মূলধন যোগাড় করে দিতে হবে, তাদের উৎপন্ন মাল বথেচ্ছ দামে বিক্রয় করতে দিতে হবে, যদি বিক্রী না হয় তাহলে সরকারকে লোকসান দিয়ে এই মাল কিনে নিতে হবে, তাঁদের বিদেশী আমদানী রপ্তানীর লাইসেন্স দিতে হবে, এই লাইসেন্স অবাধে বাজারে বিক্রী করার স্বাধীনতা দিতে হবে, রপ্তানী পণ্যের দাম কম দেখিয়ে এবং আমদানী পণ্যের দাম অতিরিক্ত দেখিয়ে—তাদের বিদেশী ব্যাঙ্ক গোপনে বিদেশী মদ্রার অ্যাকাউন্ট রাখতে দিতে হবে, শ্রমিকদের মজুরীর চাহিদা ধামিয়ে দিতে হবে শ্রমিক ছাঁটাই—এর অবাধ অধিকার দিতে হবে—এবং এই সব শিল্পবাণিজ্যের স্বাধীনতার পাবিত্ব অধিকারকে রক্ষার জন্যে রাজ্যে রাজ্যে প্রগতিশীল ধনিক শোষণের বিরোধী দল ও সরকারগুলিকে ভেঙ্গে দিতে হবে, এর জন্যে যত সম্ভব পুন্ডলিশ, সি আর পি, মিলিটারী লাগবে সব দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে এসব চোরাকারবারী অসং শিল্প মালিকদের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পনিরাপত্তা ফৌজ নামে আধা সামরিক ফৌজ গঠন করে এদের পাহারা দেয়, শ্রমিক কর্মচারীদের বে-আইনীভাবে ছাঁটাই করে এবং শিল্প মালিকদের

এই পবিত্র কর্মসম্পাদন করবার প্রেরণা জোগায়।

গণিকা সংবাদপত্র ও মোসাহেব সাংবাদিকরা খুশীতে ডগমগ হয়ে ঢাকের বাদ্য বাজাতে—থাকে : এবার সব ফলশালা হচ্ছে গেল, ছাঁটাই শুরুর হয়েছে সন্তরাং বেকার সমস্যা কমে যাবে, জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে সন্তরাং দাম কমাতে হলে ছাঁটাই করা দরকার। চুরি-জোচ্চুরি বন্ধ করতে হলে চোরা-বাজারের দামকেই খোলাবাজারের দাম দাম বলে স্বীকার করে নিতে হবে। শেল্লার হোল্ডারদের লক্ষ লক্ষ টাকা যারা আত্মসাৎ করেছে তাদের হাতে এবার করদাতাদের কটাক্ষিত অর্থ তুলে দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে মোটা মাইনের মাথা-মোটা আমলারা চশমা মছে প্যাঁচার মতো গম্ভীর মুখ করে জানাল : শীর্ণগরি পশাশ, কোটি টাকা ওদের দেওয়া হবে, তাহলেই দেশে বেকার থাকবে না।

কিন্তু আরেকটা কণ্ঠস্বরও প্রবল হয়ে উঠছে। সে কণ্ঠস্বর জানতে চায় শিল্পবাণিজ্যের অধোগতি, ক্রমঃক্ৰমঃ বেকারী, অশিক্ষা, রোগ অনশনের জন্যে দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার আমলাদের অনসৃত অর্থনৈতিক পদক্ষেপ। শিল্পবাণিজ্য বাড়িয়ে, বেকার কমিয়ে, দেশে আইনশৃঙ্খলা জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রধান বাধা শ্রমিক নয়, জনসাধারণ নয়, স্বতন্ত্র সরকার নয়, তারা ছিল প্রধান সহায়ক। এর প্রধান বাধা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক ও সামাজিক নীতিগুলি যা সৃষ্টি করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রেণীদাসসুলভ মনোভাব এবং তাদের আত্মবাহ আমলাতন্ত্র এবং সংবাদপত্রের গণিকা গোষ্ঠী।

কিন্তু জনসাধারণের দূর্দশ-দর্শনা যত বাড়ছে, প্রতিকারের পথেও তারা তত বেশী দৃঢ়পদে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই এসব নীতি ছেঁড়া কাগজের মত পরিত্যক্ত হবে, এসব আমলাকে, শিল্পপতি ও গণিকা দলকে জনগণের বিচারে কারান্তরালে অথবা লোকচক্ষুর অগোচরে আবর্জনাকুণ্ডে দিন কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তাদের জন্যে এটাই অবধারিত সত্য।

শুধু টাকার প্রস্নই নয়
একটু লক্ষ্য রাখাও দরকার...

আপনি কি কিছুই চিন্তন বা বেচন সাব্যস্তই আপনার কটাক্ষিত অর্থ জড়িত।
যতটুকু যে কোনও মেসারসের কারবার টাকার মুদ্রা অথবা জিনিষ পাচ্ছেন কি দিচ্ছেন
তা দেখুন। একটু সতর্ক ও সচেতন হলে আপনি জিনিষপত্রের ওজন ঠিক ঠিক
আছে কি না পরামর্শ পাবেন। বিশেষ করে, মোড়াক ডরা জিনিষ কেনার সময়
দোষ বোঝার আসল জিনিষটির ওজন মোড়াকের ওপর রেখে জায়ে কি না।
যাত আপনাদের কোনও জটি না হয় তার জাস্ত ওজন ও মাপের উপকরণ নির্দিষ্ট
মাপের নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং মাপের সমস্ত সরঞ্জাম
সরকারী ছাপ দেওয়া আছে।

এ ব্যাপারে সাক্ষ্যের কোনও কিছু দেখলে আপনার এলাকার
ইন্সপেক্টর অফ ওয়েটস্ এন্ড মেজারস্ কে খবর দিন।
মোটক মাপ ও ওজনে গ্রাহকদের লাভ



দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক পনেরো টাকা

ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৩১, মট্টা লেন, কলি-১০

অর্থনৈতিক দর্শন

কেন্দ্রীয় আর্থিক নীতির ফলেই অর্থনীতি অধোগামী হচ্ছে

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এত বেশী চিন্তিত যে তাঁরা টন টন কাগজে পরিকল্পনা, অজস্র ভাষণ এবং ততোধিক সফরের মাধ্যমে তাঁদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে চলেছেন।

ডজন ডজন মন্ত্রী, জনপ্রতি গোটা তিরিশেক সেমিনার বৈঠক, তথাকথিত দোকানদার শিল্পপতিদের বড়ি কয়েক মন্তব্য এবং খাদেম তলপীবাহক সাংবাদিকদের উদ্ভাসিত চাটকথনের দ্বারা যদি পশ্চিমবঙ্গের বেকার ও শিল্পোন্নয়ন সমস্যার সমাধান সম্ভব হত তাহলে মনে করা যেত যে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশামুক্তির দিন অতি নিকটে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য এবং দোকানদার শিল্পপতিদের বক্তব্য প্রায় এক। এই বক্তব্যকে নীতিরূপে হাজির করা এবং কাজে রূপ দেওয়ার কাজ মোটা মোটা মাইনেভোগী গোটাকয়েক নির্বোধ আমলার।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের অধোগতি কেন হয়েছে? শিল্পপতিরা বলবেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে শিল্পে শ্রমিক অশান্তি ঘেরাও, সাধারণভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এসব কারণেই শিল্পকারখানায় লোকসান হচ্ছে—উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, বেকারী বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রশ্নপুষ্ট ইংগিতে মাথা নাড়লেন। গণিকা-সাংবাদিকরা বড়ি বড়ি প্রবন্ধ ফাঁদল, একদিনের হরতালের ফলে কত কোটা টাকার উৎপাদন কমল, দেশের কি কি সর্বনাশ হল—এবং এর জন্যে কেমন করে একমাত্র দায়ী সি পি এম প্রভাবিত যুক্তফ্রন্ট সরকার!

এবার মাথা মোটা আমলার দল দিস্তা দিস্তা কাগজে পরিকল্পনা ফাঁদল কি করে হুজুরমণি বা বাপদের হাতে সরকারী অর্থ-ভান্ডারটী তুলে দেওয়া যায়। ব্যাংক, সাহায্যসংস্থাগুলির বড়-

কর্তারাও আমলদের সমগোত্রীয়। তারা বেকার সমস্যা হাস এবং শিল্পোন্নয়নের নামে কোটা কোটা টাকা তুলে দিল এসব দোকানদার শিল্পপতি নামে চালু কালো-বাজারী টাকার ফাঁকিদেনেওলা জঘন্য সমাজবিরোধীদের হাতে। এই লোকগুলি তখন টাকাটা লেজার ক্যাশ বইয়ে গোঁজামিল দিয়ে পুরোপুরি আত্মসাৎ করল।

আহমদপুরের সুগারমিল, বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, শ্রীদুর্গা, অন্নপূর্ণা—কত আর নাম করা যায়—সব ক্ষেত্রেই তদন্ত করলে দেখা যাবে আগেকার মালিক পরিচালকদের দুর্নীতি, অযোগ্যতার দরুন লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি, জালিয়াতির মারফতে আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং তার গুণাগার গণতে হচ্ছে প্রথমতঃ শ্রমিকদের এবং পরে কোটা কোটা করদাতাদের পকেট কেটে শিল্পগুলিকে বাঁচানোর নামে, হাজার হাজার বেকারের চাকরী যোগাড়

করার নামে এই সব চোর জোচ্চোর মালিকদের পকেটে তুলে দিয়ে।

ব্যাংকগুলি ছোট ছোট শিল্প কারখানাগুলিকে অল্প ঋণ দিতে যে পরিমাণ গড়িমসি করে, যে পরিমাণ জামীন চায় তা সবাই জানে, বিশেষ করে সত্যি সত্যি যারা কাজকারবার করতে চান, কাজ জানেন যাদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু যাদের সংগতি নেই, তাদের তো ঋণ পাওয়া দম্ভকর।

কিন্তু চোরাকারবারী, অসং মালিকরা দীর্ঘকাল ধরে নানা অসদুপায়ে শেয়ার হোল্ডারদের টাকা মেরে বাড়ী গাড়ী শেয়ার-ডিবেন্চার করেছে, তাদের বেলায় এই তথাকথিত নিয়মকানুন, জামীন-জামানত এসবের প্রয়োজন হয় না। কারও তাঁরা যে বিখ্যাত শিল্পপতি।

এই শিল্পপতিদের চমড়া একটুখানি খুলে নিলেই দেখা যাবে যে সিংহ চর্মাবৃত গর্দভের চেহারা। পরলোকগত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একবার সখেদে বলেছিলেন ভারতবর্ষে বড়িক বহনের ক্ষমতা আছে এমন কোন শিল্পপতি নেই, সবাই আদুরে খোকা শিল্পপতি—একটু লোকসানের সম্ভাবনা দেখলেই সরকারের আঁচল ধরে এসে দাঁড়ায়।

সুকুমার রায়ের সেই বিখ্যাত ছড়ার সাপ মারিয়ে বাবুর মতই এঁরা চান যে পছন্দসই সাপ হলে তারা মেরে ঠান্ডা করতে পারবেন, না হলেই মর্শকিল।

অর্থাৎ শিল্পোন্নয়ন করার জন্যে তাদের প্রয়োজন : এদেশের বাজারে তাঁদের পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না অর্থাৎ আমদানী বন্ধ করে এদেশের বাজার তাদের শোষণের জন্যে সংরক্ষিত রাখতে হবে, তাদের মূলধন যোগাড় করে দিতে হবে, তাদের উৎপন্ন মাল যথেষ্ট দামে বিক্রয় করতে দিতে হবে, যদি বিক্রী না হয় তাহলে সরকারকে লোকসান দিয়ে ঐ মাল কিনে নিতে হবে, তাঁদের বিদেশী আমদানী রপ্তানীর লাইসেন্স দিতে হবে, ঐ লাইসেন্স অবাধে বাজারে বিক্রী করার স্বাধীনতা দিতে হবে, রপ্তানী পণ্যের দাম কম দেখিয়ে এবং আমদানী পণ্যের দাম অতিরিক্ত দেখিয়ে—তাদের বিদেশী ব্যাংক গোপনে বিদেশী মদ্রার একাউন্ট রাখতে দিতে হবে, শ্রমিকদের মজুরীর চাহিদা থামিয়ে দিতে হবে শ্রমিক ছাঁটাই-এর অবাধ অধিকার দিতে হবে—এবং এই সব শিল্পবাণিজ্যের স্বাধীনতার পবিত্র অধিকারকে রক্ষার জন্যে রাজ্যে রাজ্যে প্রগতিশীল ধনিক শোষণের বিরোধী দল ও সরকারগুলিকে ভেঙ্গে দিতে হবে, এর জন্যে যত শাস্ত্র পদলিখ, সি আর পি, মিলিটারী লাগবে সব দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে এসব চোরাকারবারী অসং শিল্প মালিকদের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পনিরাপত্তা ফৌজ নামে আধা সামরিক ফৌজ গঠন করে এদের পাহারা দেয়, শ্রমিক কর্মচারীদের বে-আইনীভাবে ছাঁটাই করে এবং শিল্প মালিকদের

এই পবিত্র কর্মসম্পাদন করবার প্রেরণা জোগায়।

গণিকা সংবাদপত্র ও মোসাহেব সাংবাদিকরা খুশীতে ডগমগ হয়ে চাকের বাড়ী বাজাতে—থাকে : এবার সব ফয়সালা হয়ে গেল, ছাঁটাই শুরুর হয়েছে সতরাং বেকার সমস্যা কমে যাবে, জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে সতরাং দাম কমাতে হলে ছাঁটাই করা দরকার। চুরি-জোচ্চুরি বন্ধ করতে হলে চোরা-বাজারের দামকেই খোলাবাজারের ন্যায্য দাম বলে স্বীকার করে নিতে হবে। শেয়ার হোল্ডারদের লক্ষ লক্ষ টাকা যারা আত্মসাৎ করেছে তাদের হাতে এবার করদাতাদের কষ্টার্জিত অর্থ তুলে দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে মোটা মাইনের মাথা-মোটা আমলারা চশমা মূছে প্যাঁচার মতো গম্ভীর মুখ করে জানাল : শীর্ণগরি পণ্ডাশ কোটি টাকা ওদের দেওয়া হবে, তাহলেই দেশে বেকার থাকবে না।

কিন্তু আরেকটা কণ্ঠস্বরও প্রবল হয়ে উঠছে। সে কণ্ঠস্বর জানতে চায় শিল্পবাণিজ্যের অধোগতি, ক্রমঃবর্ধমান বেকারী, অশিক্ষা, রোগ অনশনের জন্যে দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার আমলাদের অন্যতম অর্থনৈতিক পদক্ষেপ। শিল্পবাণিজ্য বাড়িয়ে, বেকার কমিয়ে, দেশে আইনশৃঙ্খলা জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রধান বাধা শ্রমিক নয়, জনসাধারণ নয়, যুক্তফ্রন্ট সরকার নয়, তারা ছিল প্রধান সহায়ক। এর প্রধান বাধা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক ও সামাজিক নীতিগুলি যা সৃষ্টি করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রেণীদাসসুলভ মনোভাব এবং তাদের আত্মবাহ আমলাতন্ত্র এবং সংবাদপত্রের গণিকা গোষ্ঠি।

কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ-দর্দশা যত বাড়ছে, প্রতিকারের পথেও তারা তত বেশী দৃঢ়পদে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই এসব নীতি ছেঁড়া কাগজের মত পরিত্যক্ত হবে, এসব আমলাকে, শিল্পপতি ও গণিকা দলকে জনগণের বিচারে কারান্তরালে অথবা লোকচক্ষুর অগোচরে আবর্জনাকুণ্ডে দিন কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তাদের জন্যে এটাই অবধারিত সত্য।

শুধু টাকার প্রশ্নই নয় একটু লক্ষ্য রাখাও দরকার...

আপনি যা কিছুই কিনুন বা বেচুন সবচেয়ে আপনার কষ্টার্জিত অর্থ জড়িত।
যতদূর যে কোনও লেনদানের কারবার টাকার মূল্য অনুযায়ী জিনিষ পাচ্ছেন কি দিচ্ছেন
তা দেখুন। একটু সতর্ক ও সচেতন হলে আপনি জিনিষপত্রের ওজন ঠিক ঠিক
আছে কি না ধরতে পারবেন। বিশেষ করে, মোড়াক ডরা জিনিষ কেনার সময়ে
দোষ নাওন আসল জিনিষটির ওজন মোড়াকের ওপর লেখা আছে কি না।
যাও আপনার কোনও ক্ষতি না হয় তার জায় ও মাপের উপকরণ নির্দিষ্ট
মাপ নিয়ন্ত্রণ করে দেওয়া হয়েছে এবং মাপের সমস্ত সরঞ্জাম
সরকারী ছাপ দেওয়া আছে।
এ যাপ্যের সাক্ষ্যের কোনও কিছু দেখলে আপনার এলাকার
ইন্সপেক্টর অফ ওয়েটস্ এ্যান্ড মেজাস্ট্রিক খবর দিন।
মোটক মাপ ও ওজনে গ্রাহকদের লাভ



দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক পনেরো টাকা
ত্রৈমাসিক চার টাকাটাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার
ঠিকানা :

৬১, মল্ল লেন, কলি-১০

সাইক্লোনে বিধ্বস্ত উড়িষ্যা সেই একই দৃশ্য

(পৰ্বতের সংবাদদাতা)

সেই একই দৃশ্য। সেই ভাঙা গাছ, ধ্বংস পাড়া বাড়ী, ওলটানো টেলিগ্রাফের খুঁটি, বৃক্ষ পৰ্বন্ত জমে থাকা জল আর দম-আটকানো গন্ধে ভারী বাতাস।

উনিশশ আটবিটির জলপাইগুড়ি, উনিশশ উনসত্তরের হুগলী, উনিশশ সত্তরে মালদা, আর উনিশশ একাত্তরে উড়িষ্যা। কোন তফাৎ নেই। মানুষ-গুলোও এক। তাদের কথাগুলোও এক। হয়ত ভাষায় একটু পার্থক্য, বা উচ্চারণে। মৃতের সংখ্যা হয়ত কোথাও একটু কম আবার কোথাও বা বেশী।

কিন্তু সেই হাত জোড় করে কান্না, সব ভেসে গেছে। ঘর নেই বাড়ী, গরু নেই, ধান নেই। একটু চাল দাও, দুখানা কাপড় দাও। একটু জায়গা দাও, বাচ্চাটার জ্বর হয়েছে, ওষুধ দাও।

মাথায় পট্টলি বেঁধে কাতারে কাতারে লোক হেঁটে চলেছে। শুনকো জায়গাগুলো রাতারাতি আবার ছেঁড়া কাপড় আর বাঁশের চোঁচ দিয়ে তৈরী হয়েছে সেই সব তাঁবু, যাতে একমাত্র দরিদ্র ভারত-বাসীই পারে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে কুকুর-কুন্ডলী হয়ে ঘুমতে।

বালাসোর, জামপুর্, ভদ্রক রাজনগর, পারাদীপ, জম্বু আর তাদের গায়ে গায়ে হাজার হাজার নাম-না-জানা গাঁয়ে আজ এই দৃশ্য। দ্বিতীয় সাইক্লোন অবশ্য দম্বা করে আর এদিকে আসে নি। সমুদ্র ফিরে গেছে নিজের জায়গায়। মহানদী, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী আর খরপ্রোতা—সেই সব হঠাৎ-স্কাপা নদীরা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, তাদের ধারে ধারে জেগে উঠেছে মসৃণ বালির চর।

অন্ততঃ দশ থেকে বার হাজার লোক মারা গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা। বহু গ্রামে এখনও পর্যন্ত বাইরের দানিয়ার কেউ পৌঁছয় নি। কটক আর বালাসোর জেলায় অধিকাংশ গ্রামগুলোতে কাঁচা বাড়ীর আর অস্তিত্ব নেই। রিলিফের গাড়ীর অপেক্ষায় হাজার হাজার লোক বসে আছে চকচকে হাইওয়ে-গুলোর ধারে ধারে। গাড়ী দেখলেই তারা হাত জোড় করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে বলে : চাল দাও। চাল আন নি?

রিলিফ সেন্টারে অফিসারেরা বসে আছেন মন খারাপ করে। চাল হয়ত এসেছে কোন কোন সেন্টারে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। আর সমুদ্রের ধারে ধারে যে সব গ্রাম সেখানে অনেক জায়গাতেই কিছুই পৌঁছয় নি। লতাপাতা, জংলী শাক আর কচু খেয়ে কোন-রকমে গ্রামবাসীদের দিন কাটছে।

গত সপ্তাহে ভদ্রক শহরে গিয়ে দেখি, এস ডি ও-র অফিসের বাইরে কোমর পর্যন্ত জল। খানিক-দূরে রাস্তার ধারে একটা চায়ের

দোকান সম্পূর্ণ উল্টে পড়ে আছে। দোকানের মালিক উন্নয়ন আর কেটলী নিয়ে মাটিতেই ব্যবসা চালাচ্ছেন। টেলিগ্রাফের তার দল্যা পাকিরে রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে। প্রকাণ্ড গাছ ভেঙে পড়েছে আধা-পাকা বাড়ীকে পিষে ফেলে। বস্তীগুলোর বাসিন্দারা এসে আশ্রয় নিয়েছেন ধারে কাছের পাকা বাড়ীর বারান্দায়। অনেকে বলছেন শতাব্দীর রং হাওয়ার ধরণ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের ঐ কুঁড়েঘর টিকবে না। যাঁরা পালিয়েছিলেন, তাঁরা বেঁচেছেন। যাঁরা তখনও পড়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ মারা গেছেন, কেউ আহত। সরকারী অফিসারেরা বলছেন তখনও টেলিফোন টেলিগ্রাফ চারদিকে কাজ করছে না। তাঁদের টেবিলে টেবিলে এস ও এস মেসেজ তৈরী হয়ে পড়ে আছে।

জামপুর্ শহরে গিয়ে মনে হল গোটা শহরটাকে কোন দানব মূঠোর মধ্যে নিয়ে দলে-মচড়ে দিয়ে গেছে। সারা শহর জুড়ে ইন্টার টুকরো, ভাঙা বাঁশ, কাঠ, ছেঁড়া জামাকাপড় ছিড়িয়ে আছে। আলো নেই, জল নেই। আশেপাশের গ্রাম-গুলোতে কলেরা সুরু হয়েছে। হাজার হাজার গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তাঘাট বন্ধ করে রেখেছে। চাঁদ-কালি এলাকায় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন। সরু সরু খাল আর ছোট ছোট নদীগুলো ফুলে, ফেঁপে উঠেছে। মৃতের কোন হিসাব নেই।

তার উপরে আরম্ভ হয়েছে রাজনৈতিক দলের দৌরাষ্ট্র। কোন কোন গ্রাম থেকে চাল লুটের খবর আসছে। নেতারা গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন হাঙ্গামা বাধাবার

জন্য। চিরাচরিত ব্যাপার। আট-বাঁটি সালে জলপাইগুড়ির বন্যা দেখতে গিয়েও শুনিয়েছিলাম, রিলিফের মাল নিয়ে রাজনৈতিক কচ-কচি, অভিযোগ আর প্রতি-অভিযোগ। এ ব্যাপারও তাই।

পারাদীপ বাওয়ার সময় পথের ধারে ধারে দেখলাম কন্যার ছয়দিন ধারে ধারে দেখলাম বন্যার ছয়দিন পরেও মৃতদেহ পড়ে আছে। পারা গ্রামে রাস্তার ধারে এক যুবকের মৃতদেহ, জলার মধ্যে শালকের গাছায় আটকে রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসকেরা বললেন, ওর নাম তিনু। জল আসছে শুনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে দৌড়াচ্ছিল, পালাতে পারে নি। ওর মা আর ভাইকেও পাওয়া যাচ্ছে না। তিনুকে সবাই চেনে, তবুও শালকের গাছা থেকে তার দেহটা বার করা হয়ে ওঠে নি।

তিনু হাত-দশেক দূরেই পড়ে আছে একটি গরু। তার একটু পরে একটি মোষ, তারপরে আর একটি গরু। কয়েকটি কুকুর তাদের আশেপাশে নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম করছে, তাদের চোখেমুখে তৃপ্ত ভাব। শকুন অবশ্য দেখলাম না। লোকের মুখে শুনলাম, কিছু মৃতদেহ গণ-কবরে গেছে, কিছু কেরোসিন দিয়ে দাহ করা হয়েছে। অনেকে ত ভেসেই গেছে। আর কুকুরেরা তাদের সাধ্যমত সাহায্য করছে। এই কুকুরগুলোকে দেখে আমার মনে পড়ল। নদীয়া সীমান্তে যখন বাংলাদেশ শরণার্থীদের মধ্যে কলেরার মড়ক হয় তখন শিকারপুর-করিমপুর রোডের ধারে কতগুলো কুকুরের মুখেও ঠিক ঐরকম তৃপ্তির ভাব দেখেছিলাম।

অবশ্য মৃতের জন্য শোক করার অবস্থা জীবিতদের নেই। খাদ্য এবং আশ্রয়ের স্থানে তাঁরা যেন নিজেদের চরম শোকও ভুলে গিয়েছেন। যাঁর এক ছেলে গিয়েছে, অন্যদের বাঁচাবার তাগিদে তিনি হারাণ ছেলের কথা ভাবার সময় (শেষাংশ অঙ্কন পৃষ্ঠায়)

অপারেশনের অভাবে রোগী মরে ডাক্তার প্রাইভেট প্রাকটিসে ব্যস্ত

(বিশেষ সংবাদদাতা)

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, কলকাতার মেডিকেল কলেজে এ্যানেসথেটিস্ট থাকা সত্ত্বেও প্রতি-মাসে অপারেশনের অভাবে প্রায় পনেরো কুড়ি জন রোগী মারা যাচ্ছে। নিভরযোগ্য মহলের খবর অনুসারে জানা যায় মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের প্রফেসর ডাইরেক্টর ডাঃ এ কে রায় বর্তমানে ঐ কলেজের এ্যানেসথে-টিস্ট। কিন্তু অপারেশনের সময় তাঁকে হাসপাতালের কোথায়ও পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগে আরো বলা হয়েছে তিনি সকাল আটটায় প্রতি-দিন হাসপাতালে আসেন বটে, তবে তিনি নাকি হাসপাতাল কপাউন্ডে গাড়ীটি রেখে অন্যথায় ট্যাক্সি নিয়ে তাঁর নার্সিং হোমে রোগী তদারক করতে যান। রোজই তিনি একটা না একটা গাড়ী রেখে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যান। গাড়ীটি যথা সময়ে আবার তাঁর ড্রাইভার তাল বদলে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে যায়। অবশ্য তাঁর (সরকারী মতে) ডিউটি আওয়ারসের পর। তিনি হাসপাতাল কপাউন্ডে গাড়ী রেখে এটা প্রমাণ করতে চান যে তিনি হাসপাতালেই আছেন। কিন্তু যদি ব্যাপকভাবে তদন্ত করা যায় তা হলে দেখা যাবে তিনি তখন তাঁর নার্সিং হোমে।

শুধু তাই নয়, অভিযোগে আরো জানা যায় যে কোন রোগী যদি তাঁর মারফৎ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চান তা হলেও তিনি নাকি তিনি থোক চার হাজার টাকা ফিস নেন। সম্প্রতি তাঁর এই

দুর্নীতির কথা মেডিকেল কলেজের কিছু ছাত্র জানতে পারেন এবং অপারেশনের অভাবে বেশ কয়েকজন রোগী মারা যাচ্ছে জেনে তারা একদিন ডাঃ রায়কে শ্রীক ঘেরাও করেন। পরে ডাঃ রায় তাদের কাছে মচলেকা সিনে দেন যে, তিনি ভবিষ্যতে কোন দিন হাসপাতালে অনুপস্থিত থাকবেন না এবং যতদূর সম্ভব ক্যাচ পেমেন্ট সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।

অপারেশনের অভাবে যখন হাসপাতালে দিনের পর দিন বেশ কয়েকজন রোগী মারা যেতে বসে-ছেন তখন ঐ হাসপাতালেই এক শ্রেণীর ডাক্তার তাদের ডেজিগ-নেশনের দৌলতে নার্সিং হোম খুলে প্রতি মাসে আশি থেকে নব্বই হাজার টাকা গ্যাপন পথে উদ্ধার করছেন। বাদের ডিউটি টাইমে হাসপাতালের মধ্যে পাওয়া যায় না তাদের সম্বন্ধে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন মন্তব্য নেই শুনে আশ্চর্য লাগে।

বিশেষ এক সূত্র থেকে আরো জানা গেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের জনৈক অফিসারকে নাকি কলকাতার কয়েকটি বড় বড় হাসপাতালের বেশ কয়েকজন ডাক্তার প্রতি মাসে দ্বিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়ে ধকেন। পাছে অফিসারের কোপে পড়েন সেই জনই নাকি এই ব্যবস্থা।

ইছাপুরের প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্রে বন্ধ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয়তাবিরোধী কাজ

(পৰ্বতের সংবাদদাতা)

চৌঠা অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ নির্দেশে ইছাপুরে অবস্থিত প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্র ডিফেন্স মেটালার্জিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রতি-ষ্ঠানটির কাজ বন্ধ হয়েছে বিশেষ অক্টোবর থেকে।

গবেষণা কেন্দ্রটির তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চিফ ইন্সপেকটর অফ মেটাল এ পদ-নিয়োগ করা হলেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের হারদারাবাদে বদলী করা হয়েছে। গবেষণাগারটি বন্ধ করার ফলে যদিও কোন কর্মচারী ছাটাই হয়নি, কিন্তু খাতু গবেষণার দিক থেকে এটি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

গত দশ বছরে দশটি নতুন

অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী তৈরী হয়েছে। সারা ভারতে। অথচ পূর্বাঞ্চলে কোন অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী গড়া হয়নি। ব্রিটিশ আমলে পাশ্চিম বাংলায় চারটি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী হয়েছিল। এর প্রতিটির সঙ্গে যুক্ত আছে প্রতিরক্ষা সামগ্রীর গণাগুণ পরীক্ষার জন্য একটি করে ইন্সপেক্টরট বিভাগ। আর খাতু গবেষণার জন্য তৈরী হয়েছিল ইছাপুরের এই গবেষণাগারটি।

কেন্দ্রীয় সরকার উনিশশ পঁয়-বাঁটি সালেই এই গবেষণা প্রতি-ষ্ঠানটিকে হারদারাবাদে স্থানান্ত-রের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অল ইন্ডিয়া ডিফেন্স এমপ্লয়িজ ফেডা-রেশন ও ইউনিয়নের যুক্তি ছিল, ইছাপুরই গবেষণা কাজ চালাবার প্রকৃষ্ট জায়গা এবং তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উক্ত সিদ্ধান্তকে জাতীয়

য়তাবিরোধী আখ্যা দেয়। কেননা প্রতিরক্ষা বিভাগের বৃহৎ খাতু বিষয়ক কারখানা মেটাল এন্ড স্টিল ফ্যাক্টরী, তাছাড়া গবেষণাগারের কাছেই দমদম কাশীপুরের ইঞ্জি-নীয়ারিং কারখানার লি অবস্থিত। শুধু তাই নয়, পূর্বাঞ্চলেও রয়েছে দুর্গাপুরের দুটি ও রুরকেল্লার দুটি স্টীল ফ্যাক্টরী। কলকাতা, যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের লি কানি-গার বিভাগের সাহায্য পেতে পারবে ইছাপুরের গবেষণাগারে। এর কোন সুযোগ হারদারাবাদে নেই।

উনিশশ পঁয়বাঁটি সালে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাশ্চিমবঙ্গের তৎ-কালীন কংগ্রেসী মধ্যমন্ডীর বোগ-সাজসেই এই গবেষণাগারটি স্থানা-ন্তরের চেষ্টা চলছিল। স্মরণ করা যেতে পারে ইছাপুরে সরকারী

জমির উপরেই গবেষণাগারটি অব-স্থিত ছিল, অথচ হারদারাবাদে নিজাম প্যালেস ভাড়া করে স্থানা-ন্তর করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্বরণ সিং লোকসভা সদস্য মহঃ ইস-মাইলকে আটবাঁটি সালের তেসরা জুলাই লিখিত চিঠিতে গবেষণা-গারটির দায়িত্ব এবং সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু আজ সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হল। হারদারা-বাদে একচেটিয়া পুঞ্জির মনোফার স্বার্থে গবেষণাগারটিকে স্থানান্ত-রিত করা হয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয়, এই প্রতি-ষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করবার নির্দিষ্ট তারিখেই ইছাপুর মজদুর ইউনিয়-নের তেইশ জন সমর্থক ও কর্মীকে ছাটাই করা হয়েছে।

নকশাল রাজনীতির ব্যর্থতা

আপনাদের পরিচয় উন্মোচন করে অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশিত বিমল পাল 'মহাশয়ের "প্রতিরোধ কমিটি প্রসঙ্গে" লেখাটি বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। যদিও বিমলবাবুর বহু মন্তব্য আমার কাছে অবান্তর এবং বিকৃত বিশ্লেষণ বলে মনে হয়েছে তবু উনি যে নকশালপন্থীদের আন্দোলন অবশেষে হাজার হাজার ভুলের চোরা-বালিতে আটকে পড়ে আজ নিজেই খতম হয়ে গিয়েছে একথা স্বীকার করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

তবে দৃষ্টান্তের কথা, আজও বিমলবাবুর সাধারণ মানুষের কাছে নকশালপন্থীদের আন্দোলনের একটা মার্কসবাদী কাহিনী হাজির করার চেষ্টা করেন। আর তাছাড়া প্রতিরোধ কমিটিগুলিতে কোন দলের বা কোন কোন চরিত্রের লোক দানা বেঁধেছে তা বিশ্লেষণ করার কোন অধিকারই নকশালদের আর নেই বলে আমি মনে করি। কারণ যারা নিজেদের কমিটিদেরই প্রতীকী চরিত্র বসাতে পারেন, তাদের মধ্যে অন্যদের প্রতীকীচরিত্র বিশ্লেষণ আদৌ শোভা পায় না বা সঠিক হতে পারে না।

বিমলবাবু আজ যাদের লক্ষ্যপন বলে গালাগালি দিচ্ছেন অথবা বদ কংগ্রেসের চর বলেছেন, আমরা দিনের পর দিন আমাদের এই কুসনগর শহরেই দেখছি পাইপ-

গান আর রিভলবার হাতে নিয়ে সেইসব বীর বিপ্লবীদের মাও সে তু-এর চেলা সেজে বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনীর বোলচাল দিয়ে দিনের আলোর প্রকাশ্য রাস্তায় নর-বলি দিতে এবং লোকের বাড়ী থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করতে। জানি না আপনাদের চার মজুমদার আন্দোলনের এই অব-

তরণ প্রাণ আজ পৃথিবীর মাটি থেকে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। সুতরাং বিমলবাবু দৃষ্ট কণ্ঠে আপনাদের শোভা পায় না।

আশা করি আপনার মনে আছে প্রথম যখন নকশালবাদীতে আন্দোলন শুরু হলো, তখন চাবন সাহেব এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কত কড়া কড়া মন্তব্য করেছিলেন নয়াদিম্মীর

মতামত

স্থাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করছেন, তবে জেনিনের সেই ঐতিহাসিক শ্লোগান—“বিপ্লব চট্টের খলিতে আমদানী বা রপ্তানীর জিনিস নয়”—এই বাংলার মাটিতে আরেকবার বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রমাণিত হলো।

আর এই সঙ্গে সি পি এম নেতাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কারণ এঁরাই সর্বপ্রথম নকশালপন্থীদের চরিত্র, আসল উদ্দেশ্য এবং এদের পেছনের সেই বিপুল বিশাল নরখাদক ব্যক্তিগণের মূখোশ জনসাধারণের কাছে স্পষ্টভাবে খুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন; যদিও সর্বক্ষেত্রে প্রতিরোধ করা সি পি এম-এর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি, ফলে কয়েক হাজার

বিভিন্ন সভায় এবং এক সময় তিনি ট্রেনেছিলেন নকশালবাদীতে সরাসরি কেন্দ্রীয় পলিশ বাহিনীকে পাঠিয়ে কৃষক আন্দোলন ধ্বংস করতে। কিন্তু ধাপ্তাবাজ ইন্দিরা গান্ধীর নব কংগ্রেসী শাসক ও শোষণ সরকার এবং মনোফাবাজ ব্যবসায়ীরা ভালভাবেই জানেন, কি ভাবে লোকসানের কারবারকে লাভের কারবারে পরিণত করা যায়। তাই দেশের জনসাধারণ আঁত ভয়ে দিনের মধ্যেই দেখতে পেলো ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ রায় থেকে শুরু করে ভবানী সেন পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক নেতা এবং বিড়লা থেকে থেকে শুরু করে পাড়ার হবু মজুমদার লংকানারায়ণ পোন্দার পর্যন্ত নকশালপন্থীদের বীরত্ব

গাথায় পশ্চম্বে। আর সেইসঙ্গে দৈনিক বাজারী পত্রিকাগুলোর পাতায় প্রকাশিত হতে শুরু হলো নানাধরনের পিঠ-চাপড়ানি সংবাদ। এইসব দেখে শুনে চারবাবু এবং আরো কিছু নেতা ক্যাঙ্গারুর মতো লেজে ভর দিয়ে লাফাতে শুরু করলেন, আর এই বিভ্রান্তির সন্ধান নিয়ে পলিশের লোকেরা রাতের অন্ধকারে দেয়ালে দেয়ালে আল-কাতরা দিয়ে বড় বড় নকশালী শ্লোগান লিখে দিতে শুরু করলো, নব কংগ্রেসীরা কয়েক হাজার ভাড়াটে যবককে হাতে পাইপগান-আর রিভলবার দিয়ে এবং মূখে কাষ্ট্রো কাপড়ের মূখোশ পরিয়ে নকশাল লেবেল এঁটে পাড়ার পাড়ার চালান করে দিল, যাতে তারা পাড়ার সমস্ত সংগ্রামী যবককে খুন করতে পারে; সাধারণ মানুষের ওপর এমন অত্যাচার শব্দ

করে দিল যার ফলে “চালের দাম বেড়েছে”—এই কথাটাও বলার শক্তি আজ সাধারণ মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। ক্যাসিস্ট শক্তি যখন দেখলো নকশালদের সাইনবোর্ড-গুলো আর ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার দরকার নেই তখনই তারা তাদের আসল পরিচয় অর্থাৎ যুব কংগ্রেস বলে পরিচয় দিতে শুরু করলো। সুতরাং এই অবস্থাকে কখনোই ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে যাওয়া বলে না।

আমার পরিচিত একটি নকশালপন্থী ছেলে দৃষ্ট করে বলেছিল—“দাদা, বিপ্লবের নামে যে টাকাগুলো যোগাড় করেছিলাম, আজ নিজের প্রাণ বাঁচাতে পলিশের কন্সটেবলদের পর্যন্ত ঘুষ দিতে দিতেই তা নিঃশেষ হয়ে গেল।”

অরুণ রায় বিশ্বাস

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

কম্পিউটার মেশিন

আজ যখন সমস্ত পশ্চিম বাংলায় শাসক শ্রেণী একদিকে আধা ক্যাসিস্ট কার্যদার গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে সচেষ্ট অপরাধকে শাসকশ্রেণীর পুঞ্জিবাদী নীতির ফল স্বরূপে প্রতি বছরে প্রচুর সংখ্যক যে বেকার সৃষ্টি হচ্ছে তার সদ্রাহ করাতে দুরে থাক, যারা আজ কাজ করছেন তাদের কর্মচ্যুত করে নিজেদের সৃষ্ট সংকটের বোঝা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছে, তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ ও বিজ্ঞান কলেজে রেডিও ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে আই বি এম কম্পিউটার মেশিনটি বসিয়েছেন।

ইতিপূর্বেও মেশিনটি বসানোর চেষ্টা কতৃপক্ষ করেছিলেন, কিন্তু কর্মচারী ও ছাত্রদের বোধ আন্দোলনের কাছে কতৃপক্ষ পিছিয়ে যেতে বাধ্য হন। এই মেশিনটি বসানোর জন্য বিজ্ঞান কলেজে পলিশ বসান হয়েছে এবং স্থানীয় আধা ক্যাসিস্ট বাহিনী বদ কংগ্রেসের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আর এই কর্মচারী ছাড়াই সৃষ্টিকারী মেশিনটি এমন সময় বসান হোল, যখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল।

আমরা দেখছি যখন কিব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মচারী নেতৃবৃন্দ আক্রান্ত হন, গ্রেপ্তার হন তখন কতৃপক্ষ নীরব থাকেন। এখনও পর্যন্ত চারজন ছাত্র নেতা ও দুইজন কর্মচারীদের নেতাকে পলিশ বিনাকারণে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আটক রেখেছে কিন্তু সেই সময়েই মেশিনটি বসানোর জন্য কতৃপক্ষ বিজ্ঞান কলেজে পলিশ মোতায়েন করেছে।

সম্পাদকমন্ডলী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষকে হুঁশিয়ারী দিচ্ছে এই

মেশিন তোলা না হলে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং তার ফলে যেকোন পরিণতির জন্য দায়ী থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ।

দেবাশীষ দাস
সম্পাদক, বি পি এস এফ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আউশগ্রাম থানায়

নৃশংস ঘটনা

গত তিরিশে অক্টোবর তারিখে আউশগ্রাম থানায় অন্তর্গত পিচকুড়ি গ্রামে বেঙ্গা এগরটায় পলিশ ও জোতদার একজোটে সাত কস্তিকে গ্রেপ্তার করে। এঁদের নাম (এক) আহম্মদ আলি মালিক, (দুই) সিরাজ সেখ (তিন) কালিপদ দাস, (চার) কেষ্ট দাস (পাঁচ) দিবাকর রাসদী, (ছয়) রাধাই প্রামাণিক (সাত) রসিদ মন্ডল। এঁরা সকলেই সাধারণ গরীব মানুষ। জানা গেল যে ব্যক্তিদের নামে নাকি কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ আছে। গ্রেপ্তার করার পর জোতদারদের কিছু গন্ডা ও পলিশ একজোটে যে ব্যক্তিদের নিম্নমতাবে প্রহার করে এবং রসিদ মন্ডল নামে একজন যবক ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাকি ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান এবং সেখানে আরও দুজন যবক আহম্মদ আলি মালিক ও সিরাজ সেখ মারা যান। অন্যান্যরাও গুরুতরভাবে আহত। জোতদার ও পলিশের জোটবদ্ধতার এই ধরনের নৃশংস ঘটনা এলাকার মানুষের মধ্যে ভীষণ চাপুলের সৃষ্টি করেছে।

জনৈক গ্রামবাসী

সত্যজিৎ রায়ের সীমাবদ্ধ প্রসঙ্গে

দর্পণে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের “সীমাবদ্ধ” ছবির সমালোচনায় সমালোচকের যুক্তিসমূহের মধ্যে সূচ্যে যে বড়ো যুক্তি—শ্রীরায় তাঁর কংগ্রেস ক্যাডাটে এই “জারজ সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরবেন তাঁর শিল্পকর্মে”—এই আশাপূর্ণ করেন নি কেন? “গতানুগতিক গল্পের ফাঁকে পড়ে” নাকি ছবিটি “প্রচলিত ধারার” শেষ হয়েছে।

সত্যজিৎবাবু কাছাকাছলে এই উচ্চবিস্তৃত সীমাবদ্ধ জীবনের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গের পাইপগান ব্যবহার করেন নিন, এর কারণ—(এক) তাঁর পরিচালন পদ্ধতির পরিবর্তন। তিনি এখানে ডকুমেন্টারিয়ান, রিপোর্টার এবং সবশেষে শিল্পীর রূপকার ও দার্শনিক। তিনি এখানে বহিঃসংগত নাটকে অস্বীকার করেছেন। পরন্তু সঙ্কল্প, পরিবেশ এবং শিল্পস্ব-মামল বর্ণনাভঙ্গীর বালিরাশির নীচে নাটকের ফল্গু ধারাকে প্রবাহিত করেছেন। (দুই) শব্দের ক্রান্ত। একদিকে বৃকোছে সেসব বোড়ের উদ্যত কাঁচর শাসানি, আর একদিকে জনগণের এক দ্রোণীর দ্বারা রক্তপট ভস্মীকরণভয়। সুতরাং ফলস্বরূপ—কাব্যিক উপায়ে, প্রতীক কল্পনায় “কারখানার লক-আউট” দৃশ্য চিত্রণ এবং যড়যন্ত্রের আভাস-দান।

স্বীকার করছি, সত্যজিৎ কোঁশলে আর্টের সুক্ষ্মপথ ধরেছেন। কিন্তু আর্ট তো ব্যর্থ হয় নি? একটু মাথা ঠান্ডা করে (পিটার্স ফ্যানের স্পিন্স হাওয়ার?) “তৃতীয় নেটি” উন্মোচিত করলেই তা উপলব্ধি হবে। অবশ্য আর একটু শৃঙ্খল। রুদ্ধ পথ ধরলে সত্যজিৎ শিল্প-দেবীর সামিথ্য থেকে দূরে গিয়ে সাহসী মৃগাল সেন হতে পারতেন।

শেষ দৃশ্যই তো ছবির সব। ছবির-প্রাণ। এবং এর আগেকার সব দৃশ্য এই শেষ দৃশ্যে পৌঁছানোর সিঁড়ি। “সিঁড়ি” তো অশ্লুত প্রতীকের ব্যঞ্জনার কাজ করেছে। লিফট “আউট অফ অর্ডার” হওয়া থেকে নামকের শেষ সিঁড়ি ভাঙা পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি করছি, এতোক্ষণ যা দেখলাম, সবই এই সিঁড়িভাঙা নামকের পিছ, পিছ, উচ্চাকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায়। টাচ্ লাইনে এসে যাওয়ার মূহুর্তে জিকির কিরকম অবস্থা হয়। সঙ্গে যদি প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে? (নির্দেশ : নামকের শালীসহ সংলাপ)। সিঁড়ি উঠেছে আটপায়ে। নাটকের ভাব-গত ক্লাইমাক্সও। ভাবের সঙ্গে আঙ্গিকের কী আশ্চর্য মিলন।

কিন্তু সব সিঁড়ি ভাঙাটাই যে ব্যর্থ (লিফট অচল হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবনের অচলতার প্রতি মারাত্মক আররাগির বাণ নিক্ষেপ করা হয়েছে)। তাই সন্ধ্যার স্নান

অন্ধকারে (এটা কি নামকের আত্ম-উপলব্ধির যোগ্যতম পরিবেশ? না মানসিক সংকটসূচনা? নাকি এই সীমাবদ্ধ জীবনের সারাক্ষর প্রতীক?) ক্লান্ত অবসন্ন চশমা-ছেড়ে বসা নামকের (এর আগেও একবার চশমাটা খুঁজে পাচ্ছিল না) জলে-কাপসা চোখে শালীর প্রতি তাকিয়েছে (যে আগন্তুক মুক্ত আকাশপানে পলকের জন্য তাকিয়েছে, যে এই সীমাবদ্ধ জীবনকে দেখেছে, পরখ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ডিস-অ্যাপ্রুভ করেছে), অন্তিম শ্যালিকা ধার দেওয়া হাত ঘাড়িটি নামকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে অন্তর্ধান করেছে (ক্যামেরার অশ্লুত টেক-নিকে অন্তর্ধান), নতমোলি নামক দুহাতে মুখ ঢেকেছে, সঙ্গীতে বিরহ-মূর্ছনা বা মানসিক মন্থণা—সব মিলিয়ে ফাঁকিবাজ ভিত্তিক সীমাবদ্ধ জীবনকে পরিচালকের অস্বীকার। নামক এর পরে কী করবে তা বড়ো নয়। সীমাবদ্ধ জীবনের কারাগারেই তার “প্লেগস অফ কনসেন্স” বা মানসিক স্বপ্নের সূচনা—এখানেই ছবির সমাপ্তি। নিঃশব্দ ভাষা যে সমস্ত ভাষার চেয়েও বাঙগর। শান্ত, সংযত, শোভন এবং স্বগীয়। অপ-রূপ সম্মা। ছবির স্পিরিটটি এভাবেই ধর্তব্য।

সুদেষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

রাজধানীর চিত্র

বাংলা দেশ নিয়ে মার্কিনী চক্রান্ত

(দর্পণের প্রতিনিধি)

নয়াদিল্লী, পাঁচই নভেম্বর—পাক-ভারত যুদ্ধ কি আসন্ন? অন্ততঃ রাজধানীর আবহাওয়া দেখে তাই মনে হয়। তবে এ যুদ্ধোত্তম আবহাওয়ার সমস্তটাই সুদূরপাল্লার।

বেশ মহড়া দিয়ে একটা “চুপি-সার অভিযান” বা whispering campaign চালু করা হয়েছে কিছুদিন ধরে। প্রায় রাজাই প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে সাংবাদিকদের খবর দেওয়া হচ্ছে সীমান্তে পাক হামলা সম্ভব এবং হুমকি দেওয়া হচ্ছে—আর সহ্য করা যাবে না। এবার হেস্টা-নেস্টা একটা কিছু হবেই ইন্দিরাজী বিদেশ থেকে ফিরলেই, তেরোই বা চোদ্দই নবেম্বর যুদ্ধ বাঁধবে।

কিন্তু হেস্টা-নেস্টা করার পুরো অধিকার কি আমাদের আছে? থাকলে অনেকদিন পূর্বেই হয়তো যুদ্ধ বাধতো। নেই বলেই ইন্দিরাজীকে শেষ পর্যন্ত মার্কিন মুলুকে ছুটতে হল। যদিও প্রচার করা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী মরোরপ জম্মে বার হয়েছেন, আসল উদ্দেশ্য নিক্সনের সঙ্গে আলাপ। এ সফর, নিক্সনের নিমন্ত্রণে হয় নি, হয়েছে ইন্দিরাজীর অনুরোধে। মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য করা ছাড়াও বহুবার সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে ইয়াহিয়া খাঁকে তারা সমর্থন করে যাবে। এ সম্বন্ধে ইন্দিরাজীর মার্কিন মুলুক গিয়ে নিক্সনকে বোঝাবার জন্য এত তাড়াহুড়ো কেন? সত্যিই কি কিছু বোঝাতে গেছেন? বোঝাবার আর বাকি আছে কি? না নিক্সনের কাছ থেকে কিছু আশ্বাস আদায় করতে গেছেন?

প্রথম দিনের আলাপ থেকে বোঝা গেছে যে মার্কিন সরকার পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধান চায়। শোনা যাচ্ছে যে মার্কিন সরকার ভারতবর্ষকে এই আশ্বাস দেবে যে বছর দুই একের জন্য এই জাতীয় রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেওয়া হোক। তারপর পশ্চিম পাকিস্তান আস্তে আস্তে বাংলা দেশের স্বাধীনতা মেনে নেবে।

আপাততঃ এই মুহূর্তে এই জাতীয় রাজনৈতিক সমাধান—অর্থাৎ পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে আওয়ামী লীগ পরিচালিত স্বায়ত্তশাসন—মার্কিন সরকারের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হবে। এই শাসন বছর দুই-এক ধরে চললে, এই অবসরে মার্কিনীরা বাংলাদেশে তাদের ভিতটাকে শক্ত করে নিতে পারবে। টাকা ঢেলে বাংলাদেশের মূর্খ অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়ে এবং মার্কিনী বিশেষজ্ঞের বেশে গুপ্তচর আমদানি করে বাংলা-দেশকে আবার একটি তাবিতদার রাষ্ট্র

করে তুলতে পারলে পশ্চিম পাকিস্তানের আওতা তার আর থাকবার দরকার হবে না। দু বছর পরে স্বাধীন বাংলাদেশ তখন মার্কিন সরকারের কাছে গ্রহণীয় হবে।

মার্কিনীদের কাছে এই সমাধান আশু প্রয়োজনীয়, কারণ তাদের ভয়—ক্রমশই বাংলাদেশে মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাত থেকে খসে গিয়ে অন্যান্যদের বামপন্থী দল বা রাজনীতি বহির্ভূত ই পি আর বা ই বি আর এর অফিসার—হাতে গিয়ে পড়বে। এই আশংকার জন্যই কিছুদিন আগে তারা বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করেছিল। একটি অংশকে দিয়ে রাজনৈতিক সমাধানে রাজি করাতে চেষ্টা করেছিল। দু-এক জায়গায় মুক্তি ফৌজের কমান্ডার—যারা এতে আপত্তি জানিয়েছিল, যেমন জিয়া খাঁ তাদের নেতৃত্ব থেকে সরতেও সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু নীচু তলার বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মীবৃন্দ এবং মুক্তি ফৌজের সশস্ত্র সৈন্যদের চাপে পড়ে বাংলাদেশ সরকারের মার্কিন সমর্থক গোষ্ঠীটিকে পিছু হটে আসতে হয়েছে।

এরপর মার্কিনীরা চেষ্টা করছে মুক্তি ফৌজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে। যেহেতু ই পি আর বা ই বি আর-এর নায়কেরা অধিকাংশই বামপন্থী রাজনীতি সম্বন্ধে এতদিন কিছুটা উদাসীন ছিলেন, মার্কিনীরা আশা করছে, তাদের সহজে কিনে নেওয়া যাবে।

এই পরিকল্পনারই আর এক অঙ্গ, ভারতীয় সরকারকে জন্ম করা। মার্কিনীরা বহুবার আমাদের ধমকে বলেছে যে মুক্তি ফৌজকে অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করা দরকার, কিছু দিনের জন্য মুক্তিফৌজের কার্যকলাপ বন্ধ রাখা দরকার। এটা হল বাংলাদেশে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরলে মার্কিনীরা ইয়াহিয়া খাঁকে রাজি করাতে পারে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য। আর এতে যদি ভারতবর্ষ রাজি না হয়, তাহলে বাস্তবতার সঙ্খ্যা আরও বাড়বে, মার্কিনী সাহায্য আরও কমবে এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতি আরও খারাপের দিকে যাবে।

মার্কিনীরা ভারতীয় সরকারকে আর একটা ভয়ও দেখাচ্ছে। বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে মুক্তি ফৌজের কার্যকলাপ ও বামপন্থী শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি হলে, পশ্চিম বাংলাতেও তার ধাক্কা এসে পড়বে। শত্রু বাস্তবতার আগমনের জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই নয়, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলার ক্ষোভ আরও মারমুখী হয়ে উঠতে পারে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রভাবে পশ্চিম বাংলার সিংহাস

রাজনীতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলতে পারে।

এই আশংকাগুলি ইন্দিরাজী নিজেও অনুভব করেন। তাই এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এখন এ সমাধান কি উপায়ে হবে? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভারতীয় সৈন্য দ্বারা বাংলাদেশ মুক্ত করে, না মার্কিনী উপদেশানুসারে রাজনৈতিক সমাধান মেনে? সমস্যাটা এখানেই।

যুদ্ধের জন্য অনেকদিন ধরেই বস্তুতঃ, মার্চ এপ্রিল থেকে—জনসংঘীরা এবং অন্যান্য কিছু লোকও উঠে পড়ে লেগেছে। জন-

সংঘী নেতা জগন্নাথ রাও যোশী তো ঘোষণা করেছেন যে বাংলাদেশের সমস্যা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, বিদেশী রাজ্যের কারুর কিছু বলার নেই।

যুদ্ধ বাঁধিয়ে বাংলাদেশকে মুক্ত করে ভারতবর্ষের উপনিবেশ তাকে পরিণত করার জন্য অনেক ভারতীয় ব্যবসাদার এবং অন্যান্য স্বার্থ জালায়িত। বাংলাদেশ সরকার বা আওয়ামী লীগের যাই মতামত হোক, অন্ততঃ যারা লড়াই করছে—অর্থাৎ মুক্তি ফৌজ তারা চায় না ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করুক। পরের সাহায্যে মুক্তিলাভ করা হয়তো আপাততঃ সুবিধাজনক হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে অনুকূল নয়। ইতিহাস এই কথাই বলে। গত মহাযুদ্ধের পর, পূর্ব যুরোপের মুক্তি ফৌজকে বহু বছর ধরে অস্ত্র সাহায্য করে এক দীর্ঘ মেয়াদী ভিয়েতনামবর্ষী গেরিলা যুদ্ধ, যাদের দোরগোড়ায়, আনার দায়িত্ব গ্রহণে ইন্দিরাজী স্পষ্টতই নারাজ। তাঁর নিজের শ্রেণীর স্বার্থে এই জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী মুক্তি আন্দোলন তিনি চান না।

তাই যুদ্ধের হুমকির প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় কখনও কখনও। আবার রাজনৈতিক সমাধানের কথাও বলতে হয় (দ্রষ্টব্য : শ্রীশ্রবণ সিং-এর সিমলায় কংগ্রেস অধিবেশনে বক্তৃতা)। হয়তো আশা, মার্কিনী অনুরোধে, ভারতবর্ষের হুমকিতে যদি ইয়াহিয়া খাঁ রাজি হয়ে যায় কোন একটা সমাধানে আসতে যার ফলে উভয়কূলই রক্ষিত হয়, অর্থাৎ ইয়াহিয়ার মুখরক্ষাও হয়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বও বজায় থাকে এবং বাংলাদেশে ইন্দিরাজীর প্রভাবও অটুট থাকে। ইন্দিরাজীর মার্কিন সফর এই জন্যই। দেখা যাক, তিনি কি হাতে নিয়ে ফিরে আসেন।

আরও একটি সম্ভাবন চাওয়ার আগে ভাব দেখুন

যেটি আছে তাকে ঠিকমতো লালন-পালন করতে পারছেন কি না।



আপনার মনের সাথ, ছোটবেলা থেকেই ছেলের পড়াশুনার মন বসুক। চান তার সব চাহিদা পূরণ করে মানুষ করে তুলতে। কিন্তু এখনই পিটোপিটি যদি আরেকটি এসে পড়ে সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা ছুনিয়্যর কোটি কোটি মনুষ্য এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবশি পয়েরটির কথা তারা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয়, যবাবের জননিরোধক। আপনার পয়ের সম্ভাবনটি যাতে কিছুদিন পরে আসে, তাতে নিরোধই আপনার সহায়।

জাতীয় সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র ১৫ পরমাণু ৩টি নিরোধ পাওয়া যায়।

আরেকটি সম্ভাবন না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লক লক লকের মনের মতন, নিরাপদে জননিরোধের সহজ উপায়

যদিহাবী বোকার, ওষুধের বোকার, দুধীর বোকার, পানের বোকার ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।



ভারত দর্পণ

মধ্যপ্রদেশ

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

পশ্চিম ভারতীয় প্রদেশ মিশ্র মধ্যপ্রদেশের একজন প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা। তিনি মধ্যপ্রদেশের মধ্যমন্ত্রীও ছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে দূর্নীতিমূলক কাজকর্ম করার দরুণ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল তাঁর নির্বাচন বাতিল করে দেন এবং ছয় বছরের জন্যে নির্বাচনে তিনি দাঁড়াবার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন।

পশ্চিম মিশ্র এর আগে কংগ্রেস ছেড়ে স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, বর্তমানে তিনি ইন্দিরা কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির প্রভাবশালী সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সুতরাং অবশ্যই তিনি একজন প্রগতিশীল কৃষি এবং আদালতের রায়ে “নির্বাচনে দাঁড়াবার পক্ষে অযোগ্য”

ঘোষিত হলেও প্রগতিশীল ইন্দিরা-কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির সদস্য হবার যোগ্যতম ব্যক্তি।

তিনি যখন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখন মধ্যমন্ত্রী ছিলেন পশ্চিম রবিবংশের শত্রু। পশ্চিম রবিবংশের শত্রুর পুত্র শ্রীশ্যামাচরণ শত্রু এখন মধ্যপ্রদেশের মধ্যমন্ত্রী। তাঁর আরেক পুত্র শ্রীবিদ্যাচরণ শত্রু এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সমরোপকরণ উপপাদন বিভাগের মন্ত্রী। ভূতপূর্ব মধ্যমন্ত্রীর পুত্র হওয়া ছাড়া এদের অপর কোন সদস্যের কথা মধ্যপ্রদেশবাসীর জানা নেই। যা জানা আছে তা পিতা-পুত্র কর্মবিশেষের কারো পক্ষেই গৌরবজনক নয়। তা ছাড়া পিতার পুত্র বা কন্যার পিতৃপদ অলঙ্কৃত করাই আমাদের দেশে এখন প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু মধ্যপ্রদেশের শত্রু মানুষ ডি পি মিশ্র মধ্যপ্রদেশে এই “সোনামণির” রাজত্ব সহ্য করতে পারছেন না।

তিনি বেশ কিছুদিন ধরে শ্যামাচরণ শত্রুকে তাড়িয়ে অন্য কাউকে মধ্যমন্ত্রী করার চেষ্টা করছেন। তিনি এমন কাউকে চান যিনি ভারতের মত পশ্চিম মিশ্রের পাদুকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজত্ব চালাবেন, যতদিন পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের শ্রীরামচন্দ্র ছয় বছরের বনবাস থেকে না ফেরেন।

শত্রু-মিশ্রের কলহ শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থেকে গেছে। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীউমাশংকর দীক্ষিতের চেষ্টায় পশ্চিম মিশ্র এবং শ্যামাচরণ শত্রুর মধ্যে একটা আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নি। প্রধান কারণ পশ্চিম মিশ্র চান মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রিসভা থেকে অন্ততঃপক্ষে শ্রীভগত সার্ব, হরিপদ শত্রু, জগদীশনারায়ণ আবস্টাই, শত্রু তিওয়ারী এবং কে এন প্রধান মধ্যমন্ত্রীর এই পাঁচজন প্রধান সমর্থককে বরখাস্ত করতে হবে। অর্থাৎ মধ্যমন্ত্রী শ্যামাচরণ শত্রুকে “দোসর”হীন করে দিতে হবে। স্বভাবতঃ শ্যামাচরণ শত্রু এটা চান না। তাই দুজনের মধ্যে আপোষ হল না। এখন পশ্চিম মিশ্র বলছেন যে স্বয়ং মধ্যমন্ত্রীকেই না সরালে মধ্যপ্রদেশে দূর্নীতি ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে দৃষ্ট এই মন্ত্রিসভা পরিশুদ্ধ হবে না এবং আগামী নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশে ইন্দিরা কংগ্রেসের চেহারা মলিন দেখাবে। অর্থাৎ কেটলী কড়াইকে কালো বলে উপহাস করছে, সতর্ক করছে।

আসাম ও নাগাল্যান্ড

শেষ পর্যন্ত আসাম তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হল। প্রাক্তন আসাম রাজ্যের কোহিমা ও খাসি-জয়ন্তিয়া এবং গারো পাহাড় জেলাগুটি যথাক্রমে নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয় নাম ধরে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করল।

বাকী আছে বাঙালী ভাষাভাষী কাছাড় জেলা এবং উত্তর-কাছাড় ও মিকির হিলস। এখানে অসমীয়া ভাষা চালু হয় নি। কাছাড় জেলার প্রখ্যাত নেতা শ্রীমেন্দল হক চৌধুরী পূর্বাঞ্চলের ভূট্টো বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার অল্প কিছুদিন আগেও কাছাড় জেলার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র পূর্বাঞ্চল প্রদেশ গঠনের দাবীতে আন্দোলন করার হুমকী দিয়েছিলেন। তিনি তখন বলতেন যে পাঁচ লক্ষ লোক নিয়ে মেঘালয় রাজ্য গঠিত হলে সতেরো লক্ষ বাঙালী (হিপুড়া সহ হিশ লক্ষ) কেন পূর্বাঞ্চল প্রদেশ গঠন করতে পারবে না। উপজাতি বন্দুরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবী আদায় করছেন,

আসামের বাঙালীদেরও সেভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু মন্ত্রী হবার পর মেন্দল হক সাহেব আর এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করছেন না।

সম্প্রতি আসামের সি পি আই গোঁহাটিতে তাঁদের রাজ্য সম্মেলনে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেছেন যে খাঁটি অসমীয়া ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে নির্ভেজাল অসম প্রদেশ গঠন করতে হবে, এ জনে বাংলা ভাষাভাষী কাছাড় জেলাকে আলাদা করে দেওয়া হোক। অবশ্য তাঁরা অপর বাংলা ভাষাভাষী জেলা গোলাপাড়া সম্পর্কে এরকম কোন প্রস্তাব করেন নি।

সি পি আই-এর কাছাড় জেলা সম্পর্কে বিরোধের হেতু আছে। আসামে সি পি আই-এর দুটি প্রধান খাঁটি নগরী এবং কাছাড় জেলার মধ্যে কাছাড় জেলার অধিকাংশ সদস্য সি পি আই-এর যোগ দেওয়ার ফলে সি পি আই-এর বিশেষ অস্তিত্ব নেই। নগরীতে সি পি আই ভাগনের মতো। প্রাচীনতম সি পি আই নেতা শ্রীকিষ্ণ বরা তাঁর শতাধিক অনুগামী সহ নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। কামরূপ জেলাতেও সি পি আই ক্ষীণ-মাণ শক্তি। তাই তারা সম্ভবতঃ কাছাড় জেলাকে আসামের বাইরে ঠেলে দিতে আগ্রহী। স্বতন্ত্র রাজ্য হতে পারলে কাছাড়বাসীরও এতে আপত্তি নেই, তবে তাঁরা কেন্দ্রের শাসনাধীন অঞ্চল হয়ে থাকতে নারাজ। হিপুড়া এবং কাছাড় জেলা নিয়ে স্বতন্ত্র পূর্বাঞ্চল প্রদেশ গঠন করতেই তাঁরা আগ্রহী।

উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি পুনর্গঠন নিয়ে নাগাল্যান্ডের মধ্যমন্ত্রী যে বিরোধী মনোভাব দেখিয়েছিলেন তা অটুট রয়েছে। তিনি কোহিমাতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেছেন যে নাগাল্যান্ড কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত এই পক্ষপাত সমর্থন করে না এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার রাজ্যগুলির এরকম পুনর্বিভাজন তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থোত্তিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা এনে দেবে বলে মনে করেন। আসলে নাগা জনগণের অধিকাংশই ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ, একমাত্র ফিজোপন্থী নাগা বিদ্রোহীরাই সম্পূর্ণ সার্বভৌম স্বাধীনতার দাবী করছেন।

নাগা নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যে হস্তক্ষেপ, সংবিধানকে কেন্দ্রিকতার দিকে টেনে নেওয়ার ঝোঁক, দলীয় স্বার্থে রাজ্যের রাজ্যে নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকারগুলির পতন ঘটানো, রাজ্য পদলিগকে অকেজো করে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পদলিগ বাহিনীকে বেশী করে

নিষ্পত্ত করা সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দেহান। মধ্যমন্ত্রী ও তাঁর বিরোধী অংশও একমত যে একমাত্র দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র ও মদ্রাব্যবস্থা ছাড়া আর সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতে দিতে হবে, অন্যতঃ নাগাল্যান্ডের জন্য এরকম একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতেই হবে।

এই মনোভাব থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ ও রাজ্যগুলির পুনর্গঠন সম্পর্কে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রসূতা ও রাজ্যে রাজ্যে দলীয় স্বার্থে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন ও হস্তক্ষেপের ফলে ভারতীয় ইউনিয়নের গোটা কাঠামোকেই ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। নাগাল্যান্ড সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে মধ্য খুলেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় এই প্রতিবাদে মধ্য হতে মনে হয়।

আইনজীবীদের

নিরাপত্তা বিল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যের পদলিগ বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় কতিপয় সমাজবিরোধী আইন কবসারীদের জীবনযাত্রার নিরাপত্তাকেও বিঘ্নিত করতে চলেছেন।

ইতিমধ্যেই এইসব সমাজবিরোধীদের হাতে একজন আইনজীবী শ্রীভবদীশ রায়কে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাছাড়া অশালীন ভাবে অপমানিত হতে হয়েছে বর্ধমানের শ্রীদেব ভট্টাচার্যকে। সেখানকার অপর একজন আইনজীবী সইদ মনসুর হাবিবুল্লাহকেও নৃশংসভাবে আক্রমণ করা হয়, যখন একটি সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা করছিলেন।

কালনার সমাজবিরোধীদের আক্রমণ এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যেখানে প্রাকটিশনাররা নিশ্চিন্তে প্রতিদিন কোর্টেও যাতায়াত করতে পারেন না। কালনা কোর্টের কুশলী আইনজীবী শ্রীঅমল্য মল্লিককে গ্রেপ্তার এবং পদলিগের দৌরাণ্ডে অবশেষে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এবং অরবিন্দ ঘোষাল আরো জানিয়েছেন যে, সরকার পদলিগকে এবং স্বাধীনতা গণদাবাহিনীকে দিয়ে যেভাবে ফাসিস্ট সম্প্রদায় সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভেঙে দিতে চাইছে, তাতে রাজ্যের আইনজীবী এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মনোভাব গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজন।

উড়িষ্যা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

পাচ্ছেন না। ছয়-সাত থেকে পনেরো বছরের ছেলেরা নিজেদের খাবার খেঁজার দায়িত্ব নিজেরাই নিচ্ছে। রাস্তায় গাড়ী আসতে দেখলে তারা রাস্তায় শুয়ে পড়ে। তারা অফিসার বা রিপোর্টার বোঝে না। শহর থেকে গাড়ী নিয়ে এসেছে, সঙ্গে আমাদের জন্য চাল নেই? নেই শুনে অবাক হয়ে তারা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মেয়েরা গাড়ীর পাশে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কোলের বাচ্চারা অবাক হয়ে চায়। বসন্তের হাত জোড় করে আবেদন জানায়, “বাবু, আপনাদেরও ত হৃদয় আছে, সেই হৃদয়ের কাছে...”।

জন্মতে রিলিফ সেন্টারে সামান্য আটা, চাল, সূজি এসেছে, কিন্তু লোক হাজার হাজার। যে যেটুকু চাল পাচ্ছে, অনেকখানি করে জল মিশিয়ে রাখছে, যাতে পরিবারের সকলেই মূখে কিছু দিতে পারে। ওদিকে ধানখেতের ভিতর থেকে ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। নাকে কাপড় চেপে সবাই বসন্তবিল করে, “ওখানে আছে...”। আমাকে নিয়ে যেতে যেতে একজন আঙুল দিয়ে দেখালেন, ঐ যে বাবু, ঐখানে দেখুন, আহা মেয়েটার বসন্ত তো বেশী ছিল না। তারপরে বললেন, আরও অনেক ছিল বাবু। ভেসে গেছে, কুকুরে নিয়েছে।

ধান ক্ষেতের চেহারা এখনও জলজলে সবুজ, কিন্তু এবারের রবি ধান শেষ হয়ে গেছে নোনা জলের বিবে। আমার সঙ্গী ধান-গাছের শীষ ভেঙ্গে দেখালেন, “দেখুন বাবু, ধান খাড়া আছে,

কিন্তু ভিতরের দৃশ্য মরে গেছে।” জন্মতে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ পূর্ব বাংলার রিফিউজি, যাঁরা দেশবিভাগের সময়ে এসেছিলেন। এখানে এসে জমি পাওয়া গিয়েছিল, কুড়িঘর উঠেছিল, আস্তে আস্তে দু-চারটি গরু-মোষ কিনে খেয়ে পরে সংসার চলছিল। আবার সব গেল। আবার শিয়ালদহ স্টেশনের মত সেই ছেঁড়া কাপড় আর বাঁশের চৌচের তাঁবু। আবার সেই ক্ষিদে-পেটে কুকড়ে শুয়ে ঘমনো আঁর ডোলের প্রতীক্ষা।

সাতচল্লিশ সালের যুবক রিফিউজী এবারে বৃদ্ধ রিফিউজী। ডাকবাংলোর ধাবে প্রায় শতাব্দীক তাঁবু পড়েছে। প্রতিটি তাঁবুতে দু-তিনটি অসুস্থ লোক, চারদিক থেকে বাচ্চাদের কান্না। অনাহারে শূন্য মূখ আর জ্বরে জ্বল চোখ নিয়ে কয়েকজন আমাকে ঘিরে দাঁড়ালেন। “কি করি বাবু আমরা, সব ত গেল। ফিরে বলবেন চাল পাঠাতে।” বরিশাল, খুলনা, যশোরের লক্ষ লক্ষ মানুষ যেমন পশ্চিম বাংলার উদ্ভাস্ত ক্যাম্পে আছেন, এখন উড়িষ্যাতেও আছেন এই চল্লিশ হাজার।

কদিন একনাগাড়ে ঘুরে কটক শহরে ঢুকলাম। কার্তিক পূর্ণিমা উৎসব চলেছে। শহরের মাঝখানে বিরাট মেলা। চারদিক থেকে ঢাকের আওয়াজ আসছে। রাস্তায় রাস্তায় আলো আর ঢাক নিয়ে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। আমার রিকশা এগোতে এগোতে থেমে গেল। রিকশা ছেড়ে দিয়ে হেঁটে এগোতে লাগলাম। থাকার জায়গা তখনও অনেক দূর। চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিতে হল। রায়ে বেশ ঠান্ডা।

বিদেশ দর্পণ

(দর্পণের পূর্ববক্ষণ)

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ সম্প্রতি এক বিদেশী সাংবাদিককে ইসলামাবাদে বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ দেখান হয়েছে তার সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন। জেনারেল সাহেব অবশ্য এর জন্য মূলত দায়ী করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী-দের। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে এক হাজার মাইল দূরের পূর্ব পাকিস্তান যে স্বাভাবিকভাবেই অনেকাংশে স্বাধীন শাসিত হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

জেনারেল সাহেবের ক্ষোভ যে “গত দু বছর ধরে আমার সঙ্গে স্বাধীন শাসনের প্রসঙ্গ আলোচনার পর হঠাৎ শেখ মুজিব বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করলেন এবং সেনাবাহিনীর একটি অংশকে বিদ্রোহী হতে

উৎসাহিত। এ কথা সকলেই জানেন যে আন্দোলনের মাধ্যমে যদি কোন সমাধান এই অবস্থায় হয় তাহলে বাংলা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা হবে না। এক হতে পারে স্বায়ত্তশাসন। বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলোচনার বিবৃতি পড়ে মনে হয় তিনিও এতে অরাজকী হবেন না।

বিদেশী শক্তিগুলির অধ্যুযায় এই ধরনের আলোচনা হতে পারে ইয়াহিয়া-এবং আওয়ামী লীগ অথবা পাঁচটি দলের প্রতিনিধি নিয়ে যে কনসালটেশন কমিটি হয়েছে তাদের সঙ্গে। আওয়ামী লীগ অথবা বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যতই কেন না পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করুন, বর্তমান অবস্থায় যদি ভারত সরকার চাপ দেয় তাহলে তাদের এই ধরনের বৈঠকে যোগ না দিয়ে কোন উপায় থাকবে না। অবশ্য অন্য আরেকটি উপায় আছে এবং তা হচ্ছে পুরোপুরি বাংলাদেশের ভিতরে থেকে, জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করে নিজ ক্ষমতায় স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে

উৎসাহিত। এ কথা সকলেই জানেন যে আন্দোলনের মাধ্যমে যদি কোন সমাধান এই অবস্থায় হয় তাহলে বাংলা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা হবে না। এক হতে পারে স্বায়ত্তশাসন। বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলোচনার বিবৃতি পড়ে মনে হয় তিনিও এতে অরাজকী হবেন না।

বিদেশী শক্তিগুলির অধ্যুযায় এই ধরনের আলোচনা হতে পারে ইয়াহিয়া-এবং আওয়ামী লীগ অথবা পাঁচটি দলের প্রতিনিধি নিয়ে যে কনসালটেশন কমিটি হয়েছে তাদের সঙ্গে। আওয়ামী লীগ অথবা বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যতই কেন না পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করুন, বর্তমান অবস্থায় যদি ভারত সরকার চাপ দেয় তাহলে তাদের এই ধরনের বৈঠকে যোগ না দিয়ে কোন উপায় থাকবে না। অবশ্য অন্য আরেকটি উপায় আছে এবং তা হচ্ছে পুরোপুরি বাংলাদেশের ভিতরে থেকে, জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করে নিজ ক্ষমতায় স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে

উৎসাহিত। এ কথা সকলেই জানেন যে আন্দোলনের মাধ্যমে যদি কোন সমাধান এই অবস্থায় হয় তাহলে বাংলা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা হবে না। এক হতে পারে স্বায়ত্তশাসন। বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলোচনার বিবৃতি পড়ে মনে হয় তিনিও এতে অরাজকী হবেন না।

বিদেশী শক্তিগুলির অধ্যুযায় এই ধরনের আলোচনা হতে পারে ইয়াহিয়া-এবং আওয়ামী লীগ অথবা পাঁচটি দলের প্রতিনিধি নিয়ে যে কনসালটেশন কমিটি হয়েছে তাদের সঙ্গে। আওয়ামী লীগ অথবা বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যতই কেন না পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করুন, বর্তমান অবস্থায় যদি ভারত সরকার চাপ দেয় তাহলে তাদের এই ধরনের বৈঠকে যোগ না দিয়ে কোন উপায় থাকবে না। অবশ্য অন্য আরেকটি উপায় আছে এবং তা হচ্ছে পুরোপুরি বাংলাদেশের ভিতরে থেকে, জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করে নিজ ক্ষমতায় স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে

উৎসাহিত। এ কথা সকলেই জানেন যে আন্দোলনের মাধ্যমে যদি কোন সমাধান এই অবস্থায় হয় তাহলে বাংলা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা হবে না। এক হতে পারে স্বায়ত্তশাসন। বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলোচনার বিবৃতি পড়ে মনে হয় তিনিও এতে অরাজকী হবেন না।

বিদেশী শক্তিগুলির অধ্যুযায় এই ধরনের আলোচনা হতে পারে ইয়াহিয়া-এবং আওয়ামী লীগ অথবা পাঁচটি দলের প্রতিনিধি নিয়ে যে কনসালটেশন কমিটি হয়েছে তাদের সঙ্গে। আওয়ামী লীগ অথবা বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যতই কেন না পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করুন, বর্তমান অবস্থায় যদি ভারত সরকার চাপ দেয় তাহলে তাদের এই ধরনের বৈঠকে যোগ না দিয়ে কোন উপায় থাকবে না। অবশ্য অন্য আরেকটি উপায় আছে এবং তা হচ্ছে পুরোপুরি বাংলাদেশের ভিতরে থেকে, জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করে নিজ ক্ষমতায় স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে

নকশালদের বিরোধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ট্রটস্কিপন্থা অবস্থানের দ্বারা চার মজুমদারকে বহিস্কার করা। এখন জানা গেছে ঐ বৈঠকে অসীমের বিকল্প তত্ত্ব উপস্থাপিত করার কথা ছিল। আর এই তত্ত্বের ধিনি রচয়িতা দীপাজন রায়চৌধুরীও সঙ্গে ছিলেন তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করার জন্য।

চারবাবুকে তাড়িয়ে বিহারের সত্যনারায়ণ সিংহ নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। সত্যনারায়ণবাবু আগে সি পি এমের নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। নকশাল আন্দোলনের সূরু থেকে তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

এম এল পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সত্যনারায়ণ সিংহই প্রথম গেরিলা কারদায় কৃষি বিপ্লবের তত্ত্ব হাজির করেন পার্টির মতপন্থ “লিবারেশন”-এ। সেখানে তিনি সূরু থেকেই বলতে আরম্ভ করেন যে, গেরিলা যুদ্ধে জয় রণাঙ্গনের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল নয়, কৃষক সমাজে গেরিলাদের ব্যাপক প্রভাবই এই জয়ের একমাত্র গ্যারান্টি।

সেই থেকেই সূরু হয় পার্টির মধ্যে দুই রাজনৈতিক লাইনের সংঘর্ষ—একদিকে কৃষিকৃষি আর শহরে সমাজবিপ্লবীদের সহযোগিতায় ব্যাপক লড়াইরাজ ও সন্ত্রাস আর অন্যদিকে সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের নিষ্ফল প্রয়াস। চীনের পার্টি চারবাবুকে সমর্থন জানায় আর উনিশশ সত্তর সালের দোসরা জানুয়ারীর সংখ্যায় পিকিং রিভুতে শ্রীকাকুলাম আন্দোলন সম্পর্কে বিকৃত তথ্য হাজির করে চারবাবুর প্রশস্তি গান করে।

পরে শ্রীকাকুলাম আন্দোলন

নির্মম পুর্লিশী আক্রমণে স্তম্ভ হয়ে যায়, সমস্ত কৃষক এলাকা থেকেই নকশালীরা হটে আসতে সূরু করে আর সেই সঙ্গে শহরে ব্যক্তি হত্যা লড়াই বাড়তে থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই নকশালীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সূরু হয়। চারবাবুর বিরোধী গোষ্ঠী অবি-লম্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডাকার দাবী জানায়। চারবাবু গ্যাট হয়ে বসে থাকেন। তখন থেকেই প্রস্তুতি চলে পাল্টা কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডাকার।

দেওঘরে অসীম চ্যাটার্জীর প্রেক্ষাগৃহে পর একমাত্র স্বয়ং চার মজুমদার ছাড়া নকশালপন্থীদের আর কোন বড় নেতা জেলের বাইরে রইলেন না। অসীমকে ধরাটা সরকার একটি বড় কৃতিত্ব বলে মনে করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কৃতিত্ব কার প্রাপ্য তাই নিয়ে খেয়োখোয়ি সূরু হয়ে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব তথ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের মতে বিহার পুর্লিশই প্রথম অসীমের খোঁজ পায় এবং কলকাতা পুর্লিশ শূরু সনাক্ত করতে সাহায্য করে। অতএব অসীমকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল তা বিহার পুর্লিশের ইন্ফরমারেরই প্রাপ্য।

কিন্তু কলকাতা পুর্লিশ তা মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে অসীমকে ধরিয়ে তাঁরই। প্রেক্ষাগৃহের প্রসঙ্গে একই সঙ্গে মুখ্য সচিব ও পুর্লিশ কমিশনার নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেছেন। পুর্লিশ কমিশনারের মতে কলকাতার গোয়েন্দা পুর্লিশের তৎপণতার ফলেই, এই প্রেক্ষাগৃহ সম্ভব হয়েছে। অবশ্য পুর্লিশের নিজেদের মধ্যেও গন্ডগোল আছে। ঘটনাস্থলে ঠিক সময় পৌঁছতে না পারায় স্পেশাল ব্রাঞ্চ ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলতে সূরু

করেছেন যে অসীমের খবরাখবর তাঁরই জোগাড় করেছিলেন শূরু দেওঘরে যেতে তাঁদের একদিনেরই হয় যার মধ্যে গোয়েন্দা দফতর গিয়ে কাজ হাসিল করে আসে। এ যেন অনেকটা নেপায় মারে দৈ গোছের অবস্থা।

অসীমের প্রেক্ষাগৃহের গুরুত্ব যথেষ্ট তা শূরুমাত্র নকশালী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে নয়। দর্পণ জানতে পেরেছে যে সি পি আই (এম-এল) এর অন্তর্দলীয় মতবিরোধ বেড়ে উঠে যে পর্যায় পৌঁছেছিল সেই পর্যায়ে অসীমকে প্রেক্ষাগৃহ করার পিছনে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে।

চারবাবুর সঙ্গে অসীমের আদর্শগত বিরোধের একটি প্রধান দিক ছিল তার শহরে আকর্ষণের নীতি পরিত্যাগ ও গণ সংগঠন, গণ আন্দোলনের উপর জোর দেওয়া। সে বোধেছিল যে চারবাবুর লাইন প্রকৃতপক্ষে প্রতি-বিপ্লবী এবং শ্রেণী শত্রুর হাত জোরদার করা ছাড়া ওই লাইনের আর কোনও সাধকতা নেই। অতএব সে ক্রমশ পুরোনো নীতি ছেড়ে দিয়ে গণ আন্দোলনের পথে যাওয়ায় গুরুত্ব উপলব্ধি করছিল এবং দলীয় আলোচনায় নিজের বক্তব্য রাখছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে চারবাবু গোড়া থেকেই গণ আন্দোলনকে শোষণ শ্রেণীর দালালি আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখে কৃষিসমস্যাকেই প্রকৃত মাওবাদী লাইন বলে প্রচার করে চলেছিলেন। ইদানীং অসীমের পাল্টা প্রচারের ফলে অবশ্য তিনি নিজ দলেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন।

সরকার এই ব্যাপারে ঘাবড়ে যান। বর্তমান চারবাবু তাঁর অতি বিপ্লবী লাইন দিয়ে সমস্ত বামপন্থী আন্দোলন বানচাল করছিলেন ততদিন সরকার খুশী ছিলেন—অবশ্য নক-

শালীরা তাদের উদ্দেশ্য সফল করছে এই কারণে যে তাঁরা তাঁদের ধরছিলেন না তা নয় বরঞ্চ কোন-রকম ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন না থাকায় পুর্লিশ যা খুশী করে যাচ্ছিল। কিন্তু যেই অসীম অন্য লাইন নিল সরকারের টনক নড়ল। তাঁরা বুঝলেন যে এই লাইনের ফলে অসীম যদি কোনদিন আবার সি পি আই (এম) এর কাছাকাছি আসে তাহলে ফল দাঁড়াতে মারাত্মক। অতএব যে অসীমকে বহুবার হাতে পেয়েও তারা ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই অসীমকে ধরার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগলেন। এবং পুর্লিশ ও চারবাবুর সমর্থকদের থেকে পালিয়ে বেড়ানো অসীমকে ধরা তাঁদের পক্ষে মোটেও কঠিন হল না।

অসীমের পরিচয় আজ বিশেষ অজানা নয়। উনিশশ ছেয়টি সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে আন্দোলন তাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। ফেসিয়াল প্যারালিসিসে আক্রান্ত ঈষৎ বাঁকা মুখে একগাল দাড়ি, শীর্ণকায় এই ছেলেটি তার সংগঠন গড়া ও নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত ক্ষমতার ফলে অলপদিনেই ছাত্র সমাজকে জয় করে ফেলে। “কমরেড কাকা” অসীমের এই নাম আজ আর কারুর অজানা নয়। সি পি আই (এম এল) দল গঠনের সময় থেকেই যুক্ত অসীম ছিল সর্বোচ্চ নেতৃত্বের অন্যতম এবং দলের একটি বড় অংশের অবিসংবাদী নেতা। সম্প্রতি চারবাবুর সঙ্গে মতবিরোধের ফলে সে পশ্চিমবঙ্গ বিহার ওড়িশা আঞ্চলিক কমিটির মাধ্যমে নিজের কাজ চালাচ্ছিল।

অসীমের সঙ্গেই ধরা পড়ে তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী দীপাজন রায়চৌধুরী। প্রেসিডেন্সী কলেজের আরেকটি যোগ্য ছাত্র দীপাজন কর্মিসম্প্রীতে এম এস সি পাশ করে

কৃতিত্বের সঙ্গে। অসীমই একে রাজনীতিতে টেনে আনে। বাস্তব-গত জীবনে দীপাজন প্রাক্তন বিচার-পতি সূরুজিত লাহিড়ীর জামাতা ও চব্বিশ পরগণার পুর্লিশ সূপার রথীন ভট্টাচার্যের ভায়রাভাই। দীপাজনের বর্তমান বয়স ছাব্বিশ, সাতাশ, রোগা ফরসা চেহারা, চোখে মোটা চশমা।

প্রসঙ্গত আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। অসীমের দল নাকি ঠিক করেছিল যে চারবাবুর প্রকৃত পরিচয় ফাঁস করা দরকার এবং সেইমত নাকি তাঁকে সি আই এ-র চর হিসাবে অভিহিত করে একটি দলিলও তৈরী করেছিল।

খানার অত্যাচার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিয়ালদা পুর্লিস কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ মিত্রের কাছে মেয়েটি এই জবানবন্দী দিয়েছিল। মেয়েটির উকীল বলেছিলেন—স্যার, আমার মজলকে পুর্লিস কাস্টার্ডি থেকে জেল কাস্টার্ডিতে স্থানান্তরিত করার অনুরোধ দিন। পুর্লিস বলেছিল—আবো তদন্ত সাপেক্ষ। সুতরাং পুর্লিস হেফাজতে রাখা হোক। ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেছেন—এর পরেও। তিনি তাকে জেল হাজতে স্থানান্তর করেছেন। কনস্টেবলের উপর সমন জারী করা হয়েছে। নয়ই তারিখে ছাত্র পরিষদ তেরগা বাস্কা নিয়ে শিয়ালদা কোর্টের চফরে শেলাগান দিয়েছে—ম্যাজিস্ট্রেটের দলবাজী চলবে না। কালো হাত ভেঙে ফেল।

গত ছয় তারিখে দুই হাজার সি তার পি মিরাবাগান বস্তী ঘেরাও করে কিভাবে নির্বাচনে প্রেক্ষাগৃহ ও অত্যাচার চালায় তার বিবরণ আগামী সংখ্যায় দেব।

সন্মুখ সময়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অজস্র গুন্ডা চুকিয়ে যথেষ্টাচার করে যাচ্ছেন। ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন ইউনিটে নির্বাচন হবার কথা। তাও সব জায়গায় তিনি হতে দিচ্ছেন না। মোট কথা সুব্রত মুখার্জীকে নিয়ে একটা মতবিরোধ দানা বাঁধছিল। দপ্তরের পাঠক জানেন, যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সির সঙ্গে ইদানীং সুব্রতের মন কষাকষি চলছে। প্রিয় মুন্সি পুরোপুরি সিদ্ধার্থ রায়ের লোক। আর সুব্রত কিন্তু তরুণ-কান্তি ঘোষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রেখে যাচ্ছেন, টাকা পয়সা নিচ্ছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর কলকাতায় ছাত্র পরিষদের নির্বাচন হয় গত অক্টোবরে এবং নির্বাচনে সুব্রত ভট্টাচার্য নামে উত্তর কলকাতার একটি কলেজের ছাত্র সুব্রত মুখার্জীর সমর্থিত প্রার্থীকে হারিয়ে উত্তর কলকাতা ছাত্র পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়। সুব্রত ভট্টাচার্য হচ্ছেন প্রফুল্লকান্তি ঘোষের লোক। কিছুদিন আগে আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। প্রফুল্লকান্তির হাতেও উত্তর কলকাতার অনেক নামজাদা গুন্ডা আছে। গুঁর অনুপস্থিতিতে পদলিখ কিছু নকশাল নামধারী গুন্ডাদের ধরেছিল। কিন্তু প্রফুল্লকান্তি কলকাতায় ফিরেই এখন তাঁদের ছাড়াবার ব্যবস্থা করছেন। প্রফুল্লকান্তির হাতে অমৃতবাজার যুগান্তরের মধু আছে। কারকে এখানে চাকরী, কারকে কাগজের এজেন্সি, মোটর গাড়ী, কন্সট্রাক্টরী ইত্যাদি নানা মধু দিয়ে উনিও বেশ একটা বড় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী পোষণ করে থাকেন। প্রফুল্লকান্তি যেদিন আমেরিকা থেকে দমদমে নামেন সেদিন এই ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সঙ্গে সুব্রত ভট্টাচার্যও দমদমে গিয়েছিলেন এবং প্রফুল্লকান্তিকে স্বাগত জানিয়ে পোষ্টার লাগানো হয়। অমৃতবাজার যুগান্তরের প্রায় সব কয়খানি মোটরগাড়ী গিয়েছিল প্রফুল্লকান্তিকে দমদম থেকে আনতে।

প্রফুল্লকান্তি যখন কলকাতায় এলেন তখন সুব্রত মুখার্জীর দল চোরাকারবারী আর মদ্যফা-খোরদের বিরুদ্ধে একটা অনশন করার ব্যবস্থা করছে। প্রফুল্লকান্তির সঙ্গে রাজ্যের ব্যবসায়ী এবং মদ্যফাকারীদের দহরম মহরম আছে। হামেশা এদের কাছ থেকে তিনি টাকা পয়সা, জিনিষপত্র আদায় করে থাকেন। তাই এই ব্যবসায়ীরা প্রফুল্লকান্তিকে ধরলেন। প্রফুল্লকান্তিও তৎপর হলেন, ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দিলেন। তারপর গেলেন, সুব্রতদের কাছে। কিন্তু দেখেন এ যেন আর এক সুব্রত। টেবিলের ওপর পা তুলে বসে থাকে। প্রতি নমস্কারও করে

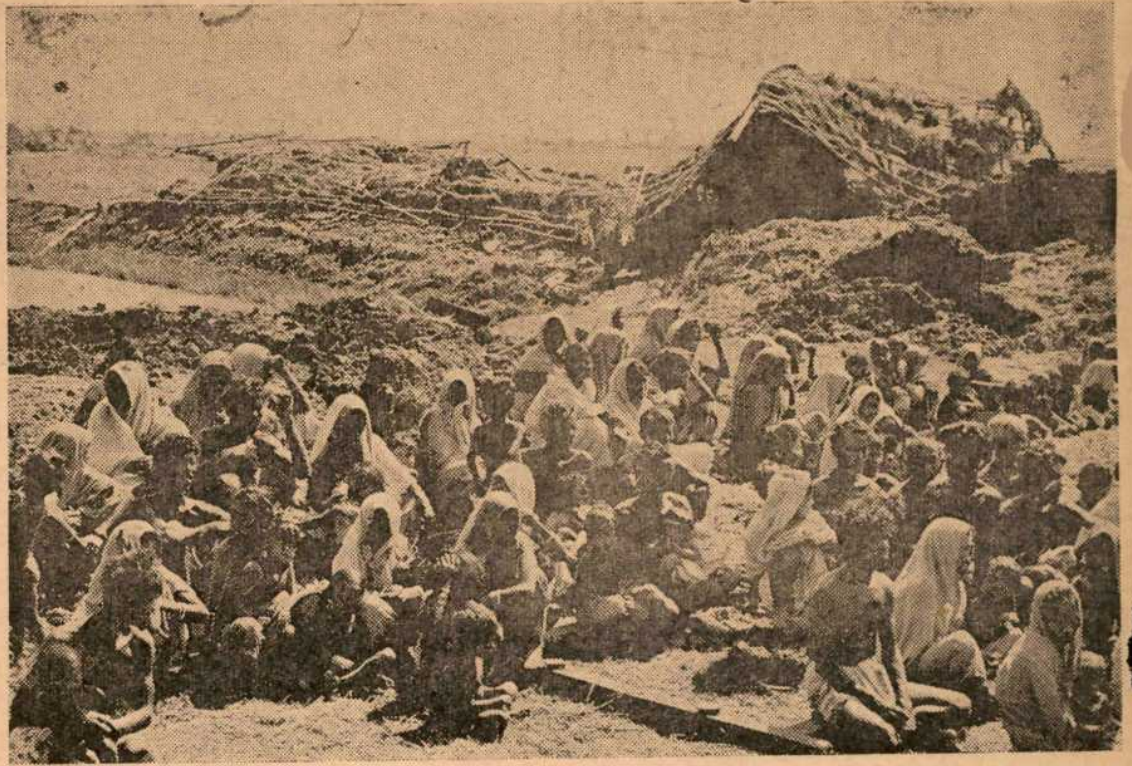
না। সুব্রতরা তাই প্রফুল্লকান্তিকে কোনো আমলই দিল না। বরং জানিয়ে দিল, প্রফুল্লকান্তির কোনো কর্তৃত্ব চলবে না। ক্রুদ্ধ প্রফুল্লকান্তি অপমানিত হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে বেশী এগুতে সাহস পাননা। কেননা, অমৃতবাজার যুগান্তরের আসল মালিক তরুণ-কান্তি ঘোষ এসব ঝামেলায় যেতে চাননা। দ্বিতীয়তঃ তাঁর (তরুণ-কান্তির) কংগ্রেস সভাপতিত্বে বাধা দিলেও সুব্রত মুখার্জীরা এখন তাঁর কথা কিছু কিছু শুনছেও।

সুব্রতদের ওপর প্রফুল্লকান্তির রাগের আরও কারণ আছে। তাঁর আমেরিকা অবস্থানকালে বেলেঘাটার সরকারদের (তাঁর শ্বশুর-বাড়ি) একটি ভেড়ী সুব্রতরা দখল করে নিয়েছে। লোকে বলে এটি প্রফুল্লকান্তিরই বোনামী ভেড়ী।

কিন্তু প্রফুল্লকান্তিও সোজা লোক নন। উত্তর কলকাতার গুন্ডা জগতের তিনি নিকটতম ব্যক্তি। এই অবস্থায় একটি সুযোগও এসে গেল। সেদিন আটই নভেম্বর সুব্রত মুখার্জী হঠাৎ ডেকে পাঠালেন উত্তর কলকাতার নব নির্বাচিত ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যকে মহাজাতি সদনের অফিসে। অফিসে ডেকে সুব্রত মুখার্জী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, ছাত্র পরিষদের সব কিছু তার নির্দেশে চলবে এবং উত্তর কলকাতার এই নির্বাচন তিনি নাকচ করে দেবেন ইত্যাদি। কথা কাটাকাটির মধ্যে সুব্রত সুব্রত ভট্টাচার্যকে শত ঘোষের (প্রফুল্লকান্তির ডাক নাম) দালাল বলে গালাগালি দিলেন এবং শেষ পর্বায়ে একরকম গলা ধাক্কা দিয়ে সুব্রত ভট্টাচার্যকে মহাজাতি সদন থেকে বের করে দিল।

সুব্রত ভট্টাচার্য সরাসরি অমৃতবাজার পত্রিকায় এসে প্রফুল্লকান্তির সঙ্গে দেখা করে সব বলতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সারাদিন ধরে তোড়জোড় চললো। পরদিন নয়ই নভেম্বর প্রফুল্লকান্তি সদলবলে সমবেত হলেন শ্যামবাজার ঘড়িওয়ালা বাড়ীর সুব্রত মিত্রের বাড়ীতে। সুব্রত মিত্র অমৃতবাজারের ল-অফিসারও বটে। প্রায় শখানেক ছেলে এসে গেল। তাদের সঙ্গে নামকরা ঠ্যাঙাড়ে ছেলেরাও যোগ দিল। প্রফুল্লকান্তি কিন্তু এঁদের সঙ্গে গেলেননা। মোটরে করে আগে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে বসে রইলেন। আর তাঁর ছেলেরা লাঠি, ছোরা, রিভলবার নিয়ে শোভাযাত্রা করে কংগ্রেস অফিসের সামনে এসে সুব্রত মুখার্জীর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে।

সুব্রত মুখার্জী তখন কংগ্রেস অফিসে এসে গেছেন। শোভাযাত্রার



কটক জেলার কেন্দ্রপাড়া সার্বভাষিনে আশেপাশের পাঁচ ছয়টি গ্রাম থেকে লোক জড় হয়ে অপেক্ষা করছে কখন রিলিফের নৌকা আসবে।

পক্ষ থেকে কংগ্রেস সভাপতি আবদুস সাত্তারের কাছে সুব্রতের বিরুদ্ধে একটি মেমোরেন্ডাম দেওয়া হলো। সাত্তার সাহেব বললেন, তিনি মীমাংসা করবেন। কিন্তু তাতে কি মেটে। অশ্রুশ্রমে সুসজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা এসেছে। তারা তখন কংগ্রেস অফিস তখনছ করতে সুরু করেছে। ছাত্র পরিষদের দুজন কর্মী বাধা দিতে গিয়ে গুরুতররূপে আহত হয়ে হাসপাতালে গেলেন।

এবার সুব্রতের পালা। সুব্রতকে দেখতে পেয়েই শোভাযাত্রার ছেলেরা জামার কলার ধরে চড়চাপড় মারতে সুরু করে দিল। সুব্রত টেবিলের তলায় আশ্রয় নিলেন। তখন সুব্রতের দেহরক্ষী পদলিখ রিভলবার বের করে সুব্রতকে টেনে নিয়ে গেল। শোভাযাত্রার ছেলেরাও তখন রিভলবার বের করেছে। এই সময় বেরিয়ে এলেন প্রফুল্লকান্তি। যেন কিছু জানেন না, এমন ভাব করে শোভাযাত্রার ছেলেরা চলে যেতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তখন অনুরোধ শোনার অবস্থা নেই। ছেলেরা দাবী জানাচ্ছে, “শতদা, আপনার অপমান! আপনার কথায় এসেছি। আমাদের মাঝে আসুন।” প্রফুল্লকান্তির উপায় নেই। নিজের দল ডাকছে। তাই এগিয়ে গেলেন দলের মধ্যে। বক্তৃতা করলেন সুব্রত মুখার্জীকে নিন্দে করে। তারপর ছেলেগুলো শতদাকে পেয়ে বাড়ী ফিরলো।

বাড়ী ফিরে প্রফুল্লকান্তি এবার তাঁর পেটোয়া যুগান্তরের একজন রিপোর্টারকে ডাকলেন। হুকুম হোসো, বিভিন্ন কাগজে সুব্রত মুখার্জীর বিরুদ্ধে যেন রিপোর্ট বেরায় তার তদ্বির করবার।

রিপোর্টারটি চেষ্টা করলেন। গভীর রাত পর্যন্ত অন্য কাগজের রিপোর্টারদের অনুরোধ করা

আটাত্তর দিন পরে

সৌরমেন

কারখানায় দীর্ঘকাল লক-আউট চলছে। শ্রমিকরা অর্ধাহার দঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে। যা টাকা পয়সা উঠছে সকলে ভাগ করে নিয়ে কোনরকমে সংসার চালাচ্ছে। আর একদিকে ওয়াগন রেকার—যে এদেরই মত ঐ কারখানার শ্রমিক, কিন্তু অভাবের তাড়না সহ্য করতে না পেরে ওয়াগন রেকার হয়ে গেল। তার মা, ভাই, একদা-সহকর্মীর কন্যার সঙ্গে সংঘাত এবং সর্বোপরি তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে অজিত লাহিড়ীর নতুন ছবি “আটাত্তর দিন পরে”।

সাধারণতঃ ভারতীয় ছবি বাস্তব জীবনকে অনুসরণ করে না। আশোচ্য ছবি সম্পর্কে সবচেয়ে প্রশংসার কথা এখানে ঘটনার বিন্যাস, চরিত্রের আচার আচরণ বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রচলিত ছাঁচে ঢালা হয়নি। ওয়াগন রেকার দলের সর্দার ফটিকের তার প্রতিবেশীর কন্যা ঝন্টির প্রতি অনুরাগের ফলে যেসব ঘটনার সূত্রপাত তাকে নিয়ে বাজারী যে-

কোন পরিচালক অনেক মিষ্ট মধুর দৃশ্য এবং দ্বৈত সংগীতের অবতারণা করতেন। এক্ষেত্রে পরিচালক অজিত লাহিড়ীর সংযম তার সিরিয়স মানসিকতার পরিচয় দেয়, অন্ততঃ বর্তমান ছবির ব্যাপারে।

টাইটেলের আগে ছবির আরম্ভটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুপরিবেশিত। বস্তৃত রেলওয়ে ইয়ার্ডে ওয়াগন ভাগগেতে যাওয়ার সবগুণী দৃশ্যই বাস্তবসম্মত ও প্রশংসাযোগ্য। অন্ধকারে আবছা আলো, কালো কালো ছায়া, দাঁড়িয়ে থাকা বা চলমান ওয়াগন, পদলিখের দৌড়াদৌড়—সব মিলিয়ে ছবির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছেন পরিচালক। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, শমিত ভঞ্জর অতি দক্ষ অভিনয়।

পরিচালকের রাজনৈতিক বিশ্বাস এ ছবিতে সোচ্চার হয়েছে ধর্মঘটী শ্রমিকদের জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে। এই অংশে তিনি একটি রাজনৈতিক বস্তব্য রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়াগন বেকারের বিক্ষুব্ধ মানসিকতা এবং পরিপার্শ্বের সঙ্গে তার সংঘাতের কাহিনীই মনকে আচ্ছন্ন করে।

ছবির শেষাংশে কিছুটা অতি-নাটকীয়তা থাকলেও গভীর রাতে নায়কের নিজ গৃহে প্রত্যাগমন, স্বীয় ভ্রাতাকে হত্যার চেষ্টা এবং কথ্যতা বেশ দক্ষতার সঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে।

হোলো। কিছু কাজ হয়তো হয়েছিলও। কিন্তু সুব্রত মুখার্জীও কম ঝগড় নয়। পশ্চিম বাংলার এই উঠতি নেতা বাহান্তর ঘন্টার নোটিশে প্রফুল্লকান্তিকে কংগ্রেস থেকে তাড়ানোর দাবী তুললেন। অন্যদিকে প্রফুল্লকান্তিও দলবল নিয়ে তৈরী হচ্ছেন।

পরিণতি কোথায় যাবে জানিনা। তবে বলতে পারি এ সৈয়ানে সৈয়নে কোলাকুলি। দুপক্ষের হাতেই প্রচুর গুন্ডা আর অশ্রুশ্রম আছে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

দর্পণ

১৪শ বর্ষ ৪১শ সংখ্যা ॥ শ্রদ্ধাবার ১৯শে নভেম্বর ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা

তুর্ভ-শতর বিরোধের সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে চূড়ান্ত খেয়োখেয়ি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গের নব কংগ্রেস দলের উত্তর কলকাতার প্রফুল্লকান্তি ঘোষ বনাম ছাত্র পরিষদের বিরোধ এখন প্রচণ্ড দলাদলির আবেগে ঘরপাক খাচ্ছে। ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুরত মুখার্জীরা দাবী করেছিলেন, প্রফুল্লকান্তি ঘোষকে বাহাস্তর ঘন্টার মধ্যে কংগ্রেস থেকে বের করে দিতে হবে। গোপালবোমগো সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে রাজ্যের নব কংগ্রেস সভাপতি সান্তার সাহেব ভার দিয়েছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে। এই ভার

দেবার পর থেকে সিদ্ধার্থ রায়ের অবস্থা হচ্ছে, “শ্যাম রাখি না কুল রাখি”। কেননা ছাত্র পরিষদ আর যুব কংগ্রেস সিদ্ধার্থ রায়ের অন্তর্গত। অবশ্য তরুণকান্তি ঘোষের ভয়ে প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করতে চায় না।

কিন্তু এখনকার মোসাদা কথা হচ্ছে, সুরত মুখার্জীদের দাবী অনুযায়ী প্রফুল্লকান্তি বাহাস্তর ঘন্টার মধ্যে কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হননি। অন্যদিকে প্রফুল্ল-
(শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়)

কৃষক ও শ্রমিক ফ্রন্টে কংগ্রেসী গুণ্ডা নিযুক্ত

সি পি আই কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও নেতৃত্ব নির্বিকার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত মোটাই নভেম্বর কলকাতার সি পি আই রাজ্য কাউন্সিলের সভা হয়ে গেল। সেখানে ট্রেড ইউনিয়নে আর কৃষক ফ্রন্টে নিযুক্ত পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা নব কংগ্রেসের মালিক ঘোষা নতুন আক্রমণের একাধিক ঘটনার উল্লেখ করেন।

এই সমস্ত নেতারা বলেন যে, কারখানা ও জমির মালিকেরা এখন নব কংগ্রেসের ভলান্টিয়ারদের নিয়ে গন্ডাবাহিনী তৈরী করছে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন পতন করার জন্য।

কল্যাণনি এলাকায় নব কংগ্রেসী গন্ডাদের সঙ্গে সি পি আই কর্মীদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে। ওরা বোমগাদি চালাতে সুরু করে, তখন সি পি আই কর্মীরাও গুলি চালায়। এর ফলে নাকি তিনজন কংগ্রেস কর্মী নিহত হয়।

সি পি আই-এর কৃষক ফ্রন্টের নেতারা অভিযোগ করেন যে বড় বড় জোতদারেরা এখন যন্ত্রফল্ট আমলে কৃষকের অধিকার করা জমি থেকে কৃষককে তাড়াবার জন্য নব কংগ্রেসী গন্ডাবাহিনী নিয়ে অভিযানে নেমেছে।

অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় যদি এই ধরনের কাণ্ড চলতে থাকে, এবং সি পি আই রাজনৈতিক কারণে চপ্প করে বসে থাকে তাহলে সি পি আই প্রমিক এবং কৃষক এলাকা থেকে মুছে যাবে। ফলে সি পি আই-এর প্রসার ঘটবে।

সি পি আই-এর বর্তমান নেতৃত্ব নব কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার সর্বভারতীয়

রাজনীতির খেলায় সিদ্ধার্থ রায় পরাজিত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজনীতির খেলায় সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় আর একবার পরাজিত হয়েছেন। জানা গিয়েছে পদুর্লিয়া থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হিন্দুরা কংগ্রেসী সদস্য দেবেন মাহাতোকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে সিদ্ধার্থ রায় অনুরোধ করেছিলেন। এই অনুরোধ দেবেন মাহাতো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকাশ দেবেন মাহাতো বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ তিনি প্রধানমন্ত্রীর মারফৎ চান,

আই এন টি ইউ সি নেতাদের উদ্বেগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সৈদিন কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে আই এন টি ইউ সির পশ্চিমবঙ্গ শাখার নব নির্বাচিত সভাপতি বিষ্ণু ব্যানার্জী ও সম্পাদক শিশির গাঙ্গুলী নব কংগ্রেসের যুব ছাত্র নেতাদের কংগ্রেসের নামে ট্রেড ইউনিয়নে অদ্বৈতপ্রবেশ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তারা বলেন যে, আই এন টি ইউ সি নব কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে উৎসাহ এবং এই ব্যাপারে ওই পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা সুরু হয়েছে।

তবে এই উঠতি ছোকরাদের ট্রেড ইউনিয়নে হঠাৎ ঢুকে পড়ার ব্যাপারে গোপালবোমগো হতে পারে। তাই আই

(শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়)

নব কংগ্রেসী যন্তনদের কীর্তি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খবরে প্রকাশ যে, নব কংগ্রেসের কয়েকজন সক্রিয় কর্মী দুর্গাপুরে এম এ এম সি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিমলা দাশগুপ্তের হত্যার ব্যাপারে

নীর্তি গ্রহণ করেছে। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে আলাদা নীর্তি হতে পারে না।

তাই পার্টির নব নির্ধারিত সম্পাদক গোপাল ব্যানার্জী সবাইকে এই আশ্বাস দিয়ে ঠান্ডা করেন যে, তিনি এ সম্পর্কে নব কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন, ওদের বোঝাবেন এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করে সি পি আই-এর সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্টের মাধ্যমেই সি পি আই-এর প্রসার রোখা যায়।

এর আগে একবার গোপালবাবু নব কংগ্রেসী নেতা আবদুস
(শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়)

বৃহৎ সংবাদপত্র মালিকরা বেশ বিপাকে পড়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিম বঙ্গের সংবাদপত্রের—শেষ পর্বন্ত বৃহৎ সংবাদপত্র মালিকদের বিরুদ্ধে কলকাতার কাগজ বিক্রেতারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এদেরই বিদ্রোহের ফলে কলকাতায় ছয়খানা বৃহৎ দৈনিক সংবাদ পত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়ে আছে এবং বৃহৎ বার এই সংবাদ লেখা পর্বন্ত মীমাংসার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

দর্পণের পাঠকদের আগেই জ্ঞানানো হয়েছে ভারত সরকার কর্তৃক পনেরো হাজারের বেশী সাকুলেশানের সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোর প্রতি কপিতে দুই পয়সা কর ধার্য করা হয়েছে, এই করের ফলে ছয়খানা সংবাদপত্রের দাম অতিরিক্ত দুই পয়সা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের

বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিক গোষ্ঠী দুই পয়সার উপরে কেউ অতিরিক্ত চার পয়সা, কেউ অতিরিক্ত ছয় পয়সা দাম বাড়িয়েছেন।

(শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়)

সবিনয় নিবেদন

পনেরো হাজারের বেশি যে সব পত্রপত্রিকার সাকুলেশন তাদের প্রতিটি বিক্রিত কপি ওপর কেন্দ্রীয় সরকার দুই পয়সা কর ধার্য করার ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের বর্তমান সংখ্যা থেকে দর্পণের দাম দুই পয়সা বাড়িতে হচ্ছে। এইভাবে যে বাড়তি টাকাটা পাওয়া যাবে তার সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে নেবেন। সুতরাং দর্পণ যারা বিক্রি করেন তাদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন বাড়তি দুই পয়সার ওপর কমিশন দাবী না করেন।

জন্ম থেকেই দর্পণ বিজ্ঞাপনদাতাদের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত। যদিও বর্তমানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ সাপ্তাহিকের মধ্যে দর্পণের প্রচার সংখ্যা সর্বাধিক তবু আজও দর্পণে বিজ্ঞাপনের অবস্থা অপরিবর্তিত। অতএব দর্পণকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তার পাঠকরা। নিউজ প্রিন্টের দুর্মূল্যতা ও ছাপাখানার খরচ বাড়ার সত্ত্বেও তাঁদের দিকে তাকিয়ে আমরা দর্পণের দাম দুই পয়সার বেশি বাড়ালো না।

জড়িত। গত পনেরোই নভেম্বর এই নৃশংস হত্যা ঘটে।

এরা নকশালী কায়দার স্কুলের ল্যাবরেটরী পোড়াতে এসেছিল। সামনে প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে, পরে নিশ্চিন্দা গুলি গুলে গেল। ছিঁটিলে আগুন দিয়ে দেয়। পাছে অন্য কেউ এসে নিবিরে ফেলে সেই জন্য ঘরে তালা দিয়ে দেয়।

ওদের নৃশংসতার কারণ হল হেড মাস্টার মহাশয় ওদের সবাইকে চিনতেন। তাই ওঁকে হত্যা করার দরকার হল। আরও শোনা যায়
(শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়)

বিশ্বভারতী অডিন্যান্সের আসল উদ্দেশ্য

শান্তিনিকেতন নকশালীদের কার্যকলাপের একটি ঘাঁটি হয়ে উঠেছে এই অজহাতে কেন্দ্রীয় সর-

কার সম্প্রতি যে অডিন্যান্স জারী করেছেন তাতে বিশ্বভারতীর শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মীদের একটি বড় অংশ চিন্তিত।

অডিন্যান্সের ফলে - শিক্ষা সংক্রান্ত যে কমিটিগুলি বিশ্বভারতীতে ছিল সেগুলির বর্তমান সদস্যদের হঠাৎ দেওয়া হল। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছেন যে নতুন নীর্তি অনুযায়ী এই কমিটিগুলি পরবর্তীকালে নির্বাচিত না হয়ে মনোনীত হবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে নকশালী দমনের বাজ্ঞে অজহাতে সরকার কমিটিগুলিতে নিজেদের লোক দিয়ে ভরাতে চান যাতে অধ্যাপক, কর্মীরা আর তাদের প্রতিনিধিদের মারফৎ তাঁদের ন্যায্য দাবী দাওয়ায় কথা জানাতে না পারেন।

(শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়)

বঙ্গদর্শন

চলচ্চিত্র

পিকিং রেডিও থেকে রোজ এখন বঙ্গদর্শনের বাণী প্রচার করা হয়, বঙ্গ হয় আফ্রিকা ও এশিয়া জনসাধারণের প্রীতি ও সৌহার্দ্যই চীনের একমাত্র কাম্য এবং এই লক্ষ্যে পেশীজ্ঞানের জগৎ বর্তমানের নয়া কৌশল হল পিং পং খেলার আরোহণ। সেখানে ভারতীয় দলও আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত। এখন আর সশস্ত্র বিপ্লবের ও তার প্রতি সমর্থনের মাধ্যমে শোষিত জনগণের ঐক্যের কথা নয়। এখন প্রীতির আরোহণ আফ্রো-এশীয় বিভিন্ন দেশীয় দল যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের মাঝেই। পিকিং রেডিও বারবার ঘোষণা করেছে যে, এই পিং পং খেলার প্রতিস্বন্দ্বিতা বড় কথা নয়, “এই খেলার মূল লক্ষ্য হল আফ্রো-এশীয় ঐক্য”।

এখন চীন জাতি সংঘের সদস্য। সদস্য হিসাবে আন্তর্জাতিক সদা-চরণের তাগিদে এখন চীনের আচরণবিধি জিহ্বা হতে বাধ্য। ক্রমশঃ চীনও সোভিয়েট ইউনিয়নের মত বিরাট বিশ্ব শক্তির অন্যতম হবে, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং সোভিয়েট কৌশলে চীনও চেষ্টা করবে বিশ্ব ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে ধনতন্ত্রের নিজের কার্যদায় পরাজিত করতে, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও তীব্র করে তাকে নিঃশেষ করে আনতে। তখন সোভিয়েতের মত চীনের একই যুক্তি হবে যে সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত বাজারে মাল্য বিক্রি করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদ দূর্বল হয় এবং তার ফলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কাপক হয়ে

দেশী ধনতন্ত্র অধনতান্ত্রিক পথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হয়। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত যুক্তির দিক থেকে ক্রমশঃ তন্ত্রের অবতারণা হবে—ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য সব সময়েই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন নেই। পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এই উত্তরণ শান্তিপূর্ণ পথেই হতে পারবে।

এখন পিকিং রেডিওতে আর “চেনারম্যানের চীন আক্রান্ত হতে পারে” এই তথ্য হাজির করা হয় না। আর সেই সঙ্গে পিকিং-এ মস্কোর প্রতিস্বন্দ্বিতায় বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সমান্তরাল নেতৃত্বের কথাও ঘোষণা করা হয় না। বস্তুতঃ, দৈনন্দিন পিকিং রেডিও শুনে আমার মনে হয়েছে যে, চীনা নেতৃত্বের হয়ত বা সোভিয়েত সম্পর্কে আগের সেই তিক্ত মনোভাব বিদ্যমান নেই।

কয়েকমাস আগে শোনা গিয়েছিল পিকিং রেডিওতে সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি পদগণি লিখিত পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খাঁকে চিঠির

ব্যাপারে স্বেচ্ছাশ্রিত। কিন্তু তারপর যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেছে। চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যই খালি হয় নি, এই সংগঠন থেকে চিয়াং কাইশেক শাসিত তাইওয়ান বিতাড়িত হয়েছে। এই অবস্থাস্থাপন হয়েছে চীন-মার্কিন গোপন বৈঠকের মাধ্যমে।

এ সব আন্তর্জাতিক ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষণীয়। বেশ কয়েক শত তরুণ পিকিং অনুপ্রাণিত আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে, এই কথা বিশ্বাস করে যে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করতে পারবেই “চেনারম্যানের চীন”কে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো যায়। প্রায় দু-বছর ধরে পিকিংপন্থী চারু মজুমদারের দল গণ-আন্দোলন বাদ দিয়ে ব্যক্তি হত্যা ও শহুরে সন্ত্রাসের মাধ্যমে এখানে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা চালাল। অবশ্যই পিকিং অমার্কসীয় এবং লেনিনবাদ বিরোধী এই বিকৃত তথ্য ও তার প্রয়োগ-

বিধি সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু একদিনের জন্যও এই সম্পর্কে কোন সতর্কবাণী পিকিং রেডিও থেকে উচ্চারিত হয় নি। বরং মাঝে মাঝে তথাকথিত সশস্ত্র বিপ্লবের বিকৃত তথ্য হাজির করে পিকিং রেডিও ও পিকিং রিডু এই বিকৃত আন্দোলনকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থন জানিয়ে এসেছে।

এখানকার সাম্যবাদী আন্দোলনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং এই আন্দোলন নিজ ক্ষমতায় বলীমান হয়ে যদি পরিণত বদ্বিশ্বতে না পৌঁছে থাকে তবে দায়িত্ব চীন বা সোভিয়েতের নয়। নিজের তাগিদে আন্দোলনকে নিজ নেতৃত্বের পরিচালিত করে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন নিজের বিপ্লব সফল করেছে। ভিন্নতরনামের মরণজরী সংগ্রাম নেতৃত্বের জন্য চীন অথবা সোভিয়েত মৃত্যুপেঙ্কী নয়।

আমাদের দেশের তথাকথিত সাম্যবাদীরা কথায় কথায় চীন বা সোভিয়েত বিপ্লবের নজীর না দেখিয়ে নিজের দেশের লোককে একটু ভাল করে চিনতে পারলে দেশ জাভান হবে।

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে উপাচার্য ও তার সাজোপাজোদের দুর্নীতি

(বিশেষ প্রতিনিধি)

কিছুদিন যাবৎ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ডাঃ শশীভূষণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যপাল ডায়াস সাহেব নব কংগ্রেস-পুর্ন ডাঃ চৌধুরীর বিরুদ্ধে এখনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। সম্প্রতি এম এ পরীক্ষার ফলাফল অনুমোদন প্রসঙ্গে উপাচার্যের দুর্নীতির যে নশন চিত্র আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে, সে দিকে ভাল করে চেয়ে দেখবার জন্য রাজ্যপাল ও তাঁর শিক্ষাবিসয়ক মন্ত্রক খুঁজে সি সেনগুপ্তকে অনু-রোধ জানাচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর আমলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির প্রসঙ্গে যে সকল নব কংগ্রেসী পাণ্ডারা অতি বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন, এবার বোধহয় কংগ্রেসদল শশী চৌধুরীর কার্যকলাপে তাঁরাও চমকে উঠবেন।

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত এম এ (সংস্কৃত) পরীক্ষার ফলাফল অনুমোদন করবার জন্য পরীক্ষক বোর্ডের যে সভা গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয় তাতে এক চাপল্য-কর ঘটনার আবরণ উন্মোচিত হয়েছে। পরীক্ষকদের মধ্যে স্নাত-কৌস্তর সংস্কৃত বিভাগের প্রধান শ্রীগোবিন্দগোপাল মধোপাধ্যায় সহ অন্যান্য অধ্যাপকগণ এবং ভারত-বিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্যবিদ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও ছিলেন। বোর্ডের সভায় পরীক্ষকগণ লক্ষ

করেন যে ট্যাবুলেশন শীটটি ট্যাবুলেটর-এর স্বাক্ষর বিহীন এবং তাঁরা আরও দেখেন যে পরীক্ষার্থী শ্রীমতী শ্যামলী সান্যাল (রোল বার এস ৪৯)-এর নামের পাশে মার্কস-এর ঘরগুলি ফাঁকা এবং রিমার্কস কলাম-এ নোট দেওয়া আছে যে ভাইস চ্যান্সেলরের আদেশানুযায়ী তার পরীক্ষা ক্যানসেল করা হয়েছে। ট্যাবুলেশন শীট-এ ট্যাবুলেটর-এর স্বাক্ষর না থাকায় পরীক্ষকগণ তার কারণ জানতে চান এবং ট্যাবুলেটর-এর নাম জানতে চান, কারণ ট্যাবুলেটর-এর স্বাক্ষর বিহীন ট্যাবুলেটর শীট তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু কন্ট্রোলার অব একজামিনেশন শ্রীবিজয়ভূষণ ব্যানার্জী অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় তাদের ঐ ন্যায় প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর পরীক্ষকগণ ঐ পরীক্ষার রেজাল্ট প্রাপ্ত না করে অস্থায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীশশীভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জানতে পারেন যে শ্রীমতী শ্যামলী সান্যালের পিতা বর্তমান রাজ্য কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আংশিক অধ্যাপক শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যাল উক্ত ট্যাবুলেটর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে ট্যাবুলেটর-এর পদে নিয়োগপত্র গ্রহণ করার আগে এই মর্মে একটি ডিক্লারেশন দিতে হয় যে ট্যাবুলেটর এর নিকট কোনও

আত্মীয় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় বসেন নি। কন্যা পরীক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও শ্রীঅবন্তীকুমার কিভাবে ঐ ডিক্লারেশন দিলেন বা কি ভাবে ট্যাবুলেটর হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণ করলেন তা বিস্ময়ের বিষয়।

এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে পরীক্ষকগণ আরও জানতে পারেন যে এম এ (সংস্কৃত) পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর (অনুমান, যখন শ্রীঅবন্তীকুমার জানতে পেরেছেন যে তাঁর কন্যা এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে) শ্রীমতী শ্যামলী সান্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন যে তাঁর পরীক্ষার রেজাল্ট যেন ক্যানসেল করা হয় কারণ তার পরীক্ষার খাতা থেকে নাকি পাতা ছিঁড়ে নেওয়া

হয়েছিল। আরও বিস্ময়কর ঘটনা এই যে শ্রীমতী শ্যামলীর ঐ আবেদন পত্রটি কুখ্যাত অধ্যাপক প্রতাপ-শালী ই-সি-র সদস্য শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্যের ফরওয়ার্ডিং সম্বলিত এবং ক্যানসেলেশন-এর স্বপক্ষে অতীব অসাধু কন্ট্রোলার অব একজামিনেশন শ্রীবিজয়ভূষণের রেকমেন্ডেশন পুর্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়ে অস্থায়ী উপাচার্য শ্রীশশী চৌধুরী তাঁর উক্ত “সাক্ষাৎ”-দের সহায়তা করবার জন্য শ্রীমতী শ্যামলীর আবেদন পত্রের উপর তাঁর পরীক্ষা ক্যানসেলেশন-এর আদেশ দেন।

ঘটনার কিছু এইখানেই শেষ নয়। সংস্কৃত বিভাগের প্রধান শ্রীগোবিন্দগোপাল মধোপাধ্যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত সাহিত্যবিদ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী সহ বোর্ডের ঐ সভায় উপস্থিত অন্যান্য অধ্যাপক-দের দৃঢ় মনোভাবের জন শ্রীশশী চৌধুরীর (অস্থায়ী উপাচার্য) ব্যাপারটিকে ধামাচাপ দেবার অপ-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু শ্রীশশী

চৌধুরী এবং তাঁর সাজোপাজো অতি দ্রুত অস্বাক্ষর গলিপথে এগোতে শুরুর করেছেন। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে যে ইতিমধ্যে শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যাল যে ঐ পরীক্ষার ট্যাবুলেটর নন তা প্রমাণ করবার জন্য সংস্কৃত পরীক্ষার পরীক্ষক বোর্ডের সামনে যে ট্যাবুলেশন শীট দেখানো হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে গায়েব করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অফিসার, স্মারা অন্য একটি ট্যাবুলেশন শীট প্রস্তুত করা চলেছে। এই কাজে সার্থক হতে পারলে শশীভূষণ দোষমুক্ত হতে পারেন—অবন্তীকুমার এবং বিজয়ভূষণ বেকসুর খালাস পেয়ে যে পারেন এবং এম এ (সংস্কৃত) পরীক্ষক বোর্ডের সং এবং নির্ভীক অধ্যাপকগণ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের দৌর্দন্ত প্রতাপ রাজ্যপাল—বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত এ এল ডায়াস মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন এই যে এই ঘটনার কি এই ভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটবে?

দুই বাংলা কংগ্রেসই ডুবতে চলেছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একদিন বাংলা কংগ্রেসের আবির্ভাব যতখানি বিস্ময়কর ছিল, তিরো-ভাবের দিন যতই ঘনির্বে আসছে অবস্থাটা ততই করুণ ও হাস্যকর হয়ে উঠছে। অজয়বাবুর অতীত জীবনের খ্যাতিকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে রাজনীতির কারবারে বাহাদুর হেসে সশীল ধাড়া যতটা মজা লুটতে পেরেছিলেন, একদিন তার চেয়েও বেশী ম্যানেজ করার

তালে ছিলেন তাঁর নতুন শিষ্য প্রণব মধাজী প্রমুখ ব্যক্তিরা। কিন্তু বাদ সেখেছেন অজয়বাবু নিজেই। নিজের দল সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ ঘটেছে। এখন উদ্দেশ্য কংগ্রেসী নবগঙ্গার তীরে গিরে ভিড়বেন সদলবলে। দলকে নব-কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে অপর এক সম্পাদক অহীন মিশ্র খোলাখলি তার বক্তব্য রাখ-ছেন বেশ কিছুদিন আগে থেকে।

যে কারণে সশীলবাবুর সঙ্গে তাঁর পূর্বে কল্লেকবাই সংঘাত ঘটে গিয়েছে এবং একই কারণে প্রণব আমজাদ জর্জটির সঙ্গেও সংঘাত চলছে। অহীনবাবু ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে সমাজতন্ত্র আবিষ্কার করে বসে আছেন। তাঁর সুবিধা এই যে বাংলা কংগ্রেসের এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তার বেশীর ভাগ অংশ মেদিনীপুর জেলাতেই। এই (শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়)।

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের কর্তার সঙ্গে নব কংগ্রেসী মস্তানদের গোপন আঁতাতের ফলে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থায় চূড়ান্ত অবনতি

(বিশেষ প্রতিনিধি)

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগে রেল চলাচল ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর দর্শনা সীমাহীন হয়ে পড়েছে। এই বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীকে কে দাসের সঙ্গে একদিকে নবকংগ্রেসী মস্তানদের আর অন্যদিকে বেসরকারী বাস ও লরী মালিকদের গোপন আঁতাত এই ভয়াবহ অবস্থার জন্য দায়ী বলে বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

রেলের ওভার হেড তার চরী, ওয়াগন ভাঙা, সমাজ বিরোধীদের হামলার সঙ্গে সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষের দর্শনীয় ও অপদার্থতার ফলে রেল চলাচল ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মতো। গত দুই-তিনমাস ধরে ওভারহেড তার চরী এবং অন্যান্য হামলা কিছুটা কমেছে কিন্তু রেল চলাচল ব্যবস্থার আদৌ উন্নতি টেঁ নি।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল একাত্তর সালের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত রেলের প্রচলিত নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করে গোপনে ট্রাক-সন বিভাগে নিয়মিত ভাবে নব কংগ্রেসী মস্তানদের নিয়োগ করার ফলে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে রেলের সম্পত্তি চুরি করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে আর তাছাড়া নিয়মিত রেল চলাচলের পক্ষে বিরাট বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে।

একাত্তর সালের গোড়া থেকে বিশেষ করে বিখ্যাত মধ্যবর্তী নির্বাচন অনর্ধিত হয়ে যাওয়ার পূর্বে থেকে আজ পর্যন্ত এই বিভাগে গোপনে কয়েকশত নব কংগ্রেসী মস্তানকে সরাসরি চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ করা হয়েছে। নব কংগ্রেসের নব নায়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসম্মানার্থ শঙ্কর রায় এবং নব কংগ্রেসী মস্তানদের নেতা শ্রীপ্রিয়দাস মন্সী এবং শ্রীসরিত মন্সী-পাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া

তালিকানুসারে এই নিয়োগ করা হচ্ছে।

নব-নিষ্পত্ত কর্মীদের ডিউটি পড়ে কার সেডে। সেখানে তাদের কোচগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সাহায্য করতে হয়। তাছাড়া রাতে চৌকিদারীর ভারও এদের উপর আঁপিত হয়েছে। ভক্ষককে রক্ষকের পদে বসানোর চমৎকার ব্যবস্থা। নব কংগ্রেসী মস্তানরা যাদের নাম পলিশের খাতায় সমাজবিরোধী বলে চিহ্নিত তারা মহানন্দে পাইপ-গান, ছোরা প্রভৃতি হাতে নিয়ে রাতে পাহারা দিচ্ছে এবং মহানন্দে রেলের সম্পত্তি চুরি করে চলেছে। সুযোগ এবং সময় বুঝে ওয়াগন-ভাঙা মস্তানদের মদত দিচ্ছে।

আরো একটি নতুন পদ্ধতি এই মস্তানরা গ্রহণ করেছে। গত দুই-তিন মাস ধরে দেখা যাচ্ছে যে সকারের দিকে রেল চলাচল অপেক্ষাকৃত নিয়মিত। বিকেলের দিকে ডাউন গাড়ী শিয়ালদহ এসে

পৌঁছানোর পরই দেখা যায় সে-গাড়ীগুলো আর চলেছে না। গাড়ী ছাড়ার পূর্বে মনুতে ড্রাইভার এসে দেখে গাড়ী চলেছে না। যাত্রীরা মনে করেন ড্রাইভার-গার্ডরা দোষী।

অনুসন্ধান করে জানা গেল নব-নিষ্পত্ত নব কংগ্রেসী মস্তানরা নিয়মিতভাবে প্রতিদিনই বিকালের দিকে ডাউন ট্রেনের কপলার জাম্পার কেটে নেয়। সামনের দিকে গাড়ী এগুতে পারে বলে ড্রাইভার টের পায় না। পরে গাড়ী ছাড়তে এসে দেখে আপ গাড়ী যাচ্ছে না। গাড়ীগুলোকে তখন কার সেডে দিয়ে যায়—মস্তানদের নিয়মিত ওভারটাইমের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

রেল শ্রমিক ইউনিয়নের দাবী ছিল যে নতুন নিয়োগ করতে হলে প্রথমে সুযোগ দিতে হবে ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের, তার পরে রেলের নিষ্পত্ত যে সব শ্রমিক অবসর নিচ্ছেন তাদের আত্মীয়স্বজনদের, রেলওয়ে

বোর্ড নীতিগতভাবে এই দাবী মেনে নিয়োঁছিলেন। অন্যান্য ডিভিশনে এই নীতি অনুসারে নিয়োগও হয়। কিন্তু শিয়ালদহ ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই নীতি মানছেন না। নব কংগ্রেসী মস্তানদের তিনি নিয়োগ করে চলেছেন। এ কাপারে তাঁকে কয়েকজন অফিসারও নিয়মিত সাহায্য করে থাকেন।

এ ছাড়া বাস-মালিক সমিতির সঙ্গে শিয়ালদহ বিভাগের রেল কর্তৃপক্ষের একটা গোপন বন্দোবস্তের কথাও রেলের অনেক পদস্থ কর্মচারীরা জানেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে কন্ট্রোল রুমের কার-সাজিতে প্রায়ই শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন চলাচলের বিঘ্ন ঘটানো হয়। শহরতলীর যাত্রীদের সমস্ত রকমের ঝুঁকি নিয়ে বাসে বাড়ী ফিরতে হয় আর বাকী লক্ষ লক্ষ যাত্রী চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে শিয়ালদহ স্টেশনে রাত কাটান।

পৌরসভায় ভ্যাকসিনেটরের পদে কংগ্রেসীদের পেটোয়া ব্যক্তিদের নিয়োগ

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

কয়েক বছর ধাবৎ কলকাতা পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরে তেপানটি ভ্যাকসিনেটরের পদ শূন্য পড়ে আছে। পদগুলি অবিলম্বে পূরণের জন্য বিভিন্ন তরফ থেকে বারে বারে চাপ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও শূন্য পদগুলি আজ পর্যন্ত পূরণ করা হয়নি। তারা বরাবরই দাবী করে- ইন যে শূন্য পদগুলি সার্ববিধানিক পদ্ধতিতে পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ পৌর সংবিধানের রিক্রুটমেন্ট রেগুলেশন এবং কয়েক বছর পূর্বেকার কলকাতা হাইকোর্টের রুল অনুযায়ী ঐ শূন্য পদগুলিতে ভ্যাকসিনেটর নিয়োগ করতে হবে।

কিন্তু সবরকমের দাবীকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে পৌরসভার বর্তমান কর্তৃপক্ষ ভ্যাকসিনেটর হিসাবে কাজ করবার জন্য কিছু সংখ্যক অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছেন। গত আগস্ট মাস থেকে প্রতি কিস্তিতে দুই মাস করে সাতটিটি পেটোয়া ব্যক্তির মধ্যে দুই কিস্তির নিয়োগ-পত্র বিতরণ করা হয়েছে। নিয়োগ-পত্রটি সমাধা করা হয়েছে নতুন পদ্ধতিতে অর্থাৎ দৈনিক চার টাকা মজুরীতে “ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার” হিসাবে। দ্বিতীয় কিস্তির মেয়াদ-কাল গত সাতই নভেম্বর উনিশশ একাত্তর সালে শেষ হয়ে যাওয়ার তৃতীয় কিস্তির নিয়োগপত্র বিতরণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ মহলে বিশেষ কর্মতৎপরতা এবং তোড়-জোড় সেরে দিয়েছে।

শোনা যাচ্ছে, স্বয়ং ডেপুটি মেয়র এবং নব কংগ্রেসের কাউন্সিলার শ্রীরাণীয়ারী রাম পেটোয়া ব্যক্তিদের পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আরও শোনা যাচ্ছে যে, নিয়োগের ব্যাপারে কংগ্রেসের একজন প্রাক্তন মেয়রের সুপারিশ সম্বলিত একটি চিঠি পৌরসভার কংগ্রেসী কেব্-বিস্ট্রদের হাতে ঘোরফেরা করছে। প্রাক্তন মেয়র দাবী করেছেন যে, পেটোয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই নব কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। সুতরাং এরা যে অনতিবিলম্বেই তৃতীয় কিস্তির নিয়োগপত্র সংগ্রহ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহান থাকে বাঙ্কনীয় নয়।

পৌর সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েই এই সব পেটোয়া ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে। বিষয়টি আরও প্রাধান্য-যোগ্য এই কারণে যে, যে সময়ে অতিরিক্ত ভ্যাকসিনেটর নিয়োগের প্রয়োজন থাকবার কথা নয় অর্থাৎ যে সময়ে সাধারণতঃ কোন মহা মারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে না, সেই সময়ে নিতান্ত স্বজন পোষণের নেশায় অচ্ছন্ন হয়ে কপোত কল্পিত প্রয়োজনের অজহাত তুলে নিয়োগ-পত্র বিতরণ করা হয়েছে। পৌরসভার রিক্রুটমেন্ট রেগুলেশনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা আছে যে ভ্যাকসিনেটর পদ প্রাথমিক নির্বাচন-কালে নিম্নতম যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ স্কুল ফাইনাল অথবা সম-তুল্য পরীক্ষাসম্পূর্ণ সার্টিফিকেট

নির্বাচক মন্ডলীর সমীপে দাখিল করতে হবে এবং কলকাতা পৌর সংস্থার অধীন কোন একটি টিকাদান কেন্দ্র থেকে ন্যূনপক্ষে ছয় মাসের (একশ আশিটি কর্মদিবসের) শিক্ষানবিশীর সাক্ষ্যের স্বীকৃতি হিসাবে পৌর স্বাস্থ্য অধিকর্তার সার্টিফিকেটও হাজির করতে হবে। অন্যথায় প্রাথমিক ভ্যাকসিনেটরদের কাজের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না।

পৌরসভার কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে অরাজকতা আজকের ঘটনা নয়। এটা বহুদিনের। অরাজকতা নিরসনকল্পে কিছুকাল আগে কলকাতা হাইকোর্ট কলকাতা পৌরসভার উপর একটি রুল জারী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোন কোন অবর্তীচীনও বোধহয় বিশ্বাস করবে না যে পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মীদের ঝগড় কতাব্যস্তরা পৌর সংবিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বরং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই বলা যায় স্বেচ্ছাচারিতার অদর্শে অনুপ্রাণিত এই ব্যক্তিরা এটা পরিষ্কারভাবেই জানতেন যে সংবিধানিক পদ্ধতিতে নিয়োগের ব্যবস্থা হলে পেটোয়া-দের মধ্যে একজনেরও নিয়োগপত্র সংগ্রহ করবার যোগ্যতা হোত কিনা সন্দেহ। সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তি-দেরই নিয়োগ করা হয়েছে অত্যন্ত বেআইনী ভাবে, নিছক স্বজন পোষণের প্রমত্ততায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রতি বছর পৌরসভার স্বাস্থ্যদপ্তর কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে

যাদের ভ্যাকসিনেটর পদে কাজ করবার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম যোগ্যতা আছে, তাদের পৌরসভার অধীনস্থ টিকাদান কেন্দ্র থেকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে থাকেন। শিক্ষা গ্রহণের মেয়াদকাল ন্যূনপক্ষে ছয় মাস অর্থাৎ একশ আশিটি কর্মদিবস। শিক্ষা গ্রহণের মেয়াদ-কাল পূর্ণ হবার পর রীতিমত পরীক্ষা গ্রহণ করে পৌরসভার স্বাস্থ্য অধিকর্তা তাদের সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। বর্তমানে শতাধিক পুরুষ ও মহিলা শিক্ষা-কাল পূর্ণ করে স্বাস্থ্য অধিকর্তার নিকট থেকে সার্টিফিকেট আদায় করে বেকার হয়ে ঘরে বেড়াচ্ছেন এই দুরাশা নিয়ে সে পৌরসভার যখন ভ্যাকসিনেটরের প্রয়োজন হবে তখন হয়ত তারা সুযোগ পাবেন।

সম্প্রতি যখন বাংলাদেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানব সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিলেন, পৌরসভা তখন তাদের শিবির-গুলিকে সংরক্ষক ব্যাধির মহা-মারীর কবল থেকে রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে কিছু সংখ্যক শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কুমুনগর প্রভৃতি অঞ্চলে পাঠালেন এই আশ্বাস দিয়ে যে উদ্ভাস্ত শিবিরগুলির কাজ সমাপ্ত হলে তাদের পৌরসভার স্বাস্থ্যদপ্তরে নিয়োগ করা হবে। অথচ প্রয়োজনের অজহাত তুলে যখন ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার নিয়োগ

করা হোল তখন সেই সকল যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কউকেই সুযোগ দেওয়া ত দূরের কথা, ডাকা পর্যন্ত হোল না। স্বজন পোষণের এ ধরনের নিকৃষ্ট নিদর্শন আর আছে কিনা আমাদের জানা নেই।

প্রকাশিত হল
শফিকুল হাসানের
মুক্তির সংগ্রামে
পূর্ব বাংলা

পূর্ব বাংলার সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মনুষ্য-বুদ্ধির ঐতিহাসিক পটভূমি, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির ভূমিকা, সংগ্রামী জনতা ও বিপ্লবী কর্মীউর্নটদের ভূমিকা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বর্তমান পরিস্থিতি ও সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ, মুক্তির পথ এবং গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি রণকৌশল সম্পর্কে বহুল তথ্য সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য রচনা সন্কলন।

দাম : আড়াই টাকা
প্রকাশক : রবীন মুখোপাধ্যায়
প্রাণ্ডিহান :
৬১নং ষ্ট লেন, কলিকাতা-১৩

(ମର୍ମାଘେର ମହାମହାତ୍ମା)

. ७२, बगै टमन, कनि-२०

বেলেঘাটার মিঞাবাগান বস্তি ভেঙে পড়েনি

অরুণাভ সেন

বেলেঘাটা ব্রীজ ছাড়িয়ে বাঁ দিকে চলে যান। দেখবেন একটা সেকেন্ডে বনেদী চেহারার বাড়ি, রাসবিহারী ম্যানসন। এর উল্টো দিকেই মিঞাবাগান বস্তি। প্রায় দশ হাজার বাসিন্দা। মাটির বাড়ি। কোনটি টালি, কোনটি টিনে ছাওয়া। দু' চারটে পাঁকা বাড়িও আছে। এরা সকলে পূর্ব বাংলার (অধুনা বাংলা দেশ) লোক। দেশ ছেড়ে অনেক কষ্টে মাথা গুঁজবার ঠাই করে নিয়েছে। কেউ শ্রমিক, কেউ কেরানী, কেউ দোকানদার। এরা নিজের এই উপনিবেশে একটা সামান্য সম্বল হারান সেকেন্দারী স্কুল করেছে। একটী জন-কল্যাণ ডিসপেন্সারী করেছে। এখানে সব রাজনৈতিক মতে 'বিশ্বাসীরাই' আছে। তবে কাউন্সিলার সি পি এম-এর প্রশান্ত চ্যাটার্জী। বিধান-সভায় জিতেছিলেন ঐ পার্টির কৃষ্ণপদ ঘোষ। তাঁই বস্তীকে ঘিরে ছিট সি আর পি ক্যাম্প। বস্তীর ঠিক মধ্যখানে বালির বস্তার কার। সেখানেও সি আর পি।

এই বস্তীতে রাতে মেয়েরা কেউ ঘুমোয় না। রাতের জ্যোৎস্নায় স্নানকারী মৃগীর টুটি টিপে নিয়ে যায়। রাতের কলকাতার মিঞাবাগান বস্তীতে জ্বলজ্বল চোখে সি আর পি শ্বাপদেরা ঘোরে। প্রতিদিন প্রতিরাতে তরুণেরা নিহত কিংবা আহত হয়। কালো কয়েদী ভ্যানে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। মায়েরা জানেনা বাছা তার ফিরবে কি না। তরুণীরা কোমারকে আগলে পাহারা দেয়। বধূরা কপালেতে ভাগ্য করে সি'দের টানে। যদি কেউ মূছে দেয়।

ঐ বস্তীর প্রতিটি বাড়ি আপনি দুন। বেলেটের দাগ। বোমার মর্চে পড়া ঝুঁ মাটির দেয়ালে। শিপাদের বাড়ির সামনে দেখবেন শূন্য রক্তের চিহ্ন।

ছয়ই নভেম্বর—বেলা এগারোটা দুই হাজার সি আর পি ঘিরে ফেলেন মিঞাবাগান বস্তী। তাদের পরিচালনা পাঁচটি থানার ও সি—নারকেলডাঙা, বেলেঘাটা, ফুলবাগান মাণিকতলা আর এন্টালীর। রাস-বিহারী ম্যানসনের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে পূর্ব কলকাতার পুলিসের ডেপুটি কমিশনার সেরোজ ভট্টাচার্য। তিনি এ অভিযানের নায়ক। বস্তীর বাইরে থেকে সূর্য হল ফায়ারিং। ভিতরে ঢুকে পড়লো সি আর পি আর কলকাতার পুলিস। পুলিসের হাতে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা। তারা মিঞাবাগানে তেরগা ঝাণ্ডা তুলবে। সঙ্গে কুখ্যাত সব গুন্ডারা। প্রথমে তারা ঢুকলো যুব সংস্থার ক্লাবে। আলমারি ভেঙে সস্তর টুকা ছিন-তাই করলো। পাশে দোকান ঘর ভাঙলো। তার পাশের বাড়িতে বসেছিল অসীম পোন্দার। তাকে চুল ধরে টানতে টানতে তোলা হল পুলিসের জীপে। ধরে নিয়ে

গেল অসীমার দুই ভাই রবীন আর নিতাইকে। অসীমাদের বাস ভেঙে গরম শাল টাকা পরসা বা পেল উল্লসের মতো চুরি করলো।

শিপ্রা সাহা বসেছিল তার ঘরে। পুলিস তার হাত ধরে টান দিলো। মুখখিস্তি করে বসে—চল শালী। শিপ্রা, বিস্মিত কিশোরীটি শূন্যলো—কোথায়?

কোথায়? মুখ ভেঙে উঠলো জানোয়ারগুলো। হাত ধরে গালে চড় মারলো শিপ্রার। টানতে টানতে তাকে একটা সরু গলিতে নিয়ে গেলো। সেখানে তাকে বলা হল চলে যেতে। শিপ্রা যেই পিছনে ফিরলো, তার ঘাড় বন্দকের নল লাগিয়ে গুলি করা হলো। মাগো বলে আছড়ে পড়লো শিপ্রা। সমস্ত ভালেবাসা, স্বপ্ন, আশা নিয়ে রক্তাক্ত তব্বী দেহটা পড়ে রইল মিঞাবাগান বস্তীর গলিতে।

জানোয়ারের দল পাশের বাড়িতে ঢুকলো। দুই ভদ্রমহিলাকে গিয়ে বসে—সই কর সাদা কাগজে। মহিলা

দুজন জিজ্ঞাসা করলেন—কেন। অফিসারটি হাঁকলো—সি আর পি। সি আর পি এসে বন্দকের নল ঠেকালো তাদের বকে। সাদা কাগজে সই করালো। পরে ওপরে লেখা হল—“শিপ্রার ভাইয়ের গুলিতে শিপ্রা মরিয়াছে।” এই খবর বেরলো আনন্দবাজার শৃগা-স্তরে। সাংবাদিক একথা লিখলেন, পুলিস রিপোর্টের বাইরে আর খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি।

তারপর এরা ঢুকলো রাণী বিদ্যামন্দিরে। মাস্টারদের থাকা ঘরে কোণে ফেলে দেওয়া হল। জানোয়ারগুলো ছাত্র ছাত্রীদের হাত শূন্যতে লাগলো। বস, বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। শূন্যেরে ছানাগুলো বোমা ছুঁড়েছে চারটি বাচ্চা ছেলেকে গুলি করা হল।

অন্তস্রা এক মহিলার পেটে খোঁচা মেরে বলা হল, এই বস্তীর প্রতিটি মেয়ে বোমা ছুঁতে জানে। এর পেটের মধ্যে বোমা আছে। অশ্লীল হাসির শব্দে কে'পে উঠলেন ভাবী মা।

প্রশান্ত চ্যাটার্জীর প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন প্রার্থী ছিলেন চন্ডীচরণ বসু। চন্ডীবাবু কংগ্রেসের লোক। কিন্তু এই বস্তীর বাসিন্দা! তার বাড়িও তখনই করা হয়েছে। চমৎ-কার কাজ দেখবার জন্য পুলিসের রাষ্ট্রপতি পদক পাওয়া এক এ এস আই-এর দুই মেয়েকে সি আর পি প্রহার করেছে। বেলা এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত অবিরাম ফায়ারিং করা হয়েছে। সমস্ত বস্তীকে তখনই করা হয়েছে। পুতে দিয়ে গেছে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা।

গত চৌদ্দ দিনে এই বস্তীতে সি আর পি গুলিতে মারা গেছে চৌদ্দ বছরের মেয়ে পার্বতী শীল, চল্লিশ বছর বয়সের পানের দোকা-নের মালিক গণেশ দাস বছর বহি-শের বলাই সাহা। ধর্ষিতা হয়েছে একাধিক তরুণী। গুলি হলে-ছেন শতাবধি যুবক। এই বস্তীতে ঘরে গেছেন জ্যোতি বসু, সর্ধীন কুমার, সেরোজ মুখার্জী। তারা বসেছেন—প্রতিরোধ ছাড়া কোন পথ নেই।

সত্যিই এরা বুঝে গেছে প্রতি-রোধ ছাড়া কোন পথ নেই। যান বস্তীর ভিতরে। দেখবেন, এতো

অত্যাচার। 'তবু' দেয়ালে পোস্টার। তাতে লেখা—“দাসত্বের কাছে মাথা নত নয়। অত্যাচারের কাছে মাথা নত নয়। যাকের কাছে হাঁট গেড়ে মৃত্যু নয়।”

দেখবেন, শিপ্রাকে না ভোলার প্রতিশ্রুতি।

মিঞাবাগান ভেঙে পড়েনি। প্রতিটি মা আজ অতল রাত কাটায়। প্রতিটি তরুণী জেগে থাকে দাঁতে দাঁত চেপে। দুপুরে ফেরারী ছেলেরা রাতের পাহারাদার। খব-রের কাগজের ছবিতে প্রসিদ্ধি ইন্দিরাজীর এনামেল করা মূখর হাসি তাদের কাছে রাক্ষসীর মোহিনী হাসি। ইয়াহিয়া খাঁর অত্যাচার নিয়ে দেবদলোলের কাঁদুনি শুনতে শুনতে মনে হয় অসহ্য প্রতারণা। বাংলা দেশ নিয়ে নিপ্ৰ-দীপের মহড়া এদের কাছে আত্ম-মণের নতুন ছতো।

ধৈর্য ধরে তারা কাগ গোণে—কবে বদলা নেবার দিন আসবে। তারই প্রতীতি ঘরে ঘরে। অত্যাচার তাদের স্নায়কে করেছে ইম্পাত। তারা মাথা নোমাবার নয়। বিপ-র্ষ তাদের সন্ধান দেয় বিপ্লবের।

স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিবহন বিভাগে চূড়ান্ত দুর্নীতি

ভারপ্রাপ্ত সহকারী ডিরেক্টর দুহাতে মজা লুটছেন

(দপ্পনের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য-দপ্তর সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। একমাত্র এই দপ্তরের অধীনেই মোট সরকারী কর্মচারীর অর্ধেকের কাছাকাছি লোক কাজ করেন। এই দপ্তরের অধীনে প্রতিটি বিভাগই দুর্নী-তিতে ভরা। উপরের তলার অফি-সারদের দুর্নীতি অক্ষমতা আর অপদার্থতা সমস্ত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা-কেই অচল করে রেখেছে। আজ শব্দ এই দপ্তরের একটি বিভাগের গণকর্তন করবো।

বিভাগটির নাম স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিবহন বিভাগ। এই বিভাগের মধ্যমি জন-স্বাস্থ্য বিভাগের এক-জন এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। করিং-কর্মী ব্যক্তি। তাই তদারকী কমি-শনের বিদ্যুৎ রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও উক্ত পদে স্থায়ী হয়েছেন। বিভা-গটির গুরুত্ব অপরিসীম। লক্ষ লক্ষ টাকা আমদানীর সুযোগ রয়েছে। তাই যখন জেলায় জেলায় এমনকি খাস কলকাতা শহরেও এই বিভাগের অত্যন্ত জরুরী কাজ-কর্ম পরিবহনের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে তখন একটি ইউনিটের বরাদ্দ গাড়ী উক্ত এ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টরের সৌদ-পুর্বে বিপুল কয়ে নির্মীয়মান তার বাড়ীতে, বরাহনগরে তাঁর শ্বশুরালয় এবং লিলুয়াতে পিতৃ-গৃহে নিছক ব্যক্তিগত কাজে ব্যা-য়ত করছে।

দার্জিলিং থেকে কলকাতা।

সমগ্র পশ্চিম বাংলার এই দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন ধরনের প্রায় নয়-শতটি গাড়ী আছে। প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবার পরি-কল্পনা বিভাগ এবং ইউনিসেফ থেকে এই দপ্তরের হাতে নতুন নতুন গাড়ী আসে। নতুন গাড়ী পুরানো গাড়ী মেরামত এবং সমস্ত গাড়ী-গুলির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা সবই এই পরিবহন বিভাগের হাতে। উক্ত এ ডি মহাশয় সর্বময় কর্তা। সুদূর উত্তর বাংলা থেকে সুদূর করে সব জেলায় এই দপ্তরের সব গাড়ীর ব্যবস্থা একমাত্র এই অফি-সারের উপর নির্ভর করে।

সামান্য মেরামতী কাজের জন্য মফস্বল জেলায় একটা গাড়ী অচল হয়ে রইলো। কিন্তু জেলায় কোন ব্যবস্থা হবে না। কলকাতায় পাঠিয়ে মেরামত করতে হবে, না হলে এ ডির বিশেষ নির্দেশে সেখানে কাজ হবে। এই মেরা-মতীর কাজ পড়ে থাকে। জেলায় অতি প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হবে না। কারণ তাহলে এ ডি সাহেবের লোকসান।

অন্যান্য কথায় পরে আসছি। প্রথমে শব্দ চমৎকার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার কথাতে আসা যাক। আপনি যদি গোবরা হাসপাতালে যান দেখতে পাবেন খোলা মঠে জল-রোদের মধ্যে গত কয়েকমাস ধরে অন্ততঃ খান বিশেক গাড়ী

পড়ে আছে। ইজিনগুলো বিকল মাটি জমে কোনো গাড়ীর উপর নতুন চারা গাছ গজিয়ে গেছে। এগুলো কি ভাঙা গাড়ী? আদৌ নয়। তবে এ হাল কেন?

মেরামতীর দৌড় কত? বছরের পর বছর গাড়ী পড়ে আছে গ্যারেজে একেবারে অচল হয়ে। কিন্তু খর-চের খোঁজ নিন। মেরামতী, রক্ষা-বেক্ষণ আর পেট্রোল প্রভৃতি জ্বালানী বাবদ মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ লক্ষ টাকার উপরে। কল-কাতার প্রজেক্ট এবং পুন্দের যে গাড়ীগুলি মেরামতীর জন্য গ্যারেজে পড়ে আছে সেগুলোর নড়া-চড়ার কোনো আশা নেই। ইউনিসেফের কয়েকখানি গাড়ী এখন বদলী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাত আট মাস আগে এই বিভাগে কিছু দক্ষ এবং অদক্ষ কারিগর নিয়োগের সরকারী অনু-মোদন এসেছে কিন্তু একজন লোকও নিয়োগ করা হয়নি। তার বদলে জন তিরিশেক ছোক এখন দৈনিক মজুরীতে অফিসে, গ্যারেজে এবং স্টোরে কাজ করছেন। বলা বাহুল্য তাঁরা সবাই এ ডি সাহেবের নিজস্ব লোক।

এবার গাড়ী মেরামতের প্রহ-সনটার দিকে নজর দিন। কাল যে গাড়ী মেরামত করা হয়েছে আজই সে গাড়ী অচল হয়ে পড়লে আপনার বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। বাঁধা দোকান থেকে বাঁধা

প্রণামীর ব্যবস্থার মাধ্যমে যে নিম্ন-তম মানের স্পয়ার পার্টস কেনা হয় তা দিয়ে মেরামত করলে এই অবস্থা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

আরো একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে মেরামতের ব্যাপারে আট-দশ হাজার টাকার কাজ করানোর জন্যও কোনো কোর্টসান নেয়ার দরকার হয় না। যদি আদৌ কোনো কোর্টসান নেয়া হয় তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা। বিশেষ কোনো সংস্থার কাছ থেকে নিম্নতম কোর্টসান নিয়ে কাজ দেয়া হোল। তার দুদিন পরেই উক্ত সংস্থা পেপ করেন সার্ভিসেস্টারী এস্টিমেট। আর তা মঞ্জুর হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট সংস্থার টাকা পেতে দেবী হয় না। এর পরেও যদি নিম্নতমেরা বলেন যে উক্ত এ ডি সাহেব অসৎ তাহলে তিনি নচার।

এ ডি সাহেব পুরানো চৌসিসের উপর নতুন বডি ঠেরী করানোর ব্যাপারে খুবই আগ্রহশীল। বিশেষজ্ঞরা এই ব্যবস্থা সমর্থন না করলে কি হবে? বিশেষ একটি ফর্মকে এ বাবদ গোবরা সেনের ভাণ্ডার থেকে প্রতি বছর কত হাজার টাকা দেয়া হচ্ছে। অডিট বিভাগ কি খোঁজ নেবেন এ ব্যাপারে অন্য কোনো ফর্মের সঙ্গে আদৌ কোনো দিন দর যাচাই করা হয়েছে কি?

সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের উদ্ঘাটন করা (শেষাংশ বস্তু পূর্তায়)

রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রবেশ

দর্পণের উনিতিরিংশে অক্টোবরের সংখ্যায় “রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রবেশ” শীর্ষক আলোচনার সঙ্গে কিছু যোগ করতে চাই। আলোচনাটি সমরোপযোগী-হলেও পূর্ণাঙ্গ হয়নি।

রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রবেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচনা করেছে। এতকাল ধরে যে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে ছদ্মগার্হ নীতি মেনে চলছিল, যাকে “কাগুজে বাঘ” বলে কটাকটব্য করতে কসর করত এবং যাকে ধ্বংস করার জন্যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও করেছিল, আজ সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেই চীন এক টেবিলে বসে নিজেদের সম্পর্কে সহজীকরণ করতে চলেছে।

ডঃ কিসিংগারের চীন ভ্রমণ থেকে শব্দ করে চীনের রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ সব কিছু মিলে আমাদের কাছে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে

পশ্চিম চীন উঠতে বসতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাপান্ত করতে ছাড়েনি। চীনের ধারণা সাম্যবাদ ও খনতন্ত্রবাদের মধ্যে যে বিরোধ তা আদর্শগত। তার মীমাংসা হবে সহাবস্থান নীতির দ্বারা নয়, যুদ্ধের দ্বারা। আশ্চর্য যে, চীন সেই সহাবস্থান নীতিকে স্বীকার

করে ন্যাটোর দুর্ভেদ্য দুর্গে আজ ভাল রকম চিড় ধরেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পি-চীন তত্ত্ব ফটাস করে ফেটে গিয়েছে। বেদনাদায়ক হোল তার ন্যাটো গোষ্ঠীর অন্যান্য সাক্ষরদের প্রভুর সঙ্গে বিপদে সামিল হবার ল্যাটা চুকিয়ে দিয়েছেন আলবেনিয়ার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড ও নরওয়ে আজ কেবল কাগজে কলমে

বোঝা যাবে জর্জ বশ, উইলিয়াম রোজার্স, সেনেটের ম্যানস্ফিল্ড এবং বৈদেশিক দপ্তরের মধ্যপন্থীদের প্রাণপণ থেকে। একজন পরাজয়কে শক্তি স্পেকটেকল বলেছেন। সংবাদে অবশ্য উল্লেখ নেই যে এই শক্তি স্পেকটেকল যে ক্ষত তৈরী করেছে তা সারাবার জন্যে শক থেরাপি কবস্থা ছিল কিনা। কেউ কেউ আবার হুমকি দিতে ছাড়েন নি, ম্যানস্ফিল্ড সাহেব ত বলেই ফেলেছেন—“আমি অনেকদিন ধরেই ভাবছি যে রাষ্ট্রসংঘকে আমরা খুব বেশী আর্থিক সাহায্য দিয়ে ফেলছি। অতঃপর সাহায্য দেয়ার বিপক্ষে আমি যদি ভোট দিই তাহলে কেউ যেন না ভাবেন যে রাষ্ট্রসংঘে ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে তা করা হচ্ছে। (স্টেটস-ম্যান আঠাশে অক্টোবর)

প্রস্তাব যে “উত্তম” সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ম্যানস্ফিল্ড সাহেবের বোধোদয় একটু বিলম্ব ঘটল। বোধোদয়ের প্রথম কিস্তি পেলুম। পরবর্তী কিস্তিগুলোর কী আছে জানা নেই।

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করার জন্যে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাতো বৈ-ইজ্জত হবার মুখে। বিরোধীরা একটা মওকা পেয়েছেন। পাঞ্জা কষবার। মন্ত্রিসভার সংকট ঘনীভূত। মিঃ সাতোর গদি নিয়ে টানাটানি।

শব্দ জাপান কেন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন সব-গুলোতে ঝড়ের সংকেত শোনা যাচ্ছে। এতকাল ধরে এই দেশগুলো মার্কিন দুর্নিয়ার মোসাহেবী করে দিন গজারণ করছিল আর চকচকে ডলারের গোলক ধাঁধায় পড়ে সবাই ঠান্ডা ছিল। আজ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সম্ভাব ঘটে যায় তাহলে এরা বেশ মর্শকিলে পড়বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ নিজেই লাজে গোবরে হয়েছে। সে সাক্ষরদের টানবেই বা কী করে। তাইওয়ানের অবস্থা আরও শোচনীয়। গত বছর পর্যন্ত তাইওয়ানীদের মাথাপিছ বার্ষিক আয় ছিল দুই হাজার দশ পঞ্চাশ টাকা। মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল তিন হাজার মিলিয়ন ডলার। প্রায় সমস্ত সাহায্যটা এসেছে মার্কিন দুর্নিয়া থেকে। তাইওয়ানীদের আশঙ্কা হচ্ছে বিদেশীরা যদি তাদের মূলধন গুটিয়ে নেয় তাহলে আর্থিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। সন্তরাং প্রভু এবং ভৃত্য কারুর মনে আজ এতটুকু সোম্মান্তি নেই।

একটা প্রশ্ন, যে সমস্ত রাষ্ট্র গত বছর পর্যন্ত চীনের রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশের পথ কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অথবা একেবারে সুবোধ বালকের মত “স্পিকিটি নট” করে বসেছিল হঠাৎ তারা চীনের পক্ষে ওকালতি শুরু করল কেন। শব্দ তাই নয়, চীনের সাফল্যে উল্লসিতও বটে। সংবাদে প্রকাশ, ভোটভূটির পর হাত প্লা ছুড়ে নেচেছে। তাজব ক্যাম্পার। এটা কিসের ইংগিত? তামাম দুর্নিয়ার রাষ্ট্রের্তারা কী আজ সব নিষ্ঠাবান হয়ে উঠলেন?

হাজারো প্রশ্ন মনে জাগে। অন্য-কারে সমাধান হাতড়ে বেড়াই। অনমানের ওপর নির্ভর মনকে শান্ত করার চেষ্টা কর। এতকাল কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেজুড় হয়েই ন্যাটো, সিনাটো গোষ্ঠী ও অন্যান্যরা চীন বিরোধিতা করে আসছে। আজ সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা না করেই দৌড় দিল কোলাকুল করতে। সন্তরাং গোসাঁ হবারই কথা। গোসাঁ করার নিম্ন ফল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেয়েছে। সর্বো-পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সংকট আজ প্রবল আকার ধারণ করেছে। বেকার সমস্যা ক্রমবর্ধমান। শব্দ কমিউনিস্ট জুজুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে যে অটেল ডলার ঢালা হচ্ছে মার্কিন-বাসীরা তা আর বরদাস্ত করতে চাইছে না। সরকারের বৈদেশিক নীতির সমালোচনার তারা মুখর। এটা সত্য যে সরকার যদি কমিউনিস্ট জুজুর হাত থেকে মুক্ত হতে পারেন এবং চীনের সঙ্গে যদি সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় তাহ-প্রতিরক্ষা খাতে কয়ভার কমবে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক স্বাভাবিক করায় উৎসাহী।

প্রাণগোবিন্দ দাশ

নকশাল নেতাকে হত্যার আশঙ্কা

আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি নকশালপন্থী নেতা শ্রীসোমনাথ ঘোষকে পদলিখ গত ছাব্বিশে অক্টোবর দক্ষিণ কলকাতার এক স্থান থেকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু আজ পর্যন্ত পদলিখ তাঁকে গ্রেপ্তারের কথা ঘোষণা করেনি। আমরা আশঙ্কা করছি ইতিপূর্বে পদলিখ যেভাবে নকশাল নেতাকে সরোজ দত্তকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করেছে শ্রীঘোষকেও তাই করতে চাইছে আর তাই তাঁকে গ্রেপ্তারের কথা চেপে ধরে চাইছে। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে এরূপ ঠান্ডা মাথায় হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আমরা সর্বসাধারণের কাছে আবেদন রাখছি।

ইতিমধ্যেই তার উপর প্রচণ্ড দৈহিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। আমরা শ্রীঘোষের প্রতিবেশীবৃন্দ দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে তাঁকে আদালতে হাজির করা হোক। শ্রীঘোষ ছিলেন পঞ্জীর সর্বসাধারণের একান্ত প্রিয়। বিগত পনের বছর যাবৎ তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক।

প্রতিবেশীবৃন্দ

মতামত

করে নিচ্ছে। তাহলে কী জিজ্ঞাস করবো, পৃথিবী থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে? রাষ্ট্রবৈত্তারা তার গবেষণা করুন। আমরা কিন্তু ফেলবো স্থিতির নিশ্বাস। আর অপেক্ষা করবো মাও সে তুং ও নিক্সন সহহবের ঘুখোমুখি আলোচনার ফলাফলের জন্যে।

সব চাইতে মজার ব্যাপার হোল চীনের রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশকে কেন্দ্র

ন্যাটোর সদস্য। ঐক্য অনৈক্যে পর্ববিসিত। ভাঙ্গন অবশ্য অনেক আগেই ধরেছিল, যখন দ্য গ্যল পাতত্যাড়ি গুটিয়ে এনেছিলেন ন্যাটোর দপ্তর থেকে। সেই ভাঙ্গন আজ পূর্ণাবয়ব পেলে।

তাইওয়ান বহিস্কৃত। কিন্তু মূখে চুনকালি পড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, হৃদয়ে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষত আর সেই ক্ষতের গভীরতা

বামারলরীতে যথেষ্ট প্রসঙ্গে

দর্পণ পত্রিকায় গত পনেরোই অক্টোবর বামারলরীর প্রমিকবৃন্দের নামে “বামারলরীতে যথেষ্টচার” শিরোনামায় লিখিত পত্রটিতে লেখকগণের মন্তব্য “কোম্পানী লোক ছাঁটাইয়ের উদ্দেশ্যে সুনীল দাস, প্রাণগোপাল ঘোষ ও জরান গাঙ্গুলী প্রভৃতির নেতৃত্বে একটি গুন্ডাশহী দল সৃষ্টি করে নির্বিবাদে তেরোশ লোক ছাঁটাই করেছেন এবং এখনও গালিগালাজ ও ভয়ভীতি প্রভৃতির দ্বারা অবশিষ্ট লোকজনদের চাকরীতে ইস্তফা দেবার চেষ্টা চালান হচ্ছে ইত্যাদি” সর্বৈব মিথ্যা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বামার-

লরী টি অয়ার হাউস ডিপার্টমেন্ট একাত্তর সালের উনিশে জানুয়ারী ক্রোজার করে। এই ক্রোজারে এই ডিপার্টমেন্টের মোট তেরোশ প্রমিক বেকার হন। এই সংবাদ তথা কোম্পানীর অশুদ্ধ উদ্দেশ্য ও নানা কারচুপির বিষয় আমরাই আপনাদের জানাই এবং আপনারাও অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আপনাদের কাগজে যথাসময়ে তা প্রকাশ করেছিলেন। এখনও বিষয়টির মীমাংসা হয়নি। যদিও বহু আলোচনা, লেখার দপ্তরের হস্তক্ষেপ ইত্যাদির ফলে ঐ তেরোশ লোক নিয়েই কোম্পানী ক্রোজার ভুলে নেয়। ইতিমধ্যে কোম্পানী থেকে

স্বেচ্ছামূলক ভাবে বহু লোক অবসর গ্রহণ করা সঙ্গেও কোম্পানী একশ তেরো জন প্রমিককে ছাঁটাই করেছে। পরে বর্ণিত তেরোশ নয়। ছাঁটাই কমীরী এই এসোসিয়েশনের নেতৃত্বেই কোম্পানীর হেড অফিসের সামনে সর্বক্ষণ অবস্থান চালাচ্ছেন এবং প্রত্যহ বামারলরীর সর্বত্র বিক্ষোভ চলছে। দুরত্বের বিষয়, বিরোধীটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় চীফ সেক্রেটারীর দপ্তরে বিবেচনাধীন থাকা কালেই কোম্পানী আবার দুই মাস সময় দিয়ে, আগামী তেসরা জানুয়ারী বাহান্তর থেকে এই ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছে। ইতিপূর্বে বিষয়টির একটি সম্ভব মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় শিপিং এবং ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রী রাজবাহাদুরের সঙ্গে গত ছাব্বিশে অক্টোবর আমাদের দুই দফা আলোচনা হয় এবং মন্ত্রী মহোদয় সি আই ডবল টি সির অধীনে এই ডিপার্টমেন্টের কার্যভার নেবার আশ্বাস দেন, অন্ত্যায় জাতীয়করণ করারও আশ্বাস দেন।

সর্বশেষে জানাই যে, কোম্পানীর গুন্ডাশহী বলে যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে তাঁদের পরিচয় হল সুনীল কুমার দাস, সম্পাদক বামারলরী এমগ্লোজি এসোসিয়েশন, প্রদীপ্ত-কুমার ঘোষ (প্রাণগোপাল ঘোষ নয়) এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি। বর্তমানে তিনি স্বেচ্ছামূলক অবসর গ্রহণ করেছেন। জরান গাঙ্গুলী একজন প্রখ্যাত প্রমিক নেতা এবং পাবলিক টি, অয়ার হাউস মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি।

ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতি, বামারলরী এমগ্লোজি এসোসিয়েশন

স্বাস্থ্য দপ্তরে চূড়ান্ত দুর্নীতি

(পশ্চিম পূর্বের পর)

হয়েছে। এই উপলক্ষে একটি লরী ও একটি স্টেশন ওয়াগন কেনার অর্ডার দেয়া হয়েছে বিশেষ একটি কোম্পানীকে। কিন্তু অর্ডার দেয়ার আগে এই ধরনের গাড়ীর বাজার দর অন্য কোন ফর্ম থেকে যাচাই করা হয়েছে কি? ডি জি এস এস ডি-র দর দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু সে দরতো শব্দ চেসিস সম্বন্ধে। চেসিস আর বডি দুই-ই তো কেনা হচ্ছে। তবে বাজার দর নেয়া হোল না কেন?

আরো আশ্চর্য নয়শতটি গাড়ী যে ব্যবস্থার অধীনে সেই বিভাগে গাড়ী কেনা বা মেরামত বা স্পয়ার পার্টস কেনা—কোনো ব্যাপারেই টেন্ডার কমিটী বলে কিছু নেই। এ ডি সাহেবের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে অভিযোগ গেছে অনেক। কিন্তু ডিরেক্টর মহোদয় নির্বিকার। রাজ্যপাল ডায়াস সাহেব নাকি দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য আদালত থেকে লেগে

গিয়েছেন। তিনি একটু খোঁজ নেবেন কি?

আগেই বলা হয়েছে জেলা-গালি থেকে কলকাতার গাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হয় মেরামতের জন্য। গাড়ীগলো পড়ে থাকে। জেলায় জেলায় সামান্য মেরামতীর কাজও জেলা কর্তৃপক্ষ করতে পারেন না। গাড়ী অচল হয়ে থাকে এ ডি সাহেবের নির্দেশের অপেক্ষায়। ফলে কাজ-কর্ম ব্যাহত হয় প্রতি পদে। এ ডি সাহেবের মৌলিক অধিকার অর্থাৎ বড় বড় কাজের মারফত প্রণামী লাভের সুযোগ না দিয়েও শব্দ সামান্য মেরামতীর কাজগুলো জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে দিলে জেলায় জেলায় গাড়ীগলো অচল থাকে না—আর সেই অজু-হাতে জেলার অতি জরুরী কাজ-গুলোও বন্ধ থাকে না। আর কিছু না হোক দপ্তর কর্তারা এই ব্যবস্থারটুকু করলেও অনেক উপকৃত হতেন।

স্বাধীনতার চিহ্ন

সিদ্ধার্থ রায়ের শিক্ষামন্ত্রিত্ব

রমাপ্রসাদ মল্লিক

কয়েকমাস পূর্বে সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়কে যখন সাড়ম্বরে “পশ্চিমবঙ্গ দপ্তর” বিশেষভাবে সৃষ্টির পর অর্পণ করা হয়েছিল, তখন অনেকেই এই অজুতপূর্ব এবং নজীরহীন ব্যবস্থার, রহস্য বরাতে পারেন নি। বস্তুতঃ সংবিধানে রাজ্যপ্রশাসন পরিচালনার জন্য গভর্ণরের পদ এবং ক্ষমতাক্ষেত্রের পরিধি এত সূদূর বিস্তৃত এবং কেন্দ্রের একক আধিপত্যের সর্বাধিকার সূন্দর ভাবে আটঘাট বাঁধা যে, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে এমন এক বিশেষ বিভাগ খোলবার কোনো হেতুই নেই, সাংবিধানিক ঐচ্ছিক আইনের দৃষ্টিতে থাক বা নাই থাক। কিন্তু তথ্যটি সিদ্ধার্থবাবুর জন্যে অন্য দপ্তর খোঁজা হল, পাওয়াও গেল, এবং যেহেতু তিনি একজন প্রাক্তন “বামপন্থী” তাকে পশ্চিম-বাংলারই অধোষিত সন্বেদার বানিয়ে দেওয়া হল। এতে নেতৃমূলক স্বাভিমানের প্রতি সন্তোষ অর্ধ প্রদান করাও চলে, আর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকে কাণ্ডারী বদলও করা যায়, কোনো মহলেই খটকা না জাগিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গ এখন নয়া দিল্লীতে অনেক ক্ষমতাস্বার্থী নজরে “পাজী” প্রদেশ। কেউ কেউ একে বিদ্রোহী রাজ্য কল্পনা করে; পাশে এ প্রদেশ-বাসীদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণকারী জন্মগত অধিকারের বাস্তবে অবলোপ হেতু তুমুল বিক্ষোভ জাগে, সে জন্য দঃস্বপ্ন দেখাও কেন্দ্রের এক সাম্প্রতিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিস্তবান শাসকশ্রেণীর মাঝে তো বটেই, তাদের আশ্রিত পেশাদার রাজনীতিক এমন কি সাংবাদিক মহলেও পশ্চিমবঙ্গের আলাদা হয়ে যাবার সম্ভাবনা নানাভাবে আলোচিত হয়। সূত্রান্তর এ রাজ্যের জন্য একজন এমন ব্যক্তির প্রয়োজন, যে তার রাজনৈতিক জীবনে পশ্চিম-বাংলার বামপন্থী ধারার অভিজ্ঞতা রাখে বলে মনে করা যেতে পারে; এবং যে তার ঐ অভিজ্ঞতাকে বামপন্থী বশীকরণ, অথবা বামপন্থী জন-আন্দোলনের মাঝে সূক্ষ্ম চতুরাঙ্গির সঙ্গে ভাঙন আনার উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারবে।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও, কেন্দ্রের বিবেচনায় সিদ্ধার্থবাবুর উপযোগিতা এদিকে বড় একটা জুড়সই গোচের নয়। অন্ততঃ, এ ধরনের হিসাবের উপর নির্ভর করেই তাঁকে উপরোক্ত বিশেষ মন্ত্রক দেওয়া হয়নি। তথ্যভিত্তক মহলের মতে তাঁকে সচিবালয়কোশলে শিক্ষামন্ত্রক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উক্ত মন্ত্রকের বর্তমান রাষ্ট্র-মন্ত্রী জনাব নরেন্দ্র হাসান উত্তর প্রদেশের শিক্ষাবিদ মহলে একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কৃষ্টি। আলিগড়

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহুদিনের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেমের এক আশ্বাস রূপে তিনি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করতে পারেন, সিদ্ধার্থবাবুর পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ভারতের ক্ষমতাস্বার্থীত্বের কেন্দ্রবিন্দু উত্তর প্রদেশ এবং শিক্ষা-ভিমান নামক মোহ তথা কাঁধ উত্তর ভারতে ইদানীং কয়েক বছর ধরে এমন জ্বরদন্ত চেহারা নিয়েছে যে, ভারতের শিক্ষা বন্দোবস্তের ভার “বিদ্রোহী” পশ্চিমবঙ্গের কোনো প্রতিনিধির হাতে দেওয়া যায় না। সেজন্যে নতুন দিল্লীর নবকংগ্রেসী সলতানরা একটু বেশী মায়ায় সজাগ।

কেবল তাই নয়, শিক্ষামন্ত্রক হাতে নেবার অব্যবহিত পরেই

সিদ্ধার্থবাবু অধুনা ভারতে গিজিয়ে ওঠা (বর্জেরা বিলাতের নকলে) পারিক স্কুলগুলির ওপরে খবরদারী করতে গিয়েছিলেন—সেখানে পঠিত ছাত্রদের মাঝে অন্ততঃ শতকরা পঁচিশ পারসেন্ট সিট অনুন্নত জাতি এবং তালিকাভুক্ত তপশীলী সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য রিজার্ভ করে রাখা উচিত, এমন ভাসা-ভাসা সিদ্ধি প্রকাশ করেছিলেন। ফলে আসা দিনের সমস্যামূলক আদর্শের প্রতি স্মৃতি-আনুগত্য, নাকি শাসকদলের জনতাপ্রেমী অতুলসাহ, বলা কঠিন। যাই হোক মোটামুটি টিল পড়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে অচলায়তনী বর্ণপ্রমথ রাজনৈতিক নবকলেবর লাভ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতেও অনড় প্রতিপত্তি

পল্লী দর্শন

সি পি এমকে বর্ধমান জেলা থেকে উৎখাত করার চেষ্টা

সি পি এমকে বর্ধমান জেলা থেকে সরিয়ে ফেলার স্বপ্ন নিয়ে নব কংগ্রেস সারা জেলায় অবাধে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের নাম করে জেলা জুড়ে চোর, জোচ্চর, সমাজবিরোধীদের অবাধে মদত দিয়ে চলেছে। ঐ সব সমাজ-বিরোধীরা সি পি এম সমর্থকদের অবাধে মারধোর করছে, শৃঙ্খলা তাই নয়, সি পি এম কারো বাড়ীর দেওয়ালে পোষ্টার মেরে গেলে সেই বাড়ীওয়ালাও ঐ সমাজবিরোধীদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। পার্টি ফান্ডের নাম করে যতদূর জোরজবরদস্তি করে টাকা আদায় চলেছে। তাদের পার্টিকে সমর্থন করে না গ্রুপ শ্রমিকদের পেলেই সি পি এম ভেবে তাদের উপর অবাধ অত্যাচার চালাচ্ছে।

গত এক মাস ধরে কালনা থানার অন্তর্গত রামেশ্বরপুর গ্রামে এই সন্ত্রাস চলে আসছে। আটই সেপ্টেম্বর সকাল দশটা নাগাদ হাট কাশনা অঞ্চলের নিভুজি বাজারের নব কংগ্রেসের অফিসের জনৈক শ্রমিক কংগ্রেস নেতার বন্ধুর নেতৃত্বে প্রায় দেড়শ জন লোক বোমা, পাইপ-গান, লাঠি, সড়কি প্রভৃতি সহ রামেশ্বরপুর গ্রামের মেয়ে কনক দাসের বাড়ীতে ঢুকে তার ছেলে অমৃতলাল দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস, জীবন, তপন প্রভৃতিতে ভীষণভাবে মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় এদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। পল্লীশ্রমিক টেলিফোন যোগে খবর দেওয়া

হলেও পলিশ ঘটনা স্থলে আসে নি। থানাতে কেস ডাইরী লেখা হয়নি। বর্ধমান জেলা এস পিকে ঘটনা জানালেও তিনি পলিশকে বিধিব্যবস্থা নিতে কোন নির্দেশ দেন নি।

ঐ দিন সারা গ্রামে ঢুকে নব কংগ্রেস তার গুন্ডা বাহিনী নিয়ে যতদূর তাড়বলীলা চালায়। সারা গ্রামে অবাধ অত্যাচারের ফলে আটটি পরিবার ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজ্য ঘরে ঢুকে রাজ্য ভাঙ ও হাড় ভেঙ দেওয়া হয়। গ্রাম-বাসীদের মধ্যে অহিভূষণ সরকার, বাদল সরকার, শ্যামাপদ দাস, সনৎ গুহ, ফটিক চ্যাটার্জী, সূর্য দাস, কনক দাস প্রভৃতিদের বাড়ী ঢুকে হামলা চালালো হয়। গত সাতাশে অক্টোবরও অনুরূপভাবে আবার এদের উপর তাড়ব নৃত্য চলেছে।

শ্রদ্ধা রামেশ্বরপুর গ্রামেই নয়, সারা জেলায় নানা স্থানে রানীগঞ্জ, আসানসোল, বারবনীরে অনুরূপ ঘটনা চলেছে। দর্গাপুর, অমলগঞ্জ, অনুরূপ ঘটনা ঘটছে নিত্যই। বারাবনীর অমলগঞ্জ একদল চোরাকারবারীকে একজন পলিশের এ এস আই হাতেনাতে ধরলে স্থানীয় শ্রমিক কংগ্রেসের কর্মীরা ঐ চোরাকারবারীর সঙ্গে যৌথ ভাবে ঐ অফিসারটির উপর হামলা চালায়, থানা ঘেরাও করে। আসানসোলের বড় ধেমো, সেনগুলা, চিত্তরঞ্জন, জামদারিয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রমিক কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী অকথা অত্যাচার চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের

জাভ করেছে, তা কজন শর্মী জানে? শিক্ষাব্যবস্থায় যে আজ সারা হিন্দু-স্থানেই কালো (বা শাদা) টাকার দৌলতে নতুন জাতিভেদের প্রচীর।

তাছাড়া, আরও মূর্খশিল্পের ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল শিক্ষাসম্প্রসারণের পরিকল্পনা রূপায়ণে। বর্তমান যুগে শিক্ষাকে জনারূপে কোটি অর্বদ ফলের মত ফোটানো চাটখানি কথা নয়; শিক্ষায়ত্তনগুলির সাজসরঞ্জাম বিষয়তঃ বিল্ডিং গড়ে তোলায় অনেক ঘিটেল লাগে। কোন গৌরী সেন তার খরচ জোগাবে? পরসাত্তালা শিল্প-বাণিজ্যপতির পোলাপানদের জন্য অভিজাত-স্কুল রয়েছে, দূরে হাত-ছানি দিচ্ছে বিলাত পশ্চিম জার্মানী ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র; নিদেন পক্ষে রুশিয়া। তারা কোন দরুখে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে শোধরাতে যাবে এবং তার জন্য টাকো দেবে? সূত্রান্তর নরাদিল্লীতে টাকার কুমীর শ্রেণী তৎপর হল—তাদের লক্ষ্যমুখ প্রচারণার কয়েকটিতে উদগারই যথেষ্ট। কোতুকের বিষয়, রাজধানীতে যে সমস্ত টাকার খেলোয়াড়, মালিক বশীভূত সম্পাদকরা

সিদ্ধার্থবাবু এরপর “পশ্চিমবঙ্গ বিভাগীয়” বিশেষ মন্ত্রী হওয়ায় সংবিধানের কোনো রবারসলভ অতিনমনীয়তা দেখতে পাননি, তারাই মাত্র কিছুদিন পূর্বে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। এমন একাট নমনা পাঠকদের জন্য দিচ্ছি: শিক্ষা মন্ত্রীর রয়েছে “একগাদা ব্যাপসা ধারণা, এবং কঠিন বাস্তবপ্রেক্ষণার অভাব (A burfeit of vague ideas and absence of hard facts)। সত্যিই তো, যেদেশে চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের শতকরা চার ভগ্নাংশও শিক্ষাখাতে ধরা হয় না, সেদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ দশ কি এগার, কি চোদ্দ বছর হল, তা নিয়ে মাথা ঘামান অবান্তর।

সম্প্রতি শিক্ষার রাষ্ট্রমন্ত্রী নরেন্দ্র হাসান সাহেবকে পাকাভাবে কার্যে করার জন্য রাজ্যসভায় সদস্যপদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনোদিন যদি সিদ্ধার্থবাবু তাঁর আদি পছন্দের মন্ত্রিষ্ণ ফেরৎ পেতে চান, তখন কি তার পূর্বপদের যোগসূত্র খুঁজে পাবেন?

উপর। ধানকাটার মরশুমে আসানসোলের গ্রামাঞ্চলে ভাগচাষী-বণ্ডিত করে জোতদারদের ঘরে জোর করে ধান কেটে ঢুকিয়ে দেবার জন্য এই যুব কংগ্রেসের ঠাংগাড়ে গোষ্ঠী নানা স্থানে “কণ্ট্রাস্ট” প্রথায় কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কল্যাণীতে ধর্মঘট

দশই নভেম্বর কল্যাণী স্পিনিং মিলস্ এমপ্লয়ীজ - ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির যখন সভা চলছিল কল্যাণীস্থ ইউনিয়ন অফিসে, সেই সময় বেলা দশটা নাগাদ কল্যাণীর সি আই এর নেতৃত্বে এক বিরাট সি আর পি বাহিনী নিয়ে ইউনিয়ন অফিস ঘিরে ফেলে এবং ইউনিয়ন অফিস তখনই করে। মিটিং থেকে কার্যকরী কমিটির সদস্য মরারী মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য থাকে যে মরারী মজুমদারের নামে কোন অভিযোগ ছিল না। এবং গ্রেপ্তারের সময় কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও দেখান হয় নি।

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সূত্রান্তর বসন্ত সঙ্গে চার জন দেখা করতে এসে পাশের ঘরে বসে ছিলেন। পলিশ তাদেরও গ্রেপ্তার করে। তাদের নাম—রঞ্জিত দত্ত, রঞ্জিত সাহা, জগদীশ দেবনাথ, অতুল দত্ত। তাদেরও কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখান হয় না।

এই ঘটনার খবর কারখানার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে

সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেন।

কার্যকরী কমিটি পলিশের এই জঘন্য কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসেন এবং এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে কল্যাণী স্টেশনে এসে শেষ হয়।

কল্যাণী কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে সমস্ত কারখানা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়, এবং কল্যাণীর বাসও বন্ধ হয়ে যায়।

চন্দ্রকোণা শহরে গরীবী হঠাৎ নমুনা

তেরোই নভেম্বর, মেদিনীপুরে চন্দ্রকোণা শহরের গাছশীতলা মন্দিরে রক্ততার ধারে কিছু সংখ্যক গরীব লোক কাঠের গুঁড়িতে ছোট দোকান করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। স্থানীয় স্বার্থান্বেষী কিছু ধনী ব্যক্তি দীর্ঘদিন বিরোধিতা করিয়াও এই সকল দোকান তুলিতে না পারায় নব কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করিয়া সশস্ত্র পলিশের সাহায্যে সম্প্রতি গরীব মানুষের অসংখ্যস্থানের আশ্রয়গুলি ভাঙিয়া দেয়। ইন্দিয়া সরকারের গরীবী হঠাৎয়ের এ এক নতুন নমনা। স্থানীয় গরীব মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

বিদেশ দর্পণ

মার্কিনী বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা

(দর্পণের পর্ষদবৈঠক)

মার্কিন সরকার অবশেষে জনসাধারণের দাবীর প্রতি কিছুটা মাথা নত করতে বাধ্য হলেন। এর প্রমাণ সম্প্রতি বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে দেওয়া এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের খাত থেকে সামরিক বিষয় সংক্রান্ত সাহায্যকে বাদ দেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে মার্কিন বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে এমন একটি পর্বতে পৌঁছেছিল যে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের সূচনা দেখা দেয় যার ফলে সরকারী নীতির প্রতি জনমত ক্রমশই বিরূপ হয়ে ওঠে।

সেনেটের নতুন নীতিটিকে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। শব্দ তাই নয়। ফুলরাইট, কেনেডী ইত্যাদি উদারপন্থী সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সেনেটের প্রভাব পরবর্তী যুগে ক্রমশই বেড়ে চলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৈদেশিক সাহায্য হচ্ছে মার্কিন সরকারের অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র যার দ্বারা সে নিজ প্রভাব বজায় রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর-বর্তীকালে, কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রসার এবং বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম গড়ে ওঠার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখলে যদি ধন-তান্ত্রিক বৃহত্তর বিশ্বে জিইয়ে রাখতে হয় তাহলে একমাত্র উপায় অন্তর্গত দেশগুলিতে পুতুল সরকার খাড়া করে প্রচুর অর্থব্যয়ে তাদের টিকিয়ে রাখা। এই নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্গত দেশকে লাগান আমেরিকায়, এশিয়ায় এবং ইউরোপের গ্রীস, স্পেন ইত্যাদি দেশগুলিতে।

এর ফলে মার্কিন অর্থনীতিতে ভাঙন ধরেছে। দেশে বেকার সমস্যা আজ চূড়ান্ত, জিনিষ-পত্রের দাম ক্রমশই বাড়ছে। অপরদিকে যে দেশগুলিতে কমিউনিস্ট রোধ করতে মার্কিন সরকার এত অর্থ-ব্যয় করে চলেছে, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সেইসব দেশে আজ মুক্তি সংগ্রামীদের জয় অবশ্যম্ভাবী

হয়ে উঠেছে। অপরদিকে জাপানের মতন দেশ বা নীকি প্যারোপদরি মার্কিন সাহায্যে নিজের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি গড়ে তুলেছে সে আজ ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। এই সব কারণে মার্কিন জনসাধারণ ক্রমশই সরকারের বৈদেশিক নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল যার চরম প্রকাশ ঘটল সেনেটের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে।

ভবিষ্যতে মার্কিন বৈদেশিক সাহায্য কী ভাবে দেওয়া হবে সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের মতে সরাসরি কোন অন্তর্গত দেশকে সাহায্য না দিয়ে এই টাকা দেওয়া উচিত বিশ্ব ব্যাংক এবং রাষ্ট্রপন্থের অন্যান্য সংস্থাগুলির মাধ্যমে। অবশ্য এই বক্তব্যের রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কে। এর প্রবক্তা মনে করেন যে এর ফলে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রম-বর্ধমান বদনাম যেমন কাটবে (বদনাম হচ্ছে যে মার্কিন সরকারের এই সাহায্য হচ্ছে একমাত্র নিজ স্বার্থ কালেক্ট করার প্রচেষ্টা) তেমনি

বিশ্ব সাহায্যকারী, সংস্থাগুলিকে ক্রমাগত টাকা জরিপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেগুলির উপর নিজ প্রভাব আরও বেশী জোরদার করতে পারবে। এবং এর ফলে এই সংস্থাগুলিকে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের নীতি অন্তর্গত দেশে নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে দায়বদ্ধ থাকতে পারবে। এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যের পরিমাণ শব্দ কমাতে তাই নয় তা দেওয়ার ব্যাপারে ঠিক উপরিউল্লিখিত না হলেও ওই ধরনের কোন কার্যদার পথ বেছে নেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশ : একটি রিপোর্ট :

ঢাকা থেকে সদ্য প্রত্যাপ্ত জৈনিক মার্কিনী সাংবাদিক জানিয়েছেন যে বাংলাদেশের পশ্চিম শতাংশ থানা এলাকা আজ মুক্তি বাহিনীর দখলে। বহু জায়গায় জেলা শাসকরা গোপনে মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করছেন। খোদ ঢাকা শহর সর্বস্বতন্ত্র সঙ্গে সঙ্গেই গেরিলাদের হাতে চলে যায়।

সাংবাদিকটি আরও জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে বর্তমান সংগ্রামের আসল সত্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সহ কর্তৃপক্ষের অন্ত্রাণদের কাছ থেকে

গোপন করে যাচ্ছে। অবশ্য এর একটা কারণ হচ্ছে সেনাবাহিনীর কমান্ডাররাও সাধারণ মানুষের মনোভাব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এদের অবস্থা অনেকটা দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থিত আমেরিকান সৈন্যদের মত। তিনি লিখেছেন যে 'সবটাই পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নে তিনি একটি উত্তরই পেয়েছেন। সেটি হল স্বাধীন বাংলাদেশ।'

পাক সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ক্রমাগত বিপর্যস্ত হয়ে জনসাধারণের উপর তাদের অত্যাচারের মাথাও বাড়িয়ে দিয়েছে। ওই রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে সম্প্রতি সৈন্যরা একটি গ্রাম ঘিরে ফেলে বারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের সমস্ত মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং কিশোর, যুবক মাত্র গুলী করে মারে। অবশ্য যত এই ধরনের অত্যাচার হচ্ছে তত মুক্তি বাহিনীর দলও ভারি হচ্ছে। সাংবাদিকটির মতে যে রাজাকরদের পাকিস্তানী সৈন্যদল বাড়তে সাহায্য করেছে তারাই আজ নিজেদের ক্রমাগত কুকর্মের ফলে ইয়াহিয়া সরকারের সব থেকে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ প্রশ্নে জৈনিক ভারতীয় কূটনীতিকের চিন্তাধারা

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়া দিল্লীর সরকারী লরজ্ ধার করে বলি ওয়ানা অর্থিং ওয়েস্ট এশিয়া নর্থ আফ্রিকার কোন এক জায়গা থেকে লিখা।

অল্প কয়েকজন ভারতীয় যারা আছেন এখানে প্রায় সবাই মর্মান্বিত। আরবরা ভারতবর্ষ থেকে এত সাহায্য পেয়েও ভারতবর্ষের দরকারের সময় শব্দ হাত গুটিয়ে বসে আছে তাই নয় মর্ষের কথা দিয়ে সমর্থন জানাতে পর্বন্ত রাজী নয়। ইসলামাবাদের ইসলামুই ওদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। পাকিস্তান এক সময় মার্কিনী আদেশে আরব জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেছে সেকথা আরবরা যেন ভুলেই গেছে। পূর্ব বাংলায় লাখ লাখ লোক খুন করেছে এবং করছে ইয়াহিয়াতন্ত্রের তাতে কিছু শব্দ আসে না কারণ ওটা নাকি পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার। তাছাড়া মেজরিটি মাইনরিটির কথা আরবরা বঝতে শনতে চায় না, ওরা শব্দ চায়, যেরকম করেই হোক ইসলামিক পাকিস্তান যেরকম ছিল পূর্ব পশ্চিম মিলিয়ে সেরকম যেন থাকে।

আমাদের ক্ষমতা হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছেই ত। আমরা আরবদের হয়ে কথা বলে যাচ্ছি ইজরায়লের বিরুদ্ধে এবং না বললে এখনো ওরা গোসসা করে। যদিও বাংলা দেশের আর পাকিস্তানের কথা তুললেই ওরা কানে আগুল দেয়। শুনছি গত জুলাই মাসে যখন ফকরুদ্দিন

আলি আমেদ কায়রো গিয়েছিলেন তিনি বতাই বলেন তাঁর সফরের উদ্দেশ্য বাংলা দেশ সম্পর্কে আশ্বেচনা করা, ততই ওখানকার কাগজগুলো লেখে ভারত থেকে মন্ত্রী এসেছেন মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা নিয়ে কথা বলতে।

কিন্তু এত হোল আরব্যবাহিনী ওরা ওদের স্বার্থ ভেবে চলে। কূটজ্ঞতা অকূটজ্ঞতা ওসব নিয়ে ভাবলে সব সময় সর্বাধিক হয় না। মানি না মানি, যুক্তিটা বঝি। বঝতে পারি না কি করে কোন ভারতীয় তর্ক করতে পারেন বাংলা দেশের স্বাধীনতার লড়াইকে সাহায্য করলে ভারতবর্ষের লোকসানই বেশী। পাকপাকিভাবে বিদেশ থেকে দেশের কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করছে এরকম কেউ যদি হোত তাহলে ব্যাপারটা গায়ে মাখতাম না। বা জেনারেল কারিয়ারপার মত শিক্ষা দীক্ষা বরস যদি হোত তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু এ যে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের মধ্যপদস্থ এক লোক, হয়ত কয়েক বছর বাদে কোথাও ভারতের অ্যাম্বাসাডর হয়ে আমাদের প্রতি-নিষিদ্ধ করবেন। তবে একটা কথা পরিস্কার করে রাখি তর্ক এই ভদ্রলোক ঘরোয়া বৈঠকেই করেন এবং যতদূর জানি ভারতীয়দেরই সঙ্গে অন্ততঃ এখনো পর্বন্ত।

গত এপ্রিল মে মাস। পূর্ব-বঙ্গে পাকিস্তানী তাণ্ডবের সংবাদে ভারতীয়রা সবাই বিচলিত এখানে। অনেকই আশা করছেন নয়া দিল্লী

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন এবং শিগিরেই পূর্ববঙ্গ থেকে পাকিস্তানের নাম চিরকালের জন্য মুছে যাবে। এম সময় খবর এলো জয়প্রকাশ নারায়ণ কার্জো হয়ে ইরোরোপ আমেরিকার দিকে গেছেন এবং বলে গেছেন বাংলা দেশকে স্বাধীন করার সুবর্ণ সুযোগ ভারত সরকার নষ্ট করেছে। আমাদের ভারতীয় কূটনৈতিক কর্মচারীটি তখন বোঝাতে চেষ্টা করলেন অনেককে : ইন্দিরা সরকার পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাশ করিয়েছেন বাংলা দেশকে পুরো সিমপ্যাথি আর সাপোর্ট জানিয়ে, তার বেশী আর কি চাই? চাওয়া উচিত নয় কারণ বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে টিকতে পারবে না, ভারতের এক গলগল হয়ে দাঁড়াবে এবং সাহায্য দিতে দিতে ভারত নিজেই ফতুর হয়ে যাবে। 'কাপারটা নাকি হয়ে উঠবে আমাদের পক্ষে এক ওপেন-এন্ডেড কমিটমেন্ট। কোন স্বাধীন বাংলা দেশ সরকার রেকর্গনাইস করার কথা ত ওঠেই না ওপেনহাইম টাইম অনেক বিস্মান বিস্মান সাহেব স্বর্গে হোঁচট খাবেন।

মাস দুয়েক পরে বিশেষ গোপনীয় তথ্যাদি (আরো বেশী গোপনীয় সূত্রে) পেয়ে তিনি আরো জোরদার তর্ক জুড়লেন। আমরা যারা মুক্তিবাহিনীকে পর্যাপ্ত সামরিক সাহায্য দেওয়ার কথা বলি তারা কিছদ বঝি ত নাই জানিও

না। ভারত সরকার ত গোলাগুলি দিচ্ছিলই যথেষ্ট, এখন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট এসেছে দিল্লীতে সে সবের একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে মা-ওইস্টদের হাতে। আরো সাহায্য পাঠালে বাংলাদেশ চীনা-গম্ভী নকশালীদের খপ্পরে পড়বে অবধারিত! তার ওপরে বিপদ সে সব বোমা বন্দুক সীমান্ত পার হয়ে শিগিরেই পশ্চিম বাংলার ঢুকবে এবং তারপর বাঙালীদের ত জানেনই এপার বাংলা ওপার বাংলা একপার হয়ে এক জড়জড় কান্ড বাঁধবে, ভারতের অখণ্ডতা বাঁচিয়ে বাখাই হয়ে পড়বে এক বিরাট সমস্যা।

(ভদ্রলোক উত্তরাবর্তের কোন একটি প্রদেশের। যখনই আমার সঙ্গে আলোচনা হয় তখনই মনে করিয়ে দেন যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আমরা বাঙালী সন্তা একটু উবেল হয়ে উঠবেই এবং তাঁর ভারতীয় চিন্তাধারা আমার পক্ষে অন্তর্ধান করা একটু শব্দ হতে পারে তিনি বঝতে পারেন)।

আরো মাস দুই তিন পরে এই ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটের যেন কি হোল, হঠাৎ কবল করলেন প্রেজ্-ডিস হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক তিনি আগে বিশ্বাস করতে পারেন নি বাঙালীরা লড়াই করতে চায় বা পারে। এখন তিনি বুঝেছেন তারা পারে এবং পারবে সত্তরাং ভারত সরকার ঠিক করে ফেলেছেন (আবার গোপন সূত্রে খবর এসেছে) বোল আনা মদদ

দেওয়া হবে বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধে। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স এয়ার কন্ডার দেবে মুক্তি বাহিনীকে এবং নৌভি ব্লকেড করবে বঙ্গোপসাগর, যেন পাকিস্তানী সৈন্যসামন্ত রসদ ইত্যাদি সমুদ্রপথে না আসতে পারে। সবটাই গপ্পো এবং অসত্য ইঙ্গিত করতেই ভদ্র-জৈনিক দৃ বোতল হুইস্কি বাজী রেখে ফেললেন পর্বন্ত।

কর্তমান পর্বে বাজী তিনি হেরেছেন এবং স্বীকার করেছেন কারণ মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে অস্ত্রবরের শেষে (যেতল দৃটির খোঁজ নিই নি কারণ এ বাজীটা আমার সঙ্গে ছিল না)। এবং এখন তিনি আবার তাজা টপ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পেয়েছেন। আওয়ামী লীগ আর বাংলা দেশ রিপ্রেজেন্ট করছে দাবী করতে পারে না কারণ ওখানে ভয়ানক খেয়ো-খোয় আরম্ভ হয়ে গেছে। সত্তরাং ভারতের সক্রিয় সাহায্য পেতে পারে এমন কোন দল আর বাংলা দেশে নেই।

এসব কথা শুনতে শুনতে ভাবি এই ভদ্রলোক ত আমাদের নিজেদের মধ্যেই তার বাকস্বাধীনতা চর্চা করছেন। সেদিন থেকে আপত্তি করতে পারি না। কিন্তু এই যদি তার চিন্তাধারা হয় তাহলে কার্যকালে তিনি বাংলা দেশের জন্য এবং দেশের জন্য কি কিছু করবেন? পশ্চিম এশিয়ার কোন এক জায়গায় আমারই দেশের (শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়)

ভরত দর্পণ

প্রধানমন্ত্রী আবার প্রায় শূন্য হাতে ফিরে এলেন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

প্রধানমন্ত্রী ইউরোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণ করে দেশে ফিরে এসেছেন। “বাংলাদেশের” সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানই একমাত্র পথ এবং সেই রাজনৈতিক সমাধান পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করেই করতে হবে, একথা ইউরোপ, আমেরিকার রাষ্ট্র-ধুরন্ধররা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দিয়েছেন।

পাকিস্তানের বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশের সমস্যা আসলে পাক-ভারত রাজনৈতিক সমস্যা। সুতরাং বাংলাদেশ, কাশ্মীর, খালের জল, ফরাঙ্গা বাঁধ, উভয় দেশের সবকয়টা বর্তমান সমস্যা নিয়ে উভয় রাষ্ট্রকে বসে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজন হলে জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষকদের সহায়তা নিয়ে সীমান্ত সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনাকে দূর করতে হবে।

বলা বাহুল্য, আপাতঃ-দৃষ্টিতে নির্দোষ মনে হলেও, এর আড়ালে পাকিস্তানের একটা গুঢ় কূটনৈতিক অভিপ্রায় নিহিত রয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম আসলে তরত সরকার পরিচালিত এরকম একটা আত্মসমীক্ষণ প্রমাণিত করার মতলব থেকেই পাকিস্তান এই সমস্যা পাক-ভারত বৈপাক্ষিক আলোচনার বিষয়বস্তু করতে চেয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সম্পাদক উ থল্টও অবিলম্বে পাক-ভারত সীমান্তের উভয় দিকে দেড়শ জাতিপুঞ্জ পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করেছিলেন। অর্থাৎ জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে পাকিস্তানের মরদুশ্বীরা ভারতের উপরে হস্তক্ষেপের পাক-অভিযোগটি চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই পাক-মরদুশ্বীদের কাছে ভারতের বক্তব্য বিশদ করে বলাই প্রধানমন্ত্রীর ইউরোপ, আমেরিকা সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

পালাম বিমান বন্দরে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে যা বলেছেন তাতে বোঝা যায় যে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে পুরোপুরি সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। বৃটেন ও আমেরিকা অবিলম্বে পাক-ভারত বৈপাক্ষিক আলোচনার পক্ষপাতী, তবে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী তার

আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার ও বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার সুত্রপাত হওয়া দরকার বলে মনে করছেন। এর জন্যে সর্বাগ্রে মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেবার জন্যে এই দুটি দেশ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সরকারী ভাবে অনুরোধ করতে সম্মত হয়েছেন।

এদিকে ভারতে বাংলাদেশ সমস্যার একটা আশু সমাধান সম্পর্কে লোকের মনে আশা সৃষ্টি করা হয়েছে। বিমানাক্রমণ ও নিষ্প্রদীপের মহড়া, সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ, এলাকায় এলাকায় সাম্য আইন জারী করে সরকারী মহল দেশে একটা জরুরী অবস্থা দেখা দিয়েছে, এমন ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এই সন্ধিক্ষণে যে শূন্য হাতে ফিরে এসেছেন একথা গোপন করার প্রচেষ্টায় সরকারী মহল এবং আধা-সরকারী মুখপত্রগুলি তরস্বরে চাঁৎকার শুরু করেছেন।

অথচ রাজনৈতিক সমাধানের প্রধান সূত্র শেখ মুজিবুর মুক্তিদান ও তাঁর সঙ্গে মীমাংসা আলোচনা আরম্ভ করতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। সপ্তাহ-দশদিনের জন্যে একটা বড় ধরনের সীমান্ত সংঘর্ষ যদি বেঁধে যায় তাহলে এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে পাক-ভারত উভয় সরকারই আপাততঃ পরিচালিত পেতে পারেন। তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমস্যা পাক-ভারত সমস্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থল্ট জাতিপুঞ্জ পর্যবেক্ষক নিয়োগের যে প্রস্তাব করেছিলেন অবশেষে তাই কার্যকরী করতে বাধ্য হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

তবু এই যুদ্ধের আবহাওয়া উভয় দেশের সরকারকে সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে কারণ উভয় দেশই এখন আভ্যন্তরীণ সংকটে জর্জরিত।

কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ক্রমশঃ দরবার হয়ে উঠছে অন্যদিকে পাক-ভারত সংঘর্ষের সম্ভাবনার দরুন ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকেই মুখোমুখি সৈন্য সমাবেশ করতে হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সক্রিয় হস্তক্ষেপের জোর কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মস্ত এলাকা বাড়িয়ে চলতে পারছেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঐ মুক্তি সংগ্রামীরা একবাক্যে যে কোন রাজনৈতিক সমাধানের বিরোধী। পাকিস্তানের মধ্যে থেকে কোন রাজনৈতিক সমাধানের কথা

তাঁরা চিন্তা করেই পারছেন না। শত্রু বামপন্থীদের প্রভাবিত অণু-জোঁ বিরোধিতা সীমাবদ্ধ তা নয়, আওয়ামী লীগের পরিচালিত ই বি আর, ই পি আর ও অন্যান্য অনিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও পাকিস্তানের মধ্যে থেকে বাংলা-দেশের অধিকতর স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা নিশ্চিত করে রাজনৈতিক সমাধানের যে কোন প্রচেষ্টা তাঁর বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। এখন প্রায় সকল বাঙালীর সম্মিলিত দাবী : স্বায়ত্তশাসনের ধোঁকা নয়, পূর্ণ সার্বভৌম স্বাধীনতা চাই!

বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করলে, ভারত-পাক উপমহাদেশে রাজনৈতিক ভারসাম্য যে পরিবর্তন হবে, তা ভারত সরকারের মনঃপূত নয়। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার উপর এর জোর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। সুতরাং বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া কেউই চায় না যে বর্তমান

ভারসাম্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হোক।

অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কারণে ভারত সরকার বাংলা দেশের সার্বভৌম স্বাধীনতা চান না, আর রাজনৈতিক স্থিতিাবস্থার পক্ষপাতী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিও নিজ নিজ পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য সাধনের জন্যে বাংলা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক নয়।

সুতরাং কার্যতঃ ভারত সরকারের সঙ্গে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্যের কোন তফাত নেই। তফাত শত্রু সমাধানের আকৃতি নিয়ে প্রকৃতি নিয়ে নয়।

বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকরী সদস্যরা কোন সদস্য রাষ্ট্রের অগ্রহানির বিরোধী—যদিও প্রত্যেকেরই এর জন্যে আলাদা আলাদা কারণ রয়েছে। ভারত সরকার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির নিরা-

পত্তার কারণে এবং আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার লক্ষ্য সাধনের জন্যে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলা দেশের অভ্যুত্থানের বিরোধী।

বৃহৎ শক্তিবর্গ চান বাংলা দেশের নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের মধ্যে দুই বা ততোধিক স্বায়ত্ত শাসিত অঙ্গরাজ্যের ফেডারেশন গড়ে উঠুক কিন্তু পাকিস্তানী ফেডারেশনের শক্তি কেন্দ্র যেন পশ্চিম পাকিস্তানেই বজায় থাকে। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করার ফলেই জেনারেল ইয়াহিয়া মজিবুর রহমান ছাড়া অন্যান্য বাঙালী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মীমাংসা করবার পক্ষপাতী। কিন্তু মজিবুর রহমান বা তাঁর আওয়ামী লীগের সঙ্গে নয়।

অন্যদিকে রাজনৈতিক সমাধান বলতে ভারত সরকার চান শেখ (শেখাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

প্রতিটি পদক্ষেপ আনন্দের... বাটা সিতারা

হালকা আর হাওয়া
খেলানো... বাটার এই স্যান্ডাল
পায়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই
এক আশ্চর্য পরিভ্রমণ।
বাটা সিতারা ছিমছিম ও
কোমল গড়ন দেখে বোঝা
যায়, এদের নির্মাণ ও
নকশার প্রধান লক্ষ্য :
সারাদিনের স্নিগ্ধ আরাম।
লাবণ্যময় সিতারা সব
সাজেই মানানসই। এখানে
তারই কয়েকটি নকশা
যেগুলি এখন বাটার দোকানে
পাওয়া যাচ্ছে। আজই
আসুন পছন্দমতো
একজোড়া বেছে নিন।



সিতারা
সাইজ ২-৭
৪.৯৫, ১.৯৫,
১২.৯৫

Bata

অর্থনৈতিক দর্পণ

কালো টাকার জন্ম ও বেড়ে ওঠার কাহিনী

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

কালো টাকা বা ব্ল্যাক ম্যান এখন আমাদের দেশের অর্থনীতিতে একটাই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এমন কি আমাদের আর্থিক সাধারণ কল্যাণমূলক পরি-কল্পনাগুলিও কালো টাকার প্রচণ্ড দাপটে বাড়ে বাড়ে ভেঙে পড়েছে। অন্যান্য অবৈধ উপায়ে উপার্জিত টাকা বন্ডেই সাধারণভাবে সদৃশ্যে উপার্জিত টাকার সঙ্গে প্রভেদ বোঝাবার জন্যেই কালোটাকা বলে এই অসদৃশ্যে অর্জিত অর্থকে বোঝানো হয়।

পঞ্চাশের দশকে গান্ধী স্মারক-নিধিতে সদার প্যাটেলের অনু-রোধে কয়েক লক্ষ টাকা দান করে-করেছিলেন বিশিষ্ট একচেটিয়া মালিক রামকৃষ্ণ ডালমিয়া। পরবর্তী কালে ভারত সরকারের বৈষয়িক নীতির সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয় এবং সম্ভবতঃ পণ্ডিত নেহরু পুরস্কার ইতিপূর্বে তাঁকে চোরাকার-বারী শিল্পপতি বলে কোথাও উল্লেখ করেন। এতে রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে শেঠ ডালমিয়া প্রকাশ্য বিবৃ-তিতে বলেন টাকার আবার কালোই কি সাদাই কি। গান্ধী স্মারক নিধিতে তার টাকা নেবার বেলা তো টাকাটা কালো না সাদা একথা কংগ্রেসী কতারা জিজ্ঞেসও করেন নি।

সদার প্যাটেল অপ্রস্তুত হয়ে আঁকে তার দেওয়া চাঁদার টাকা ফেরত দেবার কথাও তুলেছিলেন। কংগ্রেস নেতারা তাঁর উপর এমন নারাজ হয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত ভারত ইন্সটিটিউটের টাকা আত্ম-সাতের মামলার তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছিল, যদিও সমস্ত আরাম-রীলাসের বন্দোবস্ত জেলেও তাঁকে ভোগ করতে দেওয়া হয়েছিল।

ভারত দর্পণ

(নবম পৃষ্ঠার পর)

মুজিবুর রহমান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হউক। তাহলে পাক ভারত সম্পর্ক বৈরি-তার বদলে মৈত্রীর ভিত্তিতে রচিত হবে। অশান্তির অবসান ঘটবে।

রাজনৈতিক সমাধানের মৌল বিষয়বস্তু নিয়ে ভারত সরকার ও বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে বিরোধ নেই। পাকিস্তানকে একটী রাষ্ট্র হিসাবেই বজায় রাখতে হবে এ নিয়েও মত-ভেদ নেই।

কিন্তু বাংলা দেশের স্বাধীনতা সঙ্গ্রামীরা এ সব হিসাবের অংক পালটে দিতে পারেন। কারণ তাঁরা অস্বাভাব্যে সম্মত না হলে পৃথিবীর কোন শক্তিই বাংলাদেশের স্বাধী-নতার সম্ভাবনাকে ধ্বংস করতে পারবে না।

তবে ডালমিয়াজীর ভারত ইন্স-টিটিউটের টাকা আত্মসাতের বেলায় কংগ্রেসী বড় কতারা যতটা সক্রিয় হয়েছিলেন, বিড়লাজীর এশিয়া-টিক ও রুবি জেনারেল ইন্সটিটিউট অথবা হিন্দ মোটরসের ব্যাপারে অথবা টাটজীর সামরিক গাড়ী সরবরাহের বেলা তাঁরা যেন ঠিক তদনুপাতেই চোখ বন্ধ করেছিলেন।

কালো টাকা উপার্জন করার বহুবিধ কায়দা আছে। তার মধ্যে এক এক সময়ে একেকটা প্রধান। উপার্জনের ক্ষেত্র হিসাবেও কায়দা বদল হয়। পরিমাণ ও ধরণধারণ হিসেবেও হয়।

অনেকদুর্ভাগ্য থেকে শুরুর করসে বস্ত্য বড় হয়ে যাবে, তবু একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যাক। আবি-সিনিয়া বন্ধে বৃটিশ সেনাদলের রসদ সরবরাহের কল্যাণের হিসাবে টাটা হাউসের আদি পুরুষ নও-শেরঞ্জী টাটা (জামশেদজী টাটার পিতা) সেনাবাহিনীকে কাসকেট সরবরাহ করার নামে টিনের কানে-স্তারা সরবরাহ করে তখনকার দিনে অতিরিক্ত চল্লিশ লক্ষ টাকা (তখন টাকায় একমণ সরেশ চাল পাওয়া যেত) মনোফা কামিয়ে-ছিলেন এবং এই টাকাই টাটাজীদের আদি মূলধন।

যুদ্ধের সময় হিসাবের আদি-অন্ত থাকে না। রাস্তার ম্যাপ সেতু-দেখানো হয়, তা ভেঙ্গে গেছে দেখানো হয় এবং তা পুনর্নির্মাণের খরচও মজুর হয়। অথচ কোনদিনই হয়ত সেতুর অস্তিত্ব ছিল না। যুদ্ধের সময় সেতু ভাঙা দলের লোকেরাই শান্তির সময়ে বেলের ওয়ানগন ভাঙা শিল্পটাকে নিখুঁত করে তুলে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় অজস্র টাকা ছাণিয়ে, দাম চড়িয়ে বৃটিশ সরকার এদেশে দারিদ্র্যের সৃষ্টি করেছে, লক্ষ লক্ষ লোক বিনা খদ্যে দারিদ্র্যে অনশনে রাস্তায় রাস্তায় মরেছে। ঠিক ঐ সময়ে, বিড়লা, ইম্পাহানী, টাটা, ডালমিয়ারা (এমন কি আমাদের পরম জাতী-য়তাবাদী আনন্দবাজার পত্রিকার মালিকেরাও) চাল, ডাল, কাপড় ওষুধের চোরাকারবারে কোটী কোটী টাকা কামিয়ে নিয়েছে। বে-আইনীভাবে টাকা কামিয়ে তো আর সরকারীভাবে হিসেব রাখা সম্ভব হয় না। তাই এদেশে ব্যাঙ্ক কাঙ্কে কালোটাকার বেনামী হিসাব খোলা হল। ব্যাঙ্কের মালিক আবার এই মহাপ্রভুরাই। তারা নিজেদের কালো টাকা ব্যাঙ্কের মারফতে ধার নিয়ে নিজেদেরই সদ গর্বে দিলেন।

পঞ্চাশের দশকে প্রথম দিকে এভাবেই অর্জিত কালো টাকা ডিসপেনজারের মালে, চড়া দামে বৃটিশ ও অন্যান্য বিদেশী কোম্পা-নীর শেয়ার-মালিকানা কাজে

লেগেছিল। এভাবে বড় বড় চোরা-কারবারী বড় বড় শিল্পপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। তারা শুরুর চট-কল, চা বাগান, প্রভৃতি রপ্তানী শিল্পেই শুরুর হাত বাড়াল। তা নয়, তারা অনেকগুলি ছোট ছোট কাঙ্কে ফেল পড়িয়ে অনেক মধ্য-বিত্ত আমানতকারীকে সর্বস্বান্ত করে গোটা কয়েক বড় বড় ব্যাঙ্কের মালিকানাও হাতিয়ে নিল। যেমন টাটাজীদের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বিড়লাদের ইউনাই-টেড কমার্শিয়াল ও ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ডালমিয়া জৈনদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, করমচাঁদ থাপারদের ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স ইত্যাদি।

কাঙ্কগুলিতে বহুজাতিকের হিসাব থাকে। আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে যারা কবসা করেন তাদের মালের দর, ভোলভারীর সময়, উৎপাদন খরচ, মানে গোটা ব্যব-সার সব জাতক বিষয় ব্যাঙ্ক জানতে পারে। সুতরাং ব্যাঙ্কের মালি-করাও জানতে পারে। ফলে উদ্যোগী ছোট ছোট আমদানী-রপ্তানী কবসারী, শিল্পপতিরাও এই ব্যাঙ্ক মালিক শিল্পপতিদের অসহায় শিকারে পরিণত হন। শেষ পর্যন্ত এরাও সর্বস্বান্ত হয়ে যান এবং তুসনায় কালো টাকার মোটা মালিকদের আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এরা আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে প্রবল হয়ে উঠে। এরা বিদেশে কোম্পানী রেজিস্ট্রি করে। অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে বিড়লাদের ইন্টার-এজেন্সিজ ইনকর্পোরেটেড নিউ-ইয়র্ক এবং ইন্টার এজেন্সিজ লিঃ লন্ডন—এদুটী প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা যায়। সরু হাল রপ্তানী জিনিষের দাম কামিয়ে দেখানো এবং আমদানী জিনিষের দাম ফাঁপিয়ে দেখানো। যেমন ধরুন বিড়লা জুট কোম্পানী আমেরিকা ও বৃটেনে চট বিক্রী করছে। এদেশে চটের দাম ধরুন টন প্রতি তিনশো ডলার বা তখনকার হিসাবে দেড় হাজার টাকা। কিন্তু বিড়লা জুট ইন্টার-এজেন্সিকে (এটা মার্কিন দেশে রেজিস্ট্রীকৃত বলে মার্কিন কোম্পানী) একশো ডলার দামে চট বিক্রী করল, ফলে ব্যাঙ্কের মারফতে প্রকাশ্যে এল পাঁচশ টাকা আদায় ইন্টার এজেন্সি নিউইয়র্কে চট বিক্রী করল তিনশ ডলারে এবং দশ ডলার মার্কিন ব্যাঙ্কে জমা রাখল। আমাদের দেশের পাওনা দশ ডলার এদেশে এসে না, মার্কিন দেশে আপাততঃ থেকে গেল। তার-পর এদেশের কোন শিল্পপতি বিদেশে গেলে অথবা কোন জিনিষ আমদানী করতে চাইলে অতিরিক্ত সেলামী দিয়ে অথবা অতিরিক্ত বেশী

দাম দেখিয়ে ঐ দশ ডলার টাকার রূপ ধরে এদেশে ফিরে এল। এদেশে এসে হয়ে গেলে হিসাবের বাইরের কালো টাকা।

ষাটের দশকে এই কালো টাকার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে মূল্য বৃদ্ধির মারফত। বেবীফুডে স্টক জমাও, ওষুধের স্টক কর, চাহিদা বেড়ে গেলে উৎপাদন খরচ না বেড়েও দাম বেড়ে যায়। ফলে, নয় টাকার বেবীফুড চোন্দটাকা হয়। অতিরিক্ত কালো টাকা প্রতি পাঁচ টাকা করে চোরা-কারবারীদের হাতে জমে। টাকাটার কোন ভাগই ছোট দোকানদার বা শিল্পপতির ভাগে আসে না, সব-টাই বড় বড় মালিকদের পকেটে গিয়ে ঢোকে।

এখন আমাদের দেশে প্রচলিত নোটের পরিমাণ চার হাজার কোটী টাকার কিছু বেশী। আমাদের দেশের মোট জাতীয় আয় বা উৎ-পাদনের মূল্য বৃদ্ধি হাজার কোটী টাকা (উনিশশ সত্তর সালে) আর কালো টাকার পরিমাণ ছয় থেকে আট হাজার কোটী টাকা—দশ হাজার কোটীও হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ আমাদের বৈধ অর্থ-নীতির পাশাপাশি একটা অবৈধ আন্ডার গ্রাউন্ড অর্থনীতি রয়েছে।

কালো টাকার পরিমাণ সম্পর্কে একটা হিসাব দিচ্ছি, পঠকেরা বাকীটা আন্দাজ করে নেবেন। পার্সোমেণ্টে প্রশ্নান্তরে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বলে-ছিলেন যে বিদেশী মদ্রার কড়া-কড়ি পনেরো বছর আগে যখন শুরুর হয় তখন গড়ে প্রতিবছর কম-পক্ষে একশ কোটী টাকা করে বিদেশী মদ্রা অবৈধ উপায়ে পাচার হতে থাকে। তাহলে তার স্বীকৃতি মতই পনেরো বছরে দেড় হাজার কোটী কালো টাকা এসব চোরা-কারবারীদের হাতে জমেছে। এছাড়া ইনকামট্যাক্স, উৎপাদন শুল্ক, সম্পদ-কর ইত্যাদি বাবদ ফাঁকি বছরে দশশো কোটী টাকা ধরলেও পনেরো বছরে আরো আড়াই হাজার কোটী টাকা ওদের হাতে জমেছে। সাম্প্রতিক একটী সমীক্ষাতে বঙ্গা হয়েছে যে উনিশশ সত্তর সালে মোট উৎপাদন-মূল্য বৃদ্ধি হাজার কোটী টাকার মধ্যে অন্ততঃ আটশো কোটী টাকা কালো টাকায় রূপান্তরিত হয়েছে। আরো কম করে ধরলেও আগেকার বছরগুলিতে জাতীয় আয়ের যে অন্তিমাত কালো টাকায় রূপান্তরিত হয়েছে তা বছরে দশশো থেকে তিনশো কোটী টাকার কম নয়, অর্থাৎ দাম বাড়িয়ে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করে আরো আড়াই হাজার থেকে চার হাজার কোটী টাকা চোরাকারবারীদের গোপন মজুরে চলে গেছে।

সুতরাং কমপক্ষেও ছয় থেকে আট হাজার কোটী কালো টাকা আমাদের অর্থনীতির অভ্যন্তরে বিষাক্ত বাসা বেঁধেছে।

এই কালো টাকার পরিমাণ আমাদের প্রকাশ্য শিল্পকবসারে ব্যক্তিগত লক্ষ্যের চেয়েও বেশী। আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ধারা এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে, অর্থ-

নৈতিক পরিকল্পনার নির্ধারিত পথ অনুসরণে এই কালো টাকা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের অর্থনৈতিক চিত্র সম্পূর্ণভাবে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিহীন হয়ে পড়েছে।

কার্যতঃ এই বিষাক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশ আমাদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনকেও ক্রমশঃ দারিদ্র্য করে তুলছে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনও যখন সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকে তখন বহুল পরিমাণে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণ করার কোঁক দেখা যায়। কারণ কোন এক পুঁজি-পাতিকে বা পুঁজিপতি গোষ্ঠিকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহ বিতরণ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রতিযো-গিতা থেকেই পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিয়ম প্রতিযোগিতার সব সুযোগ সুবিধা ধ্বংস করে এবং একচেটিয়া পুঁজি মালিক গোষ্ঠির হাতে আর্থিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে।

একচেটিয়া পুঁজির আমলে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও অমঙ্গতান্ত্রিক পরিচালনা কালো টাকা উপার্জনের অসীম সুযোগ এনে দেয়। এই কালো টাকা যখন প্রকাশ্য লক্ষ্যের চেয়েও বেশী হয়ে যায় তখন মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, চোরা-কারবারের বিরুদ্ধে, মজুরী বৃদ্ধির পক্ষে, গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা অনু-সরণের পক্ষে কোন গণ-আন্দোলন-কেই এই শাসকশ্রেণী সহ্য করে না।

তখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় রূপেরও অন্তর্বস্তুর অপসারণ ঘটে। বাইরে গণতান্ত্রিক কাঠামো খানিকটা বজায় রাখলেও চোরা-কারবারী, কালো টাকার একচেটিয়া মালিকেরা সমস্ত গণতান্ত্রিক দাবীদাওয়াকে নিবাতন নিপীড়নের বন্যার ডুবিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়।

আমাদের দেশে বর্তমানে সেই লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রায় প্রতি রাজ্যে কেন্দ্রীয় হস্ত-ক্ষেপ, সামান্যতম নাগরিক স্বাধী-নতাও পদলিখ-মিলিটারী সি আর পি দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করার ঔপনিবেশিক মনোভাব, আধা ফ্যাসিস্ট গন্ডুবাহিনী দিয়ে পদলিখ বাহিনীর সাহায্যে জনসাধারণকে প্রচণ্ড দমনপীড়ন এ সব কিছুই অর্থনৈতিক ভিত্তি একচেটিয়া পুঁজি মালিক ও কালো টাকার কারবারীদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য। এই প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যেই তাদের শ্রেণী সরকার ইন্দিরা কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার এই আধা ফ্যাসিস্ট কায়দা গ্রহণ করছে। সমস্ত অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার লড়াই আজ তাই রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগ্রামে পর্ববাসিত হচ্ছে।

শিল্প প্রদর্শনী

কমলকুমার মজুমদার

এইসব তত্ত্ব লিখি নাই; কারণ অধ্যক্ষ আর্টের কিছু জানে না। অথচ ইংলশ্বে ছিল কারণ ভাস্কর্য-গদলি কোন লেভেলে রাখা উচিত তাহাতে পৰ্বন্ত তাহার জ্ঞান নাই। এই দৈনিকের মধ্য বিভাগীয় কর্তা আমাকে ভৎসনা চেষ্টা করিয়াছিল, সুবিধা হয় নাই; আশ্চর্য কপাল মানিতে হয়।

আমাদের দেশে আর্ট কেন কোন সমালোচনার প্রয়োজন আছে কি না, এ বিষয়ে ভাবিবার আছে; যদি উচিত কথা বলিতে হয়, গড়-পড়তা এমন খাটে কাজ হইতেছে যে বলিবার কিছু নাই; (উল্লেখ্য, এক আদজন এখানে দরুণ উচ্চাঙ্গে আর বাদে সকলেই তিন চার ফ্রম ব্যতীত আদত ফ্রেম বাদে, মানে কালো ম্বারা এখনও ছবি আরোপ করিতে পারে, ছবি না মিনিরেচার) অথচ খুব অবাক হইতেই হয় যখন সাহেব সুরাবাদি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে মানে যারা এম এ, বি এ পাশ, পদ্য কথো রাজনীতির খবর রাখে, তাহাদের মধ্যে অনেক নাম-ঢল মানে মানে সেজান আনিলেন, দে দস্ত চোখুরী বিনা পরিগ্রমে আর্ট শিখিল, চাঁদা করিয়া রজার ফাই কিনিল। কিন্তু নামেই বদা যায়, সুরাবাদি সাহেব মোছরমান বলিয়া উহার নাম পৰ্বন্ত কেহ করে না। ইহা পৃথ্বীশ নিয়োগীর নিকট শুনিয়াছি আরও যে বাক বেৎওফেন (কোন অপেরা নয়) সেজান পিকাশো সম্পর্কে অবহিত করা করা এক কথার নব্য আধুনিক করায় এই কস্তিরা আর্ট ব্যাপারে একজনের ভূগোল বৃত্তান্ত লিখা ছাড়া কেহই অন্যতে উৎসাহ করিল না।

আমাদের দেশে দুইটি ভাগ আছে, একটি হিন্দু মেলা ও ভন্দী নিবেদিতা উৎসাহিত আর্ট এবং ওকাকুরা আসিলেন। তখনকার শিল্পীরা শুনিয়াছিলেন, ইউরোপ খণ্ডে জাপানী আভাস বড় কাজে লাগিয়াছে (অবশ্য চিনেমারটির বাসনে বহুদিন আগে হইতে চীন ছক প্রভাব বিস্তার করে।) এখানেও সেই পৃথ্বীতি কাজে লাগিল, ইউরোপ জাপানী ভাব ইউরোপীয় হয়, কেননা তেলরঙ ক্যানভাস; তাহার সাইজ হোকুসাই এর আভাস (এফেক্ট) প্রেরণা হইল। এখানে, স্বদেশীয় যুগ অনেক ক্যানভাস রঙ আদি পরিচিত হইলেও, সোজা নকলে আসিলেন, [১৯১০ সালে প্যারিসে যে একজবিবসন হয় তাহার সমালোচনা, যে বইটিতে বাহির হয়, তাহা প্রাণকৃষ্ণ পাসের নিকট আছে (আশুতোষ মিউজিয়াম)] তখন যদি ছবির সাইজ বর্ধিত করা হইত তাহাতে কোন ফল হইত না। কেননা স্যামার তারতম্য ঘটিল না পুরাতন রঙ্গপদ্যত কাণ্ডাতে যে রঙে ব্যবহার দেখি এখানে অশ্রুত-ম্যাদটে, একমাত্র আকাশ এখানে,

তাহাও সম্ভার, বেশ সুন্দর। তাই, ভাব ব্যঞ্জক হইল যখনই জাপানী প্রথা তথা জল-খোয়া, তখনই সাদা-মিশ্র এতই বাজে হইয়াছে তাহা পোষ্টার রকমের। অথচ 'রূপভেদ প্রমাণে ভাব জাবণ্য' যোজনম সবই আলোচনা করিতেন। বাংলা-ধারা একমাত্র সুনয়নী দেবীর আঁকাতে প্রতিভাত হইল, কিন্তু বাংলার মনোভাব অম্বদা বাগচির ছবি দর্শনে ঠাকুর যেমন বলিয়া-ছিলেন যে দেখেছে সে একেছে "তাহা নাই"। অন্য দিকে গগন ঠাকুর নিজে একা, তাহার "নীলচালে মহাপ্রভু" একটি পোষ্ট কার্ডে আঁকা, এবং কালো-সাদা খুব কাব্য-ময়, অবনীবাবুর পাস্তেলে আঁকা চণ্ডী সিরিজ আমাদের মৃদু করে।

এই ধারা শেষ হইল (!); ইহার পর দেখা যায়, ফরাসী ধারা উদ্ভূত করিল। ইহাতেই আমরা

এখনও আছি; পূর্বে বলিয়াছি, বলিতে গেলে এখানে মাত্র একজনই বিশিষ্ট—তাহার পর সবই কমা-শিলাল পর্ষায়; সামান্য ক্রাফটম্যান-শিপ হতে আসে নাই—রঙ বিবেচনা, ট্রান্সপেরেন্সি বোধ, কেন্দ্রী-করণ, বহু দূরের কথা।

কমলা ঘোষ মহাশয়ের প্রদর্শনী দেখিলাম, ইহা ফাইন আর্টস ভবনে হয়। ষোলখানি ফ্রিম ছিল। কিছু তেলরঙ এবং কিছু অন্য মিডিয়ামের কাজ; আমরা তেলরঙের কথা বাহির; পাঁচশ চিত্রে, বম দিকের উপরের কোণে অনেকটা চিমনী (গৃহস্থ বাড়ীর) যেখানে সেখানে আলো বিস্তার, খেলিয়াছে—এখানে হলদেটে রঙ আছে, থাকিবেই, হলদে না থাকিয়া এই তর-তম্য ঘটাইলে ঐ একই এফেক্ট হইত। এই হৃদয়কে অন্যত্র বর্ধিত-সম্মত ভাবে, ব্যবহার হয় নাই সেখানে প্যাটার্ন হইয়াছে, যে পরিচ্ছন্নতা বোধ, তাহাব অন্য মিডিয়ামে আছে, এখানে তাহার অভাব দেখা যায়। এক নং চিত্রে, অবশ্য কিছু অন্যরূপ, জায়গা ছাড়কে

এখানে পরিচ্ছন্নতা বলিয়া গণ্য করিতে হয়, সব থেকে আমাদের চোখে লাগে কালোর ব্যবহার। এই ভারত অনেক অনেকের মধ্যে দেখা যায়! হুগোয়ী কালো বড় অপছন্দ করিতেন—যে কথা মাতিসকে বলিলেন।

গোপাল ঘোষ-এর প্রদর্শনী। বিড়লা মিউজিয়াম! এতদিন বাদে গোপাল ঘোষ তাহার ছবির সাহিত্য দাঁটি সারটিফিকেট—একটি রবিবাবুর ও একটি অবনী-বাবুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একদা বহু সংস্থাকেই সারটিফিকেট দিতেন—হলে রাখিয়াছেন, বাহাতে দর্শকরা তাহার সম্পর্কে ভাল ভবে। আমরাও ভাবিতেই চেষ্টা করিব। এখানে পয়তাল্লিশ হইতে অদ্যাবধি অনেক কাজ দেখা যায়, সবসমেত চোদ্দটি। চৌরঙ্গী টিরাস হইতে অজ্ঞ ও খুব কিছু নতুন আছে বহুজ্ঞা জানা যায় না; তিনি সংখ্যায় অনেক আঁকেন ইহাই সত্য। তাহার ৯৭, ১০১, ১০৪, ১০৫ না টানাইলে চলিত।

পুস্তক পরিচয়

দারিদ্র্যের মোকাবিলা

গ্রন্থকর্তা

The Challenge of World Poverty—Gunnar Myrdal.

বিখ্যাত সুইডিশ লেখক ডঃ গুননার মিরডালের বইটি তাঁর সুপরিচিত "Asian Drama: An inquiry into the poverty of Nation" এরই একটি অনুষঙ্গ বলা যেতে পারে। দুইটি বইয়ের বিষয়বস্তু এক যথা উদ্ভূত অর্থনীতির রাজনৈতিক-সামাজিক বিশ্লেষণ এবং উন্নত দেশগুলির দায়িত্ব।

সত্তরের দশকে মানবজাতির সামনে দুটি বিরাট সমস্যা অন্যান্য আর সব সমস্যা ছাপিয়ে উঠেছে। একটি হল কী ভাবে পূর্ণাঙ্গ পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানো যায় এবং দ্বিতীয়টি কী কী উপায়ে পৃথিবীর সম্পদের ব্যবহার ও বন্টনের মাধ্যমে মানব দারিদ্র্যের মোকাবিলার সফল হয়ে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। দঃখের বিষয় আজ অবধি মনুষ্য সমাজ এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের পথে অতি অল্পই অগ্রসর হতে পেরেছে। অর্থনৈতিক সমস্যাটির সমাধানের জন্য আজ পৰ্বন্ত স্বত আলোচনা হয়েছে তার সিকি ভাগও কাজ হয় নি। এগারো বছর আগে রাষ্ট্রসংঘ ষটের দশককে উন্নতির দশক বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তী বছরগুলিতে শব্দ যে অনুন্নত দেশগুলিতে উন্নয়নের গতি শব্দ হয়ে এসেছে তাই নয়, পশ্চিমী দেশগুলি ক্রমশ বৈদেশিক সাহায্য দানের ব্যাপারে অনুরোধসহী হয়ে পড়েছে।

ষাটের দশকের এই চিত্রের ফলে রাষ্ট্রসংঘ বর্তমান দশককে উন্নতির

দশক—দ্বিতীয় পর্বায় বলে চিহ্নিত করেছে। এর ফলাফল কী হবে তা এখনই বলা শক্ত।

ডঃ মিরডালের মতে পৃথিবীর উন্নয়নের যথার্থ দৃষ্টোপেক্ষ পৌছাতে গেলে কী পশ্চিমী কী নতুন দেশগুলি, দঃ তরফেই আরও বেশী প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ডঃ মিরডাল বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না। কিন্তু আলোচ্য বইটিতে তিনি ক্রমাগত সাহায্যস্বত্বকারী দেশগুলির নিজ প্রচেষ্টার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে যে কোন উন্নতিশীল দেশের কাছে বৈদেশিক সাহায্য করণীয় বিষয়বস্তুগুলির একটি ক্ষুদ্র অংশ হতে পারে শব্দ। যা অনেক বেশী প্রয়োজন তা হল এই দেশগুলির নিজস্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার।

ডঃ মিরডাল তাঁর বইটি অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তিনি বলেছেন এটি প্রধানত টেকনিকল কারণ; এর সঙ্গে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে ধরলে আর সামলানো যেত না।

শব্দ যে অনুন্নত দেশগুলির সমস্যাই আঙ্গোচিত হয়েছে তা নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে উন্নয়ন জনিত সমস্যাগুলি সেগুলিও এসে পড়েছে।

অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর স্বচ্ছতার অভাব এই অজুহাতে উন্নত দেশগুলির এদের সাহায্যদানে বিরত থাকা উচিত নয়। বরং

এই বাস্তব পরিস্থিতি তাদের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে থাকা উচিত, যে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা একটি প্রধান কর্তব্য।

অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত মৌলিক আইনগত পরিবর্তনের প্রয়োজন সেগুলি অনুন্নত দেশগুলির নিজেদেরই দায়িত্ব। বিশেষ ভাবে দেখতে হবে যেন গরীব মানুষের অবস্থা ভাল করার নামে ধনীদেব ঘরেই না বহরের পর বছর টাকা জমে, যা বর্তমানে এইসব দেশগুলিতে আখ্যার ঘটছে। প্রধানত কৃষির ক্ষেত্রে জমি সংক্রান্ত আইনগুলির আমূল সংস্কার করা একটি প্রধান কর্তব্য। আরও যে কাজগুলির প্রয়োজন তা হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা, নিরক্ষরতা এবং দুর্নীতি দূর করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যদি কোন দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির পথ থেকে ফিরে না আসতে চায় তাহলে এই সংস্কারগুলির উপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

উন্নত দেশগুলি কী ভাবে এই সংস্কারের কাজে সাহায্য করতে পারে? শব্দ একটি ব্যাপারে এবং তা হল নিজ দেশের কবসায়ীদের সাহায্যকারী দেশগুলির আমলা ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলা থেকে বিরত রেখে। এ ছাড়াও উন্নত দেশগুলি সাহায্যকারী দেশগুলিকে সংস্কার সচেতন হতে বাধ্য করতে পারে কতগুলি নিয়ম মেনে চলে। যেমন বিশ্ব ব্যাংকের তরফে বলা যেতে পারে যে সাহায্য দান বা তার পরিমাণ নির্ভর করবে সাহায্যকারী দেশটি কতখানি পরিবার পরিকল্পনা অথবা নিরক্ষরতা দূর করার কাজে সফল হয়েছে। এই নীতি গ্রহণ করলে (শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়)

সংবাদপত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে নয়াদিগ্লী মাদ্রাজ প্রভৃতি কেন্দ্রেও অতিরিক্ত করের হারে সমতা রেখে সংবাদপত্রের দাম বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো এই চড়া হারে দাম বাড়ানো হয়নি। আর সেখানেই বোধহয় বিরোধ। দর্পণের পাঠকদের আগেই জানানো হয়েছে

বাংলা কংগ্রেস

(২য় পৃষ্ঠার পর)

জেলার সংগঠনে অজয়বাবুর পরেই অহীন মিশ্রের প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না। উপরন্তু অজয়বাবুর সমর্থন তো আছেই তাঁর পেছনে।

অপরপক্ষে সাধারণ সম্পাদক প্রণব মুখার্জী ও সম্পাদক আমজাদ আলি দল রাখতে চান নিজেদের স্বার্থে। বড় দল কংগ্রেসে ঢুকলে কোথায় যে তালিয়ে যেতে হবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। সেখানে আবার বেশ গুতোগুতিও চলছে। তার চেয়ে এক ফোঁটা কাগজে দল হলেও দাঁকি মাতবর সেজে থাকা যার। অজয়বাবুর বিরুদ্ধে এরা ইতিমধ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছেন ও ঘুরে ঘুরে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, যেভাবে হোক নাম কা ওয়াসতে দল রাখতেই হবে। দর্পণের বিবিস্তারসূত্রে খবর বিগত নির্বাচনের আট পার্টি' ছোটোছুট এক নম্বর পার্টি' সি পি আই এদের মদত দিচ্ছেন। ঐ পার্টি' নব কংগ্রেসের বন্ধু পার্টি' হলেও আগামী নির্বাচনে (তা সে যবেই হোক না কেন) আসন ভাগাভাগির বেলাতে প্রণবপন্থী বাংলা কংগ্রেসের বেনামে কিছু বেশী সীট হাতে রাখতে পারবেন; এই আশা।

বিশ্বভারতী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রীয় সরকার তথা শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেছে একটি ঘটনার। এই অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার পরেই শাসক কংগ্রেস দলের অন্যতম নেতা জয়নাল আবেদীন বোলপুরে যান এবং বিশ্বভারতীর কিছু ছাত্রকে উপদেশ দেন ছাত্র পরিষদের একটি সংগঠন গড়ে তুলতে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী কতৃপক্ষও তাঁদের নিজস্ব একটি আইন পরিবর্তন করেন যাতে তিনজন ছাত্র তিনবার ফেল করার পরও আবার পরীক্ষায় বসতে পারে। এরা সকলেই বোলপুরের ছাত্র পরিষদ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত।

বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ কথায় কথায় রবীন্দ্র আদর্শের উল্লেখ করে বলেন যে অধ্যাপক সমিতির বিভিন্ন কার্যবলী যথা মাইনে বাড়ানো ও প্রমোশনের একটি সম্ভব নীতির

পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ পত্রের মালিকরা তাঁদের সংবাদপত্রের ভুলো সাক্ষ্যে দেখানোর জন্যে যে লোকসানের সম্মত হবেন তা পূরণ করার জন্যে এই চড়া হারে দাম বাড়িয়ে ক্রেতাদের পকেট কাটার সিদ্ধান্ত করেছেন।

কিন্তু হকাররা বিপদে ফেলেছেন। এই বাজারে কেউই রোজগার কমাতে চান না, তাই হকাররা বৃহৎ সংবাদপত্র মালিক গোষ্ঠীর মনোফা-বাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, হকাররা আরো দাবী করেছেন, অবিক্রীত কাগজগুলো মালিকদের ফেরৎ নিতে হবে। এতদিন এও নেওয়া হতো না। এখানে বৃদ্ধি হকারদের পক্ষে। কেননা চড়া হারে দাম হওয়ার প্রথম দিকে অত্যন্ত বহু কাগজ অবিক্রীত থেকে যাবে। সেই লোকসানের বোঝা হকারদের ওপর চাপালে গরীব হকাররা শেষ হয়ে যাবে। ওদের কার্যতঃ কোনো পুঁজি নেই।

কূটনৈতিক প্রতিনিধি

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

লোক একজন প্রলাপ বকছেন মনে করেও ত সবটা উড়িয়ে দিতে পারি না। এই ভুললোক যে ভারতের এক কূটনৈতিক প্রতিনিধি। কঠিন পরীক্ষা পাশ করে সার্ভিসে ঢুকেছেন এবং বোগ্য বলেই ত প্রমোশন পেয়ে ওপরে উঠছেন। এবং তার সর্বোপরওয়ালা বৈদেশিক মন্ত্রী স্বরণ সিং ও সিমলাতে বলেই ফেলেছেন যে বাংলা দেশ যদি পাকিস্তানী কাঠামোর মতোই থাকতে চায় ভারত সরকারের আপত্তি নেই।

দাবী জানানো, এই আদর্শের পরিপন্থী। অর্থাৎ রবীন্দ্র আদর্শ অটুট থাকবে, যতদিন তাঁরা বিনা প্রতিরোধে বিশ্বভারতী পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্টাচরণ এবং স্বজন পোষণ করে যেতে পারবেন।

নকশাঙ্গী হামলার প্রতিরোধে এই অর্ডিন্যান্স, এই বৃদ্ধি একেবারেই ভিত্তিহীন। শান্তিনিকেতন বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানে একদিনের জন্যও ক্লাশ বন্ধ হয় নি। আর যদি সরকার মনে করেও থাকেন যে বিশ্বভারতী চরমপন্থীদের আস্তানার পরিণত হয়েছে তার সঙ্গে কমিটিগুলি মনোনীত না নির্বাচিত তার কী সম্পর্ক? বিশ্বভারতীর প্রশাসনে প্রচুর গলদ আছে এবং তা ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মীরা সকলেই আগ্রহী। কিন্তু তারা মনে করছেন যে বর্তমান অর্ডিন্যান্স শব্দ-মাত্র গলদগর্ভীকে কায়ম করারই সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।

কংগ্রেসী বিরোধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কান্তি দাবী করেছিলেন, সুদূরত মুখার্জীকে তাঁর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে, কিন্তু সুদূরত মুখার্জী এখনও ক্ষমা চায়নি। অবশ্য অসুস্থ সুদূরত মুখার্জী এখন হাসপাতালে।

এই অবস্থায় বোধহয়, রাজ্যের নব কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রচণ্ড খেলো-খেলি, সিদ্ধার্থ রায়ের বিরোধীরা এবার দেখতে চান, তিনি কাকে সমর্থন করেন।

তার দলের ছাত্র পরিষদ আর যুব কংগ্রেসকে কিংবা প্রিয় শতকে (প্রফুল্লকান্তির ডাক নাম)। অবস্থা বেগতিক দেখে সিদ্ধার্থ রায় কয়েকদিনের জন্যে নয়াদিগ্লী চলে গিয়েছেন। আশা, যদি এর মধ্যে কোনো আপোষ হয় কিন্তু প্রফুল্লকান্তিকে কেন্দ্র করে নব কংগ্রেসীদের যে অংশ ছাত্র পরিষদ আর যুব কংগ্রেসের বিরোধী তাঁরা সোরগোল তুলছেন। তাঁরা বলছেন, প্রফুল্লকান্তিকে অপমান করা যাবে না, সুদূরতকে ক্ষমা চাইতেই হবে, অন্যথায় সুদূরতকে ছাত্র পরিষদ থেকে তাড়াতে হবে। অন্যদিকে ছাত্র পরিষদ আর তাঁর পেছনে যুব কংগ্রেসের প্রিয় দাশমর্দিস সুদূরত মুখার্জীকে মদদ দিচ্ছেন। তারা বলছেন সিদ্ধার্থ রায় তদন্তের রিপোর্টে কোন মতেই সুদূরত মুখার্জীর বিরুদ্ধে যাবে না। কেন না, যারা সেদিন কংগ্রেস অফিস চড়াও করে মারপিট করেছিল তারা যে সবাই প্রফুল্লকান্তির লোক একথা সব কংগ্রেসী মাতবররাই জানেন। হাঙ্গামাকারীদের কেউ কেউ আবার অমৃত বাজার বৃগান্তরের কর্মচারীও। প্রফুল্লকান্তিই এই কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার।

অবশ্য কোম্পানীর মালিক তরুণকান্তি ঘোষ এখনও কোনো পথ গ্রহণ করেননি শুধুনি, তিনি বলেছেন তার দুখানা কাগজ, অমৃত বাজার ও বৃগান্তরে সুদূরত মুখার্জীদের খবরও সমান ভাবে প্রকাশিত হবে।

প্রফুল্লকান্তি ঘোষও বসে নেই। তার হাতে উত্তর কলকাতার নাম-জাদা সমাজ বিরোধীরা আছে। এদের সঙ্গে তিনি দক্ষিণ কলকাতার সুদূরত বিরোধী লক্ষ্মীকান্ত বসুদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়েছেন। পরিকল্পনা করা হয়েছে, সুদূরতবাবু যেখানেই বক্তৃতা করতে যাবেন সেখানেই গোপালমালা করা হবে। কয়েকদিন আগে বেলেঘাটার সুদূরত মুখার্জীর বক্তৃতা করার কথা ছিল। কিন্তু প্রফুল্লকান্তির দল জরতোর মালা নিয়ে অপেক্ষা করছে সংবাদ পেয়ে সুদূরত আর বেলেঘাটার যান নি, প্রফুল্লকান্তি এখন চেষ্টা করছেন বিজয় জেলা কংগ্রেস কমিটি থেকে সুদূরত মুখার্জীর বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনা-

নোর জন্যে। দু একটি জেলা কংগ্রেস সাড়াও দিয়েছে। অন্যদিকে সুদূরত মুখার্জীর দলও বসে নেই। তারাও প্রচণ্ড অভিযান চালাচ্ছে, প্রফুল্লকান্তি ঘোষের বিরুদ্ধে।

ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, শেষ পর্যায়ে দু পক্ষ থেকেই নয়াদিগ্লীতে দরবারে যেতে হবে।

আই এন টি ইউ সি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এন টি ইউ সি'র নেতৃত্ব নব কংগ্রেসী নেতৃত্বের সঙ্গে এই ব্যাপারে একটি সংযোগ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছেন। কমিটির কাজ হবে নব কংগ্রেস ও আই এন টি ইউ সি'র মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির বিষয়-সমূহ পরীক্ষা করে দেখা।

আসলে বক্তব্য যে, ট্রেড ইউনিয়ন ব্যাপারে নব কংগ্রেসকে মাথা ঘামাতে হবে না। আই এন টি ইউ সি এই দিকটা দেখাশুনা করবে। নব কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ হবে কোন কোন দাবীদায়কের ব্যাপারে এবং কি ভিত্তিতে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলন করা যাবে।

আই এন টি ইউ সি'র কালী মুখার্জী আর ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর সংগঠনে মর্যাদা কমে আসছে বলে মনে হয়। সাংবাদিক বৈঠক চলায় সময় ডাঃ বসু হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েন আর বলতে শুরু করেন যে, কোন কোন সংবাদপত্র নাকি তাঁকে আই এন টি ইউ সি'র নেতৃত্ব থেকে সরানোর সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

তিনি বলেন : “আমি অনেকদিন এ জায়গায় আছি। সরানো এত সোজা নয়, আর সরালেই বা কি। আমরা অনেক কাজ আছে।”

কালী মুখার্জীও সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ কোন কথা বলেন নি। সংগঠনের তরফ থেকে যারা কথা বলেছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন অরবিন্দ বসু।

শিশির গাঙ্গুলী বলেন, নব কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এ্যাড হক কমিটিতে কালী মুখার্জীকে নেওয়া হয়েছে। “আমরা মনে করি এই অন্তর্ভুক্তি যথেষ্ট নয়। আই এন টি ইউ সি'র আরও বেশী প্রতিনিধি এ্যাড হক কমিটিতে থাকা দরকার।”

সি পি আই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সান্তার ও জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। কংগ্রেসীরা গোপালবাবুর প্রস্তাব ভেবে দেখবেন বলে ওকে বিদায় দেন।

তখন গোপালবাবুর আবেদন ছিল যে, নব কংগ্রেস অন্ততঃ এই কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুক যে, সি পি এম-এর কিছু গন্ডা কংগ্রেসে

পুস্তক পরিচয়

(এগারোশ পৃষ্ঠার পর)

অন্যতঃ দেশগুলির উপর মহল যারা এই সাহায্য চায় অথচ যারা নিজ স্বার্থ বশতই সংস্কার বিমুখ তাদেরকেও কিছুটা সংস্কারমুখী হতে বাধ্য করা যেতে পারে।

বাস্তবিক, পক্ষে অন্যতম দেশগুলির এই গোষ্ঠীই সংস্কারের পথে সবথেকে বড় বাধা। এরা প্রত্যক্ষভাবে বাধা না দিয়ে দের পরোক্ষে নিজ দেশের বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে যারা জনমত গঠন করার নামে এইসব দেশে এই গোষ্ঠীকেই জ্বিঁয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। এবং এদের সঙ্গে যোগ দেয় পশ্চিমী ব্যবসায়ী দল যারা নিজ দেশে উদারপন্থী হলেও অন্যত্র, বিশেষ করে অন্যতম দেশগুলিতে, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়াশীল পরিণত হয়। স্বল্প মেয়াদী লাভ লোকসানের বিচার করে এরা সব ক্ষেত্রেই একটি স্বৈরাচারী সরকার যা কোন প্রতিবাদ সহ্য করে না তাকেই পছন্দ করে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বর্তমানের ব্যবসায়ীরা নিজেরা যে খুব একটা দোষী তা নয় কিন্তু তাদের ব্যবসার সুত্রপাত অতীতে যে বৈআইনীভাবে দখলীকৃত অধি-ও সম্পত্তির মধ্য দিয়ে ঘটেছিল এবং তারই ফলস্বরূপ যে দনীতির দ্বারা তার থেকে এরা আর সেরে আসতে পারে না এবং সেরে আসাও খুব একটা সহজ কাজ নয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত]

মতানুদেহ কৌতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ওদের অন্যান্য অনেক কুকাঁতির কথাও হেডমাষ্টার মহাশয় জানতেন এবং সেই সম্পর্কে নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে অভিযোগের সূত্র কথাও বলেছিলেন।

পুলিশ এ পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সকলেই নব কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী বলে পরিচিত। নব কংগ্রেসী উদ্ভটন মহল থেকে এখন পুলিশের কাছে দরবার করা হচ্ছে যেন এই হত্য সম্পর্কে বিশদ খবরাখবর সংবাদপত্রে না পৌঁছায়।

এখন সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ। সি পি এম-এর “গণশক্তি”তে কিছুটা বেরিয়েছে এই ঘটনা সম্পর্কে, কিন্তু সি পি আই-এর “কালান্তর” এ সম্পর্কে নীরব।

এমন কি লোকসভার পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কে আলোচনার সময় সি পি আই নেতা তার বক্তব্যে সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে একমত হলেন যে, এ রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছে। এ ঘটনার কোন উল্লেখ তাঁর বক্তব্যে ছিল না।

ঢুকে পড়ে গুন্ডামা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘোষণার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

দপন

সুত্রের আচরণে কংগ্রেসের ভেতরে অসন্তোষ

ছাত্র পরিষদ ভাঙ্গনের সম্মুখীন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৪শ বর্ষ ৪২শ সংখ্যা ২ শতাব্দীর ২৬শে নভেম্বর ১৯৭১ ২ দ্বিতীয় ৩২ পৃষ্ঠা

সোমবারের বিমান যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ

(দর্পণের রূপাঙ্কন সংবাদদাতা)

বিমান যুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক গত সোমবার (বাইশে নভেম্বর) ঘটে গেল পশ্চিম বাংলার আকাশে। কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ পয়তাল্লিশ মাইল দূরে বয়ড়া সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি। বেলা তখন তিনটে, শীতের আকাশে এক খন্ড মেঘও নেই।

প্রথমে কিছু শিশুরা লক্ষ করেছিল দূরে বাংলা দেশের দিকে কয়েকখানা পাকিস্তানি বিমান; মনে হয় যেন ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলে মেয়েরা চীৎকার করতে থাকে যত বিমানগুলো কাছাকাছি এসে পড়ে। সর্বসমেত চারখানা বিমান।

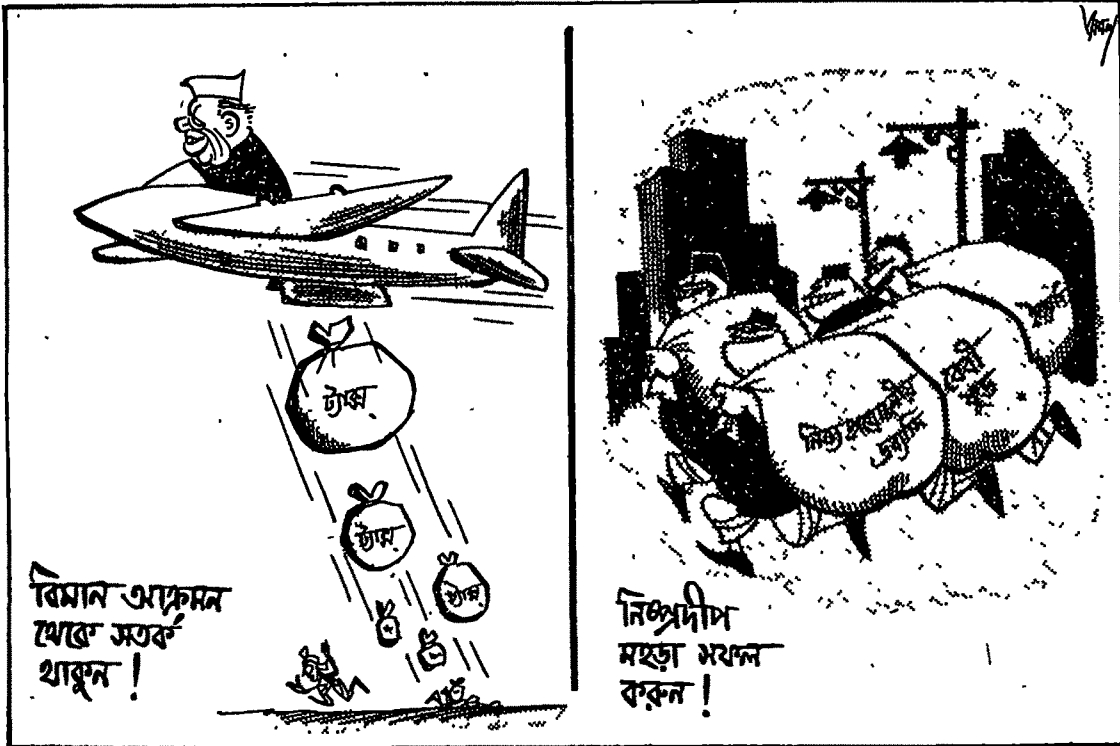
খুব বেশী উচ্চতায় ওরা ছিল না, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। যারা জানে তারা বলছে, “পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর স্যাবার জঙ্গী-বিমান”। সংখ্যার চারটি। কি কান্ড একেবারে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে এল যে। কি করতে চায় ওরা?

সীমান্ত এলাকা বরাবর লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের শিবির। লোকেরা জটলা করে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপার কি দেখতে। কিছুদিন থেকেই ওদের মনে হয়েছে আব-হাওয়া উত্তপ্ত। ওদেরই ক্যাম্প থেকে অনেক তরুণের দল চলে গেছে মজ্জি বাহিনীতে যুদ্ধ করতে। খবরও নিত্য এসে পৌঁছেছে মজ্জি বাহিনীর হাতে পাক আগ্রাসী বাহিনীর নাজেহাল হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে। ওদের সকলেরই মনে এক কথা : প্রশ্নে কি পাকিস্তান পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে না কি?”

চারটি পাক জঙ্গী বিমানের উপস্থিতি তাই ওদের মনে আশঙ্কা জাগায়। ওরা এত নীচ দিয়েই বা যায় কেন? “বোধ হয় ছবি তুলতে এসেছে” কেউ কেউ বলে।

ঠাণ্ডা কামানের গর্জন, পর পর অনেক আওয়াজ। আর সারা আকাশ ভরে যায় ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে। ভারতীয় বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলা।

বিনীত প্রহরায় নিষ্পত্ত এই কামানের দল সারা সীমান্ত এলাকা



জুড়ে পাহারা দিয়ে চলেছে গত কয়েককমাস ধরে। আর সদাজাগ্রত হয়ে বসে আছে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট।

কামানের গোলায় সঙ্গে সঙ্গে চারটি ভারতীয় জঙ্গী বিমান হঠাৎ আকাশে হাজির হয়। পাকিস্তানিরা গোলা ছুঁড়তে শুরু করে তাদের বিমান থেকে ভারতীয় বিমান

(দেখাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রিয়দাস সিদ্ধার্থকে ছেড়ে গৃহের দিকে ঝুঁকছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নব-কংগ্রেসের প্রিয়রঞ্জন দাস-মন্সী দিল্লীতে কে সি পন্থের বিশেষ স্নেহভাজন। অথচ জনরব কে সি পন্থ এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সম্পর্ক আদার কাঁচকলয়।

প্রিয়রঞ্জন জানেন, সিদ্ধার্থশঙ্করের সৌভাগ্যবিশিষ্ট অস্তিত্ব। প্রধান-মন্ত্রী অরুণে জায়ে তাকে তেমন করে কাছে টানেন না। প্রধানমন্ত্রীর আকাশে দেদীপ্যমান একটি নক্ষত্র কে সি

পন্থ। তিনি আরও স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।

তাই প্রিয়রঞ্জনবাবু ঘুরে ধরা বাঁশ সিদ্ধার্থশঙ্করকে আশ্রয় করা খুব বুদ্ধির কাজ মনে করছেন না। এখনও সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেও প্রিয়বাবু আশ্রয় গোছাতে পন্থের দিকেই চলেছেন। সম্প্রতি পন্থের ছাড়পত্র নিয়ে তিনি কলকাতায় এসে পলিশ দপ্তরের উপর খুব চোটপট করছেন।

প্রিয়রঞ্জনবাবুর রু প্রিন্ট নিয়েই পলিশ “অপারেশন বেলোঘাটা” অভিযান শুরু করেছে। কিন্তু যাদবপুর টালিগঞ্জ বাটার নব কংগ্রেসী মোহান্তকে থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে ফিরিয়ে এনেও আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে না। তাই প্রিয়বাবু ও তার সাক্ষরদর চটেছেন। এতো চেষ্টা সত্ত্বেও কেন সি পি আই এম-কে খতম করা যাচ্ছে না। বিশেষতঃ

(দেখাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসের বৈঠকে চমকপ্রদ ঘটনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সুত্র-শতর (প্রফুল্লকান্তি ঘোষ) খেলোথেনি মিটলো না। মঙ্গলবার নব কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সভায় স্থির হয়েছিল, সুত্র-শত এক যুক্ত বিবৃতি দিয়ে ব্যাপারটির অবসান ঘটাবেন। কিন্তু সভার পর মস্কো যাবার পথে সুত্র মদ্যজী রাতে নরাদিল্লী রওনা হয়ে গিয়েছে। কোনো বিবৃতিতে সে স্বাক্ষর করে যায় নি। বৃহস্পতি সকালে প্রফুল্লকান্তিও নরাদিল্লী গিয়েছেন।

মঙ্গলবার নব কংগ্রেসীদের

কার্যকরী কমিটির বৈঠকে কয়েকটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে। জানা গিয়েছে, প্রফুল্লকান্তি সভায় তাঁর বক্তব্য বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর কান্নায় সুত্রের দল চাপা হাসতে আরম্ভ করেন। অন্য দিকে সুত্র ওজ্জ্বলপূর্ণ ভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্য বলে। স্বতীয়তঃ, এই সময় এই সর্ব প্রথম অধ্যাপক দেবী চ্যাটার্জী সরাসরি সিদ্ধার্থ রায়ের সমালোচনা করেন। অধ্যাপক চ্যাটার্জী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃংখলার উন্নতির জন্য কৃতিত্ব

হচ্ছে রাজপুত্র ডায়াসের।

সিদ্ধার্থ রায় এই কৃতিত্ব নব কংগ্রেসের পক্ষে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারপর সুত্র-শতর গোলমালের মীমাংসা করতে সিদ্ধার্থ রায় ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া সুত্রদের নানা অসংগত কার্যকলাপের পিছনে বাঁরা আছেন তাঁদের খুঁজে বের করা দরকার। ইতিপূর্বে সরাসরি সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে। কেননা, তিনিই এখন সুত্র-প্রিয় মন্সীর খুঁটি।

দুই ত্রুণ কংগ্রেসী নেতার প্রতি নিবেদন

চাপক্য সরকার

গত রবিবার (একুশে নভেম্বর) নব কংগ্রেসের নব "নেতাজী" প্রিয় রজন দাসমন্সী আর জোয়ান নেতা সন্নত মুখার্জী প্রচণ্ড খেউড় করেছেন দপন-এর বিরুদ্ধে। ওরা সাধারণ মানবকে উসকোবার চেষ্টা করেছেন আর বলেছেন : "সাধারণ মানব নিজেদের দপনে দপনকে বিচার করে নিজেদের রোষে এই মার্কসবাদী দালাল পত্রিকাটির কবস্থা করবে"।

নব কংগ্রেসী দুই নেতা বক্তৃতা করছিলেন দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র-যুব সম্মেলনে ভবানীপুরের হাজরা পার্কে। পার্কে জনসমাগম হয়েছিল প্রচুর, পার্কে ভরে গিয়েছিল।

ওদের দপন-এর ওপর রাগের কারণ বোঝা যায়। এই সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছে ওদের বিকট অন্তর্ভবনের কথা, নিজেদের মধ্যে মারপিটের নানা কাহিনী আর ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের নামে সারা পশ্চিমবঙ্গে খুনখারাপি, লুণ্ঠ-তরাজ, গন্ডামী আর নানা জলদ-মের ইতিবৃত্ত।

এই সূত্রে প্রিয়বাবু ও সন্নত-বাবুকে বলে রাখা ভাল যে, আমা-দের প্রকাশিত কাহিনীর মধ্যে অসত্য কিছু নেই। ওরা যদি অসত্য প্রমাণ করে বা প্রকাশিত ঘটনার সত্যতা চ্যালেঞ্জ করে বিবর্তিত দেন তাহলেও তা আমরা প্রকাশ করব এবং আরও তদন্ত করে বিভিন্ন অনন্ত কাহিনী মানবকে জানাবার চেষ্টা করব।

প্রায় পনের বছর আগে দপন-এর জন্ম হয় কয়েমী স্বার্থ পরি-চালিত দৈনিক 'সংবাদপত্রের' বিকৃত সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। সত্য ঘটনা চেপে দেওয়া ওদের কাজ। মানবের ওপর শোষণের যে দৈনন্দিন ঘটনা তা কেন্দ্রীয় মানবের কাছে হাজির হয় না। দপন তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই সমস্ত ঘটনা মানবকে জানাতে চেষ্টা করে।

ফলে শত্রু থেকেই দপন-এর ওপর আক্রমণ সভাসমিতিতে আর বিজ্ঞাপনদাতাদের। অনেকের বিজ্ঞা-পনই দপন-এ আগে বেরিয়েছে। নানা কেলেকারি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে। আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম জার্মানীর বিদেশী দূতাবাস মারফৎ প্রচার করা বিজ্ঞাপনও দপন-এ প্রকাশিত হয়েছে। সবই অস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেছে।

বিড়লা, লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী ইত্যাদি নানা বিজ্ঞাপনই থাকত এই দপনে। এখন নেই—কিন্তু তা বলে দপন বন্ধ হয় নি। একমাত্র সম্ভব দপন-এর সত্যনিষ্ঠা এবং সাধারণ মানবের সমর্থন।

প্রিয়বাবু আর সন্নতবাবু নতুন রাজনীতিতে এসেছেন আর ওদের তারপরে সজীবতার ওরা

কিছুটা অসহিষ্ণুও হতে পারেন, হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে ওদের মনে রাখা ভাল যে, কংগ্রেসের মধ্যে কয়েমী স্বার্থের দৃঢ় মন্ডির বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের কথা ওরা অন্ততঃ মনে বলেন সেই সংগ্রাম দপন শত্রু থেকেই করে আসছে।

দপনেই প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু করে তখনকার বঙ্গেশ্বর

সাতবারটি ও উনোসত্তর সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার আমলে, কিভাবে সমাজ বিরোধীরা আর স্বার্থ-বোঁরা দলে দলে এসে বামপন্থী পার্টিতে বিশেষ করে মার্কসবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছে তার কাহিনী দপনেই প্রকাশিত হয়েছে। দপন ওদের সতর্ক করে দিয়েছে যে, এই তথাকথিত সমর্থনের ওপর

বঙ্গদপন

অতুল্য ঘোষের নানা কেলেকারীর কাহিনী। কিভাবে কংগ্রেস পার্টি আর এই পার্টি পরিচালিত সরকার একদিকে মাড়োয়ারী ও বড় বড় ব্যবসাদারের আর অন্যদিকে সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থ মানবের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শোষণ তাঁর থেকে তীব্রতর করেছে।

এই পার্টিকল ও তেলকলের মালিকেরা কোটি কোটি টাকা অন্যান্যভাবে মনোফা লুটেছে, আর এই লুট বজায় রাখার জন্য কিভাবে অতুল্যবাবু আর তার বশ-স্বদদের বহাল তবিবতে রেখেছে। কি করে এই কংগ্রেস ভবনের মত বিকট প্রাসাদ পার্টি অফিস করার জন্য গড়ে উঠল তার ইতিহাস দপ-নেই প্রকাশিত হয়েছে।

ক্ষীণদেহ অতুল্য ঘোষ প্রভাব-প্রতিপত্তি আর অর্থ ও সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণতাকার হয়েছেন আর দপনের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে গর্জন করেছেন। অতুল্য-বাবুও প্রকাশ্য সভায় দপন ধ্বংস করার সংকল্প সঙ্গে রে ঘোষণা করেছেন। বিধান রায়ের দলনীতির সংবাদ দপনে প্রকাশ করার জন্য তিনি বিধান সভায় দপনের বিরুদ্ধে হুমকী দিয়েছিলেন। মনে রাখবেন তখনকার দিনে বিধান রায় পশ্চিম-বঙ্গের হত্যাকর্তা-বিধাতা এবং অতুল্যবাবু প্রচণ্ড প্রভাবশালী, ওদের কথায় অনেক কিছুই হতে পারত।

দপন নির্ভরে সত্য প্রকাশ করে গেছে আর এই সত্য প্রকাশে কোন বাধাই আমলে নেয় নি। অব-শ্যই অর্থাভাবজনিত অনেক অস-বিধের মধ্যে দিয়ে দপনকে যেতে হয়েছে বা এখনও হচ্ছে। অর্থ সাহায্যের নানা প্রস্তাব এসেছে বিভিন্ন সূত্র থেকে কিন্তু শর্ত ছিল সাহায্যকারীদের স্বার্থ দেখার। সমস্ত সাহায্যই দপন ঘৃণার প্রত্যা-খ্যান করেছে।

প্রিয়বাবু আর সন্নতবাবু, বঙ্গেশ্বর-এ দপন মার্কসবাদীদের দালাল। ওরা রাজনীতিতে নতুন বলে অগেকার সব ঘটনা ওদের মরণে না থাকা সম্ভব।

ভরসা করা উচিত হবে না, এ সম-র্থন একবন্ধ বামপন্থী আন্দো-লন বানচাল করে দেবে।

মনে রাখা দরকার যে যুক্তফ্রন্ট আমলে বিভিন্ন পার্টির সংবাদপত্র পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বিজ্ঞাপনের বিরাট সহায়তা পেয়েছে, দপনকে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিজ্ঞাপন মারফৎ কোন সমর্থনই দেয় নি।

মার্কসবাদী থেকে আরম্ভ করে প্রায় সব বামপন্থীরাই দপনকে এক সময়ে গালিগালাজ করেছে। পড়িয়ে দেওয়ার হুমকী দিয়েছে। দপন নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হয় নি। অথচ বার্ষিক সালে চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় আনন্দবাজার গোষ্ঠী তথা প্রতিরক্ষাশীলদের উগ্র ফ্যাসিবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে দপ-নই একক কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সাতবারটি সালে তথাকথিত বামপন্থীদের একাংশের সহযোগি-তার অজর মুখার্জী যুক্তফ্রন্ট সর-কার বিরোধী গোপন চক্রান্তের কথা দপনই প্রথম ফাঁস করে। কিভাবে

অজরবাবু ইন্দিরা গান্ধী ও চাব-নের সঙ্গে গোপন শঙ্খপরাশ কর-করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙতে চেষ্টা করেছেন তার কাহিনী দপনে প্রকাশিত হয়েছে।

আবার স্বখন নকশালী সন্ধ্যাসে সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ; তখন এই সন্ধ্যাসের নির্ভর সমালোচনা দপ-নেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সমালোচনা একাধারে তাত্ত্বিক ও তথ্যভিত্তিক ছিল। সন্ধ্যাসবাদীরা দপন সম্পাদককে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে হত্যার হুমকী দিয়ে দিনের পর দিন চিঠি দিয়েছে। অথচ মজার কথা, এম এল দলের বক্তব্য এবং পুঁলিশী অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের যাবতীয় সংবাদ দপনই নির্ভয়ে প্রকাশ করেছে।

দপনই প্রথম বলেছে যে, কিছু আদর্শবাদী যুবকের প্রেরণার সূত্রে 'গ' নিয়ে কয়েমী স্বার্থ সমাজবিরোধীদের সাহায্যে সমস্ত বামপন্থী আন্দোলনকে হত্যা করতে চাইছে। প্রিয়বাবু ও সন্নত-বাবুর মনে রাখা ভাল যে, নব-কংগ্রেসও এই তথাকথিত 'নক-শালীদের' সঙ্গে হাত মিলিয়ে সন্ধ্যাস চালিয়ে গেছে এবং সেই সমস্ত কাহিনী দপনে প্রকা-শিত হয়েছে।

সি পি আই প্রমুখ কিছু বাম-পন্থী দল এই সন্ধ্যাসকে সমর্থন জানিয়েছে এই ভেবে যে, এই সন্ধ্যাস দিয়ে মার্কসবাদীদের ঠান্ডা করা যাবে। দপন এই সুবিধাবাদী সমর্থনের বিরোধিতা করেছে।

আবার মার্কসবাদীদের রাজ-নৈতিক, সাংগঠনিক ব্যর্থতার বাম-পন্থী আন্দোলন আরও ব্যাপক বিপ্লবী পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি সে সম্পর্কেও দপনে ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আজ

মার্কসবাদীরা তাদের খসড়া রাজ-নৈতিক প্রস্তাবে নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন।

অর্থাৎ জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ দপন গত চৌদ্দ বছর ধরে প্রকাশ করেছে। চূড়ান্ত আর্থিক সংকটও দপনকে বিচলিত করতে পারে নি।

এর ফলে অনেক সময় দলনী-তিপ্লারণ ব্যস্তিরা দপন সম্পাদকের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা এনেছে। এই মানহানির মামলা লড়ার জন্য সম্পাদককে দু'বার সদরে আন্দামানও পাড়ি দিতে হয়েছে। এখনও তাঁর নামে তিনটি মামলা রয়ে আছে।

প্রিয়দাসবাবু ও সন্নতবাবু যদি পশ্চিমবঙ্গে কয়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে চান তবে তাঁদের পথ হবে ব্যাপক শোষিত মানবের ঐক্যের ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন সংগঠিত করা।

ওদের দলে কাপকভাবে সমাজ-বিরোধীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এরা সেই একই সমাজ বিরোধীদের দল যারা একদা অতুল্য ঘোষের আমলে ব্রৈড ইউনিয়ন আন্দো-লনকে পিটিয়ে শেষ করত, যুক্তফ্রন্ট আমলে বিভিন্ন বামপন্থীদের দলে বিশেষ করে সি পি এম ঢকেছে, নকশালীদের নামে পাড়ায় পাড়ায় সন্ধ্যাস করে টাকা পয়সা আদায় করেছে আবার আজ নব কংগ্রেসী নাম নিয়ে নানা সন্ধ্যাস চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়বাবু এবং সন্নতবাবুদের মনে রাখা ভাল যে, দপন তাঁদের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে এবং ফাটকাবজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে একমত। কিন্তু দপন-এর সন্দেহ যে, প্রিয়বাবুদের সংগ্রাম বোধ হয় মূলতঃ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হতে চলেছে।

ভারত সরকারের বহির্বাণিজ্যিক নীতিতে নতুন ধরনের দাস মনোবৃত্তি

(বিশেষ প্রতিনিধি)

নয়াদিল্লী, উনিশে নভেম্বর : ভারত সরকারের বহির্বাণিজ্যিক নীতিতে সম্প্রতি এক নতুন ধরনের দাস মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

অতীতপ্রায় অর্থনৈতিক সাহা-য্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের উপর ক্ষমতা বজায় রাখার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের এবং প্রাচ্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি (পশ্চিম জার্মানি, যুক্ত-রাজ্য এবং জাপান বিশেষ করে) তাদের পত্রনো কারখানাগুলিকে —যেগুলি নতুন টেকনোলজিকাল আবিষ্কারের ফলে অকেজো হয়ে গেছে—ভারতবর্ষে চালান করে দিতে ইচ্ছা করে। এখনকার শিল্প-পতিরা এই কারখানাগুলিকে ভারত-ধরনের শুল্ক এদেশের অর্থনৈ-

বর্ষে উক্ত পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, কারণ এগুলি এ দেশের বর্তমান কারখানাগুলির তুলনায় বেশ আধুনিক এবং বেশী শ্রমিক খাটানোর পক্ষেও উপযোগী অর্থাৎ লেবর ইনটেনসিভ। অবশ্য বিদেশী রাষ্ট্রগুলি তাদের কারখানা চালান করতে রাজি একটি শর্ত—এই সব আমদানি করা কারখানাগুলিতে যে সব উৎপাদন হবে তা একমাত্র ঐ দাতা দেশগুলিতেই রপ্তানি করা যেতে পারে। স্বভাবতই রপ্তানির হার এবং দাম বেঁধে দেবে ঐ দাতা দেশগুলিই।

অতএব দেখা যাচ্ছে, এক নতুন ধরনের শুল্ক এদেশের অর্থনৈ-তিক বিকাশের গলার পরালো হয়েছে। অল্প খরচে এদেশের শ্রমিক-দের দিয়ে শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত করে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সেই সব দ্রব্য সম্প্রতি কিনবে। এর ফলে অনেক-গুলি লাভ। তাদের নিজেদের দেশের অকেজো কারখানাগুলিকে আমাদের ঘাড়ে চাপানো যাচ্ছে, সম্প্রতি এ-দেশের শ্রমিকদের শ্রম কেনা যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠীবাও কিছুটা অশ্বাসের প্রতিশ্রুতি পাচ্ছে এদেশের বেকারি সমস্যার আর্থিক সমাধানে।

অরুণা বিদেশী ধনতন্ত্রকে প্রশংসা দেওয়ার এই সরকারী নীতির বিরুদ্ধে কিছু কিছু দেশীয় ব্যব- (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

মেডিকেল কলেজ ও নীলবর্তন সরকার হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তার

সি আই এর হয়ে কাজ করছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নির্ভরযোগ্য মহলের খবর থেকে জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গে আমেরিকান গ্যোয়েন্ডা সংস্থা সি-আই-এ এক ব্যাপক জাল বিস্তার করে চলেছে। এই গ্যোয়েন্ডা সংস্থার পূর্বাঙ্গের প্রধান কেন্দ্র জামসেদপুরের জুবিলী পার্কে। যতদূর জানা গেছে পশ্চিম বাংলার কয়েকটি মফস্বল হাসপাতাল এবং কলকাতার মেডিকেল কলেজ ও নীলবর্তন সরকার হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তার এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন। এই ডাক্তারদের প্রতিমাসে আট থেকে নয় হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এই কলেজগুলিতে যে সমস্ত ছাত্র

ডাক্তারী পড়ে তাদের মধ্যে যারা একটু বেশি রিলিয়ান্ট তাদের মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে জামসেদপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিয়ে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য পশ্চিম বাংলার যাতে সি আই এ ভাল ভাবে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে লেবার বেস্টে। যে সমস্ত এলাকায় কম্যুনিষ্ট আধিপত্য আছে সেই সমস্ত এলাকায় এই সব ছাত্রদের জামসেদপুর থেকে উপস্থিত ট্রেনিং দেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে কাজ করবার জন্য ফেরত পাঠান হচ্ছে। যারা ডাক্তার ছাত্র তাদের সি

আই-এর টাকার বিভিন্ন শিল্প এলাকায় ডিসপেনসারী বা ডাক্তারখানা খুলে দেওয়া হচ্ছে। তারপর এই সমস্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত ডাক্তাররা শ্রমিকদের বিনাপয়সায় চিকিৎসা ওষুধ প্রভৃতি সরবরাহ করে শ্রমিকদের কাছে জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করছে। এই রকম কয়েকটি ডিসপেনসারী বা ডাক্তারখানা হাওড়া, বাগান, বজবজ, ক্যারাকপুর, দমদম প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প এলাকায় এখনও রয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার মেডিকেল কলেজের জনৈক ডাক্তার এই কলেজের দুজন ছাত্রকে ফাঁদে ফেলেন। তারা যখন জামসেদপুরে গিয়ে ব্যাপারটি বুঝতে পারে তখন তারা সেখান থেকে চলে আসে।

জামসেদপুরের জুবিলী পার্কের পেছনে জেড্ডিয়ার লেবার ইনস্টিটিউট নামে একটি সংস্থা পূর্বাঙ্গের সি আই এর প্রধান কেন্দ্র। এখানে প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রাক্তন নিউট্রেন এ্যাডভাইজার মিঃ জে জে ও কৌনার হচ্ছেন ডিরেক্টর। তাঁকে প্রতিমাসে এর জন্য প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া তার জন্য প্রথম শ্রেণীর একটি লাক্সারী বাড়ী দেওয়া হয়েছে। এখানে আরো একজন আমেরিকান কাজ করছেন তার নাম মিঃ পিটার কেনেডি। এই লেবার ইনস্টিটিউটে আবার ট্রেনিং নিচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি, ভি, গিরির এক নাতি।

বিহারের হিম্মত কাগজের সম্পাদক রাজমোহন গান্ধী নামে জনৈক ব্যক্তি এই সংস্থার সঙ্গে

জড়িত আছেন। শোনা যাচ্ছে যে তিনি খুব শীঘ্র কলকাতায় আসছেন এবং কিছু শিক্ষিত বেকার যুবকদের সঙ্গে কথা বলবেন। আর এর মধ্যে রয়েছে হাওড়ার হিন্দু মজদুর সভার জনৈক ইউনিয়ন নেতা। বিশেষ এক সূত্র থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে খতম করার জন্য যাবতীয় অপারেশন জামসেদপুর থেকে হচ্ছে। আবার এক সূত্র থেকে জানা যায় যে টাটা গ্রুপও এর সঙ্গে জড়িত আছে। পশ্চিম বাংলার ছোট ছোট কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে এরা প্রচুর টাকা দিয়ে দলে টানবার চেষ্টা করছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে দুজন ছাত্রকে সম্প্রতি নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে একজনের নাম শিবেন চক্রবর্তী।

বীরভূমে প্রতিরোধ বাহিনীর অত্যাচারে জনগণ আতঙ্কিত

(বিশেষ প্রতিনিধি)

আজ বীরভূম জেলার কয়েকটি এলাকা থেকে সি পি এম ও নকশালদের উৎখাত করার জন্য শাসক কংগ্রেস ও পুলিশ উভয়েই উঠে পড়ে লেগেছে। শাসক কংগ্রেসের তৈরী এবং পুলিশের মদত পাওয়া প্রতিরোধ বাহিনীর ভয়ে বহু সি পি এম কর্মী আজ ফেরার। ফলে এদের পরিবারের লোকজনের ওপর অকথা অত্যাচার চলছে। সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে অপদৃষ্ট হচ্ছেন। এমন কি তাদের প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে বলে অনেক মনে করছেন।

বিশ্ববস্ত্রসূত্র থেকে জানা গেছে সমগ্র বীরভূম জেলাতে কংগ্রেসী প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। বোলপুর রামপুরহাট, সাঁইখিয়া, লাভপুর প্রভৃতি এলাকাতে প্রতিরোধ বাহিনীর লোকেরা সি পি এম সমর্থকদের প্রায়ই খুন করছে বলে অভিযোগ

করা হয়েছে। এদের অত্যাচারের ফলে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক আজ এক আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বোলপুর রামপুরহাটে সি পি এমের কোন পত্রিকা (গণশক্তি) চুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বোলপুর সফরের সময় একটি সংবাদ শব্দে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সংবাদে প্রকাশ, ওখানকার বাহিনীকে রক্ষাসরকার নাকি বিচারের নামে মানব খুন করার অনুরোধ দিয়ে দেয়। অর্থাৎ প্রতিরোধ বাহিনী যাকে মনে করবে সমাজবিরোধী তাকে যে কোন সময় খুন করতে পারে। এর জন্য পুলিশ বা উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না। গত কয়েক সপ্তাহে সমাজবিরোধী নাম দিয়ে এইরকম কয়েকটি যুবককে প্রতিরোধ বাহিনী গুলি খুন করেছে। যাদের আজও পশ্চত কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

অথচ পুলিশ কলছে তাদের জেলহাজতে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই যুবকদের আত্মীয়রা জেল হাজতে তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাদের অনুরোধ দ্রুত দেওয়া হচ্ছে না। এই যুবকদের মধ্যে অধিকাংশই সি পি এমের কর্মী। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে যাদের সমাজবিরোধী বলে ধরা হচ্ছে তারা নিতান্ত ছাত্র ও শিক্ষক। আসল সমাজবিরোধীরা শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বিবাদে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতন সফর করার সময় এই একই অভিযোগ শুন। দর্শিত জন অধ্যাপক নাকি অত্যাচারের ভয়ে আজও ফেরার। এই জঘন্য অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পাঁচ জন পুলিশ কর্মীর নাকি চাকরী গেছে বলে নির্ভরযোগ্য মহলের খবরে জানা যায়।

অপরদিকে পুলিশের কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা জানান যে প্রকৃত সমাজ বিরোধী বা খুনীকে পুলিশ সব সময়েই গ্রেপ্তার করছে এবং তাদের কার্যকলাপ দমন করবার জন্য পুলিশ সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। অথচ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, পুলিশ প্রতিরোধ বাহিনী এবং সমাজবিরোধীদের মদত দিচ্ছে বোলপুর ও রামপুরহাটের দুজন পুলিশ অফিসার আমাদের জানান যে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। দল্লভত নির্বিশেষে পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকে সবসময়েই গ্রেপ্তার করছে।

রামপুরহাট, বোলপুর, ইলুম-বাজার প্রভৃতি এলাকায় রাতি দশটা পর্যন্ত কয়েকদিন ধরে দেখলাম আইন শৃঙ্খলার এখনও তেমন কোন উন্নতি হয় নি। রামপুরহাট বোলপুর সিউড়ী, ইলুমবাজার

প্রভৃতি এলাকার দোকানদার জানালেন, “স্যার আগে যে অবস্থা ছিল এখনও সেই অবস্থাই রয়েছে। এখন তো সংস্থার পর দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যেতে হচ্ছে। খদ্দেররা আতঙ্কে বাহিনী না বের হবার ফলে বিক্রী অনেক কমে গেছে এবং হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে দোকান বন্ধ করে দিতে হতে পারে।

কয়েকজন কৃষককে ইলুম-বাজারে প্রশ্ন করে জানতে পারি এখন নাকি তাদের কাছে প্রায়ই লোক আসছে ফরওয়ার্ড ব্লক বা শাসক কংগ্রেসের সদস্য হবার জন্য। ফলে চাষ বাস ফেলে এখন চিন্তা করতে হচ্ছে যে, কোন দলে যাই।

মোটের ওপর বীরভূমের অবস্থা দেখে মনে হলো কয়েকটি এলাকা অর্থাৎ সাঁইখিয়া ছাড়া প্রায় সব কয়েকটি এলাকায় প্রতিরোধ বাহিনীর অত্যাচার বেড়ে চলেছে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের গণডেপুটেশন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের আপকালীন কয়েকটি জরুরী বিষয় নিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে গত বোলই নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়।

আলোচ্য জরুরী বিষয়গুলির মধ্যে ছিল পাঁচই নভেম্বরের সফল পশ্চিমবঙ্গ দিবস, প্রতিপালনের পরও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এক বিরাট সংখ্যক কর্মীর উপর বেপরোয়াভাবে সাময়িক বর-

খাস্তের আদেশ জারী ও কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার, বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মিথ্যাকারণে চার্জশীট ও শো-কাজ দেওয়া দ্রুতমূল্য বৃদ্ধি এবং কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ কর্মীদের সম্মানের স্বাক্ষর।

কমিটির বঙ্গ সম্পাদক শ্রীঅজয় মর্যোপাধ্যায় জানান : হুগলী বর্ধমান জেলার কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম সারির নেতাদের বিনা-

কারণে সদ্য গ্রামাঞ্চলে বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি বেলঘাটা যাদবপুর, টালিগঞ্জ, শ্রীরামপুর, বেহালা, দমদম ক্যান্টনমেন্ট প্রভৃতি অঞ্চলে গুলুদারের শ্রমী কয়েকজন কর্মীকে হত্যার কথাও উল্লেখ করেন।

উনিশশ সত্তর সালে আগস্ট মাসের তিনদিনের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে রুজু করা মিথ্যা মামলার সরকারী পক্ষের পরাজয় এবং অন্যদিকে নব কংগ্রেসী লেজার সংগঠন

ছাত্র পরিষদের বেলঘাটা সেলস্-ট্যান্ড অফিসে হামলার কথাও জোরের সঙ্গে আলোচিত হয়।

অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি স্থির করেছেন যে বরখাস্ত বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জরুরী দাবীদায়কে যুক্ত করে সাতশে নভেম্বর রাজ্যপাল এবং জেলা মহকুমা ব্লক পর্যায়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ছটির পর মিছিল করে গণডেপুটেশন দেওয়া হবে। উল্লিখিত দাবীগুলি হোল : (এক) নেতৃব-

দের উপর থেকে স্বেচ্ছাচারী বরখাস্ত আদেশ সমূহ প্রত্যাহার ও সরাসরি বরখাস্ত করার ক্ষমতা বাতিল। (দুই) ব্রেক-সার্ভিসের আদেশ বাতিল (তিন) বেতনকাটা, শাস্তিমূলক বদলী, চার্জশীট, শো-কাজ, প্রভৃতি সর্বপ্রকার পীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার, (চার) দ্রুতমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে প্রাপ্য মর্যাদা, প্রদান (পাঁচ) প্রয়োজনীয় সংশোধনী বেতন কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠের সুপারিশ কার্যকর করা প্রভৃতি।

ভারত দর্শন

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের নামে কংগ্রেস দিশাহারা

(দর্পণের পর্ববৈক্য)

গত সতেরোই নভেম্বর লোক-সভায় পশ্চিমবঙ্গের অসহনীয় অবস্থা নিয়ে সি পি এম দলভুক্ত সংসদ সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসু এবং শ্রীসমর মখাজী যে মূলত্বুরী প্রস্তাব এনেছিলেন তার আলোচনা কালে শাসক কংগ্রেস পক্ষ থেকে যে কৌতুকজনক যুক্তির অবতারণা করা হয়, তা নিয়ে সাংবাদিক মহলে সরস আলোচনার যথেষ্ট খোরাক জুটে গেছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীকে সি পন্ড বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে শান্তিশৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু বাংলা দেশ থেকে বহু সংখ্যক শরণার্থী আসার দরুন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করা কি ভাবে সম্ভব তা তিনি বঝতে পারছেন না।

যখন সি পি এম সদস্যরা উল্লেখ করেন যে হিন্দুরা যে অধিবাসী আছেন, শরণার্থী সংখ্যা প্রায় তার সমান হলেও হিন্দুরা রাজ্যে বাহ্যিক সালের ফেরার মাসে নির্বাচন করা হবে, আসামে, মেঘালয়ে শরণার্থীর চাপ প্রচণ্ড হওয়া সত্ত্বেও ঐ রাজ্যগুলিতেও নির্বাচন করা হবে, কেরল মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই শরণার্থীদের জন্যে নির্বাচন করা হবে না, এটা কিরকম যুক্তি—তখন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মর্শাকলে পড়ে যান। কারণ তিনি নিজে এবং মন্ত্রিসভার তাঁর কিছু সহকর্মী পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন করার পক্ষপাতী অর্থাৎ তাঁকেই সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচনের বিপক্ষে ছেঁদো যুক্তির অবতারণা করতে হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে পক্ষসাহেব দাবী করার সি পি এম সদস্য দাবী করেন যে সেই কথাটা সাধারণ নির্বাচন করে বাচাই করে নেওয়া হউক। পক্ষসাহেব অত্যন্ত নিরন্তর।

চূড়ান্ত হাসির খোরাক জুগিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাংকো পাঞ্জা সিদ্ধার্থ রায়। তিনি একই মত্রে বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে শান্তিশৃঙ্খলার বহুল পরিমাণে উন্নতি হয়েছে আবার সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে কোন হাই কোর্টের জজই ভয়ে বরানগর কাশীপুর্ন গণহত্যার তদন্ত করতে রাজী হচ্ছেন না তাই তদন্ত করা সম্ভব হয় নি।

আর এস পির ত্রিদিব চৌধুরী মূলত্বুরী প্রস্তাব সমর্থন করে জোর করে বলেন যে সিদ্ধার্থবাবুর বক্তৃতা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনে এমনভাবে

আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে যে হাইকোর্টের জজকেও আততায়ীর হাতে আহত বা নিহত হবার আশংকার তদন্ত করতে অস্বীকার করতে হয়।

যদি কংগ্রেসের নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমন্ডলী মশাই নকশালপন্থীদের ছাত্র পরিষদ ও বদ কংগ্রেস থেকে বাছাই করে তাঁড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্তের কথা জোর দিয়ে ঘোষণা করেন।

মজার কথা যে শ্রীজ্যোতির্ময় বসু পশ্চিমবঙ্গে আধা ফ্যাসিস্ত সরকার পরিচালিত ও সংগঠিত হাঙ্গামা ও আক্রমণের যে পরিকল্পনা সরকারী গোপন সাক্ষীর থেকেই জানা যায় বলে উল্লেখ করেছেন, সরকার পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ পর্বন্ত করা হয় নি। নীরব থেকে সরকারপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে হত্যাপরোধে যে অভিব্যক্তি হয়ে রইলেন, তা উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে রাজনৈতিক খুন, হত্যার চেষ্টা, গ্রেপ্তার প্রভৃতির এক হিসাব আঠারোই নভেম্বর দাখল

বিদেশ দর্শন

সোভিয়েতের অর্থনৈতিক চাপে কাস্ত্রোর নীতিবদল

(দর্পণের পর্ববৈক্য)

গত সপ্তাহে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রো ঘোষণা করেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে নির্বাচনের ভূমিকাকে তিনি কখনোই অগ্রাহ্য করেন নি। কাস্ত্রো কিউবার বিপ্লবের পর এই প্রথম সান্তিয়াগোতে যান, চিলির মার্কসবাদী নেতা সালভাদোর অ্যালেনডী গসেনসের নেতৃত্বে বামপন্থী কোম্রালিশন সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে গত বছর অ্যালেনডী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে।

কাস্ত্রোর ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ। যে কাস্ত্রো আজ বিশ্বের সর্বত্র কম্যুনিষ্ট ও জঙ্গী বামপন্থী মহলে সশস্ত্র সংগ্রামের নীতির অন্যতম ধারক ও বাহক বলে পরিচিত, তাঁর মূখে নির্বাচনের কথা আজ মনে হয় ইঙ্গিত করে কিউবার পররাষ্ট্র নীতির কোন বিশেষ পরিবর্তনের দিকে।

কিউবার পররাষ্ট্র নীতিতে যে পরিবর্তন ঘটছে তাতে সন্দেহ নেই। এই পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রসঙ্গে।

করা হয়েছে। রাজ্যসভার শ্রীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি মন্ত্রী শ্রীএফ এইচ মহসীন জানান যে এরপর পল্লী জানরয়ারী থেকে একদিনে অক্টোবর দশমাসে পশ্চিমবঙ্গে মোট এক হাজার সাহিদ্দ জন রাজনৈতিক কারণে নিহত হয়েছেন, এর মধ্যে আটগো আটজন নিহত হয়েছেন পল্লী জুলাই থেকে পনেরোই অক্টোবরের মধ্যে। হত্যাগণের জন্য তিনি নকশাল, চরমপন্থী ও সমাজবিরোধী কৃষিকর্মীদের দায়ী করেছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, শ্রদ্ধা, মাদ্র আগন্ত সেপ্টেম্বর দু মাসে পদলিঙ্গ সি আর পি ও সামরিক বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন চরমবদই জন। পশ্চিমবঙ্গে, কি ভাবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা হচ্ছে তার নমুনা দেখে অন্যান্য রাজ্যের নব কংগ্রেসী সদস্যরাও স্তম্ভিত হয়েছেন। এবং এর জন্যে কোন তদন্তই হবে না বলে নব-কংগ্রেসী সরকার আগে ভাগে ঘোষণা করার ফলেই যে পদলিঙ্গ প্রশাসন এমন বে-পরোয়া ভাবে নাগরিকদের খুন করার কাজে হাত লাগিয়েছে এটা জেনেও অনেকেই স্তম্ভিত হবেন।

অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করার দাবী আজ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির বেনামে নব-কংগ্রেসী শাসন সম্পর্কে রায় গ্রহণের, দাবী, নাগরিকদের নিরাপত্তা সর্নিশ্চিত করার এবং জঙ্গী আইনের অবসান ঘটানোর দাবীতে

পরিণত হয়েছে। নব কংগ্রেসী শাসকরা তাই আড়ম্বরে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নির্বাচন হলে তার ফল তাদের পক্ষে কি দাঁড়াবে জানে বলেই তারা এমন দিশেহারা হয়ে স্বরিরোধী উক্তি করে চলেছে।

কেরল

কেরলে কংগ্রেস নিরাস্ত্র দক্ষিণ পন্থী কমিউনিষ্ট দলের মধ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন মশাই আঠারোই নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, যে কেরল সরকার বিদেশী মালিকাবাদী চা, কফি ও রবার বাগিচাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করে যে অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন, এখন পর্বন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি তাতে পাওয়া যায় নি। তিনি সম্মতি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কোন কোন উচ্চ মহলের অফিসারেরা এই অর্ডিন্যান্সটাই বানচাল করে দেবার জন্যে সক্রিয় হয়েছেন বহুই। কেন্দ্রীয় সরকার এব্যাপারে গড়িমসি করছেন।

অচ্যুত মেনন প্রগতিশীল ইন্দিরা সরকারের নামে সোজাসজি অভিযোগ করতে সাহস পান নি, কারণ তাহলে সেটা তার পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে চলে যায়। তাই তিনি, শ্রদ্ধা, উচ্চমহলের কর্মচারীদের উপর দোষারোপ করেই ক্ষান্ত হতে চেয়েছিলেন যাতে জাতও থাকে, মানও রক্ষা হয়।

কিন্তু নব কংগ্রেসীরা এই মূদ,

সমালোচনাও সহ্য করতে আর রাজী নন। তাঁর মন্ত্রিসভার নব-কংগ্রেসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে করুণাকরণ এক পরামর্শ করে অচ্যুত মেননকে সমঝিয়ে দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন পরোক্ষ সমালোচনাও তাঁরা সহ্য করবেন না। তিনি কৈফিয়ৎ চেয়েছেন কেন মধ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে আগে পরামর্শ না করে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন এবং কেন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসারদের সমালোচনা করেছেন। এতে নাকি পরোক্ষে নব কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রতি অশোভন উক্তি করা হয়েছে।

বেচারি অচ্যুত মেনন। পার্টি লাইন আর এগুদশের কলতব ঘটনার মধ্যে যে আকাশপাতাল ফারাক একথা বঝেই সম্ভবতঃ তিনি গা বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নব কংগ্রেসের একচেটিয়া পূর্জিপতি জমিদারদের সেবাদাস হলে গাঁ বাঁচাবারও উপায় থাকে না, একথা এবার তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। অনেক সি পি আই নেতার মতই নব কংগ্রেসে নাম লিখিয়েই তাঁদের মত ভুড় বামপন্থীদের নির্বাণ লাভ ঘটতে পারে একথা বঝে তিনি কবে নাম বদলে পরোক্ষা নব কংগ্রেসী খাতায় হাজিরা সাহি করবেন, কেরলের জনসাধারণ তারই অপেক্ষায় রয়েছেন।

যে মস্কোকে সংশোধনবাদী বলে আক্রমণের কোন সুযোগই আগে কাস্ত্রো ছাড়তেন না, বর্তমানে সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই নতুন বন্ধুত্বের চরম প্রকাশ ঘটে এই বছরের এপ্রিল মাসে যখন কিউবান কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটবুরোর অন্যতম সদস্য, ওসভাল্ডো ডিউকোস সোভিয়েত পার্টির চরিত্রতম কংগ্রেসে বক্তৃতা-কালে লাতিন আমেরিকার গেরিলা যোদ্ধাদের কথা একবারও উল্লেখ করেন না। বরঞ্চ তিনি চিলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনকে কিউবার বিপ্লবেরই আরেকটি পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। তাঁর এই “মার্কসবাদী” বক্তব্যে রুশীরা তাঁদের সাহোদরগণ সহ হাততালিতে সভাকক্ষ মধুরিত করে তোলেন।

অথচ কিছুদিন আগেও কিউবান নেতৃত্বের বক্তব্য কত ভিন্ন ছিল। আজ থেকে চার বছর আগে লাতিন আমেরিকার সংহীত সম্মেলনে তাঁরা পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে যে কোন আইনানুগ কারদায় সংগ্রামের কথা বিপ্লব পরিপন্থী এবং “শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান”

এই কথা দুটি বিপ্লবীদের ভাষা থেকে উৎখাত করে দেওয়া উচিত। যে কাস্ত্রো সেদিন এই ধরনের বক্তৃতা মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্টদের বিদ্রোপে জর্জরিত করেছিলেন তিনিই গত সপ্তাহে সান্তিয়াগোতে নির্বাচনকে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে অন্যতম হাতিয়ার বলে মেনে নিয়ে পরোক্ষে মস্কোকে সমর্থন জানালেন। এর কারণ কী?

কারণটি প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক চাপ। উনিশশো আটটি সালে হঠাৎ রাশিয়ান তৈলবাহী জাহাজগুলি ঠিক সময় এসে পৌঁছল না কিউবান, যার ফলে কাস্ত্রোকে পেট্রল রাশিয়ান-এর কথা ঘোষণা করতে হয়। শ্রদ্ধা তেল নয়, রাশিয়া থেকে শস্যের আমদানীরও ঘাটতি দেখা দেয়। ছোট দেশ কিউবা এই চাপ বেশী দিন সহ্য করতে পারল না এবং নিজের দেশবাসী সহ সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়ে কাস্ত্রো সোভিয়েতের চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ সমর্থন করে বসলেন। এই ছোলা কাস্ত্রোর নীতি বদলের সূচ-

পাত। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির কাছ থেকে মস্কো আক্রমণের ভয় দেখিয়ে যে সমর্থন আদায় করে, কিউবাকেও সে সেইভাবে অর্থনৈতিক ধ্বংসের ভয় দেখিয়ে দলে টানলো। কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের কায়দা এর থেকে আর কী খারাপ হতে পারত?

তবে মস্কো শ্রদ্ধামাত্র কিউবার সমর্থন লাভেই সন্তুষ্ট নয়। কারণ কিউবা তো লাতিন আমেরিকার একটি মাত্র দেশ। মস্কো এখন চাইছে কাস্ত্রোর মাধ্যমে অন্যান্য দেশগুলির, যেমন চিলি, পেরু, যেসব কম্যুনিষ্ট তার সমর্থক তাদের জোরদার করতে—রুশীরা ঠিকই বুঝেছে যে এই কাজে লাতিন আমেরিকার কাস্ত্রোর প্রচণ্ড সম্মান তাকে সাহায্য করবে। তাই কাস্ত্রোর সান্তিয়াগো ভ্রমণ এবং অ্যালেনডীর সমর্থনে ওই বক্তৃতা, যে অ্যালেনডী কিনা চিলির বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই আইন করে সমাজতন্ত্র আনতে চান, যে কায়দাকে কাস্ত্রো এককালে

(শেবাংশ বসু পৃষ্ঠার)

এম এল দলের রাজনীতি প্রসঙ্গে

প্রভঞ্জন দেবরায়

সি পি আই (এম-এল) কিছুকাল আগেও মানুষের মনে যে "ইমেজ" বা ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিল, তা এখন অনেকখানি ম্লান হয়ে তো গেছেই, এমন কি দল হিসাবে তাদের অস্তিত্বও যেন বিপন্ন। যে দল এক বছর আগেও সারা ভারতে বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করার জন্য হাতে কলমে ভাগে গিয়েছিল— অম্বের, শ্রীকাকুলাম, উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরী, বিহারের, রূশাহারি, আসামের গোয়ালপাড়া, ত্রিপুরা; পাজাব; মাদ্রাজ, ওড়িশা মধ্যপ্রদেশ; হিমাচল প্রদেশ; পশ্চিমবঙ্গে বিজিব স্থানে সম্প্রদায় সংগ্রামের স্বাক্ষর "শ্রেণীগত" খতমের কাজে হাত লাগিয়ে দিয়েছিল, তাদের আজ এ কি অবস্থা! একটানা জয় কোনকালেই সম্ভব নয়—লাড়াইয়ে সাময়িকভাবে পরাজয়ও ঘটে, পেছিয়ে পড়তে হয়—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই পেছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে আদৌ আবার উঠে দাঁড়ানো যাবে কি না, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ঘটনার মধ্যস্থ বিবেচনের উপর এবং দোষদুটিগুণী শব্দে নিয়ে আবার কাজে লাগার উপর। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে সি পি আই (এম-এল)-এর বর্তমান নেতৃত্ব তাঁদের সকল রকম আন্তরিকতা সত্ত্বেও মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও-সে তুং চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করতে পারেন নি—ভারতবর্ষের বিপ্লবের জনগণতান্ত্রিক রূপের কথা প্রচার করলেও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মর্মবস্তুটাকে একেবারেই গ্রহণ করতে পারেন নি। এখানে এক এক করে তারই আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ শ্রেণী বিশ্লেষণে ও শ্রেণী সংস্থাপনে (ক্লাস এস্ট্রেন-মেন্ট) তারা ভুল করেছেন। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয় (যদিও ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে প্রথমটাই স্বীকৃতি উপনীত হবার একমাত্র উপায়)—এই কথাটি তারা বড়ো উঠতে পারেন নি। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের কবল থেকে জনগণকে মুক্ত করা—বুর্জোয়াদের সঙ্গে সেখানে সম্পর্কটা নির্ভর করবে এই সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী লড়াইয়ে বুর্জোয়ারা কি ভূমিকা গ্রহণ করছে, তার উপর—যারা এ লড়াইয়ে সহযোগী হবেন, তাদের সঙ্গে হবে বন্ধুত্ব আর যারা বিরোধিতা করবে তারা হবে শত্রু, অর্থাৎ ক্রাইটেরিয়ান বা একমাত্র বিচার্য বিষয়টা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী লড়াই। মাও সে তুং-এর "নয়া গণতন্ত্র" নামক পুস্তকে সেইজন্যই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে দেখান হয়েছে চীনের মূল স্বল্প (বৈসিক

কন্সট্রাকশনস) ও মূল সমস্যা (বৈসিক প্রবলেমস) হিসাবে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তথাকার বুর্জোয়াদের চরিত্র বিশ্লেষণে পরম ধৈর্যের সঙ্গে অনেকখানি পরিশ্রম করেছেন (সি পি আই ও তাঁর "জন-বুদ্ধির জয়" নামক পুস্তকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে চীনের বৈসিক প্রবলেমস বা মূল সমস্যা হিসাবে দেখিয়েছেন) এবং দেখিয়েছেন যে, চীনে বুর্জোয়াদের মধ্যেও "জাতীয় চরিত্রের বুর্জোয়া" (ন্যাশনাল বুর্জোয়াস) ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী লড়াইয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে তিনি তাদের সহযোগিতা আহ্বান করেছিলেন, যদিও তাদের বৈত চরিত্র ও অস্থির ভাবের কথা বহুতেও কোনরূপ ক্রাণ্য করেন নি। শব্দ তাই নয়, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ার পরেও বুর্জোয়াদের জন্য নানা প্রতিশ্রুতির কথাও তিনি তাঁর এই পুস্তকে ও অন্যান্য গ্রন্থে সম্পৃক্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন—"বিপ্লব সফল হওয়ার পরেও 'যে সব শিল্প জনসাধারণের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে না' এমন সব শিল্প ও অন্যান্য ছোট ছোট পরিচালনার অধিকার বুর্জোয়াদের থাকবে এবং এইসব বুর্জোয়াদের সঙ্গে জনগণের যে মন্বল্ব তাকে তিনি "জনগণের মন্বল্বের মন্বল্ব" হিসাবে দেখিয়েছেন এবং এ মন্বল্ব নিরসনের জন্যও শান্তিপূর্ণ পথের নির্দেশ করেছেন। অনেক অতিবিসম্বী মাও সে তুং-এর এই লেখা 'খাপ্পা দিয়ে কাষেস্থানের পরিকল্পনা' বলে মনে করেন। এইসব বিদ্যাবাগীশদের উনপঞ্চাশ সালে চীন বিপ্লব সফল হওয়ার অনেক পরে পঞ্চাশ সালে মাও সে তুং-এর ইয়েনান ফোরামের বিখ্যাত বক্তৃতাটা পড়ে দেখতে বসি, তা হলেই তারা বঝতে পারবেন যে, জাতীয় এবং ছোট বুর্জোয়াদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি চীনের কমিউনিস্টরা দিয়েছিলেন তা মোটেই খাপ্পা নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব। আসলে এইসব ব্যক্তির জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মর্মবস্তু ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতেই পারেন নি। সি পি আই (এম-এল)-এর নেতৃত্বও শব্দমাত্র সাম্রাজ্যবাদ (বর্তমান অবস্থায় নিশ্চয়ই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সমেত) ও সামন্তবাদকে ভারতের মূল স্বল্প বা সমস্যা (বৈসিক কন্সট্রাকশনস বা প্রবলেমস) হিসাবে তুলে ধরে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বুর্জোয়াদের ভূমিকার বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। তাদের পার্টি প্রোগ্রামে সত্তর সালে তারা মূল স্বল্প হিসাবে দেখিয়েছেন সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ; সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক মন্বল্বসম্পন্ন পুঞ্জিকে (চোর পাহাড়ের বোকা হিসাবে), এবং পরবর্তী

একটি প্রবল (দেশরতীতে প্রকাশিত) তাদের সর্বোচ্চ নেতা চারু মজুমদার বলেছেন ভারতে কোন "জাতীয় বুর্জোয়া" নেই। এছাড়া তাদের পার্টি প্রোগ্রামে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ার পর কোন প্রকার বুর্জোয়াদের জন্যই কোন রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি। এ থেকে এটা সম্পৃক্ত যে, এরা মাও সে তুং-এর "বৈসিক প্রবলেম" কথাটার তাৎপর্ষ্য একেবারেই উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং জনগণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একাকার করে ফেলেছেন। অথচ মাও সে তুং তাঁর "নয়া গণতন্ত্র" পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন "জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে—একই-বইয়ের দুটি খণ্ডের মত—প্রথমটা শেষ করে তবেই দ্বিতীয়টা বাওয়া যায়" অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যে line of demarkation বা সীমারেখাটা তাঁর লেখায় সম্পৃক্ত। আর তিনি শব্দ বলেছেন, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে অক্ষরে অক্ষরে এই নীতিকে কার্যকরীও করেছেন বুর্জোয়াদের দেওয়া তাদের সকল প্রতিশ্রুতিগুলিকে পূরণ করে।

বর্তমান লেখকের এই লেখাটি পড়ে যেন কেউ মনে না করেন যে, সি পি আই (এম-এল) তাদের পার্টি প্রোগ্রামে বুর্জোয়াদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়ার লেখক বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে ওকালতি করছেন। আসলে এ লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই বোঝানো যে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে দুটি কর্তব্য (Basic tasks)—"দেশকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে সম্পূর্ণ করা ও সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সমাজব্যবস্থার পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা" (মাও-সে তুং এর ভাষায়) এ কথাটা সি পি আই (এম-এল)-এর নেতৃত্ব বড়ো উঠতে পারেন নি। তারা অতীতসাহে একই সঙ্গে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার "সটকট" আদানী করে ফেলেছেন মাও-সেতুং-এর সাবধানবর্ণীর মর্মার্থ বঝতে না পেরে। এর পরিণাম একদিকে দাঁড়িয়েছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে একটা জগাখিড়ী আদানী আর একদিকে শ্রেণী বিশ্লেষণে ভুল হওয়ার শত্রু সংখ্যা বাড়ানো।

"ভারতবর্ষ একটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক দেশ এবং সাম্রাজ্যবাদ এখানে নয়া-ঔপনিবেশিক কার্যদার (অর্থাৎ স্থানীয় শাসক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিসিয়ে) শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে", সি পি আই (এম-এল) যেখানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সেখানে কি করে তারা বলেছেন যে এখানে জাতীয় বুর্জোয়া কেউই নেই!

বিদেশী পুঞ্জ ও দেশী পুঞ্জ দুইই থাকবে অথচ তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে না—এ রকম মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, বিরোধী চিন্তা তারা করছেন কি ভাবে? মার্কসীয় অর্থনীতি অনুসারে এ দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী এবং চীন দেশে মাও-সে তুং তো এ দ্বন্দ্ব সম্পৃক্তভাবেই দেখতে পেরেছিলেন, যার জন্য তিনি সেখানকার জাতীয় বুর্জোয়াদের কথা বলেছেন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে, এই জাতীয় বুর্জোয়া জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অস্থির বা ইতস্ততঃকারী (vacillating) মিত্র। কিন্তু সেই অস্থির মিত্রদের এবং অন্যান্য ছোট ছোট পুঞ্জপতিদের জন্যও নানা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে এবং সেগুলিকে কার্যকরী করে চীনের কমিউনিস্টরা তাদেরকে স্থায়ী মিত্র পরিণত করতে পেরেছিলেন এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এই নীতির সফল এই হয়েছিল যে, তাঁরা শত্রু সংখ্যা কমাতে পেরেছিলেন, বুর্জোয়াদের শিবিরে ভাঙন ধরতে পেরেছিলেন এবং বিপ্লবকে সহজতররূপে বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। সি পি আই (এম-এল)-এর নেতৃত্ব নিশ্চয়ই এ কথা বলতে পারবেন না যে, এই নীতি গ্রহণ করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তথা মাও সে তুং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। সি পি আই (এম-এল) কেও ঠিক এই নীতি অনুসরণ করে সম্পৃক্ত ভাষায় ঘোষণা করতে হবে যে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পন্থ যে সমস্ত শিল্পী জনগণের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সেগুলি এবং অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প পরিচালনার অধিকার বুর্জোয়াদের থাকবে এবং সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রামে সহযোগী বুর্জোয়াদের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বকে জনগণের ভিতরকার দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচনা করে সর্বদা তার শান্তিপূর্ণ নিরসনের ব্যবস্থা করা হবে। এই নীতি ঘোষিত হলে সর্নিশ্চিতরূপে ভারতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে ভাঙন শুরু হবে এবং তাদের মধ্য থেকে "অর্থনৈতিক সংঘর্ষে ক্রমশঃ পুরাজিত ও কোণঠাসা" একদল অবশ্যম্ভাবীরূপে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হতে থাকবে—শত্রু দর্বল হবে, বিপ্লবের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের "জনগণ" বলতে মাও সে তুং বুর্জোয়াদের এই অংশটুকুকেও সঙ্গে রেখেছেন, বাদ দেননি।

সি পি আই (এম-এল) সাহসিকতার সঙ্গে তাদের পার্টি প্রোগ্রামে এই ঘোষণা করতে পারেনি। কারণ তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নির্গলিতার্থ, বিশেষ করে জনগণতন্ত্রের অর্থনীতি উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়েছেন—মাও সে তুং-এর পুস্তকগুলি পড়া সত্ত্বেও তাদের এক হীনমন্যতা (inferiority complex) পেয়ে বসেছে

"দ্বিবিবা এ রকম ঘোষণাওয়া বুর্জোয়াদের দালাল করা হচ্ছে যাবে" তাই তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রেণী বিশ্লেষণ ও শ্রেণী সংস্থাপনের এই অতি গুরুত্বটাকে একেবারে এড়িয়ে গেছেন এবং অতি বামপন্থার পথ গ্রহণ করে একটিমাত্র কথাতেই কাজ সেরে দিতে চেয়েছেন যে, "ভারতবর্ষে কোন জাতীয় বুর্জোয়া নেই। ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্বার্থে তাদের এই ভুল অবিলম্বে শব্দে নিতে হবে।

শ্রেণী বিশ্লেষণ ও সংস্থাপনে তাদের আর একটি গুরুতর ভুল হচ্ছে ধনী কৃষকদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা। অতি বিপ্লববাদের শিকার হওয়ার সি পি আই (এম-এল) কনফারমেশন-এর তত্ত্বে এমনই বন্দ যে তারা কাউকে শত্রু অথবা মিত্র এ ছাড়া অন্য কোন পর্যায়ে ফেলেতেই পারছেন না। অথচ লড়াইয়ের আর একটা কার্যকরী পদ্ধতি হচ্ছে neutralisation বা নিষ্করকরণ মিত্র হিসাবে যাকে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে যদি অস্তিত্ব নিষ্কর করেও রাখা যায়, তবে তার ফলে বন্ধুজয় অনেক সহজ হয়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ভূমিহীন ও গরীব কৃষক মধ্যকৃষকের সঙ্গে মিত্রতা যেমন গড়ে তুলবে, তেমনি সম্পৃক্তভাবে ঘোষণা করবে যে, ধনী কৃষকের সঙ্গে তাদের কোনই বিরোধ নেই যদি তারা জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের পক্ষ হয়ে এগিয়ে না আসে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে ধনী কৃষকদের ধ্বংসও করা হয় না। তাই এই নীতি ঘোষিত ও কার্যকরী হলে ধনী কৃষকেরা অনেকখানি স্বস্তি বোধ করবে এবং জোতদার-জমিদারদের সহায়ক করতে গিয়ে অথবা শত্রুতা ডেকে আনার থেকে বিরত থাকবে। বাস্তবায়ন মনে করবে। এইভাবে ধনী কৃষকদের নিষ্কর বা নিউট্রালিটি-র অবস্থায় নিয়ে আসতে পারলে আসল শত্রুকে পরাস্ত করা অনেক সহজ হবে। কারণ গ্রামাঞ্চলে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে জোতদার জমিদার মহাজন শ্রেণীর তুলনায় ধনীকৃষকদের সামাজিক বোঝাপড়া অনেক বেশী হওয়ার এরা শ্রেণী সংগ্রামের কাজে বাগড়া দিতে আরম্ভ করলে অনেক বেশী ক্ষতি সাধন করে। জনগণতন্ত্রের অর্থনীতির কথা মনে রেখে এই ঘোষণা প্রচারে শব্দ যে কোন রকম বাধাই নেই, তাই নয়, বরং কৌশলের দিক থেকেও এটা একটা অবশ্য করণীয় কাজ। অথচ এ ব্যাপারে সি পি আই (এম-এল) একটা ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়েছে বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে কল্টিকত করেছে মিত্র। এও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বঝতে না পারারই আর একটা নিদর্শন।

সি পি আই (এম-এল)-এর স্বীকৃতি মরাস্ত্রক ভুল হচ্ছে বিপ্লবের টাইমিং বা বিপ্লব শব্দ করার সময় সম্বন্ধে। সমাজ যেখানে (শেষাংশ অক্ষর পুস্তক)

সি পি এম বিচ্ছিন্নতাকামী নয়

সি পি আই এম-এর আসন্ন পার্টি-কংগ্রেসের আগে প্রবল জল্পনা—এবার সি পি আই এম রাজ্য-গত স্বায়ত্তশাসনের দাবীটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একেবারে আলাদা হয়ে যাবার দাবী করবেন। সি পি এম নেতারা তাদের এই সংক্রান্ত পার্টি দলিল থেকে সংবাদপত্রে খানিকটা উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রচারের প্রতিবাদ করলেও, জল্পনার নিরসন হয়নি।

কিন্তু ‘পার্টি’ নেতৃবৃন্দের সর্বোচ্চ স্তরে এই প্রচারকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে পার্টির একজন বড়ো নেতার বক্তব্য : ভারত-বর্ষে এ ধরনের প্রশ্ন ওঠেই না। ধারা রুশী উদাহরণ দেখাচ্ছেন, তারা জানেন না, ওখানকার সমস্যাটা একেবারেই আলাদা ছিল। বিপ্লবের আগে রাশিয়া ছিল “জাতি-সমূহের কারাগার।” অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবটাই ছিল হোয়াইট রাশিয়ানদের দাপট। অন্যান্য জাতিগুলোর আত্মবিকাশের সমস্ত অধিকার ছিল অবদমিত। স্বভাবতই, নিপীড়িত জাতিগুলোর কাছে আত্মবিকাশের প্রশ্ন একেবারে চেয়ে বড়ো স্থান দিলেছিল। তাই স্তালিনকে যখন জাতিসমূহের কমিসার করা হয়েছিল, তিনি সাংবিধানিক ভাবে জাতিগুলোর আলাদা হওয়ার অধিকার মেনে নিয়েছিলেন। আর পার্টির কাছে তাঁর নির্দেশ ছিল জাতিসমূহের একেবারে ভিত্তিতে অখণ্ড রাশিয়া গড়ে তোলার প্রচার চালাও। আপাতদৃষ্টিতে বিপ-

রীতমণী হলেও গণ্ডগোল কিছু নেই। কারণ, জার শাসিত রাশিয়ায় হোয়াইট রাশিয়ানদের যে সার্বভৌম অধিকার, শ্রমিকশ্রেণী শাসিত রাশিয়ায় সে অবস্থা ছিল না। বরং ছোট বড়ো নির্বিশেষে প্রতিটি জাতি

মতামত

বেড়ে ওঠবার অবকাশ পেয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয় একেবারে জন্ম তাই পার্টির সংগ্রাম। আরেকদিকে চীনে পার্টি সাম্রাজ্যবাদী দেশ মিলে লড়েছে। সরাসরি চীন রাজনৈতিক ভাবে কখনো কোন দেশের উপনিবেশ ছিল না। যদিও অর্থনৈতিক ভাবে পার্টি সাম্রাজ্যবাদী দেশ একটা টেরিটোরিয়াল রাইটের গালভরা

ছদ্মনামে দেশটিকে শুষে খেয়েছে। তাই চীনের জনগণের কাছে জাতীয় সংহতির প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারতে এ দৃষ্টির কোনটিই নয়।

এখানে একচেটে পুঁজি, সামন্ত তন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের স্তরে রাষ্ট্র ক্ষমতায়। এখানে হোয়াইট রাশিয়ানদের স্বত

কোন একটি জাতির একক অত্যাচার নেই। চেহারাটা পরোপদ্রি শ্রেণীবিদ্বেষের। তারই ফলে বিচ্ছিন্ন জাতি নিষ্পেষিত হচ্ছে, অবদমিত হচ্ছে। এখন বিচ্ছিন্নতার ভাব জাগিয়ে তুলছে শাসক গোষ্ঠী তার নিজের স্বার্থে। তাই পৃথক তেল-পানি আন্দোলনে, শাসক কংগ্রেস থেকে আশীর্বাদ করেন চাবন মহারাজের শিবসেনাদের। তারাই

ফ্যাসী ক্লাব সম্পর্কে

গত পনেরোই অক্টোবরের দর্পণে জনৈক মহিলা প্রেরিত “বৈদ্যপদে অঙ্গুলে সন্ধ্যাসের রাজত্ব” সংবাদের জন্য উক্ত মহিলা এবং দর্পণ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পার্টি নভেম্বর প্রকাশিত দর্পণে দেখলাম, রাজরাজেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষিকার নামে একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসী ক্লাবের সদস্যরা উক্ত মহিলার সম্মান করতে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের

প্রধানা শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষিকাদের প্রাণশেষে হুমকি দেখায় এই বলে যে “এ সংবাদ আপনারা দর্পণে দিয়েছেন; না দিয়ে থাকলে এর একটি প্রতিবাদপত্র দর্পণে প্রকাশের জন্য আপনাদের দিতে হবে।” এর অনিবার্য ফলস্বরূপ এই প্রতিবাদ পত্র।

ফ্যাসী ক্লাবের সদস্যরা গোটা অষ্টম প্রশাসন ও পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বিভীষিকার রাজত্ব চালাচ্ছে। জামালউদ্দিনকে হত্যা করেছে ফ্যাসী ক্লাবের এক মান্তান। গায়ে এ্যাসিড ঢেলে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে আবদুল মান্নানকে।

গত তিরিশে অক্টোবর তারিখে এরা পীড়াগ্রাম ও রানজামানা-গ্রামের মধ্যবর্তী রাস্তার সকলের সামনে সকাল নয়টায় এক কব্জিকে খুন করে। এছাড়া সি আর পি-র হাত থেকে রাইফেল নিয়ে গ্রামে গ্রামে লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ নিরমিতভাবেই ঘটে চলেছে।

এই সব ঘটনার পরেও আর কি প্রতিবাদ পত্রের লেখিকা অস্বীকার করতে পারবেন, রাজরাজেশ্বর বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার এলাকা পরি-ত্যাগ, চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়া ইচ্ছা, জোর জব্দ দ্বারা আদায়ীকৃত কালিপুজার আট হাজার টাকা বন্স, স্থানীয় ক্ষেতমজুরদের বাড়ীঘর জব্দালিয়ে দেওয়া—সবই সত্য? তিনি কি এখন আর অস্বীকার করতে পারেন যে, তাঁর ঐ প্রতিবাদ পত্রটি ফ্যাসী ক্লাবের ছেলেরা লিখে দিয়েছেন?

জনৈক নৃগরিক
সাদাগাছি

জনৈক অধিবাসী
বৈদ্যপদে

চায় বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমজীবী মনুষ্যকে পৃথক করতে। সি পি এম নয়। বরং সি পি এম-এর পার্টি কংগ্রেসে রাজ্য ও কেন্দ্রের সম্পর্কের প্রশ্নটি বিশদ ভাবে আলোচিত হবে। ঠিক কোন কেন্দ্রীয় শ্লেগানটি কোন দেশে প্রযুক্ত হবে, তাও দেশীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। সি পি এম মনে করে ভারতবর্ষে ফেডারেলিজম সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। এখানকার একচেটে পুঁজিগোষ্ঠী ধূপদী অর্থে ফ্যাসিস্ট হতে পড়বে না। তারা ফর্মের দিকে যতো ফ্যাসী-

বাদী হচ্ছে, ততো রাজ্যগুলির অবশিষ্ট পৃথক সত্তা বিলুপ্ত হচ্ছে। তাই দাবী উঠবে রাজ্যগুলিকে আরো বেশি ক্ষমতা দিতে হবে। তার দ্বারাই শোষিত জনগণ উপকৃত হবেন। সি পি এম এও জানে বর্তমান পরিস্থিতিতে তা আর শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সি পি এম-এর উপর অত্যাচার যতো কেন্দ্রীভূত হবে, ততোই তারা জনগণের চোখে শহীদের মর্যাদা পাবেন।

শেখর মন্ডোপাধ্যায়

সংবাদপত্রের মূল্য বৃদ্ধি অযৌক্তিক

ভারত সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের প্রতি কপিতে দুই পয়সা হারে শুল্ক ধার্য এবং অন্যান্য অজুহাত দেখিয়ে “সংবাদপত্র মালিকগোষ্ঠী” একতরফাভাবে সংবাদপত্রের দাম প্রতি কপি চার থেকে আট পয়সা পর্যন্ত বাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশন এই মূল্য বৃদ্ধিকে অযৌক্তিক বলে মনে করে।

সংবাদপত্র মালিক গোষ্ঠী, বিশেষতঃ বৃহৎ সংবাদপত্র মালিকেরা এই অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির সমর্থনে নিউজ প্রিন্টের বর্ধিত দাম ছাড়াও সংবাদপত্রের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির অজুহাতও তুলেছে। এইভাবে তারা জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে এবং সংবাদপত্রের বর্ধিত দামের বোঝা পঠক সাধারণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। জনসাধারণ এবং পঠকবর্গের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে সংবাদপত্রের আর শুল্ক মাত্র বর্ধিত কাগজের ওপরেই নির্ভর করে না। তার আরের আসল সূত্র হচ্ছে বিজ্ঞাপন। বৃহৎ সংবাদপত্রের বৃহৎ অংশ (প্রায় সত্তর শতাংশ) বিজ্ঞাপনের দ্বারাই পূরণ হয়। এই বিজ্ঞাপনের মূল্য হার গত দশবৎসরে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সংবাদপত্র মালিকেরা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মূল্যাকা করে চলেছে।

সংবাদপত্রের এই অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংবাদপত্র বিক্রেতার গণ পনেরোই নভেম্বর থেকে শান্তিপূর্ণভাবে সংবাদপত্র বয়কট আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত সংবাদপত্র শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আমরা স্বার্থহীন ভাষার একথা ঘোষণা করতে চাই যে সংবাদপত্রের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংবাদপত্র বিক্রেতাদের এই আন্দোলনের সঙ্গে সংবাদপত্র শ্রমিক কর্মচারীদের কোন বিরোধ নেই।

আমরা মনে করি সংবাদপত্র মালিক গোষ্ঠীর অতি মনোফা-লোভ থেকেই এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা দাবী জানাচ্ছি যে পরিস্থিতি আরও জটিল না করে মালিকেরা অবিজ্ঞে সংবাদপত্র

বিক্রেতাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এই অচল অবস্থার অবসান করুক।

রঞ্জন চন্দ।
সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী
ফেডারেশন

বিদেশ দর্পণ (৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

খিঙ্কার জানিয়েছেন বিপ্লব পরিপন্থী বলে।

অ্যালেনডারী কাস্ট্রার সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। তাঁর নিজের কোম্পানি সরকারের অন্তর্ভুক্ত জঙ্গী বামপন্থী অংশ নির্বাচনী সাফল্যটিকে নিজেদের সশস্ত্র সংগ্রামের কাছে লগাতে চেয়ে তাঁর যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়েছে। এই অংশটির সাধারণ কৃষককে সংগঠিত করা, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া এবং জোর করে বেআইনীভাবে দখলীকৃত জমি পুনরুদ্ধার করা, এর কোনটিই তার মনঃপুত নয় এবং এর দমনে তিনি পুলিশও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয়ে তিনি এখন কাস্ট্রাকেই একমাত্র ভরসা বলে মনে নিয়েছেন—এই বামপন্থীদের কাছে লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের অবি-সংবাদী নেতা এবং সেই হিসাবে যদি এঁরা কাস্ট্রার কথা শোনেন।

কিন্তু ঘটনা অত সহজ পথে যাবে বলে মনে হয় না। চিলি সহ লাতিন আমেরিকার সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বামপন্থীরা যে কাস্ট্রাকে সমীহ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কতদিন করবে। কারণ আরেকজনের আদর্শও এঁদের কাছে অতি আদরের। তিনি হলেন চে গুয়েরা। মন্ত্রীকে আসীন কাস্ট্রার নীতি এঁরা মেনে নেবেন না। বলিভিয়ায় বৈরাচারী সরকারের হাতে নিহত চে গুয়েরা প্রদর্শক হিসাবে ধরবেন, লাতিন আমেরিকার রাজনীতি আলোচনার এ সম্ভাবনার কথা ভাববার সময় আজ এসেছে। স্বয়ং কাস্ট্রাকে হুয়ত নিজ অস্তিত্বের জন্যও মস্কোর কাছে শ্রেয়মাত্র অর্থনৈতিক নয় অন্যান্য সমর্থনের জন্যও হাত পততে হবে—এ সম্ভাবনাকেও আজ আর বোধহয় একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অর্থনৈতিক দর্শন

বিদেশী সাহায্য, না নয়া সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশের কংগ্রেসী শাসকরা দেশের বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং জমিদার, জোতদার রাজা মহারাজাদের শেখণ অব্যাহত রাখার জন্যে যে সব রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তার প্রধান ভিত্তি ছিল দট্টী। শিল্পায়ণ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে পরিকল্পনা ও তার প্রয়োজনীয় সংগতি সংগ্রহের জন্যে কংগ্রেসী শাসকরা স্থির করেন যে, (এক) দেশের মানুষের উপর করভার বসিয়ে এবং নোট ছাপিয়ে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেশের অভ্যন্তরীণ সংগতি সংগ্রহ করা হবে, (দুই) বিভিন্ন উন্নত পুঁজিবাদী দেশ থেকে ঋণ ও অনুদান সংগ্রহ করে শিল্পায়নের জন্যে বিদেশী মদ্রার প্রয়োজন পূরণ করা হবে।

কংগ্রেসী শাসনের পঁচিশ বছরে এই প্রতিক্রিয়াশীল, জাতি-বিরোধী নীতি ভারতের জনসাধারণকে কোন সর্বনাশের অতল গহবরে টেনে নিয়ে চলেছে, তা আজ অস্পষ্ট নয়। আমেরিকা, জাপান, জার্মানী, বৃটেন প্রভৃতি দেশের চটকদার পুঁজিবাদী মহিমা দেখে অভিভূত আমাদের দেশের অধীক্ষিত আমলা এবং কংগ্রেসী মেম্বার দল এদেশের লোককে গালগল্প অনেক শুনিয়েছেন। আমেরিকা যে কত মহান্ভব,—আমাদের দৃষ্টে বিগলিত হয়েছে না মহান আমেরিকা অটল ডলার ঢেলে আমাদের অর্থনীতিকে চাংগা করবার জন্যে মরীয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী সবাই ভারতকে দারিদ্র্য দঃখ থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার দহাতে "সাহায্য" দিয়ে চলেছেন—একথা শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝাঝপালা হয়েছে।

আজ লোকে চীনের দিকে আঙুলে দেখিয়ে প্রশ্ন করছে, চীন তো এসব মহান্ভব দেশের কোন 'সাহায্য' পায় নি, বরং নব-প্রতিষ্ঠ গণ-চীনের আঁতুড়েই হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে পশ্চিমী শক্তিশালী আমেরিকার নেতৃত্বে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে গেছে গত তেইশ বছর ধরে। তাহলে আজ সবদেশকে ছাড়িয়ে গিয়ে আপন শক্তির জোরে কি করে চীন নিজের শর্তে রাষ্ট্র-সংঘে তার ন্যায় আসন আদায় করে নিতে পারল?

একদিন কংগ্রেসী রাজনৈতিক মেম্বারা, চীনের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার কথা বললেই চীনের দালাল, দেশদ্রোহী বলে হিট্টিরিয়া-গ্রস্ত লোকের মত চীৎকার শব্দ করত, আজ তাদের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীন থেকে আসা একটুখানি সদয় আনুকুল্যের জন্যে

সত্ব নয়নে পথের দিকে তাকিয়ে আছেন, এমন কি আকাশই চীন এলাকা সহ সীমান্তের সমস্যা নিয়ে এখানেই চীন-ভারত বৈঠকের জন্যে প্রস্তুত বলে তাঁরা বারবার জানাচ্ছেন। আজ প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে উনিশশ বাষট্টি সালে কারা ছিল সত্যিকারের দেশদরদী, দুর্দৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক দল, আর কারাই বা ছিল জঘন্য দেশদ্রোহী অথবা দুর্দৃষ্টিহীন অযোগ্য রাজনীতির বাহক যারা আজ আমাদের দেশকে সমৃদ্ধির পরিবর্তে অশেষ দঃখকষ্ট লঙ্ঘনার অন্ধকূপে নিষ্ক্ষেপ করেছে!

একথা আজ সুস্পষ্ট যে আত্মনির্ভরশীলতা এবং তথাকথিত 'সাহায্য' প্রত্যাখ্যানের ফলেই চীন আজ জগত সভায় অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আর আমরা অনুসরণ করে এসেছি সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীলতা। আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, জার্মানী যদি টাকা দেয় তাহলেই আমাদের অর্থনীতির হাঁড়ি উনানে চড়বে। এটা যে কত বড় ধাম্পা এবং শঠতা আজ চীনকে দেখে পৃথিবীর সমস্ত গরীব দেশ তা বঝতে শিখেছে।

আমেরিকার মহান্ভবতা ভারতের দারিদ্র্য দঃখ লাঘবের অর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, এই তথাকথিত 'সাহায্য' দিয়ে যায় নি। আমেরিকা চিরকালের মত ভারতকে অর্থনৈতিক শৃংখলে বেঁধে রাখবার জন্যে, ভারতকে নয়া-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক জালে জড়িয়ে চিরকালের জন্যে আমাদের দেশকে আধা ঔপনিবেশিক শোষণের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র করে রাখার জন্যেই সাম্রাজ্যবাদীদের সেবাদাস আমলারা এবং পুঁজিপতি জমিদার চক্রের প্রতিনিধি কংগ্রেসীরা দেশের লোককে ভুঁয়ে, স্তোত্রবাক্য দিয়ে তাঁদের বিশ্বাসের সন্ধেগ নিয়ে আমাদের দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের জোয়ালে বেঁধে দিয়েছে।

আজ আমাদের অর্থনৈতিক অধোগতির জন্যে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের কংগ্রেসী আর্থিক নীতিই দায়ী। আমাদের ঘাড়ের যে বিদেশী সাহায্যের বোঝা চেপেছে, তা থেকে মুক্ত হবার পথ কংগ্রেসীরা দেখতে পারেন না, অথচ আমাদের দেশের কষ্টার্জিত বিদেশী মদ্রা অনবরত দেশী-বিদেশী চোরকারবারীদের হাতে, সদ ও কিস্তি হিসাবে বিদেশী পাওনাদারদের হাতে চলে বঃছে—এই অবিরত রক্ত মোক্ষণের হাত থেকে এদেশের গরীব মানুষ-গুলিকে বাঁচাবার কোন পথই তাদের জানা নেই।

এই বিদেশী সাহায্য নিয়ে আগামী দিনে পৃথিবীর আর্থিক পট পরিবর্তন ঘটবে, ঘটতে বাধ্য। কোম্পানীগুলি মনোফা, সদ,

হাতিমধোই বিভিন্ন সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ হৃদয়ঙ্গম করতে আরম্ভ করেছেন যে ধনী দেশগুলির সাহায্য মানে কি?

ব্রাজিলের অর্থনীতিবিদ ডঃ হোঁও জাগুয়ারিব বলেছেন যে মার্কিন সাহায্য আসলে একটা বঃস্তব সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি মাত্র। সম্প্রতি ব্রাজিলের সম্পর্কে পশ্চিম গোলাধর্ষ বিষয়ে মার্কিন এসেনেটে এক আলোচনা প্রসঙ্গে একথা জানা গিয়েছে যে জনসংখ্যার হিসাবে; স্বাধীনতার আগে ভারতে যত জন বৃটিশ অফিসার কাজ করতেন, বর্তমানে ব্রাজিলে মার্কিন সাহায্য পরিচালনায় নিযুক্ত আমেরিকানদের সংখ্যা তার চেয়ে ব্বিগুণেরও বেশী!

ডঃ গ্যারী মাসিওন তাঁর 'বিস্তারিত সমীকরণ' নামক একটি বইয়ে লিখেছেন, যে লাতিন আমেরিকায় সরাসরি মার্কিন লগ্নীর পরিমাণ আট বিলিয়ন (আটশ কোটি) ডলার থেকে ষাটের দশকে

পনেরো বিলিয়ন ডলার হয়েছে, এখনও বছরে তা এক বিলিয়ন ডলার হিসাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিটি লগ্নীকৃত ডলারে আমেরিকান রয়েলটি প্রভৃতি খাতে তুলে নিচ্ছে দঃ ডলার। ফলে প্রকৃত পক্ষে মার্কিন লগ্নী সাহায্য দাঁদিক থেকেই লাতিন আমেরিকার অর্থনীতিকে পঃগদ করে দিচ্ছে। একদিকে তারা মনোফা নিয়ে ষাটের ফলে দেশে মূলধন গড়ে উঠছে না, অন্যদিকে তারা লক্ষ মনোফার খানিকটা লগ্নী করে লাতিন আমেরিকার শিল্প, উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ দখল করে নিয়েছে। ফলে ভবিষ্যতেও এখানে শিল্প-সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

আমাদের দেশে ও বিদেশী লগ্নী ও সাহায্যের বাজনাধারেরা এখন মন্থ লুকাতে চাইছেন যেন দায়িত্বটা তাঁদের ছিল না বা নেই।

লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে অর্থমন্ত্রী চাবন সাহেব জানিয়েছেন যে আটটি উন্নত দেশের সাহায্য আমাদের দেশের পক্ষে 'নেতিবাচক' (নেগেটিভ) হয়ে পড়েছে। উনিশশ সত্তর-একাত্তর সালে ভারত ঐসব দেশ থেকে 'সাহায্য' বাবদ ঋণ পেয়েছে মোট একশো ছাব্বিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ টাকা, আর সদ

এবং কিস্তিবাদ ঐ ছয়টি দেশের পাওনা হয়েছে দঃশো পাঁচ কোটি টাকা। ফলে লাতিন আমেরিকার মতই এদেশেরও বিদেশী সাহায্যের নেতিবাচক দিকটা উন্মোচিত করা হয়েছে তাদের দেওয়া ঋণ বা "সাহায্য" এবং বন্ধনীর ভেতর তাদের কত কোটী টাকা দিতে হয়েছে। যে ছয়টি দেশের উল্লেখ হয়েছে তা দেওয়া হল; অস্ট্রিয়া : এক কোটী আটান লক্ষ টাকা ঋণ (পাওনা এককোটী বঃহাত্তর লক্ষ টাকা) পঃ জার্মানী : বঃহাত্তর কোটী ছয়াত্তর লক্ষ টাকা ঋণ (পাওনা, চার কোটী দঃ লক্ষ টাকা) সোভিয়েত ইউনিয়ন : আটত্রিশ কোটী এগারো লক্ষ টাকা ঋণ (পাওনা দিতে হয়েছে সত্তর কোটী দঃ লক্ষ টাকা) আমেরিকা ও বৃটেনের ঋণ-বাবদ সাহায্য ও পাওনার পরিমাণ অর্থমন্ত্রী দেন নি। তাহলে দেখা যেত যে সমগ্রভাবে বিদেশী সাহায্যের বাবদ ভারতের দেয় সদ ও কিস্তি হিসাবে এদেশের কষ্টার্জিত রপ্তানীবাদ বিদেশী মদ্রার অর্ধেকেরও বেশী আজ ঐসব দেশের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে।

ফলে এমন এক দঃবঃস্থার মধ্যে আমরা পড়েছি যে অর্থনৈতিক (শেষাংশ ১ পৃষ্ঠায়)

আরও একটি সম্ভাব্য চাওয়ার আগে ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে ঠিক মতো লালন-পালন করতে পারছেন কি না



আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ করে তাকে মানুষ করে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সাধা ছুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত গরবটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ'ল, সাধা বিবে পুস্তকের সবচেয়ে প্রিয়, রবারের জন্মনিবোধক। নিরোধে ও সহজে ব্যবহার করা যায় বলে জন্মনিবোধের জন্মে বঃকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার করে আসছেন। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?

সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পরসায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়

আরেকটি সম্ভাব্য না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন



নিরোধ

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ, রবারের জন্মনিবোধক যনোহা বী দোকান, দ্বী বী দোকান, কেমিকেল দোকান এত্য়ি সর্বত্র পাওয়া যায়

ত্রিপুরার চিঠি

রাষ্ট্রপতির শাসনে জনজীবন

অমলেন্দু দত্ত

ত্রিপুরার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে এ মাস থেকে। মন্ত্রিসভা ডুবে গেছে, কিন্তু বিধানসভা ভেসে আছে। বিধানসভার তিরিশ জনের মধ্যে সাতাশ জন কংগ্রেসী এম এল এ এর মধ্যে দশ বার জন আবার মধ্যমস্তরী ধর্মোন্মোতে বিরক্ত হয়ে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। ঠিকই, কিন্তু চার-পাঁচ জন পনেরার দৃষ্টি দিয়ে শ্রীসিংহের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃত্ব তথা ইন্দিরা গান্ধী শচীনবাবুকে নিজের লোক মনে করতেন না বাতিঙ্গ লোকসভার সমস্ত থেকেই। কিন্তু

ইন্দিরাগান্ধী ঐ সময় ঘর গোছানোতে ব্যস্ত থাকায় এদিকে নজর দিতে পারেন নি। দুই তৃতীয়াংশের বলে বলীয়ান হয়ে ইন্দিরা প্রথমে রাজস্থানের সখাডিয়া ও পরে অন্ধ্র প্রদেশের রেড্ডিকে কুপোকাং করেন। ত্রিপুরার শচীন সিংহ এ থেকে শিক্ষা নিবেন না স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেবার। অবশেষে ইন্দিরার কথামতো পশ্চিমবঙ্গের “নতুন দা” বারদরেক আগর-তলা ঘুরে রাষ্ট্রপতির শাসন পাক্স করে দিয়ে গেলেন। শ্রীসিংহ এখন মধ্যমস্তরী বাসভবন থেকে পাঁচশ গজ দূরে থাকেন এবং সঙ্গো-

পাঙ্গোদের বলে বেড়াচ্ছেন “আমি আবার অসিহ”।

অপরদিকে উপ-রাজ্যপাল এন্টনি ফিরিঙ্গি ডায়াস পশ্চিমবঙ্গে চালান হয়ে যাওয়ার পর একদা নেহেরু কর্তৃক দিল্লী থেকে পূর্ববঙ্গের জগন্নাথ নিরাসিত বালেশ্বর প্রসাদ উপরাজ্যপাল হয়ে ইক্ষু থেকে আগরতলায় এসেছেন। রাষ্ট্রপতির শাসনের দৃষ্টিনয়তে না যেতেই হুমকি ছেড়েছেন now there is no umbrella over your head. প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এ সোকাটি সাধারণ কর্মচারী এমনকি অফিসারদের সামান্য

লিগেল উন্নতিকো সহ্য করতে পারেন না।

আমরা এখন ত্রিপুরার জীবনে এই প্রথম বিধানসভা থাকার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের “স্বাদ” পাচ্ছি। জনজীবন এখানে তিনদিকে সীমাস্ত এলাকা এবং বাংলা দেশের উদ্ভূত সমস্যা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। জিনিষপত্রের আকাশ ছোঁরা দাম। বেবী ফুড, কেরোসিন, ব্যটারী আরও নানা জিনিষপত্র পাওয়া যায় না। মাংস, ডিম জগন্নাথ ভাইদের সরবরাহকারীদের হাতে চড়া দামে চলে যাচ্ছে। উপ-রাজ্যপাল শাসনভার গ্রহণের সময় বেতার ভাষণে কর্মচারী আন্দোলনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আড়তদার ও মজুরদারদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি, সাধারণ নাগরিক প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জনের মতো নিহত হওয়ার পর চীফ সেক্রেটারী এখন অসামরিক প্রতি-

রক্ষা নিয়ে কান্দে।

পূর্ববঙ্গের যদি জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়ে যায় তাহলে এই ছোট রাজ্যটিতে ফেরারীতে নির্বাচন হবে কি না সন্দেহ। শাসক কংগ্রেসে বিভিন্নমুখী আন্তঃসংঘর্ষ এ সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছে। অবশ্য বিক্ষুব্ধ এবং হরেক রকমের কংগ্রেস সবাই মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এককাটা। শচীন সিংহকে বাইরে রেখে ইন্দিরা গান্ধী এডহক কংগ্রেস করলেও শ্রীসিংহ অতঃসহজে ওয়াক ওডার দেবেন বলে মনে হয় না। এ বিরোধটা যদি ভোটের ব্যাপ্ত পূর্বস্তু পেশী হয় তাহলে সি পি এম-এর ক্ষমতার আসার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সহিত তুলনা করলে শ্রীসিংহের অবস্থা এখন পশ্চিমবঙ্গের বিজয় নাহারের মতো।

এম এল দলের রাজনীতি

(পূর্বের পর)

পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত সেখানে শ্রেণীসংগ্রাম চলেবে অহরহ এবং তার পরিণামে জীবনহানিও হতে পারে—যেমন, কংগ্রেসের মালিকের পোষা গদুড়ারা দিল দজ্জন শ্রমিককে খেন করে, শ্রমিকরাও দিল মালিকের একটা দাঙ্গালকে খতম করে, কোন জোতদার হয়তো গালি চালিয়ে মেয়ে ফেললো কোন ভূমিহীন কৃষককে, কোন গরীব চরী হয়তো দিল কোন জোতদারের মাথায় টাঙ্গি চালিয়ে—এরকম খেন জখম, মারদাঙ্গা শ্রেণীবিশিষ্ট সমাজে চলবে অহরহ। এগুলি কিন্তু বিপ্লব নয়, শ্রেণী সংগ্রাম মাত্র। তাহলে বিপ্লব হয় কখন? এই প্রশ্নে মার্কসের এই জগৎবিশ্বাত উক্তিটি স্মরণ করুন, যার মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনও প্রকাশিত হয়েছে খুব স্পষ্টভাবে—“পুঁজুতন সমাজব্যবস্থার গর্ভে যখন আর একটি নতুন সমাজব্যবস্থা জন্মলাভ করে তখন পুঁজুতনের জায়গায় এই নতুন সমাজব্যবস্থাকে স্থান করে দেওয়ার জন্য বিপ্লব ধাতরী কাজ করে।” বিপ্লবেও হবে মারদাঙ্গা, খেন-জখম এবং তা অনেক ব্যাপক হবে? কিন্তু কখন হবে? যখন তখনই পুঁজুতন সমাজব্যবস্থারই মধ্যে আর একটি নতুন সমাজব্যবস্থা রূপ পরিগ্রহ করেছে। রুশ বিপ্লবের কথাই ধরুন। বিপ্লব সেখানে কখন হলো? যখন শ্রমিক ও কৃষকেরা নতুন (পাল্টা) সমাজ ও শাসনব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তুললো তাদের সোভিয়েতগনতন্ত্রকে। উনিশশ - পাঁচএর হিসাবে গড়ে তুললো তাদের সোভিয়েতগনতন্ত্রকে। উনিশশ পাঁচ-কর্থ বিপ্লবের সময়েও সোভিয়েত-গনতন্ত্র জন্মলাভ করতে শুরুর করেছিল এবং উনিশশ সত্তরো সালে

এগারশ ব্যাপকভাবে গড়ে উঠলো সারা রাশিয়া জুড়ে এবং রুশ নিল স্বৈত শাসনের—একদিকে পুঁজুতন বা প্রচলিত শাসনব্যবস্থা। আর একদিকে সমান্তরালে তৈরি হলো নতুন শাসনব্যবস্থা শ্রমিক কৃষকের সোভিয়েত শ্রমিক কৃষকের এই নতুন শাসনব্যবস্থাকে পুঁজুতনের জায়গায় কয়েম করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবিত হলে রুশ বিপ্লব বঙ্গ-শ্রমিক পাটির নেতৃত্বে যার সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন লেনিন। মার্কস অনেক আগেই বিপ্লব সম্বন্ধে যে উক্তিটি করেছিলেন, রুশ বিপ্লব যেন তারই এক ক্লাসিক উদাহরণ। সারা রুশ দেশ জুড়ে এক সঙ্গে সোভিয়েতগনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। তাই সারা দেশজুড়ে অল্প সময়ের মধ্যেই বিপ্লব সমাধা হয়ে গেল।

চীন বিপ্লবও কি ঠিক এই কায়দায় হয়েছে? নিশ্চয়ই পৃথিবীর সব বিপ্লবেরই এই হচ্ছে বাস্তবসম্মত কাহিনী—নতুন সমাজব্যবস্থা হিসাবে সমান্তরালভাবে স্বৈত শাসনের সংগঠনগুলিকে (সোভিয়েত অনুরূপ) আগে গড়ে তুলতে হবে। চীন ছিল একটা আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা-উপনিবেশিক অত্যন্ত পিছিয়েপড়া দেশ। তাই সারা চীন জুড়ে একই সময়ে স্বৈতশাসনের এই সংগঠনগুলি গড়ে তোলা যায় নি। কিন্তু যেখানে যেখানে যেমন যেমন এই স্বৈত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল সেখানেই জনগণের নতুন শাসনব্যবস্থা কয়েম করার উদ্দেশ্যে বিপ্লব সম্ভবিত হয়েছে। সেইজন্য দেখা যায় চীনে বিপ্লব হয়েছে যেন টুকরো টুকরোভাবে এবং অনেককাল ধরে। প্রথম গৃহযুদ্ধের আমলটা (১৯২৭-৩৫) কেটেছে এইভাবে। এর পর আবার প্রায়

নয়টা বছর (১৯৩৬-৪৫) তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের শেষে চীনদেশে আবার স্পষ্টভাবে ফুটে উঠলো দু রকম শাসনব্যবস্থা—একদিকে বজ্রোজা, জমিদার প্রভৃতি শোষক শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থা, আর একদিকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন জনগণের নতুন শাসনব্যবস্থা এবং দেখা গেল এই দুই বিপরীত শাসনব্যবস্থা চীনের ভিন্ন ভিন্ন এলাকা দখল করে রয়েছে। এই দুই শাসনব্যবস্থার বিপরীত তখন চীনা জনগণের কাছে এতই স্পষ্ট যে পুঁজুতনকে ভেঙে নতুনকে কয়েম করার জন্য চীনা জনগণ উদ্বেল হয়ে উঠলো এবং শুরুর হয়ে গেল বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ। এই দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের বিপ্লব সম্ভাব্যতই রূপ নিল “লিবারেশনের” (মুক্তির) অর্থাৎ আগে থেকে স্বৈতশাসনব্যবস্থার সংগঠনগুলিকে (সোভিয়েত ধরণের) গড়ে তুলে তারপর সেগুলি কয়েম করার লড়াই চালাতে আর হলো না। দুই বিপরীত ধর্মী সমাজ তথা শাসনব্যবস্থার চরিত্র সম্পর্কিত হয়ে উঠে জনগণের চেতনা ও মানসিক প্রস্তুতিকে তখন এমন এক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে যে স্বৈত শাসনের কোন সংগঠনিক বাহ্যিকপ্রকাশ না করেও জনগণ তখন পুঁজুতনের জায়গায় নতুন শাসনব্যবস্থাকে স্বাগত জানাতে ও গ্রহণ করতে মনোগতভাবে (Subjectively) সম্পূর্ণ প্রস্তুত অর্থাৎ জনগণের মনোরাজ্যে তখন নতুন শাসনব্যবস্থা জন্ম নিয়েছে। তাই লিবারেশনের স্তরে এই দুই কাজ একই সঙ্গে সম্পন্ন হতে লাগলো অর্থাৎ লিবারেশনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বৈত শাসনের বাহ্যিকপ্রকাশ হতে লাগলো—গড়ে উঠতে লাগলো নতুন শাসনব্যবস্থা। বিপ্লব

এগিয়ে চললো ঝড়ের বেগে এবং আর মাত্র তিন বছরের মধ্যেই (১৯৪৬-৪৯) সারা চীনের ষাট কোটি মানুষ (তখনকার জনসংখ্যা) মুক্ত হয়ে গেল।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে চীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই যে দীর্ঘ-স্থায়ী চীন বিপ্লব এর স্টাটিং পয়েন্টটা কোথায়? উত্তর হচ্ছে—প্রথম গৃহযুদ্ধের শুরুর সোভিয়েত ধরণের সংগঠনের মাধ্যমে যখন স্বৈত শাসন (বা সমাজ) ব্যবস্থা গড়ে উঠতে লাগলো, তখন। এরই একটা সুন্দর চিত্র আমরা দেখতে পেরেছি মাও সে তুং-এর বিখ্যাত “হুনান রিপোর্টে” (১৯২৬)। সেই স্বৈত শাসন ব্যবস্থাকে কয়েম করতে গিয়ে যে বিপ্লবের শুরুর তারই ফলে মুক্ত হতে লাগলো টুকরো টুকরো এলাকা, পার করলো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ এবং সর্বশেষে নিয়ে এলো লিবারেশনের স্তর।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, চীন বিপ্লবই বলন আর রুশ বিপ্লবই বলন অথবা অন্য যে কোন বিপ্লবের কথাই বলন, প্রতিটা বিপ্লবেরই একটা টাইমিং বা সময়নির্দেশ আছে এবং মার্কসের পূর্বোল্লিখিত উক্তিটি অনুযায়ী তা হচ্ছে পুঁজুতন সমাজব্যবস্থার মধ্যে একটা চাই অর্থাৎ আরও সহজ কথায়, স্বৈত শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হওয়া চাই—তবেই শুরুর হবে বিপ্লব। সি পি আই (এম এল) কি এই দর্শনে বিশ্বাসী? এখনও পূর্বন্ত বলা যায় “আদৌ নয়।” তাই তারা আগে যৈব ধরে জনগণের স্বৈত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলায় কাজে আত্মনিয়োগ না করেই “বিপ্লব” শুরুর করে দিয়েছেন। কাপারটা দাঁড়িয়ে গেছে ঘোড়ার আগে গাড়ী জোতার মত। তারা এর স্বপক্ষে একটা বেশ চটকদারী ও রোমান্টিক বক্তব্য খাড়া করেছেন, “আগে লাল সন্ধ্যা

সৃষ্টি করতে হবে।” এই বক্তব্য একেবারেই সম্ভ্রাসমূলক (Idealistic) ও অ-মার্কসীয়-মার্কস-লেনিনবাদ-মাও সে তুং চিন্তাধারা বিরোধী বক্তব্য এবং সর্বধা পরিভ্রান্ত। মহাশয়দের কি খেয়াল নেই যে লেনিন স্টালিনের রাশিয়ান নতুন শাসনব্যবস্থার শুরুরের বিরুদ্ধে লাল সন্ধ্যা সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার পরই মাত্র, আগে নয়। চীনেও “লাল সন্ধ্যা” নামক যে বস্তুটি দেখা গেছে বলে বলা হয়, তাও তো কতকগুলি “এনিহিলেশন স্কোয়াডের” কীর্তি নয়, জনগণের নিজস্ব নতুন শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠার সেইগনতন্ত্র ক্ষমতার সপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যখন সংগ্রাম পরিচালিত হলো, তখন। সি পি আই (এম এল) কিন্তু ওসবের ধার কাছ দিয়েও যাননি। জনগণ কর্তৃক ক্ষমতা দখলের অর্গাণ বা যন্ত্র হিসাবে সোভিয়েত ধরণের গণ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে আগেভাগে গড়ে তুলতে চাননি, তারা প্রথমেই শুরুর করেছেন একাধিক স্কোয়াড ও এনিহিলেশন স্কোয়াড দিয়ে “লাল সন্ধ্যা” সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, যার সঙ্গে কিছু কিশোর আর তরুণ পার্টি কর্মী ছাড়া ব্যাপক জনসাধারণের কোন যোগ নেই। এর জন্য পশ্চিমবাংলার অসিত সেনেরা শুরুরেই একে “বললেন চে-গয়েভারার লাইন, পরে বিহারে সতনারায়ণ সিন্‌হা এবং উত্তর-প্রদেশে শিবকুমার মিশ্ররা একে বললেন সন্ধ্যাসবাদী লাইন। অস্ত্রের নাগি রৌদ্রের বর্ণাঙ্কিত আশে পঞ্চায়ত (সোভিয়েতের অনুরূপ) ধরণের সংগঠন গড়ে তোলা হোক, কিন্তু সি পি আই (এম এল)-এর নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ চারদাবারা সে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। (চলবে)

কলিকাতা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসী

গুণ্ডা ও পুলিশের বেপরোয়া সন্ত্রাস ও অত্যাচার

(বিশেষ সংবাদদাতা)

গত কয়েকমাস ধরে পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্ত এলাকায় বিশেষ করে সি পি এম এবং আর এস পির উপর যুব কংগ্রেসের নামাবলী গায়ে দিয়ে এক শ্রেণীর সমাজ-বিরোধীরা পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে তাতে জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পরিচালনা তো দূরস্বাধ্য হয়ে উঠেছে এমনকি এই অস্বাভাবিক জলদ্রবের জন্য পরনো কংগ্রেসসেবী এবং সাধারণ পুলিশের একাংশও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে।

যাদবপুর, চাকুরিয়া, হালতু,

কারাকপুর, শিল্পাঞ্চলের খড়দহ-পানিহাটি, বেলোঘাটার মিজাবাগান প্রভৃতি এলাকায় নৃশংস অত্যাচারের অংশিক কাহিনী কিছু কিছু সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ধনিকশ্রেণী পরিচালিত প্রতিটি সংবাদপত্র এই অত্যাচারের কাহিনী বোমালম চোপে যাচ্ছে। শব্দ তাই নয় দেশে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে ভাড়াটে সাংবাদিকদের কাহিনীও প্রকাশ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে এই সব প্রচার কোন বিদ্রোহিত সৃষ্টি করতে পারছে না। কারণ তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-

তেই তথাকথিত শান্তি ও শৃংখলার অবস্থা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এখনও তথাকথিত নকসালী দমনের নাম করে সংঘর্ষের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে ঠান্ডা মাথার কিশোর ও যুবক হত্যা অভিযান থেকে পুলিশ বিরত হয় নি।

সম্প্রতিক যুব কংগ্রেসী, হামলা থেকে প্রকৃত বামপন্থী শক্তিরও শিক্ষা নেবার আছে। দূত্বের হলেও একথা স্বীকার করতে হবে অনেক এলাকাতেই শব্দ নকসালী নামের সমাজ বিরোধীদের অংশই নয়, মাত্র কিছুদিন আগেও সি পি এম এবং অন্যান্য বামপন্থীদের শোভাযাত্রায় যে সব সমাজবিরোধী কান্ডকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যেত তারাও সব এখন যুব কংগ্রেসী মস্তান।

যাদবপুর, খড়দহ, পানিহাটি, হালতু, মিজাবাগান প্রভৃতি এলাকায় যে সব কান্ড ঘটছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কিছুদিন আগেও যে সব সমাজ-বিরোধী অর্থাৎ তার-কাটা, ওয়াগান ভাঙ্গা, ছিনতাই প্রভৃতি ব্যাপারে জড়িত, বলে ব্যক্তির নাম পুলিশের খাতায় ছিল তাদের এখন পুলিশের সাহায্য নিয়ে সি পি এম, আর এস পি এবং স্থানে স্থানে ফরোয়ার্ড ব্লকের উপর হামলা করতে দেখা যাচ্ছে।

খড়দহ, পানিহাটি এলাকায় কংগ্রেসের জীপে একেবারে পুলিশী কায়দায় রাইফেল ও টেনগান ফিট করে পরিচিত সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের দিনে-দুপুরে হামলা চালাতে দেখা যাচ্ছে। ঐ অবস্থাতেই জিপটি ঘন ঘন থানায় হাতায়াত করছে। পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ করেই তারা হানা দিচ্ছে পাড়ার পাড়ায়। যুব কংগ্রেসী হানা-দারেরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পাড়া ছেড়ে যাওয়ার পরই পুলিশ পাড়ায় ঢুক নিবিচারে নিরীহ যুবক ও কিশোরদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে মারতে মারতে। ঐসব এলাকা থেকে সি পি এমের সক্রিয় কর্মীরা চলে গেছে কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। সি পি এম এবং আর এস পির পোস্টার হচ্ছে ফেলা হয়েছে। ঐ দুই দলের মধ্যপন্থ গণশক্তি ও গণবাহিনী ছিড়ে ফেলা হয়েছে। বাড়ী বাড়ী হামলা করে বার ঘন্টার মধ্যে এলাকা ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। রাইফেল, পাইপগান ও বোমা হাতে নিয়ে, কুখ্যাত, সমাজবিরোধীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে জিজিয়া কর আদায় করছে।

এই সব সমাজ বিরোধীদের একটা বক্তব্য খড়দহ এলাকায় অনেককেই বিস্মিত করেছে। যুব কংগ্রেসী মস্তানদের বক্তব্য : এই এলাকায় আর এস পি কখনো পাইপগান বোমা নিয়ে হামলা করে নি সত্য কিন্তু তারা বর্তমান সরকারকে ফ্যাসিস্ট বসে এবং আগাগোড়া ইন্দিরা বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তাই তাদেরও রেহাই দেওয়া হবে না। স্মরণ রাখা দরকার এই সব এলাকায় আর এস পির সংগঠন যুব শক্তিশালী না হলেও তাদের রেহাই দেয়া হচ্ছে না।

দীর্ঘদিন ধরে যারা কংগ্রেসসেবী বলে পরিচিত তাঁরাও এই সব জলদ্রব বরদাস্ত করতে পারছেন না। কিন্তু তাঁরাও নিরপায়। প্রিয়-দাস-সদরতর মন্থাশিষ্যরা কথায় কথায় তাদেরও শাসাতে শুরু করেছেন।

পুলিশ কর্তাদের নির্দেশে স্থানীয় থানাগারি যে ভাবে এই

অর্থনৈতিক দমন

(সমস্ত পৃষ্ঠার পর)

স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলার চরম সংকটজনক অবস্থা দেখা দিয়েছে। গত সতেরোই নভেম্বর তারিখে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জীর এক প্রশ্নের উত্তরে পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীস সুরেন্দ্রনাথ জ্ঞানান যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে কারণ দেশের ভেতরে জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যাওয়ার ফলে পরিকল্পনা ব্যয়ের শতকরা দশ থেকে পনেরো ভাগ কাটছাঁট করতে হবে। তিনি অবশ্য একথা জ্ঞানান নি যে বর্তমান পৃথিবী ব্যাপী আর্থিক সংকটের জন্যে বিদেশী সাহায্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে বলে পরিকল্পনার ব্যয় আরো কতটা কমাতে হবে এবং এই বাধ্যতামূলক ছাঁটাই-এর ফলে এদেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম কতটা হ্রাস পাবে।

গত পঁচিশ বছরের কংগ্রেসী আর্থিক নীতি কথ' হবার মধ্যে দাঁড়িয়েও এখনকার নব কংগ্রেসী ইন্দিরা সরকার তাঁদের পুরনো নীতিগুলিকেই আঁকড়ে ধরছেন।

তাঁরা নতুন করে দেশের মানদণ্ডের ঘাড়ে নতুন নতুন ট্যাঙ্কের বোঝা চাপিয়ে এবং রাশি রাশি কাগজে টাকা ছড়িয়ে অসংগতভাবে মূল্যবৃদ্ধি করে তাঁদের বড়লেকী পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ করতে বন্ধপরিকর। তার ফলে যদি দেশে কর্মহীন বেকারের সংখ্যা হ্র হ্র কবে বেড়ে যায়, কিংবা দেশের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে দেশের মানুষকে অসহনীয় ভিক্ষাকে পরিণত করে

সব সমাজবিরোধীদের মদত দিচ্ছে তাতে সাধারণ পুলিশের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। মাত্র পাঁচ-ছয় মাস আগে যে সব কুখ্যাত সমাজ-বিরোধী (এই এলাকার) দিনে-দুপুরে পুলিশ হত্যা করেছে তাদের এখন পুলিশের গাড়ীতে যোরাফেরা করতে দেখে এবং তাদের সঙ্গে পুলিশের দহরম-মহরম দেখতে পেয়ে নিহত পুলিশের পরিবারবর্গের কাছে সমস্ত চক্রান্তটা পরিষ্কার ধরা পড়ছে। পুলিশের রাইফেল নিয়ে যুব কংগ্রেসী সমাজবিরোধীরা একটা পাড়ায় হানা দিতে যাওয়ার সময় কয়েকজন সশস্ত্র কনস্টেবল সরাসরি আপত্তি জানায় বলে এই সংবাদদাতা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছে।

গত সপ্তাহে খড়দহ এলাকায় কয়েকজন নব কংগ্রেসী অপহরণের একটা গোয়েবলসীম অপপ্রচার চালানোর পর পুলিশের জ্ঞানকে সামনে রেখে যুব কংগ্রেসী স্লোগান দিতে দিতে নানা ধরনের আত্মসম্মতি হাতে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় যাদের হানা দিতে দেখা গেল তারা প্রায় সবাই টিটাগড়, খড়দহ ও সেদপুর এলাকার পরিচিত সমাজবিরোধী। এদের মধ্যে কয়েকজন প্রাক্তন নকশালী বোম্বা, দু-একজন আছে (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

তাহলেও তারা এই অসহনকারী পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না। কারণ তারা যাদের সেবা করেন তারা তো আর এদেশের গরীব, অসহন মানব নন, তাঁরা যে দেশী বিদেশী এক-চোঁটরা মালিক ও জমিদার জোতদারের মন্দিরমের মালিকশ্রেণী।

একদিন যে বিদেশী সাহায্যের প্রশস্তি গাইতে এই কংগ্রেসী নেতাদের কন্ঠ অবিরত সোচ্চার থাকত, আজ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শৃংখলের ফাঁশ তাদের গলায় এটে বসেছে। আজ তাদের স্বীকার করতে হচ্ছে যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা সাহায্যের নামে যে ঋণ দেয়, তা এদেশের পুঁজি জ্ঞানীকে বড়তে দেয় না, শিল্পাঞ্চলের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক সংকটের দরব' বোঝা এদেশের গরীব মানুষগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। তারা একে নেতিবাচক বলে ব্যাখ্যা করতে চাইলেও, এদেশের লোক বঝতে পারছেন যে গোটা নব কংগ্রেসী আর্থিক নীতিটাই এদেশের জনসাধারণের পক্ষে নেতিবাচক এবং প্রতিক্রিয়াশীল।

পর্যনির্ভরতার কংগ্রেসী নীতি আমাদের দেশকে কোন হীন, দৈন্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং কমিউনিস্ট চীনের আত্মনির্ভরতার নীতি কিভাবে তাদের বিশ্বসভায় সম্মানের, শক্তির আসনে তুলে দিচ্ছে, এই তুলনামূলক বিচারের স্মারাই এদেশের লোক নব-কংগ্রেসী সাম্রাজ্যবাদ তোষণ নীতিকে পরিত্যাগ করবেন এবং নতুন পথ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন।

দাস মনোবৃত্তি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সাদার কিছুটা বিক্ষুব্ধ। সম্প্রতি এইচ এম টি প্রতিবাদ জানিয়েছে স্কুটার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিদেশী তোষণ নীতির বিরুদ্ধে। জানা গেছে ল্যাম্ব্রেটা ও ভেস্পা কোম্পানী ইটালি থেকে পুরোন মেশিন নিয়ে এসে এখানে তাদের ব্যবসার প্রসার করবার প্রস্তাব, সরকারের কাছ থেকে অনুমোদিত করে নিয়েছে। এদেশের তৈরী মেশিনগুলি ল্যাম্ব্রেটা ও ভেসপা করখানায় কবহৃত হবে না, তার বদলে ইটালীর বিশ বছরের পুরোন রাপিড মাস কবহৃত হবে নতুন স্কুটার তৈরীতে।

দেশীয় উৎপাদিত মেশিনের বা কাঁচা মালের সহজ প্রাপ্তি সত্ত্বেও আমাদের মন্ত্রীরা বিদেশী ধনতন্ত্রের চপে পড়ে বেশী দামে তাদের দেশ থেকে কাঁচা মাল আমদানি করতে রাজি হচ্ছেন। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর শিল্পমন্ত্রী শ্রীমধন জাপান ঘুরে এলেন কিছু ব্যক্সা-বাগিজিক চাক্তি সই করে। একটি চুক্তি অনুসারে জাপান আমাদের সোডিয়াম ফর্মেট রপ্তানি করবে। অথচ, আমরা—কেরালায়, পেরিয়ার কেমিকেলস-এ যথেষ্ট সোডিয়াম ফর্মেট উৎপাদন করছি।

সম্প্রতি স্থির হয়েছে যে বিদেশী সাহচর্যে একটি ক্যালসিয়াম কারবাইড এবং আর একটি পটাসিয়াম ক্লোরেট-এর কারখানা স্থাপিত হবে। অথচ ভারতবর্ষে যথেষ্ট কারবাইড প্লান্ট বর্তমানে আছে এবং সেন্ট্রাল ইলেকট্রো কেমিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ক্লোরেটের উৎপাদনের বিষয়ে সরকারকে তাদের নিজস্ব কর্মসূচী দিতে প্রস্তুত।

অসলে বিদেশী, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চাপ ক্রমশই বাড়ছে। কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে এসে-ছিলেন স্যার নরম্যান কীপিং, ব্রিটিশ

শিল্পপণ্যীদের সংগঠনে যিনি একজন 'উচ্চ'দপ্তর উপদেশক, বহির্বাণিজ্যিক বিষয়ে। তাঁর মতে ভারত সরকার বিদেশী বিশেষজ্ঞদের এদেশে চাকরি করার পথে কড়া-কাড়ি আরোপ করেছে বলে এখানে বিদেশী পুঁজি নিরোজনের ননা অসদ্বিধা দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় শিল্পপণ্যীদের সঙ্গে দেখা করে তিনি বলেন যে বিদেশ থেকে আমদানি করা অনেক সদ্বিধাজনক, স্বদেশে জিনিষ তৈরী করার থেকে।

লক্ষ করার বিষয় যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারাও সম্প্রতি উক্ত সংগঠনের বোর্ড অফ ডিরেকটর্সের সভায় প্রায় অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর মতে নতুন বিকাশগামী দেশগুলির ইমপোর্ট সাবসিডিটেশন বা আমদানির প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বদেশে উৎপাদনের নীতি ত্যাগ করা উচিত। তার বদলে জোর দেওয়া উচিত রপ্তানি ম্বারা অর্থ উপার্জনের উপর। তাঁর মতে যেহেতু কাঁচা মালের রপ্তানির সুযোগ সীমাবদ্ধ, তাই উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানি দরকার। যেহেতু এইসব দেশগুলি ক্রমশই বিদেশী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহায়তার নানা ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করছে, উক্ত দ্রব্যের রপ্তানিতে আসলে মুনাসফা করবে ঐ সব ধনতান্ত্রিক "দাতা" বা ডোনার রাষ্ট্রগুলিই।

যাই হোক, ধনতান্ত্রিক শিবিরের চাপে আমাদের সরকারও কিছুটা নরম হয়েছে। সম্প্রতি শিল্পবিষয়ক কেন্দ্রীয় পরামর্শক সংসদ (সেন্ট্রাল এডভাইসরি কাউন্সিল অফ ইন্ডাস্ট্রিজ)-এর এক সভায়, শ্রীকে কে বিড়লা, প্রথম-মন্ত্রী শ্রীমহিন্দলা হক চৌধুরীকে বলেন যে শিল্পপণ্যেরা যুগ্মী হয়েছেন ভারত সরকারের, বিদেশী পুঁজি নিরোজনের ক্ষেত্রে কড়াকাড়ি কমানোর জন্য।

ছাত্র পরিষদ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সরব্রত বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

এই চিঠিতে আর একটি বিষয়ের জন্যও সরব্রত বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, সাতই নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস এক সভা আহ্বান করেন এবং সভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সান্তার সাহেব বক্তৃতা করেন। কিন্তু সাতই নভেম্বরের আগে চোটা নভেম্বর প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক হিসেবে সরব্রত দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকের কাছে এক চিঠিতে সাতই নভেম্বরের সভা আহ্বানের জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করে বলেছিলেন এই সভা বে-আইনী। অবশ্য সরব্রত চিঠিতে সভা বন্ধ হয়নি।

এখন কলকাতার তিনটি জেলা কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ সমবেত হয়ে সরব্রত এই ঔষ্যতোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলছেন। ওরা বলছেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি যে সভায় বক্তৃতা করবেন সেই সভাকে বে-আইনী বলবার কি অধিকার সরব্রত আছে? প্রফুল্লকান্তি ঘোষ আর এক ফ্রন্টেও জিতে বসে থাকার ভাঙ্গন। বর্তমান, পশ্চিম ফাঁকে কংগ্রেস থেকে তাড়ানোর দাবী করা হয়েছে সেই প্রফুল্লকান্তিকে উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেসের এ্যাডহক কমিটি গড়বার জন্যে কনভেনর নির্বাচিত করা হয়েছে বাহান্তর ঘন্টার মেয়াদ শেষ হবার পরই। এখানে উত্তর কলকাতার তেইশটি ওয়ার্ড কংগ্রেসের উনিশটি ওয়ার্ড প্রফুল্লকান্তিকে পুরো সমর্থন জানান। সভাপতিত্ব করছিলেন অজিত পাঁজা।

এ গেল কংগ্রেস সংগঠনে প্রফুল্লকান্তির অবস্থা। এবারে দেখা যাক সরব্রত ছাত্র পরিষদের অবস্থা। সেখানে, দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার ভাঙ্গন। বর্তমান, পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুর, ঝাড়ুড়া, এবং উত্তর বঙ্গের ছাত্র পরিষদ থেকে সরব্রত মদ্যাজীর সমালোচনা করে প্রস্তাব গ্রহণ ও বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। উত্তর কলকাতার ছাত্র পরিষদ তো প্রকাশ্যে সরব্রত বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। অবশ্য, সরব্রত বিদ্রোহকারী উত্তর কলকাতার ছাত্র পরিষদকে বাতিল বলে ফতোয়া দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সরব্রত বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে ইন্দুনাথ যোগাচ্ছেন প্রফুল্লকান্তিরা। এখন সরাসরি সরব্রত মদ্যাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি রচনা করার পালা চলছে। দু'পক্ষই বক্তৃতা পেরিয়েছেন, সিদ্ধার্থ রায় শেষ পর্যন্ত স্কাপারটি নয়াদিল্লী টেনে নিয়ে যাবেন।

সরব্রত বিরুদ্ধে যে সব অভি-

যোগ আনা হচ্ছে তার মধ্যে কতকগুলো দর্পণ জানতে পেরেছে। সে-গুলি হচ্ছে : (এক) বিজয় নাহার উপ-মদ্যাজী এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এক সঙ্গে থাকতে পারবেন না দাবী করে সরব্রত মদ্যাজী যখন বিজয় নাহারকে কংগ্রেস সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগে বাধ্য করেন তখন নিজের বেলায় একজন এক পদ নীতি অনুসরণ করেন নি। সরব্রত তখন ডেপুটি চীফ হুইপ এবং ছাত্র পরিষদের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু কোনটি থেকেই পদত্যাগ করেন নি।

(দুই) বেলেঘাটার একজন ছাত্র পরিষদ কর্মী নিহত হবার পরে প্রদেশ কংগ্রেস অফিসের মধ্যেই সরব্রত তদানীন্তন পূর্ত মন্ত্রী সন্তোষ রায়কে মারধোর করেছিলেন।

(তিন) শব্দ তাই নয়, এই ঘটনার পরিণতিতে সরব্রত বাহান্তর ঘন্টার নোটিশ দিয়ে ডেমোক্রটিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দাবী জানিয়েছিলেন। অন্যথায় কংগ্রেস থেকে ওরা পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা করেন।

সম্মান ও অত্যাচার

(নবম পৃষ্ঠার পর)

নাট্যগড়ে বদ কংগ্রেসী সমাজ-বিরোধীদের লাগানো আগুন বিশটি ছোট দোকানদারের, দোকান ঘর পর্দা দিয়ে দেখা হয়েছে। এই দোকান-গুদামের মধ্যে কয়েকটির মালিক কংগ্রেস সমর্থক। সি পি এম এলাকা কল দোকান করার জন্য তাদেরও বদ কংগ্রেসীদের আক্রমণে নিঃস্ব হতে হয়েছে।

এই সমস্ত ঘটনার সাক্ষী এই এলাকার পলিশ। কোথাও পলিশ ভাঙন দাঁড়িয়ে থেকে এই আক্রমণে সাহায্য করেছে। কোথাও বা একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে। সি পি এম কর্মী স্বপন ঘোষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফেরার সময় খড়দহ স্টেশন থেকে তাকে পলিশের সামনেই টেনে নিয়ে গিয়ে পলিশের সামনেই প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়।

উপদ্রব এখনও থামবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। টিটগড়ে বদ কংগ্রেসীদের মস্তানদের একটি গোপন সভায় স্থির হয়েছে দু-চার দিনের মধ্যেই আগুপাড়া ও বেলঘারায় আক্রমণ চালানো হবে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে ব্যারাক-পদ শিল্পাঙ্গল থেকে সি পি এম-কে নিশ্চিহ্ন করা এবং তার সঙ্গে আর এস পিকে ঘায়ের করে বাম-পন্থী আন্দোলনকে দুর্বল করার পরিকল্পনা কলকাতাতেই গৃহীত হয়েছে। চটকল শ্রমিকদের আসন্ন আন্দোলন যাতে আদৌ দানা বাঁধতে না পারে তার জন্য চটকল মালিক সমিতি আই জে এম এ ও পলিশ এবং সমাজবিরোধী বদ কংগ্রেসীদের প্রত্যক্ষ মদ্য দিয়ে বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়।

(চার) দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটি সাতই নভেম্বর মিটিং ডাকার জন্যে সরব্রত মদ্যাজীর কৈফিয়ৎ তলব আইনানুগে কি না।

(পাঁচ) উত্তর কলকাতার কংগ্রেস নেতা এবং প্রদেশ কংগ্রেসের কার্য-করী কমিটির সদস্য প্রফুল্লকান্তি ঘোষকে বাহান্তর ঘন্টার মধ্যে কংগ্রেস থেকে তাড়ানোর দাবী সরব্রত করতে পারেন কি না। সরব্রত প্রদেশ কংগ্রেসের একজন সম্পাদক। কিন্তু কংগ্রেস থেকে তাড়ানোর দাবী করেছিলেন ছাত্র পরিষদের সভাপতিরূপে। কংগ্রেস সম্পাদক রূপে বাহান্তর ঘন্টার দাবী করার আগে তার কার্যকরী কমিটির অন্তিমোদন নেওয়া উচিত ছিল। সেই অন্তিমোদন নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ছাত্র পরিষদের সভাপতি কোন ক্ষমতায় নয়াদিল্লীর মনোনীত এ্যাডহক কার্যকরী কমিটির একজন সদস্যকে কংগ্রেস থেকে তাড়ানোর দাবী করতে পারেন?

(ছয়) বাহান্তর ঘন্টার নোটিশ দেবার পরদিনই সরব্রত উত্তর কলকাতার ছাত্র পরিষদের নির্বাচিত সভাপতি সাদিন ভট্টাচার্যকে বহিস্কৃত করেন। সাদিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে প্রফুল্লকান্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে দমদমে গিয়েছিল। এই অভিযোগে কি কোন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বহিস্কৃত করা যায়?

(সাত) সরব্রত মদ্যাজী কলকাতা কর্পোরেশনে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে সমস্ত কার্ডিন্সলার-দের চোর বলেছেন। এই ঔষ্যত সরব্রত কোথায় পান?

(আট) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার জন্মদিনে সরব্রতরা যে মিছিল বের করেছিলেন তাতে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন না করে শব্দ সরব্রত জন্মদিন করা হয়েছে?

(নয়) সরব্রত মদ্যাজী বার বার কংগ্রেস থেকে চলে যাবার হুমকি দেওয়ার এই কথা কি প্রমাণিত হয় না-বে, সরব্রত মদ্যাজী প্রকৃত কংগ্রেসী নন, শব্দ আত্মসম্মতিতা দেখাচ্ছেন। আরো অভিযোগ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে সরব্রত মদ্যাজীও

প্রিয়দাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নেতাজীনগরে কিছতেই দাঁত ফোটানো যাচ্ছে না।

তাই প্রিয়বাবের পদার্পণ ঘটেছিল যাদবপুর থানায়। বিস্তর চোটপাট করেছেন। ও সি মেহান্ত বিরক্ত হলেও কিছ বলতে পারেন নি। ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে তার আক্ষেপ-সব কিছ করছি। তবু সি পি এম-কে নির্বংশ করতে পারছি না। এ কী আমার দোষ? প্রিয়-রজনবাবু ক্ষুদ্রকায় হলেও তার তার পিছনে পশ্চের বিরাট ছায়া। ক'জেই কলকাতার পলিশ মদ্য-বিবরা কিল খেয়ে হজম করছেন।

বসে নেই। তার পেছনে আছেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আর বদ কংগ্রেসের প্রিয় মুনসি। প্রিয় মুনসি এখন পশ্চিমবঙ্গে এসে কিছদিন

বিমান যুদ্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লক্ষ করে। সঙ্গে সঙ্গে গজে ওঠে মরণপণ প্রত্যুত্তর।

নীচে দাঁড়াল হাজার হাজার উৎসুক জনতা বিমান যুদ্ধের পরিণতির কথা চিন্তা না করেই সমস্ত লক্ষ করছে। হঠাৎ গোলায় আঘাতে ঘায়ের হল একটি পাকিস্তানী বিমান। সশব্দে ফেটে গেল বিমানটি আর আগুনের ডেলা নীচে পড়তে লাগল।

এই অবস্থায় আর তিনটি পাক জঙ্গী বিমান কেমন যেন ভীত মনে হল। ওরা পালাতে চেষ্টা করল। অনেক কান্দা করল ওরা, কখনও ওপরে উঠছে সোজা খাঁড়াই হয়ে, আবার ল্যাটা মাছের মত মাথা নীচ করে নেমে আসে।

পেছনে তাড়া করা ভারতীয় বিমানের দল ছাড়ার পাঠ নয়। সমানে গুলি করে চলেছে।

হঠাৎ দুটো পাকিস্তানী বিমানে আগুন ধরে গেল তার বিমান দুইটি থেকে দু জন পাইলট লাফিয়ে পড়ল মহাশূন্যে। কিছ পরে তাদের প্যারাসুটের ছাতা খুলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতীয় কামান নীরব হয়ে গেল। বোধ হয় পাকিস্তানী বৈমানিকরা আহত হতে পারে এই আশঙ্কায়। ভারতীয় বিমানেরাও গোলা ছোড়া ইতিমধ্যে বন্ধ করেছে। এই ফাঁকে একটি পাকিস্তানী বিমান দ্রুত পালিয়ে বাঁচল।

পাকিস্তানী দুই বৈমানিক নিরাপদেই স্থলে পৌঁছল। ওদের নাম, ফাইম লেফটেন্যান্ট প্যারভেজ মেহদী কুরেশী এবং ফাইম অফিসার খলিল আহমদ।

ওরা ধরা পড়ল ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর হাতে। কাছাকাছি কোন ভীড় এগুতে পারল না। ভীড়ের হাতে পড়লে ওদের আর নিস্তার ছিল না।

পারভেজের কপালে সামান্য আঘাত লেগেছিল আর খলিলের বিশেষ কিছই হয় নি। ওদের কলকাতার আনা হয়েছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হেফাজতে।

বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চলে মজিববাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পাক বাহিনী অনেক দিন থেকেই ট্যাঙ্ক ও বিমান আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এবার মজিব বাহিনী দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মজিববাহিনীর আক্রমণে পাক বাহিনীর অবস্থার সংগীন। মনে হয় পাক বিমানের অবস্থা বদলে এসেছিল আর ভারতীয় এলাকার ঢুকে পড়েছিল। যে শিক্ষা পেয়েছে তাতে

ওদের সম্বন্ধে ফিরে আসার কথা।

চারটি বিমানের তিনটে পনের মিনিটের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল। যুদ্ধে এ এক প্রায় অভূতপূর্ব ঘটনা। প্রতিহিংসার পাক বিমান বাহিনী ঢাকা ও আশে পাশের শহরাঞ্চলে বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। সাধারণ বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায় এই আক্রমণ। শোনা যায় হাজার হাজার লোক মরছে।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ওদের একমাত্র বন্দর "চালনা" অকেজো হয়ে পড়েছে মজিব বাহিনীর দখল আক্রমণে।

গত রবিবার একটি গ্রীক মালবাহী জাহাজ আসছিল চালনা বন্দরের দিকে, বোধ হয় কাঁচা পাট বোঝাই করতে। মজিব বাহিনীর আক্রমণে জাহাজ ডুবে যায় আর বন্দরের কাছাকাছি নদীগর্ভে আটকে যায়। এ জাহাজ না ওঠান পর্যন্ত আর নদীতে জাহাজ চলাচলের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

ওদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থাও সংগীন। মোট চৌদ্দটি জেটির মধ্যে বারটি অকেজো হয়ে গেছে। পড়ে আছে মাত্র দুটি। এ বন্দর বেশী দিন চালান যাবে না।

পশ্চিমাঞ্চলে মরণপণ সংগ্রাম চলছে যশোর আর খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকায়। পাকিস্তানীরা ট্যাঙ্ক এবং আরও নানা ধরনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বেপরোয়া ব্যবহার করে চলেছে। মজিব বাহিনী আক্রমণ শব্দ অকাহতই নয়, দিনের পর দিন আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মজিব বাহিনীর খবরে প্রকাশ, যে কমপক্ষে তেরটি পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক যশোরের চৌগাছা অঞ্চলে ঘায়ের হয়েছে। ওরা বিশ্বস্ত ট্যাঙ্ক ছেড়ে পালিয়েছে।

খুলনার সাতক্ষীরা মহকুমার শহর এখন মজিববাহিনীর হাতে। কামানের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের শব্দ এখন সমস্ত পশ্চিম সীমানা জুড়ে শোনা যাচ্ছে। ও পাশ থেকে ঝটকে আসা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা গেল পাক বাহিনী সবখানেই নাস্তানাবদ।

পিপলস্ লিটল থিয়েটারের

প্রযোজনায়

ঠিকানা

২৭শে নভেম্বর শনিবার

টিনের তলোয়ার

২২শে নভেম্বর, সোমবার

সন্ধ্যা ৬টা

বৃষ্টি সঙ্গন

হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

সম্পাদক-হীরেন বসু

দপন

১৪শ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা ১১ শ্রবণ ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ ৥ দাম ০২ পয়সা

আলিপুর জেলে বন্দীদের পিটিয়ে মারা হয়েছে সরকারী বিরতি সম্পূর্ণ মিথ্যা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত সপ্তাহে আলিপুর সেন্টাল জেলে যে কান্ড ঘটে গেল তা পৃথিবীর বন্দীশালার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এর আগে পৃথিবীর কোন জেলে এই ধরনের বন্দীদের আবদ্ধ রেখে পিটিয়ে মারার ঘটনা শোনা যায় নি।

গত ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত সাতটি জেলে পরপর সংগঠিতভাবে বন্দী হত্যা হয়েছে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা তেবটি। আহত কয়েক শত। আহতদের মধ্যে অনেকেই সারাজীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে। আবার অনেকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

প্রতিটি ঘটনার পর সরকারী বিবৃতি মিথ্যাপূর্ণ। সেই একই কথা

উগ্রপন্থী বন্দীরা মারধোর করার চেষ্টা করে এবং ওদের উদ্দেশ্য ছিল জেল ভেঙে পালানোর।

এতগুলো হত্যা পর পর সংগঠিত হল অথচ কোন বিস্তৃত তদন্ত হল না। কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে। তদন্তের কোন ফলাফলও জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয় নি।

আলিপুর সেন্টাল জেলের ব্যাপারে হত্যাকাণ্ড যে অন্যান্য বারের অভ্যুত্থানের থেকে অনেক বেশী নির্মম তার সরকারী স্বীকৃতি এসেছে এই ঘটনায় তদন্তের জন্য হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে।

তবে বিচারক নিয়োগ এর আগেও হয়েছে। যেমন বারাসত (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল ঘুরে একে বিভিন্ন ওয়াকিবহাল মহলের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে এই কথা পরিষ্কার যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী অথবা বাংলাদেশ মুজিব বাহিনী অবিলম্বে পাকিস্তানী আগ্রাসী বাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক সম্মুখ সমরে নামছে না।

মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে এক প্রভাবশালী কমান্ডার আমাকে বলেছেন যে, এখন ওদের বিভিন্ন এলাকায় সমস্ত পাকিস্তানী বাহিনীকে বন্ধে লিপ্ত করে দেওয়ার শক্তি আছে, কিন্তু সেই কার্যক্রমে তারা এখনই নিম্নস্ত হওয়ার কথা চিন্তা করছে না দুটি কারণে : (এক) এই ধরনের সরাসরি যুদ্ধের ফলে মনোবল বিধ্বস্ত পাকিস্তানী বাহিনী আরও বেশী সাধারণ নাগরিক হত্যার নেমে পড়বে এবং (দুই) পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অংশে যে মতভেদ ও ভাঙন দেখা যাচ্ছে ব্যাপক যুদ্ধের কৌশল সেই ভাঙনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সম্প্রতি চৌগাছায় যে টাঙ্ক যুদ্ধ হয়ে গেল সেই ব্যাপারে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর ঢাকা এবং যশোর শাখার মধ্যে খবরাখবর বিনিময়ের কিছ্র গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে। এই সংবাদ অনুযায়ী, ঢাকার অবস্থিত পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীদের একাংশ অবিলম্বে স্কাপক যুদ্ধের আদেশ দিয়েছিল এবং বলেছিল যে, প্রয়োজনবোধে পাকিস্তান বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়তে পারে।

কিন্তু এই আদেশ নীচ স্তরের সেনানায়করা অব্যবহৃত বলে মনে

করে এবং এদের ধারণা যে পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ মুক্তিবাহিনীর প্রতি সক্রিয় সমর্থন সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা নেই।

রংপুর থেকে সরু করে সাতক্ষীরা পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ মাইল জুড়ে মুক্তিবাহিনীর নতুন তৎপরতায় পাকিস্তানী আগ্রাসী বাহিনীর নাজেহাল অবস্থা, বেশীর ভাগ অঞ্চলেই পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মধ্যে সবকিছ্র ছেড়ে পলায়ন তৎপর।

রংপুর জেলার কাড়িগঞ্জা এবং তৎসংলগ্ন প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিরাট এলাকায় বাংলা দেশ সরকারের ও মুক্তিবাহিনীর নতুন হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি এক সফরে বাংলা দেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আমেদ এই নতুন প্রশাসন কেন্দ্র পতাকা উত্তোলন করে এসেছেন।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামারুজ্জামান সাহেব এই সপ্তাহে গেছেন সাতক্ষীরা সফরে। সাতক্ষীরা শহর বাদে, সমগ্র অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে বেসামরিক প্রশাসন কক্ষাঙ্গা সংগঠনের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বর্তমান সফর।

সরকার এবং মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে দর্পণকে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকার এখন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে শক্ত বাঁটি প্রতিষ্ঠা এবং বেসামরিক প্রশাসন কক্ষাঙ্গা চালু করার কাজে বেশী করে মনোনিবেশ করবে।

সরকারী এই কর্মনীতির সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম সংযুক্ত। অর্থাৎ এই সমস্ত বাঁটি এলাকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন এলাকার ক্রম-সম্প্রসারণই মুক্তিবাহিনীর এখন অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

অবশ্য সারা বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী গেরিলা ও কমান্ডোদের তৎপরতা অকাহত থাকবে। তাদের লক্ষ্য হবে পাকিস্তানী আগ্রাসী বাহিনীকে সমস্ত অঞ্চলে বিপর্যস্ত করা এবং সৈন্যবাহিনীর সরবরাহ কবন্ধা বিধ্বস্ত করা।

মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে এক উজ্জ্বল কমান্ডার দর্পণের সঙ্গে সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, এখনই যশোর ক্যান্টনমেন্টের সমস্ত সরবরাহ ব্যবস্থা ও ঢাকা যশোর রোড ধ্বংস করা মুক্তিবাহিনীর পক্ষে মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু এই কৌশল এখনই মুক্তিবাহিনী নিচ্ছে না, কারণ ঢাকা যশোর রোড বিধ্বস্ত হলে ওদের আর পালানোর পথ থাকবে না, ওরা মরিয়া হয়ে স্কাপক ধ্বংসাত্মক কাজে নেমে পড়বে।

ইতিমধ্যেই ঢাকা যশোর রোড ধরে সৈন্যবাহিনীর পরিবারবর্গ যারা এতদিন যশোর ক্যান্টনমেন্টে বাস করছিল তারা পালানোর সূত্র করেছে। এই পলায়মাণ পরিবার-

বর্গের ওপর মুক্তিবাহিনী কোন আক্রমণই করবে না।

অনুরূপভাবে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর সাধারণ সৈন্যরা যখন এই রাস্তা ধরে পালানো সূত্র করবে তখনও মুক্তিবাহিনী ক্ষমতা (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

বর্ধমান পৌরসভার নির্বাচন প্রসঙ্গে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ধমান পৌরসভা নির্বাচনে সি পি এম শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। দর্পণের কাছে খবর আছে যে, পদলিখ ও নব কংগ্রেসের ভলান্টিয়াররা ব্যাপক সন্ত্রাসের এবং জোর জুলুমের মাধ্যমে অসংল ভোটারদের আসতে দের নি, আর অনর্পাশ্রিত ভোটারদের নামে নকল ভোট বাস্তব ফেলেছে।

এ সম্পর্কে বিস্তৃত কাহিনী পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। তবে এ ঘটনা দর্পণের পাঠকদের কাছে নতুন কোন ব্যাপার নয়। কারণ রাজ্যে গত সাধারণ নির্বাচনে কলকাতার কয়েকটি কেন্দ্রে বিশেষ করে নেপাল রাস্তার জোড়াবাগানে এই একই কায়দায় নেপাল রায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সি পি এম ক্রমশঃ সাংগঠনিক দিক থেকে পেছ হুটছে এবং সেই অনুপাতে নব কংগ্রেসীদের প্রভাব বাড়ছে। শ্রদ্ধামাত্র গন্ডাবাজীর ফলে নব কংগ্রেসের জয় এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য নয়।

প্রেস কর্মীদের আন্দোলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রেস কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম কমিটির তরফ থেকে “দাবী সপ্তাহ” সরু হয় পাঁচশ নভেম্বর। এই আন্দোলন শেষ হয় দোসরা ডিসেম্বর প্রেস কর্মচারীদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। ঐ দিন সমস্ত প্রেস বন্ধ থাকে।

পাঁচ দফা দাবীর ভিত্তিতে এই আন্দোলন। দাবীগুলি হল : উপযুক্ত পে-স্কেল ও মহাঘণ্টা চালাই কর; উপযুক্ত নিম্নতম বেতন, শিক্ষাভাতা, বাড়িভাড়া ইত্যাদি দিতে হবে; দ্রব্যমূল্য কমার মিথ্যা অজুহাতে মহাঘণ্টা ভাতা কটা বন্ধ কর; বন্ধ কারখানা অবিলম্বে খুলতে হবে; প্রমিক আন্দোলনের উপর পদলিখ ও গন্ডাদের জুলুম বন্ধ কর।

ভারত সরকার যারফৎ নোভিয়েত বাংলা দেশ সরকারকে চাপ দিচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভারত সরকার বাংলাদেশে সরকারকে জানিয়েছেন যে তারা সমর্থন করতে পারেন এমন একটি সরকার যেটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করবে শ্রদ্ধামাত্র আওয়ামী লীগ নয়। নন্দাদিত্যের তরফে মুজিবনগরের কাছে এই বক্তব্য রেখেছেন কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের নীতি নির্ধারক কমিটির চেয়ারম্যান প্রীতি পি ধর।

বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ যে ধর সাহেব যে দলগুলি নিয়ে সরকার গঠন করা উচিত বলে জানিয়েছেন সেগুলি হল, আওয়ামী লীগ, দুই ন্যাপ, মণি সিংয়ের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলা দেশের জাতীয় কংগ্রেস। অবশ্য এটা সকেই মনে নিয়েছেন যে এই ধর-

ণের কোন মন্ত্রীসভাতেও আওয়ামী লীগের সদস্যই বেশী থাকবে।

আওয়ামী লীগ অবশ্য এখনই এ ধরনের কোন কোয়ালিশনের পক্ষে সায় দিতে প্রস্তুত নয়। এই দলের নেতাদের মতে এখনই এ-নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে নতুন সংবিধান ও পরবর্তীকালে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে যে অবস্থা দাঁড়াবে সেইটাই মনে নেওয়া উচিত। ভারত সরকারের এই ধরনের বক্তব্যে বর্তমান বাংলা দেশ সরকারের অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলেও জানা গেছে। শোনা যাচ্ছে যে দিল্লী যদি এই নিয়ে বেশী চাপ দেয় এবং যদি সরকারের তরফে সেই চাপ স্বীকার করে নেওয়ার কোন ইংগিত দেখা দেয়, তাহলে মন্ত্রীসভার অন্তত দুজন

সদস্য পদত্যাগ করবেন। এই প্রসঙ্গে ধরদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আসাদী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কামরুজ্জামান সাহেব।

দিল্লী এই নিয়ে এত চাপ দিচ্ছে কেন? জানা গেছে যে চাপটি নাকি আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি। মস্কো চায় স্বাধীন বাংলাদেশে এমন একটি সরকার যার মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং রাজনৈতিক প্রভাব বজায় থাকে। এর জন্য প্রয়োজন তার প্রতি আস্থাভাজন মণি সিংয়ের কমিউনিস্ট পার্টি ও মোজাফ্ফর আমেদ সাহেবের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে সরকারে স্থান দেওয়া। এর সঙ্গে দিল্লী মওলানা ভাসানীর ন্যাপকে যুক্ত করেছে, কারণ মওলানার বা বিপ্লব জনসমর্থন তাতে তাঁর দলকে বাদ দিয়ে শ্রদ্ধামাত্র অপর ন্যাপটিকে সরকারে স্থান দিলে বিক্ষোভের সম্ভাবনা থাকবে। তাই সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে এই কেম্বালিশন বা জাতীয় সরকারের পরিকল্পনা।

বঙ্গদর্শন

চাপক সরকার

জনমানসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রভাব এখন অবি-সম্বাদী। এমন কি একথাও বলা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় নেত্রী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরার নাম, ডাক প্রভাব তাঁর যশস্বী পিতার চেয়ে কোন অংশে কম ত নয়ই বরং অনেকাংশে বেশী। লোকসভায় বর্তমান অধিবেশনে বিরোধী পক্ষ প্রায় স্তব্ধ। দেশের সামনে বাংলাদেশ নিয়ে যে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব সম্পর্কে কেবলমাত্র দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ শোনা গেলো, লোকসভায় বিরোধী-পক্ষ মূলতঃ শ্রীমতী ইন্দিরার নীতি ও কার্যক্রম মেনে নিয়েছে।

বাংলা দেশ সম্পর্কে ভারতের নীতি এখন স্পষ্ট এবং এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের ঘোষণা আর

কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে, ভারত সরকার চাপক ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুযায়ী বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে মুক্তি-বাহিনী ও ওখানকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে নৈতিক অন্যান্য সম-র্থন দিয়ে যাবে। এবং এই সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে এখন আর ভারতীয় সরকারের বিশেষ কোন গোপনীয়তা নেই। এই সমর্থন সাধারণ মানবের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে অবশ্যই সাহায্য করবে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তানের অগ্রসারী অচরণের ফলে প্রায় এক কোটি উদ্ভাস্ত পশ্চিমবঙ্গের আশ্রয় শিবিরে। মানবের দুর্দশার অন্ত নেই এবং এই ব্যাপারে বিশ্ব-জনমত বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক

আন্দোলন সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হলেও বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই বিষয়ে বিশেষ কোন পদক্ষেপ নেয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের বাংলা দেশ মুক্তিবাহিনী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমর্থন বিষয়ে নির্দিষ্ট ঘোষণা ভারতীয় জনসাধারণ স্বাগত জানিয়েছে।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক গোটাকরক ঘটনাও মানবের মনে আশা জাগায়। চৌগাছার ট্যাঙ্ক যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়, একই অঞ্চলে বিমান যুদ্ধে ওদের রিপ-বিস্ত অবস্থা, দিনাজপুরের পক-ভারত সংঘর্ষ এবং পাকিস্তানিদের সীমান্ত অঞ্চল থেকে সাময়িক পশ্চাদপসরণ প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা মানবের মনে বিশ্বাস এনেছে যে, একর বোধ হয় সরকার আর কথার ধোঁয়ার অবশ্য কতককে এড়াতে চাইবে না।

ভারত সরকার এখন যে নিশ্চিত-ভাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগ্রহী তার আর একটি প্রমাণ মার্কিন মহাদেশের উদ্ভাস। মার্কিন সরকার এখন চে'চামেচি সরব্ব করেছে।

ওদের অভ্যোগ ভারত আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছে পূর্ব বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে। এর আগে যখন লক্ষ লোক বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিল তখন ওদের মধ্যে মানবের দুর্দশার মায়ী কান্না ছাড়া আর বিশেষ কিছু শোনা যায় নি। ওদের বশব্দ পাকিস্তানকে ওরা সমবে দেবার কোন চেষ্টা করে নি। এব্যাপারে বেশীর ভাগ পশ্চিমী সংবাদপত্র, বিশেষ করে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সাংবাদিকেরা, এখন উঠে পড়ে লেগেছে একথা পশ্চিমী জগতকে বোঝাতে যে ভারত পূর্ববঙ্গে সৈন্য বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়েছে। ভারত সরকার সম্পর্কে পশ্চিমী সমালোচনা যত তীব্র হবে সেই অনুপাতে ভারতীয় জনমতও সরকারের সমর্থনে আরও সমীকৃত হবে। এই লক্ষ্যই প্রকাশ পাচ্ছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাপক প্রভাব বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে।

শ্রীমতী ইন্দিরা অবিসম্বাদী জাতীয় নেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন এবং এই পরি-প্রেক্ষিতেই তাঁর মনে কান্না দরকার যে, এখন আর তাঁর পক্ষে নিজের

সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে জনসাধারণের ব্যাপক ঐক্য সম্ভাবনা ব্যাহত করা ঠিক হবে না। এই সপ্তাহের শেষে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন এবং রিগেড প্যারেড মন-দরনে জনসভায় তাঁর বক্তৃতা দেও-য়ার কথা। এই সভায় অবশ্যই বিরাট জনসমাগম হবে এবং এখানে শ্রীমতী ইন্দিরা বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের নির্দিষ্ট নীতির ব্যাখ্যা করবেন।

শ্রীমতী ইন্দিরার জেনে রাখা ভাল যে, পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের একাংশ ঐ পার্টির নতুন ভাবমূর্তির সুযোগ নিয়ে স্বেচ্ছাচার চাফিয়ে যাচ্ছে, ব্যাপক সম্মেলনের মাধ্যমে সমস্ত বামপন্থী আন্দোলনকে চূর্ণ করার মতলবে আছে। এই সংকীর্ণতা ও সম্মেলনবাদী রাজনীতির ফলে শ্রদ্ধাময় নব কংগ্রেসেরই ক্ষতি হবে না, বিশেষভাবে ব্যাহত হবে আজকের রাজনৈতিক কতক। এই কতক হল সারা ভারতীয় জনসাধারণের বাংলা দেশ আন্দোলনে এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পূর্ণ এবং সক্রিয় সহানুভূতি।

ফরোয়ার্ড ব্লকে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব

শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গন অবশ্যস্তাবী

(বিশেষ প্রতিনিধি)

ফরোয়ার্ড ব্লকের শক্ত ঘাঁটি উত্তর বাংলা এই দলের হাতছাড়া হতে চলেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেল। উত্তর বাংলার বিশিষ্ট নেতা শ্রীকমল গহ এবং শ্রীঅমর রায় প্রধানের শাসক কংগ্রেস দলে যোগদান নিশ্চিত বটেই শাসক কংগ্রেস মহল দাবী করেছেন। আর একজন বিশিষ্ট নেতা অধ্যাপক নির্মল বসু শাসক কংগ্রেসে যোগ যদি নাও দেন তাহলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে তাঁর অবসর গ্রহ-ণের সম্ভাবনাই বেশী।

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সর-ক্বারের পতনের পূর্ব সময় থেকেই শ্রীকমল গহ এবং শ্রীরায় প্রধানের সক্রিয় রাজনীতির বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না। গত মাসে চট্টগ্রাম দলের রাজ্য কমি-টির যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেল শ্রীগহ এবং শ্রীরায় প্রধান তাতে যোগ দেন নি। মাদরাসাইরে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও তাঁরা কেউ যার নি। উত্তর বাংলার শ্রীগহের নেতৃত্বা-ধীনে শক্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন উত্তরবঙ্গ পরিবহন কর্মী ইউনিয়নে সম্প্রতি শ্রীগহ স্বৈচ্ছায় কংগ্রেস শাসক দলের তরুণ নেতা শ্রীসদ্রত মদখাজীকে স্থান করে দিয়েছেন।

শ্রীগহ এবং শ্রীরায় প্রধান উভ-য়েই বরাবর তাঁর সি পি এম বিরোধী। সি পি এম বিরোধিতার সূত্রেই যুক্তফ্রন্টের আমল থেকেই তাঁরা দুজনেই তৎকালীন এস এস পি নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রকে

নিজেদের কর্মীদের কাছেও "হীরো" বানিয়ে রেখেছিলেন। শ্রীমৈত্র সম্প্রতি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার শ্রীগহ ও শ্রীরায় প্রধানের নেতৃত্বে তাঁদের অনাগামীদের কংগ্রেসে যোগদানের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

শ্রীগহ ও শ্রীরায় প্রধান সি পি এম বিরোধী হলেও তাঁরা উভয়েই কংগ্রেস বিরোধীও ছিলেন, কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাঁদের কংগ্রেস বিরোধিতাও কমে এসেছে। শাসক কংগ্রেসের করেকজন বিশিষ্ট নেতার মতক তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা বলেন, কমল গহ আর অমর রায় প্রধানকে রাজনীতি করতে হলে কংগ্রেসের সঙ্গে থেকেই করতে হবে। কংগ্রেসের বিরোধিতা করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। শোনা যাচ্ছে যে অধ্যাপক নির্মল বসুরও প্রায় একই অবস্থা। এ ব্যাপারে নীতিগত কারণ ছাড়াও অন্য কোন গোপন কারণের ইঙ্গিত কংগ্রেস মহল থেকে দেওয়া হচ্ছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে অন্তর্বির্বাদ দীর্ঘদিনের। কংগ্রেস বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এই দলের জন্ম এবং প্রসার। গোড়া জাতীয়তাবাদী নেতা-দের সম্মুখে এই দল গঠিত। ধীরে ধীরে তরুণ কর্মীদের মধ্যে মার্কস-বাদের প্রভাব পড়তে থাকলে দলের মধ্যে বিরোধ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। শ্রীমতী যুক্ত ফ্রন্টের আমলে বার-সত রাজ্য সম্মেলনে এবং পরে কল-কাতার সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই দল ভোটখিলে মার্কসবাদ ও

সুভাববাদের সম্মুখ করে নীতি গ্রহণ করে। ভারতের শাসক শ্রেণীকে সরাসরি ধনিক শ্রেণী আখ্যা দিয়ে এই দল সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল-বের লক্ষ্য ঘোষণা করে।

দলের গোড়া জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্মীরা এই অবস্থা বর-দাস্ত করতে পারে না। ইতোমধ্যে সি পি এমের সঙ্গে দলের অনেক স্থানেই সংঘর্ষ দেখা দিলে পরো দলটা কটর সি পি এম বিরোধী হয়ে পড়ে। দলের মধ্যকার মার্কস-বাদ বিরোধীরা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেন। তাঁদের চে'চাতেই সি পি আইয়ের সঙ্গে দলের সৌহার্দ্য স্থিতি পায় এবং সি পি আইয়ের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত ফরোয়ার্ড ব্লক গণতান্ত্রিক কোয়-লিশন সরকারের শরিক হয়ে পড়ে।

দলের সাধারণ তরুণ কর্মী এবং করেকজন নেতা এই অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। কংগ্রেস বিরোধিতায় যে দলের জন্ম সেই দল কংগ্রেসের শরিক হয়ে জনসাধা-রণের কাছেও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। দলের মধ্যে দেখা দেয় চড়াবন্ত বিভ্রান্তি ও হতাশা। ইতো-মধ্যে সি পি আই নব কংগ্রেসের সঙ্গে হৃদয়তার নীতি খোজাখুলি গ্রহণ করায় সি পি আইয়ের প্রভাব-মুক্ত হওয়ার জন্য দলের ওপর চাপ পড়ে।

এইভাবে টানাটোড়ের মধ্যে গত অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম দলেব রাজ্য কমিটির বর্ধিত বৈঠক বসে।

এই বৈঠকে তরুণতর কর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বৈঠকে গত দুই বসন্তের নীতি বর্জন করে কংগ্রেসের সর্বাঙ্গিক বিরোধিতার নীতি গৃহীত হয়। সি পি আইকে সরাসরি কংগ্রেসের লেজুড় আখ্যা দিয়ে ঐ দলের সঙ্গে কোন রাজ-নৈতিক ফ্রন্টে যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য সি পি এমকে সংকীর্ণ রাজনীতির দোষে দম্বত এবং খুনোখুনির রাজ-নীতির প্রবক্তা হিসাবে দলের বিশ্লেষণের কোন পরিবর্তন করা হয় নি। তবে সি পি এমের সঙ্গে কোন ক্রমেই ফ্রন্ট করা হবে না এ-কথাও বলা হয়নি।

দলের মার্কসবাদ বিরোধীরা সি পি আইয়ের সঙ্গে থেকে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার পক্ষপাতী। শাসক কংগ্রেস ও সি পি আই উক্ত অংশের সূত্রেই আলোচনা করে পরো দলটাকেই জোটে টেনে আনতে চেষ্টা করছে। শ্রীগোপাল ব্যানার্জী ফরোয়ার্ড ব্লক বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে সি পি এমের সঙ্গে গেলে সি পি এম তাদের গ্রাস করে ফেলবে। একক থাকলে দল নিশ্চয় হয়ে যাবে।

কিন্তু সবশ্রী ভক্তিব্রজ মন্ডল, অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ, ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য, চিত্ত বসু প্রমুখ পশ্চিম-বঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা দূরের কথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক সংগ্রামের কথা, কংগ্রেসকে ধনিক শ্রেণীর দল বলে আখ্যাত করতে চান। ভক্তিবাদ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কথা বল-তেও রাজী নন। ফরোয়ার্ড ব্লকের মদখপত্র লোকমতে চিত্ত বসু ও অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে কংগ্রেসকে মূল শত্রু বলে অভিহিত করা

হয়েছে। কিন্তু কোন নেতাই সি পি এমের পক্ষে এখনো কথা বলছেন না।

মাদরাসাইরে কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠকে চট্টগ্রাম সম্মেলনের নীতি অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে পুরোপুরি কংগ্রেস বিরোধী ফ্রন্ট গড়ার অসম্ভাব্য কথা অনেক বলেছেন। ভুবনেশ্বরে বর্তমান মাসে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বৈঠকে নির্বা-চনী কৌশল স্থির করা হবে।

এই টানাটোড়ের অবস্থায় দলের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা তীব্র হয়ে উঠেছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে এটা নতুন লক্ষণ। উত্তর বাংলার শ্রীদুর্গেশ নিয়োগীরা কংগ্রেসের ঘোরতর বিরোধী। তাই দল মনে করে কমল-বাদ চলে গেলে দল নিশ্চয় হয়ে যাবে না। বরং মার্কসবাদ বিরোধীরা চলে গেলে দল ছোট হয়ে পড়বে। একটা নীতির উপর দাঁড়িয়ে পারবে।

এই অবস্থায় আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে পরিবর্তন ঘটা অবশ্যস্তাবী। কমল-বাদের মত বেশ কিছু পরিচিত নেতার কংগ্রেসে যোগদানও নিশ্চিত বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। দলের প্রভাবশালী নেতা রাজ্য কমি-টির সমগাদক শ্রীঅশোক ঘোষ এখনো উত্তর পক্ষের মধ্যে সমঝো-তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা অন্যান্যবারের মত সফল হবে না বলেই অনেকে ধারণা। ইতোমধ্যে দলের জগী অংশের উপর সরকারের আক্রমণ শুরু হয়েছে। ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে দলের কৃষক কর্মী-দের উপর ইনসা দিচ্ছে। ছাত্র ব্লকের (শেখাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

টায়ার নিয়ে ডিলারদের বেপরোয়া ফাটকাবাজী

(দুর্ঘটনার সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে টায়ার নিয়ে জোর ফাটকাবাজী চলছে। ডিলাররা এই টায়ার নিয়ন্ত্রিত মূল্যের প্রারম্ভিক দামে বেচে পাঁচশো থেকে হাজার টাকা আতিরিক্ত কামাচ্ছে।

ইতিপূর্বে ডিলাররা যখন টায়ার নিয়ে ফাটকাবাজী শুরু করেছিল এবং খোলাবাজারে ন্যায্য দামে যখন টায়ার পাওয়া যেতনা, তখন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা উক্ত ডিলারদের নিয়েই “টায়ার ডিলার্স এ্যান্ড রি-ট্রেডার্স এসোসিয়েশন” নামে একটি ন্যায্য এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যের প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছিলেন।

আজ কেউ যদি কৌতূহল বশত গোল্ডেন রোডে এই প্রতিষ্ঠানটির সামনে গিয়ে এক মহড়তের জন্য দাঁড়ান, প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন, হাজার হাজার লোক দরখাস্ত হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ভিতরে বড় বড় টায়ার ডিলার এবং রথী মহারথীরা কেমন চোখের ইশারার বেনামীতে টায়ারের ডেলিভারী অর্ডার হস্তগত করে কাড় হাসিল

করে বাইরে দাঁড়ানো লাইনের দিকে মনোহর হেসে চলে যাচ্ছেন। যারা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের অনেকেই গাড়ী টায়ারের অভাবে গরুর জেই পড়ে আছে। কিন্তু একটি দৃষ্টি টায়ারের মত চেরে তারা কত দিন তাদের গাড়ী গ্যারেজে ফেলে রাখবেন? মাসে মাসে রোজ টায়ার ইন্সপেকশন, টায়ার, ইন্সপেকশন প্রিমিয়াম বসে থেকে থেকে কে আর কতদিন গরুবেন?

পশ্চিমবঙ্গে ডানলপ ইনচেক, গড্ডাইয়ার, ইন্ডিয়া সপার প্রভৃতি ছয়টি টায়ার কোম্পানী রয়েছে। ডানলপের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মতে প্রতিটি কোম্পানীতে দিনে প্রায় চারশো থেকে সাড়ে চারশো টায়ার তৈরী হয়। এখন কমপক্ষে চারশো টায়ারের হিসেবে এই ছয়টি কোম্পানীতে দিনে মোট দ. হাজার চারশো টায়ার উৎপাদ হয় যার নেওড়া বেতে পারে। প্রথাগত নিয়মে এই দ. হাজার চারশো টায়ারের মধ্যে মিলিটারী রিজার্ভ কোটা রয়েছে পঁচিশ পার্সেন্ট এবং

সরকারের জন্য নিয়ন্ত্রিত হওয়া জেন্সী কোটা রয়েছে কুড়ি পার্সেন্ট। তাহলে বাকী রইল পঞ্চাশ পার্সেন্ট। অর্থাৎ তেরোশো টায়ার। এই তেরোশো টায়ার যদি নিয়ন্ত্রিত ভাবে এসোসিয়েশনের ঘরে যায়, তবে সাধারণ ক্রেতাদের মাসের পর মাস লাইনে দাঁড়িয়ে কাঠখড় পোড়াতে হবে কেন? আসলে সেই টায়ার এসোসিয়েশনের ঘরে যাবনা, যার ডিলারদের গুদামে এবং সরকারকে ভাঙতা দেবার জন্য আর সাধারণের চোখে ঐ শিখি-ভিটি দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য ডিলারস এসোসিয়েশনের কপালে দড়টো একটা টায়ার ঠেকিয়ে দিয়েই থাকল। তাহলে ক্রেতাদের সামনে এখন দৃষ্টি মায় পথ; হয় তারা ডিলারদের ব্যক্তিগত দোকান থেকে কাসামলোয় স্বিগল দামে টায়ার ক্রয় করুন, আর নয়তো এসোসিয়েশনের দরজায় ঐ দড়টো টায়ারের জন্য দিনের পর দিন ধুকোখোর করে মরুন।

যখন ক্রেতা অনন্যপার হয়ে ডিলারের কাছেই তার নির্দিষ্ট টায়ারটি কিনতে বাধ্য হন, তারা কাসামলোতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দাম লিখে দিয়ে স্বিগল দাম আদায় করেন। যাতে ক্রেতার প্রাথমিকভাবে এই জালিয়াতী সরকারের মোচড়ে আনতে না পারেন।

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে জটিল পরিস্থিতি

সামান্য বিভাগে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে গোলযোগ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে সামান্য বিভাগে ছাত্রদের ভর্তিকে কেন্দ্র করে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কলেজের টিয়ারিং কমিটি এবং কন্ট্রোল ইন্ট্রিন্সনের বোগ-সাজসেই এ বছরে সামান্য বিভাগে নতুন কোন ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে না। অনেক ছাত্র ভর্তি হতে আসছেন, তাদের অ্যাডমিশন ফর্মও দেওয়া হচ্ছে, মৌখিক পরীক্ষাও নেওয়া হচ্ছে; কিন্তু তৎপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যাচ্ছে না। অথচ ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্র-রাও অপেক্ষা করে আছেন।

এই জটিলতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে যে বর্তমানে কলেজের কার্যভার পরিচালনার জন্য কোন প্রশাসক না থাকায় ছাত্র-শিক্ষকের একটি মিলিত সংগঠন টিয়ারিং কমিটি নাম নিয়ে সাময়িক ভাবে সেই দায়িত্ব পালন করছেন। কলাই বাহুল্য যে প্রচলিত নিয়মানুসারে কলেজের দিবা এবং সামান্য বিভাগের নিয়মকানুন এবং শিক্ষাসূচী একই কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন। কিন্তু তবুও সামান্য বিভাগের ছাত্রদের জন্য জিন্ন নিয়ম চালু করা হচ্ছে কেন? কেন স্মিটিকিফেট প্রদানের স্বার্থের দিবা বিভাগের শিক্ষা সমগ্র পাঁচ বছর আর সামান্য বিভাগের ক্ষেত্রে সাত বছর? কেনই বা একুশ বছরের উর্দে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না? শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা কোন নিয়ম?

যদিও কর্তৃপক্ষ তাদের প্রসপেক্টাসের মধ্যে সামান্য বিভাগে সাত বছরের শিক্ষাকালের কোন উল্লেখ করেন নি, কিন্তু নতুন ছাত্র ভর্তি হওয়ার সময়ে অ্যাডমিশন ফর্ম তাকে দিয়ে সাত বছরের বন্ড লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। স্বভাবতই ছাত্ররা আপত্তি করছেন। কিন্তু টিয়ারিং কমিটি তার কোন সুরাহা করছে না।

বয়সের প্রশ্নে প্রসপেক্টাসে বা লেখা আছে, তার অর্থ দাঁড়ায় একুশ বছরের নীচে কোন ছাত্রকে ভর্তি করা হবে না। কিন্তু উর্দে বেকেন বয়সের ছাত্রই তো অনা-মাসে ভর্তি হতে পারে; তবুও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন?

সামান্য বিভাগের ছাত্রদের বেলায় কেন সাতবছরের কোর্স চালু হল, তার জবাবে টিয়ারিং কমিটির প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, দিবা বিভাগের ছাত্ররা সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত মোট তিরিশ ঘণ্টা ক্লাস করেন। সেক্ষেত্রে সামান্য বিভাগের ছাত্ররা মোট পনেরো ঘণ্টা কলে সামান্য বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাটীকে থেকেই যাবে।

এক্ষেত্রেও যারা এখন সামান্য বিভাগে পড়ছেন, তাদের ক্ষেত্রে শনিবার কলেজ খোলা রেখে অন্যান্য ছাত্রের দিন কমিয়ে ঘণ্টার দিক থেকে দিবা বিভাগের সমকক্ষ করে তোলাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সামান্য বিভাগের শিক্ষকরাও তদনুযায়ী এতকাল পাঁচ বছরে শিক্ষা সমাপ্তির কথা ভেবেই আতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে এসেছেন এবং তারা সেই নিয়মে ক্লাস নিতে এখনো প্রস্তুত। এর পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ সহস্রা রায় গত বোলাই জুলাই সামান্য বিভাগের দুজন শিক্ষককেই পূর্বানুযায়ী নতুন রুটিন তৈরী করার ব্যক্তিগত পরামর্শে অনুরোধ জানান। শিক্ষকস্বরূপ রাজী। এক্ষেত্রে তাদেরো প্রশ্ন, তবুও কেন সামান্য বিভাগে নতুন ছাত্র ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না? তবে কি টিয়ারিং কমিটি সামান্য বিভাগকে তুলে দেওয়ার সংকল্পই করেছেন?

দিবা বিভাগের ছাত্ররা আরো একটি অভিযোগ করেছেন যে সামান্য বিভাগে পাঠরত ছাত্ররা তাদের প্রাপ্য চাঁদা (মাহিনা হিসেবে স্বীকৃত) ঠিক মত দেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, দিনের ছাত্রদের জন্য চারটি বিভাগ চালু আছে এবং তাদের জন্য জিন্ন রকমের চাঁদা (মাহিনা) নির্দিষ্ট আছে; তাছাড়া ছাত্র সংখ্যাও বেশী (সোয়া দুশোর মত)। কিন্তু সামান্য ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং তাদের জন্য একটি মাত্র বিভাগ (ফাইন আর্টস) চালু রাখা হয়েছে। সুতরাং সামান্য বিভাগ থেকে আর (আর্টশো টকা) নিঃসন্দেহে কম হবে এবং উক্ত বিভাগের ছাত্রদেরও অভিমত গড় হিসেবে দিবা অপেক্ষা সামান্য বিভাগের অনেক বেশী। তারো চেয়ে বড় কথা নতুন ছাত্র ভর্তি করা না করার ব্যাপারে এটা কোন ব্যক্তিই নয়।

তাছাড়া প্রতি বছরের পাঠ্যসূচী রবীন্দ্রভারতী কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া বাছনীয়। কিন্তু উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন “পাঠ্যসূচীর ব্যাপারে আমাদের কোন মতামত নেওয়া হয়নি। এটা কিভাবে সম্ভব হল আমরা কিছুই জানিনা।”

এ অবস্থায় ভর্তি ইচ্ছুক সকল ছাত্রের একই প্রশ্ন: এই বিপন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব তা হলে কে নেবে? রবীন্দ্র ভারতী না সরকারী শিক্ষা বিভাগ? নাকি তাদের এই শিক্ষাপান্থীলনের আকাঙ্ক্ষা অক্ষুণ্ণই কিন্ত হবে?

খড়দহ সোদপুর অঞ্চলে ব্যাপক সম্রাস

পুলিশের সহায়তায় নির্বিচারে খুন ও অপহরণ চলছে

(বিশেষ প্রতিনিধি)

খ্যাতকপূর মহকুমার খড়দহ, সোদপুর এলাকার আজ ব্যাপক সম্রাসের রাজত্ব চলছে। এক প্রেমীর সমাজবিরোধী সপ্নে স্বপ্নভাবে হাত মিলিয়ে জাসক কংগ্রেস ও পদলিখ নির্বিচারে খুন, বহুহত্যা ও অপহরণ করে চলেছে। সোদপুর, রহড়া, সুরকচর, নাটগড় পানিশিলা, ঘোলা, নব ব্যারাকপুর প্রভৃতি এলাকাদ্বীতে ঘরে ঘরে দেখাছিলাম অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি। দেখলাম কতকগুলি জয়গার ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও শুনলাম ছেলে ফেরার, মারের ওপর পদলিখ আর সমাজবিরোধীদের অত্যাচার। কলোনীগদ্বীতে পরদ্ব বারা আছে তারাও আজ অত্যাচারের বলি হতে চলেছে। ঘোলা সি-রক, অমরাপুত্রী সুরভানগর, গ্রিন্থ কলোনী, নাটগড়ের কদমতলা, আদিনাথপুর, মহেন্দ্রনগর, পানিশিলা প্রভৃতি এলাকার ঐ সমস্ত কলোনীগদ্বী যখন ঘরে ঘরে দেখাছিলাম তখন কলোনীর বেশ কয়েকজন মহিলা কাছে এগিয়ে বললেন, “আপনারা সাবান-দিক। জনতাম আপনাদের কলম দিয়ে সত্যি কথা বের হয়। কিন্তু এখন দেখছি আপনারা আসল খট-গাকে চেপে বিকৃত করে নকল ঘটনা সাজছেন। কেন? কি অপরাধ

আমরা করছি যে আমাদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী জপনারা লিখবেন না?

সত্যিই উত্তর দিতে পারি নি। বেশ কয়েকদিন ধরে কয়েকটি কলোনীর জোমান ছেলেদের যে বেদম মারধর করা হয়েছে তার প্রমাণও পেলাম।

জোমান ছেলেদের অপরাধ তার বাক বা অথবা বাড়ীর অন্য কেউ সি পি এম করে।

অমরাবতী ও পাতুলিয়ার কয়েকজন অধিবাসী জানালেন যে খুন হওয়ার ভয়ে তাদের বাড়ীর ছেলেরা আজ তিনমাস ফেরার। স্থানীয় কয়েকজন দোকানদার জানালেন তাদের ওপরও পদলিখের কাছ থেকে শাসানি আসছে। তাদের অপরাধ কয়েকজন সি পি এম কমী তাদের দোকানে বসে গল্প করে। পদলিখ আর সমাজবিরোধীরা প্রায় প্রতিদিনই তাদের শাসাচ্ছে যে যদি এরপরও ঐ সি পি এম কমী-দের বসতে দেওয়া হয় তাহলে তাদের দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

বেসরকারী এক বছরের সূত থেকে জানতে পারা গেছে গত কয়েকদিনে সি পি এমের প্রায় উনিশ জন কমী হয় খুন হয়েছে নতুবা তাদের আজ পর্যন্ত কোন খাতা পড়ানো হয় নি। অবশ্য সব

কারী মতে মাত্র দুই জনের খোঁজ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

সমাজবিরোধীরা প্রাক্তন সি পি এম, এম এল এ সাধন চক্রবর্তীর বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। অবশ্য চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবারবর্গ অত্যাচারের আশঙ্কায় ঐ বাড়ীতে বেশ কিছুদিন থাকছেন না।

শাসক কংগ্রেসের এই ধরনের কাজকে পরোক্ষভাবে সি পি আই জনসং ও আদি কংগ্রেস সমর্থন করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

আরকসন স্কোলাড নামে স্থানীয় সমাজবিরোধীদের নিয়ে একটি স্কোলাড গঠন করা হয়েছে। এই স্কোলাডের সামনে সমাজবিরোধীরা, মাঝে শাসক কংগ্রেস বা যব কংগ্রেসের লোকেরা ও সবচেয়ে পেছনে সি আর পি বন্দুক নিয়ে থাকে।

এই স্কোলাডের কাজ হল বিভিন্ন জয়গার ঔৎ পেতে বসে থাকা। তখন কোন সি পি এম কমী কোথায় যাচ্ছে তার প্রতি নজর রাখা এবং সমরমতো তাদের অপহরণ করে খুন করা। তারপর তাদের মৃতদেহ রাস্তার মধ্যে পরে গঙ্গার ফেলে দেওয়া অথবা রেল-লাইনের কাছে ফেলে আসা, যাতে সাধারণের ধারণা হয় যে রেলের কটা শেডে সে মারা গেছে।

(বেঙ্গালুরু মহানগর)

অর্থনৈতিক দর্পণ

শরণার্থী নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই দায় বাড়ছে

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

গত মে মাসে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চাবন সাহেব বলেছিলেন যে উনিশশ একাত্তর-বাহাত্তর সালের বাজেটে মোট দশ কোটি টাকা ঘাটতি হবে। স্বভাবতই এই ঘাটতি খরচ সংকুলানের জন্য সরকারকে ঐ পরিমাণ কাগজী নোট বাজারে ছাড়তে হবে। কারণ বাজেটে নির্ধারিত খরচ কুলোবার অন্য কোন উপায় নেই।

মূলধনী খাতে বাজেটে বিদেশী সাহায্য বা ঋণের পরিমাণ আটশো কোটি টাকার মতো পাওয়া যাবে আশা করা হয়েছিল, কিন্তু ডলার সংকট ও তার ফলে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মন্দা ও বাণিজ্য সংকট দেখা দেওয়ার ফলে বিদেশী সাহায্যের সম্ভাবনা সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন সেনেটে সমস্ত বিদেশী সাহায্যের প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত করার আমাদের মত বেশব দেশ পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে বিদে-

শের মুখাপেক্ষী তাদের সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যকলাপ স্থিতিমত হয়ে পড়ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই শ্রেণী-স্বার্থমূলক নির্বোধ আর্থিক নীতির ফলে সারা দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ সরকার ও শিল্পমালিকদের মনেও ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীসত্যজিৎ মল্লিক লোকসভায় বলেছেন যে দেশের উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দরুন পরিকল্পনার মোট প্রস্তাবিত ব্যয়ের পনেরো শতাংশ ছাঁটাই করতে হবে। পনেরো শতাংশ ছাঁটাই মানে মোট প্রস্তাবিত ব্যয় আনুমানিক চাবিশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটির পরিকল্পনা ছাঁটাই করতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনার রূপরেখা প্রস্তাব করার কালে দেশের কোটিপতি শিল্পমালিকেরা পরিকল্পনা

ব্যয় কমিয়ে চলার নীতি গ্রহণের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। তখন কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সম্মত না হলেও, অর্থনৈতিক চাপ এবং অকেজো আর্থিক নীতি গ্রহণ করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যাতে পরিণামে একচেটিয়া মালিক কোটিপতিদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হয়।

আজ তাই হয়েছে। ভারত সরকার বলতে চান যে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীদের চাপ বাড়তে থাকার ফলেই অর্থনীতি এমন বিপাকে পড়েছে। কথাটা কি ঠিক?

বাংলাদেশের ঘটনার সূত্রপাত পঁচিশে মার্চ, বাজেট এসেছে মে মাসে। নব্বই লক্ষ শরণার্থীর শিবিরে রয়েছেন তারা মূলতঃ সরকারের উপর নির্ভরশীল। এই প্রায় এককোটি নিরাশ্রয় মানবের জন্যে ভারত সরকারের আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয় পঁচিশ পঁচিশ কোটি টাকা হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। এর মধ্যে এইড ইন্ডিয়া

ক্লাব একশ তেরিশ কোটি টাকা দিতে অঙ্গীকার করেছেন। এ টাকা বিদেশী মদ্রায় পাওয়া যাবে। আরো প্রায় একশ কোটি টাকা সোভিয়েত চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ থেকে পাবার আশা রয়েছে। সতরাং মূলতঃ আন্তর্জাতিক সাহায্য হিসাবে অনুমিত ব্যয়ের অর্ধেকের মত পাওয়ার কথা। আর শরণার্থীদের জন্যে ভারত সরকারের বাৎসরিক ব্যয় আগে ধরা হয়েছিল সাড়ে চারশো কোটি টাকা। সতরাং ভারত সরকারের নিজস্ব খরচ হতে পারে দশো থেকে আড়াইশো কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক সাহায্য বৃদ্ধি পাবে এরকম সম্ভাবনাও যথেষ্ট। আর যদি সরকারী মুখপাত্রের আশা ফলবতী হয় এবং বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান মার্চ মাসের আগেই হয়ে যায় তাহলে শরণার্থীদের প্রায় সবাই বাংলাদেশে নিরাপদে ফিরে যাবেন বলে ধরা যায়।

তাছাড়া আমাদের দেশে স্বাভাবিক লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে গেছে। যদি বর্তমানে আড়াই শতাংশ বৃদ্ধির বদলে পাঁচ বছর আগেও যে সাড়ে তিন শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল তা বজায় থাকত, তাহলে এবছর ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যা আরো দশ কোটি বেশী হত। সতরাং বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী আসার ফলে বড় জোর আমাদের পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা ব্যয়ের অর্ধেক ফলপ্রসূ হরনি বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু গোটা অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার কারণ হিসেবে, চতুর্থ পরিকল্পনা ব্যয় সাড়ে তিন হাজার কোটি। ছাঁটাই করার কারণ হিসাবে বাংলাদেশের শরণার্থী আগমনকে ধরা যায় না। বাংলা দেশের সমস্ত শরণার্থী যদি অচিরে দেশে ফিরে যান, তবুও ভারতের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার মুখ থেকে রক্ষা পাবে না।

ভারতের অর্থনীতি এভাবে ভেঙ্গে পড়ার, পরিকল্পনামূলক ব্যয় এভাবে ছাঁটাই করার কোন স্বাভাবিক অর্থনৈতিক নিয়ম উপস্থিত ছিল না, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রান্ত আর্থিক সামাজিক নীতিগুলিই এবং পরোক্ষ ভাবে সারা পৃথিবীতে দারিদ্র্যের মন্দা ও বাণিজ্য সংকটের ভাগীদার বলেই ভারতের অর্থনীতি আজ অধোগামী, শিল্পোৎপাদনের হার বেড়ে শতাংশ মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে পনেরো শতাংশ, বেকারের সংখ্যা প্রতিমাসে এক লক্ষ করে বেড়ে যাচ্ছে। ভারতের

ক্রমাগত বাড়ছে, লোকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে কম্পনাতীতভাবে।

অথচ গত পাঁচ বছরে খরা ও বন্যা সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। দেশের অভ্যন্তরে পাঁচাত্তর লক্ষ টন খাদ্যশস্যের মজুত ভান্ডার গড়ে উঠেছে এবং সারা বছরে শরণার্থীদের মোট প্রয়োজন হবে মাত্র দশ লক্ষ সত্তর হাজার টনের। অর্থাৎ খাদ্যশস্য ব্যবদ শরণার্থীদের চাপ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

দেশে সম্পদের হার ও পরিমাণ উভয়েই বেড়েছে। উনিশশো ছেয়টি-সাতষটি সালে মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল একশ সত্তরো কোটি টাকা, উনিশশ উনসত্তর সালে তা দাঁড়িয়েছে একশো আটাত্তর কোটি টাকা। অর্থাৎ শিল্পোৎপাদন হ্রাস, বিপুলভাবে কর্মহীন বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস এবং পণ্যমূল্যের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটা সত্ত্বেও কৃষি পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে গ্রামীণ বড় বড় উৎপাদক জোতদার ও ব্যবসায়ীদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে এককোটি টাকার বেশী ব্যয়ের সম্পদ রয়েছে এমন বড় বড় কোম্পানীগুলির মূল্যফা ও রিজার্ভ ফান্ডের মোট পরিমাণ বেশ বেড়েছে।

তবু কেন দেশে শিল্পকারখানা বাড়ছে না? তবু কেন নতুন নতুন চাকুরী সংস্থান বাড়ছে না?

এর অন্যতম প্রধান কারণ দেশের মানববলের আর কমে গেছে, তারা আর প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র কিনতে পারছেন না। ফলে শিল্পপতিদের হাতে যথেষ্ট রিজার্ভ ফান্ড ও ব্যাংক যথেষ্ট সঞ্চয় জমা পড়া সত্ত্বেও অর্থনীতি চাঙ্গা হতে পারছে না। অন্যদিকে গ্রামীণ বড় বড় উৎপাদক, জোতদারেরা কৃষি-উৎপাদন মূল্যের বৃদ্ধাংশ আত্মসাৎ করে বাজারে নিজেরদের পণ্য ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছে।

ফলে কৃষিজাত পণ্যের দামও উর্ধ্বমুখী। আখ, তুলো, তৈলবীজ আলু, আনাজপাত, ডাল মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি এখন সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাইরে।

এই মূল্যবৃদ্ধি ও জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা পড়ে যাওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ হল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বেপরোয়া কাগজী নোটের পরিমাণ বাড়িয়ে চলা। মে মাসে অর্থমন্ত্রী বললেন যে দশ কোটি কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় হবে সারা বছরে আর বারোই নভেম্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে দেখা গেল যে ইতিমধ্যেই চার পাঁচ মাস বাকী। এছাড়া রাজ্যের সরকারগুলি একাত্তর-বাহাত্তর সালে ঘাটতি ব্যয় করবে দশো চার কোটি টাকা এবং ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাংক এই রাজ্য সরকারগুলির মোট ওভার ড্রাফটের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দশো চারাত্তর কোটি টাকা (পাঁচই নভেম্বর তারিখে)। এই ঘাটতি ব্যয়ের অধিকাংশই উৎপাদনমূলক নয়, অর্থাৎ এর জোগ্য পণ্যোৎপাদন বাড়ছে নি

আরও একটি সম্ভাব্য চাওয়ার আগে ভাব দেখুন

যেটি আছে তাকে ঠিক মতো
লালন-পালন করতে
পারছেন কি না?



বাগদার ঘরের মাঝে, ছোটবেলা থেকেই ঘেঁষে পড়াশোনা করতাম। হঠাৎ! আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ করে তাকে সুস্থ ও সুখী করতে। কিন্তু এবারই পিঠোপিঠি বহিষ্কার করুন। এটি শুধু নয়, সার্বিক স্বাস্থ্য ও ক্রিয়াকলাপের ক্ষতি করে। তখন অবস্থা খারাপ হয়। তার কারণ হল আপনি কি ভালো মা?

নারী কৃষিয়ার কোটি কোটি সম্পত্তি তাই কল্যাণ। সব ঠিক করে তৈরি না হলেও পুষ্টি পূরণের কথা ভাবা জরুরি।

শিশুদের লালন-পালন। আপনিও তা করতে পারেন। শিশুর হৃদয়, মস্তিষ্ক পুষ্টিতেই সজীব হয়। স্বাস্থ্যের জরুরি চাহিদা। শিশুরাও ও সহজে লালন-পালন করা যায় বলে কল্যাণের জন্যে অত্যাধিকার করে থাকেন। অত্যাধিকার শিশুরাও লালন-পালন করে না?

আরেকটি সম্ভাব্য মা চাওয়া পূর্ণত ব্যবহার করুন

নিরোয়া

এক লক্ষ মেরুদণ্ডের স্বাস্থ্য রক্ষণ, কল্যাণে অত্যাধিকার ও শিশুরাও লালন-পালন করে না? অত্যাধিকার শিশুরাও লালন-পালন করে না?

এম এল দলের রাজনীতি প্রসঙ্গে (২)

প্রভঞ্জন দেবরায়

উনিশশ, উনসত্তর-এর এটি প্রলেপ সি পি আই (এম এল) পার্টি তৈরির বছর খানেক আগে "কো-অর্ডিনেশন পরিষদে" প্রশ্ন উঠেছিল : "পরিস্থিতি যখন বিপ্লবী তখন কি ধরনের সংগঠন গড়ে হবে? গ্রেড ইউনিয়ন বা কৃষক সংগঠনে কি কাজ হবে?" জবাবে চারুবাবু বললেন, "বিপ্লবী পরি-স্থিতিতে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার একমাত্র কাজ।" "ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লব যে করে জনগণ এবং পার্টি যে তাতে নেতৃত্ব দেয় মাত্র"—এ কথাটা তিনি ভুলে গেলেন। তাই বিপ্লবী পরি-স্থিতিতে জনগণকে দিয়ে "অর্গান অব প্ল্যাওয়ার" বা ক্ষমতা দখলের যন্ত্র হিসাবে সর্বত্র ব্যাপকভাবে সোভিয়েত বা কমিউন ধরনের (আমাদের দেশে "গণ-পঞ্চায়েত" কথাটার স্মারাই বোধ হয় এই ভাবেটি প্রকাশ পায়) সংগঠন গড়ে তুলে শৈবত শাসনব্যবস্থা চালু করে দিতে হবে—এই গণ-কর্মসূচীর কথা তিনি রাখতে পারেননি। ফলে পরাতন সমাজব্যবস্থার মধ্যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা আর জন্ম লাভ করলো না। এমতাবস্থায় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপ্লবের নামে শত্রুমাত্র পার্টি কর্মীদের দিয়ে কিছু হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যা করা হলো এবং হচ্ছে তাকে সঙ্গতভাবে সম্ভাব্যবাদী কার্য-কলাপ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অথচ কিশোর আর তরুণ পার্টি কর্মীদের মনে এ কথা গেঁথে দেওয়া হলো যে, "শ্রেণীশত্রু খতম হচ্ছে, বিপ্লব হচ্ছে।" একথাও বলা হলো যে, যে শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত রাঙাননি সে কমিউনিস্টই নয়!

শ্রেণীশত্রু ও খতমেরও কি অ-মার্কসীয় ও বিকৃত ব্যাখ্যাই না করা হয়েছে। প্রথমেই বলছি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের যথার্থ অন্তর্ধান করতে কথ' হওয়ার তারা শ্রেণীবিশ্লেষণ ও শ্রেণীসংস্থাপনে ভুল করেছেন এবং অনেকটা যেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রেণী-বিশ্লেষণে এসে পড়েছেন। তার উপর আবার "লাল সন্ধ্যা" সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এমন একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যেন শ্রেণীশত্রু মানেই বধ বা খতমের উপযুক্ত। কিন্তু কমিউনিস্ট মতাদর্শ অনুসারী হত্যার অনুমতি কখন দেওয়া চলে? একমাত্র যখন সমাজের পুরোনো কাঠামোর মধ্যেই শৈবত শাসনরূপে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং সেই "নতুন ক্ষমতা দখলের যন্ত্রকে" অর্থাৎ শৈবত শাসনকে ক্ষমতা দখলে কেউ বাধা দিচ্ছে অর্থাৎ তার কর্মসূচীকে রূপায়িত করার পথে বাধা সৃষ্টি করছে, কিংবা যখন কেউ পার্টির সাধারণ কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার পথে চূড়ান্ত বাধা সৃষ্টি করছে। এ ছাড়া শ্রেণীবিশিষ্ট সমাজে প্রতি-ন্যিত যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে তার

পরিণামে যদি কেউ শোষকশ্রেণীর কাউকে হত্যা করে ফেলে তবে কমিউনিস্টরা তাতে দোষের কিছু দেখে না। কিন্তু শ্রেণীশত্রু খতমের নামে পার্টি কখনও কোন কর্মীকে বিচার-বিবেচনাহীনভাবে যখন তখন, যেখানে সেখানে খতমের ঢোলোয়া অনুমতি দিতে পারে না। অথচ বাচ-বিচারহীনভাবে সেইরকম খতমই হয়ে চলেছে। কত তরুণকে শত্রুমাত্র সন্দেহের বশেই কেটে ফেলা হয়েছে! জ্যোতদার জমিদার হচ্ছে তো কোন কথাই নেই—চারু-বাবু বলেছেন, "তাদের যেখানে পাবে কাটবে; এমনকি তোমার এলাকার বাইরে হলেও"। এসব ঘটনা যে সব এলাকার ঘটছে সেখানে জনগণকে ক্ষমতার অধিষ্ঠিত করার জন্য কোন প্রোগ্রামই পার্টির নেই এবং অধিকাংশই ঘটেছে সহরে। সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এই নিহত কৃষ্টিরা অনেক ক্ষেত্রে জানতেই পারেনি সি পি আই (এম-এল) তাদের কাছ থেকে কি চেয়েছিল। এসব গল্প হত্যার এক-মাত্র লক্ষ্য বোধহয় "শ্রেণী শত্রু" রক্তে হাত রাঙিয়ে "প্রকৃত কমিউ-নিস্ট" হওয়া। এই সব উদ্দেশ্য-বিহীন হত্যা জনগণের ঘৃণা ছাড়া আর কি এনে দিতে পারে?

হ্যাঁ, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস-এঙ্গেলস লিখে গেছেন যে "একশ্রেণী আর এক শ্রেণীকে ধ্বংস করে।" কিন্তু সে ধ্বংসের অর্থ কি শারীরিকভাবে ধ্বংস করা, নাকি শ্রেণী হিসাবে ধ্বংস করা? সমাজের উৎপাদনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সমাজের প্রতিটা মানুষেরই একটা শ্রেণী পরিচয় আছে—যারা উৎপাদন যন্ত্রগুলির (জমি কলকার-খানা ইত্যাদির) মালিক তারা মালিকশ্রেণী, যথা—জ্যোতদার, জমিদার, শিল্পপতি ইত্যাদি, আর যারা উৎপাদন যন্ত্রের মালিক নয়, শত্রু সেই যন্ত্রগুলিকে চালনা করে তারা মেইনতী বা শ্রমিকশ্রেণী, যথা—সামন্তবাদী সমাজে কৃষক, পুঁজি-বাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক ইত্যাদি। মালিকশ্রেণী রয়েছে শোষকের ভূমিকায়, কৃষক ও শ্রমিকেরা রয়েছে শোষিতের। শ্রেণীবিশিষ্ট সমাজে এই শোষক শোষিত প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলেছে। এই সংগ্রামেরই সবচেয়ে পরিণত রূপ হচ্ছে বিপ্লব যখন শোষিত শ্রেণী শোষক শ্রেণীকে ধ্বংস করে মালিকানা কেড়ে নিতে চায়। যে মতদর্শে শোষকশ্রেণী মালিকানাচ্যুত হলো অর্থাৎ সমাজে তার শ্রেণী পরিচয় পরিবর্তিত হলো। বিপ্লব সফল হলে সেটাই হয়। বিপ্লবের সময় শ্রমিক কৃষকেরা তাদের শৈবত শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন সমাজব্যবস্থার প্রোগ্রাম নিয়ে এগিয়ে আসে, শোষক শ্রেণীর কাছে জমি ও কলকারখানার মালিকানা দাবীকরে, যে সব জ্যোত-দার, জমিদার, কারখানা মালিক সেগুলি মেনে নেয় তারা নিশ্চয়ই

রেহাই পায় (যদিও চোখ তাদের উপর সব সময়েই রাখতে হয়) আর যারা বাধা দেয় বা দেওয়ার চেষ্টা করে তারাই মাত্র শারীরিকভাবে ধ্বংস হয়। তাই "এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে ধ্বংস করে" কমিউ-নিস্ট ম্যানিফেস্টোর একথার অর্থ এই নয় যে "শোষকশ্রেণীর যাকে যেখানে পাও কেটে ফেলো"—যে অর্থ চারু করে সি পি আই (এম-এল) বর্তমানে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং অর্থহীন শত্রুমত্ব-কেই বিপ্লব বলে চালিয়ে দিচ্ছে আর তরুণ কর্মীদের মনে খনের নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। মহাশয়গণ, কমিউনিস্ট মানে কতকগুলি রক্ত-পিপাসু জীব নয়; কমিউনিস্ট মানে সমাজের সবচেয়ে দরদী মানুষ যাদের মন মানুষের জন্য মমতায় ভরা। আপনারা কি চেয়ারম্যান মাও সে তুংকেও একটি রক্তচোষকপ নেকড়ে বলে মনে করেন নাকি? "হুনান রিপোর্টে" মাও সে তুং-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি নিশ্চয়ই আপ-নাদের স্মরণ আছে, যেখানে তিনি বলছেন "বিপ্লব কোন ভোজ সভা নয়, চিত্রাঙ্কন বা সূচীশিল্প নয় ইত্যাদি, তার শেষটার তিনি বলে-ছেন "বিপ্লব মানে বিদ্রোহ, উগ্র বলপ্রয়োগ যম্বারা এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে পার্শে দেয়।" এই "পার্শে দেয়" কথাটা মনে রাখবেন। তিনি ধ্বংস কথাটাও ব্যবহার করেন নি। মনে রাখবেন, কমিউ-নিস্টদেরও একটা "এথিক্স" আছে এবং ন্যায় অন্যায়ের সবচেয়ে ভাল বিচার তারাই করতে পারে। খন তাদের কাছে নিছক খুন নয়, খনের সাজা আর সে সাজা একমাত্র দেওয়া হয় তখনই যখন কেউ জনগণের নতুন কর্তৃত্বকে মানতে অস্বীকার করে। কোথায় আপনাদের সেই নতুন কর্তৃত্বর শৈবত শাসন বা জনগণকে দিয়ে গড়ে তুলেছেন? আপনারা বোধহয় এই স্রেফ খনো-খনির রাজনীতি চালু করে আত্ম-প্রসাদ লাভ করছেন এই ভেবে যে, আপনারাও দেশকে হুনানের সম-পর্যায় তুলে দিয়েছেন, কারণ চার-দিক থেকে ঐ কথাটাই তো শোনা যাচ্ছে, "বন্ড কাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে", যা মাও সে-তুং-এর "হুনান রিপোর্টে" দেখা যায় হুনানের ঘট-নার সবাই বলছে, "বন্ড কাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে"। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়গণ, সেই সুবিখ্যাত হুনান রিপোর্টে কতগুলি খনের খবর আছে? আর হুনান রিপোর্টে তো দেখতে পাই জনগণ নতুন সমাজ-ব্যবস্থার জন্য তাদের শৈবত শাসন গড়ে তোলার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে এবং জমিদার মহাজনদের যেন বলছে, "ইমেনে নাও আমদের শাসনব্যবস্থা।" বারা তা মানছে না, তখন পশ্চিম দেখা যায়, জনগণ নানাভাবে তাদের নাজেহাল করছে, কিন্তু পরিস্থিতি অতখানি পরি-পক্ব হওয়া সত্ত্বেও খনের খবর তো

সে রিপোর্টে বিশেষ নেই। খন যা হয়েছে, ইতিহাস বলে, তার পর-বর্তী যুগে যখন পরিস্থিতিকে আরও পাকিয়ে তোলা হয়েছে এবং বিপ্লব পুরানো হয়ে গেছে। সত্যতঃ সি পি আই (এম-এল)-কেও "টাইমিং" এর কথাটার ফিরে আসতে হবে—যেখের সঙ্গে সব-কিছুর অঙ্গ-গড়ে তুলতে হবে জনগণের শৈবত শাসনব্যবস্থাকে সোভিয়েত কমিউন বা গণ-পঞ্চায়েত মারফৎ বা জন্ম দেবে নতুন সমাজ ব্যবস্থার। বিপ্লবী পরিস্থিতিতে এগুলিই হচ্ছে একমাত্র সংগঠন বা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে হয়। এ কাজ রাশিয়াতেও করা হয়েছিল, চীনেও করা হয়েছে। এই কাজের সঙ্গে তাল রেখে পার্টি সংগঠন আপনা থেকেই বেড়ে যেতে থাকবে। ইদানিং কিছুকাল শোনা যাচ্ছে সি পি আই (এম-এল) তাদের কর্মী-দের গ্রামাঞ্চলে "বিপ্লবী কমিটি" তৈরী করে জনগণের পাশটা শাসন-ব্যবস্থা কয়েম করতে বলছে। কিন্তু এর মধ্যেও ভুল রয়েছে। "বিপ্লবী কমিটি" কেন? "কমিটি" কথাটা ব্যবহার হলোই বদ্ব্যবহার হতে তা "ব্যাপক জনসাধারণের" ব্যাপার নয়, "কিছু লোকের" ব্যাপার মাত্র। অথচ ক্ষমতা দখলের যন্ত্র হিসাবে যে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে তাতে ব্যাপক জনসাধারণের অংশ গ্রহণ এক অলঙ্ঘনীয় শর্ত। সে ক্ষেত্রে "কমিটি" করতে বলা হলে তো পার্টি কর্মীরা বেছে কিছু লোককে দিয়ে সেই কমিটি তৈরী করে রক্তবে-ওরাই ওখানকার দণ্ডমুন্ডের কর্তা। সে রকম কমিটিকে ব্যাপক জন-সাধারণ মানবে কেন? সেটাকে তো 'তারা' আর 'এক জন্ম' বলেই মনে করবে। আসলে জনগণ সম্বন্ধে হাজার কথা বললেও তাদের মধ্যে স্বাপকভাবে কাজ না করার তাদের প্রতি সি পি আই (এম এল) এর সত্যকারের আস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি এবং তাদের কর্মক্ষমতার উপর বিশ্বাস জন্মাননি। তাই স্বাপক জনসাধারণকে দিয়ে সোভি-য়েত, কমিউন বা গণ পঞ্চায়েত ধর-ণের সংগঠন গড়ে তোলার কথা এম এল পার্টি বলতে পারছে না। আর জনসাধারণকে দিয়ে ও ধরনের সংগঠন গড়ে তুলে পার্টিকে আগে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচারে নামতে হবে যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে শৈবত শাসনের অর্থ কি। কিন্তু এর জন্য যে খেঁচের দর-কার, দস্তখের বিষয়, সে খেঁচ এম এল পার্টির উপর থেকে নীচ পর্যন্ত কোন স্তরেই নেই। তাই কেবলই "সর্টকাট" খোঁজা হচ্ছে। অথচ বিপ্লবী কমিটি দিয়ে কিছু লোককে কাজে লাগানো গেলেও ব্যাপক জনগণকে কাজে লাগানো অসম্ভব। আর স্বাপক জনগণকে কাজে লাগাতে না পারলে শৈবত শাসন কখনই গড়ে উঠতে পারে না। সোভিয়েত নয়। [সোভিয়েত রুশ সামাজিক সম্ভা-জ্ঞবাদে পরিণত হওয়ার "সোভি-য়েত" কথাটির প্রতি সি পি আই (এম-এল)-এর নেতৃত্বের কেমন যেন একটা "এলাজিক" ভাব জন্মে

গেছে, অথচ তারা ভুলে যাচ্ছেন যে এই সোভিয়েতগুলি গড়ে উঠেছিল মহান নেতা লেনিনের আমলে এবং তারই নেতৃত্বে সারা রুশ জুড়ে এই সোভিয়েতের শাসনব্যবস্থা চালু হয়। কমিউন নয়, গণ-পঞ্চা-য়েত নয়—বিপ্লবী কমিটি! কেন সি পি আই (এম-এল) এর নেতৃ-বৃন্দ বিপ্লবী কমিটির কথা বল-ছেন? চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় অনেক জারগায় কর্তৃত্বভার বিপ্লবী কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল বলে কি? কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে বিপ্লবী কমিটি একটা সাময়িক ব্যবস্থামাত্র। যখন কোথাও সাময়িকভাবে একটা প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে "সাস্-পেন্ড" বা মর্জুত্বী রাখতে হয় বা একটা সাময়িক জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে হয় কিংবা লিবা-রেশনের স্তরে যখন বিপ্লব এগিয়ে চলে বড়ের বেগে তখন কিছু 'লয়াল' বা অনুগত লোককে দিয়ে তৈরী করা হয় বিপ্লবী কমিটি। চীনেও ঠিক তাইই করা হয়েছিল লিবারেশনের স্তরে ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জরুরী পরিস্থিতিতে। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক বিপ্লব শব্দ করার আগে জনসাধারণকে ডাক দেওয়া হচ্ছে শৈবত শাসনব্যবস্থা চালু করার জন্য। তাই এতে জন-গণের সকল অংশেরই সক্রিয় অংশ গ্রহণ অবশ্য দরকার। একটা বিপ্লবী কমিটি দিয়ে কাজ চালাতে গেলেই সেটা হয়ে উঠবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন "মাত্র কিছু লোকের" সংগ-ঠন বা সোভিয়েট, কমিউন বা গণ-পঞ্চায়েতের মত কার্যক্ষেত্রে স্বাপক রূপ নিতে পারবে না এবং তার ফলে প্রকৃত শৈবত শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে না। তাই পার্টিতে "বিপ্লবী কমিটি" গড়ার স্লোগানকে বদলে সোভিয়েট, কমিউন বা গণ-পঞ্চায়েত জাতীয় কোন সংগঠন গড়ে তোলার ডাক দিতে হবে, যা সঙ্গ হবে একমাত্র শ্রেণীশত্রুরা বাপে গ্রামের সকল মানুষ এবং পার্টি কর্মীদের বহুতে হবে, 'এর জন্য সমগ্র জনগণের মধ্যে যাও, প্রচার ও কর্মক্ষেত্রে ব্যাপকতম করে তোল, জনগণকে জাগিয়ে তোল এবং শৈবত শাসনব্যবস্থাকে শ্রেণী শত্রুদের বিরুদ্ধে কার্যকর করে (শেষাংশ এম পৃষ্ঠার ১)

অর্থনৈতিক দর্পণ (৪র্থ পৃষ্ঠার নম্র)

সত্যতঃ এই ধরনের খরচও মোট চাহিদা বৃদ্ধি করেছে কিন্তু মোট উৎপাদন বৃদ্ধি হয় নি, সত্যতঃ এই দাম বেড়ে গেছে। এই অনুৎপাদন খরচগুলির মধ্যে পুঁজি, সি আর পি, মিলিটারী বাবদ কেন্দ্র ও রাজসরকারের ব্যয় অর্থাৎ কমিউ-নিস্ট এবং শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্যে জনসাধারণের উপর নির্ভর-শীল হয়ে চলেছে অর্থনৈতিক ছিদ্রবৃদ্ধির আরেকটা বড়-ছিদ্র বন্ধ হত, পণ্যের বাজারে দাম বেড়ে যাওয়া বেশ কিছু কমে যেত।

এম এল দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে

আজকে সি পি আই (এম এল) এর মধ্যে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম ও অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমেই বলে রাখা উচিত যে একটি সাক্ষাৎ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দু'জাইনের লড়াই থাকবেই এবং সঠিক লাইনটি এগিয়ে যাবে। এই সঠিক লাইন নির্ধারিত হবে সংগ্রামী অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যেমন শহরে অন্ধাকশন হবে কিনা, হলে কতটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত তা সংগ্রামী অভিজ্ঞতার মধ্যেই বোঝা যাবে। যেমন বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস ও অন্যান্য পার্টির প্রতিরোধ বাহিনীর আক্রমণ আমাদের শিখিয়েছে যে শহরে স্কোয়াডদের গ্রামে যেতে হবে। সতরাং আমাদের কার্যক্রম নির্ধারিত করবে বিপ্লবী অভিজ্ঞতা।

পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম থাকবেই। কিন্তু আমার মনে হয় কোন ইস্যু নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনার পর সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় কমিটি। সেখানে যা গৃহীত হবে তাই সবার মেনে নেওয়া উচিত। এতে কোন ভুল হলে সেই ভুল কিছুদিনের মধ্যে ধরা পড়বেই। কিন্তু এ না হলে যে বার মত নিয়ে পড়ে থাকলে পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন আসতে বাধ্য। যেমন

বাংলাদেশ ব্যাপারে নিয়ে কমরেড চারু মজুমদার ও কমরেড অসীম চ্যাটার্জীর মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। আমার মনে হয় এই ইস্যু কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাখা হোক ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। চারু মজুমদারের "দেশবর্তী"-তে বলা হয়েছে যে অসীমকে তার দলিল পেশ করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তা তারা করেন নি। যদি তাই হয়ে থাকে তবে

কুৎসা শব্দ করে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের হিংস্র আক্রমণে আমাদের ক্যাডাররা আরো সংগঠিত হয়েছে। সুবিধাবাদী এবং শোষণবাদী ক্যাডাররা অত্যাচারের ভয়ে পালিয়েছে। আমাদের পার্টির চরিত্র আরো সংগ্রামী হয়েছে। তাই সি পি আই (এম-এল) নেতৃবৃন্দের কাছে আমার অবেদন তারা যেন একটি সাক্ষাৎ কমিউনিস্ট পার্টি'কে

মতামত

অসীম নিশ্চয় দোষী। অবশ্য এর-কমও শোনা যাচ্ছে (আমি নিজে এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য কিছু পাইনি) যে চারুবাবু নাকি অনেকদিন ধরে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডাকতে অস্বীকার করছেন। যদি তাই হয় তবে চারুবাবুও দোষী।

তবে আমার বক্তব্য এই যে বাংলাদেশ বা অন্য কোন কাপার নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিদ্ধান্ত করা হোক। নইলে নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ বাড়ালে সি পি আই (এম-এল)-এর শক্তি প্রভূত পরিমাণে কমবে।

না ভেঙ্গে ফেলেন বা তাদের অজান্তে হতে পারে। এই পার্টির পাতকাতলে সহস্র কমরেড শহীদ হয়েছেন, জেল ভেঙেছেন, বন্দক ছিনিয়েছেন। এবং একমাত্র আমাদের পার্টিরই আছে স্ফূর্তি-ধর ছাড়া সমস্ত মোহমত্ত ক্যাডার। যদি পার্টিতে ভাঙ্গন ধরে তবে এই-সব সত্যিকারের কমিউনিস্ট ক্যাডার হতাশ হতে ও বিপথে যেতে পারেন এবং বার দৃষ্টান্ত উল্লিখণ্ড একুশ সাল থেকে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ঘড়ি-সিঁই পাওয়া যাবে।

তাই এই বহুল প্রচারিত প্রগ-

তিশীল পরিচালনা মাধ্যমে আমি সমস্ত এলাকার সি পি আই (এম-এল) ক্যাডারদের আহ্বান জানাচ্ছি তারা যেন এ বিষয়ে চিন্তা করেন ও অস্থভাবে কিছু না করেন। কারণ আমাদের দায়িত্ব এই সাক্ষাৎ কমিউনিস্ট পার্টি'কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যদি আমরা তা করতে ব্যর্থ হই তবে জনগণ আমাদের ক্ষমা করবে না, নিজেদের কবর আমরা নিজেদেরই খুঁড়ব।

জনৈক সি পি আই (এম-এল) সমর্থক

বাটানগরে সি পি আই ইতিহাস সৃষ্টি করছে!

বাটানগরের ডেই ইউনিয়নের ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি করে আরো একবার সি পি আই নিজেদের দেউলিয়া রাজনীতি প্রমাণ করল। চ্যাটার্জী ব্রাদার্স ক্যান্টিন ওয়ার্কস ইউনিয়ন সত্তর সালের জুন মাস থেকে আজ অবধি সি পি. এম-এল একক নেতৃত্বে বাটা মালিকের সঙ্গে লড়াইয়ে একের পর এক দাবী আদায় করে নেয়।

সবুধ থেকেই এই ইউনিয়নের উপর মালিক পুলিশ, সি পি আই কংগ্রেস এবং নকশালের যৌথ আক্রমণ লেগেই আছে। একান্তর-এর মে মাসে ইউনিয়নের সহ সম্পাদক এবং ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাজল চক্রবর্তীকে দক্ষিণ-পশ্চিম গুন্ডারা খুন করে। এদের পাইপগানের মর্ম বাটানগরের শান্তি প্রিয় জনসাধারণ প্রতিদিন হুড়ু হুড়ু টের পাচ্ছে। পুলিশ হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করার বদলে ইউনিয়নেরই সহঃ সভাপতি পীযুষ চক্রবর্তী সহ আরো ছয় জন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। পীযুষ চক্রবর্তীর নামে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াইয়ের কল্পিত অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়। অদ্যাবধি তিনি সি পি আই'নে বন্দী আছেন। আরো একজন সহঃ সভাপতি রণেন সিংহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, যদিও এখন তিনি জামিনে মুক্ত, তার বাটা এলাকার ঢোকার কাপারে কোর্টের নিষেধাজ্ঞা আছে।

এরপর আরো একবার ক্যান্টিন আক্রান্ত হয়। পুলিশ এসে আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তার করার বদলে আটচালিশ জনের মত ক্যান্টিন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। চলতি বছরের আগষ্ট মাসের শেষার্শ্বে শ্রমিকদের উপর আবার নতুন করে আক্রমণ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সি পি আই এর কংগ্রেস চক্রবর্তী (ইনি আগে কংগ্রেসী ছুপেন বিজলী সমর্থন পুষ্ট নকশাল ছিলেন) সশস্ত্র অবস্থায় ইউনিয়নের কয়েকজন শ্রমিকের উপর হামলা করতে দেখা যায়। এর পর সে বলে "ইউনিয়নে তাদের একজন লোক নিতে হবে।" পুলিশের সি আইকে এই সব কথা

মৌখিক ভাবে দু'বার বলা হয়। তিনি কিছুই করেন নি। এরপর সি পি আই নেতাদের এ কথা জানানো হলে তারা প্রথমবার বলে "কন্সলিগ নকশাল করত ওর পক্ষে এটা করা সম্ভব, আমরা দেখব।" প্রীমান কল্যাণের সশস্ত্র আগমন কিন্তু অব্যাহত থাকে।

এইভাবে সন্ধ্যা সৃষ্টিতে সক্ষম হবার পর আটাই নভেম্বর সকাল বেলা সি পি আই এর লোকাল কমিটির সদস্য দিলীপ ঘোষ এবং সন্তোষ ঘোষ ক্যান্টিনে গিয়ে সি পি এমকে বাদ দিয়ে ইউনিয়ন গঠন করার অটল সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সি পি এম এর তরফ থেকে প্রথমেই ব্যক্তির (দিলীপ ঘোষ) সঙ্গে কথা বলা হলো তিনি। সোজাসুজি বলেন "আমাদের শক্তি আছে আমরা ইউনিয়ন করব।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : অঙ্গুলের প্রায় তিনশো জন সি পি এম কর্মী জেলের অভ্যন্তরে, বহু জনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়েছে, পুলিশ, সি আর পি সক্রিয় ভাবে সাহায্য করছে সি পি আই, কংগ্রেসী গুন্ডাদের। সি পি আই এর শক্তির উৎস এখানে। কোন নির্বাচন না, পাইপ গানের মধু শ্রমিকদের দিকে ফিরিয়ে, এই ডুইফোড ইউনিয়নের প্রতি শ্রমিকদের আনন্দগত আনার চেষ্টা হচ্ছে।

সন্তোষ মনোজী

চীনা পররাষ্ট্র নীতির গতিপ্রকৃতি

চীনের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে চাংক্য সরকার (উনিশে নভেম্বর দর্পণের বঙ্গবর্ষণ বিভাগে) একজ্ঞায়গায় বলছেন "চীনা সাম্য-প্রিয় জাতিপুঞ্জের সদস্যই খালি হয়নি, এই সংগঠন থেকে চিয়াং কাইশেক শাসিত তাইওয়ান বিতাড়িত হয়েছে। এই অবিসংবাদ্য কাণ্ড হয়েছে চীন মার্কিন গোপন বৈঠকের মাধ্যমে।"

কোন গোপন বৈঠকের কথা বলছেন তিনি? হেনরি কিসিংগের সঙ্গে চৈনিক নেতাদের যে বৈঠক চলছিল রাষ্ট্রসংঘের বিতর্কের সময়ে তার কথা? সিটি আর গোপন রইল কোথায়? বিশ্ববন্ধ লোক তো জেনে গেছে? আর, সে-বৈঠকে ঠিক হয়ে গেল চীনের রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ এবং তাইওয়ানের প্রশ্বান, এ রকম কথা কোনো কোনো সময়ে মনোরোচক হলেও এই বিশেষ তাৎপৰ্যপূর্ণ ঘটনার বিশ্লেষণে কোনো সাহায্য করে না।

আসলে অনেকদিন আগেই রাষ্ট্রসংঘ থেকে তাইওয়ান বিহীন হতে সেখানে চীনের অন্তর্ভুক্ত সম্ভব হতো, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে-সব দেশকে অর্থসাহায্য করে তাদের হাত মুচড়ে প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট আদায় করতে না (শেবাংশ ওয় পুটার)

ছাত্র পরিষদের আন্দোলন প্রসঙ্গে

শহরে নিত্য স্ববহার জিনিষ পত্রের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই হারে জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি হলে গরীব থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের সামনে অনাহার নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তার উপরে আবার কেন্দ্রীয় সরকার বৃদ্ধের নামে অতিরিক্ত কর ধার্য করেছে। রাষ্ট্রপতির এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এই প্রথম শাসক-শ্রেণী করভার চাপিয়ে দেশব্যাপী জনসাধারণের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে।

'দেশের' বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এর বিরুদ্ধে কিছু কার্যত কোন কথা বলছে না। কেউ কেউ আবার একটি বিবৃতি দিয়েই খালাস।

বিগত কয়েক সপ্তাহ আগে হঠাৎ দেখা গেল শাসকশ্রেণীর ছাত্র ও যুব পরিষদ জনগণের কল্যাণার্থে দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ আন্দোলনের নামে কয়েকটি বাজারের সামনে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য অনশন শব্দ করল। জিনিষপত্রের দরদাম এতে কিছুমাত্র কমে নি, বরং পূর্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের এই তথাকথিত মূল্য বৃদ্ধি রোধের অনশন সাধারণ লোকের কাছে হাসির খোরাক ব্যতীত কিছুই নয়।

জিনিষ পত্রের মূল্যমান খোলা বাজারে নির্ধারিত হয় না। উৎ-

পাদক, একচেটিয়া মালিক মজুত-দার ও মনোফাখোররাই পাইকারীদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে। এরপর পাইকারী ব্যবসায়ী তার লাভ রেখে খুচরো ক্রেতাদের জন্য দাম নির্ধারণ করেন। খুচরো বিক্রেতাগণ রজের আপ্যায়ন কয়েকটি ব্যক্তির জন্য দ্রব্যের দাম ঠিক করে। ব্যবসায়ের এই প্রচলিত রীতিতে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ খুচরা ব্যবসায়ীরা রজ মূল্যের উপর দু'চার আনার বেশী লাভ করতে পারে না।

সে কারণে দ্রব্যমূল্য রোধ করতে হলে মজুতদার মনোফাখোর চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর নীতি প্রয়োগ দরকার। এটা আজ সুবিদিত যে সরকার একাজ কোনদিন করেনি। রাজ্যপাল মহাশয় পশ্চিমবঙ্গে এসেই শান্তি-শৃঙ্খলা দৃষ্টের দমন এবং আইনের নামে অনেক বড় বড় কথার ফুল-বুড়ি ছোটালেন। কিন্তু কাজের বেলায় এখন পর্যন্ত অশ্রুস্তাই করতে হচ্ছে।

রজের শাসক সম্প্রদায়ের ছাত্র ও যুবকরা একচেটিয়া মালিক মনোফাখোর মজুতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে না নেমে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের উপর হামলা করলো। অবশ্য ওদের দোষ দেওয়া যায় না, দাদাদের অননুত পথই ওদেরও পথ। তবে দাদাদের সঙ্গে কিন্তু

ওদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে বলে সি পি আই-এর স্ফোরক মনে করেন। কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেন যে "এরা সমাজতন্ত্রের পথে চলতে চায়, কিন্তু ওদের দাদারা তা চায় না।"

সি পি আই তো ইন্দিরার দলের 'সমাজবাদী কর্মসূচী' বা আন্দোলনের নিন্দা করতে পারেন না। তাই তারা খুচরো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ছাত্র পরিষদের সঙ্গে একযোগে ঢাক পিটিয়ে আন্দোলন করছেন। মার্কসবাদে কিস্বাসী কোন দল বা ব্যক্তি বিশ্বাস করেন কি না জানি না যে গাছের মূলে আঘাত ব্যতীত গাছ ভুলে ফেলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাই আঘাত করতে হলে মূলে প্রয়োজন মনোফাখোর মজুতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই। তা না করলে আর বাই হোক দ্রব্যমূল্য রোধ করা সম্ভব হবে না।

পরিশেষে, আশার আলো হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যের শ্রমিক কৃষক খেটে খাওয়া মধ্যবিত্ত মানুষ সকলেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। এই সরবতার রোষান্বিত অচিরেই শাসক শ্রেণী ও তার দালালদের প্রভুত্ব মনোফাখোর ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে তীব্রতর আন্দোলনের জোয়ারে মল্লযুদ্ধ রোধ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে নিবাচনের পটভূমি তৈরী হচ্ছে

(বিশেষ প্রতিনিধি)

নয়া দিল্লী, ছাব্বিশে নভেম্বর : পশ্চিম বাংলার বাহ্যিক সালে বিধানসভার নির্বাচন অবশেষে হবে বলে মনে হচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধী এ সপ্তাহের শুরুর দিকে তড়িৎ দ্বারা শ্রীঅজয় মরখোপাধ্যায় এবং বাংলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের রাজধানীতে ডেকে পাঠান, বিশেষ করে নির্বাচনের সম্ভাবনা আলোচনা করার জন্য। গতবার যখন ইন্দিরাজী কলকাতা যান, তখন পরনো সরকারের দ্বারা সাক্ষরিত ও সমর্থিত ছিল, তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ইতিমধ্যে বাংলা কংগ্রেস কংগ্রেসে প্রত্যাগমনের সিদ্ধান্ত নেয়। বাকি থাকে সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য ছোট ছোট দল।

এবার দিল্লীতে অজয়বাবুর সঙ্গে ইন্দিরাজী, জগজীবন রায় ও কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জীবায়াস, আগামী নির্বাচনে এই ছোট দলগুলির সঙ্গে সমঝোতার কথা আলোচনা হয়। সি পি আইয়ের কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধা ছাড়া গতান্তর নেই। ফরোয়ার্ড ব্লক বিধা বিভক্ত।

ইন্দিরাজী ঠিক এই মন্তব্যটি বেছে নিয়েছেন পশ্চিম বাংলার নির্বাচনী জোট তৈরীর জন্য একটি বিশেষ কারণে। বাংলাদেশে যুদ্ধের

ব্যপারে পাকিস্তানী আক্রমণের মধ্যে ভারত সরকার প্রায় বন্ধকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছে। বিদেশী আক্রমণের সময় দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোন সরকার-বিরোধী অভিযান দেশদ্রোহের সম্মিলিত হবে—এই আশংকার প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলিই নীরব। জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, কল-কারখানায় শ্রমিক ছাটাই হচ্ছে, অথচ কেন্দ্র ব্যাপক আন্দোলন করার সুযোগ নেই।

এই অবস্থায় সি পি আইয়ের শ্রমিক সংস্থা এ আই টি ইউ সির কার্যকরী সমিতির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। শ্রীডাঙ্গা সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খেলাধুলি ভাবেই বলেন যে পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ হলে এ আই টি ইউ সি, শ্রমিকদের দাবি নিয়ে কোন ধর্মঘট করবে না, কারণ তাহলে উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেন যে, যদিও আন্দোলনিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষিত হয় নি, কার্যতঃ পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর হয়েছে।

সুতরাং সি পি আইয়ের রাজনৈতিক বক্তব্য ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যুদ্ধের নাম করে কংগ্রেস ও ইন্দিরাজীকে পূর্ণ সমর্থনের দিকেই এরা এগরছে। পশ্চিম বাংলার

নির্বাচন হলে এই নীতিই কার্যকরী হবে।

ইন্দিরাজীর আশা যে, এ বছরের শেষেই বা আগামী বছরের শুরুর দিকেই বাংলাদেশে একটা হেস্টো-নেস্টো হয়ে যাবে। স্বাধীন বাংলাদেশ আসন্ন—তা মন্ত্রী ফৌজের নিজস্ব লড়াইয়ের জোরেই হোক বা ভারত-পাক যুদ্ধের মাধ্যমেই হোক। স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তব হলে ইন্দিরাজীর সম্মান ভুগে উঠবে বলে ধারণা, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়। কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারণার বিশেষ অঙ্গ হবে—ভারত সরকার কি ভাবে মন্ত্রী ফৌজকে সাহায্য করেছে এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে। এক যুদ্ধশ্রমাদনা এবং জাত্যাভিমানের তোড়ে পশ্চিম বাংলার নির্বাচকদের ভাসিয়ে নিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নব কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি এম-কে প্রায় কোণঠাসা করে আনা গেছে পশ্চিম বাংলায়। গত কয়েক মাস ধরে এক সুপারিকম্পিত উপায়ে পদলিখ ও গুণ্ডার সাহায্যে মার্কসবাদী কমিীদের বহু এলাকা থেকে প্রায় হাট্টিয়ে দেওয়া হয়েছে, নয় জেলে পড়িয়ে রাখা হয়েছে, নয় খুন করে ফেলা হয়েছে।

এখানে পদলিখ সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থবর এসেছে যে মার্কসবাদী পার্টি আপাততঃ বিপর্যস্ত ও বিরত। যে কমিরা নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করবে, অন্ততঃ শহরাঞ্চলে, তাদের নীরব ও পৃথক করতে সক্ষম হয়েছে নব কংগ্রেসের ফ্যানিস্ট গুণ্ডারা পদলিখের সাহায্যে। পদলিখ আশ্বাস দিয়েছে যে, কলকাতা ও আশেপাশের বহু অঞ্চলে—যেগুলি আগে মার্কসবাদী পার্টির শক্ত ঘাঁটি ছিল—সেখানে এখন মার্কসবাদী কমিরা চকতে পারে না। সুতরাং নির্বাচনী প্রচারণা অভিযানে এ সব অঞ্চলে মার্কসবাদীরা আসতে পারবে না, নির্বাচকদের কাছে তাদের কথা পৌঁছে দিতে পারবে না।

এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ করে পদলিখ আশা করছে যে, নির্বাচনের পূর্বাঙ্কে আরও ব্যাপক আকারে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মার্কসবাদী পার্টির ভোটারদের ভয় দেখিয়ে হয় কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেওয়ানো যেতে পারে, কিংবা নির্বাচনী কেন্দ্রে তাদের অসুস্থ বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে সি পি এমের ভোটারদ্বারা—গ্রামীন গরীব কৃষক ও ক্ষেত-মজুর কতখানি সন্তুষ্ট হবেন সে বিষয়ে এখনও সরকারের সন্দেহ আছে। কল-কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে সি পি এম-এর ঘাঁটি দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে মার্কসবাদী কমিীদের ছাটাই বা গ্রেফতার করে। গ্রামাঞ্চলে অননুপূর্ণ সি পি এম-বিরোধী সরকারী ও কেসরকারী অত্যাচার শীঘ্রই শুরু হবে বলে

এখানে অনেকেই বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপদেষ্টাদের মত যে দু-এক মাসের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলেও সি পি এমকে কোণঠাসা করা যাবে। কলকাতা ও মধ্যবিন্দু অঞ্চলে অঞ্চলে নকশাল ও মার্কসবাদী সাক্ষ অভিযানের সাফল্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেকটা আশ্বস্ত করেছে।

এই সব কারণেই কংগ্রেসের ইচ্ছে পশ্চিম বাংলায় যুদ্ধের আবহাওয়া সি পি এমের সাময়িক বিপর্যয়, সি পি আইয়ের সমর্থন ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির নীরবতা এক কথায় পশ্চিম বাংলার বর্তমানে কোন যুদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভাবের সুযোগ নিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নামা।

আসন্ন নিয়ে ভাগ-বাটোয়ারাও শুরু হচ্ছে। তার প্রথম পদক্ষেপ, পশ্চিম বাংলার বর্তমান কংগ্রেসের অ্যাড-হক কমিটিতে অজয়বাবুর দলকে কতটা প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে। অজয়বাবুর সঙ্গে শ্রীতরুণ-কান্তি ঘোষ ও জ্যোতি বৈদ্যেহন। সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে কিছুটা স্থান করে নেওয়ার জন্য তিনি আপাততঃ অজয়বাবুকে মদত দিচ্ছেন, যতটুকু আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের অধিকার পড়ো-টাই সিদ্ধার্থ রায় ও তাঁর ছাত্র পরিষদ গুণ্ডাবাহিনীর হাতে না থাকে।

আগামী এক মাসের মধ্যেই ছবি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে এবং পশ্চিম বাংলার প্রাক-নির্বাচনী পটভূমি আস্তে আস্তে ঘনীভূত হবে বলে অনেকেই এখানে আশা করছেন।

এম এল দলের রাজনীতি

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয়ভাবে কার্যে করে। এখানে কোন 'সটকট' নেই।

সি পি আই (এম-এল) খুব সঠিকভাবেই 'সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ব্যাপক মিল'কে 'সর্বপ্রধান দৃষ্ট হিসাবে তুলে ধরেছে। কিন্তু তবুও 'কর্ম' (খিওরী প্রস্ট প্র্যাকটিস) কত অমিল। এই সিদ্ধান্ত অন্তিম সারে গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েট, কমিউন বা গণ-পন্থার জাতীয় শৈবত শাসনের সংগঠন ও ক্ষমতা দখলের যন্ত্রগুলিকে গড়ে তোলার কাজ ও সংগ্রামের প্রতি পার্টির সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত ছিল, শহরাঞ্চলের পার্টি কমিীদেরও পার্টির সক্রিয় সহযোগে গ্রামমুখী করে তোলা উচিত ছিল। প্রথমদিকে চারবাবুরা সেই সঠিক চেষ্টাই করেছিলেন। 'কৃষি বিপ্লব মন্ত্রিপথ' আর 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো'—এই দুটি সঠিক স্লোগানের ভিত্তিতেই তো গড়ে উঠলো সি পি আই (এম-এল) পার্টি। কিন্তু কি আশ্চর্য, যখন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নতুন এই দুটি স্লোগানের আকর্ষণে এগিয়ে এলো শহরের হাজার হাজার তরু-

ণেরা, তখন হঠাৎ যেন নেতাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে গেল। সেই সব তরুণকে, গ্রামের দিকে চালিত করার বদলে, মাও সে তুং চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাদের নিয়ে যেতে উঠলেন শহুরে সংগ্রামের খেলায়—শ্রেণীশত্রু খতম, পদলিখ খতম ইত্যাদির খতিয়ান দিয়ে ছেলেদেরকে মারিত্তে রাখলেন সম্পূর্ণ নিরর্থক একটা সংগ্রামে এবং প্রতিপক্ষের সাময়িক বিপর্যয়ে শহুরে 'মজাঞ্চল' সৃষ্টির মত মাও সে তুং চিন্তাধারা বিরোধী কথা-বার্তা বলে সম্পূর্ণ দুর্দৃষ্টিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এরা সব জেনেও জানলেন না যে এই শহুরে আন্দোলনের প্রবণতায় বিরুদ্ধে কি ভীষণ ও একটানা কত বছর ধরে স্বয়ং মাও সে তুং পার্টি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সপ্রমাণ করেছেন যে ঔপনিবেশিক ও অধীনগণনিবেশিক দেশগুলিতে গ্রামই হচ্ছে বিপ্লবীদের সর্বপ্রধান কর্মক্ষেত্র, যা থেকে দুইটি রণনীতি স্লোগানের আকর্ষণে বেরিয়ে এসেছে : 'গ্রামগুলিকে মজা করে', 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো'। কিন্তু গোড়াকতক পদলিখ মেরে শহুরে সাময়িক বিপর্যয়ে উল্লসিত এম এল নেতাদের মাথা এখনই

গলিয়ে গেল যে তারা একটা নতুন তরুই প্রচারণা করে ফেললেন যে ভারতের মত আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে গ্রামগুলিকে মজা না করেও শহুরে সংগ্রাম পরিচালনা, এমনকি মজাঞ্চল সৃষ্টি করাও সম্ভব। এই চূড়ান্ত ভুল নীতির বিপর্যয়কর পরিণাম হাতে হাতে পেতে হলো এবং হচ্ছে। এ মন্তব্যে শহুরে ক্ষমতা দখল করা হবেও না এবং সম্ভবও না, অথচ কমিীদের বলা হলো চরম পন্থা গ্রহণ করতে—শ্রেণীশত্রু খতম করো, অন্য পার্টির কমিীদের খতম করো, পদলিখ খতম করো ইত্যাদি। ক্ষমতা দখল করা হবে না অথচ খতম—এই উদ্দেশ্যহীন রক্তপাতের পরিণাম হলো এই যে, শহুরে প্রথমে জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন হারালো, সেই সুযোগে পদলিখ ব্যাপকভাবে ঘেরাও আর তল্লাসী চালিয়ে গিয়ে গিয়েছে তুঙ্গে নিয়ে গেল পার্টি কমিীদের। শহুরে তাই নয়, পার্টির খতম নীতির বিরুদ্ধে সরকার (সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে) চকালো পাল্টা খতমের অভিযান। এই বে-আইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কথা বলারও কেউ নেই, কারণ সক্ষমকেই তো 'শহুরে' বলে ডাকা হয়েছে। শহুরে অঞ্চলের

অন্ততঃ কয়েক শ কমি বালি হয়েছে সরকারী জহাজের হাতে, আরও অন্ততঃ দশ হাজার গেছে জেলে। পরাজয়ের এখানেই শেষ নয়, যে জনসাধারণকে পার্টি সহযোগী হিসাবে পেতে হবে, তারা এর পর এগিয়ে এসেছে, পদলিখের সহায়তায় সক্রিয় প্রতিরোধে। পদলিখ ও প্রতিরোধীরা সহযোগিতার সর্বপ্রতিরোধ বাহিনী গড়ে সর্বত্র জনগণই এখন পার্টির কমিীদের ধরিয়ে দিচ্ছে এবং সুযোগ পেলে হত্যাও করছে। তাই অবশিষ্ট কমিীদের পালিয়ে যেতে হচ্ছে এলাকা ছেড়ে, শহুরে এলাকা ছেড়ে নয়, শহর ছেড়ে। শহুরে যে 'লাল সন্ত্রাস' সৃষ্টি করতে চেষ্টাছিল পার্টি, তার পরিণতি ঘটেছে চূড়ান্ত শৈবত সন্ত্রাসে। কি বিস্ময়কর বিপর্যয়! (চলবে)

মতামত

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

না পারতো। এক্ষেত্রেই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত মোচড়ানি বাধা হলো। কারণ, সেই ঐতিহাসিক ভিত্তেতনাম। ভিত্তেতনামই দেখিয়ে দিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা

সোভিয়েত রাশিয়া কারো পক্ষেই আর ছোট অনন্ততঃ দেশগুলিকে দিয়ে জোর করে কিছু করিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এমনকি যেসব দেশ এমাবং মার্কিন টাকা খেয়ে আসছে তারাও, চীনকে বাদ দিয়ে যে ভীষণভাবে নিজেদের জাতীয় স্বার্থের, সুরাহা হবে না, একথা বঝতে শিখছে। এ সবই চৈনিক পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের লক্ষণ।

এ সব তথ্য পাশ কাটিয়ে ঘটনাটি চীন-মার্কিন গোপন সমঝোতার ফলে সংঘটিত হয়েছে এ কথা বলার মধ্যে যে বিকৃতি আছে, তার উদ্দেশ্য যে সৎ নয় এ রকম ধারণা করলে বোধহয় নেহাৎ অনান্য হবে না। রাষ্ট্রসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্ত প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'দুই চীন' তত্ত্বের পরাজয়ের এবং চীনের পররাষ্ট্রনীতির জয়ের বিশ্লেষণের প্রয়োজন এ দেশে আছে। কারণ এদেশে চীন সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপ্ত বিকৃত ধারণার অন্ত নেই। চাপক সরকারের মতন সাংবাদিকেরা জে সে কাজে হাত দিতে পারেন।

অভিজিৎ মরখোপাধ্যায়

মহারাষ্ট্রে আত্মকলহ, বিহারেও মন কষাকষি

(বর্ণনামূলক)

মহারাষ্ট্র : সম্প্রতি শোলাপুর জেলায় মলিশিয়ার তালুক "শেটকারী পরিষদ" (কৃষক পরিষদ) সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন জেলা তালুকদার নব কংগ্রেসী রথী-মহারথীকৃষ্ণ। সম্মেলনে প্রস্তাবিত জমির মালিকানার সর্বোচ্চ পরিমাণ কমিয়ে দেবার এবং 'বাণিজ্য' পরিবর্তে 'পরিবারকে' মালিকানার একক ভিত্তি হিসাবে ধরার যে প্রস্তাব এসেছে তার তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রের সেচ এলাকার ধনী কৃষক ও জোতদার মালিকেরাই এই 'শেটকারী পরিষদের' সক্রিয় সদস্য। এদের মহারাষ্ট্রের খাস-সেচ যুক্ত এলাকা, কোলাপুর, সাংগলি, সাতারা, শোলাপুর, পুণা, আহমেদনগর এবং নাসিক জেলাগুলিতে প্রভাব খুব বেশী এবং এই জেলাগুলিতে এই জোতদার ও ধনী কৃষকেরাই নব কংগ্রেসের গলভিত্তি। এদের স্বার্থমূলক ভাষায় 'বাণিজ্যজোতদার' বলা হয়। এদের হাতে গ্রিফিথ কো-অপারেটিভ চিনিকলের মালিকানা রয়েছে।

সম্মেলনে মহারাষ্ট্রের সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী এস. বি. পাতিলের ভ্রাতা শ্রীসরাজীরাও পাতিল ঘোষণা করেন যে যদি সরকার তাঁদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জমির সর্বোচ্চ মালিকানা কমিয়ে এবং পরিবারকে ব্যক্তিগত বদলে একক ভিত্তি করে কিস্তি পাশ করতে যান, তাহলে মহারাষ্ট্র থেকে নব কংগ্রেসকে 'উৎখাত' করে দেওয়া হবে এবং মহারাষ্ট্রের কোন নব কংগ্রেসী নেতা অথবা মন্ত্রীকে রাজ্যের মধ্যে 'নিরাপদে ঘরে বেড়াতেও দেওয়া হবে না।'

নব কংগ্রেসী পার্লামেন্ট সদস্য শ্রীবালসাহেব ভিখে পাতিলের পিতা এবং কৃষকদের মধ্যে কো-অপারেটিভ চিনিকল স্থাপনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীভিখে পাতিল আহমেদনগরে খোলাখুলি কৃষকদের এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্যে ভূমিরাজস্ব, সেচকর, শিক্ষাকর প্রভৃতি সরকারকে নব কংগ্রেসের জন্য আহ্বান জানান।

সবচেয়ে মজার উক্তি করেছে সেই বিখ্যাত নব কংগ্রেসী এম এল এ বীর পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্পর্কে মহারাষ্ট্রে ভূমল বিস্ফোভ হয়েছিল। এই ভূমলেকের নাম শ্রীশঙ্কর রাও মোহিতে প্যাটেল, নব কংগ্রেসী এম এল এ ও অ্যাপেল চিনিকল কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান। ইনি সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। শ্রীশঙ্কররাও মোহিতে প্যাটেল মশাই বলেন যে "কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরামের সদস্য এবং মন্ত্রী শ্রীমোহন ধারিয়া শাসিয়েছেন যে সরকার প্রস্তাবিত ভূমি সংস্কার আইনের বিরোধিতা করলে আগামী নির্বাচনে নব কংগ্রেসের মনোনয়ন পাওয়া যাবে

না। আমরা তাঁতে মোটেই পরোয়া করি না কারণ আমরা নব কংগ্রেসকে মহারাষ্ট্র থেকে মুছে দিতে পারি।" তিনি আরো বলেন যে শহরের লক্ষপতি-কোটিপতি শিল্পের মালিকেরাই আসল শোষণ এদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে গ্রামের সমবায় উদ্যোগী কৃষকদের বিরুদ্ধে নব কংগ্রেস জমি টুকরো টুকরো করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফল তাকে পেতেই হবে। "যদি সরকার

সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে এভাবে বক্তব্য রাখা অন্যায্য নয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় পরিষদে দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমোহন ধারিয়া সরাসরি বলেছেন যে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিষয়ে যারা বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন তাদের কংগ্রেসের সভাপদ থেকে বিতাড়িত করা হবে এবং আগামী রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তাদের মনোনয়ন দেওয়া হবে না।

ভয়ত দর্শন

কার্যক্রমী ভাবে শহরের জমির সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করতে না পারে, তাহলে আমরা সরকারকে আমাদের এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেব না।" সরকার গত দশ বছরে একজন ভূমিহীন কৃষককেও এক ছিটে জমি দেয় নি, তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ভূমি সংস্কারের কথা মানায় না।"

পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বসন্তরাও দাদা পাতিল এই ধনী কৃষক জোতদার গোষ্ঠীর কাছে নতি স্বীকার করে বলেছেন যে এখন পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে জমির সীমা নির্ধারণের কিস্তি আনা হয় নি, সুতরাং কংগ্রেসের সভ্যদের জমির

আগামী পাঁচই ডিসেম্বর মহারাষ্ট্র রাজ্য কংগ্রেসের অধিবেশনে নির্মিত সদস্যবৃন্দ ছাড়াও ঐ সব ধনী কৃষক জোতদার প্রতিনিধিদের যোগদানের জন্যে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে কৃষিজমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের নীতিকে জলবৎ তরল করার জন্যে শাসক কংগ্রেস দল সমস্ত উপায় অবলম্বন করতে যাচ্ছেন। অবশ্য মহারাষ্ট্র রাজ্যে কয়েকটা সেচযুক্ত জেলায় 'বাগাইতদার' অর্থাৎ ধনী কৃষকদের আধিপত্য এত প্রবল যে তাদের বাদ দিয়ে শাসক কংগ্রেসের পক্ষ নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়াই কঠিন। স্বয়ং

মধ্যমন্ত্রী ডি পি নায়ক হাজার একর জমির মালিক এবং তাঁর মন্ত্রিসভায় শিল্পপতিদের চেয়েও জোতদার-কৃষকদের সামন্ত শ্রেণীর প্রাধান্য বেশী। এরই ফলে আধ্যাত্মিক শিবসেনাদেব মহারাষ্ট্রে একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতি, জমিদার, জোতদারদের প্রতিনিধি শাসক কংগ্রেসের সমর্থনপুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠেছে।

বিহার : বিহারের ভোলা প্রশাসন-মন্ত্রিসভার নড়বড়ে কাঠামো আবার কাঁচ হয়ে পড়েছে। বিহারের প্রায় সমস্ত সুবিধাবাদী জনবিরোধী দল ও কৃষি এই মন্ত্রিসভার পেছনে। তবুও জনস্বার্থ বিরোধী কাজের ফলে এই মন্ত্রিসভা আর কিশীদিন টিকেতে পারবে বলে মনে হয় না।

ইতিমধ্যেই, মন্ত্রিসভার সদস্যপদ নিয়ে সি এস পি দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। রামগড়ের পরলোকগত রাজা কামাখ্যানারায়ণ সিংহের ভ্রাতা বসন্ত নারায়ণ সিং এখন সি ডব্লিউ ডি মন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে দলীয়তমূলক কার্যকলাপের অভিযোগ মন্ত্রিসভা সমর্থকদের মধ্যেও প্রবল।

শাসক কংগ্রেসের লেজর সি.পি. আই দল পর্যন্ত টাটার জমিদারী দখল বিলি রাষ্ট্রপতির সম্মতি না পাওয়ার ফলে ক্ষমত। শাসক শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ করার ফলে এই কমিউনিস্ট নামধারী দলটী রাজ্যে ও কেন্দ্রে একচেটিয়া পুঁজি মালিক রাজা মহারাজা জোতদার শ্রেণীর আধিপত্য সম্পর্কে দৃষ্টিহীন। তাই

তার দেখতে পাচ্ছে না যে একচেটিয়া মালিকদের শিরোমণি টাটার বিরুদ্ধে তাদেরই কেন্দ্রীয় সরকার যেতে পারে না। বড়জোড় মৌখিক দু'চারটে গরম বুলি ঝাড়তে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যি কোনো রকম একচেটিয়া মালিকের স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা শাসক কংগ্রেসের সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

অথচ একেই সি পি আই "প্রগতিশীল" বলে পার্টী দলিলে চিহ্নিত করেছে। এখন এই প্রগতিশীল শাসক কংগ্রেস জেজে মোচড় খেয়ে শিং বাগিয়ে সি পি আইকেও তাড়া করতে উদ্যত। গুতো খেয়ে সি পি আই বলতেও পারছে না যে শাসক কংগ্রেস প্রগতিশীল পথ পরিত্যাগ করেছে। তাই তাদের বাচাল শিরোমণি নেতা ভূপেশ গুপ্ত মশাই সখেঁদে বলেছেন যে নয়াদিল্লীর কিছুর অফিসার টাটার সঙ্গে যড়যন্ত্র করে টাটা জমিদারী দখল বিলটীকে রাষ্ট্রপতির সম্মতি না দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে। অর্থাৎ মালিক নব কংগ্রেসী ইন্দিরা সরকার দোষী নয়, দোষী হচ্ছে তাঁর হুকুমের চাকররা।

তা ভূপেশবাবুরা তো প্রায় প্রত্যহই ইন্দিরার পদযন্ত্রণে তৈল মর্দনের জন্যে বাতায়ত করেন, কথাটা তাকে বললে হয় না? দেখা যেত মনিব না চাকর দোষী।

পুস্তক পরিচয়

দারিদ্র্যের মোকাবিলা (২)

একটি

The Challenge of World Poverty—Gunnar Myrdal.

অনুদ্রত দেশগুলিতে উচ্চ শ্রেণীই—পদস্থ কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও ও বড় ভূস্বামীরা যে শ্রেণীভুক্ত—যে কোন আর্থনিক চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। তবে একদিকে যেমন এরা সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন অপরদিকে তাঁরা মনে করেন, যেকোন পরিবর্তনই খুব ধীরে হওয়া উচিত যাতে করে যে সামাজিক সম্পর্ক বহু বছর ধরে চলে আসছে তা যেন হঠাৎ চিড় না খেয়ে যায়। এবং যে ক্ষেত্রে সংস্কার শব্দমাত্র একটি মর্মে কথ্য থাকে যার সে ক্ষেত্রে কোন কবসারীর মধ্যে কম্যুনিজমের গুণগান শোনা বিদ্‌মাত্র আশ্চর্যের নয়। ভারতবর্ষ এ ব্যাপারে আরও এগিয়ে আছে। এখানে কথায় কথায় বিশেষ কমিশন বাসিয়ে দেওয়া হয়, কী ভাবে কোন ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার করা যায় তাই চর্চা। এবং খুব যত্ন করে এই কমিশনগুলির রিপোর্ট ভুলে রেখে দিয়ে পরবর্তীকালে ভুলে যাওয়া হয়।

ভূমি সংস্কার, শিক্ষা এবং দলীয় দরূপকরণের প্রচেষ্টায় এই ধরনের বহু কমিশন বসানো হয়েছে। মনে হয় যে এই কমিশন বসানোর একমাত্র উদ্দেশ্য কোন মতে সংস্কারের আদর্শটিকে বাঁচিয়ে রাখা। নেহরু থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ভারতীয় নেতারা এই মর্মে কষ্টতাও কম করেন নি এবং যে ভাবে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সেই বক্তৃতা ছাপিয়ে চলেছে তাতেও মনে হয় যে এরা কেউই সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনার বা পাঠকবর্গকে সে বিষয়ে অবহিত রাখার ব্যাপারে কম উৎসাহিত নন।

সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমানে ভারতবর্ষে একটি বিরাট বিতর্ক চলেছে মূলতঃ কংগ্রেস দলের দুই অংশের মধ্যে। তবে, যেমন ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে, এদের কারোই খুব বেশী একটা কিছু করার নেই। শব্দ তাই নয় এই বিষয়ে এদের কোন সুষ্ঠু আলোচনা করার ইচ্ছা আছে এমনও মনে হয় না। ঠিক এই ভাবেই ছেষটি সালের শিক্ষা কমিশনের অসাধারণ রিপোর্ট

টীকিত কবর দেওয়া হয়েছে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়েও সেইভাবেই কেউ মাথা ঘামায় না যদিও ঘোষিত লক্ষ্য এখনও দূর অস্ত। অপরদিকে কোন কৃষির দলীয়তির খবর যখন বেরোয় তখন সেটি একটি অংশের হাতে অপর অংশকে অক্রমণার্থে রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় মাত্র। কিন্তু যেভাবে দলীয়তি আজ জনজীবনকে অক্রমণ করছে তা দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজই হচ্ছে না। এই বিষয় সংক্রান্ত চৌষটি সালের রিপোর্টটিও রিপোর্টই রয়ে গেছে।

বর্তমান ভারতবর্ষে আমরা দেখছি যে কথায় কথায় শাসকবর্গ কয়েকটি ভাষা ভাষা সাধারণ বক্তৃতা আশ্রয় নেন, যেমন "সামাজিক সমাজ গঠন" যাতে কেউই আপত্তি করতে পারে না। এই গেল কংগ্রেস দলের কথা। এবং অন্যান্য দলগুলির আচরণও খুব একটা ভিন্ন নয়। কমিউনিস্টরা আজ তিন দলে বিভক্ত এবং এদের অধিকাংশ সমস্ত কেটে যায় নিজেদের মধ্যে এবং একে অপরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছাড়িতে। এমতাবস্থায় আসল সমস্যাগুলির সমাধান হয় না।

ভারতবর্ষের যেটি অভাব সেটি হচ্ছে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং উন্নতিকরণে জনসাধারণের থেকে চাপ। এর ফলে রাজনৈতিক স্থিতি বলে ছল করা হয় এমন একটি ঘরা

নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কমে যায় বিশেষ করে যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রকে "অবিরত কাজ চালিয়ে" যেতে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও আছে ভারতবর্ষের বিশালই যেখানে এক অংশের সঙ্গে আরেক অংশের মিল খুবই কম। জনসাধারণের নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপ এবং নিরুৎসাহের ফলে একটি ছোট অংশের হাতে বরাবর ক্ষমতা থেকে গিয়েছে, যে অংশ কী না সর্বদাই জনসাধারণকে নিজের নীতির প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে জনসাধারণকে জাগরুর কী উপায়? অনেকগুলি উপায় আছে যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে শিক্ষার প্রসার। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান এই দুটি দেশই এ ব্যাপারে সিংহল ও মালয়েস থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছে। তবে ভারতবর্ষে জমি তৈরী আছে। বছরের পর বছর নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ এখন সাড়া দিতে প্রস্তুত। তবে দুঃখের বিষয় যে এইসব নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সময়েই মৌলিক সমস্যাগুলি, যেমন ভূমি সংস্কার, জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয় না যার ফলে এরাও বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মেতে ওঠে। এই ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অনেক কিছু করার আছে কিন্তু (শেষাংশ নব পৃষ্ঠায়)

বিদেশী দৃষ্টি

ইয়াহিয়া বেনামল অবস্থা

(দশমের পর্ববৈষ্ণব)

পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ স্কচ হাইস্কী নামক পানী-য়ের বিশেষ অনুরক্ত। এ কোন ভারতীয়র দেশপ্রেমজনিত অলৌকিক কল্পনা নয়, বিদেশী সাংবাদিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য।

পানদোষ দোষ নয়, অধিকমাত্রায় ঘটলে বজ্রের পাগলামী বলা চলে যার প্রকাশ ঘটে অসংলগ্ন বাক্যে। যেমন গত সপ্তাহে ইসরাবাদের চীনা দূতাবাসের ভোজসভায় খাঁ সাহেব ঘোষণা করে বসলেন যে আগামী দশ দিনের মধ্যে ভারতের সঙ্গে বিরাত বন্ধ শব্দ হবে যার পরিচালনা করবেন তিনি নিজ রাজধানী থেকে বহুদূরে রণক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে। যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা অবশ্য ইয়াহিয়ার একার নয়। সদর ফরাসী দেশে সন্তরোত্তর বৃদ্ধ আদ্রে মালরোও ত চেয়েছেন একখানি ট্যাঙ্ক যাতে চেপে তিনি মদত দিতে পারেন বাঙ্গা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের। তফাত এই যে বেসম্মিল মালরো মানবিকভাবেই উদ্দীপ্ত ইয়াহিয়া সেইখানে নিজ নাদিরশাহী বংশ গৌরবে মত্ত হয়ে পরিকল্পনা করছেন আরও

মৃত্যুর আরও ধবংসের। যে সমস্যা একান্তভাবেই তাঁর নিজের সৃষ্ট তার জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে দোষারোপ করে তিনি আজ ঘোষণা করতে চাইছেন জেহাদ। এর ফলাফল যে কী মাত্রাভ্যাক হতে পারে চৌগাছা ও অন্যত্র অভিজ্ঞতা বোধহয় এখনও তাঁকে তা শেখাতে পারে নি।

তবে খাঁ সাহেব যে সর্বদা একই কথা বলেন তা নয়। উপরিস্থিত ভোজসভার কিছুদিন আগে তিনি নিজ রাজধানীতে বসেই জনৈক সাংবাদিকের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া পাকিস্তানের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে মনে হয় তিনি বুঝেছেন যে “ভারত পাকিস্তান অক্রমণ করতে পারে”। “কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে” এই ধরনের হুকুমার মাধ্যমেই একমাত্র নিজ দেশবাসীসহ বিশ্বের কিছু শক্তিকে অস্ত্রত মূল সমস্যা সম্পর্কে বিস্মৃত করে দিতে পারা যাবে। এবং অনেকাংশে তিনি তা পেরেছেন। ইঙ্গ মার্কিন সংবাদপত্রগুলির দিল্লীস্থ সংবাদদাতাদের প্রতিবেদন দিনের পর দিন

নিজ নিজ সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় “ইন্ডিয়ান আর্মি ডিফ-গাইজড অ্যান্ড গেরিলা ইনভেড ইস্ট বেংগাল” (মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে ভারতীয় সৈন্যদল পূর্ব বাংলা আক্রমণ করছে) এই ধরনের শির্বো-নামা নিয়ে উপহাস পড়ছে। (প্রসঙ্গত আশ্চর্য লাগে ভারত সরকারের ভগবান বুদ্ধসদলভ আচরণ। এইসব সাংবাদিকরা এই ধরনের মিথ্যা প্রচারান্তেও ঘরে বেড়াতে পারছে দেশের বহুতর।) অপরাধকে পাকিস্তান রেডিও ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করে নিয়ে বলছে এগার্লি ঘটেছে ভারতীয় সৈন্যদের হাতে।

ইয়াহিয়া এইখানে একটা বড় ভুল করছেন। সর্ব ব্যাপারে ভারতকে দোষারোপ করা প্রোপাগান্ডা হিসাবে কিছুটা কার্যকরী হলেও তাঁর নিজের ভবিষ্যত রক্ষায় কতখানি কার্যকরী হবে? তিনি যদি এখনও মজিবাহিনীর সামরিক সাংগঠনিক পটুতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতাই শ্রেয় মনে করেন তবে এই তরফে যে বিরাত আঘাত আসবে তাকে রোখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ভারতের উদ্দেশ্য যদি মজি বাহিনীর দ্বারা সাধিত হয় তবে কী প্রয়োজন তার যুদ্ধে যাওয়ার? খাঁ সাহেব যদি এখনও বাস্তবের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ছায়ার সঙ্গে লড়াইয়ে কান্ত থাকেন তবে তাঁর ইন্তেকাল আসন্ন।

আন্তর্জাতিক সমর্থন ইয়াহিয়া কতখানি পাবেন তাও অনিশ্চিত। নিজ স্বার্থে কখনোই কোন বৃহৎ রাষ্ট্র চাইবে না অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে নিজ ভাগ্যকে জড়াবে। মার্কিনীরা আজও বেড়ার উপর বসে ওজন দেখে চলেছে দাঁড়িপাল্লা যে দিকটা ভারী সেই দিকেই সমগ্র মতন টুক করে নৈমে পড়বে। আর চীন? খাঁ সাহেব যতই কেন না পিকিংয়ের সমর্থন নিয়ে আশ্বালন করুন শরণার্থীদের জন্য কম্বল পাঠানোতেই চীনের চিন্তামারার পরিবর্তন ধরা পড়েছে। তা ছাড়া চীন বরাবর বলে এসেছে যে ভারত যদি পাকিস্তানকে আক্রমণ করে তাহলে সে খাঁ সাহেবের পক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু মজি বাহিনীর ব্যাপারে ত পাকিস্তানকে সমর্থন সূচক কিছু বলছে না। বরং ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে চীন সরকার বাঙ্গলাদেশের সংগ্রাম যে জনগণের সংগ্রাম তা একটু একটু করে মানতে শরু করেছেন। এবং এই সংগ্রাম সার্থক হলে চীনও নিজস্ব স্বাধীন বাঙ্গলাদেশকে অস্বীকার করে থাকতে পারবে না—অবশ্য সেই সঙ্গে পাকিস্তানকেও সে সমর্থন জানাতে পারে একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পরিষদের তাণ্ডবলাল

(দশমের সংবাদদাতা)

কলকাতা শহরে গত কয়েকদিনের দটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের অত্যন্ত পরিচিত কর্মীদের গুন্ডামীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েও বাজারী কংগ্রেসের মালিকেরা পাঠকদের কাছে আসল তথ্য বিকৃত করে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্র পরিষদের সভারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাভাষা ভবনে যেভাবে গুন্ডামি করে গেস্স তার বিবরণ কোন বাজারী পত্রিকায় নেই। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ পি কে বোস স্বয়ং উপস্থিত থেকে এই তাণ্ডবলালার নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মহলে বলেন : এই ছেলেদের মধ্যে এত শক্তি নিহিত ছিল তাতো জানতুম না। এরাই পারবে নকশালদের রুখতে।

সত্যি, অনেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ইতিপূর্বে বত ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে ছাত্র পরিষদের কৃতিত্ব সব চাইতে বেশী।

শব্দে রবীন্দ্রনাথের একটি অমূল্য প্রতিভূতিই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মূল্যবান সম্পত্তির বিনাশ করা হয়েছে। সবচাইতে শালিন কথ্য যে দাবীকে উপেক্ষা করে এই বিক্ষোভ সেটি ছাত্র

আন্দোলনের ইতিহাসে অভিনব-পরীক্ষার নকল করার অবাধ অধিকার চাই।

আদালতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করে আইন কলেজের ছেলেরা রুল অফ ল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। মামলার হেরে গিয়ে নিজেদের হাতেই আইন রাখতে চেয়েছিলেন।

প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ বোস ছাত্র পরিষদের কীর্তিকল্পে বিস্মিত হলেও তাঁর ওপরওয়াল ডঃ সত্যেন সেনের কাছে ল কলেজের কিছু ছাত্র নেতার অনুরোধ আদায় করার নজির অল্প।

কিছু দিন আগে ঐ কলেজে ছাত্র ভর্তির কাপারে ইউনিয়নের জনৈক নেতার আবদার, শব্দে রাজী না হওয়ার ডঃ সেনকে ঐ নেতা বহু অধ্যাপকের সামনে প্রকাশ্যভাবে ধমকানি দিয়ে যান। সে পরিস্থিতির জানিয়ে যান : “কলেজ স্কোয়ারের আশেপাশে বত ছোট দোকানদান ও হকার আছে তার একটা বিরাত অংশের উপর আমার প্রভাব আছে। যদি আমার কথা না শোনেন তাহলে আমার ছেলেরা আপনার কলেজ লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিয়ে যাবে। আপনার ক্ষমতা থাকে আপনাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে দেখবেন।”

শতবার সুরতর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন

(দশমের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেস দলের সুরত-শতর (প্রফুল্লকান্তি ঘোষ) খেয়োখোয়ির কোন আপোষ হয় নি। অন্যদিকে সুরত মদ্যজীর মস্কো সফরের সর্বোচ্চ প্রফুল্লকান্তি তোড়জোড় করে সুরতর বিরোধীদের মদত দিয়ে চলেছেন। গত সপ্তাহে উত্তর কলকাতার দেশবন্দ্য পক্ষে জগজীবন রামের জনসভার আয়োজন করেছিলেন প্রফুল্লকান্তিরা। এই সভার প্রফুল্লকান্তির দল বারবার “শতদা বঙ্গ বঙ্গ জিও” ধ্বনি দিয়েছে। তারপর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভার কব্ধাখানার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রফুল্লকান্তি ঘোষ।

এই কব্ধাখানার দায়িত্ব নিয়েই প্রফুল্লকান্তি উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার সুরত বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভার আয়োজন করছেন। দক্ষিণ কলকাতার লক্ষ্মীকান্ত বোস একজন তাঁর সুরত বিরোধী। প্রফুল্লকান্তি তাই লক্ষ্মীকান্তকে দক্ষিণ কলকাতা থেকে

শোভাবাহা আনবদ্য দায়িত্ব দিয়েছেন। মধ্য কলকাতা ও উত্তর কলকাতাতেও সুরত বিরোধীরা জনসভার কব্ধাখানার রয়েছেন। শব্দে নেই সুরত মদ্যজীর দলবল।

ফরোয়ার্ড ব্লক

(২২ শ্রবণ ১৯৭১)

নেতৃত্ব যুব ও ছাত্র নেতৃত্ব সরাসরি কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা নিয়ে কাজ শরু করেছে। এই অবস্থার একমাত্র সি পি এম বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে পুরো দলকে কংগ্রেসী জোটে টানা সম্ভব হবে না বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। বরং সি পি এম নেতৃত্ব যদি আরো সহনশীল হয়ে চেষ্টা করেন তাহলে ফরোয়ার্ড ব্লকের অভ্যন্তরে মার্কসবাদ বিরোধী অংশ যতই প্রভাবশালী হোন না কেন এই দলকে সরাসরি প্রতিক্রিয়ার শিকার টানা সম্ভব হবে না। তবে দলের ঐ অংশকে হয় পৃথক দল গড়তে হবে, না হয় সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে।

খড়দহ অঞ্চলে সন্ত্রাস

(৩রা শ্রবণ ১৯৭১)

আকস্মিক স্কোয়াডের লোকেরা এখন খড়দহ স্টেশন, রহড়া বাজার, সোদপদুর বাস স্ট্যান্ড প্রভৃতি এলাকাগুলি তাদের অপহরণ বা কিডন্যাপিং সেন্টার করেছে।

পুস্তক পরিচয়

(৬শ্রবণ ১৯৭১)

আজ অর্ধাঙ্গ এ বিষয়ে তাদের মধ্যে এক আশ্চর্য অনীহা লক্ষ্য করা গেছে। দেখে গেছে যে মৌলিক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে সেইভাবে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট না গড়ে তুলে এরাও বিভিন্ন সময়ে জাতি, বর্ণ ইত্যাদির প্রশ্ন তুলে সাময়িক ভাবে লাভবান হবার চেষ্টায় অছেন।

কিন্তু বর্তমানের এই অবস্থা কী চলতেই থাকবে? মানবের সহৃদয় কী কোন সীমা নেই? ডঃ মিরডাল স্বীকার করেছেন যে ভবিষ্যৎমানী তার পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানের ছকের বিপরীত অনেক কিছু ঘটে পারে কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে ঠিক কী ঘটবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। এবং শব্দ ভারতবর্ষ নয় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি সম্পর্কেও এই এক কথাই কম বেশী ভাবে প্রযোজ্য।

এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে খড়দহ থানার জনৈক মদ্যপাত্র জানান যে পুস্তিকের বিরুদ্ধে বা অভিযোগ করা হচ্ছে তা ভিত্তিহীন। পুস্তিক সবকিছু খননের ব্যাপারে খনিকি গ্রেপ্তার করেছে।

মদ্যপাত্রটি আরো জানান যে দল ক্ষমতায় থাকে তাকে দেখা পুস্তিকের কর্তব্য। তিনি আরো জানান যে সমাজবিরোধীরা এলাকায় যে অত্যাচার করছেন তা জোর করে কিছু বলা চলে না। শব্দকচর ও আরো কয়েকটি এলাকায় রিভলভার বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে সাধারণ লোকের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করছে, তবে তা সি পি এমের লোকের কাছ থেকে করা হচ্ছে কি না তা পুস্তিক জানে না।

তিনি আরো জানান, কম বা বেশী শাসক কংগ্রেসের মধ্যে বেশ কয়েকজন সমাজবিরোধী এখনে কাজ করছে না। তবে তাদের সম্পর্কে যুব কংগ্রেসের কাছ থেকে প্রেসার আসায় পুস্তিক তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছে না।

অমরাবতী, নাটাগড়, সন্ডাষ-নগর কলোনী এলাকায় সমাজবিরোধী ও শাসক কংগ্রেসের হাতে যে সমস্ত রিভলভার বা অন্যান্য আত্মনয়ন্ত্র দেখা যাচ্ছে তা পুস্তিকেরই দেওয়া বলে কয়েকজন আমার কাছে অভিযোগ করলেন।

আলিপুর জেলের ঘটনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে—বিচারক নিষ্পত্তিও হয়েছিলেন, কিন্তু বিচারক তদন্ত শুরু করার আগেই আক্রান্ত হলেন আর তদন্ত প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। কে বা কারা বিচারকে আক্রমণ করল সেই সম্পর্কে এখনও কোন সরকারী রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। অনেকের সম্মত স্বাভাবিক যে, পটলিশের পেটোয়া গদাডারা বিচারকে আক্রমণ করে বিচারকদের মধ্যে আতঙ্ক আনার চেষ্টা করেছে যাতে এই ধরনের কোন তদন্ত ভবিষ্যতে আর সম্ভব না হয়।

কিছুদিন আগে বরানগর-কাশীপুর অঞ্চলে পটলিশের সহযোগিতায় যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে সেই ব্যাপারে তদন্তের জন্য বিচারপতি নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না কি কোন বিচারপতি পাওয়া যায় নি।

বারাসত, বরানগর, কাশীপুর, কোমগর-উত্তরপাড়া আর হাওড়া-শিবপুরে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার বেসরকারী কোন তদন্তে সরকার রাজী নয়। সরকারের একটি সর্বিধে, হত্যাকাণ্ড এত ব্যাপক আকার নিয়েছে যে, জনসাধারণ হত্যাকে বোধ হয় অনিবার্ণ ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে।

জেলে হত্যার ব্যাপারে দর্পণ তদন্ত করে জানতে পেরেছে যে, জেলা কর্তৃপক্ষ এই হত্যাকাণ্ড অবশ্য-স্বাভাবী এ কথা বহুবার জানানো সত্ত্বেও সরকার এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেয় নি।

প্রতিটি জেলে বন্দীর সংখ্যা স্থান সংকুলানের ক্ষমতানুসারী স্বিগুরুণেরও বেশী। বন্দীদের দেখা-শোনার ব্যাপারে জেল স্টাফ ব্যস্ত নি। ওদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য বরাদ্দ টাকা থেকে চুরি হয়, এ অভিযোগ বহু দিনের। সময়ে ওদের খাবার দেওয়া হয় না, রাজ-নৈতিক বন্দীদের কোন সুযোগ সর্বিধেই ওরা পায় না। এমন কি প্রাতঃকৃত্যর ব্যাপারে বহুক্ষণ ওদের লাইনে দাঁড়তে হয়।

কোন অভিযোগ করতে গেলে, অথবা জেলে বন্দীদের প্রতিনিধিরা কোন কথা বলতে চাইলে রুটভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। দিনের পর দিন এই ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে সম্পর্ক অবনতি ঘটছে।

উপস্থিত সংখ্যক স্টাফ না থাকায় জেল কর্তৃপক্ষ জেল প্রশাসনের জন্য অধিক সংখ্যক দীর্ঘমেয়াদী কর্মীদের নিয়োগ করেছে।

এই সমস্ত কর্মীদের তালিকা

একটি মনোজ্ঞ সংগীতের আসর

(দর্পণের সমালোচক)

গত রবিবার একুশে নভেম্বর কলকাতায় একটি মনোজ্ঞ সংগীতের আসর উপহার দিলেন ওস্তাদ আফাক হোসেন খাঁ সাহেবের ছাত্ররা। খাঁ সাহেবের জন্মতিথি উপলক্ষে এই আসর। প্রথমে আফাক হোসেন খাঁ সাহেবের তবলা লহরী, এবং পরে শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের সরোদ বাদন। শ্রীশ্যামবাবুর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন ওস্তাদ আফাক খাঁ সাহেব।

অনেকদিন পরে ঐতিহাসিক কলকাতার হারানো দিনের কথা মনে পড়লো। আফাক খাঁ সাহেবের দরুহ এবং অপ্রচলিত চোন্দ মাঠার ফোরদস্ত এবং পুরে দিতালের লহরী এক কথায় অনবদ্য। পূর্ণাঙ্গ লহরী বলতে যা বোঝায় তাই, পেশকার, কায়দা, গং, চক্রধার, টকরা রং রেলা দিয়ে খাঁ সাহেব অপূর্ব রস সৃষ্টি করলেন।

দিল্লী আজড়লা ও লক্ষ্মী, এই তিন আঙ্গকের বাজাই তিনি অতি নিপুণভাবে পেশ করলেন। খাঁ সাহেবের নিজেদের ঘরানার কত-কগুলি অতি জটিল আঙ্গলের কায়দা শোনালেন যা আজকালকার তবলিয়ারা বড় একটা বাজান না বোধহয় “নিকাশের” দরুহতার জন্যই।

বাঁঝার কাজের প্রাবল্যে তিনি

তালি পিতা ও গুরু খলিফা ওয়া-জেদ খাঁ সাহেবের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি কিছু মশকিল ও টেকনিক্যাল জিনিস ছাত্রদের অনু-রোধে পেশ করেন। আফাক সাহেব সহস্র সেরগিল বাজিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দেন।

শুরু আঙ্গুল ছাড়া আর কিছুই নড়েনা—যেন ষোগী। কিনার ও বাঁয়্য তিনি যে সদর সৃষ্টি করলেন তা অনেকদিন কানে লেগে থাকবে। জানিনা কি অপরূপে তিনি বেতার কর্তৃপক্ষের দ্বারা ও সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দ্বারা অবহেলিত। এর সঙ্গে সারোঙ্গীতে সহযোগিতা করেন শ্রীবাচ্চালাল মিশ্র।

আসরের পরের শিল্পী শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি বজালেন রাগ পুরীয়াধানেত্রী। সেদিন শ্যামবাবুর মেজাজ বড় ভাল ছিল। বাজনার মধ্যে তিনিও যেন প্রাণ মন ঢেলে রাগরূপটি ফুটিয়ে তুললেন। সঙ্গে আফাক সাহেব সঙ্গত করলেন অতি পরিমিত ভাবে ও সংবরের সহিত। শেষার্ধ্বে বাঁঝার সঙ্গে খাঁ সাহেবের ঠেকা ও জবাব সওয়াল শ্রোতাদের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা পায়।

এই পরিচ্ছন্ন অনবদ্যত্বটি পরিচালনা করেন ভূপলা রায়চৌধুরী এবং সজিত শেষ।

কেই খবরের আসামী। এদের এক-মাত্র স্বার্থ জেলা কর্তৃপক্ষকে খুশী রাখা যাতে কারাবাসের মেয়াদ কমে। এরা জেলের মধ্যে সেলে আবস্থ থাকে না। কথায় কথায় রাজনৈতিক বন্দীদের খিন্তি করে আর মারধোর করে।

সম্প্রতি জেল কর্তৃপক্ষ এই সব খবরে আসামীদের লাগিয়েছে নকশালী বন্দীদের পেটানোর ব্যাপারে। বেশ কয়েকটা করে খুন করে এরা এখন জেলের অধিবাসী, এদের খুন করতে হাত কাঁপে না।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের নয় নং ওয়ার্ডের মধ্যে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটল তার সত্য বিবরণ একচেটিয়া পূর্নজপিতদের মধ্যপন দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত না হলেও দর্পণ এই হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ জানতে পেরেছে।

কিছুকাল আগে জেলে পারা গেছে যে কয়েকদিন আগে ঐ জেলেরই ডেপুটী জেলার খুন হওয়ার পর থেকেই নাকি জেল কর্তৃপক্ষ জেলের বন্দীদের বিরুদ্ধে একটা কল্পনা নেবার জন্য তৈরি হয়েছিল। বন্দীদের মধ্যে সি পি এম ও নকশালদের ওপর সবিশেষ একটা আঘাত হানার জন্য এই ঘটনার তিনদিন আগে জেলের সদপার, জেলার এবং ডিসি'লিন অফিসারের মধ্যে একটা গোপন বৈঠক হয়। বৈ-সরকারী সূত্রে থেকে জানতে পারা যায়, জেলার নাকি ঐ বৈঠকে সদপারকে বলেন, “সবার জেলের মধ্যে যে সমস্ত সি পি এম ও নকশাল বন্দী গোল ল করছে তাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হোক।”

সদপার জেলারের কথায় বেগে গিয়ে বলেন—“মশাই আপনাকে মাথা খারাপ হয়েছে। আপনি রিজাইন দিয়ে বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকুন।” তারপর অবশ্য জেলার ও সদপারের মধ্যে একটা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে মতৈক্য হয়।

জানা গেছে যে, ডেপুটী জেলার খুন হওয়ার অল্প সময়ের পর ৭ দিন তিনখানি চিঠি দেন এবং সেই চিঠিতে নিজের জীবনের নিরাপত্তার দাবী করেন।

বৈঠকের পর যে সিদ্ধান্ত হয় তা কেবলমাত্র নাকি হেড ওয়ার্ডারকে জানান হয়।

ঘটনার দিন সকাল আটটার সময় কয়েকজন নকশালী বন্দী এক-সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। সেই সময় হেড ওয়ার্ডার এসে তাদের অকথা ভাষায় গালিগালাজ করে এবং তার সহকর্মীদের নির্দেশ দেয় ওদের জোর করে মিটিং বন্ধ করতে। প্রথমে ধমকাধমিত ও পরে লাঠি লোহার রড দিয়ে তাদের আক্রমণ করা হয়। প্রতিটি বন্দীর মাথায় লোহার রড দিয়ে মারা হয়।

শেঠ শঙ্করলাল কারনারী হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে দীপক

বসে, শ্যামল মিত্র ও অজয় দে-কে দেখতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি ঐ তিনজনের মাথার তিনটি জায়গাতে যে ভাবে লোহার রড মারা হয়েছে তাতে তারা জীবন ফিরে পাবেন কিনা সন্দেহ।

হাসপাতালের জনৈক মধ্যপন জানালেন যে যাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তারা ভবিষ্যতে কথা বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

জেলের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে গোপাল নগরের জনৈক ব্যক্তি বললেন যে “চে'চামেচি শব্দে প্রথমে বাড়ীর ছাদে উঠে যাই। বাড়ীর ছাদ দিয়ে সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তর ভাগ বেশ ভালভাবেই দেখা যায়। তার পর দেখি কয়েকজন ওয়ার্ডার লোহার রড দিয়ে কয়েকজন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবককে বেধড়ক মারছে। মারের চোটে অনেকে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছে। আবার কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলছে “আমাদের মেরে ফেলল, বাঁচান।” প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বন্দীদের মারধর করা হয়। আইতের সংখ্যা দশো পঁচাত্তর জন।

ঐ এলাকার জেল ভিজিটর নারায়ণ দাস অভিযোগ করেন যে তিনি ঘটনার দিন যখন জেলের অভ্যন্তরের ঘটনা জানতে চান তখন তাকে কোন উত্তর দেওয়া তো হয়ই নি, উপরন্তু তাকে ভেতরেও যেতে দেওয়া হয় নি। অথচ সরকারী নিয়ম অনুসারে তার ভেতরে যাবার অনুমতি আছে।

অপরদিকে জেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, কিছু নকশালপন্থী জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করতই এই ঘটনা ঘটে।

বাংলা দেশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থাকা সত্ত্বেও কোন হামলা চালানো না।

মদ্রি বাহিনীর ধারণা যে, পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর সম্ভারে বৃদ্ধান্তে কোন অভাব নেই, তাদের যা অভাব তা হল মনোবল। আর এই অভাব পূরণ করার ক্ষমতা পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের নেই।

সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানে ওয়ালি খাঁর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'কে সামরিক কর্তৃপক্ষ বে-আইনী ঘোষণা করেছে। এই পার্টি পাক্সাব বাদে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ প্রভাবশালী। সামরিক কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেঙ্গ-চিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠছে।

এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে বাংলা দেশের মদ্রি সংগ্রামের নেতারা সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল। তারা জানেন যে, পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর একটি শক্তিশালী অংশ গঠিত হয়েছে বেঙ্গচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়ে। এই আন্দোলন অবশ্যই এই সমস্ত অঞ্চল থেকে নেওয়া সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে। এই প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং তার বহু লক্ষণও দেখা যাচ্ছে।

Read ONWARD MARCH

(Progressive English Weekly)

- * Fresh in News
- * Rich in Articles
- * Objective in views

Published every Friday. Price 30 paise

For Agency and advertisement

Contact

Manager

249/B, B. B. Ganguly Street, Calcutta-12.

Phone : 241214

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ দ্বায়ক স্কোয়ার কলিকাতা-১০ থেকে প্রদ্রিত এবং ৩১সং মট জেল, কলিকাতা-১০ কর্তৃক কার্যকর থেকে প্রকাশিত

দপন

১৪শ বর্ষ ৪৪শ সংখ্যা ১১ শতাব্দীর ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ১১ দাম ৩২ পরমা

ভারতের সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্কে বাংলা দেশ সরকারের খসড়া

(দর্পণের সংবাদদাতা)

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে আগামী দিনে ব্যবসা এবং অন্যান্য লেনদেন ব্যাপারে কি ধরনের চুক্তি হতে পারে সেই সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তুত করেছে।

খসড়ায় বলা হয়েছে যে, পূর্ব-বঙ্গ থেকে শতাধিক কোটি টাকার মাছ ভারতে আসতে পারে। অর্থাৎ এই হিসেব অনুযায়ী ভারতে দিনে প্রায় দশ লাখ টাকার মাছ এসে পৌঁছাবে। ওজনের পরিমাণ হবে দিনে প্রায় দশ হাজার মণ।

অনুরূপভাবে পূর্ববঙ্গে এখান থেকে রপ্তানী হবে বছরে একশ কোটি টাকার কয়লা। এতদিন পর্যন্ত কয়লা আসত সুদূর চীন

আর পোল্যান্ড থেকে। ওদেশের লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের কয়লা খনির নতুন বাজার সৃষ্টি হবে। এতে কয়লা খনির সংকট কাটবে এবং দ্রুত উৎপাদনের জন্য দরকার হবে নতুন লক্ষ্যের আর আধুনিক বাস্তবিক ব্যবস্থার।

এইভাবে ওরা আমাদের আরও অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার রপ্তানী করবে, আমরাও ওদের কাপড়, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নানা জিনিস পাঠাব। আগে পশ্চিম পাকিস্তানি কাপড়ের কল থেকে উৎপন্ন দ্রব্য কোটি টাকার মাল পূর্ববঙ্গে বিক্রী হত। এই মাল এখন ভারত থেকে যেতে পেরে। এর ফলে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

পূর্ববঙ্গের সংগ্রাম সম্পর্কে পিকিং রেডিও

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)
পিকিং রেডিও বৃহস্পতিবার (নব্বই ডিসেম্বর) ভোরে একটি ইংরাজী ভাষায় দীর্ঘ সংবাদ পরিবেশনে পূর্ববঙ্গের মুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চীন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত বলে মনে করে সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ পেশ করেছে।

ওদের মতে পূর্ববঙ্গে কোনও আন্দোলনই হয় নি, যা কিছু হয়েছে সবই “ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের” চক্রান্তের ফল। আর এ ব্যাপারে “সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা” ইন্দো-পাকিস্তান উপমহাদেশে নিজেদের প্রভাববিস্তার স্বার্থে “ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের” মদত দিয়েছে।

যেহেতু এই স্বতন্ত্র চক্রান্তের ফলে শেষ পর্যন্ত “ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা” পাকিস্তান আক্রমণ করে বসেছে, সেই হেতু চীন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাষ্ট্রসমূহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সরাসরি মেলোচ্ছে আর একই প্রস্তাবে ভোট দিয়ে পাকিস্তানের মিলিটারী শাসনকে আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছে।

বৃহস্পতিবারের পিকিং রেডিও বিশ্লেষণে গত এপ্রিল মাস থেকে কি ভাবে “ভারতের মাটিতে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের মর্শ্চিমের পূর্ববঙ্গের কয়েকটি দালাল পাটো সরকার গঠন করল এবং কি ভাবে মর্শ্চিমবাহিনী সৃষ্টি হল” তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ দিয়েছে, নানা তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ঘটনার আনুক্রমিক দ্রুত বিবর্তন বোঝাবার জন্য।

পিকিং রেডিও কিন্তু উনিশশ সাতচল্লিশ সালে ভারত পাকিস্তান স্বাধীনতার পর থেকে পূর্ববঙ্গে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী

শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠল এবং কেনই বা ওখানে একযুগ ধরে জনগণের নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে মিলিটারী শাসন চালু আছে তার কোন হাঁস দেওয়ার চেষ্টা করেনি।

সেই উনিশশ সাতচল্লিশ সাল থেকেই বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেমেছে, কমিউনিস্টরা নানা নিন্দাপত্র বিতরণ সময়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে আর নানাভাবে আবার জেগে উঠেছে এসব তথ্যের কোন উল্লেখ পিকিং রেডিওর সংবাদে ছিল না।

কি কি আন্দোলনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত আয়তনবাহীর পতন হল আর জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেষ পর্যন্ত উনিশশ উনসত্তর সালে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশে সাধারণ নির্বা-

চনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিলিটারী শাসনকে সাময়িকভাবে জনসাধারণের রেষ থেকে বাঁচালেন সেই আনুক্রমিক ঘটনাও পিকিং রেডিওর বিশ্লেষণে পাত্তা পায় নি।

উনিশশ সত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ববঙ্গে অবিসম্বাদী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল—সেই ঘটনাও পিকিং প্রচারে আমলে দেওয়া হয় নি। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া ভুট্টো চক্রান্ত কিভাবে তিনমাস ধরে নির্বাচিত সংসদ অধিবেশন মূলতুর্বা রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত মার্চ মাসের সূর্য থেকে সারা পূর্ববঙ্গ আন্দোলনে গর্জে উঠেছে সেই আনুক্রমিক ঘটনাও পিকিং-এর কাছে প্রাসঙ্গিক নয়।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বিদেশী সাংবাদিকদের অভদ্র আচরণ ভারতবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বর্তমানে কলকাতায় ঝাঁকে ঝাঁকে (মোছির মতো) বিদেশী সাংবাদিক এসে উপস্থিত হয়েছে। এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু মহিলা সাংবাদিকও আছেন, অবশ্য কিছু কিছু বিদেশী পুরুষ সাংবাদিকের হিপি, মার্কা লম্বা চল ও বেল বটম প্যান্টলুম দেখে পোছন থেকে ঠাণ্ড করা মস্কিন—এরা পুরুষ কি মহিলা। যাইহোক কলকাতায় এদের ঘোরাফেরা ও আচরণবিধি নিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিশেষ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং সরকারও একাপরে নজর রেখেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিদিন যে সাংবাদিক সম্মেলন হয় সেখানে একটু সতর্কভাবে নজর রাখলেই বোঝা যায় যে এইসব সাদা চামড়ার দল যুদ্ধের খবরের থেকেও সামরিক গোপন তথ্য জানার জন্যই কোতুহলী বেশী। বারবার বলা সত্ত্বেও তারা ঘুরেফিরে সেইসব তথ্য জানতে চান যেগুলি যুদ্ধাবস্থায় কোন সামরিক বাহিনীর পক্ষেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শত্রুমাত্র অনাভিপ্রেত কোতুহলের মধ্যেই তাদের উৎসাহ সীমাবদ্ধ নয়; সাংবাদিক সম্মেলন পরিচালনাকারী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অফিসাররা যখন জায়ে দিচ্ছেন যে, এইসব তথ্য এখন প্রকাশ করা সম্ভব নয় তখন বিদেশী সাংবাদিকরা কণ্ঠের ভীষণে হেসে ওঠে অথবা টেবিল চাপড়ে অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করে।

ভারত সরকার যুদ্ধাবস্থায়

সীমান্ত অঞ্চলে বিদেশীদের গতি-বিধি নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কিন্তু পাঁচজন বিদেশী সাংবাদিক উদ্ভাস্ত শিবির পরিদর্শনের ছুতো করে সীমান্তে যাবার অনুমতিপত্র গ্রহণ করে এবং সামরিক বাহিনীর অফিসারদের আদেশ অবহেলা করে গোপনে ভারতীয় বাহিনীর সামরিক প্রস্তুতির ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এছাড়া, ইতিপূর্বে আরো তিনজন বিদেশী সাংবাদিকের আচরণ এত ভারতের স্বার্থবিরোধী হয়ে ওঠে যে ভারত সরকার তাদের পত্রপাঠ দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টান্তজনক ব্যাপার হলো, যখন লুখা যায় বিভিন্ন দেশীয় সংবাদপত্র অফিসের ট্যাকেরা কয়েকশ টাকার লোভে অথবা কোন সরকারী অথবা আধাসরকারী অফিসার এক বোতল মদের প্রত্যাশায় এইসব বিদেশী সাংবাদিকের খিদেমদগারী করছেন। মুস্কিল হলো এইসব লোকদের সম্পর্কে কিছু বলার উপায় নেই; কারণ, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কোন শপথ গ্রহণ অন্তর্ধান হইল। এরাই প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে দর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে সর্বাত্মক মেতে ওঠেন।

বিদেশী সংবাদপত্রগুলি সাধারণতঃ খুব “অবজেক্টিভিটি”-র বড়াই করে থাকেন এবং এব্যাপারে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর দিকে নাক সিটকে তাকান। একথা ঠিক, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি অর্থাভাববশতঃ সর্বত্র তাদের রিপোর্টার পাঠাতে পারেন না এবং অধিকাংশ

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

যুদ্ধকেও কংগ্রেস দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকেও পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসীরা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে বলে নানা সূত্রে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে অসামরিক প্রতিরক্ষার (সিভিল ডিফেন্স) জন্য প্রচুর লোক অস্থায়ীভাবে নেওয়া হচ্ছে। এই লোক নিয়োগের শতকরা নব্বই ভাগ নব কংগ্রেসীরা তাদের দখলে রেখেছেন। দলে দলে নব কংগ্রেসী দাদাদের সুপারিশ বা লিফ্ট অনুযায়ী ছেলেদের সিভিল ডিফেন্স টোকানো হচ্ছে। যুদ্ধের নামে প্রচারকার্য ইত্যাদির জন্য সরকারী টাকা বেরচ্ছে, আর নব কংগ্রেসীরা দু-হাতে তা গ্রহণ করছেন।

প্রকৃতপক্ষে

আন্দোলন এবং শরণার্থী আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেসীদের এখন কপাল খুলে গিয়েছে।

শরণার্থীদের মালপত্র বোণাডের জন্যে কন্ট্রাকটর দেবার সময় কুখ্যাত মুসলিম লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা রাজ্যে ছিল। সেই সময় পূর্বমন্ত্রী সন্তোষ রায়ের মাদর আর হারিকেন লন্টনের কন্ট্রাক্ট দেবার কেলেংকারী নব কংগ্রেসীরাই এখন বলে বেড়াচ্ছেন। এ সাব-কমিটিতে ডঃ জয়নাল আল্লাহ বিন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে সদস্য ছিলেন। নব কংগ্রেসীদের হতাশা অংশ এখন জয়নাল আবেদিনের নামেও অনেক কথা বলছেন। এ মন্ত্রিসভা সব ক্রম নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে কিভাবে নিজের দলের পনেরো হাজার ছেলেমেয়েকে শর-

ণার্থী শিবিরের চাকরীতে ঢুকিয়েছেন সেকথা পাঠক জানেন। এছাড়া নকশাল-সি পি এম দমনের নামে একশো পাঁচ টাকা মাস মাইনে শত শত দলীয় ছেলেকে হোমগার্ড করা হয়েছিল। এখন এসেছে যুদ্ধ। আর এখানকার নব কংগ্রেসীরা এখন সিভিল ডিফেন্সে মেতেছেন। কেননা ওখানে পরমা আছে।

লীগ-কংগ্রেসী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দ বিশ্বাস এখন জওয়ানদের উৎসাহ (?) দেবার উদ্দেশ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার একখানা জীপ গাড়ীতে, কংগ্রেসী ঝাণ্ডা উড়িয়ে সীমান্তের সংরক্ষিত এলাকায় ঘোরাফেরা শুরু করেছেন। মাঝে মাঝে বাংলাদেশেও ঢুকছেন। সঙ্গে থাকছে একদল ছেলে। সংরক্ষিত এলাকায় কিভাবে ইনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা অবশ্য এখনও জানা যায় নি।

বঙ্গদর্শন

চলচ্চিত্র

পূর্ববঙ্গ মুক্তির পথে, অর্থাৎ সেখান থেকে পাকিস্তানী আগ্রাসী বাহিনী বিতাড়িত হতে আর বেশী দেরী নেই। কেবল এই আগ্রাসী বাহিনী বিতাড়িত হলেই কিন্তু জনগণের মুক্তি নেই। আসল মুক্তি সর্নিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন দেশের প্রশাসনে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামো পুনর্গঠনে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা পাকা করা।

মুনে রাখা দরকার যে, পূর্ববঙ্গের মুক্তি ঘরানিষিত হচ্ছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর যুক্ত উদ্যোগে। ওখানকার এক কোটি মানুষ কিন্তু উৎসাহিত হয়ে চলে এসেছে আর থেকে বাওয়া বাকী সাড়ে ছয় কোটি অধিবাসী গত দশ মাস ধরে দুর্ব্ব, অত্যাচারী আগ্রাসী বাহিনীর দমন পীড়নে বিপন্ন, সর্বদা প্রায় গুলে বাকিয়ে থাকা অবস্থা। মুক্তির যুদ্ধে জনগণের সমর্থন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এই সমর্থন কোন সংগঠিত রূপ নেয় নি।

ওখানকার মুক্তিকামী রাজনৈতিক শক্তির সবচেয়ে অগ্রণী ও প্রভাবশালী অংশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এখন দেশ থেকে পলাতক

এবং সেই কারণে ওখানকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। অন্যান্য বামপন্থী দল সমূহের মধ্যে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠী রাজনৈতিক সমর্থনের দিক থেকে নগণ্য এবং সংগঠনের বিচারে প্রায় অবলম্ব্য। কমিউনিস্টরা নিজেদের কলহে এখনও ব্যস্ত এবং তারা বোধ হয় এই অবস্থাতেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রণী চরিত্র বিন্যাস ও তার বিশ্লেষণ নিয়ে তর্কে মত্ত।

এই বিভিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর অনেক নেতাই পলাতক আর মুক্তি-ময়-যারা ভেতরে পড়ে আছেন তারা নিজেদের বিশেষ কোন রাজনৈতিক ভূমিকার প্রমাণ এখনও রাখতে পারেন নি। মুক্তির পর তাদের কাজ অনেক, কিন্তু অতীত বিচারে তারা জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী অংশ হতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই কমিউনিস্টরা নিজেদের বিভেদ বুদ্ধিবশতঃ এখনও নিজেরা একত্ব হতে পারেন নি। তাদের সব অংশ একত্বভাবে ত দূরের কথা পৃথকভাবেও কোন ভবিষ্যতের পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন নি। অর্থাৎ তারা ঢাকায় ফিরে গিয়ে সেই আগের মতই অগ্রণী অংশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা সমিতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

এই দিক থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কিন্তু অনেক সজাগ। তারা আগামী দিনের কর্মসূচী সম্পর্কে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন—কি ভাবে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠবে, প্রশাসনের কর্তব্য কি, কবসা বাগিচা কি ভাবে চলবে, দেশ পুনর্গঠনে কিভাবে অর্থ সংগ্রহীত হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে তারা এখন আর প্রাথমিক স্তরে নেই। এই সমস্ত বিষয়ে তারা আগেকার প্রশাসনের অনেক বান্দা বাঙ্গালী অফিসারের সহায়তার নানা পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এই সমস্ত পরিকল্পনায় অবশ্যই জনগণের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। দেওয়ার কথাও নয়, কারণ যারা এই সমস্ত পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত তাদের অনেকেই পরানো আমলা আর বেশ একটি প্রভাবশালী অংশ দেশের ভবিষ্যত শিল্পায়নে কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কায়ম করা যায় তার চিন্তায় মগ্নগল।

এটা স্বাভাবিক যে পূর্ববঙ্গে এখন প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রণী, একচেটিয়া পুঞ্জির অথবা বড় সামন্তদের কারেমী স্বার্থ গড়ে ওঠে ওঠে নি বা তাদের যত্ন উদ্যোগ সরু থেকেই দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করবে।

অনুমান করা শক্ত নয় যে, ভারতীয় পুঞ্জি চেষ্ঠা করবে কি ভাবে পূর্ববঙ্গে নিজেদের লক্ষ্যী বাড়ান যায় এবং নিজেদের কারেমী স্বার্থ পাকা করা যায়। এই বিচারে পূর্ববঙ্গের মুক্তি আন্দোলনে ভারতীয় কক্সারী গোষ্ঠীর পূর্ণ সমর্থন ব্যাখ্যা করা যায়।

কিন্তু ওখানকার জাতীয়তাবাদীরা এই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সজাগ। তারা অবশ্যই পশ্চিম-পাকিস্তানী পাজীবী সিঁথি ব্যবসারী গোষ্ঠীর শাসন শেষ থেকে মুক্তি পেয়ে কিছুতেই মাড়োয়ারী পাশী গুজরাটীদের খপ্পরে পড়তে চাইবেন না। তাই তারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সুযোগ না দিয়ে সরকারী আওতার মূল ব্যবসা গড়ে তুলতে চান।

প্রাথমিকভাবে ওদের জাতীয়তাবাদীদের (যারা ভবিষ্যতে প্রভাবশালী হবেন) বিশেষ লক্ষ্য হবে কি করে নিজেদের মূলধন সৃষ্টি হয় এবং তারপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত হয়ে কারেমী স্বার্থে পরিণত হয়। এই কাপরে পূর্ববঙ্গের জাতীয়তাবাদীদের বিশেষ অংশ নানা কল্যাণকৌশল শিখবে অভিজ্ঞ ভারতীয়দের কাছ থেকে।

ভারতীয়রা দেখেছে কিভাবে প্রাক স্বাধীনতা যুগের কলকাতার ক্ষুদ্র বিড়লা, সিংহানিয়া, গোয়েন্দা জালানরা ফুলে ফেঁপে উঠল আর অন্যদিকে উত্তর প্রদেশে, পাজীবে দিল্লীতে সরকারী প্রশাসনের সাহায্যে নতুন কনট্রাক্টর প্রণী কয়েক বছরে শিল্পে কারেমী-স্বার্থ হয়ে গড়ে উঠল।

এখানেও প্রাথমিক পরিকল্পনার সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে উন্নয়নের কথা ভারী শিল্পে সরকারী উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে, কারেমী স্বার্থের লক্ষ্যী পাকা করার তাগিদে। প্রাথমিক অবস্থায় বোচাকেনার নিষ্পত্তি এই সমস্ত ছোট ব্যবসারীদের মূলধন গড়ে ওঠে নি ভারী শিল্পে বিনিয়োগের জন্য। জনসাধারণের ওপর চাপানো টাকার টাকা এনে দিয়েছে ভারী শিল্প সরকারী উদ্যোগে গড়ে তোলার জন্য। নানা ছোট ছোট কনট্রাক্ট মালিক কবসাদার গোষ্ঠী তাদের মূলধন বাড়িয়ে এখন প্রভাবশালী হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে কসছে।

মাত্র কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যে চোখের সামনে দিয়ে এই সমস্ত কান্ড ঘটে গেছে।

ঠিক একই ব্যাপার ঘটতে চলেছে পূর্ববঙ্গে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেশপ্রেমিকতার অভাব নেই, অথবা মানবের মঙ্গল চিন্তায় সিঁদুয়ার ঘাটতি আছে একথাও বলা হচ্ছে না। কিন্তু কৌশলবাজ উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের কি ভাবে বর্ষে রাখা যাবে তার কোন অভিজ্ঞতা হয়ত নাও থাকতে পারে।

কারেমী স্বার্থ হতে গড়ে উঠে পাকাপোক্ত না হতে পারে তার জন্য প্রয়োজন যত্ন রাজনৈতিক উদ্যোগ যাতে মানবকে সক্রিয়ভাবে দেশোন্নয়ন ব্যাপারে জড়ো করা যায় একে-

বহুর নীচরতলা থেকে। তা না হলে সাধারণ মানুষ সেই আগের মত দিন মাইনের মজুর থাকবে আর উৎপাদনের বেশীর ভাগ লভ্যাংশ অন্যের হাতে পড়ে ভবিষ্যতের জাতীয় শেখ প্রণী গড়ে উঠবে।

পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে একথা বলার প্রয়োজন হচ্ছে এই জন্য যে, ওখানকার বিধি ব্যবস্থা, রাজনীতি ও শিল্প-ব্যবসার গতি-প্রকৃতির নানা প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়বে আর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলন সেই অনুপাতে প্রভাবিত হতে থাকবে।

প্রসঙ্গ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিল্পের সংকট মেন চলে হবে।

প্রাথমিক হিসেবে দেখা গেছে যে, প্রায় এক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা দুই দেশের মধ্যে এখনই গড়ে উঠতে পারে। পরে এই ব্যবসা আরও অনেক বাড়ার সম্ভাবনা।

বাংলা দেশের সরকার একটু বিচলিত হয়েছে মাড়োয়ারীদের কান্ডকারখানা দেখে। ওদের ভয় এই মাড়োয়ারীরা হয়ত কল্যাণকৌশলে সব কবসাই হাত করে নেবে।

তাই বাংলা দেশের সরকারের প্রস্তাব যে, সমস্ত ব্যবসা চলবে দুই সরকারের চুক্তির ভিত্তিতে এবং সংগঠন পরিচালিত হবে সরকারী এজেন্সী মারফত।

আইন পরীক্ষা প্রসঙ্গে

পরীক্ষার হলে ছাত্রদের অশোভন আচরণ, দুর্ব্যবহার ও গণ-টোকাটকি প্রভৃতি কারণ দেখিয়ে আইন পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুদূরস্থ নাথ ল কলেজ ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য সব ছাত্রের মধ্যেই নৈরাশ্য এবং পরীক্ষা প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটছে। তাছাড়া অভিযোগে আরো বলা হয়েছে, মাস্টার্স কলেজ ছাত্রের দুর্বৃত্তির ফলে এই ব্যাপক পরীক্ষার্থীদের উপর শাস্তির দণ্ড ন্যে আসবে কেন?

অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল, এই সব ছাত্রদের মধ্যে একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠী নিজেদের বিচার বিবেচনাসম্মত সংগঠনের অনুমতি, ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই ছাত্রবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেন। সুদূরস্থ নাথ ল কলেজ ছাত্র সংগঠন এর বিরোধিতা করে বলেছেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মৌখিক আলোচনাই যথেষ্ট ছিল। কোর্টের শরণাপন্ন হওয়ার ফলে সংকট আরো বাড়ল।

পূর্ববর্তী বছরের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার তিনমাসের মধ্যেই পরবর্তী বছরের ছাত্ররা পরীক্ষায় বসবার সুযোগ পেতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক জটিলতার জন্য এই বছরে তার কতিপয় ঘটল।

পিকিং রেডিও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সাতই মার্চের ঢাকা রেস কোর্সের সেই ঐতিহাসিক লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী জনতার বিশাল সমাবেশ এবং সেখানে বঙ্গাবন্দ শেখ মুজিবের সেই বিখ্যাত রক্ততা—এই সমস্ত প্রসঙ্গ পিকিং এড়িয়ে গেছে। সাতই মার্চ থেকে সারা পূর্ববঙ্গের উত্তাল গণ আন্দোলনই পিকিং-এর কাছে ধর্তব্যের ব্যাপার নয়।

তারপর রাজনৈতিক আন্দোলন চলার সময় হঠাৎ ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রান্তের পিঁচিশে মার্চের বর্বর অক্রমণ পিকিংকে মোটেই বিচলিত করে নি।

কিভাবে এই অক্রমণে সমস্ত মিলিটারী যন্ত্র নিয়োজিত হল গণ-হত্যার প্রথমে ঢাকা আর অন্যান্য শহরে আর কিছুদিন পরে সারা পূর্ববঙ্গে তার কোন উল্লেখ পিকিং রেডিও করে নি।

অত্যাচারে দিশেহারা মানুষ লাখে লাখে সবকিছু ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিল, যে সংবাদ সারা পৃথিবীকে বিচলিত করল, তারও কোন উল্লেখের প্রয়োজন আছে বলে পিকিং মনে করে না।

পিকিং রেডিও অন্যদিকে রয়টার এবং নানা পশ্চিমী সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় উল্লেখ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, “ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরাই যে পাকিস্তান আক্রমণ করে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ব্যাহত করার চেষ্টা করছে” সেই বিষয়ে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা ছাড়া সারা বিশ্ব একমত।

এই প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আর জেনারেল এয়াসেন্সলীতে ভোটের ভারতীয়-সোভিয়েত জোটের কোণঠাসা অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

পিকিং-এর একটু অসুবিধা হয়ে গেছে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তির ফলে। এই চুক্তি না থাকলে বোধ হয় চীন ভারতকে একটু সমঝে দেওয়ার চেষ্টা করত। এখন এই চুক্তির ফলে চীন নিজে একটু সমঝে চলার চেষ্টা করছে। তাতে ওদের রাগ আরও বাড়ছে এবং এত দরদী হয়েও ওরা ওদের দাঁড়িনের একমাত্র বন্ধু পাকিস্তানের মিলিটারী রাজের জন্য কিছুই করতে পারছে না। নিষ্ফল অবস্থার গলাবাজী একটু বাড়ল। এখন অবশ্য চীনের নতুন অনেক মিত্র জড়চ্ছে—রাষ্ট্রসংঘে ভোটের ব্যাপারে তার প্রমাণ পড়ছে।

একই প্রস্তাবে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভোট দিচ্ছে, শত্রু ভোট নয়, একদিকে মার্কিনী নিকসন ভারতকে সাহায্য বন্ধের হুমকী দিচ্ছে আর অন্যদিকে চীনের ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড খেউড়।

দেশের এই সংকটেও এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী অতি মুনাফা শিকার চালিয়ে যাচ্ছে

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সারা ভারত আজ সংকটের সম্মুখীন। আমাদের জওয়ানরা মরণপণ লড়াই করছে আর দেশের অভ্যন্তরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষ এক জাতি এক প্রাণ হয়ে ভারত সরকারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের মনোবল দৃঢ়। যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তারা প্রস্তুত। কিন্তু যে শ্রেণীর হাঙ্গর-কুমীররা এই সব অবস্থার সুযোগ চিরদিন নিয়ে থাকে তারাও আজ প্রস্তুত তাদের মনোফার পাহাড় সৃষ্টির জন্য। সীমান্তে জওয়ানদেরা লড়ছে—অসামরিক অধিবাসীরা পক্ষ হানাদারদের গোলায় হতাহত হওয়া সত্ত্বেও অটুট মনোবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী চোরাকারবার করে মনোফা লোটার পথ প্রশস্ত করে তুলছে।

বাংলাদেশের এলাকার পর এলাকা হানাদার কবলমুক্ত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর মধ্যে ঘরে ফিরে যাওয়ার আনন্দের আভাস। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হতে চলেছে বলে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী আনন্দ উদ্বেল হয়ে পড়ছে আর সেই মহুতের দেখাছি বনগাঁ, বসিরহাট, গেন্দে, বালুঘাট সীমান্তে কবসারীদের আনগোনা। বাংলাদেশের মুক্তাঙ্গলে নিপীড়িত আর নিঃস্ব জনসাধারণ যখন হানাদার কবল মুক্ত হয়ে একদিকে নতুন করে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন আর অন্যদিকে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকটে ক্রিষ্ট হয়ে পড়ছেন তখন তাঁদের কাঁচামালের উপর আমাদের দেশের এক শ্রেণীর কালোবাজারী আর মনোফাখোররা কলঙ্কিত করবে। তাই সব দেশপ্রেমিক ভারতবাসীরাই দাবী ভারতরক্ষা আইনের ধারগলি এখন থেকেই এই সব হাঙ্গর-কুমীরদের উপর প্রবৃত্ত হোক।

কল-কারখানা, অফিস-আদালতের সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী তাদের সংগঠনগুলির নেতৃত্বে অপূর্ব দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে উৎপাদন অব্যাহত রাখার কর্মসূচী ঘোষণা করেছে কিন্তু মালিক শ্রেণীর সেই মনোভাবের পরিচয় কোথায়? কয়েকটি বণিকসভার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে তারবার্তা পাঠিয়ে ভারত সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যুদ্ধ তহবিলে বা রাণ তহবিলে কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ টাকা দান

করাই তো বড় কথা নয়। তাঁরা কি তাঁদের মনোফা লোটার হার কমানবেন? কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি বা তাঁরা দিয়েছেন তা কি স্বেচ্ছায় জমা দিয়ে দেবেন। সর্বোপরি শ্রমিক-কর্মচারীদের মনোবল অটুট রাখা আর এক ও সংহতি বৃদ্ধি করার জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবেন না?

না—তার ইচ্ছাতও পাওয়া যাচ্ছে না বরং উল্টো আভাসই পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধ শুরুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট্টকল মালিকেরা উল্লাসে ফেটে পড়েছেন। গত দেড় বৎসর ধরে চট্টকল মালিকদের মনোফা শত গুণে বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের চট্টকলগুলিতে উৎপাদন না হওয়ার বিশ্বের বাজার এখন আমাদের হাতে। তার উপর বাংলাদেশে বীর মরীচি যোদ্ধাদের সঙ্গে ইয়াহিয়া চক্কর সংঘর্ষের মধ্যেও বাংলা দেশের উৎকৃষ্ট জাতের পাট সীমান্তের বেড়া ডিঙিয়ে অনেক কম দামে আমাদের দেশের চট্টকল মালিকদের গদামে মজত হয়েছে। ফলে আমাদের দেশেও কাঁচা পাটের দাম অস্বাভাবিক পড়ে যাওয়ার চাবীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। এত মনোফা হওয়া সত্ত্বেও চট্টকল মালিকেরা শ্রমিকদের মজুরী বাড়তে রাজী নন।

সব কয়টি কেন্দ্রীয় চট্টকল শ্রমিক ইউনিয়ন বারংবার আপোষের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। জরুরী অবস্থায় স্বভাবতই চট্টকল শ্রমিকেরা ধর্মঘটের পথে যাবেন না। কিন্তু মালিকপক্ষ কি শ্রমিকদের দাবী মেনে নেবেন? তার বিসদৃশ আশা নেই। স্বভাবতই প্রতিরক্ষার স্বার্থে প্রতিটি ভারতবাসী দাবী করবে চট্টকল মালিকদের উপর ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করে শ্রমিকদের দাবী তাদের মেনে নিতে বাধ্য করা হোক।

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আদর্শগতভাবে এবং সাংগঠনিক ভাবেও শাসক কংগ্রেসের অনেক কাছাকাছি এসেছেন। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকদের স্বার্থে এমন কতকগুলো নীতি গ্রহণ করেছেন যার সঙ্গে অন্য ট্রেড ইউনিয়নের মৌলিক পার্থক্য কম। কয়েকদিন আগে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক বৈঠকে উক্ত নীতিগুলি বিশ্লেষণ করার সময় এই সব নীতি কার্যকরী করার জন্য আন্দোলন করার কথা ঘোষণা করেছেন। জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, যে সব মালিক কংগ্রেস শাসক দলেরও নেতা তাঁরা এই সব নীতি কার্যকর না করলে তাদের কংগ্রেস সংগঠন থেকে বের করে

দেয়ার জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন কি? স্পষ্ট জবাব না দিলেও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যকার সোস্যালিস্ট ফোরামের নেতৃবৃন্দ আশ্বাস দেন যে তাঁরা চেষ্টা করবেন।

এ নেতাদের অবগতির জন্য দ-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কলকাতার বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একমাত্র স্টেটসম্যান ছাড়া আর প্রায় সব কয়টির মালিকই কংগ্রেস শাসকদলের। এর মধ্যে আবার অমৃত-বাজার, যুগান্তর ও বসন্তমতীর মালিক এবং সম্পাদকেরা শাসকদলের নেতা। এই দুই সংস্থাভেই প্রচলিত আইনকে বৃথাগলি দেখিয়ে সাংবাদিক-অসাংবাদিক কর্মীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। যুগান্তর, অমৃতবাজারের মালিক গত কয়েক বৎসর ধরেই সাংবাদিক অসাংবাদিকদের ন্যায্য মহাঘড়াতা দিচ্ছেন না। বসন্তমতীর কথা না তোলাই ভাল। দীর্ঘদিন বন্ধ করে

রাখার পর যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করে সংস্থাটি খোলা হয়েছে তার কোন ধারাই মানা হচ্ছে না। মালিকপক্ষ প্রতিশোধাত্মক নীতি গ্রহণ করে নির্বিচারে পীড়ন করে চলেছেন। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত অসাংবাদিক কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার অপরাধে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অমান্য করে গত দু-তিন মাসের মধ্যে শতাধিক কর্মীকে হয় ছাঁটাই, না হয় সাসপেন্ড করা হয়েছে। চার্জশীট দেয়া হয়েছে অনেকের উপর। একতরফা ভাবে প্রত্যেকের বেতন শতকরা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্রোজারের আগে দেড় মাসের পাওনা বেতনের শতকরা সত্তর টাকা আজো দেয়া হয়নি—দেয়ার লক্ষণও নেই। মাসিক বেতন নিয়মিত দেয়া হচ্ছে না। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকলে মালিক প্রতিনিধি বৈঠকে হাজির হচ্ছেন না। চুক্তি অনুসারে যারা স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে যাবেন এক মাসের মধ্যে তাদের বেতন মিটিয়ে দেয়া হবে। বহু সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কাজ ছেড়ে গিয়েছেন কিন্তু তাদের পাওনা মৌটার কোন মনোভাবই মালিকপক্ষের নেই। ভারতরক্ষা আসন কি এই সব মালিকের উপর প্রয়োগ করা হবে?—এখানে তো শ্রমিক-

কর্মচারীরা কোন আন্দোলনই করছেন না বরং বর্তমান পরিস্থিতিতে রাতদিন খেটে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন।

যুব কংগ্রেস, যুব সংঘ, গণ-তান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, বিপ্লবী যুব সংস্থা প্রভৃতি যুব সংগঠন প্রতিরক্ষার স্বার্থে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য আন্দোলন শুরুর করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। শ্রীপ্রসাদসমুদ্রসী ঘোষণা করেছেন যুব কংগ্রেস মনোফাখোরদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সজাগ করার জন্য আন্দোলন করবেন। বিপ্লবী যুব সংস্থা দাবী তুলেছেন প্রতিরক্ষার স্বার্থে ব্যাঙ্কের লকারে মজত মালিকদের সম্পত্তি বাজে-রাপ্ত করা হোক, ছাঁটাই, ক্রোজার লক-আউট বে-আইনী করা হোক, শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা না মেটালে মালিকদের শাস্তি দেয়া হোক, গ্রামাঞ্চলে জোতদারদের জমিদার বন্ধ করা হোক। আজ রেবারেই ভুলে গিয়ে এই সব দাবীর ভিত্তিতে সমস্ত যুব সংগঠন কি ঐক্যবন্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করে তুলবেন?

যাদবপুর অঞ্চলে চরম অরাজকতা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

দক্ষিণ শহরতলীর যাদবপুর এলাকা আজ চরম অরাজকতার কেন্দ্র পরিণত হয়েছে। প্রাণ হাতে নিয়ে এখানকার লোকজনকে বর্তমানে চলা-ফেরা করতে হচ্ছে।

যাদবপুর থানা এলাকার কয়েকটি কলোনী ঘুরে দেখে এইটুকু বঝতে পারলাম যে এখানকার লোকদের ওপর একশ্রেণীর সমাজ-বিরোধী নব কংগ্রেসের ছাপ মেয়ে পুর্লিশের সাহায্যে নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজয়গড়, বাঘামতীন, গান্ধী, শ্রী, বাগদোণীর কয়েকটি এলাকা, সেলিমপুরের কয়েকটি এলাকার কয়েকজন লোকের বাড়ীতে উড়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে, “যদি তোমরা বা তোমাদের বাড়ীর কেউ সি পি এম করো তাহলে একটা লোককেও জীবিত ফিরতে দেওয়া হবে না”।

যাদবপুর থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর এই সমস্ত সমাজবিরোধীদের মদত দিচ্ছেন বলে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানতে পারা গেছে যে যদিও বর্তমানে যাদবপুর এলাকায় শান্তি বজায় আছে বলে দেখান হচ্ছে তথাপি গৃহস্থ খুন ও অপহরণের সংখ্যা

আগের তুলনায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গেছে।

কেসরকারী ভাবে জানতে পারা গেছে বর্তমান সার্কেল ইন্সপেক্টর আসবার পর গত কয়েক মাসে বাগদোণী, বিজয়গড় ও সেলিমপুর এলাকায় কমপক্ষে বিশ জন যুবককে খুন করা হয়েছে অথবা তাদের এমন কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে যেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না। পুর্লিশের কাছে সব কথা জানাতে গেলে স্থানীয় থানার কয়েকজন অফিসার অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

বিজয়গড় কলোনীর জনৈক বৃদ্ধ আমাকে জানান, “আজ তিন মাস হলো আমার নাতীর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আমি গোপনে খবর পেয়েছি তার দুটো চোখ অন্ধ করে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে”। বৃদ্ধার এই নাতীর বয়স একশ বছর। যাদবপুর এলাকার একটি ছোট কাবখানায় সে কাজ করত। যতদূর জানা যায় এই যুবকটি সি পি এমের সমর্থক ছিল। একদিন কারখানায় কাজ করতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। আরো কয়েকটি কলোনী ঘুর-

লাম। দেখলাম কয়েকজন যুবকের হাতে ও পায়ে এমন ভাবে আঘাত করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে তারা ঐ হাত বা পা দিয়ে কাজ করতে না পারে।

মেয়েদের ওপরও এখানে সমাজবিরোধীরা অত্যাচার করতে ছাড়েনি। বাগদোণী এলাকায় জনৈক তরুণী বললেন, “আমার ভাই ছাত্র ফেডারেশন করে। প্রতিদিন একদল লোক এসে তাকে খোঁজে। ভায়ের বিপদ হবে জেনে ভাই আজ দু মাস ফেরার। একদিন রাতে কিছু সংখ্যক লোক এসে আমাদের বাড়ীর যাবতীয় আসবাব পত্র ভেঙ্গে তছনছ করে দেয় এবং তারপর আমার ভাইকে না পেয়ে আমাকে মারধর করে। শব্দ তাই নয় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করে।” তরুণীটিকে যে খুব বেশী উৎপীড়ন করা হয়েছে তার প্রমাণও পেলাম। সারা গায়ে তার আঘাতের চিহ্ন।

বাজনীর সঙ্গে সংস্পর্শ নেই সেলিমপুরের কয়েকজন লোককে প্রশ্ন করলাম, আপনারা বর্তমানে এই এলাকায় কি দেখছেন? প্রথমে আমার কথার অনেকেই উত্তর দিতে চান নি। পরে তাঁরা জানান, “সত্যি কথা বলতে কি আমরা এখন একটা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাস করছি। পুর্লিশ আর সমাজ-বিরোধীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।”

আমি যখন ফিরছিলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভয়ও করছিল। (শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

এম এল দলের রাজনীতি প্রসঙ্গে (৩)

প্রভঞ্জন দেবরায়

যাঁরা বলছেন (যেমন সদ্যশীতল রামচৌধুরী — বর্তমানে মৃত) গ্রামাঞ্চলে বা ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার আগেই শহরে এই রকম বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করা ঠিক হয়নি। তারাও কিন্তু পরিপূর্ণ সঠিক বক্তব্য রাখেন না। “বিস্-এরিয়া” তৈরি হলে প্রতিষ্ঠার আক্রমণের মধ্যে হয়তো শহরের এইসব কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া যেত, “বিস্-এরিয়া” থাকলেও এই উদ্দেশ্যশীল শহরে এডভেঞ্চারের কি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে? লিলি সানের কথা স্মরণ করুন। শহর দখলের এডভেঞ্চার করে শব্দ শক্তির অপচয় ছাড়া কিছুই করেননি তিনি এবং সেই হেতু মাও সে তুং কিছুতেই সমর্থন করেননি তার নীতিকে। বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন শহরগুলি মস্ত গ্রামাঞ্চল দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়বে তখন সেগুদিকে পাকাপাকিভাবে দখলে আনার উদ্দেশ্যেই মাও শহরগুলিতে সামরিক অভিযান চালানো যেতে পারে।

তাহলে শহরের এই বিরাট বিপ্লবী শক্তি কি সেই চূড়ান্ত দিনগুলির অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? মোটেই না। গ্রামে যে মূল সংগ্রাম চলছে পার্টির সকল শক্তিকে তার দিকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পার্টিই সক্রিয়ভাবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরের কর্মীদের গ্রামের দিকে ছাড়িয়ে দেবে। গ্রামে যাওয়ার যাদের বাধা আছে তারা শহরে থেকেই পার্টির নানারকম কাজ করবে—প্রচার কার্য চালাবে, নতুন নতুন কর্মী সংগ্রহ করবে এবং গ্রামের বৈপ্লবিক কাজের সহায়ক আনুষঙ্গিক বৈপ্লবিক কার্যকলাপ (যা পার্টির তরফ থেকে করতে দেওয়া হবে) চালিয়ে যাবে। গ্রামাঞ্চলে গণফৌজ যদি গড়ে ওঠে শহরের উপযুক্ত কর্মীরা তাতে যোগ দেবে। “বিস্-এরিয়া”, বিশেষ করে মৃত্যুশ্রম গড়ে উঠলে তো আর কথাই নেই, তখন কত কাজ সাক্ষর অভিযান (Literacy campaign), শিক্ষা প্রসার, কৃষির উন্নতি সাধন, চিকিৎসার ব্যবস্থা, গোলা বারুদ উৎপাদন, ছোটখাটো কল-কারখানা চালানো প্রভৃতি কত কাজ। তখন শহর থেকে নারী, পুরুষ, জোয়ান, বৃদ্ধ সকল রকম কর্মীর জোগান দিয়েও তো কুল কিনারা পাওয়া যাবে না। এড্‌গার স্নোর “পেরড স্টার ওভার চ্যাম্পন” বইখানা পড়লে যে কেউ এ সম্বন্ধে বোধ হয় একটা সুসমজস ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। মোট কথা, কল-কাতা প্রভৃতি শহরে যা করা হলো তা কোন অবস্থাতেই বিপ্লবীরা অন্তিমোদন করতে পারেন না। চীনেও এ ধরনের কার্যকলাপ চালানো হয়নি। লিলি সানেরা যেটা করতে গিয়েছিলেন সেটাও শহরের কর্মীদের দিয়ে নয়, বাইরে

থেকে লাল ফৌজ চুকিয়ে। কিন্তু শহর দখলে রাখার মত অবস্থা তখনও সৃষ্টি হয়নি, তাই শহর হাতে মার খেয়ে পার্টির চূড়ান্ত ক্ষতি হয়েছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনামে অত-বড় লড়াই চলছে, কিন্তু সেখানেও তো এখনও শহরকে ধ্বংস করার লড়াই শুরু করা যায়নি। অতএব এই শহরে আন্দোলন চালাতে গিয়ে পার্টি চূড়ান্ত ভুল করেছে। এই মহত্ত্ব শহরে এডভেঞ্চার বন্ধ করে পার্টিকে গ্রামের দিকে সর্ব-শক্তি নিয়োগ করতে হবে।

সি পি আই (এম-এল) যে এত সহজে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো তার আর একটা কারণ “একসনের” নামে স্কুল কলেজ ছাত্রলানো, লাইব্রেরী পোড়ানো, নেতাদের মর্তি ভাঙা, যখন তখন গ্রামে বাসে আগুন দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় শহুরে কার্যকলাপ।

স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, লেব-রেটরী পোড়ানো হলে কেন? ধরাই থাক, এগুলি দিয়ে বুদ্ধোন্নতা শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধোন্নতা ভাবধারা ও বুদ্ধোন্নতা সংস্কৃতিই প্রচার করা হয়, তাই বলে এগুলি ভেঙে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে ফেলতে হবে? আর কলকারখানাগুলিতে যে বুদ্ধোন্নতা উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেগুলি ধ্বংস করতে হবে না কেন? কারখানা ধ্বংস করতে বলায় সাধু সি পি আই (এম এল) নেতাদের নেই, কারণ এ সম্বন্ধে মার্কস, এঙ্গেলস প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা অনেক আগেই বলে গেছেন যে মানবের দৃষ্টির জন্য উৎপাদনের যন্ত্র কোনকালেই দায়ী নয়, যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানাটাই আসলে দায়ী। তাই কোন দেশে কমিউ-নিস্টরা কোন দিন উৎপাদনের যন্ত্র অর্থাৎ কলকারখানাগুলিকে ধ্বংসের কথা বলে না, এগুলির ক্রান্তিগত মালিকানা রদ করে সমগ্র সমাজের দখলে আনার কথা বলে, যা কার্য-করী হয় বিপ্লবের মাধ্যমে। আর সমাজের দখলে আসার পর ঐ উৎ-পাদন যন্ত্রগুলির কল্যাণময় রূপটা ফুটে ওঠে—যা ব্যক্তিগত মনোফার স্বার্থে চালিত হচ্ছিল, তাই-ই তখন চালিত হয় সমাজের সকলের স্বার্থে। স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, লেবরেটরী এ সবের ব্যাপারেও এই একই নীতি গ্রহণ করতে হবে। এখনও দেশে বিপ্লব হয়নি, তাই ওগুদী পরিচালিত হচ্ছে বুদ্ধোন্নতা ব্যবস্থার মধ্যে এবং এগুলি দিয়ে বীরের আসছে বুদ্ধোন্নতা ভাবধারা অকল্যাণের রূপ নিয়ে। কিন্তু বিপ্লব সম্পন্ন হলে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার অধীনে এসে এগুলিরই আবার কল্যাণময় রূপটা ফুটে উঠবে। যে বুদ্ধিতে কল-কারখানা প্রভৃতি উৎপাদনযন্ত্রগুলিকে ধ্বংস করার অধিকার কমিউনিস্টদের নেই, সেই একই বুদ্ধিতে স্কুল, কলেজ,

লাইব্রেরী, লেবরেটরী ধ্বংসের অধিকারও তাদের নেই।

কি আশ্চর্য কথা, এই সব স্কুল কলেজ ধ্বংস করতে নেমে সি পি আই (এম এল) বলছে আমাদের দেশে “সাংস্কৃতিক বিপ্লব” হচ্ছে। “সংস্কৃতি” যে সমাজব্যবস্থারই প্রতিফলন (Reflection) এই মার্কসবাদী শিক্ষাটা কি সি পি আই (এম এল) নেতারা একেবারেই ভুলে বসে আছেন, তাই কাঁঠাল গায়ে আম ফলানোর মত বুদ্ধোন্নতা সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই তারা সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট সংস্কৃতি পেতে চাই-ছেন? মহাশয়রা জেনে রাখুন, দেশের সব কটা স্কুল কলেজ ধ্বংস করে ফেললেও সমাজব্যবস্থাটা যদি থাকে বুদ্ধোন্নতা তবে সংস্কৃতিটাও বুদ্ধোন্নতই থেকে যাবে। সংস্কৃতির চরিত্র বা রূপটাকে যদি পাল্টাতে হয় তবে রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিপ্লব সমাধা করে আগে সমাজব্যবস্থাটা পাল্টাতে হবে। সমাজ ব্যবস্থা পাল্টালে সংস্কৃতিও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাবে, কারণ সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থারই প্রতিফলন।

বলতে পারেন, তবে বিপ্লবের পরও চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হচ্ছে কেন? এর কারণ হচ্ছে, বিপ্লব সম্পন্ন হলেও পুরাতন সমাজব্যবস্থার বহরলোক পুরাতন সমাজব্যবস্থা থেকে, পাওয়া পুরাতন এবং পশ্চাদগামী ভাবধারাও চিন্তা নিয়ে সমাজের নানা স্থানে ঘাপটি মেরে বসে আছে এবং সমাজের সর্বপ্রকার রূপান্তর (রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিপ্লব সমাধা হওয়ার পরই যে রূপান্তরের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল) বাধা দিচ্ছে। তাই এইসব “ময়লা সাফাইয়ের” জন্য প্রয়োজন হয়েছে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বার প্রধান কর্মক্ষেত্র হচ্ছে মানবের মনোভাঙ্গা এবং চিন্তাজগৎ—যুগের (আরও ভালভাবে বলা যায়, প্রচ-লিত সমাজ ব্যবস্থার) উপযোগী চিন্তা, ভাবধারা গড়ে তোলা। যাঁরা তাল মিলিয়ে চলতে পারেন তাদের “শুদ্ধবুদ্ধি” হয়ে যাচ্ছে এর দ্বারা। আর সবথেকে বড় কথা এমন দেশজোড়া সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে এসে সেই আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হচ্ছে—“আমি ঠিক পথে চলছি তো?” এই আত্ম-জিজ্ঞাসাই বুদ্ধিবৃত্তি মানবকে মনের পরিপন্থির জন্য নিয়ে গেছে শূন্যের বিস্তারিত পরিস্কারে। (এ বিবরণ দেশত্যাগীতেই বের হয়েছিল) তাই মাও সে তুং বলেছেন, রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পরও সাম্যবাদে পৌঁছানোর আগে অনেক অনেক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়ো-জন হবে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব হচ্ছে মূলতঃ মনোজগতের বিপ্লব। মনের অন্যরূপ প্রবৃত্তি, স্বার্থপর চিন্তা ইত্যাদির দূর না হওয়ার অনেকে সমাজের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করেছে, শ্রমচার্য মিথ্যাচারের আগ্র-

হও নিয়েছে। তাই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রকৃত স্বরূপ সকলের সামনে উন্মোচিত করে তাদের উচ্চ পদ থেকে সরানোও হয়েছে। তাই রাষ্ট্রবিপ্লবের পরও এই সব সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উপ-যোগিতা অনস্বীকার্য। আজ আমরা বেশ বুঝতে পারি, রাশিয়া এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ গ্রহণ করেনি বলেই বোধহয় বিপ্লবের পরও পরিপূর্ণ লাভ করেছে সামা-জিক সাম্রাজ্যবাদে।

মোট কথা, সাংস্কৃতিক বিপ্লব হবে রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরে। সমাজের সামন্ত-তান্ত্রিক বা বুদ্ধোন্নতা কাঠামোর মধ্যে স্কুল-কলেজ পুড়িয়ে বা মদের দোকান ভেঙে সংস্কৃতিকে পাল্টানো যায় না। এইসব অ-মার্কসীয় উল্টাট পারিকল্পনা পার্টিকে এখনই পরি-ত্যাগ করতে হবে।

“পার্টির তলার কর্মীরা যে যা করছে করুক, আমরা সে সবের কোন সমালোচনা করবো না”—সি পি আই (এম-এল)-এর নেতারা এই রকম একটা মনোভাব গ্রহণ করেছেন বলে শোনা যায়। এটা কিন্তু হুঁশিয়ারী নয়। হুঁশিয়ারী রিপোর্টে মাও-সে তুং বলতে চেয়েছিলেন যে, হুঁশিয়ারী কৃষকেরা সে সময়ে (উনিশশ ছাব্বিশ) যা করেছিলেন তার মধ্যে বাড়াবাড়ি থাকলেও তাদের কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না এই জন্যই যে যুগ যুগ ধরে তো তারা জমিদার মহা-জনদের হাতে মারই খেয়ে এসেছে, তাই শ্রেণীঘৃণা ও প্রতিহিংসার বশে তারা যদি কিছু বাড়াবাড়ি করেছে থাকে তো তাতে দোষের কিছু নেই এবং ও নিয়ে কমিউনি-স্টরা তাদের সমালোচনা করতেও যাবে না। মহাশয়গণ, সাধারণ কৃষক জনতা আর পার্টি কর্মী এক বস্তু নয়। স্কুল-কলেজে আগুন দেওয়ার (কি আশ্চর্য, দুঃস্থপোষ্য শিক্ষার্থীদের কে জি স্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতেও বোমাবাজী হয়েছে) তথা কথিত আন্দোলন যারা করেছে ও করছে, তারা সাধারণ জনতা নয়, আপনাদেরই পার্টির কর্মী। পার্টির প্রতিটা কর্মীর ক্রিয়াকলাপ পার্টির কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। সুতরাং “পার্টির কর্মীরা যা কিছুই করুক। আমরা কিছু বলবো না”—এ মনোভাব কখনও একটা “সেনট্রা-লাইজড” (কেন্দ্রীভূত) পার্টির নেতৃবৃন্দ বলতে পারেন না। এ নীতি চালিয়ে যাওয়ার মানে স্পন্টে-নিউটির শিকার হওয়া, তাই এ নীতি সম্পূর্ণ ভুল এবং পরিত্যাজ্য। উদ্যোগ গ্রহণে নিশ্চয়ই তাদের উৎসাহ দিতে হবে কিন্তু ভুল করলে ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। কারণ তারা পার্টির কর্মী, সাধারণ জনতা নয়।

গ্রাম বাস পুড়িয়েই বা কি হচ্ছে? শহরে যখন ক্ষমতা দখল করা হবে না তখন লাগাতার গ্রাম বাস পোড়ানোরও কোন বুদ্ধি থাকতে পারে না। এতে একদিকে যেমন শক্তির অপচয়, অন্যদিকে

তেমনি প্রতিনিয়ত — জনসাধারণের অসদ্বিবাহ্য ফেলা। এর পরিণামে জনসাধারণের মনে পার্টির প্রতি-কোষ আর ঘৃণাই পুঞ্জীভূত হচ্ছে এবং এখন তা সমযোগ পেয়ে প্রতি-রোধ বাহিনীরূপে ফেটে পড়ছে।

আর অতীত নেতাদের মর্তি-ভাঙা? তারও কি কোন প্রয়োজন আছে? এ সব অতীত নেতাদের প্রত্যেকের কাজের মূল্যায়ন নিশ্চ-য়ই পার্টি করবে এবং সেই মূল্যায়ন জনসাধারণের কাছে রাখবে। তারপর জনসাধারণ বুঝবে তারা মর্তিতে মালা দেবে না মর্তি ভাঙবে। এ নিয়ে পার্টির কর্মীদের “একসনে” এগিয়ে দেওয়ার অর্থ সংগ্রামের অভিমুখ আসল সংগ্রাম থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার যে, এম এল পার্টির তরফ থেকে বহু অতীত-নেতা সম্বন্ধে যে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা প্রচার পারস্পেক্টিভ বা উপযুক্ত পটভূমি-কায় করা হয়নি। যেমন ধরুন রাম-মোহন রায়। তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছেন তখন মার্কস-এঙ্গেল-সরা বলতে গেলে সবে জন্মেছেন, শ্রেণী-সংগ্রামের সূত্রগুলি তখনও কেউ গ্রহণই করেনি। আর আমা-দের দেশ তো তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কুসংস্কারে নিমগ্ন—ধর্মের নামে তখন কাপালিকদের নরকলি চলেছে, বৃদ্ধশ্রী ফোঁড়, সন্তান জলে ভাসিয়ে দেওয়া, সতীদাহ ইত্যাদি আজকের দিনে অবিস্মার্য সব প্রথা আর দেশচারে সমাজ তখন কল্ট-কিত, ধর্মের এইসব অন্তঃশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে যাওয়া মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা। এ হেন অব-স্থায় রামমোহন রায় যে অমিত বিক্রমে এই সবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গোড়া ধর্মব্রতীদের সকল যড়যন্ত্র ব্যর্থ করে সারা ভারতের জন্য সতী-দাহ বন্ধের আন্দোলন গড়ে তুল-লেন এবং আইন পাশ করিয়ে নারী সমাজকে একটা জীবন্ত বিভীষি-কার হাত থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত করলেন, শ্রদ্ধা এর জন্যই তো তিনি অন্য কোন ভাবে নাহোক, অমৃততঃ সমাজ-সংস্কারক হিসাবেই সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন ও চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি

(শেখাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

চাঁদার হার

বার্ষিক পনেরো টাকা

ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৬১, মট লেন, কলি-১৩

প্রধান শিক্ষককে গুড়িয়ে মারার ঘটনা

প্রথমেই আপনাদের সংবাদদাতা প্রেরিত বিশ্বকর্মানগরের (দুর্গাপুর) এম এ এম সি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমল দাশগুপ্তের নারকীয় হত্যার সঠিক বিবরণ দর্শন পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ব্যস্ত করতে চাই।

ধান শিক্ষক বিমলবাবু অসুস্থতা কারণে দুইদিন অনুপস্থিত থাকার পরে সোমবার পনেরোই নভেম্বর স্কুলে যোগদান করেন। দোতালার তার অফিস—অফিসের পাশের রুমের খাড়া পিরিয়ডের শিক্ষক অশোক রায় দশম শ্রেণীর অঙ্কের ক্লাশ নিচ্ছিলেন। তার পরের রুমেরই বিমলবাবু একাদশ শ্রেণীর (সাহিত্য) ক্লাশ নিচ্ছিলেন। ঘটনার সূত্রপাত বেলা একটা। দশ মিনিট মাত্র বাকী খাড়া পিরিয়ড শেষ হতে। নব কংগ্রেসী গুন্ডারা স্কুলেরই কিছু ছাত্র ও শিক্ষকের সহায়তায় প্রথমে বিমলবাবুর অফিস ঘরে আগুন দেয়। সেখানে ক্লাক শ্রীআচার্যকে ভয় দেখানো হয়। তারপর এই গুন্ডারা শ্রীরায়ের ঘর অতিক্রম করে একাদশ শ্রেণীতে প্রবেশ করার মধ্যে ঐ ক্লাশেরই ছাত্রী আত্মপনা সরকারের সামনে পড়ে (আত্মপনা তখন জল খেতে যাচ্ছিল) আত্মপনাকে ওরা রেহাই

দেয় নি। তার গায়ে পেট্রল ছিটিয়ে আগুন দেওয়া হয়। তবে সে এখনও জীবনের সাথে সংগ্রাম করে হাসপাতালে রয়েছে।

এর পরেই বিমলবাবুর ক্লাশে ঢুক তার গায়ে পেট্রল ছিটিয়ে দেয়। উনি ঘটনা উপলব্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে জামা ছিড়ে ফেলে দেন আর সামনের দরজা দিয়ে বাইরে পালাতে

করে। নীচে তখন সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা ক্লাশ নিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের কাছে সমস্ত ঘটনা তখনও অশ্বেকারে। এদিকে শিক্ষক অশোক রায় তখন সাত আট হাত দূর থেকে দাঁড়িয়ে বিমলবাবুকে পড়ে যেতে দেখতে থাকেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় উনি নীচের সঠিক সংবাদ দেওয়া বা

মতামত

চেষ্টা করেন। তখন মাথার লোহার রড মারা আঘাত করা হলে উনি বাইরের বারান্দায় পড়ে যান। এই সময়ে দৃষ্ণতকারীরা টিনের সমস্ত পেট্রল তার গায়ে ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে পালিয়ে যায়। পালানোর সময় লেবরেটরীতে (যেটা ঐ ক্লাশেরই পাশে) আগুন লেগেছে এই মিথ্যা প্রচার করে। এমনকি একাদশ শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্র বারা ঘটনার সূত্রপাতে পালিয়ে নীচে চলে যায় তারাও সঠিক সংবাদ নীচে কাউকে দেয় না। আর যে ছাত্ররা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল তারা নীচে এসে একই সংবাদ প্রচার

তার ক্লাশের ছাত্রদের নিয়ে বিমলবাবুকে বাঁচানোর চেষ্টা তো করেন নি, উপরন্তু নীচে থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন উপরে ছুটে বান তখন তাদের এই বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন “আগুন, কাছে আসবেন না।” মজার কথা, এই সময়ে এম এ এম সি হাসপাতালের এমজেন্সীতে ফোন নামানো ছিল। অ্যাম্বুলেন্স বিনাকাজে বাইরে ছিল। তাই সবকিছুই পরিকল্পিতভাবে ঘটলো আর বিমলবাবুকে হাসপাতালে আনার চার ঘণ্টার মধ্যেই তার জীবনদীপ চিরতরে নির্বাণিত হোল। পশ্চিমবঙ্গের খুনো-খুনির ইতিহাসে এত নিরম, পাশ-বিক উপরে কেনা প্রধান শিক্ষককে স্কুলের মধ্যে পেট্রল দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা এই প্রথম। জ্ঞানের দীপশিখার এইভাবে নির্বাণিত হওয়াতে শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবুর কিছ্র আসে যায় না। কেননা তিনি তো এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গে একটি শিক্ষিত যুবকবাহিনী গড়ে তুলছেন! প্রাগৈতিহাসিক যুগে আফ্রিকার অরণ্যে এইভাবে নরবলি হোত আগুনে পুড়িয়ে।

ঘটনার পরই দুটি ছাত্রকে স্কুলের মধ্যে ছোরাসহ ধরা হয় (একজনের নাম দেবনারায়ণ পেম্পার—ছাত্র পরিষদের সদস্য)। পদলিগ সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিয়ে বার আর থানায় নিয়ে যাওয়ার আগেই দেবকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অপর ছেলোটো পরদিন সকালে ছাড়া পেয়ে যায়।

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস না হলে যে দৃষ্ণতকারী যুবকগুলি ধরা পড়েছে তারাও দীর্ঘ গায়ে হওয়া লাগিয়ে ঘরে বেড়াতে পারতো যদি না ঐ দলের একটি ছেলেকে বিমলবাবু পেট্রলমাখা জড়িয়ে ধরতে না পারতেন আর গুলেও যদি আগুন না লাগতো। ছেলোটো সাইকেলে পালানোর সময় বেশ পড়ে যায়, পরে এ ভি বি হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এখনো রানীগঞ্জ হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় রয়েছে। তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি মারা বাকী ছয়-সাতটি ছেলে ধরা পড়ে।

আমার কাছে যতদূর খবর পৌঁছেছে, তাতে চারজন শিক্ষককে

এ ব্যাপারে সরাসরি দায়ী করা যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য। এরা হলেন অশোক রায় (গণিতের শিক্ষক), শান্তি ব্যানার্জী (সাহিত্যের শিক্ষক), বি আর সিং (হিন্দী শিক্ষক) চন্দ্র মিত্র (সাহিত্যের শিক্ষক)। এছাড়াও স্কুলের কিছু বখাটে ছেলে আর নব কংগ্রেসের আমদানী করা আশেপাশের স্কুলের কয়েকটি ছেলে বারা এ্যাকশন স্কোয়াডে ছিল।

তবু প্রশ্ন আসে একজন শিক্ষাবিদকে নৃশংসভাবে কেন মারার প্রয়োজন হোল। এই জনাই যে, বিমলবাবু সি পি এম এর সদস্য ছিলেন, তিনি শিক্ষকদের গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে

তুলছিলেন, তিনি দুর্গাপুরের মধ্যে মাত্র এই একটি স্কুলেই গত দুই বছর ঠিকমত শিক্ষাব্যবস্থা চালিয়েছিলেন (মিশনারী স্কুল ছাড়া)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে পুজার আগে, এম এ এম সি এমপল্লীজ ইউনিয়নের নেতৃত্বদকে গ্রেপ্তারের জন্য পদলিগ সি আর পি ঘেরাও করলে বিমলবাবু শিক্ষক ও ছাত্রদের সহযোগিতায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন গণতান্ত্রিক উপায়ে। তারপর দিনই বিশ্বকর্মানগর যুব কংগ্রেসের পাঁচ-সাতটি ছেলে স্কুলে গিয়ে বিমলবাবুকে প্রচণ্ড গালাগালি দেয়, জীবনের ভয় দেখায়, ভবিষ্যতে গুরুতর পরিণাম আছে জানাতেও ভুলে যায় না ইত্যাদি।

জনৈক নাগরিক

পরিবহন সমস্যা

বেশীরভাগ প্রমিক কর্মচারী ছাত্র শিক্ষক বিভিন্ন অফিস আদালত কলকারখানার সঠিক সময়ে হাজিরা দিতে অসমর্থ হচ্ছেন এবং যথা সময়ে হাজিরা দিতে না পারার জন্য কর্তৃস্থানীয় ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও মালিক শ্রেণীর নিকট অবস্থা নাজে-হাল হচ্ছেন কেন—তার মূল কারণ পরিবহন সমস্যা।

সাধারণ খেটে খাওয়া মানব তাদের যাতায়াতের কবস্থা বাস এবং ট্রেন কিন্তু এই সমস্যা বর্তমানে এরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে যে তা একমাত্র ভুক্তভোগী বাদরকোলা যাত্রী বারা দৈনন্দিন প্রাণ হাতে করে রুটী রুজি রোজগার করতে শহরে যাতায়াত করেন তাঁরা ছাড়া কেউ এর মর্ম বুঝবে না। শ্রম মাত্র ঠান্ডা ঘরে অফিসে বসে রক্তচক্র দেখালে, বা হাজিরা খাতার লাগ লাগ দিলে, বা বাদশাহী চালে চাকুরী যাওয়ার ভয় দেখালে, কিলম্বো আসার জন্য চেয়ার দখলের আন্দোলন করলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এই সমস্যাতে জাতীয় সমস্যার রূপ দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

পাতালরেল টিউবয়েল নিয়ে বিরাট পরিকল্পনার কথা সংবাদপত্রে শোভা পাচ্ছে কিন্তু কার্যে কিছুই লাভ হয় না।

রাস্তা ঘাটের উন্নতি, রীজ, ওভার রীজ তৈরী, সরকারী ও বেসরকারী বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি, ট্রাম ও ট্রেনবাহিনী কোন কোন স্থানে এক্সপ্রেস বাস সার্ভিস (ডালহোসী ও এস্‌লান্ডে অবধি) অকেজো স্টেট বাসগুলিকে মেরামত করে কাজে লাগবার চেষ্টা করা। গঙ্গার ফেরী সার্ভিস প্রবর্তন ইত্যাদি ব্যবস্থা করলে কিছু পরিমাণে এই পরিবহন সমস্যা উন্নতি হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় এবং সাথে সাথে প্রতি অফিসে তার কর্মচারীদের জন্য পয়সার বিনিময়ে পরিবহনের ব্যবস্থা করা এবং যেখানে সম্ভব নয় সে স্থলে হাজিরার কিছু শিথিলতা দেওয়া বিশেষ কর্তব্য বলে মনে হয়। এই পরিবহন সমস্যার সমাধা-

নের জন্য প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ছাত্র সংগঠন এবং পরিবহন কর্মচারীদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হবে এবং প্রতি এলাকার যাত্রীদের স্বার্থে যাত্রী সংগঠন গড়ে তুলে পরিবহন সমস্যা সমাধানের দাবীতে এককম আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে।

অরণ্য দত্ত

সম্পাদক নর্থ সুদারবন
প্যাসেঞ্জার্স এসোসিয়েশন

চরম অরাজকতা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাদবপরে এলাকার দেখলাম ইতিমধ্যেই কয়েকটি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একজন দোকানদারকে প্রশ্ন করলাম, “এত তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করলেন কেন?” উত্তরে দোকানদার জানালেন, বেশিক্ষণ থাকতে ভয় হয়। পাছে দোকান লুট হয়।

বেসরকারী এক খবরে জানা গেছে, সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই রকম প্রায় পঁচিশটি ছোটকড় দোকান লুট হয়েছে। বারা লুট করতে আসে তারা চলে যাবার সময় বলে : “বন্দেমাতরম জিহ্মাবাদ।”

কথাটা শুনে /আশ্চর্য লাগল। থানার গেলাম দ চারজন অফিসারকে আমার পরিচয় দিতে তাঁরা আমাকে জনৈক অফিসারের কাছে পাঠালেন। পদলিগের কাছ থেকে জনতে পারা যায়—যে পূর্বেও যেমন বর্তমানেও ঠিক একই উপায়ে পদলিগের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। আজ পর্যন্ত যতগুলি ছেলে বা লোককে অপহরণ করা হয়েছে তাদের পদলিগ উদ্ধার করেছে। তবে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যে বেশ কিছু বেড়ে গেছে তা তিনি স্বীকার করেন।

তিনি আরো জানালেন, “আমাদের কাছে প্রতিদিনই অপকৃষ্ট অতিবোধ আসছে। আমরা যতদূর সম্ভব তার তদন্ত করবার চেষ্টা করছি।”

প্রতিরোধ কমিটি প্রসঙ্গ

“প্রতিরোধ কমিটি প্রসঙ্গ” নামক লেখার যে সমালোচনা “নকশাল রাজনীতির ব্যর্থতা” এই নামে বারই নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে, মূল প্রবন্ধের লেখক হিসাবে ঐ সমালোচনার যথার্থ উত্তর দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি। অরণ্য রায় বিশ্বাস মহাশয়কে ধন্যবাদ যে তিনি লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। তাঁর লেখাটিও আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়লাম; তিনি অনেক সত্যকথা এবং নোতুন কথা বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষয়, তাঁর নোতুন কথাগুলো সত্য নয় এবং সত্য কথাগুলো নোতুন নয়।

অরণ্যবাবুর নোতুন কথাগুলো হল—

১. নকশালপন্থীদের আন্দোলনের কোনো মার্কসবাদী ব্যাখ্যা হয়নি; নিজের দলের কর্মীর শ্রেণীচরিত্র নির্ণয় ঠিক না হলে, অন্ততান দলের শ্রেণী চরিত্র নির্ণয়ের কোনো অধিকারই ঐ দলের থাকে না; পদলিগের লোক দেওয়ালে নকশালী লেখা লিখেছিল; বারা এখন নব কংগ্রেসে ফিরে এসেছে তারা ঝাঁকির কই নয়, কারণ নকশালরা সবাই সবসময়েই কংগ্রেসের লোক ছিল এবং সবশেষে “আপনাদের চার মজদদার” বলে আমাকে চারবাবরে চেলা বানিয়ে দেওয়াফটো নিঃসন্দেহে এ সবই নোতুন কথা এবং যেকোন মার্কসবাদী নৈতিক নিমেয়েই বলতে পারবেন যে এগুলি ভাববাদী লোকের প্রান্তিকবুদ্ধিস ছাড়া কিছু নয়।

সদতরাং এসবের বিস্তৃত আলোচনা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

এট সমালোচনার সত্য কথা—গুনে এই রকম : কৃষ্ণনগরে পাইপ-গুন দেখিয়ে চাঁদা আদায় করা; নকশালপন্থীদের (সবার ?) পেছনে “বিপ্লব, বিশাল, নরখাদকদের” প্রভাব; এই আন্দোলনকে লোক-সঠনের কারবারের থেকে লাভের কারবারে নিয়ে যাবার জন্যে বড় লোকদের উদ্যম। বলাবাহুল্য এগুলো সত্য কথা কিন্তু বহুপরিচিত কথা।

অরণ্যবাবু যদি সত্যিই মার্কসবাদী হন তাহলে তাঁর জানা উচিত যে, কোন একজন রাজনৈতিক নেতাকে কোনরকম বিশ্লেষণ না করেই “ক্যাপ্টার” ইত্যাদি সম্ভাষণ করা মার্কসীয় সৌজন্যের আওতার পড়ে না। তাছাড়া, অসংগতি এই সমালোচনার ভূষণ, কেননা এই সমালোচনা থেকেই জানা গেল যে পদলিগের লোকই নকশাল এবং তাঁরাই দেওয়ালে লেখে, আবান সেই নকশাল বালকই পদলিগকে ধরে দিতে গিয়ে অরণ্যবাবুর কাছে কেঁদে বুক ফাটায়। সর্বোপরি, যে প্রতিরোধ কমিটির উদ্দেশ্য এবং উপায়ের গোঁজামিল মূল প্রবন্ধের বিষয় ছিল, যে প্রসঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করেই অরণ্যবাবু প্রবন্ধটিকে যে ভাবে “অবাস্তব-বিকৃত বিশ্লেষণ” ইত্যাদি রায় দিয়েছেন তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না।

বিমল পাল

জেলে নকশালদের হত্যার ষড়যন্ত্র

(বিশেষ প্রতিনিধি)

গত ছবিবিশেষে নভেম্বর আলিপদ্র সেন্দ্রাল জেলের নর নং ওয়ার্ডের বিচারার্থী বন্দীদের উপর (নকশালপন্থী অভিহিত সেলে) ওয়ার্ডারদের কর্তৃত্বাধীন নৃশংস লাঠি-চালনার ফলে সরকারী হিসেবে ঘটনাম্বলে ছয় ও পরে হাসপাতালে দুই জন মোট আট জন বন্দী প্রাণ হারিয়েছেন। আহতের সংখ্যা দুই থেকে তিন শোর মধ্যে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। আহতদের ছয় জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। বাকীদের কোন চিকিৎসা করা হয় নি। এদের অনেকেরই আত্মীয় কাউন্সিল, হাত বা পা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঔষধপত্রের নোটিশ দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ বাড়ীর লোকদের সঙ্গে এদের দেখা করা বন্ধ করে দিয়েছেন।

কিগত ডিসেম্বর মাস থেকে এই বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলে মোট পঞ্চাশ জন বিচারার্থী তরুণ স্ববন্ধকে

পিটিয়ে বা গুলি করে খুন করা হয়েছে। জেলে তথাকথিত নকশালপন্থীদের হত্যার ষড়যন্ত্রের পেছনে কি ইতিহাস তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে, সরকারের নকশাল নিখন অভিযানকে চরিতার্থ করার জন্যই এই পথের সৃষ্টি; এর পথ প্রদর্শক হল মেদিনীপুর জেল। বিভিন্ন জেলে খুনের সংখ্যা এইরকম :—

ডিসেম্বর সন্তর সালে মেদিনী-পদ্র আটজন, ফেরয়ারী একাত্তর সন্তর বহরমপুর নর জন, মে একাত্তর সালে দমদম সেন্দ্রাল জেল গনোরো জন, জেলাই একাত্তর সালে আলিপদ্র স্পেশাল জেল ছয় জন, আগস্ট একাত্তর সাল আসানসোল জেল নর জন, নভেম্বর একাত্তর সাল, আলিপদ্র সেন্দ্রাল জেল আট জন।

এই হিসেব থেকেই দেখা যায় বিচারার্থী মোট বন্দীর সংখ্যা পঞ্চাশ জনে দাঁড়িয়েছে। এই ঘট-

নাগুলি ঘটলে পরেই দেশের বিভিন্ন বামপন্থী দল এমন কি শাসক কংগ্রেসের একাংশ পর্যন্ত এই ঘটনা-গুলির তীব্র নিন্দা করে এবং তদন্তের দাবি জানায়। আগের ঘটনা-গুলির তদন্তের ব্যাপার সম্পর্কে জনসাধারণের জানার সৌভাগ্য ঘটে নি। শেষের অর্ধাং গত ছবিবিশেষে নভেম্বরের ঘটনার ব্যাপারে রাজ্য সরকার প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীবি সি মিথকে তদন্তের ভার দিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন, আদৌ তদন্তের রিপোর্ট বের হবে কি? হলে কতদিনে হবে? হয়তো ততদিনে রাজ্যের আরও দু একটা জেলে অনুরূপ ঘটনা ঘটে যাবে।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে বাম-পন্থী দলগুলির ভূমিকা দেখে। এতগুলি তরুণ ছেলেকে গত এক বছরে হত্যা করা হল, অথচ এর বিরুদ্ধে লোক দেখানো মত খোলা অথবা মাসা কাসা ছাড়া কিছুই বাম-পন্থী দলগুলো করলো না। এর

বিরুদ্ধে বাংলা দেশে কোন জনমত সৃষ্টি করা হলো না। ঐ জহাদ ওয়ার্ডারগুলিকে শাস্তি দেওয়া হয় নি। তাই দেখা গেল পরের পর কয়েকটি জেলে হত্যা হয়ে গেল। এ-ছাড়াও এ রাজ্যের প্রেসিডেন্সী, আলিপদ্র ও হাওড়া জেলে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তরুণ ছেলেদের পদ্রিশ নকশাল সন্দেহে ধরে এনে পাঁচ-ছয় মাস ধরে জেল হাজত থানা হাজতে পরে রাখে। তারপর আগে ছিল পি ভি এ, এখন চলছে "মিসা" (Maintenance of Internal Security Act)। এবার এল ভারত রক্ষা আইন। জেলে এদের অবস্থা আরও শোচনীয়, জেলগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে যেখানে হয়ত পঞ্চাশ জন বন্দী থাকতে পারে সেখানে প্রায় দেড় শতাধিক ব্যক্তিকে রাখা হয়। খাদ্যদ্রব্যের বা পানীয় জলের কোন সচ্ছন্দ ব্যবস্থা নেই। সরকারী বরাদ্দের অধিকাংশই অলঙ্কার গোপন পথে চলে যায়। বন্দীদের বাড়ী থেকে এদের জন্য

যে সব জামা কাপড় দেওয়া হয় তাও তারা পায় না। অসুস্থ করলে চিকিৎসা হয় না।

এর উপর আছে অত্যাচার। খালসপ্রাপ্ত স্ববন্ধদের কাছ থেকে শোনা যায় যে, দৈহিক পীড়ন ছাড়া ও জেলে বন্দীদের পেটে ব্যাটারী চার্জ করতেও তাদের আটকান না। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ব্যাটারী চার্জ করার কিছুদিন পর পেট থেকে রক্ত বরতে শুরু করে। যা তার জীবিত অবস্থায় আর বন্ধ হয় না। প্রহারের চোটে হাত পায়ে অঙ্গ বিকল করেও দেওয়া হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে "ব্রিটিশ রাজত্ব" দেশদ্রোহীদের যে সব পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া হত আজ তার বিলম্বমাত্র পরিবর্তন হয় নি, বরং আরও জঘন্য উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। বন্দীদের সঙ্গে বাড়ীর লোকের দেখা করার বিষয়েও অত্যন্ত কড়াকড়ি। সপ্তাহে একদিন দেখা হতে পারে যদি জেলের কর্তৃপক্ষ মনে করে দেখা হওয়া উচিত এবং তবেই "ইন্টার ভিউ" হয় আর তা না হলে সম্ভব নয়।

ডায়ালিস সঙ্কে অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের আলোচনা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

রাজ্যের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের কতকগুলি ল্যাব দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। যন্ত্রস্ত সন-কারের আমল থেকে শরুর করে এ পর্যন্ত কোনদিনই তাঁদের পূর্ণাঙ্গ-ভাবে দাবিগুলির মীমাংসা হয় নি। সম্প্রতি গত দোসরা ডিসেম্বর রাজ্যপাল শ্রীএ এল ডায়ালিস সঙ্কে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের দাবিগুলির বিষয়ে আলোচনা হল। কিন্তু অবস্থা সেই পূর্বের মতই রয়ে গেল। চারটি দাবির বিষয়ে আলোচনা হলো, বাকীগুলি পর-বর্তী কালের জন্য শিক্কে তুলে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কারণ অধ্যাপক সমিতি এবং শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের মধ্যে আলোচনা হওয়ার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাতে সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের যদি শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত কোন জ্ঞান বা শিক্ষার উন্নতির দিকে প্রচেষ্টা না থাকে তা হলে আর যাই হোক শিক্ষা ব্যবস্থা ছেঁচেমেয়ে-দের কল্যাণসাধন করবে কি করে?

রাজ্যপালের সঙ্গে অধ্যাপকদের নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা হল :

(এক) মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বিভিন্ন-ধাতে সরকারী প্রাপ্ত বারো মাসের টাকা দেওয়া হচ্ছে অনিয়মিতভাবে বাইশটি কিস্তিতে। শুনলেই মনে হবে যে হাজার পার্সেন্টের কোন ক্ষাপার কিনা। তাঁদের প্রমুখে রাজ্য সরকার হামার প্যাসেই-রপ্তি-

এই ব্যাপারে রাজ্য পালের সঙ্গে আলোচনার অধ্যাপকদের সমিতি এককালীন নিয়মিতভাবে টাকা দেওয়ার দাবি জানান। শ্রীডায়ালিস এ ব্যাপারটি সম্পর্কে ভেবে দেখার আশ্বাস দেন।

(দুই) স্পনসর্ড কলেজে অধ্যাপকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্বে নিয়ম ছিল যে কেন্দ্রীয় সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। মাঝে কছর চারক ঐ কমিটি ঘনিষ্ঠে ছিল। সেই সময় বিভিন্ন কলেজে প্রায় একশো জনের মত অধ্যাপক

অধ্যাপিকা নিয়োগ করা হয় এবং তাঁরা সন্তোষজনক ভাবেই কাজ করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঐ কমিটি দীর্ঘদিন পরে নড়েচড়ে উঠে তাঁদের ইন্টারভিউ নিয়ে অধিকাংশকেই নাকচ করে সরকারীভাবে ছাটাইয়ের নোটিশ দিয়েছে। ঐ আদেশ প্রত্যা-হারের দাবি সমিতি কর্তৃক উত্থাপিত হলে রাজ্যপাল সাহেব ব্যস্ত-গত ভাবে খোঁজ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ছাটাইয়ের আদেশ সংক্রান্ত নথিপত্র তার কাছে প্রেরণের জন্যও রাজ্যের শিক্ষা সচিবকে

তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

(তিন) উনিশশ ছিষটি সালে রাজ্যের অধ্যাপকদের বেতনের ক্ষেত্রে সংশোধিত হার এবং উনসত্তর সালে সংহত বেতনক্রম চালু হয়। ঐ সময় চাকুরীকালীন প্রায় এক হাজার অধ্যাপকের নতুন বেতনক্রমে বেতন নির্ধারিত হয় নি। সমিতি অবিলম্বে এই ব্যাপারে মীমাংসার দাবি জানালে রাজ্যপাল বিষয়টিকে দ্রুত সমাধানের জন্য শিক্ষা সচিব ও ডি পি আইকে নির্দেশ দিয়েছেন।

(চার) পয়লা এপ্রিল ছিষটি

থেকে উনসত্তর সালের পয়লা এপ্রিলের মধ্যে সৃষ্ট পদে কর্মরত নবাগত অধ্যাপক এবং যার্ট-পল্লবটি বয়সসীমার অধ্যাপকদের বকেয়া বেতন দানের দাবি করতে গিয়ে অধ্যাপক সমিতি রাজ্যপালকে জানান যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য শিক্ষাখাতে এ্যাড হক পনেরো কোটি টাকা দেওয়া সঙ্কে শিক্ষা দপ্তর টাকার কোন বন্টন করেন নি। অত-এব অবিলম্বে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা জন্য সমিতি দাবি জানান। রাজ্যপাল বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দিলেন।

কয়েকটি থানা ও বিভিন্ন সি আর পি কোয়ার্টারে অভিনব উৎসব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি কলকাতা শহরতলী ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি থানা এবং বিভিন্ন সি আর পি কোয়ার্টারের উদ্যোগে এক অভিনব উৎসব পালিত হচ্ছে। প্রত্যেক জায়গাতেই এই উৎসব চলছে তিন চারদিন ধরে। যাত্রা, আধুনিক গানের আসর কাওয়ালী এ সবই এই অনন্যরনের অন্তর্ভুক্ত থাকছে।

ঘটনাটি আকস্মিক সন্দেহ নেই। এর আগে পদ্রিশ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এ রকম কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি, যতদূর জানা গেছে, রাজ্যহাট থানার অন্তর্গত বাগদাই-আট্টা-সি আর পি কোয়ার্টারের (ডি, আট, পি রোডের ধরে) পক্ষ থেকে চারদিন ব্যাপী যাত্রা ও কীর্তন গানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল গত সপ্তাহের আগের

সপ্তাহে। অভিনীত যাত্রাগুলির মধ্যে একটি যাত্রা মণ্ডস্থ হয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং কয়েকজন বাঙালী পদ্রিশের সম্মিলিত অভিনয়ে। স্থানীয় কয়েকজন দোকান-দারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে যে, উক্ত অভিনেতা-ব্যবসায়ীদের লরীভর্তি চাল প্রায়শই উক্ত পদ্রিশের সহায়তায় গুদামজাত হচ্ছে।

লিঙ্গায়ী থানার পক্ষ থেকে চলতি সপ্তাহে এই ধরনের একটি তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। এখানে বিশিষ্ট যাত্রা, কাওয়ালী এবং বেতার শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল। আগামী সপ্তাহে অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বাগদাই থানায়। অনুষ্ঠানগুলিতে স্থানীয় জনসাধারণের অবাধ আমন্ত্রণ থাকে।

হঠাৎ এই ধরনের চমকপ্রদ

উদ্যোগের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের খোদ পদ্রিশ কমিশনারের পক্ষ থেকেই নাকি বিভিন্ন থানায় এই উৎসব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে রাজ্যে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ এবং দেশের আপৎকালীন জরুরী অবস্থার জন্য পদ্রিশ বাহিনীকে দিন-রাত কঠোর পরিপ্রম করতে হয় ও জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য সদা সতর্ক থাকতে হয়। সুতরাং তাদের চিন্তাবিনোদনের অবকাশ কোথায়? তাই এই বিশ্রামহীন কর্মঠ পদ্রিশ বাহিনীকে কর্তব্যরত অবস্থায় আনন্দ বিতরণের জন্য এই কবস্থা। অবশ্য কলকাতার অভ্যন্তরে এই

ধরনের অনুষ্ঠান করতে ওরা নাকি এখনো সাহস পাচ্ছেন না।

ঘটনাক্রমে লিঙ্গায়ী আধুনিক গানের জলসায় কৌতুহলবশত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। এক অজ্ঞাতভঙ্গলোকের একটি উক্তি আমার কানে ভেসে এল : "পশ্চিম বাংলার পদ্রিশ যে কি চাঁজ, বোঝার উপায় নেই। আজ দেখছি পদ্রিশ মতো অত্যাচারে, নৃশংস মা-বোনের চোখে অশ্রু বরছে, আবার এই দেখছি, লোককে বিনি-পয়সায় রেডিও, আর্টিষ্টের গান শুনিয়ে দিচ্ছে। এদের লীলা বোঝাই দায়।"

কথাটি কিন্তু শুধু মাত্র পারি-হাস নয়; অন্তরের জ্বালা।

জেরত দর্পণ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সারা ভারতে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সংগ্রামের প্রতি যে বিপুল ঐক্যবন্ধ সমর্থন, তার প্রতি-ক্রিয়া হিসাবে পাকিস্তানের সাম-রিক শাসকগোষ্ঠী ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের মধ্যে বেপরোয়া হয়ে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে বাংলাদেশ বনাম পশ্চিম পাকিস্তানী লরটেরা গোষ্ঠীর সংঘাতকে ভারতে বনাম পাকিস্তান সংঘর্ষে পরিণত করে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ আহ্বান করতে চাইছে।

ইতিপূর্বে, পাকিস্তানের সাম-রিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পশ্চিমী মরুদ্বীপীরা বাংলাদেশের নিষ্প্রাণিত মানবের মুক্তি সংগ্রামকে ভারত-পাক সমস্যা হিসাবে উপ-স্থাপিত করার অপচেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল পাকিস্তানের পশ্চিমী মরুদ্বীপীদের ইংগিতে ভারত-পাক সীমান্তের উভয় দিকে একশ পঞ্চাশ জন রাষ্ট্র-সংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করেছিলেন। বলা বহুলা, ভারত রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের এই কটু প্রস্তাবটিকে আমলা না দিয়ে সংগত কাজই করেছে।

কাশ্মীরে ভারতভূমির উপর পাক আক্রমণকে অছিলা করে ভার-তের সদভিপ্রায়ে সুযোগ নিয়ে কি ভাবে বছরের পর বছর রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষকদের বেনামে কাশ্মীরে ইংগ-মার্কিন প্ররোচনা অব্যাহত চলেছে তা ভারতের জনসাধারণের মনে তিস্ত অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে।

সম্প্রতিকালেও ইন্দোচীনের লাওস, কাম্বোডিয়া এবং ভিয়েত-নামে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে এবং জেনেভা চুক্তির মাধ্যমে গঠিত কমিশনগুলি কি ভাবে ঐ সব দেশে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে আড়ল করে চলছিল, তা আজ আর বিশ্বের জনসাধারণের কাছে গোপন নেই।

আরব-ইজরাইলের সংঘর্ষেও রাষ্ট্রসংঘের জারিং মিশন এবং অন্যান্য তদারকী সংস্থা সংঘর্ষ বন্ধ তো করেইনি বরং রাষ্ট্রসংঘের পতাকার আড়লে আক্রমণকারী ইজরাইল রাষ্ট্রকে বিশাল আরব ভূখণ্ড দখল করতে পরোক্ষে সুযোগ এবং উৎসাহ জর্গিয়েছে।

সুতরাং অতীত অভিজ্ঞতার কলিষ্ঠপাথরে যাচাই করলো দেখা যাবে যে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে পাক-ভারত সমস্যা হিসাবে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করার কটকোশল অবলম্বন করেই পাকিস্তানের পশ্চিমী মরুদ্বীপীরা বাংলাদেশের গণমুক্তির সংগ্রামকে গলা টিপে মারতে চেয়েছিল।

পশ্চিমী মরুদ্বীপীদের কটু-কোশলে এবং ভারতের দৃঢ়তার জন্যে যখন পাকিস্তানের রাজনৈ-তিক অভিসন্ধি কার্য্য হল, তখন

পাকিস্তান ভারত সীমান্তে আক্রমণ চালিয়ে নবরূপে বাংলাদেশ সম-স্যাকে পাক-ভারত সমস্যা হিসাবে আন্তর্জাতিক দরবারে উপস্থাপিত করবার অপচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

পাকিস্তানের হিসাবে যে গলদ রয়ে গেছে তা ধরা পড়তে দেবী হবে না। ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সরকার ও সরকার বিরোধী অভিমতের সংঘাত যত তীব্রই হউক না কেন, ভারতের জন-সাধারণ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রা-মের প্রতি এই অভূতপূর্ব ঐক্য-বন্ধ মনেভাব নিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছেন। বাংলাদেশের বীর মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি সমর্থনে ভারতের দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি মানব ঐক্যবন্ধ।

এই ঐক্যবন্ধ ভারতের উপর হামলা চালিয়ে পাকিস্তান যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইছে অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের বেনামীতে তার পশ্চিমী মরুদ্বীপীদের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভারত-পাক সমস্যা আলো-চনার সুত্রপাত করে মুক্তি বাহিনীর প্রতি ভারতের সমর্থনকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা—সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না।

বাংলাদেশের বীর জনগণ যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তার প্রতি সমর্থনে ভারতের জনগণ অটল থাকবেন এবং পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনসাধারণের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে, এই কথা সুর্ষো-দয়ের মতই অবশ্যম্ভাবী।

পাকিস্তান ইতিমধ্যেই ভারতকে একটা আক্রমণাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলবার চক্রান্ত হিসাবে, ভারত-ভূমির উপর আক্রমণ চালিয়েছে।

এই আক্রমণ সম্পূর্ণ নতুন ধরণে শুরুর হয়েছিল পঁচিশে মার্চ। কোন দেশের অভ্যন্তরে নিরস্ত্র জন-গণের উপর পুন্ডলিশ মিলিটারী লেলিয়ে দিয়ে তাদের ঘরছাড়া করে পাঠিয়ে যেতে বাধ্য করা নয়। ফ্যাসিস্টদের নতুন কৌশল। ইয়া-হিয়া খান ব্যাপকভাবে পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) এই গণতন্ত্র-কামী জনগণের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের দেশছাড়া করে কোটি কোটি মানবকে ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে।

ভারতের উপর শরণার্থীর বোঝা চাপিয়ে তার আর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করে এবং ভারতীয় জনগণ ও শরণার্থীদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান ভারতের উপর এক নতুন ধরণের আক্রমণ শুরুর করে-ছিল।

সেই আক্রমণ শুরুর হওয়ার সাড়ে আট মাসের মধ্যে পাকিস্তান

ভারতের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে প্ৰতিবাদ করে নি।

আজ এই রণকোলাহলের মধ্যে মূল সমস্যা যে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সমস্যা একথা আমরা যেন ভুলে না যাই।

‘স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলা দেশ’—নিপীড়িত বাঙালী জাতি-সত্তার আকংখার চরম অভিব্যক্তি। পাকিস্তানী অগণতান্ত্রিক, জলদুম-শাহী সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের জনগণ যে মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন, ভারতের জন-গণ তার প্রতি উদাসীন না থেকে তাকে সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আজ ভারতের জনসাধারণের উপর পাকিস্তানী হাওয়াই জাহাজ আর কামানের অগ্নিবর্ষী আক্রমণ চলেছে।

কিন্তু এ আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানী শাসকচক্র নিজেদের কবর নিজেই খুঁড়ছে। একদিকে বাংলাদেশের বীর জনগণের মুক্তি ফৌজ অপরিদ্রাক্ষে ভারতীয় জন-গণের প্রচণ্ড চাপের তলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে তাদের দেবী হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভ্যন্ত-রীণ অবস্থার দিকেও আমাদের তীক্ষ্ণ, সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে।

‘শান্তির’ মত ‘স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র’ও অবিভাজ্য। ভারত গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে বলেই পাকিস্তানের জনগণ অবধ সাধারণ নির্বাচনে যে অভিমত দিয়েছিলেন তাকে অমান্য করার যে স্পর্দ্ধা ইয়াহিয়া খান দেখিয়েছিল তার বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ দণ্ডায়মান হয়েছেন।

জনগণের প্রসারিত গণতান্ত্রিক স্বাধিকারের দাবী এখানে সমর্থন করে অন্যদেশে বিরোধিতা করা যায় না। একদেশে অত্যাচার নিপীড়-নকে বাধা দিয়ে অন্য দেশে জনগণের উপর আক্রমণকে সমর্থন করা যায় না।

সমাজতন্ত্র প্রসারিত গণতান্ত্রিক অধিকারেরই ঘনীভূত রূপ আধু-নিক যুগে সমাজতন্ত্র না হলে পূর্ণ গণতন্ত্র হয় না। সমাজতন্ত্রী দেশ হিসেবে চীন বাংলাদেশের মানব-যের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বিরোধিতা করছে, একথা সত্যিই বেদনাদায়ক।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্র একই ধারায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পুষ্ট করুক, প্রতিটি ভারতবাসী এই বিশ্বাসে আত্মবিশ্বাসী।



নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে !

মাহুষের নিয়তির কথা কে বলতে পারে! যে বাবার সে চলে যায়—রেখে যায় অসহায় বিধবা স্ত্রী, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে...
এরকম অভিশাপ কার জীবনে কখন যে আসে, কে বলতে পারে? এর থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র জীবন বীমা। সময় থাকতে জীবন বীমা করলে আর ভাবনা থাকে না। আপনার জীবদ্দশায় জীবন বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে—পুরো টাকা আপনার হাতে আসবে। আর, যদি আপনার কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা আপনার পরিবার পাবে। ফলে, আপনার অবর্তমানে, আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের আর্থিক চিন্তা থেকে মুক্ত হবেন।
বিস্তারিত বিবরণের জন্যে নিকটতম বীমা এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জীবন বীমা করান
জীবন সুখী করুন।



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

দুর্গাপুরে এ সি সি ভাইকার্স ব্যাবকক কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দুর্নীতি

সবের ছেলে কাজ পান না

কেবল কেবল থেকে লোক আসছে

(দর্পণের প্রতিনিধি)

ইঙ্গ-ভারত উদ্যোগে স্থাপিত দুর্গাপুরের এ সি সি ভাইকার্স-ব্যাবকক কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীকে এম জর্জের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে সম্প্রতি রাজ্যপাল্লের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

প্রায় তিন হাজার কুশলী শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটিকে একটি পাবলিক ইউটিলিটি কনসার্নরূপ ঘোষণা করেছেন, কারণ এই রাজ্যের শিল্প জগতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

রাজ্যপাল শ্রীডাসের কাছে স্থানীয় অধিবাসীদের একটি প্রতিবেদনে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে যদি মিঃ জর্জের বর্তমান কর্মপদ্ধতি অগোণে পরিবর্তন করাতে বাধ্য না করা যায়

তাহলে স্থানীয় লোকদের পঞ্জীভূত বিক্ষোভ একদিন ইঠাৎ অনর্থ সৃষ্টি করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে যখন শিক্ষিত যুবক ও কুশলী শ্রমিকরা কর্মের অভাবে বেকার জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন তখন মিঃ জর্জ সমস্ত প্রচলিত নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে নিজের পরিচিত লোকজনকে চাকরী দিয়ে চলেছেন।

মিঃ জর্জের স্বজনপ্রীতির নমুনা হিসাবে অনেকগুলি তথ্য এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিঃ জর্জের কাছে কোন পদের জন্য কোন প্রার্থীর যোগ্য বিবেচিত হওয়ার একমাত্র গুণ তাঁকে দক্ষিণ ভারতীয় হতে হবে। কোরোলাবাসী সর্বচাইতে বেশী যোগ্য বিবেচিত হবেন। কারণ মিঃ জর্জ এই রাজ্যেরই অধিবাসী।

প্রতি বছর এই কারখানার ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমাধারীদের শিক্ষার্থীরূপে ভর্তি করা হয়। গত বছর মিঃ জর্জের যোগদানের পর থেকে কুড়ি জন প্রার্থীর মধ্যে সত্তেরো জনই অবাংলালী। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য এই প্রার্থীদের কাজে যোগদান সম্পর্কে প্রচলিত নিয়ম মানা হয়নি। যে কেউ যে কোনদিন কাজে যোগ দিতে পারেন।

এ বছরও এই সব শিক্ষার্থী ভর্তি করার জন্য যথারীতি পরীক্ষা ও মোলাকাতের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যে চারটিরাই জন গ্রাজুয়েট প্রার্থীকে ডাকা হয় তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র চার জন ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে আবার কোরোলাবাসীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে তেইশ জনকে মোলাকাতের জন্য

ডাকা হয়। এদের মধ্যে তিনজন পশ্চিমবঙ্গবাসী।

মিঃ জর্জের স্বজন বাৎসল্যের প্রমাণ হিসাবে আর একটি তথ্য দেওয়া হয়েছে। এক বাঙালী ভদ্রলোক বহুদিন ধরে একাধিক ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পি-এর কাজ করে আসছেন। ইংরাজ আমলেও তাঁর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার রেকর্ড আছে।

কিন্তু মিঃ জর্জের কাছে ইনি অযোগ্য। কোনরকমে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা জনৈক দক্ষিণ ভারতীয়কে ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি এ নিযুক্ত করেছেন। ইনি মাসিক বেতন পান দেড় হাজার টাকা।

দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদ—পার্সো-ন্যাল ম্যানেজার ও এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার শীঘ্রই পূর্ণ করা হবে। দুজন দক্ষিণ ভারতীয়কে এই পদে নিয়োগ করা ইতিপূর্বে স্থির হয়ে গেছে। যদিও লোক দেখানর জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

মিঃ ভেনকটেশ নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার বয়লার ডিভিসনে ছিলেন। তাঁর অযোগ্যতার জন্য চাকরী বাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মিঃ জর্জের কল্যাণে একে তামিল-নাড়ুর প্রতিনিধি করে মাদ্রাজে বদলি করা হয়েছে। বিশেষ কোন কাজ নেই, অথচ তাঁর মাসিক বেতন আড়াই হাজার টাকা।

এখানে সরকারী মহলে একটা কথা সকলেরই জানা। কোথাও কোন পদ খালি হলে সঙ্গে সঙ্গে কোরোলায় সংবাদ চলে যায়। যতদিন “মনের মতন” প্রার্থী না পাওয়া যায় ততদিন পদটি খালি থাকে।

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সৃষ্টি হয় কিছুদিন আগে কোম্পানীর উদ্যোগে স্থানীয় বেকারদের সাহায্য করার জন্য। এটিও এখন মিঃ জর্জের কৃষ্ণগত। এর সুযোগ কোরোলায় ব্যবহৃত পাচ্ছেন।

মিঃ জর্জ অনেক ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে সিনিয়র অফিসারদের বলে দেন যে কোন প্রার্থীকে ভর্তি করতে হবে। তা নাহলে তাঁর বিশ্বস্ত পি এ মিঃ চেরিয়ান জানিয়ে দেন যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কাকে ভর্তি করলে খসি হবেন।

মিঃ জর্জের এই সব কুকীর্তির একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন বর্তমান কন্ট্রোলার অফ ফিন্যান্স মিঃ গুপ্ত। কিভাবে একে এখান থেকে সরানো যায় তার ব্যবস্থা হচ্ছে। পারসোনাল ম্যানেজারকে নিয়োগের ব্যাপারে সর্বময় কর্তা করে মিঃ গুপ্তকে বেকারদায় ফেলার চেষ্টা চলছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিবৃতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রথম থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সঙ্গ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে আসছে। এমন কি এই সংগ্রামের সাহায্যের জন্যও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জমায়েত করার প্রচেষ্টা করেছে এবং অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য এই সমস্ত সংগ্রামীদের পৌঁছে দিয়েছে। আজ যখন ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তখনো রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে। ইতিমধ্যে বালুরঘাট ও অন্যান্য উপদ্রুত অঞ্চলে এরা অসামরিক প্রতিরক্ষার বিভিন্ন কাজে অগ্রসর হয়েছে।

এই কমিটি সম্প্রতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন : দেশের এই জরুরী অবস্থায় সাধারণ মানুষের সংহতি একান্ত প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে সরকার যদি বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে দমননীতি চালিয়ে যান, তাহলে কর্মচারীদের মনোবল ও সংহতি বিনষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

সুতরাং ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে কো-অর্ডিনেশন কমিটির আবেদন : অবিলম্বে তেরোজন কর্মীর উপর থেকে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে ইচ্ছামত গ্রেপ্তার, বদলী ও অন্যান্য দমননীতি বন্ধ করে দেশরক্ষার কাজে কর্মচারীদের উদ্যোগকে পরিপূর্ণরূপে নিয়োগ করতে সহায়তা করুন।

তিন জন কাউন্সিলারের দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা করপোরেশনের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশনের শরিকদের সুখী পরিবার ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

গত সমগ্র শরিকদের স্টিয়ারিং কমিটির এক বৈঠকে এত কাঁদা ছোঁড়া হয় যে জনৈক আদি কংগ্রেসের কাউন্সিলর উত্তেজনার অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং ডাক্তার ডেকে তাঁর পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হয়।

জনৈক প্রবীণ কাউন্সিলর এই সংবাদদাতাকে জানান যে তিনি টি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে বৈঠকের আলোচনার চরম তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

এর বক্তব্য অনুসারে নব কংগ্রেসের নেতা শ্রীশিবকুমার খান্না (ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান), শ্রীকলিমুদ্দীন সামস (ওয়ারটার ওয়ার্কস কমিটি) এবং শ্রীকুমার দত্তই (ট্যাক্স প্ল্যানিং) সকলের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন।

সকল রকম আইন কানুনকে উপেক্ষা করে নিজের দলের যুবক যুবতীকে চাকরী করে দেওয়ার জন্য শ্রীখান্না কোয়ালিশনের অন্যান্য দলের কাউন্সিলারদের বিরোধ ভাঙন হয়েছেন।

ইনি এত বেপরোয়া যে কোন কোন প্রবীণ কর্মচারী বেশ

ভয় পেয়ে গেছেন। যদি কোনদিন তদন্ত হয় তাহলে তাঁরাও রেহাই পাবেন না এই তাঁদের আশঙ্কা।

মিঃ কলিমুদ্দীন সামস ও শ্রীকুমার দত্তের বিরুদ্ধে এদের দলের সভারও অভিযোগ তুলেছেন। এঁরা কি করে ব্যক্তিগত সুযোগ সন্নিবিষ্ট করে নেওয়া যায় তারই জন্য নিজেদের পদের মর্যাদাকে কাজে লাগাচ্ছেন এমন অভিযোগ ঐ বৈঠকে ওঠে।

দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে ব্যক্তিগত কাজে এঁরা করপোরেশনের গাড়ী দিনে রাতে ব্যবহার করে থাকেন। আইনত এরা গাড়ী পেতে পারেন না—ব্যক্তিগত কাজে নিজেদের আস্থাভাজন ড্রাইভার ছাড়া আবার এঁরা চলে ন। গাড়ীর লগবুক পরীক্ষা করলে অনেক রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে—এমন অভিযোগও একাধিক সদস্য করেছেন।

হকারদের রাস্তায় ও পার্কে দোকান করতে দেওয়ার লাইসেন্স ইস্যু করা সম্পর্কে বহু অভিযোগ শ্রীদত্তের নামে আসে। ইনি কমিটির মিটিং সাধারণত এমন সময় ডাকেন যে সময় বেশীর ভাগ সদস্য উপস্থিত হতে পারেন না অথবা যারা উপস্থিত হন তাঁরা ঠেকে মদত দিয়ে উপকৃত হন।

সি এম ডি-এর ফান্ড থেকে টাকা ভেঙ্গে খরচ করার ব্যাপার, শ্রীডাস মোটেই ভাল চোখে দেখেননি। সেজন্য বেশ কিছুদিন থেকে করপোরেশনকে সরকারের হাতে তুলে নেওয়ার কথা হয়েছিল। এতে নব কংগ্রেসীদের সন্মান মোটেই বাড়ে নি। শ্রীখান্না ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান।

নিজেদের অযোগ্যতা গোপন করার জন্য কোন কোন বাজারী-পাটিকার মারফৎ এমন প্রচারও করা হয় যে সি এম ডি এর পরিকল্পনা অনুমোদন করতে রাজ্য সরকার অহেতুক দেবী করেছে। আসল গল্পটা যাতে নজর এড়িয়ে যায়।

একমাত্র সি পি আই এর সভারাই এই কোয়ালিশনকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বর্তমান মেয়রের তাঁর দল ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতি সেরকম নিষ্ঠা নেই। যদি ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সুযোগে পাওয়া যায় তাহলে উনি নব কংগ্রেসে যোগদানে কোন সন্দেহ করবেন না—একথা ঘনিষ্ঠ মহলে বলে চলেছে।

রাজ্যপাল্লের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়ে গেছে। কি ভাবে চললে শাসক গোষ্ঠীর সুবিধা হয়—সেটা স্থির করাই হবে তাঁর প্রথম কাজ।

অসীম রায়ের কবিতার বই

আমি হাঁটছি

১৯৫০ থেকে দীর্ঘ এক শ বছরের কবিতার উজ্জল ফসল। একই সঙ্গে এমন সমাজ ও আত্ম-জিজ্ঞাসার কবিতা বিরল।

একশো পৃষ্ঠা। সুদৃশ্য বঁধাই। দাম চার টাকা।

অম্বুনা

১৭/১-ডি, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলি-১২

দর্পন

১৪শ বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা ॥ শনিবার ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ॥ দাম ৩২ পয়সা

আনন্দবাজার গোষ্ঠীর, অত্যন্ত মালিকের ভারত-বিরোধী কাজ সন্দেহজনক সংবাদ সংস্থাকে খবর দিয়ে মার্কিনীদের ভোষণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ডের মালিক গোষ্ঠী বর্তমান যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদাদি অননুমোদিত পদ্ধতিতে একটি সন্দেহজনক সংবাদ সংস্থাকে সরবরাহ করছেন বলে দর্পণ বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছে। মালিকগোষ্ঠীর এই কার্যটি হচ্ছে, মালিকের বড় ছেলে অভীক সরকার। সন্দেহজনক সংবাদ সংস্থাটি হচ্ছে এশিয়ান নিউজ সার্ভিস নামে একটি ভূই-

ফোর্ড সংস্থা। এর হেড কোয়ার্টার হচ্ছে ম্যানিলা-হংকং। দুটিই কুখ্যাত সি আই এ এলাকা।

দর্পণ জানতে পেরেছে, বর্তমান যুদ্ধ সরু হবার পর এশিয়ান নিউজ সার্ভিসের কর্তা অমিতাভ চৌধুরী অকস্মাৎ অভীক সরকারকে এই নিউজ সার্ভিসের রিপোর্টাররূপে নিয়োগ করেন। মালিকপত্র অভীক সরকার রিপোর্টার সাব এডিটর নিয়োগ-বদলী করতেই অভ্যস্ত।



সাক্ষীর মস্তিষ্ক পর সেক্টর কম্যান্ডার এম এ জলিল (ডান দিকে) এবং কম্যান্ডার ফজলুল হক এম পি একে নতুন হেড কোয়ার্টারে দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু দেখা গেল অভীক সরকার এই রিপোর্টারের নিয়ে গপত্র গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পরিচয়পত্র (ক্রেডিটেশন কার্ড) চাইলেন। রাজ্য সরকারের প্রচার দপ্তর তো হতবাক। তারা ভেবে-ছিলেন, অভীক সরকারকে ইন্টার-ভুক্ত ডেকে পাঠালে আত্মসম্মানে বাঁধবে এবং সেজন্যে তিনি আসবেন না। কিন্তু অভীক সরকার ইন্টারভ্যুতে এলেন, পরিচয়পত্র নিলেন। কিন্তু খবর পাঠাবেন কি করে? ভারতীয় টেলিফোন টেলিগ্রাফের মারফৎ তো অননুমোদিত সংবাদ পাঠানো বিপজ্জনক। কিন্তু অভীক সরকার মালিকপত্র। তিনি ঠিক করলেন, আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ডের টেলি-প্রিন্টার মারফৎ ওদের দিল্লী অফিসে খবর পাঠানো হবে। সেখান (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়)

ইয়াহিয়া নজরবন্দী টিকা খাঁর নির্দেশে সব চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশ্বস্তসূত্রে থেকে জানতে পারা গেছে যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়া খাঁ এক প্রকার নজরবন্দী। শব্দে তাই নয়, তিনি তাঁর সামরিক অনুচর টিকা খাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ করতে পারছেন না বলে জানা গেছে।

ঢাকা থেকে আগত একজন ফরাসী কূটনীতিবিদ দমদম বিমান বন্দরে আমাকে এই খবর দিয়ে জানান যে পাক তিন সামরিক প্রধানের মধ্যে টিকা খাঁ ও পীরজাদা

এখন পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন হাতে নিয়েছেন। টিকা খাঁ সামরিক বাহিনীকে এখন সম্পূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন।

ফরাসী কূটনীতিবিদ আরো জানান কয়েকমাস আগে তিনি রাওয়ালপিণ্ডি, করাচী গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেছেন টিকা খাঁর নির্দেশ ছাড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ কোন বিদেশী কূটনীতিবিদ বা সংবাদিকের সঙ্গে দেখা করছেন না।

(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের একটি ধারাবিবরণী

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

বাংলা দেশে মুক্তি যুদ্ধের জয় ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর পরাক্রমের কাহিনী হিসাবে চিহ্নিত করা ভুল দৃষ্টিভঙ্গী। আধুনিক ইতিহাসে আর একবার প্রমাণিত হল যে, অস্ত্র-শস্ত্র বন্ধ জেতে না, একমাত্র জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণেই জয় দ্রুত ও সুনিশ্চিত করে।

পশ্চিম সীমান্তে যে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী প্রতি ইঞ্চির জন্য মৃত্যুপণ সংগ্রাম চালাচ্ছে, সেই একই বাহিনী পূর্ববঙ্গে সব কিছু শক্তি থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় অধিবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মাত্র কয়েকদিনে বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত আশি হাজার পাকিস্তানী সৈন্য পূর্ব-বঙ্গ প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত হয়েছিল।

এরা তথাকথিত দূর্বর্ষ সামরিক জাতি, যেমন পাঞ্জাবী, পাঠান, বালুচদের মধ্যে থেকে নেওয়া। দাম্ভিক ইয়াহিয়া খাঁ আর তার মিত্র শক্তি ভেবেছিল সামরিক শক্তি মানুষের সংগঠিত আকাশকে দমন করতে পারে। ভিয়েতনামে ও আরও অন্যান্য জায়গায় এ দম্ভ কাগুজে বাষ্পে পরিণত হয়েছে। পূর্ব বঙ্গের কাহিনী এই ইতিহাসেরই এক গৌরবময় পরিচ্ছেদ। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সশস্ত্র সাহায্য অবশ্যই পূর্ব বঙ্গের সংগঠিত আন্দোলনকে সহায়তা করেছে। কিন্তু মুক্তি বাহিনীর সাহায্য ছাড়া ভারতীয় সৈন্যের পূর্ব বঙ্গে এই দ্রুত অগ্রগতি এবং পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা ব্যাহ ভেদ এত সহজে সম্ভব হত না।

উনিশশো উনসত্তর সালের শুরুর দিকে বিশাল গণআন্দোলনের জোয়ারে আয়বহাীর পতনের পর ইয়াহিয়া খাঁ মিলিটারী শাসনের কর্তৃত্ব আসে অর পূর্ববঙ্গের মানুষকে শেখ মুজিবকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে শান্ত করার প্রয়াস পায়। শেখ মুজিবের মুক্তি গণআন্দোলনকে নতুন স্তরে উন্নীত করে, দাবী ওঠে নতুন সংবিধানের এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের। গ্রামে শহরে সমস্ত মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিশেহারা মিলিটারী শাসন পেছদ হটতে থাকে।

বিদেশী মতস্ববাজদের পরামর্শে নির্বাচন সংগঠিত করার পরিকল্পনা পাকা হয়। ওদের

ধারণা ছিল নানা দালাল রাজনৈতিক পার্টিসমূহ মানুষকে বিভ্রান্ত করবে আর শেষ পর্যন্ত কায়মী স্বার্থ নির্বাচনের পরেও নিজেদের শোষণ শাসন বজায় রাখবে।

উনিশশো সত্তর সালের সাতই ডিসেম্বর যে নির্বাচন সংগঠিত হল তা নির্বাচনী ইতিহাসে এক অভূত পূর্ব ঘটনা। আন্দোলনের পরোক্ষ ধায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের একমাত্র প্রতীক শেখ মুজিবের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ধনতান্ত্রিক সমাজ-কল্যাণ প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে একটিমাত্র পার্টির এই ধরনের সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা এর আগে কখনও দেখা যায়নি।

ইয়াহিয়ার মুখ্য পরামর্শদাতা মার্কিন নেতাদের উপদেশক্রমে শেষ পর্যন্ত গণআন্দোলনের ওপর সমগ্র মিলিটারী নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আধুনিক ইতিহাসে দ্রুত পরিচিতি মাচা যে কান্ড ঘটেছে তার কোন নজীর মেল না।

এর পরের ঘটনা—আজ আর গোপন করে লাভ নেই—সব কলকাতায় সংগঠিত হয়েছে। এটা কলকাতার গৌরব। সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে তাদের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী স্তরের পরিকল্পনা করেছেন আর তার কিছু কিছু রূপায়ণও এই শহরে হয়েছে। গত আঠারই এপ্রিল যে বাংলা দেশ প্রজাতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তার হেড (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)।

বঙ্গদর্শন

চলক্য সরকার

পশ্চিম পাকিস্তান স্বতন্ত্রবাদের দৃষ্টিতে, বাংলাদেশের পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আদ্য আর সর্বশেষ স্বপ্ন নয়। আগামী বছরের সূর্য থেকে এক নব স্বপ্নের সূচনা হতে চলেছে। এ ঘটনা এশিয়ার তথ্য সারা বিশ্বে রাজনীতি অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। বাংলাদেশ নেতাদের ঘোষণা অনুযায়ী এ রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজবাদী ও গণতান্ত্রিক।

পশ্চিম বাংলার বাংলাদেশের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি আর ওপারে সাড়ে সাড়ে কোটি। এ বাংলার বাংলাদেশের অন্ততঃ সিকিভাগ ও বাংলার লোক, তাঁদের সকলেরই স্মৃতিতে এখনও নিজের এলাকা, মহল্লা, রাস্তাঘাট, খালবিল সবই সজীব। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ পার্শ্ব বাংলার বাংলাদেশী ওপার বাংলার প্রতি এমন কোন আগ্রহ দেখতে রাজী নয় যাতে ওদের ক্ষতি হয়, অথবা ভুল। অস্বাভাবিক কোন সুযোগ দেখা দেয়। বরং পশ্চিম বাংলার সকলের

আগ্রহ কি করে এই নতুন রাষ্ট্র নিজের ঘোষিত পথে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে। স্বাভাবিকের সর্বাধিক, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি আরও বেশী পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এইটুকু হলেই যথেষ্ট।

নতুন দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং সারা পৃথিবীতে তা স্বীকৃতি পাবে, এ চিন্তায় দুই বাংলার বাংলাদেশী বিমোহিত। কম্পনাপ্রবণ অথবা কবসা বন্ধিতে অচল বাংলাদেশী এই বিমোহিত অবস্থা বেশীদিন চলতে থাকলে পরিণাম ভাঙ্গা হবে না, কারণ এ পার বাংলার ওপেতে কসে আছে হাঙ্গারের দল, ওই অবাংলায় ব্যবসায়ীরা যারা মাত্র শতাব্দেক বছর আগে থেকে কলকাতার আসতে সুরু করে আজ সব কিছু কল্যাণ করে নিয়েছে।

বাংলাদেশের নেতারা আর প্রায় এক কোটির মত সাধারণ মানুষ পশ্চিম বঙ্গের হালচালের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন গত নয় মাস ধরে। নানা ধরনের নেতাদের সঙ্গে কথা করে

আমার ধারণা হয়েছে যে, পশ্চিম-বঙ্গে থাকাকালীন একটা বিষয় ওদের কাছে পরিস্কার যে, এতদিন ধরে এপার বাংলার বাংলাদেশীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে প্রচার ওয়া শরনে আসছিল তা ভিত্তিহীন। এ বোধ ভবিষ্যতে বোঝাপড়ার সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। ওপার বাংলার হিন্দু অধিবাসী, যারা পশ্চিমবঙ্গে আগ্রহ নিয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান বৈষম্যমূলক অভ্যাসের ফলে তাঁরাও স্থানান্তরিত নিবাস ফেলেছেন বাড়ী ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনায়। অনেকের মনে হয়েছে এ বাংলার এমন কোন মত নেই যা মানবকে আকৃষ্ট করে। বরং ধর্মের ভিত্তিতে যে বৈষম্য গড়ে উঠেছিল তার অবসান হলেই ওপার বাংলার বাংলাদেশী ফিরে যাওয়ার কোন বাধা নেই। এবং ওদের ধারণা হয়েছে যে, আগে-কার সেই বৈষম্য হরত আর কারেম থাকবে না।

বাংলা দেশের নেতারা এখন থেকেই সজাগ কিভাবে গণতান্ত্রিক সংবিধানের ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্রের দ্রুত পত্তন করা যায়। এমন এক রাষ্ট্রগঠন ওদের লক্ষ্য যাতে আইনের শাসন প্রবর্তিত হয়, যে শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে বৈষম্যহীন শাসন প্রয়োগ বিধি চালু করা।

ওদের সর্বাধিক অনেক—কিছু বড় বড় জোতদার নেতৃত্বে থাকলেও

বড় বড় ব্যবসায়ীদের খুব একটা কারেমী স্বার্থ গড়ে ওঠে নি। যারা নেতৃত্বে আছেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে অনেকেই এখন বিভিন্ন অঞ্চলে নেতৃত্বের ভূমিকা চলে এসেছেন। মনে হয় এরা সকলে মিলে এমন কোন জিনিষ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবেন না যাতে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়।

খুব বড় বড় তাত্ত্বিক কথার ওদের প্রয়োজন নেই। দরকার কিভাবে উৎপাদন বাড়ান যায়। প্রধানতঃ কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওদের প্রয়োজন হবে কি করে মাঠের ফসল বাড়ান যায়। এ ফসল বাড়বে জমি বিলি ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করতে পারলে আর কৃষিতে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি চালু করতে পারলে। নেতৃত্বের কাঠামো এবং সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সজীব এবং সক্রিয় যোগাযোগের ওপর ভিত্তি নির্ভর করবে।

তবে ইতিমধ্যেই দেশী বিদেশী স্বতন্ত্রের জাল বিস্তারের নানা ইঙ্গিত দেখা দিতে সুরু করেছে। সম্প্রতি বাংলা দেশ সরকারের অনুরোধে ভারতীয় সরকার কিছু বাংলাদেশী অফিসার ধার দিয়েছেন যারা ওদের নানা প্রশাসনিক অসুবিধায় সাহায্য করতে পারেন উপদেষ্টা হিসাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার সুরু হয়েছে বিশেষ করে ওপার,

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে, হিন্দুরা উপনিবেশ গঠনে লেগে গেছে। সমস্ত অফিসার এখন ভারতবর্ষ থেকে আসবে, এমন কি থানার দারোগা পর্যন্ত। কোন সংবাদপত্রে বা রেডিও মারফত এ প্রচার হয় নি, এ প্রচার হয়েছে মুখে মুখে। এ সম্পর্কে বাংলা-দেশ নেতারা সজাগ। তারা এ প্রচারে কিছুটা বিচলিত এবং এখনই বন্ধেতে সুরু করেছেন যে, সূচনাতেই যখন এই বিকৃতি তাহলে ব্যাপার কতদূর গড়াতে পারে।

সেই “স্বাধীন সাহিত্য”—এর নামে মার্কিন দালালরা এখন একটা ছুপটি মেরে আছে। বিদেশী অর্থ ও দরদ্রি পুষ্ট এই দালালরা নানা চক্রান্ত ইতিমধ্যেই ভাজতে সুরু করেছে কি করে নতুন রাষ্ট্রের ওপর মার্কিন প্রভাব বাড়ান যায়।

মনে হয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ওপার বাংলার বাংলাদেশী ওদের দূরে রাখতে পারবে। এতদিন ত মার্কিনীরা নানা চক্রান্ত করে পশ্চিম পাকিস্তান শাসন শোষণ বজায় রেখেছিল। বাংলাদেশী হাতিয়ারের জোরে অবস্থা পরিবর্তন করেছে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে, জীবন ও সম্পত্তির। সবাই চেয়ে আছে কিভাবে নতুন বাংলাদেশীরাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গ ডেয়ারী ও পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে দুর্নীতি

(দুর্গতের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ ডেয়ারী ও পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের কতাব্যক্তির কৃপণ এক মক্কেল রাতারাতি তার ভাগ্য ফিরিয়েছেন। কর্মকর্তাদের মধ্যেই তিনি কর্মকর্তা লক্ষ টাকা পকেটস্থ করে ফেলেছেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পশু ও পক্ষী পালন দপ্তর হঠাৎ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গমের ভূমির বন্টন নিজেদের হাতে নিলেন। এই সময়ই দেখা গেল এক মক্কেল সবসময়েই পশ্চিমবঙ্গ ডেয়ারী, রাইটস বিল্ডিং ও পশু ও পক্ষী পালন দপ্তরের কর্মীদের ঘরে দিন-রাত গুলতানি করছেন। নাম শরণ রায়, (ওরফে বাদল রায়)।

কিছুদিন পরেই জানা গেল, ডেয়ারী ও পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বহুদিনের লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের দাবী অগ্রহণ করে নিজেদের খুসীমত ভীলার নিয়োগ করলেন। এই সময়ে ডেয়ারী ও পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন অর্থদপ্তরের প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী এস গোস্বামী। হঠাৎ দেখা গেল, সেই বিশিষ্ট কান্তি অর্থী শ্রীশরণ রায় ডেয়ারী ও পোলট্রির ডিলারশিপ পেয়ে গেলেন। সবচেয়ে বেশী পরিমাণ গমের ভূমির বন্টন সুরু হল শরণ-

রায়ের “রায় সনস সেলস কোম্পানী” নামে (দু হাজার বস্তা)। তাছাড়া এদেরই আরো একটি বোনামী ফর্ম “রায় ব্রাদার্স” এর নামে পাঁচশো কস্তা এবং সেই সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের পরিবহনের দায়িত্বও এদের হাতে দেওয়া হল। হিসেবে দেখা গেল শরণরায়ের একার জন্যই মাসিক আঠারো হাজার বস্তা অনুমোদিত। অর্থাৎ মাসে কমপক্ষে আঠারো হাজার টাকা আমদানীর পথ সন্ধান

হোল। একেবারে সৈন্য সোহাগা। যদিও কলো বাজারে এর জন্য লাভ ব্যাগ প্রতি পাঁচ টাকা।

আবার কিছুদিন পরেই ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন গুড়ো দুধ বিক্রির দায়িত্ব পেলেন। বলাই বাহুল্য, রায় সনস সেলস কোম্পানীকেও সমুদ্রে ছয় হাজার প্যাকেটের অনুমতি দেওয়া হল। কালো-বাজারে এই গুড়ো দুধ লাভ কিলোপ্রতি ছটাকা। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, এই সময় শরণ রায়

ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোস্বামীকে কোলকাতার বিভিন্ন হোটেলে একসঙ্গে দেখা যেত।

তারপর নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এজেন অর্থ ও শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন সেক্রেটারী এন এন আকরা-খার। সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা না থাকার জন্য তিনি গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য দেবদত্তাচার্যকে প্রায় সব দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে শরণরায়ের অবস্থা অপরিবর্তিতই রইল। তিনি যে

সিংহাসনে ছিলেন, সেখানেই বসে আছেন।

ডিলারশিপের টার্মস এ্যান্ড কন্ডিশনের সাত নম্বর ধারায় আছে : প্রত্যেক ডিলারকে তাদের অফিস কিংবা গদ্যামের সামনে “এখানে কন্ট্রোল রেটে ভূমি পাওয়া যায়”, এই কথাটি লিখতে হবে। কিন্তু রায় সনস সেলস কোম্পানী ওসব কিছুরই তোয়াক্কা করেনি এবং করছেও না।

বাংলা দেশ প্রণে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ

বাংলা দেশের প্রণে তথাকথিত গণতান্ত্রিক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য নীতির বিরুদ্ধে বামপন্থী দৃষ্টি ছাত্র সংগঠন ও একটি স্বতন্ত্র সংগঠন চলতি সপ্তাহে কলকাতার রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

গত আটই ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল করে এক নং কেশব সেন স্ট্রীটে অবস্থিত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টারের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ জানায়। সেন্টারের মধ্য থেকে প্রচার পদস্তিকা কাগজ পত্র বাইরে নিয়ে জড় করে আগুন ধরিয়ে ভস্মীভূত করা হয়। এ

সময়ে সেন্টারের দুরারটি জানলা দরজা সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানা যায়। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের সেন্টারটির বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে, দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের এখানে কেনা হয় এবং এটি সি আই এর একটি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি। তাই এর খবর সাধন করা দরকার।

গত নব্বই নভেম্বর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বতন্ত্র ফেডারেশন একটি মিছিল করে। মিছিলটি রাজ্য সুরাধ মল্লিক স্কোরর থেকে এসে মার্কিন লাইব্রেরীর সামনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জানায়। বিক্ষোভকালে

তারা নিকসনের কুশ পদাঙ্কিকা দাহ করেন। এর পর ময়দানে এসে সমাবেশ হয়ে একটি সভা করেন।

মিছিলকারীদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিভিন্ন ধর্মী উচ্চারিত হয়েছে।

গত নব্বই ডিসেম্বর পি এস ইউও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি সমাবেশ করে।

এগরোই ডিসেম্বর ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে কলকাতার আর একটি বিক্ষোভ হয়েছে। বাংলা দেশের নামে ব্যবসার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। কলকাতায় গত তেসরা ডিসেম্বর থেকে বোম্বাইএর অভিনেতা আই এস

জোহরের “জয় বাংলা দেশ” ছবিটির মন্তিলান্ড ঘটে। ইতিপূর্বে বোম্বাইতে এই ছবিটির মন্তিল উপলক্ষ্যে খুব গড়গোল হয়। দর্শক-বৃন্দ প্রেক্ষাগৃহের আসন প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করে। উত্তোজিত অবস্থায় তাঁরা অভিনেতা ও পরিচালক শ্রীজোহরকেও লাঞ্চিত করতে গিয়ে ছিলেন কিন্তু তিনি পাগিয়ে বাঁচেন। পরবর্তীকালে দিল্লীতেও সেখানকার ছাত্র ও স্বতন্ত্রের বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

আজ এখানেও সেই বিক্ষোভ চূড়ান্তরূপে সংগঠিত হয়েছে। ছাত্র পরিষদের কর্মীরা বিভিন্ন (শেখাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

মুক্ত যশোরের বর্তমান অবস্থা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের মুক্ত শহর যশোরে আমরা অবশেষে পৌঁছলাম। যশোর থেকে ঢাকা মাত্র একশো পঁয়ষাট মাইল। যশোরের আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে পাক-সেনাবাহিনীর ফেলো যাওয়া গাড়ী, কিছ্র কামানের গোলা আর কয়েকটি ধ্বংস স্তূপ। যশোর জেলার মোট লোকসংখ্যা আশি হাজার। বর্তমানে তা বিশ-পঁচিশ হাজার দাঁড়িয়েছে। কারণ পাক-বাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে এই জেলার অধিকাংশ লোক ভারতে শরণার্থী হয়ে চলে যায়।

বিকরগাছায় পৌঁছে মনটা সবচেয়ে খারাপ হয়ে গেল। এখানকার সাতশ কুমারী যুবতী মেরে আজ পশ্চিম পাকিস্তানে বিক্রীত। তাদের আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে যখন মিলিত হলাম তখন দু চোখে জলে

ভরে এল, কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেলেও এরা যে আর কোন দিন ফিরে আসবে সেবিষয়ে অনেকেই সন্দেহ আছে।

যশোর শহরের মধ্যে যখন ঢুকছি তখন শব্দে দু-পাশের খালি বাড়ীগুলি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। শহরের সিনেমা হল দুটি বন্ধ। মানুষ যা আছে, তা হাতে গোনা যায়।

জেলার পরিষদ ময়দানে যখন পৌঁছলাম, আলোপ হল যশোর কৃষি মহকুমার তরুণ কৃষি অফিসার তারিক হাসানের সঙ্গে। ছাব্বিশে মার্চ মুক্তিবাহিনীতে তিনি যোগদান করেন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে। তিনি জানানেন দীর্ঘ আট মাস পরে যশোরে এসে মনে হল বেন কারাবাসের অবসান হোল।

তিনি জানানেন বাংলাদেশ সরকারের মনোনীত লোক দ্বারা এবার এখানকার অফিস আদালত চালান হবে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এখানকার কোর্ট কাছারীগুলিতে কাজ হবে বলে জানা গেল।

যশোর জেলে গিয়ে দেখলাম বন্দী রাজাকারদের। এদের সংখ্যা হাজারের ওপর। অনেকে বললেন ওদের মধ্যে শতকরা আশি জন তরুণ ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে মাঠের মধ্য জ্বালত জবাই করেছে। যেখানে জবাই করা হতো সেই মাঠে গিয়ে দেখলাম রক্তে রাঙা মাটি আর আশে পাশে ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙা কয়েকখানা হাড়।

যশোরে মানুষের বাস না থাকার ফলে সন্ধ্যার আবহাওয়া অন্ধকারে গ্রামের পথে কোন শিয়ালের দেখা বা ডাক শুনতে পেলাম না।

জমিগুলির অধিকাংশ ফসল পাকসেনারা চলে যাবার সময় পেটল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। তার নমুনাও পেলাম। বিকরগাছায় জনৈক ইতালিয়ান মিশনারী প্রায় কাঁদতে কাঁদতে সাংবাদিকদের কাছে বললেন, যে অভ্যচার পাকিস্তানী সেনারা করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কয়েকজন চোম্প-পনেরো বছরের ছেলেকে তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে গুল্য কেটে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

যশোরে বর্তমানে কোন মহিলা নেই বললেই চলে। অনেকে ফিরে এসেছেন। অনেকে আবার দেখে বসেছেন, যশোর সত্যিই মুক্ত হয়েছে কি না। যশোরের একটি গ্রামে থাকে যশোর-কলেজের ছাত্র মখসুদন সাহা। তিনি জানানেন যে তার বাবাকে গত ছাব্বিশে মার্চ পাকসেনারা ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। বাবার মৃত্যুর পর মা ও পরিবারের অন্যান্যদের বন-

গায় পাঠিয়ে দিয়ে সে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেয়। আজ সে দেখে যাচ্ছে তাদের বাড়ীর ঠিক আছে কি না।

যশোর সহ সমগ্র বাংলাদেশে এখন বিহারী বিম্বেষ প্রচণ্ড। বিহারী হিন্দু অথবা মসজিদমান যেই হোক না কেন তাদের সকলের ওপর প্রচণ্ড বিম্বেষ রয়েছে বলে মনে হলো।

মোটের ওপর যশোরের মানুষ আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বেসামরিক শাসনে নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলে জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা আমাকে জানালেন। যশোরে থেকেই জানতে পারলাম মুক্তি বাহিনী এখন সকল জেলাতেই এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় সেনারা যে সমস্ত জায়গা দখল করেছে সেই সমস্ত এলাকা মুক্তি বাহিনীর লোকেরা পাহারা দিচ্ছে। সর্বত্র বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে

(বিশেষ প্রতিনিধি)

দেশের বর্তমান অবস্থার সুবোধ্য নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা কেরোসিন তেল, ডাল, শিশু খাদ্য, টুচের, ব্যাটারী প্রভৃতির কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভারত রক্ষা আইন এই ধরনের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার কথা খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে পত্রিকার মাধ্যমে জানান হয়েছে। ব্যাপারটি খুব আশ্চর্য লাগছে, ভাবখানা এই যেন “তোমরা চোর ঠিক কুরে থেকে—আমরা তোমাদের ধরতে যাব।” আগের থেকে সাবধান করে দিলে তাদের ধরা তো দুইয়ের কথা জিনিষ পর কোন মাটির তলার লুকিয়ে ফেলবে তা কেউ জানতেও পারবে না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ধার্য করার কথা বলা

হয়েছে তবে কতদিনের মধ্যে করা হবে তা জানা যায় নি। আদৌ হবে কিনা এ বিষয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রশ্নের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য হল যারা সরকারের ধার্যকৃত দামে নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ বিক্রয় করবেন না তাঁদের ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হবে।

সম্প্রতি রাজ্যের এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা কেরোসিনের সংকট সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এ রাজ্যে বর্তমানে কেরোসিনের কোন সংকট হওয়াই উচিত নয়, কারণ তেল পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। এ ব্যাপারে গত মাসে রাজ্য পদলিগকে অত্যন্ত সক্রিয় দেখা গেছে। তাঁরা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে চারশো তেপাল জন অসাধু ব্যবসায়ীর সঙ্গে লিপ্ত সমাজ বিরোধী

ও একশ কারোজন বড় ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার কালে এদের কাছ থেকে বেশ কিছু মজদুরজাত নিম্ন ব্যবহার্য জিনিষ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকারী দ্রব্য সমূহঃ চাল এক হাজার নয়শ একষাট কুইন্টাল; ডাল তিনশত হাজার কেজি; সরষের তেল বিরামবদ্বই হাজার কেজি; শিশু খাদ্য নয় হাজার পঁচিশ ছয় টন; টর্চ লাইটের ব্যাটারী চারশত হাজারটি; কেরোসিন তেল পঁচিশ হাজার তিন শত লিটার; সার চারশ পঁচাত্তর মেট্রিক টন। এছাড়া বারোটি ট্রাক সরকার নিয়ে নিয়েছেন।

প্রাক জল্পনায় অবস্থা কালীন সময়ে অর্থাৎ অক্টোবর নভেম্বর মাস থেকে রাজ্য সরকারের পদলিগ চোরাকারবার বন্ধের উদ্দেশ্যে কয়েকটি জেলায় অভিযান শুরুর করে-

ছিল বলে জানা যায়।

ফলে কুচবিহার, দাজিলিং ও জলপাইগুড়িতে মূল্য বৃদ্ধি বিশেষ হয় নি। অভিযানকালে চবিদশ পরগণা, হাওড়া ও বর্ধমানে পদলিগ হানা দিয়ে একদিকে যেমন ব্যবসায়ী ও তাঁদের সাগরদ স্থানীয় সমাজ বিরোধীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে তেমনি মজদুর দ্রব্য-গুদিল ও উদ্ধার করা গেছে।

উদ্ধারকারী দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় সবচেয়ে হল চাল। এই চাল কোথা থেকে এই ব্যবসায়ীদের হাতে এসেছে। চালগুলি ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ায়। এগুলি শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য রেশন দেয়া চাল।

যে সব ঠিকাদার সরবরাহ করার ভার নিয়েছিল তাদের মধ্যকার একটি বড় অংশ এই কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছে, ফলে ব্যবসায়ীদের হাতে চাল গেছে বলে জানা গেল। এই বিষয়ে একটি নমুনা দিলেই বোঝা যাবে। একটি শরণার্থী ক্যাম্প ঠিকাদারের কাছে বাইশ হাজার লোকের রেশনের প্রয়োজনীয় চাল ডাল দেওয়া হতো। ক্যাম্প হয়তো শরণার্থী রয়েছে

খুব বেশী হলে কুড়ি-একশ হাজার। ফলে ঠিকাদারবৃন্দ এই অনুপস্থিত লোকদের জন্য পাওয়া চাল ডাল নিজেরাই নিয়ে অল্পদামে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছে, এছাড়া আর এক ভাবেও চাল ডাল আসতো। শরণার্থীরা অত্যন্ত গরীব, রাজ্য সরকারের বরাদ্দ খুব পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু তারা যা পেত এর মধ্যে একটা বড় ভাগ তারাও অর্থের জন্য বিক্রয় করে দিত। বড় বড় ব্যবসায়ীদের দালালরা এগুলি অল্প দামে কিনে নিয়ে ব্যবসায়ীদের হাতে দিত এবং পারিশ্রমিক হিসেবেও কিছু উপার্জন করতো।

এদের ধরার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আটক আইন অনুসারে খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রথমে কাজ করলেন। পরে উৎসাহে ভাটা পড়ায় তা বোধ হয় এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তা না হলে হঠাৎ নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে দেখলাম কলকাতার পদলিগ ছোটখাট বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে দু চারজনকে ধরছে, কিছু শিশু খাদ্য ভেজাল ঔষধ ধরছে। কিন্তু এখন আবার চপচাপ হবার কারণও অজ্ঞাত রয়েছে।

যশোর সফরকালে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকের ভারত বিরোধী প্রচার

(বিশেষ প্রতিনিধি)

যশোর সফরকালে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ভারত বিরোধী প্রচার চলাবান চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এই বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে আমেরিকান, ডেনিস, অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের এই কাজে সহায়তা করে-

ছেন দিল্লী থেকে আগত কয়েকজন নামী ভারতীয় সাংবাদিক।

যশোর সফরকালে একজন বিদেশী সাংবাদিক মুক্তি বাহিনীর জনৈক মুখপাত্রকে জিজ্ঞেস করেন ভারত মুক্তি যুদ্ধের গোড়া থেকে অগ্রগণ্য দিয়ে সাহায্য করেছে কি না। প্রশ্নটা অবশ্য আমার সামনে

করতে আমি থানিকটা চমকে উঠি। কারণ কলকাতা থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জনসংযোগ ও তথ্য বিভাগ আমাদের যশোর শহর দেখাবার জন্য এনেছিলেন। এই সফরে মোট একশ জন সাংবাদিক ছিলেন। তার মধ্যে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য সাংবাদিকদের

সংখ্যা ছিল খুবই কম।

এই বিদেশী সাংবাদিকরা যশোরে নেমেই সাধারণ মানুষের কাছে দোভাষীর সাহায্যে ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর সামরিক সংবাদ গোপনে বের করে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু আওয়ামী ও ছাত্রলীগের কয়েকজন তরুণ কর্মীর চেষ্টায় তাদের সে আশা ব্যর্থ হয়।

এই বিদেশী সাংবাদিকরা কলকাতার গ্রান্ড হোটলে উঠেছেন। গত শনিবার (এগারোই ডিসেম্বর) যখন বাসে করে সাংবাদিকদের যশোর শহরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদের মধ্যেও অন্ততঃ পঞ্চাশ

জন আমেরিকান সাংবাদিক ছিলেন। আওয়ামী লীগের জনৈক নেতাকে একজন আমেরিকান সাংবাদিক হঠাৎ প্রশ্ন করেন—“তোমরা কত স্বাধীন, কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কেন বাংলাদেশের মাটিতে থাকতে দিয়েছ?”

প্রশ্নটা শুনে প্রথমে আওয়ামী লীগ নেতা চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—“ভারত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাথী হতে চায়।”

বিদেশী সাংবাদিকরা কমলালেবু ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে (শেষাংশ এক পৃষ্ঠায়)

অর্থনৈতিক দর্শন

ভারত-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সহযোগিতা

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

চাকার পতনের পর বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতার স্থায়ী নিদর্শন হিসাবে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার একটি চুক্তি হয়ত সম্পাদিত হবে। ইতিমধ্যেই নিতাপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য যোগান ও চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণের আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

যে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক প্রভুত্বের বোড়া জাল ছেগে পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করল, অসীম ত্যাগ ও দীর্ঘবরণের যে পথ বাংলা দেশ গ্রহণ করে জাতীয় অভ্যুত্থানের রক্তমাখা পথে তারা আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করল, তাদের মনোভাবকে সত্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেই অর্থনৈতিক পারস্পরিক লেনদেনে আগ্রহ হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানবের চরিত্র শতাংশ ভূমিহীন

কৃষক এবং আরো প্রায় উনিশ শতাংশ পনেরো বিঘার কম জমির মালিক। গত চব্বিশ বছরে কলকারখানা যা বেড়েছে তা সবই পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ্যবান কুড়িটা পরিবারের কল্যাণ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী মালিকদের হাতে পুঞ্জিত দেশের মোট নিয়োজিত মূলধনের পনেরো শতাংশ বাংলা দেশের বিপুল শিল্পসম্ভাবনাকে অন্ধুরেই বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। ফলে কারখানার মোট কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছয় লক্ষের মত অর্থাৎ জনসংখ্যার এক শতাংশেরও কম।

একটা নব্যোন্মিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বাংলাদেশে দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে। এরা এখনো গ্রামীণ কৃষকের সঙ্গে নাড়ীর বাঁধন কেটে ফেলে নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধানতঃ কৃষক, সম্পন্ন কৃষক, জমিদার-জোতদার, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সম্প্রদায় থেকে জন্মলাভ করে।

বাংলায় হিন্দু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে

ক্রমাগত যে পথে চলেছিল তার ফলে তাদের বৃহদাংশ কৃষক জীবনের সরলতা এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও টিকে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশের সদ্যোন্মিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রামীণ সম্পর্কের সঙ্গে যোগসূত্র সতেজ রেখে চলতে সক্ষম হয়েছে বলে তাদের সংকীর্ণ শ্রেণীগত স্বার্থের ঝোঁক কম হবে বলে আশা করা যায়।

অথচ আজ অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্নে বাংলাদেশের জনগণের স্বাভাবিক আকাংখার সঙ্গে এপারের কাংখালী জনগণ এবং তারপরে ভারতের জনগণের স্বার্থের সমন্বয় করা একান্ত আবশ্যিক।

কারণ এপার বাংলা ওপার বাংলার মানবিক অনর্ভূতি ও সোহাদা প্রবলভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সচ্ছন্দতা সাধনের ওপরে নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ যে লক্ষসাধনের জন্যে লড়াই করছে সেই লক্ষ্যের প্রতি অর্থাৎ বাংলা দেশের অর্থনৈতিক মন্দির, পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ থেকে মন্দির দিকে নজর রেখেই ভারত ও বাংলা দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা সম্ভব।

ভারতে সমাগত বিপ্লবসংখ্যক শরণার্থীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়া এবং তাদের জীবন-জীবিকা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা এক কঠিন দায়িত্ব। বাংলাদেশের স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী সরকার এ দায়িত্ব বাতে সচ্ছন্দভাবে পালন করতে পারেন, ভারতের দিক থেকে তা উপলব্ধি করা এবং সহায়তা করা প্রয়োজন।

এছাড়া মার্চ মাসের ঘটনা সংঘটিত হবার আগেও যে সব মানব পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এসেছেন, তারাও হয়তো দেশে ফিরে যাবার আকাংখা রাখেন। কিন্তু, এই আকাংখা পূরণ করতে হলে মৌলিক সমস্যাগুলি জটিলতর হয়ে পড়তে পারে।

বাংলাদেশের বিধবস্ত প্রায় অর্থনৈতিক সপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে ভারত বাংলাদেশ সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করতে হলে এই জটিলতাকে পরিহার করে চলতে হবে।

বাংলা দেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী যশোহরে জনসভায় ভাষণ দেবার সময় এবং পরে সাংবাদিক সম্মেলনে যে অভিমতগুলি ব্যক্ত করেছেন, তার প্রতি লক্ষ রেখে বাংলাদেশের মানব যা চান তা রূপায়িত করতে হবে।

ইন্টার কম্যান্ডের অধিনায়ক জেনারেল আরো ভারতের মনোভাব সঠিকভাবেই ব্যক্ত করে বলেছেন যে ভারতীয় জওয়ানরা বাংলাদেশের মন্দির জনেই বাংলাদেশে গিয়েছে। তারা বাংলাদেশে থাকার জন্যে যান নি। বাংলাদেশের পূর্ব-মন্দির ঘটলেই তারা স্বদেশে ফিরে আসবেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও সেই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সুতরাং বাংলাদেশ সরকার তাদের দেশের অর্থনীতিকে পুনরায় সপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, তার প্রতি ভারতের জনগণ ও সরকার সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল।

একথা ঠিক ভারত থেকে বাংলা দেশের অর্থনীতিবিশেষ জরুরী প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি যেমন লবণ, কয়লা, বস্ত্র, লৌহ-ও ইস্পাত দ্রব্য, সিমেন্ট, চিনি প্রভৃতি পাঠাতে হবে। বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা চামড়া, মাছ, ডিম-হাঁসমুরগী প্রভৃতি ভারতে আসতে পারে।

অবাধ বাণিজ্য ও ভ্রমণের নিশ্চয়তা থাকলে বাংলা দেশের বই কাগজ পত্রিকা ভারতের বই, কাগজ পত্রিকা সংগে সহজেই বিনিময় হতে পারে। ফলে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দিক থেকেও উভয়দেশই লাভবান হবেন।

বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্যে

ভারতসরকার নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ঋণ ও সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে দ্রাস্থসুলভ সাহায্য করবেন। অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলিও নিশ্চয়ই অনুরূপ সাহায্য দিতে কাপণ্য করবেন না।

সবার উপরে একথা প্রতিনিয়ত মনে রাখতে হবে ভারতের সাহায্য যেন মার্কিনী অথবা পশ্চিমী সাহায্যের মত না হয়। বাংলাদেশ সরকার চাহিদা ও মনোভাবের স্বাধীন হস্ত প্রসারিত করতে হবে। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংস্কার অথবা প্রগতির দিকে পদক্ষেপ সম্পর্কে স্বাধীন সমর্থন ভারতের দিক থেকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের জনগণতন্ত্রী সরকারের স্নায়ু নিভর করে নিঃস্বার্থ সাহায্যদান সম্পর্কে ভারতের দ্রাস্থসুলভ ঐকান্তিকতার উপরে। আগামী অর্থনৈতিক লাভের কোন আকাংখা আমাদের যে নেই বাংলাদেশের জনগণ যেন সেটা উপলব্ধি করতে পারেন, সেভাবেই চলা বাঞ্ছনীয়।

শান্তিপূরে জনসমাবেশ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শান্তিপূরে, পঞ্চাঙ্গ ডিসেম্বর : গত তিরিশে নভেম্বর মঙ্গলবার শান্তিপূরে পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে বৈকাল্য চারটার শান্তিপূরে পুঁলিশী দমননীতি, নব কংগ্রেসের গুন্ডামী এবং পুঁলিশ-নব কংগ্রেস যোগসাজসে যৌথ আক্রমণ ও সম্ভ্রাস সৃষ্টির বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল ও গণ সংগঠনের প্রতিনিধিমূলক সংস্থা “শান্তিপূর থানা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি”র ডাকে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অধিকার রক্ষা কমিটির সভাপতি শ্রীকানাই পাল।

আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের বন্দীদের উপর বর্বর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সভাপতি শ্রীকানাই পাল। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে মনিষের জীবন ও গণতন্ত্র সম্পর্কে বিলুপ্ত মাত্র মর্ষাদা বোধ থাকলে কোন সরকার জেলের মধ্যে অসহায় বন্দীদের উপর এই প্রকার অত্যাচার এবং বন্দী হত্য করতে পারে না। এটা সরকারের আধা-ফ্যাসিস্ট চরিত্রেরই পরিচয় দিচ্ছে। এই সমাবেশে মধ্যবর্গীয় এই বর্বরতার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে ও ক্ষোভ প্রকাশ করে দাবী জানাচ্ছে যে একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটি দ্বারা অন্তঃসন্ধান ও দায়ী পক্ষকে ক্ষেত্র শান্তি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে নিহত ও আহত বন্দীদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

কয় গুণবিশিষ্ট দেশীয় তেজস্বাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সত্ত্বত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। কলকাতা, পুণ্ডিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সম্বন্ধেই আধুনিক রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেখের কলকাতা প্রস্তুত পূর্ণ হয়, ইহা স্বাস্থ্য ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য দিয়ে আসে এক অতি অমূল্যের মধ্যে দুর্লব জরাজীর্ণ তরু দেখে নতুন সজীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিক
(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮
অবাক ডাঃ বোসেনচন্দ্র বোষ এম.এ. আবু বক্কর-সাহী. এম.সি.এস. (লন্ডন). এম.সি.এস. (আমেরিকা) অক্সফোর্ড কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের চুতপূর্ব অধ্যাপক।

চলিতকাল ক্রেতা : ডঃ কলকাতা জে.এ.বি.বি.এস. (ভদ্র) অধ্যাপক

চারের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিকের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সহ পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ ২ বা ৩ আহারের পয় সেব্য।

SMM-2/64

স্বাধীনতার চিহ্ন

পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন চিন্তা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নয়া দিল্লী, দশই ডিসেম্বর : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শাসকগোষ্ঠীকে নানা বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। প্রথমতঃ, বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। মার্কিনী শিবিরের প্রতি অনুগত্য ছেড়ে সোভিয়েত শিবিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যে সুত্রপাত ভারত-সোভিয়েত চুক্তির দ্বারা হয়েছিল, তা এই যুদ্ধের মাধ্যমে অরও দৃঢ় হল। বস্তুতঃ আমাদের বিমান বাহিনী ও নৌবহর—এ যুদ্ধে যারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে—সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা পরিপুষ্ট। সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় সমর্থন না পেলে আমরা এ যুদ্ধে অগ্রসর হতাম কিনা সন্দেহ। অবশ্য একথাও ঠিক যে ইয়াহিয়া খানের ট্যাগমাটিক ভারত-পাক সীমান্তের অবস্থা এমন একটা দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল যে যুদ্ধ ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না।

এই প্রসঙ্গে মার্কিনী ও চীনা-দের যোগাযোগের কথা উল্লেখযোগ্য। শোনা যাচ্ছে, কিসিঙ্গার যখন চীন ভ্রমণে যান, তখন চৈনিক নেতাদের সঙ্গে নাকি শলাপরামর্শ হয় বাংলাদেশ নিয়ে এবং বাংলাদেশের মর্জি অন্দোলনের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খানকে উভয়ই সমর্থন করবে বলে ঠিক হয়। মার্কিনীদের উদ্দেশ্য ছিল মর্জি অন্দোলন আপাততঃ বন্ধ করে আওয়ামী লীগ যেন পাকিস্তানের মধ্যেই স্বায়ত্তশাসনে রঞ্জী হয় এবং এ ব্যাপারে তারা ইয়াহিয়াকে রাজীও করেছিল বলে শোনা যায়। এ পরিচালনা সার্থক হলে মার্কিনীরা বাংলাদেশে একটা স্থায়ী বাণীট গড়তে পারত। চীনা-দের উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র্য। তারা লক্ষ্য করছিল যে ভারত ও সোভিয়েতের আওতায় বাংলাদেশ ক্রমশই চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে স্বাধীন সরকার ভারত ও সোভিয়েতের তল্লিকাহক হবে। সুতরাং বাংলাদেশের মর্জি আন্দোলনকে অন্ধুরেই বিনাশ করা দরকার। তাই গোড়া থেকেই ইয়াহিয়াকে চীনের অস্ত্র সরবরাহ।

আসলে চৈনিক কমিউনিস্ট নেতারা শত্রু থেকেই একটা ভুল চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে সেই ভুল শত্রুরা বারংবার সফল না করে গৌরবের মত এটেকেই আঁকড়ে ধরে চলেছেন। বাংলাদেশের মর্জি আন্দোলন যে ভারত থেকে চালানো ব্যাপার নয়, সেটের মূল শিকড় যে বাংলাদেশের মটিতেই এবং তা শত্রু কিংবা মর্জি-গোও বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় একটা ব্যাপক জাতীয় জাগরণ এই মূল সত্যটি অনুধাবনে

অপরূপ চৈনিক কমিউনিস্টরা তোত-পাখির মত একই ভারত বিরোধী ও সোভিয়েত বিরোধী অপপ্রচারে মগ্ন।

স্বতন্ত্র্য, কমিউনিস্ট জলা-জলি দিয়ে চৈনিক নেতারা একটা স্বার্থপর সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করেছেন। আওয়ামী লীগকে কেউ-ই কমিউনিস্ট দরদী বলবে না, কিন্তু ইয়াহিয়া খান ধর্মাত্ম, সামন্তবাদী মিলিটারী স্বৈরতন্ত্রকে কোন মর্জিবাদী নিয়ে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলা চলে তা চীনা নেতারা আজ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। স্পষ্টতই তাঁদের সোভিয়েত-বিরোধী মনে-ভাব এমন এক পর্যায়ের গিয়ে পৌঁছেছে যে তারা মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার তীব্রদার রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গেও দ্বন্দ্বময় মনোভাব করতে রাজী আছেন।

চীনের বৈদেশিক নীতিতে এই চূড়ান্ত সুবিধাবাদ তার আভ্যন্তরীণ নীতিতেও সর্বনাশ ডেকে আনবে এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে চীন একটি বিপজ্জনক দেশ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে চীনের স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার যে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল, তা আপাততঃ দূরীভূত হয়েছে।

এ অবস্থায় ভারতের বৈদেশিক নীতিতে ক্রমশই সোভিয়েত শিবিরের প্রতি ঝোঁক দেখা দেবে। এর একটা বিপদ রাজনৈতিক পর্বেক্ষকেরা লক্ষ্য করছেন। হয়তো ভারত বর্ষ অর একটি ইজিপ্টে পরিণত হবে। ভারত পাক সম্পর্ক, অন্ততঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ইজিপ্ট-ইজরায়েলের মত একটা চিরস্থায়ী গোলমালের স্থান হয়ে দাঁড়াতে পারে। সম্প্রতি চোঁ এন লাই ইংরেজ সাংবাদিক নোভেল ম্যাকসওয়েলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে উক্ত আশংকা প্রকাশ করেছেন। তার থেকে মনে হয় চীন ও সোভিয়েত উভয়ই ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকে

দেখের এই সংকটকালীন অবস্থায় ঠিকাদারের স্বার্থে কর্মরত প্রমিকদের তাড়িয়ে দিয়ে শাসক কংগ্রেসের লোককে চাকুরী দেওয়ার দাবীতে তেল শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বন্ধ করার জন্য সেই দলের একজন যব নেতা ও প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাধীন তালুকদার ধনি ভুলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি নাকি দপ্তরবিহীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সীসিক্ত শংকর রায় এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্বাদ রয়েছে।

শুনলে অনেকেই অবাক হবেন কিন্তু ঘটনাটা সত্য। কলকাতার পশ্চিম শিল্পাঞ্চল পাহাড়পুর। এখানে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের ইনস্টলেশন অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন অফিসার নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঠিকাদারগণের মাধ্যমে কাজ করতো।

দেশের চরম বেকার সমস্যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ঠিকাদারী প্রথা বেকার সমস্যাকে বৃদ্ধি করে, কিন্তু সরকার কেমনদিন এ বিষয়ে নজর দেয় নি। ইন্ডিয়ান অয়েলের এ আই টি ইউ সির অন্তর্ভুক্ত এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন সারা দেশব্যাপী শিল্প ঠিকাদার

প্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন করেন। প্রমিক কর্মচারীদের তাঁর আন্দোলনের চাপে উনিশশো সত্তর সালে কতৃপক্ষ ইউনিয়নের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তি অনুসারে ঠিকাদারগণের হাতে কত কাজ রয়েছে এ ব্যাপারে কতৃপক্ষ ও ইউনিয়নের মধ্যে একটি যৌথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই চুক্তি পরবর্তীকালে কার্যকরী না হওয়ায় আবার শিল্পে অশান্তি শুরু হয়। চলতি বছরের জুলাই নভেম্বর মাস পর্যন্ত সারা পূর্বাঞ্চল ব্যাপী যে আন্দোলন হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ডিসেম্বরে রাজ্য প্রম কমিশনারের দপ্তরে আই ও সির কতৃপক্ষ ও এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের একটি চুক্তি হয়।

চুক্তিতে বলা হয়েছে ঠিকাদারের পরিবর্তে কর্মরত ঠিকা প্রমিকগণের একটি সমবায়ের মাধ্যমে কাজের কথা। এ পদ্ধতিতে বর্তমানে কাজ চলতে থাকে। পাহাড়পুরে ইনস্টলেশনের একজন কুক্ষাত ঠিকাদার হলেন শ্রীলতিফ। যার স্বনামে বেনামে অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অল্পের ফাঁকি দেওয়ার জন্য অল্পের কতৃপক্ষ একে ধরেছে এবং অপরাধকে আই ও সি তে বহু রকম দুর্নীতির আঁড়িমাটিয়ে সি

নিজেদের পারস্পরিক জাতীয় বিদ্বেষের কাজে লাগাবে। ওয়ার বই প্রাক্তন শত্রু হতে পারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। দাবার বেড়ের মত আমাদের দুই দেশকে ব্যবহৃত করবে বহু শক্তিবর্গ।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সমস্যাও এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নিতে পারে। যেভাবে বাংলাদেশ যুদ্ধ হচ্ছে, অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যে, ততো আপাততঃ যদিও সদ্যপ্রাপ্ত মন্ত্রির উৎসাহে পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা ভারতবর্ষকে তাদের সবচেয়ে বড় সহৃদয় হিসেবে গ্রহণ করবেন, কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অবাধ শেখণ এবং বাংলাদেশ সরকারের উপর ভারতীয় সরকারের প্রভাব ভবিষ্যতে হয়তো আবার ভারত-বিরোধী মনোভাবের জন্ম দিতে পারে। গত স্বতন্ত্র মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত লালফোজ দ্বারা মস্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থান্তরের ইতিহাস এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সুতরাং ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর সামনে এই প্রশ্নগুলো দেখা দিয়েছে। কি করে অতি সাবধানে এগোনো যায় এবং বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে হৃদয়তর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, তা

নিজেদের পারস্পরিক জাতীয় বিদ্বেষের কাজে লাগাবে। ওয়ার বই প্রাক্তন শত্রু হতে পারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। দাবার বেড়ের মত আমাদের দুই দেশকে ব্যবহৃত করবে বহু শক্তিবর্গ।

একেই সহ্যতা করার জন্য দক্ষিণ কলকাতার নব কংগ্রেসের যব নেতা তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাধীন তালুকদার ঐ ইনস্টলেশনে যান। কংগ্রেসের অপর একজন ছাত্রনেতা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসুও সহায়তা করছেন বলে জানা যায়। গত নয়ই ডিসেম্বর পাহাড়পুরে ইনস্টলেশনে বাইরে থেকে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু আসেন। সমবায় প্রথায় কর্মরত প্রমিকদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজের পেটোয়া লোকদের কাজ দেওয়ার জন্য কতৃপক্ষের কাছে দাবী জানানো হয়, বি আই এর নামে কেস চলেছে বলে জানা যায়।

একেই সহ্যতা করার জন্য দক্ষিণ কলকাতার নব কংগ্রেসের যব নেতা তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাধীন তালুকদার ঐ ইনস্টলেশনে যান। কংগ্রেসের অপর একজন ছাত্রনেতা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসুও সহায়তা করছেন বলে জানা যায়। গত নয়ই ডিসেম্বর পাহাড়পুরে ইনস্টলেশনে বাইরে থেকে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু আসেন। সমবায় প্রথায় কর্মরত প্রমিকদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজের পেটোয়া লোকদের কাজ দেওয়ার জন্য কতৃপক্ষের কাছে দাবী জানানো হয়, বি আই এর নামে কেস চলেছে বলে জানা যায়।

একেই সহ্যতা করার জন্য দক্ষিণ কলকাতার নব কংগ্রেসের যব নেতা তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাধীন তালুকদার ঐ ইনস্টলেশনে যান। কংগ্রেসের অপর একজন ছাত্রনেতা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসুও সহায়তা করছেন বলে জানা যায়। গত নয়ই ডিসেম্বর পাহাড়পুরে ইনস্টলেশনে বাইরে থেকে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু আসেন। সমবায় প্রথায় কর্মরত প্রমিকদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজের পেটোয়া লোকদের কাজ দেওয়ার জন্য কতৃপক্ষের কাছে দাবী জানানো হয়, বি আই এর নামে কেস চলেছে বলে জানা যায়।

নিজেদের পারস্পরিক জাতীয় বিদ্বেষের কাজে লাগাবে। ওয়ার বই প্রাক্তন শত্রু হতে পারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। দাবার বেড়ের মত আমাদের দুই দেশকে ব্যবহৃত করবে বহু শক্তিবর্গ।

এছাড়াও, যুদ্ধের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথাও ভারতে শত্রু করা হয়েছে। আপেক্ষালীন অবস্থার সমস্ত কঠোরতা সত্ত্বেও জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। কেরোসীন বাজার থেকে উধাও, চর্চ ও মোমবাতি কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রী হচ্ছে। এগুলি আগামীদিনের অর্থনৈতিক সংকটের প্রথম ইঙ্গিত। এর পাশাপাশি তো পশ্চিম বাংলার মত প্রদেশে শ্রমিক ছাঁটাই, কারখানা বন্ধ লেগেই আছে। এখনও পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে মন্ত্রিস্থায়ী বা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে কোন দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। সম্প্রতি এখানে শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক সভায়, এ আই টি ইউ সি ও সি টির তরফ থেকে এগুলি বন্ধ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোনই ফল হয় না। আই এন টি ইউ সি সহ অন্যান্য শ্রমিক সংস্থাগুলি একটা মনমুখী প্রস্তাব—যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন শ্রমিক বিরোধ হবে না—এই জাতীয় একটা খসড়া প্রস্তাব পেশ করে এবং সেইটেই গৃহীত হয়।

অন্যথায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেল শিল্প বন্ধ করে দেওয়ার হুমকী দেওয়া হয়। এব্যাপারে তাঁকে আশীর্বাদ করবেন শ্রীরাধীন ও শ্রীমতী গান্ধী।

শ্রীতালুকদারের বক্তৃতার একটি অংশ : সি পি এমকে আস্তাকুড়ে ফেলোঁছ, সি পি আই-এর দালালী ভেঙ্গে দেব।” অবশ্য শ্রীতালুকদারের হুমকি তার পক্ষে কাজে লাগানো সম্ভব হয় নি। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেও অবস্থার কোন অবনতি হয় নি। শাসক কংগ্রেসের এই তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা যাদের ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা নেই তাদের দিয়ে কি ধরণের প্রগতিবাদী কাজ শাসক কংগ্রেস করবেন তা রাজ্যের জনগণের কাছে অস্পষ্ট রয়েছে। পূর্বনো লোক সরিয়ে দিয়ে নতুন পেটোয়া লোক নিয়োগ করেই কি শ্রীতালুকদার মহাশয় বেকার সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন।

দেশের স্বার্থে সেন-র্যালের কারখানা অবিলম্বে খোলা হক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আসানসোলে অবস্থিত সেন র্যালের পর কল্যাণীর সেন পাড়িত এ্যানসিলারি সাইকেল কারখানাতেও কতৃপক্ষ ক্রোজার ঘেষণা করেছেন। ফলে বহু প্রমিকের অবস্থা এখন শোচনীয়। সরকারী সূত্রে জানা গেছে, সাইকেল

শিল্পের শতকরা চল্লিশভাগ উৎপাদন হয়ে থাকে এই কারখানা-গুলিতে। গত উন্নতিরিশ তারিখ থেকে মালিক পক্ষ এক তরফা বেআইনীভাবে এই কারখানাগুলিতে ক্রোজার ঘেষণা করেছে।

সেদিন কারখানাগুলির মালিক (শেষাংশ জম্মত পুন্ড্র)

শরণার্থীদের নিয়ে ন্যাকারজনক ঘটনা

পূর্ব-বাংলার অসহায় শরণার্থীদের নিয়ে শৈবরাচারী শাসক গোষ্ঠী কিভাবে ন্যাকারজনক ঘটনা ঘটালে, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার পানবাড়ী শরণার্থী শিবিরের নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

পানবাড়ীতে স্থায়ী শিবির হবার পর বৃটিশ আমলের একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসারকে উক্ত শিবিরের কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্বভার বুঝে নেওয়ার পরই শিবিরের মধ্যে কিছু লোককে মদ, মেয়ে ও টাকা-পয়সা দিয়ে বশ করে কমান্ডারিটি তাদের নিজের বশে নিয়ে আসেন। কিছু দিন বশার পর শিবিরের প্রকৃত মালিকদের দিকে তার নজর পড়ে এবং জোর করে তাঁর পছন্দ মতো

যুবতী মেয়েদের পেটোয়া লোকদের দিয়ে নিয়ে এসে মঞ্চরূপে নরক-গলজর করতেন। ক্রমে ক্রমে এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে এবং শিবির-বাসী ও স্থানীয় গ্রাম্যলোক কমান্ডারের এই কাজের জন্য বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরপর তাঁর পেটোয়া লোক ছাড়া শিবিরে বাইরের লোকের

সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের সংগে অশালীন ব্যবহার করার ঘটনাটি চরমতম রূপ নেয়।

কাপড় সরবরাহকারী ব্যবসায়ীটিকে উক্ত কমান্ডার কাপড়-গলো তাঁর কাছে জমা দিতে বলেন, কিন্তু তিনি রাজী হন না। তার ফলে রাতিবেলা সেই ব্যবসায়ীর

মতামত

বাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং শিবির-বাসীদের বাইরে আসা বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ মানবের মধ্যে বিক্ষোভ ধুমায়িত হতে থাকে। গত চার-পাঁচ দিন আগে শিবিরে কাপড়

ঘরে দু-তিন জন মেরেকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এক গাঁট কম্বল কমান্ডারের নির্দেশেই গ্রামের একজনের বাড়ীতে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই চরিত্র

আলিপুর জেলের ঘটনা প্রসঙ্গে

কুখ্যাত আলিপুর জেল ঘটনার দিন আমি সকাল নয়টা নাগাদ জেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাইরে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ দাঁড়ানো দেখে আমার ওইরূপ কোন ঘটনার আশংকা হয়। পরে রেডিওর খবরে জানতে পারি যে মায় ছয় জন বন্দী মারা গেছেন। কিন্তু আমি জেলের ভিতরকার লোক মারফৎ খবর পাই যে ওই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ছয় জন মারা যান এবং সেদিন আরও তিরিশ-পঁচাত্তির জন নকশালপন্থী মারা যান। তই বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনকে দেখা-সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হচ্ছে না। “সরকারী নেতারা” যে যাই বলুক

না কেন এ ঘটনা কোন আচমকা ঘটনা নয়, এগুলি উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবেই করা হয়েছে। বর্তমান ভারতবর্ষে থানায় থানায় ও জেলে জেলে যেভাবে লাঠি পেটা করে, শরীর থেকে রক্ত বের করে নিয়ে নকশালপন্থী বন্দীদের বিকস্মণ করে ফেলা হচ্ছে, বুট দিয়ে মাড়ানোর ফলে পেরিটোনিয়াম ফেটে গিয়ে কত বন্দীর যে মৃত্যু হচ্ছে তার হিসাব বৃটিশ আমলের হিসাবকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনের সময়ও এ ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচার আর হয় নি।

এ পরিস্থিতিতে সংশোধনবাদী

“নেতা”দের চরিত্র কি দেখতে পাচ্ছি? তারা তদন্তের দাবী কবেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করতে চাইছেন এবং জনগণকে ভাঁওতা দিয়ে সংশোধনবাদের পক্ষে অটকে রাখতে চাইছেন। শাসক শ্রেণীর এরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের গণ-তান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত না করে তারা যথার্থীতি তাদের ঘৃণ্য সংশোধনবাদী চক্রান্ত শুরুর করে দিয়েছেন। সি পি এম-এর “গণ-শক্তি” তো সবার উপরে গিয়ে মৃত এবং আহত বিপ্লবী বন্দীদের নিজেদের, এস ইউ সির এবং আর এস পির বলে দাবি করে বসেছে ও এই ফাঁকে কিছু নাম কেনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের জেনে রাখা উচিত যে তদন্তের স্বরা এ সমস্যার কোন সমাধান হবে না। পদলিখ-হাজতে পিটিয়ে মারা নিয়ে এর আগেও তদন্ত হয়েছে কিন্তু তাতে কি এভাবে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড একটুকুও কমেছে? বরং এখন অহরহ এ ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং খবরের কাগজে তা “পদলিখ-নকশাল সংঘর্ষ” হিসাবে স্থান পাচ্ছে। একথা কি ওই সংশোধনবাদীরা জানে না? শুধু তাঁরা তদন্তের দাবি করছে যা শোষণশ্রেণীর দালালী ছাড়া আর কিছুই নয়।

আলিপুর জেলের হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। এবং এ-ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আরও ঘটবে, কারণ শোষণশ্রেণী যে তাদের সত্যিকারের শত্রুদের চিনে নিচ্ছে। সংশোধনবাদী দালালদের উপর আর নির্ভর করে না থেকে জনগণকে এই অত্যাচারের মোকাবিলা নিজেদেরই করতে হবে এবং তা হতে পারে কেবলমাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহ মারফৎ।

কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির পক্ষে
সন্তোষ মুখার্জী
পশ্চিমবঙ্গ নন-গেজেটেড
পদলিখ কর্মচারী সমিতি

ব্যাপারেও ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারের জন্য কমান্ডারিটির স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। কিন্তু এ গ্রামের ছেলেরা এই ঘটনা জেনে ফেলে এবং পনের দিন যখন কমান্ডারের পেটোয়া লোক কাপড়ের গাঁটটি নিতে আসে, গ্রামের যুবকরা তাকে ঘেরাও করে। কমান্ডার নিজে তখন ছুটে এসে অশ্রাব্য ভাষায় গ্রামবাসীদের গালাগালি দিতে থাকে এবং দুটি ছেলেকে শিবিরে ধরে নিয়ে গিয়ে অমানবিক অত্যাচার চালায়। একটি ছেলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সমস্ত গ্রামের মানব দল বেঁধে এই ঘটনার প্রতিবাদ করার জন্য শিবিরে গিয়ে কমান্ডারকে ঘেরাও করে। কমান্ডার ও তার পেটোয়া জেঁকরা রাইফেল ও রিভলবার বের করে জনতাকে গুলি করার ভয় দেখায়। এতে ভাগদেয়ে অরো ঘৃণ্য হতভিত্র পড়ে। জনসাধারণ আরো উত্তেজিত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত মহকুমা শাসক এসে জনতার রোষ থেকে কমান্ডারকে রক্ষা করেন। সেই রায়ে দৃষ্টিগত শিবির কমান্ডারিটি শিবির ছেড়ে চলে যান। সকলে সন্দেহ করছেন জেলা প্রশাসকরাই কায়দা করে লম্পট, দৃষ্টিগত নিজেদের জতভাইকে গোপনে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্বজিৎ সিংহ

মার্কসবাদের অবমাননা

মার্কসবাদী পার্টির পলিটবুরোর আহবান “আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এক হয়ে দাঁড়ও” (Rally to a man to frustrate aggression) এই আহবানটি বেদনাদায়কভাবে বিভ্রান্তিমূলক। এই পার্টিটি সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাচ্ছে এবং তজ্জন্য ইচ্ছাপূর্ণ ও অন্যান্য জায়গার ছাটাই শ্রমিকদের এবং রাজ্য সরকারের ছাটাই নেতৃবৃন্দের পুনর্বহাল করার দাবী করছে। সমর্থনটি কি শর্ত কলঙ্কিত? না, তাও নয়।

সরকারের দমননীতির খানিক ফিরিস্তি দিয়ে ট্যাক্সের বোঝা বাড়লে লোকের অসুবিধে হতে পারে ইত্যাদি বলার পর পলিটবুরো জনসাধারণকে অনুধাবন করতে চাইছে যে বাংলাদেশের মন্দির ও তথাকার অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন। অতএব এই যুদ্ধকে সফল করার জন্য সব কিছুই করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সমস্ত লোককে জড়ো করে আমলারা, মালিকপক্ষ ও সরকার বাতে জনবিরোধী পথ না নেয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

সংজনশীল মার্কসবাদের এক অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে এই দলিলাটি মহাত্মাজহান্নার বাঁধিয়ে রাখার মত। শ্রেণী সমঝোতার এতোবড় নিলঞ্জক নিদর্শন আর একটিও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

উদাহরণ আরো দেওয়া যায়। যেমন পাবলিক সেকটরে কিছু

কিছু দাবী মিটিয়ে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের সহযোগিতা আদায়ের সুপারিশ করা হয়েছে। চমৎকার নয় কি?

স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের জনগণ সংগ্রাম করছেন। সেই সংগ্রামে সমর্থন এক জিনিষ, মার্কসবাদ লেনিনবাদের নামে শ্রেণী-সমঝোতার রাজনীতি, যুদ্ধের নামে আর সবচেয়ে প্রচার আর এক। বড় বড় বুলির আড়ালে মার্কসবাদের অবমাননা থেকে বিরত হলেই আমরা যুগ্ম।

মানব দেব

অর্থনৈতিক দর্পণ

আপনার পরিচয় তেসরা ডিসেম্বর “অর্থনৈতিক দর্পণ” এর শরণার্থী নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই দাম বাড়ছে—এই প্রবন্ধটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

লেখকের জ্ঞানার্থে জানাই অনুরোধ। পাদক খরচ শ্রদ্ধা পদলিখ, সি আর পি বা মিলিটারী নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হবে রাষ্ট্রপতি ভবন ও রাজ-ভবনগুলির প্রেসিটজ বা স্ট্যাটাস রক্ষার্থে ব্যয়।

অর্থনীতির ভাষায় ভারত অনন্ত দেশ। ভারতের জনগণের প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ লোক অধীহার বা অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হয়। সন্তোষ মুখার্জী সেখানে কোন যুক্তিতে দরিদ্র দেশবাসী দিনের পর দিন তথাকথিত প্রেসিটজের মূল্য রক্ষার জন্য কর গণে যাবে?

শ্রীমতী গান্ধী “গরীবী হঠাৎ” স্পোগান দিয়ে নিবঁচনী যুদ্ধে জয়লাভ করেই গরীবী হঠাৎ জন চাপিয়েছেন। জনসাধারণ যখন কর দিতে বাধ্য থাকে (খাস সংবাদ-পত্র, মণি অর্ডার কমিশন, রেলের ভাড়া ইত্যাদি) তখন তারা আর গরীবী কোথায়? আর এই ভাবেই ইন্দিরা সরকার দেশের গরীবদের হঠাৎবেন?

তপন সান্যাল

পুলিশের হয়রানি

গত তেসরা ডিসেম্বর শনিবার বিকাল তিনটার সময় আমি যখন আপনাদের পত্রিকা বিক্রয় কাজে রত, পুলিশ হঠাৎ আমায় গ্রেপ্তার করে আমাকে হয়রানি করে। যখন সকল স্তরের মানব বাঁচর তাগিদে একা-বন্ধ হতে চেষ্টা করছে তখন মানবের মধ্যে বিভেদ বিভ্রান্তি আনার অপপ্রয়াসে কিছু মানব কষ্ট। তাদের থেকে সাবধান হওয়া প্রয়োজন আজকের দিনে। শিয়ালদহ বিক্রেতা হকার্স ইউনিয়নের মাধ্যমে অনশন আন্দোলনও চলছে দীর্ঘদিন ধরে এই বিরুদ্ধে। কিন্তু রেলওয়ে কল্লপক্ষ ও পুলিশ দিন দিন অনশনীয় মনোভাবের পরিচর দিয়ে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তুলে গরীব খেটে খাওয়া মানবের কোনও ক্রমে বেঁচে থাকার প্রয়াসকে ব্যাহত করছে।

রাবি ঘোষ

পুলিশ কর্মচারী সমিতির অবৈদন

বাংলাদেশে বিগত নয় মাস ধরে পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক চক্র গণতন্ত্র ও মানবিকতার উপর নজরী বিহীন পাশব আক্রমণ পরিচালনা করে চলেছে। লক্ষ মানবের খুন, পাইকারী নারী নির্যাতন ও এক কোটি শরণার্থীর করুণ কামা শক্তির দেশগুরুত্ব ও রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশেষ সাদা জাগাতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে, পৃথিবীর বহুতম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ভারতবর্ষ, বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে তার প্রতি ন্যস্ত গুরুতর দায়িত্ব অত্যন্ত সহসিকতার সংগে সম্পন্ন করতে উদ্যত। এটা কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, পরন্তু গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ নয় বলেই আমরা মনে করি।

দেশ ও জাতি বর্তমানে এক কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেশের প্রতিটি গণতন্ত্রী মানব এক প্রাণ হয়ে যে কোন প্রকার আত্মত্যাগে কৃতসংকল্প হয়ে জাতির সেবা করবে বলে আমরা আশা করি। এই সংকট মুহুর্তে

দেশের পদলিখ বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমিতি আশা করে, পশ্চিম বাংলার প্রতিটি পদলিখ কর্মী শৃংখলা বজায় রেখে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অতন্ত্র প্রহরী হিসাবে কাজ করবে।

বরখাস্ত কর্মী হিসাবে, প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসাবে, এই ঐতিহাসিক মুহুর্তে প্রত্যক্ষভাবে দেশসেবার সদ্ব্যোগ থেকে বঞ্চিত থাকা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সরকার সদ্ব্যোগ দিলে, আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য যে কোন ভাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

ভারত সরকার কর্তৃক বাংলা-দেশকে স্বীকৃতি দেওয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই উপলক্ষে এই সমিতি স্বাধীন বাংলাদেশকে অভিনন্দন ও ভারত সরকারের এই বলিষ্ঠ নীতিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির পক্ষে
সন্তোষ মুখার্জী
পশ্চিমবঙ্গ নন-গেজেটেড
পদলিখ কর্মচারী সমিতি

এস ডেক্সটরাও

ভারত দর্শন

বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারতের জনগণ

(দুর্গার পূর্ববন্ধক)

দুই সপ্তাহ আগে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক গোষ্ঠী মরিয়্যাহে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের কাছে বাংলাদেশের সার্বভৌম, স্বাধিকারের দাবীকে আড়াল করার এবং বাংলা-দেশের মুক্তি সংগ্রামকে ভারতের হস্তক্ষেপ বলে দেখানোর অপচেষ্টার পাকিস্তানের সামরিক শাসক গোষ্ঠী এই সমস্যাকে পাক-ভারত রাজনৈতিক মীমাংসার সমস্যা বলে দেখাতে চেয়েছে।

বলাবাহুল্য ভারতের জনগণ বিশ্বের প্রতি দেশেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুদয় ও গণ-তান্ত্রিক অধিকার দমনের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী ও প্রভুত্ববাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চিরদিন সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক প্রয়োজন কিংবা ক্রোড়বদ্ধ কূটনীতিক নিয়ম-কানূনের প্রতি সরকারী বাধ্য-বাহকতা এবং ভারতের জনগণের মনোভবের মধ্যে মিল দেখা যায় নি। যেমন কোরিয়া কিউবা অথবা ভিয়েতনামের বীর সংগ্রামী জনগণের প্রতি ভারতের জনগণের মনোভাব ভারতের সরকারী নীতির মধ্যে প্রতিফলিত হয় নি।

কিন্তু বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে ভারতের জনগণ দলমত নির্বিশেষে ভারত সরকারের দৃঢ়তা অবলম্বনের নীতিকে প্রবল সমর্থন জানিয়েছেন। ফলে ভারত সরকার পাকিস্তানের আক্রমণের বিরুদ্ধে যে সব কল্যাণ অবলম্বন করেছেন, সবগুলিই ভারতের জনগণের সমর্থনপূর্ণ।

ভারত সরকারের দৃঢ় মনোভাব অবলম্বনের প্রধান কারণ জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় জনগণের এই কুঠাঠানী সমর্থন। পশ্চিমে মার্চের পর দ্রুতবেগে যে ঘটনাবলি ঘটে চলেছে, বাংলা-দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিসংগ্রামীদের অশেষ দৃঢ় কণ্ঠস্বরেও অটল সংগ্রামী মনোভাব, পশ্চিম পাকিস্তানী অধা-উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাঙালী জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী যেভাবে পূর্ণ-স্বাধীনতার অলঙ্ঘ্য দাবীতে পরিণত হয়েছে, সমস্ত ঘটনা পরস্পর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ভারতের জনগণ অনেক আগেই ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদান এবং অস্ত্র-

শস্ত্র সামরিক সাহায্যসহ সর্বপ্রকার সাহায্য দেবার দাবী উত্থাপন করে-ছিলেন।

ভারতের জনগণের মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের জনসাধারণ সর্বপ্রথম এ দাবী উত্থাপন করেছিলেন।

উনিশশ একাত্তর সালের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কক্ষ থেকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম “সমস্ত রকম বর্ধক নিয়েও বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনী ও সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র সহ সর্বপ্রকার সহায়তাদানের” দাবী উত্থাপিত হয়েছিল। তখন ডেমো-ক্র্যাটিক সরকার নিতান্ত মৃদু-রক্ষার জন্যে যে জেলো প্রস্তাব এনেছিলেন তা স্থগিত রাখতে হয়

বিদেশ দর্শন

ভারত-বাংলা দেশ সম্পর্ক

(দুর্গার পূর্ববন্ধক)

বাংলা দেশের যুদ্ধ শেষ পর্বতে পৌঁছেছে। যখন এই লেখা লিখছি সেই সময় ভারতীয় সেনা ও মুক্তি বাহিনী ঢাকা শহরের খুবই কাছে জয়দেবপুরে আঘাত হানছে। আজকের প্রশ্ন রাজধানীর পতন হবে নম, কখন? পশ্চাৎ, যমুনা, মেঘনায় পাকিস্তানী সূর্য-আজ অস্তমিত।

যে এক কোটি মানুষ গত পশ্চিমে মার্চের পর দেশ ছেড়ে ভারতে আসেন এবং যে অসংখ্য মানুষ আসেন নি তাঁদের সকলের জীবনেই এক মহামহত্ব উপস্থিত। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী শাসনের অবশ্যম্ভাবী অবসানে তাঁরা স্বভাবতই উৎফুল্ল। প্রতিবেশী ভারতের সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি সাফল্যকে তাঁরা নিজেদের সাফল্য বলে মনে করেছেন; যশো-হর, কুষ্টিয়া, জামালপুর ময়মনসিংহ প্রতিটি ঘাঁটির পতনকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন “জয় বাংলা”, “ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী দীর্ঘ-জীবী হোক” ইত্যাদি ধ্বনিতে। এক অপূর্ণ মেসবন্ধনে কোথায় উড়ে গেছে ক্লান্তিকর বোয়িংস এবং জিহ্মা সাহেবের “টু নেশন” থিয়েটারী।

শ্রদ্ধাঞ্জলি ওপার বাংলার মানুষের

এবং শেষ পর্বতে বিরোধী দলের প্রস্তাবিত “সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সহ সর্বপ্রকার সাহায্যদানের” প্রস্তাবটী গ্রহণ করা হয়। প্রচণ্ড শত্রুতা-মূলক পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সৈদীন কংগ্রেস লীগ পরিচালিত ডেমো-ক্র্যাটিক সরকার সি পি এম নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে বাংলা দেশের সংগ্রামের প্রতি একমতমূলক প্রস্তাব পশ্চিম-বঙ্গ বিধানসভায় গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

এখনই বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দলমত নির্বিশেষে আবেলবদ্ধ বণিতার প্রবল সমর্থন রূপে পেরেছিল, ভাষা পেরেছিল।

পরবর্তীকালে সারা ভারতে এই মনোভাব প্রবলবেগে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নানা রুটী বিচ্যুতি সত্ত্বেও ভারত সরকার ধীরে ধীরে জনগণের তীব্র মনোভাব উপলব্ধি করতে থাকেন। শরণার্থী আগমনে সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গ আরো কঠিনতর অবস্থায় উপনীত হলেও পশ্চিমবঙ্গবাসী এই দৃঢ় ক্রেশ ভোগকে আপনজনের প্রয়োজন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সরকারীভাবে বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকার যতই স্বীকৃতি দেন তাঁর দাবী উত্থাপন করেছেন।

ইতিমধ্যে, বাংলাদেশের মুক্তি

সংগ্রামীরা প্রথম ধাক্কা কাট্টিরে আবার দ্রুতবেগে সংগ্রামের উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং একা-দিকমে এলাকার পর এলাকায় ইয়া-হিমার জঙ্গী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করে তুলেছিলেন।

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ / প্রশমিত করতে অপারগ সামরিক চক্র তখন একদিকে আমেরিকার মারফতে বাংলাদেশের কোন কোন নেতাকে আশ্রয়দান করে ইয়াহিয়া খানের (নিউইয়র্কে) অন্যদিকে বিশ্বের দরবারে “ভারতের সূচী” বলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে দেখাতে চেষ্টা করে।

এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা দেখে পাক-চক্র ভারতের উপর তেসরা ডিসেম্বর অতর্কিতে আক্রমণ চালায় ও যুদ্ধ ঘোষণা করে।

বলা বাহুল্য বাংলা দেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে ভারতীয় জন-মতের বিপুল সমর্থন কোনো রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীকে ভারতের জওয়ান ও বাংলা দেশের মুক্তি-সংগ্রামীদের বোধে সন্তোষকে, মিছেদের সাফল্য বলে চিত্রিত করার উদ্যোগ নিতে দেখা গিয়েছে। এটা লজ্জার কথা।

ভারতীয় জনগণের মিলিত সমর্থনকে এভাবে দলীয় স্বার্থের

জন্যে ভেঙে দেবার বা ছোট করে দেখার হীনমন্যতা বতই বেদনা-দায়ক।

এ যেন যুদ্ধের সম্বোধন বাজারে দাম চড়িয়ে দেবার অপচেষ্টার মত রাজনৈতিক বাজারে খিঁকুত, কদর-হীন মার্কেটের দর চড়িয়ে দেবার মত ঠেকে।

কিন্তু ভারতের জনগণ অভিজ্ঞতার কণ্ঠস্বরে যাচাই করে শিখেছেন কে খাটী, কে মেকী। না হলে পূর্ণবাটী সালের বিশেষ অক্টোবর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থি-তিতে যে দল জনসমর্থনের প্যারেড করতে পেরেছিলেন, ছেবাটী সালের প্রবল খাদ্য আন্দোলন এবং সাত-বাটী সালের সাধারণ নির্বাচনে সে দলকে ক্ষমতার আসন থেকে বিতা-ড়িত হতে হত না।

চালাকি দিয়ে কোন মহৎ কার্য সম্পাদন করা যায় না, কংগ্রেসটী রাজনৈতিক দল যদি একথা বুঝে চলেন তাহলে, সারাবারতের জন-গণের একা থেকে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করে লাভবান হবেন। অন্যথা আবার উনিশশো সাতবাটীর স্বর্ণের জেরে পুনরাবিসর্জিত “সূচী” জনগণের ঐক্য ও লক্ষ্যকে যারা রক্ষা করে চলবেন তারই ভবিষ্যতে সম্ভাবনার নিঃসন্দেহ অধিকারী।

শত্রু করেন তবে তা ওপার বাংলার মানুষ বেশীদিন সহ্য করবেন না। প্রসঙ্গত শোনা যাচ্ছে অনেক দেশী ব্যবসায়ের নাকি ওপার বাংলায় কত মুনাকা করা যাবে তার হিসাব এর মধ্যেই শুরু করেছেন। এই ব্যাপার যদি চলতে দেওয়া হয়, এদের কার্য-কলাপ যদি রোধ না করা হয় তাহলে অচিরেই বাংলাদেশের মানুষ দেখবেন যে তাঁরা পাকিস্তানী শোষণের হাত থেকে ভারতীয় শোষণের হাতে গিয়ে পড়েছেন। এবং এর ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে তা আজ করুণই অজানা নয়। যদি

(শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায়)

ভারত বিরোধী প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠায় পর)

যশোরের সাধারণ মানুষের কাছে বার-বার জানতে চায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তেমনদের ভর দেখাচ্ছে কি না।

জটিল সামরিক অফিসার আমাকে যশোর শহরে জানালেন, যে বিদেশী সাংবাদিকদের বেশীর ভাগই সাংবাদিকতার নামে গণ্ডগোল বৃদ্ধি চালাবার চেষ্টা করছে বলে তাদের কাছে অভিজ্ঞ এসেছে। তবে ভারতীয় সামরিক বাহিনী তার সত্যতা যাচাই করে দেখবার চেষ্টা করছেন এবং সেইজন্য কোন সফরে ভারতীয় সাংবাদিকরা যে সন্নিবিষ্ট পাচ্ছে বিদেশী সাংবাদিক-দের তা দেওয়া হবে কি না এখন বিচার্য বিষয়।

হবে যে পাকিস্তানের পরাজয় সাম-য়িক ভাবে অনেকাংশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে ঘটলেও তা সম্ভব হয়েছে বাংলা দেশের মান-দয়ের জন্যই যারা বারবারে জঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে রখে দাঁড়িয়ে বর্তমান অবস্থার পথ পরিষ্কার করে দেয়। এবং যে মনুষ্য একবার প্রতি-বাদ করেছে সে নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে যে আবার নিশ্চয় রখে দাঁড়াবে আশা করি দিল্লী এই কথা সর্বদা মনে রাখবে।

এই কথাগুলি লিখছি কোন অমূলক সন্দেহ থেকে নয়। সংবাদে প্রকাশ যে ভারত সরকার নিজেদের অনেক পদস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে পাঠাবেন স্বাধীন সরকারকে প্রশা-সনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে সহায় করতে। এই আমলাবর্গ আমাদের পরিচিত। যেভাবে এরা নিজেদের দেশ শাসন করেছেন এবং করছেন সেইভাবে এবং সেই মান-সিকতা নিয়ে যদি এরা বাংলাদেশে যন তবে শ্রদ্ধা নিজেরা নন সমস্ত ভারতবাসীকে একটি অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলবেন। যে সব আমলা যাবেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই বাড়ী অতীতের পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশে। তবে সেই কারণবশত যদি তাঁরা স্বীয় স্বভাব অনবদ্য শাসনের নামে যথেষ্টাচার

কাছেই বর্তমান চরম আনন্দের দিন নয়, আনন্দের দিন এপার বাংলার মানুষের কাছেও। দেশভাগজনিত কুংকড়ে যাওয়া ভাবটী-শুদ্ধমাত্র অর্থনৈতিক নয়, মানসিকতার দিক থেকেও—যেন অনেকাংশে কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে। হোক না বাংলা দেশ একটি স্বতন্ত্র দেশ। গত নয় মাসের নৈকট্যের ফলে আজ স্বাধীন বাংলা দেশ কোন বৈরী মনোভাবসম্পন্ন বিদেশ থাকবে না, হবে সম্মান, সহৃদয় প্রতিবেশী।

অন্তত সেইটাই আশা করা যায় এবং সেইটাই কাম্য। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের আনন্দ বতই বেশী হোক না কেন তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। সীমিত পারে আর কোন শত্রু নেই এই জ্ঞানোন্মুত যে স্বস্তি, যে আনন্দ তা অনেক বেশী স্থায়ী হতে বাধ্য।

এবং এই অবস্থা স্থায়ী করটাই হবে ভারত সরকারের আসল কর্তব্য। দেশ পুনর্গঠনের ব্যাপারে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভারতের সাহায্যের নিশ্চয় প্রয়োজন হবে এবং মিত্র রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের সেই সহায় দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু যেন কোনসময় আমরা এমন কিছু না করি যাতে বাংলা দেশের মানুষ আঘাত পায়, মনে করে যে দিল্লী মোড়লী করছে। মনে রাখতে

শিল্প প্রদর্শনী

কমলকুমার মজুমদার

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “যে দেখেছে সে ঐক্যেছে”

যে এই কথা অস্বাদ্য বাগীচের অঙ্কিত কালী চিত্র দর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন। সে এবং ঐ উক্তি, আমরা দুইটি ক্রিয়াপদ পাই, দেখা, আঁকা। ইহা বেদ বাক্য। যে তবু কিস্তি, দেখিলেই যে আঁকিতে, আঁকিতে পারিলেই যে দেখিতে সক্ষম হইবে, এই জ্ঞান বঙ্গসী না। তবে অঙ্কন বিদ্যা আমাদের প্রথম লাভ করিতে হয়, দেখা পূর্বজন্মের সন্ধান। আর এক আছে, দেখার জনই এমন হয় শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, ঘোর উন্মাদনা আসিল, যে তখনই সিদ্ধি হইল।

অঙ্কন তারিখের পাঠ বড় জটিল, এই বিদ্যার দুই দিকে দেখা; প্রথম কতক লাইন, ইহা কি তাজব—উহা এক বস্তুবিষয়ে যে এবং উহা কোথায় আছে, যাহা হয় স্থানবাচক। এই রহস্যময় সম্পর্ক, ভাল এখানে কিস্তি “কেন” পরম্পরা তুলিয়া, ইহাতে শিশু ভাবান্তর রহে, ঐ অনন্মান না; উহা মানবের নিখাদ বিস্মাস তৃপ্ত হইয়াছে; ইহা সন্দর। কেশব সেন বলিয়াছেন, যার আরম্ভ সত্য, তিনিই সন্দর, ইহা পদ্য আধ্যাত্মিক। এই কবিত্বের এক বৈচিত্র্য এখানে আছে—এ দুই-এর সংযোগ যখন হইতে; যে এবং ঐ দুইকে, আমরা জানিয়াছি, কত দৃষ্টিতেই, ক্রমে বিচার, নৈতিকতা, আসিয়া অধিক, বড় মনোজ্ঞ, জট লাভ করিয়াছে—শব্দময় আনন্দভূমিক ও শীষ-টান ইহা নয়—কনট্রাস্ট সিন্থেসিস এভাবে অনেক ফেরতাই। আমরা আরও শুনিয়াছি আঁরি পোয়া-স্কারে, যিনি কালবিজ্ঞানী গণিতের অর্থাৎ নৈরায়িক, কহেন : কাগজে দুই ডাইমেনসন ব্যতীত হইতে পারে না, নিশ্চয় ঠিক ইহা তখনই যে ক্ষেত্রে ফ্রেম নিজেই আর্ট, ইহা-তেই আর্ট হয় আধ্যাত্মিক। কি পর্যন্ত রোমাঞ্চকর! কেন না উহা মায়ী সৃষ্টি করে, এমন ইহার রহস্য যে, অশ্বত্থবাদীরা এই পরমতত্ত্বকে যুক্তি অর্থে চিন্তা করে : “যথা চিত্র-পটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুর্দশ... ১২... যথা ধোতোষ্যট্টতশ্চ লাঙ্ঘিতা রঞ্জিতঃ পটঃ। ২ (পঞ্চদশী-চিত্রদশী)

আমরা রঙ দ্বারা ছবি অঙ্কিত করিয়া থাকি, যে এই হলফ না কাটিয়া, বৃথা বাহ্য, ইহা স্বস্তির যে রঙে ছবি ভরাইয়া থাকি; এরূপ কাজে শব্দ বিষয়ের সম্পর্ক ছেঁদ করার, মৌখিক ভাবেই, অনেকটা ম্যাপেতে যেমন, চেহারাতে দেখা দিয়া থাকে। চিত্রজগত সন্তোষে, সমগ্র হওয়ার যে খেঁজিয়া উঠিবে না, অথচ আমাদের সং ইচ্ছা রহে। এখন এই প্রকারের ইচ্ছা বড় কম নহে, যাহা দুর্লভ এবং যাহা হয় প্রশংসনীয়! ইহা ধ্রুব আমাদের সমক্ষে লভ্য নাই, ইতালী নাই, যাহা আমাদের মধ্যে চেতনা, ঘটাতে পারিবে! (এখানে সাহিত্যে কিছ্ সন্নিধা

আছে) ছাপা ছবি পর্ষদেক্ষেপে আমরা উৎসাহিত হই; অন্য সন্যোগ রহিত। ইহাও জ্ঞান প্রয়োজন নব্ব আর্ট বড় কঠিন (আমাদের দেশে, অনেকে ইহারা প্রায় লেখক এবং মহানুভব, নব্য আর্ট অনুপ্রেরিত হইয়া ছবি অঙ্কনে কীর্তি নিমিত্ত, তুলি ঠেকাইলেই প্রতিভা বিকীরণ হইবে বিশ্বাস করত, ছবি আঁকিলেন—হায় আর্ট কত সহজ মৈসিন কত জটিল হইতেছে! ভিক্টর হুগো, বা গতিয়ে, বা গৌকুরারা যাহা ইচ্ছা করিলে করিতে পারিতেন, কিস্তি তেমন কিছ্ করেন নাই—প্রথম চৌধুরীতে আছে : পিতা পত্রকে প্রশ্ন করিলেন, গীতা সম্পর্কে লিখিতেছ, গীতা পড়িয়াছ? পত্র কহিল, পড়ি নাই বলিয়াই ত লিখিতে পারিতেছি। (সিক)। আমাদের নিকট সচরাচর ছবির কেন্দ্র ছাড়িয়া আশপাশ নজর গ্রাহ্য হইয়া থাকে, আবার কখনও এবং মধ্যস্থিত, কেন্দ্র, কিছ্ আকৃষ্ট করে, যাহা ঘটনা থাকে সেজান ও ভান গগের বেলাতে, আমরা নির্মাণ এই কার্য ব্যবহাতে উৎসুক হই না, উহাই একা নক্স চং নহে, উহা ঘটনার একাংশ; হ্রোদীর চাবকে ডুইং, গতির সহিত ‘মাসে’-এর কি অভাবনীয় সম্পর্ক, কালীঘাটের ডুইং-এ কি ডোলফ, নিশ্চয় আমাদের কাছে ওতপ্রোত। আমরা মাস ডুলিয়া যাই, ডোলফকে আমল দিই না—ফ্রেম আছে তাহা মনে থাকে না—যাহা আলোর বৈচিত্র্যতা বটে।

অবনী ঠাকুর দারুণ সংজ্ঞায়িত করিয়াছেন শব্দহীনতাই ছবি ইহা আমাদের কখনও সচেতন করে নাই। ইহাতে বিচার রহিয়াছে; ছবি আলোর ঘটনা, যে ইহা নিছক পারিপার্শ্বিকতা না। ফরাসী মাস্টার-রা আঙুলে হইতে ফেব-রা বাহাই করেন, তাহা আলোর ব্যবহার, ডুইং ও রঙ লইয়া ভারী তর্ক আছে, যাহা মূলত, ভাবত, ঐ কথাই। শব্দ নহে, গল্প নহে, কাব্য যাহা অহলার পরিণতি। গগন-বাবু আর্টের প্রথম সূত্র, আলোর চেহারা লইয়া কাজ করিয়াছেন। আমরা নিঃসন্দেহই হই যে, ফরাসী কীর্তির যে রশ চালনা-কায়দা, ও হ্রোনোরা-কে চিত্রিতকারী যে ইতালীয় ‘মাতিয়ে’, (ইহা জ্য কাস্‌ লিখিত! সিচরেশন ডি ল্যারট মডার্ন ১২১) এবং সেজান মহা খেদে এসিল রেরণারকে বলেন, ‘আমাতে যাহা রহিত তাহা হয় উপলব্ধি, হয়ত কখনও উহা আসিত কিস্তি এখন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সেই পদ্য অবস্থাতে পৌঁছানর পূর্বেই হয়ত আমার কাল হইবে, যাহা যে, ভিনিসিয়ান-দের মত উপলব্ধি। (সূত্র পল কাজান—এমিলে বার্নার্ড) ভিনিসিয়ান শব্দেত আমরা রঙ বর্ষি আলোই অনুভব করিয়া থাকি। ইহাতে এই আসে, সেদিন কি মহৎ সেদিন আপনার

ভুক্তি, অজ্ঞান রঙ ও সমসাময়িকতার রম্ভস্বাস গতির মধ্যে চিনিতে পারিলেন, যাহা দ্বারা এক সত্য আবিষ্কৃত হইল; যে রিলিফ পম্বা বাজে; ‘ভাইরেশন’, খোলা মাঠে যাহা আলো, তাহাই নিছক, এসকল সত্য, আলো সাক্ষাতেই ঘটিল। নিজের কাজের মধ্যেই এক অনৈসর্গিক সচেতনতা লাভ হয়, আমাদের দেশ অজ্ঞান আলো, হাজার রকমে রঙ ঘর্ষাইয়া উঠে, অকাশ সবুজ হয়, চাঁদ লাল, গগ্নার জল ফরসা, এমন কি গোখলিকে লসন করিয়াও, যাহাতে কনে দেখা আলোনির্ধারণ হয়, আমরা আস্তে কিছ্ই করিলাম না, এইরূপ বহু কথা বলা যায়; ভাল এখন, আমরা আলো আরোপ করিয়া থাকি, অথচ টান-পোড়েন ঠিক হয় না; এই মনেতে রাখা দরকার বটে, যে, এক রঙ সমতল ক্ষেত্রে, কাগজ ক্যানভাসের, অকাটা বা দর্ভেদাতা ভাঙাবে, মানে যে প্রশস্ত স্থান নির্মাণ করিবে, আর রঙ আলোকে খেলিতে দিবে, এই বাস্তবতা; আমরা তাহা জানিয়া রাখি কিস্তি প্রয়োগ কুশলতার খবর নাই। আমাদের রঙ উহার নাম রূপ ভাঙিতে পারে না। যে উহারে কিশ্ব করিতে পারে না। ছোট করিয়া বলা যায়, সাধারণ ব্যাপারকে জিনিষকে বিশেষ করা হয়, নানান চিত্রে, রাস্তা ঘাটে, সাবধান, যেমন খাঁড়িতে, চোখ-আঁকা, তেমনি নৌকাতে, আমরা বোসেফ বৈরাগী (পদবী নহে) কহিয়াছিল, নৌকা এক রাস্তা বটে, তরসারে; চোখ জনাই দেয়, আবার জনজন্তুরা সম্মত করে।

এইখানে এই প্রসঙ্গে অনেক নিশ্চয় হয়, আলতামিরা-র চিত্র হইতে। অদ্যকার মধ্যে যে মহত্রে ফ্রেম আসিল—সেই দিন প্রকৃতিতে, চরাচরে অনেক পরিবর্তন সূচীত হইল, পম্ব আঁর প্রাচীরের যাহা তাহাতে ফরাক দেখাদিষ্ট, যে উহা নিজেই আপন আদিমতা ত্যাগ করত, এক বিরাট গভীর রহস্যের, হারমণির বাচক বা অংশ উদ্ভূত হইল। ঐ ফ্রেমই সমতলের দর্ভেদাতা সৃষ্টি করে, যাহাকে ভনগগ আর এক ভাবে বলিলেন, “ছবি কি? কেহ যাহা ভাবিতে পারে এবং যাহা সে করিতে পারে,—ইতিমধ্যে লৌহ প্রাচীর অবস্থিত তাহা ভেদ করত এক পথ সৃষ্টি করার কাজ।” এখন তাহার উক্তি যে “পারে” শব্দ আছে, সেই সূত্রেই আমরা দর্ভেদাতা উল্লেখ করি।

প্রদর্শনী

প্রশান্ত রায় কৃত চিত্র প্রদর্শনী। একাডেমী অফ ফাইন আর্টস। এই-খানে একটি কথা বারংবার মনে হইবে যে, শিল্পী, প্রতি বিষয় মন দিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; উহাতে অনেক কার্ড স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাতে পরিচ্ছন্ন ন্যাচারলিস্টিক, যোগদল প্রায়ই কালোর তারতম্য; ইহাতে, কিছ্

অবনীবাবুর কাজ যাহারে ওরিয়েন্টাল আর্ট বলা হয়, ইহাতে গগন-বাবু রীতির কাজ, গগনবাবুকে আমরা, যদিও তিনি ঐ স্কুলের শ্রেণীভুক্ত হন, বেশ আলাদা করিয়া ব্যক্তিগত চেষ্টা করি; যে মানবের ভাবের বই-অংশ ছবি, এখানে ছবি-গলি ভারী মজার, খুব সন্দর, আমাদের দেশে যে বইয়ের ছবি আঁকার ধারা আছে, পৃথি হইতে মদ্রণে, তাহা তিনি মান্য করিয়াছেন, তাহার একটি মাত্র কার্টুন : “পটিকট ওয়াপাস দো” এখানে আছে। যেমন একদিকে ভারী ডিনার-মাতান গল্প করা যায়, তেমনি, কেহ যদি নিঃসঙ্গতার মধ্যে ঐ গল্প করে! অবনীবাবু ধরণের কাজ পরিষ্কার ধারা মনি-রাছে; তবু তেঁস্তিরিশ নং কমলা হলদের, অনেকটা গামবোজ, উপরেতে লাইনের কাজটি, অন্যত্রে এরূপ ধরণ, সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিবেন। ইহা প্রসঙ্গত যে, রিয়ালিষ্টিক, অর্থাৎ আদ্য জিওমেট্রিক, মানে ভারতীয় ধারণার তারতম্য, (বা সহ-মপের লাইন নাই) যাহা আমরা তুলির বহু ফেরতাই—এ পাই যাহা সাদা কাগজ হইলে লেখিয়া উঠে, অনেক ক্ষেত্রে অবনীবাবুতে যেমন দেখা যায়। প্রশান্তবাবুকে খ্রীষ্টীদর্শী প্রতিমার ভাষণ দৃশ্যটি বড় বিষম মতি করিয়াছে, সরল-মতি হিন্দুকে যেমন করে, সে যদি

সেন-র্যালো

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

কেরা বিভিন্ন পরিচয় মারফৎ ঘোষণা করেছিলেন যে, উপযুক্ত বাজারের অভাব, অর্থাৎ বাজার, কাঁচামালের অভাব এবং শিল্পে মন্দার জন্য কারখানায় ক্রোজার ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ক্রোজারের জন্য প্রমিক কর্মচারীরা দায়ী নন, দায়ী সরকারের শিল্পনীতি এবং মালিকের মনফা ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী মনোভাব। সেন র্যালো, সেনপণ্ডিত এ্যান-সিলারী প্রভৃতি কারখানাগুলিতে মোট প্রায় পাঁচ হাজারের মতো কর্মী দীর্ঘ নয় মাস যাবৎ সংগ্রাম করে চলেছেন।

বন্ধ কারখানা খোলার ব্যাপারে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে দাবী জানালে, তিনি তার প্রত্যুত্তরে বলেন : “প্রমিকদের উনিশশো সাতবার্টি সলের পূর্ববস্থায় ফিরে যেতে হবে।”—অর্থাৎ যন্ত্রফল্ট আমলে এরা প্রমিক হিসেবে যে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে এসেছেন, এখন আর তা দেওয়া সম্ভব নয়। বেসরকারী সূত্রে খবর পাওয়া গেছে, কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থীদের দিয়ে এখানে পল্টা ইউনিয়ন তৈরীর চেষ্টা চলছে এবং প্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ভাঙন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজপাল ডায়াস সাহেব কিছ্

খৃষ্টম্ গ্রহণ করে তখনও যেমন মধুসূদনকে। ঐ ভাষণের দৃশ্য একাধিক, ছোট পোস্টকার্ড সাইজে এমন একটি করণ দৃশ্য আছে, এখানে আঙ্গুর ভাগ আর কালোর ভাগ সূচীকৃত, যে যাহার সংযোগ স্থলে কেন্দ্রে, একটি আর্চ, যাহার রঙ গোলাপী জাতীয় ফিকে যাহা প্রতিমা, যে এবং এই বর্চের উল্টা মানে নীচে হলদেটে, ওকার গোছ আর একটি আর্চ স্থানকে জড়িয়া আছে, যাহা তুর্বাড়ি দুইটি, ইহা ইলেকট্রিক তবুড়ী, কিস্তি ইহার ছটা ব্যবহৃত হয় নাই—ইহা মনে রাখার। আলোর বেধের দিক হইতে গগনবাবু তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছেন (যেমন ইতঃপূর্বে শূভো-বাবুকে তাহার, গগনবাবুর ছবির প্যাটার্ন আকৃষ্ট করে) এখানে বলা যায়, প্রায় ঐ রীতির ছবিতে প্রশান্তবাবু একটি বাঁকা কোণ (এ্যাংগল) গ্রহণ করিয়াছেন, সোজা আনন্দভূমিক ও শীষটান (হোরাইজন-টল ও ভারটিকাল সম্মত) হইলে ভাল হইত ঐ সব চিত্রে; যেহেতু মায়ী ঘটাইতে তিনি জানেন, যেমন সাতচল্লিশ-এ, একপাশেতে আঙ্গুর দারুণ লক্ষ্য দিয়াছে, এবং চোদ্দ নং মন্দিরের চুড়ার, অমলকে, যে বর্তমানবৎ টোনাল তারতম্য এবং নীচে স্টাইলাজ তারতম্য যাহা স্টেন সূচনার, এই দুইয়ের মিল স্কলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তাহার নিকট আমরা ফর্মবদ্ধ কাজ দেখার আশা করি।

দিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আগামী পনেরোদিনের মধ্যে সমস্ত বন্ধ কারখানা খুলে দেবেন। কিস্তি তাঁর সেই ঘোষণার পরে অর্জিত দুই মাস অতিক্রম হয়ে গেল, তবুও কেন ফল হল না।

অথচ মালিকরা বছরে বছরে সরকারী অনুদান পাচ্ছেন এবং অই আর সির পক্ষ থেকে বহিঃলক্ষ টাকা পেয়েছেন, তাতেও কি চাহিদা মিটেছে না?

অন্যদিকে দেশে এখন জরুরী অবস্থা। জাতির স্বার্থে সংহতিই মূল প্রশ্ন। সুতরাং এই অনাহার, বেকার, ছাটাই প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের জ্বালান নিয়ে প্রতিরক্ষার কাজে তারা কোন উৎসাহে এগিয়ে আসবেন?

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

চাঁদার হার

বার্ষিক পনেরো টাকা

ত্রৈমাসিক ছয় টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা :

৬১, ষ্ট্র লেন, কলি-১০

বহুরূপী অপরাজিতা

(দর্পণের সমালোচক)

বহুরূপী আরেকটি নাটক, নাম অপরাজিতা।

একটি মেয়ে, অপরাজিতা রায় এক নির্জন সম্মান বিজন ঘরে একা একা কথার ঢেউ তুলেছেন। জন্মোত্তর শৈশব থেকে বিবাহোত্তর যৌবন পর্যন্ত কিছু স্মৃতি, কিছু ভাবনা আর কিছু জ্বালা—এই নিয়ে একটি শিকড়হীন সমাজ-বিশ্লেষণহীন, কিছু বিচ্ছিন্ন এবং ভগ্ন জীবন অভিজ্ঞতার গল্প শোনাবেন বলে তিনি দর্শকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যদিও এই অপরাজিতা নামে মেয়েটির মধ্যবিত্ত পরিবার ভুক্তির একটি সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়, তবুও এই সমাজের গর্ভে থেকেও যে তিনি আশ্রয়হীনা, তার জীবনের সর্বতোগাতিকে তিনি যে কিছুতেই কোন পরিবেশ ধরে রাখতে পারেন না, সেই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কাহিনীটি সেদিন আড়াই ঘণ্টা ধরে আমাদের শুনতে হল।

অপরাজিতা স্বামী . বিচ্ছিন্ন, কেননা উচ্ছৃঙ্খল, অন্যদিকে দাদা বৌদির আভিজাতিক ভাড়াটিয়া তার পছন্দ নয়, মস্তি পীসির উপর তার তার ভীষণ রাগ, কেন না তিনিই নাকি অপরাজিতাকে উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

তবুও সে তার মনের আশ্রয় পেয়েছে ছেলেবেলার ঝগড়ার সঙ্গে, বিয়ের পর দেওর অমলের সঙ্গে, আপাতত দাদার ছেলে বাবুন্ট, আর সজীবদার সঙ্গে। কিন্তু ঘটনা কার্যকারণে সে আশ্রয় টিকে থাকলনা, অর্থাৎ অপরাজিতা আশ্রয়হীনা, অর্থাৎ যে অবস্থায় দিয়ে নাটকের শুরুর সেই অবস্থায়ই নাটকের শেষ।

নাট্যকার নীতিশ সেন এই মেয়ে-

টির অবস্থায় ক্ষয়িষ্ণুতা, ব্যর্থতা, বিপ্লবতা, প্লানি, দিয়ে দর্শককে একটা পটভূমিতে অনভাবনার বক খাড়া করে বাড়ী ফিরিয়েছিলেন। অথচ তিনি এমনই চাতুরীর সঙ্গে পাঁচ মিশেলী সাম্প্রতিক ঘটনা-বলীর সাম্মান্য মাত্রা জালে দর্শকদের এমন আচ্ছন্ন করেছেন যে তারা জানতেও পারবেন না কোনখান দিয়ে নাটকের সরলতা গরল হয়ে তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে।

অর্থাৎ একটু খানি বাঙাল-ঘটির সস্তা ব্যঙ্গ একটুখানি রাজনীতি, একটু পদলিঙ্গের কথা, একটু খুন খারাপীর কথা, একটু প্রেম, প্রকৃতির নিটোল নির্বাস, ঘোড়া ঘোড়া হাটা মধ্যযুগীয় কবি থেকে সরু করে রবীন্দ্রনাথ ছুয়ে বাদল সরকার এমনকি নাট্যকার নিজের নামটি পর্যন্ত অভিনেত্রী বেশী অপরাজিতার মত দিয়ে বসাতে বাকী রাখেন নি। এক কথায় বহুরূপী সহস্র উপচারে এই নাটকে নিম্নলিখিত খালাটি ভরে দিয়েছেন।

কিন্তু নাট্যকারের কখনোই চোখে পড়ল না, যে এই অপরাজিতা রায় যে বিরুদ্ধ পরিবেশে গড়ে উঠেছে, তার জন্যে তার রক্তে দাঁড়া নোই হবে এই চরিত্রের অবশ্য-ম্ভাবী পরিণতি? নাট্যকারের কখনোই মনে হল না, যে সামাজিক বিশ্লেষণ এবং প্ৰিধা বিভক্ত শ্রেণী সংঘাতের মধ্য দিয়ে অপরাজিতাকে ঈর্ষিত এবং অনিবার্য সত্যের পথে উত্তীর্ণ করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল? এমনকি নাট্যকারের একথাও মনে হলনা, ভানুমতী যে বাড়ীর একটা সামান্য বি হয়েও তার হিংস্র উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে করতে বসেছিল, তাকে অপরাজিতার

মানসিক দৃঢ়তায় অবশ্য অবলম্বন করে তোলার প্রয়োজন আছে।

যে শিকড়হীনতা এবং দুর্বলতার জন্যে অপরাজিতা অবস্থায় ক্ষয়িষ্ণুতা জেনেই প্রফেশনাল থিয়েটারের সেই স্টোকাটের শিকার হবার জন্য মেট্রোর নীচে গিয়ে দাঁড়ালো, এই একই কারণে শ্রীসেনের এই নাটকটি কিন্তু মানুষের এগিয়ে যাবার ইতিহাসে আর বিন্দুমাত্র অবদান রাখতে পারবে না। এক কথায় এই নাটকটিকে আমরা স্বাগত জানাতে পারছি না।

আমরাই তো দিনরাত বলে বেড়াই নাটক হল গিয়ে জাতির দর্পণ। তবে জাতি কি একটা নিশ্চল পদার্থ, তারতো এগিয়ে যাবার একটা ইতিহাস আছে অপরাজিতার মধ্যে সে দোহাটনা কোথায়? আসলে এটি একটি মৃত এবং ইতিহাস বহির্ভূত চরিত্র, তাই অপরাজিতা মেয়েটির অভিব্যক্তি আড়াই ঘণ্টার বেশী দর্শকের মানস লোকে অবস্থান করতে পারে না। যেটুকু পারে তা হোক অভিজ্ঞ ও চমকিত করার ঐশ্বর্যজালিক দক্ষতা। এনাটকে না আছে কোন logical course, না আছে sociological phenomenon, কোন কিছুই নেই।

এই ধরনের নাটকগুলি নিয়ে আমাদের সচেতনতা আরো বেশী বাড়ানো দরকার। এর কুসুমাক্ষর ক্রেদকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করা আবশ্যিক প্রয়োজন, নয়তো দর্শকের মোহ সহজে ভাঙবে না। কেননা আজ এই জাতের নাটক বাংলা মঞ্চকে গ্রাস করতে চলেছে।

তাছাড়া সত্যি কথা বলতে এ নাটকের অন্তর্বস্তুতো বহুরূপীর পূর্বাভিনীত নাটকের চর্চিত চর্চণ। অর্থাৎ নাট্যকার বহুরূপীর মেজাজটিকে ঠিক ধরেছেন। মর্মের গভীর প্রদেশে নিয়ে যাবার যে দর্শন এবং তার জন্যে যে সংলাপ প্রয়োজন, তা অভিনয়গুণে প্রতিষ্ঠিত ও চরিত্রভাষ্যে অসম্ভব রকম প্রকাশিত।

“পুতুল খেলা” থেকে সরু করে “রাজা অরুণিমাউস” পর্যন্ত চরিত্র চিত্রণ এবং যে অভিনয় দ্বারা প্রবাহিত তারই গা ঘেঁষা অত্যাধুনিক (?) নাট্যরূপ এই “অপরাজিতা” নাটকটি।

নায়িকা অপরাজিতার কখনো রাগ হয়, কখনো দঃখ হয়, কখনো তার ভীষণ ভাল লাগে। দেওর অমল চাকরী না পেলে পদলিঙ্গের বাবার (?) গুলিতে মারা গেল, সেজন্যে তিনি ভাঙাবুকে ছলো-ছলো, আবার সেই মহেতেই তিনি নাটকের শিল্পী সেজে নর্থ ইন্ডিয়া টুর করতে যাবার খুশীতে উজ্জল। তিনি রাজনীতিকে ব্যাঙ্গ করেন, রাজনৈতিক নেতাকে উপহাস করেন, তবু নির্দোষ কোন পথের সম্মান দিতে পারেন না, অথচ তিনি শত অবস্থার মধ্যেও ডাল-মটর খেতে ভালবাসেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজনীতি মিথ্যে, রাজনৈতিক নেতা মিথ্যে, বিপথগামী মানুষ মিথ্যে, জীবনাব্যবসায়ী অবস্থার মিথ্যে, সত্যি শব্দ

অপরাজিতার অবস্থার।

আজ মনে পড়ে প্রবন্ধ শব্দটি একদা বলেছিলেন—“যারা আমাদের প্রতিপক্ষ, যারা সমানে নীতিহীনতা বিচ্ছিন্নতা এবং পরমতে নির্বোধ অসহিষ্ণুতা জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করে এসেছেন এবং এখনো করছেন, তাদের অর্থবল, বাহুবল, নীচতার বল এবং প্রচার-যন্ত্রের ব্যাপক কৌশল আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, দেশকে আমরা বাঁচাবো ভেবেছিলুম তা পারিনি।” কিন্তু আমি যদি এ আলোচনায় পরমতে নির্বোধ অসহিষ্ণুতা প্রমাণ করে থাকি, সে জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু বহুরূপী কি এই অবস্থার নাটক করে দেশকে বাঁচাতে চান। তারা জিততে চান?

সবশেষে নাট্যবিষয়ের কথা ভেবে কুণ্ঠা জাগলেও বলতেই হয়, আড়াই ঘণ্টার এই স্বগত-সংলাপী নাটকে ভূমি মিমের একক অভিনয় ব্যাপকতার অর্থে আরেকবার তাঁর দরুস্ত অভিনয় ক্ষমতাকে প্রমাণিত করল নাটকের শেষ ভাগে আন্তর্জাতিক অভিব্যক্তি প্রকাশে সাক্ষরগার চাইকারখানি পরিণত শিল্পবোধের অনবদ্য প্রমাণ।

অন্যদিকে মণ্ডিটও চরিত্র বিকাশে সহায়ক হয়নি। অর্থাৎ অপরাজিতার বহুমুখী অভিব্যক্তি প্রকাশে মণ্ডিট তেমন বহুমুখী ভাষা খুঁজে পায়না।

ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রেক্ষাগৃহের সামনে বিক্ষোভকালে দর্শকদের অনুরোধ জানান ছবিটি বন্ধ করা জন্য। এবং মালিকদের কাছে আবেদন জানান যে ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করার জন্য। তাঁদের অভিযোগ : ছবিটির দ্বারা বাংলা দেশের মস্তিষ্ক বৃদ্ধ ও মস্তিষ্ক বোধীদের প্রতি অবমাননা করা হয়েছে।

ছবিটির বিষয় দ্ব একটি কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই চর্চাছিলো। এই লড়াইকে প্রতিটি ভারতবাসী যে চোখে দেখেছেন তাকে ছোট করার উদ্দেশ্যেই সুযোগ সন্ধানী অর্থালিস্ট জ্ঞানপাপী জোহর সাহেব এই ছবিটি করেছেন। জোহর সাহেব খুব দেশপ্রেমী দেখেন। কিন্তু ছবির প্রথম অংশেই দেখা গেল বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত শরণার্থীদের খবর। ছবিটির মধ্যে বাস্তবতার সম্পর্ক অত্যন্ত কম। আছে ভাড়ামী, বদমায়েসীর চড়াপত রূপ। সস্তা নাচ ও গানের ব্যাপার। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে উল্লসিত নারী-দেহ, তাঁদের ধ্বংসের কয়েকটি ঘটনা দেখিয়ে বাংলা দেশে পাক-সামরিক বাহিনীর অত্যাচার দেখিয়েছেন। মানুষের সেন্টিমেন্টে সড়সড় দিয়ে পরসী রোজগারের ভাল পথই - জোহর সাহেব বেছে নিয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকছে না। দর্শক সাধারণের উচিত এই ধরনের সস্তার

বিদেশ দর্পণ

(সম্প্রদায় পর)

কেউ মনে করে থাকেন যে আওয়ামী লীগ সরকার তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করবেন তবে তিনি জেনে রাখুন যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সম্ভব হবে না ভবিষ্যতের সেই উত্তাল জনতাকে বাগে আনা।

বাংলা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার কাপারে দিল্লীর যে কারণে আরও বেশী সতর্ক থাক উচিত তা হচ্ছে দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান। বহু শক্তিগুলি আশে যে ধরনের আচরণই করুক না কেন স্বাধীন বাংলাদেশে তারাও যে ক্রমশ প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী হয়ে তা স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে খেলা অদূরভবিষ্যতে শুরুর হবে তাতে যদি দিল্লী কোন-রকম চালে ভুল করে তাহলে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। দোরগোড়ার আরেকটি শব্দ শব্দ বাড়বে। অতএব দিল্লীর সাউথ ব্লকের কাছে অবদান, ভারতের অন্যান্য রাজ্য নিয়ে যা করছেন সেই ভাবে চলে বাংলা দেশকে নিজেদের উপনিবেশ বানাবার চেষ্টা করবে না।

ভৌতিক ভাড়াটো দেখা থেকে বিরত থাকা।

আজকের দিনের বই

সুপ্রকাশ রায়ের লেখা

মাও সে-তুঙ

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

চীন বিপ্লবের মহান নেতা মাও সে-তুঙের শৈশব, যৌবন ও রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী (সংক্ষিপ্ত বিপ্লব পর্যন্ত)

দাম : ৫.০০

আরও পড়ুন :

চীনের চলমান বিপ্লব—হিন-টন (৭৫), কাল মার্কসের কাপিটাল—বিজ্ঞান সেন (৫০), জাতি সমস্যায় মার্কসবাদ—বিজ্ঞান সেন (১০০), তেলেকান বিপ্লব—কাকি (৮০), মুক্তিযুদ্ধ ভারতের কৃষক—সুপ্রকাশ রায় (২৫০), দিল্লীর নবজন্ম—রমা বাল্যা (৭৫০), ইম্পাত—অক্সো-তু (৪৭০), মানুষের পাখি—সম্পদ—লিউ হুয়াংয়ান (১০০০)।

নিউ বুক সেন্টার

১৪, ২য়মানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-১

ইসরাইলি নজরবন্দী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আমরা জানা গেছে যে বাংলা দেশ আন্দোলন শুরুর হবার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। টিকা খাঁ যদিও ইসরাইলিয়ার অনুগত হিসাবে কাজ করেছিলেন তথাপি এখন ইসরাইলিয়ার খাঁ টিকা খাঁ সম্পূর্ণ করতল-গত হয়ে পড়েছেন।

ফরাসী কটননীতিবিদ আরো জানান যে যদি প্রেসিডেন্ট ইসরাইলিয়ার খাঁ পশ্চিম খণ্ডে সামরিক বাহিনীর তৎপরতা দেখতে যান তাহলে বন্ধে নিতে হবে তাঁকে সামরিক প্রধান টিকা খাঁ পাঠাচ্ছেন, কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের চোখে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক বিশৃঙ্খলা ধরা না পড়ে তার জন্য টিকা খাঁ এই চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে।

ছুটকে রাষ্ট্রসংঘ পাকিস্তানের অবস্থানরত বাঙালীদের ওপর

অত্যাচার না করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইসরাইলিয়ার খাঁ যে নির্দেশ দেন টিকা খাঁর নির্দেশে তা বাতিল হয়ে যায়।

ফরাসী কটননীতিবিদ আরো জানান যে বাংলা দেশ হাত ছাড়া হবে জেনেই টিকা খাঁ এই ব্যবস্থা নেন, তিনি আরো জানান রাজনৈতিক পর্ববেক্ষক মহলের ধারণা যে টিকা খাঁ খুব শীঘ্র নিজেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করবেন।

শব্দ পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়েই যাতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিশ্বের কাছে বজায় থাকে তার জন্য টিকা খাঁ নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আরব খাঁর বিদায়ের পরে সংযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হন ইসরাইলিয়ার খাঁ। এখন বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানের নায়ক হবেন টিকা খাঁ।

বাংলা দেশের ঘটনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কোয়টার অবশ্যই কলকাতায় থেকে চীৎকার করেছে, বাংলা দেশ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অধিবাসী এই বিষয়ে শব্দ জ্ঞাত নয়, এই ঘটনার তারা গর্বিত। সারা মন্ডি বাহিনীর হেড কোয়ার্টার কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এইখান থেকেই মন্ডি বাহিনীর সংগঠন, শিক্ষা এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগ সব কিছুই এই হেড কোয়ার্টার থেকেই নির্দেশিত হয়েছে।

মার্কিন চক্রান্ত আর তাদের পরিচিত দালালরা এ সমস্ত সংবাদ সরবরাহ করেছে, আর শেষ পর্যন্ত মার্কিন দুতবাসের কলকাতার অফিস হো চি মিন সরণি থেকে উঠে গিয়ে সেক্সপায়ার সরণির এক বাড়িতে অশ্রয় নিয়েছে, ওই একই রাস্তায় মন্ডি বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের ওপর অতন্ত্র পাহারার জন্ম।

বিভিন্ন সময়ে ওই হেড কোয়ার্টারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নেতারা, এমন কি সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাকেশ পর্বন্ত এসেছেন। মার্কিনীরা তাদের দূর পাহারার ক্যামেরার এর ছবি নিয়ে দারাবিশেষ ছড়িয়ে প্রচারের চেষ্টা করেছে যে, মন্ডি বাহিনী আসলে কিছু নয়, সবই ভারতীয় সংগঠন।

মজার ব্যাপার, আজ এই মার্কিনী প্রচারে বিপ্লবী চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকার সোচ্চার অংশীদার। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যোগস্ফূর্ত এবং দ্বন্দ্বশী নেতৃত্বের অকুণ্ঠ গৃহস্থায়ী। বাল্যশিক্ষা অনেক রাজনৈতিক পার্টি শব্দ

প্রায় দশ লক্ষ মন্ডি সেনা বাংলা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত। এদের সকলেই সশস্ত্র নয়। আর মন্ডি আন্দোলনে সবাইকেই সশস্ত্র হতে হয় না। আসলে প্রয়োজন মানসিকতার। আর সেই মানসিকতা বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মধ্যে ছিল বলেই এই দশ লক্ষ সংগঠিত মন্ডি বাহিনী শেষ পর্যায়ে এত দ্রুত শত্রু বাহিনী খতম করল।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট পতনের পর যে সমস্ত ম্যাপ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে এসেছে তা থেকে দেখা যায় কি বিরাট প্রস্তুতি পাকিস্তানীরা করেছিল পূর্ব বঙ্গ প্রতিরক্ষার জন্য। খুলনা থেকে রংপুর পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত বিরাট প্রতিরক্ষা লাইন, রংপুর কান্টনমেন্টের খুলনার মধ্যে দিয়ে প্রধান প্রতিরক্ষার পশ্চিমাত্তলের অক্ষ-রেখা। উত্তরে হিলি থেকে প্রতিরক্ষা লাইন শব্দ হয়েছে একেবারে পূর্বে শিলেট পর্যন্ত। এ লাইন গেছে কমলপুরে ও হালদাঘাটের মধ্যে দিয়ে। আর বাংলা দেশের পূর্বপ্রান্তে প্রতিরক্ষার অক্ষ উত্তরে শিলেট থেকে শব্দ। এ লাইন গেছে ব্রাহ্মণবাড়ীরা আখাউড়ার মধ্যে দিয়ে কুমিল্লা ফেণী চট্টগ্রাম কক্সবাজার পর্যন্ত। তোড়জোড় করেছিল ওরা অনেক। সবই তাদের তাদের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল।

ওদের প্রতিরক্ষার লাইন এক হাজার তিনশত উপপঞ্চাশ মাইল সীমান্ত বরাবর। কয়েক হাজার বিবর ঘাঁটি ওরা তৈরী করেছে ভারতীয় বাহিনীকে রোখার জন্য। ওরা বুঝতে পারেনি মন্ডি বাহিনীর সংগঠন, দেশের মানবের সঙ্গে এদের যোগাযোগ আর প্রতিরক্ষা লাইনের পশ্চাতে এদের অবস্থিতির গুরুত্ব। বহুদিন থেকে মন্ডি বাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীকে বিভিন্ন অক্রমণের কায়দায় পর্যবেক্ষণ করে আসছে। শেষ পর্যায়ে মন্ডি বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ কমান্ড গঠিত হয়।

এর পর আনন্দবাজার থেকে পাক-ভারত যুদ্ধ চোঁটা ডিসেম্বর শব্দ। অভ্যন্তরে অবস্থিত মন্ডি বাহিনীর সংবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকিস্তানী প্রতিরক্ষার সব কিছু স্ট্রাটেজীই জানা। ভারতীয় বাহিনীকে আগ্রহ অন্ধকরে হাতড়াতে হয় না। আনন্দবাজার থেকে যোগাযোগ পূর্বেই গরিবপরের খণ্ডযুদ্ধে পাক বাহিনীর পরজর সন্নিবিষ্ট হয়ে গেছে। বনগারী অদূরে বয়রার ওপারে গরিবপরে। ওখানে পাক বাহিনী তেরোটা মার্কিনী ট্যাঙ্ক এনেছিল মন্ডি বাহিনী সাফ করার জন্য। অতর্কিত আক্রমণে ওরা ঘায়েল হল। মরীয়া আবেদনে ওদের চারটি স্যাবার জেট বিমান ট্যাঙ্ক বাহিনী বাঁচাতে এসেছিল। তিনটি ঘায়েল হল। সব কিছু

ছেড়ে ওরা পালাল। সেই দিনই যুদ্ধের পরিণাম নির্ধারিত হয়ে গেল।

এরপর আনন্দবাজার যুদ্ধের প্রথম দিন ওদের তেরোটি বিমানের এক জ্বর বাহিনী সম্পূর্ণ উৎখাত হল আর পূর্ব বাংলার দক্ষিণ সীমান্ত উপসাগর ফ্রন্টে ভারতীয় কৃষ্ণ সন্নিবিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং এর ফলে ওদের সমস্ত সরবরাহ রাস্তা বন্ধ হল।

পরাজয় সন্নিবিষ্ট জেনেও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত যে প্রতিরোধ চালিয়ে গেছে তাও মিলিটারী ইতিহাসে এক নতুন নজর হয়ে থাকবে।

আনন্দবাজার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থেকে খবরগুলো কার্যকর করে এশিয়ান নিউজ সার্ভিসের কাছে দেওয়া হবে। এখন তাই করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে এশিয়ান নিউজ সার্ভিসের নেপথ্য কাহিনী বলা দরকার। দুপনের পাঠকদের জানা আছে, আমেরিকান প্রতিষ্ঠান, ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খোলাই-এর একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের এশিয়ান শাখার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন কলকাতার সেই সাংবাদিকটি, অমিতাভ চৌধুরী। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের ভারতীয় শাখা হচ্ছে প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া। এর কর্তা হচ্ছেন চঞ্জল সরকার। বছর দুই আগে এই দটি প্রতিষ্ঠানই কুখ্যাত সি আই এর টাকা পায় বলে সোরগোল হলে অমিতাভ চৌধুরী ওটি ছেড়ে এক নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। নাম দেন প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া। কিন্তু খবর নিয়ে দেখা গিয়েছে, এটিও আমেরিকান পৃষ্ঠপোষিত, উদ্দেশ্য একই এবং কমিউনিজম বিরোধী সংবাদপত্র মালিকদের অনগ্রহীত। এই প্রেস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে সংবাদপত্র মালিকদের নৈমন্তিক করে রাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। অতীত সরকারও সস্তীক ওদের অমন্ত্রণে বিদেশ সফর করে এসেছেন। কিছুদিন আগে ভারতীয় সংবাদপত্রের মালিকানা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করার এর স্বরূপ আরও প্রকাশিত হয়েছে। মোটকথা, এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কমিউনিজম বিরোধিতা এবং আমেরিকান লবী তৈরী করা। কাজ চালানো হচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন আগে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া স্বভাবতই বিরত বোধ করে থাকবেন। কিন্তু কোনো উপায় নেই। এই

খুলনা ও ঢাকার প্রতিরোধ এই নজীরের উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত।

একের পর এক ওদের সীমান্তব্যাপী সমস্ত প্রতিরক্ষা বৃহৎ ধ্বংস হয়ে গেল আর শেষে ওরা খুলনা, ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রামে প্রতি ইঞ্চিতে মরীয়া বৃদ্ধি চালাল। সেনাবাহিনীর নামকরা আত্মসমর্পণের আগ্রহ দেখালেও জওয়ান তার কর্তব্যে অটুট। সাধারণ মানব এই জওয়ান। সে নিমক-হারাম নয়। তাই তার কাছে আদেশের অর্থ কর্তব্য। ইতিহাসে এই জওয়ান যুদ্ধ করে আর কীর্তমান অনেক।

সময়, এলো ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় ভারতীয় সাংবাদিকরা প্রায় একাধারে দেশান্তরে থাকা সাংবাদিকতার যখন ব্যস্ত তখন প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া এক নতুন ফন্দি করেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতের পক্ষে বিরত হবার মতো সংবাদ সরবরাহ। তাই ফাউন্ডেশন নিয়োগ করেছেন অভীক সরকারকে রিপোর্টারপে। অভীক সরকার কেনো দিনই রিপোর্টার নন। কিন্তু তাঁর অধীনে আনন্দবাজার-ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডের বিরাট রিপোর্টার গোষ্ঠী, বাঁদের প্রায় সবাই দায়িত্বশীল এবং দেশান্তরবোধক সাংবাদিকতার রতী। রিপোর্টারদের কাছে অনেক গোপন সংবাদ থাকে যেগুলো প্রকাশ করা হয়না কিংবা জাতির স্বার্থে প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু রিপোর্টারদের নিয়োগকর্তা হলে এই গোপন খবরগুলো জানা সহজেই সম্ভব। প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়ার অমিতাভ চৌধুরী কুখ্যাত ব্যক্তি। তাই তিনি নিয়োগ করেছেন অভীক সরকারকে। সঙ্গে সঙ্গে নয়দিল্লী থেকে এসেছেন প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া চঞ্জল সরকার। উনি এখন অভীক সরকারকে সাহায্য করছেন। উল্লেখযোগ্য, বছর দুই আগে এই প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়াই সরকারীভাবে স্বীকার করেছিলেন যে তারা না জেনে এশিয়ান ফাউন্ডেশনের মারফৎ সি আই এ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে গ্রহণ করতেন।

ভারত সরকার আনন্দবাজার-ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডের টেলিপ্রিন্টার অপব্যবহারের অভিযোগ পেয়েছেন এবং আমরা শুনছি একটা তদন্তেরও আদেশ দেওয়া হয়েছে। আনন্দবাজার এই খবরটি পেয়ে এখন খুব গরম গরম আসে রিকান বিরোধী সম্পাদক লিখছে। কিন্তু পাঠক ভুলবেন না এই আনন্দবাজারেই আছে সংবাদপত্র জগতের বৃহত্তম আমেরিকান লবী, এখনই আছে কমিউনিজম বিরোধী স্বাধীন সাহিত্য সমাজের মহামান্য।

সাক্ষ্যবাহিরবিরোধী পাক্ষিক সংস্কৃতি পত্র

“পূর্বতরঙ্গ”

শতাব্দী (মূল্য ৩০ পয়সা)

প্রতি মাসের ৫ এবং ২০ তারিখে প্রকাশিত হয়
জাকযোগে “পূর্বতরঙ্গ” নিচের ঠিকানায় পাবেন

পিপলস বুক এজেন্সি; ৮০ সি, নেতাজী রোড

গোঃ বাগড়া। মুর্শিদাবাদ জেলা।

সরাসরি যে সমস্ত এজেন্টদের কাছে পাবেন

- ১। এস, চক্রবর্তী
২বি, শ্রীমোচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
- ২। নিতানন্দ মহাপাত্র
৫৫, বিধান সঙ্গী কলিকাতা-১২
- ৩। রঞ্জিত ব্যানার্জী
শ্রীমোহন মুখার্জী রোড ও হাজরা রোড জংশন
- ৪। আনল রায়; ৪৪ স্টল, হাওড়া স্টেশন
- ৫। অরুণা বুক স্টল; শিয়ালদহ
এ ছাড়া সমস্ত পত্র পত্রিকার স্টলে পাওয়া যায়

সম্পাদক-হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মন্ডি ইতিহাস প্রেস ৭, রাজা সর্বোদয় নারিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত এবং ৩১শে মার্চ ১৯৭১ খ্রিঃ, কলিকাতা-১৩ বঙ্গীয় কর্মালয় থেকে প্রকাশিত

দপন

১৪শ বর্ষ ৪৬শ সংখ্যা ২৪শ নভেম্বর ১৯৭১ ২য় পৃষ্ঠা

বাংলা দেশের উন্নয়নে মাড়োয়ারীদের মাথাব্যথা

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্যাপারে কলকাতার মাড়োয়ারীদের প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। হঠাৎ তারা টাকা কাড় নিয়ে তৈরী, কি করে বাংলাদেশের উন্নয়ন করা যায়। তারা বাংলা-দেশের জনসাধারণের কাপড় জামা-কল্লা সিমেন্ট ইত্যাদি নানা জিনিষের অভাব দূর করতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে মাছ ও পাট এরা কিনে নিতে চায় পশ্চিম বঙ্গে সরবরাহের জন্য। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকার ব্যবসা। এর অনেকটাই রক্ষাধীন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ হিসাবে আসতে পারে। আর তাছাড়া ওদের যে টাকা এতদিন ব্যাঙ্ক রাখা যেত না এবং যে

টাকা নিজেদের প্রাইভেট ব্যাঙ্ক মাধ্যমে হুন্ডি হিসাবে খাটত তা এখন কাজে লাগান যেতে পারে।

আসলে বাংলাদেশের কাঁচা পাটের ব্যবসা মাড়োয়ারীদের নখ-দর্পণে। ওরা নারায়ণগঞ্জ বাজার আর অন্যান্য কাঁচা পাটের বাজার ভল করেই চলে। দেশ বিভাগের আগে আজকের দিনের বেশীর ভাগ শিল্পপতি মাড়োয়ারী তাদের মূলধন তৈরী করেছে পূর্ববঙ্গের কাঁচা পাটের ব্যবসা-কল্লা করে। পাটকল্লাগুলো ছিল পশ্চিমবঙ্গে আর কাঁচা পাট প্রায় সবটাই উৎপন্ন হত পূর্ববঙ্গে।

এই পাট মাড়োয়ারীরা কিনত অতি (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)।

উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় সি পি এমের বিরুদ্ধে গুলিশে ও নব কংগ্রেসীদের যৌথ আক্রমণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলা দেশের যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী নেতাদের একাংশ সেই পুরানো কলকাতা সি পি এম বিরোধী অভিযান শুরুর করেছেন। গত শনিবার থেকে পুলিশ ও কংগ্রেসের যৌথ আক্রমণ চলে উত্তর কলকাতায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। ফলে, বাগবাজারে জ্যোতি বসুর একটি সভা অনর্দিত হতে পারে নি। বহু মহিলা আঁহিত ও বাড়ী ছাড়া। উত্তর কলকাতায় এখন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। সি পি এম নেতা শ্রীকেশ ঘোষ, রাজ্যপালের কাছে উত্তর কলকাতায় গত আঠারো তারিখ থেকে কংগ্রেসী ও পুলিশী অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, বাগবাজারের পরিচা ভবনে বসে এই আক্রমণের খসড়া তৈরী হয়েছে।

রাজ্যপালের কাছে লেখা চিঠিতে শ্রীঘোষ জানিয়েছেন যে, গ্রেপ্তার থেকে মারহাট্টা ডিচ লেন এবং যতীন্দ্রমোহন এডিনিউ থেকে চীৎপদর রোড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কংগ্রেসীরা পুলিশের সাহায্যে অত্যাচার চালায়। সি পি এম কর্মী ও সমর্থকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কংগ্রেসীরা হুমকি দেয় এবং মারধোর করে। বাড়ীর মেয়ে-রাও রেহাই পায় নি।

গত শনিবার কুমারটলি পার্কে এক সভায় অশোক সেন, প্রফুল্ল-কান্ত ঘোষ, কাশীকান্ত মৈত্র, ইলারায় প্রমথ নব কংগ্রেসী নেতারা বক্তৃতা করেন, এই এলাকা থেকে

সি পি এমকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। সভায় শ্রী ঘোষ লোক ছিল। বক্তারা আরো বলেন, পনের দিন সকালে বাগবাজার মেটাল ইয়ার্ডে সি পি এমের সভায় জ্যোতি বসুরকে বন্ধুতা করতে দেওয়া হবে না।

কুমারটলি পার্কে সভার পর নেতারা ও পুলিশের কর্তারা পরিচা ভবনে এসে শত ঘোষের ঘরে বসে আক্রমণের খসড়া তৈরী করে। পরিচা-কার চারটি দাড়া সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু সমাজবিরোধী-দের ডেকে আনতে। রাতে পরিচাকার ক্যান্টিনে প্রায় একশো লোকের খাবার ব্যবস্থাও করা হয়।

পারিকল্পনানুযায়ী শনিবার রাত সাড়ে আটটায় প্রথম আক্রমণ শুরুর হয় শ্যাম পার্কে সি পি এমের সভা-কল বস্তীতে। রাত নটার পর রাজ-বস্ত্র পাড়া ও রামকান্ত বোস স্ট্রীটের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। রাত দশটা নাগাদ বাগবাজার স্ট্রীটে সি পি এমের পার্টি অফিসের ওপর হামলা চালানো হয়। কাগজ ও সমস্ত আসবাবপত্র রাস্তায় বার করে এনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় সি পি এম সমর্থক সুনীল চক্রবর্তীকে গন্দারী ধরে তলপেট, পা ও হাতে ছুরি বসিয়ে দেয়। গোস্বামীলেন্স ঘটনাস্থলে এলে (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

বিদেশী রিপোর্টারদের আনন্দবাজার অবৈধ জুযোগ দিয়েছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিগত ভারত-পাক যুদ্ধের সংবাদ অননুমোদিত পন্থাভিতে বইরে পাঠানোর সহায়তার জন্যে আনন্দবাজার পরিচাকার মালিকগোষ্ঠি রেকর্ড স্থাপন করেছেন বলে অনু-মান করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ব্রিটিশ সংবাদপত্র “টাইমস” ও “সানডে টাইমস”-এর রিপোর্টাররা আনন্দবাজারের টেলিপ্রিন্টার মারফৎ অননুমোদিত সংবাদ নম্মাদিগ্নি এবং সেখান থেকে নিজেদের সংবাদপত্রে

পাঠানোর সুযোগ নিয়েছে। গত সপ্তাহে কিভাবে আনন্দবাজারের অন্যতম মালিকপদ্র কুখ্যাত সি-আই-এ পব্লেট এশিয়ান নিউজ সার্ভি-সের রিপোর্টার হয়ে নিজেদের টেলিপ্রিন্টারের মারফৎ খবর পাঠি-য়েছেন তার খবর বেরিয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, ভারত রক্ষা আইনে জরুরী অবস্থার অননুমো-দিত সংবাদ প্রেরণ করা নিষিদ্ধ। আনন্দবাজারের টেলিপ্রিন্টারে সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর কলকাতায় কংগ্রেসী সমর্থনে দুটি খনের ঘটনা গুলিশ চাপা দিতে চেষ্টা করছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উত্তর কলকাতায় নব কংগ্রেসী সমর্থনে দুটি খনের ঘটনা কলকাতা পুলিশ চাপা দেবার চেষ্টা করছে বলে দর্পণ সরাসরি অভিযোগ করছে। দর্পণের নির্দিষ্ট অভিযোগ হচ্ছে, এই এলাকার নব কংগ্রেসীদের উঠতি ছোকরা নেতা সাইরেন রায়ের, দেহরক্ষী পুলিশ গত সোমবার রাতে কুমারটলিতে বিনা কারণে গুলি চালিয়ে দুটি নিরপরাধ ব্যক্তিকে খুন করেছে। গুলি চাল-নার সময় সাইরেন রায় উপস্থিত ছিল। সাইরেন রায় হচ্ছে নিহত নেপাল রায়ের ছেলে। বর্তমানে

পিছুহত্যার প্রতিশোধের জন্যে উত্তর কলকাতায় সি পি এম খোলাই পর্বের অন্যতম পুরোধা। উল্লেখযোগ্য, নেপাল রায়ের হত্যার অভিযোগে পুলিশ যাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়েছে তারা কিন্তু কেউই সি পি এম নয়। সবাই তথাকথিত নকশাল নামধারী। এই দুটি খনের ব্যাপারে পুলিশ কোন তদন্ত করছে না, কারকে গ্রেপ্তার করে নি। সমগ্র কাপারটি খামাচাপা দেবার চেষ্টা করছে।

দর্পণ যতদূর সংবাদ পেয়েছে, তাতে জানা যায় কুমারটলি এলা-

কায় এই জোড়া খনের আগে মদের অসর বসেছিল এবং মদ্যপানের পরিণতিতেই গুলি বর্ষণ করা হয়েছে। দেহরক্ষীর সঙ্গে সাইরেন রায়ও এখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু যেহেতু সাইরেন নব কংগ্রেসী সেজন্যে উত্তর কলকাতায় পুলিশ দেহরক্ষী কিংবা সাইরেনকে গ্রেপ্তার করে নি।

উল্লেখযোগ্য, গত কয়েকদিন যাবৎ উত্তর কলকাতায় নব কংগ্রেসীরা নতুন উদ্যমে যে সি পি এম খোলাই চালাচ্ছেন তাতে এই সাই-রেন রায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সাইরেন রায়ের অফিসে সি পি এম কর্মীদের জোর করে ধরে নিয়ে খোলাই করা হচ্ছে। শ্যামপদ্রুর থানার ও-সি কয়েকবার সাইরেন রায়ের অফিসে গিয়ে স্তব্ধীকৃত বোমা, পাইপগান এবং কয়েকটি বেআইনী রিভলবার দেখে এসেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। অবশ্য এই ও-সির নানা দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ প্রকাশ করার ইচ্ছা দর্পণের আছে।

বাংলা দেশ সম্পর্কে চীন-মার্কিন ভূমিকা

একটি সাক্ষাৎকারে বাংলা দেশ
পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক বিশ্লেষণ

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

ঢাকা : বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ দর্পণের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎ-কারে বলেছেন যে, বাংলাদেশের জাতীয় মন্ত্রি সংগ্রামের বিরোধিতার জনগণতন্ত্রী চীন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ফ্যাসিবাদী পাকিস্তান জোট আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

“চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আজকের আচরণ বিস্ময়কর। মার্কিন সরকারের কথা শ্রুতান্ত, কেন না, ওদের সামর্থ্যও সাহায্যেই পাকি-

স্তানী ফ্যাসিবাদীরা মিলিটারি শাসন চালিয়েছে আর পশ্চিম পাকিস্তানী কয়েমী স্বার্থ বাংলা-দেশ উজাড় করে শোষণ চালিয়েছে।

“তবে আশার কথা মার্কিনী জনসাধারণ, বিশেষ করে ওদেশের বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন দেশের জাতীয় মন্ত্রি আন্দোলন সমর্থনে যথেষ্ট সক্রিয় এবং সোচ্চার। এবং সেই জন্য মার্কিনী সরকারের তরফ থেকে বঙ্গোপসাগরে ওরা সপ্তম নৌবহর এনেও বাংলাদেশের মন্ত্রি সংগ্রামে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করতে পারে নি।

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

সমর্থন সংগ্রহের জন্য নব কংগ্রেসের এখন আর হামলা করার প্রয়োজন নেই

চাপকা সরকার

বঙ্গদর্শন

বাংলাদেশে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা আর এই সংগ্রামে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের সশস্ত্র সাহায্য ও অকুণ্ঠ সমর্থন সারা দেশে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

শ্রীমতী গান্ধী আজ সারা ভারতে অবিসম্বাদ্য জাতীয় নেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কোন সময়েই অন্য কোন নেতা এমন কি শ্রীজহরলাল নেহেরু পর্যন্ত এই অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন নি।

শ্রীনেহেরুর বরাবরই বিভিন্ন বিরোধী দলের এবং নিজের পার্টির মধ্যে নানা আভ্যন্তরীণ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে আজ সমস্ত বিরোধিতাই স্তিমিত। শ্রীমতীর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষেরা আজ কোন বিরোধিতার বিষয় খুঁজে পাচ্ছেন না, অথবা জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে বিরোধিতায় সাহসী নন।

এই ব্যাপারে সি পি এম বাদে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বামপন্থীরা, বিশেষ করে সি পি এম, প্রচণ্ড রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন। সি পি এম অবশ্য বিরোধী ভূমিকা এখনও বজায় রাখার আগ্রহ চেষ্টা করছে, এই ঘোষণার মাধ্যমে যে নব কংগ্রেসের বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনের সঙ্গে এই দলের পশ্চিমবঙ্গে “নয়া ফ্যাসিবাদী” আচরণকে মেলান যায় না। সি পি এম-এর এই কথা বলার যথেষ্ট ভিত্তি আছে, কারণ কলকাতা এবং শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসের নামে বহু যুবকের দল সি পি এম-এর ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই হামলার ব্যাপারে তারা পদলিখিত সাক্ষর সাহায্য পাচ্ছে বলে অভিযোগ।

যারা এই সমস্ত কাজের পাশ্চাত্য তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ নয়। তাদের বক্তৃতে সময় লাগবে যে, রাজনীতির দিক থেকে নব কংগ্রেসের সমর্থন সংগ্রহে এখন আর হামলার প্রয়োজন নেই, বরং এই ধরনের হামলা পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর।

নব কংগ্রেসী নেতাদের অনেকেই অভিজ্ঞ, কিন্তু রাজনীতির তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে সন্মত বোধ থাকলে নেতারা তৎসং বক্তব্যের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে যথেষ্ট কাবু করতে পারেন। এই ভাবে বিরোধী পক্ষকে মোকাবিলা করতে পারলেই বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সঠিক ভাবে খর্ব করা যায়, দেশে রাজনৈতিক ঐক্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি আর এই ঐক্যের মাধ্যমেই নব যুগ সৃষ্টি হতে পারে।

গত এক মাসের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী দুটি বৃহৎ জনসভায় বক্তৃতা করেছেন, একটি কলকাতায় এবং

অপরটি দিল্লীতে। দুটি সভাতেই শ্রীমতীর বক্তব্য পরিষ্কার এবং তিনি চেয়েছেন দেশে রাজনৈতিক ঐক্য (অবশ্যই তাঁর নেতৃত্বে)।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মূহুর্তেও তাঁর বক্তব্যে উত্তেজনা ছিল না, ছিল দৃঢ়তার ছাপ, দেশের জনসাধারণের সমর্থনে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদে। মানবকে তিনি অহেতুক প্ররোচিত করতে চান নি, শিথিলে ছেন কিভাবে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের লক্ষ্য পরিষ্কার রেখে একের পর এক পদক্ষেপ নিতে হয়।

নিজের দলের মধ্যে অনেকেই এবং বিরোধীরা সবাই অসহিষ্ণু হয়ে ইন্দিরা সরকার কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি এবং তার স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে না সেই বিষয়ে নানা কঠোর মন্তব্য করেছেন। শেষ মূহুর্তে হঠাৎ শ্রীমতীর বিদেশ ভ্রমণ এবং আপাতদৃষ্টিতে এই ভ্রমণের “স্বার্থতা” প্রসঙ্গে অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। অশ্রুত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে, শ্রীমতী গান্ধী নিজের স্থির পদক্ষেপ সম্পর্কে অটল থেকেছেন এই বিশ্বাসে যে তাঁর পদক্ষেপ সাফল্য আনবে এবং এই সাফল্যই হবে সমস্ত বিরূপ সমালোচনার জবাব।

অর্থাৎ কোন বিরূপ সমালোচনাকে এমনকি দেশের জরুরী অবস্থাতেও তিনি দৈহিক শক্তির মাধ্যমে মোকাবিলা করতে চান নি। তিনি গেছেন জনসভায় আর নিজের বক্তব্য জনসাধারণের সামনে রেখে নিজের রাজনীতি ও পদক্ষেপ সম্পর্কে গণতান্ত্রিক সমর্থন সংগঠন করতে চেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের নেতৃত্বের আজ বোঝার সময় এসেছে যে, শ্রীমতী গান্ধীর পথে রাজনৈতিক মোকাবিলার মাধ্যমেই বিরোধীরা বিমূর্ত পড়বে। হামলার পথ অতুল্য ঘোষণার দেউলিয়া রাজনীতির পরিণতি। শ্রীমতী ইন্দিরার নেতৃত্বে কংগ্রেসী রাজনীতির আমূল পরিবর্তন এসেছে এবং সেই রাজনীতির চরিত্র প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক।

পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সি পি এম। এই শোষণ দলের নব কংগ্রেসী বিরোধিতায় বর্তমানে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য নেই; বিরোধিতার একমাত্র ভিত্তি এখন নব কংগ্রেসের নামে পাড়ায় পাড়ায় হামলার প্রতিবাদ। এই হামলাকে ভিত্তি করেই সি পি এম তথাকথিত নব কংগ্রেসী পদ্ধতিকে “নয়া ফ্যাসিবাদ” আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু নয়া ফ্যাসিবাদের অভিযোগ সি পি এম তাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না।

আর বিরোধিতার রাজনৈতিক তত্ত্ব ঠিকমত রাখতে না পারলে কোন কমিউনিস্ট পার্টিই দাঁড়াতে

পারে না। সি পি এম-এর সামনে প্রচণ্ড সংকট এই ব্যাপারে। কি পরিপ্রেক্ষিতে তারা নব কংগ্রেসী রাজনীতিকে (স্থানীয় হামলা বাদ দিয়ে) নয়া ফ্যাসিবাদ আখ্যা দিতে পারে। এই অভিযোগ কেবলমাত্র নব কংগ্রেসের রাজনীতির শ্রেণী ভিত্তিক কাখ্যার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে যে, সি পি এম এই ব্যাখ্যা হাজির করতে পারছে না। এই জন্যই বোধ হয় সি পি এম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন নির্ধারিত সময়ে সংগঠিত হলে না, আর পার্টির মাদুরা কংগ্রেস মূলতুর্বা রাখা হল। পার্টির নীচের তলার সদস্যেরা নব কংগ্রেস বিরোধী প্রচারে আগেকার শ্রেণী বিশ্লেষণ রাখতে স্বেচ্ছা বোধ করছেন। তাদের অনেকের মনেই সন্দেহ এসেছে।

নেহেরু আমলের বৈদেশিক নীতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জোট নিরপেক্ষতার নামে মার্কিনী এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তির প্রশ্ন আজ আর জোরের সঙ্গে তোলা যাবে না। ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এখন আর জোট নিরপেক্ষ নয়; এখন ভারত সোভিয়েত জোটের অংশীদার এবং সোভিয়েতের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু মার্কিন ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় সোভিয়েত

জোটের প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে সি পি এম-এর কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না। অথবা সাম্রাজ্যবাদ শিবিরের পরিপ্রেক্ষিতে সি পি এম অবশ্যই সোভিয়েত জোটকে প্রগতিশীল মনে করে।

পররাষ্ট্র নীতিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হিসাবে নব কংগ্রেসকে স্বীকার করে নিলে এই দলের জাতীয় নীতিকে “নয়া ফ্যাসিবাদ” বলা শক্ত। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধকে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে মূল রাজনৈতিক বিরোধ বিবেচনা করে এবং কংগ্রেসী রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় বৃত্তি এই ভিত্তিতেই সি পি এম তার সমস্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব খাড়া করেছে। শ্রীমতী ইন্দিরার নেতৃত্বে ভারতের নয়া বৈদেশিক নীতি সি পি এম-এর মূল রাজনৈতিক বক্তব্যের জোরালো চ্যালেঞ্জ।

বৈদেশিক নীতিকে আপেক্ষিকভাবে আগের তুলনায় প্রগতিশীল বলে ধরে নিলে, অর্থাৎ ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এখন আর সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় নয় এই কথা স্বীকার করে নিলে মার্কসবাদী বিচার অনুযায়ী জাতীয় আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অনেক নব কংগ্রেসের শ্রেণী প্রভাবের ভিন্ন চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এ কথা স্বীকার

করতে হয়।

অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ সামন্তশ্রেণী বৃহৎ কায়দা বজোঁরা জোট প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল শত্রু এই বিশ্লেষণে নব কংগ্রেস ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রধান ধারক বাহক এবং মুখপাত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

তাহলে দাঁড়ায় এই যে, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধাই যদি একমাত্র রাজনৈতিক কর্তব্য হয় তাহলে নব কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক শক্তির অংশ হিসাবে বিচার করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রণী অংশ হিসাবে শ্রমিক কৃষকের নেতৃত্বের লক্ষ্য হবে নব কংগ্রেসকে বিপ্লবের মিত্র ধরে নিয়ে নতুন রাজনীতির ব্যাখ্যা পেশ করা। এই হল সি পি এম-এর মূল সমস্যা। এ সমস্যা জটিল। তবে এস ইউ সি, আর এস পি বা ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলে তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র। কিন্তু এই সমস্ত দলের তত্ত্বের মধ্যে কেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর বাদ দিয়ে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দরকার তার কোন সঠিক কাখ্যা পাওয়া যায় না।

এখনকার অসাধু ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই

বাংলা দেশকে লুণ্ঠন করতে শুরু করেছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী নবজাতক রাষ্ট্রকে লুণ্ঠন করতে শুরু করেছেন। এই ব্যবসায়ীরা হচ্ছেন প্রধানতঃ রাজস্থানের অধিবাসী। এরা দলে দলে বাংলাদেশে ঢুকেছেন আর যেসব মালপত্র ভারতবর্ষে আনলে অত্যধিক মূল্যফার বেচা যায় তা কিনে আনছেন। এপারে আনতে কোন বাধা কোন কাস্টমস নেই, বর্ডার সিকিউরিটি পদলিখও নেই। খোলা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে এই অসাধু ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে লুণ্ঠন করতে শুরু করেছেন।

গত উনিশে নভেম্বর রবিবার বনগাঁ দিয়ে যশোর শহরে যাবার সময় দেখি কাতারে কাতারে মোটরগাড়ী চলেছে যশোরের দিকে। অধিকাংশ গাড়ীতেই রাজস্থানী

ব্যবসায়ীরা সপরিবারে চলেছেন। ভাবখানা যেন নতুন জগৎ দেখতে বেরিয়েছেন। যশোর শহরে গিয়ে দেখি, এদের অধিকাংশই দোকানপাটে ঢুকেছেন। কিনছেন লবঙ্গ। বাংলাদেশে এক সের লবঙ্গের দাম তিরিশ টাকা। ভারতবর্ষে এক কেজির (এক সের এক ছটাক) দাম অন্ততঃ একশো সত্তর টাকা। কিনছেন বেবী ফুড। বাংলাদেশে আমদানী করা বিদেশী বেবী ফুডের দাম পাঁচ টাকা পাউন্ড। ভারতে প্রাপ্ত বেবী ফুডের দাম পাউন্ড প্রতি অন্ততঃ সড়ে সাত টাকা। এই রকম হিসেব করে কিনছেন সুপারী, বিলিতি সাবান, সেন্ট অন্যান্য জিনিস। এ জিনিসগুলোর মার্গালিং ঠেকানোর জন্যেই কাস্টমস ছিল। এখন কোন বাধা নেই। অবশ্য, কাতারে কাতারে মোটরগাড়ীর মধ্যে যশোরের বহু পরো-

তন উদ্ভাসতুরা ছিলেন, মস্তি বাহিনী, মজিব বাহিনীর লোক ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ছিলেন। তাঁরাও কিছু কিছু মাল কিনছিলেন। কিন্তু সেগুলো হচ্ছে নতুন গুড়, শাক-সবজী। এগুলো সস্তা। এই শ্রেণীর মাল কিনলে বাংলাদেশের মানবেরই লাভ। তাঁরা একটু বেশী দাম পাচ্ছিলেন। কিন্তু লবঙ্গ, সুপারী, বিলিতি জিনিস কিনলে বাংলা দেশের মানবের লোকসান। লবঙ্গ, সুপারী ভারতে রপ্তানী করলে ওরা বেশী দাম পাবেন। বিলিতি জিনিস বেবী ফুডের প্রয়োজন বাংলা দেশেরও আছে। ওগুলো আমদানী করা মাল। এ কিনলে বাংলাদেশের মানবেরই ক্ষতি।

কিন্তু রাজস্থানী ব্যবসায়ীরা কি নিজের লাভ-লোকসান ছাড়া অন্য কিছু বোঝে?

পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কলেজগুলিতে প্রমোশন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি

(বিশেষ প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের বহু কর্মীই ইতোপূর্বে বিভিন্ন পদ-পদবি ক্রমশঃ বিশেষ করে দপ্তরে প্রকাশিত হয়েছে। দপ্তরের কার্যক্রম স্বাধীনভাবে ব্যক্তিরা আগা-গোড়া দলনীতি ও স্বজনপোষণের এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার ফলে এই দপ্তরটি একেবারে নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। আজ প্রতিটি হাসপাতালে চরম বিশৃঙ্খলা। শব্দ যে বর্তমান চিকিৎসা কল্যাণকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে তাই নয়, ভবিষ্যৎ যোগ্য চিকিৎসক তৈরীর ব্যাপারে যেখানে মেডিক্যাল কলেজগুলির শিক্ষক নিষিদ্ধনের গুরুত্ব অপরিহার্য সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে দ্রুত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট নীতি অনুসরণের ফলে যোগ্য ব্যক্তিরা যোগ্যপদ লাভ করতে পারেন না। অযোগ্য, কৃত্রিমতা ব্যক্তিদের প্রমোশন ও নিয়োগের ফলে চিকিৎসা শিক্ষাদানই প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

জনমতের চাপে মাঝে মাঝে সম্ভব নীতি গ্রহণের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু এই নীতি কার্যকরী করার ব্যাপারে দেখা গিয়েছে যোগ্যতা, সিনিয়রিটি প্রভৃতি সর্বস্বীকৃত গণ্যবলীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অপদার্থ ও দলনীতিপরায়ে ব্যক্তিকে বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগ বা প্রমোশন দেয়া হয়েছে। এমনও অনেক উদাহরণ আমাদের কাছে আছে যাতে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে প্রমোশন বা নিয়োগ করার উদ্দেশ্য নিয়েই সরকার নীতি নির্ধারণ করেছেন। তদনুসারে পুরাতন নীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। একাডেমিক এ্যাডভাইসারী কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ বা প্রমোশন হওয়ার কথা। কমিটির কাছে দপ্তর কর্তার কোন কোন বিশেষ ব্যক্তির সুবিধার জন্য মিথ্যা রেকর্ডও পেশ করতে সন্দিগ্ধ করেন নি। একই যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে অথবা নিছক স্বজনপোষণের তাগিদে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে।

উদ্যতন পদে প্রমোশনের ব্যাপারে অতীতে সরকারের বিশেষ কোন নীতির বালাই ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে তাঁকে খুশী করতে পারলেই হোত। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলে কংগ্রেস-আমলাদের খুশী অনুসারে নিয়োগ-প্রমোশন চলতো। সাতষাট সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে প্রথম স্বাস্থ্যদপ্তর প্রমোশনের একটা নীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করে। প্রথমতঃ সিনিয়রিটি এবং মফঃস্বলে কাজ করার উপর গুরুত্ব দিয়ে এই নীতি গ্রহণ করা হয়। সাতষাট সালের দশই অগস্ট তারিখে যুক্তফ্রন্ট সরকার একটা নীতি নির্ধারণ করে নির্দেশ নামা জারী করেন। যুক্ত

ফ্রন্ট সরকারের পতনের পর সেপ্টেম্বর মাসে মোটামুটি এই নীতিকে রেখেই আর একটি নির্দেশ সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। উনসত্তর সালে শ্রিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে চোদ্দই অক্টোবর তারিখে আর একটি নির্দেশ বের হলো। এটাও যুক্তফ্রন্টের পূর্বোক্ত নীতিকে ভিত্তি করেছে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক কোমিশন সরকারের আমল থেকে অর্থাৎ একাত্তর সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারী থেকে একাত্তর সালের একুশে জুলাই পর্যন্ত পর পর মোট পাঁচটি সরকারী নির্দেশ প্রকাশিত হয়েছে। এবারের এই পাঁচটি নির্দেশ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ধীরে ধীরে যুক্ত ফ্রন্টের নীতি অর্থাৎ সিনিয়রিটি এবং মফঃস্বলে কাজ করা বাধ্যতামূলক রেখে যে প্রমোশনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তারক নস্যাৎ করে দেয়া হলো।

মফঃস্বলে ডাক্তাররা কেউ যেতে চান না। মফঃস্বলে বিশেষজ্ঞদের অভাব। এ অভিযোগ দীর্ঘদিনের। মফঃস্বলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যে সব অসুবিধার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়—স্বল্পপািতর অভাব

প্রভৃতি বিশেষ অবস্থায় যে ভাবে চিকিৎসা করতে হয় আমাদের দেশে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে যদি সে ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া না হয় তাহলে নতুন পাশ্চাত্য চিকিৎসকরা গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করতেই পারবেন না। এদিকটা নজর রেখে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও মফঃস্বলের অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ নীতি কেন্দ্রীয় সরকারও স্বীকার করে নিয়েছেন।

তা ছাড়া মফঃস্বলে যারা কাজ করেন তারা কলকাতায় পোস্টেড চিকিৎসকদের তুলনায় সুযোগ্য সুবিধা কম পান। এজন্যই প্রমোশনের ক্ষেত্রে মফঃস্বলে কাজ করা বাধ্যতামূলক বলে যুক্তফ্রন্ট সরকার নীতি গ্রহণ করেন।

কিন্তু গত এক বৎসরের মধ্যে কি ভাবে এ নীতি বদল করা হয়েছে তা লক্ষ্য করা যাবে মার্চ থেকে জুলাইয়ের মধ্যে যে সব নির্দেশ বেরিয়েছে তা থেকেই।

সাতষাট সালের দশই আগস্টের নির্দেশে ছিল : নতুন নিযুক্ত ব্যক্তিকে মফঃস্বলে নিয়োগ করতেই হবে।

কোন শিক্ষা (মেডিক্যাল)

প্রতিষ্ঠানে যে চিকিৎসকদের অন্ততঃ চার বৎসর মফঃস্বলে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই তাকে পোস্ট করা হবে না।

এ বৎসরেরই আটই সেপ্টেম্বর তারিখে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আর একটি নির্দেশে বলা হলো :

যদি কোন বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল অফিসারের মফঃস্বলে কমপক্ষে চার বৎসর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে তার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকলেও তাকে সরাসরি লেকচারার হিসাবে নিয়োগ করা চলবে।

ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টের এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে কোন মেডিক্যাল অফিসারকে নিয়োগ করতে হলে স্পেশালিষ্ট হিসাবে মফঃস্বলে কম করে তিন বৎসর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে, এই নির্দেশগুলির লক্ষ্য ছিল যাতে ভাল ছাত্ররা এবং বিশেষজ্ঞগণ মফঃস্বলে যেতে বাধ্য হন।

কিন্তু কংগ্রেসের গ্রামের জন্য দরদ কত বেশী তার প্রমাণ পাওয়া যাবে গণতান্ত্রিক কোমিশন সরকারের আমলে গৃহীত নীতির মধ্য দিয়ে।

একাত্তর সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারী স্বাস্থ্যদপ্তর যে নির্দেশ দিলেন তাতে বলা হোল লেকচারার বা এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগের

সময় দেখতে হবে তাদের যেন তিন বৎসর মফঃস্বলে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকে।

কিন্তু সাতষাট সালের আটই সেপ্টেম্বর তারিখের পূর্বে (অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি কার্যকর হওয়ার সময়) যারা লেকচারার ছিলেন তাদের বেলায় এই নীতি মেনে চলতে হবে না।

তখনো কিছুটা চক্ষু লম্বা ছিল। কিন্তু একাত্তর সালের উনিশে মে তারিখের অর্ডারে সাফ বলে দেওয়া হলো :

Mofusil service shall not be considered as an essential condition for being eligible for teaching appointments.

এই নীতির ফলে কোন কোন ভাগ্যবানের সুবিধে হোল, কাদের মধ্য চলে এই নীতি গ্রহণ করা হোল তার ফিরিস্তি দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। নীতিগত ভাবে ভারত সরকার যার প্রবক্তা অর্থাৎ “উ প্রিপেরার এ বেসিক ডক্টর উইথ এ রুয়াল বারাস”—আর যে নীতি আমাদের দেশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য শব্দ কতকগুলো দলনীতিপরায়ে লোকের মস্তিষ্কে তাকিয়ে সেই নীতি জলাঞ্জলি দেয়া হোল। যুক্তফ্রন্ট সরকার যার কাজটা শুরুর করেছিলেন তাকে এগিয়ে না নিয়ে, পুরো সেই নীতির সমাধি রচনা করা হলো।

শ্রীরামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অণুপ্রচার

(বিশেষ প্রতিনিধি)

শ্রীরামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সি পি এম সদস্য কমল ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে শাসক কংগ্রেসের লোকেরা মিথ্যা প্রচারকার্য চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কমলবাবুর বিরুদ্ধে শাসক কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের লোকেরা পোস্টার মারছেন এবং প্রচার করছেন যে তিনি (কমলবাবু) সি-এম-ডি-এর তহবিল তছরূপ করেছেন। কমলবাবুর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ এনেছেন আবার শাসক কংগ্রেসের এমনই একজন দলনীতিপরায়ে সদস্য যাকে পদলিখ উনসত্তর সালে পৌরসভার একটি চরিত্র অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। যতদূর জানা গেছে তার বিরুদ্ধে পদলিখ এখনও মামলা চলছে যাচ্ছে। আরো আশ্চর্য লাগে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেই কংগ্রেসী সদস্য শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডার ওয়ার্কসের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকেই পৌরসভার পুকুর থেকে কংক্রেট টাকার মাছ গণ্যপনে বিক্রি করছিলেন। এও অভিযোগ যে তাকে হাতে নাতে ধরা হয়।

তারপর তাকে পৌরসভা থেকে বরখাস্ত করা হয়।

এখন এই ব্যক্তি ও তার দলবল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে আসল ঘটনাকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করছে।

যদিও কমলবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই তথাপি আমি খবরটি শুনলে শ্রীরামপুরে যাই। স্থানীয় জনসাধারণের অনেককেই কমলবাবুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। একজন কাগড়ের দোকানদার শুনেনই বললেন, মশাই দেবতুল্য লোকের সম্বন্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

মাহেশের কংক্রেট অধিবাসী জানানেন যে সি-এম-ডি-এর টাকা যদি তিনি তছরূপ করে থাকেন তাহলে এতসব কাজ হচ্ছে কোথা থেকে? পৌরসভার আর্থিক অবস্থা তো উন্নয়নমূলক কাজের এত অনুকূল নয়।

জনৈক শাসক কংগ্রেস সমর্থক জানানেন, -কমলবাবু সি পি এম সদস্য হতে পারেন, কিন্তু পৌরসভার কোন কাজে তিনি কখনও দলীয় স্বার্থ নিয়ে কাজ করেন নি। কারণ কমলবাবুর যা কিছু দলীয়

কাজ সবই পৌরসভার বাইরে। পৌরসভার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট।

জানতে পারা গেছে যে একাত্তর সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত সি-এম-ডি-এ শ্রীরামপুর পৌরসভাকে তিনটি কিস্তিতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দেন। প্রথমে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। অবশ্য পৌরসভার স্কিম ছিল সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার। কিন্তু পৌরসভা পায় মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এই সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বেশির ভাগই রাস্তা উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয়। তাছাড়া পয়ঃপ্রণালীর কাজেও ব্যয় হয়। রাস্তাগুলির মধ্যে চন্দ্রমোহন রায় লেন, বোসপাড়া লেন, কে এম সাহা স্ট্রীট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া পৌরসভা ঐ টাকাটা এ বছরের মার্চ থেকে খরচ করতে থাকেন। পৌরসভা সি-এম-ডি-একে আর একটি স্কিম দিয়েছেন যার অর্থ বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে সাত লক্ষ টাকা। তবে এখন তা অনুমোদনের অপেক্ষায়।

কমলবাবুর বিরুদ্ধে শ্রিতীয় অভিযোগ আনা হয়েছে যে তিনি পৌরসভার কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট

ফান্ডের টাকা চুরি করেছেন। পৌরসভার হিসাবরক্ষক আমাকে জানানলেন যে পৌরসভার বর্তমানে ছয়শোর বেশি লোক কাজ করে। তাদের প্রত্যেকেরই প্রভিডেন্ট ফান্ড যথাযথ ভাবে কাটা হচ্ছে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে জমা দেওয়া হচ্ছে। হিসাবরক্ষক শ্রীগোবিন্দ জ্ঞানালেন যে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি আরো জানানলেন, “রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বলতে বাধ্য নেই পৌরসভার হিসাবের কোন গলদ ও চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা পৌরসভার হিসাব থেকেই প্রমাণিত হবে বাবে।”

কমলবাবুকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে থাকলেও তাঁর দেখা পাইনি। তবে স্থানীয় লোকের খারণা কংগ্রেসীরা গুন্ডাবাহিনীর সাহায্যে কমলবাবু তথা শ্রীরামপুর এলাকার সি পি এম সমর্থকদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালাবার পরিকল্পনা করছেন। বর্তমানে এদের নেতৃত্ব করছেন বসুমতী পরিবার নবনিযুক্ত সাংবাদিক ও শ্রীরামপুর যুব কংগ্রেসের সদস্য শ্রীশ্রীম রাজমজা।

ডলারের অবমূল্যায়ন বিশ্বণু জিবাদের সাম্প্রতিক সঙ্কটের চিহ্ন

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

পাক-ভারত উপমহাদেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধবিধ্বস্ততার ডামাডোলে একটী কঠোর সত্য সম্ভবতঃ আমাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের কোন দেশের সমকালীন ঘটনা যে আজ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী কাঠামো ভেঙে পড়ার ঘটনার সঙ্গে ওতো-প্রোতভাবে জড়িত একথা স্বরণে রাখা অপরিহার্য। তা না হলে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বা সামরিক সংঘর্ষের মৌলিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন।

দুর্দিন্যার সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকা আজ যে ভাবে অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবেতে ঘরপাক খাচ্ছে, তার পক্ষে আজ যে কোনো রূপ স্থির রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ছে তা পরিষ্কার ভাবে নজরে না এলে অনেক ঘটনারই মূল তাৎপর্য বোঝা যায় না।

বাংলা দেশের মজ্জা সংগ্রামের

ক্ষেত্রেও আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষপাতী বৌক কেন ভারতকে ভয় দেখানোর, ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করার পথ গ্রহণ করল, কেন সে তার সপ্তম নৌবহরের বিশাল শক্তিকে ভারত মহাসাগরে সন্নিবেশ করেও শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশের সমুদ্র এলাকায় প্রবেশ না করার সিদ্ধান্ত নিল অথচ ভারত মহাসাগরে অবস্থান করছে কেনই বা পাকিস্তানের সঙ্গে “আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য” করার গোপন চুক্তি কব্ব করিতে পারছে না, নিরাপত্তা পরিষদে তার ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেন ও ফ্রান্স কেনই বা মার্কিন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দানে বিরত থাকল, এবং খোদ আমেরিকায়ই প্রাক্তন ডাইস প্রেসিডেন্ট হামফ্রে, রাষ্ট্রপতিপদ প্রার্থী সেনেটর ম্যাকাথী, সেনেটর চার্লস কেনেডীরা প্রেসিডেন্ট নিকসনের পাকিস্তান পক্ষপাতী নীতির বিরোধিতা করছেন, (অথচ ঐ

গোপন চুক্তি উনিশশো বাষাটি সালে পরলোকগত ডেমোক্রটিক দলভুক্ত প্রেসিডেন্ট কেনেডী নিজেই স্বাক্ষর করেছিলেন) এসবগুলি ঘটনার যোগসূত্রটী যেন নজরের বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

বর্তমান মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা - ডলারের মূল্য হ্রাস করতে আমেরিকার সম্মত হতে বাধ্য হওয়া।

উনিশশো চৌদ্বিশ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পরলোকগত রুজভেল্ট একরকম জবরদস্তি করেই সবজন্মগ্রাহ্য আন্তর্জাতিক লেনদেনে স্বীকৃত একমাত্র মাধ্যম সোনার দাম আউন্স প্রতি পঁয়ত্রিশ ডলারে বেঁধে দেন।

প্রায় সকল দেশ থেকে চাপ আসা সত্ত্বেও আমেরিকা সোনার দাম বাড়িয়ে ডলারের আনুপাতিক হারে মূল্য হ্রাস করতে সম্মত হয় নি। কিন্তু আজ তাকে বাধ্য হয়ে শতকরা সাড়ে আট ভাগ অর্থমূল্যায়ন করে সোনার দাম আউন্স প্রতি

আটত্রিশ ডলার করতে রাজী হতে হয়েছে।

এর ফলে সোনার হিসাবে ডলারের দাম কমলো এবং সেই হারে মার্কিন রপ্তানী পণ্যের দাম কমলো কিন্তু মার্কিন আমদানী পণ্যের দাম বাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বাজারে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলিও তাদের স্ব স্ব দেশের মদ্রার দাম ডলারের তুলনায় বাড়িয়ে দিল। অর্থাৎ এখন থেকে ঐ সব পুঁজিবাদী দেশের রপ্তানী পণ্যের দাম মার্কিন পণ্যের তুলনায় কিছুটা বাড়বে এবং ফলে ঐ সব দেশের পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কিছু বেড়ে যাবে বলে মার্কিন পণ্য তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হবে।

বলাবাহুল্য ওয়াশিংটনে এ সমস্যার শেষদিকে “গ্রুপ অব টেন” বা দশটা বৃহৎ পুঁজিবাদী ধনী দেশের বৈঠকে এই চুক্তি গৃহীত হয়েছে।

এর ফলে বিশ্বের মূল সঙ্কটের কিছু সমাধান হয় নি। মার্কিন দাবী ছিল, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশকে তাদের তৈরী পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মার্কিন পণ্য বাতে তুলনামূলকভাবে বিশ্বের বাজারে ঐ সব দেশের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে তার কব্বস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমেরিকার যুক্তি ছিল : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ও জাপানকে পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করার জন্যে এবং কব্বকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আমেরিকাকে অল্প ডলার বাজারে ছেড়ে “সাহায্য” যদিগিয়ে যেতে হয়েছে, তারই ফলে আমেরিকায় মদ্রাস্থিতি ঘটে পণ্যমূল্য বেড়ে গেছে এবং লেনদেনে তার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সুতরাং মার্কিন সঙ্কটের দায় দায়িত্বের ভাগ এসব ধনী দশটা দেশকেও বহন করতে হবে এবং তাদের পণ্যের দাম বাড়ানোর ব্যবস্থা হিসাবে তাদের স্ব স্ব দেশের মদ্রার মূল্য উচ্চ হারে ধার্য করতে হবে।

কিন্তু ঐ সব দেশগুলি এতে রাজী নয়। তারা বলছে সাহায্যের ঋণ আমরা শোধ করে দিয়েছি এবং কমিউনিজম ঠেকানোর মহান দায়িত্ব আমরা তোমার ঘাড়ে চাপাই নি। নিজের প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যেই তুমি নানা দেশে সৈন্য রেখেছো ঘাঁটী গাড়ছ, ভিয়েতনামের অভয় গহবরে ডুবে গেছ। সুতরাং এর দায়দায়িত্ব আমাদের নয়।

আমেরিকা তখন বেপরোয়াভাবে সব দেশেরই মজ্জা ডলার বদলে সোনা দেবার প্রতিশ্রুতি সে পালন করবে না বলে ঘোষণা করে এবং আমেরিকায় এসব দেশের যে পণ্য

আমদানী হয় তার ওপর শতকরা দশভাগ হারে আমদানী শুল্ক বসিয়ে দেয়।

এদিকে ইউরোপের দেশগুলি সব এক হয়ে যায় এবং বৃটেনকেও তাদের ইউরোপীয় কমন মার্কেটের সদস্য করে নিয়ে সবাই মিলে আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্যোগ নেয়। বিপদে পড়ে যায় জাপান। কারণ, তার বাণিজ্যের অধিকাংশ আমেরিকার সঙ্গে। ইউরোপের দেশগুলি নিজেদের মধ্যে রপ্তানী আমদানীর জিনিষের উপর থেকে একটু একটু করে সবরকম শুল্ক উঠিয়ে দেবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ। অর্থাৎ জাপানের পণ্য আমেরিকার বাজারে হারাবে, ইউরোপের বাজারেও ঢুকতে পারবে না। তাই জাপান সর্বপ্রথম মার্কিন চাপের কাছে মাথা নত করে-ইয়েনের দাম ডলার প্রতি তিনশ ষাট থেকে তিনশ আট ইয়েন করতে বাধ্য হল। পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন প্রভৃতি দেশও তাদের মদ্রামূল্য ডলারের তুলনায় পাঁচ শতাংশের মত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডলারের মূল্য হ্রাস করতেও আমেরিকাকে বাধ্য করল।

এ ধরনের আপোষরফা করে কিন্তু এ মদ্রাসঙ্কটের স্থায়ী সমাধান হয় না। এখন শব্দ মাত্র এটুকুই বলা যায় যে এই ধনী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলি প্রয়োজনের খাতরে সাময়িক আপোষ করেছে; তারা এখন চেষ্টা করবে বিভিন্ন দুর্বল, অনন্নত দেশের ঘাড়ে এই সঙ্কটের বোঝা কতটা চাপানো যাবে। এই সঙ্কটের বোঝা অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলির ঘাড়ে চাপানোর একটা প্রধান উপায় সামরিক উপকরণ সরবরাহ করে তাদের কাছ থেকে সম্পদ শোষণ করা। এর জন্যে প্রয়োজন এখনে ওখানে যুদ্ধের উস্কানি দিয়ে চলা অথচ মত্থে শান্তির বাণী আওড়ে চলা। শীঘ্রই পশ্চিম এশিয়া, তাইওয়ানের দরিয়ান অথবা অন্যত্র এর চিহ্ন ফুটে উঠবে।

অন্য একটা উপায় ঋণজালে বেঁধে এসব দেশের সঙ্গে অসম-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সম্পদ শোষণ করা। একজ করতে গেলেই আবার পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের কলহ দেখা দেয়, তাই তারা কোন সন্ধিস্থ নীতি গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়ার লক্ষণ এই ডলার সঙ্কটের মাঝেই পরিষ্কট হয়ে উঠছে।

মজুত করা জাতীয় স্বার্থের বিরোধী

সকলের প্রয়োজন পূরণ করার মত অত্যাৱশ্যক সামগ্রী যথেষ্ট আছে, কিন্তু মজুত করার মত অপরিাপ্ত নেই। কোনও অভাব যেখানে নেই সেখানে অভাব সৃষ্টি করবেন না।

.....দেশকে রক্ষা করার জন্তে এবং জাতীয় মৌল মূল্যবোধগুলির মর্যাদা রক্ষার জন্তে জওয়ানরা প্রাণ দিচ্ছেন।

আমরা এই ভাবে আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারি

- * একান্ত প্রয়োজন হলে তবেই কিনব।
- * সমস্ত অত্যাৱশ্যক সামগ্রী জাতীয় মূল্যে যোগাব।
- * জব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখব।

প্রতিরক্ষা প্রয়াসে সহায় হন—মূল্যমান কম রাখুন

রাজ্যপালের কাছে শিল্পপতিদের আবদার

(বিশেষ প্রতিনিধি)

পশ্চিম বঙ্গোপত্যে এককভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা বৈধ নয়। সেদিনই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিদের প্রধান রাজ্যপাল প্রীতানন্দের কাছে দরবার করছিলেন যে বর্তমান “স্বাধীনতা পরিপন্থী” কে যেন জীয়ে রাখা হয়।

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার “উন্নতি” হওয়ায় শিল্পপতিরা সবাই খুশী। যুক্তফ্রন্ট আমলে কলকারখানা ও ক্ষেত্রে খামারে শ্রমিক-চাষীদের বিরুদ্ধে পুলিশ নিয়োগ বন্ধ হওয়ায় মালিকদের বেশ অসুবিধা হয়।

রাজ্যপতির শাসনের নামে নব কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেই পুলিশকে পুনরায় শাসকগোষ্ঠীর সেবাদাসে

পরিণত করে। তবে কাজটা সহজে হয়নি। শ্রমিকরা কটিলে নিতে কিছুটা সময় লেগেছিল।

শিল্পপতিরা দাবী করেছেন যে ইতিপূর্বে যেমন কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের সময় খানার ও-সি থেকে শ্রম করে উপরতলার পুলিশ অফিসাররা মালিক পক্ষের একটি মাত্র টেলিফোনেই “যথেষ্ট কবস্থা” নিয়ে আসতেন, সেটিকে আবার ভালভাবে চালু করা এবং পাকা বন্দোবস্ত করা।

রাজ্যপালের কাছে এরা জানান যে “স্বাধীনতা পরিপন্থী”তে শ্রমিকদের বিক্ষোভকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এমন পরিবেশ প্রয়োজন

যাতে যারা উৎপাদন বাড়ানোর কথা না বলে মজদুরী বৃদ্ধির কথা বলবে তাদেরকে দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া সহজ হয়।

এই বৈঠকে কোন অতি-উৎসাহী শিল্পপতি এই সুযোগে সদ্যজাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের পবিত্র দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে শ্রমিকদের ঠান্ডা রাখার প্রস্তাব করেন। এই সময় প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট জনৈক শিল্পপতি এদের জানিয়ে দেন বাংলা দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব সেখানকার নাগরিকদের। পশ্চিম বঙ্গের কবসায়ী ও শিল্পপতিদের এ ব্যাপারে বেশী উৎসাহ দেখান

মোটাই শোভন হবে না। এখনই বাড়াবাড়ি করলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই মন্তব্যটি কারও কারও মনে যে ধরেন তা বোঝা যায়, যখন পাট শিল্পের শ্রমিকদের ধর্মঘটের হুমকীর উল্লেখ করে জনৈক বক্তা দুই বঙ্গের পাটশিল্পকে রক্ষাশালাইজ করার জন্য নানান যুক্তির অবতারণা করেন।

কাঁচা মাল সংগ্রহের অসুবিধা ও ব্যাঙ্কগুলি থেকে সহজে পুঁজি পাওয়ার আইনগত বাধা সম্পর্কেও আলোচনা হয় এই বৈঠকে। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে কতটা সাহায্য করতে পারেন সে কথাও রাজ্যপালকে জানানো হয়।

ব্যাঙ্কের পরিচালক গোষ্ঠীর তরফ থেকে ঋণদান সম্পর্কে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে এই বৈঠকে নাকি বেশ

বাদানবাদের সৃষ্টি হয়। শেষে চিহ্ন হয় যে পরবর্তী একটি বৈঠকে “বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে”

রাজ্যপাল নাকি দৃষ্টান্ত বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিদের অধিকাংশই স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশের দিকে যে পরিমাণ আগ্রহ দেখান উচিত ততটা দেখাননি। জনকল্যাণমূলক কাজে এরা মহারাজ, পাঞ্জাব বা তামিলনাড়ুর শিল্পপতিদের অনুসরণ করেননি।

মনে হয়, এখানকার মনোভাটাকাই এরা চেনেন, কিন্তু যে হাঁড় ডিম পাড়ে তাকে কোনরকম বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছু করতে এরা রাজী নন।

লাড়াই, দণ্ডা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে যে এরা মনে খুশী হন, এ ধারণা এই বৈঠকে উপস্থিত পর্যবেক্ষকদের কারও মনে হয়নি।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলা দেশে পাক সামরিক চক্রকে সহায়তার জন্য সপ্তম নৌবহর প্রেরণ সহ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীতির বিরুদ্ধে গত তেরোই নভেম্বর থেকে আঠারোই নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা মহানগরীর বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্লাবন হয়ে গেল।

সেই সঙ্গে বাংলা দেশের বিজ্ঞানসম্মত পালিত হয়েছে। সেদিন ধর্মান্তে মহানগরী মধুর হয়ে উঠলো। রাজনৈতিক দল ছাড়া যুব সংগঠন এবং বিভিন্ন সংস্কার ইউনিয়নগুলি এই কর্মসূচীর সামিল হয়েছিলেন।

গত সপ্তাহে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হলেও এই সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহরের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহানগরীর জনমন্ডলে যে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল তারই পরিণতি হিসেবে এই

বিক্ষোভের প্রলয় তান্ডব ঘটে গেল।

তান্ডব নৃত্য শুরুর হয় গত তেরোই ডিসেম্বর দুপুরে চৌরঙ্গীর প্যান আমেরিকান এলার ওয়েজের অফিসে একদল ছাত্র অতর্কিতে যখন প্রবেশ করে। প্রথমে তারা বিক্ষোভ জানায়। পরে চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করে। টেলিফোনটি নষ্ট করে দেয়। রাস্তার দিকের কাঁচ ভেঙ্গে ভাঙা চেয়ার টেবিলে অগ্নি সংযোগ করে চলে। এরপর চোদ্দই নভেম্বর কংগ্রেসের সোস্যালিস্ট ফোরাম শহীদ মিনার থেকে মিছিল করে এসে মার্কিন দূতাবাসে বিক্ষোভ জানায়। ভরতের কমিউনিস্ট পার্টিও সর্বোচ্চ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে এসে দূতাবাসে বিক্ষোভ দেখায়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ক্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দ মার্কিন

নীতির জঘন্য ভূমিকাকে বিচার জানানোর জন্য ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা, আমেরিকান এক্সপ্রেস ক্যাঙ্ক এবং ফাস্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশন কালে জঁরা মার্কিন সরকারের নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টির দাবী করেছেন। গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও বি পি এস এফ (এফ এস আই) সর্বোচ্চ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

পনোরোই ডিসেম্বর দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজের ছেলেরাও এই ধরনের বিক্ষোভ জানান। রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতির কো-

অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে কলকাতা ও শহরতলীর দপ্তরগুলিতে দুপুরে বিরতির সময় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে।

সতেরোই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘ ও যুব পরিষদের যৌথ উদ্যোগে মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বিক্ষোভকালে কিছু পটকা ও ঢিলও এই দপ্তরে পড়েছে বলে জানা যায়। বারোই জুলাই কমিটির উদ্যোগেও একটি মিছিল এই দপ্তরের সামনে এসে বিক্ষোভ জানায়।

আঠারোই ডিসেম্বর আয়কর কর্মচারী সমিতি ও সারা ভারত ছাত্র ব্লক, ডি ওয়াই ও, ডি এস ও-র উদ্যোগে পৃথক মিছিল বের করে বিক্ষোভ জানান হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারী-গণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল

করে মার্কিন প্রচার দপ্তরে বিক্ষোভ জানান। এ ছাড়া প্রায় প্রতিদিন ছোট বড় মার্কিন ধরনের কয়েকটি করে মিছিল মার্কিন প্রচার দপ্তর ও দূতাবাসে বিক্ষোভ জানিয়েছে।

একই সঙ্গে কেউ কেউ আবাক দেখা ও কল্যাণী দুই প্রকা-কাজ করেছেন। মার্কিন দূতাবাসে বিক্ষোভ জানিয়ে সোভিয়েত ও বাংলা দেশ দূতাবাসে গিয়ে আনন্দন জানিয়েছেন। গত সপ্তাহের মত ইতস্ততঃ বিক্ষোভ পরবর্তীকালে যে স্লাবন বইয়ে দিল ত হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হতে পারে। তবে এই সময় সরকারী দপ্তরেও একই সঙ্গে মার্কিন পুঁজির বাজেয়াপ্ত করণের জন দাবী জানান উচিত ছিল। দেশে ছাত্র ব্লক ও খেটে খাওয়া মেহনত মানুষ যদি এই দাবিতে মিলিত আন্দোলন করেন তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার এই চাপের সামনে বাধ্য না করতে বাধ্য হবেন। না হলে ক্ষমতাকর উত্তেজনার মতই এই আন্দোলন কিছুদূর গিয়ে থেমে যাবে।

কয়েকটি হাসপাতালে অচলাবস্থা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

কলকাতার বেশ কয়েকটি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে যে রূপ অচলাবস্থা চলছে তা দেখার মত কেউই নেই।

এর মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে শ্রম করে বিভিন্ন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের মনোযোগ স্বার্থান্বেষী মহলের। কলকাতা পৌরসভার অধীনস্থ হাসপাতালগুলির অবস্থা আরও চরম রূপলাভ করেছে। রাজ্য সরকারের কাছে থেকে পাওয়া টাকা পাওয়া গেলে আর চিন্তার কারণ থাকে না। কর্পোরেশনের অধীনে কলকাতার অদূরে বড়লক্ষ মধ্য হাসপাতাল নামে একটি হাসপাতাল

রয়েছে। রাজ্য সরকার এই প্রতিষ্ঠানে শয্যা সংখ্যা পাঁচ শত করতে চেয়েছেন। বর্তমানে এখানে শয্যা সংখ্যা রয়েছে একশটি অথচ দশোটি বেডের জন্য পূর্বে টাকা পাওয়া গেছে। বর্তমানে পৌর কর্তৃপক্ষকে রাজ্য সরকার আরও কুড়ি লক্ষ টাকা সাহায্যের কথা জানিয়ে পত্র দেন। উত্তর না পেয়ে কমিশনারের কাছে পুনরায় দৃষ্টি পত্র দিয়েছেন। শেষ পত্র রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটু কড়া সুর প্রকাশ পেয়েছে।

বেশ আশ্চর্য লাগলেও ঘট-

নাটি সত্য। দেশের পরিস্থিতিতে মধ্য রেঞ্জের উৎপাত বহু লোকের বাড়ীতেই রয়েছে। সকলের পক্ষেই বাড়ীতে চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা হাসপাতালে বেডের চেষ্টা করে। সরকার টাকা দেওয়া সঙ্গে পূর্বের অনুমোদিত শয্যার মধ্যে অধিক বাকী কেন? এর উত্তর আজও অজ্ঞাত। নতুন ভাবে আবার টাকা দিতে সরকার রাজী হওয়ায় ও কমিশনার সাহেবের অনীহা দেখে রূপারটি সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর কি এবার নড়েচড়ে বসে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করবেন, না কি কর্পোরেশনের কয়েকজন দর্শনীয়গণ আম-লাদের মোরসী পাট্টার বড়বন্দকে বাড়িয়ে তুলবেন?

সওদাগরী কর্মচারী ইউনিয়নের দাবী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত ষোলই ডিসেম্বর ফেডারেশন অব মার্কেটাইল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির এক সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য সম্ভাব্য প্রকাশ করা হয়। মজি ফোজ এবং মির-বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির গণতন্ত্রের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসাও করা হয়েছে এই সভায়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকার এবং জনগণতান্ত্রিক চীনেব ন্যাকারজনক ভূমিকার তীব্র নিন্দাও করা হয়।

প্রসঙ্গত সওদাগরী কর্মচারী-

দের কাছে অজকের সন্তোষ পাঠ স্থিতিতে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একাবদ্ধ হয়ে দেশরক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান এবং সরকারের কাছে দেশের অভ্যন্তরে দমন-পীড়নমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর দাবী জানানো হয়।

সমস্ত অফিস, বন্দ কলকারখানা খুলে দেওয়া এবং ছাঁটাই, লে অলক আউট প্রভৃতি বন্ধ করা আন্দোলন প্রয়োজন। সভায় বিশেষভাবে দাবী জানানো হয়, বিড়লা সহ সর্ব অফিস, সংস্থা খুলে দেওয়ার এ চাকরীচ্যুত এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কর্মচারীকে কাজে ফিরিয়ে আনা জন্য।

মতামত

দুনীতির গন্ধে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

একদা পশ্চিমবঙ্গের গৌরবস্থল যাদবপুর কে এস রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল আজ কতিপয় দর্শনীয় রচিত চিত্রকর্মের পরিচালনায় লুপ্ত হতে চলেছে। অন্যান্য হাসপাতালের ফুলনায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কর্মচারী কম দিয়ে এখানে সেবার নামে গ্রহণ চালানো হচ্ছে। রোগীদের পঁচা মাছ মরা পাঠার মাংস, বাসী ছাত সরবরাহ করা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। হাসপাতালে নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধ গায়ই থাকে না। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে এখানে রোগীরা পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত পড়ে থাকতে গাধ্য হচ্ছেন।

অথচ আরেক দিক থেকে এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর 'তুপাকৃত অর্থ' সাহায্য হিসাবে পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন শস্যপ্রতি ফরকার ও ই এস আই প্রভৃতি থেকে এসে তিনশ টাকা হিসাবে প্রতি বছর নির্দিষ্ট ভাবে মোট প্রায় তিরিশ শতাংশ টাকা এরা পেয়ে থাকেন। এ গাড়া বিভিন্ন খাতে সরকারের

বিশেষ সাহায্য এবং সাধারণের সাহায্য থেকেও আর হয় আরও কয়েক লক্ষ টাকা। তবুও এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আর্থিক সংকটের অজহাত দেখিয়ে চলেছেন। এছাড়া উপযুক্ত হিসাব দাখিল করলে সরকার আর্থিক সাহায্য আরও বাড়াতে স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু গত দশ বছরের হিসাব এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উপস্থাপিত করতে পারেন নি। এদিকে রোগীদের খাদ্য ও ঔষধ কমিয়ে কর্তৃপক্ষ টাকা বাঁচিয়ে চলেছেন। গত সন্তর সালে রোগীদের বরাদ্দ খাদ্য কমিয়ে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা বাঁচানো হয়েছে যার কোন হিসাবই পাওয়া যাচ্ছে না।

রোগীরা যখন এই দর্শনীয় বিবরণে এককথনভাবে প্রতিবাদ জানালেন তখনই রোগীদের ওপর সেবার বদলে অমানবিক অত্যাচার নেমে এল। গত বিশেষ অক্টোবর তারিখে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডাক্তারদের দিয়ে ধর্মঘট করিয়ে রোগীদের শাস্তি করতে এগিয়ে এলেন।

কর্তৃপক্ষের কয়েকজন পেটোয়া ডাক্তার এই সময় মানবিকতার এক কলঙ্কময় অধ্যায় সৃষ্টি করলেন। বিনা চিকিৎসায় চার পাঁচ জন রোগী মারা গেল। ছয়জন অসুস্থ

রোগীকে বহিস্কারের আদেশ দিতেও এই সব মানবদরদীদের (?) কুষ্ঠা হলোনা।

পরবর্তীকালে সমস্ত ঘটনা তদন্তের জন্য সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় ঐ তদন্ত কমিটিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সম্পাদক এবং ডাক্তার ক্লাবের সভাপতিকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হলো। এদের বিরুদ্ধেই রোগীদের অভিযোগ ছিল। ঐ তদন্ত কমিটি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ থাকার সত্ত্বেও রোগী-প্রতিনিধিরা উপযুক্ত প্রমাণ-পত্র সহ সাক্ষ্য দিলেন। সেই প্রমাণ-পত্রে কর্তৃপক্ষের বদলি থেকে বেড়াল বোড়িয়ে পাড়ার উপক্ৰম হওয়ায় তাড়াতাড়ি রোগীদের সঙ্গে একটা অপোষ করে নেওয়া হল এবং ঐ তদন্ত কমিটির সামনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে রোগীদের পঁচা মাছ মরা পাঠার মাংস প্রভৃতি সরবরাহ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। রোগীদের ওপর কোন আক্ৰোশমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না বলে কথা দিলেন। এরপর ডাক্তাররা কাজে যোগ দেন।

শুরু হলে পিছন দিক থেকে আক্রমণ। ঐ ছয়জন রোগীর চিকিৎসার খাতাপত্র আটকে রেখে কর্তৃপক্ষ চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছেন। অসুস্থ রোগীদের এক-ধার থেকে ডিসচার্জ করা শুরু হলো। যারা এই ডিসচার্জ আদেশ অমান্য করছেন তাদের খাদ্য ও চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে জোর করে হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। মাংস বন্ধ করে দিয়ে রোগীদের খাদ্য সংকোচন করা হয়েছে। রোগীরা যখন এই সব ঘটনার প্রতিবাদ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট গেলেন তখন তাদের একমাত্র সংগঠন আরোগ্য-কামী কল্যাণ সমিতিতে অস্বীকার করা হলো। রোগীরা এই সব নিয়ে বেশী মাথা ঘামালে তাদের শাস্তির জন্য উপযুক্ত দণ্ড দেওয়াই এর ব্যবস্থা করা হবে বলে হাসপাতালের সম্পাদক রিনটেনডেন্ট সম্প্রতি হুমকি দিয়েছেন। এই হুমকির পরেই দেখা গেল সি আর পি ভ্যান চুকিরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীদের মধ্যে সন্দ্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছেন।

রোগীদের এই দরবস্থার প্রতি সাধারণ ডাক্তারবাবরা যারা কর্তৃপক্ষের রাজনীতিতে জড়িয়ে চাননি, তারা সহানুভূতিশীল। কিন্তু কয়েকজন পেটোয়া ডাক্তারের দৌরাণ্ডো তারও মন্থ খলতে সাহস পাচ্ছেন না।

রোগীদের এই দরবস্থার সময়ে সবথেকে আশ্চর্য ভূমিকা নিয়েছেন

স্বাস্থ্য দপ্তর। রোগীদের সংগঠন আরোগ্যকামী কল্যাণ সমিতি হাসপাতালের ঘটনা সম্বন্ধে পদস্থানু-পদস্থরূপে স্বাস্থ্য দপ্তরকে বারবার জানানো সত্ত্বেও স্বাস্থ্য দপ্তর একটি চিঠির জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন অনুভব করছেন না। যে তদন্ত কমিটিতে রোগীদের সাক্ষ্য দিতে ডাকা হলো তার ফলাফল সম্বন্ধে রোগীরা কিছুই জানতে পারলেন না। যেখানে জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকায় ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, সেখানে রোগীরা খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছেন সেখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের কি কিছুই করার নেই? তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

বিমান ব্যানার্জী সম্পাদক, আরোগ্যকামী কল্যাণ সমিতি, কে এস রায় টি বি হাসপাতাল।

বিচ্ছিন্নতাবাদ

ও সি পি এম

ছবিদ্রশে নভেম্বরের দর্পণে একটি লেখায় শ্রীশেখর মুখোপাধ্যায় সি পি এম দলকে "বিচ্ছিন্নতাকামী" এই অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। আমি বলতে চাই, আত্ম-বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজন হলে ভারতীয় স্বতন্ত্রাঙ্গের অন্তর্গত "জাতিগতদের যে কোনওটির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার থাকা দরকার" এই দাবী করার মত চরিত্রের দৃষ্টিতে এই দলটির নেই। তারা নিজেরা এই দাবী তুলতে পারেন না তার কারণ বিবিশ্ব : চিন্তার দৈন্য ও বর্তমান অবস্থায় দলীয় স্বার্থ।

চিন্তার দৈন্য বলছি এই জনাই যে, এদেশের বড় বড় শোষকদের গেমস্তা পার্টির মতই তাঁদেরও ভারতীয় উপ মহাদেশের ইতিহাসের গতিধারার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করার অসুবিধা ছাড়াও মূলতঃ জাতীয়-স্বত্ববাদই সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি একথা বিশ্বাস করতে তাঁরা ভীত, পাছে তাঁরা মার্কসবাদ থেকে চ্যুত হন। ওদের কেমন করে বোঝাই, বাপদেহে, তেমনি খাঁটি বাঙালী হতে পারলে তবেই ভারতীয় তথা বিশ্বনাগরিক হতে পারবে।

বিচ্ছিন্নতার অধিকার দাবী না করার মধ্যেও এই দলের স্বার্থ-চিন্তা ক্রিয়াশীল। সি পি এম দল সব সময়ই নিজদের অনুবীক্ষণ-বল দিয়ে দেখেন; প্রকৃতপক্ষে কেবল ও পশ্চিম বাংলা ব্যতীত তাঁদের কোথাও পা রাখার মাটি নেই। এবং সেইজন্যই ক্ষমত শীল দল ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী-গুলোর অবিরাম মিথ্যায় তুর্-নির্যাদে পাছে তাঁদের ক্ষণিকশ তলিয়ে যায় সেই জন্য ঐ শয়তান-দেরই পো ধরেই দল টিকিয়ে

রাখতে তাঁরা ব্যস্ত। শ্রীমতঃপাধ্যায় সি পি এম দলের এক বড় নেতার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যার মতে বিপ্লব পূর্ব রূপে সাম্রাজ্যের কোনই তুলনায় বর্তমান ভারত স্বতন্ত্রাঙ্গের সঙ্গে চলে না। হ্যাঁ নীল চশমা দিয়ে দেখলে এই রকমই দেখায় বটে। আর বিপ্লবোত্তর ইউ এস এস অরের ছোট বড় প্রতিটি জাতি বেড়ে ওঠার সমান সুযোগ পেয়েছে কিনা সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যদিও সেই জাতিগুলির ভবিষ্যতের ভাবনা তাদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

একমাত্র গড়ল ও সুবিধাবাদী ছাড়া কেউই বলবে না যে, এই ভূখণ্ডের অধিবাসী আমরা বাঙালী নই, কাম্মারী নই, ওড়িয়া নই, মারাঠী নই—শুধুই ভারতীয়। অমদের প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আছে। আমরা পরস্পরকে সুখে দুঃখে সাহায্য ও সহানুভূতি দিতে প্রস্তুত।—আমরা ভাই ভাই। কিন্তু মিলে মিশে একাকার সঙ্কর জাতি হতে ইচ্ছে করিনা।

ভারতভূমিকে আমরা পবিত্র মনে করি ঠিক আফ্রিকার জাতি-গুলির মতই। কিন্তু আমরা জ্বর-দস্তি করে জাতিগুলির মধ্যে সংহতি আনার বিরোধী, যোগ্যতার বিচার না করে সংখ্যার জোরে সিদ্ধান্ত চাপানোর তীব্র প্রতিবাদ করবই। ঐক্য বা অন্যাক্ষর জনাই অ-হিন্দী ভাষীরা এই রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য গর্ব অনুভব করতে পারব না।

বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন নিয়ে সারা দেশকাপী এত হৈ চৈ ও সি পি এমের শ্রদ্ধা করার মূলে রয়েছে পশ্চিম বাংলার ভারত স্বতন্ত্রাঙ্গের বাইরে চলে যাওয়ার আশংকা। পূর্ব বাংলার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মজ্জিত অভূতপূর্ব লড়াই বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধি কাতরদের স্থির প্রত্যয় দিচ্ছেনা। স্বিধা না করেই বলা যায় পশ্চিম বাংলার আজকের সাংস্কৃতিক, আর্থনৈতিক, প্রশাসনিক সংকটের গভীরতা ও বিস্তৃতি যথার্থোপায় পরিপ্রেক্ষিতে দেখায় মানসিকতা ভারতের অন্য জাতি-গুলির নেই, যদিও সহানুভূতি আছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে দিল্লীর কর্তাদের কাছ থেকে পশ্চিম বাংলা পেয়ে এসেছে বণ্টন, উপেক্ষা, সন্দ্রাস ও শোষণ। এখানকার সড়ে চার কোটি মানুষ হতাশায় ও হীনমন্যতায় ক্রমেই জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ ওপার বাংলায় দেখা দিলেন শেখ মুজিব—সারা বাংলায় জাতীয়বাদের বন্যা বয়ে গেল। বোঝা গেল বাঙালীজাতি মরবে না। একে ভয় না করে ভারতের জাতিগুলির উচিত তাঁকে স্বাগত জানান।

কোনও জাতির ইতিহাসেই শেষ কথা কিছু নেই। পশ্চিম বাংলা ভারতের অঙ্গীভূত থাকবে, না বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব বাংলার সঙ্গে আপন ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ জড়াবে (শেখহাফ নব্ব পৃষ্ঠায়)

বেলেঘাটার পুলিশ ওগাদের প্রলয় দিচ্ছে

বেলেঘাটার বিভিন্ন অঞ্চলে বশেষতঃ মিঞাবাগান বস্তীর উপর গুন্ডা পুলিশ ও সি আর পির বোম্বার্ডমেন্টের কথা দর্পণে প্রকাশিত হয়েছে। গত ছয়ই নভেম্বর পুলিশের গুলিতে শিপ্রা সাহার হত্যা, বসীমার পোন্দারের উপর থানা লক ঘাপে মারধোর, ক্যাপক গ্রেপ্তার, গরী পুরষ নির্বিশেষে বস্তীর গণারণ মানবের উপর অকথ্য রীলশী অত্যাচারের বিবরণও তিপদর্বে দর্পণে প্রকাশিত হয়েছে। এই বীভৎস অত্যাচার গণারণ মানবের মধ্যে তীব্র প্রতি-স্মার সৃষ্টি করে। লোকসভাতে গোলোড়ন সৃষ্টি হয়। ফলে জন-দতর চাপে রাজ্যপাল ঘটনার তদন্ত সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেন। শাসক-গণের গুন্ডা ও পুলিশ কিছু-মান থমকে যায় এবং এলকায় গুন্ডা ঘটে না। যদিও গত ছয়ই নভেম্বর পুলিশ যে ক্যাপক গ্রেপ্তার করেছিল তাদের প্রায় কেউই মুক্তি পায় নি। সতেরোই ডিসেম্বর একই কান্দায় নব কংগ্রেসী গুন্ডারা গুলিশের সহযোগিতায় বিকাল বেলা থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। যারা পাইপগানসহ গুন্ডা-র আক্রমণ, টিয়ারগ্যাস ও রাই-ফলসহ পুলিশের আক্রমণ প্রায় ঘণ্টা ধাবণ চলে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পুলিশ বিগত দেড়বছর ধাবণ বেলে-ঘাটার বিভিন্ন অঞ্চলে কখনও

পরোক্ষভাবে, বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবেই সমাজবিরোধীদের প্রলয় দিচ্ছে। একমাত্র মিঞাবাগান বসতিতেই উনিশ জন পাটী কর্মীকে মিথ্যা অভিযোগে বিনা বিচারে পি ভি এ ও মিসাতে আটক করা হয়েছে। গত ছয়ই তারিখে যাদের গ্রেপ্তার করা হয় তাদের মধ্যে তেত্রিশ জন এখনও আটক রয়েছে, যার মধ্যে অসীমা পোন্দারসহ স্কুলের ছাত্রও রয়েছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় যে পুলিশ শিপ্রা সাহার হত্যাকাণ্ডে নিজের জড়িত থাকার বিষয়টিকে ধামচাপা দেবার জন্য প্রচার করে যে শিপ্রা সাহার ভাই নাকি শিপ্রাকে হত্যা করেছে। অথচ অসীমা পোন্দারসহ প্রত্যেককেই বেলেঘাটা থানা শিপ্রার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মনগড়া অভিযোগে অভি-যুক্ত করে আটক রেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা করছে বিনাবিচারে দীর্ঘমেয়াদী আটক রাখবার। এক-দিকে মিঞাবাগান বসতবাসীদের উপর অকল্প পলিশী নির্যাতনের ব্যাপারে লোক দেখানো তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে অপর-দিকে গুন্ডা পুলিশের অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে বিষয়টিকেই গ্রহণে পরিণত করা হচ্ছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জ্যোতি-বাবু রাজ্যপালকে লেখা এক পত্রে উপরোক্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আক-র্ষণ করে তার হস্তক্ষেপের দাবী করেছেন।

জনৈক নাগরিক

ভারত দর্পণ

পূর্ববঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ফলশ্রুতি

(দর্পণের পূর্ববন্ধক)

বাংলাদেশের বীর জনগণ অবশেষে তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন। তেসরা ডিসেম্বর পাক জঙ্গীশাহী মরিয়া হয়ে ভারতের পাঁচটি বিমানঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং তারই ফলে ভারতভূমির নিরাপত্তার সংগ্রাম বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সংগে এক হয়ে যায়।

ভারতের মাঝ চোম্পদিনের মধ্যে বাংলাদেশে লক্ষাধিক মারণাস্ত্র সন্সজ্জিত পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সামরিক দিক দিয়ে এটা একটা অদ্ভুতপূর্ব বিজয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর রণকৌশলের এই সাফল্য পৃথিবীর বিভিন্ন সামরিক বিশেষজ্ঞদের মনেও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। পূর্ব রণাঙ্গনে চোম্প দিনে যে বাহিনী এমন বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করল, পশ্চিম রণাঙ্গনে তাদের তুলনামূলক মন্ডরগতি সমর বিশেষজ্ঞদের নজর এড়ায় নি।

পাকিস্তানে মোট সামরিক সশস্ত্র বাহিনীর (ইনস্ট্রাক্ট অর ডিফেন্স স্টাডিজ-এর মতে দশ লক্ষ আর্টিলারি হাজার স্থল সেনা) প্রায় অর্ধেক পূর্ব রণাঙ্গনে নিবন্ধ ছিল। পাক জঙ্গীশাহী সামরিক দিক দিয়ে পূর্ব রণাঙ্গনের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছিল। অথচ সেখানে তারা অতর্কিতে ভেঙ্গে পড়ল।

প্রধান কারণ, পূর্ব রণাঙ্গনে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী—প্রায় লক্ষাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী—গত জন মাস থেকেই ইতোস্তত এলাকায় সংগঠিত হয়ে ক্রমশঃ একটা সুসংবদ্ধ বাহিনীর রূপ গ্রহণ করছিল। পশ্চিমে মার্চ ও তার পরে অসংখ্য অত্যাচারের, নিপীড়নের সন্ত্রাস তাদের আগামী দিনের শেষ যুদ্ধের জন্য অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তুলছিল, তাদের বাঁচতে হলে যে-কিছুই করেই বাঁচতে হবে, ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসকে ধ্বংস করেই যে তারা দেশে স্বাধীনতা ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, একথা তাঁরা বহু রক্তদানের বিনিময়ে শিখতে পেরেছিলেন।

নিরমিত সেনাবাহিনীর যা শিখতে দীর্ঘ সময় লাগে, গণহত্যা ও ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতায় তাঁরা তা কয়েক মাসের মধ্যেই আয়ত্ত করেছেন। নিরস্ত্র নিরীহ অবস্থায় যাঁরা সশস্ত্র পাক মিলিটারী ও জঙ্গী সরকারের পোষা রাজাকার দলের অকণ্ঠ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে

বাধ্য হয়েছেন, অসংখ্য নিরম হত্যা তাঁদের ভীতি ভেঙ্গে দিয়েছে। যখন তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে অস্ত্রধারণ করলেন তখন তাদের হারাবার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অত্যাচারীরা চিরদিনই এভাবে নিপীড়িত, অত্যাচারিত, সন্ত্রাস-ক্ষুদ্র মানবকে সংগঠিত হবার প্রেরণা দেয়, ভয়হীন, দর্জ করলে তোলে।

“মুক্তিবাহিনী ভারতের মুক্তি” বলে যে সব তাত্ত্বিক পণ্ডিত নাক সিঁটকতেন, তাদের জানা ছিল না যে অত্যাচারই প্রতিরোধের জন্ম দেয়।

এই বাহিনী সর্বত্র সংগঠিত ছিল একই কম্যান্ডের অধীনে এমন নয়। পূর্ববঙ্গের ভূপ্রকৃতি ও রাজনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে যারা পরিচিত তাঁরা সহজেই বুঝবেন যে নন্দদী মেখলা পরিবেষ্টিত, খাতু বৈসাদ্য চিহ্নিত বঙ্গভূমিতে একই কম্যান্ডের অধীনে সংগঠিত এমন বিপুল সংখ্যক বোম্বাদের সংগঠন গড়া সহজ ছিল না। কিন্তু জনগণের উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই এরকম সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

বাংলাদেশের মোট দু ভাগের কিছু বেশী পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল এলাকার মধ্যে চল্লিশ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর এলাকা বিস্তৃত ছিল। মার্কিন সাপ্তাহিক নিউজ উইকের (বাইশে নভেম্বর উনিশশ একাত্তর সাল সংখ্যা) পৃষ্ঠায় পরিচালিত সিনিয়র এডিটর মিঃ আনিদ দ্য বোসগেভ নিজে মুক্তিবাহিনীর এলাকা পরিদর্শন করে লিখেছেন, “যদিও ‘স্বাধীন বাংলাদেশ’ এখনও সম্ভব হচ্ছে ওঠে নি, তবু গেরিলা দলগুলি পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাসের পর সন্ত্রাস ধরে তাদের অধিকৃত এলাকা সম্প্রসারিত করে চলেছেন। শত শত সরকারী কর্মচারী, সিভিল সার্ভিসের অফিসার এবং গ্রামের মোড়লরা গোপনে গেরিলা দলের নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে থানা পারাপারের জয়গা ছাড়া শহর ও নগরের বাইরে পাকিস্তানী সৈন্যদের দেখতেই পাওয়া যায় না। দেশের অধিকাংশ এলাকায় রাতিবেলা গেরিলা বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়, ক্রমশঃ বেশী বেশী এলাকা দিনের বেলায়ও গেরিলাদের দখলে চলে যাচ্ছে।”

পরাজিত পাক-জেনারেল নিয়াজী ইন্টার কম্যান্ডের অধ্যক্ষ জেনারেল অরোরকে বলেছেন যে “আমরা সেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা

মুক্তিবাহিনী যে কার্যকলাপ চালিয়েছে তার ফলে আপনারা আমাদের বিপক্ষে উল্লেখযোগ্য ‘সুবিধা’ লাভ করেননি।” জেনারেল অরোরা, জেনারেল সুগত সিং এবং অন্যান্য ভারতীয় সেনানায়ক মস্তকণ্ঠে মুক্তিবাহিনীর সামরিক কার্যকলাপের প্রশংসা করেছেন। এমন কি স্টেটসম্যানের মত পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছে—“যদি (এরকম) সাহায্য ভারতীয় বাহিনী না পেত তাহলে যুদ্ধের ফলাফল কি ভাবে প্রভাবিত হত, এ আলোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু (মুক্তি বাহিনীর) ঐ সাহায্য যে আমাদের প্রচণ্ড সুবিধা করে দিয়েছে তা তর্কাতীত। গত আটমাস ধরে মুক্তিবাহিনী যা করেছে সম্ভবতঃ তা আরো বেশী উল্লেখযোগ্য। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আপাত প্রভাব এবং তার ফলাফল একথা ঢেকে দিতে পারে না যে পশ্চিমে মার্চ নিরস্ত্র বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পাক ফৌজী আক্রমণের অব্যবহিত পর থেকেই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম তেসরা ডিসেম্বর পাকিস্তানী বিমান আক্রমণের প্রত্যুত্তরে ভারতের জবাব দেবার সঙ্গে সংগে একীভূত হয়ে যায়। ভারতের জবাব যতই পূর্ণাঙ্গ সাফল্য অর্জন করে থাকুক না কেন, এই সংগ্রামকে মূলতঃ মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণের পরিচালিত

সংগ্রাম হিসেবেই উপলব্ধি করা প্রয়োজন।”

বাংলাদেশের সশস্ত্র গেরিলা বাহিনীর আক্রমণের মধ্যে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকা প্রায় ছেড়ে দিয়ে শহর নগরে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই তাদের প্রতিরোধ ছিল দুর্বল, ভগ্নদর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় বাহিনী, মুক্তি বাহিনীর সহায়তায় প্রায় একদমে ঢাকা গিয়ে পৌঁছায়, বিশাল গ্রামীণ এলাকায় গেরিলা ব্যাং ভারতের সেনাদলকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে, অসংখ্য নদী নালা খাল বিল পেরোবার নিশানা দিয়েছে, শত্রুর বোমাঘোণের পেছনের কেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

তাই মাত্র এক হাজার সাত-চল্লিশ জন নিহত তিন হাজার চল্লিশ জন আহত এবং উনসব্বদুই জন নিখোঁজ, এই সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী চোম্পদিনে সারা বাংলাদেশ অতিক্রম করে ঢাকা দখল করেছে এবং প্রায় একলক্ষ পাক সশস্ত্র সেনাদলকে বন্দী করতে পেরেছে। পশ্চিম-রণাঙ্গনে ক্ষতির পরিমাণ বেশী হলেও তুলনামূলক সাফল্য অর্জিত হয়।

স্টেটসম্যানের সম্পাদক সঠিকভাবেই লিখেছেন যে, “এই সংগ্রামকে মূলতঃ মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে

বাংলাদেশের জনগণের পরিচালিত সংগ্রাম হিসেবেই উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

দুখের বিষয়, শাসক কংগ্রেস দল বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রাম ও বিজয়কে তাদের দলেরই কৃতিত্ব বলে জাহির করার অপপ্রয়াস চালিয়ে হাস্যপাদ হচ্ছেন। যেন ভারতের জনগণ এই মুক্তি সংগ্রামে যে অটল ভাগ স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ তরুণ গেরিলাদল, জীবন দিয়ে যে প্রতিরোধ রচনা করলেন। তার মূল্য যেন কিছুই নয়।

বলা বহুল্য, যে সব ভদ্রলোক ভারতের জনগণের স্মৃতিশক্তি কম বলে মনে করছেন, এবং তাঁদের নির্বোধ বলে ভাবছেন, তারা অচিরেই দেখতে পাবেন মিথ্যা ভাওতা দিয়ে কার্য সাধন করা যায় না। বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম ভারতীয় জনগণেরও আশার প্রদীপ আর এই সংগ্রাম শত্রু ইয়াহিয়ার মত অত্যাচারীকেই নয়, তার চেয়ে বেশী অসংস্জিত শক্তিকেও প্রতিরোধ করতে সক্ষম—বাংলাদেশ ভিতরেতনামের মতই তার অজ্ঞেয় স্বাক্ষর রেখেছে, ভারত উপমহাদেশের প্রতিটী সং নরনারীর অন্তরে। ভারত বাংলাদেশের মৈত্রী সেই সংগ্রাম ধারারই ফলশ্রুতি।

বিদেশ দর্পণ

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ গতিবিধি

(দর্পণের পূর্ববন্ধক)

লারকানার “নবাবজাদা” জর্জফিকর আলী ছুটোর স্বপ্ন অবশেষে সত্য হল। গত সোমবার তিনি ইয়াহিয়া খাঁর পরিবর্তে শত্রু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টই হলেন না, সামরিক শাসনের মধ্য প্রশাসকের পদটিও পেলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে জনাব ছুটোই বোধহয় এক মাত্র অসামরিক কৃতি যিনি ওই ধরনেরই একটি পদে আসীন হলেন।

ছুটো সাহেবের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কী হবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। এক অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতিতে তিনি কার্যভার নিয়েছেন। একদিকে শক্তিশালী সামরিক গোষ্ঠী ও অন্যদিকে মসলিম লীগ, জম্মাতে ইসলাম ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগুলি। এ দুইয়ের মধ্যে তিনি কী ধরনের সমন্বয় ঘটতে চান ব্যক্তিগত পারবেন তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ছুটো সাহেব এবং তাঁর পীপলস পার্টির অন্য নেতাদের সঙ্গে উপ-রিপ্লিখিত সাম্প্রদায়িক দলগুলির নেতৃবৃন্দের কোনদিনই কোন সম্ভাব ছিলনা—ছুটো সাহেব একথাও বলেছেন বলে প্রকাশ, যে তিনি ক্ষমতায় এলে ওই দলসমূহের নেতাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলবেন। অবশ্য বর্তমান যে পরিস্থিতিতে তিনি

ক্ষমতায় এসেছেন তাতে ছুটো সাহেব এখনই জঙ্গদেব খোঁজে বেরবেন এমন মনে হয় না। বরং নিজ দেশের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে অন্তত অপাতত শান্ত করার জন্য তাঁর সর্বদলের সাহায্যেরই প্রয়োজন হবে বলে মনে হয়।

অবশ্যই এ সবই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভারতের দিক থেকে ইয়াহিয়ার গমন ও ছুটোর প্রবেশ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে হয় না। অন্তত পাক-ভারত সম্পর্ক আপাতত যেমন আছে তেমনই থাকবে। যে ভারতের কাছে পরাজয় ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে লোভের মূল কারণ, সেই ভারতের সঙ্গে সম্প্রীতির কোন প্রচেষ্টা পাকিস্তানী রাজনীতির একটি ক্ষমতাবান অংশ কখনই ভাল চোখে দেখবে না। তছাড়া প্রচণ্ড ভারত বিবেচী ছুটো হঠাৎ চরিত্র পালাটে ফেলবেন এমন কথা ভাবার কোন কারণ নেই।

ইয়াহিয়ার পতনের জন্যও এই গোষ্ঠী মূলত দায়ী। মার্কিনী কায়দার এদের hawks অথবা বাজপাখী আখ্যা দেওয়া হয়। সামরিক গোষ্ঠীতে এদের প্রচণ্ড প্রতিপত্তি এবং এরাই গোড়া থেকে ইয়াহিয়াকে শেখ মুজিবের দাবী মেনে

না নিতে বাধ্য করেন এবং পরবর্তীকালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ররোচনা জোগান। ইয়াহিয়া গেলেন কিন্তু হামিদ-নর খাঁ—পীর জাদা ইত্যাদির দল ত রয়ে গেলেন। এ ছাড়াও আরও অসংখ্য অফিসার আছেন যাঁরা নিজেদের জঙ্গী মনোভাব পরিবর্তনে মোটেই ইচ্ছুক নন। এবং ছুটো সাহেবের এমন কোন ক্ষমতা নেই যাতে তিনি এঁদেরকে উপেক্ষা করতে পারেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারেও পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। ছুটো সাহেব পাকিস্তানের পুরানো বন্ধু এবং চীনা সাহায্য পাকিস্তান পেতেই থাকবে। চীনেরও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রয়োজন আছে কারণ এই সূত্রে সে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে একাধারে সৌভ্রম্যেত ইউনিয়ন ও ভারতের “আগ্রাসী” নীতির সমালোচনা চালিয়ে গিয়ে এশিয়া, আফ্রিকার নিজের প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতে পারে। মার্কিন সরকারও জানে যে এই উপ-মহাদেশে পাকিস্তানকে যদি সে এখন ছেড়ে দেয় তাহলে সৌভ্রম্যেতের প্রভাব বিস্তারের পথই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে

(লেখকঃ জস্টম পুন্ডার)

পুস্তক পরিচয়

আমেরিকার ভাব্যৎ

একটি

America's Receding Future:
Ronald Segal.

কী প্রচণ্ড শক্তিশালী, ধনী, প্রাণ-প্রাচুর্যের ভরপুর এই দেশ আমেরিকা। তার শিল্পের প্রসার, দৌলতে ভরে ওঠা ভান্ডার, দিগন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া বিশাল চওড়া রাস্তা, স্বয়ং রাষ্ট্রকে ঘুরিয়ে দেওয়া কলমলে রতের আলো, এই সবকিছু মিলিয়ে সে যেন দেশবাসীকে চিরকালের মতন আনন্দের, স্বস্তির, শান্তির আশ্বাস জড়িয়ে চলেছে। বস্তুপ্রাপ্তিসুলভ জয়ের, আনন্দের মিলিত প্রকাশ ঘটেছে তার শিল্প সংস্কারগুলিতে যারা বাইরে দূরের বহু দেশের অর্থনীতি পরিচালনা করে, শস্যশোভিত বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিতে, ভুজুর চাষ অথবা গোপালনে, তামার, কয়লার, শিল্প গ্যালারী লাইব্রেরী ইত্যাদি সমূহে। মানুষের কীর্তির এই নিদর্শন আর কোন একটি সমাজে কখনও দেখা যায় নি। এই মহান কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে স্কাই-

স্কাপারগার্ল তাদের দূর আকাশে হারিয়ে যাওয়া চূড়াগুলি নিয়ে।

সম্প্রতি আমি নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলুম। সময়টা ছিল মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যার কিছুদিন পরে। বসেছিলাম হোটেলের লবীতে জনৈক প্রকাশকের সঙ্গে। হঠাৎ চারিপাশের সাংবাদিকালীন মৃদু আলাপ ছাপিয়ে অদূরের টেলিফোন বক থেকে একটি পুরুষের কণ্ঠ ভেসে এল—“এই হিসেব আমি আর সহ্য করতে পারছি না, সহ্য করতে পারছি না এই মনুষ্য”।

আমেরিকার সাধারণ হিসেব-মূলক কাৰ্যবলীর সংখ্যা অন্যান্য শিল্পোন্নত সমাজের থেকে অনেক বেশী। যে কোন একটি আমেরিকান শহরের আধিবাসীর খন হওয়ার সম্ভাবনা একটি ব্রিটিশ শহরের আধিবাসীর চাইতে দশগুণ বেশী। গড়ে প্রতিদিন আমেরিকার চারশো জন খুন হয়, দেড়শো জন গাড়ীচাপা পড়ে এবং একশো সত্তর জন অন্যান্য দর্ঘটনায় মারা যায়, পঞ্চাশ

জন আত্মহত্যা করে। এবং প্রতি বছর খনের সংখ্যা দশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাইতে অনেক বেশী। এ ছাড়া আছে স্বদেশে দাঙ্গা এবং বিদেশে যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা—আমেরিকার চারদ্রোহিত নীতির ফল।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমেরিকান সমাজ কতদিন এই চাপ সহ্য করবে। মনের দিক দিয়ে আমেরিকা ভাগ্যে শূন্য করেছে। প্রতিটি নতুন হিসেবকাজ জাতিগত প্রকৃতির বাড়িয়ে দিচ্ছে মানুষের ভয়, হতাশা, উদ্ভ্রান্তিকে।

এতদিন যে ভবিষ্যতকে মনে হতো নিশ্চিন্ত, নিরাশঙ্ক আজ দেখা যাচ্ছে সে দুঃখিত। বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খবরদারীর ফলে ধনভান্ডারে ক্রমশই টন পড়ছে। অপরদিকে এই খবরদারীর মূলে যে নীতি তাকে আমেরিকার মানব আজ ধ্বংসাত্মক বলে মনে করছে। আমেরিকার কাছে আজ দুটি পথ খোলা : হয় আরও বেশী লোক ও অর্থের অথবা বিশেষ সমাজতান্ত্রিক এক্সপেরিমেন্টের ক্রমবর্ধমান প্রসারকে মেনে নেওয়া, যে প্রসার রোখাটাকেই—সে এতদিন তার মহান দায়িত্ব বলে মনে করেছে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার ভিতরেও এসেছে বিপ্লবের আন্দোলনের জোয়ার। এর মূলে আছে মৃত্যু বর্ণবিষম। এই হিসেবাত্মক আন্দোলন, যা কিনা সবপ্রকার সংস্কারের চেষ্টাকে উপেক্ষা করে বিপ্লবের ডাক দেয়, যে কয়েকটি ধারণার উপর আমেরিকান সমাজ গড়ে উঠেছে তারই ভিত্তিতে আঘাত হানছে। কালো মানুষের এই আক্রোশকে কোন সৈন্যদল দিয়ে দমনো যায় না যেতই কেন না তারা দাঙ্গা দমনের উপযোগী সরঞ্জামে সজ্জিত হোক। গৃহযুদ্ধের দৃঢ়তা, বেপারোয়া লোক একটি জটিল শিল্প সমাজে যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে এবং এই ধরনের আন্দোলন গৃহযুদ্ধের লোকের নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে। এবং শূন্য ত নিগ্রোরা নয়। পদ্যোক্তারিকান ও মেক্সিকানরাও আজ সেই একই অসন্তোষে জ্বলছে।

নতুন বিশ্ব ত এই অবস্থার কথা বলে নি। সেই বিশ্ব আশ্বাস দিয়েছিল মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জয়ী হবার। মনুষ্য হেরে যাবে অথবা হতাশার বেনোজলে ভাসবে এই অবস্থার জন্য ত সে তৈরী হয় নি। শূন্যে আমেরিকা বলতে বোঝাতো মানুষের অগ্রগতি, কীর্তি। অথচ আজ আমেরিকা কী? অতীত থেকে যে শিক্ষা সে পেয়েছে যে কতকাবোধ তার মধ্যে জেগেছে তার সঙ্গে বর্তমানের অভিজ্ঞতার কোনও মিল নেই। এমতাবস্থায় বাড়ে শূন্য হতাশা আর দুঃখ, জন্ম নেয় অক্রোশ।

আমেরিকার যুব সম্প্রদায়ের কাছে আজ সম্প্রদায় ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত লাভ এবং এই-সব জনিত কলিগত ক্ষমতার চেত-

অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

অপ্রদীপ কবন্ধা প্রসঙ্গে দু-চারটি কথা বলা দরকার। দেশের অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই কুশলকর্মে চেষ্টা বেশী করেছিলেন। না হলে তারা দেশের পরিস্থিতি উপলব্ধি করে রাস্তার আলোয় ঠুলি পরানোর কবন্ধা করতে পারতেন। তা তো হলই না হঠাৎ যুদ্ধের সময় চার তারিখ থেকে কলকাতার বকে নেম এল অন্ধকার। রাত নয়টার মধ্যেই রাস্তাঘাট ফাঁকা, দোকানপাট বন্ধ করে লোকেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করতে থাকলো। রাস্তার ট্রাম যাও বা দেখা যেত সরকারী পরিবহন সে অর্থে অনেক কমে গিয়েছিল। বেসরকারী বাস মালিকরা অন্ধকারের মধ্যে বেশীক্ষণ চালতো না।

দিনে রাস্তার আলোগুলিতে ঠুলি পড়ানোর বন্দোবস্ত হল। দেখা গেল বেশ কয়েক হাজার ঠুলি চুরি হয়ে গেল। এখানে প্রশ্ন, কে চুরি করলো?

চোর না ধরতে যওয়াই ভাল। কারণ যে কর্তাব্যক্তির হাতে এই কাজের দায়িত্ব ছিল তদেই পোষা ব্যক্তির সহায়তার চুরি না আসলে অর্ডার বেরিয়ে ঠুলি এল না, এলো চুরির খবর।

এরপর গত ষোলই ডিসেম্বর যখন ঘোষণা করা হলো যে কাল থেকে ব্ল্যাক আউট থাকছে না। সঙ্গে সঙ্গে আবাল্যবৃদ্ধ-বণিতা পথে

নেমে পড়লেন। শূন্য হলো কলকাতাপ্রাণী বাংলা দেশ জয়ের উৎসব। কিন্তু আলো জ্বললো না। অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের নির্দেশে বিকেলে জেলাকর্তৃপক্ষের কাছেও কলকাতা কর্পোরেশনকে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে বলা হল। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

ষোল তারিখে সন্ধ্যায় ঢাকায় পাক সৈন্যদের আত্মসমর্পণের কহিনী ছাড়িয়ে পড়া মাত্রই শূন্য হলো কলকাতায় ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে বিজয় উৎসব। সমগ্র মহানগরীতে প্রাণ চাঞ্চল্যের জোয়ার বয়ে গেল। বাজী, পটকা “জয় বাংলা” ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মর্দ্যরিত হয়ে গেল। সমগ্র মহানগরীর বিভিন্ন বাড়ীতে শব্দধ্বনি শোনা গেল। রাস্তার দোকানপাট বাড়ীঘরদোর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল। কিন্তু শহরের বকে কলকাতা কর্পোরেশনের দল্লভ আলো জ্বললো না। অথচ অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্তব্য বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষ ও কর্পোরেশনের কর্তাদের বিকেলেই পূর্বেই আলো জ্বালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের আলো জ্বালানোর কাজে দেখা গেল না। এর কারণ বোধ হয় এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

বৈদ্যনাথের জনৈক

গণ চিকিৎসকের দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, বৈদ্যনাথের রামনগর এক নং ব্লকের গণ চিকিৎসক ডাঃ বিনোদবিহারী পাণ্ডা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের বিপ্লব করে সরকারী অর্থে নিজে বা খুশী তাই করে চলেছেন।

অঞ্চলের সাধারণ মানুষের অভিযোগ, তিনি ঔষধ চুরি, মদ্যগী বিক্রীর ফাটকাবাজি, মিথস্রিলের ভাউচার, প্রতি রাতে জুয়ার নাই জাতীয় দুর্বলতার উৎস। এর প্রকাশ ঘটেছে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা-বোধে, সমাজ চালনার ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তির দূরত্ব বৃদ্ধিতে। এদের মতে এরা আমেরিকাকে আজ দেখছেন নিঃসঙ্গ, ভীত হতাশ মানুষের বাসস্থান হিসাবে।

এই হচ্ছে লেখকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। দর্পণের পরবর্তী সংখ্যায় বইটির বিশদ পরিচিতি থাকবে।

আজ্ঞা, নতুন ধরনের মদ প্রস্তুত ও সেবন, সরকারী কাজে ফাঁকি এবং জনসাধারণকে হস্তরাণি প্রভৃতি একাধিক দর্শনীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন।

রামনগর থানার বিভিন্ন ব্যক্তিকে উক্ত চিকিৎসক সরকার প্রদত্ত (গ্রামের লোককে বিনামূল্যে প্রদানের জন্য) ঔষধ গোপনে বিক্রী করেন এবং সরকারের খাতায় তার কোন হিসেব রাখেন না। সরকারকে মিথ্যা ভাউচার দেখিয়ে মদ্যগীর বাজা বিক্রী করে টাকা আত্মসাৎ অর্থাৎ ক্রোড়র কাছে তিনিই মদ্যগীর বাজা লিখে নিয়ে পরে ঐ লোকের নামে পাঁচটি ইস্যু করে সরকারকে দেখানোর অভিযোগও তার নামে রয়েছে।

তাছাড়া সরকারী অফিসে রাতে জুয়ার আত্মীয় বিনামূল্যে ঔষধ-গুণি দিয়ে এক প্রকার মদ প্রস্তুত (শেষাংশ ৯৯ পৃষ্ঠার)

বিদেশ দর্শন

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

অবস্থা সে কোনদিনই মেনে নিতে পারে না।

প্রসঙ্গত, চীনের আচরণ ক্রমশই অবোধ হয়ে উঠেছে। একদিকে ত বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সে প্রকাশ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অপরদিকে উত্তর ভিয়েতনাম যে ক্রমাগত মার্কিনী বৈমহাবর্ষণ চলেছে (এ খবর ভারতীয় সংবাদপত্রে না বেরলেও ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন থেকে প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত প্রচারিত হচ্ছে) সে সম্বন্ধেও পিকিং নির্বাক। এর কারণ কী এই যে উত্তর ভিয়েতনামই প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ যে বাংলাদেশের সংগ্রামকে মজি সংগ্রাম বলে মেনে নেয় এবং যে দেশের সরকার পরোক্ষে চীনের নিন্দা করে ডঃ কিসিংগারের পিকিং সফরকে কেন্দ্র করে? বিশ্ব বিপ্লবের হেড কোয়ার্টার্সের এ হুেন আচরণের কোন মার্কসীয় ব্যাখ্যা সম্ভব কী?

তবে মার্কিনীরা চীনের থেকে বেশী বৃদ্ধিমান অস্তিত্ব বৃদ্ধি শক্তিসুলভ খেলাতে। দর্পণে যে কথা অগ্রহণ বলা হয়েছে তাই ঘটেছে অর্থাৎ মার্কিনীরা পাকিস্তানকে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের দোরোও অর্থ সাহায্যের বর্ডল নিয়ে হাঁজর হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ সরকার মার্কিনী সাহায্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, দূর কূল রাখার নীতিতে বিশ্বাসী ওয়াশিংটন এত সহজেই হাল ছাড়বে বলে মনে হয় না। এবং বাংলাদেশ সরকারও যে চিরকাল আমেরিকার প্রতি বিমুখ

হয়ে থাকবে তারই বা কী প্রমাণ। কারণ আওয়ামী লীগের মধ্যে অবস্থিত মার্কিনী জমী আজ অবস্থগতিক চাপচাপ থাকলেও ভবিষ্যতে মাথা চাড়া দেবে না এ কথা ভাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

ভুট্টো সাহেবের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। প্রেসিডেন্ট হয়েই তিনি যে অবোল তাবোল ভাষণ দিলেন তাতে বারে বারে তিনি যে নির্বাচনে জিতেছেন সেইটি প্রোতাদের মনে করিয়ে দেন। এর কারণ আছে। এর ফলে পাকিস্তানের বন্ধুদের, বিশেষ করে চীনের, আর কোন সামরিক জগীশাসককে সহায়তা করা জনিত অস্বস্তির কারণ রইল না। পাকিস্তানের কাঠমো একই রইল শূন্য তার উপর একটি গণতন্ত্রের প্রলেপ লাগিয়ে এখন কী চীন কি আমেরিকা বলতে পারবেন যে তারাও একটি নির্বাচিত সরকারকে সাহায্য করছেন। এ কথা জবাও হয়ত অন্যায় হবে না যে উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা এবং সে ক্ষেত্রে নিজ নিজ ভূমিকার বিরত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়েই ইমাহিয়ার প্রতিপক্ষকে উদ্বেগের তার উপর চাপ সৃষ্টি করে পদত্যাগ করতে এবং ভুট্টোকে সেই গদীতে বসাতে। এই ঘটনার তারা কতখানি জড়িত বলা শক্ত, কিন্তু পাকিস্তানের এত বড় একটা ঘটনায়, বিশেষ করে বর্তমান অবস্থায়, এদের কোন হাত ছিল না এ কথা মানা শক্ত।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কৌশলী পদক্ষেপ

দিলীপ মজুমদার

নিম্নলিখিত বই বলুক, দলের সাংগঠনিক নেতৃত্ব ইন্দিরা গান্ধীর হাতে আসার পর থেকেই শাসক শ্রেণী হিসেবে কংগ্রেস শাঠ্য-চাফুসে-নৈপুণ্যে খুবই পরিপুষ্ট আর সবল হয়ে উঠেছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। “শত্রু”কে কখন কোন সময় কীভাবে আঘাত করতে হবে তার কলা-কৌশল রপ্ত করতে শিখেছে। অতীতে মানুষের সংগঠিত আন্দোলনকে শত্ৰু করার একমাত্র দাওয়াই ছিল পদলিখী নিপাত্তি। সে ক্ষেত্রে আঘাত আসত বটে, কিন্তু আন্দোলন আরো সংগঠিত হত। শাসক শ্রেণীর নতুন স্বরূপ সাধারণ মানুষের চোখে আগল দিয়ে দেখিয়ে দেবার সুবিধে পেতেন বামপন্থী নেতারা।

সাতষটি সালের নির্বাচনে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দারুণ বিপর্যয় ঘটল। বিশেষতঃ কেরল আর পশ্চিম বাংলায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংসংহতি একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। শাসক শ্রেণী হিসেবে কংগ্রেস তার পুরনো কৌশল ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে ভাঙন খরানোর নতুন কৌশল গ্রহণ করল। এ কৌশল গ্রহণ করার কারণ তিনটি : (এক) দল হিসেবে কংগ্রেসের “ইমেজ” বা ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে গেছে; (দুই) পুরনো কায়দায় শাসিত হতে না চাওয়ার লক্ষণগুলি জনসাধারণের মধ্যে সম্পৃষ্ট হয়ে উঠেছে; (তিন) বামপন্থা, বিশেষতঃ কমিউনিজমের প্রতি আসক্তি বাড়ছে। কংগ্রেস ঠিকই বুঝেছিল যে তার মূল শত্রু সি পি এম, সতরাং যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। অনেক সংসাদামাঠ গণতন্ত্রপ্রিয় লোক হা-হুতাশ করে বলে থাকেন : বেইমান প্রফুল্ল ঘোষ আর অজয় মুখার্জীরা যদি না থাকতো! সিম্পান্টটা কী? ওরা না থাকলে যুক্তফ্রন্ট ভাঙতো না? আমার ধারণা, প্রফুল্ল ঘোষ আর অজয় মুখার্জী যুক্তফ্রন্টের ভাঙন ত্বরান্বিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু ওরা না থাকলেও যুক্তফ্রন্টের ভাঙন রোধ করা যেত না। কারণ, নীতির ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের কমবেশী ছোট বড় দলগুলোর নমনীয়তা ও

দোলাচলবৃত্তির সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস সি পি এমের বিরুদ্ধে দলীয় স্বার্থে প্রশাসনিক ব্যবহারের অভিযোগটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। সর্বগ্রাসী সি পি এম যে সর্বদলের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের কলেক্টর বৃদ্ধি করছে এমনিতর একটা ভীতির ভাবে আচ্ছন্ন করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

গণ-আন্দোলনের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার আর একটা কৌশলের শিকার হল নকশালপন্থীরা। বাহিরে ওদের পরিচয়টা কী? এরা সাচ্চা কমিউনিষ্ট—শোষণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। অনেক ভালো ভালো ছেলে নিজেদের “কেরিয়ার” বিসর্জন দিয়ে বিপ্লবের কাজ করেছে, ফলতঃ এরা স্বার্থ-ত্যাগী, আত্মত্যাগী। “কৃষি বিপ্লব”, “জোতদার মনোজ্ঞাধারের গলা কাটা চলছে, চলবে” প্রভৃতি শ্লোগানের সঙ্গে কিছু কিছু অঞ্চলের মানুষের মৌন সমর্থন নিয়ে তাদের কাজ করেছিল। শত্রু হল গদুপ্ত-হত্যার পর্ব। আজ যদি এদের হাতে নিহতদের সংখ্যা বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে এদের হাতে নিহত হয়েছে (এক) শতকরা এক ভাগ জোতদার (দুই) শতকরা দুই ভাগ সাধারণ পদলিখ (তিন) শতকরা পঞ্চাশ (চার) শতকরা চার ভাগ দলত্যাগী এবং (পাঁচ) শতকরা তিরানব্বই ভাগ সি পি এম বা সি পি এম প্রভাবিত গণসংগঠনের নেতা ও কর্মী। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড ও আক্রমণের ক্ষেত্রে পদলিখ ও রাষ্ট্রবল্য এদের পেছনে থেকে মদত যোগাত।

তা সত্ত্বেও হাতেনাতে প্রত্যাক্ষিত ফল পাওয়া গেল না। সি পি এমের শ্লোগান ছিল : নকশাল কংগ্রেস এক হায়া। জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে এ শ্লোগানের সত্যতা অনুভব করলেন। কৌশলী বদল হল তাই। একই সঙ্গে আক্রমণ ও বিদ্রোহিতকর প্রচারণার কসরৎ সরু হল। ঠিক এই জন্যই নতুন করে যুব কংগ্রেস আর ছাত্র পরিষদের জন্ম দিতে হল। এই দুটি সংগঠনের নবজন্মের পেছনে নিম্নোক্ত কারণগুলি বিদ্যমান। (এক) ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্ত এবং “ক্লিয়ার হটাণ্ড” “রাজন্য বর্গের ভাতা বিলোপ”, “স্বাধীন জাতীয়করণ” প্রভৃতি রোমাঞ্চকর শ্লোগান আর রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে একটু মাখামাখির “শো” দেখিয়েও ইন্দিরা কংগ্রেস নিজেদের প্রগতিশীল এবং সংগঠন কংগ্রেসকে প্রতি-ক্রিয়ালীল আখ্যা দিয়েও পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে সঠিকভাবেই অনুভব করেছিল যে, এখনো এখানে দল হিসেবে হত ভাবমূর্তির পনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। (দুই) ছাত্র যুবরা খুবই সংবেদনশীল বলে ক্রমশঃ বেশী বেশী করে বাম-

পন্থার দিকে ঝুঁকতে পড়ছে এবং সি পি এমের প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। (তিন) ঘনীভূত অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বেকারী বাড়ছে, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে, সি পি এমের গণআন্দোলন প্রসারের সুযোগ ঘটছে ঠিকই, কিন্তু ‘চটকদার শ্লোগান আর কর্মসংস্থানের প্রলোভন ইত্যাদি দিয়ে এই বিক্ষুব্ধ এবং বিদ্রোহিত ছাত্র যুব সম্প্রদায়কে সাময়িকভাবে হলেও প্রতারিত করা যায়। (চার) ব্যাপকভাবে সমাজ-বিরোধীদের এই সংগঠনের আওতার জড়ো করা যায় এবং সি পি এমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদেরই নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গড়া যায়। কোথাও আক্রমণের বাড়াবাড়ি হলে এদেরই মদ্য দিয়ে এদের সংগঠনকে “অটোনমাস” বলিয়ে নিয়ে নিজেদের নিরপেক্ষ বলে প্রমাণ করা যায়। (পাঁচ) নিজেদের আন্তর্দলীয় কোন্দলের ক্ষেত্রেও এই “অটোনমাস” বড়কে ব্যবহার করা যায়।

ছাত্র পরিষদ আর যুব কংগ্রেস দৈনিক সংবাদপত্রগুলির যে বিরাট পাবলিসিটি আর নিজেদের সমাজ-তন্ত্রমার্কা শ্লোগান নিয়ে হাজির হল তাতে অনেক সাধারণ মানুষই প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। বেন প্রথমটা বোঝা গেল : এরা নতুন আদর্শ ও নবীন প্রেরণা নিয়ে দেশের কাজে নেমেছে; এরা কালোবাজারী, মূল্যবৃদ্ধি, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চায়; এরা শিক্ষা-সংস্কার, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী; কংগ্রেসের মূল নীতি অনুসরণ করলেও গণসংগঠনের স্বাধীন চরিত্র বজায় রাখতে চায়; এরা আন্দোলন করবে যথা-সম্ভব শান্তিপূর্ণ পথে, কিন্তু শত্রুর আক্রমণও লোহদূত শৃঙ্খলার সঙ্গে মোকাবিলা করবে। এবং আদর্শের জন্য জীবন দিতেও পেছপা নয় : “গালি মার, ছোরা মার, বোমা মার—বন্দেমাতরম ভুলছি না, ভুলব না!” শহরতলী ও গ্রামদেশের বেশ কিছু সংসরল ছাত্র যুবকে প্রচার কৌশলে নিজেদের দলে টেনে নিতে পারল ওরা। সংখ্যাটা ভবিষ্যতে আর একটু বাড়বে বলেই আমার ধারণা। সেই সঙ্গে কর্মসংস্থান এবং আর্থিক প্রলোভন ইত্যাদি সমান তালে চলতে লাগল। বাস্তবিক, দ্রুত ওরা কংগ্রেসের একটা বিশিষ্ট শক্তি হয়ে উঠল। এদের দিয়ে সি পি এম বা সি পি এম প্রভাবিত গণসংগঠনগুলির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা হল। পদলিখ আর পেছনে রইলো না, দেখা গেল পদলিখের গাড়িতেই ছাত্র যুব বাহিনী সি পি এমের অত্যাচারের হাত থেকে জনসাধারণকে মুক্তি দেবার জন্য এলাকা দখলের সূচনাতম গাণিতিক পরি-কল্পনা করেছে। কলকাতা ও শহরতলীর জোড়াবাগান বেলেঘাটা দম-দম, টালিগঞ্জ, যাদবপুর, বরানগর

নলতা বিরাটী এবং হুগলী হাওড়া চব্বিশপরগণা বর্ধমানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের তখন এই মুক্তির আশ্বাদে নীড়ম্বাস উঠেছে। প্রচার-বল্য করায়ত্ত থাকার ফলে এক এলাকার প্রকৃত ঘটনাবলী সম্বন্ধে অন্য এলাকার মানুষ অবহিত থাকছে।

প্রচারের ক্ষেত্রে কৌশল হচ্ছে : (এক) প্রয়োজনবোধে কোন কোন ঘটনা বোমালম্ব চেপে বাওয়া, (দুই) কংগ্রেস যেখানে আগ্রাসী বলে জনসাধারণের কাছে মোটা-মটী প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং তা দ্রুত স্থানান্তরে ছাড়িয়ে পড়ছে সেখানে ঘটনাকে বিকৃত করা, (তিন) আগ্রাসী আক্রমণের মধ্যে দাঁড়িয়েও যেখানে জনসাধারণ প্রতিরোধে অটল ও অনমনীয় সেখানে ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে সমস্ত দোষ সি পি এমের উপর চাপানো।

এখন কংগ্রেস নির্বাচনের জন্য তৈরী হচ্ছে। সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত মশাইও বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সেই মহতের নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবে যেদিন কংগ্রেস বন্ধ হতে পারবে সে একশ একচল্লিশটি সিট লাভে সক্ষম। অর্থাৎ যে কোন সংপ্রভাতে যুম থেকে জেগে উঠে নির্ভীক নিরপেক্ষ স্বাধীন দৈনিক পত্রিকাতে কানায় নিউজে নির্বাচনের দিন ঘোষণা দেখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নির্বাচনী কেন্দ্র ধরে ধরে, গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করে কংগ্রেস নির্বাচনী কাজকর্ম সরু করে দিয়েছে। প্রাত্যহিক ঘটনাবলী বা কর্মপদ্ধতি দেখে মনে হচ্ছে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস গ্রহণ করছে নিম্নোক্ত কৌশলগুলি।

(এক) সি পি এমের “বেস” এলাকাগুলিতে সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে তছনছ করা, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য ভীতির মনোভাব সৃষ্টি করা। সি

পি এমের “বেস” এলাকা হচ্ছে—(ক) গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন যে সব জায়গায় জগীর্দার গ্রহণ করেছে এবং যে সব অঞ্চলে ক্ষেত-মজুরদের আধিক্য, (খ) শহর ও শহরতলীর শ্রমিক অধিষ্ঠিত বাসিত অঞ্চল এবং কলোনীগড়লি।

(দুই) যে সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেস বা তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা বিগত নির্বাচনে জয়লাভ করেছে অথচ সেই কেন্দ্রের কিছু কিছু অংশ সি পি এমের প্রভাবাধীন, সেই সমস্ত অঞ্চলে প্ররোচনা সৃষ্টি করে প্ররোচনার ফাঁদে সি পি এমের কর্মীদের জড়িয়ে দেওয়া এবং এলাকার অশান্তির উৎস বলে চিহ্নিত করা। প্ররোচনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইদানীং দেওয়াল লেখা বা “ওয়ালিং” বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

(তিন) করভার প্রকৃ মূল্যবৃদ্ধি পদলিখী অত্যাচার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ গলদ ও সংকট থেকে মানুষের মনকে বিক্ষিপ্ত করার জন্য বিশেষতঃ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন স্টাফ দেওয়া।

(চার) শত্রুমাত্র সি পি এম বিরোধী দলের সঙ্গে অবিলম্বে ফ্রন্ট গঠন এবং কংগ্রেস ও সি পি এম উভয় বিরোধী দলগুলির সঙ্গে দরকষাকষি।

(পাঁচ) সি পি এমের আন্দোলনের উৎস মূলগুলি অবরুদ্ধ করা, সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় সর্বোপেক্ষা দ্রুতগতিতে আঘাত করা। এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে মিছিল মিটিং স্কোয়াড প্রভৃতি প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমেও এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের রাজনৈতিক যোগাযোগের সেতু না গড়ে ওঠে।

(ছয়) এ সমস্ত ছাড়া সংবাদপত্র বা রেডিও প্রভৃতি শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের যথেষ্ট ব্যবহার তো আছেই।

পশু চিকিৎসক

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

করেন। বলাই বাহুল্য, স্থানীয় অর্থগত বাস্তবতা এ ব্যাপারে তাঁর সহৃদয় বন্ধু। গোপন কবসাগরিতেও তিনি এদের সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধ।

তাঁর প্রাইভেট কলে যাওয়ার সময়ের অভাব নেই, কিন্তু দরিদ্র সাধারণ মানুষেরা অনুরোধ করলেই তিনি দৈহিক অসুস্থতা এবং ডিউটির নির্দিষ্ট সময়ের অজুহাত দেন।

যদিও রামনগর এক নং রকে তাঁর উপস্থিতি সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট; তবেও তিনি নিয়মিত ভাবে সেই একটি দিনও অনুপস্থিত থাকেন। একই সঙ্গে তিনি দুই নং রকেরও দায়িত্বে আছেন বলে এইড সেন্টার ও সাব সেন্টারের শব্দ মাত্র পিছবনী কেন্দ্রে যান। তার কারণ ঐ কেন্দ্রটি তাঁর বাড়ী যাওয়ার পথে

পড়ে। অথচ প্রত্যেক সেন্টারে গিয়েছেন, এই অজুহাতে তিনি সরকারের কাছে মাসে মাসে অতিরিক্ত ভাতা দাবী করেন।

ডঃ পান্ডার উপরোক্ত দমনীতির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের সাধারণ মানুষের দুর্গতির অন্ত নেই। অনেকে আট দশ মাইল পায়ের হেঁটেও ডাক্তারের সাক্ষাৎ না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

বেসরকারী সুদ থেকে জানা গেছে, তিন চারমাস আগে নাকি তাঁর বদলীর আদেশও এসেছিল, কিন্তু মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পরেও বহুব্যবহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর বদলী প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অবশেষে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করে তাঁরা রাজপাল ডায়াসের মতের দিকে চোরে আছেন।

মতামত

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

নেবে তা কংগ্রেস বা সি পি এমের প্রস্তাবে চূড়ান্ত হবে না—হবে পশ্চিম বাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষের, আপনর, আমার সিদ্ধান্তে। ভারত রাষ্ট্রের এখনকার কাঠামো ও নীতিগুলি বজায় রেখে এক-বন্ধ ভারত রাখা যাবে না, কারণ একা গড়ে ওঠে সমানে সমানে, সহযোগিতার, জোর জ্বলিয়ে নয়।

নির্মল সেনগুপ্ত

সাম্প্রতিক কয়েকটি নাটক

(দর্পণের সমালোচক)

সাম্প্রতিক কালে দর্শক শ্রেণীকে চমকিত করার একটা নিরালম্ব বোঝ দেওয়া দিয়েছে, অনেকগুলি নাট্য শিবিরের মধ্যে। নাটকের নাম-করণের মধ্যে দিয়েই হোক, নাটকের অন্তর্বস্তু কিংবা সংলাপ-ভাষার মধ্যে দিয়েই হোক, দর্শকদের চিন্তা-শক্তিকে একটা গোলক-খাঁচার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে ছিন্নভিন্ন করাটাই যেন এদের কাছে অবশ্যগ্রাহ্য শিল্পাদর্শ। ভাবতে অবাক লাগে, বাংলা-দেশে এই মণ্ড দর্শনার মধ্যেও, কি ভাবে অকৃত্রিম কৃষ্ণতায় অর্থ সংগ্রহ করে, দৈনন্দিন জীবনের শৃঙ্খলিত

বাধ্যবাধকতার পাশ কাটিয়ে এরা এই ধরনের ভুলো অতঃসারশূন্য নাটক নিয়ে মণ্ড পর্যন্ত পেঁপেছে চান? এবং আরো অবাক লাগে তখন, যখন দেখি, এই অক্ষমতা এবং অপরিণত শিল্পবোধই হচ্ছে ওঠে তাদের গর্বের উৎস। এই অপরিণত চিন্তাশক্তি পরিণত রূপ নেয় চমকিত করার নিষেধিতিক এবং বহু বিচ্ছিন্ন ভাব-রাশির মধ্যে। এরা, আপন ভুল কিছতেই ভাগবেন না, অথচ পরি-শ্রমকে উৎসে ভুলে ধরতে চাইছেন। যেমন ধরা যাক “সকসার্চী”র “গোলাপ কাঁটার মৃত্যু” নাটকটি (নয়ই সেপ্টেম্বর মন্তব্যগণে অভি-

চীন-মার্কিন ভূমিকা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

“আর চীন গলা ফাটিয়ে বাংলা দেশ বিরোধী চীৎকার করলেও বাংলাদেশের সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানে হস্তক্ষেপ করতে পারে নি, কারণ তারা বরুছে এই অভ্যুত্থানের পেছনে বিশ্বের জনমত আছে।”

খোন্দকার সাহেব বিশ্বাস করেন যে, চীন ও আমেরিকার জনসাধারণই জাতীয় মন্ত্রি আন্দোলনের একমাত্র ভরসা। এই দুই দেশের নেতৃত্ব যতই চেষ্টা করুক নিজ নিজ দেশে জনমত ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। নেতৃত্ব তার পথ পরিবর্তন না করলে, দেশের জনসাধারণ নেতৃত্বকে সরিয়ে দেবে। ইতিমধ্যেই চীনে নেতৃত্ব অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ওরা যদি বিশ্বরাজনীতিতে ওদের বর্তমান ভূমিকা চালিয়ে যায় তাহলে চীনের নেতৃত্ব আমল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

খোন্দকার সাহেব বলেন : বাংলা দেশের পররাষ্ট্র নীতি অবশ্যই “জোট নিরপেক্ষ” হবে। কিন্তু বাংলাদেশ সংগ্রামে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের “বিস্তারী ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে” বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি অবশ্যই এই দুই দেশের মিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

তিনি মনে করেন শব্দ পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নয়, পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স ও ব্রুটেনও বাংলাদেশকে শীঘ্রই স্বীকৃতি দেবে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সমর্থনের উপর বাংলাদেশ অনেকাংশে নির্ভরশীল।

জাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি চীন বা মার্কিন চক্রান্তের তরফ থেকে বাংলা দেশে কোন প্রতি-বিস্তারী অপচেষ্টা হতে পারে বলে মনে করেন কিনা। উত্তরে খোন্দকার সাহেব বলেন, “ওদের উদ্ভি ও আচরণ দেখে মনে হয় যে, ওরা হয়ত এই ধরনের প্রতিবিস্তারী চক্রান্ত ইতিমধ্যেই সুরু করেছে।

তবে আশার কথা বাংলা দেশের সশস্ত্র স্বাভ্যুত্থান এই সব ষড়-যন্ত্র সম্পর্ক যথেষ্ট সজাগ এবং এই ধরনের অপচেষ্টা দমন করা শক্ত নয়।”

মাথাব্যথা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অপদামে আর জুট মিলের সাহেব ম্যানেজারদের বোগসাজ্জস অর্থাৎ ওদের মোটা টাকা ঘস দিয়ে মাড়ো-সারীরা প্রচুর পয়সা পিটেছে। তখনকার কলকাতার বড়দিন এখনও অনেকে স্মরণ করে। জুট-মিলের সাহেবদের বাড়ী খোদ মেন সাহেবের হাতে পেটি পেটি স্কচ হুইস্কি আর দামী দামী কেক ও ফলের তোড়ার মধ্যে লুকানো গোছা গোছা নোট ওরা দিয়ে আসত বড় দিনে আনন্দ করার জন্য। সব টাকাটাই আসত পাট চাষীকে ঠকিয়ে বাজারের চাল দাম থেকে অনেক কম টাকায় পাট কিনে মিলে চড়া দামে বিক্রি করে।

মাড়োসারীরা ভাবছে আবার হয়ত সেই সন্ধান ফিরবে। এই নিয়ে ওদের মধ্যে অনেক জল্পনা সুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কোন প্রতি-ষ্ঠাবান মাড়োসারী প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন। শোনা যায় এই ব্যাপারে উচ্চাশাসম্পন্ন কিছ কিছু আওয়ামী লীগ নেতা-রাও যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন।

তবে বাংলাদেশ মন্ত্রীরা অনেকই এই মাড়োসারীদের সম্পর্কে চিন্তিত। তারা ভারত সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনার প্রস্তাব করেছে যে, দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা যেন দুই সরকারের এজেন্সীর মাধ্যমে করা হয়।

কিন্তু মুস্কিল হল; সরকারী এজেন্সী করলেই সমস্যা মিটেবে না। কারণ, সরকারী এজেন্সী কাজ করে কন্ট্রাকটরের মাধ্যমে, আর এই কন্ট্রাকটররা বেশীর ভাগই মাড়োসারী। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীডামাস মাড়োসারীদের ডেকে একটু কড়কে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

নীতি)। নাম শব্দলেই আঁতকে ওঠ-বার কথা। মণ্ড গিয়ে দেখা গেল, নাটকটি বাংলা দেশের মন্ত্রি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। নাট্যকার (রচনা : দিলীপ মজুমদার) সংগ্রামের দর্শন-টিকে আমাদের সামনে রাখবার চেষ্টা করেছেন (?)। কিন্তু নাটক-টির মধ্যে নিজে এসেছেন ভিয়েত-নাম, ইয়াহিয়া খান, মজিবরের ছবি, হো চি মিনের ছবি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত এবং একটি মাস্তান ছেলে। ভিয়েতনামের সঙ্গে বাংলা-দেশের সাদৃশ্য রচনা করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন, কেনই বা ইয়াহিয়ার মানবিকতা বোধ জাগ্রত হোল, কেনই বা প্যাঁচি করা ছেলোটি চানচুর বিক্রী করতে এলো? তার নাটকীয় অনিবার্যতাই বা কি?—(কোন গোলাপ, কিসের কাঁটা, কার মৃত্যু?) শেষ পর্যন্ত এসব ঘটনা কিছই অর্থহীন হয়ে ওঠে না।

আলো প্রক্ষেপণ, মণ্ড পরি-কল্পনা কোন ব্যাপারেই এদের নিম্ন-তম ধারণা পর্যন্ত নেই।

পরবর্তী, নাটক (আটাই নুভ-ম্বর, মন্তব্যগণে) “প্রতিবিলে”র “অন্ধকারের নীচে সূর্য”। নাম-করণের মধ্যে আকর্ষণ স্বভাবতই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নাটক-র অন্তর্বস্তুতে সে আকর্ষণ কোথায়? একটি পদ্রিবারিক পরিবেশে নাটক-টির জন্ম। মা, বাবা, তিন ভাই, এক বোন। কোন চরিত্রই তার চারিত্রিক অন্তর্ভবনের মধ্য দিয়ে বিকশিত নয়। ববার সঙ্গে মার চরিত্র নির্মিতি কোন বিজ্ঞানসম্মত সাধারণ রচনা করে না। নাট্যভাষা, বিষয় এবং অভিনয় দ্বারা এত প্রাচীন এবং বর্তমান সমাজ সম্পর্কচরিত, যে কারণে চরিত্রগুলির সূত্র দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দর্শক-মন অনুরণিত হয় না। অর্থাৎ নাট্যকার (অপিন্দুত) সমাজ বিশ্লেষণের সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিকেই অগ্রাহ্য করেছেন কিংবা তাঁর সে দৃষ্টিই নেই।

পরিচালক এবং অভিনেতা হিসেবে শ্যাম মনোপাধ্যায়ের কৃতি-ত্বই বা কি আছে? তাঁর নিজস্ব অভিনয় রীতিটি এত প্রাচীনপন্থী এবং মরচে পড়া, যা দেখে অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু আশা করা বৃথা। ইন্দু চরিত্রে সুরুমার সরকারের কণ্ঠে সামান্য ব্যক্তিত্ব থাকলেও কয়েকটি শব্দোচ্চারণের দ্রুতি অমার্জনীয়।

সবশেষে দেখলাম পিপলস জার-এর “সুখহারা” (বারোই নভেম্বর, মন্তব্যগণ)। পূর্বোক্ত নাটক দুটির যেমন কোন গুণই নেই; এই নাটকের একটি গুণ এর বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা। কাষটি সালে বৈজয়াম সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য আক্রমণ এবং প্যাঁচিস লক্ষ্মীম্বর, নেতৃত্ব কেপোর বিপ্লবী জাগরণ ও সেই সঙ্গে মবতুর বিশ্বাসঘাতকতাকে কেন্দ্র করে এই নাটকের (রচনা : সৌরীন সেন) উপস্থাপনা। পৃথিবীর যে কোন দেশেরই সাধারণ মানবের জয়-স্বপ্নের ঐতিহাসিক মূহুর্তে-টিকে নাটকের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ

করানো নিশ্চয়ই প্রশংসার। সবটাই ইতিহাস কিংবা ঐতি-হাসিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে। সেই মানদণ্ডটির কখনো কখনো বদল ঘটে সমাজের ক্রমবিকর্তনশীল-তার জন্য। আজকের দিনে রূপা-স্তরিত মানদণ্ডের কথা ভেবে নাটকটিকে লেখকের পুনর্বিচারের প্রয়োজন রয়েছে কিনা ভেবে দেখা দরকার।

অন্যথার এই নাটকের অভিনয় মণ্ড, আলো সব কিছই কথ। লক্ষ্মীম্বর আশ্রয়গোপনের বিবৃতিটি পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যায় নি। পর্দা ওঠার আগে যন্ত্রমুচ্ছন্নায় যে সরো-স্নেপ করা হয়েছে, তার মধ্যে কোন বন্ধির ছাপ নেই। অভিনয়েও কোন শিল্পীর পরিমার্জিত বোধ লক্ষ্য করা যায় নি। মণ্ডের আরতনটি সম্পর্কে পর্যন্ত কেউ অবহিত নয়। একমাত্র ডঃ জেনস-এর চরিত্রে রাম বন্দ্যো-পাধ্যায় দর্শকদের একটু শান্ত রেখেছেন।

যৌথ আক্রমণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ ও গন্ডারা ফিরিয়ে দেয়। তিনবার চেষ্টা করেও এ্যাম্বুলেন্সটি আহত স্বরকটিকে উদ্ধার করতে পারে নি। সারা রাত ধরে অচেতন অবস্থায় সুনীল রাস্তায় পড়ে থাকে। শেষ রাতে তাকে উদ্ধার করে পাড়ায় লোকেরা হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু গত চারদিনের মধ্যেও পুলিশ সুনীলের কাছ থেকে কোন জবাববন্দী লিপিবদ্ধ করে নি।

পরের দিন অর্থাৎ রবিবার সকলে দলে দলে মানব জ্যোতি বসন্ত বসন্ত শোনার জন্য মেটল ইয়ার্ডে ঢুকতে গেলে দেখতে পায় সারা এলাকাটি পুলিশ সি আর পি ঘিরে রেখেছে আর সভার জায়গাটা কংগ্রেসীরা দখল করে মাইকে হিন্দী সিনেমার গান বাজছে। পুলিশ অবশ্য জ্যোতি বসন্ত সভার মাইক ব্যবহারের অনর্মাতি বাতিল করে দেওয়ার সভা করা সম্ভব হয় নি।

রবিবার সারাদিন ধরে রাজ্য নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, শ্যামপুত্র স্ট্রীটের এলাকা জুড়ে সম্ভ্রাস চালানো হয়। একটি দলের নেতৃত্ব করেন নেপাল রাজের পত্র জয়ন্ত রায়। তারপর বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণকারীরা এসে রাজ্য নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে নাগরিক সমিতির অফিসে মিলিত হয়। ঘরের দরজা ভেঙ্গে জিনিষপত্র রাস্তায় নামিয়ে আগুন লাগানো হয় পুলিশের উপস্থিতিতেই।

সোমবার দিন স্থানীয় মহিলারা নাগরিক সমিতির অফিস দখল করে বসে থাকলে কংগ্রেসীরা কুখ্যাত পল্লীর মেয়েদের সমিতির অফিসে নিয়ে আসে। তারপর মহিলাদের উপর বৈপ্লবী আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণে যুগান্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক অজয় বসন্ত শাহদড়ী গুরুতর আহত

হন। মহিলার বসন্ত ঘাটেরও উপর। তাঁর মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয়।

এইসব ঘটনার সময় কংগ্রেসী-দের সঙ্গে নিম্নলিখিত পদ্রিশের গাড়ীগুলি ছিল ডবল-বি-এস ৯১০২, ২০৩০ এবং ৯১৯৬- (জীপ) ও ডবল-বি-এইচ ৪৯০ (ভ্যান)। এছাড়া ছিল পরিচার চারটি জীপ।

জানা গেছে পত্রিকা ভবনের গোপন বৈঠকে ঠিক হয়েছে এরপর বেলগাছিয়া অঞ্চলে সি পি এম উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। গত রবিবার নব কংগ্রেসীরা ঐ অঞ্চলে এক মিছিল বের করে। মিছিলে কিছ দাগী আসামীকেও দেখা যায়। অনাথ দেব -লেনের পাশ দিয়ে শাবার সময় একজন দাগী আসামী রিভলবার নিয়ে স্থানীয় স্বরকদের তাড়া করে।

কংগ্রেসীরা নিবেদিতা লেনে রেগুদা মনোজি, নরনকৃষ্ণ সাহা লেনে সম্মা অধিকারী ও অন্যান্য মহিলাদের মারধোর করে ও অকথ্য গালিগালাজ করে বাড়ী ছাড়া করে। সেই সঙ্গে লবণ হুদ কমীদের ইউনিয়ন অফিসটিও তছনছ করে। কিছ টাকা, হ্যান্ড মাইক ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে যায়।

শনিবার রাতে কাঁটপুরুরে অবস্থিত অমৃতবাজার পত্রিকা যুগান্তর ও অমৃতের কর্মচারীদের ইউনিয়ন অফিসের উপরও কংগ্রেসীরা হামলা চালায়। একটি ঘরে পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের অফিসও অবস্থিত।

শর্মিষ্ঠা বর্মণ

সুপরিচিতা গীটার শিল্পী।

গীটার শেখাচ্ছেন।

২৪-এ, চিত্ররজন এভিনিউ,

(লিবার্টি সিনেমার কাছে),

কলিকাতা-৬

বাংলাদেশী চেতনার বিতর্কিত আলোচনা

শক্তিুল হাসানের

মুক্তির সংগ্রামে

পূর্ব বাংলা

(প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত)

শুভ তত্ত্ব নয়, তথ্য, বিশ্লেষণ নয়, ব্যাখ্যা, আওয়ামী লীগ নয়, বিশ্ব-রাজনীতি, মুজিব নয়, যাও লে-জুং; ওপার নয়, এপার বাংলাও একাকার হয়ে বরা দিয়েছে লেখ-কের তীক্ষ্ণ এবং স্বচ্ছ বিচারবোধে। ইদানীং কালের “পূর্ব বাংলা” সিরিজের উজ্জলতম ব্যতিক্রম এই গ্রন্থটি।

দাম/আড়াই টাকা

প্রান্তিক/রবীন মুখোপাধ্যায়

৬১, মট লেন, কলি-১৩

কোলকাতার যে কোন বড় স্টলে পাওয়া যায়

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কতক মডার্ন ইন্ডিয়ান প্রেস ৭, রাজা সুরবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-১০ থেকে মদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১০ দর্পণ কামালয় থেকে প্রকাশিত

দুপল

১৪শ বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা ॥ শতাব্দীর ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১ ॥ দাম ৩২ পয়সা

কলকাতায় দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ নিয়ে সিদ্ধার্থ রায়ের যড়যন্ত্র

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় যড়যন্ত্র শুরু করেছেন এবং এর ফলে আশংকা দেখা দিয়েছে হয়ত বা এই সেতুর পরি-কল্পনা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হবে। সেতু নির্মাণ ব্যাপারে তদা-রকারী ভারপ্রাপ্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্রীজ কমিশনার্স এই সেতু এবং নদীর দুপাশে রাস্তা তৈরির কাজে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসত্ত্ব কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস ইন্ডিয়া লিমি-টেডকে কন্ট্রাকটর হিসেবে নিয়োগ করার সুপারিশ করেন।

সুপারিশ করার আগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে টেন্ডার চাওয়া হয়। দুটি কোম্পানী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস এবং ভাগিরথী ব্রীজ কন্সট্রাকশন কোম্পানী নিজ নিজ টেন্ডার পেশ করে। নানা স্তরে পরীক্ষার পর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস বোগ্য টেন্ডার পেশ করেছে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সার-কারের কাছে নভেম্বর মাসের মাঝা-মাঝে অনুরোধ জানানো হয়।

এর পর থেকেই খেলা শুরু। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ভাগিরথী

কোম্পানী অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং এদের তরফ থেকে দিল্লীতে এবং অন্যান্য মহলে চাপ সৃষ্টি করা হয়। শোনা যায়, সিদ্ধার্থবাবু এই কোম্পানীর কাছ থেকে আসন্ন নির্বাচনের জন্য খরচপত্র বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশ্বাস পেয়েছেন।

এই ভাগিরথী কোম্পানী সৃষ্টি হয়েছে কলকাতার বি বি জে এবং বোম্বাইয়ের গ্যামন গোষ্ঠীর সম-



স্বয়ে। বি বি জের ডাইরেকটর ডি পি ঘোষ কলকাতার বিখ্যাত এ্যাটর্নী কোম্পানী ফাউলার কোম্পা-নীরও হত্যাকর্তা।

সিদ্ধার্থবাবুর পক্ষে আজকের তুংগ অবস্থায় এই ঘোষ মশায়কে ভোলা সম্ভব নয়। কারণ আইন-জীবী হিসাবে ওর উঠতি বদলে উনি ঘোষ মশায়ের স্নেহজন্য ছিলেন এবং বহু দাগী মাড়োয়ারীর মামলার সিদ্ধার্থবাবুকে জর্নিয়র হিসাবে রেখে ফালতু টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা ঘোষ মশায় করে এসে-ছেন। আশার কথা, সিদ্ধার্থবাবু অকৃতজ্ঞ নন।

ভাগিরথীর তরফ থেকে দ্বিতীয় সেতুর কন্ট্রাক্ট পাওয়ার আশ্রয় চেষ্টা চলছে এবং সিদ্ধার্থবাবু সেতুর কাজের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুষ্ঠানিক আদেশ আটকে রেখেছেন বলে অনেকের অভিযোগ।

ব্রীজ কমিশনার্সের চেয়ারম্যান একজন পরিচিত সি পি আই নেতা প্রীতীপ সান্যাল। বিভিন্ন মহল, এমন কি সি পি আইয়ের কেউ কেউ ভাগিরথীর পক্ষে সান্যাল মশাইকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। মণিবাণু বরাবরই সং এবং এক-রোখা। তিনি সি পি আইয়ের কংগ্রেস তোষণ নীতির খাতারে নীতি বিসর্জন না দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টসকে কন্ট্রাকট দেওয়ার পক্ষে, কারণ এদের টেন্ডার (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বাগবাজার অঞ্চলে সি পি এম বিরোধী জেহাদের দ্বিতীয় পর্যায় নতুন সাম্রাজ্যের দখল নিয়ে কংগ্রেসীদের মারামারি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দশদিন যেতে না যেতেই আবার বাগবাজার অঞ্চলে নব কংগ্রে-সীরা সি পি এম বিরোধী জেহা-দের দ্বিতীয় দফার হামলা চালি-য়েছে। গত আঠাশে ডিসেম্বর সি পি এমের সংসদ সদস্যের একটি দল উত্তর কলকাতার নব কংগ্রেস ও পুর্নালিশের বোম্ব হামলার সরেজমিন তদন্ত করতে এসে নব কংগ্রেসীদের বোমার সম্মুখীন হন।

এদিন সন্ট লেক ইউনিয়ন অফিসের ভবনবিশেষ দেখতে যাও-য়ার পথে নয়নকৃষ্ণ সাহা লেনের মধ্যে নব কংগ্রেসী নেতা শত ঘোষের বাহিনী বোমা পাইপগান হাতে সংসদ সদস্যদের পথরোধ করে গালিগালাজ শুরু করে। পরে পুর্নালিশ এলে আক্রমণকারীরা আবার ফিরে আসে এবং পুর্নালিশের সাম-নেই দুর্ব্যবহার শুরু করে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংসদ সদস্যদের উত্তর কলকাতা সফরের কথা পুর্নালিশ কমিশনারকে আগে জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ডি সি নর্থ অজ্ঞাত কারণে সংসদ সদস্যদের নিরাপত্তার কেবল ব্যবস্থা করেন নি।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় সি



নেপাল রায়ের গভী ও গুত্রের কার্যকলাপের চাঞ্চল্যকর তথ্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উত্তর কলকাতার উঠতি নব কংগ্রেসী সাইরেশ রায়ের (নেপাল রায়ের ছেলে) দেহরক্ষী কনস্টেবল সমীর চক্রবর্তী গত সপ্তাহের দর্পণে অভিযোগ প্রকাশ পাবার পর-

দিনই গোয়েন্দা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে পুর্নালিশ হেফাজতে রেখেছে। উল্লেখ-যোগ্য, গত সপ্তাহে দর্পণের একটি সংবাদে অভিযোগ করা হয়েছিল, এই দেহরক্ষী কনস্টেবলটি গুলী বর্ষণ করে কুমারটলিতে দুজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং ঘটনাটি পুর্নালিশ থানাকাপা দেবার চেষ্টা করছে।

এই সংবাদ প্রকাশ পাবার পর দর্পণের কাছে আরও বিস্তারিত তথ্য এসেছে। তাতে জানা গিয়েছে, গুলীবর্ষণে ছেলে দুটি মারা যায় নি। (দর্পণে বেরিয়েছিল মারা গিয়েছে) আশংকাজনক অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ওদের বাঁচ-বার আশা ক্ষীণ। কিন্তু এই সম্পর্কে অন্যান্য সংবাদ সত্যিকারের চাঞ্চল্য-কর তথ্য। অভিযোগ এসেছে নেপাল রায়ের স্ত্রী প্রীমতী ইলা (শেখাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

উত্তর কলকাতার কংগ্রেসী রাজনীতিতে আর একটি উপদল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসী মহলের সদরত-শতর (প্রফুল্লকান্তি ঘোষ) থ্রেন্সোথেরি আপাততঃ থামাকাপা পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। তবে বিষয়-টির কোন নিষ্পত্তি হয়নি এবং দু-পক্ষই পরস্পরকে সম্মুখিত শিক্ষা দেবার সুযোগ খুঁজছেন।

ইতিমধ্যে উত্তর কলকাতার নব কংগ্রেসী রাজনীতিতে শত-বিরোধী আর একটি দল মাথা চাড়া দিচ্ছে

বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই দলের নেতা হচ্ছেন বাগবাজারের অমল পাল নামে এক ব্যক্তি। প্রকাশ, অমল পাল প্রকাশেই বলে বেড়াচ্ছেন, আগামী নির্বাচনে তিনি কাশীপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসী টিকিট চান। অন্যদিকে শত ঘোষও বসে নেই। তিনি আগামী নির্বাচনে টিকিট এবং নির্বাচিত হলে, কংগ্রেস দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তাহলে মন্ত্রী হবার জন্যে ব্যাপক তোড়- (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস নিজের স্বার্থে মুসলিম লীগকে নির্বাচনে দাঁড় করাচ্ছে

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

মুসলিম লীগ এবারে পশ্চিম-বঙ্গে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে নারাজ ছিল। ওদের ভয় যে পশ্চিম-বঙ্গে অধিবাসীরা হয়ত মুসলিম লীগের বাংলাদেশে কীর্তিকলাপের কথা ভেবে এখানকার পার্টিকে আক্রমণ করবে।

এখানকার মুসলিম লীগের এই সিদ্ধান্তে নব কংগ্রেস ও সি পি

আই বিচলিত বোধ করে। ওদের ধারণা মুসলিম লীগ না থাকলে সমস্ত মুসলমান ভোট সি পি এম-এর দিকে চলে যাবে।

নব কংগ্রেস আর সি পি আই-এর যুক্ত প্রচেষ্টার শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ কংগ্রেসী জোটের অংশীদার হিসাবে নির্বাচনে নামতে রাজী হয়েছে।

বঙ্গদর্শন

চাঞ্চল্য সরকার

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম পশ্চিম-বঙ্গে নতুন রাজনৈতিক চেতনা এনেছে। গত নয় মাস ধরে সারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বাংলা-দেশের ঘটনা মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে আর এ কথা বরাবরে যে, শোষণের চরিত্র এক এবং বাংলা দেশের জনসাধারণ শেষ পর্যন্ত এই শোষণের অবসান উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গ অধিবাসীর সমস্ত অংশ এমনকি নিরক্ষর চাষী পর্যন্ত—দিনের পর দিন রোঁড়ও মারফৎ বাংলাদেশ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করেছে। ফলে মেহ-নতী মানবের এক রাজনৈতিক বোধ হওয়া স্বাভাবিক।

তাদের এ কথা বরাবরে এখন আর অসুবিধা হবে না যে, শোষণ করা আর এই শোষণের স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কি। পর পর দুটি বঙ্গ-ফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কি ভাবে সেই দুই

সরকারের পতন হল এবং বঙ্গ ফ্রন্ট সরকার আমলে মেহনতী মানবের স্বার্থ কি কি ব্যবস্থা দেওয়া হয়ে-ছিল এবং সেই সমস্ত ব্যবস্থা কি ভাবে ব্যর্থ করা হল তা মানবের ভোলায় কথা নয়। যে সমস্ত রাজ-নৈতিক দল কংগ্রেস-বিরোধী সঙ্গে বঙ্গফ্রন্টে যোগ দিয়েছিল এবং নানা অজুহাতে এই ফ্রন্টকে একটি ঘরোয়া বিবাদের আঁধার পরিণত করেছিল তাদের অনেকেই আজ কংগ্রেসী শিবিরে সামিল হয়েছে।

উনিশশো সাতশটি সালের বঙ্গ-ফ্রন্ট সরকারের আমলে মধ্যমশ্রী অজয় মধ্যমশ্রী ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন। কংগ্রে-সের সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি ওই বৎসর দোসরা অক্টোবর মধ্যমশ্রী হিসাবে নিজে পদত্যাগ করে ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটতে চেয়েছিলেন। উনিশশো উনসত্তর সালের বঙ্গফ্রন্ট সরকারের মধ্য-মশ্রী নিয়ে এবং মধ্যমশ্রীর ক্ষমতা নিয়ে অজয়বাবু এবং সি পি আই

একজোট-হয় আর সেই সময় থেকেই শত্রু হয় কি ভাবে সি পি এমকে কোণঠাসা করা যায়। দ্বিতীয় বঙ্গ-ফ্রন্ট সরকার এক বছর টিকেছিল এবং সেই-তখন থেকেই সি পি আই-এর ইচ্ছা কি করে সি পি এমকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসীদের নিয়ে আলাদা সরকার গঠন করা যায়।

তখন অজয়বাবু এবং তাঁর দল সি পি আই এর সঙ্গে একমত। কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি এবং আর এস পি-র দোদুল্যমান অবস্থা। তারা কোন কংগ্রেসী জোটে যেতে চায় নি, কিন্তু তারা সি পি এম-এর সঙ্গে এক প্ল্যাট-ফরমে এসে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনেও প্রস্তুত হয় নি। যার ফলে, রাজ-নৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দ্বিতীয় বঙ্গ-ফ্রন্ট সরকারের পতন হয় উনিশশো সত্তর সালে।

তারপর থেকেই নানা কায়দার শত্রু হয় সি পি এম-এর উপর আক্রমণ। এখন আর এই সম্পর্কে সন্দেহ নেই যে, উনিশশো সত্তর সালের আগস্ট থেকে হঠাৎ নক-শালীদের সি পি এম অধিবেশিত এলাকার মাস্তানি এবং এদের সঙ্গে প্রাথমিক বঙ্গে পদলিখের যোগ-সাজস, সি পি আই কংগ্রেস এবং

অন্যান্য দলের স্বেচ্ছাশীল মনোভাব ইঙ্গিত দেয় যে সি পি এম-কে প্রধান শত্রু ধরে নিয়ে একটি রাজনৈতিক বোম্বাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। এই বোম্বাণ্ডার প্রকাশ উনিশশো একা-ত্তর সালের নির্বাচনে এবং তারপর কোয়ালিশন সরকার গঠনে।

এই নির্বাচনে সি পি এম নিজের সংগঠিত শক্তি আক্রমণের মধ্যে আরও শক্তিশালী করেছে, তার প্রমাণ মেলে সি পি এমের বিধান-সভা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে। এত আক্রমণের মধ্যেও এবং নানা অপপ্রচার সত্ত্বেও সি পি এম-এর আসন সংখ্যা আশী থেকে বেড়ে একশত চৌদ্দতে পৌঁছায়। অপপ্রচার তীব্র করার জন্য ওদের প্রয়োজন হয় প্রবীণ প্রজেক্ট নেতা শ্রীহেমন্ত বসুরকে হত্যা করার এবং হত্যার পরেই শত্রু হয় চীৎকার যে এই হত্যার জন্য দায়ী সি পি এম। চীৎকারের প্রধান পাণ্ডা ছিল সি পি আই। পরে প্রমাণ হয়েছে যে এই হত্যা সি পি এম করে নি, করেছে তৎকালীন নকশালীরা। এই শোষণ গোষ্ঠীর অনেকেই এখন নব কংগ্রেসের মাস্তান। সবই প্রমাণ করে যে, কি বিস্তৃত এই ষড়যন্ত্র।

তবে এ কথা মনে করা ভুল যে, পশ্চিমবঙ্গবাসী কিছু লক্ষ করেছে না। সবই তারা বরাবরে, নিঃশব্দে। এখন আবার লক্ষ করেছে যে, নতুন নির্বাচনী আঁতাতে নব কংগ্রেস, সি পি আই এক হয়ে গেছে। আর অজয় মধ্যমশ্রী কাশী-কান্ত মৈত্রেরা কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে।

ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি মানবকে উদ্বেষ করতে পারে, কিন্তু মানবের সামনে একই সমস্যা থেকে গেছে—সেই বেকারীর, বন্ধ্য কারখানার, জোতদারী শোষণের আর পদলিখী ও অন্যান্য জলমের। এই সমস্ত কিছুর জন্য বারাদায়ী তারা অনেক ক্ষেত্রেই কংগ্রেস সম-র্থক এবং এরা প্রায় সকলেই এক-যোগে তীব্র সি পি এম-বিরোধী। এর ফলে যতই সি পি এম-এর বিরুদ্ধে প্রচার ও আক্রমণ বাড়বে ততই সি পি এম মেহনতী মানবের সমর্থন আরও বেশী করে পাবে।

সাধারণ মানব এখন রাজ-নীতির কথা অনেক বেশী করে বোঝে। যার ফলে সমাজব্যবস্থার শোষণের চরিত্র, শোষণকদের সমাজ-বাদী বলির পেছনে নতুন আক্রমণ কৌশল আর বামপন্থার নামে মানব ঠকানো কায়দা সাধারণ মানবকে বোকা বানাতে পারবে না।

উত্তর কলকাতায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জোড় শত্রু করে দিয়েছেন। কয়েক-দিন আগে শ্যাম পাকের বধমান মিউনিসিপ্যালিটিতে নব নির্বাচিত কংগ্রেসী কমিশনারদের সংবর্ধনা জানানোর নামে নিজের প্রচার কার্য এবং সিদ্ধার্থ রায়কে খোশামোদ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জনাব আবদুস সাত্তারকে হের করে ছেড়েছেন। প্রমাণ দেখতে হলে অমৃতভাজার ও বঙ্গান্তরে এই শ্যাম-পাকের রিপোর্ট দেখতে হবে।

শত ঘোষ খুব জোর কন্মেই এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খবর পাওয়া যাচ্ছে, পরিকা-বঙ্গান্তরের প্রকৃত মালিক তরুণকান্ত ঘোষ এখন শত ঘোষের কার্যকলাপ পুরোপুরি সমর্থন করছেন না। অফিসের মধ্যে সমাজবিরোধীদের আমদানী, কোম্পানীর গাড়ি, ক্ষম-তার অপব্যবহারের চূড়ান্ত ঘটনা-বলী কর্মচারী ইউনিয়ন তাঁর নজরে আনবার পর তরুণবাবু এখন একটু শক্ত হয়ে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শত ঘোষ অমৃতভাজার ও বঙ্গ-ান্তরে সত্তরদের বিরুদ্ধে যেভাবে রিপোর্টিং করাতেন তা নাকি তরুণ-বাবু সমর্থন করেন নি। অবশ্য এতে শত ঘোষের বিশেষ কিছু আসে যায় না। কেননা ওঁর হাতে এখন উত্তর কলকাতার নামকরা সমাজবিরোধীরা। তারাই শত ঘোষের পয়সা খেয়ে অমৃতভাজার গাড়ী চড়ে দেয়ালে লিখে “শতদা বঙ্গ-বঙ্গ জিও।”

নতুন সাম্রাজ্যের দখল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তারা আরও বলছে, সামনের নির্বা-চনে শত ঘোষকে দেখে নেবো।

উত্তর কলকাতার নব কংগ্রে-সীরা সি পি এমের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর পর এখন নতুন সাম্রা-জ্যের দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। শত ঘোষ তাই সরকারের উচ্চ মহলে গিয়ে অভি-যোগ করে এসেছেন যে, পদলিখ আমার কথা সবটা শুনছে না। পদলিখ সত্তরতর অন্তর্গামী অমল পালের কথাতেই নাকি উঠছে-বসছে। সেই সঙ্গে নাকি ডান কমিউনিস্ট নেতারাও শত ঘোষের বিরুদ্ধে নালিশ শত্রু করেছে পদলিখ আর চীফ সেক্রেটারীর কাছে।

আমরাও দর্পণ বিক্রয় করি

প্রোলেটারিয়েট ব্লক এজেন্সী

২২/৬ এস বি রাহা সেন,
আসানসোল

নেপাল রায়ের পত্নী ও পুত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রায় এবং তাঁর ছেলে সাইরেণ রায়ের প্রায়ই কনস্টেবলটি দীর্ঘ-দিন ধরে কুমারটুলি এলাকায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। সমীর চক্রবর্তীর মূল পোশিৎ হচ্ছে সিকিউরিটি কন্ট্রোল। সেখান থেকে ডেপুটিমেন্টে ডিউটীতে ডিপার্টমেন্ট থেকে সাই-রেণ রায়ের দেহরক্ষী হয়। সমী-রের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পেয়ে লালবাজার কর্তৃপক্ষ ওকে অন্ততঃ দ্বাবার ফেরৎ আসবার জন্যে টোল-

ফোন মেসেজ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইলা রায় আর তাঁর ছেলে সাইরেণ তীব্র করে বললী বন্ধ করিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কুমারটুলি এলাকার ওয়াকিবহাল মহল জানেন, কনস্টে-বল সমীর চক্রবর্তীই হচ্ছেন ইলা রায়ের রাজনৈতিক হাতিয়ার। সমীরকে দিয়ে ওঁরা এর আগেও অনেক কু কাজ করিয়েছেন। খবর এসেছে, সমীরকে যতগুলো বুলেট দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে এগা-রোটি বুলেটের কোন হিসেব নেই। অনুমান করা হচ্ছে, এই বুলেট-গুলো সমীর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। কিন্তু উত্তর কল-কাতার পদলিখ এখন সম্পূর্ণভাবে নব কংগ্রেসীদের করতলগত। তাই কোন তদন্ত হয়নি।

জানা গিয়েছে, সাইরেণ রায় এখন কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ পেলেই তাদের বাবার হত্যাকারী বলে পেটচ্ছে। সাইরেণ আর তার মায়ের প্রত্যেকের চারজন করে মোট আটজন দেহরক্ষী পদলিখ আছে। এছাড়া বাড়ীতে এবং অফিসে দরদল সি আর পি পদলিখ পাহারা দিচ্ছে। গত দুর্গাপূজার সময় সপ্তমীর বাতে এদের দলীয় সমাজবিরোধীরা পাইপগান নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় গুলীতে একটি মেয়ে মারা যায়। ঘটনাটি ঘটেছিল আহিরি-টোলা স্ট্রীটের এক দুর্গা মন্ডপে। এই হত্যার ঘটনা সাইরেণ রায় তীব্র করে চাপা দেয়। পরদিন কাগজে বেরোল, নকশাল আর সি

পি এমরা এই কাজ করেছে। এই রকম আরও অনেক সমাজ বিরোধী ঘটনা সাইরেণ রায়ের দল ঘটিয়ে যাচ্ছে।

কুমারটুলির সাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটে একুশে ডিসেম্বর রাত দশটায় ৩৯ এ, আপার চীংপদ রোডের সামনে। দেহরক্ষী কনস্টেবল সমীর চক্রবর্তী, সঙ্গে সাইরেণের দলের লক্ষ্যণ এবং আরও দু-তিনটি ছেলে মানিক দত্ত এবং আর একটি ছেলেকে চেপে ধরে মদ খাবার জন্যে পাঁচ টাকা দাবী করে। অপর ছেলোট নাকি মানিক দত্তের ভাই। কিন্তু ছেলে দুটি টাকা না থাকায় দিতে পারে না। অন্যদিকে সমীর রিভলবার বের করে শাসাতে থাকে। তখন মানিক দত্তের মা বেরিয়ে এসে কাতর আবেদন জানাতে থাকেন: কিন্তু সমীর চক্রবর্তীরা তখন মদের নেশায় ভরপুর। টাকা না পেয়ে সমীর-রিভলবার চালায়। দুটি ছেলে মাটিতে পড়ে যায়। তারপর সমীর-লক্ষ্যণরা যায় ইলা রায়ের বাড়ীতে।

গুলী বর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়াই ছিল। কিন্তু দর্পণ প্রকা-শিত হয়েছিল তেইশে ডিসেম্বর বিকেলে। পরদিন চম্বিশে অনন্যো-পায় হয়ে সমীর গোয়েন্দা দপ্তরে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু সঙ্গীরা এখনও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর দর্পণ একথা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে, এই হত্যার চেষ্টার কোন প্রকৃত তদন্ত কলকাতার ডিউটীতে ডিপার্টমেন্ট করবে না। কেননা, ওরা ধামাচাপা দিতেই বর্তমানে অভ্যস্ত।

দ্বিতীয় সেতু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমস্ত দিক দিয়ে যোগ্য বিবোচিত হয়েছে।

মর্মাহত মণি সান্যাল পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের আনুষ্ঠানিক আদেশ দানের বিলম্বে দিশেহারা হয়ে গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-পাল ডায়াস সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান। অন্তিমতি মেলে নি। ডায়াস সাহেব জানেন যে, এ ব্যাপারে সিদ্ধার্থবাবু জড়িত এবং চাকরীর খাতিরে অবশ্যই ডায়াস সাহেবের করণীয় কিছু নেই।

এখন প্রশ্ন শত্রু অর্ধের নয়, সমগ্র শিল্পনীতির এবং সেই হিসাবে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানা-র শিল্পপতিরা উঠে পড়ে লেগে-ছেন কি করে একটা বড় কন্ট্রোল থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কোম্পানীকে হঠানো যায়।

শিবির-কর্মীদের নিয়ে সিদ্ধার্থবাবুর ফ্যামাদ

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

শরণার্থী শিবিরে নিয়োগপত্র প্রাপ্ত এক বিরাট সংখ্যক শিবির কর্মী নিয়ে সিদ্ধার্থবাবু এখন মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন। জনা গেল, ছাব্বিশে জুলাই পর্যন্ত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে প্রায় পঁচিশ হাজার যুবক শরণার্থী শিবির-গুলিতে বিভিন্ন পদে নিয়োগপত্র পান। এবং জুলাই মাসের মধ্যেই প্রায় আট হাজার কর্মী বিভিন্ন ক্যাম্পে কাজে বোগদান করেন। বাকী তেরো হাজার নিয়োগপত্র পেয়েও চাকুরীতে যোগ দিতে পারেন না। অথচ মজার ব্যাপার হলো, পঁচিশ হাজার নিয়োগপত্র ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রায় ছয় হাজার নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে। ওরা সরাসরি ক্যাম্পে বোগ দেন।

বাকী অন্যসব যুবক নিয়োগপত্র পেয়েও কাজে বোগ দেওয়া থেকে

বাঁচত হন। ফলে এসব যুবক ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং আন্দোলনের পথ বেছে নেন। তার মধ্যে রাজভবনের কাছে তাদের পঁচাত্তর দিন অনশন পালন করা ছাড়াও আইন অমান্য আন্দোলনের ঘটনাও রয়েছে। কিন্তু বাঁরা নিয়োগপত্র পেয়েও কাজ পাননি তাদের কাজে বোগদানের ব্যবস্থা করা তো দুইয়ের কথা বারা কাজ পেয়েছেন তাঁরাও আজ কর্মচ্যুত হতে চলেছেন। কারণ শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পরে শিবির কর্মীদের কর্মচ্যুত করতে সরকার মনস্থির কবে রেখেছেন। এদিকে গত তেইশে নভেম্বর সিদ্ধার্থবাবু শিবির কর্মীরূপে বারা কাজ পাননি ও পেয়েছেন তাদের সবার সমস্যা সমাধানের সরকারী তরফে সুবিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

শোনা গেল, এ ব্যাপারে কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা

রাজ্যপাল এ এল ডামাসের সঙ্গেও দেখা করেন, কিন্তু রাজ্যপাল শিবির কর্মীদের চাকুরী সম্পর্কে কোনরূপ দায়দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছেন।

ইতিমধ্যে এসব ব্যাপারে দিল্লীতেও দরবার হয়ে গেছে। ইন্দিরাজী এ ব্যাপারে দারুণ বিরক্ত। কারণ পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন করতে হলে শরণার্থীদের স্বদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতেই হবে অথচ শরণার্থীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে শিবির কর্মীরা কর্মচ্যুত হবেন এবং শরণার্থীরা না ফিরে গেলে নির্বাচন করাও সম্ভব হচ্ছে না।

রাজ্যের কংগ্রেস মহল এখন বিধাগ্ৰস্ত হয়ে পড়েছেন। সিদ্ধার্থবাবু ও অন্যান্যরা যেসব প্রতিশ্রুতি নিয়োগপত্র প্রাপ্ত সাধারণ বেকার যুবকদের কাছে দিয়েছিলেন, সেটা যে সম্পূর্ণ জঁওতাবাজি শিবির-কর্মীরা এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। আসন্ন নির্বাচনে এই বিরাট সংখ্যক প্রতারণিত বেকার যুবকের ভবিষ্যৎ-ভূমিকা রাজ্যের কংগ্রেসী মহলকে অত্যন্ত করে তুলেছে।

শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে সি পি এমের ওপর কংগ্রেসীদের জঘন্য আক্রমণ

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

গত কয়েকদিন ধরে কলকাতা সহ শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে নব কংগ্রেসের গুন্ডার দল পদাধিগত সাহায্যে সি পি এমের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেছে। রাতের অন্ধকারে বড়ী বাড়ী চড়াও হয়ে যেমন আক্রমণ করেছে, তেমনি বহু বাড়ীর ছেলেদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর কেন্দ্রে বাদবপুদের নব পর্বায়ে শত্রু হয়েছে। পূর্ববর্তীকালে আগরপাড়া কেলসারিয়া প্রভৃতি জায়গায় এবং বাইশ তারিখে বর্ধমানও তাম্বড় চলেছে।

গত তেইশে ডিসেম্বর আগরপাড়ায় নব কংগ্রেসী গুন্ডারা সি পি এমের সমর্থক পুষ্ট জায়গায় ঢুকে বেমাঝাজী সহ ব্যাপক তাম্বড় নৃত্য শুরু করে। চব্বিশে ডিসেম্বর থেকে বাদবপুদ থানা এলাকায় একশ চুয়াশ্লিশ ধারা জারী করে সরকারী প্রশাসন বর্ধ নব কংগ্রেসের ব্যাপক গুন্ডামার বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করে স্থানীয় এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

নির্বাচন আসছে তাই নব কংগ্রেসের যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের গুন্ডারা বিভিন্ন এলাকায় এখন থেকেই রাস সৃষ্টির কার্যে রত হয়েছে। এ কাজে তারা সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ছাড়া তথাকথিত কিছু নকশালী যুবকেরও সহায়তা পাচ্ছে। বিভিন্ন পাড়ার এই ধরনের অসামাজিক যুবক যাদের অনেকের নাম পদাধিগত খাতার লেখা আছে তাদের আজ ছাত্র পরিষদের কর্তারা এই কাজে নিয়োগ করেছেন। অসামাজিক প্রান্ত বিপথগামী এই সব যুবকদের কিছু হাত খরচা হলেই চলে—তা যে দিতে পারবে তারা তারই সেবাদাস।

ব্যারাকপুদ টিটাগড় ক.মার-হাট খুদুহ-বেগমসারিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আর কয়েকদিনের মধ্যেই কংগ্রেসী গুন্ডারা ঝামেলা করবে। লোকজনের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তারা নির্বাচনী প্রচারণে নেমে পড়েছে। এবারকার নির্বাচনী কৌশলে কংগ্রেসের ছাত্র ও যুবক কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল বেছে নিয়েছে। বর্ধমান রানীগঞ্জ শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া কোলগর হিন্দ মোটর বজী নৈহাটী কাঁচড়াপাড়া বেহালা বাদবপুদ প্রভৃতি ব্যাপক অঞ্চলে রাস সৃষ্টি করে কংগ্রেসী গুন্ডারা নির্বাচনী প্রচারণে নেমে পড়েছে ও পড়ছে। রাজ্যের পদাধিগত কর্তারা এই কাজে তাদের পরো-পুদ্রি সহযোগিতা করবেন। কংগ্রেসী গুন্ডারা যেখানেই হামলা করতে

যায় পদাধিগত ও সি আর পি ড্যান সেখানে তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে যায়। ইন্দিরা গান্ধীর সমজবাদ ও গণতন্ত্রের এটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সি পি এম রাজ্যে গুন্ডামা ও খুনের রাজনীতি এনেছে বলে তাদের ধারা নিন্দা করেছিলেন তারা আজ নীরব কেন? সি পি এমের কাজ নিন্দনীয় হলে কংগ্রেসের কাজ নিন্দনীয় নয় কেন?

বাদবপুদ বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার পরিকল্পনা

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

বাদবপুদ এখন সমস্ত সমাজ বিরোধী যুব কংগ্রেস কর্মীর এবং সি আর পি বাহিনীর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিদিনই সুপারিকম্পিত উপায়ে যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে গুন্ডা বাহিনী ও সি আর পি বাহিনী সামারণ নাগরিকের জীবন দাবিষহ করে তুলেছে। এদের হাত থেকে নারীরাও বাদ যাচ্ছেন না। অনেক স্ত্রীলোকেরই মান সম্ভ্রম নষ্ট করা হয়েছে, দৈহিক নিষীতনও করা হচ্ছে।

বাদবপুদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নৃশংস হামলা করে জনজীবন বিপর্যস্ত করার পর সমাজ বিরোধী ও যুব কংগ্রেসের অশুভ আঁতাত এখন ঐতিহ্যবাহী বাদবপুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই দু একবার পদাধিগত হামলা এবং সমাজ বিরোধীদের বর্ধ হামলা হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের দায়িত্বশীল নেতা অশোক দাস ও অজুন মধুজীকে ইতিমধ্যেই লালিত করা হয়েছে। অভিযোগ, এ বিষয়ে নব কংগ্রেসী রূপে পরিচিত এলাকার কুখ্যাত গুন্ডা জুয়েন সরকার প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন উত্তেজনামূলক পোস্টারও নানা স্থানে দেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কিছুদিন পূর্বে নিহত উপাচার্য গোপাল সেনের হত্যাকাণ্ডের শাস্তি হয়নি, এমনকি পদাধিগত বাহিনীর তরফ থেকে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক ও কর্মচারীদের যে নৃশংসভাবে কিছুদিন আগেও পেটানো হয়েছে তারও কোন বিচার হলো না, অথচ ইতিমধ্যে আরেক প্রস্তুত রক্তপাত ঘটানোর পরিকল্পনা হচ্ছে। এবিষয়ে সময় থাকতেই রাজ্যের দায়িত্বশীল মহলের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করছেন।

শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেসীরা গণ্ডগোল করছে

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নতুন ধরনের গণ্ডগোল খব শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। কোথায় কোথায় ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্ত হলেও চরম আকার ধারণ করবে কল্যাণখনি অঞ্চলে। কল্যাণখনি এলাকার আসানসোল ও তার চতুষ্পার্শ্বে এ আই টি ইউ সি শক্তিশালী। রাণীগঞ্জ সিটু ছাড়া এইচ এম এসও খনি শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব রয়েছে। আই এন টি ইউ সি-র শক্তি খুব একটা নেই।

ভারতের সুদাগরী, ব্যান্ধ, জীবনবীমা, তেলশিল্প প্রভৃতিতে কংগ্রেস আজ পাট্টা ইউনিয়ন করতে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে এখনও সমস্ত জায়গায় আসে নি বলে ঘটনাটা বোঝা যাচ্ছে না। আই এন টি ইউ

সি-র সঙ্গে এই পর্বায়ে এ আই টি ইউ সি-র সম্পর্ক তিক্ততার রূপ নেবে। ডিসেম্বরের চৌদ্দ তারিখে পহাড়পুরের আই ও সি-তে এবং চব্বিশ তারিখে রাণীগঞ্জ থানার অন্তর্গত আমিকুলা কোলমারীতে সংঘর্ষ হয়। তেরগা বাণ্ডা কাঁখে নিয়ে মালিকের দালাল ও কুখ্যাত গুন্ডা টি এন শূকরা কোলমারীর মজুরদের উপর আক্রমণ করে দশ জনকে জখম করে। শ্রমিকদের ধাওড়গুদিল লুণ্ঠ করে নিয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে এই কোলমারী মজুরদের সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন এ আই টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত।

ইন্দিরার বন্ধু দলের ট্রেড ইউনিয়ন অর্থাৎ এ আই টি ইউ সি-কে যে ভাবে আই এন টি ইউ সি-র স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা আক্রমণ

করছেন তাতে আগামী দিনে দুই পার্টির মধ্যকার ভাল সম্পর্ক বিনষ্ট হবে। কংগ্রেসের ভূই-ফোড়া তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বেকার সমস্যা সমাধানের দাবীটী খুব ফলপ্রসূ হতো যদি এখানে তাঁদের দল শাসন ক্ষমতার আসতো। নব কংগ্রেস ইউনিয়ন কর্মীদের দাবী : পরোনো কর্মরত লোকদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের পেটেলা লোকের চাকুরী দাও।

আই এন টি ইউ সি-র নেতারা একদল অনাভিজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়ন নেতার এই ধরনের "বৈজ্ঞানিক" কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে সচেষ্ট না হলে আগামী দিনে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে আন্তঃইউনিয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা খনোখনির রাজনীতির চরম রূপ নেবে।

সেন-র্যালি কারখানা খোলা নিয়ে রাজনীতি

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

দীর্ঘ নয় মাস বন্ধ কারখানা সেন-র্যালি কোম্পানী পুনরায় খোলার বিষয়ে এক নোংরা রাজনীতি চলেছে বলে জানা গেল। ইতিমধ্যে এই বন্ধ শিল্পসংস্থাটির দুর্দশাগ্রস্ত কর্মীদের উপর পদাধিগত হামলা ও বিভিন্ন মামলার জড়িয়ে তাদের নাজেহাল করার ঘটনা অব্যাহত গতিতে চলেছে। সাধারণ কর্মী ছাড়াও সেন-র্যালি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকেও বহু মামলায় জড়ানো হয়েছে। ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক ভাস্কর চক্রবর্তী ও মধু ভট্টাচার্য, নারায়ণ দে, জয়ন্ত চ্যাটার্জী, জগবন্ধু রায়, রাসবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণেন্দ্র কারক বরুণ ভূইয়া মাধব চ্যাটার্জী, প্রদীপ দাশগুপ্ত ও ইন্ট-

পদ সাহাকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েকদিন আগে আসানসোল মহকুমা আদালত ইউনিয়ন কর্মীদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ সরাসরি ন্যাকচ করে তাদের বেকসুর খালাস করে দেন।

এতো গেল সেন-র্যালি বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের উপর পদাধিগত হামলার নমুনা। অন্যদিকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে মতামতামতে শত্রু করেছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী কোম্পানীর মালিক গোষ্ঠীর সঙ্গে দেখা করেন। কারখানা খোলা নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়। মালিক গোষ্ঠী নাকি জানান, সিদ্ধার্থবাবু

বলেছেন, সংস্থার সি পি এম প্রভাবিত শক্তিশালী ইউনিয়ন যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ কারখানা খোলা অসম্ভব। এরই সঙ্গে মালিক গোষ্ঠী বন্ধ কারখানার সাধারণ কর্মীদের দৃঢ় মনোবলের কথাও জানান। এরপর কেন্দ্রের এ প্রাক্তন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় শিল্পায়োজন মন্ত্রী মৈনুল হক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনিও কারখানাটি পুনরায় খোলার উপর গুরুত্ব অরোপ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের অক্ষমতার কথাও জানান। তার মতে, পশ্চিম বাংলার জনৈক প্রভাবশালী নেতা যতক্ষণ মনে করছেন, কারখানাটি খুললে সি পি এমের শক্তি বৃদ্ধি হবে ততক্ষণ সংস্থাটি পুনরায় খোলা অসম্ভব।

ভুটো সাহেবের নতুন চাল কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চেষ্টি করছেন

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চাকার ফিরে গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বড়লোকদের ধরনের কাগজগুলি ধুয়া তুলেছেন যে মজিবাহিনীকে নিরস্ত করা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অবশ্য দেশপ্রেমিক সশস্ত্র অনিশ্চিত বাহিনীকে নিরস্ত করার ইসারা এই সব সংবাদপত্র গোষ্ঠী কোথা থেকে পাচ্ছেন তা পশ্চিমবঙ্গবাসী বঙ্গালীদের অজানা নেই।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন অবশ্য এই মতলবপূর্ণ দাবী অগ্রাহ্য করে বলেছেন যে মজিবাহিনী দেশপ্রেমিক সেনাদল। তাঁরা পাক দখলদারী বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে অশেষ অত্যাচারের দ্বারা দেশকে স্বাধীন করেছেন। এদের নিরস্ত করার কোন আশু প্রয়োজন নেই বরং এদের নিয়মিত সশস্ত্র মিলিশিয়া এবং পদলিখবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইতিমধ্যেই মজিবাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক মেজর মাহবুব চাকার পদলিখ সদাপারি-টেমেন্টের কর্মভার গ্রহণ করেছেন। জনাব তাজউদ্দিন ঠিকই ধরেছেন দেশের জন্মে প্রাণ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন যারা তারা প্রজ্ঞেয় এবং সম্মানযোগ্য। তাঁদের অবিস্মার করা একমাত্র “আনন্দবাজারী” বিদেশী চরদের মতই সাজে। কলকতার সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলগুলির বাংলাদেশের মজিবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্মধারার আলোচনা পরে করব, কারণ আমরা জানি বাংলাদেশের সংগ্রামী মনব-দেরও শত্রু মিত্র চিনে নিতে হবে।

মজিবাহিনীকে নিরস্ত করার ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েও বাংলা দেশের অস্থায়ী সরকার, বর্তমান সরকারকে সদস্যস্বাধীন দেশের এখনকার অবস্থানস্বায়ী ব্যাপক গণাভিযুক্ত প্রতীতিত করতে অস্বীকার করেছেন, এটা দুঃখের কথা।

উনিশশো সত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে যে রাজনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল, আজ একাত্তরের ডিসেম্বরে তার চিহ্নমাত্র নেই। তখন নির্বাচন হয়েছিল পাকিস্তানের মধ্যে থেকে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবীতে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান দল মোলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত “ন্যাপ” পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। আজ মোলানা ভাসানীর

নীর অসমসাহসিক এবং ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ভাসানীপন্থী ন্যাপ সরকার পবিত্র চালা ও সংবিধান রচনার অংশগ্রহণের জন্যে দাবী করতে পারেন। তাছাড়া অন্যান্য অনেক দল ও ব্যক্তি বাংলা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশীদার ছিলেন; তাদেরও সরকার পরিচালনা এবং সংবিধান রচনার অংশ গ্রহণের অধিকার দেওয়া সঙ্গত।

আওয়ামী লীগ উনিশশো সত্তর সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন এটা যেমন সত্য তেমনি নির্বাচনের ইস্যু যে তখন “স্বাধীন বাংলাদেশ” প্রতিষ্ঠার দাবী তারা করেন নি এটাও তেমনি সত্য। আজ সশস্ত্র মজিব সংগ্রামের ফল হিসাবে স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী সরকার সত্তর সালের নির্বাচিত কতিরাই শত্রু গঠনের অধিকারী, তার কোন ব্যক্তি নেই।

তাছাড়া আওয়ামী লীগের যে সব জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্য ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছিলেন বলে ইয়াহিয়া খান তাঁদের আসন শূন্য বলে ঘোষণা করেন নি, সেই সব শতাধিক আওয়ামী লীগ টিকেটে নির্বাচিত “দেশদ্রোহী” সদস্যের কি এখনও স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধি বলে ধরা উচিত? ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যের কয়েকজন যেমন শের-ই-বঙ্গাল ফজলুল হকের একমাত্র পুত্র জনাব ফৈজুল হক, মিঃ এ বি এম নরুল ইসলাম, মিঃ এস বি জামান প্রভৃতি আওয়ামী লীগ সদস্য শত্রু সেনার সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার দায়ে ‘শত্রুপরাধী’ বলে গ্রেফতার হয়েছেন। চাকমা রাজা দ্বিদিব রায় স্বতন্ত্র নির্বাচিত হলেও পরে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি তো এখন জুলফিকর আলি ভুট্টোর মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী! বাংলাদেশ সরকার কি বাংলাদেশের জনগণের সামনে যে সব আওয়ামী লীগ সদস্য শত্রুর সংগে সহযোগিতা করছিলেন, তাঁদের আরেকবার জনগণের পরিবর্তিত ইচ্ছা-বাচাই করার জন্যে নির্বাচনের অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে বাধ্য করবেন না?

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ দক্ষিণপন্থী ন্যাপের পক্ষ থেকেও সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভার দাবী তুলেছেন। কিন্তু খান ওয়ালিখান তো তাঁর ন্যাপের দুই প্রধান মিঃ আরবার সিকন্দর খান এবং খদা বক্স

মেহদীকে প্রেসিডেন্ট, ভুট্টোর মন্ত্রিসভার যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তা রূপপন্থী ন্যাপ কি এখন গাছ থেকেও পড়বেন, তলারও কুড়ো-বেন ঠিক করেছেন। ভুট্টোকেও চাই, বাংলাদেশ স্বাধীন সরকারও চাই।

এতসব গোঁজামলের পাটিও কি বাংলাদেশে থাকবে? না কি জনাব জুলফিকর আলি ভুট্টো শেখ মজিবের সঙ্গে আলোচনা করে নয়া শর্তে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্যে মার্কিন চক্রান্তে যে কুটজাল বিস্তার করেছেন তার প্রতি প্রজ্ঞেয় প্রত্যয় কারো কারো এখনও আছে? ভুট্টো সাহেব লড়াই করে যা পান নি এবার কুটনীতির টেবিলে আলোচনা করে তা পেতে চাইছেন। মজিবাহিনীকে নিরস্ত করার দাবী এবং শত্রু-আওয়ামী লীগ সরকার বজায় রাখার দাবী কি ভুট্টোর হাতকে শক্তিশালী করবে না?

জনাব ভুট্টো বাঙ্গালীদের কাছে অতীত দুঃকর্মের জন্যে সামরিক প্রশাসনের অত্যাচার অবিচারের জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন এবং গত বছরের নির্বাচনে তাদের আসন শূন্য বলে ঘোষণা করে প্রাক্তন সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উপনির্বাচন করেছিলেন, তাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনলে তিনি বন্দুপরিষ্কার এবং নয়া পাকিস্তান ‘একটা শিথিল (লুজ) ফেডারেশন হলেও তিনি আপত্তি করবেন না, যদি পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি অক্ষত থাকে। অর্থাৎ এখন তিনি পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশকে (বাংলাদেশ সহ) পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে সম্মত এবং শত্রু মাত্র ধারণা (কনসেন্ট) হিসাবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ জন্যে তিনি ওয়ালি খানের দল ন্যাপকে পুনরায় আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করেছেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে দেশে জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সংকল্প ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান শত্রু ‘বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের মধ্যে ঐশ্ব্যমিক চরিত্র বজায় রেখেই চলতে হবে।

জনাব ভুট্টো এবার কুটনৈতিক চালে পাকিস্তানের সামরিক পরাজয়কে জয়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিকসন এবং লন্ডনে বৃটেনের পররাষ্ট্র সচিব স্যার অ্যালেক্স-এর সঙ্গে

নিষ্পত্ত আলোচনা করে এসেছেন। ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের পরই তিনি চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে নিষ্পত্ত আলোচনা করে তারপর এই বেতার ভাষণ দিয়েছেন। মনে হচ্ছে জনাব ভুট্টো কুটনীতির আলোচনা টেবিলে বসে এবার তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্থাৎ পাকিস্তানের অখণ্ডতার (বাংলাদেশ পুনরুদ্ধারের) দাবী আদায় করতে চান। তাই তিনি বেশ আঁটবাট বেধে মন্ত্রিসভীদের পরামর্শ উপদেশ নিয়েই কাজে নেমেছেন।

জনাব ভুট্টোর বেতার ভাষণ বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হল বাংলা-দেশকে আবার পাকিস্তানের অঙ্গভুক্ত করার জন্যে তাঁর প্রতিশ্রুতি ও প্রচেষ্টা। কি করে আজ আর তা সম্ভব হতে পারে?

জনাব ভুট্টো শেখ মজিবর রহমানকে তাঁর হাতের তুরপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চান। সম্ভবতঃ এই মনোভেদে তিনি শেখ সাহেবের সঙ্গে নিষ্পত্ত আলোচনার রত এবং পাক সামরিক চক্রের অতীত পাপের অনুশোচনা এবং বাংলা-দেশের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, শেখ মজিবকে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে দায়িত্ব গ্রহণ এবং ইচ্ছামত সংবিধান রচনার অধিকার স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত। শত্রু একটা

মাত্র শত্রু, শেখ সাহেবকে বাংলা-দেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যপসারণের দাবী করতে হবে এবং সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে।

সম্ভবতঃ মার্কিন, চীন, ফ্রান্স, ইতালী, ইজিপ্ট ও কিছু মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও শেখ সাহেবের উপর এ জন্যে অনুরোধ-উপরোধের চাপ সৃষ্টি করা হবে। শেখসাহেবকে এশিয়ার ‘নাসের’ বলে স্মৃতি করা হবে। একক বন্দী শেখসাহেবের উপর এই চাপ সৃষ্টির ফল কি হবে?

শেখ মজিবুর রহমান কি জনাব ভুট্টোর এই ফাঁদে পা দেবেন? যদি দেন তাহলে ভারতের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি হবে কারণ সেক্ষেত্রে সৈন্যপসারণ করা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকবে না। বাংলাদেশের জন্যে ভারত যা করেছে তা সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

যদি শেখসাহেব এই ফাঁদে এঁড়িয়ে চলার মত স্বথেষ্ট মনোবল দেখাতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশ শোষণ মজ্জ হবে, স্বাধীন থাকবে। কিন্তু শেখসাহেবের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা থাকবে কি?

আগামী কিছুদিনের মধ্যে এর উত্তর পাওয়া সম্ভব। এবং তার ফলে বর্তমান সমস্যাদুলির আরো দ্রুতী জটিলতা দেখা দেবে বলেই মনে হয়।

এদিনীপুর ও ১৪ পরগণার কয়েকটি অঞ্চলে

পুলিশের সহায়তায় জোতদাররা কৃষকের ধান কেটে নিচ্ছে

(বিশেষ প্রতিনিধি)

ধান কাটার মরশুমে এ রাজ্যের প্রধান দুটি জেলা মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার কয়েকটি অংশে কৃষকদের ফসল কেটে নিয়েছে জোতদারের ভাড়াটে গুন্ডারা। তাদের সহায়তা করেছে রাজ্যের পদলিখ বিভাগ। সবচেয়ে মজার কথা হল উক্ত জোতদারেরা রাতারাতি সকলেই প্রায় শাসক কংগ্রেসের তেরগুণা ব্যান্ডা কাঁধে নিয়েছে। সেই কারণে শাসক কংগ্রেসের একপ্রশণীর কমীরাও এদের সহায়তা করেছে।

সোনারপুর, হাড়োয়া, সালগরাম্বী, বসিরহাট, ক্যানিং প্রভৃতি অঞ্চলের চাষী ভাইদের মনে প্রশ্ন জেগেছে কৃষকের স্বার্থরক্ষার ধম্পা দিয়ে শাসক কংগ্রেস জোতদারের পক্ষ অবলম্বন করে দেশকে কোন ধরনের সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাচ্ছেন?

চব্বিশ পরগণা জেলার গাঙ্গের উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের পর বছর ধরে বড় বড় জমির মালিক আর জোতদারেরা ভাগ চাষী ও ক্ষেত মজুরদের উপর অত্যাচার ও শোষণ চালিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে উনসত্তর সালে যে ব্যাপক পণ্ডিত জমি দখল করা

হয়েছিল এবং তারপর থেকে ভাগ-চাষী ও ক্ষেতমজুরদের হাতে কিছু জমি আসে। এরপর থেকে তারা চাষ আবাদ শুরু করে। কিন্তু সেই পুরাতন ঘষখোর আমলাতন্ত্র ও পদলিখ প্রসারিত ঘষের সাহায্যে জোতদাররা গত দুই বছর ধরে কৃষকের ধান লাট থেকে শরদ করে তাদেরকে মারধোর প্রতীতি করছে। রাজ্যের পদলিখ এ ব্যাপারে নীরব। জনপ্রদীত আছে, গ্রামাঞ্চলের দমনীতপরিপূর্ণ পদলিখ জোতদারের টাকার উপরেই তার ঠাট বজায় রাখে। তার উপর জোতদার যদি শাসকদলের সমর্থক হয় তা হলে তো কথাই নেই। পদলিখের মহান কর্তব্য হবে শাসক দলের চোর, গন্ডা, ডাকাতি, খুনী প্রভৃতিকে রক্ষা করা। বর্তমান এই আপৎকালীন অবস্থার সম্মুখে জোতদারের সহায়তা করার কাজে রয়েছে পদলিখ বাহিনী, জে এল আর ও, বি ডি ও।

হাড়োয়া থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় কৃষকদের বাঁজ রোপণের সময় সরকারী প্রশাসন যন্ত্র একশ চর্যাগ্ৰিণ দ্বারা জারী করে বাধা (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

রাজধানীর চিঠি

বাংলা দেশের মুক্তি ও ভারত আমেরিকা চীন

(বিশেষ প্রতিনিধি)

নয়া দিল্লী, চব্বিশে ডিসেম্বর, উনিশশো একতরঃ বাংলাদেশ অবশেষে মুক্ত হল। এ প্রসঙ্গে বহু মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা স্মরণীয়। মার্কিনী সরকার অন্যান্য পশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একজোট হয়ে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী সরকারকে দিয়ে এসেছে, শত্রু নৈতিক মৌখিক সাহায্য নয়, মারণাস্ত্র ত্যাগ করেছে মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের নিরীহ জনসাধারণকে পুবার জন্য।

এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে মার্কিন বিরোধিতা এত চরমে ওঠে যে চিরকালের মার্কিন সমর্থক রক্ষণশীল দক্ষিণ-পশ্চিমী দলগুলিও—জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টি—সবাইর সঙ্গে মার্কিনদের বিরুদ্ধে কণ্ঠ মেলাতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এরপর ছাওয়া আবার শীঘ্রই পাণ্ডাতে শরৎ করতে পারে। আজ মার্কিন সরকার যেষণা করেছে যে সদ্যমুক্ত বাংলাদেশকে তারা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। এর সবোচ্চ নেবার জন্য বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষেও মার্কিন সমর্থক গোষ্ঠীগুলি যারা এতদিন চপ মেরে গিলে—তারা এগিয়ে আসবে।

সুতরাং বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের সংগ্রামী রাজনৈতিক সলগুলির এ বিষয়ে সজাগ হওয়া সরকার।

দরভাগ্যবশত, আমাদের ভারতীয় সরকার মার্কিনী দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে কতটা সজাগ এবং মার্কিনী উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতটা মোহমুক্ত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে মুক্ত।

সপ্তম নোবহরকে বঙ্গোপসাগরে মুকিয়ে আমাদের হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও, বারংবার পাকিস্তানের অন্তর্কূলে যুদ্ধবিবর্তিত প্রস্তাব আনা সত্ত্বেও, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গতকাল নিকসনকে এক পত্রাঘাত করেছেন—যার সারমর্ম চিঠিটির শেষ অনুচ্ছেদে—“অস্কা যদি কোন দল করে থাকি, তুমি বলে দাও কতখান ভুল হয়েছে।” আগাগোড়া চিঠিটিতে, ভারতবর্ষের মানববীররা ক্রোধের পরিবর্তে একটা অন্তঃকরণ-বিনয়, একটা অভিমানের সরে উঠে উঠেছে। মূল সর, মার্কিন সরকারের কাছ থেকে যে ব্যবহার করা হয়েছিল ভারত সরকার, তা করা না। অথচ, মার্কিনী সরকারের কাছ থেকে কি আশা করা যেতেন—কাম্বোজীকৃত করেছিল ভারতীয়, তারা

মানবের মার্কিনীদের সম্বন্ধে কোন মোহ নেই। কিন্তু তারা কিছুটা হতাশ ও বিভ্রান্ত এই দেখে যে মার্কিনীদের সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দও একজোট বেঁধেছে। মার্কিন সম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য রোঝা যায়। পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খাঁর সমস্ত তান্ত্রিক ধর্মীয় গোড়ামি প্রসূত গোঁয়াতুর্কিমও বোঝা যায়। কিন্তু যদি চীনের কমিউনিস্ট নেতারাও অনুরূপ কাডজ্ঞানত্বতার পরিচয় দেন, তখন সন্দেহ হয় তাদের বহাঙ্গুরে ভীমরতিতে ধরেছে কি না। বাংলাদেশের বিষয়ে, এ কথা মানতে হবে, স্বপ্রণয়ী স্বার্থে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার যে অস্থিমন্তার পরিচয় দিয়েছে, সে তুলনায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থে অকাট্য মর্ষতার পরিচয় দিয়েছে। অথচ, শেষ মহত্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের মানব-মুক্তি যোদ্ধা ও রাজনৈতিক দলগুলি, এমন কি বাংলাদেশের সরকার পর্যন্ত—অশা করেছিল যে চীন, তাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করবে। সে দেশে চীন সম্বন্ধে

প্রচণ্ড প্রম্ভা ছিল। কিন্তু চীন, একটা ভারত-বিরোধী ও সোভিয়েট-বিরোধী মোহাচ্ছন্নতা থেকে আগাগোড়া ভুগছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল উৎস ও জাতীয় ব্যাপকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকে, তার নীতি পরিচালনা করেছে। এর ফলে চীনের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা এবং তার আসল কর্মপন্থার ফারাক জগতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। স্থিতিমত, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মোহাচ্ছন্ন বিশ্ব থেকে মার্কিনী সম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে দেশ একজোট হতে পারে, তার সমাজতান্ত্রিক চরিত্র সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। আশা করা যায়, নেতাদের এই দম্ভমুখো নীতি, চীনের জনসাধারণ মেনে নেবে না।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য এটাও বলা দরকার যে বাংলাদেশে নিকট ভবিষ্যত খুব সহজ উত্তোলনের ব্যাপার হবে না। নানা স্বার্থ জল ধোলাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সুতরাং সমস্ত সংগ্রামী দলের প্রতিনিধি

নিজে জাতীয় সরকারের প্রয়োজন, এখানকার রাজনৈতিক পর্ববেক্ষকরা মনে করেন। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত করার যে প্রস্তাব অনেকে দিচ্ছেন, তার প্রতিবাদ করে এরা বলেছেন যে মুক্তি সংগ্রামে যে সহস্র শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র যোগদান করেছিল, তাদের দিয়ে গণবাহিনী বা পিপলস মিলিসিয়া করা উচিত। বলাই বাহুল্য, এ মতের সঙ্গে ভারতীয় সরকারের আমলাতন্ত্র একমত নয়।

সরকারী মহলের একংশের ইচ্ছা, এ দেশের আমলাতন্ত্রেরই পরিপূরক একটা পালাটা আমলাতন্ত্র বাংলাদেশে খাড়া করা।

দরভাগ্যবশত, রাজধানীতে সরকারী ও বেসরকারী মহলে এখন থেকেই একটা ধারণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—আমরা বাংলাদেশকে উদ্ধার করছি, সুতরাং ওদেশে আমাদের অধিকার আছে। প্রধান মন্ত্রীর তরফ থেকে এই ধারণা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা উচিত যদি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক সুস্থ রাখা আমাদের উদ্দেশ্য হয়। বিবেকবর্জিত ব্যবসাদার, স্বার্থপর শিল্পপতি, কালো-বাজারি, মুনাকফখোর, দালাল—ইত্যাদির বাংলাদেশে গিয়ে মোরসীপট্টা বসানোর চেষ্টাও এখনি বন্ধ করা দরকার।

যাই হোক, মনে হচ্ছে আর কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আবার পুরোনো খাতে

বহিতে শরৎ করবে। উনিশশো বহাঙ্গুর সালের নির্বাচন—যা মূল-ভূমী করা হয়েছিল—তা ফেরয়ারি মার্চ মাসেই হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এবং পশ্চিমবঙ্গেও বাদ যাবে না। বাংলাদেশের মুক্তির পর পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরাজীর সম্মান এখন তুঙ্গে। সুতরাং এই আবহাওয়া থাকাকালীন নির্বাচন সংগঠিত হলে ইন্দিরা-পন্থী কংগ্রেসের জয়লাভ কেঠেকার? আগামী পাঁচ বছরের জন্য কংগ্রেস নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে পারবে বলে আশা করছে। বাম-পন্থী দলগুলি, বিশেষতঃ সি পি এম বর্তমান পরিস্থিতিতে কোণঠাসা এবং সরকারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করতেও অপারগ বেহেতু দেশে আপেক্ষাকালীন পরিস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গের মানবও, যুদ্ধে জয়লাভ ও বাংলাদেশের মুক্তির আন্দলের জোয়ারে ভেসে গিয়ে ইন্দিরা ভক্তি থেকে কংগ্রেসকেই ভোট দেবে, বলে এখানকার কংগ্রেসী বড় কর্তারা স্থির নিশ্চিন্ত।

অবশ্য, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দেশের অর্থনীতির কি হাল হয়, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব ছাড়াও, যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে মদ্রাস্থিতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাকে কি করে প্রধানমন্ত্রী রুদ্ধতে পারবেন তা নিয়ে সবাই চিন্তিত।

অর্থনৈতিক দর্শন

চ্যবন সায়েব প্রকৃষ্ট কৌশলে টাকার মূল্য হ্রাস করেছেন

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের শিকলে এমনভাবে বাঁধা যে আন্তর্জাতিক মদ্রাবন্ধে আমাদের টাকার দাম অকারণে মার খেয়েছে। একথা সবাই জানেন যে এবছর মে মাস থেকেই ডলার সংকট আন্তর্জাতিক মদ্রা সংকটে পরিণত হয়েছিল। এবং গত পনেরোই আগস্ট মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিকসন সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির দায়-দায়িত্ব লঙ্ঘন করে ডলার ভাঙিয়ে সোনা দিতে অস্বীকার করেন এবং আমেরিকার আমদানী সমস্ত পণ্যের উপরে শতকরা দশভাগ আমদানী শুল্কের সার চার্জ বসিয়ে দেন। তার উদ্দেশ্য ছিল যে আমেরিকার লেন-দেন ঘাটতির সংকট অন্যান্য দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া।

বলা বাহুল্য, ইউরোপের ধনী দেশগুলি এবং জাপান এর ফলে সংকটের আঘাতে পড়ে যায় এবং তারা অস্বস্তিকার জন্যে একজোট হয়ে মার্কিন অর্থনৈতিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। আমেরিকা দাবী করেছিল যে এসব দেশের টাকার দাম বাড়াতে হবে যার ফলে তাদের দেশে উৎপাদন মূল্যের দাম চড়ে যায় এবং যাতে আমেরিকার তৈরী মাল আন্তর্জাতিক বাজারে সস্তা হয়। আমে-

রিকা চাইছিল যে ব্রুটন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ এবং জাপান তাদের দেশে উৎপাদন পণ্যের দাম চড়িয়ে দিক, যার ফলে আমেরিকার পণ্য তুলনায় সস্তা হবার ফলে বিভিন্ন দেশে বেশী বিক্রী হবে, সুতরাং আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি মিটে যাবে। কিন্তু এর ফলে আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় দেশগুলি এবং জাপানের রপ্তানী কমে যাবে, কাজে কাজেই আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি শেষপর্যন্ত ঐ সব দেশের বাণিজ্য ঘাটতিতে পরিণত হবে।

অন্যদিকে ইউরোপের ধনী দেশগুলি ও জাপান চায় যে আমেরিকা বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়ে ডলারের মূল্য হ্রাস করুক, তাহলে তার রপ্তানী জিনিষ সস্তা হবে, আমদানী জিনিষপত্রের আন্তরতরীণ দাম বেড়ে যাবে। আমেরিকাকে বাইরে থেকে বহুবিধ কাঁচামাল, শিল্পের জন্যে আধা-তৈরারী মাল আমদানী করতে হয়। আমদানী পণ্যের দাম বেড়ে গেলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে এবং রপ্তানী জিনিষের দাম শেষ পর্যন্ত বেড়ে যাবে। তাছাড়া সোনার হিসাবে ডলারের দাম কমিয়ে দিলে অন্য দেশগুলি তাদের সংরক্ষিত ডলার রিজার্ভ

ভাঙিয়ে কম ডলারে বেশী সোনা টেনে নেবে।

বারংবার নানা বৈঠকের পর অবশেষে ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ধনী দশটী দেশের (গ্রুপ অব টেন) বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রীদের আপাততঃ যুদ্ধবিবর্তিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঐ চুক্তি অনুসারে আমেরিকাকে প্রায় আট শতাংশ হারে ডলারের মূল্য কমাতে হয়েছে, অন্যান্য দেশও কিছুটা এগিয়ে তাদের মদ্রার দাম খানিকটা করে বাড়িয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জাপান, তাকে ইয়েনের দাম প্রায় সতেরো শতাংশ বাড়াতে হয়েছে এবং ফলে জাপানের তৈরী পণ্য আমেরিকার বাজারে প্রায় অনু-রূপ হারে বেশী দাম হবে। এতে জাপানের রপ্তানী বাণিজ্য দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতিমধ্যেই জাপানে বিভিন্ন শিল্পে মদ্রার অবস্থা দেখা দিয়েছে। সেকথা বারাস্তরে আলোচনা করা যাবে।

আমাদের দেশের সরকারও সঙ্গে সঙ্গে তিন শতাংশ হারে টাকার দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বৃটীশ পাউন্ড স্টার্লিং-এর দর অপরিবর্তিত থাকার ফলে আমাদের টাকার দাম পাউন্ড স্টার্লিং এর হারে কার্ভতঃ পাঁচ দশমিক চার শতাংশ হারে কমে গিয়েছে।

নতুন বিনিময় হার হিসাবে এখন এক পাউন্ড স্টার্লিং-এর বদলে প্রায় উনিশ টাকা এর আগে আঠারো টাকা এক পাউন্ড স্টার্লিং-এর বিনিময়ে পাওয়া যেত। আগে এক ডলারের দাম ছিল সাড়ে সাত টাকা এখন নতুন বিনিময় হার হল এক ডলারে সাত টাকা আঠাশ পয়সার সামান্য কম। সুতরাং পরিষ্কার হয়ে যায় যে পাউন্ড স্টার্লিং এর সঙ্গে বিনিময় হারে টাকার দাম কমছে কিন্তু ডলারের সঙ্গে বিনিময়ে টাকার দাম যেটুকু বাড়ানো হল (তিন শতাংশ) তা ডলারের সরকারী অবমূল্যায়নের চেয়ে পাঁচ দশমিক নয় শতাংশ কম। অর্থাৎ কার্ভতঃ আমাদের টাকার দাম সরকারী ভাবে পাউন্ড স্টার্লিং-এর তুলনায় পাঁচ দশমিক চার শতাংশ কমানো হয়েছে এবং প্রকৃত কাল-দায় ডলারের তুলনায় (বর্তমান আন্তর্জাতিক হারে) পাঁচ দশমিক নয় শতাংশ কমানো হয়েছে। অথচ একথাটা খোলাখলি স্বীকার করতে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী চ্যবন সায়েব লজ্জা পেয়েছেন।

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্যে যদি টাকার মূল্য হ্রাসের এই প্রয়োজন হয়ে থাকত তাহলে এর একটা মানে হত যদিও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ বিষয়েও (দেখাংশ এক পৃষ্ঠায়)

মতামত

ছাত্র আন্দোলনের নামে মিটি কলেজে গুণ্ডাম্বা

আমি সিটি কলেজ (রাজা রাম-মোহন রায় সরণী)-এর দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্র। “অধ্যয়নই ছাত্রদের একমাত্র-তপস্যা”, বর্তমান যুগের ছাত্র হিসাবে এ তত্ত্ব আমি মানতে বাধ্য নই। পক্ষান্তরে, রাজনীতিই ছাত্রদের কাছে আশার আলো একথা খুব সঙ্গত কারণেই আমি বিশ্বাস করি। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন করবে এটা ইচ্ছা। কিন্তু তাই বলে ছাত্র আন্দোলনের নামে গুণ্ডাম্বা, অসাম্প্রদায়িকতা, শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা ইত্যাদি চলতে থাকবে, এটা নিশ্চয়ই ছাত্রদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সিটি কলেজে তাই চলছে এবং ছাত্র পরিষদ নমক ছাত্র সংগঠনই এটা চালাচ্ছে, যারা নাকি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস ও সত্যগ্রহ আন্দোলনে বিশ্বাসী।

আমি গত বছর যখন প্রথম বর্ষে ভর্তি হই তখন এই কলেজে ছাত্র সংসদ ছিল বি পি এস এফ (এস এফ আই)-এর। বেশ কয়েকমাস

কলেজ করার পর প্রথম বর্ষে থাকাকালীন ছাত্র সংসদের জন্য অ-ইন-সম্মত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে বি পি এস এফ (এস এফ আই), ছাত্র পরিষদ এবং বি পি এস ইউ অংশ গ্রহণ করেছিল। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেল বি পি এস এফ (এস এফ আই) বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করেছে।

এর কিছু পরেই এসে গেল সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিদ্যাসাগর কেন্দ্র থেকে নব কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেন। এই অসমিতি বহুদিন ধরে অন্য দলের হাতে ছিল। আমাদের সিটি কলেজটি এই কেন্দ্রেই অবস্থিত। এখন, এই নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর থেকেই কলেজে ছাত্র পরিষদের প্রতিপত্তি ইঠাৎ বেড়ে যায়। এলাকার ছেলেরা (যারা কলেজের ছাত্র নয়) কলেজে আনাগোনা করতে থাকে। এর কিছুদিন পরে তারা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে বলপূর্বক ছাত্র সংসদের অফিস ঘর দখল করে নেয় এবং অনেক প্রয়ো-

জনীয় কাগজপত্র আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা ছাত্র ফেডারেশনের ছেলের অশ্রুশ্রদ্ধ সহ ভীতি প্রদর্শন করে। তারপর থেকেই ছাত্র ফেডা-

রেশনের নেতাদের কলেজে আসা বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ ছাত্র কর্মীরাও ভয়ে ভয়ে কলেজে ক্রাশ করে এবং নিজ দলীয় রাজনীতি থেকে সরে থাকতে বাধ্য হয়। এইভাবে সিটি কলেজের ছাত্র সাধারণ কর্তৃক গণতান্ত্রিক উপায়ে ছাত্র সংসদেব সক্রিয়তা অনাধ্যাত্তবে বন্ধ করে দেওয়া হল।

এরপর থেকেই কলেজে অরাজকতা দেখা দেয়। কলেজের মধ্যে কলেজের ছাত্র নয় এরকম ছেলের রাজত্ব কয়েক হয়। এই বছর কলেজে ছাত্র ভর্তির সময় এর নসনরূপ দেখা যায়। কম্পনা করুন কলেজের অফিসে চেষ্টা করে বসে ছাত্রভর্তি করাচ্ছে কলেজের কতকগুলি ছেলে, শিক্ষার দিক দিয়ে যাদের অনেকই স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে নি। অবশ্য এদের সঙ্গে কলেজের কিছু ছেলে এবং দ-একজন অধ্যাপকও ছিলেন। এদের মধ্যে একজন জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, প্রদ্যুম্নকুমার পাল যার নাকি গিয়ালনা থেকে ঠনঠনে পর্বত অবধি প্রতি-

পত্তি (কথাক্সে একদিন জীব-বিজ্ঞান বিভাগের কোন একটি ক্রাশের ছাত্রদের কাছে বলেছিলেন)। ইনি নাকি আবার একজন বিরাট সমাজসেবী। যাই হোক এই সমস্ত ভীতি হতে ইচ্ছুক অনেক ভাল ছেলের অসহায়তার সিটি কলেজে ভাল এবং অনেক যোগ্য সাধারণ ছেলেকে বিমর্ষ হতে হয়। তাইদেব দেশে তারা কোন কংগ্রেসীর চিঠি নিয়ে কলেজে আসেন নি বা তারা বিপক্ষ দল অধ্যুষিত অঞ্চলে বাস করেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেসীর চিঠি নিয়ে আসা অনেক ধরাপ ছেলেকে তাদের মনোমত বিষয় নিয়ে পড়বার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আবার ভর্তি হবার পর প্রত্যেক ছেলের থেকে জোর করে পাঁচ টাকা নেওয়া হয়েছে। এ-র প্রত্যেককেই ভর্তি হবার সময় অন্যান্যবাবের চেষ্টা অনেক বেশী টাকা দিতে হচ্ছে। তার উপর আবার ওই টাকা একেবারে মরার উপরে খাড়ার ঘা। অথচ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও বিপদ। গত বছর কিন্তু বি পি এস এফকে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে কোন-রূপ সক্রিয়তা দেখাতে দেখিনি।

বি পি এস এফ কলেজে থাকাকালীন কলেজে বা কলেজের বইরে অন্যতর তাদের বা সমমতাবলম্বী কোন দলের সভা, সমাবেশ থাকলে সেই সমাবেশে যোগদানের জন্য শ্রদ্ধমাত্র ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মীরই কলেজ থেকে মিছিল করে যেত। সেই সমাবেশে যোগদানের জন্য কখনও সাধারণ ছাত্রদের উপর বলপ্রয়োগ করা হতো না। অবশ্য কোনও সাধারণ ছাত্র যদি মিছিলে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করতো তবে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হতো। এই সমস্ত সমাবেশের জন্য কখনও কলেজ ছুটি হতো না। অবশ্য বি পি এস এফ ছাত্র ধর্মঘটের আহবান জানালে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওই ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের শরিক হতো।

জনৈক ছাত্র

রানাঘাট সাব-জেলে পুলিশী অত্যাচার

অল্প কিছুদিন হল যখন আমি রানাঘাট সাব জেলে অটক ছিলাম সেই সময়ের মধ্যে বন্দীদের উপর বিনা প্রেরণায় পুলিশী অত্যাচারের বেশ কয়েকটি ঘটনা জেল অভ্যন্তরে ঘটে, যাহা অগণতান্ত্রিক ও ভরতবর্ষের বর্তমান সংবিধান বিরোধী।

আরম্ভণিতে পুলিশ কর্তৃক খনের অভিযোগে ধৃত একটি বোল-সতেরো বছর বয়সের যুবককে রানাঘাট জেলের অভ্যন্তরে পশ্চিম ন্যায় পিটান হয় এবং দু-ঘণ্টা যাবৎ মরিগির ন্যায় রাখা হয়। এই যুবকের শা, ভাই ও বোনকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং এইরূপ অত্যাচার করা হয়।

আলিপুর সেন্ট্রাল

জেলারকে খন করার আ-বেগে শান্তিপূর ও হিজল অঞ্চলের সমস্ত ছাত্র যুবককে গভীর রাতে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে হিংস্র বন্য পশুর ন-প্রহার করা হয় এবং গ্রেপ্তার ক-হয়।

ইহা ব্যতীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, রানাঘাট জেলের ভিত এই সমস্ত ছাত্র যুবকের ওপর ব-রেচিত অত্যাচার করা হয়। এই রূপ অত্যাচার অতীতে বৃটি সম্রাজ্যবাদের অত্যাচারকে হ-মান্ন। এই সমস্ত ছাত্র ও যুবক উলঙ্গ করে দুই ঘণ্টা যাবৎ রু-ও হাণ্টারের চাকক মারা হ-শীতের সমস্ত রাতি এই অব-রাখা হয় এবং এই বলিয়া বন্দী-শ-সান হয় যদি কেহ তাদের চ-ও কম্বল দেয় তবে তাকেও ও-রূপ নিষা-তন করা হইবে।

সকল বেলায় এই সকল যুবককে এই অবস্থায় ঘরের বাহিরে আনি-গত দিনের তুলে রাখা মাটির জা-ভর্তি জলা মাথায় ঢেলে দেও-হয়, সঙ্গে সঙ্গে চালান হয় রু-ও হাণ্টারের আঘাত এবং ঘণ্টাখানেক এই অ-ঘাত চালানোর পর তাদের বরফের নটায় জল ভর্তি চো-চায় তিরিশ মিনিট যাবৎ ডুবি রাখা হয়।

মানবেন্দ্র সাহ

যুব কংগ্রেসের গুণ্ডাম্বা

বিগত যোগই ডিসেম্বর, ব-স্পতিবার, সন্ধ্যা আটটা নাগাদ যুব কংগ্রেস নামধারী একদল লোক জুলন্ত মশাল, লাঠিসোটা অন্যান্য অশ্রুশ্রদ্ধ নিয়ে আমা-ব-ড়ীতে হামলা করে। আমি তখ-বাড়ীতে ছিলাম না। হামল-কারীরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢে-আমার শিশুকন্যার বইপত্র ও আমা-প্রধানা শিক্ষিকা স্মারি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতাগু-ছিড়ে টুকরো টুকরো করে, তে-টি মিন ও লেনিনের প্রতিকৃ-ভঙচুর করে, বেপরোয়া ই-টপা-কেল ছুড়ে আমাদের বাড়ীর প্রচ-ক্ষতিসাধন করে। আমা-বাড়ীতে ঢে-কার তিনটি বড় দরজা ভেঙে ফেলে। প্রবীণ ভদ্রমহি-কালোশশী দাসকে ছুরিকাঘ-করতে উদ্যত হয়। কিশোর বয়স্কদের মরধর করে।

এ দিনই ঢাকার জঙ্গী ই-হিয়া বাহিনীর আত্মসমর্পণ-বাংলাদেশের স্বাধীনতা লা-গৌরবময় বিজয়ের মহত-এভাবেই কংগ্রেসের অনঙ্গাম-শ্রুতন ও অনাচারে কলঙ্কিত-ষিত করলো। লিষ্টন-সম্মান মিছিলে ম-উনিষ্টরা বোমা-যোগ করে-বিভিন্ন-অ-

স্কুল ব্যবসায়ের দুর্নীতি এসছে

সত্তর সালের চব্বিশে জুলাই ও সাতই আগস্ট উত্তর ব্যারাক-পরের স্কুল ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি-চক্র শিরোনামায় দর্পণে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আজ দেড় বছর পরেও সে দুর্নীতির অবসান তো ঘটেইনি, বরং আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যে স্কুলগর্ভে ছিল, তার মাধ্য-বেলটির অনুমোদন বাতিল হয়েছে প্রায় এক বছর আগেই।

এতগুলি স্কুল শ্রদ্ধমাত্র এব Gross irregularities and mal-practices (Memo No. D.P.I. 3586 (2) Sc/P Dated 28.7.70) জন্য বাতিল হয়ে গেল; অথচ কি সেই দুর্নীতি ও অনিয়মতান্ত্রিক দরবন্দা এবং কারা সেই দুর্নীতিব-পোষক ও পরিবর্ধক; সে কি শ্রদ্ধ-স্কুল ব্যবসায়ী, কজন পরিচালক মণ্ডলী না সরকারী আমসারও তা-মধ্যে জড়িত তার কোন হাদিশ পাওয়া গেলনা।

আমরা কিন্তু স্কুল তুলে দেও-য়ার পক্ষপতি কোনদিনই ছিলাম না, আজও নই। বছরের মাঝখানে স্কুলগর্ভের অনুমোদন বাতিল করে শিক্ষা বিভাগ দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষা বিভাগের অফিসার মহলের প্রোর-চনা ছাড়া এই ঘটনা ঘটতে পারে না।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে-পেরেছি যে এ জি ওয়েস্ট বেঙ্গল

শিক্ষাবিভাগের চব্বিশ পরগণা জেলা পরিদর্শক কার্য থেকে এই সব স্কুল সংক্রান্ত বহু কাগজ-পত্র পাচ্ছেন না। যে সময় উত্তর ব্যারাকপুর অঞ্চলে রাতারাতি ব্যাণ্ডের ছাত্রের মতো অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয় গর্ভে উঠেছিল, সেই সময় ডি আই ছিলেন শ্রীমতী তপতী দত্ত। তার বর্তমান অবস্থান স-লেরই অজ্ঞাত। অথচ আমরা জানি সরকারী চাকুরীর কাজেই তাকে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে। এই ভাবে সবকিছু ধমাচাপা দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীকালে এসেছেন শ্রীমতী প্রীতমা মজুমদার। তার বর্তমান অবস্থানও তথৈবচ। কিন্তু স্কুল সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে এদের প্রত্যেককেই প্রয়োজন। আমরা আরও একজনকে জানি, এই দপ্তরের এ ডি আই শ্রীমতী অরুণিমা দাশ-গুপ্তার কাহিনী।

একদিকে স্কুল ব্যবসায়ী ও অন্যদিকে সরকারী মহল—এই দুই-য়ের ষেগসূত্র হলেন এই ভদ্র-মহিলা। স্কুল ব্যবসায়ীরা “বিভূতি বালিকা বিদ্যালয়ের” নামে যে চব্বিশ হাজার টাকা আত্ম-সং করেছে তার সঙ্গে ইনিও যুক্ত ছিলেন। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় শ্রীমতী দাশগুপ্তা হুগলী জেলায় বদলী হয়েছেন।

সম্প্রতি এই স্কুল ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতে আরো এক ব্যক্তি

এগিয়ে এসেছেন। গত নির্বাচনে নৈহটি কেন্দ্রের পরাজিত প্রার্থী প্রীতারাপদ মজুমদার। তিনি বর্ত-মানে এই দক্ষতকারীদের প্রধান সহায়। এর কার্যকলাপের কিছু কাগজপত্র আমাদের হাতে এসেছে।

সত্তর সালের চব্বিশে সেপ্টে-ম্বর আমরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের অভিযোগ পেশ করি এবং তদন্তের দাবী জানাই। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে এই দুর্নীতির অনুসন্ধান আশা করেছিলাম। কিন্তু তিনি সূচক প্রশাসনে মনো-নিবেশ করলেন না।

রাজ্যপাল ডায়াস সাহেবও পশ্চিমবঙ্গে পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের অনেক কথা বলেছেন। শেনা যায়, তিনি নাকি আরো সরকারী কর্ম-চারী ছাঁটাইয়ের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। আমাদের প্রশ্ন, সেই সব তালিকায় শিক্ষাবিভাগের এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের নাম আছে কি?

আমরা শিক্ষা বিভাগের তদন্তে আর বিশ্বাস করতে পারছি না। আমরা চাই বিচার বিভাগীয় তদ-ন্তের নির্দেশ। কি কি কারণে এই বেলটি স্কুলের অনুমোদন বাতিল করা হোস তা জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরা হোক।

বিজয় বিশ্বাস
ক্ষিতীশ সেনগুপ্ত
নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে

ভারত দর্শন

তাড়াহুড়ো করে নির্বাচন

(দর্শনের পর্যবেক্ষক)

বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা আর দমাসের মধ্যে মিটে যাবে, ঢাকার বাংলাদেশ সরকার সচিবালয় হবেন অচিরেই, এবং যুদ্ধবিধি 'দ্বি-বজার' থাকলে অবিলম্বে পাক-ভারত সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই—সুতরাং ভারতের নব-কংগ্রেসী সরকার এক বছরের জন্যে বিধানসভা নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার জন্যে যে সংবিধান আইন আনবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন, তা প্রত্যাহত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবটুকু গৌরব জনসাধারণ ইন্দিরাজীর নব কংগ্রেসের একান্ত নিজস্ব বলে মনে করছেন বলেই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ধারণা হয়েছে তাই তারা সাময়িকভাবে নব কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন প্রচুর খেঁড়েছে তারই সুযোগ নিতে চান। তাই যে পশ্চিমবঙ্গে নভেম্বর মাসেও নির্বাচনের উপলব্ধ

পরিবেশ নেই বলে তারা ঘোষণা করেছিলেন, সেখানেও তারা এই সুযোগে নির্বাচন সেরে ফেলতে চান। অর্থাৎ জনসাধারণ পাঁচ বছরের জন্যে তাদের নির্বাচন করবেন এটা স্থির বিশ্বাস হয়েছে বলেই নব কংগ্রেসীরা নির্বাচনের জন্যে আগ্রহী। জনসাধারণের এই সাময়িক মোহের সুযোগ তারা নিতে চান, যেমন সংসদ নির্বাচনে “গরীবী হঠাৎ” এর শ্লোগান তুলে তারা বিপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন।

এক কথায় বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে অসংখ্য বীর যোদ্ধা অকুণ্ঠ-চিন্তে যে রক্তদান করেছেন, যে অসংখ্য শরণার্থী দীর্ঘ নয় মাস ধরে বিপদ-প্ৰসন্ন শিবির জীবনে অশেষ ক্লেশ সহ্য করেছেন, ভারতের যে বীর জনগণ মূল্যবান, টাক্সের বোঝা এবং নব কংগ্রেসী দনীতি ও সম্ভ্রাস রজ্জ্ব অপরিসীম দখলভোগ সঙ্গেও অমানবদনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা

সংগ্রামের পেছনে দণ্ডায়মান হয়েছেন—তারা কেউ নন, সব কৃতিত্বই নাকি নব কংগ্রেসের।

যখন বাংলাদেশের লড়াই মানু-ষেরা পশ্চিমে মার্চের পর থেকে অত্যাচারী জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন, যখন তবু ঘোষণা করেছিলেন যে আর আপেক্ষ আলোচনা নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সর্বভৌম অধিকার ছাড়া এসংগ্রাম শেষ হবে না, তখন কি নব কংগ্রেসীরা রাজনৈতিক সমাধানে নামে ইয়াহিয়া সঙ্গে আপোষ আলোচনার চোরাগলিতে ঐ মুক্তি-সংগ্রামকে ঠেলে দেবার উদ্যোগ নেন নি?

লড়াই করেছেন বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা রা, তাদের পাশে ছিলেন ভারতের দক্ষিণ ক্রান্ত হয়েও অকুতোভয় জনগণ। আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের অদর্শে উদ্দীপিত হয়েই তারা জঙ্গী অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নব কংগ্রেসী সরকার বারে বারে স্বাধীন-গ্ৰস্ত হয়ে পাশ কাটতে চেয়েছে, ইয়াহিয়া ভারত আক্রমণ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দেয় নি। আদি কংগ্রেস নেতা কামরাজের বিখ্যাত উক্তি “পর-কালম” অর্থাৎ “পরে দেখা যাবে” এই ছিল ইন্দিরাজীরও একঘেয়ে উত্তর। অবশেষে জনমতের চাপ, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের দ্রুত গতিবেগ এবং ইয়াহিয়া আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের আশায় ভারত আক্রমণের পথ গ্রহণ করার বাধ্য হয়ে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত বাংলা-দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিল। আজ ঐ অবস্থার কৃতিত্বের সবটাই বাংলা-দেশ সংগ্রামের প্রতি সর্বদা সংশয়-কূল নবকংগ্রেস বিজয়ের ফলটুকু আত্মসাৎ করতে চাইছে। তবে বোকা লোকে একবারই হয়, বারে বারে লোককে ধাম্পা দেওয়া সহজ হয় না।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরবতার ফল বাংলাদেশ এবং ভারতের জনগণ পাবে কারণ জওয়ানরা ভারতের জনগণেরই সন্তান। একথা কি কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বুঝতে পারবেন না যে ভারতের সেনাদল নব কংগ্রেসের দলীয় ঝটিকা বাহিনী নয়, ভারতের সেনা বাহিনী ভারতের জনগণেরই অংশ এবং তাদেরই সন্তান? আর ভারতের জনগণের অধিকাংশ নব কংগ্রেসীও নয়—সুতরাং সেনাবাহিনীর সাফল্য আবির্ভূত হলে নব কংগ্রেসীদের আত্মসাৎ করার কুৎসিত সোভ ভারতের গণতান্ত্রিক জনগণ সহ্য করবেন একথা কে নিশ্চিত বলতে পারে?

যেহেতু ইন্দিরাজী প্রধানমন্ত্রী, এবং সংসদে নব কংগ্রেস সংখ্যা-গরিষ্ঠ সেইহেতু ভারতের ইঞ্জি-নীরার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক কিংবা সামরিক বিজয় সফলতার কৃতিত্ব সবটুকু তাঁর? ভারতের জনগণের নয়? এমন বুদ্ধিবৈকল্য

ঘটলে নব কংগ্রেসী এবং রংবেরংএর আধা কংগ্রেসীরা ভারতের সদস্যর আবহাওয়া কিংবা খুরগার নেবেল প্রাইজ, সর্বকিছই তাদের কৃতিত্বের ফল বলে দাবী করতে পারেন। জিজ্ঞেস করা যায়, ইন্দিরাজী প্রধান-মন্ত্রী থাকা সঙ্গেও পশ্চিম বঙ্গাঙ্গনে পূর্ব বঙ্গাঙ্গনের মত দ্রুত ও অভা-বনীয় সাফল্য দেখা দিল না কেন?

তবু নির্বাচন হওয়া ভাল। ইন্দিরাজী গান্ধী ও তাঁর নব কংগ্রে-সীদের জনসাধারণের বিচারশালায় আবার দাঁড়ানো দরকার। অক্টোবর মাসে উড়িষ্যার চারটি উপনির্বাচনের সময়ই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে ইন্দিরাজীর “গরীবী হঠাৎ”—এর মোহময় বালি ফিকে হয়ে গেছে। তাই চারটি আসনেই নব কংগ্রেস পরাজিত, বিপর্যস্ত।

তারপরে গণগণা যমননয় অনেক জল গড়িয়ে গেছে। দূর দূরান্ত লোকের খাড়ে ট্যাক্স চেপেছে দশো পাঁচ কোটি টকা, ফলতু কাগজী নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে সাড়ে চারশো কোটি টাকারও বেশী। লবণ থেকে সাবান সব পণ্যের দাম বেড়েছে তরতর করে। লোকের দৃষ্টি ক্রেশ অস্তহীন অন্ধকারে প্রবেশ করেছে। তবু তারা শরণার্থীদের নামে বসানো ট্যাক্সের এই গরুড়ার ভেঙ্গে পড়া মেরদন্ড সঙ্গেও কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

এবার শরণার্থীরা চলে যাবেন, ভারত সরকার কি ঘোষণা করবেন যে ঐ দশো পাঁচ কোটি টাকার ট্যাক্স তুলে নেওয়া হবে, নির্বাচনের আগেই?

পরিষ্করণের সংগতিবাদের ঘাটতি যা পড়বে তার পরিমাণ নাকি দেড় হাজার কোটি টাকা। আরো ফলতু কাগজী নোট ছাপিয়ে, দাম আরো তিনচারগুণ বাড়িয়ে কি সে সংগতির অকুলান মেটানো হবে? দেশে মসে এক লক্ষ করে যে তরল বেকার বাড়ছে, তার কি হবে? চেয়ার দখল, ইউনিয়ন দখল, তিনশো দশ এগারো ধরায় বরখাস্ত সব তো হলো, বেকার বৃদ্ধি তবু ঘটছে কেন। নির্বাচনে এরকম অনেক জবাবের জন্যে দাবী উঠবে। তাই নির্বাচন হওয়া ভালো।

কিন্তু নির্বাচনে স্বাধীনভাবে

ভোট দেবার অধিকার এবার থাকবে তো? নাকি নব কংগ্রেসী ছাত্র-যুব সংগঠনের গা-জোয়ারী পাইপগান-বোমবাজির মধ্যে ভোটের পূর্ব সারা হবে? চেয়ার দখলের মত, ইউ-নিয়ন দখলের মত পাইপগান দেখিলে ভোটকেন্দ্র এবং ব্যালট পেপারও দখল করার চেষ্টা হবে? নির্বাচনের আগে জরুরী আইন, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন, পদলিখের অবাধে গুলি চালাবার ঢালাও আইন ফাননে, বিরোধী দলগুলি কমীদের অনর্থক গ্রেপ্তার, হুমরাণি এসব গণ-তন্ত্র বিরোধী আইন বাতিল করা হবে তো? যদি না হয় তাহলে নির্বাচনের প্রহসন করার দরকার কি? দক্ষিণ ভিয়েতনামের খিউ সরকারের মত ঘোষণা করে দেওয়া হোক নব কংগ্রেসীরা শতকরা নিরা-নবরই দর্শনিক নয় ভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচিত (?) হয়ে গেছেন। কেউ প্রতিবাদ করলে সি আর পি, পদলিখ মিলিটারী আর গুন্ডাবাহিনী তো আছেই।

আর যদি স্বাধীন, অবাধ নির্বাচন হয়, যদি ভোটদাতারা বিনা বাধ্য ভোট দিতে পারেন তাহলে নব কংগ্রেসের ইমেজ যে কত ভগ্ন হবে তা টের পেতে তাদের দেবী হবে না। ঠিক দমাস আগে উড়িষ্যার চারটি উপনির্বাচনে যা ঘটছিল, এবার ব্যাপক আকারে তার অভিব্যক্তি ঘটবে।

অর্থনৈতিক দর্শন

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

আমাদের মতভেদ রয়েছে। কিন্তু ঐক্য ও বল যে যে রপ্তানী বাড়ানো এবং আমদানী হ্রাসের জন্যে ভারতে প্রস্তুত পণ্যের রপ্তানী মূল্য কমানো এবং আমদানীমূল্য বাড়ানোর জন্যে এই মদ্রামূল্য হ্রাসের অন্ততঃ তাত্ত্বিক বস্তব্য রয়েছে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি? উনিশশো ছেষাটি সালের ছয়ই জুন যখন ভারতীয় টাকার মূল্য কমিয়ে দেয়া হয়েছিল তখন আমাদের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের ঘাটতি ছিল নশো একশ কোটি নবরই লক্ষ টাকা। অথচ উনিশশো উনসত্তর-সালে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি কমে একশো চারশ কোটির কিছু বেশী টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং আগামী মার্চ মাসে (বাহারের সালে) তা আরো কমে যাবার দৃঢ় সম্ভাবনা দেখা যচ্ছে।

সুতরাং উনিশশো ছেষাটি সালের তুলনায় আজ ভারতীয় টাকার বিনি-ময় বোগ্যতা বেশী। বাস্তব অব-স্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন টাকার সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য টাকার দাম বাড়ানো উচিত বলে মনে হচ্ছিল তখন ভারত সরকার প্রচুর কৌশলে ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন করেন।

এমন সয়েব রাজ্য সভায় বলে-যে কেনোরূপ রাজনৈতিক পরি ফলে ভারত সরকার এভাবে টাকার অবমূল্যায়ন করেছেন তা তারা নাকি ভারতের রপ্তানী

বৃদ্ধি ও আমদানী সংকোচের দিকে লক্ষ্য রেখেই এটা করেছেন।

যদি তাই হয়, তাহলে পাউন্ড স্টার্লিং এর সঙ্গে যে বিনিময় হার এখন নির্ধারিত হয়েছে তা গত মে মাসের ডলার সংকট দেখা দেবার সময় স্টার্লিং ডলার অনুপাত হারে ভারতীয় টাকার যে বিনিময় মূল্য লন্ডনের খেলাবাজারে ধার্য ছিল (সরকারী আঠারো টাকা এক পাউন্ড স্টার্লিং এর সমান দর নয়) তাকেই কেন এই ডিসেম্বর মাসে সরকারী দর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হল?

রপ্তানী বাড়ানোর কথাই ধরুন। জাপানের সঙ্গে লৌহ আকর রপ্তানী বাণিজ্যের কী হবে। জাপান তো একডলারের দাম তিনশো আট ইয়েন ধার্য করেছে। তাহলে ভারতীয় টাকার দামে জাপানী রপ্তানী লৌহ আকরের দাম ডলারের হিসাবে কত কোটি টাকা কম পাওয়া যাবে হিসেব করে দেখুন।

ওই হিসেব জানেন বলেই চ্যবন সায়েব আম্বাস দিয়েছেন যে রপ্তানীকারকদের ক্ষতি কেন্দ্রীয় অর্থ-ভান্ডার থেকে পদিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ভারতের করদাতাদের ঘাড় ভেঙ্গে কেটী কোটী টাকা রপ্তানীকারকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কোন কোন দেশের রাজ-নৈতিক চাপের কছে চ্যবন সাহেবরা মাথা নত করেছেন তা কি বেশীদিন লুকানো সম্ভব হবে?

ইতিহাস

প্রজ্ঞোৎসব রায়চৌধুরী
কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে
লেখা মঞ্চ-সফল একধাণি নাটক
দাম তিন টাকা মাত্র
ম্যাডিক্যাল বুক শ্রাব, কালকাতা-১২
ও অত্রান্ত সস্ত্র স্ত্র পুস্তকালয়ে
পাওয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পাক্ষিক সংস্কৃতি পত্র

“পূর্বতরঙ্গ”

শ্রীভূতন (মূল্য ৩০ পয়সা)

প্রতি মাসের ৫ এবং ২০ তারিখে প্রকাশিত হয়

পাক্ষিক “পূর্বতরঙ্গ” সমস্ত পত্র পত্রিকার সঙ্গে পাওয়া যায়
উৎসবোগে পেতে হলে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

পিপলস বুক এজেন্সি; ৮০ সি, নেতাজী রোড

পোঃ খাগড়া ৥ মুর্শিদাবাদ জেলা ৥

৥ চাঁদার হার ৥

এক বছরের জন্য : নয় টাকা, ছয় মাসের জন্য : পাঁচ টাকা

এম এল দলের রাজনীতি প্রসঙ্গে (৪)

শ্রীশঙ্কর দেবরায়

সি পি আই (এম-এল)-এর জেল সংক্রান্ত নীতিও প্রাস্ত। রাজনৈতিক কর্মীরা চিরকাল শত্রুর কাছ থেকে রাজনৈতিক মর্যাদা দাবী করবেই। এই রাজনৈতিক মর্যাদা হানি করাই তো শত্রুর লক্ষ্য, কারণ তা হলেই তো সে জনসাধারণের কাছে একজন রাজনৈতিক কর্মীকে সম্মান চোর, ডাকাত, খন্দী ইত্যাদি বলে চালিয়ে দিয়ে যত্নহীন অত্যাচারের নৈতিক অধিকার পেয়ে যাবে। সতরাং পার্টির কর্মীদের, তারা শহর থেকেই আসুন, আর গ্রাম থেকেই আসুন, তারা আশ্রয় ট্রায়ালাই হোন, সাজা-প্রাপ্তই হোন অথবা নজরবন্দীই হোন, জেলখানায় বন্দী হিসাবে প্রথম দাবীটাই হবে যে কতৃপক্ষকে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা স্বীকার করে নিতেই হবে। “হায়ার” বা “লোয়ার” ক্লাসিফিকেশনের (শ্রেণী বিভাগের) প্রশ্ন নয়, একমাত্র রাজনৈতিক মর্যাদা আর সেই সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার, যথা :— স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদ, মান-পায়খানার ভাল বন্দী-বস্ত, রাজনৈতিক ও অন্যান্য পরাশ্রম চালায়ে স্বাভাবিক অধিকার, খেলাধুলার সুবন্দোবস্ত, রোগের সুচিকিৎসা—এইসব দাবীর জন্য সংগ্রাম চালাতেই হবে। সংগ্রাম কিভাবে চলবে—সহিংস উপায়ে না অহিংস অর্থাৎ অনশনের মাধ্যমে? জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে নিরস্ত্র অবস্থায় সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল করা যায় না, তাই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অনশনের মাধ্যমেই করতে হবে। এই “অনশন” কথাটা শুনলেই এম এল পার্টির নেতা ও কর্মীদের মাথায় অতি বাম চিন্তার পোকাকালি যেন কিসকিল করে ওঠে। মনে হয় এ গান্ধীবাদ, অতএব নৈব নৈব চ। এইসব ভ্রমমহোদয়গণের অবগতির জন্য জানিয়ে দিতে চাই যে কোরিয়া যুদ্ধের সময় যে সকল চীনা স্বেচ্ছাসেবী বন্দী হয়েছিলেন, তারাও দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ও দাবী আদায়ের জন্য অনশন করেছিলেন বলে নিজের কাছে। এ ছাড়াও মনে রাখতে হবে অনশনের একটি নৈতিক প্রভাব আছে যা অনস্বীকার্য—পৃথিবীর সবকটা মানবই তো আর বিবেকটাকে বাঁধা দেয়নি, তাই রাজনৈতিক কর্মীরা রাজনৈতিক মর্যাদা ও মানবের মত ব্যবহার পাওয়ার জন্য অনশন করছে জানলে জুলুমবাজদের “হ্যা-হ্যা” করে। আবার কিন্তু এমন চিন্তাও অনেকের আছে যে, বাকি ভাল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হলে রাজনৈতিক কর্মীরা রাজনীতি ছেড়ে দেবে। আরে মশাই, বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের, যারা আশ্রয়

দিতে সदा প্রস্তুত, তাদের অত সহজে কেনা যায় না; আর যারা সত্যি অত ঠান্ডা, তারা তো বিপ্লবীই নয়—সেটা যেন বন্দী-শালাতেই যচাই হয়ে যায়, তা হলে বাইরের বাহ্যিক অনেক কমে যাবে। আরও একটা চিন্তা আছে : “ভাল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হলে তো আর কেউ পালিয়ে আসতে চাইবে না”। ওঃ, জেলখানা বা বন্দী অবস্থা থেকে বিপ্লবীরা তা হলে পালিয়ে আসে বাইরে ভাল খেতে পাবে বলে, কি বলেন? বিপ্লবীদের সম্বন্ধে এইসব নীচ চিন্তাকারীদের শত্রু একটা কথাই বলা চলে যে এরা “কমরেড” বলে সম্বোধিত হবার যোগ্য নয়। আর হাজার হাজার বন্দীর মধ্যে কতজন পালিয়ে আসতে পারে মশাই, যদি একদিন জনসাধারণই জেলের দরজা ভেঙে তাদের মুক্ত করে না আনে। কিন্তু ততদিন প্রিয় কমরেডদের নিশ্চয়ই তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে দিতে পারা যায় না। তার থেকেও বরং অনশন করে যদি তারা সত্যি করেন তবে সারা দুনিয়ার ঘৃণা শত্রুর উপর বর্ষিত হবে আর মর্যাদার লড়াইয়ের সেই শহীদরা ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে থাকবেন।

সি পি আই (এম-এল) নেতাদের অস্ত্র সম্বন্ধে ধারণাও ভুলের উদ্দেশ্য নয়। “ভাল ভাল মারণাস্ত্রের অপেক্ষায় না থেকে হাতের সামনে যা পাও তাই দিয়েই শত্রু করো”—এ নির্দেশ খুবই সঠিক। “শত্রুর হাত থেকে বন্দক ছিনিয়ে নাও”—এও সঠিক। কিন্তু এতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যতটা দরকার সকল সময়, বিশেষ করে প্রথম দিকে কি ততটা পাওয়া যায়? বন্দক পাওয়া যায় তো গুলি ফুরিয়ে যায়—বন্দক রাইফেল ব্যবহার হবে কি করে? ওদিকে শত্রুর উন্নত অস্ত্রের সামনে দাঁড়ানোই যাচ্ছে না। সাধারণ পুলিশ সপরিবারে জনসাধারণের মধ্যেই বাস করে, তাই তাদের অচমকা আক্রমণ করে খতম করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু সি আর পি ও মিলিটারীর ক্ষেত্রে? তারা থাকে ব্যারাকে আর নয় তো শিবিরে, আর যখন বের হয়, তখন থাকে দলে দলে এবং সশস্ত্র। তাদের মোকাবিলা করতে হলে বিপ্লবীদেরও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে—যথেষ্ট বুলেট চাই, শক্তিশালী গ্রেনেড চাই। তাই শত্রুমাত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ভরসা না থেকে এগরলি বাইরে থেকে আমদানীও করতে হবে, তৈরিও করতে হবে। ভিয়েতনামের কথাই ভাবুন, সেখানে কি এই দুই প্রক্রিয়াই চলছে না? চীনই হোক, আর ভিয়েতনামই হোক, যারাই লড়াই চালিয়েছে, তাদেরকে বিশেষ করে “মানুষ্যাকচারণ” বা উৎপাদনের এই দিকটাকেও অবশ্যই নজর দিতে হয়েছে। সি পি আই (এম এল)-

কেও দিতে হবে। এটা কোন ইউনিট বা স্কোয়াডের ব্যাপার নয়—এটার দায়িত্ব প্রধানতঃ কেন্দ্রকেই নিতে হবে। এতদিন এ দায়িত্ব কেন্দ্র এড়িয়ে গেছে, কিন্তু শত্রুর মারের মধ্যে তাই আজ তলার কর্মীদের প্রচণ্ড বিপর্যয়। “লড়াই যেমন যেমন উচ্চস্তরে উঠবে, তার সঙ্গে ভাল রেখে অস্ত্রশস্ত্রের মান বাড়তে হবে। ফায়ার পাওয়ার কমাটা কেন্দ্র ভুলে বসে আছে। তাই শত্রু তার “ফায়ার পাওয়ার” অনেক বাড়িয়ে ফেলা সঙ্গেও পার্টির কর্মীরা সেই শত্রুর সাবক অবস্থাতেই রয়ে বেছে, এমনকি গুলির অভাবে ছিনিয়ে নেওয়া রাইফেল বন্দকগুলোও অচল, অথচ কেন্দ্র নির্বিকার। তলার কর্মীরা যখন পেরে ওঠে না তখন যে পার্টি-কেন্দ্র থেকে তাদের উপযুক্ত সাহায্য দিয়ে তাদের অভাবটা পূরণ করতে হয়—এ চিন্তার ধার কাছ দিয়ে পার্টি-কেন্দ্র যাচ্ছে না।

জনশুদ্ধের লড়াইয়ে আরও একটা জিনিষ আছে। মাও সে তুং-এর শিক্ষানবায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলার সময় শত্রুকে পুরাপুরি খতম করতে হয়, অল্পস্বল্প ঘায়েল করে কখনই ছেড়ে দিতে নেই আর সেইজন্য দরকার concentration of forces অর্থাৎ শক্তির সমাবেশ ঘটানো যাতে ঠিক মোকাবিলার মনুতে নিজের সৈন্য সংখ্যা যেন শত্রুর সৈন্য সংখ্যা থেকে দগুণ, চারগুণ, এমনকি দশগুণ করেই মাও সে তুং বলেছেন যাতে শত্রুর সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন সুনিশ্চিত হয়। এর জন্য যে জিনিষটা অবশ্যই চাই তা হচ্ছে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য ছোট ছোট ট্রান্সমিটার সেট, যাকে বলা হয় “ওয়াক টক”। এ সব যন্ত্রও পার্টিকে সংগ্রহ ও তৈরি করার কেন্দ্রগতভাবে চেষ্টা চালাতে হবে।

লড়াই এখন যে পর্যায়ে এসেছে তাতে সাবকী চিন্তা দিয়ে আর চলাবে না। গেরিলা লড়াই চালাতে হলেও চাই আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি এবং শত্রু যেভাবে তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে তাতে লড়াই এখন প্রায় Mobile Warfare বা চলমান যুদ্ধের স্তরে এসে গেছে। পার্টি নেতাদের মধ্যে এই উপলব্ধি না আসার জন্যই গ্রীকাকুলামে পার্টি পরাজিত হয়েছে এবং কমরেডরা আর সেখানে লড়াই চালিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছেন না। এর জন্য গ্রীকাকুলামের কমরেডরা দায়ী নন, দায়ী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যারা লড়াইয়ে অনেক উচ্চস্তরে ওঠা সঙ্গেও উচ্চমানের সমরাস্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। “শত্রুক ছোট ছোট যুদ্ধে পরাস্ত করে তার সমস্ত অস্ত্র কেড়ে নিয়ে নিজেদের

চাহিদা মেটানো”—জনশুদ্ধের এই যে স্তর, সেই স্তরের উপযুক্ত হতে হলে প্রথম দিকটায় নিজেদের শক্তি বাড়াবার জন্য পার্টিকে কিছুটা সংগ্রহ ও উৎপাদনের উপর নির্ভর করতেই হবে যাতে ঠিক মোকাবিলার মনুতে শত্রুর তুলনায় কয়েকগুণ বেশী ফায়ার পাওয়ার সমাবেশ করা যায়। লড়াইয়ের এই ক্রিটিকাল স্তরটা পার করতে হলে কি গ্রীকাকুলাম, কি পশ্চিমবঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই পার্টি কেন্দ্রকে অস্ত্র ও যন্ত্রপাতির অভাবটা “যোগান” দিয়ে পূরণ করতেই হবে। তার জন্য বাইরে থেকে সংগ্রহ, উৎপাদন ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে আরও যেটা দরকার তা হচ্ছে এখনই যোগদলি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে—সেগরলি পার্টি-কেন্দ্রের দখলে আনা ও উপযুক্ত রণশলগুণিতে পেঁছে দেওয়া। এইসব কৌশলগত কাজগুলি কি পার্টি কেন্দ্র করছে? তা হলে বীরভূমের লড়াইও মার খেয়ে যাচ্ছে কেন?

গ্রীকাকুলামের পরাজয়ের অবশ্য আরও কারণ আছে। যেমন সেখানেও লড়াই শত্রু করার আগে “ক্ষমতা দখলের যন্ত্র” হিসাবে স্বৈত শাসনের সংগঠনগুলি গড়ে তোলার দিকে ব্যাপকভাবে নজর দেওয়া হয়নি, তাই মাস বেসটাই তৈরী হয়নি। শত্রু স্কোয়াড গড়েই লড়াই চালু করে দেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণ লোকেরা বঝতেই পারেনি যে জোতদার, জমিদার, মহাজনরা তো খতম হচ্ছে, কিন্তু তাদের করুনীয়টা কি, স্বৈতশাসন কি জিনিষ কিভাবেই বা তা গ্রামে গ্রামে তারা চালু করবে। এটা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচারের অভাব সূচিত করে। পরে এক সময় “বিপ্লবী কমিটি” তৈরি করার ঘোষণা পার্টি কেন্দ্র থেকে গিয়েছিল বটে, কিন্তু হায়, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে এবং শত্রু তখন অনেক শক্তি সমাবেশ করে ফেলেছে। তাই ব্যাপক জনগণকে আর সংগ্রামে নামানো সম্ভব হলো না। তাই নতুন সমাজশিশু আর ভূমিষ্ঠ হলো না, পার্টির ভুলের জন্য সেখানে যা হোল তা গভপাত।

আর এক চিন্তা ছিল এইরকম যে বাকি গ্রীকাকুলাম একাই লড়াই করে বাঁচতে পারে। তাই গ্রীকাকুলাম নিজে চেষ্টা করে আশপাশে যতটা পেরেছে বেড়েছে, কিন্তু সক্রিয় চেষ্টায় ও সর্বকোশলে সে সংগ্রামকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা পার্টি করতে পারেনি। বিপরীতক্রমে বরং দেখা যায় যে নাগি রেভিদের সঙ্গে সামান্য মতপার্থক্যকেই বড় করে দেখে এবং নিজেরও তাদের পাষ্ট্রয়েতের (সোভিয়েটের অনুরূপ) সঠিক স্লোগানকে ভুল মনে করে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে পার্টি “সেকটোরিয়ান” বা সেক্টর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে। এর ফলে যেখানে অস্ত্রের অনেকগুলি জেলতেই ক্ষমতা দখলের লড়াই সরু করে লড়াইয়ের বিস্তৃতি ঘটানো যেতে পারতো, সেখানে যন্ত্র প্রবৃত্ত হয়ে তা আর পারা গেল

না। অথচ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে নাগি রেভিদের দলও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সশস্ত্র লড়াইয়ের। একটা নমনীয়তা যেখানে, সংগ্রামকে ব্যাপক করে তুলতে পারতো সেখানে “পার্টি-বাজির বোঁক” এবং “নেতৃত্বের মোহ” জনগণের সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, শত্রুর সুবিধা করে দিচ্ছে। অনেক অনেক দেরী হয়ে গেছে, তবুও তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার সে চেষ্টা আবার নতুন করে কিন্তু এখনই সরু করতে হবে। সংগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থে যদি কিছু জাগ স্বীকার করতেও হয় তো তাও করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা দরকার। চারদিকের রাতরাতি একটা ফতোয়া জারি করে “ভারত বর্ষে গণবাহিনী গড়ে উঠলো আ, একসন্ স্কোয়াডগুলো তার অন্তর্ভুক্ত হলো” বলে যে ঘোষণা করলেন, গণবাহিনী কোথাও ঐভাবে গড়ে ওঠে না। গণবাহিনী বা যে কোন “বাহিনী” গড়তে হলে বোদ্ধাদের একটা বা কয়েকটা জ্ঞান-গায় এনে জমা করতে হয় এবং তারা সব সময় থাকবে অধিনায়ক বা অধিনায়কদের হাতের সামনে combat ready বা “রণং দেহি” অবস্থায়। মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চিংকং পাহাড়ের ঘাঁটিতে যে লাল ফোঁজ গড়ে উঠেছিল, স্মরণ করুন তার কথা। আসলে গণবাহিনী বা লালফোঁজ গড়তে হলে আগে চাই ঘাঁটি এলাকা (বেস এরিয়া) যেটা সর্বপ্রথম ধুঁজে নিতে হবে অথবা ধৈর্যের সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে। আর তা না করে “স্কোয়াডগুলো সব গণবাহিনী হয়ে গেল” বটে প্রচার করলে রাজনীতিগতভাবে কম সচেতন তরুণ কর্মীদের হয়তো খানিকটা ফিলিপ বা সাময়িক উৎসাহ দেওয়া যায় কিন্তু শত্রুর মারের মধ্যে বিভ্রম এলাকার ছড়ানো ছোট ছোট স্কোয়াডগুলো আর টিকতেই পারে না, একটা হাস্যাস্পদ অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা, আপনাকেই দেখতে পাচ্ছেন, আজ হয়েছে। এই কি গণবাহিনীর লড়াইয়ের কায়দা? সস্তার চীনা পার্টির কাছ থেকে নাম কেনা ছাড়া এর কি আর (শেবাংশ নবম পৃষ্ঠার)

দর্পণ

সংবাদ-সাহিত্যিক

চাঁদার হার

বার্ষিক পনেরো টাকা

ত্রৈমাসিক চার টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠান

ঠিকানা :

৩১, মট লেন, কলি-১০

সিটু-বিরোধী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির মৃত্যু আসন্ন

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সিটু-বিরোধী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাসমূহের মোর্চা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটিতে ভাঙ্গন শব্দ হুয়েছে। বি পি টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী), হিন্দ মজদুর সভা, হিন্দ মজদুর পঞ্চায়ত এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে নিয়ে এই মোর্চা গঠিত হয়েছে। আই এন টি ইউ সি সরকারী ভাবে মোর্চার অংশীদার না হলেও তারা ছিল এই মোর্চার স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য। সিটুকে এক ঘরে করে রাখা এবং বোঝার স্ট্রীটের ইউ টি ইউ সি-র উপর চাপ সৃষ্টি

করে দলে টানা অথবা তাদের সিটুর সঙ্গে মোর্চা গড়তে বাধ্য করা ছিল উক্ত মোর্চা গড়ার প্রধান উদ্যোগ। বি পি টি ইউ সি-র ইচ্ছা। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করে অন্যান্য দলকে কংগ্রেসের শিবিরে টেনে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই সি পি আই নিয়ন্ত্রিত বি পি টি ইউ সি এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য ও লড়াই একই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার যে নীতি সি পি আই গ্রহণ করেছে সেই নীতিই এই ট্রেড ইউনিয়ন মোর্চার প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার তুলনায় বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ আরও বেশী বিপজ্জনক বলে এস ইউ সি যে সি পি এম বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে তারই পরিণতিতে এস ইউ সি নিয়ন্ত্রিত লেনিন সরণীর ইউ টি ইউ সি উক্ত মোর্চার বিশেষ অংশ গ্রহণ করে।

কিন্তু আই এন টি ইউ সি-র সাম্প্রতিক নীতি ও নেতৃত্ব পরিবর্তন সি পি আই-র অভিপ্রায় হলেও এস ইউ সি-র পক্ষে আই এন টি ইউ সি-র সঙ্গে একই মোর্চার থাকা অসম্ভবজনক হয়ে পড়ায় এই মোর্চার ভাঙ্গন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বর্তমানে মালিকশ্রেণী এবং সরকার ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর যে ভাবে আঘাত হেনে চলেছে তাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতি অনুসরণকারী এস ইউ সি ও ফরোয়ার্ড ব্লক নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাসমূহের পক্ষে আই এন টি ইউ সি এবং বি পি টি ইউ সি-র সঙ্গে একই তালে পা ফেলে চলা মর্দক্ষল।

তাই সিটু-বিরোধী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির নীরবে মৃত্যুর দিন আসন্ন। উক্ত মোর্চা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সম্মেলন করে আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন বলে ইতোপূর্বে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন এখন আর সে সম্পর্কে কেউ উচ্চবাচ্য করছেন না। বরং দেখা গেলে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর আই এন টি ইউ সি এবং বি পি টি ইউ সি যত্নভাবে একটি কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় এস ইউ সি আর ফরোয়ার্ড ব্লক নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সামিল করার জন্য বি পি টি ইউ সি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যর্থতার পর্ববাসিত হোল।

সম্প্রতি এস ইউ সি নিয়ন্ত্রিত ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ পরিষদের বৈঠকের যে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে তা থেকেই বোঝা যায় যে উক্ত সংস্থা আর বি পি টি ইউ সি ও আই এন টি ইউ সি-র সঙ্গে গাট-ছড়া বেঁধে চলতে পারবেন না। ঐ সিদ্ধান্ত ট্রেড ইউনিয়ন একা গড়ার উপর আবার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু একা গড়ার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে ঐ সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে মালিক ও সরকারের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই এই একা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে বি পি টি ইউ সি এবং আই

এন টি ইউ সি কিছুতেই একমত হতে পারবে না।

নির্বাচন আসন্ন হয়ে পড়ায় মত পার্থক্য আরো প্রকট। আই এন টি ইউ সি-র সাম্প্রতিক নীতি অনুসারে আই এন টি ইউ সি শাসক কংগ্রেসের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অনুসরণ করতে বাধ্য। অর্থাৎ আই এন টি ইউ সি সরাসরি কংগ্রেসকে সমর্থন করবেই। সি পি আই ও তাদের নির্বাচনী নীতি ঘোষণা করেছে। তদনুসারে বি পি টি ইউ সিও কংগ্রেস-সি পি আই মোর্চাকে সমর্থন না করে পারবেন না। অন্যদিকে এস ইউ সি-র পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চা করা তো দূরের কথা, তারা মনে করে নির্বাচন অনুষ্ঠান তো দূরের কথা যেভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর কংগ্রেস ও সরকারের হামলা চলেছে তাতে নিরপেক্ষ নির্বাচনই সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। এ ব্যাপারে ফরো-

য়ার্ড ব্লক বিধা বিভক্ত। জান্না-মাসের প্রথম সপ্তাহেই ফরোয়ার্ড ব্লকের নির্বাচনী নীতি স্থির হবে। দল হিসাবে ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভাবনাই বেশী। স্বভাবতই তাদে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার পক্ষে তখন কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চার আবশ্য থাকা সম্ভব হবে না।

এ থেকে অবশ্য এখনই বলা না যে লেনিন সরণীর ইউ টি ইউ সি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের ইউনিয়ন সংস্থা সিটুর সঙ্গে গড়বেন তবে একথা এখনই বলা যে লেনিন সরণীর ইউ টি ইউ সি-কে শিখড়ী দাঁড় করিয়ে বি পি টি ইউ সি সিটু-বিরোধী বি পি টি ইউ সি-র সঙ্গে যুক্তভাবে ট্রেড ইউনিয়ন মোর্চার আয়োজন করেছিলেন তার আশঙ্ক্য এসেছে।

যোগ্যতা না থাকলেও সি এম পি ওর চাক ইঞ্জিনিয়ার করতে হবে

আধামন্ত্রী-দেবী প্রসাদের দাবী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত বোলই ডিসেম্বর কলকাতায় সি এম পি ও অফিসে জোর তৎপরতা। কেন্দ্রীয় আধামন্ত্রী ডি পি চট্টোপাধ্যায় সাহেব ডি ও লেটার পাঠিয়েছেন। বক্তব্য, একজন প্রিয়জনকে প্রমোশন দেয়া হচ্ছে না কেন? প্রিয়বরটি একজন ইঞ্জিনিয়ার, বাড়ীঘর তৈরীর ইঞ্জিনিয়ার। ডি পি বলতে চান যে গুপ্ত স্বল্পায়ু মন্ত্রিসভাকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপর একজন নব্বু কংগ্রেস আধামন্ত্রী উপরোক্ত প্রিয়জনের ফাইলে নাকি লিখে রেখে গিয়েছিলেন যে “না থাকুক এঁর কোয়ালিফিকেশন, হোলই বা বয়স গাইরিশ কি আর্টগিরা, তবুও সব নয়ম কানুনকে হত্যা করেও এঁকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার করা হোক। গোটা সি এম পি ওর চিফ ইঞ্জিনিয়ার”। এবং এটা না করে সি এম পি ও না কি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে স্বতীয়বার এক্সটেনশন দিয়েছে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পোস্টে। ভদ্রলোক কবলমাত্র বৃদ্ধই নন কাজকর্মও “বিলো ম্যাসডাউ”।

ডি পির চিঠি পেয়ে সি এম পি ওর কেরাণীকুল তৎপর হোল। দশা গেল এর আগের গড়ণর গাবান সাহেবই নাকি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রমোশন অর্ডার ফাইলে সই করে রেখে গেছেন। আর পূর্ব-ণিত প্রিয়বরের ব্যাপার? তিনি তা বাড়ীঘর তৈরীর ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে যেটি

পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সংরক্ষিত সেখানে এই ভদ্রলোককে বসানো যায় কি করে? তাছাড়া মন্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে দহরম মহরম করছেন এই ভদ্রলোক, তাতেও ক্ষম্ব হয়েছে সি এম পি ও, প্রয়োজন হলে ডিসি প্লিনারী অ্যাকসন নেবে এই ভদ্রলোকের ওপর (এমন ব্লকের জোর থাকলে তো বেঁচে যেতো দেশটা)।

এই উত্তর ডি পির পছন্দ হবে না নিশ্চয়ই। এরপর আরও লবিং হবে। শেষমেষ ডায়াল সাহেবকে ইনক্লুয়েন্স করার চেষ্টা হবে। একেই বলে তদবির। আর এই তদবিরের জন্যেই তো কংগ্রেস এতো বিখ্যাত।

দর্পণ ভবিষ্যৎবাণী করছে, দেখবেন, যেন তেন প্রকারেই এই বাড়ী তৈরীর ইঞ্জিনিয়ারকে সি এম পি ওর চিফ ইঞ্জিনিয়ার করবেই কংগ্রেস। আর বর্তমানের বড়ো চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে সি এম ডি এ, সি এম ডবলিউ এস এ মার্কা কোনও বড়োদের খোঁরাড়ে ঠেলে দেবে।

যদি কংগ্রেসের কমরী দালালী করছে মন্ত্রী মশাইয়ের কাছে এই বাড়ী তৈরীর ইঞ্জিনিয়ারকে চিফ করে দেবার জন্য। বকশিস বা মিলবে তার খানিকটা অন্তত হবে কংগ্রেস গহবরে, এটাই তো কংগ্রেসের লাভ, তার যে মূল্যই হোক না কেন?

কাদাপাড়া অঞ্চলে বিটি ইউনিয়নে গুণ্ডাদের হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত একুশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কাদাপাড়া অঞ্চলের কুখ্যাত গন্ডা মোহিতের নেতৃত্বে কতিপয় দক্ষত-কারী মারাত্মক অশ্রমশ্রমসহ শূড়া জুটমিল মজদুর ইউনিয়নের অফিসে হামলা করে। তারা প্রথমে ইউনিয়নের নেতৃত্বদলকে খোঁজ করে, পরে লাল পতাকা নামিয়ে পড়িয়ে ফেলে ও ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী ও কারখানার শ্রমিক জমাদার মাহাতাকে মারতে লাগল। এই খবর মদহুতের মধ্যে কারখানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকরা উক্ত গন্ডাদের তাড়া করে, ফলে তারা মাহাতাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে খানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে।

এই ঘটনার কিছু পরেই উক্ত গন্ডারা বেগল চটকল মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ও শূড়া জুট মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক সুনীল নাগের বাড়ীতে গিয়ে প্রথমে নিজেদের ইউনিয়নের কর্মী বলে পরিচয় দেয় ও তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। শ্রীনাগ এলে উক্ত গন্ডারা রিভলবার দেখিয়ে পাঁচশ টাকা দাবী করে। শ্রীনাগ তা দিতে অস্বীকার করলে তারা বোমা ছোঁড়ে ও তার স্ত্রীর গা থেকে বলপূর্বক গয়না খুলে নেয়। গন্ডারা চলে যাবার সময় শ্রীনাগকে শাসায় যে শূড়া মজদুর ইউনিয়নের অফিসে গেলে তাঁকে শেষ করে দেওয়া হবে। শ্রীনাগের বাড়ীতে হামলার খবরও কিছুক্ষণের মধ্যেই

কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে এপোঁছোলে তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি পক্ষ থেকে প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় পলিশের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেন এবং তার হস্তক্ষেপ দাবী করেন। ঘটনার দুই ঘণ্টা পরে পলিশ শ্রীনাগের বাড়ীতে যায় এবং অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে। প্রচণ্ড বিক্ষোভের সামনে পলিশ কয়েকজন দক্ষতকারীকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়।

শূড়া চটকলে লাল ইউনিয়ন হবার পর থেকেই শ্রমিকদের মনোবল ভাঙ্গবার বিবিধভাবে হামলা চালাচ্ছে। জোতনারায়ণ সিংকে ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের ছাটাই, গন্ডাদের হামলার ঘটনায়ও ইউনিয়নকে ভাঙা যায়। শ্রমিকদের মনোবলই আজ দুই শিখড়ী দিয়ে শ্রমিকদের পাখ্যায় ও রাখেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কয়েকমাস যাবৎ এতদঞ্চলের বিবিধ কারখানায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বেগল কেমিকালে নব কংগ্রেস গন্ডারা শ্রমিকদের ভয় দেখাতে মারখোর করছে এবং ইউনিয়নের পোস্টার ছিঁড়ে, দেওয়ালের লেখা মছে দিয়ে কংগ্রেসের শ্লোগান লিখছে। পলিশকে জানানো সত্ত্বেও গন্ডাদের তাড়বলীলা বেড়েই চলেছে।

সম্পাদক-হীরেন বসু

সম্পাদক কতক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সর্বোদয় মল্লিক স্কয়ার কলিকাতা-১০ থেকে মুদ্রিত এবং ৩১নং মট লেন, কলিকাতা-১০ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

বিশেষ দর্পণ

আন্তর্জাতিকতাবাদের অপমৃত্যু

(দর্পণের পর্ষদে)

উত্তর ভিয়েতনামে আবার মার্কিনী বোমাবর্ষণ শুরু হয়েছে। কয়েকশত মার্কিনী বোমারু বিমান বিগত কয়েকদিন ধরে উত্তর ভিয়েতনামের প্রদেশে তাদের তান্ডবলীলা শুরু করেছে। সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে যে মার্কিনীরা এমন ধরনের বোমা ব্যবহার করছে যার পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে রোখা সম্ভব নয়।

মার্কিনীরা এই বোমা বর্ষণের মূল কারণ দেখায় নি। অথবা যেতে পারে যে তারা যেসব দেখিয়েছে তার কোনটাই সত্য নয়। নিকসনের মতে বোমাবর্ষণের অন্যতম কারণ উত্তর ভিয়েতনামের একটি মার্কিনী বিমানের ধ্বংস। আনুমানিক

তার বিমান ওই দেশের আকাশ-পথে কী অধিকারে বিচরণ করছিল এই প্রশ্ন নিকসন সাহেবকে করা বৃথা কারণ উনিশশো আটশটি সালের পর থেকেই মার্কিনীরা গায়ের জোরে ওই কর্ম করে আসছে।

এই বোমাবর্ষণের কারণ মনে হয় অন্য। এর সঙ্গে যোগাযোগ আছে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবাহরী পাঠানোজনিত অস্বস্তিকর অবস্থার। সপ্তম নৌবাহরের ব্যাপারটি ওই ভাবে ফেসে যাবে তা নিকসন ভাবতে পারেন নি। বিশেষ করে সৌভিয়েতের হাতে অপদস্ত হওয়াটা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন নি। তাই উত্তর ভিয়েতনামে এই বোমাবর্ষণ মনে হয় আসলে সৌভিয়েত ইউনিয়নকে একটি চ্যালেঞ্জ—“এই ত মারাত্মক

দেখি তুমি কী করতে পার।”

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সৌভিয়েত কী এই ব্যাপারে কিছ্ করবে? যখন এই লেখা লিখছি (আঠাশে ডিসেম্বর) তখন অবধি মস্কো এই নতুন বোমাবর্ষণের ব্যাপারে কিছ্ মন্তব্য করে নি। এবং অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় না যে সৌভিয়েত একটি মৃদু প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কিছ্ করবে। এবং তাতে ওয়াশিংটন বিমুগ্ধ হয়ে বিচলিত হবে না। প্রসঙ্গত যারা মনে করেন যে ভিয়েতনামে সৌভিয়েতের কোন প্রত্যক্ষ উপস্থিতির ফলে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে তাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে বঙ্গোপসাগর কোন মহাযুদ্ধের সূচনা করে নি। করে নি যে তার প্রধান কারণ হল যে দুটি দেশই নিজ নিজ স্বার্থে এই ধরনের যুদ্ধ এড়াতে চায়।

মার্কিনীরা আরও একটি ব্যাপার জানে। সেটি হল ভিয়েতনামের ব্যাপারে সৌভিয়েতের সেই আগ্রহ নেই, যা আছে ভারতবর্ষ অথবা বাংলাদেশের ব্যাপারে। মস্কো এই দুইটি দেশে যে কোন ধরনের সহায় দানে প্রস্তুত কারণ সে জানে এর ফলে এদেরকে সে নিজ তাঁবে আনতে পারবে। এবং বর্তমানে এই উপমহাদেশে চলে ভুল করে ওয়াশিংটন তাকে সেই কাজে সাহায্য করেছে। কিন্তু ভিয়েতনামের ব্যাপার অন্য। মস্কো পরিষ্কার জানে যে উত্তর ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক দর্শনময় নিজের সার্বভৌমত্ব কখনই খোঁরাতে রাজী হবে না। তাছাড়া যেখানে তার প্রধান শত্রু আমেরিকা তাকে প্রতি-নিয়ত আঘাত হানছে, সেখানে তার সৌভিয়েত-চীনের নিজ নিজ স্বার্থ জনিত কলহে নিজেকে জড়াবার সময় নেই। হ্যান্স মস্কো, পিকিং

না হয়ে। হ্যান্সের গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার সবথেকে বড় প্রমাণ যে সেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ যে বাংলা-দেশের সংগ্রামকে মর্মে সংগ্রাম বলে স্বীকার করে যখন মস্কো, পিকিং ও তাদের তাঁবেদাররা সকলেই চপ করে ছিল।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার পর অবশ্য পিকিং সম্পর্কে নতুন করে বলার আর কিছ্ নেই। আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে অবিরত উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণের পরও পিকিং রেডিওতে একমাত্র চেয়ারম্যানের গুণগণন ছাড়া আর কিছ্ই শোনা গেল না। অবশ্য সংবাদে একবার ভিয়েতনামের গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকার এই বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার উল্লেখ করা হয়। জানি না, হয়ত চীনের নতুন নীতি অনুযায়ী এইটিও হ্যান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

তবে একটা কথা আবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। যেখানে নিজ স্বার্থ সিজির কোন উপায় নেই সেইখানে দুই সমাজতান্ত্রিক সিংহের কেউই হস্তক্ষেপে উৎসাহিত নয়। আন্তর্জাতিকতাবাদ আজ শূন্যমাত্র একটি শব্দ যার বাস্তবে কোন প্রকাশ নেই। এবং এর জন্য মস্কো, পিকিং উভয়েই সমানভাবে দায়ী। উত্তর ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা আরেকবার প্রমাণ করল যে এই দুই দেশের সাহায্যের আশা ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতের বিপ্লবীদের প্রস্তুত হতে হবে শূন্যমাত্র নিজেদের শক্তির উপর। আজ পিকিং যেভাবে পাকিস্তানকে মদত জোগাচ্ছে ঠিক সেইভাবেই মস্কো ভারতে কোন বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করবে। এবং ইতিমধ্যে যদি দিল্লী পিকিংয়ের সঙ্গে কোনরকম আঁতাত করতে পারে তবে চীনেরও আচরণ হবে অনুরূপ।

মতামত

(মত পূর্তার পর)

আমার ঘরের জিনিস ও বইপত্র আরো প্রচণ্ড ক্ষতি যে এ হামলাকারীরা করতো তাতে কোনই সন্দেহ নেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে এই হামলাবাজী চলা সত্ত্বেও পলিশ কোনে হস্তক্ষেপ করে নি এবং দৃষ্টান্ত কারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কাঁপতঃ এ ধরনের হামলাবাজীকেই প্রশংসা দিচ্ছে।

এরকম একটি জংলী পাঁচ স্থিতিই এই কংগ্রেসী পতাকা বাহীরা সৃষ্টি করতে চাইছে। বাংলাদেশের মনিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের সঙ্গে এই দল বৃষ্টির সম্পর্ক ও সংগতি কোথায়। আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তিহানি বা ক্ষতি ক্ষতির প্রশ্ন এটা নয়; প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে গণতন্ত্রের শেষ অবশেষটুকু বজায় থাকবে কি ন প্রশ্নটা হচ্ছে সেটাই। শাসক কংগ্রেস কি এ ধরনের রাজস্বই চালাতে চা এবং পলিশ ও প্রশাসন যন্ত্র এত গের নিষ্ক্রিয় নীরবতার মাধ্যমেই নিরপেক্ষতা জাহির করবেন?

বিজনবিহারী পদরক্ষা

(অধ্যাপক)

উত্তর কলকাতায়

হামলা সম্পর্কে প্রতিবাদ

আপনার চম্বিশে ডিসেম্বরে দর্পণে “উত্তর কলকাতার কিস্তি এলাকায় সি পি এমের বিরুদ্ধে পলিশ ও নব কংগ্রেসীদের বৌদ্ধ আক্রমণ” সংক্রান্ত সংবাদটি পড়ে বিস্মিত হয়েছি। এই সংবাদে অস্বাভাবিক যোগ করা হয়েছে পত্রিকা অফিসে আমার ঘরে বসে আক্রমণের খসড়া তৈরী হয়েছে, পত্রিকার গাড়ী ব্যবহার করা হয়েছে, পত্রিকার ক্যান্টিনে একশো লোকের খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মোট কথা, সংবাদে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, আক্রমণকারী কার্যকলাপের সঙ্গে আমি জড়িত দর্পণের আমি নিম্নমিত পাঠক আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। আমি কংগ্রেসের সেবক কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ প্রচা-রকারি। হিংসাত্মক রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। হিংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধেই কংগ্রেস আঁত-বান চালাচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, মানসিক দিক দিয়েও আমি কোন হিংসাত্মক কার্যকলাপের অনুরূপ। এই অবস্থায় উপরোক্ত সংবাদে। হিংসাত্মক ঘটনা বলীর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে নিশ্চয়ই আপনার সংবাদদাতা সত্যকে প্রকাশ করেন নি। সংবাদে কে একটা ব্যক্তিগত আক্রমণের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আমি আশা করি আপনার পত্রিকায় আমার কৃত্য প্রকাশ করবেন।

প্রফুল্লকান্তি ঘোষ
পত্রিকা হাউস

কৃষকের ধান কেটে নিচ্ছে

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

দিয়েছে। সেই বাধা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ধান কাটার সময় কৃষকরা জোতদারের পক্ষ থেকে আঘাত আসার আশংকা করে জেলা কৃষক-পক্ষের কাছে অর্থাৎ মহকুমা শাসককে ঘটনা সম্পর্কে জানায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহকুমা শাসক

ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি অথবা জোতদারের স্বার্থ সিজির জন্যে করেন নি।

গাঙ্গেয় এই এলাকায় গুলিতে পর পর বার তিনেক ঘণ্টা হওয়ায় ফলে এবার ফসল আশানু-রূপ হয় নি। এর মধ্যে সাগরস্বীপ কাকস্বীপ প্রভৃতি এলাকার কৃষক-দের অবস্থা অবর্ণনীয়। একে তো ঘণ্টা হওয়ায় তাদের বাৎসরিক দরদশাকে এক খাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে তারপর তথাকথিত শাসক কংগ্রেসের সমর্থক জোতদার ও বড় বড় জমির মালিক বলপূর্বক ধান কেটে নিয়ে গেছে। একশ চরায়ালি-ধারা জারী করে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষও এই কাজে পলিশকে সাহায্য করেছে।

অন্যদিকে মেদিনীপুর জেলার ইতিপূর্বে নন্দীগ্রামে একটি ঘটনা ঘটে। এছাড়া ঝাড়গ্রাম ঘাটাল, পটাশপুর, মহিষাদল, গিৎলা প্রভৃতি অঞ্চলে স্থানীয় পলিশ ভাগ চাষীদের ফসল পাকার পর জমির কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। চাষীরা এর প্রতিবাদ করলে পলিশ চাষীদের যে কোন ছুতো করে ধানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যদি কোন কৃষক-নেতা এর প্রতিবাদ করতে ধান তাকেও ধানায় আটক করা হচ্ছে বলে জানা গেল। রাজ্যপলিশের কর্তাদের জানান হলেও তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষিত চাষী ভাইরা আবার লড়াইয়ের সংকল্প করেছে। কৃষকের ধান লুণ্ঠ করার প্রতিবাদ জানিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় তাঁরা সংগঠিত হয়ে লড়াইয়ের জন্য, প্রতি-রোধের জন্য জোর কদমে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন।

এম এল দলের রাজনীতি

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

গানই লক্ষ্য আছে? গণবাহিনী লাল ফোঁজ গড়তে হলে আগে এলাকা চাই, যোদ্ধাদের সম-সংহত করতে হবে। কিন্তু লড়াই চাই। আর তা না হলে লড়াই থেকে যাবে, তার কোন পথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

কৌশলের দিক থেকে শহরে লড়াই একেবারে বন্ধ করে দিতে সশস্ত্র লড়াইয়ের শক্তিটাকে অক্ষত রাখতে হবে। কিন্তু “সিপিএম”-এ ভুল জনগণকে তৈরি করে নিয়ে লড়াইয়ে নামতে হবে। আর সেক্ষেত্রেও ভাবতে হবে নূন্যতম কতটা অঞ্চল জুড়ে সশস্ত্র লড়াই শুরু করলে সে লড়াইকে চালিয়ে যাওয়া ও টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে। নইলে দখলানা গ্রামে কাজ করাই সশস্ত্র লড়াইয়ে নেমে পড়লে “জড়পত্তার” ছাড়া আর কিছ্ই হবে না। তাই উপরোক্ত প্রস্তুতির অন্য অর্থাৎ লড়াইয়ে মাচা বেস না গণভিত্তিক গড়ে নেওয়ার জন্য যদি সশস্ত্র লড়াই কিছদিন বন্ধ রাখতে হয়, তাই তাই-ই করতে হবে। নইলে নিশ্চিত পরাজয় আর সব চরমার।

সিদ্ধার্থবাবু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ যাচ্ছেন?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শোনা গেল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বড় রকমের রদবদল আসন্ন হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে দু এক দফা আলোচনাও হয়ে গেছে। ভারত পাক যুদ্ধে সাফল্যের সুযোগ নিয়ে এখনই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী মন্ত্রিসভায় কয়েকটি পরিবর্তন করে নিতে চাইছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য, এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সিদ্ধার্থ বাবুর অবস্থা ক্রমশই প্রতিকূল হয়ে উঠছে। কারণ, এরই প্রশ্নে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের বেপারেরা হামলাবাজীতে ইন্দিরাজী রীতিমত উদ্ভিষ্ট। যদিও সিদ্ধার্থবাবু কেন্দ্রে ছাত্র পরি-ষদ ও যুব কংগ্রেসের কীর্তিকলাপ

ঢাকতে চাইছেন, তবুও এদুটি বাহিনীর কোন খবরই দিল্লীর অগো-চর নেই।

সাধারণ শ্রমজীবী মানবের উপর জঘন্যতম হামলার ঘটনাতে দিল্লীতে কংগ্রেসী মহল কংগ্রেসের ইমেজ বৃদ্ধিতে দুইয়ের কথা ক্রমশঃ তা বিলম্ব হবে বলে মনে করছেন।

তাই তাঁরা আসল খুঁটিতে আঘাত হানতে চাইছেন। পশ্চিম বাংলা বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থ বাবু এখন যতই ইন্দিরাজীর জীপ চালান না কেন পর্ষদে মহলের ধারণা, মন্ত্রিসভার আসন্ন রদবদলে সিদ্ধার্থবাবুর রেহাই নেই।